প্রবাসী, ৫৬শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৩

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিষয়সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসী, ৫৬শ ভাগ

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চড়ক-সন্ন্যাসী
শ্রীঅমিয়রঞ্জন বসু

"দূরের পাল্লা" [ফোটো—শ্রী আনন্দ মুখোপাধ্যায়

জলটুঙ্গী [ফোটো—শ্রী বিনয়ভূষণ দাস

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
১ম খণ্ড
বৈশাখ, ১৩৬৩
সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে নববর্ষের আগমন এক শুভদিন। বাংলা ও বাঙালীর কাছে সেইজন্য এই নবাগত ১৩৬৩ সন কল্যাণসম্পদবাহীরূপে আবাহনের যোগ্যতাপূর্ণ। আজ সেইজন্য আমরা পরিপূর্ণ মনপ্রাণে তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

কিন্তু জাতি যদি নিজের কল্যাণ ও দশের কল্যাণ প্রকৃতই চাহে তবে তাহার বিচার করা উচিত, সে সেই কল্যাণের আধাররূপে দেশকে ও নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে কিনা। যেমন অশুচি অবস্থায় পূজার অধিকার থাকে না, তেমনি অশুদ্ধ চিত্তে নববর্ষের আবাহনও হয় না এবং নববর্ষের শুভফলে অধিকারও জন্মায় না। আমাদের উচিত এই বিষয়ে জাগ্রত হওয়া, কেননা এই চেতনার অভাবেই আমরা গত কয় বৎসর বৃথা আক্ষেপে এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের চেষ্টায়, উন্মাদের ন্যায় কাটাইয়াছি। ফলে, অন্য অনেক প্রদেশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আমরা কেবল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার ক্ষমতা হারাইয়া পিছু হটিয়াই চলিয়াছি। এইরূপ যাত্রায় প্রগতি অসম্ভব এবং ধ্বংস অনিবার্য্য।

বাঙালী এককালে—মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও—সারা ভারতের অগ্রণী ছিল। আজ তাহার স্থান বহু পশ্চাতে। তখন বাঙালীর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা, তাহার দূরদৃষ্টি ও ব্যাপক প্রগতিপন্থী মনোভাব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

আজিকার বাঙালী প্রগতিবিরোধী, অধ্যয়নবিমুখ। রাজনৈতিক মাদক ও যৌনসম্পর্কিত কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছুতে তাহার প্রায় রুচি নাই। সারা ভারতে বাঙালীই প্রথম বহির্জগতের আলোক আহরণ করিয়া নিজের ও দশের উন্নতির কারণ হইয়াছিল। আজ সেই বাঙালীই কূপমণ্ডুক মনোভাবগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া, নিরুদ্দেশ যাত্রায়, উদ্দাম গতিতে চলিয়াছে। অন্তর্দ্দাহ ও আত্মকলহে জাতির প্রাণশক্তি তিলে তিলে নষ্ট হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। এমতাবস্থায় নববর্ষের আবাহন কি করিয়া সার্থক হইতে পারে?

হইতে পারে যদি আমরা প্রত্যেকে সচেতন ও সক্রিয় হইয়া নিজের এবং আপনজনের মনে শুচিভাব আনিতে পারি। সেজন্য সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণ। মনের ভিতরে সঞ্চিত ক্লেদ দূর করিবার একমাত্র পথ তাহাই। দেহমন এমতে শুদ্ধ না হইলে জয়যাত্রার আরম্ভ নিষ্ফল। জয়যাত্রার মুহূর্ত্ত আগত-প্রায়, আত্মশুদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে তাহাও কল্যাণপূর্ণ হইবে।

এই শুদ্ধির জন্য প্রথমেই ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দলগত চিন্তার ধারা বর্জ্জন করিতে হয়। যখন সারা পৃথিবী ঝড়ের আশঙ্কায় কাতর, তখন আমরা যদি শুধুমাত্র দলগত স্বার্থের তাড়নায় আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে ব্যস্ত থাকি তবে আমরা ক্ষীণবল ও ভগ্নবুদ্ধি হইয়া জগতের হাস্যাস্পদ হইবই, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে প্রমাণ তর্কযুদ্ধ ও কূটনৈতিক প্রয়াস আজ বাংলায় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার একাংশও উন্নয়ন-প্রয়াসে প্রযুক্ত হইলে দেশ কতই-না অগ্রসর হইতে পারিত!

বাঙালীর দুর্ভাগ্য এই যে, যে কংগ্রেস একদিন দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে নেতৃত্ব করিত সেই কংগ্রেস এখন দলগত দুর্নীতি এবং স্বার্থচিন্তায় এতই নীচে নামিয়াছে যে, ভারতে তাহার স্থান অতি নগণ্য। কিন্তু বাঙালীকে তো বাঁচিতে হইবে, বাংলাকে তো তার পূর্ব্বগৌরব ফিরাইতে হইবে, সুতরাং এখন দেশের চিন্তাশীল যাঁহারা এবং দেশের ভবিষ্যতের অধিকারী যাঁহারা তাঁহাদের দূর প্রসারিত দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎকে দেখিতে হইবে। কূপমণ্ডুকের ভবিতব্য মৃত্যুমাত্র, কাজেই আমাদের উদ্ধার হইতে হইবে সে অবস্থা হইতে।

ভারত সরকার কবিগুরুর শতবার্ষিকীর আয়োজন এখন হইতেই করিতে চাহেন। বাঙালী যদি জাগ্রত ও সচেতন হয় তবে ঐ শতবার্ষিকীতে সে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া গৌরবময় ভবিষ্যতের অধিকারী হইতে পারে।

আমাদের নববর্ষের আবাহনে যেন সেইদিনের আহ্বান জাগিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের বাংলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক।

বাংলার ভবিষ্যৎ সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের সহিত অনবচ্ছিন্ন-রূপে জড়িত, আশা করি এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যদি স্বীকৃত হয় তবে আমাদের দেখিতে হইবে আমরা কিরূপে অন্য প্রদেশগুলির সঙ্গে সমবেত ভাবে অগ্রসর হইতে

পারি। আমরা ঘরে বসিয়া রাজা-উজীর মারিব বা আত্মকলহে, পরনিন্দায় কিংবা ভোগসুখে বিভোর হইয়া থাকিব এবং অন্য রাজ্যের লোকেরা আমাদের সব কাজ করিয়া, আমাদের স্কন্ধে তুলিয়া প্রগতির পথে চলিবে—ইহা সম্ভব নহে। তাহারা নিজের কাজ গুছাইবে এবং অগ্রসর হইবে। বাঙালী নিঃস্ব হইতে নিঃস্বতর হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে ইহাই সম্ভাব্য এবং ঘটিতেছে তাহাই। এক কলিকাতার যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাকাইয়া দেখা যায় তবে তাহাতেই এই সামান্য সাত-আট বৎসরে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাই অতি আশ্চর্যজনক ও দুশ্চিন্তার কারণ বলিয়া ঠেকিবে। পেশার ক্ষেত্রে, চাকুরির ব্যাপারে, ছোট কারবারে, দোকানে, সর্ব্বত্রই ত আমরা হটিয়াই যাইতেছি। অথচ সেদিকে কাহারও চিন্তার বা প্রয়াসের চিহ্নই নাই। আছে শুধু গেদোক্তি ও সরকারকে গালিগালাজ। এরূপ বিকারগ্রস্ত অবস্থায় আর কতদিন চলিবে?

বাহিরের বিপদও আছে যথেষ্ট: পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তুদল ত আসিতেছেই। তাহারা ছিন্নমূল এবং বিভ্রান্তচিত্ত। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিক শক্তি তাহাদের নাই। না আছে তাহাদের সেই শারীরিক শক্তি বা অধ্যবসায় যাহার বলে পঞ্জাবী বা সিন্ধী উদ্বাস্তু আজ প্রায় স্বাবলম্বী। উহারা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বের গাত্রেই অঙ্গবৃদ্ধির কারণ, অথচ পাকিস্থানের চক্রান্তে এই স্রোতের প্রবাহ কমিবার সম্ভাবনাও নাই। যদি পশ্চিম বাংলা সবল ও দৃঢ় চিত্তে ইহার প্রতিকারে অগ্রসর হয় তবেই এ সমস্যা পূরণ হইবে। কিন্তু আমাদের সে বিষয়ে চিন্তার বা প্রয়াসের অবকাশ কোথায়? পাকিস্থান বিনা দ্বিধায় এই হিন্দু বিতাড়ন চালাইয়া যাইতেছে, কেননা তাহারা জানে ভারতে অন্তঃকলহ নানাদিকে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৃহবিবাদ পশ্চিমবঙ্গে।

এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে এই সমস্যা পূরণের উপর। ইহা এখন ক্রমেই যে রূপ ধারণ করিতেছে তাহাতে পরিণতিতে কোথায় কি হয় বলা যায় না।

নববর্ষের কল্যাণ যদি আমাদের কাম্য হয় তবে প্রাচীন ও পূর্ণ ভাবে পরীক্ষিত যে প্রগতির পথ আছে সেইগুলিই আবার আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালীকে খুব ভাল করিয়াই চিনিতেন—সেইজন্যই তিনি তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না।" আজিকার বাঙালী বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, স্থিতপ্রজ্ঞ ও পৌরুষগুণযুক্ত কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবতারণা চলে, কিন্তু "চালাকী"তে সে যে অদ্বিতীয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাই বাঙালীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। অথচ এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, আমরা উর্ব্বর-মস্তিষ্ক এবং চেষ্টা করিলে অতি কঠোর সমস্যাও বিচার-বিবেচনার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি। শুধু এই বিপদ যে, আমরা চিন্তার ক্ষেত্রেও আজি কোনরূপ প্রয়াসে কুণ্ঠিত। এই ভাব আমাদের দূর করিতেই হইবে।

রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতি

কেন্দ্রীয় শিল্পনীতির নূতন ব্যাখ্যা শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়াছেন। সরকারের বর্ত্তমান শিল্প-নীতি ১৯৪৮ সনে গৃহীত হইয়াছিল, এবং ইহার ভিত্তি ছিল মিশ্র অর্থনীতি। ১৯৪৮ সনের পর ভারতীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং প্রধান পরিবর্ত্তন এই যে, কংগ্রেসী সরকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন—সেই অনুসারে তাঁহাদের কার্য্যক্রমেরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। নীতির তাগিদে সব সময়ে প্রয়োজন গড়িয়া উঠে না, সামাজিক প্রয়োজনে নীতি গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমান শিল্পনীতি যখন গৃহীত হইয়াছিল তখন পরিকল্পিত অর্থনীতির কল্পনা ছিল না, সুতরাং শিল্পনীতির আশু সংশোধন অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া অনুসারে শিল্পনীতি সংশোধন করা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ভারতীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য—সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং এই আদর্শের অনুসরণে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত অর্থসন্নিবেশ প্রতিরোধ করিবে। এই ব্যবস্থার গুরু দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। ভবিষ্যতে খনিজ পদার্থের উত্তোলন এবং বুনিয়াদী ও বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। তবে এই সকল ক্ষেত্রেও নূতন খনি কিংবা শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেসরকারী ও সরকারী যুক্ত প্রচেষ্টার সম্ভাবনা থাকিবে। অধিকন্তু, যে সকল বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রের নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিবে, সেই সকল শিল্পে সরকার অংশ গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রেও রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

অমৃতসর কংগ্রেসে যে অর্থনৈতিক প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে তাহাই সরকারী নূতন শিল্পনীতির ভিত্তি। সম্প্রতি মোট আয়ের কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা হইবে না; তবে ব্যয়ের উপর কর-ধার্য্য নীতি সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হইবে। সম্প্রতি এই ব্যাপারে ভারত সরকার কয়েকজন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদের অভিমত চাহিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারা অভিমত দিয়াছেন যে, মোট আয়ের সীমা নির্দিষ্ট না করিয়া মোট ব্যয়ের উপর কর ধার্য্য করা উচিত।

নূতন শিল্পনীতি অনুসারে শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিঘোষিত হইবে। প্রথম শ্রেণীর শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি অনুসারে ছয়টি শিল্পকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছিল, এবং ইহারা যথাক্রমে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান উৎপাদন, জাহাজ নির্ম্মাণ। খনিজ তৈল এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার ও রেডিও নির্ম্মাণ। ঐ নীতি অনুসারে আণবিক শক্তি উৎপাদন ও অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ এবং রেলপথের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

নূতন শিল্পনীতি অনুসারে এই নয়টি শিল্প রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে; ইহার সহিত আরও দুইটি যুক্ত হইবে, যথা জীবনবীমা ও বিমান। অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা

যথোপযুক্ত মূলধন সৃষ্টি বা নিয়োগ করে নাই, সেই সকল শিল্পও সরকার নিজের আয়ত্তাধীনে আনিবেন। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বৃহদায়তন ঢালাই, বৃহৎ বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ইঞ্জিন, তামা, সীসা, জিঙ্ক, টিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থের উন্নয়ন, এবং খনি খননের জন্য ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহার উৎপাদনও রাষ্ট্র নিজ হস্তে লইবে। এতদিন পর্য্যন্ত এইগুলি ছিল বেসরকারী দায়িত্বের অধীনে। হীরক-খনি উন্নয়ন ও বৈদ্যুতিক তার নির্ম্মাণও প্রথম শ্রেণীর শিল্পের অন্তর্গত হইতে পারে, অর্থাৎ এইগুলি রাষ্ট্রের অধীনে আসিবে। এই সকল শিল্পক্ষেত্রে নূতন নূতন শিল্প-প্রচেষ্টা ব্যাপারে রাষ্ট্র বেসরকারী সহযোগিতাও গ্রহণ করিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারিবে, একচেটিয়া অধিকার কাহারও থাকিবে না। এই শ্রেণীতে পড়িবে—সার উৎপাদন, লৌহ খনিজ আকর উত্তোলন, ম্যাঙ্গানিজ আকর, ক্রোম আকর, বক্সাইট আকর উত্তোলন। আণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য বিবিধ খনিজ, এলুমিনিয়াম, যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ঔষধ নির্ম্মাণের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য, কৃত্রিম রবার, কাগজ ও বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম মণ্ড, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ এবং সামুদ্রিক জাহাজ পরিচালনা এই শ্রেণীতে পড়িবে। এই সকল ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না; রাষ্ট্রের নিকট হইতে ইহারা সমান ব্যবহার পাইবে।

অবশিষ্ট যাহা কিছু শিল্প সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইবে, এবং তাহা হইবে বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্র; কিন্তু প্রয়োজন হইলে যে কোনও সময় রাষ্ট্র ইহার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে, যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অগ্রগতি সন্তোষজনক না হয়। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত নীতির মধ্যে ব্যক্তিগত শিল্প-প্রচেষ্টা পরিচালিত হইবে। বেসরকারী শিল্পকে অর্থসাহায্য দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে, তবে সমবায় প্রচেষ্টার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকতর হারে আর্থিক সাহায্য পাইবে। এই আর্থিক সাহায্যের উপরের সীমা সাত কোটি টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত সাহায্য প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট শিল্পের অংশ ক্রয় করিবে। আর বৃহদায়তন ও স্বল্পায়তন শিল্পের মধ্যে, পরবর্ত্তী শিল্পকে রাষ্ট্র বেশী করিয়া সাহায্য করিবে। অর্থাৎ, বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত থাকিবে, ইহাদের উপর বৈষম্যমূলক কর ধার্য্য করা হইবে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎপাদনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। শিল্প-সংস্থার যাহাতে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় সে বিষয়ে রাষ্ট্র যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবে। বহুলাংশে বর্ত্তমান ব্যবস্থার অনুমোদন নূতন শিল্পনীতিতে বিঘোষিত হইবে। মিশ্রনীতিই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি থাকিবে, তবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের সীমানা পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইবে।' সমাজতান্ত্রিক নীতি আরও দৃঢ়তর ভাবে অনুসৃত হইবে এবং তাহার ফলে ব্যক্তিগত শিল্প রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে এবং প্রয়োজন হইলে যে-কোনও সময়ে ইহাদিগকে জাতীয়করণ করা যাইতে পারিবে। রাষ্ট্রের নীতি অনুসরণ করার উপর ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিবে। জাতীয়করণের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আশ্বাস দেওয়া হইবে না, যেমন দেওয়া হইয়াছিল ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতিতে।

ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত, এক অর্থে ইহা ঐতিহাসিক বিপ্লবাত্মক। রাশিয়া এবং চীন-বিপ্লবকে আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে দর্শন করি, কিন্তু ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইহাদের চেয়ে কোনও অংশে কম চমকপ্রদ নহে, তবে নিজের দেশের বলিয়া তেমন প্রশংসা লাভ করে না। পরের হয়ত সব কিছুই ভাল। ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অজানিতভাবে ধীরে ধীরে সম্পাদিত হইতেছে; অজানিত অর্থে খুব অল্পসংখ্যক জনসাধারণই এই বিপ্লবের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াস করে; চটকদারী বুলি মুখস্থ করার দিকেই আগ্রহ বেশী। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনবাদ—যাহা শ্রেণী সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যেন 'অঘটনঘটনপটীয়সী ভারতবর্ষে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা রক্তপাত ও শ্রেণীসংহারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহা শ্রেণী-সহযোগ ও শ্রেণী-বিবর্ত্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধনীকে মধ্যবিত্তের পর্য্যায়ে টানিয়া আনা এবং নির্ধনকে মধ্যবিত্তের পর্য্যায়ে তোলা ভারতীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও কাম্য; মার্ক্সীয় মতবাদ যে ধনী উত্তরোত্তর ধনী হইতে থাকিবে (Concentration of Capital) তাহা বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই গণতন্ত্র সমাজের নিম্নস্তর হইতে উপর দিকে ক্রমোন্নতিশীল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভূমিবণ্টন নীতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়াতে ভূমিবণ্টন-ব্যবস্থার প্রস্তাব দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ইহা যেন বিচারবুদ্ধির চেয়ে মানসিক প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রস্তাবিত ভূমি-সংস্কারের পিছনে কোন চিন্তাশীল আদর্শ নাই এবং ইহার ফলাফলের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ও গণনা করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় জমিদারী-প্রথার বিরুদ্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে দুইটি নীতির উপর ভূমি-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই দুইটি নীতি হইতেছে—অর্থনৈতিক পারদর্শিতা ও সামাজিক ন্যায়বোধ। যতদিন পর্য্যন্ত জমিদারী প্রথা ছিল ততদিন পর্য্যন্ত সামাজিক ন্যায়বোধের প্রয়োজন ছিল, কারণ—ইহার মাপকাঠিতে সামাজিক পর্য্যায় নির্ণয় ও আয়ের বণ্টন করার চেষ্টা ছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কার চারি প্রকারে সাধিত হইবে, যথা—(১) নিজস্ব কৃষির জন্য মালিক যে পরিমাণ জমি রাখিতে পারিবে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ; (২) মালিক যে জমি বর্ত্তমানে চাষ করিতেছে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ; (৩) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির অতিরিক্ত জমির পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা; (৪) রায়তী নিরাপত্তা এবং খাজনা নির্দ্ধারণ।

যে চাষী জমি তাহারই, এই কথা এতদিন কংগ্রেস বলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাক্য আর অনুসরণ করা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করেন না, সেইজন্য ইহার পরিবর্ত্তে নূতন নীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই নূতন নীতির নাম "পারিবারিক জমা" বা পারিবারিক খামার (family farm)। পারিবারিক জমা হইবে—একটি বিশিষ্ট পরিমাণের জমি যাহার খরচসমেত বাৎসরিক আয় হইবে ১,৬০০, টাকা এবং খরচ বাদ দিয়া মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,২০০, টাকায় এবং লাঙ্গল-পরিমিত জমির কম হইবে না। লাঙ্গল-পরিমিত জমি উক্ত পরিমাণের খামার নাও হইতে পারে, কিন্তু এই পরিমাণ জমির প্রধান উদ্দেশ্য—পরিবারের সমস্ত কর্ম্মঠ ব্যক্তির পূর্ণ কর্ম্মের ব্যবস্থা করা।

এইরূপ পারিবারিক খামারের প্রধান দোষ যে, ইহার সর্ব্বভারতীয় কোন মাপকাঠি হইতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জেলায়, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক খামারের পরিমাণ বিভিন্ন হইতে বাধ্য। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক খামার নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে আঞ্চলিক জমির উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এবং ইহা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ভারতবর্ষে প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর কৃষি নির্ভর করে বলিয়া বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের পরিমাণ এবং চক্রকর্ষণে (rotation of crops) বিভিন্নপ্রকার শস্যের উৎপাদিত পরিমাণেরও তারতম্য হইতে বাধ্য। এই ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য যে প্রকার কারণিক ব্যবস্থা এবং যে প্রকার খরচ প্রয়োজন তাহাতে জনসাধারণের যথার্থ মঙ্গল হইবে কিনা চিন্তার কথা।

এই কথা স্মরণীয় যে, এই ব্যবস্থা প্রচলন করিতে হইলে এক বিরাটসংখ্যক কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হইবে যাহাদের অনুমানের উপর সহস্র সহস্র কৃষক-পরিবারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা শক্তির হিসাবকালীন এই সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসাধুতা ও ঘুষের প্রাবল্য প্রকট হইতে বাধ্য, যেমন হইয়াছে বর্ত্তমানে বাংলাদেশে ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে।

অধিকন্তু, পারিবারিক খামারের পরিমাণ চিরন্তনভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তিগত আয়ও বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে পারিবারিক খামারের পরিমাণ কম-বেশী করিতে হইবে। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগ হইবে এবং তাহার ফলে পারিবারিক খামারের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, ইহা প্রতিদিনকার ঘটনা। সুতরাং সরকারী খাসে অতিরিক্ত পরিমাণ জমি থাকার প্রয়োজন—যাহা হইতে দ্বিধাবিভক্ত পারিবারিক খামারকে পুনরায় কাম্য পরিমাণে পূরণ করা যাইতে পারিবে। যেখানে জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান সেখানে পারিবারিক খামারের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বিস্তর জমির প্রয়োজন। রাষ্ট্র এত জমি কোথায় পাইবে এবং এই সকল খাস জমির চাষ করিবে কাহারা? অবশ্য দিনমজুররা, তাহা হইলে কি দিনমজুররা জমির মালিক হইতে পারিবে না। সরকারী প্রচেষ্টায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে—একদল চাষী হইবে জমির মালিক, আর একদল ভূমিহীন চাষী থাকিবে জমির মজুর হিসাবে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির দুর্দ্দশার কারণ

ভারতীয় ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ সি. এইচ. ভাবা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বলেন যে, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতায়, কেরাণীদের অযোগ্যতা প্রভৃতি কারণে ব্যাঙ্কগুলির খরচের হার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীভাবা বলেন, ১৯৪৮-১৯৫৫ সনের মধ্যে ভারতীয় সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৩৫ কোটি টাকা, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ সেস্থলে বৃদ্ধি পায় ৪৫ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যান হইতেই এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার স্বরূপ বোঝা যাইবে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির দুর্দ্দশার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ইকনমিক উইকলি" শ্রীভাবার উপরোক্ত মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীভাবা তুলনার জন্য কেন যে ১৯৪৮ সনকে ভিত্তি করিলেন তাহা দুর্বোধ্য। কারণ দেশ বিভাগজনিত চাপ ঐ বৎসরই ব্যাঙ্কগুলির উপর সবচেয়ে বেশী পড়ে। ১৯৪৮ হইতে ১৯৪৯ সনের মধ্যে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানত প্রায় ১০৫ কোটি টাকা হ্রাস পায়; সেস্থলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মাত্র সতেরো লক্ষ টাকা। স্পষ্টতঃই ভারতীয় ব্যাঙ্ক হইতে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কে আমানতের হস্তান্তরের জন্যই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানত এইরূপ কমিয়াছিল তাহা বলা যায় না। আমানত হ্রাসের প্রধান কারণ হইল ভারত হইতে পাকিস্থানে তহবিলের হস্তান্তর। ১৯৪৯ সনে ভারত হইতে পাকিস্থানে অর্থপ্রেরণের উপর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (exchange control) ব্যবস্থা প্রচলন করে তখন হইতেই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানত হ্রাস বন্ধ হয়। সুতরাং যদি কোন দীর্ঘমেয়াদী তুলনা করিতে হয় তবে তাহা ১৯৪৯ সনকে ভিত্তি করিয়া করাই সমীচীন। ১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫৫ সনের মধ্যে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ১৩৫ কোটি টাকা বাড়ে, সে স্থলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বাড়ে মাত্র ৪৪ কোটি টাকা। এই অবস্থায় ১৯৪৮

সনকে ভিত্তি করিয়া তুলনামূলক বিচারের ফলে শ্রীভাবার সিদ্ধান্ত বহুলাংশে ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে।

"ইকনমিক উইকলি" আরও লিখিতেছেন যে, তপশীলীভুক্ত ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানতের উপর যে শক্তিনিচয়ের প্রভাব পড়িতেছে তাহার সম্যক্ উপলব্ধির জন্য ১৯৪৯ হইতে ১৯৫২ এবং ১৯৫২ হইতে ১৯৫৫ সনের স্বতন্ত্র আলোচনা করা দরকার। ১৯৪৯ সনের শেষের দিকে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি দেশবিভাগের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হয় বলা চলে এবং ফলে পর বৎসর কোরিয়ার যুদ্ধজনিত 'গরম' বাজারের সকল সুবিধা তাহারা গ্রহণ করে। এই অবস্থায় ১৯৪৯-৫০ সনে তাহাদের মোট আমানত ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিও প্রায় সমান ভাবেই উপকৃত হয়, কিন্তু তাহা অপ্রত্যাশিত ছিল না। ১৯৫১ সনের মাঝামাঝি ভারতের বাহিরের কোরিয়া-যুদ্ধের বাজার-গরম শেষ সীমায় পৌঁছে এবং ১৯৫১ সনের নবেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বাজারমন্দার প্রভাব ভারতের উপর সম্পূর্ণভাবে পড়ে নাই। ১৯৫২ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানত বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। ১৯৫২ সনের শেষ ভাগে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ নাড়া খায় এবং সম্ভবতঃ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি এই সুযোগে তাহাদের প্রতিযোগিতা আরও জোরালো করে। এই সময় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির চাহিদা আমানত (Demand Deposit) হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৫২ সনে গোড়ার দিকে তাহা প্রায় ১৫ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি সর্ব্বপ্রকারে আমানতকারীদিগকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় শ্রীভাবা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যদি ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখিতেন তবে তাহার যৌক্তিকতা আংশিক অস্বীকার করা যাইত না।

কিন্তু ১৯৫২ সনের শেষ দিক হইতে ১৯৫৫ সনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯৫৩ সনে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানত ২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় অথচ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানত ১৬ কোটি টাকা হ্রাস পায়। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক রেট বর্দ্ধিত হওয়ায় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির উপর প্রত্যক্ষভাবে তাহার প্রভাব পড়ে, ফলে, তাহাদের চাহিদা আমানত ১৪ কোটি টাকা হ্রাস পায়। কিন্তু তাহাদের মেয়াদী আমানত হ্রাস পায় মাত্র দুই কোটি টাকা। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহাদের আমানতের পরিমাণ বজায় রাখিবার জন্য এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি কি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষতি হইয়াছে বলা যায় না, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদী আমানতের পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

মোটামুটি ভাবে দেখা যায় যে, ১৯৫২-১৯৫৫ সনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ১৬৯ কোটি টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; সে স্থলে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬ কোটি টাকা। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় ৯২ কোটি টাকা, আর এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির বাড়ে ১৩ কোটি টাকা।

উপসংহারে "ইকনমিক উইকলি"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি স্যর্ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্ক রেট বাড়াইবার জন্য যে আবেদন জানান এবং শ্রীভাবা ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত দাদনের উপর সুদের হার চড়াইবার ব্যাপারে ষ্টেট ব্যাঙ্ক সাহায্য করিতেছে না বলিয়া যে সমালোচনা করেন তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কজগতের প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিগণ বোধ হয় মনে করেন, ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত দাদনের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমতি দিতেছে বলিয়াই ব্যাঙ্কগুলির আয় বাড়িবার সুযোগ হইতেছে না। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, ঋণকারীরা যে হারে সুদ দিতে প্রস্তুত আছেন, কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই তাহা অপেক্ষা চড়া হারে সুদ ধার্য্য করা সম্ভব নহে। কিন্তু অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, বিশেষতঃ বেসরকারী অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের কর্ত্তব্য পালন সম্পর্কে কোনই মনোযোগ দিতেছে না।

খনিজ তৈল ও ভারতের সরকারী নীতি

খনিজ তৈল জাতির অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এখনও পর্য্যন্ত ভারতে খনিজ তৈল উৎপাদন আসাম প্রদেশেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। আসামে প্রথম তৈলখনি আবিষ্কৃত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ভূগর্ভ হইতে খনিজ তৈল নিষ্কাশনের জন্য প্রথম কূপ খনন করা হয়—সেই কূপের গভীরতা ছিল মাত্র ৬৬০ ফুট। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৯০০টিরও অধিকসংখ্যক কূপ খনিত হইয়াছে। সম্প্রতি আসামে খনিজ তৈলের আরও কয়েকটি আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতীয় খনিজ তৈলশিল্পের বিকাশের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত তৈল-নিষ্কাশণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী মালিকানার আওতায় ছিল। প্রকৃত পক্ষে, আসাম অয়েল কোম্পানীই তৈলশিল্পে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আসাম অয়েল কোম্পানী তৈলশিল্প হইতে কিরূপ মুনাফা লুটিতেছে, শতকরা তিন শত ভাগ লভ্যাংশ বিতরণের ব্যবস্থা হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। নবাবিষ্কৃত তৈল-অঞ্চলে কার্য্য চালাইবার জন্য ভারত সরকার আসাম অয়েল কোম্পানীর সহিত যুক্তভাবে একটি নূতন কোম্পানী গঠনের জন্য আলোচনা চালাইয়াছিলেন। আলোচনায় প্রাথমিক স্তরে ঠিক হয় যে, নূতন কোম্পানীটির সমগ্র মূলধনের এক-তৃতীয়াংশ সরকারের হাতে থাকিবে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ থাকিবে কোম্পানীদের হাতে। মৌলানা আজাদ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি অনুযায়ী সরকার সমগ্র মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগই

গ্রহণ করিবেন—অর্থাৎ নূতন কোম্পানীটি সরকার-নির্দ্ধারিত নীতিতেই পরিচালিত হইবে।

"ইকনমিক উইক্‌লি" পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, নবগঠিত কোম্পানীতে শতকরা ৫১ ভাগ মূলধন সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা সম্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র "সহ-অবস্থিত" নীতির জন্যই। ইহা মনে করা মোটেই সঙ্গত হইবে না যে, সরকার হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছেন—তৈল জাতির অন্যতম প্রধান সম্পদ এবং বিদেশীরা উহা লুটিয়া খাইতেছে। তৈলশিল্প সম্পর্কে সরকার এতদিন পর্য্যন্ত কোন সুদৃঢ় নীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, উপযুক্ত মূলধন ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবজনিত মানসিক দুর্ব্বলতা। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ে অভাবের জন্যই সরকার প্রথমে নূতন তৈল কোম্পানীটির অধিকাংশ মূলধন বেসরকারী হাতে রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

কি অবস্থায় সরকার নূতন নীতি গ্রহণে সাহসী হইলেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত প্রতিনিধি লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে খনিজ তৈলের অবস্থান ও উৎপাদন সম্পর্কে রুশ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট এবং আন্তর্জাতিক তৈল চুক্তি-সংস্থার (international oil cartel) বহির্ভূত একটি মার্কিন কোম্পানীর সহযোগিতার প্রস্তাব পাওয়ার পরই সরকার নূতন নীতি গ্রহণের মনোবল লাভ করিয়াছেন।

উক্ত প্রতিনিধি আরও লিখিতেছেন যে, সরকারের নূতন ঘোষণার ফলে আসাম অয়েল কোম্পানী এখন এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। যদি কোম্পানী সরকারের পরিচালনাধীনে থাকিতে সম্মত না হয় তবে আসামের নাহরকাটিয়া অঞ্চলে ৫০০ বর্গমাইল-ব্যাপী স্থানে তৈল অনুসন্ধানের যে অধিকার তাহারা লাভ করিয়াছে তাহা কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে।

ভারতের খনিজ-সম্পদ

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া আশু প্রয়োজন। সে বিষয়ে লোকসভায় যে আলোচনা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :

"নয়াদিল্লী, ৯ই এপ্রিল—প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালবীয় লোকসভায় তাঁহার মন্ত্রণালয়ের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে আলোচনার উত্তরে বলেন যে, ভারত সরকার বর্ত্তমানে দুইটি প্রাইভেট কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত বিন্ধ্যপ্রদেশের পান্না হীরক-খনি এবং রাজস্থানের একটি তাম্রখনি রাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, আসামে তৈল উৎপাদন ও তৈলের অনুসন্ধানের জন্য সরকার টাকা মূলধনযুক্ত একটি কোম্পানী সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ পরিকল্পনায় আসাম অয়েল কোম্পানী এক অংশীদার থাকিবেন। সরকার আসাম অয়েল কোম্পানীর নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সর্ত্তসমূহ লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, যদি কর্ত্তৃত্ব, পরিচালনা, কারিগরি সংক্রান্ত পরিচালনা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ ব্যবস্থা মানিয়া লইব, অন্যথায় আমরা মানিয়া লইব না।

শ্রীমালবীয় বলেন যে, রাজস্থানে যে প্রাইভেট কোম্পানী সীসা ও দস্তার খনিসমূহ পরিচালনা করিতেছেন, সরকার তাঁহাদিগকে সীসা ও দস্তা পিণ্ডের উৎপাদন এ বৎসর তিন শত টন হইতে বাড়াইয়া পাঁচ শত টন এবং অতি সত্বর এক হাজার টন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীমালবীয় আশা করেন যে, পান্না হীরক খনি সরকারের হাতে গেলে পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে উহার উৎপাদন ৩০ হইতে ৪০ গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

তৈল আহরণ সম্পর্কে শ্রীমালবীয় বলেন, ভারতীয় যন্ত্রবিদ্‌গণ আবশ্যক জ্ঞান অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত তৈল অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য বিদেশী তৈল কোম্পানীসমূহের সাহায্যের উপর নির্ভর করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন পাঁচ লক্ষ টনের অধিক নহে; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ভারতে খনিজ তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টন হইবে। ইহার অর্থ বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়। এমতাবস্থায় সরকার সম্ভবপর স্থলে বিদেশী কোম্পানীসমূহের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া তৈল অনুসন্ধান ও আহরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তিনি টাকা মূলধনযুক্ত একটি কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার ও আসাম অয়েল কোম্পানীর মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে, উহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ামাত্র পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয় লোকসভায় উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীমালবীয় বলেন যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর সহিত সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী বঙ্গীয় অববাহিকায় তৈল অনুসন্ধান করা হইতেছে। আশা করা যায়, সত্বর পরীক্ষামূলক কূপ খনন আরম্ভ হইবে; তখন জানা যাইবে, আহরণের উপযুক্ত পরিমাণে তৈল আছে কিনা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার কাংড়া উপত্যকায়, রাজস্থানের যশল্মীরে এবং ক্যাম্বেতে তৈলের জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার এখন উত্তরপ্রদেশে গাঙ্গেয় উপত্যকার কোন কোন অংশেও প্রাথমিক অনুসন্ধান করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। অনেক বিবেচনা এবং ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ও ভারতীয়দিগকে সাহায্য করিবার জন্য আগত বিদেশী সংস্থাসমূহের মধ্যে অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, পঞ্জাবের যে অঞ্চল তৈল কিম্বা গ্যাস পাওয়ার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছে তথায় পরীক্ষামূলক কূপ খননের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই পরীক্ষামূলক প্রথম কূপ-খনন আরম্ভ হইবে। আশা করা যায়, আমরা সাফল্যলাভ করিব। আমরা যদি অনুকূল কোন ফল পাই, তাহা হইলে তিন-চার মাস পর আর একটি কূপ-খনন করিব। এইভাবে আমরা আমাদের কারিগরদিগকে ট্রেনিং দিব।

শ্রীমালবীয়ের বক্তৃতার পর একজন সরকারী মুখপাত্র তাম্রখনি-সমূহসম্বন্ধে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, রাজস্থানে বে-সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত একটি তাম্রখনি অবিলম্বে সরকার গ্রহণ করিবেন। বিহারে বর্ত্তমানে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত একটি তাম্রখনি বর্ত্তমান অবস্থায়ই থাকিতে দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে সরাসরি সরকার তাম্র আহরণ করিবেন।

মণিলাল গান্ধী

৫ই এপ্রিল নিম্নস্থ সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

"ডার্ব্বান, ৪ঠা এপ্রিল—মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমণিলাল গান্ধী ডার্ব্বানের নিকটবর্ত্তী ফিনিক্সস্থিত তাঁহার ভবনে আজ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ পীড়িত ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্র মণিলালের জন্ম ১৮৯৪ সনের ২৮শে অক্টোবর। তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয় ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায়।

১৯১৪ সনে পিতার সহিত তিনি ভারতে আসেন। কিন্তু "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণের জন্য মহাত্মা গান্ধী ১৯১৮ সনে মণিলালকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেন। পিতার নির্দ্দেশ তিনি নতমস্তকে গ্রহণ করেন। আমৃত্যু মণিলাল ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের সম্পাদক ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ঘৃণ্য বর্ণবৈষম্য নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন মণিলাল। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এজন্য বহুবার তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং অনশন পালন করেন। ১৯৫৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সাত জন ইউরোপীয়ের সহিত তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া পঞ্চাশ ষ্টার্লিং অর্থদণ্ড বা পঞ্চাশ দিনের বাধ্যতামূলক শ্রমদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের নোটিশ দিলেও পরে তিনি তাহা প্রত্যাহার করিয়া পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।"

মণিলাল আমাদের বহু দিনের পরিচিত বন্ধু ছিলেন। মহাত্মার ব্যক্তিত্বের ছায়া একমাত্র মণিলালের মধ্যেই ছিল। এরূপ সরল, স্বচ্ছ অথচ দৃঢ়চিত্ত সন্তান ভারতমাতার অল্পই ছিল।

মণিলালের মৃত্যুর সংবাদে আমরা আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছি। তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ হউক।

ভাষাগত আন্দোলন

আমরা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সৃষ্টির পক্ষে বহুদিন যাবৎ লিখিতেছি। আজ যাঁহারা এ বিষয়ে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের কোনও সাড়াশব্দ এতদিন আমরা পাই নাই। আজ যে উত্তেজনার সৃষ্টি তাঁহারা করিতেছেন তাহার পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে আমরা বুঝিতে অক্ষম। কেননা যদি তাহা সত্য সত্যই কেবল ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্যই হইত তবে তাহার সূচনা অন্ততঃ সাত বৎসর পূর্ব্বে হইত। সুতরাং আমরা পণ্ডিত নেহরুর উক্তি প্রকাশ করিতেছি। আমাদের সকলেরই এ বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন।

"বিজাপুর, ৮ই এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোকের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে এই বলিয়া ভাষাগত আন্দোলনের নিন্দা করেন যে, 'এতদ্দ্বারা আপন দেহেই আঘাত করা হইতেছে' এবং ইহার একমাত্র ফল হইবে এই যে, দেশ আরও বিভক্ত হইয়া যাইবে, দেশে আরও অনৈক্য দেখা দিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত জাতির অস্তিত্বই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

শ্রীনেহরু আরও বলেন, কোন কোন স্থানে যে আন্দোলন বা 'সত্যাগ্রহ' চলিতেছে, উহা 'দুই হাতের কলহ' ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীনেহরু কোনও বিশেষ অঞ্চলের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন, একটি রাজ্যে এই আন্দোলন 'চাপ দিয়া কার্য্যসিদ্ধির' কৌশল রূপেই দেখা দিতেছে।

মনে রাখিবেন আমরা সকলেই একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গরূপে রহিয়াছি। একটি অঙ্গুলিতে যদি আঘাত লাগে, তবে, উহার বেদনা সমগ্র দেহেই অনুভূত হয়। ভারত-রাষ্ট্রদেহের অঙ্গরূপেই রাজ্যসমূহ রহিয়াছে।

শ্রীনেহরু বলেন, আমরা যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করি, অনৈক্য আনয়ন করিয়া নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত না করি।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ছায়া

গ্লাব পাশাকে বিদায় করার পর হইতেই পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিম্নস্থ সংবাদে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"লণ্ডন, ১০ই এপ্রিল—জেরুজালেমে জনৈক ইসরাইলী সামরিক মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিশরীয় সীমান্তের বিপরীত দিকে ব্যূহ নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে ইসরাইলী স্বেচ্ছাসৈন্যেরা লরীযোগে রওনা হইয়া গিয়াছে।

ইসরাইলী মুখপাত্র আরও বলেন, গত তিন রাত্রিতে যে সকল মিশরীয় কম্যাণ্ডো সেনা ইসরাইলী সীমান্ত এলাকায় আঘাত হানিয়াছে, তাহাদিগকে আটক করিবার জন্য ইসরাইল এক অতি বৃহৎ "টানা-জাল" পাতিয়া রাখিয়াছে।

ইসরাইল কর্তৃপক্ষ এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, কম্যাণ্ডো সেনারা গত রাত্রিতে তিনটি বিভিন্ন স্থানে যানবাহনের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইলে দুই জন নিহত ও চারি জন আহত হয়।

অদ্য কায়রো বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, ইসরাইলীদের আক্রমণের ফলে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলিয়া মিশরীয় সেনাবাহিনী প্রস্তুত রহিয়াছে।

"দামাস্কাস, ১০ই এপ্রিল—অদ্য সিরিয়ার জনৈক সামরিক মুখপাত্র বলেন, গত রাত্রিতে ইসরাইলী টহলদার সেনারা যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করিয়া সিরিয়ান এলাকায় প্রবেশ করিলে সিরিয়ান সৈন্যেরা প্রচণ্ড ভাবে গোলাগুলী চালায়।

পশ্চাদপসরণকালে, ইসরাইলীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলিয়া যায়।

পাকিস্থান ও ভারত প্রতিরক্ষা

পাকিস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ অস্ত্রসরবরাহ করিয়াছে ও করিতেছে তাহাতে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে শঙ্কাজনক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর নিম্নস্থ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"নয়াদিল্লী, ২১শে মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থানে 'প্রচুর পরিমাণ' সামরিক সাহায্য আসার ফলে ভারতের পক্ষে এক 'ভয়ঙ্কর সমস্যা' দেখা দিয়াছে—কেননা—উন্নয়নমূলক কার্য্যকলাপে যে সম্পদ নিয়োজিত হইতে পারিত, তাহা সামরিক প্রয়োজনে তলব করা হইতে পারে।

শ্রীনেহরু বলেন, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে 'যুদ্ধাশঙ্কার কোন লক্ষণ' দেখা দিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু, জরুরি অবস্থা উদ্ভবের আশঙ্কাও উপেক্ষা করা চলে না।

শ্রীনেহরু বলেন, সামরিক জোট গঠন করিয়া 'আমাদের উপর যে সমস্যা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে', উহার আশু কোন জবাব আমি দিতে পারিতেছি না। কিন্তু, যখনই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক না কেন, স্বভাবতঃই তাহা সংসদকে জানান হইবে। সভা যেন মনে না করেন যে, সমস্যাটি সম্পর্কে আমরা অহেতুক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। স্বভাবতঃই আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন রহিয়াছি এবং ইহাও ঠিক যে, আমরা নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতেছি না।

বিতর্কে যোগদান করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, প্রতিরক্ষায় অন্তর্নিহিত কয়েকটি নীতি এবং বিশেষ করিয়া, ভারতবর্ষ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, সেগুলির প্রতি আমি লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই বিতর্ককালে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুটা উদ্বেগ ও অস্বস্তি এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে এবং আমরা হয়ত তজ্জন্য প্রস্তুত নহি—এমন একটা ভয় ও আশঙ্কা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সন্দেহ নাই—সীমান্ত অঞ্চলে হাঙ্গামার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া এবং একটি শক্তিমান বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের প্রতিবেশী দেশকে সামরিক সাহায্য দান করিতেছে বলিয়াই এ সকল আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

শ্রীনেহরু বলেন, একটি শক্তিশালী দেশ হইতে সামরিক সাহায্য আসিতেছে বলিয়া ভারতের প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত পরিস্থিতি বিপুলভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। অবস্থার এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আমাদিগকে সকল কিছু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

যুদ্ধবিজ্ঞানের দিক হইতে প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধাস্ত্রের যে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অন্য কোন ক্ষেত্রেই সেরূপ ঘটে নাই।

সমরাস্ত্রের উন্নতির সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এদিক হইতে বিচার করিলে প্রচুর আণবিক অস্ত্রের অধিকারী দুইটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশই প্রতিরক্ষায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। এদেশের প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি পর্য্যাপ্ত কি না, তাহা আমরা কিভাবে বিচার করিব? আণবিক অস্ত্রের অধিকারী কোন শক্তি যদি নিছক সামরিক দিক হইতে ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষায় কিছুই নাই। কিন্তু, অন্যান্য দিক হইতে আমরা, এমনকি, আণবিক বোমার বিপদেরও সম্মুখীন হইতে পারিব। কেননা, যে জাতির প্রাণ আছে, শক্তি আছে, ঐক্য আছে, যাহারা কোন বিপদের সম্মুখেই আত্মসমর্পণ করিতে জানে না, তাহারা কদাপি পরাস্ত হয় না।"

পাকিস্থান ও মার্কিন অস্ত্র

মার্কিন যুদ্ধ দপ্তর কি ভাবে পাকিস্থানকে সশস্ত্র করিতেছে, তাহার কিছু ছায়া নিম্নের সংবাদে পাওয়া যায়।

"করাচী, ৯ই এপ্রিল—মার্কিন বিমানবাহিনীর জেনারেল জন ও'হারা সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, মার্কিন সামরিক সাহায্য চুক্তি অনুসারে পাক বিমানবাহিনীর জন্য সাজসরঞ্জাম প্রেরণ অদূর-ভবিষ্যতেই ত্বরান্বিত করা হইবে।

জেনারেল জন এক সপ্তাহ পাকিস্থানে সফর শেষ করিয়া অদ্য পশ্চিম এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পাকিস্থান বিমান-বাহিনীর জন্য মার্কিন সামরিক সাহায্যের বিশদ বিবরণ জানিতে চাহিলে তিনি প্রশ্নটি এড়াইয়া যান।

তিনি বলেন, আমি শুধু এটুকুই বলিতে পারি যে, পাকিস্থান সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের জেট বিমান পাইবে।

একটি প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ও'হারা বলেন, সামরিক সাহায্যের পরিমাণ সম্পর্কে পাকিস্থানে বিন্দুমাত্র অসন্তোষও নাই। অবশ্য, আমি স্বীকার করি যে, সাজসরঞ্জাম ধীরে আসিতেছে বলিয়া অসন্তোষ রহিয়াছে।

মন্থরগতিতে প্রেরণের কারণ হইতেছে এই যে, পাকিস্থানকে যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা প্রয়োজন সেগুলির মোটামুটি ঘাটতি রহিয়াছে।

জেনারেল ও'হারা বলেন, কোন মজুত ভাণ্ডার হইতে এ সকল অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে না—মার্কিন বিমানবাহিনীর নিয়মিত ভাণ্ডার হইতেই এগুলি প্রেরণ করা হইতেছে। পাকিস্থান বিগতকালে ব্রিটেনের নিকট হইতে যে সকল সামরিক সাজসরঞ্জাম পাইয়াছে, সেগুলির সহিত আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা কঠিন হইবে না।

ভারত, কাশ্মীর ও পাকিস্থান

বিগত ২রা এপ্রিল পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের প্রচার সম্পর্কে তাঁহার মতামত যাহা দিয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এত দিন পরে পণ্ডিত নেহরু পাকিস্থানের অপপ্রচার সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য কিছু করিয়াছেন বলিয়াই উহা প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য এই মন্তব্য অনেক পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল :

"২রা এপ্রিল, এক সাংবাদিক সম্মেলনে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনি আর কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী নহেন বলিয়া যে ধারণা করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই। লোকসভায় তাঁহার বক্তৃতায় তিনি কাশ্মীরে গণভোট চাহেন না বলিয়া যে ধারণা করা হইতেছে তাহা ঠিক কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রধানমন্ত্রী জবাবে বলেন, 'প্রায় সেই রকমই'।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, তিনি সর্ব্বদাই এই সমস্যা (গণভোটের) সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু বাস্তববাদী হিসাবে তিনি বলিবেন যে, ইহা তাহাদিগকে 'অন্ধ গলিতে' লইয়া যাইতেছে। 'সুতরাং যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সেইদিক হইতে একটা মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারি'।

শ্রীনেহরু বলেন যে, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে গত শনিবার যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, যদি আইনগত ও সংবিধানগত দিক হইতে সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ইহাই ঠিক যে, পাকিস্থান আক্রমণকারী, এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি বৈধ ও সম্পূর্ণ ; কিন্তু উহাকে বাস্তব দিক হইতে বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে গত আট বৎসরে যে বিভিন্ন অবস্থার বা ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সবই বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেখানে বিভিন্ন সংবিধানগত ও বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আমি বলিতে চাই যে, কাশ্মীর সম্পর্কে মিঃ বুলগানিন এবং মিঃ ক্রুশ্চেভ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা আইনগত, সংবিধানগত ও বাস্তব দিক হইতে সম্পূর্ণ নির্ভুল'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, লোকসভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, সেই বক্তৃতায় কাশ্মীরের প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ঘটনা সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াতেই তিনি বিশদভাবে বলিয়াছেন, 'ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে মতবৈষম্য তাহা বুঝা যায়, কিন্তু মূল ঘটনা যাহা রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে এবং সেই জন্য সেইগুলির পুনরুল্লেখ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি মনে করি পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবটাই সম্পূর্ণ ভুল।' অতঃপর শ্রীনেহরু বলেন, এই সমস্ত বিষয় বহুবার বলা হইয়াছে। প্রথম ঘটনা ভারতভুক্তি, ভারতভুক্তি সম্পর্কে আইনগত ও সংবিধানগত কোন সন্দেহই নাই এবং 'যদি মিঃ মহম্মদ আলি ও অপরাপরে বলিতে থাকেন যে, ইহা প্রবঞ্চনা করিয়া করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার এবং পাকিস্থানে অপরদের কোন সুবিধা হইবে না'।

শ্রীনেহরু বলেন যে, পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক সাহায্য এবং কাশ্মীরের অভ্যন্তরে গত কয়েক বৎসরে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইবে। মার্কিন সামরিক সাহায্যের জোরে ভারতের চারিদিকে, এমন কি পাকিস্থান-অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পর্য্যন্ত, সামরিক ঘাটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উহা ভারতের দেশরক্ষার দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি ইহা উল্লেখ করেন যে, গণভোট গ্রহণের প্রথম সর্ত্ত ছিল সৈন্য অপসারণ। কিন্তু এতৎসম্পর্কে আলোচনার পর পাকিস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহার ফলে সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া সমগ্র পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

তিনি বলেন যে, কাশ্মীরের ভিতরে বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং আরও উন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। শীঘ্রই কাশ্মীর সংবিধান চূড়ান্ত হইবে এবং উক্ত সংবিধানের ভিত্তিতে ঐ রাজ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইতেছে।

প্রধানমন্ত্রী সিয়াটো সম্মেলন সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, শ্রীবুলগানিন ও শ্রীক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে, জনগণ কাশ্মীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং কাশ্মীর রাজ্য ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সোভিয়েট নেতাদের এই অভিমত সম্পর্কে সিয়াটো শক্তিবর্গ সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীনেহরু বলেন যে, সোভিয়েট নেতাদের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্য।

পাক প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থান বাহিনী ১৯৪৮ সনে মে মাসে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীনেহরু এই উক্তির প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, পাকিস্থান বাহিনী ১৯৪৭ সনে নবেম্বর মাসেই কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে, উহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

কাশ্মীরে যখন গোলযোগ চলিতেছিল, তখন পাকিস্থান আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী যে উক্তি করিয়াছেন, শ্রীনেহরু তাহারও প্রতিবাদ করিয়া বলেন, হানাদারেরা যখন আসিয়াছিল, তখন কাশ্মীরে কোনই গোলযোগ ছিল না। ইহা অনাহূত, অযৌক্তিক, উপদ্রব ও আক্রমণ।'

শ্রীনেহরু বলেন, পাকিস্থানের প্রতিনিধি মিঃ জাফরুল্লা খান যখন প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন তিনি অনেকগুলি বিবৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবৃতিসমূহ আগাগোড়াই মিথ্যায় পরিপূর্ণ। সংসদে আমি ইহা বলিয়াছি এবং পুনরায় ইহার উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলেন, একটি মজার ব্যাপার এই যে, কাশ্মীর আক্রমণের সূচনায় কোন ভারতীয় বাহিনী সেখানে ছিল না। আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর বহুদিন কাশ্মীরে একজনও ভারতীয় সৈন্য যায় নাই। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা আক্রমণকারীদের নিকট উন্মুক্ত ছিল। শ্রীনগরের জনসাধারণই শ্রীনগর রক্ষা করিয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন, পাকিস্থানের সহিত কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার জন্ত আমরা বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়াছি; কারণ পাকিস্থানের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করাই আমাদের অভিপ্রায়। কিন্তু কোন মীমাংসা হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইতে হইয়াছে; কাশ্মীরে নির্ব্বাচন হইয়াছে এবং সেখানে বিধানসভাও গঠিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থান শুল্ক বিভাগের এক ব্যাগ ঘোষণা কবর সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ১৯৫৩ সনে এই কবর বাহির করা হইয়াছে। উহাতে 'পর্ত্তুগীজ পাকিস্থান' উল্লেখ আছে। তিনি বলেন যে, পর্ত্তুগালের এই উপনিবেশ ত্যাগ করিবার পর পাকিস্থান গোয়ার উপর একটা দাবি করিবার চিন্তা করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে যে খবর বাহির হইয়াছে, প্রধানমন্ত্রী তাহা সমর্থন করেন এবং বলেন যে, ইহা পুরাতন ব্যাপার। দুই বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে, তবে মাল পৌঁছাইয়া দেওয়ার চুক্তি সম্প্রতি হইয়াছে। অস্ত্র ক্রয়ের নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা অস্ত্র ক্রয় সম্পর্কে কোন দেশের সহিত বাঁধা থাকিতে চাহি না, কখন কোথায় ও কি অস্ত্র কিনিতে হইবে তাহা ভারতই ঠিক করিবে।'

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করিতে চাহিয়াছে—এই কথা শ্রীনেহরু অস্বীকার করেন, তবে তিনি বলেন যে, ভারতই রাশিয়ার সামরিক ও অসামরিক বিমান পাওয়া যায় কিনা, তাহা জানিতে চাহিয়াছিল। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ প্রধান নৌ-সেনাপতি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সহিত বিমানবাহী জাহাজের সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা হইয়াছে।"

পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি সম্পর্কে আমাদের মত এইমাত্র যে, পাকিস্থান যে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা ভিন্ন আর কিছু চাহে না, তাহার ভারতকে বিপন্ন করার চেষ্টার যে অন্ত নাই, এ বিষয়ে বিশ্বজগতে বোধ হয় পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার কটিকতক চক্রান্তকারী চাটুকার ভিন্ন আর কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। তবে অযথা এইরূপ যাচিয়া বন্ধুত্ব করার চেষ্টার অর্থ কি? গোড়ায় পাকিস্থানের হানাদারদিগের অমানুষিক বর্ব্বরতা ও পাকিস্থান সরকারের ক্রুর ও শঠতাপূর্ণ আচরণের কথা আমরা চাপিয়া গিয়াছিলাম বলিয়াই ত জাফরুল্লা এই মিথ্যার অভিযানের সৃষ্টি করিতে সুযোগ পান। সুযোগ আরও বাড়ে সে সময় আমাদের এক অতি অযোগ্য ও অপদার্থ রাষ্ট্রদূতের কার্য্যে অমনোযোগে। মার্কিন দেশে যখন পাকিস্থান মিথ্যার বন্যা বহাইয়াছিল, ইনি তখন আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন; তাহার খণ্ডনে তৎপর না হইয়া আলস্যে ও বিলাসে সময় কাটাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অতীতের কথা ছাড়িয়া এখন ভবিষ্যতের চিন্তা প্রয়োজন। আমাদের এখন সকল সামরিক বিষয়ে সচেষ্ট প্রস্তুতির সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু

নিম্নস্থ বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত। আমাদের মন্তব্য সর্ব্বশেষে দেওয়া হইল:

"কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বৃহস্পতিবার ২৯শে চৈত্র কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিপুল হারে উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থান সরকার নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিশ্রুতি সর্ব্বাংশে রক্ষা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভারত ঐ চুক্তির প্রতিটি অক্ষর পালন করিয়া চলিয়াছে।

"শ্রীখান্না উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি সম্পর্কে জানান যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসরকার পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্ত তিন লক্ষ একরের মত জমি দিতে চাহিয়াছেন।

"তিনি আরও জানান যে, সবচেয়ে বেশী জমি পাওয়া যাইতেছে ত্রিপুরার এক উপত্যকায়। এখানে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশমত ৮০,০০০ একর বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। বিন্ধ্যপ্রদেশ সরকার পান্না, ছত্রপুর, টিকমগড় ও দাতিয়া জেলা কয়টিতে ৭০,০০০ একর জমি দিতে চাহিয়াছেন।

"ইহা ছাড়া, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার যথাক্রমে ১২,০০০ ও ৫৬,০০০ একর জমি দিতে চাহিয়াছেন। শেষোক্ত এই দুই জায়গার জমি ছাড়া, অবশিষ্ট সব জায়গার জমিই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

"শ্রীখান্না বলেন, সরকারের ইচ্ছা, প্রত্যেক পরিবারকেই সংস্থান-নির্মাণোপযোগী জমি দেওয়া হয় এবং যেখানে [illegible] লক্ষ সেখানে আত্ম-পরিপূরক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা এই ব্যবস্থাও করিবেন ভাবিতেছেন যে, জমি উদ্ধার ও উন্নয়নের সময় উদ্বাস্তুগণকে স্ব স্ব পুনর্বাসনের জায়গায় ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হইবে। তাহাতে তাহারা ঐ উদ্ধার ও উন্নয়নকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

"ক্রমবর্দ্ধমান হারে উদ্বাস্তু সমাগম সম্পর্কে পাকিস্থানী নেতাদের নানা মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ণয়ের ভার পাকিস্থান সরকারের। তাঁহাদের ভারত সরকারের কর্ত্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া এক্ষেত্রে কোন লাভ নাই।

"শ্রীখান্না এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, পাকিস্থান সরকার নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিশ্রুতি সর্ব্বাংশে রক্ষা করেন নাই। পাকিস্থান সরকারের প্রস্তাব মত ভারত সরকার উদ্বাস্তু সম্পত্তি আইন বাতিল করিলেও পাকিস্থান উহার মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, পাকিস্থান কি করে ভারত তাহার অপেক্ষায় থাকে না। ভারত নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিটি

অক্ষয় পালন করিয়া চলিয়াছে। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কথা ভারতের পথনির্দ্দেশকস্বরূপ। শ্রীখান্না এরূপ আশ্বাস দেন যে, যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কোথাও চুক্তির কোন প্রকার খেলাপ তাঁহার (শ্রীখান্নার) নজরে আনিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি উহার নিরাকরণের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। এখানে জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকেরই স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়; ভারত তাহাই দেখিতেছে।

"ভারত সরকার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সম্পর্কে কড়াকড়ি করিতেছেন কিনা—শ্রীখান্না এই বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে রাজী হন না। তিনি বলেন, যাহারা ভারতে চলিয়া আসিবে তাহাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাদি করাই পুনর্বাসনমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কাজ। এই সমস্যাটা অত্যন্ত বিরাট।

"শ্রীখান্নার হিসাবমত অন্যান্য রাজ্য পুনর্বাসনের জন্য নিম্নরূপ জমি দিতে রাজী হইয়াছেন:

"মহীশূর (৪,৫০০ একর), অন্ধ্র (৩,৪০০ একর), রাজস্থান (১,২০০ একর), উড়িষ্যা (৩০,০০০ একর), উত্তরপ্রদেশ (৩,৬০০ একর), এবং আসাম (৬,০০০ একর)। সৌরাষ্ট্রে ৩০০ ধীবরকে বসাইবার আয়োজনও চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আনার চেষ্টা চলিতেছে।

"তিনি আশা করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে আগামী ছয় মাসের মধ্যেই পুনর্ব্বাসনের কাজ সুরু হইয়া যাইতে পারে।

"শিক্ষা ও ক্ষয়রোগ চিকিৎসাবাবদ পুনর্ব্বাসন বিভাগ কি করিতেছেন তাহার এক হিসাব দিতে গিয়া শ্রীখান্না বলেন, উদ্বাস্তুদের মধ্যে ক্ষয়রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। ১লা জানুয়ারী হইতে এযাবৎ তাঁহারা শিক্ষা খাতে ১২ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।"

আমাদের মনে হয় উদ্বাস্তু সম্পর্কে বিশেষতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তু সম্পর্কে এখন নূতন করিয়া অবস্থা ও ব্যবস্থার চিন্তা করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই যে বর্ত্তমানে যেরূপ কার্য্যক্রম চলিয়াছে তাহাতে উদ্বাস্তু সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না। পাকিস্থান এ বিষয়ে যে আমাদের কণামাত্র সাহায্য করিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব হয় আমাদের সমস্ত পূর্ব্ব-পাকিস্থানী হিন্দুদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নচেৎ অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে পাকিস্থানের এই কূটনীতি বিফল হয়। বলা বাহুল্য উদ্বাস্তু যাহারা তাহারা এতদিন নিজের উদ্ধারের কোন চেষ্টা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে করিবে না তাহাই ভাবা উচিত। কেননা তাহাদের কুপরামর্শদাতা ও তাহাদের নৈতিক অবনতির সুযোগে যাহারা স্বার্থসিদ্ধি করে, এই দুই দলই এখনও প্রবল।

জাহাজী উদ্যোগ

লোকসভায় পরিবহণ বিভাগীয় দপ্তরের বরাদ্দ সম্পর্কে বিতর্কের সময় পরিবহণ বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী জাহাজশিল্প সম্প্রসারণের জন্য সরকারের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত শীঘ্রই জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে (গত ৬ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হইয়াছে)। তিনি আরও বলেন যে, ভারত ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে জাহাজ চলাচলের জন্য যুগোস্লাভিয়া হইতে আগত এক প্রতিনিধিদলের সহিতও ভারত সরকার আলোচনা চালাইতেছেন। যুগোস্লাভিয়ার জাহাজনির্ম্মাণ কারখানাতে ভারতের জন্য জাহাজ নির্ম্মাণ করা যায় কি না সেই বিষয়েও আলোচনা চলিতেছে বলিয়া শ্রীশাস্ত্রী বলেন।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রকাশ করেন যে, মার্চ্চ মাসের শেষে ভারতের জাহাজের পরিমাণ ৪৮০,০০০ টন হইবে। ১৯৫৭ সনের মাঝামাঝি সময় উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ টন হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ নয় লক্ষ টন দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীশাস্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাহাজ নির্ম্মাণের লক্ষ্য হিসাবে দশ লক্ষ টন না ধরায় তিনি কাহারও অপেক্ষা কম দুঃখিত হন নাই। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, বেসরকারী জাহাজ কোম্পানীগুলি অগ্রণী হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাহাজনির্ম্মাণের জন্য যে সকল সাহায্য ও ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন। তবে যদি বে-সরকারী কোম্পানীগুলি সেরূপ উদ্যোগী না হয় তবে সরকার স্বয়ং জাহাজশিল্প সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করিবেন।

ভারতের বন্দরগুলির উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, কান্দলা বন্দরের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, ১৯৫৭ সনের মার্চ্চ মাসের মধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইবে। এই বন্দরটি দ্বারা ভারতের বন্দরগুলির ক্ষমতা দশ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কান্দলা বন্দরে আরও দুইটি বার্থ সংযোগ করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বড় বড় বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। মন্ত্রীমহোদয় জানান যে, ছোট ছোট বন্দরগুলির উন্নতির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র বন্দরের উন্নয়নার্থক পরিকল্পনা রচনার কাজে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একজন বিশেষভাবে নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আড়াই কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে পারদীপ (উড়িষ্যা), তুতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর এবং মালাপ (মাদ্রাজ) বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য।

৬ই এপ্রিল লোকসভায় উৎপাদন মন্ত্রণালয়ের ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে উৎপাদন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসতীশচন্দ্র বলেন যে, দ্বিতীয় একটি জাহাজনির্ম্মাণ কারখানার জন্য কয়েকজন সদস্য যে দাবী জানাইয়াছেন তাহা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত এবং আশা করা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাঝামাঝি সময়ে

সরকার দ্বিতীয় জাহাজনির্ম্মাণ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিতে পারিবেন। তিনি স্বীকার করেন, হিন্দুস্থান জাহাজনির্ম্মাণ কারখানার দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলির দাবী মিটানই প্রায় কঠিন। তিনি বলেন যে, হিন্দুস্থান জাহাজনির্ম্মাণ কারখানা ১০টি বড় জাহাজসহ ১৪টি জাহাজনির্ম্মাণের অর্ডার পাইয়াছে।

পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিতর্কের সময় ভারতে জাহাজনির্ম্মাণের মন্থরগতির সমালোচনা করিয়া উত্তর-প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রীরঘুনাথ সিং বলেন যে, জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশের অগ্রগতি হইতে ভারতের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের জাহাজের পরিমাণ ছিল মাত্র এক লক্ষ টন। এই এগার বৎসরের মধ্যে জাপানের জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩৭ লক্ষ টন। তিনি জাহাজনির্ম্মাণ ব্যাপারে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহারা যেন "ঘুমাইয়া রহিয়াছেন"।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের কংগ্রেসী সদস্য শ্রী সি. পি. মাথেন জাহাজশিল্পের ভার একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করার অনুরোধ জানান। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সদস্য শ্রী টি. এন্. সিং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন হইতে নির্ব্বাচিত কম্যুনিষ্ট সদস্য শ্রী ভি. পি. নায়ার বলেন যে, জাহাজশিল্প তাহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সরকার বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে জাহাজ কিনিবার জন্য অর্থসাহায্য ও ঋণ দিতেছেন। শ্রীনায়ার বলেন যে, তিনি এখনই জাহাজশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা বলিতেছেন না, কিন্তু সরকার টাকা ঋণ হিসাবে না দিয়া উহা কোম্পানীর মূলধন হিসাবেও ত দিতে পারেন। তিনি পরিবহণশিল্প সম্পর্কে সামগ্রিক তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ জানান।

মহীশূরের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীটি. সুব্রমনিয়ম বলেন যে, ব্রিটিশ সরকার রেলপথগুলির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ভারতের জলপথগুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া আভ্যন্তরীণ জলপথগুলির উন্নতির জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে মনযোগী হইতে হইবে। বিভিন্ন নদীব্যবস্থায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল আভ্যন্তরীণ জলপথ এখনও নৌবাহনযোগ্য করা যাইতে পারে বলিয়া শ্রীসুব্রমনিয়ম বলেন।

লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিভাগ

"সোভিয়েট দেশে" প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে 'লেনিনগ্রাড' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে ভারতীয়, চীনা, কোরিয়ান, জাপানী, মঙ্গোলীয়, আরবী প্রভৃতি নয়টি ভাষাতাত্ত্বিক শাখা রহিয়াছে। নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলির ইতিহাস, দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির ইতিহাস ও সুপ্রাচীন প্রাচ্যখণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনার জন্য তিনটি ইতিহাস শাখাও রহিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিভাগে হিন্দী, উর্দ্দু, বাংলা, মরাঠী, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় অনুশীলন করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহাদের প্রধান শিক্ষণীয় ভাষা ব্যতীত আরও একটি সগোত্র ভারতীয় ভাষা এবং একটি পাশ্চাত্য ভাষা (ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান বা ডাচ) শিখিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মেয়াদ পাঁচ বৎসর।

ভারতের আঞ্চলিক জলসীমা

২৩শে মার্চ্চ এক ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের তীর হইতে সমুদ্রের ছয় মাইল পর্য্যন্ত জলরাশিকে ভারতের আঞ্চলিক জলসীমার অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এত দিন পর্য্যন্ত তীর হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত ভারতের আঞ্চলিক জলসীমা বিস্তৃত ছিল।

আন্তর্জ্জাতিক আইন কোন রাষ্ট্রের উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রের উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব তীর হইতে কতদূর পর্য্যন্ত জলরাশির উপর বিস্তৃত হইতে পারে সে বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে উপকূলবর্ত্তী তীর হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত স্থানের উপর রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইত, কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত চীন এবং ভারত ব্যতীত খুব অল্প রাষ্ট্রই আঞ্চলিক জলসীমা সম্পর্কিত এই তিন মাইল সীমা মানিয়া চলিত। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের জলসীমা নির্দ্ধারণ করিয়া সময়োচিত কাজই করিয়াছেন। ভারতে অবস্থিত বিদেশী পকেটগুলির উপর এই ঘোষণার প্রভাব কিরূপ পড়ে তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাজারদর বৃদ্ধি

চাউল, আটা, সরিষার তৈল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যপ্রসঙ্গে সাপ্তাহিক "ভারতী" লিখিতেছেন যে, চাউল ও আটা ব্যতীত সরিষার তৈল প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির কারণ স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত দ্রব্যাদির উপর যে নূতন উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু শুল্কের হার যেখানে মণপ্রতি মাত্র ২।/০ আনা সেস্থলে সেই দ্রব্যের মূল্য প্রতিমণ ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তৈলবীজের অভাবের দরুন তৈলের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এই যুক্তিও মানিয়া লওয়া যায় না, কারণ তৈলবীজের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু মূল্যবৃদ্ধি এইরূপ হঠাৎ এবং অস্বাভাবিক হইতে পারে না। এইরূপ হঠাৎ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ মুনাফালোভীদের ফাটকাবাজী।

"ধূম্রজালের আবরণে এক 'দুষ্টচক্র' সৃষ্টি করিয়া সাময়িকভাবে সমাজের রক্তমোক্ষণ করাই ইহাদের আসল উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে অসাধু ব্যবসায়িগণের এইপ্রকার অপকৌশলের নমুনা আমরা বহু বার লক্ষ্য করিয়াছি। সরকারী পর্য্যায়ে বা জনসাধারণের মধ্যে কোন আন্দোলন গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ইহারা সংযতভাব ধারণ করে এবং বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রেও যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে না তাহা আমরা জানি। কারণ ইতি-মধ্যেই আমাদের শুনান হইয়াছে যে, তেলের বাজারে এই অস্বাভাবিক অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইবে না, হয়ত আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বাজারে নূতন তৈলবীজ আমদানী হইলেই তেলের দাম আবার কমিয়া যাইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সরকার এই অপকৌশলের বা ফাটকাবাজির প্রশ্রয় দিবেন কি না? আমাদের মতে এই অসাধু ব্যবসায়িগণ সমাজের পরম শত্রু এবং ইহাদের সম্পর্কে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।"

ত্রিপুরায় খাদ্যাভাব

ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপক অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া স্থানীয় "সমাজ" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন। ৭ই এপ্রিল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সমাজ" লিখিতেছেন, "অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল আনিয়া রাজ্যসরকারের ষ্টক বৃদ্ধি না করিলে আগামী বর্ষার পূর্ব্বে ও সমগ্র বর্ষাকালে শুধু আগর-তলায় নয় সমগ্র ত্রিপুরায় এক ব্যাপক খাদ্যাভাব এবং অপ্রতিরোধ্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।"

১৬ই মার্চ্চ ঘোষণা করা হয় যে, শীঘ্রই ন্যায্যমূল্য চাউলের দোকান খোলা হইবে, কিন্তু ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কোন দোকানই খোলা হয় নাই। হয়ত উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ষ্টক না থাকার দরুনই সরকার ন্যায্যমূল্য চাউলের দোকান খুলিতে পারেন নাই।

ত্রিপুরার খাদ্যসমস্যা সমাধানকল্পে সরকারী প্রচেষ্টার অসারতা ও অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া "সমাজ" পত্রিকার ৩১শে মার্চ্চ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, রাজ্যসরকারের গেজেটে একরূপ তথ্য, প্রেসনোটে অন্যরূপ তথ্য এবং প্রতিনিধিদলের নিকট প্রদত্ত আর একরূপ তথ্যের কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই। "আমরা ইহাকে ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার প্রয়াস না বলিয়া বলিব যে, সরকার স্বীয় প্রকাশিত তথ্যাদিও অবগত নহেন। (ইহাকে মানসিক ক্ষমতার ব্যর্থতা বলা যাইতে পারে।)"

"সমাজ" লিখিতেছেন, "চাউলের বর্দ্ধিত মূল্য রাখিতে চীফ কমিশনার, চাউলের চোরাকারবারী এবং সাম্প্রতিক ফাটকাবাজদের মনোভাবের ও মতামতের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না—কোন না কোন কারণে ইহারা চাউলের বর্দ্ধিত মূল্য রাখার পক্ষপাতী। অথচ খাদ্য উপদেষ্টা ও সরকারী প্রেসনোটে মূল্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের দোষারোপ করা হইয়াছে।

"এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বিগত বৎসর বিলোনীয়া সোনামুড়া সাবরুম ও কুমারঘাটে প্রায় ৩০ হাজার মণ করিয়া সরকারী চাউল বিক্রি হইয়াছে ২৲—৪৲ টাকা মণ দরে। (যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালে এই দরে খুদও বিক্রী হয় না।) উক্ত চাউলই বাজারে চড়া দরে বিক্রী হইয়াছে। বিগত বৎসর ফসল উঠার সময় বিরাট বিরাট লটে সরকারী চাউল ছাড়া হইয়াছিল যাহাতে চাষী ও ছোট ব্যবসায়ীরা চাউল মজুত করিতে না পারে এবং পূর্ব্ব মজুত চাউল সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। চাউল সঙ্কট দেখা দিয়াছে সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের যোগসাজসে ব্যবসায়ীদের দ্বারা (a well-knit racket of corruption)। খাদ্য ও কৃষি-দপ্তর খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য কি কাজ করিয়াছে তাহাও তদন্ত করিতে হইবে। আমরা পুনরায় বলি, কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত না হইলে ত্রিপুরা সরকারের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি ক্রমবর্দ্ধমান হইতে থাকিবে।"

ভারতীয় রাষ্ট্র ও ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ

রাজ্যপুনর্গঠন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্য স্বতন্ত্রই থাকিবে। উহাকে একটি কেন্দ্রশাসিত টেরিটরি রূপেই রাখা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সেবক" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, কেন্দ্রীয় শাসনে "টেরিটরি"গুলিতে কিরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই তবে অবস্থা দেখিয়া মনে হয় না যে, ত্রিপুরায় ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলনের কোন ব্যবস্থা করা হইবে।

কেন্দ্রীয় শাসনে ত্রিপুরার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, গত সাত বৎসরের অভিজ্ঞতায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের যে নমুনা ত্রিপুরার জনসাধারণ পাইয়াছে তাহা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক। "সেবক" লিখিতেছেন: "সামন্তযুগীয় শাসনের অবসান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে যে শাসন চলিতেছে তাহা অনেকদিক দিয়াই সামন্তযুগীয় একনায়কত্ব শাসন অপেক্ষা উত্তম নহে।...ত্রিপুরা রাজ্য ভারতে যোগদান করিয়াছিল গণতন্ত্রী ভারতের অংশীদার হইবার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন টেরিটরি শাসনে থাকার জন্যও আমরা স্বতন্ত্র [অবস্থিতি] চাই নাই।..."

ত্রিপুরার সকল রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আবেদন জানাইয়া "সেবক" উপসংহারে লিখিতেছেন যে, যদি কেন্দ্রীয় শাসনে ত্রিপুরার জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করিবার কোন সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা না থাকে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সম্মিলিত আবেদন করিয়া ত্রিপুরার স্বাতন্ত্র্যের অবসান চাহিয়া আসামের সহিত সংযুক্তির জন্য রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার দাবী করা কর্ত্তব্য। কারণ টেরিটরি শাসনে যদি জনগণের হাতে শাসনক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে চিরকালের মত ত্রিপুরাবাসী গণতন্ত্র হইতে বঞ্চিত হইবে। ঐ অবস্থা স্বভাবতঃই কাহারও কাম্য হইতে পারে না।

দায়িত্ব কাহার ?

স্বাধীনতার পর ডাক বিভাগের যে অবনতি হইয়াছে তাহার উদাহরণ স্বরূপে এই সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। ২৫শে চৈত্র "সেবক" পত্রিকার নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"মন্দভাগ্য এক লুসাই যুবক ডাক বিভ্রাটে এবার কৈলাসহর সেণ্টার হইতে প্রাইভেটে আই-এ পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। নাম ভেংহেয়া লুসাই, রোল নং ৪। জাম্পুই এম-ই স্কুলের শিক্ষক। রেজেষ্টারী ডাকে বিগত ২২শে মার্চ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'এডমিট' কার্ড পান কিন্তু পরীক্ষা আরম্ভ হয় ১৯শে মার্চ।"

এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তদন্তের ফলাফল জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা ডাক বিভাগের কর্তব্য।

বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনা

রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎসাহদানকল্পে প্রতি জেলায় একটি করিয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান কেন্দ্রীয় পাঠাগার এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার-পরিষদ গঠিত হয়। পদাধিকার বলে জেলাশাসক পরিষদের সভাপতি এবং সোস্যাল এডুকেশন অফিসার উহার সম্পাদক। জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি, সদর মহকুমা শাসক ও জেলা বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শক পদাধিকার বলে উহার সদস্য। জেলা শাসক সরকারী গ্রন্থাগারিক এবং তিন জন অপর সদস্যকে ঐ পরিষদে মনোনীত করেন। সম্প্রতি আজীবন ও সাধারণ সভ্যগণ এবং পরিষদের অন্তর্ভুক্ত লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে একজন সহঃ সভাপতি ও সাত জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনা-ভার ন্যস্ত রহিয়াছে সম্পাদকের উপর। ২৩শে চৈত্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বর্দ্ধমান বাণী" সম্পাদকের কার্য্যপরিচালনার সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি উক্ত সম্পাদককে গেজেটেড অফিসারের পদে উন্নীত করা হইলেও "সম্পাদক মহাশয় তাঁহার দায়িত্ব পালনে কৃতিত্বের পরিবর্ত্তে অক্ষমতারই পরিচয় দিয়াছেন।

উল্লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, পরিষদের কার্য্য পরিচালনায় সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট গাফিলতি প্রদর্শন করিয়াছেন কেবল তাহাই নহে, এমন কি গ্রন্থাগার পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী করার ব্যাপারেও তিনি অবহেলা প্রদর্শন করেন। "প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহ অনেক সময় বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। পরিষদ যাহা করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি তাহার উল্টা করিয়া থাকেন।"

যে সকল পল্লী গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হইয়াছে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ করিবার জন্য একটি গাড়ী নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু দেখা যায় গাড়ীটি পুস্তক বহনের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়ই অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকে। "বর্দ্ধমান বাণী" লিখিতেছেন, "কেন্দ্রীয় পাঠাগারটি পরিচালনাও সন্তোষজনক নহে। ইহা কখন খোলা হয় কখন বন্ধ হয় তাহার কোন ঠিকঠিকানা নাই। সম্পাদক মহাশয় এই পাঠাগারে বা পরিষদ কার্য্যালয়ে আসা আবশ্যক মনে করেন না। তিনি তাঁহার বাসভবন হইতেই হুকুম জারী করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।"

অযোগ্য শাসনব্যবস্থার দরুন সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাগুলি কি ভাবে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে উল্লিখিত বিবরণী তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত সরকার ফতোয়া জারীর মাধ্যমে জনকল্যাণ সাধনের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকটি জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা আকর্ষণ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা না করিবেন সে পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনাই সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

অন্য দিকে সাধারণ যাঁহারা তাঁহাদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। সরকারকে সমালোচনা করিলে সেটা মুখরোচক হয়, কিন্তু নিজে অগ্রসর হইয়া কাজে সাহায্য ও কাজ আদায় না করিলে যাহা চলিতেছে তাহাই চলিবে।

জঙ্গীপুর মহকুমায় পরিকল্পিত অগ্রগতি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে জঙ্গীপুরে মহকুমার কিরূপ উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে ২২শে চৈত্র স্থানীয় "ভারতী" পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মহকুমার বিভিন্ন স্থানে যে বিবিধপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। জঙ্গীপুর শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মহকুমার ছাত্রদিগের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে, জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জ শহরের বিদ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে। শহরের যানবাহন চলাচল এবং পানীয় জলসরবরাহ ব্যবস্থারও কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। "গ্রামাঞ্চলেও বহু প্রাইমারী স্কুল ও গ্রাম্য পোষ্ট আপিস খোলা হইয়াছে। অবৈতনিক উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়ে গৃহ-নির্ম্মাণের কিছু কিছু সাহায্য বরাদ্দ হইয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ থানায় প্রায় প্রতিটি গ্রামেই দুই-চারিটি করিয়া টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে।..."

পরিকল্পনাকালে মহকুমার কয়েকটি বিষয়ে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও প্রধান সমস্যাগুলির কোনই সমাধান যে হয় নাই "ভারতী"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। চাষ ও চাষীদের দুরবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। "চিকিৎসা-ব্যবস্থার দিক হইতে এই মহকুমার অবস্থা আরও করুণ। সম্প্রসারিত মহকুমা হাসপাতালটির জন্য টাকাও জমা দেওয়া আছে, কখন যে ইহা সুরু হইবে কিংবা ইহা আদৌ হইবে কিনা সে বিষয়ে কোন খোঁজখবর মিলিতেছে না।" মহকুমার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। "কুটীরশিল্পের অবস্থা আরও ভয়াবহ। রেশমশিল্প এই মহকুমার একদা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রয়োজনীয় শিল্পটি প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।...কাঁসা শিল্পের অবস্থাও তদ্রূপ।"

বারাসাত কলেজ

বারাসাতে একটি সরকারী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ রহিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় অঞ্চলের জনসাধারণের উচ্চ শিক্ষালাভের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কলেজের ব্যবস্থা সুপ্রচুর নহে। নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্ত্তি হইতে না পারায় অনেককেই বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত কলিকাতা আসিতে হয়। উপরন্তু, কয়েকটি কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র স্থানীয় কলেজে ভর্ত্তি হইতেও চাহে না। বারাসাত কলেজের "সময়োচিত ব্যবস্থার একান্ত অভাব" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২৯শে চৈত্র "বারাসাত বার্ত্তা" কলেজের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইল : "(১) বিজ্ঞান বিভাগে চতুর্থ বিষয় না থাকায় উক্ত বিভাগে বহু ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হইতে পারে না। (২) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের নির্দ্দিষ্ট আসন প্রয়োজনের তুলনায় নামমাত্র। (৩) বাণিজ্য (commerce) বিভাগ না থাকায় বহু ছাত্রছাত্রী প্রবেশে বঞ্চিত। (৪) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী শিক্ষকতা ও চাকুরী, ব্যবসা ও ক্ষেতখামারে কাজ করিয়া রাত্রে কলেজে পড়িতেছে তাহাদের কোন সুবিধা নাই। (৫) ২য় বর্ষ (Intermediate) শেষ হইলে B. A. শ্রেণীর অভাব এবং উহার সহিত ছাত্রদের প্রয়োজনীয় কমনরুমের উপযুক্ত কক্ষ, ডনঘর, খেলার ময়দান, ছাত্রাবাস ইত্যাদি অভাবগুলি উল্লেখযোগ্য।"

ছাত্রগণ স্থানীয় কলেজে পড়িতে উৎসুক নহে, অনেকেই শহরের আকর্ষণে কলিকাতার কলেজে পড়িতে যায় বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "বারাসাত বার্ত্তা" বিগত পাঁচ বৎসরে কলেজের ছাত্রসংখ্যা এবং পাশের হার উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন : "ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, স্থানীয় ছাত্রবৃন্দের নিকট কলেজটি ক্রমাগত আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় স্থানীয় কলেজের সম্প্রসারণ ও সময়োচিত ব্যবস্থার অভাবে অভিভাবকবৃন্দ ছেলে ও মেয়েদের কলিকাতা পাঠাইয়া ব্যয়ভার বহন করিতেছেন বা ছাত্রছাত্রীর শ্রম ও সময়ের অপব্যবহার হইতেছে মাত্র নহে, বারাসাত শহর ও নিকটবর্ত্তী পল্লী-অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার সহজ পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইতেছে। উহার কি উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে না?"

মহিলা বিমানযাত্রী ও লাগেজ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত বিতর্কের সময় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সদস্যা শ্রীইলা পালচৌধুরী ২২শে মার্চ লোকসভায় বলেন যে, নৈশ বিমানে যদি মহিলাদিগের জন্ত স্বতন্ত্র সীট রিজার্ভ করিবার বন্দোবস্ত না করা যায় তবে যেন যাত্রীদের মালের কতকাংশ মহিলাদের সীটের পাশে আনিয়া রাখা হয়। "আমার মনে হয় মহিলারা অপরিচিত পুরুষের পাশে বসা অপেক্ষা লাগেজের পাশে বসা বেশী পছন্দ করিবেন।"

শ্রীজগজীবন রাম বলেন, এই সমানাধিকারের যুগে শ্রীযুক্তা পালচৌধুরীর ন্যায় একজন আলোকপ্রাপ্তা মহিলার নিকট হইতে মহিলাদের জন্ত বিমানে স্বতন্ত্র আসনের দাবি কি করিয়া উঠিতে পারে তিনি তাহা বুঝিতে অক্ষম।

এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ২৬শে মার্চ্চ "হিতবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে সকল বিষয়েই স্ত্রী-পুরুষের প্রতি সমান অধিকার প্রদর্শিত হয় এবং বিমানে স্ত্রী-পুরুষের জন্ত সমান ব্যবস্থা বজায় রাখা সকল দিক হইতেই কাম্য। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের সময় মহিলা যাত্রীরা পুরুষদের পাশে বসিতে আপত্তি করেন না, সুতরাং ভারতীয় বিমানের বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোনই যুক্তি নাই!

কৃষকের পুরস্কার

সম্প্রতি কৃষকদিগকে সরকারী পুরস্কার বিতরণ সম্পর্কে যে সকল প্রচার চলিতেছে তাহার সমালোচনা করিয়া রেজাউল করিম সম্পাদিত "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন, চির-অবহেলিত কৃষককুল পূর্ব্বের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে কিন্তু এখনও তাহারা দুই বেলা উদর পূর্ণ করিবার উপযোগী খাদ্য পায় না।"

"এই কৃষককুলকে পুরস্কার দিবার কথা যখন কেহ বলে তখন হাসি সংবরণ করা যায় না। কৃষকের আবার পুরস্কার? যাহারা পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না তাহাদের আবার পুরস্কার! আগে তাহার পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য দাও, আগে তাহার জন্ত নিজের জমির ব্যবস্থা কর, তাহার আয়কে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর, তাহাকে সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে রক্ষা কর, পরিশ্রমের অনুরূপ মূল্য দিবার ব্যবস্থা কর, তার পর পুরস্কারের কথা। ইংরেজ আমলেও দেখিয়াছি স্থানে স্থানে বড় বড় কৃষি-প্রদর্শনী হইত। আর তাহাতে কেহ কেহ পুরস্কারও পাইত। কিন্তু এই পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছিল কাহারা? বড় বড় জোতদার—মূল্যবান সার প্রয়োগ করিয়া শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া উর্ব্বর জমিতে যে ফসল উৎপাদন করিতেন তাঁহার জন্য পুরস্কার পাইতেন। কিন্তু সাধারণ কৃষক সে সব পুরস্কারের সৌভাগ্য লাভ করিত না। ইহাকে 'কৃষকের পুরস্কার' বলা যাইতে পারে না। ইহার নাম জোতদারগণের পুরস্কার।"

বর্ত্তমানে কৃষকদিগকে যে পুরস্কার দান করা হয় পত্রিকাটির অভিমতে তাহাও প্রকারান্তরে জোতদারগণেরই পুরস্কার। জোতদারদিগকে ভাল উৎপাদনের জন্ত পুরস্কার দান নিন্দনীয় নহে, কিন্তু যাহারা দেশের কৃষিব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই কৃষককুলের অতি নগণ্য অংশ এই জোতদার সম্প্রদায়। সুতরাং জোতদারদের পুরস্কৃত করিয়া কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে প্রেরণা সরকার দিতে চাহিতেছেন তাহাতে দেশের কৃষিব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি হইবে না।

"বড় বড় জোতদার পুরস্কার বা প্রশংসাপত্র পাইলে তাহাতে দেশের কৃষির বিশেষ কোন উন্নতি হইবে না এবং তাঁহারা এই

পুরস্কারের মাধ্যমে সরকারের নিকট আরও অতিরিক্ত অন্যায় সুবিধা আদায় করিতে ছাড়িবেন না। পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহাদের জন্য যাহারা শরীরের পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদন করিবে। জোতদার ও খাঁটি কৃষকের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য আছে। খাঁটি কৃষক আজ নানাভাবে শোষিত। তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে জমি দিতে হইবে, তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য যাহাতে পায় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার ঘরে ফসল যাহাতে সঞ্চিত হয়, রোগে-শোকে সে যাহাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ যাহাতে সে পাইতে পারে—সেই সব ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাই কৃষকের পুরস্কার। অন্য পুরস্কার প্রহসন মাত্র।"

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন

১২ই মার্চ্চ ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবার পর রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক যে অব্যবস্থা দেখা দেয় তাহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়ায় গত ২৩শে মার্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী এক ঘোষণাবলে ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনের শাসনকার্য্য পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। শাসনকার্য্যে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দানের জন্য দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীপি. এস. রাওকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা প্রচলন সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বিদায়ী কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী শ্রীপনমপিল্লী গোবিন্দ মেনন বলেন যে, যদিও তিনি ইহাতে দুঃখিত হইয়াছেন তথাপি ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল। রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য শ্রীমেনন বিরোধীপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান হীনতাকে দায়ী করেন।

রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলনের কঠোর সমালোচনা করিয়া রাজ্যের একজন ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীপট্টম থানু পিল্লাই বলেন যে, এখন সরকারের কর্ত্তব্য হইতেছে কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া অচিরাৎ সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। শ্রীপিল্লাই আরও বলেন, রাজ্যবিধান সভায় ৫৯ জন সদস্যের সমর্থক কংগ্রেসকে গত বৎসর মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু এবার বিধানসভায় ৬১ জন সদস্যের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও শ্রীপিল্লাইকে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। শ্রীপিল্লাই বলেন: "জনসাধারণের নিকট আমি ইহার বিচারের ভার ছাড়িয়া দিলাম।"

রাজ্যবিধানসভা স্পীকার শ্রী ভি. গঙ্গাধরণ বলেন যে, রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন একটি পরিতাপের বিষয়। তিনি রাজপ্রমুখের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলেন, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যদের সমর্থনপুষ্ট নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ না দেওয়া গণতন্ত্রের হানিকারক। ত্রিবাঙ্কুর-কোচীনে এই ভাবে যে নজীর স্থাপন হইল তাহা ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচীন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন উপলক্ষে ২৫শে মার্চ্চ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, দুই বৎসরের মধ্যে দুইটি মন্ত্রিসভা পতনের পর রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের ব্যাপারকে কেহই রাজ্যের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবেন না। বিগত নির্ব্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারায় রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনে একটি স্বাভাবিক অনিশ্চয়তা অন্তর্নিহিত ছিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পতনে দেখা গেল যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজেরাও দৃঢ়সংবদ্ধ নহে।

ছয় জন কংগ্রেসী সদস্যের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহারের ফলেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের একচেটিয়া নহে। অপরাপর রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি আরও বেশী অসংলগ্ন প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে, প্রত্যেক দল এবং গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ কয়েকজন রহিয়াছে যাহারা মন্ত্রিসভাদলের সামান্যতম সম্ভাবনাতেই পদলাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। তাহা না হইলে বিধানসভায় বিভিন্ন দলের সমর্থক সংখ্যা এরূপ পরস্পরবিরোধী হইত না।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জন্য "হিন্দু" রাজপ্রমুখের কোন দোষ দেখিতে পান না। রাষ্ট্রপতির শাসনে জনসাধারণের লাভ বৈ ক্ষতি হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াও পত্রিকাটি মনে করেন না।

উপসংহারে "হিন্দু" লিখিতেছেন, যদি রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারেন যে, কেবলমাত্র একটি নূতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে চলিলেই রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অনিশ্চয়তা দূর হইতে পারে এবং সে অনুযায়ী যদি তাঁহারা আগামী নির্ব্বাচনে ঘোষিত নীতির ভিত্তিতে কোন দলকে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ভোটদানে নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন তবে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘস্থায়ী বা অবিমিশ্রিত দুর্য্যোগ রূপে নাও দেখা দিতে পারে।

দলগতনীতি, বা নীতির অভাব, এবং দলগত স্বার্থ মাত্রের চিন্তা, ইহাই ত্রিবাঙ্কুরের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। আমাদের বাংলা দেশে ঐ প্রকৃতির চিন্তা কিছু কম নাই। যাহার ফলে বাংলায় কংগ্রেসের চরম অবনতি হইয়াছে এবং অন্য দলগুলির চূড়ান্ত অধঃপতন হইয়াছে। দেখা যাউক, দেশের লোকের এইরূপ মনের বিকার কত দিনে যায়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

ভারত সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৬১ সনে সমগ্র ভারতবর্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করিবেন। যাহাতে শতবার্ষিকী উৎসব যথাযথ পালিত হইতে পারে সরকার সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতেছেন।

নিবেদিতা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

নিবেদিতার নাম ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। শুধু বিবেকানন্দের শিষ্যা বলে নয়—তাঁর ত্যাগ, তপস্যা, অপূর্ব্ব কর্ম্মজীবন, তেজস্বিতা, চরিত্রমাধুর্য্য এবং ভারতবর্ষের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জগতে বিস্ময় এবং প্রশংসার উদ্রেক করেছে। তিনি আইরিশ দুহিতা হয়েও ভারতবর্ষকে একান্তভাবে তাঁর স্বদেশ বলেই সরল চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেগে, দুর্ভিক্ষে এবং এই দেশে, বিশেষতঃ বাংলা দেশের অশিক্ষিত দুর্দ্দশাক্লিষ্ট নর-নারীর দুঃখ-মোচনে তাঁর সেবা ও প্রয়াস অতুলনীয়। জগতের ইতিহাসে এই রকম আত্মনিবেদন দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যিক প্রতিভা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, স্বদেশপ্রেম, ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শে অকপট নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, গভীর চিন্তাশীলতা আর অদ্ভুত মনীষা তাঁর রচনার প্রতিছত্রে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। ভারতের শিল্পকলায়, প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় তিনি নূতন আলোকপাত করেছেন। ভারতের নবজাগরণে তাঁর দান অসামান্য।

নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে লক্ষ্য রেখে আধুনিক কালোপযোগী যে শিক্ষা-সংস্কার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর রচনায় সুচিন্তিত সারগর্ভ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি নারীশিক্ষার যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গিয়েছেন, এই স্বাধীন ভারতেও সেই শিক্ষা-প্রণালী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দুঃখের বিষয়, যিনি প্রাণপাত করে ভারতের—বিশেষতঃ বাংলার উন্নতির জন্য আজীবন সেবা করে গিয়েছেন, আমরা কিন্তু অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন।

নিবেদিতার দেহত্যাগের পর সংবাদপত্রে শোকপ্রকাশ করা হয়েছিল। এই সময় আমি বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করে একটি স্মৃতি কমিটি গঠন করেছিলাম। সর্ নীলরতন, সর্ জগদীশ, শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু এবং দেশের অপরাপর নেতৃবৃন্দ উক্ত কমিটির কার্য্যকারী সদস্য ছিলেন। আমি ছিলাম এর সম্পাদক। কলিকাতার নেতৃবর্গের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আমি শেরিফের নিকট গিয়ে টাউন হলে স্মৃতিসভা আহ্বান করতে অনুরোধ করি। ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী প্রভৃতি কাগজে শেরিফের বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয়েছিল। সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীরা নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বিজ্ঞাপন ছাপাবার জন্য এক পয়সাও নেন নি। টাউন হলের বিরাট সভায় সর্ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি ছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নিবেদিতার স্মৃতিস্বরূপ তাঁর বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় জনসাধারণের নিকট আবেদন করেছিলেন। সেই সভায় মাত্র ১,৭০০৲ টাকার মত চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল। বহু চেষ্টা করেও আর কিছু উঠে নি। শেষে নিরাশ হয়ে আমরা নিরস্ত হই। উক্ত সংগৃহীত অর্থ নিবেদিতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য দেওয়া হয়েছিল। যা হোক, রামকৃষ্ণ মিশন সুবৃহৎ শিক্ষাভবন নির্ম্মাণ করে প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে স্থাপন করেছেন। বাংলায় তথা ভারতে নিবেদিতার এই একমাত্র স্মৃতির নিদর্শন। এই বিদ্যালয়ের জুবিলী উপলক্ষ্যে ৫০০০৲ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে "নিবেদিতা বক্তৃতা" প্রবর্ত্তন করবার জন্য দেওয়া হয়েছে। দার্জ্জিলিঙের শ্মশানে স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা হয়েছে। বাংলা দেশের জনসাধারণ আর এ বিষয়ে কিছু করেছেন বলে শুনি নি।

বড়ই দুঃখের কথা যে, আজ পর্য্যন্ত ভ্রমপ্রমাদশূন্য প্রকৃত তথ্যপূর্ণ নিবেদিতার একটি সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হয় নি। এ বিষয়ে ফরাসী মহিলা শ্রীমতী লিজেল রেমঁ ফরাসী ভাষায় নিবেদিতার সমগ্র জীবনী লিখতে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী বাংলায় তার অনুবাদ করেছেন।

কলিকাতার ল্যান্সডাউন রোডে 'সারদাশ্রমে' যখন শ্রীমতী লিজেল রেমঁ বাস করতেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে নিবেদিতা-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তখন তাঁর কতকগুলি ভুল তথ্য ও ধারণা শুনে তা দূর করতে চেষ্টা করি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ইংরেজীতে নিবেদিতার একটি জীবন-চরিত সংশোধিত আকারে প্রকাশ করবেন। তিনি অনুরোধ করায় আমার নিজের জানা কতকগুলি ঘটনা ও তথ্য দিয়েছিলাম। তিনি তখনই তা নোট করে নিয়েছিলেন এবং "In Remembrance of Nivedita" স্বহস্তে লিখে, তাঁর নাম স্বাক্ষর করে ফরাসী ভাষায় তাঁর "নিবেদিতা" বইখানি

আমায় উপহার দিয়েছিলেন—তারিখ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সন।

অনুবাদিকার কথায় পড়লাম, "নিবেদিতার আত্মীয়স্বজন, বিশেষতঃ তাঁর ভাই-বোন, এদেশে ওদেশে তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ যাঁরাই নিবেদিতাকে জানতেন তাঁদের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ হ'ল প্রচুর।" অনুবাদিকার এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শঙ্করানন্দ আমাকে লিখে জানিয়েছেন :

"প্রিয় কুমুদ, মাসিক বসুমতীতে 'নিবেদিতা' আখ্যায় শ্রীমতী লিজেল রেম লিখিত জীবনীর অনুবাদ শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী কর্তৃক ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। উহা তুমি দেখিয়াছ কিনা জানি না। ঐ বিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমি কয়েকটি স্থলে সামঞ্জস্য ও ঘটনাপারম্পর্যের অভাব, অতিরঞ্জন ও অজ্ঞতাজনিত সত্যের অপলাপ ইত্যাদি দেখিলাম।

"পূর্বে ফরাসী ভাষায় একটি জীবনী গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছিলেন এবং উহা ৺বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক কঠোর ভাবে সমালোচিত হইয়াছিল—যাহা এককালে প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপাও হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে মাদ্রাজে থাকাকালে মিসেস ভিন্ ডাবটি (লেখিকা লিজেল রেম) উঁহার লিখিত নিবেদিতার জীবনীর কিছু অংশ ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. শেষাদ্রি কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত, আমাকে দেখিতে দেন। উহা পাঠ করিয়া নানাবিধ সম্পূর্ণ অবাস্তব, অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থাকায় লেখার পার্শ্বে সামান্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময় তিনি অতঃপর উহা নূতন করিয়া লিখিবেন এবং আমায় দেখাইয়া লইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কার্যতঃ দেখিতেছি ইংরেজী পুস্তক-আকারে বাহির হইবার পূর্বেই অনুবাদ বসুমতীতে বাহির হইতেছে।* জীবনী বলিতে গেলে লোকের মনোরঞ্জক, কল্পনা-প্রসূত, অবাস্তব ঘটনাবলীর সমাবেশ বুঝায় কিনা সুধিগণের বিবেচ্য।"

অনুবাদিকার কথায় দেখছি, তিনি বলছেন :

"শ্রীমতী রেম যখন তাঁর বইখানি বাংলায় অনূদিত করার জন্য আমায় আহ্বান করেন, নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে দ্বিধা থাকলেও সাগ্রহেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম।...

"আমার এই বাণীর সাধনায় সহায়ক পেলাম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনির্বাণকে। মূল ফরাসীর সঙ্গে মিলিয়ে বইখানি তিনি আগাগোড়া পরিমার্জন করে দিয়েছেন। তিনি হাত না দিলে আমার অনুবাদ গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত কিনা সন্দেহ।"

শ্রীমতী লিজেল রেম নিবেদিতার জীবন-চরিত ফরাসী ভাষায় লিখেছেন। তাঁর সেই উদ্যম, উৎসাহ এবং পরিশ্রম প্রশংসনীয়—ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীমতী রেম নিবেদিতাকে জীবনে কখনও দেখেন নাই অথচ তাঁর জীবন-চরিতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখতে চেষ্টা করেছেন—এটা তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয়।

দুঃখের বিষয়, সত্যের অনুরোধে বলতে হচ্ছে রেমের বইখানিতে ঘটনাগুলি অনেক স্থলে ঠিকমত বিবৃত হয় নাই। কতকগুলি ঘটনার যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁরা কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। একটু বিচারবুদ্ধি ও যত্ন করে সন্ধান করলেই তিনি অনেক জিনিস পেতে পারতেন। যাঁরা নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই সাগ্রহে সাহায্য করতেন।

শ্রীশ্রীমার নাম ছিল সারদামণি—সারদেশ্বরী নয়। "The Master as I saw him" বইখানিতে "The Holy Women" অধ্যায়ে নিবেদিতা লিখেছেন, বোসপাড়ার একটি ভাড়াটে বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে ছিলেন। তখন মার বাড়ীতে নিবেদিতার থাকবার বন্দোবস্ত হয়। নীচে একটি ঘর তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই সময় প্রায়ই সেখানে যেতাম স্বামী যোগানন্দ ও শ্রীশ্রীমার দর্শনলাভের জন্য। নিবেদিতা অধিকাংশ সময় দোতলায় শ্রীমা ও অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে থাকতেন। নিবেদিতার সঙ্গে কোনও লোক দেখা করতে এলে নীচের ঐ ঘরেই এসে বসতেন। দোরের সামনে একটা পর্দা টাঙানো থাকত। নিষ্ঠাবান পরিবারের মহিলাদের পক্ষে এক বাড়ীতে মেমসাহেবের সঙ্গে বাস করতে সঙ্কোচ কতকটা তাঁদের নিজেদের সামাজিক আচার ব্যবহারের জন্য, আবার কতকটা বিদেশিনী মহিলার ভারতীয় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অজ্ঞতাজনিত। নিবেদিতা লিখেছেন—"The Swami's influence proved all powerful, and I was accepted by society". লেখিকা রেম যতটা কল্পনা করে কল্পনা চালিয়েছেন সে রকম কিছু দেখি নি। বরং সকলেই কুমারী নোবলকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখতেন—তাঁর কোনও অসুবিধা না হয় এই সেই বাড়ীর সকলেরই লক্ষ্য ছিল। অনুবাদে আছে—"গোপালের মা ত তাঁকে ঢুকতেই দিতে চান না।" এই সংবাদ তাঁকে কে দিয়েছে জানি না। কিন্তু এই সব ভুল ও বিকৃত বর্ণনা। নিবেদিতা স্বয়ং লিখেছেন :

"Gopaler ma would sometimes be in Calcutta and sometimes for weeks together away at Kamarhatty."

গোপালের মা সাধারণতঃ থাকতেন কামারহাটীর

---

*. অনুবাদিকা লিখেছেন, সম্প্রতি আমেরিকায় "The Dedicated" নামে এই বইখানির একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

দেবালয়ে, নিবেদিতাকে তিনি কেন শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না? প্রথম প্রথম তাঁর আচার, নিষ্ঠা ও সংস্কারে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন:

"In Calcutta Gopaler ma felt perhaps a little more than others the natural shock to habits of eighty years' standing at having a European in the house. But once overruled she was generosity itself.

সুতরাং এই ঘটনাটি ঠিক বর্ণনা করা হয় নি।

'নিবেদিতা'র অনুবাদে পড়লাম 'খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নবীন মঠবাসীর যে সব নিয়মকানুন আছে নিবেদিতার জন্য সেইগুলিই নির্দিষ্ট করে দিলেন।' ১৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, '১৮৯৮, ২৫শে মার্চ সকালবেলা যথাবিধি ব্রহ্মচর্য দীক্ষা নিলেন নীলাম্বর মুখার্জির বাড়ীতে। এই ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষার অত্যন্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটি হ'ল।' আবার 'ছিন্নমূল' অধ্যায়ে লেখিকা লিখছেন, 'বেলুড়ে দীক্ষিত হবার পরদিনই নিবেদিতা বিলাতী সংস্কারে দারুণ একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন।' এর কোনটা সত্যি? নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে, না বেলুড় মঠে দীক্ষা? এই ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা অধ্যায়টি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং প্রায় সবই কাল্পনিক। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ নির্মিত হয় নি। সে বছর উৎসব হয়েছিল বেলুড়ের গঙ্গাতীরে পূর্ণচন্দ্র দাঁর প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ীতে। সেবার বেলুড় মঠে উৎসব বলে যে বর্ণনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তখন মঠ ছিল। জন্মতিথির দিন আমি সেখানে অতি প্রত্যুষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত ছিলাম। সেদিন সেখানে ব্রহ্মচর্য হওয়া দূরে থাক নিবেদিতাকে আসতেই দেখি নি। নিবেদিতা লিখছেন, যা লেখিকা নিবেদিতার চিঠি থেকে সঙ্কলন করেছেন, 'কাল প্রথম দীক্ষার ঠিক এক বছর পরে আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী হলাম।' সুতরাং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের আইন-কানুন মত কিছু হয় নি।

এখানে আমি যা দেখেছি তা উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। (মিস নোবল) ব্রহ্মচারিণী হবার পর স্বামীজী যখন কলকাতায় থাকতেন তখন সন্ধ্যার পর নিবেদিতা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসতেন। স্বামীজী কলকাতায় এলে বলরামবাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে—দেখলাম নিবেদিতা তখনও পর্য্যন্ত না আসায় স্বামীজী উদ্বিগ্ন হয়ে বলছেন, 'নিবেদিতা এখনও এল না কেন?' প্রায় এক ঘণ্টা পরে নিবেদিতা এসে স্বামীজীকে নতজানু হয়ে প্রণাম করলে তিনি কঠোর গম্ভীর স্বরে শুধু সম্বোধন করলেন, "নিবেদিতা"। স্বামীজীর সেই স্বর শুনে নিবেদিতা যুক্তকরে ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্বামীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এখানে আসতে এত দেরি হ'ল কেন?" নিবেদিতা মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন, 'একজন বন্ধুর সঙ্গে আমি অপরাহ্ণে চৌরঙ্গীতে গিয়েছিলাম, নানা জায়গায় ঘোরাঘুরিতে বিলম্ব হয়েছে। এসেই আপনার কাছে চলে এলাম।' স্বামীজী বেশ গম্ভীর স্বরেই বললেন, "নিবেদিতা, তুমি এখন ব্রহ্মচারিণী, সন্ধ্যার পর কোনও পুরুষের সঙ্গে চলাফেরা এমনকি আলাপ করাও ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে নিষেধ। এমনকি এখানে পর্য্যন্ত আসাও ঠিক নয়। সন্ধ্যায় জপ ধ্যান করার সময় আমি থাকলে শুধু প্রণাম করতে আসতে পার, তার বেশী নয়। রাত্রিকালে এখানে আসাও ঠিক না।" নিবেদিতা অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'স্বামীজী, ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ হবে না।' স্বামীজী তখন প্রসন্ন দৃষ্টিতে দু'একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করে নিবেদিতাকে বিদায় দিলেন।

লেখিকা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নবীন মঠবাসীর নিয়মকানুন যা লিখেছেন তা শুধু কল্পনামাত্র।

স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগ ও শোভাযাত্রা এবং তাঁর অন্তিম সময়ের যে-সব ঘটনা লেখিকা বর্ণনা করেছেন সেগুলি নিতান্তই তাঁর মনগড়া। রোগশয্যায় স্বামী যোগানন্দকে দুই মাস সেবা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—রাত্রি জেগে অপর সেবকদের সঙ্গে। লেখিকা লিখেছেন, অনেক দিন আগে ইংরেজ ডাক্তার ডেকে এনেছিল নিবেদিতা" এটি সত্য নয়। রামকৃষ্ণভক্ত খ্যাতনামা চিকিৎসক বিপিনবাবু ও শশীবাবু সর্ব্বদা তাঁকে দেখতেন। প্রয়োজন বোধ করলে তাঁরা সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতেন। স্বামীজী স্বয়ং ও অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁর চিকিৎসার এবং সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন। নবাগতা নিবেদিতার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের আয়োজনে অধিকাংশ সময় নিবেদিতা ব্যস্ত থাকতেন। স্বামী যোগানন্দ মুমূর্ষুকালে কি বলেছিলেন, না বলেছিলেন তা তাঁর জীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। লেখিকা রং ফলিয়ে অবাস্তব ঘটনার উল্লেখ না করলেই ভাল করতেন। শ্মশান-ঘাটে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার যাওয়ার কথা সত্য নয়। এই ঘটনার উল্লেখের পূর্ব্বেই লেখিকা কলিকাতার রাস্তাঘাট, বাজার, অলিগলি দেখে যে দু'একটি কাহিনী এবং নিবেদিতার মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা পাঠ করে মনে হয় উপন্যাস পড়ছি। তাঁর নিজের মনোভাবগুলি কল্পনার তুলিতে রং করে নিবেদিতার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। স্বামী যোগানন্দের দেহ যখন শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় তখন

আমিও শ্মশানযাত্রীদের অনুগমন করেছিলাম। স্বামীজী বেলুড় মঠ থেকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন—কাশী মিত্রের ঘাটে সাধারণ চিতায় যেন তাঁর দেহ সৎকার করা না হয়। শ্মশানঘাটের বাইরে শোভাবাজার রাজপরিবারের লোকদের শবদাহ করবার স্থান নির্দিষ্ট আছে। রাজবাড়ীর অনুমতি নিয়ে সেই স্থানেই স্বামী যোগানন্দের অন্তিম সৎকার হয়। স্বামীজী বেলুড় মঠ থেকে নৌকাযোগে চলে এলে চিতার উপর দেহ স্থাপিত হয়। স্বামীজী গভীর শোকক্লিষ্ট চিত্তে তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলেন। শোকার্ত স্বরে শুধু বললেন, "এতদিন পরে ইমারতের ইট খসতে সুরু হ'ল।" অগ্নি সংযোগের পূর্ব্বেই স্বামীজী যে নৌকায় এসেছিলেন সেই নৌকাতেই বেলুড় মঠে ফিরে গেলেন। নিবেদিতা শবযাত্রায় অনুগমন করেন নি, এটি নিছক কল্পনা।

"নিবেদিতা" বাংলা অনুবাদিত গ্রন্থে লেখিকার নবগোপালবাবুর বাড়ীতে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা পড়ে মনে হয়েছিল—এটা জীবন-চরিত নয়, কাল্পনিক কাহিনী।

"তিনখানা বড় নৌকায় মশাল জেলে সন্ন্যাসীরা এসেছেন, তীরে লোকের ভিড়। তাঁরা নামতেই শোভাযাত্রা সুরু হ'ল, খোল, করতাল বাজতে লাগল। মার্গারেট দেখলেন..." ইত্যাদি। স্বামীজীর সঙ্গে আমি নিজেই নৌকায় গিয়েছিলাম। প্রাতঃকালে নৌকায় মশাল জ্বালিয়ে যেতে হয় নি। মার্গারেট সেখানে যান নি। বেলা দ্বিপ্রহরে প্রসাদ গ্রহণ করে বেলা চারটার সময় আমরা কলকাতা ও মঠাভিমুখে ফিরে আসি। সুতরাং তুমুল শঙ্খধ্বনিতে রাতের জ্যোৎস্না যেন আলোড়িত হয়ে উঠল"—এই সব বর্ণনা পড়লে মনে হয় একটু সামান্য তথ্যসন্ধানেরও কোন প্রয়োজন লেখিকা বোধ করেন নি।

চিঠিপত্র বা ঘটনার তারিখগুলির কোনও পারম্পর্য্য নেই। লেখিকা লিখেছেন, "স্বামীজীর বিদেশী শিষ্যা হেনরিয়েটা মুলারের সাহায্যে বেলুড় গঙ্গাতীরে ১৫ একর জমি কিনে..." ইত্যাদি। এই সংবাদ তিনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে পেয়েছেন? যদি বেলুড় মঠে সন্ধান করতেন তা হলে জানতে পারতেন যে, পনর একর জমি নয় বাইশ বিঘা জমি। "মূল বাড়ীটা নেহাৎ বেমেরামতি অবস্থায় লোনায় ধ্বসে পড়ছে, এটার সংস্কার করে আর একটা তলা জুড়ে দেওয়া হয়।" কিন্তু আসলে পুরানো একতলাটি ভেঙে চুরে একেবারে নূতন করে তৈয়ারি করা হয়েছিল। ছাদ ফেলে দিয়ে নূতন কড়ি বরগা বসিয়ে নূতন করে নীচের একতলা নির্ম্মিত হয়। একতলায় যে কয়খানি ঘর দোতলায়ও প্রায় সেই কয়খানি ঘর। নূতন দোতলায় 'অনেকগুলো ঘর' নয়, মাত্র পাঁচখানি এবং একতলায়ও প্রায় তাই। নিবেদিতা বইখানিতে আছে—"আর একটা ছোট বাড়ী ছিল তার চারদিকেই খোলামেলা, আগে সেটা অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহার হ'ত।" 'আগে'—কত বছর আগে? উক্ত জমি কেনবার পূর্ব্বে ও পরে আমি দেখেছি ছোট বাড়ীটা কখনও অতিথিশালা ছিল না, ওটা চাকরদের ঘর ছিল। এই রকম কল্পনার সাহায্যেই লেখিকা লিখেছেন—বেলুড়মঠের গাড়ীবারান্দার কথা আর স্বামীজীর বিছানা ঘিরে লাল টালী-বিছানো মেঝেতে দর্শনার্থীরা এসে বসেন। বেলুড়মঠে কোনও দিন গাড়ীবারান্দা বা লাল টালী বিছানো মেঝে ছিল না কিংবা এখনও নাই। কল্পনাটি একেবারে অবাস্তব। আমি জানি শ্রীমতী লিজেল রেমঁ নিজেও অনেকবার বেলুড় মঠে গিয়েছেন এবং অনুবাদিকাও বাঙালী মেয়ে, বোধ হয় একাধিকবার তিনিও সেখানে গিয়েছেন। এ ভুল তাঁদের উভয়ের চোখে পড়ে নি? আশ্চর্য্য!

অনুবাদিকা আচার্য্য সর্ জগদীশ বসুকে 'খোকা' বানিয়েছেন। আমরা দেখেছি তিনি নিবেদিতার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং নিবেদিতা তাঁকে সম্মানের চক্ষেই দেখতেন। সর্ জগদীশ বসু এবং তাঁর পত্নী উভয়েই নিবেদিতার প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং দার্জিলিঙে তাঁদের বাড়ীতেই নিবেদিতার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়। 'খোকা ও কৃষ্টিন' অধ্যায়টি পড়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আরও আশ্চর্য্যের কথা, লিজেল রেমঁ'র 'নিবেদিতা' গ্রন্থের অনুবাদিকা লিখছেন, "প্রিন্স ওডার সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় যাবার জন্য স্বামীজী প্রতীক্ষায় ছিলেন...আপনাকে নিবেদন করে দেবেন করুণাবতার বুদ্ধের পায়ে।" স্বামীজীর জীবন-চরিত এবং নিবেদিতার রচনাবলী ভাল করে পড়লেই এই ভ্রম লেখিকার হ'ত না। বহুপূর্ব্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরের বাগানে ছিলেন, তখন স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এই দুই গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি পাঠ করলেই এই ঘটনাটি জানতে পারা যায়। এমন কি "The Master as I saw him" গ্রন্থে "Swami Vivekananda and His attitude to Buddha" অধ্যায়টি ভাল করে পড়লে শ্রীমতী রেমঁ বা অনুবাদিকা এই সব বেফাঁস কথা লিখতেন না। সেই অধ্যায়ে নিবেদিতা স্পষ্টই লিখেছেন:

"The study of Dr. Rajendra Lala Mitra's writings and of the "Light of Asia" could never be a passing event in Swami's life and the seed that fell on the sensitive mind of Ramkrishna's Chief disciple during the years of discipleship came to blossom the moment he was initiated into

Sanyas for his first act then was to hurry to Bodh-Gaya and sit under the great tree, saying to himself, "Is it possible that I breathe the air. He breathed ? That I touch the earth he trod ?"

"At the end of his life again similarly he arrived at Bodh-Gaya on the morning of his 39th birthday."

আশ্চর্য। যিনি নিবেদিতার জীবনী লিখছেন তিনি নিবেদিতার বইখানাও ভাল করে পড়েন নি।

মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গেই এসেছিলেন ওডা ও ওকাকুরা জাপানের প্রস্তাবিত ধর্মসম্মেলনে স্বামীজীকে নিয়ে যেতে। ড. শ্রীকালিদাস নাগ ১৩৫৪ সনের উদ্বোধনের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় 'জাতীয় শিল্প জাগরণে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

'রোগে যখন প্রায় শয্যাশায়ী তখন জাপানী ভিক্ষু Rev. Oda ও প্রাচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ চৈনিক চিত্রকলার চরম সমঝদার Count Okakura ১৯০১ সালের শেষে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হলেন।...ওডা ও ওকাকুরা আবার জাপানে ধর্মসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন—কিন্তু সে আশা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জীর্ণ শরীর নিয়ে তবুও স্বামীজী জাপানী অতিথিদের ও সেই সঙ্গে মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপালকে নিয়ে বুদ্ধগয়া ও কাশী পরিক্রমা শেষবার করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে এশিয়াবাসীর আধ্যাত্মিক সত্তার ঐক্য, সুক্ষ্ম ভাবধারা ওকাকুরা স্বামীজীর সহিত ভ্রমণে ও আলাপ-আলোচনায় বুঝেছিলেন। ওকাকুরার 'Ideals of the East' ১৯০৩ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়।

ড. কালিদাস নাগ বলেন, তার গোড়াপত্তন কিন্তু এই বাংলা দেশে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নিবেদিতার মাধ্যমে।

ওকাকুরা, ওডা, ধর্মপাল প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামীজী প্রথমে বুদ্ধগয়ায় যান, পরে কাশীধামে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ ওকাকুরাকে ভারতের প্রাচীন শিল্প-সৌন্দর্য দেখতে পাঠালেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী জলগাঁও থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে ওকাকুরা যে চিঠি লিখেছিলেন তার অবিকল নকল নীচে দিচ্ছি। স্বামিজী ওকাকুরাকে অক্রুর খুড়ো বা খুড়ো বলে ডাকতেন। মঠে এটি ছিল তাঁর ডাকনাম।

খুড়া লিখছেন :

Dear Swamiji,

We arrived this morning and are starting for Ajanta at once. I have been suffering for sometime with a slight malaria and a shadow of a sunstroke and feel in need of rest. After Ajanta I intend to go back to Calcutta to recoup my strength against Oda's coming. Will you kindly inform me C/o. American Consulate if the Mohanto informs you of any decision. The ladies are well and enjoying everything. I have requested Niranjanananda to go back to you as I am going soon to Calcutta. . . . . . Niren has been more than kind,—brother,—nurse and a mother. I am glad that you have such manly workers with you. I shall be back before long in Banaras to thank you for this and all you have given me.

Yours truely

Khuro.

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ কলকাতায় ফিরে আসার সময় মনমাড জংশন থেকে ওকাকুরা চিঠি লিখছেন :

"Our excursion to the Caves have been most successful with moonlight adventures and twilight dreams where our thoughts were ever with you."

অজন্তা ফ্রেস্কোগুলি দেখে ওকাকুরা স্বামীজীকে লিখছেন :

"The Ajanta Frescos has given me the true glimpse into your classic art--shall I say ours? I found all I dreamt of before and more—one Padmapani was nobler than anything what even the early Italians enclothed in their ideal of divine womanhood. Ellora is magnificient. One Buddha in the Tinchan is the finest statue of the Lord. My national weakness make me think that Japan has added something to its tenderness but certainly never enhanced its grandure. The art of Tang dinesty in China decidedly owes its *Roundness of Ideal* to this classique phase of Indian form-Harmoney. This land is great in this as in all other expressions of the soul. Who says that this feeling is dead ? The same live idea runs through out the latter development as a stream courses among the fallen leaves. The over efflorescence of Bhakti, the Variagated symbolism of Tantrikism have shadowed it with phantasm, but never tempted its pristine purity. Shall we not drink at the fountain again ? The cloud of misery the night of political oblivion whose darkness drew you nearer the stars than ever is waning away. I wait the *dawn in you* and your more an.

Yours, Kakuzo.

কি গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এঁরা স্বামীজীকে দেখতেন তা এই পত্রগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়। নিবেদিতা প্রাচ্য শিল্পদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্বামী বিবেকানন্দের নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন।

শ্রীমতী রেম লিখছেন, "অমূল্য মহারাজ মঠের একজন বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী, তিনি আর সদানন্দ নিবেদিতার কাছে

রইলেন।" মঠ ছেড়ে তাঁরা নিবেদিতার কাছে থাকবেন কেন? বাস্তবপক্ষে, সদানন্দ স্বামী নিবেদিতার ভারতে আসার প্রথম হতে আরম্ভ করে স্বামীজীর আদেশেই কলকাতায় এলে নিবেদিতার তত্ত্বাবধান করতেন। কখনও নিবেদিতার বাড়ীতে বাস করেন নি। নিবেদিতা সব কাজেই তাঁর সাহায্য পেতেন। অন্তিম রুগ্নাবস্থায় শ্রীযুত বশীশ্বর সেন স্বামী সদানন্দকে বাগবাজারে বোসপাড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করে রেখেছিলেন তাঁর চিকিৎসা ও সেবার জন্য। ঐ বাড়ী ছিল নিবেদিতার বাড়ীর অতি নিকটে। নিবেদিতা প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দেখতে আসতেন এবং স্বামীজীর প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে আমিও সেই আলোচনায় উপস্থিত থাকতাম। অমূল্য মহারাজ সম্বন্ধে লেখিকা ভুল সংবাদ ও তথ্য দিয়েছেন। বেলুড় মঠ এবং বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে থাকতে নিবেদিতার কাছে কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী বাস করবার কথা অবাস্তব। এই বিষয়ে আমি পূজনীয় অমূল্য মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "নিবেদিতার ওখানে থাকতে যাব কেন? নিবেদিতার কোন প্রয়োজন থাকলে আমাদের কথাবার্ত্তা হ'ত। বরাবরই আমরা তাঁর খবরাখবর নিতাম। সদানন্দ তাঁর বাড়ীতে থাকতেন এ সব বানানো মিছে কথা। কল্পনা কতদূর যেতে পারে তা লেখিকার নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকাশ পাবে—"ক্রিষ্টমাসের সময় ওঁরা (নিবেদিতা, স্বামী সদানন্দ, ব্রহ্মচারী অমূল্য) মাদ্রাজে ছিলেন। সদানন্দ প্রস্তাব করলেন ক্রিষ্টমাসের পুণ্য রজনীটি খণ্ডগিরির পাদমূলে গুঞ্জরিত তরুচ্ছায়ায় উদ্‌যাপন করা যাক। স্থানীয় পল্লী-বাসীরা চন্দনকাঠের ধূপ ধুনা পোড়াচ্ছে—ওরা ওঁদের খোলা আকাশের তলে ধুনি জ্বালিয়ে তার চারপাশে ঘিরে বসেন সদানন্দ আর অমূল্য মহারাজ কম্বল মুড়ি দিয়ে আরমানি চাষার মত করে সাজলেন" ইত্যাদি কোথায় মাদ্রাজ আর কোথায় খণ্ডগিরি! লেখিকা না হয় বিদেশিনী, কিন্তু অনুবাদিকা ত এদেশের শিক্ষিতা মেয়ে। তাঁর এরূপ ভুল কেন? পূজনীয় অমূল্য মহারাজ—বর্ত্তমান রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রেসিডেন্ট, এই সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন যে, "তাঁরা মাদ্রাজ প্রদেশে ছিলেন বটে তবে মাদ্রাজ শহরে নয়। বাণীরামবাড়ী নামক একটি স্থানে যীশু-খ্রীষ্টের জন্মোৎসব চন্দনকাষ্ঠের ধুনি জেলে উদ্‌যাপিত হয়। তথাকার জনৈক ফরেষ্ট অফিসার সরকারী বন-বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তিনি ধুনি জ্বালাবার জন্য পাঁচখণ্ড চন্দন কাঠ দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাইবেল থেকে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ও তাঁর শিক্ষা বিষয়ে কিছু অংশ পাঠ করেন। তথাকার পল্লীবাসীরা অধিকাংশই তামিল ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না। এবং সদানন্দ স্বামীও তামিল ভাষা জানতেন না। দু' একটি কথা ফরেষ্ট অফিসার তামিল ভাষায় বলেছিলেন মাত্র, সদানন্দ স্বামী নহে।" অধিকন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে শীত বা ঠাণ্ডা থাকে না। অথচ সদানন্দ স্বামী ও অমূল্য মহারাজকে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরমানি চাষা সাজানো হয়েছে। বর্ণনার বাহাদুরি আছে। শ্রীমতী রেমঁর অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল যাতে করে তিনি পূজনীয় অমূল্য মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে এ সব ছাড়া আরও অনেক তথ্য জানতে পারতেন।

নিবেদিতা গৈরিকধারিণী ছিলেন না, স্বামীজী তাঁকে এক টুকরা গেরুয়া কাপড় দিয়েছিলেন, সেটা তিনি নিত্য ধ্যানের সময় মাথার উপর চাপা দিতেন। কখনও কখনও তাঁর পরনে লাল ডুরে গাউন বা ঘাঘরা থাকত, একেই অনেকে গেরুয়া বলে ভুল করেছে। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ আমাকে বলেছেন, স্বামীজীর বর্ত্তমানে বা তাঁর দেহান্তরের পরেও নিবেদিতা কোনও দিন 'পুরাদস্তুর গেরুয়া' পোশাক ধারণ করেন নাই। কখন কখন পাতলা একটি কাপড় (hood) যা মাথার উপর দিয়ে পরতেন সভায় বক্তৃতা দিতে গেলে। তা কতকটা ফিকে কমলালেবু রং, গেরুয়া বলে ভ্রম হতেও পারে। অথচ লেখিকা লিখছেন, "বিবেকানন্দের দেহত্যাগ করার দু'সপ্তাহের মধ্যেই যশোহরে নিবেদিতার ডাক পড়ল, তাঁর গুরু সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে বলে। নিবেদিতা পুরাদস্তুর গেরুয়া পরে সভায় এলেন" ইত্যাদি।

'সাধনা' অধ্যায়টিতে লেখিকা বলেছেন, "রাজনীতিতে অনেকে যখন তাঁকে গুরু বলে বরণ করত, নিবেদিতা আপত্তি করতেন না।" এই ভাবটিকে ফেনিয়ে নিবেদিতা সম্বন্ধে এ অধ্যায়ে যা বলেছেন তা তাঁর জীবনে বা রচনায় কখনও প্রকাশ পায় নাই। এদেশে জনসাধারণ নিবেদিতাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরু বলে মনে করত না। রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু বা শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ কেউ তাঁকে রাজনৈতিক বিপ্লবপন্থী বলে বর্ণনা করেন নি। স্বামীজীর আদর্শে ভারতবর্ষের সেবা এবং দেশপ্রেমে যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিবেদিতা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তিনি কোন দল বা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের নামেই আত্মপরিচয় দিতেন। স্বাধীনভাবে তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা করতেন। গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদিও রচনা করে গেছেন। স্বার্থত্যাগী, স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা বিপ্লবী যুবকদিগকেও উপদেশ দিতেন এবং তাদের আদর্শের অনুযায়ী বই পড়তে সাহায্য করতেন। রাজরোষে নির্যাতিত যুবকেরা

কারারুদ্ধ হলে তাদের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা আর আর্থিক সাহায্য করতেও প্রয়াস পেতেন। তাদের স্বার্থত্যাগ এবং দেশের স্বাধীনতার সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাকে তিনি সক্রিয় সহৃদয়তার চক্ষেই দেখতেন। যদি কেউ এই সব ঘটনা নিয়ে তাঁকে আয়ার্লণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ দলভুক্ত ইংরেজ-বিদ্বেষী একজন নারীরূপে কল্পনা করেন তবে নিবেদিতার চরিত্র এবং বাণীকে বিকৃত করাই হবে।

শুধু রাজনীতিক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, নারীশিক্ষা-বিস্তারে এবং ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে তাঁর সমভাবে উদ্যম, চেষ্টা এবং সহায়তা ছিল। যখন নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে টাউন হলে শেরিফের আহূত সভার আয়োজন হয়েছিল তখন আমাকে এক দিন সর্ জগদীশ বসু তাঁর বাড়ীতে কথা প্রসঙ্গে বললেন, "নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করতে পারব না। দেশ উপযুক্ত হলে তাঁর কদর বুঝবে। কত দিন তাঁর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি একটা পুতুল বা এক টুকরো পাথরে বিহ্বল হয়ে কি সৌন্দর্য্য, ভারতের প্রাচীন গৌরব দেখতে পেতেন আমরা তা দেখে অবাক হতাম। এই পরাধীন দেশে জন্মে আমরা তা বুঝতে পারি না। সকল বিষয়ে তাঁর অসামান্য প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। যদি তিনি তাঁর স্বদেশে ইউরোপে কাজ করতেন তবে নাম, যশ, অর্থ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। সেই সব ত্যাগ করে প্রায় অর্দ্ধাহারে তিনি আজীবন আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিলেন।" স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিবেদিতা "Dynamic Hinduism," "Aggressive Hinduism" ইত্যাদি বিষয়ে ভাষণ দিতেন। ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে সব বিষয়ে শিক্ষা, সমাজ ও দেশ-প্রেমকে জাগাতে হবে এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। স্বামীজীর নিকট তিনি সম্যক্‌ভাবে বুঝে সেরূপ ভারতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

লেখিকা লিখেছেন, "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সমাগত নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে এসে স্বামীজীর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। একনাগাড়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা বকে যেতেন তিনি। নিবেদিতা তাতে হাজির থেকে স্বামীজী শ্রান্ত হয়ে পড়লে কখন বা ওঁর হয়ে কথাবার্ত্তা চালাতেন।" এ অপূর্ব্ব সংবাদ লেখিকাকে কে দিয়েছে জানি না। স্বামীজী স্বয়ং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর মিস ম্যাক্‌লাউডকে লিখেছেন, "পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণের পর থেকে শয্যাগত আছি বললেই হয়। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়া রূপ অধিক উপসর্গ জোটায় আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও খারাপ।" 'The Master as I saw him' বইয়ে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে স্বামীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন, "and when the winter set in, he was so ill as to be confined to bed!" কোনও গুরুতর প্রসঙ্গ আলোচনা সে সময় তাঁর কাছে হ'ত না বলেই নিবেদিতা লিখেছেন। কংগ্রেস তখন ডিসেম্বর মাসের শেষে হ'ত। বিশিষ্ট নেতারা ১৭ নং বোসপাড়ায় নিবেদিতার কাছে গিয়ে নিজেরাই ঘনিষ্ঠ ভাবে আলোচনা করতেন, বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে নয়। নিবেদিতা কখনও কখনও যেতেন মাত্র। যদি কোন পরিচিত নেতা স্বামীজীকে দেখতে আসতেন তখন যদি নিবেদিতা উপস্থিত থাকতেন তবে হয়ত কথাপ্রসঙ্গে দু'একটা কথা বলতেন মাত্র। লেখিকা লিখেছেন, "রাজনৈতিক ব্যাপারে নিবেদিতার আগ্রহ সজাগ হয়ে উঠে। কিন্তু সেটা সক্রিয় আকারে স্ফুট হ'ল কয়েক সপ্তাহ পরে Mrs Bull-এর বাড়ীতে ওকাকুরা যখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন তখন।" স্বামীজীর উপদেশে বা প্রেরণায় নিবেদিতার আগ্রহ সজাগ হয় নি, হ'ল সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে ওকাকুরা যখন দেখা করেন তখন! এর চেয়ে আশ্চর্য্য কি? রাজনৈতিক নেতারা বোসপাড়ায় নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন এবং তাঁরা নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিশতেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পরামর্শমত নিবেদিতাকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার জন্য মিশনের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হয়। মঠ মিশনকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের সন্দেহ আর কোপদৃষ্টি থেকে মুক্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিবেদিতা প্রত্যেক কাজেই স্বামীজীর গুরু-ভ্রাতাদের পরামর্শ নিতেন এবং শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করতেন।

লেখিকা লিখেছেন, "সারদা দেবীকে ঘিরে যাঁরা আছেন এঁরা তাঁদের চেয়ে কম পূজাপাঠ করেন না।" এই সময় সারদা দেবীকে ঘিরে থাকবার মতন ছিলেন প্রাচীনা যোগেন মা, গোলাপ মা আর মায়ের দূর সম্পর্কীয়া দু'একটি আত্মীয়া মাত্র। স্বামীজী যখন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে নিয়ে পশ্চিম দেশে গমন করেন লেখিকা লিখেছেন তার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় "নিবেদিতা পঞ্চবটীতে প্রার্থনা করলেন যেন তাঁদের আগলে রাখেন।" এ কাদের? এ সংবাদও নূতন। অধিকাংশ স্থলেই লেখিকা একটি তারিখ বা পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর কথা বোঝাবার জন্য, এতে লোককে আরও বিভ্রান্ত করে। ঐ যাত্রায় জাহাজ মাদ্রাজ হয়ে কলম্বো গিয়েছিল। কোয়ারিন্টিনের জন্য কাউকেও জাহাজে উঠতে দেওয়া হয় নি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নৌকা করে জাহাজের পাশে গিয়ে কিছু ঘরের তৈরী খাবার এবং গঙ্গাজল দিয়ে এসেছিলেন—এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। নিবেদিতা

সেই জাহাজে ছিলেন। নিবেদিতা বইয়ে আছে, "মার্চের প্রথমে সারদা দেবী নিবেদিতাকে ডেকে পাঠালেন ফিরে আসতে।" বেলুড় মঠের বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্ট মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "শ্রীশ্রীমা কখনও নিবেদিতাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে জানা নেই।"

আমরা নিবেদিতাকে দেখি—রাষ্ট্রক্ষেত্রে মনস্বী নেতা শ্রীঅরবিন্দ এবং নির্যাতিত ত্যাগী বীর তরুণ সম্প্রদায়ের পার্শ্বে, সাহিত্যক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমীপে, শিল্পার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর নিকটে, আবার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সন্নিধানে। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ইংরেজী ভাষায় বঙ্গভাষার ইতিহাস প্রণয়নে এবং শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ ওকাকুরার শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থরচনায় তিনি নানাভাবে তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দিয়ে সহায়তা করেছেন। শতদল পদ্মের মত তাঁর হৃদয়খানি ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মের জ্যোতিতে এবং আত্মনিবেদনে দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

প্রকৃত জীবন-চরিত লেখা বড় কঠিন। খুব পরিশ্রম করে জীবিত ব্যক্তিদের কাছে তথ্যানুসন্ধান, সত্যাসত্য বিচার এবং তাঁর রচনাবলী অধ্যয়ন করে জীবনের ঐ আদর্শ বুঝতে হয়। জীবন-চরিতের ঘটনা যদি কল্পনামিশ্রিত থাকে, যদি তাতে অসত্য প্রবেশ করে, তবে সেই জীবন-চরিত উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। রচনার মাধুর্যে, অবাস্তব ঘটনার সমাবেশে সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করতে পারেবটে, কিন্তু বস্তুতঃ তা প্রকৃত জীবন-চরিত বলে গ্রহণ করা কঠিন। অনুবাদিকা ফরাসী ভাষায় ঠিক মূল গ্রন্থের কথাগুলি অনুবাদ করেছেন আর কতকটা তাঁর নিজের উচ্ছ্বাসের ভাষার সঙ্গে মিশে আছে। কারণ কতকগুলি শব্দ আছে যা তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ কিনা সন্দেহ। বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁরা নিবেদিতার সংস্পর্শে এসেছেন এবং তার ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁরা নিবেদিতার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত আজ পর্যন্তও লেখেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে কোনও যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করবেন।

শুভ নববর্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শুভ স্থল, জল, অন্তরীক্ষ বায়ু,
শুভ দেহমন, সুদীর্ঘতর আয়ু,
সিদ্ধি ঋদ্ধি, শান্তি পুষ্টি শ্রী,
প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ ধরিত্রী,
সত্য সকল সার্থক সাধু বাক্,
মানুষ করুক মনুষ্যত্ব লাভ।
হউক সকলে শ্রীভগবানের প্রিয়,
হে নববর্ষ, এই মহাদান দিয়ো।

সর্ব্বত্রই ভগবানে যেন খুঁজি,
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীরে পূজি,
সর্ব্বসিতের উপাসক হয়ে রই
শুধু অনাগত অমৃতের কথা কই।

গাঁথো সমাজের নূতন করিয়া ভিত
সকল মানব হোক কল্যাণকৃৎ
যেথা যত আছে উৎপীড়িত ও ভীত—
হউক মুক্ত—ভগবান হোন প্রীত।

হে নববর্ষ, যারা এ ভুবন মাঝে
যপ তপ আর ভগবান লয়ে আছে—
ধরা বিশুদ্ধ যাঁহাদের নিঃশ্বাসে,
দেবতা নিত্য ভ্রমেন যাঁদের পাশে,
অপার্থিবের শুধু যাঁরা কারবারী,
যেন তাঁহাদের মহিমা বুঝিতে পারি।
তাঁদের বিভূতি প্রতি ভালে দাও এঁকে
দিব্য কর সে পদরজ অভিষেকে।

ঘটা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মামার বাড়ীতে এসেই রন্তু মস্ত এক উৎসবের মধ্যে পড়ে গেল। উৎসবটা ঠিক মামার বাড়ীতেই না হলেও একেবারেই পাশের বাড়ীতে, তার উপর কাজের জন্ম এ বাড়ীর সবাই ও-বাড়ীতে এত যাওয়া-আসা করছে যে, মনে হচ্ছে দুটো বাড়ী যেন এক হয়ে গেছে।

খুব বড় না হোক বাপ-কাকা-দাদাদের মত, তবু এই বছর সাতের মধ্যে ঘটা কয়েকরকম দেখেছে বৈ কি; নিজেরই তো জন্মতিথি হয়ে গেল এই ক'দিন আগে, তারও আগে হ'ল দাদার পৈতে, পিসীর বিয়ে। আরও ঘটা দেখেছে কত, নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে, কিন্তু এ ধরনের ঘটা ঠিক দেখে নি। মামার বাড়ার মতই বেশ বড় বাড়ী, তার সামনে প্রকাণ্ড দুটো শামিয়ানা পড়েছে, তার নীচে কত কি ব্যাপার! একটাতে কেত্তন-গান হচ্ছে, তিন জন মেয়ে আর খোল কত্তাল আরও কি সব বাজনা। একটাতে পুজো হবে, তার জন্ম কত কি সব সরঞ্জাম। চারখানা পালং, গদি, বালিশ, চাদর-দেওয়া, মশারি-ফেলা। কত ঘড়া, কত থালা, কত ঘটি, কত গেলাস সাজানো হয়েছে, একদিকে বাছুরসুদ্ধ কি চমৎকার গোরু একটা, মালা-পরানো; একদিকে একটা ধপ্‌ধপে সাদা ষাঁড়, তার গলাতেও মালা; পুজোর জায়গায় কাপড়, শাড়ী, নৈবিদ্যি, কত ফুল, ধূপ ধুনো আরও কত কি—সব বড় বড় পুজোতেই যেমন হয়। আরও খানিকটা সরে দশ-বারো জন বই খুলে মিষ্টি সুরে দুলে দুলে কি সব পড়ছে।

পুজো আরম্ভ হ'ল—সেও কতক্ষণ ধরে! পুরুতের পাশে বসেছে নেড়ামাথা, মোটাসোটা, টকটকে রং, ধপ্‌ধপে কাপড়-পরা একজন লোক। আরও ঐ রকম নেড়ামাথা টকটকে রং ধপ্‌ধপে কাপড়-পরা তিন জন ঘোরাঘুরি করছে আর মাঝে মাঝে এসে বসছে। পুজোর পাশেই প্রকাণ্ড সতরঞ্চির উপর সাদা ধপ্‌ধপে চাদর পাতা, তাতে অনেক লোক রয়েছে বসে।

বাড়ীর ভিতর প্রকাণ্ড উঠোনের উপর মস্ত বড় চাদর টাঙিয়ে একদিকে রান্না হচ্ছে, বড় বড় কড়ায় কত রকম রান্না! একদিকে হচ্ছে খাবার তৈরি—কচুরি, রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, বোঁদে। এক জায়গায় বড় কাঠের বারকোশে ময়দা ঠাসা হচ্ছে।...দই এসেছে! দই এসে গেছে শব্দ হ'ল; রন্তু ময়দা ঠাসা দেখছিল—বেশ লাগে ত, খোকাকে চটকাবার মত, নিজেরও ইচ্ছে করে ঠাসি—শব্দ শুনে ছুটে এল। হাঁড়িতে হাঁড়িতে কত দই! ভাঁড়ারঘর থেকে ক'জন মেয়ে বেরিয়ে এল। "এদিকে নিয়ে এস গো, একেবারে ঘরে তোল।"...বলতে না বলতেই—"ক্ষীর কোন ঘরে রাখা হবে গো?" রন্তু ঘুরে দেখে ছোট হাঁড়ি করে হাঁড়ি হাঁড়ি ক্ষীর!

কত কি যে হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখে যেন থৈ পাচ্ছে না রন্তু।

এক জায়গায় পিসীর মত কত মেয়ে, পিসীর চেয়ে বড় আবার পিসীর চেয়ে ছোটও—সবাই এত পান সেজে জমা করে যাচ্ছে। কত গেলাস, কত খুরি, কত পাতা, কত আসন! ঘটা অনেক দেখেছে বৈ কি রন্তু, কিন্তু এ রকম ঘটা ত দেখে নি।

বিকেলে পুজো হয়ে গেল। এবার কাপড়, বাসন, পালং—সব নাকি দিয়ে দেওয়া হবে। কিছু কিছু বাসন তখুনি কত লোকে এসে নিয়ে নিয়ে গেল, একজন খাতা দেখে নাম ডেকে ডেকে বলছে আর সবাই নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক রইলও পড়ে, আরও সবাই এসে নিয়ে যাবে। একখানা বিছানা-সুদ্ধ পালং আর অনেকগুলো বাসন রন্তুর মামার বাড়ীর লোকেরা এসে নিয়ে গেল।

তার পর রাত্তিরে সে কি নেমন্তন্নর ঘটা! কত আলো, কত লোক, হৈ-হল্লা! এত বড় নেমন্তন্ন আর কখনও দেখেছে কি রন্তু? কৈ, মনে পড়ে না ত। খুব খেলেও রন্তু; ওকে নেমন্তন্নয় কেউ পান দেয় না, ছেলেমানুষ, জিভ মোটা হয়ে যাবে বলে। এখানে একটার বদলে দুটো পান!

কিসের এত ঘটা তা জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু ওর দিদিমাকে। ও-বাড়ীর কত্তা আশী বছরে সগ্‌গে গেলেন কি না, তাই ছেলেরা দানসাগর সেরাদ্দ করেছে। খুব বড় বড় চাকরি করে ত ছেলেরা, অনেক টাকা, দুখানা মটোর। আরও জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু, সেরাদ্দ যেমন দেখে নি তেমনি সগ্‌গও ত দেখে নি কখনও। কাউকে যেতেও দেখে নি। দিদিমা বললে সে নাকি এর চেয়েও ভাল জায়গা, আর রোজ রোজ সেখানে নাকি এর চেয়ে কত বড় বড় ঘটা হয়, কত রংবেরঙের আলো। রন্তুরা যদি আর ক'দিন আগে এসে

পড়ত ত দেখতে পেত কত বাজনাবাদ্যি করে, কত পয়সা দো-আনি ছড়াতে ছড়াতে কত সাজিয়ে গুজিয়ে সবাই সংগে নিয়ে গেল ও বাড়ীর কর্ত্তাকে। সবাই যায় সংগে, আগে ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, দাদামশাই-দিদিমারা যায়, তারপর তার ছেলেমেয়েরা, তার পর তার ছেলেমেয়ে—সবাই যখন বুড়ো হয়ে উঠে। পুণ্যির জোর থাকলেই যায়, যেমন টাকার জোর থাকলে তবে ত কলকাতায় গিয়ে বাড়ী করতে পারে লোকে। তবে একবার গেলে আর ফিরতে চায় না। আর কেনই বা ফিরবে? অত ঘটা, অত বাজনাবাদ্যি সেখানে। দেখা হয় বৈ কি সেখানে, ছেলেমেয়েরা যাবে, তার পর তার নাতি-নাত্নীরা, তার পর আবার তার ছেলেমেয়েরা, বুড়ো হ'লে। কি করতেই বা আসবে অমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে?

বুড়ো না হলে যায় না, যেতেও নেই; তাইতেই না দিদিমা ও-রকম করে ধমক দিয়ে উঠল রন্তুকে যখন সে বেচারি সব শুনেটুনে যেতে চেয়েছিল সেখানে।

রন্তুরা আসতই মামার বাড়ীতে, আরও একটা মস্ত বড় ঘটা রয়েছে যে এখানে। রন্তুর দাদামশাইয়ের জন্মতিথি। দাদামশাইও আশী বছরে পড়লেন কিনা, তাই এবারে নাকি খুব ঘটা করে হবে আর সেই জন্যই রন্তুরা সবাই এল এবার। নৈলে অত দূর থেকে ত রোজ রোজ আসা যায় না, এই তিন বছর পরে তারা এসেছে, মা বলেন—ঠিক এই তিন বছর পাঁচ মাস পরে। আরও পরে আসত, তবে পাশের বাড়ীতেই নাকি এত বড় কাজ হচ্ছে—দানসাগর ত আজকাল আর কেউ করে না বাপ মায়ের জন্যে—নিজের মোটরগাড়ি করবে, বড় লোকদের পার্টি দেবে, না, বাপমায়ের দানসাগর করবে? তাই, অত বড় একটা কাজ হচ্ছে বাড়ীর পাশেই, আর ওদের সঙ্গে খুব ভাবও ত, দু'দিন আগেই সবাই চলে এল।

বেশ লাগছে এখানে রন্তুর। শ্লেট দ্বিতীয় ভাগ বাক্সয়, সবাই দেশের চেয়ে আরও ভালবাসে, তার পর এই ঘটার উপর ঘটা। দাদুর জন্মতিথি এসে গেল বলে, আর মাত্র আটটি দিন আছে। তার পরে এ বাড়ীতেও কত আলো, কত ঘটা, কত নেমন্তন্ন!

রন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। আর মোটে তিন দিন বাকি, তবু এ বাড়ীতে ত ঘটার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও-বাড়ীর কর্ত্তার দানসাগরের ঠিক তিন দিন আগে ওরা এসেছিল। তখন থেকেই কত কাজ পড়ে গেছে ও-বাড়ীতে বাসন-কোসন কিনে কিনে আনছে বাজার থেকে—আরও কত সব জিনিস। পালং চারটে বড় বড় মোটরগাড়ি করে এসে পড়ল, তাতে ফিতে জড়ান হ'ল, তারপর বিছানা পাতা হ'ল। বাইরে উঠোন পরিষ্কার করছে কত 'মুনিস' এসে। তার পরদিন শামিয়ানা এসে পড়ল। কত হৈ হৈ করে কত লোকে দাঁড় করাল সে ছুটো। মুনিসদের বাড়ীর মেয়েরা এসে পুজোর জায়গা নিকোচ্ছে গোবর দিয়ে। আরও কত কাজ, রাত্তিরে বড় বড় আলো জেলে করছে সবাই। তার পরদিন বাড়ীর উঠোনের উপর চাদর টাঙিয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, উনুন তৈরি, ওদিকে উনুন জেলে খাবার তৈরি, এদিকে কুটনো কোটা, কত হৈ হৈ রৈ রৈ। তার পরদিন সকাল থেকে তো কথাই নেই।

ওর মামার বাড়ীতে কিন্তু কৈ সে রকম ত কিছু হচ্ছে না। কাল হয়ে গেলেই ত পরশু, কিন্তু শামিয়ানাও আসছে না, খাট বাসন-কোসন এসবও কিছু আসছে না। মুখটা চুণ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রন্তু। আরও একটা দিন গেল, কাল সকাল হলেই জন্মতিথি, কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

এসে পর্যন্ত দেখছে এ বাড়ীর সবাই ওদের কাজে ব্যস্ত। শুনে এসেছিল মামার বাড়ী গিয়ে সবার কাছে খুব আদর পাবে, তা ত হয়ই নি, দু'এক জন ছাড়া সবার সঙ্গে ভাল করে জানাশোনাও হয় নি যে জিজ্ঞেস করে—দাদুর জন্মতিথি এসে পড়ল অথচ ঘটার কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন। একটু জানাশোনা হয়েছে ছোট মামার সঙ্গে, আর সেই যেন দাদুর জন্মতিথির জন্য একটু ব্যস্ত. কয়েকবার তার মুখেই শুনলে জন্মতিথির জন্য এ জিনিসটা এখনও এসে পড়ল না, ও জিনিসটা এসে পড়ল না। তবে ব্যস্ত বলেই তাকে জিজ্ঞেস করবার সুবিধে হচ্ছে না। তবু ওরই মধ্যে একবার একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—দাদুর জন্মতিথিতে ঘটা হবে না?

ছোট মামা কোথায় যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল, একটু যেন রেগে গিয়ে একটু হেসেই বলল, "এই দেখো। বোকা ছেলে কাজে বেরুচ্ছি পেছু ডেকে দিলে! সেই জন্যই ত যাচ্ছি রে হাবা, ঘটা যখন হবে তখন দেখবি!"

হন্ হন্ করে চলে গেল। সেই থেকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহসও হচ্ছে না, কে কাজে যাচ্ছে, কে যাচ্ছে না কি করে জানবে? ছোট মামা আদর করে তাই তবু একটু হেসে বকলে, আর কেউ হলে ত চোখ রাঙিয়েই বকত।

মুখ বুজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রন্তু। এক একবার মনে হচ্ছে হয় ত কোথাও কিছু নেই, একেবারে হুড়হুড় করে সব এসে পড়বে। যেমন গল্প শুনেছে আলাদীন পিদিম জেলে দিলে আর হুড় হুড় করে সবকিছু এসে পড়ল—প্রকাণ্ড বাড়ী, খাট পালং, নানা রকম খাবার, হাতি ঘোড়া। কিংবা

যেমন সিনেমাতে দেখছে, কিংবা যেমন ম্যাজিকে দেখলে সেদিন—কোথাও কিছু নেই, টুপির মধ্যে থেকে ম্যাজিকওলা বের করতে লাগল—রুমাল, জামা হাঁস, তার ডিম, সন্দেশ টাকা। মামার বাড়ি এক আশ্চর্য্য জায়গা সে তো শুনে এসেছেই—ছড়ায়, গল্পে; ওদের দেশের চেয়ে এদেশটা কত বিষয়ে কত নূতন তাও তো দেখে আসছে; এ বিশ্বাসটা করতে মোটেই বাধল না রন্তুর, বরং যতই সময় যেতে লাগল, এখনই কি হয়ে বসে, এইবার বুঝি হু হু করে যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়—এই রকম একটা আশার সঙ্গে বিশ্বাসটা যেন বেড়েই যেতে লাগল। কোথায় হঠাৎ আরম্ভ হয়ে পড়বে তারই সন্ধানে যেন বাড়ীর এখানে-ওখানে চুপ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই না ঘটতে দেখে ওর বিশ্বাসটা যেন কমে আসতে লাগল, মনটা ক্রমেই নিঝুম হয়ে পড়তে লাগল, যেন স্পষ্ট করে কিছু একটা জানতে না পারলে আর স্বস্তি পাচ্ছে না। এই নৈরাশ্য, তার উপর আর একটা নূতন জিনিস মনে হয়ে ওর এক এক সময় বোধ হচ্ছে যেন কান্না ঠেলে আসছে গলায়।

—দাদুর কথা ভাবছে রন্তু। আহা খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, নয় শুয়ে আছেন, না হয় বারান্দাটিতে চেয়ারে বসে আছেন, নিজে কিছু করতে পারেন না, সামান্য কাজও ডেকে ডেকে করাতে হয়, কেউ যদি একটু না ভাবে তার জন্মতিথির এত বড় ঘটাটা, তিনি নিজে হতে কি করে করবেন? এক একবার দূর থেকে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—চোখ বুজে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে কত কি যেন ভাবছেন দাদু—নিশ্চয় এই সব কথাই—বড় অসহায় বলে বোধ হয় ওঁকে, গলায় কান্না ঠেলে আসে রন্তুর। ঘুম পাচ্ছে। একটু পরেই দিদিমা ছোটদের ডেকে খাওয়াতে বসাবেন; তার পরেই ঘুমিয়ে পড়বে রন্তু। দাদু চেয়ারে চোখ বুজে বসে তামাক খাবেন, জন্মতিথির কি হবে কেউ ভাববে না সেকথা, আহা! রন্তু দাদুকে ভালবাসে, তাই তার মনে এত কষ্ট, আর দাদুর ত নিজের জন্মতিথি, তাঁর মনে যে কি কষ্টটা হচ্ছে তা কি বোঝে না রন্তু?

তার পর ভাবল একটু গোড়া বেঁধে এগোনোই ভাল, সব কথা ত ঠিকমত জানেও না, এই ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যা ভেবেছিল তা হচ্ছে না; প্রশ্ন করল—"পাঁচ মামা ত তোমার নিজেরই ছেলে দাদু?"

দাদু যে হঠাৎ অমন করে গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন কেন রন্তু তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল; দাদু হেসেই বললেন—"ধরে নিলুম আমারই, তা কি বলতে চাস তুই?"

লজ্জায় পড়ে গেছে, রন্তু একবার মাথাটা ঘুরিয়ে চারিদিকটা দেখে নিল কেউ শুনছে কি না। তার পর বলল— "বলছিলাম তা হলে তোমার বেলায় ও-বাড়ীর কর্ত্তার মত ঘটা হচ্ছে না কেন? তোমার ত একজন ছেলে বেশী দাদু।

এবারেও একটু হেসে উঠলেন দাদু, বললেন—"তার যে শ্রাদ্ধ ছিল, ছেলেরা ঘটা করে দানসাগরের উজ্জুগ করেছে।"

একটু আবার ভাবতেই হ'ল, তার পর মাথাটা আর একটু এগিয়ে দাদুর কাঁধে রেখে বলল, "আমিও সেই কথাই বলছিলাম দাদু। তুমি মামাদের ডেকে বলে দাও না—জন্মতিথিটা থাকগে, তোরা বরং সেরাদ্দই করে দে আমার, দানসাগরের উজ্জুগ করে।...আহা, এরা সবাই কতদিন পরে এসেছে ঘটা দেখবে বলে!"

আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ

প্রথম যুগ

শ্রীনিখিল মৈত্র

প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে রমণীয় আন্দামান দ্বীপমালা সর্ব্বপ্রথম ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ইতিহাসের পটভূমিতে স্থান পায় বাংলা সরকারের উপনিবেশরূপে। ভৌগোলিক স্থিতিতে আন্দামানের সর্ব্ব উত্তর অংশ প্রাইস অন্তরীপ থেকে হুগলী নদীর মোহনার দূরত্ব মাত্র ৫৯০ মাইল। বর্ম্মার নেগ্রেইস অন্তরীপ থেকে আন্দামানের নিকটতম অংশের ব্যবধান আরও অনেক কম—মাত্র ১২০ মাইল। বঙ্গোপসাগরের মাঝামাঝি ১০° থেকে ১৪° ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা ও ৯২° থেকে ৯৪° ডিগ্রী পূর্ব্ব মধ্যাহ্ন রেখার মধ্যে অবস্থিত ২,৫০৮ বর্গমাইল আয়তনের ২০৪টি ছোট বড় দ্বীপসমষ্টি আন্দামান বিরাট অজগরের মত ২১৯ মাইল দীর্ঘস্থান অধিকার করে রয়েছে, কিন্তু দ্বীপমালা প্রস্থে স্বপরিসর, কোথাও ২০ মাইলের বেশী নয়।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতের পূর্ব্ব তটের বন্দরের সঙ্গে সাগরপারের অন্য দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। চীন, আরব ও মালয় দেশের নাবিকদের কাছে বঙ্গোপসাগরের পথ অজ্ঞাত ছিল না। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আশ্রয়, পানীয় এবং আহার্য্যের সন্ধানে পণ্যতরণীকে মাঝে মাঝে আন্দামানেও আসতে হয়েছে। কিন্তু, আন্দামান সাগরে যেমন সুগভীর এবং নিরাপদ স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে, তেমনি আবার সে যুগে শিলাসঙ্কুল দ্বীপমালা-বিকীর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত পথে বায়ুর গতিবেগে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল জাহাজের সাহায্যের চেয়ে বিপদের আশঙ্কাই ছিল বেশী।

প্রাকৃতিক বিপত্তির থেকেও বোধ হয় বেশি ভীতিপ্রদ ছিল আন্দামান দ্বীপের খর্ব্বাকৃতি নিগ্রয়েড জাতীয় আদিম অধিবাসীদের নৃশংসতা। শিলারাশির সঙ্ঘাতে জাহাজ জলমগ্ন হলে যে সব নাবিকদের সলিল সমাধি হ'ত না, আন্দামানীদের হাতে তাদের মৃত্যু এক রকম অবধারিতই ছিল। সেই জন্যেই সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করে ভারতের সভ্যতা,সংস্কৃতির যে ধারা বর্ম্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও চীনকে আলোড়িত করেছিল, আন্দামানের আদিবাসীকে তা স্পর্শ করে নি। দ্বীপবাসীরা সভ্যতার জয়যাত্রায় সবার পেছনের সারিতে পড়ে রইল। বোধ হয় পৃথিবীতে এত অনগ্রসর ও আদিম অবস্থায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী আর নেই। ক্লডিয়াস টলেমি, মার্কো পোলো, নিকোলাই কাণ্ট এবং বিভিন্ন আরব নাবিকদের বর্ণনাতে আন্দামানের নাম উল্লেখ আছে, সত্য মিথ্যা নানারকম কাহিনীও পাওয়া যায়। তবুও তাঁদের সবারই আন্দামান পরিচয় যে অত্যন্ত ক্ষীণ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি সমুদ্রপথে পূর্ব্ব দেশের সঙ্গে ব্যবসা, বাণিজ্য, দেশ অধিকার এবং তারই সঙ্গে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মপ্রচার সুরু করল আর এর পরিণতি হ'ল ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বিরাট প্রতিযোগিতার এবং প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষে। আন্দামানের পীমা, পাডুক, গর্জ্জন, চাপলাশের দুর্ভেদ্য বনানীতে তখনও কোনও বিদেশী শক্তির জয়কেতন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অথচ আন্দামান দ্বীপমালার ৭৫ মাইল
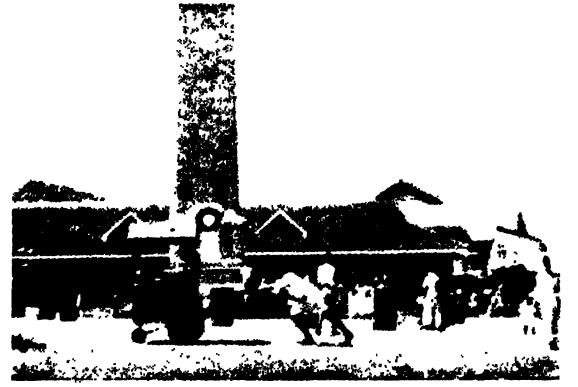
পোর্ট ব্লেয়ার, আবেরডিন বাজারে ঘড়িঘর

দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, মোরাভিয়ান, ডিনেমার প্রভৃতি জাতির ব্যবসাকেন্দ্র, মিশনারী সংগঠন এবং শাসন-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। ম্যালেরিয়া, নিকোবরী আদিবাসীদের সুস্পষ্ট অসহযোগিতা বা প্রকাশ্য শত্রুতা, যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা এ সব সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় নিয়ে কারনিকোবর-নানকৌড়িতে উপনিবেশ গড়ার প্রয়াস বহুদিন ধরে চলেছিল। পরে তাও কেন বহু পরিমাণে অসফল হ'ল সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে, এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইউরোপীয় জাতির সমস্ত রকম ধর্ম্মপ্রচার, দেশ-অধিকার, ব্যবসা সম্পর্ক স্থাপনার মূল প্রেরণা ছিল প্রাচ্যের অলৌকিক বনসম্পদ লুণ্ঠনের বাসনা। গভীর অরণ্যের বনসম্পদ ছাড়া, আহরণ, অর্জ্জন বা লুণ্ঠনের অন্য কোনও উপকরণই তখন আন্দামানে ছিল না। নিকোবরে অন্ততঃপক্ষে নারকেল ও সুপারীর প্রাচুর্য্য ছিল। হেম মৃগের সন্ধানে আন্দামানে আসা ছিল একান্ত বাতুলতা।

প্রথম উপনিবেশ

(১৭৮৯-৯৬)

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বঙ্গোপসাগরে কয়েকখানা বাণিজ্য জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং আন্দামানের উপকূলে শিলা-সঙ্কুল তটরেখায়

আহত জাহাজের অসহায় নাবিকদের হত্যার খবর বাইরের জগতেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে সুদূরপ্রসারী যাতায়াত পথ সুরক্ষিত করার জন্য আন্দামানের উপর সাধারণ সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য হয়ে উঠল। ১৭৮৮ খ্রীঃ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের লেঃ কোলব্রুক ও ভারতীয় নৌ-বহরের লেঃ আর্চিবাল্ড ব্লেয়ারকে আন্দামান দ্বীপমালায় পাঠান হয়। এঁদের তথ্যবহুল বিবরণ ও সুপারিশ অনুযায়ী ১৭৮৯ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আন্দামানের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে পোর্টব্লেয়ার পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে আড়াই মাইল দূরে খাড়ির মধ্যে বার একরের ছোট চ্যাথাম দ্বীপে আন্দামানের প্রথম উপনিবেশ ২০০ জন স্বাধীন উপনিবেশকারীকে নিয়ে স্থাপিত হয়। উপনিবেশের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হয় লেঃ আর্চিবল্ড ব্লেয়ারের উপর। পরবর্তীকালের বন্দীকারার সঙ্গে এ শিবিরের মূলগত পার্থক্য ছিল। স্থানীয় আদিবাসীদের নৃশংসতা বা নরমাংস ভোজন সম্বন্ধে সত্য, অসত্য নানা কাহিনী প্রচলিত থাকলেও চ্যাথাম দ্বীপে এই নূতন উপনিবেশে কাউকেও বিপদের সম্মুখীন হতে হয় নি। কেবল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপ পর্য্যবেক্ষণের সময় ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ হয় এবং তাতে এক জন মারা যায়।

১৭৯২ খ্রীঃ মার্চ মাসে লেঃ ব্লেয়ার কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তাতে জানতে পারা যায় যে, জলহাওয়া উপনিবেশকারীদের ভালই লাগছিল, রোগভোগও খুব কম এবং সব থেকে আশ্চর্য্যের যে, আদিবাসীরা বহুদিন থেকে বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং তারাও বুঝতে পেরেছিল যে বহিরাগতদের ব্যবহার ও উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ।

"The settlement had been so healthy as to suffer no injury from the absence of the surgeon, who had been to Calcutta on leave, and the natives had been perfectly inoffensive for a long time, and are becoming more familiar—they seem now convinced that our interests are pacific."

লেঃ ব্লেয়ার ১৭৯২ খ্রীঃ দু'জন আন্দামানীকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। তারা সম্ভবতঃ অধুনা অতি কুখ্যাত অতি হিংস্র বলে পরিচিত আন্দামানের বৈরী-ভাবাপন্ন জারোয়া উপজাতির লোক।

১৭৯২ সনের শেষাশেষি আন্দামান উপনিবেশের স্থান পরিবর্ত্তন করে উত্তর আন্দামানের পোর্ট কর্ণওয়ালিশে নিয়ে যাবার তোড়জোড় আরম্ভ হয়। তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেলের ভ্রাতা কমোডোর কর্ণওয়ালিশের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয়। অবশ্য, কমোডোর কর্ণওয়ালিশ প্রতিরক্ষার প্রশ্নকেই বড় করে দেখেছিলেন। নূতন জায়গার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, আদিম নিবাসীদের সম্পূর্ণ উদাসীনতা এবং কখনও প্রকাশ্য শত্রুতা উপনিবেশ অধিকর্তাদের সামনে বিরাট সমস্যা রূপে দেখা দেয়। তার সঙ্গে, ১৭৯৩ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের সমরানল ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্য সংগ্রামে রূপান্তরিত করে। সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে উপনিবেশের গভর্ণর মেজর কীড সাধ্যমত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। দুর্গনির্ম্মাণ, বন্দরের প্রতিরক্ষার জন্য কামান স্থাপনা, নারী-শিশুদের

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ, পোর্ট ব্লেয়ার
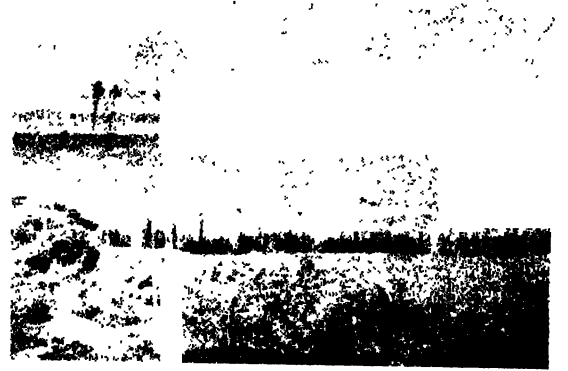
নিরাপদ সুরক্ষা-ব্যবস্থা এমনি অনেক পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছিল। তবে, কোনও সংঘর্ষ আন্দামানে হয় নি।

আন্দামানে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার ব্যয়, স্বাস্থ্যের ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি এই সমস্ত কারণে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্স উপনিবেশ উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সময় ২[illegible]০ জন শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত কয়েদী ও ৪৭০ জন স্বাধীন মানুষ নিয়ে ছিল উপনিবেশের জনসমষ্টি। স্বাধীন মানুষের মধ্যে ছিল সৈন্য, ইউরোপীয় আধিকারী, ভারতীয় এবং ইংরেজ অসামরিক ব্যক্তি ও তাদের পরিবার-পরিজন। উপনিবেশ উঠিয়ে দেওয়ার পর কয়েদীদের পেনাঙে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

উপনিবেশ উঠিয়ে নেবার সময় কর্তৃপক্ষ আন্দামানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা কাগজে-কলমে করেন, কিন্তু তা কার্য্যকরী হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর উপনিবেশ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, পরবর্তী যুগের বন্দীশিবিরের সংগঠনে এবং শাসনে এর প্রভাব ছিল সামান্যই। কিন্তু আন্দামানের বিচ্ছিন্নতা, অপরিচিতের পরিবেশে সৃষ্ট রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর ধারণা অনেকাংশে কেটে গেল। এখন থেকে আন্দামান ক্রমবর্দ্ধমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই থেকে গেল।

উপনিবেশ উঠে যাবার পর আন্দামানের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন না হলেও, শিথিল হয়ে আসে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের স্তম্ভে জলমগ্ন জাহাজ ও জাহাজীদের করুণ কাহিনীর মধ্যে আন্দামান দ্বীপ আত্মপ্রকাশ করত। আন্দামানের আদিবাসীদের নিয়ে জলদস্যুরা ক্রীতদাসের ব্যবসা করছে এরকম কথাও মাঝে মাঝে শোনা যেত। এ ব্যাপারে নাকি মালয়বাসীরাই অগ্রণী ছিল। মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সুলতানদের প্রাসাদে

আন্দামানী ক্রীতদাসকে অলৌকিক জীব হিসেবে রাখা হ'ত। শ্যামের রাজাকে এ রকম ক্রীতদাস দেবার বিবরণও পাওয়া গিয়েছে। পরের যুগে, "Our Relations with the Andamanese" নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ-প্রণেতা এম. ভি. পোর্টম্যানও বলেছেন যে, আন্দামানী ক্রীতদাস ইউরোপের রাজদরবারে খর্বাকৃতি আফ্রিকার নিগ্রো 'পেজ-বয়' হিসাবে থাকাও মোটেই বিচিত্র নয়। ভারতবর্ষের বাদশাহ, নবাব, রাজার হাবসী গোলামদের দলেও হয় ত আন্দামানী ছিল। আন্দামানীরা যে বহিরাগতদের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর, নৃশংস ব্যবহার করত এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নেই। এ নির্মম নিষ্ঠুরতা সম্ভবতঃ প্রতিশোধজনিত। দাস সংগ্রহ ও দাস ব্যবসাই আন্দামানীদের বহিরাগতের বিরুদ্ধে এতখানি ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সার্ব্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ গ্রাণ্টের মতে বঙ্গোপসাগর ব্রিটিশ সাগরে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সমুদ্রের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বীপমালা অবাধ্য বন্যজাতির আবাসভূমিতে পরিণত হয়ে থাকবে এ কি

পোর্ট ব্লেয়ারের সংলগ্ন সমুদ্রতট

রকম কথা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ১৮৫৪ সনেই এ দ্বীপপুঞ্জে স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলেন এবং বন্দীনিবাস হিসাবে আন্দামানকে গড়ে তোলা যেতে পারে কিনা এ নিয়ে পত্রবিনিময় হচ্ছিল।

১৮৫৭ সালে ধীরস্থির ভাবে নিয়মমাফিক কাজ করার সময় কারুরই ছিল না। ১০ই মে সিপাহীদের অসন্তোষ-বহ্নি যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করল তা যেমন অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিদেশী শাসকের শোষক যন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করার সাহস ও শক্তি দিল, তেমনি আন্দামানকেও ভারত ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিয়ে এল। বিদ্রোহ দমনের নামে পাশবিকতার যে তাণ্ডবলীলা শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয়, সে কাহিনী আজ বিস্মৃতির গর্ভে। তবুও বিদেশী ইতিহাসকার বা সাংবাদিকের লেখনীতে এখানে ওখানে এ নির্মমতার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। লণ্ডন টাইমস পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ডব্লু. এইচ. রাসেল 'সিপাহী বিদ্রোহ' সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ বিবরণ পাঠাবার জন্য এদেশে আসেন। নরহত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন :

"......executions of the natives in the line of the march were indiscriminate to the last degree . . . . In two days forthy-two men were hanged on the road side, and a batch of 12 men were executed because their faces were turned the worng way, when they were met on the march. All the villages in his (Renand's) front were burned when he healted . . . . (W.H. Russel's My Diary in India. p. 473-74).

ঝাঁসির রাণী, সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী, কুমার সিং, আহম্মদ শা, মঙ্গল পাঁড়ে প্রভৃতি শহীদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী সুবিদিত। তাঁদের সঙ্গে আরও বহু সাধারণ সৈনিক, কৃষক, জমিদার, আমির, ওমরাহ, পুরোহিত, মৌলবীর মৃত্যুদণ্ড হয়। ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের নির্ব্বাসন ও জীবন অবসান হয় ব্রহ্মার টুঙ্গুতে। এ ছাড়াও হাজার হাজার বীরের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হয়। পুরাতন ইতিহাস বা সংবাদপত্রের বিস্মৃতপ্রায় পৃষ্ঠায় সামান্য সংবাদ পাওয়া যায়—জনসাধারণ ও সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির অপরাধে মৌলবী আলাউদ্দীনকে হায়দ্রাবাদে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আন্দামানে নির্ব্বাসিত করা হয়। "History of the British Empire in India"র রচয়িতা এল. জি. ট্রটারের ভাষায় :

Imprisonment for life was the doom awarded to the less darkly criminal Mannoo Khan of Lucknow.....A few hundred wretches had to linger out their forfeit lives in the Andamans.... (p. 411).

অবশ্য আন্দামানে নির্বাসিত অভিশপ্ত বিদ্রোহীদের সংখ্যা কয়েক শ' নয়, কয়েক হাজার।

মৌলবী আলাউদ্দিন, মান্নু খান, নারায়ণ, রামলোচন এমনি আরও বহু বীরকে আন্দামানে পাঠানো হ'ল। কিন্তু তার পর? সে ইতিহাস আজও অকথিত।

১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি ছিল নির্মম ও কঠোর। লেখা আছে : 'আজকের নির্মমতা অনাগত দিনের মানবতায় রূপান্তরিত হবে।' যুক্তি দেওয়া হ'ত—'প্রাচ্যের লোক অনুকম্পা, কোমলতাকে দুর্বলতা বলে মনে করে।' (পার্সিভাল্ ল্যাণ্ডন প্রণীত গ্রন্থ "১৮৫৭") ১৮৫৮ সনের ১৪ই জানুয়ারী 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' কাগজে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, বোম্বাই থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত ৭৮ জন কয়েদীকে পেনাঙে পাঠানো হয়েছিল। তাদের দেখে নাকি পেনাঙের ইউরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র ঘৃণার ভাব জাগে। তাদের কাজ দেওয়া হয় শহরের সব থেকে নোংরা ড্রেন সাফ করায়।

পেনাং, মৌলমিন বা টেনাসারিমে বন্দীদের পাঠানোর ব্যবস্থা সাময়িক। আন্দামানে আবার উপনিবেশ স্থাপন করার বিষয় নিয়ে

ভারত, বাংলা, বর্ম্মা সরকার ও কোম্পানীর বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছিল। এবার তা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাস্তব রূপ নিল। ২০শে নবেম্বর, ১৮৫৭ সনে আন্দামান দ্বীপমালা পর্য্যবেক্ষণ করে সেখানে কোথায় কি ভাবে উপনিবেশ গড়া যায় এ স্থির করার জন্তে সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেল একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটির সভাপতি বেঙ্গল আর্মির সার্জ্জন এফ. জি. মোয়াট এবং সভ্য বেঙ্গল আর্মির সার্জ্জন জি. আর. প্লেফেয়ার ও নৌ-বহরের লেঃ জে. এ. হীথকট। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জানুয়ারী ১৮৫৮ সালে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল সিদ্ধান্ত করলেন যে লোক-চক্ষুর অন্তরালে পরিবার পরিজন থেকে বহু দূরে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত আন্দামানের বিস্তৃত দ্বীপমালা আর তার সুগভীর বনানীর মধ্যেই বন্দী-শিবির স্থাপন করা হবে। ডাঃ মোয়াটের নেতৃত্বে নিযুক্ত কমিটি দক্ষিণ আন্দামানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলকে (যেখানে লেঃ ব্লেয়ার প্রায় সত্তর বছর আগে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনা করে-ছিলেন) বন্দী-শিবির স্থাপনার উপযুক্ত স্থান বলে স্থির করেন।
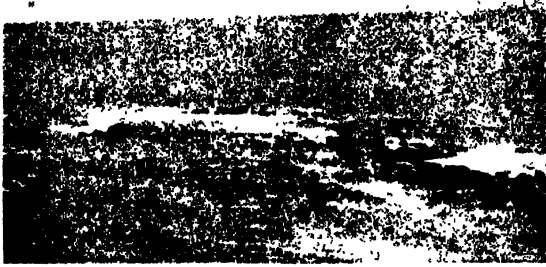
মধ্য আন্দামানে জনমানবশূন্য সমুদ্রোপকূল

লেঃ ব্লেয়ারের নাম অনুযায়ী এর নাম হ'ল পোর্ট ব্লেয়ার। ১৮৫৮ সনে ২২শে জানুয়ারী কাপ্তেন মনি পোর্ট ব্লেয়ারে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রিটিশ সার্ব্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। আগেও আন্দামানের উপর ব্রিটিশ শাসন কায়েম করার জন্ত কোনও যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয় নি বা অন্ত কোনও ইউ-রোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষারও প্রয়োজন হয় নি।

১৮৫৮ সনের ১০ই মার্চ্চ আন্দামান বন্দী উপনিবেশের প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ জে. পি. ওয়াকার ২০০ জন কয়েদী, এক জন ভারতীয় ওভারসিয়র, দুই জন ভারতীয় ডাক্তার এবং একজন ইউ-রোপীয় অফিসারের অধীনে পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় নেভাল ব্রিগেডের গার্ড নিয়ে আন্দামানে বন্দী-শিবির স্থাপনা করলেন। ড. ওয়াকারের শাসন ব্যবস্থার সময় ছিল ১৮৫৮ মার্চ্চ থেকে ১৮৫৯ এরা অক্টোবর পর্য্যন্ত। বন্দীরা সবাই বিদ্রোহী সিপাহী, তাঁর শাসনব্যবস্থার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সরকারী ঐতিহাসিক এম. ভি. পোর্টম্যান বলেছেন: "ডাঃ ওয়াকার কয়েদীদের শাসনের জন্ত কঠোরতা অবলম্বন প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। সম্ভবতঃ কঠোরতার কিছু আধিক্য হয়েছিল।" ডাঃ ওয়াকারের সাফাই গাইতে গিয়ে এই ভাষ্যকার বলেছেন যে, তখনকার দিনে বিদ্রোহীদের কার্য্যকলাপের

'মহারাজা' জাহাজে বাংলা বাস্তুহারাদের 'কালাপানি' অতিক্রম

সঙ্গে যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারীরা পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্করুণ কঠোরতা অবলম্বন করাই ছিল স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্য যে, ওয়াকার সাহেবের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত কোনও বন্দী কিছু লিখে রেখে যান নি।

বন্দীর দল এসে আগেকার সেই চাথাম দ্বীপে জঙ্গল পরিষ্কার করে ঘর বানাতে আরম্ভ করল। কয়েকদিন পরে আর একদল কয়েদীকে পোর্টব্লেয়ারের মুখে আধ একর আয়তনের রস দ্বীপে কাজ করতে পাঠান হ'ল। রস থেকে চাথাম দ্বীপের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় আড়াই মাইল। রস দ্বীপকে স্বল্পপরিসর খাড়ি প্রধান ভূখণ্ড— দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপ থেকে বিভক্ত করেছে। তখন রস দ্বীপ আন্দা-মানের অন্ত জনবিরল দ্বীপের মত গভীর বনে পূর্ণ ছিল আর তার মধ্যে আন্দামানী আদিবাসীরা বসবাস করত। আগেকার উপনিবেশ থেকে এবারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংখ্যাতেও বহিরাগতেরা অনেক বেশী এবং তারা গাছপালা, ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করল। আন্দামানের অধিবাসীদের ক্রমশঃ পিছু হটতে হ'ল। তবে অনগ্রসর, হিংস্র বৈরীভাবাপন্ন আন্দামানীরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হবার ব্যবস্থাকে বিনা যুদ্ধে স্বীকার করে নিতে পারল না। ফলে, আরম্ভ হ'ল কর্ম্মরত বন্দীদের উপর আক্রমণ। এ ছাড়া বিদ্রোহী সিপাহী আন্দামানে কারাগৃহ তৈরী করে তাতে সমস্ত জীবন নির্যাতিত হওয়ার থেকে আন্দামানের অজ্ঞাত, অপরিচিত বনে জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া শ্রেয় বলে মনে করল।

প্রথম কয়েদী দল আসার চার দিন পরই—১৪ই মার্চ (১৮৫৮) দানাপুরে বিদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন নির্বাসিত বন্দী নারায়ণ চাথাম দ্বীপ থেকে আধ মাইল বিস্তৃত খাড়ি পার হয়ে দক্ষিণ আন্দা-মানের প্রধান ভূখণ্ডে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ধরা পড়ে তার ফাঁসী হয়। আন্দামানের মাটিতে নারায়ণই প্রথম শহীদ। ২৩শে মার্চ রস দ্বীপ থেকে আবার এগার জন কয়েদী পালায়। পলাতক কয়েদী দক্ষিণ আন্দামানের গহন বনে স্বাধীনতা পেল না। চার-দিকে গভীর জঙ্গল, জোঁক আর পোকামাকড়ে ভরা। খাওয়ার

আন্দামানে বাঙালী কৃষকের ঘর দরজা

সংস্থান স্বকীয় চেষ্টায় করা একরকম অসম্ভব, অনেক জায়গায় পানীয় জলও পাওয়া যায় না, তার পর আন্দামানী আকাবী, জারোয়া প্রভৃতি হিংস্র জাতির আক্রমণ। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে, মৃত্যু-দণ্ড অবধারিত। উপনিবেশ স্থাপনার তিন মাসের মধ্যে সরকারী খতিয়ানের হিসাব :

মোট আমদানী
কয়েদী—৭৭৩

হাসপাতালে মৃত্যু—৬৪
পালিয়েছে কিন্তু ধরা পড়ে নি
(সম্ভবতঃ অনাহারে বা বন্য
জাতির আক্রমণে নিহত)—১৪০
আত্মহত্যা— ১
পালানোর চেষ্টায় মৃত্যুদণ্ড—৮৭

মোট—২৯২

অবশিষ্ট ৪৮১ কয়েদীর মধ্যে ৬০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল।

কয়েদীদের এই বিরাট মৃত্যুহারে কিন্তু সরকার মোটেই বিচলিত হন নি। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব পোর্ট ব্লেয়ারের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে কয়েদীদের দলবদ্ধ আক্রমণ সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকতে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন—গার্ডদের বন্দুকে যেন সব সময় টোটা ভরা থাকে এবং প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ যেন আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করা হয়। জবরদস্ত ডাঃ ওয়াকার নিয়ম জারি করলেন যে, কয়েদীদের জোড়ায় জোড়ায় হাতকড়িবদ্ধ অবস্থায় কাজ—ওঠা-বসা করতে হবে। আর 'বিপজ্জনক' বলে যাদের মনে করা হ'ত, তাদের ডাণ্ডাবেড়ী পরিহিত অবস্থায় দিবারাত্রি রাখা হ'ত। এমনকি কাজের সময় নিছক বসিয়ে রাখার জন্য তাদেরও সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এই অবস্থায় নিরস্ত্র, অসহায় বন্দীদের উপর আন্দামানীদের আক্রমণ পুরোমাত্রায় চলছিল। চাথামের বিপরীতদিকে দক্ষিণ আন্দামানের খড়ু অঞ্চলে ৬ই এপ্রিল ১৮৫৮ সনে 'আড়াইশ' বন্দীর এক দলের উপর আন্দা-মানীদের আক্রমণে চার জন বন্দী নিহত হয়। বাকি সবাই সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচাল। আন্দামানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কয়েদীদের হাতে অস্ত্র কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এই বন্দীর দল যে আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় সুনিপুণ সৈনিক; আবার বহুসংখ্যক কয়েদীর রক্ষকরূপে সামান্য কয়েকজন ইউরোপীয় প্রহরীকেও কাজের জায়গায় পাঠানো বিপজ্জনক। সুতরাং সরকার নির্দেশ দিলেন যে কয়েদীদের নিরস্ত্র, অরক্ষিত অবস্থাতেই কাজ করতে হবে। ১৪ই এপ্রিল (১৮৫৮) প্রায় দেড় হাজার আন্দামানী দুই দল বন্দীর উপর আক্রমণ করে। এবারেও তিন জন বন্দী নিহত আর ছয় জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বার জন কয়েদী চলৎ-শক্তিবিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। আন্দামানীরা তাদের বন্ধনমুক্ত করে এবং কিছুক্ষণ তাদের নিয়ে নৃত্য করে। যাবার সময় বন্দীদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এবার অন্যান্য বন্দীরা বলে যে, আন্দামানীরা সাধারণ কয়েদী-দের উপর একেবারেই আক্রমণ করেনি। বন্দীদশার নিদর্শন—পায়ে বেড়ী, গলায় তকমা বা অন্য চিহ্ন পেলেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বন্দীদের উপরওয়ালা প্যাঙ্গসম্যানদের (যাদের মাথায় লাল পাগড়ী আর বন্দীদশার কোন চিহ্নই নেই) উপর আদিবাসীরা পুরোদমে হামলা করেছে। এই প্রসঙ্গে সরকারী কর্ম-চারী ও ঐতিহাসিক এম.ভি. পোর্টম্যানকে আন্দামানীরা পরে বলে-ছিল যে, কয়েদীদের বিরুদ্ধে ওদের আক্রমণের কারণ যে তারা জঙ্গল কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। বনের শূয়োর, ফল, মূল, কন্দ—তাদের প্রধান আহার্য্যের অভাব হচ্ছে। কিন্তু তারা এও দেখেছে যে, কয়েদীরা স্বেচ্ছায় কোনও কাজ করতে চায় না। ওভারসিয়র, প্যাঙ্গসম্যান প্রভৃতি উপরওয়ালা তাদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেয়। এই জন্যই আন্দামানীদের আক্রোশ উপরওয়ালাদের উপর। কোনও পলাতক কয়েদী বোধ হয় আন্দামানী-দের এই সব কথা বুঝাতে পেরেছিল। ১৮৫৯ সনের শেষাশেষি পলাতক কয়েদীরা আন্দামানীদের কাছে আশ্রয় পেয়েছে এবং নৃশংস

বস্তু জারোয়া, আকাবী প্রভৃতি আদিবাসীদের কাছ থেকে আতিথেয়তারও পরিচয় পেয়েছে।

১৮৫৯ সনে ১৪ই মে "এবারডীন যুদ্ধ" বলে এক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তদানীন্তন ও পরবর্তী যুগের প্রবন্ধে, পুস্তকে পাওয়া যায়। এবারডীন পোর্ট ব্লেয়ার শহরের কেন্দ্রস্থল এবং বর্তমানে সেখানে এক বাজার গড়ে উঠেছে। তখন অবশ্য এ অঞ্চলে গভীর বনজঙ্গল কাটা সবেমাত্র সুরু হয়েছে। সংক্ষেপে এবারডীন যুদ্ধের ঘটনা—বহুসংখ্যক আন্দামানীদের এবারডীন ও আটালান্টা পয়েন্টের উপর দলবদ্ধ আক্রমণ। কিন্তু এবার, নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির চতুর্দশ রেজিমেন্টের বিদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন নির্বাসিত সিপাহী দুর্বলনাথ তেওয়ারি। আক্রমণের অল্প কিছুদিন আগে এক বছর চল্লিশ দিন পলাতক জীবন আন্দামানীদের সঙ্গে কাটিয়ে এসে কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। সেই গুপ্ত খবর আগে থেকে পাওয়ার ফলে আন্দামানীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে বিতাড়িত করা সম্ভব হয়। তেওয়ারীর দীর্ঘ আদিবাসী প্রবাস জীবনের রোমাঞ্চকর বর্ণনা থেকে আন্দামানীদের সম্পর্কে অনেককিছু জানা যায়, তবে তার মধ্যে যথেষ্ট কল্পনার কারুকার্যও আছে।

ডক্টর ওয়াকারের পর ক্যাপ্টেন হটন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং ১৮৬২ সন পর্যন্ত তিনি আন্দামান বন্দী উপনিবেশের সর্বময় কর্তার পদাধিকার করে থাকেন। আগেই বলেছি, তাঁর সময়ে আন্দামানীদের বৈরীভাব অনেকখানি কমে আসে এবং বন্দীদের করণীয় কাজের পরিমাণও বাড়তে আরম্ভ করে। রস, চাথাম এবং পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরের আরও ভেতরে ভাইপার দ্বীপ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করে জেল, আপিস, বাসভবন প্রভৃতি তৈরী হ'ল। দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের প্রধান ভূখণ্ড এবারডীন ও হাডু অঞ্চলও মানুষের বাসোপযোগী করে তোলার চেষ্টা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীদের সঙ্গে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত গুরুতর অপরাধীদেরও আন্দামানে পাঠাতে আরম্ভ হ'ল। ভারত সরকারের নিকট ক্যাপ্টেন হটনের লিখিত চিঠিপত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, আন্দামানীরা ক্যানোতে করে অপ্রশস্ত সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে ভাইপার, চাথাম এবং রস দ্বীপেও আসাযাওয়া আরম্ভ করেছে এবং ধীরে ধীরে আদিম নিবাসীদের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠছে। আন্দামানীদের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে দ্বীপের বন্দীনিবাসে তাদের নিরস্ত্র অবস্থায় আসতে হবে এবং যাবার সময় কিছু খাবার, লোহার যন্ত্রপাতি পুরস্কার হিসাবে তারা নিয়ে যাবে। ১৮৬১ সনের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দামানী আক্রমণকারী দলের কয়েকজনকে বন্দী করে রাখা হয়। তাদের মধ্যে তিন জনকে সভ্য জগতের পরিচয় দেবার জন্ম বর্মায় পাঠানো হয়। বর্মা প্রবাসকালে একজন আন্দামানী মৌলমিনে মারা যায়। পরবর্তী যুগে অনগ্রসর আদিবাসীদের সভ্য করার জন্ম বিরাট তোড়জোড় চলে। তার অবশ্যম্ভাবী মর্মান্তিক পরিণতি আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। গ্রেট আন্দামানীয় আদিবাসী গোষ্ঠী আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

১৮৬২ সনে কর্ণেল টিটলার ক্যাপ্টেন হটনের পদ গ্রহণ করেন এবং টিটলারের সময়েই আন্দামানী আদিবাসীকে সুসভ্য করার জন্ম আন্দামান হোম ও অর্ফানেজের প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্দামানের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সভ্য মানুষের অদূরদর্শী নীতি কি বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তা বুঝতে গেলে এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা জেনে রাখা দরকার। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপ ও

মধ্য আন্দামানের রঙ্গত উপনিবেশের বন্য জঙ্গল পরিবেশ

আশেপাশের দ্বীপমালায় দশটি শাখায় বিভক্ত গ্রেট আন্দামানীয় জাতির লোক বসবাস করত। তাদের গণনা ঠিক ভাবে করার প্রথম চেষ্টা হয় ১৯০১ সনে। ১৮৭২ সনে ভারতের প্রথম আদমসুমারীতে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জনগণনা একেবারেই হয় নি। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সনে পোর্ট ব্লেয়ার বন্দী উপনিবেশেরই খালি আদমসুমারী হয়, আদিবাসী সংখ্যা নিরূপণের কোনও চেষ্টা করা হয় নি। সুতরাং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও বিচ্ছিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ইতিহাসকারগণ ১৮৫৭ সনে গ্রেট আন্দামানীদের মোট সংখ্যা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন।

এম. ভি. পোর্টম্যানের অনুমান	—৮,০০০
১৯০১ সনের আদম সুমারীর অধিকর্তার অনুমান	—৪,৮০০
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান-গবেষক মিঃ ব্রাউনের মত	—৫,৬৫০

১৯০১ সনের আদমসুমারীতে গ্রেট আন্দামানিজদের সংখ্যা :

বয়স্ক		শিশু		মোট
পুঃ	স্ত্রী	পুঃ	স্ত্রী	
২৬১	২৩৪	৭৪	৫৬	৬২৫

১৯৫১ সনের আদমসুমারীতে গ্রেট আন্দামানীজদের সংখ্যা ত্রিশেরও কম।

এরা ছাড়া, দক্ষিণ আন্দামানের গভীর জঙ্গলে ও জনবিরল পশ্চিম তটে এবং দক্ষিণ আন্দামানের সংলগ্ন রাটল্যাণ্ড দ্বীপে জারোয়া আন্দামান দ্বীপমালার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপের আদিবাসী ও আন্দামান দ্বীপসমষ্টির সর্বদক্ষিণ দ্বীপ লিটল আন্দা-

যানের ওঙ্গি আদিবাসীরাও আছে। এরা সবাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষী পর্য্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন ছিল এবং ওঙ্গি ছাড়া আর দুই আদিবাসী গোষ্ঠী আজও অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং এদের সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। ওঙ্গিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোনও দিনই স্থাপিত হয় নি। চল্লিশ মাইলের সমুদ্রের ব্যবধান ও গ্রেট আন্দামানীজ জাতির সঙ্গে সম্পর্কের অভাব থাকায় এবং বন্দী-শিবির বা সরকারী অন্য কোনও বিভাগের কাজ লিটল আন্দামানে না হওয়ায় সভ্য মানুষের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পেরেছিল এরা।

মধ্য আন্দামানে শরণার্থীদের বসতির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার

গ্রেট আন্দামানীজদের অসহযোগিতা ও বৈরীভাব কিছু কমলেই পোর্টব্লেয়ারের চ্যাপলেন রেভাঃ এফ. করবীন এদের সুসভ্য করার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল টিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিবেশের শাসনকেন্দ্র রস দ্বীপে আন্দামান হোমের প্রবর্ত্তন করেন। আন্দামানী বন্দী স্নোবল এবং জাম্বো ও মাদাম কুপার বলে অভিহিত একটি আন্দামানী স্ত্রীলোক ও একটি বালককে নিয়ে 'হোম' খোলা হয়। 'হোম'-জীবন বন্দীদশারই নামান্তর। কিছুদিনের মধ্যেই আরও কিছু আন্দামানীকে এখানে বুঝিয়ে, লোভ দেখিয়ে বা সবলে সংগ্রহ করে আনা হ'ল। ইংরেজী শিক্ষা, আন্দামান বন্দী উপনিবেশের চলতি হিন্দুস্থানী (উর্দু ঘেঁষা) ভাষার তালিম এবং কায়িক পরিশ্রম করে মাঝি, মজুর, কিষাণ হিসাবে জীবিকা অর্জ্জনের সদুপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও অসভ্য আন্দামানীরা কিছুই শিখল না। নানা রং-বেরঙের জামা কাপড় সুযোগ পেলেই ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ আরম্ভ করল। পালাবার সুযোগ পেলে তখনই তার সদ্ব্যবহার করত।

১৮৬৩ সনের শেষাশেষি কয়েদীরা আবার বনে-জঙ্গলে পালাতে আরম্ভ করল। আন্দামানীরা আগেকার মত হিংস্র আচরণ করবে না—এই ধারণা সম্ভবতঃ কয়েদীদের মনে নূতন প্রেরণা জুগিয়েছিল। কর্ত্তৃপক্ষ তখন আন্দামানী হোম ও বিভিন্ন এলাকার বন্ধু-ভাবাপন্ন আন্দামানী মোড়লদের ফেরারী কয়েদী ধরার কাজে নিযুক্ত করলেন। ফলে আবার কয়েদী-আন্দামানী সংঘর্ষ আরম্ভ হ'ল এবং কয়েকজন আন্দামানী নিহতও হয়।

রেভাঃ করবিন ও পরবর্ত্তী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল ফোর্ডের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় করবিন পদত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলে জে. এম. হমফ্রি নিযুক্ত হন। এই সময়কার বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, হোমে মাসিক গড়ে দুইটি শিশুর জন্ম হচ্ছে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য সত্ত্বেও কোনও শিশুই এক সপ্তাহের বেশি বাঁচছে না। আন্দামান হোমও এ সময় রস থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। ভাইপার দ্বীপে, পোর্টমোটে এবং আরও কয়েক জায়গায় হোমের সদর বা শাখা দপ্তর স্থাপিত হয়। কিন্তু অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হ'ল না। এই সময় আন্দামানীদের সঙ্গে নেভাল গার্ডদের একটা সংঘর্ষ হয়। নর্থ পয়েণ্টের নেভাল গার্ডেরা আন্দামানীদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে গিয়েছিল। ত্রিশ জন স্ত্রীপুরুষ আদিবাসী ব্রিগেডের লোকজনকে ঘিরে বেশ শান্ত ভাবেই কথাবার্ত্তা বলছিল। এমন সময় একান্ত অতর্কিতে গার্ড প্র্যাটকে আন্দামানীরা তীর মেরে হত্যা করে। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় স্তম্ভিত নেভাল গার্ডদল আন্দামানীদের উপর দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গুলি চালায়। এ ঘটনায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং আন্দামানীরাও প্রতিশোধমূলক হামলা করে। কয়েক মাস পরে আসল ব্যাপার জানতে পারা যায়—প্র্যাট আন্দামানী স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করেছিল বলেই আন্দামানীরা উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করে। নেভাল গার্ডদের আরও নানারকম অসঙ্গত আচরণের সংবাদ পাওয়া যায়।

১৮৭০-৭১ সনে আন্দামান কর্ত্তৃপক্ষ আন্দামানীদের সুসভ্য করা এবং আদিবাসীদের ঘন ঘন বন্দীশিবিরে যাবার কুফল সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারেন। এর পরে আন্দামানীদের কয়েদী ক্যাম্পে আগমন একেবারে নিষিদ্ধ না হলেও, বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আন্দামানী হোম জঙ্গলে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্ণেল ফোর্ডের সময় আন্দামানীদের সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে, ভবিষ্যতে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে হামলা হলে, সমস্ত গোষ্ঠীকে এর জন্য পাইকারী ভাবে দণ্ডদান করা হবে না। মোড়লদের সাহায্য নিয়ে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে।

১৮৮৩ সনে জে. এন. হমফ্রির মৃত্যুর পর আন্দামানীদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এম. ভি. পোর্টম্যানের উপর। সে যুগে যাঁরা আন্দামানে আদিবাসীদের সম্পর্কে এসেছিলেন বা তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন, পোর্টম্যান নিঃসন্দেহে তাঁদের সবারই থেকে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান।

আন্দামানী হোম পোর্টম্যানের নেতৃত্বে আরও সুগঠিত হয়।

সে সময় পলাতক বন্দী ধরার পুরস্কার হিসাবে কয়েদী পিছু পাঁচ টাকা করে দেওয়া হ'ত। ১৮৮২ সনের হিসাবে দেখা যায়, সে বছর ২৪ জন কয়েদীকে ধরতে পারায় আন্দামান হোমে ১২০ টাকা জমা হয়। এ ছাড়া সামুদ্রিক শামুক ও কচ্ছপের চামড়া বিক্রী করে ৩১৫৲ টাকা, মধু, পান, ধূপ প্রভৃতি বন-সম্পদ থেকে ৮৩৫৲ টাকা, তীর, ধনুক ইত্যাদি বাবদ ৫২৲ টাকা, বেতের চেয়ার, ঘরের চাল ছাইবার পাতা বাবদ ২০৬৲ টাকা, খুচরা বিক্রী ৪১৫৲ টাকা মোট ২৪৪৫৲ টাকা। এই অর্থ আন্দামান হোম অর্থকোষে জমা হ'ত এবং তাই থেকে ও সরকারী সাহায্যে আন্দামানী হোমের খরচ, ধূমপান সামগ্রী, সামান্য কাপড়চোপড় ও সস্তা বিলাস দ্রব্য দেওয়া হ'ত।

আন্দামানীদের জীবন-ধারায় বিরাট ও ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসা এবং তাদের সুসভ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা বা অপচেষ্টা সবই ব্যর্থ হ'ল। এর উপরে দেখা দিল রকমারি ব্যারাম। স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির অভাবে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, সাধারণ চক্ষুরোগ, নিমোনিয়া, হাম প্রভৃতির আক্রমণে বহু আন্দামানী মারা গেল। তারপর ১৮৭৬ সনে সিফিলিস আন্দামানীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। পোর্টব্লেয়ার বন্দী আবাসের এ অভিশাপ অতি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভাইপার দ্বীপের হাসপাতালে কয়েকজন রোগীকে আলাদা করে সরিয়ে রেখে রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ব্যর্থ হ'ল। আন্দামানীদের মৃত্যু সভ্য মানুষের সংস্পর্শ ও তাদের দেশে বন্দী আবাস করার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেখা দিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক সিফিলিস রোগের সংক্রমণ ভাইপার দ্বীপের ভারতীয় বন্দী ও কয়েদী 'পেটি অফিসার' থেকেই হয়েছিল বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। হয়ত তা ঠিক, কিন্তু আন্দামানী আদিবাসী সমাজের বিলুপ্তির দায়িত্ব কয়েকজন রোগদুষ্ট বন্দীর উপর চাপিয়ে দিয়ে শাসক সমাজ নিজের দোষ স্খালনের যে সহজ পথ বেছে নিয়েছে তা একান্তভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট।

আন্দামানী শিশুদের ইংরেজী শিক্ষা, উর্দু অনুবাদ এবং প্রাথমিক অঙ্কের হিসাব সম্বন্ধে উপদেশ দেবার জন্য রেভাঃ করবিন একটি অরফানেজ প্রতিষ্ঠা করেন। অরফানেজের অপমৃত্যু অল্প কিছুদিন পরেই হয় এবং সামান্য কয়েকজন বিদ্যার্থীকে আন্দামান হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আন্দামান দ্বীপের জারোয়া, নর্থ সেনটিনেল অধিবাসী এবং লিটল আন্দামানের ওঙ্গি—এরা সবাই বৈরীভাব নিয়ে সভ্য সমাজের সংযোগ সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলছিল। জারোয়াদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ সুরু হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমে। ১৯০২ সনে মিঃ ভক্সের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র বাহিনী আন্দামানের দুরধিগম্য বনাঞ্চলে প্রেরিত হয় জারোয়া আদিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য। জারোয়ারা তীর মেরে ভক্সকে মেরে ফেলে এবং সেই প্রতিহিংসার জের আজও অব্যাহত গতিতে চলছে। বর্তমানে ওঙ্গিদের সংখ্যা সম্ভবতঃ খ' পাঁচেক।

আন্দামানীদের ঐ সময় থেকে দেশ দেখানো, বাইরের জগতের বিষয় শেখানো ও সভ্য সমাজকে এই অনগ্রসর আদিবাসী জীবকে দেখানোর জন্য ভারতবর্ষ ও বর্মার বিভিন্ন জায়গায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বা কোনও উচ্চ রাজকর্মচারীর খেয়ালখুশী মত নিয়ে যাওয়া হ'ত। এই রকম চার জন আন্দামানী পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মডেল তৈরি করার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তাঁদের সম্পর্কে ই. এইচ. ম্যান লিখেছেন :

. . . While they were quartered for a few weeks in the Zoological Gardens, where they attracted large crowds of Bengalees, who had never before had an opportunity of seeing the people whom they are said to regard as the descendants of the Rakshas(!). Circumstances proved that Port Blair training had not been lost on these representatives of their race, for being asked by their visitors for a souvenir in the shape of a lock of their corckscrew ringlets, they promptly demanded a rupee before giving them the favour and in like manner the pleasure of witnessing an Andaman dance was not to be obtained previous to some *ik-pu-ku* (money) having been bestowed . . . (*The Andaman Islanders*—Man, Introduction."

অর্থাৎ—তাদের (আন্দামানীদের) কয়েক সপ্তাহের জন্য চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। সেখানে বহু বাঙালী ওদের দেখতে আসত, কারণ এর আগে বাঙালীদের এ রকম লোক দেখার কোনও সুযোগ ঘটে নি এবং এদের রাক্ষস বংশধর (!) বলে বাঙালীরা মনে করত। ঘটনা দেখে প্রমাণ হ'ল যে আদিবাসীদের পোর্টব্লেয়ার শিক্ষা বিফল হয় নি। দর্শকদের দল স্মারকচিহ্ন হিসাবে আন্দামানীদের গোল আংটির মত ঘুরানো চুলের গোছা চাইলে, তারা তৎক্ষণাৎ দানের বদলে এক টাকা দক্ষিণা চাইত। তেমনি আন্দামানী নাচ দেখার ফরমায়েস হলে ইক-পু-কু (অর্থ) দিতে হ'ত।

এদের নিয়ে চমৎকার বাঁদরের খেলা চলছিল!

আন্দামানী আয়া, চাকরাণী পোর্টব্লেয়ারের ইংরেজ রাজ-কর্মচারীরা অনেকেই রেখেছিলেন এবং কয়েকজন আবার সাগরপারে পেনাং, মৌলমিন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জায়গায় চাকরি নিয়েছিল।

১৮৬৪ সনে আন্দামানের বন্দী সংখ্যা ছিল ৩,০১৪ এবং কয়েকজন কয়েদীকে কিছুদিন কারাবাসের পর শান্ত আচরণের পুরস্কার হিসাবে টিকেট-অন-লীভ দিয়ে চাষ আবাদ বা অন্য কাজ-কর্ম করার সুযোগ দেওয়া আরম্ভ হ'ল। দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের ১৪৯ একর জমিতে ধানচাষও সুরু হ'ল। এর আগে রস, চ্যাথাম ও ভাইপার দ্বীপে তরিতরকারি, ফলমূল লাগানো হয়েছিল। ১৮৬৯ সনে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও দিনেমারদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে

আসে। জলদস্যুদের উৎপাত দমনের জন্ত ও আশপাশের দ্বীপে ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও আন্দামান মূল বন্দী উপনিবেশের শাখা খোলা হয়। নানকৌড়ি বন্দরের কামোর্ট্রা দ্বীপে এ উপনিবেশ ১৮৬৯-৮৮ সন পর্য্যন্ত থাকে। গড়-পড়তায় এই শাখা বন্দীশিবিরে ৩৫০ জন কয়েদী ছিল।

১৮৬৮ সনে কর্ণেল ম্যান আন্দামানের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই বন্দীদের বসবাস ও কাজকর্ম্মের অবস্থার উন্নতি হয়। বন্দীশিবিরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর হারও বহু পরিমাণে কমে যায়। মৃত্যুহারের সঠিক পরিমাণ বুঝতে পারা যাবে নীচের হিসেব থেকে :

সন	মৃত্যুহার (শতকরা)
১৮৫৮-৫৯	১৬
১৮৫৯-৬০	৬৩
১৮৬৩-৬৪	২১·৫৫
১৮৬৭-৬৮	১০·১৬
১৮৭২-৭৩	১·৬৪

১৮৭১ সনে জেনারাল ষ্টুয়ার্ট জেনারাল ম্যানের নিকট থেকে কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তার পরের বছর আন্দামান বন্দী উপনিবেশের অধিকর্ত্তার পদ চীফ কমিশনারের মর্য্যাদা পায়। বর্ম্মার অধীনে আন্দামান কারানিবাস কয়েক বছর রাখার পর আবার এই অঞ্চলকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগ সরাসরি নিজেদের হাতে নেন।

১৮৭২ সনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়োর আন্দামান আগমন। ৮ই ফেব্রুয়ারী বিকালে পোর্ট-ব্লেয়ার বন্দরের উত্তরতটে দেড় হাজার ফুট উঁচু মাউন্ট হেরিয়েট থেকে তিনি সূর্য্যাস্ত দেখতে যান। ফেরার পথে হোপটাউন জেটির ধারে তাঁকে পাঠান আততায়ী অতর্কিতে অন্ধকারে আক্রমণ করে এবং সেখানেই লর্ড মেয়োর মৃত্যু হয়। আততায়ীর এ আক্রমণের পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা বা সে ভারতের বিপ্লবী ওয়াহাবি দলভুক্ত ছিল কিনা, অথবা এ হত্যা নিছক ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত দুর্বৃত্তের কম্ম এ নিয়ে বহু বাদবিতণ্ডা চলে। এ রহস্যের সমাধান আজও হয় নি।

গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বন্দীদের ২০-২৫ বছর কারাবাসের পর কর্তৃপক্ষ তাদের আচরণ সন্তোষজনক হলে মুক্তি দেবার অধিকারী হন। দশ বছর কারাবাসের পর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত পুরুষেরা নারী কয়েদীদের বিবাহ করতে পারত। নিয়ম ছিল যে, বিবাহেচ্ছু পুরুষকে স্বোপার্জ্জনী টিকিটের অধিকারী হতে হবে, ১০ বিঘা জমি চাষবাস করতে হবে, একজোড়া বলদ ও সেভিংস ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ টাকা জমা থাকা চাই। শারীরিক সুস্থতার সার্টিফিকেটও প্রয়োজন। অন্যদিকে পাঁচ বছর কারাবাস করেছে এমন বন্দিনীদের মধ্যে যারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক তাদের একত্রিত করা হ'ত। কারাবাসের অধিকারীদের সামনে এই স্বয়ম্বর-সভা বসত। দুই পক্ষের সম্মতি এবং শাসকের অনুমোদনে কয়েদী নূতন করে সংসার আবার শুরু করত। স্ত্রী-সংগ্রহ বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ আনুপাতিক হিসেবে নারীর সংখ্যা বড় কম। তাই বিবাহের পর স্ত্রী-সংরক্ষণ ছিল অতি দুরূহ ব্যাপার।

নীচে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা তালিকা থেকে সমস্যার গুরুত্ব বোঝা যাবে :

	কয়েদী পুং-স্ত্রী	প্রাপ্তবয়স্ক পুং-স্ত্রী	মোট জনসংখ্যা
১৮৭৪	৬৭৩৩-৮৩৬	৭৬৫৪-৯০৭	৯২৩২
১৮৮১	১০৩২৫-১১২৭	১১৭৬৬-১৩২৯	১৪১৯৮
১৮৯১	১০৮৭৪-৮৬৪	১২৫৩২-১৪৩৯	১৫৫৬০
১৯০১	১১২১৭-৭০০	১৩২৩৫-১৪৭৭	১৬১০৬

পুরুষ ও স্ত্রীর আনুপাতিক হিসাব :

১৮৭৪	পুরুষ	৮·৪৩	স্ত্রী	১
১৯০৬	"	৮·৯৬	"	১

সিপাহী বিদ্রোহীর বন্দীদলের মধ্যে প্রথম কারাধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াকারের শাসন, ব্যাপক রোগ, আন্দামানীদের আক্রমণ এবং প্রতিহিংসার শিকার হবার পরও যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরা আন্দামানের বন্দীনিবাসে নির্ব্বাসিত গুরুতর অপরাধীদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শুধু তাঁরা নয়, আন্দামানের অন্য বন্দীরাও নিছক খাঁচার তাগিদে ভাষা, ধর্ম্ম, শ্রেণীগত ভেদ-বিভেদ ভুলে বন্দীশিবিরের শত অপমান, অসম্মানের মধ্যে ঘর বাঁধলেন। আন্দামানের এই সমাজ-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সামাজিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জীবনের জয়যাত্রায় অতীতের কালিমা এখানে দুরপনেয় নয়। অনাগত দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার আশায় এরই মধ্যে ঘরসংসার গড়ে উঠেছিল। এই মিলনের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে এক 'লোকাল বর্ণ' সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। ধর্ম্মান্তরিত না হয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ হ'ত। সাধারণ ব্যবস্থা থাকত যে ছেলে স্বামীর ধর্ম্মমত নেবে আর মেয়ে নেবে স্ত্রীর উপাসনা ধারা। ভাষার ভেদ-বিভেদও বন্দীনিবাসের কটাহে দলিত মথিত হয়ে সার্ব্বজনীন উর্দু-ঘেঁষা হিন্দুস্থানীর রূপ নেয়। মিলিটারি পুলিস ও ভারতীয় ইনফ্যান্ট্রিতে শিখ, পাঞ্জাবী, মুসলমান এবং উত্তরপ্রদেশের সংখ্যাধিক্যের ফলে ভাষা এই রূপ পরিগ্রহ করে।

আন্দামানের সমাজ-জীবনে তখনকার দিনে যে মিলন ও একতারই সুর বাজত তা কখনই নয়। পুরুষ স্ত্রীর সংখ্যা বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া সমস্ত সমাজ-জীবনের উপরেই ছিল। বন্দিনীদের নিয়ে নানারকম ব্যভিচার, খুন, জখম হ'ত আর তার জন্য পরবর্তী যুগে স্ত্রী কয়েদী আন্দামানে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮৯৪-৯৫ সনে ১০,৩৪৮ জন কয়েদীদের মধ্যে স্বাবলম্বী টিকিটে ছিল ২,৫৮০ জন। চাষের জমি নিয়ে অনেকে চাষ-আবাদ করছিল। কিন্তু জমির মালিকানা-স্বত্ব কোনও প্রজাকেই দেওয়া হয় নি। সবাই ছিল উঠ-বন্দী প্রজা।

১৮৮৫-৮৬ সনে বর্ম্মা যুদ্ধের বন্দী, ১৮৯১ সনে মণিপুর বিদ্রোহের বন্দী এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের বন্দীরা আন্দামানে

নির্বাসিত হন। মণিপুর রাজবন্দীদের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। বর্মার বন্দীরা অন্ত অপরাধী বর্মী বন্দীদের সঙ্গে মিলে আন্দামানে এক বর্মী সমাজ গঠন করে। বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে '২১-২২ সনের মোপলা বিদ্রোহী ছাড়া আর কেউ আন্দামানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে নি।

১৮৯০ সনে সর্ চার্লস লায়ল এবং সর্ আলফ্রেড লেথব্রিজকে নিয়ে গঠিত এক কমিশন আন্দামান উপনিবেশের আইনকানুন ও জেল-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে যান। তাঁরা সুপারিশ করেন যে, আন্দামান বন্দীদের আরও কঠোরতর অনুশাসনের মধ্যে রাখা। সুতরাং বড় রকম একটা জেলখানা তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়ল।

সেই নির্দেশ অনুযায়ী কুখ্যাত সেলুলার জেল তৈরি হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই বিরাট কারাবাসের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়। সেলুলার জেল তৈরি হবার সময় জনৈক সরকারী ইতিহাসকার লিখেছেন যে, এবারডীনের এই জেল তৈরি হলে দেওয়ালে যেরা ছ'কোণা তারার মত দেখাবে। পুণার র‍্যাণ্ড-এমহার্ষ্ট হত্যা মামলা ও আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা সেলুলার জেলকে ভারতবর্ষের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন।

ভারত থেকে সদ্য-আগত ডাণ্ডাবেড়ী পরিহিত নূতন কয়েদী-দলকে সেলুলার জেল দেখাবার দায়িত্ব নিলেন জেলার ব্যারি। টিলার উপরে লাল রঙের বিরাট কারাপ্রাচীর দেখিয়ে তিনি বলতেন —দেখ, ঐখানে আমরা সিংহকে পোষ মানাই। আর এখানে ভগবানও আমি!

বীর বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, সেলুলার জেলে যাবার কয়েকদিন পরে সিপাহী যুদ্ধের এক বৃদ্ধ বন্দীর কাছ থেকে ছোট একখানা চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল: পুরাতন নূতনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

শ্যামল অতীত

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

গেছে যৌবন, জরা-জর্জ্জর জীবন-তরু।
চারিদিক যেন সাহারা মরু।
নিষেধ-নিগড় পরেছি কতই, কি দুঃসহ!
শুধু তুমি আছ শ্যাম অতীতের গন্ধবহ।
ভোজ্য প্রচুর, ভোজনের নেই সে অধিকার,
মেদে মেদ বাড়ে; চেপেছে আধি ও ব্যাধির ভার।
কোনমতে চলে ধূসর জীবন গড্ডলিকা।
হয় প্রতিদিন সফল বিফল ইতিহ লিখা।
প্রাত্যহিকের ফাঁকে তবু মন যায় যে উড়ে।
যায় চলে যায় অতীতের সেই স্বপন-পুরে।
যেথা তুমি ছিলে মানসী রমা
প্রেমিকের চোখে শ্যামলী সুতনু তিলোত্তমা।
কোন যাদুকর তুলির স্পর্শে ছিল তব এত রূপ।
আজি যদি বলি সে কথা বারেক, তুমি ভাব বিদ্রূপ।
উজ্জয়িনীর অগুরু অঙ্গে মাখি
সে দিনের তুমি দাঁড়ায়েছ পাশে ভরা যৌবন সাকী।
মুগ্ধ লুব্ধ হৃদয়েতে শুধু ক'নে বলিয়াছি প্রিয়া।
অনঙ্গ বুঝি করিত রঙ্গ অপাঙ্গে লুকাইয়া।
সতেরো শীতের তুহিনলগ্ন তনুতীরে তব বাণী,
খুঁজিয়া পেয়েছি গত জনমের লুপ্ত প্রেমের বাণী।
কত আকুলতা দিয়া
চপল করেছ রাগে অনুরাগে চল চঞ্চল হিয়া।
ঝরাপাতা দিন হয়েছে বিলীন জানি।
মনের আঁচলে ঝরা ফুলগুলি আজো করে কানাকানি।
সে দিনের ছবি মনে পড়ে সবি নিভৃতে যখন থাকি।
বাস্তব বাধা ইতি করে তাই শ্রী'তব নবনী মাখি।

মন ও চৈতন্য

শ্রীকালিদাস দত্ত

জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মধ্যে দুইপ্রকার বিভিন্ন মতবাদ আছে। একমতে চৈতন্যই জগতের মূল এবং উহা তদুৎপন্ন বিভূতি, মননশক্তির মাধ্যমে অসংখ্য বস্তুর আকারে জগৎরূপে রূপায়িত। অপর মতে জগতের একমাত্র উপাদান বস্তু এবং তদ্দ্বারাই বস্তু স্বভাবে সমগ্র জগত গঠিত ও পরিচালিত।

ভারতবর্ষে শেষোক্ত মতবাদের প্রবর্ত্তক ছিলেন বৃহস্পতি ও চার্ব্বাক। তাঁহারা বৈদিক যুগে আবির্ভূত হন এবং উক্ত মতবাদ এই ভাবে প্রকাশ করেন ;

"স্বভাব এব জগতঃ কারণম্, স্বভাবাদেব জগদ্বৈচিত্র্যম্ উৎপদ্যতে,
স্বভাবতো বিলয়ং যাতি।"

অর্থাৎ, স্বভাবই জগতের কারণ, স্বভাবেই জগদ্বৈচিত্র্য উৎপাদিত হয় ও স্বভাবেই লয় পায়।

"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতম্ সমস্পর্শস্তথানিলঃ
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ ব্যবস্থিতিঃ॥"

অর্থাৎ, অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, বায়ুর সমস্পর্শতা কাহার দ্বারা সৃষ্ট ? স্বভাবের দ্বারা।

তাঁহাদের মতে উক্ত চৈতন্যও বস্তুসংযোগোৎপন্ন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ। যথা ;

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥"(১)

অর্থাৎ, ক্ষিতি, তপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি বস্তুর সংযোগে, কিণ্বপদার্থের সংযোগে উদ্ভূত মাদকতা শক্তির ন্যায় চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

প্রাচীনকালে এইরূপে বস্তুবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইবার বহুদিন পরে উহা গ্রীসদেশে প্রচারিত হয়। যে সকল গ্রীক দার্শনিক উহা প্রচার করেন তন্মধ্যে ডিমোক্রিটাস ও এপিকুরাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বৃহস্পতি ও চার্ব্বাক কথিত ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি বস্তুর পরিবর্ত্তে, তৎকালে আবিষ্কৃত উহাদের সূক্ষ্মতম অংশ পরমাণুই বিশ্বের মূল উপাদান এবং উহার সংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি এইরূপ ঘোষণা করেন।

বর্ত্তমান যুগেও অনেক দার্শনিক ঐ প্রকার মতবাদ বহুবিধ উপায়ে প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেলস বিখ্যাত। তাঁহাদেরও প্রধান কথা :

"Matter is not the product of mind but mind is the highest product of matter."

ইদানীং তাঁহাদের মতবাদ নানা কারণে প্রসারিত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং তদনুযায়ী অনেকের বস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত এই ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলে বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর উক্ত প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের মতবাদ পূর্ব্বোল্লিখিত অধ্যাত্মবাদীদের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ দেখা যাইতেছে যে পরমাণুর উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে উহারা দেশকালের সীমায় আবদ্ধ নহে এরূপ একপ্রকার তরঙ্গে পর্য্যবসিত হয়। গাণিতিক সূত্রের মানস প্রত্যক্ষ ব্যতীত ঐ সকল তরঙ্গের অন্য কোন ধারণা মানুষের হইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ জনৈক পণ্ডিতের ভাষায় উহাদের পরিচয় এইরূপ ;

"They are, it appears, completely immateria waves. They are as immaterial as the waves of depression, loyalty, suicide and so on that sweep over a country."[1]

তজ্জন্য বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত অবাস্তব তরঙ্গকে মননশক্তি ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না। জে. বি. বার্কের এই মন্তব্যটি উহার একটি নিদর্শন :

"We can reduce matter to motion and what d we know of motion, save that it is a complex percep tion or mode of thought . . . . For of motion w know nothing except that it represents a continuo change of certain perceptions in their relations wit those of space and time. . . . . Hence one form c thought—our mind—runs parallel to and is concor tant with another form of thought—permanent—though we cannot say, which we call matter, electr city or either. And it resolves itself into mind pe ceiving mind."[2]

(১) সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ : মাধবাচার্য্য

(1) Limitations of Science. Page 68. By W. N. Sullivan.

(2) Origin of life. Page 337. By J. B. Burke

এই সকল তথ্য হইতে বিভিন্ন বস্তু উক্ত রূপ মননশক্তিরই নানাপ্রকার বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

কোন্‌কোন বস্তুবাদী পণ্ডিত উহা অস্বীকার করিয়া ঐ প্রকার তরঙ্গকে সর্ব্বব্যাপক বস্তু (all pervasive substance) বলিয়াছেন*। কিন্তু বস্তু যে মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত হইতে পারে না তাহা আইনষ্টাইনের Theory of Relativity দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল উহা এইরূপে সংক্ষেপে বলিয়াছেন :

"The Theory of Relativity by merging time into space time has damaged the traditional notion of substance more than all arguments of philosophers. Matter for commonsense is something which persists in time and moves in space. But for modern Relativity Physics, this view is no longer tenable. A piece of matter has become, not a persisting thing with varying states, but a series of inter-related events. The old solidity is gone, and with it the characteristic that, to the materialist, made matter more real than fleeting thought. Nothing is permanent, nothing endures; the premise that the real is the persistent must be abandoned."[1]

যেমন জীন্‌স এ বিষয়ে বলিয়াছেন :

"Even the physical theory of relativity has now shown that electric and magnetic forces are not real at all—do not even pass the test of objectivity."[2]

এই সকল কারণে বৈজ্ঞানিকগণের নিকটে বাস্তব জগত ছায়ার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহারা বস্তুর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত সত্তার ধারণা ভ্রান্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। এডিংটনের ভাষায় উহা এই :

"The external world of physics has thus become a world of shadows. In removing our deed we have seen that the substance is one of the greatest of our illusions."[3]

তজ্জন্য তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন বাস্তব জগত গঠনের উপাদান মননশক্তি। যথা :

"The stuff of the world is mindstuff."[4]

জীন্‌সের উক্তিতে উহা আরও বিশদভাবে এইরূপে উল্লিখিত আছে :

"The stream of knowledge is heading towards a non-mechanical [illegible]ality—the universe begins to look more like a great thought than like a great machine. We are [illegible]g to suspect that we ought rather to hail [illegible] the creator and governor of the realm of [illegible] not of course our individual minds but the [illegible] in which the atoms, out of which our individual minds have grown exist as thoughts."[1]

বস্তুবাদের পূর্ব্বোক্ত রূপ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেকের ইহাও ধারণা যে জীবদেহে মনের যে বিকাশ দেখা যায় তাহাও বস্তু-সংযোগে গঠিত মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া (Reflex action) মাত্র এবং মস্তিষ্কের বিনাশে উহার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণসমূহের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মননশক্তিই বস্তুর মূল এবং উহাই বস্তুরূপে রূপায়িত। সুতরাং বস্তুসংযোগে মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। উহা ব্যতীত মস্তিষ্ক নষ্ট হইলেও জীবদেহে যতক্ষণ চৈতন্য থাকে ততক্ষণ উহাতে যে মনের ক্রিয়া লোপ পায় না তাহাও জানা গিয়াছে কতকগুলি সজীব প্রাণীর মস্তিষ্ক সরাইয়া তাহাদের আচরণ পরীক্ষার দ্বারা। ঐ সকল প্রাণী মস্তিষ্কবিহীন হইয়া যে কয়দিন জীবিত ছিল সেই সময় তাহাদের চৈতন্যের সহিত মনের ক্রিয়াও পরোক্ষে বিদ্যমান ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাভলোভের কুকুরের উপর ঐ প্রকার পরীক্ষার বিবরণ এইরূপ :

"Pavlov's experiments have been conducted on dogs, but they deal with such basic phenomena that it is likely that they throw light on certain fundamental processes in higher animals, including human beings. At the sight and smell of food, saliva will flow into the mouth of a normal dog. If the dog has had it's cerebral hemispheres removed, however, it will not salivate until the food is actually thurst into it's mouth."[2]

নিউইয়র্কের রুজভেল্ট হাসপাতালের অধ্যক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার টমসনের লিখিত একখানি পুস্তক হইতে স্বামী অভেদানন্দও তাঁহার "Life Beyond Death" নামক গ্রন্থে ঐরূপ অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাতে বলিয়াছেন যে, উক্ত চিকিৎসক সেই পুস্তকে শব-ব্যবচ্ছেদের পর সংগৃহীত বহু প্রমাণ-পঞ্জী ও উহাদের সংখ্যা

* Materialism. Page 215. By M. N. Roy.

(1) Introduction. *History of Materialism*. By Dange.

(2) Physics and Philosophy. page 200. By James Jeans.

(3) Introduction. The Nature of the Physical World. By A. S. Eddington.

(4) The Nature of the Physical World. page 276 (1929). By A. S. Eddington.

(1) The Mysterious Universe. page 187. By James Jeans.

(2) The Limitations of Science. page 110. By J. W. N. Sullivan.

দিয়া লিখিয়াছেন যে, একব্যক্তির মস্তিষ্কের অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইলেও তিনি জানিতে পারেন নাই কোন্ সময় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সেই অবস্থায় তাঁহার জীবনের কোন ধারাতেই কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই এবং তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য সমানভাবে অব্যাহত ছিল১।

এই শ্রেণীর প্রমাণ ভিন্ন এ প্রসঙ্গে অতি সূক্ষ্ম জীবাণু প্রভৃতি প্রাণীরও উল্লেখ করা যায় যাহাদের মস্তিষ্ক নাই অথচ মন আছে। উদ্ভিদসমেত উক্তরূপ নিম্নতম প্রাণীর উচ্চতম মেরুদণ্ডবিশিষ্ট সকল প্রাণীর মত, মন ও তদন্তর্গত চৈতন্যের প্রধান লক্ষণ দেখা যায় উহাদের বোধশক্তি ও কার্য্যশক্তি প্রভৃতি হইতে। এ্যামিবা নামক এককৌশিক জীবেও ঐ সকল শক্তি কিরূপ আছে তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, মন মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া নহে। মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীবের মস্তিষ্কের মাধ্যমে উহা ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে স্থূল জগতের সহিত ঐ প্রকার জীবের চৈতন্যকে সংযুক্ত করে মাত্র। উক্ত চৈতন্যই মনের সর্ব্বপ্রকার বোধ ও কার্য্যশক্তি প্রভৃতির মূল। উহা যে কেবল জীবে বর্ত্তমান তাহা নহে, উহা জড়েও আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহা তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনিয়াছেন। তিনি সেই যন্ত্রের দ্বারা জড়কে মাদক দ্রব্য, ক্লোরোফরম প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ দিয়া তজ্জনিত সাড়া লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। যাহার ফলে জানা গিয়াছে যে এক খণ্ড টিন, একটি গাছের ডগা এবং একটি ব্যাঙের পেশী বাহিরের উত্তেজনায় একই ভাবে সাড়া দেয়২।

উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করে যে মানুষ ও অন্যান্য জীবের অন্তরের মত নিখিল বিশ্বে সর্ব্বপ্রকার বস্তুতে শুধু যে এক মননশক্তি (Universal mind) আছে তাহা নহে। তন্মধ্যে এক সর্ব্বগত চৈতন্যও আছে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের মন ও চৈতন্য উহারই নানারূপ সংস্কারাচ্ছন্ন infinitesimal অংশ বিশেষ এবং উক্ত নিখিল চৈতন্যই মননশক্তির ভিতর দিয়া জীবগণের বিভিন্ন সংস্কারানুযায়ী নানা বস্তুরূপে বিচিত্র ভাবে রূপায়িত হইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়।

বৈজ্ঞানিকগণও এখন আর একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। উহার প্রমাণ প্লাঙ্কের এই উক্তি :

"I regard matter as derivative of conciousness. Conciousness I regard as fundamental."[3]

পদার্থ বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে উপরোক্ত রূপে বস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত নহে প্রমাণিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এখন দেশকালের অতীত বিশ্বের মূল সত্তা অনির্দ্দেশ্য ও সাঙ্কেতিক।

তজ্জন্য এডিংটন বলিয়াছেন :

"Matter and all else that is the physical world have been reduced to a shadowy symbolism."

উক্ত কারণে লিঙ্কন বার্নেটও লিখিয়াছেন :

"A state of existence devoid of association has no meaning . . . . And what the scientist and philosopher called the reality—the colourless, soundness impalpable cosmos which lies like an iceberg beneath the plane of man's perception —is a skeleton structure of symbols."

(1) *Life Beyond Death*. Chapter X. By Swami Abhedananda.

(2) *Response in Living and Non-living*. (1902). By Sir J. C. Bose.

The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus. (1901). Royal Institute.

(3) *Observer*. 25th January, 1931.

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

প্রথম পর্ব

নন্দনতত্ত্বের একটা দুরূহতা-কণ্টকিত প্রশ্নের উত্তর হ'ল মহুয়া কাব্যগ্রন্থ। প্রয়োজনবাদ ও শিল্পবোধ—এ দুটোর সঙ্গতি কোথায়, এদের সমন্বয় সাধন অনায়াসসাধ্য কিনা, এ তত্ত্বের আলোচনায় অনেক ফলহীন প্রয়াস নিঃশেষিত হয়েছে, তবু কোন সুষ্ঠু সমাধান সত্যের মর্য্যাদা পেল না রসিকজন তথা পণ্ডিতজনের কাছে। এই জটিলতাসঙ্কুল সমস্যা কবির বোধের স্বচ্ছ আলোয় সহজ হয়ে উঠল; অনায়াসে কবি দিগ্‌দর্শন করলেন যেখানে তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতেরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। কবি বললেন যে, প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের বেড়াটা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। প্রয়োজন কখন হঠাৎ অপ্রয়োজনের ঘরে গিয়ে মনোময় রূপ ধরে শিল্প বলে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়, তা পূর্বাহ্নে সঠিক বিচার করে বলা যায় না। জন্ম যার প্রয়োজনের তাগিদে সে হয়ত হঠাৎ অতি-রিক্তের রস-রাজত্বে গিয়ে হাজির হয় আর রসিক তাকে শিল্প বলে গ্রহণ করেন। সব সময় প্রয়োজনটা শিল্পানুগ নয় এ ধারণাটা বিভ্রান্তিপ্রসূ। জাতশিল্পীর হাতে প্রয়োজনের রূপান্তর ঘটে। প্রয়োজন চলার বেগে আপনার রূপ পাল্টায়; ফরমাসী কবিতাও সহজ স্বচ্ছন্দ তালে নেচে চলে। সে নাচের তাল, মান, লয় স্বতোৎসারিত নৃত্যছন্দ বলে মনে হয়। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মূল প্রেরণা হয় ত এসেছিল প্রয়োজন থেকে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সে সাময়িক প্রয়োজনকে অতিক্রম করেছে। মহুয়ার কবিতা গুচ্ছ আন্তর রস-ঐশ্বর্যে সর্বকালের রসিকমনকে অনির্বচনীয় রসধারায় পরিপ্লুত করবে। কবিগুরু মহুয়ার ভূমিকায় বললেন, "মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাসের ধাক্কা নিঃসন্দেহেই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল-ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে। কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দকে সারথি হয়ে বসে।" এই ফরমাসের ধাক্কা কাটিয়ে লেখবার আনন্দকে সারথি করে বসিয়ে দেওয়া যে সে শিল্পীর কাজ নয়। যাঁরা জাতশিল্পী তাঁদের পক্ষেই এই প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করে শিল্পলোকে উত্তরণ সহজসাধ্য। কবি-কল্পনার আন্তরিক তড়িৎশক্তি সমস্ত সাময়িক প্রয়োজনকে অনায়াসে অতিক্রম করে দুরধি-গম্য শিল্পলোকে পৌঁছে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বে বিশ্বাস রেখেছেন এবং মহুয়ার কবিতাগুলি সেই প্রতীতি-স্বাক্ষরিত।

নারী ও পুরুষ

এবার মহুয়ার ভিতরে প্রবেশের পালা। মহুয়ার কবিতা-গুলি প্রধানতঃ প্রজাপতির উদ্দেশে আর তাঁরই নির্দেশ পালন করেন যে দেবতা তাঁর উদ্দেশে রচিত। নারী, পুরুষ, প্রেম, মিলন, বিরহ—এইগুলি হ'ল এই কাব্যের উপজীব্য। বর্তমান নিবন্ধে আমরা নারী ও পুরুষের রূপ-কল্পনার আলোচনা করব। প্রবন্ধান্তরে প্রেম, মিলন, ও বিরহ-সম্পর্কিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। সন্ন্যাসীর ক্রোধাগ্নি একদিন পঞ্চশরকে ভস্মীভূত করেছিল। তবু তার মৃত্যু হয় নি; অতনুর ভস্মশেষ প্রাণময় হয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল দিগ্বিদিকে—সূক্ষ্ম ভাবময় রূপে সেই অদেহী কামনা প্রত্যেকটি জাতকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাই ত প্রেমের লীলা চলল ভুবনে ভুবনে। তার আদি নেই, সে অনন্ত। সেই অনন্ত প্রেমের কীর্তিকথা হ'ল আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ। কোথাও দেখি সে প্রেমের প্রতিষ্ঠা ঘটল নিছক গীতি-কবিতায়; তার লীলা, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ। সেখানে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আবার আর এক শ্রেণীর কবিতায় দেখি ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল। প্রেমের প্রসাধন-কলা নারীকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে। পুরুষ নারীর মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রকাশ চায়। তাই ত প্রেমে প্রসাধন-কলার প্রয়োজনীয়তা। 'যেমন আছো তেমনি এসো আর ক'রো না সাজ'—এ ত পুরুষের কোন এক মুহূর্তের উক্তি। তার সার্বকালিক চাওয়ার কথা ত এর মধ্যে নিহিত নেই। রসলিপ্সু পুরুষ রূপের পূজারী—পুরুষচিত্ত বৈচিত্র্যের রূপময়তায় মগ্ন হয়। তার চিত্তে প্রচ্ছন্ন কামনার আলো জ্বলে; সে পুরুষ প্রসাধনময়ীকে কামনা করে। তাই ত কবি ব্যঙ্গ-সুনিপুণা, বিদুষী নারীর চিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর নারী:

> 'প্রসাধন সাধনে চতুরা—
> জানে সে ঢালিতে সুরা
> ভূষণ ভঙ্গীতে,
> অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে!
>
> জাদুকরী বচনে চলনে;
> গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে:
> অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
> নিন্দা তার করি দেয় দূর।' (পৃ. ১১০)

ছলনাময়ী নারীর এই ছলনার মাদকতার মাধুর্যটুকু কবি

তাঁর নাম্নী পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে ধরে দিয়েছেন। যা সত্য, যা সহজ তার আবেদন পুরুষচিত্তের কাছে সহজে সত্য হয়ে ওঠে না। সহজ সুরে সহজ কথাটুকুর মাধুর্য বহুদূর অনুসারী হয় না। তাই ত বক্রোক্তির প্রয়োজন হয়। তাই ত নারীর আপনাকে বহুবিচিত্রতায় প্রকাশের এত প্রয়াস। এই রূপবৈচিত্র্য ত মিথ্যা নয়। এই মাদক রূপের মোহময় আবেদনই ত পুরুষকে মাতাল করে। এই রূপসীকে আপন করার জন্য পুরুষের প্রয়াসের অন্ত নেই। এই রূপও যেমন সত্য, এই চাওয়াও ঠিক তেমনি সত্য। এই চাওয়া আছে বলেই এই রূপের এত আদর। পুরুষ চায় বলেই নারীর এই সাজসজ্জা। পুরুষের চোখে সহজ রূপে নেশা লাগে না; রঙের ঘোর লাগে তখনই যখন সহজ কথা ঘুরিয়ে বলা হয়। মনের কথা সহজ ভাবে ব্যক্ত করলে তার রসটুকু গাঢ় হয় না। তাই ত নারীর প্রেমনিবেদনের ধারা বহুবিচিত্র। 'হেঁয়ালি'র রূপ-কল্পনায় তারই আভাস মেলে:

'যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে ঢেকিয়া দেয় তারে,
কেবলি আলো আঁধারে,
সংশয় বাধায়;
ছলকরা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।' (পৃ. ১০১)

নারী-চরিত্রের এই বিভিন্ন ছদ্মবেশ, এই বহুরূপী প্রকাশকে কবি তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন নাম্নী পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে। প্রেম-সুষমার অনন্ত ঐশ্বর্য নারীসত্তাকে অন্তহীন রূপময়তায় ঐশ্বর্যময়ী করে। নানান রঙে, নানান রেখায়, বিচিত্রতর ভঙ্গীতে নারীর প্রেমের বহিরঙ্গ। বাইরের রূপে লাখো তরঙ্গের মেলা; অন্তরে গভীর প্রেমের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি। বাইরে রূপের বাহার, অন্তরে অপরূপের আসর। পুরুষ আসে—সে আগন্তুক বাইরের রঙে মুগ্ধ হয়, অন্দর মহলের খবর সে রাখে না। সে বার মহলের চটকদারিতে ভোলে। নারীর অন্তরের শক্তিটুকু সহজ অনাড়ম্বর সৌন্দর্যটুকু তার কাছে অজানা থেকে যায়। নারীর প্রেমের দুর্বারতা, ত্যাগ ও ক্ষমার দ্যুতি, সত্যপথে পুরুষকে চালনার সুতীব্র অভীপ্সা—এই গুণগুলো প্রসাধনের মুখোশের তলায় লুকিয়ে থাকে। সহজ দৃষ্টিতে এদের দেখা যায় না—এরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। নারী যেখানে শুধু নর্মসহচরী, লীলাসঙ্গিনী সেখানে পুরুষ তার চটকদারিতে ভোলে। সে বহুবিচিত্র রূপের রংদার ছবি কবি "মহুয়া" কাব্যগ্রন্থে অনেক এঁকেছেন। আবার তাকে অতিক্রমও করেছেন অনায়াসে। লীলাসঙ্গীর কামনা-রঙীনমূর্তি অন্তর্হিত হয়েছে: সেখানে আমরা দেখেছি কল্যাণী বধূর রূপ। এই বধূই হ'ল পুরুষের সহধর্মিণী। সহধর্মিণীর প্রসাধনে অনুরাগ নেই। সে পুরুষের সত্যধর্ম পালনের প্রেরণা; ধর্ম-সাধনায় সে তার নিত্য সহচর। নর্ম-সাধনার সাথী ধর্ম-সাধনার সঙ্গীরূপে দেখা দিল সহধর্মিণীর মধ্যে। পুরুষ ও নারীর এই যুগলরূপ তার প্রিয়ার মধ্যে কামনা করে। তাই ত কবি বলেন:

"বধূরে যেদিন পাব—ডাকিব 'মহুয়া' নাম ধরে।"

পুরুষ-ঈপ্সিত বধূ যেন শাল-তাল-তমাল-পরিবৃতা মহুয়া। তার আবেদন সর্বকালের—দুর্ভিক্ষে ও ব্যসনে তার সমান অকাতর ঔদার্য। প্রার্থীর অঞ্জলি সে সব সময়েই ভরে দেয়—অন্নরিক্ত মধ্যাহ্নে আবার বাসনাতপ্ত সায়াহ্নেও। সে নারী বহু দীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ়, উন্নত। বিলাসের চাঞ্চল্য-বিহীন সুগম্ভীর সেই নারীই পুরুষের কানে কানে বলে:

'শোনো, শোনো, আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন,
পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে—উপবাস-ছিদ্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে ঊর্ধ্বপানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি।' (পৃ: ৮৬)

অবিচল বীর্যের আধার শক্তিময়ী এই নারীর জায়ারূপ পুরুষের নিত্য-প্রেরণার উৎস। অন্তহীন পথচলায় সর্বকর্মে প্রেরণাদাত্রী কল্যাণী আর প্রসাধনময়ী নয়, সে ছলনার আশ্রয় অতিক্রম করে সহজ সরল মাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ হ'ল নারীর জায়ারূপ, নারী যেখানে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, সেখানে সে মহাশক্তির অংশ, তারই প্রতিষ্ঠা দেখি জায়ার মধ্যে, সহধর্মিণীর অন্তরলোকে। তাই ত সহধর্মিণী সকল ধর্ম-সাধনার অঙ্গ। তাই ভগবানের অবতার শ্রীরাম-চন্দ্রেরও স্বর্ণসীতাকে প্রয়োজন হয়। ধর্ম-কর্ম-সাধন সাক্ষী এই সহধর্মিণী পুরুষকে নতুন নতুন কর্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। তার সত্তায় শক্তির আশ্বাস, শান্তির ইঙ্গিত। কর্ম-ক্লান্ত পুরুষের অবসাদ সেবাব্রতার স্পর্শে দূরীভূত হয়। অবসন্ন পথচারীকে সেবায়, শুশ্রূষায়, আবার আগামী দিনের কর্মমুখর জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে নারী। সে পবিত্রা, সেবাশুদ্ধা নারীকে পুরুষ যুগে যুগে তার শ্রদ্ধা-বিনম্র অভিবাদন জানিয়েছে। চলার পথে সংশয় বার বার আসে পুরুষের জীবনে—কখনও সংশয় আপনার শক্তিতে, কখনও বা বিধাতার মঙ্গল কর্মে। পুরুষ সেই দ্বিধা অতিক্রম করে নারীর সাহচর্যে। নারীর বিশ্বাসের সরলতায় সে পুরুষের সংশয় দূর করে তাকে সহজ বিশ্বাসের পথে অগ্রসরণের প্রেরণা দেয়। বিভ্রান্ত পুরুষ আবার সন্মার্গগামী হয়। কল্যাণ, সত্য ও প্রেমের পথে সে আবার লক্ষ্যাভিমুখী হয়। তাই ত নারীর পার্থিব সহজ অস্তিত্বটুকু এক অপার্থিব

মর্যাদায় পুরুষের চোখে ভাস্বর হয়ে ওঠে। কবি সেই অতিমানবীয় নারীসত্তার প্রতিষ্ঠা করেছেন জায়ার কমনীয়তায়, সহধর্মিণীর একনিষ্ঠতায়। অলৌকিক পদ্মের মতন নারীর নারীত্বের প্রকাশ ঘটে। অন্তহীন কাল, অসীম আকাশ এবং নিদ্রাহীন আলো এই অলৌকিক নারীসত্তার উপাদান। কোন এক অনাদি মন্ত্রবলে এরা মিলে মিশে রমণীর অলৌকিক মাধুর্য ও মর্যাদাকে রূপ দিয়েছে। এই নারী অনন্ত শক্তির উৎস। পুরুষের সর্ব কর্ম-প্রেরণার কেন্দ্রস্থলে এই রমণীর প্রতিষ্ঠা। কবি এই অনন্তশক্তিপ্রদায়িনী নারীসত্তার উদ্দেশে বললেন :

'যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়
অগ্নিময়ী বেদনায়
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে। (পৃ. ৯৩)

এই রূপবর্ণনায় শ্রদ্ধার প্রগাঢ়তা আছে। এ যেন ভক্তের চোখে দেবীমূর্তি দর্শন করা। যা কিছু অপূর্ণতা, যা কিছু ক্ষুদ্রতা, যা কিছু মালিন্য—তাদের স্পর্শ এখানে নেই। গ্যেটে 'ফাউস্টে' পরমসঙ্গিনীর প্রশস্তি গেয়েছিলেন :

'ধরণীর সব অপূর্ণতা
নারীতে পেয়েছে বুঝি
পূর্ণের মহিমা!'

[Earth's insufficiency here finds perfection]

এই পূর্ণ নারীত্বের রূপ-কল্পনা যুগে যুগে পুরুষচিত্তে দুর্মদ কর্মপ্রেরণা উৎসারিত করে দিয়েছে। লাভক্ষতির সহস্র ছিদ্রযুক্ত ব্যক্তিজীবনে সে এনেছে আর এক নতুন মূল্যবোধ। পুরুষকে পথ দেখিয়ে সে নিয়ে গেছে আর এক আদর্শের জগতে – সে জগৎ উপরের জগৎ। মহত্তর জীবনবোধ নারীই দিয়েছে পুরুষকে। পুরুষ তার উত্তরাধিকার রেখে গেছে বংশপরম্পরায়। আবার সেই আদর্শ জীবনচর্যার প্রেরণাও জুগিয়েছে নারী। সর্ব ক্ষুদ্রতার মোহপাশ থেকে মুক্তি পেল পুরুষ এই নারীর সাহচর্যে। যখনই পুরুষচিত্তে সংশয় আসে, অবিশ্বাসের প্রেতচ্ছায়া তার বিচারকে আচ্ছন্ন করে তখন পুরুষ স্মরণ করে নারীর অবারিত আত্মদানকে, তার ত্যাগের মন্ত্রকে তার উদার জীবনবাদকে। পুরুষ নারীর কাছে তার অবসাদক্লিন্ন জীবন থেকে তাকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করার জন্য আবেদন জানায়। পুরুষ জানে যে নারীর আকর্ষণীশক্তির চুম্বক তাকে তার সব মালিন্য, সকল ক্লেদ থেকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করবে। নারীর পবিত্র স্পর্শে তার সব কলুষ ঘুচে যাবে। তাই সে বলে :

'হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।' (পৃ. ৬৭)

এই বাণীপ্রতিম দেবীমূর্তির সৌন্দর্য তার দেহে নয়, তার মনে, তার অন্তরের সতীধর্মে।

নারীর এই দেবীমূর্তি পুরুষের সৃষ্টি। যেমন প্রিয়ামূর্তি পুরুষের কল্পনায় রঙীন, ঠিক তেমনই সহধর্মিণীর এই সতীরূপ পুরুষের শ্রদ্ধায় ভাস্বর। পুরুষ আপন মনের রংঘরে রং তুলি দিয়ে রংদার যে চিত্র অঙ্কিত করে তা অনন্তসুন্দর। পুরুষ আপনার অগোচরে নারীর মাধুর্যটুকু সৃষ্টি করে। কস্তুরীমৃগ যেমন আপনার নাভিগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে গন্ধের উৎসানুসন্ধান করে ফেরে বন থেকে বনান্তরে, পুরুষও ঠিক তেমনি করে নারী-রহস্য, রমণী মাধুর্যের স্রষ্টা হয়েও সে এই লোকাতীত সৌন্দর্যের উৎস নারীর মধ্যে সন্ধান করে। তার অনুসন্ধানের শেষ নেই। একথা পুরুষ ভুলে যায় যে, রমণীর অতলস্পর্শী রহস্যের সে-ই স্রষ্টা। তার সৃষ্টি তার বুদ্ধিকে অতিক্রম করে। সে তার নাগাল পায় না। তাই ত পুরুষের চোখে নারী চিররহস্যময়ী। কিন্তু নারীর অপূর্ণতা নারীর কাছে বাস্তব, সত্য। তাই সে তার প্রিয়তমকে বলে :

'ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই তাই শেষে পড়ে ধরা—
দেখ দূর হতে এসে, জলাশয়ে জল নাই ভরা।' (পৃঃ ৯৫)

নারীর অপূর্ণতা পুরুষ ঘুচিয়ে দেয়। সেকথা নারী জানে। সে আরও জানে যে, পুরুষের ভিক্ষাঞ্জলি সে যে ধনে পূর্ণ করে সে সম্পদ পুরুষেরই দেওয়া। নারীর সবকিছু অপূর্ণতা, সমস্ত দীনতাকে পরিপূর্ণ করে দেয় পুরুষের অকৃপণ ঔদার্য। ভাবাবেগের কোন এক নিবিড় মুহূর্তে নারী পুরুষকে বলে :

'তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারই দান,
গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছ আমায়।'

নারীর স্বভাবজাত স্থিরবুদ্ধির আলোয় সে সত্যকে দেখে, গ্রহণ করে ধ্রুবকে। প্রেমঘনিষ্ঠ কোন এক পরম লগ্নে সে তার দয়িতকে বলে আপন দীনতার কথা অকপটে। কোথাও কোন আবরণ নেই : অপ্রকাশের কোন কুণ্ঠা তাকে বিব্রত করে না। সে তার পুরুষকে বলে :

'তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করিনি আমি কভু।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কী মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।

নহে নহে, হে রাজন ! তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি।'

পুরুষ দেবার অপরিসীম আনন্দে তার ঐশ্বর্য অবারিত করে দেয় নারীর কাছে। নারী সে সম্পদে ঐশ্বর্যময়ী হয়। পুরুষের এই দানেই আনন্দ, নারীর আনন্দ এই মহাদানকে যথোচিত মর্যাদায় গ্রহণ করা। পুরুষ দেবার আগ্রহে উন্মুখ, নারীর রিক্ততাকে পূর্ণ করার জন্য সে সদাব্রতী। এই দেওয়াই পুরুষের ধর্ম· রবীন্দ্রনাথের পুরুষ-কল্পনা তার বৃহত্তর জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের পুরুষ হেগেলীয় ব্রহ্মের মতই আপনার সৃষ্টি-সান্নিধ্যে আপনার পরিপূর্তি খুঁজে পায়। নারীর অলৌকিক মর্যাদার অভিব্যক্তিতে পুরুষের সৃষ্টি-আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। সে হ'ল পুরুষের সৃষ্টি। আবার সে-ই পুরুষের শূন্যতা পূর্ণ করে। নারীর ক্ষুদ্র পার্থিব সত্তা পুরুষের শ্রদ্ধার পটভূমিতে অপার্থিব মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। মানুষী দেবীমূর্তিতে আবার পুরুষকে নব নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে। এই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা চলে যুগে যুগে। পুরুষের কল্পনায় নারীর এই নতুন রূপ-রচনা ; পুরুষের দানে নারীর এই নিত্য নব ঐশ্বর্যলাভ—এ হ'ল নিত্যকালের। ভগবানের অনাদি সৃষ্টির এরাও হ'ল নিত্যসঙ্গী। পুরুষের এই সৃষ্টিশক্তিকে নারী শ্রদ্ধা করেছে, বিশ্বাস করেছে পুরুষের অনন্ত সম্ভাবনায়। সে তার পুরুষকে বলে :

'তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর।' (পৃ. ২৭)

নারী তার আপন পুরুষকে তাকে নতুন করে সৃষ্টি করার আমন্ত্রণ জানায়। সে পুরুষ নারীর বহু স্বপ্নের নায়ক। রবীন্দ্রনাথ সে পুরুষের চিত্র এঁকেছেন বলিষ্ঠ রেখায় সুন্দর ভঙ্গীতে। কবির মানসকন্যা কোন্ ভাগ্যবানের কণ্ঠলগ্না হবে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। কবি বলেন, সেই ভাগ্যবানই তাঁর মানসকন্যার বরমাল্য লাভ করে যে দুঃসাধ্যের সাধনা করে। নারী তার জন্য তার বরণডালা নিয়ে প্রতীক্ষা করে। প্রতীক্ষাদীর্ঘ রজনীর শেষে নারী বলে :

'হে বীর অপরিচিত, শেষ হ'ল আমার রজনী—
জানা তো হ'ল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
জয় তব উঠিল ধ্বনি। আমি রহিনু জাগিয়া।' (পৃ ৮৮)

তার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় না। এই অপরিচিত বীরের সত্যরূপ চিরকাল নারীর অগোচর থাকে না। নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ আসে অনতিদূর ভবিষ্যতে। সে চলমান জনতার মধ্যে তার দয়িতকে আবিষ্কার করে। সে পুরুষ সকলের মধ্যে থেকেও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। সে নিঃশঙ্ক কৌতুকে চলমান জনতাকে প্রত্যক্ষ করে। তার চিত্তে প্রশান্তি, ব্যক্তিত্বে সুগভীর নিষ্ঠা। নারী তার নিশ্চল ঔদাসীন্যে আকৃষ্ট হয়, তাকে আত্মনিবেদন করে বলে :

'তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান মাঝে উষার ভৈরবী।' (পৃ. ৭৮)

পুরুষের এই মহিমা-ব্যঞ্জিত মূর্তি তার প্রিয়ার চোখে ধরা পড়ে। দয়িতা দেখে তার পুরুষ জনতার দীর্ঘ ছায়ার মাঝে ছায়া বিস্তার করে না। সে অচ্ছায়া, সে আলোক-প্রেরণার উৎস। তার মজ্জায় মজ্জায় শক্তির আশ্বাস, বীর্যের ঘোষণা। পরম পৌরুষে সে তার জীবনসঙ্গিনীকে জয় করে। নারী সানন্দে সাগ্রহে বীরের কণ্ঠলগ্না হয়। সে শ্লথপ্রাণ দুর্বল পুরুষকে কামনা করে না। দুর্বল পুরুষের কামনা-কলুষ নারীর অসম্মান করে। তার নারীত্ব ব্যথিত, ক্লিষ্ট হয় এই ধরনের পুরুষের সান্নিধ্যে। নারী যদি জীর্ণমজ্জা কাপুরুষকে গ্রাহ্য করে, যদি আত্মদান করে নির্বীর্য পুরুষকে, তবে দেবতা তার উপর রুষ্ট হন। সে দেবতার কাছে দোষী হয়। তাই কবির মানসকন্যা বলে যে সে বীরভোগ্যা হবে। বীরের সহধর্মিণী হওয়াই তার পরম কামনা। তার আন্তর ঐশ্বর্য পদ্মের পাপড়ির মত আপনাকে প্রতিদিন মেলে দেবে বীরের স্পর্শ পেয়ে। তার নারীত্বের সুগভীর কাঠিন্য তার প্রেমাস্পদের পৌরুষকে চিরকাল উদ্দীপ্ত করে রাখবে। নারীর বিনম্র দীনতা পুরুষের পৌরুষকে খর্ব করে। তাই ত কবির মানসকন্যা সে দীনতাকে পরিহার করে। দুর্বল লজ্জার অক্ষম আবরণ বার বার তার প্রিয়তমের ব্যক্তিত্বকে, তার মর্যাদাকে খর্ব করে, তাই সে এই দুর্বল লজ্জাকে পরিত্যাগ করেছে ; নারী সযতনে আপনাকে যোগ্য করে তোলে তার প্রিয়তমের জন্য। তাকেই ত সে তার শ্রেষ্ঠ দানটুকু দেয়। তার সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন অবারিত হয় এই পুরুষের প্রেমস্পর্শে। দেবার আনন্দ তাকে ধন্য করে।

নারীর এই অনির্বচনীয় ঐশ্বর্যটুকু পুরুষ গ্রহণ করে তার সমস্ত অন্তরের সঙ্গে। সে নারীকে ধন্য করে, নিজেও ধন্য হয়। তার নিজের দেওয়া ঐশ্বর্য তাকেই মুগ্ধ করে। তার নিজের দেওয়া দান আবার তার প্রিয়ার হাত থেকে গ্রহণ করে সে কৃতার্থ হয়। নারসিসাস আপন রূপে আপনি বিমুগ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথের নায়ক আপনার সৃষ্ট রূপে আপনি বিভ্রান্ত। বিহ্বল পুরুষ ভুলে যায় নারী-মাধুর্যের সৃষ্টি-রহস্যের কথা। লোকাতীত স্রষ্টাকে নারী-সৃষ্টির সবটুকু গৌরব অর্পণ করে ভাবমুগ্ধ কণ্ঠে সে বলে :

'নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।' (পৃ. ৮৪)

বাসা বদল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাড়ীর সামনে কাঠা চারেক জমি—শক্ত বাখারির বেড়া দিয়ে ঘেরা। জলে রোদে কালো হয়ে ভঙ্গুর হয় বাঁশের খুঁটি—তার পর উঁই ধরে ভেতরটা ফোঁপরা করে মাটি ভরিয়ে তোলে। কেশব বুদ্ধি করে বেড়ার গায়ে কয়েকটা জীয়ল গাছের ডাল পুঁতে ছিল, তারাই শাখাপল্লবে জীবন পেয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে বেড়াটিকে। রোদে জলে আর উঁইয়ে জীর্ণ বাখারি মাটির সঙ্গে মিতালি পাতায়, তবু তার দেহাংশের পরিবর্ত্তনে রক্ষা পায় কায়াটা। যে রক্ষা করে তার পরিশ্রমটাও লঘু রকমের।

মালী-বাড়ীতে কেশবকে নিয়ে হয় ত বহু পুরুষ হ'ল, কেশব কিন্তু তিন পুরুষের হিসাব রাখে। বাবা অমৃতকে (ডাক নাম অমর্ত্য) মনে পড়ে। গোলগাল বেঁটে খাটো মানুষটি—মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পানের রসে ঠোঁট দুখানি সর্ব্বদাই স্যাঁত-স্তে তে, তারই মাঝে পানের-ছোপ লাগা মিশ কালো দু'সার দাঁত। ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে—নিড়েন, খুরপো, শাবল, পস্তা হাতে নিয়ে সটান চলে যেত—বাখারি-ঘেরা ওই জমিটুকুর মধ্যে; গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়ে শিকড়ে কার্ত্তিকের হিম লাগালে গাছের স্বাস্থ্য ভাল হয়, ফুলের বাহারও খোলে চমৎকার। ফুল বড় হয়—ফোটেও অজস্র—রঙেও লেগে থাকে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল্যটুকু। অতএব শাবল চালিয়ে মাটি তুলে বার কর—তার শিকড়। কুন্দ ফুলের ঝাড়ের বাঁধনটা আলগা করে তার শাখা-প্রশাখাগুলিকে আলো আর রোদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ করে না দিলে—সারা শীতকালটা অজস্র ফুল দিয়ে বৃত্তি-ব্যবসা বজায় রাখবে কেমন করে? গাঁদার ঋণটাও অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। ইতু পূজার ঘটে—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের যে-কোনও ব্রতে মালা—অঞ্জলিতে দেবতার তুষ্টিসাধনে ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে ওর তুলনা মিলবে না। কিন্তু গাঁদা ত কুঁদের মত রোজ রোজ অজস্র ফোটে না, রাশি রাশি বিলিয়েও যা শেষ হয় না। কিংবা তা এমন নয় যে, প্রতি রাত্রির অন্ধকারে কুঁড়িটি পূর্ণ হয়ে প্রতি প্রত্যূষের আলোর আভাসে ফুল হয়ে ফুটবেই। রাশি রাশি ফুল—একটি বেলার জীবন ওদের, তাই একটি রাত্রির অন্ধকার-মঞ্চে তাড়াতাড়ি রূপ-সজ্জা সেরে ঝাঁক বেঁধে অভ্যর্থনা করে প্রভাতকে। গাঁদার গ্রামভারী চাল। ফুল হওয়ার আয়োজন ওর চলে দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে। ফুল হয়ে ও এক বেলা-কার জীবনই উপভোগ করে না, বসে বসে থিতিয়ে জিরিয়ে কয়েকটি দিন আর রাত্রি ধরে বৃন্তে বৃন্তে জরদ রঙের বাহার খুলে নিজে উপভোগ করে পৃথিবীকে, উপভোগ করায় মানুষকে। বেড়ার ধারে ধারে ওরা উদ্যানের রমণীয় জমিটিকে বেঁধে রাখে সুদৃশ্য জরদ রঙের পাড়ের বাঁধনে। দোপাটি, টগর, রঙন, যুঁই, মল্লিকা, অতসী, রজনীগন্ধা এরা এক এক ঋতুর ফসল। জবা আর একপাটি টগরের অত কাল বাছাবাছি নাই, সারা বছরে—কখনও কম—কখনও প্রচুর ফুল দেয়। করবী ওরই মধ্যে একটু খুঁতখুঁতে, স্থলপদ্মেরই মত বছরে দু'বারের বেশী শাখায় শাখায় হাসির লহর তুলতে চায় না। অপরাজিতা ত নগকন্যার নাম গোত্রে চির দুর্ল্লভই। দোপাটি আর সন্ধ্যামণি আর সূর্য্যমুখী এরা কেউ শীতকালে—কেউ বা বর্ষায় আপন আপন পরিচয়পত্র দাখিল করে। তুলসীর ঝাড় আর দূর্ব্বার কোমল আস্তরণ না থাকলে মালী-বাগিচারই অঙ্গহানি। এরা শুধু বার মাসেরই নয়, সর্ব্ব দেব-দেবী অর্চ্চনার আদিভূত বস্তু। সমস্ত পূজায় সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরির উপস্থিতি অনিবার্য্য; শালগ্রামশিলা বিনা কোন দেবতাকেই অভ্যর্চনা করার রীতি নাই—আবার শ্রীহরিও তুলসী-বিরহ সহ্য করতে পারেন না। বহু রূপে যে পরমাত্মা নিখিলের প্রাণসত্তায় গ্রথিত—তাঁরই পূজামন্ত্রে তুলসী চন্দন হ'ল একমাত্র উপকরণ। আর দূর্ব্বা? যেখানে কোন আয়োজন নাই—সেখানে সব রিক্ততার লজ্জা ঘুচিয়ে পূজাকে সার্থক করে তোলে এই জিনিষটি। বহু উপকরণ জমা হলেও—তাকে দিয়েই সুরু হয় পূজা বন্দনা।

রৌদ্রময় উজ্জ্বল দিনের গৌরব যেমন প্রত্যূষের কোমল আলোর ছোপ লেগে সুরু হয়, তেমনি ছোট বড় সমস্ত পূজার উদ্বোধনীতে দূর্ব্বা। তবু এই দূর্ব্বাকে সর্ব্বদা শাসন না করলে চলে না। পরিমিত উপচারে এরা উদ্যানের শোভা, সম্পদও বটে; পরিমাণের বেশী হ'লে উদ্যানের শত্রু এরা। তাই খুরপো নিড়েন হাতে প্রতি সকালে অমৃত এসে বসত এই কাঠা চারেক জমির মধ্যে। সকালের রোদ চড়া হয়ে উঠত, গাছের মাথা ডিঙিয়ে ফুলের গাছ ভাসিয়ে অমৃতের গায়ে চিমটি কেটে বলত, আর না, এবার ওঠ, খাবার বেলা হয়েছে।

অমৃত চমকে উঠে প্রায়ই বলত, এঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেল ত! চট করে চানটা সেরে আসি—ভাত বাড়। খুরপো শাবল বাগানে রেখেই সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসত।

তার কাছেই হাতে খড়ি কেশবের। খুরপো দিয়ে ঘাস চাঁচা—নিড়েন দিয়ে ঘাস তোলা—সাবল দিয়ে দো-আঁশ মাটি তুলে—বেলে আর এঁটেল মাটির সঙ্গে মেশানো, কাঁচি দিয়ে গাছের শুকনো ডালগুলি ছেঁটে দেওয়া। ছোট সরু বাখারি দিয়ে রজনীগন্ধার ডাঁটি আর গাঁদার পুষ্পভারাবনত শাখাগুলি বেঁধে দেওয়া, চন্দ্র-

মল্লিকার টবগুলি কখনও ছায়ায় কখনও বা রোদে মেলে দেওয়া, অপরাজিতা আর তরুলতার লতাগুলিকে বেড়ার গায়ে বেঁধে দেওয়া প্রভৃতি উদ্যান-চর্য্যার কাজগুলি সে অমৃতের কাছেই শিখেছে। মানুষটি এমনিতে সাদাসিধে, হাসিখুসিভরা, কিন্তু রাগলে যেন গন্‌গনে আগুন। যেমন তাত—তেমনি তেজ। সামনে ওই কামারশালার জ্বলন্ত হাপরের মতই বোধ হয়। সে আঁচ অকারণেই কত বার কেশবের গায়ে এসে লেগেছে; স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে অমৃত।

তারও আগের পুরুষ অর্থাৎ পিতামহকে আবছা-আবছা মনে পড়ে। মনে পড়ে একটি মিষ্টি কোল, নরম স্নেহময় হৃদয় আর অফুরন্ত সোহাগ।

ওটি কেগো—মালী-ঠাকুরদা ?

নাতি—আমার নাতি—আমার সগ্‌গে বাতি। বলে গাল টিপে টেনে টেনে তৃপ্তির হাসি হাসত বুড়ো।

এক দিন কোথায় চলে গেল বুড়ো। স্বপ্নের মত মনে হয়। কান্নাকাটি—লোকজনের আনাগোনা, না রান্না—না খাওয়া, সোহাগ আদর দূরে থাক—কেউ চেয়েও দেখল না—সারাদিন কোথায় রইল ছেলে—কি বা খেলে।

তার পর অমৃতও চলে গেল একদিন। স্বপ্নের মধ্যে নয়, পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোতেই। গৃহ থেকে শ্মশান পর্যন্ত একটি দুঃসহ তাপ কেশবের অঙ্গ স্পর্শ করে জ্বালা ধরিয়ে দিল. কেশব তখন উনিশ বছরের জোয়ান ছেলে। তাপটা সঞ্চিত হয়ে আছে স্মৃতির মণিকোঠায়, দাহযন্ত্রণার লেশমাত্র আজ আর নাই।

২

সেই বয়সেই কমলার সঙ্গে পরিচয়। অন্য পাড়ার মেয়ে, ফুলের লোভে এসে জুটত সকাল বেলায়। নিড়েন হাতে একমনে গাছের গোড়াকার ঘাস তুলছে কেশব—পিছনে না চেয়েও বেশ বুঝতে পারছে শ্যামলী মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে বেড়ার আগড় ধরে—মুখে চোখে কিছু বিস্ময়, কিছু বা বাঞ্ছার ঔৎসুক্য। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদ্যান-চর্য্যা দেখে ও সাহস সঞ্চয় করে ডাক দিচ্ছে, একটা ফুল দেবে ?

ফুল ? জানিস—এ ফুলে ঠাকুর পুজো হয়। ঘাড় না ফিরিয়েই কেশব জবাব দেয়।

দাও না—মোটে ত একটি। ঠাকুরের জন্য মেলাই ত রয়েছে।

নরম গলার অদ্ভুত অনুনয়; যেমন চোখে জল এলে স্বরটা ভিজে ভিজে ঠেকে, কথাগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে যায়। একটু কাঁপেও বা মুখ তুলে চাইতেও ভয়।

কি ফুল নিবি ?

ওই লাল গাঁদাটা।

এই নে, খবরদার আর আসিস নে।

বাঃ—চমৎকার ফুল ত। খোঁপায় পরি। লাফাতে লাফাতে চলে যায় মেয়েটি, সে যেন নৃত্যেরই লয়। জরদা রঙের বড় ফুলটা খোঁপায় বৃন্তে বেশী করে হেসে উঠে তখন।

কিন্তু মেয়েটি শুধু কেশবের কাছেই ফুল নিতে আসে না, সতীশের কাছেও যায় টুকরো লোহার সন্ধানে। রাস্তার এপার ওপার দুখানা বাড়ী। মালীবাড়ী—আর কামারবাড়ী। দু'বাড়ীর চালাঘর খড়ের ছাওয়া, দাওয়া মাটির, দাওয়ায় ছোটমত একখানি তক্তপোশ পাতা—কুটুম্ব অভ্যাগতদের আদর সম্বর্দ্ধনার জন্য। মালীবাড়ীর বাইরের ঘর বলতে এই দাওয়া, কামারবাড়ীতে এ ছাড়াও একটি কামারশালা আছে। সেইখানেই 'এসোজন' 'বসোজনের' ভিড়। তিন দিকে মাটির দেওয়াল ঘেরা, ছাউনি অবশ্য খড়েরই—উঁচু ছাউনি। সামনে একটি আগড় আছে—সেটিকে দুয়ার বলা চলে। কানাস্তারার টিন কেটে সেই টুকরোগুলি বাখারির বাঁধনে শক্ত করে বেঁধে তৈরি হয়েছে পাল্লা। বাঁশের একটা হুড়কো-খিল দিয়ে ঘরটা বন্ধ করে সতীশ নিশ্চিন্ত বোধ করে। সবাই জানে এ আগড় চোর ঠেকাবার জন্য নয়। কামারশালার মধ্যে চুরি করবার বস্তু কিই বা আছে! কতকগুলো মরচে-ধরা ভাঙা বাঁকানো লোহার টুকরো, একটি জলভর্তি মাটির নাদা। একটি পায়াভাঙা ঘুণধরা আম কাঠের বেঞ্চি। বাঁশের সঙ্গে কায়েম করে বাঁধা একটা ভস্ত্রা, তার আচার্য্য কিছু কাঠকয়লা, একটা জবরদস্ত নেহাই—তা সেটা এমন ভাবে পোঁতা আছে মাটিতে যা তোলা একরূপ দুঃসাধ্যই। হাতুড়ী, ছেনি, সাড়াশী, মুগুর আর নল ভাঙা গাড়ু—ঘর বন্ধ করার সময় বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় সতীশ। কিন্তু ওই টুকরা লোহার লোভেই মেয়েটি এসে দাঁড়ায় কামারশালে। বলে, একটু লোহা দেবে ?

লোহা ? কি করবি রে কমলা ?

কেন—হাতা, খুন্তি করব—খেলাঘরের হাতা খুন্তি। আর ছোট্ট একটা বঁটি গড়িয়ে দেবে ?

ছোট বঁটির ভাবনা কি, চোত সংক্রান্তির দিন চড়কের মেলা বসবে—কিনিস সেখান থেকে।

পয়সা কোথায় পাব ?

কেন চেয়ে নিবি মায়ের কাছ থেকে। আচ্ছা—আমি ত সেই সময়ে গড়ব অনেক বঁটি—দেব একখানা।

বাঃ, বেশ হবে। মেয়েটি খুশিতে নেচে ওঠে। নাচতে নাচতে চলে যায়। খোঁপায় গোঁজা সেই জরদা রঙের গাঁদাটা—দূর পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবার আগে কি অপরূপই না দেখায়!

৩

কামারশালে কেশবও আসে। খুরপো, নিড়েন, কোদাল, শাবল দা—এ সবে মাঝে মাঝে শান দিয়ে না নিলে কাজ চলে না। অল্প শ্রমের কাজগুলির পারিশ্রমিক নেয় না সতীশ। সামনাসামনি বাড়ী, প্রতিবেশী, বাল্যবন্ধুও। টুকিটাকি কাজের জন্য পয়সা চাইতে চক্ষুলজ্জা বোধ করে। ব্যবসা চলে একটু দূরের প্রতিবেশীর

সঙ্গে—বাদের সঙ্গে কোন রকম লেনদেন সম্পর্ক নাই। কেশব দাম দেয় না, দাম দেবার কথা মনেও হয় না ওর। কিন্তু প্রতিদিন কিছু দেয়। গাছের ডাল গোলাপ ফুল ফুটলে—ছোট ডালশুদ্ধ ফুলটি তুলে এনে বলে, ঠাকুরের পটের সামনে টাঙিয়ে রাখ গে—ভারি চমৎকার বাস, ঘর ম ম করবে গন্ধে।

ফুলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাকের কাছে এনে খুব জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে সতীশ বলে, আঃ—আঃ।

একটু পরে বলে, তা ফুলটা আমায় দিলি যে? বিক্রী করলে পয়সা পেতিস।

ভাল ফুলের দাম নেই। ঠাকমা বুড়ি বলত, দেবতাকে যিনি পয়সায় ফুল দিলে পুণ্যি হয়, কিন্তু পেট চলে না বলে ঠাকুরের পাওনাতেও ব্যবসা করছি। আর বলতো কি জানিস—ফুল ভক্তি করেই দাও—কি ভালবেসেই দাও—দাম নিয়েছ কি সব মাটি। দাম দিয়ে যেমন ভালবাসা কেনা যায় না, তেমনি ফুলও।

সতীশ হেসে জবাব দেয়, তা আমাকে ফুল দিলে ত তোর ভালবাসা সার্থক হবে না! ফুলের মতই যে সুন্দর—

কেশব বলে, তোর রং মিশ কালো আর মুখখানা হুমদো পারা বলে বলছিস বুঝি এ কথা?

বলছিই তো। শুনিস নে—সবাই বলে অসুর, দৈত্য। বলে হো হো করে হেসে ওঠে।

কেশব বলে, কিন্তু সত্যি বলছি—তোকে দেখে হিংসে হয় আমার। লোহা যেমন কালো—তেমনি কালো তোর রং, লোহা যেমন মজবুত—তেমনি মজবুতও। গনগনে আগুন থেকে লাল টকটকে লোহা তুলে—নেহাই-এর উপর রেখে যখন হাতুড়ি দিয়ে পিটতে থাকিস—তখন সত্যি বলছি—কি সুন্দরই দেখায়। ঠনাঠন শব্দ হয়—আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে এধার ওধার—তোর হাতের গুলি বেলের মত ফুলে ওঠে—বুকখানা কি চওড়াই না দেখায়। সত্যি বলছি সতে—ফুল বাগানে আগাছা নিড়োতে নিড়োতে এক একদিন ভাবি—তোর মত ক্ষমতা যদি থাকত ত এতদিনে ছটো বাগান তৈরি করে ইন্দিরভুবন করে তুলতাম বাড়ীটাকে।

সতীশ হেসে বলে, দূর বোকা, এই দেহের আবার বড়াই করে কেউ? যেন চোয়াড় চাষা একটি! তোর বাবু বাবু কচ্ছের চেহারা দু'দণ্ড দেখে সবাই। ফরসা, কোঁকড়ানো চুল, একহারা গড়ন। জামা জুতো পরলে কে বলবে যে মিস্তিরদের ছোটবাবু নয়। বাড়ী এসেছে শনিবারে, সোমবারে যাবে কর্মস্থলে—শহর কলকাতায়।

দু'জনেই প্রাণখোলা হাসিতে কামারশালা ভরিয়ে তোলে। কমলাকে নিয়ে ঠাট্টা চলে দু'জনায় মধ্যে।

সতীশ আপন মনে বলে, যেমেটি ফুল ভালবাসে কি তোকে ভালবাসে কে জানে!

কেশব বলে, ও ফুলই ভালবাসে, আমাকে নয়। না হলে খোপায় ফুল গুঁজে কামারশালে আসে ঘর পাতাবার জিনিস খুঁজতে?

ঠিক বলেছিস—ঘর পাতাবার সখই ওর। তাই ফুলটা গোঁজে মাথায়। আমাকে ভালবাসলে ওর লাভটা কি বল—বিয়ে তো হবে না। তোদের স্বজাত—তোরই জয় জয়কার।

কেশব বলে, না রে, মালী-বাড়ীর মেয়েদের শুধু ফুল ভাল লাগলে চলে না, ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার ফুরসত কোথায় তাদের। তাদের জানতে হয়—কোন্ কোন্ ফুলে মোড়ক তৈরি করতে হয়—কেমন করে মালা গাঁথতে হয়, কোন দেবতার পুজোয় কি কি ফুল লাগে।

অর্থাৎ, কেশব বলতে চায়—ফুল খোপায় পরার সখ থাকলে চলবে না, মালা গাঁথার কারিগরিতে যদি উপার্জ্জন জমে তবেই তা সার্থক। যে মেয়ে এর ব্যবহারিক দিকটা জানে—সেই মালীঘরের যোগ্য।

কিন্তু বিধাতার হিসাব ছিল অন্য রকম। কমলা কেশবের ঘরেই এল।

৮

সংসারে মানুষজন কম। কেশবের মা নাই, বাবা নাই—আছে এক বুড়ী পিসী। তা সে সংসার যত করুক না করুক—বক বক করে অনবরত। কেশব ফুল তুলে সাজি ভরে তার সামনে রাখে—সে কলাপাতার মোড়কে সেগুলি ভরে ভরে তোলে। দু'-পয়সা থেকে চার পয়সায় মোড়ক। যোগানের ফুলগুলি আলাদা মোড়কে থাকে—বিক্রীরগুলি থাকে আলাদা। মোড়কগুলি পেতের ভরে—সেই পেতে কাঁকালে নিয়ে এ বাড়ী ও বাড়ী—এ পাড়া সে পাড়া করে বুড়ী। তার পর বকতে বকতে বাড়ী ফেরে। সব মোড়ক সব দিন বিক্রী হয় না—সেদিন বুড়ীর গজর গজর বেড়ে যায়। সেদিন বাড়ী ফিরে কি যে ছাই ভস্ম রাঁধে—নিজেই টের পায় না। খাওয়ার সময় থু থু করে ভাত ছড়ায় আর বলে, মরণ হয় না ত—যম যে ভুলে আছে! নজরের জুত নেই—মনের জুত নেই, এই বয়সে কোথায় ঠাকুর দেবতার পুজো-আচ্ছা করব—না পেতে কাঁকালে ঘুরে মরছি দোর দোর—আর হাঁড়ি ঠেলছি! এমন পোড়া অদেষ্ট আমার!

কমলা এলে বুড়ী পা ছড়িয়ে দাওয়ায় বসে বলল, বাঁচলাম—কেশার সুমতি হ'ল তবু। নিজের ঘরকন্না বুঝে সুঝে নাও বাপু—আমার ত গঙ্গাপানে ঠ্যাং।

পনের বছরের মেয়ে ঘরের মর্ম কি বুঝবে! বাঁশের আড়া—বাখারির বাতা—খড়ের ছাউনি—চার দিকে তার মাটির দেওয়াল। অন্দরে একখানিই ঘর—তার আধখানা জুড়ে রয়েছে বড় একখানা মাইপোষ—তার ওপর একরাশ কাঁথা আর বালিশ আর ছেঁড়া চাদর। ওপাশে একটা বড় কাঠের সিন্দুক—তার ভিতরে নাকি যাবতীয় সম্পত্তি আছে। পিতল, কাঁসার বাসন থেকে গহনাপত্তর

টাকাকড়ি, দলিলদস্তাবেজ, কাপড়চোপড়—সমস্ত। একখানা ছোট জলচৌকির উপর কিছু বাসন, তার পাশে একটি মাটির দেড়কোর একটা মাটির প্রদীপ জলছে মিট মিট করে, ওপরে বাঁশের আলনা টাঙানো—তাতে কাপড় জামা প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস, কুলুঙ্গীতে টুটাকুটা কত জিনিস। মাটির দেওয়ালে খানকতক পট—দেশী পটুয়ার আঁকা কালী দুর্গা গণেশ—কালীয়দমন—অন্নপূর্ণা আর রামরাজার ছবি। দিনের বেলায় চালের খড় দিয়ে বা একটু আলো আসে—আর আসে দুয়োর দিয়ে রাত্রিবেলা প্রদীপের মিটি মিটি আলো, কোন সময়েই ঘরখানা—কি ঘরের ভিতরকার জিনিষগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং ঘর বুঝে নেওয়ার মানেটিই কমলার কাছে ওই রকম অস্পষ্ট। সে মালীর মেয়ে বটে, বাপ দাদারা কোন্ কালে বৃত্তি-ব্যবসা বন্ধ করে অন্য উপায়ে রোজগার করছে। কেউ মুদিখানার দোকানে কাজ করে, কেউ তাঁত চালায়, কেউ বা করে এটা ওটা কেনা বেচার কাজ। ওখানকার ঘর বলতে দিন-আনা দিন-খাওয়ার একটানা সাংসারিক একটি আশ্রয়। তাতে না আছে ফুলের বর্ণবিভ্রম, না বা চিত্ত উদ্‌ভ্রান্তকারী সুরভিমণ্ডল রচনার আভাস। এই ফুলের হাটে বসে নতুন চোখে যে ঘরকে সে দেখছে—তাকে কি ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা যায়—সে কল্পন কমলার আসবে কি করে। তবে খোঁপায় ফুল ও জৈ কৌতুকে পা ফেলে ফেলে নাচের লয় জাগানোর দিন যে ফুরিয়ে গেছে—এটি সে বুঝেছে। সে বুঝেছে সীমন্তে সিন্দুরচিহ্নের সঙ্গে চার পাশের বেড়া দেওয়া গণ্ডীটুকুই তার বধূজীবনের বিচরণভূমি। এই আইনের নাগপাশে সে বন্দিনী। সে দুপুরের খরতাপ-পীড়িতা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে জানালায়। জানালার ওপারে গলিত অগ্নিস্তম্ভের জুড়িয়ে আসা দেহে হাতুড়ির আঘাত পড়ছে—সেই আঘাতে রূপান্তর গ্রহণ করছে ধাতুদেহ, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের ফুল। মানব-দেহের শিরায় শিরায় প্রাণের তরল প্রবাহ—পেশীতে পেশীতে শক্তির বিস্ফারণ। সামনের ফুল বাগানে নানা বর্ণবৈচিত্র্য ভরা ফুল—আর একটু দূরে তন্দ্রা-পীড়িত কালো কয়লার বুকে আগুনের উজ্জ্বল হাসি জানালার বাইরে বৈচিত্র্যভরা এটুকু স্বতন্ত্র জগৎ—সুন্দর সে জগৎ। অনেক ক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে কমলা। কেশবের ধমকে ওর ধ্যান ভঙ্গ হয়।

ওখানে বসে বসে কিসের ধ্যান হচ্ছে? খাবারটাবার দিতে হবে না?

এমন কর্কশ স্বর কেশবের কণ্ঠে মানায় না। ওর গৌরবর্ণের ছিপছিপে দেহে—শক্তি যেন সৌন্দর্যের আকারে লুকিয়ে আছে। কোঁকড়া চুল, পাতলা ঠোঁট, আয়ত দুটি চোখ, মাজা মাজা নাতিপ্রশস্ত কপাল—ওর সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠ বড়ই অশোভন। ধাক্কা খেয়ে জানালা থেকে সরে এল কমলা।

জানালার ধারে এসে দাঁড়াল কেশব। মুখে তার হাসি ফুটে উঠল—ব্যঙ্গের হাসি।

ওঃ—তাই বুঝি জানালা থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না? একটা জোয়ান ছেলের পানে অমন বেহায়ার মত চেয়ে থাকতে লজ্জা করে না?

কমলা মাথা নামিয়ে বলে, ও ত সতীশদা।

জানি। সতীশদারও জোয়ান ছেলে হতে বাধা কি। পিসী যদি দেখে ঘরের বৌ পথের ধারে চেয়ে চেয়ে পরপুরুষকে দেখছে—কি কাণ্ডটা হবে—বল দেখি!

কমলা উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মনটি তার কেমনই করতে থাকে। খালি শাসন—আর শাসন। যেমন শাসন ওই ফুলের বাগানে চালায় কেশব, তেমনি শাসন ওর মানুষের উপর।

প্রথম যখন বিয়ের সম্বন্ধ হয়—মনটায় খুশির রঙ ধরেছিল। যে বাগানের ধারে একটিমাত্র ফুলের প্রত্যাশী হয়ে কতক্ষণ ধরে খোসামোদ করেছে কেশবের—সে বাগান তারই সম্পত্তি হয়ে যাবে—সে খুশিমত নানারকমের ফুল তুলবে, পরবে খোঁপায়, গাঁথবে তোড়া, ইচ্ছে হলে বিলিয়ে দেবে কাউকে। বিয়ের পর বুঝল—বেড়ার বাঁধনে গাছগুলি—কেশবের সম্পত্তি—রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, তেমনি বাড়ীর বাঁধনে কমলাও আর একটি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম এখানেও একতিল শিথিল নয়। পবিত্র তৌলদণ্ডে ফুল আর সীমন্তিনী তুল্যমূল্য।

চোখের জল আঁচলে মুছে রান্নাঘরের শিকল খুলল কমল।

কামারশালাতেও পরিবর্তন হয়েছে কিছু। রাস্তার দিকে কামারশালার মুখ। কাঠের তক্তার উপর ছেঁড়া চট পেতে বসলে বাঁ ধারে পড়ে কেশবের বাড়ী। সামান্য একটু ঘাড় ফেরালেই—সে বাড়ীর দৃশ্যটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। সামনে দাওয়া—তার পাশের দেওয়ালে—অন্দরের একটিমাত্র ঘরের একটি মাত্র জানালা। ওটা প্রায়ই বন্ধ থাকত, কমলা আসার পর থেকে খোলা হচ্ছে। বধূ হলেও কমলার বাল-চাপল্য ঘোচে নি। বালিকা-মনের সুলভ কৌতূহলে পথের ধারের জানালা খুলে—পথের প্রান্তে দুই চোখ মেলে দেয় ও। তন্দ্রার চাপে আগুন উজ্জ্বল হয়ে ওঠার মত ওর দুই চোখ ঝলসে ওঠে মাঝে মাঝে, মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বে কখনও তা অপরূপ দেখায়

একটি চোখে পৃথিবীকে দেখার কৌতূহল—কতক্ষণই বা দমন করা যায়। দু'চোখই ফেরায় সতীশ।

কমলা এখন বড়ই হয়েছে। মাথায় ঘোমটা টেনে নতুন হয়েছে, চোখে ওর গৃহিণী-জনোচিত স্থির প্রশান্তির ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে—যেন মারনদীতে নৌকার দু' পাশে ভাঙা ঢেউগুলি কিনারায় একটু ছলছলাৎ সুর টেনে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন এক টুকরো ভাঙা লোহার জন্য ওর কাঙালপনা নেই, কিন্তু কামারশালার দিকে ওর মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে সেই বিহ্বল ভাবটি একেবারে লুপ্ত হয় নি। খেলাঘর সত্যিকার ঘর হয়ে উঠেছে, খেলনার বস্তুগুলিও তা

জয়পুরে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক স্তম্ভ
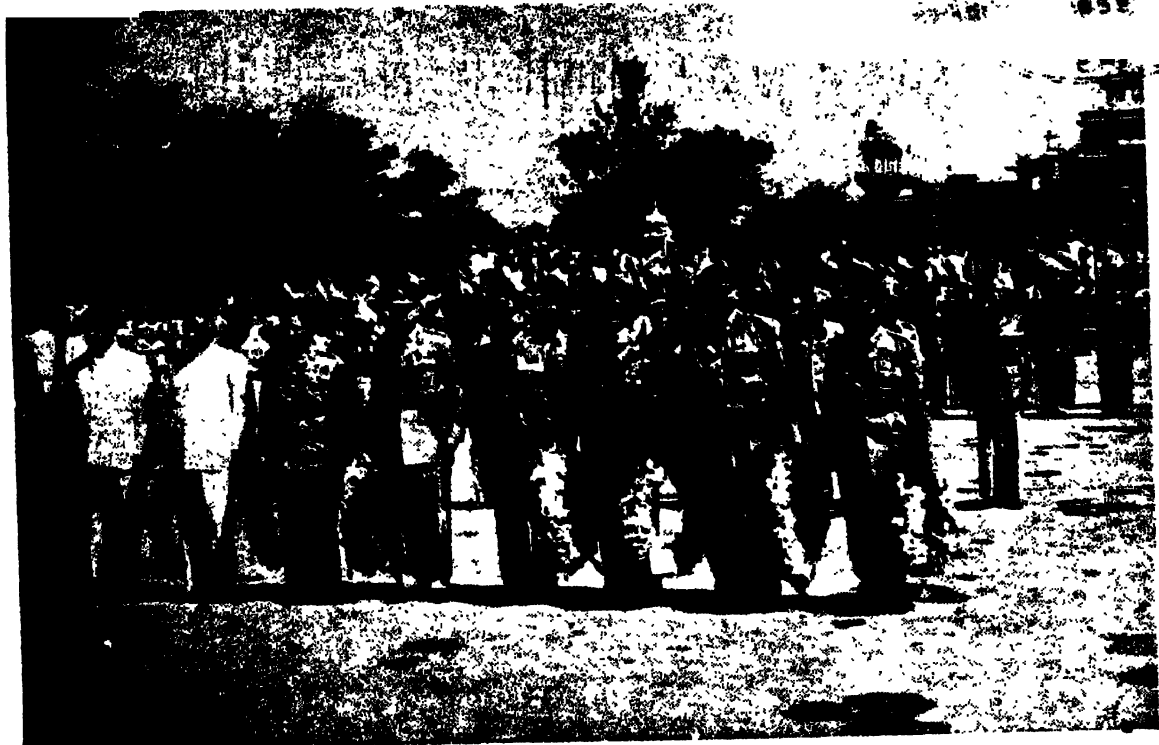
স্মারকস্তম্ভে সৈন্যবাহিনীর বিশিষ্ট অফিসারগণ কর্তৃক পুষ্পমালা প্রদান। (বাম দিক হইতে)
শ্রী এম. এল. সুখাদিয়া, জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজী প্রভৃতি

নিদাঘে [ফোটো—শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়

মহীশূরের অরণ্যে হস্তীপৃষ্ঠে মহীশূরের রাজপ্রমুখ ও শিকারীবৃন্দ সহ
ইরাণের শাহানশাহ ও সম্রাজ্ঞী
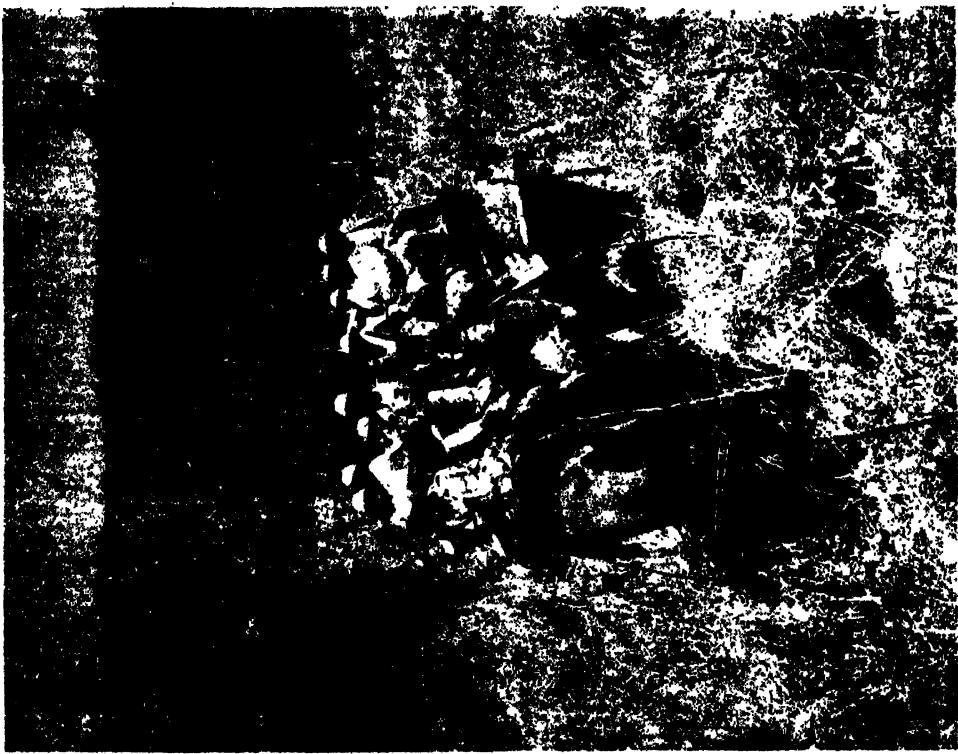
প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। একখানি ছোট বঁটির বদলে একখানি বড় বঁটিই কামনা করে হয় ত।

কিন্তু কেশবের কেন এত পরিবর্ত্তন হ'ল? ওর শাবল খোন্তা নিড়েন কোদাল কি আজকাল বিকল হতে জানে না? বন্ধুর কাছে বিনামূল্যে মেরামত করায় এত সঙ্কোচ ওর কেন? বিনিময়ে দু' একটি ফুল পাওয়া যেত, তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে সতীশ। কিন্তু ফুল যে সতীশের চাই-ই। কর্কশ হাতে হাতুড়ি পিটে পিটে পেশীর মাংস শক্ত হলেও বুকের মাঝখানের কোমল মনটি ওর ফুলবাগানেই ঘুরে মরে। সে ত কালের বেণায় ধরা দিতে জানল না, বৃত্তির দিনানুদিন অনুবৃত্তিতে অভ্যাসগ্রস্ত হতে পারল না? ফুলের ফুল নিকটে এনে—হাতে তুলে—আঘ্রাণ করে শোবার ঘরে শিয়রে রেখে তবে তার তৃপ্তি। কোন কোন মদির রাতে মালীবাড়ীর বাগান ভরে ফুল ফুটলে পাড়াটাই উতল হয়ে ওঠে গন্ধে। সে রাতে চাঁদ থাকে আকাশে, ঘুম হারিয়ে যায় দু'চোখ থেকে, দুয়ার খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। পায়চারি করে বাগানের এধার থেকে ওধারে। কি যেন সে চায়—কিসের অভাব তীব্র হয়ে ওঠে। কামনাই হয় ত—যৌবনের কামনা। প্রকৃতির পাত্রখানি পূর্ণ হয়ে ওঠে—সুধায় কিংবা সুরায়, ঐশ্বর্য্য কি মত্ততায়। অনেকক্ষণ ধরে ব্যথাটা বুকের মধ্যে চলাফেরা করে। ভোররাতে হাতে মুখে জল দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। একটি রাত শুধু শুধু কেটে গেল, জীবনের কিছু অংশ বৃথা ক্ষয় হয়ে গেল—এমনি মনে হয়।

কেশব ফুল দেওয়া বন্ধ করলেও—অন্য জায়গা থেকে ফুল জোগাড় করে সতীশ। বাড়ীর মধ্যে অল্প জায়গা। রোয়াকের নীচের হাত-মুখ ধোয়া জল পড়ে পড়ে যে জমিটুকু কাদা পাঁকে ভর্ত্তি হয়ে থাকে—তারই একটু দূরে খানিকটা জমি পাট করল সতীশ। রথের মেলা থেকে কিনল দুটি গোলাপের কলম—একটিতে তার লাল টকটকে ফুল ধরেছে—সেই দু'টি গাছ পুঁতল সেই জমিতে। তার পর জমির সারে আর সতীশের পরিচর্য্যায় গাছ দুটি সতেজ হয়ে উঠল, শাখা-প্রশাখায় ঝাঁকড়া হ'ল। সেই শাখাগুলিতে ধরল অজস্র কুঁড়ি। সতীশের আনন্দ দেখে কে!

প্রতিবেশিনীরা সতীশের মাকে বলল, আর কেন, এইবার বিয়ে দাও ছেলের।

মা সখেদে বললেন, কত বার কত রকম করে বলেছি—ছেলের বন্ধকভাঙা পণ, বিয়ে করবে না।

ওরা বিশ্বাস করল না কথা। বলল, ওমা—বল কিগো! জোয়ান ছেলে, উপার্জ্জন করছে, ফুল গাছ পুঁতেছে—ষোল আনা সখ রয়েছে মনে—বিয়ে করবে না কিগো!

মা বললেন, তোমরাই বলে দেখ—যদি বিশ্বাস না হয়!

আমাদের বলা আর তোমার বলা সমান হ'ল! জোর কর। বলগে—বিয়ে না করিস ত আমায় কাশী পাঠিয়ে দে।

সতীশ সব শুনে বলল, কাশী গিয়ে কিন্তু বাবা বিশ্বনাথকে দেখতে পাবে না মা, ওই ছাপরই দেখতে হবে।

মা রাগ করে বললেন, কেন—কাশী যেতে পারি না?

আমায় বেঁধে দেবে কে? অসুখ হলে দেখবে কে?

ষাট—ষাট! কথার ছিরি দেখ। বলি আমারও সাধ আহ্লাদ বলে কিছু আছে ত? নাতি নাতকুড়ের মুখ দেখতে সাধ হয়—কি হয় না?

তা হলে আর কিছু দিন সবুর কর—আর একখানা ঘর তুলি। বিয়ে করে ঘরখানি দখল করে তোমাকে দাওয়ায় ঠেলে দিতে পারব না। এতে তুমি দুঃখ পাও, নাচার।

মা তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, কিন্তু সবাই যে নিন্দে করে। বলে আমারই দোষ। এই ত কাল কেশবের পিসী বৌমাকে নিয়ে দুপুরবেলা বেড়াতে এসেছিল। বলল, একটু চেপে ধর ছেলেকে, কাঁদাকাটা কর—না হলে—

সতীশ হেসে বলল, আমি যেদিন দুপুরে হাটে যাই—সেই দিনই তোমাদের মজলিস বসে! তা কেশবের বৌ কি বলল?

বলবে আর কি, পিসশাশুড়ী যতক্ষণ রইল জুজুর মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। বুড়ী ওকে রেখে অন্য বাড়ী বেড়াতে গেলে উঠে ঘরদোর দেখতে লাগল।

সতীশ হো হো করে হেসে উঠল। উঃ, কতই না ঘর! বললেন, সাজানো গোছানো রাজবাড়ী আর কি।

মা রেগে উঠলেন—ওরাই বা কি বড়লোক শুনি! যাই হোক, বৌটি খুব ভাল—লক্ষ্মী মেয়ে। এক একটি জিনিষ দেখে আর বলে, বাঃ, বেশ ত! কে এত সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছে খুড়ীমা। বলে, আপনারা ফুল খুব ভালবাসেন বুঝি? চমৎকার গোলাপ-গাছ দুটি হয়েছে। ঘরের কুলুঙ্গিতে মাটির ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছেও চমৎকার। ফুলদানির মধ্যে জল আছে বুঝি? নুনগোলা জল? ওই জলে বোঁটা ডুবিয়ে রাখলে ফুল তাজা থাকে দু'তিন দিন।

বললাম, ফুলের রাজ্যে বসে সামান্য দুটি গাছ যে তোমাদের চোখে ধরেছে—এই আশ্চর্য্য! তোমাদের বাগানে হেলায় ফেলায় যা ফুটছে আমরা আদেখলার মত তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখছি।

বলল, হেলাফেলার জিনিষ বলেই যত্ন নেই। যারা বেশী পাবার পায়, তারাই নষ্ট করে বেশী। খানিক চুপ করে থেকে বলল, এবার সতীশদার একটা বিয়ে দিন খুড়ীমা, আপনার খাটা-খাটুনি কমুক।

ইঃ, মেয়েটা এরই মধ্যে বেশ পেকে গেছে ত! হেসে উঠল সতীশ।

কেন সবাই ত ওই কথাই বলে।

সবাইয়ের মুখে যা মানায়—ঐ পুঁচকে মেয়েটার মুখে তা শোভা পায় না। সবে সেদিন যার বিয়ে হ'ল—এরই মধ্যে তার মুখে গিন্নী-গিন্নী কথা।

সতীশ ঠাট্টা করে যাই বলুক—কামারশালায় বসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে মেয়েটি জানালার ধারে এসেছে কিনা?

এক বছর মাত্র বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে এত বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে? খেলাঘর থেকে আসল ঘরে পৌঁছতে কতটুকু বা সময় লাগে! কিন্তু মনটাকে দৌড় করিয়ে নিয়ে যাওয়া ওইটুকু সময়ের মধ্যে···আশ্চর্য্য লাগে। কিশোরী কমলাকে যেন ফুলবাগানে আর মানায় না, কামারশালার করুণ অঙ্গনে ভারিক্কি চালে ওর পদচারণা সুরু হয়েছে।

৬

কমলা কিন্তু ফুলের রাজত্বেই বাসা বাঁধল। পিসীকে দিয়ে একটা মাটির ফুলদানি কিনিয়ে আনাল। সেটা নুনগোলা জলে ভর্ত্তি করিয়ে বাগানের সবচেয়ে সেরা ক'টি গোলাপ ডাঁটি সমেত কেটে গুছিয়ে রাখল তার মধ্যে। চৌকিটা সরিয়ে আনল—যাতে শিয়রের দিকে পড়ে কুলুঙ্গিটা যেখানে ফুলদানিতে আছে গোলাপ-গুচ্ছ। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠল ঘর। পিতলের পিলসুজটা মাজল চকচকে করে। বাঁশের আগালিতে ঝাঁটা বেঁধে ঘরের ঝুল ঝাড়ল, পরিপাটি করে পাতল বিছানা। বস্ত্র, সিন্দুক সব ঝেড়ে-মুছে ঘরের শ্রী দিল ফিরিয়ে। সারা দুপুরবেলায় এই সব করল সে। কেশব তখন তাস খেলতে পাড়ায় বার হয়ে গেছে।

অপরাহ্ণে কেশব ফিরল। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। ঘরের জিনিষ সব উলটপালট হয়ে গেছে। তক্তাপোষটা এগিয়ে এসেছে, বিছানাটা তক্ তক্ করছে—আর মিষ্টি মিষ্টি একটি গন্ধ. কুলুঙ্গিতে ফুলদানির মধ্যে গোলাপগুচ্ছ· · কেশবের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। চীৎকার করে উঠল, পিসী—পিসী, এ সব কি হয়েছে?

রান্নাঘরে খাবার তৈরি করছিল দু'জনে মিলে। পিসী উঠে এসে বলল, কেন, হয়েছে কি? ঘরখানা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে ত মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে নাকি?

হয় নি ত কি! বলি গাছের ভাল গোলাপগুলো কে তুলতে বলেছিল সর্দারি করে? কাল মিটিং আছে স্কুলে, জেলার হাকিম আসবে—তাকে তোড়া দিতে হবে না?

হবে ত হবে, আর যেন ফুল নেই বাগানে। পিসী-অভ্যাসমত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

ছুত্তোরি কাণ্ড। মেয়েমানুষের ঢিম কত আর বুঝবে তোমরা। ফুল নিয়ে সখ করা সাজে আমাদের? মালীর ঘরে সখ, তোর সখের নিকুচি করেছে।

কুলুঙ্গি থেকে ফুলদানিটা নিয়ে আছড়ে ফেলল উঠানে। চীৎকার করে উঠল, ফের যেদিন এ সব দেখব রেয়াৎ করব না বলছি। হাড় এক ঠাঁই—মাস এক ঠাঁই করব।

দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেশব।

৭

সতীশ কামারশালার ঝাঁপ বন্ধ করছিল। কেশব তার সামনে এসে পড়তেই—ডাকল, কি গো বাবু, আজকাল যে ডুমুরের ফু হয়েছ! দেখাই নেই।

কেশব মুখ তুলে চাইল না, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গে খানিকটা।

সতীশ দৌড়ে এসে ওর কাঁধটা চেপে ধরল। বলি, ব্যাপারখানা কি। এত গোসা কেন?

কেশব বিরক্ত স্বরে বলল, ছাড়—ছাড়, কি যে ইয়ার্কি করিস লাগছে।

লাগার মত কাজ করিস কেন! বলি বিয়ে করে অনেকে—এমন পায়াভারি হয় না কারও। আরে মুখখানা যে গোমরা করে রইলি! বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কেশবের মনের তাপ ততক্ষণে শীতল হয়ে এসেছে। সতীশে কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল ও। গলার স্বর নামিয়ে বলল ঝগড়া হয় সাধে! রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করলে কার না রাগ হয় শুনি?

ব্যাপার কি শুনি? আয় বাড়ীর মধ্যে আয়।

কেশবকে বাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল সতীশ। মাকে ডেকে বলল, মা, কেশবকে নিয়ে এলাম দুখানা রুটি বেশী করে দিও।

রোয়াকের কাছে এসে কেশবের নজরে পড়ল ফুলন্ত গোলাপ-গাছ দুটির উপর। বলল, বাঃ, চমৎকার ফুল হয়েছে ত! কবে পুঁতলি গাছ? কি সার দিয়েছিস?

সতীশ বলল, সার কোথায়! কি জাতের ফুল বল দেখি? গিছলাম রথের মেলায়—লাল টুকটুকে ফুল দেখে কিনলাম দুটো চারা। একটায় ফুল কিন্তু ঘোর লাল হয় নি, কাঁটাও নেই গাছে, ফুলগুলো ইয়া বড় বড়।

ওটা পলনীরো। আর এটা বোধ হয় ব্ল্যাক প্রিন্স। ভাল জাতের গোলাপ।

কথা বলতে বলতে দু'জনে ঘরে এসে বসল।

ঘরের ভিতরে অন্ধকার—সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হয় নি। চৌকির উপর বসে কেশব বলল, বেশ গোলাপ ফুলের গন্ধ আসছে ত এখানে! আর আমাদের বাগানের ধারে ফুলের গন্ধ পোকবার জন্ম পায়চারি করতে হবে না।

সতীশ হেসে বলল, যা বলেছিস।

মা এসে রেড়ির তেলের প্রদীপ জেলে দিলেন। একখানি ছোট কাঁসার রেকাবি করে খান কয়েক রুটি ও খানিকটা গুড় এনে ওদের সামনে রেখে বললেন, তোদের দু'জনের খাবার এক সঙ্গে দিলাম।

জল খাবার শেষ হলে সতীশ প্রদীপের সলতে উসকে দিল। তারপর কুলুঙ্গি থেকে ফুলদানটা তুলে এনে বলল, দেখ দেখি কত বড় ফুল। সবচেয়ে ভাল ফুলগুলি তুলে এতে সাজিয়ে রাখি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে যে গন্ধ পাচ্ছিলি—তা বাইরের নয়—

ফুলদানিটা একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখল কেশব। দৃষ্টি ওর

উজ্জ্বল হয়ে উঠল অকস্মাৎ; তারপর সেই দৃষ্টির দু'পাশে ছায়া নামল, ঘন গাঢ় ছায়া। সে ছায়া ছড়িয়ে পড়ল মুখমণ্ডলে। প্রদীপের কম্পমান শিখায় মুখটা তার অদ্ভুত থমথমে দেখাতে লাগল। কোন মন্তব্য না করে চুপ করে বসে রইল সে। তারপর তেমনি অকস্মাৎই উঠে হন্ হন্ করে রোয়াক দিয়ে নেমে চলে গেল।

বাড়ী ফিরল অনেক রাত্রিতে। পিসী ও কমলা তখন গভীর নিদ্রামগ্ন।

সকালবেলায় পিসীর চীৎকারে এ পাড়া ও পাড়া থেকে লোক এসে জুটল কেশবের বাড়ীতে। একটানা চীৎকার করে বুড়ী ততক্ষণ হাঁপিয়ে পড়েছে; কিন্তু নতুন নতুন লোক আসতে দেখে বুড়ীর উৎসাহ বেড়ে গেল। কাঁকালে বাঁ হাত রেখে ডান হাতখানা নেড়ে নেড়ে চীৎকার করতে লাগল, দেখ গো—তোমরাই দেখ। কোন আবাগী সব্বনাশীর গরু সারা রাত ধরে মইমাড়ন করেছে ফুল বাগানে। একটি দুটি নয়—এক পাল গরু। যে যমে-খেকো আগড় খুলে গরু ঢুকিয়ে দিয়েছে বাগানে—সে যেন ঝাড়ে মূলে নিপাত যায়। সে যেন···

কেশব বেরিয়ে এল বাইরে। চেয়ে দেখল ফুলবাগানের পানে। চার পাঁচটি গরুতে সারা রাত ধরে চরে খুঁটে খেয়েছে—ফুলের গাছ থেকে দুব্বো ঘাসটি পর্যন্ত। পাতা, ফুল, কচি কচি ডাল কিছুই বাদ যায় নি; শুধু শক্ত ডালগুলি শ্মশানভূমিতে পরিত্যক্ত বাঁশ-বাখারির মত ছড়িয়ে আছে।

কেশবকে দেখে ওর পিসী ডুকরে কেঁদে উঠল, ওরে কেশা—সব্বনাশ হয়েছে রে! একটাও ফুল নেই যে বিক্রী করে—

না থাকুক—এধারে এস। প্রশান্ত স্বরে কেশব বলল। ফুল বেচে আজকাল দিন চলে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এস বাড়ীর মধ্যে।

পিসীকে বাড়ীর মধ্যে এনে দাওয়ায় বসিয়ে বলল, কাঁদ কেন? আমি মনে করছি—নগদ গহনায় মিলিয়ে যা আছে—তাই দিয়ে তাঁত বসাব দুখানা। এখন কাপড়ের যা দর—তাতে উপার্জ্জন হবে খুব। দুধ আর কাঁচাগোল্লা খেতে পাবে একাদশীর দিন।

পিসীর সুর সপ্তম থেকে উদারায় নামল। দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে আপন মনে গুন গুন করতে লাগল।

কেশব ঘরের মধ্যে এসে কমলাকে বলল, বাক্সর চাবি খুলে যা গহনাপত্তর আছে বার করে দাও তো। আজই ওগুলোর বিলিব্যবস্থা করে তাঁত বসানোর ব্যবস্থা করব।

কমলা একটুও বিস্মিত হ'ল না—একটি কথা'ও জিজ্ঞাসা করল না। আঁচল থেকে চাবির রিংটি নিয়ে বাক্স খুলল। বাক্স থেকে একে একে বার করল—হার, চুড়ি আর মাথার চিরুণি। সেগুলো তক্তাপোশের উপর রেখে হাতের বালা দু'গাছাও টেনে টেনে খুলল।

গভীর রাত্রিতে পথের ধারের জানালা খুলে আকাশের পানে চাইলে কমলা। অন্ধকার রাত। দূরের কাছের সমস্ত বস্তুই লেপে পুঁছে একাকার হয়ে গেছে। শুধু আমগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো আকাশ দেখা যায়। ঘন নীল আকাশ—জ্বলজ্বলে নক্ষত্র ফুটেছে তার গায়ে—ঠিক যেন সতীশদের বাড়ীর ছাঁচতলায় ফুলে ফুলে ভরা বহুশাখাপুষ্ট দুটি গোলাপগাছ কে বসিয়ে দিয়েছে। সেই ফুলগুলিই কি তারা হয়ে ফুটেছে আকাশের গায়ে?

কিন্তু আকাশ কি উঁচু—আর কত দূরে!

কুন্তী ও সূর্য্য

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কুন্তী

তুমি সূর্য্য ?

সূর্য্য

আর্য্যে, এতক্ষণে অবিশ্বাস ? সূর্য্য আমি,
আসি নিত্য পূর্ব্বাচলে, অপগত হয় যবে যামী।

কুন্তী

তুমি রবি, দিবাকর, মহাদ্যুতি, অন্ধকারহারী,
সর্ব্ব-পাপ-নিবারণ, পূর্ব্বাপরা-গগনবিহারী ?

সূর্য্য

ইচ্ছা হয় দাও মোরে স্তবমাল্যে আছে যত নাম,
তব সম্ভাষণ ভক্তে, সাধ হয় শুনি অবিরাম
ওই ফুল্ল বিম্বাধরে। বার বার ব্যঙ্গ-প্রশ্নছলে
ফোটে চারুরূপরেখা ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্রতলে!
একাকিনী বনমাঝে নদীনীরে করি উষাস্নান
"এস, এস সূর্য্য" বলি করেছিলে কাহারে আহ্বান
মনে পড়ে ? বনতলে তব উচ্চ মধুকণ্ঠস্বর
আনিল আমারে হেথা, হেরিলাম যৌবন সুন্দর!

কুন্তী

স্বর্গের দেবতা তুমি ?

সূর্য্য

স্বর্গ ওই বহু ঊর্দ্ধে আছে,
তবু যেথা আছ তুমি, সেকি স্বর্গ নহে মোর কাছে ?
মিলন-সম্ভোগশেষে এ সংশয় এখনো কল্যাণি ?
মোর পরিচয়মাঝে কিবা পেলে অসত্যের বাণী ?

কুন্তী

এই বিশ্বে তব নাম কল্যাণ-আধার বিবস্বান্ ?

সূর্য্য

কেন প্রশ্ন বারে বারে ? আমারি আদেশে ঘূর্ণমান
ধরিত্রীর ঋতু-চক্র। ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, ইন্দ্রধনু, মেঘ,
পুষ্পে বর্ণ, ফলে বীজ, জীবনের স্পন্দন-আবেগ
সকলি আমারি সৃষ্টি। দ্রব করি সঞ্চিত তুষার
তরুলতাতৃণে আমি আঁকি চারু স্নিগ্ধ শ্যামলিমা,
বেদে সংহিতায় কাব্যে শোন নি কি আমারি মহিমা ?
উদয়-বিলম্ব হেরি জাগে শঙ্কা নিখিলের বুকে,
এবার বিদায় দাও, কিবা ফল প্রশ্নের কৌতুকে ?
অদূরে বনানীপ্রান্তে ধরিব যে দিবাকর-বেশ
লোকচক্ষু-অন্তরালে। হে সরলে, আনন্দ অশেষ
পেয়েছি সেবায় তব। রুদ্ধজ্যোতি যায় পূর্ব্বাশার,
চঞ্চল সপ্তাশ্ব মোর! অবসর কোথা মোর আর ?
হে তম্বি, যামিনীশেষে উদয়াচলের ব্যোমপথে
গতিহীন জ্যোতি-চক্র নিত্য-পরিক্রমণের রথে।

কুন্তী

তুমি চলে যাবে ঊর্দ্ধে, আমি পড়ি রব ভূমিতলে
কৌমার্য্যের গ্লানি বুকে, অনুতপ্ত নিত্য অশ্রুজলে।
ভাগ্যদোষে তব তেজে জন্মে যদি সন্তান আমার,
কি করিব লয়ে তারে ? অবাঞ্ছিত কলঙ্কের ভার
কোথায় লুকাব আমি ? নদীনীরে গড়ি পত্রভেলা
হয় ত ভাসাব তারে, তারপর ফিরিব একেলা
আপন গৃহের পানে, কৌমার্য্যের শুচি-দীপ্ত দেহে।
নির্ব্বাক্ ক্ষুধিত চিত্ত হাহাকার করি মাতৃস্নেহে
খুঁজিবে সন্তানে মোর, কেহ জানিবে না কোন কথা,
রবে চির অন্ধকারে অতিগূঢ় মরমের ব্যথা।
তারপর যদি কোন অতর্কিত অভিশপ্ত দিন
আমার সন্তানে আনে কাছে মোর পরিচয়হীন,
কেমনে চিনিব তারে ? বঞ্চিত ও বঞ্চিতার মাঝে
কোন-সে অলক্ষ্য স্নেহসূত্রখানি ছায়ারূপে রাজে
কে দেবে সন্ধান তার ? কোন্ স্মৃতি কোন্ অভিজ্ঞা
দেবে তার পরিচয় ? তৃপ্ত কোথা জননীর প্রাণ ?
লবে স্বর্গে তুমি সে সন্তানে ?

সূর্য্য

সে যে অসম্ভব অতি,
কেমনে যাইবে স্বর্গে ক্লেদময় মর্ত্ত্যের সন্ততি ?

কুন্তী

পেয়েছিলে পরশিতে ক্লেদময় দেহ মানবীর,

হরিলে কৌমার্য্য মোর ? কোথা ছিল দেবত্ব তোমার,
মর্ত্ত্যের কর্দ্দমতলে লুটায়েছ যবে বার বার
মানবী-যৌবন লাগি ? স্বর্গে তব ছিল না অপ্সরী ?
মানবী এতই প্রিয় ? তাই আসি নররূপ ধরি
মর্ত্ত্যের ধূলির মাঝে ফেলে গেলে দেবত্বের সাজ ?
দেবতার চেয়ে হায় মানবী যে বড় হ'ল আজ।
তুমি চলে যাবে ঊর্দ্ধে, নিয়ে পৃথ্বী তোমারে ধিক্কারি'
মুছাবে আমার অশ্রু, হয়ে মাতা রহিব কুমারী।
একটি মানব-শিশু কোনদিন জানিবে না হায়,
ওই সূর্য্য পিতা তার। চিরদিন স্বর্গ-সীমানায়
প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে। দূরে রহি বঞ্চিতা জননী
অতীত দুঃস্বপ্ন মাঝে শুনিবে শিশুর কণ্ঠধ্বনি!

সূর্য্য

দিগ্‌বধূ-আলিম্পনে রক্তআভা ধরে পূর্ব্বাকাশ
মোর শুভ যাত্রাপথে। ব্যথিতার প্রতপ্ত নিঃশ্বাস
কেন এ বিদায়লগ্নে ? আছে মোর বন-অন্তরালে
পরিত্যক্ত দেব-বেশ। কে জানে এখনি উষাকালে
আসিবে তপস্বী কেহ স্রোতস্বিনী হতে নিতে বারি,
তব সাথে হেরি মোরে প্রচারিবে কলঙ্ক তোমারি।
হে সরলে ভক্তিমতী, আশীর্ব্বাদ করি চিরদিন
এ তিক্ত-মধুর স্বপ্ন হয় যেন বিস্মৃতি-বিলীন।

কুন্তী

মানুষের বহু ঊর্দ্ধে দিয়াছিনু দেবতায় স্থান,
নিত্য পূজা আরাধনছলে তার কত গুণগান
করিয়াছি মুগ্ধ চিতে। ঊর্দ্ধে চাহি জুড়ি দুটি পাণি
অশ্রু-ছলছল নেত্রে মাগিয়াছি স্নেহাশিসখানি।
মর্ত্ত্যভূমে দেবতারা নামে মানুষের রূপ ধরি
একথা শুনেছি কত। তাদের কল্পিত মূর্ত্তি গড়ি'
মানুষ করিছে পূজা। কিন্তু আজ একি করিলাম,
কৌমার্য্যলোভীর পায়ে ভক্তিভরে দিলাম প্রণাম!

সূর্য্য

হে তন্বি, অন্তরে যদি দিয়ে থাকি আঘাত কঠিন,
আমারে ক্ষমিও তুমি। ক্ষণিকের রূপ-মোহলীন
হয়েছিল চিত্ত মোর।

কুন্তী

আপনার মনে আসে লাজ,
স্বর্গের দেবতা যিনি, তাঁর এই হীনতম কাজ ?

দুর্ব্বাসা দিলেন বর তুষ্ট হয়ে আমার সেবায়,
তাঁর দত্ত মন্ত্রে আমি ডাকি যদি কোন দেবতায়,
সে দেবতা নেমে আসি স্বর্গ হতে ধরার ধূলিতে
করিবেন বরদান যাহা মোর বাঞ্ছা জাগে চিতে।
নির্জ্জন কানন-প্রান্তে উষাস্নান করি নদীনীরে
কৌতূহলে ডাকিলাম সূর্য্যদেবে। প্রশান্ত সমীরে
আকাশ বাতাস ভরি প্রতিধ্বনি তুলিল সে-স্বর।
সহসা আসিলে তুমি নররূপধারী দিবাকর
বন-অন্তরাল হতে, হাস্যমুখে কৌতুক-নয়নে
করিলে জিজ্ঞাসা মোরে—"সূর্য্যে কেন ডাক সুলোচনে ?"
আবেগে অধীর চিত্ত, ভক্তিতে সজল হ'ল আঁখি,
করযোড়ে বন্দিলাম। তুমি মোর শিরে কর রাখি
বলিলে মধুর স্বরে—"হে কুমারি আতপ্ত-যৌবনা,
সূর্য্য তরে উষাকালে সুগোপন কেন আরাধনা ?"
বাণী সরিল না মুখে, তুমি মোর ধরি দুটি কর
করি কত অনুনয়, মোহময় স্বপন সুন্দর
দেখালে আমার চোখে। অকলঙ্ক নিদ্রিত যৌবন
প্রথম কামনা-স্পর্শে ধীরে ধীরে মেলিল নয়ন
অজ্ঞাত রহস্যলোকে। এ কি মায়া, এ কি ইন্দ্রধনু,
যারে কভু দেখি নাই, তনু ধরে আজি সে অতনু!
অধীর উৎসুক হিয়া এতকাল বঞ্চিত-কামনা
লভিল বিস্ময় নব, আশ্লেষের তপ্ত উন্মাদনা!
সারা অঙ্গ ব্যাপি ছোটে তড়িতের অপূর্ব্ব প্লাবন
শঙ্কায়, আনন্দে, লাজে। রূপে গন্ধে বিচিত্র ভুবন!
প্রতিরোধ-লীলাচ্ছলে করিলাম কত যে মিনতি,
তবু শুনিলে না কানে, নেমে এল নিষ্ঠুর নিয়তি
কৌমার্য্য-বিদায়লগ্নে। সর্ব্বহারা, চাহি তব পানে
বিস্ময়ে রহিনু স্তব্ধ, নারীত্বের ঘৃণ্য অপমানে!

সূর্য্য

ভবিতব্য ছিল যাহা, তার লাগি এ অনুশোচনা
তোমারে সাজে না তন্বি, করিয়াছ সূর্য্য-আরাধনা।

কুন্তী

তুমি দেব বিবস্বান্ নররূপে সম্মুখে আমার,
এ যে কত বড় ভাগ্য জানি আমি। কিন্তু যে ধিক্কার
জাগিছে দেবতা-নামে, তাহারে কেমনে করি দূর ?
দেবতা মর্ত্ত্যের দ্বারে নেমে আসি ত্যজি স্বর্গপুর
মানবীর কাছে শুধু ভিক্ষা চায় কুমারী-যৌবন ?
এ গ্লানি লুকাব কোথা ? কিসে যাবে এ তীব্র দাহন ?
যে দেবতা মহাদ্যুতি, তমিস্রারি, সর্ব্বপাপহারী,
নগণ্যা মানবীকাছে দাঁড়াল সে কৌমার্য্যভিখারী!

সূর্য্য

নরদেহে দেবতারা মর্ত্ত্যে যবে করে বিচরণ
ষড়্‌রিপুবশ তারা নরতুল্য ধরে আচরণ
দেবত্ব লুকায়ে রাখি। স্বর্গে আছে স্বর্গের মহিমা,
সে মহিমা লুপ্ত হয় লভে যবে মর্ত্ত্যের এ সীমা।
এবার বিদায় দাও, সপ্তাশ্বের ক্ষুরোত্থিত ধূলি
পূর্ব্বাশার মেঘে মেঘে ছড়াইছে স্বর্ণরেণুগুলি,
বিলম্ব সহে না আর। বনচ্ছায়ে দেবরূপ ধরি'
এখনি উঠিব নভে, তুমি হেথা তিষ্ঠ হে সুন্দরি।

কুন্তী

নভোচারি, যাও নভে। অনির্ব্বাণ শুধু বক্ষতলে
একটি স্মৃতির চিতা তিলে তিলে দহিবে অনলে!
সে প্রদাহ, সে বেদনা আমারে আচ্ছন্ন করি রবে
ভস্মাবৃত বহ্নিসম। জীবনের শত কলরবে
অবাঞ্ছিত শিশু এক কোথা হতে ক্ষীণ কণ্ঠে তার
আমারি উদ্দেশে হায়, উচ্চারিবে ঘৃণায় ধিক্কার
প্রতিদিন স্বপ্নমাঝে। উপেক্ষিতা ভাগ্য-প্রবঞ্চিতা
অলক্ষ্যে রহিব দূরে অতীতের স্মৃতিনিপীড়িতা,
নীরবে মুছিব অশ্রু। শুধু মোর দুঃস্মৃতির মাঝে
তোমার মানবমূর্ত্তি ক্ষণিকের প্রণয়ীর সাজে
দাঁড়াবে কৌতুকহাস্যে। শতরূপা শতপ্রিয়া এসে
কলহাস্যে উচ্ছ্বসিয়া তোমারে যে যাবে ভালবেসে
দেবতাজীবনে তব। মোর কথা ভাবিবে কি আর?
স্মরিবে কি সে রোমাঞ্চ, ক্ষণে ক্ষণে বেপথুসঞ্চার
তৃষাতপ্ত তনুতটে? যে নিভৃত আত্মনিবেদন
করেছে এ উষালোকে প্রেমস্নিগ্ধ আমার ভুবন
সে যে এবে জ্বালাময়! এই শান্ত বন-পরিবেশে
প্রথম অশান্ত হ'ল যে পিপাসা অজানা আবেশে
সে যে অভিশাপভরা! প্রতিদিন স্মরণে তোমার
যেই লজ্জা, যেই গ্লানি কশাঘাত দিবে বার বার
কেমনে ভুলিব তারে? তব স্পর্শে প্রতিরোধহীন
অশুচি যৌবন আজ ফিরে চায় পূত শুভ্র দিন!

সূর্য্য

হে কল্যাণি, ওই দুটি অশ্রুভরা আঁখি-নীলোৎপল
কভু ভুলিব না আমি। চিরদিন করিবে চঞ্চল
তোমার মধুর স্মৃতি। তবু মোর শোন এ মিনতি
আমারে ভুলিয়া যাও, অনুযোগ কেন মোর প্রতি?
আমার উদ্দেশে যদি কর পুনঃ মন্ত্র-উচ্চারণ,
পাবে না আমার দেখা। আমি চির রহিব গোপন।

কুন্তী

ব্যর্থ এ জীবনে মোর সে চিন্তার কোথা অবকাশ?
তোমার আকাশ মুক্ত, মেঘেভরা আমার আকাশ!
তুমি রবে বহু ঊর্দ্ধে, নিম্নে আমি কলঙ্ক-মলিন
চেয়ে রব তব পানে। উষা হতে সন্ধ্যা প্রতিদিন
হেরিব তোমার মূর্ত্তি গৌরবে প্রভায় সমুজ্জ্বল!
নিদাঘ-মধ্যাহ্নে যবে তব কর বর্ষিবে অনল,
বলিব তোমারে ডাকি—"দগ্ধ মোরে কর বিবস্বান্‌,
মৃত্যু মুছে দিক স্মৃতি, কলঙ্কের হোক অবসান।"
ঊর্দ্ধে চাহি অশ্রুনেত্রে জিজ্ঞাসিব মরমের কথা—
"হে বিধাতঃ, বলে দাও, কারে বলে স্বর্গের দেবতা?"
—যাও তবে দিবাকর, সপ্তাশ্ব-বাহিত দীপ্ত রথে,
দেখিও না তারে আর যে ফুল দলিত হ'ল পথে!

সূর্য্য

হে ভদ্রে, বিদায় তবে, চিরবিরহের পথ ধরি'
যাবে অস্ত এ তপন, মাঝে রবে অনন্ত শর্ব্বরী।

[বনপথে দ্রুত প্রস্থান করিলেন ও কুন্তী অশ্রুসজলচক্ষে দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। নির্ঝরিণীর কলতানে ও অরণ্যের পত্রমর্ম্মরে একটা করুণ সুর ধ্বনিত হইতে লাগিল।]

কালিদাস-সাহিত্যে বিপরীত বর্ণনা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাব একত্র করিয়া তুলনামূলক ভাবে তাহাদের বর্ণনা করা মহাকবি কালিদাসের 'মায়ালেখনী'র এক মধুরতম বৈশিষ্ট্য। এক এক স্থানে কেবল একটি শ্লোকে নয়, শ্লোকের পর শ্লোকে তিনি ধারাবাহিক ভাবে বিপরীত ভাবের বর্ণনা করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেখানো গেল।

'রঘুবংশে'র পঞ্চদশ সর্গে মহাকবি শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণ নামক এক রাক্ষস বধের বিবরণ দিয়াছেন। তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়া শত্রুঘ্ন বৃহদ্রত লবণ রাক্ষসের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেওয়াতে যখন তাহার বিরাট বপু ভূমির উপর পড়িয়া গেল, মহাকবি বলিতেছেন, তখন

'আনিনায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাং' (রঘু-১৫।২৪)

অর্থাৎ পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, আর আশ্রমবাসীদের কাঁপুনি বন্ধ হইয়া গেল।

রাক্ষসের দেহের গুরুভারে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল, আর যে সব আশ্রমবাসীরা অদূরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, আর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন, রাক্ষসকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহাদের কম্পন বন্ধ হইল।

তাহার পরের শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন,

লবণের দেহের উপর পড়িল আকাশ হইতে শকুনির দল, আর শত্রুঘ্নের দেহের উপর পড়িল আকাশ হইতে দেবতাদের ফেলা পুষ্পবৃষ্টি (রঘু—১৫।২৫)।

শকুনিরা অমঙ্গলের, আর পুষ্পবৃষ্টি মঙ্গলের প্রতীক।

এর পর কি হইল? মহাকবি সে বৃত্তান্তও বিপরীত বর্ণনার দ্বারা জানাইতেছেন—

লবণ রাক্ষসকে বধ করিতে পারিয়া নিজেকে ইন্দ্রজিৎ বিজয়ী লক্ষ্মণের উপযুক্ত ভাই ভাবিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক গর্ব্বে উন্নত হইয়া উঠিল, তারপর যখন তপস্বীরা তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার গর্ব্বোন্নত শির লজ্জায় নত হইয়া গেল (রঘু—১৫।২৬,২৭)।

এখানে 'বিক্রমেণ উদগ্রং' অর্থাৎ গর্ব্বে উন্নত, আর 'ব্রীড়য়া অবনতং' অর্থাৎ লজ্জায় অবনত দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের কি সামঞ্জস্যপূর্ণ যোজনা।

'রঘুবংশে' পরশুরামের দর্পচূর্ণ গল্প হইতে একটি বিপরীত বর্ণনার উদাহরণ দিতেছি। পূর্ব্বাংশ বা context না জানা থাকিলে শ্লোকটির ব্যাখ্যা বুঝিতে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া প্রথমে কিছু পূর্ব্বাংশ দিলাম।

রামচন্দ্র মিথিলায় 'হরধনু' ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া পরশুরাম আপনার বলবীর্য্যের শৃঙ্গ ভাঙিয়া গেল ভাবিয়া আহত পৌরুষের ক্রোধে আরক্ত হইয়া অযোধ্যায় ফিরিবার পথে রামের পথরোধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাম যদি তাঁহার ধনুকটায় কেবলমাত্র ছিলা পরাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া লইবেন। রাম অনায়াসে পরশুরামের ধনুকে ছিলা পরাইয়া দিলেন। তখন দুই জনের—পরাজিত ভার্গবের মুখ, ও বিজয়ী রামচন্দ্রের মুখ মহাকবি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহা দেখানো গেল—

'তাবুভাবপি পরস্পর স্থিতৌ
বর্দ্ধমান পরিহীন-তেজসৌ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে
পার্ব্বণৌ শশিদিবাকরাবিব। (রঘু-১১।৮২)।

দুইজনে তখন পরস্পরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—একজন তেজোহীন নিষ্প্রভ, আর একজন তেজের বৃদ্ধিতে প্রফুল্ল—যাহারা ভিড় করিয়া দেখিতেছিল, তাহাদের মনে হইতেছিল, যেন দিনের শেষে একদিকে সূর্য অস্ত যাইতেছেন, আর অপরদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইতেছেন।

পরশুরাম ছিলেন সূর্য্যের মত প্রখর তেজোদৃপ্ত পুরুষ, পরাজিত হইয়া অস্তগামী সূর্যের মত নিষ্প্রভ ও মলিন, আর শান্তস্বভাব রামচন্দ্রের জয়ের আনন্দে প্রফুল্ল বদন যেন, পূর্ণিমার উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ মনোহর চাঁদ।

চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের উপমা দিয়া বিপরীত বর্ণনার আর একটি উদাহরণ দিলাম। শ্লোকটি 'রঘুবংশে'র অষ্টম সর্গ হইতে উদ্ধৃত। বহু বৎসর রাজ্যসুখ ভোগ করার পর বৃদ্ধ রঘু শেষ জীবন ভগবদারাধনায় যাপন করিবেন বলিয়া তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অজের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে চলিয়া যাইতেছেন, আর তরুণ অজ রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়া রাজবেশ ধারণ করিয়া পিতৃদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিতেছেন, এই ভাব দুইটি মহাকবি কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র—নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখাইতেছি,

'প্রশমস্থিত পূর্ব্বপার্থিবং
কুলমভ্যুদ্যত নূতনেশ্বরম্।
নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলা
মুদিতার্কেন সমারুরোহতৎ।' রঘু-৮।১৫

অর্থাৎ মোক্ষকামী পূর্ব্ব রাজা (রঘুকে) ও বংশের উন্নতিকামী নূতন রাজা (অজকে) দেখিয়া লোকের মনে হইতেছিল, যেন আকাশের একদিকে প্রভাতের মলিন শশী অস্ত যাইতেছেন, আর অপরদিকে প্রবুদ্ধ সূর্য সমারোহের সহিত উদিত হইতেছেন।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলের' চতুর্থ অঙ্কে এইরূপ চন্দ্র সূর্যের উপমা দিয়া মহাকবি যে বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ; তাহা এই—

'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতোঽরুণ-পুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবৈব দশান্তরেষু ।।' (শকু-৪র্থ অ)

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আর অপর পার্শ্বে সূর্য অরুণকে সম্মুখে রাখিয়া উদিত হইতেছেন। একই সময়ে দুই তেজস্বীর—একজনের উত্থান ও অপর জনের পতন দেখিয়া মানুষের উচিত তাহাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অর্থাৎ জীবনের সুখ ও দুঃখ অবিচলিত ভাবে ভোগ করিতে শিক্ষা করা। এই শ্লোকে মহাকবি যেন বলিতে চাহেন যে, চন্দ্র ও সূর্যের উদয় ও অস্ত যেমন স্বাভাবিক তেমনি মানবের জীবনেও সুখ ও দুঃখ, পতন ও উত্থান স্বাভাবিক ভাবে যাওয়া-আসা করে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ প্রকৃতির নিয়ম নহে, যেমন উদয়ের পর অস্ত, অস্তের পর উদয়, তেমনি সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ আসিবেই। সুতরাং সুখের বা উন্নতির দিনে গর্বে বক্ষের স্ফীতি হওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি দুঃখের দিনে বা জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করার সময় মুষড়াইয়া পড়াও তেমনি অবাঞ্ছনীয়।

মহাকবির বিপরীত বর্ণনার আরও একটি সুন্দর উদাহরণ 'রঘুবংশের' ষষ্ঠ সর্গে পাওয়া যায়। ভোজরাজের ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভা, বহু রাজা ও রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হইয়া সভার একদিকে বসিয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন, আর অপরদিকে ভোজ-রাজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে বসিয়া ইন্দুমতীর স্বামী-নির্বাচন দেখিতেছেন। তারপর ইন্দুমতী যখন সকলকে ছাড়িয়া রাজকুমার অজের কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করিলেন, সেই সময় বরপক্ষের আনন্দ ও অপর রাজা এবং রাজপুত্রদের হতাশ অবস্থা মহাকবি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে দেখাইতেছি—

'প্রমুদিত বরপক্ষমেকতস্তৎ
ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্।
উষসি সর ইব প্রফুল্লপদ্মং
কুমুদবন-প্রতিপন্ননিদ্র-মাসীৎ ।' (রঘু-৮।৮৬)

অর্থাৎ, সভার একপার্শ্বে তখন বরপক্ষীয় সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, আর অপরদিকে নরপতিদের দল শুষ্কহৃদয়ে মলিন হইয়া বসিয়া রহিলেন, স্বয়ংবর-সভা তখন দেখাইতেছিল—যেন উষার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরের একপার্শ্বে পদ্মগুলি প্রফুল্ল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, আর অপরদিকে রাত্রের ফোটা কুমুদ ফুল নিমীলিত হইয়া যাইতেছে।

কেবল পূর্ণ শ্লোকগুলিতেই নয়, কতকগুলি শ্লোকাংশেও, এমন-কি কোনও কোনও স্থানে দুই-তিনটি শব্দের দ্বারাও মহাকবি তাঁহার বিপরীত-বর্ণনা-প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ এখানে দেখানো গেল।

'অসহ্য-বিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদন্বতা'—(রঘু—৪।৫২)

অসহ্য-বিক্রম রঘু সমুদ্রতীর হইতে দূরীভূত সহ্যপর্বতে আসিয়া পড়িলেন—এখানে সহ্যপর্বতে অসহ্য বিক্রম রঘু আসিয়া পড়িলেন বলাতে বুঝা যাইতেছে যে, মহাকবি যেন কেবল 'সহ্য' ও 'অসহ্য' এই দুইটি বিপরীতার্থমূলক শব্দের একত্র প্রয়োগ করিবেন বলিয়া 'অসহ্য-বিক্রম' শব্দটি ব্যবহার করিলেন।

আর একটি শ্লোকাংশ—

'শরৈরুৎসব-সঙ্কেতান্ স কৃত্বা বিরতোৎসবান্'—(রঘু—৪।৭৮)

অর্থাৎ, উৎসব-সঙ্কেত জাতির বীরদিগকে তিনি শর নিক্ষেপের দ্বারা বিরতোৎসব করিলেন। 'উৎসব-সঙ্কেত'রা ছিল হিমালয় পর্বতের এক যুদ্ধপ্রিয় জাতি, সেই 'উৎসব-সঙ্কেত' জাতিকে 'বিরতোৎসব' করিলেন লিখিয়া মহাকবি যেন 'উৎসব' ও 'বিরতোৎসব' এই দুইটি বিপরীতার্থবোধক শব্দের একত্র প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখাইলেন।

'রঘুবংশের' আর একটি শ্লোকে—

'নিগ্রহোঽপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ'—'আপনার এ নিগ্রহের দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম'। শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া পরশুরাম বলিতেছেন, 'পরমপুরুষ আপনি, আপনার এ 'নিগ্রহ' নিগ্রহ নয়, আমার প্রতি 'অনুগ্রহ'। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে পরাজিত হওয়া পরশুরামের পক্ষে অপমান নয়, গৌরব।

মহাকবির বিপরীত বর্ণনার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ রঘু ও অজ—পিতাপুত্রের তুলনামূলক কার্য বর্ণনায়—তাঁহার কবি-প্রতিভার অন্যতম চরম বিকাশ। যতিবেশধারী বৃদ্ধ রঘু ও রাজবেশধারী তরুণ অজের অস্তগামী চন্দ্র ও উদীয়মান সূর্যের সহিত উপমা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে, তাহার পরও মহাকবি আরও কয়েকটি শ্লোকে উভয়ের কি ভাবে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এখানে দেখাইব।

কালিদাস বলিতেছেন—

'যতিপার্থিবলিঙ্গধারিণৌ
দদৃশাতে রঘুরাঘবৌ জনৈঃ।
অপবর্গ মহোদয়ার্থয়ো
র্ভুবমংশাবিব ধর্ময়োর্গতৌ।।'—(রঘু—৮।১৬)

একজনের রাজবেশ, অপরে সন্ন্যাসী, তাই মহাকবি বলিতেছেন, 'যতিবেশধারী রঘুকে ও রাজবেশধারী রাঘবকে (রঘুপুত্র অজকে) দেখিয়া লোকেদের মনে হইতেছিল, যেন স্বয়ং ধর্ম দুই অংশে বিভক্ত হইয়া, 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' এই দুই মূর্তি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অজ যেন ধর্মের প্রবৃত্তি, ও রঘু তাঁহার নিবৃত্তি মূর্তি।

মহাকবি এই বলিয়াই থামিলেন না, পিতাপুত্রের পরস্পরের বিপরীত ভাবগুলি একত্র করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাব বজায় রাখিয়া বর্ণনা করিয়া চলিলেন, অজ রাজা, রঘু সন্ন্যাসী ; অজ তরুণ, রঘু-

বৃদ্ধ : অজ চাহেন সাংসারিক উন্নতি, রঘু চাহেন সংসার হইতে মুক্তি বা মোক্ষ, তাই মহাকবি বলিতেছেন—

'অজিতাধিগমায় মন্ত্রিভিঃ
যুযুজে নীতি বিশারদৈরজঃ।
অনপায়ি পাদোপলব্ধয়ে
রঘুরাপ্তৈঃ সমিয়ায় যোগিভিঃ।'—(রঘু—৮।১৭)

অর্থাৎ, অজের কাজ হইল যে দেশগুলি জয় করা হয় নাই, কি উপায়ে তাহা জয় করা যায় নীতিবিশারদ মন্ত্রীদের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করা, আর রঘুর কাজ হইল, কি উপায়ে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়, তত্ত্বজ্ঞ যোগীদের নিকট হইতে সে বিষয়ে উপদেশ লওয়া।

প্রজাদের নালিশ শুনিয়া বিচার করার জন্য যুবা বসিতেন বিচারালয়ের বিচারপতির আসনে, আর চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করার জন্য বৃদ্ধ বসিতেন নির্জ্জনে পবিত্র কুশাসনে।

একজনের চেষ্টা হইল, কি উপায়ে অন্য সমস্ত রাজাদিগকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করাইবেন তাহার ব্যবস্থা করা, আর অপর-জনের কাজ হইল, কি করিয়া শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গুলি ও পঞ্চবায়ুকে আয়ত্তে আনিবেন, সমাধি অভ্যাসের দ্বারা তাহার সাধনা করা।

এর পর মহাকবি আরও বলিতেছেন—

'অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ
দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ।
ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং
ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা।।' (রঘু ৮.২০)।

অর্থাৎ, 'অচিরেশ্বর কিনা নূতন রাজা (অজ) শত্রুদের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার (অনিষ্ট করার) ফল ভস্মসাৎ করিতে লাগিলেন, আর অপর জন (রঘু) জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা নিজ কর্ম্মফল দহন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ভগবদ্গীতায় 'জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ' এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি মহাকবি যেন এই শ্লোকটিতে শুনাইলেন।

একজন চলিয়াছেন বৈষয়িক উন্নতির পথে, অপর জন ধরিয়াছেন বৈরাগ্যের পথ, এই দুই বিপরীত পথের যাত্রীদের আরও বিবরণ দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন—

দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করিলে ফল ভাল হইবে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অজ সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি রকমারি নীতির প্রয়োগ করিতেন, আর রঘু সে সময়ে করিতেন কি ? তিনি করিতেন সত্ত্ব রজঃ আর তম, এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থায় আনার চেষ্টায় 'লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে' সমজ্ঞান অর্থাৎ একের নীতি হইল 'ভেদ', অপর জনের হইল 'সাম্য'।

তার পর মহাকবি বলিতেছেন, 'স্থিরকর্ম্মা' নব-প্রভু অজ যে কাজে হাত দিতেন তাহা সফল না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতেন না, আর 'স্থিরধী' প্রাচীন রঘু পরমাত্মাকে দর্শন না করিয়া যোগাসন ছাড়িয়া উঠিতেন না। এইরূপে আপাত দৃষ্টিতে উভয়ের বিপরীত কর্ম্মের পরিণতি কি হইল, মহাকবি বলিতেছেন—

'প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়ো
রুভয়াং সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ।।' (রঘু—৮।২৩)

যে যাঁহার লক্ষ্য অনুসারে একাগ্রতার সহিত চলিয়া উভয়ে সিদ্ধিলাভ করিলেন, অর্থাৎ অজ পৌঁছিলেন উন্নতির চরমশিখরে, আর রঘু লাভ করিলেন নির্ব্বাণ মোক্ষ।

রঘুবংশের ষোড়শ সর্গে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখ দিয়া তাঁহার অতীতের সৌভাগ্যের দিনগুলির ও বর্ত্তমানের দুরবস্থার কাহিনী মহাকবি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, অতঃপর তাহাই দেখাইব।

শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর রামবিহীন অযোধ্যায় আর কাহারও বাস করার ইচ্ছা না হওয়ায় অধিবাসীরা সকলে একযোগে অযোধ্যা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ যিনি অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনিও সেখানে বাস করিতেন না, তিনি থাকিতেন কুশাবতীতে। অযোধ্যা তখন পতি-পুত্র-কন্যা সকলকে হারাইয়া শোকগ্রস্তা নারীর মত শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছিল, জনমানব কেহ সেখানে বাস করিত না, বাড়ীগুলি ভগ্ন, ঘাস ও জঙ্গলে পূর্ণ। এমনি সময় এক গভীর নিশীথে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দীন মলিন বেশে কুশাবতীর রাজপ্রাসাদে মহারাজ কুশের শয়নগৃহে যাইয়া তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিলেন। দেবীর উক্তির যেখানে যেখানে বিপরীত ভাবের বর্ণনা আছে, কেবল সেইগুলিই এখানে সংক্ষেপে দেখানো গেল : দেবী বলিতেছেন—

'সোপানমার্গেষু চ যেষু রামাঃ
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যোহতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং
ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে।।' (রঘু—১৬।১৫)

আমার (বাড়ীগুলির) যে সমস্ত সিঁড়ির ধাপের উপর পূর্ব্বে নারীদের অলক্ত-পরা পাগুলি চলাফেরা করিত, এখন সেই সিঁড়ির ধাপের উপর দিয়া চলিয়া থাকে সদ্যোহতবধজনিত রক্তে লিপ্ত ব্যাঘ্রদের পা !

রাজপথগুলির বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইবার জন্য দেবী দুঃখ করিয়া বলিতেছেন,

'নিশাসু ভাস্বৎ কলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাং।।' ইত্যাদি

অর্থাৎ যে রাজপথের উপর দিয়া নিশীথ রাতে অভিসারিকা নারীরা নূপুরের সুমিষ্ট ধ্বনি করিতে করিতে চলিত, সেই রাজপথ দিয়া চলে এখন শৃগালের দল, মুখে উল্কা লইয়া মাংসের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়।

রাজপথের নিশীথ পথিক—পূর্ব্বে নারীর দল, বর্ত্তমানে

শৃগালের দল! পথের দুর্ভাগ্য এর চেয়ে বেশী আর কি হইতে পারে?

আর এক শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন—

'আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈঃ
মৃদঙ্গ ধীর ধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ
শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকানাম্॥' (রঘু-১৬।১৩)

যে দীঘির জলে স্নান করার সময় নারীরা জলের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিতেন বলিয়া জল হইতে মৃদঙ্গের ধ্বনির মত সুমিষ্ট শব্দ শুনা যাইত, সেই সমস্ত দীঘির জলে পড়িয়া থাকে এখন বুনো মহিষের দল, তাহাদের শৃঙ্গের আঘাতে জলের কর্কশ ধ্বনি যেন শুনিতে পারা যায় না।

রঘুবংশের সপ্তদশ সর্গে কুশের পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র মহারাজ অতিথির জীবনীতে বিপরীত বর্ণনার অনেকগুলি উদাহরণ পাওয়া যায়, পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেখানো গেল।

'ধূমাদগ্নেঃ শিখাঃ পশ্চাদুদয়াংশবো রবেঃ।
সোঽতীত্য তেজসাং বৃত্তিং সমমেবোত্থিতো গুণৈঃ॥'
(রঘু-১৭।৩৪)

অর্থাৎ, অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে প্রথমে বাহির হয় ধূম, পরে দেখা দেয় তাহার শিখা, সূর্য্য উদিত হয়েন প্রথমে, তারপর বিকীর্ণ হয় তাঁহার কিরণজাল, তেজস্বীদের ইহাই স্বভাব, কিন্তু রাজা অতিথির বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল, রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গুণরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

আর একটি শ্লোকে মহাকবি বলিতেছেন—

'সর্পস্যেব শিরোরত্নং নাস্য শক্তিত্রয়ং পরঃ।
স চকর্ষ পরস্মাত্তৎ অয়স্কান্ত ইবায়সম্॥' রঘু-১৭।৬৩

অর্থাৎ, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া লয়, তিনিও তেমনি শত্রুদের শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেন, অথচ সর্পের মস্তকস্থ মণি যেমন কেহ কাড়িয়া লইবার সাহস করে না, তাঁহারও শক্তি সম্পদ কোনও শত্রু বলপূর্ব্বক লইবার সাহস করিত না।

মহারাজ অতিথির সম্বন্ধে কালিদাসের আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

'প্রবৃদ্ধৌ হীয়তে চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি তথাবিধঃ
স তু তৎসমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভূত্তাবিব ক্ষয়ী॥' রঘু-১৭।৭১

অর্থাৎ, চন্দ্রের বৃদ্ধি হওয়ার পর তাঁহার ক্ষয় আরম্ভ হয়, সমুদ্রের বেলাতেও তাই (স্ফীতির পর হ্রাস), কিন্তু রাজা অতিথির উন্নতি চন্দ্র-সমুদ্রের মত কেবল বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল, কিন্তু তাহাদের মত ক্ষয় হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

রঘুবংশের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। দেবতারা রাবণের অত্যাচারে অস্থির হইয়া নারায়ণের নিকট নিজেদের দুঃখ নিবেদন করিতে যাইয়া তাঁহার স্তব করিয়া বলিতেছেন—

'অজস্য গৃহ্ণতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব॥' রঘু ১০।২৪

তোমার জন্ম নাই, তবু তুমি (পৃথিবীতে অবতাররূপে) জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তোমার কর্ম্ম (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) নাই, তবু তুমি শত্রু বিনাশ কর, তুমি যখন যোগনিদ্রায় অভিভূত হও, তখনও তুমি জাগিয়া থাক, তোমার স্বরূপ কে বুঝিতে পারে?

বৈশাখী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

এনেছি বৈশাখী চাঁপা, লও তুমি, লও তুমি তুলে!
মধুমাধবের রাতে উঠেছিল পূর্ণিমার শশী,
সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না বুঝি অন্তরের অন্তঃস্থলে পশি'
বিকশিয়া তুলেছিল জীবনের সহস্র মুকুলে।
প্রাণ ভরেছিল পূর্ণ বর্ণে গন্ধে বিচিত্র সে ফুলে,
আজও সেথা সে বসন্ত থেকে থেকে উঠে কি নিঃশ্বসি',
সেই চন্দ্রালোকগীতি আজো হেথা উঠে কি উচ্ছ্বসি?
আজো কি সে আকর্ষণে হৃদিসিন্ধু উঠে দুলে দুলে?

হয়ত ফাল্গুন গেছে চ'লে গেছে চৈত্রের রজনী,
দেয় না দক্ষিণা আর সৌন্দর্য্যের সে ঐশ্বর্য্য ঢালি,
কোকিলের কুহুস্বরে উঠে নাকো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি,
অজস্র জ্যোৎস্না মেখে এ আকাশ হয় না রূপালি,
তবু জানি পুষ্পভরা, প্রীতিভরা শ্যামলা ধরণী,
বৈশাখে এনেছি তাই হিরণ্ময় চম্পকের ডালি।

বাসাংসি জীর্ণানি

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলসহ চ্যুতপত্র একটা মাঘ মাসের গাছ। ফুল ঝরে গেছে, পাতা শুকিয়ে একটা একটা করে ঝরে পড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে তবু রস-সজীব গাছটা, পত্রহীন শাখা-প্রশাখায় রস সঞ্চালিত করে দাঁড়িয়ে আছে খসে-পড়া পাতা-ফুলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। যা গেছে, তা গেছে। আবার ত নূতন সম্পদ এসে ঢাকবে তাকে একটু একটু করে। ফাল্গুন ত আবার আসবে।

ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে কল্যাণীও ঠিক এমনি একটি গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে। এত সব ঠিক বোঝে কিনা কে জানে, কিন্তু দ্বিধাহীন পরিচ্ছন্ন মুখে দুঃখের ছাপ বোধ করি চেপে বসে না। সহায়-সম্বল নেই, আত্মীয়-শুভানুধ্যায়ীরা ঝরে পড়েছে, খসে পড়েছে একে একে জীর্ণ বস্ত্রের মত। কিন্তু কল্যাণীকে কেউ বিষণ্ণ হতে দেখে নি, অসহায় আর্ত্তনাদে একটা দিনও ভেঙে পড়ল না সে। সরস মুখে একটা দাগ পড়ল না, কপাল একটা রেখাতে শ্রীহীন হয়ে উঠল না।

মাত্র সাত বছর বয়স, মা মরে গেল অনেক দিন ভুগে ভুগে। ডাক্তাররা রোগের কোন হদিস পান নি, মাস দুই ভোগের পর মা যন্ত্রণায় কাঁদত দিনরাত। কল্যাণী মাটির পুতুলের মত টুকটুকে সাজে পাশে বসে থাকত। পাড়াগাঁয়ের আশ্রিত পিসীমা টিপ-কাজল পরিয়ে সাজিয়ে দিতেন দু'বেলা, কল্যাণী নরম চোখ দুটি তুলে মায়ের কাছে বসে কান্না দেখত।

—আমি মরে গেলে তুই কাঁদবি?

ঘাড় নাড়ত কল্যাণী—কাঁদবে না। বাইরে বৈশাখের শুকনো বাতাসে ঊর্দ্ধমুখী চোরপালতার ভুট্টার মত থোকা থোকা লাল লাল ফুলগুলো ঝিলিক দিত চোখ-ঝলসানো সূর্য্যের আলোয়। চিলের কর্কশ শব্দ ভাসত ওপরের আকাশে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলত, একমাত্র মেয়েটা না জানি এমনি করে হয় ত কতদিন এসে বসে থাকবে এখানে।

মা মরে গেল একদিন। কল্যাণী কিন্তু কাঁদল না, দেখল শুধু একধারে দাঁড়িয়ে শোকের তীব্র দাবদাহ।

দিন দশ পর পিসীমা সাজিয়ে দিলেন বিকেলবেলা, বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। একটু দূরে মাঠের উপর নিয়ে গিয়ে বাবা দুঃখটা চেপে বললেন, তোর মায়ের জন্ত কষ্ট হয়, না রে?

না, বাবা।

ক্ষুণ্ণ পিতার মুখের ওপর নিপতিত হ'ল সরল, আয়ত দুটি চোখের দৃষ্টি, নিঃশঙ্কচিত্তে প্রশ্ন করল তার পর কল্যাণী, তোমার কষ্ট হয় নাকি?

হয়।

মিথ্যে কথা। কখখনো না। একটা ছায়াশীতল ছোট গাছ লক্ষ্য করে ছুটতে আরম্ভ করল ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে কল্যাণী।

বছর তের বয়স, বাবাও চলে গেলেন। সেই বিধবা পিসীমার হাতে ছিটকে পড়ল কল্যাণী। স্নেহপ্রবণ পিসীমা, দুঃখে কাঁদেন কেবল অহোরাত্র। এই বিপুল পৃথিবীতে একমাত্র আশ্রয়-স্থল ভাইটি তাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল, মাথার উপর একটি শিশুকে আবার চাপিয়ে দিয়ে। ফুটো নৌকা নিয়ে পার হতে হবে দামোদরের হড়পা বান। ছায়াহীন জলহীন নির্ম্মম দেশ, সত্যিকার সমবেদনা কেউ দেখাবে না। মৃত্যুকামনা করতে ভয় হয়—বোধ করি অসহায় মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়েই।···

বর্ষাকাল। ভাই যাওয়ার পর বছর দুই পার হয় নি, সর্দ্দি-বাত একসঙ্গে চেপে বসল পিসীমার দেহে। শরীরটা থম থম করছে ক'দিন। একটানা ঝিমঝিমে বৃষ্টির মধ্যে একটু সকাল সকাল কাজকর্ম্ম সেরে ফেললেন তিনি। কল্যাণীকে খাইয়ে উভয়ে শুয়ে পড়তে যাবেন, নিরীহ মেয়েটার শান্ত মুখখানিটির দিকে চোখ পড়তেই পিসীমার অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হাত ধরে বিছানায় টেনে এনে বললেন, আহা রে! আমি না থাকলে কার কাছে শুতিস?

হেসে ফেলল কল্যাণী, বলল, যাও না তুমি চলে। আমি বেশ একলা থাকতে পারি।

দূর, পাগলা মেয়ে।

সত্যি পিসীমা। আমার একটুও ভয় করে না।

এবার পিসীমারই মুখ মলিন হবার পালা। যেন হঠাৎ থেমে, থিতিয়ে গেলেন। উপেক্ষা, না নির্বুদ্ধিতা? শুয়ে শুয়ে বাইরের বৃষ্টির শব্দের দিকে কান খাড়া করে রইলেন কতক্ষণ; ভাদ্রের অন্ধকারে শিশিরের ফোঁটার মত টপ টপ করে জল পড়ছে, খড়ের চালের ওপর একটানা শব্দের গমক একটা। মরচে-কালি মাখা বিষ্ণুপুরী চৌকো লণ্ঠনটা অতি ক্ষীণ ভাবে জ্বলছে জানালার উপর, পাশের ডোবাটা থেকে শোনা যায় ব্যাঙের অন্তর-চমকানো অশ্রান্ত কলরব। কুসংস্কারে জোড়াতালি দেওয়া পিসীমার মন, নড়বড়ে হয়ে গেল একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়। এমন অদ্ভুত কথা বলে কেন এই অভাগা মেয়েটা! একলা থাকতে পারে—একটুও ভয় করে না!

চাপা অন্ধকার, ভিজে অস্বস্তিকর আবহাওয়া, পিসীমার ভয় করে উঠল হঠাৎ একটেরে এই বাড়ীতে। অনেকদিন আছেন, কল্যাণীর তখন জন্ম হয় নি। সে সময় এ বাড়ীর রূপ ছিল আলাদা, ক্ষেপার্মি কারবিকেলের আলোয় [illegible] থেকে

ও ঘর পরিষ্কার উজ্জ্বলতায়। তার পর বাতির তেল ফুরিয়ে গেল ভরদুপুর রাতে, চৌকো একটা ছোট লণ্ঠন সামান্য একটু আলো ছড়িয়ে ঘরদুয়ারের অন্ধকার আরও ঘন করে তোলে আজ। তাও আবার জোনাকির নরম আলো নয়। কালি-পড়া শিষ-ওঠা কেরোসিনের চোখ-ধাঁধানো অপ্রীতিকর আলো। ছায়া কালো কালো কিলবিল করছে চারপাশে, দপ করে নিবে গেলেই হি হি শব্দে আছড়ে পড়বে গায়ের উপর!

—রাম রাম—পিসীমার সুপ্ত মন বলে উঠল নিঃশব্দে।

কল্যাণী তাকিয়ে দেখছে পিসীমাকে, কোনও উদ্বেগের ছাপ নেই তার উজ্জ্বল চোখে। প্রশ্ন করল, তোমার ভয় করছে না, পিসীমা?

চমকে উঠলেন তিনি একটু, ও, তুই ঘুমোসনি?

না।

নীরবে একটু সরে এলেন পিসীমা, ঝিমঝিমে শরীর নিয়ে শুয়ে রইলেন একভাবে। কল্যাণী তাঁর একটা হাত বুকের উপর টেনে এনে চেপে ধরে রইল, একটু কি ভেবে বলল, জানো পিসীমা, আমি মাকে এখনও স্বপ্ন দেখি—প্রায় রোজই। এক এক দিন জেগে জেগেই মনে হয়, মাকে চোখের সামনে দেখছি।

গলায় হাতে কয়েকটা কবচ পিসীমার, নানা ঠাকুরের আশীর্ব্বাদী মন্ত্রপূত রূপার-পিতলের মাদুলীগুলো কল্যাণী আনমনে নেড়ে নেড়ে দেখতে লাগল চুপ করে—আবছা অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে। বলল, কাল রাত্তিরবেলা দেখলাম, মা যেন আমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে, পাশে কত গয়না। দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু কেমন যেন পিছনে পড়ে গেলাম, ঘুমটা ভেঙে গেল।

আর কি দেখেছিলি?

পড়ে যেতেই গয়নাগুলো দেখতে পেলাম না। ঢোক গিলল একটা কল্যাণী—ভাদরের ভ্যাপসা গরমে খাবি খাবার মত করে—আর—আর—বাড়ীতে যেন শুধু আমি একা।

শিউরে উঠলেন পিসীমা, এ ধারের হাতটাও কেঁপে উঠল। কল্যাণী কিন্তু নড়ল না, পিসীমার হাতটা মৃদু চাপ দিয়ে প্রশ্ন করল, খুব খারাপ, নয়? পড়ে গেলাম যে!

পিসীমা হাতটা টেনে নিলেন ধীরে ধীরে, সাহস দিয়ে বললেন, না, না, স্বপ্নে পড়ে গেলে ভালো ফল হয়।

ভালো ফলের আশা-আশ্বাস দিয়েও কিন্তু পিসীমার নিজের আতঙ্কিত অন্তর শান্ত হ'ল না। সর্দি, বাত চেপে বসতে লাগল আরও, পাটগোর দিয়ে জ্বর এল একদিন। দিনদশেক বেহুঁশ পড়ে থাকার পর অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন, সেই কাকা বাড়ীর স্বপ্ন। অতগুলো মাদুলী-কবচের রক্ষামন্ত্র বিফল করে পিসীমা দেহ রাখলেন দিন পনের পর। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত তিনি মরবার আগে বেশ জ্ঞান ফিরে পেলেন ঘণ্টাখানেক, কল্যাণীকে ডেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার যদি কিছু হয়, রমাই কাকার কাছেই থাকবি। পাতানো সম্পর্ক হলেও তার কাকীমা তোকে ফেলতে পারবে না দেখিস। আর—আর—তোর মায়ের গয়নাগুলো হাতে হাতে রাখবি। ওতেই তোর বিয়ে হয়ে যাবে।

কল্যাণীর দুঃখে পিসীমার চোখে জল এল, এই বোধ হয় শেষবার। কিন্তু কল্যাণী কাঁদল না একটুও, স্বচ্ছন্দ নির্লিপ্ততা নিয়ে মাসকয়েকের মধ্যে দাঁড়াল গিয়ে রমাই কাকার পদচ্ছায়ায়। শুধু কিছুদিনের একটা ছায়া সরে গেল, নিশ্চেষ্ট ত্যাগ করে মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নার মত সে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল আরো। শ্যামল শালগাছের স্নিগ্ধতা লাগল মেয়ের গায়ে। কুমোরের চক্র-নেমিতে মৃত্তিকাখণ্ড পাক খেতে খেতে শিল্পীর হাতের স্পর্শে রূপায়িত হ'ল একটি সুন্দর মৃন্ময় পাত্র। মৃন্ময় নয়, চিন্ময়—শতদল পাপড়ি মেলল সূর্য্যের প্রাণস্পর্শে। কল্যাণী যেন এতদিনে একটা মলিন কাপড় ফেলে কলকা দেওয়া চওড়া পাড়ের জমজমাট ছাপা শাড়ি পরল।

লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়ে শহরে এল কল্যাণী। রমাই কাকা ডাক্তার, বোধ হয় রোগীদের বিশেষ করে পাতাপত্র দেখছিলেন। কাকাকে বিরক্ত না করে সরাসরি ভিতরে চলে এল কল্যাণী। গৃহিণী রমলা কতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে, চৈত্রের খররৌদ্র তখন মাথার উপর আগুন ছড়াচ্ছে। পায়ের মাটির উপরও লকলক করে শিখ উঠছে এ সময়টায়। কল্যাণী স্তব্ধ হয়ে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। কাকীমা প্রশ্ন করলেন, তুমি রুণীদির মেয়ে?

হাঁ।

তা হলে তোমার তো কেউ নেই?

না, কিন্তু আপনারা তো আছেন।

কাকীমা নেমে এসে মাথায় হাত রাখলেন কল্যাণীর, বললেন, রোদটা থেকে উঠে চল মা, হাতে পায়ে জল দাও। আহা! দিদিকে দেখেছিলাম সেই কখন একবার, তোমাকে প্রথম চিনতে পারি নি।—রমলা কল্যাণীর চিবুকে হাত দিয়ে চুমা খেলেন, বিস্মিত হয়ে মুখের দিকে তাকালেন বার বার করে। হঠাৎ এক যুগ আগের কথা মনে পড়ল—রমলার মেয়ে মারা গেছে। পানের মত মুখ, চোখের কালো ঈশারা, বাঁপাশে চেপে চলার একটু লঘু-ছন্দায়িত পদক্ষেপ—ঠিক সেই মেয়ের মত। বেঁচে থাকলে সে আজ 'মা' বলে হয়ত এমনি করেই কাছে ও এসে দাঁড়াত। বুকের মধ্যে সঞ্চিত কতকটা বাষ্প কণ্ঠ বেয়ে ঠেলে বের হতে চাইল, স্খলিত পদে রমলা কল্যাণীকে হাত ধরে উপরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। হাতে মুখে জল দিলেন নিজে, খাটের উপর এনে বসালেন। সামনের ছোট কাচের আলমারীতে পরিপাটি করে সাজানো পুতুল, মাটির ফল, নানা রকমের খেলনা পালকি। ছেড়ে-যাওয়া সেই মেয়ের স্মৃতিচিহ্ন। কাকীমার দৃষ্টি অনুসরণ করে কল্যাণী দেখল, তিনি আলমারীটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন, একটু সঙ্কোচ করে বলল, আমার সুটকেসটা এখানেই থাকবে?

কি আছে ওতে?

কল্যাণী হাসিমুখে স্যুটকেসটা খুলে বের করল পুটলি একটা, মায়ের দেওয়া অলঙ্কার। তার মধ্যে সোনার গোট, বাউটি দেখে পুলকিত হয়ে উঠলেন রমলা, বললেন, এ সব সেকালের গয়না। এই ধরনের জিনিষই আমার মেয়ের বিয়েতে দেব ভেবেছিলাম—

—আপনার মেয়ে?

কল্যাণীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রমলা বললেন, বেঁচে থাকলে ঠিক তোমার মতই দেখতে হ'ত।···

প্রথম শীতের সকালবেলায় আলতো ভাবে দীঘির জল ছুঁয়ে যেমন কুয়াশা থাকে, তেমনি রমলার স্নেহ কল্যাণীকে ঘিরে জড়িয়ে রইল। ডাক্তার চৌধুরী একদিন চটির শব্দ করতে করতে উপরে উঠে এলেন ছেলেকে ডাকতে—বিমান, বিমান গেল কোথায়? শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে দেখলেন, কল্যাণী তাঁর বিছানা তৈরি করছে, দাঁড়িয়ে পড়লেন: বিমান—

—তিনি নীচের ঘরে পড়ছেন বোধ হয়—

নীচের ঘরে?

অত চেঁচাও কেন?—রমলা বারান্দায় কাপড় মেলতে গিয়েছিলেন, ভিজে হাতটা আঁচলে মুছতে মুছতে এলেন; ইশারায় স্বামীকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, সে নীচের ঘরে না থাকলে পরের মেয়ে—

ও। কিন্তু ওকে যে হাসিরহাটি থেকে দেখতে এসেছে।

আদেশের স্বরে রমলা বললেন, ওদের যেতে বল আজ। আমরা পরে খবর দেব।

কড়া চুরুট মুখে ধোঁয়া উদ্গিরণ করছিলেন ডাক্তার, প্রশ্ন করলেন, তার মানে?

—মেয়ের বিয়ে আগে না দিয়ে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। কল্যাণীর জন্যে শিবনাথের মায়ের কাছে আমি বিমানকে পাঠিয়েছি। ভাইপোর বিয়েতে এসেছে, কলকাতায় ওদের বাড়ী আছে, ছেলেটি ডাক্তারী পড়ছে। আমার মেয়ে বেঁচে থাকলেও ত এমনি বিয়ে দিতে হ'ত। তা ছাড়া, তোমার লাগবে না এমন কিছু, মা মেয়েকে যথেষ্ট গয়না দিয়ে গেছে।

মুখের চুরুটটা হাতে ধরে ডাক্তার স্ত্রীকে দেখতে লাগলেন। নিষ্ঠাবান হিসেবী লোক, বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করেন তিনি, রমলা থামতেই বললেন, তুমি পাগল হ'লে নাকি? ও এসেছে, থাক কিছুদিন। তারপর ওর এক মাসীমা আছেন, পাঠিয়ে দেব সেখানে। এসব ঝামেলার মধ্যে যেয়ো না, বুঝলে?

কিন্তু নিজের মেয়ে আজ বড় হলে বিয়ে দিতে না?

নিজের মেয়ের দিতাম। তুমি আগুন নিয়ে খেলতে যেয়ো না। তোমার জানা উচিত, বড় ছেলে ঘরে রয়েছে।

—দাঁড়াও। গমনোদ্যত স্বামীর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন রমলা, মুখের উপরের চুলগুলো সরিয়ে বলে উঠলেন, তুমি রোগী আর মরা মানুষ চেন শুধু, জীবনের আর এক দিকের কি জান? কল্যাণীর মুখের পানে তাকিয়ে দেখেছ?

জবাব দিতে পারলেন না, একটা ভ্রূভঙ্গি করে ডাক্তার চৌধুরী নীচে চলে গেলেন। সিঁড়িতে বঙ্কিম রেখা ছড়িয়ে পড়ল কতকটা। সেই রেখা তখনও মিলায় নি, বিমান উঠে এল, ডাকল—মা!

রমলা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, সম্পূর্ণ সফলকাম হয় নি সে। বললেন সুবিধে হ'ল না বুঝি?

কল্যাণী কি একটা বই নাড়াচাড়া করছিল, একবার চোখ তুলেই বইটা রেখে চলে গেল নিজের ঘরে। বিমান ঘরের মধ্যে গিয়ে বলল, 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে কেবল। মেয়ে দেখব, ছেলে কি বলে, এই সব।

এই কথা? আচ্ছা, তুই যা। আর শোন একটা কথা—গলার স্বর বেশ সরু করে রমলা বললেন, তোর বাবাকে বলিস, নিজের কথাটা ভেবে দেখবার জন্যে একটু সময় চাস। পারবি?

মায়ের স্মিতমুখের দিকে তাকিয়ে বিমানও হেসে ফেলল, বলল, একটু কেন মা, অনেক পরে দিও। কিন্তু বাবাকে।

লজ্জা করবে?

চুপ করে রইল বিমান।

—তা হোক, বলিস। বলেই চলে আসবি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে উঠলে বলবি। পারবি না?

ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে চলে গেল বিমান।

রবিবার। দুপুরবেলায় বিমান নীচের ঘরে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একটা ভারী বই উপুড় হয়ে পড়ছে, কল্যাণী পাশে এসে দাঁড়াল। বিমান চোখ না তুলেই বলল, বস।

—আশ্চর্য! বড় বড় বই পড়লে লোকে না চেয়েই দেখতে পায় নাকি?

পায়। তাদের মাথার উপরেও একটা চোখ গজায়।

কল্যাণী বসল না, দরজার দিকে একবার দেখে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, এ রকম চোখ থাকার দরকারও হয়েছে। উপর থেকে নীচে নামিয়েছি, আবার হাতের পাঁচ শুভক্ষণটা হাত ফসকে পিছিয়ে গেল।

বইটা পরিপাটি করে বন্ধ করল বিমান, চোখের কোণ দিয়ে এদিকে একটু দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, সেটা লোকসান হ'ল না লাভ হ'ল ধরতে অবিশ্যি সময় লাগছে।

কল্যাণী খাটের পাশে হাতটা ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল, জবাব দিল, আপনাকে দেখলেই বঙ্কিমের নবকুমারের কথা মনে পড়ে। বেচারা পরের জন্যে কাষ্ঠ আহরণ করতে গিয়ে পারাপারের নৌকো হারাল।

কিন্তু তার পর? নবকুমার ত ঠকে নি।

সে গল্পের নবকুমার। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে কল্যাণী উত্তর দিল, তা না হলে যে গল্প জমবে না। সত্যিকার জীবনে কিন্তু তা হয় না।

খাটের ওপর বসে ভাবছিল বিমান মনে মনে কথাটা নাড়াচাড়া করে, মাথা ফিরিয়ে দেখল, কল্যাণী চলে যাচ্ছে। দুটো কথা বলে এভাবে হঠাৎ চলে যায়, বিমান বিস্মিত হয়ে দেখে। বসতে বললেও বসে না। কখন এক সময় আসে, শরতের বৃষ্টির মত এক পশলা কথা বলে, তার পরই থাকে না একদণ্ড। অনেক সময় উপরে গিয়ে দেখেছে, একমনে পড়ছে কিছু একটা, তাকে যেন আর চিনতেই পারে না।

বিকেলবেলা কল্যাণীর মাথা বেঁধে দিতে দিতে রমলা প্রশ্ন করলেন, হাঁ রে, মা শিবপুজো করিয়েছিল?

কাত-করা ঘাড়টা একটু সোজা করে কল্যাণী বলল, আরম্ভ করেছিল কাকীমা, শেষ হয় নি।

হয় নি? তাই বলি বেগ পেতে হচ্ছে কেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে বসে আঙুলে কাপড় জড়াতে লাগল কল্যাণী, ধীরে ধীরে বলল, আমার কপাল, কাকীমা। আমি বলি, আমাকে পাঠিয়ে দাও—

সেই মাসীর কাছে, নয়? চল মুখপুড়ী আমার সঙ্গে, ঠাকুরের কাছে চিলেকোঠায়। আমি নিজে হাতে শেখাব তোকে।

রমলার ঠাকুরঘর। ছাদের একপাশে ছোট একচিলতে ঘর। ঘষা কাচের আবরণের মধ্যে দ্যুতিমান ছোট ছোট দুটি পট, কৃষ্ণ আর রাধিকা নির্মল প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রমলা পুজোর ব্যবস্থা সব দেখিয়ে দিলেন। কল্যাণী গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে, তার পর রমলার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। ঝরঝরে গলায় বলল, আমার জন্মের সময় বিধাতা-পুরুষের ঘুম এসে গিয়েছিল কাকীমা। তাই মা-টা বদল হয়ে কোথায় ছিটকে পড়েছিলাম। ভগবানকে ডেকে বলব, আসছে বার যেন এমন গণ্ডগোল না করেন আর।

—তিড়বিড় করিস নে, বস। কল্যাণী না বসতেই ঠিকমত বসিয়ে দিলেন রমলা, দেখে নে, এমনি করে কাল সকাল থেকে পুজো করবি।

দিন কয়েক পর ভোরবেলা রমলার একটা পাটের শাড়ি পরে কল্যাণী ঠাকুরকে অঞ্জলি দিচ্ছে, রমলা পা টিপে টিপে দূরে দাঁড়ালেন। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উপবিষ্ট নিমীলিতনয়না পূজারিণীর সে স্নিগ্ধতা দেখে পা দুটো যেন আটকে গেল, স্থির বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কল্যাণী বুঝতে পারল না কিছুই। কতক্ষণ পর তেমনি নীরবে এক পা এক পা করে নেমে এলেন রমলা, চোখ দিয়ে পাতলা এক ফোঁটা জল ঝরে পড়তে চাইল। দীর্ঘকাল লোকান্তরিতা কন্যার প্রতি স্নেহের ধারা, না অসহায় এক বালিকার প্রতি মমতা, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। আঁচল দিয়ে মুছে ফেললেন চোখ দুটি। সংসারের কাজ ভুলে গিয়ে নিজের ঘরে সেই আলমারীর দিকে মুখ করে চুপ করে বসে রইলেন কল্যাণী না আসা পর্যন্ত, সে এলে পরও তাকিয়ে রইলেন বোকার মত।

—তোমার শরীর খারাপ নাকি কাকীমা? ভীরু গলায় কল্যাণী প্রশ্ন করল।

রমলা বলে উঠলেন, তাই যদি হয়, নিজের কোন ভাবনাই ভাবতে শিখলি না আজ পর্যন্ত, তুই কি করবি বল দেখি?

কল্যাণী আশ্বস্ত হয়ে হাসল একটু, পাশে বসতে বসতে বলল, কি করি বল? ওসব কেমন যেন ধাতে সয় না।

কিন্তু কাল যদি আর ভালো না বাসি?

কল্যাণী উত্তর দিল না, রমলার পিঠের উপর মুখ রেখে চুপ করে রইল।

রমলা ধীরে ধীরে কল্যাণীকে কোলের উপর টেনে আনলেন, পিঠের উপর স্নিগ্ধ একটি হাত মমতাভরে বোলাতে লাগলেন। চামড়া-ঢাকা একটা পাঁজরা আঙুল দিয়ে ধরে বললেন, তুই নিশ্চয়ই খাস না ভাল করে। মনে মনে ভাবিস, না?

কাকীমার কোলের উপর মুখ রেখে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল কল্যাণী। বহুদিন ধরে অনেক জল জমা হয়ে ছিল বুকের মধ্যে, চোখের আনাচেকানাচে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল। জ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম কাঁদল কল্যাণী।

দিন কয়েক পর। দুপুরবেলা স্বামীর খাওয়া শেষ হলে রমলা তাঁর হাতে পানের কৌটো তুলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা ডাক্তার—

গোটা দুই পান দাঁতের সাহায্যে সবে পিষতে আরম্ভ করেছেন ডাঃ চৌধুরী, থেমে গেলেন। অত দুঃখের সম্ভাষণ হঠাৎ? তোমার কথা কখনো অমান্য করেছি? মায় ছেলের বিয়ে পর্যন্ত স্থগিত রাখলাম—

—ধন্যবাদ দিচ্ছি তার জন্য। স্নিগ্ধ হাসিতে শুভ্র দাঁতগুলি ঝকঝক করে উঠল রমলার, একটা ডাক্তারী কথা জিজ্ঞেস করব বলেই—

তাই ডাক্তার সম্বোধন! বলো—বলো—

রমলা ভাবছিলেন বোধ হয় কথাটা একমনে, গম্ভীরভাবে বললেন, আচ্ছা, আমি তো সামান্যতেই হাসি, কাঁদি, রাগ করি। কিন্তু এমন মানুষও আছে যে, কিছুতেই কিছু অনুভব করে না, কেন বল তো।

মাথা নাড়লেন প্রবীণ ডাক্তার, বললেন, লক্ষণটা সুবিধের নয় কিন্তু। এ সব লোক বড় নিষ্ঠুর হয়, বুঝলে?

নিষ্ঠুর?

হাঁ, একদম হার্টলেস। অনুভূতিগুলো ওদের শুকিয়ে গেছে, অন্তরে শক্ত হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে সাবধানে মিশবে, বুঝলে?

বুঝলাম, তুমি ছাই বুঝেছ। রোগ জান চিনতে, সুস্থ মানুষের খবর ছাই জান তুমি।

পানের রসে আরক্ত করে তুলেছেন মুখ ডাক্তার চৌধুরী, উচ্চ-গ্রামে হেসে উঠলেন—আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ তাচ্ছিল্যভরা হাসি। রমলারও ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল, স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন, সত্যিই তুমি এ সব ছাই বোঝ, ডাক্তার।

হঠাৎ ডাক্তার সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রোগী কে বললে না তো ?

রমলা চলে যাচ্ছিলেন, ঘুরে এলেন। ঠিক এমনি সময়ে কালো একটি তাঁতের শাড়ি পরে খোলা চুলে অদূরে এসে দাঁড়াল কল্যাণী, হাতে একটা চাবি, বোধ হয় কাকীমাকে দিতে এসেছে। আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল রমলার অন্তর, চলে যেতে যেতে চাপা গলায় বললেন, রোগী তুমি গো ডাক্তার, তুমি।

দু'এক মাস নয়, একটা বছর ঘুরে এল।

বিকেলে দমকা বাতাস উঠেছিল একটা, কালবৈশাখীর নটনৃত্য। একখণ্ড কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলল, ছোট শহর ওলটপালট করে দিল। ঝড়ের মুখে লাল ধুলোর বারুদ; আকাশ থেকে নামল বজ্র, বিদ্যুৎ, শিলা আর কালো মৃত্যু। খণ্ড প্রলয় যেন। ঝড়-বৃষ্টি থামল যখন, দেখা গেল পুরনো দালান আর পোড়োবাড়ীর অস্থি-কঙ্কাল পথে পথে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তার পরই প্রকৃতির আর এক রূপ—নরম, ঝিরঝিরে বাতাস ঠাণ্ডা করে দিল উত্তপ্ত শহর।

রাত্রি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শব্দময় জগৎ ঘুমিয়ে পড়ল একটু একটু করে। শান্ত আবহাওয়া। কল্যাণী জেগে বসেছিল একটা বই নিয়ে, ভাবছিল আকাশপাতাল। সাবধানে নীচে নেমে এল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে বিমান পড়ছে তখনো। মুখ তুলেই বিস্মিত হয়ে উঠল, তুমি? এত রাত্রে?

খাটের পাশে এসে দাঁড়াল কল্যাণী, ফিস ফিস করে বলল, বেচারা নবকুমার!

সময় অদৃশ্য হাতে করে অন্তরঙ্গতার সেতুবন্ধন করে দিয়েছে, নিরালা একান্তে তারই পথ দিয়ে পুরনো সেই বিশেষ সম্বোধনটা চলাফেরা করে আজও। বিমান কিন্তু সে ডাকে আজ সাড়া দিল না, নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, এবার তো নিজের ঘরে চললে, আর কেন?

ওপক্ষ থেকে কিন্তু কোন উত্তর এল না। উৎসুকভাবে চেয়ে রইল বিমান, দেখল টানা টানা দুটি চোখ নির্লিপ্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঋজুদেহা স্নিগ্ধ মেয়েটি মুখ টিপে হাসছে শুধু। অনেক যাওয়া-আসার ইতিহাস জমা হয়ে আছে ঐ দেহমনের মধ্যে, কোনটা সত্য, কোনটা বা অসত্য। কিংবা সবকিছুই হয়ত ছিন্নবস্ত্রের মতই আজ মূল্যহীন। বিমানের চঞ্চল ভাব দেখে ক্রমশঃ হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল কল্যাণীর সমস্ত মুখের ওপর, বলল, ওঠ না বীরপুরুষ, বসে থাক।

কি ভাবতে লাগল সহসা কল্যাণী মুখ নত করে। বিমান বলল, তোমাকে দেখে কেবল একটা প্রশ্ন জাগে। উত্তর দেবে?

বল।

কোন কিছুই কি তোমাকে স্পর্শ করে না? তোমার—তোমার অন্তর নেই। অনুভূতি বলে একটা জিনিষ তোমার জানা নেই।

বেদনা-কঠিন স্বর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল বিমান, একটু একটু করে মাথাটা নেমে গেল কল্যাণীর।

কৈ, উত্তর দিলে না যে?

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে কল্যাণী পাল্টা প্রশ্ন করল, সবকিছুই কি আমরা চাইলেই পাই বিমান-দা? না ইচ্ছে করলেই নিজেকে যেমন খুশি গড়তে পারি? অনেক দিন আগে কাকীমাও ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন আমাকে। কিন্তু কি করে বোঝাই বল, যে ভাগ্যের উপর মানুষের কোন হাত নেই!

কিছুই নেই?

আজকের বিকেলের কালবোশেখীর উপর কোন হাত ছিল মানুষের?

কিন্তু মানুষ আর প্রকৃতি এক?

হাসতে হাসতে কল্যাণী জবাব দিল, যদি বলি এক? মানুষ দুঃখ পায় বিমান-দা, মাথা পেতে দুঃখকে মেনে নিতে পারে না বলে। তার ধৈর্য থাকলে—

বিমান বিরক্ত হয়ে উঠল, থামো। বক্তৃতা দিও না। যেন কত বয়েস!

ক্ষণিক চুপ করে গেল কল্যাণী, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে বলে উঠল, সত্যিই আমার অনেক বয়েস। কিন্তু যাক সে সব কথা। দিনকতক পরই ত সেই কলকাতার ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছ তোমরা। সামনে এসে নত হয়ে কল্যাণী প্রণাম করল বিমানকে, পায়ের ধুলো মাথায় নিতে নিতে বলল, তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি। আর হয়ত সুযোগ হবে না, কিন্তু—

হয়ত আরও কি বলতে যাচ্ছিল, গলাটা ভারী হয়ে গেল। মুহূর্তে বেরিয়ে গেল কল্যাণী। বিমান হতবাক হয়ে বসেছিল, আর্ত কণ্ঠে ডাক দিল, কল্যাণী!

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কল্যাণী, মুখে আবার দেখা দিয়েছে হাসি হাসি ভাব, বলল, কি বল?

—কিছু না, যাও। তুমি সুখী হলে আমিও সুখী হব।

মাস দুয়েক পর।

কলকাতায় বৃষ্টি নেমেছে। পাড়াগাঁয়ের উন্মুক্ত আকাশ এখানে চোখে পড়ে না, পাণ্ডুর পরিবেশ, বিষণ্ণ, ঝিমঝিমে বর্ষা। শিবনাথ মাকে এসে বলল, আমি হোষ্টেলে যাব ভাবছি।

—সে কি? কেন? কখন যাবি?

এখনি।

মোহিনী দেবী চমকে উঠলেন, বিয়ের পর হতেই ছেলের উড়ু উড়ু ভাবটা কেমন যেন বেড়েই চলেছে। সংসার গড়ে দেবার জন্যে কলকাতার বাড়ীতে বাস করছেন তিনি, কিন্তু এ ছেলের ধারা আবার উল্টো। এমন সুন্দর বৌ নিয়ে এসেও একমাত্র সন্তানকে ঘরে বাঁধতে পারলেন না, বরং আরও ছন্নছাড়া হয়ে উঠল। সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তোর বল দেখি?

হবে আবার কি! ফাইন্যাল পরীক্ষা আসছে, এখানে নানান অসুবিধা।

বৌমা একলা থাকবে?

ওর জন্তে ভেবো না মা, তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল শিবনাথ। ওর এসব কিছুই গায়ে লাগবে না।

আমার অদেষ্ট বাবা, আমার অদেষ্ট। তা না হলে তোমার মত ছেলের হাতে আমাকে পড়তে হয়?

আঁচল টেনে অশ্রু চাপতে চাপতে মোহিনী দেবী চলে গেলেন। কল্যাণী পরমুহূর্তেই এসে দাঁড়াল শিবনাথের কাছে। আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, মাকে কি বলেছ?

—আমি হোষ্টেলে যাচ্ছি।—কল্যাণীর চোখ চিক চিক্ করে উঠল, কথা বলতে পারল না আর। স্বামীর গতিবিধি তারও আর অজানা নেই, কিন্তু বোধ হয় এতখানি দুঃসাহস ঠিক কল্পনা করতে পারে নি। পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত একবার যেন শরীরটা কেঁপে উঠল, কিন্তু সংযত করে নিল নিজেকে। আচ্ছা বলে কল্যাণী যে দরজা দিয়ে এসেছিল সেই দরজা দিয়েই আবার চলে গেল।

সিঁড়ির পাশে বাড়ীর বুড়ী ঝি অন্নদা মুখ চুপ করে সব শুনছিল। কল্যাণীকে দেখে কাছে সরে এল। ডাকল, বৌমা! আরও একটু কাছে এসে কেউ শুনতে না পায় এমনি গলায় বলল, খোকাবাবুকে যেতে দিও না বৌমা, ওর মতিগতি ভাল নয়। ঘরের বাইরে থাকলে ওর আর কিছু বাকি থাকবে না, তুমি ছেড়ে দিও না, মা।

হু হু করে কেঁদে ফেলল বুড়ী। গ্রামের মেয়ে, অনেক আশা নিয়ে নিয়ে সন্তানের মত মানুষ করেছে শিবনাথকে, একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে কাঁদতে লাগল। কল্যাণী সান্ত্বনা দিল, বলল, কিন্তু তোমাদের খোকাবাবুকে তুমি ত চেন অন্নদা। আমি কি তার কাছে একটা মানুষ!

সেখান থেকে চলে গিয়ে এঘর ওঘর অযথা ঘুরতে লাগল কল্যাণী। কি যেন হারিয়ে গেছে, ঠিক মনে পড়ছে না, সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে হাজির হ'ল আবার সেই উপরের ঘরটায়। সেখানে শিবনাথ সুটকেস গুছিয়ে যাবার জন্তে তৈরী হচ্ছে। ঘরে ঢুকে কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেল, মাথার উপর এক ঝলক রক্ত চনচন করে বোধ হয় জমা হয়েছে এসে। কল্যাণীর সে এক অভূতপূর্ব রূপ। সিঁথির মাঝখানে সিন্দুরের রেখা, পায়ে অলক্তক, নববধূর লাজনম্র লাবণ্য অক্ষুণ্ণ এখনও। আঁচলটা সামলে নিল, সহজভাবে প্রশ্ন করল, এখনই যাচ্ছ?

দেখতেই পাচ্ছ।

কবে আসবে আবার?

ঠিক নেই।

কল্যাণী এগিয়ে এসে সুটকেসটা একটা তোয়ালে দিয়ে ঝেড়ে মুছে বলল, চল, আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

শিবনাথ মনে করেছিল, বিদায়ের সময়টায় অন্ততঃ সাধারণ মেয়ের মত কল্যাণী চোখের জলে একটা ছোটখাটো নাটকের সৃষ্টি করবে, আর সে বিজয়ী বীরের মত উপভোগ করবে দৃশ্যটা। কামনা করছিল অনাদর প্রকাশ করবার সেই চরম ক্ষণটি, কিন্তু অন্ত পক্ষ থেকে এমনি ধরনের উপেক্ষা সে কল্পনায় আনতে পারে নি। বিজিত পৌরুষ আহত হ'ল একটু, শিবনাথ বলে উঠল, থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। এগিয়ে ধরতে গেল সুটকেসটা, কল্যাণী একটু হেসে সেটা নিয়ে পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়ে সিঁড়ির একটু নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বলল, সত্যিই কি তুমি পড়াশুনোর জন্তে হোষ্টেলে যাচ্ছ, না আর কোথাও?

চাপা গর্জন শোনা গেল শিবনাথের, তার মানে?

—আমাকে ভাল না লাগুক, বাড়িতে থাকলে আমি তোমাকে কিছু বলতাম না সত্যি, অথচ মা দুঃখ পেতেন না।

যথাস্থানে আঘাত দিলে দুর্জন ক্ষেপে যায়। শিবনাথ পাগলের মত কল্যাণীর হাত থেকে সুটকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

কয়েক মিনিট পর। শ্মশান-স্তব্ধ বাড়ীটার সেই ঘরে কল্যাণী আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিল, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে এল। ছোট একটা এটাচিকেস, খুলে ফেলল ডালাটা। উপরের পকেটে হাত চালাতেই দেখতে পেল মোটা আপিস-খামটা, তার মধ্যে কতকগুলো চিঠি এবং একটি মেয়ের ফোটো। বিয়ের পর একদিন স্বামীর জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে এ বস্তুটা চোখে পড়েছিল, রেখে দিয়েছিল তার এটাচির মধ্যে। শিবনাথের সুটকেসে রাখবার আর সুযোগ হয় নি, রাখব রাখব করে একদম ভুলে গেছে। খাম থেকে এক এক করে সব বের করল। একক ফোটো, খোলা চুলের গুচ্ছ উন্নত বক্ষ বেয়ে সামনের দিকে ছড়ানো, চঞ্চল, চটুল ভঙ্গি। আকর্ষণের বেসাতি সাজানো। উল্টো পিঠে শিবনাথকে উপহার দেওয়ার স্বাক্ষর এবং তারিখ। বিয়ের মাত্র একমাস আগের প্রীতিচিহ্ন। কিন্তু খামের মধ্যের পত্রগুলোয় প্রেম-নিবেদনের ভাষায় ছবির এ উদ্ধত গৌরব নেই, সেখানে অসহায় এক রমণীর অশ্রুঝরা মিনতি। পড়েছিল একবার কল্যাণী, ক্রীমরঙের লেটার পেপারে লম্বা টানের দুর্বল লেখাগুলো। হাসপাতালের নার্স মেয়েটি, পরিচয় রয়ে গেছে অনেক চিঠিতে। একটা চিঠি আবার বের করল, "বাড়ীতে পড়ে আছি, প্রায় একা। ডিউটিতে যাবার আর মুখ নেই। কি করেই বা যাই বল? এত দিন ধরে এত আশা দিয়ে তুমি যে আমাকে প্রতারণা করবে, এ দুঃস্বপ্ন যেন আর সহ্য করতে পারি না। আজীবন কষ্ট পেয়েছি। কেউ আমার সংসারে নেই, তুমি সবই জান। জানতে পারলাম, তুমি বিয়ে করতে যাবে। সুন্দরী বৌ নিয়ে ফিরে এসে আমার জন্তে একটু কড়া বিষ পাঠিয়ে দিও।" এই সুরের চার পৃষ্ঠা প্রলাপ ছবির মদিরেক্ষণার ছায়াটা যেন চিঠির মধ্যে মরা মরা গলায় কথা বলছে। বিপন্ন ভিখারিণীর শুধু নিঃস্ব হাতের আবেদন। টেবিলের ছবির দিকে আবার তাকাল কল্যাণী। চাপা ভ্রূর মধ্যে বিজয়িনীর দৃঢ়তা, সর্বাঙ্গে কৃশানুর তরঙ্গদীপ্তি।

সেটিই তার জীবনের ক্ষণবসন্ত, তার পর শীত আর আসন্ন মৃত্যু।

মিতালি—নাম লিখেছে মেয়েটি। হয়ত এটি তার আসল নাম নয়, শিবনাথের দেওয়া নাম। তাড়াতাড়িতে ভুলে ফেলে গেছে ফোটো আর চিঠির প্যাকেটা। কি'সব টানে কোথায় এবার পালিয়ে গেল সবকিছু পেছনে ফেলে, অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল কল্যাণী। একটুও ক্ষোভ হ'ল না, রাগ হ'ল না, ঈর্ষা জাগল না, বরং অন্তরে পরিবেদনা-সজল হয়ে উঠল সেই মিতালি মেয়েটির প্রতি। দেখা ত হ'ল না, হলে বোধ হয় 'দিদি' বলে আপন করে নিতে পারত। তারই মত আত্মীয়হীন অসহায় সে ও। মুখ পুড়িয়ে লজ্জায় কোন এক কোণে পড়ে আছে বসে বসে।

তারপর যা ঘটল, কল্যাণীও কল্পনা ভাবতে পারে নি।

অনেক দূরের একটা ষ্টেশন থেকে শিবনাথ পত্র দিয়ে মাকে জানাল, সে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে।

সেই কয়েক মাস আগের কথা।

শীতকালের অপরাহ্ন। পিয়ন দরজার কাছে এই অসময়ে চিঠি একটা ফেলে দিয়ে গেছে। মোহিনী দেবীর অন্তরাত্মা দুরু দুরু করে উঠল। খুলে পড়লেন চিঠি। পড়তে পড়তে আনন্দের ছায়া ঘনিয়ে এল মুখের উপর। শিবনাথের চিঠি, কলকাতায় আসছে লিখেছে। অনেক দিন পরে পর পশ্চিমের দূর একটা জায়গা হতে পত্র দিত, কখনমাত্র কারো প্রয়োজনে। মায়ের দুঃখ আর কান্নায় ছেলে কি আর সাড়া না দিয়ে পারে। খুশি হয়ে ঝিকে ডাকতে আরম্ভ করলেন, অন্নদা, ও অন্নদা

অন্নদা কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, বৌমা কোথায় রে?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্নদা পাল্টা প্রশ্ন করল, কার চিঠি গো? খোকাবাবুর? আসবে লিখেছে বুঝি? তুমি এত করে লিখলে। খোকা হবে—আর কি না এসে পারে গো

অন্ধকার ঘরটায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে কল্যাণী কি একটা বই পড়ছিল, মোহিনী দেবী সরাসরি ঢুকে পড়ে বললেন খোকা আসছে বৌমা, একটু ভাল করে কাপড় চোপড় ছেড়ে

কবে আসছেন মা?

কবে? চিঠিটা চোখের সামনে নাড়তে লাগলেন মোহিনী: তা ত লেখে নি।

দেহটা টেনে টেনে উঠে বসল কল্যাণী, হাঁ করে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে।

কল্যাণীর কথাটা মোহিনী ঠিক প্রশ্নের মধ্যেই আনলেন না, নিজেকে শুনিয়েই যেন বলতে লাগলেন, আসবে লিখেছে যখন এদ্দিন পর, আজকালের মধ্যেই আসবে বৈ কি?

কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার হয়ে গেল। মোহিনী দরজা খুলে সেই পিয়নের জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেন, আবার কতক্ষণ পর বন্ধ করতে হয় দরজা। কল্যাণী তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে—দেখতে পায় না কিছুই। সেই পুরনো কলকাতা, পিচের রাস্তার উপর জনতার সমারোহ, ফিরিওয়ালার চিৎকার, ট্রামবাসের ঘরঘরানি। আকাশের নীচে স্তরে স্তরে অট্টালিকা—জগদ্দল পাথরের মত মাটির বুকের উপর চেপে বসে আছে, হাঁপাচ্ছে ওদের ভারে স্থবিরা পৃথিবী—ওরা বোধ হয় কোন কালে নড়বে না। তারও উপরে ধুলো-ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা, নীচের মানুষের বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে এতটুকু ফাঁকা জায়গাও নেই, একটু নির্মল বাতাসও নেই। বর্ষার জল পেয়ে শরৎকালে সেই গ্রামের বাড়ীর চার ধারে মাঠে মাঠে ডগডগে ধানের গাছগুলো শ্যামল সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, প্রাণের উচ্ছলতায় বাতাসে মাথা দুলিয়ে হাসত খেলত। বছরের পর বছর নূতন রূপে দেখা দিত সে দেশ কত গাছপালায় সবুজশ্রী, চোখে স্নেহের পরশ বোলাত তাকিয়ে দেখলে। সেই গ্রাম, সেখানের সেই জীবন, আর এ লোহ নগরী কলকাতা, উগ্র, ক্লান্ত, দুঃস্বপ্নময়।

জীবনও সত্যিই এবার দুঃস্বপ্ন বলে মনে হ'ল নাকি? ঘুমোতে পারল না কিন্তু এদিন কল্যাণী। শেষ রাতে তন্দ্রার ঘোরে মধুর স্বপ্ন দেখল যেন, আচ্ছন্ন অবস্থাতেই শুনল চাপা শব্দ, খুট খুট।

নীচের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। অন্নদা দরজা খুলে দিয়ে বজ্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, খোকাবাবু।

—চুপ।

আর কিছু শোনা গেল না। তারপর সিঁড়ির পথে সতর্ক পদক্ষেপ, ঘরের মধ্যে গড়িয়ে এল শব্দটা। স্বপ্ন নয়, চোখে দেখল কল্যাণী, তার পাশে শিবনাথ এসে বসেছে। ভুলে গেল সব অভিমান, ধড়মড় করে উঠে বসে তার পিঠে মুখ রাখল। কিন্তু মাথটা এক ঝাঁকায় তুলে নিল আবার, বিস্ফারিত চোখে তাকাল, বলল, ওমা, তুমি এল পেয়েছ নাকি?

কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে শিবনাথকে, মাথার চুল বড় বড়, রুক্ষ, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। দাঁত বের করে হাসল, বলল, ও এমন একটু থেকে হয় উপকারের। মাথা ঢাকা দিয়ে কাটতে গেলে—

সে আবার কি?

সে তুমি বুঝবে না

মড়া কাটছিলে নাকি এতদিন?

তুমি দেখছি আমার উপর খুব রেগে আছ, নয়?

তোমার উপর? না ত। বিড় বিড় করে বলতে বলতে শুয়ে পড়ল কল্যাণী, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে, সারারাত জেগে বসেছিলাম, ঘুম হয় নি।

আমার জন্যে? শিবনাথ জড়ানো ভারী গলায় প্রশ্ন করল।

তোমার জন্যে। বড় ভয় করছে কেন যেন। একটু শোও না আমার কাছে। কল্যাণী পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজল। শিবনাথ তার মাথায় গায়ে হাতটা ছড়িয়ে দিল, সম্মোহিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। এদিকে অন্নদা অশরীরী একটা ছায়ার মত পা টিপে

টিপে সিঁড়ি থেকে দেখল এক সময়, তার পর নিজের ঘরে গিয়ে অনেক দিন পর আরামে ঘুমিয়ে পড়ল বুড়ী।

সকালবেলায় আচমকা উঠে বসল কল্যাণী। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল, যেন কি একটা তীব্র গন্ধে একেবারে অচেতন হয়ে পড়েছিল। রাত্রের ঘটনাটা যাচাই করতে লাগল ঘরের এ পাশ ওপাশ তাকিয়ে। স্বামী নেই। কিন্তু ভুল নয়, শরীরের উপর তার স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে এখনও। পরক্ষণেই হতভম্ব হয়ে গেল কল্যাণী, সর্বাঙ্গের একটি গয়নাও নেই। চুড়ি কঙ্কণ, হার, কানপাশা।

তেমনি বোবার মত বসে রইল। অলস দেহ, দেবতার দেওয়া আশীর্বাদের গুরুভার তার উপর, নড়তে ইচ্ছে করে না রক্তমাংসের প্রতিটি প্রাণকে যে শিবনাথের গৌরব বহন করছে, সেই শিবনাথই তাকে নিরাভরণ করে গেল। তা হোক, যা নিয়ে গেছে, সেটা মেকী, যা দিয়েছে, তাই শাশ্বত। চাকাটা কেড়ে ফেলে নেমে গেল।

অন্নদা বোধ হয় ইতিমধ্যেই মোহিনী দেবীকে সংবাদটা পরিবেশন করে পুলকিত করে তুলেছিল, কল্যাণীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে তিনি বলে উঠলেন, এ কি বৌমা, গায়ের গয়নাগুলো খুললে কেন সকালবেলায় ?

গলাটা একটু কেঁপে উঠল কল্যাণীর। দৃষ্টি নত করে বলল, আপনার ছেলে কাল এসে গয়নাগুলো নিয়ে গেছে মা।

নিয়ে গেছে। চলে গেছে নাকি

তিনি আবার বিয়ে করেছেন কিনা। সেই মেয়েটির বড় অসুখ, বিশেষ দরকার টাকার।

অন্নদা এবং মোহিনী দেবীর পায়ের কাছ দিয়ে যেন একটা গোখরো সাপ ছুটে গেল, এমনি ভয়ার্ত মুখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। কল্যাণী ধীরে ধীরে চলে গেল পূর্ণ শান্ত মুখে।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমল করছে আবার আকাশ। দুপুরবেলায় খোকার পায়ের দিকটা রাধের উপর রেখে কল্যাণী সস্নেহ নয়নে ছেলেকে দেখছিল সিঁড়িতে অপরিচিত পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল। উল্লসিত হয়ে উঠে দাঁড়াল—কি ভাগ্যি আমার, বিমানদা তুমি এসেছ।

কল্যাণী হাসিমুখে পায়ের ধুলো নিল। বিমান বলল, তোমার কাকীমা যে এদিকে ভেবে সারা। মাসখানেক হ'ল চিঠিপত্র দেওয়া নেই, ব্যাপার কি ?

তা না হলে তুমি বুঝি আসতে না ?

সেইখানেই মাটির ওপর বসে পড়তে পড়তে বিমান বলল, ঠিক শিবনাথের মত দেখতে হয়েছে যে। সে কোথায় ?

কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না যে বড়। বা রে, আমাকে আর দেখতে আসতে ইচ্ছে করে না, না ? ব্যবস্থা করে দিয়ে বোধ হয় বেঁচেছ।

ঠোঁটের উপর ঈষৎ হাসি ভেসে উঠল বিমানের, তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ কল্যাণী, তোমার ব্যবস্থার জন্যে আমার ব্যবস্থাটাই বাতিল হয়ে গেল।

কল্যাণীও হেসে ফেলল, বেচারা নবকুমার। তা এখনও হ'ল না কেন শুনি ?

সে অনেক কথা।

তার মানে ?

মানে, কার মত একটি মেয়ে না হলে এখন ছেলের মায়ের আর পছন্দই হচ্ছে না। তবে বোধ হয় এবার হয় হয়।

কার মত

যে জিজ্ঞেস করছে, তাকে জিজ্ঞেস কর।

অনেক কথা যেন জড়ো হয়ে এল একসঙ্গে, কিন্তু প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে কল্যাণী বলল, অনেক দিন অনেক দিন কেন, অনেক মাস পরে এলে তুমি এবার বিমানদা। কাকীমা, কাকাবাবু ভাল আছেন ত ?

হ্যাঁ। কিন্তু তোমাদের খবর বলো ত। আমার চিঠির উত্তর দাও নি কেন ? তোমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বড্ড, অসুখ করেছিল না কি ?

অসুখ ? না না, তুমি তাকে অন্য রকম করে দেখলে

কল্যাণীর মুখ থেকে শরীরের দিকে চোখ বুলিয়ে বিমান পুনরায় প্রশ্ন করল, শিবনাথ কোথায় মাসীমা

কল্যাণী চোখ নত করে জবাব দিল, মায়ের মস্ত অসুখ গেল একটা, বিশেষ চলাফেরা করতে পারেন না এখন আর তিনি মিবালিনী একটি মেয়েকে নিয়ে আর এক জায়গায় বাস করছেন।

তবে যে গতবার আমাকে বললে সে কোথায় আছে, পরীক্ষা দিচ্ছে ?

কল্যাণী অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উদাস স্বরে বলল, নিজের দুঃখের কাহিনী তোমাদের বলে আর কষ্ট দিতে চাই নি বিমানদা। তুমি বস, একটু শরবত করে এনে দি।

বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল বিমান। আবেগরুদ্ধ হয়ে এসেছিল কল্যাণীর গলাটা, তাই বোধ হয় তাড়াতাড়ি চলে গেল একটা কাজের অছিল করে। এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু একবারও জানায় নি তাদের। দুঃখের ভাগ আর দিতে চায় নি। অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে চিরটা কাল এমনি একা সহ্য করে এসেছে সব বিপর্য্যয়। কিন্তু কত আর সহ্য করতে পারে সামান্য একটা মানুষ। শুকনো, নিষ্করুণ শীতের বাতাসে জীর্ণ দেহের রক্তমাংস ক্ষয় হয়ে গেছে, চামড়ায় ঢাকা হাড়ের কঙ্কাল প্রকট হয়ে উঠেছে তাই। শেষ মাঘের পত্রহীন গাছের মত লাবণ্যহীন হয়ে উঠেছে কল্যাণী। আশ্চর্য্য। তবু এখনও হেসে বলেছে, আমার কিছুই হয় নি ত। সেই বাড়ীতে একটি শ্যামলশ্রী মেয়ের ঝরঝরে কথাগুলি মনে পড়ে বিমানের, সংযত অভিসারিকার সেই

নানা রূপে আত্মপ্রকাশ। কিছু বলা, অনেক না বলা। কিন্তু অন্তরের মহিমা গৌরবে জলন্ত সব সময়। আর আজ!

মিনিট কয়েক পরেই কল্যাণী ফিরল, বিমানের হাতে গেলাসটা দিয়ে বলল, এইটুকু খেয়ে নাও। তার পর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে বিমান গেলাস হাতে, কল্যাণী উজ্জ্বল ভাবে হেসে খোকার ওধারে বসে পড়ল, কি দেখছ? খাও।

খাই।

কি হ'ল বলত তোমার বিমানদা? কথা বলছ না যে?

অপরাধীর মত চুপ করে রইল বিমান।

কল্যাণী তাকে বোধ হয় সহজ করবার চেষ্টা করে এবার বলল, তোমারও চেহারাটা কি হয়েছে, জান না বোধ হয়?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে হাসল বিমান, বলল, তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, কল্যাণী। আমি তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারি নি।

মুক্ত হাতটা প্রসারিত করে কল্যাণী সেই আগেকার স্বরে বলল, বাইরে থেকে দেখতে বোধ হয় একটু রোগা হয়ে গেছি। কিন্তু সত্যিই আমি ভাল আছি বিমানদা।

ভাল আছ! গম্ভীর হয়ে গেল বিমান, ঝলসে গেছ, ঝরে গেছ।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কল্যাণী, দোহাই তোমার, এ সব কোনও কথা যেন আর বাহাদুরি করে কাকীমাকে শুনিও না।

বিমান হঠাৎ বলে বসল, তবে আমার সঙ্গে চল তুমি।

তোমার সঙ্গে আবার কোথায় যাব?

কেন? আমাদের ঘরে।

যাব বৈ কি বিমানদা। আগে বৌদি আসুন, তার পর দেখতে যাব।

পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে ছিল কল্যাণী, বিমান ধীরে ধীরে চোখ তুলতেই নেমে এল আবেগময় সে দৃষ্টি। একমনে হাত পা ছুড়ে খেলছিল ছেলে, বিছানাটা একটু এগিয়ে ধরে বলল, দেখ, দেখ বিমানদা, খোকা কেমন মিটিমিটি হাসছে!

বলে কল্যাণী নিজেও হাসল। একটি সবুজ পাতা নিয়ে নতুন কাঞ্চনের গাছ যেমন হাসে।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

বৌদ্ধদর্শনে যাহারা বিজ্ঞানবাদী তাহাদের অপর একটি নাম যোগাচারী। কারণ এই মতের পোষকগণ বোধিপ্রাপ্তির জন্য 'যোগ' ও বোধিসত্ত্বের ভূমিনিচয়ের মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য অনুষ্ঠান বা 'আচার'-এর উপর বিশ্বাসশীল ছিলেন। সাধারণ মতে অসঙ্গকে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানা গেলেও বাস্তবিকপক্ষে মৈত্রেয়নাথ ইহার সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই অসঙ্গ অপেক্ষা প্রাচীনতর বিজ্ঞানবাদের স্থাপক বলা যাইতে পারে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অসঙ্গ তাঁহার প্রতিভার শক্তিতে মৈত্রেয়নাথকে ম্লানপ্রতিভ করিয়াছিলেন বলিয়াই অসঙ্গকে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধুকে বলা হইত দ্বিতীয় বুদ্ধ; তাঁহার সময়ে বিজ্ঞানবাদ দার্শনিক মতবাদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। অসঙ্গ তাঁহার মহাযানসম্পরিগ্রহশাস্ত্রে যোগাচার মতবাদের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে—১। আলয়বিজ্ঞান সকল জীবের মধ্যে বর্ত্তমান। ২। জ্ঞান ত্রিবিধ—মায়োপম, আপেক্ষিক ও পারমার্থিক। ৩। বাহ্য জগৎ ও জ্ঞাতা (subjective ego) আলয়েরই বহিঃপ্রকাশ। ৪। ছয় প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব (perfection)। ৫। দশ প্রকার বোধিসত্ত্বের মধ্য দিয়া বুদ্ধত্ব অর্জন করা যায়। ৬। মহাযান হীনযান অপেক্ষা প্রশস্ততর, ব্যাপক বলিয়া অনেক ভাল। ৭। বুদ্ধদেহ ধর্ম্মকায়ের সহিত একীভূত হওয়া হইল জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ৮। বস্তু ও ব্যক্তির দ্বৈতভাবের অবসান ঘটাইয়া চিৎস্বরূপের (Pure consciousness) সহিত ঐক্যসাধন করাইতে হইবে। ৯। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে নির্ব্বাণ ও সংসারের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ১০। যাহা সংসারের দৃষ্টিতে নির্ম্মাণকায়া তাহাই বাস্তবিকপক্ষে ধর্ম্মকায় অর্থাৎ বুদ্ধদেবের চিদ্রূপ স্বরূপ।

বিজ্ঞানকে প্রথমতঃ প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞানরূপে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানকে আবার সাত ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—সর্ব্বাস্তিবাদীদের চক্ষু, ঘ্রাণ, শ্রোত্র, জিহ্বা, কায় ও মন বিজ্ঞানকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার উপর বিশিষ্ট মনবিজ্ঞান বলিয়া সপ্তম একটি বিজ্ঞান ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সপ্তমটি মনবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞানের সেতুস্বরূপ—প্রথম পাঁচটি দ্বারা বস্তুর কল্পনা হয়, মনবিজ্ঞান দ্বারা তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় এবং বিশিষ্ট মনবিজ্ঞানের মাধ্যমে বস্তু সম্বন্ধে হয় অনুভূতি এবং

ইহাদের সকলের পশ্চাতে আছে চিত্ত বা আলয়। লঙ্কাবতার সূত্রে বলা হইয়াছে—

চিত্তেন চীয়তে কর্ম্ম মনসা চ বিধীয়তে।

বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানাতি দৃশ্যং কল্পেতি পঞ্চভিঃ ॥ (পৃঃ ৪৬)

লঙ্কাবতার সূত্রে আলয়বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা শাশ্বত, স্থির, অপরিণামী জ্ঞানের বা চৈতন্যের আলয়স্বরূপ।

ইহা বস্তু-ব্যক্তিরূপ দ্বৈতভাবের উপরে বর্ত্তমান (গ্রাহ্যগ্রাহক-বিসংযুক্ত) ; ইহা উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গবিরহিত (উৎপাদস্থিতিভঙ্গ-বর্জ্জ্য)। ইহার মধ্যে কল্পনার প্রপঞ্চ নাই (বিকল্পপ্রপঞ্চরহিত) এবং পূর্ণ নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারাই ইহাকে জানা যায় (নিরাভাস প্রজ্ঞাগোচর)। আলয়বিজ্ঞানের মধ্যে অবিদ্যা কর্ত্তৃক যে অবিরত প্রেরণা দেওয়া হয়—যাহাতে আলয় গ্রাহ্যগ্রাহকরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহাই হইল সৃষ্টির মূল কারণ। এই প্রেরণার আশ্রয় ও বিষয় হইল আলয় স্বয়ং। অনাদি এই প্রেরণা হইতে বহুত্ব জ্ঞানের উদয় হয় (অনাদিকাল প্রপঞ্চ দৌষ্ঠুল্যবাসনা)। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বাহ্যবস্তুর ন্যায় আলয়ের বহিঃপ্রকাশমাত্র। ইহা আলয়ের সহিত একও নয়, বিভিন্নও নয়—যেমন একটি মৃৎপিণ্ড ধূলিকণার সহিত একও নয়, বিভিন্নও নয়; যদি আলয়কে বলা হয় সমুদ্র তাহা হইলে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইল সমুদ্রের তরঙ্গ। যেমন বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া ঢেউগুলি সমুদ্রের উপর নৃত্য করে সেইরূপ অনেক প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বস্তুরূপ বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া আলয়ে নৃত্যরত হয়। লঙ্কাবতারে এই কথাই বলা হইয়াছে—

আলয়ৌঘস্তথা নিত্যো বিষয়পবনেরিতঃ।

চিত্রৈস্তরঙ্গবিজ্ঞানৈর্নৃত্যমানঃ প্রবর্ত্ততে ॥

অসঙ্গ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, জগতের সমুদয় পদার্থ আপেক্ষিক (relative) বলিয়া ক্ষণিক। আর ক্ষণিক না হইলে ইহার উৎপত্তিই সম্ভবপর নয়। নদীর জল সর্ব্বদাই প্রবহমাণ। কিন্তু তত্ত্ব সর্ব্বদাই শাশ্বত। তত্ত্ব অসঙ্গের মতে অদ্বয়। বাস্তবিক ভাবে বলিতে গেলে বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই। তবুও সংবৃত সত্যের দিক হইতে বিচার করিয়া আমরা বলিয়া থাকি যে, সুকর্ম্মের দ্বারা বন্ধনমুক্তি হয়—তাই মহাযান-সূত্রালঙ্কারে বলা হইয়াছে—

ন চান্তরং কিংচন বিদ্যতেঽনয়োঃ সদর্থবৃত্ত্যা শমজন্মনোরিহ।

তথাপি জন্মক্ষয়তো বিধীয়তে শমস্য লাভঃ শুভকর্ম্মকারিণাম্ ॥

যোগাচারী বৌদ্ধগণ বিভিন্ন বিহার ও ভূমির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন। যেমন অগ্নি সুবর্ণকে পরিশুদ্ধ ও ভাস্বর করে সেইরূপ এই ভূমি ও বিহার বোধিসত্ত্বকে শুদ্ধ করে।

বিংশতিকায় বলা হইয়াছে যে, চিত্তার বহির্ভূত ত্রিজগৎ অবস্থান করিতে পারে না। মন, চিত্ত, চৈতন্য, জ্ঞান সমপর্য্যায়ের। লোকে যেরূপ ভ্রমবশতঃ এক চন্দ্রের স্থলে দুইটি চন্দ্র দেখে, কিন্তু মূলতঃ চন্দ্র একটিই, সেইরূপ বাহ্যজগৎ ভ্রমবশতঃ আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্নে যেরূপ সুবর্ণনগরীর প্রাসাদাদির জ্ঞান হয়—যদিও বাস্তবিকপক্ষে ইহাদের অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ বাহ্যজগৎও অস্তিত্বহীন। চৈতন্যই নিজকে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা (subject-object) রূপে বিভক্ত করে। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দুই প্রকারের—প্রথমটি হইল ক্লেশাবরণ, যাহার জন্য আমাদের সকল দুঃখ উৎপন্ন হয়। অপরটি হইল জ্ঞেয়াবরণ—যাহা আমাদের নিকট হইতে বস্তুর স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে। তত্ত্ব চৈতন্যস্বরূপ। এই তত্ত্ব (বিজ্ঞপ্তিমাত্র) নিজের শক্তিবলে ত্রিপ্রকার বিকৃতি ধারণ করে। ইহার প্রথম হইল আলয়বিজ্ঞান বা বিপাক—যাহা সমস্ত চৈতন্যের আগার স্বরূপ। এই আলয়বিজ্ঞান আবার মন ও বিষয়বিজ্ঞান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই তিন প্রকার বিজ্ঞপ্তির মূলে আছে পূর্ণ ও পবিত্র জ্ঞান (বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্র)।

শূন্যবাদের পরমার্থকে বিজ্ঞানবাদে বলা হয় 'পরিনিষ্পন্ন' এবং শূন্যবাদের 'সংবৃতিসত্যকে' বিজ্ঞানবাদে পরতন্ত্র ও পরিকল্পিতরূপে দু'ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যখন বাহ্য জগতের অসত্যত্ব অনুভূত হয়, তখন বসুবন্ধুর মতে কর্ত্তাও (subject) অসত্য হয়, কারণ—কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরস্পরসম্বদ্ধ বা আপেক্ষিক বলিয়া একের অবর্ত্তমানে অন্য থাকিতে পারে না। যখন এই কর্ত্তা-কর্ম্ম সম্পর্কের ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায় তখন সামঞ্জস্যপূর্ণ পরমার্থ (Absolute) লাভ হয়। পরমার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে—'তত্ত্ব-চিৎস্বরূপ' এইরূপ বাক্যও অসত্য, কারণ—ইহা জ্ঞানের অংশবিশেষ।

সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা করা হয় যে, বিজ্ঞানবাদে বাহ্য জাগতিক পদার্থের সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই জগতের পদার্থ ক্ষণিক বিজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনা হইতে স্পষ্টতর প্রতীতি হইবে যে, বিজ্ঞানবাদীদের মতে ক্ষণিকত্ববাদ জগতের পদার্থ-বিষয়ক। এই ক্ষণিকত্ব তত্ত্বকে (Reality) স্পর্শ করিতে পারে না।

ছোউ নৃত্যের ঐতিহ্য

শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
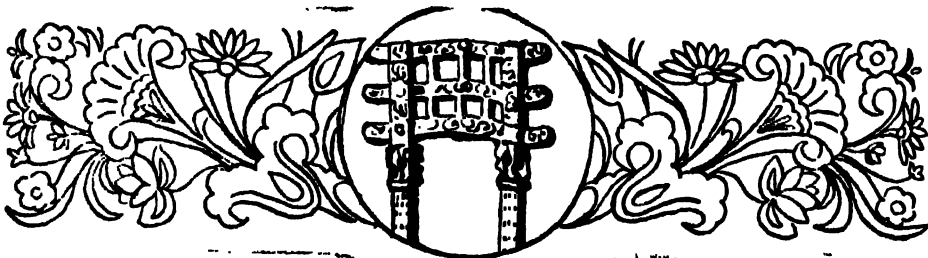
ছোউ নৃত্যের মূল ভিত্তির সন্ধান নিতে কিছুদিন পূর্বে সেরাই-কেলাতে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। স্থানটি টাটা-নগরের পরের ষ্টেশন সিনির সাত মাইল দূরে। স্থানীয় যে ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উক্ত নৃত্যের বিকাশ তার মধ্যে প্রাচীন বাংলার এক অবলুপ্ত সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছি।

ছোউ নৃত্যের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পরিবেশের মধ্যে বাংলার গাজন উৎসবের প্রক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বলা চলে যে, ছোউ ও গাজন উভয় পর্বেরই নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে চৈত্র মাসের শেষ। দ্বিতীয়তঃ, সেরাইকেলাতে এই সময়ে ছোউ নৃত্যের মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় তার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছেন শিব বা নটরাজ এবং বাংলায় গাজন বা চড়কপূজার যে বিধি লক্ষ্য করা যায় তারও প্রাণকেন্দ্র শিব।

বাংলার এই পর্ব ধর্মঠাকুর নামে আর্য ও অনার্য উভয় পদ্ধতির সমাবেশে এককালে রূপগ্রহণ করে। ধর্মঠাকুরের পূজা বহুকাল পূর্বে বাংলার সর্বত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে তা ভাগীরথীর দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত রাঢ় অঞ্চলেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। সেরাইকেলা বাংলার এই অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত এবং সেই কারণে উক্ত ধর্মানুষ্ঠানের প্রভাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার
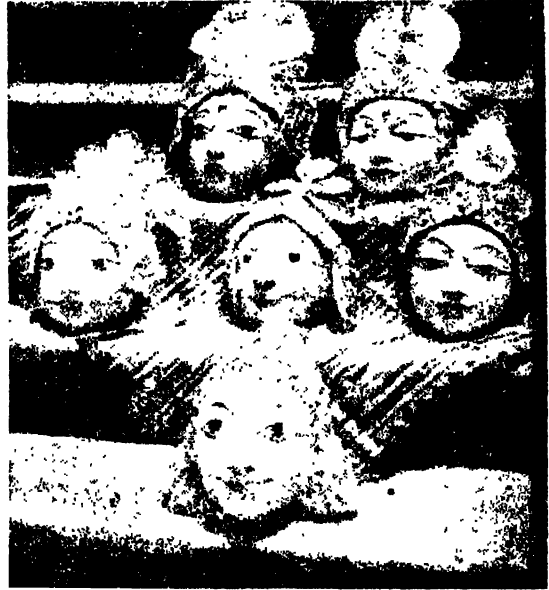
নয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, স্থানবিশেষে ধর্মঠাকুরই শিব বা বিষ্ণু আখ্যায় পরিগণিত হতেন এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিকেরা

তৃতীয়তঃ, বাংলার ধর্মের গাজনের মুখোশ পরে, মৃতদেহ বা মড়ার মাথা নিয়ে নাচ ও গানের প্রথা ছিল। উত্তর রাঢ়ে এই নাচকে বলা হ'ত "পাতা নাচ" বা "পাত্রনৃত্য"। সেরাইকেলাতেও অনুরূপ ধারার সন্ধান পাওয়া যায় ছোউ নৃত্যের মুখোশ ব্যবহারে।

অনেকের বিশ্বাস, ছোউ কথাটি ছাউনির অপভ্রংশ। বহু পূর্বে পাইক বা সৈন্যেরা ছাউনি খাটিয়ে তার তলায় অবসর-বিনোদনের জন্য যে নৃত্যের অবতারণা করত তা থেকেই

ছোউ নৃত্যের সঙ্গে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র, পশ্চাতে শ্রীবনবিহারী পটনায়ক

পরবর্তীকালে ছোউ নৃত্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু সৈন্যদের ব্যক্তিগত জীবনের খানিকটা রূপায়ণ যদি নৃত্যে স্বীকার করে নেওয়া যায় তা হলে বীরত্বব্যঞ্জক প্রকাশভঙ্গী অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছোউ নৃত্যে বীরত্ব ছাড়া সুকুমার ভাবধারারও যথেষ্ট স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই কারণে মনে হয় ছাউনি সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা ভ্রান্ত। অবশ্য সেরাইকেলায় তরবারি-হস্তে এক প্রকার নাচের প্রচলন আছে যার নাম "ফরিংগুা"। কিন্তু সুকুমার ভাবধারায় পুষ্ট ছোউ নৃত্যের কাছে এই বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গির প্রসার দিন দিনই কমে আসছে।

খরকাই নদীতটবর্তী শিবমন্দির—যাত্রাঘাটের যাত্রা এখান হইতে শুরু হয়

অনেকে মনে করেন, সংস্কৃত শব্দ "ছায়া" থেকে ছোউ-এর উৎপত্তি। নামকরণের মূলে যে কারণই থাকুক না কেন, বর্তমানে ছোউ বলতে মুখোশ ছাড়া আর অন্য কিছু বোঝায় না। মুখোশ-পরিহিত নাচের মধ্যে ছোউয়ের স্থান যে সর্বাগ্রে সেকথা জোর গলায় বলা চলে। উত্তরপ্রদেশের রামলীলা এবং দার্জিলিঙের প্রেত-নৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার আছে, কিন্তু সে সব মুখোশে ছোউয়ের মত উন্নত ও রুচিসম্মত নির্মাণপদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নৃত্যেও মুখোশের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তা পুরোপুরি মুখোশ নয়। মুখমণ্ডলকে "মেক-আপের" সহায়তায় মুখোশের মত রূপ দেওয়া হয়।

ছোউ নৃত্যের মুখোশ তৈরি হয় মাটি ও ন্যাকড়ার সাহায্যে। সেরাইকেলার অতি প্রাচীন শিল্পের রীতি এই মুখোশ। মৃৎশিল্পের দান নিয়ে নৃত্যপদ্ধতির বিকাশ—আমার মনে হয়, শুধু সেরাইকেলাতেই সম্ভব হয়েছে। মুখোশ প্রথমে তৈরি হ'ত কাঠ খোদাই করে। পরে সম্ভবতঃ ওজনে হাল্কা করার জন্য টুকরি আকারযুক্ত বাঁশের কাঠির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে মুখোশ তৈয়ার করা হ'ত। তারও পরে লাউয়ের শুকনো খোলার সাহায্যে এ কাজ করা হ'ত। বর্তমানে মুখোশ তৈরি হয় কাগজ, ন্যাকড়া এবং তার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে। এই মুখোশ নির্মাণের পদ্ধতি হচ্ছে আগেকার আমলের চশমার মত কানের পাক দিয়ে সুতার টানা লাগানো। মুখোশের সঙ্গে কৃত্রিম চুল বা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করায় এই সুতার টানা ঢাকা পড়ে যায়। নৃত্যশিল্পীর যাতে দৃষ্টিবিভ্রম না ঘটে তার জন্য প্রত্যেক মুখোশে চোখের মণির স্থানটিতে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিদ্র করা থাকে।

ওজনে হাল্কা হলেও নৃত্যশিল্পীর পক্ষে বেশীক্ষণ মুখোশ ধারণ করা সম্ভব নয় এবং সেই কারণে ভারতীয় নৃত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে সময়ের যে ব্যাপ্তির সন্ধান পাওয়া যায়, ছোউ নৃত্যে তা সম্ভব নয়। অল্প সময়ের পরিসরে একক নৃত্যই হচ্ছে ছোউ নৃত্যের ধারা। অবশ্য নৃত্যনাট্য শ্রেণীর অন্তর্গত, এক সঙ্গে একাধিক শিল্পীর অভ্যাগম যে ছোউ নৃত্যে একেবারেই নাই সেকথা বলা চলে না। শ্রীদুর্গানৃত্যে একাধিক শিল্পীর আবির্ভাব এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। তা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ছোউ প্রধানতঃ একক নৃত্য এবং তাতে পুরুষরাই সর্বক্ষেত্রে এ যাবৎ অংশ গ্রহণ করে আসছেন।

রাজরাজড়ার পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট হলেও ছোউ নৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া কঠিন। তবে রাজাসাহেবের মুখে শুনলাম, ষোড়শ শতাব্দীতে সেরাইকেলা রাজ্যের ভিত্তি পত্তন হয় এবং সেই সময় থেকেই মুখোশযুক্ত নৃত্যের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা—শৈবমতের পরবর্তী যুগে ছোউ নৃত্যের উদ্ভব হয়। শিবপূজার বিধি নৃত্যপ্রচেষ্টার মধ্যে কতকটা থাকার দরুন এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নাচের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায়, শৈবমতের বাইরেও বহু নৃত্য-পরিকল্পনা এই নাচে স্থান পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে

পারে—শ্রীরাম, পরশুরাম, মধুকৈটভ,শ্রীদুর্গা, মহিষাসুর, চণ্ডী, কালী, চন্দ্রভাগা (সূর্যদেবের প্রণয়িনী), দুর্যোধন, শ্রীকৃষ্ণ, কালীয়দমন, শিকারী, নাবিক, ময়ূর, সাগর, ফুলবসন্ত ইত্যাদি।

নাচের বিষয়বস্তু অনুযায়ী এসব নাম থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পৌরাণিক ও কাল্পনিক চিন্তাধারাকে আশ্রয় করেই এগুলি প্রসারলাভ করেছে। ছৌউ নৃত্যকে অনেকে পল্লীনৃত্যের সমস্তরের মনে করেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তার বহু ঊর্ধ্বে এ নৃত্যের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পল্লীনৃত্যের সমমাত্রিক ছন্দ এবং একই দেহভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি ছৌউ নৃত্যে স্থান পায় নি। নানা ছন্দ, নানা তাল, নানা ভঙ্গি এ নৃত্যের প্রাণ। নাচের নাম ও তালের প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। যথা : আরতি নাচ—সুরফাঁক তাল (১০ মাত্রা), হরপার্বতী নাচ—দাদ্‌রা তাল (৬ মাত্রা), সবার বা শিকারী নাচ—চৌতাল (১২ মাত্রা), চন্দ্রভাগা নাচ—ত্রিতাল (১৬ মাত্রা), ফুলবসন্ত নাচ—ঝাঁপতাল (১০ মাত্রা), নাবিক নাচ—যৎ তাল (৭ অথবা আট মাত্রা), ভূপস্তিমনোরঞ্জন নাচ—ধামার তাল (১৪ মাত্রা)। নাচ আরম্ভ হয় অপেক্ষাকৃত ঢিমা লয়ে, তখন তালের বোল স্পষ্ট রাখা হয়। কিন্তু পরে দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ে যখন দ্বিগুণ ও চৌগুণ গতিতে তাল বাজতে থাকে তখন পবন ও ছন্দপ্রধান কতকগুলি কর্তব্যের অবতারণা করা হয়—যা তবলা বা পাখোয়াজী বোলের ধারা মেনে চলে না। এসব বোল সম্ভবতঃ স্থানীয় বাজনদারদের তৈরি এবং এরই সংস্পর্শে এসে নাচের ছন্দ বিচিত্র আকারে ফুটে উঠে।

ছৌউ নৃত্যে নূপুর ব্যবহৃত হয় কিন্তু মুখমণ্ডল মুখোশ দ্বারা আবৃত থাকায় মুখভঙ্গিমা প্রকাশের কোনও অবকাশ নাই। এই অপূর্ণতা অতিক্রম করার জন্তই মনে হয় দেহ-ভঙ্গিমা ও পদসঞ্চালনের মধ্যে বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়েছে। সেরাইকেলার গুণীমহলের ধারণা এসব দেহভঙ্গিমা ও পদ-সঞ্চালন ভরত মুনিকৃত ভরতনাট্যমেরই অনুরূপ। শিক্ষার্থী প্রথমে কতককলি প্রাথমিক ভঙ্গিমার সাহায্যে নৃত্যচর্চা সুরু করে এবং সেগুলিকে "উপলয়" বলা হয়। উপলয়গুলি আয়ত্ত করে পুরোপুরি আকারের শিল্পী হতে হলে ছয় থেকে সাত বৎসর সময় লাগে। সেরাইকেলায় গিয়ে স্থানীয় কয়েক-জন শিল্পীর নাচ দেখে আমার মনে হয়েছে যে, ছৌউ সত্যই একটি পরিবর্ধনশীল নৃত্যপদ্ধতি এবং তাতে নৃত্যশিক্ষকদের গভীর চিন্তার বিকাশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিরই সন্ধান দিয়ে এসেছে।

নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলি ছৌউ নৃত্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়—ধাংশা বা নাগারা, ঢোল, টৌসা বা চর্চরী, মৃদঙ্গ (শুধু রঙ্গমঞ্চের অনুষ্ঠানে), মুহুরী বা সানাই, শিঙ্গা, মদনভেরী, মন্দিরা, করতাল ও বাঁশী। বর্তমান কালের ছৌউ নাচের অনুষ্ঠানে অবশ্য নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি অবিকৃত ধারার পরিপোষক নয়।

সেরাইকেলা রাজপ্রাসাদের একাংশ—সম্মুখের প্রাঙ্গণে ছৌউ নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়

নৃত্যের সঙ্গে গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত নাই। নাচের বিষয়বস্তু অনুযায়ী রাগরাগিণী বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়, যেমন ফুলবসন্ত নাচে বাহার, চন্দ্রভাগা নাচে সাবেরী ইত্যাদি। এই ধরনের রাগরাগিণীযুক্ত যন্ত্রসঙ্গীতের বিন্যাস ছৌউ নৃত্যের একটি বিশেষ আকর্ষণ এবং সেই কারণে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের পটভূমিকায় ছৌউ নৃত্যের বিচার হওয়া প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিক ভাবে ছৌউ নৃত্যের অনুশীলন সেরাইকেলাতে বহুকাল থেকেই প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসের শেষ চার দিন এই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান সময় এবং সেই কারণে এই নাচকে অনেকে চৈত্রপর্ব নামে অভিহিত করেন। মূল অনুষ্ঠানের তের দিন পূর্ব থেকে প্রত্যহ নৃত্যানুরাগী ভক্তবৃন্দ শহরের কেন্দ্রস্থিত শিবমন্দির হতে নির্গত হয়ে খরখাই নদীতটে মাজনা ঘাটের পার্শ্বে অবস্থিত অন্য একটি শিবমন্দিরে যায় এবং স্থানান্তে পূর্বোক্ত মন্দিরে নটরাজের প্রতীক হিসাবে একটি পতাকা বহন করে আনে। সমস্ত পথটি বাদ্য ও সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠে। তারপর ভক্তবৃন্দ যায় রাজপ্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত একটি বিশেষ অঙ্গনে। চৈত্রের পঁচিশে তারিখ অবধি প্রতিদিন চলে এই সুরের মিছিল।

তারপর সুরু হয় "আখড়া-মাড়া" বা নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। রাজপ্রাসাদের পার্শ্বস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নটরাজের পতাকা প্রোথিত করে তারই সামনে চলে 'আখড়া-মাড়া'র অনুষ্ঠান। সেই রাতেই "যাত্রাঘটে"র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় সত্যকারের নৃত্যানুষ্ঠান। উপরোক্ত মাজনা ঘাট থেকে জল-

পূর্ণ মাঙ্গলিক ঘট বা যাত্রাঘট, লাল পোশাক-পরিহিত এক ভক্ত কর্তৃক রাজপ্রাসাদ ও তৎপরে শহরের মধ্যস্থিত শিব-মন্দিরে নীত হয়। ঘট ও ঘটবহনকারী উভয়েই যাত্রাঘট নামে পরিচিত এবং শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে তাদের গণ্য করা হয়। যাত্রাঘটের আগমনের সঙ্গে সানাই, নাকাড়া, ঢোল ইত্যাদি এক বিশেষ ছন্দে বেজে উঠে। তার পর যে

ছোউ নৃত্যের প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী রাজকুমার শ্রীশুদ্ধেন্দ্রনারায়ণ সিং দেও

নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয় তারই নাম ছোউ। এই অনুষ্ঠানে উচ্চনীচের কোনও ভেদাভেদ নাই। সকলেই এতে সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। শহরের প্রধান নৃত্যকেন্দ্র বা আখড়া থেকে আগত শিল্পীরাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অংশ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বা পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানের নাম বৃন্দাবনী। প্রথমে বানরাকৃতিধারী একটি মানুষ নৃত্যের ছন্দে শহর প্রদক্ষিণ করে রাজপ্রাসাদের নৃত্যাঙ্গনে আসে এবং তার পর সারারাত্রি ধরে চলে ছোউ নৃত্যের বিভিন্ন আসর। রাবণের মধুবন বিনাশ করে উক্ত বানরের আগমন সেরাইকেলার শিশুমহলের এক বিশেষ আকর্ষণ। নাচের মাধ্যমে মধুবন বিনাশের উল্লাস যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে!

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানের নাম "গরিয়াভর"। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের বিরহ-মিলন এ নৃত্যানুষ্ঠানের বিষয়বস্তু।

চতুর্থ বা শেষ রাত্রির অনুষ্ঠান "কালিকাঘট" বা "কামনাঘট" নামে পরিচিত। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধ পথ দিয়ে আসে এই মাঙ্গলিক ঘট এবং তাতে "কামনা" বা আশার বারি সিঞ্চিত থাকে। পূর্বোক্ত যাত্রাঘটের সম-পর্যায়ের এই অনুষ্ঠান। পার্থক্য শুধু এই যে, ঘটবহনকারী ভক্ত লালের বদলে কালো পোশাক ও রূপসজ্জা গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য—কালিকা বা কালীমাতার আবির্ভাব ঘোষণা করা। যাত্রাঘটে যে নৃত্যানুষ্ঠান সুরু হয় কালিকা বা কামনাঘটে তার পরিসমাপ্তি হয়।

সর্বশেষে, ছোউ নৃত্যের প্রখ্যাত শিল্পীদের সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি, কারণ তাঁদের সার্থক সৃষ্টির ফলেই ছোউ আজ ভারতের গর্বের বস্তু। পূর্ববর্তীকালে নিম্নলিখিত শিল্পীবৃন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—নারায়ণ দাস, বিভাধর ছল্লা, উপেন্দ্র বিসওয়াল, নন্দীঘোষ সাহু, দীনবন্ধু ব্রহ্ম, হরিহর সিং এবং রাজেন্দ্র পট্টনায়ক। পট্টনায়কবংশীয় প্রথম শিল্পী পীতাম্বর তিনপুরুষ পূর্বে উপেন্দ্র বিসওয়ালের সহযোগিতায় এক নৃত্যকেন্দ্র খোলেন। উপেন্দ্র পরে ময়ূরভঞ্জ দরবারে চলে যাওয়ায় তাঁরই ছাত্র রাজেন্দ্রর (উপেন্দ্রের পুত্র) উপর নৃত্যকেন্দ্র পরিচালনার ভার পড়ে। আজ সে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক বনবিহারী পট্টনায়ক (রাজেন্দ্রের পুত্র)। রাজেন্দ্র পট্টনায়কই হচ্ছেন ছোউ নৃত্যের প্রকৃত প্রাণদাতা এবং তাঁরই প্রভাবে সেরাইকেলা রাজপরিবারে ছোউ নাচের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। তারই ফলে কুমার শুভেন্দ্র, হীরেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র ও শুদ্ধেন্দ্র প্রমুখ রাজবংশীয় শিল্পীদের আবির্ভাব ছোউ নৃত্যকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথেই চালিত করেছে। রাজপরিবারের চেষ্টায় ছোউ নৃত্য পাশ্চাত্যেও পরিবেশিত হয়েছে এবং সেখানে এই নৃত্য যে সমাদর লাভ করেছে তাতে একথাই মনে হয় যে, ভারতবাসীর কাছে এ নৃত্য রীতিমত গর্বের জিনিষ।
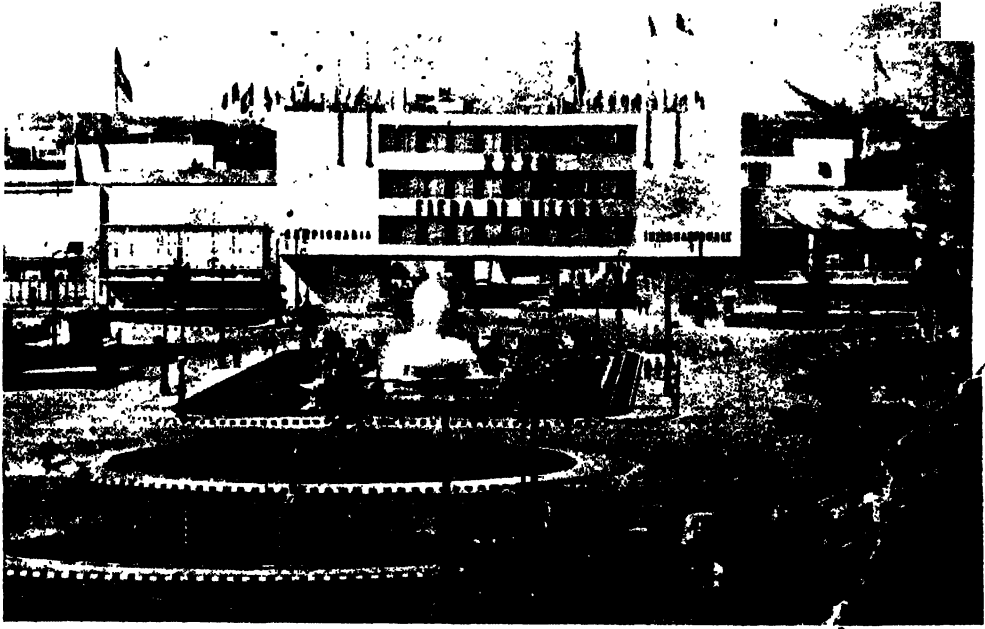
'মিলান ফেয়ারে'র প্রবেশ-পথ

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

সাত

২ই এপ্রিল '৫৪। ইটালী দেশটা ট্যুরিষ্টদের কাছে স্বর্গ—এ কথাটা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ানোর যাদের সখ আছে অথবা লোভ আছে তাঁদের কানে বাসি খবর। আর যাঁরা নেহাত শিলং কি উটি, গোপালপুর কি কন্যাকুমারিকা, মাদুরা কি মহাবলীপুরম—এর কোন একটিংও বুড়ী ছুঁয়েছেন, তাঁরাও বলবেন ছুয়ে আর ছুয়ে যে চার হয়, সেকথা দু'বার শোনবার দরকার কি!

না, দরকার তেমন কিছু নেই। তবে অনেক সময় দরকার না থাকলেও শেখর মিলিকে মনে করিয়ে দেয়—কাল তোমার জন্মদিন, মনে আছে ত?

আপনি কড়েপুকুর-ডালহাউসী, ডালহাউসী-কড়েপুকুর করে হয় ত অনেক কথাই ভুলে গেছেন। তিন মাস যে ছুটি নিয়েছেন, যাবেন কোথায়? তাই আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম। চলুন না ইটালীতেই!

আল্পসে যান, পাহাড়ে বরফ দেখুন। রিভিয়েরাতে যান, মনে হবে কড়েপুকুরে ফিরে না গেলেই হয়। ফ্লোরেন্সে বসে আর্ট নিয়ে মাথা ঘামান। সম্ রেস্তোর ফোক-ড্যান্স দেখুন, ভেরোনা ও রোমের অপেরায় যান। ওসব ভাল না লাগলে ইটালীয়ান ফিল্মের নিও-রিয়্যালিজমের উপর থিসিস লিখুন, নয় ত রোমের ধ্বংসাবশেষ কত বছরের পুরনো তার আঁক কষুন। সবশেষে আসুন কাপরিতে। ছ'আনা সেরের বোম্বাই আঙুর হাতে করে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে রোদে গায়ের চামড়া ট্যান করান। শেষের পরেও আর কি আছে যদি জানতে চান ত বলব, পূর্ণিমারাতে ভেনিসে গন্ডোলায় চড়ে স্বপ্ন দেখুন।

এমনি একটা দেশের সাধারণ লোক যে মোটেই পরিশ্রমী হবে না, এ ত খুবই স্বাভাবিক। তারা চাইবে, খাও দাও, ফুর্তি কর।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর নয়া ইটালীকে ভাল করে চিনতে হলে 'মিলান ফেয়ারে' এক সপ্তাহের মত তাঁবু ফেলতে হবে। সকাল-বিকেল ইউরোপের সবচেয়ে বড় এই 'মিলান শিল্প-মেলায়' রুটিন করে হাঁটতে হবে। নইলে একত্রিশ মাইলের প্রদর্শনী দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ষোল দিনে পঞ্চাশ লাখ দর্শক আসে। চুয়াল্লিশটি দেশের শিল্প নিদর্শন 'অতিআধুনিক' লেবেল-মার্কা হয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়। একই সারিতে ইটালীয় যন্ত্রপাতিও স্থান পায়। কাজেই তুলনামূলক বিচারও খুব সোজা হয়ে যায়।

আজ থেকে মিলানের শিল্প-মেলা সুরু হ'ল।
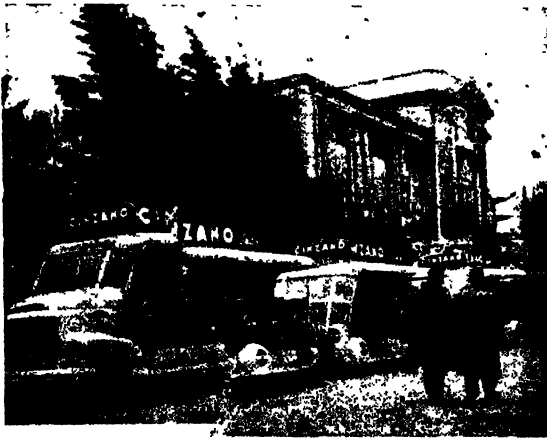
শিল্প-মেলার (মিলান-ফেয়ার) ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইবার গাড়ী

আজকের দিনে ইটালী ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে প্রথম সারিতেই স্থান পায়। 'ফিয়াট'ই যে দেশটাকে উন্নতির দিকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। টুরিনের 'ফিয়াট প্ল্যাণ্ট' ইউরোপের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্রগুলির অন্যতম। এখানকার কুড়িটি বিভিন্ন কারখানায় ৭১,০০০ কর্ম্মী কাজ করে। ফিয়াটে তৈরী হয়—মোটর, বাস, ট্রাক, ট্রলীবাস, রেলকোচ, জাহাজের ডিজেল ইঞ্জিন, এয়ার-ক্র্যাফট ইঞ্জিন, জেট ও টারবো-জেট ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন ধরনের মেশিন টুল।

'অলিভেত্তি'র টাইপরাইটার, ক্যালকুলেটিং মেশিন ও অন্যান্য আপিস-সংক্রান্ত 'বিজনেস মেশিন' পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। ফেরানিয়া ফটোগ্রাফি ও সিনেমাটোগ্রাফির সকল রকম যন্ত্রপাতি এবং মালমশলা তৈরি করে। 'মন্তেকাতিনি'র রাসায়নিক দ্রব্যাদি পৃথিবীবিখ্যাত। 'পিয়াজ্জো'র ভেস্পা মোটর স্কুটার কলকাতারও বেশ চালু হয়েছে। প্রতি মাসে ভেস্পা বিক্রী হয় দশ হাজার। ইউরোপের ভেস্পা ক্লাবে পঞ্চাশ হাজার সদস্য আছে। 'ইন্নোচেন্তি'তে তৈরী হয় লাম্ব্রেত্তা মোটর স্কুটার, হাইড্রলিক প্রেস, পাইপ মিল্‌স, রোলিং মিল্‌স এবং বিশেষ বিশেষ মেশিন টুল।

'রিভ'-এর এগার হাজার কর্ম্মী এন্টিফ্রিক্‌শান বেয়ারিং তৈরি করে। 'নেকি' ও 'বরলেত্তি' সেলাই-কলের জন্য বিখ্যাত। আমেরিকায় বছরে এক লাখ কল রপ্তানি করে মাত্র একটি কোম্পানী। মিলানের 'ব্রেদা' ভারতকে দিচ্ছে ইলেক্‌ট্রিক রেলকোচ ও ইঞ্জিন।

ইটালীর 'কটন-প্রিণ্টে'র নমুনা সংগ্রহ করতে আমেরিকা থেকে লোক আসে। রেয়ন জাতীয় 'নকল সুতোর' জিনিস ইটালী পাঁচ মহাদেশেই রপ্তানি করে—পশমেও কোন দেশের চেয়েও কম যায় না।

এসব ছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাস, আল্পস ও অ্যাপেনাইনের জল-বিদ্যুৎ, ওষুধপত্র, কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদিতেও ইটালী প্রভূত উন্নতি করেছে।

পিয়াত সা কাস্তেল্লো : টুরিন

ইটালীর লোকেরা খালি গান গায়, প্রেম করে আর কাজে-অকাজে রেস্তোরাঁয় কাফেতে বসে আড্ডা দেয়—এর সবটুকুই আর আজ সত্যি নয়। ওরা কাজ করে। তবে কাজের পর ফায়ার-প্লেসের ধারে গিয়ে চুপচাপ কাগজ কি ম্যাগাজিন পড়ে না। আর স্ত্রী বেচারীও বুনতে বুনতে উলের গুটিটা হু'চার বার মেঝের গড়িয়ে দেয় না—ওরা ফুর্তিও করে। যাক ওকথা।

মিলানের শিল্প-মেলার কয়েকটা বিশেষত্ব এখানে বলে রাখা ভাল। হয় ত হঠাৎ কোন দিন আপনার কাজে লাগতেও পারে।

সকালে ছু চ হয়ে ঢুকে রাত্রে ফাল হয়ে যদি বেরোতে চান, মানে যদি সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত পয়সা বাঁচিয়ে ভাল খেয়ে ও একটু জিরিয়ে মেলার সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে চান, তা হলে আপনার পোঁটলায় কিছু খাবার ও পানীয় নিন। ভেতরে বসবার জায়গা অনেক পাবেন।

মেলাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবার জন্য গাড়ী পাওয়া যায়। এক-

ত্রিশ মাইল হেঁটে বেড়াতে অনেকেরই হয় ত আপত্তি থাকতে পারে।

মিলানের ট্রাম, বাস কি ট্রলীবাস যেগুলি 'ফেয়ারে' যাবে, সবগুলির মাথায় নিশান উড়ানো থাকে। কাজেই জিজ্ঞেস করার বালাই নেই, উঠে পড়লেই হ'ল, তবে উল্টো দিকে নিশ্চয়ই নয়।

১লা মে '৫৪। আজ টুরিনে এলাম। ইণ্টারন্যাশনাল অটোমোবিল এগজিবিশন দেখতে।

লোম্বার্ডির পশ্চিমে পো নদীর ধারে টুরিন ইটালীর দ্বিতীয় শিল্প প্রধান শহর। ফিয়াটের কারখানা এখানে। টুরিনের সুপের্গায় ইটালীর ন্যাশনাল চাম্পিয়ন ফুটবল দলের সবাই বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যায় কয়েক বছর আগে।

এই শহরকে ইটালীর লোকেরা বলে ভদ্রতার শহর। মিলানবাসীর ঔদ্ধত্য এখানে নেই। বাইরে থেকে ফ্যাশন দেখানোও চোখে পড়ল না একবারও। ভদ্র এরা সত্যিই।

এই শিল্প-নগরের লোকেরা সন্ধ্যায় 'পো'তে দাঁড় বায়, 'উইক-এণ্ডে' 'পো'র অপর পারে পাহাড়ে যায় বেড়াতে। আর আজ ১লা মে'র ছুটিতে কর্মীরা বাটন-হোলে লাল ফুল গুঁজেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাউড স্পীকারে রেকর্ড বাজছে। বুড়োরা

ভেরচেল্লীর পথে লেখক

রাস্তা-কাফের চেয়ারে বসে পুরনো কথার রোমন্থন করছেন। কিন্তু যুবকেরা কোথায়? কি জানি ওদের হয় ত ছুটির দিনেও কাজ থাকে।

টুরিনের বেশীর ভাগ রাস্তাই সমান্তরাল। সার্পেণ্টাইন লেন এই শহরবাসীদের কাছে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য্য। শহরের বড় বড় স্কোয়ারগুলি আশ্চর্য্য সুন্দর—সবচেয়ে সুন্দর বুঝি পিয়াৎসা কাস্তেল্লো। এর চারদিকে আর্কেড, দু'পাশে অগুনতি গাড়ী ও ওপেন্-এয়ার কাফে, মাঝখানে একফালি রাস্তা।

অটোমোবিল এগজিবিশন, টুরিন, ইটালী

অটোমোবিল এগজিবিশন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। পৃথিবীর সব রকমের গাড়ীই এক জায়গায় দেখা গেল। আর্জেণ্টিনার প্রথম মোটরগাড়ী থেকে সুরু করে আল্‌ফা রোমেও'র নূতন মডেল, সবই আছে। এই প্রদর্শনীতে একটা কথা জানা গেল—ইটালীর পিনিন ফারিনা এবং গিয়া আমেরিকার অনেক মোটরের 'বডি' 'ডিজাইন' করেছেন। গাড়ীর বডি ডিজাইনের ব্যাপারে পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই নাকি এ'দের ডাক আসে।

৫ই জুন '৫৪। যশোবন্ত এক লম্বা চিঠি লিখেছে—অপ্রত্যাশিত এবং অনেকটা আত্মগত। লিখেছে সারা সকালটা কাটছে রিসার্চ করে। দুপুর কাটছে অনাহূত ঘুমের সঙ্গে বোঝাপড়ায়। বিকেলের রোদ ল্যাবরেটরীর জানলা দিয়ে কোন দিন দেখা যায়, কোন দিন দেখা যায় না। সন্ধ্যায় ইচ্ছে হয় এখানে-ওখানে যেতে, এর-ওর সঙ্গে আলাপ করতে, কিন্তু একলা ওর ওসব ভাল লাগে না। কাজেই ঘরে বসে মনের বোঝা বাড়ানো ছাড়া কিই-বা করার আছে। সবশেষে হাঁপিয়ে উঠে লিখেছে, আর পারি না। চিঠি ত নয়, একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

আমি গালে হাত দিয়ে একটু ভাবলাম।

যশোবন্ত আরও লিখেছে, এখন ভেরচেল্লীতে ধান রোয়া সুরু হয়েছে। আমার যদি সময় থাকে ত এটা যেন দেখে আসি।

যশোবন্ত এখন আছে ভেরচেল্লীতে। ওখানে 'রাইস রিসার্চ ষ্টেশনে' ও কাজ করছে। ইটালীর শতকরা চল্লিশ ভাগ ধান এই ভেরচেল্লীতেই জন্মায়।

চিঠিটা আমি পেয়েছি গতকাল।

আজ এখন সবে সকাল সাতটা। কারনাণ্ডোকে ডেকে ওর ভেস্পায় বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়। যশোবন্তকে অন্তত: একটু উৎসাহ দিয়ে আসা উচিত। নইলে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে কোন দিন আবার রিসার্চেও যাবে না হয় ত।

আলের ধারে, ভেরচেল্লী

কারনাণ্ডো ভেরচেল্লীর নামে নেচে উঠল। ভেরচেল্লী 'বিটার রাইস'-এর শহর। ধানের জমিতে জমিতে সিলভানা মাঙ্গানোদের সারি ধান রুইছে। অতএব শুভস্য শীঘ্রম।

স্কুটার ছুটল মিলানের সবে-ঘুম-ভাঙ্গা অলস বাস-ট্রামগুলোর পাশ কাটিয়ে।

যশোবন্তের রিসার্চ মাচায় উঠল। আমাদের দেখে ত ও চমকিত, পুলকিত।

কারনাণ্ডো বলল, তোমার ও চালের নমুনা আজকের মত সিন্দুকে তোল। চল, ষ্টেশনে যাই।

যশোবন্ত বলল, ষ্টেশনে কেন?

বা রে! এখান থেকেই ত 'বিটার রাইস' সুরু। সুরুটা না দেখে আগেই শেষ দেখে লাভ কি? কি বল কুণ্ডু?

আমি বললাম, সুরু শেষ জানি না। পথে নামি চল, তারপর যেদিকে দু'চোখ যায়।

ষ্টেশনে এসে দেখি, দুটো ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে অগণিত মেয়ে। মেয়েরা ট্রেন থেকে তখনও নামছে একের পর এক, ছুটিতে বাড়ী-আসা ফ্রন্টিয়ারের সৈন্যদের মত। নামছে লাফিয়ে লাফিয়ে, শিস দিতে দিতে। প্রায় সবারই হাতে একটা স্যুটকেস, মাথায় স্কার্ফ, নয়ত টুপি।

কুড়ি থেকে চল্লিশ বছরের এই সব মেয়েরা এসেছে ধান রুইতে। এমন নাকি ক'দিন ধরেই আসছে। ভেরচেল্লীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এরা কাজ করবে এই দু'তিন মাস। তারপর আবার যে যার বাড়ী ফিরে যাবে। ফেরবার আগে বেশ দু' পয়সাও পাবে।

এবার আমরা চলে এলাম ধানের জলো জমিতে। আলের গা ঘেঁষে এক সারি লম্বা গাছ। পেছনে মেঘ আর আকাশ। সামনে মেয়েরা নানা রঙের পোশাকে অদ্ভুত উজ্জ্বল। নীচু হয়ে ধানের চারা রুয়ে যাচ্ছে। তারই সঙ্গে গানও গাইছে। সকলের মাথায় চওড়া কিনারাদার খড়ের টুপি।

আমি ত ফোটো তুলতে জমিতে নেমে গেছি। কিন্তু এত গভীর জল ও কাদা যে গামবুটেও শেষ পর্য্যন্ত কুলোল না। উলের প্যাণ্টটায় ভেরচেল্লীর ছাপ নিয়ে মিলানে ফিরেছিলাম।

মাঝে মাঝে দুটো জমির মাঝখানে একফালি খাল, দু'পাশে গাছপালা। মেয়েরা ওখানে ভাল জামা, কাপড়, সাইকেল, দুপুরের লাঞ্চ ইত্যাদি রেখেছে।

এক জায়গায় দেখি ওরা লাঞ্চে বসেছে। যশোবন্ত ও কারনাণ্ডোকে বসতে ইশারা জানিয়ে আমি ওদের মধ্যে বসে পড়লাম।

তারপর আলাপ করা ত খুব সোজা। আমরা ইটালীয়ান বলতে পারি ভাল আর ইটালীয়ানরা আমাদের মতই মিশুক ও গায়ে-পড়া। খুব কম সময়েই পাঁচমিশেলী প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের আলোচনা দানা বাঁধল।

আট

১৭ই জুন '৫৪। মিলান থেকে মাইল কুড়ি উত্তরে ছোট শহর অজ্জোনো। ওখানে টেক্সটাইল মেশিনের কারখানা কারনিতি কোম্পানীতে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম।

সপ্তাহে তিন দিন মিলান থেকে যাই। সন্ধ্যায় হোষ্টেলেই ফিরে আসি। মন্ত্রসা থেকে ব্রড গেজের ট্রেন পাল্টে ন্যারো গেজের ডিজেল ট্রেন ধরতে হয়। ফিয়াটের তৈরী ছোটো কম্পার্টমেন্টের গাড়ী। বাইরেটা ষ্ট্রীমলাইনড ও নিখুঁত। ভেতরে আরাম যথেষ্ট। ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের তৎপরতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতায় অবাক হতে হয়। ওরা যেন পুরোপুরিই যন্ত্রচালিত।

জানালার বাইরে দু'বেলা একই দৃশ্য দেখতে একঘেয়ে মনে হয় না কখনও। সবুজ শস্যক্ষেতের ওপারে আকাশের গায়ে পাহাড়ের সারিটা একরকম দেখি নি কখনও। ওরা রোজই রূপ বদলায়। এমন বোধ করি হলিউডের উগ্র আধুনিকা চিত্রতারকারাও বদলায় না। কখনও ট্রেন চলল বাড়ীর উঠোনের উপর দিয়ে। কোন দিন দেখা যায় গৃহকর্ত্রী উঠোন পরিষ্কার করছে। কিশোরী মেয়েটা পীচ কামড়াতে কামড়াতে ট্রেনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কখনও আবার বাড়ীর জানলা-দরজা বন্ধ, উঠোনটা নিস্পন্দ। শহরতলীর দোকানী ট্রেনের শব্দে বাইরে এসে দাঁড়ায়। খদ্দের নেই, সময় কাটে না।

ট্রেনের যাত্রীও হরেক রকম। ম্লানমুখ কর্মক্লান্ত আইবুড়ো শিক্ষয়িত্রীর দল, ওদের জীবন-মধ্যাহ্ন প্রায় অতিক্রান্ত। কারখানার শ্রমিক, গাঁয়ের চাষী, সাধারণ যাত্রী, স্কুলের ছেলেমেয়ে—এরাই আমাদের নিত্যসঙ্গী। মাঝে মাঝে পাদ্রীরা আনাগোনা করে। গীর্জাগুলো খোলা কি বন্ধ, হয় ত তা দেখতে। আজকাল রবিবার সকালেও নাকি লোক হয় না। এক দিন এক পাদ্রী বলেছিল—রোমান ক্যাথলিকদের দেশে এটা নাকি ঘোর নাস্তিকতা।

২০শে জুন। আজ বিকেলে আর মিলানে ফেরা হ'ল না। বন্ধু কারলেত্তো ওর বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেল।

কারখানার মিলিং-মেশিন অপারেটর কারলেত্তো। সেই আমার সুবিধা অসুবিধা দেখত। লঞ্চের ছুটিতে রেস্তোরাঁ অবধি নিয়ে যেত, ছুটির পর ট্রেনে তুলে দিত।

'বিটার রাইস'-এর দৃশ্য ভেরচেল্লী

ধান-রোয়া, ভেরচেল্লী

অজ্ঞোনোর পাঁচ হাজার লোকের জন্যে আছে দুটো টেলিফোন, একটা সিনেমা-হল, একটি ডান্স-ফ্লোর, আর একটা স্বচ্ছ জলের হ্রদ। কাছেই পাহাড় আছে, উৎসাহীরা পাহাড়িয়া পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।

বিকেলে কারলেত্তো, ওর বোন, বোনের বন্ধু আর আমি অজ্ঞোনোর লেকে ডিঙ্গি বাইতে গেলাম। নিরিবিলি জায়গায় ক'জন ছিপ ফেলেছে। স্নানে নেমেছে কয়েকজন।

অজ্ঞোনোর লেকে মাছ ধরা

বাড়ী ফিরে কারলেত্তোর বোন রান্না করল, খাওয়াল, তারপর বাগানে আমাদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল। খুব সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে খুঁটিনাটি অনেককিছু জিজ্ঞেস করল। ওর আদরযত্নের আন্তরিকতায় মনে হচ্ছিল যেন দশ বছর পর বোনের বাড়ীতে এসেছি। অজ্ঞোনো আধা পাড়া-গাঁ, আধা শহর বলেই হয় ত এমনটি হতে পেরেছে।

কারখানার কথা বলতে গিয়ে প্রৌঢ়া নার্স টির কথা বার বার মনে আসে। কাজে ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে ওর ঘরে গিয়ে বসতাম।

একদিন নার্স টি আমাকে জিজ্ঞেস করল, ঘোড়ার মাংসের স্টেক খেয়েছেন কখনও?

আমি অবাক হয়ে বললাম, খাই নি কখনও। কেউ যে খায় এমন ত শুনিও নি।
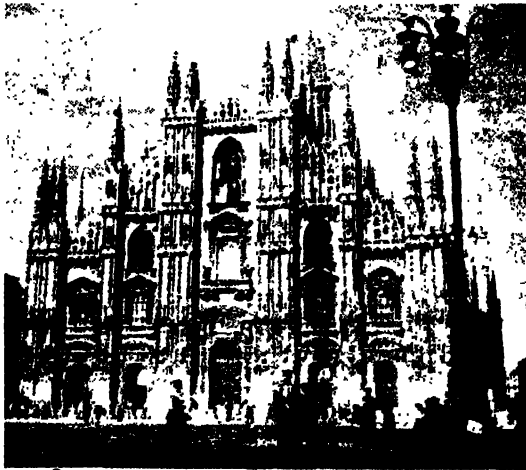
গীর্জ্জা দুয়োমো, মিলান

—আপনি জানেন না, আমার স্বামী কত রোগা ছিল। আর এখন যা হয়েছে, অনেকে দেখে চিনতেই পারে না। সে ত সম্ভব হয়েছে ঐ ঘোড়ার মাংসের স্টেক খেয়ে খেয়ে।

আমি হেসে বললাম, ও, আপনি বলতে চাইছেন যে, আমিও যেন ঐ স্টেক্ খেয়ে শরীর সারাই। না, তা পারব না। রুচিতে বাধবে।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে দিত নার্স টি।

আর এক দিন বলল, জানেন বোধ হয়, ইটালীয়ান মেয়েরা খুব সুন্দরী।

—সে ত দেখছিই পথেঘাটে। চোখ বুঁজে ত আর পথ চলি না।

—আচ্ছা, ইটালীর একটা মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় না?

—সে ইচ্ছেটা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল হ'ল এই, ইণ্টারন্যাশনাল ম্যারেজে আমার এখনও তেমন আস্থা হয় নি। আমার মনে হয়, দেশী মেয়েকে নিয়ে ঘর করা অনেক সহজ হবে।

এমনি হাল্কা কথাবার্ত্তায় কারখানার একঘেয়েমির হাত থেকে খানিকটা রেহাই পেতাম।

পরীক্ষার আগে হঠাৎ এক দিন নার্স টি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। একটা ছোট শিশি থেকে একটু জল গেলাসে ঢেলে বলল, খেয়ে নিন।—খেয়ে নিলাম।

দুয়োমোর সিঁড়িতে লেখক

—ওটা আমাদের গীর্জ্জার পবিত্র জল। দেখবেন আপনার পরীক্ষা ঠিক ভাল হবে। প্রার্থনা করি, সবার চেয়ে আপনার পরীক্ষা ভাল হোক।

—ধন্যবাদ, এটা কিন্তু ঠিক আমাদের দেশের রীতির সঙ্গে মিলে গেল। আমার মাও পরীক্ষার সময় পূজোর ফুল মাথায় ছুঁইয়ে দিতেন—যেমন আপনি দিলেন ঐ জলটুকু।

২২শে জুন '৫৪। মিলানের কর্ম্মচাঞ্চল্য পিয়াত্সা দুয়োমোর। মাঝখানে বিরাট চত্বর। এক দিকে গীর্জ্জা দুয়োমো। ইউরোপে এটাই সবচেয়ে বড় গথিক ছাঁচের গীর্জ্জা। ঐ গীর্জ্জাটাই যেন গোটা শহরটার ভারকেন্দ্র।

একসময় চুপি চুপি সন্ধ্যা এসে পড়ে। চারধারে রোশনাই ঝলমল করে উঠে, আর শহরে মেয়েদের চলাফেরা বাড়ে। এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হলে অনেককিছুই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বেশ বোঝা যায়, অকৃত্রিম আন্তরিকতা ওদের কাছে ছেলেমানুষি। Cotolette alla Milanese কি করে তৈরি হয় ওরা তা জানে না। ওদের মতে যৌবন-প্রভাতে সংসার করাটা নেহাতই বোকামি। ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না। আদব-কায়দা, প্রসাধন আর ফ্যাশান যাদের শয়নে-জাগরণে একমাত্র চিন্তা, তারা বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবে কখন?

ক্রমশঃ

শস্য বপন

(বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

১। আউশ ধান (বোনা) দোআঁশ ও এটেল মাটিতে জন্মে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ১ মণ বীজ লাগে, একরপ্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

২। আউশ ধান (রোয়া)—দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৬×৬ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ১২-১৫ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

৩। আমন ধান (বোনা)—এটেল দোআঁশ ও এটেল মাটিতে জন্মে। বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ২৫-৩৫ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ২০-৩০ মণ ফলন হয়।

৪। আমন ধান (রোয়া)—এটেল দোআঁশ ও এটেল মাটিতে জন্মে, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে ৯×৯ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ১০-১৫ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ২০-৩০ মণ ফলন হয়।

৫। ভুট্টা বা জনার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ১৮ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ১৮ ইঞ্চি অন্তর বীজ বপন করিতে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয় একরপ্রতি ৬-৯ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৬-৯ মণ ফলন হয়, পশুখাদ্য রূপেও ইহার ব্যবহার হয়।

৬। জোয়ার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৬-৯ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৫-৯ মণ ফলন হয়। ইহা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৭। চীনা—উঁচু বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৩-৫ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ৪-৬ মণ ফলন হয়, ইহার খড় পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৮। অড়হর—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২।-৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ২। হইতে ৩ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৬-৯ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৬-৯ মণ ফলন হয়।

৯। বরবটি—দোআঁশ ও এটেল মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়; একরপ্রতি ১৫-১৮ সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ৮-১০ মণ দানা পাওয়া যায়, ইহা পশু খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

১০। সয়াবীন বা গৌরী কলাই—বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি ফসল হয়, একরপ্রতি ১০-১২ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৪।-৭। মণ ফলন হয়।

১১। বেগুন—জল দাঁড়ায় না এরূপ উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে। তিন ফুট অন্তর লাইনে চারা রোপন করিতে হয়, নাবী জাতীয় ফসল আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হয়, একরপ্রতি ৪-৬ ছটাক বীজ লাগে, একরপ্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

১২। ঢেঁড়শ—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২ ফুট হইতে ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া বীজ বপন করিতে হয়, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩-৪। সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৬০-৮০ মণ ফলন হয়।

১৩। লাউ—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনিতে হয়, চারা বাড়িয়া উঠিলে সবচেয়ে বেশী সবল চারাটি রাখিয়া বাকী চারাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, তিন-চার মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ।১০-।০ সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

১৪। কুমড়া—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, লাউয়ের মত ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনিতে হয়, ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ।১০-।০ সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

১৫। চিচিঙ্গা—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি ফলন হয়, একরপ্রতি ১-১।০ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

১৬। করলা—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, ৩ মাস পরে ফলন হয়, একরপ্রতি ।০-১ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

১৭। কাঁকরোল—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ইহা সাধারণতঃ কন্দ হইতে জন্মায়, ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়, ইহার জন্ত মাচার দরকার হয়।

১৮। ঝিঙ্গা—(পালা) বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, ২-৩ মাস পরে ফলন হয়, একরপ্রতি ১।০-২ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১০০-১২০ ফলন হয়।

১৯। কাঁকড়ি—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, বর্ষার ফসল হলে, একরপ্রতি ৮-১২ ছটাক বীজ লাগে, একরপ্রতি ৮০-১০০ মণ ফলন হয়।

২০। শিম—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪।০-৬ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৯০-১২০ মণ ফলন হয়।

২১। বাকলা শিম—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৮-১২ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়, ৩ মাস পরে ফসল হয়; একরপ্রতি ৪-৬ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

২২। চুকাবী—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, ৫ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩-৪ সের বীজ লাগে এবং ৪০-৫০ মণ ফলন হয়।

২৩। মেটে আলু বা চুবড়ি আলু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৫ ফুট অন্তর গর্ত্তের মধ্যে বীজ আলু রোপণ করিতে হয়, ৮-৯ মাস পরে ফলন হয়, একরপ্রতি ১০-১৫ মণ বীজ লাগে, একরপ্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

২৪। মূলা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ২ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ২-৪ সের বীজ লাগে একরপ্রতি ১২৫-১৫০ মণ ফলন হয়।

২৫। শিমুল আলু—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫ ফুট অন্তর লাইন করিয়া ১ ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া এবং ৫-৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ডগা বসাইতে হয়, ৮-৯ মাস পরে ফসল হয়। একরপ্রতি ৬০৫০ ডগা লাগে, একরপ্রতি ৩০০ মণ ফলন হয়।

২৬। কচু—বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ১।-২ ফুট অন্তর মুখী রোপণ করিতে হয়, ভাদ্র-কার্ত্তিক মাসে ফসল হয় একরপ্রতি ৪।-৬ মণ মুখী লাগে, একরপ্রতি ১৮০-২০০ মণ ফলন হয়।

২৭। মানকচু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৩ ফুট অন্তর মূল বসাইতে হয় পৌষ-ফাল্গুন মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৫-৬ হাজার মূল বসাইতে হয়, একরপ্রতি ১২০ ১৮০ মণ ফলন হয়।

২৮। ওল—বেলে দোআঁশ, মাটিতে জন্মে, ২।-৩ ফুট অন্তর গর্ত্তে মুখী রোপণ করিতে হয় ৬ মাস পরে ফলন হয়, একরপ্রতি ৬-৯ মণমুখী লাগে, একরপ্রতি ১৫০-২০০ মণ ফলন হয়।

২৯। টেপারি—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়, ৪ ৫ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ ছটাক বীজ লাগে।

৩০। শাক, নটে, পুঁই, ডাটা, ফুলকা ইত্যাদি—যে কোন জমিতে হয়, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ১-১। মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ ছটাক বীজ লাগে।

৩১। হলুদ—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২। ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর 'মোথা' বা দড়ি বসাইতে হয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল তুলিতে হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ হলুদ লাগে, একরপ্রতি ১৫-২০ মণ শুষ্ক হলুদ হয়।

৩২। আদা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে ২। ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর 'মোথা' বা দড়ি বসাইতে হয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল হয় একরপ্রতি ২-৩ মণ মূল লাগে, একরপ্রতি ৬০-১০০ মণ ফলন হয়।

৩৩। গোল মরিচ—নিম্ন সরস জমিতে জন্মে চারা ৪। ফুট অন্তর লাগাইতে হয় ৩-৪ বৎসর পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ১,০০০ কাটিং লাগে, প্রত্যেক লতায় গড়ে এক সের করিয়া ফলন হয়।

৩৪। চীনা বাদাম—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ইহার জাতি অনুযায়ী লাইন করিয়া ২-২।। ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল হয় একরপ্রতি ১৮-২৫ সের (খোসা-সমেত) বীজ লাগে, একরপ্রতি ১৮-২০ মণ ফলন হয়।

৩৫। কলা—উঁচু দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, তেউড়গুলি ২ ফুট চওড়া ও ১। ফুট গভীর গর্ত্তে ১২ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়, তেউড় বসাইবার সময় ১০-১২ মাস পরে ফসল হয়, একর প্রতি ৩০০-৪০০ তেউড় লাগে এবং ৩০০-৫০০ কাঁদি কলা হয়।

৩৬। পেঁপে—উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, চারাগুলির যখন ৩-৪টি পাতা বাহির হয় তখন উহাদিগকে নাড়িয়া ৬-৮ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয় ৯।১০ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪-৬ তোলা বীজ লাগে।

৩৭। শশা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, ৩ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬ ৮ তোলা বীজ লাগে, একরপ্রতি ১০০-১২০ মণ ফলন হয়।

৩৮। পাট—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে পাট কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৩-৪। সের বীজ লাগে একরপ্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

৩৯। শণ—এটেল ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি শণ কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৩০-৪০ সের বীজ লাগে ও ১০-১৫ মণ ফলন হয়।

৪০। রিয়া—দোআঁশ ও এটেল মাটিতে জন্মে, ২×২ ফুট অন্তর "কাটিং" লাগাইতে হয়, শ্রাবণ-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ ফলন হয়।

৪১। কার্পাস—জল দাড়ায় না এইরূপ উঁচু সারবান জমি ইহার পক্ষে উপযুক্ত, ২।। ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২।। ফুট অন্তর ১।-২ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ২-৩টি বীজ বুনিতে হয়, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তুলা হয়, একরপ্রতি ৬-৮ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ১।-২ মণ ফলন হয়।

৪২। রেড়ি—উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, জাতি হিসাবে ৩-৪ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়, ৭-৯ মাস পরে ফসল হয়, জাতি হিসাবে ৪।-৬ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৮-১০ মণ ফলন পাওয়া যায়।

৪৩। পান—এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর "কাটিং" বসাইতে হয় আশ্বিন-অগ্রহায়ণ মাসে পান পাওয়া যায়, একরপ্রতি ৩০০০ "কাটিং" লাগে, একরপ্রতি ৬০-৭০ কাহন পান হয়।

৪৪। বাজরা (পশুখাদ্যের জন্য)—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ২-২।। মাস পরে ঘাস কাটা যায়, একরপ্রতি ৬-১০ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ২০০-২৫০ মণ কাঁচা ঘাস হয়।

পকেটমার

শ্রীউমাপদ নাথ

ধীর পায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল মহেন্দ্রির।

বাড়ীর ভেতর থেকে তখনও গড়িয়ে আসছে সুবলের মার গলা—করবে বৈ কি, আলবৎ করতে হবে। দায়িত্ব মাথায় নেবার সময় মনে ছিল না?

বাড়ীতে বউয়ের সঙ্গে খুব যে একচোট ঝগড়া হয়ে গিয়েছে তা নয়। আসল কথা হ'ল, অভাবের সংসার। পেটের আগুন মাথা গরম করে দেয়। কথায় দাঁত ধরে একটু বেশী। মেজাজ নষ্ট হয়ে যয় সামান্যতেই।

কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল ছিল না। এ দৈন্যের কোনও কৌলীন্য নেই। রেশন আপিসের আর্দালি ছিল মহেন্দ্রির। যা বেতন পেত, তার বেশী পেত পার্বণী। স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে যেত ওদের সংসারটি। আর সংসার বলতেই বা কি, নিজে, বৌ আর একমাত্র ছেলে সুবল।

কিন্তু ছাঁটাইয়ে পড়ে চাকরি গেল মহেন্দ্রিরের। স্বচ্ছন্দ সচ্ছল গতি বাধা পেল অকস্মাৎ। সমতলের নদী এসে ঠেকল খাড়া পাহাড়ের গায়ে, হয় জমে পচে মরা, নয় পথ করে নেওয়া তার পাশ দিয়ে।

মহেন্দ্রিরের চেয়ে বেশী ভেঙে পড়ল তার স্ত্রী। তাই ত এখন কি হবে! কি করে এখন চলবে? কিন্তু নৈরাশ্যের সঙ্গে সমাধানের কি সম্বন্ধ আছে? নিরুপায় হয়ে মাথা খারাপ করলেই কি উপায় এসে হাজির হয় সামনে? সেটা সুরবালা বোঝে না। এখন যে স্বামীকে উৎসাহ দেওয়াই দরকার, কটু কথা না শুনিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তাতা-পোড়া দেহে বুলিয়ে দিতে হয় স্নিগ্ধ হাতের একটু স্পর্শ, অতশত বোঝে না সে। অত হিসেব নেই তার মাথায়। ভাবে, এখন কড়া কথায় চেতিয়ে না তুলতে পারলে ও কি আর কোনও পথ দেখবে। সপ্তমে গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠে সুরবালা—সংসার করবার সাধ হয়েছিল যখন, তখন তার ঝক্কি নিতে হবে বৈ কি। এখন গালে হাত দিয়ে বসে ভাবলেই অমনি চলে যাবে? যেমন করে পার—

আর বচন-শ্রবণের অপেক্ষায় থাকে না মহেন্দ্রির। বাসা থেকে বেরিয়ে চলে আসে রাস্তায়। এই ত রাস্তা, কলকাতার রাজপথ। এর এক-একটা রাস্তার কত না ইতিহাস। কত কথা-কাহিনীর পুঁজি এর এক-একটা রাস্তার বুকে। এদের বড় মোহ, বড় আকর্ষণ। এই টানেই ত মহেন্দ্রিরের কলকাতায় আসা। ফতুয়ার পকেটে পড়ে আছে জমিয়ে-রাখা কয়েকটা আধপোড়া বিড়ি। কাছের পান-বিড়ির দোকান থেকে তারই একটা ধরিয়ে নিল জলন্ত দড়িতে ঠেকিয়ে। ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে এক পা দু'পা করে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

বেলা গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা। মহেন্দ্রির তেমনি ঠায় বসে গোলদীঘির সেই বেঞ্চিতে। বিড়ি টানতে টানতে গলি ছাড়িয়ে মির্জাপুর হয়ে সিধে চলে এসেছে গোলদীঘিতে। ভাববার জন্যে একটু ধোঁয়া জুটেছে, এবার জুটে গেল একটু জায়গা।

মহেন্দ্রির ভাবছে। ভাবনা ছাড়া এখন আর কি করবার আছে?

— দেশ-বাঁটোয়ারার ফলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। বাড়ীর অবস্থা যে খুব ভাল ছিল, তা নয়। তবে বাড়ীতে থাকলে খাওয়া-পরার অভাব হ'ত না কোনও দিন। জমির ধান, গাইয়ের দুধ আর বাগানের তরকারি—এর ত আর মার ছিল না। আর মাছ? সে ত সখের আমদানি। মৌজের মেহনত। ডিঙ্গাদির বাঁক থেকে ফিরে কই-মাগুর-শিঙ্গিতে-ভরা খলুইটা নামিয়ে দিয়েছে সুরবালার সামনে। এ বেলা ঝাল-চচ্চড়ি কর, আর সুবলের জন্যে একটু মাখো-মাখো ঝোল, কম লঙ্কা দিয়ে।

শীতকালে বিলের জল মরে আসে, তখন চালায় পলো। পলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টেনে তুলেছে কত বড় বড় শোল। ও সুবল, গোঁজের মুখটা খুলে ধর, বাবা! গোঁজ-ভর্তি একটা জ্যান্ত মাছ হাতে ধরে সুবলের সে কি আনন্দ!

এ সব কাহিনী অতীতের, কিন্তু চিত্রগুলি এখনও জল-জ্যান্ত—চকচকে, তাজা।

মহেন্দ্রির বিশেষ লেখাপড়া করতে পারে নি। সে তার বদনসিব, মন্দ ভাগ্য। হাড়ে-হাড়ে বোঝে তা মহেন্দ্রির। আহা, বিদ্যের তুল্য কি বস্তু আছে! ওই যারা হাকিম হুজুর হচ্ছে, তাদের পুঁজি কি? বিদ্যে নয়? পড়েছে, শিখেছে, বিদ্বান হয়েছে—তারই পুরস্কার।

নিজের দুঃখ ঘুচাতে চেয়েছে ছেলেকে দিয়ে। টিকিট করে হাজরাবাবুদের পুকুর থেকে রুই মেরে এনে তার মুড়োটা খাইয়েছে ছেলেকে। মগজে মগজ বাড়বে। বুদ্ধি বাড়বে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। তেমাথা বুড়োর গল্প শুনিয়েছে বৌকে। যেমন করেই হোক, সুবলকে মানুষ করে তুলতেই হবে।

কিন্তু সুরবালার তেমন আস্থা-ভক্তি নেই লেখাপড়ায়

প্রতি। স্বামীর যেন এ সব বাড়াবাড়ি—কল্পনার আতিশয্য। বলে, তুমিও ত মাইনর পাস দিয়েছ, কিন্তু কি করছ? এই ত জমির খাও আর কাদা খুঁচে মাছ ধর।

মাইনর পাস দেওয়া এবং ফলে দ্রষ্টব্য একটা কিছু না হওয়াকেই চরম সাক্ষ্য রেখে তর্কে অবতীর্ণ হতে চায় সুরবালা।

আরে রাম! মহেন্দ্রর বোবায়, এটা কি আর একটা লেখাপড়া। এল-এ, বি এ হলে না কদর?

'ও বাবা'!—একটু দুষ্টি ঠোঁটেই উল্টে ফেলে সুরবালা। 'তোমার ছেলেকে তুমি এল-এ, বি-এ করাতে চাও, কর না কেন। একটা হাকিম যদি হয়, সে ত আমার ভাগ্যি।' সুরবালা সমাপ্তি টেনে দেয় তর্কের।

আট বছরে পড়তে গাঁয়ের পাঠশালায় সুবলকে ভর্তি করে দিয়েছিল মহেন্দ্র।

তার পরে ঐ আরম্ভেই ইতি। বাস্তুহারা হয়ে চলে আসতে হয়েছে কলকাতায়। অনেক ঘোরাফেরা করে, দেশের লোক মুকুন্দবাবুকে ধরে শেষে রেশন-অপিসে আর্দালীর চাকরিটা জুটে যায় ভাগ্যের জোরে। মুকুন্দবাবু তখন ও বিভাগের বড়কর্তাদের দলে।

কয়েক মাসের আয়ের থেকে টাকা জমিয়ে অবশ্য মুকুন্দবাবুর মান রক্ষা করতে হয়েছিল মহেন্দ্রকে। কিন্তু তার জন্য আফসোস নেই মহেন্দ্রর। মুকুন্দবাবু যে উপকার করেছেন তার কি তুলনা আছে? তিনি না ডাকালে সেই অবস্থায় কলকাতার মত শহরে এসে দাঁড়াত কেমন করে! এত বড় একটা হিল্লে করে দিয়ে কিছু দক্ষিণা নিয়েছেন, এ আর আশ্চর্য কি। সে নিজেও ত অমনি কত নিয়েছে। একখান দরখাস্ত পৌঁছে দিয়েছে, কি বড়কর্তা আছেন কিনা একটু সংবাদ নিয়ে দিয়েছে, তার জন্তেই পার্ব্বণী পেয়েছে আট আনা, এক টাকা।

খেয়ে পরেও দু'পয়সা জমা হচ্ছিল হাতে। এই দুর্দিনে অন্য পাঁচ জনের তুলনায় ওদের ভাগ্য ত অনেক ভাল। মুকুন্দবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে মনে মনে।

সুরবালার কাছে কথা পাড়ে বিশ্রামের সময়। যাক, ভগবানের ইচ্ছায় সুবলকে বোধ হয় মানুষ করতে পারব এবার। কলকাতা শহর, স্কুল কলেজের অভাব নেই। এ ত আর সেই মুকসুদপুর গাঁ নয়। এখানে যত খুশি পড়। ভাখো, শেখো, মানুষ হও। বাড়ীর খেয়ে বিদ্যা অর্জ্জনের এমন সুবিধে কোথায় আছে?

খুলনা জেলার পাড়াগাঁ মুকসুদপুরের সঙ্গে কলকাতা শহরের তফাৎটা চিন্তা করে দুঃখের মধ্যেও আশ্বস্ত হয় মহেন্দ্র। একমাত্র ভরসা যে ছেলেটা মানুষ হবে, হয়ত এই কলকাতারই কোনও এক আপিসের বড় সাহেবের গদিতে বসবে এক দিন। চিন্তা করেও সুখ পায় চের বুকখানা গর্বে ফুলে উঠে। কল্পনার ফানুসে অনেক দূর উড়ে যায় মন।

এই কল্পনার ইমারত ধ্বসে পড়ল অকস্মাৎ। সার্কুলার শীটে নাম বেরিয়ে গেল অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে মহেন্দ্ররেও। রিট্রেঞ্চমেণ্টের নির্ঘাত গুলি এসে বিঁধল ঠিক এই জমাট স্বপ্নের সময়—সৌভাগ্যের ঠিক শীর্ষ মুহূর্ত।

মাথায় হাত দিয়ে বসল মহেন্দ্র।

সুরবালা যুক্তি দিলে—যাও আর একবার মুকুন্দবাবুর কাছে। হাতে-পায়ে ধরে ত্বাখো।

সুরবালা যা উপদেশ দিল, তার চেয়ে অনেক বেশীই করল মহেন্দ্র। পুরো দু'মাসের বেতন বাজি রাখল। কিন্তু হ'ল না কিছুই, মুকুন্দবাবুর কোনই হাত নেই। ছাঁটাইকে রদ করবার মত ক্ষমতা তাঁর এক্তিয়ারে নেই।

মুখ কালো করে ফিরে এল মহেন্দ্র।

'কি হ'ল'?

ভাগ্যপরীক্ষা করে কখন ফিরে আসবে স্বামী, তার প্রতীক্ষায় ছিল সুরবালা। বাইরে পায়ের শব্দ শুনেই রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হ'ল?

'কিছুই না', ছোট কথার একটি সরল উত্তর। কোনও ভূমিকা নেই, নেই কোনও জোড়বাক্য।

এক নিমিষেই চুপ হয়ে গেল সুরবালা। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রতীক্ষা-উদ্বেগের অন্ত হয়ে গেল ঐ একটি উত্তরে।

সুরবালাও চুপ, মহেন্দ্রও চুপ। এর পরে কিছু বলার যেন আর কোনও প্রয়োজন নেই—না সুরবালার, না মহেন্দ্রের।

সুবল ঘরে বসে পান্তা ভাত খাচ্ছিল, বাইরে আঁচাতে এসে দেখল বাপের চেহারা। সেই সাত-সকালে বেরিয়েছিল, ফিরল এই আন্দাজ তিনটেয়। একে না-নাওয়া, না-খাওয়া, তার উপর হাঁটাহাঁটি আর রোদের তাত। মুখটা চুমড়ে যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছে বাপের।

এবেলা গরম ভাত হবার কথা ছিল না। সুরবালা বলেছিল, পান্তা জলে দুটো মুখে দিয়ে যাও। এই টা-টা রোদে ঘুরবে।

না, এখন নয়, ঘুরে আসি আগে।

মহেন্দ্র জবাব দিয়েছিল, একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত মনটা ভাল লাগছে না। ঘুরেই আসি চট করে, মুকুন্দবাবু আবার আপিসে থাকেন না বেশী সময়।

আসল কথা তা নয়, পান্তা কত ক'টি আছে কে জানে। আগে সুবল ত খাক পেট ভরে।

তারপর? এমনি করে আর ক'দিন চলবে?

উৎসাহ দিতে গিয়ে সে দিন অনেক কথাই বলে ফেলল সুরবালা।

কিন্তু তার জন্তে তেমন দুঃখ নেই মহেন্দ্রির। মিথ্যে কথা ত আর বলে নি ও। এই কলকাতায় যদি কিছু না করতে পারে, তবে আর কোথায় কি জুটবে? কলকাতায় যার অন্ন নেই, তার ভাগ্যে হা'ভাত ছাড়া আর কি?…

ভেবে চলেছে মহেন্দ্রির।

হাতের বিড়ি শেষ হয়ে গিয়েছে কখন। পোড়া পিছনটুকু টান দিয়ে দূরে ফেলে দিল মহেন্দ্রির। এতক্ষণ ওইটুকুই ঠোঁটে গুঁজে বসেছিল। কি লজ্জার কথা! চাকরিতে থাকতে কত বাবুরা এসে প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরে দিয়েছে সামনে।

আজ যেন কে তাকে জোর করে অপমান করছে। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরে খান খান করে দিচ্ছে গায়ের জোরে।

সামনেই টলটল করছে গোলদীঘির জল। গরমের সন্ধ্যা, বাবুদের ছেলেরা সাঁতার কেটে স্নান করছে ওই জলে। সবাই লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের ছেলে। আর এই কলেজ স্কোয়ারের চারদিকের বাড়ীগুলো? সবগুলোই চেনে মহেন্দ্রির। মেডিক্যাল কলেজ, ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ কত কি—সব লেখাপড়ার পীঠস্থান। পড়াশুনার পাড়, এই সব জায়গারই ত ছেলে এরা। এরই একটা ঘরে সুবলের পড়ার কথা। ফরসা জামা-কাপড় পরে বই-খাতা নিয়ে কলেজে যাবে। ফিরে এসে একটু জলখাবার মুখে দিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরোবে। পেছনে পেছনে লুকিয়ে এসে তাকিয়ে দেখবে সে। সুবল তখন লম্বা-চওড়া রীতিমত ভদ্রলোক—দশ জনের এক জন।

দশ বছরের আগাম স্বপ্ন দেখে মহেন্দ্রির।

কিন্তু এখন? এখন খালি হাতে বাসায় গেলে ও খাবে কি—তার ওই সুবল! বাসাভাড়া না হয় আরও কিছু দিন বাকি রাখা চলবে। ভদ্রলোক কম করে নি। দেশসুবাদে নিজের ভাড়াটে বাসা থেকে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছে সামান্ত টাকায়। টাকাটা অবশ্য মাসের শেষে চুকিয়ে দিতে পারলেই ভাল, কিন্তু না দিতে পারলেই কি আর ঘর ছাড়তে বলবে? চাকরি যাওয়ার পর থেকে ঘোষবাবুর সংসারে হাট-বাজার, টুকিটাকি কাজ খাতিরে করে দিচ্ছে মহেন্দ্রির। কিন্তু পেটের জন্তে দুটো দানা ত চাই। বিশেষ করে ওই ছেলেটার—বার বছরের ছেলে স্বপ্নের কেন্দ্র ওই সুবলের জন্তে।

সন্ধ্যা উতরে বেশ খানিকটা রাত হয়েছে ততক্ষণ। পকেট থেকে আর একটা পোড়া বিড়ি বার করে দেশলাই খুঁজতে লাগল মহেন্দ্রির। যদি কেউ বিড়ি-সিগারেট ধরায়, সেই আগুনে ধরিয়ে নেবে। কিন্তু লোক তখন বেশী নেই সেখানে। প্রায় সব বেঞ্চিই খালি, এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখে মহেন্দ্রির। ওই যে, একটু দূরে মির্জাপুর কলেজ ষ্ট্রীটের কোণের দিকটায় ফুল-ঝোপের কাছাকাছি যে বেঞ্চিটা, সেখানে কে একজন শুয়ে ভাবল, একবার দেখবে নাকি দেশলাইটা চেয়ে।

উঠে এল কাছে। নাঃ, ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছে, হ্যা, ভদ্রলোকই, হাতে দিব্বি হাতঘড়ি, পায়ে দামী জুতা, পোশাক-আশাকও তেমনি। আর—

বুক-পকেটের ফাঁক দিয়ে জানা যাচ্ছে ভেতরে কয়েকখানা বড় নোটের অস্তিত্ব। উঃ, কি বোকা ভদ্রলোক! এমন জায়গায় নিশ্চিন্তে পড়ে ঘুমোচ্ছে! যদি পকেট মারা যায়? হাতঘড়িটা কেউ খুলে নেয়? তা পারবে না? খুব পারে। এমন সাফাইওয়ালা আছে বৈ কি কলকাতায়। পথচলতি মেয়ের গলা থেকে হার বার করে নেওয়া, ট্র্যাক কেটে টাকা হাওয়া করে দেওয়া—এ সব এদের কাছে জলের মত সোজা। বিলকুল হাতের কেরামতি। যার আছে, তার মারছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে দিব্বি মজা লুটছে। কি ব্যবসাই না শিখেছে এরা! এ সম্বন্ধে কত গল্পই না চাকরিতে থাকতে শুনেছে সে। বুক-পকেট থেকে মারতে হলে নাকি দুটো আঙুল হলেই হয়, তর্জনী আর মধ্যাঙ্গুলি। আঙুল দুটো ধীরে গলিয়ে দিয়ে সাঁড়াশির মত করে ধর আর প্রেমসে বার করে আন। নীচের পকেটের ব্যাপারে নাকি কাঁচিই সেরা হাতিয়ার। বস, বিনা মেহনতে খোরপোষ। মায় বউয়ের গয়না, ছেলেপুলের—

সুবল আর সুবলের মার ছবি ভেসে উঠে চোখের সামনে। না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে সুবল, আর তার মা চোখ মুছছে দোরগোড়ায় বসে। চোখে এসেছে হতাশার ক্লান্তিজনিত ঘুম।…

ছি ছি, ঘেন্নার কাজ যে! তা হোক, ডান হাতের তর্জনী আর মাঝের আঙুলটা একবার দেখে নিল মহেন্দ্রির।

বাঃ চমৎকার পেশা, ভারি মজার! কিন্তু বুকের মধ্যে দুরদুর করছে তখনও। হাতের তেলো ঘেমে উঠেছে উত্তেজনায়, পা দুটো যেন কাঁপছেও। না না, আর দেরি করা চলে না। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিল

মহেন্দ্রর। যাক্, কেউ দেখে নি মনে হয়, তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এল, সোজা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে। আর এখানে নয়, এগিয়ে চলল একেবারে শেয়ালদামুখো।

অনেক দূরে এসে বার করল নোটের গোছা। আবার একটা কাঁপুনি এল সারা দেহে। পেছনটা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি গুনে ফেলল আয়ের অঙ্কটা। দু'আঙ্গুলের আয় দু'শত টাকা। ভয়কে উপচে একটা দারুণ স্ফূর্তি এল ভেতরে, একটা আনন্দের আতিশয্য। মেহনত কিছুমাত্র নয়, সময় আধ মিনিটেরও কম। চাকরি-বাকরি লাগে এর কাছে!

দোকান থেকে খাবার কিনে নিল—ভর্ত্তি একটা বড় ঠোঙ্গা। সুবলকে ডেকে তুলে খাওয়াবে, তার মাও একটু মুখে দেবে।

কিন্তু জিজ্ঞেস করলে কি বলবে? যদি জিজ্ঞেস করে চাল কেনবার পয়সা নেই, মিষ্টি কিনে আনলে কেমন করে? একথা ত উঠবেই, উঠতেই ত পারে। তবে সে আর এমন কি ফ্যাসাদ? বলবে, এক চেনা লোকের চাকরি হয়েছে, তাই মিষ্টি খেতে দিয়েছে। বাড়ীতে ছেলে-বৌ আছে, দিয়েছে এক ঠোঙ্গা। হাঁ, মিছে কথাই বলবে—মিথ্যে বলবে, তবু বৌয়ের কাছে ছোট হবে না। আরও আছে, আছে সুবল, ভয় তাকেই সবচেয়ে বেশী। ছেলের কাছে ধরা দেবে চোর বলে, পকেটমার বলে! যে ছেলে এক দিন একটা কিছু হতে পারে, তার লজ্জার ইতিহাস মগজে ঢুকিয়ে দেবে এখনই। চিরদিনের মত মাথা হেঁট করে দেবে ছেলের। অসম্ভব, এর ছোঁয়া লাগতে দিতে পারে না ওর গায়ে। ওকে যে মানুষ করতেই হবে।

টাকা ফুরনোর আগেই আবার চাকরির চেষ্টা করেছে অনেক। অনেক হেঁটেছে, খোশামোদ করেছে। রোদ লাগিয়ে শরীর খারাপ করেছে। কিন্তু ফল হয় নি কিছুই। ভেবেছে অনেক, এ পথে মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নেই। নিজেরা মরবে, ছেলেটাকে চোখের সামনে দেখতে হবে কুলিগিরি করছে, নয় পকেট মারছে, বদমায়েসি করছে। ভাবতে ভাবতে কপাল ঘেমে যায়, আর ছাই ভাবতে পারা যায় না। ওই ভাল, ওই ভাল। নিজে বয়ে গিয়েও যদি ছেলেটাকে তুলে ধরা যায়। একটা পয়সার সৌরভে যদি পাঁকের কলঙ্ক ঢাকে, তবে ছেলের কৃতিত্বে বাপের পাপ মুছবে না? তার মার্জ্জনা হবে না?

পেশা ঠিক হয়ে গেল মহেন্দ্রের, একটার পর আর একটা শিকার করতে করতে হাতও পেকে গেল। তবে হুঁশিয়ার হয়েছে একটু বেশীমাত্রায়। সবখানেই—বাড়ীতে এবং বাইরেও। এদিকে যেমন কোনও রকম গুঞ্জন উঠতে দেয় না, ওদিকে তেমনি নির্ঘাত মৌকা না পেলে মারে না। লোভে পড়ে ঝুঁকি নিতে যায় না। আয়ের পরিমাণটা তাই খুব বেশী নয়, কোনও প্রকারে দিন গুজরান হচ্ছে। অভাব-অনটনের হাত থেকে একেবারে বেকসুর খালাস হয় নি। দু'কূল ঠিক রাখা ত বড্ড মুশকিল।

উপরি উপরি ক'মাসের ভাড়া দেওয়া হয় নি। ঘোষবাবু এবার তাগাদা দিয়েছেন। তাগাদাটা একটু কড়া রকমেরই হয়েছে। টাকার অঙ্কটাও ত আর কম নয়। একুনে পঞ্চাশের উপরে, তার পর আর কিছু বাড়তি খরচও আছে। নূতন বছরে ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করতে হবে।

ঘোষবাবু তাগাদাটা প্রকাশ্যেই পেশ করেছেন। প্রকাশ্যে মানে বাড়ীর ভেতরেই, কিন্তু সুবলের সামনে। ছেলের সামনে বাপকে এমন ভাবে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিল? মনটা খারাপ হয়ে গেল মহেন্দ্রের। যেমন করেই হোক ভাড়ার টাকাটা শিগগীরই চুকিয়ে দিতে হবে, পারে ত আজই।

ভাবতে ভাবতে ধীর পায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল মহেন্দ্র।

পিছন থেকে তখনও কানে আসছে—সুরবালার সংসারের দায়িত্ব বিষয়ক সতর্কবাণী।

ভগবান, একটা মৌকা যেন আজ মেলে।

মনের মধ্যে একটু রাগও হয় মহেন্দ্রের। ভারি একটা নচ্ছার কাজ এই, ভারি হারামি পেশা। লোকে ভাবে ও অমুক ব্যাটা পকেটমার, তবে কত না মারছে। টাকা লুটছে দু'হাত দিয়ে। সেও এমনি এক দিন ভেবেছে, কিন্তু তখন সে অনভিজ্ঞ, এখন বুঝছে, কত ধানে কত চাল। পকেটমার—শুধু নামেরই জেল্লা! এদিকে পেট শুকিয়ে আমসি।...

বাবা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই রাস্তায় এসে দাঁড়াল সুবল। মনটা মোটেই ভাল নয়, সকালবেলায় বাপকে এমন করে অপমান করল! তের বছরের ছেলে, কিছু বোঝে বৈ কি।

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট থেকে হ্যারিসন রোড ধরে অনেকটা এগোল মহেন্দ্র, কিন্তু সুযোগ এল না। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরল বড়-বাজার মুলুকে। একটাও বেহুঁশিয়ার পকেট চোখে পড়ল না। আজ রবিবার, ট্রামে-বাসেও ভিড় নেই, হতাশ হয়ে এসে দাঁড়াল হাওড়া পোলের উপর। একটু ঠাণ্ডা বাতাস লেগে শরীরটা চাঙ্গা ত হোক। এগিয়ে লাভ নেই, এইখান থেকেই আগে নজর রাখা যাক। ছেঁড়া জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল একবার।

রেলিঙের ধার দিয়ে দিয়ে পায়চারি করছে, হঠাৎ খ্যাচ

কার দৃষ্টিতে টান পড়ল। বুক-পকেট নয়, কোমর তবিলের আসল অংশটাই ঝুলে পড়েছে নীচে। জামার নীচে না নেমে এলেও জামার তলা দিয়ে চোখে পড়ছে সামান্য সামান্য, ঐ সামান্যতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল পাকা চোখের কাছে। থলেটা কোমরে জড়িয়ে তার তবিলটা রেখেছে ঝুলিয়ে। খুশীতে মনটা মেতে উঠল, চমৎকার মৌকা, মালও নিশ্চয় মোটাই।

শুকনো মুখখানা চকচকে হয়ে উঠল আশা-আনন্দে। কিছু মেহনত নয়, শুধু ধারালো হাত-কী টিটার একটা পোঁচ। মোষবাবুর বুকের উপর ছুঁড়ে দেবে তার গোটা পাওনাটা, এক কিস্তিতেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা শিস বেরিয়ে এল তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিল।

চার পয়সা দিয়ে একখানা প্ল্যাটফরম টিকিট কিনে দাঁড়াল গিয়ে বোম্বাই মেলের প্ল্যাটফরমে। উঃ কি ভিড়, সব যোগাযোগ—ভগবানের দয়া। কুলি-খরচ বাঁচিয়ে পোঁটলা নিয়ে ঠেলে উঠছে ভদ্রলোক ইণ্টার ক্লাসের একটা কামরায়।

ভদ্রলোক কামরায় ঢোকবার আগেই অপারেশন শেষ করে প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে এল মহেন্দ্র।

পোলের মাঝখানে এসে গোটাকয়েক তামার পয়সা বের করল পকেট থেকে। টুক করে কপালে ঠেকিয়ে ছেড়ে দিল গঙ্গার বুকে। এ একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে ওর। যখন যা পায় তার থেকে দেবতার নামে কিছু দেওয়া।

কিন্তু এ কি! সামনে এত হট্টগোল কিসের?

একটু ভড়কে যেতে হল। শব্দটা ত ভাল নয়। সবাই মিলে চেঁচাচ্ছে: ধর ধর পকেটমার। সেই কি তবে ধরা পড়ছে। আওয়াজটা পিছন দিক থেকে এলে এতে আর কোনও সন্দেহই ছিল না, কিন্তু সে পথ এক রকম বন্ধ, ও হল ট্রেনের প্যাসেঞ্জার। হতে পারে অন্য কোনও হতভাগা হয় ত ধরা পড়ছে। কলকাতা শহর, চোর-চোট্টার কি অভাব এখানে? কত লোকের এই পেশা, কিন্তু সহবৃত্তিক হলেও সব ব্যাটাকে দেখতে পারে না মহেন্দ্র। সবারই ত আর এমনি কোনও মহৎ উদ্দেশ্য নেই।

এগিয়ে রাস্তায় পড়তেই দেখে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়েছে এক জায়গায়, ব্রিজের ঠিক মুখটাতেই। যেমন হুমকি-হামকি তেমনি চটাপট প্রহারের শব্দও। শিকার ধরা পড়েছে বোধ হয় ওদের।

আহা, বেচারি বাঁচতে পারে নি! নিজের অজ্ঞাতসারেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটুখানি সহানুভূতি—সবাইকে মনে মনে পছন্দ না করলেও।

যাক মশাই, খুব মার হয়েছে, এখন থানায় দিয়ে দিন। ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! বাচ্চারাও নেমেছে এই কাজে! ব্যাটারা সব বংশগত পকেটমার। যা হোক এগিয়ে দেখতে যায় মহেন্দ্র।

ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে মাথা গলিয়ে দিতেই মাথাটা ঘুরে উঠল বোঁ করে। চোখের সামনে হুড়মুড় করে হাওড়া ব্রীজটা বুঝি ভেঙে পড়ল। পড়তে পড়তে কোনও রকমে টাল সামলে নিল মহেন্দ্র।

ভুল নয়, ঠিকই দেখেছে, ভিড়ের ভেতরে পকেটমার বলে ধরা পড়েছে তার সুরেন।

মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের নৃত্যগীত

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

মধ্যপ্রদেশের গহন জঙ্গলে, বস্তার, মাণ্ডলা ও চান্দা জেলায় এবং সরগুজা অঞ্চলে যে সমস্ত আদিম অধিবাসীদের দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কোরবা, ভুঁইহার, কোর্কু, গোন্দ, ওরাওঁ, মারিয়া ও বৈগা জাতি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া সাতপুরার অরণ্যে আরও বহু শ্রেণীর উপজাতি আছে। এ সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে কোরবা আর পণ্ডো জাতিই এখন পর্যন্ত এক রকম খাঁটি অরণ্যবাসী রয়ে গেছে। বর্তমানে কোরবা জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে, 'পহাড়িয়া কোরবা' ও 'ডিহরিয়া কোরবা' নামে পরিচিত।

ডিহরিয়া কোরবারা জনপদে সভ্যজাতির সংস্পর্শে এসে বহু অংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তারা কাপড় পরতে, রান্না করে খাদ্য-দ্রব্য খেতে ও চাষবাস করতে শিখেছে। তাদের ভাষার সঙ্গে ছত্রিশগড় ও বিলাসপুরী ভাষা মিশ্রিত হয়ে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

পহাড়িয়া কোরবাদের সাতপুরা পাহাড় ও অরণ্যে এবং নর্মদার তীরে তীরে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের পোশাকের বালাই বড় নেই; গাছের বাকল তাদের লজ্জা নিবারণ করে। তাদের রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তারা দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ। মাথার চুল তারা কখনও কাটে না, পিঠে পিঠে নিয়ে ঝুলিয়ে দেয় অথবা রশির মত পাকিয়ে রাখে। তাদের প্রধান খাদ্য হ'ল বন্য পশুর মাংস এবং ফলমূল ও কন্দ। তারা পাকা শিকারী, পিঠে তীর ধনু ঝুলিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে বন্য পশুর সন্ধানে ঘোরে, এবং বিষ-মাখানো তীর দিয়ে অনায়াসে পশু শিকার করে আনে ও আগুনে ঝলসে খায়। এঁদের স্বভাবে বৈশিষ্ট্য আছে, এঁরা সাহসী, নির্ভীক, সত্যবাদী, সরল এবং অতিথি-বৎসল। এদের চেয়ে কিঞ্চিৎ উন্নত স্তরে যারা পৌঁছেছে, তারা এক বিচিত্র উপায়ে কৃষি করে। এরা জঙ্গলের একটা স্থান নির্দিষ্ট করে এক শুভদিনে সেখানকার বড় বড় গাছ কাটতে সুরু করে দেয় ও সেগুলো ফেলে রাখে। গ্রীষ্মকালে সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সব গাছগুলো পুড়ে গেলে এক একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে সবগুলো ছাই জমির চার-দিকে ছড়িয়ে ফেলে। বর্ষাকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে, সেই ভিজা ছাইয়ে চার-পাঁচ রকমের শস্যদানা একসঙ্গে ছড়িয়ে দেয়। প্রথম দুই বৎসর সেই উর্বরা জমিতে চমৎকার ফসল হয়, তারপর ফসল আর তত ভাল হয় না। সেজন্য তারা পাহাড়ের উপর এক স্থানে দুই তিন বৎসরের বেশী ক্রমাগত চাষ করে না। দুই তিন বৎসর চাষ করেই তারা ঐ স্থান ত্যাগ করে জঙ্গলের অন্য স্থানে আবার পূর্বোক্ত ভাবে গাছ কেটে জ্বালিয়ে জমি তৈরি করে। এভাবে ক্ষেত তৈরি করার জন্য বছরের পর বছর তারা জঙ্গলের মূল্যবান গাছগুলি কেটে নিঃশেষ করে ফেলছে। পরিণামে এই হয়েছে—যে সমস্ত বড় বড় গাছ বৃষ্টির জল শোষণ করত, সেগুলি নির্মূল হয়ে যাওয়াতে বর্ষার সময় পাহাড়ের উপর থেকে প্রবল জলধারা গিয়ে নদী নালাতে মিলিত হয়, আর সেই সব ক্ষীণকায়া পাহাড়ী নদী বিশালাকার ধারণ করে তীব্র স্রোতে দু'দিককার উৎকৃষ্ট ভূমি এবং এদের পর্ণ-কুটীর ধ্বংস করে বয়ে চলে। এই সব আদিম জাতি অন্যভাবে ক্ষেত-কৃষি করতে বিশেষ ইচ্ছুক নয়, তারা বিশ্বাস করে ধরিত্রী-মাতার উপর হলচালনা করলে মাতার বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

এরা বৎসরে দু'তিন মাস এই অভিনব ধরনের কৃষি করে এবং অবশিষ্ট সময় নাচ-গান আমোদ-প্রমোদে কাটায়। এরা ভূত-প্রেত

"টোনা-টানা"র গভীরভাবে বিশ্বাস করে। সব উৎসবেই এরা মদ্যপান ও নৃত্যগীত করে—এমন কি শবদাহের পরেও।

গোন্দ জাতিরও নাচ-গানের বড় সখ। তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে। কোন কোন নৃত্য স্ত্রী-পুরুষ কর্তৃক একত্রে অনুষ্ঠিত হয়। করমা নাচে যুবক-যুবতীরা সেজেগুজে যুগলে নৃত্য করে। মাদল বাজে, বাঁশী বাজে, আর এক এক জোড়া যুবক-যুবতী এক হাত গলায় ও এক হাত কোমরে দিয়ে বাজনার তালে তালে নাচে। সাধারণতঃ প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরের সহিত নাচে এবং সন্তান না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীও জোড়া হয়ে নাচে। নাচের পূর্ব্বে সবাই প্রচুর মহুয়ার মদ পান করে।

আদিবাসীদের মধ্যে পর্দ্দার কোন বালাই নাই। নারীরা মুক্তভাবে মাঠে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে চলাফেরা করে এবং সেজন্য নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়, তাতে তরুণ-তরুণীরা প্রেমে পড়ে নিজ ইচ্ছামত বিবাহ করতে পারে। শুধু তাই নয়, বিবাহিতা নারীরা ও অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হলে অনায়াসেই পূর্ব্ব-বিবাহ-সম্বন্ধ ছিন্ন করে দ্বিতীয় বার পতিগ্রহণ করতে পারে, শুধু প্রেমিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রথম পতিকে অর্থদণ্ড দেয়। যারা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে, কনেকে তাদের যৌতুক দিতে হয় না। এদের মধ্যে কনেকে যৌতুক পণ দিতে হয় এবং গরীব অরণ্যবাসীদের পক্ষে অনেক সময় সেটা কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক পুরুষ কন্যাপণ হিসেবে নগদ অর্থ দিতে না পেরে ভাবী শ্বশুরগৃহে মজুরের কাজ করে এবং এক বৎসর দুই বৎসর শ্রমদান করে তবে বধূলাভ করে। এরূপ প্রণয়প্রার্থীদের "লমসেনা" বলে। আদিবাসী স্বামী-স্ত্রীদের "ডোকা" "ডোকী" বলা হয়, বরকে অনেক সময় "ডুলহাবাবু" বলে।

আদিবাসীদের কয়েক প্রকার নৃত্যের মধ্যে করমা, বৈগা, বেমর, শৈলা ও চাচর নৃত্য উল্লেখযোগ্য। এদের অনেক গানে উঁচু স্তরের ভাব বা শব্দবিন্যাস কিছুই নেই, শুধু নাচের তাল রাখবার জন্য অনেক সময় কতকগুলো অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করে। তবে জনপদে এসে যে সব আদিবাসী কিঞ্চিৎ উন্নত হয়েছে, তাদের সঙ্গীতে তারা সহজ সরলভাবে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। নাচের বাদ্যের মধ্যে মাদল, মন্দিরা, বাঁশী ত আছেই, এ ছাড়া আছে চটকোলা। চুটুকরা বাঁশ ও কাঠ দিয়ে চটকোলা তৈরি করে এবং নাচের সময় তা দিয়ে চটক্ চটক্ আওয়াজ করে। করতালের মত একটা থালা বাজায় তাকে থালী বলে। আর একটি বাদ্যের নাম হ'ল "টিমকি" একটি মাটির বাটিকে চামড়া দিয়ে মুড়ে নেয় ও তা দড়ি দিয়ে কোমরে ঝুলিয়ে রাখে এবং দুটো কাঠি দিয়ে টিম টিম করে বাজায়।

বেমর নৃত্য একটি অতি কঠিন নাচ। এরা পাহাড়ের উপর চাষের জমিকে "বেমর" বলে। পাহাড়ে ক্ষেত করা যেরূপ কষ্টসাধ্য এই নৃত্যও সেরূপ, সেজন্য একে বেমর নৃত্য বলে। মাদল আর টিমকি তালে তালে বাজতে থাকে, নৃত্যকারীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একদল অন্য দলের কাঁধের উপর চড়ে নাচে, এই নাচটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

শৈলানৃত্যও খুব কঠিন, এটা হ'ল বীরদের নাচ। পাহাড়ের উপর গোল হয়ে হাতে বর্শা নিয়ে আদিম অধিবাসীরা নাচে, তাতে গানের কথা বড় বেশী থাকে না, সামান্য দু'চার পংক্তি গীতই বার বার গেয়ে তারা নাচের তাল রাখে।

ঐলে ডুঙ্গরিয়া, পৈলে ডুঙ্গরিয়া
বীচমে রহে মটা
মটটা কে উপর কীক মারে
ঝুলিয়া মঞ্জুরা।

বিবাহ-অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোক কর্তৃক হলুদ মাখানো

—"এদিকে জঙ্গল, ওদিকে জঙ্গল, মধ্যভাগে টিলা, টিলার উপর পুচ্ছওয়ালা ময়ূর নাচে।"

এই শৈলা ও বেমর নৃত্য জব্বলপুর ও বস্তার জেলায় বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

সভ্য জগতের সংস্পর্শে যারা এসেছে সেই সকল আদিবাসীদের গীতে হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

যখন পাহাড়ের উপর গহন জঙ্গলে দল বেঁধে স্ত্রী-পুরুষ কাঠ কাটতে কিংবা ক্ষেতে কাজ করতে যায়, তখন তারা কাজ করতে করতে গান গেয়ে তাদের শ্রম দূর করে এক পদ পুরুষরা গায় অন্য পদ নারীরা গেয়ে উত্তর দেয়, সাধারণতঃ এ সব গান আদি-রসাত্মক হয়।

পুরুষ। হে মডলেবালে তেরা নৈনা নজর রে
ঝুলেইয়ার হে মডলেবালে রে।

স্ত্রী। হে মড়লেবালে, ভরো-মুননা, বিসর
মত জানা, হমারী গলী আনা,
হে মড়লেবালে রে।

পুরুষ। পানী তো বরসৈ, পাতরা কোধী
জরা ইসকে তো দেখো হমার কোধী
হে মড়লেবালে রে।

স্ত্রী। উপর কে নৌলা বোয়ে তো বারী
তোহে দেখন কে লাগে ললক ভারী
হে মড়লেবালে রে।

পুরুষ। মাঈ নরমদা, বড়ী তো ধরনী
বিজ নৈনা চুনাদ, কগী তো গরমী—

স্ত্রী। গঈন বজরিয়া, লাঈন ভাঁটা
মোরী ভিজ চুনরিয়া, ওড়া দে ছাতা
হে মড়লেবালে রে।

শিরোভূষণ পরিহিত ভীল বর ও কনে। বধূর পরনে সাদা ফ্লানিয়ুনি বস্ত্র

পু। হে মড়লেওয়ালা, তোমার নয়নপথে সর্বদা তোমার প্রেমিকের চিত্র ভাসছে।

স্ত্রী। হে মড়লেওয়ালা একটু শুন, আমাকে ভুলে যেও না, আমার গলিতে এসো।

পু। পাতার দিকে জল গড়িয়ে পড়ছে, তুমি একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে দেখ, হে মড়লেওয়ালা।

স্ত্রী। উপরে গ্রাম, নীচে জল বয়ে যাচ্ছে, তোকে দেখবার জন্ত অত্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে।

পু। নর্মদা মা, তুমি ত বড় ধার্মিকা, বিজলী চমকাও, বড় গরম লাগছে।

স্ত্রী। বাজারে গেলাম, বেগুন কিনলাম। আমার ওড়না ভিজে গেল, ছাতা ধর হে মড়লেওয়ালা।"

মণ্ডল জেলার অধিবাসীরা করমানাচে এই গীতটি গায়। এই গানটি প্রেমিক-মনের সহজ সরল অভিব্যক্তি।

যখন অন্ত টোলা বা বস্তি থেকে কুটুম্ব সম্পর্কীয় বন্ধুদের বা প্রেমিকের আগমন হয় তখন সেখানকার স্ত্রী-পুরুষেরা আনন্দে দল বেঁধে মাদল বাজিয়ে গান গায় নাচে। পুরুষ ও নারীরা গোল হয়ে পাশাপাশি বসে, এবং দলের দু'এক জন পুরুষ বাজনা বাজিয়ে তালে তালে নাচে। এই গানের নাম হ'ল 'সজনী', এটা হ'ল প্রণয়গীতি—

স্ত্রী। মুরলা রে ঘর সাজন আয়ে
নাচো পংখ পসার
ঘুমড় ঘুমড় কে বদরা ছায়ে
শীতল চলে বয়ার

পু। দূর দেশকে হম পরদেশী
করলো কুছ সংকার

স্ত্রী। কা চাহিয়ে জিমনার তুমহারে
কা চাহিয়ে সংকার

পু। তুমহারে ভোজন চাহিয়ে
নৈনো কা সংকার।

স্ত্রী। ঐসী বাতো কহো নহমসে
তো হুত হৈ তকরার।

পু। ভোলা ভালা রূপ তুমহারা
কৈ সে দেঁও বিসার।

স্ত্রী। আয়ো সাজন ঝিলমিল করকে

পু। আয়ো সজনী ঝিলমিল করকে

দু'জন। বন্ধ করো তকরার।

স্ত্রী। "ময়ূর রে পাখা ছড়িয়ে নাচো, ঘরে প্রেমিক এসেছে গুড়ুম গুড়ুম করে মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, শীতল বাতাস বইছে।

পু। আমি দূর দেশ থেকে পরদেশী এসেছি, আমার অভ্যর্থনা করো।

স্ত্রী। তুমি কি খেতে চাও, তোমাকে কি রকম অভ্যর্থনা করব?

পু। তোমার তৈরী খাদ্য চাই, আর তোমার নয়নের প্রীতি চাই।

স্ত্রী। এ রকম কথা বলো না তবে ঝগড়া হবে।

পু। তোমার মন ভুলানো রূপ কি করে ভুলি?

স্ত্রী। বন্ধু এসো, মিলে মিশে এসো

পু। বান্ধবী এসো, মিলে মিশে এসো

দু'জনে একসঙ্গে। ঝগড়া বন্ধ করো।

—এটিও প্রণয়গীতি, পুরুষ ও নারীরা দল বেঁধে গানে উত্তর প্রত্যুত্তর করে ও নৃত্যকারীরা তালে তালে নাচতে থাকে মাদল বাজিয়ে।

পুরবৈয়া বৈরন হওয়া চলে,
তেরা মেরা মিল না অব কাইসে তোয়
পু। তেরা মেরা মিলনা কুঁয়ে পে তোয়
স্ত্রী। ননদিয়া বৈরিন পানী ভরৈ
তেরা মেরা মিলনা
পু। তেরা মেরা মিলনা চোক সে তোয়
স্ত্রী। জেঠনিয়া বৈরিন চৌকা করে
তেরা মেরা মিলনা
পু। তেরা মেরা মিলনা ডগর মে তোয়
স্ত্রী। পড়োসিন বৈরিন কাঁটা লগৈ
তেরা মেরা মিলনা

ডিন্‌ডরিয়া কোরবাদের সেলা নৃত্যের প্রস্তুতি

এটা হ'ল অভিসার-গীতি। প্রেমিকার বিরহ সহ্য করতে না পেরে প্রেমিক বলছে, "পূবের হাওয়া শত্রু হয়ে বইতে সুরু করেছে, তোর আমার মিলন এখন কি করে হবে।"
পু। তোর আমার দেখা কুয়োর পাড়ে হবে।
স্ত্রী। ননদিনী শত্রু হয়ে সেখানে জল ভরছে,
তোর আমার দেখা কি করে হবে।
পু। তোর আমার দেখা রান্নাঘরের আঙ্গিনায় হবে।
স্ত্রী। সেখানে বড় জা শত্রু হয়ে বসে বসে লেপছে।
পু। তোর আমার দেখা রাস্তার মাঝে হবে।
স্ত্রী। পাড়া-প্রতিবেশী শত্রু হয়ে সেখানে কাঁটা লাগিয়ে রেখেছে, তোর আমার মিলন কি করে হবে।"

বৈলা চলিন রাই, ঘাট করীদে
বৈলা ছোটে ছোটে রে
ডোঙ্গর মাঁ আগী লগৈ জরত হ্যায় পতেরা
সুন সুন কে হীরা মোর জরত হ্যায় করেজা
ভলা ছোটে ছোটে রে।
কুটকী কে পেজ রাঁধে মাহুল কে দোনা
তোরে বিনা জোড়ী মোর হোইনো সুনা
ভলা ছোটে ছোটে রে।
মহুয়া কে লাটা, থমের ঠোলা
নোটকে আওয়ে হমায় টোলা
ভলা ছোটে ছোটে রে,
পিপর কে পত্তা, পবন হিলনা
চোলা তরস গৈ কবৈ তো মিলনা
ভলা ছোটে ছোটে রে।

"প্রেমিক বা স্বামী বলদ নিয়ে হাটে চলে গেছে, বিরহিনী স্ত্রী একা ঘরে থাকতে না পেরে বলছে, জঙ্গলে আগুন লেগে পাতা জলছে, আমার মনও শুষ্ক হয়ে জলে যাচ্ছে তোমার বিরহে, বলদ ছুটে যাচ্ছে।
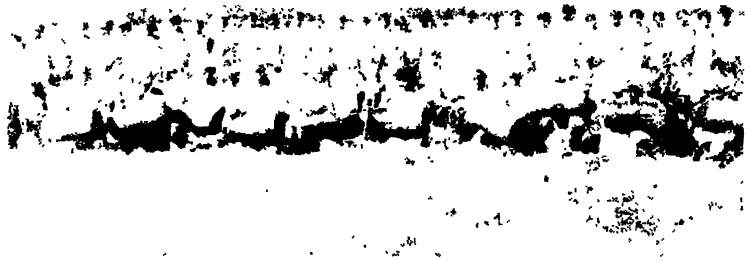
মহুয়া পাতার ঠোঙাতে কুটকী ডাল আর চালের পাতলা খিচুড়ি করেছি। মহুয়া ফলের লাড্ডু, আর থমের ফলের মিঠাই বানিয়েছি, তুমি আমার গ্রামে ফিরে এসো। পিপল পাতা বাতাসে দুলছে, আমার শরীরও শুকিয়ে উঠেছে, কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, বলদ ছুটে যাচ্ছে।"

"হায় চোলা রোওত হ্যায় রাম
বিনা দেখে পরাণ চোলা রোওত হ্যায় রে
দাদর ঝাওর, কোড়ী ঢুঁড়ো
ডোঙ্গর বীচ মঝার, ভৈয়া
সবৈ পতেরন তোলা ঢুঁড়ো
কহাঁ লুকে হ্যায় জার
চোলা রোওত রে।
মায়ালা তৈ কসকে ছোড়ৈ
সুরতা মোরে ভুলাই, ভৈয়া
মোর মড়ায়া সুনী করকে
কহাঁ করে পহু নাই
চোলা রোওত হ্যায় রে।
ইন নৈ নো মে নীদ ন আয়
হিরদা হোই গৈ সুনা, ভৈয়া
ডোঙ্গর ডঙ্গরী তোল ঢুঁড়ো
বিপদ বড় গৈ দুনা
চোলা রোওত হ্যায় রে

"হায় আমার মন কাঁদছে, তোকে না দেখে আমার দেহমন কাঁদছে। নদী নালা টিলা সব জায়গায় তোকে খুঁজে দেখেছি, তুই কোথায় লুকিয়েছিস, তোর জন্য আমার মন কাঁদছে।

আমায় মায়া ছেড়ে আমাকে ভুলে, আমার কুটীর শূন্য করে কার সঙ্গে তুমি প্রেম করছ? আমার মন কাঁদে।

আমার নয়নে নিদ্রা নেই। হৃদয় শূন্য হয়ে গেছে, তোকে বন-জঙ্গল খুঁজে দেখেছি, আমার জ্বালা বেড়ে গেছে, হায় আমার মন কাঁদছে তোকে ছেড়ে।"

সমতলের জনপদে যে সব আদিবাসী বাস করে তারা নাচের সময় বিশেষ কোন পোশাক পরে না, কিন্তু পাহাড়ী আদিবাসীরা নাচের সময় বিচিত্র পোশাক পরিধান করে। নারী ও পুরুষ উভয়েই কড়ি ও হাড়ের তৈরী অলঙ্কার, হাতে গলায় কোমরে পরে এবং ময়ূরের পালক ও নানা কারুকার্যখচিত মুকুট মাথায় দেয়।

আমরা সরগুজিয়া আদিবাসীদের ডেকে আমাদের বাড়ীতে নাচ গান করিয়েছি, তারা পাঁচ-ছয় প্রকারের নাচ দেখিয়েছে, তাতে বেনর ও শৈলা নাচ শুধু দেখতে পাই নি।

করমা নাচে নারীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কোমর ও গলায় হাত দিয়ে এক সারিতে দাঁড়ায়। সামনে আর এক সার পুরুষ মাদল গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়ায়। পুরুষরা মাদল বাজাতে সুরু করে ও নারীরা সেই তালে তালে একবার পুরুষদের সামনে এগিয়ে যায়, আবার পিছিয়ে যায় আর গান গাইতে থাকে।

নারীদের পোশাক, দৃষ্টি ও অঙ্গভঙ্গী শালীনতাপূর্ণ ছিল। গানের মধ্যে ভাবের আতিশয্য থাকলেও নাচের ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গীতে অধীরতা ছিল না। বাদ্যের উন্মাদনা সত্ত্বেও নারীদের বোধ হয় সংযত ছিল।

বাজনার সুর ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে উঠতে লাগল এবং পুরুষরা মাদল নিয়ে লম্ফঝম্ফ করতে করতে মাদলে দ্রুত কাঠি চালাতে লাগল। কখন কখন মেয়েদের পায়ের কাছে বসে মাদল বাজাতে লাগল, আবার লাফিয়ে উঠে দূরে সরে দাঁড়াল, এদের এই মাদল নিয়ে নাচটা বেশ উপভোগ্য। তবে নাচের বা গানের তালে বৈচিত্র্য নেই, ছন্দ ও গীত কয়েকটা তালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো দর্শক ও শ্রোতার কাছে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নৃত্যকারীদের গতিতে কোন ক্লান্তির চিহ্ন দেখা যায় না, সেই একঘেয়ে বাদ্য ও নাচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে, অবশ্য নাচের পূর্ব্বে নৃত্যকারীরা প্রচুর মহুয়া-মদ্য পান করে নেয়।

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম ভাগে নর্ম্মদাতীরে, একদিকে সাতপুরা পর্ব্বত ও অন্যদিকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের বনাঞ্চলে ভীল বনজারা কোর্ম্ম ইত্যাদি আদিমজাতি বাস করে। ভীলদের মধ্যেও বহু নৃত্যগীতের প্রচলন আছে। মধ্যপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের গীতে যেরূপ হিন্দী ভাষার প্রভাব, ভীলদের ভাষায় তার পরিবর্ত্তে গুজরাটী ভাষার আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়।

" ভীল নারীরা যখন মধ্যাহ্নে মাঠে তাদের রাখাল-স্বামীদের জন্য খাদ্য নিয়ে যায় তখন এই গানটি গায়।

শটক স াদেনী রাত। গোয়ালিয়াবে লেলে
ক তে কবলা ম া কুঁদী
ম য় তে বোরা, গোঁউ কাড়িয়া
যে তে বিনা বিনা পীস্তা।
তিন কাতলা বনায়া
যে তে কলেড়ী, ম া হেকা
ক তে মাথে দীনে শালী—
সইয়র ভাঁতা পুযে।
সোরী—কুনা লীজায় ভাঁতা?
পেলা সোপালা না ভাতা
গোয়াল খাঁমলিয়া মালো ম া,
যে তে জাইনে পালো খীসে া।
গোয়াল ধীরে ধীরে উঠো
গোয়াল সঙ্গে মু ট্টা পুরম।
গোরী গায়া ফেরতী ভাইজ।*

চাঁদনী রাত, আমি শস্যের ক্ষেতে লাফিয়ে পড়লাম। আমি নানা ঘাসের বীজ কুড়িয়ে আনলাম, পিষলাম, তা দিয়ে মোটা মোটা তিনটা রুটি বানিয়ে নিলাম। একটা ভাঙা কলসীর টুকরাতে সেঁকে নিলাম, মাথায় এটি নিয়ে চললাম, পথে বধূ জিজ্ঞেস করল কার খাওয়া নিয়ে যাচ্ছ?

আমি বললাম ঐ পেটমোটা লোকটার খাওয়া নিয়ে যাচ্ছি। রাখালটা অমলিয়া মালে শুয়ে আছে গাছতলায়। আমি গিয়ে তার বুড়ো আঙুলটা টানলাম। রাখাল একটা কাঁটার ডাল নিয়ে আমাকে মারতে লাগল, আমি ছুটে পালালাম।

—এটা হ'ল দুষ্ট রাখাল-বৌয়ের গান, ভাল রাখাল-বৌ গায়—

"চাঁদনী রাত, আমি শস্যক্ষেতে লাফিয়ে পড়ে ভাল শস্য কুড়িয়ে আনলাম, ভাল করে পিষে পাতলা তিনখানা রুটি বানালাম, তা মাথায় করে নিয়ে চললাম, পথে বধূ জিজ্ঞেস করল 'কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, অমলিয়া মালের রাখালের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। আমি গিয়ে তার পাগড়ীর প্রান্ত ধরে টানলাম। সে ধীরে ধীরে উঠল এবং মিষ্টি রুটি খেল। হে প্রিয়, এখন গরু তাড়িয়ে ঘরে ফিরে চল।"

ভীলদের গানে ঋতুর বা প্রকৃতির বর্ণনা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তাদের গান কাহিনীমূলক এবং কাব্য হিসাবে উচ্চ স্তরের নয়।

---

* ভীলদের এই গানটি ওলন্দাজ পণ্ডিত ইয়ুব ব্লুট ওলন্দাজ এর নিকট থেকে সংগৃহীত। তিনি ভীলদের সঙ্গে কয়েক বৎসর থেকে তাদের ভাষা শিখে, তাদের রীতিনীতি, বিবাহ, নাচগান ইত্যাদি সম্বন্ধে ইংরেজীতে কয়েকখানা বই লিখেছেন।

১৩

চন্দ্রবাবুর ইচ্ছে হ'ল চাকরী ছেড়ে দেন।

ইস্কুলে তিনি সমস্ত দিন কোন কাজ করতে পারলেন না, আপিসের কাজ, ক্লাস নেওয়া, ক্লাস ইনসপেকশন—কোন কাজ করলেন না, আপিসে বসে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

ওই শম্ভু গড়াঞী পাগল হয়ে যাওয়ার দিন তিনেক পর।

সিদ্ধি খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়েছেন তিনি। তিনি নিজে এই ব্যাপারের দায়ে আংশিক ভাবে দায়ী হয়ে পড়েছেন। তদন্ত করেছিলেন তিনি এবং ব্রজবিহারী বাবু। চন্দ্রবাবু সঙ্কল্প করেছিলেন—এই ঘটনার নায়ক যে বা যে-যে ছাত্র একজন বা দু'জন—তাকে বা তাদের তিনি ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন। রাষ্টিকেট করবেন না, সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করবেন। এবং এতে ইস্কুলের বা বোর্ডিঙের চাকর ঠাকুর যারা যুক্ত থাকবে—তাদের তাড়িয়ে দেবেন। যে ছেলেরা সিদ্ধি খেয়েছে তাদের প্রত্যেকের জরিমানা করবেন।

নিজেকে তিনি জানেন। ছেলেরা তাকে যতটা ভয় করে ততটা ভয়ের পাত্র তিনি নন। তাঁর হাতে বেত আজ পর্যন্ত ভাঙে নি। তিনি ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করেন খুব কিন্তু বেত মারবার সময় তাঁর হাত ঠিক ওঠে না। যতটাও ওঠে—তার উপযুক্ত বেগে পড়ে না। তাঁর কেমন ভয় হয়। কোথায় কোনখানে মারাত্মক হয়ে যাবে। এবং মার খেয়ে কখন কোন্ ছেলে কোণঠাসা বেড়ালের মত নখ-দাঁত বের করে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—সে ভয়ও তাঁর হয়। এ সব তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই বিপ্রগ্রামে ইস্কুল হয়েছে বারো বছর—এক যুগ। এই যুগটির মধ্যে এমন অনেক ছেলেকে নিয়ে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। ওঃ সে সব ছেলে এক-একটি দৈত্য। রামজয় বলত—ষণ্ডামার্কের দল। অবশ্য একটা যুগ চলে গেছে, যুগান্তর হয়েছে, সে শুধু কাল বা বৎসরের হিসাবেই নয়—সব হিসাবেই। এখনকার ছেলেরা তখনকার ছেলেদের চেয়ে অনেক শিষ্ট হয়েছে। দেশটাও পালটেছে। সেকালে পড়ত শুধু বিপ্রগ্রাম এবং আশপাশের অবস্থাপন্ন বিষয়ী ঘরের ছেলেরা। তিনি বলতেন—বাবুর বেটা বাবুরা। তাদের ছিল—পড়লেও ঘরের ভাত, না পড়লেও ঘরের ভাত। না পড়লে লোকে মুখ্যু বলবে, ইংরিজী না শিখলে সভ্য সমাজে অচল হবে, ভাল ঘরে বিয়ে হবে না—তাই পড়ত। যারা একটু বিশিষ্ট ঘরের ছেলে—তারা পড়ত সাহেবসুবোর সঙ্গে ইংরিজীতে দু'চারটে কথা বলতে হবে বলে। এরা—নানা ছাঁদে টেরী কাটত, পকেটে বার্ডশাই রাখত, বাড়ীতে গড়গড়ায় তামাক খেত, দু'চার জন চরস খেত, গাঁজাও এক-আধ জন খেত। এদের শাসন করতে গেলে এরা প্রথম কয়েক মিনিট গোঁ ধরে চুপ করে থাকত; তার পরই উত্তর করতে সুরু করত, তার পর বেত দু'বারের পর উদ্যত হলেই খপ করে চেপে ধরত। সে উপেক্ষা করেও বেত চালাতে গেলে বেত কেড়ে নিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করত। এবং শেষ পর্যন্ত চৈতন্যবাবুর স্ত্রী—গিন্নী-

মায়ের কাছে নালিশ করত। মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন শক্ত সমর্থ জেদী শিক্ষক এসেছেন—তাঁরা দু'এক জনকে প্রহার করেছেন—ভয় করেন নি, কিন্তু পরিণাম ভাল হয় নি।

বঙ্কিম ঘোষাল—বেত মেরেছিলেন ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে কিশোরকে। এক সপ্তাহের মধ্যে বঙ্কিম ঘোষাল তার ফল পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি গ্রামে প্রাইভেট পড়াতে যেতেন, একদিন পড়ানো শেষ করে ফেরার পথে কোন অজ্ঞাত লক্ষ্যভেদীর ঢেলার লক্ষ্য হলেন; ঢেলার আঘাতে প্রথমেই হাতের লণ্ঠনটি ভেঙে নিভে গেল, তার পর কানের পাশ দিয়ে বন বন শব্দে ঢেলা ছুটল। প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে তিনি কোন রকমে বোর্ডিঙে এসে পৌঁছুলেন এবং পরের দিনই চাকরীতে জবাব দিয়ে চলে গেলেন।

আর একজন—বনবিহারী বাবু। তিনিও এমনি একটি দুর্দান্ত ছেলেকে শাসন করেছিলেন। কিছুদিন পরই একদিন ক্লাসে একটি ছেলেকে গালে একটি চড় মারতেই সে অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে গেল, এবং ক্লাসের একদল ছেলে তাকে ঘিরে এমনই হৈচৈ সুরু করে দিলে যে ছেলেটির অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সত্য কিনা যাচাই করবার অবকাশ কেউ পেলে না। ছেলেরা চীৎকার করলে, কাঁদলে, ঘটি ঘটি জল এনে তার মাথায় ঢাললে—সে ভিজে বেড়ালের মত মিট মিট করে চোখ মেলে বললে—মাথাটা কেমন করছে। কথাটা গিন্নীঠাকরুণের দরবার পর্য্যন্ত গেল। বনবিহারী কাজ ছেড়ে চলে গেলেন।

আরও একটা কারণ আছে। সেটা তাঁর নিজের স্মৃতি। ছেলেদের মারতে গেলেই তাঁর বাবার মারের কথা মনে পড়ে। নিষ্ঠুর ভাবে মারতেন তিনি। সে যন্ত্রণা—সে দুঃখের স্মৃতি তাঁর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বাবা তাঁকে অনেক দিন পর্য্যন্ত মেরেছেন, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ুন যখন তখনও মেরেছেন। একদিন তাঁর আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, কতদিন ঘর থেকে পালাবার সঙ্কল্প করেছিলেন—সে সব তাঁর মনে পড়ে যায়।

পারেন না, ঠিক যতখানি কঠোর হওয়া প্রয়োজন—ততখানি কঠোর হতে তিনি পারেন না। ভয় হয়, মমতা হয়, দুই-ই হয়। ছেলেরা তাঁকে ভীতুই মনে করে, সে তিনি জানেন। ছেলেরা—শাসনের দুর্ব্বলতা নিয়ে—তাঁর ভয় নিয়ে রহস্য করে হয় ত ব্যঙ্গও করে—তাও তিনি শুনেছেন। নূতন ছেলেদের—পুরনো ছেলেরা বলে দেয়—গর্জ্জায় খুব কিন্তু বর্ষায় না। ডাকে জোরে কিন্তু বাজ পড়ে না। বেত উঠবে আকাশে—লক লক করে নাচবে কিন্তু পিঠে পড়বার সময় ঠুক করে। শুধু চীৎকারে না ভড়কালেই হ'ল। খুব হিন্দী আর ইংরিজী বলবে। নিকালো—আভি নিকালো—হামারা ইস্কুলসে আভি নিকালো, নেহি মাংতা হ্যায়। গেট আউট—গেট আউট—দিস ভেরি মোমেণ্ট—ই—মি—ডিয়েটলি—ইউ গেট আউট। গলায় হাত দিয়ে ধাক্কাও মারবে, কিন্তু দোর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। ব্যস! এ সব তিনি জানেন।

এই কারণেই ব্রজবাবুকে এই তদন্তের মধ্যে নিয়েছেন তিনি। ব্রজবাবু শাসন করতে পারেন এবং ব্রজবাবুর আকর্ষণ বিচিত্র। মার খেয়েও ছেলেরা মর্ম্মান্তিক আঘাতে মর্ম্মে আহত হয় না। তদন্ত চলছে আজ এই ক'দিন ধরে। সব সত্য প্রকাশিতও হয়েছে—নায়ক দু'জন; তারা ধরা পড়েছে। সিদ্ধি দোকান থেকে তারাই নিয়ে এসেছিল। তাঁর ভয় ছিল—হয় ত কেষ্ট এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কেষ্ট জড়ায় নি—জড়িয়ে পড়েছেন তিনি নিজে। সিদ্ধি খেয়েছিল এরা কচুরী তৈরি করে। কচুরীগুলি তৈরি হয়েছিল তাঁর বাড়ীতে; সেদিন যে কড়াইয়ে সত্যনারায়ণের সেবা উপলক্ষে লুচি এবং তালের বড়া তৈরি হয়েছিল—সেই কড়াইয়ে ভাজা হয়েছিল এবং তার জন্য ঠাকুরকে দায়ী করতে পারা যায় না; ঠাকুর বলেছে—বীণাদিদি দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামজয়ের মেয়ে বীণা। তার সঙ্গে ছিল বঙ্গবালা তাঁর কন্যা। ভাল করে সন্ধান করেছেন তিনি। বীণাও দায়ী নয়। সিদ্ধি এনেছিল বঙ্গবালা। সেই বীণাকে অনুরোধ করেছিল—তুমি করিয়ে দাও বীণাদিদি।

বঙ্গবালাকে প্রশ্ন করবার জন্য তিনি ডেকেছিলেন—বঙ্গবালা!

কঠিন কণ্ঠস্বরে ডেকেছিলেন। বঙ্গবালা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরজাটি ধরে এবং পরমুহূর্ত্তেই মূচ্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ব্রজবিহারী বাবু ছুটে গিয়ে তাকে তুলে এনে শুশ্রূষা করে চেতনা ফিরিয়েছিলেন। এবং তাঁকে বলেছিলেন—আপনি এখন সামনে থাকবেন না মাষ্টারমশাই।

বঙ্গবালার জ্ঞান হওয়ার পর তিনিই তাঁকে বলেছেন—আর না মাষ্টারমশাই। এইখানেই ক্ষান্ত হোন। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।

তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—সে কি উচিত হবে ব্রজবাবু?

—হবে। আমি বলছি।

—কেন একথা বলছেন? এত বড় একটা ব্যাপার। বঙ্গ অবশ্য সিদ্ধি এনে দিয়েছে—কিন্তু কে তাকে দিয়েছে, তার নাম জানতে হবে। বঙ্গ ছেলেমানুষ, এগার বছরের মেয়ে—তাকে ভোলানো এমনকি ব্যাপার? আমি তাকে, আমি তাকে—

তাঁর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

—আমি তাকে রাষ্ট্রিকেট করব। আমি তাকে সিভিয়ার পানিশমেণ্ট দেব। এক্সামপ্লারি পানিশমেণ্ট।

শান্ত স্বরে ব্রজবিহারী বলেছেন—না। এইখানেই শেষ করতে হবে ব্যাপারটা।

—কেন? দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করেছিলেন চন্দ্রবাবু।

—আপনি আমার কথা রাখুন। পরে বলব আপনাকে। পরে। কাল সকালে।

আজ সকালে সমস্ত শুনে তাঁর মনে হ'ল—সমস্ত আঘাতটা ফিরে এসে তাঁর মাথার উপর পড়ল! না—। মনে হ'ল, বিষধর সাপে তাঁকে তাঁর অজ্ঞাতসারে দংশন করেছিল—বিষটা এই মুহূর্তে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, মাথা তিনি আর তুলতে পারছেন না।

ব্রজবাবুর আগেই কথাটা আজ ভোরে তাঁকে শোনালেন তাঁর স্ত্রী সত্যবতী। কাল এই ঘটনার পর সত্যবতী বঙ্গবালাকে নিয়ে রাত্রে আলাদা ঘরে শুয়েছিলেন। ভোরবেলা সত্যবতী উঠে তাঁর ঘরে এসে তাঁর দুটি পায়ে ধরে বলেছেন—সব অপরাধ আমার। যে শাস্তি আমাকে দেবে, দাও। বঙ্গকে আর কিছু বল না। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করো না।

সত্যবতী অকপটে বলেছেন—এখানে এসে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াত সম্পন্ন কায়স্থঘরের সুন্দর একটি ছেলের সন্ধানে। বঙ্গর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। সম্পন্ন ঘরের ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভাল ছেলে। হেডমাষ্টারের মেয়ে—তাকে অবশ্যই আদর করে নেবে।

সে ছেলে মিলল। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে মল্লিকপুরের সিংহবাড়ীর রবি সিংহ। সুন্দর ছেলেটি, তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম, পোশাক-পরিচ্ছদে সম্পন্ন ঘরের ছাপ; কেষ্ট বলেছিল—পড়াশুনায় একটু মাঠো। অঙ্ক সংস্কৃততে কাঁচা খানিক। তা—পাস ঠিক করবে। মাষ্টাররা বলে—ম্যাটিকের ধাক্কা পার হলে উদিকে গড়গড় করে চলে যাবে। গান জানে। ভারী মিষ্টি গলা। বাড়ীর অবস্থা বলতে নাই। সে একেবারে উরি, চৌরী দক্ষিণ দুয়োরি; মা লক্ষ্মী মড়মড় করছেন—বাখারে বাখারে, ঘরের সিন্দুকে ঝমঝম করছেন।

সত্যবতীর অন্তরের কল্পনা অনুমান করতে কেষ্টর বিলম্ব হয় নি। সে বলেছিল—তা আমাদের বঙ্গর সঙ্গে বিয়ে হলে কিন্তু খুব ভাল হয়।

সত্যবতী বলেছিলেন—তা ত হয়। কিন্তু ওরা কি—? সে ভাগ্যি কি—?

—দেখেন দেখি। চন্দ্র মাষ্টারের মেয়ে, সে কেলনা না কি। মাষ্টারকে বলেন কথাটা পেড়ে দেখতে। দেখবেন—একবারে কেতাত্ত হয়ে যাবে।

সত্যবতী বলেছিলেন—ছেলে এমন সুন্দর, বঙ্গু ত আমার সুন্দর নয়, পাঁচপাঁচি। পছন্দ না করে যদি?

কেষ্ট বলেছিল—দেখছি দাঁড়ান। ওই ওদের কেলাসের কামু মুখুজ্জে আছে। সে ভারি মাতব্বর—লোকও ভাল। তাকে বলছি। বুঝেছেন।

সত্যবতী বারণ করেছিলেন—না কেষ্ট কাজ নাই।

কেষ্ট বলেছিল—কিছু ভাববেন না। কেউ জানতে পারবে না।

কেষ্ট বলেছিল—কামদেবকে। কামদেব বলেছিল রবিকে। রবি সাগ্রহে মত দিয়েছিল। সত্যবতী কথাটা এক দিন তাঁকেও বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—এখন অন্তত দু'বছর ও কথা নয়। ছেলেটা আগে পাস করুক। মূর্খ জামাই আমি করব না।

এরই মধ্যে কথাটা গিয়ে বঙ্গর কানে পৌঁছেছিল। এগার বছরের বঙ্গ সলজ্জ এবং স্বপ্নালু হয়ে উঠেছিল। কথাটা চাপা পড়লেও রবিকে দেখে বঙ্গুর লজ্জা পাওয়ায় ছেদ পড়ল না। সে দিন দিন বেশী লজ্জা পেতে সুরু করলে। রবিকেও তার ছোঁয়াচ লাগল। ফুল ফুটতে লাগল—একটি ষোল বছরের ছেলে ও একটি এগার বছরের মেয়ের মনের আকাশে। ক্রমে কথাটা আর গোপন রইল না। রবির কয়েকজন অন্তরঙ্গ জানল। তার মধ্যে কামদেব এবং ওই শম্ভু গড়াঞী প্রধান। নর্ম্যাল পাস শম্ভুর কাছে বঙ্গবালা মধ্যে মধ্যে পড়া বুঝিয়ে নিতে যেত।

চন্দ্রবাবু এ ভারটা দিয়েছিলেন রঙ্ক এসিষ্ট্যাণ্ট বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নকুলবাবুকে, ছেলেরা যাকে বলে মিষ্টার ডেভিড হেয়ার। নকুল ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত; বঙ্গবালা মেয়েটি বুদ্ধিমতী, বাপের কল্যাণে নানান বই পড়েছে অনেক। পড়াতে গিয়ে ঘোষ একটু আধটু বেগ পেতেন। বঙ্গবালার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না। নকুল ঘোষই শম্ভুকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন—বঙ্গুর পড়াটা একটু করে দেখে দিও তুমি। বুঝেছ।

শম্ভুর কাছে পড়ে বঙ্গবালা খুশী হয়েছিল। শম্ভু শুধু ভাল পড়াতই নয়, এই বিয়ের কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে ব্যাপারটিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিল, যেন আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথবার জন্য সুচ সুতো যুগিয়ে দিত।

সত্যনারায়ণ সেবার দিন কামদেব এবং শম্ভু এরা দু'জনেই সিন্নি এনে বঙ্গর হাতে দিয়েছিল। রোট ভাজিয়ে এনে দিতে হবে।

বঙ্গর মুখে দ্বিধার ভাব দেখা গিয়েছিল, বঙ্গ সত্যই ভয় পেয়েছিল, বলেছিল—বাবা যদি জানতে পারেন ?

—কিছু জানতে পারবেন না।

—না।

—তা হলে যা বলতে হয় তুমি রবিকে বল। ওই পাঠালে। ওই দেখ—দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যই কুয়োর ধারে রবি দাঁড়িয়েছিল। সে ও দলের অন্যতম পাণ্ডা এবং বঙ্গবালার দিকেই তাকিয়েছিল। এর পর আর বঙ্গ আপত্তি করে নি। সে এসে ধরেছিল বীণাদিদিকে। বীণা দীর্ঘকাল বাপের শিক্ষক জীবনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। টোলের ছাত্রদের খাদ্যাখাদ্যে গোপন সাধের সঙ্গে তার পরিচয় আছে; তারাও কখনও-সখনও সিদ্ধি খায়, সে সবও সে জানে। ভাইয়ের সাথে বোনের সাহায্য করার মত সাহায্যও করে। ইস্কুল বোর্ডিঙের ছেলেদের সঙ্গেও সহযোগিতা করে। পরীক্ষার পর গোপনে নম্বর জেনে দেয়; ছেলেদের ফিষ্টি হলে তাদের দেওয়া মাছ-মিষ্টি বাপের অজ্ঞাতসারে সেই নেয়; কত ছেলে এল কত ছেলে গেল, বালিকা বীণা ক্রমে ক্রমে যুবতী হ'ল, ছেলের মা হ'ল, বীণা থেকে বীণাদিদি হ'ল—কিন্তু ছেলেদের সহ-যোগিতায় সে চিরকালের সেই এক বীণা রয়ে গেছে। বাটা সিদ্ধি নিয়ে নিজে ময়দার সঙ্গে মেখে বেলে দাঁড়িয়ে থেকে সে রোট তৈরি করিয়ে দিয়েছে এবং একখানা নিয়ে সে নিজে খেয়েছে। বঙ্গবালাকেও আধখানা খাইয়েছিল। এ রোটে কিছু ছিল না; দ্বিতীয় বার আবার রোট ভাজিয়ে নিয়ে গিয়ে-ছিল শম্ভু এবং কামদেব। এবার তারা সিদ্ধি মাখা ময়দা থেকে আটখানা কাঁচা কচুরি তৈরি করে এনে বঙ্গর হাতে দিয়েছিল এবং সাবধান করে দিয়েছিল—খবরদার একটুকরো যেন কম না পড়ে। রবির দিব্বি রইল—হাঁ। বঙ্গবালাই সে সিদ্ধির রোট ভাজিয়ে নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিল।

সত্যবালা বললেন—বঙ্গু ভাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী। তাকে আর কিছু বল না। সে ভয়ে মরে গিয়েছে। কেবলই কাঁদছে। সারারাত ঘুমোয় নি। এই ভোরবেলা একটু ঘুমাল। আমি তোমার কাছে এসেছি।

চন্দ্রবাবু মাথায় হাত দিয়েছেন তখন থেকে।

সত্যবালা এর পর আরও শোনালেন—আরও একটা কথা তোমার কাছে গোপন করব না। পাগল হয়ে শম্ভু যে শুধুই বলেছে—'ওই নীল উজল তারাটি', ওটা একটা গান; রবি ওই গানটা গায় বঙ্গবালাকে লক্ষ্য করে। বঙ্গকে রবি এই বলেই ডাকে।

চন্দ্রবাবু সেই মুহূর্তে স্থির করলেন—চাকরি ছেড়ে দেবেন তিনি। তিনি অযোগ্য। তাঁর কন্যা থেকেই এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। শম্ভু হয় ত নিজেই রোট খেয়েছে—তার জন্য দায়ী হয় ত সে নিজে। কিন্তু বঙ্গবালা সমস্ত কিছুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। তিনি বঙ্গবালার বাপ, বঙ্গবালার সঙ্গে তিনি বাঁধা পড়েছেন। বিচারকের আসন থেকে তিনি কন্যার টানে অপরাধীর স্থানে নেমে এসেছেন। শাস্তি তাঁর নেওয়া উচিত। নিজে শাস্তি না নিয়ে কাউকে তিনি শাস্তি দেবেন কি করে ?

তখনই তিনি ব্রজবিহারী বাবুর কাছে গেলেন। সকল কথা অকপটে বলে বললেন—বলুন, আমি কি করব ?

ব্রজবাবু বললেন—এত বিবরণ আমি জানতাম না। তবে মোটামুটি জেনেছিলাম।

চন্দ্রবাবু অধীর ভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন—আমার কর্তব্য কি বলুন ?

—আপনার কর্তব্য বলতে আপনি কি বলছেন ?

—হয় আমাকে বঙ্গকে শাস্তি দিতে হয়—

—বঙ্গ আপনার মেয়ে, তাকে শাস্তি দিলে আমরা কি বলতে পারি ? সে আপনি বাপ হিসেবে করবেন। হেড মাষ্টার হিসেবে কর্তব্য হলে—এ নিয়ে আপনাকে থানায় যেতে হয় মাষ্টারমশায়। গাঁজার দোকানের ভেণ্ডার থেকে অনেক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হয়। বঙ্গকে আপনি শাস্তি দিতে যাবেন কি বলে ?

—আমি ভাবছিলাম—আমি রিজাইন দেব। আপনি আমার চেয়ে অনেক যোগ্য ব্যক্তি ব্রজবাবু। আপনি হেড মাষ্টার হোন।

—আপনি এ নিয়ে বড় বেশী চঞ্চল হয়েছেন।

—চঞ্চল হব না ? বলেন কি মাষ্টারমশাই। আমার মেয়ে—

—আপনার মেয়ে ? বঙ্গবালা দশ-এগার বছরের মেয়ে; সে ভুল করে একটা কাজ করে ফেলেছে। তার উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন ? না—না। এসব করবেন না। আরও একটা খবর আপনাকে দিই। ধুতুরার বীজ ক্ল্প—আরও কি কি মিশিয়ে শেষের সিদ্ধিটা শম্ভু নিজে বেঁটে তৈরি করে-ছিল। তকরার হয়েছিল ওদের মধ্যে—এই রোট যে খেয়ে সহ্য করতে পারবে সে পচিশ টাকা বাজী জিতবে। শম্ভুর পাগল হওয়ার জন্য দায়ী শম্ভু নিজে।

ব্রজবাবুর কথাটা অস্বীকার করতে পারেন নি চন্দ্রবাবু। কিন্তু বঙ্গবালার দায়িত্ব নেই একথাও মানতে পারেন নি। বাড়ী ফিরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলেন সারাক্ষণ। কোন-ক্রমে স্নান-খাওয়া সেরে স্তোত্রপাঠের আসর থেকে আপিস-

ঘরে এসে চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

কি তাঁর কর্ত্তব্য ? তাঁর কর্ত্তব্য একটা আছে। নিশ্চয় আছে, কি করলে তাঁর মনের এ গ্লানি কেটে যায় ? হঠাৎ একটা পথ যেন তিনি পেলেন। ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা। ব্রজবাবু সেকেণ্ড ক্লাসে এডিশনাল ম্যাথামেটিকস কষাচ্ছেন তাঁর নিজের ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস। ব্রজবাবুকেই বলেছেন— তিনি ফার্স্ট ক্লাসে একটা ট্রানশ্লেসন টাস্ক দেবেন। ক্লাস দুটো পাশাপাশি মাঝের দরজা খুলে রেখেছেন।

চন্দ্রবাবু হন্‌হন্‌ করে এসে ক্লাসের দরজায় দাঁড়ালেন।

ব্রজবাবু বেরিয়ে এলেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি এলেন কেন ? আমাকে ডাকলেই ত পারতেন।

—আমি একটা উপায় পেয়েছি ব্রজবাবু। হোয়াট ডু ইউ সে ?

—কি বলুন ?

—শম্ভুর সমস্ত চিকিৎসার খরচ আমি বহন করব।

—চলুন, এখানে নয়। ওয়া বয়েজ আর ওভারহিয়ারিং। আপিসে এসে ব্রজবাবু বললেন—শম্ভু গরীব ছাত্র, ভাল ছাত্র। তার চিকিৎসার খরচ আপনি বহন করেন, সে ভাল কথা। কিন্তু দায় বলে গ্রহণ করলে আপত্তি করব। আর শম্ভুর খরচ সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা করে দিতে চাচ্ছে। তাদের আমি বলেছি।

—আমি অর্দ্ধেক দেব।

—ভাল। ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। ওর বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। আর একটা কথা।

—বলুন।

—গোপাল বাবু আপনি বাইরে যান একটু।

কেরাণী গোপাল বাবু বাইরে চলে গেলেন।

—রবি সিংহের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ?

—বঙ্গবালার ?

—হ্যাঁ।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন চন্দ্রবাবু। কি উত্তর দেবেন ? উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তাঁর কল্পনা ছিল বঙ্গকে লেখা-পড়া শেখাবেন। সেই হবে এ অঞ্চলের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। সে এখানে মেয়েদের মধ্যে নতুন জীবন আনবে। কিন্তু—কি হয়ে গেল—।

ঢং ঢং শব্দে ছুটির ঘণ্টা পড়ছে।

ব্রজবাবু বললেন—স্থির করুন। বিয়ে যদি দেন ত ভাল। সে মত যদি না থাকে তবে রবি সিং মাস্ট গো ফ্রম হিয়ার। ওকে যেতে হবে।

দল বেঁধে মাষ্টাররা এসে ঢুকলেন।

ক্রমশঃ

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবন একটা কুরুক্ষেত্র—করিস নে তুই অবিশ্বাস।
আরামকে কর হারাম যদি বিজয়মালা পরতে চাস।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় বলহীনের ঠাঁই কোথায় ?
পুরুষ মানুষ যুদ্ধ করে,—ক্লীবগুলো সব ঢোল বাজায় !
লড়াই যারা করতে জানে, মরতে যাদের নেইকো ভয়,—
নিঃস্ব হলেও বিশ্বে জানিস তারাই করে দিগ্বিজয়।
তারাই জানিস যুগে যুগে ইতিহাসের পথিকৃৎ ;

স্বর্গ থেকে আগুন এনে পোড়ায় তারা অন্ধকার ;
রক্তে গড়ে স্বর্ণমিনার তারাই মানব-সভ্যতার ;
বন্ধ্যামাটির শূন্যকোলে শস্য ফলায় তাদের শ্রম ;
বিঘ্ন-বাধার পাহাড় ঠেলে তাহাদেরই পরাক্রম
অরণ্যকে নগর করে, জগতকে চমৎকার ;
লক্ষ্মীছাড়া জাতির গলায় দোলায় তারা রত্নহার।
দুঃখজয়ী সাধক তারা ; তাদেরই তো তপস্যায়

লাভ-ক্ষতিরে তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করাই বীরের কাজ।
গর্জে আসে কালবোশেখী, ঊর্দ্ধে ডাকে ক্রুদ্ধ বাজ ;
সামনে কিছুই যায় না দেখা ; অন্ধকারে সমুদ্দুর
কূলে কূলে কাঁদতে থাকে ; ঝড়ের বাঁশির তীক্ষ্ণ সুর
কর্ণে নিয়ে এ দুর্য্যোগে তুলছে কারা ঐ নোঙর ?
কারা এমন দুঃসাহসী ? কাদের এমন মনের জোর ?

ওরাই তো রে চিরকালের দুঃখজয়ী কলম্বাস।
যুগে যুগে ওরাই বলে : আসুক না কো সর্বনাশ ;
ডুববে তরী ? ডুবুক না সে। কে করে রে জানের ভয় ?
প্রাণটা কি রে চিরদিনের ? হয় বিজয়, নয় বিলয়।

জীবন-মরণ তুচ্ছ ক'রে ঐ চলেছে বীরের দল।
পণ্ডিতেরা দাঁড়িয়ে তীরে বলছে : ওরা কি পাগল !
দিকে দিকে গর্জে সাগর, পথের রেখা নেই কোথাও,
এই অকূলে বাতুল ছাড়া কেউ কখনো ভাসায় নাও ?
কল্পনাতে আছে কেবল, বাস্তবে যার নেই প্রমাণ,—
সেই অজানার পিছু পিছু ধায় কভু কি বুদ্ধিমান ?
ঝোড়ো হাওয়ায় আসছে ভেসে : রইবো না তো আঁকড়ে কূল
সংশয়ে কূল আঁকড়ে থাকা—এর মতো আর নাইরে ভুল।

দিনের পরে দিন কেটে যায়—ডাঙার কোনই নাই হদিস।
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছু গর্জে কেবল অহর্নিশ
কূলশূন্য গৃহহারা ক্রুদ্ধ ভয়াল নীল সাগর।
কলম্বাসের কর্ণে আসে আকাশবাণী : 'ভয় কি তোর ?'
প্রাণে সদাই মাভৈঃ বাণী স্বপ্নে আছে নূতন দেশ,
কল্পনা—সে সত্য হবেই ; হবেই হবে পথের শেষ
নূতন দেশের শ্যামল কূলে। অবশেষে মিললো তীর।
ইতিহাসের রায়ে বলে, ভুল হয় নি বিশ্বাসীর।
অবিশ্বাসে সেদিন যারা ছেড়ে যেতে চায় নি কূল—
আজকে মোরা ঠিকই জানি : করেছিল তারাই ভুল।

কে দুনিয়ায় ভুল করে না ? ভুল কি এতই মারাত্মক ?
ভুলের ভয়ে চলবে না যে—ঘরমুখো সে নপুংসক।
সারা জীবন রইবে পড়ে বৃক্ষসম একই ঠাঁই !
এর চেয়ে যে মৃত্যু ভালো ! সত্য যাহা জানতে চাই।
জানতে গিয়ে চলার পথে ভুল যদি হয় বারম্বার—
ভুলের বোঝাই খুলবে শেষে স্বর্ণ-আলোর সিংহদ্বার
দিগন্তরের অন্ধকারে আজকে না হয় কালকে ঠিক।
ঠকবো বলে চলবে নাকো—সেই ভীরুরে একশো ধিক।

তার্কিকেরা তীরে বসে তর্ক ক'রে কাল কাটায়।
কূল-হারানোর ভুল করেই তো কলঙ্কিনী কৃষ্ণ পায় !
সব-হারানোর পথেই আসে সব-পেয়েছির বৃন্দাবন !
সর্ব্বনাশকে ভয় করেছে পুরুষসিংহ বল কখন ?
ঘরের আরাম ছাড়তে যাদের প্রাণটা সদাই শঙ্কাতুর
—সেই কুনোদের আসন জানিস অসম্মানের আস্তাকুঁড়।

জীবন একটা রণক্ষেত্র। শুনিস নে কি শঙ্খরব ?
কপিধ্বজে কে ঐ ব'সে ? ভগবান কি জরদ্গব ?
তিনি কি রে ঝিমিয়ে পড়া ঠুঁটো একটা জগন্নাথ—
ভালো-মন্দ ঘটছে যাহা—কিছুতেই যাঁর নাইকো হাত ?

না রে, না রে—কান পেতে শোন : ঐ যে তাঁহার কণ্ঠস্বর :
ক্লৈব্য ছেড়ে, পার্থ, ওঠো ; ধরো বীরের ধনুঃশর।
যুদ্ধ করো তুচ্ছ ক'রে লাভ-ক্ষতি ও দুঃখ-সুখ ;
যুদ্ধ করো ভাগ্যে তব জয়-পরাজয় যা-ই আসুক।
পূর্ণ আমার অভাব কোথায় ? তবু তো মোর নাই বিরাম।
সৃষ্টিতে সব লণ্ডভণ্ড আমি যদি চাই আরাম।
আমার মতোই কর্ম্ম করো ; আলস্যে ঘোর অকল্যাণ।
কাজ না করে খায় যে মানুষ নিশ্চয়ই তার নাই ইমান।

কালোরাতের ছায়ার মতো এলো কখন বিস্মরণ।
বাঁকা বাঁশীর কোমল সুরে তলিয়ে গেল কোথায় মন !
নীরব হ'ল পাঞ্চজন্য ; পড়লো খসে ধনুর্ব্বাণ।
পার্থ হ'ল অপদার্থ ; বৃহন্নলার নৃত্য-গান
সুরু হ'ল। ইতিমধ্যে ডাকলো কামান ফিরিঙ্গীর।
আমরা তখন একতারাতে গান ধরেছি বৈরাগীর !
নিবে গেছে ক্ষাত্র তেজের বহ্নিশিখা ; গীতার শ্লোক
গেছি ভুলে ; চক্রবালে মুছে গেছে সব আলোক !

আজকে আবার ডাকি তোমায় ! বাজাও তব অভয় শাঁখ !
সর্ব্বনেশে এই জড়তা দিগন্তরে মিলিয়ে যাক।
অপগত হোক এ মোহ ! রক্তে জেলে দাও আগুন।
পাঞ্চজন্যে আবার ডাকো : দাঁড়াও উঠে হে অর্জ্জুন !
নিধন করো পাপের সেনা ; সত্যের ঠিক হবেই জয়।
কল্যাণ যে করে জেনো, কখনই তার নাইরে ক্ষয়।
জীবন ডাকে—মহৎ জীবন গৌরবেতে দীপ্তিমান।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পার্থ, ধরো ধনুর্ব্বাণ।

সাধক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমরকুমার দত্ত

ভারতীয় ব্রহ্মবাদী ঋষিদের সাধনা ছিল দুইকে নিয়ে—আত্মা ও পরমাত্মা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা উপাসক ও উপাস্যকে নিয়ে আর এই দুইকে এক করে দেখা—উপাসনার মাধ্যমে সত্যর কাছে এগিয়ে গিয়ে সত্য হওয়া। জীবনে ও জগতে সদাসর্ব্বদা ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখা, কারণ "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনিই সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।

এই সাধনমার্গের তিনটি সোপান—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। যাঁরা সত্যদ্রষ্টা তাঁদের উপলব্ধির বাণী শ্রবণ করে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, সেইগুলিকে জীবনের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। মনন অর্থাৎ জীবনের ভিতরে আসা। মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে সত্য-স্বরূপকে পাওয়া—অর্থাৎ তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া। নিদিধ্যাসন বা ধ্যান—অর্থাৎ ভগবানকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করে তাঁকে সর্ব্বত্র বিরাজিত দেখা। সান্তের ভিতরে অনন্ত, অপূর্ণের ভিতরে পূর্ণ, দুঃখের ভিতরে আনন্দ-স্বরূপকে উপলব্ধি করা। তাঁরা বলেছেন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই তাঁহার দ্বারা আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করে সেই প্রেমাস্পদকে লাভ কর এবং পরমানন্দ উপভোগ কর।

ভারতের নবযুগে উপনিষদকার ঋষিদের সেই সাধনাকে নূতন করে প্রবর্ত্তন করে গেলেন যুগস্রষ্টা রামমোহন, এবং তাকে আপন সাধনার দ্বারা সঞ্জীবিত করে তুললেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পথেরই উত্তরসাধক। তিনি বলেছেন, "আমার জন্ম যে পরিবারে, সে পরিবারের ধর্ম্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা···আবাল্যকাল উপনিষদ্ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে"।

সেই অন্তর্দৃষ্টির সামনে তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ। তাঁর চিদাকাশে হ'ল নব অরুণোদয়—হ'ল নব চিদাভাস। সেই চিদাভাসের উদ্বোধিত আত্মায় সেই নব অরুণোদয়ের জয়ধ্বনি করে সাধক-কবির বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠল আগমনী সুর:

> জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়!
> পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ম্ময়:
> এস অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি
> অপহৃত শঙ্কা, অপগত সংশয়!
> এস নব জাগ্রত প্রাণ, চির যৌবন জয়গান,
> এস মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্ব নাশা!
> ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়।"

চিত্তগগনে উদ্ভাসিত এই নব অরুণোদয়ের পানে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এই নবজাগ্রত সাধক শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে, অসত্যকে খণ্ডন করে, বিচার করে, সত্য-স্বরূপকে জীবনে স্বীকার করে নিয়ে আদিত্যবর্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন—"হে জ্যোতির্ম্ময়—আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ—তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্য্যালোকে সে জ্যোতি কুলায় না—সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো—আমাকে জ্যোতির্ম্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।"

"জ্যোতির্ম্ময় করো—হে জ্যোতির্ম্ময়! আমাকে জ্যোতির্ম্ময় করো।" সাধক-চিত্ত হতে মানবের আদিকাল থেকে অহরহ এই প্রার্থনাই উঠছে তাঁর কাছে, যিনি—"অস্মিন আত্মনি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ"—যিনি প্রত্যেক মানব-আত্মাতে তেজোময় অমৃতময় পুরুষরূপে বিরাজিত। যিনি সর্ব্বানুভূঃ—যিনি সকলি জানছেন। তিনি জানছেন, আমাদের অন্তরের মাঝে সর্ব্বদা বিরাজিত থেকে, আমাদের দীনতা মলিনতার কথা, আমাদের মূঢ়তা অজ্ঞানতার কথা আমাদের পাপ পরিতাপের কথা। তিনি জানছেন, আমাদের চিত্তের সকল দুর্ব্বলতার কথা। তাই সাধক-চিত্ত নিজের পুরুষকার বা সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায় ভগবৎ কৃপা। ভগবৎ-কৃপাই সাধক-জীবনের নির্ভর ও সম্বল। ভক্তসাধকেরা চিরদিন বলে এসেছেন, "তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভবসঙ্কটে"। সাধক রবীন্দ্রনাথও তাই ভগবৎকৃপাপ্রার্থী হয়ে বললেন—

> "তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,
> নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে"।

এই ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করেই সাধক তাঁর অন্তরের প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁকে যেন ভগবান তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে, তাঁর সমস্ত দীনতা, মলিনতা, পাপ, সঙ্কীর্ণতা পবিত্র আলোকধারায় ধুইয়ে দিয়ে জ্যোতির্ম্ময় করে দেন। জ্যোতিঃ-পিয়াসী সাধক-চিত্তের তাই একান্ত প্রার্থনা:

> "আজ আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও।
> আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার—ঢাকা, ধুইয়ে দাও।
> যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
> আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
> অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান,
তার নাইক বাণী, নাইক ছন্দ, নাইক তান ;
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।"

সাধক-জীবন যখন এই অমৃতলোক-ঝরণাধারায় বিধৌত হয়ে পরিশুদ্ধ চিত্ত ও জ্যোতি-বিভাসিত চৈতন্য লাভ করে, তখন তার অন্তর্দৃষ্টির সামনে থেকে তমসার ও অজ্ঞানতার পর্দা যায় সরে। তখনই সে ভিতরে ও বাহিরে এক আলোকের ও আনন্দের পারাবার দেখতে পায় এবং সত্যানুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন সে বলে ওঠে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"— আনন্দ-স্বরূপ হতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দিব্য অনুভূতি সাধকের জীবনে প্রথমে স্বল্পকালের জন্যই আসে এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটু আভাস মাত্র দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এসেছিল সেই রকম একটি প্রভাত, এবং সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে খসে পড়েছিল তাঁর চোখের সামনের পর্দা। তিনি বলেছেন—"চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য্য উঠছে। যেমনি সূর্য্যের আবির্ভাব হ'ল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হ'ল মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হ'ল সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম।···দেখলুম, সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ···তখন মনে হ'ল এই মুক্তি। এই অবস্থায় চারদিন ছিলুম।···আবার পরদা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু তার পূর্ব্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।···সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।···এই যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ।···এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়।"

রবীন্দ্রনাথ এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়েই সেদিন সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি বিরাজিত আছেন "অস্মিন আত্মনি"—এই মানবাত্মাতে, তাঁকেই দেখেছিলেন "অস্মিন আকাশে"—এই অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে জগত সংসারে বিরাজিত থাকতে। সেদিন তিনি একদিকে অনুভব করেছিলেন তাঁর সকল চেতনা বেদনার সেই অতীন্দ্রিয় অরূপ পুরুষের মঙ্গল স্পর্শ। আবার আর একদিকে এই ছায়ার রাজত্বের আকাশের সকল সোনালী, রূপালী, সবুজ সুনীল রংয়ের আড়ালে সেই সত্য পুরুষের আবির্ভাব। সেদিন তিনি সর্ব্বমানবের মধ্যেই দেখেছিলেন সেই এক আত্মাকে, যিনি "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবো বহিশ্চ"—যিনি সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট থেকে নানান রূপেতে প্রকাশিত হন। যিনি অনাদি অতীতকাল থেকে অনন্ত ভাবীকাল অবধি অখণ্ড সেতুস্বরূপ হয়ে চিরবিরাজিত। সেই সবার অন্তর্নিহিত পরম সত্তা—

"যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

রবীন্দ্রনাথও তাঁর অন্তর-প্রদীপখানি সাবধানে জ্বেলে সেই অপরূপ অরূপকে তাঁর আত্মার গভীরে অনুভব করে গাইলেন :

"কে গো অন্তরতর সে!
আমার চেতনা, আমার বেদনা, তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ, কত সুখে দুখে হরষে!
সোনালী রূপালী সবুজে সুনীলে,
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে ;
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে ডুবালে সে সুধা সরসে।
কতদিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়,
নানা পরিচয়ে, নানা নাম লয়ে, নিতি নিতি রস বরষে।"

এই অন্তরতর অন্তরতম দেবতা বার বার মানব—হৃদয়দ্বারে আঘাত দিয়ে আহ্বান করে বলছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—ওঠো, অজ্ঞান-নিদ্রা হতে জাগো। বার বার আমরা তা শুনেও শুনছি না, কিন্তু সাধক-প্রাণ—

"যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে।···তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ-কন্থা, বিষয়বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।
তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।"

যে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়

অমৃতময় পরমপুরুষের পায়ে সাধক তাঁর ধন, মান, প্রাণ অকাতরে সমর্পণ করে বিষয়বিরাগী, পথের ভিক্ষুক হয়ে বেরিয়ে পড়েন, উপনিষৎ তাঁকেই সম্বোধন করে বলেছেন :

"পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পায়ে আত্মনিবেদন করে বললেন,

"তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু : আমার বিদ্যা, আমার ধন,—'ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব'। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড় সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আনন্দ স্বরূপ।···এই যে যোগ এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষ ভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, 'পিতা নো বোধি', তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো 'পিতা নোঽসি' পিতা আছ, কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না 'পিতা নো বোধি' তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি দাও। 'পিতা নোঽসি' পিতা তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের ও জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। সত্যং—এই বলে ঋষিরা তোমাকে জপ করেছেন—সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে, পিতা নোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা। কিন্তু তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে পেতে হবে! তুমি আছ—এ ত শুধু একটা মন্ত্র নয়—তুমি আছ এটা ত শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। 'তুমি আছ'—এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে যেতে না পারি তবে কিসের জন্য এ জগতে এসেছিলাম?···সেই জন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই 'পিতা নো বোধি' তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ এই সত্যের বোধ আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও।"

ভগবৎ-কৃপায় উদ্বোধিত, আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে আনন্দিত, জাগ্রত বোধিতে সমুন্নত সাধক এইবার সেই পরম পিতাকে, তাঁর প্রভুরূপে, প্রিয়রূপে, চির পথের সঙ্গী, চির জীবনরূপে, পরম পতি ও পরম গতিরূপে দেখে তাঁহার জীবন-বীণার সাধন-সুরে গান ধরলেন :

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার, চির জীবন হে!
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার, বন্ধন-ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার, জীবন মরণ হে।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে!
ওগো সবার, ওগো আমার,
বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার, নূতন, নূতন হে।

"সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"—সকলের আত্মারূপে বিরাজিত সেই অদ্বিতীয় একের আহ্বানে জাগ্রত সেই বোধিত সাধক-চিত্তের কর্ণে বেজে উঠল প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল, দ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানের অমৃতময় মন্ত্র—"সত্যং জ্ঞানমনন্তম"—তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ। সাধক রবীন্দ্রনাথ সেই ধ্যানলব্ধ মহামন্ত্রগুলিকে আপনার জপমন্ত্ররূপে সাধন করে তাঁর গভীর উপলব্ধিময় বাণীতে বললেন :

"তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব? সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে। কিন্তু···এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন।···"আনন্দরূপমমৃতম যদ্বিভাতি"। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।···এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই অধোতে, এই যে ঊর্দ্ধে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয় মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।—'স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।' এই ত প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর ত কোন কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ—সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকে ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার! এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।"

উপনিষদ বলেছেন, যিনি সত্যং তিনিই "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"—তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি অদ্বৈত এক। এই অদ্বৈত একের সাধনা করে একনিষ্ঠ ব্রহ্মসাধক বললেন—

"অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসঙ্ঘ দশ দিকে ছুটিয়াছে; যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।···সংসারের অনন্ত চলাচল, আনন্দ কোলাহলের মধ্যস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্ত্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং নিয়ত বিরাজ করিতেছেন।···আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্ত স্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে।···এই জগতের মধ্যে যে

প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলেফুলে প্রাণে সৌন্দর্য্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং তিনিই শিবম্। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দাম শক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গল লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গল রূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মত নিখিল-জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই রক্ষা করিতেছে।...এই শিবস্বরূপকে সত্য ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ, শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।...তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক। সংসারের সবকিছুকে পৃথক করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু...অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে ত একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে ত প্রতি মুহূর্ত্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না; সমস্ত পৃথিবীকে ত আমরা এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে ত কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম্ম, কত মানুষ, কত লক্ষ কোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয় মন ত একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্।...এই যিনি অদ্বৈতং তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।"

শান্তং শিবমদ্বৈতম্—ব্রহ্ম সাধক এইরূপে সেই অনাদি এককে জীবনে ও জগতের মাঝে দেখে, তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন:

"আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে প্রকাশ কর—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'—আমি অসত্যে আচ্ছন্ন আমাকে সত্যে প্রকাশ কর, আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ কর, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ কর।—আবিরাবীর্ম এধি। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হোক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোন বাধা না পা'ক—সেই প্রকাশ বাধা নির্ম্মুক্ত হলেই—'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যম্'—তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্ম রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।"

সাধক তখন তদ্ভাবে ভাবিত হয়ে, তদ্গত চিত্তে, সত্যমজ্ঞানমনন্তমের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আরাধনা করলেন—

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুব-জ্যোতি তুমি অন্ধকারে!
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, দুখ-জ্বালা সেই পাসরে,
সব দুখ-জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী;
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে,
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।"

জ্ঞান-জ্যোতি বিভাসিত সাধকের ধ্যানের গভীরে তখন ধ্বনিত হতে লাগল একটি মন্ত্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তিনি বলেছেন:—

"আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি, কালের স্রোতে ডুবল না সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীনকালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—অন্ত নেই, তার অন্ত নেই—অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে।"

কিন্তু কেমন করে সেই সত্যকে, সেই জ্ঞানকে আমরা পাব? কেমন করে তাঁর নামের মাধুরী আমরা বুঝব? প্রেমিক সাধক তার উত্তরে বলছেন:—

"যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রেম উদ্বোধিত হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি—এ কথা আমি জানলাম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম, এ কথা সত্য।...তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন?...সমস্ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলাম, সমস্ত মাধুর্য্যের ভিতরে যেদিন সেই মধুরকে পেলাম, সেদিন আমার মাধুর্য্যের পরিচয় দেব কিসে?...যেদিন বলতে পারব যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর, পরম সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন, সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দ'লে চলে যাব। সেদিন জানব যে কর্ম্মে কোন ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোন বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে, তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে।"

বিরহী প্রেমিকের মতন তিনি চাইলেন তাঁর সঙ্গে মিলন, নিবিড় মিলন। সেই মিলনানন্দ-সম্ভোগের আশায় তাঁর বিরহী প্রাণের তারে তারে বেজে উঠল তাঁর প্রাণের আবেদন—

'শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার, সারাদিনের তৃষা,
কেমন করে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা;
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়, সেই কথা বলিয়ো।
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়,
হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন, দাও গো আমার হাতে
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে;
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়।"

মিলন হ'ল। সাধক ও আরাধ্য, উপাসক ও উপাস্য এই দুইয়ের মিলন হয়ে হ'ল এক। সাধক জ্ঞানেতে যাঁর স্বরূপ জানলেন, ধ্যানেতে যাঁর স্পর্শ পেলেন, প্রেমেতে তাঁর সঙ্গে হলেন মিলিত। তাই তিনি গাইলেন—

"তাই ত প্রভু যেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

যুগলসম্মিলনে পূর্ণের প্রকাশ হ'ল। তখন "মধুবাতা ঋতায়তে"। তখন "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। পূর্ণ মিলনানন্দে চরিতার্থ হয়ে সাধক তখন বলেন:

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে,
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্য্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

ইউরোপের মেয়েরা

শ্রীশেফালি নন্দী

সামান্য কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে বোধ হয় বলা সঙ্গত হবে না যে সে দেশের সবকিছু আমি দেখেছি। কারণ সেটা সম্ভব নয়। তবে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, যাদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছি, যারা আমার দিনরাত্রির সঙ্গী ছিল, তাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাই ইউরোপের মেয়েদের কথাই কিছু লিখছি, যদিও ইউরোপ দেখেছি আমি অল্পই, আজন্ম ভারতে থেকেও বলতে পারি কি—ভারতবর্ষ আমার দেখা হয়ে গেছে?

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদায় বলেছিলেন—"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী"···"যদি অনুমতি কর কঠোর ব্রতের তব সহায় হইতে আমার পাইবে তবে পরিচয়।" ঠিক এইটিই বোধ হয় ইউরোপের মেয়েদের পরিচয়।

সাধারণতঃ পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগেই আমরা ধরে নি'—শালীনতা, লজ্জা প্রভৃতি প্রাচ্য নারীসুলভ গুণগুলি তাদের মোটেই নেই। কারণ আমাদের যা ভাল ওদের তা মন্দ, আর পশ্চিমের যা ভাল তা আমাদের সমাজে অচল। কিন্তু যাঁরা ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে থাকেন তাঁরা জানেন, ভাল সবদেশেই ভাল। কতকগুলি মূল জিনিষ আছে—যেমন—দয়া, ক্ষমা, বিদ্যা, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সবদেশেই আদর্শ বলে স্বীকৃত। সে দেশেও ঠিক তেমনি। আবার প্রাচীন সমাজও প্রায় সব দেশেই এক। তবে কোন দেশ কয়েক শ' বছর পিছিয়ে আছে, আর কোন দেশ বা এগিয়ে গিয়েছে, তাই যেমন প্রাচীনপন্থী পিতা-মাতার সঙ্গে অর্বাচীনপন্থী পুত্রকন্যার মতের মিল হয় না, তেমনি কোন কোন সমাজ-ব্যবস্থাও প্রাচীনপন্থীরা মেনে নিতে পারেন না—এই যা তফাৎ।

বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকের ইউরোপের মেয়েদের যা আদর্শ ছিল তা কোন ক্রমেই প্রাচ্য আদর্শের বিরোধী বলা চলে না। পিতৃগৃহে বাল্যকাল কাটাবার পর ক্রমশঃ অন্তঃপুরে অবরোধ, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতা বা সমাজ-কর্তৃক নির্ব্বাচিত অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বনির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করে তার অন্তঃপুরে স্থানলাভ যৎসামান্য বিদ্যা বা কৃষ্টির সমন্বয়ে স্বামীর মনোরঞ্জনে তৎপর হওয়া—স্বামী যেমনই হোন তাঁকে মান্য করা, ইহকাল পরকালে তিনিই পরম গতি বলে মেনে নেওয়া আর এই নিয়মগুলো না মানলে সমাজের চক্ষে হেয় হয়ে থাকা এই ছিল আদর্শ।

তার পর বিদ্যাচর্চা—"মেয়েদের ত আর দেশ শাসন করতে হবে না, রাজনীতি পড়ে কি করবে?" "তারা কিছু আর অস্ত্রোপচার করতে আসবে না—শারীরবিদ্যা পড়ার প্রয়োজন কি?" "ধর্ম্মতত্ত্বের কচকচানি নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় যে কেন—ওদের ত আর শাস্ত্রালোচনায় ডাকা হবে না। যদি বা তখনকার দিনে বাধানিষেধ এড়িয়ে কোন মেয়ে শেষ পর্য্যন্ত পড়াশোনা করতে পারল—তাদের চাকরি করতে ডাকা হলে কিন্তু তার পরিবারবর্গ ত বটেই, সে নিজেও বলত—কি সাংঘাতিক কথা মেয়েদের জ্ঞানার্জ্জন ত শুধু তাদের স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই, যদি বা ভগবানের কৃপায় খানিকটা সুযোগ-সুবিধা পেলাম তা প্রকাশ করে নিন্দার ভাগী হব

কেন? সমাজের ভয়ে জর্জ এলিয়টের মত লেখিকাও ছদ্মনাম নিয়েছিলেন, শুধু তাই নয়—প্রকাশকেরা তার লেখা প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন কয়েক বছর। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ গ্রেগরী সেকালের মেয়েদের বিদ্রূপ করে মন্তব্য করেছিলেন—"যদি কোন বিদ্যা পেয়েই থাক, যত্ন করে লুকিয়ে রেখো তা অন্তরের মণিকোঠায়।" এই বিদ্যা অর্জন করতেও মেয়েদের কি পরিমাণ আয়াস স্বীকার করতে হ'ত, তার কিছু পরিচয় পাই মাদাম মন্তেসরীর জীবনী আলোচনায়। তিনি ইটালীর প্রথম মহিলা ডাক্তার, ১৮৯০ সনেও ডাক্তারী পড়ার সময় ছেলেদের সঙ্গে তাঁকে পড়তে হ'ত বলে পাছে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায় তাই বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাঁকে একলা—এমন কি এনাটমির ঘরেও একলা পড়তে বাধ্য করেছিলেন।

ইউরোপের সেই অতীত দিনগুলোর সঙ্গে যখন বর্তমানের তুলনা করি, অবাক্ লাগে সত্যিই। আজ মেয়েরা স্কুল-কলেজ চালাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক হয়েছে, রাজনীতির কথা নাই বা বললাম, তারা এরোপ্লেন চালাচ্ছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে করছে সহযোগিতা। বিগত যুদ্ধের সময়কার কলকারখানাগুলো ত সে দেশের মেয়েরাই বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজ সেখানে পোষ্ট আপিসে যান টিকিট কিনতে—ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বলবেন,"কি চাই, ভারতবর্ষের জন্য কত টিকিট লাগবে, দাঁড়াও এক সেকেণ্ড, দেখে দিচ্ছি—এই যে এক শিলিং, ও তুমি রেজিষ্ট্রি করতে চাও বুঝি—তবে যে আরও চার পেনি বেশী লাগবে। হ্যাঁ তার পরের জন এসো।"

দোকানে যান কাগজ পেন্সিল কিনতে, সেখানেও নারীকণ্ঠ—"কি মাপের কাগজ চাই, ৩ × ৮—তা ত আজ আসে নি, তুমি আগামী শুক্রবার এসো, পাবে। আচ্ছা এই পেন্সিলটা কেমন, বেশ না?" ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা—কথা "তোমার দেশ থেকে এসে শীত লাগছে নিশ্চয়ই। পেনি শিলিং নিয়ে অসুবিধেয় পড়তে হয় না। হ্যাঁ, তার পরের জন—"

সেখান থেকে বেরিয়ে কিছু খাবার কেনা যাক, বিক্রয়কারিণী বেরিয়ে এলেন সুবেশা তরুণী,—"এই যে এস, আজ কি আপেল দেব, রান্নার না খাবার ময়দা চাইছ—তা ত এত সকালে পাওয়া যায় না—এই গোটা সাড়ে এগারটার সময় এসো, একটায় ত লাঞ্চের ছুটি—"

সবই ত প্রায় কেনা হ'ল, এবার চলুন বাসে যাওয়া যাক—লেডি কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর পরের ট্রেনটা ক'টায় বলতে পার, আমার যে খুব তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।' "নিশ্চয়, এই ত বাসটা ৯-৪৫এ ষ্টেশনে পৌঁছবে, ৯-৫২ মিনিটে ট্রেন, সাত মিনিট সময় থাকবে হাতে, টিকিট কিনে খুব ট্রেন ধরতে পারবে।"

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ুন কলেজে, লেকচার দিচ্ছেন লেডী প্রিন্সিপ্যাল, কিংবা লেডী প্রোফেসর। সে কলেজটা যে একমাত্র মেয়েদেরই হতে হবে তার কোন মানে নেই, অক্সফোর্ড কেমব্রিজে মেয়ে লেকচারারের অভাব নেই। যারা "হার টুয়েল্‌ভ মেন" ছবিটা দেখেছেন তাঁরা জানেন—আমেরিকার মত দেশেও প্রথম মেয়ে শিক্ষিকা নিয়ে কি গোলযোগ হয়েছিল। ইউরোপেও হয়েছিল নিশ্চয়ই, তবে যুগটা যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ।

তার পর আসুন ভূগর্ভস্থিত রেলগাড়ী করে যাওয়া যাক, সেখানেও নিশ্চয়তা নেই, ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ছেলে কি মেয়ে। আপিস আদালতের মেয়েদের সংখ্যায় কোন স্থিরতা নেই, কখনও বাড়ছে কখনও কমছে।

এবার দেখা যাক, কি করে এরা সংসার চালায়। প্রথমতঃ ধরুন একটি নববিবাহিত দম্পতির কথা। ইউরোপের প্রথা অনুযায়ী তাদের সংসারে শুধু স্বামী আর স্ত্রী—আর কেউ নেই। সকালবেলা উঠে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে নিল এক জন, এক জন ব্রেকফাষ্ট তৈরি করল, দু'জনে খেয়ে দেয়ে যার যার কাজে বার হয়ে গেল। দুপুর বেলার খাবার জন্য বাড়ী ফিরতে হয় না। আপিসে স্কুল-কলেজে হোটেলে রেস্তোরায় সস্তায় খাবার বন্দোবস্ত আছে। বিকালে চায়ের ব্যবস্থাও ইচ্ছা করলেই করা যায় বাইরে। নয় ত বাড়ী ফিরে এসে স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে চায়ের ব্যবস্থা করে নিল। তাও এমন একটা কিছু হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড নয়, এক জন গ্যাসটা জ্বেলে নিল একটা দেশলাই-কাঠি দিয়ে—আর এক জন হয়ত জলটা চাপিয়ে দিল; একজন চায়ের কাপ ডিশ পেড়ে ট্রে'র উপর সাজিয়ে দিল, অপর জন তাকের উপর থেকে কেক-বিস্কুটের কৌটোটা এনে গোটাকয়েক সাজিয়ে নিল ডিশে, এবার শুধু খেলেই হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দু'জনে মিলে রাত্রের খাবার তৈরি করলে—খাওয়ার পর গোটাকতক কাপ ডিশ বড় প্লেট ও বাটি ধুয়ে মুছে রাখা—বাস, মিটে গেল হাঙ্গামা। তার পর রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত পড়াশুনা, গানবাজনা, সেলাই চর্চা, যার যা খুশি! এই ত সারা সপ্তাহের রুটিন। বাড়তি কাজগুলো যেমন কাপড় কাচা, ঘরদোর ঝাড়া মোছা, ইস্ত্রি করা, মোজা গেঞ্জী রিপু করা—এগুলো হয় রবিবারে। শনিবার বিকালটা থাকে বিশ্রামের জন্য—বেড়ানো, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া এগুলোও শনিবারে।

আচ্ছা, তার পর আরও দু'একটা বছর এগিয়ে আনা যাক এদের। এবার এদের পরিবারে আসবে শিশু, তার জন্যে চাই প্রস্তুতি। নিজের চেয়েও বেশী যত্ন নেয় এরা শিশুর প্রতি, ভাবী কালের নাগরিক সে, তার প্রতি তাই বাপ মা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে প্রচুর। তার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তার যাতে লাঘব হয়, সে ব্যবস্থাও সরকার করে থাকেন। হাসপাতালে বিনা খরচায় চিকিৎসা, মায়ের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা এবং পরিণত অবস্থায় মাকে বাড়ীতে গিয়ে পরীক্ষা করে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামা কাপড়, বিছানা এবং প্যারাম্বুলেটর যাতে অল্প খরচায়—কিংবা মাসিক কিস্তিতে কেনা যায় তারও ব্যবস্থা আছে। একমাত্র অসুবিধা হয় মায়ের চাকুরি নিয়ে। সাধারণ পরিবারে দেখাশুনা করার আর লোক নেই বলে মাকে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে শিশুর পরি-

চর্য্যায় রত হতে হয়। সেটা প্রত্যেক মা-ই সানন্দে স্বীকার করে নেয়।

শিশু একটু বড় হলে তাকে নার্শারী স্কুলে পাঠিয়ে মা আবার কাজের চেষ্টা করেন। পূর্ব্ব-ইউরোপে যেমন শুনি, পশ্চিম-ইউরোপে একমাত্র জার্ম্মানী ছাড়া বোধ হয় শিশুদের জন্তে তেমন 'ক্রেশে'র বা শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা অন্ত কোথাও নেই। তাই গরীব, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার অথবা শ্রমিক পরিবারে—যেখানে মায়ের চাকুরি না থাকলে শিশুর খাবার কেনাও অসম্ভব হয়ে পড়ে সেখানে কয়েকটি পরিবার মিলে যায় যেদিন কর্ম্মবিরতি পড়ে সে সেদিন সকলের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার নেয়। এমনি কঠোর পরিশ্রমের পরও মা শিশুকে অযত্ন করে না। সময়মত খাইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে। সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে সন্তানদের মা বড় করে তোলে। তার পর পড়াশোনার যখন সময় আসে, তখন মা যদি অবস্থাপন্ন না হন, ত সরকারী স্কুলে বিনা বেতনে সন্তানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন, আর যদি সামর্থ্য থাকে খরচ করে পড়ানোর, প্রাইভেট স্কুলে সঙ্গে করে দিয়ে আসেন। পয়সার পড়াই হোক আর বিনা পয়সার পড়াই হোক, বিদ্যার 'মান' সব স্কুলেই সমান। এই শিশুও যখন বড় হয়, তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক প্রাথমিক পড়া শেষ করে নিজেই ভেবে নেয়, কি রকম অর্থকরী বিদ্যা শিখবে। নিতান্ত অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান না হলে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নেবার জন্ত সকলেই খুব ব্যগ্র হয়ে ওঠে না, কারণ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীটাই সেখানে চাকুরির যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি নয়।

যে মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে প্রোফেসরি বা মাষ্টারির চাকরি নিল সেও যেমন তেমনি যে মেয়েটি পড়াশোনা চালাতে না পেরে বাড়ীর ঝিয়ের কাজ নিল সেও তেমনি—কাগজে-কলমে এবং বাহ্যতঃ তার প্রেষ্টিজ সমান। আমাদের বাসন মাজার ঝি পেঁচী, খেন্তি, পেঁচী ইত্যাদি, স্কুলের শিক্ষিকা—মাসীমা, দিদিমণি। সে দেশে ঝি মিস মাইনর, মিসেস কুপার ইত্যাদি আর শিক্ষিকা মিসেস, জনসন, মিস ওয়াল্টার ইত্যাদি। তার পর ঝি বা রাঁধুনীর নির্দ্দিষ্ট মাইনে বাঁধা আছে, কাজের নির্দ্দিষ্ট সময়ও বাঁধা। ইচ্ছা করলেই তাকে দু'ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টা খাটানো যায় না। খুশীমত তাকে পাঁচ শিলিঙের জায়গায় তিন শিলিং দিতে পারেন না। তার জন্ত আইন-আদালত আছে। শিক্ষয়িত্রীর, মাইনের নিয়ম আছে। স্কুল-কমিটি তাকে ইচ্ছা করলেই ৩৫০ পাউণ্ডের জায়গায় ২৫০ পাউণ্ড দিতে পারেন না, বা ২০০ পাউণ্ড দিয়ে ৩০০ পাউণ্ড লিখিয়ে নিতে পারেন না। কারণ এ বড় শক্ত ঠাঁই, একবার প্রকাশ পেলে বা কোন শিক্ষিকা অসন্তুষ্ট হলে সে স্কুল চালানো কঠিন হবে। কাজের বাঁধা নিয়মের বাইরের সময় শিক্ষিকাও যেমন অবসর যাপন করেন, পরিচারিকাও তেমনি করেন।

মেয়ের বিয়ের বয়স হলে আপনি আমি ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। তার স্বামীটিকে কোথা থেকে খুঁজে বার করি। সে দেশে কিন্তু এ ভাবনাটা ছেলেমেয়েরা নিজেরাই করে থাকে। খুঁজবেও তারা, উদ্যোগ-আয়োজন করবেও তারা, আপনাকে সময়মত জানাবে উৎসবটা সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্ত। খরচটা উপার্জ্জনক্ষম ছেলেমেয়ে ভাগাভাগি করে দেবে। বাপ-মাকে মেয়ে বিয়ের দক্ষিণা ধরে দিতে হয় না। বেশীর ভাগ দায়িত্ব ছেলের নিজের। বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর উভয়ে মিলে ঘর খোঁজে, জিনিষপত্র কেনে, তার পর শুভদিন দেখে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করে। আমাদের হিন্দু পরিবারের বিয়ের ব্যাপারের সঙ্গে তুলনা করলেই ছেলের বাবারা (শুধু বাবারা কেন দাদারা এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও) বলে বসবেন—আমাদের সমাজে মেয়ের সংখ্যাধিক্য, তাই অর্থনীতির চাহিদা ও সরবরাহের মূলসূত্র ধরে ছেলেকে টাকাপয়সা জিনিষপত্র দিতে হয়। আসলে কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে নারীর সংখ্যা আরও বেশী—হিসাবে বলে এক শত পুরুষে নারীর সংখ্যা প্রায় আড়াই শত। কাজেই ওটা দুর্ব্বল যুক্তি। সমাজে মেয়েদের বাঁচবার দাবি এবং মনুষ্যত্বের দাবি অস্বীকৃত হয় নি।

এবারে সুরু করি পথ চলা। সকালবেলা দেখবেন উর্দ্ধশ্বাসে মেয়েরা ছুটছে রাস্তায়, সময়মত গিয়ে পৌঁছতে হবে। সে মেয়েরা কিন্তু এখানে আমরা যে ধরনের মেমসাহেব দেখতে অভ্যস্ত তেমন নয়, ঠোঁটে তাদের রঙের বাহুল্য নেই, পোশাকে ঠমক-দেখানো চাকচিক্য নেই, তা বলে অপরিচ্ছন্ন নয় তারা। তারা পরিশ্রমী, এত সাজ-পোশাকের জঞ্জাল জোটাবার সময় কোথায় আপিস টাইমে? সেটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্ত ত রবিবারই রয়েছে। যা হোক, বাসে হুড়ো-হুড়ি লেগে যায় না, কারণ লাইন করে দাঁড়িয়ে বাসে উঠতে হয়, আপিস টাইমে বাসে যে কয়েকটি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তার বেশী আর উঠতে পারে না। সে দেশে বিনা দ্বিধায় ছেলেদের পাশে বসে অথবা দাঁড়িয়ে মেয়েরা যেতে পারে বলে লেডিস সীট নেই বাসে ট্রেনে। একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমাদের দেশে লেডিস সীট নেই কেন?" তিনি বলেছিলেন, "ওতে যে আমাদের অপমান এতে। বোঝায় আমাদের ভদ্রতার উপর ওদের ত বটেই আমাদেরই আস্থা নেই, তাই সংরক্ষিত আসন লাগে, পাছে অঘটন কিছু ঘটে।"

একুশ বছর বয়সে সে দেশে মেয়েরা সাবালিকা হয়। ষোল-সতের বছর বয়স থেকেই ইচ্ছামত চলাফেরার উপর তাদের সম্পূর্ণ অধিকার। তবে সে অধিকারের মর্য্যাদা তারা পরিপূর্ণ বজায় রেখেছে, কেউ কারও ব্যাপার নিয়ে অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করে না, তাই বিনা সঙ্কোচে মেয়েরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারে—সে যত রাতই হোক না কেন! অনেক মেয়েকেই ত বাসে, ট্রেনে, কারখানায় নাইটডিউটি সেরে রাত বারটায় বাড়ী ফিরতে হয়, তাতে অবাঞ্ছিত ঘটনা ত বড় একটা ঘটে না, পিছন বা সামনে থেকে অশোভন মন্তব্য করা, কোন মেয়েকে একলা পেয়ে সঙ্গদানের জন্ত এগিয়ে আসা, অথবা তার নামে অপযশ রটানোর দায়িত্ব নেওয়া, এবং

কোনটাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড বা অষ্ট্রিয়ায় চোখে পড়ে নি। বছরখানেকেরও বেশী সে দেশে কাটাবার সময় একবারও কিন্তু মনে হয় নি আমি মেয়ে বলে অভিভাবক বা সঙ্গীহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোটা আমার পক্ষে বিপজ্জনক।

পাঠকপাঠিকারা হয়ত ভাবছেন—এত স্বাধীনতা পেয়ে সে দেশের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে, বিশেষতঃ সে দেশের অনুকরণকারী এ দেশের একটা সমাজ দেখে এ ধারণাটা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর একমাত্র উত্তর এই যে, উচ্ছৃঙ্খলতা সব দেশেই কিছু না কিছু আছে এবং থাকবেও, কিন্তু শৃঙ্খলাই যে মানব-সমাজের ভিত্তি একথা ভুললে চলবে না, না হলে সমাজ গড়ে উঠতেই পারত না। সিনেমা-বায়স্কোপ দেখে এবং কিছু কিছু খবরের কাগজ পড়ে আমরা মনে করি ওদেশে বুঝি স্থায়ী বিবাহ-বন্ধন নেই, আছে শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদ। মনে রাখা উচিত আসলে বিবাহ-বিচ্ছেদটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়।

ইউরোপের সমাজে যা দেখেছি তাতে বুঝলাম, ছেলেপুলে নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ঘর-সংসার বেঁধে জীবন কাটানোটাই সে দেশের লোকেদের প্রধান কাম্য, তবে ঘর-সংসার বলতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাড়িকুড়ি নিয়ে বসে পরিবারের প্রত্যেকের মনোরঞ্জনের ভার নিয়ে ব্যস্ত থাকে না তারা। পরিবারের প্রত্যেকের উপর যে দায়িত্ব আছে তা ওরা ভুলে যায় না বলেই ওদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা অনেক বেশী সুশৃঙ্খল। স্বাস্থ্যনীতি পালন, পরিচ্ছন্নতা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি থাকলে যে পারিবারিক জীবন আরও সুন্দর এবং সুসহ হয়ে উঠে এটাই ওদের কাছে আমাদের দেশের মেয়েদের এবং ছেলেদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত।

জননী বসুন্ধরা

শ্রীকালিদাস রায়

দেখেছ বৎস, নিকুঞ্জবন ফুলে ফুলে আলো করা,
তটিনী-বক্ষে লক্ষ তরণী কক্ষে পণ্যভরা।
দেখেছ বৎস ফলভারে নত আম্রকদলী বন,
সোণার ধান্যে ভরা প্রান্তর জুড়ায়েছে দু'নয়ন।
দেখেছ বৎস দূর দিগন্তে সুনীল গিরির শ্রেণী,
মেঘের মতন, ভাবিয়াছে তায় আমার এলানো বেণী।

দেখ নি শতেক যোজন জুড়িয়া মরুভূমি করে ধু ধু
হিমমণ্ডল দেখ নি যেখানে কঠিন তুষার শুধু।
দেখ নি উচ্চ গিরির শিখরে চিরহিমানীর ভার,
দেখ নি গহন রবিকররোধী অটবী আফ্রিকার।
দেখ নি অগ্নিগিরির কটাহে বিদীর্ণ জ্বালানলে
যেথা অবিরত পঞ্জর মোর গলিয়া বহিয়া দ্রুত গলে।

দেখেছ মায়ের হাসিমুখ আর হাতের ব্যজনীখানি
পিয়েছ স্তন্য পেয়েছ অন্ন শুনেছ সোহাগবাণী।
দেখ নি মায়ের শুকানো বদন লুকানো প্রপাতধারা,
কত অকথিত ব্যথিত আকুতি করেছে আত্মহারা।
ভয় ভাবনার ইন্ধনে তার কি অনল প্রাণে জ্বলে
দহিতেছে তার আরাম বিলাস বিশ্রাম পলে পলে।
জান না বৎস, কেবল তোমার হাসি মুখখানি দেখে
আনন্দময়ী সেজেছে মা তার সকল বেদনা ঢেকে।

প্রতীক্ষা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সেবারে বেড়াতে বেরিয়ে দিল্লী থেকে হরিদ্বার চলে গেলাম। জায়গাটা আমার বরাবরই ভাল লাগে। আকর্ষণ কিসের তা জানি না। পুণ্যলোভাতুর আমি মোটেই নই। তবু জোরগলায় বলতে পারি, উত্তর-ভারতের দিকে পাড়ি দিলে হরিদ্বার না হয়ে ফিরলে মনটা যেন কোনমতেই স্বস্তি পায় না। হয় ত বলবেন সংস্কার। তা বলুন। আমি কিন্তু তা বলতে পারি না। যাক্ ও কথা।

হ্যাঁ, হরিদ্বার গেলাম। পরিচিত পাণ্ডা আমার ছিল—তার ওখানেই উঠলাম। মাত্র থাকব তিন দিন কি চার দিন। তার পর ফিরে আসব—পরিকল্পনা ছিল এই। এক দিন সকালবেলা পা পা করে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর গিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাস্তার পাশে দেখি একটি আশ্রম। কয়েকজন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী গৈরিক পরে ঘুরছেন। কি খেয়াল হ'ল—ঢুকে পড়লাম আশ্রমের ফটক দিয়ে। ভেতরটা দেখতে লাগলাম। আশ্রমবাসী সকলেই অবাঙালী। একটি আবাসিক বিদ্যালয়ও আছে আশ্রমটির মধ্যে। অনেকগুলি ছাত্রও দেখলাম ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছে। সেদিন কি বার ছিল মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, সেদিন বিদ্যালয়ের ছুটির দিন। অধ্যয়ন হয় তো হতে পারে, কিন্তু অধ্যাপনা হয় না। ছেলেরা প্রায় সবাই যুক্তপ্রদেশের। বিহারের ছেলেও কয়েকজন আছে। নৈতিক শিক্ষাটা যাতে ভাল হয় সেই জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর আওতায় ছেলেদের পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের অভিভাবকেরা। ভাল হবারই কথা। আশ্রমের উপর যাতে চাপ না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি আছে সকলের। ছেলেদের খরচ মাস মাস আসে তাদের বাড়ী থেকে। কয়েকটি অনাথ ছেলেও আছে, তাদের ব্যয়ভার আশ্রমই বহন করে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

ভোজনাগার, ভজনাগার, পাঠাগার, শয়নাগার প্রভৃতি সমস্তই এক এক করে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাঃ, আশ্রমটি তো বেশ। স্থানটিও খুবই মনোরম। এক জন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী এসে আমার নাম-ধাম সমস্ত জিজ্ঞেস করে গেলেন। রাষ্ট্রভাষায় প্রশ্ন—তাই এ ভাষা যতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম সেই ততটুকুর মধ্যে নিজের ভাবধারা টেনে-টুনে গুটিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রভাষাতেই উত্তর দিয়ে গেলাম।

'উসকে লিয়ে, ইন্‌কে লিয়ে, মগর লেকিন'—এই ক'টা কথা আমি খুব ব্যবহার করে থাকি। কেমন একটা মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে আমার। মানে হয় ত সকল স্থলে কথাপ্রসঙ্গে ঠিক হয় না—কিন্তু তা বুঝতে পারি না। বুঝতে পারেন নিশ্চয় আমার শ্রোতারা। পরদেশী বলে মাপ করে নেন আমার ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। তাইতে আরও বেড়ে যায় আমার দুঃসাহস। বলতে কেমন আরও ভাল লাগে ঐ ক'টি শব্দ বাংলা দেশের মাটির বাইরে পা দিলেই—ঐ 'মগর, লেকিন, উসকে লিয়ে, ইন্‌কে লিয়ে'।

সাধুজী বুঝলাম আমার উত্তরে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, দেখিয়ে বাবুজী, দেখিয়ে—আরামসে দেখিয়ে।

সম্মান জানিয়ে আমিও বললাম, উসকে লিয়ে আপকা মেহেরবানি, সাধুজী। মগর লেকিন হামলোককো সংসারী আদমী আছে। ইন্‌কে লিয়ে শান্তি সুখকো ওয়াস্তে মহাত্মা পুরুষ যাঁহা রহতা—হুঁয়া আতা-যাতা। যো কুছ উসকে লিয়ে আরাম আনন্দ মিল্‌তা—মগর লেকিন ইন্‌কে লিয়ে—

আর আমার ভাষা যোগায় না। কি বলব ছাই! এদিক-ওদিক চাইতে লাগলাম। সাধুজী বুঝতে নিশ্চয় পেরেছিলেন আমার অবস্থাটা। বলেছিলেন, ঠিক হ্যায়, বাবুজী—গুরুজীকা আশ্রম আরামসে দেখিয়ে।

তার পর দেখলাম তিনি রন্ধনশালায় ঢুকে একখানা বড় শাল-পাতায় খানছয় ইয়া মোটা মোটা লাল আটার রুটি এবং খানিকটা ঘন ডাল ও ভাজি নিয়ে বল্টুওলা খড়ম পায়ে খটাস খটাস করতে করতে, মুখে কি একটা স্তব আওড়াতে আওড়াতে আশ্রমের একদিকে চলে গেলেন।

তাঁর দিক থেকে মুখ ঘোরাতেই অদূরে নজর পড়ল একটা পাড়-বাঁধানো পাতকুয়ার কাছে একটি বছর বারো-তের বয়সের ছেলে বসে বসে শুকনো ছাই দিয়ে বাসন মাজছে। ছেলেটি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে আর হাত রগড়াচ্ছে একখানা বড় থালার উপর। পরণে হাফপ্যান্ট, গায়ে একটা গৈরিক-রঙে ছোপানো ছেঁড়া গেঞ্জি। আমি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটি ক্যাল্ ক্যাল্ করে চেয়ে দেখতে লাগল। কি করুণ চাহনি তার। একটা বুককাটা তৃষ্ণার জ্বালা যেন সে চাহনিতে ঝরে পড়ছে। ছেলেটির চেহারা কৃশ ও রুগ্ন। গায়ের রঙ কালো। হিন্দুস্থানী ছেলে বলে বোধ হচ্ছিল না। কাছে আরও এগিয়ে গেলাম।

ছেলেটি কেমন যেন একটু লাজুক বলে বোধ হ'ল। নিকটবর্তী হতে সে তার চোখ দুটো নামিয়ে নিলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার পর পাতকুয়ার মধ্য থেকে এক বালতি জল তুলে সে আপন-মনে বাসন ধুতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, তোম্ লোক্‌কো মোকাম কাঁহা?

ছেলেটি উত্তর দিলে, আমি বাঙালী—বর্দ্ধমান জেলায় আমাদের বাড়ী।

কেমন চমকে উঠলাম। বাঙালী—বাংলা দেশের ছেলে—এত দূরে এখানে কি করতে এসেছে! আশ্রমে থেকে পড়তে এসেছে

বোধ হয়। তাই হবে। কেমন আলাপ করতে ইচ্ছে হ'ল—মাখামাখি আলাপ।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

ছেলেটি বললে, সত্যেন।

বর্দ্ধমান জেলায় কোনখানে বাড়ী?

মায়না। তবে আমাদের কলকাতায় বাসা আছে।

এখানে কি করতে এসেছ?

বাবা এখানে পড়াশুনা করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তা বেশ—পড়ছ ত?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, হ্যাঁ—পড়ি।

তোমার বাবা কি করেন?

রেল অপিসে চাকরি করেন।

ক'বছর এখানে আছ

তিন বছর।

দেশে যাও না?

ছেলেটি এ কথায় কোন উত্তর দিলে না। কেমন ম্লান মুখে চুপ করে রইল।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, দেশে যাও না?

ছেলেটি বললে, প্রথম বছরে বাবা আমায় নিয়ে গেছলেন একবার। তার পর আর নিয়ে যান নি।

কেন?

ছেলেটি নিরুত্তর।

জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ীতে গিয়ে দুষ্টুমি কর বুঝি?

আমার কথায় ছেলেটি অমনি ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললে। অতি করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল, না গো—আমি দুষ্টুমি করি না। নতুন মা শুধু শুধু বাবাকে বলে আর বাবা আমায় মারধর করেন।

নতুন মা! কি ব্যাপার! ছেলেটির কি আপন মা নেই তা হলে!

কথায় কথায় জানতে পায়লাম পরে। ছেলেটির বাপের নাম নিকুঞ্জবাবু—নিকুঞ্জ চক্রবর্ত্তী। সত্যেনের আট বছর বয়সে তার মা মারা যায়। নিকুঞ্জবাবু আবার বিবাহ করেন। নবপরিণীতা স্ত্রী অর্থাৎ সত্যেনের নতুন মা সত্যেনকে মোটেই দেখতে পারেন না। তাই স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে সত্যেনের এই নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সত্যেনের আশ্রমে থাকা, পড়ার খরচ নিকুঞ্জবাবু মাস মাস ঠিক পাঠিয়ে দেন। অবস্থা তাঁর ভালই। তিন বছরের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু সত্যেনের সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছিলেন মাত্র দু'বার। চিঠি তিনি মাসে মাসে দেন—খোঁজখবর নেন আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হতে। গত বছর পূজোর আগে তিনি সত্যেনকে একবার ঘরে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। দিনকতক রেখে আবার এখানে পাঠিয়ে দেবেন। সত্যেন সেকথা শুনেছিল। কিন্তু এ বছরের পূজোও সম্প্রতি কেটে গেল। নিকুঞ্জবাবু আসেন নি। তিন মাস আগে সত্যেনের দারুণ উদরাময় পীড়া হয়েছিল। ভুগেছিল অনেকদিন। সে খবর নিকুঞ্জবাবু পেয়েছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন তাঁকে পত্র মারফত। ছেলেকে একবার দেখে যাবার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় সময় করে উঠতে পারেন নি আসবার। সেই থেকে সত্যেন ভুগছে প্রায়ই পেটের অসুখে। আশ্রমে ভাত হয় না। সত্যেনকে খেতে হয় আশ্রমের রুটি না হয় পুরী। একান্ত খেতে না পারলে অসুস্থ হলে—ব্যবস্থা আছে ঘোল ও বার্লির। আশ্রমের মধ্যে চিকিৎসালয় আছে। যথাসম্ভব চিকিৎসা রোগীদের সেখান থেকেই হয়। বেশ ভাল। কিন্তু সত্যেন এখানে অন্য কোন ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বা খেলা করতে পারে না। এ দুর্ব্বলতা সত্যেনেরই। আশ্রমের কাজকর্ম একটু-আধটু সকলকেই করতে হয়। সম্প্রতি সকালবেলা বাসনমাজার কাজ পড়েছে সত্যেনের উপর। লেখাপড়ায় উন্নতি তার কতখানি হয়েছে—সেকথা আমি তাকে জিজ্ঞাসাও করি নি বা তাকে পরীক্ষা করবার বাসনাও আমার জাগে নি। যাক্—মোদ্দা কথা—তার কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝতে পারলাম, এক রকম চারা গাছ আছে—যার শিকড় বাংলা দেশের জলোমাটিতে বেশ গজায়—অন্য কোথাও তেমন গজায় না। সত্যেন যেন ঠিক সেই জাতের চারাগাছ। তাকে যেন জোর করে বাংলার মাটি থেকে চড়চড় করে উপড়ে নিয়ে টেনে এনে সারজল দিয়ে গেঁথে গেঁথে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এই উত্তর ভারতের পাথুরে মাটিতে। ফল তার যা হবার ঠিক তাই হয়েছে।

কিন্তু—আহা, ছেলেটা একবার দেখতে চায় তার বাপকে—সে আশা তার মিটছে না। শুনলাম—সত্যেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেখানে যে কাজই করুক—সেখান থেকে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে আশ্রমের ফটকের দিকে। চেয়ে চেয়ে কেবল দেখে—যত লোক আসছে তার মধ্যে তার বাবা আসছে কিনা! দিনের পর দিন আজ এই পাকা দু'বছর ধরে এইরূপে একান্ত মনে পথপানে চেয়ে থাকার কঠোর সাধনা করে যাচ্ছে সে। হায় রে, নির্ব্বোধ বালকের এ কি কঠোর তপস্যা, নিদারুণ নৈরাশ্যের মাঝে বসে ছলনাময়ী আশার মন্ত্র জপ করে করে।

শেষে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বাবা, তোমার বাবাকে চিঠি দাও না কেন?

সত্যেন বাসন মাজতে মাজতে বললে, দিই ত। বাবা কোন উত্তর দেয় না। বোধ হয় বাবার কোন অসুখ করেছে—তাই আসতে পারছেন না। কিংবা বদলি হয়েছেন বোধ হয় অন্য কোথাও। নইলে বাবা ঠিক আসতেন এত দিনে। আমায় সেবার বলে গেছেন—এইবার এসে নিয়ে যাবেন আমায়।

সান্ত্বনা দেবার ছলে তার মুখের কথাটাই পুনরুল্লেখ করে বললাম, তাই হবে। তোমার বাবা নিশ্চয় আসবেন। শীগগির এসে পড়বেন—মনে হয়।

হঠাৎ মুখ তুলে সত্যেন আমায় জিজ্ঞেস করলে, আপনি আমার বাবাকে চেনেন? আমার বাবা শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী। কলকাতায় পার্শিবাগানে আমার বাবার বাসা।

বললাম, চিনি না তাঁকে। তবে আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার বাবাকে খবর দেব। তোমার বাবার বাসার ঠিকানাটা কি বল দেখি।

কথাটা বলতেই সন্তোনের চোখে মুখে একটা চকিত আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল। খুব আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, আপনি লিখে নিন কাগজে—নইলে হয় ত ভুলে যাবেন।

সন্তোন তার বাবার বাসার ঠিকানা বললে। লিখে নিলাম তা বেশ স্পষ্ট করে আমার ছোট পকেট-ডায়রীতে।

তার পর সন্তোনকে যতটা পারি বুঝিয়ে, একটু আশ্বাস দিয়ে চলে এলাম আশ্রমের বাইরে। আর আমার মন চাইল না আশ্রম দেখতে। আসবার সময় ছেলেটির চোখের যে ছলছল করুণ চাহনি দেখে এসেছিলাম—সে চাহনির ভাষা দেব এমন শক্তি আমার নেই। তবে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বেশ বুঝতে পারছিলাম কিসের খোঁচা যেন আমায় ঠেলা দিয়ে দিয়ে বার করে দিচ্ছে—ঠেলে পাঠাচ্ছে যেন আমায় কলকাতায়—কলকাতার পার্শিবাগানে। খোঁচা অন্য কিছুর নয়—খোঁচা মা-হারা ছেলের করুণ চাহনির।

যাক্, ঠিক করলাম কলকাতায় পৌঁছে পার্শিবাগানে খোঁজ করব সন্তোনের বাপের—খোঁজ করব নিকুঞ্জবাবুর।

যথাসময়ে হরিদ্বার ছাড়লাম। রওনা হলাম ডাউন দুন এক্সপ্রেসে।

ইণ্টার ক্লাস কামরা—কামরাখানায় খুব ভিড়। সকলেই দূরের যাত্রী। দু'টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ভদ্রমহিলা বসে আছেন। রোগা ছিপছিপে চেহারা। সর্ব্বক্ষণই পান চিবোচ্ছেন। পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটি পানের রসে বেশ রাঙা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে নীচের ঠোঁটটি আপনমনে যতটা পারেন এগিয়ে ধরে এক একবার চেয়ে দেখছেন বোধ হয় রেঙেছে কেমন। গায়ের রঙ ফর্সা। পরনে একখানি রঙিন টাঙ্গাইল শাড়ী। তাঁর পাশে বসে আছেন একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখে চশমা। তিনিই মাঝে মাঝে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে মহিলাটিকে পান যোগাচ্ছেন—যোগাচ্ছেন তারই সঙ্গে সঙ্গে জর্দা, দোক্তা ও কিমাম। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে পুচ পুচ করে পানের পিক ফেলছেন মহিলাটি থেকে থেকে। কোনও রকমে বাচ্চা দুটির এক পাশে যতটা সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটু ঠাঁই করে বসতে পেরেছি আমি। বাচ্চা দুটি শুয়ে শুয়ে যাচ্ছে। মহিলাটি আমায় হঠাৎ বলে উঠলেন, একটু সরে বসুন—ছেলেটার পাটা মুড়ে রয়েছে, সোজা করে দেব। অগত্যা একটু সরেই বসলাম।

গাড়ী চলেছে ঝ ঝ করে। এক্সপ্রেস গাড়ী অনেক ষ্টেশনে দাঁড়াচ্ছে না। আমাদের সামনে একটি ছোকরা বসেছিল। ছোকরাটি মহিলাটিকে সম্বোধন করে বললে, দিদি, দাদাবাবুকে বল না—একবার কাশ্মীর ঘুরিয়ে আনতে।

শুনতে পেয়ে ভদ্রলোকটি বললেন, যাব—যাব, সামনের বছর বেরিয়ে আসব কাশ্মীর। এ বছর আর হবে না। ফ্রি পাস যা নেবার তা সব নেওয়া হয়ে গেল এবার।

অনুমানে বুঝলাম, এঁরা স্বামী-স্ত্রী।

ভদ্রলোকটি বললেন মহিলাটিকে, তুমি একটু শুয়ে পড় এবার। সারারাত জাগলে অসুখ করবে আবার।

মহিলাটি বললেন, না থাক্ এখন শোব না।

তার পর পরস্পর কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন স্বামী, স্ত্রী ও সম্বন্ধীতে। বুঝতে পারলাম, মুসৌরি পাহাড়ে বেড়াতে গেছলেন। এবার ফিরছেন কাশীতে। কাশী হয়ে কলকাতায় ফিরবেন।

কি কথায় কথায় ছোকরাটি জিজ্ঞেস করলে, দিদি, শুনেছি এই দিকে কোথায় না কি সতু থাকে?

বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন মহিলাটি, কে জানে।

ভদ্রলোকটি বললেন, হ্যাঁ, সতু এইখানেই থাকে। হরিদ্বারে নেমে একদিন থেকে গেলে হ'ত—সতুকে একবার দেখে যেতে পারতাম।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মহিলাটি, থাক—আর হরিদ্বারে নামতে হবে না তোমায়। যেখানে যাচ্ছ সেখানে চল। সতু ত আর জলে পড়ে নি বা আগুনে পোড়ে নি। মাস মাস টাকা তো পাঠিয়ে দিচ্ছ—তা হলেই হ'ল।

এই বলে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পুচ করে একটু পানের পিক ফেললেন মহিলাটি।

কেমন চমক লাগল আমার। ছোকরাটির কাছ থেকে রেলের টাইম টেবলটা হাতে নিয়ে একবার পাতা উল্টে উল্টে এর একটু আগে থেকেই দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল টাইম-টেবলের একটা পাতায় নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে কালো কালিতে:

Nikunja Chakrabarty,
Parsi Bagan Lane, Calcutta

এই দেখেই টাইম-টেবলটা ফিরিয়ে দিলাম ছোকরাটির হাতে। চেয়ে রইলাম একটু ভদ্রলোকের মুখের পানে। শুনতে পেলাম ভদ্রলোকটি বলছেন, ছেলেটার অসুখ শুনেছিলাম—কেমন আছে কে জানে?

একটু চাপা বিরক্তির ছায়া ফুটে উঠল মহিলাটির মুখে—উত্তর দিলেন না কিছু। চকিতে মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন খোলা জানালার দিকে চেয়ে।

আর সন্দেহ রইল না আমার। বুঝতে পারলাম নিকুঞ্জবাবুকে ময়াল সাপে গিলেছে। আমাকেও যেন সাপে কামড়েছে মনে হ'ল। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। উঠে দাঁড়ালাম। সামনে বেরিলি ষ্টেশন আসছে। ট্রেন থামবে, নেমে অন্য কামরায় উঠব ঠিক করলাম। চেয়ে আছি দরজা দিয়ে বাইরের দিকে। রাত তখন অনেক। চাঁদের আলো বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। দেখছি খানিকটা উঁচু-নীচু জায়গা সাঁ সাঁ করে যেন পিছু হটে যাচ্ছে। দেখলাম একটা পাড়-বাঁধানো বড় পাতকুয়া। বেশ স্পষ্ট দেখতে

যাচ্ছি একটি বারো-তের বছরের রুগ্ন ছেলে শুকনো ছাই দিয়ে আশ্রমের বাসন মেজে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে আছে যেন আমার দিকে। বুককাটা বেদনা যেন থই থই করছে দু' চোখের চাহনিতে। কি যেন চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম তাকে এমন সময় কুলীর ডাকে চমকে উঠলাম আমি।

বেরিলি—বেরিলি—

একটা হৈ চৈ-এ ভরা আলো-ঝলমল ষ্টেশন।

ময়াল সাপের দৃষ্টিবিষ এড়িয়ে তখখুনি নেমে পড়লাম তাড়াতাড়ি এক্সপ্রেসের ইণ্টার ক্লাস কামরা থেকে।

বুদ্ধ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎ অজ্ঞানে লীন, হিংসা নাচে নিশি-দিন,
মত্ত ফণা তুলি';
সে, এক অসুর-প্রায়, শুধু হীন স্বার্থ চায়,
পরমার্থ ভুলি';
'মার', তার সহচর; সেও এক বিষধর
—সে এক পিশুন,
মিথ্যা-মরীচিকা-ফাঁদে মানবে সতত বাঁধে,
করিবারে খুন।
তখন, কালের ভালে, প্রসন্ন প্রভাতকালে,
ফুটে এক ছবি:
সে ছবির পদপুটে পৃথ্বী পদ্ম হয়ে ফুটে,
ভালে ফুটে রবি।
সে ছবির আস্যদেশে হেরে সিন্ধু সৌম্যবেশে
পূর্ণ চন্দ্রে তার;
সে ছবির সর্ব্ব অঙ্গে চুয়ে আসি' রসরঙ্গে
কান্তি অমরার।
সেই ছবি, সেই তুমি, হে বুদ্ধ, হে মহামুনি,
হে সত্যসম্রাট!
তিন লোকে, তিন কালে, ধর্ম্মের হিল্লোল-তালে,
চলে তব নাট;
তব বাণী-মহোদধি উদ্ঘোষয়ে নিরবধি
ভৈরবী ভূমায়;
মহাবোধি তব গজ ঊর্দ্ধে তুলি' দ্যুতিধ্বজ
করয়ে বিহার।

এই বিশ্ব-জেতবনে, সৃজে নিত্য কুকর্ম্মে
ক্লেশের কণ্টক;
দুঃখের ক্রমের তলে শুষ্ক হয় পলে পলে
অরক্ত-কোরক;
প্রবলের দৃঢ়-বাহু দুর্ব্বলের হয়ে রাহু
করয়ে ধর্ষণ;
কামীর কাঞ্চন-স্তূপ ধরি' শেষে লোষ্ট্র-রূপ
করে প্রবঞ্চন।
সেই দৃপ্ত নিঃস্বতার, সে দুঃসহ গ্লানিভার,
সেই আর্ত্তনাদ,
তব রাজচিত্তদ্বারে ধেয়ে আসে, লভিবারে
মুক্তির প্রসাদ;
তব স্বর্ণ-সিংহাসন ত্যজি' তুমি সেই ক্ষণ
প্রব্রজ ধুলায়;
ধরার ধুইতে ধূলি কি সে ঊর্ম্মি উঠে দুলি'
তোমার হিয়ায়!
সেই দিন হতে, তুমি জগতের চিত্ত-ভূমি
করিছ কর্ষণ,
বুনিতেছ শীল-বীজ, যাহে শান্তি-সরসিজ
হইবে সৃজন;
সেই দিন হতে, তব ত্রিপিটক অভিনব
বিশ্ব-মরুস্থলে
ত্রিতাপ-তরঙ্গনাশী মরুদ্যান অবিনাশী
রচে কুতূহলে।

গান ও স্বরলিপি

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

ধন্য বিশ্বকবি তুমি, হে রবীন্দ্র, গুণাধার।
তোমার অপূর্ব কীর্তি তুলনা নাহিক তার।
শান্তিনিকেতন, দেশে, রচিলে জনকাদেশে।
সেথা কত শত লোকে শান্তি পায় অনিবার।
তুমি মহাজ্ঞানী গুণী বুঝিয়াছে সর্বজন।
বহু অর্থদান করি রাখিয়াছ সুধীজন,
নানা ভাষাবিদ্‌গণে, সুখে শান্তিনিকেতনে,
জীবন কাটান তাঁরা, কোনো দুঃখ নাহি আর।
তুমি নররূপী দেব, অমর হইয়া আছ।
মার্গসঙ্গীত ভাঙ্গি কত গীত রচিয়াছ।
গোপেশ্বর ও পীঠস্থানে, সুখে আছে তৃপ্ত প্রাণে,
তব কীর্তি হেরি আজি হর্ষে ভাসে হিয়া তার।

২´			৩				০			১			
ধা	ধা	|	পধা	ণর্সা	ণা	|	ণা	ধা	|	পা	পা	-া	|
ধ	ন্য		বি০	০০	শ্ব		ক	বি		তু	মি	-	
২´			৩				০			১			
মা	মা	|	রমা	পধা	পধপা	|	মা	জ্ঞা	|	রা	-া	-া	|
হে	র		বী০	০০	ন্দ্র০		গু	ণা		ধা	-	র	
২´			৩				০			১			
সা	রা	|	ধা	-া	ধা	|	ধা	ণা	|	ধা	পা	মা	|
তো	মা		র	-	অ		পূ	র্ব		কী	০	র্তি	
২´			৩				০			১			
পা	র্সা	|	ণা	ধা	পা	|	মা	জ্ঞা	|	রা	-া	-া	|
তু	ল		না	০	না		হি	ক		তা	-	র	

২´ ৩ ০ ১
মা পা | পা না মা | র্সা র্সা | র্সনা র্সা র্সা
শা ০ ন্তি নি কে ত ন দে০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
ধা র্সা | ণা ধা ধা | ধা র্সণা | ধা পা -া
র চি লে - জ ন কা দে শে -

২´ ৩ ০ ১
মা ধা | ধা ধা ধা | র্সণা ণা | ধা পা -া
সে খা ক ত শ ত০ ০ লো কে -

২´ ৩ ০ ১
মা -া | পা পধা মপা | মা জ্ঞা | রা -া -া
শা - ন্তি পা০ ০য় অ নি বা - র্

২´ ৩ ০ ১
সা সা | রা রা রা | রা রা | রা রা জ্ঞা
তু মি ম হা জ্ঞা নী - গু ণী ০

২´ ৩ ০ ১
মা মা | পা -া পা | পা -া | পা পা পা |
বু ঝি য়া - ছে স - র্ব জ ন

২´ ৩ ০ ১
মা মা | মা -া মা | মা পা | মা ধা পা |
ব হু অ - র্থ দা - ন ক রি

২´ ৩ ০ ১
মা মা | রমা পধা পধপা | মা জ্ঞা | রা রা -া |
রা খি য়া০ ০০ ছ সু খী জ ন -

২´ ৩ ০ ১
মা পা | না -া না | না র্সা | র্সা সা -া |
না না ভা - ষা বি দ্ গ ণে -

২´ ৩ ০ ১
র্সা র্সা | না -া ধা | ধা ণা | ধা পা -া |
সু খে শা - ন্তি নি কে ত নে -

২´ ৩ 0 ১
মা ধা | ধা -া ধা | ধা র্সনা | ধা পা -া |
জী ব ন - কা টা ন০ তাঁ রা -

২´ ৩ 0 ১
মা পা | মপা ধা পধপা | মা জ্ঞা | রা -া -া |
কা নো দু০ ০ খ না হি আ - র

২´ ৩ 0 ১
সা সা | রা রা রা | রা -া | রা -া জ্ঞা |
তু মি ন ব রূ পী - দে . ব

২´ ৩ 0 ১
র্মা মা | পা -া পা | পা পা | পা পা -া |
অ ম র - হ ই য়া আ ছ -

২´ ৩ 0 ১
মা -া | মা মা -া | মা মা | মা ধা পা |
মা - র্গ সং - গী ত ভা ০ তি

২´ ৩ 0 ১
মা মা | মা -া পা | মা জ্ঞা | রা -া রা |
ক ত গী - ত র চি য়া - ছ

২´ ৩ 0 ১
মা পা | না না না | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
গো পে শ্ব র এ পী ঠ স্থা নে -

২´ ৩ 0 ১
ণা র্সা | ণা ধা ধা | র্সা ণা | ধা পা -া |
সু খে আ ছে তু ০ ও প্রা ণে -

২´ ৩ 0 ১
মা ধা | ধা -া ধা | ণা র্সা | ণা ধা পা |
ত ব কী - র্তি হে রি আ ০ জি

২´ ৩ 0 ১
মা -া | পা ধা পা | মা জ্ঞা | রা -া -া |
হ - র্ষে ভা সে হি য়া ভা . রূ

প্রগতির পথে বর্ত্তমান ইটালী

সাম্প্রতিক কালে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইটালী উত্তরোত্তর প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইটালীর মোটর-শিল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইটালীতে যে সকল যন্ত্রপাতি এবং প্ল্যাণ্ট নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলির প্রতিও ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান জগতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়মের প্রয়োজনীয়তা

ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষণের প্রস্তুতিকালে কর্মরত যন্ত্র

লেগহর্ণের নিকট অরেলিয়ায় নবনির্ম্মিত রাজপথ
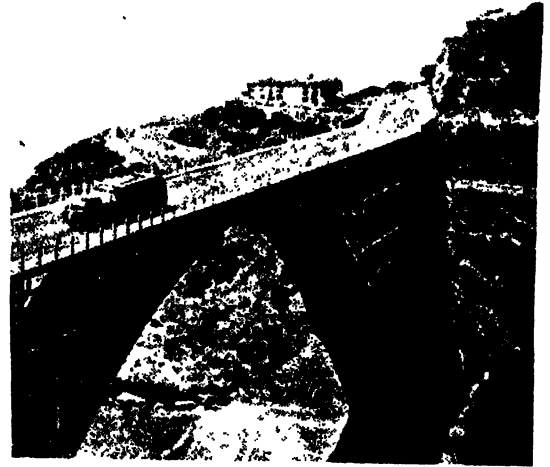
যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সম্প্রতি ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষণের ফলে আব্রুৎসিতে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হওয়াতে ইটালীর পেট্রোলিয়াম-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই আবিষ্কারের পর ১৯৫৫ সনের প্রথম আট মাসে ১০৬,৩১০ টন অপরিষ্কৃত তৈল পাওয়া যায় এবং ৩২টি তৈল-বিশোধনাগারে মোট ১,৮২,৪০০০ টন বেনজাইন ও ৬,৪৬,০০০ টন পরিষ্কৃত তৈল উৎপন্ন হয়।

অতি গভীর নলকূপ বিদ্ধ করার (Drill) ফলে পেসকারার তারে কুপাতে মাত্র ৫০০ মিটারের নিচে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গিয়াছে। সিসিলিতে আরও পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের পর আব্রুৎসিতে অন্যান্য 'ডিপজিট' আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই দেশে প্রতিষ্ঠিত বত্রিশটি তৈল-বিশোধনাগারে বৎসরে ২,১৭,০০,০০০ টন অবিশুদ্ধ তৈল (crude oil) পরিশ্রুত হয়।

রোমানরা একদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাস্তা নির্ম্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—বর্ত্তমান ইটালীও সেই ঐতিহ্যের ধারা বহন করিতেছে। রাজপথ নির্ম্মাণের দিকে ইটালীয়ান সরকারের মনোযোগও প্রভূত পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। যানবাহন চলাচলের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য, সমগ্র দেশে প্রসারিত রাজপথের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের নিমিত্ত রাষ্ট্র একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরীকরণে হাত দিয়াছে। ১৯৫৫ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ইটালীর রাজপথসমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছিল ২৪,৮১১ কিলোমিটারের উপর। ইহা ছাড়া ইটালীর বিভিন্ন
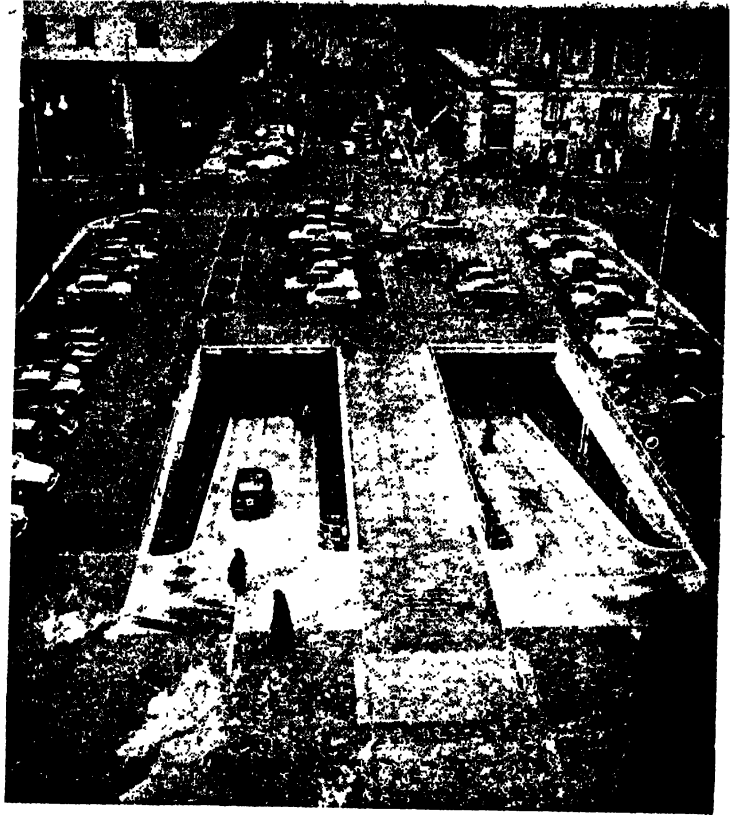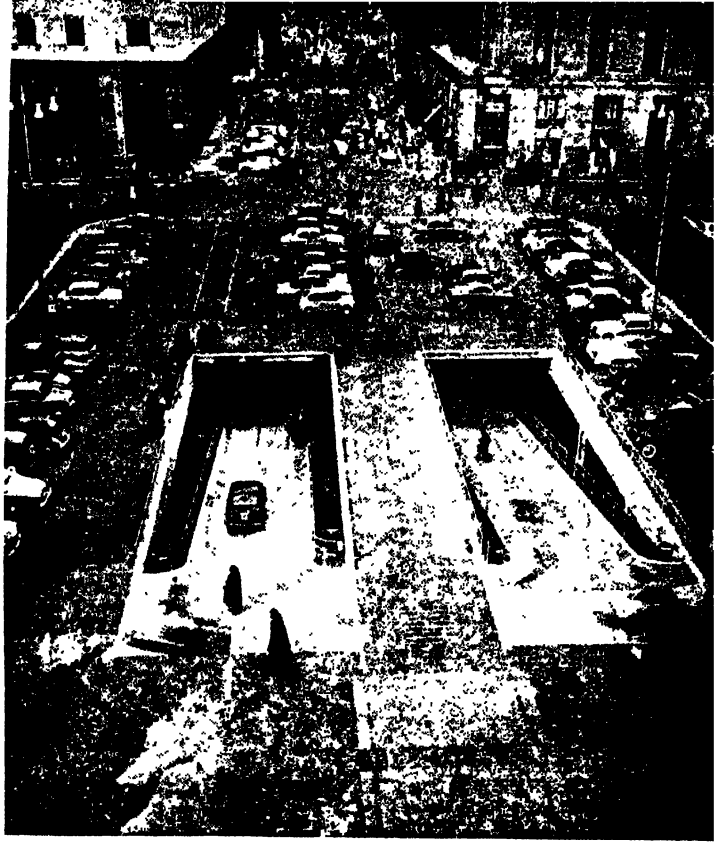
মিলানে ভূগর্ভস্থ নূতন "কার পার্ক"

ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষাকালে কর্ম্মরত যন্ত্রপাতির আর একটি দৃশ্য

পেসকারার ভাল্লে কুপাতে পেট্রোলিয়ামের জন্য অতিগভীর নলকূপ বিধ করা

ভালে কুপাতে একটি "ড্রিলিং ইনষ্টলেশন"

অঞ্চলে আরও ১৭৬ কিলোমিটার রাজপথের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল— ইতিমধ্যে রাজপথ-নির্ম্মাণ-কৌশলেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

সিসিলিতে টুরিষ্টদের যাতায়াত এই দ্বীপের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এবং সিসিলীয় আঞ্চলিক সরকারের (South and the Sicilian Regional Goverment) ফণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে আধুনিক প্রয়োজনসমূহ অধিক তৎরূপে মিটাইবার জন্য নূতন রাজপথগুলি নির্ম্মিত হইতেছে।

ইটালীতে ভূগর্ভস্থ 'কার পার্ক' ইত্যাদির নির্ম্মাণকার্য্যও সুপরিকল্পিত প্রণালীতে চলিতেছে। ছবিতে পিয়াত্‌সা ভিয়াৎস-এর যে ভূগর্ভস্থ পার্কটি দেখা যাইতেছে তাহাতে ৪০০টি মোটরকারের স্থানসঙ্কুলান হইতে পারে। ইহা অতিআধুনিক "ক্লিনিং ইনষ্টলেশনে"র ব্যবস্থাযুক্ত। টেক্‌নিক্যাল উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে মিলান্‌। এই স্থানে একটি খাড়া (vertical) 'কার পার্ক' নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে লিফ্‌টের সাহায্যে সেই সকল যানবাহনকে 'পার্ক' করা যায়, স্থানাভাববশতঃ যেগুলিকে খোলা জায়গায় সাময়িকভাবে রাখা (park) সম্ভবপর হয় না।

—

গল্প লেখার গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটগল্পের আদর্শ নিয়ে সেদিন বন্ধুমহলে তুমুল তর্ক উঠেছিল। সেই পুরনো তর্ক—যা নিয়ে এককালে সাহিত্যিক মহলে চরম আন্দোলন হয়ে গেছে—সেই তর্ক আবার উঠেছে। ইদানীং সাময়িক সাহিত্যে যে সব গল্প ছাপা হচ্ছে সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে গল্প বলা চলে কিনা, এই নিয়ে তর্ক চলছিল—বাদানুবাদেরও অন্ত ছিল না। ছোটগল্প এবং বড়গল্প এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কি, মাঝে মাঝে এ সব প্রশ্নও মাথা চাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু তুমুল তর্কের শেষ ফল যা হয়—কোনও মীমাংসাই হচ্ছিল না। গীড মোপাসা, ব্যালজাক, টুর্গেনিভ, টলষ্টয় থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাত-কুমার, বীরবল, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি আধুনিককালের বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত কেউই বাদ যাচ্ছিলেন না।

এই সব তর্কের মধ্যে রমেশ একদম চুপচাপ ছিল। রমেশকে লক্ষ্য করে সতীশ বললে, "রমেশ, তুমি যে একেবারে নিস্তব্ধ আছ, তোমার কি এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নেই ?"

রমেশ বললে, "আমার কথাটা যদি তোমরা মেনে নিতে চাও তা হলে ছোট-গল্প যে কাকে বলে সেটা আমি বুঝিয়ে দিতে পারি—"

জগৎ বললে, "আমাদের কারুর সঙ্গে কারুর আদর্শ যখন মিলছে না, তখন তোমার কথাটাই মেনে নিতে হবে। তর্কের দ্বারা আমরা যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না—সে আমরা বেশ বুঝেছি। একমাত্র তুমিই আমাদের তর্কের তুফান থেকে তফাৎ আছ—বিচারক তোমাকেই খাড়া করলাম—এখন ছোটগল্পের আদর্শ সম্বন্ধে তুমি যা রায় দেবে, তাই আমরা নত শিরে মেনে নেব। আপোষ মীমাংসার এ ছাড়া আর কোন পথ দেখছি নি—।" জগতের কথায় খুশী হয়ে রমেশ বললে, "আমাকে যখন ছোটগল্পের বিচারক হিসাবে তোমরা মেনে নিলে তখন আমার আদেশে সবাইকে চুপ করতে হবে। তার পর আমি যা বলব মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও তা হলে ছোটগল্প যে কি জিনিষ সেটা বোঝা সহজ হবে।"

রমেশের আদেশে সবাই চুপ করল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রমেশ বলতে লাগল, "দেখ, তোমরা প্রত্যেকেই সাহিত্যিক—প্রত্যেকেই লেখক। কেউ ছোটগল্প লিখে নাম করেছ—কেউ বা বড়গল্প-লেখক—উপন্যাসও দু'একজন

আরম্ভ করছ—আমি কিন্তু কিছুই না। তোমাদের প্রত্যেকেরই লেখা কোন না কোন মাসিকে ছাপা হয়েছে, এবং যশ ও অর্থ-লাভও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে আমার কিন্তু একটি লেখাও কোন কাগজে ছাপা হয় নি—এ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্য-সমিতি থেকে প্রবন্ধ পড়বার জন্ত অথবা তোমাদের আজকালকার ভাষায় বাণী দেবার জন্ত ডাক আসে নি—এটা কি আমার কম আপসোস! তোমাদের দেখাদেখি আমিও দিনকতক গল্প লেখায় হাত পাকাতে সুরু করে-ছিলাম, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার হাত কাঁচাই থেকে গেল। আশাহত হয়ে অনেক দিন লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু মনে একটা ব্যথা আছে। তোমাদের আলোচনায় কেন যোগ দিই নি এতক্ষণে বোধ করি তার কারণটা বুঝতে পারবে। আমি যে কখনও গল্প লিখতে সুরু করেছিলাম এবং তা ছাপার অক্ষরে দেখবার জন্ত কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি—সফল-মনোরথ হই নি—সম্পাদকের পর সম্পাদকের কাছ থেকে গল্পগুলি না মঞ্জুর হয়ে ফিরে এসেছে—তোমরা এক দিনের জন্তও তা টের পেয়েছিলে? এই পরাভবের কথাটা এ পর্য্যন্ত কাউকে জানতে দিই নি। তোমাদের ছাপা গল্প যখন এই সভায় পঠিত হ'ত তখন আমার বুকের শিরাগুলি কি বেদনায় টন্ টন্ করত সে তোমরা বুঝতে না। তোমাদের সকলের মুখ আশায় উৎফুল্ল আর আমার অন্তরের মধ্যে নিরাশার কান্না ফেনিয়ে উঠত। হায় মা, বীণাপাণি! রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র না হতে পারি, কিন্তু এই সব রাম, শ্যাম যদুদের মত কি একজন সাধারণ লেখকও হতে পারি না? তোমরা নিজের নিজের লেখার প্রশংসায় মত্ত থাকতে—আমার অবস্থাটা বুঝতে না। কেনই বা বুঝবে—ব্যর্থতার ব্যথা যে কি জিনিষ সে তোমরা বোঝ নি বলেই আজ তুমুল তর্ক তুলেছ। বারংবার অকৃত-কার্য্য হয়েও আমি কিন্তু বহুদিন হাল ছাড়ি নি। সম্পাদকগোষ্ঠী একজোট হয়ে অটল চিত্তে আমার লেখা ফেরত দিয়েছেন, তথাপি এক দিনের জন্তও তাঁদের স্তবস্তুতি করতে আলস্য বোধ করি নি। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং বিদেশী দু'এক জন লেখকের দু'চারটে গল্প নাম-ধাম বদলে নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু হায়রে দুরাশা—ধরা পড়তে বিলম্ব হয়নি। এ অপচেষ্টা বেশীদিনও চলেনি। শেষটা নিজের ক্ষমতায় কুলোয় ত লিখব—নইলে লিখব না এই প্রতিজ্ঞা করে হয়ে নিজের যৎকিঞ্চিৎ পুঁজিপাটা নিয়ে দিনরাত কল্পিত নায়ক-নায়িকার নামজপ করতাম। কি প্রবল বাসনা আমাকে মত্ত করেছিল জানো—আমার ছাপা গল্প হঠাৎ তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে একেবারে চমক লাগিয়ে দেব। আমিও যে তোমাদের মত লিখতে পারি—আমিও যে এক জন লিখিয়ে সেইটে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া এবং তোমাদের কাছ থেকে কিছু প্রশংসা লাভ আমার একমাত্র কাম্যবস্তু হয়েছিল। লেখকের উঁচু গদিতে বসে তোমরা আমাকে পাঠক বানিয়েছিলে—এই আক্ষেপটাই আমাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিত। এই জীবনটা পাঠকই থেকে গেলাম—লেখকের সম্মানার্হ পদবীতে কখনো উঠতে পারলাম না। তোমাদের কোন গল্পের এতটুকু খুঁত যদি বের করতাম অমনি 'বেরসিক' 'ও আর্টের কি বোঝে' ইত্যাদি উক্তি করে তোমরা আমার প্রতি মারমুখো হয়ে উঠতে। কাজেই তোমাদের গল্পের সমালোচনা তোমাদের মুখে শুনে তিক্ত লাগলেও আমাকে চুপ করে থাকতে হ'ত—কেন না বিপরীত কিছু বললেই তোমরা তৎক্ষণাৎ আমার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করতে। এই আমার গল্প লেখার

মর্ম্মান্তিক ইতিহাস। এখন শেষটা শোন—তাতেই প্রকৃত আর্টের আচ পাবে।

আজ এক বৎসর হ'ল সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়েছি। আঘাতে আঘাতে যদিও মনটা পাথর হয়ে গেছে তথাপি এমন একটা প্রসন্নতা লাভ করেছি তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। যেদিন গল্পের খাতাখানা ঘৃত-চন্দন লিপ্ত করে বহ্নিদেবতাকে অর্পণ করলাম—ব্যথিত মর্ম্মস্থলটায় সেদিন কে যেন সান্ত্বনার শীতল হস্ত বুলিয়ে দিলে। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আরাম পেলাম—চির বিনিদ্রকে কে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে। সেই থেকে আর লিখি না—মনে মনে যাদের বিদ্বেষ করতাম—তাদের আবার ফিরে পেলাম।

এখন বুঝেছি সাহিত্যক্ষেত্রে হিংসার কোন স্থান নাই। যাদের মধ্যে 'গিফ্‌ট' আছে তারাই লিখতে পারে। ও জিনিষটা আসে হাড়ের ভেতর থেকে। সে যাদের নেই তারা হিংসে করে হাজার মাথা কুটলেও পারবে না। টেলেন্ট এবং জিনিয়াস দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ—জিনিয়াস লিখবে টেলেন্ট বড়জোর সমালোচনা করবে। এইটে আগে বুঝতাম না বলে গল্প লিখতে গিয়ে এত কষ্ট পেয়েছি। এই আমার গল্প-লেখার গল্পটি হুবহু টুকে নাও, আদর্শ ছোট গল্পের সন্ধান পাবে। এ গল্প একাধারে হাসি-কান্নার অদ্ভুত মিশ্রণ—বীরবলের ভাষায় যাকে বলে ট্রাজি-কমেডি। যারা আমার মত হতাশার আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে গেছে তাদের চোখ দিয়ে সমবেদনার অশ্রু ঝরবে এবং যাদের তরী তোমাদের মত গল্পসমুদ্রের তুফান কাটিয়ে তীরে ভিড়েছে তারা প্রচুর হাসবে।

রমেশ চুপ করল।

রমেশের গল্পলেখার ব্যর্থতার কাহিনী শুনে সকলেই এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, কিছুক্ষণ কারও মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল হেমেনের কথায়—সে বললে—"রমেশদা, এতদিন তোমাকে চিনতে পারি নি—ক্ষমা কর—তুমি যে এমন একটি আদর্শ গল্পের মূর্ত্ত প্রতীক তা এক দিনের জন্যও টের পাই নি—"

উদীয়মান সাহিত্যিক নরনারায়ণ বললে—"ভাই রমেশ, তুমি আমার মনের কথাগুলো টেনে বলেছ—আমার প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে তোমার গল্প-লেখার গল্প হুবহু মিলে গেছে—এই নিয়ে যে একটা ছোটগল্প দাঁড় করানো যেতে পারে—সেই কথাটিই বরাবর এড়িয়ে গেছি। তার কারণ মানুষ নিজের অক্ষমতার কথা, দুর্ব্বলতার কথা সহজে কারও কাছে প্রকাশ করতে চায় না—সেই জন্যই বরাবর ঐ কথাটা চাপা দিয়ে এসেছি। পোষ্টমাষ্টারকে বলা ছিল—আমার লেখার কোন প্যাকেট ফেরত এলে যেন বাড়ীতে বিলি না হয়—আমি নিজে গিয়ে আপিস থেকে নিয়ে আসতাম—স্ত্রীর কাছে পাছে পৌরুষ গর্ব্বের লাঘব হয়। আজ তুমি ছাই উড়িয়ে দিয়েছ—আসল কথাটি বেরিয়ে পড়েছে। তোমার গল্প মাসিকে ছাপা নাই বা হ'ল—তুমি আমাদের চেয়ে কোন অংশে ছোট নও। আমরা সবাই এক—ছোটগল্পের আদর্শ কাকে বলে আজ তুমিই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছ।"

ভূপতি বললে—"ছোটগল্পের আদর্শ সম্বন্ধে রমেশ যে সুদীর্ঘ বাণী দান করেছে তাতে কিন্তু আমার খটকা আছে—আপিসের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর রমেশ এত সময় পেত কোথায়? এ পর্য্যন্ত ত ওকে একখানা মাসিকের পাতা ওল্টাতে দেখলাম না—তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে রমেশচন্দ্রের এ কাহিনী আগাগোড়া কাল্পনিক—বিলকুল মিথ্যা—তোমরা বীরবলের নীললোহিতকে জানতে—আমাদের রমেশচন্দ্র হচ্ছেন নীললোহিতের অভিনব সংস্করণ—"

প্রতিবাদ করে রমেশ বললে, "তোমাদের কোন্ গল্পটি সত্যি সেইটি জানতে চাই—"

সতীশ বললে, "তুমি না ছোটগল্পের আদর্শ বোঝাতে এসেছিলে? বিচারকের আসনে বসেছিলে? তুমি কি জান না—গল্পমাত্রই কল্পনার খেলা—"

রমেশ বললে, "তা হলে ধরে নাও আমার ঐ গল্পলেখার গল্পটি আগাগোড়া বানানো—অর্থাৎ, আমি যা বলেছি তার একবর্ণও সত্য নয়। খুব অল্পের মধ্যে মিথ্যাকে যারা মনোহর ভাবে সাজাতে পারে—যা পড়ে মনে হবে এ সত্যি—জীবনে ঠিক ঠিক এমনি ঘটে—গল্প লেখার ভেল্কি তারাই আয়ত্ত করেছে। ঐ দেখ বাইরে তোড়জোড় চলছে—রাতও বোধ করি বারটাই হবে—অতএব আজকের মত সভাভঙ্গ হোক।"

উপনদী—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

উপনদী শীর্ণ জলধারায় নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিলেও—এক কালে ইহার বুকে জোয়ার-ভাটার প্রবাহ থাকে; বন্যায় গ্রাম ভাসানো ও ভাঙ্গনের ক্ষুধায় বাড়ীঘর কুক্ষিগত করাও ইহার ধর্ম্ম। এই নদীধর্ম্মী একটি নারী-চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। পটভূমিকায় আছে একটি অনুন্নত গ্রাম।

লেখক সুকবি এবং পল্লী-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তিনি গ্রামোন্নয়নের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া উপন্যাসের মূল সুরটি বাঁধিয়াছেন এবং গ্রাম্য মানুষের দোষত্রুটি অশিক্ষা দুর্ব্বলতা প্রভৃতির উপর সস্নেহ আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেবার স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলে নায়ক-চরিত্রটি দরদ দিয়া আঁকা। নায়িকা সুলেখার জীবন উপনদীর সঙ্গে তুলনীয়। অশোকের সংস্পর্শে সেই জীবন-নদীতে জোয়ার আসিয়াছে এবং সব ভাসাইয়া লইবার উন্মাদনাও জাগিয়াছে। দৈনন্দিন ঘটনার সংস্থানে মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দুটি জীবনকে বৃত্তাভিমুখী করিয়াছেন লেখক এবং শেষ অধ্যায়ে, যে রুদ্ধস্রোত উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে—তাহার সঙ্গে সুলেখার চরিত্রের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া বেদনা-বিধুর ছবিটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সঙ্কেতময়তার মধ্যেই লেখকের কবি-মনের পরিচয়।

তথাপি সূক্ষ্ম রসগ্রাহী পাঠক কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিতে পারেন। উপন্যাসের শেষাংশে বহু ঘটনা ও হৃদয়দ্বন্দ্বের লীলা—যাহা বিস্তৃত হইলে চরিত্রগুলি আরও পরিস্ফুট এবং কার্য্যকারণ সম্পর্কিত বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। হয়ত বা এই কারণেই ঘটনা ও সংলাপে কিছু নাটকীয় ভঙ্গী লক্ষ্যগোচর হয়। তথাপি গল্পটি বেশ জমিয়াছে।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ-পারিপাট্য লক্ষণীয়।

অতি গভীর নলকূপ বিদ্ধ করার (Drill) ফলে পেসকারার তারে কুপাতে মাত্র ৫০০ মিটারের নিম্নে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গিয়াছে। সিসিলিতে আরও পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের পর আব্রুৎসিতে অজ্ঞাত 'ডিপজিট' আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই দেশে প্রতিষ্ঠিত বত্রিশটি তৈল-বিশোধনাগারে বৎসরে ২,১৭,০০,০০০ টন অবিশুদ্ধ তৈল (crude oil) পরিশ্রুত হয়।

মিলানে ভূগর্ভস্থ নূতন "কার পার্ক"

রোমানরা একদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাস্তা নির্ম্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—বর্ত্তমান ইটালীও সেই ঐতিহ্যের ধারা বহন করিতেছে। রাজপথ নির্ম্মাণের দিকে ইটালীয়ান সরকারের মনোযোগও প্রভূত পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে। যানবাহন চলাচলের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য, সমগ্র দেশে প্রসারিত রাজপথের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের নিমিত্ত রাষ্ট্র একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরীকরণে হাত দিয়াছে। ১৯৫৫ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ইটালীয় রাজপথসমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছিল ২৪,৮১১ কিলোমিটারের উপর। ইহা ছাড়া ইটালীয় বিভিন্ন

ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষাকালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির আর একটি দৃশ্য

পেসকারার ভারে কুপাতে পেট্রোলিয়ামের জন্য অতিগভীর নলকূপ বিদ্ধ করা

ভালে কুপাতে একটি "ড্রিলিং ইনষ্টলেশন"

অঞ্চলে আরও ১১৬ কিলোমিটার রাজপথের নির্মাণকার্য্য চলিতেছিল— ইতিমধ্যে রাজপথ-নির্মাণ-কৌশলেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

সিসিলিতে টুরিষ্টদের যাতায়াত এই দ্বীপের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এবং সিসিলীয় আঞ্চলিক সরকারের (South and the Sicilian Regional Goverment) কর্তৃত্বাধীনে আধুনিক প্রয়োজনসমূহ অধিক তরুপে মিটাইবার জন্য নূতন রাজপথগুলি নির্মিত হইতেছে।

ইটালীতে ভূগর্ভস্থ 'কার পার্ক' ইত্যাদির নির্মাণকার্য্যও সুপরিকল্পিত প্রণালীতে চলিতেছে। ছবিতে পিয়াৎসা ভিয়াংস-এর যে ভূগর্ভস্থ পার্কটি দেখা যাইতেছে তাহাতে ৪০০টি মোটরকারের স্থানসঙ্কুলান হইতে পারে। ইহা অতিআধুনিক 'ক্লিনিং ইনষ্টলেশনে'র ব্যবস্থাযুক্ত। টেক্‌নিক্যাল উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে মিলান্‌। এই স্থানে একটি খাড়া (vertical) 'কার পার্ক' নির্মিত হইয়াছে। এখানে লিফটের সাহায্যে সেই সকল যানবাহনকে 'পার্ক' করা যায়, স্থানাভাববশতঃ যেগুলিকে খোলা জায়গায় সাময়িকভাবে রাখা (park) সম্ভবপর হয় না।

—

গল্প লেখার গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটগল্পের আদর্শ নিয়ে সেদিন বন্ধুমহলে তুমুল তর্ক উঠেছিল। সেই পুরনো তর্ক—যা নিয়ে এককালে সাহিত্যিক মহলে চরম আন্দোলন হয়ে গেছে—সেই তর্ক আবার উঠেছে। ইদানীং সাময়িক সাহিত্যে যে সব গল্প ছাপা হচ্ছে সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে গল্প বলা চলে কিনা, এই নিয়ে তর্ক চলছিল—বাদানুবাদেরও অন্ত ছিল না। ছোটগল্প এবং বড়গল্প এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কি, মাঝে মাঝে এ সব প্রশ্নও মাথা চাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু তুমুল তর্কের শেষ ফল যা হয়—কোনও মীমাংসাই হচ্ছিল না। গীথ মোপাসা, ব্যালজাক, টুর্গেনিভ, টলষ্টয় থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, বীরবল, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এমনকি আধুনিকদের বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত কেউই বাদ যাচ্ছিলেন না।

এই সব তর্কের মধ্যে রমেশ একদম চুপচাপ ছিল। রমেশকে লক্ষ্য করে সতীশ বললে, "রমেশ, তুমি যে একেবারে নিস্তব্ধ আছ, তোমার কি এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নেই?"

রমেশ বললে, "আমার কথাটা যদি তোমরা মেনে নিতে চাও তা হলে ছোটগল্প যে কাকে বলে সেটা আমি বুঝিয়ে দিতে পারি—"

জগৎ বললে, "আমাদের কারুর সঙ্গে কারুর আদর্শ যখন মিলছে না, তখন তোমার কথাটাই মেনে নিতে হবে। তর্কের দ্বারা আমরা যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না—সে আমরা বেশ বুঝেছি। একমাত্র তুমিই আমাদের তর্কের তুফান থেকে তফাৎ আছ—বিচারক তোমাকেই খাড়া করলাম—এখন ছোটগল্পের আদর্শ সম্বন্ধে তুমি যা রায় দেবে, তাই আমরা নত শিরে মেনে নেব। আপোষ মীমাংসার এ ছাড়া আর কোন পথ দেখছি নি—।" জগতের কথায় খুশী হয়ে রমেশ বললে, "আমাকে যখন ছোটগল্পের বিচারক হিসাবে তোমরা মেনে নিলে তখন আমার আদেশে সবাইকে চুপ করতে হবে। তার পর আমি যা বলব মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও তা হলে ছোটগল্প যে কি জিনিষ সেটা বোঝা সহজ হবে।"

রমেশের আদেশে সবাই চুপ করল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে রমেশ বলতে লাগল, "দেখ, তোমরা প্রত্যেকেই সাহিত্যিক—প্রত্যেকেই লেখক। কেউ ছোটগল্প লিখে নাম করেছ—কেউ বা বড়গল্প-লেখক—উপন্যাসও দু'একজন

আরও কাছে—আমি কিন্তু কিছুই না। তোমাদের প্রত্যেকেরই লেখা কোন না কোন মাসিকে ছাপা হয়েছে, এবং যশ ও অর্থ-লাভও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে আমার কিন্তু একটি লেখাও কোন কাগজে ছাপা হয় নি—এ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্য-সমিতি থেকে প্রবন্ধ পড়বার জন্ত অথবা তোমাদের আজকালকার ভাষায় বাণী দেবার জন্ত ডাক আসে নি—এটা কি আমার কম আপসোস! তোমাদের দেখাদেখি আমিও দিনকতক গল্প লেখার হাত পাকাতে সুরু করে-ছিলাম, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার হাত কাঁচাই থেকে গেল। আশাহত হয়ে অনেক দিন লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু মনে একটা ব্যথা আছে। তোমাদের আলোচনায় কেন যোগ দিই নি এতক্ষণে বোধ করি তার কারণটা বুঝতে পারবে। আমি যে কখনও গল্প লিখতে সুরু করেছিলাম এবং তা ছাপার অক্ষরে দেখবার জন্ত কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি—সফল-মনোরথ হই নি—সম্পাদকের পর সম্পাদকের কাছ থেকে গল্পগুলি না মঞ্জুর হয়ে ফিরে এসেছে—তোমরা এক দিনের জন্তও তা টের পেয়েছিলে? এই পরাভবের কথাটা এ পর্য্যন্ত কাউকে জানতে দিই নি। তোমাদের ছাপা গল্প যখন এই সভায় পঠিত হ'ত তখন আমার বুকের শিরাগুলি কি বেদনায় টন্ টন্ করত সে তোমরা বুঝতে না। তোমাদের সকলের মুখ আশায় উৎফুল্ল আর আমার অন্তরের মধ্যে নিরাশার কান্না ফেনিয়ে উঠত। হায় মা, বীণাপাণি! রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র না হতে পারি, কিন্তু এই সব রাম, শ্যাম যদুদের মত কি একজন সাধারণ লেখকও হতে পারি না? তোমরা নিজের নিজের লেখার প্রশংসায় মত্ত থাকতে—আমার অবস্থাটা বুঝতে না। কেনই বা বুঝবে—ব্যর্থতার ব্যথা যে কি জিনিষ সে তোমরা বোঝ নি বলেই আজ তুমুল তর্ক তুলেছ। বারংবার অকৃত-কার্য্য হয়েও আমি কিন্তু বহুদিন হাল ছাড়ি নি। সম্পাদকগোষ্ঠী একজোট হয়ে অটল চিত্তে আমার লেখা ফেরত দিয়েছেন, তথাপি এক দিনের জন্তও তাঁদের স্তবস্তুতি করতে আলস্য বোধ করি নি। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং বিদেশী দু'এক জন লেখকের দু'চারটে গল্প নাম-ধাম বদলে নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু হায়রে দুরাশা—ধরা পড়তে বিলম্ব হয়নি। এ অপচেষ্টা বেশীদিনও চলেনি। শেষটা নিজের ক্ষমতায় কুলোয় ত লিখব—নইলে লিখব না এই প্রতিজ্ঞা করে হয়ে নিজের যৎকিঞ্চিৎ পুঁজিপাটা নিয়ে দিনরাত কল্পিত নায়ক-নায়িকার নামজপ করতাম। কি প্রবল বাসনা আমাকে মত্ত করেছিল জানো—আমার ছাপা গল্প হঠাৎ তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে একেবারে চমক লাগিয়ে দেব। আমিও যে তোমাদের মত লিখতে পারি—আমিও যে এক জন লিখিয়ে সেইটে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া এবং তোমাদের কাছ থেকে কিছু প্রশংসা লাভ আমার একমাত্র কাম্যবস্তু হয়েছিল। লেখকের উঁচু গদিতে বসে তোমরা আমাকে পাঠক বানিয়েছিলে—এই আক্ষেপটাই আমাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দিত। এই জীবনটা পাঠকই থেকে গেলাম—লেখকের সম্মানার্হ পদবীতে কখনো উঠতে পারলাম না। তোমাদের কোন গল্পের এতটুকু খুঁত যদি বের করতাম অমনি 'বেরসিক' 'ও আর্টের কি বোঝে' ইত্যাদি উক্তি করে তোমরা আমার প্রতি মারমুখো হয়ে উঠতে। কাজেই তোমাদের গল্পের সমালোচনা তোমাদের মুখে শুনে তিক্ত লাগলেও আমাকে চুপ করে থাকতে হ'ত—কেন না বিপরীত কিছু বললেই তোমরা তৎক্ষণাৎ আমার নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করতে। এই আমার গল্প লেখার

মর্মান্তিক ইতিহাস। এখন শেষটা শোন—তাতেই প্রকৃত আর্টের আঁচ পাবে।

আজ এক বৎসর হ'ল সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়েছি। আঘাতে আঘাতে যদিও মনটা পাথর হয়ে গেছে তথাপি এমন একটা প্রসন্নতা লাভ করেছি তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। যেদিন গল্পের খাতাখানা ঘৃত-চন্দন লিপ্ত করে বহ্নিদেবতাকে অর্পণ করলাম—ব্যথিত মর্ম-স্থলটায় সেদিন কে যেন সান্ত্বনার শীতল হস্ত বুলিয়ে দিলে। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আরাম পেলাম—চির বিনিদ্রকে কে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে। সেই থেকে আর লিখি না—মনে মনে যাদের বিদ্বেষ করতাম—তাদের আবার ফিরে পেলাম।

এখন বুঝেছি সাহিত্যক্ষেত্রে হিংসার কোন স্থান নাই। যাদের মধ্যে 'গিফ্‌ট' আছে তারাই লিখতে পারে। ও জিনিষটা আসে হাড়ের ভেতর থেকে। সে যাদের নেই তারা হিংসে করে হাজার মাথা কুটলেও পারবে না। টেলেণ্ট এবং জিনিয়াস দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ—জিনিয়াস লিখবে টেলেণ্ট বড়জোর সমালোচনা করবে। এইটে আগে বুঝতাম না বলে গল্প লিখতে গিয়ে এত কষ্ট পেয়েছি। এই আমার গল্প-লেখার গল্পটি হুবহু টুকে নাও, আদর্শ ছোট গল্পের সন্ধান পাবে। এ গল্প একাধারে হাসি-কান্নার অদ্ভুত মিশ্রণ—বীরবলের ভাষায় যাকে বলে ট্রাজি-কমেডি। যারা আমার মত হতাশার আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে গেছে তাদের চোখ দিয়ে সমবেদনায় অশ্রু ঝরবে এবং যাদের তরী তোমাদের মত প্রেমসমুদ্রের তুফান কাটিয়ে তীরে ভিড়েছে তারা প্রচুর হাসবে।

রমেশ চুপ করল।

রমেশের গল্পলেখার ব্যর্থতার কাহিনী শুনে সকলেই এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, কিছুক্ষণ কারও মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল হেমেনের কথায়—সে বললে—রমেশদা, এতদিন তোমাকে চিনতে পারি নি—ক্ষমা কর—তুমি যে এমন একটি আদর্শ গল্পের মূর্ত্ত প্রতীক তা এক দিনের জন্যও টের পাই নি—"

উদীয়মান সাহিত্যিক নরনারায়ণ বললে—"ভাই রমেশ, তুমি আমার মনের কথাগুলো টেনে বলেছ—আমার প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চ্চার সঙ্গে তোমার গল্প-লেখার গল্প হুবহু মিলে গেছে—এই নিয়ে যে একটা ছোটগল্প দাঁড় করানো যেতে পারে—সেই কথাটিই বরাবর এড়িয়ে গেছি। তার কারণ মানুষ নিজের অক্ষমতার কথা, দুর্ব্বলতার কথা সহজে কারও কাছে প্রকাশ করতে চায় না—সেই জন্যই বরাবর ঐ কথাটা চাপা দিয়ে এসেছি। পোষ্টমাষ্টারকে বলা ছিল—আমার লেখার কোন প্যাকেট ফেরত এলে যেন বাড়ীতে বিলি না হয়—আমি নিজে গিয়ে আপিস থেকে নিয়ে আসতাম—স্ত্রীর কাছে পাছে পৌরুষ-গর্ব্বের লাঘব হয়। আজ তুমি ছাই উড়িয়ে দিয়েছ—আসল কথাটি বেরিয়ে পড়েছে। তোমার গল্প মাসিকে ছাপা নাই বা হ'ল—তুমি আমাদের চেয়ে কোন অংশে ছোট নও। আমরা সবাই এক—ছোটগল্পের আদর্শ কাকে বলে আজ তুমিই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছ।"

ভূপতি বললে—"ছোটগল্পের আদর্শ সম্বন্ধে রমেশ যে সুদীর্ঘ বাণী দান করেছে তাতে কিন্তু আমার খটকা আছে—আপিসের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর রমেশ এত সময় পেত কোথায়? এ পর্য্যন্ত ওকে একখানা মাসিকের পাতা ওল্টাতে দেখলাম না—তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে রমেশচন্দ্রর এ কাহিনী আগাগোড়া কাল্পনিক—বিলকুল মিথ্যা—তোমরা বীরবলের নীললোহিতকে জানতে—আমাদের রমেশচন্দ্র হচ্ছেন নীললোহিতের অভিনব সংস্করণ—"

প্রতিবাদ করে রমেশ বললে, "তোমাদের কোন্ গল্পটি সত্যি সেইটি জানতে চাই—"

সতীশ বললে, "তুমি না ছোটগল্পের আদর্শ বোঝাতে এসেছিলে? বিচারকের আসনে বসেছিলে? তুমি কি জান না—গল্পমাত্রই কল্পনার খেলা—"

রমেশ বললে, "তা হলে ধরে নাও আমার ঐ গল্পলেখার গল্পটি আগাগোড়া বানানো—অর্থাৎ, আমি যা বলেছি তার একবর্ণও সত্য নয়। খুব অল্পের মধ্যে মিথ্যাকে যারা মনোহর ভাবে সাজাতে পারে—যা পড়ে মনে হবে এ সত্যি—জীবনে ঠিক ঠিক এমনি ঘটে—গল্প লেখার ভেল্কি তারাই আয়ত্ত করেছে। ঐ দেখ বাইরে তোড়জোড় চলছে—রাতও বোধ করি বারটাই হবে—অতএব আজকের মত সভাভঙ্গ হোক।"

সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের *ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY SOAP
L. 257-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

উপনদী—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

উপনদী শীর্ণ জলধারায় নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিলেও—এক কালে ইহার বুকে জোয়ার-ভাটার প্রবাহ থাকে; বন্যায় গ্রাম ভাসানো ও ভাঙনের ক্ষুধায় বাড়ীঘর কুক্ষিগত করাও ইহার ধর্ম্ম। এই নদীধর্ম্মী একটি নারী-চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। পটভূমিকায় আছে একটি অনুন্নত গ্রাম।

লেখক সুকবি এবং পল্লী-জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তিনি গ্রামোন্নয়নের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া উপন্যাসের মূল সুরটি বাঁধিয়াছেন এবং গ্রাম্য মানুষের দোষত্রুটি অশিক্ষা দুর্ব্বলতা প্রভৃতির উপর সস্নেহ আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেবার স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলে নায়ক-চরিত্রটি দরদ দিয়া আঁকা। নায়িকা সুলেখার জীবন উপনদীর সঙ্গে তুলনীয়। অশোকের সংস্পর্শে সেই জীবন-নদীতে জোয়ার আসিয়াছে এবং সব ভাসাইয়া লইবার উন্মাদনাও জাগিয়াছে। দৈনন্দিন ঘটনার সংস্থানে মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দুটি জীবনকে বৃত্তাভিমুখী করিয়াছেন লেখক এবং শেষ অধ্যায়ে, যে রুদ্ধস্রোত উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে—তাহার সঙ্গে সুলেখার চরিত্রের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া বেদনা-বিধুর ছবিটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সঙ্কেতময়তার মধ্যেই লেখকের কবি-মনের পরিচয়।

তথাপি সূক্ষ্ম রসগ্রাহী পাঠক কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিতে পারেন। উপন্যাসের শেষাংশে বহু ঘটনা ও হৃদয়দ্বন্দ্বের লীলা—যাহা বিস্তৃত হইলে চরিত্রগুলি আরও পরিস্ফুট এবং কার্য্যকারণ সম্পর্কিত বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। হয়ত বা এই কারণেই ঘটনা ও সংলাপে কিছু নাটকীয় ভঙ্গী লক্ষ্যগোচর হয়। তথাপি গল্পটি বেশ জমিয়াছে।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ-পারিপাট্য লক্ষণীয়।

সৌন্দর্য্যের রানীর কান্তি আপনারও হতে পারে!
দিনে দিনে সুন্দর
হয়ে উঠুন...
হ্যাঁ, আপনারও উজ্জ্বল সুন্দর কান্তির স্বপ্ন সফল হয়ে উঠতে পারে! প্রতিবার স্নানের অথবা মুখ ধোয়ার সময় রেক্সোনার ক্যাডিল সমৃদ্ধ ফেনা গায়ে মুখে ভাল করে মেখে ধুয়ে ফেলুন। আপনার কান্তি দিনে দিনে আরও সতেজ আরও মসৃণ লাবণ্যে ভরে উঠবে।
...রে ক্সো না র
সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে
একমাত্র ক্যাডিল* যুক্ত সাবান
"মিস রেক্সোনা"
১৯৫৫ সালের রেক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগীতার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈলসমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
Rexona
Rexona
বড় সাইজেও পাওয়া যায়
RP. 130-X52 BG

বহ্নি—শ্রীনগেন নিয়োগী। স্বাক্ষর প্রকাশনী। ১৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য আড়াই টাকা।

উপন্যাস। নায়ক শক্তিকুমার আদর্শবাদী যুবক, জননায়কও। জনকল্যাণের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াই তাহার আনন্দ। ধনী কন্যা ডলির সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে ভালবাসায় রূপান্তরিত। আরও বহু চরিত্রের সমাবেশ আছে বইয়ে। ধনসাম্যবাদের চিন্তা ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন লেখক। কয়েকটি চরিত্রে বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয়ও আছে। কিন্তু গল্পের বিন্যাস শিথিল এবং ভাষা দুর্বল। গল্প জমাইবার বহু উপকরণ থাকা সত্ত্বেও গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয় নাই এই কারণেই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
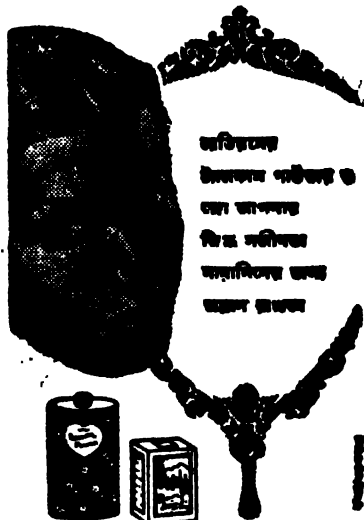
সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ। প্রকাশক—শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "মনোরম", কুণ্ডা, দেওঘর। মূল্য দেড় টাকা।

আজকাল যে বই যত বেশী আনন্দ দান করে, যত চিত্তাকর্ষক হয়, তত তাহার প্রশংসা হয়। কিন্তু কেবল চিত্তাকর্ষকতা থাকিলেই ভাল বই বলা উচিত নয়। সাধারণতঃ আমাদের বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল, এজন্য যে পুস্তক পড়িয়া আমাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় তাহাই আমাদের চিত্তাকর্ষক হয়। সব সময় বৈধ শুদ্ধভোগ যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে তা নয়, অবৈধ ভোগের চিত্রেও আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সাহিত্যে বৈধ ও অবৈধ ভোগ উভয়ই থাকে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তিনি, যিনি এরূপ ভাবে অবৈধ ভোগের চিত্র আঁকিবেন যে তাহার প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং এ ভাবে বৈধ ভোগের চিত্র আঁকিবেন যে তাহার প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'—অর্থাৎ, স্বয়ং ভগবানই ধর্মের অবিরুদ্ধ কামরূপে অবস্থান করেন। বৈধ এবং অবৈধ ভোগের চিত্র মহর্ষি বাল্মীকি যেরূপ উৎকৃষ্ট ভাবে আঁকিয়াছেন আর কেহ সে ভাবে আঁকিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। একদিকে সীতা-রামের পবিত্র চরিত্র অপর দিকে রাবণ ও সূর্পনখার অপবিত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা। পড়িলেই সীতা ও রামের প্রতি ভক্তি এবং সহানুভূতিতে হৃদয় বিগলিত হয়, অপর দিকে রাবণের অবৈধ ভোগাকাঙ্ক্ষায় ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। হোমরের ইলিয়ডে পেরিস ও হেলেনের অবৈধ প্রণয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয় না, বরং তাহাদের প্রতি কবির সহানুভূতির ভাব দেখা যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের চিত্তাকর্ষক চিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে হইলে অনেক বিখ্যাত লেখক এবং বিখ্যাত রচনার নাম করিতে হয়। পরাধীনতার ফলে ভারতীয় চিন্তার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার যে প্রভাব পড়িয়াছে ইহা তাহার এক নিদর্শন।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সাঁঝের প্রদীপ এই পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। গল্পগুলির মধ্যে ভালমন্দ দুই প্রকার চরিত্রই আছে এবং স্বভাবতঃ সৎ চরিত্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। কালীচরণবাবুর দক্ষ লেখনী-স্পর্শে সব চিত্রগুলিই বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পগুলিতে সকলপ্রকার রসের সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে করুণ, মধুর ও হাস্যরস অতি সমুজ্জ্বল। অনাবিল হাস্যরসের সহিত সুনিপুণ ঘটনাবিন্যাসের সমন্বয়ে "শিকারী শঙ্কর" বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। করুণ ও মধুর রসের সমাবেশে "অনাথিনী"কে প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প বলা যায়। বসন্তকুমারীর ইহজীবনের সর্বনাশ হইতে যে একটি সর্বজনহিতকর দেবীমূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই পাঠকের চিত্তে পবিত্র ভাব জাগ্রত করিবে। ধর্ম ও সদাচারের প্রতি শ্রদ্ধা সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়া গ্রন্থের মূল্য অতিশয় বর্দ্ধিত করিয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলরোল—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য। সোয়ান বুকস্, ১১।১-বি বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ সিকা।

'স্বপ্ন-বিলাসের' নয়, অংশতঃ 'বুদ্ধিবিলাসের' কাব্য। প্রথম কবিতা 'যুগ-বন্দনা'। কবির উক্তি :

"দেহ আমার ক্ষুধায় কাতর, মন আমার মূঢ়,
আমি নই তোমাদের সে কালের কবি।"

কিন্তু কবি-মন যে চিরদিন স্বপ্ন-বিধুর ভাষাতেই কথা বলে। তাই তাঁর কণ্ঠে কখনও শুনি :

মন্দির-দ্বারে

শান্তকুমার সেন
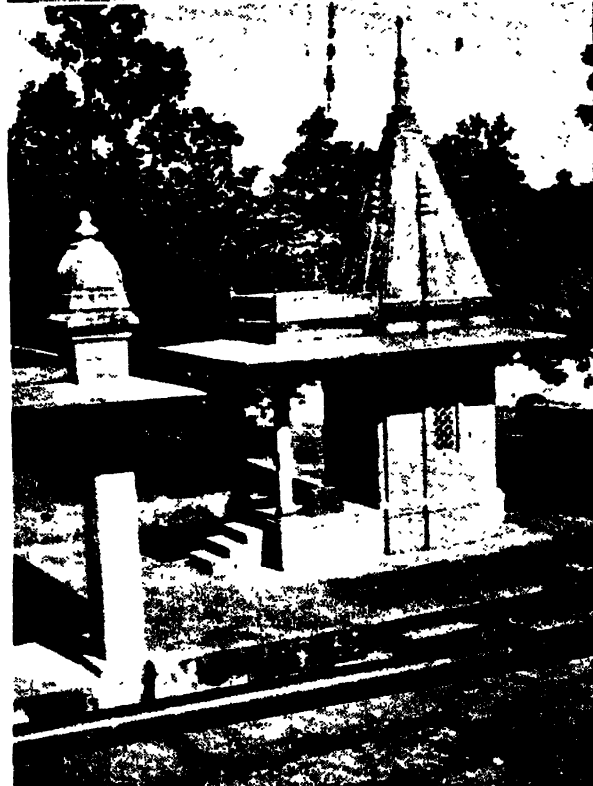
উপরে (বাম দিক হইতে) : বুদ্ধমূর্ত্তি (নূতন), বুদ্ধমূর্ত্তি (পুরাতন)
নীচে (" " ") : গৌতমমন্দির, গৌতমধারা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সংযুক্তির ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত রীতিমত প্রহসনে পরিণত হইল। শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্ত ও তাহার কারণ আমরা সম্পাদকীয়ের মধ্যে অন্যত্র দিয়াছি। সে বিষয়ে বিশেষ মতামত প্রকাশ নিরর্থক, কেননা এখন তাহাতে কোনও ফল হইবে না। শুধু এই মাত্র বলা চলে যে, যদি ডাক্তার রায় তাঁহার ভাবক ও সমর্থকবৃন্দের উপর নির্ভর না করিয়া দেশের বিচক্ষণ লোকদিগের পরামর্শ পূর্ব্বাহ্নে লইতেন তবে ঐরূপ প্রস্তাবের এমন শোচনীয় পরিণতি হইত না। ঐ প্রস্তাবের মধ্যে অনেক-কিছু ছিল যাহা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিশেষ সহায়ক হইত এবং বর্ত্তমানেরও বহু ক্ষতিকর বাধা উহাতে অপসারিত হইতে পারিত। শঙ্কার কারণ যাহা ছিল তাহার বিবর আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেগুলি দূর করাও অসম্ভব ছিল না, বিশেষতঃ যদি ঐ প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস কর্ত্তৃপক্ষ করিতেন।

সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে নেতিবাদেরই জয় হইল। স্বর্গত দেশবন্ধু দাশের আমল হইতেই এই নেতিবাদের ধারা চলিয়া আসিতেছে। নূতন কাজে উৎসাহের বদলে যাহা গঠিত বা যাহা পরিকল্পিত তাহাকে ধ্বংস অথবা ব্যর্থ করিতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে দেশের সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে।

যে জাতির গঠনের চেষ্টা নাই কেবলমাত্র আছে অন্যের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্যম, সে জাতি যে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, একথা কি বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন? অথচ আমাদের যে অবস্থা তাহাতে প্রগতি ভিন্ন আমাদের অস্তিত্বের পথ নাই। কেননা আমরা সকল ক্ষেত্রেই এতটা পিছাইয়া পড়িতেছি যে, যদি আমাদের উন্নতি দ্রুত না হয় তবে সমস্ত বাঙালী জাতি অনুন্নত শ্রেণীতে পরিণত হইবে।

ডাক্তার বিধান রায় নতিস্বীকার করিলেন বলিয়া একদল লোক উল্লসিত হইয়াছেন। শ্রীবিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার মণ্ডলী যে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে দেশের লোকের মনে একটা আক্রোশ জমানো স্বাভাবিক। কিন্তু এই ব্যর্থতায় সেই আক্রোশের জ্বালা কি নিভিবে।

আমাদের দেশে দুঃখকষ্টের অন্ত নাই, তাহার উপর বাস্তুহারার বোঝা বুকের উপর জগদ্দল পাষাণের ন্যায় চাপিয়া বসিয়া আছে। দুঃখদহনের নিবৃত্তির পথ কি খোঁজার সময় হয় নাই? দেশে ত অনাচার, দুর্নীতি ও অত্যাচারের চূড়ান্ত চলিতেছে, পথেঘাটে সকল দিকেই বে-বন্দোবস্ত ও হয়রানি। এর শান্তি কি অত্যাবশ্যক হয় নাই?

তবে এইরূপে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ আর কতদিন চলিবে?

এই বাংলা ও বিহারের ব্যাপারে যে কেহই কোনদিকেও সক্রিয় অংশ লইয়াছেন তিনিই দেশের ও দশের, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, ক্ষতি করিয়াছেন। কথাটা একটু জটিল শোনায়, কিন্তু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে ইহার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

যাঁহারা এই প্রস্তাব আনিয়াছিলেন এবং বিনা বিবেচনায় উহা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাঁহারাই যত বিশৃঙ্খলা ও অকাজের খোরাক যোগাইয়াছেন। আবার যাঁহারা তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহারা যেভাবে যুক্তি-তর্কের প্রতি উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র উদ্দাম প্রতিরোধে দেশকে নাচাইয়াছেন, তাঁহারা দেশের লোকের—বিশেষে যুবজনের—মস্তিষ্কবিকার আরও শঙ্কাজনক অবস্থায় আনিয়াছেন। নেতিবাদের পথে জয় মানেই ধ্বংসের পথের অভিযান, যাহাকে ইংরেজীতে বলে Pyrrhic Victory। ইহাতে বিজিত ও বিজেতা দুইয়েরই লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক।

আজ যদি, অন্য প্রদেশের (অর্থাৎ বাংলা ও বিহার ছাড়া) কাগজপত্রে এই ব্যাপারের সমালোচনা পড়া যায় তবে বুঝা যাইবে—আমাদের মান-মর্য্যাদা আজ কোথায় নামিয়া গিয়াছে। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপর সারা ভারতের শ্রদ্ধা ছিল—'হিংসা'ও ছিল। আজ আমরা বিদ্রূপের পাত্র, অবহেলার ও হেয়জ্ঞানের বস্তু।

কংগ্রেস ত নামিয়া চলিয়াছে অবনতির পথে। সারা ভারতেই এই অবনতি চলিতেছে। কিন্তু বাংলার কংগ্রেসের অধঃপতন যতটা হইয়াছে অতটা বোধ হয় বিহার বা আসামেরও হয় নাই। কেননা সেখানে কংগ্রেস এখানকার মত অতটা উচ্চেও কোনদিন উঠে নাই। অথচ কংগ্রেসের উদ্ধার ভিন্ন প্রতিকারের পথই নাই।

শিল্প-পল্লী

কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্ম ভারত সরকার বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন; ইহাদের মধ্যে শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা নূতন কল্পনার পরিচায়ক। আগামী বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে পাঁচটি শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যতে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই শিল্প-পল্লীগুলি প্রথমতঃ নিম্নলিখিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যথা: দিল্লীনগরীর অন্তর্গত ওখলা গ্রামে, সৌরাষ্ট্রের রাজকোটে, মাদ্রাজের গিণ্ডি ও বিরুদ্ধনগরে এবং ত্রিবাঙ্কুরের কুইলন শহরে। অদূর-ভবিষ্যতে কানপুর ও আগ্রাতে এই প্রকার শিল্প-পল্লী স্থাপিত হইবে।

শিল্প-পল্লীতে ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি জমি ক্রয় করিতে পারে কিংবা ভাড়া লইতে পারে। রাষ্ট্র জমি ভাড়া দেওয়া অপেক্ষা বিক্রয় করার পক্ষপাতী বেশী এবং সেই কারণে জমি কিস্তিবন্দীতে বিক্রয় করিতেও আপত্তি নাই। রাস্তা ও নর্দ্দমা নির্ম্মাণ, জল-সরবরাহ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি সরবরাহের জন্ম সরকার কিছু কিছু কর স্থাপন করিবেন। যে সকল ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রকার কর দিতে অপারগ হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পাঁচ বৎসরের জন্ম সাহায্য হিসাবে এই সব খরচের অর্দ্ধেক দিবে।

শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা প্রদেশগুলির দায়িত্ব; তবে প্রদেশগুলিকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্ম এই বাবদে খরচ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে প্রদেশগুলিকে দিতে সরকার রাজী আছেন। প্রাদেশিক সরকার নিজেরাই অথবা সহকারী কর্পোরেশন দ্বারা শিল্প-পল্লীগুলির শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারেন। জমি উন্নয়ন, কারখানা প্রতিষ্ঠা, রেলপথ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করিবেন।

শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠী-পল্লীর (guild) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থানীয়করণে সুবিধা হইবে এবং ইহার ফলে বেচাকেনার সুবিধা হইবে ও পল্লীর শ্রমিকরা তাহাদের ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জ্জন করিবে। এই সকল কুটীর-শিল্পের বহুপ্রকার অনুপূরক শিল্প শিল্প-পল্লীর আশেপাশে গড়িয়া উঠিবে।

ভূমিক্ষয় নিবারণ

ভারতবর্ষের বহু সমস্যার মধ্যে ভূমিক্ষয় সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান হারে ভূমিক্ষয় চলিতে থাকিলে আগামী এক পুরুষের মধ্যে ভারতের কৃষিজমির প্রায় ২৯ শতাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ, আগামী ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের কৃষিজমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্রগর্ভে কিংবা নদীগর্ভে চলিয়া যাইবে। ভূমিক্ষয় অর্থে দেশের মৌলিক সম্পদ নষ্ট হওয়া এবং নদী পরিকল্পনাগুলির উপর যে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে তাহারও কোন সার্থকতা থাকিবে না।

ভূমিক্ষয়ের জন্ম মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই সমান দায়ী। বন উৎপাটন এবং সেস্থলে কৃষিচারণ মানুষের অপকীর্ত্তি—যাহা ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ। আর তীব্র বায়ুবেগ এবং প্রচুর বারিপাত নদী সহযোগে ভূমিকে ক্ষয় করিয়া দেয়। নদীতীরস্থ জমি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কৃষিজমি, সবুজ চারণভূমি এবং উর্ব্বরভূমির উপরিভাগ প্রথমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরে সম্পূর্ণরূপে পতিতজমিতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে ভূমিক্ষয় নিবারণের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ভূমিক্ষয় নিবারণ করিতে না পারিলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। এমনকি, খাদ্যশস্য উৎপাদনের বর্ত্তমান হারও বজায় রাখা যাইবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খসড়ায় বলা হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরে ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় উন্নয়ন সমিতির অভিমতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিবে খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্যে এবং তাহাদের সস্তা মূল্যে। কেন্দ্রীয় সরকার ভূমিক্ষয় ব্যাপারে যে পরিমাণ সচেতন ও চিন্তিত, প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাহার সিকি পরিমাণেও চিন্তিত নহেন; ইহা অবশ্য ভুলিলে চলিবে না যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবে প্রাদেশিক সরকার।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্ম নির্দ্ধারিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩·২৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাবদ খরচ ধরা হইয়াছে ২৬·৮৩ কোটি টাকা। এই বর্দ্ধিত অর্থের পরিমাণ ভূমিক্ষয় সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেতনতার পরিচায়ক। প্রায় প্রতি প্রদেশেই একটি করিয়া বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক বোর্ডগুলি কার্য্য করে। বিভিন্ন স্থানে গবেষণা ও পরিদর্শন-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে; কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বিভাগের অধীনে একটি ভূমি-সংরক্ষণ বিভাগ স্থাপন করা হইয়াছে। এখন প্রয়োজন সর্ব্বভারতীয় কার্য্যক্রম; ভূমি সংরক্ষণ-প্রচেষ্টা পরিচালিত হইবে প্রধানতঃ মরুভূমি এলাকায় ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে, কারণ এই দুটি অঞ্চলেই ভূমিক্ষয় দ্রুত প্রসরণশীল।

যোধপুরে একটি মরুবনবিবর্দ্ধন গবেষণাগার খোলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার কার্য্য বৃদ্ধি পাইবে যাহাতে রাজস্থান মরুভূমিতে বনবৃদ্ধি দ্বারা মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করা যায়। রাজস্থান মরুভূমির পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল। যোধপুর গবেষণাগারে মরুভূমির উপযোগী বিভিন্ন প্রকার গাছের বীজ জমান হইতেছে এবং এই সকল বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। নির্ব্বাচিত পথে এবং রেল লাইনের ধারে ধারে গাছের আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা হইতেছে। দেরাদুন, কোটা, বসাদ (বোম্বাই প্রদেশ), বেলারী ও উতাকামণ্ডে কেন্দ্রীয় ভূমি-

সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক গবেষণাগার খোলা হইয়াছে। দেশে যাহাতে এই ব্যাপারে শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ভূমি-সংরক্ষণ বিভাগ একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

যে সকল জমিতে সেচকার্য্য সম্ভবপর নহে সেই সকল জমির পক্ষে জমি-সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের কৃষিজমির ৫০।৬০ শতাংশ এই ধরনের জমি অর্থাৎ এই সকল জমিতে সেচকার্য্য প্রায় হয় না বলিলেই চলে। বিশুষ্ক এলাকার জমিতে আর্দ্রতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা তিন রকম ভাবে হইতে পারে —(১) কৃষকের জমিতে আর্দ্রতা রক্ষা করিবার জন্ম জমির চতুর্দ্দিকে বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন; নালাগুলি ভরাট করিতে হইবে এবং সারি সারি ভাবে চাষ করা প্রয়োজন; (২) সারা গ্রামে নদীতীরবর্ত্তী ভূমিতে আর্দ্রতা রক্ষার জন্ম প্রয়োজন সমবেত প্রচেষ্টা, যথা—গ্রামের এলাকার মধ্যে নদীতীরবর্ত্তী জমির সংরক্ষণ ও গোচারণ-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, এবং (৩) নদী অববাহিকার তীরবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে এই সকল উপায় সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা সাধন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম উপায়টি কৃষকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হওয়া উচিত, দ্বিতীয়টি সারা গ্রামের দায়িত্ব এবং তৃতীয়টি কতিপয় গ্রামের সমবেত দায়িত্ব।

এই উপায়গুলিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে যথোচিত আইন প্রণয়ন আবশ্যক যাহার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পারস্পারিক দায়িত্ব নিরুপিত হয়। জমি-সংরক্ষণ উপায়গুলিকে কার্যকরীভাবে অনুসরণ করানোর জন্ম প্রাদেশিক সরকারকে যথোচিত ক্ষমতা দিতে হইবে। জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের জন্ম কর্তৃপক্ষ প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছেন জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থাগুলির উপর; কিন্তু এই সংস্থাগুলির কাজ মোটেই আশাপ্রদ নয়। নদী-পরিকল্পনাগুলির উপকারিতা যেমন আছে, তাহাদের অপকারিতাও যথেষ্ট আছে। নদী-পরিকল্পনার জন্ম বড় বড় জলাধার তৈয়ার করিতে হয় এবং সেইজন্ম কিছু পরিমাণ বন ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী; নদী-পরিকল্পনা একটি মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া আর একটি অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনে—সেচকার্য্যের সুবিধা করিতে গিয়া বন ধ্বংস করে এবং তাহার ফলে ভূমিক্ষয়ের কারণ হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসীভ্যালীর অধিনায়ক যখন আসেন তখন তিনি নদী-পরিকল্পনার অপকারিতা সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন এবং বলেন যে, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বন ধ্বংস ও জমিক্ষয়। ডাঃ এলমহার্ষ্ট (যিনি বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের কৃষি-উপদেষ্টা হিসাবে বহুদিন ছিলেন) বলেন যে, নদী-পরিকল্পনা বন্যানিরোধের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, কারণ এই বিরাট বিরাট জলাধারগুলি ১০০।১৫০ বৎসরের মধ্যে পলিমাটি পড়িয়া বোঝাই হইয়া যাইতে বাধ্য, তখন এইগুলিকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা না হইলে ভীষণ বন্যা অবশ্যম্ভাবী। পুরনো জলাধারগুলি পরিত্যাগ করিয়া নূতন জলাধার নির্ম্মাণ করা মানে আবার কিছু পরিমাণে বন ধ্বংস করা। নদীর গতিকে অব্যাহত রাখিয়া বন্যানিরোধের প্রধান উপায় বন সৃষ্টি করা। অন্যান্য দেশে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ২৫ হইতে ৩০ শতাংশ, ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ১৮ শতাংশ মাত্র। সুতরাং নদী-পরিকল্পনার চেয়ে আজ ভারতবর্ষের পক্ষে বেশী প্রয়োজন বন-বিস্তৃতি।

রাষ্ট্রীয় শিল্পের পরিচালনা

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক গলব্রেথকে কেন্দ্রীয় সরকার আহ্বান করিয়াছিলেন ভারতবর্ষে রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পসংস্থাগুলি সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্ম। অধ্যাপক গলব্রেথের সুচিন্তিত অভিমত অবশ্য প্রণিধানযোগ্য, যদিও সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ থাকিতে পারে। পরিকল্পনার ব্যাপারে রাষ্ট্র যে সকল যৌথমূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যেগুলি নিজেরাই পরিচালনা করিতেছে, ভবিষ্যতে সেগুলিকে লইয়া অসুবিধায় পড়িবে—টাকার অভাবে নয়, অভিজ্ঞতার অভাবে। এ সম্বন্ধে অবশ্য দ্বিমত কাহারও থাকিতে পারে না যে, রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে গুণী ব্যক্তির অভাব আছে। বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির সাফল্যের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে, সেই কারণে অধ্যাপক গলব্রেথ রাষ্ট্রীয় শিল্প-সংস্থার চারি প্রকার বিপদের সম্ভাবনার আভাষ দিয়াছেন। এইগুলি যথাক্রমে:

(১) সরকারী শিল্প-সংস্থাগুলির সম্পাদনার মাপকাঠি ব্যক্তিগত সংস্থাগুলির অনেক উপরে। ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পারিশ্রমিকের বৈষম্য চোখে পড়ে, এবং কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে ভুল হইলে সেই অযোগ্য কর্ম্মচারীকে উচ্চতর পারিশ্রমিকে পদোন্নয়ন দিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কার্য্যে বদলী করিয়া দেওয়া হয়। নিয়োগে দুর্নীতি শুধু স্বীকৃত নহে, অনুমোদিতও বটে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সবকিছুই নির্ভর করে মোট ফলাফলের উপর এবং তাহাদের কোন জনমতের ভয় নাই। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানের পিছনে জনমতের ভয় আছে এবং সেখানে এই সকল দুর্নীতি এবং অনিয়মের স্থান নাই।

(২) সরকারী সংস্থার মাপকাঠি অতি উচ্চ, ফলে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা জনমতের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার জন্ম ব্যগ্র থাকেন। যদিও বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্বায়ত্ত-শাসনের জন্ম বক্তৃতা করা হয় ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তথাপি কার্যতঃ কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের দিকে ঝোঁক থাকে। আইন-পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন করিবার ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর মন্ত্রী-পরিষদের নিয়ন্ত্রণ উভয়েই কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের দিকে সরকারী সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অধ্যাপক গলব্রেথের অভিমতে রাষ্ট্রীয় সংস্থার সম্পাদনার কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় প্রভাবের মধ্যে নাই, আছে অন্যত্র। কর্ম্মচারীদের সাবধানতা ও তাহাদের কর্ম্মক্ষমতার উপর সরকারী সংস্থার উৎকর্ষ নির্ভর করে; এ কথা স্মরণ না রাখিলে রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইবে। শুধুমাত্র হিসাব পরীক্ষার সুব্যবস্থা দ্বারা কিংবা আইন-পরিষদে প্রশ্নবাণের দ্বারা সরকারী শিল্প-সংস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা যায় না। এই বিষয়ে অধ্যাপক গলব্রেথের অভিমত অতীব সত্য। হিসাব পরীক্ষা দ্বারা

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে চুরি ধরা পড়িয়াছে এবং পড়ে ঠিকই, কিন্তু সম্পাদনার কৃতিত্ব বৃদ্ধি করার তাহাই একমাত্র মাপকাঠি নহে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের এষ্টিমেটস কমিটিও প্রায় এই অভিমত দিয়াছেন যে, সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যৌথমূলধনী কারবার হিসাবে ব্যবসায়ী নীতির দ্বারা চালিত হওয়া উচিত; সরকারী কারবার যদিও আইনসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তথাপি তাহা যেন রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপার না হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ, সরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্পোৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে; উৎপাদক সংস্থায় উচ্চ কারিগরী জ্ঞান প্রয়োজন, কিন্তু অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের কর্তৃপক্ষ এই নীতি কোনও অবস্থাতেই অনুসরণ করেন নাই। তাহাদের প্রিয়ব্যক্তিদের যখন যেখানে খুশী যে-কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে বসাইয়া দিয়াছেন। ফল হইয়াছে এই যে অজ্ঞ ও অকর্ম্মণ্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সম্পাদনার দিকে নজর না দিয়া নজর দিয়াছেন চুরির দিকে। গত কয়েক বৎসরের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি চুরি ও অকর্ম্মণ্যতার ইতিবৃত্তে ভরা।

চতুর্থতঃ, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের চেয়ে সংস্থাগত প্রাধান্য অধিক কার্য্যকরী। সরকারী প্রচেষ্টা চালিত হয় উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করিবার দিকে, কিন্তু একজনের দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান চলে না। গলব্রেথ বলেন যে, সংস্থার নিজস্ব প্রাণ থাকা প্রয়োজন, নিজের গতিতে সে চলমান থাকিবে এবং সংস্থাগত দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ইহা যেন বুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। সংস্থাগত উৎকর্ষ ব্যক্তিগত উৎকর্ষকে ছাড়াইয়া যায় এবং ব্যক্তিগত দোষকে ছাপাইয়া রাখে। গুণী ব্যক্তি নির্ব্বাচনে রাষ্ট্র শতকরা ২৫ ভাগ ভুল করিতে বাধ্য, সুতরাং সংস্থাগত প্রাণপ্রতিষ্ঠাই প্রধান কর্ত্তব্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জেনারাল মোটর কর্পোরেশন কিংবা টেনেসীভ্যালী প্রতিষ্ঠান সংস্থাগতভাবে এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, যে-কোনও উৎপাদনশীল কার্য্যই ইহারা করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া জেনারাল মোটর কর্পোরেশনের কোনও বিশেষ কর্ম্মচারী আর একটি এই রকম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে নাও পারে। ভারতবর্ষে সংস্থাগত উৎকর্ষ লাভের দিকে ঝোঁক দেওয়া বেশী প্রয়োজন।

ভারতের করপ্রণালী

৫ই মে সাপ্তাহিক মন্তব্য প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের "ইকনমিক উইকলি" অধ্যাপক ক্যালডর ভারতীয় করপ্রণালী সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশের দাবী জানাইয়াছেন। অধ্যাপক ক্যালডর ভারতীয় পরিসংখ্যান ভবনের (Indian Statistical Institute) অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রিত হইয়া ভারতে আসেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় করপ্রণালী সম্পর্কে যে গবেষণা করেন তাহার ফলাফল সরকারীভাবে পরিসংখ্যান ভবন কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি কোন একটি অর্থনৈতিক পত্রিকাতে অধ্যাপক ক্যালডর লিখিত নীট সম্পদের উপর বার্ষিক কর সম্পর্কিত খসড়া প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"ইকনমিক উইকলি" লিখিতেছেন যে, ভারতীয় করপ্রণালী সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালডরের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কর্তৃপক্ষের উচিত এইগুলি সম্পূর্ণ আকারে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা। ঐ সুপারিশগুলির এইরূপ খাপছাড়া এবং আংশিক প্রকাশে সাধারণের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইবার অবকাশ থাকে।

উপরন্তু, আরও একটি বিশেষ কারণেও অধ্যাপক ক্যালডরের মন্তব্যগুলি প্রকাশ করা প্রয়োজন বলিয়া পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ক্যালডরের সুপারিশগুলি কোন বিশেষ কর সম্পর্কে নহে—সাধারণভাবে করপ্রণালী সম্পর্কেই সেগুলি করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ সুপারিশগুলি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। করপ্রণালীর সার্ব্বিক পরিবর্ত্তন এক দিনে সম্ভব নহে সত্য, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তনের নীতিটি পূর্ব্বাহ্নেই জনসাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাছাড়ে ভূমি সংস্কার

আসামে ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার আইন রাজ্য-বিধান সভায় গৃহীত হইয়াছে। জমিদার উচ্ছেদ আইন এবং ভূমিসংস্কার আইন দুইটির ধারাগুলির পারস্পরিক বিরোধিতার কথা উল্লেখ করিয়া ১৪ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, আসাম জমিদারী উচ্ছেদ আইনে (গোয়ালপাড়া, গারো পাহাড় ও কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমায় প্রযোজ্য) বলা হইয়াছে, ভূম্যাধিকারীদের অনূর্দ্ধ ৪০০ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি (বসতবাড়ী ও খাসখামার সমেত) থাকিতে পারিবে। পত্তনীদারদের ক্ষেত্রে এই সর্ব্বোচ্চ সীমা হইল ১৫০ বিঘা। ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে জমিদার মিরাজদাররা নিজ নিজ আয়ের অনুপাতে ১৫ গুণ (১০১০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে) হইতে ক্রমানুযায়ী দুই গুণ (তিন লক্ষ টাকার উর্দ্ধে আয়ের ক্ষেত্রে) পাইবে। সম্প্রতি আসাম বিধান-সভায় 'Ceiling on Land Holding' সম্পর্কে যে আইন পাস হইয়াছে তাহাতে অপর পক্ষে ১৫ গুণ হইতে ৫০ গুণ ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান রহিয়াছে। 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন, "এই দুইটি আইন স্থলবিশেষে সামঞ্জস্যহীন, এমনকি পরস্পরবিরোধী বলিয়াও প্রতিভাত হইতেছে নাকি?"

শ্রীহট্টের যে অঞ্চলগুলি দেশ বিভাগের পর কাছাড় জেলার অন্তর্গত হইয়াছে তাহাদের বিশেষ অবস্থার আলোচনা করিয়া 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন যে, ভূমিব্যবস্থার অত্যধিক জটিলতার জন্য ঐ সকল অঞ্চলের ভূমির যথাযথ বা নির্ভরযোগ্য স্বত্ব বিবরণী আজ পর্য্যন্ত সরকার প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার-মিরাশদারদের সংখ্যা এখানে অত্যধিক এবং

তালুক মহলাদি প্রায়ই এজমালী স্বত্ব-বিশিষ্ট হইয়া পড়াই এই জটিলতার প্রধান কারণ। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অবস্থা কিন্তু ভিন্নরূপ। সেখানে মাত্র কয়েকটি জমিদার পরিবারই সমগ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী এলাকার ভূম্যধিকারী হওয়ায় স্বত্বলিপি (Records of Right) প্রস্তুত করা সহজতর এবং বর্ত্তমানে জমিদার পক্ষ সুপ্রিম কোর্টে মামলা হারিয়া যাওয়ায় রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক গোয়ালপাড়ায় জমিদারীগুলি দখল করার ব্যাপারে আর কোন প্রতিবন্ধক দাঁড়ায় নাই।

"কিন্তু করিমগঞ্জের বেলা তাহা সম্ভবপর নহে: এখানে মহাল সংখ্যা চারি সহস্রাধিক এবং তথাকথিত স্বত্বাধিকারী এক লক্ষেরও ঊর্দ্ধে! তন্মধ্যে দুই হাজার টাকার অধিক আয়বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী (প্রাচীন ও নবীন) সংখ্যায় এক ডজনও হইবেন না। বাকী সব প্রায় বিত্তহীন হইলেও মধ্যবিত্ত নামধারী এবং ইহাদের মধ্যে তালুকদার, মিরাশদাররূপে জমির খাজনা-প্রাপক ততটা নহে—ভাগী, চুক্তিভাগী ইত্যাদি ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগী যতটা। সে যাহাই হউক, এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, করিমগঞ্জ মহকুমায় এই স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকারী কর্ত্তৃপক্ষ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (১৯৫১ সনে) জমিদারী উচ্ছেদ আইন রচনাকালে অমনোযোগী থাকায় এখানে উক্ত আইন প্রয়োগে যেরূপ বেগ পাইতে হইতেছে, ভূমি-সংস্কারমূলক সম্প্রতি প্রণীত আইনটির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বা ততোধিক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।"

আসামের চা-বাগানের শিক্ষাব্যবস্থা

গত ১৮ই এপ্রিল শিলং সেক্রেটারিয়েট ভবনে আসাম সরকারের ষ্ট্যাণ্ডিং লেবর কমিটির নবম অধিবেশনে আসামের শ্রমমন্ত্রী শ্রীঅমিয়কুমার দাস আসামের চা-বাগানগুলিতে শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থায় আতঙ্ক প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'শ্রমিক' পত্রিকা ১লা মে লিখিতেছেন যে, শ্রমমন্ত্রীর এই মনোভাবকে আন্তরিক বলিয়া মনে করা যাইত যদি তিনি এই সর্ব্বপ্রথম রাজ্যের শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এই কথা বলিতেন। "কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রমদপ্তরের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অজ্ঞতার ভাণ করা অথবা কারণাধীন কিছু করিবার অক্ষমতা মোটেই শোভা পায় না। আমরা ইহাকে দায়িত্বের প্রতি পরিপূর্ণ জ্ঞানহীনতাই বলিব।"

রাজ্যসরকারের বিবৃতি অনুযায়ী আসামের চা-বাগানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযুক্ত ২১,২৬৯ শিশু আছে এবং প্রচলিত ব্যবস্থায় তাহাদের শতকরা ১৯.৫ জন শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। 'শ্রমিক' এই পরিসংখ্যানের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন যে, শিক্ষালাভার্থী শিশুর সংখ্যা প্রদত্ত সংখ্যা হইতে অনেক বেশী হইবে এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা মোট সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগের বেশী হইবে না।

বাগানে ৫৯৫টি পাঠশালার মধ্যে সরাসরি সরকারী পরিচালনায় রহিয়াছে মাত্র ১৮টি—বাকিগুলি পরিচালনার ভার মালিকের হাতে। "ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ বাগানে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব কেহই লইতেছেন না। সরকার বলেন, দায়িত্ব মালিকের, আর মালিক বলিতেছেন এত বোঝা বহন করিতে তাঁহারা অসমর্থ।"

সরকারের এইরূপ দায়িত্ব এড়াইবার মনোবৃত্তির নিন্দা করিয়া "শ্রমিক" বলিতেছেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আসাম রাজ্যের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি চা-শিল্পের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ এবং মূলধন সৃষ্টিতেও চা-শিল্পের দান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু যাহাদের রক্ত ও ঘর্ম্মে ইহা সম্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র ত্রুটিপূর্ণ সরকারী নীতির জন্যই তাহারা জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার অত্যন্ত সামান্য সুযোগটুকু হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছে।

"শ্রমিক" লিখিতেছেন যে, বৎসরখানেক পূর্ব্বে প্রদত্ত "বেগী কমিটি"র রিপোর্ট কার্য্যকরী করিবার কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নাই। ১৯৫২ সনের আসাম চা-বাগিচা আইনে বাগানের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির যে সকল বিধি বিধান রহিয়াছে সেগুলিও অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। "সরকার যদি এখনও এই ব্যাপারে পাশ কাটানোর পথই ধরিয়া থাকেন, তবে এর প্রতিক্রিয়া শ্রমিকের মনে তীব্রভাবেই হইবে এবং ইহার সম্ভাব্য পরিণতির জন্য সরকার ও মালিক উভয়েই দায়ী হইবেন।"

ভারতের ভৌগোলিক সীমা ও পাকিস্থান

পাকিস্থান সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজনৈতিক মানচিত্রগুলিতে জুনাগড়, কাশ্মীর ও জম্মু প্রভৃতি ভারতীয় রাজ্যগুলিকে পাকিস্থানের অংশ বলিয়া দেখান হইয়া থাকে। কেবলমাত্র তাহাই নহে, ঐ সকল মানচিত্রে হায়দরাবাদ রাজ্যকে একটি রাষ্ট্রহিসাবেও দেখান হয়। ড. চৈতরাম গিদোয়ানীর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৪ই মে লোকসভায় উক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পাকিস্থান সরকারের দৃষ্টি এই ব্যাপারের প্রতি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং দুই দেশের সরকারের মধ্যে এই সম্পর্কে পত্রালাপও হইয়াছে।

শ্রী জি. এল. বানসাল জানিতে চাহেন যে, কয়েকটি "বন্ধু-ভাবাপন্ন সরকার" কর্ত্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রেও যে কাশ্মীরকে পাকিস্থানের অন্তর্গত বলিয়া দেখান হয় সে সম্পর্কেও সরকার অবহিত আছেন কি না।

উত্তরে শ্রীনেহরু বলেন যে, অন্যান্য দেশের কয়েকটি পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ঐরূপ বিকৃত তথ্যপূর্ণ মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন বটে তবে অন্য কোন সরকার ঐ ধরনের মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভারত সরকারের জানা নাই।

ভারতের বৈদেশিক বিভাগীয় মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীসাদাত আলী খান জানান যে, বিদেশে পাকিস্থানের এই ভ্রান্তিপূর্ণ মানচিত্র যাহাতে ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য

গত অক্টোবর মাসে বিদেশে নিযুক্ত সকল ভারতীয় দূতাবাসের নিকট নির্দেশ পাঠান হইয়াছিল যে, তাঁহারা ভারতের সঠিক মানচিত্র প্রকাশ করিয়া স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, পাঠাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেন পাঠায়।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয় মালিকানায় পরিচালিত 'ডেলী মেল' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মানচিত্রে জুনাগড় পাকিস্থানের অংশ বলিয়া দেখান হইয়াছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসাদাত আলী খান তাহা স্বীকার করেন। সিঙ্গাপুরস্থ ভারতীয় প্রতিনিধি উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিলে পত্রিকাটি দুঃখপ্রকাশ করিয়া পরবর্তী সংখ্যাতে সঠিক মানচিত্রটি প্রকাশ করে।

শ্রীসাধনচন্দ্র গুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সিঙ্গাপুরস্থিত পাকিস্থান ট্রেড কমিশনার কর্তৃক 'ডেলী মেলে'র নিকট উক্ত মানচিত্রটি প্রেরিত হয়। পাকিস্থান প্রজাতন্ত্র দিবস (২৩শে মার্চ) উপলক্ষে অন্যান্য বহুবিধ বস্তুর সহিত ঐ মানচিত্রটি সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয় এবং উক্ত সম্পাদক ২৩শে মার্চ পাকিস্থান প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উক্ত পত্রিকা যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে তাহাতেই ঐ মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়।

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে দুর্বৃত্তদের অত্যাচার

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার ২২শে বৈশাখ সংখ্যায় এক প্রবন্ধে শ্রীদিলীপ মজুমদার মুর্শিদাবাদ সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্গতি বিবৃত করিয়া লিখিতেছেন যে, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের— বিশেষভাবে হিন্দুদের আজ আত্মসম্মান ও জীবন বজায় রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এক দল স্বার্থান্ধ সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারকার্যের ফলে তাহারা খুন, লুঠপাট, পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি অন্যায় উৎপীড়ন অবাধে চালাইয়া যাইতেছে। ইহার উপর আছে পাকিস্থানে মাল-পাচারের চোরাকারবার।

শ্রীমজুমদার লিখিতেছেন, "আমাদের জেলার জলঙ্গী বা অন্যান্য সীমান্তের অবস্থা কোথায় নেমেছে ভাবতেও ভয় লাগে। এটা পাকিস্থান নয়। তবু পাকিস্থানও যেন এর চেয়ে ভাল ছিল। এটা ঠিক নিমন্ত্রণ খাওয়ার মত ব্যাপার হয়েছে—'না ডাকলে এস না, বাড়ীতেও হাঁড়ি চড়িও না'। ভারতে বাস করে ওখানকার অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় আজ এত দুঃসাহস পায় কোথায়?

"আজ হিন্দুস্থানে বাস করে সীমান্তের সাধারণ হিন্দুরা এত বিপদগ্রস্ত কেন? হিন্দু মেয়েছেলেরা আজ একা বেরুতে ভয় পায় কেন? কার ভয়, কিসের এবং কেন এত ভয়, আজ একথা কাকে জিজ্ঞাসা করব? ওখানকার হিন্দুদের না জাতীয় সরকারকে? আজ কে জবাব দিবে?"

'মুর্শিদাবাদ সমাচার' পত্রিকার ঐ সংখ্যায় "জেলার সীমান্তের কথা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সীমান্তে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে চোরাকারবারের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্রের সীমান্ত ও চরের অধিবাসিগণ পুরুষ-নারীনির্বিশেষে অধিকাংশ বেআইনী মালপাচারে লিপ্ত এবং পাচারকারীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই মুসলমান।

সীমান্তবর্তী জলঙ্গী, রাণীনগর, ভগবানগোলা ও ডোমকল থানাগুলি মুসলমান প্রধান। কিছুদিন যাবৎ সৈয়দ বদরুদ্দোজা সেখানে গিয়া বক্তৃতা দিয়া মুসলমানদের বলিতেছেন যে, আল্লাতালা ব্যতীত আর কাহারও নিকট মুসলমানদের মাথা নত করা উচিত নহে। তিনি গত সাধারণ নির্বাচনে ঐ এলাকা হইতে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়া ব্যর্থমনোরথ হন। এবার পুনরায় নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি নানাবিধ জনসভা ও বক্তৃতা দ্বারা নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ বদরুদ্দোজা সাহেবের উপদেশ অনুসরণ করিয়াই সাগরপাড়া গ্রামের দুই জন মুসলমান ছাত্র জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার বিরোধিতা করিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলা কর্তৃপক্ষ এ সকল ঘটনা সম্পর্কে কতখানি অবহিত আছেন এবং অবহিত থাকিলে এ অবস্থা দূরীকরণের জন্য তাঁহারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহা জনসাধারণকে জানানো কর্তব্য। এই সকল ঘটনার প্রতি রাজ্য-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে কি?

মুসলমান ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত জলঙ্গী থানার সাগরপাড়া গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলে বহুদিন হইতেই পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্বে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" গীত হইয়া আসিতেছিল। এই গানে এতদিন পর্যন্ত কাহারও আপত্তি হয় নাই এবং মুসলমান ছাত্রগণসহ সকল ছাত্রই সশ্রদ্ধভাবে এই সঙ্গীতে যোগ দিত। সম্প্রতি এক সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ মৌলানার প্ররোচনায় মুসলমান ছাত্রগণ জাতীয় সঙ্গীতের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কারণ উহা নাকি মুসলমানদের ধর্মবিরোধী।

সাগরপাড়া গ্রামের বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কঠোর নিন্দা করিয়া জনাব রেজাউল করিম "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন:

"মুসলিম ছাত্রদের এই অন্যায় অশোভন ও জাতীয়তা-বিরোধী আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাহাদের জানা উচিত যে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কোন ধর্মের আদর্শবিরোধী নহে। ইহার আবেদন সর্বভারতীয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্রগণ নিমিত্তমাত্র। তাহারা ছোট ছোট বালক মাত্র। তাহাদের পশ্চাতে যাহারা উস্কানি দিতেছে তাহাদিগকেই বাহির করিতে হইবে এবং তাহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। এই উস্কানিদানকারী ব্যক্তিদেরকে জানাইতেছি যে, তাহারা এককালে লীগের ধ্বজা উড়াইয়া দেশের ও সমাজের সর্বনাশসাধন করিয়াছে। আজ যদি তাহাদের এই লীগ-মনোভাব দূর না হয়, আজ যদি তাহারা অল্পবয়স্ক বালকগণকে

এই ভাবে ক্ষেপাইয়া থাকে তবে তাহা সহ্য করা হইবে না। আমরা আশা করি, সাগরপাড়ার মুসলিম ছাত্রগণ উঁহাদের দ্বারা আর বিভ্রান্ত হইবে না এবং যথানিয়মে জাতীয় সঙ্গীতে যোগদান করিবে।"

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা"র মন্তব্য বিশেষ যুক্তিসঙ্গত এবং আমরা ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক অবস্থিতি

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-পুনর্গঠন বিলে ত্রিপুরা রাজ্যকে "টেরিটরি" রূপে স্বতন্ত্র রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ত্রিপুরাকে টেরিটরিরূপে রাখিবার প্রস্তাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যগণ বিরোধিতা করিয়াছেন।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ভারত সরকার কর্ত্তৃক রাজ্য-পুনর্গঠন বিল আনয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে লিখিত "সেবক" পত্রিকার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ত্রিপুরার বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ত্রিপুরাকে টেরিটরি রূপে রাখিলে রাজ্যের অবস্থা বর্ত্তমান হইতেও বহুগুণ খারাপ হইবে। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু রাজ্য সরকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মাধ্যমে যে কাজ করা হইয়াছে তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পরিকল্পনার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে আদর্শ গ্রামও স্থাপিত হয় নাই অথবা বেকার সমস্যারও কোন সমাধান হয় নাই।

"সেবক" পত্রিকার মতে রাজ্যের দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ প্রশাসনিক অযোগ্যতা। প্রশাসনিক অযোগ্যতার জন্য বহুলাংশে দায়ী সরকারের কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি। কর্ম্মচারী নিয়োগনীতির গলদগুলি, "সেবকে"র মতে যথাক্রমে (১) স্থানীয় অফিসার হইলেই অযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। উপযুক্ত হারে বেতন দেওয়া হয় না। পরবর্ত্তীকালে স্থানীয় ভাষা জানে না এমন লোককে দ্বিগুণ, তিন গুণ হারে বহাল করা হয়। (২) বড় বড় পদগুলি ক্রমশঃ স্থানীয় ভাষাজ্ঞানহীন লোকদ্বারা পূরণ করা হইতেছে। (৩) স্থানীয় অফিসারের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করা হয় না। (৪) বেতনের হারে আকাশপাতাল ব্যবধান-ব্যবস্থা রহিত না করা। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে আর একটি মস্ত বড় গলদ বা অসুবিধা দেখা যাইবে যে, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে অনেকগুলি পদ (অফিসারের) আছে যাহার একটা একবার একজন কর্ত্তৃক দখল হইলে তাহার পদ পরিবর্ত্তন কিংবা বদলীর কোন সম্ভাবনা নাই এমনকি তিনি অযোগ্য হইলেও নয়।"

'সেবক' লিখিতেছেন, সরকারের কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি টেরিটরি শাসনের আমলে আরও বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। ত্রিপুরা রাজ্য প্রথমে যে যে কারণে আসামভুক্তির বিরোধিতা করিয়াছিল টেরিটরি আমলে সেই সকল কারণই শতগুণ বর্দ্ধিত রূপে দেখা দিবে। এই অবস্থায় সেবক লিখিতেছেন, "রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ত্রিপুরা আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে প্রথম কিছুকাল বহু বাধাবিঘ্ন দেখা দিবে। টেরিটরি শাসনে চিরকালের জন্য অর্দ্ধমৃত থাকার চেয়ে এই সব বাধাবিঘ্ন কিছুকাল সহ্য করাও শতগুণে ভাল বলিয়া আমরা মনে করি।"

ত্রিপুরায় চাউল সঙ্কট

ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকাতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যসঙ্কট চরমে পৌঁছিয়াছে। সাধারণভাবে সকলেই রাজ্যসরকারের অযোগ্যতাকেই খাদ্যসঙ্কটের প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"ত্রিপুরার শাসন সঙ্কটই খাদ্যসঙ্কটের প্রধান কারণ" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'সমাজ' পত্রিকা ২৮শে এপ্রিল লিখিতেছেন, রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলিয়াছেন যে, ত্রিপুরায় মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ যথেষ্টই রহিয়াছে এবং তাহাতে রাজ্যের তিন মাসের খাদ্যসংস্থান হইবে। "অথচ ২৪শে এপ্রিল উপর্য্যুপরি কয়েকদিনের অনাহারক্লিষ্ট দুই-তিন শত ভুঁখা জনতা একদিন বা এক বেলার চাউলের জন্য ডি-এম অফিসে ধর্ণা দিয়া ব্যর্থ হইয়া খাদ্য উপদেষ্টার ভবনে যায় এবং জনপ্রতিনিধি (?) উপদেষ্টার নিকট চাউলের প্রার্থনা জানাইলে তিনি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠেন, রাজ্য-সরকারের মজুত চাউল নাই। সুতরাং চাউল দেওয়া হইবে না। উক্ত তারিখ রাত্রিতে জেলা শাসকের আদেশ ও আজ্ঞাবহ সদর হাকিমও গোলবাজারে গিয়া উক্ত জনতাকে সরকারী চাউলের অভাবের সংবাদ জানান।"

ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক গলদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক তদন্তের দাবি জানাইয়া 'সমাজ' লিখিতেছেন, "অন্যথায় লক্ষ লক্ষ মণ চাউল পাঠাইলেও খাদ্যাভাব সঙ্কট সমাধান হইবে না। আমরা দ্বিধাহীনরূপে বলিতেছি যে, বর্ত্তমান সঙ্কটের কারণ সুগভীরভাবে ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নিহিত এবং চীফ কমিশনার, উপদেষ্টাগণ ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের পারস্পরিক বিরোধিতা ও নাজেহাল করিবার প্রয়াস হইতে উৎসারিত। খাদ্যসঙ্কট ইহারই বাহ্যিক প্রকাশ।

"ত্রিপুরা সরকারের শাসনকাঠামো কিরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা কিছুটা বুঝা যাইবে অতি সম্প্রতি উদয়পুর, সাবরুম ও বিলোনীয়া মহকুমা কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে আনীত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ হইতে। ইহাদের উপরও যাঁহারা দুর্নীতিমুক্ত হইলে এরূপ ব্যাপক দুর্নীতির খেলা চলিত না। অবিলম্বে ব্যাপক তদন্ত না হইলে কোটি কোটি টাকা ও লক্ষ লক্ষ মণ চাউলেও ত্রিপুরার খাদ্যসঙ্কট সমাধান হইবে না।"

২৩শে বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চাউল সঙ্কট সম্পর্কে তদন্তের দাবী জানাইয়া "সেবক" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট ত্রিপুরা সরকারের অযোগ্যতার ফলেই দেখা

দিয়াছে। রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক খাদ্যসঙ্কটের উল্লেখ করিয়া "সেবক" লিখিতেছেন যে, অবিলম্বে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ন্যায্যমূল্যে চাউল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আগরতলায় যে দোকানগুলি খোলা হইয়াছে তাহাতে যে চাউল সরবরাহ করা হয় তাহা মানুষের খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সরকারের মজুত চাউলের অপ্রতুলতা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া পত্রিকাটি বলিতেছেন যে, বেসরকারী হিসাব মতে অন্ততঃ ২০-২৫ হাজার টন চাউল আমদানী করা প্রয়োজন।

ত্রিপুরায় চাউল আমদানী ব্যবস্থা সম্পর্কে "সেবক" লিখিতেছেন : "কলকলিঘাট রেল ষ্টেশনে চাউল বুক হওয়ায় কেবল চাউল পৌঁছিতে বিলম্ব হইতেছে না, এই চাউল কি ভাবে আগরতলা কেন্দ্রীয় গুদামে পৌঁছিবে তাহাও এক বিরাট সমস্যা। প্রথম কিস্তির ৫৪,০০০ মণ চাউলের মধ্যে ৩২,৪০০ মণ চাউল কলকলিঘাট পৌঁছিয়াছে কিংবা পৌঁছিবে। এই চাউল আসাম-আগরতলা রাস্তা দিয়া আনান হইবে এবং তজ্জন্য প্রায় ৪৫০টি ট্রাক ও বিশ সহস্রাধিক গ্যালন পেট্রলের প্রয়োজন পড়িবে। একমাত্র মোটর ভাড়া বাবদ সরকারের দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইহার চেয়েও বড় প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, উক্ত সড়কের বর্তমান অবস্থায় ৪৫০টি ট্রাক ৯০০ বার যাওয়া আসা করিলে সড়কটি একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, এই সড়ক নির্মাণে যে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা ত জলে গেলই আরও আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করিয়া রাস্তা মেরামত করিতে হইবে। এখানে টাকার ক্ষতি ছাড়াও জাতির বিশেষ প্রয়োজনীয় সড়কটিও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই সড়কটি দিয়া চাউল আমদানী করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে না।"

পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার

হিন্দু উত্তরাধিকার বিলে কন্যার স্থান এতদিনে নির্ণয় করা হইয়াছে। সংবাদপত্রে উহার বিবরণ এইরূপ :

"নয়াদিল্লী, ৮ই মে—অদ্য লোকসভায় হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের সহিত কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই বিলটিকে একটি বৈপ্লবিক বিধান বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন, ইহাকে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথে একটি পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। আইন দপ্তরের মন্ত্রী বিলটিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিধান বলিয়া বর্ণনা করেন।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সম্পর্কে লোকসভায় প্রায় ৪০ ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে এবং অদ্য অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টাকাল অধিবেশন চালাইয়া এই বিল গৃহীত হয়।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু প্রায় ৩৫ মিনিটকাল বক্তৃতা করেন। সমালোচকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন পৃথিবীতে বসবাস করা নিরর্থক। ভারতে যে রাজনৈতিক বিপ্লব আসিয়াছে এবং বর্তমানে যে অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া ভারত অতিক্রম করিতেছে তাহার অতিরিক্ত সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইলেই ভারত প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক অর্থে তিনি এই বিলটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈপ্লবিক বিধান বলিয়া মনে করেন। কারণ 'ইহা মানুষকে চিন্তার জড়তা হইতে মুক্ত করিবে এবং এই কারণেই আমি ইহাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি।'

ভারতীয় নারী জাতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, কোন দেশের সভ্যতাকে যাচাই করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে দেশের নারীরা কিরূপ অবস্থায় বাস করে এবং নারী সম্পর্কিত দেশের আইন-কানুনই বা কিরূপ।

তিনি বলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতীয় নারীর অবস্থা মোটেই ভাল নহে এবং তাহাদের এই দুরবস্থার জন্য নিশ্চয়ই তাহারা নিজেরা দায়ী নহে ; সমাজ ব্যবস্থার গলদই এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

হিন্দু সমাজে গতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন এবং বলেন, ইদানীংকালে যে সকল পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা সম্ভব হইয়াছে কারিগরী বিদ্যা এবং উৎপাদন সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তনের ফলে। তবে মূল আদর্শ অপরিবর্তিত থাকিবে—যাহা ভাল তাহা ভালই এবং যাহা মন্দ তাহা মন্দই।

ভারতীয় নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধিকার দানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, এই বিলের দ্বারা এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাইবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের দ্বারা যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ধরিবে —এই অভিমত তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন আসিবে যাহার ফলে সমগ্র মানব সমাজকে নূতন করিয়া সংগঠিত করিতে হইবে।

অদ্য একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় এইরূপ বিহিত হইয়াছে যে, উইল করিয়া কোন উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভরণপোষণের অধিকার লাভ করিবে।

বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীপটাশকর বলেন, নারীকে কেবলমাত্র 'দেবী' আখ্যা দান করিলেই তাহার সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি বলেন, কয়েকজন সদস্য ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে যে গর্ববোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনিও সমরূপ গর্ব অনুভব করেন ; তবে তিনি মনে করেন না যে এই বিল দ্বারা তাহা কোন প্রকার ক্ষুন্ন হইবে।

অধ্যক্ষ শ্রীআয়েঙ্গার লোকসভাকে এবং শ্রীপটাশকরকে তাঁহার

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, জনসাধারণই সরকারী নীতির গুণাগুণ বিচার করার একমাত্র অধিকারী। যদি তাঁহারা মনে করেন যে, সরকারী নীতি ভ্রান্ত, তাহা হইলে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁহারা যে কোন সময়ে সরকারকে গদীচ্যুত করিতে পারেন। সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার অস্ত্র একমাত্র জনসাধারণেরই আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, আগামী দশ মাসের মধ্যেই জনসাধারণ সরকারী নীতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পাইবে। সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন সেই নীতির ভিত্তিতেই তিনি জনসাধারণের মতামত জানিতে ইচ্ছুক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, সরকারী বা বেসরকারী কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার তিনি পক্ষপাতী নহেন। তবে তিনি মনে করেন যে, গ্রামজীবনের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে এবং সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইলেও বেসরকারী শিল্পগুলিতেই প্রধানতঃ ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে হইবে। ফলে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ পাইবে। ইহা ব্যতীত সিমেণ্ট চিনি, চা, লৌহ প্রভৃতি আরও কতকগুলি শিল্পেও বেসরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, গত কয়েক বৎসরে উক্ত অসন্তোষ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে কারণ ১৯৪৭ সন হইতে যে সকল উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিয়াছে তাহাদের সকলের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই; এই বিরাট সমস্যার সমাধানে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি কতটুকু সাহায্য করিয়াছে তাহা তিনি জানিতে চাহেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী মনে করেন যে, ভারতবর্ষের এই বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে এমনকি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও সচেতন নহেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এই সমস্যাগুলির কথা স্মরণ করিয়াই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। তিনি বলেন যে, ঐ সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও রচনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার দোষগুলি জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরার তিনি পক্ষপাতী। কারণ তিনি মনে করেন যে, পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রয়োজন। সাধারণ লোকের জীবনধারণের মান উন্নয়ন করা ভারত-সরকারের লক্ষ্য। ধনীসম্প্রদায়ের জীবনধারণের মান সীমাবদ্ধ করিলে জনসাধারণের জীবনধারণের মান কিছু উন্নীত করা যায় বলিয়া তিনি মনে করেন।"

বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অসন্তোষ এবং এই প্রদেশের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে কৃষ্ণমাচারী যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। এই প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে নিজেদের লাভ লোকসান দেখেন তাহারই ফলে দেশের লোকের সমর্থন ও সহানুভূতি তাঁহারা হারাইতেছেন। স্বার্থচিন্তা দোষের নহে, কিন্তু যে লোক বা যে প্রতিষ্ঠান শুধু নিজেদের নিছক স্বার্থের কথাই ভাবে, অন্যদের নিকট তাহার অস্তিত্বের কোনই সার্থকতা থাকে না। এই কারণেই আজ পুঁজিবাদ ঘৃণার বস্তু।

বুনিয়াদী শিক্ষা

"নয়াদিল্লী, ১১ই মে—বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত ষ্টান্ডিং কমিটি অদ্য এখানে এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা নির্দ্ধারণ কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করার নিমিত্ত বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা নির্দ্ধারণ কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য এখানে বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত ষ্টান্ডিং কমিটির পঞ্চম অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ষ্টান্ডিং কমিটি অবস্থা নির্দ্ধারণ কমিটির রিপোর্ট পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর কর্ত্তৃক এই অবস্থা নির্দ্ধারণ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল।

কমিটি এই সুপারিশ করেন যে, ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে বুনিয়াদী ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত একটি সর্ব্বভারতীয় পরিষদ গঠন করা হউক। কমিটি আরও সুপারিশ করেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক দূর করিবার উদ্দেশ্যে অপরাপর বিদ্যালয়ের যে স্তরে ইংরেজী পড়ান হয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরও সেই স্তরে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। এই বিষয়ে একমত হওয়া গিয়াছে যে যে সকল স্থানে চাহিদা আছে, তথায় বুনিয়াদী পরবর্ত্তী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া রাজ্য সরকারগুলির কর্ত্তব্য এবং এই সকল বিদ্যালয় মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গরূপেই গণ্য হইবে।

কমিটির অভিমত এই যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বুনিয়াদী-পরবর্ত্তী বিদ্যালয়ের উপযোগী পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদত্ত ডিপ্লোমার অনুরূপ ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ভারতের সহকারী শিক্ষামন্ত্রী ড কে এল শ্রীমালী, শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী কে. জি. সয়ীদায়েন এবং কাকাসাহেব কালেলকরও অন্যান্য ষ্টান্ডিং কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বুনিয়াদী শিক্ষার পরি-

কল্পনায় এখনও অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র গোঁড়ামী ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই শিক্ষার নীতি এবং মাধ্যম স্থির করায় উহা আড়ষ্ট ও অকেজো হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রতিকার অচিরে হওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তি

গত ২১শে বৈশাখ নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:

"বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

ভারত সরকারকেও তিনি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিতেছেন বলিয়া জানান।

গত ২৪শে জানুয়ারী তিনি এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ড. শ্রীকৃষ্ণ সিংহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তি প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

কিঞ্চিদধিক তিন মাসকাল পর এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের কারণ সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম কলিকাতা হইতে সংসদ সদস্য উপনির্ব্বাচনে জনসাধারণের যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াই তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই দিন অপরাহ্ণে বিমানযোগে কলিকাতা আসেন এবং সরকারী দপ্তর-ভবনে রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর এক বিবৃতিতে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।"

ডাঃ রায়ের ঘোষণার জের বিহারে ও দিল্লীতে গড়াইয়াছে নিম্নরূপে:

"পাটনা, ১৩ই মে—বিহারের কিষেণগঞ্জ এবং পুরুলিয়া মহকুমা দুইটিকে পশ্চিমবঙ্গের নিকট হস্তান্তরের বিরোধিতা করিয়া বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া প্রামাণিক সূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় সাম্প্রতিক উপনির্ব্বাচনের ফলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জনমতের নিকট নতিস্বীকার করিয়া পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। ড. সিংহের পত্রে এই বিষয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিহারের এলাকা পশ্চিমবঙ্গের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে জনসাধারণ যে অভিমত প্রকাশ করিবেন ড. সিংহও সেই অভিমতের নিকট নতিস্বীকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, তিনি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিহারের এলাকা পশ্চিমবঙ্গের নিকট হস্তান্তর সম্পর্কে জনসাধারণ কিরূপ অভিমত পোষণ করে তাহা অবগত হইবার জন্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হইতে যাঁহারা সংসদের এবং রাজ্য বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে এবং এই বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে দেওয়া উচিত।"

"নয়াদিল্লী, ১২ই মে—অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ও সংসদ-সদস্য শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জ্জি অদ্য এখানে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী না করিবার নিমিত্ত বিহারের কতিপয় সংসদ-সদস্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, শ্রীনেহরু তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রী চ্যাটার্জ্জি বলেন, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রস্তাব সংশোধনের পর কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের যে সকল অংশ পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। তিনি আরও বলেন যে, ঐ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়াই জানা যায়। এই সম্পর্কে বিহারের সংসদ-সদস্যদের অনুরোধ যখন অগ্রাহ্য হইয়াছে, তখন আর এই বিষয়ে কোন অনিশ্চয়তা বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশা

গত ১০ই বৈশাখ আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই আয় সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাহাদের দুর্দ্দশার ও তজ্জনিত অসন্তোষের কারণ ইহাতেই বুঝা যায়।

"পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, নানারকম অপরিহার্য্য পণ্যের উপ্লেখযোগ্য মূল্যবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ গত দুই মাস যাবৎ কঠিনতর হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আনুপাতিক বা আপেক্ষিক আয়বৃদ্ধি না হওয়ায় ঐসব পরিবারকে শতকরা অন্ততঃ পনর-কুড়ি ভাগ বেশী ব্যয় করিতে হইতেছে। খাওয়া ও পরার ব্যাপারেই মূল্যবৃদ্ধির বহর সব চাইতে বেশী।

প্রকাশ, লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট উত্থাপিত হইবার পর মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় ফাটকাবাজির ঝোঁক দেখা যাইতেছে। সমাজবিরোধী লোকেরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে। চলতি বৎসরের মার্চ্চ মাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়মাত্রা ৪০২-এর কোঠায় গিয়া উঠে। (১৯৩৯ সনে ব্যয়ের মাত্রা ধরা হইয়াছিল ১০০ এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া এই হিসাব ধরা হইয়াছে।) গত দেড় বৎসরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ইহাই সর্ব্বাধিক ব্যয়মাত্রা। এখনও যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে এপ্রিলে এই মাত্রাও ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ চাউলের দাম ধরা যাক। 'কৃষি-বাজার-বিবরণী' (এগ্রিকালচারাল মার্কেট রিপোর্ট) অনুসারে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি সাধারণতঃ যে মাঝারি ধরণের চাউল ব্যবহার করে, গত বৎসর জুলাই মাসে উহার মূল্য ছিল মণপ্রতি ১৭৷৶০ আনা (অর্থাৎ, যে সময়ে চাউলের মূল্য স্বভাবতঃই বাড়ে)। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী-

ফেব্রুয়ারী মাসে মাঝারি ধরনের চাউলের দাম ছিল মণপ্রতি ১৭্ টাকা হইতে ১৭।০ টাকা। এখন, এই এপ্রিল মাসে এই চাউলের মূল্য মণপ্রতি ২০-২১্ টাকারও বেশী : মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ আড়াই টাকার মত।

দৈনন্দিন ব্যবহার্য্যের মধ্যে আর একটি জিনিষ হইতেছে ডাল। মুগের ডালই বাঙ্গালী পরিবারে বেশী চলে। গত বৎসর জুলাই মাসে পাড়ি মুগের গড়ে প্রতিমণ ১৭৷৶০ আনা দরে এবং ভাঙ্গা মুগের প্রতিমণ ১১৷৶০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। এখন, এই বৎসর এপ্রিল মাসে পাড়ি ও ভাঙ্গা মুগের যথাক্রমে মণপ্রতি ২৫্ টাকা ও ২০্ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

মশলার মধ্যে গত বৎসর অক্টোবর মাসে কলিকাতায় শুকনো লঙ্কার দাম ছিল প্রতি সের পৌনে দুই টাকা। এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার দাম চড়িয়া সের প্রতি ২্ টাকা হয় এবং এখন এই এপ্রিল মাসে ২।০ টাকা হইতে ২।৶০ আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

সরিষার তৈল না হইলে কোন বাঙ্গালী পরিবারে রান্না চড়ে না। গত বৎসর অক্টোবর মাসে এক সের সরিষার তৈলের দাম ছিল ১৷৶০ আনা। বর্ত্তমানে উহা পৌনে দুই টাকা বা দুই টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। নারিকেল তৈলের দাম ছিল সের প্রতি পৌনে দুই টাকা, এখন সোয়া দুই টাকা।

ফেব্রুয়ারী মাসে তরকারীর দাম মোটামুটি ছিল। কিন্তু উহা এখন খুবই চড়িয়াছে। পাঁচ ছয় আনা সেরের কমে পাওয়া যায় যায় না, বেগুন আর আলুর কম নাই। সুতরাং মাছ মাস হইতে খাদ্য-ব্যয়ের চাপ অত্যন্ত বেশী অনুভূত হইতেছে।

গত বৎসরের জুলাই মাস হইতে খাদ্যের ব্যয়মাত্রা ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে বাড়িতেছে।

কোন এক বণিক-সভার সংগৃহীত তথ্যানুসারে গত বৎসর জুলাই মাসে খাদ্যের ব্যয়মাত্রা (১৯৩৯ সনে মূল একশতের তুলনায়) ছিল ৪৪৬, গত ডিসেম্বর মাসে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৪৫৫। ফেব্রুয়ারী মাসে বাজারে নূতন চাউল আসিলে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৪২ হয়। কিন্তু মার্চ মাসে, কেন্দ্রীয় বাজেটের পর, উহা ৪৫৩ মাত্রায় উঠে।

কাপড়-জামার দাম অত্যধিক বাড়িয়াছে। এই ক্ষেত্রেও গত জুলাই হইতে মূল্যমাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। ঐ মাসে উহা ৪০৪ হয়। ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে উহা চলতি বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে ৫০৭ হয়। কেন্দ্রীয় বাজেটের পর মার্চ মাসে উহা ৫২০ মাত্রা স্পর্শ করে। (বর্ত্তমানে এক জোড়া সাধারণ ধুতি ১২।১৪্ টাকার কমে পাওয়া যায় না)।

গত বৎসর জুলাই মাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়মাত্রা ছিল ৩৯৪—নবেম্বর ও ডিসেম্বরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৪০১। বর্ত্তমান বৎসরে ব্যয়মাত্রা ছিল ৩৯৪, কিন্তু মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশের পর উহা ৪০২ মাত্রায় উঠিয়া যায়।

উক্ত বণিক-সভায় জনৈক অর্থনীতিবিদ্ বলেন, আজ যে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, সেই পরিবারে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। আগে যেখানে ১০০্ টাকার মধ্যে ৭০্ টাকাই খরচ হইয়া যাইত, সেখানে এখন ১০০্ টাকার মধ্যে অন্ততঃ ৮৫্ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ, যে পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, সেই পরিবারে মাসের শেষে বেশ বড় রকমের ঘাটতি দেখা যাইবে। এই অবস্থার সঙ্গে যদি বেকার-সমস্যাটি গণ্য করা যায়, তবে বোঝা যায়, ব্যবহার্য্য দ্রব্য অথবা কারখানার পণ্যের বাজারে কেন মন্দা দেখা দিয়েছে : নিত্যকার অপরিহার্য্য পণ্য ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন মিটাইবার পর ঐ পরিবারের অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিনিবার মত কিছু থাকে না।

অনেকে মনে করেন, বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া অপরিহার্য্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত। মাদ্রাজে এরূপ একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায়ই বা এরূপ কমিটি নিয়োগে বাধা কি?

কোন বিপর্য্যয় ঘটিবার পূর্ব্বেই এই মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার।"

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা ও কংগ্রেস

ছয় সহস্র মুদ্রায় রবীন্দ্রনাথের স্মারক কি নির্ম্মিত হইতে পারে আমরা জানি না, তবে ফুটবল ক্রীড়া দর্শকগণ যে কংগ্রেসের এতটাও মুখরক্ষা করিয়াছেন ইহাও ঢের। রবীন্দ্র-স্মৃতি সম্পর্কে ঐ স্থলে কি করা উচিত সেকথা না বলাই ভাল :

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিমতলা শ্মশানঘাটে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে ৬,০০০ টাকা শনিবার রবীন্দ্রভারতীকে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রভারতীর সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শনিবার সন্ধ্যায় সরকারী দপ্তর ভবনে সাংবাদিকদের উপরোক্ত মর্ম্মে তথ্য পরিবেশন করিয়া এইরূপ জানান যে, নিমতলা শ্মশানঘাটে ঐ স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, নিমতলাঘাটে কবিগুরুর স্মৃতির উদ্দেশে, একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কিছুকাল আগে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে অনুরোধক্রমে ভারতীয় ফুটবল সমিতি এক 'চ্যারিটি ম্যাচ'-এর আয়োজন করেন। ঐ ম্যাচের বিক্রয়লব্ধ উপরোক্ত পরিমাণ টাকা সমিতির পক্ষ হইতে উক্ত স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে দেওয়া হয়। স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণকল্পে একটি পরিকল্পনাও রচিত হইয়াছে। নিমতলাঘাটে ঐ স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ

করা সম্ভবপর কিনা সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কর্পোরেশন-কর্তৃপক্ষ পরিষ্কারভাবে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্য্য চলিতেছে। ইতিমধ্যে যথাসম্ভব সত্বর স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য তিনি মেয়রকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার দোগেছিয়া ইউনিয়ন

'পল্লীবাণী' পত্রিকার ২৬শে বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত দোগেছিয়া ইউনিয়নের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, প্রধানতঃ কৃষিনির্ভরশীল ইউনিয়নের দুর্দ্দশাগ্রস্ত অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান-উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্থানীয় অঞ্চল সমূহ বর্ত্তমানে কেবল-মাত্র উপযুক্ত রাস্তার অভাবেই এই অঞ্চলের কৃষি-উৎপাদকদের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। উক্ত প্রতিনিধি লিখিতেছেন, "পূর্ব্বস্থলী থানার মধ্যে মুকসিমপাড়া ও দোগেছিয়া ইউনিয়নের প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও যাতায়াতের যোগাযোগ-বিহীন এলাকা আর এ অঞ্চলে নাই। এ কারণে এই দুইটি ইউনিয়নের অধিবাসিগণ সমুদ্রগড়-কাটোয়া রাস্তার পূর্ব্বস্থলী-কাটোয়া অংশটি যাহাতে এই দুইটি ইউনিয়নের মধ্য দিয়া যায় তজ্জন্য গত চারি বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্দ্ধমান জেলার দায়িত্বপূর্ণ অফিসারগণ ও প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহা মানিয়া লইয়া মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধও করিয়াছেন। যদি সরকার অনুমোদন করেন তবে উক্ত পঞ্চাশটি গ্রামের ২৫,৩০ হাজার অধিবাসীর প্রচুর উন্নতি হইবে এবং তাহারা প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।"

আসানসোলে জলকষ্ট

আসানসোল শহরে অন্যান্য বারের মত এবারেও প্রবল জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। জলাভাবে জনসাধারণের দুর্গতির উল্লেখ করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, যদি অবিলম্বে শহরের জলকষ্ট দূরীকরণে পৌরসভা সমর্থ না হন তবে পৌরসভার সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত। ইহাতে বর্ত্তমান সদস্যগণ নিজেদের বিবেকের নিকট দায়মুক্ত হইবেন এবং পৌরসভা পরিচালনার ভার সরকারের উপর পড়িবার ফলে জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য সরকার চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইবেন।

বঙ্গবাণী এইরূপ তীব্র জলাভাবের কারণ সম্পর্কে লিখিতেছেন :

"আমরা শুনিলাম ডি. ভি. সি. নাকি ১৯৪৮ সন হইতে এখন পর্য্যন্ত জল দেওয়ার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির নিকট প্রায় দেড়, দুই লক্ষ টাকার বিল করিয়াছে। খোঁজ লইয়া জানা গেল এই জলের দাম সম্বন্ধে পৌরসভার সহিত ডি. ভি. সির নাকি পূর্ব্বে কোন contract বা চুক্তিই হয় নাই। নদীজলের অবাধ flow বা গতি বন্ধ করিয়া উহা ধরিয়া রাখিতেই বা কে বলিয়াছিল আর সেই ধরা জল ছাড়িয়া দিয়া তাহার দাম আদায়ের কথাই বা কে বলিয়াছিল? দামোদর নদের দুইপার্শ্বে যে সকল গ্রামবাসী দামোদরের জল পান করিয়া থাকে ডি. ভি. সি তাহাদের নিকটও জলের দাম লইবে নাকি? আসানসোল শহর জলাভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট-ভোগ করিতেছে আর ডি. ভি. সি জলের দাম শোধ না হওয়ায় জল বন্ধ করিয়াছে বা করিবার প্রস্তাব করিয়াছে—এ কথা সত্য হইলে ডি. ভি. সি'র মত উচ্চ শ্রেণীর একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের এই বেনিয়াবৃত্তি সম্পূর্ণ নিন্দার্হ ও সমর্থনের অযোগ্য।"

উপসংহারে 'বঙ্গবাণী' লিখিতেছেন যে, পৌরসভার সদস্যদের আসল করণীয় হইতেছে সরকারকে অনুরোধ করা যাহাতে ডি. ভি. সি'র কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত জল সরবরাহ করেন। তাহা সম্ভব না হইলে সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত।

বাসযাত্রীদের অসুবিধা ও সরকারী ঔদাসীন্য

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন :

"ডিসেরগড় হইতে যে সকল বাস যাতায়াত করে তাহা যাহাতে ডিসেরগড়ে নামে ঘাটের শেষপ্রান্ত অবধি গিয়া থামে এবং সেখান হইতে যাত্রী নামাইয়া দেয় ও নূতন যাত্রী লইয়া তাহাদিগের গন্তব্য পথে যায় এজন্য ডিসেরগড় ও নদীপারের অঞ্চলের জনসাধারণ বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন এবং বাস এসোসিয়েশন, স্থানীয় এস. ডি. ও এবং আর, টি, এ'র সেক্রেটারী প্রভৃতি সকল স্থানে এই অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দরখাস্ত-আদিও করিয়াছেন। আমরাও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একাধিকবার বঙ্গবাণীতে আলোচনা করিয়াছি। এবং তাহাতে বার বার দেখাইয়াছি যে, এই সামান্য কাযটুকু না করার ফলে যাত্রীদিগকে কিরূপ কষ্ট ও হয়রানি সহ্য করিতে হয়। অথচ ইহা করিতে বাসমালিকদিগের কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জনসাধারণ ও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও বাসমালিক অথবা সরকারী কর্তৃপক্ষ কেহই এই সামান্য অসুবিধাটুকু দূরীকরণে অগ্রসর হন নাই। বাসমালিকগণ অর্থলোভী হইয়া হয়ত যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের কলমের এক খোঁচায় এ বিষয়ে অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া সম্ভব সেই সরকারী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তায় পত্রিকাটি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

উপসংহারে "বঙ্গবাণী" লিখিয়াছেন : "আমরা পুনরায় এ বিষয়ে স্থানীয় এস. ডি. ও, এবং আর. টি. এ-র সেক্রেটারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

বিচিত্রানুষ্ঠানের নামে প্রতারণা

হাবড়ার "স্বামীজী সেবা সমিতি" নামে কোন প্রতিষ্ঠান কলি-

কাতার বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীবৃন্দ উপস্থিত থাকিবেন ঘোষণা করিয়া স্থানীয় সিনেমা হলে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করেন। নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানের সময় কিন্তু দেখা গেল যে, বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের মধ্যে কেহই উপস্থিত হইলেন না। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ স্থানীয় শিল্পীদের সাহায্যে অনুষ্ঠান চালাইবার চেষ্টা করিলে দর্শকবৃন্দ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাগণ পলায়ন করার সংবাদে বিক্ষুব্ধ হইয়া সিনেমা হলের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া তছনছ করে।

১০ই বৈশাখ উপরোক্ত সংবাদ পরিবেশন করিয়া "বারাসাত-বার্তা" "শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী কে?" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

"আধুনিক সাধারণ সমাজের অত্যন্ত দুর্ব্বল স্থানে ঘা মারিয়া, চিত্রতারকাদের নামে উক্ত বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক পক্ষ চড়া দামে প্রচুর টাকার টিকিট বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি প্রচারিত চিত্রতারকা ও শিল্পীবৃন্দের অনুপস্থিতির কারণ জনতার সম্মুখে দেখাইতে পারিতেন অথবা প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির সর্ত্তরক্ষায় অসমর্থতার জন্য জনতার দাবি অনুযায়ী বিক্রীত টিকিটের মূল্য ফেরৎ দিতেন তবে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটিত না। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ লইয়া ব্যবস্থাপকবৃন্দের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে দর্শক ও প্রেক্ষাগৃহের মালিক পক্ষকে ফেলিয়া আত্মগোপনের পশ্চাতে পূর্ব্বের সুপরিকল্পিত নীতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং ভাওতা (ব্লাফ) দিয়া জনতার অর্থ আত্মসাতের প্রশ্ন ও পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাইতেছে। ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে সাধারণ সমাজের মোটা অর্থ হস্তগত করিয়াছেন বলিয়া কেহ অভিমত প্রকাশ করিলে স্বামীজীর নামাশ্রয়ী হাবড়ার কোন এক সেবাধর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের সুনামে কলঙ্কপাত হইবে না।"

মানভূমের দুরবস্থা

১৮ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মানভূমের দুর্দ্দশা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "সংগঠন" লিখিতেছেন :

"আজ মানভূমের গ্রামে গ্রামে খাদ্যাভাব, তদপেক্ষাও বেশী জলাভাব—আজ গ্রামের মানুষের পানীয় জল নাই, স্নানের জল নাই—এমন এমন গ্রাম রহিয়াছে যে গ্রামে ঘোলা কর্দ্দমাক্ত জলও গবাদি পশুদের পানের জন্য পাওয়া যায় না, অথচ মানভূমে জলাশয়ের নামে, কূপখননের নামে, পুষ্করিণী খননের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসাবনিকাশ প্রস্তুত হইল, সরকারী তহবিল হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হইল।"

"সংগঠন" লিখিতেছেন, মানভূমের বিহারে থাকা সত্ত্বেও মানভূমবাসী বিহার সরকারের করুণা-বঞ্চিত। ধানবাদে এক ভাঁড় জলের দাম চার টাকা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ২৪৲ টাকা মণ দরেও চাউল মিলিতেছে না। "বিগত কয়েক বৎসরের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যখন হইতে মানভূমকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ও লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মানভূম হইতে বাহিরে রপ্তানী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঠিক সেই সময় হইতেই অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধি ও মূল্য দিয়াও চাউল প্রাপ্তির অভাব হেতু স্থানীয় অধিবাসিগণকে শুষ্ক খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিতে হয়। উদ্বৃত্ত অঞ্চল ঘোষণা করার ফলেও মানভূম হইতে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানীর জন্যই মানভূমের বুকে দুর্ভিক্ষের ছায়া। মানভূমের এই খাদ্যাভাব বিহার সরকারের অবিবেচনার ফলে বিহার সরকার কর্ত্তৃক সৃষ্ট।"

করিমগঞ্জে রাস্তাঘাটের অসুবিধা

আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার রাস্তাঘাটের দুর্দ্দশা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"করিমগঞ্জ মহকুমার সর্ব্বত্র পি. ডব্লিউ. ডি. এবং ই. এণ্ড ডি. রাস্তার অবস্থা অবর্ণনীয়। মাত্র ৪৫ দিনের বৃষ্টিতে যদি রাস্তা যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হইয়া যায় তবে পুরা বর্ষায় রাস্তাগুলি কি রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহা ভাবনার বিষয়। নীলামবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া চুরাইবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তায় নূতন মাটি দেওয়া হইয়াছে, ফলে মালবাহী ট্রাক বা যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এই রাস্তার গুরুত্ব খুব বেশী; কারণ এই রাস্তা দিয়া নীলামবাজার, পাথারকান্দি, দুল্লভছড়া, রাতাবাড়ী অর্থাৎ মহকুমার প্রায় সব বড় বাজারে যাইতে হয়। ত্রিপুরার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্রও এই রাস্তা। শিলচর-রাস্তায় গত দুই দিন ধরিয়া কোন ট্রাক মাল নিয়া যাইতে রাজী নয়। অন্যান্য রাস্তারও অনুরূপ অবস্থা।"

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করিমগঞ্জ বাজার ও সন্নিহিত রাস্তাগুলির দুরবস্থারও উল্লেখ করা হইয়াছে। করিমগঞ্জ-লক্ষীবাজার রাস্তার পূর্ত্তবিভাগ কতকগুলি ঝামা পাথর এরূপ ভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে পথচারীদিগকে বিশেষভাবে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

'যুগশক্তি' লিখিতেছেন :

"রাস্তার এই দুরবস্থার বিষয়ে আমরা ইতোপূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি মার্চেন্টস এসোসিয়েশন শিলঙে মন্ত্রী ও চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে টেলিগ্রাম করতঃ যে প্রকারে হউক রাস্তাগুলি চালু রাখার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং স্থানীয় ট্রাক এসোসিয়েশন হইতেও অনুরূপ টেলিগ্রাম করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। কিন্তু অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আমাদের গবর্ণমেন্টের কাজের কোন সুপরিকল্পনা নাই। কোন কাজই সময়মত হয় না। ৩১শে মার্চ শেষ হইয়া যাইতেছে—তাই তাড়াহুড়া করিয়া সব রাস্তায় কিছু মাটি ফেলা হইল; কিন্তু কি ভাবে রাস্তা যানবাহনের উপযোগী রাখা যায় সেদিকে দৃষ্টি নাই—ফলে আজ সর্ব্বত্র এই

দুরবস্থা এবং আমাদের আশঙ্কা এই বর্ষায় কোন রাস্তায়ই বাস বা ট্রাক চলিতে পারিবে না। অনেক পুলের নিকটবর্তী জায়গায় ৩-৪ ফুট মাটি দেওয়া হইয়াছে, ট্রাক বা বাস সেই রাস্তা দিয়া উঠিতে চাকা কাদায় ডুবিয়া যায়। ইহাতে পেট্রল খরচ বেশী হয়, গাড়ী নষ্ট হয়, অতিরিক্ত সময় লাগে, দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির আশঙ্কাও রহিয়াছে।"

সংবাদের উৎস সম্পর্কিত আইন

সিংহলের নব-অধিষ্ঠিত বন্দরনায়ক সরকার স্থির করিয়াছেন যে, রাষ্ট্র সম্পর্কিত সাধারণ গোপন সংবাদ প্রকাশ করিলে সংবাদপত্রগুলিকে তাহাদের প্রকাশিত সংবাদের উৎস প্রকাশ করিতে বাধ্য করা হইবে। এই সম্পর্কে আইন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রীসভা আইন-বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীএম. ডব্লু. ডি. ডিসিলভাকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাক্তন কোটেলেওয়ালা মন্ত্রীসভাও অনুরূপ একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সংবাদপত্রগুলির বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত উহা পরিত্যাগ করেন।

নেপাল মহারাজের রাজ্যাভিষেক

নেপাল মহারাজের অভিষেকের সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে :

"কাঠমাণ্ডু, ২রা মে—আজ সকাল ১০টায় সুপ্রাচীন হনুমান ঢোকা প্রাসাদে মহারাজা পঞ্চশ্রী মহেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেবের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠান প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী।

ভারত, চীন, ব্রহ্ম, সিংহল, পাকিস্থান, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি দল এবং দলাইলামা ও পাঞ্চেনলামার প্রতিনিধিগণ ইহাতে উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ঠিক ৯৷৷টায় শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে অবিরাম মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পুণ্যস্নান আরম্ভ হয়। তার পর সকাল ১০৷৷টায় রাজা প্রার্থনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। জ্যোতিষীর গণনানুযায়ী সকাল ১০টা ৪৩মিঃ শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত হইলে মহারাজা মহেন্দ্র রাজমুকুট ধারণ করেন এবং ষাঁড়, বিড়াল, চিতাবাঘ সিংহ ও বাঘের চামড়ার উপর স্থাপিত রাজপ্রতীকবাহী সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় সঙ্গীত বাজান হইতে থাকে।

বর্ত্তমান বিশ্বে নেপালই একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। এই প্রথমবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নেপালের রাজ্যাভিষেকে যোগদান করিলেন। শতাধিক সাংবাদিক ও চিত্রগ্রহণকারী অনুষ্ঠানের বিবরণ সংগ্রহ ও চিত্রগ্রহণ করেন।

উল্লেখ করা যায়, ১৯১৩ সনে রাজা ত্রিভুবনের রাজ্যাভিষেক হয়।"

এই ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর নেপালে এই প্রথম উন্মুক্ত দরবারে রাজ্যাভিষেক হইল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে নেপালের মহারাজাধিরাজ নামে মাত্র রাজদণ্ড ধারণ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে রাজশক্তির প্রতীকরূপে নিভৃতে প্রতিষ্ঠা করিয়া ও বন্দী রাখিয়া, জঙ্গ বাহাদুরের বংশধরগণ নেপাল শাসন ও শোষণ করিতেন।

ভারত ও পাকিস্থানের লেনদেন

পাকিস্থান কোন দিন ভারতের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে নাই। ভারতের অনিষ্ট করাই তাহার উৎপত্তির কারণ ও ব্যবহারিক মূল-নীতি। তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমরা নিম্নরূপ সংবাদ পাই :

"নয়াদিল্লী, ১১ই মে—ভারত ও পাকিস্থান সরকারের অর্থ-দপ্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন দিবসব্যাপী আলোচনা সমাপনান্তে প্রচারিত একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে উভয় দেশের জনসাধারণকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের মধ্যে অর্থপ্রেরণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির সম্ভাব্যতা ভারত ও পাকিস্থান সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা হয়। পাকিস্থান কর্ত্তৃক দেশ বিভাগের পূর্ব্বেকার ঋণের অংশ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পরিশোধ এবং সেই বাবদ সুদ ভারতকে প্রদান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সমস্যাসমূহের মীমাংসার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই উভয় দেশের অর্থমন্ত্রীদ্বয় মিলিত হইবেন।

ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রতিনিধিদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয় এবং এই আলোচনার ফলে অর্থমন্ত্রীদ্বয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা হইবে।

কর্ম্মী ও কার্য্যচালনা

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজি. ডি. আম্বেকার তাঁহার ভাষণে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

এই অভিমত অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নহে। কেন নহে তাহ আমরা আজিকার অবস্থার বিচার করিয়াই বলিতেছি।

এতাবৎ এ দেশে শ্রমিক-নেতৃবর্গ—অন্য নেতাদেরই পথ অনুসরণ করিয়াই—শুধুমাত্র অধিকার ও দাবীর কথায় উপরই জোর দিয়াছেন; অধিকার ও দায়িত্ব যে পরস্পরের উপর শুধু নির্ভর করে না, একের সঙ্গে অন্যের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ আছে, একথা তাঁহারা সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই; শ্রীআম্বেকার তাহার আভাসমাত্র দিয়াছেন। স্পষ্ট ভাবে বলেন নাই যে দায়িত্ব গ্রহণ দাবির অঙ্গ :

সুরাট, ৬ই মে—গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় এমন একটি নীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে নীতি অনুসারে উৎপাদনকারী কর্ম্মীদের উপর গণতান্ত্রিক উপায়ে শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত অর্পিত হইবে।

"অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে শ্রী জি. ডি. আম্বেকার উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

শ্রীআম্বেকার বলেন, "কর্মীদের উপর রাতারাতি এই দায়িত্ব যে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা যাইতে পারে না, তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহাই উহা পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ না করিবার যুক্তি হইতে পারে না।"

শ্রীআম্বেকার প্রস্তাব করেন যে, প্রথমতঃ কতকগুলি বিষয়, বিশেষতঃ কর্মীদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পারস্পরিক সম্মতিতে গৃহীত সুনির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা অনুসারে পরিচালনার ভার তাহাদের উপর দেওয়া উচিত। অধিকন্তু উৎপাদন, সংগঠন, শিল্প-সংক্রান্ত সম্পর্ক ইত্যাদির মত বিষয়সমূহ সম্পর্কে কর্মীদের উপদেষ্টা পরিষদ থাকা উচিত। এই পরিষদের পরামর্শ একান্ত প্রতিকূল না হইলে যথেষ্ট কারণ ব্যতীত অগ্রাহ্য করা উচিত হইবে না। ইহার ফলে শিল্পে যে তাহাদেরও স্বার্থ আছে সে সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান জন্মিবে এবং তাহাদেরও যে শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে দায়িত্ব আছে—এই গর্ব তাহাদের মনে জাগ্রত হইবে।

শ্রীআম্বেকার বলেন যে, স্বাধীনতার ফলে নবচেতনা জাগ্রত হওয়ায় এবং কংগ্রেস সরকার কর্তৃক তাহা স্বীকৃত হওয়ায় কর্মীরা বর্তমানে সমাজে উচ্চতর স্থান লাভ করিয়াছে। সামাজিক নিরাপত্তা-লাভ, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহারা এখন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের স্বাধীনতা পূর্বক [illegible] অনুভূত হইয়াছে। বর্তমানে কর্মীরা তাহাদের সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করিয়াছে এবং ইহা অত্যন্ত আশার লক্ষণ। তাহারা [illegible] সহযোগিতার এবং শিল্প ও শ্রমিকের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোধ করে।

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের [illegible] মালিকদের মধ্যে যাহারা প্রগতিশীল, তাহারা [illegible] প্রতিনিধিগণের সহিত আলাপ-আলোচনার এবং শ্রমিকদের দাবি মানিয়া লইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ প্রদর্শন করেন [illegible]। মালিকদের মধ্যে যাঁহারা রক্ষণশীল, তাঁহারা [illegible] সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেন এবং [illegible] আলোচনার দ্বারা সমস্যা সমাধান করিতে [illegible]।

কলিকাতা বন্দরে ধর্মঘট

কলিকাতা বন্দরের শ্রমিক ধর্মঘটে [illegible] বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার বিবৃতি ও সংবাদের [illegible] নিম্নে দেওয়া হইল। শ্রমিক-স্বার্থে দেশের ও [illegible] [illegible] তাহার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইবে:

"রবিবার কলিকাতা বন্দরের শ্রমিকদের ১৪ দিনব্যাপী কর্ম-বিরতির অবসান ঘটে। ঐদিন ডক লেবার বোর্ডের অধীন প্রায় ৮,০০০ কর্ম-বিরত শ্রমিক ও কয়লা বার্থের প্রায় ২,০০০ কর্ম-বিরত শ্রমিক কাজে যোগদান করে এবং ১৪ দিন পর বন্দরের স্বাভাবিক কাজ আবার চালু হয়। ঐদিন জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাসের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে উক্ত শ্রমিকগণ মার্চ মাসের অগ্রিম মাহিনা দিতে বিলম্ব হওয়ায় কাজে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। ফলে, কলিকাতা বন্দরে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ১৪ দিন মাল বোঝাই ও খালাস না হওয়ার দরুন মোট প্রায় ৮০টি জাহাজে ও প্রায় ৫০,০০০ টন মাল বন্দরে আটক পড়িয়া থাকে।

প্রকাশ, রবিবার সমস্ত শ্রমিক কাজে যোগ দেওয়ায় জাতীয় রক্ষীদলের স্বেচ্ছাসেবকগণের একাংশকে বন্দরের কাজ হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে জাতীয় রক্ষীদলের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে বন্দরের কাজ হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রবিবার রাত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার পর কলিকাতা পোর্ট ও ডক লেবার বোর্ডের চেয়ারম্যান এক বিবৃতিতে বলেন, যথেষ্ট কারণ থাকিলেও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দরের কাজ বন্ধ করিবার মত যথেষ্ট কারণ ছিল না। পোর্টের কমিশনারগণ এবং ডক লেবার কমিটি এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন মাসের পয়লা তারিখ রবিবার হইলে পূর্বে যথাযথ নোটিশ দিয়া উহার পূর্ববর্তী শনিবার কিংবা উহার পরের দিন বেতন দেওয়া হইবে। ধর্মঘট চলাকালে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ আরও কতকগুলি দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু এই সকল দাবির মধ্যে কয়টি যে শ্রমিকদের পক্ষে বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা বলা কঠিন। ইহাদের মধ্যে শ্রমিকগণের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবি কমিশনারগণ এবং ডক লেবার বোর্ড যথাসম্ভব শীঘ্র কাজে পরিণত করিতে উৎসুক।

ধর্মঘট চালু অবস্থায় এক বিবৃতিতে আমরা নিম্নোক্ত সংবাদ পাই:

"কলিকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান শ্রী[illegible] বলেন যে বন্দরের কাজে নিযুক্ত [illegible] প্রায় ১২০০ কর্মী [illegible] [illegible]। [illegible] এই দিন ধরিয়া [illegible] কোন [illegible] করিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন।

এই সম্পর্কে কলিকাতা [illegible] চেয়ারম্যান [illegible] এক বিবৃতিতে বলেন, [illegible] ভারত সরকার কর্তৃক ডক লেবার বোর্ডের মারফতে বন্দর শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানে [illegible] কলিকাতার রেজিস্টার্ড ডক শ্রমিকদের ছুটি এবং হাজিরা বেতন ছাড়াও মাসে ন্যূনতম ১২ দিন কাজ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরে কাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ডক শ্রমিকগণ হঠাৎ অজুহাতে নোটিশ না দিয়া ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমি শ্রমিকদিগকে অবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া আইনসম্মত উপায়ে ডক লেবার বোর্ডের নিকট তাহাদের দাবিদাওয়া করিতে আহ্বান জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস উক্ত বোর্ড এবং জাহাজী ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট সকলেই যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা করিবেন।

বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ

অধ্যাপক শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য, এম-এ

আজ হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার নির্বাণলাভের পর বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বহু মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং উহার মূলে ছিল তাঁহার শিষ্যদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য। বুদ্ধের দর্শন সম্পূর্ণ ভাবে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিচার ও যুক্তির দ্বারা স্থিরনিশ্চিত না হইয়া কোন বাণী গ্রহণ করিতে তিনি শিষ্যগণকে উপদেশ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—তাপদাহে যেরূপ অগ্নির বিশুদ্ধি পরীক্ষিত হয়, সেইরূপ তাঁহার বাক্য যেন অনুসরণের পূর্বে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করা হয়। শ্রদ্ধা অপেক্ষা যুক্তিই বলবান।[১] এই জগতের স্বরূপ কি, আত্মা আছে কিনা, নির্বাণের স্বরূপ কি—এ বিষয়ে শিষ্যগণ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নির্বাণের স্বরূপ জানা অপেক্ষা নির্বাণলাভের উপায় কি, কোন্ পথে ক্লেশদগ্ধ মানব এই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে—তিনি সেই মার্গের নির্দেশ দিয়াছেন। দুঃখবিনাশের মার্গ অবলম্বন কর—এই কর্মপথেই মানবের চিরশান্তি লাভ, সেই নির্বাণ-অবস্থায় মানবের কোন অস্তিত্ব থাকে কিনা—সে কূট বিচারে সাময়িক প্রশান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্ত তাহাতে চিরতরে শান্ত হইবে না। তাঁহার উপদেশাবলী প্রধানতঃ ব্যবহারিক। নৈতিক জীবনের উচ্চতম স্তরে উপনীত হইবার যে পন্থা—তাহারই নির্দেশ বুদ্ধবাণীর প্রধান অঙ্গ।

বুদ্ধদেবের শিষ্যসম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। নির্বাণ সম্বন্ধে ইঁহাদের মধ্যে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

ভারতীয় দর্শনের মূল সুর দুঃখবাদ—কিন্তু উহা চরম কথা নয়। দুঃখের পর সুখের আস্বাদলাভের সম্ভাবনা আছে, অন্ততঃ দুঃখ হইতে পরিত্রাণের পথ ত আছেই। দুঃখ যেমন সত্য[২], দুঃখ হইতে মুক্তি তেমনই সত্য। বুদ্ধদেব চারি প্রকার আর্যসত্যের উপদেশ করিয়াছেন—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ। দুঃখ আছে, সমুদয় অর্থে কারণ—ঐ দুঃখের কারণ আছে, সেই কারণের নিরোধও আছে এবং সেই দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদসাধনের উপায়ও আছে। নৈয়ায়িকপ্রবর উদ্দ্যোতকরও এই চারিপ্রকার আর্যসত্যকেই 'অর্থপদ' রূপে অভিহিত করিয়াছেন—হেয়, হান, উপায় ও অধিগন্তব্য। হেয় অর্থে দুঃখ ও তাহার কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি। হান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান; সেই তত্ত্বজ্ঞানলাভের 'উপায়' শাস্ত্র। 'অধিগন্তব্য' পদের অর্থ মোক্ষ[৩]। এই সর্ববাদিসম্মত দুঃখ হইতে পরিত্রাণই নির্বাণ।

প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগ হইতে নির্বাণ পদটি মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। মহাভারতে নির্বাণ পদটির বহুবার উল্লেখ আছে। পাণিনির "নির্বাণোঽবাতে:" (৮.২.৫০) সূত্রটির সাহায্যে ইয়ামাকামি সোগেন নামক বৌদ্ধদর্শনবিদ্ অনুমান করিয়াছেন যে, নির্বাণ পদটি পূর্বে অভাবার্থে ব্যবহৃত হইত। প্রদীপের নির্বাণ অর্থে আলোকের অভাবই বটে। এই প্রসঙ্গে তিনি পালিগ্রন্থ হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন[৪]—দিপস্‌স্ ইব নিব্বানম্ বিমোকখো আহু চেত্তসো—অর্থাৎ, দীপনির্বাণের মত চিত্তধারার নির্বাণই মোক্ষ। কিন্তু ইহা যে সকল-বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কথা নয় তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

হুয়েন সাঙ্ হীনযান সম্প্রদায়ের 'অভিধর্মমহাবিভাষা শাস্ত্র' নামক অভিধান গ্রন্থটির চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত অনূদিত গ্রন্থে নির্বাণ পদের কয়েকটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণীত আছে। (ক) বান্ অর্থাৎ জন্মান্তরের পথ নির্ অর্থে মুক্ত। অর্থাৎ—যাঁহার জন্মান্তরের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। (খ) বান্ দুর্গন্ধ, নির্—অভাব অর্থাৎ, কর্মবন্ধনরূপ দুর্গন্ধের আত্যন্তিক অভাব। (গ) বান—গহন অরণ্য, নির্—চিরতরে মুক্তি। অর্থাৎ, রাগদ্বেষ মোহ জন্ম স্থিতি বা লয়রূপ গভীর অরণ্য হইতে মুক্ত হইয়া যিনি জ্যোতির সন্ধান পাইয়াছেন তিনি নির্বাণলাভ করিয়াছেন। (ঘ) বান—বয়ন, অর্থাৎ—জন্মমৃত্যুর বয়ন হইতে মুক্তি।

উপরোক্ত অর্থগুলি হইতে প্রতিপন্ন হয়—জন্ম ও ভবযন্ত্রণা হইতে যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি তাহাই নির্বাণ। বৌদ্ধদর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িকপ্রবর উদয়নও বলিয়াছেন—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি যে মোক্ষ এ বিষয়ে কাহারও মতবিরোধ নাই।[৫]

এই দুঃখের স্বরূপ কি? বুদ্ধদেব দুঃখ-বিনাশের জন্য

১। কমলশীল—তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা, পৃঃ ১২।

২। সর্বত্র সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্বতীর্থকরসম্মতম্। সর্বদর্শনসংগ্রহ—বৌদ্ধদর্শন।

৩। ন্যায়বার্তিক পৃঃ ১১ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ)।

(৪) S. Yamakami—Systems of Buddhistic Thouht পৃঃ ৩১।

৫। দুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী অত্র বাদীনামবিবাদ এব—কিরণাবলী।

চরম সত্য প্রচার করিলেন—সর্বমনিত্যং, সর্বমনাত্মং, নির্বাণং শান্তম্। এ জগতের সকল পদার্থ ই অনিত্য ক্ষণমাত্রস্থায়ী। এই ক্ষণিকত্ববাদের উপর বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি। সমস্ত পদার্থ ই যখন ক্ষণিক তখন জ্ঞানও ক্ষণিক, জ্ঞানের আশ্রয় নিত্য পদার্থ কিছু নাই—নিত্য আত্মার অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না—করিতে পারেন না। কারণ স্থায়ী আত্মা স্বীকার করিলে আত্মাভিমান আসিবে। রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি অবিদ্যার কারণের ক্ষয় অসম্ভব হইবে। অতএব মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করিবে—নিত্য আত্মা নাই। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) ত সিদ্ধ বস্তু। অতএব বৌদ্ধ বিজ্ঞানধারা (Consciousness-Continuum) স্বীকার করেন। এক দেহের ক্ষয় হইলে এই বিজ্ঞানধারা অন্য দেহকে আশ্রয় করে। এইরূপে জন্মমৃত্যুর বন্ধন চলিতে থাকে। অতএব 'নিত্য কোন পদার্থ নাই', 'নিত্য আত্মা নাই' এইরূপ প্রতি-পক্ষ ভাবনা করিতে করিতে চিত্তের যে আবরণ তাহার ক্ষয় হইবে।

হীনযান সম্প্রদায়ের মতে দুঃখ ত্রিবিধ—দুঃখ দুঃখতা অর্থাৎ মানসিক ও দৈহিক দুঃখ, সংস্কার-দুঃখতা অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর জন্য যে দুঃখভোগ, এবং বিপরিণাম-দুঃখতা অর্থাৎ সুখভোগের পর যে দুঃখ। নির্বাণে এই ত্রিবিধ দুঃখের উপশম হইবে।[৬] চিত্তের আবরণ দুই প্রকার—ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণ। রাগ, দ্বেষ, মান, অবিদ্যা, দৃষ্টি ও বিমতি (সংশয়), চিত্তের এই ছয় প্রকার ধর্ম ই 'ক্লেশ' নামে অভিহিত। এই ক্লেশগুলির জন্যই পুদ্গল সংসারবন্ধনে আবদ্ধ। এই সকল অনুশয় বা ক্লেশ আত্মাভিমানের উপর নির্ভর করে। আত্মাভিমান দূর হইলে ক্লেশও দূর হইবে। প্রথমে নৈরাত্ম্য বিষয়ে গুরুর উপদেশলাভ—উহা শ্রুতময় প্রজ্ঞা। পরে যুক্তিতর্কের দ্বারা উহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা—উহাই চিন্তাময়। এই মননের দ্বারা মল বা সংশয় দূরে যায়। তখন ভাবনাময় দর্শন বা নৈরাত্ম্যরূপ সত্যের উপলব্ধি। এই মার্গকেই বেদান্ত বা যোগদর্শনে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বলা হইয়াছে। ইহার পর অনাবরণাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়। উহাই নির্বাণ। অতএব দুঃখের কারণ সমূহের ধ্বংসের জন্য সর্বদা তৎপর হইতে হইবে, তবেই অনাগত দুঃখের সম্ভাবনা চিরতরে তিরোহিত হইবে। ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকরাজা মিলিন্দ মহাস্থবির নাগসেনকে প্রশ্ন করিলেন "কি কারণে এই তপশ্চর্যা"? নাগসেন উত্তর দিলেন "মহারাজ! বর্তমান দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে এবং অপর কোন দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, 'এই জন্য এই উদ্যম করিয়া থাকি।"[৭]

পূর্বে যে ছয় প্রকার ক্লেশের কথা বলা হইয়াছে, ঐ ক্লেশ বা অনুশয়গুলির যাহা মূল তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে অবিদ্যা রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তের অবিদ্যা হইতে বৌদ্ধ-দর্শনের অবিদ্যা মূলতঃ পৃথক। অদ্বৈতবেদান্ত মতে অবিদ্যা অনির্বচনীয়। উহা সৎ বস্তু নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়। অবিদ্যা জগতের উপাদান কারণ (Material cause)। কিন্তু বৌদ্ধমতে অবিদ্যা অনির্বচনীয় নয়। কোন পদার্থ অনির্বচনীয় হইতে পারে না। অবিদ্যা ভাব-পদার্থ। যোগাভ্যাসের ফলে নৈরাত্ম্যদর্শনের আবির্ভাব হইলে অবিদ্যার নাশ হয়।

এই নির্বাণের স্বরূপ বিষয়ে এক দিকে সৌত্রান্তিক, অন্য দিকে বৈভাষিক তাঁহাদের স্বমত প্রচার করিয়াছেন। জ্ঞান-ধারা সমল অবস্থায় চলিতে থাকে। চতুর্বিধ আর্যসত্যের অনুশীলন দ্বারা ঐ জ্ঞানধারার নিরোধ হয়। সৌত্রান্তিক বলেন, মুক্তিতে জ্ঞানধারার বিচ্ছেদ হয়। উহার পর আর কিছুই থাকে না, সবই শূন্য। বিষয়সম্পর্কিত বিজ্ঞানধারা একমাত্র সত্য, নৈরাত্ম্যদর্শনের ফলে ঐ বিজ্ঞানধারার নাশ হয়। কারণ বিষয়ের দ্বারা উপহিত না হইয়া কোন বিজ্ঞান থাকিতে পারে না। তাই সৌত্রান্তিক মতে চিত্তপ্রবাহের বিরতিই মুক্তি। গুণরত্ন বলিয়াছেন, নৈরাত্ম্য-ভাবনা হইতে জ্ঞানসন্তানের উচ্ছেদ হয়, উহাই মোক্ষ।[৮] অতএব সৌত্রান্তিক মতে নির্বাণ অভাবাত্মক। বাঙালী দার্শনিক শ্রীধরাচার্য এই সৌত্রান্তিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন।[৯] শূন্য-বাদী বৌদ্ধদার্শনিক নাগার্জ্জুনও সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া সৌত্রান্তিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

শান্তরক্ষিত ও কমলশীল ভাবরূপ নির্বাণ স্বীকার করেন। বহুস্থলে তাঁহারা নিজদিগকে সৌত্রান্তিক রূপে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের মত যে সৌত্রান্তিকসম্মত নয় তাহার পরিচয় আমরা গুণরত্নের উক্তি হইতে পাইয়াছি। উপরোক্ত দার্শনিকদ্বয়ের মত বৈভাষিক-সম্মত বলিয়াই মনে হয়। পূর্বে যে অনুশয় বা ক্লেশের কথা বলা হইয়াছে, ঐ ক্লেশগুলির সহিত চিত্ত অনাদিকাল হইতে যুক্ত থাকে। ক্লেশযুক্ত চিত্তকে ক্লিষ্ট বা উপপ্লুত বলা হয়। চিত্তের এই উপপ্লুত-অবস্থার নাম সংসার বা

৬। ন্যায়বার্তিককারের মতে দুঃখ একবিংশতি প্রকার। সাংখ্যদর্শনে দুঃখ ত্রিবিধ।

৭। "ইদক দুক্খং নিরুজ্ঝেয্য, অঞ্‌ঞঞ্চ দুক্খং ন উপ্পজ্জেয্যাতি", মিলিন্দ পঞ্‌হো ৩।৭।৩

৮। সর্বদর্শনসমুচ্চয়টীকা, পৃঃ ৪৭।

৯। ন্যায়কন্দলী পৃঃ ৫৩।

বন্ধন। চতুর্বিধ আর্যসত্যকে অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে করিতে প্রতিসংখ্যা নিরোধ হয়। প্রতিসংখ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সমল চিত্তপ্রবাহের গতি নিরুদ্ধ হয়। ঐ নিরোধ হইলে ক্লেশের ধারা শুদ্ধ হইয়া যায়, ক্লেশের সহিত চিত্তধারার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যোগী তখন ভাবনামার্গে প্রবিষ্ট হন। এইরূপে যোগীর চিত্ত উপপ্লবরহিত হইয়া যায়। এই উপপ্লবরহিত চিত্তপ্রবাহ আর উচ্ছিন্ন হয় না। তখন শুদ্ধ জ্ঞানধারা চলিতে থাকে। সৌত্রান্তিক বলিয়াছেন, বিষয়সম্পর্কিত বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ। বৈভাষিক বলেন, শুদ্ধবিজ্ঞানও সৎ। এই শুদ্ধবিজ্ঞানপ্রবাহের উচ্ছেদ হয় না বলিয়া উহাকে 'ধ্রুব' বলা হইয়াছে।১০ অতএব আগন্তুক-মলনির্মুক্ত কেবল চিত্তের স্থিতিই মুক্তি।১১ শ্রীধর উহাকেই বলিয়াছেন—'নিখিলবাসনোচ্ছেদে বিগতবিষয়াকারোপপ্লববিশুদ্ধজ্ঞানোদয়ো মহোদয়:'১২ —সকল কামনা-বাসনার উচ্ছেদ হইলে বিষয়রহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, উহাই মহোদয় বা মুক্তি। এই জন্যই বলা হইয়াছে, নির্বাণ শিব বা মঙ্গলময় (শিবমিতি নির্বাণমুচ্যতে—তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা ৩:২২)।

১০। মাধ্যমিককারিকা ২৫।৩

১১। আগন্তুকমলাপেতচিত্তমাত্রত্ববেদনাৎ—তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক ৩৫৩৫-৩৬।

১২। ন্যায়কন্দলী পৃঃ ৫৩।

এই প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব স্মরণীয়। সৃষ্টিকালে প্রকৃতির দুই প্রকার পরিণাম বা পরিবর্তন। প্রকৃতিই (Matter) জগতের উপাদান-কারণ। সৃষ্টিকালে প্রকৃতিই মহদাদি রূপে পরিণত হয়। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে কোথাও সত্ত্বগুণের বা রজঃ গুণের কিংবা তমঃগুণের আধিক্য দেখা যায়, উহাই প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম; আবার প্রকৃতিও নিজে নিজে পরিবর্তিত হইতে থাকে, উহা সদৃশ পরিণাম। এই বিসদৃশ পরিণাম শুদ্ধ হইলেও প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম চলিতে থাকে—সেইরূপ বৈভাষিকেরও ক্লেশধারা নিরুদ্ধ হইলে উপপ্লবরহিত চিত্তপ্রবাহ চলিতে থাকে। উহাই নির্বাণ।

অনেকে পরিনির্বাণ ও নির্বাণের মধ্যে পার্থক্যনির্ণয় করিয়াছেন। নির্বাণ অর্থে জীবন্মুক্তি, দেহধারণ করিয়া যে অবিদ্যাক্ষয় তাহাই জীবন্মুক্তি বা নির্বাণ। ঐ অবস্থায় পঞ্চ স্কন্ধ অবশিষ্ট থাকে। অতএব উহাকে সোপাধিশেষ নির্বাণ বলা হইয়াছে। নিরুপাধিশেষ নির্বাণই পরিনির্বাণ। উহাই পরমমুক্তি। তখন দেহ অবশিষ্ট থাকে না, পঞ্চস্কন্ধের ধ্বংস হয়।১৩ শিষ্যোপদেশের জন্যই নির্বাণ বা জীবন্মুক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। শিষ্যোপদেশের পর বুদ্ধদেব এই পরিনির্বাণই লাভ করিয়াছিলেন।

১৩। মাধ্যমিককারিকা ২৫।৫।

সাগর-বেলায়

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সাগর-বেলায় ঝিনুক-শামুক কোঁচড়ে কুড়ায়ে নিয়া,
তুমি আর আমি খেলাঘর সাধে গড়িয়া তুলি যে প্রিয়া:
ঝিনুক-শামুক-বালুকণা আর কাঁকরে মিশানো ঘর;—
তা'র গায়ে-গায়ে আলো-আলপনা এঁকে দেয় দিবাকর।
জোছনা-রাতের চাঁদের সুচারু হাসি ঝলকে যে তায়,
তুমি আর আমি গ'ড়ে তুলি ঘর বড়ো সাধে বালুকায়।
কোন্ সে খেয়ালী আপন খেয়ালে তোমার আমার মাঝে
রসের রগড় জমায়ে তুলিছে, কেন, কিছু বুঝি না যে।

ঢেউগুলি ভাঙে পাড়ের কিনারে বালুর বেলায় এসে,
ফেনাগুলি যেন হাজার ফুলের দল হ'য়ে যায় ভেসে।
তুমি আর আমি খেয়াল-খেলায় মেতে থাকি অবিরত;
বরুণের বুকে ফোটে কত ছবি,—ঝরে গান কত শত।

চারিদিক হতে যুগল-জীবনে জাগে অপরূপ ভাতি:
সাগর-বেলায় খেলা-ঘর গড়ি, ঝিনুকের মালা গাঁথি।
কোন্ সে খেয়ালী খেলায় মাতায় আড়ালে-আড়ালে থেকে
এ বেলার খেলা ফুরালে বুঝি সে অসীমে লইবে ডেকে!

সাগর-বেলায় বালু-ঘর গড়া একদিন হবে সারা;
সেদিন আবার রসের রগড় জমাবে না জানি কা'রা!
এই বালু-বেলা—এই বালু-ঘর—ঝিনুকের গাঁথা-মালা
সবই ফেলে যাবো; চলিবে হেথায় মিলন-বিরহ পালা,-
কত মমতায় মাধুরী-মেশানো লীলা-খেলা বারে-বারে;
কোন্ সে খেয়ালী জমায় রগড় জীবন-সাগর-পারে!
শত যুগ ধ'রে কোটি যুগলের প্রেম সে কি চেখে-চেখে,
কোটি লয় করে একের ভিতরে, কোটি গড়ে এক থেকে!

গৌতম-ধারা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[রাঁচি হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে পর্ব্বতবেষ্টিত নির্জ্জন স্থানে গৌতম-ধারা নামে বিখ্যাত জলপ্রপাত। তাহারই সম্মুখে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতগুহায় ভগবান্ বুদ্ধের প্রস্তরমূর্ত্তি বহুকাল হইতে রহিয়াছে। পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে ধর্ম্মশালাতেও বুদ্ধদেবের আর একটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় ধর্ম্মশালার সমস্ত দ্বার ও জানালা সুদৃঢ়ভাবে লৌহ-নির্ম্মিত। সকালে নয়টার পূর্ব্বে ও অপরাহ্নে তিনটার পরে জঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া বিশেষ বিপজ্জনক]

চারিদিকে বন পথ নির্জ্জন পাহাড়তল
ধূসর ধুলায় ধাবা এঁকে যায় বাঘের দল।
উপল-বিছানো মাটিকে আঁকড়ি ধরে'
শাল-পিয়ালের কালোছায়া আছে পড়ে',
দিনরাত শুধু হা-হা করে' হাসে ঝড়,
দোলে বন-অঞ্চল,
বিরাম-বিহীন জাগে চির মর্ম্মর,
ঝরে পড়ে ফুল ফল।

পথ কি হারাও? আরো আগে যাও পাহাড় ঘুরে',
এবার দাঁড়াও, কি শুনিতে পাও কাছে ও দূরে?
অতীতের কথা জাগে বন-নির্ঝরে,
উতল বাতাসে সে ধ্বনি ছড়ায়ে পড়ে;
নত কর' শির, কোথায় এসেছ জানো?
—হও নাই পথহারা,
গৌতমপদে প্রাণের অর্ঘ্য আনো,
এ যে গৌতম-ধারা!

শত নির্ঝর বহে ঝর্ঝর্ পাষাণ 'পরি,
একই ধারা তার ভেদিয়া পাহাড় পড়িছে ঝরি'।
ধারার ছন্দে ওঠে বন্দনা-গান,
হেথা জাগ্রত তথাগত ভগবান,
ধুয়ে লও তব মনের কালিমা যত,
শিরে লও পথ-ধূলি,
জাগুক তোমার চিত্ত ভক্তিনত
মোহ-বন্ধন খুলি'।

তুলি' মধুসুর বাজিছে নূপুর কি সঙ্গীতে,
বনদেবী বুঝি এল পথ খুঁজি' শরণ নিতে।
অতি নির্জ্জন পূত পরিবেশ মাঝে
আরত্রিকের মধুমঙ্গল বাজে,
অভ্র-প্রদীপে ঝিকিমিকি শিখা-ভাস
কল্যাণ জ্যোতিরূপে,
তরু-নির্যাসে ঝরে চন্দনবাস
নিত্য অগুরু ধূপে।

মেঘ-নির্ম্মল নীল নভোতল, সূর্য্যকরে
জলকণাবুকে লীলা-কৌতুকে মাণিক ঝরে
অমিতাভ যিনি, কোন্ আভা দেবে তাঁরে,
রামধনু হেথা লাজ পায় বারে বারে,
সকল মাধুরী হয়ে গেছে একাকার
ও দুটি নয়নতলে,
সকল বর্ণ রচিছে আসন তাঁর
শুভ্র প্রেমোৎপলে!

জন্ম-মরণ করে নিবারণ যে সুধা-গীতি
সেই ত্রিশরণ গাহে অনুখন এ বনবীথি।
গৌতম-ধারা গৌতমপদে মেশে,
প্রণতি জানায় চির পূজারিণীবেশে,
ফেন-উত্তরী লুটায়ে লুটায়ে পড়ে
শিলা হতে শিলা ছেয়ে,
গাথা-গুঞ্জনে পথটি মুখর করে
নৃত্য-চপলা মেয়ে!

কত যুগ হতে নির্ঝরস্রোতে যে-বাণী বাজে,
তারি সঞ্চয় হয় নাই ক্ষয় এ বনমাঝে।
স্পর্শ করি' এ প্রপাতের পূতজল
বুদ্ধচরণে নমে ভক্তের দল,
ভব-বন্ধন মোচন করিতে চায়
গাহি' ত্রিশরণ-গান,
গৌতম-ধারা গৌতম-মহিমায়
দেয় পরিনির্ব্বাণ।

হঠাৎ আলোর তীরে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সকালটা সত্যি সুন্দর। ঘুম ভাঙতেই ফিক করে হেসে উঠল কচি শিশুর মত। রাতে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে তারই ঠাণ্ডা আমেজ। রোদ উঠল চাঁপার কোমল হলদে স্পর্শ নিয়ে। আকাশ এখন কূলে কূলে উদার নীল।

এমন সকাল ভিড় করে আসে না মানুষের জীবনে। যখন আসে, অনেক দূরের কথা ভাসিয়ে আসে, জাগিয়ে তোলে পুরনো ব্যথা। মানুষ কেমন এক তিক্ত-মধুর আমেজে শয্যায় পড়ে থাকে চোখ বুঁজে।

বিকাশও আজ দেরি করে উঠল। একটা করুণ সুর আপনিই মনের কোণে কতক্ষণ গুঞ্জরণ করে ফিরছিল, বাজারে বেরিয়ে সে ভাবটা আবার আপনিই কখন হারিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, অযথা দেরি করে ফেলেছে। হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে আসছে, সামনে পথ আগলে দাঁড়াল অনিরুদ্ধ। বিকাশ থমকে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু চিনতে পারলে না। চশমা চোখে এ অনিরুদ্ধ আর এক মানুষ। কোঁকড়ানো চুলের বাবরি ঘাড়ে নেমেছে, গলার খাঁজে মেদবলয়, বয়সের চেয়ে গুরুত্ব বেড়ে গেছে অনেক বেশী। বিকাশ যেন সহসা কথা কইতে পারলে না।

'এখনও চিনতে পারলি নে, আমি অনিরুদ্ধ রে।'

অনিরুদ্ধ!—কিছু আশ্চর্য্য হয়ে বললে বিকাশ, 'এত বদলেছ চেনা দুষ্কর। তার পর এখানে কোথায়?'

'আবার মেসে, অর্থাৎ পুনর্মূষিকঃ।'

কথার অর্থ বুঝলে না ঠিক। বিকাশ আবার জিজ্ঞেস করলে, 'তার মানে?'

'মেসেই চল্‌ না। কতদিন পর দেখা,...বছর দশেক হ'ল বোধ হয়, কি বলিস?'

'তা হ'ল। কিন্তু...।' বিকাশ তখনও সমীহ করে কথা বলছে। অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা থাকলেও সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। একটু চেষ্টা করেই বলে ফেললে, 'তার পর কতদিন আছিস এখানে?'

'আমি ত এখানেই থাকি। তোর সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই আশ্চর্য্য। দিব্যি করে বলছি, তোকে খুঁজি নি এমন জায়গা নেই, অথচ রয়েছিস হাতের কাছটিতে।'

কথাগুলো ভাল লাগল শুনতে। বিকাশের ইচ্ছা হ'ল যায় তার মেসে, কিন্তু তবু ইতস্ততঃ করতে লাগল। সহসা তার বাজারের থলির উপর নজর পড়তে হেসে ফেলল অনিরুদ্ধ, 'তাই বল, কৃষ্ণের জীব, আপিসের দেরি হচ্ছে, গৃহিণী ওদিকে—।

বিকাশ তার ভাবভঙ্গী দেখে না হেসে পারলে না।—'তোর কল্পনার দৌড় কিন্তু খুব। তাও তো শেষের জনের দেখা মেলে নি এখন।'

'বিয়ে করিস নি, সত্যি? এত বাজার কার তবে?'

'পরের সংসারে বাজার-সরকারি করি।'—হেসে বললে বিকাশ।

'এখানেও সেই ভগ্নীপতির বাড়ী নাকি? বোনের ননদ-টনদ—?'

'সে হিসেব পরে নিস্‌, আপাততঃ ঠিকানা দিয়ে ছেড়ে দে। ওবেলা বরং দেখা করব।'—বিকাশ বাজারের ফর্দ্দটা ঠিকানার জন্ত উল্টে ধরলে। অনিরুদ্ধ লিখে দিতে মনে মনে কি চিন্তা করে বললে, 'রূপমতী এভিনিউ, খালের ওধারটায় কি?'

'শিওর শট্‌, ঠিক ধরেছিস।' বলে অনিরুদ্ধ আরও কিছু রসিকতা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিকাশের আকস্মিক প্রশ্নে সহসা ম্লান হয়ে গেল।

'তুই বিয়ে করেছিলি না, বৌদি কোথায়?'—বিকাশ জিজ্ঞেস করলে।

'সে অনেক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না। ওবেলা আসিস।'

বিকাশ হয়ত আর একটু অপেক্ষা করতে রাজী ছিল, কিন্তু যেভাবে অনিরুদ্ধ সহসা পা বাড়ালে তার পর আর তাকে আটকানো চলে না। বিকাশও ফিরে চলল বাড়ী-মুখো। হাঁটতে হাঁটতে আবার কেমন খটকা লাগল। পিছন ফিরে দেখলে, অনিরুদ্ধ আপনমনে হেঁটে চলেছে, বড় একটা চাইছে না কোন দিকে। বাঁ পা-টা বোধ হয় সামান্ত দুর্ব্বল। ঢিলে পাঞ্জাবীটা দুলছে একদিক ধরে। কেমন একটি করুণ কোমল ছন্দ! দূর থেকে তাকে দেখে বিকাশের মনে কেমন এক অনুকম্পা জাগে। সেই অনিরুদ্ধ। সেদিনের সেরা এথলেট, উদ্ধত জোয়ান, তরুণ মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে আজ এলিয়ে পড়েছে। কালের কি অসীম শক্তি! কিন্তু না, মনের দিকেও কম বদলায় নি সে। আজ সে কথায় কথায় লঘু রসিকতা করছে। আর সেদিন? কথাই বলত না একরকম, কিন্তু যখন বলত,

একেবারে বুলেটের মত এসে বিঁধত গায়ে, দুরুর হ'ত বিরুদ্ধে তর্ক করা। অন্তের মনের উপর চেপে বসাই ছিল ওর স্বভাব। বেচারা!

ভাবতে ভাবতে বিকাশ ঢুকে গেল বাথরুমে। তার পর কাপড় ছেড়ে নিজের দিকে চাইলে ভাল করে। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, অনিরুদ্ধর পাশে দাঁড় করালে সেই বরং বেশী বদলেছে। মাথার উপরের চুল অনেক হাল্‌কা হয়ে এসেছে—টাকটা বড় বেশী স্পষ্ট, দেহের পেশীগুলো—।

মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল। খেতে বসে কথার উপর কথা এসে জমতে লাগল গলায়। এতদিন পর অনিরুদ্ধর সঙ্গে দেখা, তাও কেন খুশী হতে পারছে না সে? দশ বছরের ব্যবধানটাই কি এত বড় হ'ল—না কি সে ঈর্ষা করছে তার চেহারা দেখে? তাই বা সত্যি ভাবে কি করে? অনিরুদ্ধর মুখে যা শুনল তাতে বরং অনুকম্পাই জাগে মনে। সে হয়ত কত অসুখী আজ, দাম্পত্য-জীবনে হয়ত বা এসেছে চরম ব্যর্থতা।

অনেক চেষ্টা করেও মনের ঠিক সুরটি ধরতে পারলে না বিকাশ। সকাল থেকেই কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিল, কতকগুলো পুরনো কথা ব্যথার আকারে ঘুরছিল মনের কিনারায়, আবার বাজারে গিয়ে ভুলেও গিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা অনিরুদ্ধর সঙ্গে। মনে পড়ল, তার পর থেকেই ব্যথাটা গ্লানির আকারে মনে চেপে বসেছে।

বিকাশ ক'টা এলোমেলো বছর পর পর সাজাবার চেষ্টা করে এবার। চল্লিশ সনের গোড়ার দিকে—হ্যাঁ, বাণীপূজার পরের দিনই বোধ হয়—দিন পনেরর জন্ম এসে উঠেছিল অনিরুদ্ধর বোর্ডিংএ।

রিক্সার উপর বাক্স-বিছানা দেখে অনিরুদ্ধ অবাক—'ব্যাপার কি রে, হঠাৎ না বলে কয়ে?'

হঠাৎ যখন এসেছে, একটা কারণ দেখাতে হ'ল—'বাড়ীর সবাই চলে গেছে পশ্চিমে, বাধ্য হয়ে।'

'দিদি-জামাইবাবু না হয় বেড়াতে গেছেন, বাড়ীটাও কি বেচে গেছেন সেই সঙ্গে? কৈ, কালও ত বললি না কিছু?'

'আমিই কি জানতাম?'—বিকাশ অভিনয় করলে—'একা একা থাকতে হ'ত, ভাবলাম ক'টা দিন তোর কাছে থেকে হৈ-হুল্লোড়ে কাটিয়ে যাই।'

অনিরুদ্ধ বিরক্ত হ'ল। বিকাশ সংশোধন করে আবার বললে,'হৈ-হুল্লোড় মানে—আই মীন—তোর আবার পরীক্ষা, খুব বেশী বিরক্ত করলাম কি?'

'তোর পরীক্ষা নেই?'

'এবার আর দেব না রে—একদম তৈরী হতে পারি নি। তা ছাড়া শেষ সময় একটা বাধা—' কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই বিকাশ কথা ঘুরিয়ে বললে, কাল পাশের বাড়ীতে রাতদুপুরে একটি মেয়ে মারা গেল—সারারাত সে কি কান্নাকাটি—আমার ভয় করতে লাগল, তাই পালিয়ে এলাম।

অনিরুদ্ধ সে কথায় থমকে উঠল তাকে। আশ্চর্য্য নয়, সন্দেহ করেছিল হয়ত। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বিকাশকে বললে—'থাক, আপত্তি করব না, কিন্তু এই তোমার দুঃখের ইতিহাস সুরু হ'ল বলে রাখছি। এখনও সময় আছে, ভেবে দেখ।

বিকাশ জানত আর হয় না তা। তবু মুখে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'আসছে বছর দেখিস, ঠিক ফার্স্ট ক্লাস।'

বাকিটুকু আর সারা জীবনে সম্পূর্ণ করতে পারে নি। কেবল ছলনাটুকুই সত্যি হয়ে রইল। অনিরুদ্ধর কথাই ঠিক হ'ল। কিন্তু সে কতটুকু? গোটা জীবনটাই যে বাজি রেখে সবকিছু হারাল, এম-এ পাস না করার ক্ষোভ আজ তার কাছে বড় নয়। আজ হয়ত তার একটা জবাবদিহি দেওয়া চলত—ছলনা তার স্বভাবে আসে না, কিন্তু কি করবে, সেদিন যে তার কোন উপায় ছিল না।...

বিকাশ আপিসের বাসে ঝুলছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দিনের তীব্র আলো ভেদ করেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—একটি নিকরুণ সন্ধ্যার তিক্ত ছবি, যেদিন সে তার পুরনো আশ্রয় ছেড়ে চিরদিনের মত বেরিয়ে পড়েছিল পথের ধুলোয়। সন্ধ্যায় অনিরুদ্ধর সঙ্গে দেখা করবে—ভাবতেও কেমন এক আতঙ্কময় রোমাঞ্চ আসছে মনে। এতদিন পরে পুরনো কথার সূত্র ধরে সত্যি যদি সে প্রশ্ন করে বসে, কি আছে তাকে বলবার, বোঝাবার? কিংবা বিকাশ নিজেই দিতে চায় সে কৈফিয়ত? দশ বছর আগে দু'জনে বেরিয়েছিল দু'-পথে—আজ আবার দেখা হ'ল এক জায়গায় এসে। কে কোথায় কতটুকু কুড়িয়ে পেল, হারাল কতখানি—একটা যদি হিসাবনিকাশ হয় আজ, মন্দ কি?

আপিসে এসে বিকাশ তাড়াতাড়ি লেজার বইখানা সেরে পাঠিয়ে দিলে সাহেবের ঘরে। ব্যাঙ্ক-পিয়ন না ফেরা পর্য্যন্ত সামান্ত অবসর। এক কাপ চা আনিয়ে মুখে দিতে যাবে বরাট এসে হাজির হ'ল।—'কি দাদা, আজ, আর পেসাদ পাব না?'

চেয়ে খাওয়া বরাটের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, লজ্জা দেওয়া যায় না। এতদিনের প্রশ্রয়, আজ মানবে না। প্লেটের ওপর অর্দ্ধেক চা ঢেলে তাড়াতাড়ি বিদায় করলে তাকে।

বিকাশ কেমন অন্তমনস্ক হয়ে পড়ল। টাইপ-রাইটারের পটাপট শব্দ কানে যাচ্ছে। বড় সাহেব পাশ দিয়ে

চলে গেল। বিকাশ দেখল না তা। মিস মঞ্জরেকর কীবোর্ডে আঙুল থামিয়ে ইশারা করলে। নতুন এসেছে মেয়েটি। কেমন একটু দুর্বলতা, একটু শ্রদ্ধামিশ্রিত সহানুভূতি বিকাশের উপর। সেও কেরানী, কিন্তু একটু যেন আলাদা অন্যের চেয়ে, তাই বোধ হয় ভালবাসে বিকাশকে, সেধে তার কাজ নিয়ে যায়, চিঠিগুলো ছেপে আনে পরিপাটি করে—সবার আগে। মঞ্জরেকরের ইশারায় বিকাশ সজাগ হয়ে অভ্যাসবশে কলম তুলে ধরল। কিন্তু হাতে তুলেই আবার রেখে দিলে কলমটা। কেরাণীর চাকরির ভয়, কিন্তু বিদ্রোহ মনে মনে—কেরানীও মানুষ, যন্ত্র নয় সে। ভয়েই মনুষ্যত্ব যায় বিকিয়ে, আরও চেপে ধরে সুযোগসন্ধানীরা। বিকাশ উঠে গেল কাউণ্টার ছেড়ে।

তাড়াতাড়িতে জিজ্ঞেস করা হয় নি অনিরুদ্ধর কাজের কথা। সে যে পরাজিতের দলে নয়, তার চেহারাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। নইলে এতদিনে চশমার কাচ পুরু হয়ে উঠত, পিঠ নুয়ে যেত বুকের ভারে, সখ হ'ত না কব্জিআঁটা গেরুয়া খদ্দরে।

আপন মনেই হাসল বিকাশ। আর একবার হাতখানা দেখাবে তাকে? কার না সাধ হয় অজানায়? কিন্তু তখনই আবার মন প্রশ্ন করে, কি চাও, কি পেলে সুখী হও জীবনে? বিকাশ মনে মনে ভেবে দেখলে, না, সে আর কিছুই চায় না। ধন নয়, মান নয়,—সুখ-সম্পদ কোন প্রাপ্তিতেই আজ সে সুখী হতে পারবে না। যে লগ্ন বয়ে গেছে, তাকেও নিংড়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে সেই সঙ্গে।

তবু মনে মনে অনিরুদ্ধর তারিফ না করে পারলে না। সে যে এত ভাল 'কীরোম্যান্সি' জানে তাই কি জানত বিকাশ।...

জানুয়ারীর এক সেঁতানো সন্ধ্যা। বিকাশ অনিরুদ্ধর সেই বোর্ডিংএ। বর্ষার দিনে ছোলা-মুড়ি আনিয়েছে খাবে বলে। ঘরে আরও দুই বন্ধু। অনিরুদ্ধ চার প্লেট ওমলেট আনালে। কীরোর হস্তরেখা-বিজ্ঞান নিয়ে তর্ক উঠল। বিকাশ দু'পক্ষের তর্ক শুনছে আর টপাটপ মুড়ি ফেলছে মুখে। খিদেও জোর ছিল। হঠাৎ অনিরুদ্ধ তার হাতটা চেপে ধরলে—'এই হাতটা ছড়া ত একবার?'

কতক মুড়ি মেঝেয় ছিটিয়ে গেল। বাদবাকি মুখে ফেলে বিকাশ হাত বিছিয়ে দিলে।

'আহাম্মক, হাতের তেল মোছ আগে।'

বিকাশ তাই করলে। ইতিমধ্যে তর্ক ছেড়ে সবাই নিজের নিজের হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু অনিরুদ্ধ বিকাশের হাতখানাই ধরে রইল। তারপর বইয়ের ভেতর থেকে হাতল দেওয়া একখানা পুরু আতশ কাচ বার করে, তাজুব নানা জায়গায় চাপ দিয়ে রেখাবিচার করতে লাগল। আবার আপনমনেই হাত ছেড়ে দিয়ে ছোলার বাটি টেনে নিলে।

হো হো করে হেসে উঠল আর সবাই—'সেই কাঁঠাল খাওয়ার গল্প হ'ল যে। চালাক ছেলে কিন্তু অনিরুদ্ধ।'

বিকাশ গ্রাহ্য করলে না রসিকতা। দুরু দুরু বুকে প্রশ্ন করলে অনিরুদ্ধকে—'কি দেখলি?'

ছোলা চিবুতে চিবুতে অনিরুদ্ধ চোখ বড় করে জবাব দিলে, কিছু নয়। মুখে তখন আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি দেখে ধরা পড়ার ভয়ে বিকাশ আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। অনিরুদ্ধই বাঁচিয়ে দিলে অন্য কথা পেড়ে।

খাওয়া সেরে শুতে যাবে বিকাশ, অনিরুদ্ধ ডাকলে—'এখনই শুবি কি, উঠে এসে বোস।'

তার কণ্ঠস্বর আন্দাজ করে আপনিই উঠে এল টেবিলের ধারে। বিকাশ যেন তার সাহায্য চায়, কিন্তু কি হ'ল, মুখ ফুটে বলতে পারলে না সে কথা। ঠোঁটে এসেও আটকে গেল।

অনিরুদ্ধ পীড়াপীড়ি করল—'কি হয়েছে খুলে বল ত? ভালবেসেছিস কাউকে—বামুন না কায়েত?'

বিকাশ নিরুত্তর। অনিরুদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করছে—'ঝগড়া করেছিস বাড়ীতে?'

কথা লুকোবার এমন সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেল বিকাশ। সত্য মিথ্যা অনেক কিছু সাজিয়ে অনিরুদ্ধর চোখে ধুলো দিয়ে আত্মরক্ষা করলে।

সেই লুকানো কথার সূত্র ধরেই যদি সে আজ আবার প্রশ্ন তোলে। কি জবাব আছে দেবার। বলবে ভাগ্য? কিন্তু সে অজুহাত দিয়েই বা সব কথার শেষ হয় কৈ? না, বিকাশ আজ আর কোন সঙ্কোচ করবে না, লজ্জা করবে না। অকপট স্বীকারোক্তি দিয়েই শেষবারের মত মুছে নেবে হৃদয়ের যা কিছু ক্লেদ আজও অবশিষ্ট আছে। আর—

চিন্তায় বাধা পড়ল। মিস মঞ্জরেকর টেবিলের উপর ছাপা চিঠির তাড়া রেখে দিয়ে মুচকি হেসে বিদায় নিলেন। বিকাশের কানে শুধু দুটি কথা ভেসে এল—বড্ড ভাবছো!

বিকাশ পিঠ টান করে ঘড়ির দিকে চাইলে। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। টাইপ-রাইটারের উপর আবার স্বর-ব্যঞ্জনের কলহ। বিকাশ চিঠির পাঁজা টেনে দেখতে লাগল।

অনিরুদ্ধর মেস খুঁজে বার করতে কিছু রাত হয়ে গেল।

বন্ধ্যা প্রান্তরের বুকে একটিমাত্র দোতলা বাড়ী। কাস্তুনের পাতাঝরা জ্যোছনায় স্বপ্নময় পরিবেশ। খোলা জানালার সামনে বসে অনিরুদ্ধ কি লিখে চলেছে। মুখ তুলতেই দেখলে, বিকাশ সামনে দাঁড়িয়ে।

'বিকাশ! আয় আয়। খুঁজতে বেগ পেলি বোধ-হয়?'

'মোটেই না।'—বিকাশ বললে—'কি লিখছিলি, গল্প না কবিতা?'

'ও কিছু না, বোস তুই।'

বিকাশ টেবিলের উপর দৃষ্টি ফেলে পেছনে সরে এল।—স্বরলিপি! 'তুই গান গাইতে জানিস, জানা ছিল না ত?'

'কে কার কতটুকু খোঁজ রাখি আমরা, বিকাশ?'

অনিরুদ্ধ এক অনির্ব্বচনীয় উদার হাসি হাসল। এ তার আর এক ভাব। চেতনাতুর ইন্দ্রিয়ানুভূতির সরস কণ্ঠস্বর। সে যেন এতক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্দ্ধে উঠে সম্পূর্ণ এক মনোময় জগতে বিরাজ করছিল। বিকাশের সন্ধানী চোখের সামনে সে এবার কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। বললে—'বড্ড একা ঠেকে, তাই নিজে লিখি, নিজেই গাই। কিছুক্ষণের জন্ত বাড়ীটা তবু বা একটু সরগরম থাকে। চল, বাইরে গিয়ে বসি,—কি গরম পড়েছে দেখছিস?'

অনিরুদ্ধ গামছা দিয়ে নিজের ললাট মুছলে। বিকাশ বললে—'না না, নিরিবিলি এই বেশ আছি। তার পর, বৌদি কোথায়?'

বিকাশ ভয়ে ভয়ে কথাটা তুলতেই অনিরুদ্ধ যেন আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠল—'কেন শুনিস নি তুই, সে আজ দু' বছর নেই।'

বাকিটুকু তার মুখের ভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেল। বিকাশ স্তব্ধ। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে কেবল বললে—'ব্যাড লাক।'

'তুই কিছুই জানিস নে দেখছি!'—অনিরুদ্ধ আবার বলতে লাগল—'দশ বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। গোয়ালিয়রে প্রোফেসরি করছিলাম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর মন মেজাজ বড় খারাপ হয়ে গেল। প্রাইভেট কলেজের তাঁবেদারি আর পোষাল না, ছেড়ে দিলাম। তা ছাড়া একার প্রয়োজনই বা কতটুকু?'

'তা হলে এখন চলছে কি করে?'—প্রশ্ন করে বিকাশ।

'অল্প কিছু জমেছিল হাতে, তাই দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা চালাচ্ছি। রাত্তে গরীবদের জন্ত একটা ইস্কুল খুলেছি। সরকার ইতিমধ্যে কিছু কিছু সাহায্য দিতে সুরু করেছে, তাতেই চলে যায় আমার।'

অনিরুদ্ধ উঠে বিকাশের হাতে এককপি পত্রিকা দিলে।

'শ্রীকান্ত তুই-ই নাকি?'

পরম আত্মপ্রসাদে বললে অনিরুদ্ধ—আমারই গৃহলক্ষ্মীর দেওয়া নাম। আর ওই যে নাইট স্কুল, তাও তিনিই চালু করে গেছলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর কোন উদ্দেশ্য নেই জীবনে, তাঁরই আরব্ধ কাজে সঁপে দিয়েছি নিজেকে।'

একটু দম নিয়ে বললে আবার—'ঘরকন্না কমই করত। কেবল নারীসমিতি, শিক্ষায়তন আর শেষের দিকে পত্রিকা চালানোর একটা ঝোঁক পেয়ে বসেছিল তাকে।'

'ছেলেপুলে হয়নি?'

'তা একটা কারণ বটে। কিন্তু না, তাও নয় ঠিক। নিজের সন্তান চাইত না কোনদিন, শুধু ঘরকন্নাতেও খুশী হতে পারত না। বাধা দিলে বিরক্ত হ'ত। সত্যিকারের একটা স্পৃহাহীন বৈরাগী মন ছিল তার, নারীজীবনে যা সচরাচর দেখি নি।...কত লোকের সঙ্গেই যে আলাপ হয়েছিল।'

বিকাশ লক্ষ্য করলে, অনিরুদ্ধ যেন আজ তাকে পেয়ে অনেক দিনের আবদ্ধ কথার অর্গল খুলে দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত মুখরতা কেবলমাত্র তার জীবনের ওই একটিমাত্র নারীকে কেন্দ্র করে। তাঁর জীবনের নানা খুঁটিনাটি আলোচনা করতে করতে সে যেন মাঝে মাঝে কথার সূত্র হারিয়ে ফেলছে। সহসা যেন তার চৈতন্য হ'ল। ক্লান্ত হয়ে বললে—'ওই দেখ, নিজের কথাই বলছি সেই থেকে। কেমন যেন একটু বেতাল হয়ে পড়ি আজকাল। দোষ নিস নে।'

'কোন দোষ নিই নি অনিরুদ্ধ।'...সান্ত্বনা দিলে বিকাশ—'এত বড় আঘাত, হয়ত সারা জীবনই কেটে যাবে ভুলতে।'

অসীম কৃতজ্ঞতায় অনিরুদ্ধ বিকাশের কাঁধে একখানা হাত তুলে দিয়ে বললে—'কত ভাগ্য আমার তোর দেখা পেলাম। এমনই বন্ধুই খুঁজছিলাম একজন। কিন্তু তুই যে সেই ডুব দিলি! তার পর, কি করছিস আজকাল? একটুও বাড়িস নি দশ বছরে—শরীরের দিকে নজর দিস না?

'কোন্‌কালেই বা চেহারা ছিল যে যত্ন করব!'—বিকাশ হাসল একটু।

'কি যে বলিস, তুই সত্যি হ্যাণ্ডসাম ছিলি।—অনিরুদ্ধ বললে—'এম-এ টা-ই না হয় দিতে পারিস নি, দিয়েছিলি?'

বিকাশ মাথা নাড়লে। অনিরুদ্ধ বললে—'সে না হোক,

কিন্তু তার আগেরগুলো ত ভালভাবেই পাস করেছিলি, বলতে-কইতেও পারতিস।'

আত্মপ্রশংসা শুনে বিকাশ কেমন অস্বস্তি বোধ করলে। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'পুরনো কথা আর না তোলাই ভাল। অন্য কথা বল।'

'তোর যে এখনও শোনাই হয় নি কিছু।'—বললে অনিরুদ্ধ—'কি করছিস আজকাল ?'

'ব্যাঙ্কের লেজার ক্লার্ক-কাম-পত্রনবীশ।'—খাটো জবাব দিয়ে বিকাশ অন্য কথায় এল—'তোর পত্রিকা চলছে কেমন ? অনেক জায়গাতেই দেখি কিন্তু।'

সম্পূর্ণ আত্মগত হয়ে অনিরুদ্ধ কি ভাবছিল। বিকাশের কথাগুলো বোধ হয় শুনতে পায় নি। বললে—'তোর ত কেরাণী হবার কথা ছিল না বিকাশ ?'

'ভাগ্য কি তোর ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে ?'

'তা ঠিক, একশ' বার ঠিক। তবু মন মানে কৈ ? যুক্তি একটা খুঁজবেই।'

অনিরুদ্ধর দার্শনিক কথায় বিকাশের মনের ভেতরটাও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। তবু মনের জ্বালা বাইরে দমন করে চেয়ে রইল পথের দিকে। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রান্তরের বুকে দীর্ঘ ছায়ার ক্ষত। ক্রমে উঁচু হয়ে পথটা সমান্তরাল হয়ে গেছে নাসিক রোডের মোটর-পথের সঙ্গে। মাঝে মাঝে হেডলাইটের তীব্র আলোর হঠাৎ ঝলকে ঘরখানি জ্বলে উঠছে বার বার। দশ বছরের পুঞ্জীভূত ব্যথার গ্লানি নিয়ে সামনাসামনি বসে দুই বন্ধু। কিছুক্ষণের অস্বস্তিকর নীরবতা। বিকাশ আর পারল না। এমন দিনে, এমন ঘরে বসে মানুষ বুঝি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত কৈফিয়ত দিয়ে বসে কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে।

বিকাশও হঠাৎ স্বীকারোক্তি করে ফেললে—'অনিরুদ্ধ, অনেক দিন হ'ল তোর কাছে একটা মিথ্যাভাষণের অপরাধ করেছিলাম, হয়ত বুঝতে পারিস নি।'

'মিথ্যে বলেছিলি, তুই ?'—আশ্চর্য্য হ'ল অনিরুদ্ধ—'দশ বছর দেখাই হয় নি, বললি কবে ?'

'সেই বোর্ডিংটা মনে পড়ে, দিন পনেরো ছিলাম তোর কাছে ?'

'কোনটা বল ত, সেই ঠনঠনের ধারে ? তোর মনে আছে ! আমার কিন্তু আজও গা ঘিনঘিন করে।'

'তা করে।'—বিকাশ বললে—'সেখানেই এক সন্ধ্যার কথা মনে কর ত ? কি বলেছিলি হাত দেখে !'

পুরনো স্মৃতির জট খুলতে খুলতে অনিরুদ্ধ যেন ঠিক জায়গাটিতে এসে বলে উঠল, 'আই সি, দ্যাট সিলি 'টু-এণ্ড-টোয়েন্টি' এফেয়ার ?'

'ঠিকই ধরেছিলি। কেবল বুঝতে পারিস নি দেউলিয়া হয়েই তোর শরণ নিয়েছিলাম।'

'তাও মুখ ফুটে বললি নি কেন ? আমি না কত পীড়াপীড়ি করলাম তোকে !'

'কেমন সঙ্কোচ এসে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল অনিরুদ্ধ। আমি জানতাম, তোকে বললে বিহিত হ'ত, পারতিস তুই বাঁচাতে। কিন্তু...যাক গে, পুরনো কথা ঘেঁটে আজ আর লাভ নেই।'

'তবু ব্যাপারটা খুলেই বল্ না।' পীড়াপীড়ি করলে অনিরুদ্ধ।

'বাকিটুকু বুঝে নে।'—দম নিয়ে বললে বিকাশ—'সেই আমি তোকে ছাড়লাম, পড়া ছাড়লাম, ঘুরতে ঘুরতে একদিন ছিটকে এসে পড়লাম এখানে। বাকিটুকু আরও রোমাণ্টিক। ষ্টেশনে বেঞ্চির ওপর শুয়ে রাত কাটাচ্ছি—ক্লান্তিতে মাঘ মাসের শীতেও হুঁস ছিল না,—ভোর রাতে উঠে দেখি মাথার তলা থেকে ব্যাগসুদ্ধ শেষ কপর্দ্দকটি উধাও।'

বিরস হাসি হেসে বিকাশ থামল একটু। তার পর বললে—'বেশী নয়, মাত্র দু'দিন খাওয়া হ'ল না। লজ্জায় বলতে পারি নি কাউকে। ভাগ্যি ভাল, তাই ভিক্ষে আর করতে হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত হঠাৎ এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার সব কথা শুনে বাড়ী নিয়ে গেলেন, কতদিন পরে সেই দুটো বাড়ীর ভাত পেলাম, শুতে পেলাম দোর বন্ধ করে গরম বিছানায়।

তিনিই দয়া করে কাজটি জুটিয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোকের বাইরে ঘোরা কাজ, তাঁর সংসারের কাজকর্ম্ম দেখি, ছেলে পড়াই ; বিনিময়ে বোর্ড-লজিং ফ্রি।'

'তাই বলে আর ভাল কাজ খুঁজবি না।'

'কি দরকার ? তাঁরা একরকম আত্মীয়ের মতই হয়ে গেছেন, কোন অপমান নেই।'

'তোর দিদি কোথায় ?'

'খোঁজ রাখি না। শুনেছি জামাইবাবু আজকাল টি. ডবলু. এ'র টুরিষ্ট অফিসার। কায়রোয় আছেন।'

অনিরুদ্ধ চুপ করে কি ভাবলে কিছুক্ষণ। এবার বললে—কিন্তু যেখান থেকে কাহিনীর সুরু তা ত ছেড়েই গেলি ?'

'কেন ঘটা করে পত্রিকায় ছাপাবি নাকি ?'

তীব্র প্রতিবাদ করলে অনিরুদ্ধ—'না বিকাশ, এমন

সিরীয়াস ব্যাপারে তামাশা ভাল নয়।—কে মেয়েটি, বিয়ে করেছে ?'

'নইলে ছাড়বে কেন ?'

'লেখাপড়া জানত না বোধ হয় ?'

'বিলক্ষণ, তখনই এম-এ পাস হয়ে গেছে।'

'বলিস কি, তোর চেয়ে বয়সে বড় ? তুই না সেবার ফাইন্যাল ইয়ারে !'

'বয়সটাই বড় করে দেখি নি, বিশ্বাস করেছিলাম তার কথাগুলো। বয়সে হয়ত বা সমানই ছিল, কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী।'

'লেখাপড়ায় সত্যি অশ্রদ্ধা জাগে এসব শুনে।'—অনিরুদ্ধ আবার প্রশ্ন করে—'আচ্ছা কেমন দেখতে ?'

'আজ তাকে ঠিক সুরূপা বলব না, তবে সেদিন মনে হ'ত অনিন্দ্যসুন্দর, ভালবাসার একটা মোহ ত ছিলই।'

'অর্থাৎ রূপের মোহ এই ত ?'

'রূপ !' বিকাশের ললাট কুঞ্চিত হ'ল। বললে—'তা নয়, তা হলে অনেক দিন মন থেকে মুছে যেত সে—তার পরেও অনেক রূপসী খুঁজে পেতাম চাইলে।...হয়ত বা অভিমান, কিংবা হয়ত অপমান—যা খুশি বলতে পারিস—এই দীর্ঘদিন সেই অনাদরের গ্লানিই কুরে কুরে খেয়েছে আমাকে। কিন্তু আজ বুঝেছি সব...আর শ্রদ্ধা জাগে না।'

'একজনকে দেখে তুমি সবার বিচার করবে এতে আমার আপত্তি আছে, বিকাশ। কোথাও ভুল করেছিলে হয়ত। আমার জীবনেও ত নারী এসেছে, তার জন্য তা হলে এতটা ত্যাগ করছি কি করে ?'

'তোমার কথা আলাদা অনিরুদ্ধ, তুমি বিবাহ করেছিলে।' বিকাশ বললে—'কিন্তু আমি একজনকে নিয়েই জগৎ চিনেছিলাম, একজনের জন্যই আজ আমি সর্ব্বহারা, আমার শ্রদ্ধা আসবে কেমন করে, তুমিই বল ?'

'যা, ভাবছি বাধাটা এল কোন্‌দিক থেকে।'

'বাধা ছিল না কিছুই। আমারই দেশের মেয়ে, আমারই পর্য্যায়ের, কেবল ছিল না আমার সঙ্গতি।'

'তোর দেশ কোথায় যেন।'

'নাটোর।'

'ঠিক ঠিক। তার পর ?'

'এর পর আর কি, নটে শাকটি মুড়োল।' বিকাশ করুণ মুখে হাসবার চেষ্টা করলে একটু। তার পর নিজেই আবার বললে—'আজ বলতে হাসি পায়—তিন বছর এক বাড়ীতেই পাশাপাশি থেকেছি, মিশেছি—একান্তভাবে ভালবেসেছি বলতেও আজ আর কুণ্ঠা নেই। এম-এটা হয়ে গেলেই একটা চাকরি নিয়ে কোন দূর বিদেশ গিয়ে ঘর বাঁধব এই ছিল দু'জনের কল্পনা, সেদিনের পরস্পর স্বীকৃতি। কিন্তু...।

বিকাশের গলা শুকিয়ে আসছিল। উঠে জল গড়াতে গেল। বাধা দিয়ে অনিরুদ্ধ বললে—'শুধু জল খাবি কি রে, চা জলখাবার আনাই দাঁড়া।'

'না থাক।'—বলে বিকাশ ঢকঢক্ করে এক গ্লাস জল মুখে ঢাললে। মুখ থেকে চলকে বুকের অনেকখানি ভিজে গেল।

চাকরকে ডাকতে উঠে অনিরুদ্ধ অনুনয় করল—'একটু চা-ই আনুক ?'

'না না, চা খেলে রাতে ঘুম আসে না, থাক।' বিকাশ বুকের কাছের জামা বেড়ে আবার তক্তপোশে এসে গুম হয়ে বসে রইল। দূরের কোন কারখানার খোলা চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। ফিকে আকাশের গায়ে তারই দগ্‌দগে লাল আভা।

বিকাশ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। আপন মনেই কত কি ভেবে এক সময় স্বগতোক্তির মতই বললে—না, তাকে দোষ দেব না। দেশের সংস্কার, সমান বয়সের এম-এ পাস মেয়ে, আমি বেকার। তার উপর উকীলের পয়সা, সব যে একযোগে তাকে বাধ্য করলে !'

'বাধ্য করলে আর সে বদলে গেল ? নিজের শিক্ষাদীক্ষা কোন কাজে এল না ?' বিকাশের স্বগতোক্তির সূত্র ধরে বললে অনিরুদ্ধ।

'তাই ত দেখলাম।' অনিরুদ্ধর কথায় আবার যেন উষ্মা বাড়ল বিকাশের। বললে—'তারও আবার অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে হয় না শুধু আমাদের দেশের বালবিধবাদের। এ জাত থাকবে অনিরুদ্ধ ?'

'সে ভুলে গেল, আর তুই আজও তাকে ভুলতে পারছিস না, আচ্ছা আহাম্মক ত। বিয়ে কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিকাশ সে কথার কোন জবাব দিলে না। বললে—'তোকে একটা হাসির কথা বলব। তার বিয়ের আগে লুকিয়ে একবার শেষ দেখা করেছিলাম, কি বলেছিল জানিস ?...বলেছিল, যেন আমি ভুলে যাই তাকে। ভাবি, সে কর্ত্তব্যের কাছেই নিজেকে বলি দিলে। আর বলেছিল, অনেকেই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে, কিন্তু আমাদের গোপন ভালবাসার কথা তার বাবা-মার কানে উঠলে নিশ্চয় তাঁরা সইতে পারতেন না।'

'এ ডেভিল অফ এ লেডি !'—অনিরুদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে তক্তপোশের ধারে উঠে এল—'তুই কি বললি ?'

'বলতে কিছুই পারলাম না, যেন হিমে জমে গেলাম

তখনকার মত। কিন্তু না, একটা প্রতিঘাত করবার কেমন এক গোপন ইচ্ছা মনে জাগল যেন, বলে ফেললাম, 'সে ত বিবাহ করে পরের ঘরণী হতে চলল, আমি যদি প্রতিজ্ঞা না রাখতে পারি, আমাকেও যদি কর্ত্তব্য করতে হয়, আমার বিবাহে সে মত দেবে কি?'

'নাইসলি সেইড!'—বিকাশের কাঁধে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললে অনিরুদ্ধ—'কে বলে তুই বেকুব? কি উত্তর দিলে তাতে?'

'বোধ হয় বড্ড রূঢ় হয়ে গিয়েছিল।' বলতে বলতে বিকাশের নিজের চোখই বাষ্পাকুল হয়ে উঠল—'কিছুই বলতে পারলে না, অঝোরে কাঁদতে লাগল মুখ লুকিয়ে।... সেই কান্নাই আমার কাল হ'ল, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল তার বিদায়ের নীরব অভিশাপে।'

অনিরুদ্ধ আর বসে থাকতে পারলে না। আবেগে উঠে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। এক সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র কণ্ঠে বললে—'তুমি একটি আস্ত ইডিয়ট,—তোমারই উচিত ছিল তাকে রক্ষা করা। একটি কাপুরুষ তুমি!'

বিকাশ আশ্চর্য্য হ'ল তার কথা শুনে—তার উত্তেজনা দেখে। তবু ক্ষীণ প্রতিবাদ করলে—'কিন্তু সে যে কর্ত্তব্যকে বড় করে দেখলে—আমি কি করে ছোট করতাম নিজেকে?'

'কিন্তু তাই বলে তুমি আজও পরস্ত্রীকে কামনা করবে, তাই বা কোন ধর্ম্ম হ'ল?'

'একে তুমি কামনা বল অনিরুদ্ধ?' বিকাশ আবার প্রতিবাদ জানালে।

'একশ' বার বলব।'—অনিরুদ্ধ তেমনি রেগেই বলে উঠল 'পিওর এণ্ড সিম্পল প্যাশন এণ্ড নাথিং এল্‌স। মেয়েটির নাম কি বল ত?'

অনিরুদ্ধ সহসা 'বল্‌' ছেড়ে 'বল' বললে—বিকাশ লক্ষ্য করল তা। কেমন একটা সন্দেহও জাগল মনে।'

হয় ত উঠে গেলেই ভাল ছিল। কিন্তু এমনই এক তীব্র দৃষ্টিতে অনিরুদ্ধ চেয়ে রইল তার দিকে যে উত্তর না দিয়েও উপায় ছিল না। আবার পাছে সে কথার প্রতিক্রিয়া তার হৃদয়ের কোন দুর্ব্বল কোণে গিয়ে আঘাত করে সেই ভয়ে বিকাশ মাপ চেয়ে বললে—'এটুকুই বলতে পারব না, ভাই। মাপ করিস আমায়।'

'বলতে পারবে না?'

বাধা পেয়ে সহসা অনিরুদ্ধ যেন উন্মাদ হয়ে গেল। তড়িদ্‌গতিতে পাশের ঘরে ঢুকেই দেয়াল থেকে একখানা ফটো খুলে এনে ছুঁড়ে দিলে এ ঘরের মেঝের উপর—'দেখ, সেই কিনা।'

ফটোখানা উল্‌টে পড়ে রইল মেঝেয়, খান খান হয়ে ছিটিয়ে গেল ছবির কাঁচ, কোন এক রাতের যুঁইফুলের শুকনো সোহাগ-মালা গড়িয়ে গেল ধুলোর উপর। বিকাশ হতচকিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে তাই দেখলে, যেন কিছুই আর করবার নেই, বলবার নেই।

'দাঁড়িয়ে দেখছ কি দেখে যাও তাকে।'

কি নিষ্করুণ ভাষা, কি রূঢ় বলবার ভঙ্গী! বিকাশ আর স্থির থাকতে পারলে না। চট করে ফটোখানা হাতে তুলে না চেনবার ভান করে বিস্ময় প্রকাশ করলে—'ছিঃ ছিঃ, এ তুমি কি করলে অনিরুদ্ধ! এঁকে আমি চিনব কি করে?'

তবু সন্দেহ গেল না অনিরুদ্ধর। বললে—'তবে নাম লুকোচ্ছ কেন?'

ছবির তলায় লেখা নামটা পেয়ে বিকাশ যেন বেঁচে গেল। বললে—'নাম লুকোনোর অন্য কারণ ছিল তাই, কিন্তু আর দরকার নেই। তার নাম ছিল কমলা, ইনি দেখছি সরিতা, আমার বৌদি!'

অনিরুদ্ধ এবার ভেঙে পড়ল। বিকাশের কণ্ঠ জড়িয়ে রুদ্ধ গলায় বললে—'একটিমাত্র বিশ্বাসের জোরে আজও বেঁচে আছি বিকাশ, এ বিশ্বাস ভাঙলে কাল আর বাঁচব না।'

বিকাশ তাকে বুঝিয়ে ফটোখানা যথাস্থানে টাঙিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। তার মনে এইটুকুই সান্ত্বনা—ছলনা দিয়ে সে আর একজনকে বাঁচিয়েছে আজ।

এত আঘাতেও সরিতার মুখে তেমনি ক্ষমার হাসি—এতটুকু ম্লান হ'ল না।
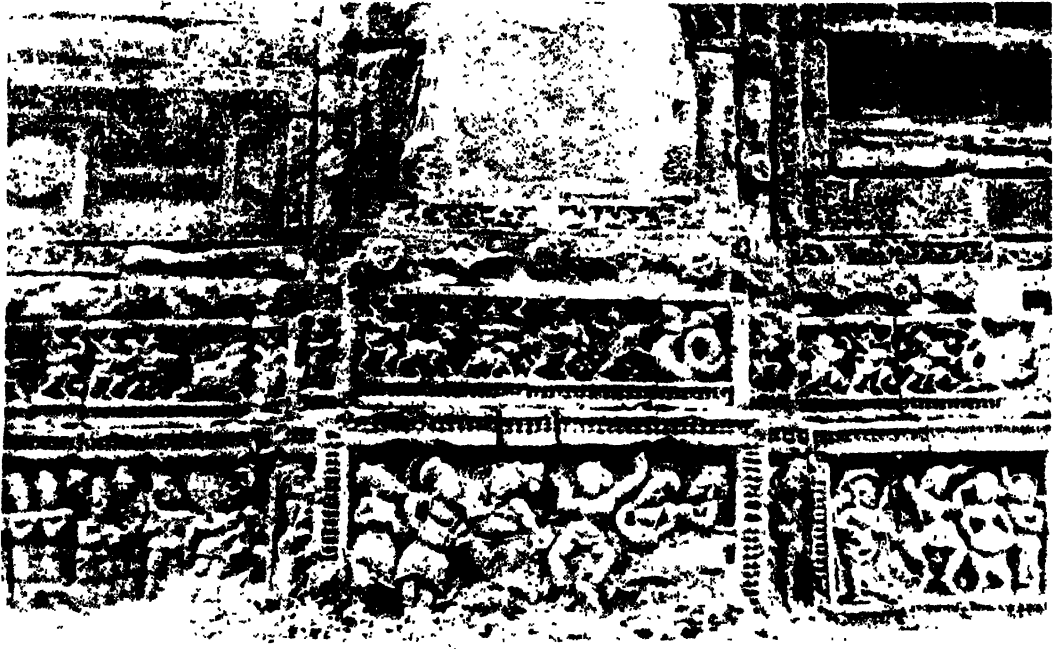
প্রাচীন মন্দির-গাত্রে পোড়ামাটির কাজ

বাংলার মৃৎশিল্প

শ্রীঅমল বিশ্বাস

বাংলার মৃৎশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ঐ শিল্পে প্রাচীন বাংলার দানের কথা উল্লেখ করতেই হবে। সঙ্গীত ও সাহিত্যের মত শিল্পচর্চ্চার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাংলা যে পিছিয়ে ছিল না—তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন শিল্প-সংগ্রহশালায় রক্ষিত তদানীন্তন শিল্প-নিদর্শনগুলি থেকে অন্ততঃ ঐ কথাই প্রমাণিত হয়। তবে বাংলার মৃৎশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসের সম্যক পর্য্যালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কাজেই সংক্ষেপে প্রাচীন ও বর্ত্তমান বাংলায় ঐ শিল্পের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

এ কথা সত্য যে, বর্ত্তমানে শিল্পের Theory বা উপপত্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে নানা ভাষায় শিল্পসম্পর্কিত আলোচনা প্রসারলাভ করছে, এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রও স্থাপিত হয়েছে—শিল্পচর্চ্চার সেই সকল উপকরণ আজ সহজলভ্য, প্রাচীন বাংলায় যেগুলির বিশেষ অভাব ছিল। বাংলা দেশের মৃৎশিল্পের প্রাচীন নিদর্শনগুলি পর্য্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায়—তখনকার দিনে শারীর-স্থানের (Anatomy) সূক্ষ্ম মানদণ্ডে শিল্পবস্তুকে বিচার করার জন্ত শিল্পীরা ততটা আগ্রহশীল ছিলেন না, যতটা ছিলেন শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব-বিকাশের প্রয়াসে। তাই বলে প্রাচীন বাংলার শিল্পকলায় 'এনাটমি'র নামগন্ধ একেবারেই ছিল না এমন নয়, তবে শিল্পসৃষ্টিতে ভাবের প্রাধান্তকেই ঐকান্তিক ভাবে বরণ করে নিতেন তদানীন্তন শিল্পী বা পটুয়ারা। এই ভাবের প্রাধান্তই ভারতীয় শিল্পকলার বীজমন্ত্র। বাংলার শিল্পসাধনাও এই মন্ত্রে সঞ্জীবিত। 'সুজলা সুফলা শস্তশ্যামলা' বাংলার একান্ত নিজস্ব ভাবময় পরিবেশ বাঙালীকে করে তুলেছে ভাবপ্রবণ, বঙ্গ-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তার এই ভাবপ্রবণতার ছাপ রয়ে গেছে। ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির পার্থক্য আছে—তা স্বকীয় ও স্বতন্ত্র।

প্রস্তর সকলের পক্ষে সহজলভ্য নয়, তা ছাড়া প্রস্তরকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে শিল্পসৃষ্টিতে সময় এবং মেহনত দুই লাগে প্রচুর; তাই স্থায়িত্ব কম হলেও প্রাচীন বাংলায় মৃৎশিল্পের বেশ চলন ছিল। বাংলার মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে বানগড় ও তমলুকের মাটির মূর্ত্তি ও খেলনার উল্লেখ আছে। ঐ সকল মূর্ত্তি ও খেলনায় খ্রীঃ পূঃ প্রথম থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের শিল্পসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বল্প সময় ও স্বল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হলেও 'Terra-Cota' বা পোড়ামাটির প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনগুলি গঠন-কৌশলে ও রূপবৈচিত্র্যে সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের কতকগুলি নমুনা (পোড়ামাটি)
[ফোটো—শ্রী অৰ্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের আর একটি নমুনা (পোড়ামাটি)
[ফোটো—শ্রীঅৰ্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

বাংলার বিভিন্ন স্থানের পুতুল-শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন
[ফোটো—শ্রীঅৰ্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

হওয়ার যোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, আশুতোষ মিউজিয়ম ইত্যাদি শিল্প-সংগ্রহশালার পোড়ামাটির ঐ ধরনের অনেকগুলি সার্থক শিল্প-নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। সাধার মূর্ত্তি, পুতুল ইত্যাদি ছাড়া শাস্ত্র বা পুরাণের উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন মন্দিরগাত্র ও অলিন্দে পোড়ামাটির বহু শিল্পসম্ভার রচি হয়েছে। ঐ সকল কাজে শিল্পীরা কখন ছাঁচ ব্যবহার করেছেন, কখন হাতের সাহা নিয়েছেন, আবার কখনও-বা উভয়ে সহায়তায় শিল্পসৃষ্টি করেছেন। ত গুপ্তযুগের কাজে ছাঁচেরই প্রাধান্য পরিলক্ষি হয়। প্রাচীন পুতুলের মধ্যে নারীমূ আধিক্য দেখা যায় এবং ঐগুলির অ

কাংশই যৌবনের লাবণ্যে লীলায়িত। আঙুলের সাহায্যে শিল্পীরা যে সকল মূর্তি গড়েছেন সেগুলিতে দেহের লাবণ্য অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে। পুতুলগুলির মাথা সাধারণতঃ ছাঁচে তৈরি করে দেহের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সংলগ্ন করা হয়েছে। পোড়ানোর

বিচিত্র মুখাবয়ব (পোড়ামাটি)
[ফোটো—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক
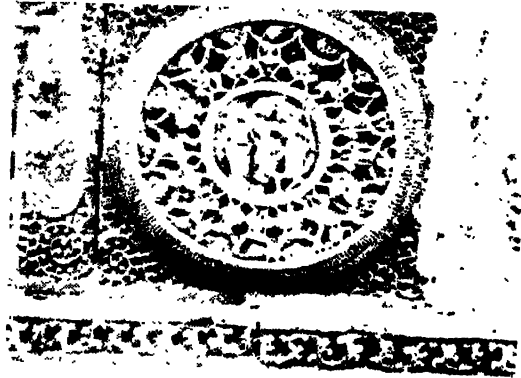
প্রাচীন মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ

তারতম্য অনুসারে পোড়ামাটির কাজ লাল, কালো, ধূসর বা তামাটে বর্ণ ধারণ করে। ঐ কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—রঙের ব্যবহার না করে কেবলমাত্র গঠন-কৌশলে শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা। অবশ্য স্থানবিশেষে পোড়ামাটির কাজে উজ্জ্বল লাল বা কালো রঙের ব্যবহারও দেখা যায়।

বর্তমান বাংলায় মাটির কাজে কৃষ্ণনগরের দান উল্লেখযোগ্য। মূর্তিনির্মাণ ছাড়া 'নেচারাল কালার' অর্থাৎ স্বচ্ছ রঙে রাঙানো এখানকার 'মডেল' শিল্পসামগ্রী ভারতের তথা বিশ্বের শিল্প-রসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কথিত আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা মৃৎশিল্পীদের নিয়ে কৃষ্ণনগরে একটি স্থায়ী শিল্পী-বসতি গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য একথাও শোনা যায় যে, তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতার 'রাজা-মহারাজা' অর্থাৎ বড় বড় জমিদার-বাড়ীগুলিতে ধীরে ধীরে মূর্তিপূজার প্রচলন হতে থাকায় কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা দলে দলে চলে আসেন কলিকাতার কুমারটুলী অঞ্চলে। মূর্তিশিল্পের মেহনতি কাজে অধিকতর পসার জমানোর বাসনায় ক্রমে ক্রমে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে এবং যে স্থানটি ছিল বনজঙ্গলে পূর্ণ, কালক্রমে সেখানে আজকের কুমারটুলীর জনাকীর্ণ শিল্পী-বসতিটি গড়ে উঠে। বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিনির্মাণে কুমারটুলী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে; তবে অর্থোপার্জনের তাগিদে

দ-শিল্প—জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি [ফোটো—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

এখনকার শিল্পে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এদিক দিয়ে কুমারটুলীর অনেক মৃৎশিল্পী আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ছেন বলে বোধ হয়। পোড়ামাটির কাজে বাঁকুড়ার নামও উল্লেখযোগ্য। নানারূপ জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি (হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি) নির্মাণে ঐ স্থানের শিল্পীরা বেশ কৃতী। ঐ সকল শিল্পবস্তুর বিশেষ ঢঙ বা গঠন-বৈচিত্র্যের সঙ্গে অপরাপর স্থানের মৃৎশিল্পের বেশ খানিকটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এর অধিকাংশ চাহিদামত ছাঁচের সাহায্যেই তৈরি করা হয়। রঙীন পুতুল বা অপরাপর মৃৎশিল্পে বিষ্ণুপুর, মজিলপুর, চাঁদপাড়া,সিঙ্গুর,বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের নাম করা যেতে পারে।

অধুনা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মৃৎশিল্পের এক সঙ্কটময় অধ্যায় চলেছে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পোৎপাদনে প্লাষ্টিক ইত্যাদির ব্যাপক প্রসারের ফলে মৃৎশিল্পের চলন কমে আসছে। তবে ভারত তথা বাংলার মানব-সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে মৃৎশিল্পের দান অনস্বীকার্য্য। বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের দিনে সস্তায় সৌখীন শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের দরুন রুচিবোধের তারতম্য ঘটছে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে এই বিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নয়। আজ কেন—আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে মৃৎশিল্পী বা পটুয়ারা বরাবরই কেমন যেন অপাংক্তেয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে; ঐ শিল্পীকুলের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বীকৃতিটুকু পেতে আর কত দেরি?

সত্যব্রতা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

পুরী উপান্তে ঘন শালবনে সাতশ' ভিক্ষু সাথে
এলেন বুদ্ধ পূর্ণিমা-দিনে ভিক্ষাপাত্র হাতে।
মাথার উপরে ফুলতরু যত
পুষ্পবৃষ্টি করে অবিরত
নগর ছাড়িয়া পুরবাসী শত ছুটিয়া চলেছে বনে।
শুদ্ধোদনও পথচারী হন রাণী গৌতমী সনে।

তৃতীয় দিবসে শাক্যসিংহ মহানগরীতে আসি'
ভ্রমেন ভিক্ষা চাহিয়া চাহিয়া সকলেরে ভালবাসি';
মহাশ্রেষ্ঠও পায়সিক' যারে
বহুদিন যেচে আপন আগারে
সে-জন ভিখারী-কুটীর-দুয়ারে অন্ন যাচেন হাসি'।
স্থবিরেরা সবে থমকি থামেন চণ্ডাল-দ্বারে আসি'।

কপিলাবাস্তু প্রাসাদ সৌধে পড়েছে খুশীর সাড়া।
অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ হ'ল উৎসবে দিশেহারা।
ভিতর মহল হইল উজাড়
আঙিনায় ভিড় কুল-ললনার
বোধিসত্ত্বের কৃপা-কণিকার ভাগী হতে চান তাঁরা।
বহু দিন পরে ফিরেছেন ঘরে কুমার সে ঘরছাড়া।

এলেন বুদ্ধ, ক্ষমা-সুন্দর, সম্ভাষি' জনে জনে।
বহান প্রীতির মন্দাকিনীরে মধুর মিলন-খনে।
জিজ্ঞাসু চোখ চাহে বার বার
পায় না খবর সে যশোধরার
সতীর মতন সে কি আজো তাঁর অনুবর্ত্তন করে?
চীনাংশুকের বসন ছাড়ি কি কঠিন কাষায় পরে।

ভিতর ভবনে গেলেন দণ্ডী সারিপুত্রের সাথে
চলে অনুসরি' মৌদ্গল্যান চারু ভৃঙ্গার হাতে।
যশোধরা বসে ইষ্টের কাছে
স্বামী ও সত্য এক হয়ে আছে
ছিন্ন কেশের চিহ্ন যে বাঁচে চন্দন-পেটিকায়।
রাজবালা পতি-পাদুকা পূজেন সত্যের সাধনায়।

প্রতিজ্ঞা তাঁর, 'সত্যই যদি হই সহধর্ম্মিণী
কোন এক দিন বোধিসত্ত্বকে লইতে হইবে চিনি।
আসিতে হইবে পুরীর মাঝারে
ভাগ্যহীনার পূজা লইবারে
নহি দ্বিচারিণী, কহি বারে বারে, রেখেছি ধর্ম্মে মতি
চক্ষে আমার এক হয়ে আছে পতি ও জগৎপতি।'

পূজা শেষ করি' যশোধরা যেথা দানিছেন অঞ্জলি,
স্থবিরদ্বয়ের সঙ্গে বুদ্ধ সেথায় গেলেন চলি।
দাঁড়ান বাড়ায়ে যুগল চরণ
পড়িল চরণে পুষ্পাভরণ
অঞ্জলি দিয়া করিল বরণ যশোধরা বুদ্ধেরে।
সত্যব্রতা সম্মুখে আজ স্বামী আসিয়াছে যে রে।

কহেন বুদ্ধ, দেবী যশোধরা সার্থকনামা তুমি,
তোমার যশের বিভায় দীপ্ত হয়েছে ভারতভূমি।
তোমার নিষ্ঠা, সাধনা তোমার
মুগ্ধ আমারে করে বার বার
তব সহায়তা অজ্ঞানতার আঁধার দিয়াছে নাশি।
বুদ্ধের চোখে বোধির আলো কে উঠে তাই উদ্ভাসি।

কৃষ্ণ-বলরাম লীলা শিল্পী—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাসের চিত্রকলা

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

গত ৭ই এপ্রিল কলিকাতার বেলভেডিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে অধ্যাপক শ্রীযুত হুমায়ুন কবীর যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রকলার একটি বিভাগ ছিল, এবং এই চিত্রগুলি সমস্তই শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাসের আঁকা। বাংলার একটি নিজস্ব ধারা এই চিত্রগুলির মধ্যে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রদর্শনী দেখতে দেখতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি চিত্রগুলির প্রশংসা করেন। শিল্পী মহীতোষ দীর্ঘদিন গ্রামে থেকেই শিল্পচর্চা করেছেন, শহরের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ ছিল না। তাই তাঁর চিত্রকলার সঙ্গে এত দিন শহরের বিশিষ্ট শিল্পরসিকের কোন পরিচয় ঘটে নি। সেই পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সত্যই একটা ভাল কাজ করেছেন।

শিল্পীর আঁকা প্রায় কুড়িখানি চিত্র প্রদর্শনীতে ছিল। বেশীর ভাগ ছবির বিষয়বস্তু দেবদেবী হলেও গ্রামের কৃষক, ফুল, পাখী, লতাপাতা শিল্পীর রচনাতে ধরা পড়েছে। এই সকল চিত্রের মধ্যে বর্ণলেপনের এমন একটি কৌশল আছে যা চোখকে গভীর তৃপ্তি দেয় এবং বিষয় বস্তুর মর্মকথা ব্যক্ত করে। চিত্রগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, মাতাপুত্র, লক্ষ্মী, সিংহবাহিনী, দেবী দুর্গা ও কৃষক উচ্চ শ্রেণীর রচনা বলে আদৃত হতে পারে।

শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাসের চিত্রকলা সম্বন্ধে শিল্পীর নিজের মুখের কয়েকটি কথা বলা খুবই প্রয়োজন মনে করি। আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পী বললেন ঃ

"আমি বাল্যকাল থেকেই ছবি আঁকছি। বাল্যকালে আমার পরিচয় হয় কালনার দুই জন পটুয়ার সঙ্গে। গুরু হিসাবে এঁদের কাছেই আমার হাতেখড়ি হয়। কিন্তু তখনকার দিনে এই সব অশিক্ষিত পটুয়াদের কাজ দেশের লোকের কাছে তেমন প্রশংসা পেত না। কাজেই কিছু লেখাপড়া শেখার পর আমি "সোসাইটি"তে পূজনীয় ক্ষিতীন্দ্র-নাথ মজুমদার মহাশয়ের কাছে ছবি আঁকা শিখতে এলাম। শিক্ষা শেষ হলে আবার গ্রামে ফিরে গেলাম। কিন্তু আমার অন্তর থেকে বাংলার পটের কথা গেল না। আমার অনেকগুলি ছবি নিয়ে ১৯৪৫ সনে প্রবর্তক সংঘ কলকাতায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। এই প্রদর্শনীতে এক দিন প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক যামিনীকান্ত সেন মহাশয় এলেন। তিনিই আমাকে প্রথম পটের পদ্ধতিতে আঁকা আমার স্বকীয় ধারাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট উৎসাহও দিয়ে-ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—'এ পথে বহু বাধা আসবে, কিন্তু এ পথ ছেড়ো না, একদিন আসবে যখন দেশের লোক

তোমাকে চিনবে, তোমার কাজ বুঝবে এই আশা নিয়েই আমি শিল্পচর্চা করছি। দারিদ্র্যরাক্ষসী আমার পিছনে থেকে আমার পথভ্রান্তির চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তা পারে নি। আমি আজও আশা নিয়ে আমার পথে এগিয়ে চলেছি। যাঁরা বাংলার পটচিত্রের মধ্যে শুধু একটা "পল্লী ধারা" দেখেন—আর কোন রসের সন্ধান পান না, তাঁরা ভালবেসে বাংলার এই অপূর্ব শিল্পসম্পদকে ভাল করে দেখেছে বলে মনে হয় না। আমি জানি, যে শিল্প ভাবপ্রকাশে সক্ষম সেই শিল্পই স্বীকৃতির দাবি রাখে।

তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। তা হচ্ছে এই যে, 'পট' বলতে যাঁরা আজও সেই 'কালীঘাটের পটে'র কথা মনে করেন আমি যে সেই 'পটচিত্র' পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছি তা

জাতীয় গ্রন্থাগারে শিল্পী শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস (ডান দিকে দণ্ডায়মান)

নয়, পট অর্থ এখানে চিত্র। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলাতে পটুয়ার বাস ছিল, তাঁদের আঁকবার ধারাও রকমারি ছিল। কিন্তু এই সব চিত্রের হুবহু নকল করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না, তাই কতকটা নূতন অঙ্কনরীতি প্রাচীন পটচিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে বহুদিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি নূতন রূপ দানে সক্ষম হয়েছি। আমার চিত্রকলার রূপ যাতে সর্বজনের মনোরঞ্জন করতে পারে সেই দিকে আমি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়েছি।

আজকাল দেখি, শিল্পীদের মধ্যে কাজের পদ্ধতি বা রীতি নিয়ে বেশ দলাদলি, মনকষাকষির ভাব আছে। আমি থাকতাম গ্রামে, এ সবের কোন ধার ধারি নি, এখনও নয়। কারণ আমি বুঝি, শিল্পীর রচনার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেই শিল্পীর স্বীকৃতি, খ্যাতি যা কিছু, তা যে পদ্ধতির কাজ হোক না কেন।

কালী ভজি কি কেষ্ট ভজি তা বড় কথা নয়, আলোচনার কথা নয়। আমি ভক্ত না সত্যকারের সাধক, তা দেখা দরকার।

কিন্তু সাধনা ছেড়ে যদি শুধু কালী বড় কি কেষ্ট বড় এই নিয়ে শাক্ত আর বৈষ্ণবে তর্ক মারামারি হয়, তবে সত্যকার ঈশ্বর সাধনা কারও হবে না।

চিত্রকলা ক্ষেত্রেও আমি এই কথা ভাবি। সেজন্য বাংলার প্রাচীন চিত্রধারাকে ভিত্তি করে আমার নিজস্ব অঙ্কনরীতিকে গড়ে তুলেছি। আমার ছবি রসোত্তীর্ণ হ'ল কিনা সেইটুকু দেখার ভার শিল্পরসিকের।"

লক্ষ্মী শিল্পী—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

নিমাই পণ্ডিত শিল্পী—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

শিল্পীর এই কথাগুলিতে তাঁর শিল্পসাধনা সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। আজ বাংলার চিত্রকলা ক্ষেত্রে বড় দুর্দিন। অধিকাংশ শিল্পী অর্থাভাবে জর্জরিত সুতরাং অভাবের তাড়নায় সত্যকার শিল্পচর্চা ছেড়ে ব্যবসায়ীর জন্য কমার্শিয়াল আর্টের দিকে তাঁদের মন দিতে হয়। এরই মধ্যে যাঁরা সত্যকার শিল্পীমন নিয়ে, অন্তরের তাগিদে নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে শিল্প সৃষ্টি করছেন তাঁদের কাছ থেকেই আমরা কিছু রসের সন্ধান পাচ্ছি। এই সব সাধক-শিল্পী যে দেশের গৌরব ও সকলের ভালবাসা পাবার যোগ্য তা অবশ্যই বলা যায়। নন্দলাল, যামিনী রায়ের পথে উত্তরকালে আমাদের দেশে যে কয়জন শিল্পী আপন সাধনার দ্বারা দেশে শ্রেষ্ঠ আসনের দাবি রাখেন তাঁদের ধারা সার্থক ভাবে বহন করে চলেছেন শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বাংলার নিজস্ব শিল্পশৈলী শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাসের চোখে দেখা দিয়েছে ও তুলির টানে দিয়েছে। বাংলা ভাষার মত বাংলার শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, যাঁরা এই শিল্পসাধনায় রত তাঁদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে. উৎসাহ দিতে হবে। শিল্পী মহীতোষের চিত্রকলা বাংলার নিজস্ব সম্পদ বলা ত বাহুল্য মাত্র।'

দীননাথ দে

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র

পৃথিবীতে এমন একশ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা জনতার মাঝখানে আপনার কর্মকৃতির জন্ম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত সমুজ্জ্বল থাকেন; স্তুতি আর প্রশংসার সমারোহে ইতিহাসে রেখে যান তাঁরা স্বাক্ষর। তেমনি আর একদল আছেন যাঁরা পাণ্ডিত্যে, ব্যক্তিত্বে আর আচরণে মহোত্তমের পর্য্যায় উন্নীত হয়েও পরিহার করে চলেন মানুষের ভিড়, অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা থেকে দূরে তাঁরা জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন।

আজ যাঁর কথা লিখছি তিনি শেষোক্ত দলের। তাঁর জীবন আলোচনার মধ্যে দেখতে পাই মনীষী চরিত্রের আলোকচ্ছটা।

ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জাগরণের শুভ লগ্ন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ তখন বাংলার কুসংস্কারসর্বস্ব জড় জীবনে প্রাণবন্যা এনে দিয়েছে; অন্ধ বিশ্বাসের জায়গায় ক্রমশঃ স্থান পাচ্ছে প্রবল যুক্তি। তৎকালীন বাংলা দেশের সূর্যকরোজ্জ্বল সামাজিক আব-হাওয়ায় যাঁরা বেড়ে উঠলেন তাঁদের মননধারা স্বচ্ছ হয়ে উঠল—জীবনকে তাঁরা অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে সুরু করেন।

এই ষষ্ঠ দশকেই (২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬২) দীননাথ দে কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন; "সরকারবাড়ী লেন" নামে বর্ত্তমানে বাগবাজারে যে রাস্তা আছে তা তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটের উপর দিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন দীননাথের পূর্বপুরুষের সম্পূর্ণ পদবী ছিল "দে সরকার।" এঁর পিতা শ্যামচাঁদ দে তৎকালীন বাংলা সরকারে কাজ করতেন। বাল্যকালে দীননাথের পড়াশুনা অন্যান্য সাধারণ ছেলেদের মতই এগিয়ে গিয়েছিল; পিতা শ্যামচাঁদ দে আপনার কর্মে ব্যাপৃত থাকতেন বলে পুত্রের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহশীল হলেও ইচ্ছানুরূপ উৎসাহ দিবার অবকাশ পেতেন না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দীননাথ ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, গঙ্গায় স্নান করা ছেলেবেলায় তাঁর এক বিশেষ নেশা ছিল। খড়ের বড় বড় নৌকার উপর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার মধুর স্মৃতি শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মনে গাঁথা ছিল। দীননাথ ধনীর সন্তান ছিলেন না; তাই পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে আপনার একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কাছে থেকে পড়াশুনা চালাতে হয়েছিল। জীবনের এই সঙ্কটময় অবস্থায় তিনি আপনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প করেন।

দীননাথ দে

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হবার পর তিনি জেনারাল এসেম্বলীতে অধ্যয়ন সুরু করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞানতপস্যা সুরু হয়। কেবল পাঠ্য পুস্তক নয়, অন্যান্য বহু মূল্যবান এবং পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পুস্তকও পড়তে আরম্ভ করেন। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের এই সংযোগ, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মননধারার সঙ্গে এই পরিচিতি তাঁর মনে নতুন আলো জ্বেলে দেয়। বাংলার ধর্মীয় আকাশ তখন ব্রাহ্মধর্মের উদারতা আর হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামীর সঙ্ঘাতে ভারাক্রান্ত; যুবক দীননাথ বাহ্যিক অনুষ্ঠানসর্বস্ব হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেন ও তিনি ব্রাহ্মধর্মে অনুরক্ত হন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রচণ্ড বিরোধী হওয়ায় ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তিনি সংযোগ রক্ষা করতে পারেন নি।

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা তাঁর মনে কোন রেখাপাত করে নি; উপরন্তু প্রতিমা পূজার আজীবন তিনি নিষ্করুণ সমালোচনা করে গেছেন, বিরূপতার জন্য আত্মীয়, বন্ধু সকলেরই কাছ থেকে তিনি নিন্দা কুড়িয়েছিলেন, কিন্তু নিজের যুক্তিতে অটল ছিলেন। এ সম্পর্কে ১৯২৭ সনে তাঁর এক চিঠির উদ্ধৃতি লক্ষণীয়:

"আমাদের ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ, তার পর উপনিষদ ও দর্শনের যুগ, তার পর বৌদ্ধ যুগ, এই তিন যুগে প্রতিমা গড়ে দেবতা বলে পূজা করার কোন বালাই ছিল না। সে সব যুগে এদেশে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছিল তা এখনও পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেয়। বৌদ্ধদের অধঃপতনের সময় থেকেই মূর্ত্তি গড়া আরম্ভ হয়েছিল। তারা স্তম্ভ স্তূপ এই সব থেকে সূত্রপাত করে ক্রমে ধ্যানী বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ, তারাদেবী, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি মূর্ত্তি কল্পনা করে পূজা করতে আরম্ভ করে দিলে এবং তন্ত্রশাস্ত্রকে তার উচ্চাসন থেকে নামিয়ে বীভৎস আকারে পরিণত করে পাপের স্রোত বহাতে লাগল।...পুরাণকাররা একেবারে সস্তায় মুক্তির ব্যবস্থা করে লোকদের সহজেই হস্তগত করতে পেরেছিল। সাধনা, চিত্তশুদ্ধি, রিপুদমন, আর্ত্তসেবা, পরার্থপরতা, সমদর্শিতা এ সবের জন্য মাথা ঘামাবার দরকার নেই, তুমি একটুকরা পাথর বা পুরাণকারের কল্পিত একটি রকমারি পুতুল এক ঘরে রেখে দাও আর এক ব্রাহ্মণকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত কর এবং সেই ব্রাহ্মণের আহারের জন্য প্রাত্যহিক ভোগের বন্দোবস্ত করে দাও তোমার বেতনভোগী সেই ব্রাহ্মণই তোমার মুক্তির পথ প্রস্তুত করতে থাকবে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।" ১৯২৭ সনের তাঁর মতবাদ ১৯৫৫ সনেও অটুট ছিল। সাম্প্রতিক এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "পূজার অর্থ হচ্ছে উপাসনা আর আরাধনা—একটা প্রতিমাকে আর আরাধনা উপাসনা কি করে করা হবে, ওতে কেবল কতকগুলি অর্থহীন আচার পালন করতে হয়...মূর্ত্তি পূজা প্রকৃত পূজা নয়।" সীমাহীন অনন্তকে সামান্য প্রতিমা রূপে কল্পনা করা তাঁর যুক্তিবাদী মনের বিপরীত ছিল। অন্তরে ঈশ্বরের অনুভূতির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বহু সময় তিনি রামপ্রসাদের গানের কথাটি বলতেন—"ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে, তুই মনোময় মূর্ত্তি গড়ে বসা হৃদি পদ্মাসনে।"

সাহিত্য আর ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। নিয়মিত পড়াশুনায় তিনি ভরিয়ে রেখেছিলেন সুদীর্ঘ অবসর। শেক্সপীয়র, মিলটন, পোপ, ড্রাইডেন থেকে সুরু করে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সকল সুসাহিত্যিকের রচনাই তাঁর নখাগ্রে ছিল। কেবল পড়া নয়, তিনি পঠিত বিষয় স্মরণে রাখার অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শেক্সপীয়রের রচনার উদ্ধৃতির পরমুহূর্ত্তে অনায়াসে তিনি ভারতীয় প্রাচীন এবং নবীন কবি সাহিত্যিকদের রচনাংশ উদ্ধৃত করতেন। শয়ন ঘরের আলমারী তাঁর সাহিত্য, দর্শন আর ইতিহাসের বইতে পূর্ণ থাকত, ছাত্রসুলভ কৌতূহল আর তপস্বীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে গেছেন। সাহিত্যিকদের উপর তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। উদীয়মান সাহিত্যিকদের উৎসাহদানের কথা সাহিত্যিকপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "স্মৃতিকথা" পুস্তকের ২য় খণ্ডে লিখেছেন:

"ভাগলপুরে পৌঁছে ওকালতি ব্যবসায়ের উদ্যোগপর্ব্বে মনোনিবেশ করলাম; সেজদাদার পরামর্শে কয়েক জন বড় বড় উকিল এবং দু'চার জন হাকিমের সঙ্গে দেখাশুনা করে বেড়াতে লাগলাম। উকিলরা অবশ্য অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন, শুভেচ্ছাও জানালেন; কিন্তু খুশিতে মন ভরে গেল দীননাথ দের নিকট হতে উচ্ছল অকপট অভ্যর্থনা লাভ করে। দীননাথ তখন ভাগলপুরের প্রথম সাবজজ, প্রখর বুদ্ধিশালী ব্যক্তি; সহজ সাবলীল বিচার নৈপুণ্যের গুণে উকীল, ব্যারিষ্টার, মক্কেল সকলের চিত্ত থেকে সমভাবে শ্রদ্ধা নিষ্কাশণ করেন। আমার নাম শুনে দীনবাবুর দুই চক্ষে কৌতূহলের রশ্মি দেখা দিলে। 'উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ নাকি আপনি?' ভারি বিপদে পড়া গেল, হ্যাঁ-ও বলতে পারিনে না-ও বলতে পারিনে। সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ নাম এখন না হয় কোন প্রকারে বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু তখনকার দিনে মাসিকপত্রে কয়েকটি গল্প ও কবিতা লিখে এবং 'সপ্তক' নামে সামান্য একটি গল্পের বই প্রকাশিত হওয়ার দাবীতে কি করে সাহিত্যিক আখ্যা গলাধঃকরণ করতে পারি। বেঙাচিকে বেঙ বললে বেঙাচির যে অবস্থা হয় আমার অবস্থা তার চেয়েও করুণ মনে হতে লাগল। কুণ্ঠস্বরে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অল্পস্বল্প, একটু-আধটু লিখে থাকি।' 'প্রতিক্রিয়া' ত আপনার লেখা? মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হালকা হলাম। তা হলে অন্তত দীননাথের মতে আমি 'সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ' বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ও লেখাটা আমারই।' আমার উত্তর শুনে খুশি হয়ে দীনবাবু বললেন, 'আনন্দের কথা, এখানকার উকীল মহলে একজন লেখক এসে যোগ দিলেন।' তার পর সাহিত্য বিষয়ে উকীলদের সাধারণ ভাবে ঔদাস্যের এবং অকৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বললেন, 'এ বিষয়ে হাকিমদের দিকটা কিন্তু খুব উজ্জ্বল।' উত্তরে আমি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন আইন-ব্যবসায়ী লেখকের নাম উল্লেখ করলাম। দীনবাবু বললেন, 'এঁরা সাহিত্যিক সে কথা মানি, কিন্তু যে সাহিত্য-গগনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্র, সেখানে এঁরা তারা ভিন্ন আর কিছুই নন্।' হালে পানি পাই না দেখে আমি মহাকবি মাইকেলের নাম করলাম। মৃদু হেসে দীননাথ বললেন, 'বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাস করে এসে মধুসূদন যদি কোন কিছু প্রমাণ করে থাকেন ত এই কথাই প্রমাণ করেছিলেন যে, আইন-ব্যবসায়ের তিনি কেউ ছিলেন না।' এই কঠোর সত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলাম।

বিদায়-গ্রহণ কালে দীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'দোসরা জানুয়ারী যোগ দিচ্ছেন ত?' বললাম, 'আজ্ঞে হাঁ, দোসরা জানুয়ারী।'"

ইতিহাসের প্রতি তাঁর যেমন একাগ্র কৌতূহল ছিল তেমনি অনৈতিহাসিক ঘটনাকে ঐতিহাসিক সত্যে রঞ্জিত করার বিরুদ্ধে তিনি একান্ত নিকটজনকেও প্রকৃত যুক্তি উত্থাপন করে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতে বিরত থাকতেন না। 'প্রবাসী'র পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় "আঁটপুর" শীর্ষক এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, উক্ত প্রবন্ধে লেখক আঁটপুর মিত্র-বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "কথিত আছে যে, বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর আদিস্যুর যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, পথে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরে যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত পাঁচ জন ক্ষত্রিয় কায়স্থও আনয়ন করিয়াছিলেন, ইঁহারা অসি, কবচ, ধনু প্রভৃতি ধারণ করিয়া যোদ্ধবেশে অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে আগমন করিয়াছিলেন।" এই প্রবন্ধ পাঠ করে দীননাথ দে লেখককে একখানি পত্র লেখেন এবং তা ১৩৬০ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়। উক্ত পত্র পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তার কতদূর ছিল। পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

"প্রবাসীতে তোমার আঁটপুর সম্বন্ধীয় লেখা পড়েছি। মিত্র-বংশের ইতিহাস লিখতে গোড়াতেই যে সূত্রপাত করেছ সেটা একটা চলতি গল্পের উপর নির্ভর করে লিখেছ, সে গল্পের উৎস কোন ঐতিহাসিক তথ্য নয়, কেবল ঘটকদের কুলজী গ্রন্থ, সে গ্রন্থের পনর আনা কল্পনাবিলাস এবং এক কিম্বদন্তির উপর রঙ ফলান। তুমি লিখেছ, 'কথিত আছে যে বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর আদিস্যুর…,' প্রথমতঃ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি শতাব্দ আদৌ ছিল না, ও অব্দ আরম্ভ হয় দশম শতাব্দ থেকে। মোগল সম্রাট আকবর যে দিন সিংহাসন আরোহণ করেন, সেই দিন হিজিরি অব্দ ছিল ৯৬৩, আমার যতদূর মনে হয়। সে সময়ে বঙ্গে মুসলমান আধিপত্য, সেইজন্য বঙ্গে সেই কি ৯৬৩ থেকে অব্দ চালু করা হয়। আকবরের সিংহাসন আরোহণ খ্রীষ্টাব্দ ১৫৫৬ সনে, তখন থেকে ৪০০ বৎসরের পরে বঙ্গাব্দ দাঁড়িয়েছে ১৩৫৯, আর হিজিরি অব্দ যদিও বঙ্গাব্দের সঙ্গে এক সংখ্যাতেই আরম্ভ হয় তবু এখন দাঁড়িয়েছে ১৩৭১-৭২, তার কারণ হিজিরি অব্দের বৎসরগুলি চান্দ্র বৎসর আর বঙ্গাব্দের বৎসরগুলি সৌর বৎসর, চান্দ্র বৎসর দশ দিন আগে শেষ হয়ে যায়, সেই জন্য ৪০০ বৎসরে উভয় অব্দের বর্ষ সংখ্যায় ১১।১২ বৎসর তফাৎ হয়ে গেছে, যা হউক এখন বুঝতে পারলে যে বঙ্গাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দী নামে কোন শতাব্দী ছিল না। বঙ্গে লক্ষ্মণাব্দ বলে একটা অব্দ প্রচলিত ছিল, শেষ সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন সেটা চালু করেন, বঙ্গাব্দ চালু হবার পর সে অব্দ লোপ পায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক দেব, তার পর সপ্তম শতকে বাংলা দেশে মাৎস্যন্যায় (anarchy) বা অরাজকতা ছিল, তার পর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও সামন্ত রাজারা অরাজকতা শেষ করার জন্য সকলে একমত হয়ে পাল-বংশীয় গোপালকে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক বলে নির্ব্বাচন করলে, তখন থেকে চার শত বৎসর যাবৎ পাল বংশীয়রা বঙ্গদেশের এক ছত্র সম্রাট ছিলেন। আদিশূর নামক কোন ব্যক্তি কখনও গৌড়েশ্বর ছিল না। শূর-বংশীয় একজন ক্ষুদ্র রাজা বা সামন্তর নাম পাওয়া যায়, তিনি রাঢ়ের এক অংশে রাজত্ব (তার নামটা এখন আমি ভুলে যাচ্ছি) করতেন, তার কন্যাকে বল্লাল সেন বিবাহ করেছিলেন। তুমি 'আদিশূর' লিখতে 'আদিস্যুর' লিখেছ, বংশটা শূর বংশ, স্যুর নয়। তার পর পশ্চিম থেকে ব্রাহ্মণ আনা সম্বন্ধে একটা সন্ধান পাওয়া গেছে, যে রাজা শশাঙ্ক ছয় জন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। চট্ট-বংশীয় ব্রাহ্মণ পাল বংশীয় রাজাদের আমলেও ছিল, পাঁচ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ ক্ষত্রিয় কায়স্থ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে ব্রাহ্মণদের শরীর রক্ষীরূপে এসেছিল, একটি উপন্যাসের উপযোগী বর্ণনা। আমার মনে হয় ক্ষত্রিয় কায়স্থ এ কথাটা তোমার নিজের উদ্ভাবিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় কেউ বলত না; কায়স্থ এক রাজকর্ম্মচারীর উপাধি। ইংরেজীতে যাকে সেক্রেটারী বলা যায় সম্রাট অশোক (খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতক) স্থানে স্থানে যে প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, তার একটা স্তম্ভ মধ্যভারতে আছে, তাতে রাজকর্ম্মচারীদের নামের তালিকা খোদিত আছে। সেই তালিকাতে একজন কর্ম্মচারীর নাম আছে কায়স্থ, বাস্তবিক কায়স্থ ছিল মসীজীবী ও হিসাব-রক্ষক, সেই কায়স্থকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে আগমন করছে বললে যাত্রার সং বলে মনে হয়। বাংলা দেশে জাত সৃষ্টি করা হয়েছিল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এই দুই পুরাণে, ঐ পুরাণদ্বয় একাদশ কি দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে লেখা হয়েছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রথম স্থান অবশ্য ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে, তার পর বৃত্তি অনুসারে ৩৬ জাত সৃষ্টি করা হয়েছে—যথা, কায়স্থ, করণ, বৈদ্য, কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতি, গন্ধবেনে, মালাকার, তেলি প্রভৃতি, তার পর বাকী অসংখ্য জন অন্ত্যজ অস্পৃশ্য, জল অনাচরণীয় এই সব। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দুই শব্দের নামগন্ধও ঐ দুই পুরাণে নাই। তার পর পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুনন্দন এক স্মৃতি লিখে জোর গলায় প্রচার করলেন, বাংলা দেশে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই দ্বিজ, আর সকল বর্ণই শূদ্র। যাক, ও সব অবান্তর বিষয় ছেড়ে এখন কথা হচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলার মিত্র বংশের আদিপুরুষ কে? তিনি কি কুলজী গ্রন্থের কল্পিত সেই ব্যক্তি যাকে তুমি রঙ চড়িয়ে ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বলে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করেছ আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেহরক্ষী (সোজা কথায় চাকর) বলেছ। আমার মতে ও রকম কল্পিত

অপমানসূচক বিবরণ দিয়ে আদিপুরুষকে উপস্থিত না করলেই ভাল হ'ত।"

৯১ বৎসর বয়সে লেখা এই চিঠি দেখে বিস্মিত হতে হয়, ৯০ বৎসর অতিক্রম করার পরও দেখেছি তাঁকে প্রচুর মূল্য দিয়েই ইতিহাসের বই সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতে। পরিণত বয়সে চিন্তাশক্তির এই প্রাখর্য দুর্লভ বস্তু।

কেবল যে বইয়ের ছাপা অক্ষরের মধ্যেই আপনাকে নিমগ্ন রাখতেন দীননাথ তা নয়। জীবনের সমস্যা, সমাজের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল বৈপ্লবিক মতবাদ থাকায় আত্মীয়স্বজন অনেকে আপন আপন যুবসুলভ সঙ্কল্প তাঁর কাছে জ্ঞাপন করত, কিন্তু তিনি অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করতেন। নিম্নে উদ্ধৃত পত্রাংশ তিনি তাঁর এক বিবাহবিমুখ নাতিনীকে লিখেছিলেন :

"বিবাহ সম্পর্কে তুমি যে মত পোষণ কর ওটা প্রাকৃতিক নিয়ম, সামাজিক নিয়ম ও নৈতিক বিধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। প্রকৃতির সমস্ত পদার্থ জড় বা চেতন, নিজেদের প্রকাশ ও বিস্তৃতি করার জন্যে ব্যাকুলিত, সেইটাই তাদের প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট স্বভাব, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া প্রকৃতির নিয়ন্তাপুরুষের অভিপ্রেত নয়। সমস্ত চেতন পদার্থ এক কোষবিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজম থেকে অসংখ্য কোষবিশিষ্ট মানুষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের জীবনের কাজ হচ্ছে propagation of species. এবং প্রকৃতিই সেই কাজ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং সেই কাজের প্রবণতা নিহিত করে দিয়েছে··· তার পর একাকী জীবন-যাপন করতে গেলে হৃদয় ক্ষেত্র অবশেষে মরুভূমিতে পরিণত হয়। যে পৃথিবী ত্যাগ করে লোকালয় ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করে তার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তারাই কি প্রকৃতির কাছে নিস্তার পায়, ভরত রাজার উপাখ্যান পড়, কবি Browning এর Paraclus পড়, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়, দেখবে প্রকৃতি শুষ্ক হৃদয়ের কি রকম প্রতিশোধ নিতে পারে।"

ঠিক তেমনি অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে তিনি অপূর্ব উদার ভাব অবলম্বন করেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি বলতেন :

"আমার দৃঢ় ধারণা যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত না হলে সমাজে মেয়েরা শুকিয়ে যাবে—যখন প্রতি গৃহে বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করি তখন মনে হয় যে, বিবাহের যে অসংখ্য গণ্ডী আছে সেগুলো জোর করে উৎপাটিত করে ফেলি, যাতে গৃহের মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে।"

১৪।৪।৫৬-এ কোন নাতির বিবাহ সম্পর্কে তিনি লিখছেন :

"কন্যা নির্ব্বাচন করতে গেলে নির্ব্বাচন ক্ষেত্র প্রসারিত করা প্রয়োজন এবং inter-caste marriage-এর উপর উন্নাসিকতা স্বাধীন ভারতে যুগোপযোগী হবে না।"

তাঁর জীবন দিগন্ত বিস্তৃত হওয়ার ফলে আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাও প্রচুর হয়েছিল, নিকট বা দূর কোন পার্থক্য-রেখা না টেনে সবাইকেই তিনি সমচোখে দেখতেন। নিজের ইচ্ছে কারোর উপর আরোপ করতেন না। সারা বৎসর চাকরবাকর এবং দু'এক জন নাতি-নাতিনী নিয়ে থাকতেন, কেবল ছুটির সময় দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয় অনাত্মীয় সবাই এসে তাঁর কাছে বিশ্রাম নিত। বাড়ীভর্ত্তি লোক, কিন্তু নিজের সময়ানুযায়ী কাজ তিনি করে গেছেন; স্বাবলম্বন তাঁর বিস্ময়কর ছিল; শেষদিন পর্যন্ত কারুর সহায়তা না নিয়ে কাপড় কোঁচান থেকে সুরু করে নিজের সব কাজ করে গেছেন।

বাইরে তিনি কঠোর ছিলেন, কিন্তু অন্তর ছিল ফুলের মত নরম। বাড়ীর পরিচারক-পরিচারিকাদের বেয়াদপিতে তিনি যেমন উগ্র হয়ে উঠতেন তেমনি তাদের অসময়ের অন্তরঙ্গ সহায়ক ছিলেন। তাঁকে দেখেছি পিতৃসুলভ উদ্বেগ নিয়ে অসুস্থ পরিচারকের দেহের তাপ পরীক্ষা করতে আর পরিচর্য্যার নির্দেশ দিতে। মধুপুরের বিভিন্ন বাড়ীর কলিকাতাস্থিত উদাসী মালিকদের সঙ্গে তিনি মালীদের বাকী মাইনে নিয়ে পত্রাদি লিখতেন। পাড়ার নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণের একান্ত নির্ভর ছিলেন তিনি। পাড়ায় চোর ধরা পড়লে পুলিসে দেবার আগে তারা ধৃত চোরকে "জজবাবুর" সামনে হাজির করত। তা ছাড়া মধুপুরে তাঁর বাড়ীতে কত আত্মীয় গুরুতর রোগ ভোগের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

জীবনকে তিনি ভালবেসেছিলেন আপনার অন্তর দিয়ে। রূপ রস গন্ধময় পৃথিবীর মর্ম্মমধু পান করার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯১৯ সনে জেলাজজ রূপে অবসর গ্রহণ করে শাল মহুয়ার দেশ মধুপুরে অবসর যাপনের ব্যবস্থা করেন। ঘরের চারপাশে ছিল স্বর্ণ চাঁপা, কুর্চী, ল্যাভেণ্ডার, আর কামিনী ফুলের ঝাড়—বাগানে ফুটে থাকত নানা রঙের ফুল দীননাথ নিমগ্ন থাকতেন সেই সুরভিত আবেষ্টনে, কাব্য কবিতা আর ইতিহাসের পাতায়। ফুলবাগান ছিল তাঁর অতি আদরের; যে দিন কোন ভাল গাছের চারা লাগান হ'ত, সেদিন হৈ হৈ পড়ে যেত, বাড়ীতে উপস্থিত যাঁরা থাকতেন তাঁদের তিনি গাছ পোতবার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ডেকে পাঠাতেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তাঁর লেখা থেকেই দিচ্ছি :

"মানুষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের বাউলরাও বলে, 'সবার উপরে মানুষ ভাই, মানুষ উপরে নাই।' বেদান্ত বলেন, 'সোঽহম্', সঃ (সেই ভগবান) অহম্ (আমি)। সব দেশের সব ভাবুক ও জ্ঞানীদের এক মত। অপরিমের বিলাসব্যসন অবশ্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, তাতে মেরুদণ্ড ভগ্ন করে দেয় এবং জীবনের কর্ম্ম-পালনে অক্ষমতা আনয়ন করে। কিন্তু তা বলে মোহমুদ্গরের

"কৌপীন বন্ত খলু ভাগ্যবন্ত" এ নীতিও অনুসরণীয় নয়, কবি প্রার্থনা করেছেন—

"এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
শব্দ বর্ণ গন্ধময়।"

বস্তুতঃ শব্দ বর্ণ গন্ধময় পৃথিবী উপভোগ না করলে জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, জীবনরস-রসিক যাঁরা তাঁরা নবীনের সাহচর্য লাভে উদ্‌গ্রীব থাকেন; দীননাথের মধ্যেও আমরা তার আভাস পাই; তিনি একবার বলেছিলেন "নবীনের সরসতা উপভোগ করবার বাসনা আমার বরাবরই প্রবল আছে। বালক-বালিকাদের সাহচর্য্য আমার বড়ই প্রীতিকর, তারা যেন ভগবানের হাত থেকে সদ্য নির্ম্মিত হয়ে এসেছে—পৃথিবীর আবর্জনা দ্বারা তাদের হৃদয় মন এখনও কলুষিত হয় নি, তাদের সাহচর্য্যে পৃথিবীর দ্বন্দ্ব কোলাহল বিস্মৃত হয়ে শান্তি লাভ করতে পারা যায়।"

এত জ্ঞান এত আত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার ছিলেন, কোনদিন আপনাকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হন নি। সম্প্রতি তাঁর এক নিকটজন তাঁর জীবন-চরিত রচনা সম্পর্কে উদ্যোগী হলে তিনি তাঁকে এই বলে নিবৃত্ত করেন:

"চাকরি জীবনে আরও কত লোক কত ভাল কাজ করে সাময়িক ভাবে কত লোকের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাভাজন হয়, সেজন্ত তাদের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করাবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। যে মনীষী ব্যক্তির জ্ঞান, চিন্তা এবং আচরণের দ্বারা সমসাময়িক সমাজ ও ভবিষ্যৎ সমাজ প্রভাবিত হতে পারে সেই ব্যক্তিরই জীবন-চরিত লিখিত হওয়া উচিত। আমি এক নগণ্য ব্যক্তি, আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন এমন দীপ্তি সম্পন্ন নয় যে সমাজের লোক চমৎকৃত ও প্রভাবিত হতে পারে। তোমরা ও কল্পনা পরিত্যাগ কর। তোমাদের শুভেচ্ছা অবশ্য আমাকে অভিভূত করেছে এবং উহাই আমার পাথেয়স্বরূপ।"

সব প্রশংসাই তাঁর কাছ থেকে বিনম্র প্রত্যাখ্যান লাভ করেছে। তাঁর অসীম জ্ঞানগরিমার ইঙ্গিত করায় তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন:

"আমার জ্ঞানের কথা লিখেছ আমি হলুম প্রজাপতি-ধর্ম্মী, নানা ফুলে মধু চেখে চেখে বেড়াই কিন্তু চক্র নির্ম্মাণ করে যে মধু সঞ্চয় করে রাখব এবং অপরকে বিলাব সে শক্তি আমার নেই, কারণ চক্র নির্ম্মাণ করার নিপুণতাই নেই, তবে অনেক মধু চাখতে গিয়ে দুই-এক ফোটা জিবে লেগে আছে তারই অল্প-স্বল্প কণা ক্ষরিত হয়, এবং তাইতেই যে তোমরা তৃপ্ত হও সেটা আমার গৌরবের বিষয়।"

পূতচরিত্র দীননাথ দে গত ২৮শে এপ্রিল মধুপুরেই তাঁর 'অরুণোদয়' ভবনে ৯৪ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মনকে কালের তালে এগিয়ে এনেছিলেন, তাই তিনি মানসিক দীনতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তেমনি পরিমিত আহার এবং নিয়মিত জীবন যাপনের ফলে তাঁর দেহ জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি। সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে এবং মুক্ত মনে তিনি চিরযাত্রা করেছেন। রেখে গেছেন বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং সর্বোপরি নানা স্থানের বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। মধুপুরে চিরস্মরণীয় স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর অতি নিকটেই দীননাথের বাড়ী ছিল। স্যর্ আশুতোষের সহিত তাঁহার সৌহার্দ খুবই ছিল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীননাথকে অতি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর মৃত্যু খবর পেয়ে রমাপ্রসাদবাবু বলেছেন, "He was an institution by himself"।

দীননাথের মৃত্যুও এক বিস্ময়ের বিষয়। কিছুদিন পূর্বে তিনি এক জামাতাকে লিখেছিলেন—"Drivelling dotard"-এর মত বেঁচে থাকতে চাই না। মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে তিনি সব কাজই নিয়মিতভাবে করেছেন, কিছুমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন নি, তাঁর নিকটে তাঁর অবিবাহিতা একজন দৌহিত্রী ছিলেন, তাঁর সহিত নানা রকমের কথাবার্তা বলেছেন তাঁর ঘরে চেয়ারে বসে পেন্সনের কাগজ সই করছিলেন—সেই সময় চেয়ারে বসেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, কেউ জানতে পারে নি।

দীননাথের 'প্রদীপ' ও প্রবাসীর সহিত আজীবন ঘনিষ্ঠতা ছিল—প্রবাসী তাঁর সঞ্জীবস্বরূপ ছিল, এবং প্রবাসীর প্রত্যেক প্রবন্ধ তিনি অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন। ১৯৫৩ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখের এক পত্রে তিনি তাঁর এক জামাতাকে লিখিয়াছিলেন:

"আমি কিছুদিন থেকে সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে 'খাদ্য উৎপাদন' পত্রিকায় তুমি সম্পাদকের নাম ছাপাবার সময় নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ আর যোগ করছ না। নিজের নাম বলবার সময় বা লেখবার সময় 'শ্রী' যোগ করা যে অনুচিত ভরসা করি তুমি সেটা উপলব্ধি করেই ঐ শব্দটি ত্যাগ করেছ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসী পত্রিকায় এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল তাতে লেখক নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন এবং সুযুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করেছিলেন যে ঐ রকম 'শ্রী' যোগ করা দাম্ভিকতার পরিচায়ক। আমি সেই অবধি শ্রী শব্দ যোগ করা ত্যাগ করেছি।

"উক্ত প্রবন্ধ ছাপা হবার কিছুদিন পরে শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ ছাপান, তাতে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের

প্রবন্ধ ছাপা হবার পরেই রবীন্দ্রনাথ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার ত্যাগ করলেন।"

আমরা পূর্ব্বোক্ত কথার পুনরাবৃত্তি করেই দীননাথের জীবনকথা শেষ করি—"He was an institution by himself'। তাঁর মত নিরহঙ্কার সতত-সজাগদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর প্রয়োজনীয়তা আজকার দিনে অত্যধিক।

নূতন প্রভাত

শ্রীলীলাময় দে

জীবনের মিথ্যা অবসাদ
হানে শুধু বাদ;
যারা চলে ছুটে চলে, আগামী যুগের পথে
নামায়ে চরণতলে অজস্র আলোর ধারা
অনন্তের রথে।
মোর গানগুলি
চুম্বিয়া তাদের চরণ-ধূলি
বারে বারে
ছিন্ন যেন পারে করিবারে
সে নিষ্ঠুর অবসাদ মায়াজাল যত।
চরণের যাহা কিছু ক্ষত
নাহি রহে তিলমাত্র শোণিতলিখায়;
নিঃশেষে মুছিয়া যেন যায়
আগামী যুগের যাত্রাপথগামীদের
নিঃশঙ্ক চরণের ক্ষীণতম ক্ষতচিহ্ন হতে
জীবন-সংগ্রাম পোতে
আছাড়িয়া পড়ে যদি উদ্ধত ঝড়ের হাওয়া,
ভেঙে দেয় হাল, হানে তীব্রাঘাত;
তবে ওরে যাত্রীদল, জানিও নিশ্চয়
সম্মুখে জাগিছে তব নূতন প্রভাত।

জীবন-অরণ্য

শ্রীশান্তশীল দাশ

জীবন-অরণ্য মাঝে ঘুরে ফিরি: গভীর আঁধার
বার বার একই পথ করি অতিক্রম!
ঘন কুজ্ঝটিকা ঘেরা সে পথের বাহিরে আসার
মেলে না নিশানা কোনো; ব্যর্থ পরিশ্রম!

তবু চলি সেই পথে, মনে জাগে দুরন্ত দুরাশা,
শেষ হবে একদিন আরণ্য-জীবন;
অন্তরে আছে মোর যে-আলোর সুতীব্র পিপাসা,
অরণ্যের প্রান্তে তার হবে নিরসন।

আলোকের স্বপ্ন দেখি: পরিক্রমা আঁধারের মাঝে,
নৈঃশব্দ্যের মাঝে শুনি অশ্রুত বিলাপ;
ঝিল্লীর অক্লান্ত সুর একটানা কানে এসে বাজে,
ভোগ করি জীবনের ক্রূর অভিশাপ।

মন ছুটে চলে যায় জীবন-অরণ্য ভেদ করে,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয়ে যায় ম্লান;
স্বপ্ন মোর দেখা দেবে একদিন সত্য রূপ ধরে,
সেদিনের আজিও তো পাইনি সন্ধান।

স্মৃতিশক্তি

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম-এ,এম-বি

চিকিৎসকদিগের নিকটে মাঝে মাঝে এমন লোক আসেন, যিনি বলেন, "ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটার মোটে মেধা-শক্তি নেই! আজ কোন জিনিস পড়লে কাল সেটা মনে করে বলতে পারে না। এ বেলা পড়লে ও বেলা ভুলে যায়। ওর স্মৃতিশক্তিটা বড়ই কম! একটা ওষুধ দিতে পারেন যাতে ওটা বাড়ে।"

ডাক্তারবাবু হয়ত প্রার্থীর বাড়ীতে অনেক রোগীপত্র দেখেন বলিয়া সেই খাতিরে আপন ঘর বজায় রাখিবার জন্ত—অথবা প্রার্থিত স্মৃতিশক্তি বাড়ে কিনা তাহা চেষ্টা করিবার নিমিত্ত, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একটা বা একাধিক ঔষধ লিখিয়া দিলেন। প্রার্থী ব্যক্তি সেই ঔষধ পয়সা খরচ করিয়া কিনিয়া দিনকতক খাওয়াইলেন, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, কিছুদিন ঔষধ খাওয়ানোর পরও ঐ ঔষধ-সেবী বালক কোনও উন্নতিলাভ করে না। তখন অভিভাবক হয়ত মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া আবার চিকিৎসকের কাছে যান। এবার ডাক্তারবাবুও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার একটা ব্যবস্থা করেন—নূতন কিছু ঔষধ দিয়া। কিন্তু সাধারণতঃ এক্ষেত্রেও দেখা যায়, তথাকথিত রোগীর স্মৃতিশক্তি যেমন আগে অল্পমাত্রিক ছিল এখনও তাহাই রহিয়াছে। হয়ত কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা মনে হওয়াই মাত্র সার, বাস্তবক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্যমশীল অভিভাবক হাল না ছাড়িয়া আশায় আশায় অনেক পয়সা ব্যয় করিয়া অনেক ঔষধ খাওয়াইলেন, কিন্তু শেষে একদিন হয় ত বুঝিতে পারিলেন, ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে, ঔষধ খাওয়াইয়া বিশেষ কিছু উপকার হয় নাই। তাহার পর তাঁহারা হয় ত চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ যে কোনও উপকার পান, এমন দৃষ্টান্ত কৈ দেখিতে পাই না।

ডাক্তারেরা এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সেই সব ঔষধের ব্যবস্থা করেন, যেগুলি অধিকাংশ স্নায়বিক শক্তিবর্ধক, যথা ফস্ফরিক এসিড, লেসিথিন অথবা উভয়ের সংমিশ্রণ (যথা ফস্ফো-লেসিথিন), ভিটামিন ইত্যাদি। সঙ্গে হয়ত শারীরিক শক্তিবর্ধক—যাহাকে টনিক বলা হয়, সেই ঘটিত ঔষধ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ফল বিশেষ পাওয়া যায় না। সমস্যা এই যে, স্নায়বিক শক্তিবর্ধক ঔষধে স্নায়ুর শক্তি বাড়িতে পারে বা টনিক জাতীয় ঔষধে শরীর আরও সবল এবং পুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতিশক্তি বাড়িবে কেন? স্মৃতিশক্তি কি স্নায়বিক শক্তি বা শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করে? তাহা যদি করিত তবে যুদ্ধ-বিভাগের সেনাপতি বা সৈনিকদিগেরই স্মৃতিশক্তি একচেটিয়া হইত। কৈ তাহা তো হয় না। বরং কত শীর্ণ, ভীরু-স্বভাব, এমনকি রুগ্ন লোকেদের এরূপ স্মৃতিশক্তি থাকিতে দেখা যায় যে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এমন অনেক কৃতী ছাত্রকে আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে দেখা যায়, যাঁহাদের স্মৃতিশক্তির প্রাচুর্য্য অবিসংবাদিত, কিন্তু যাঁহাদের শরীর ও স্বাস্থ্য শীর্ণ, দুর্ব্বল এবং বিশেষ আক্ষেপের বস্তু।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের কৈশোরে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার জনৈক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের নিকটে এক-শত সদ্য-রচিত সংস্কৃত শ্লোক একবার মাত্র শুনিয়া তিনি গুটিকতক শ্লোক হুবহু আওড়াইয়া গেলেন। দিগবিজয়ী পণ্ডিত তো দেখিয়া অবাক! উপস্থিত অন্যান্য পণ্ডিতেরাও হতবাক্। এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে "শ্রুতিধর" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি না হয় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ এমন অনেক লোকও ত দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা শারীরিক দিক দিয়া দুর্ব্বল, হয় ত আরশুলা দেখিয়া ভিরমি যান, কিন্তু অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন।

সুতরাং একরকম বুঝাই যায় বা স্বীকার করিয়া লওয়াও যায় যে, স্মৃতিশক্তি শারীরিক বল কিংবা স্নায়বিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নহে বা সমগোত্রীয় বস্তু নহে, উহা ভিন্ন বস্তু শারীর বৈজ্ঞানিকেরাও ঐ কথা বলেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মত এই যে, স্মৃতিশক্তি মস্তিষ্কের গুণ বা ক্রিয়া। উহার কেন্দ্র-স্থান—মাথার ঘিলুতে (cerebrum)। মাথার ঘিলু ও স্নায়ু বা শরীর বিভিন্ন জিনিস। শেষোক্ত জিনিস দুইটির প্রভাব প্রথমোক্তের উপর পড়ে না। কাজেই যে সকল ঔষধে স্নায়ু বা শরীর সতেজ হয় সে সকল ঔষধে স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হইবে কেন? আইসল্যাণ্ডে সীল মাছ বাড়িলে কি ভারতবর্ষের লোকের কোনও উপকার হয়? আরবে উষ্ট্র-সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িলে কি চীনদেশে শস্য বেশী জন্মায়? লেখাপড়া বেশী পরিমাণে শিখিলে কি দেহের কৃষ্ণবর্ণ গৌরবর্ণে পরিণত হয়?

যাঁহাদের শারীরিক শক্তি বেশী তাঁহারা হস্তপদাদি দ্বারা সাধনীয় কার্য্য অনেক করিতে পারেন অথবা অনেকক্ষণ ধরিয়া একনাগাড়ে খাটিতে পারেন, কিন্তু স্মৃতির বস্তু বিষয়ে তাঁহারা

কৃতিত্ব দেখাইবেন কি করিয়া? এইরূপে ধরা যায়—যাহারা শারীরিক শক্তিসম্পন্ন, তাহারা শরৎবাবুর শ্রীকান্ত পুস্তকে চিত্রিত ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক কার্য্যধারা সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যালয়ে কৃতী মেধাবী ছাত্রদিগকে পড়া মুখস্থ বলিয়া পরাজিত করিতে পারিবে কেন? এ সমস্যা বুঝিতে হইলে জানা প্রয়োজন মানুষের স্মৃতি দেহের কোন্ যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয় এবং কেমন করিয়া সাধিত হয়।

কোনও বিষয়বস্তু পড়িলে বা চক্ষু কি কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহার ভাবধারা গিয়া পৌঁছায় মস্তকের খুলির মধ্যে অবস্থিত মস্তিষ্কে। সেখানে ঘৃতের মত অর্দ্ধ তরল, অর্দ্ধ কঠিন, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ একপ্রকার পদার্থ থাকে তাহাকে আমরা চলিত ভাষায় বলি ঘিলু। যখন কোন প্রত্যক্ষীকৃত বা বোধগত ভাবধারা ইহাতে প্রবেশ করে তখন সাধারণ সুতা হইতেও যথেষ্ট সূক্ষ্ম একপ্রকার খোল বা গর্ত্ত কর্ত্তিত হয় ঐ ঘিলুর উপর স্তরে। কেন কর্ত্তিত হয়?

বর্ত্তমান জীবন-বৈজ্ঞানিকদিগের (Biologists) মত এই যে, কোনও ভাবধারা মস্তিষ্কের ঘিলুর মধ্যে প্রবেশ করিলেই সেই পথে একটা রাসায়নিক (?) প্রতিক্রিয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে কলইডাল (colloidal) চর্ব্বিজাতীয় একপ্রকার অম্লবস্তু আনুপাতিক ভাবে সেখানে উদ্ভূত হয়। অম্লবস্তুর সাধারণ ক্ষমতা এই যে, শরীরের যেকোন বস্তু বা 'টিস্যু' ইহার সংস্পর্শে আসিলেই কিছু ক্ষয়িত হয়। গায়ে এসিড লাগিলেই গা অল্পবিস্তর ক্ষয় হইয়া যায়। সেই সূক্ষ্ম ক্ষয় হইতেই সূক্ষ্ম খালের সৃষ্টি হয়। এই সকল অণু-প্রমাণ খাল অনেক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে। এমনকি মানুষের সারাজীবন ধরিয়া আমৃত্যু উহাদিগের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। এই খালগুলি স্মৃতির বাসগৃহ বা ভাণ্ডার। যখনই আমাদের প্রয়োজন হয় কোনও কিছু বিষয় মনে আনিবার, তখনই মস্তিষ্কে খনিত ঐ খালগুলি হইতে উহার যোগান হয়। আজ যাহা দেখিলাম বা পড়িলাম, তাহার বিম্ব কিংবা প্রতিবিম্ব আজ অথবা কাল মনে করিতে পারি, পরেও মনে করিতে পারি, এক বৎসর পরে বা দশ বৎসর পরেও মনে করা যাইতে পারে—এমনকি সারাজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার স্মৃতি আমাদের মনের সহিত বিজড়িত থাকিতে পারে। মস্তিষ্ক স্মৃতিগুলির আড়ত বা ভাঁড়ারঘর। যখনই দরকার তখনই সেখানে দরখাস্ত পড়িলেই সেখান হইতে মাল সরবরাহ হয়।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিল, যদি চিরজীবনের জন্য এই ভাঁড়ারঘরগুলিতে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে তাহা হইলে আমরা অনেক জিনিস ভুলিয়া যাই কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরও বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন। কত লক্ষ লক্ষ খাল এই ভাবে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে মস্তিষ্কে অনবরত খনিত হইতেছে। আমরা সকালে একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার একটা খাল প্রস্তুত হইল। তাহার পর একখানি বই পড়িলাম; তাহাতে কত শত খাল নূতন করিয়া কর্ত্তিত হইল। আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা কহিয়া কত নূতন নূতন বিষয়ের স্মৃতি-খাল মস্তিষ্কে কাটিলাম। অবিরত আমরা হয় কথা কহিতেছি, না হয় কিছু দৃশ্য দেখিতেছি, না হয় শুনিতেছি। কাজেই ইন্দ্রিয়সকলের মাধ্যমে কত শত বিষয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে। তাহাতে খাল তৈয়ারি হইতেছে। সুতরাং এই প্রভূতসংখ্যক খাল সৃষ্ট হওয়াতে সেগুলি পরস্পরে কাটাকাটি করিয়া ফেলে ও সেখানে হিজিবিজি ঘটিয়া যায়। তাহাতে কতকগুলি খাল চাপা পড়ে। তাহা ছাড়া ঐ সকল খাল সৃষ্ট হইবার যে প্রধান কারণ—ঐ কলইডাল চর্ব্বিজাতীয় অম্ল প্রত্যেক ভাব-আগমনের প্রক্রিয়ায় যে উদ্ভূত হইতেছে সেগুলি এত পুঞ্জীভূত বা স্তূপীকৃত হইয়া যায় যে, সেই সকলই আবার কতকগুলি খাল বুজাইয়া ফেলে।

ধরুন একটা জমি, তাহাতে একটা খানা কি গর্ত্ত খোঁড়া হইল। কিছুকাল তাহা ফেলিয়া রাখুন, দেখিবেন খানাটা অর্দ্ধেক না হউক কিছু বুজিয়া আসিয়াছে। কিসে বুজিয়া আসে? চারিদিককার জমা মাটি (যে মাটি খানা খুঁড়িবার কালে পাশে জমা পড়িয়াছিল) হইতে মাটি খসিয়া আসিয়া কিছু পূরণ করে, হাওয়া হইতে ধুলা আসিয়া কিছু সঞ্চিত হয়, চারদিককার গাছপালা হইতে স্খলিত জীর্ণ পত্র জমা হয়, পর্য্যুষিত লতাপাতাও তাহাতে স্থান পায়। দেখা যায় অনেক সময় বৎসর যাইতে না যাইতে গর্ত্তটি প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে ঐ সকল ধুলামাটি লতাপাতার দ্বারা। আরও কিছুদিন পরে গর্ত্ত এমন বুজিয়া যায় যে, তাহা চারিদিককার জমির সহিত সমতল হইয়া যায় এবং গর্ত্তের আর কোন চিহ্নও থাকে না। কত দিনে যে গর্ত্ত বুজিয়া যায় তাহা অবশ্য নির্ভর করে গর্ত্তের গভীরতার উপর।

মস্তিষ্কে যে প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের খাল কর্ত্তিত হয়—যাহা স্মৃতির রচনা করে—এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম খালগুলিরও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। অজস্র ছোট ছোট খাল উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হওয়াতে পরবর্ত্তীগুলির মাটি অগ্রবর্ত্তী খালগুলিকে বুজাইয়া দেয়। এখানে মাটির কাজ করে—কোনও বিষয় মস্তিষ্কের যাইবার সময়ে যে চর্ব্বিজাতীয় অম্লবস্তুর উৎপত্তি হয় সেইগুলি। অবিরত নূতন নূতন ভাব মস্তিষ্কে আসিতেছে, এ খাল কাটিতেছে ও খাল কাটিতেছে, কাজেই খালের মাটিগুলিও অবিরত এদিক-ওদিক ফেলা-ছড়া হইতেছে।

কিন্তু কোন জমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া যদি একেবারে ফেলিয়া রাখা না হয়—যদি তাহা হইতে মাঝে মাঝে পরিপূরক মাটি ও জঞ্জাল তুলিয়া ফেলা হয়—অর্থাৎ মাঝে মাঝে গর্ত্তটি আবার খুঁড়িয়া দেওয়া হয়—তাহা হইলে কিন্তু গর্ত্ত আর বুজে না। এভাবে মাঝে মাঝে খুঁড়িয়া গর্ত্ত বহুকাল রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

স্মৃতির বেলায়ও ইহা ঘটাইতে পারা যায়। যাহা একবার মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকিয়াছে ও মস্তিষ্কে খাল কাটিয়াছে, তাহা যদি মাঝে মাঝে স্মৃতিপথে আনিয়া ঐ খাল পুনঃপুনঃ পূর্ব্বাকারে সংস্থাপিত রাখা যায় তাহা হইলে আর স্মৃতি বুজিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় না। এই ভাবে দেখা যায়, কোন জিনিস একবার পড়িলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে না, কিন্তু বার বার পড়িলে তাহা অনেক দিন টিকিয়া যায়। এই রূপে আমরা কোনও বিষয় মনে রাখিবার জন্য মুখস্থ করি, অর্থাৎ বারবার আবৃত্তি করি।

কোনও জিনিস ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলে তাহা কিন্তু অনেক দিন মনে থাকে। কেননা বুঝিয়া পড়িলে মস্তিষ্কে বুদ্ধিবৃত্তির প্রক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহাতে চর্ব্বিজাতীয় কলোইডাল অন্নবস্তু অধিক পরিমাণে সঞ্জাত হয়। তাহাতে স্মৃতির খাল আরও গভীর হইয়া কর্ত্তিত হয়।

কোন বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিয়াও বা মস্তিষ্কে ভাল রেখাপাত না করিলেও অনেক সময় মুখস্থ কিংবা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়াও তাহা মনে রাখা যাইতে পারে। অনেক ব্রাহ্মণসন্তান সন্ধ্যাহ্নিক মুখস্থ বলিতে পারেন সন্ধ্যাহ্নিকের অর্থ কিছুমাত্র না জানিয়াও বা না বুঝিয়াও। ইহা তো আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। অনেক ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র সংস্কৃত ভাষা না শিখিয়াও জীবনভোর সন্ধ্যাহ্নিক মুখস্থ বলিতে পারেন। অবশ্য উচ্চারণে বা বাক্যে হয় ত কিছু স্খলন বা ত্রুটি হইতে পারে কিন্তু মোটামুটি একরকম চলিয়া যায়। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন, তাঁহারা সেগুলি শোধরাইয়া লন, কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় একেবারেই নাক গলান নাই, তাঁহারাও সন্ধ্যাহ্নিকের মোট কাঠামোটা একরকম খাড়া করিতে পারেন। ইহা ঘটে পুনঃপুনঃ আবৃত্তির দ্বারা। প্রত্যহ তিন বার সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্রগুলি তাঁহাদের মস্তিষ্কে খনিত-খাল বজায় রাখিয়া যাইতেছে, কাজেই স্মৃতির খালগুলি কিছুতেই বুজে না। হয়ত কোনও শব্দ—যেমন 'অগ্নিমীলে'র বদলে "অগ্নিমলে" বলে, কিন্তু ও শব্দের হাড়গোড়গুলি ঠিক স্মৃতিতে হাজির হয়, গোলমাল হয় একটু মাংসে বা বাহিরের চামড়ায়।

এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে একটি প্রবচন আছে :
'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।' অর্থাৎ, সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ বুঝিলে তো ভাল, কিন্তু বুঝার চেয়ে আবৃত্তি আরও কার্য্যকরী।

বিশ-ত্রিশ বৎসর আগে দেশে অনেক টোল ছিল। সেখানে শিক্ষার্থী বালকদিগকে সংস্কৃত শিখানো হইত। প্রভাতে টোলে আসিয়া পড়ুয়ারা ব্যাকরণ বা কাব্য শুধু মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া আবৃত্তি করিয়া যাইত। তাহাতে তাহাদের পাঠ্যবিষয় অনেক মনে থাকিত। পরবর্ত্তী পাঠের সুবিধা হইত।

সংস্কৃত শাস্ত্রও এই জন্য সূত্র-বহুল। ব্যাকরণে সূত্র, উপনিষদে সূত্র, ছয় রকম দর্শনশাস্ত্রে কেবল সূত্র। কম কথায় গ্রথিত এই সকল সূত্র মুখস্থ করা সুবিধাজনক, কাজেই স্মৃতিতেও থাকিতে পারে বহুদিন ধরিয়া। এই জন্য সূত্রেতেই এ সকল শাস্ত্র লিখিত।

পুনঃপুনঃ আবৃত্তিতে আর এক প্রকারের উপকার হয়। যদি কোনও পঠিত বিষয় পড়িয়াও ভাল অর্থ বুঝা যাইতেছে না এমন হয়, তাহা হইলে অনেকবার তাহা পড়িলে অর্থ অনেকটা সুগম হইয়া আসে। পুনঃপুনঃ আবৃত্তি যেন প্রাইভেট টিউটর বা অর্দ্ধ শিক্ষকের কাজ করিয়া দেয়। আবার অর্থবোধ হইলেই বিষয়টি মনে (স্মৃতিতে) থাকিয়া যায় অনেকদিন।

কাজেই স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় পুনঃপুনঃ আলোচনায়। যাঁহারা ঔষধ হইতে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি আশা করেন, তাঁহারা আকাশকুসুম পাওয়ার মত হয়ত নিরাশ হইতে পারেন।

স্মৃতির উপরোক্ত কার্য্যধারা ও কারণগুলি বিজ্ঞানসম্মত। কাজেই তাহা যদি আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে আবৃত্তিই যে স্মৃতিশক্তির উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা তাহা বুঝিতে পারি। ঔষধের দ্বারা কেন যে কোন স্বীকার্য্য ফল পাই না, তাহাও বুঝিতে পারি। আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্য ঔষধ প্রস্তুতকারী বহু কোম্পানী অনেক ঔষধ (এমনকি প্রচুর গবেষণা দ্বারা আবিষ্কৃত, এমন ঘোষণা তাঁহারা করেন ।) প্রস্তুত করিতেছেন এবং বিজ্ঞাপন-দামামার দ্বারা সেগুলি বিঘোষিত করিতেছেন, কিন্তু সেগুলির যথেষ্ট ফল পরীক্ষা এখনও হয় নাই। ভবিষ্যতে হয়ত এমন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে, যাহা মানুষের স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট সহায়তা করিবে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা কোন ঔষধেই আস্থাবান হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের শেষ উপদেশ আবৃত্তির দ্বারাই স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে। তাহার সঙ্গে একটু ভাল করিয়া অর্থ বুঝিয়া পড়িলে, আরও চমকপ্রদ ফল পাওয়া যায়। সুতরাং ভাল করিয়া অর্থ বুঝিয়া পড়া বা দেখা এবং সেই সঙ্গে আবৃত্তি ইহাই প্রায় শেষ কথা।

উৎপলশিখা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

বন্ধুরা উৎপলের নাম দিয়েছে 'লেডি-কিলার'। উৎপল কিন্তু অপবাদটা এতটুকু স্বীকার করে না। সে পাল্টা প্রশ্ন করে পতঙ্গ যে আলোক-শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কি আলোর অপরাধ ?

কথাটা ব্যাখ্যা করার জন্য বলে আলো যেমন পতঙ্গ সম্বন্ধে উদাসীন সেও তেমনি নারী-সম্বন্ধে উৎসাহহীন। কিন্তু তা সত্বেও মেয়েরা যদি তার ঘুম ভাঙাতে অহরহ চেষ্টা করে চলে তা হলে সে নিরুপায়। অবশ্য যেটা তার সাধ্যের ভেতর সেটা সে করতে ত্রুটি করে না। নিজেকে আলোকশিখার সঙ্গে তুলনা করলেও আসলে সে মানুষ, নিষ্ঠুর নিষ্প্রাণ আলো নয়। পতঙ্গের দহন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার হৃদয় করুণায় বেদনায় বিগলিত হতে থাকে। ফলে দহনপর্ব্ব সমাপ্ত হবার আগেই সে দপ করে নিভে যায়, নিষ্কৃতি দেয় অর্দ্ধদগ্ধ পতঙ্গকে।

অর্থাৎ পতঙ্গের দহনের পরেই উৎপল বিচলিত বোধ করে, আগে নয়।

কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই অকারণে দিনটা বড় মিষ্টি মনে হচ্ছিল উৎপলের। কলেজে পর পর দুটো সুদীর্ঘ লেকচার দিয়ে একটুও ক্লান্তি অনুভব করল না, মনে হ'ল আরও দুটো লেকচার দিয়ে যেতে পারে এক নিশ্বাসে। লেবরেটরীতে আগের দিনের একটা অসমাপ্ত কাজ পড়ে রয়েছিল, গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে উৎপল কাজটা টেনে নিল। কিন্তু একটু পরেই সবকিছু একপাশে ঠেলে রাখল। নাঃ, আজ আর কাজ নয় নবীনতর ছাত্র-দের টেবিলে গিয়ে এটা ওটা নেড়ে চেড়ে দেখল, ছেলেদের গেম সেক্রেটারীর সঙ্গে খেলাধুলা নিয়ে আলোচনা করল, বিশ্রামরত এক সহকর্মীর টাইটা আলগা করে দিল, খোলা জুতাজোড়া দু'দিকে দুটা আলমারির তলায় সরিয়ে ফেলল।

তার পর উৎপল অসময়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করার পর কলেজ স্কোয়ারে এসে বসল স্থির হয়ে। বিকেলের সূর্য্য হেলে পড়েছে একদিকে, নিস্তেজ হয়ে এসেছে আলোকরশ্মি। উৎপল তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল আকাশের গায়ে রঙের খেলা। তার পর এক সময় সন্ধ্যা হয়ে এল। গ্যাসের আলোগুলো ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল। উৎপল তখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে।

"উৎপলদা !"

এক স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আর এক স্বপ্নে ডুবে গেল উৎপল। নির্ঝরিণী !

নির্ঝরিণী শৈশবের বন্ধু প্রিয়তোষের ভগ্নী। এককালে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু প্রিয়তোষ বিদেশে চলে যাবার পর থেকে যোগাযোগের সূত্রটা ক্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। গত দু'বছরের মধ্যে বোধ হয় একবারও উৎপল যায় নি তাদের বাড়ীতে। নির্ঝরিণী এ জন্য অনুযোগ দিয়েছে, দুঃখ করেছে, বলেছে তারা সাধারণ লোক, তাদের বাড়ীতে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করতে আসবে উৎপলদার মত মানুষ। নির্ঝরিণীর আত্মীয়দের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে কিন্তু এতটুকু নতুন মনে হয় নি উৎপলের। ঠিক একই কথা সে ঘন ঘন শুনতে পায় এমনি বহু নির্ঝরিণীর মুখ থেকে, তাদের বাবা-মা-দাদা-দিদি-ভাই-বোন সবার মুখ থেকে। শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে প্রিয়ভাষী ও প্রিয়দর্শন অধ্যাপক ডক্টর উৎপল রায়।

কিন্তু শীতের সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারের আবছা আলোয় সেই পুরনো কথাগুলিই বড় ভাল লাগল উৎপলের। চোখ মেলে তাকায় উৎপল। লাবণ্যে টলমল করছে নির্ঝরিণীর সারা দেহ। উৎ-পলের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে নির্ঝরিণী, এখখুনি তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতে চায়।

বিনা আপত্তিতে উৎপল উঠে পড়ল। একবারও ভেবে দেখল না যে এ রকম অদ্ভুত কাজ আগে সে কখনও করে নি।

উৎপলকে কেন্দ্র করে নির্ঝরিণীর অভিভাবকেরা পুরনো স্মৃতি নিয়ে মেতে উঠলেন। সে আলোচনার হয়ত শেষ হ'ত না, যদি না নির্ঝরিণী এক সময় জানিয়ে দিত—উৎপলকে সে ধরে এনেছে অঙ্কগুলো একটু দেখে নেবার জন্য।

উৎপলকে নিজের পড়ার ঘরে নিয়ে গেল নির্ঝরিণী। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হেসে বলল, "কি ভাবছ ?"

উৎপলও হাসল, "তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি নির্ঝর! আর ভাবছি তুমি কি বুদ্ধিমতী।"

"কিন্তু যদি সত্যি সত্যিই অঙ্কের খাতা বার করি ?"

"তা হলে জানব তুমি আরও বুদ্ধিমতী, দু'মাস পরে যে পরীক্ষা সেটা ভুলে যাও নি। ভাল কথা, কেমন হ'ল টেষ্টে ? এবার নাকি আই-এসসি'র কোশ্চেন বেশ শক্ত হবে শুনছি।"

ভ্রূভঙ্গী করে নির্ঝরিণী বলল, "থাক আর ভালমানুষি দেখাতে হবে না। অতই যদি দরদ থাকত তবে অন্ততঃ মাঝে মাঝেও এসে খোঁজটা নিতে কেমন লেখাপড়া করছি। আচ্ছা তোমার কি চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নেই ? দাদা থাকতে রোজ আসতে অথচ দাদা চলে গেলে দু'বছরেও একবার এমুখো হও নি ? না কি আমরা পর হয়ে গেছি ?"

নির্ঝরিণীর টেবিলে চন্দনী ধূপের গন্ধ। জানালায় আকাশী পর্দায় কাশ্মীরী নক্সা। কোণের তেপায়াতে সাদা চায়নার একগুচ্ছ রক্তগোলাপ।

উৎপলের বুকের ভেতরটা হঠাৎ গুর্ গুর্ করে উঠল।

নির্ঝরিণীর চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল উৎপল। কাঁচের পেপার ওয়েটটা ঘোরাতে ঘোরাতে মৃদু স্বরে বলল, "পর? না, নির্ঝর, পর ভাবব কেন? তবে আসি না কেন? সে অনেক কথা নির্ঝর। অনেক কিছু।"

একটু যেন বিচলিত হয়ে উঠল নির্ঝরিণী; "কেন, কেন উৎপলদা?"

"সেকথা আমার একান্তই নিজের কথা। বন্ধ ছিল, এসেছি, ক্ষতি ছিল না কিছু! কিন্তু এখন···"

কেন, আমার মা আছেন বাবা আছেন, আমি আছি, ভাই-বোনেরা আছে। আমরা কি কেউ নই?"

একটু হাসল উৎপল, "নির্ঝর, তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ, আমার কথা সব বুঝবে না। তাই বলছিলাম কথাগুলো একান্তই আমার নিজের। সব সময়ই তোমাদের কথা মনে হয়, কিন্তু সাহস পাই না। তুমি যদি ছোট থাকতে, রোজ আসতাম। কিন্তু তুমি এখন বড় হয়ে উঠেছ। ঘন ঘন এলে হয়ত অনেকে· ·"

নির্ঝরিণী কি বলতে যাচ্ছিল, উৎপল হেসে উঠল, বলল, "না, কি হবে ওসব আবোলতাবোল বকে? তার চেয়ে তোমার খবর বল।"

"কোন খবর চাই?"

"এই তোমার পড়ার খবর, পাড়ার খবর, বন্ধুদের খবর আর তোমার বিয়ের খবর।"

নির্ঝরিণী হাসল: "মেয়েরা বড় হলে তাদের বিয়ের জন্য অভিভাবকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েন, আমার জন্যও হয়েছেন। এই হ'ল আমার বিয়ের খবর। কিন্তু তুমি বিয়ে করছ না কেন উৎপলদা? বিয়ের বাজারে ত তোমার অনেক দাম।"

উৎপলের মুখখানা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে উঠল। "বিয়ে?" আপন মনেই যেন প্রশ্ন করল উৎপল। একটু বিষাদের হাসি ফুটে উঠল চোখের কোণে। বলল, "বিয়ে আমার হবে না নির্ঝর।"

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল নির্ঝরিণীর। ব্যাথাতুর চোখ দুটি তুলে ধরল। চোখে প্রশ্ন।

উৎপল আবার চোখ নামিয়ে নিল। বলল, "না, বিয়ে আমার হবে না নির্ঝরিণী। যাকে বিয়ে করতে পারতাম সে আমাকে বিয়ে করতে পারত না কিছুতেই। আর বিয়ে করার ইচ্ছেও আমার নেই। তবে আবার যদি কোন দিন মনের মানুষ মেলে তা হলে হয়ত—"

ক্ষণকাল নীরব থেকে নির্ঝরিণী বলল, "মনের মানুষ মেলা কি এতই শক্ত উৎপলদা? তুমি এত বিদ্বান, এত সুন্দর, তোমাকে পেলে কোন্ মেয়ে না ধন্য হয়ে যায়?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল উৎপল। গভীর ভাবে বলল, "জানি নির্ঝর জানি। তারা সবাই চায় ডক্টর উৎপল রায়কে, উৎপল

সে চোখে উৎপল নিজের ছবি দেখতে পেয়ে উঠল। একি, একি! যা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল করতে উদ্যত হয়েছে। পতঙ্গের ঘুম ভাঙাতে আলোকশিখা নিজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

দারুণ শীতেও ঘামতে আরম্ভ করল উৎপল। গ্লাস থেকে চক চক করে জল খেল খানিকটা। নির্ঝরিণীর অলক্ষ্যে একবার জলে আঙুল ডুবিয়ে কানের ওপর বুলিয়ে নিল। উত্তেজনা এতটুকু কমল না। তবে কি পরাজয়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে উৎপল?

দুঃসহ কয়েকটা মুহূর্ত···পরাজয়? কিসের পরাজয়? জীবনে হয়ত আর কোনদিন তার বুক এমনি দুরু দুরু করে কেঁপে উঠবে না, নির্ঝরিণীও হয়ত আর তার দিকে এমন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না, এমন মদির সন্ধ্যাটিও হয়ত আর তার জীবনে আসবে না। না, ', নিজেকে ঠকাবে না উৎপল।

আরও ক্ষীণ স্বরে বলল, "তাই ত আমার মনের মানুষ খোঁজার বিরাম নেই নির্ঝর। মাঝে মাঝে মনে হয়—এই বুঝি পেয়েছি সে মানুষ, কিন্তু সেইটুকুই। এ পর্যন্ত আমি শুধু অঙ্কই শিখেছি, মানুষ চিনতে শিখি নি। তাই মনের মানুষ একেবারে কাছে এসে বসলেও চিনতে ভুল করি, দূরে চলে গেলে ভাবি তবে কি···? পরশ-পাথর হাতে পেয়েও তাকে হারিয়ে ফেলি, এমনি হতভাগা আমি।"

নির্ঝরিণীর মুখখানা কি ধীরে ধীরে রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠছে না? সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে কি শান্ত করতে চাইছে না বক্ষের প্রলয়-তরঙ্গ?

চোখের কোণ দিয়ে উৎপল নিরীক্ষণ করতে থাকে। না, এতটুকু পরিবর্তন নেই নির্ঝরিণীর। স্মিতমুখে সে বসে রয়েছে টেবিলের বাঁ ধারে, মুক্তোর মত দন্তপংক্তির কয়েকটি একটুখানি দেখা যাচ্ছে ওষ্ঠাধরের মাঝখানে। চোখের দৃষ্টি নিজের নখের দিকে।

মৃদু শব্দে হেসে উঠল উৎপল: "আজকে বোধ হয় আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে নির্ঝরিণী, নইলে এত সব আজেবাজে কথা মনে আসছে কেন? এসেছি পর থেকে তো শুধু আমিই বকে যাচ্ছি। এবার তুমি বল, আমি শুনি। সেই ভদ্রলোকটির খবর কি?"

"কোন্ ভদ্রলোক?"

"সেই যে, যাঁর সঙ্গে প্রায়ই তোমাকে দেখা যায় ট্রামে বাসে? লম্বা পাতলা চেহারা, ক। রঙ, চুল একটু কোঁকড়ানো।"

নির্ঝরিণী বিস্মিত, "কে তিনি? আমাদের কেউ হন?"

চোখদুটো ছোট ছোট করে উৎপল বলল, "খুব সম্ভব। নইলে অত ঘন ঘন দেখি কেন তোমার সঙ্গে?"

এতক্ষণে আরক্ত হ'ল নির্ঝরিণী। বলল, "ও ঠাট্টা করছ, তাই বল।"

"ঠাট্টা! আমায় নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে বল?"

নির্ঝরিণী হাসতে লাগল, "অমন মিথ্যে বদনাম দিও না কিন্তু আমার নামে, ভাল হবে না বলে রাখছি।"

উৎপল সোজা হয়ে বসল। টেবিলের উপর সোৎসাহে একটা চাপড় মেরে বলল, "বদনাম? কি বলছ নির্ঝর? সে ত কত গর্বের কথা। কত ভাগ্যবান হলে প্রেমে পড়ে জানো? এই দেখ না, লোকে বলে আমার নাকি বিছে আছে, বুদ্ধিও আছে আর তোমাদের মুখ থেকেই শুনতে পাই আমি নাকি দেখতেও খুব খারাপ নই। কিন্তু কৈ, কিছু কি হ'ল? সত্যিই তোমাদের দেখে হিংসে হয় নির্ঝর।"

"আবার ওসব যা তা কথা বলছ? ভুলে গেছ বুঝি, আমি কি রকম ঝগড়া করতে পারি?"

"মুখখানা কাঁচুমাচু করে উৎপল বলল, আচ্ছা আচ্ছা আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। প্রতিজ্ঞা করছি আমি আর মুখ খুলব না, কাউকে কিছু বলবও না।"

খিলখিল করে হেসে উঠল নির্ঝরিণী: "তুমি দেখছি দুষ্টু মিতেও কম যাও না। তোমার এ বিদ্যেটার কথা ত আমার জানা ছিল না।"

তার পর গম্ভীর ভাবে বলল, "না উৎপলদা, সত্যি বলছি, আমি ওসবের মধ্যে নেই। ছেলেমেয়েরা যে কি ভাবে একে অপরের প্রেমে পড়ে, ভেবে পাই নে। আমার ত মনে করতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

উৎপল আরও একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আবেগভরে বলল, "কিন্তু সব জিনিসই কি নিজের ইচ্ছেয় হয় নির্ঝর? আগুনের কাছে এলে ঘি গলে যায়। শুধু ঘি কেন তেমন আগুনের কাছে এলে পাথরও গলে যায়। সেটা পাথরের অপরাধ নয়। আগুনেরও গুণ নয়, সৃষ্টির নিয়ম। তুমি নিজে পাথর হয়ে থাকতে পার, কিন্তু কোন হতভাগ্য যদি সেই পাথরে মাথা খুঁড়ে রক্তাক্ত হয় তা হলে তোমার কি বলবার আছে?"

উৎপলের হাত থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধানে টেবিলের উপর একটি সুডৌল বাহুলতা। আলোতে ঝিকমিক করছে একটি ছোট্ট পান্না। চাঁপার কলির মত আঙুলকটি কি চকিতে টেনে নিতে পারা যায় না নিজের শক্ত মুঠোর ভেতর? এই নিরালায় গুন্ গুন্ করে কি দুটো কথা বলা যায় না নির্ঝরিণীর কাণে কাণে?

ঘড়িটা টিক টিক করে বেজে চলেছে। অধীর চঞ্চলতায় কাঁপছে দীপশিখা। নির্ঝরিণী প্রস্তরের মতই স্থির।

বহু চেষ্টায় একটুখানি হাসি টেনে এনে উৎপল বলল, "জবাবটা কি আমি পেতে পারি না নির্ঝরিণী?"

"কি জবাব দেব বল? পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের হিসেব রাখতে গেলে সংসার চলে না উৎপলদা।"

"কিন্তু নির্ঝর, মাথা খুঁড়ে মরার বদলে কেউ যদি পাথর গলাবার জন্ত আগুন জ্বালে?"

মৃদু হাসল নির্ঝরিণী, "দূরে পালিয়ে যাব।"

"কিন্তু সে যদি পালাতে না দেয়? যদি সে সত্যিই পুরুষের মত পুরুষ হয়? যদি সে বিদ্বান হয়? যদি রূপবান হয়? যদি ...যদি...যদি সে হয় তোমার অতি পরিচিত কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি? তা হলে কি করতে নির্ঝর?"

একই ভাবে উত্তর দিল নির্ঝরিণী: "তা হলে বাধা দেব। আমার মনের জোর আছে।"

"কথা আর কাজ কিন্তু এক জিনিস নয় নির্ঝর। তখন সত্যিই পারবে ত?"

"নিশ্চয়ই।"

কণ্ঠস্বরে তরলতা ঢেলে দিল উৎপল: "তবে দেখব নাকি তোমার মনের জোরটা পরীক্ষা করে?"

নির্ঝরিণী এতটুকু চমকে উঠল না। হাতখানা এক ইঞ্চিও পিছিয়ে নিল না। স্মিত মুখেই জবাব দিল, "না।"

"না কেন? এই না কত বড় বড় কথা বললে? দেখাই যাক না তোমার মনের জোর সত্যিই কতখানি?"

"না।"

নির্ঝরিণী তো যে-কোন মুহূর্তে রূঢ় কথা বলতে পারে? অথবা সৌজন্যের খাতিরে শুধু একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে যেতে পারে অন্য ঘরে? যাচ্ছে না কেন?

তবে কি উৎপলই মূর্খ?

পতঙ্গ-দাহক উৎপলের জীবনে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

বুকের ভেতরটা কি ফেটে যাবে উৎপলের? কম্পিত কণ্ঠে ডাকল, "নির্ঝর!"

নির্ঝরিণী চোখ তুলে তাকাল। স্নিগ্ধ হাসিটি একই ভাবে লেগে রয়েছে তার মুখে।

"মানলাম নির্ঝর তোমার বাধা দেবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে যদি বাধা না মানে? রূপকথার রাজপুত্রের মত যদি সে জোর করে তোমাকে নিয়ে উড়ে যায় পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে? তা হলে? তা হলে তুমি সেই দুঃসাহসীকে ক্ষমা করতে পারবে ত? পারবে ত সেই রাজপুত্রকে বরণ করে নিতে?"

উজ্জ্বল হাসিতে নির্ঝরিণীর মুখখানা ঝলমল করে উঠল, প্রখর বিদ্যুতালোকে হেসে উঠল তার শুভ্র দন্তপংক্তি। গভীর দুটি কালো চোখ একটা অপূর্ব দ্যুতিতে জল জল করতে লাগল। বিলোল কটাক্ষ হেনে নির্ঝরিণী বলল, "এক সন্ধ্যায় রাজপুত্র?"

এক ফুৎকারে নিভে গেল প্রদীপশিখা।...

শুধু উৎপলকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল কোনমতে। বুকের প্রলয় থেমেছে, কিন্তু হাঁটুদুটো কাঁপছে থর থর করে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, "ওঃ, আটটা বেজে গেছে। যাই, মাসীমা কি করছেন দেখে আসি।"

ঘরের বাইরেই প্রশস্ত বারান্দা। সিঁড়ির গোড়ায় মিরর ষ্ট্যাণ্ড। ফ্লুরিসেন্টের নীলাভ শ্বেত আলোকধারার নীচে দাঁড়াতেই উৎপল কেঁপে উঠল। কে? কে? কার প্রেত-বিম্ব আয়নায়?

নির্ঝরিণীর মা সেলাই করছিলেন। তাঁর পাশে গিয়ে বসল উৎপল। নির্ঝরিণী সঙ্গে এল। আবদারের সুরে বলল, "দেখ মা, উৎপলদা এখনি চলে যেতে চায়। তুমি দশটার আগে উঠতে দিও না।"

মা হাসলেন। বললেন, "ওর বুঝি কাজকর্ম্ম থাকতে পারে না?"

বেণী দুলিয়ে জবাব দিল নির্ঝরিণী: "না, থাকতে পারে না। তুমি উৎপলদাকে বলে দাও না মা রোজ আসতে।"

উৎপলের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "শুনলে ত মেয়ের আদেশ?"

উৎপল হাসার চেষ্টা করে বলল, "আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েকে একেবারে মাথায় তুলেছেন মাসীমা।"

"আদরের কি দেখলে? দু'বছর পর একদিন এলে তাই আর একটু থেকে যেতে বলছি। আমি কি জানি না যে আর তুমি দু' বছরের মধ্যে আসবে না?"

অভিমানে ভরে উঠেছে নির্ঝরিণীর গলা।

"আচ্ছা, আচ্ছা এবার থেকে আমি রোজ আসব। তখন কিন্তু বন্ধুর জন্মদিন বলে পালিয়ে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি।"

"থাক আর ভোলাতে হবে না। আমি ছেলেমানুষ নই। কত আসবে জানা আছে।"

চোখ দুটি ছল ছল করছে নির্ঝরিণীর।

প্রতিশোধ?

সত্যিই দশটার আগে ছাড়ল না নির্ঝরিণী। পরিপাটি করে খাওয়াল, নিজে পরিবেশন করল। উৎপল স্তব্ধ।

সদর দরজায় গাড়ী প্রস্তুত। নির্ঝরিণী সোফারকে আদেশ দিয়েছে উৎপলকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে। বাইরে এসে বলল, "আবার কবে আসছ বলে যাও।"

উৎপল নীরব।

নির্ঝরিণী আবার বলল, "সতের তারিখে ত তোমার ছুটি। এস না সেদিন? আসবে ত? কি, চুপ করে রইলে কেন? ও বুঝেছি আসবে না। তা কেন আসবে? আমরা সাধারণ লোক।"

উপহাস? শ্লেষ?

মাঘ মাসের ঘন কুয়াশার মাঝে একটুখানি গ্যাসের আলো। উৎপল ফিরে তাকাল। নির্ঝরিণীর মুখের ওপর একটা করুণ ছায়া নেমে এসেছে, চিনতে এতটুকু ভুল হ'ল না।

গাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসল উৎপল। দরজা বন্ধ করতে করতে নির্ঝরিণী বলল, "এস কিন্তু।" কণ্ঠ উদ্বেগে ব্যাকুল।

তবে কি নির্ব্বাপিত দীপশিখার দুঃখে বেদনাক্ত হয়ে উঠেছে পতঙ্গ-হৃদয়?

আর একবার তাকাবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

নির্ব্বাসিত কবি হেনরি হাইন

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

১৮৫৬ সনের এক বর্ষণমুখর প্রাতঃকালে প্যারিনগরে মঁমার্ত্রে কবরখানায় একটি শবযাত্রা মন্থরগতিতে প্রবেশ করিল। এই শবযাত্রার কোন আড়ম্বর ছিল না—লোকসংখ্যা মাত্র শ'খানেক—তাহাদের মধ্যে ছিলেন লেখক আলেকজান্দার ডুমা এবং থিওফিল গতিয়ে। ইহারা বিখ্যাত জার্মান কবিকে শেষ সম্মান দেখাবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সমাধিপার্শ্বে কেহই বক্তৃতা করে নাই।

১৭৯৭ সনে ডুসেলডর্ফ শহরে হাইনের জন্ম হয়। ব্যবসা ও প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি যখন প্যারিসে বাসা বাঁধিলেন তখনই তিনি একজন বিখ্যাত লেখক—সকলে তাঁহার কঠোর এবং শ্লেষাত্মক লেখাকে একাধারে ভয় ও প্রশংসা করিত। তিনি ডক্টর অব ল উপাধিপ্রাপ্ত, নানা বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ইতিমধ্যে তৎপ্রণীত Buch der Lieder (গানের বই), এবং Reisebilder (ভ্রমণচিত্র) প্রকাশিত হইয়াছিল। বার্লিন সাহিত্যমহলের তাঁহার অজানা কেহ ছিল না। কিন্তু Reisebilder-এর কশাঘাত বা চাবুক কেহ সহজে ভুলিল না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে জার্ম্মানীতে অন্নসংস্থান কঠিন হইয়া পড়িল।

অন্য কারণেও তাহাকে জার্ম্মানী ছাড়িতে হইল। তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে তাচ্ছিল্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাঁহার স্বাস্থ্য খুবই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং ধর্ম্মান্তরিত ইহুদী হিসাবে জার্ম্মানীতে বসবাস করিবার মত তাঁহার আরামের কিছুই ছিল না। তিনি বলিতেন, "আমি ইহুদী অথচ খ্রীষ্টান, আমার জীবন বিয়োগান্ত এবং মিলনান্ত—উভয় রকম কাব্য।" হাইনের জীবন ছিল পরস্পরবিরোধী ভাবের সমন্বয়ক্ষেত্র—বড় কবি, বিখ্যাত সাংবাদিক, স্বৈরতন্ত্রের শত্রু আবার নেপোলিয়নের অনুরাগী। দুঃখবাদী হাইন অপরের ভাবপ্রবণতাকে উপহাস করিতেন অথচ নিজেই ছিলেন ভাবপ্রবণ। স্বেচ্ছায় ফরাসী দেশে নির্ব্বাসিত অথচ স্বদেশের জন্য দরদী হাইনের কবিতা ছিল জার্ম্মান পল্লীজীবনের জন্য গভীর মমতায় পূর্ণ।

প্যারিসে আসিয়া প্রথম প্রথম হাইন খুব উৎসাহ বোধ করিলেন। শহরটি খুব ভাল লাগিয়াছিল—এই বড় শহরের যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, এমনকি ইহার জনতার ভিড়ে ধাক্কা খাইয়াও ইহার প্রশংসা করিলেন। জার্মানী হইতে সুপারিশ-চিঠি লইয়া আসাতে ব্যারন রথচাইল্ডের গৃহে তাঁহার সমাদর হইয়াছিল—এই স্থানেই বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা লিজ (Listz) আর্পা, বেলিনি, মেণ্ডেলজন (Mendelssohn), বের্লিও (Berlioz) এবং রোসিনি কন্সার্ট বাজাইতে আসিত। এই স্থানেই রিচার্ড ভাগনারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

অল্প দিনেই হাইন ফরাসী বুদ্ধিজীবী-মহলে সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য সাহিত্যিক মহল অপেক্ষা সৌখীন সমাজেই তাঁহার মেলামেশা বেশী হইয়াছিল। জেরার্ড দ নের্ভাল এবং ইউজিন স্যু ছিলেন তাঁহার বন্ধু, বালজাক তাঁহাকে বেশী প্রশংসা না করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

ভিক্টর হুগো এবং লামার্টিন তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না, কিন্তু এই দুই জন ছাড়া হাইন অন্যান্য তৎকালীন রোমান্টিক লেখকগণের—যথা: ল্যামেনায়া (Lammenais), আলফ্রেড দ ভিনি, মেরিমে, বেরাঞ্জে এবং জর্জ সাঁদ-এর সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

অল্প দিনেই প্যারিসে তাঁহার খুব পসার জমিয়াছিল। ১৮৩২ সনের প্রথমে বিখ্যাত মাসিক "La Revue des Duex Mondes" (দুই জগতের নূতন ও পুরাতন সমালোচনা) প্রকাশিত হইল, Reisebilder-এর ফরাসী অনুবাদ বাহির হইল এবং অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই "L'Europe Litteraire" (ইউরোপীয় সাহিত্য) পত্রিকায় 'Die Romantische Schule' (রোমান্টিক স্কুল) প্রকাশিত হইল।

এই সময় জার্মান সংবাদপত্রের সংবাদদাতারূপেও হাইনের সুনাম হয়। তাঁহার সাংবাদিকতা ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের এবং তাঁহার এই সময়ের বাছাই লেখাগুলি পরে Franzosische Zustande (ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী) এবং Lutezia (লুটেজিয়া) এই দুই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সময় তিনি খুবই অমিতব্যয়ী ও সৌখীন জীবন যাপন করিতেন—এজন্য অর্থাভাব লাগিয়াই ছিল। ১৮৩৪ সনে ইউজেনি মিরাতের (Ugenie Mirat) সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং পরে তাহাদের পরিণয় হয়। ইউজেনিকে তিনি মাথিলডে বলিয়া ডাকিতেন। ইউজেনি ছিল অল্পশিক্ষিতা, অহঙ্কারী ও অমিতব্যয়ী সুন্দরী পুত্তলীমাত্র। কিন্তু সে তাহার স্নেহ ও প্রেম দ্বারা স্বামীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যদিও স্বামী একজন আদর্শ পত্নীপ্রেমিক ছিলেন না।

১৮৩৬ সনে যখন জার্মান বুণ্ড (সম্মিলিত জার্মান রাষ্ট্র) জার্মানীর তরুণদের উপরে আক্রমণ সুরু করে তখন হইতে হাইনের লেখা জার্মানীতে আর প্রচারের সম্ভাবনা রহিল না। পর বৎসর তিনি Pariser Zeintung (প্যারি টাইমস) নামে একখানি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন এবং প্রুশিয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি চান। তাহাকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি অবশ্য দেওয়া হয় নাই, সুতরাং কোন কাগজ প্রকাশিত হইল না।

১৮২৭ সনে যখন হাইনের Buch der Leider (গানের বই) প্রকাশিত হইল তখন রাতারাতি তাঁহার কবিখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে চারি রকমের কবিতা ছিল। তাঁহার গীতিকবিতা কেবল জার্মানীতে নয়, ইউরোপে এক নূতন ধরণের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন কবি তাঁহার কবিতায় এরূপ সাহসিকতার সহিত প্রকৃতিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেন নাই, কিংবা এরূপ জীবন্ত ভাবে হৃদয় এবং আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তিকে ফুটাইয়া তোলেন নাই। সুবার্ট তাঁহার বহু কবিতায় স্বরলিপি তৈরি করিয়াছেন—The Lorelei (লরেলাই-উপকথা) এবং Two Grenadiers-এর (দুই বন্দুকধারী) স্বরলিপি খুবই বিখ্যাত।

১৮৩৯ সনের মধ্যে হাইন বহু পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তার মধ্যে Die Romantische Schule (রোমান্টিক স্কুল) Florentinische Nachte (ফ্লোরেন্সের রাণী) এবং Elementargeister (প্রকৃতির আত্মা) বিখ্যাত। ১৮৪৭ সনে প্রকাশিত হয় Ludwig Boorne (লুডুইগ বোর্ণ) এবং Gediche und Romanzen (কবিতা ও কাহিনী)। ইহার পরে ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—Deutschland (ডয়েটসল্যাণ্ড) ein wintermarchen (একটা শীতের গল্প) এবং Atta Troll (আট্টা ট্রল), ein Sommernachtstraum (একটা গ্রীষ্মরাত্রির স্বপ্ন) এবং Die Gottin Diana (দেবী ডায়েনা)।

১৮৪৫ সনে হাইন ভয়ানক ভাবে মেরুদণ্ডের রোগে আক্রান্ত হন—ইহা ১৮৪৮ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া রাখিয়াছিল। নিদারুণ রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার চিন্তার স্বচ্ছতা ও শক্তি হ্রাস পায় নাই। এই পরস্পরবিরোধী মতের অদ্ভুত লোকটি—সুস্থ অবস্থায় যিনি ছিলেন অধৈর্য্য এবং খিটখিটে স্বভাবের, পক্ষাঘাতের সময় কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনিই দেখাইয়াছিলেন অসীম ধৈর্য্য এবং মনের প্রফুল্লতা। বহু নিদ্রাহীন রজনীতে বেদনায় ছটফট করিলেও তাঁহার কবি-কল্পনার বিরাম ছিল না। সকাল হইলেই তিনি কবিতা লিখিতেন বা একজন লেখক তাহার মুখে শুনিয়া কবিতা লিখিয়া যাইত।

এই সময় তিনি Romanzero (রোমান্জেরো) এবং Nueste Gedichte der Lieder (নূতন কবিতা ও গান) নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঔষধের প্রয়োগে অর্দ্ধনিদ্রিত এবং অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় তিনি যে কবিতা রচনা করিতেন তাহা হইত অস্পষ্ট অথচ গভীর ভাবে পূর্ণ। এই ভাবপ্রবণ কবিতা-রচনার মধ্যেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি আফিম ও মরফিয়ার অবসাদ এবং অর্দ্ধ অন্ধতা হইতে মুক্তির সন্ধানের প্রয়াস পাইতেন।

১৮৫৬ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাহার মাথার যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পাইল যে তিনি লেখা স্থগিত রাখিলেন। "আমি আমার মাথার

মণিপুরী নৃত্যশিল্পীগণ কর্ত্তৃক নাগা লোকনৃত্যানুষ্ঠান

চরকায় সুতাকাটা
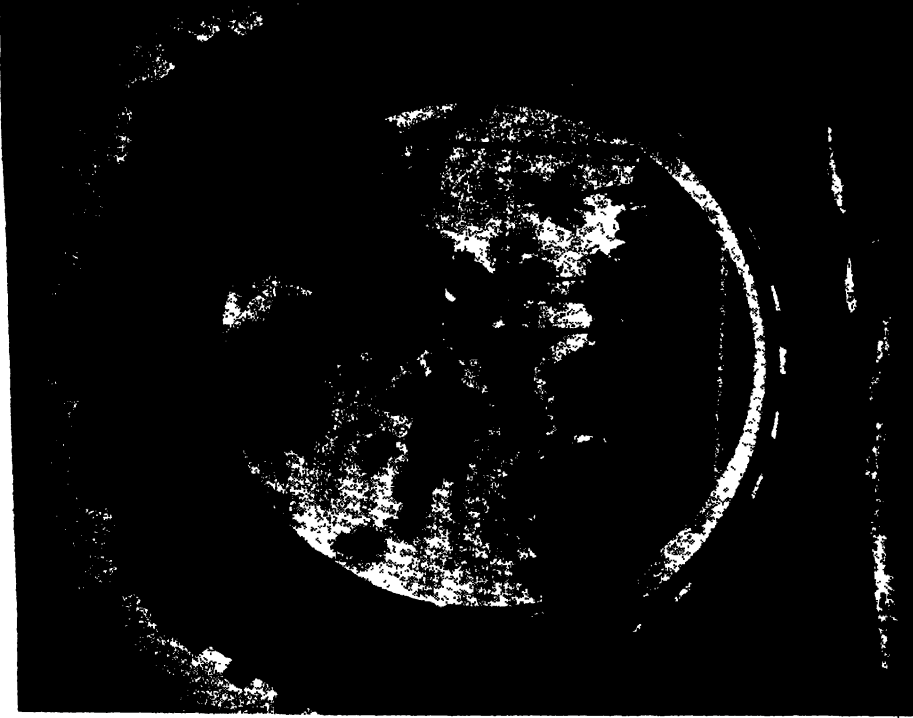
নিকট আর চিঠি লিখিতে পারিব না—আমার আত্মজীবনী শেষ করিতে আমার আরও তিন দিন বাঁচা দরকার”—হাইন বলিলেন।

হাঁ, মাত্র আরও তিন দিনই হাইন বাঁচিয়া ছিলেন। রবিবার আসিল—বেদনা তখন খুবই বাড়িয়াছে। অস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি বার বার বলিলেন, “হাঁ লিখিব, আমি নিশ্চয়ই লিখিব।” কিন্তু তাঁহার শক্তি ছিল না। মেথিল্‌ডে অপর এক ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল। হাইন আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, কেহ যেন মেথিল্‌ডেকে বিরক্ত না করে। নিঃসঙ্গ হাইন ১৮৫৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইহধাম ত্যাগ করিলেন। (ইউনেস্কো)

প্রেমের দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

“এ বুকের রক্তে যে ফুল হয়েছে রাঙা
কুঙ্কুম ঘুমভাঙা,
পাপড়ি মেলেই দেয় যদি দুই চোখে,
গুন্ গুন্ করে অলস পাড়ার লোকে
ক্ষমা করো, বুলু, এ বাউল বুলবুলে
রেখো বাতায়ন খুলে।
নিশীথে নীরবে গাঁথ যে ব্যথার মালা
অশ্রুত সুরঢালা।
আমি, সুন্দরি, সেই সৌরভভার
হৃদয়ে তুলিয়া ভুল করে একবার,
তারপর যদি আর নাহি ভাল লাগে
যদি না মহুয়া জাগে,
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো উদাসীন হেলাভরে
পথের ধূলার ’পরে।
যতটুকু পাই ভালবাসি, ভালবাসা
মান অভিমান, কান্নাখচিত হাসা
মনে মনে এই লুকোচুরি খেলাখানিক
খুলানো পরশ মাণিক।
এ রূপ-পেয়ালা কানায় কানায় ভরা
করো ত্বরা, তৃষাহরা।
বুকের বসন খসেছে কখন ভুলে,
দোলা দিল হাওয়া দেবদারুদের চুলে,
রবির কিরণ তরুণী ধরায় ঠোঁটে
মানে না সবুর মোটে।

রঙের নেশায় তোমার গানের কলি
তোলে হিয়া টলমলি।
সকল চেতনা চকিতে মাতাল করে
তুফানের ঢেউ মাথা কুটে কুটে মরে
এর চেয়ে ভালো যদি যায় ভেঙে-চুরে,
ব্যথা দিয়ে কেন দূরে।”
অবাক আলোর মেলিল ছ’কালো আঁখি
বলে, বুলু, নীল পাখী—
“বেঁচে থাক্ শুধু চেয়ে না পাওয়ার ব্যথা
পানে পানীয়ের স্বাদ মিলে কবে কোথা?
ভোগের বিলাসে মোহ আপনারে মারে
প্রজাপতি কারাগারে।
এর চেয়ে ভালো চোখে চোখে চেয়ে থাকা
থেকে থেকে শুধু ডাকা
যে নাম প্রাণের পদ্মের কোষে মধু,
ক্ষণেকেই যায় সৌরভ স্বাদ শুধু,
বিষের দাহ সে নহে ওষ্ঠাধরে
দেহ সের ভুল ভরে।
প্রেমের জগতে জোয়ারে জাগে না ভাঙা
তীর নেই, নীড় ভাঙা।
শূন্যতা দেবে পূর্ণের পরিমাণ,
পেয়ালায় বুকে সেই চিরসন্ধান।
ছুটি হাত ধরে মিনতি জানাই মিতা,
রাধারে করো না সীতা।”

১৪

সাত বৎসর পর।

চন্দ্রভূষণবাবু টেলিগ্রাফ পিয়নের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

রাজামিয়া ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ পিওন। সে এসে বেশ উৎসাহিত কণ্ঠে ডাকলে—টেলিগেরাপ—মাষ্টারবাবু।—চন্দ্রভূষণবাবু বুঝেছেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন আপিসের দরজায়।

—বকশিশ চাই হুজুর!

—নিশ্চয়! পাবি বই কি!

টেলিগ্রামখানা খুলে ফেললেন চন্দ্রভূষণ বাবু।

টেলিগ্রাম করেছেন ব্রজবিহারী বাবু। দীর্ঘ টেলিগ্রাম। ব্রজবালা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছে। বিধু ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট ষ্ট্যাণ্ড করেছে। ভুবন ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছে। অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ব্রজবিহারী।

মুহূর্তের মধ্যে আকাশে বাতাসে যেন হাজার রঙের ফানুষ ভেসে উঠল। চন্দ্রবাবু দরজার বাজুটা চেপে ধরলেন। সারাটা জীবনে এমন বিপুল আনন্দের আকস্মিক আবির্ভাব তাঁকে এক মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে নাই। মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

—ভূপতি! রাজাকে একটা টাকা বকশিশ দাও। ভূপতি ইস্কুলের নতুন ক্লার্ক। কেষ্ট! কেষ্ট!

কেষ্ট আপিসের পাশের ঘরে বসে ঢুলছিল। চন্দ্রবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের ডাক শুনে সে ধড়মড় ক'রে উঠে এল—আজ্ঞে!

—মাষ্টার মশায়দের ডাক। এখ্খুনি!

—আজ্ঞে!

—বিধু ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট হয়েছে, ভুবন পনের টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে। যাও! যাও।—হ্যাঁ। আর বাসায় যাবে একবার। ব্রজ পাস করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে, সব আগে শম্ভুকে খবর দিও।

শম্ভু অর্থাৎ শম্ভু গড়াঞী। সাত বছর আগে সিদ্ধি খেয়ে যার মাথা খারাপ হয়েছিল। সুস্থ হতে শম্ভুর লেগেছিল একটি বছর। এক বছর পর শম্ভু আবার এসে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু স্মৃতি ও মেধার সে দীপ্তি আর ফিরে পায় নি। নর্মাল পাস করা ছেলে—অঙ্ক-সংস্কৃতে পণ্ডিত, ইংরিজীতেও সে কাঁচা ছিল না; সকলেই প্রত্যাশা করেছিলেন শম্ভু স্কলারশিপ পাবে। কিন্তু ওই ঘটনার পর শম্ভু কেমন যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল। শম্ভু ফার্স্ট ডিভিশনে পাসই করেছিল, স্কলারশিপ পায় নি। অর্থাভাবে পড়ার সঙ্গতি ছিল না, তার উপর শম্ভুর আর দুটি ভাই—তারাও এই ইস্কুলেই পড়ছিল। সেই কারণে শম্ভুর সঙ্গে সঙ্গেই উপার্জন করার প্রয়োজন ছিল। চন্দ্রবাবু নিজেই শম্ভুকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন। এখানকার ফিফ্থ মাষ্টার এখন সে। বিধু শম্ভু গড়াঞীরই সব ছোট ভাই। বিধু সত্যই চৈতন্ত ইনষ্টিটুশনের কপালের অক্ষয় চাঁদ! এ চাঁদ কলায় কলায় ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়ে পূর্ণ চন্দ্র হোক।

আক্ষেপ হচ্ছে—শম্ভুর আর তাই নাই।

অদ্ভুত মেধাবীর বংশ। বিধুর বড় শম্ভুর ছোট শিবু—সেও দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল। স্কলারশিপ পাওয়ার দিক থেকে চৈতন্ত ইনষ্টিটুশনের ভাগ্য ভাল নয়। তাঁর ভাগ্য ইস্কুলের ভাগ্যের সঙ্গে জড়ানো। ধ্রুবর মত ভাল ছেলে. সে স্কলারশিপ পায় নি। শম্ভুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আর একটি ভাল ছেলে—কালী, সে দশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল। তার পর কয়েক বছরের মধ্যে ওই শিবু পেয়েছে ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ, একটি মুসলমান ছেলে এবং আর একটি তপশীলী জাতির ছেলে পেয়েছে বিশেষ বৃত্তি। বাকী বৎসরগুলি বন্ধ্যা গিয়েছে।

এ বৎসর অভূতপূর্ব্ব ভাগ্য। বিধু ফার্স্ট হয়েছে ইউনিভারসিটিতে। ভুবন ডিভিশনে ফার্স্ট হয়েছে। তার সঙ্গে বঙ্ক পাস করেছে।

সাত বৎসর পর এ তাঁর যেন সপ্তম স্বর্গ।

সাত বৎসরে চৈতন্ত ইনষ্টিট্যুশনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন, ব্রজবিহারী বাবু এখান থেকে ভাল চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছেন। জয় হোক ব্রজবিহারী বাবুর, দিন দিন তাঁর উন্নতি হোক, ভাগ্য তাঁর প্রসন্ন থেকে প্রসন্নতর হোক, তিনি চন্দ্রভূষণ বাবুর কাছে অবিস্মরণীয়; চৈতন্ত ইনষ্টিট্যুশনে তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রয়েছে এবং থাকবে। পুরনো কাল চলে যায়, নতুন কাল আসে—পুরনো কালের সঙ্গে যা পুরনো হয় তাকে পুরনো কালের সঙ্গেই যেতে হয়, নতুন কালে তার স্থান নাই—স্থান হয় না। যে নতুন কালের সঙ্গে জীর্ণতা বর্জ্জন করে নবীনত্ব অর্জ্জন করতে পারে, সেই থাকে। ব্রজবিহারী বাবু চৈতন্ত ইনষ্টিট্যুশনকে নবীনত্বের মন্ত্র দিয়ে গেছেন। কালের সঙ্গে নবীন হয়ে হয়ে সে সগৌরবে চলেছে। আজ এ কি আকস্মিক প্রকাশ তার! ব্রজবিহারী বাবুই বঙ্কবালার পড়ার ভার নিয়েছিলেন। গত বছর পর্য্যন্ত পড়িয়ে গেছেন তিনি। সাত বছর আগে ওই শম্ভু যখন সিদ্ধি খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে চলে গেল তখন বিচিত্র ভাবে বঙ্কবালার প্রশ্ন এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। রবি সিংহ বলে সেই ছেলেটিকে নিয়ে সে কি সমস্যা!

ব্রজবাবুই বলেছিলেন স্থির করুন। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন ত ভাল। সে মত যদি না থাকে তবে রবি সিং মাষ্ট গো। ওকে যেতে হবে।

মাষ্টারেরা ঠিক সেই সময়টিতেই দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আর কথা হয় নি এবং তখনই উত্তর দেবার মত মানসিক অবস্থাও তাঁর ছিল না।

ব্রজবাবু বলেছিলেন—আচ্ছা—সেকথা পরে হবে।

মন ঠিক করতে লেগেছিল এক মাস। সুযোগও হয়েছিল—সামনেই ছিল পুজোর ছুট। রবি বাড়ী গিয়েছিল। তিনিও বঙ্কবালাকে নিয়ে বাড়ী গিয়েছিলেন। সত্যবতী বলেছিল—দোষ কি? ঘর ভাল। ছেলেটি দেখতে যেন রাজপুত্তুর। পড়াতেও খারাপ নয়। দাও না বিয়ে।

রামজয় বলেছিল—শুভস্য শীঘ্রং।

—কিন্তু এত অল্প বয়সে—

—অল্প বয়স? ওহে অষ্টম বর্ষে গৌরীদান সেদিন পর্য্যন্ত চলিত ছিল। এই ত বাবুদের বাড়ীতে দেখ না, বড়বাবুর মেয়ের দশ বছরে বিয়ে হ'ল। ওই কমলেশের বোনের এগার বছরে—

—ওদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ আছে রামজয়। আমার ইচ্ছে—

—কি তোমার ইচ্ছে?

—আমার ইচ্ছে রামজয়—বঙ্কবালা লেখাপড়া শেখে।

—বেশ ত শিখুক না। ঘরে পড়াও।

—সে পড়া নয় রামজয়।

—তবে? একটু চমকে উঠেছিল রামজয়।

—আমার ইচ্ছে—বঙ্কবালাকে আমি ইস্কুল-কলেজে পড়াই। অন্ততঃ বাড়ীতে পড়িয়েও পরীক্ষা দেওয়াই। বঙ্কবালা এখানকার প্রথম মেয়ে গ্রাজুয়েট হবে। আমার ছেলে নেই; আমি এখানে প্রথম হাই ইস্কুল করেছি—বঙ্কবালা এখানে প্রথম মেয়েদের হাই ইস্কুল করবে—এই আমার ইচ্ছে।

—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

—কেন রামজয়?

—গোবিন্দকে ডাকব না ত কাকে ডাকব বল? মেয়ে তোমার পাস করবে মাষ্টার হবে. কেবতা দিয়ে কাপড় পরে সাদা সিঁথি টেনে—ইস্কুল করবে আর ওদিকে তোমার চৌদ্দ-পুরুষ বংশলোপের সঙ্গে নরকস্থ হবে। এ মতি তোমাকে কে দিলে বল ত? ব্রজবাবু?

—না। তাঁকে দোষ দিও না। এ আমার নিজের ইচ্ছে।

এর পর রামজয় আর বসে থাকে নি, উঠে চলে গিয়েছিল এবং গোটা পুজার ছুটিটাই আর আসে নি। তিনিই একদিন রামজয়ের কাছে গিয়েছিলেন।

—রাগ করেছ?

—না। লজ্জা পেয়েছি নিজের কাছেই।

হেসেছিলেন চন্দ্রবাবু। রামজয় বলেছিল—লজ্জায় আমিই যেতে পারি নি। নিত্যই যাব ভেবেছি কিন্তু লজ্জা পেয়েছি।

তামাক সেজে কায়স্থের হুকোর মাথায় চাপিয়ে চন্দ্রভূষণের হাতে দিয়ে বলেছিল—খাও।

আর একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—তুমি যখন পড়াবে ঠিক করেছ বজবালাকে—তখন পড়াও। আমার মত আমি পরিবর্ত্তন করেছি। তবে সংস্কৃত পড়িও।

—হঠাৎ?

রামজয় বলেছিল—গিয়েছিলাম মোহনপুর; বর্দ্ধমানের উকীল সন্তোষবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে। খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক নিমন্ত্রিত ছিল। সেখানে চন্দ্র—ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা—ব্রাহ্মণদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করলে সন্তোষবাবুর মেয়ে। বছর পঁচিশেক বয়স হে; অবাক হয়ে গেলাম। ওহে সভায় বসে আমাদের সব প্রশ্ন করলে! শুনলাম—মেয়েটি সংস্কৃতে এম-এ পাস। সন্তোষবাবু বললেন—মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন বাল্যকালে, বছরখানেক পর বিধবা হয়। প্রথম ইচ্ছা করেছিলাম—বিবাহ দেব। কিন্তু মা রাজী হন নি—আমার স্ত্রীও না. সবচেয়ে আপত্তি হয়েছিল মেয়ের। ও বলেছিল—আমাকে পড়ান বাবা. আমি পড়ব। তা ওর বুদ্ধিও তীক্ষ, নিষ্ঠাও অপরিসীম। পাস করে গেল একটার পর একটা। এম-এতে ত ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। ওর জন্ত আমি নিশ্চিন্ত। গল্প করলেন—এদিকে দেখছেন শান্ত শিষ্ট কিন্তু এই এবার মায়ের অসুখের সময় আমার আগেই ওরা এল এখানে। সেকেণ্ড ক্লাসে আসছে। পথে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঠলেন সদলবলে। সাহেবের ক'জন চেলাচামুণ্ডা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে মেয়েছেলেদের রক্ষকহীন দেখে চ্যাঙড়া-পনা করেছিল। মেয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডামূর্ত্তি ধারণ করে'ছিল। সমানে তর্ক জুড়েই ক্ষান্ত নয়, শেষ একটা ষ্টেশনে নেমে পাশের গাড়ীতে সাহেবের কাছে হাজির। চোস্ত ইংরিজীতে সাহেবকে বলেছিল—তোমরা নিজেদের খুব সভ্য বল, কিন্তু তোমাদের চলারা এত অসভ্য কেন? মেয়েদের সম্মান করা দূরে থাক—অপমান করে? সাহেব অবশ্য লোক ভাল—সে নিজে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে অসভ্য চেলা ছুটিকে কামরা থেকে নামিয়ে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছে। বলেছিল—আমি ওদের কঠিন শাস্তি দেব। তা ওর মায়া-মমতাও আছে—বলেছে তা করবেন না সাহেব. কারণ ওরা ত আমার দেশের লোক, আমরাই ত ওদের মা। আমাদের কাছেই ত প্রথম শিক্ষা। কে জানে—ওই অসভ্যতা আমাদের দোষেই ওরা শিখেছে

গল্প শেষ করে রামজয় বলেছিল—বজবালাকে এমনই একটি মেয়ে যদি করতে পার তবে সত্যিই আনন্দের হবে। আর—

আর একটি মেয়ের কথা বলেছিল—রামজয়ের এক জ্ঞাতি-কন্তার কথা। মেয়েটির ভাল বিবাহ হয়েছিল। পাত্রপক্ষের অবস্থা ভাল—ছেলেটিও ভাল। কিন্তু মেয়ের সন্তান হ'ল না বলে তারা ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির অবশ্য দোষ একটু আছে, সে বাপমায়ের আদরের মেয়ে—সে সতীন নিয়ে ঘর করতে পারলে না। বাপের বাড়ী এল। বাপ তিরস্কার করলে, ভাই-ভাজ অসন্তুষ্ট হ'ল। মেয়েটা অভিমানে ঘর থেকে একবস্ত্রে চলে গেল মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতেই বা ও মেয়ে থাকবে কি করে? সে এখন ভাত রান্না করছে এক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাড়ীতে। বলে খেটে খাবে।—তুমি শেখাও। ওকে লেখাপড়া শেখাও।—আমার বীণা—

রামজয়ের বিধবা মুখরা মেয়ে বীণা।

—ওকে যদি লেখাপড়া শেখাতাম চন্দ্র, আর কিছু না পারুক গ্রামে পাঠশালা করত। ওতে মনের একটা জোর হয়, পাড়াকুঁদুলী হয় না। সেদিন রাগ করা আমার অন্যায় হয়েছিল।

চন্দ্রভূষণ মনে জোর পেয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন—বজকে লেখাপড়াই শেখাবেন। গ্রাজুয়েট। শ্রীমতী বজবালা ঘোষ, বি-এ। ডটার অব চন্দ্রভূষণ ঘোষ, বি-এ। হেডমিস্ট্রেস—বিগ্রাম গার্লস হাই ইংলিশ স্কুল।

ছুটির পর এসে ব্রজবাবুকে বলেছিলেন—মনস্থির করেছি ব্রজবাবু। বজবালাকে আমি পড়াব—রীতিমত পড়াব। বিয়ের কথা এখন ভাবব না। যদি পড়াশুনা না হয়—

হা-হা করে হেসেছিলেন ব্রজবাবু। আপনার মেয়ের লেখাপড়া হবে না?

—তা হয় না। পণ্ডিত বাপের মূর্খ ছেলের অভাব নেই। অনেক।

—সে পণ্ডিত লোকেরা বাপ হিসেবে মূর্খ বলে। আপনার বজবালার পড়ার ভার আমি নেব। আমার স্ত্রী এখন ওকে পড়াবে, আমি তদ্বির করব। তার পর বছরতিনেক পর ফোর্থ ক্লাস থেকে আমি পড়াব।

ব্রজবাবু সেই বারই বাসা করেছিলেন। মেয়েটি শহরের মেয়ে, ম্যাট্রিক পাস। বিয়ের পর বাড়ীতে ব্রজবাবুর কাছেই আই-এ পড়ছিল। চমৎকার মেয়ে। তাঁর কাছে বজ শুধু লেখাপড়াই শেখে নি—একটা আদর্শ পেয়েছিল—তাঁর মধ্যে।

ব্রজবাবু বলেছিলেন আপনাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। বছরে চারটে পরীক্ষা নিতে হবে। রীতিমত কোশ্চেন পেপার করে এগজামিনেশন।

রবি সিং সেই বছর ক্লাস প্রমোশনের পর এখান থেকে ট্রানসফার নিয়ে চলে গেল।

সাত বছর পর বজবালা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলে।

আর বিধু গোটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট হয়েছে। ভুবন ডিভিশনে ফার্স্ট হয়েছে। এ আনন্দ তিনি রাখবেন কোথায়? এমন দিন তাঁর জীবনে আর কখনও আসে নি, হয় ত কখনও আসবে না। না আসবে—আসতে পারে। দু'বছর পর বজ যখন আই-এ দেবে, সেবার—তাঁর ইস্কুলের—সেবার কান্তি বলে ভাল ছেলেটি সে—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রথম হতে পারে।

—মাষ্টারমশায়—

—ও শম্ভু! টেলিগ্রামখানা বাড়িয়ে ধরলেন চন্দ্রবাবু—পড়্। বিধু ফার্স্ট হয়েছে।

শম্ভুর চোখ দুটি চিরকালের মত কেমন লালচে হয়ে গেছে, দৃষ্টির একটা অস্বচ্ছতা যেন চব্বিশ ঘণ্টা ফুটে থাকে। মধ্যে মধ্যে অর্থহীন ভাবে হাসে। শম্ভু হাসছে।

—সে আমি জানি। একটি আঙুল তুলে বললে—এটা আমিও জানি, বিধুও জানে। খুক খুক করে সকৌতুকে হাসছে শম্ভু।—শিবুও হ'ত—ফার্স্ট-সেকেণ্ড একটা হ'ত। কিন্তু সে একটা খারাপ কাজ হয়ে গেল। আমি জানি আর শিবু জানে।

—চন্দ্র!

আজ চন্দ্র বলে আহ্বান করে রামজয় এসে ঢুকলেন।

—এস রামজয়! আজকের মত শুভ দিন আমার জীবনে আর আসে নি।

—বজবালা পাস করেছে। ফার্স্ট ডিভিশনে। এই যে! আয়—আয়—আয় মা।

বজবালা ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। বজবালা আজ সলজ্জ কিশোরী। সে প্রণাম করতে লাগল সকলকে।

এদিকে ক্লাসে ক্লাসে কলরব উঠছে। ছেলেরা হৈ চৈ সুরু করেছে।

—ছুটি দাও চন্দ্র।

—নিশ্চয়!

—কেষ্ট! কেষ্ট! না, দাঁড়াও। ভূপতি ইস্কুলের হলে সমস্ত ছেলেদের জড়ো হতে বল। আমি ওদের কিছু বলব। হ্যাঁ কিছু বলা দরকার। তার পর ছুটি। শুধু আজকের মত নয়। কাল ফুল হলিডে। ফুল হলিডে।

ক্রমশঃ

ব্যাপ্তিবাদ ও জ্ঞানকাণ্ড

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্যাপ্তিপঞ্চক (সিংহব্যাঘ্রপ্রকরণসহ), ব্যধিকরণ, পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণ, সিদ্ধান্ত লক্ষণ, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি, সামান্যাভাব, বিশেষ ব্যাপ্তি ও অতএব চতুষ্টয় এই আটটি প্রকরণকে আচার্য্যপরম্পরায় ব্যাপ্তিবাদ-রূপে এবং ব্যাপ্তি গ্রহোপায়, তর্ক, ব্যাপ্ত্যনুগম, সামান্য লক্ষণা, উপাধি, পক্ষতা, পরামর্শ কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকী, অর্থাপত্তি, অবয়ব, সামান্যনিরুক্তি, সব্যভিচার, সাধারণ, অসাধারণ অনুপ-সংহারি, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি, বাধ ও অসাধকতাসাধকত্ব,—এই একুশটি প্রকরণকে অনুরূপভাবে জ্ঞানকাণ্ডরূপে ধরা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার এই যে, ব্যাপ্তিবাদের প্রথম দুইটি, অর্থাৎ, ব্যাপ্তিপঞ্চক ও ব্যধিকরণ প্রকরণে ব্যাপ্তির স্বরূপ-মাত্র আলোচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ছয়টি ও জ্ঞানকাণ্ডের অর্থাপত্তি পর্য্যন্ত দশটি—মোট ষোলটি প্রকরণে স্বার্থানুমানের আলোচনা রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের অবয়ব প্রকরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এগারোটিতে পরার্থানুমানের আলোচনা দৃষ্ট হয়। অনুমান যে স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধরূপে স্বীকৃত তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আলোচনায় দেখা যায়। আচার্য্য গঙ্গেশ, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী প্রভৃতি অনুমান বিভাগ যে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা উক্ত প্রকরণদ্বয়ের আলোচনাতেই সুস্পষ্ট। বরং বৌদ্ধন্যায়-স্বীকৃত স্বার্থ ও পরার্থ বিভাগ স্বীকার করিয়াই তিনি যে অনুমান-প্রকরণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা তত্ত্বচিন্তামণির পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণে উল্লিখিত "স্বার্থানুমানোপযোগি ব্যাপ্তিস্বরূপ নিরূপণং বিনা কথায়ামপ্রবেশাদিতি" এবং অবয়ব-প্রকরণের উপোদ্ঘাত উক্তি—"উক্তানুমানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যমিতি"...ইত্যাদি হইতে ধরা পড়ে।

নব্যন্যায়ের ব্যাপ্তিবাদ ভালভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার এই যে, প্রাচীন ন্যায়ে যাহা "অবিনাভাব" নব্যন্যায়ে

তাহা "ব্যাপ্তি"। "ব্যাপ্তি"প্রসঙ্গ আদিতে মীমাংসাশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল ; আচার্য্য উদয়নই প্রথমে ইহাকে তার বৈশেষিকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া "কিরণাবলী" গ্রন্থে আলোচনা করেন। কিন্তু তখনও ইহা "অবিনাভাব" লক্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিকাশলাভ করে নাই। আচার্য্য শিবাদিত্যের "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থে দেখা যায়, "হচ্চব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতা বিশিষ্ট লিঙ্গ জ্ঞানম্" (সূত্র-১২৪) এবং "ব্যাপ্তিশ্চ ব্যাপকত্ব ব্যাপ্যাধিকরণ উপাধ্যভাব বিশিষ্ট সম্বন্ধ" (সূত্র-১২৫)। ব্যাপ্তি-বিষয়ক এই দুইটি সূত্র এবং "শব্দস্যাপ্যনুমান বিবক্ষেনাবিনাভাবোপজীবকত্বেন বা অনুমানত্বম্" সূত্রটির দ্বারা উভয় সংজ্ঞাই পাশাপাশিভাবে রাখিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী প্রকরণে উভয় যেরূপে আঙ্গিকভাবে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে তাহার সমৃদ্ধ প্রমাণ আচার্য্য গঙ্গেশের উক্ত তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডে পাওয়া যায়। এখন "ব্যাপ্তিপঞ্চক" প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যে, "ব্যাপ্তি" আর "উপাধ্যভাববিশিষ্ট" নহে এবং উক্ত প্রকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট "সিংহব্যাঘ্রপ্রকরণে" সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বিচার দ্বারা ব্যাপ্তির সহিত "অবিনাভাব" তত্ত্বের সম্বন্ধ বিচার করা হইয়াছে। ব্যধিকরণ প্রকরণে ইহা ছাড়া উক্ত "অবিনাভাব"তত্ত্বসংশ্লিষ্ট 'অভাব' ও ব্যধিকরণ সম্বন্ধ বিচারে ব্যাপ্তিলক্ষণকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন ন্যায়ের অবিনাভাব যদি ক্রমপরিণতির ফলে নব্যন্যায়ের "ব্যাপ্তি" হয় তবে উক্ত অবিনাভাব পদার্থের 'অভাব'পদার্থ কি সূচনা করে ইহা বিচার্য। 'অবিনাভাব' বলিতে 'বিনাভাবে'র 'অভাব' না 'অবিনার অভাব' না অন্য কিছু বুঝায়—ইহা জানা আবশ্যক। এই সঙ্গে ইহাও জানা দরকার যে,'অভাব' দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব কি না, অবশ্য অভাবকে প্রতিযোগীরূপে পাইলে যে-কোনও বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় এবং সেই দিক দিয়া বিচারে 'প্রতিযোগিতাকাভাব' ব্যাপ্তিজ্ঞানেরও হেতু, কিন্তু সে স্থলে 'অভাব'-পদার্থের সামানাধিকরণ্য অবস্থা আবশ্যক, কিন্তু ব্যধিকরণ অবস্থায় তাহা সম্ভব নহে।

অবিনাভাব বলিতে কথার মারপ্যাঁচে অন্য যে-কোনও অর্থ আসার সম্ভাবনা থাকুক, নৈয়ায়িক কিন্তু 'বিনাভাবের' অভাব ছাড়া অন্য কোনও অর্থগ্রহণ করিতে পারেন না। প্রচলিত শ্লোক—

এষ বন্ধ্যা সুতো যাতি খে পুষ্প কৃত শেখরঃ।
কূর্ম্মক্ষীর চয়স্নাতঃ শাশশৃঙ্গ ধনুর্ধরঃ।

মধ্যে যে বহু অসম্ভব বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে "শশশৃঙ্গ" পদটিতে 'শশেশৃঙ্গাভাব' ব্যতীত অন্য কোনও অর্থ নাই, কারণ "শশ" এবং "শৃঙ্গ" উভয় বস্তুই পৃথিবীতে বিদ্যমান। এই জন্যই 'ব্যধিকরণ' প্রকরণের শেষে চিন্তামণিকার বলিয়াছেন যে—শবিশশ-শৃঙ্গাভাব প্রতীতের সিদ্ধেঃ শশশৃঙ্গং নাস্তীতি চ শশেশৃঙ্গাভাব ইত্যর্থঃ।

"ব্যধিকরণ লক্ষণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "সপ্তপদার্থী"-কার" বলিয়াছেন যে—ব্যধিকরণং সধ্যাবর্ত্তকমূপলক্ষণম্। ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত পদবাচ্যত্বং বৈয়ধিকরণ্যম্ (সূত্র-১৬০)। ব্যধিকরণ যে সমবায় নহে তাহা মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার উক্ত প্রকরণ দীধিতি ব্যাখ্যানটীকায় বলিয়াছেন—(সমবায়িত্বং নতত্ত্যধিকরণ ধর্ম্ম)। তবে এই ব্যধিকরণ লক্ষণের উপর যে বিরাট বিচার, প্রথমতঃ শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, পরে 'প্রগল্ভাচার্য্য তৎপরে জয়দেব (পক্ষধর) মিশ্র এবং অবশেষে বাসুদেব সার্ব্বভৌম দ্বারা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়। এই সমস্ত মতের বিচার এবং খণ্ডনের পরও বঙ্গগৌরব রঘুনাথকে সার্ব্বভৌম-ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের বিদুষী প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং স্বীয় প্রতিভাবলে একটি মতের খণ্ডন করিয়া অপরটিকে গঙ্গেশের স্বীকৃত পন্থায় পুচ্ছলক্ষণরূপে অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে—তাহাতে ধরা পড়ে। এই ব্যধিকরণ প্রসঙ্গকে একেবারে উড়াইবার প্রচেষ্টা বহু পণ্ডিতের মধ্যে দেখা গেলেও নৈয়ায়িক শিরোমণি 'ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব' যে বিরল ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মাইতে পারে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং এই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব সমবায় জ্ঞান জন্মায়। ইহা ব্যধিকরণের কেবল প্রথম সূত্র—'অথেদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাদিত্যত্র সমবায়িত্বয়া বাচ্যত্বাভাবো ঘটে এবং প্রসিদ্ধঃ, ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবস্য কেবলান্বয়িত্বাৎ দ্বারাই প্রমাণিত তাহা অন্যরূপেও প্রমাণিত হয়। অভাব ও সমবায় অনেক বৃত্তি, কিন্তু প্রতিযোগীর দ্বারা নিরূপণীয়, কাজেই উহারা সহায়সম্পন্ন, সুতরাং সমবায় ও অভাবের জ্ঞান অন্য নিরূপ্য বলিয়া ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব সমবায় মাত্র। আরও প্রমাণ এই যে, বঙ্গগৌরব রঘুনাথ সমবায়ত্বকে অখণ্ডোপাধি বলিয়াছেন। 'বলভদ্র সন্দর্ভ' মতে আশ্রয়োপাধি শরীরপ্রবিষ্ট ব্যাপকত্বাব্যাপকত্ব তথত্তস্তত্তভাব অখণ্ড উপাধিঃ [সপ্তপদার্থী ১২৫ সূত্রের সম্যগনুপলভ্য অংশরূপে গৃহীতাংশ]। বাঙলায় বিভক্তির ব্যধিকরণে যে সমবায় লক্ষণ দেখা যায় [প্রবাসী ১৩৫৪ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "সমবায়" প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য] তাহা উক্ত বলভদ্র লক্ষণের সহিত সমন্বযুক্ত। সো-দড় উপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত এই ব্যধিকরণ বাদ আধুনিক উপযোগিতা প্রমাণে সজীব এবং সর্ব্বথা স্বীকারযোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আন্বীক্ষিকীর ব্যাপ্তিবাদ মীমাংসা দর্শন হইতে আসিয়াছে। কিন্তু মীমাংসা দর্শনের ব্যাপ্তি ধর্ম্ম আন্বীক্ষিকীর ব্যাপ্তিধর্ম্ম হইতে পৃথক। সুবিখ্যাত ভট্টবাদী মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র তাঁহার "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে এই ব্যাপ্তিধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

ভূয়োদর্শন গম্যাহি ব্যাপ্তিরিত্যভিধানতঃ—(পৃষ্ঠা ৬৭)।

কিন্তু "তত্ত্বচিন্তামণি"কার "ব্যাপ্তিগ্রহোপায়" প্রকরণের প্রথমেই বলিয়াছেন—সেয়ং ব্যাপ্তি ন ভূয়োদর্শন গম্যা দর্শনানাং প্রত্যেকম্ হেতুত্বাৎ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মীমাংসামতে ব্যাপ্তি ভূয়োদর্শন-গম্যা, কিন্তু আন্বীক্ষিকী মতে ইহা সেরূপ নহে। "সপ্তপদার্থী"র ব্যাপ্তিলক্ষণে উপাধির অভাব স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ

ব্যাপ্তিলক্ষণ অবিনাভাবের সহিত একাকীভূত হইবার প্রয়োজনে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে ক্রমবিকাশলাভ করিয়াছে ততই উপাধির ব্যভিচারও যে কখনও কখনও ব্যাপ্তিজ্ঞানে সাহায্য করে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং ফলে উক্ত উপাধি-প্রসঙ্গ অনুমানখণ্ডের এক বিশিষ্ট অংশরূপে গ্রহণ করিতে আচার্য্য গঙ্গেশকেও বাধ্য করিয়াছে। এই আলোচনায় আমরা মীমাংসা বৈশেষিক ও আন্বীক্ষিকীসম্মত ব্যাপ্তিলক্ষণের পার্থক্য পাইতেছি।

মীমাংসা ও বৈশেষিকের ব্যাপ্তি কতিপয় নিয়মসিদ্ধ। "বলভদ্র সন্দর্ভের উল্লিখিত শেষাংশে বলা হইয়াছে যে—তৎপশ্চাত্তাভাবঃ সংযোগাভাব বিশেষশ্চ, তত্র প্রতিযোগ্যারোপহেতুকী বিষয়াভাবশ্চ বিঘটিত নিয়ম চ ব্যাপ্তিরিতি শাস্ত্রাশ্রয়াদিঃ। বৈশেষিকের এই সূত্রে ব্যাপ্তিঘটিত নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু উক্ত নিয়মসূত্র যথাযথ ভাবে পাই না। কিন্তু মীমাংসাশাস্ত্রে উক্ত সূত্র সুনির্দিষ্ট। "পার্থ সারথি"র উক্ত "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে ব্যাপ্তিবাদের তৃতীয় কারিকায় (পৃঃ ৫৭) আমরা পাইতেছি :

যো যথা নিয়তো যেন য দৃশেন যথাবিধঃ।

স তথা তাদৃশস্তৈব তাদৃশোঽন্যত্র বোধকঃ॥

উক্ত কারিকার মূল অর্থ—' যে পদার্থ যাহা তাহাই" এবং ইহাই পাশ্চাত্ত্য আন্বীক্ষিকী মতে The Law or Principle of Identity। "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে উল্লিখিত কারিকার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আরও দুইটি উদ্ধৃত কারিকা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটি নিম্নরূপ :

সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাঽত্র লিঙ্গধর্মস্য লিঙ্গিনা।

ব্যাপ্যস্য গমকত্বঞ্চ ব্যাপকং গম্যমিষ্যতে॥

উক্ত কারিকার অন্তর্নিহিত অর্থে—"যে-কোনও পদার্থ হয় আছে, না হয় নাই" এই নিয়ম পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করিলে ইহার অর্থ আরও দাঁড়ায় এই যে, কোনও পদার্থের দুইটি বিরোধী গুণের একটি অবশ্যই থাকিবে, কোনওটি নাই এরূপ হইতে পারে না।" অর্থাৎ ইহা দ্বারা পাশ্চাত্ত্য The Law or Principle of Excluded Middle পাইতেছি।

অন্য কারিকাটি—

যো যস্য দেশকালাভ্যাং সমোন্যূনোঽপি বাস্তবেৎ,

সব্যাপ্যো ব্যাপকস্তস্য সমো বাঽপ্যধিকোঽপিবা॥

এই কারিকাটির অর্থে The Law or Principle of Contradiction অর্থ মেলে। এই তিনটি ব্যাপ্তি সংক্রান্ত নিয়ম মীমাংসা দর্শন স্বীকৃত হইলেও আন্বীক্ষিকী প্রকরণে স্বীকারে কোনও অসুবিধা নাই। বরং ইহাদের গ্রহণে উক্ত শাস্ত্রকে আধুনিক যুগোপযোগীরূপে দাঁড় করাইবার বিশেষ সুবিধা আইসে।

এক্ষণে অনুমানের বিভাগ বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। "সপ্তপদার্থী" মতে অনুমানের দ্বিবিধ বিভাগ—"স্বার্থমর্থরূপম্" এবং "পরার্থঞ্চ শব্দরূপম্" রূপে নির্দিষ্ট হইলেও স্বার্থানুমান যে ব্যাপ্ত্যাশ্রয়ী তাহা পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণ-উদ্ধৃত সূত্র প্রমাণে আগেই বলিয়াছি। এই স্বার্থানুমানকে সর্ব্বাংশে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের Immediate Inference-এর সহিত অভিন্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ যে অনুমানে একটি মাত্র কথা হইতে অন্য কোনও কথার সাহায্য না লইয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই Immediate Inference. [Immediate inferences are mere developments out of a single proposition already accepted.] ইহার অর্থ "স্বার্থমর্থরূপম্" এই সপ্তপদার্থী সূত্রের অনুরূপ। বাস্তবিক একটি মাত্র কথা হইতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিশেষভাবে আবশ্যক এবং সেই জন্য পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণের উক্তি—"স্বার্থানুমানোপযোগি ব্যাপ্তিস্বরূপ নিরূপণং বিনা কথায়ামপ্রবেশাদিতি"—Immediate Inference-এর ভারতীয় সংজ্ঞাও স্বীকার্য্য। Mediate Inference-কে পাশ্চাত্ত্য নৈয়ায়িকেরা Syllogistic ও Inductive এই দুই ভাগ করেন, এই Mediate Inference-এর যে বিভাগ Syllogism-এর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাকেও নিঃসন্দেহে পরার্থানুমান বলা যায়, কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শব্দানুমানং পরার্থং ন্যায়সাধ্যমিতি।—অবশ্য পরার্থানুমানেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু তাহা গৌণ।

স্বার্থানুমানও ব্যাপ্তির সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে "কথা"-র যে উল্লেখ আচার্য্য গঙ্গেশ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ কি। কথা-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা জগদ্গুরু জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য লিখিত "ন্যায় সিদ্ধান্তমালা" গ্রন্থের ৫৬-৭১ পৃষ্ঠায় দেখা যায়। উক্ত প্রকরণমধ্যে "কথা"র যে সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে—নানাস্থাপনা প্রতিস্থাপনা ভিন্নৈকা কথা (পৃঃ-৫৪)। এই কথার বিভাগ "উদ্ভাবন, উত্থাপন" প্রভৃতি নানা প্রকারের হইতে পারে। জগদ্গুরু জয়রাম বলিয়াছেন—নতু তদুদ্ভাবনেন কথা বিচ্ছেদঃ (পৃ-৫৭)। কিন্তু উদ্ভাবন (conversion) প্রভৃতি প্রক্রিয়া অনুমিতি ক্রিয়াসহায়ক কিনা ইহাতে সন্দেহ আসিতে পারে। কারণ ন্যায় পরিশুদ্ধিকার মতে—সর্ব্বেষামপ্যনুমানানাং স্বপ্রতিসন্ধানাদিবলেন প্রবৃত্ততয়া স্বব্যবহার মাত্র হেতুত্বেন চ স্বার্থত্বাৎ। বাক্য প্রতিপত্তেরপি নতু বাক্য বলাদর্থসিদ্ধিঃ (পৃঃ—১৫৭৫) বলিয়া উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে আমরা একটি সত্য হইতে অপর এক সত্যে উপনীত হইতে পারি না। একটি ব্যাপারকে যে শব্দসমষ্টি দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকেই কি ভাবে অন্য কতকগুলি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় তাহা দেখানোই ইহাদের কার্য্য। "সকল মনুষ্য মরণশীল" এবং "কোনও মনুষ্য অমর নহে"—এই দুই কথা একই ব্যাপারকে দুই ভাবে প্রকাশ করিতেছে মাত্র, দ্বিতীয় কথার মধ্যে কোনও নূতন সত্যের সূচনা নাই। ন্যায় পরিশুদ্ধিকার সেজন্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, তদিদমনুমানং স্বার্থং পরার্থং চেতি কেচিদ্বিভজন্তে, তদযুক্তম (ঐ পৃঃ ১৫৪)। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বক্তব্য যদি এই যে উদ্ভাবন, উত্থাপন ইত্যাদিতে সিদ্ধ ত্রুটি অনিবার্য্যভাবে কোনও হেতুবাক্য হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা

কোনও নূতন সত্যকে প্রকাশ করে না তাহা হইলে যে কোনও অনুমান সম্বন্ধেই ইহা খাটিবে—অর্থাৎ, আমরা যে সকল প্রক্রিয়াকে অনুমান বলিয়া গণ্য করি তাহাদের কোনওটিকেই প্রকৃতপক্ষে অনুমান বলিয়া মনে করা চলিবে না। কিন্তু বক্তব্য যদি এই হয় যে, কোনও স্বার্থানুমানে আমরা যে সত্যে উপনীত হই তাহা বাস্তবিক হেতুবাক্য হইতে ভিন্ন নহে তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, দুইটি কথা যে দুইটি সত্যকে প্রকাশ করিতেছে তাহারা অভিন্ন অথবা পৃথক তাহা নির্ণয় করা যাইবে কি উপায়ে? কেবলমাত্র সম্বন্ধ পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারাই ইহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ উক্ত ন্যায় পরিশুদ্ধিকার মতেও স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি প্রতি-সন্ধান ইত্যাদি কার্য্য [কিন্তু বাক্যার্থোপস্থাপিত ব্যাপ্তি প্রতিসন্ধানাদিনৈব—পৃঃ ১৫৫]। উদ্ভাবন, অথবা উত্থাপন সিদ্ধান্তের সহিত হেতুবাক্যের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, হেতুবাক্য যে দুই বিষয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, সিদ্ধান্ত-বাক্য ঠিক সেই দুই বিষয়ের মধ্যে সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করে না। হয় একটি বিষয়ের পরিবর্ত্তে অপর একটি বিষয় উপস্থিত হয়, নতুবা সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে অথবা এই উভয় পরিবর্ত্তনই ঘটিতে পারে। "সকল শিক্ষিত ব্যক্তি দূরদর্শী, অতএব কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি অদূরদর্শী নহেন"—এ স্থলে হেতুবাক্যে আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু হইতেছে "শিক্ষিত ব্যক্তি" ও "দূরদর্শিতা" এবং তাহাদের মধ্যে 'সরূপ সম্বন্ধ'; কিন্তু সিদ্ধান্তে আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তু হইতেছে, "শিক্ষিতব্য কি" ও "অদূরদর্শিতা" এবং তাহাদের মধ্যে 'বিরূপ সম্বন্ধ'। এ স্থলে যখন দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধান্ত-বাক্যের বিষয়বস্তু হেতুবাক্যের বিষয়বস্তু হইতে ভিন্ন তখন তাহাকে কেবলমাত্র হেতুবাক্যের পুনরাবৃত্তি বলিব কেন। যদি সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র না হইত তাহা হইলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি হেতুবাক্য হইতে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত সত্যই নিঃসৃত হইতেছে কিনা তাহা নির্ণয় করিতে কষ্ট পাইতে হইত না। সুতরাং উদ্ভাবন, উত্থাপন ইত্যাদিকে অনুমান বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ নব্য ন্যায়মতে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞানসৃষ্টি জন্য জ্ঞানই অনুমিতি এবং তাহার করণই অনুমান [তত্র ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান জন্য জ্ঞানমনুমিতি তৎকরণমনুমানম্—তত্ত্বচিন্তামণি অনুমান প্রকরণ]।

শীত রাত্রি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কুয়াশায় ঢাকা ময়দান,
শীত রাত্রি। কমেছে যাত্রীর ভিড়।
চাদর জড়ায়ে ব'সে আছি ট্রামে।
চাকার ঘর্ঘর শব্দে বাজিছে ঘুমের তাল,
তন্দ্রা ভরা চোখ।

রান্না শেষ কখনস ক্কার,
ছেলেরা ঘুমায়,
সমতার সাবাদেহে গভীর, গভীর, অবসাদ,
ক্লান্তি ভার, সর্ব্বাঙ্গে আমার।

ট্রাম থামে, নামি পথে, এ কি কলকাতা?
পথ জনহীন।
একটি ভিখারী শুয়ে আছে ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকায়ে।

এসেছি গলির মোড়ে,
ছোট চালাঘর,
মাটির দেয়াল।
সমতা দুয়ার খোলে,
হারিকেন মিটিমিটি জ্বলে।

শীর্ণ মুখ মলিন-বসন সমতা আমার।
কত রাত আছে প্রতীক্ষায়,
আরও কত রাত!
জীবনে নেমেছে শীত, শীতল তুহিন,
বক্ষে নাই আগুনের তাপ।
স্বপ্ন সব শেষ হয়ে গেছে।
শুধু দুটি অন্ন চাই সন্তানের মুখে,
সকালে চায়ের জল, এক টুকরো রুটি।

সম্মুখে প্রান্তর গাঢ় কুহেলি বিলীন
আচ্ছন্ন করিয়া লবে ঘন আবরণে।

ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম্ম

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভারতের শিল্প মূলতঃ আধ্যাত্মিক এবং যে নিগূঢ় অধ্যাত্ম-রহস্য হতে এর উদ্ভব তার থেকে একে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরিপ্লুত এমন এক পরিবেশে এর সৃষ্টি হয়েছিল যা হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত প্রাণসত্তা। কেবল-মাত্র মানবিক সম্পর্ক অপেক্ষা অধ্যাত্ম ভাব-কল্পনা ভারত-শিল্পে এত

লক্ষ্মী

বেশী রূপায়িত হয়েছে যে, এদেশের লোকেদের নিকট "শিল্পের জন্য শিল্প" এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক বলে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, শিল্পসৃষ্টি সেখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে। শিল্পীকে—তা তিনি চিত্রকরই হোন্ বা ভাস্করই হোন্, পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম ভাব-দ্যোতক প্রতিমূর্ত্তি-সৃষ্টির জন্য যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে, তা যেমন সূক্ষ্ম তেমনই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ।

এই কারণেই, যে আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিকে এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা কখনও কখনও তাদের করে তুলেছিল সঞ্জীবিত

নৃত্যকারিণী, (তাম্রমূর্ত্তি, মোহেন্-জো-দড়ো)

তার থেকে এই সকল প্রতিমূর্ত্তিকে বিচ্ছিন্ন করা বড়ই কঠিন। কেননা শিল্পীর রূপ-ভাবনার সঙ্গে সকল সময়েই জড়িয়ে থাকে এমন একটি উদ্দেশ্য যা খাঁটি নন্দনতত্ত্বের এলাকার বহির্ভূত।

শিল্পী সকল সময়েই গ্রহণ করে মানবীয় এবং অতিমানবীয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারীর ভূমিকা।

সরস্বতী

গোড়াতেই পাশ্চাত্ত্য শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মূলগত গভীর পার্থক্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সুদূর অতীতকাল থেকে পাশ্চাত্ত্যের শিল্পীরা করে আসছে প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ, তাদের শিল্পসৃষ্টিতে মানুষের তো বটেই, দেবতাদেরও পর্য্যন্ত দৈহিক সৌন্দর্য্যের রূপায়ণই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে—গ্রীক দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তিগুলি রূপসৃষ্টির দিক দিয়ে নিখুঁত, তবে সেগুলিতে দেবদেহের সঙ্গে নরদেহের কোন পার্থক্য নেই। দিব্যানুভূতিসম্পন্ন ভারতের শিল্পী কিন্তু দেহের মধ্যে খুঁজেছেন বিদেহী সত্তাকে, তাই রূপের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন রূপাতীতকে। গভীর ধ্যানের ফলে তাঁদের মানসলোকে দেবতার যে রূপ প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে তাকেই তাঁরা রূপায়িত করেছেন তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে। ভারতীয় শিল্পে দেবদেবীর রূপ-কল্পনার মূলে রয়েছে সাধক-শিল্পীর ধ্যানলব্ধ সত্যানুভূতি। ভারতীয় শিল্পে বৌদ্ধ এবং হিন্দু দেবদেবীদের যে সকল প্রতিমূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই তারও বেশীর ভাগ ধ্যানী-মূর্ত্তি। যৌগিক সাধনার ধ্যান-ধারণা প্রত্যাহার ইত্যাদি কতকগুলি ক্রমিক স্তর অতিক্রমণের পর এমন অবস্থা আসে যখন সাধক ধ্যেয় বিষয়ের সহিত হয়ে যান একাত্ম—এরই নাম সমাধি। যে জটিল সাধন-পদ্ধতির মূলে রয়েছে এই যোগারূঢ় অবস্থালাভের অভীপ্সা, তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে দেবদেবীর এই সকল রূপ-কল্পনা। একদিকে যেমন অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ফলে সৃষ্ট এই সমস্ত রূপের তত্ত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে শিল্পশাস্ত্রসমূহে, অন্যদিকে তেমনি শাস্ত্রনিবদ্ধ এই সকল নিয়ম অনুসরণ করা শিল্পীর পক্ষেও ছিল অপরিহার্য্য—কেননা বিশ্বাসী ভক্তকে দেবতার দৈহিক প্রতিরূপের গণ্ডী অতিক্রম করে দিব্যানন্দের এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ হতে হ'ত যেখানে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে পরিণত হয় দেহাতীত চিন্ময় সত্তায়। ফলে ধ্যানী-শিল্পীর মন তাঁর ধ্যান-ধারণার আধারের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধিকেই তিনি ফুটিয়ে তোলেন ভাস্কর্য্য অথবা চিত্রকর্ম্মের মাধ্যমে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতের শিল্পীর লক্ষ্য ছিল অধ্যাত্ম অনুভূতির রূপময় প্রকাশ—তা শরীরী আকার পরিগ্রহ করত দেবতার প্রতিমূর্ত্তির মাধ্যমে। ভারত-শিল্পের এই সকল মূল সূত্রের কথা মনে রাখলে এটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাবে যে, ভারতের চিত্রকলা এবং মূর্ত্তিশিল্পের পক্ষে একটি অ-সাধারণ পথ অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বুদ্ধ অথবা মহাবীর জৈনের মত লোক-গুরুদের দৈহিক রূপায়ণেও সেই পন্থাই অনুসৃত হয়েছে।

মহাসম্বোধি লাভের পূর্ব্বে ও পরে বুদ্ধের দেহ শারীর-স্থানের (Anatomy) দিক দিয়ে ছিল একই, কিন্তু মহাসম্বোধি পুরোপুরি রূপান্তরিত করে দিয়েছিল সন্ন্যাসী গৌতমকে, সমগ্র বিশ্বের উপর লাভ করেছিলেন তিনি অখণ্ড আধিপত্য। বস্তুতঃ, শাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মপদ্ধতিকে জয় করে ধর্ম্মের গুহাহিত সত্যকে মানবজাতির নিকট প্রকাশিত করবার জন্যই হয়েছিল তাঁর জন্ম এবং তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিগ্রহ।

গোড়াকার দিকের বৌদ্ধ শিল্প বুদ্ধের এই মূলগত অধ্যাত্মসত্তাকে মানবীয় আকার দিতে গিয়ে স্বকীয় অক্ষমতা উপলব্ধি করে অবশেষে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করল। এইখানেই পাশ্চাত্ত্য শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মূলগত পার্থক্য। পাশ্চাত্ত্যের শিল্পীদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে, তাই দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকেও দিয়েছে তারা মানবীয় রূপ। কিন্তু ভারতের শিল্পী অনুসরণ করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ, মহিমময় আত্মিক সত্তাকে প্রকাশের জন্য এদেশের শিল্পী অনবরত শারীর-স্থান বিষয়ক খুঁটিনাটিকে উপেক্ষা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। শিল্পশাস্ত্রসমূহ থেকে তিনি আহরণ করেন সেই সকল সুনির্দ্দিষ্ট প্রতীক যেগুলি তার ভাবাদর্শের রূপায়ণের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। তাঁর হাত দিয়ে যে মূর্ত্তি সৃষ্ট হয় তাতে তিনি বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে তার দৈহিক একাত্মতা দেখাবার প্রয়াস পান।

বুদ্ধ যে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করেন তার সঙ্গে তাঁর মানবীয় ব্যক্তিসত্তা হয়ে যায় এক এবং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচকগণ সেই সকল ভাবকল্পনার উপর জোর দেন যেগুলির সম্বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণকারী শিল্পীদের ছিল সহজাত বোধি (intuition)। প্রজ্ঞা পদ্ধতিতে—সুভূতি ছিলেন যার প্রতিনিধি, দৃঢ়তার সহিত এই মত প্রকাশিত হয়েছে যে, একমাত্র প্রজ্ঞা

(illumination) ছাড়া আর সবকিছুই মায়া এবং মিথ্যা। নাগার্জুন তাঁর সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে (dialectical system) বুদ্ধের পরিদৃশ্যমান জীবন এবং তাঁর প্রকৃত অনন্ত সত্তা—যা ধর্ম-কায়া অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা গঠিত শরীররূপে পরিচিত—এই দুয়ের মধ্যে সীমারেখা টেনেছেন। বুদ্ধের রূপকায়া অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহকে কল্পনা করা হয়েছে মহাশূন্যের মত নিঃসীম বলে—বুদ্ধের এই যে রূপকায়া তা অরূপ অথচ যাবতীয় রূপ তাতে রয়েছে বিধৃত। বজ্রচ্ছেদিকা বলেন—"যারা আমার রূপময় প্রকাশ দেখেছে এবং আমার বাঙ্ময় প্রকাশ যাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে, ব্যর্থ তাদের সাধনা, কেননা তারা দেখতে পাবে না আমাকে।"

এতে আরও বলা হয়েছে—"বুদ্ধের দেহকে আশ্রয় করে আছে ধর্ম এবং এই ধর্মকে বোঝাও যায় না, কিংবা বুঝানো যায় না।"

এই শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য হচ্ছে, ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যেতে পারে কেবলমাত্র বোধির দ্বারা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধধর্মের সমগ্র দার্শনিক তত্ত্ব যথা-রীতি নিহিত ছিল তদানীন্তন সকল শ্রেণীর শিল্প-রূপায়ণের মধ্যে।

এখানে আমরা দেখতে পাই সেই পারস্পরিক সম্পর্কের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত যা ভারতীয় শিল্পকে অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে আবদ্ধ করে একসূত্রে। পারস্পরিক বলা হচ্ছে এই জন্য যে, শিল্প যেমন মেনে চলে রক্ষণশীল শাস্ত্রবিধির নির্দেশ, তেমনি শিল্প-প্রচেষ্টার অমোঘ শক্তিতে রক্ষণশীল আদর্শও হয় বিকাশপ্রাপ্ত এবং রূপান্তরিত। এই রূপান্তরের মূলে থাকে শিল্পীর ধ্যানলব্ধ অনুভূতির সুষমাময় প্রকাশ। কাজেই শিল্প এবং অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে যে যোগ তা অত্যন্ত নিগূঢ় এবং ভারতীয় শিল্পের মর্মমূলে পৌঁছলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এই দুটি ধারা যেন একীভূত হয়ে গেছে।

শিল্প এবং অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অভিব্যক্ত হয় আর একদিক দিয়েও। কেননা প্লাস্টিক অথবা প্রস্তরের মূর্তি গঠন অথবা চিত্ররচনা করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্পী অল্পবিস্তর নিজেরই অজ্ঞাতসারে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করেন যা ভারতীয় সভ্যতার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাণীজগতে কেবলমাত্র মানুষের উপরেই চূড়ান্ত রকমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব আরোপিত হয় নি। সে প্রকৃতির প্রভু নয়, তার একটি অংশ মাত্র; এবং শিল্পী দেখাতে চেষ্টা করেন সেই সৌসাম্যপ্রসূ, সেই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন যা উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্য্যন্ত জীবনের বিভিন্ন প্রকাশকে গ্রথিত করে এক অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে। জীবনের এই একত্বানুভূতি ভারতীয় শিল্পীর অন্তরে সঞ্চারিত করে এক গভীর প্রেরণা। এই প্রেরণাবশে ইতিহাসের উষাকাল থেকে ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পীরা সকল শ্রেণীর প্রাণীর প্রতিরূপ সৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই উপমহাদেশের বিপুলসংখ্যক ইতর প্রাণীকুল ঐ শিল্পের সমৃদ্ধির পক্ষে আনুকূল্য করেছে, তাদের জীবনধারা থেকে শিল্পীরা লাভ করেছেন অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। এই অনুরাগ, এই অনন্যসাধারণ রচনাশৈলীর সৃষ্টি কস্মিন কালেও হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না যদি না থাকত সেই সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গী যা ভারতের বহু ধর্মের সাধারণ জিনিষ—যা মনুষ্য-জীবন এবং প্রাণী-জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে একই স্তরে। কর্ম এবং জন্মমৃত্যুর নিয়ত ঘূর্ণায়মান যে চক্রে যাবতীয় প্রাণী আবর্তিত হয় তৎসম্পর্কিত ধারণা এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী নয়।

পুরুষের মুখাবয়ব সম্বলিত একটি পদক—ভারহুত
(কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত)

পক্ষান্তরে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মনুষ্যমূর্তিকে রূপ-দানের বেলায় শিল্পীকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করে মনের শ্রেষ্ঠ অবস্থাকে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। অনুভূতিসমূহ, মানসিক গুণাবলী (কখনও কখনও নেতিবাচক) এ সকলকেই তিনি চান প্রকটিত করতে। তাঁর অনুরাগ বহিরঙ্গের প্রতি নয়—এমন কোনকিছুর প্রতি যা গভীরতর—আত্মার মূলগত ধর্মকে ব্যক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য। একথা উত্থাপিত হতে পারে যে, গভীরতর সত্তাকে প্রকাশ করবার জন্য শিল্পীর এই যে আকুতি, কখনও কখনও তা হারিয়ে যেতে পারে বৃহত্তর এবং বহুমূর্তিসম্বলিত দৃশ্যপটে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, এই সকল ক্ষেত্রে একটি মূর্তিই অধিকার করে মুখ্য স্থান—সেই মূর্তিকে তার পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটিয়ে তুলবার জন্যে যে পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন হয়েছে, ঐ সকল দৃশ্য তারই অংশমাত্র। সবকিছুই আবর্তিত হয় এই কেন্দ্রস্থ মূর্তির চতুষ্পার্শ্বে। প্রতীক-সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এই মূর্তির প্রকৃত স্বরূপ—হাতের ভঙ্গী, মুদ্রা প্রভৃতি সুস্পষ্টরূপে আধ্যাত্মিক অবস্থার নির্দেশ প্রদান করে।

কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, অঙ্গভঙ্গীর এই সকল প্রতীক্ অভিব্যক্ত হয় স্থূল ভাবে। শিল্পীর প্রায়শঃই লক্ষ্য থাকে মুদ্রাভঙ্গীযুক্ত ঐ সকল হস্তে প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করার দিকে এবং এগুলিতে পরিচয় পাওয়া যায়—বলিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির। অজন্তা গুহাচিত্রাবলীর ছন্দোময় রেখানিচয়, মূর্তিসমূহের প্রসারিত বাহুতে আধ্যাত্মিক আশ্বাসের ভঙ্গী দর্শকের মনকে বিপুল ভাবাবেগে উদ্বেলিত করে

বুদ্ধের দিব্যপ্রেরণা (গান্ধার পদ্ধতি)

এখন আমরা আসছি ভারতীয় শিল্পের আর একটি মূলগত ভিত্তির প্রসঙ্গে—সেটি হচ্ছে গতি।

মোহেন্-জো-দড়ো এবং হরপ্পার যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখি—সেই সুদূর অতীতকালের শিল্পীরা মানুষ এবং পশুর যে সকল মূর্ত্তি গড়েছে কিংবা ছবি একেছে সেগুলি শুধু যে এনাটমির দিক দিয়ে নিখুঁত তা নয়, রূপসৃষ্টিতে গতিবেগ ফুটিয়ে তোলার কৌশলটি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পীরাও আয়ত্ত করেছিল পরিপূর্ণ ভাবে, এবং তাদের শিল্পসৃষ্টি প্রায় এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যে, কালের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও তা জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পের পাশে দাঁড়াতে পারে।

এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই যে, অতি প্রাচীন কাল থেকে, 'গতি' বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল এই সমস্ত প্রায়-ভারতীয় (Proto Indian) শিল্পীদের মনোযোগ; এবং প্লাষ্টিকের কাজে গতিবেগ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে আঙ্গিক-কৌশল আয়ত্ত করবার দিকেও তারা ঝুঁকেছিল।

কিন্তু মেসোপোটেমিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের রূপসৃষ্টি সে দেশে কোন প্রকার সাড়া জাগাতে সক্ষম হ'ল না। সুমেরীয় আর্টের চূড়ান্ত অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, স্থির নিশ্চল রেখাসমূহের উপরেই শিল্পীর নির্ভর। পক্ষান্তরে ওখানকার শিল্প কিন্তু সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিদেশীয় শিল্পপদ্ধতিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এভাবে সমাদরে গ্রহণ করা সত্ত্বেও, খাটি ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্প-রূপায়ণের গুরুত্ব কিন্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি, কিংবা যে ভাবধারায় সেগুলি সঞ্জীবিত তার ব্যত্যয় ঘটে নি। হরপ্পার আদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা সামান্যই জানি। কিন্তু এমন সব প্রমাণ বিদ্যমান যাতে এই বিশ্বাসের সমর্থন মেলে যে, এর বিশ্বানুভূতি ছিল অন্ততঃ আংশিক ভাবে ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্ম অনুভূতিরই অনুরূপ। সেখানেও দেখি, ইতরপ্রাণীর রূপায়ণের প্রতি সেই একই অনুরাগ, নারী-সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলায় সেই একই আদর্শের অনুসরণ। তখনকার যুগের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম যে নৃত্যের সহিত সম্পর্কিত এটা শুধু আকস্মিক ঘটনা নয়, হরপ্পার শিল্পীও রূপসৃষ্টির মাধ্যমে যে ভারতের চিরন্তন প্রাণধর্ম্মকেই প্রকাশ করবার প্রয়াস পেয়েছে, নৃত্যচ্ছন্দে পদক্ষেপ করতে উদ্যত ত্রি-শীর্ষ দেবতার ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়। হরপ্পার যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ-চতুর্দ্দশ শতকের অপূর্ব্ব ব্রোঞ্জমূর্ত্তিসমূহে অভিব্যক্ত হয়েছে সেই দিব্য ছন্দ যা বিশ্বের সৃষ্টি এবং লয়ের কারণ। সৃষ্টি এবং ধ্বংস এই দুই বিপরীত প্রান্তসীমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যে জীবনধারা তাকে মহিমামণ্ডিত করে তোলে এই নৃত্যচ্ছন্দ। কিন্তু এই গতিশীলতার পেছনে ধ্যানী-শিল্পীর রসচেতনায় এমন এক আনন্দলোক উদ্ভাসিত হয় যা নিত্য, নিশ্চল এবং অস্পর্শ্য। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা অবগাহন করে সেই রূপপ্রবাহে যেখান থেকে জীবনের উদ্ভব। "অরূপ রতন আশা করেই" শিল্পী নিমজ্জিত হন "রূপসাগরে"; এবং যে অতীন্দ্রিয় জগতে গিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হন সেখানে সকল চাঞ্চল্যের, সকল গতির অবসান—সেখানে, 'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।'

এই উপলব্ধি এত গভীর, এত মহান্ এবং এত ব্যাপক যে, শিল্পী যখন সাঁচির স্তূপে বুদ্ধের নানা জন্মের কাহিনীসমূহকে প্রকটিত করতে চান তখনও পর্য্যন্ত তিনি যে 'ধর্ম্ম' থেকে প্রেরণা আহরণ করেন তা যা কিছু পার্থিব তাকে প্রত্যাহার করে নির্ম্মম ভাবে। জীবনের প্রতি এই উদাত্ত বন্দনা-গান উদ্গীত হয় তখনই যখন শিল্পীর সৃষ্ট মানুষ এবং পশুর প্রতিকৃতিসমূহ এক ব্যাপকতর গতির দ্যোতনা করে।

গতিকে ফুটিয়ে তুলবার এই এষণায় শিল্পসৃষ্টিতে সংযোজিত হয় অপ্রত্যাশিত খুঁটিনাটি, কিন্তু এই গতিময়তাকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে এক আধ্যাত্মিক নিশ্চলতা। এই গতির আনন্দই খাজুরাহো থেকে শ্রীরঙ্গম এবং কাঞ্চীপুরম পর্যন্ত মধ্যযুগের মন্দিরগুলিতে নমনীয় নারীমূর্তিসমূহের মাধ্যমে পুষ্পপুঞ্জের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। শিল্পী কখনও ভোলেন নি নৃত্যের ছন্দের কথা। কেননা নৃত্য অবশ্য

নারীমূর্তি (খাজুরাহো)

বাস্তব ভাবে প্রকৃতির কোনকিছুর অনুকরণ করে না, কিন্তু নৃত্যই ত বিশ্বের মূলগত সত্য—সৃষ্টিমূলক প্রেরণার ছন্দোময় প্রবাহ প্রকাশের একমাত্র উপায় বলে প্রতীয়মান হয় এই নৃত্য। এ হচ্ছে স্রষ্টা এবং সংহারকর্তা শিবের বিশ্বনৃত্য অথবা নবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সমুদ্রতরঙ্গের উপর বিষ্ণুর নৃত্যলীলা। এমনকি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে পর্যন্ত নৃত্যরত মূর্তিসৃষ্টির রীতি আছে।

দেহের এই ছন্দোময় গতিভঙ্গী এবং রূপসৃষ্টিমূলক কৃত্যসমূহের সম্পর্কের কথা ব্যক্ত হয়েছে চিত্রসূত্র গ্রন্থে। তাতে চিত্রকর এবং ভাস্করদিগকে নৃত্যকলা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঔপপত্তিক (Theoretical) জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে তাঁরা সৃষ্টিমূলক প্রবাহের একটি বিশেষ মুহূর্তকে ধরে রাখতে এবং রূপায়িত করতে সক্ষম হবেন। এই সমস্ত ছন্দের মাধ্যমেই তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন পরিপূর্ণ ভাবে স্থিতিশীল একটি ভঙ্গীকে নয়, কিন্তু তরল গতিময়তার মধ্যে একটি যতির মুহূর্তকে।

কিন্তু ধ্যানী বুদ্ধ অথবা মহাবীর ছাড়া হয়ত বৈদেশিক প্রভাবের দরুন আরও কিছু কিছু স্থিতিশীল মূর্তি ভারতীয় শিল্পীর হাতে সৃষ্ট হয়েছে। এই যে নিশ্চল প্রতিমূর্তি—শিল্প-শাস্ত্রে এগুলির নাম সমপদস্থানক। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এই সমস্ত অনড় (stiff) মূর্তি সাধারণতঃ শিল্পীদের অন্তরে সাড়া জাগাতে সক্ষম হ'ত না। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা ফিরে তাকাত উদ্ভিদ-জগতের দিকে। এই ধরনের প্রাচীনতম মূর্তিসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়, দিদারগঞ্জের যক্ষিণীমূর্তি—যার সৌন্দর্য্য মুখ্যতঃ নির্ভর করে রেখাসমূহের কোমলতা ও সর্বোপরি অসামান্য প্রাণশক্তির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল মুখশ্রীর উপরে।

শত সহস্র বৎসর ধরে এই ধারারই অনুবর্তন করে এসেছে ভারতীয় শিল্প। পূর্ববর্ণিত ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিল্প বৈদেশিক প্রভাব সত্ত্বেও স্বধর্মচ্যুত হয় নি। ভারতীয় শিল্প বিভিন্ন শৈলী এবং পদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে বটে, কিন্তু ছিন্ন হয়ে যায় নি কখনও এর অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র।

নটরাজ (মাদ্রাজ মিউজিয়ম)

সুমেরীয় শিল্প, আকিমেনিয়ান পারস্য, আলেকজাণ্ডারের হেলেনিজম, পার্থিয়ানের ইরাণীয় প্রভাব, অথবা সাসানীয় আধিপত্য, এমনকি উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকো-রোমান-বৌদ্ধ পদ্ধতির উদ্ভব অথবা তথাকথিত দ্রাবিড়ীয়-আলেকজেন্দ্রিয়ান পদ্ধতির সমন্বয়—যা পরিলক্ষিত হয় দাক্ষিণাত্যের স্মারক স্তম্ভসমূহে—এই সকল কিছুই স্থানীয় শিল্প-'ধর্মের' পরিবর্তন বা রূপান্তরসাধন করতে সক্ষম হয় নি। এমনকি পরবর্তীকালে ইসলামের যে প্রাথমিক প্রভাব

ভারতে এসে প্রবেশ করে এবং যার দ্বারা অতি উঁচুদরের শিল্পধারার উদ্ভব হয় তাও পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের চিরন্তন প্রাণধর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত করতে পারে নি। এই নবাগত ইসলামিক শিল্প কিন্তু খাঁটি ভারতীয় শিল্পকর্ম্মসমূহকে কোনও দিক দিয়েই বর্জ্জন করে নি।

চোখে কাজল-লেপন-রত নর্ত্তকী (খাজুরাহো)

ভারতীয় শিল্পের যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই তা আত্মসাৎ করে আসছে নূতন রূপ এবং নূতন আঙ্গিককে। ভিন্ন দেশের শিল্পরীতি এ দেশের মাটিতে এসে হয়ে গেছে রূপান্তরিত, কিন্তু এদেশের শিল্পকে স্বধর্ম্মচ্যুত করতে পারে নি। এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করলে মনে হয়, ভারতীয় শিল্প উদ্ভূত হয়েছে ভারতের যে মাটি থেকে তার সঙ্গে তার একেবারে নাড়ীর যোগ। সেই গোপন রহস্যলোক থেকেই হয় এর নব নব রূপের অভিব্যক্তি—মানুষের ইচ্ছা সক্ষম হয় না এর পরিবর্ত্তনসাধনে।

নূতন শিল্পপদ্ধতির আবেদনে সাড়া দেবার এই যে শক্তি, ভারতীয় শিল্পের এই যে অন্তর্নিহিত ঐক্য এর মূলে নিশ্চিতই রয়েছে আংশিক ভাবে ঐতিহ্যের ধারা এবং যে আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে এই শিল্পের উদ্ভব তার অমোঘ শক্তি। কিন্তু সর্ব্বোপরি এই শিল্পকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়েছে ভারতের সমগ্র জনগণের অধ্যাত্ম মনোভাব। এ হচ্ছে ভারতের সাধনার সারবস্তু—প্রাচীনকালের শিল্পী যাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন সর্ব্বপ্রযত্নে।

এখন আমরা শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। একটি প্রাচীনতম এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হচ্ছে তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যশিল্পের সমৃদ্ধির সময়ে রচিত "ধম্মসাঙ্গণি" নামক গ্রন্থ। মহান বৌদ্ধ শিল্পের উদ্ভবের মূলে রয়েছে যে ভারহুত ও সাঁচি পদ্ধতি

সমৃণাল পদ্ম হস্তে নারী (অজন্তা গুহা)

তারও প্রারম্ভ কালের সমসাময়িক গ্রন্থ এখানি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ অথশালিনী নামে ধম্মসাঙ্গণির একখানি মূল্যবান টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁর ভাষ্য স্পষ্টতর এবং পূর্ণতর।

মানুষের মনকে বুদ্ধঘোষ অভিহিত করেছেন 'চিত্ত' বলে। এই চিত্তের ক্রিয়াপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মনের অবচেতন লোকে আকাঙ্ক্ষাগুলি থাকে লুকিয়ে, কিন্তু সচেতন অবস্থায়—সুতরাং কর্ম্মে রূপান্তরিত হতে তৈরী থাকে। এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে বুদ্ধঘোষ বলেন, শিল্প-কর্ম্ম হচ্ছে শিল্পীর মনের ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন এবং তা যদিও কতকটা বিষয়াশ্রিত (objective), তথাপি সর্ব্বোপরি শিল্প কিন্তু রূপ-পরিগ্রহ করে একটা আধ্যাত্মিক ভাবনা থেকে। কাজেই শিল্পী যাকে রূপ দেয় সেটা আসলে তার ভাবকল্পনার রূপময় বিকাশমাত্র।

অনেক বাহু সমন্বিত শিবমূর্ত্তি, ভুবনেশ্বর

এখানে আমরা পাচ্ছি শিল্প সম্বন্ধে এক উচ্চাঙ্গের ভাবনা যা সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে অন্তরতম সত্তার বোধির (intution) উপর এবং এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই সহজ যে, সেই আভ্যন্তরীণ রূপচ্ছবিকে (inner image) লাভ করবার জন্যে বুদ্ধঘোষ যে সকল উপায় অবলম্বনীয় বলে মনে করেন, অতীন্দ্রিয়ের ধ্যান—যা যোগের অঙ্গীভূত—সেগুলির অন্তর্ভুক্ত।

একটি হিন্দুশাস্ত্রেও এই একই সমস্যা আলোচিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত শুক্রনীতি-সার। শুক্রাচার্য্য বলেন, রূপচ্ছবিকে প্রকাশ করতে হবে, যখন শিল্পীর অন্তর-সত্তা তাকে পরিপূর্ণরূপে ধারণা করতে সক্ষম হয়, কেবল তখনই তাকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভবপর হয়ে উঠে।

শিল্পরত্ন এবং পঞ্চরত্ন নামে অপর দুখানি শিল্পশাস্ত্রেও শিল্প-সৃষ্টির প্রসঙ্গে বোধি, ধ্যান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অন্তরের ভাবকল্পনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দিতে গেলে প্রচুর আঙ্গিক কৌশল আয়ত্ত করাও প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একথা বলা আবশ্যক যে, শাস্ত্রগুলির উৎপত্তি হয়েছিল কারিগর এবং সাধারণ শিল্পীদের ত্রুটিসমূহ যতদূর সম্ভব শুধরে দেবার উদ্দেশ্যে।

এ বিষয়ে অবশ্য বাস্তবিকই সন্দেহ নেই যে, ভারতীয় শিল্পীরা যে-কোন বাঁধাধরা নিয়মের অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁরা জানতেন, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল রূপের প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যায় শাস্ত্রবিধিকে। শঙ্করাচার্য্য যখন কঠোর পরিশ্রম সহকারে ওজন করে মেপে জুখে সৌন্দর্য্য-রহস্য বুঝাবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন তখন সহসা যেন তাঁর দিব্যদর্শন হ'ল—তিনি দেখেন যে, সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। এমন রূপ পরিগ্রহ করেছেন তিনি যা সকল নিয়মকে পরাহত করে দেয়। দার্শনিকের তখন হ'ল সত্যানুভূতি, তিনি বললেন, "দেবি, এই সকল বিধি তৈরী হয় নি তোমার জন্যে। আমার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণসমূহ তোলা রইল কেবলমাত্র ধর্ম্মীয় উপাসনার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট প্রতিমূর্ত্তিসমূহের বেলায় ব্যবহারের জন্য। অয়ি সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অনন্ত রূপে তুমি নিজেকে প্রকাশিত করে থাকো এবং কোন শাস্ত্রেই তার বর্ণনা করতে সক্ষম নয়।

এই শেষের কথাগুলি চিরন্তন সত্য এবং ভারতীয় শিল্পকে বুঝবার পক্ষে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, শিল্পী এবং দার্শনিক উভয়েই কোন কোন বিধির কৃত্রিম প্রকৃতির (character) কথা বুঝতে এবং সেজন্যে তাকে ভাঙতেও পারতেন। দৈবী প্রতিভার অধিকারী ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের উপর আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে এমন সব অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি করেছেন যা সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়স্বরূপ হয়ে আছে।

পূর্ব্বোক্তগুলি ছাড়া আর একটি শিল্পপদ্ধতি আছে যার আদর্শ ব্যাখ্যাতা হচ্ছেন শ্রীশঙ্কুল। তাঁর মতে, শিল্পের কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুকরণ করা। যদিও এই অনুকরণের ফলে যা সৃষ্ট হবে তা একটি ভিন্ন পর্য্যায়ের। এর তাৎপর্য্য এই যে, শিল্পকর্ম্ম যদিও অনু-করণের ফল তথাপি এ হচ্ছে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র কিছু এবং এর নিজস্ব একটি 'ধর্ম্ম' আছে। এর বিপরীত মন্তব্য করেছেন অভি-নবগুপ্ত (৯৫০-১০২০ খ্রীঃ) যাঁর মতবাদের ভিত্তি এই যে, ব্যক্তি-গত ভাবাবেগের (emotion) প্রকাশ অনুকরণ নয় এবং তার অনুকৃতিও সম্ভবপর নয়। শ্রীশঙ্কুলের মতবাদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ধ্যানলব্ধ বোধির উপর এর প্রতিষ্ঠা নয়, বরং শিল্পকে

সেখানে বিচার করবার চেষ্টা করা হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের দিক দিয়ে।

এই সমস্ত মতবাদ অনুধাবন করলে ভারতীয় শিল্পে কতকগুলি জীবজন্তু, মানুষ এবং দেবমূর্তির মধ্যে যে অনন্যসাধারণ প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে তার মূলসূত্রটি কি তা বুঝতে পারা যায়। প্রতীকতার (Symbolism) কোন আভাস এগুলিতে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না বললেই চলে। প্রকৃতির প্রতি এই যে মনোভাব তা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও। মধুমক্ষিকার তাড়নায় উদ্বেজিতা শকুন্তলার আলেখ্য-রচনার বর্ণনা করেছেন কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলায়। মধুমক্ষিকা

আকাশপথে (অজন্তা গুহার ছাদের ভিতরের দিকের চিত্র)

তাতে এমন কৌশলে চিত্রিত হয়েছিল যে, চিত্র-দর্শনকারীরা এটিকে জীবন্ত মনে করে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। এখানে আমরা দেখছি সৃজনধর্মী শিল্পের সেই পুরাতন বিষয়বস্তু বাস্তবের সঙ্গে হয়ে যায় একাত্ম। মেঘদূত কাব্যে বিরহী যক্ষ তার প্রণয়িনীর নিকটে মেঘকে দূত হিসেবে পাঠিয়ে নিজের অন্তর্গূঢ় বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছে যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে প্রণয়িনীর অবয়বের সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে সে তার অন্তরের আকুতিকে পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। সঞ্চারিণী লতা, হরিণীর চক্ষু ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিষের সঙ্গে তুলনা করে যক্ষ তার প্রেয়সীর সৌন্দর্যকে স্থান দিয়েছে প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।

কাজেই এখানে আমরা এমন একটি মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি যা ধ্যানলব্ধ রূপসৃষ্টি এবং প্রতীকতার সম্পূর্ণ বিপরীত; এবং ভারতের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির মূলে রয়েছে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সম্বন্ধে এই কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী।

এখন আমাদের সামনে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে উপস্থিত এই শিল্প দুটি বিপরীত অথচ সহাবস্থানকারী ধারার মধ্যে দোলায়মান। একদিকে একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্যের সঙ্কেতময় অভিব্যক্তি, অন্যদিকে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি এবং জীবনের গভীর অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত রূপসৃষ্টি। কাজেই ভারতীয় শিল্পের অধিষ্ঠানক্ষেত্র স্বর্গ এবং মর্ত্য

শিশুক্রোড়ে নারী (মথুরা)

উভয়ত্রই; এবং ভারতের শিল্পীর প্রতিভা সকল সময়েই এমন একটি রচনাশৈলীর উদ্ভাবন করে যা যেমন প্রাণবন্ত তেমনি পরিচ্ছন্ন। এই রচনাশৈলীর মাধ্যমে শিল্পীর এমন আবেগাপ্লুত কল্পনা অভিব্যক্ত হয় যা একদিকে যেমন আপনাকে হারিয়ে ফেলতে চায় অনন্ত আকাশের অসীমতার মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি কান পেতে শোনে ধরণীর ছন্দোময় হৃৎস্পন্দন এবং ব্যাখ্যা করে তার সৌন্দর্যের চিরন্তন লীলামাধুর্যের।*

* রোমের "East and West" পত্রিকায় প্রকাশিত Mario Bussagli'র প্রবন্ধকে ভিত্তি করে লিখিত

ইতিহাসের বিচারে শ্রীরাধা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বাংলাদেশের ধর্মাচরণে বৈষ্ণব ভাবধারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই বৈষ্ণব ভাবধারায় লীলাবাদ এক অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। তন্মধ্যে আবার লীলাবাদের প্রাণকেন্দ্র রাধাবাদ জাতিগত ভাবে বাঙালীর এক তপোলব্ধ রত্নরূপে আখ্যা পেতে পারে। বাঙালীর ধর্ম, বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর কাব্য এই রসরূপিণী শ্রীরাধাকে অবলম্বন করে নিত্য নূতন ভঙ্গিমার পথে কোন্ বিস্মৃত অতীত যুগের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমধারায় পরিপুষ্টি লাভ করে চলেছে। এমনকি বলা যেতে পারে বাঙালী এই ভাবময়ী শ্রীরাধাকে পেয়ে নূতন রসভূমির আবিষ্কার দ্বারা এক বিস্ময়কর জীবনবেদ রচনা করেছে।

সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য সময়েও বাংলাদেশের দরদী কবিদের কাব্যে প্রেমমূলক গীতিমাত্রেই ব্রজগোপী বা রাধা-ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। সেনরাজার সভাকবি জয়দেব ঠাকুরের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ নামক অমৃতগীতি গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমাবলম্বনেই চিরমধুর হয়ে আছে। জয়দেবের সমসাময়িক শ্রীধরদাসের কবিতা সংকলন গ্রন্থ সদুক্তি-কর্ণামৃতে প্রেম কবিতায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ই মূল অবলম্বন। তৎপরবর্তী বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের প্রেমগীতি ও বৃহদ্‌বঙ্গের কবি বিদ্যাপতির প্রেমগীতি রাধাকৃষ্ণেরই প্রেম-মূর্তি প্রকাশ করে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ ছাড়া তৎপরবর্তী যাবতীয় প্রেমগানে বা প্রেমকাহিনীতে এমনকি নিরক্ষর স্বভাবকবিদের অপূর্ব রচনাতেও রাধাভাবই প্রাণবন্ত রূপে পরিচিত হয়ে উঠেছে। মৈমনসিংহগীতিকা—পূর্ববঙ্গগীতিকা-গুলি রাধাভাবের আশ্রয়ে মধুর রসাবেদনের মৌলিকত্ব নিয়েই সমাদর লাভ করেছে। পূর্ববঙ্গগীতিকায় রাধার নাম মহিমা প্রকাশ করে বলা হয়েছে :

> "অষ্ট আঙুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা।
> নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।"

বাঙালীর এই রাধা পক্ষপাত এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়েছে যে, বৈষ্ণবভিখারীর ভিক্ষাপ্রার্থনায়ও 'জয় রাধে' ধ্বনিটি মন্ত্রবৎ উচ্চারিত হয়ে থাকে। এমনকি ধর্মানুষ্ঠানেও রাধানামের নামাবলী উত্তরীয়। কটূক্তির ব্যঞ্জনায় 'রাধে রাধে' নামেই তিরস্কার ঘোষিত হয়। তাই পদকর্তা গোবিন্দ অধিকারী তার ভাবের গরিমা সম্বল করে যে অপূর্ব শুকসারীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন তা যেমন ভাব-পরিবেশনে মধুর তেমনই রাধাপ্রীতির এক গভীর অভি-ব্যক্তি।

> "শুক বলে—আমার কৃষ্ণ মদনমোহন
> শারী বলে—আমার রাধা বামে যতক্ষণ
> নইলে পারবে কেন ?
> ... ...
> ... ...
> শুক বলে—আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান
> শারী বলে—সত্য বটে বলে রাধার নাম
> নইলে মিছে সে গান।" ইত্যাদি

একথা নিশ্চয় করে বলা যায়, মানবের সর্বস্তরে রাধাভাবের এতখানি বিস্তার বাংলা দেশ ভিন্ন ভারতের অন্যত্র কোথায়ও সম্ভব হয় নি।

এইখানেই এসে পড়েছে একটা সন্দেহ বা দ্বন্দ্বের বীজ। কারণ এভাবে আমরা বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে সঙ্গীতে সাহিত্যে ধর্মে যে শ্রীরাধার এ অপরূপ মূর্তিটির গভীর প্রভাব দেখতে পাচ্ছি, তার উৎপত্তি-মূল ও ঐতিহাসিকতা জানবার পক্ষে আমাদের প্রমাণ-অনুসন্ধান সূত্রটি কি ? অনেকে রাধাবাদের এই নবরূপ দেখে বলে থাকেন, এটি বাংলারই সৃষ্টি—ভাবপ্রবণ বাঙালীর প্রেমমধুর মানসকল্পনার একটি মনোরম রূপায়ণ মাত্র।

সত্য বটে, বাঙালী কতকাংশে ভাবপ্রবণ জাতি, কিন্তু তাই বলে একটা ভিত্তিহীন কল্পনা এ ভাবে সম্পুষ্ট করে সজীব বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে—এ ব্যাখ্যা সত্য কিনা, পক্ষান্তরে, অপ্রাকৃত রসরূপিণী ভগবদ্‌ভিন্না হ্লাদিনী শক্তি বিগ্রহবতী হয়ে এ ধরায় নেমে এসেছিলেন মানুষের মধ্যে—এই তথ্যেরও ঐতিহাসিক স্বীকৃতি সম্ভব কিনা, এ বিষয় বিশেষ ভাবেই বিচার্য্য। মানবমনের এই সন্দেহের দ্বন্দ্ব এখনও জিজ্ঞাসু চিত্তে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে; কারণ গোপী-প্রেমের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতেই রাধা-নামের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তা ছাড়া প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থ—বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে গোপীলীলার কথা রয়েছে অথচ রাধানামের উল্লেখ নেই। অপিচ, তখনকার ইতিহাস-গ্রন্থ মহাভারতের কোথায়ও রাধানামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এ ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন লক্ষ্য স্থির না করে যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করে বলা যায়, প্রতিটি গ্রন্থে কারও নাম না

থাকাতে তা প্রমাণবিরুদ্ধ—এ যুক্তি চলে না। কারণ 'পুরাণ'-গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি একই উদ্দেশ্য বা বিষয় নিয়ে লিখিত নয়। অংশবিশেষে কোনটিতে লক্ষ্মী প্রভৃতির, কোনটিতে দুর্গার, কোনটিতে শিবের, কোনটিতে বা বিষ্ণু কিংবা কৃষ্ণের বিষয় বিন্যাসক্রমে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে। তাতে প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর বিষয় সন্নিবিষ্ট হলেও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য বিস্তার সঙ্গত হয় না। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলার বর্ণনায় এক প্রধানা গোপীর বিশেষ বিবরণ রয়েছে, তেমনই আবার খিল হরিবংশে রাসলীলার কথা রয়েছে বটে, কিন্তু প্রধানা কোন গোপীর সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি, তাতে ভাগবতের কথাকে অপ্রমাণ বলা সঙ্গত হবে কি? তেমনই বহু গ্রন্থে থাকলেও অপরাপর অনেক গ্রন্থে না থাকাতে রাধানামের প্রমাণসিদ্ধতা নেই—একথাই বা কি করে যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে? কারণ রাধানামের প্রমাণ দেবীভাগবত, পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র, নির্বাণতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, সম্মোহনতন্ত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ এবং অন্যান্য উপপুরাণ প্রভৃতিতেও স্পষ্ট পাওয়া যায়। এতগুলি প্রামাণিক গ্রন্থে থাকা সত্ত্বেও রাধা নাম নবাবিষ্কৃত ও অপ্রামাণিক? শ্রীমদ্দেবীভাগবত বলেছেন :

"কেনচিৎ কারণেনৈব রাধা বৃন্দাবনে বনে।
বৃষভানুসুতা জাতা গোলকস্থায়িনী সদা।" (৯:৫০.৪৩)

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বলেছেন :

"চিদানন্দস্বরূপা সা চিদানন্দপ্রদায়িনী।
সর্বলক্ষণসম্পন্না রাধানাম্নী বিনোদিনী।"

(পদ্ম-উ-১৬২ অঃ)

নারদপঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে :

"প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।
ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ।"

(নাঃ ৩য় অঃ)

এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে রাধাবিষয় বিস্তৃত ভাবেই বলা হয়েছে। এ দুটি ত মহাপুরাণ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধানামের অনন্তবিভূতি বিস্তার করা হয়েছে। এ ছাড়াও হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিভিন্ন তন্ত্রে, পুরাণে, সংহিতায় রাধা ঠাকুরাণীর নাম ভক্তপ্রাণের মানস-তিমিরে উজ্জ্বলবর্তিকা রূপে বিরাজমান। পরম পণ্ডিত শ্রীজীব গোস্বামী নানা গ্রন্থে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি অবলম্বনে রাধানামের বহুবিধ প্রমাণোপন্যাস করেছেন। সবচেয়ে কঠিন দ্বন্দ্ব হ'ল শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধানাম নেই কেন? এই অভিযোগটি সর্বাংশে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ ভক্ত জন বলে থাকেন ভাগবতেও রয়েছে রাধানাম। কিন্তু সেখানে আদর্শেরই প্রাধান্য বলে নাম নিরূপণে দৃষ্টি নেই, তাই মুখ্যতঃ নাম নিয়ে কোন আগ্রহ দেখানো হয় নি। ভাগবতের রাসলীলার বর্ণনায় যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমা রূপে কোন প্রধানা গোপীর উল্লেখ রয়েছে, তা ত অতি স্পষ্ট। এই প্রধানা গোপীর অন্য কোন নামও উল্লিখিত হয় নি। অথচ এই প্রধানা গোপীই একান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা এবং সর্বাধিক প্রিয়কারিণী একথা অন্যান্য গোপীদের মুখেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখানে রাধারূপে নামোল্লেখের উপর ভাগবতকার জোর দেন নি এই কারণে যে, গোপীভাবই ভাগবতের লক্ষ্য, ব্যক্তিবিশেষ নয়। প্রধানা কোন গোপীতে যে গোপীভাবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছিল, সেই গোপীতত্ত্বের আদর্শই বিস্ময়কর রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য দেখা যায়—রাধা কেন, সেই প্রধানার কোন নামই ত ভাগবতকার করেন নি। সুতরাং বলা যায় নামের উপর ভাগবতকারের এক্ষেত্রে ঝোঁক ছিল না। কিন্তু ভাগবতকারের নিকট এ নাম পরিচিত ছিল না বা অন্য নাম ছিল তা বলা চলে না। অন্যান্য পুরাণে, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে সে নাম ত রয়েছে। তাই এ রসের আস্বাদ নিয়ে যাঁরা সে দিব্য রসানুভূতি লাভ করেছেন, তাঁদের অনুভূতির প্রসাদেই ভাগবত থেকে সে নাম নিঃসৃত হয়েছে। বহ্নির দাহিকাশক্তির প্রমাণ অপরের বোধগম্য না হলেও যে বহ্নির সংস্পর্শে এসেছে সে জানে। সুতরাং ভক্তের অনুভব এবং অন্যান্য বিস্তর গ্রন্থের সমর্থন প্রভৃতি দ্বারা আমরা মনে করে নিতে পারি—রাধানাম আকস্মিক নয়। এজন্যই ভাগবতের—"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ"—গোপীদের এই উক্তি থেকেই রাধানামের বীজ ভাগবতেও আবিষ্কার করেছেন সাধকগণ।

দেবীভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণে উল্লিখিত রাধানামের যে প্রমাণ রয়েছে, তাকে অর্বাচীনতার অজুহাত দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে লাভ নেই। কথা হচ্ছে তার বীজ অনুসন্ধান নিয়ে। আমরা এক্ষেত্রে বলতে চাই যে, মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর কাব্য মেঘদূতে একটি উপমায় মেঘের রূপ বর্ণনায় বলেছেন—"বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ"—অর্থাৎ "তোমার শ্যামতনু (হে মেঘ), উজ্জ্বল কান্তিময় ময়ূরপুচ্ছশোভিত গোপবেশধারী বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) শ্যামতনুর ন্যায় শোভমান হবে।" পুরাণ ভিন্ন বিষ্ণুর গোপবেশের কথা অন্যত্র নেই, সুতরাং কালিদাসের সময়ে গোপীপ্রেমপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের কথা একান্ত ভাবেই প্রচারিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা হাল সাতবাহন প্রাচীন কবিদের কবিতা সংকলন করে প্রাকৃত ভাষায় যে সংগ্রহ গ্রন্থ "গাহা সত্ত সাই" বা গাথা সপ্তশতী সম্পাদন

করেন, তাতে স্পষ্টতঃ রাধানামের উল্লেখ রয়েছে। শুধু উল্লেখ নয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা রূপেই তার পরিচয় রয়েছে :

"মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহি আএ অবণেন্তো।
এ তাণ বল বীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি॥ (১৮৯)

অর্থাৎ, "হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ (ধূলিকণা) অপনয়ন করে এই বল্লবীদের এবং অন্যান্য নারীদেরও গৌরব হরণ করেছ।" এই গ্রন্থটি খৃষ্টীয় প্রথম শতকের। কবিগণ নিশ্চয়ই আরো প্রাচীন কালের। তাঁর পরবর্তী সপ্তম শতকে এসেও আমরা দেখছি —কবি ভট্টনারায়ণ তাঁর বেণীসংহার নাটকের নান্দী শ্লোকে যমুনাকূলে রাস সময়ে কেলিকুপিতা রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-কথা উল্লেখ করেছেন।

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তী মনু গচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
—ইত্যাদি

এই ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। আরও পরবর্তীকালের কবিদের লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ করে লাভ নেই। কারণ এই দুটি প্রমাণ থেকেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় এই রাধার জীবন-কথা গীতগোবিন্দের রচয়িতা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের জয়দেব বা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তকবিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নি। বিশেষতঃ গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুর-মম্বরং...' প্রভৃতি বর্ণনার বীজ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নন্দকর্তৃক গোচারণ বর্ণনাতে স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাই। সুতরাং জয়দেব যে ঐ পুরাণ থেকে তা গ্রহণ করেছেন তা অস্বীকার করা যায় না। আরও একটি কথা—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অমূল্য রত্নস্বরূপ যে দুখানি গ্রন্থ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সংগ্রহ করে এনেছিলেন—তা হ'ল ব্রহ্মসংহিতা আর কৃষ্ণকর্ণামৃত। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থখানি গোদাবরীতীরস্থ কৃষ্ণবেন্বাবাসী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক ভক্তিগ্রন্থ। তাতে তিনি "রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষ শায়িনে" বলে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার জানিয়েছেন। ইনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়। দাক্ষিণাত্যে যে পূর্বাবধি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচিত হ'ত সেই রায় রামানন্দের উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে—যার সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু মুগ্ধ হয়েছিলেন। পূর্বাবধি এ তত্ত্বের অনুশীলন না থাকলে সকলের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের আলোচনা কি করে সম্ভব? আর রায় রামানন্দই বা এ তত্ত্ব হঠাৎ পেলেন বা শিখলেন কোথায়? সুতরাং বলা যেতে পারে, এ অমিয় রাধাবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা আবিষ্কৃত বা কল্পনার রূপদান মাত্র নয়। এ এক বাস্তব সত্যের স্মৃতিরূপে ভারতের সর্বত্র পূর্বাবধি ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল।

এই পুরাণাদির কথায় বা তৎসমুদয় প্রচারিত রাধাবাদের কথায় আমরা বর্তমান সময় থেকে কালিদাসের সময় পর্যন্ত, সাহিত্যাদির মাধ্যমে—অল্পবিস্তর নানা গ্রন্থের তথ্য আহরণ করে এগিয়ে যেতে পারি। কথা উঠতে পারে—তৎপূর্ববর্তী প্রমাণ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে তৎপূর্ববর্তী কালের অবস্থা বা পরিবেশ কি ছিল। তৎকালের সমুদয় গ্রন্থই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে কিনা? আর সে সময়টির ব্যাপকতাই বা কত?

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত গ্রহণ করলে বলা যায়—যুধিষ্ঠিরাদির রাজত্বকাল ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে। তন্মধ্যে দু' হাজার বৎসরের ইতিবৃত্ত মধ্যে পুরাণাদির কথা আমরা পাচ্ছি। ঐ যুধিষ্ঠিরের সময়েই শ্রীকৃষ্ণের ভগবদ্রূপে আবির্ভাব। তা হলে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পরবর্তী দেড় হাজার বৎসরের ইতিহাসে শ্রীরাধার প্রামাণ্য বিবরণ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বলা যেতে পারে ঐ দেড় হাজার বৎসরের গোড়ার দিকে যে বিশাল সভ্যতা বর্তমান ছিল, তৎকালে ব্যাস নামধেয় অপৌরুষেয় শক্তিশালী মহাকবি বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শ দিয়ে ইতিহাস লিখছিলেন। তন্মধ্যে প্রতিকল্পের ইতিহাসরূপে পূর্বপ্রাপ্ত প্রচলিত সারমর্ম অবলম্বন করে মহাকবি ব্যাস নূতন ভাবে পুরাণগ্রন্থ এবং তদানীন্তন ভারতের ইতিহাসরূপে মহাভারত রচনা করেন। ঐ গ্রন্থসমূহই সর্বত্র রাজন্যদের মধ্যে, সাধারণ সমাজে, বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর সম্মুখে, ধর্মসভা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হ'ত। এঁদের প্রভাব অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করবার সাহস যে দীর্ঘকালের মধ্যে কেউ করে উঠতে পারেন নি, অন্ততঃ হাজার বৎসর ধরে এঁদেরই কীর্তিগাথা যে তার ফলে অব্যাহত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। পরবর্তী কালেও যা রচিত হয়েছে বা এখনও যা হচ্ছে তারও অনেক কিছু তাঁদের রচিত কথা-কাহিনী বা বর্ণনার মূলধন নিয়ে।

বস্তুতঃ চিন্তায় ও গভীরতায় বিশাল-বুদ্ধি সত্যবতীসুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির প্রভাবের তুলনা কোথায়? তার পরবর্তী-যুগ ত বৌদ্ধযুগ। দেখা যায় যে যুগে যার প্রভাব, গ্রন্থাদিও তদনুযায়ীই লিখিত হয়ে থাকে; সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের মধ্যে তখনকার রচিত পুস্তকে ব্যাপকভাবে রাধা-নামের ছড়াছড়ি অস্বাভাবিক। এজন্য দেখা যায়, স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে যাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম বা ভক্তিবাদ ধূমাবৃত হয়ে আপন অস্তিত্বমাত্র রক্ষা করে চলেছিল তাদের মধ্যে

ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় রাধাবাদও অক্ষুণ্ণই ছিল। এ ভাবধারা একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের সংগ্রহগ্রন্থে কখনও পূর্বকবিদের রচনারূপে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী স্থান পেত না। পুরাণে রাধানাম থাকলেও মহাভারত কৌরব রাজন্যদের ইতিহাস—তাতে গোপীলীলার ক্ষেত্র রচনা করা সঙ্গত নয় বলেই মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সম্পর্কজনিত শ্রীকৃষ্ণের যেটুকু বিবরণ প্রাসঙ্গিক, তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখা যায়—প্রতিটি গ্রন্থেরই একটা নিজস্ব মুখ্য উদ্দেশ্য রয়েছে, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য বহির্ভূত কোন বিষয়ের উপর অকারণ জোর দেওয়া হয় নি। এজন্য বলা যেতে পারে—বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মহা আবির্ভাবের কাল থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় রাধার কাহিনী নানা ভাবে প্রচারিত ও পরিচিত থাকলেও সর্বত্র সর্বগ্রন্থে সমান ভাবে তা বিকশিত করা হয় নি।

এ কথা সত্য যে, এই রাধাবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর হৃদয়-সরোবরে এসে যে ভাবে সহস্রদলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, এমনটি পূর্বে সাধারণের মধ্যে দেখা যায় নি। হয়ত কেবল বৃন্দাবনের বনে বনে, রাসলীলায় রাসমণ্ডলে শ্রীরাধারই বিভূতিরূপা, শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গময়ী গোপাঙ্গনাদের হৃদয়সরোজে সে লীলার রসমধু সঞ্চিত হয়েছিল—কিন্তু জগজ্জনের হৃদয়মণ্ডলে রাসের লীলাস্থল নির্মাণ করে দিয়েছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ। যদিও দাক্ষিণাত্যের রায় রামানন্দ প্রভৃতির মাধ্যমে, এর অঙ্কুরোদ্গম হয়ে পূর্বাবধি স্ফুটনোন্মুখ হয়েই ছিল, তথাপি প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মধুর লীলাবিলাসে যে এ রাধাতত্ত্বের সুমধুর পূর্ণরসরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই অপূর্ব রত্নোদ্ধারের অবিস্মরণীয় দান এবং অপরূপ মহিমাটি লক্ষ্য করেই পরবর্তী গবেষকগণ বলে থাকেন—রাধাবাদের স্রষ্টা হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ। প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে, রাধারূপের স্রষ্টা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ।

ঐতিহাসিক প্রমাণই যেখানে মূল্যবান্ প্রমাণ, সে ক্ষেত্রে যদি আজ 'গাথা সপ্তশতী' গ্রন্থ আবিষ্কৃত না হ'ত তবে রাধানামের বিবরণ-প্রমাণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নেমে আসত। সুতরাং এই গ্রন্থে নেই, আর ঐ গ্রন্থে নেই এ জাতীয় কথায় স্ব-স্ব সিদ্ধান্তের অনুকূল ঐ ছিটেফোঁটা কয়েকটি দৃষ্টান্তের বলে পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা প্রভৃতির প্রমাণকে একেবারে উড়িয়ে দেবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। গভীর ভাবে অনুশীলন করলে স্বতঃই মনে হ'তে থাকে শ্রীমদ্ ভাগবতের—"অনয়ারাধিতো নূনং" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ করে, তাতেই রাধানামের বীজ স্বীকার করে নিয়ে তার ঐতিহাসিকতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে বলেছেন :

> "কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
> অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।"—

তাতেই মৌলিক সত্য অন্তর্নিহিত রয়েছে এবং আরও গবেষণা, আরও অনুসন্ধান, আরও নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যই কালক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

জাতীয় সম্পদে বান তৈল

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গন্ধ-বিচারে মানুষের রুচিভেদ থাকলেও গন্ধযুক্ত কোন জিনিষের প্রতি মানুষ স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। শুধুই কি মানুষ—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই। একদিকে যেমন ফুলের সভা মধুমক্ষিকার সমাগমে মুখরিত হয়, অপরদিকে তেমনি পশু বনপথে খুঁজে বার করে নেয় তার শিকার। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, গন্ধ আমাদের মগজের এমনএকটি স্থানকে আঘাত করে যার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা হৃদয়ের সম্পর্ক নেই। তার ফলে সমস্ত প্রাণীজগৎ গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই দুনিয়ায় এমন কোন জিনিষ নেই বললেই চলে যা গন্ধহীন। সুগন্ধি বলে ফুলের প্রসিদ্ধি সবার উপরে, তার পর চন্দনকাঠ। এ ছাড়াও এমন অনেক জিনিষ আছে যা নাকের কাছে আনলেও কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফেলে তাদের গন্ধও বাইরের জগতে প্রকাশ করা যায়।

এই যে মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ এর উৎস খুঁজতে গিয়ে জানতে পারা যায়—এ জিনিষটি লুকিয়ে আছে তেলের মত একটি তরল পদার্থের আকারে গাছে-পাতায়, তৃণে-লতায়, ফুলে-ফলে এবং সমস্ত জিনিষের মধ্যে—যেমন সরষে আর তিলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তেল। সরষে ও তিলতেল আর 'গন্ধবাহী' তেল ভিন্ন জাতের। এইজন্য 'গন্ধবাহী' তেলের নাম হচ্ছে 'উদ্‌বায়ী তৈল' বা 'বান তৈল'। যেহেতু বান তেলই সমস্ত সুগন্ধ-দ্রব্যের মূল উৎস

এজন্য এর ইংরেজী নাম essential oil. ইংরেজী essence থেকে essential এই শব্দের উৎপত্তি।

প্রকৃতি আদি কাল থেকে মানুষকে সুগন্ধে আমোদিত করে আসছে। কিন্তু সুগন্ধের প্রাণস্বরূপ এই বান তেল বার করে নিয়ে মানুষ নিজের সুবিধামত কাজে লাগাতে কসুর করে নি। কিন্তু এমনিধারা সুগন্ধি-দ্রব্যের ব্যবহার কবে থেকে যে সুরু হ'ল তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, মানুষ যে দিন থেকে পূজো করতে শিখেছে সেদিন থেকেই ভগবানের কাছে অর্ঘ্য দানের অঙ্গ' হিসাবে কৃত্রিম গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার সুরু হয়। আবার কারুর কারুর মতে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন সময়ের সন্ধান পাওয়া যায় না যখন কৃত্রিম গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার মানুষ জানত না।

উদ্বোধন-ভাষণ পাঠরত কৃষিমন্ত্রী ডক্টর পি. এস. দেশমুখ

এই সমস্ত কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আমাদের বান তেলের প্রসঙ্গ সুরু করা যাক। বান তেল ও তৎসংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার আজ মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে কেবল এসেন্স, আতর, সুগন্ধি চন্দন ও ধূপই আমাদের কাছে ব্যবহার্য্য সুগন্ধি দ্রব্য বলে মনে হয়। কিন্তু নানা প্রকার প্রসাধন-দ্রব্য ছাড়াও রবার, প্লাষ্টিক, সুতি, কাগজ, কালি, জুতোর পালিশ, পেণ্ট, আঠা, সাবান, চিঠি লেখার কাগজ এমনি আরও অনেক শিল্পে এই বান তেল কিংবা এতৎসংক্রান্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য্য। কাঁচা চামড়া, যেখানে পাকা করা হয়, দুর্গন্ধের জন্য তার ত্রিসীমায় ঘেঁষা মুশকিল। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বান তেলের ব্যবহারের ফলে পায়ের জুতো থেকে সুরু করে বুক-পকেটের মনিব্যাগ সবই ব্যবহার্য্য হয়ে ওঠে। নাম-করা কোন কারখানায় তৈরী ঝরণা কলমের কালির বোতল খুললে পাওয়া যাবে একটি সুন্দর গন্ধ। কিন্তু সময় সময় অখ্যাত কারখানায় তৈরী কালির বোতল খুললে বিশ্রী গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়।

বান তেল ও তৎসংক্রান্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার আজ এত ব্যাপক যে এক কথায় বলতে পারা যায়—এমন শিল্প খুব কমই আছে যাতে বান তেলের ব্যবহার কোন-না-কোন আকারে না করতে হয়। যেমন প্রয়োজনের ব্যাপকতা তেমনি দামেরও বিভিন্নতা। বিভিন্ন প্রকারের বান তেলের মূল্য পাঁচ টাকা পাউণ্ড থেকে কুড়ি হাজার টাকা পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

প্রয়োগ যতই অপরিহার্য্য হোক না কেন, দেশের বর্ত্তমান শিল্প-ব্যবস্থার দরুন আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানি করতে হয়। আর তা রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এসে দেশ থেকে কয়েক গুণ বেশী টাকা বের করে দিচ্ছে। আমরা কেবল যে রপ্তানি করছি তা নয়, প্রায় সমসংখ্যক টাকার বান তেল আমদানিও করছি। নীচের মোটামুটি হিসাব থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যাবে :

রপ্তানি (১৯৫১-৫৫)

১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	
১,২৮৮,৭৫১	১,১৫৩,৪০৯	১,৬০২,১১৯	১,৯৩৫,৬৮০	=পাউণ্ড
২১০,৬৯,০২২	১১২,৪৭,০৫৪	১২৬,৭১,২৬৭	২৩৪,১২,৬৮১	=টাকা

আমদানি (১৯৫১-৫৪)

৩১,০০৯,৭৮২	৮৩১,০৩৭	১,২৩১,১১৩	=পাউণ্ড
১২৯,০৫,৮৫৫	৭৭,৩৬,৯৭০	৮৯,২০,২৩৮	=টাকা

জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির ব্যাপারে বান তেলের প্রভাব যতই থাক না কেন, কাঁচামাল ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের নাই। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বান তেলের ব্যবসায়ে আমাদের দেশ এককালে ছিল পৃথিবীতে অগ্রণী। অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই যে কেবল আমাদের ভবিষ্যতের পথ নির্দ্ধারণ করতে হবে তা নয়, জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্যও এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করতে হলে বিজ্ঞানী এবং শিল্পপতিদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। সহযোগিতার পথ সুগম করার জন্য গত ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসে দেরাদুনের 'বন গবেষণা মন্দিরে' বান তেল সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন হয়। সরকারী, বেসরকারী, এবং আধা-সরকারী প্রায় শ' খানেক প্রতিনিধি এই আলোচনায় যোগদান করেন। দু' একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানও এতে যোগ দেয়।
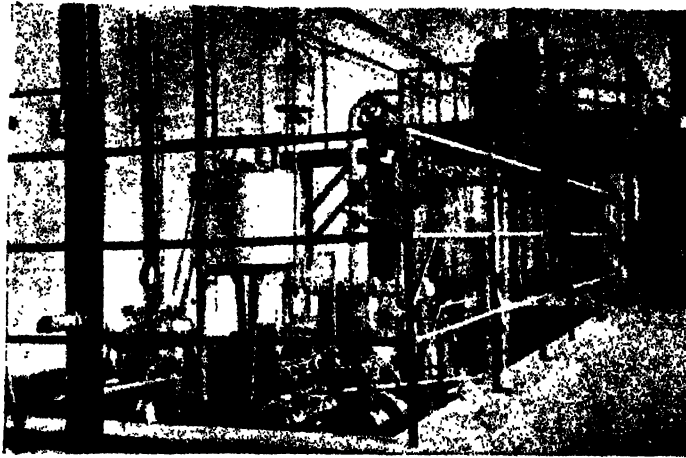
বানতৈল গবেষণাগারের একটি বিভাগের দৃশ্য

এই সভার উদ্বোধন-ভাষণে ড. পাঞ্জাবরাও দেশমুখ (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) এ বিষয়ে আমাদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, চীনা পর্য্যটক ফাহিয়ান ভারতবর্ষকে সুগন্ধি ফুল-লতা-পাতার দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে চন্দনকাঠের তেল আর চন্দনকাঠই নাকি যেত গাড়ী গাড়ী বোঝাই হয়ে মিশর, গ্রীস, রোম এবং আরও অনেক দেশে। সুগন্ধি-দ্রব্যের জন্য ভারতের নাম পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ভারতবর্ষের যেসব স্থানে সুগন্ধি-দ্রব্য প্রস্তুত হ'ত তন্মধ্যে কনৌজ, জৌনপুর, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌ, পুণা ছিল নাম-করা।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এই শিল্পে আমাদের অবনতি হ'ল কেন? সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ড. পাঞ্জাবরাও দেশমুখ সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে রুচিরও পরিবর্ত্তন হয় বা হতে পারে সে বিষয়ে অবহিত হতে না পারার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ উক্ত শিল্পে আমাদের এই অবনতি হয়েছে। এককালে ছিল তীব্র গন্ধের চলনই বেশী, কিন্তু বর্ত্তমানে ফুরফুরে গন্ধ না হলে আমাদের নাসিকা পরিতৃপ্ত হয় না। আমাদের শিল্পপতিরা সেকথা গ্রাহ্য না করলেও বিদেশীরা তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আমাদিগকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

এখন এ বিষয়ে অগ্রগতির জন্য যে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। প্রথমই জানা দরকার আমাদের কি আছে আর কি নেই। যা নেই তা আমাদের দেশে তৈরি করার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। না থাকলে কেন নেই। আমাদের দেশ বিরাট। বান তেল তৈরী হতে পারে এমন অনেক গাছ, লতা, তৃণ ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছে। এ বিষয়ে পুরোপুরি জরিপের প্রয়োজন এবং পরে গবেষণা করে ঠিক করতে হবে কোন জাতীয় গাছ কোথায় এবং কি ভাবে জন্মালে সবচেয়ে ভাল বান তেল পাওয়া যেতে পারে। আবার কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলি আমদানি করতে হয় মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে। খুব সাধারণ গবেষণার ফলেই এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, বিজ্ঞানসম্মত আবাদ ও চাষবিষয়ক গবেষণা চালিয়ে গেলে, এই জাতীয় ভাল বান তেল উৎপাদনকরী চারা (যেমন পচৌলী—Pogostemno cablin) আমাদের দেশেই উৎপন্ন করতে পারা যাবে। আবার অনেক চারা আছে যা থেকে অতি দামী বান তেল পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ সমস্ত চারাগাছের চাষ একান্ত নগণ্য। গাছগাছড়া বাদেও আমরা নিত্য এমন অনেক জিনিষ ব্যবহার করি যা থেকে ভাল বান তেল পাওয়া যেতে পারে। যেমন করাতের গুঁড়ো। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই গুঁড়ো থেকে বান তেল বার করে নিলেও বর্ত্তমানে এর যা ব্যবহার তা সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষুন্ন থেকে যেতে পারে আগের মতই। কমলালেবুর খোসা থেকে নাকি অতি উৎকৃষ্ট বান তেল তৈরী হয়। অথচ ভেবে দেখুন আমরা প্রতি বৎসর কত টন কমলা লেবুর খোসা ফেলে দিই। ভারতীয় কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কমলালেবুর খোসা থেকে বান তেল তৈরির কাজে ব্যাপৃত আছে। তবে তাদের অভিযোগ এই যে, এ ব্যবসা মোটেই লাভজনক হচ্ছে না।

চাষ আবাদের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার দিকটিও সমান ভাবে উন্নত করে তুলতে হবে। অবশ্য কয়েকটি সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে এর প্রসার এবং উন্নততর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত নীতি নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক। দেরাদুনের বন-গবেষণা-মন্দির বনজ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বান তেলেরও অধিকাংশ আসছে লতা-পাতা, তৃণ আর গাছ থেকে। কিন্তু এই গবেষণা-মন্দিরে বান তেল বিভাগটি ছিল ইংরেজীতে যাকে বলে মাইনর প্রডাকটস হিসাবে—অর্থাৎ, পেছনের সারিতে। তবে সুখের বিষয় এই যে, আলোচনার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাগটি ঢেলে সাজা হয়েছে এবং প্রথম শ্রেণীর মর্য্যাদা লাভ করেছে।

এই গবেষণাকার্য্য যে কেবল চাষ আবাদ এবং কাঁচা মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে বান তেল এবং সেই সংক্রান্ত রাসায়নিক পদার্থের জন্যও সমানভাবে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। তা না করতে পারলে দিন দিন উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি-বিধান ত সম্ভব হবেই না, উপরন্তু অবনতির সম্ভাবনাই থাকবে পুরোপুরি। আর একটি বিশেষ কারণ আছে, যার জন্য এ বিষয়ে

আমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তা হচ্ছে জনসাধারণের মনে আস্থা সৃষ্টি করা। কেননা উৎপন্ন বান তেলের উপর যদি জনসাধারণ ও শিল্পপতিদের আস্থা না থাকে তবে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সবই বিফলে যাবে। এই আস্থাসৃষ্টির প্রথম সোপান হিসাবে প্রয়োজন-প্রমাণ (standard) নির্ণয় করা এবং যাতে এই প্রমাণমাফিক বান তেল ও তজ্জাত দ্রব্য তৈরি হয় তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ভেজাল মেশানো এবং ব্যবসায়ে অন্যান্য দুর্নীতিমূলক আচরণ—যা অতীতে আমাদের অবনতির সহায়ক হয়েছে, তা রোধ করতে হলে এ পথ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। জনসাধারণ যদি বুঝতে পারে যে, সমান দামে ভাল দেশী জিনিষ কিনতে পাওয়া যায় তবে তারা যে বিদেশী জিনিষের দিকে ঝুঁকে পড়বে না—তার প্রমাণ দরকার হবে না বলেই মনে হয়। আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় প্রমাণ-মন্দিরের (I. S. I.) এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি প্রমাণ ইতিমধ্যেই রচিত হয়ে গিয়েছে। তবে এ কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে যে ভারতীয় প্রমাণ মন্দির এবং বান তেল গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে তা জানালেন দেরাদুন বন গবেষণা মন্দিরের রাসায়নিক বিভাগের অধিকর্তা ড. সদগোপাল। কেবল যে প্রমাণ তৈরির কাজ শেষ হলেই সব প্রচেষ্টার অবসান হ'ল তা নয়, সময় অবস্থা চিন্তাধারা ও রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণগুলিকেও পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন করে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।

আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, বান তেল সম্পর্কীয় দৈনন্দিন অগ্রগতির খবর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কেননা এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে না পারলে যথেষ্টসংখ্যক উপযুক্ত কর্মী ও বৈজ্ঞানিককে এদিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে না। দেরাদুন বন-গবেষণা-মন্দিরে যে আলোচনার আয়োজন হয়েছিল গত অক্টোবর মাসে, তার সঙ্গে একটি প্রথম শ্রেণীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ড. সদগোপাল দুঃখ করে বললেন, "অনেক চেষ্টা করেও

বান তৈল সম্পর্কিত নানা বিষয় ব্যাখ্যায় রত ড. সদগোপাল

জমাতে পারলাম না।" সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও জানালেন তিনি—যখন এ পথে পা দেন তখন কি বাধা ও নিষেধের গণ্ডী পার হয়ে 'উৎসাহবিহীন একলা পথে' বিচরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। বান তেলের ব্যাপারে বিদেশীদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কয়টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই আলোচনা-সভায় ও প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছে তাদের প্রচারপত্রের ভঙ্গি ও দৃষ্টি একদিকে যেমন রুচিসম্মত, অন্যদিকে তেমনি চিত্তাকর্ষক।

অভাব আজ আমাদের চারিদিকে। বান তেল তৈরি করতে চাই প্রথম শ্রেণীর পাতক (distillation) যন্ত্র। আমাদের দেশের অনেক গবেষণা-কেন্দ্র ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্ত পাতক যন্ত্রের অভাবে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারছে না। তবে অভাব পূরণ করার উদ্যম অচিরেই আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবে বলে মনে হয়।

প্রভাতের গান

শ্রীউমা দেবী

১

আজ ভোরবেলা তুমি এসেছিলে শয়ন-সীমায়
উষায় উজ্জ্বল হলে নিশীথের দুর্ব্বল স্বপন,
মুহ্যমান অন্ধকার রাত্রিশেষে যখন ঝিমায়
নূতন আলোর সঙ্গে জেগেছিল ঘুমানো নয়ন।
জেগেছি—পেয়েছি সেই ভোরবেলা তোমার স্পর্শন
অসামান্য মমতায় হাতখানি করুণা-শীতল,
জেগেছি—পেয়েছি ভোরে অসামান্য তোমার দর্শন
সুপ্ত আনন্দের বীজ সেইখানে মেলেছে ফসল।
প্রভাতের সিংহদ্বারে রাজকীয় সেই মহোৎসব
ছড়াল মেঘের বুকে রাশি রাশি আলোর আবীর,
জীবন সমুদ্র কোলে মোহমুক্ত মুক্তার বিভব
অলঙ্কৃত করে দিল কেশগুচ্ছ এ সীমন্তিনীর।
মানস-তরঙ্গ-ক্ষিপ্ত শীকরের স্পর্শনে অধীর
সুগন্ধ নিঃশ্বাস ঢেলে বয়ে গেল বসন্ত সমীর।

২

উষায় অনেক পুষ্প বেঁধেছিলে পীত উত্তরীয়ে
এখন সন্ধ্যার পথে ফুলগুলি কোথায় হারালো ?
নিশীথের মাল্য বুঝি গাঁথা হবে তাহাদের নিয়ে
হৃদয়ের শৈত্যে বুঝি তাপ দেবে আলোকের আলো !
তোমার দিনের ফুল ফেলে গেলে পথের ধূলায়—
আমার রাতের স্বপ্নে তাদেরই সে সুরভি-উদ্গার
অসামান্য আবেদনে ভরে দিল গাঢ় মমতায়
অসামান্য আনন্দের শোনালো সে বাণী অমুচ্চার।
তোমার মহৎ প্রাণে যে বেদনা হয়েছে মহতী
অলৌকিক যে বিরহে পরিব্যাপ্ত ভুবন তোমার,
সে বেদনা—সে বিরহ যাত্রাপথে এনেছে প্রগতি,
উদ্বেল তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রাণতটে এনেছে জোয়ার।
কায়ার পিঞ্জরমুক্ত ছায়া হাসে বিমল দর্পণে,
শবের সৎকার কর স্মৃতিমুক্ত আনন্দ-তর্পণে।

৩

যে ঐশ্বর্য্য গুপ্ত আছে তুমি তার একক ভাণ্ডারী,
যে মাধুর্য্য সুপ্ত আছে তুমি তার একান্ত রসিক,
তোমাকে করেছি তাই এ তরীর সাহসী কাণ্ডারী
তোমাকে করেছি তাই এ দেহের হৃদয়-প্রতীক্।
পদ্মরাগ মণিদের যত দীপ্তি হারিয়ে গিয়েছে
তারা এসে তড়িন্ময় করেছে এ দেহের শোণিত,
সাগরের যত নীল মেঘেদের রাঙিয়ে দিয়েছে
তারি নীল সুষমায় গড়েছি এ হৃদয়ের ভিৎ।
এ দেহের সে ঐশ্বর্য্য এইক্ষণে তোমাকে দিলাম
এ মনের সে মাধুর্য্য একমাত্র তুমি করো পান,
নিজেকে নিজের খুশি বিনামূল্যে করেছে নিলাম
নিজের দারিদ্র্য সুখে পেয়েছে সে রাজত্বের মান।
এ দারিদ্র্যে তৃপ্ত হ'ল ঐশ্বর্য্যের দৃপ্ত অবসর,
এ মাধুর্য্যে দীপ্তি পেল নয়নাশ্রু-মুক্তার প্রসর।

৪

হৃদয়-পদ্মের মধু কবে হ'ল নয়নে মদিরা,
মদির সঙ্কেতে তার এ পরাণ আশায় অধীর,
উন্মুক্ত জীবনক্ষেত্রে বয়ে গেল স্বচ্ছন্দ সমীর—
হৃদয়-পদ্মের মধু মধুকর কর গো সঞ্চয়,
(বাসনায় সোনা-গলা কমলের আলাময় স্বাদ
তোমার স্ফটিকপাত্রে অমরার মন্দার সংবাদ)
আঁধারে মিশাও পাখা—এ আঁধারে নাই কোনো ভয়,
গভীরের স্পর্শ পেয়ে এ রজনী হয়েছে গভীরা।
স্বচ্ছ নীল পদ্ম দুটি ডুবে যাবে নীল অন্ধকারে,
গভীর অতলে যার ঝিকিমিকি তারার কণিকা,
নয়নের গাঢ় সুধা ভরে নেব ক্ষীণ দেহাধারে
এ দেহ-আধার হবে আঁধারের কমল-মণিকা।
হৃদয়-পদ্মের মধু মধুকর কর গো সঞ্চয়,
গভীরের স্পর্শ পেয়ে এ জীবন হয়েছে নির্ভয়।

পথের ক্ষণিক

শ্রীঅরবিন্দ পালিত

মার্চ-শেষের পড়ন্ত বেলায় সেন্টপলস গীর্জার পাশে হাল্কা সবুজ ঘাসগুলোর উপর এলোমেলো বাতাস লুটোপুটি খেয়ে যায়। পশ্চিম দিগন্তে সারি সারি গাছপালা আর জাহাজের মাস্তুলের ফাঁক দিয়ে বিদায়ী সূর্য্য আকাশের নীল ওড়নায় এক পিচকারী সোনালী রং দিয়ে হাসতে হাসতে ডুব মারে। আকস্মিক কৌতুকাঘাতে আকাশটা কিশোরী মেয়ের মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। বিস্তৃত ময়দানের এখানে-ওখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। নরম ঘাসের গালিচায় শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে বসে সুধন্ব। শ্যামল তন্বুদেহটি ঘিরে অমিতার আসমানী সাড়িটাও যেন ডুব মারে এই কোমল আলো-আঁধারিতে। আবছা অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে অমিতার আবেগ-কোমল কণ্ঠস্বর শোনা যায়—

"তুমি কিন্তু বেশী দেরি করে বাড়ী ফিরতে পাবে না।"

"কেন?" হাল্কা ভাবে প্রশ্ন করে সুধন্ব।

"বা রে!" একটু অভিমানের ছোঁয়া লাগে কণ্ঠে, "আমি যে সারা দুপুর একলা কাটাব, তার বেলা! না, তুমি সোজা আপিস থেকে বাড়ী ফিরবে। তার পর মুখ হাত পা ধুয়ে বারান্দার ধারে ইজি চেয়ারটায় বসবে। আমি চা জলখাবার নিয়ে আসব। দু'জনে মিলে চা খাওয়া যাবে। তার পর দু'জনে বেড়াতে যাব। আমি কিন্তু গলির মোড়ে যে লোকটা বেলফুলের মালা বেচে, তার কাছ থেকে রোজ একটা করে মালা কিনব, খোঁপায় দেব। তখন কিন্তু তুমি বকতে পাবে না, বাজে খরচ করছি বলে। তা আগে থাকতেই বলে রাখছি।

"তার পর?" মৃদু হেসে সুধন্ব বলে।

"তার পর"—একটু হেসে অমিতা বলে যায়, "বেড়িয়ে ফিরে কিন্তু আর একটুও সময় নষ্ট করা নয়। দু' কোণের দুই টেবিলে দু'জনে পড়তে বসব। উল্টো মুখে, যাতে পড়ার সময়ে কেউ কাউকে দেখতে না পাই। সাড়ে দশটার পর আমি উঠে স্টোভটা ধরিয়ে খাবারগুলো গরম করতে যাব। তুমি আর একটু পড়তে পার। কি চুপ করে আছ যে? আমার প্ল্যানটা বুঝি পছন্দ হচ্ছে না?"

নারী-হৃদয়ের নীড় বাঁধবার সেই চিরন্তন স্বপ্ন। বাংলা দেশের নগণ্য পল্লীর যে-কোন মেয়ের সঙ্গে যে স্বপ্ন একই ভাবে দেখে মহানগরীর কেমিষ্ট্রি অনার্স-পড়া মেয়ে অমিতা চৌধুরী।

সুধন্ব ভাবে। বেড়িয়ে ফেরার পথে অমিতাকে রোজ ওদের হোষ্টেলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরতে ফিরতে অমিতার কথাগুলো ভাবে সুধন্ব। সেই অমিতা! এই ত সেদিন—সেদিন পর্য্যন্ত অমিতার সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় সম্ভ্রমভরা দূরত্ব বজায় রেখে সে চলেছে। আর আজ! আজ থেকে কত আর দূরে সেই দিনটা যেদিন ওকে অমিতা আবিষ্কার করল। হ্যাঁ, অমিতারই আবিষ্কার।

[illegible]...

বি-এসসি পাস করেছিল সুধন্ব বেশ ভাল ভাবে, অনার্স নিয়ে। তার পর সায়ান্স কলেজের দিকে আর না গিয়ে সোজা খবরের কাগজের দ্বিতীয় পাতায় ডুব দিল। প্রথম প্রথম নিজের কোয়ালিফিকেশানগুলো লিখে দরখাস্ত ছাড়তে ভালই লাগত তার। দফাওয়ারি ভাবে সাজানো গুণের ফিরিস্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে একটু আত্মগৌরবই বোধ হ'ত। কিন্তু দাদার পয়সায় কেনা ডাকটিকিট লাগাতে লাগাতে কিছুদিন পরেই এল কুণ্ঠা আর বিরক্তি; ক্রমে ক্রমে—ক্রোধ, ক্ষোভ। মাঝে মাঝে এক-আধটা ইণ্টারভিউ অবশ্য মানসিক ক্ষোভে বারিসিঞ্চন করত। কিন্তু তাই নিয়েই বা কতদিন থাকা যায়। যদিও বাড়ীতে কেউ গঞ্জনা দেয় নি, তবুও দাদা একা কি ভাবে সংসারটা চালাচ্ছে, তা ত দেখতেই পাচ্ছিল। চোখের সামনে তার চেয়ে অনেক ভাল এবং অনেক খারাপ রেজাল্ট করা বন্ধুবান্ধবেরা একে একে চাকরি পেয়ে গেল মামা, কাকা, দাদাদের সুপারিশের জোরে। শেষ পর্য্যন্ত হতাশায় দিনগুলো তখন প্রায় বর্ণহীন হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে একদিন ইণ্টারভিউ দিয়ে ফিরছিল এক সরকারী ল্যাবরেটরী থেকে। ইণ্টারভিউ'র রেজাল্ট সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ বা দুশ্চিন্তা ছিল না। জানত, ও চাকরি তার হবে না। ল্যাবরেটরী-এসিষ্টাণ্ট পোষ্টের জন্য ইণ্টারভিউ'র জন্যে ডেকে পাঠিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, ইউ. কে. কি? সেখানকার এগ্রিকালচার-মিনিষ্টার কে? দিয়েন-বিয়েন-ফুঃ প্রব্লেম কি? কোন বাঙালী ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরেছে? এই সব। গত কয়েক মাস ও খবরের কাগজই পড়ত না, বিরক্তিতে। তাই উত্তর দিয়েছে সব এলোমেলো।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ট্রাম থেকে নেমে, বাড়ী না গিয়ে সোজা হেদুয়ায় এসে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। খেয়ালই করল না, ভাদ্র মাসের খটখটে রোদ বেঞ্চিগুলোকে আগুন করে রেখেছে; মনেই হ'ল না, আজকেই কাচা ট্রাউজার আর সার্টটার ক্রিজগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে; প্যাণ্টের পকেট থেকে খামেমোড়া সার্টিফিকেটগুলো নীচে ঘাসের উপর পড়েই রইল। সুধন্ব চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। এখান থেকে কলেজটা পরিষ্কার দেখা যায়। দীর্ঘদিনের আভিজাত্য-ভরা ঐ গুরুগম্ভীর অট্টালিকা। দোতলায় ঐ ত অনার্স ল্যাবরেটরী। এখনও হয়ত ডক্টর ব্যানার্জ্জির সেই হুঙ্কার ছেলেদের তেমনি ভাবেই সচকিত করে তোলে; অতি সাবধানীরা টেবিলের উপর থেকে ভিজে ফিলটার-পেপার নীচের বাস্কেটে ফেলে দেয়। ঠিক তেমনি ভাবেই হয়ত সুধন্বর মত আর একদল ছেলে বেকার-জীবনে প্রবেশন পাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। হাতে-ধরা টেষ্ট-টিউবের তলায় সারি সারি গ্যাস-বার্ণারগুলো জলছে; আর জলছে তাদের চোখে

"এ কি! আপনি এখানে?"

সুধন্য চমকে তাকাল। অনতিদূরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে তার কলেজ ফাইল। কমলা রঙের ধনেখালি সাড়িটা শ্যামল দেহটিকে জড়িয়ে উঠে, উপর থেকে নেমে আসা দুই বিনুনীকে বুকের উপর আলতোভাবে ছুঁয়ে রয়েছে। তার ভাসা ভাসা কালো চোখ দুটোর কোল জুড়ে হর্ষ আর বিস্ময়। সুধন্য ধড়মড় করে উঠে বসল।

"উঃ! এই রোদে আপনি এখানে শুয়ে আছেন। আচ্ছা লোক ত। আসুন, ঐ ছায়ার দিকটায়।"

সুধন্য উঠল।

"আপনার কি যেন একটা পড়ে গেছে বোধ হয়।"

সুধন্য ফিরে তাকিয়ে অবহেলাভরে খামটা কুড়িয়ে নিয়ে চলল মেয়েটির পিছু পিছু. ভাদ্রের কাঠফাটা রোদ থেকে সরে গিয়ে অল্প একটু স্নিগ্ধ সবুজ পরিবেশে। চলার ছন্দে অল্প অল্প কাঁপছিল মেয়েটির কমলা-রঙের অাঁচল। আর সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুধন্যর মনে দ্রুত ভেসে আসছিল অতীতের কয়েকটা ছবি—সিনেমায় ফ্লাশ-ব্যাকে বলা কাহিনীর মত।...

বুরেটের মেনিশকাশ লক্ষ্য করতে করতে ডক্টর ব্যানার্জ্জির চীৎকার শুনে মুখ তুলে তাকিয়েছিল সুধন্য। ডক্টর ব্যানার্জ্জি ধমকাচ্ছেন মেয়েটিকে। যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে মেয়েটিকে দেখেছে সুধন্য। গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করত। ল্যাবরেটরীতে সহপাঠিনীদের সঙ্গে আজেবাজে কথা কইতে দেখে নি কখনও। সেকেণ্ড ইয়ার সায়ান্সের ছাত্রী যে এত মন দিয়ে প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাস করে তা সুধন্য এই প্রথম দেখল। তাই তাকে বকুনি খেতে দেখে সে একটু অবাক হ'ল। যা হোক, একটু পরেই কিন্তু মেয়েটি তার কাছে এল, সল্ট এনালিসিস চার্টের কয়েকটা জায়গা বুঝে নিতে। বললে, আজকেই সল্টটা না বার করলে নয়—দু'দিন ধরে চেষ্টা করছে; কিন্তু একটা জায়গায় কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

অবশ্য অল্প একটু বুঝিয়ে দিতেই মেয়েটি, 'বুঝতে পেরেছি', বলে চলে গেল। তার পরও কয়েকবার এসেছে সুধন্যর কাছে, এটা ওটা বুঝে নিতে, কখনও ল্যাবরেটরীতে কখনও বা লাইব্রেরীতে। সবচেয়ে মজা হ'ল, ওদের টেষ্টের আগে। ও কিছুতেই ফিজিক্স পরীক্ষা দেবে না; বিরাট কোর্স, বিশেষ কিছুই তৈরী হয় নি। সুধন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক বোঝাল ওকে, ভরসা দিল, শেষ পর্যন্ত গোটাকতক কোশ্চেন সাজেষ্ট করে, সেগুলো বুঝিয়ে এক রকম জোর করেই ওকে পরীক্ষা দিতে পাঠাল। আর সেই প্রথম দিন অমিতার অনুপস্থিতিতে, ওর কথা একটু ভাবল। উদ্বিগ্ন হয়ে বেলা চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তার পর কোশ্চেন পেপার নিয়ে অমিতা যখন হাসিমুখে বেরিয়ে এসে জানাল, পরীক্ষা ভাল দিয়েছে; তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাড়ী ফিরতে উদ্যত হ'ল। অমিতা অবশ্য ওকে ওদের বাড়ী যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল; সুধন্য একটু মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিয়েছিল; তার পর ভুলে গিয়েছিল।

এর পর আর একদিন দেখা হয়েছিল। সেদিন অমিতার অনুরোধে সুধন্য ওকে ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির কিছু সাজেশ্‌শান দিয়েছিল ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য। সেদিনও অমিতা ওকে পূর্ব্ব-নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সুধন্য মৃদু হেসেছিল। কিন্তু অমিতাদের ঠিকানা নেবার কথা ওর মনেই হয় নি।

কলেজী ছাত্র-সুলভ দৃষ্টিতে রোমান্সের রঙীন-চশমা লাগানোর মনোভাব সুধন্যর কোনদিনই গড়ে উঠতে পায় নি। ম্যাট্রিকে ভাল রেজাল্ট করে সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে এল কলকাতায় দাদার বাসায়, পড়তে। এসেই দেখল, দাদার অস্থায়ী চাকরিটির আয়ু শেষ হয়েছে। সেকথা বাড়ীতে জানায় নি। তখন কি আর করে। বিলেতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার স্বপ্ন উপস্থিত বাক্সবন্দী করে টিউশানি সুরু করলে। দাদাও নানারকমে উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে লাগল। এমনি করে দু'ভাই মিলে বাড়ীতে টাকা পাঠাত। বছরখানেক পর দাদার আর একটা চাকরি হ'ল। তখন সুধন্য কলেজে ভর্ত্তি হয়ে আবার পড়াশুনা সুরু করল। সে আই-এসসি. পরীক্ষা দেবার পরই কিন্তু সমস্ত পরিবারটা দেশ ছেড়ে চলে এল কলকাতায়, দেশবিভাগের হাঙ্গামায়। একা দাদার পক্ষে এতবড় সংসার চালানো সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষায় ফার্ষ্ট গ্রেড স্কলারশিপ পেলেও সুধন্য চাকরি নিল এক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে, কাকার চেষ্টায়। তা ছাড়া টিউশানি ত ছিলই। এমনি করে বছর দুয়েক কাটবার পর দাদার একটা ভাল প্রমোশন হ'ল। দাদাই তখন জোর করে সুধন্যকে আবার পড়তে পাঠাল। একটু অবশ্য টানাটানি করে চালাতে হবে; তা হোক। ফলে সুধন্য আবার এসে ভর্ত্তি হ'ল বি-এসসি ক্লাসে। ইতিমধ্যে ওর অনেক বন্ধু-বান্ধবই পড়া শেষ করে কর্ম্ম-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পিছিয়ে পড়ায় ও চাইত জীবনের অগ্রগতিতে কয়েক বছরের ফাঁকটা তাড়াতাড়ি পূরণ করে নিতে।

তাই অমিতার সঙ্গে এই স্বল্প আলাপে ও মাথা ঘামায় নি বা হাল্কা রোমান্সের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দেয় নি। অমিতার কথা ও ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ বিগত দিনের ওপার থেকে অমিতা যেন ভেসে এল, সঙ্গে নিয়ে এল ছাত্রজীবনের সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর মধুর স্মৃতি।...

একটা গাছের তলায় ছায়া দেখে ওরা বসল। অমিতাই প্রথম কথা বলল, "চিনতে পারছেন ত। দেখে যেন মনে হচ্ছে ভুলেই গেছেন।"

"না, মনেই আছে। বরং বেশী করে মনে আনার চেষ্টা করছি।" মৃদু হেসে সুধন্য বলে।

"প্রথমেই আপনাকে একটা ধন্যবাদ জানাই। অবশ্য সেটা আপনার পাওনা হয়েছে প্রায় দেড় বছর আগে।"

"কি ব্যাপার বলুন ত?" কৌতূহলী হ'ল সুধন্য।

"আপনার দেওয়া সেই সাজেসশানটায় প্রায় সবগুলিই এসেছিল, যার জন্ম সে যাত্রা উদ্ধার হয়েছিলাম।"

"ও।" সুধন্ধ স্মিত হেসে চুপ করে রইল।

"এবারে কিন্তু একটা অনুযোগ আছে। আমাদের বাড়ী যাওয়ার কথাটা কিন্তু আপনি আজও রাখেন নি। মা আপনার কথা মাঝে মাঝে বলেন।"

"আমার কথা!" এবার সত্যিই অবাক হ'ল সুধন্ধ।

"হ্যাঁ। মাকে ত আপনার কথা অনেক বলেছি—আপনি যে আমার কত সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে সেই সাজেসশানগুলোর কথা। মা তাই অনেকবার আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। কিন্তু সেই যে আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হ'ল, তার পর আপনার আর কোন খোঁজই পেলাম না। ডক্টর ব্যানার্জিকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলাম। তা উনিও বলতে পারলেন না। মা শুনে কত রাগ করতে লাগলেন। আপনার ঠিকানাটা জেনে রাখি নি বলে কত বকুনি দিলেন।"

"তাই নাকি! আমি অবশ্য টেষ্টের পর আর এদিকে বড় একটা আসি নি। আর তা ছাড়া আপনার ঠিকানাটা নিতেও ভুলে গেছলাম।"

"হাঁ! ঠিকানা জানা থাকলে যেন কত যেতেন।" অনুযোগ করল অমিতা।

"না, তা নয়। তবে কি জানেন, পরীক্ষার পর থেকে এত ব্যস্ত রয়েছি যে—"

"যে ভরদুপুরে তেলোর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। এই ত!" দু'জনেই হেসে ওঠে।

"আচ্ছা, আপনি এখন কি করছেন?"

"বিশেষ কিছুই না," ম্লান হেসে বলল সুধন্ধ।

"ও, বুঝেছি। তাই বুঝি—" বলতে গিয়ে থেমে গেল অমিতা। তার পর ধীরে ধীরে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা বলি।"

"না, না, বলুন।"

"আচ্ছা, আপনারা কি বলুন ত", শান্ত, সংযত কণ্ঠস্বর অমিতার, "এত অল্পেই ভেঙে পড়েন কেন?"

"অল্পেই ভেঙে পড়েছি কি করে বুঝলেন?"

"মাপ করবেন। পাস করে বসে আছেন, এখনও পর্য্যন্ত কোনও চাকরি-বাকরি যোগাড় করে উঠতে পারেন নি। এই ত! এর জন্যই ত দুপুরের রোদে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকা।"

"ধরেছেন ঠিকই। তবে বেকার-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—"

"জানি, আমার নেই।" একটু উত্তেজিত হ'ল অমিতা, "কিন্তু আপনাদের ত দেখছি। আমার দাদা আজ এম-এ পাস করে বছরখানেক বসে আছে। ঠিক আপনার মত তার অবস্থা। তাকে কিছু বলতে গেলেই বলবে, তুই এসব বুঝবি না। চুপ কর দেখি।" মানলাম, বুঝব না, কিন্তু আপনাদের দেখে দেখে কি একটু পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও হয় নি?"

"স্বীকার করলাম আপনার কথা। কিন্তু কি করতে বলেন আপনি?"

"এতদিন ধরে লেখাপড়া শিখে যে তৈরি করলেন নিজেকে, তা কি এই এক বছর, দেড় বছরে ভেঙে পড়বার জন্যে? আপনার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, এসবের পরীক্ষা ত এখনই।" উত্তেজনায় মুখটা একটু লাল হয়ে উঠেছিল অমিতার। তা সত্ত্বেও সুধন্ধ হো হো করে হেসে উঠল। অমিতা একটু আহত হয়ে একদম চুপ হয়ে গেল। সুধন্ধ হাসতে হাসতেই বলল,—

"আপনি রাগ করবেন না। ওসব কথা আমরাও জানি, আর এগুলো যে নিছক ছেঁদো কথা তা আমাদের জীবনের প্রতি পদে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।"

অমিতা মুখ নীচু করে বসে নখ দিয়ে ঘাস ছিঁড়ছিল, মুখ খুলে ধীরে ধীরে বলল, "একটা কথার জবাব দেবেন?"

"বলুন।"

"ধরুন, আপনার এই শোচনীয় মানসিক অবস্থায় একটা ইন্টারভিউ এল। কিন্তু আপনি নিজের উপর এতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, সেটা যাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করবেন কি করে?" সুধন্ধর দিকে তাকিয়ে দেখল সে চুপ করে আছে।

"আপনার ত মনে হবে, দূর ছাই, চাকরি ত হবেই না, কি লাভ চেষ্টা করে। ফলে একটা চান্স নষ্ট করে আরও হতাশ হয়ে পড়বেন। আর ক্রমাগত এ রকম ভাবে হতাশা ত বেড়েই যাবে।" শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সুধন্ধ কয়েক মিনিট মাথা নীচু করে বসে রইল। তার পর মুখ তুলে অভিভূতের মত বলে উঠল, "তুমি—তুমি ত ঠিক বলেছ।" বলেই চমকে উঠল। তার পর সামলে নিয়ে বলবার চেষ্টা করল, "মানে, আপনি ইয়ে।"

অমিতা হেসে ফেলে বলল, "আচ্ছা হয়েছে। যা স্বাভাবিক তাই বলেছেন। তা হলে আমার কথা স্বীকার করে নিলেন?"

সুধন্ধ একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বলল, "স্বীকার করা মানে? তা হলে শোন" বলে আজকের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে গেল। সব শুনে অমিতা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, "ছি, ছি, কি করলেন বলুন ত। হয় ত এই চাকরিটাতেই কোন সুপারিশের বালাই ছিল না। ভাল করে ইন্টারভিউ দিলে হয়ত হতে পারত।" তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, "যাক গে। এবার থেকে আর কিন্তু অমন করবেন না। আমি বলছি, কাজ আপনার হবেই।"

"ভরসা দিচ্ছ তা হলে।"

এবারে অমিতা লজ্জা পেল। কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাদের বাড়ী কবে যাচ্ছেন বলুন ত?"

"কবে যাব বল।"

"তা হলে পরশু চলুন। ঐ দিন শনিবার আমিও বাড়ী যাব।"

"শনিবার তুমি বাড়ী যাবে মানে?"

"আমি ত এখানে হোষ্টেলে থাকি। বাড়ী আমাদের শ্রীরামপুরে।

অমিতার বাবা কলকাতার এক মার্চেন্ট আপিসের মাঝামাঝি রকমের চাকুরে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। অমিতা মেজ। ছোট মেয়েটি স্কুলে পড়ে। দুই ছেলে। সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার, ষ্টেশন থেকে একটু দূরে শহরের ধার ঘেঁষে ছোট একতলা বাড়ী। সন্ধ্যাবেলায় সুধন্ব ছাদে বসেছিল। বাড়ীটার একপাশে একসারি কলাগাছ, এ ছাড়া আম, জাম, নারকেল গাছে ঘেরা চার ধারটা। অনেক দূরে রেললাইনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালটার পাশ দিয়ে সূর্য্য ডুবে গেছে। চারদিকে একটা আবছা আলো-আঁধারি ঘনিয়ে আসছে। এমন সময়ে অমিতা এল চায়ের পেয়ালা নিয়ে। পেয়ালাটা সুধন্বর হাতে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "একলা বসে বসে কি দেখছেন?"

"সূর্য্য ডোবার পরের এই সুন্দর সময়টুকু দেখতে দেখতে গ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। গ্রাম ছেড়ে চলে আসার অনেক দিন পর আজ আবার এই সময়টাকে একটু উপভোগ করলাম।"

দু'জনেই একটু চুপচাপ বসে রইল। তারপর অমিতাই মৃদু স্বরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

"কেমন লাগল?"

"কি?"

ঘাড়টা অল্প একটু হেলিয়ে সুধন্বর দিকে একবার তাকিয়ে অমিতা বলল, "এই ধরুন, আমাদের সকলকে, আমাদের বাড়ী, এই জায়গাটা।"

"যদি সেন্টিমেন্টাল না বলে বস, তবে বলব, সব মিলিয়ে আজকের দিনটা আমার জমার ঘরেই পড়ল।" সুধন্ব আস্তে আস্তে কথাটা বলল। অমিতা একটু সরে এসে আঙুল দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা জড়াতে জড়াতে সুধন্বর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, "কেন?"

"কেন? নিজের স্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করে বললে বলতে হয়, "আমার সব হতাশা যেন কেটে যাচ্ছে। আর তুমি পাশে আছ বলে যেন নতুন শক্তি অনুভব করছি।"

"যা—ও!" বলেই অমিতা ঘুরে আলসের ভর দিয়ে দাঁড়াল। সুধন্ব কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করল। সুদূর পশ্চিম দিগন্তে তখনও আবছা কালোর উপর গাঢ় লালের অল্প কয়েকটা প্রলেপ লেগে আছে। সেইদিকে তাকিয়ে-থাকা অমিতাকে দেখতে দেখতে ওর মনে হ'ল, অমিতা যেন ওর জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজে চিররহস্যময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শেষ পর্য্যন্ত ল্যাবরেটরী এসিষ্টাণ্টের চাকরীটা হ'ল সুধন্বর। মাইনে অবশ্য বেশী নয়, উপস্থিত সব মিলিয়ে শ'দেড়েকের মত। যাক, তাই ভাল; বেকার বসে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। অমিতাও সেই কথাই বলল। সেণ্ট পলস গীর্জার পাশে, সবুজ ঘাসে-ঢাকা ময়দানে, বিকেলের মায়াময় আলোয় বসে দু'জনে আলোচনা করছিল। সুধন্য খুশী হয়েছিল বটে, কিন্তু খানিকটা ম্লান হয়ে পড়ছিল এই ভেবে যে, জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতি হ'ল দেড়শ' টাকায় জীবন সুরু করা। কিন্তু অমিতা উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বেশ খানিকটা দূর পর্যান্ত ছড়িয়ে পড়ছিল। "তুমি বলছ কি। তুমি কি ভাবছ জীবনের দৌড়ে, একটু পেছন থেকে আরম্ভ করলে বরাবর পেছনেই পড়ে থাকবে। এ কি ধারণা তোমার! উপস্থিত পায়ের তলায় একটু মাটি পেলে ত। দুশ্চিন্তাও আর থাকবে না। এবার না হয় ধীরেসুস্থে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার চেষ্টা কর।"

"তুমি বলেছ মন্দ নয়। অন্ততঃ এবার একটা ভেবেচিন্তে কিছু করবার সুবিধা হবে।"

দীপ্ত মুখে অমিতা বলল, "আমি বলছি, নিশ্চয় হবে। দেখলে ত, যেদিন ইণ্টারভিউ দিলে সেদিনই তোমায় বলেছিলাম।"

সুধন্য ওর হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "না, তে মার পয় আছে দেখছি। তুমি কি আমার জীবনে কল্যাণী হয়ে দেখা দিলে?"

অমিতা সলজ্জ হাসি হেসে মুখ নামিয়ে নিল।

কিন্তু বেশী দিন নয়। সপ্তাহের ছ'টা দিন দশটা-পাঁচটা খেটে আর সন্ধ্যাবেলায় টিউশানি করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরা। ছুটির দিন রবিবারটা টুকিটাকি কাজ সেরে বিকেলের দিকে অমিতাকে নিয়ে ময়দানে কিংবা টালা পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কিনারায় জলের ধার ঘেঁষে বসা আর এলোমেলো বকা এবং শোনা—কত দিন আর ভাল লাগে। জীবনের আহ্বান যে আরও গভীরে বাজে—তার সুর ত এত হাল্কা জীবনে প্রতিধ্বনিত হয় না। তাই অমিতার ভাবী জীবনের পরিকল্পনায় ত্রুটি দেখা যায়, আলোচনায় ছেদ পড়ে।

সুধন্ব বলে, "শুনতে ভালই লাগল। কিন্তু ভেবে দেখ। এ-দিকে বলছ বটে, নিজেদের ছোট্ট সংসার, নিজেরাই চালিয়ে নেব, লোকজনের দরকার নেই। কিন্তু জিনিষটা কি দাঁড়ায় দেখেছ। সারাদিন খেটে বাড়ী ফিরে তোমাকে তাড়া দিয়ে চা-টা খেয়ে পড়াতে যাব। রাত্রে ফিরে, আর যাই হোক, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা মনেও আসবে না। তোমার খোঁপায় বেলফুলের গোড়ে মালা বা রজনীগন্ধা শুকোতেই থাকবে; তা বোধ হয় দেখবারও অবকাশ হবে না। তখন চারটি খেয়ে শুতে পারলে হয়। সকালে উঠে দোকান-বাজার করে এসে খবরের কাগজটা নিয়ে হয়ত বসলাম, তুমি বললে, সরষের তেল আর হলুদের কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি। বিনা তেল-হলুদে তরকারী খাওয়া যায় কিনা ভাবতে ভাবতে আমি দৌড়লাম। ফিরে এসে ত আর সময় নেই। তার পর তুমি এক জগতে, আমি আর এক জগতে।"

অমিতা চুপ করে থাকে। এমনি করে ওদের কোন কোন মিলন-গোধূলির কাব্যিক পরিবেশে সাংসারিক গদ্যের লগুড়াঘাত হয়। ওরা আরও সচেতন হয়ে ওঠে। অমিতা চায় বাস্তব সমাধানই খুঁজতে। একটা ঘাসের ডগা দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভাবতে থাকে।

"কিন্তু আমিও ত বসে থাকব না। লেখাপড়া যখন শিখেছি, তখন আমিও রোজগার করব। আর তা ছাড়া আমরা আলাদা না থেকে তোমাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেও ত থাকতে পারি। তাতে খরচটাও অনেক কম হবে।"

"খুব ভাল কথা। মানলাম, তুমিও রোজগার করবে। কিন্তু একটা বড় পরিবারের খরচের তুলনায় আমাদের আয় কতটুকু। সেই একই অভাব অনটনের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। বরং কয়েকবছর বাদে পোষ্যবৃদ্ধি হলে অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। কি লাভ এতে। উন্নতিই যদি কিছু না হ'ল, সমাজে চিরটা কাল সেই একই ভাবে যদি কাটাতে হ'ল, তবে কেন এই কষ্ট করে লেখাপড়া শেখা। আর কেনই বা উচ্চাশা পোষণ করা।"

"আচ্ছা, দেখই না আর কিছু দিন। এর চেয়ে ভাল চাকরিও ত পেতে পার। না হয়, ততদিন অপেক্ষাই করব। তাড়াতাড়ির কি আছে। জীবনে দুঃখের পর সুখ ত আসেই।"

আবার অমিতার স্বর ভারী হয়ে আসে। আবার কল্পনায় রঙীন পরিবেশ গড়ে ওঠে :···

সেদিন দুপুরে আপিস থেকে বাড়ী ফিরে সুধন্য দেখল, অমিতা ওর জন্য অপেক্ষা করছে। পরের দিন রবিবার, অমিতার ছোট ভাইয়ের জন্মদিন। ওর মা অনেক করে বলে দিয়েছেন সুধন্যকে যেতে। সুধন্য মৃদু হেসে সম্মতি জানিয়ে জামাটা খুলতে লাগল।

"এই চিঠিটা বোধ হয় তোমার।"

টেবিল থেকে একখানা খাম তুলে নিয়ে অমিতা সুধন্যর হাতে দিল। খামটাকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে সুধন্য সেটাকে খুলে ফেলল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একখানা পোষ্টকার্ড সাইজ ফটোগ্রাফ। সেটা দেখতে দেখতে সুধন্যর ভ্রূদুটো কুঁচকে গেল। তার পর আস্তে আস্তে ছবিখানা খামের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল।

"কার ছবি দেখি না।"

কৌতূহলী অমিতা সুধন্যর হাত থেকে খামটা নিয়ে ছবিটা বার করল। একটি তরুণী, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল আদুরে আদুরে মুখটা, চোখদুটো গভীর কালো—সব মিশিয়ে বেশ স্নিগ্ধ মুখশ্রী। অমিতা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। একটু পরে হেসে উঠে বলল, "ও, বুঝেছি।"

সুধন্য জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। সেই দিকে তাকিয়েই গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "না বোঝ নি।"

অমিতা এবার খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "খুব বুঝেছি। আগেকার রাজকুমার যৌবনে পা দিলে, ভাটের মুখে শুনতেন রাজকুমারীর রূপবর্ণনা ; এখনকার রাজকুমার চাকরিতে প্রবেশ করে, ফটোগ্রাফের মারফত করেন এ যুগের রাজকন্যার রূপদর্শন। তার পর পছন্দ হলে করেন পাণিগ্রহণ। কেমন, এই ত?"

"অমিতা, দোহাই তোমার। চুপ কর।" সুধন্যর ক্ষুব্ধ স্বরে অমিতা চমকে উঠে দেখল, সুধন্য সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে :···

কিছুক্ষণ পর দু'জনেই রাস্তায় বেরিয়ে এল। উভয়েই গম্ভীর।

"কোন দিকে যাবে?" সুধন্য জিজ্ঞেস করল। অমিতা কোন উত্তর দিল না। হাঁটতেই লাগল।

"আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। চল, সোজা একটু বেড়িয়ে আসি।"

অমিতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"অমিতা"—

অমিতা সুধন্যর দিকে তাকাল।

"তুমি কি রাগ করেছ।"

"না, রাগ করব কেন?" বিষণ্ণ হাসি হেসে অমিতা বলল।

"আমি তখন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। তাই ঠিক করে কিছু বলতে পারি নি। এখন বলছি, শোন।"

"নাই বা বললে। যদি কিছু অপ্রিয় বা অন্যকিছু হয়, তবে থাক না"—শান্ত কণ্ঠস্বর অমিতার।

"না, শোন।" সুধন্য বেশ দৃঢ়ভাবেই বলল, "ছোটবেলা থেকেই আমার সখ, বিলেতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে আসব, তা তোমায় বলেছি। আমার মনোবাসনা চাপা ছিল না। মা-মাসীর মুখে অনেকের কানেই তা পৌঁছেছিল। ছোটবেলায় এ নিয়ে অনেকে আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করেছে। সীতা, মানে ঐ মেয়েটির বাবা মণিবাবু ছিলেন আমাদের গ্রামের একজন নামকরা বড়লোক। সীতা তাঁর একমাত্র মেয়ে। ওঁরা বেশীর ভাগ শহরেই থাকতেন। মাঝে মাঝে গ্রামে এলে আমাদের খোঁজখবর নিতেন। কেন জানি না, ছেলেবেলা থেকেই তিনি আমার সম্পর্কে একটু 'ইন্‌টারেষ্টেড' ছিলেন। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁরও কানে গিয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আর পাঁচ জনের মত তিনিও শুনেছিলেন, আমি পরীক্ষায় খুব ভাল করব। সেই সময়ে তিনি প্রস্তাব করে পাঠান, যে, তিনি আমাকে বিলেতে পাঠাতে প্রস্তুত আছেন, যদি আমি তাঁর মেয়েটিকে গ্রহণ করি। অবশ্য সে প্রস্তাব আমাদের বাড়ীতে তেমন আমল পায় নি। আমাদের অবস্থাও তখন ভাল ছিল। তার পর ত জানই, কলকাতায় আসার পর থেকে, কি গণ্ডগোল হয়ে গেল। কে কোথায় ছিটকে পড়ল। অনেক দিন পর উনি আবার খোঁজখবর করে মায়ের কাছে পুরনো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তারই নিদর্শন ঐ ছবিটা।"

"তুমি সীতাকে এর আগে দেখ নি?" অমিতা ধীরে ধীরে বলল।

"ছোটবেলায় দু'একবার দেখেছি।" সুধন্য এবার একটু হাল্কা ভাবেই বলল।

"তা এ ত খুব ভাল প্রস্তাব। বিয়েটা কি বিলেত যাবার

আগে হবে, না বিলেত থেকে ঘুরে এসে হবে?" অমিতা কপট গাম্ভীর্যে জিজ্ঞেস করে।

সুধন্ব সেই ভাবেই জবাব দেয়, "না ভাবছি সামনের মাসেই একটা ভাল দিন দেখে বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর সীতাকে নিয়ে পরের মেলেই জাহাজে উঠব।"

এবারে দু'জনেই হেসে উঠল, একটু পরে অমিতা বলল,

"আচ্ছা, তখন ও রকম চটে উঠলে কেন?"

"চটে উঠলাম? কখন?"

"তখন, বাড়ীতে বসে।"

সুধন্ব একটু চুপ করে থেকে বলল, "কি জান, সেটা ঠিক রাগ নয়। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে, বেকার-জীবনের হতাশায় মাঝে মাঝে ভাবতাম, সীতার বাবার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আজ হয়ত পথে পথে ঘুরতে হ'ত না। ক্যারাডে হাউসে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং-এর ক্লাসে পাঠ নিতাম। তাই অনেক দিন বাদে হঠাৎ যখন ঐ ছবিটা এল তখন কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম।"

"ও!"

"চল, এবার ফেরা যাক।"

"চল," অমিতার গলাটা কি রকম ধরা-ধরা। সুধন্ব ওর দিকে তাকাতেই ও হঠাৎ সুধন্বর হাতটা জড়িয়ে ধরে ভারী গলায় বললে, "আচ্ছা, তোমার খুব বিলেত যেতে ইচ্ছে করে, না।"

সুধন্ব ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, "ছি অমিতা।"

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় দু'জনে অমিতাদের বাড়ীর ছাদে বসেছিল। একথা সেকথার মাঝে হঠাৎ অমিতা প্রশ্ন করে বসল, "কালকের চিঠিটা সম্পর্কে কি ঠিক করলে?"

"তার মানে?" সুধন্ব অবাক হয়ে বলল, "তার আবার ঠিক করাকরির কি আছে।"

অমিতা অনুনয় করে বলতে লাগল, "দেখ, সীতার বাবার সাহায্যে তোমার বিলেত যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মাঝখানে আমি এসে পড়েছি বলেই কি তোমার জীবনের এত বড় স্বপ্ন ভেঙে যাবে! তোমার জীবনে কল্যাণী হয়ে দেখা দেবার এই কি পরিণতি!"

সুধন্ব চঞ্চল হয়ে জবাব দিল, "অমিতা, তুমি ভুল করছ। তুমি আসবার আগে সীতার বাবার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতাম কিনা, সে কথা এখন বলা যায় না। কারণ সে পরিবেশ আজ আর নেই। হয়ত নিতাম না; ভাবতাম, পরের সাহায্যে বড় না হয়ে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী যতটুকু পারি করব। কিংবা হয়ত ভাবতাম, এসব সেন্টিমেন্টালিটি এ যুগে অচল। পরের মেয়েকে যখন একান্ত আপনার করে নিতে পারব, তার বাপ-মা-আত্মীয়দের যখন স্বজন করে নিতে পারব, তখন তার বাবার টাকাকেই বা পরের টাকা মনে করব কেন? কিন্তু আজ আর ত এ সব প্রশ্নই উঠে না।"

"কেন উঠে না? বাধাটা কোথায়?"

"বাধা কোথায়?" অধীর হয়ে সুধন্ব জবাব দিল, "বাধা তুমি! তোমাকে পাশে নিয়েই আমি আমার জীবনকে একটু একটু করে বিকশিত করে তুলব। সেখানে আর কারও স্থান নেই।"

"কিন্তু আমি তোমার জীবনের উন্নতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব!" আহত অমিতা জবাব দিল, "তার চেয়ে আমার সরে যাওয়াই ভাল।" বলতে বলতে অমিতার গলা ধরে এল।

"তুমি ভুল বুঝ না, অমিতা।" সুধন্ব আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, মোহ আছে, কামনা-বাসনা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু আমি মানুষ বলেই ত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছি, জয়ী হবার চেষ্টা করছি। জীবনে একদিন যার হাতে রাখী বাঁধলাম, নিজের স্বার্থের খাতিরে সে বাঁধন নিজেই কাটব—তুমি কি চাও এতটা ছোট আমি হই।"

বলেই পকেট থেকে সীতার ছবিটা বার করে বলল, "এই ছবিটা তোমার আমার সম্পর্কের মাঝে এত বড় বাধা হয়ে দেখা দেবে, ভাবি নি।" বলেই ছবিটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। অমিতা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সুধন্বও সে নীরবতা ভঙ্গ করল না। অনেকক্ষণ পর কালো আকাশ যখন তারায় ভরে গেছে, তখন সুধন্ব উঠে দাঁড়াল। তারপর, 'আজ চলি' বলে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, অবশ্য "তুমি যদি নিজে থেকে কোন দিন সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাও, আমি তাতে বাধা দেব না।" বলেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ওর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে অভিমান-স্ফুরিতা অমিতার কালো আঁখির প্রান্তে ঘনিয়ে এল সজল ছায়া। আর তার সাক্ষী হয়ে রইল তারায় ভরা কালো আকাশ।

এর পর সপ্তাহ-দেড়েক আর অমিতার সঙ্গে সুধন্বর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।

অমিতার টেষ্ট পরীক্ষা হচ্ছিল। পরীক্ষার পর আবার দু'জনের দেখা হ'ল, টালা-পার্কের সেই কোণ ঘেঁষে জলের ধারে দু'জনে বসে। আজকে দু'জনের কথাবার্তাই একটু কম। কথার মাঝে একটা ছেদ পড়েছিল। দু'জনেই জলের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। একটু পরে অমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা, আমি যদি কোন দিন সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাই, আমাকে মনে রাখবে?"

সুধন্ব খুব শান্ত ভাবে জবাব দিল, "মনে রাখবার মালিক ত আমি নই। স্মৃতি আর বিস্মৃতি আমাদের অগোচরেই তাদের কাজ করে চলে।"

অমিতা বলল, "জানত, কবি কি বলেছেন,···

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে গভীর কণ্ঠে সুধন্ব বলল "জীবনের কাব্য সব সময়ে জীবনায়ন হয়ে উঠে না, অমিতা।"

"কিন্তু কোন কোন সময়ে ত হয়ে উঠে। তখন?"

"যদি কোনদিন তেমন সময় আসে, জবাব দেব। যাক, তুমি বাড়ী যাচ্ছ কবে?"

"পরশু যাচ্ছি।"

"আর দু'মাস পরেই ত পরীক্ষা। ভাল করে পড়, এখন আর

সময়ে অসময়ে গিয়ে বিরক্ত করব না। মাঝে মাঝে দেখা করব। কেমন!"

অমিতা ওর মুখের দিকে তাকালে, মিষ্টি হাসি হেসে অল্প একটু ঘাড়টা নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

কিন্তু ছবিটা সুধন্য ছিঁড়ে ফেলে দিলেও প্রস্তাবটা কিন্তু বাড়ী থেকে নাকচ করে দেওয়া হয় নি: অবশ্য সুধন্যকে এখনও খোলাখুলি কেউ কিছু বলে নি। তবে সুধন্যর আপত্তির আঁচ পেয়েছিল। মাসখানেক ধরে সীতার বাবা মণিবাবু আনাগোনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুধন্যর মা ওর কাছে খোলাখুলি কথাটা পাড়লেন। সুধন্য আপত্তি করতে পারে ভেবে মণিবাবু জানিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে টাকা নিতে সুধন্যর আপত্তি থাকলে, তিনি টাকাটা ধার হিসেবে দিতে পারেন। সুধন্য না হয় পরে শোধ করে দেবে। তিনি পাসপোর্ট, কলেজে সীট পাওয়া ইত্যাদির বন্দোবস্ত এক রকম করেই রেখেছেন। বিয়ে ফিরে এসেই হবে। এখন সুধন্য কথা দিলেই হয়। অবশ্য সুধন্যর যদি অন্য কিছু আপত্তি থাকে, তা হলে তিনি আর বিরক্ত করবেন না।

না, এবার খোলাখুলি সব বলতেই হয় দেখছি—আপিস যাবার আগে সুধন্য ভাবল। অনেক দিন আগে যখন তার মনের পটে কোন রঙীন ছায়াপাতই হয় নি, তখন সীতাকে তার স্ত্রীরূপে কল্পনা করতে কোন বাধাই ছিল না, বরং কেমন একটা অনাস্বাদিত পুলকই অনুভব করত, কিন্তু আজ আর তা হয় না। যাক, কাল রবিবার অমিতাদের বাড়ী যাওয়া যাবে। প্রায় মাসদেড়েক হ'ল ওদের বাড়ী যাওয়া হয় নি। ওর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। তারপর পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়াই ভাল।

আপিস থেকে ফিরে টেবিলের উপর কলম, পাস ইত্যাদি রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল তার নামে একখানা চিঠি। হলদে রঙের খাম, এক কোণে লেখা, 'শুভবিবাহ'। কার বিয়ে! খামটা খুলে চিঠিখানা পড়ল ধীরে ধীরে। কে লিখছে? কার বিয়ে! বুঝতে পারল না ও। আবার পড়তে গিয়ে দেখল, এক জায়গায় লেখা—সহিত শ্রীমতী অমিতার শুভপরিণয়—।" হোঁচট খেল যেন। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল চিঠিটার দিকে। অমিতা! অমিতার বিয়ে! ভুল দেখছে না ত? না, তলায় এই ত অমিতার হাতের লেখা। চিঠিটার কোণায় গোটা গোটা অক্ষরে কয়েকটা কথা লেখা ছিল। সুধন্য পড়ল,

"তোমার কথা বুঝেছি। আমার কথা বোঝবার চেষ্টা করো। জীবনায়ন হতেই চেয়েছিলাম; জীবনের বোঝা নয়। যাচ্ছি।"

এখনও

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

এখনো চাঁদের আলোকে মাধুরী ঝরে,
তারার হাসিতে অপূর্ব্ব বিস্ময়।
রাঙা রামধনু জাগে নীল অম্বরে—
নিখিল-কণ্ঠে উঠে জীবনের জয়।

সূর্য্যের লিপি ছড়ায় দিগ্‌দিকে,
শেফালির বনে মৌমাছি উড়ে যায়।
প্রতিদিনকার পরিচিত পৃথিবীকে
সহসা নেহারি নবতর সজ্জায়।

এখনো বকুল-বিতানে কোকিল ডাকে
উন্মনা করে সুরের ইন্দ্রজাল।
দিলাই পেরিয়ে পাকুড়তলীর বাঁকে
শুনি আগ্রহে রাখালিয়া ভাটিয়াল।

এখনও নয়নে দীপ্তি সমুজ্জ্বল,
অন্তরে সদা-সঞ্চিত ভালবাসা।
দুর্ব্বার ঝড়ে বক্ষ বিন্ধ্যাচল,
সবার ঊর্দ্ধে জাগে দুরন্ত আশা।

হে মেঘ-কন্যা, এখনো তোমায় ভরে,
প্রজাপতি নাচে, ফুল ফুটে থরে থরে।

সাহিত্য-সভা ও একটি বিনিদ্র রজনী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সমস্তিপুরে চলেছি।

জায়গাটা মিথিলা-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। আকার-অবয়বে গ্রাম-তুল্য হয়েও শহরের পোশাকটা গায়ে চাপিয়েছে ভাল করে। পীচ-বাঁধানো পাকা রাস্তা, বিজলী-বাতি, স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্ক-আদালত, মোটর-সিনেমা কিছুরই অভাব নাই। আরও একটা বড় অভাব মোচন করেছেন প্রবাসী বাঙালীরা—সাহিত্য-পরিষদ স্থাপনা করে। এই পরিষদের বাৎসরিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে আমরা চলেছি মিথিলায়।

মিথিলার নাম স্মরণ হতেই কবি বিদ্যাপতি এসে দাঁড়ালেন সামনে।

'কৈশোর যৌবন দুহু মিলি গেলা।'

দূর অতীতের এমনই এক সন্ধিক্ষণে মিথিলার সঙ্গে বাংলার মিলন ঘটেছিল। তখনকার বিদগ্ধ-সভা পরস্পরকে না পেলে গৌরবান্বিত হ'ত না। মিথিলার উপাধি আহরণ করে বাংলার সুধী হতেন পণ্ডিত শিরোমণি। শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে লীলারস আস্বাদন ও বিতরণ করেন—তার মূলে ছিল বিদ্যাপতি-রচিত শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-গীতি-কাব্য। রামায়ণ-কারও আমাদের কম যুক্ত করেন নি মিথিলার সঙ্গে। রাজর্ষি জনক ত পৃথিবীতে অতুলন। আর জনক-দুহিতা সীতা?

বহিঃপ্রকৃতিতেও বাংলা মিথিলা প্রায় অভেদ। হাওড়া থেকে সমস্তিপুরের দূরত্ব কতটুকুই বা। তিন শত মাইলের কিছু বেশী; কিন্তু এক নদী এক শত ক্রোশের ধাক্কা। এ পারে মোকামা ঘাট, ওপারে সিমারিয়া ঘাট, মাঝখানে গঙ্গা। প্রশস্ত গঙ্গা, এক পারে দাঁড়ালে অন্ত পারকে মসীলেখার মত বোধ হয়। মাঝখানে বালির চর—ইন্দ্রলুপ্তির মত তার বিভীষিকাটাও কম নয়। এই গঙ্গা পারা-পারের জন্ত ষ্টীমার রয়েছে। এখন গ্রীষ্মকাল বলে—রেল ষ্টেশন থেকে ষ্টীমারঘাট সরে গেছে দু'মাইল দূরে। ঘাট ষ্টেশন থেকে বেশ কিছুটা পায়ে হেঁটে সটল ট্রেনে উঠতে হয়। সেটা দশ মিনিট কাল ধুকতে ধুকতে যেখানে নামিয়ে দেয়, সেখান থেকে ষ্টীমার আবও পোয়াটাক পথ। তারপর ষ্টীমার আরোহণ। যাত্রীর ভিড়ে ঠেলা খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যাওয়া শুধু। বিপদের ঝুঁকি খানিকটা নিতে হয় বৈ কি। মানুষের চাপে জখম না হলেও মানুষের মাথায় চাপানো বাক্স তোরঙ্গ সুটকেসের ধাক্কায় বেসামাল হওয়া আশ্চর্য্যের নয়। তার আগে সটল ট্রেনের সব-একাকার-করা কামরায় মানে মানুষে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে যথেষ্ট। ফলে 'দেহে নাহি অন্তরলেখা' এমন গৌরব করবেন কে!

যা হোক ষ্টীমারে এসে হাত পা ছড়িয়ে বাঁচা গেল। চারিদিকে খোলা-মেলা আকাশ, বীচি-বিক্ষুব্ধ অগাধ জল—দু'পারে ছবির মত মাঠ, বসতি—এত যে দুর্ভোগ এক মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে গেল। উত্তর-দক্ষিণ দুই বিহারকে যুক্ত করার জন্ত মাইলখানেক দূরে হাতীদার চলছে ময়দানবের অহোরাত্রব্যাপী কর্মযজ্ঞ। নদীর দু' পাশে রুদ্রজায়ার রোষবহ্নির চিহ্ন, কিন্তু হাতীদার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—কত দিন আর চপলাক্ষী গঙ্গা মানুষকে ভূমিক্ষয়ের ভ্রূকুটি দেখাবেন? হাতীদার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মানুষ ভবিষ্যতের মনোরম ছবি আঁকছে।

এপারেও অর্থাৎ সিমারিয়া ঘাটে পৌঁছে খানিকটা হাঁটতে হয়, তারপর ট্রেন। কিন্তু এত লোক কোথায় যাচ্ছে? কোথাও কি মেলা বসেছে?

মেলাই বটে, বিয়ের লগ্ন চলছে। সারা মাস চলবে সমারোহ। গ্রামকে গ্রাম চলেছে 'বরাতে'র বায়নায়। আর সঙ্গে লটবহরের ধূমই বা কি! বোঁচকা-বুচকি ট্রাঙ্ক সুটকেশ হাসাক আলো মাইক লাউড-স্পীকার গ্রামোফোন রেকর্ড খাবার ভর্তি চাঙ্গারি বন্দুক—কিনা সঙ্গে রয়েছে! এ সব ঠেলে চুলে কোন মতে ছোট লাইনের গাড়ীতে বসা গেল। এ লাইনে শ্রেণী মান্ত করার রীতি নাই, যাত্রী দল ভারী দেখে রেল-কর্তৃপক্ষও অত্যন্ত উদার হয়েছেন বোধ হ'ল।

দু'ধারে রুক্ষ মাঠ, অল্প হাওয়ায় ধুলোর কুয়াশা জমছে দিগন্তে। ছোট-খাটো দু'একটা ষ্টেশন যা পড়ল তা মরুভূমিরই গোত্রজ। এরই মধ্যে বারুণি জংশনের যা একটু জাঁকজমক। চা খাবার ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সমস্তিপুর ষ্টেশনটার কিন্তু বিরাট চেহারা। ষ্টেশন দেখে যদি শহরটাকে আন্দাজ করে বসেন—অবশ্যই ভুল করবেন। নিতান্ত কালিমত একটু জায়গা—শহরের যাবতীয় উপকরণে ঠাসা। পশ্চিমের যে-কোন শহরের মত ধুলো-ভরা নোংরা পথঘাট, ধুলোর মাঝখানে খাবার সাজানো, মাছির জটলা খাদ্যবস্তুর উপর, রাস্তার মাঝখানে পাল্লা খাটিয়ে মাল ওজনের ব্যবস্থা। বালুভুজি মোমফালি আর কটকটিয়া কাঠি ভাজা নিয়ে ময়লা কাপড়-পরা ফিরিওয়ালা ঘুরছে, কারও মাথায় বা কাঁকড়ীর ঝুড়ি। সিনেমা-পোষ্টার সর্বাঙ্গে সেঁটে—ঢোল পিটিয়ে চলেছে একটা মিছিল। ঠেলাগাড়ীতে হরেক-রকমের চোখ-ভোলানো পণ্য সাজিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ক্রেতা টানছে দোকানী…

শহর যাই হোক, শহরবাসীদের সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ। আমরা ত সামান্ত সাহিত্য-সেবক—আমাদের পেয়ে কি আনন্দ এঁদের। এঁরা সাহিত্যকে বিলাসের বস্তু বলে গ্রহণ করেন নি—প্রাণের জিনিস বলে নিয়েছেন।

বাঙালীর একটা বড় সংখ্যাই চোখে পড়ল। স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, রেল, ইনসিওরেন্স, আদালত প্রভৃতি নানান প্রতিষ্ঠানের বাঙালী কর্মীরা এক জায়গায় মিলে থাকেন মাঝে মাঝে। এই মিলন-আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয় শারদীয়ায়। সেটা সাময়িক মিলন

পর্ব। আর প্রতিদিনের কর্মক্লান্ত মুহূর্তকে সরস করে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিলন সমিতি। বাণী-সাধনার জন্য সাহিত্য-পরিষদ। পরিষদের বয়স মাত্র আট বছর। এই অল্প বয়সে সে শুধু চলতে শেখে নি—চালাতেও শিখেছে। নিজেকে নিয়ে অপরকে সাথী করে—নিজেকে বিলিয়ে অন্যকে বুকে টেনে তার জীবন যাত্রার আয়োজন। নববর্ষে ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য-সভার সুযোগে পরস্পরের এই মিলন—স্থায়ী মিলনের ভূমিকা রচনা করছে—এর প্রমাণ সাহিত্য-সভায় পেলাম।

অপরাহ্ণে মুজঃফরপুর থেকে এলেন ড. সরোজ দাস, ইনি সভাপতিত্ব করবেন। দারভাঙ্গা থেকে এলেন বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এলেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ্ কয়েকজন আর শহরের নবীন প্রবীণ সমস্ত প্রবাসী বাঙালী।

সভায় মহিলা ও শিশুর সংখ্যাও কম নয়। আজকার সভায় নাচ গানের ব্যবস্থা নাই, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার হিড়িক নাই, কোন কৌতুকাভিনয় হবে না, তবু সভাগৃহে তিলধারণের স্থান নাই।

সামনে ছেলেদের ভিড় দেখে মনে সংশয় জাগল—এরা শান্ত থাকবে তো? সভাপর্বের সর্বত্রই পুরোভাগে এদের আসন, এরা স্বভাবতঃই চঞ্চল। নিজ মনের আহার্য্য না পেয়ে গোলমাল এরা করেই এবং বক্তৃতার কিছুমাত্র না বুঝেও সজোরে করতালিধ্বনি দ্বারা বক্তাকে সংবর্দ্ধিত করে। এই হাততালি দেওয়ার কৌতুকেই হয়ত সভারোহণে এত উৎসাহী এরা?

এদের জন্য কিছু আয়োজন অবশ্য ছিল। সেটি ছিল সভা-শেষে। কিছুদিন আগে আবৃত্তি ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রয়েছে। ছোট ছোট কাপ ও সাহিত্য-গুণান্বিত বই। যাঁরা প্রতিযোগিতায় স্থানলাভ করতে পারে নি তাদেরও সান্ত্বনা-পুরস্কারস্বরূপ একখানি করে শিশুগ্রন্থ দেবার ব্যবস্থাটি ভারি ভাল লাগল। নববর্ষের আনন্দ আয়োজন সকলকার খুশির ছটায় সার্থক হয়ে উঠেছে মনে হ'ল।

কিন্তু তার আগে বক্তৃতা। সেগুলির বিষয়বস্তু শিশু-চিত্তগ্রাহী নয়। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা নিয়ে আলোচনা করলেন। দারভাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক গোস্বামী নববর্ষ সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক সহযোগে কিছু বললেন, ড. সরোজ দাস নিরবধি কাল সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যা করলেন সংক্ষেপে, আমাদের বক্তব্যও হাসি-কৌতুকের ধার ঘেঁষল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও তাদের মা ঠাকুরমারা অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে নিঃশব্দে এই সমস্ত গ্রহণ করল।

বাংলা সাহিত্য-সাধনার মর্মকথাটি যেন নিষ্ঠার সঙ্গে অনায়াসে ব্যক্ত হ'ল। এমন শৃঙ্খলা-বোধ ইতিপূর্বে কোন সভাতে লক্ষ্য করি নি।

সাতটায় আরম্ভ হয়েছিল সভা—শেষ হ'ল সাড়ে দশটায়।

বন্ধুবর বিভূতি মুখোপাধ্যায় বললেন, আহারাদি সেরে আমরা দারভাঙ্গায় ফিরব। আপনারা দু'জন সঙ্গে যাবেন।

এই রাত্তে?

তাতে কি! পীচবাঁধানো ভাল রাস্তা—চব্বিশ মাইল মাত্র। মোটরে বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক।

শুক্লা ত্রয়োদশীর একটি প্রসন্ন রাত। জ্যোৎস্নার জোয়ারে লঘু মেঘের টুকরা ভাসছে আকাশে। পৃথিবীতে তার প্লাবন-ধারা। দূরে—থেকে থেকে একটি কোকিল ডেকে উঠছে। এমন 'নাথ উদয় কর চন্দা' রাত্রিতে মনে হয় 'চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।' মিথিলার আকাশ-প্রান্তর ওই পরিপূর্ণ আনন্দ-সঙ্কেতে মধুময় হয়ে উঠল।

দুখানা মোটর এসেছিল দারভাঙ্গা থেকে। একখানা ছিল জীপ গাড়ী—সেখানায় মেয়েরা চাপবেন। অন্যখানাতে আমাদের বাড়তি দু'জনকে নিয়ে ছ'জন। তা ঠাসাঠাসি করে গেলে কি এমন অসুবিধা! কিন্তু প্রথম অসুবিধা সৃষ্টি করল জীপখানাই।

আহারাদি শেষ হতে রাত একটা বাজল। মেয়েরা গুছিয়ে বসলেন জীপে। আমরাও বসলাম অন্য গাড়ীতে। একটু পরে মেয়েরা নেমে এলেন। জীপের মেজাজ বিগড়েছে। এত রাত্তে পাড়ি দেওয়াতে ওর ঘোরতর আপত্তি দেখা গেল। বহু সাধ্য-সাধনাতেও যখন ওকে বশে আনা গেল না—তখন ঠিক হ'ল—রাত সাড়ে তিনটের ট্রেনে মেয়েরা ফিরবেন দারভাঙ্গায়—আমরা অবশ্য অগ্রগামী হব।

কিন্তু হায়, এক যাত্রায় পৃথক ফলের কল্পনা বিধাতাও যে করেন নি—সে বুঝবে কে!

ভরা জ্যোৎস্নার জোয়ারে পা ভাসাল মোটর। শহর শেষ হ'ল, দু'ধারে মাঠ প্রান্তর এগিয়ে এল। এগিয়ে এল গণ্ডকী নদীর সেতু। মাথার উপর চাঁদ এগোচ্ছে তর তর করে। নিস্তব্ধ পথ—সেও যেন এগিয়ে চলেছে—কৌতুক ভরে। মাইল তিনেক এসে হঠাৎ মোটর থামাল সারথি। ওর মনেও কৌতুকের আমেজ ঘনিয়ে উঠল কি?

বলল, গাড়ী বড্ড বোঝাই হয়েছে—পিছনের চাকা মাটিতে ঠেকছে। একটা স্প্রিং খারাপ হয়েছিল আসবার সময়—সেইটেই—

অর্থাৎ সময় বুঝে সেইটির কৌতুকস্পৃহা প্রবল হয়েছে।

উপায়?

একজন নামলেই চাকার চাপটা কমবে—গাড়ী ঠিক চলবে।

কিন্তু কে সেই একজন—রাত দুপুরে জনহীন পথে যিনি পরি-ত্যক্ত হবেন?

বিভূতিবাবুর ভাই হরিবাবু নেমে পড়লেন। বললেন, কাছেই মুক্তাপুর ষ্টেশন—শেষ রাতের ট্রেনেই ফিরব।

গাড়ীর কৌতুকস্পৃহা তবু কমল না।

দশ হাত এগোতে না এগোতে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হ'ল।

ব্যাপার কি?

আরও ভার কমান দরকার।

অর্থাৎ?

আর জন দুই নামলেই গাড়ী ঠিক যাবে।

দু'জন আরোহীর মধ্যে একজন ত নেমেছেন। আর দু'জন, কে নামবেন? অধ্যাপক গোস্বামীর সঙ্গে একটি মেয়ে আছেন—ওঁরা দু'জন নামতে পারেন না। আমরা দু'জন অতিথি—বিদেশী—আমাদের নামার প্রশ্নই ওঠে না। বিভূতিবাবু আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আরও কিছুদূর গিয়ে যদি গাড়ির কৌতুকরঙ্গ আবার প্রবল হয়ে ওঠে—তখন নিশুতি রাতে জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্তের অবস্থাটি কল্পনা করতে পারেন কি কেউ?

হরিবাবু ফিরে এসে বললেন, কি ব্যাপার?

আরও দু'জন না নামলে নাকি ভার কমবে না।

জুলে ভার্ণের সেই বেলুন যাত্রার বর্ণনাটা স্মরণ হ'ল। ভার কমানোর সে কি ভয়াবহ আয়োজন!

বিভূতিবাবু বললেন, গাড়িখানা কোন রকমে সমস্তিপুরে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

স্প্রিঙের ওপর চাপ পড়ছে বহুৎ—বহু টাকা লোকসান হবে। বলে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল চালক।

অগত্যা আমরাও নামলাম।

মাথার উপরে নির্মেঘ আকাশ, মনে হ'ল নির্মমও। পাতলা মেঘের চাদর উড়িয়ে চাঁদ ছুটেছে হাল্কা চালে—সেই চাদর থেকে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্নার বৃষ্টি। মাঠ—ঘাট—গাছপালা সব ভেসে যাচ্ছে। আমরাও ভেসে চলেছি সেই সঙ্গে। কোথায় তীর, কোথায় আশ্রয়, কি উপায় কিছুই ঠিক করা যাচ্ছে না। হাওয়াটাও ঘুরেছে উত্তরে—পাতলা জামার আস্তরণ ভেদ করে গায়ে চিমটি কাটছে তার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অঙ্গুল দিয়ে। অনবরত চিমটি কেটেই চলেছে সে।

কোন উপায় নাই দুস্তর পথ উত্তরণের। সারথি নিশ্চিন্ত মনে একটি চালা ঘরের দাওয়ায় বসে বিড়ি ধরাল। বিড়ির আগুন নিভলে সটান শুয়ে পড়ল। যাত্রীদের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত আলস্যে গা এলিয়ে দেয় গাড়োয়ান—ওর অবস্থাটাও সেই রকম।

আমরা পায়চারি করতে লাগলাম। খানিক পথে—খানিক বা প্লাটফরমে। তারপর ষ্টেশন-ঘরে গিয়ে বসলাম। খটাখট—খটাখট—খবর আনাগোনার আওয়াজ বাজছে যন্ত্রে। মাঝে মাঝে চোঙটা তুলে নিয়ে ষ্টেশন মাষ্টার ট্রেনের গতিবিধি নিরূপণ করছে। একটি মালগাড়ী লাইন ক্লিয়ার নিয়ে ষ্টেশন পেরিয়ে গেল। দ্বারভাঙ্গার দিক থেকেও একখানা গাড়ী এল।

ওটা নাকি এক্সপ্রেস—থামবে না এখানে। ব্রাঞ্চ লাইনে এক্সপ্রেস। দিনের বেলায় এ লাইনে প্রত্যেকটি গাড়ী তো প্রত্যেকটি ষ্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—রাতের বেলায় এমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হওয়ার হেতু? অদৃষ্ট আমাদের।

তিনটে বাজল। মাষ্টার বললেন, তিনটে চল্লিশে গাড়ী আসে, আজ কুড়ি মিনিট লেট। অর্থাৎ, পুরো চারটের রাত পুইয়ে যাত্রা।

গাড়ীতে কি ভিড় হয়?

যথেষ্ট। এখন যে বিয়ের বাজার। ট্রেনে উঠতে পারেন ত পরম সৌভাগ্য বলে মানবেন।

পূব প্রান্তে পিঙ্গল রঙ ধরতেই ট্রেন এসে গেল। লম্বা গাড়ি, আকণ্ঠ বোঝাই। যেন বলছে, হটো—তফাৎ যাও।

কিন্তু ওর কথা শুনলে চলবে কেন—আমাদের যে উঠতেই হবে। অনুনয় বিনয়ে কেউ এক ইঞ্চি সরল না। সরবেই বা কোথায়? 'বরাতে'র নানান দ্রব্যে বাক্স মেঝে উপচে পড়ছে—খোলা দরজায় তেমনি উপচে পড়ছে মানুষ।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। আমরা তখনও ছুটোছুটি করছি গাড়ীতে উঠবার জন্য।

গাড়ী দুলে উঠল—গাড়ী ছাড়ল। আমরা তখনও প্লাটফরমে।

হঠাৎ কি বুদ্ধি জাগল। আমাদের মধ্যে একজন সঙ্গিনী মেয়েটিকে গার্ডের গাড়ীর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল, গার্ড সাহেব মেহেরবানি করে মেয়েটিকে যদি তুলে নেন—

দয়া হ'ল তাঁর। হয়ত তাঁর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হলেন যিনি নিখিল চরাচরের নিয়ন্তা। এতক্ষণে বুঝি তাঁর কৌতুকস্পৃহার উপশম হ'ল। সে রাতে আমরা দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছব না এইটিই হয়ত চেয়েছিলেন তিনি। রাত্রি শেষ হ'ল যদি—ইচ্ছে'র গুরুত্ব আর এক হেতু?

ব্রেক কসল গার্ড। গাড়ী থামল। মেয়েটিকে পুরোভাগে রেখে আমরা উঠে পড়লাম হুড়মুড় করে।

ছোট্ট কামরায় তিলধারণের জায়গা রইল না। গার্ড আতঙ্কে উঠল, এত লোক!

কামুফ্লেজ করা শত্রুপক্ষ যেন হঠাৎ জায়গা দখল করে নিচ্ছে। তখন আর উপায় কি—জায়গা দখলের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—গার্ডকে ঘিরে আমরা ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়েছি। গাড়ী ছাড়ার ছাড়পত্র প্রসবুজ আলোটি যে জানালা দিয়ে দেখাবে সে উপায়ও রাখি নি।

এমনি করে সূর্য্য উঠলে—আমরা পৌঁছলাম দ্বারভাঙ্গায়।

অতঃপর বিভূতিবাবুর সুমধুর আতিথ্যে রাতের ব্যাপারটি অচিরাৎ ভুলেই গেলাম।

ঠিক ভুললাম না, ওটিকে দুঃসাহসিক অভিযানের পর্য্যায়ে উন্নীত করে রীতিমত উপভোগ করতে লাগলাম। বিভূতিবাবুর অস্বস্তি দূর হ'ল না কিন্তু। আমরা যে ওঁর আহ্বানে যাত্রা করে সারা রাত পথে বিনিদ্র কাটালাম এই ব্যথাটুকু কিছুতেই ওঁর মন থেকে দূর হতে চাইছিল না।

আহার এবং বিশ্রাম প্রচুর হ'ল। শহর দেখা হ'ল। রাত্রি ন'টার গাড়ীতে চাপলাম—সমস্তিপুর ফিরব বলে। ফেরবার পথে সেই মুক্তাপুর—সেখানে হঠাৎ গাড়ী থামল। এখানটায় গোলযোগ কিছু আছে নাকি?

না—শিকল টেনে ট্রেন থামিয়েছে বরযাত্রীরা। ওদের দলে পুরো একটি গ্রাম—সত্তর আশী জনের কম হবে না। সেই পরিমাণে সাজসরঞ্জাম। মাত্র পাঁচ-দশ মিনিটে সকলকে গুছিয়ে ট্রেনে তোলা সম্ভবপর কি? সুতরাং টান শিকল। গাড়ী থামল প্রায় এক মাইল এসে। থেমে রইল ততক্ষণই—যতক্ষণ না বরযাত্রী দলের সমস্ত মানুষ আর মাল গাড়ীর কামরাজাত হ'ল।

আশ্চর্য্য, রেল পক্ষ থেকে কেউ তদন্তে এসে শুধোল না কে চেন টানল—কেন টানল? বিনা কারণে শিকল টানলে যে টাকাটা জরিমানা দিতে হয়—সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যেন কারও নাই। সুতরাং গাড়ী এক ঘণ্টা লেট হওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটল না—কোন হাঙ্গামাই পোয়াতে হ'ল না কাউকে। সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রে সাধারণদেরই তো জয় জয়কার।

আসে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাধক জগন্মঙ্গল ব্রতী, ভাবুক শিল্পীদল—
স্বপ্নে ও ধ্যানে গড়ে যে দিব্য ভাবের ভূমণ্ডল,
সমুজ্জ্বল সে ভুবনই যে আসে জীর্ণ জগৎপর,
করিতে তাহারে শুচি সুন্দর, বৃহৎ মহত্তর।
মহামানবেরা আজ যা ভাবেন কাল যে তাহাই হয়,
ভাব যে জমিয়া বস্তু হইতে, সময় একটু লয়।
বাল্মীকির সে রামই আসেন—করুণার নাহি সীমা—
মিশে সত্যের অরুণ আলোকে স্বপনের পূর্ণিমা।

২

মনুষ্যত্বে উচ্চ করিতে গুহা-মানবের স্তর,
দেশ ও জাতির ধ্যানীরে লেগেছে এক কোটি বৎসর।
সূর্য্য গিয়াছে ক্ষয়ে কতখানি—কমেছে তাহার গতি,
গড়িতে একটি 'অমিতাভ' আহা, একটি জগজ্জ্যোতি।
গরুড়ের স্থির শুভ আকাঙ্ক্ষা জমিয়া ক্ষমার পাকে,—
গড়েছে একটি অপাপবিদ্ধ গান্ধী মহাত্মাকে।
করেছে বঙ্গ কত তপস্যা—কোজাগর নিশি সাধ—
কত শরতের পদ্মের ধ্যানে এলো রবীন্দ্রনাথ।

৩

পিপীলিকা তোলে বল্মীক—তাহা অদ্ভুত কিছু নয়,
ক্ষুদ্র সে—তার স্বপ্ন যে গড়ে—সুবিশাল হিমালয়।
টুনটুনি-ক্রোধ অগস্ত্য হয়ে সাগর শোষণ করে,
মন যে তাহার দর্পহারীর—দর্পীরে নাহি ডরে।
পুণ্যের ন্যায় পাপও ফিরে আসে দেখি মাথা হয় হেঁট,
করে নিষ্পাপ যীশুর বিচার এখনো যে 'পাইলেট'।
যুগ চলে যায় প্রতিহিংসার কিছুই কমে না জ্বালা,
[illegible]'র ব্যূহ রচে আজও—রচে নব 'কারবালা'।

৪

ত্যাগীর ধ্যানেতে দধীচি গঠিত—তপস্যা ধরণীর,
পেয়েছে ভীষ্ম সম সংযমী—অর্জ্জুন সম বীর।
হয় যে সমাজ সুসভ্যতর, সূক্ষ্ম শিল্পকলা,
'ছড়া' 'দোঁহা' ভাঙ্গি বাহিরিয়া আসে কবির 'শকুন্তলা'।
কবির স্বপ্ন আজও পাতে নব সাম্রাজ্যের ভিত
জীবকে করিছে উন্নততর—তাঁহাদের সঙ্গীত।
ছোট চাতকের কাকুতিতে ভাঙ্গে সুর-সরিতের বাঁধ,
চকোরের ডাকে আগায়ে আসিছে যুগ যুগ ধরে চাঁদ।

৫

সৃষ্টিকে করে শ্রেষ্ঠতর যে স্থির সংকল্পই,
উৎকর্ষ ত লভে না ভুবন শুই উপাদান বই।
তিলোত্তমারে গড়িয়া তুলিছে রসিক শিল্পীমন,
ভাবই রূপের পরিমণ্ডল বাড়ায় অনুক্ষণ।
ফুরায় বন্ধ্যা শতাব্দী কত—নির্ম্মম বর্ষ
প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে বিরাট আদর্শ।
অশোকের সাধ—ইচ্ছাশক্তি কালে যায় নাই ক্ষয়ে,
নব কলেবরে আবার আসিছে—বিপুল শক্তি লয়ে।

৬

করিতে হয়েছে ব্রত সুকঠিন জাতির গৃহশ্রীকে,
ধরায় আনিতে দেবী ও মানবী সীতা ও সাবিত্রীকে।
মাতৃস্নেহ সাত সাগরেতে ঢেলেছে তাহার গা,
নর-নারায়ণে সন্তান পেতে—হতে গোপালের মা।
ধরি নরতনু প্রেম আসে, আসে অবিনাশী পুণ্য,
বসুধাকে দিতে নবৈশ্বর্য্য—নবীন লাবণ্য।
যিনি সৎ চিৎ পরমানন্দ—নাহি পরিবর্ত্তন
বহু বহু রূপে ভাবগ্রাহী সে—আসেন জনার্দ্দন।
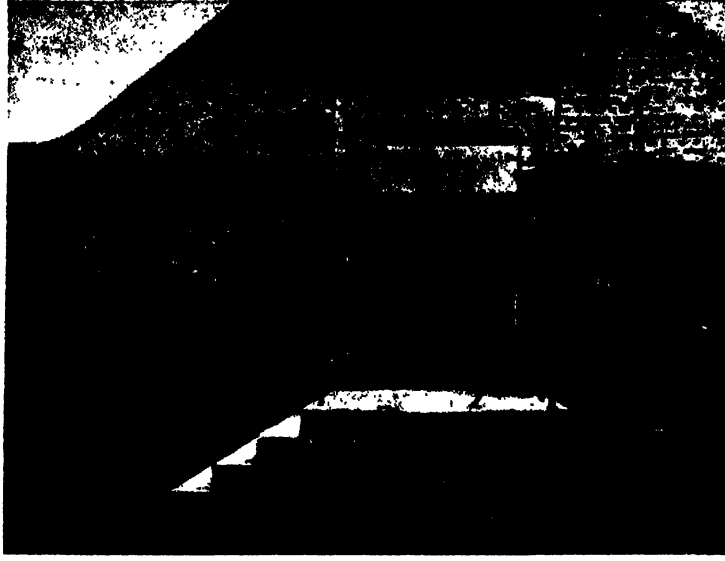
সেলুলার জেলের ফাঁসির ঘর

আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ

শ্রীনিখিল মৈত্র

(দ্বিতীয় পর্ব)

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের কারাজীবন আন্দামানে কঠোরতর করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। আন্দামান পোতাশ্রয়ে খাড়ির মধ্যে ক্ষুদ্র ভাইপার দ্বীপ থেকে প্রধান কারাগার স্থানান্তরিত হয় এই সময়ে—পোর্টব্লেয়ার শহরের কেন্দ্রস্থল এবারডীন বাজারের সন্নিকটে আটালাণ্টা পয়েণ্টে। প্রায় আট শ' স্বতন্ত্র সেলে বিভক্ত তিনতলা সেলুলার জেলের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। ভাইপারের কয়েদীদের ও দেশ থেকে নবাগত কয়েদীদের সেলুলার জেলে রাখা হ'ত। সাধারণতঃ ছয় মাস সেলুলার জেলের সেলে আবদ্ধ থাকার পর, কয়েদীদের বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট কনভিক্ট ষ্টেশনে কাজ করার জন্য পাঠানো হ'ত। প্রথম সাড়ে চার বছর কয়েদীরা এই সমস্ত কেন্দ্রে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করত। কাজের জন্য কোনও পারিশ্রমিক দেবার বিধি প্রচলিত ছিল না! এর পরে আরও পাঁচ বছর এদের শ্রমিক-কয়েদী হিসাবে কাজ করতে হ'ত। তখন বিধি-নিষেধের কঠোরতা বহুল পরিমাণে শিথিল করে দেওয়া হ'ত। যৎসামান্য হাত-খরচাও শ্রমের বিনিময়ে কয়েদীরা উপার্জ্জন করতে পারত। সঞ্চয়ী বন্দীরা সেই অর্থ পোষ্ট-আপিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা করত। উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই অবশ্য সাধারণ বিলাসব্যসনে বা মদ, বিড়িতে ব্যয়িত হ'ত। জুয়াখেলারও রেওয়াজ ছিল। দশ বছর পরে বন্দী 'স্বাবলম্বী টিকিট' নেবার অধিকারী হ'ত, কিন্তু নাগরিক কোনও অধিকারই তার ছিল না। স্বাবলম্বী বন্দীদের জন্য স্বতন্ত্র গ্রাম ছিল, মুক্ত মানুষের গ্রামের মধ্যে বন্দীরা বসবাস করতে পারত না। এমনকি, ব্যবসায়, সামাজিক বা অন্য কোনও কারণে মুক্ত মানুষ বন্দী-গ্রামে গেলে তাকে অনুমতি নিয়ে যেতে হ'ত। স্বাবলম্বী অবস্থায় জমি চাষ করা, বাড়ী তৈরি করা এবং নিজের গো-পাল রাখার অধিকারী সবাই ছিল। সে অবস্থায় নিজের পরিবার পরিজনকেও দেশ থেকে নিয়ে আসার পথে কোনও বাধা ছিল না। আবার অনেকে সাউথ পয়েণ্টের নারী-বন্দীশিবির থেকেও ভাবী জীবনের সঙ্গিনী সংগ্রহ করত। সাধারণতঃ আঠার বৎসরের কম এবং চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সের কোনও কয়েদীকে আন্দামানে পাঠানো হ'ত না।

বন্দিনীদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন প্রায় পুরুষদের মতই ছিল, তবে কঠোরতার মাত্রা একটু কম। পোর্টব্লেয়ার শহরের দক্ষিণ কোণে সাউথ পয়েণ্টে আন্দামান উপনিবেশের বন্দিনী-শিবির ছিল। সেলুলার জেলের তুলনায় এই শিবিরের নির্ম্মাণ-কৌশল অতি সাধারণ। কাঠের ও টিনের লম্বা ব্যারাক, চারিদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। মেয়ে ওয়ার্ডার ও পোর্ট-অফিসারদের তত্ত্বাবধানে, নির্ব্বাসিতা বন্দিনীরা কাপড় সেলাই, বেতের কাজ প্রভৃতি করত। বন্দী-শিবিরের রান্নাবান্না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এ সকল কাজও ছিল তাদেরই। নারী-বন্দীনিবাসে—একমাত্র স্বাস্থ্য-বিভাগের সহকারী এবং শিবিরের ছুতোরমিস্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। পাঁচ বছর কারাবাসে থাকার পর

বন্দিনীরা বিবাহ করতে পারত, এবং বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে স্বাবলম্বী বন্দী-গ্রামে গিয়ে বসবাস করত। দেশে ফিরতে হলে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে ফিরতে হ'ত, মেয়াদ শেষ হবার পর একলা কারুর পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বন্দিনী বিবাহিতা হলে পনের বছর আন্দামানে নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর দেশে ফিরবার অনুমতি পেত, আর আন্দামানে অবিবাহিত থাকলে শাস্তি-ভোগের সময় বেড়ে হ'ত কুড়ি বছর। পোর্টব্লেয়ারের সরকারী কর্মচারীদের বাড়ীতে আয়া চাকরানী হিসাবে বন্দিনীদের নিযুক্ত করার রেওয়াজ ছিল, তখন অবশ্য তারা মনিবের বাড়ীতেই বসবাস করতে পারত।

পরিত্যক্ত সেলুলর জেলের সেল

অল্প কিছু মেয়াদী পুরুষ-কয়েদীও তখন আন্দামানে ছিল, কিন্তু কারুরই সাজা দশ বছরের কম নয়। সারা জীবনের জন্ত দণ্ডিত কয়েদীদের মত একই নিয়মকানুনের মধ্যে মেয়াদীদের রাখা হ'ত। তবে কোনও মেয়াদীই এই শতাব্দীর প্রথম দিকে স্বাবলম্বী টিকিটের অধিকারী ছিল না। ১৯০৫-৬ সনের রস, এবারডীন, হাড্ডু ও গরাচেরামা উপনিবেশ অঞ্চল মুক্ত মানুষের বসতি ছিল। ভাইপার এবং ওয়েম্বারলিগঞ্জ পুরোপুরি কয়েদী-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল।

স্বাবলম্বী টিকিট পাওয়ার আগে প্রত্যেক কয়েদীকে জেলের উর্দি পরতে হ'ত, তারই সঙ্গে থাকত গলায় কাঠের হাঁসুলি সহ কাঠের উপর খোদাই করা বন্দীর পরিচয়পত্র। প্রত্যেক কয়েদীই এই পরিচায়ক তকমা সব সময় গলায় ঝুলিয়ে বেড়াত। কারো কারো জীব

নের, ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারায় সে দণ্ডপ্রাপ্ত, সাজার তারিখ এবং দণ্ডকাল ও মুক্তির তারিখ খোদাই করা থাকত। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের টিকিটের উপর বড় করে ইংরেজী এল (লাইফার) লেখা থাকত। একই মামলায় কয়েক জনের দণ্ড হলে তাদের টিকিট তারকা-চিহ্নিত হ'ত, এবং কোনও অবস্থায়ই তাদের এক কর্মকেন্দ্রে রাখার প্রথা ছিল না। অনেক সময় নরহত্যা, ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের সাজা নিয়ে কুড়ি-পঁচিশ জন সাংঘাতিক দুর্বৃত্ত একই সঙ্গে একই মামলায় কয়েদী হিসাবে আন্দামানে নির্বাসিত হ'ত। কারাকর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের বিভক্ত করে, স্বতন্ত্র কর্মকেন্দ্রে পাঠাতে হ'ত। অনেক
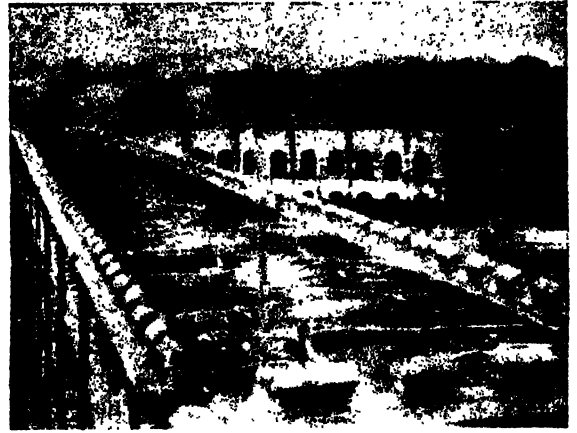
ঘড়ি-ঘর হইতে সেলুলর জেল

সময় এই বিষয়টি জটিল হয়ে উঠত। একই দলের অপরাধী, কিন্তু তারা ধরা পড়েছে বিভিন্ন সময়ে, কোনও ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান দুই, তিন বা পাঁচ বছর। স্বভাবতঃই তাদের বিচার হয়েছে আলাদা আলাদা করে, আন্দামানে এসেছেও বিভিন্ন সময়ে। এদের যোগসাজশের সূত্র বের করে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না।

সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে অশান্ত, স্বভাবদুর্বৃত্ত প্রভৃতি বন্দীদের জন্ত অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ত। অনেকে সারা জীবনটাই সেলুলর জেলের অবরুদ্ধ পরিবেশে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। আবার অনেককে পোর্টব্লেয়ারে অন্ত কোনও অপরাধ করার জন্ত চরম দণ্ডও দেওয়া হয়েছে। সে যুগে স্বভাবদুর্বৃত্ত কয়েদী-দের জন্ত যে সমস্ত শাস্তিমূলক 'গ্যাঙ্গ' ছিল তাদের তালিকা এই :

সেলুলর জেলে চিরদিনের জন্ত আবদ্ধ বন্দী, চেন গ্যাঙ্গ, ভাই-পার জেলে আমরণ বন্দী, স্বভাবদুর্বৃত্ত গ্যাঙ্গ, ভাইপার দ্বীপের শাস্তিমূলক গ্যাঙ্গ, অস্বাভাবিক অপরাধীদল, চ্যাথাম দ্বীপ শাস্তিমূলক গ্যাঙ্গ, সন্দেহজনক চরিত্রের 'ডি' (ডাউটফুল) টিকেটধারী দল।

জেল-কর্তৃপক্ষের উপর কঠোর নির্দেশ ছিল যে, একভাষাভাষী

কারণ এত বড় বন্দীনিবেশে বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা সব সময়ই চিন্তা করা প্রয়োজন। কাজের প্রয়োজনে যেখানেই বহু কয়েদীকে একত্রিত করার প্রশ্ন উঠত, তখনই ভিন্ন ভাষাভাষী কয়েদীদের নিয়ে সে দল গঠন করা হ'ত। বাঙালী, তেলেঙ্গী, পাঠান, মালাবারী —একত্রে কাজ ও বসবাস করলে, স্বভাবতঃই তাদের মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারকার্য্য করা শক্ত। গোপনীয়তা থাকবে না, হিন্দুস্থানীর মাধ্যমেই কথাবার্ত্তা বলতে হবে। সরকারপক্ষ হতে অবশ্য কয়েদীদের মধ্য থেকে অনেকগুলি গুপ্তচরও নিযুক্ত করা হ'ত। বন্দীশিবিরের অস্বাভাবিক অবস্থায় অতি সাধারণ প্রলোভনেই বন্দী অপরের বিরুদ্ধে সংবাদ দিতে রাজী হয়ে যেত।

সেলুলর জেলের 'হুইপিং ষ্ট্যাণ্ড':
এইখানে কয়েদীদের বেত মারা হইত

জেলের মধ্যে পূর্ণ সন্ত্রাসবাদের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা আলোচনা করলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বন্দীদশার বিভিন্ন পর্য্যায়ের যে বর্ণনা আছে, তাতে রাজনৈতিক বন্দীদের কথা বলা হয় নি। কারণ ইংরেজ সরকার এদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কালাপানির অপর পারে বিপ্লববাদী, স্বাধীনতাকামী যুবকদের উপর যে নির্ম্মম নিষ্পেষণ চলেছিল তার অতি সামান্য আভাস ইঙ্গিত এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিপ্লবীদের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। এই সব কারা-কাহিনী অধিকাংশই রচিত হয়েছিল ইংরেজ শাসনের আমলে। স্পষ্ট সত্য নির্ভীকভাবে তখন বলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু, দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতার পরও সে কাহিনী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা হয় নি। আন্দামানে নির্ব্বাসিত সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীদের কাহিনী আজ আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর সেলুলর জেলের ব্যথা-বেদনাময় ইতিহাস আজও রচিত হতে পারে। আন্দামানে সেলুলর জেলের মূল্যবান পুথিপত্র জাপানীরা এসে নষ্ট করে দেয়। জাপানীরা বিগত মহাযুদ্ধে—'৪২ সালে আন্দামান অধিকার করে সেলুলর জেলের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করার সঙ্গে, জেলের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে। সুতরাং রাজনৈতিক বন্দীদের সেলুলর জেলে অবস্থানের ইতিকথা সঙ্কলন করতে হবে ভূতপূর্ব্ব বন্দীদের কাছ থেকে।

আগেই বলেছি যে, সেলুলর জেল নির্ম্মাণের পর প্রথম যে রাজনৈতিক বন্দীদলকে সেখানে অবরুদ্ধ করা হয় তাঁরা মহারাষ্ট্রের। তার কিছুদিন পরে বাংলা থেকে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা যান। বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯১০ সনে পঞ্চাশ বৎসর সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হন। ঢাকা, বরিশাল, হাওড়া প্রভৃতি রাজনৈতিক মামলার আসামীদের আগমনেও সেলুলর জেলের বন্দীসংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সরকারী নিয়মকানুনে বিপ্লববাদী বন্দীদের স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা হয় নি, তাঁদের করা হয়েছিল সাধারণ অপরাধীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত. শাসকশক্তি কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হন নি। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সুপরিকল্পিত কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। একজন অতি দুর্ব্বৃত্ত নরহন্তাকে জেলে বা আন্দামানের অন্যান্য বন্দীশিবিরে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হ'ত রাজনৈতিক অপরাধীকে তা থেকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করা হ'ত। সমস্ত জীবন সেলুলর জেলে বদ্ধ অবস্থায় রাখাই ছিল বিধি। ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করা, আটার চাকি ঘুরানো, নারকেলের ছোবড়া কোটা, দড়ি পাকানো প্রভৃতি কায়িক শ্রমের কাজ তাঁদের দেওয়া হ'ত। জেলারের ইঙ্গিতে কয়েদী পেটি অফিসার কাজের সময় বন্দীদের উপর অত্যন্ত নির্ম্মম ব্যবহার করত। নির্দ্দিষ্ট কাজ না করতে পারার অপরাধে অবসন্ন বিপ্লবী বন্দীদের মারধোর ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সাভারকর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, সেলুলর জেলে তিনি ও তাঁর বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকর উভয়েই বন্দী অবস্থায় থাকলেও, তাঁদের সাক্ষাৎকার হতে বহু সময় লেগেছিল। গণেশ সাভারকর আগে আন্দামানে আসেন, তাই ছোট ভাই বিনায়ক যে নির্ব্বাসিত হয়ে সেলুলর জেলে এসেছেন এ খবর পর্য্যন্ত তিনি জানতেন না। অকস্মাৎ দূর থেকে বন্দীর উর্দ্দি পরনে দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের নিজেদের অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করতে হয় অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। জেলের অমানুষিক নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে অসহায় বন্দীদের লড়াই করার একমাত্র পন্থা ছিল—আমরণ অনশন করা। কিন্তু সেলুলর জেলে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের সংবাদ চারিদিকের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেদ করে বাইরে এবারডীনেই বা যাবে কেমন করে এবং সেখান

থেকে আট শ' মাইল সমুদ্রের ব্যবধান অতিক্রম করে দেশবাসীকেই বা সে সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে কি উপায়ে ?

আন্দামানের বন্দীশালায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এই তিলে তিলে মৃত্যুবরণের কাহিনী বাংলাদেশে তথা ভারতে প্রচারিত হ'ল এক অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনাকে উপলক্ষ করে। সেলুলার জেলে কয়েক বছর আবদ্ধ থাকার পর আলিপুর মামলার কয়েকজন প্রখ্যাত বিপ্লবীকে বাইরে কন্‌ভিক্‌ট ষ্টেশনে কাজ করার জন্য নেওয়া হয়। নিজেদের কোনও গোপনীয় সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ এ কাজ করেছিলেন কি না তা এখন বলা অসম্ভব। কিছুদিন পরে লালমোহন সাহা নামে একজন সাধারণ কয়েদী জেল-কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয় যে, বিপ্লবীরা গোপনে বোমা তৈরি করছে এবং আগ্নেয়াস্ত্রও তারা ভারতবর্ষ থেকে অবৈধ ভাবে নিয়ে এসেছে। সমস্ত পোর্ট ব্লেয়ার সচকিত হয়ে উঠল। দেশী মিলিটারী পুলিস ও পল্টনের সঙ্গে ইংরেজ গ্যারিসনকেও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে 'ডিউটি' দেওয়া হ'ল। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জেলের মধ্যে সেলে দিবারাত্র বন্ধ করে রাখা হ'ল। তারই সঙ্গে চলল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান। 'থার্ড ডিগ্রী'র পরিপূর্ণ বিবরণ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকদিন পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হ'ল—আলিপুর মামলায় অন্যতম দণ্ডিত বিপ্লবী ইন্দুভূষণ রায় আত্মহত্যা করেছেন এবং সেই দলের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত যুবককর্মী উল্লাসকর দত্ত পাগল হয়ে গিয়েছেন। অদূরে সেলের রুদ্ধদ্বারের ভিতরে গোঙানির অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এসেছিল বিনায়ক দামোদরের কানে। ইন্দুভূষণ আত্মহত্যা করেছিলেন না নিহত হয়েছিলেন এ প্রশ্নের সমাধান হয় নি। সেই সময়ে বাংলা পুলিসের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার আন্দামানে বান এবং বোমা বিভলবার খুঁজে বের করার জন্য এক অদ্ভুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এবারডীনের ঠিক নীচে, এখন যেখানে অতি সুন্দর খেলার মাঠ জিমখানা গ্রাউণ্ড সেইখানে, তখন ছিল জলা আর সুন্দরীগাছের বন। কয়েক বৎসর আগে আন্দামান বন্দীশিবির ও এবারডীনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমাবার জন্য সরকার সমুদ্রের ধারে দেয়াল গেঁথে সমস্ত জলা জায়গা ভরাট করার পরিকল্পনা কার্যকরীকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই সময়সাপেক্ষ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯১৮ সনে। কিন্তু ১৯১২ সনে জলাভূমিকে আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখার প্রশস্ত জায়গা বিবেচনা করে পুলিসের কর্তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, এ অঞ্চল খুঁড়ে ফেলা হউক। কাঁকড়া, জোঁক এবং দু' চারটে সাপ ছাড়া অবশ্য অন্য কিছু বের হয় নি।

ইংরেজ আমলে আন্দামানের চিফ কমিশনারদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুপণ্ডিত ও কর্মদক্ষ ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল। তাঁর কার্যকাল ১৮৯৪ থেকে ১৯০৩ সন পর্যন্ত। এই সময়ে ফিনিক্স বে ডক ইয়ার্ড ও কারখানার প্রভূত উন্নতি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ১৯১৩ সনে কর্ণেল এম. ডগলাস আন্দামানের

সেলুলার জেলের অবশেষ

ফিনিক্স বে, পোর্টব্লেয়ার

শাসনভার গ্রহণ করেন। মহাযুদ্ধের সময়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের স্মরণীয় ঘটনা জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ এমডেনের আগমন। এমডেন পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ২৩৫ মাইল দক্ষিণে নানকৌড়ী বন্দরে যায়। বন্দরের গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট তখন ছিলেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী নামে এক মহিলা। ইনি পোর্টব্লেয়ারের স্বাধীন বাসিন্দা এবং ব্যবসাসূত্রে নানকৌড়ী গিয়েছিলেন। বুদ্ধিমতী ও কর্মনিপুণা বলে তিনি সবারই প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। পরে, তিনি নানকৌড়ীর সরকারী এজেণ্টেরও কাজ নেন। জার্মান জাহাজ নানকৌড়ী খাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু ইন্দ্রাণী রণতরীর উপস্থিতি উপেক্ষা করে কামোর্টা দ্বীপে সরকারী বাসভবনের সামনে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করেন। দূরে জাহাজের ব্রিজ থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জার্মান ক্যাপ্টেনও এ ঘটনা লক্ষ্য করেন। তারপর যে-কোনও কারণেই হউক ক্যাপ্টেন নানকৌড়ীতে না নেমে, জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দেন। এমডেন জাহাজের উপস্থিতির সংবাদ ইন্দ্রাণী নিকোবারীদের মারফতে 'ক্যানো'তে করে

কায় নিকোবারে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে ব্যবসায়ীর জাহাজে খবর যায় পোর্টব্লেয়ারে আর বেতার-সঙ্কেতে সে সংবাদ আসে কলিকাতায়। কিছুদিন পরে ব্রিটিশ নৌবহরের জাহাজ এমডেনকে ডুবিয়ে দেয়।

দিলথামনি জলাশয়, পোর্টব্লেয়ার—সামনে জাপানীদের তৈরী গেট

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষে বিপ্লব-অভ্যুত্থানের যে প্রচেষ্টা হয় তৎসংক্রান্ত রিপোর্ট ইত্যাদিতে আন্দামানের উল্লেখ আছে। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, আন্দামানে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র, লোকজন নামিয়ে সেখানকার বন্দী বিপ্লবীদের মুক্ত করার পরিকল্পনা নাকি নেতারা করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত রেজিমেণ্ট তখন আন্দামানে বন্দী। রাউলাট কমিটি অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, এ ধারণার পেছনে কোনও সত্য ছিল না। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বিদ্রোহী সৈনিকদের নাকি আন্দামানে পাঠানো হয় নি। অবশ্য ঘটনা পর্য্যালোচনা করে মনে হয় যে, রাউলাট কমিটি প্রকৃত তথ্য বিকৃত করে দেখিয়েছেন। সে সময় হংকং, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, নিকট-প্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু বিদ্রোহী সৈনিককে আন্দামানে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই দলে এক বেলুচ রেজিমেণ্টকে পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তরে লং আইল্যাণ্ডে নিয়ে রাখা হয়। বেলুচ বিদ্রোহীদের তৈরী নারিকেল বাগানে এখন প্রচুর ফল হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়-উৎসব উপলক্ষে আন্দামানের বহু বন্দী মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। আবার, পঞ্জাবে গণ-বিক্ষোভে দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীরা ঐ সময়ে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হন। হরেদরে রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা বেড়েই গেল।

১৯২২ সনে জেল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আন্দামানে নারী-কারাগার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সময় অবশ্য সমস্ত বন্দী উপনিবেশ উঠিয়ে দেওয়া ঠিক হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দামান সরকার একমাত্র মোপলা-বিদ্রোহের চৌদ্দ শত বন্দী এবং বিভিন্ন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় নির্ব্বাসিত বিপ্লবীগণ ছাড়া অন্য সাধারণ কয়েদীদের নিতে অস্বীকার করেন।

মালাবার কৃষক-বিদ্রোহের শাস্তিপ্রাপ্ত মুসলমান কৃষাণ-মোপলারা আন্দামানে নূতন এক পরিবেশ সৃষ্টি করল। সংখ্যায় তারা যথেষ্ট এবং অনেকেই সরকারের সম্মতি নিয়ে দেশ থেকে স্ত্রী-পুত্রসহ আন্দামানে এসেছিল। দণ্ডভোগের পর অধিকাংশ মোপলাই আর দেশে ফিরে গেল না। আন্দামানেই তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে সুরু করল। আজ আন্দামানে নিজেদের শ্রমে বহু মোপলা সমৃদ্ধ গ্রাম গড়ে তুলেছে। তবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য তারা বিসর্জ্জন দেয় নি।

কর্ণেল বিডন ১৯২০-২৩ সালে আন্দামানের চিফ কমিশনার ছিলেন। তাঁর সময়ে কয়েদীদের শাসন-ব্যবস্থার কঠোরতা কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়। যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞা হলেই আন্দামানে নির্ব্বাসিত করার নীতি পরিবর্ত্তন করা হ'ল। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় যারা আন্দামানে আসতে চায়, সেই সব বন্দীকেই কেবল আন্দামানে পাঠানো হবে বলে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হ'ল। তাতে ঘোষিত হ'ল—আসার আগে প্রতিটি বন্দীর সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে যে, সে আন্দামানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে পারবে কিনা। স্বভাবদুর্বৃত্ত বা অপরাধপ্রবণ কোনও কয়েদীকে আন্দামানে পাঠানো হবে না। ভারতবর্ষের জেল থেকে কিন্তু আন্দামানের মুক্ত আবহাওয়ায় যাবার জন্যে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দিয়ে বন্দী এল খুবই কম। বন্দী উপনিবেশ উঠিয়ে দিলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুক্ত কয়েদী ও তাদের সন্তানসন্ততির কি সমস্যা দেখা দেবে সে সম্বন্ধেও সরকার গভীর ভাবে বিবেচনা আরম্ভ করলেন। আন্দামানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর করে বন্দীদের উপর। নির্ব্বাসনে বন্দী পাঠানো বন্ধ হলে ভারত সরকারও আন্দামানের জন্য ঐ পরিমাণে অর্থব্যয় করবেন না। তা ছাড়াও অবশ্য আন্দামানে আট-নয় হাজার কয়েদী অর্দ্ধমুক্ত অবস্থায় রয়েছে, তাদেরই বা কি হবে? আবার কি তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কারাপ্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করলেন। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব কোন সরকারই আন্দামান থেকে কয়েদী ফিরিয়ে নিয়ে এসে নিজেদের জেলে ভর্ত্তি করতে রাজী হলেন না।

এই সমস্ত বিবেচনা করে চীফ কমিশনার কর্ণেল এম. এফ. ফেরার নূতন করে আন্দামান বন্দীনিবাস গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। আন্দামানে সাধারণ কয়েদীরা যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় বসবাস করে, সেজন্য আগেকার মত কঠোর পরিশ্রমে প্রথম দশ বছর সময় কাটাবার নিয়ম বাতিল করা হ'ল। কয়েক মাস সেলুলার জেলে আবদ্ধ থাকার পরই বন্দীদের বাইরে কাজ করার অনুমতি মিলত। যে-কোনও কয়েদী ইচ্ছা করলে 'তলবদার' পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারত। কাজের পরিবর্ত্তে মাইনে এবং রেশনে চাল, ডাল, তৈল, লবণ, আটা প্রভৃতি দেওয়া হ'ত। কয়েদীর বিশেষ সাজপোশাক পরার বিধিও উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এই সময়ে বহু বন্দী এবং শিখ কয়েদী

তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে আসে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

কর্ণেল ফেরার আন্দামানের চীফ কমিশনার ছিলেন ১৯২৩ থেকে ১৯৩১ সন পর্য্যন্ত। তাঁর সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আন্দামানের স্থায়ী বাসিন্দাদের দখলী স্বত্বলাভ। এর আগে জমির উপর কোনও স্বত্ব না থাকায় ভাল করে ঘরবাড়ী তৈরি করার দিকে বড় কেউ মনোযোগ দিত না। সঙ্গতিপন্ন

পোর্টব্লেয়ারে মাছ ধরায় রত ছেলে

গৃহস্থও কুঁড়েঘর ছেড়ে অন্য কিছু তৈরি করার কথা ভাবত না। এর পর থেকে আস্তে আস্তে কাঠের ও ঢেউখেলানো টিনের ছাদের সুন্দর সুন্দর বাড়ী গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। আন্দামানী গ্রামের বাড়ীঘর সুদৃশ্য, ছিমছাম। চারদিকে ফলের বাগান এবং সামনেই উপত্যকাভূমিতে ধানের ক্ষেত। অনেকটা ব্রহ্মদেশের গ্রামের মত। মাসিও, উঙ্গুর প্রভৃতি গ্রাম কর্ম্মীরাই গড়ে তুলেছিল।

১৯২৫ সনে বর্ম্মার বেসিন জেলা থেকে কারেন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা আন্দামানে বনবিভাগের শ্রমিকরূপে আসে। মধ্য আন্দামান দ্বীপের উত্তর অংশে ওয়েবীতে তারা সুন্দর এক উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। প্রত্যেক পরিবারই নিজের জমিতে চাষ আবাদ করে; কমলা, আনারস প্রভৃতি ফলের বাগানও গড়ে তুলেছে। এরা সবাই খ্রীষ্টান এবং অত্যন্ত শান্ত ও নিরলস কর্ম্মী। আজও কারেনরা তাদের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছে।

উত্তর ভারতের অপরাধপ্রবণ বলে কুখ্যাত যাযাবর উপজাতি ভাণ্ডরা আসে সপ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে। আসার সময়ই তারা স্থির করে যে, আন্দামানের বন্দী উপনিবেশে নূতন করে ঘর-সংসার পাতবে। ভ্রাম্যমাণ অপরাধী-জীবন ত্যাগ করে ভাণ্ডরা আন্দামানে কৃষক ও মজুর হিসেবে সুনাম অর্জ্জন করে। '৩১ সনে ভাণ্ড উপনিবেশিকদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় তিন শ'।

আলোচ্য ত্রিশ বছরে আন্দামানের আদিবাসীদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক আরও নিকটতর হয়। আদিবাসীদের প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, গ্রেট 'আন্দামানিজ' আদিবাসীর সংখ্যা দ্রুত কমে যেতে আরম্ভ করে। আচারে ব্যবহারে শিক্ষায় দীক্ষায় তাদের

লিটল আন্দামানের আদিবাসী—'ওঙ্গি'

নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণরূপেই তারা হারিয়ে ফেলে। আন্দামানের প্রধান দ্বীপমালা থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে প্রশস্ত সমুদ্রের প্রণালী দ্বারা বিভক্ত লিটল আন্দামানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ওখানকার ওঙ্গি আদিবাসীদের মধ্যে বর্ত্তমান সভ্যতা বিস্তারের কোনও কার্য্যক্রম সরকার গ্রহণ করেন নি এবং বছরে এক-আধ বার লোহার জিনিষ, বিড়ি, চা, দেশলাই প্রভৃতি নেবার জন্য ছাড়া অন্য কোন উপলক্ষে ওঙ্গিরা পোর্টব্লেয়ারে আসত না।

মুশকিল হ'ল কিন্তু জারোয়াদের নিয়ে। জঙ্গল থেকে জারোয়া আদিবাসীদের ধরে নিয়ে তাদের শিক্ষিত করে সমস্ত উপজাতিকে বন্ধুভাবাপন্ন করার চেষ্টা হয়। ১৯০২ সনে ভস্, বোনার্স এবং বনিগের নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল এই উদ্দেশ্যে আন্দামানের গহন বনে যাত্রা করে। এতে কোনও ফল হ'ল না, উপরন্তু জারোয়াদের নিক্ষিপ্ত তীরে ভস্ নিহত হন।

জারোয়া এলাকায় দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিযান হয় মার্চ-এপ্রিল, ১৯১৩ সনে। ফসেটের নেতৃত্বে অভিযাত্রী দল জঙ্গলের মধ্যে এক বড় জারোয়া বসতি ঘিরে ফেলে। মিলিটারী কায়দায় বন্দুক উঁচিয়ে ফসেটের সেপাই সান্ত্রীরা অগ্রসর হতে থাকে। জারোয়াদের চেঁচামেচি কোলাহলও শোনা যাচ্ছিল। এত সব চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু জারোয়ারা ফাঁদে পা দিল না। চারদিকের

দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে জারোয়ারা যেন মিলিয়ে গেল, শিশু বা স্ত্রীলোকরাও পেছনে পড়ে রইল না। জারোয়ারাও প্রতিপক্ষের কায়দাকানুন সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়।

১৯১৮ সনে মরগানের নেতৃত্বে ষোল জন পুলিশ এবং পঁচিশ জন অভিজ্ঞ বন্দী শ্রমিক ও কয়েকজন বন্ধুভাবাপন্ন গ্রেট আন্দামানিজ পথপ্রদর্শক—এদের এক বাহিনী জারোয়াদের উপর চড়াও করে। কিছুদিন আগে জারোয়ারা টেম্পলগঞ্জ ও মণিপুরে গ্রামবাসীদের উপর বেপরোয়া ভাবে চড়াও হয় এবং কয়েকজনকে গুরুতররূপে আহত করে। জারোয়াদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি লাল লেংটি পরেছিল আর আক্রমণের সময় দু'একটি হিন্দুস্থানী কথাও তাদের বলতে শোনা যায়। গ্রামবাসীদের মনে এর ফলে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, গ্রেট আন্দামানিজ পেটিভুক্ত অধিবাসীরাই তলে তলে এ সব অনাচার করছে। জারোয়াদের পক্ষে হিন্দুস্থানী শব্দ ও তার অর্থ কোনই জানা সম্ভব নয় এবং লাল কাপড়ই বা তারা পাবে কোথা থেকে। মরগানের অভিযান থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'ল যে আগেকার আক্রমণের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী জারোয়ারাই। একথাও অভিযাত্রী বাহিনীর সবাই বলেছে যে, জারোয়াদের সঙ্গে কেনও পলাতক বন্দী নিশ্চয়ই যোগ দিয়েছে। তারাও হিন্দুস্থানী কথা দূর থেকে শুনতে পেয়েছে। কিন্তু সঠিক ভাবে পলাতক বন্দী সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হয় নি। জারোয়া বসতি অধিকার করে এবারও মানুষ পাওয়া গেল না, মিলল নানা রকমের জিনিষপত্র—ডেকচি, পেরেক, এনামেলের কাপ, খাকির কাপড়, লোহার বহু যন্ত্রপাতি, কয়েদীর নম্বর দেওয়া বাটি। মিঃ মরগান জারোয়াদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার পথও বাৎলে গিয়েছেন। ত্রিশ জন সশস্ত্র বর্ম্মী ও তাদের পথপ্রদর্শক কয়েক জন আন্দামানী সদাসর্ব্বদা জারোয়াদের উপর চড়াও হওয়ার জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরলে দুই তিন বছরের মধ্যে নাকি সমস্ত জারোয়াকে আন্দামান থেকে নিঃশেষ করে ফেলা যাবে। সেই সময় থেকে জারোয়াদের দেখলেই গুলি চালানো আরম্ভ হ'ল আর জারোয়া কুঁড়েঘরগুলি পুড়িয়ে ফেলাও হ'ল তাদের কর্তব্য।

কিন্তু এত সব অপচেষ্টা করেও জারোয়াদের ধ্বংস করা গেল না। শুধু বৈরীভাবই বেড়ে চলল। আন্দামানের জঙ্গলে আজও জারোয়ারা রয়েছে। সংখ্যায় সম্ভবতঃ এক হাজারের বেশী নয়, কেউ কেউ মনে করেন পঁচশ'র বেশী নয়। সবই অবশ্য অনুমান। আন্দামানের বুনো শূয়োর বা হরিণও সভ্য মানুষকে এত ভয় করে না, যত করে জারোয়ারা। মানুষে মানুষে দেখা হলেই সেখানে অনর্থ বাধে, অকারণ রক্তপাতে এ অশুভ সম্পর্ক বহুদিন ধরে বিষিয়ে রয়েছে।

অতি প্রাচীন চীনদেশীয় কবিতা

শ্রীশৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনা কাব্য-জগৎ, সে এক অপূর্ব্ব জগৎ। সেখানে হাটে-মাঠে-ঘাটে, কাননে-কান্তারে, উন্মুক্ত নদীতটে সর্ব্বত্রই কবিতার সুর যেন গুঞ্জন করে বেড়ায়। শিক্ষিত লোক-মাত্রেই সেখানে কবি। তাঁরা কবিতা লেখেন, একে অন্যকে উপহার দেন, বিনিময়ে আবার কবিতাই ফিরে পান। এ নিয়ে যেন সেখানে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে। দান পেলে প্রতিদান দেওয়া যেমন সভ্যজগতের রীতি, তেমনই কবিতা পেয়ে আরেকজনকে কবিতা ফিরিয়ে দেওয়াও সেখানকার রীতি।

তাদের এ রীতি কিন্তু আজকের নয়—এ রীতি সমানে চলে আসছে আজ বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে। কি করে তার আরম্ভ, সে এক আশ্চর্য কথা। সেই পুরনো যুগে যখন অন্যান্য অনেক দেশই সভ্যতার মুখও দেখে নি, তখন একদিন রাজার আদেশ প্রচারিত হ'ল, কবিতাকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে গ্রহণ করবার জন্য। অর্থাৎ কবিতার রসমাধুর্য, কবিতার স্নিগ্ধ রসাস্বাদন যেন কুলী, মজুর, কামারকুমোর আদি সবারই জীবনকে সুখশান্তিপূর্ণ করে দেয়—এই আহ্বান জানিয়ে রাজা এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ফলে কবিতা রাজসম্মান পেয়ে উন্নত হতে থাকে এবং অজস্র কবিতার প্লাবনে দেশ ভেসে যায়। সেই থেকেই চলে আসছে এ রীতি।

বাঙালী জাতির সম্বন্ধেও এ বিষয়ে অনুরূপ উক্তি আছে। শোনা যায়—Bengalis are born poets. অবশ্য কথাটা সব সময়ে সদ্ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অকর্মণ্য হয়ে বসে বসে স্বপ্ন দেখতে যখন কাউকে দেখা যায় তখনও তাদের প্রতি ঐ উক্তিরই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমনকি ঐ উক্তির সমর্থনে কখনও কখনও শিক্ষাকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে ইঙ্গিত করা হয়। কাজেই এই বিধানে যদি আমরা চীনদেশের কাব্যপ্রবণতাকে উড়িয়ে দিতে চাই তা হলে তারা শুনবে না। তারা বলবে—

আপত্তি ?
বসন্তের জলে এলোনা তোমার আপত্তি।
তোমার সব শব্দ স্তব্ধ।
ঐ দেখছ না সূর্য ডুবল বলে ;—
এক পেয়ালা খাবে ?... —

অর্থাৎ, তারা তা উড়িয়ে দেবে মৃদু হেসে আর পালিশ-করা কথায়।

যাক সে সব কথা। এ নিয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় ; এখানে হাজার বছরের পুরনো কয়েকটি কবিতার কথাই বলব। এ কথা বলার উদ্দেশ্য শুধু সেখানকার পারিপার্শ্বিককে চেনা। কারণ পরিস্থিতি না জেনে যেমন সমাজনীতির বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা ত্রুটিপূর্ণ হয় তেমনই অবস্থা না বুঝে টীকাটিপ্পনী করাও উচিত হয় না।

চীনদেশের "বুক অব পোয়েট্রি" (কনফুসিয়স্ সম্পাদিত) সব দেশেই পরিচিত। সে বইখানিতে আছে তিন শ' পাঁচটি বাছাই করা কবিতা। 'বাছাই করা' বললাম এজন্য যে, ইতিহাসে বলে প্রাচীন যে সব কবিতা আজও চীনের আকাশ-বাতাস মুখর করে রেখেছে তার সংখ্যা তিন হাজারেরও উপর। অথচ 'ক্লাসিক পোয়েট্রি' বলে যে কবিতাগুলিকে মেনে নেওয়া হচ্ছে তার সংখ্যা মাত্র তিনশ' পাঁচটি। কাজেই এ মুষ্টিমেয় কবিতা বাছাই করেই সংকলিত করা হয়েছে, অবশিষ্টাংশকে বাদ দিয়ে। এ ছাড়া এর আর কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ কবিতা-সমষ্টির মধ্যে তিন জাতীয় কবিতা পাওয়া যায়। প্রথম এবং সবাপেক্ষা অধিকসংখ্যক হ'ল 'লোক-সঙ্গীত' কবিতা বা 'ফোক সঙ্'। দ্বিতীয়, জাতীয় সঙ্গীত বা 'Song of the State' ; আর কয়েকটি কবিতা আছে যা আমাদের বেদের মন্ত্রের মত দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত বা দেবতার স্বরূপ বর্ণনায় মুখর কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উদ্ঘাটনে তৎপর। এক কথায় বলা যায় 'ode' জাতীয় কবিতা। শেষোক্ত 'প্রার্থনা' কবিতাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—'শাং' বংশের রাজত্ব-সময়ে রচিত (১৭৮৩-১২২ খ্রীষ্টপূর্ব)। এ ছাড়া লোকসঙ্গীতগুলিও প্রায় এরই সমসাময়িক। বিখ্যাত চীনা লেখক কেং শু টুং বলেন, এ কবিতাগুলি রচনার মূলে ছিল কয়েকটি কারণ। প্রথমতঃ, সেই প্রাচীন সময়ে রাজার নির্দ্দেশে যে সব বাৎসরিক মেলা বসত তাদের বৈশিষ্ট্যকে সর্ব-শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত করার। দ্বিতীয়তঃ, তৎকালে রাজপুরুষগণও ঐ শ্রেণীর সঙ্গীত গেয়ে জনসাধারণের মনোভাব নিরূপণের চেষ্টায় থাকতেন। আর সেই অনুসারে রাজ্য পরিচালনার রীতিনীতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হ'ত। এটাও রাজ-আদেশ-প্রসূতই। আর তৃতীয়তঃ, জনসাধারণও তাদের মনোভাব কবিতায় গ্রথিত করে ব্যক্ত করত। সুতরাং এ জাতীয় কবিতায় রাজপরিবারের প্রতি স্তুতি এবং ব্যঙ্গও দেখা যায়।

কবিতা-রচনার উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও বিষয় দেখে যদি কারও মনে তার কবিত্ব সম্বন্ধে সংশয় জাগে, তা হলে তা কিন্তু নিছক ভ্রান্ত ধারণাই হবে। কারণ তার উদ্দেশ্য ও বিষয় যাই হোক না কেন, কবিত্বের স্ফুলিঙ্গ তার মধ্যে যেখানে-সেখানে ঝকঝক করতে দেখা যায়। যেমন লোক-সঙ্গীত জাতীয় কবিতার কয়েকটি নিদর্শন :

১। পূর্বতোরণের দ্বার দিয়ে গিয়েছিলাম বাইরে,
মেঘের মালায় দেখলাম সুন্দরী'র দল।
বাদল কেন ? আরো কোমল, আরো উজ্জ্বল তারা।
ভিড়ের অশুভ্রতা।
ঐ ত আমার আলো
ক্ষীণ-তন্বী, গোধূলির আলো-সম-কোমল
সে আমার প্রেয়সী

প্রাকারের মিনারদ্বারে গিয়েছিলাম বাইরে,
বিকশিত ফুলদলে দেখলাম সুন্দরীর মুখ
প্রস্ফুটিত আবেগে যেন দুলছে।
কিন্তু সেই ক্ষণে মনে হ'ল,—
আমার প্রেয়সী, দেবী ; তার শুভ্র বসনে রক্তের শাসনে সে আমার সব।

২। যাক্ মোর তরী, শাল কাঠে গড়া,
ঐ দিকে বয়ে যাক্।
ঐ যে 'হো'-এর বাঁধন-না মানা স্রোত।
কোথা সেই সাথী মোর !
সাথীহীন এই নারে
যাই চলে অন্ধ মরণের স্নেহকোলে !
জননী আমার, হায় ওগো ভগবান !
তুমি বুঝিবে না, তাও কি কখনো হয় !

যাক্ মোর তরী, শাল-কাঠে গড়া,
ঐ দিকে বয়ে যাক্।
ঐ যে 'হো'-এর তলহারা খরস্রোত,
কোথা তুমি প্রভু মোর !
না, না, কভু মোরে, শপথ আমার,
পারিব না দিতে তুলে
জননী আমার, হায় ওগো ভগবান !
তুমি বুঝিবে না, তাও কি কখনো হয় !

৩। সম্মানের সুপীত পোশাক,
নীল বহে নিত্য অপমান।
সাজিলাম নীল সাজে, ত্যজি স্বর্ণসাজ
অনায়াসে ফিরাই এ মুখ।

সাজায়েছি তনু মোর অবজ্ঞার নীলে
কে ধরিবে স্বর্ণসাজ দীর্ঘকাল ধরি ?
ভাবিতেছি জ্ঞান-গুরু ঋষিদের কথা
মিথ্যা যেন নাহি করি তাঁহাদের বাণী।

তারি তরে আজি মোর যত লজ্জা-গ্লানি।
বসে আজ ভাবি শুধু তাই :—
ভাবিতেছি জ্ঞান-গুরু ঋষিদের কথা,
নারীর হৃদয় বোঝা এতই সহজ !

উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রথমটির রচনাকাল ৮০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ, দ্বিতীয়টির ১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, আর তৃতীয়টির ৭৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ :

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এখানে ভাব ও ভাবের আচ্ছাদনে যে রূপ, তা কি গাঢ় নিবদ্ধ নয় ? ভাবের গায়ে রূপটি যেন কত দৃঢ় বাঁধনে বাঁধা আছে, তাকে খুলে দেখা শুধু কঠিনই নয়, হয়ত-বা অসম্ভবও। কাজেই বলতেই হবে অর্থ আর অর্থাতীত দুই-ই এখানে অভিন্ন। প্রাচীন চীনা কবিতার এ একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতি কবিতারই ভাব আর রূপ, অর্থ ও মূর্তি এমন দৃঢ়বদ্ধ ও ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত যে দুটিকে পৃথক করা যায় না ! দুটি একই অনুভূতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ— এ পিঠ আর ও পিঠ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রার্থনা-সঙ্গীত। এরাও উৎকণ্ঠায়, আগ্রহে ভরা, সময় নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনিমুখর। আর পূর্বোক্ত অভেদ ত আছেই।

অলাব্‌ এখনো ত্যজে নি তিক্ত পাতা,
চঞ্চল নদীতে ফুলিয়া উঠিছে জল;—
বন্ধু আমি যে প্রতীক্ষা-বিহ্বল।

মরা-নদী বুকে এলো যে জোয়ার-স্রোত
কাঁদিছে কপোতী, কোথায় কপোত হায় !
বন্ধু গো মোর দিন যে বিফলে যায়।

শেষ খেয়া—মাঝি ঐ যে হাঁকিছে সুর
সাথীদলের যাত্রাও বুঝি শেষ;—
বন্ধু আমি যে আছি চেয়ে অনিমেষ !

৭১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত এ কবিতা কি নৈরাশ্য ও আগ্রহের অনুভূতিতে ভরা নয় ? তার পর :

প্রভাত গরিমা ভাতিছে শিখরচূড়ে—
আনত আমার শির
রূপহারা আজ সাদা, লাল, নীল, গোলাপী, কুসুম, আর অশান্ত মোর মন।

দূরে ঐ হোথা শুষ্ক-নীরস-ঘাসে
চঞ্চলি ওঠে কিসের ও আলোড়ন !
সচকিতে চাহি,—ঐ বুঝি ধ্বনি, ঐ বুঝি পাদক্ষেপ
হেরিলাম এক ফড়িং ঝাপটে ডানা।

প্রতিপদ চাঁদে শৈলশিখরে উঠি
হেরিলাম তারে দখিণার পথে আসে
হৃদয়ের বোঝা নামানু শিখরচূড়ে
উন্নত মোর শির।

এর উৎকণ্ঠাকে কি অস্বীকার করতে পারা যায় ? এ যেন 'পথের উৎকণ্ঠা বেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয়'। সৃষ্টির মূলের অভ্রান্ত অগ্রগতির অনুভূতিই যেন এর লক্ষ্য।

আর জাতীয় সঙ্গীত :

রিক্ত বাগান, আগাছা ঢাকা অঙ্গন
চিরের ডালে হাসছে আবার বসন্ত
বসন্তের মুক্তি বুঝি ?
ঐ যে পশ্চিম নদীর 'পরে জ্বলছে চাঁদ—
এত দিন 'শিয়াং' রাজার পুরসুন্দরীরা কোথায় ?

কিংবা

ধ্বংসের স্তূপ, শহর ধ্বংস, শুনি কেবল হাহুতাশ।
'স্যুচো'র ধারে ঝরছে—ওকি কান্না !
'চো' রাজার দালান-শিখরে আর নদীর 'পর বৃথাই ডোবে সূর্য
দালান—সেও ত আধভাঙ্গা আর জঙ্গলে ভরা !

এর ভিতরে ব্যঙ্গের আর প্রজ্ঞার অতৃপ্তির সুর শোনা যায়।

টেক্সি

মাডলাণ্ড ডেভিস

অনুবাদক শ্রীতন্ময় বাগচী

ছোট্ট দোকানের সামনে বসে ধূমপান করতে করতে পরিচিত অপরিচিত সবার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করাই টেক্সির কাজ। তার শান্ত মুখশ্রী দেখে সবার মনে হয়, সে যেন 'সব পেয়েছির দেশে'র অধিবাসী—সংসারে তার মত সুখী আর যেন কেউ নেই। ছোট্ট ছেলেমেয়ে টেক্সির অত্যন্ত প্রিয়। তাকেও তারা ভালবাসত সত্যি, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বাসত তার দেওয়া মিষ্টি খাবারগুলো। রোজই তাই তার দোকানের সামনে ভিড় লেগেই থাকে।

সেদিন বিকেলে ছেলেমেয়েদের আসতে দেখে টেক্সি জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর সব দাদু-দিদিদের? বিকেলে কোথায় ছিলে?'

ছেলেরা বলে, 'যুদ্ধ করছিলাম।'

মেয়েরা বলে, 'রান্না করছিলাম।'

টেক্সি হেসে উঠে জবাব দেয়, 'বেশ···বেশ···! বড় হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই বিখ্যাত সৈনিক আর পাকা গিন্নী হবে। এখন দেখ দেখি বুড়োর হাতের তৈরী এই খাবারগুলো কেমন হয়েছে?'

প্রত্যেকের হাতে একটা করে মিষ্টি দিল টেক্সি। ছেলেমেয়ের দল খেতে খেতে আর আনন্দে চীৎকার করতে করতে চলে গেল। তারা চলে যাবার কিছু পরেই কোকো এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। কোকো শুধু পুরনো খদ্দের নয় টেক্সির, একমাত্র বন্ধুও! দু'জনে দোকানের ভিতরে গিয়ে বসে। টেক্সি চা করতে আরম্ভ করল।

টেক্সির দোকানে জমেছে নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। ভারত আর চীনের নানা রকম বৌদ্ধমূর্ত্তি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-করা রেশমী কাপড়, ছোটখাটো মিশরীয় পিরামিড, লাল নীল সোনালী কালিতে হাতে লেখা পারস্য দেশের পুথিও টেক্সির দোকানে পাওয়া যায়।

চায়ের কাপটা কোকোর দিকে ঠেলে দিয়ে টেক্সি বলল, 'আজ নতুন কি জিনিস দেখতে চান?'

'টেক্সি—আমি ত নতুন কিছুই দেখতে আসি নি—শুধু গল্প করব বলে এসেছি। সত্যি তুমি এত ভাল লোক যে কি বলব!'

'আমি একজন নগণ্য দোকানদার অতখানি প্রশংসার সত্যি যোগ্য নই!'—বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল টেক্সি—'আজ যদি টাকা থাকত তবে এই সব প্রাণের চেয়েও প্রিয় জিনিসগুলি কি বিক্রী করি? যে কারণে আমি ওদের পেয়েছি তা ভাবলে অবাক না হয়ে পারি না। কেবলি মনে হয় জিনিষগুলোর মালিক জীবনের পরপারে গিয়েও যেন ওদের কথা ভুলতে পারে নি। হঠাৎ এক দিন ঐ সব মূর্ত্তি থেকে এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাই। আমায় হয় ত পাগল ভাবছেন—কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার কথার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। সে শব্দের হেতু এখনও আমি খুঁজে পাই নি। বোধ হয় স্বর্গ থেকে ওদের মালিক এসে ছুঁয়ে গিয়েছিল।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত টেক্সির মুখের দিকে তাকিয়ে কোকো বলল, 'আমার দৃঢ় ধারণা ছিল গ্রামের সবচেয়ে সুখী হচ্ছ তুমি। কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভাঙল! এখন বুঝছি তোমার মনে যে আগুন জ্বলছে, হাসি দিয়েই তাকে ঢেকে রেখেছ।'

এক টুকরো ম্লান হাসি খেলে গেল টেক্সির মুখের উপর দিয়ে।

'তোমার কথাই হয় ত ঠিক বন্ধু! চল বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। তার পর তোমায় একটা গল্প শোনাব!'

ইতস্ততঃ খানিকক্ষণ ঘুরে দু'জনে আবার দোকানে ফিরে এল। টেক্সি দোকানের এক গুপ্ত স্থান থেকে সূক্ষ্ম কাজ-করা রেশমী কিমানো, একগোছা হলদে চুল, একজোড়া 'গেটা' আর একটা আয়না বের করে আনল। কিন্তু সেগুলির দিকে তাকিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল টেক্সি: তার পর প্রদীপের সলতেটা উসকে দিয়ে বলতে সুরু করল—

'অনেকদিন আগেকার কথা। এক রাতে মুকুল-ছাওয়া বাদাম গাছগুলি দেখে আমার মনে এক অদ্ভুত আনন্দের উদ্রেক হয়। একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ভগবান বুঝি প্রকৃতিদেবীর অকৃপণ দান আমার ছোট্ট অন্তরে ভরে দিয়েছেন। আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত আনন্দকে আরও উপভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর অপূর্ব্ব শোভা। দেখলাম বসন্তরাণী যেন পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সখীদের অনুপম সঙ্গীত আমার প্রাণে ঝঙ্কার তুলল। বুঝলে কোকো, ভালোবাসা মানুষকে কবি করে তোলে আর সেই সময় যদি প্রাণভরে প্রেমের অমৃত পান করা যায় তবে সারা জীবন তারই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

'তখন আমি সত্যি ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার সঠিক সংজ্ঞা দিতে না পারার অপরাধ নিও না। দুঃখময় অশান্ত জীবনকে শান্ত করে এই ভালোবাসা: একঘেয়ে একটানা জীবনে দেয় নূতনত্বের আস্বাদ!

'কি আকর্ষণে সুরী আমার কাছে এসেছিল জানি না। গরীব জেলের মেয়ে সে। মুখখানা কমনীয়তায় ভরা; বিনম্র স্বভাব; সরল আর উজ্জ্বল তার চোখের চাউনি। কেমন করে সে রূপের ছবি আঁকব কোকো! তখন সুরী আমাকে ঠিক ভালোবাসে না। আমি শুধু তার বন্ধু!···বন্ধু ঠিক নয়—খেলার সাথী বলতে পার।

'সুরীর কাছে কখন যে আমার মন বাঁধা পড়েছিল জানি না। কিন্তু টের যখন পেলাম তখন এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিয়ের কথা বলামাত্রই সে কিন্তু পালিয়ে যেত। কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসতে হাসতে হাজির হ'ত। তার সেই মধুর হাসির রূপ ভাষা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। এই ঘর এখনও যেন তার হাসিতে মুখর।

ধীরে ধীরে জানতে পারলাম আমার প্রণয়ে আরও এক প্রতিদ্বন্দ্বী এসে জুটেছে। তখন শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় বইতে লাগল প্রতিহিংসার স্রোত! ছলনা দিয়ে মনের ভাবকে ঢেকে রাখা কোন দিনই আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না! তখন কে জানত, প্রেমের খেলা দাবার মতই! সামান্য একটু ভুল চালে খেলা ভেঙে যায়?

সুরী আমার এই অহেতুক ঈর্ষাকে অন্যায় বলে মনে করে নি। সে আমার প্রতি আরও ভালবাসা দেখাতে লাগল—যাতে আমার মনের ভ্রম দূর হয় সে জন্যে। কিন্তু আমার দুর্ব্যবহার সুরীকে উদাসীন করে তুলল। একদিন সে আমায় বলল কি জান কোকো, সে বলল,—'টেঞ্জি! অবিশ্বাসের বীজকে মাথা তুলে বাড়তে দিলে তার ফল ভাল হয় না। কেন তুমি আমাকে সন্দেহ কর?'

'কিন্তু আমি তখন ঈর্ষার আগুনে তিল তিল করে পুড়ছি, তাই তার কথায় আমার সান্ত্বনা কোথায়? কল্পনায় কেবল দেখলাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সুকেমিটসুর চেহারা।'

'আর এক দিন সুরী এসে চাইল সুকেমিটসুর সঙ্গে নৌকা-ভ্রমণের অনুমতি!

'জান কোকো, সুরীর সেকথা আমার অন্তরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। মনের ভাব গোপন করে যাবার অনুমতি দিলাম। সেদিন থেকে তাকে ভুলবার, তাকে এড়াবার কত চেষ্টা করলাম। কিন্তু হায়! সবই বৃথা হ'ল!

'সুরী আর সুকেমিটসুর নৌকা ভেসে গেল নদীর বুকে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে তাই দেখলাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল এদের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষ হবে কোন অখ্যাত পল্লীতে। সেখানেই হবে তাদের পরিণয়। তার পর সুখে শান্তিতে কেটে যাবে ওদের বাকি জীবনটা···

'একমনে কতক্ষণ চিন্তা করেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখি নৌকা তীরের দিকে ফিরছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম সুকেমিটসু ধীরে ধীরে দাঁড় টানছে আর সুরী যেন স্থাণুর মত হাল ধরে বসে আছে। চাঁদের আলো সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। সুকেমিটসু সুরীর পাশে এসে বসে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। হাতের সে বাঁধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সুরী তাকে ধাক্কা দিতেই নৌকা উল্টে গেল।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে জামা-কাপড় খুলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু সুকেমিটসু আমাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে কেবলই চেষ্টা করতে লাগল। কতবার ডুবলাম, কতবার উঠলাম—তার ঠিক নেই। একবার মনে হয় সমুদ্রেই বুঝি আজ চিরনির্ব্বাণ লাভ হবে, কিন্তু কিছু দূরে নিমজ্জমান সুরীর কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ আমার কানে এসে পৌঁছতেই সুকেমিটসুকে বললাম, 'সুরী ডুবে যাচ্ছে, শীগগির ছেড়ে দাও আমাকে।'

উত্তর এল—'ডুবুক গে যাক্।'

অনেক চেষ্টা আর কৌশল করে তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সুরীর অচেতন দেহটা তীরে তুলে আনলাম। মুখ ফিরিয়ে জলের দিকে তাকাতেই দেখি এক বিরাট কুমীর প্রকাণ্ড হাঁ করে সুকেমিটসুর দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখখানা ভয়ে পাংশুটে হয়ে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই কুমীর তাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল তার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

এর পরের ঘটনার প্রায় কিছুই মনে নেই। তবে এটা বেশ মনে পড়ে, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলো তীরের দিকে ছুটে এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। আর আমি আমার শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ঢেউয়ের তালে তালে সুরীর দেহটাকে টেনে এনে তীরে উঠেছিলাম।···

সকালে জ্ঞান হতে দেখলাম আমি সেই সমুদ্রতটে পড়ে আছি, আর কে যেন কোমল স্পর্শ আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ মেলতেই সুরীর মুখখানা চোখে পড়ে গেল। আমার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে আছে সে। সমস্ত অন্তরটা অব্যক্ত বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। সুরীকে সামান্য ধন্যবাদ জানানোর ভাষাও খুঁজে পাই না। শুধু দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু। সুরী ফিস ফিস করে বলল, 'টেঞ্জি, সমুদ্র আজ আমাকে যে দুর্লভ জিনিস হাতে তুলে দিয়েছে তা হচ্ছ তুমি।'

টেঞ্জি হঠাৎ চুপ করে যায়।

কোকো এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, 'তার পর! নিশ্চয়ই তুমি সুখী হয়েছিলে।'

'না কোকো না।'—টেঞ্জি মাথা নাড়তে নাড়তে আবার বলতে সুরু করল—'সুরীকে বিয়ে করলাম বটে, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরে সে একদিন বলল, সুকেমিটসুর সঙ্গে নৌকাভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার জন্য নাকি আমার উপর তার ভালবাসা জন্মে যায়। বিয়ের পরের দিনগুলো হাসি আনন্দের মাঝে কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না। কিছুদিন বাদে সুরীর কোল জুড়ে আগমন হ'ল নবজাত শিশুর। আমাদের আনন্দ তখন ষোলকলায় পূর্ণ। তার নাম রাখলাম হাসনাহানা। সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে বাসায় এনে ফেলতে পারলে আর ভাবনা ছিল না। সুরী গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে পরিতৃপ্ত করত।'

'কোকো, এসব কথা এখন স্বপ্ন বলেই মনে হয়। একদিন কাজের চাপে অনেক দূর যেতে হয়েছিল। ফেরবার পথে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামছি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ বজ্রপাত হতে লাগল। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ! পৃথিবী যেন থর থর করে কাঁপছে। সমুদ্রের জল যেন উন্মত্তের মত লাফাচ্ছে! আমার পায়ের তলার মাটি থর থর করে কেঁপে উঠল। প্রবল তরঙ্গস্রোত বন্যার বেগে ছুটে এসে সমস্ত গ্রামখানাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি সজোরে একটা গাছকে আঁকড়ে ধরলাম। তা না হলে সে স্রোত আমাকে কোথায় ছিটকে নিয়ে যেত তার ঠিক নেই।

'ঝড় থেমে যেতেই দেখলাম বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বুড়ো-বুড়ীর প্রাণহীন দেহ জলে ভেসে যাচ্ছে। প্রাণের চেয়েও যারা প্রিয় তাদের দেখবার জন্ম জলকাদা ভেঙে ব্যাকুল চিত্তে ছুটে চললাম আমার সেই ছোট্ট বাড়ীর দিকে। গিয়ে কি দেখলাম জান কোকো? আমার সুখের মন্দির মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—ভগ্নস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে সুরী আর হানার প্রাণহীন দেহ!...'

বুড়ো টেঙ্গি আবার চুপ করে গেল। তার দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বেদনার অশ্রান্ত অশ্রুর ধারা। সুরীর কিমানোটা হাতে নিয়ে আকুল নয়নে দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে চোখে মুখে ফুটে ওঠে আনন্দ উৎসাহের দীপ্তি। বুঝলাম তার শোকের বেগ অনেকটা কমে এসেছে।

কোকো হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—'তোমাকে ও রকম দেখাচ্ছে কেন টেঙ্গি? তুমি কি কাউকে দেখতে পেয়েছ? শীগগির বল...'

টেঙ্গি আনন্দে লাফিয়ে উঠে ঘরের জানালাগুলো খুলে দিল। তারপর রাস্তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখ...দেখ...কোকো... তারা এগিয়ে আসছে। অনেকেই আছে দলে...লোকান্তরিত আত্মার কি ভিড়! পাহাড় ডিঙিয়ে...সাগর পার হয়ে...রাজপথ ধরে...ঐ যে ঐ যে, তারা এগিয়ে আসছে...। আমি নিশ্চিত জানতাম সে আসবেই...ঐ দেখ সুরীর কোলে হানা। কোকো... দেখ...দেখ সুরী কি সুন্দর দেখতে...চোখেমুখে কি রকম উজ্জ্বলতা...'

ঘরময় আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, টেঙ্গি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে সেই যে বসে পড়ল আর উঠল না। কোকো তাড়াতাড়ি আয়না, চুলের গোছা টেঙ্গির হাতে দিয়ে রেশমী কিমানোতে সমস্ত শরীর ঢেকে দিল।

বুড়ো টেঙ্গি এত দিনে চরম শান্তি পেয়েছে, সে বিষয়ে কোকোর আর কোন সন্দেহ থাকে না।

উমেশচন্দ্র রায়

শ্রীপঞ্চানন রায়, কাব্যতীর্থ

১৮৩৫ সনে পারিবারিক বিপর্যায়ে উমেশচন্দ্র রায় বিহার-প্রবাসী হন। মজঃফরপুর শহরে ফার্সী শিক্ষা করিয়া এখানেই ওকালতি আরম্ভ করেন। ঐ শহরের বর্ত্তমান কেদার-নাথ রোডে বিরাট বসতবাটী ও অন্যত্র বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া ১৯১৫ সনে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ স্থানে বাস করেন। তাঁহার আগমনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই সরকারী কর্ম্মসূত্রে এক দল বাঙালী এখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন উমেশচন্দ্রের মাতুলস্থানীয়। উমেশচন্দ্র খেয়াযোগে বিশাল পদ্মানদী পার হইয়া কাটিহার পথে ঐ শহরে উপনীত হন। পাচকের কাজ করিতে করিতে তিনি ফার্সী শিক্ষা করেন। ঐ ভাষায় আইন পড়িয়া তিনি 'বারে'র সভ্য হন। এই সময় দুইটি ঘটনা তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়া দেয়। একদিন খেয়াযোগে নদী পার হইতে-ছিলেন। জজ সাহেবের স্ত্রীও সেই খেয়ায় ছিলেন, মাঝ-নদীতে হঠাৎ জলে পড়িয়া যাইবার মত হইলে উমেশচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া রক্ষা করেন। তিনি স্বামীর নিকট সুপারিশ করিয়া উমেশচন্দ্রের পসার বৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দেন। ঐ সময় জনৈক হিন্দু জমিদারের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া দুই পক্ষ মামলা করেন। উহার এক পক্ষ মুসলমান। এই পক্ষ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, স্বর্গীয় জমিদারের সম্পত্তি তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বেই আছে। কিন্তু খাতাপত্রে গণেশজীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। উমেশচন্দ্র ঐ বিষয়ে বিচারকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলেন, "মুসলমান কর্ত্তৃত্বে থাকিলে খাতায় কখনই গণেশজীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে পারিত না। অতএব উহা নিশ্চয়ই হিন্দু-পক্ষের ব্যবস্থাধীনে আছে।" বিচারক যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া হিন্দুপক্ষকে উত্তরাধিকার দেন। তদবধি উমেশচন্দ্রের প্রভাব বাড়িতে থাকে। দ্বারবঙ্গের মহারাজা প্রভৃতি ভূস্বামীগণ তাঁহাকে নিজ উকিল নিযুক্ত করেন। অল্পকালেই তিনি তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন।

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চেতুয়াবাসুদেবপুর গ্রাম উমেশচন্দ্রের জন্মস্থান। এই গ্রামের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কাশ্যপ দত্তবংশীয় মুরলীধর সম্ভবতঃ বাংলার শিবাজী রাজা

শোভাসিংহের প্রপিতামহ রাজা রঘুনাথ সিংহের (শহীদ ক্ষুদিরামের ভগ্নীবাড়ী হাটগেছে রায়বংশে এই রাজার সন ১০২১।১৫ ভাদ্র তারিখের ছাড় আছে) সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ঠেঙ্গাপুর বা মীরণপুর হইতে রাজকর্ম্মসূত্রে এখানে আসিয়া বাস করেন ও চেতুয়া পরগণার ছয় আনার মালিক

উমেশচন্দ্র রায়

হন। এই সময় ইঁহাদের উপাধি হয় রায়চৌধুরী। মুরলী-ধরের পুত্র দামোদর রায়চৌধুরীর নিকট হইতে রাজা হেমন্ত সিংহ সন ১১১৬ সালের ২৩শে বৈশাখ এই জমি-দারী লইয়া ইঁহাদের গৃহদেবতা শ্রী৺রাধাবল্লভ জীউ প্রভৃতির সেবার জন্য বাসুদেবপুর প্রভৃতি সাতটি গ্রামে এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। বাসুদেবপুরের বেড়বাড়ী ও মহাত্রাণ গড়বন্দী ইহার সামিল। পরবর্ত্তী ভূস্বামী সন ১১২৩।৩১ চৈত্র এই দান মঞ্জুর করেন। চেতুয়া পরগণার দামোদরপুর গ্রামটি ইহার নামেই হওয়া সম্ভব। দামোদরের ভ্রাতা হরেকৃষ্ণের পুত্র রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাপ রায় ও কনিষ্ঠ মদনমোহন রায়। গোলাপ রায় বা গুলাব দত্ত বাসুদেবপুর হাটে ইসলামীয় রীতির দেউলটি নির্ম্মাণ করান। বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র বাং ১১৬৩।১১ চৈত্র ও ১১৭২।১৩ ফাল্গুন দুইটি সনন্দ দ্বারা ইঁহার পৈতৃক মহাত্রাণ নিষ্কর দখল মঞ্জুর করেন। গোলাপের পাঁচ পুত্র—পঞ্চানন, জগৎ, নয়নানন্দ, রামশঙ্কর ও ভক্তরাম। মদনের পুত্রদ্বয় গয়ারাম ও দেবীচরণ। ১২০৯ সালের ৫২৫৬৭ ও ৫২৫৭১ নং তায়দাদদ্বয় জগৎ, ভক্তরাম, গয়ারাম, পঞ্চানন প্রভৃতির নামিত। ব্রিটিশ সরকার উহাতে এই বংশের দেবোত্তর, মহাত্রাণাদি স্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

গোলাপের চতুর্থ পুত্র রামশঙ্করের তিন পুত্র কৃষ্ণকান্ত, নবকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ। কৃষ্ণকান্ত অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বাবধি এই বংশে দৈনিক এক শত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণকান্ত স্বীয় বদান্যতায় বহু পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। নিম্বার্কমঠের তৎকালীন মহান্ত চতুরশরণ ও চৈতন্যশরণ এই সম্পত্তির ক্রেতা। কৃষ্ণকান্তের পুত্রদ্বয় মহেশ ও উমেশ। পারিবারিক বিপর্য্যয়ের সময়ে ১৮৩১ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। কৃষ্ণকান্ত এই সময় নিঃস্ব হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হন ও বর্দ্ধমানরাজ তেজেশ-চন্দ্রের রাজধানীতে কোন মন্দিরে কার্য্য গ্রহণ করিয়া অজ্ঞাত-বাস করিতে থাকেন। নিজের বেতন হইতে দৈনিক এক টাকা দান না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। তিন লক্ষ টাকা সঞ্চয়ের পর উমেশচন্দ্র পিতার সন্ধানে বহির্গত হন ও বর্দ্ধমানরাজের সহায়তায় নাটকীয় ভাবে পিতাপুত্রের মিলন ঘটে। পিতাকে স্বগ্রামের বাস্তুতে বাস করাইয়া উমেশচন্দ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ, প্রাচীন মণ্ডপাদি সংস্কার, পুষ্করিণী খনন ও সোপান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করাইয়া দেন। নাড়াজোল রাজবংশের অংশ জোড়াগেড়ে মহাল খরিদ করান ও বাসুদেব-পুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের পত্তনীস্বত্বের মালিক করিয়া দেন।

কৃষ্ণকান্ত গ্রামে হাট স্থাপন করেন। নিজে সাহায্য করিয়া তিনি গ্রামের সকল জাতির দ্বারা দুর্গোৎসব করাই-তেন। এই সময় বাগদী, দুলে ও হাড়িরাও তাঁহার সাহায্যে দুর্গোৎসব করিত। সর্ব্বসমেত গ্রামে পঁচিশখানি প্রতিমা হইত। উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের ছাত্র কলমিজোড়-নিবাসী পণ্ডিত লক্ষ্মণ শিরোমণির (ইং ১৮৯২ এর টোলের তালিকায় ইঁহার নাম আছে) দ্বারা নিজ বংশের দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিখাইয়া কৃষ্ণকান্ত সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। কয়েক দিন ধরিয়া ভূরিভোজনের ব্যবস্থায় দিবারাত্রির মধ্যে লুচির কড়া চুল্লী হইতে নামিত না। গ্রামবাসিগণের ঘরে ঐ কয়দিন হাঁড়ি চড়িত না। প্রতি পূজাবাটীতেই সকলের নিমন্ত্রণ তিন দিনব্যাপী। পূজার সর্ব্বপ্রকার যোগানদারগণের জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। সপ্তমী, সন্ধি ও নবমীতে বলিদান হইত। বাদ্যধ্বনির সঙ্কেতে ৺জয়চণ্ডীর আরতি, তাহার

সঙ্গে বেথুয়াবাটীর কালীমন্দিরে বলি ও সেই সঙ্গে পরগণার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের সকল প্রতিমারই সন্ধিপূজা নিয়ন্ত্রিত হইত। সন্ধির সময় পাটের কাঠি, সোনার শাঁখা, পাড়শখা, মোমবাতি ও মিঠাই নিবেদন করিবার প্রথা ছিল। নবমীর রাত্রে শিবাভোগ ও দশমীতে বিসর্জ্জনের পর রাত্রিকালে দক্ষিণান্তে ও জ্যেষ্ঠক্রমে অপরাজিতা-বন্ধন হইত। কয়েকটি ব্রাহ্মণ-পরিবার পূজার বস্ত্রগুলি বৃত্তিস্বরূপ পাইতেন। ইহার অবশিষ্ট সকলই পুরোহিতগণের প্রাপ্য ছিল। প্রতিমার গণেশ ও কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপবিভাগে থাকিতেন। চেতুয়ার দাসপুরের চৌধুরী, বলিহারপুরের রায় (সৌকালিন ঘোষ), রাধাকান্তপুরের তালুকদার, বসু ও সয়লার সিংহ বংশেও এই রীতিতে প্রতিমার দেবতা-বিন্যাস-বিধি। বসুবংশে "কায়স্থ কুলদর্পণ" নামক প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল—উহা মুদ্রিত হইয়াছে। বাসুদেবপুরে দেশনালার উপরিস্থ পাকা পুল ও হেছুয়ার ঘাটের পাশের অষ্টশাল চতুষ্টয় রায়কুলের কীর্ত্তি। বিজয়ার মহামেলাও কৈলাস মুখোপাধ্যায় এবং উদয় রায় স্থাপন করেন।

উমেশচন্দ্রের বিহার গমনের পূর্ব্ববৎসরই বাসুদেবপুরে প্রথম শ্মশানকালী পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। ১২৪২ সালে কৃষ্ণকান্ত নিরুদ্দিষ্ট হইলে মহেশ ও উমেশ মাতার অধীনে পৃথগন্ন হন। ঐ বৎসরই উমেশচন্দ্র ভাগ্যান্বেষণে বিহার গমন করেন। ১২৪১ সালে ঐ পূজা আরম্ভ ধরিয়া আমি ঐ পূজার বয়স পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। বারোয়ারীর খাতাতেও ঐ বয়স আমার আমল সন ১৩৪৬ সাল হইতেই লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই পূজায় আলিপনা, পঞ্চগুঁড়ি, বরণডালা ও দক্ষিণান্ত রায়বংশের বৃত্তি। নানা সাধারণ সৎকার্য্যেও কৃষ্ণকান্ত অগ্রণী ছিলেন। ঐ সকল সৎকর্ম্মের মূল উৎস ছিলেন উমেশচন্দ্র। সমাজের কর্ত্তৃত্ব করিতেন কৃষ্ণকান্ত। ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকেই তাঁহার নিকট হইতে অশৌচান্তে অনুমতি লইতে হইত। সরকার নিযুক্ত প্রধান বিচারক বা সালিস ছিলেন তিনিই। তাঁহার বিচারের একটি নথি এবং রায় এখনও আমাদের নিকট আছে। অধ্যাপক-সমাজ তাঁহার সময় পর্য্যন্ত বার্ষিক সম্মান পাইতেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের কণাদবংশীয় হরদাস তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণকে লিখিত একটি পত্রে ঐ মানের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণকান্ত কর্ত্তৃক নিষ্কর দানের একটি সনন্দ বিদ্যালঙ্কার-বাটীতে আছে। সামাজিক আচার আচরণ প্রভৃতির তিনিই ছিলেন আদর্শ।

সন ১২৭৭ সালের চৈত্র মাসে কৃষ্ণকান্তের লোকান্তর হইলে যে দানসাগর শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে অধ্যাপক-বিদায়ের অধ্যক্ষতা করেন লেখকের পিতামহ সুরনাথচূড়ামণি। ইনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়চন্দ্র ন্যায়ভূষণের একমাত্র পুত্র। এই শ্রাদ্ধসভায় সমবেত অধ্যাপকগণ ইহাকে চূড়ামণি উপাধি প্রদান করেন। বারাণসী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের শত শত অধ্যাপক আমন্ত্রিত হন। বাসুদেবপুর, চাঁদপুর, রাধাকান্তপুর, বলিহারপুর, হাটগেছে প্রভৃতি গ্রামের সকল বৈঠকখানাগুলিই অধ্যাপকগণের অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোচ্চ বিদায় ছিল দুই শত টাকা, পাথের এক ভরি সোনা, তৈজস, ছাত্র ও ভৃত্যবিদায় আর সিধা। যোড়শের একটি খাট এখনও লেখকের বাটিতে আছে। কাঙালী-ভোজনের সময় মুড়ি ও মুড়কি পড়িয়া প্রায় এক পোয়া পথ আচ্ছন্ন হয়। ভূরিভোজনের প্রচুর ব্যবস্থাসমেত এরূপ শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে আর হয় নাই। সমগ্র পরগণাবাসী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ইহাতে আহূত হইয়াছিলেন। গ্রামের শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকান্তের পুণ্যের পরিচয় আপনি আর আপনার পুণ্যের পরিচয় আপনার পুত্রগণ"—পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।"

মুর্শিদাবাদ-কান্দীর সন্নিহিত যজান গ্রামবাসী বিশ্বেশ্বর ঘোষের সহিত উমেশচন্দ্র মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দেন। ঐ গ্রামেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মী রামকমল সিংহের নিবাস। উমেশচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীরাখালদাস ঘোষ, বি-এ বৃন্দাবন ও অনূপসহরে লালাবাবুবংশীয় কুমার জগদীশ সিংহের জমিদারীর কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীশৈবালকুমার ঘোষ, বি-এসসি, এল-টি মথুরা নেতাজী সুভাষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বর্ত্তমানে বিন্ধ্যপ্রদেশের সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। রমেশচন্দ্রের সময় বাসুদেবপুরের দক্ষিণ রাঢ়ীয় দত্তবংশের কুমুদনাথ রেভিনিউ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনিই প্রবাদবাক্যের "বাবু দত্ত কুমুদনাথ, সুবা বাংলা যাঁহার হাত, ইচ্ছা হলে দিনকে যিনি করতে পারেন রাত"। সেরেস্তাদার কুমুদনাথের পৌত্র গজেন্দ্রনাথ কলিকাতা বড়বাজার ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। উমেশবাবু ও কুমুদবাবু দুর্গাপূজার সময় চৌবট্টিখানি পালকিযোগে উলুবেড়িয়ার ষ্টীমারঘাট হইতে বাড়ী আসিতেন। বাড়ী আসিয়া উমেশচন্দ্র সকল জাতিরই ঘরের কুশলাদি লইতেন। সাধ্যমত সকলেরই অভাব অভিযোগ পূরণ করিতেন। প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। ভ্রাতুষ্পুত্রের দুর্ব্যবহারে উমেশচন্দ্র শেষে পত্তনীস্বত্ব ছাড়িয়া দেন।

পুরোহিত-বাটীতে উমেশচন্দ্র সাগ্রহে প্রসাদ পাইতেন। কখনও-বা একজন গৃহদেবতাগণের সেবায়েত-বাটীতে প্রচুর সিধা পাঠাইয়া দিতেন। রায়গুণাকর বংশীয় পুরোহিত ন্যায়ভূষণের পৌত্র মহানুভব সতীশচন্দ্র রায়কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুরনাথ চূড়ামণিও সতীশচন্দ্রকে স্বহস্তে নহি

করিয়া কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ উপহার দেন। ১৩১৪ সালে তাঁহার আহ্বানে সতীশচন্দ্র মজঃফরপুর গেলে তিনি কোন শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে কাশ্মীরী শালজোড়া, বিবিধ তৈজস উপহার দেন। ঐ শালজোড়া ও বৃহৎ সামিয়ানা কোন রাজা মামলায় জয়লাভ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সামিয়ানাখানি গ্রামের সকল বৃহৎ কাজকর্ম্মে ব্যবহৃত হইত। গ্রামের শিক্ষিত ও বৃদ্ধ সকলকেই তিনি বহু প্রীতি-উপহার দান করিতেন।

উইলে তিনি বিবিধ সৎকার্য্যে দান করিয়া যান। রাইন গোপালনগরের উমেশ গ্রন্থাগার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। কোন পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে গোপালনগর গেলে উক্ত গ্রামবাসিগণের অনুরোধে তিনি ঐ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার বর্ত্তমান পুলিস কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী তাঁহার নিকট-আত্মীয়। উমেশচন্দ্রের খুল্লতাত প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাজচন্দ্রের দুই পুত্র, ব্রজেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। ব্রজেন্দ্রবাবু বি-এ পাস করিয়া অকালে গত হন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু বিহার পূর্ত্তবিভাগের এস-ডি-ও হন। ১৩৫৪ সালে তিনি লোকান্তরিত হইলে "সার্চ্চ লাইট" পত্রিকা আবেগময়ী ভাষায় শোক প্রকাশ করেন। কেবল এই ভ্রাতুষ্পুত্রগণই নহে—অন্যান্য বহু আত্মীয় ও স্বজাতীয় উমেশচন্দ্রের সাহায্যে সুশিক্ষিত হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চারি পুত্র সুশীল, সুধীর, সুনীল ও সুবোধকুমার উচ্চশিক্ষিত ও বিহার সরকারে কর্ম্মে নিযুক্ত। ইঁহারা ডিহ্‌রি-অন-শোণের শিবগঞ্জবাসী।

১৩২২ সালের ৩০শে আশ্বিন রবিবার (১৭ই অক্টোবর, ১৯১৫) বিজয়া দশমীর দিন উমেশবাবু পরলোকগত হন।

এক দিন

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

একেক দিন আসে যেন সে কবেকার
হারানো অতীতের নীরব বেদনায় স্মৃতির সুধাভরা,
যেন সে পাড়াগাঁর আবেশ-বিহ্বল লাজুক রূপবতী—
গভীর মমতায় দু'চোখ ভরো ভরো
অধর কাঁপে তার আবেগে থরো থরো
প্রথম প্রকাশের নিবিড় নিরালায়।

এমন দিন আমি কখনো চেয়েছি কি
কখনো মনে মনে অথবা কথাতেও?
তবু এ সকালের পাখীর ডানা বেয়ে নরমমিঠে রোদে
সবুজ ধান-ক্ষেত শিশির ভেজা সেই সবুজ সাড়িটিতে
সে এসে উঁকি দেয় ডাগর চোখে চেয়ে
নীরব এ-মনের নিভৃত জানালায়।
আধেক জেগে থাকা, আধেক ঘুম ঘুম
কী এক শিহরণ—
সে যেন ভীরু হাতে প্রথম সেতারের
সলাজ আলাপন!
তখন মনে হয় হৃদয় ডানা মেলে
হাল্কা মেঘ হয়ে শরৎ আকাশের
কোথাও উড়ে যাক—
কোথাও নিঃসীম সুদূর ঠিকানায়;
তখন মনে হয় চেয়েছি এই তো,
চেয়েছি কত শত হারানো দিবসের
সে-দিন-রজনীর জীবন-বাসনায়।
বুঝেছি এ-হৃদয় আশায় বেঁধে বুক
ফিরেছে খুঁজে যাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে
সারাটা দিনমান, আকুল পথ চেয়ে—
আসে না আসে না সে; মিলনের লগ্ন বিকলে বয়ে যায়।

শিৎস, সুইজারল্যাণ্ড

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

নয়

২৭শে মে, '৫৪। কাশ্মীর যদি ভূস্বর্গ হয়, সুইজারল্যাণ্ড তা হলে স্বর্গই। যে দেশের এমন বিপুল সৌন্দর্য্য-সম্পদ, যেখানে চার পুরুষ ধরে শান্তির ফোয়ারা বইছে, সে দেশ স্বর্গ নয়ত কি!

সুইজারল্যাণ্ডে সাধারণতঃ লোকে বেড়াতেই আসে। অবশ্য বেড়ানোর আবার অনেক রকমফের আছে। আমেরিকান টুরিষ্ট ডলার ছিটিয়ে ছড়িয়ে উড়ে উড়ে চলে। আর ইংলণ্ডে পাঠরত ভারতীয় ছাত্র কন্টিনেণ্টে বেড়াতে আসে সারা বছরের জমানো পয়সায়। সে এক জায়গায় দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপভোগ করতে চায়।

বেড়ানো ছাড়া সুইজারল্যাণ্ডের আরও অন্য আকর্ষণ আছে। বিত্তশালী এশিয়াবাসীরা এখানে আসে এপেণ্ডিসাইটিস অথবা চোখের ছানি কাটাতে। উৎসাহী যুবক-যুবতীরা শীতের দিনে নিরিবিলি ঘরের কোণ ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডে আসে বরফের উপর স্কি ও স্কেট করতে। টুরিষ্টস লিটারেচারে ল্যাণ্ড পেলিজের দাগ দিয়ে অনেকে উঠতে আসে ইয়ুংফ্রাও-য়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান প্রধান দেশের কূটনীতিবিদরাও এখানে হামেশাই হাজির হন বৈঠক করতে। আর যত বিদেশী এদেশে আসে সবারই একটা গৌণ উদ্দেশ্য থাকে ঘড়ি কেনা।
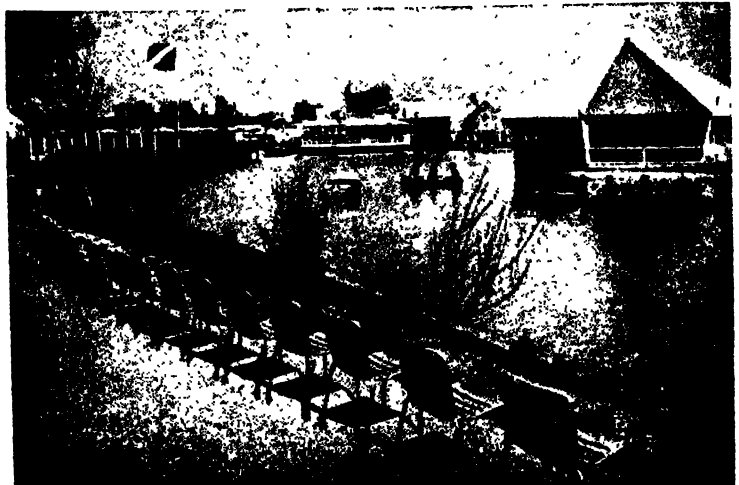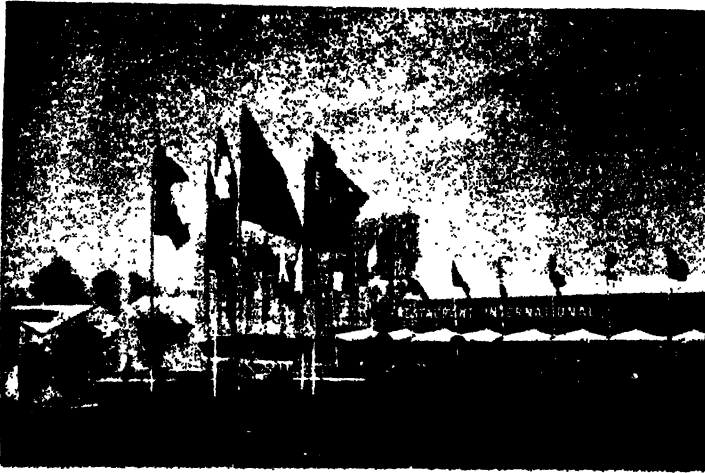
ইণ্টারন্যাশনাল জুরিখ এগজিবিশনে কৃত্রিম হ্রদ

ইণ্টারন্যাশনাল কুকারি এগজিবিশনে আন্তর্জাতিক রেস্তোরাঁ, বার্ন

আমরাও চলেছি 'বার্ন'এ। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইণ্টারন্যাশনাল কুকারি এগজিবিশন দেখা।

আজকের প্রগতিশীল এগজিবিশন-জগতে শুধু ছবি, ফোটো কি বাগবাজারের সার্বজনীন পাঁচমিশেলী পূজা-প্রদর্শনী নয়, এখন ক্যালেণ্ডার, পুতুল, কোদিত্ত এবং খচিত কাঠের গুঁড়ি ও ডাল, ছেঁড়া কাগজের তৈরী জিনিষপত্র, বইয়ের প্রচ্ছদপট, এ সবেরও প্রদর্শনী বেশ জাতে উঠেছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক রান্নার প্রদর্শনীর কথা কোন কালেও শুনি নি। গতকাল টমাস কুকের আপিসে শুনে আজই আমরা বার্নের টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে বসেছি।

ইটালীর সীমান্ত-ষ্টেশন দোমোদসোলায় কণ্ডাক্টরটি ইংরেজী, ইটালীয়ান, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান চারটে ভাষায় যেন মুখস্থ আওড়াল—পাসপোর্ট ও যে সব মালপত্র শুল্কবিভাগকে দেখিয়ে নিতে হবে সেগুলো তৈরি করুন।

পাসপোর্ট এবং ওসব হাঙ্গামার পাট চুকল। কণ্ডাক্টর বদল হ'ল, বোধ হয় ড্রাইভারও। ট্রেন চলতে সুরু করলে একটি সুইস মেয়ে ট্রলী ঠেলে চকোলেট বেচতে এল।

খাবার জিনিসের মধ্যে সুইস 'চীজ'টার সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের কোন্ জমিতে যে কাকাও গাছ জন্মায় সেটাই আঁচ করবার চেষ্টা করছিলাম। গরম দেশের গাছ ওটা। পরে অবশ্য ঐ সুইস মেয়েটিই বলেছিল, সুইজারল্যাণ্ড মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কাঁচা চকোলেট কেনে। তার পর দুধ মিশিয়ে অথবা দুধ ও বাদাম মিশিয়ে চকোলেট-বার তৈরি করে। অপূর্ব্ব সুস্বাদু! তৈরির চাতু বটে।

মেয়েটির কাছ থেকে চকোলেট কিনে আমরা ত একমুহূর্তেই নিঃশেষ করেছি। খানিক পরে দেখি মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে। জিজ্ঞেস করল—কেমন লাগল?

কারনাগো বলল, "ইটস সুইট জাষ্ট লাইক ইউ, হানি।"

ইন্দ্র বলল, দেখ, এটা মিলান নয়। ঐরকম রসিকতা চলবে না।

মেয়েটি কারনাগোকে বলল, "দেন হ্যাভ সাম মোর"—'তা হলে আরও কিছু নাও।'

মেয়েটির সঙ্গে কারনাগোর আরও কিছু কথাবার্ত্তা হ'ল। তার একটি কথার জবাবে কারনাগো গলা বাড়িয়ে কিছু বলার আগেই মেয়েটি ট্রলি ঠেলে চলে গেছে।

ইন্দ্র বলল, বলেইছিলাম ত, এটা মিলান নয়। কেমন হ'ল?

আমি এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ও দর্শক ছিলাম। এবার কারনাগোকে একটু সহানুভূতি জানালাম—এক মাঘে শীত পালায় না, কি বল কারনাগো। দধীচির হাড় আমাদের চাই না। ঐ চকোলেটই আমাদের বজ্র হবে।

হঠাৎ মনে হ'ল সূর্য্য যেন নিভে গেল। চারদিকে ঘনীভূত অন্ধকার। কিন্তু সে মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্যে। হঠাৎ আবার দপ করে কামরার আলোগুলো জলে উঠল। বুঝলাম 'সিম্প্লন পাস'-এ ঢুকেছি। চকোলেট-বাহাদুরো আল্পসের টানেলটার কথা খেয়ালই ছিল না।

একটানা একটা গম্ গম্ শব্দ হয়ে চলল।

টানেলের ওপারে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত-ষ্টেশন ব্রিগ। ওখানে আর এক দফা পাসপোর্ট মালপত্র নিয়ে বোঝাপড়া হ'ল। ভারতীয় আমরা কি জানি কেন সব জায়গাতেই চটপট রেহাই পেয়ে যাচ্ছিলাম। অনেক ভেবেও কারণ খুঁজে পাই নি।

বার্নের ইয়ুথ হোষ্টেলে গিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাড়ল। ইন্দ্রর বয়স পঁচিশের উপরে। ওর ইয়ুথ বুঝি প্রায় অতিক্রান্ত। তাই ওকে ইয়ুথ হোষ্টেলে থাকতে দেওয়া হ'ল না। এমন চমকপ্রদ অভিনবত্বের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ইন্দ্র অগত্যা কাছাকাছি একটা হোটেলে আশ্রয় নিল। আমি আর কারনাগো ইয়ুথ হোষ্টেলেই বাসা বাঁধলাম।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বার্ন শহরের গোড়াপত্তনের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত শহরটি যে ভাবে গড়ে উঠেছে, ঠিক সে ধারাটুকু বার্নের বাসিন্দারা সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। পুরোনো বলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন কিছু করার প্রয়াস এখানে নেই। এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাটি সত্যিই চোখে পড়ার মত।

শহরটি ছোট। ঘণ্টাতিনেক হেঁটে বেড়ালেই দর্শনীয় জিনিস-গুলো দেখা হয়ে যায়।

সকলের আগে উল্লেখ করতে হয় শহরের সেরা ক্লক-টাওয়ারটির কথা। ঘড়ির ঘণ্টাটি যখন বাজে, তখনকার সেই 'কিলাম-প্লে'

দেখার জন্যেই বিদেশীরা বার্নে আসে। দুপুর বারোটায় স্বভাবতঃই টাওয়ারের আশেপাশে ভিড় হয় বেশী। ঘন্টাটা যে বারো বার বাজবে।

বেয়াটুস হোলেনের গুহায় "ষ্ট্যালাকমাইট"

ঠিক ঘণ্টাবাজার আগে ক্লক-টাওয়ারের মোরগটি ডেকে উঠে। 'ফাদার টাইম' 'আওয়ার-গ্লাস' ঘুরিয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে মুখ নেড়ে ঘন্টা গোনে। সিংহ মাথা ঘুরিয়ে 'ফাদার টাইম'-এর দিকে চেয়ে থাকে। নীচে কতকগুলি ভালুক বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। উপরে সোনার বর্মপরা এক নাইট হাতুড়ি দিয়ে ঘণ্টা বাজায়।

মধ্যযুগের স্থাপত্য-শিল্পের একটা আশ্চর্য্য নিদর্শন হ'ল বার্নের আর্কেডগুলি। প্রত্যেক রাস্তার দু'পাশে বাড়ীগুলির নীচ দিয়ে চলে গেছে লম্বা টানা আর্কেড। পথের গাড়ী-ঘোড়া, হট্টগোল বাঁচিয়ে বেশ নিরিবিলিতে বিপণি-সজ্জা দেখে বেড়ানো যায়, নয়ত দল পাকিয়ে গল্পগুজবও বেশ জমে। শীতের দিনে আবার বরফের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়।

বার্ন শহরের আরও একটি বিশেষত্ব হ'ল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফোয়ারা ও জলাধারগুলি। জলাধারগুলির মাঝখান থেকে একটি করে থাম উঠেছে। থামের মাথায় একটি করে বিশেষ কারও মূর্ত্তি।

অনেক দিন আগে যে-সময়ে বাড়ীতে বাড়ীতে কলের জল পাওয়া যেত না, সেই সব দিনে জলের প্রয়োজন মেটাত ঐ ফোয়ারাগুলিই। ওগুলি তৈরীও হয়েছিল ঐ উদ্দেশ্যেই। তখন গল্পগুজব করার ও খবরাখবর নেওয়ার কেন্দ্র ছিল ঐ ফোয়ারাগুলি। গিন্নীরা জল নিতে এসে সংসারের সুখ-দুঃখ নিয়ে মনের কথা আলোচনা করত। বেশ মনে হয় ঐ ফোয়ারার চারপাশ তখন গুঞ্জনমুখর হয়ে থাকত।

আর আজ ফুলের চারা লাগিয়ে, মূর্ত্তি ও থামগুলি রংচঙে করে ফোয়ারাগুলিকে আরও দর্শনীয় করে তোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রাণ-স্পন্দন আজ আর নেই। বিদেশীরা দু'চারবার ফোয়ারাগুলির
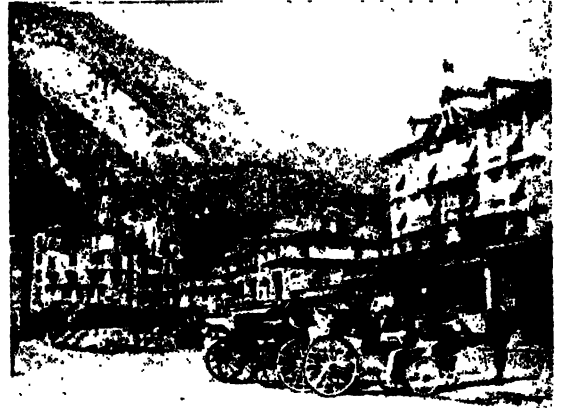
ইণ্টেরলাকেনের অপর একটি দৃশ্য

দিকে তাকায়। স্থানীয় অধিবাসীরা হয়ত ওদিকে তাকাবার ফুরসতই পায় না। আধুনিক ব্যস্ত জীবন পেছনের দিকে তাকাবার সে সুযোগই দেয় না।

২৮শে মে '৫৪। ইণ্টারন্যাশনাল কুকারি এগজিবিশন দেখতে সকাল সকালই প্রদর্শনী-চত্বরে ঢুকে পড়লাম।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেশ ছড়ানো প্রদর্শনী। প্রদর্শনী গৃহ-গুলির আকৃতি ও গঠনে শুধু পারিপাট্যই নয়, নানা রঙের ব্যবহার এবং সৌসামঞ্জস্যও লক্ষণীয়।

প্রদর্শনীর মধ্যেই ঘুরে বেড়ানোর জন্য ডিজেল-চালিত ছোট্ট ট্রামগাড়ী, নৌকা চালাবার জন্যে একটা কৃত্রিম হ্রদ, হ্রদের মাঝখানে ভাসমান রেস্তোরাঁ—এক কথায় একঘেয়েমি এড়াবার মত সব ব্যবস্থাই আছে।

ঘুরে ঘুরে, বাড়ীতে রান্না, রেস্তোরাঁর রান্না, রেস্তোরাঁ-গাড়ী, রান্না সম্বন্ধে বিস্তর বইপত্র, আন্তর্জাতিক রন্ধনপদ্ধতি ইত্যাদি সবই দেখা হ'ল, মাঝে মাঝে রান্না চাখাও গেল।

সবচেয়ে ভাল লাগল ইণ্টারন্যাশনাল রেস্তোরাঁ। ওখানে বিভিন্ন দেশের পাচকেরা নিজের নিজের দেশের সেরা খাবারগুলি রান্না করে দর্শকদের খাওয়াচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় সবকিছু দেখা শেষ করে এনেছি ঠিক

ইণ্টেরলাকেন, সুইজারল্যাণ্ড

স্পিৎস থেকে আবার বোটে চড়লাম। ষ্টেশনে মালপত্র জমা দিয়ে রেখে এসেছি। সন্ধ্যা ছ'টায় স্পিৎস থেকেই মিলানের গাড়ী ধরতে হবে। এখন চলেছি ইণ্টেরলাকেনে।

ইন্দ্র এতক্ষণ কোথায় ছিল কি জানি। হঠাৎ এসে বলল—বেয়াটুস হোলেনে নামতে হবে। ইণ্টেরলাকেন পরে যাব।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কেন, কেন কি আছে বেয়াটুস হোলেনে?

ইন্দ্র বলল—পাহাড়ের ভেতর নাকি একটা অদ্ভুত গুহা আছে। দেখার জিনিস।

—তা বেশ ত চল। কিন্তু বরুল পরে গুহাতেই থেকে যেও না আবার।

বেয়াটুস হোলেনের গুহাটা সত্যিই দেখবার মত। গুহার ভেতরে আছে হাঁটবার অনেকগুলি রাস্তা, নানা রকম জলের উৎস অপূর্ব্বসুন্দর ষ্ট্যালাকটাইট ও ষ্ট্যালাকমাইট—তার মধ্যে কতকগুলি আবার একেবারে স্বচ্ছ। উৎস-মুখে আছে রঙীন আলোর ঝলকানি, স্বচ্ছ ষ্ট্যালাকটাইটের পেছনে আছে সরু একফালি তীব্র রশ্মি, আবার কোথাও জমা জলের নীচে এক আঁজলা ছড়ানো আলো। প্রাকৃতিক সম্পদকে কৃত্রিম আলোর আবরণে দিয়ে আরও সুন্দর করা হয়েছে সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে।

গুহা থেকে আমরা সবাই আর একটা বোটে চেপে ইণ্টের-লাকেনে এলাম—সবই ফেরী-বোট।

ইণ্টেরলাকেন ছোট শহর। কিন্তু একেবারে আদর্শ শহর বললেই হয়। এই শহরের ছবি আমার মনে গভীর ভাবে গেঁথে আছে। আর কোন শহর এত ভাল লাগে নি।

রাস্তাগুলি ঘরের মেঝের মত ঝকঝকে। দোকানগুলি টুরিষ্ট-দের কেনার মত জিনিসে ভর্ত্তি। সাজানোও এমন লোভনীয় ভাবে যে হাতদু'টা আপনিই মানিব্যাগ হাতড়ে বেড়ায়।

শহরের প্রধান প্রমিনেডটাতে ফুলে ও প্রজাপতিতে রামধনুর রঙের বাহার। ফোয়ারা আছে ওরই মাঝে, মূর্ত্তিও আছে।

ট্রাম-বাসের ভিড় নেই। পথচারীর ঝাঁক নেই। নেই পদে পদে বার ও রেস্তোরাঁর প্রাচুর্য্য।

শহর ছোট হলেও আধুনিকতম। সুইমিং পুল, গ্যাম্বলিং, কাসিনো, নাচঘর, টেনিস কোর্ট সবই আছে এবং ব্যবস্থার নৈপুণ্য হয়ত মোনাকো মণ্টেকার্লোকেও হার মানায়।

শুধু ভিড় দেখলাম আমেরিকান টুরিষ্টের। ওরাই যেন ইণ্টের-লাকেনকে প্রায় শ্যামবাজার করে তুলেছে। গায়ে জেকারের

তখনই হঠাৎ যেন চোখের সামনে 'চিচিং ফাঁক' দেখলাম। একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ। অভাবনীয়! আমরা তিন জনে একটা 'হপ ষ্টেপ জাম্পে' ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

লোভনীয় কিছুই পাওয়া গেল না। খেলাম রায়তা, পাঁপড়-ভাজা, তরকারীর চাটনী, ভাত, চিকেন কারী ও দই। রসনার তৃপ্তি না হলেও মনটা একটু খুশী হ'ল।

আমাদের হুমড়ি খেয়ে পড়াটা বোধ করি 'জী উণ্ট এর্'-এর ষ্টাফ ফটোগ্রাফার দেখতে পেয়েছিল। আমরা গোগ্রাসে দই গিলছি, ও এসে আমাদের ফ্ল্যাশ ফটো নিল। সে ছবি ছাপাও হয়েছিল। মিলানে বসে 'জী উণ্ট এর্'-এর সেই সপ্তাহের সংখ্যাটা পেলাম।

মে ২৯ '৫৪। আজ বার্ন থেকে থুন যাব। শেষবেলায় দু'একটা জিনিস কেনার কথা মনে পড়ল। না, ঘড়ি নয়। দেখতে দেখতে যেটা ভাল লাগবে সেটাই কিনব। ইন্দ্র কিনল ঘড়ি। কাবনাগ্রো কিনল ক্যামেরা। শেষ পর্য্যন্ত আমি কিনলাম ডজন-খানেক চকোলেট-বার। মিলানের বন্ধুবান্ধবদের দেওয়া যাবে।

চোখে ত পড়ল অনেককিছুই, কিন্তু তেমন কিছু যে মনে ধরল না।

সুইজারল্যাণ্ডের হোটেলে থাকা খাওয়ার খরচ বিস্তর, শোনা ছিল। কিন্তু থুনে পৌঁছেই আমাদের কপাল খুলে গেল। মাত্র পাঁচ টাকায় বেশ আরামেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা হ'ল।

মে ৩০ '৫৪। থুন থেকে থুন হ্রদের উপর দিয়ে ফেরী-জাহাজে 'স্পিৎস'এ এলাম।

সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্য-তালিকায় প্রথমেই পড়বে হ্রদগুলি, আল্পসও নয়, ভ্যালিও নয়—এমনকি সুইস তরুণীরাও নয়।

পাহাড়, নীল আকাশ, পাহের গাছ, জলের ওপর রোদের ঝিকিমিকি—সব মিলে যেন আপনিই রোমান্স জাগায় প্রাণে।

হাওয়াই শার্ট আর পরনে বেয়নের ট্রাউজার। মাথায় কদমছাঁট। কাঁধে হাতে গোটা দু'তিন ক্যামেরা।

দোকানে বেশ মজা হ'ল। আমি বারো-চৌদ্দটা মিউজিক বক্স দেখে একটা কিনলাম। আর দোকানদার একজন গোঁসালো আমেরিকানকে একটা মিউজিক বক্সের মজুরী দিল।

কারনাতো ব্যাপার দেখে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছিল। আগেই পালিয়েছে।

শস্য বপন

(বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

(১) আউস ধান (বোনা)—দোআঁশ ও এঁটেল মাটি—দোআঁশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১ মণ বীজ লাগে; একর প্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

(২) আউশ ধান (রোয়া)—দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৬×৬ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়; শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১২-১৫ সের বীজ লাগে একর প্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

(৩) আমন ধান (বোনা)—এঁটেল দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফসল কাটিতে হয়, একর প্রতি ২৫-৩৫ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ২০-৩০ মণ ফলন হয়।

(৪) আমন ধান (রোয়া)—এঁটেল দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতে জন্মে, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে ৯×৯ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়; অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল কাটিতে হয়, একর প্রতি ১০-১৫ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ২০-৩০ মণ ফলন হয়।

(৫) ভুট্টা বা জনার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে; ১৮ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ১৮ ইঞ্চি অন্তর বীজ রোপণ করিতে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়; পশুখাদ্যরূপেও ইহার ব্যবহার হয়।

(৬) জোয়ার—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ৬-৯ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৫-৯ মণ ফলন হয়; ইহা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৭) চীনা—উঁচু বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ৩-৫ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৪-৬ মণ ফলন হয়; ইহার খড় পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৮) অড়হর—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু দোআঁশ এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২॥-৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ২॥-৩ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাসে ফসল কাটিতে হয়, একর প্রতি ৬-৯ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৬-১০ মণ ফলন হয়।

(৯) বরবটি—দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়; একর প্রতি ১৫-১৮ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৮-১০ মণ দানা পাওয়া যায়, ইহা পশুখাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়।

(১০) সয়াবীন—বা গৌরী কলাই—বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়; কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি ফসল হয়; একর প্রতি ১০-১২ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ৪॥ হইতে ৭॥ মণ ফলন হয়।

(১১) বেগুন—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে; তিন ফুট অন্তর লাইনে চারা রোপণ করিতে হয়; নাবী জাতীয় ফসল আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হয়, একর প্রতি ৪-৬ ছটাক বীজ লাগে, একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১২) ঢেঁড়শ—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২ ফুট হইতে ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া বীজ বপন করিতে হয়, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফসল হয়; একর প্রতি ৩ হইতে ৪॥ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৬০-৮০ মণ ফলন হয়।

(১৩) লাউ—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনিতে হয়; চারা বাহির হইলে সবচেয়ে বেশী সবল চারাটি রাখিয়া বাকী চারাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়; ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়; একর প্রতি ⁄।০-⁄৷৹ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১৪) কুমড়া—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, লাউয়ের মত ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনিতে হয়; ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়; একর প্রতি ⁄।০-⁄৷৹ সের বীজ লাগে; একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১৫) চিচিঙ্গা—দোআঁশ মাটিতে জন্মে; ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়; শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন

মাসের মাঝামাঝি ফলন হয় ; একর প্রতি ১ সের হইতে দেড় সের বীজ লাগে ; একর প্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

(১৬) করলা—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয় ; ৩ মাস পরে ফলন হয়, একর প্রতি ৷৵০-৷১ সের বীজ লাগে ; একর প্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

(১৭) কাঁকরোল—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ইহা সাধারণত কন্দ হইতে জন্মায়, ৩-৪ মাস পরে ফসল হয়, একর প্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয় ; ইহার জন্য মাচার দরকার হয়।

(১৮) ঝিঙ্গা (পালা)—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, ২-৩ মাস পরে ফলন হয়, একর প্রতি ১৷-২ সের বীজ লাগে ; একর প্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(১৯) কাঁকড়ি—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে ; ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, বর্ষায় ফসল ফলে ; একর প্রতি ৮-১২ ছটাক বীজ লাগে ; একর প্রতি ৮০-১০০ মণ ফলন হয়।

(২০) শিম—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে ফসল হয়, একর প্রতি ৪৷ হইতে ৬ সের বীজ লাগে, একর প্রতি ৯০-১২০ মণ ফলন হয়।

(২১) বাকলা শিম—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৮-১২ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়, তিন মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪-৬ সের বীজ লাগে ; একরপ্রতি ৯০-১০০ মণ ফলন হয়।

(২২) চুকাই—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, ৫ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩-৪ সের বীজ লাগে এবং ৪০-৫০ মণ ফলন হয়।

(২৩) মেটে আলু বা চুবড়ী আলু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৪-৫ ফুট অন্তর গর্তের মধ্যে বীজ আলু বপন করিতে হয়। ৮-৯ মাস পরে ফসল হয় ; একরপ্রতি ১০-১৫ মণ বীজ লাগে ; একরপ্রতি ১০০-১৫০ মণ ফলন হয়।

(২৪) মূলা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, দুই মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ২-৪ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১২৫-১৫০ মণ ফলন হয়।

(২৫) শিমুল আলু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫ ফুট অন্তর লাইন করিয়া ১ ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া এবং ৫-৬ ইঞ্চি গভীর গর্তে ডগা বসাইতে হয় ; ৮-৯ মাস পরে ফসল হয় ও একরপ্রতি ৬০০০ ডগা লাগে, একরপ্রতি ৩০০ মণ ফলন হয়।

(২৬) কচু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, দেড় দুই ফুট অন্তর মুখী রোপণ করিতে হয়, ভাদ্র-কার্ত্তিক মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪৷-৬ মণ মুখী লাগে, একরপ্রতি ১৮০-২০০ মণ ফলন হয়।

(২৭) মানকচু—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৩ ফুট অন্তর মূল বসাইতে হয়, পৌষ ফাল্গুন মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ৫-৬ হাজার মূল বসাইতে হয়, একর প্রতি ১২০-১৮০ মণ ফলন হয়।

(২৮) ওল—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২৷-৩ ফুট অন্তর গর্তে মুখী রোপণ করিতে হয়, ৬ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৯ মণ মুখী লাগে, একরপ্রতি ১৫০-২০০ মণ ফলন হয়।

(২৯) টেপারি—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়, ৪-৫ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ ছটাক বীজ লাগে।

(৩০) শাক, নটে পুঁই, ডাঁটা, মুলকা ইত্যাদি—যে-কোন জমিতে হয়, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ১-২৷ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ ছটাক বীজ লাগে।

(৩১) হলুদ—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর 'মোথা' বা 'দড়ি' বসাইতে হয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল তুলিতে হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ হলুদ লাগে ; একরপ্রতি ১৫-২০ মণ শুষ্ক হলুদ হয়।

(৩২) আদা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর 'মোথা' বা 'দড়ি' বসাইতে হয় ও অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ মূল লাগে, একর প্রতি ৬০-১০০ মণ ফলন হয়।

(৩৩) গোলমরিচ—নিম্ন সরস জমিতে জন্মে, চারা সাড়ে চার ফুট অন্তর লাগাইতে হয়, ৩-৪ বৎসর পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ১০০০ কাটিং লাগে, প্রত্যেক লতায় গড়ে এক সের করিয়া ফলন হয়।

(৩৪) চীনাবাদাম—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ইহার জাতি অনুযায়ী লাইন করিয়া ২-২৷ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল হয়, একরপ্রতি ১৮-২৫ সের (খোসা-সমেত) বীজ লাগে, একরপ্রতি ১৮-২০ মণ ফলন হয়।

(৩৫) কলা—উচু দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, তেউড়গুলি ২ ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর গর্তে ১২ ফুট অন্তর বসাইতে হয়। তেউড় বসাইবার ১০-১২ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩০০-৪০০ তেউড় লাগে এবং ৩০০-৪০০ কাঁদি কলা হয়।

(৩৬) পেঁপে—উঁচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, চারাগুলির যখন ৩-৪টি পাতা বাহির হয় তখন উহাদিগকে নাড়িয়া ৬-৮ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়, ৮-১০ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৪-৬ তোলা বীজ লাগে।

(৩৭) শশা—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৫-৬ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, ৩ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৬-৮ তোলা বীজ লাগে, একর প্রতি ১০০-১২০ মণ ফলন হয়।

(৩৮) পাট—দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, আষাঢ়-ভাদ্র মাসে পাট কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৩-৪৷ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১৫-২০ মণ ফলন হয়।

(৩৯) শণ—এটেল ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাসের মাঝা-

যাহি শণ কাটিতে হয়, একরপ্রতি ৩০-৪০ সের বীজ লাগে ও ১০-১৫ মণ ফলন হয়।

(৪০) রিয়া—এটেল ও দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ২×২ ফুট অন্তর "কাটিং" লাগাইতে হয়, শ্রাবণ-আশ্বিন মাসে ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ২-৩ মণ ফলন হয়।

(৪১) কার্পাস—জল দাঁড়ায় না এরূপ উচু সারবান জমি ইহার পক্ষে উপযুক্ত, আড়াই ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে আড়াই ফুট অন্তর ১।-২ ইঞ্চি গভীর গর্তে ২-৩টি বীজ বুনিতে হয়, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তুলা হয়, একরপ্রতি ৬-৮ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ১।-২ মণ ফলন হয়।

(৪২) রেড়ি—উচু দোআঁশ মাটিতে জন্মে, জাতি হিসাবে ৩-৪ ফুট অন্তর বীজ বপন করিতে হয়, ৭-৯ মাস পরে ফসল হয়, জাতি হিসাবে ৪।-৬ বীজ লাগে। একরপ্রতি ৮-১০ মণ ফলন পাওয়া যায়।

(৪৩) পান—এটেল দোআঁশ মাটিতে জন্মে, ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর "কাটিং" বসাইতে হয়, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ মাসে পান পাওয়া যায়, একরপ্রতি ৩০০০ "কাটিং" লাগে, একরপ্রতি ৬০-৭০ কাহন পান হয়।

(৪৪) বাজরা (পশুখাদ্যের জন্য)—বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মে, বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, ২-২। মাস পরে ঘাস কাটা যায়, একরপ্রতি ৬-১০ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ২০০-২৫০ মণ কাঁচা ঘাস হয়।

মরা জ্যোৎস্না

শ্রীকরুণাময় বসু

স্বপ্নের ঘোরে দু'হাত বাড়ায় নিশাকর। আয় আয় সোনা আয়, মাণিক আমার, এত কান্না কিসের? ও খোকন তুই হাসলে বুঝি মুক্তো ঝরে, তোর কান্নায় বুঝি পান্নার রং উথলে পড়ে। কাঁদিস নে মাণিক আমার, এত দুঃখ কিসের?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, মেসের ভাঙা তক্তপোশের উপর উঠে বসে নিশাকর। অনেক দিন পরে বুকে কিসের ব্যথা অনুভব করে সে। আজ সকালে দেশ থেকে চিঠি এসেছে নতুন খোকা হয়েছে তার। জানালার ফাঁক দিয়ে শেষ রাতের মরা জ্যোৎস্না ঘরে এসে পড়েছে। সমস্ত শহর নিঝুম নিশ্চুপ। ঘুম-ঘুম চোখে একবার কি ভাবতে চেষ্টা করে নিশাকর; কালো রাত মাকড়সার জালের মত হিজিবিজি রেখা টানে চোখের সামনে তার।

তবু স্বপ্ন দেখে নিশাকর, কতকাল আগেকার স্বপ্ন। সুনন্দা ঘাড় কাত করে নিশাকরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। নির্জ্জন রাত্রি আরও রহস্যময় হয় নিশাকরের কাছে। সে সুনন্দাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করে, কি?

আমার জন্ত তোমার ভয় হয় না? আমি যদি মরে যাই?

ইস, মরতে দিলে ত, তা হলে আমিও বাঁচব না।

সুনন্দার করুণ হাসিতে সুদূর নির্জ্জনতা, অর্থহীন আশা, স্বপ্নমোহের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের জন্ত স্নিগ্ধ অনুকম্পা। মৃত্যুকে সে দেখেছে ধূসর আবছায়ার মত, হাসিতে বুঝি সেই কথাটাই বুঝাতে চায়।

তুমি ভয় পাচ্ছ কেন সুনন্দা?

আচ্ছা যদি মেয়ে হয়, তুমি দুঃখ পাবে?

কেন, দুঃখ পাব কেন, প্রথম মেয়ে হওয়া ত লক্ষ্মীর চিহ্ন। মেয়ের নাম কি রাখবে, জয়ন্তী?

জয়ন্তী বেশ নাম না গো?

উঁহু অজন্তা আরও ভাল। বেশ তুমি ডাকবে জয়ন্তী, আমি অজন্তা।

যদি ছেলে হয় নিশাকরের সঙ্গে নাম মিলিয়ে দিবাকর রাখা হবে আগেই ঠিক করা ছিল।

সুনন্দা চোখ বোজে। স্থির রাত্রির গভীরতায় কোন আবর্ত্ত নেই। মৃদু নিশ্বাসের উত্থানপতনের মত নিশ্চিন্ত নিস্তব্ধ রাত্রি। কিন্তু নিশাকরের বুকে উত্তপ্ত উদ্বেল তরঙ্গমালা। দু'বছর আগে ছ'মাসের খোকন চিরকালের মত চোখ বুজেছে। যে চিকিৎসার দরকার ছিল সে চিকিৎসা করানো গরীব নিশাকরের ছিল সাধ্যাতীত। সেই অগ্নিগর্ভ বেদনা কেবলই নিশাকরের বুকে পাক খেয়ে বেড়ায়। আগ্নেয়গিরির যন্ত্রণা চোখে মুখে ফোটে তার। আজ আবার সেই যন্ত্রণা বুকের মধ্যে গুমরে উঠে। চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়ায় তার। চোখের জলে মনের আগুন নেভাবে সে। আবার নতুন খোকা এসেছে তার।

তবু দিন যায়। হাতের মুঠোয় ধরে আশার রঙীন প্রজাপতি। পূজোর দেরি আছে, তার আগে বাড়ী যাওয়া হবে না। বাঁকুড়ার কোন অজপাড়াগাঁয়ে বাড়ী তার।

পুজোয় কত জিনিষ কেনা দরকার, ফর্দ্দ আছে পকেটে, শুধু পকেট ফাঁকা, তবু স্মরণের মণিমালায় সোনার আলপনা টানে, তবু জানে সে উড়ো মেঘের ছায়ায় দিনের রূঢ় রৌদ্র ঢাকা পড়ে না। স্বপ্নের রং ফিকে হলেই মনের সোনালি যাদু হঠাৎ যাবে মুছে ; তার পর নিরাবরণ নিরাভরণ দারিদ্র্য।

পকেট থেকে ফর্দ্দ বার করে নিশাকর। সুনন্দার লেখা শুধু খোকনের সাজ-পোশাকের দীর্ঘ তালিকা। সাটিনের পাঞ্জাবী, জরীর কাজ করা টুপী, ফুলতোলা জুতো। পাখীর পালকের ছোট লেপ, ঘেরাটোপ দেওয়া মশারি এইসব কথা। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা, খোকন কার মত হয়েছে বল ত ? আমার শরীর ভাল না, সেজন্য চিন্তা করো না।

এটকিনসন কোম্পানীর এক শ' সাড়ে পাঁইত্রিশ টাকার কেরানী নিশাকর মাথায় হাত দেয়। একবার ভাবে ভবানীপুরে তার বন্ধু রমাপতির কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার নেবে। মধ্যে মধ্যে রমাপতি ধার দিয়েছে তাকে, কিন্তু হাসিমুখে দেয় নি জানে নিশাকর। যদি না দেয় ছি, ছি, লজ্জার কথা।

দূর থেকে ভেসে আসে খোকনের হাসি—দাঁতহীন মুখের কলকল হাসি ; ভোরের আলোর মত উৎসারিত, অবারিত হাসি। জীবনে দুঃখ অনেক তবু পুজোয় প্রিয়জনের ম্লান মুখ বুকে তীরের মত বেঁধে। লজ্জা ত্যাগ করে নিশাকর রমাপতির কাছে হাত পাতে। হেসে হেসে বলে, তুমি না দিলে কে দেবে ভাই ?

একটু ইতস্ততঃ করে রমাপতি, "তাই ত অল্প মাইনের। কেরানী, শোধ করতে কষ্ট হবে।"—দু'হাত দিয়ে রমাপতির ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরে নিশাকর—"এবারকার মত তোমাকে এ উপকারটি করতেই হবে। যত কষ্টই হোক, দু'মাসের মধ্যে তোমাকে শোধ করে দেব এ টাকা।—শেষ পর্য্যন্ত রমাপতি টাকা দিয়েছে নিশাকরকে।

নিশাকর আবার স্বপ্ন দেখে। খোকন হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায় জিনিসপত্র ছড়িয়ে একাকার করে। সুনন্দা যেন টিপিটিপি হাসে, গালে হাত দিয়ে বলে, তুই এত দুষ্টুমি কোত্থেকে শিখলি খোকা ?—খোকন হয়ত একটা আঙুল মুখে পুরে মার দিকে চেয়ে অকারণেই হাসে হি-হি-হি। খোকন আবার হাঁটে দু'এক পা—মাতালের মত টলে, আবার ধপ করে বসে পড়ে।

শরতের সোনার রং জলে স্থলে, আকাশে, শ্যামল অরণ্যে মায়ার আলপনা টানে ; আলপনা টানে নিশাকরের মনে। হিমছোঁয়া বাতাস বুঝি এত দিনে ফুলকাঠির আবাদ, মরিচ-ডাঙার জঙ্গল পার হয়ে ভেসে আসে সুপুরির বন দোলা দিয়ে, নারিকেলপাতা ঝিরঝির করে কাঁপিয়ে, দু'একটি শিমুলতুলো উড়িয়ে দিয়ে পাখীর পালকের মত। কলমী দিঘের বনে নীল ফুলের মেলা, পেঁপেগাছের নীচে মরা রোদ এসে পড়েছে।

খলসেখালির বাওড় থেকে বুঝি পা ধুয়ে ফিরে এল সুনন্দা। বিকেলের ট্রেন এঁকে-বেঁকে চলে গেছে ওই দূর বাঁধের উপর দিয়ে। ইতুগঞ্জের হাট করে লোক ফিরছে ; আবছা অন্ধকারে দু'একটা সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে উঠল কলা-বাগানে, আমবনের ভিতর—হয়ত সরকারবাড়ী কি সামন্তদের ভিটে থেকে।

তাড়াতাড়ি ঘোমটা নীচে নামিয়ে দেয় সুনন্দা, ওমা এর মধ্যে এসে পড়লে ?

এই ব্যাগটা রাখ, যা ভিড় ট্রেনে সমস্ত রাত ঠায় দাঁড়িয়ে, খোকন কোথায় ?

দুই চোখে আগেকার মত মায়া মমতার ছলছল আভাস। নিশাকর দুই হাতে সুনন্দাকে নিজের দিকে টানে, সুনন্দা নিশাকরের মুখ চেপে ধরে। ছি ছি ছি—এখুনি ছোট পিসী এসে পড়বে।...

ছোট পিসী নিয়ে গেছে সামন্তদের বাড়ী। বসো, একটু জিরোও হাওয়া করি ; কিছুক্ষণ পরে হাত-পা ধুয়ো।...

কত দূরদূরান্তর থেকে এই সব ছবি, এই স্বপ্ন ভেসে আসে নিশাকরের মনে। আচমকা একটা স্মৃতি জেগে ওঠে—ছেলেবেলাকার কথা, মাটির দাওয়ায় বসে আছে নিশাকর পা ছড়িয়ে। শরতের সোনালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে কাজল-ডাঙার চরে, উলুঘাস ভর্ত্তি ভিটেপোতার মাঠে, বাড়ীর পাশেই জামরুল-বনে, পদ্মফুল ছাওয়া বুড়োশিবতলা দীঘির জলে। একটা ছোট্ট কাঠবিড়াল কাঁঠালগাছে ছুটে উঠে গেল, আবার নেমে এল তরতর করে, দু'পা তুলে একবার চার-দিক চেয়ে কি দেখলে, তার পর দৌড় দিলে কাঁটা ঝোপঝাপ জঙ্গলে। হঠাৎ খুশিতে ঝিকমিক করে উঠেছিল নিশাকরের সমস্ত হৃদয়। এত দিন পরে সেই ছবি অকারণেই মনে পড়ে গেল তার।

নিশাকর চেঁচিয়ে বলে, অ ভূপতি, আজ দুপুরে আমার সঙ্গে যাবি ভাই ? জিনিসপত্তর কিনব।

কাচের 'শো কেসে'র সামনে নিশাকর কতদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। ছোট ছেলের লেপ তোশক বালিশ জামা টুপী সাজানো আছে। কেমন সুন্দর ছোট মোটরগাড়ী, টাকা থাকলে কিনত সে খোকনের জন্য, খোকন চড়ে বেড়াত বাড়ীর চার ধারে সেই মোটরগাড়ীতে।

বালিশের ভিতর থেকে টাকা ক'টা বের করে নিশাকর। ওয়াড় সেলাই করে তার মধ্যে টাকা রেখেছিল সে, হাতে রাখে নি যদি খরচ হয়ে যায়। মেসের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে নিশাকর, ভূপতি পিছনে আছে। শেষ ধাপে নামতেই পিয়ন একখানা চিঠি দেয় নিশাকরের হাতে।

কার চিঠি নিশাকর, বাড়ী থেকে বুঝি? ভূপতি বলে পিছন থেকে।

আশ্চর্য্য, পাথরের মত নির্ব্বিকার নিশাকরের মূর্ত্তি—'খোকা নেই, খোকা নেই ভূপতি।'

কোথায় যাচ্ছ নিশাকর, এস এস উপরে এস।

আসছি, তুমি উপরে যাও নিশাকর।

এক রকম ছুটে রাস্তায় এসে কালীঘাটের বাসে চড়ে বসে নিশাকর। দুপুরবেলা, বাস প্রায় খালি। একটা সীটে বসে নিশাকর দুই হাতে মাথা টিপে ধরে। কি যেন ভাবতে চেষ্টা করে সে, প্রথমেই অনুভব করে একটা অনন্ত অবারিত মুক্তির আকাশ। খোকা নেই, অনেকখানি দায়িত্বও যেন সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মাস মাস দুধের দাম, সাবু মিছরি কেনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। হঠাৎ খিল খিল করে একটা অদ্ভুত চাপা হাসি বুকের ভিতরটাকে কাঁপিয়ে তোলে। খোকা চলে গিয়েছে, বাধনছেঁড়া নৌকোর মত হৃদয় টলমল করে ওঠে। যেন পৃথিবীর কোথাও সুখ নেই, দুঃখ নেই, ব্যথা নেই, বেদনা নেই, শুধু অসাড় অনুভূতিহীন মনোরাজ্যের বিস্তীর্ণ পরিব্যাপ্তি। হঠাৎ ভয় হয়, হাতড়ে দেখে নিশাকর অন্ধকার হৃদয়ের আনাচেকানাচে। সত্যিই কি সুখদুঃখহীন একটা আশ্চর্য্য অবস্থা এসেছে তার, তবে কেন কান্না আসছে তার? হাঁ, সত্যিই কান্না ত, হু হু করে বুকের মধ্যে। একবার মনে ভাবে কোথায় কোন্ অচেনা পৃথিবীতে খেলাঘর পাতিয়ে রেখে খোকন পালিয়ে এসেছিল এখানে, সেই জগতের সাড়া এসে পৌঁছয় এই প্রাণচঞ্চল শিশুদের জগতে, তাই কি পাখীর মত ডানা মেলে দিল অনন্ত আকাশের সীমানায়। ওই দূর রঙীন মেঘের ওপারে কি পারাপারের খেয়াঘাট আছে, খোকন সেই খেয়াঘাট পার হয়ে চলে গেল।

হঠাৎ রুদ্ধ কান্না পাক খেয়ে ওঠে। দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে নিশাকর ফুঁপিয়ে কাঁদে। যাকে সে কোন দিন দেখে নি, সেই খোকন যেন এখনও তার বুকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে। দুই ঠোঁট কেঁপে ওঠে তার, বাবা আমার, মাণিক আমার, ধন আমার!...

রমাপতি অবাক হয়ে বলে, খবর কি নিশাকর, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ ভাই, টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন?

না না, রাগ কিসের রমাপতি, টাকার আর আমার দরকার নেই, আমার কষ্ট হবে তাই খোকা তার গরীব বাপকে মুক্তি দিয়ে গেছে ভাই।

সর্ব্বোদয় ও সত্যনিষ্ঠা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বোদয়—অর্থাৎ সকলের উদয়, সকলের উন্নতি, সকলের মঙ্গল। হাঁ, ভারতের ঋষিদের কণ্ঠে যুগে যুগে এই মহান্ আদর্শেরই তো বন্দনাগান। সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সবাই সুখী হোক, সবাই নিরাময় হোক। মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। এ সংসারে কেউ যেন দুঃখী না থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন: লোকসংগ্রহের অর্থাৎ লোককল্যাণের জন্যেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

সর্ব্বাধিক মানুষের সর্ব্বাধিক মঙ্গল নয়—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মঙ্গল। 'ফাগুনের কুসুম-কোটা হবে ফাঁকি আমার এই একটা কুঁড়ি রইলে বাকী।' প্রতিটি কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, তবে তো বনে বনে বসন্তের উৎসব সফল হবে! আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে এই আদর্শই গান্ধীজীর কাছ থেকে পেয়েছি। পূর্ণ স্বাধীনতা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনতা। একটি মানুষের জীবনও যদি দারিদ্র্যের মধ্যে, অজ্ঞতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত থেকে যায়, ব্যর্থ হয়ে যাবে স্বাধীনতার বসন্ত। ব্যক্তি নিয়েই ত সমষ্টি। দেশ ত আমাদের প্রত্যেককে নিয়েই। তাই বড় হতে হবে আমাকে, বড় হতে হবে তোমাকে, বড় হতে হবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে। তবেই দেশ বড় হবে। প্রত্যেকটি কাষ্ঠখণ্ড যদি শুকনো থাকে তবেই তো অগ্নিকুণ্ড ভাল করে জ্বলবে।

কিন্তু সকলের মঙ্গল কেন আমরা চাইব? কারণ সকলের সঙ্গে যোগেই আমাদের জীবনের পরম কল্যাণ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা 'আমি' আছে। এই আমি যেখানে সকলের সঙ্গে মিলিত, সেখানে আত্মার আনন্দময় পরিবিস্তারের মধ্যে সে অনুভব করে জীবনের প্রাচুর্য্যকে; যেখানে সে সকলের

কাছ থেকে পৃথক, সেখানে সঙ্কুচিত অস্তিত্বের অবগুণ্ঠনের মধ্যে সে অনুভব করে মৃত্যুর অভিশাপকে। এ সম্পর্কে কবিগুরুর মন্তব্য কি চমৎকার!

'যেদিকে সে পৃথক সেদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সে দিকে তার চিরকালের আনন্দ; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার স্বার্থ, সেই দিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ, সেই দিকে তার পুণ্য; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার কঠোর অহঙ্কার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্যের সার প্রেম।' (শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রনাথ) (২য় খণ্ড)

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর রাজা রাশি রাশি সোনার মধ্যে বসে কাঁদছে: 'হায় রে, আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' রাজা বলছে নন্দিনীকে, 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।' কেন এই রিক্ততা কেন এই ক্লান্তি? কেন এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও রাজা এত নিরানন্দ? এর উত্তরে আবার বলতে হয়: যা আমাদিগকে সকলের সঙ্গে মেলায় তারই মধ্যে আমাদের যথার্থ কল্যাণ। রাজা ত সকলের সঙ্গে মিলতে পারছে না। মনকে অনাসক্ত করতে না পারলে সকলের সঙ্গে মিলন কি সম্ভব? রাজার মনে রয়েছে সোনার প্রতি আসক্তি। সোনার লোভ মানুষকে যখন পেয়ে বসে তখন পড়শীকে 'খেয়ে ফুলে উঠতে' কোথাও তার বাধে না। 'রক্তকরবী'তে অধ্যাপকের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন: 'বাঘকে খেয়ে বাঘ বড় হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে উঠে।'

আদর্শবাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। নিজেদের স্বার্থের কথাও যদি তলিয়ে ভাবি তা হ'লেও কি সকলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? কেন গান্ধীজী অর্থ নৈতিক সাম্যকে বললেন স্বাধীনতার মন্দিরে ঢুকবার প্রধান চাবিকাঠি? কারণ, কয়েক জন ধনী যদি জাতীয় সম্পদের মালিক হয়ে থাকে, আর লক্ষ লক্ষ নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন মানুষ অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে ক্ষুধাতুর পুত্রকন্যা নিয়ে কষ্ট পায় তবে রক্তসাগরে তরঙ্গ তুলে বিপ্লব ত আসবেই। তখন কোথায় থাকবে ধনীদের টাকাকড়ি, ঘর-বাড়ী—ঐশ্বর্য্যের এই সমারোহ? মানুষ কাঠের অথবা পাথরের মূর্ত্তির মত অন্যায়কে নিঃশব্দে চিরদিন সহ্য করুক—এইটাই কি আমরা কামনা করি? 'গোলাম' হওয়ার চেয়ে 'মানুষ' হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নয়? গান্ধীজীর, তাই, স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার মন্দির গড়ে উঠবে অহিংসার ভিত্তিতে। কিন্তু ধনীরা যদি সকলের মঙ্গলের জন্য ঐশ্বর্য্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে রাজী না থাকে, বিষয়-সম্পত্তিতে সকলকে সানন্দে ভাগ না দেয় তবে কি হবে? গান্ধীজী বলে-ছিলেন: 'তবে বিপ্লব হবে—রক্তাক্ত সশস্ত্র বিপ্লব।' রক্তাক্ত সশস্ত্র বিপ্লব এলে দেশের কি দুর্গতি হয় তার পরিচয় দিচ্ছে ইতিহাস। ফরাসী-বিপ্লবের রক্তের বাতে গিলোটিনের নীচে নরমুণ্ডের পিরামিডের কথা ভাবলে এখনও আমরা শিউরে উঠি। রাশিয়ার এবং চীনের রক্তাক্ত অন্তর্বিপ্লবের দৃষ্টান্তও লোভের এবং স্বার্থপরতার ভয়াবহ পরিণামের দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করছে।

সকলের মঙ্গলকে বড় করে না দেখলে, কেবল নিজেদের স্বার্থকে আঁকড়ে থাকলে পদদলিত সর্ব্বহারারা একদিন ক্ষেপে উঠে সব তছনছ করে দেবে—এই সাবধানবাণী একদিন জলদগম্ভীর স্বরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও উচ্চারণ করেছিলেন। বঙ্কিমের সময়ে এক দল লোক জোরগলায় বলতে আরম্ভ করেছিল, ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা ক্রমশঃই সভ্য হচ্ছি এবং আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, নবীন চিকিৎসাশাস্ত্র, অট্টালিকাময়ী মহানগরী এবং মুদ্রাযন্ত্র—এগুলি কি প্রগতির নিদর্শন নয়? এই মঙ্গল হুড়াহুড়ির মধ্যে বঙ্কিম এলেন এবং সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে একটি প্রশ্ন করলেন: কার এত মঙ্গল? রামা কৈবর্ত্ত এবং হাসিম সেখ দুইটা অস্থিচর্ম্মসার বলদে ভোঁতা হাল ধার করে এনে জমি চষছে, তৃষ্ণায় মাঠের কর্দ্দম অঞ্জলি ভরে পান করছে, সন্ধ্যার সময় বাড়ী গিয়ে ওরা ভাঙা পাথরে মোটা চালের ভাত নুনলঙ্কা দিয়ে আধপেটা খাবে এবং গোয়ালের একপাশে শয়ন করবে—ইংরেজ শাসনে ঐ চাষীদের কি কোন কল্যাণ হয়েছে? নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন: আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না।' এখানেই বঙ্কিম থামলেন না। বললেন 'তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?'

দেশের শতকরা যারা আশী জন তারা যদি ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভূমিকম্পে সারা দেশ কেঁপে উঠবে, সভ্যতার ইমারত ভেঙে পড়বে, রক্তবন্যায় সব একাকার হয়ে যাবে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করে দিয়ে বললেন:

"তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি। কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।"

বঙ্কিম সর্ব্বোদয়ের কথা শোনালেন। শোনালেন তাদের মঙ্গলের কথা যাদের কথা আমরা ভুলে ছিলাম, যাদের আমরা উপেক্ষা করতাম গাঁয়ের চাষা বলে। ঋষি বঙ্কিমের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও এই কথা শোনালেন।

শোনালেন, "ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

শোনালেন, "বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

আর রবীন্দ্রনাথ? তিনিও যুগের কানে শোনালেন,

"যেথায় থাকে সবার অধম, দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে
সবহারাদের মাঝে।"

যারা অবহেলিত, পদদলিত তাদের শ্রদ্ধা কর। বিশ্বভূবণ ভগবান দীন-দরিদ্র সাজে যে ওদেরই মধ্যে বিচরণ করছেন।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ যাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় গড়ে উঠেছে তাঁদের একজনও কি প্রাদেশিকতার, সাম্প্রদায়িকতার অথবা জাতি-ভেদের ক্ষুদ্রতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন? কি শোনালেন রামকৃষ্ণ? পৃথিবীতে প্রত্যেকটি ধর্ম্মবিশ্বাসেরই সমান অধিকার আছে বেঁচে থাকবার এবং আমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য হচ্ছে প্রতিবেশীর বিশ্বাসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা। বললেন: "আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি, শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি।" রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধীজী—এঁরা আমাদিগকে শিখিয়েছেন, সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসী বলে নিজেদের ভাবতে। এঁরা দেশাত্মবোধকে জাতির মর্ম্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে না দিলে আমরা সকল ধর্ম্মের-সকল প্রদেশের নরনারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কি একযোগে লড়াই করতে পারতাম? এঁদেরই কল্যাণে সর্ব্বোদয়ের আদর্শকে আমরা ভালবাসতে শিখেছি।

এইবার প্রশ্ন হচ্ছে—সর্ব্বোদয়ের সঙ্গে সত্যনিষ্ঠার সম্পর্ক কি? সম্পর্ক হচ্ছে: সর্ব্বোদয়ের মন্দিরে পৌঁছবার অপরিহার্য্য পন্থা সত্যনিষ্ঠা। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসই ত সমাজ-জীবনের প্রাণ। এই বিশ্বাস ভেঙে দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা যদি দুধ বলে জল চালায়, কোথায় যাবে শিশুদের স্বাস্থ্য? জাতির ভবিষ্যৎ তা হলে কি জাহান্নামে যাবে না? ডাক্তার যদি ঔষধ বলে জল ইন্‌জেকশন্ করে, রোগী-দের কি অবস্থা হয়? ভিজিট এবং ঔষধের দাম দিতে গৃহস্থ সর্ব্ব-স্বান্ত হয়ে যাবে কিন্তু রোগী বাঁচবে না। বিচারকেরা যদি ঘুষ খেয়ে চোরাকারবারীকে ছেড়ে দেন তবে অবাধে দুর্নীতি চলবে। খাদ্যে বিষ মিশিয়ে চামড়ার লোভে গ্রামে যে গোরু মারছে তাকে টাকা খেয়ে দারোগা যদি চালান না দেয়—কোন গৃহস্থই মাঠে গোরু ছেড়ে দিতে সাহস করবে না। বস্তুতঃ সমাজের সর্ব্বনাশ করতে মিথ্যার বেসাতির মত এমন জঘন্য বেসাতি আর নেই। সর্ব্বোদয়ের স্বপ্ন ফলবান হতে পারে কেবল সত্যানুরাগের পথে—এতে কি অণুমাত্র সন্দেহ আছে? গ্রামের দুর্জ্জনেরা গ্রাম-বাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যারা জানে তারা ভয়ে সাক্ষ্য দেবে না, সত্য বলতে সাহস করবে না। কেমন করে তা হলে দুর্ব্বলেরা রক্ষা এবং দুর্জ্জনেরা শাস্তি পাবে? সত্যানুরাগের অভাবের জন্যই ত দেশ দুর্নীতির কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছিলেন: "চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।" "সত্যানুরাগ, প্রেম এবং মহাবীর্য্য"র পথই তিনি আমাদিগকে দেখিয়ে গেছেন। সত্যের এবং অহিংসার উপরে গান্ধীজীর এত জোর—সেও ত সর্ব্বোদয়ের স্বর্গে দেশকে পৌঁছে দেবার জন্যে। ইংরেজ শাসন দেশকে সবদিক দিয়েই সর্ব্বনাশের মধ্যে ডোবাচ্ছিল। সেই শাসনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা ভগবানের এবং মানবতার কাছে অপরাধ—কে না জানত? কিন্তু সত্যকে জানা সহজ; তাকে অনুসরণ করাই কঠিন। সত্যাগ্রহের পথ যে দুঃখবরণের বন্ধুর পথ। দুঃখকে স্বভাবতঃই আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। গান্ধীজী এসে দেশের হাজার হাজার মানুষকে সত্যা-গ্রহী করে তুললেন। সেই সত্যাগ্রহের পথে এল স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাকে আশ্রয় করে এল দেশের কল্যাণ। সত্যের প্রতি যেখানে দুর্ব্বার অনুরাগ আছে সেখানে অত্যাচার টিকতেই পারে না, সুতরাং অমঙ্গলও থাকতে পারে না।

সমাজে বুদ্ধিমান লোকের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। প্রথম স্তরের রাষ্ট্রনেতা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—সকলকেই আমাদের চাই—কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দরকার চরিত্রবান পুরুষ এবং চরিত্রবতী নারী। জাতির নৈতিক চরিত্র যদি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে—সমাজের সমস্ত কাঠামো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মন ও চৈতন্য" নামক প্রবন্ধে পৃষ্ঠা ৩৯, স্তম্ভ ১, পংক্তি ৩২-এর শেষ হইতে এইরূপ পড়িতে হইবে:

"In removing our illusion we have received the substance for indeed we have seen that the substance is one of the greatest of our illusions."

ইটালী ও জাপানের সিনেমা

"রোমের সারকোলো রোমানো দেল সিনেমা" নামক ক্লাবটি ইটালীর চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান—ভাভিভিনি ইহার প্রেসিডেন্ট এবং ব্লাসেত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দা সিস', রোসেলিনি হইতে ভিসকন্তি পর্য্যন্ত ইটালীর চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত। গত বৎসর এই ক্লাবের উদ্যোগে কতকগুলি নির্ব্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ও সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনারও আয়োজন করা হয়।

জাপানী কূটনৈতিক দপ্তরের কয়েকজন সদস্য পর্দ্দায় এই সমস্ত চিত্ররূপায়ণ দেখিবার জন্ম উপস্থিত ছিলেন. এই নির্ব্বাচন বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং ইহার দৌলতে দর্শকমণ্ডলী যুদ্ধপরবর্ত্তী কালে পুনরুজ্জীবিত জাপানী সিনেমায় প্রযোজিত শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির রসোপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশ্য পাশ্চাত্ত্যবাসীদের পক্ষে গেম্প'কু-নো-কো নামক ছবিটি—যাহাকে বাস্তবতামূলক (Realistic) ফিল্মের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে—দেখিবার সুযোগ এখনও হয় নাই।

এই উপলক্ষে যে সকল ছবি দেখানো হইয়াছে তন্মধ্যে উগেৎসু মোনোগাতারি নামক ছবিটি চলচ্চিত্র-সমালোচকদের মতে সকলের চেয়ে সেরা। ইহাতে অবশ্য যুদ্ধের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাই এই ছবিটির উৎকর্ষের হেতু নয়। কেন্‌জি মিজোগুচির এই ছবিতে গভীর মানবতা এবং আচার-ব্যবহার ও পারিপার্শ্বিকের যে যথাযথ রূপায়ণ হইয়াছে তাহাই ইহাকে এক প্রামাণ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ইহা মিজোগুচিরই ইচাদাই ওন্না নামক ফিল্মকেও—যাহা ১০৫২ সনের 'ভেনিস ফেষ্টিভ্যালে' আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করিয়াছিল—উৎকর্ষের দিক দিয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে। শিচি-নিন-নো সামুরাই নামক ফিল্মটিও ব্লাসেত্তি এবং দা সান্তিসের মত চিত্র-পরিচালকগণ

মিজোগুচির 'সানশো দায়ু' নামক জাপানী ফিল্মের একটি দৃশ্য

কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। কুরোসাওয়ার এই ছবিটির মধ্যে যে কতকগুলি খাঁটি কবিত্বপূর্ণ অংশ আছে তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই দৃশ্যটির কথা বলা যায় যেখানে নকল সামুরাই জলন্ত আগুনের ভিতর হইতে একটি শিশুকে উদ্ধার করিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছে—"এই শিশু যে আমি—আমিই, যখন আমি ছোট ছিলাম।"

লুচিনো ভিসকান্তির "সেনসো" চিত্রের একটি ভূমিকায় এফ. গ্রেঞ্জার

মোনোগাতারি উগেৎসু নামক শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য ফিল্মটির উৎস-সন্ধান করিতে হইবে সাইকাকু-ইচিদাই-ওন্না (পতিতা ও-হারুর জীবন) নামক তাঁহার অপর ফিল্মের প্রস্তাবনার বর্ণনায়। তাহাতে এই উক্তিটি আছে: "সুদীর্ঘকালের আত্মোপাসনার পর, জাপানী আমরা আজ আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের গহন গভীরে প্রবেশ করিব। আমাদের জনগণের একথা জানা প্রয়োজন যে, আমাদের সৌজন্য ও কারুণ্যের মূল অভিজাত-সম্প্রদায়ের ভয়াবহ এবং কণ্টকাকীর্ণ জগতে নয়, তাহা নিহিত আছে আমাদের কারিগর এবং চাষীদের আনন্দময় কোমল স্বভাব আর পারিবারিক জীবনের অনাবিলতার মধ্যে।" এই কথাগুলি মিজোগুচিরই অপর ফিল্ম—"টেল অব দি ওয়ান এণ্ড সায়লেন্ট মুন" নামক ছবিটির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের পিছনে যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রেরণা রহিয়াছে, তাহা ইহাকে উন্নীত করিয়াছে মানবতার এক আদর্শ স্তরে। সর্ব্বোপরি ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই ফিল্মটির মধ্যে আদ্যোপান্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে একটি খাঁটি কাব্যিক অনুপ্রেরণা। এই ফিল্মে এমন কিছু আছে যাহা ফুটাইয়া তোলা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল।

ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লওয়ার মধ্যেই যে চরম শান্তি নিহিত তাহা দেখানো হইয়াছে মিজোগুচির সাইকাকু ইচাদাই-ওন্না নামক ফিল্মে। এই ছবির নায়িকা ও-হারু, মধ্যযুগীয় সমাজের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিতা। ও-হারুর বাবা নিজেই অমানুষ—পাপের নিম্নতম সোপানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন সে জরাগ্রস্ত এবং স্বজন-পরিত্যক্ত হইল তখন শান্তির সন্ধান পাইল এক বৌদ্ধ মঠে শরণ লইয়া।

জাপানী চলচ্চিত্র সম্পর্কে এই আলোচনাই একমাত্র ঘটনা নয় যাহা গত বৎসর ইটালীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য চলচ্চিত্র-জগতের মধ্যে সমস্বার্থমূলক যোগসূত্র সংস্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ভারতও ইটালীতে পাঠাইয়াছে একটি বিস্ময়সঞ্চারী ফিল্ম—'দো বিঘা জমিন'। ইহা ইটালীর নয়া বাস্তবতামূলক পদ্ধতির (Neo-realistic School), বিশেষতঃ ড সিকা'র 'সাইকেল চোরেরা'র (Bycycle Thieves) সমগোত্রীয়। ইটালীর ড সিকার মত দো বিঘা জমিনের ডিরেক্টর বিমল রায়ও এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা গতানুগতিক নয়, তাহাতে সমসাময়িক বাস্তবতার কতকগুলি নীতিমূলক দিকের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা করিতে গিয়া তাঁহাকে ইটালীর ড সিকা'র ন্যায় ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফিক ঐতিহ্যগত প্রবণতার ফলে উদ্ভাসিত বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু রায় এই সমস্তকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দো বিঘা জমিন ভারতের জাতীয় জীবনের সেই সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেরই অংশ যাহার ভিত্তি স্বাদেশিকতা এবং সংস্কার। সাহিত্যে সেই নবযুগের পুরোধা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণের কবি ভারতী এবং উত্তর-ভারতের কৃষক-সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে বহু গ্রন্থ রচয়িতা প্রেমচাঁদ। সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিকতার সেই পুনরুজ্জীবনের সূচনা করেন গান্ধী—এখন ইহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন নেহরু। ইটালী ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আজ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। এখানে নেহরুর উক্তি হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ভারত ও ইটালীর মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশের পিছনেই রহিয়াছে দীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি, যদিও ভারতের সহিত তুলনায়—যাহা একটি অনেক বৃহত্তর দেশও বটে—ইটালীর সংস্কৃতি বহু পরবর্ত্তীকালের। দুইটি দেশই রাজনৈতিক দিক দিয়া বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারতের ন্যায় ইটালীতেও 'জাতীয়তা'র আদর্শ কখনও লোপ পায় নাই; এবং বিভক্ত দুইটি দেশই হইয়াছে বটে, তথাপি কোনওটিরই একত্বানুভূতি কখনও হারাইয়া যায় নাই। যেমন ইটালী পশ্চিম-ইউরোপকে দিয়াছে ধর্ম্ম তেমনি পূর্ব্ব-এশিয়াতে ধর্ম্মবিস্তার করিয়াছে ভারত—যদিও চীন এই দেশের চেয়ে কম প্রাচীন এবং শ্রদ্ধার্হ নয়।"

এখন সে বিধা জমিন যে পথ খুলিয়া দিয়াছে, ভারতীয় সিনেমা-শিল্প যদি সেই পথ ধরিয়া চলে তাহা হইলে এই দেশের প্রতি সারা বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে এবং এ ধরনের অন্যান্য ফিল্ম সৃষ্টি না হইয়া পারে না। ঐ দিকে ইটালীয় সিনেমারও প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং ইহার প্রকৃত অভিব্যক্তির পথে যে সকল প্রতিবন্ধ রহিয়াছে সেগুলির অপসারণের জন্যও ইহার চেষ্টার অন্ত নাই। নয়া বাস্তবতা হইতে বাস্তবতায়, ঘটনার স্থূল বিবরণী হইতে জীবনের ব্যাপকতর এবং অধিকতর সার্বভৌম ব্যাখ্যায় পৌঁছিবার জন্য এখন ইহার অক্লান্ত প্রয়াস।

ইটালীর বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী লুশিয়া বোসে
এই রূপসজ্জায়ই ফ্রান্সেস্কো মাসেল্লির একটি চিত্রে অবতীর্ণ হইবেন

ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক-অভিনেতা (Director-Actor)–ভ সিসা এবং তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত জাভাত্তিনি এখন "দি রুফ" (ছাদ) নামক চিত্র-নির্মাণে ব্যাপৃত আছেন। খুবই আশা করা যায় যে, এই চিত্র মুক্তিলাভ করিলে তাঁহার পূর্বপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কিন্তু সম্প্রতি ইটালীর যে সিনেমা-মরশুম (Cinema Season) শেষ হইল তাহার রেকর্ড আশাপ্রদ নহে। গত ভেনিস ফেষ্টিভালে কাস্তেল্লানির 'রোমিও জুলিয়েট'কে লায়ন অব সেণ্ট মার্ক'স পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা মাত্র ক্ষীণ সাড়া জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষের যে ফিল্ম সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা হইয়াছে তাহা ফেলিনির "দি ষ্ট্রীট"। কিন্তু ইহারও সার্থকতা সম্বন্ধে প্রচুর সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। তবে একথা জোর-গলায়ই বলা যাইতে পারে যে, "I vitelloni"-র পরিচালক তাঁহার সম্প্রতি-সমাপ্ত Il Bodone-এর দৌলতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। ভেনিস আন্তর্জাতিক উৎসবে (Venice International festival) এই ফিল্মখানি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়।

বর্তমান বৎসরের ইটালীয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফিল্ম হইতেছে লুচিনো ভিসকন্তির "সেন্‌সো"। ইহাতে আর্টের সঙ্গে বৃহত্তর শিল্প-প্রচেষ্টার এক অভিনব সমন্বয় হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইটালীতে এই প্রথম লাক্স ফিল্মের মত একটি বিখ্যাত কোম্পানী বিরাট আকারের এমন একটি ফিল্ম নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছে যাহাতে আর্টের দাবি উপেক্ষিত হয় নাই। "সেন্‌সো" আর্টের দিক দিয়া যে নিপুণ সৃষ্টি, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক সিনেমার ছবি তৈরির ভার তরুণদের হাতে। মার্চি এবং মালেরবা নামক দুই জন যুবকের প্রথম সৃষ্টি 'নারী ও সৈনিকগণে'র বিষয়বস্তু হইতেছে মধ্যযুগের ইটালী।

আগামী মরশুমে যে সকল ফিল্ম দেখানো হইবে সেগুলির মধ্যে 'গ্লি সবান্দাত্তি'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাও ফ্রান্সেস্কো মাসেল্লি নামক আর এক জন তরুণ চিত্র-পরিচালকের প্রথম কাজ। ইনি খুবই তরুণ—বয়ঃক্রম এখনো চব্বিশ বৎসরও হয় নাই এবং সমগ্র পৃথিবীতে ইনিই সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ চিত্র-পরিচালক। তিনি যে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পরিচালনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট। ভিসকন্তি এবং আন্তো-নিওনির গুরুত্বপূর্ণ ফিল্মসমূহের প্রযোজনায় তিনি সহযোগিতা করিয়াছেন। এই তরুণ চিত্র-পরিচালকের মধ্যে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞানের সঙ্গে কবিত্বশক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকেই এই আশা পোষণ করিতে-ছেন যে, তাঁহার পরিচালনায় মাধ্যমে নিশ্চয়ই খাঁটি ইটালীয় চলচ্চিত্র পরিপূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবে। জাপানী, ভারতীয় এবং আমেরিকান চলচ্চিত্রের ন্যায় ইটালীয় চলচ্চিত্রেরও মূল নিহিত বাস্তবতার মধ্যে। এবং এই কথাটির যতই অপব্যাখ্যা করা হোক্ না কেন, সবকিছুর ঊর্ধ্বে এবং সবকিছুকেই অতিক্রম করিয়া এই বাস্তবতাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মিলনক্ষেত্র রচনা করিবে।*

ন.ভ.

* Elio Rutto'র প্রবন্ধ অবলম্বনে

অন্নপ্রাশন

শ্রীরেণুকা দেবী

হরিপ্রসন্ন বাবুর নাতির অন্নপ্রাশন। প্রাচীন চৌধুরী পরিবারের সে জাঁকজমক আর না থাকলেও নামের জমজমাট ভার এখনও আছে। তার উপর বর্তমানে চার শরিকের মধ্যে হরিবাবুর নামটাই এখন ভারী, কাজেই নাতির ভাতে ধুমটাও একটু জোরালো করতে হবে—না হলে ভারসাম্য থাকবে না।

ভাগ্যবান শিশুটি জন্মগ্রহণ করার পর থেকে দেশের ও কলিকাতার চেনা-জানা জ্ঞাতি-বন্ধু সকলের মধ্যে আলোচনা চলল যে, ধুম একটা হবে বটে। ক্রমশঃ সাতটি পূর্ণ চাঁদের মুখ দেখল শিশুটি। এবার আলোচনা চেনামহল ছাড়িয়ে আপনজনের মধ্যে এসে পড়ল। উপযুক্ত, বিবাহিত চার পুত্রের পিতা হরিপ্রসন্নবাবু, কিন্তু এই প্রথম পৌত্রলাভ হয়েছে তাঁর। তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় সন্তান এই শিশুটি। রেলওয়েতে বড় গোছের চাকরী করতেন তিনি। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করবার মোহ যাদের থাকে—অবশ্য সংকার্য্যের দ্বারা মহত্তর প্রশংসা পাওয়ার নয়, পয়সাওয়ালা বলে, নিজেকে খ্যাতিমান করার বাসনা, চাকুরির ধাপে ধাপে উঠে সেটা সম্ভব নয় তা তিনি ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই ছেলেদের মানুষ করেছিলেন অকুভাবে। এর জন্য বহু গ্লানিকর কাজ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু রজতখণ্ডের উজ্জ্বলতায় সব কলঙ্ক ঢাকা পড়ে এইটাই তিনি বুঝতেন।

চিত্তপ্রসন্ন বড় ছেলে, ব্যারিষ্টার। চারিটি কন্যার পিতা ও হিসেবী পত্নীর স্বামী। মেজ ছেলে নিত্যপ্রসন্ন ইঞ্জিনীয়ার, ভাল মাইনে পান, নিঃসন্তান, ধনীর কন্যা, সমাজ-সেবিকা স্ত্রীর অত্যন্ত বাধ্য স্বামী। সেজ দেবীপ্রসন্ন, শিশুটির পিতা, এম-এ, বি-এল। উকীল হলেও সেদিকে তেমন কিছু নয়, রাজনৈতিক আন্দোলনে দিন কাটিয়েছেন। বহু দল ঘুরে বর্ত্তমানে একটি দলে আশ্রয় পেয়েছেন। নামের আগে পরিচয়বাচক শব্দ যুক্ত থাকলেও এখনও বিশেষ আমল পান নি। এম-এ পাস, অধ্যাপিকা স্ত্রীর স্বামী, আট বছরের কন্যা আছে একটি। অন্য ব্যাপারে যাই হোক, অর্থব্যয়ের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী একমত। ছোট ছেলেও বিলাতফেরত, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। বিয়ে করেছে লণ্ডনে, তবে মেম নয়। লণ্ডনপ্রবাসী বাঙালীর কন্যা, বিয়ের পর দেশে এসেছে। হাসিখুশী পত্নীর স্বামী, একটি বৎসর চারেকের মেয়ে আছে।

বাইরে থেকে দেখতে যতটা ভাল, ভিতরের আর্থিক-স্বাচ্ছন্দ্য ততটা নয়। বড় ছেলের পসার তেমন নয়। মেজ ছেলে বেশীর ভাগ বাইরে থাকে—বদলীর চাকরি। তার উপর বহু কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে যুক্ত, অবশ্য স্ত্রীর পিতৃদত্ত অর্থও কিছু আছে। সেজ ছেলে ঠিক সাংসারিক খরচের অংশটুকুই দিতে পারে। ছোট ছেলের ভাল মাইনে ও মোটা বোনাস হলে কি হবে, বৎসরে একবার করে আরামদায়ক ভাবে দেশ বেড়াতেই তা শেষ হয়ে যায়। সাংসারিক ব্যয় ও বিলাসের পর কিছুই সঞ্চিত হয় না।

তথাপি বৃদ্ধ হরিপ্রসন্ন বাবু অতি হিসাবের দ্বারা উচ্চদরের চাল বজায় রেখে চলেন। পুত্রদের প্রতি উদার হয়ে, পুত্রবধূদের স্বাধীনতা দিয়ে, নাতনীদের আধুনিক হবার সুযোগ দিয়ে বাইরের লোকের কাছে তাই তিনি বিচক্ষণ গৃহকর্ত্তা আর তাঁর পরিবার আদর্শ পরিবার।

শিশুর জীবনে অষ্টম চন্দ্র সমাগত, হরিবাবু ব্যস্ত এবং চিন্তিত, জাঁকজমক এবং খরচের মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য করতেই হবে।

চিত্তপ্রসন্ন বললেন, বেশ চার শত টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই, তবে আমার 'পার্সন্যাল' ফ্রেণ্ড কয়েক জনকে বলতেই হবে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, তোমার ভাইপোর অন্নপ্রাশন বলবে বৈ কি, ওই তোমার জাষ্টিস···ওঁরা সব ত?

—হ্যাঁ, হাঁ, আমিও তাঁদের কথাই বলছি।

নিত্যপ্রসন্ন টাকা আরও দুই শত বেশী দেবে, কিন্তু স্ত্রীর কথামত কাঙালী ভোজনটা হওয়া চাই।

মাথা চুলকান হরিবাবু, কথাটা মন্দ নয়। ভিখারীদের মুখে জয়ধ্বনি শোনার জন্যে নয়, দীনদরিদ্রের প্রতি তিনি কত সদয়, সেই যশের লোভে।

শিশুর পিতা, দেবীপ্রসন্নর অনর্থক ব্যয় করার সঙ্গতি নেই, তবে কিছু নিজের বাছা বাছা লোক ও কিছু কাগজের তরফের লোককে বলতেই হবে, কারণ সামনের ইলেকশনে একটা "নমিনেশন" তার চাই, চারিশত টাকা সেও দেবে। আলোকপ্রসন্নর মনটা ভাল, পুরো হাজার টাকা দেবে সে, তবে রকমারি বাজনাগুলোর ব্যবস্থা করতেই হবে। রোশনচৌকি, ব্যগপাইপ, ঝাঁঝর, ঢোল, ডগর কিছুই যেন বাদ যায় না। হরিবাবু নিজেও রিক্তহস্ত নন। পুত্রবিত্তের উপর নিজের ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ভরসা তিনি করেন না। পুত্রদের যৌথ সংসারে তিনিও সমান অংশেই টাকা দেন। মেয়েদের যাতায়াত আছে, পড়ায় প্রয়োজনে তাদের দুটি একটি ছেলেমেয়ে থাকেই, কাজেই নাতির ভাতে মেতে উঠে সঞ্চিত অর্থের অনেকখানি ব্যয় করে ফেললে তাঁর চলবে না। তবে কিছু খরচ করবেন বৈকি, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক-বিদায় পর্ব্বটাও সারা চাই, নইলে বাইরের মান অনেকখানি খর্ব্ব হয়ে যাবে।

চিত্ত ঘরে আসতেই বড়বৌ বললে, তুমি যে বাবাকে চারশ' টাকা দেবে বললে, আমাকে ত আলাদা কিছু দিতে হবে। যতই হোক, বাইরে থেকে আমি বড় জেঠীমা ত—ও টাকা দেওয়ায় ত···

—বাবার নাম হবে, তা হোক—কি দিতে চাও তুমি।

—অন্ততঃ একসেট রূপার বাসন, বাবাকে তিনশ' টাকা দিলেই হ'ত।

শুনতেই বাবা আছেন, খরচ ত সমানই দিতে হয়, না হয় বাড়ীভাড়াটাই লাগে না।

—আরে না—না, আমারও স্বার্থ আছে। জাষ্টিস সোম, দে, গুপ্ত ব্যানার্জ্জি, এদের একটা পার্টি দেব, অনেক দিন থেকে ভাবছি। কিন্তু আজকাল তাতেও লোকের চোখ পড়ে। ভাল সুযোগ পাওয়া গেছে, বাবার একমাত্র "প্রাণ্ডসান" বুঝলে না, তুমি আর একশ' টাকার মধ্যে ম্যানেজ করে ফেল দিকি। এবার বড় বৌ খুশী হয়।

মেজ বৌ বারে বারে বলে—দেখ, তোমার তিনশ' টাকার উপর আমার তিনশ' টাকা দিয়েছি, কাঙালী-ভোজন যেন নিশ্চয়ই হয়, আমাদের বাড়ীর উৎসবে এটাও যদি না হয় আমি মুখ দেখাতে পারব না, বড়লোক খাইয়ে নাম কেনা বলে ঠাট্টা সইতে হবে।

এইভাবে অন্নপ্রাশনের আয়োজন চলে, বহুকাল পরে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। নাতনীদের ভাতে যা হোক উৎসব হয়েছিল, তবে নান্দীমুখের প্রয়োজন হয় না বলে পুরোহিত ডাকতে হয় নি। বিশিষ্ট হিন্দু-পরিবার বলে শান্তির লোভে বৈশাখ মাসে মহাভারত, কার্ত্তিক মাসে গীতা-পাঠের ব্যবস্থা আছে, তাতে খরচ বেশী হয় না, যথাপি যদিও ছেলেরা বিলাত ফেরত, উদারপন্থী পরিবার তৎসত্ত্বেও গোঁড়া হিন্দুয়ানির পরিচয় দেওয়া হয়। বালগোপালের মূর্ত্তি মহাপুরুষের চিত্রপট, দেবদেবীদের নানাপ্রকার দারু বা প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত একটি ঠাকুরঘর আছে। কর্ত্তাগিন্নীই পূজা করেন। দেশের বাড়ীতে জ্ঞাতি ভাইপোকে চিঠি দিলেন কুল-পুরোহিতের জন্য। তার উত্তর পেলেন, ঠিক যে ঘর এঁদের পুরোহিত ছিলেন তাঁরা আর এখন পৌরোহিত্য করেন না। আর বর্ত্তমানে সেই বংশের যাঁরা আছেন তাঁরা শূদ্রঘরেও যাজকতা করেন। তাঁকে দিয়ে ত হরি কাকার চলবে না।

এর পর আর তাঁকে দিয়ে কাজ করানো চলে না। কলিকাতায়ই পুরোহিতের ব্যবস্থা হয়। দেবীপ্রসন্ন বলেন, পুরোহিত কত চাও। হরিবাবু বলেন, দেখ বাপু, চেহারা যেন ভদ্র হয়, আর মন্ত্র যেন ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে।

—হাঁ হাঁ, পাবনা চাটমোহরের বিখ্যাত মহেশ ন্যায়রত্নের বংশ।

আয়োজন সম্পূর্ণ, বাড়ীর সম্মুখ ভাগ আলোকমালায় সজ্জিত করা থেকে প্রতি ছেলের চাহিদামত সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়-বন্ধু কেউই বাদ পড়ে নি নিমন্ত্রণ থেকে। অনুষ্ঠান-সূচী হচ্ছে—সকালে অধিবাসের পর অধ্যাপক-বিদায়, স্বামী ভিক্ষু গোস্বামী আচার্য্য নিয়ে জন পঁচিশেক ব্যক্তি। মাঝারি সাইজের কাঁসার রেকাবে এক পোয়া চিনি, চারটি সন্দেশ ও পাঁচটি করে টাকা। দ্বিপ্রহরে দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও ব্রাহ্মণ-ভোজন। ব্রাহ্মণ বলতে যাঁরা বাড়ীতে এলে বাড়ীর মর্য্যাদা বাড়ে কিন্তু রাত্রে আসতে পারবেন না, তেমনি বাছা বাছা কয়েক জন। বাকী সকলের জন্য রাত্রে বিরাট আয়োজন। কাঙালীদের জন্য চালে-ডালে এক মণ খিচুড়ী, একটা তরকারী ও বুঁদিয়া। পরিপাটি ব্যবস্থা।

পুরোহিত এসেছেন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ছিন্ন পট্টবস্ত্র, গায়ে নামাবলি, হাতে পুথি ও থলি। চারিদিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি হ'ল, পুরোহিতের বেশবাস দেখে। যাই হোক, পুরোহিত ত্রিলোচন তর্কতীর্থ হাত-পা ধুয়ে আসন গ্রহণ করলেন। চৌধুরী-বংশে প্রতি শুভ কাজের আগে কালীপূজার রীতি আছে। হাত-তিনেক প্রমাণ প্রতিমা এনেছেন। প্রথমে কালীপূজা আরম্ভ হ'ল, সামান্য পরমান্ন দিয়ে মায়ের ভোগ হ'ল, এত ব্যস্ততার মধ্যে এর চেয়ে বেশী সম্ভব নয়। বেলা দশটার কিছু আগে অধিবাস হ'ল।

এই বার নান্দীমুখের কার্য্য আরম্ভ হবে—পূর্ব্বপুরুষদের আহ্বান। পুরোহিত আয়োজনের কাছে বসে দেখেন নিকৃষ্ট আতপ চাল, তাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। তিনি চালের গুণের কথা নয়, পরিমাণের কথা, যে মহিলাটি সব গুছিয়ে দিচ্ছিলেন তাকে জানালেন।

সম্বন্ধে খুড়ীমা তিনি। চিত্তকে ডেকে বললেন চালের কথা। বাপের কাছ থেকে ঘুরে এসে চিত্ত বললেন—ওই দিয়েই চালিয়ে দিন, একটু অল্প করে ভাগ করুন না।—হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে গেলেন ব্যাপারটা।

ত্রিলোচন দেখলেন—কেবল চাল নয়, পৈতাগুলি কোন ব্রাহ্মণের গলায় দেবার উপযুক্ত নয়, দেড় হাত গামছা, সাড়ী মাত্র একখানি, ধুতিও তাই।

একটু পরেই এলেন স্বয়ং কর্ত্তা। বললেন, দেখুন ওই কালী-পূজার ধুতি সাড়ীটা—মানে আমি কিছু মূল্য দেব, আর আসন-অঙ্গুরীও ওই ব্যবস্থা করবেন। ওগুলো ভুল হয়ে গেছে—এখন আবার অসুবিধা।

—কেন? আমি তো ফর্দ্দে সব লিখে দিয়েছিলাম।

—হাঁ তা ওই ভুল, আর ওতে ত আপনাদেরও সুবিধা।

আজ ক'দিন ধরেই বাড়ীতে খুবই অনটন চলছে ত্রিলোচন তর্কতীর্থের। একটি শ্রাদ্ধবাড়ীর কাজে যা পাবেন আশা করেছিলেন তার কিছুই পান নি। সব খরচ সমানভাবে হয়, কেবল পুরোহিতের বেলায় সবাই অভাব দেখায়। শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ভড়ংটুকু চাই। অর্থ তো দেয়ই না, শ্রদ্ধাটুকুও নেই। নিজেরাই বলে, সংক্ষেপে সারুন। ছত্তোর কি দরকার নিখুঁত ব্যবস্থার, শুদ্ধ মন্ত্রপাঠের।—হরিবাবুর মুখে সুবিধা কথাটা শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারেন না। বলেন, আমাদের সুবিধার জন্যই যখন এই ব্যবস্থা তখন আর কথা কি। কার্য্য আরম্ভ করা যাক।

কুঞ্চিত ভ্রূর মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তি ফুটে উঠল—যেন আস্পর্দ্ধা ত কম নয় পুরুতের। সূর্য্যের চেয়েও বালির তাত বেশী, সবাই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন পুরোহিতের উপর।

আস্ত কাঁচকলা দেওয়া হয়েছে ভাগ করা তণ্ডুলের উপর।

জ্ঞাতি খুড়ীমা বলেন, কলাগুলো আস্ত দিলেন কেন ছাড়িয়ে দিন।

সৌন্দর্য্যের রানীর কান্তি আপনারও হতে পারে!
দিনে দিনে সুন্দর হয়ে উঠুন…
হ্যাঁ, আপনারও উজ্জ্বল সুন্দর কান্তির স্বপ্ন সফল হয়ে উঠতে পারে! প্রতিবার স্নানের অথবা মুখ ধোয়ার সময় রেক্সোনার ক্যাডিল সমৃদ্ধ ফেনা গায়ে মুখে ভাল করে মেখে ধুয়ে ফেলুন। আপনার কান্তি দিনে দিনে আরও সতেজ আরও মসৃণ লাবণ্যে ভরে উঠবে।
…রে ক্সো না র
সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে
একমাত্র ক্যাডিল* যুক্ত সাবান
"মিস রেক্সোনা"
১৯৫৫ সালের রেক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগীতার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈলসমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
Rexona
Rexona
বড় সাইজেও পাওয়া যায়
RP. 130-X52 BG

—কেন আজ দেওয়াই ত বিধি।

—বিধি না আর কিছু, পূর্ব্বপুরুষরা খাবেন খোসাসুদ্ধ, কেবল নিজেদের সুবিধা।

ত্রিলোচন তর্কতীর্থের ইচ্ছা হ'ল বলেন, দেড়হাতি গামছা পরে ওই চাল যদি খেতে পারেন ত, কলার খোসাও খেতে পারবেন। কিন্তু তা না বলে বলেন, কি সুবিধা—রেখে খেতে পারব ?

—তা কেন, বেচাও যাবে।

—তা কালকের বাজারে গেলে, কলা বেচা যাবে না, যে কিনবে সে ত দেখে নেবে, তবে দান করা চলে—কাঁচকলা দান, মন্দ না।

খুড়ীমা অধৈর্য্য হন—কেন পুরুতরা বেচে না, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, সোনা-রুপো।

—বেচে বৈ কি, অভাব হলে, ওসব সকলেই বেচে।···

—কর্ত্তার মত অনুযায়ী কার্য্য করেই ক্রিয়া সম্পন্ন করা হ'ল, এবার দক্ষিণান্ত করতে হবে। বড় ছেলেকে ডেকে পরামর্শ করেন হরিবাবু। চিত্ত বললে, পাঁচ পাঁচই যথেষ্ট, তার উপর কাপড়-গামছা দিয়ে পঁচিশ-ত্রিশে ঠেকবে। কালীপূজোয় এক টাকা দেওয়া হয়েছিল, এতে চার টাকা দেওয়া হ'ল।

—ত্রিলোচন তর্কতীর্থ পণ্ডিত-বংশের সন্তান, শুদ্ধ আচারবিধি অনুসারে বাপ-পিতামহকে কার্য্য করতে দেখেছেন, নিজেও তাই করেন। বেশ ছিলেন পল্লীগ্রামের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসী স্বল্পশিক্ষিতদের মধ্যে, অর্থ না দিক বেশ শ্রদ্ধাটুকু ছিল আন্তরিক। অভ্যাসবশতঃ শুদ্ধ কার্য্য করাতে দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গেল।

সকলেই বিরক্ত, কি দরকার বাপু নিখুঁত আচারের, এই ভাব খানিকটা। অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণের আহার হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। জলযোগের পর আহার করতে বলায় তর্কতীর্থ মশায় বললেন, বাইরের পাচকের হাতে আমি আহার করি না, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

সকলেই হাঁ হাঁ করে উঠেন। হরিবাবু বলেন—সে কি, কেন মশাই বহু সদ্‌ব্রাহ্মণই ত আজকাল—। বাবাকে থামিয়ে নিত্যপ্রসন্ন বলে, খায়, সবাই—কেউ কি মানে আজকাল ? আপনি কেন খাবেন না ?

স্বীকার করে ত্রিলোচন বলেন, হ্যাঁ খায় বৈ কি, মানে কি আর কেউ কিছু।

তবে কেউ গোপনে খায় কেউ সদরে খায় এই ত—বলে নিত্য।

—কতকটা তাই।

—তবে আপনিও খান।

—হয় ত খাই, তবে ওই, যে সদরে খাই না।

—মানে—

খুবই সোজা, অনেকে আবার শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ চান ত, নইলে নাম খারাপ হয়ে যায়।

চিত্ত বললে, প্র্যাকটিসের অসুবিধা হয় আর কি।

—ঠিক বলেছেন। হেসে উঠেন ত্রিলোচন তর্কতীর্থ।

গম্ভীর হয়ে হরিবাবু বললেন, তা হলে পৌরোহিত্যও একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। আগেকার দিনে, দিনান্তে একমুঠো চালেই সন্তুষ্ট ছিলেন সবাই।

—কিন্তু সেটাও প্রতি দিনান্তে জোটা প্রয়োজন। যাক আমি ত উপবাসী নই আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আপনারা আহার করুন আমি অপেক্ষা করছি।

—তেমন যে খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন সকলে আহারের জন্য সেটা ঠিক নয়। এই না খাওয়ার জন্য কোথায় যেন স্পর্দ্ধা থেকে যাচ্ছে পুরোহিতের। দেবীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোন বাড়ীতেই আহার করেন না।

—করি, শূদ্রবাড়ী হলে স্বপাক, ব্রাহ্মণবাড়ী হলে বাড়ীর কেউ রন্ধন করলেই চলে।

—তা ত বলেন নি আগে !

আপনারা ত জিজ্ঞাসা করেন নি।

—আমরা ভেবেছিলাম, আমরা যখন খাই, তখন আপনিও খাবেন।

—প্রত্যেকের শ্রেণী প্রকৃতি পৃথক সেটা ত মানেন। আপনারা এর জন্য এত উতলা হবেন না। এ আমাদের অভ্যাস আছে। যান আহার করে আসুন।

—ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের ঘরে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রাপ্য চাল, কাপড়গুলি থলিতে রাখতে রাখতে ভাবেন—অতি আশা করেই বড় থলিটি এনেছিলেন, ঘরে চাল নেই এমনকি, আজ কি দিয়ে আহার হবে, তার পর্য্যন্ত স্থিরতা নাই। এই কার্য্য দ্বারা দিনদশেক অন্ততঃ চলবে ভেবেছিলেন। তিনটি শিশু রেখে বড় ছেলে মারা গেছে—বিধবা পুত্রবধূ, গৃহিণী, নিজে, এবং ছোট ছেলে। সে এক কবিরাজী দোকানে কাজ করে, অতি সামান্য পায়, তার যাতায়াত বাদে ঘরভাড়াটা হয় কোনক্রমে।—ভাবেন দেখি প্রাপ্য টাকা কি দেয়।

ঘণ্টা পার হয়ে যায়, কর্ত্তাদের কারও দেখা নেই। সবাই খাওয়া সেরে রাতের ব্যাপারের তদারকে ব্যস্ত ! কর্ম্মচঞ্চল বাড়ী। কর্ত্তার খাস চাকর বলাই এসে বলে, ঠাকুরমশায় কি এখন যাবেন ?

হাঁ যাব বৈ কি, কর্ত্তাদের বল, আমার প্রাপ্যটা।

—আজ্ঞে, এখুনি বলছি। বলাই চলে যায়।

খবর পেয়ে কর্ত্তারা অবাক, দক্ষিণা ত দেওয়াই হয়েছে, কেন চাল, কাপড় ইত্যাদি উনি নেন নি।

—আজ্ঞে সে সব ত ঠাকুরমশায়ের থলিতে।

বোধ হয় আরও কিছু চান, বলে আলোকপ্রসন্ন।

চিত্ত বলে, কেন খান নি বলে, ভোজনমূল্য।

বলাই এসে জানায়, আজ্ঞে, বাবুরা বললেন, দক্ষিণা ত তাঁরা দিয়েছেন।
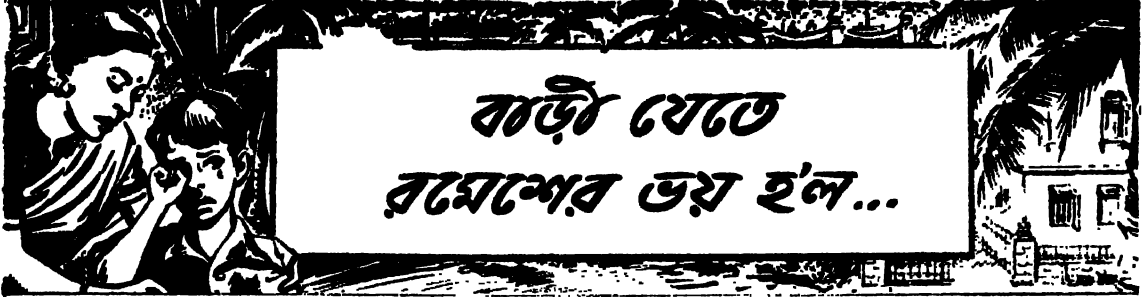
বাড়ী যেতে
রমেশের ভয় হ'ল...

কাপড় আমার ময়লা করে ফেলেছি রাম। এখন মায়ের কাছ থেকে বকুনি খেতে হবে।
আমার কাপড়ও তো প্রায়ই ময়লা হয়ে যায় ভাই, কিন্তু মা আমাকে কখনও বকেননা। আয় আমার সঙ্গে।

রামের বাড়ীতে
ও কাঁদছে কেন?
কাপড় ময়লা হয়ে গেছে বলে ও বাড়ী ফিরতে ভয় পাচ্ছে।

রমেশের বাড়ী
আবার নোংরা হয়ে বাড়ী ফিরেছো! আর কোনদিন তোমায় বাড়ীর বাইরে খেলতে যেতে দেবোনা।

আহা বাছাকে বোকোনা—খেলতে গেলে সব ছেলেই অমন কাপড় ময়লা করে ফেলে।

ওর কাপড় আছড়ে কাচতে রোজই আমার গলদঘর্ম হয়—আর সেইজন্যেই তো ওর কাপড় অতো তাড়াতাড়ি ছেঁড়ে!

সে তো বটেই, আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যাবেই তো, তারজন্যেই অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে!

আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে
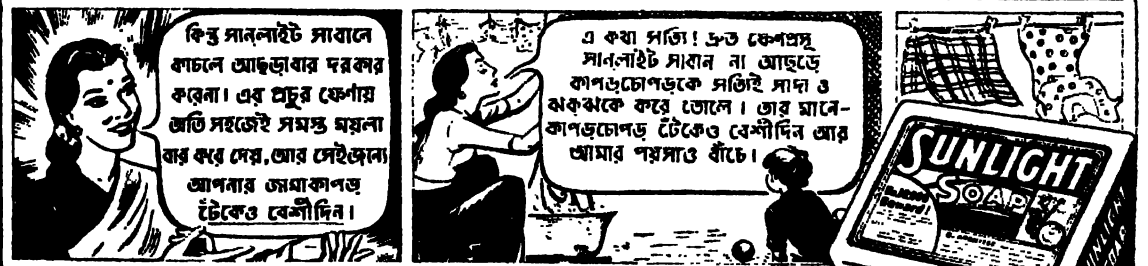
কিন্তু সানলাইট সাবানে কাচলে আছড়াবার দরকার করেনা। এর প্রচুর ফেণায় অতি সহজেই সমস্ত ময়লা বার করে দেয়, আর সেইজন্যে আপনার জামাকাপড় টেঁকেও বেশীদিন।

এ কথা সত্যি! দ্রুত ফেণাপ্রসূ সানলাইট সাবান না আছড়ে কাপড়চোপড়কে সত্যিই সাদা ও ঝকঝকে করে তোলে। তার মানে—কাপড়চোপড় টেঁকেও বেশীদিন আর আমার পয়সাও বাঁচে।

SUNLIGHT SOAP
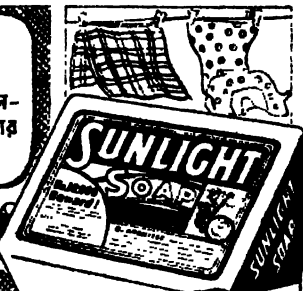
—দক্ষিণা দিয়েছেন, কিন্তু কালীপূজা নান্দীমুখ সব পারিশ্রমিক কি এই পাঁচ টাকার সামা হ'ল ?

চিত্তপ্রসন্ন পিছনেই ছিলেন। না খাওয়ার জন্য তাঁর যেন জ্বালাটা বেশী ছিল। এগিয়ে বলেন—শুধু পাঁচ টাকাই নয়, আনুষঙ্গিক আছে। আর এই নিন, আপনার ভোজন মূল্য এক টাকা।

প্রথম অপরাহ্নের আলোক তির্য্যক্ ভাবে এসে পড়ছে। অনাহারী দারিদ্র্যপিষ্ট ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে যেন আগুন জ্বলে উঠল, তথাপি আত্মসংযম করে বললেন, থাক, ভোজন করি নি কাজেই তার মূল্য আমি চাই নি। তার পর থলিটি উপুড় করে চাল, কলা, কাপড়, গামছা ইত্যাদি মাটিতে ঢেলে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আসি, নমস্কার।—বার হয়ে আসেন তিনি।

—সে কি, ওগুলো, নেবেন না আপনি।

আসতে আসতে বলেন, না, ও ত আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বাস্তু-দেবতা নারায়ণকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া, আপনারাই প্রসাদ পাবেন।

শূন্য থলি হাতে বাড়ী আসেন ত্রিলোচন। গিন্নী বলেন, এ কি কিছুই যে আন নি, ওঁরা বুঝি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন? যাক বহু কষ্টে কিছু ধার করে বাছাদের চালে-ডালে করে দিয়েছি। চাল কত গো, সের পনের হবে?

—এক কণিকাও নয়, ওরা সব বড়লোক বুঝলে, রাতে হাজার লোক খাবে, আর পুরুতের বেলায় পাঁচটি টাকা, আর নিকৃষ্ট দ্রব্য। তাও ওদেরই দিয়ে এসেছি।

গৃহিণী চুপ করে রইলেন, বুঝলেন, বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে তিনি সব ছেড়ে আসতেন না।

ওদিকে হরিবাবুর বাড়ী, সন্ধ্যা থেকেই খাওয়ানো আরম্ভ হয়েছে, বিরাট ব্যাপার, বাড়ীর সব স্থানেই খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবুও একদল ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের মায়েরা খেতে বসেছেন।

নিত্যপ্রসন্ন বললেন, এরা দাঁড়িয়ে কেন, জায়গা নেই, আচ্ছা ওই যে কোণের ঘরে কি, নান্দীমুখ হয়েছিল? আচ্ছা, দে দে ওটাই পরিষ্কার করে দে—বলাই, পাঁচুর মা—যাও শীগ্‌গির।

দাদাবাবুর কথায় ঝি চাকরে মিলে, মেঝের সেই চাল, কাপড় ইত্যাদি তাড়াতাড়ি এক কোণে ঠেলে দিয়ে, আসন পেতে জায়গা করে দিল। খাওয়ার শেষে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল পায়ে তারই কতক অংশ ছড়িয়ে দিয়ে গেল, তার পর পরিবেশক, দর্শক ও ভোক্তাদের যাতায়াতে সেই চাল—যে কদন্ন ভোজন করে, ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হলে হরিবাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা তৃপ্তিলাভ করতেন, তা সকলের পদতলে পিষ্ট হতে লাগল। তখন সারাদিনের অনাহারী ব্রাহ্মণ, পরের দিন শিশুদের অনাহারের আশঙ্কায় নিদ্রাহীন।

হরিবাবুর বাড়ীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবার ভোজনে বসেছেন। তিনি স্বয়ং সমাদর, আপ্যায়ন করছেন। চার ছেলে কাছে কাছে আছে। পরিবেশকরা একে একে আসছে, হরিবাবু বলে চলেছেন, হ্যাঁ দিয়ে যাও—দাও, দাও—এ হ'ল গোবিন্দভোগ চালের নিরামিষ পুষ্পান্ন—অপেক্ষা করছ, কেন? পাবেন বৈকি—গোলাপসরু চালের মংস্যান্ন। নেবেন, নিশ্চয়ই নেবেন, এই হচ্ছে—পেশোয়ারী চালের পলান্ন।

সকলে বলে উঠলেন—এ কি, এ যে, রাজকীয় কাণ্ড!

উচ্চাঙ্গের হাসির ভঙ্গিমায় তাচ্ছিল্যের ভাব মিশিয়ে, হরিবাবু বললেন, এটুকুও যদি না হবে—তা হলে আর অন্নপ্রাশন কি!

সুচিত্রা সেন পছন্দ করেন লাক্স
টয়লেট সাবান
এর
শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার
জন্য।
সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্য্যের উৎস
"আপনার ত্বককে মসৃণ ও সুন্দর রাখতে হলে ভালভাবে রগড়ে নিন ...
"পরিস্কার করে ধুয়ে নিয়ে শুকিয়ে গেলে —ঝরঝরে তাজা অনুভূতি আপনার আসবে।
"লাক্স টয়লেট সাবানের নবনীসুলভ ফেনা ও সৌরভ মোহময়
"আপাদমস্তক সৌন্দর্য্যের জন্য বড় সাইজ ব্যবহার করুন যা আমি করি।"
LUX
TOILET SOAP
বিমল রায়ের "দেবদাস" এর মনোমোহিনী অভিনেত্রী

কালের বিচার—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, দাস ভিলা, ২১ শ্যামনগর রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮। মূল্য ২৲ টাকা।

বহুদিন পূর্ব্বে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী-চরিত্রের পরিণতি লইয়া শরৎচন্দ্র অভিযোগ তুলিয়াছিলেন। আদর্শনিষ্ঠ বঙ্কিম নাকি রোহিণীর মৃত্যু ঘটাইয়া চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করেন নাই, রক্ষণশীল সমাজকে খুশী করিতে গিয়া সৃষ্টি-মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের অভিযোগ বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল বেশ। আলোচ্য নাটকখানির বিষয়বস্তু ঐ বাদ-প্রতিবাদকে লইয়াই। ইহার মধ্যে গল্প নাই—নাটকীয় গতির অভাব—তবু নবীন নাট্যকার নাটকের মধ্যে দুই পক্ষের বক্তব্যকে কতকগুলি চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

নাটকের পাত্র-পাত্রী বলিতে উপন্যাসে অঙ্কিত পুরাতন চরিত্রগুলিই; ভ্রমর, রোহিণী, গোবিন্দলাল, রমা, রাজলক্ষ্মী, কমল এবং এই সকলের স্রষ্টা বাংলা-সাহিত্যের দুই দিকপাল সাহিত্যিক বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ বক্তব্যসমেত কালের বিচারশালায় হাজির হইয়াছেন। চরিত্রগুলির সীমাবদ্ধতা নাট্যরস বিকাশের সহায়ক নহে, তথাপি ঘটনাগুলিকে বাছিয়া বক্তব্যকে গুছাইয়া নাট্যকার উহারই মধ্যে নাট্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। সে রস যে ।ফকে হয় নাই—তাহা নাটকখানি পড়িলেই বোঝা যায়। রোহিণীর প্রতি সমবেদনা দেখাইয়াও শরৎচন্দ্র রমা এবং রাজলক্ষ্মীকে সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন—কিন্তু কমল হইয়াছে বর্ত্তমান কালের পথিকৃৎ। তবু কোন প্রশ্নই শেষ প্রশ্ন নহে এবং কালের বিচারে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে ডিগ্রী জারি করাও মুশকিল। নাট্যকারও সে চেষ্টা করেন নাই। দুই পক্ষের সৃষ্টিকার্য্যের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই ধরণের দুরূহ একটি বিষয় নির্ব্বাচনে নাট্যকারের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির মঞ্চ-সাফল্য পরীক্ষার বিষয় হইলেও সাহিত্য-সৃষ্টিগত সমস্যাটি যে পাঠককে নূতন করিয়া চিন্তা করিবার সুযোগ দিবে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। নাট্যকার নবীন হইলেও শক্তিমান, —বাংলা নাট্য-সাহিত্য পরিপুষ্ট করিবার উদ্যম তাঁহার ব্যর্থ হইবে না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শিকারী জীবন—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

সাহিত্য-জগতে গ্রন্থকার অপরিচিত নন্। রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণকে যাঁহারা জানেন না, লেখক ধীরেন্দ্রনারায়ণের কবিতা-গল্পের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকেরই হয়ত পরিচয় আছে। লালগোলার সহিত সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রাজর্ষিকল্প যোগীন্দ্রনারায়ণের দানেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গোড়ার দিকে গড়িয়া উঠিয়াছে। ধীরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের পৌত্র। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর এই রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আচার্য্য ত্রিবেদী ধীরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষাগুরু এবং সম্বন্ধে মাতামহ।

ইংরেজীর মত বঙ্গ-সাহিত্য শিকার-কথায় সমৃদ্ধ না হইলেও অনেকেই শিকার-কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুখপাঠ্য। শাস্ত্রকারেরা ব্যসন বলিয়া নির্দ্দেশ দিলে কি হইবে, ধনুর্ব্বাণ হইতে আরম্ভ করিয়া উইনচেষ্টার রাইফেলের যুগ পর্য্যন্ত শিকারের মাদকতা সমভাবে বর্ত্তমান। শিকারের মধ্যে যে উত্তেজনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুঃসাহস এবং দারুণ বিপদের মধ্যেও একটা দৃক্‌পাতহীন মনোভাব আছে, তাহা প্রতিনিয়ত আমাদের আকর্ষণ করে। তাই শিকার-কাহিনী চিরদিন পাঠকের এত চিত্তগ্রাহী। আলোচ্য গ্রন্থে এ সবই আছে, কিন্তু ইহাই শুধু "শিকারী-জীবনে"র বৈশিষ্ট্য নয়। যেখানে জীবনকে প্রকৃতভাবে প্রকাশ করা হয় সেখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। "শিকারী-জীবন" যদি শুধু শিকারেরই বর্ণনা হইত, যদি শুধু ইহাতে শিকারের উন্মাদনা, আনন্দ, ভয়াবহতা, অনিশ্চয়তা এবং সাফল্যের কথাই থাকিত তাহা হইলে পুস্তকখানি কৌতূহলোদ্দীপক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা খাঁটি সাহিত্য হইত না। "শিকারী-জীবনে"র সর্ব্বত্র সেই মানুষটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে মানুষ শুধু শিকারী নয়, শুধু রাজকুমার নয়, শুধু বংশগৌরবে গৌরবান্বিত নয়, যে মানুষ মানবধর্ম্মে ঐশ্বর্য্যশালী, যে সাধারণ হইতে নিজেকে তফাৎ করে না, যে বন্ধুবৎসল সখা, পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তানবৎসল পিতা, যে আভিজাত্যের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী নয়, যে বিশিষ্ট হইলেও পৃথিবীর জনগণের একজন। লেখক তখন ছেলেমানুষ, বয়স বছর দশেক, মাতুলালয়ে গিয়াছেন, মাতুল পাল্কী চড়িয়া শিকারে যাইতেছেন, বলিলেন,

"পাল্কী নামা—ওয়ে বড্ড গরম, একটু পাখা কর্।" "আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তালবৃন্তের ব্যজন সুরু হ'ল। আমার মনে হ'ল, বাতাসটা কার পাওনা? ঘর্মাক্ত-কলেবর বাহকদের, না পাল্কীতে সুখাসীন মাতুলের?" এই রকম একটু তুলির ছোঁয়াতে লেখক যেমন নিজেকে তেমনি পারিপার্শ্বিক মানুষদেরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জীবনের প্রকাশ আছে বলিয়াই "শিকারী-জীবন" সাহিত্যপদবাচ্য এবং এ সাহিত্য রসসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। লেখকের পাঁচ জন দেহরক্ষী ছিল, "তাদের চিরদিন এড়িয়ে চলতাম। এর মধ্যে একটা আড়ম্বর আছে; মনে হ'ত আমি যেন একটা আলাদা মানুষ, জনসাধারণের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন।" কিন্তু গ্রন্থকার শুধু গম্ভীরভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেখার মধ্যে একটি লঘু-লীলায়িত ভঙ্গী আছে। তিনি পাকা শিকারী, লক্ষ্য অব্যর্থ, কিন্তু লেখার কোথাও অযথা বাহাদুরী লইবার প্রয়াস নাই। লেখকের কৌতুকবোধ যথেষ্ট, তাই শিকার-কাহিনীতে শুধু বীররসের অবতারণা নাই, হাস্যরসের ভিতর দিয়া ঘটনাগুলি উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্বাভাস, শিকারী-জীবনের গোড়াপত্তন, শিকারী-জীবনে হাসি, পদ্মার চরে বাঘ, শিকারের নেশায়—কুমীর, শুয়োর, পক্ষী ও ব্যাঘ্র, গানের আসর থেকে বাঘের আসরে, কার বাঘ কে মারে, পুরীতে পাটকীয়া জঙ্গলে, চিল্কাহ্রদে পক্ষীশিকার, কোণারকে, বালিগাই, পদ্মায় পক্ষীশিকার, একই দিনে বাঘ ও জোড়া ভাল্লুক, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও 'ফেন' হ্রদে হরিণ শিকার, হাজারীবাগের বাঘ—গ্রন্থে এই পনেরটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ বিয়োগান্ত। একেবারে শেষের দিকের এই করুণ এবং সংক্ষিপ্ত বিয়োগ-বেদনার ইতিহাস আমাদের মনকে ব্যথিত করিয়া তোলে। হাসি ও অশ্রু-মিশানো এই "শিকারী-জীবন" স্বতঃই পাঠকের একান্ত আকর্ষণের বস্তু। মাত্রাবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া লেখা আতিশয্যবর্জিত। দুই-চারিটি মাত্র কথায় অরণ্য, পদ্মার চর এবং প্রকৃতি রেখাঙ্কিত চিত্রের মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রচনা সাবলীল। ঘটনা প্রবহমাণ। পড়িতে বসিলে শেষ পর্যন্ত না পড়িয়া উপায় নাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শিক্ষা প্রসঙ্গ—স্বামী বিবেকানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা। মূল্য ১॥০।

স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র ধর্মনায়ক নন, তিনি আধুনিক ভারতের একজন প্রধান চিন্তানায়ক। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উপদেশাবলী গভীর ভাবে অনুধাবনযোগ্য। "মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা।" তাঁর এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, কতকগুলি মত, তত্ত্ব অথবা বুলি আওড়াতে পারলেই শিক্ষা হয় না; আন্তরিক শক্তির স্ফুরণই শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য।

আলোচ্য গ্রন্থে স্বামীজীর শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা নয়টি প্রবন্ধের আকারে সঙ্কলিত হয়েছে: (১) শিক্ষার মূলতত্ত্ব (২) শিক্ষালাভের উপায় (৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য (৪) বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ ও তন্নিরাকরণের উপায় (৫) ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (৬) শিক্ষা ও ছাত্র (৭) স্ত্রীশিক্ষা (৮) জনশিক্ষা (৯) আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-প্রণালী।

স্বামীজীর মনস্বিতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে পরিস্ফুট। তাঁর জ্ঞানদীপ্ত চিত্তের প্রভাবে পাঠকের মন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

ভারতের মুক্তিসাধনায় অরুণাচলের অবদান—শ্রীঠাকুরদাস রায়। অরুণাচল মিশন। মূল্য ৷৷০।

অরুণাচল ধর্মাশ্রম। পুস্তিকাখানি প্রচারমূলক। আমাদের মনে হয়, সাধকদের পক্ষে আত্মপ্রচার থেকে বিরত থাকাই শোভন।

আলোর তৃষা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম: পণ্ডিচেরী। মূল্য ১৷০।

'মায়ের দিকে', 'আলোর তৃষা', 'অন্তর্জীবন' প্রভৃতি অধ্যাত্মভাবমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ।

মুস্কিল আসান—নারায়ণ সান্যাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৷০।

হাস্যরসের নাটিকা। লেখকের 'ছাত্রবয়সের লেখা'। সুতরাং এতে কাঁচা হাতের ছাপ থাকা অপ্রত্যাশিত নয়।

জীবনকাব্য—শ্রীপতিচরণ পড়ুয়া। ৫।২ডি, রাজেন্দ্র সেন লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৷০।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও যৌবনান্ত—জীবনের বিভিন্ন অবস্থার কথা পদ্যের সূত্রে গাঁথা। অনুভূতি হয়ত সত্য, কিন্তু তার প্রকাশ কবিতা হয় নি। ছন্দেরও বাঁধুনি নেই।

বার্ণার্ড শ'—শ্রীসত্যনারায়ণ লাহিড়ী। ৮।১ডি, হাজরা লেন। মূল্য ১৷৷০।

প্রধানতঃ শ'য়ের চিন্তাপ্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা। যাঁরা বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে শ'য়ের সম্বন্ধে কিছু জানতে ও ভাবনার খোরাক পেতে চান, তাঁরা পড়ে উপকৃত হবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শান্তির বারতা (১ম খণ্ড)—প্রেমময় ব্রহ্মচারী। অযাচক আশ্রম, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।
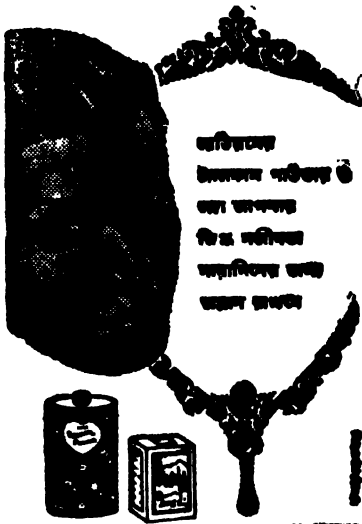
ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা। কথোপকথন-সূত্রে লেখকের গুরু স্বামী স্বরূপানন্দ যে সব উপদেশ দিয়েছেন, তার সঙ্কলন।

আঁখিতে রহ গো—শ্রীআশীষ গুপ্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩৲।

এক সময়ে আশীষ গুপ্তের গল্প অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার পর সাহিত্যজগতে দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন প্রায় নির্বাক। অনেক দিন পরে এ বইয়ে তাঁর বিদ্রূপ-করুণা-নিপুণ রচনার পরিচয় মিলল। বইখানিতে নন্দলাল, সহধর্মিণী, আমাদের যুগের সুনন্দ, ও হে ঈশ্বর—এই চারটি গল্প আছে।

ভারত-আত্মার বাণী—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ডবল ডিমাই, ২৮৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲।

অজর অমর শাশ্বত সনাতন আত্মার শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া জড়বাদী ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্ত্য শক্তিবৃন্দ দিকে দিকে জড়বিজ্ঞানের বিজয়-কেতন উড়াইয়া দুনিয়ার মালিকানা দাবি করিতেছে। আধ্যাত্মিক প্রাচ্য জাতিমণ্ডলকে যেন সদর্পে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, 'জড়বাদের প্রতাপ লক্ষ্য কর, আকাশে এরোপ্লেন, জলে সাবমেরিন ও ডেষ্ট্রয়ার, স্থলে ট্যাঙ্ক, কামান-বন্দুকের অজস্র সম্ভার, তদুপরি এটম ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি বিশ্ববিধ্বংসী মারণোপকরণ, সুতরাং আত্মিক শক্তির বড়াই না করিয়া তোমরা আমাদের বশবর্তী হইয়া চল। মোটর, রেডিও, টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক রেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক উপকরণাদি আহরণ করিয়া তোমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া দিব।' দুইটি বিশ্বমহাযুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবৃন্দের এই জড়বাদী সভ্যতার পরিণাম লক্ষ্য করা গিয়াছে। অতঃপর গ্রন্থকারের 'ভারত-আত্মার বাণী' শুনাইবার প্রয়োজন কি? জড়বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপাদি দর্শনে চমৎকৃত বিশ্বজন আধ্যাত্মিকতা, মানবতা ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে কি? কিন্তু জীবনদর্শনাভিজ্ঞ প্রাচীন গ্রন্থকার ইহাতে দমিত না হইয়া বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত, বুদ্ধবাণী প্রভৃতি হইতে প্রাচীন ভারতের বাণী ও বর্তমান কালের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও দর্শন হইতে অজস্র উক্তি ও রচনাংশসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, কালপ্রবাহে কত সুপ্রাচীন সভ্যতার পতন ও বিলোপ ঘটিয়াছে, কিন্তু ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার বিনাশ নাই। এখনও তা কালের বিশ্বগ্রাসী অমোঘ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া অটল অটুট ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, আত্মার চিরভাস্বর ও চির-অম্লান জ্যোতিতে দেদীপ্যমান, মহীয়ান ও বলীয়ান।

বইখানি বার বার পড়িতে ইচ্ছা হইবে, কারণ গ্রন্থকার প্রচুর শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ভারত-আত্মার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ও জবাহরলালের প্রতিকৃতি দেওয়াতে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। মলাটের পরিকল্পনা সুন্দর।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

শান্তি-সাহানা—শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী। "কবিতা-বিতান।" ৪১, বামাচরণ রায় রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। মূল্য এক টাকা।

'শান্তি-সাহানা' কবিতার বই। ঠিক আধুনিক কবিতা নয়—চিল, শকুন, শিয়াল, কুকুর, বন্যা, নাগিনী প্রভৃতি কুড়িয়ে-আনা শব্দপ্রয়োগে অভি-

আধুনিকতার ছাঁচে ঢালাই করা। ফলে স্থানে স্থানে মর্মোদ্ধার দুরূহ হওয়ায় আর কৃত্রিমতার প্রলেপ পড়ায় কবিতার প্রসাদগুণ ব্যাহত হয়েছে। তাঁর কথায় বলি :

"থামো কেমাটিক কবিপুঙ্গব ; যে কথা বলছি শোনো :
আমদানী-করা কলমের চারা সৌখিন-টবে যতই কেননা বোনো
কোনো-ই কুসুম ফুটবে না তাতে,—যদি এ-দেশের মৃত্তিকা-পয়োধরে,—
এদের দৃপ্ত কিশলয়-প্রাণ বাঁচার খাদ্য না পায় সুধায় ভ'রে।"

—প্রোগ্রেসিভ, পৃঃ ২৯।

উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু অতি-আধুনিক হওয়ার মোহ মাঝে মাঝে তা ব্যর্থ করেছে। অবশ্য তাঁর সার্থক কবি-কর্মের প্রমাণও রয়েছে এ বইয়েই—

"নদীর ও-পারে আকাশের নীচে পদ্মার সমতলে
আবির-ঝড়ের অরুণ-ওড়না রক্তের শতদলে
স্রোতের আবেগে মেলে যে পাপড়ি তার,
আকাশ, পৃথিবী সমতল—একাকার !
বাতাসের বাণী তখন পূরবী-শান্তির লিপি লিখে'—
পাঠায় আগামী, উজ্জ্বল পৃথিবীকে।
আরক্ত-চাঁদ জেগে ওঠে ধীরে সোনালী-মেয়ের ডাকে
যৌবন-ভরা পদ্মার বাঁকে বাঁকে।" সোনালিয়া, বলো—পৃঃ ৮।

লেখক জাত-কবি। শক্তির অপচয় না করলে এবং অতি-আধুনিকতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলে এঁর কাছে রীতিমত ভাল কবিতা পাওয়া যাবে।

কাগজের ফুল—দেবপ্রসাদ। হোমশিখা প্রকাশনী বিভাগ। উমাচরণ মুখার্জ্জী লেন, কৃষ্ণনগর। প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

'কাগজের ফুল' উপন্যাস। কালিন্দী আর তার স্বামী অমূল্যের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতাই এর কাহিনীর উপজীব্য। গ্রামের গরীব-ঘরের কিশোরী মেয়ে কালিন্দী। সুন্দরী বলে উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলে অমূল্যের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল। কলিকাতার উপকণ্ঠে সাহেবি ভাবাপন্ন পরিবার—লেখাপড়া, নাচগান শিখিয়ে ঐ পরিবারের উপযুক্ত করে তোলা হ'ল কালিন্দীকে। তার পর পারিবারিক জীবন ছাড়িয়ে সামাজিক জীবনে ছড়িয়ে পড়ল কালিন্দীর কার্য্যকলাপ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালিন্দী বুঝতে পারল—তার আর তার স্বামীর মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধানের প্রাচীর রয়েছে। কিন্তু কোথায় তা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। এদিকে কালিন্দীর সঙ্গে বিয়ের আগে স্বামীপরিত্যক্তা বনলতার সঙ্গে অমূল্যের হয়েছিল অন্তরঙ্গতা এবং এই অবৈধ মিলনের ফলে একটি ছেলেরও জন্ম হয়েছিল—নাম তার নীলু। কালিন্দীকে বা অন্য কাউকে অমূল্য একথা জানায় নি, অমূল্যের সঙ্গে বনলতার কোন যোগাযোগও অবশ্য ছিল না। হাসপাতালে মারা যাবার সময় বনলতা কিন্তু সাত বছরের ছেলে নীলুকে অমূল্যের হাতে সঁপে দিয়ে গেল। অমূল্য নীলুকে বাড়ী নিয়ে এল, সদ্যমাতৃহারা অসহায় এ ছেলের পরিচয় দিল তার এক নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর পুত্র বলে। কালিন্দী নিঃসন্তানা—নীলুকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগল সে। হঠাৎ একদিন অমূল্যের পকেটের এক চিঠি থেকে কালিন্দী নীলুর পরিচয় জানতে পারল। এক মুহূর্তে স্বামীর এত দিনের আচরণের অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠল কালিন্দীর কাছে। এর পর স্বামী-স্ত্রীতে চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।—লেখক ঝরঝরে ভাষায় গল্পটি আগাগোড়া বর্ণনা করে গেছেন। স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও আবেগ প্রাধান্য লাভ করায় গল্পের গতি কতকটা ব্যাহত হলেও লেখকের সাবলীল ভাষা শেষ পর্য্যন্ত মনকে টেনে নিয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

দেশ-বিদেশের কথা

সাহিত্যতীর্থে কথা-সাহিত্যিক ও কবিসম্মেলন

গত ৩০শে চৈত্র, ১লা বৈশাখ ও ২রা বৈশাখ এই তিন দিন ধরিয়া কলকাতার বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান সাহিত্যতীর্থের দ্বিতীয় বার্ষিক কথা-সাহিত্যিক ও কবিসম্মেলন ৬৬।১, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের 'মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রসংক্রান্তির সন্ধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস এই উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্যতীর্থের বাংলা কবিতা পুস্তক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই দিন কথা-সাহিত্যিক সম্মেলনে স্বরচিত ছোটগল্প পাঠ করেন বাণী রায়, রণজিৎকুমার সেন প্রভৃতি। কথা-সাহিত্যিক সম্মেলনের প্রারম্ভে 'বাংলা ছোটগল্প' এই পর্যায়ের আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় শরৎচন্দ্রের পরবর্তী গল্পকারদের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে অভিনবত্বের কথা উল্লেখ করেন। এই দিবস এবং পর দিবস সাহিত্য-তীর্থের তীর্থপতি কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সভা পরিচালনা করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন বাণী দাশগুপ্তা।

১লা বৈশাখ কবি সম্মেলনে প্রাচীন ও আধুনিক, প্রবীণ ও নবীন কবিদের মধ্যে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি।

২রা বৈশাখ প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার উনঅশীতিতম জন্মজয়ন্তী দিনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। সভায় আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক শ্রীহরিপদ মহলানবিশ সভাপতিত্ব করেন। সাহিত্য-তীর্থের তীর্থঙ্করদের পক্ষে শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক অভিনন্দনপত্রে বলেন, "কথার পরে কথা গেঁথে আপনি যে অমর কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন, বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর তা অমর সম্পদ, অক্ষয় সম্পদ।" সভায় বহু বিশিষ্ট

অতিথির মধ্যে শ্রীঅখিল নিয়োগী, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভাপতির ভাষণের পরে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংবর্দ্ধনার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া সাহিত্যতীর্থের তীর্থঙ্করবৃন্দকে আন্তরিকতার সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করেন।

হরনাথ তত্ত্বপ্রচারিণী সভা

'পাগল' হরনাথ বলিয়া পরিচিত সিদ্ধ পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হরনাথ তত্ত্বপ্রচারিণী সভার পরিচালকবৃন্দ ১৯১২ সনে পুরীধামের স্বর্গদ্বারে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমটি ধর্ম্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান। পুরীর তীর্থযাত্রীরা বিনা খরচে তিন দিন তথায় থাকিতে পারেন। প্রতিদিন তথায় নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করা হয়। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিধবাদিগের জন্ত গৃহশিল্প ও কারুশিল্পের একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা উক্ত সভার কর্ত্তৃপক্ষের আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে 'সভা'র অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। টাকাকড়ি নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য :

শ্রী এস. কে গাঙ্গুলি। ৫০-বি, সারপেনটাইন লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের সম্মান

উত্তর প্রদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত আয়ুর্ব্বেদিক ও টিব্বি একাডেমি রাজবৈদ্য ডাঃ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম-এ, আয়ুর্ব্বেদ বৃহস্পতিকে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার রচিত "ক্যান্সার রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা" (Ayurvedic Treatment of
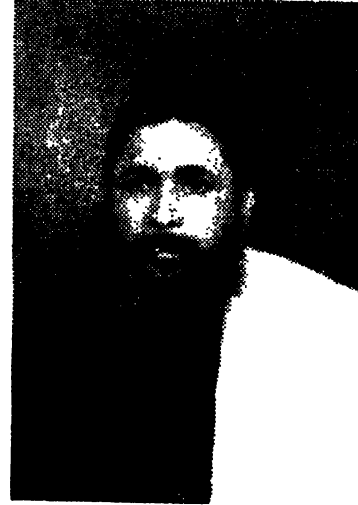
শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

Cancer) নামক গ্রন্থখানির (১৯৫৫-৫৬ সালের) জন্য দুই শত টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। বাংলা দেশের কবিরাজগণের মধ্যে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এই পুরস্কার লাভ করিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

পল্লীপ্রান্তে

শ্রীঅসিতরঞ্জন বসু

উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ (তক্ষশিলা : ৫ম শতাব্দী)

পাথরের বুদ্ধমূর্তি (মথুরা : গুপ্তযুগ ৫ম শতাব্দী
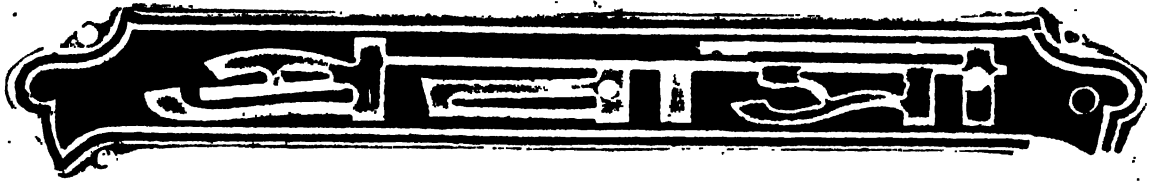
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৬৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নৈতিক মান

বোম্বাইয়ে বিগত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মধ্যে নৈতিক মান সম্পর্কিত প্রস্তাবটিই বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। অধিবেশনের অল্পদিন পূর্ব্বে খড়্গপুর ও কালকার রেল ধর্ম্মঘটিগণের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও দুষ্কৃতি এবং অধিবেশনের মুখে, বোম্বাইয়ে সংযুক্ত-মহারাষ্ট্র দলের প্রবল বিক্ষোভ, এই কয়টি ঘটনা পরে পরে আসায় কংগ্রেস কমিটির চৈতন্যের উদয় হয়। ফলে তাঁহারা অনেক প্রয়াসের পর একটি দীর্ঘ উপদেশমূলক, আপ্তবাক্য প্রচার করিয়া দেশের লোককে কৃতার্থ করেন।

কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা একটি সংবাদ দিতেছেন যে, বর্ত্তমানে এই নগরীতে কিশোর ও যুবজনের মধ্যে উদ্দাম যথেচ্ছাচার ও দুর্নীতি ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। ফলে নাগরিকদিগের জীবন-যাত্রার পথে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথে উহা বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং পুলিস বাধ্য হইয়া এই সকল ব্যাপারে প্রতিকারের পথ খুঁজিতেছে।

রোগ ত সারা দেশে মহামারীর ন্যায় দেখা দিয়াছে। প্রতি-কারের জন্য কংগ্রেস মাতব্বরী দিয়াছেন ও স্থানীয় পুলিস টোটকার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু রোগের কারণ ও তাহার প্রতিক্রিয়া যদি সম্যক ভাবে বিচার না করা হয় তবে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা কি করিয়া হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

কংগ্রেস ত বর্ত্তমানে নৈতিক অধঃপতনের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। নিজের ঘরে যদি অনাচার, ব্যভিচার ও দুষ্কৃতির চূড়ান্ত চলিতে থাকে তবে পরকে উপদেশ দেওয়া যায় কোন মুখে? ছলে বলে কৌশলে পরকে বঞ্চিত করিয়া যিনি নিজের পাতে ঝোল টানিয়াছেন তিনি অন্যকে কি বলিয়া সততার পথে লইয়া যাইবেন? শিষ্টের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া যে সরকার দুষ্ট ও দুর্ব্বৃত্তের কাছে নতি স্বীকার করে, কি করিয়া সে জনসাধারণের সাহায্যে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সক্ষম হইতে পারে?

অল্পদিন পরেই দেশের ও রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অধিকার লইয়া নির্ব্বাচনের অভিযান আরম্ভ হইবে — তাই আজ কংগ্রেস কমিটির মাথা ব্যথা, সেই জন্য আজ কলিকাতায় পুলিস কমিশনার দুশ্চিন্তায় মগ্ন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ও সময়ে সকল দলের সকল মুখপাত্র বাক্যের ফোয়ারা খুলিবেন। কেহ-বা দেশে রামরাজ্য স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিবেন, কেহ-বা বাজাইবেন সাম্যের ঢোল, কেহ-বা পিটিবেন জনকল্যাণের কাঁসর। নির্ব্বাচন হইয়া গেলে যিনি ও যাঁহারা জিতিবেন তাঁহারা সকলেই প্রথমে নিজের স্বার্থ এবং পরে দলের পুষ্টি এই দুই মূলনীতি গ্রহণ করিয়া অন্য সকল চিন্তা বর্জ্জন করিবেন। এই তো সনাতনী প্রথা এবং বর্ত্তমানে এদেশে যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে তাহার কোনও লক্ষণ তো আমরা দেখিতেছি না।

দেশের ভবিষ্যতের আলোক যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের নৈতিক অধঃপতন যে ব্যাপক ভাবে হইতেছে সে তো এখন সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু তাহার প্রতিকার কি এতই সহজ যে, পুলিস কমিশনারজাতীয় অধিকারী দ্বারা তাহা হইতে পারে? কলিকাতার পথেঘাটে যাহারা চলাফেরা করে, যাহারা সাধারণ ভাবে কলিকাতার নাগরিক জীবনের সমস্যাগুলি দেখে তাহারা জানে কলিকাতার পুলিস কি প্রকার জীব! পুলিস কমিশনার আগে নিজের ঘর শোধন করিয়া পরে কিশোর ও যুবকের সমস্যা হাতে লইলে ভাল হয়। যদি কিশোর ও যুবকেরা কলিকাতার পথেঘাটে দেখিতে পায় যে হঠকারিতার জয় সর্ব্বত্র, তবে সে নিজেও যে ঐ দিকেই যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শিক্ষক যদি ক্লাসে ছাত্রের সম্মুখে অনাচারের আদর্শরূপে বসিয়া থাকেন তবে পড়ুয়ার আদর্শের বিকার হইবে না কেন?

নৈতিক মানের অবনতির দৃষ্টান্ত তো বিধানসভায়, লোকসভায় ও রাজ্যসভায় ভূরি ভূরি রহিয়াছে। কংগ্রেসের ত শতকরা ৯০ জন, যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিবার জন্য শঠতার পথে আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা নৈতিক মানের বুঝেনই বা কি আর দেখানই বা কি?

দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তনী

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে জাতীয় আর্থিক পরিস্থিতি খুব আশার বাণী সঞ্চার করে না; প্রগতি যেন হঠাৎ কিসে ধাক্কা খাইয়া থমকিয়া গিয়াছে, কিম্বা বিপরীত গতি অবলম্বন করিয়াছে। হিসাবের খতিয়ানে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কতখানি হইয়াছে তাহা ভাবিবার কথা। সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে যে, জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যক্তিগত আয় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ আশাপ্রদ, কৃষি উৎপাদনের সূচী ৯৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১১৫তে আর ১৯৫১ সন হইতে ১৯৫৫ সনের মধ্যে শিল্পোৎপাদনের সূচী ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবহন-ব্যবস্থা, বিশেষতঃ রেলপথের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী খাতে খরচ হইয়াছে ২,১০০ কোটি টাকা, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খরচ হইবে ৪,৮০০ কোটি টাকা। আগামী পাঁচ বছরে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিগত আয় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। হিসাবের রঙে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন রঙ্গিন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেন আলেয়ার পিছনে ধাবমান।

দেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, মূল্যমান বাড়িতেছে এবং সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে জীবনযাত্রার খরচ। সাধারণ মানুষের সরকারী হিসাবের ভেল্কীতে তাক লাগিয়া যায়, কিন্তু কেহ খুব আশান্বিত হয় না। ১৯৫৩-৫৪ সনে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০,৫৪০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত আয় ছিল বছরে ২৬৯ টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সনে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১০,১৭০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত আয় ছিল ২৬৯ টাকা। এই হিসাব ধরা হইয়াছে ১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্যস্তর দ্বারা। বর্ত্তমান মূল্যস্তর দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৩-৫৪ সনে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১০,৪৯০ কোটি এবং ব্যক্তিগত আয় ছিল ২৮১ টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সনে জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৯,৯১০ কোটি টাকায় এবং ব্যক্তিগত আয় নামিয়া আসে ২৬২ টাকায়। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার মান অবনত হইয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। মূল্যমান বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। ১৯৫৫ সনে মোট ৬,৫০ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করা হইয়াছে; খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবের খাতায় অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়াই ধরা হয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখিয়া মনে হয় যে, সরকারী হিসাব অবিশ্বাস্য। এই অপ্রকৃত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ১৯৫৫ সনে ৮০,০০০ হাজার টন চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া হইয়াছে।

এই বৎসরের নূতন বাজেটের ফলে ফাটকা বাজারের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য কালাবাজারের ব্যবসায়ীরা ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশমুখের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। সরিষার তৈল প্রভৃতি কয়েকটি খাদ্যজাতীয় দ্রব্যের উপর কর স্থাপনার ফলে ফাটকাবাজারীরা মনে করিল যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা পূর্ণোদ্যমে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিল। কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অবশ্য মূল্য বৃদ্ধি ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট, কারণ এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মাথায় কাহারা ঢুকাইয়া দিয়াছে যে, ভারতে মুষ্টিমেয় ধনীরাই কেবল রাষ্ট্রকে কর দেয়, আর আপামর জনসাধারণ দেয় না। ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে দরিদ্রকেও কর দিতে বাধ্য করা হইবে এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় খাদ্যদ্রব্যের উপর কর স্থাপন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতির পরিপন্থী। মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় তথা ব্যক্তিগত আয়ের প্রকৃত পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য যে জাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করা তাহা ব্যাহত হইবে।

দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরকারের কতকগুলি আশা ও সদিচ্ছার সমষ্টিমাত্র, বাস্তবক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি পূরিত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশনে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। শ্রী কে. সি. নিয়োগীর অভিমতে পরিকল্পনার কল্পনায় ভারসাম্যের অভাব আছে, কল্পনা আর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দুইটি এক জিনিষ নয়। আজিকার দিনের প্রধান সমস্যা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবপর হইবে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন, যে, আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই।

আর্থিক পরিকল্পনা আর প্রকৃত পরিকল্পনা দুইটি ভিন্ন জিনিষ; আর্থিক কল্পনার মাপকাঠিতে পরিকল্পনার বাস্তব সাফল্য কিংবা প্রগতি বিচার করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান দোষ কয়েকটি এই ভাবে ধরা হয়—প্রথমতঃ, অর্থাভাব। প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত করদ্বারা তোলা সম্ভবপর হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পিত খরচের পরিমাণ কম করিয়া ধরা হইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, শিল্পোৎপাদনের নির্দ্ধারিত পরিমাণের পক্ষে পরিবহন-ব্যবস্থা অনুপযুক্ত। ইহার প্রমাণ আমরা পাই-কলিকাতায় বর্ত্তমানে জ্বালানি কয়লার অভাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রেলপথ, জাহাজ ও অন্যান্য পরিবহন-ব্যবস্থার জন্য যে খরচের পরিমাণ ধরা হইয়াছে তাহা অপ্রতুল। আর খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও অল্পকালের মধ্যে প্রয়োজনীয় সরবরাহ বিদেশ হইতে পাওয়া যাইবে না। কয়েক মাসের মধ্যেই বোম্বাই

বন্দরে রোজ প্রায় ২,০০০ হাজার টন করিয়া ইস্পাত আসিবে, কিন্তু বর্ত্তমানের পরিবহন-ব্যবস্থা দৈনিক মাত্র ৮০০ টন বহন করিতে পারিবে। ভারত স্বাধীন হইবার সময় হইতেই পরিবহন-ব্যবস্থার স্বল্পতা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিকে ব্যাহত করিয়া আসিতেছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী সামর্থ্য প্রায় সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় পরিবহন-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ও প্রসারের জন্য বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, বিশেষতঃ জাহাজ-নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আর একটি দোষ এই যে, উপযুক্ত লোকের অভাব। শুধু পরিকল্পনা কাগজে-কলমে তৈয়ার করিলেই কার্য্যকরী হয় না; তাহাকে কার্য্যকরী করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষে এই প্রকার কর্ম্মচারীর যথেষ্ট অভাব আছে। এখানে সবাই মাছিমারা কেরাণী হইতে পারে; প্রথম পরিকল্পনার অনেকগুলি কল্পনাই চিন্তাশীল কর্ম্মচারীর অভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, যেমন কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট। ইহার জন্য আমাদের কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট দায়ী। তাঁহারা অতীতের কর্ম্মচারিতান্ত্রিক লৌহ কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছেন এবং কর্ম্মচারীদের নিরেট ইস্পাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতন সৃজনীশক্তির স্থান নাই।

সর্ব্বশেষে আসে মুদ্রাস্ফীতির ভয়। দেশের মূল্যমান ক্রমবৃদ্ধির দিকে। বাজেটের আলোচনার সময় লোকসভায় জনৈক সভ্য এই ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশের মূল্যমানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রধান উপায় হইতেছে, বর্দ্ধিত হারে খাদ্যশস্য, কাঁচামাল, বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদন। ইহার উত্তরে অর্থমন্ত্রী গীতার নিস্পৃহ দার্শনিক তত্ত্ব আওড়াইয়া সমস্যাটিকে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি যে ঠিক কি বলিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তবে ইহাও ঠিক যে, অর্থমন্ত্রী নিজে কি বলিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই ভাল করিয়া বোঝেন নাই। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন—"একজন সভ্য অভিমত দিয়াছেন যে, মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার প্রধান উপায় বস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যের বর্দ্ধিত সরবরাহ। অঙ্কের হিসাবে ইহা ঠিক, কিন্তু পরিকল্পনার দিক দিয়া ইহা ভুল; কারণ অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার প্রয়োগ এক জিনিষ আর পরিকল্পনার দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদনশীলতার সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করার প্রচেষ্টা ভিন্ন জিনিষ।" সত্য কথা বলিতে কি অর্থমন্ত্রীর ধোঁয়াটে উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে সবই যেন ধোঁয়া হইয়া যায়। পরিকল্পিত অর্থনীতিক কাঠামোয় সবই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে—অতিরিক্ত উৎপাদনশীলতা স্বাভাবিক হউক কিংবা পরিকল্পিত হউক তাহাতে এমন কিছু পার্থক্য হয় না; লক্ষ্যের বিষয় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার। যখন শ্রী কে. সি. নিয়োগী দেখাইলেন যে, খাদ্য, বস্ত্র, ইত্যাদির অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যতীত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না, তখন প্ল্যানিং কমিশন তাহা গ্রহণ করেন। গত বৎসর ভারতবর্ষে বস্ত্র ও চিনির উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণে হইয়াছে, তথাপি ইহারা বাজারে অগ্নিমূল্যে বিকাইতেছে। ভারতবর্ষে চিনির প্রয়োজন প্রায় ১৮ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তাই কর্তৃপক্ষ চিনির আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর তাঁহাদের হাতে যে আমদানী চিনি ছিল তাহা তাঁহারা বেসরকারী ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। ভারতে আভ্যন্তরিক চিনির উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় এখনও ঘাটতি আছে। সেই অবস্থায় আমদানী বন্ধ করার ফলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। কর্তৃপক্ষ বোধ হয় মনে করেন যে, ৩৫ কোটি লোকের মাঝখানে যদি ৫০০ জন অতিরিক্ত লাভ করে ত করুক না কেন, তাহাতে কাহার বা কি ক্ষতি হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও আইনপরিষদ হ, য, ব, র ও ল'য়ের সংমিশ্রণ—একদিকে আছেন উগ্র সমাজতান্ত্রিক, অন্য দিকে আছেন উগ্র ধনতন্ত্রবাদী, মাঝখানে আছেন বিভিন্ন পর্য্যায়ের উদারনৈতিক মতাবলম্বী যাঁহারা শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখিবার প্রয়াস পান। ইহা যেন এরোপ্লেন, রেলগাড়ী, গরুরগাড়ী ও রিক্সকে একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া দিয়া চালাইবার প্রচেষ্টা। ফলে কেহ চায় উড়িতে, কেহ বা চায় মাটিতে পড়িয়া থাকিতে, আর কেহ বা চায় হামাগুড়ি দিয়া যাইতে। এই অবস্থাকে বোধ হয় সুকুমার রায় কল্পনা করিয়াছিলেন "হাতিমির" দশা বলিয়া। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রতিক্রিয়াপন্থী অর্থমন্ত্রীকে বিদায় দেওয়া অতি অবশ্য প্রয়োজন।

বহির্বাণিজ্য পরিস্থিতি

যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাব ঘাটতিতে পূর্ণ। ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৫৫ সন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই ঘাটতি হইয়াছে, কেবলমাত্র ১৯৫০ সন ব্যতীত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বহির্বাণিজ্যে ভারতের প্রায় ১১২০ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবে, কারণ এই সময়ে যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। প্ল্যানিং কমিশন এই ঘাটতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন, কিন্তু ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা কিছু করেন নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতকগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছে এই ঘাটতি পূরণের জন্য। যথা: বিদেশী মুদ্রার জমা হইতে খরচ, বিদেশের বাজারে ঋণ গ্রহণ, ব্যাঙ্ক দাদন ও রপ্তানী ঋণ, বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ, বিদেশ হইতে ব্যক্তিগত মূলধন আমদানী ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি কেবলমাত্র আশার প্রতীক ও সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

১৯৫৫ সনে ভারতবর্ষ ৬৪৭ কোটি টাকার মাল আমদানী করে ও রপ্তানী করে প্রায় ৬০৫ কোটি টাকার মাল, ঘাটতি হয় প্রায় ৪২ কোটি টাকার মত। ১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি ছিল প্রায় ৫৫ কোটি টাকার মত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষ যদি লাভ করিতে না পারে তাহা হইলে দ্বিতীয় পরি-

কল্পনার অনেক অংশ কার্য্যকরী হইতে পারিবে না। প্ল্যানিং কমিশনের মতে আগামী পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ গড়ে বৎসরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর মতে এই হিসাব খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ভারতের রপ্তানী প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ বৎসরে প্রায় গড়ে আট শত, সাড়ে আট শত কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী করা হইবে। তিনি বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।" সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রভাবে ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ইহা অতিরিক্ত আশা।

বহির্বাণিজ্যের প্রধান কথা এই যে, ইহার গতি দ্বিমুখী, অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানী প্রায় সমান ভাবে চলে। শুধু রপ্তানী করিব, বিক্রয় করিব, কিন্তু আমদানী করিব না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। অপর দেশের জিনিষ না ক্রয় করিলে তাহারা আমাদের জিনিষ ক্রয় করিবে না, ইহা সোজা হিসাব। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতবর্ষের রপ্তানী হ্রাসের একটি প্রধান কারণ আমদানী হ্রাস ও টাকার মূল্য হ্রাস। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিত। কিন্তু পরে যেই আমদানী হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল, সেই অনুপাতে রপ্তানীও হ্রাস পাইল। সুতরাং ভারতবর্ষের অনুধাবন করা উচিত যে, রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইলে কিছু পরিমাণে আমদানীও বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহা আখেরে লাভ হইবে। কারণ আমদানী দ্রব্য দ্বারা দেশের মূল্যমান নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। আর মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া ভারতবর্ষ যে প্রাথমিক ভুল করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ আজও শেষ হয় নাই। মুদ্রামূল্য হ্রাস ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষতিকারক হইয়াছে।

কলিকাতার হাসপাতালের ঔষধ কোথায় যায়?

সম্প্রতি কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া শহরের বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল হইতে অপসারিত প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের ঔষধ ও ডাক্তারী সাজ-সরঞ্জাম উদ্ধার করে। ঔষধগুলির অনেকগুলির গায়ে হাসপাতালের নাম ছাড়া রোগীদের "বেড" নম্বর পর্য্যন্ত লেখা ছিল বলিয়া প্রকাশ।

এই উপলক্ষ্যে "ব্যর্থ হানা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কলিকাতার সান্ধ্য দৈনিক "ক্রীস্যান্ট" লিখিতেছেন যে, শহরের বিভিন্ন ঔষধের দোকান এবং গুদাম হইতে বিভিন্ন হাসপাতাল হইতে অপহৃত ঔষধপত্র পুলিস কর্তৃক উদ্ধারের দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। কয়েক মাস পূর্ব্বে পুলিস বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক গুণে বেশি মূল্যের ঔষধপত্র এইভাবে উদ্ধার করে। তখনও কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যখন হাসপাতালগুলিতে এইরূপ অনাচারের কথা প্রকাশ পায় তখন চারিদিকেই বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায় এবং যতদূর স্মরণ হয় কলিকাতার কোন বৃহৎ মেডিক্যাল ভবনের অধ্যক্ষ যিনি ঐরূপ অনাচার উদ্ঘাটনে সাহায্য করেন—তাঁহাকে বেনামী পত্র দিয়া শাসানো হয় যে, ঐ ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু কয়েক দিনের আলোড়নের পরই ব্যাপারটি চাপা পড়ে এবং শহরের বুকে এইরূপ সমাজ-বিরোধী কাজ সম্পর্কে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাওয়া যায় না।

"ক্রীস্যান্ট" বলিতেছেন, সাম্প্রতিক পুলিস হানার ফলাফলে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, হাসপাতালগুলির ঔষধ লইয়া যে অবৈধ ব্যবসা চলিতেছিল যে কোন কারণেই হউক পুলিসের পূর্ব্বতন প্রচেষ্টার ফলে তাহার অবসান ঘটে নাই। বর্ত্তমানে যে বিভিন্ন ধরনের এবং মূল্যের ঔষধপত্র ধরা পড়িয়াছে তাহাতে একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল স্বচ্ছন্দে চালান যায়। ইহাতে স্বতঃই সন্দেহ জাগে যে, হাসপাতালে যে কেবল নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মীরাই এই ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন তাহা নহে। পরিপূর্ণ নির্ব্বোধ ব্যতীত কেহই ইহা মনে করিবেন না যে, হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে দিনের পর দিন এরূপ ভাবে যাদুমন্ত্রবলে হাসপাতালের মহামূল্যবান ঔষধপত্র ও ডাক্তারী সাজসরঞ্জাম অপসারিত হইতে পারে। এই অসাধু ব্যবসায়ের মূল আরও গভীরে নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার পিছনে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত রহিয়াছে মনে হয়। সুতরাং পুলিস যদি সত্যই এই চক্রান্তের অবসান ঘটাইতে চায় তবে তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে, এইরূপ সাময়িক হানা পরিত্যাগ করিয়া চক্রান্তকারীদের মূল অনুসন্ধান করিয়া তাহা উৎখাত করা।

পরিবহন সমস্যা

"ইকনমিক উইক্লি" লিখিতেছেন, রেল বিভাগীয় মন্ত্রণাদপ্তর ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতি পরিবহন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতেই বোঝা যায় যে, পরিবহন-সমস্যা কিরূপ জরুরী আকার ধারণ করিয়াছে। বিভিন্ন মহল হইতে সরবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পরিবহন-ব্যবস্থার দোষেই দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে, কিন্তু কেহই বলিতে পারেন নাই পরিকল্পনার অন্তর লক্ষ্যবস্তু হইতে সম্পদ সরাইয়া আনিয়া কি ভাবে পরিবহন অচলাবস্থার সমাধান করা যাইতে পারে।

যদি ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির পরিবহনকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তবে সাধারণভাবে পরিবহন-সমস্যার সমাধান না হইলেও যে, স্বতন্ত্র সংস্থা ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি পরিবহনের সুরাহা করিতে সক্ষম হইবেন সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু পরিবহন-ব্যবস্থার রেশন করা হইলেও কেবলমাত্র ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতিকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেই চলিবে না; কয়লা এবং সিমেণ্টও বিভিন্নস্থানে বহন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে খাদ্যশস্য এবং অত্যাবশ্যক ভোগ্যদ্রব্যের পরিবহনও অগ্রাধিকার দাবি করিবে এবং পরিকল্পনা সফল করিতে চাহিলে এইগুলির

কোনটিই অবহেলা করা যাইবে না। অপরপক্ষে, ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির পরিবহনকে সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে, উহাদের পরিবহনের যেরূপ সংখ্যক যানবাহন দেওয়া প্রয়োজন কার্য্যতঃ তদপেক্ষা অনেক বেশী দেওয়া হইতে পারে। এরূপও হইতে পারে যে, যখন ইস্পাতের প্রয়োজন সেরূপ জরুরী নহে তখনও সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতির জন্যই রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট করা থাকিবে।

"ইকনমিক উইকলি" লিখিতেছেন, হয়ত পরিবহন রেশনিং এবং অগ্রাধিকার স্থাপন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু সেই চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে সকল প্রকার পরিবহন কাজে লাগাইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন একটি পরিবহন বোর্ড গঠন করা যে বোর্ড বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিবেন।

রেলওয়ে বোর্ড চতুর্থ দশকের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এখনও মনে করেন যে, রেল ভিন্ন অন্যান্য স্থলযানে মাল চলাচলের অতিরিক্ত ব্যয়ভার শিল্পগুলির পক্ষে বহন করা সম্ভব হইবে না, অতএব যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে মাল রেলপথেই বাহিত হওয়া প্রয়োজন। "ইকনমিক উইকলি" এই মনোভাবকে হাস্যকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসীন হইয়া অত্যধিক কর বসাইয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে রোড ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার বিকাশের পথে সকল প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি রেলবোর্ডের নিকট একবারও উদয় হয় না যে, স্বল্পদূরবর্ত্তী স্থানের পরিবহন-ব্যবস্থা যদি মোটরযানগুলির উপর অর্পণ করা হয় তবে রেলবিভাগ অধিকতর যোগ্যতার সহিত নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন? রেলপথের সমান্তরাল পথে যাহাতে অন্যান্য যানবাহন চলাচল করিবার লাইসেন্স না দেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে রেলকর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রদানকারী সংস্থাকে প্রভাবিত করিবার জন্য বিশেষ একদল কর্ম্মী নিয়োগের যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন অবিলম্বে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য "ইকনমিক উইকলি" পরামর্শ দিয়াছেন।

জঙ্গীপুর কলেজে বি-এ ক্লাশ

"ভারতী" লিখিতেছেন:

"সংবাদে প্রকাশ জঙ্গীপুর কলেজে এ বৎসর বি-এ ক্লাশ খুলিবার পরিকল্পনা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি দুঃখকর। গত বৎসর যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এখানে বি-এ ক্লাস খুলিবার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তখন সমগ্র জঙ্গীপুরবাসী ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিল এবং ছাত্র ভর্ত্তিও সুরু হইয়াছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করতঃ এই পরিকল্পনা বাতিল করেন এবং যে কয়জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল তাহাদের টাকা ফেরত দেন। সেই সময় স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দকে কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, আগামী বৎসর বি-এ ক্লাস নিশ্চয়ই খোলা হইবে এবং তাঁহারা যেন এই সময়টুকু ধৈর্য্য-সহকারে অপেক্ষা করেন। তদবধি সকলেই এই একটি বছর সুতীব্র আশা লইয়া প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহাদের এই আশা ফলবতী হইল না।"

জঙ্গীপুর কলেজে বি. এ. ক্লাশ খোলার প্রধান বাধা বাস্তব অর্থ-নৈতিক। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কলেজে নূতন ক্লাশ খোলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে একটি সর্ত্ত ছিল যে, বি. এ. ক্লাশ খোলার জন্য যে অতিরিক্ত চারিজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তজ্জনিত ব্যয়ভার স্থানীয় জনসাধারণকেই বহন করিতে হইবে—অর্থাৎ কলেজটি যদিও সরকার পরিকল্পিত ও সরকার যদিও সকল ঘাটতি বহন করেন তথাপি বি. এ. ক্লাশ খোলার জন্য সর্ব্বনিম্ন যে চারিজন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তাহার ব্যয়ভার সরকার বহন করিতে সম্মত নহেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ এই অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকিয়াই গত বৎসর বি. এ. ক্লাশ খোলার আয়োজন করেন। ইতিমধ্যে সরকার অতিরিক্ত অধ্যাপকদের দুই জনের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সমস্যা হইল অবশিষ্ট দুই জন শিক্ষকের ব্যয় সঙ্কুলান করা।

"ভারতী" লিখিতেছেন যে, হয় ত একজন শিক্ষক কম লইয়াও এ বৎসর ক্লাশ খুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দিতেন। তিন জন নূতন শিক্ষকের মধ্যে দুইজনের ব্যয়ভার সরকার বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায় একজন অতিরিক্ত অধ্যাপকের বেতন প্রভৃতি ছাত্রদত্ত বেতন হইতে তোলা মোটেই অসম্ভব হইত না। "কাজেই এ বৎসর বি. এ. ক্লাশ না খুলিবার পক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।"

শিক্ষক কম হইলে পড়াশুনা কিরূপে হইবে তাহা আমরা বুঝিলাম না।

কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বি. এ. ক্লাশ খোলার সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিলেন কেন তাহার আলোচনা করিয়া "ভারতী" বলিতেছেন যে, স্পনসর্ড স্কীমে গঠিত কলেজে বি. এ. ক্লাশ খোলা হইলে সরকার আর বেসরকারী কলেজগুলিকে সাহায্য করিবেন না এইরূপ একটি বেসরকারী খবর পাইয়াই কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বি-এ ক্লাশ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত নাকচ করেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণের সমালোচনা করিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন:—

"আমরা কর্ত্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে পারিলাম না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্পনসর্ড কলেজে একসঙ্গে বি. এ. ক্লাস খুলিবার পরিকল্পনার কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদ আমরা পাই নাই। দ্বিতীয়তঃ, সরকারের এইরূপ কোন পরিকল্পনা থাকিলেও ঠিক কোন্ বৎসরে তাহার কাজ সুরু হইবে তাহাও জানা যায় নাই। তৃতীয়তঃ, কোন স্থানে যদি জনসাধারণ উদ্যোগী হয় তবে পরে তাহারা সর্ব্বপ্রকার সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বরং জনসাধারণ অগ্রণী হইলে সর্ব্বপ্রথম সেই

কলেজেই সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিবে ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকারের দিকে তাকাইয়া বসিয়া না থাকিয়া স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করাই অধিকতর সমীচীন। তাহা ছাড়া স্থানীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও ছেলেপিলেদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। এ অবস্থায় স্থানীয় চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে ভাল করিতেন বলিয়া আমরা মনে করি। যাহা হউক, এখনও সময় অতীত হইয়া যায় নাই। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া অবিলম্বে সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি, আমাদের এ আবেদন উপেক্ষিত হইবে না।"

অর্থের অভাবে তো প্রাথমিক শিক্ষাই ব্যাহত। উচ্চ শিক্ষার খাতে কি আছে আমরা জানি না।

পাকিস্থান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

পাকিস্থান সরকার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ১৯৬০ সনের মধ্যে দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধিসাধন। পরিকল্পনাকালে মোট ১১৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে—সরকার ব্যয় করিবেন ৮০০ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি আনুমানিক ৩৬০ কোটি টাকা। পরিকল্পনাটিকে সফল করিতে ৫৩০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে বলিয়া প্রকাশ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল, খাদ্যোৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি করা; সেচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির প্রসারসাধন, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের ক্ষমতার উন্নতি করা যাহাতে পরিকল্পনার শেষে প্রতি বৎসর পাকিস্থানের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্য্যের জন্য ৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

পরিকল্পনা বোর্ড সরকারী কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার কথা চিন্তা না করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে এখন হইতে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে হইবে।

খসড়া পরিকল্পনাটি (১৯৫৫-৫৬—১৯৫৯-৬০) সর্ব্বসাধারণের আলোচনা ও পরামর্শদানের জন্য ১৪ই মে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাকিস্থানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ উপলক্ষে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" লিখিতেছেন যে, আজিকার দিনে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা আর বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। দেশের প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথ অবহিত থাকিয়া একটি সার্থক পরিকল্পনা রচনা করার জন্য যে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন পাকিস্থান প্লানিং বোর্ডের সদস্যদের তাহা আছে কিনা কার্য্যক্ষেত্রেই তাহা ধরা পড়িবে।

"জনশক্তি" লিখিতেছেন, "আজিকার দিনে যে কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হয় যাহারা এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্বগ্রহণ করিবেন তাঁহারা কোন মনোবৃত্তি লইয়া কাজে নামিবেন। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের জন্য পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে তাহারা এই বিষয়ে কতটুকু উৎসাহী আছে অথবা আজ না থাকিলেও অনতিবিলম্বে এই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহী করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে।"

"জনশক্তি" পাকিস্থান পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন যে, দৈনন্দিন সাধারণ কার্য্য পরিচালনাতেই পাকিস্থানের মন্ত্রীমহোদয়গণ ও সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ যেরূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পর ইহাদের দ্বারাই সংগঠনমূলক কার্য্যাবলীর জটিল সমস্যাগুলির সহজ সমাধান হইয়া যাইবে ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। ফলে, মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী কনট্রাক্টর শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কেহ যে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হইবেন তাহা মনে হয় না।

ভারতে বেআইনীভাবে মুসলমান আগমন

পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে নিয়মিতভাবে মুসলমানগণ বে-আইনী ভাবে ভিসা ও পাসপোর্ট ব্যতিরেকেই দলে দলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করিতেছে। মাঝে মাঝে এই বে-আইনী প্রবেশের সময় যাহারা ধরা পড়ে তাহাদিগকে জেল-জরিমানা প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে এই অনুপ্রবেশ বিন্দুমাত্রও কমে নাই। সাম্প্রতিক তথ্য হইতে বিপরীত পক্ষে উহাই প্রমাণ হয় যে, এইরূপ অনুপ্রবেশ আশঙ্কাজনকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্থানী মুসলমানদের আসামে এইরূপ বে-আইনী অনুপ্রবেশে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া "যুগশক্তি" ১১ই জ্যৈষ্ঠ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, আসামের সর্ব্বত্রই উহারা যে ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে "আসামের অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও ভাবিবার আছে। এই মুসলমানেরা অনেকে হয়ত শীঘ্রই ভারতের নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া এই রাষ্ট্রে থাকিয়া নানারূপ গোলযোগ সৃষ্টির সহায়ক হইতে পারে। সুতরাং সময় থাকিতে ভারত ও আসাম সরকারের এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন—যাহাতে পাসপোর্ট, ভিসা না নিয়া এইভাবে পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া মুসলমানেরা না আসিতে পারে তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।"

বর্দ্ধমানের জেলাশাসক

২৮শে বৈশাখ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "দামোদর" পত্রিকা

বর্দ্ধমান জেলাশাসকের আচরণের বিশেষ সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন : "আমাদের বর্দ্ধমানের জেলাশাসক মহাশয়ের অনারারী সার্ভিস কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। বেলা সাড়ে দশটায় বিচারক, অফিসার প্রভৃতি সকলেরই অফিসে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম, কিন্তু কোন দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত দেখা যায় না। অবশ্য জরুরী ব্যাপারে জেলাশাসককে জেলার বিভিন্ন স্থানে যাইতে হয়। কিন্তু কোন দিনই তিনি সময়ে উপস্থিত হইবেন না—ইহা কেমন কথা?"

"দামোদর" অভিযোগ করিয়াছেন যে, জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ঐ সময়ে অধিকাংশ দিনই জেলাশাসক মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। পত্রিকাটি আরও বলিতেছেন যে, গত ৫ই মে মধ্যরাত্রে আর. এম. এস-এর মধ্যে কর্ম্মরত কর্ম্মচারীদের উপর একদল গুণ্ডা হামলা চালাইলে জেলাশাসক মহাশয়কে জানান হয়। কিন্তু জেলাশাসকের প্রহরী নাকি জবাব দেয় যে, রাত্রে সাহেবকে বিরক্ত করা চলিবে না—ফলে সংবাদটি আর সাহেবের নিকট পৌঁছাইতে পারে নাই।

মানভূমে আসন্ন দুর্ভিক্ষ

মানভূম বর্ত্তমানে বিশেষ দুরবস্থার সম্মুখীন। অন্নকষ্ট ও স্থানে স্থানে জলকষ্ট চরমে উঠিয়াছে। বিহার সরকার মানভূমের দুরবস্থার কথা প্রথমে স্বীকার করিতে চাহেন নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষেও অধিক দিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। ২১শে এপ্রিল তারিখের রিলিফ কমিটির মিটিং-এ মানভূমের ডেপুটি কমিশনার স্বীকার করেন, মানভূমের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, শীঘ্রই সর্ব্বত্র সাহায্যদানের ব্যবস্থা না করিলে মানভূমবাসীর দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। উক্ত মিটিংএ স্থির হয় যে, রিলিফ তহবিলে যে ত্রিশ হাজার টাকা মজুত রহিয়াছে অবিলম্বে তাহার সাহায্যেই কাজ আরম্ভ করা হইবে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন রিলিফকার্য্য সুরু হয় নাই।

মানভূমের আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্দ্দশা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "সংগঠন" পত্রিকা ২২শে জ্যৈষ্ঠ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিহার সরকারের ঔদাসীন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। "সংগঠন" লিখিতেছেন :

"বর্ত্তমানে মানভূমের গ্রামে গ্রামে বেকার নিরন্ন অভুক্ত জনসাধারণ যে দুর্গতির মধ্যে কালযাপন করিতেছে তাহাতে অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে সরকারী সহায়তার প্রয়োজন। কিন্তু বিহার সরকার মানভূমের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মাইনর ইরিগেশন প্রভৃতি স্কীম মঞ্জুর হইয়াছে কিন্তু এজেন্টরা অর্থ পাইতেছে না, বার বার আসামীর মত কোর্টে হাজিরা দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা বিহার সরকারকে সেবার মনোভাব লইয়া দুস্থ জনতার সেবা করিতে অনুরোধ করি। গ্রামে গ্রামে কাজ আরম্ভ করা হউক যাহাতে প্রতি শ্রমিক কাজ করিতে পারে। গ্রামে গ্রামে কৃষিঋণ ও ধান কর্জ্জ দেওয়া হউক যাহাতে কৃষকসম্প্রদায় চাষ করিতে পারে এবং আগামী বৎসর নিজেদিগকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। অবিলম্বে যদি বিহার সরকার সেবাকার্য্যে অগ্রসর না হন তবে তাঁহাদের নির্ম্মম শোষণ, শাসন ও পেষণের জন্য মানভূমের বুকে যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জলিত হইবে তাহা সমস্ত অন্যায় ও আবিলতার পুঞ্জীভূত জঞ্জালকে পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিবে এবং তাহা হইতে বিহার সরকারের পরিচালকবর্গ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।"

কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি

কাঁচড়াপাড়া পৌরসভার নির্ব্বাচন গত ফেব্রুয়ারী মাসে সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত নূতন বোর্ড গঠিত হয় নাই। এইরূপ অহেতুক বিলম্বের মূলে রহিয়াছে দলাদলি। পুরাতন বোর্ডই এখনও পর্য্যন্ত কাজ চালাইতেছেন, কিন্তু পুরাতন বোর্ডের বহু সভ্য নির্ব্বাচনে পরাস্ত হওয়ায় নিজ নিজ কর্ত্তব্যসম্পাদনে বহু সভ্যকেই সেরূপ উৎসাহী দেখা যায় না।

"২৪-পরগণা বার্ত্তাবহ" ২২শে জ্যৈষ্ঠ এক সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"সকল বিপর্য্যয়ের মূলে রহিয়াছে দলাদলি যাহার সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ এতটুকু নাই। ফলে জনসাধারণের কর দিয়া নাম গান করা ছাড়া আর কোন গতি নাই। এই দ্বিতীয় পক্ষের মাঝখানে বিষফোড়ার মত বিষকণ্টকিত আশ্রয় লইয়াছে এক্জিকিউটিভ অফিসার। নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব হইতেই তিনি কায়েমীভাবে মৌরসী পাট্টা লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। ট্রিকসার আঘাতে জর্জ্জরিত জনসাধারণ নানা পকেটে অর্থ দিয়া তাহাদের কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন।"

ভাষাভিত্তিক রাজ্য আন্দোলন ও শিক্ষক সম্প্রদায়

সাম্প্রতিক বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনা করার জন্য বর্দ্ধমান জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সমালোচনাপূর্ব্বক ৭ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দামোদর" লিখিতেছেন যে, ভাষাভিত্তিক আন্দোলন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। "ইহার প্রথম বলিরূপে জামালপুর থানার গুহেকালনার শ্রীরাধারমণ পালকে তাহার নিজ গ্রাম হইতে শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী একটি বিদ্যালয়ে বদলী করা হইয়াছে। বিধানসভায় সরকার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ দিয়া বলা হইয়াছে, এই আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তি দিবার অভিপ্রায় কংগ্রেসের নাই। জেলা স্কুলবোর্ডের সভাপতিও এরূপ কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধারমণ পালকে ফিরাইয়া আনিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতেছি, তাঁহাদের শয়তানী অব্যাহত ভাবেই চলিয়াছে।..."

ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ এবং অংশ গ্রহণের দরুন প্রাথমিক শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন যে, যদি এরূপ কোন নিয়ম থাকিত যে প্রাথমিক শিক্ষকগণ কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারিবেন না, তাহা হইলে কাহারও অভিযোগ করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষকগণ কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিলে কোন দোষ হয় না, কেবলমাত্র বিরোধী দলগুলি-পরিচালিত আন্দোলনে যোগদান করিলেই কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে শিক্ষকগণ অপরাধী হন। "যেখানেই কংগ্রেসের সভা হয়, তাহার সঙ্গেই শিক্ষক সমিতির সভা হয়। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আবার একটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হইয়া বসিয়াছেন। কংগ্রেস রাজনীতি করিতে শিক্ষকদের দোষ নাই যত দোষ অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সহিত সংযোগ রাখা।..."

এই অভিযোগের জবাব কংগ্রেস দিবেন তবে শিক্ষক বদলী হইলেই যে তাহা শাস্তি এটা শুধু বাংলা দেশেই শোনা যায়।

ভারতে পঙ্গপাল অভিযানের সম্ভাবনা

লণ্ডনস্থিত পঙ্গপাল-বিরোধী গবেষণা-কেন্দ্র জানাইতেছেন যে, জুন মাসে ভারত, পাকিস্থান, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে পতঙ্গ অভিযানের আশঙ্কা রহিয়াছে।

সাধারণতঃ এপ্রিল মাসে এবং মে মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম-এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চল হইতে পতঙ্গের ঝাঁক আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। পঙ্গপালদল যাহাতে পূর্ব্বদিকে আসিতে না পারে সেজন্য সৌদী আরবে একটি নিয়ন্ত্রণ-ঘাটি রহিয়াছে। পঙ্গপালদল সেই নিয়ন্ত্রণ-ঘাটি অতিক্রম করিয়া আসিলেই সকল দেশকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়! সৌদী আরবে অবস্থিত এই নিয়ন্ত্রণ ঘাটিটি যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিচালনাধীন।

টিটো ও মলোটভ

৩রা জুন মাদ্রাজের ইংরেজী দৈনিক "হিন্দু" 'টিটো ও মলোটভ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, মার্শাল টিটোর মস্কো আগমনের প্রাক্কালে মলোটভের পদত্যাগ ঘোষিত হইয়াছে। এই পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত এমন নহে। অনেকদিন হইতেই বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রদপ্তর এই ঘোষণার প্রত্যাশায় ছিলেন। কিন্তু ঘোষণাটির সময়ের মধ্যে ইহার তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। যুগোস্লাভ নেতার বিরুদ্ধে কমিনফর্ম যে আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহার প্রতি মলোটভের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল; এবং যখন রুশ নেতৃবৃন্দ টিটোর সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগোস্লাভিয়া যান তখন মলোটভ যিনি বহু বৎসর যাবৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয় নাই। শেপিলভ যিনি মলোটভের উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত হইয়াছেন, তিনি যুগোস্লাভিয়া গমনকারী সোভিয়েট প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তাঁহার পক্ষে যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলা কঠিন হইবে না। সতত পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যে সকল ভ্রান্তিপূর্ণ পথে স্বতঃই আগাইয়া চলেন মলোটভ যখন ঐরূপ একটি তত্বগত 'ভুল' করেন তখন শেপিলভ সম্পাদিত "প্রাভদা" পত্রিকাই তাহার বিশেষ সমালোচনা করে। মলোটভ বলিয়াছিলেন, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পরে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি "তত্বগত দিক হইতে ভ্রান্ত", কারণ রাশিয়াতে ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই একটিমাত্র ভ্রান্ত বক্তব্যের জন্য মলোটভ চাকুরী হারাইয়াছেন। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, পুরাতন বলশেভিকদের মধ্যে একমাত্র মলোটভই ষ্ট্যালিনের বিধ্বংসী প্রক্রিয়া অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়াছিলেন।

"হিন্দু" লিখিতেছেন, পররাষ্ট্র বিষয়ে শেপিলভের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তবে তাঁহার পিছনে ক্রুশ্চেভের সমর্থন আছে বলিয়া মনে হয়। রাশিয়াতে বর্ত্তমানে এই সমর্থনের বিশেষ মূল্য আছে। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর যখন বেরিয়ার প্রাণদণ্ড হয় তখন মনে হইয়াছিল যে, এক নেতার শাসনের পরিবর্ত্তে রাশিয়াতে কমিটি শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং মস্কো হইতে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। মলোটভের পদত্যাগের ফলে রুশনীতি—বিশেষ পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের আসন হইতে বঞ্চিত হইলেন। ম্যালেনকভের অধোগতি ইতিপূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। "কমিটি" যেন ক্রমশঃই জনবিরল হইয়া আসিতেছে।

রাশিয়াতে সরকারীভাবে মার্শাল টিটোর আগমনের উদ্দেশ্য দুইটি দেশ ও দুইটি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এ ক্ষেত্রে মলোটভের অপসারণ বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। টিটো তাঁহার স্বাধীনতা ত্যাগ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা অল্প। পশ্চিমের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া যুগোস্লাভিয়ার লাভ হইয়াছে এবং টিটো ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়া কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যদি কেহ বেলগ্রাদ ও মস্কোর মধ্যকার বিরোধকে নিন্দা করিয়া থাকিয়া থাকেন তাহাতে টিটোকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই। বস্তুতঃ 'টিটোবাদ" আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। মার্শাল টিটো সর্ব্বদাই সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার জন্য নিজস্ব পথ বাছিয়া লইবার অধিকার দাবি করিয়াছেন। মস্কো পরিদর্শনের ফলে টিটোবাদের অবসান ঘটিবে না। কিন্তু রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে গোঁড়া কম্যুনিষ্টদের নিকট তাঁহার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য হইবে। এই বিষয়ে যুগোস্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টিতে আর গভীর ফাটল দেখা দিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। রাশিয়ার সহিত তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান বন্ধুত্ব পশ্চিমী রাষ্ট্র-

গোষ্ঠীর—বিশেষতঃ ওয়াশিংটনের নিকট বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইবে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে একদল লোক আছেন যাঁহারা সর্বদাই টিটোর কার্য্যাবলীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত। মলোটভের পদত্যাগ হইতে বুঝা যায় যে, যুগোশ্লাভিয়ার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারকে রাশিয়ানরা কতদূর গুরুত্ব দান করে।

টিটোর রুশ ভ্রমণের কোন প্রত্যক্ষ বা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল নাও দেখা দিতে পারে। তবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বলকান কম্যুনিষ্ট ফেডারেশন সম্পর্কে যে সকল কথা শোনা গিয়াছিল তাহা এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বলকান ফেডারেশনের মূল কথা হইল যুগোশ্লাভিয়া, বুলগারিয়া, আলবানিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে একটি ফেডারেশনে আবদ্ধ করা হইবে। মার্শাল টিটো এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কমিনফর্ম হইতে বহিষ্কারের পরও মার্শাল টিটো ঐ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন নাই। কার্যতঃ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে তিনি আর এক ধরনের বলকান ফেডারেশন গঠনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ঐ পুরাতন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে পুনরায় আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে থাকিবে টিটোর নিরপেক্ষ-বাদ যাহার দ্বারা যুগোশ্লাভিয়ার আংশিক উপকার সাধিত হইয়াছে। যুগোশ্লাভ সংবাদপত্রগুলিতে বলা হইয়াছে যে, টিটোর রুশ-ভ্রমণ যুগোশ্লাভিয়ার সহিত পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলির সম্পর্কের উন্নতি-সাধনে সহায়তা করিবে। টিটোর সহিত যে প্রতিনিধি দল রুশ-দেশে গিয়াছেন তাহা বিশেষ শক্তিশালী করিয়া গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। স্বভাবতঃই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়াই আলোচনা চলিবে। পশ্চিমের দেশগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সকল আলোচনার ফলাফল লক্ষ্য করিবেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে মার্শাল টিটো বিশেষ অনুকূল অবস্থায় রহিয়াছেন। যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি দলের মস্কো ভ্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য হইতে পারে। সকলেই ইহা আশা করেন।

গোয়া ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত গোয়াবাসীদের এক সভায় ভারতের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরু পশ্চিমী শক্তিবর্গকে গোয়া সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করিবার দাবী জানান। শ্রীনেহরু বলেন যে, যাঁহারা ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ বলিয়া অভিযোগ করেন তাঁহারা নিজেরা কেন গোয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ রহিয়াছেন তাহা তিনি জানিতে চাহেন।

গোয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মনোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "হিতবাদ" লিখিতেছেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের, নীরব সমর্থনের দরুনই পর্তুগাল তাহার ভারতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপনিবেশটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস পর্তুগীজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কুনহার সহিত যুক্ত বিবৃতিতে গোয়াকে পর্তুগালের প্রদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া পর্তুগালকে প্রত্যক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। অনুরূপভাবে অতি পুরাতন এক চুক্তির ভিত্তিতে পর্তুগাল ব্রিটেনের সমর্থন লাভের আশা করিতেছে এবং ব্রিটেন নীরবে পর্তুগালকে তাহার উপনিবেশ-গুলি আঁকড়াইয়া থাকিবার উৎসাহ যোগাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আজ পৃথিবীতে গণ-তন্ত্রের পতাকা বহন করিতেছে এবং কম্যুনিষ্ট একনায়কত্বের কবল হইতে অন্যান্য রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যখনই পশ্চিমী জগতের ঔপনিবেশিকবাদের প্রশ্ন উঠে তখন তাহারা বিজ্ঞের মত নীরব থাকেন। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে খোলাখুলি ভাবে ঔপনিবেশিকবাদের সমর্থন করা হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মুখে গণ-তন্ত্রের বুলি যথেষ্ট শোনা হইয়াছে। এখন প্রয়োজন ঔপনিবেশিকবাদ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করা।

ব্রিটিশ যখন ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন মনে হইয়া-ছিল যে, স্বাধীনতার মূল্য বোধ হয় পরিশোধ হইয়াছে এবং শান্তি-পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে দেশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে একটি তুচ্ছ ইউরোপীয় দেশ আজ ভারতের একাংশকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। ভারত স্বেচ্ছায় যে আত্ম-সংযমের পরিচয় দিয়াছে তাহাতেই পর্তুগীজরা এরূপ বর্ব্বরতা চালাইবার সাহস পাইয়াছে। এই প্রচেষ্টায় তথায় রক্তনদী প্রবাহিত করিয়াছে। পর্তুগীজগণ গোয়াকে এখন একটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত করিয়াছে।

"হিতবাদ" লিখিতেছেন, "কিন্তু এ ভাবে ভারতের জাতীয়তা-বাদের প্রবাহকে রুদ্ধ করা যাইবে না।" ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের সহিত ভারতে যে ঐতিহাসিক বিবর্তন দেখা দিয়াছে এবং ফরাসী-দের ভারতত্যাগের ফলে যাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ভারতীয় জনসাধারণ কখনই একটি ক্ষুদ্র ঔপনিবেশিক শক্তির সশস্ত্র হুমকির দ্বারা ইতিহাসের সেই গতিকে প্রতিহত হইতে দিবে না। ভারতের অন্যান্য অংশের জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের পর গোয়াবাসীরাও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ভারতীয় ভূমিতে বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি ভারতীয় সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিতেছে। গোয়া (পর্তুগাল সরকার) ও পাকিস্থানের মধ্যকার মিতালী আজ আর কাহারও অজানা নাই। ইহা ব্যতীত গোয়া উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সদস্য। পাকিস্থান যেরূপ সিয়াটো ও মেডো (মধ্য এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা)র সাহায্যে কাশ্মীর সম্পর্কে তাহার দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, সেইরূপ পর্তুগালও গোয়াতে অনুসৃত নীতির স্বপক্ষে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার সদস্যদের সমর্থন-লাভের চেষ্টা করিতেছে। এরূপ অশুভ পরিস্থিতিতে ভারত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সিংহলস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি

সিংহলের নবনির্ব্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীসলোমন বন্দরনায়ক ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিংহলে ব্রিটিশের যে দুইটি সামরিক ঘাঁটি রহিয়াছে তাহাদের অপসারণ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকা যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী মহল এই ঘোষণায় বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই। "টাইমস" পত্রিকা সিংহল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে অর্থনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্ব উভয় দিক হইতেই অসার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "টাইমস" এরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের আগামী সম্মেলনে অপরাপর প্রধানমন্ত্রিগণ শ্রীবন্দরনায়ককে তাঁহার এইরূপ চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা এবং অসারতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবেন এবং সিংহল সরকার যাহাতে সামরিক ঘাটি সরাইয়া লইবার দাবী পরিত্যাগ করেন সেজন্য শ্রীবন্দরনায়কের উপর সকল প্রকার চাপ দিবেন।

"টাইমস"এর যুক্তি অনুযায়ী সিংহল হইতে ব্রিটিশ সামরিক ঘাটি অপসারণ করিলে সিংহলের অর্থনৈতিক দুর্গতি দেখা দিবে এবং কমনওয়েলথ প্রতিরক্ষা শৃঙ্খলের একটি অংশ ছিন্ন হইবে। ব্রিটিশ সামরিক ঘাটির অবস্থানের ফলে সিংহলের সার্ব্বভৌমত্বের কোন হানি ঘটে নাই এবং ব্রিটেন কখনও ঘাটিগুলিকে রাজনৈতিক চাপ দিবার জন্য ব্যবহার করে নাই।

মার্কিন পত্রিকাটির অভিমতে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীদের কর্ত্তব্য হইবে, সিংহলের প্রধানমন্ত্রীকে ইহা বুঝান যে, সিংহলের ব্রিটিশ সামরিক ঘাটিগুলি "ব্রিটিশ" ঘাটি নয়, কমনওয়েলথ ঘাটি। ঐ ঘাটিগুলি কমনওয়েলথের সুবিধার জন্যই সিংহলে রহিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বিশ্বের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকেও সাহায্য করিতেছে।

"নিউইয়র্ক টাইমসে"র উপরোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের সমালোচনা করিয়া "বোম্বে ক্রনিকল" লিখিতেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "সর্ব্বতহীন" সাহায্য হিসাবে যে ৫০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিয়াছে, তাহার কালি শুকাইবার পূর্ব্বেই ওয়াশিংটনের এই বেসরকারী মুখপত্রটি সিংহল সরকারের উপর চাপ দিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছে। যে দেশ সামরিক ঘাটি দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার পক্ষে নিরপেক্ষ দেশগুলির শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব নহে।

"বোম্বে ক্রনিকল" উল্লেখ করিতেছেন যে, এমন কি ব্রিটিশ সরকার পর্য্যন্ত বন্দরনায়কের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় মার্কিন হস্তক্ষেপ সমস্যাটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে। সামরিক ঘাটি তুলিয়া লইলে সিংহলের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইবে বলিয়া "টাইমস" যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিয়া "বোম্বে ক্রনিকল" বলেন, যদি ভবিষ্যতে সিংহল বিপদগ্রস্ত হয় তখন সহজেই সে ব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে। যদি কমনওয়েলথের দেশগুলি মনে করে যে, কমনওয়েলথের প্রতিরক্ষার জন্য সিংহলের প্রতিরক্ষা দৃঢ়তর করা প্রয়োজন তবে ঘাটিগুলি সিংহলের হাতে তুলিয়া দিলেই সব দিক দিয়া সুবিধা হয়।

বর্দ্ধমান পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা

গত ৫ই মে রায়না থানার কামারগড় গ্রামে অবস্থিত বড়বেনান ইউনিয়ন বোর্ড আপিসের সন্নিকটস্থ স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে অরুণ মালিক নামক একটি দিনমজুরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিনের মধ্যেও পুলিস তথায় যাইয়া কোনরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা মনে করে নাই বলিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন। উক্ত পত্রিকাটির বিবৃতি অনুযায়ী প্রকাশ যে, যদিও ইউনিয়ন বোর্ড আপিসের পার্শ্বে এই রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে এবং যদিও গ্রামে দফাদার ও চৌকিদার ছিল তথাপি দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে কেহই উপস্থিত হয় নাই। "এত বড় ঘটনার সংবাদ ইউনিয়ন বোর্ড হইতে মাত্র চার মাইল দূরবর্ত্তী রায়নার পুলিস থানায় দেওয়া হইল না।" ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে থানায় সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি নাকি অস্বীকৃত হন। ঘটনার পরদিন অনন্যোপায় হইয়া নিহত ব্যক্তির পুত্র স্বয়ং থানায় খবর দিতে গেলে দারোগা নাকি বলেন যে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে পত্র লইয়া না আসিলে তিনি আসিতে পারিবেন না; এইরূপে স্থানীয় পুলিস যখন ঘটনাটি সম্পর্কে কোনরূপ দায়িত্ব লইতে অস্বীকৃত হইল তখন মৃতের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মৃতদেহ শুদ্ধ বর্দ্ধমানের পুলিস অধ্যক্ষের নিকট যায়। পুলিস অধ্যক্ষের নির্দ্দেশে বর্দ্ধমান সদর থানায় কেস গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই শোচনীয় ঘটনার উপর এক সম্পাদকীয় আলোচনায় "দামোদর" লিখিতেছেন,

"৫ই মে শনিবার বৈকালে ঘটনা ঘটিয়াছে, ৬ই থানায় সংবাদ গিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় ১০ই মে এই প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংবাদ সেখানে এ পর্য্যন্ত পুলিস উপস্থিত হয় নাই। কামারগড়ে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে, সূর্য্যাস্তের পর কেহ রাস্তায় বাহির হয় না। আমরা বহুদিন হইতে সংবাদ পাইয়া আসিতেছি, উক্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চুরি, রাহাজানির প্রচেষ্টা, দলগতভাবে নিরীহ ব্যক্তিদের প্রহার প্রভৃতি চলিতেছে, থানায় ডায়েরী করিতে গেলে, তাহা গৃহীত হয় না। এই সমস্ত প্রশ্রয়ের জন্য অঞ্চলটি অরাজকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পর মিলিত বঙ্গ অপেক্ষা বর্ত্তমান খণ্ডিত বাংলায় পুলিসখাতে বরাদ্দ অন্ততঃ চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। তাহাতেও যদি প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের ঘটনায় স্থলে পুলিস উপস্থিত

না হয় এবং আততায়ীকে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা না হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ দাঁড়াইবে কোথায়? আমরা বর্দ্ধমানের পুলিস অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, অবিলম্বে ঐ অঞ্চলে সাময়িকভাবে এক পুলিসবাহিনী প্রেরণের এবং বাহিরের কোন উপযুক্ত অফিসারকে দিয়া তদন্তের ব্যবস্থা করুন। রায়নার থানা অফিসার স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি নিরীহ প্রজার জীবনকে এরূপ অবহেলা করিবার প্রেরণা কোথা হইতে পাইলেন, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। একদিকে এ অঞ্চলের জরুরী নিরাপত্তা ও অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট অফিসারের উপযুক্ত বিচার আমরা দাবি করিতেছি। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষকে কীট-পতঙ্গের মত হত্যা করা চলিবে না।"

কিশোর সমস্যা ও পুলিস

নিম্নস্থ সংবাদটি আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার দিয়াছেন। ইহাতে যে সমস্যার কথা রহিয়াছে তাহা জাতীয় জীবনের একটি সাংঘাতিক বিপদের আকর।

কিন্তু আমাদের মনে হয় না যে, যে পথে পুলিস কমিশনার ঐ সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। পুলিস কমিশনারের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই এবং যে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা তিনি করিতেছেন তাহাও সংগ্রহ করা নিতান্তই প্রয়োজন এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু রোগের কারণ নির্ণয় হইলে পরে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা শেষ হয় না, ঔষধ-পথ্যেরও প্রয়োজন।

কিশোরের জীবনে নানা প্রভাব আসে এবং সেইগুলির সমষ্টিগত ফলে তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত ও গঠিত হয়। অভিভাবক, শিক্ষক, ক্রীড়াকৌতুকের চালক, সঙ্গীদলের নেতা, ইহারা সকলেই কিশোরের জীবনের এক-একটি পর্য্যায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইয়া থাকেন। পুলিস এই কয়টির মধ্যে কেবলমাত্র সঙ্গীদলের নাগাল পাইবে। সুতরাং সেক্ষেত্রে পুলিস কি বা করিতে পারিবে?—

"নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করিয়া কলিকাতা এবং তাহার আশে-পাশে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধমূলক কার্য্য-কলাপের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় রাজ্যের পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিসের সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা গিয়াছে যে, ইদানীং খুব অল্প বয়সেই অনেকে নানারকম সমাজ-বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

ঐ সকল কার্য্যের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয়, কখনও বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এইভাবে তাহাদের মন হইতে অপরাধপ্রবণতা (তাহা যে কারণেই জাগিয়া থাকুক) সমূলে দূর করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা পুনরায় অপরাধমূলক কার্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং কেহ কেহ অবশেষে প্রকৃত অপরাধী হইয়া উঠে বলিয়া পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন।

এই সামাজিক সমস্যার যতদূর সম্ভব প্রতিকার করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস কমিশনারের উদ্যোগে শীঘ্রই লালবাজারে এক "জুভেনাইল ব্যুরো" খোলা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক অপরাধ-প্রবণদের উন্নতির ভার এই ব্যুরো গ্রহণ করিবেন।

এই জুভেনাইল ব্যুরোর কাজ হইবে, যে সকল অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের ফলে পুলিসের নজরে বা রক্ষণাধীনে আসে, তাহাদের অপরাধ-প্রবণতার মূল কারণ ও পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করা। শুধু তাহাই নয়—তাহারা কি পরিবেশে মানুষ হইয়াছে, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা, তাহাদের জীবনের সুবিধা ও অসুবিধা, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদিরও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। তাহার পর কিভাবে এবং কি অবস্থায় সেই সব শিশু অপরাধীদের মন হইতে অপরাধ-প্রবৃত্তি দূর করা যায় এবং কিভাবে তাহাদিগকে সহজ ও সুস্থ সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে ঐ ব্যুরো তৎপর হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা

"বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য যে পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছিলেন, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

শিক্ষাদপ্তরটি আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই থাকিবে, অপর কোন মন্ত্রীকে এই দপ্তরের ভার দেওয়ার বা এজন্য নূতন কোন মন্ত্রী নিয়োগের সম্ভাবনা নাই।

স্বরাষ্ট্র (পুলিস) দপ্তরের ভারও হস্তান্তর হইবার সম্ভাবনাও এখন কম।"

আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা উপরে উদ্ধৃত সংবাদটি দিয়াছেন। বাংলায় শিক্ষার অবনতি তো চূড়ান্ত হইতেছে। পরীক্ষায় পাশের নম্বর কমাইয়া যেখানে ছেলে পাশ করান হয়, সেখানে শিক্ষার মূল্যই বা কি আর কার্য্যকারিতাই বা কি? অন্য-দিকে শিক্ষার কারখানায় "ভূরি-উৎপাদন" ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদিগের জীবনে বিনয়-শৃঙ্খলা কোনও স্থান পাইতেছে না। আদর্শহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষার ফলে তাহাদের জীবনও ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দামগতিতে চলিতেছে। সত্য বলিতে কি, বাংলার ও বাঙালীর এই জীবনমরণের সন্ধিস্থলে, সুশিক্ষার অভাব সমস্ত দেশে যে বিষ ছড়াইতেছে তাহার প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ানক। এরূপ ক্ষেত্রে অতি যোগ্য ও কর্ম্মঠ একজন মন্ত্রীর প্রয়োজন যিনি দিবারাত্র এ বিষয়ে চেষ্টিত ও ব্যস্ত থাকিবেন। ডাঃ রায় নিজে কোন প্রতিকারের উপায় করিতে পারিবেন না।

কলিকাতায় শান্তিশৃঙ্খলা

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার নিম্নস্থ সংবাদটি দিয়াছেন। পরে অবশ্য ঐ দুর্বৃত্তগণের মধ্যে অনেকে

গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু কলিকাতার বড় রাস্তায় এইরূপ ডাকাতি ব্রিটিশ আমলেও কমই হইত। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কতটা শিথিল হইলে ডাকাত এতটা সাহস পায় তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাও শোনা যায় যে, আক্রান্ত গদী হইতে টেলিফোন পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ সময় মত উপস্থিত হয় নাই :

"গত বুধবার রাত্রি প্রায় সোয়া দুই ঘটিকার সময় ইণ্টালী এলাকায় একদল সশস্ত্র লোক ১ নং কনভেণ্ট রোডস্থিত এক মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীর গদিতে হানা দিয়া তিনটি ক্যাসবাক্স এবং একটি লোহার সিন্দুক সহ অনুমান ১৮ হাজার টাকা নগদ এবং ৫০ তোলা পরিমাণ সোনা লুণ্ঠন করিয়া বাহিরে অপেক্ষমান এক লরীযোগে সরিয়া পড়ে।

ঘটনার বিবরণে আরও প্রকাশ, ঐ সময় গদির মধ্যে ছয়জন কর্ম্মচারী নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহারা চীৎকার করার চেষ্টা করিলে দুষ্কৃতিকারিগণ চারজনকে ছুরিকাহত করে। তন্মধ্যে মতিলাল নামে ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি নীলরতন সরকার হাসপাতালে প্রেরিত হওয়ার পর মারা যান। অপর দুইজনকে ঐ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ইহা ছাড়া, একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ঘটনা সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ যে, দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে রিভলবার, ছোরা এবং লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল।"

কলিকাতার পথঘাট

নিম্নস্থ বিবরণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ১২ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয় :

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত এবং রেজিষ্ট্রার ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী একমাত্র দৈবানুগ্রহেই শুক্রবার রক্ষা পাইয়াছেন বলিতে হয়। ঐদিন প্রাতে চৌরঙ্গী রোডে তাঁহাদের গাড়ীখানির সহিত একখানি চলন্ত লরীর প্রচণ্ড সজ্জর্ষ হইলে তাঁহারা ভীষণ এক দুর্ঘটনার কবলে পতিত হন। লরীটির ধাক্কায় গাড়ীখানির সম্মুখভাগ বিশ্রী রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহার চালক আশু বিপদের মুখেও ধৈর্য্য না হারাইয়া তড়িদ্‌গতিতে ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া দেয়। ফলে উহা আলু ভর্ত্তি লরীর প্রচণ্ড ধাক্কায় শোচনীয় পরিণতি হইতে রক্ষা পায়। ভাইস-চ্যান্সেলার ও রেজিষ্ট্রার মস্তকে ও দেহে অত্যন্ত ঝাঁকুনি বোধ করেন এবং তাঁহাদের মস্তক গাড়ীর বডিতে ধাক্কা খায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে উভয়েই অক্ষত থাকেন।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের মোড়ে শুক্রবার সকালে স্যার আশুতোষের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠানে যোগদানের পর রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে ভাইস-চ্যান্সেলার যখন গাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন এসপ্ল্যানেডের অদূরে চৌরঙ্গী রোড ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডের মোড়ে এ দুর্ঘটনা হয়। রেজিষ্ট্রারের গাড়ীখানি দক্ষিণ অভিমুখে যাইতেছিল। হঠাৎ পূর্ব্বদিক হইতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড বরাবর একখানি আলু বোঝাই লরী এ স্থানে আসিয়া পড়ে এবং উহার সহিত রেজিষ্ট্রারের গাড়ীর ভীষণ সজ্জর্ষ হয়। উক্ত গাড়ীর চালক কোনক্রমে গাড়ীর মুখ ঘুরাইবার চেষ্টা করিয়া অধিকতর শোচনীয় পরিণতির হাত এড়ায়। উহার পিছু পিছু বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর গাড়ীও আসিতেছিল। তাঁহারা এ দুর্ঘটনা দেখিয়া গাড়ী থামান এবং ভাইস-চ্যান্সেলার ও রেজিষ্ট্রারের ভগ্ন গাড়ীখানির দিকে ছুটিয়া যান। তাঁহারা উভয়কে অক্ষত দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। প্রকাশ, ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বোঝাই লরীটি নাকি হু হু শব্দে গড়ের মাঠের রাস্তা ধরিয়া ছুটিতেই থাকে। রেজিষ্ট্রারের ভগ্ন গাড়ীর চালক ইহা দেখিয়া নিজে প্রবল ঝাঁকুনি ও আঘাত লাগা সত্ত্বেও ছুটিয়া জনৈক অধ্যাপকের গাড়ীতে করিয়া এ লরীর পিছু ধাওয়া করে। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা খিদিরপুরের নিকটে গিয়া ট্রাফিক পুলিস ও বেতার গাড়ীর টহলদারী পুলিসের সাহায্যে লরী থামাইতে সক্ষম হয়। পুলিস লরী চালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

কলিকাতার পথ তো অশিষ্ট ও দুর্দ্দান্ত লরী, বাস ও ট্যাক্সী চালকের রাজত্ব। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে রাত্রে চলাফেরা আরও বিপজ্জনক। কিন্তু প্রতিকারের কোন চেষ্টাই আমরা দেখি না।

পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল

আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার নিম্নস্থ সংবাদটি দিয়াছেন :

"ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখা কর্ত্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে নগরীর হাসপাতালসমূহের অবস্থা সম্পর্কে যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহা যেমন ভয়াবহ, তেমনি উদ্বেগজনক।

শুক্রবার এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বি পি. ত্রিবেদী এক সাংবাদিক বৈঠকে ঐ কমিটির তদন্তের ফলাফল এবং হাসপাতালগুলিতে যে সকল গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতি ও অব্যবস্থা বিদ্যমান, উহার প্রতিকারকল্পে তাঁহাদের সুপারিশসমূহ বিবৃত করেন।

তদন্তের ফলে কমিটি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন : ১। হাসপাতালের বহির্ব্বিভাগ এবং এবং অন্তর্ব্বিভাগে রোগীর চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই বর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের মত অতিরিক্ত ব্যবস্থা নাই ; ২। পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবসায়ী সহ সমাজের সুবিধাভোগী প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে হাসপাতালে বিনামূল্যের শয্যা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন ; ৩। বেসরকারী হাসপাতালগুলিকে মুখ্যতঃ জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া উহাদের পক্ষে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারী হাসপাতালের ন্যায় মান প্রবর্ত্তন করা, এমনকি ন্যূনতম সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না ; ৪। অধিকাংশ হাসপাতালেই প্রয়োজনের তুলনায় কর্ম্মচারীর সংখ্যা কম এবং অত্যাবশ্যক সাজ-

সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অভাব বিদ্যমান ; ৫। হাসপাতালের অধস্তন কর্মচারীদের বেতন অল্প, কিন্তু কাজের সময় বেশী ; ৬। কয়েকটি সরকারী হাসপাতাল সহ অধিকাংশ হাসপাতালেই পেনিসিলিন, সালফা ড্রাগ, এ টি এস প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ঔষধ বহির্বিভাগ হইতে রোগীদের সরবরাহ করা হয় না। বেসরকারী হাসপাতাল-গুলিতে এমনকি অন্তর্বিভাগের রোগীদিগকেও ঐ ধরনের ঔষধ ক্রয় করিতে হয়। ইহার ফলে আর্থিক অনটন হেতু প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাবে সুচিকিৎসা পাওয়া সম্ভব হয় না ; ৭। অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবে এমার্জেন্সী কেসগুলিও অবহেলিত হয় ; ৮। কলিকাতায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে অত্যন্ত গুরুতর কেসেরও কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসা হয় না।"

হাসপাতালে অভাবের ও অব্যবস্থার ফিরিস্তি তো ঐরূপ। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি অভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হাসপাতালের কর্মিগণের দয়ামায়া ও মনুষ্যত্বের। ঐ সংখ্যার আনন্দবাজারেই অন্যত্র একজন বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মন্তব্য আছে। তাহাতে আমরা পাই যে, রোগীর বালিশের নীচে পয়সা না থাকিলে সে শত চীৎকারেও কোন সেবা পায় না।

সিদ্ধার্থ নগরে শ্রীনেহরুর ভাষণ

দেশে যে হিংসাত্মক অনাচার ও দুর্নীতির প্লাবন বহিতেছে সে সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ আনন্দবাজার পত্রিকা এইরূপে দিয়াছেন :

"সিদ্ধার্থনগর, ২রা জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওজস্বিনী ভাষায় দেশে যে সমস্ত বিচ্ছেদসৃষ্টিকারী, হিংসাত্মক, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নীচাশয় শক্তি মাথা-চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তৎসমুদয়ের তীব্র নিন্দা করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, 'ক্ষুদ্রতায় মগ্ন হইলে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও দেশে তাহার শ্রদ্ধা ও সম্মান হারাইবে। হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ দমন করিতে গিয়া কংগ্রেস নির্ব্বাচনে পরাজিত হইবে, এই ভয়ে কি আমরা ভীত হইব? আমরা যদি নির্ব্বাচনে পরাজিত হই, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। নির্ব্বাচন জাহান্নামে যাউক। আমরা যেন মানুষের মত আচরণ করি।"

শ্রীনেহরু বলেন যে, এই হিংসাপ্রবণতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর কর্ত্তব্য। ভারতে ভারতীয়েরা ভারতীয়গণকে হত্যা করিতেছে, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন : 'আমরা পূর্ব্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিয়াছি। কিন্তু আমরা অহিংসভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছি। ভারতীয়েরা তখন আহত হইয়াছে ও ক্ষতের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। কোন শত্রু আঘাত করিলে তাহার বেদনা সহজেই বিস্মৃত হওয়া যায়। কিন্তু ভাই ভাইকে আঘাত করিলে সে ক্ষত চিরদিন বেদনাদায়ক হইয়া থাকিয়া যায়। তাহা সহজে নিরাময় হয় না।'

দেশ বিভাগের পর রাজপথসমূহে মৃতদেহসমূহের উপর স্তূপীকৃত মৃতদেহের কথা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন যে, এই হাঙ্গামার ফলে সহস্র সহস্র হৃদয় খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : 'আপনারা কি মনে করেন যে, এই সমস্ত ভগ্নহৃদয়ের বেদনা কি কখনও দূর হইবে? গত আট বৎসর যাবৎ এই ক্ষত নিরাময়ের জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছি। এখনও একার্য্য দুঃসাধ্য হইয়াই রহিয়াছে।'

তিনি ঘোষণা করেন : 'কংগ্রেস টিকিয়া থাকুক বা না থাকুক, আমরা এই হিংসাপ্রবণতাকে বৃদ্ধি পাইতে দিতে পারি না। আমাদিগকে ইহা দমন করিতে হইবে, ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে।'

শ্রীনেহরু বিশেষভাবে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক কার্য্যাবলী এবং খড়্গপুরে ও কালকায় রেলকর্মীদের হাঙ্গামার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, পাঞ্জাবে আন্দোলন মূর্খতার পরিচায়ক। কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া যদি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হইয়া থাকে, তবে তাহা পাঞ্জাবে হইয়াছে। তবে সেখানে লোকেরা টিনপাটকেল ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে কেন? আমরা এইরূপ সহিংস কার্য্যকলাপ বরদাস্ত করিব না এবং আমাদের সর্ব্বশক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিব।

খড়্গপুর ও কালকার কর্মীদের হিংসাত্মক কার্য্যের নিন্দা করিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছে। তাহার গুরুত্ব তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উন্নতি কখনও হিংসাত্মক কার্য্যের ভীতি প্রদর্শন ও আকস্মিক ধর্ম্মঘটের সাহায্যে হয় না।"

শ্রীনেহরুর উন্নত মনোভাব, সততা ও দৃঢ়চিত্ততা যদি তাঁহার সহকারী ও সহকর্ম্মিগণের মধ্যে থাকিত তবে এই বক্তৃতা সার্থক হইত।

কালকায় হাঙ্গামা

কালকা ষ্টেশনে যে সংঘর্ষ হয় তাহার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল :

"আম্বালা, ২১শে মে—অদ্য সকালে পুলিস কালকা রেল কারখানায় একদল বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীর উপর গুলীবর্ষণ করে।

গুলীবর্ষণের ফলে চারিজন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী নিহত এবং সাতজন আহত হইয়াছে।

প্রবীণ পুলিস কর্ম্মচারীদের সমভিব্যাহারে পুলিসের একটি বড় দল এই স্থান হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কালকায় রওনা হইয়া গিয়াছে।

এইস্থানে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রেলওয়ে কর্ম্মীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিস অদ্য সকালে কালকায় (পাঞ্জাব) শূন্যে গুলীবর্ষণ করে। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীজি, পাণ্ডে একখানি রেল কারে সিমলা যাইবার সময় রেলের এই সমস্ত কর্ম্মী রেল কারখানি আটক করে।

নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা ১৮ মিনিট পরে রেল কারখানি কালকা ছাড়িয়া চলিবার উপক্রম করিলে রেলের কয়েকজন কর্ম্মচারী গাড়ীখানি ঘিরিয়া ফেলে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। তাহারা বলে যে, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট তাহারা তাঁহাদের দাবির একটি সনদ পেশ করিতে চাহে।

শ্রীপাণ্ডে তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, সিমলায় পৌঁছিবার পরই তিনি তাহাদের দাবি যথাসম্ভব শীঘ্র বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; কিন্তু বিক্ষোভপ্রদর্শনকারিগণ দাবি করে যে, এই স্থানেই তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইতে হইবে।

রেল কার লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয় বলিয়াও প্রকাশ। ফলে গাড়ীর কাঁচের সার্সি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের মধ্যে একজন জনৈক পুলিস কর্ম্মচারীর রিভলবার ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। তাঁহাকে প্রহারও করা হয়। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীরা পুলিসের উপর প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে। উহার ফলে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস সুপার সহ কয়েকজন পুলিস আহত হয়। বিক্ষোভপ্রদর্শনকারিগণ তখন লোকো শেডের সামনে রেলপথের উপরে বসিয়া পড়ে এবং ইঞ্জিন চলিতে দিতে অস্বীকার করে। ট্রেন চলাচল বন্ধ করিবার জন্ম রেলের রাস্তার উপরে পাথরকুচি স্থাপন করা হয়।

বিক্ষোভপ্রদর্শনকারিগণ ক্রমেই বেপরোয়া হইতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্ম পুলিসকে উপরের দিকে গুলী নিক্ষেপ করিতে হয়।

পাঞ্জাব পুলিসের ইন্সপেক্টর-জেনারেল স্বয়ং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে মোটরযোগে আম্বালা হইতে কালকা যাত্রা করিয়াছেন।

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপাণ্ডে অদ্য বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কালকাতেই আটক পড়িয়া আছেন।

আম্বালা, ২৯শে মে—অদ্য লোকসভায় কালকার ঘটনা এবং জনতার যে উন্মত্ত আচরণের জন্ম পুলিস গুলী বর্ষণ করিতে বাধ্য হয় তাহার বিষয় উল্লেখ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপন্থ গত সপ্তাহে খড়্গপুরে চালকবিহীন অবস্থায় একটি ট্রেণকে চালাইয়া দেওয়া অপেক্ষা এই ঘটনাকে "অধিকতর ভীষণ বলিয়া" মন্তব্য করেন।"

মানুষ কতটা স্বার্থচিন্তায় উন্মত্ত হইলে এরূপ অমানুষিক কাণ্ড ঘটায় সেইটাই এখন চিন্তার বিষয়।

লোকসভায় খড়্গপুরের ঘটনা

খড়্গপুরের ঘটনার আলোচনার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

"২৮শে মে—দৃঢ় হস্তে বেআইনী কার্য্যকলাপ দমন করিবার জন্ম সরকারের সঙ্কল্প গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গণ-আন্দোলনে হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বনের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণা প্রচারে সম্মত হইতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতি আবেদন জানান।

অদ্য লোকসভায় খড়্গপুর ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে দুই ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কের মধ্যে শ্রীনেহরু বলেন যে, খড়্গপুর ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটান অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ ও অধিকতর অপরাধজনক কার্য্যের বিষয় তিনি চিন্তা করিতে পারেন না। তিনি বলেন: 'ইহা নিছক হত্যা বা হত্যার চেষ্টা এবং ইহা তাহা অপেক্ষা আদৌ ন্যূনতর নহে।'

গত শনিবার ধর্ম্মঘটী রেলকর্ম্মীদের এক জনতা ট্রেন হইতে ইঞ্জিন চালক ও ফায়ারম্যানকে টানিয়া নামাইয়া ট্রেনখানিকে চালাইয়া দিলে তাহা খড়্গপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর উঠিয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং তাহার ফলে ৬৩ জন আহত হয়। অদ্য লোকসভায় শ্রীফিরোজ গান্ধী এই ঘটনা সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, 'যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার জন্ম স্থানীয় ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী' অথবা ঐই ইউনিয়ন 'সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং তাহার অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন নাই।' তিনি স্পষ্টভাবে জানান যে, তিনি কর্ম্মীদের উপর বা ট্রেড ইউ-নিয়ন আন্দোলনের উপর রুষ্ট নহেন। তিনি সমস্ত কর্ম্মীরই নিন্দা করিতেছেন না; কারণ, ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে যাহারা আহত হইয়াছে, তাহারাও কর্ম্মী।

তিনি বলেন, "আমি ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু যাহারা সর্ব্বদাই দুষ্কার্য্যে তৎপর, তাহারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে পঙ্ককুণ্ডে টানিয়া নামাইবে, ইহা আমি চাহি না।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সুষ্ঠু ও ন্যায়-সঙ্গত পথে প্রসারলাভ করুক, ইহাই তিনি দেখিতে চাহেন। তিনি ধর্ম্মঘট করিবার অধিকারও স্বীকার করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে যেরূপ ভুল পথে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে তিনি উদ্বেগ বোধ করেন। ইহা তাহাদের নিজেদের পক্ষেই কলঙ্কের বিষয়।"

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ঠিক সেই অমানুষিক স্বার্থচিন্তায় আপ্লুত যেমন দেশের প্রত্যেকটি অনাচারী স্বার্থসেবীর দলের। ভুক্তভোগী এবং নিপীড়িত যাহারা তাহারা দেশের লোকের শতকরা ৯৮ ভাগ। কিন্তু তাহাদের নেতৃত্ব কে করিবে? রেলকর্ম্মীর অসাধুতা ও অত্যাচারের ভুক্তভোগী প্রায় সকল যাত্রীই। কিন্তু প্রতিকারের পথ কেহই খুঁজিয়া পায় না।

রেলপথের যাত্রী

রেলে ভীড়ের প্রতিকার সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্য নিয়ে দেওয়া হইল। পণ্ডিতজী কি মনে করেন যে রেলে লোকে চাপে মনের সুখে?—

"নয়াদিল্লী, ১৬ই মে—ট্রেনে অত্যধিক ভীড়ের প্রশ্নে উত্যক্ত হইয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু অদ্য লোকসভায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ

হইবে, ট্রেনের ভাড়া বাড়াইয়া দিয়া তাঁহারা ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করিবেন—না চীন দেশের প্রথা অনুযায়ী ভ্রমণের জন্য অনুমতিপত্র প্রবর্ত্তন করিবেন? পরে শ্রীনেহরু নিজেই বলেন যে, তিনি নিজে দ্বিতীয় উপায়টি পছন্দ করেন না এবং এই সম্পর্কে তাঁহাদের চীনা পদ্ধতি অনুসরণের ইচ্ছা নাই। যদি ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রেলপথগুলি রিটার্ণ টিকিট প্রভৃতি দ্বারা লোক-জনকে ভ্রমণ করিতে প্রলুব্ধ করিতেছে কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনেহরু বলেন—আমাদের এই বিরাট দেশে কি ব্যাপার ঘটিতেছে, লোকজন যাহাতে তাহা দেখিতে পায়, তজ্জন্যই এই সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিনা কারণে ভ্রমণে উৎসাহদানের জন্য এই সব ব্যবস্থা করা হয় নাই।

দারিদ্র্যে বিতরণ?

লোকসভায় ও রাজ্যসভায় একদল লোক গিয়াছেন যাঁহাদের মনস্তত্ত্ব অতি সরল অথচ অতি ক্ষুদ্র। তাঁহারা মানুষকে উঁচু করায় চাইতে খাটো করাতেই আনন্দ পান। তাঁহাদের ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন।

"নয়াদিল্লী ১৮ই মে—প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন যে, সমাজতন্ত্রকে দারিদ্র্যের চরম পর্য্যায়ের সহিত সমীকৃত করা চলে না। তিনি বলেন, আয়ের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নহে। এই আদর্শকে আপনারা কার্য্যে রূপদান করিতে পারেন না। আপনারা শুধু মানসিকভাবে সন্তোষলাভ করিতে পারেন।

সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকায় বাঁধিয়া দিবার জন্য রাজ্যসভায় একটি বে-সরকারী প্রস্তাব করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক কর্ম্মচারীর সর্ব্বোচ্চ বেতন মাসিক ১,৮০০৲ টাকায় বাঁধিয়া দিতে বলা হয়।

এই প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্কের সময় শ্রীনেহরু বলেন, "সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের মাথা কাটিয়া তাঁহাদের বেতন হ্রাস করার প্রস্তাব অস্বাভাবিক। অবশ্য আমি জানি যে, কোন কোন চাকুরীতে উচ্চ বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ভাল বেতন পান না। অন্যান্য দেশে তাঁহাদের মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক অনেক বেশী বেতন পাইয়া থাকেন।"

শ্রীনেহরু বলেন, "তাঁহার এই ভাষণ পূর্ব্ব-পরিকল্পিত নহে। সভায় কি আলোচনা হইতেছে তিনি জানিতেন না। সভায় আসিয়া তিনি কিছুক্ষণ আলোচনা শুনিয়াছেন। কেহ কেহ সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যাহাদের আর কিছু বেশী তাহাদের সকলের শিরশ্ছেদনই বুঝি সমাজতন্ত্রের হইয়া সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও হইতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সমাজতন্ত্রকে দারিদ্র্যের চরমপর্য্যায়ের সমীকৃত করা চলে না। সমাজতন্ত্র তখনই সমাজতন্ত্র হয় সমবণ্টনের উপযুক্ত সম্পদ থাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে সম্পদের সমবণ্টন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বাধিক প্রয়োজন উৎপাদন-বৃদ্ধি।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "উক্ত প্রস্তাবে জাতীয় জীবনের গতিশীলতার দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। এই প্রস্তাবে একটা কৃত্রিম সমতা স্থাপনের প্রয়াস হইয়াছে।" তিনি বলেন, "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। বৈষম্য দূর করিয়া সকলের জন্য সমান সুযোগের সংস্থান কিরূপে সম্ভব ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইবে।"

কাশ্মীর সমস্যা

"উতকামণ্ড, ১৩ই জুন—ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে. এন. কাটজু অদ্য এখানে সাংবাদিকদের সহিত এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পুনরায় বলেন যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া ভারত বিশ্বাস করে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, সিরিয়ায় পাকিস্থানী দূত দামাসকাসে বলিয়াছেন যে, 'কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।'

এই সংবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিবৃতি দিয়া ডাঃ কাটজু বলেন, 'এইরূপ বিবৃতিতে ভারতের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইবার হেতু নাই।'

ভারতের মনোভাবের কোনও পরিবর্ত্তন না হইতে পারে, অন্ততঃ ডাঃ কাটজু যে দলের প্রতিনিধি তাহাদের না হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণ এইরূপ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতে চায় যে, ঐরূপ ভয় প্রদর্শনে শঙ্কিত হইবার সত্যই কারণ নাই। অর্থাৎ প্রতি-রক্ষার ব্যবস্থা আমাদের শুধু আছে মাত্র নহে, তাহা ক্রমেই শক্তি-শালী এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিযুক্ত হইতেছে।

আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, শান্তি ও স্বাধীনতার মূল্য দৃঢ় ও বলিষ্ঠ প্রহরীর ও অবিশ্রান্ত-অপলক সতর্কতা। এই মূল্যদানে শৈথিল্য হওয়ার ফলে আমাদের ছয় শত বৎসর দাসত্ব ভোগ করিতে হয়।

সিংহলে ভোজবাজী

"কলম্বো, ১৩ই জুন—প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সর জন কোটলেওয়ালা সরকারের বিরুদ্ধে সিংহলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়ক আজ এই অভিযোগ আনিয়াছেন যে, তাঁহারা আভ্যন্তরীণ জন-নিরাপত্তা দপ্তরের এবং সম্ভবতঃ সিংহলে ব্রিটিশ সামরিক ঘাটি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীবন্দরনায়ক আজ বলেন যে, দপ্তরের আনাচে-কানাচে কিছু কিছু নথিপত্র পড়িয়া থাকিতে দেখা গেলেও আভ্যন্তরীণ জন-নিরাপত্তা সম্পর্কিত বাকি সমস্ত কাগজপত্র প্রাক্তন সরকার বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

সিংহলে ব্রিটিশ সামরিক ঘাটি সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ব্রিটিশদের ত্রিনকোমলী ও কাতুনায়াকে ব্যবহার সম্পর্কে বা কি কি সর্তে ব্রিটিশরা এই দুই এলাকা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনও দলিলপত্র আমি খুঁজিয়া পাই নাই। দলিলপত্র দূরের কথা, এক টুক্‌রা কাগজ পর্য্যন্ত নাই। প্রাক্তন সরকারের ইহা এক অসাধারণ কীর্ত্তি।"

উপরোক্ত সংবাদটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সরকার দেশ ছাড়িবার মুখে এইরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কয়েক-জন এদেশীয় কর্ম্মচারী—বিশেষে ভি, পি, মেনন—ঐরূপ ব্যাপারের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া অনেক কিছু ফাইল সরাইয়া রাখায় সেই নথিপত্র নষ্ট করার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। সিংহলে কি দেশাত্ম-বোধযুক্ত কর্ম্মচারী কেহই ছিল না ?

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার রিপোর্ট সংসদে পেশ করার বিবরণ নিম্নরূপ :—

"নয়াদিল্লী, ১৫ই মে—পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণের স্বাক্ষর-সম্বলিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্ট অদ্য সংসদে পেশ করা হয়।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৬ সন হইতে ১৯৬১ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে আনুমানিক ২৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ২৫৲; টাকা দেশের শিল্পায়ন দ্রুততর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ হইবে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের পল্লী-জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা, শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা, জনগণের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বলতর ও অনগ্রসর, তাহাদের জন্য সম্ভবপর সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং দেশের সকল অংশের সুসমঞ্জস উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জাতির সম্মুখে যে বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন বলেন, 'যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যাহত হইয়াছে, তাহার পক্ষে এই কাজগুলি গুরুতর সন্দেহ নাই ; কিন্তু চেষ্টা করিলে এবং ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

দেশে মোট অর্থ বিনিয়োগের হার ১৯৫৫-৫৬ সনের শতকরা ৭৲ টাকা হইতে ১৯৬০-৬১ সনে ১১ শতাংশ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থাও যেমন একদিকে করা হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে দেশের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় দেশের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে উন্নয়ন-কার্য্য শেষ হইবে, এইরূপ পরিকল্পনার কথাও বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল শেষে অর্থ বিনিয়োগের হার ক্রমেই বাড়ান হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত না ইহা জাতীয় আয়ের ১৬ অথবা ১৭ শতাংশ পর্য্যন্ত হয়। এই ধাচের উন্নয়নের গতি ক্রমে ক্রমে বাড়িবার ফলে জাতীয় আয় ১৯৬৭-৬৮ সনের মধ্যে দ্বিগুণ হইবে এবং ১৯৭৩-৭৪ সনের মধ্যে জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়

এই পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর বিশেষতঃ মৌলিক শিল্পগুলির উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বৃহদায়তন শিল্প এবং খনি খাতে ৬৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খাতে। সাকুল্যে শিল্প ও খনি বাবদ মোট বরাদ্দের ১৯ শতাংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিল্প ও খনিতে এই উন্নয়ন সাধন করিতে হইলে পরিবহনের বিশেষ করিয়া রেলওয়েসমূহের অনেক উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পরিকল্পনায় রেলওয়েসমূহের উন্নয়নের জন্য ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। খাদ্য ও শিল্পোপকরণের উৎপাদন-বৃদ্ধির কার্য্যও অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে আগামী পনর বৎসরের মধ্যে সেচ-সুবিধা যাহাতে দ্বিগুণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ছয়গুণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। মোট বরাদ্দের মধ্যে কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ১১·৮ শতাংশ ; সেচ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন বাবদ ১৯ শতাংশ ; শিল্প ও খনি বাবদ ১৮·৫ শতাংশ ; পরিবহন ও যোগাযোগ বাবদ ২৮·৯ শতাংশ ; সমাজসেবা বাবদ ১৯·৭ শতাংশ এবং বিবিধ খাতে ২·১ শতাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনাটি এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, উহা রূপায়ণের সময় প্রয়োজনবোধে উহার পরিবর্ত্তন করা চলিবে। কাজকর্ম্মের সামগ্রিক গতি নির্দ্ধারণ ও সংশোধনের সুবিধার জন্য কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা আছে।"

আমরা এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে মতামত এই সংখ্যায় পূর্ব্বেই দিয়াছি। এখানে সরকারি বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল। ইহাতে আমাদের মন্তব্যের সহিত সরকারী দৃষ্টিকোণের পার্থক্য অনুভূত হইবে। সরকারী বিবরণে সময়কে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া দূর ভবিষ্যতের কথাই বলা হইয়াছে। ততদিন যদি বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের বৈষম্য দূর না হয় তবে কি হইবে তাহা বলা হয় নাই।

পঞ্চশীল

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

নেহেরু-চাউয়েন-লাই সংবাদের এক অপূর্ব্ব ফলরূপে "পঞ্চশীল" শব্দটি তাহার আড়াই হাজার বৎসরের জীর্ণ কায়া ত্যাগ করিয়া নবকলেবরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে উহা ছিল ধর্ম্মের অঙ্গ, এখন হইয়াছে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। শুনা যায়, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্র সঙ্ঘপন্থী (কমিউনিষ্ট) কোনও রাষ্ট্র জনপন্থী (ডিমোক্র্যাট), কোনও রাষ্ট্র ইহুদী, কোনও রাষ্ট্র ইসলামিক, কোনও রাষ্ট্র স্রেফ নাস্তিক হইলেও নূতন পঞ্চশীলের গুণে নাকি সুখে থাকিতে পারিবে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত ভিন্ন প্রসঙ্গে যিনি পঞ্চশীলের দেশনা করিয়াছিলেন, জগতে শান্তির অগ্রদূত সেই বুদ্ধদেবের আশীর্ব্বাদে নবযুগের রাষ্ট্রনায়কগণের আশা সফল হউক।

শীল শব্দের অর্থ আচার বা নিয়ম। পঞ্চশীল পাঁচটি আচার বা কর্ম্মনীতি। বৌদ্ধেরা দীক্ষাকালে এই পাঁচটি নীতি অনুসরণের প্রতিজ্ঞা করেন। পরেও নানা উপলক্ষে একক বা সমবেতভাবে পঞ্চশীল উচ্চারণ করেন। অষ্টশীল দশশীলও আছে, কিন্তু পঞ্চশীলই প্রধান।

তন্মধ্যে প্রথম শীলটি হইতেছে (পালিভাষায়)—পাণাতিপাতা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়া মি। অর্থাৎ প্রাণিহত্যা হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষা গ্রহণ করিলাম। অন্য চারিটি হইতেছে (পালি মূল আর না-ই দিলাম)—যে দ্রব্য তাহার স্বত্বাধিকারী আমাকে দেয় নাই তাহার গ্রহণ হইতে, কামজ ব্যভিচার হইতে, মিথ্যাকথন হইতে, মাদকদ্রব্য সেবন হইতে বিরতির শিক্ষাও গ্রহণ করিলাম। সংক্ষেপে বলা যায়, হিংসা, চৌর্য্য, পরস্ত্রীগমন, মিথ্যাকথন ও মাদকসেবন বর্জ্জনীয় হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে সমাজে প্রথম উদ্ভূত হয় তথায় এই পাঁচটি দোষ নিন্দিতই ছিল, বুদ্ধ নূতন কিছু বলেন নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি", কোনও প্রাণীকেই হিংসা করিবে না। তবে "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত"—অগ্নিষোম যজ্ঞে (এবং অন্যান্য যে যজ্ঞে পশুবলির বিধি আছে তাহাতে) পশুবধ করিতে পার। অর্থাৎ যজ্ঞে বধ—অবধ। ঐরূপ মদ্যপান নিন্দনীয় (এবং বোধ করি কিঞ্চিৎ উত্তরকালে সুরা-ব্যবসায়ী সমাজে ঘৃণ্য) হইলেও কোনও কোনও যজ্ঞে সোমরস পান কর্ত্তব্য ছিল, উহাও মদ্যবিশেষ। বুদ্ধ বলিলেন, হিংসা, মদ্যপান ইত্যাদি সর্ব্বাবস্থায় বর্জ্জনীয় হইবে। এইখানে তাঁহার ধর্ম্মে কিছু বিশেষ।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম যখন এমন সকল দেশে গেল যেখানে মাংস খাদ্যের প্রধান অঙ্গ বা সকল শ্রেণীর লোক অবাধে নানা প্রকার মাংস খাইতে অভ্যস্ত তখন কিছু গোল বাধিল। যেমন ব্রহ্মবাসীরা ও চীনারা ভীষণ মাংসখোর; তাহারা এবং তদবস্থ অন্য জাতিরা বলিল, বুদ্ধ ত মধ্য পথ ধরিয়া চলা অনুমোদন করিয়াছেন, তখন আমরা যদি স্বহস্তে প্রাণীহত্যা না করিয়া অন্যকর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর মাংস খাই তাহাতে দোষ কি? এইরূপে পঞ্চশীলের প্রথম ও প্রধান শীলটি দেশীয় রুচি অনুসারে বিকৃত হইয়া গেল।

কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধের সময়েও এদেশের বৌদ্ধেরা উক্ত যুক্তি অনুসারে মাংস খাইত। প্রবাদ আছে—বুদ্ধ স্বয়ং কতিপয় শিষ্যসহ এক কর্ম্মকারের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে শূকর মাংস খাইয়া মৃত্যুরোগগ্রস্ত হন। এই প্রবাদ নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও ইহা বিশ্বাস করেন নাই; তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, শূকরের মাংস নয়, শূকরের প্রিয় খাদ্য ভূগর্ভজ কন্দ ছত্রক ইত্যাদি। তাঁহারা বলিয়াছেন, trufiles খাইয়া থাকিবেন, অথবা এটা রূপকবিশেষ। যিনি অহিংসা ধর্ম্ম জীবনে দু'দশ দিন নয়, পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত ভাবে প্রচার করিয়াছেন, তিনি শিষ্যদিগকে বলিবেন—তোমরা অন্যের কাটা পশুর মাংস খাইতে পার এবং স্বয়ং আশী বৎসর বয়সে ভিক্ষুগণসহ মাংস খাইবেন ইহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য।

পতঞ্জলির যোগদর্শন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে প্রবলই ছিল। পতঞ্জলির উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ একটি অঙ্গ। উহার নাম যম। তিনি বলিয়াছেন, এইগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে এবং সার্ব্বভৌম হইলেই মহাব্রত অর্থাৎ সম্যক্ পালিত হয়। অহিংসা ধরিয়াই এ বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। যদি কোনও ধীবর বলে, আমি আমার জাতিধর্ম্ম অনুসারে মৎস্যহিংসা করিব, অন্য প্রাণী হিংসা করিব না, তাহা হইলে তাহার অহিংসা জাতি-

দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইল। যদি কেহ বলে আমি কেবল তীর্থে হিংসা করিব না, কিংবা কার্ত্তিক মাসে ও চতুর্দ্দশী পূর্ণিমায় মৎস্যাদি ভোজন করিব না—তাহা হইলে তাহাদের অহিংসা দেশ বা কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইল। "সময়" শব্দের অর্থ—আচার। দেবপূজা বা ব্রাহ্মণাদির ভোজনের প্রয়োজনে মাত্র হিংসা করিলে সে অহিংসা সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইল। এখানে যজ্ঞে বধ অবধ এইরূপ কোনও ফাঁক রাখা হয় নাই। কেননা অবধ সার্ব্বভৌম হইবে।

আরও বলা হইয়াছে, হিংসাদি অল্প বা অধিক যে-কোনও মাত্রায় কৃত, কারিত বা অনুমোদিত এবং লোভ ক্রোধ মোহপূর্ব্বক হইলেও নিন্দনীয়। নিজে কৃত পশুবধ যেমন দোষের, অন্যকে দিয়া করাইলে এবং অন্যে নিজ হইতে করিলে তাহার অনুমোদন করিলেও তেমনই দোষের কারণ হইবে।

সত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উহার মূলও অহিংসা বুঝিতে হইবে। সুতরাং যদি সত্য বলিলে নরহত্যার সম্ভাবনা থাকে, তবে সত্য না বলাই ভাল। এই একটু ফাঁক। বুদ্ধের উপদেশে তাহাও দেখা যায় না। পরস্ত্রীগমন ও চৌর্য্য হিন্দুশাস্ত্রে মাহাপাপ বলিয়া গণ্য। অসত্য এবং মদ্যপানও পাপ বলিয়া গণ্য।

পঞ্চশীলের কোনও শীলেই মধ্যপথ সমর্থিত হয় নাই। অহিংসা সম্বন্ধে জৈনেরা কিছু বাড়াবাড়ি করেন ইহা সকলেই জানেন। সেটা বাড়াবাড়িই। বৌদ্ধ বা হিন্দু কোনও মতেই এবং কোনও কালেই অন্ততঃ অনুমোদিত হয় নাই। কিন্তু তাহাকেও মধ্যপথ বলা ঠিক নয়। কেননা হিংসা স্বল্পমাত্রায়ও নিন্দনীয়। প্রকৃত মধ্যপথ হইতেছে যেখানে দুই কোটিই নিন্দনীয় (যেমন এক কোটিতে পানাহারে উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্য কোটিতে দীর্ঘকালব্যাপী অনশন) তথায় আহার বিষয়ে সংযম মধ্যপথ। গীতায় সাত্ত্বিক আহারের প্রশংসা আছে। অথবা তেজ বশতঃ আত্মপীড়নের নিন্দাও আছে।

বস্তুতঃ বৌদ্ধমতে মধ্যপথ বলিলে "আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ"ই বুঝায়। ঐ অষ্টমার্গ হইতেছে, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম (পঞ্চশীল), সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি (ধ্যান) ও সম্যক্ সমাধি। এইগুলির ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের বাহিরে যে বৌদ্ধধর্ম্মে ও পঞ্চশীলে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহার এক কারণ এই যে, বৌদ্ধপ্রচারকগণ কোনও দেশেই প্রচলিত সংস্কার বা ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ উৎখাত করিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রচলিত ও জাতীয় চরিত্রে নিতান্ত বদ্ধমূল আচারবশে বৌদ্ধশীল ষোল আনা পালিত না হইতে পারিলে তাঁহারা তেমন অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন না। এইরূপে সিংহলে বৌদ্ধপূর্ব্বযুগে প্রচলিত "দেবতা"-দিগের পূজা, ব্রহ্মে নাটদিগের পূজা, তিব্বতে প্রাচীন "বন"-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নানা আচার ও অভিচারাদি বৌদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। চীনে ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাবিশেষে ভিক্ষুরা বিবাহও করেন।

চৌর্য্য, পরস্ত্রীগমন এবং অবস্থাধীনে মিথ্যাকথন (যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য) সকল দেশেই সমাজের বিপর্য্যয়কারক বলিয়া—রাজশক্তি দ্বারাই দণ্ডনীয়। মাদক সেবন, অসত্য, গোপনে ব্যভিচারও সকল দেশেই নিন্দনীয় হইলেও সাধারণ লোকের মধ্যে অপ্রচলিত নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম তৎসমুদয় কোনও অবস্থায়ই অনুমোদন করে নাই। এখানে মধ্যপথের কথা উঠে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম ইদানীং পাশ্চাত্য দেশে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডে নানা বৌদ্ধসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম মুখ্যভাবে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বলিয়া ইসলাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মত সামাজিক ভাবে উপাসনার কোনও বিধান উহাতে হইতে পারে না। কিন্তু পুস্তক ও পত্রিকা এবং সময় সময় বিশেষ বিশেষ সম্মেলন ইত্যাদিতে বক্তৃতা দ্বারা ঐ সকল দেশে উহার প্রচার হইতেছে। তথায় অনেকে আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয়ও দিতেছেন। সকলে উপাসক-উপাসিকা মাত্র থাকিয়াও তৃপ্তি পাইতেছেন না; কেহ কেহ শ্রমণ এবং অনাগারিক দশাও অবলম্বন করিয়াছেন। ভিক্ষুর সমস্ত নিয়ম পালন অসাধ্য দেখিয়া অতি অল্প লোকই ভিক্ষুত্ব বরণ করিয়াছেন। ঐ সকল দেশে বলা হইতেছে যে, যদি তথায় রীতিমত ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থাপিত হয়—তাহা হইলে ভিক্ষুজীবনের কোনও কোনও অতি কঠোর শীলকে একটু নরম করিয়া লইতে হইবে। যেমন মুদ্রা স্পর্শ করা, যে বাড়ীতে স্ত্রীলোক থাকে তথায় বাস করা, খাট-পালঙ্কে শোয়া, বেলা বারটার পরে এবং একবারের অধিক খাওয়া ভিক্ষুর পক্ষে নিষিদ্ধ। মুদ্রা স্পর্শ না করিতে পারিলে ট্রামে বাসে চলিতে একজন সঙ্গী লইতে হয়, তাহা সর্ব্বদা সাধ্য নয়। বাসগৃহের সমস্যাও দুরতিক্রমণীয়। শীতের দেশে দ্বিতীয় বার ভোজন না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। অন্ততঃ ঔষধজ্ঞানে দ্বিতীয় বার ভোজন আবশ্যক হইবে। উক্ত নিয়মগুলি পঞ্চশীলের অতিরিক্ত শীল। পঞ্চশীল শিথিল করার প্রয়োজনের কথা উঁহারা বলেন না। তবে ঐ সকল দেশে সাধারণ উপাসক ও উপাসিকাদিগের পক্ষে মাংস ও মদ্য বর্জ্জন বোধ করি দুঃসাধ্য হইবে।

বুদ্ধের কীর্তি

আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার

বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে পূর্ব মহাদেশে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক এবং প্রচণ্ড এক পরিবর্তন ঘটেছে, যাকে বিপ্লব অর্থাৎ 'রেভল্যুশন' বলা উচিত। ভারতবর্ষের একটি ছোট রাজ্য হতে বার হয়ে এই পবিত্র ধর্মস্রোত প্রায় সমস্ত এশিয়ার লোকদের মধ্যে চিত্তের শান্তি ও নৈতিক বল ঢেলে দিয়েছে, কত কত নিষ্ঠুর বর্বর যাযাবর জাতিদের মানুষ করে তুলেছে, তাদের মনে দেবতার মত হবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছে। যে ধর্মচক্র তিনি কাশীর কাছে একটি হরিণ চরার বাগানে পাঁচ জন লোকের সামনে প্রথম ঘুরিয়ে দেন. তা আজও ঘুরছে। অশোক রাজার প্রচারকগণ শুধু গ্রীকদের বাইরের বসতিতে, এশিয়া যেখানে আফ্রিকা ও ইউরোপকে ছুঁয়েছে, সেই পর্যন্ত পৌঁছে। আর আজ, ছোট ছোট আইওনিয়ান রাজ্য ছেড়ে যে সব মহাদেশের নাম পর্যন্ত অশোক শুনেন নাই, সেখানেও বিজয়যাত্রা করেছে—আদর পেয়েছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা এই সব সভ্যদেশের কত সুধী, কত মহাপণ্ডিত, কত ভক্ত প্রগাঢ় চিন্তা এবং আজীবন পরিশ্রম করে বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি পড়ছেন, জগতের হিতের জন্য তার ব্যাখ্যা প্রকাশিত করছেন।

এত বড় জয়লাভ একজন ফকির কিরূপে করলেন? এটা তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের ফল। মানব-কল্যাণের জন্য সিদ্ধার্থ সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের মহাকবি সত্যই বলেছেন:

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই!
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর মা মায়াদেবী স্বপ্ন দেখলেন যে, একটা সাদা হাতী আকাশ থেকে এসে তাঁর জঠরে ঢুকল। সাদা হাতী অতি কম দেখা যায়, ওটাকে লোকে মহা সুলক্ষণ-যুক্ত বলে বিশ্বাস করে। দৈবজ্ঞরা রাণীর স্বপ্নের এই অর্থ করলেন যে, তাঁর ভাবী সন্তান সমস্ত দেশের উপর চক্রবর্তী সম্রাট হবে, অথবা খুব বড় একজন সাধু ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা হবে। আজ হতে আড়াই হাজার আশী বছর আগে শাক্য বংশের রাণীর গর্ভে যে পুত্র জন্ম নেন, তিনি এর দুটোই হয়েছেন। জগতের শতকোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি রাজার উপর অধিরাজ হয়ে বসে আছেন, তাঁর ধর্ম আজ পৃথিবীর প্রায় সিকি পরিমাণ মানুষ মেনে নিয়েছে। তিনি চক্রবর্তী অর্থাৎ সম্রাটের পদ লাভ করেছেন যুদ্ধবিজয় করে নয়, লক্ষ লক্ষ লোককে মেরে, দাসত্বে বন্দী করে নয়।

এই কীর্তি অর্জন সম্ভব হয়েছে তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত দেখে, তাঁর কথাগুলি শুনে, তাঁর হৃদয়ের অসীম করুণার ফলে। এই জন্যই তাঁর খাঁটি শিষ্য প্রিয়দর্শী অশোক লিখে গেছেন—

এষ চ মুখ্যতমঃ বিজয় দেবানাম্
প্রিয়স্য যঃ ধর্ম-বিজয়ঃ।
ইচ্ছতি হি দেবানাম্ প্রিয়ঃ
সর্বভূতানাম্ অক্ষতিং সংযমং
সমচর্য্যাং মার্দবং॥

অর্থাৎ,

"ধর্ম-বিজয়ই আমার সবচেয়ে প্রধান জয়লাভ। আমি চাই সবলোকের কল্যাণ, সংযম, সমান ব্যবহার, আনন্দ"। বুদ্ধ এই আদর্শই মানবজাতির সামনে দাঁড় করে দিয়ে গেছেন:

শাক্য বংশের এই রাজপুত্র সংসারের সব সুখ, রাজপদের সব গর্ব কেন ত্যাগ করলেন? তাঁর দয়াভরা প্রাণ বড় ব্যথা পেয়েছিল, বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল, মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে। প্রথম যৌবনে, অসীম ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও তিনি দেখতে পেলেন একজন রোগী লোককে। সে তাঁর মতই মানুষ, তার হাত-পা চোখমুখ ঠিক তাঁর মত অথচ ব্যারামে তার শরীর যেন ধূলার মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। আর একদিন দেখলেন একজন বুড়ো মানুষ। জরাতে সে যেন মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। তৃতীয় দিন তিনি দেখলেন একটা মৃতদেহ দাহ করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মানুষের শেষ দশা, একদিন তাঁর ভাগ্যেও তা হবে। শেষ দিন দেখলেন এক ভিক্ষু সন্ন্যাসী, যে সব দুঃখ শোক জরা চিন্তা হতে মুক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে পথ নিয়েছে। তার কোন বন্ধন নাই, সে যেন একটা সুস্থ সবল পাখী—আনন্দে উড়ে যাচ্ছে।

তখন এই শাক্য রাজকুমার স্থির করলেন যে, জীবের দুঃখ শোক কেন হয় এবং কি করলে তা দূর করা যায়, তার কারণ ভেবে বার করতে হবে, নচেৎ তাঁর জীবনই বৃথা। তিনি যে এই গভীর সত্য আবিষ্কার করেন, তা

বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ঘোষণা করছে। অসংখ্য বৌদ্ধমূর্তির নীচে এই কথাগুলি খোদা আছে :

যে ধর্মাঃ হেতু প্রভবাঃ হেতুস্তে-
ষাম্ তথাগতঃ হি অবদৎ।
তেষাম্ যঃ নিরোধঃ এবং
বাচি মহাশ্রমণঃ ॥

অর্থাৎ,

"সংসারে আমরা যে সব দৃশ্য, যে সব ঘটনা দেখতে পাই, তা কোন্ কারণে হয়েছে ? আর এগুলি কি করলে থামান যায়, শেষ করা যায় ? তাও এই মহাসন্ন্যাসী বলে গেছেন। সৃষ্টির এই নিগূঢ়তম সত্য আবিষ্কার করা, এইরূপ নিজের হৃদয়ে চরমজ্ঞানের আলোক পেয়ে সম্বুদ্ধ অর্থাৎ যে সব বুঝে এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ হওয়া, শাক্য রাজপুত্রের পক্ষে একদিনের কাজ ছিল না। যৌবনের পূর্ণ জোয়ারের মধ্যে সুখের জীবন, রাজগদি, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, চাকর সব ছেড়ে দিয়ে তিনি একা পথে বেরুলেন ঘর ছাড়া ভিক্ষুক হয়ে। কয়েক বছর কঠোর তপস্যা করে, শরীরকে যন্ত্রণা দিয়ে কোন ফলই পেলেন না। তখন বুঝলেন যে, সুখে গা ঢেলে দিলেও মুক্তি নাই, কষ্টের মধ্যেও মুক্তি নাই, তবে অন্য উপায় বের করতে হবে।

ছয় বৎসর ধরে একা নির্জনে ভেবে ভেবে অবশেষে এই প্রশ্নের উত্তর পেলেন আর এক বৈশাখী পূর্ণিমায়— উরুবিল্ব গ্রামের কাছে পথের ধারে এক বটতলায় বসে বসে। এর মধ্যে শয়তানের কত বাধা কত বিপদ তাঁকে টলাতে পারল না। মুক্তির ঠিক উপায় আবিষ্কার করা মাত্র তাঁর হৃদয় স্থির হ'ল, তিনি মাটি ছুঁয়ে পৃথিবীকে সাক্ষী করলেন, "দেখ, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, আমি সম্বুদ্ধ, এবার আমি মানুষের দুঃখ শোক জরা জন্ম ঘুচাতে পারব। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি ঐ বটগাছের কাছে খোলা জমিতে সতের বার পা ফেলে হাঁটলেন, আর প্রতি পদক্ষেপের জায়গায় এক-একটি পদ্ম ফুটে উঠল। এখন সেখানে শ্বেতপাথরের পদ্ম রাখা হয়েছে।

এই নূতন তত্ত্ব, এই মুক্তির সত্য পথ, এটা কি ? বুদ্ধের শিক্ষার মূল কথা হচ্ছে যে, অসংযত ভোগ আর অসীম কষ্ট-সাধনের জীবনযাত্রা এ দুটিই ভুল, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যে পথ, অর্থাৎ সরল, সংযত সংসারযাত্রাই মানুষকে জীবনে শান্তি, মরণে মুক্তি দিতে পারে। এই মধ্য পথের আটটা অঙ্গ আছে, অর্থাৎ এই পথে চলতে হলে আট রকমের চরিত্রগুণ ও চেষ্টা অভ্যাস করতে হবে। কিন্তু সেগুলিকে সংক্ষেপ করে তিনটা বললেও কাজ চলে। বিদিশানগরের বাইরে বেটোয়া নদীর পারে যে দু'হাজার বৎসরের পুরাতন গরুড়-স্তম্ভ আছে, তার সব নীচে এই কথাগুলি ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদা আছে :

ত্রিণি অমৃতপদানি সু-অনুষ্ঠিতানি
নিয়ন্তি স্বর্গম্—
দমঃ ত্যাগঃ অপ্রমাদঃ ॥

অর্থাৎ, "ইন্দ্রিয় দমন, স্বার্থ ত্যাগ এবং স্থির বুদ্ধি এই তিনটি পা ফেলতে পারলে স্বর্গে পৌঁছান যায়। এই কথাগুলিতে বুদ্ধের বাণী এক নিশ্বাসে শেষ করা হয়েছে। এই তিনটিই ত ভারতের চিন্তা-নেতাদের আবহমানকাল হতে মেনে নেওয়া চির সত্য।

প্রথম, বাসনার দমন। আমাদের দুঃখভোগের প্রধান কারণ উন্মত্ত বাসনাগুলি। গয়াশীর্ষ পর্বতে হাজার ভক্তের সামনে ব্যাখ্যা করার সময়ে বুদ্ধ বলেছেন—"সব জিনিস আগুনে পুড়ছে—মন, ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলি সব বাসনার, কামের আগুনে জ্বলছে। যদি বাসনা ত্যাগ করতে পার, তবেই মুক্তি, অর্থাৎ আত্মার স্বাধীনতা লাভ করবে ; সংযত পবিত্র ভাবে জীবন কাটালে তার পর আর পুনর্জন্ম নাই। এই বাসনা যখন পুড়ে শেষ হয়, ছাই মাত্র পড়ে থাকে, তখন মন শীতল হয়, ইহাই নির্বাণ। তার পর ত্যাগ, পরের জন্য নিজের সর্বস্ব নিঃশেষে দান করলে, তবেই প্রকৃত ভোগ করা যায়। সেই কত পুরাতন উপনিষদের যুগের বাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে।

অবশেষে অপ্রমাদ, অর্থাৎ স্থির হয়ে নিজে চিন্তা করে যা সত্য তাকে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ এই যুগের অতি প্রিয় স্লোগান আওড়ান, হুজুগে মেতে দল বেঁধে মামুলী কথার চীৎকার তার সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস।

বুদ্ধের প্রচার-বাণীতে, তাঁর মুখ হতে শোনা গল্প যাকে জাতক বলে তাতে, সর্বত্রই এই কথা বলা হয়েছে যে, মানবের মুক্তি হয় শুধু একটি ক্রমোন্নতির পথে জন্মান্তর স্থির ভাবে চললে তবে। যেমন আমরা ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে ধাপে উপরে উঠি, প্রথমে ম্যাট্রিক পাস করে, তার পর আই-এ, সেটা পার হলে বি এ, শেষে এম-এ। ঠিক সেইমত সৎ লোক প্রথমবারকার মানবজন্মে কতকগুলি পুণ্য কাজ করে, ত্যাগ দমন অভ্যাস করে। তার পর জন্মে ঐ সাধনার পথে আরও উঁচুতে উঠেন, তাঁর পক্ষে সাত্ত্বিক জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়ে উঠে, তৃতীয় জন্মে তাঁর আরও বেশী আত্মার উন্নতি হয়। এইরূপে ক্রমে দশ-বিশ জন্মের পর তিনি পূর্ণ বুদ্ধ হন, তার পর তাঁর আর জন্ম নাই। এই সব আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অক্লান্ত পথচারীদের বোধিসত্ত্ব নাম দেওয়া হয়েছে।

আড়াই হাজার বৎসরে, বুদ্ধের শিক্ষা ক্রমে ক্রমে অগণ্য

শাস্ত্ররাশি আর তর্কের বোঝাতে প্রায় চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এর আদি ও অকৃত্রিম রূপ তাঁর খাঁটি শিষ্য অশোক অতি সহজে অতি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, পাথরে খুদে চিরকালের জন্য রেখে গেছেন :

ধর্মঃ সাধুঃ। কিয়ান্ তু ধর্মঃ ইতি? অপাস্রবঃ বহুকল্যাণম্ দয়া দানম্ সত্যম্ শৌচম্।...অভ্যভূত-শুশ্রূষা, মাতাপিতৃ-শুশ্রূষা, গুরুণাম্ শুশ্রূষা—দাস-ভৃতকেষু সম্যক্ প্রতিপত্তিঃ।

অর্থাৎ, "লোকে ধর্ম ধর্ম করে, বেশ কথা। কিন্তু ধর্ম কি? ধর্ম হচ্ছে পাপ হতে দূরে থাকা জনসাধারণের মঙ্গল কাজ করা, দয়া, দান, সত্যনিষ্ঠা, শুদ্ধ থাকা। আর্য্যদের, পিতামাতার, গুরুজনের সকলের সেবাশুশ্রূষা, ভৃত্যদের প্রতি যত্ন ও সম্মান দেখান।"

আড়াই হাজার বৎসরেরও বেশী হয়ে গেল, এই মহাশ্রমণ, এই তথাগত অর্থাৎ অবিরাম ভ্রমণকারী জনশিক্ষক পৃথিবীর মধ্যে চিরশান্তির বারি বর্ষণ করে যান। যে জাতি তাঁর কথা না শুনবে, যে জাতি বাসনাকে ভোগকে জীবনতন্ত্র করে নেবে, তারাই লোপ পাবে। সেই পরম কারুণিক সব জীবকে —মানব পশু কীটপতঙ্গকে পর্যন্ত ভালবাসতেন, তাদের সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখের সমান মেনে নিতেন। তাঁর সন্ন্যাসী দলের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতির সব গোত্রের সব ব্যবসায়ের লোককে ডেকে স্থান দিয়েছিলেন, মুক্তির দুয়ার সকলের জন্য খোলা রেখেছেন।

বুদ্ধদেবের এই করুণার ধারা কেমন করে ফল্গু নদীর মত বালি ফুটো করে বার হয়ে আসে তার একটা দৃষ্টান্ত দিব। আনন্দ নামে একটি বালক তাঁর শিষ্য হতে আসে। সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। একদিন বুদ্ধ তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজগীরের গৃধ্রকূট পাহাড়ে ধ্যান করতে গেলেন। একটা চূড়ার নীচে এক গুহায় ঢুকে বুদ্ধ নিজে ধ্যান করতে বসলেন, আনন্দকে দূরে অন্য এক গুহায় গিয়ে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন যে, কতকগুলি শকুন আনন্দের গুহার উপরের চূড়ায় বসে পাখা ঝাপটাচ্ছে, আর সেই নির্জন স্থানে একাকী বালকটি ভয় পেয়েছে। অমনি বুদ্ধ নিজের ডান হাত বাড়ালেন। হাত ছোঁওয়া মাত্র পাহাড় গলে গিয়ে গুহার পাশে একটা ছিদ্র হ'ল, সেই ছিদ্র দিয়ে তাঁর হাত বার হয়ে ক্রমে লম্বা হয়ে আনন্দের গুহায় ঢুকে, সেই বালকের মাথায় আদরের সাহস দিয়ে বললেন, "ভয় করো না, আমি আছি।" কলিকাতার জাদুঘরে ডান দিকে নীচতলায় গান্ধার প্রস্তরগুলির মধ্যে শ্বেতপাথরে খোদাই করা এই দৃশ্য আছে।

আজ বিশ্বজগতের দশা দেখে মনে হয় যেন যত অসুর, রাক্ষস, দৈত্য সব একজোট হয়ে মানবজাতিকে নাশ করতে আসছে, এশিয়াতেই প্রথম আণবিক বোমা ফাটান হয়, আর এখন এশিয়াতেই নূতন নূতন শক্তিশালী বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাই আজ আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বুদ্ধ আছেন, তাঁর ধর্ম আছে, তাঁর সংঘ এখনও কাজ করছে।

বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি
ধম্মং শরণম্ গচ্ছামি
সংঘং শরণম্ গচ্ছামি।

বুদ্ধ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ব্যাকুল পৃথিবী করে, হে প্রশান্ত, তোমারে আহ্বান,
সন্দেহে সন্ত্রস্ত আজ সচকিত মানবের মন,
মোহে মুগ্ধ, ভয়ে ক্ষুব্ধ, আর্য্য পথ করেছে বর্জন,
করুণায় তারে তুমি স্নিগ্ধ কর, শান্তি কর দান।
হিংসার অনল জ্বলে, দিকে দিকে শিখা লেলিহান :
তোমার অমৃত-বাণী, আজ তার বড় প্রয়োজন,
মানবে অভয় দাও, কর তার সংশয়-ভঞ্জন,
তোমার প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত কর তার প্রাণ।

এসেছিলে এক দিন, এনেছিলে নূতন জীবন,
পঁচিশ শতাব্দী বুঝি তার পর হয়ে গেল পার,
নূতন আলোকে সেই ভ'রে গেল অর্দ্ধেক ভুবন,
বিপন্ন পৃথিবী আজ, এ সঙ্কটে কে করে উদ্ধার!
আলো দাও, বল তবে, বুদ্ধ তব লইনু শরণ,
সে ধর্ম—পরম ধর্ম, অপূর্ব্ব সে—প্রেম নাম তার।

রোজ-ভিলা

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

শেষ রাত্রের দিকে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হেমন্তর ভোর। শীতের আমেজ দিয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভোরের ধূম্র-ধূসর অস্পষ্টতা অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। নির্মল অবারিত আকাশের অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যায়। সামনেটা বেশ ফাঁকা। কোথাও কোন আড়াল নেই।

বাড়িটা একটা উঁচু টিলার উপর।

সামনের রাস্তাটা পার হয়ে বিস্তৃত ঢালু জমিটা যেন নীচে গড়িয়ে গেছে। তলিয়ে গেছে বোধ হয় একটা ছোট পাহাড়ী নদীর গর্ভে।

জমির বুকে ইতস্ততঃ ছড়ানো বড় বড় কালো পাথরের চাঙড়। গড়াতে গড়াতে সেগুলো যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে নিচে থেকে থাক থেকে।

বাড়ির দেয়ালের ধারে বড় বড় ইউক্যালিপটস। এক-হারা সাদা ধপধপে গুঁড়িগুলো ভোরের ঝাপসা আলোয় ঝলমল করছে নিটোল মসৃণ মেয়েদের দেহের মত। বাড়ির সামনে খানিকটা জমিতে ফুলের ক্ষেত। অজস্র গোলাপ ফুটেছে, রকমারী রঙের—লাল, গোলাপী, সাদা, জরদা। সার্থক হয়েছে বাড়ির 'রোজ'-ভিলা নাম। দেয়ালের ধারে স্থলপদ্ম, রক্তকরবী, জবা, গন্ধরাজ, কামিনী, টগর, শিউলি।

প্রতি নিশ্বাসে ঝরা শিউলির গন্ধে-ভরা বাতাস।

জায়গাটা মনোরম মনে হ'ল। বাড়িটা ভালই পাওয়া গেছে। ছুটির অবকাশের জন্য দরকার এমনই মুক্ত আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস আর বিস্তৃত নির্জনতা। বেশ নিরিবিলি, পরিচ্ছন্ন আর ফাঁকা লাগল।

আমি বাগানে নেমে খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম।

পায়ের তলায় এই রঙীন ফুলের জগৎ। মাথার উপর বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ নীল আকাশ আর দূর দিগন্তের ঢেউ-খেলানো ধূসর পাহাড়।

শীতের প্রথম কুয়াশায় সবুজ ঘাসে ঢাকা জমিগুলো হলদে হয়ে এসেছে।

গাছের মাথায় পাখির দ্বিধাজড়িত কাকলি—প্রভাতী বন্দনা গান গেয়ে গাছের মাথা থেকে বিদায় নিচ্ছে। দূরে কোন্ দেবালয়ে প্রভাত আরতির কাঁসরঘণ্টা বাজছে।

আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

সব ঘুমিয়ে আছে।

একা আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি প্রকৃতির এই সৌন্দর্যরাজ্যে। বুক ভরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুষে নিচ্ছি ফুলের গন্ধ-ভেজা ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস।

—কিগো, বাড়ি পছন্দ হয়েছে?

পাশে এসে দাঁড়াল আমার স্ত্রী লীলা।

দু'জনে চোখাচোখি হ'ল।

দৃষ্টির সংঘর্ষ হ'ল। যদিও চোখে নেই বিদ্যুৎ। দৃষ্টিতে নেই বহ্নি।

নাই থাক, চিরদিন কিছুই থাকে না। তবুও দুজনে হাসলাম। বিস্মৃত যৌবনের হাসি।

আমি হাসতে হাসতে তার হাত ধরে বললাম, চমৎকার, সত্যিই বাড়িখানা ভালই পেয়েছ। বাড়ির চেয়ে ভাল কিন্তু বাইরের এই বাগানটা।

লীলা চোখে বিলিক দিয়ে চাপা গলায় বললে, তোমরা যে বাইরের খদ্দের। ভিতর পর্যন্ত তোমাদের দৃষ্টি ত পৌঁছয় না। তোমাদের দৌড় বাইরে পর্যন্ত।

—তাই নাকি? ভিতরে কি এত সৌন্দর্য আছে নাকি? এই ফুলের রাজত্ব আর আকাশের মায়া?

লীলার মুখে ফুটে উঠল হাসির ঢেউ। বললে সত্যি। চমৎকার বাগানটি। ফুলে ফুলে ভরে আছে।

—আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।

—কি?

চোখ তুলে তাকাল আমার পানে লীলা। জোর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, শুধু আমরাই ফুরিয়ে গেলাম।

গায়ে ধাক্কা দিয়ে লীলা কটাক্ষ হেনে বললে, ইস্! ফুরিয়ে অমনি গেলেই হ'ল? ভালবাসা কি ফুরোয় নাকি?

—দিদি, চাকরকে পাঠিয়ে দিন। গাই দোওয়া হচ্ছে।

আমি চমকে উঠলাম।

লীলা উত্তর দিল, দাঁড়াও ভাই। আমার চাকরের ঘুম থেকে ওঠবার সময় হয় নি এখনও।

পাশের বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে টুকরো হাসির শব্দ এল।

একটি মেয়ে হাসির ঢেউ তুলে মাঝের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে এল।

লীলাকে জিজ্ঞেস করলে, দাদাবাবুর আসতে কাল অনেক রাত হয়েছে। ট্রেন লেট্ ছিল বুঝি ?

লীলা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মেয়েটির। আমাদের বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মালিক।

সুশ্রী হাসিমুখ মেয়েটির। বয়সও অল্প বলেই মনে হ'ল। মুখে চোখে তারুণ্যের প্রখর দীপ্তি।

এক সময় লীলা বললে, আমাদের বাড়ির চেয়ে বাড়িউলি কিন্তু ইন্টেরেস্টিং এবং মিস্টিরিয়স্।

—কি রকম ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লীলা বললে, ওর ঐ হাসির নীচে লুকিয়ে আছে অশ্রুর সমুদ্র।

—কেন ? আর কে আছে ? স্বামী নেই ?

—তা জানি না। তবে আছে একজন, দেখিয়ে আনব একদিন। গেলেই দেখতে পাবে।

পাশের বাড়ির নাম 'প্রেম-রেণু'।

মেয়েটির নাম মুরজা।

সন্ধ্যার পর লীলার সঙ্গে গেলাম প্রেম-রেণুতে। মুরজার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হ'ল। স্পষ্ট করে কাছ থেকে দেখলাম তাকে।

অপূর্ব শান্তির রূপ। তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে পরম আদরে গড়েছেন তার বিধাতা। চোখ দুটিতে তপস্যার ছায়া। মুখে চোখে প্রগাঢ় প্রশান্তি। হাসি উপচে পড়ছে ঠোঁটের দু'কূল ভেঙে ভারী মিষ্টি হাসি।

মুরজাকে আমার ভাল লাগল।

মাঝে একখানা হলঘর। দু'পাশে দু'খানা ছোট সাইড রুম। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

মাঝের হলঘরেই আমাদের নিয়ে গেল মুরজা। ঘরখানি পরিচ্ছন্ন। ফিটফাট সাজান।

মেঝেয় বিচিত্র পুরু কার্পেট। কোচ, সেট, টিপয়। টিপয়ে বিচিত্র মিনে করা ভাস। ভাসে তাজা ফুলের গুচ্ছ। দেওয়ালে বড় আর্শি আর ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি।

ধূপ আর ফুলের গন্ধে ঘরখানি ভরে আছে। ঘরে ঢুকেই মনে হ'ল দেবালয়ে এলাম।

ছায়ামূর্তির মত, ঝাপসা আলোয় চোখে পড়ল একটি মূর্তি। ঘরের একপাশে একখানা কোচে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে একটি হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি তরুণ।

একজন চাকর ইতিমধ্যে ঘরে একটা হ্যাসাক্ আলো জেলে নিয়ে এল।

উজ্জ্বল আলোয় তার পানে চেয়ে দেখলাম। গায়ের রং ফর্সা।

মুরজা কাছে গিয়ে বললে, ও বাড়ির দাদাবাবু এসেছেন, ভানু, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

যুবকের নাম ভানু।

ভানু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে নড়ে উঠল তার নিস্পন্দ অবশ হাত দু'খানি। মনে হ'ল, সে হাত দু'খানা তোলবার চেষ্টা করলে, পারলে না। মুখে ফুটে উঠল একটা করুণ হাসি। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ধ্বনি। সব যেন কেমন এলোমেলো, খাপছাড়া।

ভানু পক্ষাঘাতে পঙ্গু, অবশ, অথর্ব। নিশ্চেতন জড়ের মত সে মুরজার পানে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে স্থির হয়ে গেল। দৃষ্টি প্রখর কিন্তু তাতে চৈতন্য নেই। যেন মানুষের দৃষ্টি নয়।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করেও চাপতে পারলাম না। মধুর আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

মুরজা প্রশ্নভরা ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকাল। হাসতে হাসতে বললে, এই আমার অবলম্বন। আমি ওরই ছায়া।

আমি নিজের অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করে বসলাম, আপনার স্বামী ?

মুরজা অপরূপ ভঙ্গীতে ছেলেমানুষের মত হাসতে হাসতে উত্তর দিল, না, ও আমার ভানু। ওই আমার সব। ওর জন্তই আমার বেঁচে থাকা।

—কতদিন ওর এ রকম অবস্থা হয়েছে ?

—সাত বছর।

—চিকিৎসায় ফল হ'ল না ?

—চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

আমরা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। দ্বিধাভরে চেয়ে দেখলাম ভানুর মুখের পানে। সুন্দর সুশ্রী চেহারা। কিন্তু সব যেন কেমন বেখাপ্পা। বেমানান্। তার বশের বাইরে। একটা সুন্দর মূর্তি যেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

সাজ-পোশাকের বাহুল্য না থাকলেও পরিচ্ছন্ন বেশবাস। মাথার ঝাঁকড়া কালো কুচকুচে চুলগুলি সুবিন্যস্ত। পাষাণ মূর্তির সর্বাঙ্গে যেন ভক্তের হাতের সেবার ছাপ।

মুরজা থাকে থাকে সপ্রেম সোৎসুক দৃষ্টিতে ভানুর মুখের পানে চেয়ে দেখে দু'চোখ ভরে, মা যেমন দু'চোখে অগাধ স্নেহভরে অসহায় শিশুর পানে চেয়ে দেখে। মাঝে মাঝে মুখের উপর হতে তার লতানো চুলগুলি সরিয়ে দেয়। অসংবত শিথিল হাত দু'খানিকে সরিয়ে কোলের উপর জড়ো করে দেয়। যেন নিজেরই একটা অঙ্গ।

মুরজার মাঝে দেবদাসীর প্রতিশ্রুতি। পাষাণ মূর্তির সেবায় দিয়েছে নিজেকে উৎসর্গ করে। শালগ্রাম শিলার মাঝে দেখেছে বৈকুণ্ঠনাথের দুর্লভ রূপ।

নিজের হাতে চান করিয়ে দেওয়া, খাওয়ানো, শোওয়ানো হাসিখুশি, গালগল্প, বই পড়ে শোনানো, গান গেয়ে ওর মনকে খুশী রাখা। অবোধ শিশুকে মা যেমন আদরে-আব্দারে ডুবিয়ে রাখে।

এই কি সব? আবার ওর মন ভোলাবার জন্ম সন্ধ্যার দিকে মুরজাকে একটু সাজ-পোশাক করতে হয়। নিজেকে সুন্দর করে তুলে ওর কাছে বসে ওকে গান শোনাতে হয়। নিজের জীবনের শূন্যতা ভরাতে হয় অন্তরের নিবেদনকে মধুর কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলে।

এই ওর অভিসার।

ওকে দেখে ত মনে হয় না যে ওর মনের কোথাও কোন শূন্যতা আছে। ও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। ঐ রুগ্ন, অথর্ব পঙ্গু যেন ওর সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওর সমস্ত শরীরে ওর প্রিয়জনের সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। ও স্নেহমন দিয়ে সত্যরূপে সম্পূর্ণভাবে ওকে জয় করেছে। এই পাওয়াই ওর কাছে পরম পাওয়া। নিজেকে তার কাজে লাগাতে পেরে তার সেবার অধিকার পেয়ে সে যেন পরিতৃপ্ত।

মুরজার শান্ত স্নিগ্ধ শুভ্র সুকুমার মুখের মাঝে কোথাও একটু অতৃপ্তির ছায়া পর্যন্ত নেই। কি অজস্র স্নেহ ওর চোখ দুটিতে, আনন্দের রেখা ওর মধুর অধরে! আমি ওর মহিমায় ও মাধুর্যে বিস্মিত।

কাজে কি গভীর নিষ্ঠা মুরজার। চার-পাঁচটা গাই। দুধ বিক্রি করে।

জমি। ক্ষেতখামার। শাকসব্জী হাটে বিক্রি হয়। নিজেই সমস্ত দেখাশুনা করে। গরুর সেবা করে নিজের হাতে। উদয়াস্ত সে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে।

তারই মাঝে সবচেয়ে বড় কাজ তার ভানু। অসহায় রুগ্ন ভানুর সেবা। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য দেবসেবার মত। তাকে বাদ দিয়ে মুরজার জীবনের কোন ব্যাখ্যা থাকে না। ওর সমস্ত জীবনধারাটাই যেন অতি পবিত্র, অতি আনন্দময়।

রাশিকৃত কালো চুল ওর শুভ্র পিঠের উপর ঝলমল করে। কোমরে আঁচলের কষি জড়িয়ে সে এধার-ওধার করে চঞ্চল প্রজাপতির মত। আমি অবাক্ হয়ে দূর থেকে ওর পানে চেয়ে দেখি। মাঝে মাঝে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ করে চপল বালিকার মত।

সত্যই মুরজা আমায় প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছে। মুরজা আর ভানু আমায় যেন পেয়ে বসেছে। ভানু উপলক্ষ্য, মুরজার আত্মপ্রকাশের উপকরণ।

ভানুর জন্যই মুরজা এত দামী। কিন্তু ভানু ওর কে? ওদের সম্বন্ধের আসল চেহারাটা দেখবার জন্ম আমার ঔৎসুক্য অধৈর্য হয়ে উঠল।

লীলাকে মুরজা দিদি ডাকে। সেই সম্পর্কে মুরজার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা মধুর। কাজেই সে ঠেকাতে পারলে না আমার উদ্দাম অসহিষ্ণু কৌতূহলকে।

একদিন মুরজা সবিস্তার বর্ণনা করলে তার বিস্ময়কর প্রেমের কাহিনী।

চমকে উঠলাম মুরজার পূর্ণ পরিচয় পেয়ে।

মুরজা ভূতপূর্ব নটী। জনপ্রিয় ফিল্ম-স্টার।

মুখের পানে চেয়ে মনে হ'ল, এ ত আমাদের চেনা। আশ্চর্য! এতদিন একে চিনতে পারি নি।

আশ্চর্য হবারই কথা। পর্দার গায়ে এর রূপশ্রী দেখে, এর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি। লীলার সঙ্গে একে বহুবার দেখেছি, বহু ছবিতে।

যাক সে কথা।

সৌন্দর্যময়ী ছায়ানটী মুরজার জীবনে তখন বিস্ময়-বৈচিত্র্যের জন্ম হচ্ছে পলে পলে। জীবনের চারিপাশে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর জটলা আর ঐশ্বর্যের ইন্দ্রজাল। মেক-আপ আর পালিশ-করা স্বপ্ন-রঙীন জীবন তার হাওয়ায় পাখা মেলে দিয়েছে। ঠিক তেমনই দিনের এক সুন্দর প্রভাতে তার আলো ঝলমল মনের আকাশে ভানুর উদয় হ'ল স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের মত।

রাজপুত্রের মতই রূপ আর ঐশ্বর্য ভানুর।

মুরজার মনে ঝড় উঠল, সে মেতে উঠল ভানুকে নিয়ে। সে এক নতুন ধরনের চেতনা। সব পেরিয়ে তার মন ছুটল মুক্তির সন্ধানে। নদী প্রসারিত হ'ল সমুদ্রের পানে। মিলে-মিশে এক হয়ে বিরাম লাভ করতে চাইল। তারই মাঝে অসীম অগাধ মুক্তি, অফুরন্ত আনন্দ।

ভানু তার রক্তে দোলা দিয়েছে। তাকে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখিয়েছে। তাকে শুচিশুভ্র মহত্তর জীবনের কল্যাণময় পথে তার চিরজীবনের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

মুরজার মনের আকাশে নতুন আলো, নতুন রঙ। ভানু তার জীবনের আদর্শ বদলে দিয়েছে, তাকে ভেঙে নতুন করে গড়েছে, তার ভেতরের চিরন্তন নারীকে সে জাগিয়ে তুলেছে। মুরজা জ্বলে উঠেছে।

সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নটীর জীবনে ইস্তফা দেবে। সে নেমে আসবে অবাস্তবের মায়ালোক থেকে শান্তিময় নির্ঝঞ্ঝাট গৃহকোণে।

সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তারা দু'জনে কাছাকাছি এগিয়ে এল দ্রুতগতিতে। তাদের শক্তি আছে, স্বাস্থ্য আছে, সাহস আছে, প্রতিরোধের প্রচুর ক্ষমতা আছে। আসলে তাদের অন্তর্লোকে সত্যের আলো জ্বলেছে। মেয়েপুরুষে যেখানে সত্যিকার মিলন ঘটে।

তবে বাধাটা কোনখানে?

কোন বাধাই ছিল না তাদের পথের ধারে। কিন্তু একদিন বিস্ময় এসে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল আকস্মিক।

নিয়তির চক্রান্তের মত নিষ্ঠুর সে আক্রমণ। অতর্কিতে ভানুকে ধরাশায়ী করে দিল। সে প্রচণ্ড আক্রমণের গতিবেগ রোধ করতে পারল না।

বাবা তার মত বদলেছে। তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে তাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে। অথচ অনেক আগেই সে তার বাবার সম্মতির আশীর্বাদ পেয়েছিল। পেয়েছিল বলেই সে এত দূর এগিয়ে ছিল। স্নেহময় পিতার মাতৃহীন সন্তান সে। তার নয়নের মণি। বিস্ময়ের সে রূঢ় আঘাত তার স্নায়ুগুলো সহ্য করতে পারলে না। শিরা-উপশিরাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হতবাক্ ভানু মরণোন্মুখ ভঙ্গীতে মুরজার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

মুরজা সজল চোখে তার নিশ্চেতন মাংসপিণ্ডের মত বিশৃঙ্খল দেহটাকে আঁকড়ে ধরলে।

মুরজা তার চিকিৎসা করাল সাড়ম্বরে। পীড়িত প্রিয়তমের সেবার ভার তুলে নিল নিজের কোমল হাতে। রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করল তার আত্মীয়স্বজনের আসার আশে।

ভানুর বাবাকে মুরজা খবর দিল। কিন্তু তার পরিজনদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ এল না তাকে চোখের দেখা দেখতে।

নটীর গৃহে তারা আসবে কেমন করে? নিষিদ্ধ গৃহকোণে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভানু তাদের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে তাদের মানসম্ভ্রমকে।

মুরজার ভিতরের আগুন দীপ্তশিখায় জ্বলে উঠল। সে সত্যের আগুন। মিথ্যের সমস্ত জঞ্জাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে হোমানল শিখার মত নিজের আভা বিস্তার করল। সে আগুনে সিনেমা-স্টার মুরজা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তার আসল পরিচয় দীপ্তিলাভ করল তার সর্বাঙ্গে।

মুরজা নিজেকে ভুলল। জীবনকে নিবেদন করল মরণের কাছে। মুরজা নিজেকে তুলে ধরল। আত্মসচেতন মন তার আনন্দের উপচার সংগ্রহ করল নিজের প্রেমের মধ্যে দিয়ে। সান্ত্বনা পেল প্রেমাস্পদের অক্লান্ত সেবার মধ্যে দিয়ে। অন্তরের পানে চেয়ে সে নিয়তির এই নির্মম আঘাতকে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বছর কেটে গেল।

চিকিৎসায় কোন ফল হ'ল না, দুরারোগ্য ব্যাধি। ডাক্তার হতাশ হ'ল। এমনই বিকলাঙ্গ হয়েই ওর জীবন অবসান হবে।

প্রচুর আলোবাতাস এবং ভানুর জীবনস্বপ্নকে সফল করে তোলবার জন্তই মুরজা পশ্চিমের এই নিরিবিলি শহরপ্রান্তের এই রোজ-ভিলা কিনল। প্রচুর টাকা ছিল হাতে। পাশের জমি কিনে নিজের মনোমত নতুন বাড়ি তৈরি করল নিজেদের বসবাসের জন্ত। পরিচিত পৃথিবীর সবকিছু পেছনে ফেলে মুরজা তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটিকে এক নতুন লক্ষ্যের পথে টেনে নিয়ে চলল।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। আজও সে অতন্দ্র।

বিহঙ্গীর মত বিকলাঙ্গ প্রণয়ীকে স্নেহপক্ষপুটে ঢেকে এই দীর্ঘদিন সে কঠিন নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের সাধনা করে চলেছে।

ক্লান্তি নেই, অসন্তোষ নেই, বিষাদ নেই, বিরাম নেই। নিজের বিশ্বাসের খুঁটি ধরে প্রশ্নের মত প্রেমের উপাসনা করে চলেছে।

এই তার অভিসার। পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুর্গম। লক্ষ্য আনন্দময় আলোতীর্থ।

আমি যেন বিশ্বাস করতে পারি না। মুরজা যেন একটা জটিল রহস্য।

লীলা মুরজাকে জিজ্ঞেস করেছিল, জীবনটাকে মিথ্যে মনে হয় না?

মুরজা হাসতে হাসতে নিঃসংকোচে জবাব দিয়েছিল, মিথ্যে মনে হবে কেন? প্রেম যদি সত্য হয়, জীবন মিথ্যে হবে কেন? মন ত আমার শূন্য নয়। মন ত ভরে আছে।

—আর কোন সুখসাধ নেই?

সসংকোচে লীলা তাকে প্রশ্ন করেছিল।

মুরজা বলেছিল, অভাবটা আমার কোনখানে দেখলে? জীবনটা ত ও আমার রসে ভরে রেখেছে। ও পঙ্গু অথর্ব বলে ভাবছ? হলেই-বা। ও অসহায় অথর্ব না হলে কি এমন একান্ত হয়ে আমার কাছে ধরা দিত, না নিজেকে এমন ভাবে ওর ভোগে নিবেদন করতে পারতাম? এ ত আমার ভালবাসার পরীক্ষা। আমি ওকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিলাম। লোভও ছিল বৈকি। লোভের বাসা ভেঙে গেল বলেই না আমার ভালবাসা সত্যি হয়ে উঠল।

এ কেমনতর ভালবাসা? বাঁধন নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কায়িক সম্ভোগের সকল স্পর্শ থেকে মুক্ত। আমাদের চোখে এ পরম বিস্ময়। কিন্তু এর সৌন্দর্য অনুপম।

তার প্রেমসাধনার যোগোদ্যানে দাঁড়িয়ে স্বামীস্ত্রীতে আমরা মনে মনে প্রেমতপস্বিনীকে প্রণাম করেছিলাম। চোখের দৃষ্টি কান্নায় ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

হুইটম্যান জন্মবার্ষিকী

শ্রী...

হুইটম্যানের জীবনের সায়াহ্ন বেলার দিনগুলি নিউজার্সির ক্যাম্পডেন শহরে কেটেছে। অকৃতদার কবি ১৮৮৪ সনের ২৬শে মার্চ থেকে ১৮৯২ সনের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুকাল অবধি ক্যাম্পডেনের মিকল ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই বাস করে গেছেন। এই জায়গাটি ডেলোওয়ারে শহর থেকে খুব দূরে নয়। এখানকার শান্ত পরিবেশ, কুহেলী-ছাওয়া আকাশ, খেয়ানৌকোর ঘণ্টা আর দূরের বাঁশির আওয়াজ কবিকে মুগ্ধ করত। তিনি এ জায়গাটিকে খুব পছন্দ করতেন। বাড়ীতে তাঁর সঙ্গী ছিল পোষা কুকুর, নানা রকম পাখী, একজন পরিচারক, আর মিসেস মেরী ডেভিস নামে জনৈক নাবিকের বিধবা পত্নী।

তখন বিশ্বের বহু খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি কবির দর্শনলাভের জন্য এখানে এসেছেন। অস্কার ওয়াইলড, ডাঃ জন জনষ্টন, 'লাইট অব এশিয়ার' লেখক সর এডুইন আর্ণল্ডের মত বিখ্যাত ব্যক্তি কবি সন্দর্শনে এসেছেন। কবির নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গদান করে আনন্দ সঞ্চার করেছেন তাঁরা। আর এসেছেন, প্রায় প্রতিদিন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ও প্রকাশক হরেস ট্রাউবেল। ট্রাউবেল পরিবার আইনস্টাইন পরিবারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। চিরনিদ্রায় শয়নকালে তাঁরই হাতে হাত রেখে বলে গেলেন :

> প্রিয় বন্ধু, তুমি যে কেউই হও না কেন,
> আমার এই চুম্বন গ্রহণ করো...
> আমার মনে হয়, যারা দিনান্তে কর্মাবসানে,
> ক্ষণকাল বিশ্রামের তরে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে
> আমিও তেমনি তাদের মত জগতের সব কিছু থেকে
> বিদায় নিচ্ছি।
> আমি তোমায় ভালবাসি...

হুইটম্যানের স্মৃতি-বিজড়িত বহু পুস্তক-পুস্তিকা, কবিতার পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত তৈজসপত্র ঐ গৃহেই সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁর এই বাসগৃহটিকেই স্মৃতিসৌধে পরিণত করা হয়েছে।

যে কেউ এই পুণ্যস্থান পরিদর্শনে গেছেন তাঁদের সকলেরই দৃষ্টি তাঁর বহু টীকা সমন্বিত একখানি পুস্তকের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। প্রায় সকলেরই মনে প্রশ্ন জেগেছে—ঐ পুস্তক তিনি পেলেন কোথায়?—এ ত আজকের কথা নয়, আগামী ৩০শে মে তার ১১৭তম জন্মবার্ষিকী দিবস। এ একশত বছরেরও আগেকার কথা। হুইটম্যানের মৃত্যুর এক বছর পরে ১৮৯৩ সনে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরের ধর্ম-মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন।

বইখানি হচ্ছে ভগবদ্গীতার একটি পকেট সংস্করণ। কবি হুইটম্যান সব সময়েই নাকি এই বইখানি তাঁর কাছে রাখতেন। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এমার্সন কবিকে এই বইখানি উপহার দিয়েছিলেন।

হুইটম্যানের কবিতার অনেক জায়গায়ই দেখা যায় গীতার অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে আত্মসমর্পণের মনোভাবের সমন্বয়। 'তাঁর লীভস অব গ্রাস' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৫ সনে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। কবির তখন ৩৬ বৎসর বয়স। এমার্সন কবিকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি মন্তব্য করলেন—"তোমার এ কবিতায় আধুনিক সাংবাদিকতার আঙ্গিকের সঙ্গে ভগবৎগীতার ভাবের সমন্বয় ঘটেছে।—মহান্ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রারম্ভে তোমাকে অভিনন্দন জানাই।" সুয়েজখালের উদ্বোধনের পর কবি 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' শীর্ষক কবিতায় লিখলেন :

> কল্পনা আমাকে নিয়ে যায়
> সেই প্রাচীন জনাকীর্ণ পৃথিবীর সর্ব সমৃদ্ধ দেশে
> চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের ছবি
> আমি যেন দেখি সিন্ধু, গঙ্গা তাদের
> বহু শাখা উপশাখার স্রোতধারা বয়ে যায়...

১৮৫৫ সনে মাত্র বারটি কবিতা আর কবির কাব্যাদর্শ সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা নিয়ে "লীভস অব গ্রাস" প্রথম প্রকাশিত হয়। অখ্যাত অপরিচিত কবির পরিচয়ের স্বাক্ষর ছিল একমাত্র কবিতায়। কবির একটি প্রতিকৃতি ছাড়া পরিচয়ের কোন চিহ্নই, কবির নাম-ধাম কি কোন কবিতার কোন শিরোনামা কিছুই ছিল না। কবি কেবল নিজের হাতে কবিতাই রচনা করেন নি, অক্ষরের পরে অক্ষর সাজিয়ে এই বই ছাপার কাজও সম্পন্ন করেছিলেন। প্রথমে ৮০০ কপি ছেপেছিলেন। গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নাম-বিহীন এই পুস্তকে যে প্রতিকৃতিটি ছিল তা দেখে তাকে কবি বলে মনে করবার কোন উপায়ই ছিল না। মাথায় মস্ত টুপী, মুখে একগাল দাড়ি, গায়ে রঙীন সার্ট—কবি ত নয়, যেন একবারেই সাধারণ লোক।

যে সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী, যে ছন্দে এতকাল কাব্য রচিত হয়েছে সেই সমাজ-বন্ধন ও ছন্দবন্ধন

যুগের কবি হুইটম্যান, মেনে চলেন নি। আগামী কালকে আবাহন করে কবি যে গান গাইলেন তা একমাত্র চিন্তাশীল কবি ও দার্শনিকদের ছাড়া জনচিত্তে তেমন সাড়া জাগায় নি। আমেরিকার এমার্সন ও থরো ব্যতীত, ইংলণ্ডের দার্শনিক রাসকিন, কবি সুইনবার্ণ ও টেনিসন এবং ডব্লিউ. এম. রসেটিও কবিসত্তার মূলভাব ও মূল প্রেরণা উপলব্ধি করে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

কবি জন্ম নেয় কেবল বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও। তাই যাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র বর্তমানেই নিবদ্ধ তাদের কাছে কবির বাণী অস্পষ্ট, কবিকে তারা বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করতে সামান্যতমও সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ইতিহাসের অতিক্রান্ত পথে এমনি বহু শিল্পী ও কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা অনাদরে অবহেলায় ভগ্নমনোরথ হয়ে আত্মহনন করেছেন।

হুইটম্যানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তবে তিনি অপরিসীম প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বোস্টন ইনটেলিজেন্সার নামে একটি পত্রিকায় এই কাব্য-গ্রন্থকে আত্মকেন্দ্রিক এবং অতি নিম্নরুচির পরিচায়ক বলে মন্তব্য করা হয়েছিল। এমন কি সমালোচক এই পুস্তকখানি কোন বিকৃত মস্তিষ্কের কীর্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া যে সকল পুস্তক কবি আমেরিকার লেখকবর্গকে উপহার দিয়েছিলেন তারা অতি অপমানকর মন্তব্য করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবি তখন তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, মহাকালই আমার কাব্যের বিচারক, আমার কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব কালের কষ্টিপাথরেই নির্ণীত হবে।

হুইটম্যানের জীবন অতি বৈচিত্র্যময়। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি "লং আয়ল্যাণ্ডার" নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিলেন। তখনকার দিনে ছোট ছোট পত্রিকার সম্পাদকের কেবলমাত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনার ভার নিলেই চলত না, পত্রিকা বিলিবণ্টনের ভারও তাদের নিতে হ'ত। এই সময়ে বহু অভিজ্ঞতাই তিনি অর্জন করলেন। কিন্তু কোন কাজেই তিনি বেশী দিন বাঁধা পড়তেন না। ১৮৪৬ সনে "ব্রুকলীন ঈগল" নামে আর একটি পত্রিকায় এসে যোগ দিলেন। এই পত্রিকায় তাঁর কোন কোন কবিতা প্রকাশিত হয়। এ ছিল প্রাথমিক প্রস্তুতি, "দি সং অব দি সেলফ" জাতীয় রসোত্তীর্ণ কবিতা প্রথম যুগের এই সব রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না। এর কিছুদিন পরে "লীভস অব গ্রাস" প্রকাশিত হয়। কবির স্বদেশে এ্যাণ্টনী কমস্টকের মত কতিপয় প্রতিক্রিয়াপন্থীর বিরুদ্ধতার ফলে এই পুস্তক প্রকাশ কিছু দিনের জন্য নিষিদ্ধ হয়, এই কাব্যগ্রন্থকে তারা অশিষ্টোচিত অন্তর্ঘাতী ভাব-ধারার বাহন মনে করতেন। কিন্তু পনর বছরের মধ্যে হুইট-ম্যানের সমর্থকদেরই জয় হয়।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

হুইটম্যানের পিতৃ-পরিচয়েও অসাধারণত্ব কিছুই নেই। ১৮১৯ সনে নিউ ইয়র্কের লং আয়ল্যাণ্ডে সাধারণ চাষী ও ছুতোর মিস্ত্রীর ঘরে জন্ম। এগারটি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। দরিদ্রের সংসার। এগার বৎসর বয়সে স্কুলের পড়া ছেড়ে তাঁকে ব্রুকলিনে অফিস বয়ের কাজে যোগ দিতে হয়। সেখানে বালক হুইটম্যান এক বছরের বেশী থাকে নি। বারো বৎসর বয়সে একটি সংবাদপত্রে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন, তার পর জাহাজে করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। কুড়ি বৎসরের মধ্যেই তিনি পুস্তক মুদ্রণ ও পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

বহু সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন, কিন্তু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিতে সম্মত না হওয়ায় কোন জায়গায়ই তাঁর বেশী দিন কাজ করা সম্ভব হয় নি। তিনি রাজনীতি চর্চা করেছেন, সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও দিয়েছেন, নানা কাজ করেছেন, কিন্তু ছত্রিশ বৎসরের পূর্বে তাঁর প্রতিভার প্রস্ফুরণ হয় নি—১৮৫৫ সনে

তাঁর আত্মবিকাশ ঘটে, এ যেন বিশাল আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্‌গিরণ।

তিনি বললেন, "ব্রুকলীন ও নিউইয়র্কে যে জীবন-যাপন করে এসেছি সেই জীবনের অভিব্যক্তিই আমার এই কাব্য, পনর বৎসর ধরে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে ভালবাসা ও প্রীতিস্নিগ্ধ, মুক্ত আবহাওয়ায় আমার দিন কেটেছে তারাই রয়েছে আমার কাব্যে।"

মানুষের সামগ্রিক রূপই তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল বত্রিশটি কবিতা। ১৮৬০ সনে ১৩২টি এবং ১৮৯২ সনে তাঁর মৃত্যুকালে ১১তম সংস্করণে ছিল ৪২৩টি কবিতা। কালাতিক্রমণে তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হওয়ায় পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে—কলেবর বৃদ্ধির পর তিনি একবার বলেছিলেন "এই পুস্তকে পাবে মানুষের মর্মবাণী, মানুষের প্রাণের স্পর্শ।"

১৮৬০ সনে আমেরিকায় সুরু হল গৃহযুদ্ধ। কবি আহত সৈনিকদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে জীবন-চক্রবাল আরও দূরপ্রসারিত হল, কাব্য পেল নূতন ভাষা। চারদিকে যখন অশান্তির আগুন জলেছে, আশাহত অনেকেই ভেঙ্গে পড়েছে, তখন কবি গাইলেন :

> নিরাশায় ভেঙ্গে পড়োনা,
> প্রেমের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার
> স্বপ্ন হবে সফল,
> যারা ভালবাসতে পারে
> তাদের পরাজয় নেই।

মানুষের প্রতি এই ভালবাসা ও প্রেমের বাণীই হুইটম্যান-কাব্যের মর্মকথা। কবি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এই পৃথিবীর সবকিছুরই একটি নিজস্ব স্থান রয়েছে, অধিকার রয়েছে—কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ধনী, কি নির্ধন কেউ ছোট কেউ বড় নয়। "লীভস অব গ্রাস" কাব্য-গ্রন্থের মধ্য দিয়ে হুইটম্যানের যে অবদান অসামান্য হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে অনন্তের উপলব্ধি, সীমাহীন ব্যক্তিত্বের অনুভূতি।

কবি হুইটম্যান জীবনের বহুক্ষেত্রে বিচরণ করে গেছেন। অফিস বয়, প্রেস কম্পোজিটার, স্কুলশিক্ষক, সাংবাদিক, ওয়াশিংটনে হাসপাতালের নার্স, যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিভাগে কেরানি হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু ঐ বিভাগের সেক্রেটারী "লীভস অব গ্রাস" প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৮৬৫ সনের ৩০শে জুন তারিখে তাঁকে বরখাস্ত করেন। এই ঘটনার পরে ১৮৭৩ সন পর্যন্ত তিনি এটর্নি জেনারেলের আপিসে কাজ করেছেন।

"লীভস অব গ্রাস" ছাড়া হুইটম্যান "ড্রাম ট্যাপস" (১৮৬৫), "প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" (১৮৭১), "ডেমোক্র্যাটিক ভিস্টাস" (১৮৭১), "মেমোরেণ্ডা ডিউরিং দি ওয়ার" (১৮৭৫) "টু রিভ্যুলেটস" (১৮৭৬), "স্পেসিম্যান ডেজ এ্যাণ্ড কালেকট" (১৮৮৩), "নভেম্বর বাউজ" (১৮৮৮), "গুডবাই মাই ফ্যান্সী" (১৮৯১), প্রভৃতি কাব্যপুস্তক রচনা করেছেন। একক কবিতা হিসাবে "আউট অব দি ক্র্যাডল এণ্ড লেসলী রকিং", লিঙ্কনের স্মৃতিতে লিখিত "হোয়েন লিল্যাকস্‌ লাস্ট ইন দি ডোর ইয়ার্ড ব্লুমড" ও "ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হুলা নাচের দৃশ্য

হাওয়াই দ্বীপে সাত দিন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

গোধূলির স্নিগ্ধ আলোকে ৬-৩০ মিনিটে প্যান-আমেরিকান বিমান নামল হনলুলু বিমান বন্দরে। কল্পনার স্বপ্নপুরী হাওয়ায় রচা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলু। বিমান-ঘাঁটিতে অনেকে এসেছে মালা নিয়ে বন্ধুদের অভ্যর্থনা জানাতে।

আমার জন্য এসেছিলেন মিসেস ম্যারোজি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এঁদের কথা বলেছিলেন। ম্যারোজি একজন ইটালীয় ভাস্কর। স্বামী বিবদিবানন্দের নিকট ইনি হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। এদের জন্য অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কথামত এক শিশি গঙ্গাজল নিয়ে গিয়েছিলাম।

ট্যাক্সি করে মিসেস ম্যারোজি আমায় নাপুয়া হোটেলে নিয়ে গেলেন। ট্যাক্সিতে লাগল ২ ডলার ৬০ সেণ্ট—অনেকগুলি টাকা দিতে হ'ল বলে একটু কষ্ট হ'ল। নাপুয়া হোটেলে শুধু থাকবার জায়গা খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। খেতে হবে বাইরে—হোটেলের ফাঁকা ফাঁকা ছোট ছোট ঘর—ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই। তবে এক সপ্তাহের ভাড়া ২০ ডলার দিতে হবে।

মিসেস বাড়ী গিয়ে স্বামীকে নিয়ে এলেন। ম্যারোজি বক্তৃতার ব্যবস্থা করবেন বললেন। তবে অর্থ দিতে পারবেন না বললেন। মেয়েদের মন স্নেহপ্রবণ, মিসেস আমায় খাওয়ার কথা বলছিলেন—কর্তা বললেন, "সে পরে হবে।" তখন মনে খানিকটা কষ্ট হ'ল—কারণ সেই রাতে অজানা স্থানে খেতে পেলে সুবিধাই হ'ত। ওরা বিদায় হলেন—কোথায় খাবার পাওয়া যাবে বলে গেলেন—কিন্তু আমি অচেনা জায়গায় রাতে আর বার হলাম না। কাজেই খাওয়াও আর হ'ল না।

যাদের জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গঙ্গাজল আনলাম, তাদের কাছে আর একটু দরদ আশা করেছিলাম। অবশ্য ম্যারোজি ভেবেছিলেন পরে একদিন ভাল করে খাওয়াবেন এবং খাইয়েও ছিলেন।

হনলুলুর ওয়াইকিকি সমুদ্রতট সুবিখ্যাত। প্রাকৃতিক দৃশ্যে অনুপম—শান্ত বালুবেলায় স্নানার্থীর ভিড়। কালাকাউয়া এভিনিউ বেয়ে সেখানে ক'দিন সকালে যাত্রা সুরু করেছিলাম—একটা ছেলে ভুল খবর দিল যে সমুদ্রতট বহুদূর, তাই ফিরে এলাম।

হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস মুর ৯টা ৯।টায় আসবেন কথা ছিল। তাঁর জন্য বসে রইলাম। অনেক পরে তিনি ফোনে খবর দিলেন—বিকাল আড়াইটায় আসবেন। কাজেই বাসে করে ওয়াইকিকি বেলাভূমে গেলাম। এই বেলাভূমে হনলুলুর নাম করা হোটেল যথা হাওয়াইয়ান, মোয়ানা, হাইলকুলানি প্রভৃতি অবস্থিত।

আড়াইটায় চার্লস মুর এলেন। দার্শনিক পণ্ডিত তিনি, কিন্তু কথাবার্তায় বেশ সুচতুর বলে মনে হ'ল। মিষ্ট কথা বললেন, কিন্তু আমার জন্য বিশেষ কিছু করবেন সে ভরসা হ'ল না। এ জন্য তোর দোষ দেই না—আমি অধ্যাপক নই—আমার লেখা ইংরেজী দার্শনিক বই নেই, কাজেই উচ্ছ্সিত আবেগ আশা করবার কোনও কারণ ছিল না।

চার্লস মুর চলে গেলে একা একা ভ্রমণে বার হলাম। নাপুয়া হোটেলের কাছেই একটা সুন্দর পার্ক। তার পাশে এদের একাডেমি অফ ফাইন আর্টস চিত্রশালায় ছবির সংগ্রহ মোটামুটি সুন্দর, সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে গেলাম এদের সাধারণ পাঠাগারে।

আমেরিকার প্রত্যেক বড় শহরেই একটি সরকারী খরচে চলা পাঠাগার আছে, আমাদের দেশে সম্প্রতি এই ধরনের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে।

ওয়াইকিকি সমুদ্রে নৌবিহার

১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার। ডোল কোম্পানীর আনারসের কারখানা দেখতে গেলাম। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অর্ধেক আয় আসে আনারস থেকে. আনারস তৈরী করতে এবং টিনে বোঝাই করতে বহু লোক অন্নের সংস্থান করে। যখন পৌঁছলাম তখন ৭॥টা, ৯টার আগে দেখাবার ব্যবস্থা নেই, কাজেই বসে বসে কাগজের ঠোঙায় আনারসের রস পান করলাম আর কিছু সাময়িক পত্র পড়লাম। ৯টা বাজতে দশ বার জন দর্শনার্থী এল, আমাদের নিয়ে এদের একজন সব দেখিয়ে দিল। ন'টা কোম্পানী আছে, তাদের তেরটি বাগান, ১,৮০,০০০ বিঘা জমির উপর আনারসের চাষ। ন'টি কারখানায় মরসুমে প্রায় ২০,০০০ লোক এই ব্যবসায়ে খাটে। কারখানাগুলিকে বলে cannery। আস্ত আনারস কলের ভিতর ছেড়ে দিলে খোসা ছাড়ান হয়ে যায়—তার পর পরিষ্কৃত হয়ে যায় যেখানে মেয়েরা বসে বসে এর চোখ ছাড়িয়ে দেয়—তার পর খণ্ড খণ্ড হয়।

ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে এলাম রাজপ্রাসাদে। সেখানে হাওয়াই রাজাদের সিংহাসন-ঘর দর্শকদের দেখান হয়। এখানকার তত্ত্বাবধায়কের নাম মিঃ ব্রে—মিঃ ব্রে বললেন তার এক অতিবৃদ্ধা পিতামহী ছিলেন হিন্দু মেয়ে। মিঃ ব্রের চরিত্রে দেখলাম ভাবালুতা এবং দৈবশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। মিঃ ব্রে বললেন, তাঁর কাছে আছে এক শিলা—যে শিলাকে তাঁরা মন্ত্র পড়ে পূজা করেন। আমাকে সেটা দেখাতে চাইলেন।

বাসায় ফিরে ওয়াতুমল দম্পতীর জন্য বসে রইলাম। ওয়াতুমল সিন্ধী বণিক। তার এখানে বড় রকম ব্যবসা আছে। তাঁর স্ত্রী একজন ডেনিশ মহিলা। ওয়াতুমল ভারতীয় বিদ্যা প্রচারের জন্য কিছু টাকা ব্যয় করেছেন—আমি তাদের বৃত্তি চেয়েছিলাম—এই বৃত্তি পরিচালনা করেন মিসেস ওয়াতুমল। তিনি বললেন—তাঁদের টাকা এখন জন্মশাসনে ব্যয় হবে—ভারতীয় দর্শন প্রচারে আর হবে না। ওরা ১২-৪০ মিনিটে এলেন—একটা বড় হোটেলে নিয়ে গেলেন—সেখানে চার্লস মুরও অভ্যাগত ছিলেন—লাঞ্চ খাওয়ালেন।

এখান থেকে চার্লস মুরের সঙ্গে গেলাম হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যক্ষের নাম Sinclair। লোকটা চমৎকার, মিষ্টভাষী, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত—আমাকে বললেন, "টাকা থাকলে আমাকে হনলুলুতে কিছুদিনের জন্য থাকতে বলতেন।" চার্লস মুর আমায় হোটেলে পৌঁছে দিলেন।

খানিক বিশ্রাম করে হোটেলের নিকট যে Lincoln School সেখানে গেলাম। হেডমাষ্টার অতিশয় সদাশয় লোক। মঙ্গলবার দিন ৯টায় ছেলেমেয়েরা আমায় কিছু বলতে বললেন। স্বীকৃত হয়ে গেলাম এদের আদালত দেখতে। খানিকক্ষণ সব দেখে-শুনে হনলুলুর প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "Star Bullatin" আপিসে গেলাম। সেখানে ওরা আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় লিখে নিল। পরদিন সেটা ওদের কাগজে বার করেছিল। তার পর Honolulu Advertiser নামক অন্য একখানি বড় কাগজের আপিসে সাক্ষাৎ করে বাসায় ফিরলাম। ফিরে ক্লান্তি ভরে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম।

শনিবার দিন সকালে একা একাই চললাম Koko Head নামক পাহাড়-চূড়া দেখতে। হনলুলু থেকে অনেক দূর—বাস পরিবর্তন করে বাসে চলতে সে প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্যময় নগরের উপকণ্ঠের মধ্য দিয়ে—। জীবনে একাকিত্ব আমার যেন লেগেই আছে—আমার সঙ্গে কেউ যায় নি—পথে অন্য যাত্রীরও দেখা মিলল না—কাজেই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হ'ল না—তবে যতদূর উঠেছিলাম সেখান থেকে শান্ত সমুদ্রের লীলাচঞ্চল রূপ খুব নয়নাভিরাম লাগল।

যে পথে গিয়েছিলাম সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফেরার জন্য হনলুলুর অনেকখানি দেখা হয়ে গেল।

পথে একটি জাপানী বধূর নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করলাম। ম্যারোজী দম্পতী মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও আহার শেষে স্থানীয় চিড়িয়াখানা এবং জীবজন্তুর আবাস দেখে ফিরলাম।

হোটেলের সহকারিণী মিস ইভা, হাওয়াইয়ান মেয়ে। তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার চেহারায় দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়ে। তার ছবি তুলব বললাম, সে বললে সোমবারে সেজেগুজে আসবে। তার ছবি তুলেছিলাম, কিন্তু আনাড়ি আমার হাতে সেটা ওঠে নি। ওর কাছ থেকে খানকতক বই চেয়ে নিয়ে এলাম। আমাদের দেশের মত দিবানিদ্রা এখানে আরামদায়ক।

পরে আদালতে গেলাম। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। তার পর পাঠাগার ঘুরে পাঁচটায় ফিরলাম। ম্যারোজিয়া বলেছিলেন হোটেলে রাত্রে Hula dance দেখতে নিয়ে যাবেন, কিন্তু পরে জানা গেল আজ আর হবে না। হোটেলটি একটি জাপানী দম্পতীর। ডক্টর কানস্তুর হচ্ছে মালিকের নাম। ডক্টর কানস্তুর বেশ সদালাপী। তিনি বললেন, "আগামী কাল রাত ৮টায় হবে, তখন যেন যাই।"

সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসে Alewa Heights নামক পাহাড় চূড়'য় বেড়'তে যাবার জন্ত। কতকগুলি পর্ব্বতশ্রেণীর তলদেশে সুবিস্তৃত সমতলের উপর হনলুলু শহর রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের স্তায় এই তরুগুল্মময় পাহাড়গুলি শহরের শ্রীতে দেয় গাম্ভীর্য্য এবং চাঞ্চল্য।

বাসে আলাপ করলেন বৃদ্ধ বোম্যান। ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভ্রমণে এসে'ছেন, অযাচিত আলাপ করলেন। খানিক আলাপ শেষে বললেন, "চলুন আমার সঙ্গে এদের দেশের ভিতরটা দেখে আসবেন"। তার সঙ্গে চললাম Leper Asylum এ। সেখানে বোম্যান একখানি মোটর চেয়ে নিলেন। তাতে করে আমাকে নিয়ে পার্ল হারবার দেখিয়ে ওয়াইকিকি সমুদ্রতটে নিয়ে এলেন।

তার পর বাসায় ফিরে ম্যারো'ভি দম্পতীর আয়োজিত হলে বক্তৃতা দিলাম। ম্যারোজি বক্তৃতার শেষে তিন ডলার দক্ষিণা দিলেন। এই প্রথম দক্ষিণা বলে সেটা নিয়ে নিলাম।

সকালে খাওয়া হয় নি। স্নান শেষে Alewa Heights, Pacific Heights এবং Nuana Avenue বেড়িয়ে এলাম। পথে পড়ল বনানীর মধুর শোভা এবং নগর প্রান্তের ও নুয়ানা উপত্যকার সৌন্দর্য্য।

প্রদোষের দিকে চললাম বোম্যানের ওখানে। তার পর বোম্যানের গাড়ীতে করে মোয়ানা হোটেলে Hula dance দেখতে গেলাম।

হুলা নাচ এদেশের দেশীয় নাচ। ফুলের মালা পরে মেয়েরা নাচে ও গান গায়। এটা শুধু উৎসব নয়, এটা মাঙ্গল্য ক্রিয়া। মোয়ানাতে অনেকক্ষণ ধরে নানা ধরনের নাচ, গান ও কৌতুক দেখে আমরা তার পাশের বড় হোটেল রয়্যাল হাউইয়ান দেখতে গেলাম। সেখানে নাচ ছিল না, তবে তার সাজ সজ্জা, তার উপবনের ঐশ্বর্য্য মন ভুলায়। এখানে বোম্যানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হ'ল। আমি প্রশ্ন করলাম, "বিয়ে কর নি কেন?" বলল, সে তার জীবনের দুঃখের কাহিনী, যে মেয়েটিকে সে ভালবাসত, তাকে বিয়ে করতে যথেষ্ট পয়সা ছিল না। তাই সে অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু মেয়েটি অপেক্ষা করল না, অন্তকে বিয়ে করল। তাই তার বিয়ে করা হয় নি। কিন্তু সে বিয়ে করতে অরাজি নয়, এখনও মনের মানুষের সন্ধানে আছে—যদি মেলে তবে তাকেই জীবনসঙ্গিনী করবে। দেহ বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম—তাকে ভারতীয় সংযম ও সাধনার বাণী স্পর্শ করে নাই। আর সত্য কথা বলতে কি, আমাদের দেশেও ত বোম্যানের জুড়ি শত সহস্র আছে। দিলখোলা বোম্যানকে তবু তার সত্যভাষণের জন্ত খুব ভাল লাগল।

সোমবার ১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে উঠে ডাক ঘরে গেলাম। সামুদ্রিক ডাকে দীপায় নামে এক বাণ্ডিল ছবি পাঠালাম, ৪৪ সেণ্ট খরচ হ'ল। তার পর ডেভিড ব্রের ওখানে গেলাম।

কালাকউয়া এভিনিউ

দেখলাম, আইওলানি প্রাসাদ, হাওয়াই রাজাদের বিলাস নিকেতন। সিংহাসন-ঘরে বসে হাওয়াই দ্বীপের অতীতের কথা মনে জাগে।

সাগরের বুকে আগ্নেয় পাহাড়ের চূড়ায় জন্মাল কয়েকটি দ্বীপ, কোন অতীতে কেউ জানে না। সেখানে ভেসে এল ডোঙায় করে টাহিটি প্রভৃতি পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে বীর একজাতি। তারা এসেছিল ভারতবর্ষ থেকে। তার পর মালয় প্রভৃতি আদিবাসীদের

...য়ে করে তারা মিশ্র জাতিতে পরিণত হ'ল। হাওয়াই দ্বীপে যারা ...সেছিল, তাদের নাম দিয়েছে এরা মেনহুন।

এদের গাথার সঙ্গে পলিনেশীয় গাথার চমৎকার সাদৃশ্য ও মিল আছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক এই দ্বীপপুঞ্জ দেখতে পান। তখন ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিল। দিগ্বিজয়ী কামেহামেহা সকল দ্বীপের সার্বভৌম রাজা হয়ে বসেন ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। তার পর দ্বিতীয় কামেহামেহা, তৃতীয় কামেহামেহা, চতুর্থ কামেহামেহা, পঞ্চম কামেহামেহা, রাজা লুনালিলো, রাজা কালাকাউয়া, রাণী লিলিউয়ো কালানি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। হাওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের উনপঞ্চাশতম রাষ্ট্র, কিন্তু একে এখনও রাষ্ট্রের মর্য্যাদা দেওয়া হয় নি। তাই নিয়ে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে।

আনারস কারখানার একটি দৃশ্য

ডেভিড ব্রে বলল, হাওয়াইয়ের আদিবাসীরা কাহুনদের ভক্তি করে। এরা আমাদের দেশের গুণীনের মত, মন্ত্র,তন্ত্র, বশীকরণ জানে, রোগ নিরাময় করে। ব্রে এদের অলৌকিক এবং অতি লৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। সে দেখাল তার শালগ্রাম শিলা—পুরোহিতদের ...পূত পাথরের গোলক।

ব্রে বলল, এটা তাদের পূর্ব্বপুরুষ পলিনেশিয়া থেকে নৌকায় করে নিয়ে এসেছিল, এর জন্য তাদের নৌকা ডোবেনি। আমি ওকে ভারতের কথা বললাম। ব্রে ভারতের প্রতি ভক্তিমান্। সে বলল, হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা মূলতঃ ভারতীয়। সে আমায় কয়েকজনের সন্ধান দিল, যারা ভারতের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপের মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

ব্রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম। চার্লস্মুর ১০-১৫ মিনিটে এলেন। তিনি আমাকে বিশপ মিউজিয়ম দেখাতে নিয়ে গেলেন। এই প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে অনেক চমৎকার জিনিসের সংগ্রহ আছে।

এখানে দেখলাম, কাহুনদের অরণি, কেমন করে এরা আগুন জ্বালত। এদের ঘরের নির্ম্মাণ-প্রণালীর সঙ্গে আমাদের দেশের খড়ের ঘরের মিল চোখে পড়ল। এই যাদুঘরের যিনি পুরোধা তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি বললেন, হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা পলিনেশীয়ান। ইন্দোনেশিয়া থেকে সেখানে তারা এসেছিল। ভারত থেকে প্রথমতঃ এলেও বহু শতাব্দী তারা ইন্দোনেশিয়ায় ছিল। তাই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ়।

এই সুবৃহৎ সংগ্রহটি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে দেখবার মত নয়, কিন্তু এ দেখে বুঝবার মত বিদ্যা আমার নেই আর তা ছাড়া মুরও অনেক সময় দিতে পারেন না। কাজেই ওখান থেকে আমরা ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরলাম।

২-৩০ মিনিটে ব্যোমান এলেন। তার সঙ্গে লেপার এসাইলাম পর্য্যন্ত মোটরে গেলাম ও এলাম, কিন্তু দুপুরের রোদে বেশ ঘুম পেল। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধুরী উপভোগ বেশী হয় নি।

পৌনে ছয়টায় হনলুলু এডভার্টাইজার থেকে রিপোর্টার এল। তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল।

হাওয়াই জবা ফুলের দেশ। নানা বিচিত্রবর্ণ জবার সমারোহ চোখকে জুড়িয়ে দেয়। লাল জবা হাওয়াই রাষ্ট্রের সরকারী ফুল। জবা আমাদের দেশের প্রাচীনতম ফুল। এটা ভারতের আদি অধিবাসী কিনা, সে তত্ত্ব আমি জানি না। তবে ভারত থেকে ইন্দোনেশিয়ার পথে জবা হাওয়াই দ্বীপে অনুপ্রবেশ করেছে কিনা সেটা ভাববার বিষয়।

রাত আটটায় এলেন রেভারেণ্ড ডেভিড. কে. পিমান্থ, হিব্রু আইটিয়ান থিয়োলজিষ্ট। ষ্টার বুলেটিং কাগজে আমার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বার হয়ে ছিল সেটা পড়েই ইনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসেন।

ভদ্রলোক গোঁড়া, বাইবেলের উক্তি উদ্ধার করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে হাওয়াই দ্বীপের লোকেরা আসলে এসেছে প্যালে-ষ্টাইন থেকে, আব্রাহামের যে ছেলে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিল, সেই এদের পিতৃপুরুষ। ভদ্রলোকের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত না হলেও তার বিশ্বাসের আন্তরিকতা ভুলবার নয়। রাত সাড়ে নয়টায় ম্যাজিক লণ্ঠনে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের ছবি দেখালেন ডাক্তার ...

বান্ধবী, এক জাপানী মেয়ে। ছুটিতে দুর্গম দক্ষিণ আমেরিকার নানা প্রদেশে এই দুঃসাহসিকা মহিলা যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তার ছবি খুব সুন্দর ভাবে তুলে এনেছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার হাটের ছবি যেটা দেখাল তার সঙ্গে আমাদের পাড়াগাঁয়ের হাটের ছবির হুবহু মিল আছে। মেয়েটি স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য্য, মধুর কণ্ঠ, দৃষ্টির বিশালতা আমার খুবই ভাল লাগল।

পরদিন সকালে লিনকন স্কুলে বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতার শেষে ছোট ছোট মেয়েরা ও ছেলেরা নানাবিধ প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করল। দেখলাম এদের শিখবার ও জানবার কি চমৎকার আগ্রহ।

দুপুরে লায়ন ক্লাবে খাওয়ার জন্য বোম্যান বলেছিলেন। খুঁজে খুঁজে সেইখানে গেলাম। লায়ন ক্লাব চমৎকার একটি সংস্থা, আমেরিকার নানা শহরে এদের শাখা আছে, সভ্যেরা তা থেকে সুবিধা ও সুযোগ পায়। এখানেও এমন ধরনের একটা থাকবার ব্যবস্থা আছে। বোম্যান সেইখানেই ছিলেন। সেখানে থাকার ও খাওয়ার খরচ খুবই সামান্য, অথচ সুযোগ ও সুবিধা প্রচুর।

এই দিনের অধিবেশনে হাওয়াই রাষ্ট্রের প্রাক্তন গর্ভনর টম বক্তৃতা দিলেন। লিচুকলের চাষ বাড়ালে কেমন করে ধনে-ধান্যে হাওয়াই পূর্ণ হবে, সেটাই ছিল বক্তৃতার বিষয়।

রাত্রে এখানকার ইণ্ডিয়ান ক্লাব বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। এই ক্লাবের পিছনে আছেন চার্লস মুর, ওয়াতুমল দম্পতী প্রভৃতি। তাদের নিজস্ব ঘর নেই—প্যাসিফিক হাউস নামক স্থানে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় মুর ঠিক করে দিয়েছিলেন—মনু ও নেহেরু।

ভারতের প্রাচীন সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গে বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তনের তুলনামূলক আলোচনা। চার্লস মুরের নিজের গাড়ী বিগড়ে গিয়েছিল—ভদ্রলোক অন্যের গাড়ী করে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি বেশী কেউ আসে নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে বড়জোর কুড়ি জন নারী ও পুরুষ এলেন। আমার বক্তব্য শেষ হলে প্রশ্নবাণ এল। চার্লস মুর নিজেই অনেক প্রশ্ন করলেন—আমি তার যথাযোগ্য উত্তর দিলাম।

ফিরলাম এলসেন দাশের গাড়ীতে—এই মেয়েটি ঢাকার উপেন্দ্রকুমার দাশ নামক একজন রাসায়নিককে বিয়ে করেছিলেন—হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তার পর থেকে ভদ্রমহিলা ওয়েকিকি বিচে একটা ছোট দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করছেন।

মেয়েটি খুব আলাপী নন—আমার প্রশ্নের জবাবে দু' চারটি কথা মাত্র বলেছিলেন। ভারতীয় বধূর ভারতের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক, কিন্তু সে ধরনের কোনও ঔৎসুক্য বা কৌতূহল তাঁর দেখতে পেলাম না। হয়ত অপরিচয়ের আড়াল অন্তরায় হয়েছিল।

তাঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম। মনে হয়েছিল হয়ত মেয়েটি বলবেন—আমার দোকানে বেড়িয়ে যেও। না, সে সব কিছু বললেন না। সকালে উঠে আদালতে গেলাম। চীফ জাষ্টিস টাউসের সঙ্গে দেখা করবার সময় স্থির ছিল। ভদ্রলোক খুব অমায়িক—নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল—কথাপ্রসঙ্গে জাপানের চীফ জাষ্টিসের কথা উঠল। আন্তর্জাতিক

কাষ্ঠ খোদিত মূর্ত্তি—বিশপস মিউজিয়ম

আইনের কথা উঠল। সমস্ত পৃথিবীতে রণডঙ্কা শেষ হয়ে মৈত্রীর যজ্ঞ আরম্ভ হবে কবে, সে প্রশ্নে তিনি বললেন—'হবেই, তবে আজ হউক আর কাল হউক।'

হাওয়াই দ্বীপের কথা উঠল। তিনি বললেন, "আমেরিকা হাওয়াইকে সমর রাষ্ট্রের মর্য্যাদা দিলে ভাল করবে।" তারপর

হাসতে হাসতে বললেন যে, এতদিনে এটা হয়ে যেত কেবল রাজনৈতিক দলাদলির ফলে হয় নি।

ওখান থেকে গেলাম পাঠাগারে। আজ বিদায়ের দিন—বহু বর্ষ আগে মার্কটোয়েন হাওয়াই সম্বন্ধে যা লিখেছেন—সে কথা আজ

হাওয়াই তরুণী

আমার কাছে খুব ভাল লাগল। আমার মনেও অনুরূপ ভাব জেগেছে :

"No alien land in all the world has any deep strong charm for me but that one, no other land could so longingly and so beseechingly haunt me sleeping and waking, through half a life-time, as that one has done.

"Other things leave me, but it abides other things change, but it remains the same. For me its balmy airs are always blowing, its summer seas flashing in the sun, the pulsing of its surf-beat is in my ear; I can see its garlanded crags, its leaping cascades, its plumpy palms drowsing by the shore, its remote summits floating like islands above the cloud-rack.

"I can feel the spirit of its woodland solitudes, I can hear the plash of its brooks, in my nostrils still bears the breath of flowers that perished twenty years ago."

মার্ক টোয়েনের এই পংক্তিগুলো কেবল ভাবালুতা নয়। বাস্তবের রূপায়ন। তালীবনরাজি নীলা হনলুলুর বালুবেলাতট, তার পুষ্পলতার সমারোহ—তার দিগন্তবিলীন পর্ব্বতের শোভা আজিও মনে ভাসে।

বারটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে লাঞ্চ খেতে এলাম মারোজি দম্পতীর ওখানে। মারোজি তাঁর ভাস্কর্য্যগৃহ দেখালেন। তার পর মারোজি গাড়ী করে চারটি বুদ্ধ মন্দির দেখিয়ে আনলেন। এগুলি চীনা ও জাপানীদের।

এখানে চীনা ও জাপানীরা বেশ আরামেই আছে। জাতিবৈর হাওয়াই দ্বীপে নাই। পরস্পর মৈত্রী ও ঐক্যে এরা বাস করছে—যে যার ধর্ম্মমত অনুসারে পূজা-অর্চ্চনা করছে। আইনের চোখে সবাই যেমন সমান, সামাজিক, দৃষ্টিভঙ্গীতেও তেমনই রয়েছে সহৃদয়তা এবং সৌজন্য।

ওখান থেকে ফিরে হনলুলু এডভার্টাইজার পত্রিকায় প্রবন্ধ দিয়ে এলাম—সে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল কি না জানতে পারি নি। বাসায় ফিরে মারোজি দম্পতীর নিকট বিদায় নিয়ে বাসায় বসে রইলাম উড়ো জাহাজের বাসের জন্য।

বাস এলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। ফলে জাপানে কেনা ভাল ক্যামেরাটি ফেলে এলাম। একজন নিগ্রো এসে আমার জিনিষপত্র নামাল। তার সঙ্গে নিগ্রোদের অবস্থার কথা আলোচনা হ'ল। লোকটি লেখাপড়া জানে, বললে, "আমাদের যথেষ্ট আয় নেই—যথেষ্ট আয়ের সুযোগও নেই।"

তার পর হঠাৎ ধরা পড়ল যে আমার ক্যামেরা নেই। তখনই ওদের আপিসে গিয়ে নাপুয়া হোটেলে ফোন করলাম। ডাঃ কানসুর বললেন, ট্যাক্সি করে লোক দিলে, ক্যামেরা পাঠিয়ে দিতে পারেন—তবে ট্যাক্সি ভাড়া আমায় দিতে হবে। তাতেই রাজি হলাম।

ফলে ২ ডলার ৭০ সেণ্ট দিতে হ'ল। তবে ক্যামেরাটি ফেরত পেলাম এই যা।

তার পর বিমান আরোহণের পালা। কাল যাওয়া যাবে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিসকো শহরে—সেই নূতনের মাধুর্য্য মনকে সচকিত করে—অথচ সাতটি দিনের স্মৃতি ক্রমেই যেন মনকে ব্যথিত করে তোলে।

আসন গ্রহণ করে জানালায় ঝুঁকে হনলুলুর দিকে চেয়ে রইলাম। চোখে পড়ল—আলোকস্তম্ভ। হনলুলু বন্দরের মুখে এই সু-উচ্চ স্তম্ভটি পোতযাত্রীদের বিস্ময় জাগায়।

ওয়াহু দ্বীপে হনলুলু বন্দর এবং পার্ল হার্বার অবস্থিত বলে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে অধিক। ব্রিটিশ জাহাজ বাটারওয়ার্থের কাপ্তেন ব্রাউন ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হনলুলুর বন্দর হওয়ার যোগ্যতা আবিষ্কার করেন। তার ফলেই হাওয়াই দ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব করে যায়।

ওয়াহুর উপর দিয়ে বিমান চলতে আরম্ভ করল। পিছনে

রইল কল্পনার রম্য নিকেতনে নিসর্গ দৃশ্যের মনোরম মাধুরী মিশেছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মানুষের সরল যৌগিক সংস্কৃতির সঙ্গে—সব মিলে গড়ে উঠেছে এক আশ্চর্য্য, অভিনব সুষমার পরিবেশ।

কাঠের গামলা—বিশপস মিউজিয়ম

প্রশান্ত মহাসাগরের স্বপ্ন-পুরী ভূস্বর্গ হাওয়াই দ্বীপে ফেরা হয়ত আর হবে না তবু তার বাহু আজও যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে তার আরামের ও বিরামের মাঝখানে। ডাকছে তার বালুবেলাতট—ডাকছে তার চন্দ্রালোক—তার পুষ্পলতা বিটপী—তার ছোট ছোট পাহাড়—তার পাদপাদপ—ডাকছে তার নানা মানুষের ধারা।

পার্শ্ববর্ত্তিনী আমেরিকান মহিলা বললেন, "কেমন লাগল আপনার ?"

উত্তর দিলাম, "খুবই সুন্দর"।

"তবে শুনেছি আপনাদের ভারতবর্ষে এর চেয়ে সুন্দরতর স্থান আছে।"
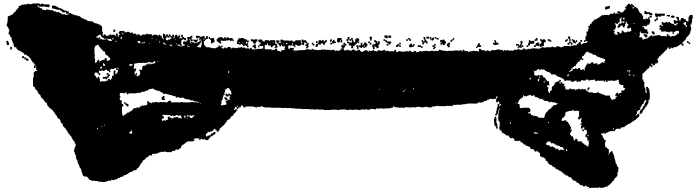
"তা আছে, তবে ঠিক এমনটি নেই, ভারতের সমুদ্রতীরের সবখানি দেখা আমার হয়নি, কিন্তু এমনটি আছে বলে জানিনি।"

মহিলা হাসলেন, বললেন, "এটা হয়ত বিজ্ঞাপনের বাহু।"

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন, "কর্ম্মক্লান্ত আমরা এখানে পাই বিরাম, তাই আমাদের উচ্ছাস অপরিমিত।"

সেই অনুরাগই বহু মুখে ব্যক্ত করে পৃথিবীতে গড়ে তুলেছে হাওয়াই দ্বীপের এত নাম।"

স্বপনগন্ধা ! জ্যোছনায় ভিজে বিরলে থেকো না ঘুমি'

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রতি দিবসের সাজের সুরে বুদ্ধি চেতনা লয়ে,
চির যাযাবর চলেছি কোথায় ? কোন্ সীমাহীন স্রোতে !
পরম প্রেমেতে চরম বাসনা নিতি অন্তরে বয়ে
ভেসে যাই কোথা মায়ার লীলায় আত্মিক স্তর হোতে !
সৌরভ মম যৌবন মাঝে পরশ পেয়েছি যার
অনন্ত সুরে সেকি ডাকে মোরে দূর হোতে অনিবার !

বিশ্ব আকাশে অসংখ্য তারা ওঠে আর নিবে যায়,
পৃথিবীর পথে বিবর্ত্তনের আলো আঁধারের খেলা।
অসীম সত্তা বহু রূপে জাগে মননের মমতায়
হৃদয়-নিবিড়-উৎস কিনারে পড়ে আসে কেন বেলা ?
জীবন মরণ একীকরণের সময় হোলো কি মোর ?
শীতালি তৃণের শিয়রে ঝরিছে রাতের অশ্রু লোর।

তোমার প্রণয় প্রচ্ছদপটে স্বাক্ষর যাবো রেখে,
ভগ্ন নীড়েতে স্মৃতিটুকু শুধু উজ্জ্বল করে রেখো।
বহু জনমের গতি প্রকৃতির পথ গেছে এঁকে বেঁকে
সেই পথে যেন ক্ষণ অভিসারে নাম ধরে মোরে ডেকো।
আশা আনন্দ দুঃখ বেদনা সব কিছু লয়ে তুমি
স্বপনগন্ধা ! জ্যোছনায় ভিজে বিরলে থেকো না ঘুমি'।

গুরুদক্ষিণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৫)

দিন পনের পর।

সে দিন তিথিতে পূর্ণিমা। এদিকে মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষ্যে ইস্কুলের ছুটি। পর পর দু'দিন ইস্কুল বন্ধ। শনিবার ছুটি, রবিবার যথানিয়মে ইস্কুল বন্ধ। চন্দ্রবাবুর বাসায় সেদিন প্রায় মহোৎসব। অনেক কাল পর আবার তাঁর বাড়ীতে সত্যনারায়ণ সেবার আয়োজন হয়েছে। সেই প্রথম বাসা পত্তনের পর সেই যে সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল—যার আয়োজনের মধ্যে ছেলেরা সিদ্ধির কচুরী ভেজে খেয়েছিল—শম্ভু পাগল হয়ে গিয়েছিল—সেই সত্যনারায়ণ সেবার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন সমারোহ তাঁর বাসায় তিনি করেন নি। ছোট সংসার, বজবালা ছাড়া সন্তানও নেই; সংসারে একমাত্র অবশ্য পালনীয় পর্ব্বের মধ্যে পিতৃ ও মাতৃশ্রাদ্ধ। সেও তিনি আগে ঠিক করতেন না, এখন করেন। সে উপলক্ষ্যেও ইস্কুলের শিক্ষক কয়েক জন ছাড়া আর কাউকে নিমন্ত্রণ করেন না এবং তাতে কোন ঘটাও তিনি করেন না। মধ্যে একবার সত্যবতীর ব্রত প্রতিষ্ঠা গিয়েছে। ভাদ্র মাসে অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত প্রতিষ্ঠা। রামজয় বলেওছিলেন—চন্দ্র, এতকাল এখানে রয়েছ—এখানকার সমাজে সকলের বাড়ীতেই তোমার নেমন্তন্ন হয়, বহুজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছে, এই উপলক্ষ্যে দশ জনকে তুমি একদিন নেমন্তন্ন কর না কেন? খেয়েই থাকবে চিরদিন?

চন্দ্রবাবু হেসে বলেছিলেন—আমি ত সামান্য লোক রামজয়, মাষ্টার পণ্ডিত মানুষ, আমার কি সাধ্য বল? সত্য বলতে আমি ত গরীব সামান্য লোক।

রামজয় বলেছিলেন—চন্দ্র, কথাটা ঠিক হ'ল না ভাই। এ অঞ্চলে যত বড় বড় লোক সব তোমার ছাত্র না হয় ছাত্রের বাপ। তোমার বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হলে তুমি কাকের মুখে বার্ত্তা দিলে দশটা যজ্ঞের আয়োজন ভারীর কাঁধে চাপিয়ে তোমার ঘরে তুলে দেবে।

চন্দ্রবাবুর মুখ স্মিতহাস্যে ভরে উঠেছিল। বলেছিলেন—কথাটা ষোল আনা সত্য না হলেও আট আনা সত্য বটে। ভাবতে ভালই লাগে। কিন্তু চাইতে আমি ঠিক পারব না।

—আমি চেয়ে আনব। ও ভারটা আমার হাতে দাও। আমি বামুন মানুষ। আমার অভ্যেস আছে।

তা আছে। রামজয় গৃহস্থ হিসাবে আদৌ অভাবী নয়, স্বচ্ছল গৃহস্থ। এমন কি সামান্য বেতন এবং চাষবাসের আয় থেকে সংসার চালিয়ে যা সঞ্চয় করে পোস্ট আপিসের খাতায় জমা করে বিধবা কন্যার জন্য। তার অভাব নাই। তবুও সে নানা উপলক্ষ্যে নানা স্থান থেকে ভিক্ষে করে আনে। ছাত্র আছে, শিষ্য-সেবক আছে, অবস্থাপন্ন লোক আছে যারা শিষ্যও নয়, ছাত্রও নয়, তাদের কাছে গিয়ে রামজয়ের হাত পাততে কোন সঙ্কোচ নেই। মাটির ঘর হচ্ছে—রামজয় কারও কাছে গিয়ে দুটো তালগাছ, কারও কাছে জামগাছ, কারও কাছে অর্জ্জুন গাছ চেয়ে সংগ্রহ করে আনে। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হলে কারও কাছে মাছ, কারও কাছে কাঠ চেয়ে নেবে। এমনকি খড়, সাবুই এ সবও চাইতে তার দ্বিধা নাই। যে সব ছাত্র কলকাতায় থাকে তাদের কাছে পালা করে পত্র যোগে বরাত পাঠায়। 'আমার জন্য এক জোড়া তালতলার চটি আনিবে।' 'গতবার তুমি যে চমৎকার ধূপশলাকা আনিয়া দিয়াছিলে তাহার গন্ধে দেবতা সন্তুষ্ট হন। অতএব ঐ ধূপশলাকা এবারও কিছু আনিবে।' 'আমার পূজার সময় পরিধানের পট্টবস্ত্র ছিঁড়িয়া কষ্ট পাইতেছি; একখানি মটকার ধুতি তোমার নিকট দাবী করিয়েছি।

অখণ্ড অবশ্য লইয়া আসিবে। ঐ ধুতি পরিয়া পূজার্চনা করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিব।' "এবার শীতকালে আমার শীতবস্ত্র নাই। দীর্ঘদিনের বাসনা একখানি বালাপোষ গায়ে দি'। তুমি বহরমপুরে আছ। মুরশিদাবাদ উৎকৃষ্ট বালাপোষের জন্য বিখ্যাত। তোমার নিকট -হইতে একখানি বালাপোষ চাহিতেছি। আতর ইত্যাদির গন্ধে প্রয়োজন নাই। তবে বেশ 'ফাইন' হওয়া চাই। তোমার নিকট হইতে খেলো দ্রব্য আমি লইব না।"

এ নিয়ে অনেক বার অনেক কথাই উঠেছে ইস্কুলে।

রামজয় অকপটে অসঙ্কোচে স্বীকার করেছে, বলেছে—হ্যাঁ চেয়েছি। দিয়েছে। নিয়েছি। কিন্তু এরা ত প্রাক্তন ছাত্র—'এক্সো স্টুডেণ্ট'। ওদিকে ত খাতা দেখার সময় পারশিয়্যালিটি করে অধিক মার্ক দেবার সম্ভাবনা নাই। ওরা সব কৃতী ছাত্র, কেউ চাকরী করে, কেউ পড়ে, কত বাজে খরচ করে সেখানে। যে বিদ্যার জোরে করে তার কিছুটা আমি শিখিয়েছি, অকৃপণ ভাবে শিখিয়েছি। পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতন পাই। দৈনিক তা হলে দেড় টাকা। আজকাল যারা ঘরামির কাজ করে, যারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তারা পায় পাঁচ সিকে দেড় টাকা। তাতে আপত্তি করি না। কারণ সারাটা জীবন ছেলেদের প্রণাম পাই, মনে মনে জানি অভাব হোক, অভিযোগ হোক ওরা আমার পূরণ করে দেবে। আগেকার কালে দিয়েছে—একালেও দেবে। যেদিন জানব দেবে না, সেদিন আর চাইব না, ইস্কুলেও চাকরী করব না। দেখুন, আগেকার কালে জমির আল ভেঙে গেলে বেটাদের কোদাল নিয়ে ছুটতে হ'ত। জল বাঁধ না মানলে পিঠ দিয়ে শুতে হ'ত। গরু চরাতে হ'ত গুরুর। সেকাল অবিশ্যি নেই। কিন্তু একখানা বালাপোষ পনের-ষোল টাকা দাম, একখানা মটকার ধুতি—দশ-বারো টাকা দাম—আট আনার ধূপশলাকা, দেড় টাকা পাঁচ সিকের তালতলার চটি—এ চাইবার অধিকার আমার আছে মশায়।

কথাটা বলেছিলেন নতুন এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার সৌরীন বাবুকে। ব্রজবিহারীবাবু চলে যাবার পর এসেছেন সৌরীন্দ্র ঘোষ। কলকাতার লোক। আধাবয়সী মানুষটি একটু কেমন খটরোগা মানুষ। ডিসপেপ্সিয়ার রোগী—অন্যথায় লোক মন্দ নন। মাখনবাবু সেকেণ্ড মাষ্টারও চলে গেছেন। এখান থেকে এম-এ পাস করে এই জেলারই এক শহরের ইস্কুলে হেড মাষ্টার হয়ে গেছেন। তার জায়গায় চন্দ্রবাবু বেছে নিয়েছেন বসন্তকে। এই ইস্কুলেরই ছাত্র বসন্ত। এখানকারই ছেলে। শান্ত মেধাবী গরীবের ছেলে। বেচারীর মা অনেক কষ্টে ছেলেটিকে বি-এসসি পাস করার খরচ জুগিয়েছে। চরিত্রবান মিষ্ট স্বভাবের ছেলেটির উপর চন্দ্রবাবুর সস্নেহ দৃষ্টি অনেক দিনের। অজাতশত্রু ছেলে বসন্ত। চন্দ্রবাবু বসন্তকে ডেকে বলেছিলেন—পাস করলে এবার কি করবে?

ছাত্র ইস্কুলের পড়া পাস করেই হোক আর ফেল করে তিক্ত হয়েই হোক ছেড়ে বাইরে গেলেই চন্দ্রবাবু তাকে আর তুই-তুকারি করেন না—তুমি বলে থাকেন।

বসন্ত উত্তর দিতে পারে নাই। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। আশা-আকাঙ্ক্ষা ত অনেক। আবার দরিদ্র পল্লী যুবকটির ভীরুতারও অন্ত নাই। ইচ্ছা হয় আরও পড়ে, বিলাত যায়, আই-সি এস হয়ে আসে—জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হয়, ইচ্ছা হয় ব্যারিষ্টার হয়ে আসে; ইচ্ছা হয় ব্যবসা করে—ওই চৈতন্য বাবুদের মত বিশাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ইচ্ছা হয় ওই রকম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা সেল্সম্যান ওই রকম একটা কিছু হয়; আরও অনেক আকাঙ্ক্ষা হয়। কখনও উত্তেজনার মুহূর্তে চকিতের মত মনে হয় সর্বস্ব ত্যাগ করে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের পন্থা অনুসরণ করে দেশনেতা হয়ে ওঠে। কিন্তু ভয় হয়। নিদারুণ একটা ভয়। কিছুক্ষণ ভাবতে ভাবতেই অন্তরাত্মা যেন জলমগ্নের মত হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় এই সব বিশাল বিস্তীর্ণ জীবন সমুদ্রের মত দিশাহীন—তলহীন; এর কূল নাই কিনারা নাই, আছে শুধু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, মুহূর্তে গ্রাস করে নেয়, সে তার মধ্যে ডুবে যাবে, তলহীন অনন্ত গভীরতার মধ্যে। সে গরীব ঘরের ছেলে, তার মা তাকে বাল্যকাল থেকে শিখিয়েছে—ওই সব বড় ঘরের ছেলেদের কথা আলাদা বাবা, ওদের ভাগ্য আলাদা। ওদের ওপর ভগবানের দয়া আলাদা। ওদের সঙ্গে সঙ্গ করো না।

গল্প বলত মা; বলত—বাবা, এক রাজার ছেলে আর এক গরীবের ছেলে একই লগ্নে একই রাশিচক্র নিয়ে জন্মেছিল। দু'জনেরই পাঁচ বছর বয়সে স্বর্ণপ্রাপ্তি যোগ ছিল। পাঁচ বছর বয়সে একদিন দু'জনেই খেলা করছে। রাজার ছেলে রাজার বাগানে আর গরীবের ছেলে তাদের বাড়ীর পাশে—শুকনো ডোবার ধারে। রাজার ছেলে মাটির তলা থেকে পেলে একটা হলুদ-বরণ মাটির ঢেলার মত ঢেলা; সেটা হ'ল সোনার একটা বাট; কোন কালে হয় ত ওই রাজবাড়ীরই কেউ বাগানে হারিয়েছিল। আর গরীবের ছেলেও পেলে মাটীর তলা থেকে হলুদ-বরণ একটা কি। সেটা হ'ল—মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা সোনা ব্যাঙ।

এই গল্প এবং মায়ের ওই ভীরু সযত্ন পক্ষপুট আচ্ছাদনের প্রভাব তার জীবনের সাহস এবং উদ্যমকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। নইলে তারই চোখের সামনে এই ইস্কুলের ছাত্র এই বিধগ্রামের ছেলে শ্যামাপদ ফেল করে করে কোনমতে বি-এ

পাস করে বড় ব্যবসায়ী হয়েছে; দেশনেতা না হোক এই অঞ্চলের একজন নেতা হয়েছে। একজন এম-এসসি পাস করে সরকারী হিসাব বিভাগের পরীক্ষা পাস করে বড় চাকুরে হয়েছে; যারা কোন পাসই করে নি, তারাও বংশপ্রতিষ্ঠার গৌরবে প্রতাপশালী এবং অনেক কিছু। ভীরু বসন্তের অন্তরতম গোপনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষাই উঁকি মারুক—তারা কোন দিন প্রকাশ্যে মাথা তুলতে পারে নি; তার সচেতন প্রকাশ্য অন্তরের আশা ছিল স্বল্প স্বচ্ছল আয়, অনুন্নত খানিকটা প্রতিষ্ঠা; আশার মধ্যে যেটুকু ছিল বৃহৎ—যেটুকু ছিল মহৎ—সে হ'ল লোকের স্নেহ এবং প্রশংসা। সে দিক দিয়ে শিক্ষক জীবন তার পক্ষে আদর্শ জীবন। কিন্তু চন্দ্রবাবু নিজে ডেকে তাকে যখন প্রশ্ন করলেন—কি করবে এখন। তখন তার জবাবেও সে ইস্কুলে কোন চাকরীর কথা বলতে পারে নি। চন্দ্রবাবুই নিজে বলেছিলেন—সেকেণ্ড মাষ্টার মাখনবাবু চলে গেলেন, লোক চাই; মাষ্টারী করবে?

সেই পুরাতন কালের ছাত্রের মত ঢোক গিলেই সে বলেছিল—করব স্যার্।

—কাল থেকেই এস তা হলে। পরে ম্যানেজিং কমিটিতে তোমাকে পারমেনেণ্ট করে নেব।

ষাট টাকা মাইনে। বসন্ত সেদিন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বসন্ত এখন সেকেণ্ড মাষ্টার। মাখনবাবুর পর গেছেন ব্রজবিহারী বাবু। এসেছেন সৌরীনবাবু। সর্ব্বাগ্রে গেছেন ভূতনাথ বাবু থার্ড মাষ্টার, মোক্তারি পাস করে চলে গেছেন। বাকী মাষ্টারদের সবই চন্দ্রবাবু ও রামজয় পণ্ডিতের ছাত্র। সেই কারণেই রামজয় এখন প্রায় অকুতোভয়। সৌরীনবাবুর কথার জবাবে বেশ রসালো এবং ঝাঁঝালো করে কথাগুলি বলতে আদৌ ভয় পায় না। এবং চন্দ্রবাবুকেও এমনই কোন উপলক্ষ্য করে অধিকতর প্রবলপ্রতাপ হতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু চন্দ্রবাবু তাতে উৎসাহ প্রকাশ করেন না। স্ত্রীর ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে মাছ কাঠ চাল তরিতরকারী নিয়ে বিবগ্রামে সমারোহ করে খাওনদাওনের প্রস্তাবেও তাই তিনি রাজী হন নি। রামজয়কে বলেছিলেন—না রামজয়, তা হয় না।

রামজয় বলেছিলেন—কেন? ঘুষ না হোক উপঢৌকন নেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে?

হেসে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—দেখ রামজয় যে বৃত্তি নিয়েছি সে বৃত্তি ব্রাহ্মণের। শিক্ষাদান গুরুর কাজ, ব্রাহ্মণের কাজ। তুমি নিজে এ কাজ করছ।

—নিশ্চয়। প্রমোশন ত তোমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রমোশন পেয়ে তার মত কাজ করতে হবে ত। তাই ত করতে বলেছি। ভিক্ষের ঝুলিটা কাঁধে দাও। কানের কলম—কায়স্থের চিহ্নটা সরাও, হিসেবনিকেশটা তোল।

—সেই ত। সেই ত বলছি। আমার কাছে লেখাপড়া শিখে পরীক্ষা পাস করে, কিন্তু তোমার কাছে কানে মন্ত্র নেওয়ার মত মন্ত্র ত নেয় না; সে দেবার ত অধিকারও হয় না, সে হেডমাষ্টারই হই আর প্রফেসরই হই। তখন ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নেবার কি দক্ষিণে নেবার অধিকার আমাদের কি করে হয় বল? তাই, সংসারে সব জিনিসটা কুণ্ঠাহীন অপরাধবোধহীন মনে করবার ক্ষমতাই আসল ক্ষমতা। সেটা তোমাদের আছে আমাদের নাই।

—তা নাই। হেসেছিলেন রামজয়।—তোমরা বামুনদের যতই ছোট আর যতই হীন ভাবতে চেষ্টা কর, আমাদের গায়ে দাগ লাগে না হে। তোমরা চাও না—থাকার গৌরবে, আমরা চাই না-থাকার গৌরবে।

এতকাল পর চন্দ্রবাবু রামজয়কে ডেকে বলেছিলেন—এবার একদিন ভাল করে সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা কর রামজয়। খুব ভাল করে। মানে এখানকার স্থানীয় ভদ্রলোকেদেরও খাওয়াতে চাই। শুধু একটা ভাবনা—

—কি?

—সত্যনারায়ণ সেবায় মাছ করব কি করে? আর মাছ না হলে খাওয়া-দাওয়াই বা ভাল করে কি করে হয়? বাঙালীর খাওন-দাওন ত।

—তার আর কি? সত্যনারাণের সঙ্গে মা কালী মা চণ্ডী জুড়ে দাও। বকবালা পাস করেছে, ইস্কুলের ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট; পূর্ণিমার দিন মা চণ্ডীর স্থানে পুজো দাও। শুধু মাছ কেন—মাছমাংস দুই হোক; তার সঙ্গে রাধাবল্লভী—মালপো—। সে একবারে ষোড়শোপচারে ভোজন; মধু গুড় একসঙ্গে।

ব্রাহ্মণ রামজয়ের এই সব বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই। পরমুহূর্ত্তেই বলেছিলেন—এই ত পূর্ণিমেতে মুসলমানদেরও কি পরব আছে। তাও খানিকটা জুড়ে-টুড়ে দাও। ওদের মসজেদে কি কি সব পাঠাতে হয় পাঠিয়ে দাও। জেয়াউদ্দিনকে ডাক। ব্যস, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হয়ে যাবে। চণ্ডীতলায় পুজো দাও, পুরুত ওঝা আমাদের ছাত্র, সে দেখবে মায়ের স্থানে ঝপাঝপ ছুটো মানতের পাঁঠা যা জমা আছে—কেটে ফেলে পাঠিয়ে দেবে। মসজেদে পুজোভেট পাঠাও, ওরাও শোনপাপড়ি ফলমূল পাঠিয়ে দেবে, মের্জ্জাদের বিলায়েৎ-এনায়েৎ দুই আমাদের ছাত্র। যদি একবার ঘাড় নেড়ে ইসারা দাও ত ছুটো খাসিও পাঠিয়ে দেবে কোরবাণী করে। আর যদি বল—ভাই ত এনায়েৎবিলায়েত—জনকয়েক যে আবার বলে বিড়িয়ানী পোলাও

খাব—কি বলে তার সঙ্গে পক্ষীমাংস খাব তা হলে ত দিল-দরিয়া খুশী হয়ে সব তরিবৎ করে বেঁধে বেড়ে পাঠিয়ে দেবে। দেখবে সত্যিনারাণের সেবার লুচি, সুজির পায়েস, আটা, রাধাবল্লভী বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। কেউ খাবে না। ওই আমি আর শম্ভু চাটুজ্জে। ওই ত বসন্তকে জিজ্ঞেস কর না। কি বাবা বসন্ত—কি খাবে তুমি? এনায়েতের বাড়ী পাকানো—পলাণ্ডু রসুন সুরভিত পোলাও এবং পক্ষীমাংসের কুরুয়া অথবা মা চণ্ডীর প্রসাদী মাংসের ঝোল—মৎস্যের অম্বল অথবা সত্যনারায়ণের প্রসাদী নিরামিষ লুচি পায়েস আটা রাধাবল্লভী?—কিসে রুচি? অকপটে কহ। একে মিথ্যা কথা বলা পাপ। তদুপরি গুরুর সম্মুখে—ডবল গুরু। বল!

বসন্ত মৃদু হেসে বললে—সত্যি বলতে যখন বলছেন তখন পণ্ডিতমশায় বলি—ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় যখন হচ্ছে—তখন তাই হয়ে যাক। অল্প-অল্প করে সবই খাওয়া যাবে।

সকলেই হেসে উঠল কিন্তু চন্দ্রবাবু কি যেন গভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

সমারোহ করে সেই উৎসব। হাসি-তামাসা করে রামজয় যা বলেছিলেন—চন্দ্রবাবু তার একটিও বাদ দেন নি। কথাগুলি তাঁর মনে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। ইদানীং তিনি দিন দিন অনুভব করছিলেন যে, মুসলমান ছাত্রেরা যেন ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে। উনিশশ' একুশ সনে একটা আশা জেগেছিল—হয়ত-বা হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদটা এইবার যাবে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক যে একটি বিচিত্র ব্যক্তি ভারতবর্ষের জীবন ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁকে তিনি খুব প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি; লোকটির ধারণা কল্পনাও তাঁর বিচারে ভ্রান্ত—পুরাপুরি পদার্থহীন—কোন মূল্য নাই। বিশ্ববিজয়ী—কূটবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়—রাজনীতি বিজ্ঞানে ধুরন্ধর—ইংরেজের সঙ্গে অহিংসা আর অসহযোগ অবলম্বন করে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে জয়ের প্রত্যাশা! এর চেয়ে ভ্রান্তি আর কি হতে পারে? তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আজ গোটা দেশটাকে নিরুৎসাহিত—অবসন্ন করে ফেলেছে। ব্যর্থ হয়ে গেছে সে আন্দোলন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম বয়কট করে কি ফল হয়েছে? ফল হয়েছে—সব মন্দ, সব মন্দ, সব মন্দ! সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ফল হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে—ছেলেদের রাজনৈতিক আন্দোলনে টেনে দেশের শিক্ষার ভবিষ্যতের সর্ব্বনাশ করা হয়েছে!

অমরবাবু একদিন উনিশশ' একুশ সনে কাউন্সিল ইলেকশনের সময় এখানে এসেছিলেন—আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—বানিয়াটা দেশের সর্ব্বনাশ করে দিলে! দেশের লোক সব ইডিয়ট। নইলে দেশের লোকেই ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিত।

অমরবাবু তখন কাউন্সিলে নির্ব্বাচন-প্রার্থী। মহাযুদ্ধের বাজারে প্রচুর উপার্জ্জন করেছেন। দেশে কীর্ত্তির পর কীর্ত্তি করে যাচ্ছেন। সরকারের ঘরে বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিটি কাজে সরকার সহযোগিতা করেন। তাঁর কথার ভঙ্গী তখন ওই রকমই হওয়ার কথা। ও ভঙ্গীটা তাঁর ভাল লাগে নি কিন্তু বক্তব্যের মোটামুটি অর্থটার একাংশ তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেছিলেন। সর্ব্বনাশই হ'ল দেশের। শুধু এক-স্থানে আশা জেগেছিল, মনে হয়েছিল এইবার বোধ হয় হিন্দু মুসলমান এক হবে। কিন্তু তাও হ'ল না। বাংলাদেশের চীফ মিনিস্টার হলেন ফজলল হক সাহেব। ওদিকে খিলাফৎ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেল। মুসলমানেরা আবার সরে গেল এবং যাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। পূর্ব্ববঙ্গে ওরা সংখ্যায় বেশী, এ অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম—এতকাল পর্য্যন্ত সত্যকথা বলতে ওরাই একঘরের মত থেকেছে। বিশেষ করে এই বিশ্বগ্রাম অঞ্চলটিতে মুসলমানেরা সংখ্যাতে শুধু কমই নয়—অবস্থাতেও ওরা এখানকার দরিদ্র। এখানকার জমিদারী, জোতদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হিন্দুদের হাতে। কয়েকঘর অবস্থাপন্ন চাষী ছাড়া অধিকাংশ মুসলমানই দৈহিক পরিশ্রমে দিন আনে, দিন খায়। ভাড়ায় গাড়ী বয়, ইট পাড়ার কাজ করে, মাটি কাটে, রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, কিছু আছে লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক—তারা জমিদার-জোতদারের ঘরে পাইকের কাজ করে, আর করে এ অঞ্চলের চাষী মজুরের কাজ। এখানকার জমিজমার অধিকাংশই হিন্দুদের মালিকানা হলেও সে জমি কৃষাণ হিসাবে চাষ করে এই মুসলমানেরা। চাষী তারা ভাল, সত্যকারের ভাল চাষী। সেই সূত্রে প্রায় সকল হিন্দুবাড়ীতেই ওদের যাওয়া-আসা রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু সেখানে ওরা প্রায় অস্পৃশ্য। প্রায় কেন—পুরাপুরিই তাই। ওদের হাতে জিনিস দেয় আলগোছে। ওদের হাতের জিনিস আলগোছেও নেয় না, ওরা নামিয়ে দেয় সে জিনিস জল দিয়ে ধুয়ে ঘরে তোলে। ছোঁয়া পড়লে নিষ্ঠাবানেরা স্নান করে। মুসলমানেরা অবশ্য হিন্দুদের বাড়ীতে খায় না, হিন্দুদের উৎসব-পার্ব্বণ পরিহার করে, অন্ততঃ করতে চেষ্টা করে, মসজিদেও উঠতে দেয় না, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সম্পদসমৃদ্ধ হিন্দুসমাজ তার কোন কিছুই অনুভব করে না। অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই এতকাল পর্য্যন্ত এ সব চলিত আচার-আইন প্রকৃত পক্ষে কোন দলকেই স্পর্শ করত না। সয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সেই সয়ে নেওয়ার কালটা চলে গেল। মুসলমানেরা আর

সইবে না। তারা উঠে দাঁড়াচ্ছে। তবে একটা দোষ ওদের ছিল—সেটা আজও আছে, এবং সেটা যেন বাড়ছে। হিন্দুদের ধর্মকে ওরা সুযোগ পেলেই আঘাত করেছে, সেই আঘাতের স্পৃহা ওদের বাড়ছে। এরা স্পর্শদোষের সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছে—ওরা সেটা ঘুচিয়ে আক্রমণ করতে আগেও চেয়েছে এখন বেশী করে চাইছে। হিন্দুকে মুসলমান ওরা অনেক ক্ষেত্রে জোর করে করেছে। আরও একটি মারাত্মক অপরাধের বোঝা ওদের ঘাড়ে চেপে আছে। সেটা অবশ্য কোন সম্প্রদায় বা কোন ধর্মের দোষ নয়, সেটা দুষ্ট প্রকৃতির লোকের স্বভাবগত দোষ। সে দোষ নিজেদের সমাজ ও ধর্মকে পীড়ন করেই ক্ষান্ত থাকে না, অপর সমাজেও হানা দেয়। সেই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নাকি সরকারী তথ্য অনুযায়ী ওদের সমাজে বেশী। সেটা নারীঘটিত অপরাধ। রামজয়েরা ওই কথাটাই ওদের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। কিন্তু এখানে সে অপরাধের সংখ্যা বেশী নয় এবং যাও দু'চারটি ঘটে থাকে—তারও অধিকাংশের পিছনেই আছে প্রথম হিন্দুর অপরাধ। ছলে-বলে হিন্দুদের ব্যভিচারী অবস্থাপন্ন যুবকেরা যে সব অসহায়া হিন্দুনারীকে পথভ্রষ্ট করে—বিপথে টেনে শেষ পর্য্যন্ত সমাজের বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়—সেই অসহায়াদের ওরা সুবিধা পেলেই ওদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করে নেয়। জোর জবরদস্তির ঘটনাও আছে। আজ এই উঠে দাঁড়ানোর প্রথম কালে—ওরা সব দোষগুণ নিয়েই উদ্ধত ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইস্কুলের মধ্যে চন্দ্রবাবু নিত্য তার উত্তাপ অনুভব করছেন। প্রায়ই তাঁকে অনুযোগ শুনতে হয়—কোন মুসলমান ছেলে হিন্দুদের গ্লাসে জল খেয়েছে। তিনি ডেকে তিরস্কার করেন—তারা প্রশ্ন করে—ও-ও মানুষ আমিও মানুষ; ও গ্লাসে জল খেলাম ত হয়েছে কি? আমাদের গ্লাসটা অপরিষ্কার ছিল তাই খেয়েছি এবং ধুয়েই ত রেখে দিয়েছি।

—ওরা ত তোমাদের গ্লাসে খায় না। তা যখন খায় না, সেই যখন ওরা মানে, তখন সেটা মানতে তোমাদের ক্ষতি কি? পরস্পরের রীতিনীতির প্রতি সহনশীলতা থাকা ভাল নয় কি?

এ কথার জবাব ওরা দেয় না কিন্তু এ সহনশীলতা ওদের নেই—সে ওরা মানবে না। এই গত বছরেই বিজয়ার দিনে —বিশ্বগ্রামে লাঠি নিয়ে ওরা দাঁড়িয়েছিল; সদর রাস্তার ধারে একটা আমগাছের তলায় পীরতলা হয়েছে নূতন, সেখান দিয়ে বাজনা বাজিয়ে প্রতিমা নিয়ে যেতে দেবে না।

সমস্ত কিছুর আঁচ ইস্কুলে এসে নিত্যই লাগছে। নিত্যই একটা-না-একটা ঘটনা ঘটে থাকে। তবু জেয়াউদ্দিন এখনও মৌলবী আছে বলেই এই ঘটনাগুলি প্রশ্রয় পেয়ে ফুঁ দিয়ে জালানো আগুনের মত জ্বলে উঠতে পায় না। কিন্তু এর জন্য মুসলমান ছাত্র এবং অভিভাবক দুই তরফেরই মনে মনে অভিযোগের সীমা নাই। মধ্যে মধ্যে বেনামী দরখাস্ত হচ্ছে জিয়াউদ্দিনের বিরুদ্ধে। জিয়াউদ্দিন এখানকার মুসলমানদের মধ্যে সম্মানিত বংশের দৌহিত্র এবং গুরুর প্রভাব অধিকারী। এখনও ঈদের নমাজ প্রভৃতি ইসলামী পর্ব্বে-পার্ব্বণে তার নেতৃত্ব অবিসম্বাদী। তাই তার বিরুদ্ধে ইসলাম-বিরোধী বলে দরখাস্ত হয় না, দরখাস্ত হয়—তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি ইংরেজী জানেন না বলে। মুসলমানেরা এখন এখনকার কালের কোন নতুন ইংরেজী ও ফার্সী-জানা মৌলবী চায়। হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধিতা করে তাদের উঠে দাঁড়াবার পথে সে তাকে সাহায্য করতে পারবে। এই সময়ে রামজয় পরিহাস করে কথাটা বললেও চন্দ্রবাবু কথাটাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। ভয়ও হয়েছিল। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অঘটন ঘটে! বলা ত যায় না! তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখেছিলেন ব্রজবিহারী বাবুকে। এবং তাঁকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। "আপনাকে আসতেই হবে। বজবালা আমার কন্যা কিন্তু বজবালার গুরু আপনি। আপনি তাকে পথ দেখিয়েছেন—তার পথ মুক্ত করে দিয়েছেন। আপনি না এলে এ আয়োজনের কোন সার্থকতাই নেই আমার কাছে।" তারপর এই সঙ্কল্পের কথা লিখে প্রশ্ন করেছিলেন—"একি ঠিক হবে? আপনার মত না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি সঙ্কল্প স্থির করতে পারছি না।"

ব্রজবিহারী বাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি নিশ্চয় যাব। যে সঙ্কল্প করেছেন সে সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকুন। এর সুফল হয় ত কিছু পাবেন না, তবে কুফলের ফলন কিছু কম হলেও হতে পারে। কিন্তু নিজেদের কাছে জবাবদিহি করা হবে। শেষ পর্য্যন্ত যত সর্ব্বনাশই হোক সে সময় নিজের কাছে বলতে পারবেন—সর্ব্বনাশ যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিজস্ব করে তুললেন কেন? ইস্কুলের উৎসব করতে ক্ষতি কি ছিল? ইস্কুলের এত বড় রেজাল্ট হ'ল—উৎসব করারই ত কথা। তাতে এর মূল্যটা অনেক বড় হ'ত। হ'ত না?"

তা হ'ত। সে কথাও চন্দ্রবাবুর মনে হয়েছিল। কিন্তু সাহস করেন নি। হিন্দুপ্রধান বিশ্বগ্রাম বাইরে থেকে জামায়-কাপড়ে ফ্যাশনে বাক্যে খুবই প্রগতিশীল কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার বিপরীত। এখানে সাহেবসুবোর সঙ্গে মেলামেশায় তাদের সঙ্গে ডিনার লাঞ্চ চা খাওয়ায় খুব উৎসাহ। বক্তৃতায় বড় বড় কথা বলে। কিছুদিন আগে ইস্কুলের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসন মিটিংে সস্ত্রীক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং

জজসাহেব এসেছিলেন। ওদের মহলে পবিত্রবাবুর খুব খাতির। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর নারীকল্যাণে খুব উৎসাহ, সমিতি গড়ে বেড়ান। স্ত্রীস্বাধীনতার জন্ম মিটিং করেন। তাঁর উপস্থিতিতে, চৈতন্যবাবুর বাড়ীরই একজন—ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটিরও সভ্য—সভায় মহিলাদের অনুপস্থিতি নিয়ে ওজস্বিনী ভাষায় আক্ষেপ করে বক্তৃতা করেছিলেন—"আমরা স্ত্রীকে বলি সহধর্ম্মিনী। যিনি সহধর্ম্মিনী আজকের এই ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রে আমরা যখন এখানে রয়েছি তখন তাঁরা এখানে নেই কেন ?" হাততালি নিজে দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট-সহধর্ম্মিনী, প্রতিধ্বনিও উঠেছিল সভা জুড়ে। কিন্তু চন্দ্রবাবু মনে মনে হেসেছিলেন। কারণ এই যুবকটি বছর-দুয়েক আগে একটি দশ বৎসরের ধনিকন্যার পাণিগ্রহণ করে তার বালিকা বিদ্যালয়ে পড়া বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তার পাড়ায় বালিকাসুলভ স্বভাবে ও আগ্রহে ঘোমটা খুলে বের হওয়ার পথেও পাহারা বসিয়েছিল। নিজের ঘরের জানালায় পর্দ্দা টানিয়েছে। গ্রামে সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বগ্রামে এখনও অনেক কড়াকড়ি। তিনি কায়স্থ, মাষ্টারদের মধ্যে আরও অনেক জাতি আছে, বোর্ডিঙে ত আছেই নানান জাতের ছেলে ; গ্রামে কোন বাড়ীতে তাঁদের নিমন্ত্রণ হলে—তাঁদের বসবার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হয়, কারণ তাঁরা বোর্ডিঙে জাতিবিচারটা বিশেষ মেনে চলেন না। এক রামজয় সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে বসে। এরা সাহেবদের সঙ্গে বাগান-পার্টিতে খেলেও মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে কখনও খান না—খাবেনও না। তবুও ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্রকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বল ? ইস্কুল থেকে করলে হয় না ?

পবিত্র চৈতন্যবাবুর মত ধনীর সন্তান হয়েও বিনয়ী, মিষ্ট মধুর স্বভাবের লোক, কিন্তু দুর্ব্বল ভীরু প্রকৃতির লোক, সে বলেছিল—আপত্তি হবে মাষ্টার মশায়।

শুধু তাই নয়, বলেছিল—আপনাকেও বারণ করছি। আপনি নিজে করবেন—এই প্রথম করবেন—তখন কোন বাধাবিপত্তির আশঙ্কা জোর করে টেনে আনছেন কেন ? কি গোলমাল হয়, কে করে তার ঠিক কি ?

চন্দ্রবাবু বিব্রত বোধ করেছিলেন।—বন্ধ করে দিতে বলছ ?

—না, তা বলি না। তবে হিন্দু মুসলমান জড়িয়ে এ সব করে কাজ কি ? একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আপনি হিন্দু আপনার সমাজ নিয়ে করুন। না হয়—। না-হয় পৃথক পৃথক করুন। একদিন সব হিন্দু, একদিন সব মুসলমান।

ব্রজবিহারী বাবুর পত্র পেয়ে চন্দ্রবাবু সঙ্কল্পে দৃঢ় হলেন। একদিনেই সব করবেন এবং মাছ মাংস পোলাও ভাত এ সব উঠিয়ে দিলেন। পূজো সর্ব্বত্রই দিলেন। মহাপীঠে-মসজিদে পাঠালেন পূজো—সে সবই ফুলফল মিষ্টান্ন ধূপ ইত্যাদির উপচারে।

বকুলবালা সতের বছরে পা দিয়েছে। বাপের মতই সে মাথায় একটু ঢেঙা হয়ে উঠেছে। তবে বেমানান ঠিক দেখায় না। দীর্ঘাঙ্গী শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে যেন ভালই দেখায়। চোখ দুটি ডাগর, মাথায় প্রচুর চুল, সাদা জমির কালা-পেড়ে শাড়ী পরে মুখে সলজ্জ স্মিত হাসি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দ্রবাবু তাকে বলেছেন—লজ্জা করে ঘরে চুপ করে বসে থাকলে হবে না বকু। তোমাকে বেরিয়ে সকলকে প্রণাম করতে হবে, নমস্কার করতে হবে—অভ্যর্থনা করতে হবে। আজ তোমার ভবিষ্যতের পত্তন হয়ে যাক। এখানে আমি ছেলেদের হাইস্কুল করেছি। তুমি বি-এ পাস করে এখানে গার্লস হাই ইস্কুল করবে। পারবে ত ?

বকুলবালা হেসে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—পারব বাবা।

ঠিক এই সময়েই ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ব্রজবিহারী-বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল - কই মাষ্টার মশায়। বকুলবালা কই ?

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

দ্বিতীয় পর্ব

প্রেম

রবীন্দ্র-দর্শন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেছে সামান্যের মধ্যে, বিশেষের বৈশিষ্ট্য সেখানে অতিক্রান্ত। ব্যক্তি-মানসের ছোট বড় সুখ-দুঃখের কথা গোষ্ঠী-মানসের বৃহৎ পটভূমিতে এক অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছে। যা একান্ত ব্যক্তিগত, তাই হয়ে উঠেছে সমষ্টির চেতনার অঙ্গীভূত। ঘটনার আকস্মিকতা নিত্য কালের সম্পদ হয়ে উঠেছে। এ হ'ল কবিপ্রতিভার জাদু। কবির চোখে নরনারীর মিলন-বিরহ এক নতুন মূল্য পেল। এ প্রেম দেহাতিরিক্ত, অতীন্দ্রিয় অনন্ত চক্রবলয়িত। এর সীমা নেই, শেষ নেই। দেহের তটে এ প্রেমের উদ্দাম ঊর্মিমালা বার বার আপনাকে উৎসর্গ করে না। দেহাভিমুখী প্রেমের সাময়িক শান্তি আছে। দেহবিমুখ প্রেম চির অশান্ত। লক্ষ্যহারা নিত্য চাওয়ার দুর্নিবারতায় এ প্রেমের অনন্তলীলা। অশ্রুত কোন এক গানের ছন্দে দুটি হৃদয় নিত্যকাল দোলায়িত—এ অদ্ভুত দোলার উৎস হ'ল দেহবিচ্ছিন্ন ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম-ধারণা প্লেতোনিক প্রেমের সমধর্মী। কবিগুরু এই প্রেমের কল্যাণ-ধর্মকে আবিষ্কার করেছেন। এই কল্যাণধারার স্রোতোপথ দুটি নরনারীকে ঘিরে রচিত হয় নি। সর্বমানবের কল্যাণ-কামনায় এ প্রেম অভিনিবিষ্ট। মানুষের তপস্যাপূত এই প্রেমধারা আপনাকে বিস্তার করে দেয় মানুষের সকল মঙ্গলকর্মে। প্রকৃতির মধ্যেও তার বিস্তৃতি ঘটে। তাই ত নরনারীর মিলন-লগ্ন আর প্রকৃতির পূর্ণতা-লগ্ন একই সময়ে আসে। ঋতুচক্রের আবর্তন-পথে প্রকৃতি যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে রূপে ও রসে, যখন বর্ণগন্ধের সমারোহে পূর্ণতার বার্তা ঘোষিত হয় বন থেকে বনান্তরে সেই লগ্নে নরনারীর মিলনও সম্ভব হয়। এ মিলন ত আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন ও নিরর্থক নয়। বিশ্ববিধানের সঙ্গে এর নিগূঢ় যোগ আছে।

প্রেম আপনার আন্তর মাধুর্যে পাত্রপাত্রীকে সৃষ্টি করে, সৃজন করে তার পরিবেশ। কবির ভাষায় বলি—"প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনই করে অন্তরে-বাইরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে।" (মহুয়া কাব্যগ্রন্থ, ভূমিকা) প্রেমের প্রসাধনই ত ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ। প্রেমের বারণহীন প্রকাশ-ব্যাকুলতা অনির্বচনীয় রূপ-ঐশ্বর্যে আপনাকে ব্যক্ত করে। পুরুষের ক্লাসিক মনস্বিতার ইমারতে রোমান্টিক কল্পনার রং এসে লাগে। ব্যক্তি-মানস সাধন-সৌন্দর্যে প্রতিদিন সুন্দরতর হয়ে ওঠে—তার প্রসার ঘটে নব নব তপস্যার তীর্থপথে। নারী ধর্মে কর্মে সেবার মাধুর্যে অনন্যা হয়ে ওঠে। পুরুষ বীর্যে, শৌর্যে ও ক্ষমায় অনন্যসাধারণ হয়। প্রেমের জাদু পুরনো কাঠামোয় নতুন মূর্তি গড়ে—তার রং, তার রূপ মনোহরণ করে মানুষের। এই নতুন সৃষ্টিটুকুকে পুরনো কাঠামোর সঙ্গে অসম্পৃক্ত বলে মনে হয়। সখ্যসন্ধানী দুটি প্রাণ বিনিসুতোর বাঁধনে বাঁধা পড়ে। এদের মধ্যে বন্ধনের বেদনা নেই। আবশ্যিকতার সামাজিক নাগপাশ কোথাও ক্ষুণ্ণ করে না এদের সহজ অস্তিত্বটুকুকে। পুলকসমৃদ্ধ কোন এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানি এসে লাগে দুজনার চোখে—রঙীন হয়ে ওঠে সমস্ত বিশ্বসংসার। নারী ও পুরুষের জীবনে এই দুর্লভ মুহূর্তটি পরম কাম্য। জীবনের সবটুকু মধুর স্বাদ গ্রহণ করতে করতে লীলাচঞ্চল দুটি প্রাণ স্বগতোক্তি করে:

> "আমরা চকিত অভাবনীয়ের
>
> ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।" (মহুয়া, পৃঃ ৫৩)

অভাবনীয়ের অলোক আলোকদীপ্তি দুটি মানুষকে এক অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান দেয়। দেহের দাবী সেখানে নেই। আত্মার মিলনে দুটি মানুষের প্রেম সার্থক হয়। সার্থকতার সেই দুর্লভ লোকে আর সব মিথ্যা হয়ে গেছে। দুঃখ, মৃত্যু সবই সেখানে অসত্য। দুঃখতাপকে অনায়াসে তারা অস্বীকার করে। পুরুষের পৌরুষ আপনাকে সহস্র প্রকাশপথে ব্যক্ত করে। নারীর নয়নে যে শক্তির আশ্বাস তা-ই সঞ্চারিত হয় পুরুষের অস্থিতে, মজ্জায়। পরম নির্ভরতার সঙ্গে পুরুষ নারীর কানে কানে বলে:

> "ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
>
> ভিক্ষা না যেন যাচি,
>
> কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
>
> তুমি আছ, আমি আছি।" (মহুয়া, পৃঃ ৫০)

এই প্রেমের স্থান বিলাসীর কল্পনাস্বর্গে নয়। দুঃখ-বেদনাদীর্ণ অসংগতি-কণ্টকিত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই প্রেমের প্রতিষ্ঠা। প্রতিদিনের জীবনসত্য এই প্রেমকে ম্লান করে না; বস্তুর সংঘাতে প্রেম আপাত উজ্জ্বলতর হয়। সত্যকে পরিহার করে অবাস্তব কল্পনাবিলাসে এ প্রেমের ঋদ্ধি নেই। জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রেমের

অনন্ত সম্ভাবনা ও পরম পরিণতি। দুঃখের তিমির রজনীতে পুরুষ কঠোর বীর্যে দুঃখ জয়ের সাধনা করে। সাধনার কৃচ্ছ্রতা সে হাসিমুখে সহ্য করে যদি নারী তার পাশে এসে দাঁড়ায়, স্নেহে, প্রীতিতে, প্রেমে সে যদি পুরুষকে অনুপ্রাণিত করে। নারীর সঙ্গসুধা পুরুষকে শক্তি দেয়, আনন্দ দেয়। সঙ্গাতিরিক্ত কোন কামনা পুরুষ বা নারীর নেই। সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিলীলা চলে পুরুষের সান্নিধ্যে। সেই সান্নিধ্যটুকু প্রকৃতির অনন্ত সৃষ্টি-লীলার উৎস। রবীন্দ্রনাথও পুরুষ এবং নারীর প্রেমের সার্থকতার কল্পনা করেছেন এই সান্নিধ্যকে কেন্দ্র করেই। তার অতিরিক্ত কোন কিছু আবেদন এদের জগতে সত্য নয়। ফুলগন্ধমন্থর মধুযামিনীতে দেহসম্ভোগের আতিশয্য নেই। সে রাত্রে বাসকশয্যা রচিত হ'ল না। মিলন-বিহ্বল দুটি নরনারীর অসার্থক মিথুন-সম্ভোগ সার্থক প্রেমের অন্তরায়। তাই ত কবির 'পুরুষ ও নারী' তাদের ভালবাসাকে আস্বাদন করতে চায় জীবনের দুঃসহতম কাজের মধ্যে। রুক্ষ দিনের দুঃখ-দহনে তাদের প্রেমের পরীক্ষা হয়। তারা জয়ী হয় সেই পরীক্ষায়। দুটি প্রাণ পরস্পরকে আশ্রয় করে—একের মধ্যে অন্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কবির ব্যক্তিগত জীবনে আমরা মহুয়ার এই প্রেম দর্শনের ছায়াপাত লক্ষ্য করি। কবিপত্নীর অকাল মৃত্যুর পরে 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্মিনীর উদ্দেশে বেদনা-মধুর অপূর্ব কথায় এই দর্শনেরই প্রতিধ্বনি করে বললেন :

"আজি আমি একা একা দেখি দুজনের দেখা
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।" (প্রতিনিধি)

বিচ্ছেদজয়ী এই জীবনদর্শনই 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর। কবির মানসপুত্র বলে :

"দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখিছি দোঁহে—
মরু পথ তাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটিনি মোহন-মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যত দিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী প্রেয়সী, হোক্ মহীয়সী
তুমি আছ, আমি আছি।" (মহুয়া, পৃঃ ৫১)

দু'জনের চোখে দু'জনার জগৎ দেখার ইতিকথাই 'ও' প্রেমের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। এই প্রেম ব্যক্তিসত্তার আংশিক অবলুপ্তি ঘটায়। এই অবলুপ্তি কল্যাণকর কারণ এর মধ্যেই পুনরুজ্জীবনের অমোঘ মন্ত্র ঘোষিত হয়। একের ব্যক্তিসত্তা অপরের সত্তায় বিলুপ্ত হলে ব্যক্তি-জীবন আপেক্ষিক অমরত্ব লাভ করে। ব্যক্তিজীবনে এই অমরত্বটুকু আরোপ করার জন্যই প্রেম দুটি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ সত্তাকে অবলুপ্ত করে না। প্রেমের কাজ হ'ল উদ্দেশ্যবিহীন। প্রখ্যাত দার্শনিক কান্ট শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, শিল্পেরও একটা উদ্দেশ্য আছে এবং তার স্বরূপ হ'ল 'purposiveness without a purpose'; শিল্পকলার যেমন উদ্দেশ্যটুকু উদ্দিষ্ট নয়, অনুক্ত, তার স্বরূপ অনির্দেশ্য ঠিক তেমনি করে প্রেমের লীলার যদি কোন গোপন উদ্দেশ্য থেকে থাকে দুটি নরনারীর মিলন সংঘটনে, তবে তা-ও হ'ল অনির্দেশ্য। জৈববাদীদের মত রবীন্দ্রনাথ এ কথা বললেন না যে, প্রেমের কাজ হ'ল বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা করা। সৃষ্টিকে রক্ষা করার মধ্যে যে স্থূলতা রয়েছে সেটা কারুকার ব্রহ্মার পক্ষে প্রশংসনীয় হলেও চারুকার মন্মথের পক্ষে তা-ই অপযশের। শিবলিঙ্গের পূজা আদিম মনকে অভিভূত করলেও আধুনিক মানুষের কাছে তার আবেদন ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সভ্যতার প্রথম পাদে সৃষ্টি ছিল মানুষের চোখে পরম বিস্ময়ের। সৃষ্টির স্থূলতা ও আদিম নগ্নতা তাদের কাছে অশ্লীল বলে মনে হয় নি। আধুনিক মননরীতিতে মনস্বী রবীন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টি রচনার এই তত্ত্বকথার আবেদন একেবারেই পৌঁছল না। তিনি প্রেমকে দেখলেন অকারণ অবারণ শক্তি হিসাবে। বিচিত্র পথে প্রেম সর্বত্রগামী হয়েছে—তার লীলা চলে ভুবন থেকে ভুবনান্তরে। এর রহস্যময়তা বুদ্ধির অগম্য। প্রেম সার্থক তার লীলামাধুর্যে; বিধাতার সৃষ্টিকথার কাছে প্রেমের খবরদারী নেই। এর বাইরে কোন প্রশ্ন যদি করা হয়, যে কেন প্রেমের এই লীলা, তবে আমরা বলব যে, এ হ'ল 'অতিপ্রশ্ন'। মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগোচর এই প্রেমতত্ত্ব হ'ল অনির্বচনীয়। আমরা অনির্বচনীয় তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার কারণ এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

এই প্রেমের সত্তা অসঙ্গ স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ হ'ল abstract বা অনাশ্রয়ী। নরনারীর হৃদয়াধার অতিক্রান্ত এই প্রেম বিদেহী, ভাবময়। এর সত্তায় অমরতার ইঙ্গিত। মহাসত্য হ'ল প্রেমের লক্ষণ; আংশিক আপেক্ষিক সত্য, যা আমাদের চারপাশের বাস্তব জগতে ছড়িয়ে রয়েছে, তা প্রেমের সত্য থেকে স্বতন্ত্র। বস্তুতন্ত্রে এই সত্যের হদিস মেলে না। স্বপ্ন-লোকের অধিবাসী হয়েও ধরণীর সব অপূর্ণতাকে প্রেমই পূর্ণ করে। তাই ত কবির মানস-কন্যা লাবণ্য অমিতকে দিয়েছিল এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের অমৃত আস্বাদ। তার কথা উদ্ধৃত করে দিই :

"বিস্মৃত প্রদোষে
হয় তো দিবে সে জ্যোতি,

হয় তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়।
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।"

প্রেমের অমরতায় কবি বিশ্বাস করেছেন, মানসনেত্রে অবলোকন করেছেন তার মৃত্যুহীন সম্ভাবনা। তাই প্রেমকে তিনি পৃথক, স্বতন্ত্র হৃদয়-অনাশ্রয়ী মহৎ সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন। নরনারীর হৃদয় আশ্রয় করা প্রেমের পক্ষে একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। যদি মানব-হৃদয়ের সঙ্গে প্রেমের কোন আত্মিক, নিগূঢ়, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকত তা হলে তার অমরতার দাবিটুকু গ্রাহ্য হ'ত না। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেরও শেষ হত। কেননা, যে হৃদয়ে প্রেমের অধিষ্ঠান তার বাস হ'ল মানুষের দেহে। প্রেম যদি দেহাশ্রয়ী কোন এক যৌগিক সত্তা হ'ত তবে তার বিনাশও স্বতঃসিদ্ধ হ'ত। তাই ত কবি প্রেমকে অসঙ্গ, অনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তারূপে কল্পনা করলেন। এইরূপ কল্পনা হ'ল যুক্তিসিদ্ধ। অবশ্য কবি ন্যায়শাস্ত্রের অনুশাসনের দিকে লক্ষ্য রেখে যে এই রূপকল্পনা করেছেন এ কথা আমরা বলছি না। কবির সর্বগ্রাসী বোধির আলোয় সত্য উদ্ঘাটিত হয়। তিনি তাঁর 'বাসরঘর' কবিতায় প্রেমের এই অবিনশ্বরতার কথা ঘোষণা করলেন :

"যায় নাই, যায় নাই
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।"

কবিগুরুর প্রেমের ধারণা হ'ল আদর্শীভূত প্রেমের ধারণা। জীবনের সকল তুচ্ছতা ও মালিন্য মুক্ত এই প্রেম। বৃহদারণ্য বনস্পতি যেমন মাটির গভীর থেকে প্রাণ-পাথেয় সঞ্চয় করে আপনাকে আলোকের এবং বাতাসের সীমাহীন বিস্তারে প্রসারিত করে দেয় প্রেমও ঠিক তেমনি করেই জীবনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে, জীবনাতীত অসীমতায় আপনাকে বিস্তার করে দেয়। এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কালের ব্যাপ্তির দ্বারা এই প্রেমের মূল্য নির্ণীত হয় না। প্রেম স্বয়ংসম্পূর্ণ এ কথা আমরা আগেই বলেছি। সুচিরকাল দু'জনা দু'জনকে ভালবাসলে তবেই সে প্রেমের সার্থকতা, এ বিশ্বাস হ'ল সাধারণ মানুষের। তারা কালকে প্রেমের সত্য নিরূপণের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে। কবি এই প্রত্যয়ের অংশভাগী হন নি। তাঁর চোখে প্রেমই প্রেমের মানদণ্ড। দার্শনিক যাকে 'End in itself' বলেন, প্রেম হ'ল মানবজীবনের সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য। কালের ব্যাপ্তি, নরনারীর হৃদয়-আতিশয্য এ সবই হ'ল অতিরিক্ত। প্রেমের জগতে এরা আগন্তুক, অপরিচিত। তাই ত কবি এ কথা বললেন :

"চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল ;
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,"

এই চপল ছন্দ-মাধুর্যের পিছনে যে গভীর প্রত্যয়ের কঠোরতা আছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ প্রত্যয় ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তি অনুসারী। কাল এখানে নিরপরাধ দর্শকের ভূমিকায়। বোহেমীয় জীবনবাদ বুঝি এই ধরনের প্রেমবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। প্রয়োজন এখানে বাহ্য। অপ্রয়োজনের অতিরিক্ত রসরাজত্বে প্রেম সার্বভৌম। প্রমাদবশে আমরা জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থে প্রেমের বিচার করি। তাই তার সত্যস্বরূপ আচ্ছন্ন হয় ; হৃদয়-আতিশয্য ও দেহাসক্তি কখনও বা সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটায়। তবু মেঘনির্মুক্ত সূর্যের মত প্রেম সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে স্বস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। কবি প্রেমের এই তিমিরজয়ী রূপ কল্পনা করলেন তাঁর মুক্তরূপ কবিতায় :

"আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কী আমার জীবন।
গাঁথিব কী বুদ্বুদের হার।
তোমারে আড়াল করে তোমার স্বপন
মিটাবে কী আকাঙ্ক্ষা আমার॥
বিরাজে মানব শৌর্যের সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু—
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।" (মহুয়া, পৃঃ ৮৩)

এই প্রেমেই নারী জীবনের চরম সার্থকতা, পরম পরিসমাপ্তি। পুরুষের জন্মগত অধিকার হ'ল নারীর প্রেমে। নারী নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করে তার প্রিয়তমের কাছে। তার সত্তার অবলুপ্তি ঘটে ; পুরুষসত্তায় সে বিলীন হয়। নারীর যা কিছু মহৎ, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সবই সে তার প্রেমাস্পদকে উৎসর্গ করে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। এই আত্মবিলোপই হ'ল প্রেমের ধর্ম। প্রেমের বোধন হয় ত্যাগে ; প্রেম নারীকে স্বর্গের সব দাক্ষিণ্যটুকু পুরুষের পায়ে অঞ্জলি দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই আত্মদানেই নারী পুরুষকে জয় করে। প্রেমের পরম লগ্নে নারী প্রাণের অনন্ত উপহারটুকু তার দয়িতকে নিবেদন করে বলে :

"কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তারে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম।
পায়ে দিব তার
যে এক মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।" (মহুয়া, পৃঃ ২৩)

এই প্রাণের অনন্ত উপহারটুকু পূর্ণ প্রাণের স্রোতে উপজিত হয়। এ সম্পদ হ'ল ভিতরের; নারীর মর্মমূলে তার বাস। সে উৎসের সন্ধান একমাত্র নারীই জানে। নারী কামনা করে তার দান সাগ্রহে পুরুষ গ্রহণ করবে। তবেই সার্থক হবে তার প্রেমের তপস্যা। কবির মানস-কন্যার মর্মকথাটি নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে:

"নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণী হিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে।
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে,
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
মরিব লাজে—
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে।" (মহুয়া,)

নারীর এই ঐকান্তিক প্রেম ব্যর্থ হয় না কেননা পুরুষও যে নারীর পরিপূর্ণ প্রাণের প্রসাদ প্রত্যাশী। মানুষের অসংবেদনশীল মনের তির্যক কটাক্ষ তাকে প্রতিপদে ব্যথিত করে। সমাজের অসংখ্য অকরুণ বিধিনিষেধ তার প্রতিভাকে অসংলগ্ন বলে, অস্বীকার করে তার তপস্যাকে। তার শক্তি, তার চারিত্রসত্তা সংসারের ঘূর্ণিপাকে বিপর্যস্ত হয়। সে তখন প্রত্যাশা করে তার দয়িতাকে। তার কাছে সে সান্ত্বনা চায়, চায় তার ব্যর্থ পৌরুষের স্বীকৃতি। নতুন প্রেরণায় সে অনুপ্রাণিত হতে চায়; তার মানসীর কল্যাণস্পর্শে সে ধন্য হতে চায়। সুনিবিড় চাওয়ার প্রত্যাশানিবিড় মুহূর্তটি মিলনের প্রাক্-মুহূর্ত। নারী যখন তার বরণডালা নিয়ে পুরুষের হৃদয়ের বাসমহলে দ্বিধাজড়িত আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করে তখন পুরুষও জীবনের ব্যর্থতাকে ভোলার জন্য অন্তরে অন্তরে তার রমণীর আগমন প্রতীক্ষা করে। উভয়ের প্রতীক্ষাই সার্থক হয়, প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। তাদের মিলন হয়, নারীর আত্মনিবেদনের ধারা ধন্য হয়। পুরুষ পরম প্রাপ্তির স্পর্শে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পুরুষ নারীকে বলে:

"তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।"

পুরুষের এই নারী-বন্দনা দেবী-বন্দনার মতই শান্ত ও সুন্দর। কামনাকলুষহীন পুরুষচিত্ত পরম রমণীকে আবিষ্কার করেছে তার প্রিয়ার মধ্যে। প্রেমই সম্ভব করেছে পুরুষের চোখে নারীর এই অতিমানবীয় রূপ-কল্পনা। এই বরাভয়-দাত্রী প্রেয়সী রমণীর জন্য পুরুষের তপস্যার শেষ নেই, তার প্রত্যাশার বিরাম নেই। পুরুষের ক্লান্তি, বেদনা, দুঃখ, নৈরাশ্য—এ সবই দূর হয়ে যাবে তার প্রিয়ার পবিত্র স্পর্শে, এ কথাই পুরুষ যুগে যুগে বিশ্বাস করে এসেছে। পুরুষের প্রেমপবিত্র দৃষ্টি নারীকে দেবীমাহাত্ম্য দান করেছে। এই বরাভয়দাত্রী দেবীর কাছে পুরুষের অনন্ত প্রত্যাশা। আবার পুরুষের প্রেম নারীকে সৃষ্টি করে; শৌর্য-স্নাত যে প্রেম পুরুষ দিতে পারে তার জন্য নারীর সমগ্র সত্তা উন্মুখ। নারী সর্বদেহে মনে পুরুষের প্রেম-স্পর্শ কামনা করে। পুরুষের প্রেমেই নারীর সত্য পরিণতি, যথার্থ মর্যাদা। যদি নারী তার দয়িতের কাছে শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করে তবেই সে পূর্ণ হয়, সে ধন্য হয়। তাই কবির মানসকন্যা বলে:

"সত্য যদি হই তোমা কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব যোজিবে তখন—
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার।" (মহুয়া, পৃঃ ৩৩)

নারীর এই আজন্ম প্রতীক্ষার পূর্ণ ফল পুরুষ যুগে যুগে দিয়েছে তার সর্বস্ব ত্যাগ করে। নারীত্বকে পুরুষ দিয়েছে দেব-দুর্লভ সম্মান। পুরুষের প্রেমে নারীর যে রূপান্তর ঘটছে, তার সত্যমূল্য পুরুষের চোখে ভাস্বর। নারী তার খবর রাখে না। পুরুষের প্রাণের বিরাট বিস্তৃতিতে প্রেমের মন্ত্রে নারীর রাজেন্দ্রানীর মতই অভিষেক হয়েছে। তার সুচির সঞ্চিত আশা পূর্ণ হয়েছে। এদিকে পুরুষও আবার নারীর প্রেমে তার পরম আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে। কত পুরানো ঘর ভেঙেছে, আবার গড়ে উঠেছে কত নতুন ঘর। পুরুষের শক্তি নারীর ইঙ্গিতে নিয়োজিত হয়েছে এই ভাঙা-গড়ার খেলায়। পুরুষ ও নারীর এই পারস্পরিক মিলন-অভীপ্সা কোনদিনই পরস্পরের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ হতে দেয় নি। নিঃসঙ্গ জীবনের মর্মান্তিক বেদনা তখনই দুঃসহ হয়ে ওঠে যখন মানুষ ভরা মনে বসে থাকে দেবার প্রত্যাশায় অথচ নেবার মানুষ তখনো অনাগত। প্রেমের ফাঁদ পাতা বিশ্ব-ভুবনে। দুটি প্রাণের এই চরম নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে প্রেমের দেবতা আসেন ফুলরথে, পুষ্পধনুতে শরযোজনা করেন; প্রেমমুগ্ধ পুরুষ ও নারীর মিলন হয় বিশ্বভুবনের একটি অসীম কোণে। সেখানে যুগল প্রাণের পদ্মাসন পাতা হয়, প্রেমের অভিষেক ঘটে দুটি প্রাণের সঙ্গম-তীর্থে।

সৎপণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী

(মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গ্রন্থকার)

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

বাংলার বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুর প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় রাজবংশের আশ্রয়ে বহুতর বিদ্যাসমাজ মেদিনীপুরে বিস্তৃত ছিল এবং অধ্যাপকশ্রেণী ব্যতীত বহু গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ও সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয়ে বর্ত্তমানে কাহারও বিশেষ গৌরব বোধ নাই এবং তাহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র গবেষণা হয় নাই। আমরা দিগ্‌দর্শন স্বরূপ মেদিনীপুরের সমুজ্জ্বল রত্ন-স্থানীয় গোপাল চক্রবর্ত্তীর পরিচয়াদি ও গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মেদিনীপুরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের এই তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের প্রতি তরুণ গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গ্রন্থপঞ্জী : গোপাল চক্রবর্ত্তীর নাম বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র চণ্ডীর টীকাকার রূপে সুপরিচিত। এই টীকা বটতলার কৃপায় বহুকাল হইল মুদ্রিত হইয়া সুপ্রাপ্য হইয়াছে—সুতরাং ইহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। বঙ্গদেশে নিত্যপাঠ্য দেবীমাহাত্ম্যের বহুতর টীকা রচিত হইয়াছে—আমরা ২০।২৫টি বাঙালী রচিত টীকা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তীর (১) তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। মধ্যযুগে বাঙলার গুণগ্রাহী পণ্ডিতসমাজে বাঙলার এক প্রান্তে বসিয়া রচিত এই টীকা সমুচিত সমাদর লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা রচনা করিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তী চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পূর্ব্বতন টীকাকার বিদ্যাবিনোদের ব্যাখ্যা গোপাল বহুস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং একস্থলে (মসী কজ্জলবিকার ইতি) "বিদ্যাবিনোদ-বিদ্যাভূষণৌ" বলিয়া এক অজ্ঞাত টীকাকারের নাম করিয়াছেন। আমাদের ধারণা "পূর্ব্বগ্রামী" রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় নানা গ্রন্থকার মহাপণ্ডিত বিদ্যাবিনোদও মেদিনীপুরনিবাসী ছিলেন—এ বিষয়ে সমুচিত গবেষণা হওয়া আবশ্যক। গোপাল কর্ত্তৃক উদ্ধৃত "উৎকলদেশীয়" পাঠ, মন্ত্রকৌমুদীব্যাখ্যানং, রায়মুকুটপঞ্জিকা প্রভৃতি লক্ষণীয়। টীকার শেষে গোপাল বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সামাজিক প্রতিষ্ঠা সূচনা করিয়াছেন। যথা,

> আসীদ্ বন্দ্যকুলোদ্ভবো গড়গড়ী শ্রীমান্ হিরণ্যঃ কৃতী
> চত্বারস্তনয়াস্ততঃ সমভবন যেষামনন্তো২গ্রজঃ।
> খ্যাতো যো২প্যপরঃ শিবঃ শিব ইব প্রাবের তস্যাত্মজৌ
> জাতৌ জ্ঞানমহেশ্বরৌ দ্বিজবরো দুর্গাভিধো জ্ঞানজঃ॥
> দুর্গাদাসসুতঃ শ্রীমান্ গোপালঃ কৃতিনাং বরঃ।
> অকরোচ্চণ্ডিকাটীকামেতাং তত্ত্বপ্রকাশিকাম্॥

পরে এই বংশ পরিচয় আলোচিত হইল।

গোপাল বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—চণ্ডীটীকা ব্যতীত সমস্তই এখন বিলুপ্তপ্রায়। আমরা একটি সূচি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। সেকালে প্রবাদ বাক্য ছিল "অব্যাকরণকন্থকঃ"—শাস্ত্রচর্চ্চার প্রথম সোপানেই ব্যাকরণগ্রন্থ নিপুণভাবে অধ্যয়ন করিতে হইত। নতুবা পাণ্ডিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। গোপাল সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ "কবিচন্দ্র" নামক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া তদুপরি (২) "সারার্থদীপিকা" নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। টীকাটি গোপাল নামে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বৎসমাজে এক সময়ে প্রচারিত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্ধিপাদের একটি খণ্ডিত পুথি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা কারক, সুবন্ত ও সমাসপাদের "গোপাল" সংগ্রহ করিয়াছি—টীকাটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অভিরাম, ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতির ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিয়া পড়া আবশ্যক। সমাসপাদের পুষ্পিকা উদ্ধারযোগ্য :—

> ইতি শ্রীকবিচন্দ্রাঙ্ঘ্রি রজোরঞ্জিতমস্তকঃ।
> অকরোদ্দ্বিজগোপালঃ সমাসটিপ্পনীং মুদা॥

ইতি বিবিধবিদ্যাবিশারদশ্রীকবিচন্দ্রচরণারবিন্দদ্বন্দ্বমেলিন্দবন্দ্যঘটী কুলোদ্ভবশ্রীগোপালচক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং সারার্থদীপিকায়াং সপ্তমঃ সমাসপাদঃ সমাপ্তঃ। টীকার বহুস্থলে কবিচন্দ্রের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে কতিপয় কারিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

(৩) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত সাতকাণ্ড অধ্যাত্মরামায়ণের উপর গোপালরচিত বালবোধিনী টীকার সম্পূর্ণ পুথি এসিয়াটিক সোসাইটীতে এবং খণ্ডিত পুথি লণ্ডনে আছে। গ্রন্থশেষে স্পষ্ট পরিচয় থাকাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই :

> দুর্গাদাসসমাহ্বয়ো২ভবদথো জ্ঞানাত্মজস্তৎসুতঃ
> শ্রীগোপালধরামরঃ সমতনোৎ টীকামিমাং সম্মুদে॥

গোপাল এই দুরূহ গ্রন্থের দার্শনিক তত্ত্বের উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া স্বকীয় সম্প্রদায়সঙ্গত স্বরস পরিব্যক্ত করিয়াছেন—তিনি অদ্বৈতবাদী হইয়াও পরম ভক্ত ছিলেন।

যথা গ্রন্থশেষে,

> প্রীয়তাং রামচন্দ্রো মে কর্ম্মণানেন নিত্যদা।
> ময়া তু তস্য সংপ্রীত্যৈ কৃতমেতন্ন কীর্ত্তয়ে॥
> বক্তা যস্য শিবঃ স্বয়ং শ্রুতিময়ী শ্রোত্রী চ সা পার্ব্বতী
> বেদান্তাগমবেদসারমমলং যদ্দ্বৈতধীশোধনম্।
> তদ্ব্যাখ্যানকথাসু কো২পি জড়ধীর্জাতার তন্মে ততঃ
> কিন্তু শ্রীরঘুনাথপুণ্যচরিতাৎ পাপক্ষয়ে মচ্ছ মঃ॥

টীকাটিতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত আছে তন্মধ্যে বিষ্ণুস্বামী ও বেদান্তসার-কারের নাম উল্লেখযোগ্য। পুষ্পিকায় "সৎপণ্ডিত" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। (৪) গোপাল-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যালেশ-টীকার সম্পূর্ণ পুথি লণ্ডনে আছে (পত্র সংখ্যা ৮৬)। দুইটি পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—

> ইতি তৃতীয়স্কন্ধস্য ব্যাখ্যালেশো যথামতি।
> গোপালশর্ম্মণাকারি গোপালতোষহেতবে॥
> এবং চতুর্থস্কন্ধস্য পদ্যানাং তু কচিৎ কচিৎ।
> গোপালশর্ম্মণাকারি ব্যাখ্যানং তু যথামতি॥

এই সংক্ষিপ্ত টীকায় ভাগবতের দার্শনিক তত্ত্ব বেদান্তের অদ্বৈতবাদ-সম্মত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কিত স্থলসমূহেরই ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে। আমরা টীকাটির প্রথম ৯ পাতা মাত্র এক স্থানে দেখিয়াছিলাম—শ্রীধরস্বামী ব্যতীত মধুসূদন সরস্বতী ও জীব গোস্বামীর বচন তন্মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকিলে অধ্যাত্মরামায়ণ বা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের টীকা রচনা করিতে কেহ অগ্রসর হয় না। ব্যাখ্যালেশের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য:

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥

গোপাল প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত গৌড়ীয় পুস্তকে উপলভ্যমান আদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা কোন টীকাকারই ধরেন নাই:

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা, তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশকায়॥

[এতৎ পদ্যং টীকাকৃতাব্যাখ্যাতত্বাৎ "গায়ত্র্যা চ সমারম্ভ" ইতি পুরাণবিরুদ্ধত্বাচ্চ শ্রীভাগবতস্থং ন, কিন্তু গৌড়ীয়পুস্তকস্যাদৌ সর্বত্র বিদ্যত ইতি ব্যাখ্যায়তে।]

(৫) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মেদিনীপুরের অন্তর্গত "বহুপুর" নিবাসী রাজেন্দ্রলাল গোস্বামীর গৃহে ১৬৩২ শকাব্দে অনুলিপিত গোপাল-রচিত "জ্যোতীরত্ন" গ্রন্থের সন্ধান পান—ইহার পত্রসংখ্যা ১৫৪। প্রারম্ভে আছে:

বরাহাদিকৃতান্ গ্রন্থানালোক্য বহুশো যথা।
নিরূপ্যতে কর্মকাণ্ডঃ সবিশেষঃ সতাং মুদে॥

সৌভাগ্যবশতঃ গ্রন্থশেষে রচনাকাল লিখিত আছে:—

বেদাঙ্কবাণাবনিসংমিতেহব্দে
শাকে দিনেশে প্রমদাং গতে চ।
গোপালশর্মা সমপূরি শাস্ত্রং
মিদং মুদা রূপবতী (-তনুজঃ)॥

অর্থাৎ ১৫৯৪ শকাব্দের আশ্বিন মাসে (১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার পূর্বেই "সারার্থদীপিকা" এবং অন্যান্য বহু টীকা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কারণ, প্রারম্ভের একটি শ্লোকে লিখিত হইয়াছে:

শব্দাগমং সুনিপুণং কবিচন্দ্রপাদাৎ
বোধীত্য তত্র × × × স্বমতং ব্যতানীৎ।
কাব্যাদিশাস্ত্রনিবহেষু তথা × × ×
যঃ সর্বদা ব্যরচয়ৎ বহুশস্ত পঙ্কান্॥

দুঃখের বিষয়, গোপাল-রচিত কোন কাব্যাদির টীকা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুথি ঘাটিয়া আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কম।

(৬) রূপগোস্বামীর হংসদূতের উপর গোপাল চক্রবর্তীর টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তাহাতে রচনা কালও লিখিত ছিল—কিন্তু বর্তমানে আমরা তাহার বিবরণ লিখিতে অপারক।

(৭) গীতগোবিন্দের উপর "অর্থরত্নাবলী" নামে উৎকৃষ্ট টীকা শেষ বয়সে গোপাল রচনা করিয়াছিলেন—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উলায় (অর্থাৎ বীরনগরে) একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করাইয়াছিলেন (পত্রসংখ্যা ১২২)। ইহার মনোহর মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি জয়দেবের অনুকরণ:

মুখরুচিতির্জিতঃ শশধরো মালিন্যমাপ্তিতো
মন্দং মন্দমুদেতি ভামিনি দিশা প্রৌঢ়াগতো দৃশ্যতাম্।
ইত্থং চাটুকথাসু দত্তহৃদয়ামালিঙ্গ্য রাধাং চিরং
চুম্বন্ প্রেমরসাবশাং হরিরসৌ পায়াদপায়াম্বুদম্॥

ইহারও শেষে রচনাকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে:—

নবাঙ্কবাণেন্দুমিতে শকাব্দে, মাসে মধৌ চণ্ডকরস্য বারে।
টীকামিমাং রূপবতীতনূজো, গোপালশর্মা ব্যতনোৎ সমগ্রাম্॥

অর্থাৎ ১৫৯৯ শকাব্দে চৈত্র মাসে (১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

কুলপরিচয়: গোপাল তাঁহার সমস্ত রচনায় নিজের কুলপরিচয় "গয়ঘড়-বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব" সমুজ্জ্বল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং পৃথক শ্লোকে তাঁহার পিতৃপিতামহাদির নাম কীর্তন করিয়াছেন, চণ্ডীটীকায় শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—অর্থরত্নাবলীর শ্লোকটিও উদ্ধৃত হইল:

আসীদ্বন্দ্যকুলোজ্জ্বলো গয়ঘড়ী ধীমান্ হিরণ্যাভিধঃ
তৎপুত্রঃ শিব ইত্যভূচ্ছিবমুখো জ্ঞানাহ্বয়োঽস্মাত্সুতঃ।
দুর্গাদাস ইতি প্রমোদবসতিস্তত্তাত্মজো যঃ কৃতী
গোপালঃ কিল তেন নির্মলধিয়া টীকা কৃতেয়ং মুদা॥

এতদ্দ্বারা গোপালের বংশকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। হিরণ্য একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী পৃ. ১২১ দ্রষ্টব্য)—তিনি আদি কুলীন মহেশ্বরের অধস্তন দশম পুরুষ। নামমালা এই: মহেশ্বর—মহাদেব—দুর্বলি—অনন্ত—নন্দন—বনমালী—পদ্মনাভ—সুধাকর—বাসু—হিরণ্য। নন্দন সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৩):—

তৎপুত্রঃ কুলভূষণো বহুধনো দানৈককল্পদ্রুমো
জাতঃ শাস্ত্রবিশারদো গয়ঘড়ী শ্রীনন্দনো নামতঃ।

শান্তিপুরের নিকটে গয়ঘড় নামে গ্রাম আছে—তাহাই এই সুবিখ্যাত বংশধারার আদিস্থান বলিয়া ধরা হয়। হিরণ্যের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম কুলগ্রন্থানুসারে "আনাক্রি"—তাহার বিশুদ্ধ রূপ ধ্রুবানন্দের মতে অনিরুদ্ধ ("অনিরুদ্ধশ্চ তপনো বিত্তানন্দঃ শিবাখ্যকঃ" পৃঃ. ১২১) এবং গোপালের মতে অনন্ত। সর্ব কনিষ্ঠ শিবানন্দের জন্মকাল অনুমান ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ধরা যায়। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানের সম্বন্ধে ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে (গয়ঘড় প্রকরণ ৬।১ পত্র):

জ্ঞানস্ত ব্রাহ্মণভূমিনিবাসিনঃ রাজ্ঞঃ কন্যাবিবাহঃ।

জ্ঞানের একমাত্র পুত্র দুর্গাদাসই সম্ভবতঃ দৌহিত্রসূত্রে ব্রাহ্মণভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালে (১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীঃ) হইয়া থাকিবে এবং গোপাল চক্রবর্তীর

আবির্ভাবকাল নিঃসন্দেহে ১৬০০-১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপন করা যায়। গোপালের মাতার নাম ছিল "রূপবতী"।

অধস্তন বংশধারা : আমরা বর্দ্ধমান অঞ্চলের একটি কুলপঞ্জীতে গোপাল চক্রবর্ত্তীর সম্পূর্ণ বংশাবলী পাইয়াছিলাম—তন্মধ্যে কাহার কয় কন্যা ছিল এবং কোন বংশে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল তাহাও লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষেপে এই বংশাবলী উদ্ধৃত হইল। গোপাল চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র ও দুই কন্যা—কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল যথাক্রমে অবসথী চট্টবংশীয় রামকৃষ্ণসুত মধু ও খড়দহ মুখবংশীয় গোপীরমণ সুত রামজীবনের সহিত।

১) গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দরাম বিদ্যালঙ্কার—তাঁহার ধারায় পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রব্যবসায় দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। নন্দরামের তিন পুত্র—মথুরেশ বিদ্যাবাগীশ, ত্রিলোচন সার্ব্বভৌম ও রামরাম। রামরামের দুই পুত্র কামদেব ও বাসুদেব—উভয়েই নিঃসন্তান। মথুরেশের চারি পুত্র মহাদেব সিদ্ধান্তবাগীশ, রামদেব, মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চানন ও কৃত্তিবাস—রামদেব ভিন্ন সকলেই অপুত্রক ছিলেন। রামদেবের তিন পুত্র জয়দেব (নিঃসন্তান), বিজয়রাম ও বংশের শেষ পণ্ডিত ভোলানাথ বাচস্পতি (অপুত্রক)। বিজয়রামের পুত্র দাশরথি, তৎপুত্র "কৈলাসীচরণাখ্যঃ"—গোপালের অধস্তন সপ্তমপুরুষ। তাঁহারা প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

২) গোপালের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দরাম বাচস্পতি। তাঁহার দুই পুত্র কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র রামচন্দ্র নিঃসন্তান। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র দয়ারাম, তৎপুত্র সার্থকরাম, তৎপুত্র রামনারায়ণ ও রূপনারায়ণ (গোপালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ)।

৩) গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র ভবানী সিদ্ধান্ত—তাঁহার পাঁচ পুত্র প্রাণবল্লভ, রমাবল্লভ (নিঃসন্তান), রামেশ্বর (নিঃসন্তান), কাশীশ্বর ও সদারাম। প্রাণবল্লভের দুই পুত্র ঘনশ্যাম ও সিদ্ধেশ্বর উভয়েই নিঃসন্তান। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর সদারামের এক পৌত্র দুর্গাপ্রসাদকে দত্তক গ্রহণ করেন। কাশীশ্বরের পুত্র শত্রুঘ্ন নিঃসন্তান। সদারামের পুত্র দেবীচরণ—তাঁহার দুই পুত্র রামজয় ও (সিদ্ধেশ্বরের পোষ্যপুত্র, দুর্গাপ্রসাদ। বাহুল্যবোধে কন্যাদের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। কুলপঞ্জীটিতে ইঁহাদের বাসস্থান লিখিত আছে—"এতে বহুপুর-নিবাসিনঃ।" এই বহুপুর ব্রাহ্মণভূম পরগণার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম। তথায় গোপালের বংশধারা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

বর্ষায়

শ্রীকালিদাস রায়

এসেছে বরষা দলিতাঞ্জন-বিগলিত ধারা ঝরিয়া পড়ে
নব ঘনরূপ রামের নয়নে সীতাশোকে যেন অশ্রু ঝরে।
আজি ছাপাছাপি নদনদী-বাপী সলিল ধারায় ভরিয়া যায়,
পম্পার তীরে চিত্ত ধায়।

শিহরি উঠেছে কদম্ববন, পবনে কেতকী গন্ধ ভাসে
আমার উটজ অজন পরে গৈরিক ভরু কুটজ হাসে।
জম্বুবনের পানে চেয়ে চেয়ে মন ছুটে যায় বিন্ধ্য শিরে।
ঘুরিয়া বেড়ায় রেবার তীরে।

রজনী তিমিরে গুণ্ঠিত আজি বজ্রকণ্ঠে জলদ মাতে।
চপলা-চমকে মাঝে মাঝে বটে, দ্বিগুণিত হয় আঁধার তাতে।
মন ছুটে যায় উজ্জয়িনীর পুরপথে হাতে ধরিয়া বাতি,
অভিসারিকার হইতে সাথী।

মেঘৈর্মেদুর অম্বর আজি মাঝে মাঝে জাগে ইন্দ্রধনু
মনে হয় শিখিপুচ্ছ-মৌলি গগনে শোভিছে শ্যামের তনু।
মন ছুটে যায় যমুনার কূলে কদম্ববনে সে ব্রজধামে,
যেথা রাধা শোভে কানুর বামে।

বজ্রা পাষাণে প্রহরিয়া দুকূল কল কল রব হৈমবতী
মনে হয় যেন উমার বিরহে কাঁদিয়া ভাসায় মেনকা সতী।
কৈলাস হ'তে মন ছুটে যায় যেথা কাঁদে গিরিরাজেশ্বরী
উমার বারতা বহন করি।

আমার ভারত কাব্য ভারত যুগে যুগে আমি তাহার কবি
অভিসারিকা বরষায় হেরি শত জনমের স্বপন ছবি।
যুগে যুগে শ্রুত সঙ্গীত কত জুড়ায় আমার তৃষিত শ্রুতি
বরষা আমার স্মৃতির দূতী।

MÂYÂDEVÎ

(Birth of the Buddha)

মায়াদেবীর স্বপ্ন (পাথরের মূর্ত্তি। ভারহুত : সুঙ্গ যুগ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী)

মানুষ

শ্রীসুভাষ সমাজদার
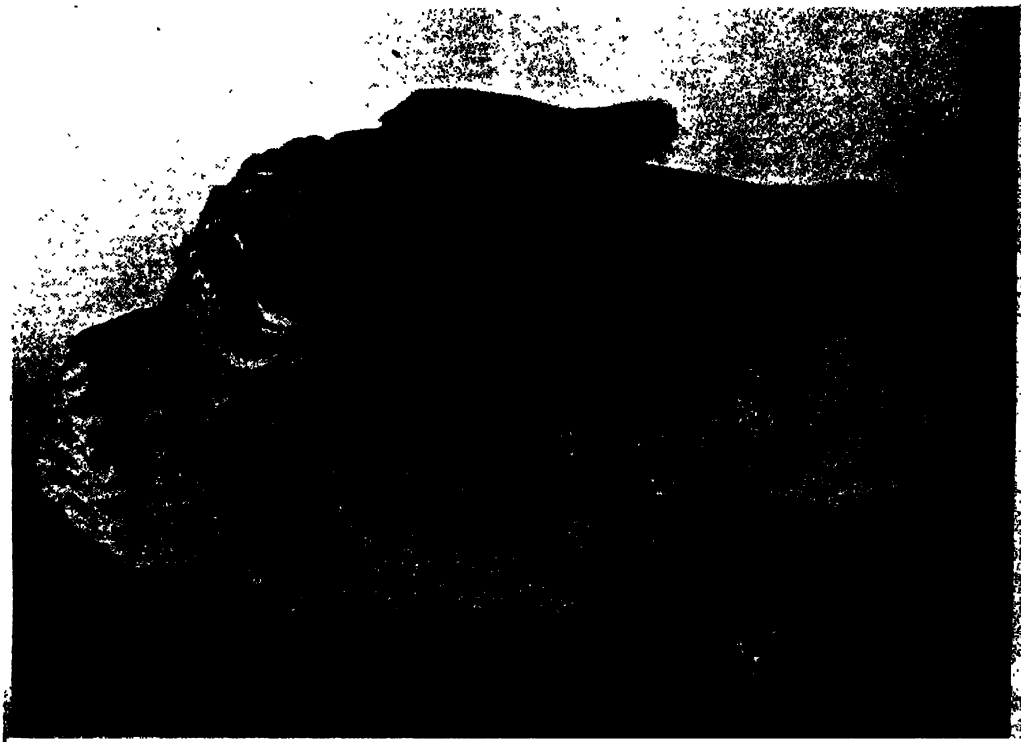
[প্রৌঢ় শিক্ষক জিতেন চক্রবর্তীর বৈঠকখানা। দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও সারদা দেবীর ছবি। ছবি ছুটোর ফ্রেমে বেলিফুলের ছুটো মালা জড়ানো রয়েছে। একটা টেবিলের ছুই পাশে ছুটো চেয়ারে বসে আছেন জিতেনবাবু ও তাঁর দেশসেবক আদর্শবাদী কনিষ্ঠ ভাই সত্যেন]

জিতেন। কৈ রে সত্যেন, রাত আটটা বেজে গেল, তবুও গৌরদাস তো এল না? রজনী মোক্তারেরও পাত্তা নেই!

সত্যেন। আচ্ছা দাদা, তোমরা কি গৌরদাসের চালচলনে ভগবানের বিভূতি দেখতে পেয়েছ?

জিতেন। আরে গৌরদাসকে তুই তো চিনিস। আমাদের পাশের গ্রাম পত্তিরামের কেশব মালাকরের ছেলে গৌরদাস—

সত্যেন। ও! গৌর! সে তো ছোটকালে আমাদের বাড়ীতে আসত। আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট—

জিতেন। হ্যাঁ, আমিও একটু অবাক হয়েছি। শুনলাম, গৌরদাস না কি কৃষ্ণনাম শুনলেই বিভোর হয়ে যায়। কীর্তন গাইতে গাইতে ওর চোখ ছুটো সজল হয়ে ওঠে। তাই ত ওকে আজ আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে আসতে বলেছি।

(প্রতিবেশী গৌরদাসের ভক্ত দেবেন প্রামাণিক ও হরেন সাহার প্রবেশ)

দেবেন। (জিতেনকে) কি ঠাকুরকর্তা, বালক-সাধু গৌরদাস এখনও আসেন নি?

জিতেন। আরে! দেবেন হরেন এসেছ? এস, এস গৌরদাস এখুনি এসে পড়বে। দুজন লোক পাঠিয়েছি তার আশ্রমে—

দেবেন। হরি! হরি! বুঝলেন ঠাকুরকর্তা, নদীয়ার নিমাই যিনি, তিনিই স্বয়ং গৌরদাসের ভেতরে কায়া ধরেছেন। মহাপ্রভুর সব লক্ষণ হুবহু মিলে যায়।

সত্যেন। আমার মনে হয় দেবেন কাকা, রজনী মোক্তারই ওকে ভগবান বানিয়ে তুলেছে। ঐ বয়সে কত ছেলেরই কত রকমের বাই থাকে।

হরেন। চুপ কর ছোট ঠাকুরকর্তা, তুমি একটা ঘোরতর নাস্তিক। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছয় সাত বৎসর বয়স থেকে সমাধিস্থ হতেন, তন্ময় হয়ে শিবপূজা করতেন, এগুলো বুঝি সব কাঁচা বয়সের ছেলেরাই করে? যা বলবে, ভেবে বল কর্তা।

দেবেন। সত্যি ছোট ঠাকুরকর্তা, তোমার কথাবার্তায় কোন মাথামুণ্ডু নেই। এই বয়সে গৌরদাস কেমন সুন্দর কীর্তন গায়—কেমন সুরেলা গলা! প্রাণ মন যেন একেবারে উজাড় করে ঢেলে দেয় গানে।

জিতেন। হ্যাঁ আমিও শুনেছি, কীর্তন গাইবার সময় ওর নাকি ভাব হয়, ভক্তরা হুড়োহুড়ি করে পায়ের ধুলো নেয়।

দেবেন। আপনি বোধ হয় জানেন না ঠাকুরকর্তা, রজনী মোক্তারই ত গৌরদাসকে আবিষ্কার করলেন। ওর বাপকে ডেকে বললেন, এ ছেলে সামান্য নয়। পূর্বজন্মের অনেক তপস্যায় এমন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ এসেছেন—হেলা করবেন না।

হরেন। রজনী মোক্তারের কি সত্যদৃষ্টি দেখেছ প্রামাণিক! রজনী মোক্তার—

দেবেন। ঠিক বলেছ বসাক, মোক্তারবাবু বালক-সাধুর দিকে লক্ষ্য না করলে ওর সাধন-ভজন, ওর ভক্তিময় মনটা অকালেই মুকুলের মত ঝরে পড়ত।

জিতেন। সংসারের এই নিয়ম বুঝলে হে প্রামাণিক! রামকৃষ্ণের যেমন রানী রাসমণি, তেমনি তোমাদের বালকসাধুর পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক হলেন রজনী। বড় প্রতিভা হলেও একজন প্যাট্রনের দরকার হয়।

দেবেন। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন কর্তাঠাকুর। মোক্তার বাবুই ত শেষ পর্যন্ত গৌরদাসের সব ভার নিয়েছেন। মাহীনগরে টিনের একটা ছোট চালাঘর করেছেন। আশ্রমে চতুর্দোলে আছে রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি, বিধিমত পূজোর সরঞ্জাম। গৌরদাস দিনরাত পূজো নিয়ে মেতে আছে। আশ্রমে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয় আর ভক্তদের কি ভিড়!

সত্যেন। দেবেনকাকা! (মুখে অবিশ্বাসের হাসির মৃদু রেখা) তা হলে গৌরদাস তার চাষী বাপ-মাকে ছেড়ে আশ্রমে বাস করছে! রজনী-দাও কি মোক্তারী ছেড়েছে?

হরেন। (বিরক্ত হয়ে) ছাড়বে না? বিরাটকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করলে অনেক বড় ত্যাগ করতে হয় ছোট ঠাকুরকর্তা। বুদ্ধদেব অতবড় রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করেছিলেন আর বালকসাধু ওঁর বুড়ো বাপ-মা ছাড়তে পারবেন না?

সত্যেন। কিন্তু দাদা কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ও তাঁর গৃহত্যাগের মাঝখানে কোন রজনী মোক্তার ছিল না কিন্তু। সিদ্ধার্থ সংসার ছেড়েছিলেন—

জিতেন। নিজের প্রেরণায় তুমি একথা বলবে তো? কিন্তু তাঁকেও কেউ প্রেরণা দেয় নি—ইতিহাস সেকথা নাও বলতে পারে।

হরেন। আরে ঠাকুরকর্তা, ছোটকর্তার সঙ্গে তুমি মিছিমিছি তর্ক করছ! উনি তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরে আর কিছুই স্বীকার করবেন না।

জিতেন। হ্যাঁ, রক্ত এখনও গরম আছে। দুঃখের অভিজ্ঞতা না থাকলে জ্ঞান আসে না।

দেবেন। হরি বলো! হরি বলো—বুঝলে ছোটকর্তা, ভগবানের বিভূতি কার ভেতর দিয়ে কখন প্রকাশ পায় তা ঠিক করা সহজ নয়।

হরেন। আরো ত কত ছেলে আছে! এমন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে দিনরাত বিভোর হয়ে থাকে কয় জন শুনি?

সত্যেন। কি জানি, আমি কেন যেন রজনী মোক্তার আর গৌরদাসের ভেতরে রহস্যের আঁচ পাচ্ছি। ধর্মমূঢ়তায় অন্ধ ভক্তিবাদের দেশে আশ্চর্য ঘটনা কিছুই নেই—

হরেন। তার মানে তুমি কি বলতে চাও ছোট ঠাকুরকর্তা?

সত্যেন। (উদ্দীপ্ত হয়ে বলল) ফকির-সাধু-মোহান্তকে নিয়ে এদেশের লোক হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির কথা মুখে মুখে ছড়ায়। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান উড়িষ্যার পাগলবাবাকে পরে দেখা যায় মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারীরূপে। কত শোনা যায়, ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী শক্তিমান সন্ন্যাসীর আখড়ায় পুলিস হানা দেয়। তদন্তে প্রমাণ হয় তিনি নামজাদা গুণ্ডা!

জিতেন। থাম—থাম, তুই থাম। তোর ভাল না লাগে, তুই চুপ করে থাক—

দেবেন। দেখ ছোট ঠাকুরকর্তা, রজনী মোক্তার বালক-সাধু আর তাঁর ভক্তদের সামনে আবার কিছু বলে ফেল না—

সত্যেন। না দেবেনকাকা, অত মূর্খ নই আমি। আর আমি যা বলছি তা নাও হতে পারে ত, তবে দেখ রজনী-মোক্তার লোকটা—

(হঠাৎ নেপথ্যে বহু লোকের মৃদু গুঞ্জন ভেসে এল। কয়েক মুহূর্ত পরে আকাশ কাঁপিয়ে শব্দ হ'ল)

বালক-সাধু গৌরদাস বাবাকি জয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণকি জয়!

জিতেন। আরে! এই ত গৌরদাস এসে পড়েছে—

(নেপথ্যের দিকে ছুটে যেতেই রজনী মোক্তার ও গৌরদাসের প্রবেশ। তাদের সঙ্গে জন-দুয়েক ফোঁটা-তিলক কাটা, নামাবলী গায়ে দেওয়া ভক্ত। গৌরদাসের তরুণ মুখখানায় মধুর হাসি। পরনে লালপেড়ে গরদের ধুতি। গায়ে বৃন্দাবনী ছাপের চাদর। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা, তাতে আবার বেলীফুলের মালা। কালো, গোলগাল রজনী মোক্তার খোঁচা খোঁচা গোঁফে হাত বুলিয়ে বলল)

রজনী। কৈ মাষ্টারমশায়? (জিতেনবাবু) বালক-সাধু কোথায় বসবেন ঠিকঠাক করেছেন কিছু?

জিতেন। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠল) এই হরিপদ, জলচৌকিটা পাঠিয়ে দিতে বল তোর বৌদিকে—

(লক্ষ্মীর পায়ের ছাপের আলপনা আঁকা জলচৌকিটা নিয়ে চাকর হরিপদের প্রবেশ। সে ঘরের দেয়াল ঘেঁসে জলচৌকিটা বসিয়ে দিল। সত্যেন চেয়ারেই বসে রইল আগের মত)

রজনী। (গৌরদাসকে) বাবা যান আপনি, আপনার আসন গ্রহণ করুন—

(বালক-সাধু বসলেন। ভক্তরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল)

জয় বালকসাধুকি জয়! জয়, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকি জয়!

(রজনীমোক্তার হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে চোখ বুজে বালকসাধুর সম্মুখে বসল। ভক্তরাও বসলেন)

১ম ভক্ত। সাধুবাবা, আপনি শরীর খারাপ বোধ করছেন না ত?

গৌর। (উদাসীন দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে) না।

২য় ভক্ত। এখন কি নামগান করবেন?

রজনী। না, না, তোমরা থামো না বাপু। মাষ্টারমশায় তাঁর বাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মোৎসবের জন্য ডেকেছেন। উনি যা বলবেন তাই হবে—

(চাকর হরিপদের প্রবেশ)

হরিপদ। দাদাবাবু, (জিতেনকে) পাড়ার মাইরা অন্দরে আইছে। সাধুবাবার দর্শনের লাইগা হুড়াহুড়ি পইড়া গ্যাছেগা। তাগো আইতে কইমু?

জিতেন। থাম এখন। তোর বৌদিকে বল তাঁরা যেন একটু পরে আসেন। ঠাকুরের জন্মোৎসবটা আগে শেষ হতে দে—

সত্যেন। তুমি কি করবে ঠিক করেছ দাদা?

জিতেন। ভেবেছিলাম, ঠাকুরের বাণী পাঠ করাব গৌরদাসকে দিয়ে। আসরের সবাই শুনবে।

(নেপথ্যে হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল। কারা যেন করুণ গলায় চীৎকার করে বলল)

আমরা ভেতরে যেতে চাই—বালক-সাধুকে দর্শন করতে দাও—আমরা বড় দুঃখী—

(নেপথ্যের দিকে ছুটে গেল হরিপদ। প্রবলভাবে হাত ঝাঁকিয়ে বলল)

হরিপদ। তোগো এখানে কে আইতে কইছে? ঠাকুরের সভা হইতাছে—

(হরিপদের পাশ কাটিয়ে এক রকম জোর করেই তিনজন দুঃস্থ লোকের প্রবেশ। তাদের পরনে শতছিন্ন মলিন বসন। চোখেমুখে নিদারুণ দারিদ্র্যের ছাপ।)

জিতেন। তোরা এখানে কি চাস রে?

রজনী। ওরা নিশ্চয়ই সাধুবাবার কাছে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে—

জিতেন। তোরা একপাশে দাঁড়া। তোদের বক্তব্য পরে বলিস। [হরিপদের প্রস্থান]

রজনী। মাষ্টারমশাই, যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করুন। বালক-সাধুর শরীরটা তত ভাল নয়। দেখবেন যেন বেশী পরিশ্রম না হয় বাবার—

জিতেন। তোমার চেয়ে গৌরদাসের উপরে আমার কি দরদ কম রজনী? ও সকলের কাছে মহাপুরুষের সম্মান পেলেও আমাদের কাছে গৌরদাস পতিরামের কেশব মালাকরের ছেলে—

(রজনীর চোখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটল। সে উঠে জিতেন-বাবুর কানের কাছে ফিস ফিস করে কি যেন বলল)

সত্যেন। কি রে গৌরদাস, আমাকে চিনতে পারছিস?

গৌরদাস। (মুখ নীচু করে, লজ্জা-জড়ানো গলায়) কি যে বল ছোড়দা, তোমাকে চিনতে পারব না? কলকাতা থেকে কবে এলে? আজ রাত্রে তোমার কাছে কিন্তু কলকাতার গল্প শুনব—

রজনী। (অধৈর্য্য হয়ে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে) কৈ হে তোমরা কে কে বালক-সাধুর পায়ের ধুলো নেবে? এগিয়ে এস। তোমাদের যা যা প্রার্থনা আছে বল—

(দুঃস্থ দরিদ্র তিন জনের ভিতরে একজন এল)

১। বাবা আমার ছেলেটার বড় অসুখ। বাঁচবে ত?

গৌরদাস। (চোখ দুটো আধ-বোঁজা করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে) আমি কি জানি? আমি কে? একমনে গোপালকে ডাক। যা করবার তিনিই করবেন—

২। সাধুবাবা! তুমি ত অন্তর্য্যামী। তুমি সব দেখতে পাও, বলতে পার—কি দোষে আমার বৌ সব সময় আমাকে দাঁত ছটকানি দিয়ে কথা বলে? এমনিই ত অভাবের সংসার—

১। তুমি যে নেশাভাঙ করে রাতদুপুরে বাড়ী ফের চাঁদ—

২। তুই চুপ কর। মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। তুমি খুব সাধু না? তুই তোর বিধবা পিসীমার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিস বলেই ত তোর ছেলে অসুখে মরতে বসেছে—

হরেন। এই—এই তোমরা থামো। বালক-সাধুকে যা বলবার আছে বল। নিজেরা ঝগড়াঝাটি যা করতে হয় বাড়ী গিয়ে কর। মনে রেখ, এটা মাষ্টারমশায়ের বাড়ী।

(গাঢ় নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল চারিদিক। রজনী গৌরদাসের কানে কানে কি বলল। গৌরদাস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল)

গৌরদাস। (২নং কে) তুমি সৎ হয়ে ভদ্রলোকের মত জীবনযাপন কর। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ হও। তা হলেই তোমার স্ত্রী তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করবে—

৩। বাবা, দেশভাগের ফলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এদেশে এসেছি। সব বাস্তুত্যাগীদের 'রিফিউজি লোন' দিচ্ছে। কিন্তু আমি চাইতে গেলেই রিলিফ অফিসার তেড়ে মারতে আসে—

রজনী। বাপু হে, তুমি কি খালি হাতে রিলিফ অফিসারের

৩। কিছু হাতে থাকবেই যদি তা হলে আর ধার চাইতে যাব কেন?

রজনী। কানে জল ঢুকলে কি করে জল বের করে জান?

৩। হ্যাঁ, আরও কয়েক ফোঁটা জল কানে দিতে হয়।

সত্যেন। রজনীদা, ওকে এই দুর্নীতি শেখাচ্ছ কেন? কেন ও অফিসারকে ঘুষ দিতে যাবে? (তিন নম্বরকে) ও হে তুমি আমার সঙ্গে যেও আপিসে। আমি তোমার রিফিউজি লোনের ব্যবস্থা করব—

৩। (গৌরদাসকে) সাধুবাবা, কি বলেন, যদি কিছু মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে অফিসারের সুমতি করতে পারেন—

গৌরদাস। আমি কি করব? সবই কৃষ্ণের কৃপা। তিনি ইচ্ছা করলে রাজাও হতে পার, আবার চোখের পলকে একেবারে পথের ভিখারীও হয়ে যেতে পার—

দেবেন। তাঁর ইচ্ছাতেই ত আমরা বেঁচে আছি—চলছি, ফিরছি। গাছের পাতা নড়ছে। তাঁর দয়া না হলে আমরা ঐহিক কোন সুখই পেতে পারি না—হরি! হরি!

(গৌরদাস ভাবাবেগে দুলছে। অস্ফুট স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করছে। নেপথ্যে অন্দরমহল থেকে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। হঠাৎ নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল)

গোপালরে—আমার গোপাল! তুই যে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিস—

(আলুথালু বেশে, চুল এলো করে উন্মাদিনীর মত নিঃসন্তানা সরকার-গিন্নী তরুবালার প্রবেশ)

তরুবালা। (গৌরদাসের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে) বাড়ীর ভেতরে তোর জন্য অপেক্ষা করে করে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলাম। এবার তোকে পেয়েছি আর ছেড়ে দেব না।

(গৌরদাস লজ্জায় মাথা হেঁট করল)

সত্যেন—খুড়ীমা, কি হয়েছে তোমার? গৌরদাসের গলা জড়িয়ে ধরছ—ছিঃ, ছিঃ, তোমার লজ্জা হচ্ছে না—

তরু। ছেলের গলা জড়িয়ে ধরতে আবার লজ্জা কিসের রে? কাল রাতেই যে ওকে আমি স্বপ্ন দেখেছি।

১ম ভক্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি ঠিক চিনেছেন।

২য় ভক্ত। মনে আকুলতা না এলে ত উনি দর্শন দেন না।

হরেন। মা, আপনার গোপাল কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই আপনার। আপনার দুঃখ নিশ্চয়ই ঘুচবে।

(হরিপদের প্রবেশ)

হরিপদ। (হরেনকে) কত্তা, আপনার চাকর আইছে। ডাকতাছে আপনাকে। আপনার পোলার অসুখ বাড়ছে।

হরেন। এ্যা—(বালক-সাধুর পায়ের কাছে বসে) তুমি বলে দাও ঠাকুর—কি করলে আমার ছেলে ভাল হবে।

গৌরদাস। খুব ভাল করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে নারায়ণ-পূজা

হরেন। নারায়ণ-পূজা দিলেই ভাল হবে ঠাকুর—হবে ?

গৌরদাস। হ্যাঁ ভাল হবে।

(কুঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে হরেনের প্রস্থান)

৩। (হঠাৎ আবেগে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল) বাস্তুভিটে ছেড়ে এদেশে একেবারে পথের ভিখারী হয়ে এসেছি। কিছু দিয়েই তোমার সেবা করতে পারলাম না ঠাকুর। নাও নাও তুমি আমার মন উজাড় করা ভক্তি নাও। তুমি আমাকে কৃপা কর।

(সজোরে মাথা ঠুকতে লাগল গৌরদাসের পায়ের কাছে আর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল)

জিতেন। আরে—আরে, লোকটা মরে যাবে যে ?

রজনী। ছেড়ে দিন মাষ্টার মশাই! ওর ভাব এসেছে!

(৩ নং হঠাৎ টান হয়ে শুয়ে পড়ল। হাত-পা শক্ত কাঠের মত হয়ে গেল)

সত্যেন। এই হরিপদ—জল—জল নিয়ে আয় শীগগির—এক ঘটি জল। 'সেন্সলেস' হয়ে গেছে।

(হরিপদ ছুটে প্রস্থানোদ্যত হতেই আবার সত্যেন ডাক দিল)

এই হরিপদ শোন—শোন। ব্লটিং পেপারের টুকরো আর দু' একটা শুকনো মরিচ নিয়ে আসিস।

হরিপদ। কোথায় হইত ঠাকুরের উৎসব। তা না ভাল রঙ্গ সুরু হইল দেখতাছি।

প্রস্থান]

রজনী। ওর কানের কাছে গিয়ে কেউ হরিনাম উচ্চারণ কর। জ্ঞান ফিরে আসবে।

১। (তিন নম্বরের কানের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলতে লাগল) হ রি বল—হ রি বল—রাধাকৃষ্ণ বল।

২। (তিন নম্বরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে) কিরে শ্রীকৃষ্ণ-ঠাকুরের দর্শন পেলি ? তিনি তোর রিফিউজি লোন সম্বন্ধে কিছু বললেন ?

(ব্লটিং পেপারের টুকরো, দুটো শুকনো মরিচ আর এক ঘটি জল নিয়ে হরিপদের প্রবেশ)

সত্যেন। এই সরে যাও—সরে যাও সব। যত সব বুজরুকের আড্ডা হয়েছে এখানে।

রজনী! আমাদের ভক্তদের এ রকম বলো না।

সত্যেন। থামো তো তুমি রজনীদা।

রজনী। বেশী ইয়ে করলে সাধুবাবাকে নিয়ে যাব।

গৌরদাস। রজনীদা, ছোড়দার সঙ্গে ওরকম করে কথা বলবেন না।

(সত্যেন তিন নম্বরের মাথায় জলের ঝাপটা দিতে লাগল। ব্লটিং পেপার আর শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া তার নাকে দিল)

৩। (সমস্ত শরীর মুচড়িয়ে জড়িত গলায় বলল) এ কি আমি কোথায় ? আমি বালক-সাধুর কাছে রিফিউজি লোনের জন্ত এসেছিলাম না ?

সত্যেন। হ্যাঁ, এসেছিলে, এবার বাড়ী যাও।

জিতেন। (এক, দুই, তিন নম্বরকে উদ্দেশ্য করে বলল) ওহে তোমরা এখন বাড়ী যাও তো। তোমরা বালক-সাধুর আশ্রমে গিয়ে দেখা কর। যাও—যাও।

[এক, দুই, তিন নম্বরের প্রস্থান]

রজনী। ও বাবা যে সে সাধু নয়! ওর চোখে চোখে তাকালে যে কেউ অজ্ঞান হতে বাধ্য।

(গ্রামের পুরোহিত নিতাই ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

নিতাই। হুঁ সাধু না আরও কিছু! বুঝলেন, মাষ্টার মশাই, হাবাগোবা ছেলেটাকে নিয়ে মোক্তারী প্যাঁচ খেলিয়ে রজনী কারবার খুলেছে ভাল। আরে মায়ের পেট থেকে পড়েই কেউ সাধু হয় না। সাধন-ভজন চাই বুঝলেন? একদিন এই বুজরুকি ভাঙবে দেখবেন।

(বালক-সাধুর দুই জন ভক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। এক নম্বর ভক্ত লাফিয়ে এসে পুরোহিতের ঘাড় ধরে বললে)

১ম ভক্ত। কেন, কোন সাহসে তুমি আমাদের বালক-সাধুকে অপমান করছ ঠাকুর ?

২য় ভক্ত। তোমার বুঝি অন্ন মারা যাচ্ছে, না? তাই তোমার গা জ্বালা করছে।

নিতাই। হ্যাঁ হ্যাঁ—একশো বার বলব এসব বুজরুকি—সব তোমাদের শেখানো-পড়ানো।

১ম ভক্ত। মুখ সামলে কথা বল ঠাকুর।

২য় ভক্ত। বিশটা গ্রামের লোকে যাঁকে শ্রদ্ধা করে তাঁর সম্বন্ধে এ রকম বল না।

জিতেন। ওসব বল না নিতাই। অনেক দূর থেকে এসেছে ওর সব ভক্তরা। এখুনি ওরা মারমূর্ত্তি হয়ে উঠবে।

নিতাই। কি, মারপিটের ভয়ে সত্য গোপন করব না কি ? (চাদরের নীচ থেকে পৈতে বের করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল) আমি এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি।

রজনী। কি বলছ ? কি তোমার সত্য কথাটা শুনি ?

নিতাই। আমি গৌরদাসের বাবা কেশবের কাছে গিয়েছিলাম। কেশব কেঁদে বলল, রজনীবাবু আমার ছেলে কেড়ে নিয়েছে। তাকে সঙ সাজিয়ে প্রচুর পয়সা রোজগার করছে।

রজনী। বুঝলেন মাষ্টার মশাই, সব মিথ্যে বলছে শালা।

১ম ভক্ত। তবে রে শালা, চালকলা-বাঁধা ঠাকুর। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

২য় ভক্ত। মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব।

(দুই ভক্ত নিতাইয়ের পিঠে বৃষ্টির মত কিল চড় মারতে লাগল)

জিতেন। এই—এই ও কি হচ্ছে! কি হচ্ছে? দাঙ্গাবাজী করবার জায়গা এটা নয়। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ওকে।

(নিতাই অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। জিতেন ভক্তদের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের দ্রুত প্রস্থান। নেপথ্য থেকে তার আক্রোশ-ভরা গলার স্বর শোনা গেল)

নিতাই। (নেপথ্যে) দেখ—এই চক্রান্ত একদিন সকলেই জানতে পারবে। রজনী আশ্রমে কতকগুলো গুণ্ডা পুষছে।

জিতেন। রজনী, তোমার ভক্তদের আশ্রমে যেতে বল।

রজনী। কেন? ওরা তো—

জিতেন। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। এই মুহূর্তে ওদের যেতে বল।

তরু। আহা! নিতাই ঠাকুরকে এখুনি মেরে ফেলত ওরা। কি সব ডাকাতের মত চেহারা।

সত্যেন। এটা চক্রবর্তি বাড়ীর বৈঠকখানা! 'বক্সিং' খেলবার মাঠ নয়।

জিতেন। ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তোমাদের ডেকেছি রজনী। আজকের এই পুণ্যদিনে আমারই বাড়ীতে এই অশোভন অপ্রীতিকর ঘটনা।

রজনী। (ভক্তদের) ওহে তোমরা যাও—

[ভক্তদের প্রস্থান]

গৌরদাস। আমি বড় ক্লান্ত! আমাকে বাতাস কর।

জিতেন। এই হরিপদ—পাখা নিয়ে আয় ত একটা জলদি—(নেপথ্যে তাকিয়ে হাঁক দিল)

(দুটো পাখা নিয়ে হরিপদের প্রবেশ। একটা পাখা ছো দিয়ে কেড়ে নিল তরুবালা। হরিপদ আর তরুবালা দু'জনে গৌরদাসের দু'দিকে দাঁড়িয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল)

জিতেন। রজনী, গৌরদাসের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

দেবেন। বড় ঠাকুরকর্তা, আমার একটা নিবেদন আছে বালক-সাধুর কাছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তাঁকে বলবার সুযোগ পাই নি হট্টগোলের ভিতরে।

জিতেন। তোমার নিবেদন বালক-সাধুকে বলেই চলে যেতে হবে কিন্তু। আমাদের এখানে বড্ড জরুরি কাজ আছে।

দেবেন। তাই যাব বড় ঠাকুরকর্তা!

(বালক-সাধুর পায়ের কাছে বসে ভক্তিভরে বলল)

আচ্ছা সাধুবাবা, যক্ষ্মারোগে পর পর দুটো জোয়ান ছেলে আমার মারা গেছে। সেজ ছেলেকেও রাজরোগে ধরেছে। কত ওষুধ-বিষুদ করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না কেন বলতে পার?

গৌরদাস। তোমাদের বংশে গুরুতর পাপ ঢুকেছে। করে আবার পনের বছর বয়সে আমরা দীক্ষা নিই।

গৌরদাস। তোমাদের তিনতলা দালানটা হয়েছে প্রামাণিক?

দেবেন। কেমন করে আবার? বাবা সাহেব-কাছারীর পাটোয়ারী ছিলেন, তাঁর উপার্জ্জনেই হয়েছে।

গৌরদাস। সাহেব-কাছারীর তহবিল ভেঙ্গে ভেঙ্গে তোমার বাবা ঐ দালান তুলেছিলেন।

(দেবেনের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ চিৎকার করে গৌরদাসের পায়ে আছড়ে পড়ল। আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বলল)

দেবেন। যে কথা কেউ জানে না, সে কথা তুমি কি করে জানলে ঠাকুর?

রজনী। যোগবলে—

দেবেন। কি করলে আমাদের এই গ্রহ কেটে যাবে ঠাকুর?

রজনী। তুমি কাঁজিয়ালসী গ্রামের নারায়ণ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়েছ ত?

দেবেন। আজ্ঞে হাঁ!

গৌরদাস। ওতে কিছু কাজ হবে না। তোমাকে সস্ত্রীক হরিদ্বারের শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দের কাছে দীক্ষা নিতে হবে।

দেবেন। দীক্ষা নিলেই দোষ কেটে যাবে বাবা?

গৌরদাস। নিশ্চয়ই। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সবাই পাপের বৈতরণী পার হয়ে যায়। মন দিয়ে সাধন ভজন করলে তুমি পারবে না কেন?

দেবেন। গ্রহ কেটে যাবে বাবা? দীক্ষা নিলেই গ্রহ কেটে যাবে?

গৌরদাস। হাঁ।

(উত্তেজিত হয়ে দেবেন গৌরদাসকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল। আর চিৎকার করে গান শুরু করল)

দেবেন। জীব তরাতে এসেছেন নিমাই
দেখে নে রে দু' চোখ ভরে'

(রজনীও ভাবাবেগে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল)

জিতেন। এই দেবেন—কি হচ্ছে? ওকে নামিয়ে দাও—কাঁধ থেকে পড়ে যাবে যে।

(গৌরদাসকে জলচৌকিতে বসিয়ে দিয়ে দেবেন তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল)

দেবেন। যাই ঠাকুর—সস্ত্রীক হরিদ্বারে যাবার ব্যবস্থা করি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর।

(গৌরদাস ডান হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে আশীর্ব্বাদের মুদ্রা করল। আবার মাটিতে লুটিয়ে তাকে প্রণাম করে দেবেনের প্রস্থান)

সত্যেন। (তরুবালাকে) খুড়ীমা, আপনার গোপালকে ত

তরুবালা। একদণ্ড ওকে চোখের আড়াল করলে বুকের ভেতরটা যে হু হু করে রে! তুই আমাকে যেতে বলিস না সত্য।

রজনী। রাত হয়েছে। মাষ্টার মশায় ঠাকুরের সেবার সময় উতরে যাচ্ছে।

হরিপদ। (জিতেনকে) বড় দাদাবাবু! মা কইছেন বালক-সাধু আজ রাত্রে আমাগো বাড়ীতে থাকবেন।

রজনী। দেখুন মাষ্টার মশায়, কাল ভোরে আবার খাসপুরের জমিদার বাড়ীর মেয়েরা আশ্রমে আসবেন। তাঁরা খবর পাঠিয়েছেন। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি—

জিতেন। রজনী, তোমার ত সাহস কম না! আমাদের চক্রোত্তিবাড়ী চিরকাল এই তল্লাটের বিশটা গ্রামের মাথা! আমার মায়ের একটা সামান্য অনুরোধ থাকবে না?

গৌরদাস। আজ আমি এখানে থাকব রজনীদা। তুমি আপত্তি করো না।

রজনী। বেশ, বেশ ত! তোমারই অসুবিধে যদি হয় তাই বলছিলাম।

গৌরদাস। (জিতেন, সত্যেনকে ইঙ্গিত করে) এই বড়দা ছোড়দাকে ছোটকাল থেকে নিজের দাদার মত দেখে এসেছি। ওঁরা আমার নিজের দাদার চেয়েও বেশী! ওঁদের এখানে একরাত্রি থাকলে আমার হবে অসুবিধে—তুমি বলছ কি রজনীদা?

(জিতেনের স্ত্রী সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। (জিতেনকে) ওগো শুনছ, গৌরদাস মা'র সঙ্গে তাঁর ঠাকুরঘরে বসে খাবে। মা বুড়ো মানুষ। ওর জন্ম অপেক্ষা করে করে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন।

সত্যেন। যাও গৌরদাস, বৌদির সঙ্গে তুমি ভিতরে যাও।

(সুনীতি, গৌরদাস, তরুবালা ও হরিপদের প্রস্থান)

রজনী। আমিও এই সঙ্গে যাই না কেন মাষ্টার-মশায়?

জিতেন। তুমি ত আচ্ছা ঠেঁটকাটা হে রজনী! শুনলে ত মা গৌরদাসকে একলা চেয়েছেন। সেখানে তুমি যাবে কি রকম?

রজনী। না, এই মানে, বালক-সাধুর সেবার যদি কোন বিঘ্ন ঘটে।

সত্যেন। ঘটে—ঘটবে। গৌরদাস সকলের কাছে বালক-সাধু হলেও এ বাড়ীতে কেউ ওকে জীবন্ত ঠাকুর বা মহাপুরুষ বলে ভাববে না। আমার ভাইপোর সঙ্গে ও বহুবার এ বাড়ীতে এসেছে। আগে ওর যেমন স্নেহ ও যত্নের ত্রুটি হয় নি, তেমনি এবারও হবে না।

জিতেন। শোন রজনী, তোমাকে আর গৌরদাসকে যে জন্ম ডেকেছি।

রজনী। হাঁ, সে ত ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মোৎসবের জন্ম ডেকেছিলেন, কিন্তু—

জিতেন। ধূপধুনো দিয়ে জাঁকজমক করে ঠাকুরের দুটো বাণী আউড়ে গতানুগতিক ভাবে তাঁর জন্মতিথি পালন করার পক্ষপাতী আমি নই। ঠাকুরের সরল, উদার ধর্মমত প্রচারের জন্ম সত্যিকারের কিছু কাজ করতে চাই।

রজনী। কি করতে চান? আমরা কি করব?

জিতেন। তোমাকে কিছু করতে হবে না, শুধু মোক্তারবাবে ফিরে যেতে হবে আশ্রম তুলে দিয়ে। আর আমি গৌরদাসকে কলকাতায় বেলুড়মঠে নিয়ে যেতে চাই।

রজনী। (আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল) গৌরদাসকে! বেলুড়মঠে। কেন?

জিতেন। গৌরদাসকে যতই তুমি বালক-সাধু বলে প্রচার কর না কেন, আসলে ও সাধুটাধু কিছু নয়—

রজনী। তবে কি ও?

জিতেন। গৌরদাসের মনটা শুভ্র, অপাপবিদ্ধ ফুলের মত পবিত্র। ও খাঁটি ভক্ত। বেলুড়মঠে গেলেই ওর উন্নতি হবে। ও পথ খুঁজে পাবে—

রজনী। না, না! দয়া করে এই কথাটি বলবেন না মাষ্টার-মশাই। এ অঞ্চলের হাজার হাজার দুঃস্থ আর্ত্ত মানুষ শুধু গৌর-দাসকে একবার দর্শন করেই সান্ত্বনা পায়। এদের সকলের মায়া-মমতা শ্রদ্ধা দিয়ে তিলে তিলে গড়া এই বালক ভগবানকে এই বহুর স্রোতে ভাসিয়ে দেবেন না। আমাদের অনাথ করে দেবেন না, দোহাই মাষ্টারমশায়।

সত্যেন। তোমার বালক-সাধুর আশ্রমে দৈনিক কতজন ভক্ত আসেন রজনীদা?

রজনী। তা দু'বেলা প্রায় শ'খানেক লোক আসে। দূর দূর গ্রাম থেকে গোরুর গাড়ী করে আসে।

সত্যেন। তাদের প্রণামী থেকে তোমার কত আয় হয়?

রজনী। আয়? মানে—বলছ কি সত্যেন? আমি জন-সাধারণের স্বার্থে মোক্তারী ছেড়ে আশ্রম তৈরি করেছি। বালক-সাধুকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছি। নিয়মিত ভাগবত পাঠ হয়—

সত্যেন। তা ত হ'ল। কিন্তু মোক্তারী ছেড়ে দিয়ে তোমার সংসার চলছে কি করে?

(নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠের একটা আকুলকরা চীৎকার ভেসে এল)

বালক সাধু কি এখানে আছেন?

(সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে একটা ভারী গলার ডাক শোনা গেল)

কৈ হে জিতেন মাষ্টার আছ না কি?

জিতেন। শশী ডাক্তারের গলা বলে মনে হচ্ছে! শশীদা না কি? ভেতরে এস—

(শশী ডাক্তারের প্রবেশ। গলায় কণ্ঠির মালা। নাকে রসকলি। কপালে তিলক। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাইঝি, আঠার বছরের বিধবা তরুণী কল্যাণী। কল্যাণীর গায়ের রঙ শ্যামলা। বড় বড় দুটো উজ্জ্বল চোখ)

নিশ্চয়ই বালক-সাধুর খোঁজে এসেছ শশীদা ?

শশী। আর বল কেন ভাই, সারাটা জীবন ত সাধুসন্ন্যাসী নিয়েই কাটিয়ে দিলাম। বিদেহী এবং দেহধারী মহাপুরুষদের প্রতি আকর্ষণ আমি আর কাটিয়ে উঠতে পারলাম না ভাই—

সত্যেন। তাই ত দেখছি শশীদা! অন্ধ আবেগে সাধু-সন্ন্যাসীর সেবায় অনেক খেসারত দিয়েছেন। কিন্তু আপনার স্বভাব শোধরায় নি—

শশী। স্বভাব আর বদলাবে না ভাই!

জিতেন। কিন্তু মেয়েটি কে শশীদা ?

শশী। আরে ওর জন্যই ত আসা। ও আমার ভাইঝি কল্যাণী। কল্যাণী গৌরদাসকে মনে করে দেহধারী কানাই। কিন্তু ঠাকুর ওকে আমল দেয় না। তাতে ওর কোন দুঃখ নেই। মুগ্ধ, তন্ময় অপলক চোখে ঠাকুরকে দেখেই ওর আনন্দ।

জিতেন। এত ভক্তি! এত ধর্মবিশ্বাস এতটুকু মেয়ের! ওকে বেলুড়মঠে পাঠিয়ে দাও না শশীদা ?

শশী। (আবেগে বলতে সুরু করল) সত্যি, ওর নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই জিতেন! লেখাপড়া কিই বা জানে। তবু ওর মুখে ধর্মের কথা শুনে অবাক না হয়ে পারি না। আমি বলি, 'তুই বালক-সাধুর আশ্রমেই থেকে যা'। কল্যাণী হেসে বলে— 'কাকা, অকুলে না ভাসলে কুল পাওয়া যায় না; চমৎকার কীর্ত্তন গায়।

জিতেন। রাত হয়েছে অনেক। শশীদা, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?

শশী। না। খাওয়ার জন্য ব্যস্ত কি ? সে সব পরে হবে—

কল্যাণী। আমি আগে বালক-সাধুকে দর্শন করতে চাই— কাকাবাবু ?

রজনী। কথা কি জানেন মাষ্টার মশাই! দেখছি ত এত ভক্ত আছে বালক-সাধুর। কিন্তু কল্যাণীর মত কেউ নয়। এত দয়া, এত করুণা, তবু ঠাকুর ওকে দেখলেই কেমন যেন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন—

সত্যেন। কেন ? নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন কেন ?

রজনী। যে যত বড় আধার, তার পরীক্ষা যে তত বেশী।

জিতেন। আমাদের দেশের মেয়েদের সহজ ধর্মবিশ্বাস আর গভীর ভক্তিনিষ্ঠার তুলনা নেই শশীদা!

শশী। ঠিক বলেছ জিতেন। মথুরার রাধাকুণ্ডে এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছর ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেছেন। রাধাগোবিন্দের ভাবে বিভোর। জিজ্ঞাসা করেছিলাম— মা তাঁর দেখা পেলেন ? মৃদু হেসে তিনি বললেন—সব দিতে পারলাম কৈ বাছা ? ষোল আনা মনপ্রাণ দিতে পারলাম কৈ ? হয়ত উন্মাদিনী এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে—

সত্যেন। একটা কথা বলব শশীদা, আপনি কিছু মনে করবেন না কিন্তু—কল্যাণী আপনার ভাইঝি। আমারও স্নেহের পাত্রী।

শশী। বল না হে। ইতস্ততঃ করছ কেন ?

সত্যেন। ভরা বয়স ওর। আপনার কথামত বালক-সাধুর আশ্রমে থাকলে কিন্তু—

শশী। তুমি বলছ লোকে খুব নিন্দা করবে। আমিও সেকথা ভেবেছি। তাই ত কল্যাণীকে বলেছি, গৌরদাসের কাছে মন্ত্র নিয়ে বাড়ীতে বসে সাধন ভজন কর।

(হঠাৎ কল্যাণী ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল কাকার পায়ের কাছে। ব্যাকুল কান্নাভরা গলায় বলল)

কল্যাণী। না, না! এমন কথা বলবেন না কাকাবাবু। লোকে যা খুশি বলুক। কলঙ্কের বিষে রাধার সোনার অঙ্গও কালো হয়ে গিয়েছিল। বালক-সাধুর ঐ রাঙা চরণ দুটো ছাড়া ত্রিভুবনে আমার আর ঠাঁই নেই। যেদিন প্রথম দেখেছি ওঁকে, সেদিন থেকেই কচি কিশোর ঢল ঢল মুখখানা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে কাকাবাবু।

রজনী। আমিও বহুবার ওকে বলেছি সত্যেন। সকলের চোখ ত এক রকম নয়।

কল্যাণী। (ভাবে বিভোর হয়ে চোখ দুটো আধবোজা করে) বালক-সাধু বড় নিষ্ঠুর দেবতা! আমাকে দুঃখ দিয়েই আনন্দ দেয়।

সত্যেন। (চাপা বিরক্তিভরা গলায়) হোপলেস সেন্টিমেন্টা-লিজম্—

(সুনীতির প্রবেশ)

সুনীতি। (জিতেনকে) তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবে না ? মা-র ঘরে গৌরদাসের খাওয়া ত প্রায় হয়ে এল—

(হঠাৎ কল্যাণীকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুনীতি। কল্যাণীর কাছে এগিয়ে এসে, তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সুনীতির চোখে বিষাদের ছায়া নামল। আর্ত্ত গলায় বলল)

কল্যাণী! এ কি বেশ তোর ? তোর কপাল পুড়ল কবে ?

শশী। ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলাম বৌমা! ছেলেটি ছিল ডাক্তার। কিন্তু ওর কপালই মন্দ—

জিতেন। ওঃ, তোমার এই ভাইঝিরই 'হাজবেণ্ড' বোধ হয় রেলে কাটা পড়ে—না শশীদা ?

শশী। হ্যাঁ, হ্যাঁ অপঘাত মৃত্যু।

সুনীতি। (পরম স্নেহে কল্যাণীর চিবুক স্পর্শ করে বলল) এই ত এক বছর আগে বিয়ের রাতে তোকে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিলাম—(জিতেনকে ইঙ্গিত করে) কৈ কল্যাণীর কথা তুমি কিছু বল নি ত ?

জিতেন। শশীদার আরও ত ভাইঝি আছে। বেলা, জুঁই, পারুল। কার স্বামী মারা গেছে, তা ত ভাল করে জানতাম না—

শশী। এ আলোচনা ছেড়ে দাও বৌমা। মৃত্যুর মত এমন স্বাভাবিক পরিণতি জীবের আর কি আছে ? হরি বল! হরি বল! (জিতেনকে ইঙ্গিত করে) আমাকে এখখুনি যেতে হবে জিতেন,

সুনীতি। কল্যাণী আজকের রাতটা আমার কাছেই থাকবে। আপনি কাল এসে নিয়ে যাবেন শশীদা—

শশী। তাই ভাল হবে বৌমা। তোমার কাছে ও খুব আনন্দে থাকবে—

জিতেন। কাল কিন্তু এস শশীদা। (শশীর প্রস্থান)

সুনীতি। চল কল্যাণী ভেতরে চল। (জিতেনকে) তুমিও সবাইকে নিয়ে এস। রান্নাঘরের বারান্দায় সকলের খাওয়ার জায়গা হয়েছে—

জিতেন। চল হে রজনী।

কল্যাণী। ভেতরে গেলে ঠাকুরের দর্শন পাব ত কাকীমা?

সুনীতি। হ্যাঁ পাবি। গৌরদাসের খাওয়া প্রায় হয়ে গেছে।

(জিতেন, রজনী ও কল্যাণীর প্রস্থান। সবশেষে সুনীতি প্রস্থানোদ্যত হতেই চাপা গলায় সত্যেন ডাকল)

সত্যেন। বৌদি শোন।

সুনীতি। ওমা! তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন ঠাকুরপো? চল খেয়ে নেবে চল—

সত্যেন। আচ্ছা বৌদি, তোমরা মেয়েরা ত মানুষের মন 'এক্স-রে' করতে পার না?

সুনীতি। এই রাতদুপুরে আবার কি হেঁয়ালী সুরু করলে ঠাকুরপো? যা বলতে চাও সোজাসুজি বল না বাপু।

সত্যেন। (সুনীতির কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায়) কল্যাণীকে কেমন বুঝছ?

সুনীতি। সে আবার কি কথা? কেন ও ত খুব ভক্তিমতী মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে ত, তাই বেচারা জপতপ পুজো নিয়ে আছে—

সত্যেন। কিন্তু বৌদি! আমার ত মনে হচ্ছে, কল্যাণীর চোখ দুটোয় কিসের যেন নেশা টলমল করছে।

সুনীতি। দূর্ কি যে বল ঠাকুরপো? তুমিই আইবুড়ো হয়ে রয়েছ কিনা, তাই কল্যাণীই তোমার চোখে নেশা ধরিয়েছে। এত করে বলছি, বিয়ে থা কর একটা।

সত্যেন। না, না বৌদি ঠাট্টা নয়। শোন, কল্যাণীর এসব অর্থহীন কথার কলকাকলী আর গৌরদাসের ওপর গভীর অনুরাগ দেখে শুনে মনে হয়—

সুনীতি। কি মনে হয় ঠাকুরপো?

সত্যেন। মনে হয় কল্যাণী গৌরদাসের অনুরাগিনী হয়েছে।

সুনীতি। (কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে) তুমি বলছ এ কথা ঠাকুরপো?

সত্যেন। হ্যাঁ। কল্যাণীর চোখের দৃষ্টি এ কথা বলছে।

সুনীতি। আমারও তাই মনে হয় ঠাকুরপো। রজনী মোক্তার, এমনকি গৌরদাস পর্য্যন্ত কত দিন কল্যাণীকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও সে আশ্রমে যায়। ছয় মাস থেকে গৌরদাসের আশপাশে ছায়ার মত ঘুরছে। তোমার অনুমানই হয়ত,

(নেপথ্য থেকে জিতেনের ভারী গলায় ডাক শোনা গেল)

জিতেন। (নেপথ্যে) সুনীতি, এদিকে এস। আমরা যে সবাই খেতে বসেছি—

সুনীতি। আমি যাই ঠাকুরপো। গৌরদাসকে একলা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং খোলাখুলি ভাবে ওকেই জিজ্ঞাসা কর। আমারও মতামত তোমারই মত ঠাকুরপো—ধর্ম্মের মেকী আচার-অনুষ্ঠানে ডুবে থেকে জীবন-যৌবনের অপচয় করা শুধু অন্যায় নয়, পাপও—

সত্যেন। ঠিক বলেছ বৌদি, সত্যি যদি গৌরদাসও কল্যাণীকে ভালবাসে—তা হলে রজনীর খপ্পর থেকে ওকে উদ্ধার করে সংসারে ফিরিয়ে দিতে হবে—

সুনীতি। দেখ, সেই চেষ্টা করে। কল্যাণীর ব্যর্থ রুক্ষ জীবনটা ফুলে ফলে ভরে উঠবে তা হলে— (প্রস্থান)

(গৌরদাসের প্রবেশ। চোখেমুখে নিদারুণ বিরক্তির ছাপ)

সত্যেন। আয়, আয় গৌরদাস। তোর মুখ ভার কেন রে?

গৌর। আর বল কেন ছোড়দা? অষ্টপ্রহর মাছির মত ছেঁকে ধরে থাকে মানুষগুলো। এসেছি তোমাদের বাড়ী। দেখ পিছু পিছু শশী ডাক্তার এসেছে, তার ভাইঝিটাকে পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছে—

সত্যেন। তোর ত এ সব ভালই লাগে গৌরদাস। দিব্যি শত শত লোকের পুজো পাচ্ছিস। প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছিস। তুই ত দেবতা রে!

গৌর। (দাঁতে দাঁত চেপে ধরে) দেবতা—না ছাই! ছোড়দা, বিশ্বাস করুন; রজনীই আমাকে ওর স্বার্থে দেবতা বানিয়ে তুলেছে। আমি ছোটকাল থেকে কৃষ্ণনাম করি। লক্ষ্মীর পাঁচালী সুর করে পড়তে ভাল লাগে—এর চেয়ে বেশী আর কিছু নয়—

সত্যেন। তুই তা হলে ভগবান নস। রজনী যে বলে বেড়ায়, 'চোখ বুজলেই বালক-সাধু বিশ্বরূপ দেখতে পান'—

গৌর। ওসব রজনীর সাজানো কথা ছোড়দা। আমাকে ভক্তদের উপদ্রব থেকে বাঁচান। (গলার স্বর নামিয়ে চাপা যন্ত্রণাভরা গলায়) আমি আর পারছি না ছোড়দা! আমি মানুষের মত হেসে-কেঁদে, ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে বাঁচতে চাই ছোড়দা—

সত্যেন। তুই রজনীর এই লাভের ব্যবসার উপকরণ হয়ে না থেকে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাড়ী চলে যা না কেন?

গৌর। ছোড়দা, ছেড়ে দে বললেই কি ছাড়া যায়? রজনী যে মোক্তারী প্যাঁচ কষিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমাকে—

সত্যেন। কি রকম? তোকে কিছু মাইনে দেয় না কি দেবতার ভূমিকায় তোর অভিনয়ের জন্য?

গৌর। পয়সাওয়ালা বহু ভক্ত মেয়ে-পুরুষ দুবেলা আসে আমাদের আশ্রমে। পাশের ঘরে শুনি, তাদের সঙ্গে রজনী মোক্তারের ফিস ফিস কথাবার্ত্তা; টাকা-পয়সার টুং টাং শব্দ। দৈনিক প্রচুর আয় করে রজনী। আমাকে এক পয়সা দেয় না। শুধু বাবার হাতে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা দেয় রজনী। ওতেই আমাদের দিন চলে—

সত্যেন। ওদিকে তুই সন্ন্যাসী হয়ে গেছিস বলে, তোর বাবা কাঁদছে—

গৌর। বাবা-মা কাঁদছেন তার কারণ, আমি আশ্রমে ভগবান হয়ে থাকলে তাঁরা কোন দিনই ছেলের বৌয়ের মুখ দেখতে পাবেন না—

সত্যেন। তুই জোয়ানমদ্দ আছিস। খেটে বাবা মাকে খাওয়াবি। রজনীর লোকঠকানো ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আয়—

গৌর। বেরিয়ে আসতে পারি ছোড়দা, কিন্তু—

সত্যেন। কিন্তু কি? খোলাখুলি বল্। যদি কেউ পারে, আমিই পারব বুড়ো রজনীর শয়তানী ষড়যন্ত্র আর কতকগুলো আধ পাগলা লোকের ক্ষ্যাপামি থেকে তোকে উদ্ধার করতে। চল আমার সঙ্গে কলকাতায়। তোকে আমি মানুষের মত করে বাঁচতে শিখিয়ে দেব—

গৌর। (সারা মুখ জুড়ে আনন্দের বিদ্যুত ঝকমক করে উঠল) ছোড়দা, তুমি ত আমার চেয়ে মাত্র বছর চারেকের বড়। তবুও তোমাকে বলতে লজ্জা হচ্ছে—

সত্যেন। বলেই ফেল না। আমার কাছে তোর কোন লজ্জা নেই।

গৌর। ছোড়দা, আমি কল্যাণীকে ভালবাসি।

সত্যেন। কল্যাণীকে দেখে মনে হয়, তারও তোর প্রতি দুর্বলতা আছে—

গৌর। একদিন আষাঢ়ের এক মেঘলা সন্ধ্যায় প্রথম কল্যাণী এসেছিল আমাদের আশ্রমে আমাকে দেখতে। মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত কমনীয়তা-মাখা ওর মুখখানা, পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মত ওর উজ্জ্বল দুটো চোখ সেদিনই আমাকে মাতাল করে দিয়েছে ছোড়দা।

সত্যেন। প্রথম দিন তুই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি শুনলাম—

গৌর। হ্যাঁ দিয়েছিলাম ছোড়দা। ওর দুটো টানা টানা চোখের অপলক দৃষ্টি আমাকে চঞ্চল করে দিয়েছিল। কল্যাণীকে দেখেই বুঝতে পারলাম আমি দেবতা নই, রক্তমাংসের মানুষ ছোড়দা!

সত্যেন। রজনী নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি তোদের এই দুর্বলতা বুঝতে পেরেছে?

গৌর। হ্যাঁ। ওর শকুনির মত দুটো চোখের দৃষ্টি সর্বদা আমাকে পাহারা দেয় ছোড়দা। কল্যাণী আমার সামনে এলেই ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

সত্যেন। কল্যাণীও কি তোর ভগবানের এই ছদ্মবেশের আড়ালে তোর ভিতরের মানুষটাকে দেখতে পেয়েছে?

গৌর। নিশ্চয়ই পেয়েছে। কল্যাণী ত দেবতার কাছে আসে নি। পতঙ্গের মত ও আমার কাছে ছুটে এসেছে।

(সুনীতি ও কল্যাণীর প্রবেশ)

সুনীতি। (কল্যাণীকে) এই যে তোমার ঠাকুর—নাও হ'ল ত? বাবাঃ, কি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে! (সত্যেনকে) ঠাকুরপো তোমার দাদা লাইব্রেরীঘরে বসে রজনীবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন। তুমি খেয়ে নেবে এস।

সত্যেন। ওরা কি আলাপ করছে বৌদি?

সুনীতি। গৌরদাস সম্বন্ধেই আলাপ করছেন। তোমার দাদা ওকে বেলুড়ে নিয়ে যেতে চান। রজনীবাবু সেই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী নন।

সত্যেন। নাঃ, গৌরদাসকে ত আচ্ছা আড়কাঠিতে ফেলেছে! দেখি কি করতে পারি। চল—চল।

[সুনীতির সঙ্গে খুব ব্যস্ত এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে সত্যেনের প্রস্থান]

কল্যাণী। সত্যি, তুমি কি বেলুড় মঠে চলে যাবে?

গৌরদাস। কি জানি! বড়দার বিশ্বাস, বেলুড়ে গেলেই আমি ঠিক পথ খুঁজে পাব। (হঠাৎ আগুনঝরা চোখে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল)

কেন তুমি এখানে এসেছ? কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

কল্যাণী। অকারণে তুমি এত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন? আমাকে দুঃখ দিয়ে তুমি আনন্দ পাও?

গৌর। একদিকে তুমি আর একদিকে রজনী মোক্তার। দু'দিক থেকে দুটো তীর এসে বিঁধেছে আমার পাঁজরে।

কল্যাণী। না তোমার ভুল হ'ল একটু। রজনী মোক্তার চায় তোমার ফোঁটা তিলক কাটা বাহ্যিক ভড়ংটাকে। আর আমি চাই—

গৌর। থাক থাক খুব হয়েছে—আর বলতে হবে না।

কল্যাণী। আজ তোমার এত তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে কেন বল ত? জিতেনকাকার বাড়ীতে এসে নতুন কোন সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে? কিন্তু মনে রেখ, দোলপূর্ণিমার রাত্রে আশ্রমের কামিনীগাছের নীচে দাঁড়িয়ে তুমি কি বলেছিলে।

গৌর। কি বলেছিলাম? না—না (ভয়ার্ত গলায়) সে তোমার অতিরিক্ত পীড়াপীড়ি আর আগ্রহে।

কল্যাণী। চুপ কর। তোমরা পুরুষরা যেমন সহজে ভালবাস, তেমনি সহজে অস্বীকারও করতে পার। তোমাদের হৃদয় বলে কোন পদার্থই নেই।

গৌর। না—না—সে অসম্ভব! (মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল) না-না, তোমার ভুল—তোমার।

কল্যাণী। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বাগানে দাঁড়িয়ে সেদিন তোমার চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম, সেই দৃষ্টি কোন তরুণী মেয়ে বুঝতে ভুল করে না। তুমি আমার হাত ধরে কাতর গলায় বলেছিলে—

গৌর। কল্যাণী!

কল্যাণী। বুকভরা কামনা নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে চিরকাল মানুষকে ত ফাঁকি দেবেই, নিজেকেও দেবে।

গৌর। (চারিদিকে তাকিয়ে খপ করে কল্যাণীর হাত দুটো ধরে করুণ গলায়) কিন্তু তোমাকে বিয়ে করলে রজনী মোক্তার যে আমাকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেবে।

কল্যাণী। দেবে তাতে কি? আমি থাকলে তোমার দুঃখ অনেক হাল্কা হবে। সংসারের আর দশটা লোকের মত দুহাতে খাটব, খাব, হেসে-কেঁদে মানুষের মত বাঁচব।

গৌর। কিন্তু বাবা-মা?

(হঠাৎ বৈঠকখানাঘরের জানালায় রজনীর মুখখানা উঁকি দিয়েই সরে গেল। নেপথ্যে তার কর্কশ গলার স্বর শোনা গেল)

রজনী। (নেপথ্যে) বালকসাধু, তোমাদের শাস্ত্র আলোচনার আর কতটুকু বাকী আছে?

(কল্যাণী ও গৌরদাস, দু জনেই সরে দাঁড়াল। রজনীর প্রবেশ। মুখে ধূর্ত্ত হাসি)

রজনী। বালক-সাধু! তুমি মনু পড়েছ ত? মনু বলেন, নিরালায় মার সঙ্গেও দীর্ঘকাল আলাপ করিবে না। সাধন-ভজনের পথে কামিনী বিষবৎ পরিত্যজ্য।

গৌর। আমরা জীবন আর সংসারের কথাই আলাপ করছি রজনীদা।

রজনী। উহু উহু, এত রাত্রে নির্জ্জন ঘরে আগুনের শিখার মত এই মেয়ের সঙ্গে তুমি মায়াময় সংসারের আলাপ করছ, এমন কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না—(কল্যাণীকে) যাও ত মা কল্যাণী তুমি ভিতরে যাও।

গৌর। না ও যাবে না।

রজনী। কি?

গৌর। চোখ রাঙিও না বলছি। আমি কারও চাকর নই।

রজনী। তুমি বালক-সাধু সেজে সারা মুলুকের প্রণাম কুড়োবে আর নিরালা ঘরে সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে ব্যভিচার করবে?

গৌর। মুখ সামলে কথা বল। ব্যভিচার করছ তুমি আমাকে বালক-সাধুর সঙ সাজিয়ে! আমি প্রণাম কুড়োচ্ছি। তুমি দু'হাতে টাকা লুটছ।

রজনী। ওরে হারামজাদা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! নিশ্চয়ই সত্যেনবাবু তোর চোখ ফুটিয়েছে। ভুলে যাস না, আমি তোর বাপ মাকে, তোর গুষ্টিকে পুষছি।

গৌর। লোকঠকানো পাপের টাকায় আমার বাবা-মা ভাত খাচ্ছেন বলে প্রতিটি রাত্রি আমি কেঁদেছি আর ঠাকুরকে বলেছি এই অবস্থা থেকে আমাকে বাঁচাও।

রজনী। যত নষ্টের মূল এই মেয়ে—(হঠাৎ সজোরে চুল ধরে কল্যাণীকে হিড় হিড় করে টেনে) যা, যা ভেতরে যা, নিজের কপাল পুড়িয়ে এখন ওর মাথা খেতে বসেছে।

(নেপথ্যে জিতেন, সত্যেন, ও সুনীতির সম্মিলিত গলার স্বর শোনা গেল)

এই—এই কি হচ্ছে? কে কাকে মারছে? আরে আরে এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ী—এই রজনী।

কল্যাণী। (গর্জ্জন করে) কোন সাহসে তুমি আমাকে অপমান করছ?

(জিতেন, সত্যেন ও সুনীতির প্রবেশ)

সত্যেন। কি হয়েছে গৌর?

গৌর। রজনীদা কল্যাণীকে অপমান করছে।

জিতেন। কেন? কল্যাণী ত তোমার সঙ্গে ধর্ম্ম আলোচনা করছিল।

রজনী। (মুখ বিকৃত করে) ধর্ম্মালোচনা করিছিল না ছাই করছিল। বুঝলেন মাষ্টার মশাই, শয়তান ঐ শশী ডাক্তার—বিধবা ভাইঝিটাকে ওর কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে সরে পড়েছে।

সত্যেন। মুখে সামলে কথা বল রজনীদা। মনে রেখ, চক্কোত্তিবাড়ীর অন্দরমহল এটা।

জিতেন। ব্যাপারটা আমাকে খোলাখুলি বল ত। সোজাসুজি বলবে। কোন মোক্তারী প্যাঁচ কষিও না।

সুনীতি। হ্যাঁ। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলুন। আপনারা ত দিনকে রাত করতে পারেন। খুনীর আসামীকে বেকসুর খালাস দিতে, আবার নিরপরাধকে খুনী করতে পারেন।

জিতেন। শোন রজনী, সত্যি যদি ওরা কোন অশোভন ব্যবহার করে তা হলে আমি ক্ষমা করব না। তুমি বল।

সত্যেন। কৈ রজনীদা, চুপ মেরে গেলে যে! বালুরঘাট 'বারে' দাঁড়ালে তোমার মুখে যে খৈ ফুটত!

(জিতেন, সুনীতিকে চোখের দৃষ্টিতে কি এক ইঙ্গিত দিল)

সুনীতি। কল্যাণী, তুই আমার সঙ্গে ভেতরে আয়।

(সুনীতি ও কল্যাণীর প্রস্থান)

জিতেন। এবার বল ত রজনী, গৌরদাস কি অশোভন কথা বলেছে?

রজনী। সে অতি গুরুতর কথা! (অকারণে চাপা গলায় ফিস ফিস করে) বুঝলেন মাষ্টারমশাই, এই গৌরদাসের ওপরে কল্যাণীর আসক্তি আছে। আমাদের আশ্রমের বাগানে পূর্ণিমার রাত্রে (গৌরদাসকে ইঙ্গিত করে) এই শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রীরাধিকার সঙ্গে লীলা করেন—

সত্যেন। (হো হো করে হেসে) আসক্তি—লীলা—এসব কি বলছ রজনীদা? বল ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে।

জিতেন। (তিক্তবিরক্ত হয়ে গম্ভীর কর্কশ গলায়) রজনী, তুমি যা বললে, ওটা তোমার অনুমান নয় ত?

রজনী। অনুমান! মানে বলছেন কি? আমি নিজের কানে ওদের পরামর্শ শুনেছি।

জিতেন। কিসের পরামর্শ?

রজনী। ওরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে।

জিতেন। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল) বিয়ে! বালক-সাধু সেজে তলে তলে এই সব শয়তানী ফন্দী? একটা বিধবা মেয়ের সর্বনাশ?

রজনী। সর্বনাশ মানে? বেঙ্গলায় ক্রিমিন্তাল কেস! প্রহিবিটেড রিলেশনসের কোন মেয়ের হাত ধরলেই আই. পি. সি।

জিতেন। গৌরদাস, এর বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?

(মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ভয়ে, লজ্জায় কাঁপতে লাগল গৌরদাস)

সত্যেন। দাদা, এ তুমি কি বলছ? গৌরদাস কল্যাণীকে ভালবাসে।

জিতেন। (নেপথ্যে তাকিয়ে) সুনীতি, কল্যাণীকে নিয়ে এস ত। (গৌরদাসের দিকে তাকিয়ে) আমি তোমাদের দুজনকে পাড়া থেকে বের করে দেব (উত্তেজিত হয়ে ক্রুদ্ধ বাঘের মত পায়চারী করতে করতে) আমি তোমাদের এমন শিক্ষা দেব—

রজনী। মাষ্টারমশায়! না, না, গৌরদাসের কেলেঙ্কারীটা বাইরে প্রকাশ করবেন না।

জিতেন। কেন, বালক-সাধুকে নিয়ে তোমার 'বিজনেসে'র ক্ষতি হবে?

সত্যেন। দাদা, এ তুমি কি করছ? কল্যাণী আর গৌরদাসের কোন দোষ নেই। জীবনের দাবি, যৌবনের দাবি সবচেয়ে বড়।

জিতেন। তা মানি। তাই বলে নীতি, ধর্ম, চরিত্র বলতে কিছুই থাকবে না? (অধৈর্য হয়ে আবার নেপথ্যে তাকিয়ে চীৎকার করে ডাকল) কৈ সুনীতি দেরি করছ কেন? কল্যাণীকে নিয়ে এস। ওর জবানবন্দীটা আমাকে নিতে হবে (দাঁতে দাঁত চেপে ধরে) আমার বাড়ীর মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এ সব উচ্ছৃঙ্খলতা।

(সুনীতির সঙ্গে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী, তুমি এদিকে এস।

সত্যেন। দাদা, তুমি ভেবে দেখ।

সুনীতি। প্রেম ভালবাসাকে তোমার শ্রদ্ধা করা উচিত।

জিতেন। (শক্ত করে কল্যাণীর হাতটা ধরে টেনে এনে) লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন ধরে তোমাদের এই আলাপ-সালাপ চলছে?

সুনীতি। ছিঃ ছিঃ, তুমি বাপের বয়সী হয়ে ঐ একফোঁটা মেয়েকে এ সব বলছ—লজ্জা হচ্ছে না?

জিতেন। সত্য, দেয়াল থেকে ঐ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের ফটোটা পেড়ে নিয়ে আয় ত?

সুনীতি। কি গো?

নাকি?

জিতেন। আঃ চুপ কর। সত্য, যা বলছি, তাই কর।

(রজনী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফটোটা নামাতে গে[illegible] জিতেন আর্তনাদ করে উঠল)

আহা—আহা—তুমি ও ফটো স্পর্শ করো না রজনী।

(সত্যেন পরমহংসের ফটোটা নামিয়ে এনে জিতেনে[র] হাতে দিল। ফটোর ফ্রেমে জড়ানো দুটো বেলফুলে[র] মালা হাতে নিয়ে জিতেন বলল)

গৌরদাস! কল্যাণী! খবরদার! আর লুকিয়ে লুকি[য়ে] দেখাসাক্ষাৎ করো না। এই নাও, দিবালোকে তোমাদের গ[ল্প] করবার, প্রাণ-ভরে ভালবাসার ছাড়পত্র।

(মালা দুটো কল্যাণী ও গৌরদাসের হাতে দিয়ে বলল) দাও—পরস্পরকে পরিয়ে দাও।

(সুনীতি সজোরে উলুধ্বনি দিয়ে উঠল। কল্যাণী আ[র] গৌরদাস পরস্পরকে মালা পরিয়ে দিল)

সত্যেন। তাই বলি! আঃ বড়দা! কলেজের থিয়েটা[রে] তুমি যে মেডেল পেয়েছিলে—সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

রজনী। (আর্ত চীৎকার করে দু'হাতে বুক চেপে ধরে ব[সে] পড়ল) এ আপনি করলেন কি মাষ্টারমশাই? ছেলে-মেয়ে নি[য়ে] একেবারে পথে বসব!

(হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল)

(নেপথ্যে সম্মিলিত জনতার কোলাহল শোনা গেল)

জনতা। (নেপথ্যে) ভোর হয়েছে। আমাদের বালক-সা[ধু] সারারাত এখানে আছেন—আমরা আমাদের বালক-সাধুকে দর্শ[ন] করতে চাই—আমাদের ভেতরে যেতে দেওয়া হোক—

সত্যেন। (নেপথ্যের দিকে এগিয়ে এসে) ওহে, তোমর[া] বাড়ী ফিরে যাও, তোমাদের বালক-সাধু আর সাধু নেই—মানুষ—মানুষ হয়ে গিয়েছেন তিনি।

জনতা। (নেপথ্যে) বলে কি রে! মানুষ হয়ে গিয়েছেন!

(রিফিউজি লোন প্রার্থী সেই তিন নম্বরের প্রবেশ)

৩। বললেই হ'ল মানুষ হয়ে গিয়েছেন! সাধু যদি মানু[ষ] হয়ে যান, তা হলে আমাদের কি হবে।

(হঠাৎ বালক-সাধুর দিকে নজর পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেল[।] কয়েক মুহূর্ত স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কল্যাণী আর গৌর[-]দাসের দিকে তাকিয়েই চীৎকার করতে করতে প্রস্থান।)

ওরে চল—চল সত্যিই বালক-সাধু মানুষ হয়ে গিয়েছেন—ডাক্তারের ভাইঝি সেই ডাগর মেয়েটাকে বিয়ে করেছেন।

জিতেন। কল্যাণী, গৌরদাস, তোমরা ঠাকুরের প্রতিকৃতিকে প্রণাম কর—প্রার্থনা কর—

রজনী। (বিষাক্ত গলায় চীৎকার করে উঠল) তোমাকে বুঝবে মাষ্টার—আমি—আমি তোমাকে 'কেসে' ফেলব,—তোমাকে—

সত্যেন। এই রাস্কেল, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

(রজনীর প্রস্থান। নেপথ্যে শোনা গেল তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর)

রজনী। (নেপথ্যে) তোমাদের দুই ভাইকে, সবাইকে আমি—একটা মেয়েছেলেকে 'কিডন্যাপ' করে বিয়ে দেওয়ার 'চার্জ্জে' ফেলব।

জিতেন। বুঝলে গৌরদাস, ঠাকুর বলেছেন—'সংসার করবে, কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে',মনে তীব্র ভোগবাসনা নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

(সুনীতি আবার সজোরে উলুধ্বনি দিল। কল্যাণী ও গৌরদাস পরমহংসের প্রতিকৃতিকে প্রণাম করল)

যবনিকা

কস্তূরী মৃগ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ভেবেছিনু মনে, মনেরি ভরমে
চিনেছি তোমারে স্বামী
মিছে অভিমান, মিছেই চেনার ভান,
অন্তর-মাঝে অরূপ-মূরতি
দেখি নাই চেয়ে আমি
ভুল ক'রে করি সরণির সন্ধান।

দেখেছি তোমার ছায়ার মূরতি
তুলির চিত্র রটে
দেউলে দেয়ালে করেছি আরতি
বিগ্রহে ঘটে পটে।

আপন মনের মোহের মায়ায়
চিত্রতুলির ছায়া-সুষমায়
প্রতিবিম্বিত নভো নীলিমায়
সাগরে তটিনী-জলে
ইন্দ্রধনুর বর্ণালী মালা
সজল জলদ তলে।
প্রতি অবয়বে—ভবিয়াছি যবে
তোমারি আবির্ভাব
ভাবি নাই আমি কস্তূরী-মৃগ
কস্তূরী-ভরা নাভ

আমারি হৃদয়ে দিয়েছি আগল
তুমি জাদুকর জানো কত ছল
দুনয়নে বুলায়ে দিয়েছো
মায়ার কাজল-রেখা
সিন্ধু মরুর বিন্দু ও কণা
শুধেই চলেছি একা!
হৃদয়ের ঘরে বসে আছ তুমি
একেলা একেশ্বর
খুঁজি সব ঠাঁই কোথাও না পাই
কোথায় বেঁধেছো ঘর?
অন্তর-মাঝে বাঁধিয়াছো বাসা
ভুবন ভ্রমিয়া কাটে না কুয়াসা
জাহ্নবী তীরে অন্ধ শুধায়
কোথা হায়! সরোবর
বিশ্ব-নিখিলে সলিলে বা নীলে
কোথা ভুবনেশ্বর।
কস্তূরী-মৃগ মৃগ্যা সুরভি
খুঁজে মরে চরাচরে
নিষাদের স্বরে মরে তার পরে
ত্যাজি বিষাক্ত শরে।
সিন্ধু ফেলিয়া পিয়াসী চাতক
চাহে সে বিন্দু জল
করুণা-সিন্ধু তোমারে ফেলিয়া
পান করি হলাহল।

বর্ষা-বন্দনা

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

(১)

উপনিষদের ঋষির ধ্যানদৃষ্টিতে বিশ্বস্রষ্টার সত্যস্বরূপটি ফুটে উঠলো, "কবির্মনীষী"রূপে। বৈচিত্র্য সৃষ্টিই হ'ল অন্যতম কবিকর্ম। সেই বৈচিত্র্যই আবার রসিকচিত্তে সঞ্চার করে "রসের," যা' নিয়ে আসে আনন্দ-মধুর চমৎকৃতিকে। এই নিখিল বিশ্বে দিকে দিকে বিলসিত হয়ে আছে অনন্ত বৈচিত্র্য অপূর্ব মাধুর্য। তাই ত তিনি "কবীনাং কবিঃ"। কালে কালে, দেশে দেশে, ঋতুতে ঋতুতে দেখি কত নবীনতা, কত বিচিত্রতা! এই মহাশিল্পী তথা মহাকবি ধরণীর রঙ্গমঞ্চে ষড়-ঋতুর নিত্য নূতন অভিনয়ে নিয়ত প্রকাশিত করে চলেছেন তাঁর আনন্দ-সুন্দর রূপটিকে। এমনি করেই কালচক্রের আবর্তনে নটরাজের ঋতুরঙ্গশালায় রাজসমারোহে নববর্ষার হ'ল শুভাগমন। বর্ষার কবি কালিদাস তাই বর্ণনা করছেন :

"সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর—
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতধ্বনি—
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥" (ঋতুসংহারম্)

"জলকণাবর্ষী মেঘ এই মহারাজের মত্ত মাতঙ্গ; তড়িৎ হ'ল পতাকা, আর অশনি হ'ল মাদল ধ্বনি।" জ্যৈষ্ঠশেষের তপ্ত দিনের রুদ্র মূর্তি দেখেছি। ধরণীর বুকে রচিত হয়েছে বিগত বর্ষকে ভস্মীভূত করার জন্য গ্রীষ্মের মহাশ্মশান। রুদ্র-রৌদ্র-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ-ধূসর প্রান্তরের মধ্যে যেন বিশ্বপ্রকৃতি নববর্ষার জন্য করছে উগ্রতপস্যা। সেই দুঃসহ তপস্যার অবসানে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" নিশান উড়িয়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিজয়ীর বেশে সমাগত হ'ল ঋতুরাজ বর্ষা। তাই, যুগান্তরের কবি এই মহান্ অতিথির সম্বর্ধনার জন্য "তড়িৎ-চকিত-নয়না" জনপদবধূ এবং "তরুণী পথিক-ললনাদে"র জানাচ্ছেন আহ্বান :

"আনো মৃদংগ-মুরজ-মুরলী মধুরা
বাজাও শংখ উলুরব করো বধূরা।
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘ-মল্লার রাগিণী ॥" (বর্ষামঙ্গল—কল্পনা)

এই বর্ষা শাশ্বতকালের মানব-হৃদয়ে পেতেছে তার স্থায়ী আসন। মানুষের বসবাস ত কেবল লোকালয়ে নয়, বিশাল বিশ্বেও। নিখিলের সঙ্গে রয়েছে তার প্রাণের নিবিড় যোগ। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতি যখন মিতালী পাতিয়ে চলে, উভয়ের মধ্যে যখন জাগ্রত হয় ঐক্যবোধ, তখনি প্রকাশিত হয় সৌন্দর্য, যা "আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।" তা'রি অনুবর্তনে যুগে যুগে নিত্য নূতন কবিচিত্তে এই বর্ষা "নিতুই নব"-রূপে হয়েছে প্রতিভাত। ঋক্, যজুঃ এবং অথর্ববেদের বহু স্থানে এই বর্ষার এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রকারের মেঘ, জল, বিদ্যুৎ, মণ্ডূকদাদুরীর ঐক্যতান প্রভৃতির বহুল বর্ণনা ছড়িয়ে আছে দিকে দিকে। ঋগ্বেদের ঋষি দাদুরীকুলকে বর্ষার আবাহনী গাইবার জন্য জানাচ্ছেন আহ্বান—

"সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্রমণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥" (৭।১০৩।১)

"যে মণ্ডূককুল ব্রতচারী ব্রাহ্মণের মত সারা বৎসর বর্ষা-বিহনে নীরব ছিল, ধারাবর্ষণের প্রাচুর্যে তারা এখন পর্জন্য-প্রীতিকর ধ্বনিতে সকল দিক্ মুখরিত করে তুলুক্।" প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির "মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী, ফাটি যাও— অত ছাতিয়া।"

অথর্ববেদের ঋষি ত বর্ষার আবাহনে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। এই বেদের চতুর্থ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের পঞ্চদশ সূক্তটি বিশ্ব-সাহিত্যে বর্ষা-বরণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ বলে মনে করা যেতে পারে। বর্ষার বহু বিচিত্র রূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ সরস বর্ণনায় ঋষিকণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে। "বায়ুচালিত মেঘরাজি মহাবৃষের মত করছে গর্জন; তাদের শব্দায়মান জলধারা পৃথিবীকে করুক তৃপ্ত; বৃষ্টিজলের এই রসামৃত ওষধির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে ধরণীকে করুক শস্য-শালিনী।" বর্ষার স্নেহধারা বিভিন্নরূপে বর্ষিত হয়ে মানব-জীবনকে করে তুলুক সুন্দর, এই ত কবির প্রার্থনা—

"সংবোবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥
আশামাশাং বিদ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা সংযন্তু পৃথিবীমনু ॥" (৪।৩।১৫।৭-৮)

"অজগরের মত ধেয়ে চলে আসে যে বাদলের ধারা, তারা সবারই মঙ্গল বিধান করুক। মরুদ্গণের দ্বারা প্রেরিত মেঘরাজি পৃথিবীর উপর 'পাগলাঝোরার ধারার' মত অঝোরে করুক বর্ষণ। দিকে দিকে বিকীর্ণ হোক বিদ্যুতের ছটা,

আর সকল দিকে প্রবাহিত হোক সুশীতল সমীরণ। তৃষিত ধরণী সিক্ত হোক বায়ুবিতাড়িত মেঘের বর্ষণে।"

যজুর্বেদে বহুবিধ জলের বন্দনা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সকল প্রকারের মেঘেরও বন্দনা। বিদ্যুৎ-উৎপাদনকারী মেঘ, স্ফুর্জৎ মেঘ, বর্ষণশীল মেঘ, ধারাসার বর্ষণশীল মেঘ, উগ্রবর্ষণশীল মেঘ, সত্বর বর্ষণশীল মেঘ, মৃদুমন্দ বর্ষণশীল মেঘ প্রভৃতির আহ্বান ধ্বনিত হ'য়েছে যজুর্বেদে। জলের বন্দনায় যজুর্বেদের ঋষি বলছেন—

"হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ যাসু জাতঃ
সবিতা যাস্বগ্নিঃ।
যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ
শংস্যোনা ভবন্তু॥" (১।১৮।১)

"হিরণ্যবর্ণ, শুচি এবং পাবক যে জল ; সবিতা ও অগ্নি যে জল থেকে উৎপন্ন হ'ল ; এবং যে জল অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করে, শোভনবর্ণা, আবিলতাশূন্য সেই জল আমাদের রোগনাশক ও সুখদায়ক হোক।"

এমনি করেই এই বর্ষা চিরকালের কবিচিত্তকে নব নব ভাবে করেছে উদ্বোধিত। বাল্মীকির বর্ষা বিরহের বেদনা নিয়ে হয়েছে উপনীত। সীতা-বিয়োগবিধুর রামচন্দ্রের মনে এই বেদনাই আজ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালীন প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের এক গভীর যোগ ব্যঞ্জিত হয়েছে আদি কবির কাব্যে। মন্দমারুতের তপ্ত নিঃশ্বাসে এবং সন্ধ্যা-চন্দন-রঞ্জিত মেঘের ঈষৎ পাণ্ডুরতায় বিরহের বেদনারুণ, ব্যথা-করুণ ছবিটিই যেন ফুটে উঠেছে।—

"মন্দ-মারুত-নিশ্বাসং সন্ধ্যা-চন্দন-রঞ্জিতম্।
আপাণ্ডু-জলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্॥
এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারি-পরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি"॥ (কি—২৮।৮৭)

বর্ষার সেই তৃষার্ত চাতক, মানসযাত্রী হংসবলাকা, প্রথম মুকুলিত নীপবনে ময়ূরের নৃত্য, শ্যাম জম্বুবন, অরণ্যনির্ঝরের প্রপাতধ্বনি, সলিল-শীকর-সিক্ত কেতকীপরাগের সুরভি—এই সবই বাল্মীকি এবং কালিদাসের বর্ণনায় ছড়িয়ে আছে পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে। আদি কবি বলছেন—

"সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥" (কি—২৮।২২)

"জলের গুরুভার বহন করে গর্জন করতে করতে মেঘগুলো উত্তুঙ্গ শৈলশীর্ষে বিশ্রাম করে করে প্রয়াণ করছে।" মেঘদূতেও যক্ষ মেঘকে নির্দেশ দিচ্ছে—

"খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘুপয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য॥" (পূ-মে-১৩)

বাল্মীকির বর্ষা বিরহের সুরকেই বেশী মনে করিয়ে দেয়। পরবর্তী ভট্টি প্রভৃতি কবিকুল রামচন্দ্রের বিরহ-বর্ণনায় আদি কবিকেই অনুসরণ করেছেন। কালিদাস 'মেঘদূতাদিতে' যেমন বিপ্রলম্ভকে গ্রহণ করেছেন, তেমনি "ঋতুসংহারাদিতে" সম্ভোগশৃঙ্গারকেও গ্রহণ করেছেন পূর্ণভাবে। তবুও বিপ্রলম্ভের ক্ষীণ রেশটুকু তাতেও দেখা যায়। কারণ, "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" বিরহ বিনা মিলন তো পূর্ণ হয় না। মহাকবি শূদ্রক "মৃচ্ছকটিকম্"-এর পঞ্চম অঙ্কে অভিসারকালে বর্ষার অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। সম্ভোগ শৃঙ্গারের পরিপূর্ণ সার্থকতা ফুটে উঠেছে অভিসারান্তে প্রিয়ালিঙ্গনবদ্ধ চারুদত্তের প্রার্থনায়—

"বর্ষশতমস্তু দুর্দিনমবিরতধারম্ শতহ্রদা স্ফুরতু।
অস্মদ্বিধদুর্লভয়া যদহং প্রিয়য়া পরিষক্তঃ॥"

"শত বৎসর ধরে অবিরত ধারায় বর্ষণমুখর দুর্দিন হোক্, ঘন ঘন স্ফুরিত হোক্ বিদ্যুৎ। কারণ, আমাদের মত লোকের পক্ষে একান্ত দুর্লভ যে প্রিয়তমা, তারি ভুজপাশে আজ বদ্ধ হয়েছি আমি।" তিনি আরো বলছেন :

"ধন্যানি তেষাং খলু জীবিতানি যে কামিনীনাং গৃহমাগতানাম।
আর্দ্রাণি মেঘোদক-শীতলানি গাত্রাণি গাত্রেষু পরিষ্বজন্তি॥"

"যারা স্বয়ং আগত অঙ্গনাদের বৃষ্টি-শীতল আর্দ্র অঙ্গ আলিঙ্গন করতে পারে, তাদের জীবনই ধন্য।" একটি শ্লোকের মধ্যদিয়েই সুনিপুণ কবি কী অপূর্বভাবে বর্ষার সমগ্র রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন! কর্দমলিপ্ত মুখ ও ধারা-বর্ষণে আহত ভেককুল বৃষ্টির জল পান করছে ; কামার্ত ময়ূরগণ কেকাধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক মুখরিত করে তুলছে ; কদম্বতরু নববিকশিত ফুলের পসরা নিয়ে প্রদীপের মত আচরণ করছে ; কুলদূষণকারী ব্যক্তি যেমন সন্ন্যাসধর্মকে কলঙ্কিত করে, তেমনি মেঘরাজিও চন্দ্রকে করছে আবৃত ; আর হীন কুলোৎপন্ন যুবতীর মত বিদ্যুৎও সদাই চঞ্চল, কোথাও এক মুহূর্ত স্থির থাকছে না"—

"পংকক্লিন্নমুখাঃ পিবন্তি সলিলং ধারাহতা দর্দুরাঃ
কণ্ঠং মুঞ্চতি বর্হিণঃ সমদনো নীপঃ প্রদীপায়তে।
সন্ন্যাসঃ কুলদূষণৈরিব জনৈর্মেঘৈর্বৃতশ্চন্দ্রমা
বিদ্যুন্নীচকুলোদগতেব যুবতির্নৈকত্র সন্তিষ্ঠতে॥"

কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে মেঘের চাঞ্চল্যকে মানব-স্বভাবের সঙ্গে তুলনা করার মধ্যে। "মানুষ হঠাৎ বড় লোক হলে তার বাইরের আড়ম্বরের সীমা থাকে না। অসংযত এবং চঞ্চল আচরণে কখন কি করবে দিশে পায় না। ভুলে যায় সুসংযত কর্মপদ্ধতি। বর্ষার মেঘও যেন তাই। কখনো উড়ছে, কখনো নামছে, কখনো বর্ষণ করছে, কখনো গর্জন করছে, আবার কখনো হঠাৎ সবদিক অন্ধকার করে তুলছে :

"উন্নমতি নমতি বর্ষতি, গর্জতি মেঘঃ করোতি তিমিরৌঘম্।
প্রথম-শ্রীরিব পুরুষঃ করোতি রূপাণ্যনকানি।"

এই কবি বৃষ্টির ধারা পতনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন এক অপূর্ব ঐক্যতান সঙ্গীত, শ্রুতিমধুর সুর-ঝঙ্কার—

"তালীষু তারং, বিটপেষু মন্দ্রং,শিলাসু রুক্ষং, সলিলেষু চণ্ডম্
সঙ্গীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেণ পতন্তি ধারাঃ॥"

"তালবনে উচ্চশব্দে, তরুশাখায় গম্ভীর শব্দে, উপলতলে কর্কশ শব্দে এবং জলে তীব্রশব্দে তালে তালে বাদ্যমান সঙ্গীতবীণার মত বৃষ্টিধারা সুরলহরী সৃষ্টি করে ধরণীর বুকে বর্ষিত হচ্ছে।"

মেঘমেদুর অম্বরতলে তমালতরুর শ্যামল বনে বর্ষার বারিধারা চিরকালের 'অকথিত বাণী' এবং 'অগীত গান'কে মূর্ত করে তোলে। বর্ষাসমাগমে প্রাচীন ভারতে হ'ত কর্মবিরতি। গৃহবাসী তখন প্রবাসীর প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে দিন কাটাতো। আর, ঘরমুখো প্রবাসীও উৎসুক হয়ে উঠতো প্রিয়মিলনের জন্য। এই ভাবটিই নিবিড় হয়ে মিশে গেছে ভারতীয় চিত্তে। বাংলার বৈষ্ণব কবিকুলের অপূর্ব মানস-সৃষ্টি নায়িকাশিরোমণি রাইকিশোরী রসিকচূড়ামণি কৃষ্ণকিশোরের উদ্দেশে যখন অভিসার যাত্রা করছেন, তখনো—

"গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥" (রায়শেখর)

তাই তো বর্ষায় নরনারী বিরহে ব্যাকুল হয়ে মিলনের আশায় কাটায় কত উৎকণ্ঠিত রজনী। কবি মোহিতলাল বর্ষণমুখর দিনের সেই বেদনাকে করেছেন রূপায়িত।

"কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্বরী
প্রিয়াহারা বিরহী যে বারিধারে হৃদয় বিধুর।
কত রাধা বায়ু রবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বঁধুর॥" (স্মরগরল)

মিলন-বিরহ, স্নেহ-প্রীতি, সুখ-দুঃখের ক্ষেত্রে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে মানব-চিত্তে রয়েছে একটা সুগভীর যোগ। মানব-মনের এই অনুভূতিগুলি সর্বজনীন ও সার্বকালিক। তাই, বর্ষার বিরহিণী রূপটিই যুগযুগান্ত ধরে কবিচিত্তকে করেছে উদ্বোধিত। এই কারণেই কালিদাসের মন্দাক্রান্তার মেঘমন্দ্র স্বরে সেদিন নিখিল বিশ্বের বিরহীচিত্তের বেদনাই যখন সঙ্গীতের মাঝে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।—

বৃষ্টিধোয়া চারিধার ঘন শ্যাম অন্ধকার
ঝুপ ঝুপ শব্দ আর ঝরো ঝরো পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমাল তল নীল যমুনার জল
আর দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।" (পত্র-মানসী)

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম মাধুরী এবং যক্ষ-দম্পতীর বিরহ-ব্যথা প্রাচীন হয়েও চিরনবীন। কবিচিত্ত আজ বর্ষার আহ্বানে হয়েছে অন্তর্মুখী। মানব-জীবনের অতীত রূপের সঙ্গে বর্তমানের ঐক্যতান সঙ্গীতই আজ গীত হচ্ছে কবিকণ্ঠে—

"আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।"

এবং

"এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।"

আষাঢ়ের প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের সঙ্গে এই কালের যোগটা অনুভব করেছিলেন নিবিড়ভাবে। বাইরের জগতে দেশ-কালের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হলেও বাদলদিনের কাজল-ঘন আঁধারে নির্জন অন্তরায়তনে বিরহ-বিধুর এই কবিকুল পরস্পর প্রতিবেশী। ষড়ঋতুর প্রতিটি পরিবর্তনই কালিদাসের চিত্তে অনুরণিত হলেও নববর্ষার একটা বিশেষ আবেদন ছিল তাঁর প্রাণে। তাই তো, তাঁর কাছে শুনি—"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।" রবিকবিরও মনের কথা এইটি। কল্পলোকে বসে রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ষার আবাহনী গেয়েছেন, তখন বৈদিক ঋষিকুল, বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব এবং বাংলার বৈষ্ণবমহাজনদের কণ্ঠই তাঁর কণ্ঠে নতুন ভাবে হয়েছে প্রতিধ্বনিত। পুরানো গানই নতুন যুগের কবিকণ্ঠে বিচিত্র সুরে নিত্য নতুন ঝঙ্কারে হয়েছে অনুরণিত। আবার শত শতাব্দী পরে এই মূর্ছনাই নিত্য নতুন পরিণতিতে হবে উৎসারিত। প্রাচীন কবিকুলের সংহত মনীষার ধারক এবং বাহক রবীন্দ্রনাথ কুণ্ঠাহীন চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছেন এই ঐক্যমন্ত্রের সাধনা তথা ঐক্যতান সঙ্গীতের কথা।—

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা
শত শত গীত মুখরিত বনবীথিকা।" (বর্ষামংগল—কল্পনা)

পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের দিকে দিকে কবি দেখেছেন বিরহে মিলনে মধুর এক অখণ্ড প্রেমলীলা। সেইটিই যেন আবার দাঁড়িয়ে আছে মানব-জীবনের সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের একটা সার্থক পটভূমিকার মতো অথবা নিরন্তর গীত হচ্ছে নেপথ্য সঙ্গীতের মতো। এই নেপথ্য সঙ্গীতের সঙ্গে মানবের জীবন-সঙ্গীত মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে এক অখণ্ড সুর-সুষমা। যুগযুগান্তের প্রবাহে ভেসে এসে সে সঙ্গীত আজ আমাদের মনের সায়রে তুলেছে তরঙ্গ।

এই বর্ষা মানুষের হৃদয়-দুয়ারে জানায় মুক্তির আহ্বান; দৈনন্দিন দীনতা হীনতা থেকে অলকার অমরাবতীতে গমনের আহ্বান। প্রেমের মুক্তি এবং তার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের মুক্তির সঙ্গীতটিই অনুরণিত হচ্ছে বর্ষার সঙ্গীতে। প্রভুশাপাহত যক্ষ আজ ধন্য! কারণ, অপূর্ণতার বিরহই তাকে পরিচালিত করেছে পূর্ণের পানে, সেই অলকাপুরীতে—

যেখানে—

"যত্রোন্মত্ত-ভ্রমর-মুখরা পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ।"

যেখানে—

"নিত্য জ্যোৎস্না-প্রতিহত-তমো বৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ।"

এবং যেখানে—

"আনন্দোত্থং নয়ন-সলিলং যত্র নান্যৈ নিমিত্তৈঃ॥" (মেঘদূতম্)

কল্পনার দানে এই অলকা ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা, সুখ-সৌন্দর্য-প্রেমের অনন্ত লীলাভূমি। বর্ষার মেঘের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি-জীবনের প্রেমও চলেছে অভিসারে—"মানসলোকের" অগম্যপারে স্থিত তার দয়িতের সন্ধানে, শূন্য হতে পূর্ণে, সসীম হতে অসীমে। তাই, বৈষ্ণবকবির এই আকুতিই মূর্ত হয়ে উঠেছে বর্ষার ধারামুখরিত রজনীতে।—

"ঝম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া॥
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন-রাতিয়া॥"

যিনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপালক, বিশ্বচালক, তিনিই তো আবার নটরাজ। ঋতুগুলো যেন তাঁরি রঙ্গপীঠ। তাই ঋতুতে ঋতুতে চলেছে তাঁর বিভিন্ন নৃত্যলীলা। তাঁর তাণ্ডব-নৃত্যের এক পদক্ষেপে বহির্বিশ্বের রূপলোক হচ্ছে আবর্তিত; আর অন্য পদক্ষেপে অন্তরলোকের রসবোধ হচ্ছে উৎসারিত। অন্তরে বাইরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিলে জগতে ও জীবনে উপলব্ধি করা যায় লীলাময়ের অখণ্ড লীলা-রস। আর সেই অনুভূতির আনন্দে প্রাণ-মন অমৃত-আলোকের দিব্যস্পর্শে হয়ে উঠে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।

শেষের বেলায় প্রার্থনা করি, সকল প্রাণীর প্রাণভূত এই বর্ষা বিতরণ করুক সবারি কাম্য কল্যাণ—

"জলদ সময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।" (ঋতুসংহারম্)

জ্যোৎস্না আঁকা রাত্রি যেন

শ্রীকরুণাময় বসু

জ্যোৎস্না আঁকা রাত্রি যেন পথ ভোলা মৌমাছি উৎসুক,
এখনি আসিল কাছে, এই দণ্ডে কোথা যাবে উড়ে,
কাজ যদি নাহি থাকে, বস' কাছে, ফিরায়োনা মুখ,
আমি কথা, তুমি গান, প্রাণ দাও মোর বীণা সুরে।

তুমি আমি দুটি তীর, প্রেম যেন নদী জলস্রোত,
সংকীর্ণ সীমার মাঝে স্বপ্ন দেখি সাগর-মোহনা;
যেখানে হৃদয় মেশে, মিশিয়াছে অনন্ত জগৎ,
তুমি আমি ক্ষণস্থায়ী, এ মুহূর্ত তবু ভুলিবনা।

একখানি ছবি যেন এই সন্ধ্যা, সোনালি আকাশ,
শ্যামল অরণ্য বাঁকে নদী প্রান্তে ঢালু বালুচর,
মেঘেরা বলাকা গাঁথি উড়ে যায় যেন বুনো হাঁস,
ওই শোন কথা কয় বনান্তের পল্লব মর্মর।

আকাশে উঠেছে চাঁদ, স্বপ্নময়ী বকুল বীথিকা,
চলো যাই এই বেলা কুড়াইব শিথিল কুসুম;
যে ফুল গাঁথিনু আজ, কাল ভোরে শুকাবে মালিকা,
প্রেমের সমাধি কাল; আজ চোখে আনিও না ঘুম।

জ্যোৎস্না আঁকা রাত্রি যেন পথ ভোলা মৌমাছি চঞ্চল,
হাসির আড়ালে আনে বিদায়ের ম্লান অশ্রুজল।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতি বৎসর ৮ই মে হইতে 'রবীন্দ্র-পক্ষ' শুরু হয়। লক্ষ্য করিবেন, 'রবীন্দ্র-সপ্তাহ' নয়, 'রবীন্দ্র-পক্ষ'—পনর দিন ধরিয়া রবীন্দ্র-জয়ন্তী চলে কিনা, তাই রবীন্দ্র-পক্ষ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঙালী আমোদ-উৎসবে মাতিয়া উঠে। অনেকে ইহার নিন্দা করেন, আবার ইহার সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। বাংলা দেশে এখন ছায়াছবির অন্ত নাই; শহর, গ্রাম, গঞ্জ যেখানেই যাই দেখি সিনেমা-হাউস। বাঙালী আমোদ চায়। তাহার পিপাসা ছবিতে মিটে না, সে আরও কিছু চায়। আগেকার দিনে দেশ-গাঁয়ে যাত্রা ছিল, কথকতা ছিল; রামায়ণ গান, মনসার ভাসান, কবি, টপ্পা, কীর্ত্তনগান, জারিগান—কত কি ছিল। তাহাতে লোকে আমোদ পাইত, আবার লোকশিক্ষারও অঙ্গ ছিল এ-সব। পল্লীর তো কথাই ছিল না, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার মত বড় শহরে কত যাত্রা কথকতা হইত। আজ কি পল্লী কি শহর সকল স্থান হইতেই যেন এ সমুদয় বিদায় লইয়াছে। সিনেমা, ছায়াছবি ইহার স্থান প্রায় জুড়িয়া বসিয়াছে, কিন্তু মানুষের মন ভিজিতেছে না। ক্ষণিক আমোদ বা উত্তেজনার রেশ কত সময় থাকে?

রবীন্দ্র-জয়ন্তী আজ বাংলায় নগরে পল্লীতে প্রতিপালিত হইতেছে। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয় এই উৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ। লোকেরও ভিড় খুব। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই আসিয়া সভায় জমায়েত হন, কখন সঙ্গীতাদি আরম্ভ হইবে তাহার প্রতীক্ষায় থাকেন তাঁহারা। এখানে বক্তৃতার অবকাশ নাই, রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা চলিতে পারে না, এরূপ ভিড়ের মধ্যে কোনও গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একান্তই নিষ্ফল। কেহ কেহ বলিতেছেন, রবীন্দ্র-জয়ন্তী?—না রবীন্দ্র-বারোয়ারী? শ্রীযুত অমল হোম লিখিয়াছেন,* ব্রিজ ক্লাব বা তাসের আড্ডা হইতে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তাঁহার নিকট আহ্বান আসিয়াছিল! তিনি ইহাতে চটিয়া গিয়াছেন, আক্ষেপও করিয়াছেন। কিন্তু তাসের আড্ডার সভ্যেরাও ত মানুষ। এ মরুময় জীবনে গতানুগতিক পন্থা হইতে মানুষ খানিকটা নিষ্কৃতি চায়, তারা আমোদ করিবে, আবার দশ জনকে সেই আমোদের ভাগ দিবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এই দিকটার কথা যে আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। আগে দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করিয়া কত আমোদ-উৎসবের আয়োজন ছিল; এখন তাহাদের স্থান যে-সব জিনিষ লইয়াছে, তাহাতে মানুষের আমোদ হয় না; গায়ে জ্বালা ধরে, মনের অশান্তি বাড়ে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্য করিয়া নিখরচায় বা সামান্য খরচায় যদি কিছু আমোদ-আহ্লাদ করিয়া লওয়া যায়। ইহাকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর চটুল দিক বলুন বলিতে পারেন, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করার তো উপায় নাই। সুতরাং এ সকল ব্যাপারে উন্নাসিকতা প্রদর্শনে বিশেষ 'ফয়দা' হইবে না। কি করিয়া, এ-সব মানিয়া লইয়াও, উৎসবকে সুনিয়ন্ত্রিত, সফল ও শিক্ষাপ্রদ করা যায়, আসুন সেই কথা একবার ভাবি।

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' কি ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। অধ্যাপক, গ্রন্থকার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক—অনেকেরই এ বিষয়ে কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহারাও আমার কথায় হয়ত সায় দিবেন। শহর পল্লী প্রতিটি স্থান সম্বন্ধেই এ-সব কথা কমবেশী প্রযোজ্য। ধরুন, সভা পাঁচটায় সুরু হইবার কথা। সভাপতি মহাশয়কে দূর হইতে ঠিক সময়ে আনা হইয়াছে, কিন্তু সভা-মণ্ডপ জনশূন্য। সাড়ে পাঁচটা বাজে, ছ'টা বাজে. লোকের দেখা নাই; সাড়ে ছ'টার সময় কিছু লোক হয়ত সভাক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইলেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ হইতে হইতে প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। সভার সম্মুখেই শিশু ও বালক-বালিকার দল। তাহারা অবশ্য আগেই আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ছেলেমানুষই; নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঢের পরে সভা আরম্ভ হইতেই তাহারা অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় যদি কোন বক্তা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাহার ফল কি হয় একবার ভাবিয়া দেখুন। বক্তা মাইকের মুখে অনর্গল গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিয়া যাইতেছেন, দু'হাতের মধ্যেই ছেলের দল সমানে চেঁচামেচি গোল-মাল সুরু করিয়া দিয়াছে! কি বিসদৃশ ব্যাপার। একটি অনুষ্ঠানে এই অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। যতক্ষণ তিনি বক্তৃতা দিলেন ততক্ষণ গোলমাল আর থামিল না! কোন কোন সভায় দেখিয়াছি, ৫টা হইতে ১০টা কি ১১টা পর্য্যন্ত আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য চলিয়াছে। সভাপতি-বেচারা নিরুপায়: প্রায় পাঁচ ঘণ্টা নিশ্চল বসিয়া থাকার ধাক্কা কাটাইতে তাঁহার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তেমন সবল সুস্থ ব্যক্তি হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। সভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরে যখন সভাপতি বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, দেখা গেল, তখন সভা প্রায় জনমানব শূন্য, উদ্যোক্তারা কয়েকজন মাত্র এদিক-ওদিক আনাগোনা করিতেছেন!

হয়ত আপনি কলিকাতা হইতে দেড়, দুই কি আড়াই ঘণ্টার রেলপথে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে পৌরোহিত্য করিতে গিয়াছেন। সময়মত আপনাকে ট্রেন ধরিতে হইবে। সভা পাঁচটায় বলিয়া ছ'টায় আরম্ভ। অনুষ্ঠানাদি চলিল। পরে যখন সভাপতির ভাষণ, তখন আর সময় নাই; আপনাকে 'বোলে হরিবোল' দিয়া সত্বর ট্রেন ধরিতে হইল। আবার কোন সভায় সভাপতি হইলেও

* পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ।

ভাষণ যদি সামান্যও দীর্ঘ হয় অমনি উদ্যোক্তাদের কেহ আসিয়া পাশে এমন কাতর ভাবে তাকাইবেন যে, অমনই তাঁহার কথা শেষ করিতে বাধ্য হন। একটি সভার কথা জানি, সেটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সভা না হইলেও একই পর্য্যায়ের বলিয়া উল্লেখ করি। কলিকাতা হইতে খানিকটা দূরে। সভা ৪টায় শুরু হইবার কথা, আরম্ভ হইল ৬টার পরে। ৭টায় সময় থিয়েটার। দর্শনার্থীর জন্য টিকেটের ব্যবস্থা। সাড়ে ছ'টা নাগাদ দর্শনার্থীদের ভিড় জমিয়া গেল। আর কি সভা চলে! বক্তৃতার তোড়ে মাইক কাটিয়া যাইবার উপক্রম, তবু গোলমাল আর থামে না; সভাপতিকে অগত্যা নিরস্ত হইতে হয়। 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে যে-সব সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সত্য সত্যই জনসভা—এখানে সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্বস্তরের লোক আসিয়া সমবেত হন। গানের আসরের মত এখানকার প্রধান আকর্ষণ নৃত্যগীত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনয়ানুষ্ঠান। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা বা রবীন্দ্র-কীর্ত্তি প্রচারের স্থান ইহা নয়। আজ সুদূর পল্লীতেও রবীন্দ্র-জয়ন্তী; ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সেদিন জনৈক জেলা-শাসক বলিলেন, শহর হইতে দূরে, দুর্গম বিল অঞ্চলে (এখন রাস্তা দ্বারা যুক্ত) তিনি সকালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষ্যে গিয়াছিলেন, সেখানে বেশ জনসমাগম হয়, সভার কার্য্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।

ভারত সরকার আগামী ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সরকারী ঘোষণা বা কার্য্য, ইহার মূলে অনেকে অনেকরকম মতলব খুঁজিতে পারেন। কিন্তু এই ভাবে সমগ্র ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে রবীন্দ্র-স্বীকৃতিতে কাহার প্রাণে না আনন্দ উপজয় হয়? আমরা ভারতবাসী হইয়াও বাঙালী, আমরা যে খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিব, এ তো একান্তই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে জাতীয় সঙ্গীত দান করিয়াছেন, ভারতবাসীর জাতীয়তার মূল উৎসের সন্ধান দিয়াছেন, ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্বদরবারে গৌরবের আসনে বসাইয়াছেন। একটি মানুষের পক্ষে এ কি কম কথা? কেহ কেহ বলেন, হাজার বৎসরেও এমন একটি প্রতিভা যে দেশে জন্মগ্রহণ করে সে দেশ ধন্য। আমরা ধন্য যে, এমন এক মহামনীষী এদেশে আমাদেরই যুগে জন্মিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে আমরা পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি যে-সব সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার আংশিক অনুসরণ ও অনুশীলনেই পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হইতে দেশ সক্ষম হইয়াছে। ঝড়ের আগে শুকনো পাতার মত বিদেশী শাসনের খোলস কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

এখন, আসল কথায় আসা যাক্। কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি, রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব কতকগুলি ক্লাব বা সঙ্ঘের যেন একচেটিয়া। এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ এবং কলেজসমূহ বন্ধ থাকে, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীরা যে যাঁর নিজের 'ঘরে' ফিরিয়া যান। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবশ্য প্রায়ই খোলা থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের পক্ষেই 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সাড়ম্বরে পালন করা সম্ভব হয়। তাই প্রায় সর্ব্বত্রই সংঘ বা ক্লাব এই উৎসব উদ্‌যাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। বড় বা ছোট শহরে, এমন কি গঞ্জে ও গ্রামে—পাড়ায় পাড়ায় সংঘ। ইতিমধ্যে একটি জায়গায় গিয়াছিলাম; ইহাকে একটি বড় গ্রাম বা ছোট শহর বা কিছু বলিতে পারেন। শুনিলাম সেদিনে ঐ স্থানে পাঁচ-ছ'টা রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভা। একটি স্বল্পায়তন অঞ্চল, অথচ সেখানে একই দিনে প্রায় একই সময়ে পাঁচ-ছ'টি রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভা, শুনিতেও বিস্ময় লাগে।

ছোট্ট জায়গায় 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব একসঙ্গে করা যায় না কি? রবীন্দ্র-জয়ন্তী জাতীয় উৎসবের মর্য্যাদা লাভ করিতেছে। এ সময় অল্প-পরিসর স্থলেও কি যুবকগণ একসঙ্গে উৎসব পালন করিতে পারেন না? এক সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপনের উপকারিতা কত তাহা বলিতেছি। একটি কারণে ইহা অতিশয় প্রয়োজনীয়ও বটে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের মূল উৎসে যেমন, তেমনি ইহার বিভিন্ন বিভাগেও আলোকসম্পাত করিয়াছেন। এ সকল বিষয়ের আলোচনা এক দিনে সম্ভব নয়, উৎসব করিলেও নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য তথা রবীন্দ্র-শিক্ষার দুইটি দিক—একটি গুরুগম্ভীর, অপরটি আনন্দের—যাহার প্রকাশ নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয়ে; যাহাকে এক কথায় বলিতে পারি আমোদ-উৎসবের দিক। একই সঙ্গে এই দুইটি উদ্‌যাপন করা সম্ভব নয়। গুরুগম্ভীর দিক অপেক্ষা আমোদ-উৎসব দিকটিরই উপর লোকের বেশী নজর পড়িতেছে। আর ইহার জন্যই হয়ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর এবম্বিধ আয়োজনাদির মধ্যে চটুলতাই বেশী দেখিয়া থাকেন। তাহা তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট্ট শহরে বা গ্রামে সকলে মিলিত হইলে এই উৎসব দুই দিনে উদ্‌যাপিত হইতে পারে। একদিন—বাছাই-করা লোকেরা রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করিবেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা এই সকল আলোচনার মধ্যে ধরিয়া দেওয়া চাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপরে প্রতিযোগিতা-প্রবন্ধ আহূত হইয়া উৎকৃষ্টগুলি এখানে পাঠেরও ব্যবস্থা করা যায়। অর্থে কুলাইলে প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠেয়। এই দিন সাধারণ সভা; কারণ ইহা মুখ্যতঃ রবীন্দ্র-স্মারক স্বরূপ তাঁহার কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত এবং নাটক অভিনয় মারফত আমোদ-উৎসব। জনসাধারণ ইহা দ্বারা নিছক আনন্দ পাইবেন, অথচ অবাঞ্ছিত বক্তৃতার বালাই থাকিবে না। সাহিত্যালোচনা বৈঠকী জিনিষ, জনসভার বিষয় নয়। এ কথাটি উৎসবের উদ্যোক্তাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন এই উৎসব জনশিক্ষার উপায়স্বরূপ হয়। যাত্রা, কথকতার ভিতর দিয়া আমরা শুধু আমোদ পাই না, আমরা শিক্ষাও লাভ করি। আমোদের মাধ্যমে যে শিক্ষা আমরা পাই তাহা অনায়াস-লব্ধ; সহজেই হৃদ্‌গত হইয়া যায়।

এখন, বিভিন্ন সংঘের করণীয় সম্বন্ধে কিছু বলি। উপরে যাহা

যাহা বলিলাম, এক-একটি সংঘ সম্বন্ধেও তাহা খাটে। অপিচ, আরও কিছু তাঁহারা করিতে পারেন। গত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন সংঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে বর্ত্তমান লেখককে নানা সূত্রে যোগদান করিতে হইয়াছে। সংঘ পাঁচমিশালি বস্তু। এখানে বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের জন্যই কিছু কিছু আয়োজন আছে। খেলাধুলার ব্যবস্থা রহিয়াছে; সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার—গ্রন্থাগার না বলিয়া পাঠাগার বলিলেই হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব করেন, কিন্তু এক একটি সংঘের শক্তিসামর্থ্য কতটুকু? দুই দিন ধরিয়া উৎসব করা প্রত্যেকটির পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহারা প্রত্যেক বারই পাঁচ-মিশালি আয়োজন না করিয়া এক একটির উপর এক একবার বেশী করিয়া ঝোঁক দিতে পারে। কোন বার সঙ্গীত ও নাটকাভিনয়ের সুষ্ঠু আয়োজন করুন, যাহাতে লোকে বেশ খানিকক্ষণ অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আবার, কোন বৎসর শিশু ও বালক-বালিকাদের লইয়া উৎসব করুন। রবীন্দ্রনাথ শিশু এবং কিশোরদেরও যে কত প্রিয় তাহা তাহারা জানিতে পারিবে। 'শিশু ভোলানাথে'র তারিফ করিবে তাহারা। কোন বার রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চ্চা, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা উৎসবের প্রধান অঙ্গ হইতে পারে। তবে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, ইহা সর্ব্ব-সাধারণের জন্য নহে, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মধ্যেই ইহা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকিবে। সংঘের যদি অর্থ-সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে প্রতি বৎসরই এই তিনটি ধারাতে কাজ চলিতে পারে, আর যদি তাহা না থাকে তবে এক-একটি একবার করাই সুবুদ্ধির কাজ। নিষ্ঠা ও সংযমের সঙ্গে কার্য্যে অগ্রসর হইলে প্রত্যেকটি সংঘ রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করিয়া জনশিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারিবে। আর ইহাই ত কাম্য।

এই সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন সংঘের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে। ধরিয়া লই, এক একটি কেন্দ্রে একাধিক সংঘ আছে। সংঘগুলি সাধারণতঃ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। সংঘ শক্তির উৎস, আবার আকরও বটে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া প্রতিবেশী হইতে পারে; তাহাতে প্রত্যেকটিরই ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গত ভাবে শক্তি বাড়িবে। বিষয়টি আর একটু তলাইয়া বলি। সংঘনিচয় শুধু নিজেদের সভ্যদের মধ্যে নয়, বিভিন্ন সংঘের সভ্যদের মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক, সঙ্গীতবিষয়ক, আবৃত্তিবিষয়ক প্রতি-যোগিতা আহ্বান করুন। কিশোর, যুবক প্রত্যেকের উপযোগী প্রতিযোগিতা। সম্বৎসর ধরিয়া না হউক, অন্ততঃ ছয় মাস বা চারি মাস ধরিয়া এই কার্য্য চলুক। রবীন্দ্র-জয়ন্তী বা রবীন্দ্র-পক্ষে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। ইহাতে দুই রকমের লাভ হইবে: (১) বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি পাইবে, (২) রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। রবীন্দ্র-পক্ষের জন্য শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়; আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ বা বক্তৃতা সম্বৎসরের আলোচনা-অনুশীলন-অনুধ্যানের নিমিত্ত। আবার শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য কেন, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র হইতে আধুনিককালের শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত ক্লাসিক সাহিত্য আলোচনায়ও সংঘগুলি প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিভিন্ন সংঘের সাহিত্য-বিভাগই এই কার্য্যে অগ্রণী হইবেন, আমি শুধু সাহিত্যাংশের কথাই এখানে বলিতেছি। এ ভাবে ক্লাসিক সাহিত্য যুবকদের মধ্যে সুষ্ঠু আলোচনায় সুযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র-ভারতী, গীত-বিতান, অরবিন্দ-পাঠচক্র হইতে সংঘ-কর্ত্তারা এ বিষয়ে কতকটা নির্দ্দেশ পাইবেন।

উক্ত উদ্দেশ্য কি ভাবে সাধিত হইতে পারে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিন-চার বৎসর পূর্ব্বের কথা। কলিকাতা হইতে আটাশ মাইল দূরে বসিরহাট মহকুমায় বড়হাটি গ্রামে গিয়াছিলাম। গ্রামে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা। গান, আবৃত্তি, ক্রীড়া সব রকমই আছে। প্রকাশ্য সাধারণ সভার কিছু কিছু নমুনা প্রদর্শন, এবং বক্তৃতাদি কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত। শুনিলাম বড়হাটিকে কেন্দ্র করিয়া অন্ততঃ কুড়িখানা গ্রাম প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছে। এই রকম এক একটি কেন্দ্রে কুড়িটি না হউক, অন্ততঃ দশটি কি পাঁচটি সংঘও যোগ দিতে পারে। আবার কলিকাতার সন্নিকটে একবার রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যাইতে হয়; সেখানেও দেখি দূর দূর অঞ্চল হইতে যুবকেরা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। কিছুকাল আগে হইতে এই সব আয়োজন চলে। হৈ-হল্লোড়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তী 'রবীন্দ্র-বারোয়ারী'তে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কলিকাতায় কোম্পানীর বাগানে আজ দু'বৎসর যাবৎ সাতদিন-ব্যাপী রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে। আমরা যাই নাই, তবে শুনিয়াছি, ইহাতেও খানিকটা হৈ-হল্লোড়ের ব্যাপার। অন্যত্রও বিরাট আকারে হইয়াছে। এক বন্ধু বলিলেন, সেণ্ট্রাল এভিনিউর ফাঁকা জায়গায় বাড়ী উঠিয়াছে, এখন আর কার্নিভাল সার্কাসের স্থান নাই। বিরাট আকারের রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভা সেই সব কার্নিভাল সার্কাসের অভাব পূরণ করিতেছে। আমরা অত দূর বলি না। তবে প্রত্যেক বিষয়ে সংযম চাই, নিষ্ঠা চাই, নহিলে তাহা হৈ-হল্লোড়েই পর্য্যবসিত হয়। এখন শক্তি সঞ্চয়ের সময়, শক্তি অপচয়ের সময় নাই। রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে ভিত্তি করিয়া আমরা যেন সংঘবদ্ধ, সংহত এবং শক্তিমান হইবার প্রয়াস পাই।

রবীন্দ্র-জীবনকথা আলোচনা হওয়া দরকার। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল ধারা বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে চলিবে কেন? মহর্ষিদেবের নির্দ্দেশে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, উপনিষদের মন্ত্র-আবৃত্তি, আশৈশব শারীর চর্চ্চা এবং অধ্যয়ন-অনুশীলন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর স্বাদেশিকতা, হিন্দু মেলার সাজাত্যবোধ-উদ্দীপক পরিমণ্ডল, অগ্রজদের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা-নিরত হইয়াও প্রাচীন আর্য্য ভারতের আদর্শে শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, স্বদেশী সমাজের আদর্শ-প্রচার, স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণরসসঞ্চারী গীতিমালা, উপনিষদের মানবপ্রেমমন্ত্র কাব্যে গানে প্রবন্ধে প্রকাশ—এই সকল

দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্য-অনুশীলনকারীর সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি যে কত গভীর তাহা ১৯১৯ সনে, পাঞ্জাবের অনাচারকালে, তৎকর্তৃক 'নাইটহুড' উপাধি-ত্যাগের মধ্যেই সুপ্রকট। শ্রীযুত অমল হোম 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথে' এই বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের প্রত্যেককেই এই ছোট্ট বইখানি পড়িতে বলি। রবীন্দ্র-জীবন কথা আলোচনায় রবীন্দ্র-পার্ষদগণেরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করুন। এই ভাবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সার্থক হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। অন্যথায় শক্তির অপচয়ই ঘটিবে।

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

দশ

৬ই আগষ্ট। ভেনিসে যাবার পথে ভেরোনায় যে একবার নামবই, সে শুধু দুটো প্রধান আকর্ষণের জন্য। প্রথমটি হ'ল জুলিয়েটের বাড়ীর খোলা-বারান্দাটা দেখা, দ্বিতীয়টি—ভেরোনার রোমান এম্ফিথিয়েটারে খোলা আকাশের নীচে এই অপেরা মরশুমের সময় পৃথিবী-বিখ্যাত একটি ক্লাসিক্যাল অপেরা দেখা-শোনাও বটে।

জুলিয়েটের বাড়ী : ভেরোনা, ইটালী

আমার বলিভিয়ান বন্ধু ওসমান তো ভেনিসের দিকেই সোজা পা বাড়িয়ে আছে। সেক্সপীয়ার যে জলো-জিনিষটাকে নিয়ে কাব্যিক রোমান্স করে গেছেন, তাতে নাকি ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই। আর মিলানের স্কালাতে যে একবার অপেরা দেখেছে তার আর দ্বিতীয়বার অপেরায় যাবার দরকার হয় না।

আমি বললাম—দেখ ওসমান, যুক্তি দেখিয়ে যাব কি যাব না এই তর্কবিতর্কে নামলে লাভ হবে এই, ট্রেনটা যথাসময়ে ছেড়ে যাবে, আমরা তখনও সেক্সপীয়ারতত্ত্বে কাঁচা চুল পাকাতে থাকব। আমার যাওয়া ঠিক। এখন তুমি তোমার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া কর।

খানিক ভেবে ওসমান বলল, গোঁ যখন ধরেছ, তাই যাও।

—যাও নয়। তাই চল।

—চল।

না, ট্রেনটা ছাড়ে নি। তবে বসবার জায়গাটা আর মিলল না। বিমর্ষ ওসমানকে আমার এটাচিটার ওপরেই বসিয়ে দিলাম।

ভেরোনা শহরটি রোমিও ও জুলিয়েটের প্রেমকথার জন্য সুপরিচিত। ভেরোনাকে ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ তালিকায় লাল টিক দিয়ে গেছেন সেক্সপীয়ার। সে বহুদিন আগে। আজও জুলিয়েটের বাড়ীর সামনে পুলকিত-প্রাণ বারান্দা-প্রেমে বিশ্বাসী-দের ভিড় একটুও কমে নি।

আমরাও কালকের দিনের আলোয় দেখব বলে জুলিয়েটের বাড়ী যাওয়া আজ মুলতুবি রাখলাম।

৭ই আগষ্ট '৫৪। বেড-টিতে চুমুক দিয়েই এটাচি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। ব্রেকফাষ্টের জন্য সবুর করতে গেলেই পরের দিনের ব্রেকফাষ্টও ঘাড়ে চাপবে। দিনের বেলায় ঘুরে-ফিরে রাতারাতি পথে পা বাড়াবার পক্ষপাতী আমি। হোটেলের ঘর-ভাড়াটা বাঁচে। ট্রেনে যদিও ঘুমোবার অবকাশ বড় একটা মেলে না তবু ঘুম পেলে সুযোগ করে নেওয়া যায় ঠিকই। ওসমানও বলল, ঠিক আছে। ভেনিসে তাড়াতাড়ি পৌঁছলেই হ'ল। খাওয়া আর ঘুম বাতিল কর, আমার আপত্তি নেই।

জুলিয়েটের বাড়ী দেখে তো প্রায় ভিরমি লাগে আর কি। এই নাকি সেই উপকথার রোমান্টিক ব্যালকনি! এত এক দরজার সামনে কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ীর মত একটুখানি বারান্দা। অবশ্য একজন দাঁড়িয়ে থাকার মত প্রশস্ত বটে। আর. দেওয়ালের

কি শ্রী! প্লাষ্টার নেই পনের আনা, ইটের পাঁজর দৃষ্টিকে পীড়িত করে। অনাদরের ছাপ নিয়ে এই আছে অবশিষ্ট।

লোকে চাইবে, জুলিয়েট যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াত তখন বাড়ীটি যেমন ছিল তেমনটি দেখতে খুবই স্বাভাবিক। অথচ সে রংও নেই, সে বাহারও নেই। খুঁতখুঁতে কেউ বলবে, ঠিক কেমন ছিল, তাই বা কে জানে? আমি বলব, কেমন ছিল তা নিয়ে গবেষণা করে, লেখালেখি করে, মজা একে একটা পুরো বছর পার করে দাও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপাততঃ আমাদের মন ভোলাতে মন গড়া একটা পালিস দিতে ক্ষতি ছিল কি?

এই কথাটা জুলিয়েটের বাড়ীর তত্ত্বাবধায়কেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। অথচ ঐ লোকটি পিকচার-কার্ড বিক্রি করছে, ওতো দু'হাতে কার্ড বেচেও পেরে উঠছে না। কারণ, ওর কার্ডে জুলিয়েটের বাড়ী রঙের জলুসে ঝিকমিক করছে, জুলিয়েট হাত বাড়িয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে, আর নীচে রোমিও উর্দ্ধমুখ হয়ে হাত কচলাচ্ছে। কেন বিক্রি হবে না? টুরিষ্টরা ডজন ডজন কিনছে ওদের জুলিয়েটদের জন্য।

'আইদা' অপেরার প্রস্তুতি: ভেরোনার এম্ফি থিয়েটার

ওসমান হঠাৎ বলে উঠল—হ্যালো জুলিয়েট!

আমি তাড়াতাড়ি ওর গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বললাম—এই অসভ্য রোমিও, এটা উনিশ শ' চুয়ান্ন সাল।

ছাতার নীচে বাজার: ভেরোনা, ইটালী

কিন্তু ওসমানকে থামাতে পারলাম না। ও সোজা গিয়ে এক ভদ্রমহিলার হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল। ভদ্রমহিলার মুখে হাসি দেখে আশ্চর্য্য হলাম। ওরা পূর্ব্ব-পরিচিত।

ওদের ছেড়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। শহরটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখব। ওসমানকে বলে এলাম, রাত্রে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে দেখা হবে।

শহরের গীর্জ্জা, দুর্গ, পিয়াতসা ইত্যাদি দেখতে দেখতে একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। একটি বাজার। বিরাট বিরাট কাপড়ের ছাতার নীচে প্রত্যেকটি দোকান। বাজারটি স্থায়ী বাজার, সাধারণ সাপ্তাহিক বাজারের মত নয়।

বাজারের ভেতরে ঢুকে পড়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত একটা টহল দিয়ে নিলাম। একটি দোকানে অনেক রকম টুকিটাকি জিনিস দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এক প্রৌঢ়া মহিলা এগিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে বলল, কি চাই, সিনিয়রে?

আমি ওর কথাগুলো আন্দাজেই ধরে নিলাম। কারণ মহিলাটি ইটালীর একটি উপভাষায় কথাগুলি বলেছিল। আমি অবশ্য শুদ্ধ ইটালীয়ানই বলি, তবে উপভাষার ভাবটি হাতড়ে নিয়ে কি বলতে চায় সেটুকু আঁচ করে নিতে পারি।

আমি বললাম, কি যে চাই, আমিও ঠিক জানি না। পাঁচটা দেখতে দেখতে যদি কোনটা মনকে টানে!

—বেশ, বেশ। দেখুন।

—আপনাদের এই বাজারটি ভারি সুন্দর কিন্তু।

—ও, আপনি ঐ ছাতাগুলোর কথা বলছেন!

—হ্যাঁ, ঐটুকুই ত এই বাজারের বিশেষত্ব, সৌন্দর্য্যও বলতে পারেন।

গ্র্যাণ্ড ক্যানাল : ভেনিস

একটু পরে মহিলাটি হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনি কি ইটাল'য়ান ?

আমি একটু হেসে বললাম, কেন, সন্দেহ হচ্ছে কি ? আমি ত সিসিলির লোক।

—আমিও সেই রকমই ভাবছিলাম।

একটা চামড়ার মনিব্যাগ কিনে দামটি হাতে দিয়ে চলে আসবার সময় বললাম, আমি ভারতীয়। আমার মত ঘন খয়েরি চামড়ার লোক সিসিলিতে একটিও নেই। আজ আর সময় নেই। আরিভেদেরচি (আবার দেখা হবে)!

এইবার সোজা এরিনাতে চলে এলাম। অপেরা 'আইদা'র টিকিট কাটতে হবে। হঠাৎ চোখের সামনে অসংখ্য লোক দেখে বেশ দমে গেলাম। ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চ্যারিটি ম্যাচে র‍্যাম্পার্টে যেমন জনসমুদ্র দেখা যায়, এও যেন তেমনি।

দু'হাতে লোক ঠেলতে ঠেলতে কাউণ্টারে পৌঁছতে ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। টিকিট যে মিলবে, এমন দুরাশা এক মুহূর্তের জন্যও মনে উঁকি দেয়নি। অথচ পনের সারির পেছনে একখানা টিকিট পেয়ে গেলাম পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে।

ভেতরে ঢুকে বসে পড়লাম। এরিনার সমস্ত ধাপগুলো ছেয়ে গেছে লোকে। সামনে 'আইদা'র দৃশ্যবহুল বিশাল সেট। উপরে তারা-ঝিকমিক স্বচ্ছ আকাশ। ঐতিহাসিক রোমান এম্ফিথিয়েটারে সারা পৃথিবীর লোক এসেছে অপেরা দেখতে।

কনসার্ট পার্টি একটা সুরের ঝঙ্কার তুলতেই সমস্ত এরিনা জুড়ে মোমবাতি জ্বলে উঠল। প্রায় সব দর্শকের হাতে একটা করে বাতি। এটাই নাকি এখানকার ট্র্যাডিশন। বৃত্তাকার সারিতে সারিতে এই সহস্র সহস্র জ্বলন্ত বাতির দৃশ্য কোনদিনই মন থেকে মুছে যাবার নয়। না দেখলে এ দৃশ্য সত্যিই কল্পনা করা যায় না অপেরা সুরু হ'ল।

ছোট্ট করে বলতে গেলে 'আইদা'র গল্প হ'ল এই : ফারাওর রাজত্বকালে মিশরের সঙ্গে ইথিওপিয়ার লড়াই বাধে। মিশরের প্রধান সেনাপতি রাদামেস যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন দেখে যুদ্ধযাত্রা করল। ভাবল, বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে রাজসভায় ইথিওপিয়ার চিরদাসী আইদাকে বিয়ে করার অনুমতি চাইবে রাজার কাছে। কিন্তু কেউ জানে না, আইদা শত্রুপক্ষের প্রধান আমোনাসরোর মেয়ে।

যুদ্ধজয় শেষে রাজা রাদামেসকে তার মেয়ে আমনেরিসকে বিয়ে করতে বলল। আমনেরিস রাদামেসকে ভালবাসে। অথচ রাদামেস চায় আইদাকে।

ইথিওপিয়ার বন্দীরা যারা মুক্তি পেল তাদের মধ্যে আমোনাসরোও ছিল। ও আবার লোকজন যোগাড় করে মিশরের সঙ্গে যুদ্ধে নামল। আমোনাসরো শত্রুপক্ষের মতলব সব জানতে পেরেছিল। এই সময় আমোনাসরো রাদামেসকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আইদাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে। রাদামেস রাজী হ'ল। এই কথোপকথন আমনেরিস শুনে ফেলেছে। আমনেরিসকে দেখেই আমোনাসরো ওকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। কিন্তু রাদামেস ও তার রক্ষীরা বাধা দিল এবং রক্ষিদল আমোনাসরোকে বধ করল।

এর পর রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অভিযোগে ভগবানের বেদী-

অপেক্ষমাণ গণ্ডোলা : ভেনিস

মূলে রাদামেসের জীবন্ত সমাধির আজ্ঞা হ'ল। রাদামেস নিজেকে বাঁচাতে চাইল না।

আইদা সমাধিতে রাদামেসের সঙ্গ নিল ও সহমরণের বাসনা জানাল।

শেষ দৃশ্যে একটি প্রেম-সঙ্গীত প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দিল।

আইদার সঙ্গীত-সুর জুসেপ্পে ভের্দির।

এখন নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কন্টিনেন্টের অবশ্য-দ্রষ্টব্যগুলোর মধ্যে ভেরোনার এই এম্ফিথিয়েটারের অপেরা একটি।

মারিও দেল মোনাকোর কণ্ঠসঙ্গীত এক কথায় অপূর্ব্ব বলা যায়।

আইদার শেষ দৃশ্যটি যেমনি করুণ ও আবেদনপূর্ণ, রাদামেসের বিজয়-গৌরবের দৃশ্যটি তেমনি জমকালো ও নয়নাভিরাম। ঐ দৃশ্যের বিরাটত্ব এবং গভীরতা মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত করে রাখে।

প্রত্যেক দৃশ্য শেষে হাজার হাজার দর্শকের সশব্দ করতালি আকাশ-বাতাস আলোড়িত করছিল।
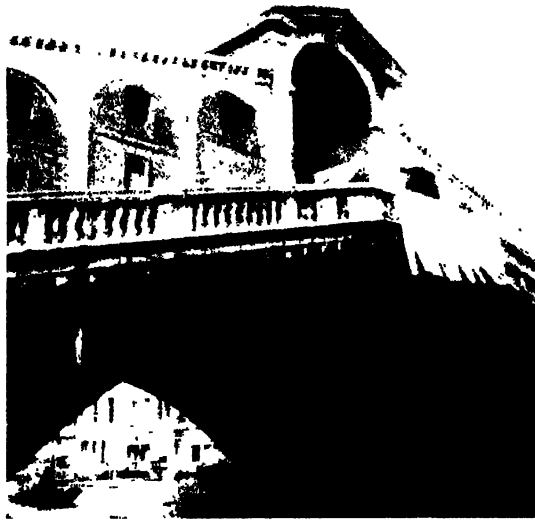
রিয়াল্তো ব্রীজ : ভেনিস

রাত্রে, মানে গভীর রাত্রেই বলতে হবে, ভেরোনার ষ্টেশনে এলাম। প্ল্যাটফর্মে ওসমান হাজির, সেই জুলিয়েটও সঙ্গে আছে।

আমি ওসমানকে ইসারা করে ট্রেনে চড়ে বসলাম। ট্রেন ছাড়লে ওসমান এল। জুলিয়েটকে দেখলাম না।

৮ই আগষ্ট '৫৪। ভেনিস, এই সেই সুপ্রাচীন গণ্ডোলা-খ্যাত স্বপ্নের শহর। একশ' কুড়িটি দ্বীপের ওপর আজব শহর এই ভেনিস। অল্প কয়েকটি সরু পায়ে-চলা রাস্তা, গ্র্যাণ্ড ক্যানাল, আরও বহু ছোট খাল, জমা জলের একটা আঁষিষগন্ধ, বড় বড় প্রাসাদের সারি, গায়ে গা ঠেকিয়ে চলা পিঁপড়ের সারির মত ট্যুরিষ্টরা, অপেক্ষমান গণ্ডোলাওয়ালাদের হাঁকডাক, আর আধুনিকতম লিডোর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা—সংক্ষেপে এই হ'ল সমস্ত পৃথিবীর অদ্বিতীয় শহর ভেনিস বা ইটালীয়ান ভাষায় ভেনেৎসিয়া।

সেণ্ট মার্কস স্কোয়ার ভেনিসের কেন্দ্র। বিশাল চত্বরময় যত লোক, বোধহয় তত কবুতর। আর, ফটোগ্রাফারদের ব্যস্ততাও বিশেষ করে লক্ষণীয়। দেহাতীরা কবুতর কাঁধে নিয়ে দাঁত ঝিক-মিকিয়ে ফটো তোলাচ্ছে।

কানোভা'র তৈরী নেপোলিয়ানের ভগিনীর মর্ম্মর মূর্ত্তি : রোম

দুপুরে ষ্টীমারে চড়লাম সেণ্ট মার্কস স্কোয়ার থেকে লিডো যাব বলে। লিডোই ভেনিসের আধুনিকতম সংযোজন। ক্রমবিকাশও বলা যেতে পারে। এই লিডোতেই ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল হয়, ফ্যাশন প্যারেড হয়, কাসিনোয় গ্যাম্বলিংয়ের আসর জমে, নাইট-ক্লাব কাবারেতে উল্লাসের জোয়ার বয়।

এই ভরদুপুরে আমার একমাত্র ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে অ্যাড্রিয়াটিকে একটি বিলম্বিত সমুদ্র-অবগাহন। সেই জন্যই লিডোতে আসা।

এখানকার সমুদ্রতীর অনুপম। লম্বা টানা ভিজে নরম বালির চর। জলে সামুদ্রিক ঢেউ একেবারেই নেই। ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ জল। অদ্ভুত মনে হ'ল, জলে খুব অল্প লোক দেখে। তীরে বালুতে বহু লোক, যে যার কাজে যেন ডুবে আছে। সুন্দরীরা চোখ বুজে মড়ার মত শুয়ে আছে, গায়ের ধবধবে রংটা যদি একটুও

বাদামীর দিকে ঘেঁষে তো সৌন্দর্য্য নাকি আরও খুলবে। দু'চার জন ছাতার নীচে উপুড় হয়ে বই পড়ছে। পাশেই হয়তো কি একটা পানীয় পড়ে আছে। আর এক জায়গায় একটি যুবক—স্প্যানিশ গীটারে আঙুল চালাচ্ছে, আর গোটা দলটি একটা ল্যাটিন গানের মহড়া দিচ্ছে। তিনটি ছেলে তাস খেলছে। ভাবছি, উনুন নিয়ে এসে রান্নাটাই বা বাকি আছে কেন।

মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরী মর্ম্মর মূর্ত্তি—ডেভিড : ফ্লোরেন্স

ফেরবার পথে গ্র্যাণ্ড ক্যানালের ওপর রিয়ালতো ব্রীজ দেখা গেল। ব্রীজটি বেশ শক্ত কাঠামো দেখেই বোঝা যায়। ব্রীজের ওপর দোকানপাটও বিস্তর।

আর একটি কথা হঠাৎ খেয়াল হ'ল। ভেনিসে কুকুর-বিড়াল জাতীয় প্রাণী অথবা সাইকেল জাতীয় যানবাহন একটিও নেই, অন্ততঃ চোখে পড়ে নি। খালি কবুতর আর গণ্ডোলা, মোটরবোট ও ষ্টীমার।

লাঞ্চে বসে শুসমাম বলছে—আজ তো ভাল চাঁদের আলো থাকবে। গণ্ডোলায় রাত্রে চড়া যাবে, কি বল?

—না, আমি তোমার সঙ্গে গণ্ডোলায় চড়তে রাজী নই।

—কেন?

—ভেনিসে চাঁদের আলোয় কখনো দুজন পুরুষ গণ্ডোলায় চড়ে না। এ-খবরও কি রাখ না? লোকে দেখলে যে হাসবে।

—ও, তা এখন গার্ল-ফ্রেণ্ড তোমার জন্য আমি জোটাব কি করে?

—তাই তো বলছি আমি চড়ব না। তুমি বরং যাও।

২৫শে আগষ্ট '৫৪। গতকাল রোমে এসেছি। জুলিয়াস সীজারের রোম। অগাষ্টাসের রোম।

বেরনিনি'র তৈরী মর্ম্মর মূর্ত্তি সেণ্ট টেরেসা : রোম

প্রবাদ আছে রোমকে ঠিকমত চিনতে হলে পুরো একটি জীবন-কাল রোমে কাটাতে হবে। সেটা শুনে সত্যিই ঘাবড়ে গেছি। রোমে থাকব তো মাত্র চার-পাঁচ দিন।

আজকের দিনটা তাই ঠিক করেছি বাইরেই বেরোব না। আগামী তিন দিনের প্রোগ্রাম আজ খাতায় কলমে ঠিক করে ফেলি। কাল থেকে দ্রিষ্টব্য দেখব আর ঘড়ি ধরে ঘোড়দৌড় করব।

এই ষ্টুডেণ্ট হষ্টেলের অনুসন্ধান-ঘর থেকে যতদূর সম্ভব সব খবর নিয়ে এসেছি। এখন রোম সম্বন্ধে দুটো-তিনটে গাইড বই ও একটা বড় ম্যাপ খুলে বসেছি।

২৮শে আগষ্ট '৫৪। বিকেলে নেপল্‌স-এর ট্রেনে চেপেছি। একই কামরায় একটি বাঙালী দম্পতীও যাচ্ছিলেন। আলাপ হতে এক মুহূর্ত্তও সময় লাগল না। বিশেষ করে, বহুদিন পর বাংলা

রোমান হলিডে'র ড্যান্সিং ক্লাব : রোম
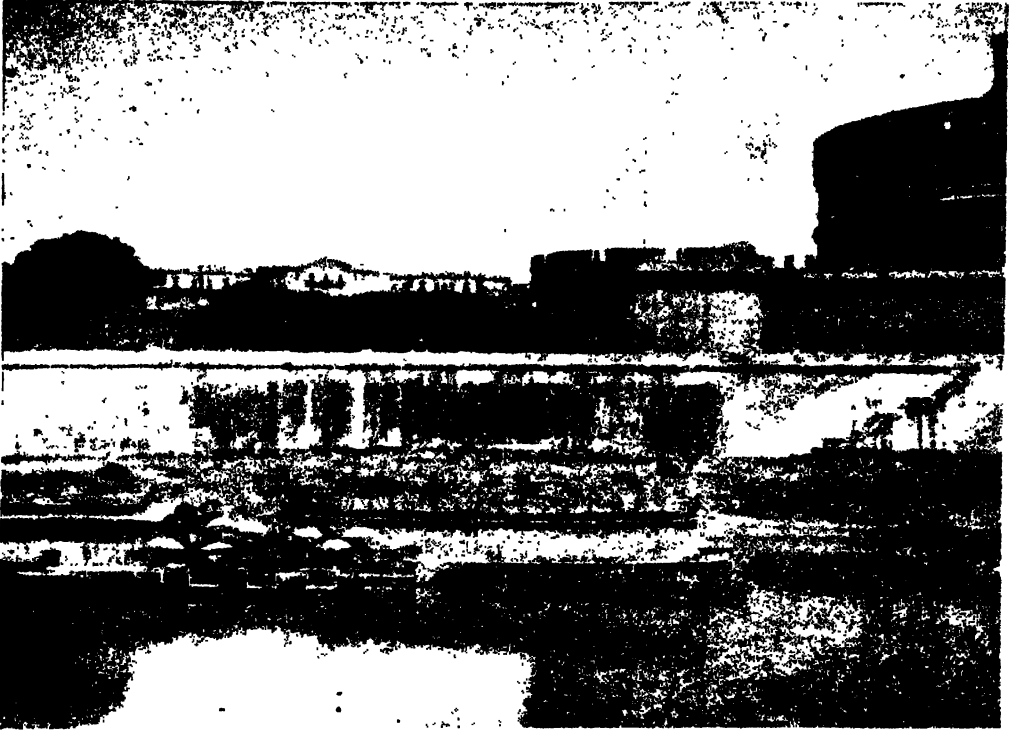
বলার সুযোগ পেয়ে ওঁদের সামনের লোকটিকে ঠেলে তুলে দিয়ে জায়গা বদল করলাম।

ওঁরা হলেন মিঃ ও মিসেস সেন। মিঃ সেনের এটি দ্বিতীয় বার ইউরোপ পর্যটন। এইবার এসেছেন নিছক বেড়াতে—হানিমুনে।

কথায় কথায় রোমের কথা উঠল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম— রোম কেমন লাগল? সব দেখা হয়েছে?

মিঃ সেন বললেন—রোম অপূর্ব। বিশেষ করে রাত্রে। ফাউন্টেনগুলো এত অদ্ভুত আলো দিয়ে সাজায়! তবে সব নিশ্চয়ই দেখা হয় নি। আপনিই বলুন না কোথায় কোথায় গেছেন।

—প্রথম দিন রাত্রে বাথস অফ কারাকাল্লায় একটা অপেরা দেখলাম। পরদিন রোমান ফোরাম, শনির মন্দির ও কোলোসসিয়াম দেখে সুপ্রাচীন রোমের একটা ধারণা করলাম। সেণ্ট পীটার্স দেখলাম, ভাটিকান যাদুঘরে ঘণ্টা চারেক পাক দিয়েও সব দেখা হ'ল না। তবে মিকেল আঞ্জেলোর সিষ্টিন চ্যাপেল দেখে মুগ্ধ হলাম। ভাটিকান ডাকটিকিট সেঁটে একটা খাম ছাড়লাম বাড়ীর ঠিকানায়। ফাউন্টেন অফ ট্রেভিতে একটা পয়সা ছুঁড়েছি, যদি আবার রোমে ফিরে আসতে পারি! একদিন সন্ধ্যায় রোমের আধুনিকতম ফ্যাশন-মহল ভিয়া ভেনেতোর এ-মাথা ও-মাথা বার দুয়েক হেঁটেছি। পিঞ্চো বাগানের টেরাস থেকে রোমকে দেখলাম, আবার ত্রিনিতা দেই মন্টির সিঁড়ি ভেঙে শহরে নামলাম। কিন্তু এত সব করেও শেষ পর্যন্ত একটা দর্শনীয় স্থানই বাদ পড়ে গেছে।

মিসেস সেন বলে উঠলেন—সেটা কি?

—টিভোলি গার্ডেন্‌স। রোম থেকে একটু দূরে।

—কৈ আমরাও তো সেখানে যাই নি।

মিঃ সেন বললেন—যাই-ই নি তো। উনি যে অত জায়গার কথা বললেন, ওর সবগুলোই কি দেখেছ নাকি?

—না।

—তবে?

মিঃ সেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, আপনি টাইবারের ওপারে সেণ্ট এঞ্জেলস দুর্গে যান নি?

—হাঁ, নিশ্চয়ই। দুর্গের নীচে জলের ধারে একটা ড্যান্সিং ক্লাব আছে, লক্ষ্য করেছেন কি?

—যেখানে রোমান হলিডের কতকগুলো দৃশ্য তোলা হয়, সেটার কথা বলছেন তো?

—হাঁ।

—জায়গাটা কিন্তু বেশ।

আমি বললাম—ও আর একটা জায়গার কথা বলি নি। সেটা হ'ল ভিল্লা বরগেজে। সুন্দর বেড়াবার জায়গা। গাছপালা, হ্রদ ইত্যাদিতে সাজানো। ওখানে একটু বেড়িয়ে বরগেজে আর্ট গ্যালারীতে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়েছিলাম। আর্ট গ্যালারীটা দেখেছেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। ওটা বাদ দিই নি।

—আচ্ছা, কানোভার তৈরি নেপোলিয়ানের ভগিনীর মর্মরমূর্তিটি লক্ষ্য করেছেন তো?

—আপনি যা বলতে চাচ্ছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। লক্ষ্য তো করেছিই, এমন কি আমার স্ত্রী তো হাত দিয়ে অনুভব করতেও ছাড়ে নি। বসবার গদিটা এত স্বাভাবিক হয়েছে যে, অনেকেই হাত দিয়ে খুব মোলায়েমভাবে আস্তে অনুভব করতে চেষ্টা করে গদিটা কত নরম। কিন্তু আসলে পাথর! সত্যিই অদ্ভুত ক্ষমতা।

সম্রাট অগাষ্টাসের সময়কার রোমের মডেল : রোম

—তা হলে ফ্লোরেন্সে মিকেল আঞ্জেলোর ডেভিডের কথাও বলতে হয়। রোমে বেরনিনির সেন্ট টেরেসার মূর্তিও কিছু কম যায় না। হ্যাঁ, আরও একটা জায়গার কথা মনে পড়েছে। রোমান সিভিলিজেশানের একটা মিউজিয়াম আছে। সেখানে গেছেন কি?

মিসেস সেন বলে উঠলেন—কৈ না তো! আমরা তো এসব কিছুই দেখি নি। কি তুমি!

মিঃ সেন একটু ফিক্‌ হেসে অপরাধ স্বীকার করে নিলেন।

আমি বললাম—ওখানে রোমান আমলের বহু অনেক জিনিষ আছে। আর আছে সম্রাট অগাষ্টাসের সময় রোম কেমন ছিল তার একটা মডেল। ওটি মাটি, সিমেন্ট, বোর্ড ও প্লাষ্টার দিয়ে তৈরি। মডেলটি দেখবার মত।

মিঃ সেন বললেন—তাহলে মশাই অনেক কিছুই দেখি নি। একলাই হয় না, তার ওপর দুজন। সঙ্গে এমন স্ত্রী-লাগেজ থাকলে কি কিছু হয়? তা দু'বার যখন হয়েছে, বার বার তিন বার হবেই। আর একবার একলা এসে সব দেখে যাব।

মিসেস সেন জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন। মৌন থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছেন বোধ হয়।

ক্রমশঃ

অমূল্য প্রত্নশালা—রাজবলহাট

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

আমি গত ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকাতে আমাদের প্রত্নশালায় পুরাবস্তু সংগ্রহের কথা কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। উপস্থিত আরও কতকগুলি নূতন সংগৃহীত পুরা দ্রব্যের কথা এখানে বলিব।

১। প্রাচীন সোলার ছবি—প্রত্নশালায় সংগৃহীত একখানি প্রাচীন শোলার ছবি রহিয়াছে। শিল্পী, শোলাগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া অতি মনোযোগ সহকারে এই ছবিখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবিখানিতে একটি গৃহ, বাগান, গাছপালা ও গৃহের

প্রাচীন সোলার ছবি

নিচে নদী ও নদীর উপর সেতু ইত্যাদির দৃশ্য, শিল্পী অতি অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবিখানিতে কোন রং না লাগাইয়া কেবল খণ্ড খণ্ড শোলাগুলিকে কাটিয়া ছবির উপরে যে ভাবে ধৈর্য্য-সহকারের সংযোগ করিয়াছেন, তাহা সত্যই মনোমুগ্ধকর। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। শোলাগুলিও আমাদের দেশীয় শোলা নহে। বেলজিয়ম শোলা বলিয়া অনুমান হয়। যদিও শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই, তথাপি তাঁর এই সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম্মের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

২। প্রাচীন অভ্রের উপর অঙ্কিত ছবি—এই অভ্রের ছবিখানিও অতি প্রাচীন ও মূল্যবান। একখণ্ড শুভ্র অভ্রের উপর এই ছবিখানি তৈয়ারি করা হইয়াছে। ছবিখানিতে একটি বৃক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখীসহ ঝুলনযাত্রার দৃশ্য অঙ্কন করা হইয়াছে। ছবিখানির মাপ ১০×৭ ইঞ্চি। প্রাচীনতার দিক হইতে ছবিখানির মূল্য খুব বেশী, কারণ ইহার অঙ্কনপ্রণালী কাংড়া রীতির অঙ্কনের ন্যায়। এইরূপ অভ্রের উপর আঁকা ছবি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। এইরূপ মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও প্রত্নশালার শিল্পবিভাগে, রাঢ়ীর সংস্কৃতি বজায় রাখিবার মানসে, বহু 'রাঢ়ের পট' রাঢ়দেশীয় পটুয়ার দ্বারা অঙ্কন করাইয়া রাখার

ব্রহ্মদেশীয় শিল্প-সংগ্রহ

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাঢ়ের অতীত গৌরব এই 'পটশিল্প' এবং 'পটুয়া' জাতি উভয়েই এখন রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা বাংলার প্রধান কর্ম্ম। অভ্রের ছবিখানি ১৫শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

চীনদেশীয় শিল্পের নিদর্শন

৩। ব্রহ্ম ও চীন দেশীয় শিল্পসংগ্রহ—আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া এই চীনদেশীয় শিল্পসম্ভারগুলি সংগ্রহ করিয়া, পল্লীবাসীর অজ্ঞতা দূরীকরণের নিমিত্ত প্রত্নশালার সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ পারেখ তাহা চীন দেশ পরিভ্রমণ কালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়া এই শিল্প সম্ভারগুলির মধ্যে হাতে-বোনা রেশমের একখানি সুন্দর ছবি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, চীনদেশের বারখানি বিভিন্ন স্থানের দৃশ্যের সুদৃশ্য কার্ড রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত পারেখ প্রথম দফায় উপরোক্ত দ্রব্যগুলি এবং দ্বিতীয় দফায় তিনি অতি সুন্দর দুইটি কাচের পাখি ও হাঁস দান করিয়া এই পল্লী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য আমরা তাঁহাকে এবং সংশ্রি ছাত্র-সংহতিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা করি, বাংলার ছাত্রসমাজ শিক্ষা বিস্তারকল্পে, অকুণ্ঠভাবে এইরূপ পল্লী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দান করিয়া, সারা পশ্চিম বাংলার মুখোজ্জ্বল করিবেন। এগুলি ছাড়াও, ব্রহ্মবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী পি. সি. চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে এই প্রত্নশালা ব্রহ্মদেশীয় একসেট বিভিন্ন শিল্পসংগ্রহ, একটি সুন্দর শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তিসহ প্রায় ত্রিশ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি দান পাইয়াছে। আমরা তাঁহাকেও আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।
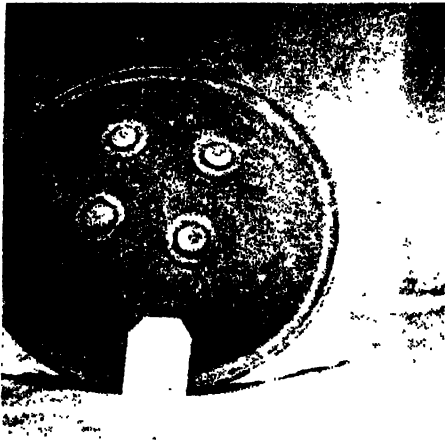
রাঢ়ের প্রাচীন ঢাল

৪। রাঢ়ের যুদ্ধাস্ত্র ও ঢাল—নিষ্ঠুর কালের গতিতে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে আমাদের রাঢ় অঞ্চলে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ, তাহাদের ব্যবহৃত বহু যুদ্ধাস্ত্র এখনও রাঢ়দেশের সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। এমনকি প্রত্নপ্রস্তর যুগের, পাথরের বহু যুদ্ধাস্ত্রসমূহ কিছু কিছু রাঢ়দেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১]

আজকালের বৈজ্ঞানিক যুগে যদিও ঐ সকল যুদ্ধাস্ত্রের প্রচলন বা ব্যবহার লোপ পাইয়াছে, তথাপি ঐ প্রকার অস্ত্রসমূহের গঠন-প্রণালী ও তাহার ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তখনকার দিনেও অর্থাৎ দুই শত হইতে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও এই ঢাল ও তলোয়ারই ছিল নৃপতিদিগের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। দেশের স্বাধীন নৃপতিগণ সর্ব্বপ্রথমে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে, নিজেরাই কারিগর বা শিল্পী নিয়োগ করিয়া, নিজ তত্ত্বাবধানে এই সকল অস্ত্রশিল্পের পুষ্টিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। আমি অন্যান্য অস্ত্রের কথা এখানে আলোচনা না করিয়া, কেবলমাত্র একটি সামান্য 'ঢাল' অস্ত্রের কথাই আপনাদের বলিব। কারণ এই 'ঢাল' শিল্প 'রাঢ়দেশ' হইতে এখন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র এখন ভারতের দু' একটি স্থানে সখের শিল্প হিসাবে জীবিত রহিয়াছে।
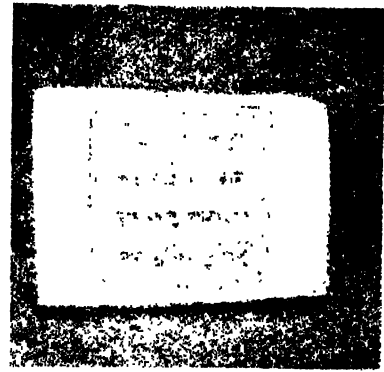
প্রাচীন বাংলার শিল্পলিপি

গোয়ালিয়র, হায়দরাবাদ, রাজস্থান এবং পুণার কিছু কিছু এই 'ঢাল-শিল্প' তৈরি হইতে দেখা যায়। তৈয়ারি এবং ব্যবহারের অনুপাতে এই শিল্প এখন মৃতপ্রায়। এখন যেসব ঢাল তৈয়ারি হয় তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ভাল এবং মজবুত হয় না। পূর্ব্বে এই শিল্প ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রের নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নিশ্চিত হইয়া প্রধান শিল্পহিসাবে বহু লোকের অন্নসংস্থান করিত।

আমরা ঐরূপ ১৫শ শতাব্দীর প্রাচীন দু' একটি ঢাল এবং তলোয়ার প্রত্নশালায় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে আমাদের রাঢ়দেশের বিভিন্ন স্থানে যথা : হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের শিল্পীগণ ঢাল তৈয়ারী করিতে জানিত। তাহার প্রমাণস্বরূপ আজও রাঢ়ের বহু উচ্চ বংশসম্ভূত জমিদার এবং প্রাচীন নৃপতিগণের বংশধরগণের গৃহে খোঁজ করিলে এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় শিল্পীগণ প্রথমে গণ্ডারের পেটের এবং পিঠের মোটা চামড়া মাপ দিয়া গোল করিয়া কাটিয়া লইত। পরে ঢাল তৈয়ারির জন্য ভারী পাথরের চাপ দিয়া চামড়াগুলিকে ঠিক কচ্ছপের সরার ন্যায় বাঁকাইয়া লইত। পরে চামড়াগুলিকে শুকাইয়া, কাল রং বা ভূসা এবং কয়েকটি দ্রব্যের সংমিশ্রণে এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারি করিয়া ঢালটির উপর এবং নিচে লাগাইয়া শুকাইতে দিত। এইরূপ তিন-চারি বার প্রলেপ লাগাইয়া শুকাইবার পর পালিশ করিয়া

১ 'আমরা বাঙালী'—শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২

উজ্জ্বল করিয়া লইত। এই পালিশ এত সুন্দর হইত যে পালিশের উজ্জ্বলতার বর্ণে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া যাইত এবং লোহার ঢাল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত। পরে ঢালটির মাঝখানে চারিটি ছিদ্র করিয়া ধরিবার জন্য লোহার কড়া লাগাইয়া দিত। কোন কোন ঢালে লোহার কড়ার সহিত লোহার শিকল ব্যবহার করা হইত। নির্দিষ্ট মাপের কোন ঢাল তৈয়ারি হইত না। শিল্পীগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ঢাল তৈয়ারি করিয়া রাজদরবারে উপঢৌকন পাঠাইত। পরে নৃপতিগণ তাহাকে গুণানুপাতে পুরস্কৃত করিয়া দেশে শিল্পের প্রসার করিতেন এবং শিল্পও পরিপুষ্টি লাভ করিত।

পরবর্তী মুসলমান যুগেও ঐরূপ চামড়ার এবং বেতের উপর নির্মিত ঢালের প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। এখন আর কোনরূপ ঢাল দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্নশালায় ঐরূপ চামড়া এবং বেতের দুই প্রকার ঢাল সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা

কাঠের মনসা মূর্ত্তি (প্রাচীন)

করিতেছি। এই মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদগুলি হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চোংদার মহাশয় তাঁহার পিতার স্মরণার্থে 'ললিত স্মৃতি' হিসাবে প্রত্নশালাকে দান করিয়া হুগলী জেলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি প্রত্নশালার একজন পরম হিতৈষী, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।

প্রাচীন বাংলা অক্ষরের শিলালিপি—উপরোক্ত শিলালেখটি ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন তাহা সন ও তারিখ দেখিলেই জানা যায়। ১২১৭ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ। উক্ত ৺দাতারাম দাস দত্ত মহাশয় তাঁহার নিজ কুলদেবতার নাম শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রীচন্দ্রশেখর মহাদেবের মন্দির এখনও হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতকালের সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও লেখাটি প্রাচীন তাহা হইলেও শিল্পীর সৌন্দর্য্য-বোধ কম ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ শিলালিপির ধারের লাইনগুলি সোজা করিয়া কাটিতে পারেন নাই। ভাষা এবং

অক্ষরের সহ
প্রাচীন বাংলা অক্ষ
মাপ ৮"×৬"।

প্রত্নশালায় রক্ষিত বিষ্ণু মূর্ত্তির মস্তক

সাদা পাথরের ছোট লিঙ্গেশ্বরী মূর্ত্তি—প্রত্নশালায় আর একটি সাদা বালী পাথরের ছোট মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি এই মূর্ত্তিটি 'লিঙ্গেশ্বর' বা এক লিঙ্গেশ্বরী মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিতেছি। কারণ 'লিঙ্গসার তন্ত্রে' 'শিবপার্ব্বতী' সংবাদে এইরূপ শিব ও শক্তির একত্রে সম্মিলিত রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যথা :

১। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্তং লিঙ্গরূপী হ্যহং প্রিয়ে।
২। ইতি তে কথিতং দেবী মম নাম—শতোত্তমম।
৩। …অহঞ্চ জগদাধারো মমাধারস্তমেবো হি।
৪। তৎসমা প্রকৃতির্নাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ
৫। তব যোনিং সমাসাদ্য সর্ব্বমেব করোম্যহম।

এই বার দেখুন এই পাষাণ মূর্ত্তিটিতে শিবলিঙ্গের সঙ্গে শক্তিরূপী যোনীর একত্রে সংযোগ রহিয়াছে। নিম্নদিকের লিঙ্গের সহিত উপরে শক্তিরূপী যোনীর বেষ্টনীর বন্ধন রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি ছোট এবং সাদা বালী পাথরের। মাপ ৬×৩ ইঞ্চি মাত্র। লিঙ্গরূপ শিব এবং যোনীরূপ শক্তির রূপ ছাড়া মূর্ত্তিটিতে অন্য কিছু খোদাই করা হয় নাই। মূর্ত্তিটি ১৬শ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন কাঠের মনসামূর্ত্তি—এই বৃহৎ কাঠের মনসামূর্ত্তিটি কিছু-দিন হইল হুগলী জেলার কোন এক গণ্ড গ্রাম হইতে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়ার সময় সংগৃহীত হইয়া এই প্রত্নশালায় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। যদিও মূর্ত্তিটির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি, এখনও যাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই উপলব্ধির বস্তু। মূর্ত্তিটি একখানি মনসা কাঠের গুড়ি হইতে খোদাই করিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। ইহা রাঢ় বাংলার প্রাচীন কাষ্ঠশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা

মনসা কাঠ সাধারণতঃ খুব নরম এবং হাল্কা। মূর্ত্তিট উচ্চতায় আড়াই হাত। মূর্ত্তিটির গঠনে, শিল্পী তাঁহার একাগ্রতা এবং ভাব-তন্ময়তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কারণ, মূর্ত্তিটির গঠন, হাত, পা, হাতের আঙ্গুল, সাপ দুটি এবং গহনাগুলির কারুকার্য্য অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। মূর্ত্তিটির হাতের আঙ্গুলগুলির ও সাপ দুটির ফণা দেখিলে শিল্পীর সৃজনী শক্তির কলাকৌশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শিল্পীর নাম অজ্ঞাত। এইরূপ কাষ্ঠশিল্পও রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

সংগৃহীত প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা—প্রত্নশালায় যে সকল প্রাচীন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারও কিছু কিছু বিবরণ আপনাদের দিব। সংগৃহীত মুদ্রার সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় পাঁচ শতাধিক হইবে। তন্মধ্যে যে কয়টি ভারতীয় মুদ্রার প্রাচীনতা হিসাবে মূল্য খুব বেশী, এখানে কেবলমাত্র সেই কয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

ছবির প্রথম লাইনের ১, ২ নং, দ্বিতীয় লাইনের অর্থাৎ ৫নং, এই তিনটি মুদ্রা সম্রাট সাহজাহানের রৌপ্য মুদ্রা। মুদ্রা তিনটির আকার এবং ওজন এক নহে।

ওজন এক ভরী হইতে সওয়া ভরী। মুদ্রার উপরের লেখা-গুলিও বিভিন্ন প্রকারের তবে ১, ২ এবং ৫নং মুদ্রায় সম্রাটের নাম সন (হিজীরা) ও তারিখ খোদাই করা রহিয়াছে। ৬নং মুদ্রাটিও সম্রাট সাহজাহানের বলিয়াই মনে হয়। কারণ মুদ্রাটির উপর সাঙ্কেতিক চিহ্ন সম্রাট সাজাহানেরই রহিয়াছে। মুদ্রার উপর এবং পার্শ্বে নানারূপ চিত্র করিয়া তখনকার দিনে, নবাবী আমলে সম্রাটগণের নিজ নিজ সাঙ্কেতিক চিহ্ন করিয়া দিতেন। ৭নং মুদ্রাটিও খুব প্রাচীন। তবে সম্রাটের নাম, মুদ্রা তৈয়ারিকালে কাটিয়া গিয়াছে, তাই পাঠ করিবার উপায় নাই। ৪নং মুদ্রাটিতে আমাদের বাংলা অক্ষরের এইরূপ লেখা মুদ্রিত রহিয়াছে :

(ক) ৪···শ্রীশ্রীহরগৌরী চরণারবিন্দ মকরন্দ মধুকরস্য

(খ) ৪ (অপর পৃষ্ঠায়)···শ্রীশ্রীরাজদেব শ্রীলক্ষ্মী সিংহ

নৃপস্য শাক ১৬৯৮···।

এখন শকের সহিত ৭৮ বৎসর যোগ করিলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইলে ১৬৯৮ + ৭৮ বৎসর = ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইল। তাহা হইলে ১৯৫৬ : ১৭৭৬ = ১৮০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা গেল। এখন দেখা যাক···শ্রীলক্ষ্মী সিংহ নামীয় কোন বাঙালী নৃপতি রাজত্ব করিতেন কিনা। আমি নিজে অবশ্য

বিষ্ণুমূর্ত্তির আর একটি মস্তক, পাল-সংগ্রহ

মুদ্রা গবেষক নই। তবে অনুমান হয় যে, আসাম অথবা ত্রিপুরায় ঐরূপ কোন হিন্দু নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীহরগৌরীর নাম মুদ্রার একপৃষ্ঠায় খোদাই করিয়া নৃপতি নিজ রাজকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। অপর পৃষ্ঠায় নৃপতির নাম···শ্রীলক্ষ্মী

সিংহ, সন (শক) এবং তারিখ খোদাই করিয়া মুদ্রাটির প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নামের পূর্ব্বেও শ্রীশ্রীবাসুদেব নামটি কাহার? এখানেও ঐরূপ কুলদেবতার নাম খোদাই করিয়াছেন। কারণ, দেবতাগণের নামের পূর্ব্বে শ্রীশ্রী থাকার ফলে দেবতার নাম এবং শ্রী স্থলে নিজ নাম অনুমান হইতেছে। মুদ্রাটি খাটি রৌপ্যের দ্বারা নির্ম্মিত। এরূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট রৌপ্য মুদ্রা বড় একটা দেখা যায় না। মুদ্রাটি ক্ষুদ্রাকৃতি। ওজন এক ভরী। এখন ৮নং মুদ্রাটি দেখুন। উহা সামন্তদেবের সময়ের মুদ্রা। মুদ্রার উপরে 'শ্রীসমন্ত' লেখাটির ছাপ কেবলমাত্র উঠিয়াছে। 'সমন্ত' লেখার পূর্ব্বে 'শ্রী' কথাটির মাত্র (ী) দীর্ঘইর দাঁড়ী মাত্র ছাপ উঠিয়াছে। 'সমন্ত' কথাটি কেবলমাত্র ভালভাবে পড়িতে পারা যায়। 'সমন্ত' লেখার নীচে একটি ষাঁড় অঙ্কিত রহিয়াছে। ষাঁড়টির মুখের, গলার নীচের দিকে এবং সামনের পায়ের কিছু কিছু অংশ ছাপ দিবার

পাল-সংগ্রহ

সময় কাটা পড়িয়া বাদ হইয়া গিয়াছে। পিছনের দিকে কেবলমাত্র কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতির ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। মুদ্রাটি ক্ষুদ্রাকৃতি, ওজন পাঁচ আনা। ৯নং মুদ্রাটি 'গধিয়া' মুদ্রা বলিয়া পরিচিত। ৮নং এবং ১০নং মুদ্রাগুলি খুব মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। ঐগুলিকে 'পাঞ্চমার্ক' বা কার্ষাপণ মুদ্রা বলা হয়। ঐগুলি নানা আকারের এবং বিভিন্ন ওজনের প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাগুলি নাকি আমাদের প্রথম প্রচলিত মুদ্রা। এই মুদ্রা সকলের পরিবর্ত্তে রাজসরকারগণ তখন দেশে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিতেন। রাজসরকারগণ এই মুদ্রা তৈয়ারী করার জন্য প্রথমে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা রৌপ্যের পাতকে, বিভিন্ন প্রকারের ছাপ দিয়া দিতেন। পরে ঐগুলির সমতা এবং অংশ বজায় না রাখিয়া কাটিয়া প্রচলন করিতেন। ফলে কাটিবার সময় ঐ ছাপেরও কিছু কিছু অংশ বাদ পড়িয়া যাইত। ঐ মুদ্রাগুলির উভয় পৃষ্ঠে নানা রকমের ছাপ দেখা যায়, যথা :—পর্ব্বত, সূর্য্য, চন্দ্র, ফুল, বলদ (ষাঁড়), গৃহ ইত্যাদি। মুদ্রাগুলি খাটি রৌপ্যের, ওজন তিন আনা হইতে চারি আনা। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মার্শাল, স্যার জন কানিংহাম, সি. জে. ব্রাউন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ এই মুদ্রা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন।

১১নং প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রাটি ভারতের গ্রীক মুদ্রা। এই দুইটি প্রত্নশালার খুব মূল্যবান সংগ্রহ। ভারতের গ্রীক অভিযানের ফলে এই মুদ্রাগুলির প্রচলন হইয়াছিল। ইহাকে 'মিনান্দার' বলা হয়। মুদ্রাগুলির উপরে রাজার নাম ও রাজার মস্তকদেশের ছাপ দেখা যায়। রাজার মাথার উপরে গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার নাম খোদাই করা হইয়াছে এবং পর পৃষ্ঠায় অর্থাৎ (১১ খ) একটি নারী মূর্ত্তি এবং গ্রীক্ ভাষায় কিছু লেখা খোদাই করা হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলির ওজন আট হইতে দশ আনা।

পাল-সংগ্রহ, পাথরের মূর্ত্তির কিয়দংশ

পাল সংগ্রহে নূতন অবদান :—হুগলী জেলার মহানাদ গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার 'পাল সংগ্রহে' এই বৎসর বহুবিধ পুরাদ্রব্য দান করিয়া এই সংগ্রহটির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি এই বৎসরে বহু গুপ্ত, পাল, সেন এবং মুসলমান যুগের পুরাদ্রব্য দান করিয়া এই পল্লী-প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পাল যুগের মৃৎশিল্পের ভগ্ন নারীর অংশগুলি, শ্রীকৃষ্ণের মস্তক, চূড়া, শরীরের অংশগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইগুলি 'পাল যুগে' মৃৎশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। মূর্ত্তিগুলি দেখিলে বেশ ভাল ভাবে মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, 'পাল-যুগের' কাল পাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তির মস্তকদেশ, বাহুদ্বয় ইত্যাদিও মূল্যবান সম্পদ।

শ্রদ্ধেয় পাল মহাশয় আমাদের প্রত্নশালার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি সকল সময় এই প্রত্নশালার

উন্নতির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গুপ্তযুগের, পালযুগের বহু দুষ্প্রাপ্য পুরাদ্রব্য দান করিয়া আমাদের অশেষ ঋণী করিয়াছেন।

প্রাচীন বৌদ্ধযুগের দুইটি নিদর্শন :—প্রত্নশালায় বৌদ্ধযুগের পাথরের দুইটি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। একটি পাথরের ছোট বৌদ্ধ বিহার (চৈৎ বা স্তূপ)। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। বিহারটি সাদা বেলে পাথরের। মাপ ৬।×৫ ইঞ্চি; অপরটি ঐ সাদা পাথরের চতুষ্কোণ খণ্ডের মধ্যে বড় হইতে ছোট দ্বাদশটি বুদ্ধের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি দর্শনীয় বস্তু। মাপ ৫×৭ ইঞ্চি। এগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্নশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।

দুর্দ্দিনের ডাক

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জনমনগণভগবান,
সর্ব্ব অমঙ্গল শঙ্কার বুক ভেদি'
করো তুমি আজি উত্থান।

ব্যক্তির পুঁজিবাদ দর্পে হাঁকায় রথ
শোষকেরা ছাড়ে হুঙ্কার,
বক্ষিয়া শোষিতেরে অস্ত্র ভেদিয়া শির
পর্ব্বত উঠে দুনকরে।

জাতির খাদ্যে ঐ মিশায় মৃত্যুবিষ
পুঁজিবাদী যত সয়তান,
দুঃখ পরিত্রাণে চূর্ণিতে দুর্নীতি
করো তুমি আজি উত্থান।

জনগণ পাপরত ঘুষেতে মগ্ন দেশ
আদর্শ করে হাহাকার,
জাতি সে জীবন্মৃত নেতারা ভণ্ড আজ
কে করিবে এর প্রতিকার?

আজি অতি দুর্দ্দিন যারা অতি হীন তারা
উর্দ্ধে চাহিছে অধিকার,
ছাগের ভয়েতে আজ করে আছে মাথা নত
ভল্লুক হাতী গণ্ডার।

বর্ব্বরতার পায়ে গুণীরা পিষ্ট আজ
পণ্ডিত লাজে হতমান,
দুঃস্থ করিরা বহে রাষ্ট্রে বাঁচার লাগি
ভিক্ষুক সম অপমান।

অত্যাচারীরা ঐ সত্যেরে পায়ে দলে
মিথ্যার উঠে ঘন জয়,
ধর্ম্মের বিদ্বেষে রক্তেতে রাঙা পথ
হত্যা চলেছে দেশময়।

সিংহ শিশুরা আজি হয়েছে ধর্ম্ম মেষ
মার্জ্জার দেখাইছে ডর,
মহান কৃষ্টি গাথা সংস্কৃতি মণিমালা
ছিঁড়ে পড়ে আজি ঝর্ঝর।
দুর্নীতি মহাপাপ সহিতে নারিয়া আর
ধরণীমা কাঁদে হতমান,
শোষণে অত্যাচারে দারিদ্র্যে জ্বলে দেনা
জাগো তুমি গণ ভগবান!
বঞ্চক শোষকের অত্যাচারের হাতে
অবসান করো শঙ্কার,
ভণ্ডেরে দণ্ডিতে প্রলয় কোদণ্ডেতে
ঘন ঘোর দেহ টঙ্কার।
দম্ভের স্তম্ভকে ফাটাইয়া আজি তুমি
গর্জ্জিয়া করো উত্থান,
নৃসিংহ সমবেশে আর্ত্ত পরিত্রাণে
জাগো তুমি গণভগবান।
সর্ব্বহারারা কাঁদে অত্যাচারের তারা
জানে নাতো কোনো প্রতিরোধ,
নিঃস্পেষিতের দল সহজ সরল তারা
জানেনা তো নিতে প্রতিশোধ।
তাহাদেরে রক্ষিতে উদ্যত করো তুমি
লক্ষ লক্ষ কোটি হাত;
তোমার মাভৈঃ লভি আর্ত্ত মানবনারী
চরণে করুক প্রণিপাত।
নিজের লাগিয়া নয় অসহায়দের লাগি'
ডাকি এই বুক চেরা ডাক,
এ মহা পাগল ডাকে জানি তুমি জাগিবেই
কেটে যাবে লাখো মৈনাক।
বাঁশী নয়—বীণা নয়—লক্ষ বজ্র হানি
দুর্দ্দিন করো অবসান,
আজি এই বিশ্বের বিস্ময় সম জাগো
নিঃস্বের তুমি ভগবান।

পল্লী প্রদর্শনী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অবিভক্ত বাংলার কয়েকটি জেলা বা মহকুমার উপরেই কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হইত এবং এই সকল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের ভার থাকিত—সরকারী, বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপর। প্রধানতঃ জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসক এই সকল সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেন। বলিলে ভুল বলা হইবে না যে, জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসকগণের উদ্যোগে, উৎসাহে ও প্রেরণাতেই এই সকল প্রদর্শনীর আয়োজন হইত এবং তাঁহারাই জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিগণের নিকট প্রদর্শনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থে "চাদার" জন্ত আবেদনপত্র পাঠাইতেন। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত সহানুভূতি থাকুক, আর নাই থাকুক, শাসক মহোদয়গণের সন্তোষ বিধানের জন্তই হউক বা তাঁহাদের ভয়েই হউক কিংবা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্তই হউক চাদার জন্ত আবেদন নিষ্ফল হইত না।

তবে ইহার ব্যতিক্রম যে ছিল না তাহা নহে। যত দূর জানি চিরস্মরণীয় দানবীর স্বর্গত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় "বান জেটিয়া প্রদর্শনী"র জন্ত প্রতি বৎসর স্বেচ্ছায় প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। এইরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ ছাড়া জনসাধারণের নিকট হইতেও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইত। সরকারী সাহায্য এবং জেলা-বোর্ডের তহবিল হইতেও কিছু পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইত। সাধারণতঃ প্রদর্শনীতে কোন "প্রবেশ-ফি" থাকিত না, তবে আমোদ-প্রমোদ (প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে আনীত থিয়েটার) দেখিবার জন্ত নির্দ্দিষ্ট "প্রবেশ-মূল্য" দিতে হইত।

লেখক এইরূপ বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত ছিলেন। এই সকল প্রদর্শনীতে প্রকৃত কৃষক শ্রেণীর সমাবেশ তত বেশী হইত না, সাধারণতঃ তাঁহারা মনে করিতেন—এই সকল প্রদর্শনী "বাবুদের" দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং তাঁহাদেরই "আমোদ-প্রমোদের" স্থান : তবে কলিকাতা হইতে আনীত থিয়েটার দেখিবার জন্ত জনসাধারণের ভিড় প্রচুর হইত এবং লেখক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে, অনেকেই ঋণ করিয়া (এমনকি ঘটি, বাটি প্রভৃতি বাঁধা দিয়া) থিয়েটার দেখিতে আসিতেন।

মোট কথা, যে কোন কারণেই হউক, ঠিক প্রদর্শনীর প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ খুব কমই ছিল, আমোদ-প্রমোদের প্রতিই আকর্ষণ বেশী ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও মনোভাব এইরূপই ছিল। ১৯১৪-১৫ সনে মিষ্টার জে. এ. উডহেড, আই-সি-এস (পরে স্যার জন উডহেড—বঙ্গদেশের অস্থায়ী গভর্ণর) ফরিদপুরের জেলা-শাসক ছিলেন—তিনি ফরিদপুর প্রদর্শনীর নাম দিয়াছিলেন—"It is an annual Tamasha" অর্থাৎ "বাৎসরিক তামাসা"। লেখক সেই সময়ে ফরিদপুরের জেলা-কৃষি কর্ম্মচারী ছিলেন এবং ফরিদপুর শহরের উপর অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা বলা প্রয়োজন যে, সাধারণতঃ এই সকল প্রদর্শনীর স্থায়ী কমিটি, স্থায়ী তহবিল, স্থায়ী নিয়ম-কানুন, স্থায়ী প্রচারকার্য্য, পুরস্কার অর্জ্জনের জন্ত কোন স্থায়ী নিয়মাবলী, কোন প্রকার নূতন কৃষি বা শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল না। প্রতি বৎসর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের ২ ৩ মাস পূর্ব্বে 'সর-গরম' পড়িয়া যাইত। জেলা শাসকের সভাপতিত্বে তথাকথিত এক সাধারণ সভা আহূত হইত। সেই সভায় একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইত এবং প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্য্যের জন্ত 'সাব-কমিটি'ও গঠিত হইত। ইহার পরে জেলা বা মহকুমা শাসকের স্বাক্ষরিত চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ছড়াছড়ি হইত। মোট কথা, বিভিন্ন স্থানে এইরূপ এলোমেলো ভাবে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত, কোন ধারাবাহিক প্রণালী ও উদ্দেশ্য থাকিত না, হাতে-হেতেড়ে কাজ দেখাইবারও কোন ব্যবস্থা থাকিত না। আমোদপ্রমোদের দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হইত—এবং এই আমোদ-প্রমোদ—বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে আনীত থিয়েটারের প্রবেশ-মূল্যের দ্বারা প্রদর্শনীর তহবিল পুষ্ট হইত।

লেখকের প্রস্তাবে এবং ফরিদপুর জেলার তদানীন্তন জেলা-শাসক মিষ্টার জে. এ. উডহেডের অনুমোদনে ফরিদপুর জেলার অভ্যন্তরে (বক্সর খোলা, বালিয়া কান্দি প্রভৃতি গ্রামে) কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রথম অনুষ্ঠিত হয় এবং ফরিদপুর শহরের উপরের প্রদর্শনী কয়েক বৎসরের জন্ত স্থগিত থাকে। ফরিদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রদর্শনীসমূহ স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে অধিকতর আকর্ষিত করে ও ঐ সকল প্রদর্শনীতে কৃষকগণের সমাবেশ অধিকতর হয় এবং তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম প্রচুর ভাবে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের প্রদর্শনীতে আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন করা হইত, তবে কলিকাতা হইতে থিয়েটার আমদানী করা হইত না। স্থানীয় আমোদ-প্রমোদের (যাত্রা, জারি, কবি গান ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা হইত এবং ইহার জন্ত কোন 'প্রবেশ-ফি' থাকিত না। ইহা ছাড়া সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে নৌকার বাইচ খেলা, ষাঁড়ের দৌড় ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিত। সাধারণতঃ, এই সকল প্রদর্শনী স্থানীয় হাটে কিম্বা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইত—এবং প্যাণ্ডেল প্রস্তুতের খরচ কিছুই ছিল না, অন্যান্য খরচও খুব কম হইত ; জনসাধারণ মনে করিতেন ইহা তাঁহাদেরই গ্রামের অনুষ্ঠান, সুতরাং ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত

করিবার জন্ত তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন, এই ধারণার ফলে অনেকের নিকট হইতে অনেক রকমের সাহায্য পাওয়া যাইত। এই সকল প্রদর্শনীতে হাতে-হেতেড়ে কৃষি ও শিল্পের কাজ দেখানোর ব্যবস্থা কতকটা থাকিত। পরে যখন ফরিদপুর শহরের উপর বার্ষিক কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, উহাকে নূতন ছাঁচে চালিবার চেষ্টা করা হয়—প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রদর্শন-উত্তান (Demonstration garden) রচনা করা হয় এবং নানাবিধ শিল্পের কাজ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হাতেকলমে দেখানোর ব্যবস্থা হয়—যেমন পাটি প্রস্তুত, সাবান প্রস্তুত, বস্ত্রাদি প্রস্তুত, কৃষ্ণনগরের পুতুল প্রস্তুত ইত্যাদি। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ আকুর্হাট প্রভৃতি মনীষিগণ এই সকল প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং প্রদর্শনীর ব্যবহারিক দিক দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সকল প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের ভার মুখ্যত লেখকের উপর অর্পিত ছিল।

গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর হইতে পল্লী-অঞ্চলে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং বর্ত্তমানে ইহার সংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় বহু স্থানেই পূর্ব্বের সকল ত্রুটিই রহিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ কোন রকম উন্নতিই চোখে পড়ে না। অথচ, আজিকার দিনে পল্লী-অঞ্চলের প্রদর্শনীর স্থান খুবই উচ্চে এবং ইহার মূল্য ও গুরুত্ব খুবই বেশী। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে জনশিক্ষার জন্ত, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্ত এবং আরও অনেক কারণে (রাজনৈতিক) পল্লী-অঞ্চলের প্রদর্শনী অধিকতর উন্নত প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সম্পর্কে সরকারী ও বে-সরকারী দুই মহলই যেন বিশেষ উদাসীন, পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সহযোগিতা নাই বলিলেই চলে, তবে সরকারী সাহায্য স্বরূপ ২।১ শত টাকা দান, সরকারী কর্ম্মচারীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায় ২।১ ঘণ্টার জন্ত উপস্থিতি, সরকারী বিভাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েকখানা প্রাচীরপত্র বা মামুলী কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রভৃতি যদি সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার পরিচয় দেয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, সরকারী মহল উদাসীন নয়। এই প্রসঙ্গে এই কথাও বলা দরকার যে, যদি কোন মন্ত্রীমহোদয় কোন প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন কিম্বা পুরস্কার-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন ও ইহা পূর্ব্ব হইতে ঘোষিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রদর্শনীর প্রতি সরকারী মহলের মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী পড়ে এবং উচ্চ পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীর মধ্যে ২।১ জন উদ্বোধন বা পারিতোষিক-বিতরণ সভায় উপস্থিত থাকেন। অভিজ্ঞতা হইতে এই কথাও বলিতে পারি যে, কোন এক পল্লী প্রদর্শনীতে এক জন মন্ত্রী মহাশয়ের যাইবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে অনিবার্য্য কারণবশতঃ তিনি যাইতে পারেন নাই, কোন বিভাগের একজন উপস্থিত কর্ম্মচারী এই কথা শুনিয়া প্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণ সভায় উপস্থিত থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন এবং পরের ট্রেনেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সরকারী মহলের এইরূপ উদাসীনতা ও অমনোযোগের বহু উদাহরণ দিতে পারি এবং পল্লী প্রদর্শনীর সহিত জড়িত অনেকেরই এই রকমের অনেক অভিজ্ঞতা আছে।

যাহা হউক, পল্লী প্রদর্শনী কি ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত তাহা এখন অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রত্যেক পল্লী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের জন্ত স্থানীয় একটি স্থায়ী কমিটি থাকা আবশ্যক। এই কমিটিতে জাতি-ধর্ম্ম-পেশা-রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি নির্বিশেষে সকল উদ্যোগী ও উৎসাহী ব্যক্তিদের স্থান থাকিবে, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ব্যক্তিদের এই কমিটিতে প্রাধান্ত থাকিবে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, কি কি কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির কি ভাবে কিরূপ উৎকর্ষ সাধনের জন্ত কি কি পুরস্কার দেওয়া হইবে, নূতন নূতন কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রবর্ত্তন ও প্রচলনের জন্ত কি কি পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং উহার নিয়মাবলী, অন্তান্ত রকমের গঠনমূলক কার্য্যের জন্ত কি কি পুরস্কার দেওয়া হইবে—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সারা বৎসর প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে এবং এই প্রচারকার্য্যের ভার কমিটিকে গ্রহণ করিতে হইবে, অবশ্য সরকারী জাতিগঠনকারী বিভাগগুলি কমিটিকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক প্রদর্শনীর বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহা সারা বৎসর ধরিয়া জনসাধারণের গোচরে আনিতে হইবে। যে সকল কৃষক ও শিল্পী প্রদর্শনীর নিয়ম অনুসারে কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা নূতন নূতন কৃষি ও শিল্পের প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করিতে ইচ্ছা করেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে কমিটির নিকট নির্দিষ্ট ফর্ম্মে নাম পাঠাইতে হইবে। কমিটি ইঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দকে এ সম্বন্ধে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং উপরোক্ত যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্ত একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রদর্শনী আদৌ ব্যয়-বহুল হইবে না। প্রদর্শনীর জন্ত পৃথক 'প্যাণ্ডেল' করিবার কোন প্রয়োজন নাই, স্থানীয় বিদ্যালয়-গৃহই প্রদর্শনীর উপযুক্ত স্থান, তবে ইহার অভাবে স্থানীয় হাটের আটচালায়, স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণের গৃহের প্রাঙ্গণে বা নাট মন্দিরে প্রদর্শনীর স্থান হইতে পারে। প্রদর্শনী সজ্জিত করার ভার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ও স্থানীয় যুবকগণের উপর অর্পিত হইবে। ইহার জন্ত অতি স্বল্প ব্যয় হইবে। তবে প্রদর্শনীর জন্ত অর্থের সংস্থান করিতেই হইবে। এবং ইহার জন্ত একটি বাজেট প্রস্তুত করিতে হইবে; স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেই হইবে, তবে ইহার জন্ত কোন 'জোর জুলুম' করা উচিত হইবে না, যিনি যাহা পারেন তাহা স্বেচ্ছায় দিবেন; অতি অল্প হারে মাসিক চাঁদাও ধার্য্য হইতে পারে; ইহা ছাড়া ধনী ব্যক্তিদের গৃহে বিবাহ, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদির সময় তাঁহাদের নিকট

হইতে কিছু চাঁদা সংগৃহীত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, কমিটির একটি স্থায়ী তহবিল থাকিবে, নির্দিষ্ট নিয়মে হিসাব-নিকাশ রাখিতে হইবে এবং প্রতি বৎসর উপযুক্ত পরীক্ষকের দ্বারা হিসাব-নিকাশ পরীক্ষিত হইবে। মোটামুটি ভাবে আয় অনুসারে ব্যয় হইবে। সরকার, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রদর্শনীর তহবিলে উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমানে যে নিয়মে ও যে হারে সরকার সাহায্য করেন সেই নিয়ম ও হার বদলানো দরকার। স্থান বিশেষে প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সরকারী সাহায্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। সাধারণতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট হারে প্রথম কয়েক বৎসর সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের সাহায্যের নিশ্চয়তা ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। বিভিন্ন বিভাগ এইরূপ সাহায্য বণ্টন না করিয়া জেলা-শাসকের উপর বণ্টনের ভার অর্পিত করিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। প্রত্যেক জেলার পল্লী অঞ্চলের প্রদর্শনীসমূহের কর্তৃপক্ষ আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিবেন, এবং জেলা-শাসকই প্রত্যেক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক প্রদর্শনীর তহবিল পুষ্ট করিবেন। ইহা হইলে জেলা-শাসকের সহিত পল্লী অঞ্চলের প্রদর্শনীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইবে, এবং এইরূপ যোগাযোগ খুবই বাঞ্ছনীয়।

পল্লী অঞ্চলের প্রদর্শনীর আকার খুব বৃহৎ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রদর্শনীতে সেই অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকৃষ্ট নমুনা, নূতন প্রবর্ত্তিত দ্রব্যাদির নমুনা, স্থানীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎকর্ষের নমুনা প্রভৃতির সমাবেশ থাকিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইরূপ কৃষক ও শিল্পীর কার্য্যাবলীর সহিত প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের যোগাযোগ থাকিবে। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে সাধারণতঃ প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষ কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শিত নমুনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না—কেহ একটা বৃহৎ আকারের কুমড়া বা লাউ প্রদর্শন করিলে সকলেই 'বাহবা' দেন—কিন্তু উহা কাহার দ্বারা কোন অঞ্চলে উৎপাদিত, বা কোন্ রকম চাষের প্রণালী অবলম্বন করিয়া উহা এত বৃহৎ হইয়াছে কিংবা কত পরিমাণ জমিতে উহার চাষ হইয়াছিল এবং জমিতে এইরূপ বৃহৎ আকারের কয়টা কুমড়া ফলিয়াছিল—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কাহারও কোন জ্ঞান থাকে না—অথচ এইরূপ নমুনার জন্য মোটা পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। এই কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, এইরূপ একই নমুনা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখানো হইয়া থাকে। আটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীতে এই ধরনের ২।১ রকম নমুনা দেখিয়া এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, "এই একই নমুনা সেদিন "—" প্রদর্শনীতে দেখিয়া আসিয়াছি।" সুতরাং এই রীতির পরিবর্ত্তন করা একান্ত দরকার। প্রত্যেক প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে—(১) সরকারী বিভাগ কর্ত্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের নমুনা, (২) উন্নত প্রণালী অবলম্বনে সাধারণের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদির নমুনা, (৩) স্থানীয় প্রণালী ও প্রথা অনুসারে উৎপাদিত দ্রব্যাদির নমুনা, (৪) কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যাদির নমুনা ইত্যাদি। যতদূর সম্ভব demonstrations-এর অর্থাৎ হাতে-হেতেড়ে কাজ দেখাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে ইহাই প্রত্যেক প্রদর্শনীর প্রধান অঙ্গ হইবে। বিশেষতঃ কুটীর-শিল্পের কাজ হাতে-হেতেড়ে দেখানো একান্ত দরকার।

প্রদর্শনীতে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকিবে—তবে ইহা কোন মতে ব্যয়বহুল হইবে না; লোকশিক্ষামূলক স্থানীয় আমোদ-প্রমোদকেই (যাত্রা, জারি, তর্জ্জা প্রভৃতি) প্রাধান্য দিতে হইবে। বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন আমোদ-প্রমোদ প্রধান স্থান অধিকার না করে। প্রদর্শনীতে বা আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন প্রবেশ-মূল্য থাকিবে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পল্লী প্রদর্শনী স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে এবং সহযোগিতায় এইরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে যেন জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ইহা তাঁহাদেরই অনুষ্ঠান এবং স্থানীয় জীবনে ইহার মূল্য খুবই বেশী—তাঁহাদের সকলের স্বার্থের ও উন্নতির সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইতে পারিলে—সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব হইবে না অর্থের অভাব হইবে না। চাই কেবল স্বার্থশূন্য নেতৃত্ব। সরকারী মহলের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পল্লী অঞ্চলের উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক প্রদর্শনীর সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করেন, কোন্ মন্ত্রী বা কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন বা উহার পারিতোষিক বিতরণী-সভায় পৌরোহিত্য করিবেন ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন সাহায্য ও সহযোগিতার তারতম্য না করেন। লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, স্থানীয় কর্ম্মিতকর্ম্মা একজন কৃষক বা শিল্পী কিম্বা স্থানীয় নেতার দ্বারাই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হওয়া বাঞ্ছনীয়—মন্ত্রী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে যাইবেন—তাঁহাদের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন—এবং স্থানীয় জনসাধারণকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিবেন। স্থানীয় জনসাধারণও তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন। মোট কথা বর্ত্তমান যুগে আগেকার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। Public Servant (সাধারণের সেবক) এই কথাটির আসল তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীজবাহরলাল নেহরু এই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় সরকারী মহলের দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনেকের এই সম্বন্ধে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যেই পল্লী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং ইহার নাম হওয়া উচিত পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর সহিত কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রভৃতি সবই জড়িত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে

ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে প্রতি বৎসর যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়—তাহার নাম পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী এবং এই প্রদর্শনী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রতি ইহার দৃষ্টি থাকে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়াছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের প্রশংসা করিয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহোদয় বলেন, "এখানকার প্রদর্শনী একটা মামুলী ব্যাপার নয়।" বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় বলেন, "গ্রামকে কেন্দ্র করে পল্লী-কল্যাণ সমিতি গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে—এই প্রদর্শনী তারই আনুষঙ্গিক উদ্যোগ।" বর্ত্তমানে আঁটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান স্বরূপে পরিণত হইয়াছে।

প্রতিবন্ধক

শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার

সকালে বেড়ান বন্ধ করতে হয়েছে। মনের উপর ত আর জোর চলে না।

কদমতলা থেকে রেলপুল পর্য্যন্ত যাতায়াতে মাইল তিনেক পথ। বেড়ানর পক্ষে সত্যিই চমৎকার। শান্ত শীর্ণ জলাঙ্গী নদীটি পটে-আঁকা ছবির মত পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। কোথাও কাছে, কোথাও দূরে। একদিকে মাঝে মাঝে হালফ্যাশনের নতুন নতুন বাড়ী; অন্যদিকে বড় বড় খেজুর গাছ, ছোটখাট ক্ষেত, চিতে ও ভেরেণ্ডার বেড়ায় ঘেরা উদ্বাস্তুদের টিনের ঘর। রাস্তার ধারে জায়গায় জায়গায় সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা চলেছে কন্টিকারীর বেগুনী ফুল ও কালকাসুন্দার হলদে ফুলের মধ্যে। বাবলার চারার কচি ডালে সাদা সাদা কাঁটা বেরিয়েছে। আরামে পা মেলে বসে আছে আকন্দ ফিকে রঙের আভা ছড়িয়ে। এ গাছে শালিক, ও গাছে শ্যামা। জলের কিনারায় কয়েকটা বক। পুলের নীচে দু'চারখানা জেলে ডিঙি। প্রকৃতির আসল রূপ উপলব্ধি করা যায় ভোর বেলায়। মানুষের কোলাহল জেগে উঠলে জীবন্ত প্রকৃতি রূপান্তরিত হয় প্রাণহীন পটভূমিতে।

শীতের শুরুতে বেড়াতে আরম্ভ করি। এক সপ্তাহের মধ্যে শরীর ও মন সজীব হয়ে ওঠে। উৎসাহ বেড়ে যায়। ভোরে শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি পথে। সেদিন বুধবার। মালোপাড়ার মোড়ে এসে দেখি বাঁধান বেঞ্চির উপর বসে দাঁতন করছেন দয়াল হালদার। দয়াল বাবুর পৈতৃক নিবাস আমাদের পাশের গ্রামে। সরকারী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত ছিলেন। রিটায়ার করে কৃষ্ণনগরে বাস করছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এত সকালে এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

সংক্ষেপে উত্তর দিই—বেড়াতে।

—কলেজের সুন্দর মাঠ থাকতে ধুলোর রাস্তায় কেন?

—নির্জ্জন নদীতীর ভাল লাগে।

—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার বড় ছেলেটি কাটোয়ার বনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে চাকরি পেয়েছে।

—শুনে সুখী হলাম। ভগবানের কাছে কামনা করি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

—কোন রকমে মাথা গোঁজবার মত বাড়ী করেছি এ পাড়ায়। একদিন দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন। আপনি দেশের লোক—একান্ত আপনার! এলে ভারি খুসী হব।

—আচ্ছা, সুবিধামত যাব আপনার নতুন বাড়ীতে।

মিনিট পাঁচেক দেরী হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পূর্ব্বদিক লাল হয়ে উঠেছে। নদীর বুকে সূর্য্যোদয় হচ্ছে। কি মনোরম দৃশ্য! জোরে জোরে হাঁটি আর ভাবি। ছেলেবেলায় আম কুড়ুতে গিয়ে বিলের ধারে সূর্য্যোদয় দেখে এমনি ভাবেই মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। আজ আমি প্রৌঢ়ত্বে পা বাড়িয়েছি কিন্তু দৃশ্যমান জগৎ তেমনিই নবীন আছে। অরুণ ঠিক তেমনি করেই তার সোনার ঝুলিতে আশার লিপি বহন করে আনে আমার সংসার-পীড়িত হৃদয়ের দুয়ারে।

রবিবার। অঞ্জনার খালের ধারে পৌঁছেছি। সার্কিট হাউসের পিছনের রাস্তা দিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসেন ব্রজেন বিশ্বাস। গায়ে কাশ্মীরী মের্জাই, গলায় কম্ফর্টার, পায়ে বাটার বাদামী রঙের রবিন, পরনে মাদ্রাজী ধুতি, হাতের মোটা লাঠিটা কাঁধের উপর চড়ান। ব্রজেনবাবু কালেক্টারিতে কাজ করতেন। চাকরির শেষ দিকে নির্ব্বাচন বিভাগে বেশ নাম কিনেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর শাস্ত্র চর্চ্চা ও শরীর চর্চ্চা দু'দিকেই সমান মনোযোগী। হাসিমুকুলিত মুখে বলেন, স্যার মর্নিং ওয়াক আরম্ভ করেছেন! খুব ভাল। শীতকালটা চালিয়ে যাবেন। আমি বিকেলে রোজ ব্রীজ অবধি যাই। আরও অনেকে যান—সরকার মশাই, সেন মশাই, নিধুবাবু, বিপিনবাবু।

গলা একটু নামিয়ে বলেন, শুনেছেন বোধ হয় আমাদের হাক

অধিকারী বি. টি. পড়তে গিয়েছে। কৃতবিদ্য কৃতকর্ম্মা হলে কি হবে, বি-টি না হলে ত হাই স্কুলের হেড মাষ্টার হতে পারবে না। জীবেন্দ্র বালিকা বিদ্যাপীঠে জীবন নষ্ট করা কারুর উচিত নয় কোন মতেই। যাই হোক, আমাকে ওর জায়গায় বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে অনেক চেষ্টা করে। আমি কাজ ভালবাসি। তাছাড়া পড়ানোর একটা আনন্দও আছে। সকালে স্কুল। আজ ছুটি, তাই বেরিয়েছি। রোদ উঠে গিয়েছে। আপনি এগোন। আমাকে একবার যেতে হবে সেক্রেটারীর কাছে। বেসরকারী বিদ্যালয়ের ঝামেলা কম নয়।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ব্রজেনবাবু বিদায় নেন। আমি দ্রুত চলতে শুরু করি। গেট রোডের শেষ বাড়ীটি পেরিয়ে যাই। গৃহস্বামীর রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। তারের বেড়ায় তরুলতা, লোহার গেটের দু'পাশে ঝাউ গাছ, উঠোনের মাঝখানে ফুলগাছের কেয়ারী। একটু যেতে না যেতেই গাছপালার ভিতর থেকে বিপুল বিস্ময়ের মত বেরিয়ে পড়ে জজ সাহেবের কুঠি। এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে পুল পার হয় লালগোলাগামী মালগাড়ী। তার ঝন ঝন ধক ধক শব্দ সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার পর যে বিজনতা সেই বিজনতা। আমাদের জীবনটাও ক্ষণিকের কলরব নয় কি?

বৃহস্পতিবার। কত কি ভাবতে ভাবতে আপন মনে হাঁটছি। জীর্ণ স্মৃতিমন্দিরটা ছাড়িয়ে খানিকটা এগোতেই শুনতে পাই—'স্যার, স্যার'। পিছন ফিরে দেখি মোহনলালকে। কালো র‍্যাপারের উপর কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলছে ঢেউ খেলান চুল। মোহনলাল আমার ছাত্র। কয়েক বছর আগে বি-এ পাস করে বেরিয়েছে। জিজ্ঞাসা করি—খবর কিহে? মোহনলাল প্রণাম করে বলে, আজ্ঞে, কালেক্টারীতে একটা অস্থায়ী কাজ পেয়েছি। সেক্রেটারিয়েটের ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আছে। পি-এস-সি থেকে ফর্ম আনিয়েছি। কতকগুলো জায়গা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার বাড়ী গিয়ে বুঝিয়ে নেব ভেবেছিলাম কিন্তু সময় পাচ্ছি না। সকালে এ পাড়ায় টিউশানি করি। যদি আপনার অসুবিধা না হয় ত দেখাই।

গরজ বড় বালাই। অনুমতির অপেক্ষা না করেই মোহনলাল পকেট থেকে ফর্মখানা বার করে আমার হাতে দেয়। আমি সেখানার উপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোহনলালকে বুঝিয়ে দিই কোন্ জায়গায় কি লিখতে হবে আর কি কি জিনিস পাঠাতে হবে দরখাস্তের সঙ্গে। সে কুণ্ঠিত ভাবে বলে, আপনি একখানা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবেন স্যার।

আমি প্রতিশ্রুতি দিই। বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জোড়া বাংলার একটার মধ্যে ঢুকে পড়ে মোহনলাল। তার পাল্লায় পড়ে আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। বেশী দূর বেড়ান হয় না।

সোমবার। 'শশিনিবাস' পিছনে ফেলে গজ কুড়ি পঁচিশ গিয়েছি এমন সময় নগেন্দ্রনগরের মাঠ থেকে আম গাছের নীচে দিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে আসেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মতিলাল মিত্র। কিছুকাল আমার সহকর্ম্মী ছিলেন। সৌখিন মানুষ। দামী শাল, পশমী মোজা, সাদা কেড্‌স, বাহারে ছড়ি, চকচকে টাকের পাশে পাকা চুলের সিঁথি ছাঁট। ডিগডিগে ডিস্‌পেপসিয়া রুগী। মিত্তির মশাই জিজ্ঞাসা করেন, এই যে ভায়া, আপনাকে কোনদিন বেড়াতে দেখিনি ত?

—পূজার ছুটিতে বাইরে যাওয়া হয় নি। বড় একঘেয়ে লাগে, তাই আজকাল একটু বেড়াচ্ছি।

—বেশ করছেন।······কলেজে মর্নিং শিফট হয়েছে, তাও অনেকে ভর্ত্তি হতে পারে নি। ব্যাপার কি?

—উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলেছে। স্বাধীন দেশে খুবই স্বাভাবিক।

—সে ত বটেই, তবে মফঃস্বলে আরও কলেজ হওয়া দরকার। কলকাতায় ছেলেমেয়ে পড়াতে পারে ক'জন এই অর্থ সঙ্কটের দিনে? আমার ভাইঝিটি থার্ড ডিভিসন ব'লে জায়গা পায় নি। বহরমপুর গার্লস কলেজে পড়ছে। দেখবেন যদি কোন রকমে ট্রান্সফার নিয়ে আসতে পারে।

—আচ্ছা, লক্ষ্য রাখব।

—হাঁ, কলেজে আজকাল ভাল ভাল অনুষ্ঠান হচ্ছে। সম্ভব হলে আমাকে একটু জানাবেন। ক্রমেই বাক নাবার হয়ে পড়ছি। ছেলেরা চিনবে কি করে?

—ঠিক কথা। ছেলেদের বলব আপনাকে কার্ড দিতে।

—অনেক ধন্যবাদ। মাঝে মাঝে পাকিস্থানে যাই কিন্তু সময় যেন আর কাটে না।

অস্বস্তি বোধ করি। বেলা বাড়ে। সবুজ ঘাসের উপর ক্ষণজীবিনী উষার চিরকালীন অশ্রুবিন্দু শুকিয়ে যায়। আমার মনের ভাব বুঝতে পারেন মতিবাবু। লজ্জিত ভাবে 'আজকের মত আসি' বলে চলে যা'ন। অবসর গ্রহণ করলেও কলেজের ব্যাপারে আজও মশগুল তাঁর মন। আমি চঞ্চলতা প্রকাশ না করলে হয়ত এক ঘণ্টা ধরে কলেজ প্রসঙ্গ চলত। এমনিই হয়। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় মানুষ বার বার ফিরে চায় তার ফেলে-আসা কর্মক্ষেত্রের দিকে। কর্ম্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে তীর্থক্ষেত্র।

তিন দিন বাধাহীন ভাবে কাটে। যাবার ও ফিরবার সময় পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে নীরব নমস্কার বিনিময় ছাড়া আর কিছু হয় না। শুক্রবার 'রাধালয়ে'র কাছাকাছি দামোদর দত্তের সঙ্গে দেখা। বিরাট ভুঁড়ি, চলতে কষ্ট হয়। হাঁটছেন আর হাঁপাচ্ছেন। এর অভিযান যে মেদ-বাহুল্যের বিরুদ্ধে সেটা অনায়াসে অনুমান করা যায়। প্রাতঃভ্রমণকারীদের সমস্যা কত বিভিন্ন! ক্ষীণকায় মতিলাল ও স্থূলকায় দামোদর একই পথের পথিক! দামোদর বড় ব্যবসাদার, আবার ভজন-সাধনও করেন। বাড়ীতে মাঝে মাঝে কীর্ত্তন, কথকতা বা ভাগবত পাঠ হয়। মিষ্ট কথা, মধুর ব্যবহার। অত্যন্ত সাদাসিধে পোষাক। দেখে বোঝবার জো নেই যে টাকার কুমীর। মুখোমুখি হতেই বলেন, সরু চাল কয়েক বস্তা রয়েছে।

কাঁকর খুব বেশী বলে পাঠাই নি। ভাল গম এসেছে। কতটা লাগবে জানাবেন।

'আচ্ছা' বলে পাশ কাটাতেই পিছু ডাকেন—নতুন আলু উঠেছে, আধ মণটাক পাঠিয়ে দেব কি?

—দিতে পারেন।

বেড়াবার সময়েও দোকান আর বাজারের কথা। কি বিরক্তিকর! দামোদর কারবারের বাইরে কোন জগতের খবর রাখেন না, রাখবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। বেসুরো মন নিয়ে বাড়ী ফিরি। প্রত্যহের পরিচিত চিত্রগুলি নজরে পড়ে। বাড়ীর রোয়াকে বসে কালী কন্ট্রাক্টর তামাক টানছেন আর কাসছেন। মোমিন পার্কে ধোপারা কাপড় শুকুতে দিচ্ছে। কেটের কাপড়-পরা বৃদ্ধারা ঘাটে যাচ্ছেন সংসারের কথা ও পাড়ার ঘটনা আলোচনা করতে করতে। ভক্ত চামারের ধাড়ী শূয়োরটা একপাল বাচ্চা নিয়ে ওচলার ঢিবির ওপর রোদ পোয়াচ্ছে। গর্ত্তের ধারে ভাঙা বাড়ীর ছাদের পূর্ব্ব আলসেতে ছেঁড়া আসমানী শাড়ীখানা যথারীতি ঝুলছে, মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা মোষের গাড়ীখানা মন্থরগতিতে চলেছে।

মঙ্গলবারের অভিজ্ঞতা মোটেই মঙ্গলজনক নয়। 'পাত্রম্যানসনে'র কাছে আমার পিছু নেন নিকুঞ্জ কবিরাজ। ভদ্রলোককে আমি চিনতাম যদিও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই বালাপোশ মুড়ি দিয়ে তাঁকে যেতে আসতে দেখেছি। আর দেখেছি নিঃসঙ্কোচে আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানতে। সে দৃষ্টির অর্থ আজ বুঝতে দেরী হয় না। আমার গা ঘেঁষে চলতে চলতে হঠাৎ অতি পরিচিত জনের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করেন, প্রাতঃভ্রমণে উপকার পাচ্ছেন কিছু?

বিস্মিত ভাবে বলি, উপকার! বেড়াতে কেমন লাগে জানতে চান? বেশ লাগে।

—মনের প্রফুল্লতা ত হবেই। সে কথা নয়। মানে আপনার শারীরিক উন্নতি হচ্ছে কি? আপনার ব্যাধি নিশ্চয় কোষ্ঠকাঠিন্য।

—কই, সে রকম অসুখ ত আমার নেই।

—আপনার চেহারা দেখে তাই মনে হয়। আপনি হয়ত বুঝতে পারেন না কিন্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে। কবিরাজি করে চুল পাকিয়েছি। এ রোগে প্রাতে বায়ু সেবন প্রশস্ত। ফল অচিরেই পাবেন।

কবিরাজের গায়ে-পড়া ভাব ও অযাচিত উপদেশ আদৌ ভাল লাগে না। কথার জবাব না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলি। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গ ছাড়তে নারাজ। কিছুক্ষণ আগে সিউলিরা খেজুর গাছ থেকে রসের কলসি নামিয়ে নিয়েছে। নলের মুখ থেকে টপ টপ করে রস পড়ছে। একটা টিয়াপাখী লম্বা ঠোঁট দিয়ে রস খাচ্ছে। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। তাদের মুখে চোখে ঔৎসুক্যের চেয়ে ঈর্ষাই ফুটে উঠেছে বেশী। টিকালো নাকটি তুলে কবিরাজ বলেন, মিষ্ট দ্রব্যে শিশুদের লোভ অপরিসীম। দুঃখের বিষয় দুর্ম্মূল্যের বাজারে উপযুক্ত পরিমাণ মিষ্ট দ্রব্য তাদের ভাগ্যে জোটে না।

'হ্যাঁ', 'না' কিছু না বলেই ফিরতে উদ্যত হই। কবিরাজকে এড়াতে চাই। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। বিদ্যাসাগরী চটি জোড়া মাটিতে ঠুকে শিশির-ভেজা ধুলো ঝেড়ে বলেন, চলুন, আমিও যাব ঐদিকে। শ্রীগোপাল বস্ত্রালয়ে একটু কাজ আছে। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। আপনি যে ব্যায়রামে ভুগছেন তা প্রৌঢ় বয়সে অনেকেরই হয়, বিশেষতঃ যাঁরা অঙ্গ চালনার চেয়ে মস্তিষ্ক চালনা বেশী করেন। চিন্তার কারণ নেই। তিন মাস পরীক্ষা করে দেখুন প্রাতঃভ্রমণ ফলদায়ক হয় কিনা। যদি না হয় আমাকে খবর দেবেন। আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রে কোষ্ঠশুদ্ধির চমৎকার ব্যবস্থা আছে। ফল অব্যর্থ। শান্তিপুরের হরিগোপাল সান্যাল মশাইকে হয়ত জানেন। তিনি কোষ্ঠবদ্ধতায় দীর্ঘকাল ভুগে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েন। আমার চিকিৎসা তাঁকে নবজীবন দান করেছে। এখন তিনি বেশ কর্ম্মক্ষম। মেদিনীপুর জেলার কোন্ কলেজে (নামটা মনে আসছে না) অধ্যক্ষের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত। দেবনাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানানন্দবাবুও আমার ঔষধের ফল পেয়েছেন হাতে হাতে। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি হার মেনেছে কবিরাজির কাছে।

আমার নীরবতায় বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে অনর্গল আত্মপ্রশংসা করে যান কবিরাজ। আমি শুনবার ভান করি আর পথ চলি। বাড়ীর কাছে এসে নম্র নমস্কার জানাই। কবিরাজ প্রতিনমস্কার করে বলেন, রাগ করবেন না, অনেক সময় নষ্ট করেছি আপনার। আবার দেখা হবে।

কবিরাজের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। প্রশ্নমুখর পথ ছেড়ে নির্ব্বান্ধব গৃহচূড়ায় আশ্রয় নিয়েছি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। এখানে স্কুল কলেজ, হাট বাজার, আপিস আদালত, ডাক্তারি কবিরাজির আবহাওয়া নেই। আছে সীমাহারা আকাশ, কূলভাঙা নদী, অরুণের বর্ণসমারোহ, বিহগের বিচিত্র কলরব, শুভ্র বালুচরের কঠোর বৈধব্য, মায়াবী বনের অধীর আমন্ত্রণ। কোন প্রতিবন্ধক দেখিনে আমার ও প্রকৃতির মাঝখানে।

আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ

(তৃতীয় পর্ব)

শ্রীনিখিল মৈত্র

১৯১৯ সনে ভারত সরকার যে জেল কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁরা আন্দামান বন্দী উপনিবেশ দেখে এসে বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের বাইরে নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে কয়েদী পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। আর আন্দামানকে উপনিবেশরূপে স্বাধীন মানুষের বসবাস-যোগ্য স্থান হিসাবে গড়ে তুলতে হলে সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা নিয়ে একেবারে নতুন জায়গায় কাজ আরম্ভ করতে হবে। মধ্য আন্দামান দ্বীপে বসতি গড়ার পরিকল্পনাও জেল কমিটি সমর্থন করেন নি। এ সব সিদ্ধান্ত কিন্তু আন্দামানের বন্দী নির্বাসন বন্ধ করতে পারল না।

তা সত্ত্বেও জেল কমিটির সুপারিশ এবং ভারতবর্ষে আন্দামান ও অন্যান্য জেল সংস্কারের জন্য বিরাট আন্দোলন ধীরে ধীরে আন্দামানের বন্দী উপনিবেশ ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এল। কারা-শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পুনর্নির্দ্ধারিত হ'ল—বন্দীকে জেলের গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখার প্রয়োজন যাতে সে আবার অপরাধ না করে; আর জেলের শাসনে তার চরিত্রের উন্নতি করার চেষ্টা করা হবে। এই মাপকাঠি দিয়ে আন্দামানের কারা-উপনিবেশের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায় যে, ১৯৩১-৪১ সনে এই কয়েদী শিবিরের শাসনব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রথমতঃ যে-কোনও কর্মক্ষম গুরুতর অপরাধী নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা (যাবজ্জীবন বা মেয়াদী) পেলেই তাকে আন্দামানে নিয়ে আসার নিয়ম রদ করা হয়। স্বভাবদুর্বৃত্ত বা জঘন্য অপরাধীকে পারতপক্ষে এ সময়ে আন্দামানে নিয়ে আসা হ'ত না। আন্দামানে আসার পর কোনও অপরাধ করলে তাকে দণ্ড দিয়ে ভারতবর্ষের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

১৯৪১ সনে আন্দামানে নির্বাসিত কয়েদী মাস ছয়েক সেলুলার জেলে কাটাবার পরই তলবদার পর্যায়ভুক্ত হতে পারত। সুস্থ সামাজিক জীবন গড়ে তোলার জন্য দু'বছর পরে তাকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হ'ত। নিজেই সে সরকারী খরচে দেশে গিয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে আসতে পারত। প্রয়োজন হলে দেশের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও কয়েদীর স্ত্রী ও সন্তানদের কোনও আত্মীয় রক্ষকের তত্ত্বাবধানে আন্দামান পাঠিয়ে দিতেন। তলবদারদের কয়েদীর সাজপোশাক পরার নিয়মও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিজেদের ইচ্ছামত কাপড়জামা তারা পরতে পারত। মাঝে মাঝে এর ফলে যে মুস্কিল হ'ত না তাও নয়। ফিটফাট পোশাকের কারুর সঙ্গে নবাগত সরকারী কর্মচারী হয়ত পরম সমাদরে আলাপ-আলোচনা করছেন, পরে খবর পেলেন যে, ঐ ব্যক্তি একটি তলবদার, আন্দামানে নব পরিবেশে কয়েদী জীবন কাটাচ্ছে! এই ভাবে ঠকার ফলে এক জবরদস্ত ডেপুটি কমিশনার নিয়ম জারি করলেন যে, তলবদাররা সাধারণ পোশাকের উপর বিশেষ কোনও পরিচয় চিহ্ন পরবে। পরে সে নিয়ম বদলে হ'ল যে, জামার সঙ্গে তকমা ঝুলোবার কোনও প্রয়োজন নেই, কেবল পরিচয় কার্ড সঙ্গে রাখলেই চলবে।

তলবদাররা কালাপানিতে প্রথম দু'বছর বিভিন্ন কয়েদী কেন্দ্রে থেকে কাজ করত। মাইনে মাসিক দশ টাকা থেকে আঠাশ টাকা পর্য্যন্ত। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে কয়েদী কেন্দ্রের বাসিন্দারা বাইরে বেড়াতেও যেতে পারত এবং ইচ্ছা করলে কৃষকের ক্ষেতে, ব্যবসায়ীর দোকানের কাজে বা কারিগরী করে তাদের পয়সা উপার্জ্জন করারও কোন বাধা ছিল না। দু'বছর পরে তলবদার 'টিকেট অন লীভ' পদে উন্নীত হ'ত, তখন তার মাইনে বেড়ে যেত এবং অনেকেই ক্ষেতের কাজ বা ব্যবসা করে রোজ উপার্জ্জনের পথ বেছে নিত। যারা সরকারী চাকরী করত, তাদের পরিবারের জন্য বিশেষ ভাতা দেবার ব্যবস্থা ছিল। স্ত্রীর জন্য পাঁচ টাকা এবং প্রতি সন্তানের জন্য দু'টাকা। পোর্টব্লেয়ার শহরের ভিলানীপুর অঞ্চলে মাসিক আট আনা ভাড়ায় সরকারী কোয়ার্টারও পাবার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণতঃ দ্বীপান্তরিত কয়েদী আট-দশ বছর শান্ত ভাবে আন্দামানে বসবাস করলে তার দণ্ডকাল শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হ'ত। তখন তার পক্ষে দেশে ফিরে যাবার পথে কোন বাধা ছিল না।

১৯৪১ সনে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় আন্দামানের পূর্ণাঙ্গ জনগণনা ও তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নি। অতি সংক্ষিপ্ত যে তথ্য তখন সরকার প্রকাশ করেছিলেন তাই থেকে জানতে পারা যায় যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিল একুশ হাজার আর তার মধ্যে পোর্ট-ব্লেয়ার ও আশেপাশের এলাকায় উনিশ হাজারেরও বেশি লোক। স্ত্রীপুরুষের সংখ্যানুপাতিক বৈষম্য অনেকখানি দূর হলেও পুরুষের সংখ্যা পোর্টব্লেয়ার এলাকায় ছিল তের হাজার আর স্ত্রীলোক দু'হাজারেরও কম। পোর্টব্লেয়ার অঞ্চল প্রায় আশীটি ছোটবড় গ্রাম নিয়ে গঠিত। সেই সময় প্রায় ন'টা বড় বড় কনভিক্ট স্টেশন ছিল। মিডলপয়েন্ট, পাহাড়গাঁও,

হামফ্রিগঞ্জ, ডাণ্ডাস পয়েন্ট, উইম্বারলিগঞ্জ, রস, নমুনাঘর, হ্যাডো এবং আঠালাণ্টা পয়েন্ট। তা ছাড়া, এলিফণ্টি পয়েন্ট এবং তুসনাবাদ অঞ্চলেও ছোট ছোট অর্দ্ধমুক্ত কয়েদী-কেন্দ্র ছিল।

আন্দামানের শাসনব্যবস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব আজকের মত তখনও চীফ কমিশনারের উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কোনও ভারতীয়কে এই পদে নিযুক্ত করা হয় নি। এমনকি ডেপুটি কমিশনারও একজন ভারতীয় ছাড়া আর কেউ হয় নি। মিলিটারী বা ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের জাঁদরেল চাঁইরা এই দুটি পদ অলঙ্কৃত করতেন। একমাত্র স্বাস্থ্যবিভাগ ছাড়া দায়িত্বশীল কোনও উঁচু পদে ভারতীয় কর্মচারীকে আন্দামানে বদলী করা হয় নি। জেলার, ওয়ারলেস অপারেটর প্রভৃতি কম মাইনের দায়িত্বশীল পদে সাধারণতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের নিযুক্ত করা হ'ত। ডেপুটি কমিশনারের অধীনে দু'জন এসিস্টাণ্ট কমিশনার—একজন কর বিভাগের এবং আর একজন শাসন বিভাগের। দ্বিতীয় কর্মচারীর পদকে সেটেলমেণ্ট এসিস্টাণ্ট কমিশনার বলা হ'ত। ঐ পদাধিকারী সাধারণতঃ পুলিস বিভাগের কোনও ইংরেজ কর্মচারী হতেন। কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। ১৯৩৩ সন থেকে আন্দামানে আবার নবপর্য্যায়ে বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক বন্দী নিয়ে যাওয়ায় সেলুলর জেলের শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেওয়া হয় এবং বিশেষ একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ পথে নিয়োগ করা হয়।

১৯৪১ সনে আন্দামান বন্দীনিবাসে প্রায় ১২০ জন ইউরোপীয় সৈনিকের এক কম্পানী একজন ক্যাপ্টেনের অধীনে রস দ্বীপে থাকত। প্রতি ছ'মাস পর পর এই কম্পানীর বদলী ভারতবর্ষ থেকে যেত। ব্রিটিশ সৈন্যদের আন্দামানবাস বায়ু পরিবর্তনেরই নামান্তর। রাত্রে চীফ কমিশনারের বাসগৃহ বা গবর্নমেণ্ট হাউস পাহারা দেওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনও কাজ ছিল না। তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জাপানী অধিকারের আগে পর্যন্ত এই কম্পানী আন্দামানে ছিল। বন্দীশিবিরের সুরক্ষা—বিশেষ করে রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে আসার পর সরকারের সামনে বিরাট এক সমস্যা রূপে দেখা দেয়। সে কাজ ইংরেজ সরকার কি নিখুঁত ভাবে করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় আন্দামানের মিলিটারী পুলিশের গঠন দেখলে। বন্দী উপনিবেশের প্রধান প্রহরী ছিল মিলিটারী পুলিশ। সাধারণ সিবিল পুলিশের সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শ। ভারতীয় মিলিটারী পুলিশ চারটি কম্পানীতে বিভক্ত—শিখ ও ডোগরা এক-একটি কম্পানী, পঞ্জাবী মুসলমান পল্টন, পুলিস দুই কম্পানী। প্রত্যেক কম্পানীর উপরে একজন সুবেদার এবং বি[illegible] সুবেদারের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল সুবেদার মেজরের উপ[illegible] মিলিটারী ও বেসামরিক পুলিসের উপরওয়ালা কমাণ্ড[illegible] মিলিটারী পুলিস। তিনিও ইংরেজ।

১৯৩১-৪১ সনে আন্দামানে কয়েদী চালান করার জ[illegible] মহারাজা জাহাজই ব্যবহৃত হ'ত। উত্তর-ভারতের আন্দ[illegible]মানগামী বন্দীদের কলকাতার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নি[illegible] এসে রাখা হ'ত। জাহাজ ছাড়ার দিন খুব ভোরে ডাণ্ড[illegible] বেড়ী পরিহিত অবস্থায় বন্দী নিজের ছোট বিছানা এ[illegible] জেলে উর্দি নিয়ে জাহাজঘাটে বন্দী গাড়ীতে চড়ে কড়া পু[illegible] পাহারায় আসত। মহারাজা জাহাজের নীচের ডেকে মাঝখানে বয়লারের ঠিক উপরে সারি সারি ছোট ছো[illegible] সেল। তারই মধ্যে কয়েদীদের রাখা হ'ত। সেলে ঢুক[illegible] ডাণ্ডাবেড়ী রাখা নিয়মবিরুদ্ধ। কামার এসে ঐ সব কে[illegible] দিত। দিনে ঘণ্টাদুয়েকের জন্য উন্মুক্ত বাতাসের মা[illegible] শাস্ত্রীর পাহারায় উপরের ডেকে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম ছিল। পোর্টব্লেয়ারেও বন্দীদের আলাদা করে নামিয়ে নিয়ে খানা তল্লাসী করে সেলুলর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

এই সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামানে নিয়ে আস[illegible] আর এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩৫ সনে সেলুলর জেলে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই শত। পি-আই ব[illegible] পারমানেণ্টাল ইনকারসিরিটেড (পাকাপাকি বন্দী) ব[illegible] তাঁদের বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল এবং সেলুলর জেলের কঠো[illegible] অনুশাসন ও রুদ্ধ সেলের বাইরে তাঁদের পাঠানো হ'ত না। নিজেদের অধিকার নিয়ে বিপ্লবী বন্দীরা আবার আন্দোল[illegible] সুরু করলেন। সেই চিরাচরিত পথে—প্রায়োপবেশন ক[illegible] জেল কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিলে[illegible] যে বন্দীত্বের অবমাননা বিনা প্রতিবাদে তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না। অনশনে কয়েকজনের মৃত্যুও হ'ল। ১৯৩[illegible] সনের ভারতবর্ষ এ সংবাদ শুনে বিরাট প্রতিবাদ আন্দোল[illegible] আরম্ভ করল। ভূস্বর্গ আন্দামান বলে ভারত সরকার ব[illegible] প্রচার চালিয়েছিলেন। কিন্তু, জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে[illegible] সৈনিকদের আন্দামানের কারাকক্ষে নির্বাসন ভোগ করতে দিতে রাজী হ'ল না। দেশব্যাপী বিপুল আন্দোলনের সামনে ইংরেজ সরকার নতি স্বীকার করলেন, রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হ'ল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ইংরেজ শক্তির আদেশ অমান্য করার অপরাধে কিছু সৈনিককে আন্দামানে নিয়ে আস[illegible] হয়েছিল। জাপানী আক্রমণ এবং আন্দামানে জাপানী শক্তির অধিকারের সম্ভাবনায় সে সমস্ত বন্দীদের '৪১ সনের শেষাশেষি দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৪২ সনে সিঙ্গাপুর, মালয় ও বর্মার পতনের সঙ্গে আন্দামানের উপরেও জাপানী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তা সুনিশ্চিত ভাবে ইংরেজ সরকার বুঝতে পারেন। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাদের পরিবার-পরিজন, ইংরেজ পল্টন, ভারতীয় মিলিটারী পুলিশের এক বিশেষ অংশ এবং কিছু ভারতীয় কর্মচারীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা ভারত সরকার করেন। আন্দামান বন্দী উপনিবেশের অস্তিত্বও জাপানী অধিকারের দিন থেকে শেষ হয়ে যায়। '৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করার পর আন্দামানে আবার সাড়ম্বরে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলিত হল, ইংরেজ এবং ভারতীয় পল্টনও আন্দামানে আসে। কিন্তু, বন্দী শিবির হিসেবে আর আন্দামানকে ব্যবহার করা হবে না—একথা খুব স্পষ্ট করেই ভারত সরকার ঘোষণা করেন।

ভারতবর্ষের একাঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী রাজশক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তখন থেকেই ভারতবর্ষের বাইরে দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত বন্দীদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সুমাত্রার বেনকুলেনে প্রথম ভারতীয় বন্দীর দল নির্বাসিত হয় ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বেনকুলেন ডাচ কর্তৃপক্ষের শাসনাধীনে চলে যায়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বন্দীদের তখন নারবে নিয়ে আসেন পেনাঙে। দু'বছর পরে পেনাঙের বন্দী-নিবাস উঠিয়ে সিঙ্গাপুরে কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৭৩ সন পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বর্মী, মালয়, সিংহলী প্রভৃতি বন্দীদের এক উপনিবেশ থাকে। পরে সেখানকার কয়েদীদের আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, আন্দামানকে ফরাসীর কুখ্যাত নির্বাসন দ্বীপ ডেভিলস্ আইল্যান্ডের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা করা সম্ভব নয়। নিছক প্রতিশোধবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আন্দামান বন্দী শিবির গড়ে উঠে নি। এখানে অতি ভীষণ নরহন্তা, স্বভাব দুর্বৃত্তকে সংশোধন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে তাঁরা দেখাবেন আন্দামানের 'লোকাল বর্ণ' সমাজ (যাঁদের কেউ কেউ নিজেদের আণ্ডামানিয়ান নামে এখন অভিহিত করেন)। এই সমাজের স্রষ্টা অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুতর অপরাধীরা। সিপাহী বিদ্রোহের বন্দীরা নব পর্যায়ে আন্দামান উপনিবেশের প্রথম বাসিন্দা। কিন্তু, কয়েক বছরের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন, আদিম নিবাসীদের অবিশ্রান্ত আক্রমণ এবং বিভিন্ন রোগে অধিকাংশ বিদ্রোহী সিপাহীর মৃত্যু হয়। সে যুগে আন্দামান নিশ্চয়ই ফরাসী গায়নার কারানিবেশকে টেক্কা দিত, যে সামান্য বিপ্লবী এত বিপদের মধ্যেও বেঁচে ছিলেন তাঁরা নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেললেন সাধারণ কয়েদীদের প্লাবনে। কোনও নরঘাতিনী বন্দিনীর সঙ্গে বিপ্লবী সিপাহীর বিবাহও হ'ল এবং পরের যুগে সমস্ত কয়েদীদের সন্তান-সন্ততি এক সঙ্গে মিলে গেল।

আন্দামানের এই সমাজ বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং ধর্মমতের লোকের সংমিশ্রণে গঠিত। খ্রীষ্টান মিশনারিরা কয়েদীদের মধ্যে প্রথম দিকে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করতে পারেন নি। সেলুলার জেলের মধ্যে হিন্দুকে মুসলমান করার অপচেষ্টার কিছু বিবরণ বীর সাভারকরের আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়। তবে পরবর্তী সময়ে এ সমস্ত খুব তীব্র আকার ধারণ করে নি। আন্দামানের হিন্দু সমাজ ও নিছক বাঁচার তাগিদে ছুতাছুত, খাওয়ার ব্যাপারে গোঁড়ামি এবং আরও বহু অনুশাসনের বন্ধন শিথিল করে দেয়। শিখ এবং বর্মী সমাজ স্বতন্ত্র ধারায় নিজস্ব রীতিনীতি নিয়ে চলে। ভারতবর্ষ ও বর্মার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর ১৯৩৭ সনে কিছু বর্মী কয়েদী আন্দামান ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যায় কিন্তু অনেকেই আন্দামানের বসতি আঁকড়ে পড়ে থাকে। মোপলা (মালাবারী মুসলমান) সমাজও আন্দামানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

বন্দী উপনিবেশের শেষ পর্যায়ে আন্দামানের স্থায়ী বাসিন্দা সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। সরকারও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ফলে ডাক্তার, মাস্টার, সরকারী চাকুরে, কারিগর প্রভৃতিও এই সমাজ থেকে বেরোতে আরম্ভ করে। শান্ত সামাজিক জীবনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল বিরাট এক কয়েদী সমাজ। নারী ঘটিত কলহ বিবাদের ফলে খুন খারাপিই হ'ত। একবার নরহত্যার সাজা পাবার পর দ্বিতীয়বার আবার কারুর প্রাণ নিলে, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। তাই দ্বিতীয় খুন অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। মদ্যপান ও জুয়া খেলার রেওয়াজও ছিল খুব বেশী।

ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের মত আন্দামানকে যে কখনও বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারে একথা ইংরেজ সরকার কখনও চিন্তাও করেন নি। ফলে রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় নি। '৪১ সনের শেষে জাপানী অগ্রগতির সামনে আন্দামান পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কয়েদীদের জাপানীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে ঠিক হ'ল। '৪২ সন জানুয়ারী মাস থেকে জাপানী উড়ো-জাহাজের আনাগোনা আরম্ভ হ'ল। উদ্দেশ্য বোমা ফেলা নয়, পর্যবেক্ষণ করা, দেশে ফিরে যাবার জন্যে সবাই

ব্যগ্র। সরকার অবশ্য এ অবস্থায় কঠোরভাবে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন। মার্চ মাসের ১৩ তারিখে (১৯৪২ সনে) এস এস-মুরুলিয়া আন্দামান থেকে অবশিষ্ট যাত্রিদল নিয়ে ভারতবর্ষের পূর্বতটের বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। পোর্টব্লেয়ারে গুরখা রাইফেলের অবশিষ্ট লোকজন, ব্রিটিশ সৈন্য এবং কিছু সরকারী কর্মচারী নিয়ে জাহাজ ছেড়ে গেল। অতি সামান্য মালপত্র যাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিল। তারপরে প্রায় পঞ্চাশ টনের ছোট 'মোটর ভেসেল কিসমতে' আন্দামানের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার, ইঞ্জিনীয়ার ও হারবার মাস্টার, কমান্ডাণ্ট মিলিটারী পুলিশ, সেলুলর জেলের জেলার প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। চীফ কমিশনার সি. এফ. ওয়াটরফল আই-সি-এস এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আন্দামানে থেকে যান।

ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ আন্দামানে যে শিথিল হয়ে আসছে এবং সমস্ত দ্বীপমালা অতি শীঘ্র যে জাপানী অধিকারে চলে যাবে তা কয়েদীরাও ভাল করে বুঝতে পেরেছিল। অথচ এই পরিবর্তনের অনিশ্চিত সময়ে গোলমাল একেবারে হয় নি বললেই চলে। জাপানী অধিকারের পরে একথা আন্দামানবাসীরা মর্মে মর্মে বুঝেছিল যে দুর্বৃত্ত কয়েদীদের স্বাধীন করে দিয়ে তাদের মধ্য থেকে শাসক সংগ্রহ করার ফল কত মর্মান্তিক হতে পারে। বর্মা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে জাপানী অধিকারের যুগে যে ভাবে ভারতীয় জাতীয়-বাহিনী (আই-এন-এ) গড়ে উঠেছিল, আন্দামানে তা মোটেই হয় নি। উপরন্তু বিরাট কয়েদী-বাহিনী এবং স্থানীয় অধিবাসীরা একে অপরের নামে অবিরাম দোষারোপই করেছিলেন এবং জাপানী শাসনকে আরও কঠোরতর করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

কয়েদী যুগে পাঞ্জাবী সংখ্যাধিক্যের জন্য এবং সরকারের পরোক্ষ প্রোৎসাহে উর্দু আন্দামান উপনিবেশের সাধারণ চলতি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও পোর্টব্লেয়ার সরকারী হাইস্কুলে একমাত্র উর্দু ভাষাতেই লেখাপড়া শেখানো হ'ত। পোর্টব্লেয়ার তথা আন্দামানে উচ্চ-বিদ্যালয় একটিই এবং ১৯৩৭ সন পর্যন্ত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

আন্দামানের উর্বর জমিতে মুক্ত কয়েদী চাষ-আবাদ করতে আরম্ভ করে কিন্তু কৃষিকেই প্রধান উপজীবিকা করেছিল এ রকম লোকসংখ্যা খুব কমই ছিল। শতকরা ৭০ ভাগ সাবালক পুরুষ কোনও না কোনও সরকারী কাজ করত, তারই সঙ্গে অবসর সময়ে চাষবাস। ফলে কৃষি-ব্যবস্থা কখনও খুব উন্নত ধরনের ছিল না। বন্দী উপনিবেশের বাধানিষেধ, কৃষিকার্য, ব্যবসায় এবং স্বাধীন বৃত্তি প্রভৃতি কাজেই অনাবশ্যক বহু বাধার সৃষ্টি করত। জাপানী অধিকারের যুগে খাদ্যবস্তুর জন্যে পরনির্ভরশীলতার কঠোর দণ্ড আন্দামানবাসীদের দিতে হয়েছিল।

বন্দী উপনিবেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় স্বাধীন চিন্তা, ভাবনার বা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে উঠার কোনও সুযোগ ছিল না। ১৯২১ ও ৩০ সনের জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগর এবং সরকারী বাধানিষেধের প্রাচীর ভেদ করে আন্দামানে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। এমন কি সেলুলর জেলের মধ্যে বিপ্লবী বন্দীদের অনশন এবারডীন বাজারে অতি সঙ্গোপনে আলোচিত হ'ত মাত্র, তাই নিয়ে কোনও বিক্ষোভ কোথাও দেখা দেয় নি। সরকারী অনুকম্পায় গঠিত একমাত্র লোকাল বর্ন এসোসিয়েশন ছাড়া অন্য কোনও সংগঠন এখানে গড়ে উঠে নি।

সর্প

শ্রীসুবোধ বসু

প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া বাড়ি ফিরিতে একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল। বাড়ির কাছাকাছি নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। বাজারের ব্যাগ হাতে বাজারের দিকে চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া যথারীতি সবিনয় নমস্কার করিলেন।

নরেশবাবু আমার প্রতিবেশী। আমার বাড়ির পাশে শালিখডাঙার বাবুদের যে ঘোড়ার আস্তাবলগুলি সামান্য অদল-বদল করিয়া ইদানীং মানুষদের কাছে ভাড়া দেওয়া হইতেছে, ইনি মাসছয়েক আগে তাহার একটি দখল করিয়াছেন। পাড়ার ছোকরাদের সরস্বতী পূজা-কমিটির মিটিঙে মাসতিনেক আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তার পর হইতে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন ভদ্র নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি।

বছর চল্লিশের শান্ত, নিরীহ ভদ্রলোক। কোন এক মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেন। কয়টি ছেলেপুলে বলিতে পারিব না; কিন্তু তাঁর বাড়িতে কখনও কোনও চেঁচামেচি, হাঁকডাক শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বস্তুতঃ, এমন নিঃশব্দ প্রতিবেশী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। আমার স্ত্রী জানালা হইতে ইঁহাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিবার পর সার্টিফিকেট দিয়াছেন, 'গরীব হলে কি হবে, সুখী পরিবার!' প্রতি সন্ধ্যায় নরেশবাবুকে সস্ত্রীক লেকের দিকে হাওয়া খাইতে যাইতে দেখিয়া একথা বহুবার আমারও মনে হইয়াছে। আর এও মনে হইয়াছে, সুখের জন্য সবচেয়ে যেটা বেশী দরকার সেটা একটা বিশেষ মনোবৃত্তি, বৈভবের প্রাচুর্য্য নয়।

'এমন উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে কেন? অসুখ-বিসুখ নয় ত?'

'না, স্যার।' নরেশবাবু কহিলেন। 'অসুখ নয়। দু' রাত্তির ধরে ঘুমোতে পারছি না। আপনি শোনেন নি বুঝি?...'

'কি ব্যাপার?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম।

'গাঙ্গুলি সাহেবের গ্লাস-কেস থেকে কি করে তাঁর একটা বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে গেছে। আমাদের আস্তাবল-বাড়িতেই নাকি এসে লুকিয়েছে সেটা। এখনও ধরা পড়ে নি। ভয়ে দু'রাত ধরে সপরিবারে জেগে বসে আছি...'

আস্তাবল-বাড়ির পাশেই গাঙ্গুলী সাহেবের চার তলা প্রাসাদ। গাঙ্গুলী এক সময় কয়েষ্ট অফিসার ছিলেন। খুব মোটা রকম ঘুষ খাওয়ায় তাঁর চাকরি যায়। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের বাজারে তিনি কণ্ট্রাক্টরী শুরু করেন এবং শীঘ্রই লাল হইয়া উঠেন। শহরের তিনি একজন গণ্যমান্য লোক। কিন্তু একটি বন্য সখ তাঁর আজও রহিয়া গেছে। সাপ পোষা। বিচিত্র ধরনের বহু সাপ কাচের বাক্সে পুরিয়া তিনি একটা হলঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দেশী-বিদেশী বহু লোক এই সর্প-সংগ্রহ দেখিয়া তারিফ করিয়া যায়। তাঁর 'চিত্রিণী', 'শঙ্খিনী' 'হিল্লোলিনী'দের মধ্যে অস্বস্তিকর রোমাঞ্চ বোধ করিতে করিতে আমিও গাঙ্গুলী সাহেবের এই ভয়ঙ্কর সখের অনেক তারিফ করিয়াছি। ইহাদের একটি ছাড়া পাইলে পাড়ায় কি রকম বিপদের সৃষ্টি হইতে পারে, নরেশবাবুর মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া ও তাঁহার দুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিলাম।

'না না, অত ভয় পাওয়ার কি আছে?' ভদ্রলোককে নিছক আশ্বাস দানের উদ্দেশ্যেই কহিলাম।

নরেশবাবু প্রায় আহত হইলেন। কহিলেন, 'আপনারা তিন তলার ওপরে থাকেন, তাই বলছেন। আমরা ত ভয়ে জুজু হয়ে আছি। আর এ কি রকম বেয়াড়া সখ বলুন ত! ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে সাপ পোষা! এখন যদি কাউকে কামড়ায় কে তার দায়িত্ব নেবে?' বলিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট মুখে তিনি বাজারের দিকে পা বাড়াইলেন।

রাত প্রায় আটটা। সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া স্ট্যাণ্ড হইতে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুতের আলোয় "এ ক্রিটিক অব পিওর রিজন্" পড়িতেছি। মনোনিবেশ বোধ হয় বেশ গভীরই হইয়াছিল, এমন সময় স্ত্রী আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, 'শুনছ, পাশের বাড়িতে ঝগড়া লেগেছে। নরেশবাবু বোধ হয় তাঁর বৌকে ধরে মারছেন...'

'দূর্!' আমি বই রাখিয়া কহিলাম।

'দূর্ কি!' গৃহিণী অসহিষ্ণু ভাবে কহিলেন। 'শুনছ না ঝগড়ার শব্দ?'

উত্তেজিত কথাবার্তার একটা মিশ্রিত আওয়াজ এবার আমার কানেও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'নিশ্চয়ই সাপটা বেরিয়েছে!' আমি কহিলাম।

'সাপ না কচু!' গৃহিণী ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কহিলেন, 'ভয় পেয়ে লোকে এমন বিশ্রী গালাগালি করে? জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একবার শুনে এস।'

ভদ্রতার নিয়মাবলী বিসর্জ্জন দিয়া অন্ধকার কামরার জানালা হইতে নিচের বাড়িতে আড়ি পাতিতে গেলাম। নরেশবাবুর বাড়ি সম্পূর্ণ অন্ধকার, কিন্তু উচ্চ ক্রুদ্ধ ধারালো আওয়াজ যে ঐখান হইতেই কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আর কি তীক্ষ্ণ হিংস্র কণ্ঠধ্বনি! যেন শব্দের একটা বিষাক্ত-ছোরা নরম অন্ধকারকে বেপরোয়া আঘাত করিয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে।

'মেরে ফেলব হারামজাদী, মেরে ফেলব!'

'পাজি, বদমাস, কসাই। লজ্জা করে না? আর এক পা এগো দেখি, কত বড় তুই মরদ!'

'জিব উপড়ে ফেলব বলছি। আবার গাল দিবি ত টেনে জিব উপড়ে ফেলব, দজ্জাল মেয়েমানুষ!'

অপর পক্ষ হইতে এবারও ইহার উচ্চতর ও তিক্ততর পাল্টা জবাব আসিল। কোনও লজ্জা নাই, আব্রু নাই, প্রতিবেশীরা যে স্বামী-স্ত্রীর এই নির্লজ্জ কলহের প্রতিটি শব্দ শুনিতেছে, সেদিকে দু'জনের ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।

স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিজেরই যেন লজ্জা করিতে লাগিল। নরেশবাবুর বাড়ি হইতে কোনদিন একটা জোরে হাঁকও শুনি নাই। এমন ঠাণ্ডা শান্ত পরিবার সচরাচর দেখা যায় না। স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিল আছে, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে আজ অকস্মাৎ তাঁহারা এমন করিয়া সকল ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিয়া বসিলেন কি করিয়া?

সাপের ভয়ে দুই রাত্রি অনিদ্রা ইহার কারণ নয় ত? ক্রোধকে সাময়িক উন্মাদরোগ বলা হয়। দুই রাত্রি না ঘুমাইয়া ইহারা সত্যই পাগল হইয়া উঠে নাই ত? স্বকর্ণে না শুনিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতাম না যে, এমন হলাহল এই দম্পতী পরস্পরের প্রতি উদ্গিরণ করিতে পারে।

'কেমন, এখন বিশ্বাস হ'ল ত সাপ নয়?' গৃহিণী কাছে হাজির হইয়া মাষ্টারের ভঙ্গিতে কহিলেন।

'সাপ এতে সন্দেহমাত্র নেই।' আমি কহিলাম। 'এ সাপ দেহের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে, স্নায়ুর জটের কোন্ তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে মড়ার মত চুপ করে পড়ে থাকে, ঠিক নেই। তারপর কি করে একদিন এই সাপের গায়ে অকস্মাৎ অসতর্ক পা পড়ে। মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করে ওঠে নির্জ্জীব সর্প, ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়ায়। দাঁত থেকে বিষ টপটপ করে পড়তে থাকে, যাকেই সামনে পায় নির্বিচারে তাকেই ছোবল মেরে বসে। এমন ভয়ঙ্কর সাপ আর জগতে নেই। মানুষে মানুষে সম্পর্ক এক পলকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে এই সরীসৃপ!'

'তোমার ও সব দার্শনিক হেঁয়ালি রাখ।' বলিয়া আমাকে আর কোনরূপ আস্কারা না দিয়া গৃহিণী তাচ্ছিল্যভরে স্বকাজে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতেছি। রাস্তায় নরেশবাবুর সঙ্গে দেখা। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যথারীতি সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কারও মুখেই গতরাত্রের ঘটনার কোনও ছাপ নাই। এক রাত ও এক বেলার মধ্যেই তাঁরা নিজেদের মতভেদ ও মনোমালিন্য মিটাইয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

'গাঙ্গুলী সাহেবের সাপটা আজ সকালবেলা ধরা পড়েছে, শুনেছেন?'

'ওঃ, তাই নাকি?' আমি কহিলাম।

'তাঁর নিজের বাড়ির বইয়ের সেল্ফের পেছনেই গুঁড়ি-গুড়ি মেরে বসেছিল। বই ঝাড়তে গিয়ে বেয়ারা দেখতে পায়।' নরেশবাবু কহিলেন। 'অথচ এই সাপের ভয়ে আমাদের দু'দুটো দিন কি করেই না কেটেছে!...বাড়ি ফিরছেন বুঝি? আচ্ছা চলি, একটু হাঁটতে বেরিয়েছি...'

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কপালে হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া আগাইয়া গেলেন। সাপ ধরা পড়ার স্বস্তি তাঁহাদের চোখে-মুখে সুস্পষ্ট।
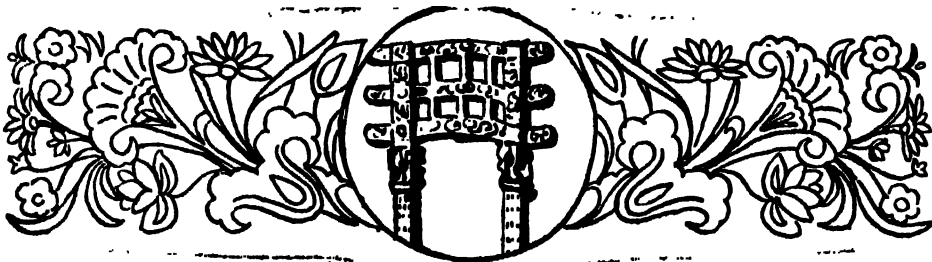
গান ও স্বরলিপি

ইমনকল্যাণ—দাদ্‌রা

নয়নের আলো নিভালে যদি গো
অন্তরে আলো দাও
ভুবনে আঁধার বিছালে যদি গো
ভক্তি-দীপ জালাও !

যে পরম-জ্যোতি মনের আড়ালে রয়
সেই যেন মোর সব আঁধার করে ক্ষয়
অন্তরলোকে প্রকাশে জ্যোতির্ম্ময়—
এই কৃপাকণা দাও !

বাহিরে বাহিরে ঘুরে মরা নিশিদিন
তাও কি গো কভু সয় —
তাই কি দয়াল কালো করি আলো সব
পথ কর আলোময় ?

তাই হোক্ তবে তাই হোক্
তব ইচ্ছার জয় হোক্
এ আমার আমি লয় হোক্—
তোমাতে ডুবাও ।।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

১ 0 ১´ 0
।। সা পা গা | -া পা পা I .পা পা ক্ষা | -গা গা মা I
ন য় নে র্ আ লো নি ভা লে ০ য দি

১´ 0 ১´ 0
গা -া -া | -া -া -া I সা -গা গা | গরা রা রা I
গো ০ ০ ০ ০ ০ অ ন্ ত রে০ আ লো

১´ 0 ১´ 0
সা -া -া | -া -া -া I সা সরা রা | রা রা -া I
দা ০ ০ ০ ও ০ ভু ব০ নে আঁ ধা র্

১´ 0 ১´ 0
রা রা রা | -গা সা গরা I গা -া -া | -া -া -া I
বি ছা লে ০ য দি০ গো ০ ০ ০ ০ ০

১ 0 ১´ 0
সা -গা গা | রা -া রা I সা -া -া | -া -া -া II
ভ ক্ তি দী প্ জ্বা লা ০ ০ ০ ও ০

১´ 0 ১ 0
II { গা -গা গা | -পা পা ধা I ধা র্সা -া | র্সা না র্রা I
{ যে প র ম্ জ্যো তি ম নে র্ আ ড়া লে

১´ 0 ১´ 0
র্সা -া -া | -া -া -া I র্সা র্গা র্গা | র্গা র্গা -র্রা I
র ০ ০ ০ র্ ০ সে ই যে ন মো র্

১´ 0 ১´ 0
র্রা -া র্রা | র্রা -না না I র্রা র্সা -া | -া -া -া } I
স ব আঁ ধা র্ ক রে ক্ষ ০ ০ য্ ০ }

১´ 0 ১ 0
না -া না | -া না না I ধা ধা ধা | পা ক্ষা -ধা I
অ ন্ ত র্ লো কে প্র কা শে জ্যো তি র্

১ 0 ১´ 0
পা -া -া | -া -া -া I রা -গা গা | গা রা রা I
ম ০ ০ ০ য্ ০ এ ই কু পা ক ণা

১´ 0
সা -া -া | -া -া -া II
দা ০ ০ ০ ও ০

১´ 0 ২´ 0
{ সা রা রা | রা রা রা । রা রা রা | গা সা গরা ।
{ বা হি রে বা হি রে ঘু রে ম রা নি শি০

১´ 0 ২´ 0
গা -া -া | -া -া -া । জ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞগা জ্ঞা পা ।
দি ০ ০ ০ ন্ ০ তা ও কি গো০ ক ভু

১´ 0 ২´
পা -া -া | -া -া -া । পা -ধা ধা | ধা ধা -া ।
স ০ ০ ০ য়্ ০ তা ই কি দ য়া লু

১´ 0 ২´ 0
ধা ধা ধা | ধপা ধা না । না -া -া | -া -া -া ।
কা লো ক রি০ আ লো স ০ ০ ০ ব্ ০

১´ 0 ২ 0
না -া না | নধা না র্সা । র্সা -া -া | -া -া -া } ।
প থ ক রো০ আ লো ম ০ ০ ০ য়্ ০ }

১´ 0 ২´ 0
{ পা -গা পা | -া পা ধা । ধা -র্সা র্সা | -া -া -া ।
{ তা ই হো ক্ ত বে তা ই হো ০ ক্ ০

১ 0 ২´ 0
র্সা র্গা র্গা | -া র্রা -া । না -র্রা র্সা | -া -া -া } ।
ত ব ই ০ চ্ছা র্ জ য়্ হো ০ ক্ ০ }

১´ 0 ২ 0
না না না | -া না না । ধা -া পা | -া -রা -া ।
আ মা র্ আ মি ল য়্ হো ০ ক্ ০

১´ 0 ২ 0
গা গা -া | রা -া রা । সা -া -া | -া -া -া ॥
তো মা ০ তে ০ ডু বা ০ ০ ০ ও ০

স্মৃতির খেয়াল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বিস্মিত হই, হই যে অবাক—
স্মৃতির খেয়াল দেখে,
কত সমারোহ ঢেকে মুছে দেয়,
ছোট খাটো ছবি রেখে।
কোথা বর্ণের উজ্জ্বল ছটা—
কেমনে এমন ঘটে ?
ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ ক্ষণিকের ছবি
অটুট চিত্রপটে।
কারে কি যে দেয় দর ?—
শুকায় সাগর বড় বড় নদী
বহে যায় নির্ঝর।

২

আষাঢ় গগনে নব ঘনঘটা,
দেখালো যে মোরে ডাকি,
মুরতি তাহার সে শোভার সাথে
স্মৃতি যে রেখেছে আঁকি।
কতই আষাঢ় এলো গেল পুনঃ
করি নি তাদের খোঁজ,
বিচিত্র সেই চিত্রে দিয়েছে
নূতন রঙের পোঁচ।
ব্যাপার কি অদ্ভুত—
দামী হ'ল মোর জীবন আষাঢ়ে,
মেঘ চেয়ে মেঘদূত ?

৩

মাঠের মাঝারে রেলষ্টেশন
গাড়ীতে তুলিয়া দিতে,
বন্ধু এলেন, তুচ্ছ ঘটনা—
অঙ্কিত আছে চিতে।
তিনি নাহি আর, নমি গাড়ী হতে—
দ্রুত চলে যায় ট্রেন,
তীর্থ হয়েছে এখন আমার
সেই সে ষ্টেশন।

স্মৃতি বেছে নিল কি রে ?
গোলাপ গুচ্ছ, চম্পক কেলি
ছোট আকন্দটি রে ?

৪

গভীর রাত্রে চলেছে গো-গাড়ী,
'আউচ' ফুটেছে কোথা ?
এখনো আমার বক্ষে তাহার
গন্ধের মধুরতা।
ভুলেছি জলসা বাদ্যভাণ্ড,
নৃত্য গীতের জাঁক,
মনে পড়ে শোনা সুদূর 'চুনারে'
সাঁঝে শিয়ালের ডাক।
বলেছিনু ওগো দেখো—
উহাদের সাড়া বিনা আমাদের
সন্ধ্যা মানায় নাকো।

৫

বাঙালী বাবুটি 'পাস্তারা' কেনে
ফেরী-ওয়ালাকে ডাকি',
'অম্বালার' এক ভবন দুয়ারে,
সেটা স্মরণীয় নাকি ?
ক্ষণের আলাপে 'লুণ্ডি কোটালে'
হাতে দিল মোর হাসি,
দুইটি আপেল, যুবক জনেক
'খাইবার-পাস' বাসী।
কোথা বড় বড় দান ?
স্মৃতি করিয়াছে কেন জানি নাক'
উহাই মুল্যবান।

৬

মনে পড়ে দূরে ছাদ হতে সেই
রুমাল ওড়ানো কার ?
কাঁধে ছোট নাতি, মেলা হতে ঘরে
ফেরে শিখ সর্দার।
জালন্ধরের সড়িষার ক্ষেতে
এখনো কেন যে স্মরি ?

দাঁড়াইয়া ছিল কৃষক বালিকা
রঙিন ঘাঘরা পরি।
ঢেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্ত রঙের
এই সব ছিটে কোঁটা।

৭

চলেছে মোদের ষ্টীমার সজোরে
শুনিলাম যেতে যেতে,
'মণিপুরীদের' নৃত্য হইবে,
চণ্ডী মণ্ডপেতে।
আলো লয়ে সবে করে ছুটাছুটি,
আনন্দে উৎসাহে,
অপেক্ষমান গ্রামবাসিগণ
আগ্রহে পথ চাহে।
সাবাস স্মৃতির দাবী!
'মণিপুরী দল' এলো কিনা দেখা
এখনো যে আমি ভাবি।

৮

স্মৃতির খেয়ালই রঙিন ঝুলিতে
আহরি রেখেছে মরি,
সুদীর্ঘ মোর জীবনপথের
এই সব মাধুকরী।
কোথাও সিঁদুর আবীরের দাগ,
প্রসাদের রেণুকণা,
তীর্থ মহিমা মাখানো মধুর
গন্ধের আনাগোনা।
উৎসব গেছে মুছি,
মনে ভেসে আসে চাল-চিত্রের
ভাঙা রাঙতার কুচি।

লাল সাহেব

শ্রীউমাপদ নাথ

লাল সাহেবের কথা এখনও ভুলতে পারি নি। লাল নরেন্দ্রনারায়ণ দেব।

উড়িষ্যায় রাজবংশের ছেলেদের সাধারণ নাম লাল সাহেব। নরেন্দ্রনারায়ণের ঠাকুরদাদার থেকে এরা সিংহাসনের অধিকার হারিয়ে রাজ-পরিবারের মর্যাদা নিয়ে নিজ প্রাসাদে বাস করছেন। এর ঠাকুরদাদার বড় ভাই ছিলেন রাজা, আর উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুসারে তাঁর সাক্ষাৎ বংশধরই তখন রাজ্যের শাসক। লাল নরেন্দ্রনারায়ণ বৃত্তিভোগী রাজবংশধর। নিজেদের পৃথক তালুক-দারিও আছে। বিত্তের দিক দিয়ে না হলেও বৃত্তির দিক দিয়ে রাজকীয়। আচারে-ব্যবহারে চাল-চলনে সাধারণের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

তথাপি লাল সাহেব বড় মিশুক। রাজকীয় ঐতিহ্যের বোঝা মাথায় নিয়েও মেজাজটিকে রেখেছিলেন অতি সরেস। জামদানী পাঞ্জাবীর ঢিলে আস্তিনটা একটু পিছনে টেনে ডান হাতখানা সামনে এগিয়ে দেন, ইওর হাণ্ড প্লিজ! হাতটা ভাল করে বাড়িয়ে দেবার আগেই নিজের থেকে ধরে একটা মৃদু ঝাঁকানি দেন। তার পর উজ্জ্বল আয়ত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন মুখের দিকে। মুখে লেগে থাকে একটা সরল সৌন্দর্য্য—একটা অভিজাত সস্মিতি।

একটা সঙ্গত উক্তি, একটা সাচ্চা কথা শুনলেই তাকে আপ্যায়ন করেন এমনি করে। মোসাহেবীকে ঘৃণা করেন লাল সাহেব। অপৌরুষ বড় অসহ্য।

এই লাল সাহেব ছিলেন মস্ত বড় শিকারী। রাজ্যে আর রাজ্যের বাইরেও তাঁর নাম। লাল সাহেবের গুলির আঘাতে কত যে নরখাদক বাঘ, বুনো হাতী, ভালুক, বাইসন প্রাণ দিয়েছে তার সংখ্যা নেই। অব্যর্থ গুলিটা লাগে গিয়ে ঠিক দুই চোখের মাঝ-খানে, নাকের উপরে। অনেক বিলিতি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে লাল সাহেবের শিকার-কাহিনী। অনেক হোয়াইট হাণ্টারের সঙ্গে তাঁর ভাব।

একদিন বুইক হাঁকিয়ে সটান চলে এলেন আমার বাংলোয়। স্নিগ্ধ, সৌম্য অথচ সুদৃঢ় চেহারা। অভ্যর্থনা জানাতেই আন্তরিকতার কপাট খুলে দিলেন লাল সাহেব। বললেন, আলাপ করতে এলাম।

বাজে কথা খরচ করেন না, অল্প কথাতেই আলাপ জমাতে জানেন লাল সাহেব। আরও আগে আসতে পারেন নি, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

লোকপ্রিয় বলে আমারও খ্যাতি কম ছিল না, কিন্তু এই ভদ্র-লোকটির কাছে যেন হেরে গেলাম। আমার নেমন্তন্ন হয়ে গেল লাল সাহেবের বাড়ীতে। পর দিন ডিনার খেতে হবে তাঁর প্রাসাদে।

পর দিন যথাসময়ে লাল সাহেবের গাড়ী এল। তৈরী হয়ে বেরোলাম।

লাল সাহেবের বাড়ীতে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। ঘরে ঢুকেই রীতিমত ভড়কে গেলাম। দরজার পাশেই দেওয়ালের সঙ্গে ষ্টীলের হুকে চেনে বাঁধা মস্ত একটা বাঘ—একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। লাফ দিয়ে পিছনে সরে আসব, লাল সাহেব

বাঁ হাতখানা চেপে ধরলেন। বললেন, সরি, এ্যাটাক করবে না, আমার সঙ্গে আসুন। সে কয়েক মুহূর্তের স্মৃতি কখনও ভুল হবে না। আমাকে এক রকম হাত ধরে টেনে নিয়েই বসালেন লাল সাহেব।

'লাইভ নয়, সব ট্যাক্সিডার্মি করা। মাইসোর থেকে করানো। বড় সুন্দর করেছে, না?'

ট্যাক্সিডার্মি! রীয়েল নয় তবে? হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কত জানোয়ার এমনি চতুর্দ্দিকে সাজানো।

কাছে গিয়ে দেখতে তথাপি সাহস হয় না, সেগুলো এমনি জীবন্তের মত। বিরাট হল-ঘরে একটা চিড়িয়াখানা বিশেষ। বাঘ একটা নয়, এমনি পাঁচ-ছটা। কোনটা হাঁ করে গাঁক্ করে তেড়ে আসছে, কোনটা জিভ বার করে দাঁড়িয়ে, কোনটা 'কীল'-এর দিকে তাকিয়ে আছে লোভাতুর অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে। লাল সাহেব সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। হলের মাঝখানটায় শ্বেত পাথরের উঁচু গোল টেবিলের ওপর বসানো আছে একটা এগার ফুট ম্যান-ইটার। মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার আগের পোজটি, বললেন, একজ্যাক্ট এই। যেমন করে ইঁদুর ধরবার আগে বিড়াল তার সামনের পা দুটো বিছিয়ে পিছনের পায়ের হাঁটু ভেঙে বসে, ঠিক তাই। গোঁফের লোমগুলো সব খাড়া, ভিজে জিভটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে রক্তলোভের আতিশয্যে। চোখ দুটো আগুনের গোলা। উত্তেজনা, দাঢ্য আর সঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব চকচক করছে।

লাল সাহেবের স্পর্শ পেলাম আমার হাতে। 'দেখুন কি সুন্দর! কি রোমান্টিক!'

মিথ্যা নয়। কিন্তু লাল সাহেব নিত্য দেখছেন, তবু যেন তাঁর বিস্ময়ের শেষ নেই। ওর ভেতরেই ডুবে আছেন তিনি।

অনেক দেখলাম। অনেক রকম শিকারকে জিইয়ে রেখেছেন লাল সাহেব। দেওয়ালে দেওয়ালে ভেলভেটের চাদরের গায়ে বসানো রয়েছে অনেকগুলি শিঙশুদ্ধ মাথা। এক জায়গায় ঝুলছে বিরাট দু'জোড়া হাতীর দাঁত।

বললেন, ওয়েণ্ট ম্যাড। এক দিনে দুটো হাতী শিকার করেছিলাম। ওন্‌লি টু শটস টু কিল টু। একটু মৃদু হাসলেন লাল সাহেব। একটুখানি সরল আত্মপ্রসাদের হাসি। সংক্ষেপে এবং অনাড়ম্বরে জানিয়ে দিলেন নিজের কীর্ত্তিমত্তার কাহিনী।

-বাইসনের শিঙ জোড়া দেখছেন? বিরাট এক জোড়া শিঙের কাছে দাঁড়ালেন লাল সাহেব। 'বিগেষ্ট এভার কিল্ড।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কি মজবুত আর কি ভয়ঙ্কর! কপালের লোমগুলো পর্য্যন্ত রাখা হয়েছে।

একটা লম্বা টেবিলের ওপর একটা বিরাট কুমীর। খুদে চোখ দুটোর চেহারা দেখলে মনে হয় তখনও জ্যান্ত।

'এটার জন্তে দুটো হিট লেগেছিল। একটা কপালে আর একটা পিঠে।' দুটো ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে দিলেন লাল সাহেব।

দেওয়ালের বাকী জায়গা সব বাঘের চামড়ায় ঢাকা।

বললেন, 'বাঘটাই আমার সব চেয়ে প্রিয়।'

বলতে বলতে গোল টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'দেখুন, কি সুন্দর!'

হলদের ওপরে কালোর ছাপ। বললেন, 'দেখুন দেখি কালো নক্সাগুলো কত এনচান্টিং! যেন এক-একটা পাখীর কালো ডানা। ধারগুলোতে দেখুন কি মিহি সেড! ওয়াণ্ডারফুল!'

ভয়ঙ্করের মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য খুঁজে পেয়েছেন, চোখে-মুখে আবার সেই সাফল্যের ঔজ্জ্বল্য।

'দাঁড়ান, ওর বন্দুকটা আপনাকে দেখাই—যেটা দিয়ে একে মারা হয়েছে।'

আমি একটা চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম লাল সাহেবের পৌরুষের কথা। কানে শুনেছিলাম অনেক, কিন্তু চোখে এতটা দেখি নি।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন লাল সাহেব। হাতে একটা বন্দুক। কিন্তু যে উদ্দীপনা নিয়ে ওটা আনতে গেলেন, তার যেন একান্ত অভাব এখন। বন্দুকটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে নেহাত যেন কথা রক্ষা করলেন। কিছু বুঝতে পারলাম না, ভাবান্তরের কারণ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করাও সঙ্গত মনে করলাম না।

ডিনার শেষ হ'ল। মুখে একটা পান ফেলে সিগারেট ধরিয়েছি। লাল সাহেব একখানা এলবাম বার করে সামনে ধরলেন। দেখুন, সব নেই, তবে কিছু পাবেন।

প্রায় পাঁচ শো ফটোর মোটা এলবাম বই। বলা বাহুল্য, সবগুলিই তাঁর শিকারের ছবি। অধিকাংশই ব্যাগ-করা শিকারের সঙ্গে লালসাহেব দাঁড়িয়ে। কোন-কোনটা টিপ করবার পোজের ছবি। একখানায় টিপের ছবি দেখিয়ে বললেন, এটা একটা বাজি জেতার ছবি। রায়গড়ের রাজাসাহেব হতেন তাঁর মামা। তাঁর সঙ্গে একবার বাজি হয়েছিল। মামা-ভাগ্নে বন্দুক নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন, পথে বাজি রেখে উড়ন্ত বক মেরে লালসাহেব জিতলেন। বাজির গরমে দ্বিতীয় বাজি রাখা হ'ল। বাড়ী ফিরে এলেন। পয়সার মাপের একটা টিনের চাকতি সুতোয় বেঁধে টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল। লালসাহেব চার শো গজ দূর থেকে গুলি মেরে সেটাকে উড়িয়ে দিলেন। মামা হার মেনে ভাগ্নেকে হাসি মুখে হাতের বন্দুকখানা উপহার দিলেন।

ফটোগুলো দেখে চমৎকৃত হলাম। বললেন, বাকী আছে সিংহ শিকার। আফ্রিকায় যাওয়া এখনও হয়ে ওঠে নি। সখ ছিল, কিন্তু আর হবে কিনা—

কথার আর জের টানলেন না, থেমে গেলেন। কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। একটা বিষাদের পাতলা পর্দ্দা দেখলাম যেন মুখে। আনন্দ-রাজ্যের মেলা ফেলে কোন্ বেদনা-রাজ্যে সরে গেলেন যেন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত।

বয়স হয়েছে আন্দাজ চল্লিশ। ভারী অথচ আঁটো চেহারায়

সামর্থ্যের জলন্ত চিহ্ন। ফিটফিটে গৌর বর্ণে রাজবংশের আভিজাত্য। কপালের ত্রিবলী-রেখায় চরিত্রের সংযম আর কর্মের সঙ্কল্প।

বিপত্নীক জীবনে বন্দুককেই করেছিলেন একমাত্র সহচরী। শিকারের নেশায় মশগুল হয়ে ছিলেন লালসাহেব। চোখে দেখতেন বাঘের মগজ আর বন্দুকের টিপ।

সেই চোখে দেখলাম বেদনায় একটা থমথমে ভাব। এক টুকরো ক্লেশের অন্ধকার।

লাল সাহেবের কবি-মন কোথায় চলে গিয়েছে জানি না, কিন্তু অবস্থাটা মোটেই উপভোগ্য নয়। কথা বলতে হ'ল। বললাম, 'আফ্রিকায় না গেলেও আপনার কৃতিত্ব কম নয়।'

মনের ওপর অদ্ভুত আধিপত্য দেখলাম তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন তাঁর বর্ম্মবিহার থেকে। একদম স্বাভাবিক হয়ে।

একটু হাসলেন। বললেন, বিশেষ কিছুই করি নি। তবে সংগ্রহে আছে। এ পর্যন্ত যা শিকার হয়েছে তার নমুনাগুলো থাকলেও একটা বেশ বড় গুদামের দরকার হ'ত। লাইফ রিস্ক করেছি অনেকবার, কিন্তু পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে বিপদ এসে গা ছুঁতে পারে নি।

মনে একটা লোভ ছিল, সেটা প্রকাশ করে ফেললাম। বললাম, আপনার একটা শিকার-সামগ্রীর প্রতি আমার লোভ আছে—অবশ্য আপনার ইচ্ছে যদি থাকে।

'দয়া করে বলুন।' স্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। একটা কিছু প্রেজেন্ট করতে পারবেন ভেবে বেশ খুশী হয়েছেন।

বললাম, একখানা 'হরিণের চামড়া। বাবাকে দিতাম। তিনি একটু সাধন-ভজন করেন কিনা।'

একটু যেন লজ্জা পেলেন। মুখখানা একটু ছোট হয়ে গেল। বললেন, খুবই খুশী হতাম, 'কিন্তু দুঃখের বিষয় হরিণের চামড়া সব শেষ। ও জিনিষটা আবার হাতে থাকে না, ওর চাহিদা অনেক।'

'তবে নেক্সট্ ব্যাগটা আমার।'

বললেন, 'দু'এক দিনেই পেয়ে যেতেন। কিন্তু—সে একটা ইনসিডেন্ট, বোসবাবু। জীবনের একটা ফ্লু।'

জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম।

'একটা ব্যাড ইনসিডেন্ট করে ফেলেছিলাম একদিন। বছর তিন-চার হ'ল। সেই থেকে আর শিকার করিনি। যদি কোন দিন বন্দুক ধরি, আপনাকে নিশ্চয়ই দেব। একটা কেন, যে ক'টা চান আপনি।'

'কিন্তু এত বড় সখটা আপনার ছেড়ে দিলেন! এত বড় একটা অসামান্য কেরিয়ার!'

'বলি হবে, শুনুন। আর দু'এক জনকে মাত্র বলেছি, বেশী কেউ জানেন না।' মুহূর্ত্ত সময় মৌন থেকে তাঁর দুর্ঘটনার কাহিনী আরম্ভ করলেন লাল সাহেব: 'শিকারে গিয়েছি, এই ষ্টেটেরই মধ্যে—বামুণ্ডা পীড়ের ফরেষ্টে।'

বললাম, 'নাম শুনেছি, বামুণ্ডা পীড় ফরেষ্ট—মস্ত বড় বন।'

'এখানকার মধ্যে খুব রীচ ফরেষ্ট। বনের উত্তর-পশ্চিম বেড়ে রয়েছে বিশকোণী বেল্ট। হাইয়েষ্ট পীক্ সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঁচু। তারই মাথা থেকে নেমে এসেছে বেণীর মত পাঁচটি জলের ধারা, নীচে নেমে এক সঙ্গে মিশে নাম নিয়েছে পঞ্চবেণী। যে জায়গায় মিশেছে তার নাম হ'ল ভৈরব তট, লোকে বলে ভৈরী গাঁ। আমাদের পাহাড়ে জায়গায় গাঁ মানে ত জানেন, দু'চারটে টুঙ্গী হলেই হ'ল। এই ভৈরী গাঁ আর তার আশপাশের নদীর ধারে পাবেন অজস্র সম্বর, বাঘ আর বরাহ।

'বলছি যেখানকার কথা, সে ঐ ভৈরী গাঁ। লোকমানবহীন অরণ্যলোকে কয়েকটি মানুষের এক টুকরো লোকালয়। নদী, পাহাড় আর ঘন বন। সত্যিই সে সমন্বয়ের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। অনেক বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি, কিন্তু এমনটি সচরাচর চোখে পড়ে নি। ভৈরব তট শিব-পার্ব্বতীর লীলার যোগ্য ভূমিই বটে।

ভৈরী গাঁয়ের যে ক'ঘর বাসিন্দা—সব আদিবাসী। তারই মধ্যে একটি ছোট্ট ঘর, ঘরে এক জোড়া প্রাণী। বাষট্টি বছরের বুড়ো বাপ আর বাইশ বছরের কুমারী মেয়ে। তিরিং আর রাণী।

এদেরই বাড়ীর কাছে গাড়ী রেখে পায়ে হেঁটে গিয়েছি পঞ্চবেণীর ধারে। গাছের আড়ালে বসে অপেক্ষায় আছি, জল খেতে একটু পরেই হয়ত আসবে সম্বর আর বরাহের পাল। একটু অপেক্ষা করতেই জলের শব্দ এল কানে। বনের ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি চালালাম, দেখা গেল গোটা কয়েক বরাহ জল খাচ্ছে। টিপ করলাম তার একটাকে। জল থেকে পালিয়ে যাবার আগেই তাকে ঝরিয়ে দিলাম শুকনো পাতার মত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লাল সাহেব। 'কিন্তু কি মারলাম জানেন? বরাহ নয়, মানুষ। জল খেতে এসেছিল নদীতে, বুনো শুয়োর দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি তাকে আর পালাতে দিলাম না। আই কিল্ড তিরিং, আঃ, দি ইনোসেন্ট ওল্ড ফেলো!

'আর এই যে সেই আয়েয়াস্ত্র—ছাট কার্স্‌ড গান্।' টেবিলের ওপরের সেই বন্দুকটা দেখিয়ে দিলেন আঙুল দিয়ে।

অনুতাপে আর গ্লানিতে মুখখানা বড় শুকনো দেখাল লালসাহেবের।

এতক্ষণে বিষাদের সূত্র কিছুটা বুঝলাম।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন তিনি। বললেন, 'হদিশ বের করতে দেরী হল না, মরা বাপকে নিয়ে রাণীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। কি বলব, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু ক্ষমা চাইলাম। অপরিসীম অপরাধ: বললাম, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কোন কথা বলল না রাণী, জানতে পেরেছে রাজা-ঘরের লোক —শুধু অঝোরে চোখের জল ফেলে যেতে লাগল মুখে কাপড় গুঁজে। গাঁয়ের আর পাঁচ ঘরের লোক এসে দাঁড়াল। কারও মুখে

অভিযোগ নেই, এ যে রাজঘরের ছেলে—লাল সাহেব। সবাই বললে, শিকার ভেবে মেরেছেন, হুজুরের দোষ নেই। হাতের বন্দুক তখনও তিনটে শট ভর্তি।

গ্রামবাসীদের বিদেয় করে দিলাম তিরিংয়ের সৎকারের জন্যে।

রাণীর মুখে তখনও ভাষা নেই। সংসারের একমাত্র খুঁটোটি অপসারিত করেছি আমি। আমার সঙ্গে কি কথাই বা তার থাকতে পারে—অভিযোগ যখন অবৈধ!

উঠোনে পড়েছিল একটা বোম্বাই-দড়ির খাটিয়া, বোধ হয় আমার জন্যেই কেউ বের করে দিয়ে থাকবে। বসে পড়লাম সেইটায়। বললাম, রাণী, এ পাপের ক্ষমা নেই, আমি জানি। আমাকে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দাও। তোমার আর কেউ নেই, তোমার ভার আমার।

বুঝতে পারলাম, রাণী এতটা আশা করেনি। তার অশ্রুস্রাবী চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কষ্টের মধ্যেও অতি সুন্দর দেখাল রাণীকে। হায় পিতৃহারা রাণী! হাত দুটো চেপে ধরলাম তার। বললাম, যত দিন তোমার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে না পারছি, ততদিন আমার শিকার বন্ধ।

সেই থেকে আর ঘোড়া টিপি নি, বোসবাবু।'

বড় দুঃখের কাহিনী আর আন্তরিকভাবেই লাল সাহেব এর সঙ্গে জড়িত। তাই কোন হাল্কা মন্তব্যে গুরুত্বের মেঘকে পাশে ঠেলা যায় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাণী এখন কোথায় আছে?'

'তার কুটিরেই, ভৈরী গাঁয়ে। জানেন তো আমাদের রাজ-পরিবারের আদব-কায়দা,' একটু থেমে নিজের থেকেই বলতে লাগলেন লাল সাহেব, 'আমরা যে কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারি নে। রাজ্য না থাকলেও রাজরক্তের বিধি মেনে চলতে হয়। এর অন্যথা করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। একটা গোঁয়ার্তুমিও বলতে পারেন।'

আর কোন প্রশ্ন করি নি, চুপ করে গিয়ে সেদিনের আলাপ শেষ করেছি।

তার পর অনেক যাতায়াত করেছি লাল সাহেবের বাড়ীতে। লাল সাহেবও অনেক এসেছেন আমাদের বাসায়। কিন্তু রাণী-প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করি নি। হরিণের চামড়া না পাওয়ার নৈরাশ্যের জন্য মন খারাপ করি নি, দুঃখ হয়েছে তাঁর শিকার প্রমাদের জন্য।

সেদিন বদলি হয়ে যাচ্ছি। লাল সাহেবের কাছ থেকে আগেই বিদায় নেওয়া হয়েছে। তাঁর সাহচর্য্য জীবনের একটা বিশিষ্ট স্মৃতি-সংগ্রহ হয়ে রয়েছে।

সপরিবার ট্রেনে উঠে বসেছি। দেশীয় রাজ্যের ছোট গেজের গাড়ী। এখান থেকেই লাইনের আরম্ভ, মিশেছে গিয়ে কোম্পানীর বড় রেলের সঙ্গে।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। গার্ড সাহেব বাঁশী বাজিয়ে পাখা দেখিয়েছেন। এঞ্জিনের চাকা ঘুরতেই লাল নিশান দেখিয়ে গাড়ী থামিয়ে দিলেন আবার। দেখি, লাল কাঁকর-বিছান সড়ক দিয়ে একখানা মোটর-কার ছুটে আসছে তীব্র বেগে। চিনতে পারলাম লাল সাহেবের সেই বুইকখানা। মোটর থেকে ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন ট্রেনটা একটু ধরে দেবার জন্যে।

ষ্টেশনের ফটকের পাশে ঘ্যাচ করে গাড়ী থামিয়ে লাফিয়ে পড়লেন লাল সাহেব। সঙ্গে নামলেন একটি মহিলা। লাল সাহেবের হাতে কাগজে মোড়া একটা বড় প্যাকেট। ভাবলাম, কোথাও যাবেন বোধ হয়। আমি জানালা দিয়ে হাত বার করে আহ্বান জানালাম লাল সাহেবকে, 'এই যে আসুন!'

'হ্যালো, আপনার জন্যই।' তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন আমার কামরার কাছে। 'এই নিন।'

প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। 'হরিণের চামড়া, ট্যান করিয়ে নেবেন। দু'খানা আছে, খুব ভাল জিনিষ।'

চকিতে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। লাল সাহেব যে শিকার করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যত দিন না—

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন লাল সাহেব। একটু নির্মল ছাকা হাসি। বললেন, 'এখন শিকার করছি যে।' সঙ্গের মহিলাটির দিকে আমাদের দৃষ্টি টানলেন, 'এই যে, তিরিং-কন্যা রাণী।'

এই সেই রাণী! লাল সাহেবের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্তা তিরিং-কন্যা! কালো কুঞ্চিত কেশের মাঝখানে টকটক করছে সিঁথির সিঁদুর। আমার স্ত্রী জানালার কাছে এগিয়ে এসে নির্ব্বাক হয়ে রাণীকে দেখছে। আর দেখছে লাল সাহেবকেও। লাল সাহেবের রাজ্য নেই, কিন্তু রাণীর চোখে উনি চিরকালের রাজা।

'আর লেট করাব না।' লাল সাহেব হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে গার্ড সাহেবকে ট্রেন ছাড়বার ইঙ্গিত করলেন। 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ।'

আবার তীব্র স্বরে গার্ড সাহেবের বাঁশী বেজে উঠল। ভোঁ বাজিয়ে ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে দিল।

হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানালাম সাহেবকে। জানালাম রাণীকেও।

ট্রেনের ধীরে ধীরে গতি বাড়তে লাগল। আমরা জানালা-পথে মুখ বার করে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। মনে পড়ল লাল সাহেবের সেই চ্যালেঞ্জের কথা। লাল সাহেব হয় ত গোঁয়ার্তুমি করেন নি, হয় ত চ্যালেঞ্জে জিতেছেন।

তখনও তাঁরা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। সেই অরণ্যকন্যা রাণী আর বিখ্যাত শিকারী লাল নরেন্দ্রনারায়ণ দেব।

নূতন পরিবেশে ইটালী

দ্বিতীয় মহাসমরকালে ইটালীর উপর দিয়া যে ধ্বংসলীলা চলিয়াছে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন কর্ম্মপ্রয়াসের ভিতর দিয়া তাহা কতকটা কাটাইয়া উঠিতে সে আজ সক্ষম হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইটালীর নব রূপায়ণে নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে তথাকার অধিবাসীরা উদ্যোগী হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে তাহারা মিলনাকাঙ্ক্ষী। ইহার উপায়ও তাহারা অবলম্বন করিতেছে।

মেলা বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাহারা এই মিলন কতকটা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিলান শহরের প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রদর্শনীতে চুয়াল্লিশটি দেশ বা রাষ্ট্র যোগদান করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পঁয়ত্রিশটি সরকারী ভাবেই আসিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছে। প্রদর্শনীতে যাঁহারা দ্রষ্টব্য বস্তু পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা হইবে ১২,৭৩৮। ইঁহাদের মধ্যে ৩,৭৫৬ জন বিদেশী। আন্তর্জাতিক মেলামেশার উপায় হিসাবে এই ধরনের মেলা বা প্রদর্শনীর উপকারিতা ইটালী বর্ত্তমানে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছে।

ইটালী পরিদর্শন বা পর্য্যটনে যে সব বিদেশী আসেন, নূতন কায়দায় নির্ম্মিত সেতুগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। বিধ্বস্ত ইটালীর রাস্তাঘাট অনেকটা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই আপনাকে বহু সেতু পার হইতে হইবে। সেতুগুলি কোন কোনটি খুবই চওড়া; কম চওড়া সেতুও অনেক রহিয়াছে। ১৯৪৫-৫৫ এই দশ বৎসরের মধ্যে ইটালীতে বহু ভাঙা সেতু পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ সেতুর সংখ্যা ৭,২০৬। নূতন করিয়াও অনেক তৈরী করা হইয়াছে। এরূপ সেতুর সংখ্যা ৪০২টি। এগুলির মধ্যে ১৭৯টি অন্ততঃ দশ মিটার করিয়া প্রশস্ত।

নানা বিষয়েই ইটালী আজ উন্নতি-পথযাত্রী। রেজিও ক্যালাব্রিয়া এবং মেসিনার মধ্যে রহিয়াছে মেসিনা প্রণালী। উভয় অঞ্চলের মধ্যে যাত্রী ও মালপত্র পারাপারের কাজ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। দুই দিকেই সমসময়ে ট্রেন যাতায়াত করে। কিন্তু সময়মত এপার হইতে ওপারে যাইতে না পারিলে বা মালপত্র ঠিকমত না পৌঁছাইলে লোকের বড়ই অসুবিধা হয়। মেসিনা প্রণালীতে খেয়া নৌকা পূর্ব্বে যে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু বর্ত্তমানের সঙ্গে অল্পসংখ্যক খেয়া নৌকা ঠিক তাল রাখিতে পারে নাই। এখন ফেরিবোট বা খেয়া নৌকার সংখ্যা হইয়াছে পাঁচখানি। এইরূপ ছোট ছোট ব্যাপার হইতেই ইটালীর প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।

সমগ্র ইউরোপে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইটালী ছিল একটি প্রধান আকর্ষণ। তাহার স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, শিল্পকলা কত বিদেশীকেই না তাহার দিকে টানিয়া লইয়াছে। দ্বিতীয় মহাসমরের পর ইটালীতে বিদেশী পর্য্যটক বা পরিদর্শকের সংখ্যাও অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৫৫ সনের পরিসংখ্যানই ধরুন না। এই এক বৎসরে সেখানে গিয়াছেন ১,০৭,৮৮,০০০ বিদেশী-বিদেশিনী। এখানে যাতায়াতের কোন বিশেষ সময় নাই। সম্বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ইটালীতে আসেন এবং নয়নমন তৃপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন।

খেলাধূলার জন্যও ইটালীর খ্যাতি কম নয়। শীতকালে ওখানকার বহু অঞ্চল বরফে একেবারে ঢাকিয়া যায়। বরফ সরাইয়া খেলার মাঠ পরিষ্কার করা দরকার। আগে কিছু কিছু চেষ্টা হইত, কিন্তু তাহা তেমন ফলপ্রদ হইত না। বর্ত্তমানে বরফ সরাইবার নিমিত্ত একপ্রকার কলের লাঙ্গলের খুব চলন হইয়াছে। এই কলের লাঙ্গল তৈরীর একটি শিল্পও ধীরে ধীরে সেখানে গড়িয়া উঠিতেছে। বরফে-ঢাকা খেলার মাঠ পরিষ্কার করা, খেলার মাঠে যাইবার পথ হইতে বরফ সরাইয়া ফেলা—এই সব কাজে এ ধরনের কলের লাঙ্গল খুবই প্রযুক্ত হইতেছে।

বিমান-শিল্পেও ইটালী বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সেখানে মনোপ্লেনের প্রয়োগ সাধারণের মধ্যে চালু হইতেছে। এ কারণ বিমান নির্ম্মাণের জন্য কারখানার কাজও বাড়িয়া গিয়াছে। এরোপ্লেন চালনা শিক্ষার যে-সব স্কুল আছে সে সব স্থলেই শিক্ষার্থীদের এই বিমান ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে। এই বিমান ৫৫০ এম-পি-এইচ'এ দশ হাজার ফুট উচ্চে উঠিতে পারে।
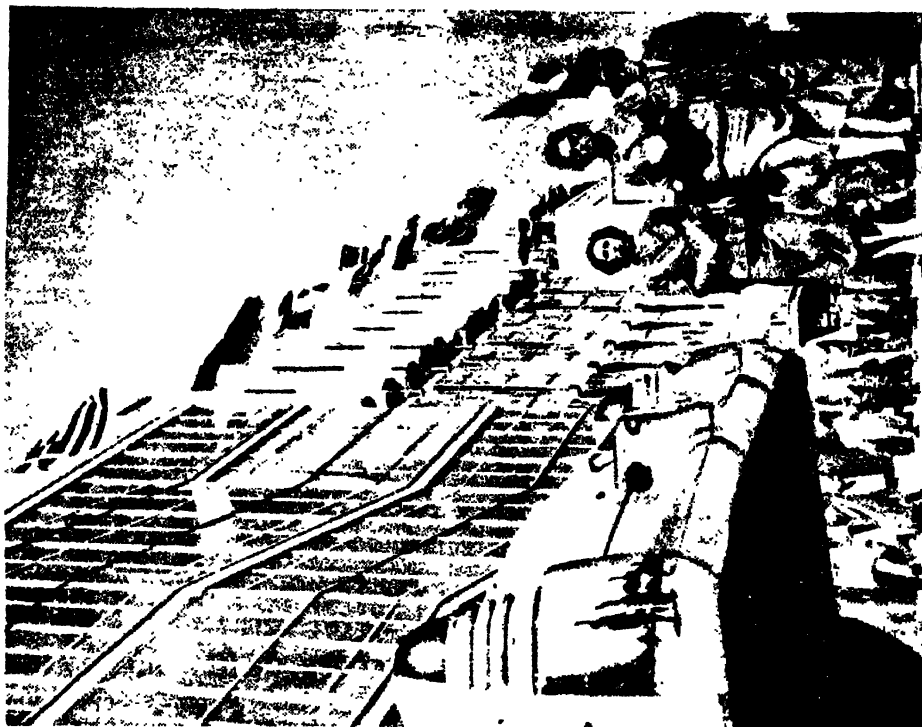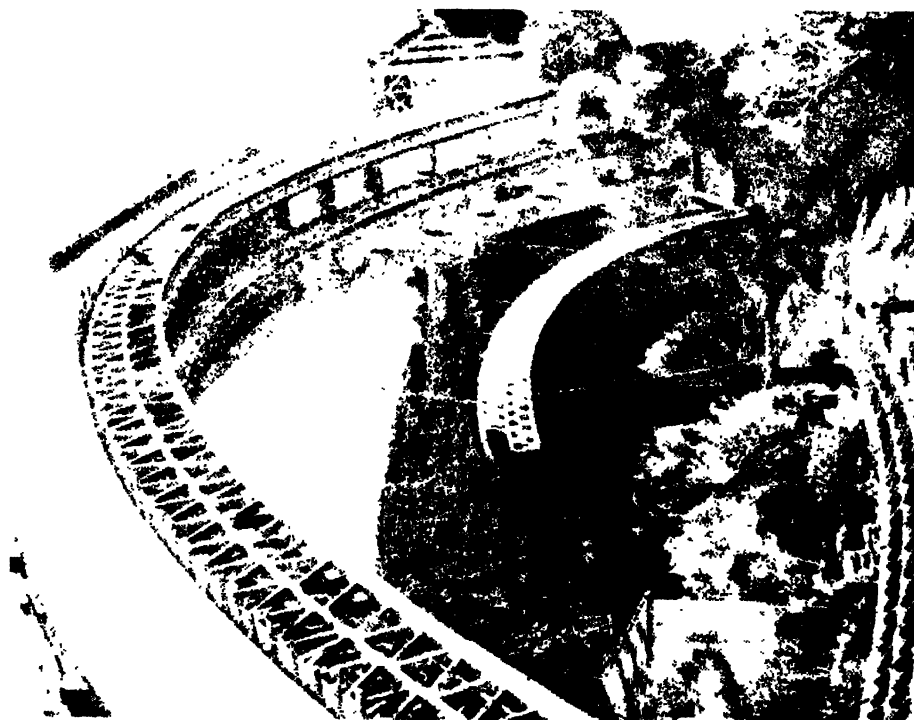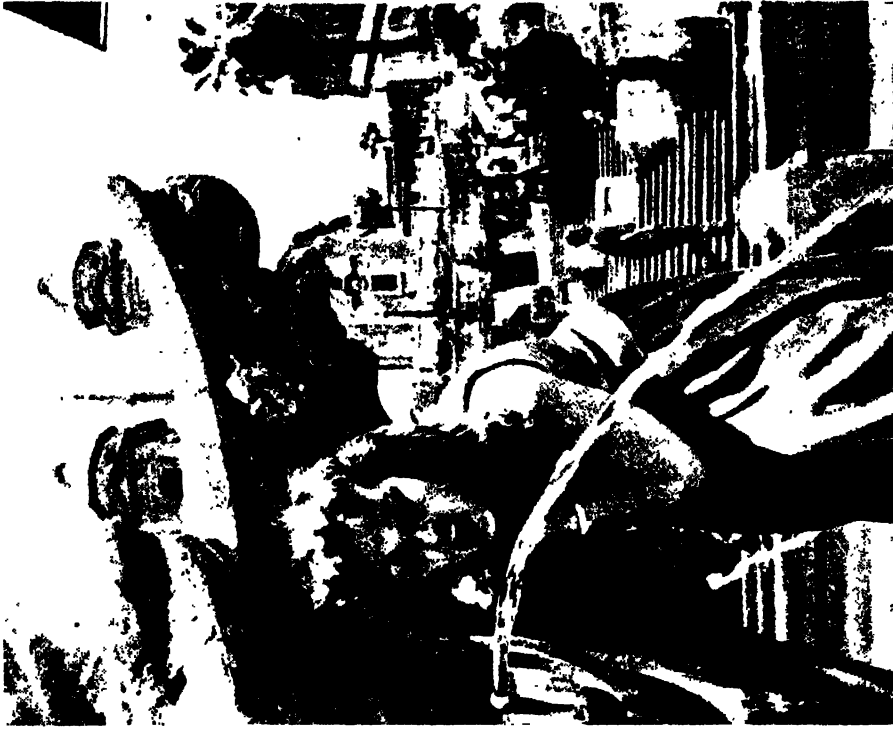
যো. চ. বা.

জেনোয়া-শহরে পথিমধ্যে দিও [illegible] উপর নবনির্মিত বিরাট সেতু

মিলান প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

রোমে একজন 'টু হিং' মহিলা

ইটালীর নব-নির্মিত 'মনোপ্লেন'

মেসিনা প্রণালীতে নূতন 'ফেরী বোট'

বরফ সরাইবার নব-নির্ম্মিত যন্ত্র
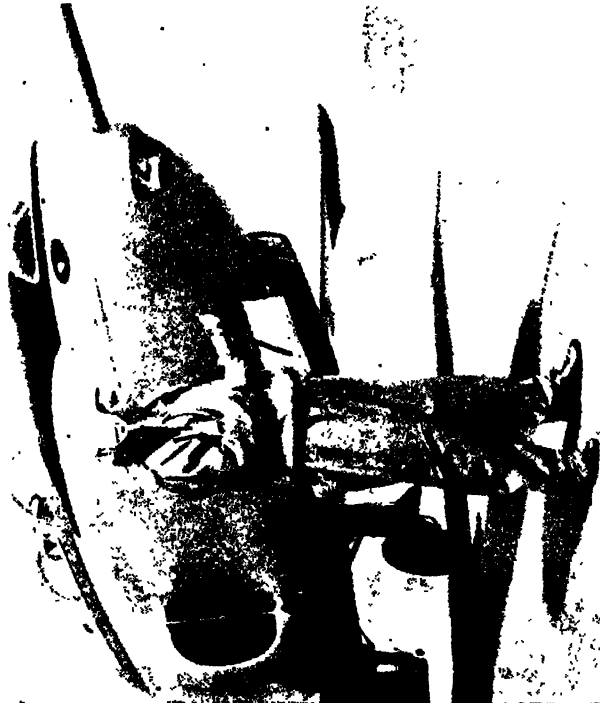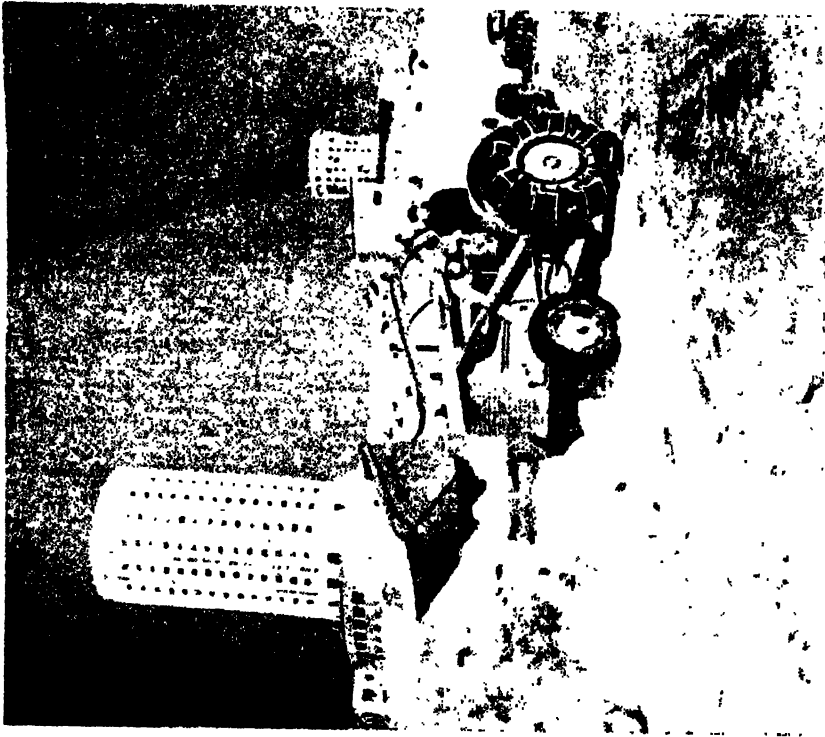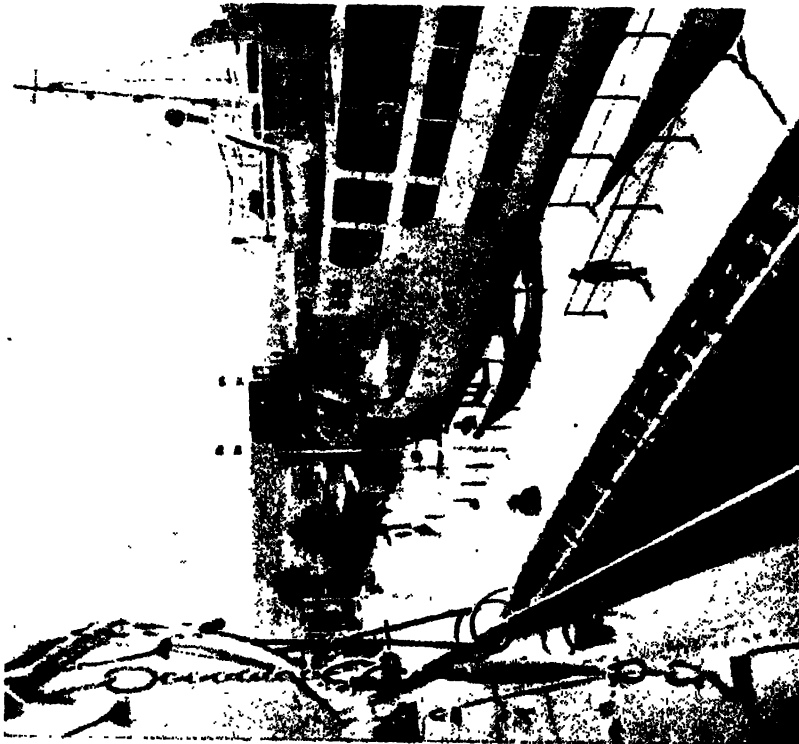
প্রাকবিদ্যালয় অন্ধ শিশু

ডাঃ এডওয়ার্ড জোনাথান
প্রিনসিপ্যাল, পালামকোটা অন্ধ-বিদ্যালয়

ভারতে অন্ধের সংখ্যা কত এ পর্যন্ত তার সঠিক গণনা না হলেও বিশ লক্ষ বলে ধরা হয়। তার মধ্যে ২৫,০০০ হাজার থেকে ৫০,০০০ হাজার হচ্ছে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু। কিন্তু অন্ধদের বিদ্যালয়ে আসবার আগে বাড়ীতে তারা কেমন অবস্থার মধ্যে কাটায়? ভারতে আছে মাত্র ৫০টি অন্ধ বিদ্যালয়। সেগুলিতে শিক্ষা পায় পাঁচ বছরের কম বয়সের মাত্র ২,০০০ শিশু।

কাজেই ভারতে প্রাকবিদ্যালয় অন্ধ শিশুগণের জন্য যে কিছুই করা হয় নি, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। অন্ধ শিশুগণের মাতাপিতাকে পরামর্শ ও শিক্ষা দেবার মত কোন গৃহশিক্ষক বা শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজকর্মী নেই। ভারতের কোথাও অন্ধ শিশুগণের জন্য একটিও উপযুক্ত শিশুনিকেতন বা পরিচর্যাশ্রম দেখা যায় না। তবে দক্ষিণ ভারতে পালামকোটায় তার একটির সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। এই শিশুনিকেতনে এখন আছে পাঁচ বছরের কম বয়সের মাত্র চারটি শিশু।

দারিদ্রের ঘরেই অন্ধ শিশুর সংখ্যা বেশী। অন্ধত্বের সাধারণ কারণ হচ্ছে, ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে কোন রকমের ক্ষতি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যাধি, ভিটামিনের স্বল্পতা ও উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যের অভাব। এই শেষোক্ত কারণটি কিন্তু তুচ্ছ নয়। তার পর চক্ষু রোগাক্রান্ত শিশুগণকে ভুল ঔষধ প্রয়োগের ফলেও তাদের অন্ধত্ব ঘটে।

পরিবারে অন্ধ শিশুর জন্ম হলে বা শিশু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে, মাতাপিতা অসহায় বোধ করেন এবং তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানে হন অপারক। জন্মান্ধ শিশু তার এই শারীরিক ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা নিজেদের সাধারণ শিশুর মতই অনুভব করে এবং তাদেরই মত ইন্দ্রিয় গ্রামপরিচালনা করে থাকে। কাজেই তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে হবে মাতাপিতাকেই। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি শিশুটির ভবিষ্যৎ মানসিক অবস্থা মাতাপিতার মানসিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল। অন্ধ শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে তখন বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে। সেজন্য তার মানসিক অবস্থা যথাযথ ও অভ্যাসগুলি রীতি অনুসারী হওয়া উচিত। প্রায়শঃই দেখা যায়, অন্ধ ব্যক্তির জীবনের দুঃখময় ঘটনা কেবল তার অন্ধত্ব নয়, তার প্রতি পরিবারের ও সমাজের সকলের অপ্রীতিকর আচরণও। মাতাপিতার কাছে প্রথমে যাবেন চিকিৎসক-সমাজকর্মী। সমাজকর্মী ধৈর্য ও কৌশলের সঙ্গে মাতাপিতাকে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করাবেন যে, তাঁদের সন্তানটি অন্ধ। শিশুটি যাতে ভারতের সাধারণ ও প্রয়োজনীয় নাগরিক হয়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাকে তাঁদের যথাসাধ্য শিক্ষাদান বিষয়ে উৎসাহিতও করতে হবে। যদি তাঁরা তাতে তিক্ততা বোধ করেন এবং শিশুটির অন্ধত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হন, তাহলে শিশুটি হয়ে উঠবে অসাধারণ। তাদের অন্তর হবে নৈরাশ্যে পূর্ণ।

অন্ধ শিশু প্রথমতই শিশু এবং দ্বিতীয়ত সে অন্ধ। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুর বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলি যা তারও তাই।

১৯৫২ সনে আগষ্ট মাসে হল্যাণ্ডের বুস্সুম সম্মেলনে ইউ-এস-এর অন্তর্গত ওহিওর কুমারী টোটমান তাঁর "প্রাকবিদ্যালয় অন্ধশিশু"র সামাজিক প্রয়োজন ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তিনি বলেছেন শিশুদের বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলি নিম্নরূপ :

১। ভালবাসা ও নিরাপত্তা।

২। তার নিজ মূল্যসম্বন্ধে বোধ (নিজ সত্তার অধিকার)।

৩। একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই জ্ঞান (প্রয়োজনীয়তা)

৪। কোন ঘটনা বা অবস্থার সম্মুখীন হবার মত পর্যাপ্ততা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে বোধ।

৫। অর্জন বা অবদান সম্বন্ধে অনুভূতি।

৬। ক্রমবর্ধমান আত্ম-প্রসার।

অন্ধ শিশুও সক্রিয় এবং নিজের কাজ নিজেই করতে চায়। তার প্রয়োজন মাতাপিতার ভালবাসা কাজেই গুরুতর কোন কারণ ব্যতীত তাকে নিজের বাসগৃহ থেকে বঞ্চিত করা কল্যাণের নয়। যেখানে সম্ভব প্রাকবিদ্যালয় বছরগুলিতে শিশু নিজ বাড়ীতেই থাকবে। এই সময়ে মাতাপিতার অভিজ্ঞ কর্মীর নির্দেশে চলা দরকার।

অন্ধ শিশুকে তার নাগালের মধ্যেই প্রধান প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি পেতে হবে। প্রায়শঃই সে কণ্ঠস্বর চিনতে শেখে, কিন্তু সেই সঙ্গে তা অস্পষ্টও হয়। কারণ শব্দটা যেখান থেকে আসে সেই উৎপত্তিস্থলটি সে দেখতে পায় না। শিশুটি যখন হাঁটতে আরম্ভ করে তখন সে কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যেই নিজেকে স্থাপন করে থাকে।

তাকে দিতে হবে এমন সব খেলার সামগ্রী যেগুলির সাহায্যে তার মধ্যে জেগে উঠবে সাংগঠনিক, মানসিক ও দৈহিক সক্রিয়তা। তার প্রয়োজন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা। সে নিরাপদ স্থানে চলে-ফিরে বেড়াবে এবং সেই সঙ্গে সকল রকমের ভূমির উপর হাঁটতে শিখবে। তাকে বড় বল, ভলি বল, দেওয়া যেতে পারে যা সে এদিক-ওদিক ছুড়বে এবং নিজেই আবার সংগ্রহ করে আনবার চেষ্টা করবে। তাকে পাতা, ফুল ও গাছ অনুভব করতে এবং উঁচু জায়গায় চড়তে উৎসাহ দিতে হবে। অতিরিক্ত বেতার সঙ্গীত সে যেন না শোনে। তাকে শেখাতে হবে সহজ ভারতীয় ছড়া।

ইউ-এস-এতে অন্ধ শিশুদের জন্য আবাসিক শিশুনিকেতন আছে খুবই অল্প। ইংলণ্ডে অনেকগুলি শিশুবিদ্যালয় আছে। সেগুলি সমস্ত অন্ধ ও ছোট ছোট শিশুদের খবরদারী করে থাকে। আর ডেনমার্কে অন্ধ শিশুরা বাস করে নিজ গৃহে। শিক্ষিত সমাজকর্মীরা তাদের মাতাপিতাকে কোন পথে চলতে হবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

ভারত বিশাল দেশ। এখানে এক বা একাধিক সমাজকর্মীদের পক্ষে বিশেষ একটি অঞ্চলে সকল অন্ধ শিশুর মাতাপিতার কাছে যাওয়া সম্ভব কিনা তা চিন্তার বিষয়। এই সব বিকলাঙ্গ শিশুর মাতাপিতা দরিদ্র ও নিরক্ষর। তাঁরা অভিজ্ঞ সমাজকর্মীদের পরামর্শ ও পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেও পারেন। কর্মীদের কথা হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। আর, প্রায়শঃই তাঁরা অন্ধ শিশুদের জন্য অর্থ ব্যয় বা সময়ক্ষেপে অসমর্থ। উপেক্ষিত অন্ধ শিশুর চরিত্রে দেখা দেয় "অন্ধত্ব" বা মুদ্রাদোষ যা পরবর্তী জীবনে উচ্ছেদ করা অতি কঠিন।

আমাদের দেশের অনেক গৃহস্থের অবস্থা বিবেচনা করে অন্ধ শিশুদের জন্য আবাসিক শিশুবিদ্যালয় ও আশ্রয় নির্মাণই সমীচীন। ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রাক্‌বিদ্যালয় অন্ধ শিশুদের জন্য কতকগুলি শিশুবিদ্যালয় স্থাপনের আশা করছেন। সেণ্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড (কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ) ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহিত করবেন যদি তাঁরা অন্ধ শিশুদের জন্য শিশুবিদ্যালয় খোলেন।

অতএব প্রাক্‌বিদ্যালয় অন্ধ শিশুর পক্ষে তার নিজ বাসগৃহই সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান। যেখানে গৃহের অবস্থা যথোপযুক্ত নয় সেখানে অন্ধ শিশুকে শিশুনিকেতনে বা অন্ধ শিশুবিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রাক্‌বিদ্যালয় অন্ধ শিশুদের প্রতি আরও বেশী করে মনোযোগ দেওয়া দরকার। তারা যাতে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য তাদের পরিবেশকে প্রীতিকর ও আদর্শস্বরূপ করা উচিত।

প্রাকবিদ্যালয় বধির শিশু

শ্রী এ. সি. সেন
প্রিন্সিপাল, লেডি নয়েস মূক বধির বিদ্যালয়, দিল্লী

প্রারম্ভেই প্রাকবিদ্যালয় শিশুর বয়স স্থির করা প্রয়োজন। ভারতে পাঁচ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়সের বধির শিশুকে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়।

অনভিজ্ঞ মাতাপিতা বধির ও সাধারণ শিশুর মধ্যে পার্থক্য সহজে ধরিতে পারেন না। শিশুর দ্বিতীয় ও তদূর্দ্ধ বয়সের সময়ে মাতাপিতা তাহার বাক্‌শক্তিহীনতা সম্বন্ধে দুঃখের সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রাকবিদ্যালয় বধির শিশুরা দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে পড়ে। ইহার অর্থ এই নয় যে, দুই বৎসরের কম বয়সের বধির শিশুকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশু হইতে চিনিয়া লওয়া যায় না। তিন মাস

ও তদূর্ধ্ব বয়সেও ইহা সম্ভব। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশু ছয় মাস বয়সেই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে চোখ তুলিয়া তাকাইবে। আসল কথা এই যে, শিশুটি সাধারণ বা পৃথকধরনের তাহা জানিতে কেহই উদ্বিগ্ন হন না। মাতা-পিতা যতক্ষণ না বাধ্য হইয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের শিশুটি বিকলাঙ্গ ততক্ষণ তাহাকে সাধারণ শিশু বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এই উদ্বেগহীনতা কিন্তু একেবারে খারাপ নহে। শিশুটি যে বিকলাঙ্গ তাহা না জানার দরুন তাহাকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন সাধারণ শিশুর মতই অকুণ্ঠিত ভাবে লালন-পালন করা হয়। যখন জানা যায়, শিশুটি বধির এবং তাহার প্রতি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন সাধারণ শিশুর মতই ব্যবহার করিবার জন্ম মাতাপিতাকে পরামর্শ দেওয়া হয়, তখন তাঁহারা তাহা করেনও বটে কিন্তু তাঁহাদের কুণ্ঠিত মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে। কাজেই আচরণটা অল্প-বিস্তর অস্বাভাবিক হইতে বাধ্য। আবার, যে শিশু আংশিক বধির তাহার এই অবস্থাটা আগেই জানা খুবই দরকার। ঐ ধরনের শিশুদের জন্ম আজকাল চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক কিছু করিতে পারা যায়। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও বিকলাঙ্গ শিশুর মধ্যে যে তারতম্য তাহ অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব।

শিক্ষা বনাম বিদ্যালয়ে শিক্ষা—প্রাকবিদ্যালয় বধির শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাকালে শিক্ষা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন।

তৃতীয় দলভুক্ত বধির শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্ভব। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্ম যে সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা হইবে তাহার সহিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমানুপাতিক হইবে না। তবে বর্ধনশীল দেহীর পক্ষে শিক্ষা কেবল সম্ভব নহে আবশ্যকও। অঙ্গী তাহার পরিবেশের সহিত প্রতি ক্ষণে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বর্ধিত হইবে। কাজেই বধির শিশুর জন্ম আমরা যে পরিবেশ সৃষ্টি করি তাহাই দৈহিক বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই পরিবেশ দেহীর সাধারণ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহায়ক বা প্রতিবন্ধক হইলে তাহার শিক্ষাও সফল বা বিফল হইবে।

সম্পূর্ণ বধির দল--বধির শিশুগণ এক জাতীয় নয়—নানা প্রকারের বধির শিশু আছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়।

আধুনিক শিশুবিদ্যালয়—বহুকাল আগে রুশো তাঁহার "এমিল" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, আসল শিক্ষক হইতেছে অভিজ্ঞতা ও ভাব। ইথেল ম্যানিন মন্তব্য করিয়াছেন যে, শিশুবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের প্রবেশকে তিনি ভাল চোখে দেখেন না। বিজ্ঞান যেন মাতৃত্বের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া তাহার স্থলে সেবিকাত্বকে বসাইতেছে। শিশুর হৃদয়ে ও মানসলোকে কি ঘটিতেছে তাহার সহিত সেবিকাত্বের কোন সম্পর্ক নাই; তাহার সম্পর্ক কেবল নিজের বৈজ্ঞানিক, নিপুণ, উচ্চ শিক্ষানুসারী তত্ত্বাবধানের সহিত। এ দেশে ও ইউরোপ-আমেরিকায় কতকগুলি দেশে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় আমি দেখিয়াছি। কেবল-মাত্র বধির শিশুদের জন্ম কয়েকটি বিদ্যালয়ও দেখিয়াছি। সেই সব বিদ্যালয়ের সরঞ্জামাদি খুব মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিলে সেখানকার বয়স্ক পরিচালকের শিশুবিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি নিখুত দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে মনে আতঙ্কই জাগে। কারণ, সেখানকার বয়স্ক পরিচালকগণ শিশুমনকে শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে বেশ সচেতন ভাবেই যত্নশীল। ইহাতে শিশুমন স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইবার সামান্য সুযোগও লাভ করে না। ইহা হইতেছে শিশুগণকে তাহাদের শৈশব উপভোগ করিতে না দিবার সুসংগঠিত প্রচেষ্টা।

শিশুনিকেতন—আধুনিক মানস-বিজ্ঞান মানুষের সম্পর্ক ও আচরণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আমাদের বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিয়াছে। সমস্যাবিজড়িত শিশুর উদ্ভব সমস্যাবিজড়িত গৃহ হইতে এবং অপরাধ সামাজিক অব্যবস্থার ও অসংযোগের ফল। ফ্রয়েড, অ্যাডলার ও অপরাপর পণ্ডিতগণ এই সত্যটি দেখাইয়াছেন যে, শিশুদের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে বয়স্কগণের প্রত্যেকটি শুভ প্রচেষ্টায় শিশু আত্মরক্ষায় তৎপর ও বয়স্কগণের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিতে পারে। যে শিশুর ইচ্ছা অনবরত উপেক্ষিত হয় সে অপরের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ না করিয়া বাড়িয়া উঠে। শিশুকে তাহার অহমবোধের মধ্য হইতে বাহিরে আসিতে,হইবে। সে নিজেকে তাহার সামাজিক পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবে। কিন্তু শিশুবিদ্যালয়ের জগদ্দল কার্যাবলীর ফল ঠিক ইহার লক্ষ্যের বিপরীত হইতে পারে।

এই বয়সের প্রধান আবশ্যক—আমাদের বিশ্বাস এই বয়সে নিজ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর কেহ নাই এবং মাতার রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষা আর কাহারও রক্ষণাবেক্ষণ উত্তম নহে। বৃদ্ধির পক্ষে শিশুগণের তিনটি জিনিষ প্রয়োজন।

১। নিরাপত্তা ও ভালবাসার পরিবেশ। একমাত্র মাতা তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ পারেন না।

২। নিজ বৃদ্ধির জন্ম শিশুর আবশ্যক নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। শিশু নিজ জগৎ সৃষ্টি ও তাহার মধ্যে বাস করিবে। বয়স্কেরা

যেমন পছন্দ করেন না কেহ তাঁহাদের কার্যের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে তেমনি সকল বয়সের শিশুর, বধির শিশুর ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার।

৩। শিশুগণই শিশুনিকেতনের সরঞ্জাম নির্বাচন করিবে। ঘড়ি ভগ্ন ও সময়-তালিকা দগ্ধ হইতে পারে। যে শিশু পথের ধারের বালু দিয়া প্রাসাদ নির্মাণ করে বা কাগজের নৌকা গড়িয়া জলাধারের জলে ভাসায় অথবা সামান্য কাদা দিয়া পুতুল বানায় সে সৃজনী আবেগে মশগুল। তাহাকে শিশুনিকেতনের তৈয়ারী সরঞ্জাম দেওয়া অর্থে তাহার সেই আবেগে বাধা দান। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, শিশু যে কোন তৈয়ারী সামগ্রী পাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা সে তাহার নিজ সৃজনী কাজকর্ম হইতে যে আনন্দ লাভ করে তাহাই অধিক। একটিতে তাহার আত্মবিকাশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্র থাকে অপরটি তাহা ক্ষুণ্ণ করে।

৪। প্রাক-বিদ্যালয় বধির শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, তাহার সহিত সংযোগ রাখা যায় না। সে দলের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের একজন নয়। ফলে সে দল হইতে সরিয়া যায়। এই প্রাক-বিদ্যালয় কালে যদি কিছুর দাম থাকে, তাহা হইতেছে, মধ্যপথে তাহার সহিত সংযোগের পন্থা বাহির করা এবং যে ভাষা সে বুঝিবে সেই ভাষার সাহায্যে তাহার সহিত সংযোগ রক্ষা। ইহা অবশ্য কর্তব্য। ইহাই দলের সহিত তাহাকে যুক্ত করিবে।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, শিশুটির বৃদ্ধি, আর সবই গৌণ।

পাহাড়িয়া

ফ্রেদা বেদি

উত্তর হিমালয় অঞ্চলে আশী লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের বাস। তাহারা আনন্দ ও সাহসের সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সেখানকার অপেক্ষাকৃত নিঃসঙ্গ ও কঠোর জীবনের সম্মুখীন হয় এবং সযত্নে প্রাচীন আচার-ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করে। ইহাতে বৈচিত্র্য আছে। ইহা এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের। এই সকল অধিবাসীদের দেখা যায়, হিমালয় পর্বতমালার অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত ক্রোড়স্থিত অঞ্চলে। এই অঞ্চলটি এক দিকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হইতে হিমাচল প্রদেশের মধ্য দিয়া পাঞ্জাব শৈলমালা, কুলু, কাংড়া, লাহাউল ও স্পিতি পর্যন্ত প্রসারিত। তাহার পরও উত্তর-প্রদেশের শৈলাঞ্চল, আলমোড়া, নইনিতাল, ডেরাডুন, গাড়োয়াল ও টেহরী গাড়োয়াল পর্যন্ত ইহারা ছড়াইয়া আছে। এমন কি, এই অঞ্চল হইতে আরও দূরে বিহারের দিকে, যেখানে পাহাড়িয়াদের বসতি আছে সেখানে, বাংলার দার্জিলিঙেও ইহাদের দেখা যায়। এই অঞ্চলে বাস করে লেপচা, নেপালী, শেরপা ও ভুটিয়াগণ।

এই আশী লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশই পাহাড়িয়া। ইহারা ঐ নামেই পরিচিত। পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশে যাহারা বাস করে তাহারা এক ভাষায় কথা বলে। ইহার নাম 'পাহাড়ি' ভাষা। এই ভাষাই কিছুটা পরিবর্তিত আকারে শোনা যায় জম্মুতেও।

ইহাদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন—যখনকার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না সেই কুয়াশাচ্ছন্ন ও বৈদিক যুগের। এই ঐতিহ্যকে ইহারা বিশ্বাস ও ভাবের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। ইহাই এই সকল পাহাড়িয়াদের কেবল সুদূর অতীতের সহিত নয়, একালের পাহাড়িয়াদেরও সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের বাসভূমি তুষারাচ্ছন্ন; সুদূর গ্রামাঞ্চলে ও হিমরেখার নিচে বাসগৃহগুলিতে নামে তুহিনভরা শীতের কঠোরতা ও স্বল্পকালস্থায়ী গ্রীষ্ম। ইহাতেও ইহাদের আনন্দ আছে। ইহাদের সাধারণ সমস্যা হইতেছে, নিঃসঙ্গতা ও অপেক্ষাকৃত মন্দ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার প্রধান উপায়, কৃষি। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন না হইলে, খাদ্যের অভাব ঘটে এবং তাহা সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। জীবিকার্জনও তখন কষ্টকর।

উত্তর-ভারতের শ্রমিক ও গৃহভৃত্যগণ প্রধানতঃ পাহাড়িয়া। ইহাদের মধ্যে অনেক সময়ে পাহাড়িয়া নারীও দেখা যায়। ইহার কারণ কি? এমন হইবার কারণ কি, এই অঞ্চলে যাহারা বাস করে তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে ইহারা হীন? যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ব্যাপার তাহা নয়। একটি জিনিষ চোখে পড়িবে। তাহা এই যে, সমতলবাসীদের মত তাহার শিক্ষার সুযোগ পায় নাই। এই অভাবই প্রায়শঃই ইহাদের

হীন কাজ ও শ্রমিকের কর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। তৎসত্ত্বেও ইহারা নিজদের ঐতিহ্যে গর্ব বোধ করে, যখনই সম্ভব একত্র মিলিত হয় এবং রাজপতগণের মতই অনুভব করে যে, ইহারা যে মনিবের হুকুম তামিল করে তাহাদের চেয়ে উন্নত।

এই সকল পাহাড়িয়াদের অধিকাংশ কেবল তখনই চাকরি করিতে আসে, যখন তাহাদের গ্রাম তুষারে ঢাকিয়া যায়, জীবিকার সংস্থান কঠিন হইয়া পড়ে। আবার অন্যেরা হাজারে হাজারে সমতলভূমিতে আধাস্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসে।

তাহাদের লক্ষ্য, যথেষ্ট উপার্জন করিয়া নিজকে বাঁচানো এবং যাহাদের গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহাদের কিছু কিছু পাঠানো এবং পাহাড়িয়া পরিবারকে ঋণমুক্ত করা অথবা বিবাহের খরচ যোগানো। অনেকে তাহাদের অর্ধেক জীবন পরিবার হইতে দূরে কাটাইয়া দেয়, কেবল স্বল্পকালের ছুটিতে দেশে যায়। তারপর বৃদ্ধ বয়সে ঘরে ফিরে।

উত্তর-প্রদেশের রিপোর্টে কর্মপ্রার্থীর যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়। ৫০০,০০০ লক্ষ পাহাড়িয়া সমতল প্রদেশে আধাস্থায়ী কর্ম অন্বেষণ করিতেছে এবং ৭০,০০০ হরিজন (এক তৃতীয়াংশ হরিজন) ঋতুবিশেষে কর্মপ্রার্থী। উত্তর-প্রদেশের পাহাড়িয়া অধিবাসীদের মোট সংখ্যা হইতেছে ২৫০,০০০ লক্ষেরও কম। কাজেই শতকরা অনুপাত অত্যন্ত উচ্চ। এই কর্মপ্রার্থীদের আর একটি প্রধান পথ হইতেছে সৈন্যবিভাগে কর্ম। ঐ বৃত্তিটির সহিত আছে রণ্ডইকারের কাজ, পরিচারকের কাজ, কুলিগিরি, দ্বারোয়ানি, মোটর চালক ইত্যাদির কাজ।

এই সব মানবীয় সমস্যা ও দুর্ভোগের অর্থ কি? ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে পবর্তীয় পটভূমিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

দুর্নীতিপূর্ণ নারীব্যবসায়—আইনমান্যকারী ও ধার্মিক ব্যক্তির দেহে কর্কটরোগের মত পর্বতীয় অঞ্চলে নারীব্যবসায় চলে। চাহিদা ও সরবরাহ এই চিরন্তন নিয়ম অনুসারে এই পর্বতীয় অঞ্চলের সুন্দরী নারীদের সমতলপ্রদেশের পতিতালয়ে চালান দেওয়া হইয়াছে। দারিদ্র্যের মধ্যে, বিশেষ করিয়া একটি দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এই বিনিময় প্রাচীন প্রথানুসারে চলিত আছে। ইহা লোপ পাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

সেণ্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের (কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ) নৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য সমিতি এই সরবরাহের কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার এক সুদূর প্রসারী পন্থার হদিস দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলিবারকালে এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে অনেক কিছু করার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আলমোড়া-নৈনিতাল অঞ্চলের একজন পুরাতন কর্মীর মতে, কোন সরকারী সংস্থা বা আইন এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না যে-পর্যন্ত না এই সমস্যার সংস্কারের পশ্চাতে জনমত থাকে। এই বীভৎস ব্যবসায় হইতে সহজেই অর্থলাভ হয়। এমন কি, যাহারা চালায় তাহাদের পরিবারের নিয়মিত মাসিক আয়ও হইয়া থাকে। বহুকালের অভ্যাসের ফলে বিবেক মরিয়া যায়। প্রচুর আয়ের এই সহজ পথ ছাড়িয়া কঠোর পরিশ্রমে সামান্য আয় করিতে আর ইচ্ছা হয় না।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীনে রক্ষী বাহিনী স্থাপন এবং প্রতিরোধ কার্যাবলীর সহিত স্থানীয় সংস্থার বেশী করিয়া সহযোগও অন্যান্য কার্যের সহিত করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সমতল প্রদেশে ভুয়া "বিবাহ সংস্থা"; তথাকথিত "নারী নিকেতন"গুলিকেও নিরস্ত করা আবশ্যক।

যে সমাজে কর্মক্ষম পুরুষেরা গৃহ হইতে একটানা দূরে থাকে সে সমাজে পরিত্যক্ত নারীদের কষ্ট অত্যন্ত গভীর। কতকগুলি পর্বতীয় অঞ্চল যে বিশেষ করিয়া বাছিয়া লওয়া হয়, তাহার মধ্যে অর্থ নিহিত আছে। এই সব স্থান হইতে বহুকাল হইতে নারীদের লইয়া বড় বড় শহরের পতিতালয়ে চালান দেওয়া হয়। উত্তর-প্রদেশের পর্বতীয় অঞ্চলের কতকাংশ, হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি ও মাহাসুর, পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকা ইহা দ্বারা আক্রান্ত। উত্তর-প্রদেশের নাইক ও ডোমের বালিকাদের এই পাপব্যবসায় হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই অঞ্চলের বালিকাদের বিক্রয় করিয়া একটি সম্প্রদায় শত শত বৎসর ধরিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া আসিতেছে।

সমাজ কর্মিগণ ও পর্বতীয় অঞ্চল—অধিকাংশ সমাজকর্মী এই বিষয়ে একমত যে, যদি পাহাড়িয়া নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নতি করিতে হয় আর সমতল প্রদেশের মত একই ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজ তাহাদের মধ্যে চালাইতে হয়, তাহা হইলে যে সব সমাজকর্মী কঠোর অবস্থার মধ্যে কাজ করিবে তাহাদের উচ্চ বেতন দেওয়া আবশ্যক। এই কাজে পাহাড়িয়াদেরই দেওয়া ভাল। কিন্তু পাহাড়িয়া তরুণী ও স্ত্রীলোকেদের শিক্ষিত করিয়া এই কাজে নিযুক্ত করিতে এখনও বহু বৎসর লাগিবে।

শিক্ষার অভাব ও অপরাপর বাধা—যে নিষ্ঠা ছোট পাহাড়িয়া বালকদের বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য বারো মাইল পথ হাঁটায় আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে,

পাহাড়িয়াদের জাগ্রত বুদ্ধি ও জিদ্ আছে। একবার সুযোগ দিলে উহারই বশে তাহারা আকুল আগ্রহে শিক্ষাকে গ্রহণ করে। অনেক অঞ্চলে বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষার অভাব থাকায় সামাজিক শিক্ষারও অভাব ঘটে। হিমাচল প্রদেশে শতকরা আট জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। সম্ভবত এই হিসাব ঠিক। তবে কুলু উপত্যকায় শতকরা পনর জন শিক্ষিত, এই সংখ্যা সম্ভবতঃ খুবই বেশী। টেহরি-গাড়োয়াল, কুলু বা কের বিশাল অঞ্চলের কোথাও কোন কলেজ নাই। বড় বড় পর্বতীয় বসতি ছাড়া স্ত্রীলোকেরা কদাচিৎ শিক্ষা পায়।

অনগ্রসর শ্রেণীর ভবিষ্যৎ—পাহাড়িয়াগণ সম্ভাবনা ও বুদ্ধি সত্ত্বেও "অনগ্রসর শ্রেণী" রূপে চিহ্নিত। ইহার প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষা ও আর্থিক অসুবিধা। তাহারা কোন বিশেষ সরকারী দান বা পরিকল্পনায় সাহায্য পায় না। কারণ অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণভাবে তাহারা উপজাতি। পূর্ব-ভারতে ও আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ বা জম্মু ও কাশ্মীরে ইহা অবশ্যই সত্য নয়। কাজেই পর্বতীয় অঞ্চলে আমাদের এক অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হইতে হয়। সেখানে তপশীলী শ্রেণী ও উপজাতিরা শিক্ষায় সাহায্য লাভ করিতে পারে, অপরাপর পাহাড়িয়াগণ তাহা পারে না।

চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সমস্যা ও পর্বতীয় অঞ্চল—পর্বতীয় সমস্যাবলীর কতকগুলি হইতেছে চিকিৎসা বিষয়ক। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও যৌন ব্যাধিকে পর্বতীয় অঞ্চলের উৎপাত বলা যাইতে পারে। যৌনব্যাধি ঐ অঞ্চলের অন্যান্য সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের পথে সম্ভবতঃ বিপরীত স্রোত। পাহাড়িয়া পরিচারকগণ দীর্ঘকাল তাহাদের পরিবারবর্গ হইতে দূরে থাকে বলিয়াই এরূপ ঘটে। গাড়োয়াল অঞ্চলে কুষ্ঠের আক্রমণ বেশী কিন্তু সে অঞ্চলে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র নাই। অন্ততঃ বৎসর দেড়েক পূর্বে ত ছিল না। তবে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে কতকগুলি ডিসপেনসারি আছে। সেখানে বাহিরের রোগীদের চিকিৎসা করা হয় এবং ঔষধ ও প্রচারের সাহায্যে এই রোগকে প্রতিরোধের চেষ্টা হইতেছে।

পর্বতীয় অঞ্চলে যক্ষ্মার কারণ, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও খারাপ, আলো-বাতাসহীন ঘরে এক সঙ্গে অনেক লোকের বাস। ইহার ফলেই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই রোগটিকে দূর করিবার জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা অনেক সুফল দান করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষৎ

কোন প্রতিষ্ঠানের জীবনে তিন বৎসর সময় দীর্ঘ নয়। কোন প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাতের অল্পকাল পরেই তার কাজের মূল্য নির্ধারণ করার মধ্যে তার দিক থেকেই বাধা আছে। তবুও মাঝে মাঝে তার কার্যাবলী পরীক্ষা করলে তার চলার পথে সাহায্য করা হয়। তার দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির অবদান ও ত্রুটির পরিমাণ নিরূপণ করা যায় এবং তার কার্যে ফলপ্রসূতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পন্থা ও উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব। ১৯৫৬ সনের আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের তিন বৎসর পূর্ণ হবে। পর্ষৎটি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে তার একটি অংশ ছিল স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণের কাজ। সেই অংশটির অবস্থা কেমন ছিল তা পরীক্ষা করলেই সংস্থাটির অবদান স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সমাজের হতভাগ্য, শোষিত বা অনগ্রসর ব্যক্তিগণকে সাহায্যের ব্যাপারটি সময়ে সব সমাজকল্যাণ নামে অভিহিত হয় নি। কিন্তু মানুষ, এমন কি পশুও এই ধরনের সাহায্য ভারতে অতি প্রাচীনকালে সেই বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগ থেকে পেয়ে আসছে। তবে রাজা রামমোহন রায় ও গত শতাব্দীর মধ্যভাগের সমাজ-সংস্কারকগণ থেকেই সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টা একালের ভারতীয় জীবনযাত্রার একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল অগ্রপথিকের কাজের ও ভারতে খ্রীষ্টান যাজকসম্প্রদায়ের আগমনের এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠার ফলে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত বিধবা ও নারীগণের, কুমারী-জননীগণের, বৃদ্ধগণের এবং হতভাগা শিশুগণের সাহায্যকল্পে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের একটা কাঠামো দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সকল সংস্থা সংখ্যায় ছিল অল্প এবং দেশের বিরাট সমস্যাবলী সমাধানে পর্যাপ্ত ছিল না।

বস্তুতঃ জাতির জনক গান্ধীজীর মিলনের সঙ্গেই প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে সমাজসংস্কার জাতীয় জীবনের একটি অংশ হয়ে

দাঁড়ায়। গ্রামে গ্রামে কাজে, নারীদের চরকা কেটে অর্থার্জনে সাহায্য করে। খাদি ও গ্রাম্যশিল্পে উৎসাহদান, মদ্যপান ও পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচার, বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার মত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা প্রভৃতি ঘটে। কাজেই তখন দেশের চারিধারে এই মহান নেতার দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র নারী হয় সমাজকর্মীর অথবা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যক্তিগত ভাবে উদ্বুদ্ধ হন।

আবার সমাজকল্যাণের প্রত্যয় সম্বন্ধেই পরিবর্তন আসছিল। শিক্ষাপ্রাপ্ত কল্যাণকর্মীর প্রয়োজনীয়তা বেশি করেই অনুভূত হচ্ছিল। টাটা পরিবার সমাজকল্যাণমূলক কাজ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বোম্বাইতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

উত্তর স্বাধীনতা আন্দোলন—জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকর্মিগণের আশা স্পষ্ট ভাবে জেগে ওঠে। তখন তাঁরা মনে করলেন, দীর্ঘকাল উপেক্ষিত মানুষগুলির কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভাবে কাজ ও কাজের উন্নতি করা সম্ভব হবে। তাঁরা আশা করলেন, রাষ্ট্র এ কাজে অনেক দূর অগ্রসর হবেন এবং সকল রকমের সম্ভাব্য সাহায্য দান করবেন। ফলে, এতকাল ধরে তাঁরা যা কামনা করছিলেন তা লাভে সমর্থ হবেন। বিভিন্ন কল্যাণ-সম্মেলন থেকে কেন্দ্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রীদপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানান হতে থাকে। রাজ্যসরকারেও যাতে সমাজ-কল্যাণ বিভাগ থাকে সেজন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হয়। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ধরনের সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা সরকারী পরিকল্পনায় ক্রমে বেশি করে স্থান লাভ করে। এইগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন বিভাগের অধীনে ন্যস্ত হয়। এই কাজগুলি হচ্ছে, শিক্ষা, শ্রম, পল্লীমঙ্গল ও উন্নয়ন। উপজাতিগণের কল্যাণ ও অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণমূলক কাজকর্ম, ঐ উদ্দেশ্যেই পৃথক ভাবে গঠিত বিভাগগুলির হাতে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগ অপরাধী শিশু ও কয়েদী প্রভৃতির কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে।

সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি—যেসব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় সমাজকল্যাণমূলক কাজের ভার নিয়েছেন তাঁরা পুরানো ও নূতন দুই রকমেরই সমস্যা সমাধানে তৎপর। দেশ খণ্ডিত হবার ফলে, যুদ্ধের দরুন অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটায় ও দ্রুত নগরাদি পত্তনের কারণে সমাজজীবনে অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়েছে। এটাই সমাজের নূতন সমস্যা। আগেই সমাজের সমস্যাগুলি ছিল ব্যাপক, কিন্তু সেগুলি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। এগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল বিশেষজ্ঞের সাহায্য। সমাজকল্যাণের কোন জাতীয় পরিকল্পনা না থাকায়, স্থানীয় দলগুলির প্রচেষ্টায় ছিল বিশৃঙ্খলা। সেজন্য কোন কোন অঞ্চলে এই সব দল ছিল একাধিক। তাদের কার্যক্রমও ছিল সেই রকমের। ফলে, বহু শক্তি ও অর্থ অপচয় হয়েছে। আবার, অপর পক্ষে বহু অঞ্চলে কোন কার্যই হ'ত না, দীর্ঘকালের সামাজিক সমস্যাগুলির কথা কেউ চিন্তাও করত না।

সামাজিক সঙ্গতির স্বল্পতা—যে অংশে স্বেচ্ছামূলক ভাবে সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ হ'ত সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থাভাব বাধা ঘটাত। তার ফলে পুরনো সমস্যাগুলির সমাধান করা যেত না, নূতন কাজ ত পরের কথা। সমাজ-সংক্রান্ত অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। লোকের কাছ থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে মোটা দান পাবার দিনও শেষ হয়ে আসছিল। দানের উৎসগুলি শুষ্ক হয়ে পড়ছিল। সেইজন্য সমাজকর্মীরা প্রায়শঃ তাঁদের হাতে যে কাজগুলি ছিল সেগুলিকে উপেক্ষা করে ঠিক সেই সব কাজের জন্যই অর্থ সংগ্রহে তাঁদের শক্তি ক্ষয় করছিলেন। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমেই সরকারের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করছিলেন। তাঁরা আশা করছিলেন, সরকার তাঁদের কিছু আর্থিক সাহায্য করতে অগ্রসর হবেন যার ফলে তাঁরা তাঁদের আরব্ধ কাজগুলি যা একদিন নিঃসহায় অবস্থায় সম্পাদন করছিলেন, কোন রকমে সম্পাদন করে যেতে পারবেন।

পরিকল্পনার উদ্ভব—তখন উপস্থিত হ'ল প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা। সমাজকর্মীদের আশা আবার জাগ্রত হ'ল। তাঁরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন, তাতে সামাজিক কল্যাণের কোন ব্যবস্থা আছে কি না। তাঁরা দেখে খুশি হলেন যে, সমাজ-কল্যাণের জন্য একটি পৃথক পরিচ্ছেদই আছে। আবার, ঐ সঙ্গে একেবারে হতাশও হলেন যে, সেই উদ্দেশ্যে অর্থ-ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ঠিক এই সময়ে শ্রীমতী দুর্গাবাঈ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যা নিযুক্ত হন। তাঁর হাতে দেওয়া হয় সমাজকল্যাণমূলক কাজের ভার। সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে তাঁর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ছিল। তার অল্পকাল পরেই পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত ও সমগ্র রূপটি প্রকাশিত হয়। সমাজকর্মীরা দেখে আনন্দিত হন যে, সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য ৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির প্রচেষ্টা ঐ সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে স্থির করা হয়েছে যে, সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রধান দায়িত্ব থাকবে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে। তাঁরাই সে-সব কাজকর্ম করবেন। এই রকমের নীতির পক্ষে খুব শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত কারণও ছিল।

স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের অফিস

সমস্যাবলীর প্রকৃতিই এমন যে, সেগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে মানবতার স্পর্শের প্রয়োজন। এই অতিপ্রয়োজনীয় স্পর্শ সরকারী শাসনযন্ত্রে সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে সরকারী শাসনযন্ত্রের চেয়ে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা ভাল। দ্বিতীয়তঃ, তখনও সরকারী সঙ্গতিকে সীমাবদ্ধ বলে বিবেচনা করা হ'ত। সরকার পারতেন কেবল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির মত বুনিয়াদী সমাজসেবার কাজ করতে। এগুলি যে কোন সভ্য সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু সরকারী সঙ্গতির সঙ্গে পরিপূরকরূপে সামাজিক সঙ্গতিরও যথেষ্ট প্রয়োজন। কারণ, কতকগুলি বিষয়ের বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক, যেমন নারী, শিশু, ঐ সঙ্গে বিকলাঙ্গ ও সমাজের যারা দুষ্টব্রণস্বরূপ তাদের। অপর দিকে, পরিকল্পনাকারিগণও স্বেচ্ছাকর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলির অসুবিধাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন। সেজন্য স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে তিন-চারটি প্রধান খাতে তার ব্যবস্থা করেন।

নূতন পরিচালকমণ্ডলী—ঐ চার কোটি টাকা বণ্টনের উদ্দেশ্যে পরিচালনাকারিগণ একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন। এই কাজের ভার তাঁরা সরকারী বিভাগের মন্ত্রী-দপ্তরের হাতে দেন না। তাঁরা একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করতে মনস্থ করেন। এই পরিষদের রূপ হবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মত। তারা নিজেরাই তাদের অধিকার মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা দ্রুত কার্যকরী করতে পারবে। এই কেন্দ্রীয় পর্ষদের আর একটি নূতন রূপ এই হ'ল যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও অর্থ এই চারটি মন্ত্রীদপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হবেন বেসরকারী ও দুটি লোকসভারই প্রতিনিধিগণ।

প্রথম পদক্ষেপ—ভারতের নানা অংশে স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান বিস্তৃত। মণ্ডলী বা পরিষদ ঐ সব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও অভাব কি তা জানবার জন্য বেসরকারী সমাজকর্মীদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে তা জানতে মনস্থ করলেন। পরিষদ বুঝতে পারলেন, দিল্লীতে বসে কোন কেন্দ্রীয় পরিষদ সারা দেশে বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অভিযোগ ও অভাব কি তা বুঝতে পারবেন না। সেজন্য রাজ্যসরকারগুলিকে 'সমাজকল্যাণ পরামর্শ পরিষদ' গঠনের জন্য অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং এখানেও পরিষদের সেই পূর্ব ধাঁচকে অনুসরণ করে পরামর্শ পরিষদে বেসরকারী সদস্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় পরিষদের কাজ বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী কার্যনির্বাহক সংস্থা স্থাপন করে তাঁদের উপর ভার দেওয়া হয় আবেদনপত্রাদি গ্রহণ ও তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার, প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শনের, তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারণের এবং তাদের কতটা সাহায্য দেওয়া দরকার পরিষদের কাছে তার সুপারিশ করার।

নূতন কার্য—এই সময়ে বাণিজ্যিক দুর্নীতি, পাপ ও নারী এবং শিশু ব্যবসায় সমাজকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। ভারতের সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য সংস্থাও পরিষদকে সারা দেশের এই বিষয়ের একটা হিসাব নিয়ে ফলপ্রসূ উপায় গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। পরিষদ তাতে অবিলম্বে সাড়া দেন। এজন্য দুটি কমিটি নিযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা—পর্ষৎ প্রথম পরিকল্পনাকালে যে যে কাজ করেন তাঁদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্ভব তা থেকে। দেশের ৩১৫ পনেরটি জেলায় একটি করে সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে তাঁরা প্রত্যেক জেলায় আগামী পাঁচ বৎসরে আরও তিনটি করে সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। পরিষদ প্রথম পরিকল্পনায় ১৭৬০টি প্রতিষ্ঠানকে ২৫০০টি সাহায্য করেছেন। আগামীতে তাঁরা ৮০টি আশ্রম স্থাপন করবেন। প্রত্যেক জায়গায় থাকবে পাঁচটি করে আশ্রম। এই পাঁচটির মধ্যে একটি হবে নারী-উদ্ধার আশ্রম। প্রত্যেক আশ্রমে থাকবে শিল্প-উৎপাদন উদ্দেশ্যে একটি করে বিভাগ। পরিষদ যে যুক্ত কর্মতালিকা গ্রহণ করেছেন তার জন্য অর্থাগম হবে বিভিন্ন মন্ত্রী-দপ্তর ও রাজ্যসরকারগুলির কাছ থেকে। প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রাম-সেবিকা, ধাই ও ধাত্রীর কাজের জন্য শিক্ষা দান করা হবে।

অসামান্য তৎপরতা—পরিষদ গত তিন বৎসরে যা করেছেন এবং আগামী পাঁচ বৎসরে যা করবেন উপরে তার কিছু আভাস দেওয়া হ'ল। ঐ থেকে দেখা যায় পরিষদ কি অসামান্য তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন। সমাজকর্মীদের পক্ষে গত ত্রিশ বৎসরে যা শুরু ও সমাধা করা সম্ভব হয় নি, পরিষদ মাত্র তিন বৎসরে তা করেছেন। তাঁরা "সমাজ-কল্যাণ"কে লোকের কর্তব্য কর্মে পরিণত করে বহু অলস ব্যক্তিকে এই কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

একত্রে কার্য—আজকালকার কল্যাণমূলক কাজের অত্যন্ত জটিল সমস্যা হচ্ছে, একত্রে কাজ। পরিষদ এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেও একটি সংস্থা গঠন করেছেন। তাতে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী বিভাগের, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি বিভাগের প্রতিনিধিগণ ত তার সদস্য আছেনই।

তবুও পরিষদের কাজকে আরও সুষ্ঠু ও উন্নত করার অনেকগুলি ক্ষেত্র রয়ে গেছে। পরিষদ সে বিষয়ে অবহিত এবং যে কোন ত্রুটি অপসারণে আগ্রহশীল।

দেশবন্ধু স্মরণে

শ্রীক্ষেমঙ্করী রায়

কলেজে পড়িতে পড়িতে ১৯১৮ সনে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি। সেই সময়ে বহুবাজার নিবাসী স্বর্গত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের চতুর্থ পুত্রবধূ লোকান্তরিতা কৃষ্ণভামিনী দাস আমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিতা হন। দেশবন্ধুর (চিত্তরঞ্জন দাস) দ্বিতীয়া ভগিনী স্বর্গতা অমলা দাসের সহিত তিনি নিগূঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া দাস মহাশয়া আমাকে পুরুলিয়ায় বায়ুপরিবর্ত্তনে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

আজীবন কৌমার্য্যব্রতধারিণী অমলা দাস মাতৃ-পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাদের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া পিতা ৺ভুবনমোহন দাসের পুরুলিয়াস্থিত 'দি রিট্রিট' নামক বাড়ীতে একা বসবাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিতেন। সেবার বড়দিনের ছুটিতে তিনি কলিকাতায় আসিলে, কৃষ্ণভামিনী দাস মহোদয়া আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সেটা ১৯১৮ সনের ডিসেম্বরের কথা। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই স্নেহশীল, উদারহৃদয় দাস-পরিবারের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছি।

দীর্ঘ ছয় অথবা সাত বৎসর পুরুলিয়ায় ছিলাম। ইঁহাদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও যত্নে পুনরায় ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই।

মাসীমার (অমলা দাসের) ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে মাতৃ স্মৃতিরক্ষার্থে নিস্তারিণী বালিকা বিদ্যালয় নামে মেয়েদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব তিনি আমার উপর ন্যস্ত করেন। এই সূত্রে দীর্ঘকাল আমি তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করি ও পরমানন্দে পুরুলিয়ায় থাকিয়া যাই।

সুতরাং ইঁহারা স্নেহ, আদর ও যত্নের দ্বারা আমায় মুগ্ধ করিয়া আপন পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং এই আত্মীয়তাসূত্রে আমার মামাবাবু মামীমা, মাসীমা বলিবার অধিকার দিলেন। পিতৃহীনা পিতা পাইয়া ধন্যা হইল! এমন অনাবিল স্নেহ কাহাকে না অভিভূত করে?

অমলা দাসের মৃত্যুর পর আমাকে পুরুলিয়া ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই।

অবলা বসুজায়া মহাশয়ার প্রতিষ্ঠিত নারী-শিক্ষা-সমিতির পরিচালনায় ১৯২১ সনে বালিগঞ্জে একটি উচ্চ প্রাইমারী শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। বসুজায়ার নির্দ্দেশানুসারে একটিমাত্র ছাত্রী লইয়া আমি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন বালিগঞ্জ ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। শৃগাল ও সর্পের উপদ্রবে সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতাম। এই সময়েও এই স্নেহশীল পরিবারটি সর্ব্বদা আমার খোঁজখবর লইতেন। এমনই মহানুভবতা এই পরিবারের।

তখন বালিগঞ্জের গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়া, আমিও ইহার আক্রমণে অস্থিচর্ম্মসার হইলাম।

উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা ও তাহার ফলে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহাতে এবং সর্ব্বত্র কংগ্রেসের অক্লান্ত সেবা করিয়া মামাবাবুর (দেশবন্ধু) স্বাস্থ্য ভাঙিতে আরম্ভ করে। ডাক্তারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও জলপথে ভ্রমণের পরামর্শ দেন।

ডাক্তারের নির্দ্দেশানুযায়ী একখানি (এস. এস. ভুবানী) আসামগামী ষ্টীমারের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী রিজার্ভ করা হইল।

দেশবন্ধু তাঁহার চতুর্থ ভগ্নী (উর্ম্মিলা দেবী) তাঁহার পুত্রকন্যা, মামাবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা (কল্যাণী), নববিবাহিতা পুত্র ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য জলপথে ভ্রমণে চলিলেন। স্নেহময়ী মামীমা (বাসন্তী দেবী) ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী ন'মাসীমা (উর্ম্মিলা দেবী) আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমাকেও ইঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। ইহা ১৯২১ সনের অক্টোবর মাসের কথা।

ষ্টীমার ছাড়িবার আগের দিন আমরা সকলে ষ্টীমারে গিয়া রাত কাটাইলাম। মামাবাবু পরদিন সকালে ষ্টীমারে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণার প্রথম পুত্র সেই দিন ভূমিষ্ঠ হওয়ায় মামীমার যাওয়া হইল না। জগন্নাথঘাট হইতে ষ্টীমার রওনা হইল। ব্যারিষ্টার ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গী হইলেন।

জলপথ ভ্রমণের এই কয়েকটি দিন মামাবাবুর নিকট হইতে যে নিবিড় পিতৃস্নেহের স্পর্শ পাইয়াছিলাম তাহা আজীবন স্মরণে থাকিবে।

আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া যখনই সেই মধুর দিনগুলি স্মরণ করি, হৃদয় মন শ্রদ্ধায় অবনত ও আনন্দে অধীর হয়। মামাবাবুর অসুখ ছিল, পেটে একটা ভীষণ যন্ত্রণা হইত। ডাক্তারের পরামর্শে পথ্যের উপর নির্ভরই ছিল তাঁহার আরোগ্যের উপায়। পথ্যাপথ্য বিষয়ে ন'মাসীমাই ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ। সুতরাং সুপথ্যের বন্দোবস্তের দায়িত্ব তিনি আপন হস্তে তুলিয়া লইলেন। আমিও রোগাক্রান্ত, দিনের পর দিন ন'মাসীমার প্রস্তুত নিত্য নূতন পথ্য পাইয়া ক্রমে ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতে লাগিলাম।

পূর্ব্বে মামাবাবুকে বরাবর কর্ম্মব্যস্ত দেখিয়াছি। এই এক মাস তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে দেখিলাম এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।

তিনি যে কিরূপ সাহিত্যানুরাগী, হাস্যকৌতুকরসিক, মিষ্টালাপী ও স্নেহশীল ছিলেন, তাঁহার পরিচয় এই সময়ে একে একে পাই।

কল্যাণী (দেশবন্ধুর কন্যা) আমায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিত। আমার বিবাহ স্থির হইলে মামাবাবু অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। বিশেষ কার্য্যগতিকে তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে হয়। সেই জন্য আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বিবাহ-বাসরে উপস্থিত থাকিতে মামীমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া যান।

আমাদের বিবাহের কয়েকমাস পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বড় সভায় মামাবাবু সভাপতি হইয়াছিলেন। আমরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভান্তে তাঁহাকে উভয়ে প্রণাম করিলাম। মৃদু হাসিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ষ্টীমারে ন'মাসীমা রন্ধনের ও বৈকালের চায়ের সঙ্গে জলখাবার তৈয়ারী করিবার পালা করিয়া দিলেন। রান্নার নিত্য নূতন পালা চলিতে লাগিল। একদিন ভাজা মশলায় আলুর দম রান্না করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরে ভোজনের সময় মামাবাবু বলিলেন, সুনিপুণা রাঁধুনির চিনির দমটা আর একটু দাও। বুঝিলাম মিষ্টি বেশী হইয়াছে।

মামাবাবুর সঙ্গে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। সামান্য কিছু খাইতে হইলেও তিনি কাঁটাচামচ ব্যবহার করিতেন। তিনি একদিন ছুরি ও কাঁটার সাহায্যে পাকা পেঁপে খাইতেছিলেন, মামাবাবু দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,"জিবটা খেয়ো না যেন।" চড়ায় নৌকা দেখিলেই আমাদের ডাকিয়া বলিতেন, "তোমাদের নৌকা যাচ্ছে দেখ।" আবার বাজার হইতে তরকারী আসিলে ডাকিয়া বলিতেন, "লাউ ঘণ্ট দিয়ে লুচি খাওয়াবে ত?"

এই জ্ঞানী, গুণী, বিখ্যাত আইনজীবী যে এরূপ কৌতুকপ্রিয় তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

বিকালের জলখাবার তৈরীর সময় সকলেই ঘুমাইয়া থাকিত। মামাবাবু একা ডেকের উপর পায়চারী করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-আলো-আঁধারের খেলা উপভোগ করিতেন। মাঝে মাঝে আসিয়া কি খাবার তৈয়ারী হইতেছে জিজ্ঞাসা করিতেন। সেই দৃশ্যটি এখনও সুস্পষ্টরূপে চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

একদিন যখন কচুরি ভাজিতেছিলাম, তখন তিনি হঠাৎ আসিয়া সরল শিশুর মত হাত পাতিয়া একখানি কচুরি চাহিলেন। বলিলেন, "ভয় নাই, ছুটকী কিছু বলবে না।" ঘিয়ের জিনিস পাওয়া ডাক্তারের নিষেধ ছিল। কি করি মহাসমস্যায় পড়িলাম; ছোট শিশুকে যেমন করিয়া ভুলায় তেমনি করিয়া আমি একখানি ছোট্ট কচুরি ভাজিয়া তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। তাহাতেই খুশী হইয়া তিনি মধুর হাসি হাসিলেন। তিনি যে শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন তাহার পরিচয় এই ঘটনায় পাইলাম।

আমাদের আসামগামী ষ্টীমারখানি যে সকল ষ্টেশনে মাল তুলিয়া লইত অথবা মাল নামাইয়া দিত, সেই সকল ষ্টেশনে তিন-চারি ঘণ্টা, কখনও কখনও সারারাত্রি নোঙ্গর করিয়া থাকিত। সেই সুযোগে আমরা সকলে ষ্টেশনে নামিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া আসিতাম এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও তরিতরকারী কিনিয়া আনিতাম।

ষ্টীমার দিবারাত্রি চলিত, কেবলমাত্র মাল নামাইবার ও তুলিবার জন্য ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামিত। এক রাত্রিতে আমরা যখন সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তখন হঠাৎ ভয়ানক শব্দ হইয়া ষ্টীমারটি থামিয়া গেল। মনে হইল নদীর মধ্যে কোনও চড়ায় ধাক্কা লাগিয়াছে। আমরা সকলেই সভয়ে জাগিয়া উঠিলাম। কিন্তু মামাবাবু তখনও নিদ্রিত। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহাকে পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা বলা হইলে হাসিয়া বলিলেন, "আমি তো জেগেই ছিলাম, তোমাদের সকলের নাক ডাকা শুনছিলাম।" এইরূপ সরল হাস্য-পরিহাস দ্বারা তিনি সকলের আনন্দবিধান করিতেন।

তিনি রসগ্রাহী বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। রাত্রির আহার সমাপনান্তে আমরা সকলেই টেবিলে বসিয়া গল্পগুজব করিতাম। তাসও খেলিতাম। মামাবাবু সমানতালে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসের ব্যাখ্যা তিনি এক এক রাত্রিতে করিতেন। তিনি বলিতেন, সর্ব্বরসের সার মধুর রস—গোপীপ্রেম। এই সকল তত্ত্ব বুঝাইতে বুঝাইতে আবেগে প্রায়ই অশ্রুবর্ষণ করিতেন। কোনও দিন বা তাঁহার স্বরচিত কিশোর-কিশোরী, সাগরসঙ্গীত, অন্তর্যামী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। আবার কোনও কোনও রাত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ হইতে মনোনীত কবিতাগুলি সুর, ছন্দ ও তাল লয় সহকারে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেন। আমরা এই ভাববিহ্বল কবির আবৃত্তি স্তম্ভিত, বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া শুনিতাম। এই আমোদ-প্রমোদে দীর্ঘ একটি মাস কাটাইয়া সকলেরই দেহ মন সুস্থ ও সবল হইল। ক্রমে ভ্রমণও শেষ হইল।

একটি মাস পরস্পরকে একান্তভাবে পাইয়া আমাদের ও ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আত্মীয়তার ভাব নিবিড় হইয়াছিল। মামাবাবু অধ্যক্ষ ও খালাসীদের ডাকিয়া বকশিস দিয়া বিদায় লইলেন। তখন তাহাদের চক্ষু সজল দেখিলাম।

এবার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পালা। কিন্তু এই একটি মাসের আনন্দপূর্ণ মধুর স্মৃতিটি আজও স্মৃতির ভাণ্ডারে মহামূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত আছে।

মহাকালের নিষ্ঠুর বিধানে অকালে স্নেহময় মামাবাবু ও ভাই চিত্তরঞ্জনকে হারাইয়াছি। কিন্তু সত্যই তো বিধাতার রাজ্যে কিছুই হারাইয়া যায় না। কবিগুরু কথায়:

> "মোর যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে,
> সব যদি দেই সঁপিয়া তোমাকে,
> তবে যে গো তাহা, সব জেগে রয়,
> তব মহা মহিমায়।
> তোমাতে রয়েছে কোটি শশী ভানু,
> হারায় না তারা অণু পরমাণু,
> আমার এ ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
> রবে নাকি তব পায়?"

মনে হয় দেশবন্ধুর অমর আত্মা পরলোক হইতেও আমাদের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন, সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেছেন।

মামাবাবু দানবীর, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, অক্লান্তকর্ম্মী দেশসেবক,

প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার রূপেই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু তাঁহার অন্তরটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় স্নেহধারায় যে সদাসর্ব্বদা কিরূপ সরস থাকিত তাহার সন্ধান পাইবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। সেই স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের কি তুলনা আছে? তিনি দাতা ছিলেন, কর্ম্মী ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। দিন কয়েকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁহার চরিত্রে মনুষ্যত্বের যে বিরাট মহিমা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা অতুলনীয়। আজ সেই 'মানুষ' চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি-উচ্ছ্সিত হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইলাম।

ভাওয়াইয়া গান ও বাউদিয়া সম্প্রদায়

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

ধূলি-ধূসরিত পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে বাউদিয়া তার দো-তারা হাতে নিয়ে। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যায় সে। আপনার খেয়ালেই কখন সে দাঁড়ায় নি এক জায়গায়। বিলীয়মান সূর্য্যরশ্মির দিকে চেয়ে হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই ঝঙ্কার তোলে দো-তারার তারে। বিবাগী মনের মণিকোঠা থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে আলোর ঝলকানি। ফেলে-আসা দিনগুলির কথা স্মরণ করে নিয়েই হয়ত সে আবেগের সঙ্গে গেয়ে উঠে:

"সখী আর কি দেখা পাব জীবনে,
আমার দিনে দিনে তনু অইলো ক্ষীণ
সখী ভাবদে ভাবদে তাহারি।
দুই নয়নের জলে আমার বক্ষি ভাসে নদী
সখী এতদিনে ক্ষয় হইতাম পাষাণ হইতাম যদি।

হইতাম যদি জলের কুমীর
খুজ্যা দ্যাখতাম জলে
(সখী) হইতাম যদি বোনের বাঘ রে
খুজ্যা দ্যাখতাম জোঙ্গলে,
হারে দারুণ বিধি যদি দিত পাখারে
সখী দ্যাখতাম নয়ন ভরে।"

বাউদিয়া আবার এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলাই ত তার ধর্ম্ম। বিবাগী বা 'বাউড়া' কথা থেকে বাউদিয়া শব্দের উৎপত্তি ধরে নেওয়া চলে। তাই এদের অধিকাংশ গানের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের সুর খুজে পাওয়া যায়।

এই বাউদিয়া সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া যায় সাধারণতঃ দিনাজপুর, রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে। এরা সাধারণতঃ ঘর বাঁধে না। কোন সামাজিক সংস্কারেরও বড় একটা ধার ধারে না। এদের সাধনা-পদ্ধতি, জীবনযাত্রা-প্রণালী সবই যেন একটু আলাদা ধরনের। এরা একাধারে বাউলের মত আত্মভোলা, কিন্তু গীতগুলি ঠিক সেই অনুপাতে অধ্যাত্মভাব সমৃদ্ধ নয়। অপর দিকে পূর্ব্ববঙ্গের উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও রয়েছে এদের প্রচুর মিল। তাই এদের গানে বৈষ্ণবের মত বিচ্ছেদ, অভুরা, পূর্ব্বরাগ, পরকীয়া প্রেমের সন্ধান মিলবে। কিন্তু তাই বলে কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি বা গণ্ডীর মধ্যেও এদের আটকান যাবে না। এরা সারা জীবন প্রেমের দেবতাকে খুঁজে বেড়ায়। হয়ত জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও এদের এই খোঁজার শেষ হয় না। তাই এরা ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, মাঠে ঘাটে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তারা তাই ঘর বাঁধারও কোন আবশ্যকতা বোধ করে না। যদি বা কখনও কোথাও আস্তানা পড়ে, তবে তা হয় ক্ষণস্থায়ী। দু'দিন ঘর করতে না করতেই যেন হাঁপিয়ে উঠে। প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন কান খাড়া করে থাকে বাঁশীর সুরের দিকে। দূর হতে আগত বাঁশীর সুরে ভুলে যায় তার ঘরের কথা। হাতের কাজ যাই থাকুক না, ফেলে দিয়ে অমনি বেরিয়ে পড়ে। এদের ভিতরেও মিলন বিরহ আছে। কিন্তু সে জন্য কোন খেদ নেই—কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

সবচেয়ে মজার কথা ছিল এ সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত ধর্ম্ম নিয়ে কোন ভেদাভেদ নেই। তাই এদের গানে বাউল, বৈষ্ণব এবং সাই, দরবেশ ও সুফীদের ভাব ও সুর এক হয়ে মিশে গেছে। বাউদিয়া হ'ল একটা সম্প্রদায় মাত্র, জাত নয়! এই খেয়ালী বাউদিয়া আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে যে গীত-লহরী তাকেই নাম দেওয়া হয়েছে ভাওয়াইয়া।

'ভাব' থেকেও 'ভাওয়াইয়া' কথা এসেছে হয় ত। সত্যিই এদের গান ত আর নিছক সময় কাটাবার জন্য নয় বা কোন বিশেষ উপলক্ষেও রচিত নয়। একদিকে অধ্যাত্মবাদ ও অন্যদিকে মনস্তত্ত্ব সবই পাওয়া যাবে এই গানে।

ভাওয়াইয়া গানের ভিতর যে একটু লঘু রসের খোরাক যোগায় —সংসারের সুখ, দুঃখ, হাসি, ঠাট্টা—এগুলিকে 'চটকা' আখ্যা দিতে হবে এগুলি বেশী শুনতে পাওয়া যায় কুচবিহারে। তা ছাড়া মহিষ চরাতে চরাতে যে গান গায় বা গরু চরাতে চরাতে বা গাড়ী চালাবার সময় যে সকল গান হয় তাকে বলা হয় 'মৈষাল' ও 'গাড়োয়ালী' গান। এই গাড়োয়ালী গানের সুরের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গানের একটা সুরগত ঐক্যও দেখতে পাবেন। এ ছাড়া মৈষাল গানের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের রাখালী গানের মিল ত পাবেনই। কিন্তু আমাদের বাউদিয়া ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে নদীর কিনারায়।

কালবৈশাখী দেখা দিয়েছে। আকাশ মুখ ঢেকেছে তার ভ্রমর কালো মেঘের ওড়নায়। হয়ত তার মাঝে ক্ষণিকের তরে দেখা

দেয় তার চটুল চাহনি—ঝিলিক দেয়ে উঠে ক্ষণপ্রভার হাসি। বাউদিয়ার বুকের মাঝে হু হু করে উঠে তার প্রাণবঁধুর কথা মনে করে। সে আর থাকতে না পেয়ে গেয়ে উঠে :

"প্রেম জানে না অসিক (রসিক) কালাচাঁদ
ও সে ঘুইয়ে মরে মোন
কতদিনে বঁধুর সনে হইবে দরশন।

হাটিয়া বাইতি নদীর জল
খাবলুম্ কি থুবলুম্ কি
থলাল থলাল করে রে
(হায় হায় পরাণের বন্ধুরে)
(বন্ধু) তোমার আশায় বইসে থাকি
বট বিবিক্কির তলে
মন আমার উড়াম বাইরাম করে রে
উড়াম বাইরাম করে।"

পাঠকগণ এই ফাকে লক্ষ্য করুন এদের গানের শব্দ চয়ন এবং সুর ঝঙ্কারের প্রতি। এক প্রেমিক অভিসারে চলেছে, পথিমধ্যে আছে চিরল নদী। নদীর গর্জ্জন ভীষণ। এর উপর আছে বরুণ-দেবের ভ্রূকুটি। নদীর গর্জ্জনের সঙ্গে ঝড়ের মিতালিতে এর তখনকার অবস্থা কি অপূর্ব্ব ভাবে ফুটে উঠেছে এই গানে। নদীর জলকল্লোল, কিংবা অশান্ত মনের দুরন্ত ভাবরাশি যেন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এদের গানের মাধ্যমেই। স্বভাবকবি বাউদিয়ারা সাধারণতঃ নিরক্ষর। কিন্তু দেখুন কি অপূর্ব্ব তাদের কাব্যবোধ, সেই সঙ্গে কাব্য-শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এরা সজ্ঞানে কেউ কোন শব্দ চয়ন করে নি।

নদীর ঘাটে এসে পৌছেছে অভিসারিকা। ওপারে তার বঁধুর বাড়ী, এপারে সে অবলা নারী। কি করেই বা সে এই দারুণ নদী পার হবে ভেবে ঠিক করতে পারে না। স্পষ্ট কণ্ঠেই সে ঘোষণা করছে, যে তাকে এই দুস্তর নদী পার করে দেবে সেই মাঝিকে শুধু যে তার গলার হারটাই উপহার দেবে তাই নয়—তনু, মন সবই দিতে প্রস্তুত। ভরা যৌবনের বাঁধনছাড়া জলধারা জীবননদীর কূলে কূলে ভরাট করে মহাপ্লাবনের সূচনা করেছে। বাউদিয়ার হাতের দো-তারা আর কণ্ঠের অপূর্ব্ব সুরে মায়াজাল রচনা করে চলে :

"যে মোরে করিতোরে পার
দান করিতাম গলার হার
পার হইয়া যৈবন করতাম দান।
ওই পারে বন্ধুর বাড়ী
এই পারে মুই নারী
মধ্যে আছে চিরল নদীর ধারা।

বাহুতে আধিনু (বাধিনু) বাহুতে বাঁধিনু
জলেতে ভাসাইয়া দিলাম হাড়ী।
আর বিয়ায় সোয়ামী মইলে
খাব মাছ আর ভাতরে
(আর) পান (প্রাণ) বঁধুয়া মইলে
হব আড়ি (রাড়ী – বিধবা)।
না জানি সাতাররে, না জানি পাহাড়
না জানি ঘুয়া বাইর (বারে)
আমি অকুল দড়িয়ায়
ক্যামনে হব পাওয়ার (পার)।"

তবেই বুঝুন, এত যে প্রেম প্রীতি সবই বুঝি হ'ল বালু-সৈকতে সৌধ নির্ম্মাণ। তা হোক, আমার প্রেমের দেবতাকে যদি পাই তা হলেই ত আমার সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া, সকল চাওয়ার শেষ চাওয়া সাঙ্গ হ'ল। আর ত কিছুই চাই না। আজ যদি আমার বিয়ে করা স্বামী মারা যায় সেজন্যে কিছুমাত্র দুঃখিত হব না, বৈধব্য বেশও ধারন করব না, বিধবার লক্ষণস্বরূপ মাছ ভাত খাওয়াও ছাড়ব না। কিন্তু যদি সত্যি আমার প্রাণপ্রিয়ের কোন দুর্ঘটনা ঘটে তা হলেই ত আমি সত্যিকারের বিধবা হব।

পরকীয়া প্রেমের এত বড় নিদর্শন একমাত্র পদাবলী সাহিত্য ছাড়া জগতের যে-কোন সাহিত্যেই দুর্লভ। তত্ত্বজ্ঞানী বাউদিয়া তাই আবার তার দো-তারার তারে টঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠে :

"প্রেমের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি
মুই সেন জান।
বন্ধুর ঘরে প্রেম করা ভালো
কেইন্দে কেইন্দে চোক্ষের জল মোর
হোল সারা রে।
মুই সেন জান।
চন্দ্র সূর্য্য যাচ্ছে জ্বলিয়ারে
আরে ওই রকম ওই নারীর প্রাণ
সদাই ঝরেরে।"

বসন্ত সমাগমে গাছে গাছে ফুটল নতুন ফুল। সবুজে সবুজে ছেয়ে ফেলল বন-প্রান্তর। ঝোপে ঝাড়ে ডেকে উঠল 'বৌকথা কও' পাখী। অশোক-কিংশুকের মেলায় মন হরণ করে নিল কবির। প্রকৃতি হেসে উঠল আবার এত দিন পর। নতুন জীবন পেল পুরাতন ধরিত্রী। কিন্তু বাউদিয়া? তার ত ঘরও নেই, বাড়ীও নেই। তার কি আর চলার শেষ হবে না? খুঁজে কি পাবে না তার জীবনধনকে? কেন, এই যে দো-তারা! এই ত তার জীবনের সাথী, এই ত তার প্রেয়সী! এই দো-তারাকে সঙ্গী করেই ত সে ঘর ছেড়েছে।

"(আরে ও) মরি হায়রে হায়
নবীন বয়সে যোক্ করলিযে বাউদিয়া।
যখন দো-তারা তোকে নিলাম হাতে
নিষত (নিষেধ) করে যোক্ পাড়ায় লোকে

সান্‌লাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত

কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।

S. 234-X52 BG

নিরত করে মোক (আমাকে) দয়াল বাপ ভাই ।
তোর জন্ত মোর গেয়াম বাদী

আজ তুই দো-তারা বাথলিরে মাথ
রুপা দিয়া মুই বান্ধাবরে কান···।"

হয় ত গাড়োয়ানের বেশেই চলেছে তার প্রাণ-প্রিয়। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। কিন্তু তার অব্যক্ত কথা প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে বাউদিয়া। দো-তারার তারে ঘা মেরে গেয়ে ওঠে তার মনের কথা—

"ওকে গাড়ীয়াল ভাই
উজান উজান করে গাড়ীয়াল
উজানে বাঘের ভয়।
গাড়ী ধরিয়া গাড়ীয়াল
বাড়ী ফিরিয়া যায়।
ভাত ও মাগো খাইয়া গাড়ীয়াল
মুখে না দেয় পান,
চালের বাতায় ধরিয়া কন্যা
ঝুড়িছে কান্দন।

না কান্দ না কান্দ কন্যা
ভাজিবে রথের গোড়া
আর এক দিন ফিরিয়া আসিলে
সোনা দিয়া বান্ধিবেরে গলা।"

কখনও বা আর থাকতে না পেরে কেঁদেই ফেলে :—

"চ্যাংড়া বন্ধুরে—
আমারে ছাড়িয়া যাবিরে কোথায়।
তোমার জন্তে ভেইব্যে ভেইব্যে
হইলামরে গাছের বাকল
চ্যাংড়া বন্ধু তুই মোর নয়নের কাজল।

চ্যাংড়া বন্ধু মোর আউলাইল পরাণ···।"

কখনও বা আপনার মনেই প্রশ্ন করে, তবে সে কি প্রেমপ্রীতি কিছুই জানে না? তাই যদি না হবে তা হলে তার বন্ধু কেন আসছে না। কি এমন তার অপরাধ?—

"ওকি ধন ধনরে
তোর শরীলে এতইরে গোঁসা
পিরীতি মুই জান না—
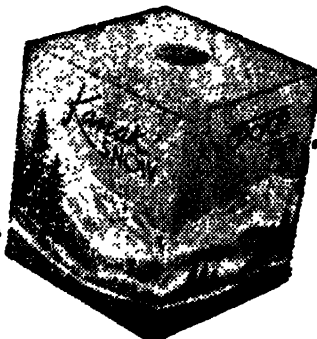
এটি অনেক...
অনেক...
বেশী সুগন্ধী!
রেক্সোনা সাবানে এখন
অনেক...অনেক
বেশী সুগন্ধ আছে
দীর্ঘস্থায়ী
সতেজতার জন্যে
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরি লিঃ-এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত।

একে ত আন্ধাইরা রাতি
হাউসের (সাধের) বন্ধু আমার
গোঁসা হইয়া যায়।"

একদিকে তার প্রাণ-বঁধূ অন্যদিকে ঘরের শাশুড়ী-ননদ। শাশুড়ী-ননদের কথা শুনতে গেলে, সংসারধর্ম্ম পালন করতে গেলে বঁধুর সঙ্গে মিলন হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সে হয় ত অভিমানভরে চলেই যাবে। অন্য দিকে বঁধুর সনে মিলতে গেলে সাংসারিক নির্যাতনও কম সহ্য করতে হবে না :

"আমার শশুর করে মুণ্ডর মুণ্ডর
ভাশুর করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আইন্যা
ধরল চুলের খোসা।"

দোটানায় পড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে তার মনপ্রাণ। তুষের অনলের মত ধিকি ধিকি করে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত অন্তরাত্মা। অথচ করবারও ত তার কিছুই নেই। বাউদিয়াই বা কি করবে এক্ষেত্রে? সেও ত এই ভাবেই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। মাথার চুল হয়েছে তার সাদা। দৃষ্টি হয়ে আসছে ঝাপসা। পার্থিব সুখ, দুঃখ এখন তার কাছে সব একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরমাত্মার সন্ধান কি এখনও মিলল না?

শ্রান্ত দেহে উদাস মধ্যাহ্নের উদার মাঠের মাঝে এসে বসে বাউদিয়া। জগৎসংসার সবই তার কাছে মায়া বলে মনে হচ্ছে। এখন সে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চলেছে। নিজের কাজেরই ফল-ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। সুতরাং এজন্যে আর অন্যকে দোষ দিয়ে কি হবে?—

"আপন কর্ম্মদোষে সব হারালি
দোষ দিবি তুই কারে।
মোনরে পূবান পচ্ছিমে বাও
রাধা কৃষ্ণের ভাঙ্গা নাও
ঠমকে ঠমকে ওঠে পানী।
মোনরে ইঙ্গলা পিঙ্গলার ঘর
ঘুমে করেছে জড় জড়
খসে পড়ল তোর বত্রিশ বান্ধনের জোড়া।

ওপারে কদম্বের গাছ
ঝিল মিল ঝিল মিল করে পাত
তার উপর জোড় বগিলার বাসা।
আহারের লোভেরে জমিনে পরিয়ারে
সেইনা বগা ঠেকলো মায়াজালে।"

সন্ধ্যা নেমে আসে। বাউদিয়া আবার পথ চলতে সুরু করে। হাতের দো-তারা তার তখনও বেজে চলে এক উদাস সুর তুলে। মাঠের পর মাঠ, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হয়ে যায় সে। দো-তারার সুরে সুর মিলিয়ে সে গেয়ে চলে :

"ওরে জীবন ছাড়িয়া না যাইস মোরে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কে?
ভাই বল ভাতিজা বল সম্পত্তিরোরে ভাগী
আগে করবে ধনের আশা
পিছে করবে দেহার গতি।

চিত্রগুপ্তের খাতা লয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী
পরমায়ু শেষ হলে হস্তে দিবে দড়ি।
দুই জনাতে যুক্তি করে আনল ভবের হাটে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলি নিঠুরা পাথারে।"

দেশ-বিদেশের কথা

সাহিত্য-সেবক সমিতি

ঔপন্যাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সেবক সমিতি কলিকাতার একটি বিখ্যাত সাহিত্যালোচনা প্রতিষ্ঠান। বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক এই প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

সম্প্রতি সাহিত্য-সেবক সমিতির ৪৪তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৩১৭ সনে জনকয়েক সাহিত্যসেবীর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় মাত্র নয় জন সভ্য লইয়া এই সমিতির গোড়াপত্তন হয়। প্রতিষ্ঠা কাল হইতে আজ দীর্ঘ ৪৩ বৎসর ধরিয়া সমিতি অগ্রগতির পথে চলিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সমিতির ২৪টি সাধারণ সভা এবং ৭টি কর্ম্মী সংসদের বৈঠক বসে। তাহাতে গল্প প্রবন্ধ কবিতা নাটিকা ইত্যাদি পঠিত হয় এবং সঙ্গীত সহযোগে বক্তৃতা হয়। ২৯শে বৈশাখ বুধবার শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চতুর্নবতিতম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর '৫৪ শনিবার কলেজ স্কোয়ারস্থ ষ্টুডেণ্টস হলে ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সমিতির ত্রিচত্বারিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ সনের ৩১শে অক্টোবর শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের ঢাকুরিয়া শহীদনগর কলোনীস্থ বাসভবনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬২ সনে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডক্টর সুবোধকুমার সেনগুপ্ত বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ইহার সভাপতি

পদে বৃত হইয়াছেন। এই সমিতির প্রাক্তন সভাপতিগণের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কামিনী রায়, জলধর সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর প্রভৃতি সম্পাদকরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রাধারমণ সম্মিলন সমিতি

গত ২০শে মে ডুমুরদহ ধ্রুবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাধারমণ সম্মিলন সমিতির ৪১শ বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই অনুষ্ঠানে হুগলী জেলাশাসক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য আই. এ. এস মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম. এল. এ., মহোদয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভুজঙ্গ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ডি-লিট, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি উভয়েই এই পল্লী-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিয়া এবং পল্লীগ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অধ্যক্ষ মিত্র, ডক্টর ভট্টাচার্য্য এবং বিভূতি দত্ত মহাশয়ও বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সভাপতির ভাষণে জেলাশাসক মহাশয় ডুমুরদহ গ্রামটিকে বাংলার একটি বিশেষ পুণ্যতীর্থ বলিয়া মন্তব্য করেন। এই পল্লীর সংগঠনে উত্তমাশ্রমের আচার্য্য শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের কর্ম্মতৎপরতা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হয়।

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় একটি বাণী প্রেরণ করেন।

সভার কার্য্য শেষ হইলে প্রসিদ্ধ বেতারশিল্পী শ্রীশশাঙ্কমোহন সিংহ মহাশয় সদলে শ্যামাসঙ্গীত ও পল্লীগীতি গাহিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫২-১৯৫২)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং 'বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', 'বাংলার লোকসাহিত্য', 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ। কলিকাতা-১২। মূল্য পনর টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলায় ধারাবাহিক ভাবে আধুনিক ধরনের নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই ইহার রচনা হইলেও সে সময় হইতে ইহা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন ধারার সাহিত্যেরও বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ নেপালে যে কয়খানি বাংলা নাটকজাতীয় গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন বাংলা নাটকের সন্ধান এ পর্যন্ত মেলে নাই। মনে হয়, এই কারণেই গ্রন্থকার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে তাঁহার গ্রন্থের সূত্রপাত করিয়াছেন। দীর্ঘ একশত বৎসর যাবৎ বাংলা নাটকের ইতিহাসে ক্রমবিবর্তনের যে ধারা পরিলক্ষিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকার প্রদান করিয়াছেন; বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার আলোচ্য বিষয়কে তিনটি যুগে ভাগ করিয়াছেন—আদিযুগ (১৮৫২-১৮৭২), মধ্যযুগ (১৮৭৩-১৯০০), আধুনিক যুগ (১৯০১-১৯২২)। আধুনিক যুগের শেষে অতি আধুনিক যুগের আলোচনা করা হইয়াছে। যাত্রা, গীতাভিনয়, অপেরা প্রভৃতি নামে পরিচিত এক বিশাল সাহিত্য বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক মস্ত বড় অংশ জুড়িয়া আছে। দুঃখের বিষয়, ইহার কোনও বিবরণ বা পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থশেষে দুইটি পরিশিষ্ট আছে। একটিতে ১৮৫২ সন হইতে ১৯৫২ সন পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা নাটকের কালানুক্রমিক তালিকা ও অপরটিতে শব্দসূচী বা আলোচিত গ্রন্থ, গ্রন্থকার প্রভৃতির নামের সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্ট দুইটি পাঠকদের বিশেষ কাজে লাগিবে। বাংলার নাট্যসাহিত্য আলোচনায় গ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-দর্শন—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

কাব্য এবং দর্শন দুইয়ের বিচরণ ক্ষেত্র পৃথক। বিভিন্ন দেশের কবি, দার্শনিক এবং সমালোচকেরা এই দুই বস্তুকে মিলাইয়া দেখিবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে কবির সৃষ্টি যুক্তিবদ্ধ নহে, প্রমাণের অপেক্ষাও রাখে না—স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ অনুভূতির সমষ্টি মাত্র। তাহা একক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অপর পক্ষে দার্শনিক যুক্তি বিচারের আলো জ্বালাইয়া ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবভূমিকে আবিষ্কার করিতে ভালবাসেন। তথাপি যাঁহার রচনার পরিমাণ বিপুল, বহু বিচিত্র কল্পনা ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া জীবন লোককে ধনী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করিতে যিনি দক্ষ—তাঁহার কবিকৃতির সঙ্গে জীবন-প্রীতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটি কোন্ পথে কেমন করিয়া নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করিবার প্রয়াস সুধীজনের স্বাভাবিক ধর্ম। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে দর্শনের নিকষপাথরে ফেলিয়া যাচাই করিবার চেষ্টা বহু জনে করিয়াছেন। তাঁহার সব কয়টিই যে পাঠক সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে এমন নহে। দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা কোথাও কবিকে, কোথাও বা তাঁহার সৃষ্টিকর্মকে রীতিমত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সুখের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থখানি ইহার ব্যতিক্রম। ইহার প্রধান গুণ নিত্যদৃষ্ট সহজ উপমার সাহায্যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দিবার প্রয়াস। লেখার প্রাঞ্জলতাও সহজ বোধ্যতার অন্যতম উপকরণ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে তাঁহারই সাহিত্য কর্মের (কাব্যে ও প্রবন্ধে) মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করায় রবীন্দ্র-দর্শন তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছে। দর্শনের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করিয়াছেন লেখক। বস্তু পরিচয়, দর্শনের মার্গ, বিশ্বের রূপ, সত্যোপলব্ধি, মানুষের ধর্ম এই কয়টি অধ্যায় ছাড়াও দর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা একটি অধ্যায়ে রচিয়াছে। এই অধ্যায়গুলিতে রবীন্দ্র-দর্শনের মূল চিন্তাধারা, অনুভূতি ও মননমার্গের বিশ্লেষণ, অনুভূতিমার্গের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্বের হেতু, সর্বেশ্বরবাদ প্রতীতি প্রভৃতি সংক্ষেপে সহজ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনায় লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের সঙ্গে কবি-জীবনের গভীর যোগসূত্রটি এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেবা ও প্রেমের শক্তিতে মানুষ যে পরম সত্তার পূর্ণ রূপটিকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহার দ্বারাই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যুক্তিক্ষেত্র প্রস্তুত
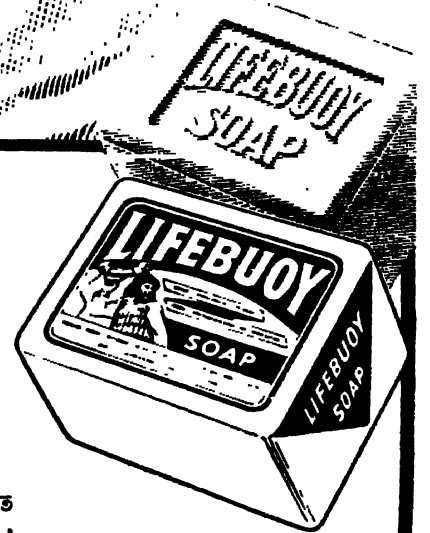
হইয়া উঠে—রবীন্দ্র-দর্শনের এই সহজ সত্যটিকে দৃষ্টান্ত, যুক্তি ও ব্যাখ্যার দ্বারা বোধগম্য করাইয়া দিয়াছেন লেখক।

রবীন্দ্র-সমালোচনা-সাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জতুগৃহ—শ্রীসুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা আট আনা।

একখানি বিয়োগান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক। অঙ্কগুলি দৃশ্যাবলীতে খণ্ডিত নয়। শ্রমিকসাধারণের অবস্থার উন্নতির আন্দোলনকে ভিত্তি করে নাটকখানি রচিত। নাটকে চরিত্র আছে নয়টি। সেগুলির মধ্যে নারী চরিত্র মাত্র একটি। চরিত্রগুলি সাধারণ ও জীবন্ত। এই ধরনের নাটকাভিনয়ের জন্য মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যাবলী ও সাজপোশাকের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। নাটকের ভাল-মন্দ বেশির ভাগই অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। দর্শকগণের ভাল লাগা, তাদের চিত্তকে প্রভাবিত করার মধ্যেই তার সার্থকতা। নাটকের প্রাণবন্ত চিত্তচমৎকারী, সংলাপ ও নাটকীয় দৃশ্যাবলী যার খুব বড় একটা অভাব আলোচ্যমান নাটকখানিতে নেই।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র—অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। দি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১৭৬। মূল্য দুই টাকা।

দুই বৎসর এগার মাস সতর দিনের আলোচনার পর ১৯৪৯ সনের ২৬শে নভেম্বর ভারতের শাসনতন্ত্র গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে কার্যকরী হয়। এই শাসনতন্ত্র রচনায় ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ সার্বভৌম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি ইহার অধিনায়ক হইলেও তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শমত কার্য করিয়া থাকেন। মন্ত্রিমণ্ডলী যতদিন পার্লামেন্টের আস্থাভাজন থাকেন ততদিনই রাষ্ট্রশাসন করিতে পারেন। ভারতরাষ্ট্র আবার কয়েকটি উপরাষ্ট্র বা রাজ্য বা প্রদেশে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার আইন সভা, রাজ্যপাল প্রভৃতি রহিয়াছে। রাষ্ট্রের কাঠামো অনেকটা যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল), কিন্তু ঠিক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত নহে। আবার ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেকটা ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত। বর্তমান সময়ে রাজ্যগুলিকে নূতন করিয়া গড়া হইতেছে এবং এজন্য শাসনতন্ত্রের সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত (চতুর্থ সংশোধন) সংশোধন এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। শাসনতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা আছে অথচ দেশে গণশিক্ষা অনগ্রসর ইহাই দেশের একটা গুরুতর সমস্যা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার বিপুল চেষ্টা চলিতেছে।

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখকের ইংরেজী গ্রন্থের মুক্ত অনুবাদ। ভূমিকায় গ্রন্থকার শাসনতন্ত্রের ইতিবৃত্ত, রূপ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকগণের কাজে লাগিবে। এরূপ পুস্তকে ব্যবহৃত পরিভাষার একটি তালিকা থাকিলে পাঠকের সুবিধা হয়। আশা করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা করিবেন। বর্তমানে রাষ্ট্রতন্ত্রের যে বৃহৎ সংশোধন চলিতেছে পুস্তকের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য তাহা পৃথক ভাবে মুদ্রিত করিয়া যথাসময়ে বিতরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা পাঠকগণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে ইহার বিপুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কাশ্মীর—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪্ টাকা।

ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু পুস্তকখানিতে শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্তই স্থান লাভ করে নাই—কাশ্মীরের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কথাও ইহাতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজগতিসম্পন্ন। ভ্রমণলিপ্সু ব্যক্তিদের নিকট এই তথ্যবহুল পুস্তকখানি "গাইড বুক" হিসাবে গণ্য হইতে পারে। ঊনসত্তরখানি ছবি পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ছাপা মোটেই ভাল হয় নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সুচিত্রা সেন পছন্দ করেন লাক্স
টয়লেট সাবান
এর
শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার
জন্য।
সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্য্যের উৎস
"আপনার ত্বককে মসৃণ
ও সুন্দর রাখতে হলে
ভালভাবে রগড়ে
নিন ...
"পরিষ্কার করে ধুয়ে
নিয়ে শুকিয়ে গেলে
—ঝরঝরে তাজা
অনুভূতি আপ
নার আসবে।
"লাক্স টয়লেট সাবানের
নবনীসুলভ ফেনা
ও সৌরভ
মোহময়
"আপাদমস্তক সৌন্দর্য্যের
জন্য বড় সাইজ
ব্যবহার করুন যা
আমি করি।"
LUX
TOILET SOAP
বিমল রায়ের "দেবদাস"
এর মনোমোহি অভিনেত্রী
চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ৬৬। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানি বাংলার শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। বালক-বালিকারা ইতিহাস-পুস্তকে চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কতটুকুই না জানিতে পায়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার জীবন ও কর্মকথা সরল ভাষায় গল্পের মত করিয়া বলা হইয়াছে। পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষা—(তত্ত্ব ও প্রয়োগ)—শেফালিকা শেঠ। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ১২+২২৪+২৮। মূল্য দুই টাকা।

লেখিকা স্বদেশ এবং বিদেশের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া বাঙালী মেয়েদের নিমিত্ত শহর হইতে দূরে, প্রাকৃতিক নিরালা পরিবেশে 'মা লক্ষ্মীর আলয়' নাম দিয়া একটি আদর্শ স্ত্রীশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন এইরূপ বাসনা ছিল। [illegible] ভুল হইবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কার্যকরী পরিকল্পনাও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, পরিকল্পনা রচনা শেষ করিয়াই, [illegible] পূর্বে, ১৯৫৪ সনের ৩১শে আগষ্ট মারা যান। উক্ত রচিত পরিকল্পনাই আলোচ্য পুস্তকের বিষয়-বস্তু।

লেখিকা পরিকল্পনাটি মুখ্যতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন (১) মা লক্ষ্মী আলয়ের কর্মপন্থা এবং (২) মা লক্ষ্মী আলয়ের জ্ঞানপন্থা। [illegible] তিনি মোটামুটি মূল উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। পরিকল্পনার প্রথম ভাগে গৃহস্থালী, শিল্পকলা, স্বাস্থ্যচর্চা, বস্ত্রজ্ঞান, প্রকৃতি পরিচয়, পশুপালন এবং সঙ্গীত এই ছয়টি বিষয়ের মূল কথা এবং শিক্ষার নির্দেশ লেখিকা আলোচনা করিয়াছেন; দ্বিতীয় ভাগে আছে—রূপকথা, সঙ্গীত, [illegible], মাতৃভূমি (ইতিহাস ও ভূগোল), গণিত, [illegible] নির্বাচনী বিষয়াবলী বিষয়ক আলোচনা ও শিক্ষার নির্দেশ। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা যে ঢালিয়া সাজা আবশ্যক একথা চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানিতে সন্নিবদ্ধ পরিকল্পনাটি শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাব্যবস্থাপকগণের বিশেষভাবে চিন্তার খোরাক যোগাইবে। এই প্রসঙ্গে মনীষা-প্রবর ভূতপূর্ব প্রমথনাথ বসুর *National Education and Modern Progress* পুস্তকখানিও তাঁহাদের পড়িয়া দেখিতে বলি। তিনি ছেলেদের শিক্ষার কথা বলিলেও ব্যবস্থা বা প্রণালী মেয়েদের বেলায়ও হয়ত খানিকটা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে পরিশিষ্ট এবং গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ লেখিকার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা গ্রন্থারম্ভে দিয়াছেন। লেখিকা এই পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করার পক্ষে বিদুষী শ্রীইন্দিরা সরকারের সহযোগিতা লাভের আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হউক এই কামনা।

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅমল হোম। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা ৭৮। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি স্বল্পপরিসর; কিন্তু ইহাতে যে ক'টি বিষয় সন্নিবেশিত ও আলোচিত হইয়াছে তাহা আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে [illegible] রচনায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের অন্ত নাই। [illegible] পুস্তকখানি হইতে যথেষ্ট [illegible]। প্রধান চারিটি এবং [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] রবীন্দ্রনাথ, কেরানি রবীন্দ্রনাথ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের [illegible] উপাধি ত্যাগ ও এই বিষয়ক পত্র, [illegible] সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক [illegible] হইয়াছে তেমনি আমাদের তৎকালীন [illegible] বিবৃত হইয়াছে। [illegible] 'টিকিট' [illegible] কলিকাতা [illegible] আলোচনা করায় [illegible] হইয়াছে। [illegible] কিছু কিছু [illegible] আমার [illegible] হইয়াছিল। পুস্তকখানির বহুল প্রচার আশা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

যশোদা-দুলাল

শ্রীমায়া দাস

জল্‌কে চল

জীবে প্রেম

[ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৬৩ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্কুল ফাইনালের ফলাফল

এইবারের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল অনেক বিষয়ে আমাদের চিন্তার কারণ যোগাইয়াছে। তাহার সম্যক্ বিচার কোথাও হইতেছে কিনা জানি না, কিন্তু হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরীক্ষা দিয়াছিল ৭০৯৪৯ জন। ইহাতে হয় ত অনেকে একটু আশার আলোক দেখিবেন, কেননা ৭০৯৪৯ জন ছেলেমেয়ে স্কুল ফাইনাল পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়াছে ইহাও একটা কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শিক্ষালাভ করিয়াছে কয়জন ?

মোটামুটি ৪৫০০০ জন ছাত্রছাত্রী স্কুলে নিয়মমত পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছে এবং ২৫৯৭০ জন প্রাইভেট শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষা দেয়। রেগুলার ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৫৫·১ ও প্রাইভেটদিগের শতকরা ৩৬·৬ জন পাস হইয়াছে : সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৫০০০ ছেলেমেয়ে পাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পাসের ব্যাপারেও অনেকে আশার চিহ্ন দেখিবেন, কেননা গতবার অপেক্ষা এবারে রেগুলার ছাত্রছাত্রীগণ শতকরা প্রায় ·৭ এবং প্রাইভেট প্রায় শতকরা ১০ বেশী পাস করিয়াছে।

কিন্তু কিভাবে পরীক্ষার মান নামাইয়া এই সকল পরীক্ষার্থী-দিগকে পার করাইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহার পরিচয় আমরা পাই যখন খোঁজ লওয়া যায় যে, ঐ ৩৫০০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কোন কোন শ্রেণীতে কতগুলি পাস হইয়াছে।

দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীতে মাত্র কয়েকশত পাস করিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও সামান্য কয়েক হাজার। সুতরাং পাসের মধ্যে শতকরা ৮০-৯০ জন কোনক্রমে তৃতীয় শ্রেণীতে ঢুকিয়া স্কুললীলা সাঙ্গ করিয়া পিতৃকুল-মাতৃকুলকে ধন্য করিয়াছে।

এবারে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যেরূপ সহজ হইয়াছিল, এবং পরীক্ষক-গণকে যেভাবে পাস করাইতে বলা হইয়াছিল, উপরন্তু যেভাবে গ্রেস-মার্ক ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, অন্ততঃ শতকরা ৭৫ জন পাস করিবে এবং তাহার মধ্যে অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ প্রথম শ্রেণীতে ও অর্দ্ধেকের উপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইবে, যেরূপ বহু পূর্ব্বেকার দিনে এণ্ট্রান্স ও ম্যাট্রিকে হইত। তাহার স্থলে এই অপরূপ ফল!

বলা বাহুল্য এইরূপ সহজ পরীক্ষায়ও যাহারা ফেল হইয়াছে তাহাদের শিক্ষা, শিক্ষক ও পাঠাভ্যাস, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব কিছুই অপরূপ। আমাদের শুধু জানিতে ইচ্ছা করে যে, কি ভাবিয়া তাহাদের পরীক্ষায় পাঠানো হইয়াছিল। যদি শতকরা দশ-বিশটি ফেল হইত তবে না হয় বুঝিতাম যে, অনেক ছাত্রের মধ্যে কিছু কাঁচামাল পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেখানে অর্দ্ধেকের মত ফেল ও পাসের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কোনক্রমে পার, সেখানে বলিতেই হইবে যে যাঁহারা এইরূপ ছাত্রছাত্রীদিগকে পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই শিক্ষাসম্বন্ধে জ্ঞান অতি হীন বা অসম্পূর্ণ।

বস্তুতঃপক্ষে বাঙালী জাতির সর্ব্বনাশের আকর দাঁড়াইয়াছে এই পাসের মোহ। শিক্ষাদানের যোগ্য ব্যবস্থা নাই, ছাত্রছাত্রীদের পাঠে মন নাই এবং শিক্ষালাভ বা বিদ্যার্জ্জনে কোনও উৎসাহ বা চেষ্টা নাই। সর্ব্বোপরি ছাত্রজীবনের যেটি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ সেই "ডিসিপ্লিন" বা বিনয়, যাহাতে চরিত্রগঠন ও মেধার উৎকর্ষসাধন দুই-ই হয়, সেদিকে কাহারও বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। তবে এই শিক্ষার মূল্যই বা কি এবং ইহাতে কোন কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় ?

বাঙালী ছেলেমেয়ের শরীর দুর্ব্বল। দৈহিক ক্লেশ বা কঠোর পরিশ্রম তাহারা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং কায়িক পরি-শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙালী হটিয়াই চলিতেছে। ছিল একমাত্র ভরসা মানসিক প্রখরতায় ও তীক্ষ্ণ মেধায়। তাহাও যদি এই ভাবে অবনতির পথে চলে তবে জাতির ভবিষ্যৎ যে কি অন্ধকার তাহা কি বলা প্রয়োজন ?

একথা তো আমরা সকলেই জানি যে, স্কুল-কলেজের নির্দ্দিষ্ট ধাপে যে পা দিয়াছে, সে ক্রমেই জীবিকানির্ব্বাহের অন্য সকল পথ হারাইয়া একমাত্র বুদ্ধিজীবীর বৃত্তির কথা ভাবিতে পারে। যখন সে উচ্চতম সোপানের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাহার ক্ষেত্র শুধু সঙ্কুচিত নহে বরঞ্চ অতি কঠোররূপে সীমাবদ্ধ। এবং যে প্রতিপদে

হোঁচট খাইয়া কোনক্রমে সব কয়টি সোপান পার হইয়াছে, তখন তাহার সম্মুখে জীবনযাত্রার অন্য সকল পথই প্রায় রুদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে যাহারা কঠিন প্রতিযোগিতায় যুঝিতে সক্ষম বা যাহাদের মেধা যেমন দৃঢ় ও সুগঠিত তাহারাই উচ্চশিক্ষার ফল অর্জনে সফল হয়, একথা তো সর্বজনবিদিত।

একদিন ছিল যখন ভারতে বাঙালীর প্রতিযোগী ছিল অল্প পারসী এবং মাদ্রাজী। সকল পেশায় ও চাকুরীতে বাঙালীকে প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছে ইংরেজ কর্মচারীর সহিত। ইংরেজ সিভিলিয়ান, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবহারাজীব, প্রফেসার ইত্যাদিকে হটায় বাঙালী। এবং ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীর কর্মক্ষেত্রও প্রসারিত হয় সারা ভারতবর্ষে।

সেইদিন বাঙালী যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল তাহার পিছনে ছিল অধ্যবসায় ও **একাগ্র চিত্তে শিক্ষার সাধনা**। ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি যে তখন বাঙালীর ছিল না তাহা নয়, কেননা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিবৃত্তিতে তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া যায় এবং সেই অধর্মে অর্জিত টাকাই "বনেদী বাঙালী"কে চূড়ান্ত অধঃপতনের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুনর্বার বলি, বাঙালীর সকল গৌরব, সকল খ্যাতির মূলে ছিল বিদ্যার একাগ্র সাধনা। একমাত্র এই সাধনার ফলেই বাঙালী বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, চিকিৎসায়, এককথায় সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে, যশঃগৌরব অর্জন করিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে অর্থাগমও হইয়াছে প্রচুর।

সেইজন্যই উচ্চশিক্ষার পথে বাঙালীর এত আগ্রহ ছিল এবং এই কারণে সে অন্য সকল পথ অপেক্ষা এই মার্গই নিজের জীবিকা-নির্বাহের জন্য প্রশস্ত মনে করে।

এই পথ পছন্দের কারণ আরও একটি ছিল ও আছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং যন্ত্রশিল্পে কলকারখানায়, শারীরিক পরিশ্রম, এবং তৎসঙ্গে প্রথমে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়। শিক্ষার সোপানে দাঁড়াইয়া বাঙালী যখন দেখিল যে, বুদ্ধির ও শিক্ষার পথে ঐ কায়ক্লেশ এড়াইয়া চলা যায় তখন সে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় এদিকেই চলিতে লাগিল। এমনকি, বাঙালী ছুতার, কর্মকার, কারুবৃত্তিজীবী সকলেও ধীরে ধীরে নিজের পিতৃ-পিতামহের বৃত্তি ছাড়িয়া মসীজীবী বা বাক্যজীবী হইতে লাগিল। ফলে, চাকুরীর বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

বাঙালী যন্ত্রচালনায় ও শিল্পকৌশলেও প্রথম দিকে অশেষ খ্যাতি লাভ করে। বাঙালী মিস্ত্রী এই সেদিনও রেলওয়ে কারখানায়, জাহাজঘাটায় ও যন্ত্রশিল্পাগারে পেশোয়ার হইতে রেঙ্গুন—এমনকি বসোরা হইতে হংকং-সাংহাই পর্যন্ত—খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। জামসেদপুরের লৌহ-ইস্পাত কারখানায় ইংরেজ ও আমেরিকানের পরেই বাঙালী প্রতিষ্ঠালাভ করে ও খ্যাতির সহিত কাজ করিয়া প্রচুর অর্থাগম করে।

কিন্তু এই শ্রমকৌশলজীবী বাঙালীও ছিল সাধক। ফাঁকি, চাতুরী ও ছলনা তাহাদের মধ্যে খুবই কম দেখা যাইত। আজ বাঙালী মিস্ত্রীর কুখ্যাতি যে কত সে কি বলা প্রয়োজন? তাহাকে কেহই চায় না কেন সে ত সকলেই জানে।

যাহাই হউক, বাঙালীর শ্রমবিমুখতার কারণেই হউক বা তাহার বুদ্ধির প্রাচুর্যেই হউক, ক্রমে ক্রমে আজ তাহার জীবিকানির্বাহের একমাত্র পথ দাঁড়াইয়াছে তাহার শিক্ষা ও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি। তবে সে এখন ভুলিয়া গিয়াছে যে, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত যদি শিক্ষা ও বিনয়—অর্থাৎ ডিসিপ্লিন—না থাকে তবে সেই বুদ্ধি শুধু অধঃপতন ও সর্বনাশের কারণ দাঁড়ায়। বর্তমান জগতে শ্রম-বিমুখ গোমূর্খের অন্নসংস্থানের কোনও পথ নাই একথা বাঙালী যুবক-যুবতীর ও তাহাদের অভিভাবকবর্গের জানা নিতান্তই প্রয়োজন। শুধু সুপারিশ ও খুঁটির জোরে বা "আমাদের দাবি মানতে হবে" চীৎকারে একটি সমগ্র জাতির অন্নসংস্থান অসম্ভব। উপর-চালাকীতে কাজ জুটিতেও পারে কিন্তু সে কাজ টিঁকিতে পারে না, যতই উৎপাত বা ষ্ট্রাইক হউক না কেন। ঐরূপ উপদ্রবের ফলে কলকারখানা হইতে বাঙালীর স্থান গিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলিও সরিয়া গিয়াছে।

সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালী-বিদ্বেষের কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ পায় না, একথা চতুর্দিকেই শুনা যায়, এবং আমরাও তাহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু কিছুদিন যাবত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশ লওয়ার কারণে অর্জিত যে অভিজ্ঞতা, তাহার ফলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঐ অভিযোগ অতি খেলো ভিত্তির উপর স্থাপিত। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রাদেশিকতা সর্বপ্রদেশের লোকের মধ্যেই প্রবল—যদিও বাঙালীই সেটা দোষ মনে করে—এবং তাহার ছায়া সকল পরীক্ষায়ই দেখা যায়, কিন্তু অতি সীমাবদ্ধ ভাবে।

কিন্তু আজ প্রত্যেক প্রদেশেই শিক্ষার মান উচ্চে উঠিতেছে—শুধু এক বাংলায় তাহা ধাপে ধাপে নামিয়াই চলিতেছে। উহারই ফলে কঠোর প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী হটিতেছে। আমরা আট-দশটি পরীক্ষায় বাঙ্গালীর অকৃতকার্য হওয়ার কারণ যাহা প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখিয়াছি তাহা শুধু বিদ্যার অভাব ও জ্ঞানের অভাব। উপরন্তু, শিষ্টাচার জ্ঞানের অভাবও এরূপ দেখিয়াছি যে, অন্য পরীক্ষক-দিগের অবজ্ঞার হাসিতে আমাদের মাথা হেঁট হয়।

আজ সকল ক্ষেত্রেই সর্বভারতের প্রার্থীদিগের কঠোর প্রতি-যোগিতা। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ফাঁকিবাজের স্থান কোথায়? এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সচেতন হওয়া প্রয়োজন অভি-ভাবকদিগের। যাহাদের সন্তান ফেল বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাস হইয়াছে, তাঁহাদের যদি বুদ্ধি-বিবেচনা কিছুমাত্র প্রয়োগ করার সময় থাকে তবে তাঁহাদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, এরূপ সন্তানের ভবিষ্যৎ কি এবং সে বিষয়ে তাঁহাদেরই বা কর্তব্য কি?

যে ছেলে গোড়াতেই এইরূপ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহার এইরূপ অবস্থার কারণ কি তাহা নির্ণয় করিয়া সময়মত

তাহার সংশোধন ও ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের যোগ্যতা অর্জনের পথ-নির্দেশ এই দুই-ই অবিলম্বে করা প্রয়োজন। নহিলে সে উচ্ছন্নে যাইবেই যাইবে।

অভিভাবকদিগের জানা উচিত যে, তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের সৎপরামর্শ দিবার ও ভবিষ্যতের জীবনপথের ব্যবস্থা করার লোক একমাত্র তাঁহারাই। তাঁহাদের সন্তানদিগকে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল মূর্খে পরিণত করার সহায়ক পথে-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে অসংখ্য। উপরন্তু, তাহাদের মস্তক চর্ব্বণে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও উদরপূর্ত্তি-কারক রাষ্ট্র-ধ্বংসবাদী রহিয়াছেই।

সেদিন একটি বাঙালী যুবক তর্কের প্রসঙ্গে সজোরে বলে যে, যে লোক কার্য্যক্ষম ও যোগ্য সে বেকার থাকিতেই পারে না। কথাটা আজিকার দিনে ষোল আনা সত্য না হইলেও চৌদ্দ আনা সত্য নিশ্চয়। অন্যদিকে অলস, ফাঁকিবাজ ও অশিক্ষিতের কার্য্য-সংস্থান আজ প্রায় অসম্ভব। এটা আমাদের সকলের বুঝা উচিত।

এদেশে হরতাল

এদেশে অকারণে হরতাল কি ভাবে চলে তাহার বিবরণ আনন্দ-বাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা ২৩শে আষাঢ়ের হরতাল :

"রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার ন্যূনতম দাবীর প্রতি উপেক্ষা ও অবিচারের প্রতিবাদে শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়।

বিগত ছয় মাসের মধ্যে অনুরূপ উদ্দেশ্যে এইবার লইয়া রাজ্যব্যাপী তিন বার হরতাল হইল। কিন্তু পূর্ব্বেকার দুইবারের তুলনায় কলিকাতায় এবারকার হরতাল তেমন সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ব-ব্যাপী হয় নাই বলা যায়। তবে খাস শহর অপেক্ষা শহরতলী অঞ্চলগুলিতে হরতাল অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে।

রেলপথে কলিকাতা মহানগরীর সহিত অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একেবারে ভোরের দিকে হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে কয়েকটি ট্রেণ আনা-গোনা করে বটে, কিন্তু শহরতলী অঞ্চলে জনতা রেলপথে বসিয়া পড়ায় অথবা পথরোধ করায় সকাল সাতটার পর হইতেই নির্দ্দিষ্ট ট্রেণগুলির যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়।

দমদম বিমান ঘাটিতে বিমানের আনাগোনা স্বাভাবিক থাকে।

শহরের অভ্যন্তরে যানবাহনের দিক হইতে একমাত্র খিদিরপুর রুট ছাড়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত সারাদিনে আর কোন রুটে ট্রাম চলাচল করে নাই। খিদিরপুর রুটে স্বল্পসংখ্যক যাত্রী লইয়া সকাল দশটার পর স্বাভাবিক অপেক্ষা অর্দ্ধেক সংখ্যক ট্রাম আনাগোনা করে।

বেসরকারী বাস একটিও চলে নাই। কিন্তু রাজ্য পরিবহন বিভাগীয় মোট ৩০০ বাসের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক সরকারী বাস স্বল্পসংখ্যক যাত্রী লইয়া কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট রুটে চলে। অন্যান্য রুটেও সরকারী বাস চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু মধ্য কলিকাতার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটে সরকারী বাসের উদ্দেশ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে বাস-চালক আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই সম্পর্কে পুলিস ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে শ্যামবাজার ও অন্যান্য রুটে আর বাস চলে নাই।

ইটপাটকেল নিক্ষেপ, পিকেটিং, পথরোধ ইত্যাদি নানা অভি-যোগে এইদিনে কলিকাতায় প্রায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

বামপন্থী দেশে হরতাল

পোলাণ্ডের পোজ্‌নান নগরের শ্রমিকেরা খাদ্যের অভাবে বিক্ষোভ করায় কি ঘটে তাহার বিবরণ নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায় :

"লণ্ডন, ২৯শে জুন—পোলিশ সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ, গতকাল পশ্চিম পোলাণ্ডের পোজ্‌নান শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে মোট ৩৮ জন নিহত ও ২৭০ জন আহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে পোলিশ সৈন্য ও নিরাপত্তা বিভাগের লোকজনও আছে। আজ সকালে অধিকাংশ শ্রমিক কারখানায় কাজে যায় এবং ট্রলি এবং বাস চলাচল পুনরায় আরম্ভ হয়।

গতকালের দাঙ্গাহাঙ্গামার পর আজ শহরের অবস্থা শান্ত আছে। আজ সকালে এখানকার আন্তর্জাতিক মেলাও যথারীতি বসে। উহাতে ব্রিটেন ও অন্যান্য ৩৪টি দেশ অংশ গ্রহণ করিতেছে।

প্রকাশ, পোজ্‌নানের ষ্টালিন কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্বে হাঙ্গামাকারীরা 'আমরা খাদ্য চাই' ধ্বনি করিয়া রাস্তা পরিক্রমা করিতে থাকে। তাহারা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনাগমন করে। যখন তাহারা একটি পুলিস সদর দপ্তরের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের উপর গুলী চালান হয় এবং ট্যাঙ্ক আমদানী করার পর হাঙ্গামা বন্ধ হয়।

গতকাল হাঙ্গামার পর শহরে রাত্রি নয়টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত কার্ফু জারী করা হয়। সৈন্যদল ও পুলিস রেলষ্টেশন ঘেরাও করিয়া রাখে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ১৫ হাজার শ্রমিক হাঙ্গামায় যোগ দেয়।"

হরতালের গুরুত্ব

বিগত ২৩শে আষাঢ় আনন্দবাজার "অর্থহীন হরতাল" শিরো-নামায় এক সুচিন্তিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত করেন। সংবাদপত্রের যে একটি প্রধান কর্ত্তব্য বিভ্রান্ত জনমতকে পথনির্দ্দেশ করা, একথা এত দিনে ইঁহারা সাহসে ভর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানাইয়া তাহার একটি অংশ আমরা নীচে দিলাম। তবে আমাদের মতে এরূপ হরতাল কেবল অর্থহীন নয়। উহার অর্থ বাঙালী জাতির ধ্বংসসাধন :

'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বঙ্গ-বিহার ভূমি হস্তান্তর বিলের আলোচনা উপলক্ষ্যে যে হরতাল আহ্বান করা হইয়াছে তাহার অসমীচীনতা প্রদর্শন করিয়া শহরের প্রায় সকল সংবাদপত্র একযোগে তাহাতে আপত্তি জানাইয়াছে এবং উদ্যোক্তাদিগকে এই অবিবেচনা-

প্রস্তুত প্রয়াস হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু এই সমবেত অনুরোধ সত্ত্বেও উদ্যোক্তারা নিবৃত্ত হইতে সম্মত হন নাই। বরং যাহারা অনুরোধ করিয়াছিল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি কটূক্তি বর্ষণ করা হইয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতেছেন সকলেরই তাহা চাওয়া উচিত। সুতরাং যাহারা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিবে তাহারা আক্রমণের পাত্র হইবে বৈকি? নিজেদের ইচ্ছাটাকে তাঁহারা এত অতিরিক্ত মাত্রায় বড় করিয়া তুলিয়াছেন যে, জনসাধারণের দিকটা দেখিতে পাইতেছেন না এবং আপনাদের আচরণের অসঙ্গতিও উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিলের আলোচনা শুক্রবারেই শেষ হইয়াছে।

হরতালের উদ্যোক্তা দুই কমিটি—একটি, বামপন্থীদিগের 'ভাষাভিত্তিক কমিটি' এবং অন্যটি, বামপন্থী, হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘ, ভূতপূর্ব কংগ্রেসী প্রভৃতির পাঁচমিশালী "রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি।" উভয় কমিটি বলিয়াছেন, ভাষাভিত্তিক দাবীর জন্য তাঁহারা হরতাল আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উক্তি কিরূপ অর্থহীন এবং হরতাল আহ্বান কিরূপ উদ্দেশ্যহীন তাহা এই দুই কমিটির দাবীর পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধি হইবে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি বলিতেছেন, তাঁহারা ত্রিপুরা চাহেন, কাছাড় চাহেন, গোয়ালপাড়া চাহেন এবং আন্দামান চাহেন; বামপন্থী কমিটির লোকেরা বলিতেছেন, তাঁহারা এইগুলির কোনটিই চাহেন না। কেবল ইহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানেরা বলিতেছেন, এইগুলি দাবী করা, "সাম্রাজ্যবাদী দখলের মনোবৃত্তি" ছাড়া আর কিছুই নহে। যেখানে দুই কমিটির মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধতা এবং একপক্ষের দাবীর প্রতি অপর পক্ষের এইরূপ মনোভাব সেখানে উভয়েই স্ব স্ব দাবীর সমর্থনে হরতাল ডাকিলে লোকে কি করিবে? কাহার দাবী সমর্থন করিবে? কোন্ দাবী সমর্থনের জন্য হরতাল আহূত হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে?

প্রশ্ন এই, হরতাল নামক ব্যাপারটির কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে কিনা, যদি থাকে তাহা হইলে যে কোন সময়ে, যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি বা দল জনসাধারণের উপরে এই হরতালের এই দায় চাপাইয়া দিতে পারেন কিনা? হরতাল ডাকিলে জনসাধারণকে যেরূপ বিব্রত হইতে হয় তাহাতে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধী হরতালের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন চূড়ান্ত অস্ত্র হিসাবে এবং নিতান্ত অপরিহার্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য: বঙ্গ-বিহার বিলের আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া যাঁহারা হরতাল ডাকিয়াছেন তাঁহারা হরতালের এই মূল কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন। এই হরতালের প্রস্তাবে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে, দুই দিক দিয়া তাহার প্রমাণ পাইতেছি। "পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী শিল্প সংস্থার" পক্ষ হইতে এই হরতালের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, "বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্কটজনক বিধায় খুশীমত হরতাল হইলে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইয়া পড়ে। আমরা এই প্রকার হরতালের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।" ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কলিকাতা শাখার সভাপতি এক বিবৃতিতে হরতালের ফলে চিকিৎসকগণকে কিরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হয়—তাহা জানাইয়া বলিতেছেন—"অতীতে হরতালের সময় চিকিৎসকদের যাতায়াতে বাধা দেওয়া হইয়াছে, বিঘ্ন ঘটান হইয়াছে এবং তাঁহাদের গাড়ীর ক্ষতি করা হইয়াছে। ইহা আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি।" হরতাল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই যে দুই বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে, ইহা হইতেই লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। ইহারা প্রকাশ্যে জানাইতে পারিয়াছেন। বেশীর ভাগ লোকেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। অসহায় ভাবে সহ্য করিয়া যায়। হরতালের উদ্যোক্তারাও যে ইহা না বুঝেন তাহা নহে। তাঁহারাও বিবৃতিতে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন—"যে অল্পসংখ্যক লোক হরতাল করিতে চাহিবে না তাহাদের উপর যেন কোন জবরদস্তি না হয়।"

ভারতের বহির্বাণিজ্য

যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘাটতি। ঘাটতির কারণ হয়ত অনেক দেখানো যায়, কিন্তু কারণগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সুযুক্তিপূর্ণ নহে। ১৯৫৫ সনও কোনও ব্যতিক্রম দেখায় নাই, ঘাটতি দিয়াই বৎসর শেষ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী দপ্তরের হিসাব অনুসারে ১৯৫৫ সনে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইয়াছি ৪০ কোটি টাকা; রপ্তানীর পরিমাণ ৬০৪ কোটি টাকা ও আমদানীর পরিমাণ ৬৪৪ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৫ কোটি টাকায়; আমদানী হইয়াছে ৭৪৭ কোটি টাকার ও রপ্তানী হইয়াছে ৬৪২ কোটি টাকার। গত পাঁচ বৎসরে, মোট ঘাটতি হইয়াছে ৫০৬ কোটি টাকার।

প্রধান রপ্তানীগুলির মধ্যে আছে পাট-শিল্পজাত দ্রব্য (১২০ কোটি টাকা); চা (১১০ কোটি টাকা); বস্ত্র (৮৬ কোটি টাকা); ধাতব আকর (২৫ কোটি টাকা); চামড়া (৩২ কোটি টাকা); কাঁচা তুলা (৪৪ কোটি টাকা) এবং ভেজিটেবল তৈল (৪৩ কোটি টাকা)। ১৯৫৪ সনের তুলনায় ১৯৫৫ সনে প্রায় ৮ কোটি টাকার কম পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে; চা রপ্তানীর পরিমাণও বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে; ১৪৬ কোটি টাকা হইতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১১০ কোটি টাকায়।

আমদানী ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভারত-সরকার ১৩৯ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছেন; তাঁহাদের আমদানীর মধ্যে প্রধানতঃ আছে খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রধান আমদানীগুলি যথাক্রমে—যন্ত্রপাতি (১০৯ কোটি টাকা); খনিজ তৈল (৬৯ কোটি টাকা); ইস্পাতদ্রব্য (৫৮ কোটি টাকা); কাঁচা তুলা (৫৮ কোটি টাকা); যানবাহন (৩৯ কোটি টাকা);

ঔষধপত্র (২১ কোটি টাকা) এবং কাঁচা পাট (১৮ কোটি টাকা)। কাঁচা পাটের আমদানী ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৯৫৪ সনের তুলনায় ; ইস্পাত দ্রব্যের আমদানী ১২৩ শতাংশ এবং যন্ত্রপাতির আমদানী ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যানবাহন, ঔষধপত্র ও কাঁচা তুলার আমদানীও ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী খাতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী ৬৬ শতাংশ কম হইয়াছে, কিন্তু যন্ত্রপাতির আমদানী ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৪ সনের তুলনায় ১৯৫৫ সনে ৯ শতাংশ আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ আমদানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি। গত বৎসর রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৫৪ সনের তুলনায় ৭ শতাংশ হইয়াছে। কতকগুলি জিনিষের রপ্তানী অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; যথা, ভেজিটেবল তৈলের রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ ৯৭ শতাংশ ; কাঁচা তুলার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে ৯৬ শতাংশ আর কাঁচা চামড়ার রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ ১৮ শতাংশ।

গত পাঁচ বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসর, অর্থাৎ ১৯৫১ সনে দেশে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ছিল। কোরিয়া যুদ্ধের জন্য দেশে কিছু পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি হয় এবং তাহার ফলে আমদানী বৃদ্ধি পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। পরবর্তী দুই বৎসরে অল্প মন্দা দেখা দেয় এবং ইহার কারণ মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা। এই মন্দার ফলে আভ্যন্তরিক শিল্পোন্নতির গতি কিছু পরিমাণ শিথিল হয় এবং ১৯৫২-৫৩ সনে আমেরিকার বাজারে মন্দার ফলে ভারতের রপ্তানী হ্রাস পায়। কিন্তু রপ্তানী হ্রাস পাইলেও আমদানীর পরিমাণ অব্যাহত থাকে, ফলে, ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইদানীং সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখাইতে চান যে, ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবে সব সময়ে লাভ থাকে, কিন্তু ইহা একটি অপচেষ্টা মাত্র। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিতে চান যে, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সনে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে লাভ ছিল : কিন্তু ইহা সত্যের অপলাপ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯৫২ সনে রপ্তানীর মূল্য ছিল ৬০১ কোটি টাকার এবং আমদানীর পরিমাণ ছিল ৬৩৩ কোটি টাকার এবং বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩২ কোটি টাকার মত। ১৯৫৩ সনে রপ্তানী হয় ৫৩৯ কোটি টাকার এবং আমদানী হয় ৫৯১ কোটি টাকার ; ঘাটতি হয় ৫২ কোটি টাকার। Net Invisibles খাতে যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা দ্বারা ঘাটতি পূরিত হয়,ফলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুব ফলাও করিয়া দেখান যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ আছে। কিন্তু Net Invisibles-এর মধ্যে কি আছে—ইহার মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত ঋণ, আমেরিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ও ঋণ এবং কলম্বো প্ল্যান দেশগুলি হইতে অর্থসাহায্য। ইহা সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় ঋণ ও সাহায্য হিসাবে আসে এবং প্রকৃতপক্ষে রপ্তানীর অন্তর্গত নহে। কিন্তু ব্যবসায়ে ঘাটতি পূরণের জন্য এই সাহায্যকে বহির্বাণিজ্যের অংশ হিসাবে দেখানো হয় যাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। ১৯৪৯ সনে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯৫৫ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় গত বৎসর ডলার দেশগুলি হইতে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ দুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে ; এবং সরকারী সাহায্যও অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ডলার দেশগুলি হইতে সরকারী দান হিসাবে ৪৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুব ফলাও করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ডলার দেশগুলির সহিত চলতি বাণিজ্যের হিসাবে ভারতবর্ষের অতিরিক্ত ৪৯ কোটি টাকা লাভ আছে। ষ্টার্লিং দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ১৯৫১ সনেই ভারতবর্ষ সবচেয়ে অধিক রপ্তানী করিয়াছিল ; তাহার পর হইতে রপ্তানী ক্রমহ্রাসমান। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থাভুক্ত দেশগুলি হইতে (O. E. E. C.) ভারতবর্ষের আমদানী সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে ঘাটতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসর এই দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের প্রায় ৮৪ কোটি টাকার ঘাটতি হইয়াছে। পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; যথা : রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে রাশিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ২,০০,০০০ পাউণ্ড চা আমদানী করিয়াছে। ইদানীং ষ্টার্লিং দেশগুলিতে ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে।

গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে ভারতবর্ষ দান হিসাবে পাইয়াছে ৯৭ কোটি টাকা এবং সরকারী সাহায্য পাইয়াছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সনের শেষে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের পরিমাণ ছিল ৭৮১ কোটি টাকা।

ভারতবর্ষের পেন্সিল-শিল্প ও আমদানী নীতি

ভারতবর্ষের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকেরা যখনই কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন কিংবা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পান তখনই তাঁহারা দাবি করেন বিদেশী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য। স্বদেশী যুগে বিদেশী দ্রব্য আমদানীর বিরুদ্ধে যে নীতিগত বিরুদ্ধতার প্রয়োজন ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষে সে নীতির প্রয়োজন নাই এবং তাহা থাকা উচিতও নহে। এখনকার মাপকাঠি হওয়া উচিত, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেশের অর্থনৈতিক মঙ্গল এবং সস্তায় ব্যবহারিক দ্রব্য যাহাতে জনসাধারণ পাইতে পারে। ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপাদক শিল্পপতিকে সাহায্য করিবার মানসে আমদানী বন্ধ করিবার অর্থ ঐ শিল্পপতিকে ভারতের বাজারে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া—ইহার ফলে ঐ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পায় এবং উৎকৃষ্টতা দিন দিন অবনত হয়। শিল্পপতিদের জনস্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত মুনাফালাভের দিকে নজর থাকে বেশী। ভারতের শকরা-শিল্প ইহার একটি বড় নিদর্শন।

১৯৪৯ সনে শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) অভিমত দিতে বাধ্য হন যে, ভারতীয় শর্করা-শিল্পপতিদের কার্য্যকলাপ জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এই অবস্থায় তাঁহাদের আর বিদেশী আমদানীর বিরুদ্ধে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে। সরকার মাঝে মাঝে যখন চিনির আমদানী বন্ধ করিয়া দেন (মনে হয় যেন শর্করা-শিল্পপতিদের অধিক মুনাফালাভের ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য) তখন ভারতবর্ষে চিনির মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। মাঝে টাটারা দাবি করিয়াছিলেন, ভারতে যেসকল বিদেশী সাবানের কারখানা আছে সেগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়ার। কারণ তাঁহারা সস্তায় ভাল সাবান বাজারে বিক্রয় করায় দেশী সাবান কম বিক্রয় হয়। ভারতে অবস্থিত বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি প্রধান দোষ এই যে তাহারা তাহাদের ভারতীয় কর্ম্মচারীকে অত্যধিক হারে মাহিনা দেয়, যাহা ভারতীয় শিল্পপতিরা দিতে অনিচ্ছুক কিংবা অক্ষম।

সম্প্রতি ভারতীয় পেন্সিল-শিল্পের মালিকেরা দাবি তুলিয়াছেন যে, বিদেশী পেন্সিলের আমদানীর ফলে দেশী পেন্সিলের কাটতি তেমন হয় না। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন যে, বিদেশী পেন্সিলের মূল্য যদিও অধিক কিন্তু তাহার বিক্রয় হয় বেশী। আর দেশী পেন্সিলের মূল্য যদিও সস্তা তথাপি লোকে কিনিতে চায় না. সুতরাং তাঁহারা দাবি করিয়াছেন যে, বিদেশী পেন্সিলের আমদানী বন্ধ করা প্রয়োজন। ভারতের পেন্সিল-শিল্পের মালিকেরা অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম বুঝিতে চান না। ইহাকে বলা হয় "Consumer Resistance", কিংবা "ক্রয়-বিমুখতা।" অর্থাৎ সস্তায় ভাল জিনিষ পাইলে ক্রেতারা বেশী দাম দিয়া খারাপ জিনিষ ক্রয় করে না। বেশী দাম দিয়া লোকে ভাল জিনিষই কিনে। সুতরাং বেশী মূল্যে লোকে বিদেশী ভাল পেন্সিলই ক্রয় করে। এমন একদিন ছিল যখন স্বদেশীর অজুহাতে শিল্প-মালিকেরা খারাপ জিনিসে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছেন এবং জনসাধারণ তাহাই ক্রয় করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ফলে, স্বদেশী জিনিস হইলেও খারাপ হইলে তাহা লোকে কিনিতে চায় না। ভারতের পেন্সিল-শিল্প ও ঝরণা-কলমের গোড়ার ইতিহাসে দেখা যায় যে, জার্ম্মানী ও জাপান হইতে তৈয়ারী জিনিষ আসিত দেশী শিল্প-মালিকদের নামের ছাপ লইয়া। জনসাধারণের স্বাদেশিকতার সুযোগ লইয়া এই সকল বিদেশী জিনিষই স্বদেশী বলিয়া ভারতের বাজারে চালু করা হইয়াছে। সেইদিন স্বদেশী শিল্পপতিদের এই প্রবঞ্চনায় নীতিবোধে কোন আঘাত লাগে নাই।

ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ২,৪০০,০০০ ডজন পেন্সিল উৎপাদিত হয়। এদেশের বছরে প্রয়োজন ৭২ লক্ষ ডজন। বৎসরে ১০ শতাংশ পেন্সিলের দাবি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে পেন্সিলের চাহিদা দাঁড়াইবে ১০৮ লক্ষ ডজনে। ১৯৫৪ সনে ভারতবর্ষে ১৮ লক্ষ টাকায় ১২ লক্ষ ডজন পেন্সিল আমদানী হয় এবং ১৯৫৫ সনে ২৬ লক্ষ টাকায় ২৪ লক্ষ ডজন পেন্সিল আমদানী করা হয়। বিদেশী আমদানী বন্ধ করিলে দেশী পেন্সিলের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইবে। আর দেশী পেন্সিলের উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। দেশী পেন্সিলের কাটতি বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহার উৎকর্ষ সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশী ব্যবহারিক শিল্পের মালিকেরা ভাল জিনিষ উৎপন্নের দিকে তত নজর দেন না, যত নজর দেন মুনাফা লাভের দিকে। তাঁহারা চান সরকারী সাহায্যে বিদেশী প্রতিযোগিতা নিরোধ করিয়া একচেটিয়া মুনাফা লাভ। সীস ব্যতীত পেন্সিলের অন্যান্য উপাদান যথা, কাঠের ফালি, মাটি ও মোম বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ১৯৫০ সনে ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশন দেশী শিল্পকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সাবধান করিয়াছিলেন। কমিশন বলিয়াছিলেন যে, সংরক্ষণ ব্যবস্থার নামে যেন অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দেওয়া না হয়, কারণ তাহা হইলে নিকৃষ্ট জিনিষ অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রিত হইবে। তবে এই সাবধান-বাণী আমাদের কর্তৃপক্ষ সকল সময় মনে রাখেন না। সম্প্রতি যে আমদানী-নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এগুলির আভ্যন্তরিক সরবরাহ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

হিন্দু উত্তরাধিকার

"নয়াদিল্লী, ১৮ই জুন—সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গতকল্য রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হওয়ায় ১৯৪৭ সনে রাও কমিটির প্রস্তাবিত হিন্দু সংহিতার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পাদিত হইল। হিন্দুর বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত ১৯৫৫ সনের হিন্দু বিবাহ আইন দ্বারা উক্ত প্রস্তাবিত সংহিতার প্রথম অংশ সম্পাদিত হয়।

হিন্দুর উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভারতের সর্ব্বত্র একইরূপ প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন করা হইয়াছে।

এই আইনের ফলে পুরুষের ন্যায় নারীও একইভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। অতীতে অনেক ক্ষেত্রে নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও কেবলমাত্র জীবিত স্বত্ব ভোগ করিতেন। দান-বিক্রয়ের অধিকার তাঁহার ছিল না। এই আইনে কন্যাও এই প্রথম পিতার সম্পত্তির অংশ পাইবার অধিকারিণী হইলেন।"

এই বিলের অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের নারীর নূতন অধিকার লাভ হইল। এত দিন তাহাদের প্রাপ্য ছিল শুধু স্তোকবাক্য। এখন বাস্তব কিছু তাহার সহিত যুক্ত হইল।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন

নিম্নে যে আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত সংবাদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিবেন।

"পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় গত শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় অধিবেশনে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ক্রমাগত

দলে দলে উদ্বাস্তু আসিতে থাকায় এই রাজ্যে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া নবাগত উদ্বাস্তুগণের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যাইতে রাজী হইবার সাতিশয় প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

শ্রীমতী রায় বলেন, আমাদের ওয়ার্ক-সাইট ও ট্রানজিট ক্যাম্প-গুলিতে প্রায় ২ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে। এই দুই লক্ষের মধ্যে কিছু সংখ্যককে এই রাজ্যে পুনর্ব্বাসনের জন্য আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের এবং এক্ষণে যাহারা নূতন আসিতেছে তাহাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান সামর্থ্যের মধ্যে এই রাজ্যে পুনর্ব্বাসন করাইবার কোন আশা নাই।"

শ্রীমতী রায় তাঁহার বিবৃতির উপসংহারে সভার সকল সদস্য ও বাহিরের জনসাধারণ সকলের নিকট এরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান যে, উদ্বাস্তুরা যাহাতে নিজেদের সন্তোষজনক ভাবে পুনর্ব্বাসন করিয়া ভারতের নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে তাহাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাইবার প্রয়োজনীয়তা যেন সকলে নবাগত উদ্বাস্তুদের বুঝাইয়া দিয়া রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন।

আমরা বহুদিন যাবং বলিয়া আসিতেছি যে, এক দল অতি নীচ প্রকৃতির লোক এই উদ্বাস্তুদিগের দুর্দ্দশা ও যাতনা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইতেছে। কলিকাতার রাজনৈতিক গোলমাল মূল্যবান জমি জবরদখল, নানা নামে পল্লিভালয় স্থাপন এবং সাধারণ ভাবে শান্তিশৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা বানচাল হইলে যাহাদের লাভ সেই শ্রেণীর ও দলের লোকেদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না হইলে শ্রীমতী রায়ের আবেদন নিষ্ফল হইবেই।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ভূমি

পশ্চিমবঙ্গের চাষী তো নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্যই যথেষ্ট জমি পায় না। উপরন্তু এই প্রদেশে অসংখ্য ভূমিহীন কৃষিমজুর জমির অভাবে দুর্দ্দশা এবং অভাবগ্রস্ত। এইরূপ অবস্থায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য কতটুকু জমি এ প্রদেশে পাওয়া যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

অন্য প্রদেশে যে জমি আছে তাহা যদি চাষের উপযোগী হয় তবে উদ্বাস্তুদিগের যদি পুনর্ব্বাসনের ইচ্ছা কিছুমাত্র থাকে তবে তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত। যাহারা উহার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি দেখায় তাহারা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অনিষ্টসাধক শত্রু তাহা নয়, তাহারা উদ্বাস্তুদিগেরও অধঃপতনের সহায়ক।

এইরূপ লোককে দমন না করিলে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর উদ্ধার নাই।

"নয়াদিল্লী, ১৯শে জুন—পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে ভারতের সর্ব্বত্র পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি পরিকল্পনা বিন্যাস করিয়াছে। উহাকে এক্ষণে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে ১২টি রাজ্যে পরস্পরসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে।

যেসব এলাকায় উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন করা হইবে, সেসব এলাকা পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসারগণ পরিদর্শন করিয়াছেন। ঐসব জমি যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকদের বিশেষভাবে উপযোগী হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের কৃষিজাত আয়ের সহায়ক কুটীরশিল্পও পূর্ব্বোক্ত ভূখণ্ডগুলিতে গড়িয়া তোলা হইবে। নূতন পরিবেশে কৃষকগণ কোনরূপ অসুবিধায় না পড়ে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য বঙ্গভাষী ওয়েলফেয়ার অফিসারগণকে প্রতিটি এলাকায় পাঠান হইবে। এ পর্যন্ত ১২টি রাজ্য পুনর্ব্বাসনের জন্য জমি দান করিতে সম্মত হইয়াছে। বিহারের চম্পারণ, পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর, ধানবাদ ও ভাগলপুরে ১২ হাজার একর কৃষি জমি দেওয়া হইবে। আটটি এলাকায় ৪৪৮টি কৃষক পরিবার, ১১৫টি ধীবর পরিবার এবং ৪৭টি কারিগর পরিবারের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়াছে।

উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় একলাগোয়াড় ৩০ হাজার একর পরিমিত জমি আপাতদৃষ্টে উদ্বাস্তুদের উপযোগী হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ এলাকায় কয়েকজন অফিসার প্রাথমিক তদন্ত করিতেছেন। উড়িষ্যা সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ১০ হাজার চাষযোগ্য পতিত জমি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

উত্তর প্রদেশে বড়বাঁকি জেলায় ২,৬০০ একর পরিমিত জমি পুনর্ব্বাসনের জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। গোরিয়া জেলায় লাখামা ঝিলে ১,২৮৪ একর জমিও পুনর্ব্বাসনের উপযোগী বলিয়া জানা গিয়াছে।

আসাম সরকার কাছাড়ে ৬ হাজার একর জমি দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার ৫৬ হাজার একর জমি দিবেন। উহাদের মধ্যে ৩১ হাজার একর বস্তার, ১৫ হাজার একর জমি সরগুজার ও ১০ হাজার একর জমি রায়গড় জেলায় অবস্থিত। ঐসব এলাকার মাটি পরীক্ষার পর চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচিত হইবে। বিন্ধ্যপ্রদেশের পান্না, ছত্রপুর, টিকামগর ও দাতিয়া জেলায় ৭০ হাজার একর জমি আছে। মণিপুর, ৪৫০০ একর এবং রাজস্থান ১২ হাজার একর জমি দিবে।

সৌরাষ্ট্র সরকার নববন্দরে ৪ শত ধীবর পরিবারের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞগণ ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন।"

কলিকাতায় খানাতল্লাসী

কলিকাতায় কয়েক দিন পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নে কয়েকটির বিবরণ আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত হইল।

উহা ভিন্নও আরও ৮।১০টি স্থলে কঠোর খানাতল্লাসী হইয়াছে। অন্য সংবাদে শুনা যায় যে, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ে চোরাই আফিং

চালান এবং তাহার পরিবর্ত্তে সোনা ও মহামূল্য রত্নাদি আমদানী, এই চোরাকারবারে কোটি কোটি টাকার হিসাবে কলিকাতায় চলিতেছে। তাহারই নিরোধে এই অভিযান :

"গত বুধবার কলিকাতায় এক বৃহত্তম তল্লাসীর অভিযানকালে জল ও স্থল শুল্ক বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা কয়েকজন ক্রোড়পতি শিল্পব্যবসায়ীর ৪টি বাসভবনে হানা দিয়া ব্যাপক তল্লাসী চালায়।

প্রকাশ চোরাই আমদানী স্বর্ণ ও জহরতাদির সন্ধানে একই সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ঐ ৪টি বাসভবনে উক্ত তল্লাসী চালান হয়।

তল্লাসীকালে শুল্ক বিভাগীয় পুলিসবাহিনীর লোকেরা এ চারিখানি বাসভবনের চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা দিতে থাকে এবং অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বুধবার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এ খানাতল্লাসী চালান হয়।

অভিযোগে প্রকাশ যে, বুধবার রাত্রের মধ্যেই এ তল্লাসীকালে এমন কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে নাকি হংকংয়ের মার্কা ছিল। তাহা ছাড়া কতকগুলি মূল্যবান পাথরও আটক করা হইয়াছে। শুল্ক বিভাগ হইতে এরূপ অভিযোগও করা হইয়াছে যে, এই তল্লাসীকালে যে সব স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর আটক করা হয় সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নাকি গোপনপথে বিনা শুল্কে এই দেশে আনীত হইয়াছে এবং সেগুলি অলঙ্কারে পরিণত করা হইয়াছে।

শুল্ক বিভাগীয় পুলিস উপরোক্ত যে চারিটি বাসভবনে তল্লাসী চালায় সেগুলি হ্যারিসন রোড, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও বড়বাজারে অবস্থিত।"

কলিকাতায় জীবনযাত্রা

এই আজবশহর কলিকাতায় লোকজনের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নের সংবাদে পাওয়া যায়। আমরা বলিতে বাধ্য যে, এইরূপ দুর্ঘটনা এই শহর ও এই প্রদেশের বাহিরে হওয়া সম্ভব নয় :

"রবিবার বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বালিগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসনের ওভারব্রীজ ভাঙিয়া এক মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনায় ৩ জন স্ত্রীলোক সহ ১৭ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক সহ ৫ জনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া জানা গিয়াছে। দুর্ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যে আহতদের শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পথচারী লোকজনের চাপে ওভারব্রীজের আনুমানিক ছয় ফুট দীর্ঘ ও ছয় ফুট প্রশস্ত কাঠের পাটাতন অকস্মাৎ ভাঙিয়া পড়ে এবং পনেরো জন পথচারী পাটাতন সমেত সতের ফুট নীচে রেল লাইনের উপর পড়িয়া গুরুতররূপে আহত হন। দুই জন পাটাতনের প্রান্ত ধরিয়া ঝুলিতে থাকেন। ঠিক ঐ মুহূর্ত্তে ক্যানিংগামী একখানি ট্রেন শিয়ালদহ হইতে আসিতেছিল। দুর্ঘটনার স্থল হইতে আনুমানিক ২৫ গজ দূরে রেলওয়ে কেবিনের নিকটে অতিকষ্টে ট্রেনটি থামানো হয় এবং আহত ব্যক্তিরা শোচনীয় পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পান।

প্রকাশ, মেরামতীর অভাবে উক্ত ব্রীজের পাটাতনগুলি পচিয়া বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে টালার নিকটে ব্রীজ ভাঙিয়া আর একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে।

ভারত সরকারের খনিজ তৈলনীতি

খনিজ তৈল জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ তৈলের সরবরাহ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। ভারতের খনিজ তৈলের চাহিদার অধিকাংশ বর্ত্তমানে আমদানী মারফত মিটান হয়। ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্প বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিদেশী কোম্পানীগুলির করায়ত্ত। ভারতে খনিজ তৈল উত্তোলনের ভার রহিয়াছে বার্ম্মা-শেল গোষ্ঠীর অন্তর্গত আসাম অয়েল কোম্পানীর উপর এবং খনিজ তৈল পরিশোধনাগারগুলির পরিচালনা-ভার রহিয়াছে মার্কিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী এবং বার্ম্মা-শেল অয়েল কোম্পানীর উপর। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম এবং বার্ম্মা-শেল তৈল পরিশোধনাগারগুলি যে হারে মুনাফা লুটিতেছে তাহাতে ভারত সরকার বিশেষরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ভারত সরকারের নিকট হইতে এই কোম্পানীগুলি যে সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছে প্রকৃতই তাহা অপরিমিত। ২৫ বৎসরের মধ্যে কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করা হইবে না বলিয়া আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে। উপরন্তু তাহাদিগকে বিশেষ সুবিধাজনক হারে ভারতে তৈল বিক্রয়ের মূল্যনির্দ্ধারণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। "ইকনমিক উইকলি" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র এই একটি সর্ত্তের দ্বারাই কোম্পানীগুলি তাহাদের লগ্নীকৃত অর্থের অনুপাতে বহুগুণ বেশী মুনাফা আদায় করিতে পারে। অপর একটি মত অনুযায়ী ভারত সরকার প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্দ্ধিত হারে কোম্পানীগুলির উপর কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার নাকি বর্ত্তমানে ঐ সকল চুক্তির সর্ত্তগুলি বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন যাহাতে পরিশোধনাগারগুলির পূর্ণ উৎপাদন আরম্ভ হইলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্ত্তগুলির পরিবর্ত্তন করা যায়। কোম্পানীগুলি এরূপ আলোচনা চালাইতে সম্পূর্ণরূপে গররাজী নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতে সরকারের অদূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ অববাহিকায় তৈল অনুসন্ধানের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীকে লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত মার্কিন কোম্পানী পূর্ব্ব পাকিস্থানেও তৈল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। "ইকনমিক উইকলি" সম্পাদকীয় মন্তব্যে

লিখিতেছেন যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানীকে পশ্চিমবঙ্গে তৈল অনুসন্ধানের লাইসেন্স দেওয়াতে প্রথমেই একটি বিরাট ভুল করা হইয়াছে। খনিজ তৈল সম্পর্কে যাঁহাদেরই কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন যে, পেট্রোলিয়াম যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তাহা বহু হাজার মাইল ব্যাপিয়াই অবস্থিত থাকে। ভূমধ্যস্থিত এই তৈল "নদী" স্বভাবতঃই কোন রাজনৈতিক সীমা মানিয়া চলে না। তৈল নিষ্কাষণের আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোন দেশ এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে যথাসম্ভব তৈল নিষ্কাষণ করিতে পারে। ফলে পূর্ব্ব পাকিস্থানে তৈল নিষ্কাষণ আরম্ভ হইলে পশ্চিমবঙ্গ অববাহিকা হইতে তৈল টানিয়া লইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কারণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব পাকিস্থানে তৈল নিষ্কাষণেই বেশী আগ্রহ দেখাইয়াছে। সম্প্রতি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গের জন্য আনীত একটি খনন যন্ত্র পূর্ব্ব পাকিস্থানে চালান করিয়া দেওয়ায় অনেকেরই মনে উপরোক্ত সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়াছে।

ভারত সরকারের তৈলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "ইকনমিক উইকলি" পত্রিকার দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, ভারতের তৈলনীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যেরূপ আনাড়িপনা দেখাইয়াছেন ভারতের জাতীয় প্রচেষ্টার অপর কোন ক্ষেত্রেই তাহা দেখা যায় নাই। তৈলনিষ্কাষণ সম্পর্কিত জটিল কারিগরি জ্ঞানের অভাব ইহার একটি কারণ হইতে পারে কিন্তু তৈলনিষ্কাষণ, পরিবহন, বিতরণ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান-লাভেরও কোন সুসংবদ্ধ চেষ্টা করা হয় নাই।

তৈলনীতি নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংগঠনিক দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়া উক্ত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তৈল অনুসন্ধানের কার্য্যাবলীর জন্য দায়ী রহিয়াছে। অপরপক্ষে, যে সকল অঞ্চলে খনিজ তৈল প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে সেইসকল অঞ্চলে তৈল অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইয়াছে বার্ম্মা-শেল অয়েল গোষ্ঠীর অন্তর্গত আসাম অয়েল কোম্পানীকে। পশ্চিমবঙ্গে ঐ কাজের ভার রহিয়াছে মার্কিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর উপর। ফলে, যে সকল অঞ্চলে খনিজ তৈলপ্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা সেই সকল স্থানে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার কোন সুযোগই নাই।

তৈল-পরিশোধন ব্যাপারেও ঐ একই জটিলতা রহিয়াছে। উৎপাদন মন্ত্রণাদপ্তর ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত পরিশোধন-গারগুলির সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত অথচ পূর্ব্বাঞ্চলে নূতন পরিশোধনাগার স্থাপনের জন্য আলোচনা চালাইতেছে প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তর।

"ইকনমিক উইকলি"র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তৈলের অনুসন্ধান ও খনন ইত্যাদি অতিশয় জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। উপরন্তু তাহাতে অনিশ্চয়তার ব্যাপার খুবই বেশী। সরকার নিজে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে ঐ দুইটি বিষয়ে সম্যক বিবেচনা না করিলে চাকীর দায়ে মনসা বিক্রয় সম্ভব। এ দেশের লোকের ঐ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা কিছুমাত্রই নাই, সুতরাং প্রথমে সেইটা প্রয়োজন। তবে দেশের স্বার্থরক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য

পশ্চিমবঙ্গে অন্নাভাব সম্পর্কে বিধান সভায় ও নানা পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়। তাহার উত্তরে মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কেন্দ্রীয় সহকারী খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী এস. ব্যানার্জ্জি, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী বি. সেন, আঞ্চলিক খাদ্য ডিরেক্টর শ্রী জে. এস. নারায়ণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রী এস. কে. গুপ্ত সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের কালেক্টরগণ, অন্যান্য অফিসার ও স্থানীয় নেতৃগণ সমভিব্যাহারে ১৪ই ও ১৫ই জুলাই তারিখে ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমা হইতে আরম্ভ করিয়া নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্থানের সীমান্ত বরাবর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যুক্ত সফর করেন।

সফরকালে তাঁহারা সরেজমিনে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্ব পাকিস্থান সীমান্তবর্ত্তী জেলা-গুলিতে চাউলের অভাব নাই এবং চাউলের কলসমূহ ব্যবসায়ী ও চাউল উৎপাদকগণের নিকট যথেষ্ট চাউল মজুত আছে। তাঁহারা আরও জানিতে পারেন যে, বহু স্থানে এবার আউশ ধান্যের প্রচুর ফলন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যেখানেই প্রয়োজন, চাউলের মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে ন্যায্য মূল্যের দোকানসমূহ পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীসেন শ্রীকৃষ্ণাপ্পা ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ সদলবলে সীমান্ত এলাকায় ষ্টীমলঞ্চ ও মোটরগাড়ীযোগে প্রায় তিন শত মাইল ভ্রমণ করেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা প্রায় ১২০ মাইল ইছামতী নদী দিয়া ষ্টীমলঞ্চ-যোগে ভ্রমণ করেন। এই নদীটি ভারত ও পাকিস্থানের সীমান্ত রচনা করিয়াছে। তাঁহারা প্রধান চাউল উৎপাদক এলাকাগুলির অন্যতম হিঙ্গলগঞ্জ পরিদর্শন করেন। এখানে পাঁচটি চাউল কল আছে।

তাঁহারা শুল্ক পরীক্ষা-ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। তাঁহারা অতর্কিতে স্থানীয় বাজারও পরিদর্শন করেন। তাঁহারা চাউল ক্রেতা ও চাউল উৎপাদকগণের নিকট ধান্য ও চাউল সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী এই দুইটি জেলায় সাধারণের ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল আট আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে তাঁহারা দেখিতে পান। তাঁহারা পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিগণের নিকট সরেজমিনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী জেলা-

গুলিতে পাকিস্থানী মুদ্রায় ৩৫ হইতে ৪০ টাকা মণদরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। তবে এই সমস্ত এলাকায় বর্তমানে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইতেছে।

কোন কোন সমাজবিরোধী ব্যক্তি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ আগামী সাধারণ নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলেও চাউলের কলসমূহ এবং ব্যবসায়ী ও চাউল উৎপাদকগণের নিকট যে যথেষ্ট চাউল আছে, তাহার প্রমাণ তাঁহারা পাইয়াছেন। আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও জনগণ আদৌ বিচলিত হয় নাই, তাঁহারা দেখিতে পান।

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে বে-আইনী চালান ব্যবসা

২২শে মে তারিখের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বে-আইনী মালচলাচলের সমস্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ বে-আইনী ভাবে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রের যে ক্ষতি হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তার খাতিরে অবিলম্বে এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসার বিলোপসাধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ বে-আইনী ব্যবসা বন্ধ করা বিশেষ সহজসাধ্য নহে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাষায় "যেহেতু সীমান্তে যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা একবার এই ব্যবসার একবার মধুর আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাদের মুখ হইতে সে আস্বাদ দূর করা অসম্ভব। সীমান্তে শুল্কবিভাগ, পুলিশ বা অপরাপর সরকারী লোক যাহাদের রাখা হইয়াছে, তাহারা হঠাৎ মহাজন চোরাকারবারীদের কিছু করিতে পারেন না। কারণ স্বরূপ কড়ের চেষ্টা করিলে মাল ধরাও যাইবে না, উপরন্তু উপরি যে লাভ মাস মাহিনার মত বরাদ্দ আছে তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, পাচার বন্ধ করা যখন সহজই নয় তখন নিজেদের আমদানী রোজগারের পথ নিজের হাতে বন্ধ করা মূর্খতা ব্যতীত কিছুই নহে।…"

কি উপায়ে এই বে-আইনী ব্যবসা চালান হইতেছে তাহার বর্ণনা দিয়া "সমাচার" লিখিতেছেন—"কিছু দিন হইতে দেখি প্রত্যহ চার-পাঁচ ট্রাক বোঝাই চাউল সাইথিয়ার দিক হইতে বহরমপুরে আসে এবং এই চাউল নিশ্চয়ই শহরের বাজারেই প্রতিদিন কাটে না। রাত্রি দশটার সময় ট্রাকে চাউল বোঝাই হইতেও আমরা দেখিয়াছি। দিনের বেলাতেও ট্রাকে চাউল বাহিরে যায়। সংবাদ লইলে জানা যাইবে বেশির ভাগ চাউল এই সমস্ত ট্রাকের গন্তব্যস্থল সীমান্তবর্তী কোনও গঞ্জ বা গ্রাম। এখানে যে চাউলের দর মণপ্রতি ২২ টাকা পাকিস্থানে তাহার দর ৪০।৪৫ টাকা। চাউলের বস্তা ট্রাকে বা জঙ্গী বা কাস্তদারীতে পাঠানো, ঘাট খরচ, পুলিশের পার্বণী প্রভৃতি ধরাবাঁধা খরচ ৪।৫ টাকা পড়ে। তদুপরি নৌকা ভাড়া এবং পাক পুলিশের প্রাপ্য আছে। এই ভাবে এক মণ চাউলের দাম পাকিস্থানে পৌঁছানোর পর ৩২।৩৫ টাকা ধরা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চাউল পাচারের ব্যবসাই এখন সবদিক দিয়াই একমাত্র লাভজনক ব্যবসা এবং বহু ব্যবসায়ী এই সহজ মুনাফার লোভে মাতিয়া সব ভুলিয়া গিয়াছেন।"

কিন্তু কেবল চাউল লইয়াই যে এই চোরা কারবার চলে তাহা মনে করা ঠিক হইবে না। ভারত হইতে আলকাতরা, বিড়ির পাতা এবং খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য বহু পণ্য এই চোরাপথে পাকিস্থানে চালান যাইতেছে।

"সীমান্ত অঞ্চলের বাড়ী মাত্রেই পাচারকারীদের গুদাম বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না," "সমাচার" লিখিতেছেন। "বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ এমন এমন বাড়ীতে মাল রাখে, যেখানে মাল থাকা সম্ভব বলিয়া মনে করাও যায় না।…সীমান্তের পাচার ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব নয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, কারণ মুনাফার লোভে সীমান্ত অঞ্চলে কে যে পাচার ব্যবসা করে না তাহা বলা অসম্ভব…"

ত্রিপুরার খাদ্যসঙ্কটে সরকারী দায়িত্ব

ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যসঙ্কটে সরকারী দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সমাজ" পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, খাদ্য বন্টনের পূর্ব হইতেই খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল অথচ ঠিক আখাউড়া ষ্টেশন হইতে একমাসের মধ্যেও শহরে চাউল আনা হয় নাই—অথচ ষ্টেশনে চার হাজার মণ চাউল মজুত ছিল এবং তাহা সময়মত চালান না করিতে পারায় ত্রুটি উদ্ঘাটন করা হইতেছে :

"সমাজ" লিখিতেছেন :

"বিগত ২২শে মে আখাউড়া ষ্টেশনে কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত চাউলের তৃতীয় স্পেশাল ট্রেনখানি যথারীতি পৌঁছায়। কয়েক দিনের মধ্যে চতুর্থ স্পেশাল ট্রেনখানিও চাউলসহ আসিয়া পৌঁছায়। আখাউড়া ষ্টেশন আগরতলা সহর হইতে মাত্র ৬।৭ মাইল এবং সর্বদা যে কোন যানবাহনের যোগ্য পাকা রাস্তা। ২২শে মে হইতে ২২শে জুনের মধ্যে উক্ত চাউল কেন আগরতলায় আনা গেল না? বর্তমান কণ্ট্রাক্টরের পূর্বে নিম্নতম রেটের যে কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত ছিলেন তিনি মাত্র ৮।৯ দিনের মধ্যে অনুরূপ দুর্যোগময় অবস্থায় মধ্যেও ৪২ হাজার মণ চাউল আখাউড়া হইতে আগরতলায় আনিতে পারিয়াছিলেন। তৎপূর্বে কলকলিঘাটেও উক্ত পূর্ব নিম্নতম রেটের কণ্ট্রাক্টরের তৎপরতায় ও কর্মনিষ্ঠার ফলেই সরকারী বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী হুকুমসৃষ্ট ঝামেলা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত চাউল সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে পারে নাই। অথচ উক্ত কণ্ট্রাক্টরের পরিবর্তে অধিকতর সময়ের মেয়াদে ও রেটে অন্য কণ্ট্রাক্টর কোন অফিসার কি কারণে নিযুক্ত করিয়াছেন?"

"সমাজ" সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ষ্টেশনে চাউল জলে

নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অজুহাত প্রদর্শন করিয়া চাউল বা চাউল অধিকতর মূল্যে পাকিস্থানে রপ্তানী করা হইতেছে। সন্দেহের কারণ আছে কিনা এ বিষয়ে সরকারী তদন্ত প্রয়োজন আমরা মনে করি।

শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষের ছায়া

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "জনশক্তি" শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, দেশে চাউলের মণ পঞ্চাশ-ষাট টাকা হওয়ার ফলে শতকরা ৮০ জনই আজ অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। মফঃস্বলের কোন কোন বাজারে পয়সা দিয়াও নাকি চাউল পাওয়া যাইতেছে না।

জেলার খাদ্যাবস্থা বর্ণনা করিয়া "যুগশক্তি" ১৩ই আষাঢ় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন:

"দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত শ্রীহট্ট জেলায় বন্যাও আসিয়া যোগ দিল। কয়েক দিনের অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলেই খাসিয়া পাহাড়, লুসাই পাহাড় ও ত্রিপুরা পাহাড়ের জলরাশি নদীপথে আসিয়া সমগ্র জেলা-ব্যাপী প্লাবনের সৃষ্টি করিল। দুর্গত কৃষক শীঘ্রই আউস ধান পাইবে বলিয়া আশায় বুক বাঁধিয়াছিল, কিন্তু তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। আমন ফসলও জলমগ্ন হইয়াছে। তাহার কত অংশ যে রক্ষা পাইবে তাহা ঈশ্বরই জানেন। তবে আউস ফসল শতকরা ৮০ ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিকৃষ্ট চাউলও জেলার সর্বত্র ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। মৌলবীবাজার মহকুমার কোন কোন স্থানে ৬০৲ পর্যন্ত দর উঠিয়াছে, তাহাও সর্বদা সহজলভ্য হইতেছে না। কচু ও কলাগাছ খাইয়া মানুষ ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী আমরা পাইতেছি। প্রকৃতির লীলা-নিকেতন শ্রীহট্ট জেলায় এত নিদারুণ অন্নকষ্ট এবং চাউলের অবিশ্বাস্য উচ্চ মূল্য স্মরণাতীত কালে কেহ প্রত্যক্ষ কিংবা কল্পনা পর্যন্ত করেন নাই। বিগত ১৩৫০ সনে বাংলার মন্বন্তরের কালেও মাত্র কয়েক দিনের জন্য শ্রীহট্টে ৪০৲ টাকা পর্যন্ত চাউলের দর উঠিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের বাজারের কাঁচা পয়সায় সেই দুর্মূল্যতা লোকের ক্লেশকর বোধ হয় নাই।"

এইরূপ পরিস্থিতিতে শ্রীহট্ট জেলাকে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমগ্র জেলায় রেশনিং-এর পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিবার জন্য "জনশক্তি" দাবি জানাইয়াছেন।

আমরা মফস্বলের সংবাদপত্রে একরকম দেখি এবং মন্ত্রীগণের উক্তিতে অন্যরকম শুনি। সত্য কি তাহা নিরূপণের ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু চাউল মহার্ঘ না হইলে এইরূপ কথা কিরূপে কাগজে আসে তাহাও আমরা বুঝিতে অক্ষম। সত্য যাহাই হউক, শ্রীহট্টে চাউলের মূল্য নামাইবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। ইহাতে তো তর্কের অবকাশ নাই।

সংবিধানে ষষ্ঠ সংশোধন

সংবিধানে ক্রমান্বয়ে সংশোধন চলিতেছে। উহা অবশ্য অনিবার্য এবং সকল দেশেই উহা চলে কিন্তু এই সংশোধনের সম্পর্কে বিরোধী দলের আশঙ্কা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাঙালীর অন্নবস্ত্রের সমস্যা এখনই অতি সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই সংশোধনের ফলে কি হইবে তাহা পূর্ব হইতেই জানা প্রয়োজন। নিম্নে বিধান সভার রিপোর্ট আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত করা হইল:

"বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন (ষষ্ঠ সংশোধন) বিল অনুমোদন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ এই বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত সংশোধনের দ্বারা নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপর করধার্যের অবাধ ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। এ বিলটি ইতিপূর্বে সংসদে গৃহীত হইয়াছে।

বিতর্কের উত্তরে ডাঃ রায় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপর যাহাতে করধার্য না হয় তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। অবশ্য বিধানমণ্ডলী যদি মনে করেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কার্যের জন্য করধার্য প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তাঁহারা স্বাধীনভাবেই তাহা স্থির করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন অনুমতি গ্রহণের আবশ্যক হইবে না।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সংবিধান সংশোধন (ষষ্ঠ সংশোধন) বিলটি উত্থাপন করিলে প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়-চৌধুরী বলেন যে, সংবিধানের এই সংশোধনের দ্বারা রাজ্য-সরকারের হাতে নূতন করধার্যের ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর এখন হইতে করধার্য করিতে পারিবেন। তাঁহাদের আশঙ্কা যে, সরকার নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের উপর একের পর এক করিয়া কর বসাইতে থাকিবেন। শ্রীরায়চৌধুরী ঘন ঘন সংবিধান সংশোধনেরও বিরোধিতা করেন।

মফঃস্বলে মেডিক্যাল কলেজ

১৫ই আষাঢ় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দামোদর" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রবল বাধা সত্ত্বেও বাঁকুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫০ সন হইতেই বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিতেছিল এবং ১৯৫৪ সনে কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ ও ছাত্র ভর্তির আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াও কেবলমাত্র সরকারী বিরোধিতার জন্যই কার্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। অবশেষে সকল প্রকার সরকারী প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া বর্তমান বৎসর হইতে কলেজটি যে কার্য আরম্ভ করিতে চলিয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের সকল অধিবাসীই আনন্দিত হইবেন। সরকারের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কলেজটিকে অনুমোদন দান

করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাহসিকতার পরিচয় দান করিয়াছেন "দামোদর" তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বাঁকুড়াতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন উপলক্ষ্যে "দামোদর" বর্দ্ধমান শহরেও একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবীর পুনরুত্থান করিয়া লিখিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান শহরে যে মেডিক্যাল স্কুলটি ছিল তাহা পশ্চিমবঙ্গের মেডিক্যাল স্কুলগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅনুনাথন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছিলেন যে, মফঃস্বলে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বর্দ্ধমানেই সর্বপ্রথম তাহা করা উচিত। "অতঃপর বর্দ্ধমানে যদি হয়, তাহা হইলে প্রথম হইবে না, দ্বিতীয় হইবে। তবে সরকার যদি অগ্রসর হন, তাহা হইলে ইহা মফঃস্বলে প্রথম সরকারী মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইতে পারে।"...

এই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, নির্দ্দেশটির বলে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও জলপাইগুড়ির মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বলা ছিল যে, স্বতন্ত্র মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা উচিত, কেননা চিকিৎসায় শিক্ষার মান দুই প্রকার হওয়া উচিত নয়। ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রে স্কুল কলেজে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি পুরান স্কুল লোপ পায় মাত্র!

হাসপাতালে দুর্নীতি

সরকারী হাসপাতালগুলিতে কিরূপ ব্যাপক দুর্নীতি চলিতেছে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল হইতে অপহৃত ঔষধ উদ্ধারের মধ্য দিয়া তাহা বিশেষ প্রকট হইয়াছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে উপযুক্ত অনুসন্ধানে সর্বত্রই একই প্রকার দুর্নীতি ও অব্যবস্থার রাজত্ব হয়ত প্রকাশ পাইবে।

২২শে আষাঢ় সংখ্যায় পাক্ষিক "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকা লিখিতেছেন, "বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের একজন বর্ত্তমান ডাক্তারকে উৎকোচ গ্রহণকালে গত ১৪ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জেলা শাসকের ওয়ারেণ্টবলে স্থানীয় এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ হাতেনাতে ধরিয়া ফেলেন। পুলিস তাহার পকেট হইতে চিহ্নিত ষোল টাকার নোট হস্তগত করেন। পুলিস তাহার জমা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র 'সীজ' করিয়াছেন। এ ঘটনায় সমগ্র জেলায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার পর দীর্ঘ ১৬ দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীটিকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই, তাঁহাকে সাসপেণ্ড করা হয় নাই, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জশীট দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই।"

মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিতে নানারূপ দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আমরাও বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বিজয়চাঁদ হাসপাতালের প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অভিযোগগুলির পশ্চাতেই বিশেষ সত্য থাকিতে পারে। এই প্রকার দুর্নীতিপরায়ণতা দূর করিতে হইলে সুসংবদ্ধ, দৃঢ় অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে কেবলমাত্র অনুসন্ধান করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে কোন ফলই হইবে না যদি না অপরাধী ব্যক্তিকে—তা তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউন না কেন—কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে হাসপাতালগুলিতে দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ এবং তাহার প্রতিকার সম্পর্কে সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" যে সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে সার্বজনীন অভিযোগগুলি আলোচনা করিয়া বঙ্গবাণী লিখিতেছেন:

"সাধারণতঃ হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে এইপ্রকার অভিযোগই শুনিতে পাওয়া যায়—(১) হাসপাতালে স্থানাভাব। অনেক সময় সাধারণ লোক গিয়া যখন স্থানাভাবের অজুহাতে ভর্ত্তি হইতে পারে না তখন সুপারিশওয়ালা লোক গিয়া সেই সময়ই ভর্ত্তি হইতে পায়! (২) ইন্‌জেক্‌সনের ও অন্যান্য দামী ঔষধের অভাব। সাধারণ লোককে অনেক ক্ষেত্রেই জীবনরক্ষার জন্য এই সকল ঔষধ বাহির হইতে কিনিয়া দিতে হয় কিন্তু কোন influential বা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি আসিলে তাঁহাকে হাসপাতাল হইতেই এই সকল ঔষধ দেওয়া হয়, (৩) নার্সদিগের অমনোযোগ ও দুর্ব্যবহার, (৪) রোগীর পথ্য ঠিকমত না দেওয়া এবং তাহা হইতে চুরি করা, (৫) রোগীর আত্মীয়স্বজনের সহিত ভদ্রতাসম্মত ব্যবহার না করা। যদিও সরকারী অনেক অফিসের দেওয়ালে লেখা থাকে 'Civility costs nothing', তবুও সরকারী হাসপাতালে রোগীদিগের উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজনের সহিত একটু সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার না করিয়া কর্কশ ও হৃদয়হীন ব্যবহার করা হয়।

"(৬) সরকারী ডাক্তারদিগের সাধারণ রোগীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়া এবং এমন ঔদাসিন্য দেখান যাহাকে অপরাধের পর্য্যায়ে (criminal) ফেলা যাইতে পারে এবং যাহার ফলে রোগীর জীবনান্ত অবধি হইয়াছে, এরূপ শোনা গিয়াছে।"

হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি (২০শে আষাঢ়) বহু পুরাতন, কিন্তু তথাপি তাহাদের প্রতিকার হয় না। এই সম্পর্কে অনুযোগ করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, পুলিসের যে সকল অফিসারের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট কিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে দেখিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নথিপত্র দেখিতেছেন। তিনি "কি হাসপাতালের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি তদন্ত করিতে পারেন না? তাঁহার মত চিকিৎসক থাকিতে হাসপাতালগুলির দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি আরোগ্য হয় না কেন? আমরা আশা করি তিনি সচেষ্ট হইলে ইহারও প্রতিকার হইবে।"

জঙ্গীপুর কলেজে বি-এ ক্লাস

জঙ্গীপুর কলেজে বি. এ. ক্লাস খোলা সম্পর্কে গতমাসে আমরা "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া-

ছিলাম। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কলেজে বি. এ. ক্লাস খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আপাততঃ বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিশেষ বাংলা এই কয়টি বিষয় পঠনপাঠন হইবে।

১৪ই আষাঢ় এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে "ভারতী" লিখিয়াছেন, "কিছু বিলম্বে হইলেও শেষ পর্যন্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষ যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"

কলেজের অধ্যক্ষও ঐ মর্মে আমাদের জানাইয়াছেন।

পুলিসের দুর্নীতিপরায়ণতা

পুলিসবিভাগের দুর্নীতিপরায়ণতা সম্পর্কে "বর্দ্ধমানবাণী" পত্রিকার ৮ই আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীপ্রবতস সাত্তার একটি সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি অভিযোগ তুলিয়াছেন যে, কালনা মহকুমার কোন থানার দারোগা জনৈক ব্যক্তির বন্দুক মামলার ফেছিলায় বিনা রসিদে লইয়া যায়। "মামলা শেষ হইল, সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইল, কিন্তু সে বন্দুক আজও পাইল না। থানার দারোগা তাহাকে ডাকাইয়া বলিল—দুই শ' টাকা দাও, ভাল রিপোর্ট দিব। সে ব্যক্তি টাকা দিল না, তাই আজও সে বন্দুক পাইল না—থানাতেই পড়িয়া আছে।"

আসানসোল মহকুমাতেও একটি ব্যাপারে স্থানীয় পুলিসের দারোগার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি বিশেষ অনুযোগ করিয়া লিখিতেছেন যে, আসানসোল "গোধূলি" সিনেমার দখল দিবার জন্য কোর্টের নির্দেশ কার্যকরী করিতে নাজির স্থানীয় পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিলে পুলিস তাহাকে সাহায্য না করিয়া প্রতিপক্ষকেই নাকি সাহায্য করে। শ্রীসাত্তার বলিতেছেন যে, "জানিয়া শুনিয়াও পুলিস আদালতের রায়কে বলবৎ করিবার জন্য নাজিরকে সাহায্য করে নাই—সাহায্য করিয়াছে অপর পক্ষকে, যাহারা আদালতের আদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্যায়ভাবে ঐ সিনেমা গৃহকে দখল করিয়া থাকিতে চায়। সংশ্লিষ্ট সাব ইনস্পেক্টর সম্পর্কে আমরা কিছু বলিব না—সাবজজ যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি:

". . . he did nothing to help the Nazir in the matter of delivery of possession. I am inclined to believe that he submitted an incorrect report most likely because he is more familiar with the people who are now running the Godhuli Cinema. It would be a bad day for the country if Police officers of this sort are asked to maintain law and order."

এ সম্পর্কে আর অধিক কিছু বলিব না। আসানসোল থানার সাব-ইন্সপেক্টর সম্পর্কে সাব-জজ যে মন্তব্য করিয়াছেন আমরা উর্দ্ধতন পুলিস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি।"

পুলিসের অবনতি তো চতুর্দ্দিকেই হইতেছে। কিরণশঙ্কর রায়ের মৃত্যুর পর ওদিকে দৃষ্টি দিবার লোক নাই, ইহাই প্রকৃত কারণ।

ক্ষেতমজুরদের দাবী

৩০শে জুন ও ১লা জুলাই বর্দ্ধমান জেলার মেমারীতে বর্দ্ধমান জেলার ক্ষেতমজুরদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে তাহাদের দাবীর যাথার্থ্য এবং সেই দাবী আদায়ের জন্য ক্ষেতমজুরদের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া "বর্দ্ধমান বাণী" পত্রিকার ২২শে আষাঢ় সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীপ্রবতস সাত্তার লিখিতেছেন যে, যখন শ্রমিক, কেরাণী এবং অপেক্ষাকৃত ধনী চাষীরা নিজের নিজের সংগঠন গড়িয়াছে তখন ক্ষেতমজুরদেরও সংঘবদ্ধ না হইবার কোন কারণ নাই।

ক্ষেতমজুর কাহারা? শ্রীসাত্তার বলিতেছেন যে, যাহারা অল্প জমির মালিক, নিজের জমিতে চাষ করিয়া যাহাদের অন্নসংস্থান না হওয়ায় অপরের জমিতে খাটিয়া খাইতে হয়, অপরের জমি যে ভাগে চাষ করে ও পরের চাষে যাহারা মজুরী করিয়া খায় তাহারা সকলেই ক্ষেতমজুরের পর্যায়ে পড়ে। আমাদের দেশে বড় বড় কৃষি ফার্ম বেশি না থাকায় অধিকাংশ স্থলেই ক্ষেতমজুরদিগকে মধ্যবিত্ত ও অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহস্থ বাড়ীতে খাটিয়া খাইতে হয়। এইরূপে অসংখ্য মালিকের অধীনে কাজ করে বলিয়া ক্ষেতমজুরদিগের সংগঠন গড়িয়া তোলা বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

ক্ষেতমজুরদিগকে কি ভাবে শোষণ করা হয় সেই সম্পর্কে শ্রীসাত্তার লিখিতেছেন:

"কোথাও পথ চলিতে দেয় বলিয়া, কোথাও পুকুরের ঘাট সরিতে দেয় বলিয়া, আবার কোথাও পুকুরের পাড়ে কুঁড়ে বাঁধিতে দিয়াছে বলিয়া ক্ষেতমজুরদের নিকট হইতে বেগার আদায় করা হয়। ইহা বে-আইনী কিন্তু ইহা আজও কোথাও কোথাও চলিতেছে। জমি চাষ ভাগে করিলে ভাগীদার ফসলের কি অংশ পাইবে তাহার বিধান আইনে আছে। কিন্তু আজও সেই মত ধান, খড়, চাটাই সকল জায়গায় হইতেছে না। এমন স্থান আছে যেখানে ভাগীদারকে ফসলের অর্দ্ধেকও দেওয়া হয় না। চাষের সময় জমির মালিক যে টাকা ধার দেয় তাহার দরুন চড়া সুদ ধরিয়া লয়।

এই সকল অন্যায় অবিচারের প্রতিকারসাধনের জন্যই ক্ষেতমজুরদের আজ সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে শুনা যায়। প্রকৃত অবস্থা কি তাহার নির্ণয় অবশ্য প্রয়োজন।

ভাঙনের মুখে জঙ্গীপুর শহর

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা ২১শে আষাঢ় "কথাপ্রসঙ্গ" লিখিতেছেন:

"সম্প্রতি স্থানীয় ফৌজদারী কোর্টের সম্মুখে ভাগীরথীর গর্ভে একটি চর উদ্ভূত হইয়াছে। চরটির দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল। এইরূপ একটি অতিকায় চর উদ্ভূত হওয়ার ফলে নদীটি এই স্থলে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে এবং ইহার প্রধান জলধারাটি জঙ্গীপুর

শহর ঘেঁসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এজন্য জলের চাপ ঐদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত দু'তিন বৎসর হইতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি বর্ষাকালে ভাগীরথী স্ফীতিলাভ করায় মিউনিসিপ্যাল এলাকার কিয়দংশ প্রতিবারই নদীগর্ভে বিলীন হইতেছে। ভাঙন এইভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের আশঙ্কা হয় জঙ্গীপুর শহরের বসতি অঞ্চলও ভবিষ্যতে কাটিয়া যাইতে পারে। আরও উদ্বেগের বিষয় এই যে, জঙ্গীপুর কলেজের নব-নির্ম্মিত ভবনটি একেবারেই নদীর তীরবর্ত্তী। কাজেই ভাঙন একটু তীব্রতর হইলেই এই মূল্যবান অট্টালিকাটিও আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

"এ অবস্থায় আমাদের মনে হয় এখন হইতে যদি ভাঙন প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তবে অদূরভবিষ্যতে শহরটিকে রক্ষা করা দুরূহ হইতে পারে। আমাদের মনে হয় নবোদ্ভূত চড়টিকে যদি ড্রেজার দ্বারা সরকারী ব্যয়ে এখনই কাটিয়া ফেলা হয় তবে অতি সহজেই জঙ্গীপুরের পারে জলের চাপ রোধ করা যাইতে পারে ও শহরটিও রক্ষা পায়। আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি।"

বাঁকুড়া শহরে বিদ্যুৎ কোম্পানীর অব্যবস্থা

১৯শে আষাঢ় "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় "শ্রীদুর্ম্মুখ" লিখিতেছেন যে, বাঁকুড়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী কর্ত্তব্যকর্ম্মে যেরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে সমগ্র শহরটি একটি "মৃত্যুর ফাঁদে" পরিণত হইতে চলিয়াছে। বৈদ্যুতিক লাইনগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। "সামান্য বৃষ্টি হইলেই (ঝড় হইলে কথাই নাই) লাইনের এখানে-ওখানে সর্ট-সার্কিট হইয়া যায়, কোথাও পোল-চার্জ হইয়া থাকে, পাশের গাছ বা দেওয়ালে লাগিয়া তাহাকেও বিপজ্জনক করিয়া তোলে। প্রায় সর্ব্বত্রই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কমার্স বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই।"

উক্ত পত্রিকার ৫ই আষাঢ় সংখ্যায় বাঁকুড়া শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানীটি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর অভিযোগ করিয়া বলা হয়: "আমরা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ইহুদী কোম্পানীর বহু অন্যায় এবং লাইসেন্সের সর্ত্তবিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। জানি না কোন রহস্যময় কারণে তাহার প্রতিকার পাওয়া দূরের কথা, কোম্পানী সর্ব্বতোভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সমর্থন' পাইতেছে। কমার্স ডিপার্টমেণ্ট প্রায় সব জেলার শহরের বৈদ্যুতিক কোম্পানীগুলির (বর্দ্ধমান, সিউড়ী, মালদহ প্রভৃতি) লাইসেন্স যে কারণে বাতিল করিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী অন্যায় কাজ বেপরোয়াভাবে করিয়া চলা সত্ত্বেও ইহুদীদের কিছু করিতেছেন না।"

নাগা বিদ্রোহ

আসামে বিদ্রোহী নাগাদলগুলি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেছে। এ বিদ্রোহের অবস্থা এখন গুরুতর সন্দেহ নাই। প্রথম দিকে এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ না করায় অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে বর্ষা নামায় এ অঞ্চলে প্রতিরক্ষা দুরূহ দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে আসাম সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি, পুলিসের ও সৈন্যদলের সংবাদ সংগ্রহে অকৃতকার্য্যতা এবং ভৌগোলিক বাধাবিঘ্ন সবকিছুই আছে। উপরন্তু কেহ কেহ বলেন যে, বিদেশ হইতে নাগাদিগকে অস্ত্র সরবরাহও করা হইতেছে। সেই সম্পর্কে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হইল।

"নয়াদিল্লী, ১৫ই জুলাই—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ এখানে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নিকট নাকি বলিয়াছেন যে, নাগা বিদ্রোহীরা বর্ত্তমানে বৈদেশিক সূত্র হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। তাহাদের হাতে যে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, তাহা গত মহাযুদ্ধের শেষদিকে মিত্রসৈন্য ও জাপানী সৈন্যরা ফেলিয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি জানান।

আজ দলীয় সভায় কয়েকজন সদস্যের অনুরোধে পণ্ডিত পন্থ নাগা সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন। প্রকাশ পণ্ডিত পন্থ আরও বলেন যে, নাগা সীমান্তে অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সময় লাগিবে। কারণ সামরিক বাহিনী অভিযান পরিচালনাকালে শান্তিপূর্ণ নাগাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাইতে চাহেন না।"

পণ্ডিত নেহরু ও ব্রিটেনের সংবাদপত্র

বিগত ৩রা জুলাই শ্রীনেহরু ও নিউজীল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিডনী হল্যাণ্ড লণ্ডন নগরীর শ্রেষ্ঠ পৌর সম্মান "ফ্রীডম অব দি সিটি অব লণ্ডন" দ্বারা ভূষিত হন। লণ্ডনের "গিলডহল"-এ সম্মানদান উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মানের তাৎপর্য্য সম্পর্কে "রয়টার" বলিয়াছেন, "পৃথিবীবাসীর অথবা কমনওয়েলথের কিম্বা ব্রিটিশ জাতির সেবায় বিশেষ উচ্চ পর্য্যায়ের কল্যাণকর কার্য্য কেহ করিলে তাঁহাকে 'ফ্রীডম অব দি সিটি অব লণ্ডন' সম্মানে ভূষিত করা হয়। যাঁহারা এই সম্মান লাভ করেন, তাঁহাদের নাম 'রোল অব ফেম'-এ (উচ্চসম্মানে ভূষিত বিখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের তালিকা) পঞ্জীভুক্ত হইয়া থাকে।"

অতীব বিস্ময়ের বিষয় এই যে লণ্ডন নগরীর এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সংবাদ লণ্ডন নগরীর অধিকাংশ সংবাদপত্রই প্রকাশযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। ৮ই জুলাই-এর "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় উক্ত পত্রিকার লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা শ্রীজেমস কাওলে এই ঘটনা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। শ্রীকাওলে লিখিতেছেন যে, ভারতীয় জনসাধারণ ভারতীয় সংবাদপত্রে লণ্ডন নগরীতে শ্রীনেহরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া পুলকিতচিত্তে হয়ত ভাবিয়া থাকিবেন যে,

ব্রিটিশ জনসাধারণও নিশ্চয় সংবাদপত্র পাঠে ঘটনাটির গুরুত্ব অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। ব্রিটেনের জাতীয় পত্রিকাগুলির অধিকাংশই এই ঘটনাটিকে কোনরূপ স্বীকৃতি দান করে নাই। "মেল", "হেরাল্ড", "নিউজ ক্রনিকল", "মিরর", "স্কেচ" পত্রিকার পাঠকগণ বৃথাই ঐ ঘটনাটির সংবাদ অনুসন্ধান করিবেন— কারণ ঐ পত্রিকাগুলির কোনটিতেই গিলডহল অনুষ্ঠানের কোনরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। "এক্সপ্রেস" পত্রিকাটিতেও অনুষ্ঠানের কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই, তবে এই উপলক্ষ্যে পত্রিকাটি সম্পাদকীয় কলমে শ্রীনেহরুর প্রতি একটি কটাক্ষ হানিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই ভাবে ঐ ছয়টি পত্রিকার এক কোটি বাট লক্ষ পাঠক গিলডহল অনুষ্ঠান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকিয়া যাইতেন যদি না ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের দৈনিক সংবাদ বুলেটিনে উহার খবর প্রচারিত হইত।

শ্রীকাওসে লিখিয়াছেন যে, লণ্ডনের পত্রিকাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র "টাইমস" ও "টেলিগ্রাফ" পত্রিকা দুইটিতেই শ্রীনেহরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন বক্তৃতার যথোপযুক্ত সারমর্ম কেবলমাত্র "টাইমস" পত্রিকাই প্রকাশ করে।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি কথাও প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য "গার্ডিয়ান" সম্পাদকীয় পাতায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে জনসাধারণের উদাসীনতার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। ফ্লিট ষ্টীট দিয়া বিগত ৪০ বৎসর যাবত যতগুলি শোভাযাত্রা গিয়াছে তাহাদের প্রত্যক্ষদর্শী অনেক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "গিলডহল" অনুষ্ঠানের সময় যে উদাসীনতা দেখা গিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব।

বলা বাহুল্য, এইরূপ উদাসীনতায় ভারতের কোনই লোকসান নাই; বরঞ্চ লাভ আছে। ব্রিটিশ জনসাধারণ যে কি বস্তু তাহার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়।

ষ্টালিনের নিন্দা ও কম্যুনিষ্ট সমাজ

সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক দলের ভূতপূর্ব নেতা যোসেফ ষ্টালিনকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করার ফলে বিশ্বের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা দিয়াছে অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের অভিমতে তাহার সঙ্গে কেবলমাত্র ষ্টালিন-ট্রটস্কী বিরোধিতার সময়কার অবস্থাকেই একমাত্র তুলনা করা চলে। যে ষ্টালিনকে একদা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রচার করিত আজ তাহাকেই প্রকারান্তরে প্রবঞ্চক, হত্যাকারী, কাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৎসরখানেক পূর্ব্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ষ্টালিনকেই রাশিয়ার জনসাধারণের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়া বলা হইতেছে যে, ষ্টালিন রাশিয়াকে রক্ষা করা দূরে থাকুক উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্কেত পাওয়া সত্বেও তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। যাহারা "বার্লিনের পতন" শীর্ষক সোভিয়েট ছায়াচিত্রটি দেখিয়াছেন তাঁহারাই স্মরণ করিবেন যে, ছবিটিতে সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধে জয়লাভের প্রধান কৃতিত্ব ষ্টালিনকেই দেওয়া হইয়াছে। সমসাময়িক অসংখ্য সোভিয়েট পত্রপত্রিকাতেও ষ্টালিনকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি বলা হইতেছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েট বিজয়ে ষ্টালিনের কোনই কৃতিত্ব নাই— যুদ্ধবিজয়ের যাহা কিছু কৃতিত্ব তাহা সোভিয়েট জনসাধারণের এবং সেনাপতিমণ্ডলীর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষণ ব্যাপারে কাহার ভূমিকা কিরূপ সে সম্পর্কে বর্ত্তমানে নূতন করিয়া একটি চলচ্চিত্র মস্কোতে নির্মিত হইতেছে।

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক ষ্টালিনের এই প্রকাশ্য নিন্দায় বিশ্বের কম্যুনিষ্ট মহলে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা কোনদিন প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমালোচনা করেন নাই তাঁহারাও সোভিয়েট রাষ্ট্র, নেতৃবৃন্দ এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট মহল হইতে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ সমালোচনা করা হইয়াছে এই জন্য যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ষ্টালিনের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ যে গোপন রিপোর্ট প্রদান করেন তাহা প্রকাশের পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে জানান হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা ষ্টালিনের এইরূপ একতরফা নিন্দাবাদ করাকেই নিন্দা করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, ষ্টালিনের জীবিতকালেই কেন ষ্টালিনের এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় নাই।

ইউরোপের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে ইটালী, ফ্রান্স, বৃটেন ও নরওয়ের কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সাম্প্রতিক ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিও সোভিয়েট পার্টির সমালোচনা করিয়াছে। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সমালোচনা না করিলেও ষ্টালিনের গুণাবলীর প্রতি পার্টি সদস্যদিগকে সচেতন থাকিবার জন্য যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছে তাহাতে ষ্টালিনের একতরফা নিন্দাবাদের প্রচ্ছন্ন সমালোচনাই করা হইয়াছে।

তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাহার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন ইটালীর বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীপামিরো তোগলিয়াত্তি। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন কেন বর্ত্তমান সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ষ্টালিনের জীবদ্দশায় এই সকল সমালোচনা প্রকাশ করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কি ত্রুটির ফলে ষ্টালিনের মত স্বেচ্ছাচারীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। বৃটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টিও তোগলিয়াত্তির বিবৃতির সমর্থনে অনুরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা লেখক ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত হাওয়ার্ড ফাষ্ট বলিয়াছেন যে, এখন হইতে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধু থাকিবেন বটে তবে প্রয়োজনে উহার কঠোর সমালোচনা করিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না।

পৃথিবীব্যাপী এইরূপ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিরূপ মনোভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ যে কিরূপ পরিমাণে বিচলিত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ ৩০শে জুন সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি। উক্ত প্রস্তাবে বিভিন্ন দিক হইতে উত্থিত সমালোচনার জবাব দিবার চেষ্টা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ষ্টালিনের জীবদ্দশায় তাঁহার সমালোচনা না করিবার কারণ সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কাপুরুষতা নহে। সকল সময়েই ষ্টালিনের বিরুদ্ধে একটি লেনিনবাদী চক্র দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করিয়া যাইতেছিল বলিয়া প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে। ইটালীয় কম্যুনিষ্ট নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তির বিবৃতির সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনরূপ গলদের জন্য ষ্টালিনের মত স্বেচ্ছাচারীর আবির্ভাব ঘটিতে পারিয়াছিল বলিয়া তোগলিয়াত্তি যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপরিবৃত পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রহিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে ঐতিহাসিক অবস্থায় ছিল তাহাতে ক্ষেত্র এবং সময় বিশেষে সোভিয়েট রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সংকোচসাধন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐরূপ ঐতিহাসিক অবস্থার জন্যই ষ্টালিনের স্বেচ্ছাচারিতার অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টি যেরূপভাবে তাহাদের শেষ প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তাহাদের [illegible]িক অশান্তি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের [illegible]হারকে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতরূপে দেখিয়া ধরিবার জন্য মানসিক [illegible]লতাও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা কোন প্রশ্নেরই যথাযথ [illegible] না দিয়া বিশ্বের কম্যুনিষ্টদিগের ভাবাবেগ উদ্বেলিত করিবার [illegible]সে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে সহায়তা না করিতে আহ্বান [illegible]ইয়াছে। বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য [illegible]র পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আবেদন করিয়াছে। [illegible] প্রচ্ছন্ন অর্থ সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার দোহাই পাড়িয়া [illegible]ণর দেশগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মুখ বন্ধ করা। সেই [illegible] যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই তাহার প্রমাণ ষ্টালিনের সমালোচনা [illegible] ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক [illegible]। ভারতীয় পার্টি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের আচরণের সমা[illegible] করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্ব মুহূর্তে সোভিয়েট পার্টির [illegible]টি প্রকাশিত হওয়ায় ভারতীয় পার্টি একটি অপেক্ষাকৃত [illegible]য়েম প্রস্তাব পাশ করিয়াছে।

সোভিয়েট পার্টির প্রস্তাবে যে কয়টি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর [illegible] তাহা হইল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে লেনিনবাদী চক্র থাকিয়া থাকিলে সেই চক্রের সদস্য কাহারা ছিলেন? এতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট পার্টি ত ষ্টালিনকেই লেনিনের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছিল। ষ্টালিনের জীবিতকালে ষ্টালিনের প্রকাশ্য নিন্দা করিতে অসমর্থ হইলেও কেন তাঁহারা ষ্টালিনকে প্রশংসা করিয়া মাথায় তোলেন? "ষ্টালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা", "ষ্টালিন সংবিধান" প্রতিটি কার্য্যের জন্য ষ্টালিনকে সকল কৃতিত্ব অর্পণ ইহা কি কেবল একা ষ্টালিন দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল?

সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলির সত্যবাদিতা

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্র এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সংগঠনগুলির দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির "লাইন" সঠিক প্রমাণ করিবার জন্য সংবাদপত্রগুলি অনেক সময়েই যে সত্য গোপন করে অথবা বিকৃতরূপে প্রকাশ করে সে সম্পর্কে বহু দিন হইতেই অভিযোগ করা হইতেছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সাম্প্রতিক রুশ সফরের সময় সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বক্তৃতার অংশবিশেষ প্রকাশ করে নাই।

এতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট সংবাদপত্র কর্তৃক সত্য গোপনের অভিযোগ কম্যুনিষ্টরা স্বীকার করিতে চাহিত না। সম্প্রতি তাহারাও সোভিয়েট পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে সত্যগোপনের অভিযোগ করিতেছে। নিউ ইয়র্ক "ডেলী ওয়ার্কার" (মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র) পত্রিকার এক প্রবন্ধে পত্রিকার বৈদেশিক সম্পাদক শ্রীযোসেফ ক্লার্ক মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ইউজিন ডেনিস কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ "প্রাভদা" পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশের সময় সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইহুদীদের উপর নির্যাতন সম্পর্কে শ্রীডেনিসের কয়েকটি মন্তব্য বাদ দিয়া ছাপানর জন্য "প্রাভদা" পত্রিকার নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ইহাই ধারণা থাকে যে, ডেনিসের মন্তব্য সত্যানুগ নহে তবে তাঁহারা বক্তব্যটি বাদ না দিয়া উহা প্রকাশ করিয়া অভিযোগটির সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিতেন।

শ্রীক্লার্ক লিখিতেছেন, "উপরন্তু, বিগত পঞ্চম দশকের শেষার্দ্ধে শ্রেষ্ঠ ইহুদী সোভিয়েট লেখক ও কবিদের শারীরিক বিনাশ (physical annihilation) সম্পর্কে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কৈফিয়ত দেওয়া বহুদিন হইতেই প্রয়োজন হইয়াছে।"

শ্রীক্লার্ক সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রেসিডিয়ামের নূতন মহিলা সদস্যা একাটেরিনা ফারতসেভাকে তিরস্কার করিয়াছেন। বামপন্থী "ন্যাশনাল গার্ডিয়ান" পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী ফারতসেভা সোভিয়েট রাষ্ট্রে ইহুদীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দিবার অভিযোগ অস্বীকার করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে ইহুদী নেতৃবৃন্দের জীবনাবসান ঘটাইবার অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

তৃতীয় পর্ব

মিলন ও বিরহ

ভারতীয় প্রেমসাধনায় দেহের স্থান আছে ; দেহাতীত যে প্রেম তারও গুণকীর্তন বিরল নয়। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে ঐন্দ্রিয়জ কামের কথা একটু বেশী বলা হয়েছে। দেহাতীত যে প্রেম তার কথা কমই শুনেছি দেবভাষার মুখপাত্রদের মুখে। মহাকবি কালিদাস বারবার নিছক দেহজ কামনার কথা বলেছেন। ভোগতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে সে যুগের কাব্যে ও সাহিত্যে। স্মরণ করুন শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনের কথা। দুষ্মন্তের ভোগলিপ্সার উগ্রতা রুচিবান সহৃদয় পাঠককে ক্লিষ্ট করে। দেহোত্তীর্ণ যে প্রেম তার আবেদন হয় ত সে যুগের মানুষের কাছে ধারণাতীত সূক্ষ্ম বস্তু ছিল। এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মহাকবি কালোত্তীর্ণ হলেও সমকালীন প্রভাব তাঁর মননে এবং কথনে থাকবে। 'ইথস্' গণমানসের প্রতিফলন। নীতিশাস্ত্রবিদ্‌রা বলেছেন যে, মানুষকে তার সমসাময়িক নৈতিক আবহাওয়া থেকে নৈতিক শুচিতা এবং অশুচিতা, দুটোকেই কিছু পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়। দেশের মানুষের মনে যদি দেহজ কামনার জোয়ার জাগে তবে কবির মনের তটেও সে ঢেউ এসে আঘাত করে। কবি দেহের জয়গান করেন, জয়গান করেন মিলনের; সে মিলনে দেহের আকৃতির পরিসমাপ্তি। সে আকুতির তীব্রতা নানান বর্ণে চিত্রিত হয়েছে অনেক কবির লেখনে।

কালিদাস বললেন এই দেহজ মিলনের কথা তাঁর অনন্যসুন্দর ভাষায়। স্বল্পখ্যাত কবিরা মহাকবিকে অনুসরণ করলেন। কবি নরসিংহ, মনোবিনোদ, রাজশেখর, শ্রীহর্ষদেব, ধর্মকীর্তি এঁরা সকলেই প্রেমের মধ্যে কামের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেহজ ভোগ ও ইন্দ্রিয়জ তৃপ্তিকে এঁরা প্রেমসাধনার প্রধান সহচর হিসাবে দেখেছেন। এ যুগে হয়ত এই ধরনের প্রেম-ধারণা আমাদের কাছে খুব বেশী গ্রহণযোগ্য নয়। দেহজ কামের মোহকে আমরা অতিক্রম করে প্রেমের অমরাবতীর সন্ধান করে ফিরছি দেহবিমুখ আত্মিক শুদ্ধ প্রেম-ধারণার মধ্যে। একথা শুধু ভারতবর্ষেরই কথা নয় ; এ তত্ত্ব আজ সারা পৃথিবীর সত্য। ইংলণ্ডের কথাই বলি। সেখানেও আজ সাধারণ মানুষের কাছে দেহজ মিলন প্রেমসাধনার একমাত্র পরিণতি হিসাবে গৃহীত হচ্ছে না। ওয়ালটার এম. গালিচান বলছেন তাঁর "Sexual Apathy and Coldness in Woman" শীর্ষক গ্রন্থে :

"Platonic affection so-called is far more usual than it was fifty years ago in England. A host of youths and maidens are good Companions, without any obvious intrusion of actually erotic interest."

বিংশ শতাব্দীতে প্রেম দেহবিমুখ হয়েছে, শুধু কাব্যে বা সাহিত্যে নয়, রক্তমাংসে গড়া মানুষের জীবনে।১ কথাটা অদ্ভুত শোনালেও পণ্ডিতজনেরা একথা বলেছেন। এর সপক্ষে নজীর আছে।

অবশ্য আধুনিক-পূর্ব যুগেও দেহোত্তীর্ণ প্রেমের কথা যে সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের একেবারে শোনায় নি তা নয়। মহাকবি ভবভূতির মধ্যে আমরা এই দেহধারার উত্তরণ লক্ষ্য করি। ভবভূতি আমাদের এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকের সন্ধান দেন, যেখানে দেহকামনা নিবৃত্তি লাভ করেছে। দেহ যেখানে অতিরিক্ত, বিদেহী প্রেমের সেই রসরাজত্বই ত যথার্থই প্রেমিকের লীলাভূমি। সম্ভোগ থেকে দেহ-ভোগাতীত রসধারায় অবগাহন করে মানুষ যে গভীর আনন্দ লাভ করে তার জুড়ি মানুষের অভিজ্ঞতায় বিরল। এই স্থায়ী প্রেমরসেই যথার্থ প্রেমিকের পরিতৃপ্তি। কি মিলন, কি বিরহ কোথাও ভবভূতি নিছক দেহাশ্রয়ী হয়ে পড়েন নি ; তাই তাঁর কাব্যও এই দেহমুখীনতা থেকে মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এই দিক থেকে ভবভূতির উত্তরসাধক। কালিদাসপ্রমুখ দেহবাদী কবিদের প্রভাব হয়ত কিছু কিছু পড়েছে 'কড়ি ও কোমল' থেকে আরম্ভ করে 'মানসী'র কোন কোন কবিতায়, কিন্তু 'মহুয়া'র রবীন্দ্রনাথকে অসংকোচে ভবভূতির পদানুসারী বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্লেটনিক প্রেম-ধারণায় বিশ্বাসী, একথা আমরা আগেই বলেছি।২ এ প্রেম দেহবিমুখ। মনের মিলন অনাড়ম্বর, দেহের মিলনে আড়ম্বর আছে। দেহের প্রত্যাশা, তার পূর্তিজনিত উল্লাস, না পাওয়ার বেদনায় দেহের বিকার, এ সবের বর্ণনার ক্ষেত্র সুপরিসর। কিন্তু মনের আকাশে কোন বাধাই ত বাধা নয় ; সেখানে মিলনও যেমন সহজে ঘটে, বিরহও তেমনই স্বাভাবিক। কোথাও কোন রং নেই ; বর্ণসমারোহের অবকাশই বা কোথায় ? মন হ'ল ইন্দ্রিয়-

১। ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'রবিদীপিতা' দ্রষ্টব্য

২। প্রবাসী, বৈশাখ ও আষাঢ়, ১৩৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

গোচরতার বাইরে ; তাই তার বিকারকে বোঝাতে হলে উপমার আশ্রয় নিতে হয়। বাইরেকার প্রকৃতি থেকে চিত্র আহরণ করতে হয় আন্তরপ্রকৃতিকে দুটি হৃদয়ের মিলন-মাধুর্যটুকুকে বোঝাবার জন্ত। অন্তরলোকে এই গভীর মিলনের রসঘন চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কল্পনার রঞ্জনরশ্মির সহায়তায়। দুটি মনের মিলনে আদিরস অবিরল ধারায় ঝরিয়ে দেওয়া যায় না। আর এই আদিরসের ছোঁয়াচ না থাকলে মিলনচিত্র বা মিলনদৃশ্য উতরে যায় না। এ হ'ল সাধারণ নিয়ম। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি আদিরসের প্রাবল্য না ঘটিয়েও শুদ্ধ আত্মিক প্রেমের নায়ক-নায়িকার হাজারো ছবি আঁকলেন। কোথাও দেহের আবিলতা রইল না। সর্বত্রই দেহকে তিনি অনায়াসে অতিক্রম করে মনলোকের সীমাহীন বিস্তৃতিতে দুটি হৃদয়ের মিলন ঘটাবার সুযোগ দিলেন। আলো জ্বলল না, বাঁশীও বাজল না দেহের কিনারে কিনারে ; কিন্তু মনের নীলিমায় আকাশপ্রদীপ জ্বলে উঠল লক্ষ বর্তিকায় আর শাঁখ বেজে উঠল শুভ-মিলন ঘোষণা করে। দেহের মিলনকে বর্ণনা করা সহজ ; অ-দেহী যে মিলন তার ছবি আঁকা দুরূহ। তাই কি মহাকবি কালিদাস মিলনের আদিরসাশ্রিত ছবি আঁকলেন ? হয়ত বা সে যুগের রুচিকে, সে যুগের মানুষের হাততালিকে বেশী মূল্য দিয়ে মহাকবি আপনার কাব্যে দেহজ প্রেমকেই প্রাধান্ত দিলেন। ভবভূতির মত হয়ত কালিদাস আশাবাদী ছিলেন না। নিরবধি কাল, বিপুল পৃথিবীর কথা ভেবেও তিনি হয়ত ভবিষ্যতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তাই বিদায় নিলেন নগদ মূল্যে। এ কথা স্বীকার্য যে বিদেহবাদ, যা আমরা রবীন্দ্রনাথে পেয়েছি, বিরহমিলনের চলচ্ছবি আমাদের উপহার দেয় না। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শন ক্ষুদ্র থেকে ভূমায় যাওয়ার ইতি-কথা। তাই ত প্রেমদর্শনেও তিনি দেহের ক্ষুদ্রতাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন। মহুয়ার রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি দেহবিমুখ প্রেমের উপাসক ; তাই ত মহুয়া কাব্যগ্রন্থে দুটি নরনারীর মিলননিবিড় মধুর ছবির একান্ত অভাব। দেহের জন্ত দেহীর যে ব্যাকুলতা, তজ্জনিত সুগভীর বিরহ-বেদনার আভাস এই কাব্যগ্রন্থখানির কোথাও নেই। সাধারণ অর্থে মিলন, বিরহ এরা মহুয়ার প্রেমের জগতে অবান্তর, অতি-রিক্ত। মহুয়ার কবি আত্মিক মিলনে বিশ্বাসী, তাই ত সেখানে আশাবাদের ক্ষেত্রও সুবিস্তৃত। ব্যর্থ প্রেমিকের নৈরাশ্য বেদনা কবির প্রেমের জগতে অনুপস্থিত ; প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের সন্দেহ দোলায় যে ছন্দ, যে রস, যে মাধুর্য, তার আভাসটুকুও কবির প্রেমের জগতে নেই। যে পুরুষ বিশ্বাস করে যে, নারীর প্রেমে তার অধিকার হ'ল জন্ম-জন্মান্তরের এবং এ অধিকারটুকু বিধাতার অদৃশ্য লিখনের ফলস্বরূপ, তাকে ত নারীর ছলাকলা প্রতারিত করতে পারে না। সে জানে নারীর প্রেমলীলার পরিণতি। সে পুরুষের জীবনে না-পাওয়ার বেদনাও তীব্র হয়ে উঠতে পারে না। সে জানে ক্ষণিক বিরহের পরে মিলন অবধারিত। তাই ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শন আশাবাদিতায় ভরপুর। নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ চিত্তে কবির মানসপুত্র তার প্রেয়সীর আগমন প্রতীক্ষা করে। কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে তাঁর প্রেমদর্শন গভীর ভাবে সম্বদ্ধ। কবির জীবনদর্শনের মর্মবাণীটি নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে :

> 'যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
> ইন্দ্রের অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
> মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত,
> তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
> নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।'
>
> (জন্মদিন, সেঁজুতি)

বুভুক্ষুর লালসাকে কবি জীবনের সব কর্মে অপাংক্তেয় করে রেখেছেন। প্রেমের রাজ্যেও তার প্রবেশ নেই। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যকে কবি প্রতিষ্ঠা করেছেন জীবনের সকল প্রয়াসে। এ বৈরাগ্য মিলন এবং বিরহকেও নতুন মর্যাদা দিল। সর্বকর্মে নিরাসক্তি, গীতোক্ত সেই পরম নিষ্কাম কর্মের আদর্শ কবির জীবনের মূলে বাসা বেঁধেছিল। তাই শুনি কবিকণ্ঠে বার বার নিরাসক্ত তপস্বার শান্ত বাণী। 'অপরাজিত' কবিতায় নিস্পৃহ প্রেমিকের প্রেমগাথা গাইলেন কবি। আকাশচারী মেঘপুঞ্জ হাওয়ায় দিগবলয় প্রত্যাশী হয়। এদিকে নিয়ে নিবিড় অরণ্য। সে চায় মেঘের স্নেহস্পর্শ। সহস্র বাহুর শ্যামল অঙ্গুলি ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানায়। তবু সে কামনায়, সে মিলনাকুতিতে 'সবলা'র দার্ঢ্য আছে, লালসার লোলুপতা সে কামনাকে কলুষিত করে না। অরণ্যের আমন্ত্রণ বুঝি ব্যর্থ হয়। বিমুখ মেঘ চলমান। নারীর চিরন্তন ছলাকলা অধরের মায়ামাধুর্য বিকাশের অনুকূল। তাই মেঘের এই লীলা। অরণ্যের প্রতিনিধি বনস্পতির সুপ্ত পৌরুষ আপনাকে প্রকাশ করে নবতর তপস্যার পথে। বনস্পতি তখন :

> 'নিঠুর তপে মগ্ন জপে নীরব অনিমেষে
> দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।'
>
> (অপরাজিত, মহুয়া)

দহনজয়ী সন্ন্যাসীর দুশ্চর তপস্যায় বনস্পতি প্রেমের সাধনা করে। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে অচিরেই। অরণ্যানীর বুকে আকাশের জলভরা মেঘের আত্মনিবেদনের ধারা পূর্ণ হয়। পুরুষ এবং নারীর দেহাতীত আত্মিক মিলন

সম্ভব হ'ল তপস্যার, সন্ন্যাসের অ-কল্পিত পথে। জয় হ'ল পুরুষের, জয় হ'ল নারীর। নারীও এই পরম প্রেম-গর্বের অংশভাগী। কবির মানসপুত্রই শুধু আপন প্রেমের সার্থক পরিণতি সম্বন্ধে আশাবাদী নয়, তাঁর মানসকন্যাও জানে যে, তার কাঙ্ক্ষিত তারই পাশে ফিরে আসবে পরম মিলন লগ্নে। পুরুষের বিবাগী চিত্ত অশান্ত, ভ্রান্তিহীন তার বিহার। তবু সব শেষে দুটি ডাগর কালো আঁখির তিরস্কার মাথায় বয়ে তাকে ফিরে আসতে হবে তার প্রিয়তমার অঞ্চল-ছায়ায়। তাই পরম নির্ভয়ে রমণী বলে :

"হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হ'তে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ লিখন—
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণ দ্বারে
যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।"
(প্রত্যাগত, মহুয়া)

প্রেমের শেষ হ'ল মিলনে। এই পরম আশার কথা কবি আমাদের বার বার শুনিয়েছেন, কখনও পুরুষের মুখ দিয়ে আবার কখনও বা নারীকণ্ঠে সে কথা শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের মূল জীবনদর্শনের সঙ্গে এর নিবিড় যোগ রয়েছে। যে আশাবাদের আলোয় রবীন্দ্র-জীবনদর্শন ভাস্বর, তারই প্রতিফলনে তাঁর প্রেমাদর্শও উজ্জ্বল।

নরনারীর মিলন ভোগাসক্তি রহিত। বর্ষার অতিরিক্ততার মধ্যে এ মিলন সংঘটিত হয় না। বসন্তের রাগরক্ত সমারোহেও এই মিলনের আসন পাতা হয় না। বর্ষার ধরিত্রী সৃষ্টি-সম্ভবা। সৃষ্টির ইঙ্গিতটুকু বুঝি প্রয়োজনকে প্রচ্ছন্ন রাখে। প্রয়োজনের দরবারে প্রেম ত কুর্নিশ করে না, প্রেম যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বসন্তের প্রকৃতিও বুঝি বর্ণ সম্ভারের আচ্ছাদনে আপনার আদিম বাসনার তৃপ্তি খোঁজে। তাই ত কবিকল্পিত মিলন-বাসর এই দুই ঋতুকেই পরিহার করে চলে। এ মিলন দেহচর্চা নয়, এ মিলন হ'ল নির্লিপ্ত, আত্মসাধনায় তৎপর দুটি হৃদয়ের পরস্পর সন্নিধি লাভ। এই নারী ও পুরুষের আদর্শ হ'ল উমাপতি শিব ও শিবপ্রিয়া উমা। তাই তাদের মিলনও পরম বৈরাগ্যের গৈরিক তিলক লাঞ্ছিত। রবীন্দ্রনাথ এই মিলন বাসরের ছবি আঁকলেন তাঁর অনুপম ভাষায় :

"বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিণী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।
দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিল প্রবাসী।
সেই স্নিগ্ধ ক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে
পূর্ণতায়—গম্ভীর অম্বরে,
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তোমারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে চক্ষু নাহি জানে।"
(লগ্ন, মহুয়া)

এই হ'ল কবির চোখে মিলনের যথাযোগ্য পরিবেশ ও প্রস্তুতি। ইন্দ্রের অমরাবতী তার আনন্দের ভাণ্ডারটুকু অবারিত করে দেয় এমনিধারা নিরাসক্ত দুটি হৃদয়ের মিলন-সম্ভাবনায়। চিত্তের গহনে প্রেমাস্পদের যে রসঘন মূর্তি গড়া হয়েছে সে ত চির-অদেখা। কখনো হয়ত তার চকিত আবির্ভাব ঘটে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষে। তাই ত ভাল লাগে নারীর একটি বিশেষ পুরুষকে এবং পুরুষের একটি বিশেষ নারীকে। তারা অভাবনীয়ের মাধুর্যটুকু সারা অঙ্গে মেখে নিয়ে মনোহর, অপরূপ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। দেহাতিরিক্ত মিলনের এই ধারণা স্বয়ংসম্পূর্ণ একথা আমরা আগেই বলেছি। পাত্র-পাত্রীর প্রয়োজনও সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ তাদের আবশ্যকতার ব্যাপ্তি। কোন বাধাই হৃদয়ের গতি-পথকে বাধা দিতে পারে না। বাইরের দুস্তর ব্যবধান অনায়াসে অতিক্রম করে দুটি হৃদয় পরস্পরের সন্নিধি লাভ করে। দেহের দূরত্ব মনের নৈকট্যকে কখনো খর্ব করে না। কবির প্রেম-ধারণা এমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, প্রেম-নিবেদনেই প্রেমের সার্থকতা এমন কথাও কবি বললেন। গ্রহণটাও সেখানে অবান্তর। আত্মনিবেদন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। নারী পুরুষকে বলে :

"বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে
তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষতি—
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে
চরণে তব গোপনে তার গতি।"
(দিনান্তে, মহুয়া)

কবির প্রেমদর্শনে বিরহ-বিচ্ছেদ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। হৃদয়ে যে মিলন বাসা বাঁধে সে কখনও বিচ্ছেদের দ্বারা খণ্ডিত নয়। এ মিলন-স্পর্শ—সোহাগ, বাহুবন্ধন ও চুম্বনের দ্বারা চিহ্নিত নয়; পুলক, স্বেদ, মূর্ছা এই সব প্রেমলক্ষণও এই আত্মিক মিলনের জগতে অবাঞ্ছিত। দুটি হৃদয় আপন

আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পরস্পরকে একান্তভাবে আশ্রয় করে ; যখন একের সত্তা অপর একটি সত্তার মধ্যে অনুস্যূত হয় তখনই মিলন পূর্ণ হয়। এই পরিপূর্ণ মিলনের ছবি এঁকেছেন কবি :

"শুভক্ষণ আসে সহসা আলোক জ্বেলে,
মিলনের সুধা যার ভাগ্যে মেলে।
একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দু'জনার যোগে পরম একের ঠাঁই
সে একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে।"
(পরিণয়, মহুয়া)

প্রেম একটি সত্তাকে অপর একটি সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে। অন্তরে অন্তরে যেখানে বিরহ, সেখানে মিলনও সহজ। মানসিক প্রস্তুতিটুকু সম্পূর্ণ হলেই মিলন হয় হৃদয়ে হৃদয়ে। একটি হৃদয় দেশকালের বেড়া ভেঙ্গে আর একটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাই ত আমরা বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ইন্দ্রলোকে নিত্য মিলন, নিত্য বিরহ। কোন অলক্ষ্য পথে বিরহ পূর্ণ হয় মিলনের সুধারসে, আবার মিলন বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে লাঞ্ছিত হয় সে কথা বলা শক্ত। দেহাতীত প্রেম নৈর্ব্যক্তিক। বিলাসী ব্যক্তিসত্তা অবিলাসী প্রেমকে স্পর্শ করে না, কেননা প্রেম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আশ্রয়ী নয়। আত্মার চিন্ময়লোকে প্রেমের অধিষ্ঠান। তাই ত কবি বারংবার আত্মাকে এবং প্রেমকে মৃত্যুহীন বলে ঘোষণা করলেন :

"তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্য লোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চির স্পর্শমণি :
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।"
(অন্তর্ধান, মহুয়া)

ব্যক্তির অন্তর্ধান তার আপন শূন্যতাকে পূর্ণ করে আপনার চিন্ময় রূপ-মাধুর্যে। অবস্থান এবং অন্তর্ধান সমর্থক হয়ে উঠেছে কবির প্রেমদর্শনে। রমণী কোন্ 'চিরস্পর্শমণির' আসল উজ্জ্বলতায় কবির বেদনা-বিহ্বল চিত্তে শান্তি-বারি সিঞ্চন করে, সে তত্ত্ব চিররহস্যে ঢাকা। তবু এ কথা কবির কাছে অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে, তার প্রিয়ার বিচ্ছেদ-শূন্যতা পরম মাধুর্যে আপনাআপনি ভরে ওঠে। রমণীর দান অলক্ষ্য পথে আসে, আত্মার গোপন পথে তার গতায়াত। কবির মানসকন্যা যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত পুরুষকে বলবে :

"—কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃত প্রদোষে
হয় তো দিবে সে জ্যোতি,
হয় তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।"
(বিদায়, মহুয়া)

তাই ত আমরা বলেছি রবীন্দ্রনাথের 'প্রেম' সকল বিচ্ছেদজয়ী।

মিষ্ট হাসি সারদার

শ্রীমহাদেব রায়

ভারতীয় সাধনায় তন্ময় তনয় যোগাচারে
একান্তে জীবন-প্রান্তে উপনীত যষ্ঠবতি-পারে—
'স্বস্তিকের বক্ষে তুমি' সারদায় ধ্যানে-আরাধনে,
ভাবে নাই কোনদিন—দিবে দেখা সাধনা-কেতনে
মান-দানে সমারোহ। অকস্মাৎ অপলকে চাহি'
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ কহে, 'হায়, আজি সেদিন ত নাহি,
স্বচ্ছন্দে নিবেদি মান্য অতিথিরে স্বাগত সম্ভার
দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে, আনিস যে বর উপহার
দ্বারে মোর সযতনে। হে অতিথি, অক্ষমতা ক্ষম',
বিশ্বের বিদ্যার পীঠ করপুটে কহে, 'নমো নমঃ,'
ত্রুটি মাগে শ্রদ্ধা ভরে যোগিজনে সঁপি' কণ্ঠহার,
অচিতের কম্প্র করে সমাদৃত অঞ্জলি সম্ভার
সঙ্কুচিত ব্রীড়া ভরে। সভাজন হেরিল অন্তরে
মিষ্ট হাসি সারদার প্রস্ফুটিত মুগ্ধ ওষ্ঠাধরে।

* বাঁকুড়া কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনব সমাবর্তনে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে ডি. লিট. উপাধি নিবেদন উপলক্ষে রচিত।

১৫

বঙ্গবালা ভূমিষ্ঠ হয়ে ব্রজবাবুর পায়ে প্রায় লুটিয়ে পড়ল।

ব্রজবাবু হঁ-হাঁ করে উঠলেন—ওকি? খানিকট পিছিয়ে গেলেন তিনি।

বঙ্গ একটু হাসল। তখন তার প্রণাম সারা হয়ে গেছে।

—এই বুঝি শিক্ষার ফল হচ্ছে!

ব্রজবাবু বঙ্গবালাকে শিখিয়েছেন—এক বাবা আর মা ছাড়া আর কারও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না। কারও পায়ে হাত দেবে না। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে আমাদের জাতটার সঙ্গে দেশটার মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। নমস্কার করবে।

বঙ্গ প্রথম দিন বলেছিল—রামজয় জ্যাঠামশাইকে নমস্কার করলে ক্ষেপে যাবেন উনি।

ব্রজবাবু হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা ওঁকে প্রণাম করবে।

—আর আপনাকে।

—খবরদার। কখখনো না।

আজ বঙ্গবালা অতর্কিতে প্রণাম সেরে উঠে হাসতে হাসতে চলে গেল। বলে গেল—আজ শুনব না আপনার কথা। আমি চা নিয়ে আসছি।

চন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাসছিলেন। উপভোগ করছিলেন তিনি গুরু ও শিষ্যার ওই মধুর আলাপটুকু।

ব্রজবাবু বললেন—আমি যে একটি কাজ করে এসেছি মাষ্টারমশাই। দুটি নূতন নিমন্ত্রণ করে এসেছি আপনার হয়ে।

—দু'জন কেন? দশ জন করলেই বা কি হ'ত? আজকের এ আনন্দ এ সাকসেস এ ত আপনার জন্মই। বঙ্গবালাই হোক—আর বিধুই হোক এদের এই সাকসেসের পিছনে আপনি যে কতখানি সে ত সকলেই জানে! কিন্তু কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করেছেন? আমি কি আবার লোক পাঠাব?

ব্রজবাবু বললেন—পাঠানো উচিত। ষ্টেশনে রয়েছেন—

—ষ্টেশনে?

—হ্যাঁ। আমাদের ছাত্র ছিল—রবি সিং।

—রবি সিং? চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু। সেই রবি সিং! ব্রজবাবুই তাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে প্রমোশনের পর এখান থেকে ট্রানসফার সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করেছিলেন। বঙ্গবালার মা যে প্রিয়দর্শন অবস্থাপন্ন স্বজাতির ছেলেটিকে দেখে বঙ্গবালার সঙ্গে বিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। কথাটা ওদিকে পৌঁছেছিল রবির কানে এদিকে বঙ্গবালার কানে। যার ফলে—

ব্রজবাবু বললেন—জানেন নিশ্চয় রবি গত বৎসর এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে!

তাও জানেন চন্দ্রবাবু। নিশ্চয় জানেন। রবি সিং এখান থেকে ট্রানসফার নিয়ে রামপুরহাট গিয়েছিল। ব্রজবাবুই পাঠিয়েছিলেন। সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করেও তিনিই তাকে সস্নেহে বলেছিলেন—তুমি রামপুরহাটে যাও। ওখানকার হেডমাষ্টার বড় ভাল লোক—আমার বন্ধু।

রামপুরহাট থেকে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করেছিল। আই-এসসি পাস করেছিল বহরমপুর থেকে সেও ফার্ষ্ট ডিভিসনে। বি-এসসি কলকাতার সেন্টজেভিয়ার্স থেকে।

ম্যাথামেটিকসে অনার্স নিয়ে পাস করেছিল। স্কলারশিপও পেয়েছিল। গত বৎসর এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। জানেন বৈ কি। তিনি জানেন—ইস্কুলের মাষ্টারেরা জানে—বঙ্গবালার মা—বঙ্গবালা এরাও জানে। এখানকার ছেলেরাও জানে। সম্প্রতি নাকি মস্ত বড়লোকের ঘরে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে তাও শুনেছেন। বিয়ের পর বিলেত যাবে।

ব্রজবাবু বললেন—ট্রেণে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে বাড়ী আসছে। আমাকে দেখে আমার গাড়ীতেই এসে উঠল। আমি নিমন্ত্রণ করলাম। চল। মাষ্টার মশায়ের বাসায় আজ সেই সত্যনারায়ণের পর এই প্রথম উৎসব। আমি নিমন্ত্রণ করছি। হয় ত রাজী হ'ত না। নানারকম ছুতো তুলছিল—বাড়ীতে বাবা মা আজই রাত্রে পৌঁছতে বলেছেন। ষ্টেশনে গাড়ী আসবে। না গেলে ভাববেন। কিন্তু শিবনাথ ওর সব আপত্তি প্রায় হেসে উড়িয়ে দিলে। না বলতে পারলে না। শিবনাথকেও বলেছি।

—শিবনাথ!

—হ্যাঁ। শিবনাথ হোম ইনটার্ণড হয়ে এল। বর্দ্ধমানে উঠল ট্রেনে।

বিশ্বগ্রামের শিবনাথ! দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে চৈতন্ত ইনস্টিটুশনের পাঠানো প্রথম সৈনিক। রতনবাবুর হাতেগড়া সেই শ্যামবর্ণ ছেলেটি! সেই পড়াশুনার চেয়ে কবিতা লেখায় অনুরাগী শিবনাথ। সে ফিরল?

কিন্তু খুব খুশী হয়ে উঠলেন না চন্দ্রবাবু। একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা হলে শম্ভুকে পাঠিয়ে দিই। শম্ভু রবির সঙ্গে পড়ত, শিবনাথের সঙ্গে ওর বেশ আলাপ আছে। ওই যাক।—কেষ্ট! শম্ভুবাবুকে পাঠিয়ে দাও ত একবার!

ব্রজবাবু বললেন—আপনি কি খুব খুশী হলেন না মাষ্টার মশাই?

—না-না না। সে কথা কেন বলছেন?

—আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ—তা একটু—। ম্লান হেসে চন্দ্রবাবু বললেন—মনের কথা আপনাকে লুকোব না। মন বিচিত্র ব্রজবাবু। খবর শুনে খুশী হই নি তা নয়, হয়েছি, সত্যই হয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আশ্চর্য্য ভাবে উল্টো রকমের চিন্তা মনে জেগে উঠছে। কি করব? রবি সিংহের কথায় মনে হচ্ছে—আজ বঙ্গ কি ভাববে? বঙ্গ হয় ত ভাববে—এর সঙ্গে ত আমার বিয়ে হতে পারত। বাবা দেন নি। বিয়ের কথাটা তার মনের মধ্যে নতুন করে বাসা গাড়বে। নিজেও ভাবছি, মেয়েকে পড়াব—এম এ পাস হয় ত করাব, কিন্তু ওকে ত সংসারী দেখে যাব না। নিজের ঘরদোর স্বামী-পুত্র সংসার—এ সাধ যে জন্মগত। বিশেষ করে মেয়েদের।

ব্রজবাবু বললেন—আমি রবিকে কিন্তু ঠিক সেই জন্তেই নিমন্ত্রণ জানালাম মাষ্টারমশাই। কথায় কথায় রবিকে বললাম, রবি সে সময় যদি মাষ্টারমশায়ের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ত তা হলে কিন্তু তুমিও এম-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে না, হয় ত এম-এ পর্য্যন্ত পড়তেই না। এত দিনে দুটি-তিনটি পুত্রকন্তার বাপ হয়ে হয় ঘরে বসে তোমার স্বচ্ছন্দ সংসার দেখতে, পাইক পেয়াদা নিয়ে সুদ আদায় করতে, পাওনাগণ্ডার হিসেবনিকেশ করতে। আর বঙ্গও ম্যাট্রিক পাস করত না। সিংহী বাড়ীর বউ গিন্নী হয়ে ঠাকুরবাড়ী থেকে বাড়ীর কানাচ পর্য্যন্ত অনাচার ইনসপেকসন করে বেড়াত। বাইরের বাড়ীতে মাটির হাঁড়িতে তোমাকে মুরগী রান্না করে খেতে হ'ত লোভ-টোভ হলে। হাসতে লাগল। বললাম—চল—তুমি এম-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ, বঙ্গ ফার্ষ্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেছে—বাড়ীতে পড়ে সেটা কম গৌরব নয় তার; ম্যাট্রিকে তুমি যা রেজাল্ট করেছিলে সেই রেজাল্টই সে করেছে। চল দেখা করে আসবে। কংগ্র্যাচুলেট করে আসবে তাকে। চুপ করে রইল। মিথ্যে কথা আমিও বলব না। আমি নিয়ে এলাম ওকে ওই জন্তই। অবশ্য বাল্যপ্রেমের খুব মূল্য আমি দিই না। কারণ বিশেষজ্ঞেরা বলেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্পবয়সের প্রেম যাকে বলে, যাতে এমন দেখা যায় যে, বাধা পেলে তারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়, আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাতেও যদি তাদের নব্বই দিন দেখাশুনো হতে না দিয়ে পৃথক করে রাখা যায় তা হলে সে মোহ তাদের কেটে যায়। ওদের যদি কেটে না থাকে তা হলে ওই দেখা হওয়া থেকে বিয়ের নতুন সুযোগ আসবে মাষ্টার মশাই।

—রবির খুব বড় ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্রজবাবু। আপনি জানেন না। চন্দ্রবাবু গভীর চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন কথা শুনতে শুনতে। উত্তরে শঙ্কিত স্বরেই কথাগুলি বললেন—মেয়ে শুনেছি সুন্দরী। বিলেত যাবার খরচ দেবে তারা। এ ক্ষেত্রে অনিষ্ট হলে বঙ্গবালারই হবে।

—ভাববেন না আপনি তার জন্ত। আমি শুধু রবির মনটা বুঝে নেব। বঙ্গবালাকে ওর কাছে একবার ছাড়া আসতে দেব না। ইউ ডিপেণ্ড অন মি। বঙ্গবালা আপনার মেয়ে কিন্তু ওকে আপনার চেয়ে আমি বেশী বুঝি। ওর ভেতরে খুব একটি শক্ত মেয়ে আছে। তাকে আমি আমার স্ত্রী দু'জনে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছি।

শম্ভু গড়াঞী এসে দাড়াল।—আমাকে ডেকেছিলেন? আপনি সার ভাল আছেন? ব্রজবাবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে শম্ভু।

—তোমরা আর আমার শিক্ষাটা নিলে না। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাটা আর ছাড়লে না। এখন বিধুর অভিনন্দনটা তুমিই নাও। কারণ এটা আসলে তোমারই প্রাপ্য। এ রেজাল্ট তোমারই করার কথা, কিন্তু সিদ্ধি-সাধনা করেই ভোম্বল বাবাজী হয়ে গেলে তুমি। এখন যাও দেখি একবার ষ্টেশনে। আমাদের রবি সিং—তোমাদের সঙ্গে পড়ত, সে নেমেছে আমার সঙ্গে। তাকে মাষ্টারমশায়ের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এস এখানে। আর গ্রামে গিয়ে শিবনাথকেও নিমন্ত্রণ করে আসবে। সেও আজ বাড়ী এসেছে হোম ইনটার্ণড হয়ে।

বঙ্গবালা চা আর রেকাবীতে খাবার নিয়ে এসে দাড়াল।

—ও ভাবনা আমার পরের ভাবনা ব্রজবাবু। আপনি রবির কথা আগে বললেন আমিও ওই কথার জবাবটাই আগে দিলাম। আমার আগের ভাবনা রবির জন্য নয়—শিবনাথের জন্য।

—ইণ্টার্ণড বলে বলছেন? না। সে ভাবনা বিশেষ নেই। তাকে পুরোপুরি ছেড়েই দেবে—তার আগে বাড়ীতে পাঠিয়েছে। ঠিক হোম ইণ্টার্ণমেণ্টও নয়, ওকে বেঙ্গলের অন্য জেলাগুলি থেকে এক্সটার্ণ করে—এই জেলাতে এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। জেলার মধ্যে কোথাও যেতে আসতে কোন বাধানিষেধ নেই। শুধু সপ্তাহে একবার থানায় গিয়ে হাজরে দিয়ে আসতে হবে।

—কিন্তু—। কুন্ঠিত ভাবেই বললেন চন্দ্রবাবু—আমার দায়িত্বের কথাটা ভেবে দেখেছেন ব্রজবাবু? এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ পুরুষের দায়িত্ব। শিবনাথ এখানে এল—এ তার বাড়ী—বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেলে, আনন্দের কথা। তার মায়ের মুখে হাসি ফুটল। আমি তার শিক্ষক—আমারও অনেক আনন্দ। তবু আমার দায়িত্বের কথা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি। আমি আজকের কথা ভাবছিও না। বড় জোর আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবে—"তুমি নিমন্ত্রণ করেছিলে?" আমি বলব—"আমার ছাত্র—এককালে আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। আজ যখন গ্রামের সকল ভদ্রজনকে নিমন্ত্রণ করেছি তখন তাকে কি করে বাদ দেব? করেছি নিমন্ত্রণ।" আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা। এখানকার ছেলেরা ওর কাছে ছুটে যাবে। বারণ শুনবে না। রাজনীতির বীজ ওদের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে। সে যে কি আকার নিয়ে বের হবে সে ত কেউ জানে না। প্রকাণ্ড প্রাসাদ তার একটি চুলের মত ফাটল—সেখানে গিয়ে পড়ে একটি বটের বীজ। চারা গজায়; একটু বাড়তে পেলে আর রক্ষা থাকে না। কেটে ফেলে—আবার গজায়। আবার কাটে আবার গজায়। তখন আর সে গাছ শাখাপ্রশাখায় পাতায় পল্লবে বাড়ে না বাড়ে ভিতরে ভিতরে শিকড়ে শিকড়ে। সে রাজপ্রাসাদ যত বিরাটই হোক তাকে ফাটিয়ে ছেড়ে দেয়। ভেঙে পড়ে যায়। বাস হয় সরীসৃপের। এও তাই হবে ব্রজবাবু! এ একবার ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না। এর শেষ নেই। আমি অনেক কষ্টে চৈতন্য ইনস্টিটুশন গড়ে তুলেছি। শিবনাথ বটের বীজের মত এর কোন ফাটলে পড়ে আজ পাতা মেলে বেরিয়েছে। একে একদিন শেষ করে দেবে। শিক্ষা বড় পবিত্র জিনিস। জ্ঞান—তার মূল্য শুধুই জ্ঞান। কোন স্বার্থের সংস্পর্শই তার সহ্য হয় না। চাকরীর স্বার্থেই শিক্ষার চেহারাটা কি হয়েছে দেখেছেন। রাজনীতি অতি উগ্র বিষ, ও বিষ ঢুকলে আর রক্ষা থাকবে না। আমি তাই ভাবছি।

হেসে ব্রজবিহারী বাবু বললেন—আপনি একটু বেশী ভাবছেন মাষ্টারমশাই। ভেবেও ত আপনি এর গতিরোধ করতে পারবেন না। এ কালের গতি।

—হ্যাঁ। কালস্য কুটিলা গতি। ও রোধ করা মানুষের সাধ্য নয়।

কণ্ঠস্বর রামজয় পণ্ডিতের। কখন পিছনে এসে দাড়িয়েছেন ব্রজবাবু চন্দ্রবাবু জানতে পারেন নি।

—পণ্ডিতমশায়?

—হ্যাঁ। কুশল আপনার?

—হ্যাঁ। আপনি।

—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ হবিষ্যান্ন খাই—মাসে তিন-চারটে উপবাস করি, অসুখ হবার উপায় কি? কিন্তু আর ও আলোচনা করবেন না। শিবনাথ এসে হাজির হয়েছে। শিবনাথের সঙ্গে রবি সিং। ওই আসছে।

রবি সিং এবং শিবনাথ এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রবাবু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রবি সিঙের দিকে। রবি সিং ছেলেবেলায় রূপবান ছেলেই ছিল। সুকুমারকান্তি কিশোর। পরিপূর্ণ যৌবনে সে হয়ে উঠেছে অপরূপ সুন্দর।

চন্দ্রবাবুর সে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রামজয় একটু হেসে চলে গেলেন সেখান থেকে। তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন কালই তিনি রবির বাড়ী গিয়ে তার বাপের কাছে ধর্না দেবেন।

—ভাল আছেন স্যার!

প্রণাম করলে শিবনাথ, তার পরে রবি।

—তোমরা ভাল আছ ? আমি খুব খুশী হয়েছি, তোমরা এসেছ। বস। বস। রবি তোমার উন্নতিতে আমি অত্যন্ত সুখী। অত্যন্ত সুখী। এ ইস্কুল থেকে তুমি পাস না কর, তবু আমার ইস্কুলেরই ছাত্র তুমি। তুমি এম-এসসিতে ম্যাথামেটিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ এ আমার গৌরবের কথা। উই আর প্রাউড অব ইউ।

রবি লজ্জিত হ'ল, লজ্জিত ভাবেই সে চুপ করেই রইল। উত্তর দিলে শিবনাথ—রবি বিলেত যাচ্ছে—আই-সি-এস হতে, না হলে শেষ ব্যারিষ্টারি। আমি বললাম—সে কি ? ম্যাথামেটিকসেই হায়ার ষ্টাডি করে এস। তোমার মত ছেলে চাকরীর জন্ম পড়বে কি ? পড়ার জন্ম পড়। আপনারা ওকে বলুন। বিলেত না গিয়ে ও বরং জার্ম্মানী চলে যাক। পোষ্টওয়ার জার্ম্মানীর দুর্দ্দশা অনেক কিন্তু সত্যিকারের সায়েণ্টিষ্ট থাকে ত জার্ম্মানীতেই আছে।

—শিবনাথ ভাল কথা বলেছে রবি। ব্রজবাবু বললেন আর বিয়ে করে সেই টাকায় বিলেত যাওয়াটাও তোমার ঠিক হচ্ছে না।

—তবে স্যার বিয়ের টাকায় বিদেশে যাক বা না-যাক, বিয়ে করে যাওয়াটা ভাল।

—কিন্তু তুমি এখন কি করবে শিবনাথ ? গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রবাবু।—দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করা অবশ্যই গৌরবের কথা। কিন্তু আজ এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে যুদ্ধে আমরা হেরেছি। এখনও ইংরেজের শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমরা অর্জ্জন করতে পারি নি।

শিবনাথ একটু হেসে বললে—ভাবছি এখানে চরখা তাঁত নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে তুলব।

—ইউ মীন—দোজ টিপিক্যাল আশ্রমস ? যার উপরটায় ওগুলো নেহাতই একটা আইওয়াশ ভিতরটায় শুধু পলিটিক্স ! ইনোসেণ্ট ভাল ছেলেগুলিকে ধরবার একটা ট্র্যাপ ? বোমা পিস্তল নিয়ে—

—না স্যার। আমি হিংসায় বিশ্বাস করি না। আমি গান্ধীজীর অহিংসায় বিশ্বাসী। মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ওই পথেই আমাদের স্বাধীনতা আসবে। বিশ্বাস করি বিশ্বজগতের দরবারে ওই অহিংসায় বিশ্বাস নিয়েই আমাদের যেতে হবে—আমরা যাব—পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হবে এই অহিংসা।

শিবনাথের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। চন্দ্রবাবু শঙ্কিত হয়ে বললেন—থাক ওসব কথা শিবনাথ। লোকজন আসছেন সব, ছেলেরা ঘুরছে চারিদিকে, এসে সব জমে জটলা পাকাবে। ও সব কথা থাক।

—বসুন ব্রজবাবু—আমি দেখি কে কে যেন এলে মনে হচ্ছে।

উঠে পড়লেন চন্দ্রবাবু।

ব্রজবাবু মৃদু স্বরে বললেন—তুমি এখানে আশ্রম তৈরি করবে শুনে উনি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—ইস্কুলের জন্ম।

—জানি স্যার। সেই এণ্টি-ম্যালেরিয়েল ওয়ার্কের কথা আমার মনে আছে। একটু হাসলে শিবনাথ।

—কিন্তু তুমি যেন ওঁকে ভুল বুঝো না। তুমি বোধ হয় জান না। কথাটা তোমাকে বলি। তোমার জানা দরকার।

পুরনো কথা। শিবনাথ এখান থেকে পাস করে কলকাতায় পড়তে গিয়ে প্রথম বৎসরই সন্দেহভাজন হিসেবে ভারতরক্ষা আইনে ধরা পড়েছিল। পুলিস ওকে সেবার বাড়ীতেই নজরবন্দী করে রেখেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর ইণ্টার্ণমেণ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে শিবনাথ এখানেই সমাজসেবার কাজ সুরু করে। সেবাধর্ম্মই তার মধ্যে প্রধান কলেরা এপিডেমিক থেকে সূত্রপাত। তার পর করেছিল একটি ফায়ার ব্রিগেড। তার পর ধরেছিল ম্যালেরিয়া নিবারণী কাজ। রবিবার রবিবার তার কর্ম্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে গ্রামে গ্রামে কেরোসিন তেল নিয়ে পাঠাত, খানায় ডোবায় তারা কেরোসিন ছড়িয়ে আসত। ছেলেরা দলে দলে তার সমিতিতে এসে জুটতে চেয়েছিল। কিন্তু হেডমাষ্টার আপত্তি জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে বোর্ডিঙের ছেলেদের কঠোর নির্দেশ দিয়াছিলেন তারা যেন না যায়। শিবনাথ ব্রজবাবুর কাছে এসেছিল। ব্রজবাবু ম্লান হেসে বলেছিলেন বোর্ডিঙের ছেলেদের বাদ দিয়েই তুমি কাজ কর শিবনাথ। মাষ্টার মশাই ওদের যেতে দেবেন না। গ্রামের ছেলেরা অনেকটা স্বাধীন, অন্ততঃ তারা নিজেদের অভিভাবকদের অধীন। তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না উনি। কিন্তু বোর্ডিঙের ছেলেদের উনিই অভিভাবক। উনি যেতে দেবেন না। তুমি ত জান উনি পলিটিক্সকে কি রকম ভয় করেন। শিবনাথ বোর্ডিঙের ছেলেদের বাদ দিয়েই কাজ করত। এর কিছু দিন পর দেশে ইউনিয়ন বোর্ড হ'ল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হলেন পবিত্রবাবু। ওদিকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্ম ছেলেরা চঞ্চল হ'ল। শিবনাথকে দ্বিতীয় বার পুলিস রাউলাট আইনে ধরে নিয়ে গেল। তখন ছেলেদের ওদিক থেকে ফেরাবার জন্ম সরকারী পরামর্শে পবিত্রবাবু ইউনিয়ন বোর্ড থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণী কাজ সুরু করলেন। চন্দ্রবাবু তখন ছেলেদের অনুমতি দিলেন সে

কাজে যোগ দিতে। ব্রজবাবু তখন মৃদু অনুযোগ জানিয়ে বলেছিলেন ভাল কাজ সব সময়েই ভাল কাজ মাষ্টার মশাই। আজ ছেলেদের সে কাজ করতে অনুমতি দিলেন, আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু শিবনাথ যখন বলেছিল তখন অনুমতি দিলে আরও খুশী হতাম। সে আমাদের ছাত্র। আদর্শবাদী—

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—সমস্ত সত্ত্বেও আমি ওকে পছন্দ করি না ব্রজবাবু। শিবনাথ আমাকে নিরাশ করেছে। ওকে আমি আরও বড় দেখতে প্রত্যাশা করেছিলাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ। ব্রজবাবু এই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি বিশ্বাস করি না। এতে কিছু হবে না। দেশকে আগে শিক্ষিত করতে হবে। তার পর। তার পর! তার আগে নয়। শিবনাথ লেখাপড়া শেষ করে যদি এ আন্দোলনে যোগ দিত আমি তাকে প্রশংসা করতাম আশীর্ব্বাদ করতাম। কিন্তু লেখাপড়ার বয়সে—সেই বয়সের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে যে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করল তার নিজের জীবন ব্যর্থ এবং যে পরধর্ম্ম সে পালন করতে গেল তাও ব্যর্থ। ও অনেক বড় হতে পারত। ও ছাত্রজীবনে লিখত। পদ্য লিখত। ও বড় কবি হতে পারত। সে সম্ভাবনাও নষ্ট হয়েছে। আমি পড়ার সময় পদ্য লেখার জন্য তিরস্কার করেছি, সে পড়াশোনায় অবহেলার জন্য। নইলে প্রত্যাশা করতাম বৈকি ও একজন বড় কবি হবে। ওর সম্পর্কে আলোচনা যখন হবে তখন তাতে লিখতে হবে তার শিক্ষা হ'ল চন্দ্রভূষণ হেডমাষ্টারের কাছে। সে শিক্ষা নিয়েছিল এই চৈতন্য ইনস্টিটুশনে। সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি ওকে পছন্দ করি না।

ব্রজবাবু বললেন—ওর সে মুখ চোখের চেহারা আজও ভুলতে পারি নি শিবনাথ। দু'চোখ ভরে জল টলমল করে উঠেছিল। উনি চট করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। তুমি যেন ওকে ভুল বুঝো না।—এই বিচিত্র মানুষটিকে চেনা সহজ নয়—অত্যন্ত কঠিন শিবনাথ। ছাত্র অবস্থায় তোমরা চিনবে কি তোমাদের বয়স অল্প তার উপর লেখাপড়া নিয়ে পুরোপুরি ব্লাড আর স্কলার-এর সম্বন্ধ।

একটু হেসে বললেন—প্রথম যখন স্বদেশী বক্তৃতা করতে তখন বিদেশী শাসকদের উল্লেখ করবার সময় পুলিস দারোগা আর মাষ্টারদের মূর্ত্তিই ভেসে উঠত তোমার চোখে।

শিবনাথ হেসে উঠল—না স্যার! ওকথা বললে আমার উপর একটু অবিচারই করা হবে।

ব্রজবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—সেটা অবশ্য খুবই ভাল কথা। আশীর্ব্বাদ করব তোমাকে আর এক দফা। তবে ভেসে উঠে থাকলে দোষ দোব না।

তার পর গম্ভীর হয়ে বললেন—আমারই চিনতে অনেক দিন লেগেছে। তোমরা বোধ হয় জান না বঙ্গবালার বিয়ে না দিয়ে ম্যাট্রিক পড়ানোর কারণ বাল্যবিবাহে আপত্তি নয়; উনি চান বঙ্গবালা বিয়ে না করে লেখাপড়া শিখে ওর ব্রত গ্রহণ করে। ছেলে নেই। একটি মেয়ে। মেয়েকে দিয়েই সাধ মেটাতে চান। এম এ পাস করাবেন বঙ্গবালাকে। কল্পনা করেন সে ফার্ষ্ট ক্লাস পাবে। প্রফেসরী করবে। ফার্ষ্ট ক্লাস না পায় বি-টি পাস করিয়ে এখানে বঙ্গবালাকে দিয়ে গার্লস হাই ইংলিস স্কুল করবেন। বঙ্গবালা পাস করার জন্যে এই কারণেই ওর এত উৎসাহ, এত সমারোহ করছেন উনি।

হঠাৎ শম্ভু গড়াঞী ব্যস্ত হয়ে এসে ডাকলে—মাষ্টার মশাই!

—কি? ব্যাপার কি শম্ভু?

—গণ্ডগোল পাকিয়ে গেল, স্যার।

—গণ্ডগোল? কোথায়?

—চায়ের আসরে! হিন্দু-মুসলমানের আলাদা খাওয়ার জায়গা হয়েছে ত। তা সবাই অবশ্য ঠিক ঠিক বসেছে, শুধু গোলাম হোসেন চৌধুরী হিন্দুদের টেবিলে একখানা চেয়ারে বসে গেছে। কেউ কিছু বলতেও পারছে না। মুখ তাকাচ্ছে এ ওর। মাষ্টার মশাই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। উনি আপনাকে ডাকছেন।

—চলুন, স্যার। আমিও যাই। শিবনাথ ব্রজবিহারী বাবুর আগেই উঠে পড়ল।

বসে রইল শুধু রবি।

ব্রজবাবুর শেষ কথাগুলি তার মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় এর মধ্যে কয়েকবারই যেন সে হেডমাষ্টারের বাসার ভিতর থেকে কারও অস্পষ্ট ইঙ্গিত অনুভব করেছে। দু'বার যেন বাইরের জানালাটি খুলেছে, বন্ধ হয়েছে। কে যেন একবার কাকে বলেছে- কেউ নেই যে এঁদের চা দিয়ে পাঠাই। ওঁরা কখন থেকে বসে আছেন। কি বিপদ বল দেখি! কণ্ঠস্বর চেনা তবু তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। একবার খিল খিল হাসি কানে এসেছে।

রবি বসেই রইল। তার বুকের মধ্যে হৃৎস্পন্দন উল্লাসে বা বেদনায় বা কামনায় বা দ্বন্দ্বের তাড়নায় প্রবল গতিতে ছুটে চলছে, যেন মাথা কুটছে। তার যেন উঠবার শক্তি নাই। অবসন্ন হয়ে গেছে।

ওদিকে বোধ করি চায়ের আসরেই কলরব উঠছে, প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

হঠাৎ চন্দ্রবাবুর বাসার সামনের ঘরের দরজার পর্দাটি খুলে

গেল। ঘরের ভিতরের আলো পিছনে রেখে বেরিয়ে এল ছুটি মূর্ত্তি। নারী মূর্ত্তি।

দীর্ঘাঙ্গী তরুণী একটি। শ্যামবর্ণা মেয়েটিকে দেখে আজকের সকালে দেখা সূর্য্যালোকিত একখানি জলভরা মেঘের শ্যাম লাবণ্যের কথা তার মনে পড়ে গেল। মেঘখানির চারি পাশের সাদা মেঘ রোদের ছটায় ঝলমল করছিল এই মেয়েটির সাদা ধবধবে কাপড়খানির মত। এই ত বঙ্গবালা! এমন অপরূপা হয়েছে বঙ্গবালা! সঙ্গে কে?

সঙ্গে বাসার ঝি। ঝিয়ের হাতে একখানি থালার উপর চায়ের কাপ ও ডিসে জলখাবার সাজিয়ে বঙ্গবালা এসে দাঁড়াল!

উঠে দাঁড়াল রবি।

—আপনি একা বসে আছেন? মাষ্টারমশাই, শিবনাথদা এঁরা কোথায় গেলেন।

—ওঁরা, ওদিকে গেছেন। কি জানি যেন একটা গণ্ডগোলের উপক্রম হয়েছে।

—আপনি চা খান।

এক কাপ চা এক ডিস জলখাবার সে নিজের হাতে তুলে বাড়িয়ে ধরলে।

—তুমি ভাল আছ? মা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। আপনারা?

—ভালো আছি। কিন্তু তুমি কত বড় হয়ে গেছ!

হাসলে বঙ্গবালা। বললে—বাঁচলেই বয়স বাড়ে, বড় হয়, আবার বুড়ো হয়! তুমি খাবার জল নিয়ে এস চিন্তু। আর এগুলি নিয়ে যাও।

চিন্তু ঝি চলে গেল।

রবি বললে—তুমি ম্যাট্রিক পাস করেছ, ভারী খুশী হয়েছি।

—আপনি ত এম-এসসিতে ফার্স্ট হয়েছেন—বিলেত যাচ্ছেন!

—তা হয়েছি। তবে বিলেত যাচ্ছি কি যাচ্ছি না সে ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু তুমি ত আমাকে অভিনন্দন জানাও নি। আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার পাসের আনন্দভোজে বিনা নিমন্ত্রণে ছুটে এসেছি। তোমাকে আমি ভুলি নি। তুমি আমাকে ভুলে গেছ।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল বঙ্গবালা। তার পর মৃদু স্বরে বললে—কেন যান নি জানি না। ভুলেই যাবেন আমাকে।

তার পর সে শান্ত ধীর পদক্ষেপে বাসার দিকে চলে গেল।

—বঙ্গ!

—কারা সব আসছেন।

বলতে বলতে সে পর্দ্দার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

হলা সহি, কারে কাহ কাহার ক্রন্দন
কালি স্তব্ধ অর্দ্ধ রাতে করিনু শ্রবণ
তব চারু তনুতটে! কোন্ দেহহীনা
অনন্ত রহস্যময়ী সেথা তন্দ্রালীনা-
বন্দীসম নিশিদিন অন্ধ কারাগারে?
আলেয়ার আলোসম ভুলায় আমারে
সেই চিরকুহকিনী সারাটি জীবন
শত ছলে। দেহাতীতে করি অন্বেষণ—
নশ্বর রমণী-দেহে! আঁখির মায়ায়,
ওষ্ঠপুটে, শ্রোণিতটে, কুন্তল-ছায়ায়
যতবার খুঁজি তারে—যায় দূরে সরি'
মরুমরীচিকাসম ব্যর্থতায় ভরি'
এ হৃদয়। কালি রাতে শুনিয়াছি তার-
তব দেহ-গেহ মাঝে ক্ষুব্ধ হাহাকার!

বাংলা অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শতাধিক বৎসর যাবৎ বাংলায় অনেক অভিধান সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু স্থলে সংকলয়িতাদের প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক অভিধানের অভাব এখনও দূরীভূত হইয়াছে বলা চলে না। অবশ্য বাংলা অভিধানের আদর্শ ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই। প্রকাশিত অভিধানের গুণাগুণ সম্পর্কেও কোন বাদপ্রতিবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ অভিধান পর্যালোচনার অভ্যাস বাঙালি পাঠকসাধারণের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। যাঁহারা মাঝে মাঝে অভিধান দেখেন তাঁহারাও ইহার দোষগুণ লক্ষ্য করেন না।

অভিধান শব্দের অর্থ নির্দেশ করে এবং সেই প্রসঙ্গে শব্দের রূপ ও অর্থ পরিবর্তনের ধারার আভাস প্রদান করে। অভিধান ভাষার শব্দসম্পদের ধারক ও বাহক—যুগে যুগে এই সম্পদ কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার পরিচয় অভিধান হইতেই পাওয়া যায়। আদর্শ অভিধানে কালানুক্রমিক অর্থ নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রয়োগের উদাহরণ। এ কার্য অতি দুরূহ সন্দেহ নাই। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' এই দুরূহ কার্য সম্পাদনের কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আকরনির্দেশ সর্বত্র ভ্রমশূন্য না হইলেও বিশেষ উপযোগী। এ কার্যে যতদিন পূর্ণ সাফল্য লাভ করা না যায়—যতদিন সমস্ত শব্দের সকল অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ সংকলিত না হয় ততদিন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যে অভিধানে শব্দটি ও তাহার নির্দিষ্ট অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার নাম করা যাইতে পারে। এ কাজ তেমন কঠিন নয়। বিশাল সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুমে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে। বোটলিঙ্ক ও তদনুসারী মনিয়র উইলিঅমসের বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে অন্যত্র অপ্রাপ্ত অর্বাচীন শব্দ সম্পর্কে শব্দকল্পদ্রুমের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। ফলে কোন্ শব্দ বা কোন্ অর্থ প্রাচীন তাহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বিভিন্ন প্রদেশে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি বা যাহাদের বিশিষ্ট অর্থ অর্বাচীন কালে সেই সেই প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে ইহাদের আকর উল্লিখিত না হওয়ায় অনুসন্ধানী পর্যালোচককে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। শব্দকল্পদ্রুম হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা হইতেই আমরা জানিতে পারি 'সধবা' শব্দ জটাধরের অভিধানে ধরা আছে—'বালিশ' শব্দের অধুনা প্রচলিত অর্থ শব্দমালা নামক অভিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলা অভিধানেও এইরূপ আকর নির্দেশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়—অন্যথা পদে পদে সন্দেহের সম্ভাবনা।

নানা কারণে সাধারণ বাংলা অভিধানের অর্থনির্দেশ অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নহে। সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিত অনেক সময় বাংলা অভিধানের অর্থ নির্দেশ দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। এই অর্থ নির্দেশ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার নিকট অমূলক ও ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। মূল সংস্কৃতের অপব্যাখ্যা বা দুর্বোধ্যত্ব, লেখকবিশেষের বিকৃত বা ভ্রান্ত প্রয়োগ, ব্যবহার ও আসল বস্তুর সহিত অপরিচয় ও অনুমান এবং ব্যুৎপত্তির উপর নির্ভর প্রভৃতি কারণে অভিধানের অর্থ নির্দেশে কিছু কিছু গোলমালের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যথাযথ আকরনির্দেশের অভাবে গোলমালের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোন শব্দ সংস্কৃত বা সংস্কৃতোদ্ভূত এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই আকরনির্দেশ সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক হইতে পারে না। সংস্কৃত বলিলেই একটা প্রাচীনতার ধারণা হয়। কিন্তু সংস্কৃতের আকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত শব্দই প্রাচীন নয়—বহুলপ্রচলিত অনেক শব্দের সংস্কৃত অভিধানে কোনও স্থান নাই। মহালয়া, বৃদ্ধপ্রপৌত্র, ঘটিকা প্রভৃতি অতিপরিচিত শব্দও এই শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে যেগুলির প্রচলিত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে নাই। তাহা ছাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দী কি তাহার পূর্ব হইতেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা প্রকাশের জন্য সংস্কৃতের আদর্শে এমন অনেক শব্দ গঠিত হইয়াছে যেগুলিকে সংস্কৃত বলিয়া নির্দেশ করিলেই তাহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার সংস্কৃত ব্যাকরণবিরোধী—ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে অর্থহীন। আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, জীবনবেদ প্রভৃতি অধুনাপ্রচলিত অগণিত শব্দ এই শ্রেণীতে পড়ে।

বাংলা অভিধানে শব্দের অর্থনির্দেশ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ 'ক্রন্দসী' শব্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেদে ইহার অর্থ দ্যাবা-পৃথিবী বা স্বর্গমর্ত্য। সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে শব্দটি নাই।

বাংলা অভিধানে ও প্রয়োগে ইহার অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। 'মদকল' শব্দের অমরকোষ ধৃত অর্থ মদমত্ত হস্তী—অর্বাচীন অভিধানে উল্লিখিত অর্থ মত্ততা জন্য অব্যক্ত মধুর ধ্বনিকারী। শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি ভবভূতির উত্তররামচরিতে এবং মাইকেলের মেঘনাদবধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন অভিধানে এই অর্থ আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। গহনার নৌকাকে চিত্রাঙ্কিত নৌকা বা 'অনেক যাত্রী লইয়া চলাচলকারী নৌকাবিশেষ' বলিলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ধরা পড়ে না; বস্তুতঃ নির্দিষ্ট ভাড়ায় নির্দিষ্ট স্থান হইতে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে যে নৌকা যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে তাহাই গহনার নৌকা। গণ্ডগ্রাম শব্দের অভিধানোক্ত অর্থ বড় গ্রাম—কিন্তু ব্যাবহারিক অর্থ ক্ষুদ্র গ্রামও উপেক্ষণীয় নয়। শেষোক্ত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ 'পোস্টমাস্টার' গল্পে ও 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। মিত্র শব্দের অপভ্রংশ রূপে পরিচিত ইতু বা ইথু শব্দের 'সূর্য্য পূজার ঘট' এইরূপ অর্থ নির্দেশ করার কারণ বুঝা যায় না। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন অর্থের মধ্যে এইটিকেই প্রথম স্থান দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমে মুখ্য অর্থ উল্লেখ করিয়া পরে গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থ নির্দেশ করাই সমীচীন পদ্ধতি। অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অর্থ নির্দেশের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

কাকু—বক্রোক্তি; চার্বাক—নাস্তিক মুনিবিশেষ—ইনি আত্মা, পরলোক প্রভৃতিতে অবিশ্বাসী ছিলেন; নিবীত—কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র; প্রেত—(প্রধানতঃ নরকগামী বা অতৃপ্ত) মৃতের আত্মা; প্রেতকর্ম—মৃতের দাহন ও সপিণ্ডীকরণাদি কার্য; কর্মপ্রবচনীয়—অব্যয় পদবিশেষ—যাহা কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়া উহাকে কোন কারকে আনয়ন করে বা বিভক্তিযুক্ত করে। অভিধানের অর্থ নির্দেশে এ জাতীয় ত্রুটি প্রশংসনীয় নহে অথচ প্রচলিত অভিধানগুলিতে ইহাদের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নহে। ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে চাই সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতের আন্তরিক সহযোগিতা।

অবশ্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণও সর্বত্র শব্দের অর্থ সম্পর্কে সর্বথা নিঃসন্দেহ নন—সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাকপক্ষ এইরূপ একটি শব্দ। ইহার প্রাচীন আভিধানিক অর্থ বালকের শিখা। রাজকুমারদের চঞ্চল কাকপক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়—ইহার সংখ্যা ছিল পাঁচ। আধুনিক অভিধানের অর্থ 'জুলপি'র সহিত ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে কিভাবে? 'ঝুঁটি' এই অর্থ কতটা সঙ্গত ভাবিয়া দেখা দরকার। 'দময়ন্তী কথা'য় দময়ন্তীর বর্ণনায় যে চিকিৎসাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে আধুনিক শুশ্রূষাবিদ্যা কল্পনা করা সেই প্রাচীন যুগের পক্ষে কত দূর সঙ্গত বলা কঠিন। মহাভারতে স্ত্রীলোককে কুচেল দ্বারা রক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে—কিন্তু ময়লা কাপড় পরাইয়া তাহাকে প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করার কথা বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সংশয় হয়, প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রাচীন বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা।

বাংলা অভিধানে মূলতঃ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সংস্কৃত হইতে অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে—নূতন নূতন ভাব প্রকাশের জন্য বাংলায় অনেক নূতন শব্দ গঠিত হইয়াছে। সেগুলি বাংলা ভাষার অঙ্গ—সুতরাং সেগুলি অবশ্যই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বাংলায় সাধারণতঃ অপ্রচলিত যে সমস্ত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শব্দ মূল বা পরিবর্তিত অর্থে বিশিষ্ট লেখকের লেখায় কোথাও কখনও ব্যবহৃত হইয়াছে অভিধানে তাহাদেরও স্থান করিতে হইবে। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখায় এই জাতীয় অনেক শব্দ পাওয়া যায়। মাইকেলের বররুচিরিচ্যমান, মহেষ্বাস, কামধুকে প্রভৃতি শব্দ—রবীন্দ্রনাথের কমিক, সাম্রাজিক বা সাম্রাজ্যিক, বিশ্বঘহ, মৌলিক্ত (=মৌলিকতা), কাকুধ্বনি(=ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ), শাস্ত্রিক (=শাস্ত্রীয়), উজ্জ্বলিত, চঞ্চলিত, নিজকীয় (=স্বকীয়), কহুৎসাহী, পরিপ্রেক্ষণা (=পরিপ্রেক্ষিত), খণ্ডিতা (=খণ্ডীকৃতা), দ্বৈপায়নতা, উৎসর্জন, প্রদোষ (=উষা), ঔকর্ষ্য প্রভৃতি শব্দ বাংলা অভিধানে গ্রহণ করিতে হইবে। দুঃখের কথা এই যে, বিশিষ্ট লেখকের ব্যবহৃত এইরূপ অজস্র শব্দ বাংলা অভিধানে স্থান পায় নাই; অথচ বাংলায় অব্যবহৃত—অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারের অযোগ্য—অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঘৃতার্চি, ঘৃতোদ, উদ্‌বপন, উপারত, উদীরিত, ধম্মিল্ল, ধেয়, নপ্ত্য, গন্তা, মর্ত্ত্যকাম (?) এ জাতীয় প্রচুর শব্দ বাংলা অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান' 'চলন্তিকা'তেও এইরূপ অনেক শব্দ স্থান পাইয়াছে—'সুপ্রচলিত' 'প্রচলনযোগ্য' বা 'অল্পপ্রচলিত' ইহাদের কোন শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে না এমন শব্দের সংখ্যাও উহাতে কম নয়। বাংলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩২০ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঙ্গালা শব্দকোষে'র 'সূচনা'য় বাংলা-অভিধান হইতে সংস্কৃত শব্দ বর্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাঁহার প্রস্তাব

অনুসারে কার্য করা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকার কারণ নাই। কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল তাঁহার প্রস্তাব কোন অভিধান সংকলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

উপদেশ পরম্পরার আধার ; যাহা উপদেশ পরম্পরারূপে আছে।" 'ইতিহাস' শব্দের এই যে অর্থ কোন কোন অভিধানে দেওয়া হইয়াছে তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। শব্দটির তাৎপর্য বাংলায় সুপরিচিত—অর্থ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়।

অভিধানে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগ্রহণ সম্পর্কেও কিছু বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে অনেক লেখক বাংলায় প্রতিদিন যে নূতন নূতন শব্দগুলির আমদানি করিতেছেন সেগুলি সকলই যে এখনই বাংলা অভিধানে গৃহীত হইতে পারিবে এমন কথা বলা যায় না। অর্থের অস্পষ্টতা ও ব্যাকরণের অবিশুদ্ধি সত্ত্বেও কিছু কিছু শব্দ হয়ত ভাষায় চলিয়া যাইবে এবং কালক্রমে অভিধানে স্থান পাইবে। অভিধানে স্বীকৃতি লাভের পূর্বেই অনেকগুলির অকালমৃত্যু হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ইতিমধ্যে তাহাদের দোষক্রটি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তবে ভাষা ও শব্দ বিষয়ে আমরা উদাসীন। প্রাচীন ধারা এখন লুপ্ত— পূর্বের মত পংক্তি ব্যাখ্যা ও প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণে আমাদের আর রুচি নাই। আবার আধুনিক ধরনে ভাষার শব্দসম্পদ বিশ্লেষণে ও বিচারেও আমরা অভ্যস্ত হই নাই। যাহা হউক, যে সকল গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যের আসরে একটা নির্দিষ্ট স্থান লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দগুলি সুন্দর হউক অসুন্দর হউক, শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ অভিধানে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। না হইলে পাঠকদের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সত্য সত্যই উপযুক্ত অভিধানের অভাবে প্রাচীন সাহিত্যে বা আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে লেখা পত্রপুস্তক এখন পাঠকের দুর্বোধ্য—এমনকি যে সমস্ত নামকরা বই সাম্প্রতিক কালে লেখা তাহাদেরও সকল শব্দ ভাল করিয়া বোঝা সম্ভবপর নয়। আমরা মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া গর্ব করি কিন্তু তাঁহাদের লেখা যাহাতে যথাসম্ভব অনায়াসে সাধারণ পাঠক সহজে বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বোধ করি না। তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দের স্বতন্ত্র অভিধান ত দূরের কথা সাধারণ অভিধানের মধ্যেও তাহাদের সকলের স্থান নাই। বস্তুতঃ, সমগ্র বাংলা সাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অভিধান-সংকলনের কাজে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই। এ কাজ একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না—এজন্য চাই বহুজনের সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। পুণার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক ধরনে সংস্কৃত ভাষার অভিধান-প্রণয়নে ব্রতী হইয়া দেশবিদেশের সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন—বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শব্দসংকলন করান এই প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রেত। সংকলিত শব্দগুলি কালানুক্রমে সজ্জিত করিয়া অভিধানে সন্নিবেশিত হইবে। পনর বছরের মধ্যে তাঁহারা এই বিশাল অভিধান প্রকাশ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকারের সহায়তায় কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা হিন্দীভাষার অভিধান 'শব্দসাগর'কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা হইতে সংকলিত শব্দের সমাবেশে পূর্ণাঙ্গ করিবার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। বাংলা অভিধানের বেলায়ও অনুরূপ আয়োজনের আবশ্যকতা আছে—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন।

ঘরছাড়া, পথহারা

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

শিশুরা দেবতার প্রিয়, মানুষের কামনার ধন, কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে সেই শিশুই যে কত অনাদরের মাঝে, অবহেলার চাপে অমানুষ হয়ে দাঁড়ায়, পূজার ফুল অকালে শুকিয়ে যায় তার হিসাব কে রাখে? আজ সমাজের এক স্তরে চেতনা জেগেছে, অবজ্ঞাত শিশুদেবতাকে ধুলো থেকে তুলে এনে তার যোগ্য স্থানে বসাবার চেষ্টা চলেছে, তাই কয়েকটি শিশুর বিড়ম্বিত জীবনের চিত্র পাঠকের কাছে উপস্থিত করছি।

১

ছেলেটির নাম জীমূত—বয়স বারোর কাছাকাছি, গায়ের রং ফর্সা, চুল কটা, গালে একটা কাটা দাগ। মুখে কেমন বেপরোয়া ভাব, যেন সে কাউকে কেয়ার করে না। বাপ-মা আছেন, তবু কেন সে পথে পথে ঘোরে? জিজ্ঞাসা করতে প্রথমে অজস্র মিথ্যা কথা বলে সে নিজের চারিপাশে আত্মরক্ষার একটা প্রাচীর রচনা করল। সত্যমিথ্যা অপূর্ব ভাবে মিশেছে তার কাহিনীর মধ্যে। কিন্তু দরদী মনের পরিচয় পেয়ে কখন যে দেয়াল ভেঙে গেল, তা সে নিজেও জানে না।

অপরূপ তার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস। পাকিস্থানে তার বাপের অবস্থা ছিল চলনসই। পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করে তিনি যা কিছু রোজগার করতেন তাতে সংসার চলে যেত। শহরের বিলাসিতার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, অভাবও ছিল না। তার পর সেই একঘেয়ে করুণ ইতিহাস, উদ্বাস্তুর ভাগ্যবিপর্যয়। মহানগরী কলকাতায় এসে তাদের জীবনের ধারা একেবারেই বদলে গেল। ভদ্র পরিবার, কিন্তু এখানে বসতি হ'ল সাধারণ বস্তীতে, একখানি মাত্র ঘরে। তারও যা অবস্থা, পল্লীবধূর চোখ সজল হয়ে ওঠে। বাবার দিন কাটে অর্থ উপার্জনের ধান্দায়, অভাবের সংসারে মা হাঁপিয়ে ওঠেন। একই ঘরে চার-পাঁচটি সন্তান, নিজেরা দু'জন, বুড়ো শাশুড়ি—না আছে শোওয়ার জায়গা, না আছে দিনের বেলা একটু নড়াচড়ার উপায়। নড়তে গেলে পায়ে বাজে। গৃহ নেই তবু গৃহকর্ম, অভাব-অসুবিধায়, লাঞ্ছনায় মায়ের চিত্ত বিমুখ হয়ে ওঠে। কোনমতে দিনগত পাপক্ষয়ের মত ক্ষুদকুঁড়ো রেঁধে সে বুভুক্ষু ছেলেমেয়ের মুখে ধরে দেয়। আর নিজে থাকে অর্দ্ধাশনে, অনশনে। কোলের ছেলেটি ছাড়া আর কারু দিকে তার নজর নেই, অন্য ছেলেমেয়েরা খাওয়া শোওয়ার সময়টুকু ভিন্ন বাইরে বাইরে কাটায়, সে ভ্রূক্ষেপও করে না, বরং তাতেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। শরীর ভেঙে পড়ছে, মন তাই খিঁচড়ে গেছে।

বাবা ঘোরেন বাইরে বাইরে, আয়ের পথ করতে পারছেন না, সঙ্গে যা সামান্য এনেছিলেন, তা নিঃশেষ হয়ে এল। এখন বাড়ী ফেরেন কোন্ মুখে? যতটা পারেন এড়িয়ে চলেন এদের। ঠাকুমা চালের বাতার দিকে তাকিয়ে যাবার দিন গোণেন আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। শুধু অদৃষ্টকে নয়, তাঁর ভৎসনা বধূর ওপরেও বর্ষিত হয়, ছেলেগুলি যে উচ্ছন্নে গেল। কিন্তু উপায় হয় না।

ছেলেরা বাইরে সঙ্গী পেয়েছে। আজকালকার বাজারে খারাপ পথে টানবার লোকের অভাব নেই। জীমূত দেখতে সুশ্রী, মাথায় বেশ বুদ্ধি খেলে—এ রকম ছেলেকে দিয়ে কত কাজ পাওয়া যায়। সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসে মাস্‌। সে-দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত জীমূত ঘরে ফিরল না, বাবা একটু আগেই ফিরেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেন বড় ছেলেটি ঘরে ফিরেছে, কিন্তু জীমূতের এখনও দেখা নেই। বড় মেয়েটি দুঃখের সংসারে চোরের মত বেড়ায়, আজ ঘরে তেল নেই বলে আলো জ্বালতে পারে নি, তাই বাবার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। এরই মধ্যে জীমূতের মা সেদিন জ্বরে শয্যাগত। ব্যাপার আজ ষোলকলায় পূর্ণ। বাবারও সহ্যের সীমা আছে। একটু বেশী রাতে জীমূত ফিরলে তাকে দিলেন বেদম প্রহার। অবস্থা বিপর্যয়ের যত ক্ষোভ, নিজের অক্ষমতার যত পুঞ্জীভূত গ্লানি, সব যেন এই সময়টিতে ছাড়া পেয়ে তাঁর প্রহারের মধ্যে প্রকাশ পেল। প্রহারের মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেল বলাই বাহুল্য। জীমূতের কচিমন ব্যথার উপশম হলেই হয়ত ভুলে যেত। কিন্তু মাস্‌ দেখলে, এই তার সুযোগ। এই যে জীমূত বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে, তার পরই সুরু হ'ল তার পতনের ইতিহাস। যদি কখনও বাড়ী আসে, বাবাকে লুকিয়ে ঠাকুমার কাছে পায় প্রশ্রয়, এদিকে মাও নির্বিকার। দেখেও দেখেন না। তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেছে, ভাবনা-চিন্তার শেষ সীমা পর্যন্ত এসে তিনি থমকে গেছেন, তাঁকে মানুষ না বললেও চলে।

এই মাস্‌র পাল্লায় পড়ে জীমূত ছোট বোনের হাতের ব্রোঞ্জের চুড়ি একদিন খুলে নিয়ে পালাল—শিক্ষানবিশির সময়ও ত কিছু রোজগার করা চাই, নইলে মাস্‌ কি বসিয়ে খাওয়াবে! এতটুকু ভালো করতে সময় লাগে প্রচুর, কিন্তু

এতখানি মন্দ করা যায় নিমেষে। বেশী দিন সময় লাগল না, জীমূত আজকাল আর বড়ীর ছায়া মাড়ায় না। এর পকেট মারা, ওর দোকানে ঢোকা, ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। এখন বেশ বুঝেছে, আশ্রয় কোথাও নেই। কিছু এনে দিলে সর্দার খাওয়াবে, না আনলে এখানেও প্রহার জুটবে। বিপদের মুখে তাকে এগিয়ে দিয়ে নিজে সরে থাকার বিদ্যে মাল বেশ জানে—কার ওপর আর জীমূতের নির্ভর? এখন বাড়ী ফিরলে কেমন হয়? ঠাকুমা এত দিনে বেঁচে আছেন কি? মা ত পাথরের মত হয়ে গিয়েছিলেন, বড়দিরই কি আর ওর জন্য মায়া হবে? গেলে বাবা নিশ্চয় এবার মেরেই ফেলবেন। জীমূতের আর ফেরা হয় না।

কিন্তু মন তার ঘুরে ফিরে বস্তীর সেই ছোট বাড়ীটির কাছেই পড়ে থাকে। ভাবে, একবার যদি কিছু শিখে, ভাল পথে কিছু রোজগার করে নিয়ে বাড়ী যেতে পারে, তবে বোধ হয় আবার সে ঘরের ছেলে ঘরে থাকতে পারে। এই অবাঞ্ছিত পরিবেশে সর্দারের গোলামি তাকে করতে হয় না। তার ভাল হবার, ভাল পথে চলার উপায় কি হয় না? এখনও তাকে বাঁচান যায়, এখনও সময় আছে। কিন্তু কোথায় সে সুহৃদ?

২

আর একটি ছোট মেয়ে। নাম তার দুলারী। জন্মের প্রথম শুভমুহূর্তে কেউ নিশ্চয় আদর করেই নামটা রেখেছিল। আজ তার অঙ্গে কোথাও সেই আদরের চিহ্ন নেই গায়ের রং ধূসর, অযত্নে অনাদরে স্বাভাবিক বর্ণ কোথায় মিলিয়ে গেছে, বেশবাস বলতে ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের একটি টুকরো গায়ে জড়ান আছে, পরনে শতছিন্ন এক ময়লা পাজামা, তেলের অভাবে চুলগুলি দড়িপাকানো। বয়স আন্দাজ করা শক্ত, শিশুর লাবণ্য তার অঙ্গে কোথাও নেই। কিন্তু মুখে একটা সপ্রতিভ ভাব, সংসারের সুখে দুঃখে উদাসীন। ডকের নিষিদ্ধ এলাকায় কয়লা কুড়োতে গিয়ে ধরা পড়েছে, পুলিস তাকে ধরে এনেছে। সহচর সহচরী তার অনেক আছে, তারাও এসেছে। তাদের কারু মুখে সামান্য লজ্জার অপ্রতিভ ভাব, কারু মুখে বেপরোয়া উপেক্ষার ভাব, যেন বলতে চায়, আজ ধরা পড়েছি, কালও আবার ধরা পড়তে পারি, তবু কালই আবার যাব ঐ ডকের অঙ্গনে। খেলার সঙ্গী আছে, অভ্যস্ত কাজ আছে, এ কাজ বাদ গেলে চলবে কেন? দুলারীর মনোভাবও প্রায় এদেরই মত।

এরা যাবে কোথায়, খাবে কি, থাকবে কি নিয়ে? জন্মেছে কেউ অনেক ভাইবোনের মাঝে, গরীব মাবাপের কুঁড়ে ঘরে, কেউ এসেছে অবাঞ্ছিত এ পৃথিবীতে, পৃথিবীর ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাটাচ্ছে নিজেদের শৈশব আর বাল্যকাল। কে জানে কোথায় কি ভাবে কাটবে এদের পরিণত বয়স? অযত্নেও যে গাছ বাড়ে, ঝড় জল যেমন সহজে তাকে স্পর্শ করে না, এদেরও তেমনই জীবন, মাটির বুকে আগাছার মত বেড়ে চলে লক্ষ্যহীন, আশা-আশাহীন জীবনের পথে। তবু আশ্বাস বুঝি কিছু আছে এদের জন্য নইলে পঙ্কে পদ্মের মত, নিঃসীম অন্ধকার আকাশে তারার আলোর মত ক্ষণিক দ্যুতি এদের মাঝে ফুটে উঠত না।

দুলারীর তাই বেশবাস মলিন, কিন্তু মুখে মিষ্টি হাসি। জানে না কে তার বাবা, লোকে বলে, তাই শুনেছে, তার বাপ বহুদিন মারা গিয়েছে, মা পরে বিয়ে করেছে ভিন্ন দেশী, ভিন্ন জাতের এই লোকটিকে। এই নতুন স্বামীর মন দুলারীর মা পায় নি, ক্ষণিকের মোহ কেটে গিয়ে এখন এসেছে একটানা নির্যাতনের পালা। তার মধ্যে দুলারী একটা কাঁটার মত ওদের বিঁধছে, এখন সেই কাঁটা তুলে ফেলাও মায়ের পক্ষে কঠিন। মা কাজ করে, কিন্তু মেয়েকে খেতে দেওয়া তার পাপ। নতুন স্বামীর আদেশ জারি হয়েছে। মা তাই এ সব ভুলতে মদ ধরেছে, আর মদের কড়ি জোগাড় করে দিতে হয় দুলারীকে। যেদিন কিছু আনতে পারে মা লুকিয়ে খেতে দেয়, যেদিন কিছু না পায় সেদিন উপবাস। উপরি পাওনা প্রহার। কাজেই দুলারী তৎপর থাকে, কখন কোন্ ফাঁকে এক ঝুড়ি কয়লা সরাতে পারবে, কখন এক ফাঁকে হাত সাফাই করে তার মায়ের ঘাঁকতি মেটাতে পারবে।

এ যে তার আত্মরক্ষার উপায়, কাজেই এ পথ সে ছাড়তে পারে না। পথের বন্ধুদের সঙ্গে সে বেশ বনিবনাও করে থাকে, কিন্তু মায়ের নতুন স্বামীর সঙ্গে তার মোটে বনে না। তার শিশুচিত্তও বোধ হয় বোঝে যে মায়ের সঙ্গে এই লোকটি প্রবঞ্চনা করেছে। ছোটখাটো উপায়ে দুলারী তাকে বিব্রত ও বিরক্ত করতে পারলে ছাড়ে না। কতবার এই নতুন বাবার তাড়া খেয়ে ও তার আশ্রয় ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু আবার আসে, বার বার আসে। মায়ের ওপর টানটুকু যায় না, কিন্তু মা যে আর মানুষ নেই। ডকের নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়ার অপরাধে ও কতবার পুলিসের হাতে ধরা পড়ে, বিচারের জন্যে তাকে আনা হয়, বিচারে ছাড়া পেয়ে ছুটে চলে যায়। কখনও মায়ের কাছে, কখনও ফুটপাথের কোলে। আবার চলে সেই ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার পুনরুক্তি। নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত কবে কোথায় গিয়ে ঠেকবে। কে তার হদিশ রাখবে? ধরণীর ধুলোয় ধূসরিত হবে, কিন্তু করুণার স্নিগ্ধ বারিসিঞ্চনে সেই ধুলো কি ধুয়ে মুছে যাবে কোন দিন?

৩

মরিয়াম্মার কাহিনী আরও করুণ। এককালে সে দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল, তাতে কারু সন্দেহ হবে না। নিটোল স্বাস্থ্য, টানা টানা চোখ দুটি, তুলি দিয়ে আঁকা দুটি ভুরু তাকে বেশ একটা শ্রী দিয়েছে—রং যতই কালো হোক। শহরের এক বিচারালয়ে সে একটি কাঠের বেঞ্চির ওপর বসেছিল। তার মুখের লাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সুন্দর মেয়েটির মুখে কি গভীর বিষাদের ছায়া, একটু হলেই যেন কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিসের ব্যথা তার, প্রশ্ন করে জানা গেল, ছেলে তার চোর বলে ধরা পড়েছে। একবার নয়, দু'বার নয়, এই নিয়ে তিনবার হ'ল। আর ত সে সইতে পারছে না। এ ছেলেকে এ পথ থেকে ফেরাবার সাধ্য তার নেই। ছেলে একেবারে তার হাতের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু কেন এমন হ'ল ?

মরিয়াম্মা যদি বিধিলিপির দোষ দিতে পারত তবে বোধ হয় তার এত আত্মগ্লানি থাকত না। কিন্তু সে বলে, দোষ তার কর্মের, তাই সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না, আর তাই সে আজ হতাশায় ভেঙে পড়ছে। দেশ তাদের দক্ষিণ-ভারতের একটি ছোট গ্রামে, জীবিকার অন্বেষণে স্বামীর সঙ্গে সে এসেছিল এই মহানগরীতে। স্বামীর একটা কাজ জুটতে তেমন দেরিও হ'ল না, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই ছেলে তখন মোটে তিন বছরের ; সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও শ্রীমণ্ডিত তাদের শিশুপুত্রটি সকলের আদর সহজেই পেত। দিন কোন রকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু শহরের জীবনযাত্রা তাদের চোখ ঝলসে দিল। নিত্য নতুন অভাববোধ মনকে পীড়িত করে তুলল। তখন স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করে ঠিক করল যে দু'জনেই কাজ করবে, স্বামী যে বাড়ীতে ভৃত্যের কাজ করত সেই বাড়ীতেই মরিয়াম্মা পেল আয়ার কাজ।

সমস্যা হ'ল ছেলেকে নিয়ে। মনিব বাড়ীতে ছেলেকে নিয়ে যাবার অনুমতি মিলল না। দুশ্চিন্তার অবসান করে দিল মরিয়াম্মার প্রতিবেশী বাবুলালের স্ত্রী। তারও ত ছেলেপুলে আছে, তাদের সঙ্গেই উত্তম থাকবে, খেলবে। সামান্য কিছু টাকা খোরাকি বাবদ পেলেই সে তাকে খাওয়াতেও পারবে। আর রাত্রিবেলা ত মাবাপ দু'জনেই ঘরে ফেরে। ব্যবস্থাটা ওদের বেশ মনঃপূত হ'ল। রোজ কাজে যাওয়ার সময় মা ছেলেকে কত কিছু বুঝিয়ে বলে যায়। বাবা উত্তম, ভাল ছেলে হয়ে থেক, মাসির কথা শুনো, রাস্তায় যেও না, তোমার বই নিয়ে পড়া করে রেখ। এমনই সব উপদেশ দিয়ে যায়।

কিছুদিন বেশ কাটল। ছেলে ভাল আছে, রাত্রিবেলায় ছেলেকে কাছে পায় আর ছুটিছাটা পেলেই এসে দেখে যায়। কিন্তু এসে ছেলের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখে মায়ের মন খারাপ হয়। দু'এক দিন হঠাৎ কাজ থেকে বাড়ী এসে দেখে ছেলে ঘরে নেই, বাবুলালের বউ বলে, ছেলে বড় হয়েছে, এখন কি আর তার কথা শুনবে ? সে ত প্রায়ই এ রকম করে, এখন ছেলেকে ইস্কুলে দেওয়া দরকার। মরিয়াম্মা তাই করলে। কিন্তু তাতেও ত সমস্যা মিটল না, ছেলে ইস্কুল ফাঁকি দিয়ে বাইরে চলে যায়, তার কুসঙ্গী জুটেছে। বাবুলালের বউ বিরক্ত হয়ে উঠেছে, বলে, এবার তুমি অন্য ব্যবস্থা কর, নয়, নিজে কাজ ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে দেখ। নিরুপায় মরিয়াম্মা সেই ব্যবস্থাই করবে ঠিক হ'ল। সে আর সারাদিনের কাজ রাখবে না, ঠিকে কাজ করে দিয়ে আসবে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। মাত্র দশ দিনের জ্বরে ভুগে উত্তমের বাপ মারা গেল। তখন উপায় কি ? তাকে কাজ রাখতেই হ'ল, ছেলেকে খাওয়াতে হবে, নিজের অন্ন সংস্থান করতে হবে।

ছেলের উপায় করতে গিয়েই এবার ছেলের বয়ে যাবার পথ সে মুক্ত করে দিল। বাপের আদর-শাসন দুই থেকেই উত্তম বঞ্চিত হয়েছে, মায়ের মন ভেঙে গেছে, তাতে অবকাশ মোটে নেই, রোজগারের দিকে অধিকতর মন দিতে গিয়ে এবার ছেলের উপর তার প্রভাব একেবারে হারিয়ে গেল। ধাপে ধাপে নামতে নামতে ছেলে এখন যা খুশী করে বেড়াচ্ছে। দু'বার দলে মিশে চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। যেমন হয়, দলটি সরে পড়ে, অনভিজ্ঞ ছোট ছেলেরাই ফাঁদে পড়ে। দু'বারই মায়ের তত্ত্বাবধানে তাকে বিচারক ছেড়ে দিয়েছেন। আশায় বুক বেঁধে সে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে গেছে। কিন্তু বিফল হয়েছে তার সব চেষ্টা। আদর যে চায় না, শাসন যে মানে না, তাকে কি করে মরিয়াম্মা সুপথে ধরে রাখবে ? উত্তম যে মায়ের চোখের জলে ভেজে না, একেবারেই তার হাতের বাইরে গিয়েছে।

এবার তাকে বিচারক যেন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন, যেখানে সে মানুষ হবে। মায়ের চেয়ে যোগ্যতর কারও হাতে তার শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা হোক, এই আজ মরিয়াম্মার প্রার্থনা। নাই-বা সে তাকে দেখতে পেল, সে ত অমানুষ হয়ে যাবে না। কিন্তু তার সঙ্কল্প বুঝি টলে যায়, উত্তম হাত জোড় করে, মাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, মা, এই বারটা মাপ কর, এবার আমি ভালো হব। কিন্তু এই ত প্রথম নয়, প্রত্যেক বারেই সে এ রকম বলে, আর যেই বাড়ী আসা, অমনি সব ভুলে যায়। জননীর অক্ষমতায় তাকে উত্তরোত্তর অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এবার মরিয়াম্মা শক্ত হতে চায়। ছেলের ভালোর জন্যে ছেলেকে আজ কষ্ট দিচ্ছে, ছেলে কি তার মূল্য দেবে ?

বর্ত্তমান বিশ্বভারতী বিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-স্থাপত্য

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের কৃতিত্ব অনেকখানি। হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ ও সক্ষম না থাকলে মানুষ যেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ ও সক্রিয় না হলে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণসত্তা প্রকাশের একান্ত অভাব ঘটে।

উচ্চশিক্ষাদান এবং গবেষণাদ্বারা জ্ঞানভাণ্ডার হতে নূতন তথ্যাদি আবিষ্কার ও প্রকাশ করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদের হাতে তাঁদের স্ব স্ব চাহিদামত উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বই ও পত্রিকাদি সরবরাহ করে তাঁদের কাজে সাহায্য করা গ্রন্থাগারের কর্ত্তব্য। দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এবং গ্রন্থাগার পরস্পরের কাজে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেজন্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের স্থান ও দান বিশেষ সুস্পষ্ট।

গ্রন্থাগারকে সক্রিয় ও সম্পূর্ণ করতে হলে চাই—আধুনিক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অনুযায়ী সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার-গৃহ। গ্রন্থাগার-গৃহ সুপরিকল্পিত না হলে—পাঠক, বই ও গ্রন্থাগারকর্ম্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এর ফলে অনর্থক শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সুপরিকল্পিত নয়। সে কারণ শক্তি ও অর্থের অপব্যয় এবং অন্য দিকে কাজের সুবিধার অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে।

আধুনিক জগৎ গ্রন্থাগার স্থাপত্য নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করছেন এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগার-গৃহকে যথার্থ রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমানে আমেরিকাতে এবং ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার-স্থাপত্য নিয়ে যে সব আলোচনা ও পরিকল্পনা চলেছে তা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে আর নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে বেড়ে চলে গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা। এই সকল ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের প্রয়োজনমত উপযুক্ত পুস্তকাদি আনান, সেগুলি যথাযথ রাখার সুব্যবস্থা করা, পুস্তকাদি আদান-প্রদান ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত ও দ্রুত কার্য্যকরী এবং অনুলয় সেবাকে (Reference service) প্রাণবন্ত করা গ্রন্থাগারিকের কাজ। গ্রন্থাগারিকের উদ্দেশ্য হবে এই সব ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যের মাধ্যমে সফল ও

সক্রিয় রাখা এবং প্রচার ব্যবস্থার দ্বারা গ্রন্থাগারের সাদর আহ্বান সকলকে জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ পুস্তক, পত্রপত্রিকা, মানচিত্র, চিত্র-সংগ্রহ, সংবাদপত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড ও মাইক্রোফিল্ম ইত্যাদি রাখা হয়। এই সব জিনিসের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী রাখার ব্যবস্থা না করলে ব্যবহারের সুবিধা হয় না। পত্রিকাগুলি যদি গুদামজাত হয়ে থাকে, পুস্তক ও এর কার্ডগুলি যদি সহজে দেখা না যায়, পুথিশালার যদি রেকর্ড বাজাতে হয় বা মানচিত্রগুলি টাঙিয়ে রাখা হয় তা হলে এগুলো রাখার সার্থকতা কোথায়? এই সব বিশেষ বিশেষ জিনিসের ব্যবহারের জন্য বিশেষ স্থান ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অনেকগুলি বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমষ্টি। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এই সব বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনা করা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সকল বিভাগীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাদির ও নিজস্ব সূচী রাখা এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে আদান-প্রদান ব্যবস্থা সহজ করা। পূর্ব্বে একটি বিরাট জমকালো গ্রন্থাগার-গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ের পুস্তক ও পত্রপত্রিকাদি একত্রে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এ ব্যবস্থা আদৌ সুব্যবস্থা নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগগুলি স্থানে স্থানে ছড়ান। প্রতি বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রকে যদি তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ের পুস্তকাদি দেখা ও পড়ার জন্য প্রতিবার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আসতে হয় তা হলে যথেষ্ট সময়ের অপ-ব্যবহার হয়। তা ছাড়া আলোচনার সময় যদি সেই বিষয়সংক্রান্ত পুস্তকাদি হাতের কাছে না থাকে তা হলে কাজেরও অসুবিধা হয় অনেক। এই সকল দিক বিবেচনা করে বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় পরিচালনায় বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বইপত্র পড়ার জন্য সে কারণ পড়াশুনার যাতে সুবিধা সেই দিকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। বিভাগীয় গ্রন্থাগার চালু করার ফলে দ্রুত আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষ ভাবে সাহায্য-ব্যবস্থা

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন গ্রন্থাগার
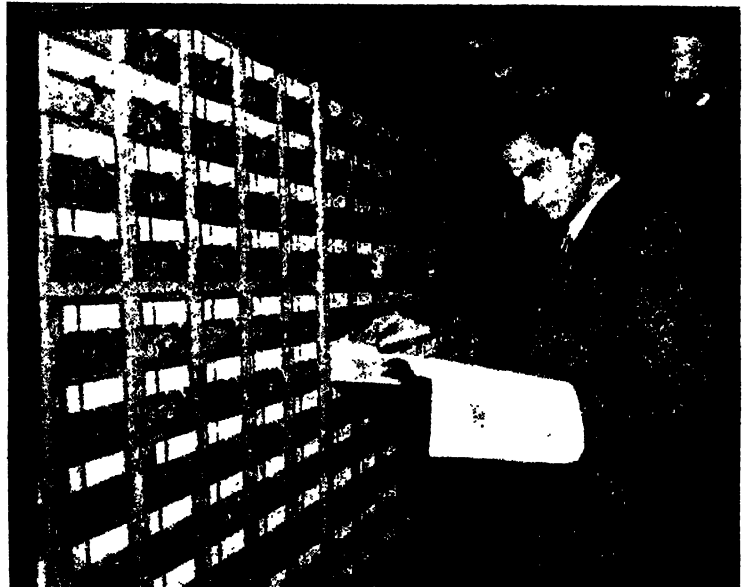
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার: গ্রন্থ-তালিকা কক্ষ

করা সম্ভব হয়। বিরাট জমকালো থামওয়ালা বাড়ী ছবিতে দেখতেই ভাল কিন্তু গ্রন্থাগারের পক্ষে এরূপ বাড়ী কতখানি কার্য্যকরী সে বিষয়ে ভাবা দরকার। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত কলম্বিয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারও আগে ঐ

আরাম-কক্ষ : কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রকম বড় বড় থাম ও গম্বুজওয়ালা জমকালো বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু কাজের অসুবিধা হওয়ায় এবং অযথা আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য রক্ষায় স্থান অপচয়ের জন্য তারা নূতন পরিকল্পনা করে গ্রন্থাগার গৃহের নূতন রূপ দিয়েছে। এই গৃহের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য কার্য্য-কারিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে স্থানের আবশ্যকতা খুব বেশী। কারণ সেখানে (১) নূতন বইপত্রাদি রাখার গুদাম, (২) বইপত্রাদি গ্রন্থাগারে ব্যবহার উপযোগী করবার দপ্তরখানা, (৩) বইপত্রাদি ব্যবহারের জন্য তাকে রাখবার উপযুক্ত স্থান, (৪) অনুলয় সেবা ও আদান প্রদান বিভাগের প্রশস্ত ব্যবস্থা, (৫) দপ্তরীখানা, (৬) দামী ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখার বিশেষ ব্যবস্থা, (৭) ফটো কপি করবার স্বতন্ত্র ঘর, (৮) প্রচার দপ্তর, (৯) পাঠক-দের ধূমপান ও আরাম কক্ষ এবং (১০) সংবাদপত্র, মানচিত্রাদি রাখারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা চাই। এ ছাড়া পাঠকদের বসবার ও কাজ করবার জন্য যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা ত রাখতেই হবে। সেজন্য গ্রন্থাগার-গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ের প্রতি সচেতন না থাকলে পরিকল্পনা সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় গ্রন্থাগারের কাজও ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সেজন্য পরিকল্পনার সময় বর্ত্তমান সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে সজাগ থাকা উচিত।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্থানের চাহিদা হয় —বইপত্র রাখার ও পাঠকদের বসবার ব্যবস্থার জন্য। আধুনিক মত অনুযায়ী প্রতি পাঠকের জন্য ২৫ বর্গফুট স্থানের ও যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। বই রাখার জন্য তাকগুলি যেন ৭ ফুটের বেশি উঁচু না হয়। তা হলে বইপত্র পাঠকের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

গ্রন্থাগারের মধ্যে শব্দ ও প্রতিধ্বনি যাতে না হয়, তাপ-

প্রদর্শনী কক্ষ : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মাত্রা যাতে সুসংবত থাকে, বাইরের ধুলা ও পোকামাকড় যাতে সহজে ঢুকতে না পারে এবং অগ্নিনিরোধক ও যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা থাকে সে সকল দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনায় একাধারে স্থপতি ও গ্রন্থাগারিকের সাহায্য প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের চাহিদা বিশেষ

বই রাখবার সেল্ফ: এডেলেড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ধরনের। সে কারণ যে কোন গৃহ গ্রন্থাগার-গৃহ হবার উপযুক্ত নয় এবং যে কোন স্থপতি গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনার অধিকারী নন।

গ্রন্থাগার-গৃহ পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ৫ দফা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত:

১। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন সুপরিচালনার সহায়ক হয়;

২। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন গ্রন্থাগারের সকল কাজের জন্য অযথা শক্তি ও অর্থের অপচয় দূর করে;

৩। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন আড়ম্বরহীন সহজ ও সুন্দর হয়।
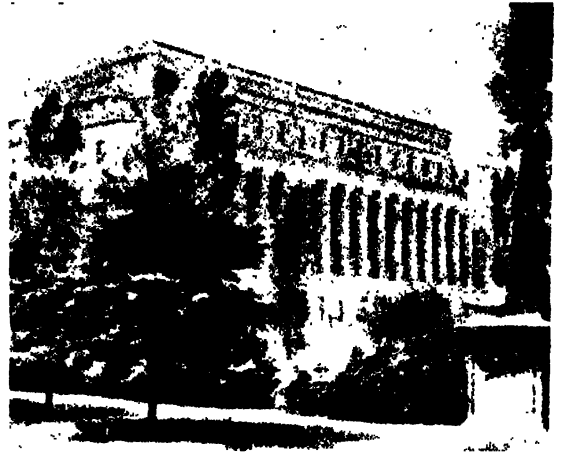
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রন্থাগার

৪। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কাজের অনুকূল হয়;

৫। গৃহ-ব্যবস্থাটি যেন পাঠক, বই ও গ্রন্থাগারকর্মীর মধ্যে সহজ যোগাযোগ রক্ষার সহায়ক হয়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন গ্রন্থাগার-গৃহের পরিকল্পনা করেছেন। শীঘ্রই গ্রন্থাগার-গৃহ নির্মাণের কাজ সুরু হবে এবং আশা করি, ভবিষ্যতে আধুনিক চিন্তাধারায় পরিকল্পিত এই গ্রন্থাগার-গৃহটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-স্থাপত্যের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হবে।

নাগার্জ্জুনের জীবনী ও যুগ-সমস্যা

শ্রীমদনমোহন চক্রবর্ত্তী

পৃথিবীর সমস্ত দেশই নিজের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করছে। এই গবেষণায় ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আরও উদ্দেশ্য আছে। হিন্দু যুগে ভারতে রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-দর্শনের বিভিন্ন শাখায় কতটা উন্নতি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অনেক ভারতীয় মনীষী গবেষণা সুরু করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। আজও অনেকে করছেন। গবেষণায় অসুবিধা অনেক। সেকালে হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁদের বিদ্যা ও পুঁথি নিজস্ব গণ্ডী ছাড়া প্রকাশ করতেন না। যেমন মিথিলা থেকে নব্যন্যায়ের গ্রন্থ বাইরে আনতে দেওয়া হয় নি। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাশেষে পণ্ডিতগণ দেশে ফিরতে দিতে রাজী ছিলেন না। আলবেরুনী হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে সামান্য জ্ঞানলাভ করেন। তাই সে যুগের এইসব খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বা ভূপর্যটকের বিবরণী সংক্ষিপ্ত। অস্পষ্ট এবং ভ্রান্তিকর। অনেক সময় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের জ্ঞান-গরিমা পুঁথির আকারেও প্রকাশ করতেন না। যতটুকু লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা পুঁথির আকারে এবং রক্ষিত হ'ত মঠে, মন্দিরে। কালের করাল-গ্রাসে এবং মুসলমান সমরনায়কদের অত্যাচারে সে সবই আজ নিশ্চিহ্ন। মহাকালের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি যে-সব গ্রন্থ আজিও বর্ত্তমান রয়েছে—তাদের পাঠ সর্ব্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়। সেগুলি একসঙ্গে পাঠ করে সিদ্ধান্ত করতে হবে এবং সে যুগে তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি যে-সব দেশের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক যোগসাধন হয়েছিল—সেখানেও গবেষণা করতে হবে। উৎসাহী গবেষককে সংস্কৃত, পালি, তিব্বতীয়, চীনা, জাপানী প্রভৃতি ভাষার পুঁথিপত্র পাঠ করতে হবে—তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই।

এই উদ্দেশ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খ্যাতনামা ফরাসী রসায়নী ও প্রাচীন ইউরোপের রসায়ন ইতিহাসের লেখক ম সিয়ে বার্থেলোর উৎসাহে ভারতের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রসায়নশাস্ত্রসমূহ ছাত্র-মনোবৃত্তি নিয়ে দীর্ঘ বারো বছর অধ্যয়ন করে "হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" রচনা করেন। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আচার্য্যদেব বলছেন, এই অধঃপতিত জাতিই একদিন বিজ্ঞানচর্চ্চায় জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিল ভাবলে ভবিষ্যতে আশার সঞ্চার হয়। চরক, সুশ্রুত, কণাদ, বরাহমিহির, নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি প্রভৃতির প্রতিভা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি, ভবিষ্যৎ চিত্রে এর প্রভাব কেনই বা পড়বে না। কালিদাস, ভবভূতি, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, শঙ্কর, রামানুজের প্রতিভা হিন্দুগণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। এঁরা শুধু হিন্দু সমাজের নন, সমগ্র জগতের গৌরবের বস্তু। পৃথিবীর প্রাচীন রসায়ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নি। ইউরোপের ঐতিহাসিকগণ অনেকেই আরবীয়দের রসায়ন-বিজ্ঞানে মূল ব্রতী ঘোষণা করেছেন। সুদূর অতীতে গ্রীক সভ্যতার শেষ রশ্মিটুকু বিলীন হয়ে গেলে প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠরত্নরাজি নিয়ে আরবীয়গণ ইউরোপে উপস্থিত হন। আরব থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ইউরোপে প্রসারিত হয়। তাই ভারতের নিকট আরবের ঋণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। আর সেজন্যই এবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। পণ্ডিত মোক্ষমূলর, অধ্যাপক ম্যাকডোনেল, কোলব্রুক, উইলসন, জ্যাকবি, উইন্স, কিউবটন, শ্লেগেল, ভুষ্টেনফেল্ট প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করেন, পারস্যের মধ্য দিয়ে গ্রীক-পণ্ডিতগণ হিন্দু দার্শনিক কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

বৌদ্ধযুগের অন্যতম দার্শনিক ও রসায়নী হচ্ছেন নাগার্জ্জুন। হিন্দু রসায়ন ও দর্শনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে হলে নাগার্জ্জুনের সময়কাল জানা প্রয়োজন। কিন্তু নাগার্জ্জুনের জন্মকাহিনী, জীবনী ও সময়কাল সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই—এই প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

দক্ষিণ-ভারতে বিদর্ভদেশে (বেরার) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে নাগার্জ্জুনের জন্ম। "চতুরশীতি মহাসিদ্ধ জীবনী সংগ্রহ" পাঠে জানা যায়-নাগার্জ্জুনের জন্ম কাঞ্চীদেশের কহোরে। জন্মের পর দৈবজ্ঞগণ বলেন, এর আয়ু সপ্তাহকাল মাত্র। আয়ুবৃদ্ধির জন্য শত ভিক্ষু ও শত ব্রাহ্মণকে দান-ভোজনে সন্তুষ্ট করায় আয়ু সাত বছর হয়। সাত বছর পরে তার পিতামাতা সন্তানের মৃত্যুদর্শন ভয়ে এক নির্জ্জন স্থানে পাঠান ও অবাধ ভ্রমণের সুযোগ দেন। বালক নাগার্জ্জুন দেশ-দেশান্তর ঘুরে নালন্দায় উপস্থিত হন। সেকালের নাম-করা পণ্ডিত সরহ তখন নালন্দায়। তাঁর উপদেশে দীর্ঘজীবন লাভের আশায় বোধিসত্ত্ব অমিতায়ুর সাধনা করেন। আট বছর বয়সে সরহের কাছে নাগার্জ্জুনের বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা সুরু হয় এবং উনিশ বছর বয়সে "শ্রীমান্" নাম নিয়ে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁকে "মিথ্যা দৃষ্টি ছেদক"ও বলা হয়। অতঃপর নাগার্জ্জুন মহামায়ূরী ও কুরুকুল্লা দেবীর আরাধনা করে বজ্রকায় ও অন্যান্য সিদ্ধিবিদ্যা লাভ করেন। আর রত্নভের কাছে রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে নালন্দায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি স্বর্ণপ্রস্তুতকরণ বিদ্যার সাহায্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে বিহারের দুঃখ-মোচন করেন।

নাগরাজ তক্ষকের কন্যা নাগার্জ্জুনের ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নাগলোকে নিয়ে যান। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি যোলখণ্ড গ্রন্থ ও নাগলোকের পবিত্র মাটি সঙ্গে আনেন। ঐ গ্রন্থে ত্রিপি-

টকের কিছু অংশ ও কয়েকটা ধারণী থাকায় তাঁর নাম হয় "নাগার্জ্জুন"। তিনি তিন বার ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। প্রথমে নালন্দায় বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী শঙ্করকে স্বধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত করেন। তার পর মাধ্যমিক মতবাদ প্রচার করেন। মধ্যদেশে তাঁর প্রচেষ্টায় একশো মন্দির এবং মহাকালের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। পরিশেষে উত্তর কুরু থেকে জম্বুদ্বীপে আসার সময় রাজা পুরুটকালকে রত্নাবলী গ্রন্থ উপহার দেন। দক্ষিণে জনসংঘের পাঁচ শ' জন বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করায় নাগার্জ্জুনের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

নাগার্জ্জুন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে (উত্তরবঙ্গ) রসায়নশাস্ত্র প্রচার করেন। সুপণ্ডিত হয়পাল ত্রিপিটক পণ্ডিত তঁদের শিষ্য। নাগার্জ্জুনের তারাতন্ত্র শিক্ষালাভ করেন হয়পাল ত্রিপিটের শিষ্য হয়ঘোষের কাছে। আর মহাকাল ও কুরুকুল্লাতন্ত্র শিক্ষালাভ করেন ধান্যকটক বিহারে বোধানন্দীর কাছে।

তিব্বতবাসীদের ধারণা, নাগার্জ্জুন মধ্যদেশে দু'শ বছর, উত্তর-দেশে ও নাগলোকে বার বছর, দক্ষিণদেশে দু'শ বছর আর শ্রীপর্ব্বতে এক শ' বছরেরও কিছু বেশী, মোটমাট পাঁচ শ' বছর জীবিত ছিলেন।

নাগার্জ্জুনের কর্ম্ম ও ঘটনাবহুল জীবনের শেষ অধ্যায় শ্রীপর্ব্বতে। তিনি এক রাখাল বালককে বিদেহরাজ্যের অধিপতি পদে অধিষ্ঠিত করান। এই রাখাল রাজার নাম শালবন্ধ। কথিত আছে রাজা শুভচর্য্যার কনিষ্ঠ পুত্র সুশুক্তি মাতৃ প্ররোচনায় শ্রীপর্ব্বতে নাগার্জ্জুনকে হত্যা করেন। মতান্তরে স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে তাঁর মস্তক প্রার্থনা করলে তিনি স্বেচ্ছায় দান করেন।

সঠিক ভাবে নাগার্জ্জুনের সময় নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। প্রাচীন ইতিহাসে এ নামে অনেক ব্যক্তির পরিচয় আছে। দু'জন নাগার্জ্জুনের অস্তিত্ব আমরা মেনে নিয়েছি—তাঁদের একজন মাধ্যমিক ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক দার্শনিক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ভারতীয় রসায়নের যুগপ্রবর্ত্তক—তির্য্যকপাতন, ঊর্দ্ধপাতন, ভস্মীকরণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক। পরবর্ত্তী হিন্দু রসায়নের গতি একটি নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত। ঔষধ বিজ্ঞানের যুগে রচিত গ্রন্থাবলীতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাগার্জ্জুনের প্রভাব সুপরিস্ফুট। হিউয়েন সাঙ, তারানাথ প্রভৃতি মনীষীর ধারণা দার্শনিক ও রসায়নী নাগার্জ্জুন একই ব্যক্তি।

লাসেনের মতে নাগার্জ্জুন কনিষ্কের সমসাময়িক। আনুমানিক ২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত কুষাণ রাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে ইনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত হন। কালক্রমে বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান ও হীনযানবাদী নামে বিশিষ্ট দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ প্রকট হওয়ায় শ্রমণদের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর দূর করবার জন্য কণিষ্কের আহ্বানে বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যগণের যে অধিবেশন হয় ইতিহাসে তা চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ-সঙ্গীতি। মহাযানপন্থীদের কর্ণধার হিসাবে নাগার্জ্জুন তাতে প্রতিনিধিত্ব করেন। "সর্ব্বং শূন্যং" মতের পরিপোষক মাধ্যমিক দর্শনের উদ্ভাবক নাগার্জ্জুন মহাযানবাদ প্রসারের জন্য দায়ী। একাদশ শতাব্দীর অন্যতম মনীষী "রাজতরঙ্গিণী" প্রণেতা কহ্লন মিশ্রের ধারণা নাগার্জ্জুন শাক্যসিংহেরও প্রায় দেড়শ বছর পরে জীবিত ছিলেন। এই মতে নাগার্জ্জুনের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারত পরিদর্শনে আসেন। তিনি নাগার্জ্জুনকে পৃথিবীর চতুঃসূর্য্যের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন। ৪০১ থেকে ৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বের জীবনী চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, বৌদ্ধ-রসায়নী নাগার্জ্জুন রাজা সাতবাহনের বন্ধু ছিলেন। সমসাময়িক কবি বাণভট্টের "হর্ষচরিত" গ্রন্থে হিউয়েন সাঙের মতবাদ সমর্থিত হয়েছে। চীন ও তিব্বত দেশের অনেক গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের সঙ্গে রাজা সাতবাহনের সখ্যতার কথা আছে। ঐ সব সূত্রে রাজা উদয়নের সঙ্গে ঋষির বন্ধুত্ব কাহিনীও উল্লেখ-যোগ্য। "রসরত্নাকর" গ্রন্থে নাগার্জ্জুন রাজা সালিবাহনের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। উদয়ন, সালিবাহন এবং দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতি সাতবাহন একই ব্যক্তি এবং সাতবাহন রাজাদের বংশধর। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন (অন্ধ্র) সাম্রাজ্যের পতন হয়। সুতরাং আনুমানিক ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে নাগার্জ্জুন ভারতীয় রসায়ন সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন মনে করলে কোন ভুল হয় না। আবার রসরত্নাকর গ্রন্থে সালিবাহনের চরিত্রকে কাল্পনিক মনে করারও প্রমাণ আছে।

অনেকের মতে নাগার্জ্জুন একাধিক অথবা প্রাচীন ভারতে রসায়ন বা বৌদ্ধ শ্রমণ সম্প্রদায়ের প্রধান নাগার্জ্জুন পদবীতে ভূষিত হতেন। "কক্ষপুটতন্ত্রের" মুখবন্ধে লেখক সেকালে চারজন নাগার্জ্জুনের আভাস দিয়েছেন। পরবর্ত্তীকালে তারানাথ তিব্বতীয় ভাষায় নাগার্জ্জুনের যে জীবনী লিখেছেন তাতে বহু অবিশ্বাস্য কথা বর্ত্তমান। তারানাথ নাগার্জ্জুনকে একজন ঐন্দ্রজালিক রসায়নী হিসাবে অঙ্কিত করে তাঁর সময়কাল নির্দ্ধারণ করেছেন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে।

তিব্বত ও চীনদেশীয় তথ্যগুলি আলোচনা করে ভালেসার বলেছেন, "যার নাম আমরা সঠিক ভাবে জানি না, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান, যাকে নানা গ্রন্থের প্রণেতা বলে মনে করি তারই নাম নাগার্জ্জুন।" ভালেসার সাহেব অন্যত্র বলেছেন, "যবনিকার অন্তরালে, গূঢ় রহস্যচ্ছায়ে নাগার্জ্জুনের ব্যক্তিত্বকে বেষ্টন করেছিল একটা ভাবধারা। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কত কাহিনী, গড়ে উঠেছে একটা অনাবদ্ধ অপরিমিত জীবনকাল। এই অসীম ঐশীশক্তি অর্জ্জনের গৌরব তাকেই দেওয়া হয়।" "ইণ্ডিয়ান্ হিস্টোরিক্যাল্ কোয়ার্টারলীতে" সম্প্রতি এক নিবন্ধে অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক মন্তব্য করেছেন, তিব্বতীয়গণ দুই পৃথক নাগার্জ্জুনকে একীভূত করে ফেলেছেন। রসায়নী নাগার্জ্জুনের কাল নির্ণয়ে ঐ সব তথ্য তাই নির্ভরশীল নয়।

নাগার্জ্জুনের অন্যতম গ্রন্থ "কক্ষপুটতন্ত্র"। ঐ গ্রন্থের তথ্যাবলী থেকে বলা যায় তাঁর সময়কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে একই নামধারী দার্শনিকের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব। "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার" পত্রিকায় সম্প্রতি এক প্রবন্ধে শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, কক্ষপুটতন্ত্র প্রণেতার যুগ নিশ্চিতভাবে ষষ্ঠ শতাব্দী বা তারও পরে। তাঁর মতে রসায়নিক ও দার্শনিক নাগার্জ্জুন দুই বিভিন্ন ব্যক্তি। শেষোক্ত নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব খ্রীষ্টধর্ম বিকাশের প্রারম্ভে।

নাগার্জ্জুন বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রসমূহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতীত ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন প্রধানতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে অনুসৃত হয়েছিল—রসায়ন জ্ঞানের মূল উৎস মৃতসঞ্জীবনী—মানুষকে অমরতা দান। পরবর্তীকালে এটি ধর্মানুশীলনের পর্যায়ে পড়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়—ইন্দ্রজাল, প্রেততত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, পরশ পাথরের সন্ধান প্রভৃতি রহস্য এই সব গ্রন্থের উপপাদ্য। হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে তন্ত্রের অবদান অসামান্য। ভারতীয় আলকিমির উদ্ভব এবং স্বরূপ তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। তন্ত্র সাধনার অতি গৌরবময় যুগে "রসার্ণব", "রসহৃদয়", "রসসার", "রসরত্নাকর" প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে যেখানে হর ও পার্ব্বতী সর্বজ্ঞানের উৎস, বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রে সেখানে একজন বুদ্ধ, তথাগত বা অবলোকিতেশ্বরকে অবতারণা করা হয়েছে। রসরত্নাকরতন্ত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের সংমিশ্রণ হয়েছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের অবনতির যুগে নিজ নিজ তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। তান্ত্রিক মতবাদের প্রাধান্য সবই গুপ্তোত্তর যুগে। এর আগে কোন তন্ত্রশাস্ত্র পাওয়া যায় না। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কক্ষপুটতন্ত্র রচিত হয়েছে গুপ্তযুগের পরে, যে যুগের অবসান ঘটেছে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। বীরেশ্বরবাবু কক্ষপুটতন্ত্রে "দীনার" কথাটির উপর আলোক সম্পাত করেছেন। রোম দেশীয় মুদ্রা "দীনারিয়াস" ভারতে প্রথম প্রচলিত হয় কুষাণরাজ বিম কদফিস বা ২য় কদফিসের সময়ে। স্মাপসন্, টমাস প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে তাঁর রাজশাসনকাল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে দীনার কথাটি স্থান পেয়েছে আরও পরে গুপ্তযুগে। কক্ষপুটতন্ত্রে এর উল্লেখ থাকায় মনে হয় তৎকালে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আনুমানিক গুপ্তযুগে অথবা তারও কিছু পরে সংস্কৃত সাহিত্য যখন পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে—গ্রন্থের লেখক সেই সময়ের।

দুই পৃথক নাগার্জ্জুনের অস্তিত্ব পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য ও গিউসেপী টুসি সমর্থন করেছেন। তিব্বতীয় তথ্যের উপর নির্ভর করে শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য বলেছেন, দার্শনিক নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর এবং রসায়নী নাগার্জ্জুন সপ্তম শতাব্দীর। গিউসেপী টুসি বলেন, "এত প্রবন্ধ এত পুস্তিকা যা আমরা নাগার্জ্জুনের বলে মনে করি তা নিঃসন্দেহে পরবর্তী যুগের অবদান এবং অন্য এক নাগার্জ্জুনের (সিদ্ধ-নাগার্জ্জুন) রচনা।" এই সব প্রমাণ থেকে মনে হয় "রসরত্নাকর", "কক্ষপুটতন্ত্র", "আরোগ্যমঞ্জরী", "নাগার্জ্জুনতন্ত্র", "রত্নাবলী", "মহাভেরীসূত্র" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক রসায়নী নাগার্জ্জুন বা সিদ্ধ-নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব কাল সপ্তম শতাব্দীর কাছাকাছি।

বৈদ্যরাজ সিংহগুপ্তের পুত্র বাগভট তাঁর "রসরত্নসমুচ্চয়" গ্রন্থে আলকিমি বিদ্যাবিশারদ সপ্তবিংশতি বুধমণ্ডলীর অন্যতম স্থানে নাগার্জ্জুনকে বন্দনা করেছেন এবং "ধাতুবাদ" সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছেন। বৃন্দ, চক্রপানি এবং "রসেন্দ্রচিন্তামণি" প্রণেতা ঢুণ্ঢুকনাথ নাগার্জ্জুনের স্তুতি গান করেছেন। বৃন্দ ও চক্রপানির মতে নাগার্জ্জুনই কজ্জলের আবিষ্কর্তা। সুশ্রুতের যে ভাষ্য এখন চলিত, ডল্লন ও অন্যান্য অনেকের মতে তা বৌদ্ধ রসায়নী নাগার্জ্জুনের সঙ্কলিত। কিন্তু তাঁর লেখার ভাবে মনে হয় নাগার্জ্জুন ভিন্ন অপর প্রতি সংস্কারও পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি ছিল "প্রতিসংস্কর্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব।" নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের সংস্কর্তা স্বীকার করলে এই নাগার্জ্জুন কে তা স্থির করা কঠিন। সুশ্রুতে পারদের জরা-ব্যাধি-নাশকতা গুণের উল্লেখ না থাকায় সিদ্ধ-নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুত-সংহিতার লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। দার্শনিক নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের ভাষ্যকার বলবার কোন প্রমাণ বৌদ্ধ গ্রন্থে নেই। তবে সুশ্রুতের মধ্যে সুভূতি গৌতমের উল্লেখ প্রভৃতি দু-একটি কথা থেকে যদি অনুমান করি সুশ্রুতের সংস্কার হয়েছিল বৌদ্ধযুগে তাহলে অসঙ্গত হয় না। এ কথা স্বীকার করলে বলতে হয় সুশ্রুতের সংস্কার হয়েছে দু-হাজার বছর আগে। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বৌদ্ধাচার্য নাগার্জ্জুন দু-হাজার বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে চরকোক্ত ক্ষয়জ-কাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুত সংহিতায় স্থান পাওয়ায় মনে হয় সুশ্রুতের সংকলন চরকের পরবর্তী যুগের। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন আপনাকে পাল নৃপতি মদনপালদেবের বল্লভ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। পাল রাজারা খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। ডল্লন ও চক্রপানি উভয়ের মধ্যে কেউই কারও নাম না করায় মনে হয় উভয়েই এক সময়ের। ডল্লন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

চরক, সুশ্রুত বা বাগভটের চেয়ে নাগার্জ্জুনের গ্রন্থাবলী সারগর্ভ, সারবান এবং ভাষার লালিত্যে প্রাণবন্ত। সুতরাং নাগার্জ্জুনের সময়কাল বাগভটের পরবর্তী। ইৎসিং নামক চীনা পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণে আসেন। তাঁর গ্রন্থে বাগভটের উল্লেখ থাকায় মনে হয় বাগভট খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। "নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে" একটি ঔষধের প্রস্তুতি ও ব্যবহারবিধি বৃন্দ ও চক্রপানি উভয়েই সঙ্কলন করেছেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় রসায়নী নাগার্জ্জুন বৃন্দ ও চক্রপানির পূর্ব্ববর্তী। চক্রপানি দত্ত গৌড়াধিপতি নয়পালের রাজবৈদ্য নারায়ণের পুত্র। নয়পাল ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চক্রপানি বৃন্দ লিখিত "সিদ্ধযোগ" অনুসরণ করে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন, বৃন্দ আবার মাধব

করের "নিদান" গ্রন্থ অবলম্বনে সিদ্ধিযোগ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রমাণ হতে মনে হয় বৃন্দ চক্রপানির এক বা দুই শতাব্দী পূর্ব্বে নবম বা দশম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পাটলিপুত্রের স্তম্ভে নাগার্জ্জুনের উল্লেখ থাকায় তাঁকে বৌদ্ধাচার্য্য বলেই মনে হয় কেন না পাটলিপুত্রে বৌদ্ধগণের বিহার ক্ষেত্র ছিল। তন্ত্রাচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি নাগার্জ্জুনের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন এ কথা নাগার্জ্জুন স্বীকার করেছেন এবং চন্দ্রকীর্ত্তি নাগার্জ্জুনের মতবাদে গভীর আস্থাবান ছিলেন।

আরবীয় ঐতিহাসিক আলবেরুনী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পরিক্রমায় আসেন। তিনি বলেছেন, "আলকেমী বিদ্যার মূর্ত্ত প্রতীক নাগার্জ্জুনের জন্ম সোমনাথের নিকট দাহিক দুর্গে। আমাদের একশো বছর আগে তিনি জীবিত ছিলেন।" বিজ্ঞানেতিহাসের অন্যতম দিকপাল জর্জ্জ সারটনের মতে নাগার্জ্জুন অষ্টম শতাব্দীর। বিখ্যাত রসায়নী এবং রসায়ন ইতিহাসের খ্যাতনামা লেখক পারটিংটন মনে করেন নাগার্জ্জুন নবম শতাব্দীর।

এই সব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি বলা যায় সিদ্ধ-নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব নবম শতাব্দীতে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন এবং নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ সমূহের আভ্যন্তরীণ তথ্যাবলীর আলোচনার মাধ্যমে সুমীমাংসা সম্ভব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাগার্জ্জুনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। "নাগার্জ্জুন পুরস্কারের" ব্যবস্থা করে। রসায়নের শ্রেষ্ঠ গবেষকদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। হায়দ্রাবাদ রাজ্যসরকারের প্রচেষ্টায় কৃষ্ণা নদীতে "নাগার্জ্জুন সাগর পরিকল্পনা" এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যে "নাগার্জ্জুন স্তম্ভ" প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ১২ই ডিসেম্বর ঐ পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন ও স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করবেন।

গ্রন্থ ও পত্রিকা স্বীকৃতি

১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়: "স্পর্শমণি"—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩১।

২। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়: হিন্দু-সায়নী বিদ্যা (শ্রীভবেশ চন্দ্র রায় অনূদিত)।

৩। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন: আয়ুর্ব্বেদ পরিচয়।

৪। অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক "আচার্য্য নাগার্জ্জুন ও চন্দ্রকীর্ত্তি"—জগজ্জ্যোতিঃ, মাঘী পূর্ণিমা সংখ্যা, ১৯৫৪।

৫। ডাঃ কালিদাস নাগ: স্বদেশ ও সভ্যতা।

6. Sir P. C. Roy: *History of Hindu Chemistry* (Vol. I and II).

7. Dr. J. R. Partington: *History of Chemistry*.

8. Bireswar Banerjee: "Age of Nagarjuna"—*Science and Culture*, November, 1954.

9. G. Sarton: *Introduction to the History of Science*, Vol. I.

10. R. M. Chatterjee: *Siddha Nagarjuna Kakshaputam*.

11. M. Walleser: *Life of Nagarjuna from Tibetan and Chinese Sources*.

12. S. Pathak: "Life of Nagarjuna"—*Indian Historical Quarterly*, March, 1954.

13. *Studies in the Tantras*.

14. Brown: *Coins of India*.

15. Vidhushekhara Bhattacharjee: *Mahajanavimsaka*.

16. Guiseppe Tucci: *Dinnaga Buddhist Texts on Logic from Chinese Sources*.

17. D. C. Bhattacharjee: "New Light on Vaidyaka Literature"—*Indian Historical Quarterly*, Vol. 23, 1947.

জ্যোতির্ম্ময়

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

আলোর সাথে প্রথম প্রাতে
তোমার নীরব বাণী,
পাঠিয়ে দিলে ভুবন তলে
নিবিড় তিমির হানি'।
সেই বাণী যে তরু-লতায়
জাগায় তৃষা আকুলতায়
সেই বাণী যে দখিন বায়ে
করে কানাকানি॥

নিত্য-ঝরা নির্ঝরিণীর
মতো তোমার সুরে,
দূরের গীতি দোল দিয়ে যায়
মনের মধুপুরে।
আলো-ছায়ার মিলন ধারা
করবে জানি আপন হারা
সেই সুরেতে তোমার আমার
হ'বে জানাজানি॥

গঙ্গার ইলিশ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বাড়ীর আঙিনার একটি বিশেষ স্থানে রোদ এসে পড়তেই সুমথ থলি হাতে করে মন্থর পদে অন্যমনস্ক ভাবে বাজারের পথে অগ্রসর হয়ে চলে। ভাঙ্গা বাজারে জিনিষপত্র সস্তায় পাওয়া যায়। এ নিয়ে রোজই তাকে গঞ্জনা সইতে হয় কিন্তু সে নিরুপায়। অবস্থার বিপর্য্যয়ে আজ যেখানে এসে তারা দাঁড়িয়েছে তাতে এর চেয়ে ভাল কিছু তার চোখে পড়ে না—নইলে ছেলেদের মাঝে মাঝে একটা ভাল মাছ কিম্বা কিছু টাটকা তরিতরকারি খাওয়াতে পারলে সে নিজেই কি কম খুশী হ'ত? গোনাগুনতি কয়েক আনা পয়সায় তাকে ব্যবস্থা করতে হয়—বেশী খরচ করবার সামর্থ সুমথর নেই। কলোনীর একপ্রান্তে এককালি জমি দখল করে ছোট কুঁড়ে ঘরখানি তুলতেই তার সঞ্চিত অর্থের একটা বৃহৎ অংশ শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্টাংশও জীবন ধারণের প্রয়োজনে এই ক' বছরে ব্যয় হয়েছে। সেও আজ প্রায় দু' বছর হ'ল। তার পর থেকেই চলেছে এই সংগ্রাম।

স্ত্রী সরমা জেনে শুনেও যে কেন মাঝে মাঝে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে সুমথ তা বোঝে না। অর্থহীন চেঁচামেচি, যুক্তি নেই বিচার নেই। তবে একথা সে জানে যে, সরমার এ গর্জ্জন ক্ষণস্থায়ী তাই নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে বর্ষণের।

সে দিনেও বাজার থেকে ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল। আরম্ভটা মৃদু কণ্ঠে হলেও কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে পঞ্চমে উঠল। নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রিয় সুমথ কাতর কণ্ঠে বারে বারে শুধু বলতে থাকে, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে সরমা! ছেলেদের তুমি যেমন মা আমিও তেমনি বাপ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। রেগে গেলে সরমার জ্ঞান থাকে না। তাই বলে এতখানি মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয় ইতি-পূর্ব্বে আর কোনদিন দিয়েছে বলেও সুমথর মনে পড়ে না। আজ যতখানি সে ব্যথিত হ'ল তার চেয়ে ঢের বেশী হ'ল বিস্মিত।

সরমা তখনও বলে চলেছে, এখানে তুমিই শুধু একলা মানুষ নও—তোমার মত আরও হাজার হাজার বাস করছে। তাদের যদি চলতে পারে তোমার চলবে না কেন?

কঠিন প্রশ্ন। এর কোন জবাব সুমথ দিতে চায় না। শুধু অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সরমা থামতে পারে না। উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে থাকে, কবে কি খেয়েছ আর কি পরেছ তাই ভেবে তোমার দিন চলতে পারে কিন্তু সকলের চলে না। আমাকে রোজ দুটি বেলা ছেলেদের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে হয়। ওদের সব রকমের বায়না আমাকেই সইতে হয়।

আশ্চর্য্য এতেও সরমা সুখী নয়—সুমথ অন্যমনস্ক ভাবে ভাব-ছিল, সে আজও দুটি বেলা ছেলেদের সামনে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে পারছে। এ যে কত বড় পাওয়া তা সরমা বুঝতে না চাইলেও সুমথ অনুভব করে, কিন্তু অভিযোগ করে না।

সরমা তেমনি বলে চলেছে, কত আর মিথ্যে দিয়ে ওদের ভুলিয়ে রাখব?

সুমথ এতক্ষণে কথা কইলে। শান্ত ব্যথিত দুটি চোখ তুলে সে সরমার পানে তাকালে, বললে, ওদের সত্য কথাটা এতদিন তোমার জানিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।

তাতে তোমার সম্মান বাড়ত না—সরমা উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলে।

সুমথর মুখে বড় সুন্দর একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে তেমনি শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, অক্ষমকে অক্ষম বললে তাকে অসম্মান করা হয় না সরমা। আমি ব্যথা পেলেও এক বিন্দু দুঃখিত হব না। আমার এ কথাটা অন্তত তুমি বিশ্বাস করো।

সুমথর কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না, কিন্তু সরমা অকস্মাৎ নিজের অজ্ঞাতেই চমকে উঠল। স্বামীর মলিন মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই তার এতক্ষণের মারমুখী ভাব এক নিমেষে মিলিয়ে গেল এবং সহসা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে ধীরে ধীরে বললে, আমার দুঃখ তুমি কোন দিন বুঝলে না।

সুমথ পুনরায় চোখ তুলে স্ত্রীর মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে। সরমা এ চাহনি সহ্য করতে পারলে না। পালিয়ে আত্মরক্ষা করলে। এতবড় মিথ্যা অনুযোগ বুঝি ইতিপূর্ব্বে আর কোন দিন সে করে নি।

বিচিত্র মানুষের মন। সুমথ ভাবছিল। কিন্তু জবাব সে দিলে না। সরমাকে সে জানে তাই বৃথা তর্ক করে ওকে আর নূতন করে লজ্জা দিতে চায় না। তা ছাড়া যে অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা চলেছে, মনের উপর যে অসহ্য চাপ পড়ছে তাতে এমনি দু'চারটে অসংলগ্ন কথা যদি সরমার মুখ থেকে বেরিয়েই আসে তাই নিয়ে ক্ষেদ করে কি হবে। আর তাতে তার অক্ষমতার গ্লানি কিছুমাত্র লাঘব হবে কি?

রান্না ঘর থেকে বিন্দিবৌয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, সরমাদির বাজার এল বুঝি এতক্ষণে? রাঁধবে কখন? ঐ দুধের ছেলেদের খেতেই বা দেবে কখন?

অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন। পাড়াপড়শীরা এ প্রশ্ন সকলকেই করে থাকে। কিন্তু সরমা জবাব দিলে না। অন্ততঃ সুমথর কানে এসে উত্তরটা পৌঁছল না।

বিন্দিবৌ দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলে, তোমার থলির মধ্যে কি রেখেছ দিদি—ডাঁস মাছিতে ছেঁকে ধরেছে যে?

সরমার জবাবটা এবারে সুমথর কানে এল। সরমা বলছিল, আজ কি নূতন দেখছ বোন? শেষ বাজারের জিনিষ ওর চেয়ে ভাল হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। জালা আছে। প্রচ্ছন্ন শ্লেষও হয়ত রয়েছে, তবে ত' কার উদ্দেশে বর্ষিত হ'ল তা বুঝতে না পেরে সুমথ চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবার মত মনের অবস্থা তখন তার নয়। নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিন্দিবৌ পুনশ্চ বললে, তোমারও কিন্তু দোষ আছে দিদি—কণ্ঠস্বরে খানিকটা কৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ পেল। চেষ্টা করেও ঢাকতে পারে না বিন্দিবৌ।

সরমা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওকে ঠিক বুঝতে পারে না সে। বলে, এর মধ্যে আবার দোষ খুঁজে পেলে কোথায় তুমি বোন।

বিন্দিবৌ বড় বড় চোখ করে তাকাল, তার পরে হেসে বললে, কোন কথাই যদি তোমরা না বুঝবে তা হলে অভাব ঘুচবে কেমন করে। তোমরা দু'জনেই হয়েছ সমান। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ।

সরমা করুণ হেসে জবাব দিলে, দিন রাত অভাব অভাব করে চিৎকার করলে কি দুঃখ দূর হবে? তা ছাড়া মন্দই বা আছি কি…

হাত মুখ নেড়ে বিন্দিবৌ পুনরায় বলে, তুমি অবশ্য সব সময়ই তাই বল, কিন্তু ছেলে দুটো যে দিনরাত ছোঁক ছোঁক করে এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। তা ছাড়া ওদের আর দোষ কি—ছেলেমানুষ। আমরাও মানুষ দিদি তা তোমরা যতই অগ্রাহ্যি কর না কেন। পারলাম কি চুপ করে থাকতে। কর্তা হাতে করে গঙ্গার ইলিশটা নিয়ে এল আর ছেলে দুটো সেখানে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলে, ইলিশ মাছ বুঝি? খেতে খুব ভাল তাই না কাকী। বললাম, তোর বাপকে বলিস এনে দেবেন। ওরা একসঙ্গে জবাব দিলে, বাবা কুঁচো চিংড়ি আনেন। বড্ড কষ্ট হ'ল দিদি। চোখের সামনে নিয়ে এল মাছটা—বসিয়ে রেখে দিলাম খানকয়েক ভেজে—

কথার মাঝে বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে সরমা জিজ্ঞেস করলে, আর ওরা তাই বসে বসে খেলে—

আহা খাবে না—বিন্দিবৌ বিগলিত কণ্ঠে বললে, সোনামুখ করে খেলে। বলে, এমন ওরা কোনদিন খায় নি। তা বাপু তুমি রাগ করলে কি হবে। ছেলেমানুষ সব সময়ই ছেলেমানুষ। মাঝে মধ্যে এনে দিলেও পার—

না পারি না—সরমা ভেঙে পড়ল, কিন্তু তুমি ত ছেলেমানুষ নও বোন! তুমি কি বলে ওদের মাছ দিতে গেলে—

বিন্দিবৌ একমুখ হেসে জবাব দিলে, তুমি কি যে বল দিদি! মানুষের চামড়া নেই আমাদের গায়।

সরমা ইতিমধ্যেই সামলে নিয়েছে। সে শান্ত কণ্ঠে বললে, না বৌ ভবিষ্যতে তুমি এ ভাবে ওদের আস্কারা দিও না। ওদের বাবা এ সব পছন্দ করেন না।

বিন্দিবৌ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে তা হলে ছেলেদের ঘরে বন্ধ করে রেখে দিও নইলে তোমাদের মান সম্মান সত্যিই শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে না।

সরমা কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলে। বললে, কিছুই ত নেই বৌ শুধু ঐটুকু ছাড়া! আমার অনুরোধ বোন এ দিকে তোমরা নজর দিও না।

বিন্দিবৌ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সহসা সে বসে পড়ল। বার কয়েক মাথাটা এ পাশ থেকে ও পাশে হেলিয়ে বলতে সুরু করলে, আমিও সবসময় এই কথাটাই বলি, কিন্তু সে মানুষটা কি কথা শোনে? বলে, সময় অসময় অমুকদার কাছে অনেক উপকার পেয়েছি—টাকা পয়সা দিয়ে না পারি দুটো মুখের কথা দিয়েও যদি—

কথাটা বিন্দিবৌ শেষ করতে পারে না। সরমা তাকে বাধা দিয়ে বলে, উনি যে কোন কথাই শুনতে চান না এ তোমাদের কত বার বলব বৌ। ওঁর সেই এক কথা, দেনা করব তা শুধব কেমন করে? যদি কারবারে লোকসান হয়ে যায়? সরকার কি তখন আমায় রেয়াৎ করবে?

বিন্দিবৌ খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, আমাদের উনি ত সেই কথাই বলেন। সরকারী দেনা আবার শোধ করতে হবে কেন—এ খবরটাও তোমরা জান না? এ যে আমার ছোট ছেলেটাও জানে। আজকের দিনে এই ভাল মানুষটাকে লোকে নাকি ভণ্ডামী বলে—

সরমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। উত্তেজনায় সে কাঁপছিল। বললে, যে ভাবেই হোক দিন হয়ত তোমাদের ভালই যাচ্ছে, কিন্তু তার গরমে অকারণে মানুষকে অপমান করতে এস না বৌ—

বিন্দিবৌ পিছু হটবার পাত্রী নয়। শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে সে জবাব দিলে, কথাটা আমার কাছ থেকে আজ নূতন শুনলে নাকি? আমি বরং যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েই বললাম। উনি দাদা বলে ডাকেন তাই।

বিন্দিবৌ উঠে দাঁড়াল। আর একবার আড়চোখে সরমার মুখের পানে চেয়ে দেখে হেলে দুলে প্রস্থান করলে।

সরমা বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টিতে তার চলার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ জ্বালা করে জলের ধারা নেমে এল। বিন্দিবৌর এই অকারণ আক্রমণের কোন হেতুই সে খুঁজে পায় না।

সরমা যে কতক্ষণ এমনি অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিল তা তাঁর হুঁশ ছিল না; সহসা পুত্রের আহ্বানে চেতনা ফিরে এল এবং তাকে আর দ্বিতীয় কথা বলার অবকাশ না দিয়ে তার গালের উপর ঠাস ঠাস দু' ঘা বসিয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক রূঢ় কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, হতভাগা ছেলে আমার কাছে এসেছ কেন? লজ্জা করে না

আমাকে মা বলে ডাকতে? দূর হয়ে যা আমার চোখের সুমুখ থেকে। যাদের কাছে হাত পেতে ইলিশ মাছ খেয়েছিস সেখানে যা হারামজাদা নচ্ছার—সহসা ছেলের মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সরমা থামলে। তার দু' চোখে জলের ধারা।

আঘাতের চেয়েও মায়ের চোখের জল এবং অকারণ অভিযোগ গোপালকে কেমন যেন অভিভূত করে ফেলেছে। সরমা থামতেই গোপাল কাতর ভাবে বলে উঠল, তোমাকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে মা। বৃন্দাবন কাকা যখন মাছ নিয়ে আসেন আমি আর দুলাল সেখানে ছিলাম। মাছ ত খাইনি আমরা। কাকা দিতে চাইলেন আমরা নিই নি। কাকীমা কত রাগ করলেন কাকাকে।

সরমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছেলেকে অকারণে তাড়না করবার জন্যে অনুতপ্ত হ'ল। বিন্দিবৌর আজকের আক্রমণের কারণটাও এতক্ষণে সে কতকটা অনুমান করতে পেরেছে। ওদের সে বহুদিন থেকেই জানে। অকারণে মানুষকে বিব্রত করেই ওরা আনন্দ পায়। কিন্তু তাই বলে দুটি অবোধ শিশুকে নিয়ে এই—কথাটি ভাবতে গেলেও সরমার মন ছোট হয়ে যায়।

মায়ের বেদনা-মলিন মুখের পানে চেয়ে পুনরায় গোপাল বললে, তুমি দুলালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবে মা।

সরমার চোখে জল দেখা দিল। সে গোপালকে সহসা বুকের কাছে টেনে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললে, দুলালকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেন? আমার গোপাল কি তার মার কাছে মিথ্যে বলতে পারে?

গোপাল দুঃখ ভুলে হাসিমুখে চলে গেল। সরমার বুকের উপর থেকে এতক্ষণের পাষাণভার এক নিমেষে নেমে গেল। কিন্তু সুমথ আত্মগ্লানির কঠিন চাপ থেকে তার মনটাকে কিছুতেই মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছিল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পায় পায় সে বহুদূরে চলে এসেছে। মনটা চলে গেছে আরও দূরে। সুমথ ভাবছিল তার নিজের কথা। যেগুলো ঠিক কথা নয়—ঘটনাগুচ্ছ। যার সৌন্দর্য্য ছিল—সুবাস ছিল। সে ঘ্রাণ আজও তার নাকের পাশে লেগে আছে। তার চেতনায় এর অবস্থিতি। আর সেই সঙ্গে সে স্পষ্ট দেখতে পায় সানুকে। ওকে সুমথ চেনে। শুধু চেনে বললে সব বলা হয় না। মনে হলেই ভিতরে বাইরে সে চঞ্চল হয়ে উঠে। সানুর চিন্তাকেও সে ভয় করে—সানু এ সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে। এক পাল সহপাঠীসহ তার চোখের সম্মুখে জীবন্ত হয়ে উঠে। সুমথর কাছে বর্ত্তমান মুছে যায়—আত্মনিমগ্ন হয়ে বসে আছে সে। আর তার চোখের সামনেই সানু তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মায়ের কাছে হাজির হয়েছে। সানুর মা একমুখ হেসে বললেন, আজ তোদের ছুটি বুঝি?

বন্ধুর দল চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ মাসীমা। আজ আমাদের ইনস্পেক্টর এসেছিলেন যে ভাই।

সানুর মা তেমনি হাসিমুখেই জবাব দেন, তাই বুঝি মাসীমাকে উদ্ধার করতে এসেছ!

সানু প্রতিবাদ জানায়, বারে তুমি নিজেই ত বললে আজ তাল-পিঠে হবে—

মা হেসে উঠে সস্নেহে বলেন, তার মানে কি পিঠে খাবার নেমন্তন্ন রে সানু? কিন্তু তোরা হাংলার দল এলি কোন মুখে—

সানুর মা এমনি করেই ওদের অভ্যর্থনা জানান। সকলেই তা জানে। এর পরে তাঁকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা যায়। ওদের সামনে বসিয়ে পরম যত্নের সঙ্গে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দেবার আগে আবার আসবার কথা বলে দেন।

সানুর সমস্ত অন্তর জুড়ে তার মা। বাবা আছেন এই পর্য্যন্ত। তিনি থাকেন তাঁর ব্যবসা নিয়ে। সংসারের কোন কিছুর ধার ধারেন না তিনি। মায়ের স্নেহের ছায়ায় ভেসে গেলে সানু বড় হতে লাগল। শৈশব গেল। কৈশোরও যাই যাই প্রায়, এমনি দিনে সানুর বাবা তাকে ব্যবসায়ে টেনে নিতে চাইলেন। মা বাধা দিলেন। তাঁর সানু আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক তার পরে…কিন্তু তার পরের কথা নিয়ে মাকে আর বেশী দিন মাথা ঘামাতে হয় নি। তার আগেই তাঁকে চলে যেতে হ'ল। সানুর জীবনে একটা পরিবর্ত্তন ঘনিয়ে এল। পড়াশুনা সেইখানেই ইতি হ'ল। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তার সাহসও নেই, শক্তিও নেই। তা ছাড়া মার মৃত্যুর কয়েক মাসের ব্যবধানেই তার বাবা যেন অনেক বছর এগিয়ে গেলেন। সানু ভয় পেল। এমনি এক সম্ভাবনার জন্ম সে প্রস্তুত ছিল না। কোন দিন কল্পনা করতেও পারে নি। তাই সংসারে দুঃখের এই বাস্তব রূপ দেখে সে শঙ্কিত হ'ল। বাবার কাছে সানু পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলে।

কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বাপ তাঁর ভাঙা সংসারে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলেন। কথাটা শুনে প্রথমে চমকে উঠলেও বিয়ের পরে সে চমক শিহরণে রূপান্তরিত হ'ল। রূপে, রসে আর গন্ধে তার জীবন সরস হয়ে উঠল। মায়ের অভাব ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এল। স্ত্রী তার মনের একটা বৃহৎ অংশ ভরে রেখেছে—সেবায়, ভালবাসায়, হাস্যে আর লাস্যে।

সানু মন দিয়ে ব্যবসা করে। পড়শীদের দুর্দ্দিনে বুক দিয়ে দাঁড়ায়। অর্থ দিয়ে করে সাহায্য।

সানুর স্ত্রী দুটি পুত্র সন্তানের জননী হয়েছে। তার অনেক কাজ। মৃত শাশুড়ীর শূন্যস্থান সে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। একথা সানুর বাবা রোজই এক বার করে বলে থাকেন। দিন দিন তিনি ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছেন। কি যে সব আবদার করেন তিনি সানুর স্ত্রীর কাছে। সে মনে মনে হাসে। এ আবদার তার ছোট ছোট ছেলেরা করলেই যেন মানায়। অপরিসীম তৃপ্তিতে আর গর্ব্বে তার বুক ভরে ওঠে। মার কথা আবার নতুন

করে মনে পড়ে। আজ তিনি বেঁচে থাকলে তাদের দিনগুলি না জানি আরও কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারত।

দিন চলে যায়। দেখা দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কিন্তু তাদের গ্রামে যুদ্ধের বিন্দুমাত্র আঁচ লাগে নি। দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত ঘটে নি তাদের আশেপাশে কোথাও। এত যে হানাহানি, এত যে টানা-টানি তাতেও ওদের অভ্রান্ত জীবনযাত্রাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। কিন্তু এরই পরে এল স্বাধীনতা। যারা চলে গেল তারা ছড়িয়ে গেল মারাত্মক তীব্র বিষ। সে বিষের জ্বালায় জ্বলে গেল কত অগণিত সুখী সংসার। মিলিয়ে গেল তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ভেঙে গেল তিল তিল করে গড়ে তোলা সামাজিক জীবনের সকল আশা আর আকাঙ্ক্ষা।

সানু আজ কোথায়? কোথায় আজ তার আনন্দমুখর সংসার। বিগত দিনের সবকিছুই আজ নিছক একটা সুখস্বপ্ন। ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে তারা হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে শূন্য দৃষ্টি রেখে—

সানু কাউকে দোষ দেয় না। দেশব্যাপী এত বড় একটা পরিবর্তন যখন হয় কিছু লোককে তার জন্য আত্মাহুতি দিতে হবে বৈকি। তাই সর্বস্বান্ত হয়েও এখানে এই মাথা-গোঁজার স্থান পেয়ে নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করতে চায়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে প্রাণপণে এগিয়ে চলতে চেষ্টা করে। বারে বারে চোখ রগড়ে সামনে, পিছনে, ডাইনে এবং বাঁয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে আলোর সন্ধান করে। খোঁজার তার বিরাম নেই। কিন্তু সানুর বাল্য-বন্ধুর দলই আজ তার সঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী শত্রুতা করছে।

সুমথ অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল পুত্রের আহ্বানে। তুমি এখানে—আর আমি খুঁজতে কোথাও বাকি রাখিনি।

সুমথর একটি নিঃশ্বাস পড়ল। সে দিনের সানুই আজকের সুমথ। যার জীবনের সকল আনন্দ আর কোলাহল থেমে গেছে। তাই সে ভুলতে চায় অতীতকে, ভুলতে চায় বর্ত্তমানকে—শুধু আগামী কালের আশায় বুক বাঁধে। তার বংশধরগণ যেন পেয়ে হারাবার দুঃখ না পায়। দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়েই ওদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠুক। তাকে জয় করে ওরা বাঁচার মন্ত্র শিখুক। কিন্তু সুমথর এ আশা পূরণ হবে কোন পথে! যে পথেই পা বাড়ায় সেখানেই বিষাক্ত কাঁটার ছড়াছড়ি। এগোতে গেলেই অপমৃত্যু।

তবুও সুমথ থামতে পারে না। এগিয়ে চলে। জীবন মৃত্যু ত হাত ধরাধরি করেই চিরদিন চলে। বিষের ভয়ে পালিয়ে গিয়েই কি বাঁচতে পারবে। প্রতিনিয়ত সুমথর মনের সঙ্গে চলছে যুক্তির লড়াই। বৃন্দাবন, রাজেন আর নিবারণের উপদেশ সে গ্রহণ করতে পারছে না বলেই তার মনে এই জিজ্ঞাসা।

সুমথর ছেলে পুনরায় ডাকলে, তোমার জন্য আমরা কেউ যে খেতে পারছি না বাবা—

চমকে উঠে সুমথ। বলে, তুমি আর দুলা খেয়ে নাও গিয়ে। আমি ততক্ষণে একটা ডুব দিয়ে আসছি।

সকালের সে উগ্র মূর্ত্তি এ বেলায় আর সরমার নেই। বরং সে মূর্ত্তি যেন বেদনায় ম্লান হয়ে গেছে। মিনতি করে সে স্বামীকে বললে, তোমাকে এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

সুমথ বিস্মিত ও শঙ্কিত হ'ল। বললে, এত বছর পরে হঠাৎ এ কথা কেন সরমা! আর আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ত তোমার অজানা নয়।

তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না—সরমা ভেঙে পড়ে বলে, এখানের সংসর্গে থেকে আমার গোপাল আর দুলাকে সরিয়ে না নিলে ওরা যে মানুষ হবে না গো।

সুমথ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, পালিয়ে কোথায় যাবে বলতে পার সরমা? ঘরের মধ্যে জানালা কবাট বন্ধ করে ত মানুষ বাঁচতে পারে না—

সরমার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর! সে বললে, তুমি বলতে চাইছ কি?

সুমথ বলে, সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। তফাৎ শুধু—প্রকাশের রকমফের। তার চেয়ে বিষের ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে তাকে আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হওয়া যায় না কি?

খানিক চুপ করে থেকে উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলে সরমা, ও সব কেতাবী কথা শুনতেই ভাল। নইলে বিষ খেয়ে যে মানুষ বাঁচে না তা তুমিও যেমন জান আমিও তেমনি জানি। একটু থেমে সে পুনশ্চ বললে, এ সব যুক্তি হ'ল অক্ষমের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সহজ পথ। মোট কথা এখানে থেকে তোমার বন্ধুদের উপহাস কুড়োতে আমি আর পারছি না।

সরমা রাগ করে প্রস্থান করে।

সুমথর নিজেকে আজ বড় অসহায় মনে হ'ল। যে মাটির উপর সে দাঁড়িয়ে থেকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে এতদিন লড়াই করে এসেছে সেটুকুও কি আজ তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে?...তার শেষ এবং একমাত্র ভরসাস্থল।...

আঙ্গিনার ঘরের কোণে ছিটাবেড়াকে আশ্রয় করে লতিয়ে ওঠা গাছটাতে গোটা কয়েক ফুল ধরেছে। ফুলগুলি নীল। লতাটার নেই স্বাস্থ্যসম্পদ। গোড়ায় বাসা বেঁধেছে উঁই পোকার দল। মাথার দিকে এখনও দেখা যায় গোটাকয়েক সবুজ পাতা। ক'দিন পরে ও ক'টিও হয়ত আর অবশিষ্ট থাকবে না। সুরুতে এই সময় নীলমণির নীলে চোখ জুড়িয়ে যেত। আজ জাগে বেদনা। ও নীলে নীল সেই আছে বিষ। যার জ্বালায় ও নিজেও জ্বলছে...

বাজে চিন্তায় সুমথর অনেকখানি সময় অযথা নষ্ট হয়েছে। যা কিছু কেনাবেচা তা এই সময়টাতেই হয়। দড়িতে বাঁধা হাতকাটা সাটটি দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে কতকটা ছুটতে ছুটতে সে রাস্তায় এসে উপস্থিত হ'ল।

পর দিন সকাল বেলা। সুমথ বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সরমা এসে সম্মুখে দাঁড়াল। কোন প্রকার ভূমিকা না করে বললে, চাল নিয়ে এলে তবে রান্না হবে। একটু সকাল সকাল ফিরে এসো।

কোন জবাব না দিয়ে থলি হাতে সুমথ রওনা হতেই সরমা আর একটু কাছে সরে এসে বললে, আর একটা কথা ছিল।

সুমথ বললে, কি কথা?

সরমা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, এই আংটিটা নিয়ে যাও। ছেলেদের জন্য একটা গঙ্গার ইলিশ আনতে হবে।

সুমথ কোন কথা বললে না। এক বার আংটিটির পানে এক বার সরমার মুখের পানে সে তাকিয়ে দেখে নিঃশব্দে হাত পেতে তা গ্রহণ করলে। এটি ওদের বিয়ের আংটি।

এই নীরবতা সরমাকে আঘাত করল। সে মৃদুকণ্ঠে বললে, কিছু বলবে না?···

সুমথ একটু হাসবার চেষ্টা করে জবাব দিলে, বলবার কি আছে সরমা। কত কষ্টে যে তুমি এটা হাতছাড়া করতে চাইছ সে ত বুঝতেই পারছি—

সরমার মুখের ভাব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে গভীর কণ্ঠে বললে, দুঃখ না আনন্দে। আমার একথাটা তুমি বিশ্বাস করো।

সরমার কানের পাশে গোপালের কথাগুলি আর এক বার ধ্বনিত হয়ে উঠল, বৃন্দাবন কাকার ওখানে আমরা ইলিশ মাছ খাইনি মা। তুমি ভুল শুনেছ—

কথাটা সুমথকে বিস্মিত করল। তথাপি সে প্রশ্ন করলে না। এইখানেই সরমার দুঃখ। সুমথর এই অস্বাভাবিক নিলিপ্ততার কোন অর্থই সে খুঁজে পায় না। তবুও সে থামতে পারে না। সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরটাও সে মুখে মুখে বলে যায়।

সুমথ নীরবে কান পেতে শোনে।

সরমা বলতে থাকে, ওরা ছেলেমানুষ। আজ লোভকে জয় করতে পেরেছে বলেই তাদের আকাঙ্ক্ষা মরে যেতে পারে না। তাই···আর তা ছাড়া ওদের জন্যেই আমাদের সব। তুমি রাগ করলে না ত?

সুমথ একথারও কোন জবাব না দিয়ে একটুখানি ম্লান হেসে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলে। কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে আংটিটি বের করে এক বার সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে পুনরায় তা পকেটে রাখে। পাঁচটি টাকা তার কাছে আছে। গত সন্ধ্যার মোট আমদানী। সেটা পুরো খরচ করবার অধিকার তার নেই। অথচ তাকে চাল কিনতে হবে—একটি গঙ্গার ইলিশও কিনতে হবে। আংটি বাঁচিয়ে এই দুটি বস্তু কেনা সম্ভব কিনা মনে মনে হিসেব করে দেখছিল সুমথ।

বৃন্দাবনের আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়াল।

বৃন্দাবন বলছিল, দাদা আজ যে বড় সকাল সকাল বাজার যাচ্ছ—

সুমথ যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠে জবাব দিলে, চাল না আনলে— একেবারে শূন্য কিনা তাই।

বৃন্দাবন ততক্ষণে চলতে সুরু করেছে, একে বলে কোন লাভ নেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুমথ এসে চালের দোকানে উপস্থিত হ'ল আগে চাল তার পর অন্য চিন্তা।

সুমথ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। মালিকের যুবক পুত্রের খেয়াল নেই। অল্প বয়স। নতুন বিয়ে করেছে। বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে বৌর কথা নিয়ে। নানা সম্ভব-অসম্ভব রঙীণ গল্প। রীতিমত এক স্বপ্নের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা বেচারার এই সুখস্বপ্নটা ভেঙে দেবে সুমথ! সবে সংসার-সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। ঢেউ দেখে তাই আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। প্রচুর উচ্ছ্বাস ওর চোখেমুখে। নোনা জলের স্বাদ পায় নি। কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে সে। ও পাশ থেকে চাল নিয়েছে এ পাশে দেবে দাম।

সুমথ বলে, চালের দামটা—

যুবকটি এ পাশে মুখ ফিরিয়ে তাকালে। কিছু বিরক্তি ওর চোখেমুখে। হাত বাড়িয়ে বললে, দিন।

পুনরায় সে তার অসমাপ্ত কথার সূত্র ধরে সুরু করলে। সুমথ তার হাতে পাঁচ টাকার নোটখানি দিলে। যুবকটি তা সম্মুখে খোলা কাঠের ক্যাস বাক্সে ছুড়ে ফেললে। গল্প তখনও চলেছে। সুমথ বাকি টাকা দাবি করলে। যুবকটি লজ্জিত হ'ল। তাড়াতাড়ি বাকি টাকাটা সুমথর হাতে দিয়েই সে পুনরায় গল্পে মন দিলে।

বাকি টাকাটা হাতে আসতেই সুমথর চোখের সম্মুখে তার পকেটে রাখা বিয়ের আংটিটা আর এক বার ভেসে উঠল। চাল চাই—গঙ্গার ইলিশ চাই। সত্যই ত আজ লোভকে দমন করতে পেরেছে বলেই কি আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে গেছে। দশ সের চালের দাম নিয়ে তাকে এতগুলি টাকা ফেরত দিলে কেন দোকানের মালিক-পুত্র? সে তাকে ওর আনন্দের অংশ দিতে চায় নাকি? পকেটে তার এতদিন যত্নের মত আগলে রাখা মধুর-স্মৃতি বিজড়িত আংটিটি। দাবি তার মাত্র একটি গঙ্গার ইলিশ। যার দাম অন্ততঃ চার টাকা। সুমথ অন্যমনস্কভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তার মাথার ভিতরটা যেন খালি হয়ে গেছে। স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছে না সে। অথচ চিন্তার হাত থেকে রেহাইও পাচ্ছে না। আকাঙ্ক্ষা তো মানুষের থাকবেই, তাই বলে লোভকে দমন করতে শিখবে না? কিন্তু সরমার আংটিটি কোন কিছু ভাবতে দিতে চায় না। সুমথ উদ্দেশ্যহীনের মত বহুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। বার কয়েক চালের দোকানের কাছেও সে ফিরে এসেছিল কিন্তু স্থির হয়ে সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে নি। পুনরায় সে ফিরে আসে মাছের বাজারে। মাত্র দুটি ইলিশ অবশিষ্ট আছে একটি-মাত্র দোকানে। সুমথ চোখ কান বুজে তারই একটি তুলে নিলে তার থলিতে। টাকাটা ফেলে দিয়ে সে চোরের মত সতর্ক গতিতে বাড়ীর পথে ফিরে চলল।

রাজেন ডাকলে, বড় সকাল সকাল যে আজ—

সুমথ অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা

এত দ্রুতবেগে চলতে সুরু করেছে যে তার মনে হ'ল যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে।

বাজেন কিন্তু দাঁড়াল না। অথচ সুমথ তখনি রওনা হতে পারল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে একটি নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় চলতে সুরু করলে।

আঙ্গিনায় পা দিতে চোখে পড়ল নীলমণি গাছটা। যেটুকু ছিল বৃন্দাবনের ছাগলটা সেটুকুও বাকি রাখে নি। ছাগলটা তখনও খাচ্ছিল। সুমথ বাধা দিলে না। দু'দিন পরে হয়ত আপনি শেষ হয়ে যেত।

ঘরে প্রবেশ করতেই সরমা ছুটে এল। স্বামীর হাত থেকে থলে দুটো নিজের হাতে নিলে। সুমথ তখনও হাঁপাচ্ছিল। এতটা রাস্তা কে যেন তাকে পিছন থেকে তাড়া করে নিয়ে এসেছে। সর্ব্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজে সপ সপ করছে।

সরমা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোমার কি হয়েছে—শরীর খারাপ বোধ করছ নাকি ?

সুমথ সামলে নিয়ে জবাব দিলে, ও কিছু নয় সরমা। বাইরে বড্ড রোদ তাই হয়তো—

সরমা কোমল কণ্ঠে বললে, তুমি খানিক বিশ্রাম করে রান্নাঘরে যেও। আমি ততক্ষণ সব গুছিয়ে নিচ্ছি। সে চলে গেল।

সুমথ অন্যমনস্কভাবে চুপ করে বসে আছে আর ভাবছে, এটা সে আজ কি করলে, কেমন করে তার পক্ষে এ কাজ সম্ভব হ'ল! এত বড় একটা অন্যায়—

রান্নাঘর থেকে গোপাল আর দুলালের আনন্দ-কোলাহল তার কানে এল। একেবারে গঙ্গার ইলিশ মা? কি সুন্দর যে দেখতে—অনেকগুলো মাছ হবে ত মা ?

সরমার জবাবটাও তার কানে এল, হবে বৈকি বাবা। অনেক হবে। তোমাদের যতগুলো খুশী খেও।

ছেলেরা কোলাহল করতে করতে চলে গেল।

সুমথ তখনও ভাবছে। এত বড় একটা অন্যায় আর এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এর কোনটা সত্য ?

সহসা সরমার আহ্বান তার কানে এল। এক বার এখানে এস নাগো।

সুমথ উপস্থিত হতেই সরমা মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে জানাল, এত ভাল মাছটা নিয়ে এলে, কিন্তু এমনিই কপাল কাটার পরে মনে হচ্ছে—

সুমথ চমকে উঠল। তার কণ্ঠনালি থেকে একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল। তার বিবর্ণ মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে সরমা মৃদু স্বরে সান্ত্বনাচ্ছলে বললে, তুমি মিথ্যে ভেব না। যা হোক একটা গতি হবেই।

মাছের একটা গতি সরমা অবশ্যই করেছিল, কিন্তু সুমথর মনের পাষাণবোঝা তাতে একবিন্দু হ্রাস পেল না…

সুমথ ভারাক্রান্ত মনে এসে শুয়ে পড়ল। এমনি বহুক্ষণ পড়ে থাকার পর একসময় সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। নাকের পাশে তখনও ভাত ধরে যাওয়ার একটা তীব্র গন্ধ লেগে আছে। ভাতটাও বুঝি গেল। ঠিকই হয়েছে। সুমথ উঠে এসে পকেটে হাত দিয়ে আংটিটা অনুভব করে দেখলে। না ওটা যথাস্থানেই আছে। ভাতটাও নাকি ধরে যায় নি। ব্যাসনের সাহায্যে মাছেরও একটা গতি সরমা করেছে। কিন্তু খেতে বসে ভাতের গ্রাস বারে বারেই সুমথর গলায় আটকে যাচ্ছিল।

গোপাল আর দুলাল হাসিমুখে বলছিল তাদের মাকে, গঙ্গার ইলিশ কিনা খালি তেল আর তেল—মুখে দিতেই গলে যাচ্ছে। খুব ভাল মা…বড্ড ভাল—

সুমথ অকারণেই বিষম খেলে। নাক মুখ দিয়ে একসঙ্গে একরাশ ভাত বেরিয়ে এল, আর চোখ দিয়ে অনেকখানি নোনা-জল।

মুক্তধারা

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুব উচ্চ নয়। এর কারণ প্রধানত দুটি। প্রথম, নাট্য-রচনায় তিনি এদেশে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন এবং নূতনকে গ্রহণ করবার জন্ত চিত্তের যে নমনীয়তা প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তা ছাড়া, নাটকগুলি ভাবাত্মক হওয়ায় কিছু দুর্গ্রহ; সাধারণ-শিক্ষার মান উন্নত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণে এদের স্বীকৃতি দিতে স্বভাবতই কুণ্ঠিত হবে। ইংলণ্ডের সমসাময়িক নাট্য-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মনস্বী মর্লি যা বলেছিলেন আমাদের দেশের পক্ষেও তা সমান প্রযোজ্য—"The great want of the stage in our day is an educated public that will care for its successes." দ্বিতীয়ত, কবি-রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখে এত বড় হয়ে আছেন যে, নাট্যকার-রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর পাশে ঠাঁই করে নেওয়া কঠিন হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কবি হিসাবে তাঁর স্বীকৃতিও খুব সহজসাধ্য হয় নি। অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে পথ করে নিতে হয়েছে। আমার মনে হয় 'রেপার্‌টরি' থিয়েটারের আদর্শে একটি চরিষ্ণু নাট্য-চক্র গঠন করে যদি এই 'রূপক'-নাটকগুলির অভিনয় পালাক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিয়ে বেড়ান যায় তা হলে এই বিরাগের ভাবটা দূর হতে দেরি হয় না। এই ভাবেই আধুনিক কালে ইংলণ্ডে জনপ্রিয় মামুলী নাটকগুলির সঙ্গে সঙ্গে গল্সওয়ার্দি, ইয়েটস, ইলিয়ট প্রভৃতির ভাব-নাটকগুলি জনচিত্তে আসন করে নিয়েছে। প্যারিসে আঁদ্রে আঁতোয়ান্ 'Theatre Libre'-র প্রবর্তন করে নূতন-ধরনের নাটকের রূপায়ণের পথ খুলে দিয়েছিলেন। অনুরূপ ভাবে আয়র্লণ্ডে ফ্র্যাঙ্ক ফে রাসেল এবং ইয়েটসের লেখা নাটকগুলির অভিনয় করিয়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। আমাদের দেশের কোন সাহসী নাট্য-প্রযোজকও যদি কোমর বেঁধে এই কাজে লাগতে পারেন, তা হলে বোধ হয় জন-রুচির হাওয়া বদলে যেতে পারে। এ ছাড়া, স্থানে স্থানে শেক্সপীয়র-সোসাইটির মত নাট্য-সঙ্ঘ ও মজলিশ গড়ে তোলাও দরকার; আশ্বাসের কথা, এদিক দিয়ে প্রশংসনীয় উদ্যম ইদানীং দেখা যাচ্ছে। এই ভাবে দেশ জুড়ে একটি সমঝদার-গোষ্ঠী গড়ে উঠবে এবং নাট্যকার-রবীন্দ্রনাথ কবি-রবীন্দ্রনাথের খুব পিছনে পড়ে থাকবেন না এ কথা জোর করেই বলা যায়। কারণ দুর্গ্রহতা সত্ত্বেও নাটকগুলির মধ্যে নাট্যরস যথেষ্টই আছে।

মুক্তধারা-নাটকের পটভূমি স্থাপিত হয়েছে সম্ভবত রাজপুতানার আরাবল্লী অঞ্চলে। এই অনুমানের কারণ এই যে, শৈবধর্মের ব্যাপক অভ্যুত্থান হয়েছিল ঐ অঞ্চলে। প্রত্ন-লিপি থেকে জানা যায় খ্রীঃ সপ্তম শতকের শেষ পাদ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত গৃহস্থগণের ও রাজবংশের মধ্যে শিবোপাসনার এই ধারা অব্যাহত ছিল। তা ছাড়া, যে মৌলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটকটির উৎপত্তি (অর্থাৎ শিবতরাইয়ের লোকদের মুক্তধারার জল বন্ধ করা) সে সমস্যাটা বিশেষ করে রাজপুতানার মরু অঞ্চলের হওয়াই সম্ভব। 'শিবতরাই-এর লোকেরা কান-ঢাকা টুপী পরে,' আর 'উত্তরকূটের লোকেরা কাপড় পরে মালকোঁচা মেরে'—'ওরা ভাঁড়ভাঙা পোড়া মাটি দিয়ে গড়া, ওরা শক্ত'—নাগরিকদের এই সব উক্তি থেকেও এই ধারণারই সমর্থন মেলে। বলা বাহুল্য, ভৈরব মত শৈব মতেরই প্রকারভেদ মাত্র। সে যা হোক, নাটকের ঘটনাগুলি ঘটেছে একই স্থানে এবং একটি পরিমিত কালের মধ্যে; কাজেই এতে অঙ্ক বা দৃশ্য-বিভাগের কোন প্রশ্নই নেই। মঞ্চ-ব্যবস্থাপনার এই সরলতা অভিনয়ের দিক থেকে সুগম করেছে নাটকটিকে। একমাত্র ভৈরব-মন্দিরের পথেই ঘটেছে বর্ণিত ঘটনাগুলির অধিকাংশ, কোন কোনটি ঘটেছে পথিপার্শ্বস্থ রাজশিবিরে কিংবা তরুচ্ছায়ায়। দৃশ্য-বৈচিত্র্যের বিরলতাজনিত ক্ষতি পূর্ণ হয়েছে ঘটনা-সংস্থাপনের ক্ষিপ্রতায়। ছায়াছবির মত ঘটনাগুলি অনবচ্ছিন্ন-ধারায় বয়ে গিয়েছে, কোথাও মন্থর হয়নি তাদের গতি। প্রচলিত রীতি অনুসৃত না হলেও শুধু এই কারণেই এর আকর্ষণ মন্দীভূত হয় না একটুও। প্রয়োগ-পদ্ধতির জটিলতা সখের অভিনয়ের পক্ষে একটা বড় বাধা; সেই বাধা অপসারিত হওয়ায় নাটকটির রূপায়ণের পথ মুক্ত হয়েছে। ভৈরবপন্থীদের গান দিয়ে এর সূচনা এবং ঐ গান দিয়েই এর সমাপ্তি। মন্দির-পরিক্রমায় রত সন্ন্যাসীর দল ঘটনার মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়ে ঐ গান দিয়ে যেন প্রবাহের মধ্যে ছেদ টেনে দিয়েছে। ঐ গানের দ্বারাই নাটকের 'পতাকা'-সন্ধিগুলি চিহ্নিত হয়েছে—অর্থাৎ অঙ্ক-বিভাগ-সূচক যবনিকার কাজ করেছে ঐ 'জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর'—গানটি। যবনিকার আসল উদ্দেশ্যও তাই, অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তরের অবকাশ-সৃষ্টি। প্রাচীন প্রথায় পূর্বরঙ্গে নির্দিষ্ট বাদ্য ও নৃত্যাদির ব্যবস্থা না থাকলেও এই ভৈরব-স্তোত্রটিকে একাধারে পূর্বরঙ্গের নান্দী ও ধ্রুবা বলা যেতে পারে। যবনিকা না থাকলেও নেপথ্য অবশ্যই আছে এবং কুশীলবগণের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটেছে সেই পথেই। ভৈরব-গীতিটি ছাড়া অন্তর্গীতিও (contextual music) আছে অনেকগুলি এবং নাট্যরূপের দিক থেকে সংলাপাংশের চেয়ে এই গীতাংশের মূল্য কিছু কম নয়।

উত্তরকূটে অবস্থিত এই ভৈরব-মন্দির, নগরবাসীরা সকলেই এই ভৈরবের উপাসক। এই দেবতা একাধারে শঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কর—রক্ষক ও সংহারক; রুদ্ররূপে তিনি সংহার করেন, কল্যাণরূপে করেন রক্ষা। সমগ্র নাটকের পূর্বভাব হিসাবে স্তোত্রনিবদ্ধ ভাবটি একান্ত সঙ্গত। উত্তরকূটের প্রজাপুঞ্জ যখন শক্তির মত্ততায় উঠেছে মেতে,

প্রাণের উপরে আসন দিয়েছে যন্ত্রের, সেই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে এই ভৈরব-গীতিটির একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। 'শব'-কর সংহার করেন কল্যাণের কারণেই; প্রলয়ের দেবতা হলেও মঙ্গলের নিলয় তিনি। তাই মানুষের অভ্রভেদী শক্তির অহঙ্কারকে চূর্ণ করে বেজে ওঠে তাঁর 'বজ্রঘোষ বাণী', উদ্যত হয় রুদ্রের সংহার-ত্রিশূল।

অচলায়তনের মত মুক্তধারাও নবাতন্ত্রের নাটক। কি আকৃতি কি প্রকৃতি, কোন দিক দিয়েই পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যধারার সঙ্গে এর মিল নেই। নাটক সম্বন্ধে মূল্যবোধ এ যুগে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, কাজেই প্রাচীন, প্রতীচ্য অথবা প্রাচ্য, কোন মান দিয়েই এর পরিমাপ করা চলে না। অভিনয়ের 'আঙ্গিক' অংশ ক্রমশ দুর্ব্বল হয়ে 'বাচিক'কে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। 'আহার্য্য' অর্থাৎ অঙ্গরাগের অংশও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অভিনয়ের চতুর্থ অঙ্গ 'সাত্ত্বিক'ও দেহাত্মক; অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অশ্রুপুলকাদি আটটি সাত্ত্বিক ভাবের ইঙ্গিত করাই এর কাজ: এই সব প্রতীক-নাটকে তার স্থানও স্বভাবতই খুব সঙ্কুচিত। ঘটনা-সঙ্ঘাতের স্থান অধিকার করেছে ভাব ও আদর্শের সঙ্ঘাত; কাজেই ঘটনা-প্রধান নাটকের মত আঙ্গিকাভিনয়ের প্রয়োজন হয় না এজাতীয় নাটকে। ভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যত বেশী হবে, আঙ্গিকের উপযোগিতাও তত কমে যাবে এবং বাচিক হয়ে উঠবে বড়। এই কারণেই এই সব নাটকের সংলাপ-রচনায় বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শব্দগুলি এমন সুনির্ব্বাচিত এবং তাদের গ্রন্থন এমন নিপুণ হওয়া চাই যে, সেই সন্দর্ভ-রূপের মধ্য দিয়ে নাটকের নিভৃত ভাবটি যেন আভাসিত হয় অনায়াসে। ভাষায় অতি-ব্যক্তি অভিব্যক্তির অন্তরায়, অতি-সংবৃতি থেকে আসে দুর্গ্রহতা। সুতরাং রিক্ততা ও অতিরিক্ততার মাঝামাঝি একটা মধ্য-পথ বেছে নিতে হয় সংলাপ-কল্পনায়। অলঙ্কারের ব্যবহারও পরিমিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ ধ্বনির প্রসারণের দিক থেকে অলঙ্কার ভার ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন একটি কথাও থাকা উচিত নয় সংলাপের মধ্যে যা অবান্তর—সমগ্র সন্দর্ভ-রূপের দিক থেকে যা অনভিপ্রেত। কথার জন্য কথা, অথবা চমক লাগাবার জন্য বাগ্‌বিন্যাস নাটকের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। গলসওয়ার্দির ভাষায় "নাট্য-সংলাপ ভাল 'লেসে'র মত, শব্দসূত্র দিয়ে শিল্পীর হাতে সযত্নে বোনা; এমন একটা খেইও থাকে না এর মধ্যে যা নাটকের সৌন্দর্য্য ও শক্তিকে বাড়িয়ে না দেয়।"* ক্ষেমেন্দ্র-প্রমুখ আলঙ্কারিকরাও ঔচিত্যকে রস-পাকের লবণ বলে নির্দ্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সব সঙ্কেত-নাটকের সংলাপ-রচনায় যে ঔচিত্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তাকে অনন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্ত দিই:

দূত···কীর্ত্তি গড়ে তোলবার গৌরব ত লাভ হয়েছেই, এখন কীর্ত্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড় গৌরব তা লাভ কর। (পৃ, ১১)

বিভূতি···কীর্ত্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। তাকে ভাঙবার অধিকার আমার নেই। (পৃ, ১১)

মন্ত্রী···দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে। (১৫)

রণজিৎ···ও বললে, এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষার শব্দ শুনতে পাই। (১৫)

অভিজিৎ···কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। (২৭)

সঞ্জয়···যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে। (২৮)

ধনঞ্জয়···মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁর পায়ের কাছে রেখে আয়। (৩৫)

" ···মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মারতে, নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। (৩৭)

এই জাতীয় রসোচিত বক্রোক্তি আছে এই নাটকের পাতায় পাতায়। এক একটি উক্তির মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চরিত্রের এক একটি চিত্র। অলঙ্কারবহুল ভাষায় ভাবের এই উৎক্ষেপ কখনই সম্ভব হ'ত না। এদের যে কোন একটিকে ভাষান্তরিত করতে গেলেই বোঝা যায় যে, তা কত শক্ত; দশ গুণ কথা বলেও এর দশ ভাগ প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। বিদগ্ধ-সমাজে স্ফুটতার চেয়ে স্ফোটতার সমাদর এই কারণেই। মেটার্লিঙ্ক-এর মতে বিষাদ-নাট্যের নিগূঢ় সৌন্দর্য্যটি ফুটে ওঠে শুধু 'কথার সন্ধ্যালোকে'।

অন্তর্গীতিগুলি গাথা আছে এই সংলাপের সঙ্গে। ভাব-নাটকের পক্ষে এরা অপরিহার্য্য। যখনই কবি অনুভব করেছেন শুধু সংলাপের মাধ্যমে ব্যঞ্জনাটি ঠিকমত ফুটছে না, তখনই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সুরের। 'কথা যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, সুর সেখানে উড়ে যায়' অনায়াসে—মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনুদ্দেশের দেশে। অবশ্য, রঙ্গ-পীঠে সঙ্গীত না হওয়া পর্য্যন্ত এদের পূর্ণ প্রভাব অনুভব করা সম্ভব নয়। তবুও এ কথা অসঙ্কোচে বলা চলে যে, ভাবপ্লব এই গানগুলি রস-পরিপুষ্টির প্রকৃষ্ট হেতু। সাধারণ নাট্যগীতির মত এগুলি প্রক্ষিপ্ত নয়, আক্ষিপ্ত—ভাব-কল্পনার সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। একাঘেয়তা-নিবৃত্তি অথবা বৈচিত্র্য-সম্পাদনই এদের উদ্দেশ্য নয়—নাট্য-বিগ্রহের এরা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভরতের মতে ভাবানুকীর্ত্তনই নাটক; 'শীলে নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্'—এও তাঁরই কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তধারায় সৃষ্টি করেছেন শীলানুকূল সংলাপের সাহায্যে ভাবানুকূল একটি পরিমণ্ডল। কি চরিত্র-কল্পনা, কি প্রসঙ্গ-রচনা, সর্ব্বত্রই শোভন সঙ্গতি নাটকটিকে একটি সংহত সৌন্দর্য্য দান করেছে। এর প্রধান চরিত্র অভিজিৎ—তার ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করেই ঘটনার তরঙ্গগুলি আবর্ত্তিত হয়েছে। প্রাণ ও প্রেমের প্রতীক সে। তার প্রতিস্পর্দ্ধী যন্ত্ররাজ বিভূতি—প্রাণের উপরে যে স্থান দিয়েছে তার পূর্ত্তকীর্ত্তিকে।

* "Some Platitudes concerning Drama."
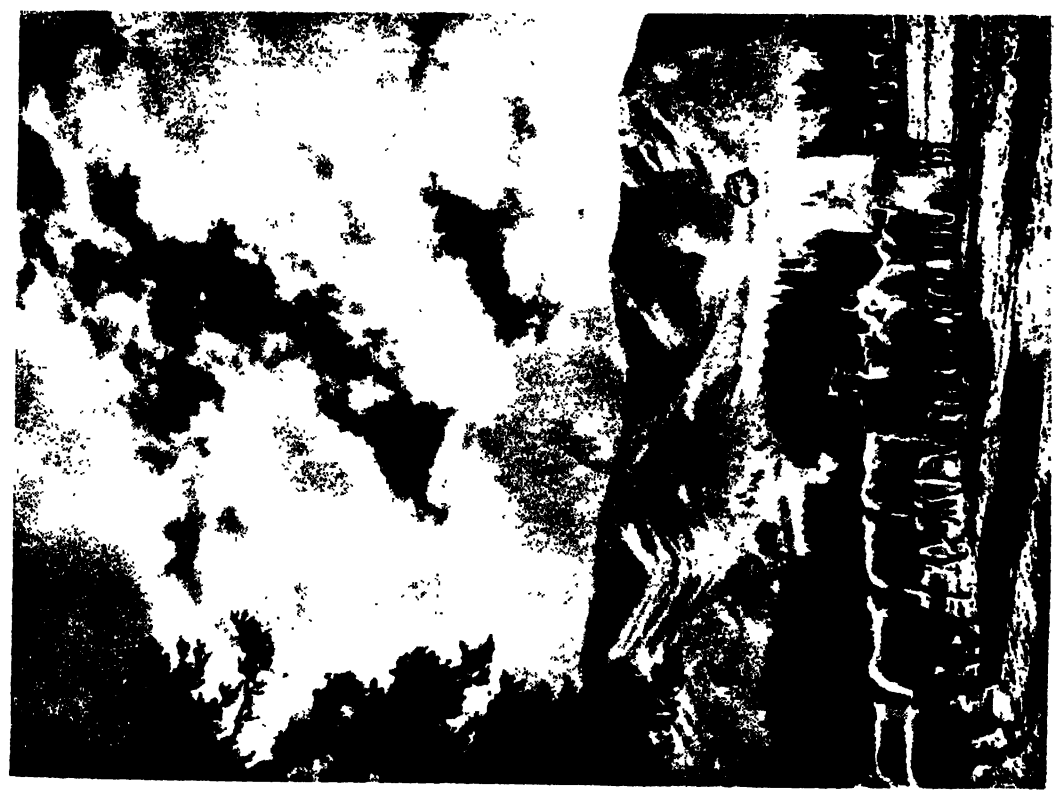
ইউরোপের পথে দিল্লীর বিমানবন্দরে কাম্বোডিয়ার প্রাক্তন রাজা ও মন্ত্রীর সহিত শ্রীনেহরু

দিল্লীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তরে ভারতের ফরাসী উপনিবেশগুলি হস্তান্তর অনুষ্ঠান

প্রকৃতি-শক্তিকে পরাভূত করায়—অহংকে অভ্রংলিহ করে তোলায় নেশা এমন করে পেয়ে বসেছে তাকে, যে সে অবকাশই পায় নি মানুষের হৃদয়ের দিকে তাকাবার। ফলে প্রাণশক্তির সঙ্গে বেধেছে যন্ত্রশক্তির সংঘাত এবং এই শক্তিদ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে মুক্তধারার বন্ধন-মুক্তিতে; হাজার হাজার মানুষের তৃষ্ণার্ত বুকের উপরে উঠেছিল যে যন্ত্রমূর্তি প্রাণের প্রচণ্ড আঘাতে তার বনিয়াদ গিয়েছে ধ্বসে। একটা সংশয় তবুও থেকে যায় নাটকটির নায়কত্ব-প্রসঙ্গে। এর প্রকৃত নায়ক কে? অভিজিৎ—যে তার প্রদীপ্ত প্রেম ও সমুচ্চ আদর্শের প্রেরণায় প্রাণ দিল, সে? না বিভূতি—যার অভিচারলব্ধ সিদ্ধি ভেঙে, ভেসে গেল মুক্তধারার উন্মত্ত আক্ষেপে? উত্তরকূটে সাক্ষাৎ দেবশিল্পীরূপে সম্মানিত এই মানুষটির সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল একমুহূর্তে—ভৈরব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে তার অভ্যর্থনার আয়োজন গেল নিভে! আশাভঙ্গে বিহ্বল এই জীবন্ত মানুষটিকেই এই বিষাদ-নাটকের নায়ক বলে সন্দেহ হয়। অন্য পক্ষে, অভিজিৎকে নায়ক বললে নাটকটি আর ট্র্যাজিডি থাকে না, কারণ সে প্রাণ দিয়েছে প্রাণেরই প্রেরণায়—দধীচির মত আত্মবলি দিয়েছে বিশ্বকল্যাণের বেদীমূলে; যন্ত্রের উপরে উড্ডীন হয়েছে তার প্রেমের বৈজয়ন্তী। এ দিক দিয়ে নাটকটির আস্বাদ আদৌ বিষাদাত্মক নয়। তার বিয়োগজনিত বেদনা ডুবে যায় তার সঙ্কল্প-সিদ্ধির গৌরবে, এরিস্টটল-এর ভাষায়—'The pity we feel for his outward misfortune is sunk in our admiration of the courage with which it is borne'। বিভূতির মধ্যে আছে সেই দুর্লভ প্রতিভা—সেই দুর্বার চিত্তশক্তি যা সাধনার একাগ্রতায় অসাধ্যকেও সাধ্য করে তোলে। কিন্তু সেই মনীষা মলিন হয়ে গিয়েছে মনুষ্যোচিত সমবেদনার অভাবে; শত শত মানুষের দুঃখের মূল্যে তাকে লাভ করতে হয়েছে তার কাম্যফল। আত্মম্ভরিতার এই রন্ধ্র-পথেই শনি এসে ভর করেছে তার ভাগ্যে—মহত্ত্বের শিখর থেকে ঘটিয়েছে তার অতর্কিত পতন। তপোলব্ধ কীর্তির এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি ক্ষণকালের জন্য আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু সহানুভূতি অন্য পক্ষে থাকায় বিষাদটা ঠিক দানা বেঁধে উঠতে পারে না। কবিও বিভূতিকে বাঁধভাঙার খবরটাই শুধু শুনিয়েছেন · এই মর্মান্তিক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে তার মনের অবস্থা কি হ'ল তা জানান প্রয়োজন মনে করেন নি। শুধু ছোট কয়েকটি কথায় তার মনোভাবের আভাস আমরা পাই; —'বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে? তার নিস্তার নেই।' সংবাদটি শুনেই তার মনে প্রথম যে প্রতিক্রিয়াটি দেখা দিয়েছে তা ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়, অমিশ্র প্রতিশোধ-স্পৃহা। অনেকটা এই কারণেই যে সহানুভূতি সে আকর্ষণ করতে পারত তা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতে প্রতিপক্ষের প্রতি পাঠকের অনুকম্পাও গিয়েছে বেড়ে। 'তা হলে তাঁকে কি আর পাব না?' গণেশের এই বিষণ্ণ প্রশ্নটির মধ্যে অনুভব করা যায় অনুকম্পার সেই কম্পনটি!

বস্তুনিষ্ঠ লেখকের মত রবীন্দ্রনাথ ঘটনাকে আলগোছে উপর থেকে দেখেন না। কবিদৃষ্টিতে প্রত্যেকটি বস্তু কোন না কোন ভাবের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়। অভিজিতের কথায় বলা যায়—'মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন।' এই অলিখিত রহস্য-লিপির পাঠোদ্ধার করেন কবি এবং তার নিগূঢ় মর্মটি তুলে ধরেন প্রেপন্ন পাঠকের সম্মুখে। বস্তুর মত ব্যক্তিকেও তিনি দেখেছেন ভাবের প্রতীকরূপে এবং এই কারণেই ব্যক্ত-রূপকে অতিক্রম করে তার অব্যক্ত ভাব-রূপটিই বড় হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকে। কিন্তু, রূপের পথেই করেছেন তিনি অরূপের অন্বেষণ; তাই তাঁর নাটকগুলিতে ভাবের সঙ্কেতটি প্রধান হলেও তার আধানটিও উপেক্ষণীয় নয়। এই ভাবরূপায়ণের জন্য তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে একটি অভিনব পথ। বস্তুনিষ্ঠ না হলেও এই আঙ্গিক সর্বথা বাস্তববর্জিত নয়; অন্য কথায় কার্যকে স্বীকার করেন বলেই তিনি তার কারণ-নির্ণয়ে ব্যগ্র। তাঁর নাট্যকৃতিগুলি বুদ্ধিদীপ্ত হলেও, পিরানডেলোর নাটকের মত, বুদ্ধিসর্বস্ব নয়, আবেগ ও চিন্তার এমন হরগৌরী-সঙ্গম নাট্য-কাব্যে অতি অল্পই দেখা যায়। চরিত্র-চিন্তা কতকটা নৈর্ব্যক্তিক হ'লেও চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্ববর্জিত ক, খ, গ অথবা নং ১, ২, ৩ নয়;* বীজগণিতের প্রণালীতে জীবন-সমস্যার সমাধান এ নাটকে নেই; ব্যক্তিত্বের জোকস্পর্শে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও উজ্জ্বল। তা ছাড়া, expressionist-দের মত অব্যক্তকে অভিব্যক্তি দেবার ছলে রূপকের কুহক সৃষ্টি করে কিংবা রূপকথার রঙমহল তৈরি করে পাঠককে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টাও করেন নি তিনি। বস্তুবাদীর আলোক-চিত্র কিংবা সমীক্ষাবাদীর রঞ্জনালেখ্য এগুলি নয়; এরা সৃষ্টি—কবি-প্রতিভার অনিন্দ্য অবদান। ফ্রয়েড-এর মনঃসমীক্ষণের সূত্র ধরে অবচেতনার চিন্তা অথবা গূঢ়ৈষার চুলচেরা বিচার নেই এ নাটকের মধ্যে। এই আঙ্গিক অবশ্য তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, এর ইঙ্গিত তিনি পেয়েছিলেন মেটারলিঙ্কের কাছে। রবীন্দ্রনাথের মত মেটারলিঙ্কও ছিলেন বাস্তবতার বিরোধী—আত্মার অন্তরতম ভাবচ্ছবিটি তিনি এঁকেছেন ব্যঞ্জনাময়ী বাণীর বর্ণে।

চরিত্র ও চিত্রাবলীর একটু আলোচনা করলে বিষয়টা আরও বিশদ হবে। রাজার নাম রণজিৎ, প্রেমের দ্বারা প্রজার চিত্তজয়ের চেয়ে বলের দ্বারা তাদের বশীভূত করার আগ্রহই তাঁর বেশী। অভিজিতের সঙ্গে তাঁর মত ও পথের মিল নেই একটুও, উভয়ের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান; তবুও মুক্তধারার ধারে কুড়িয়ে-পাওয়া, সৃষ্টিছাড়া এই ছেলেটির জন্য তাঁর মমতা ফল্গু-ধারার মত বয়ে চলেছে অলক্ষ্যে, বাইরে তার প্রকাশ নেই। এই অবরুদ্ধ স্নেহ

---

* 'রক্তকরবী' নাটকে কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি নামের বদলে সংখ্যার ব্যবহার করেছেন; আবার কোন কোন পাত্রকে চিহ্নিত করেছেন বৃত্তিদ্বারা, যেমন অধ্যাপক, গোঁসাই, পালোয়ান, চিকিৎসক ইত্যাদি; বিশু, ফাগুলাল, চন্দ্রা, কিশোর পরিচিত নিজ নিজ নামে।

অবারিত হয়ে পড়েছে শুধু একবার, বাঁধ-ভাঙার খবর শুনে তার চরম অমঙ্গলের আশঙ্কায়। খুড়া বিশ্বজিৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষেই ছিলেন এতদিন, কিন্তু অভিজিতের সঙ্গে সংসর্গের ফলে বলের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছেন প্রেমের রাজ্যে।

কবি-কল্পনার অনুপম সৃষ্টি অভিজিৎ। মুক্তধারার মতই মুক্ত তার মনটি—আকাশের মত উদার, 'গৌরীশিখরে'র শৃঙ্গের মত উত্তুঙ্গ। অভি সত্যই অভী: ভয়কে সে ভয় করে না, জয় করে প্রেমের অস্ত্রে। মুক্ত মনুষ্যত্বের প্রতীক সে; পুত্রবিরহিণী অম্বার, পুত্রশোক-কাতর বটুর বেদনায় সে সমব্যথী—শিবতরাইয়ের প্রজাদের বিপদকে নিজের বিপদ বলেই মনে করে। রাজপুরীর পাষাণ-বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য সে ব্যাকুল, মুক্তধারার মধ্যে তার 'অন্তরের কথা আছে', 'উত্তরকূটের সিংহাসনই তার জীবন-স্রোতের বাঁধ'। শিবতরাইয়ের লোকেরা তাকে ভালবাসে, শক্তিদৃপ্ত বিভূতির দল তাকে দেখে সন্দেহের চোখে। যে যন্ত্র-দানব রাজার তাজার লোকের তৃষ্ণার জল হরণ করে তাদের চোখের জল ফেলিয়েছে, সেই শক্তিমূর্তির উপর হেনেছে সে প্রাণের প্রচণ্ড আঘাত—রক্তাক্ত হৃদয়ের উপর করেছে প্রেমের অভিষেক। সঞ্জয়ের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি বড় মধুর—বড় মর্মস্পর্শী। সঙ্গী হবার আবেদন জানিয়ে সঞ্জয় যখন কোন সাড়া পেল না তার কাছে, তখন সে তার ব্যথার স্থানগুলির প্রতি ইঙ্গিত করতে লাগল একে একে। কিন্তু তার শান্ত দৃঢ়তার গায়ে ঠেকে সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল; আর তখন থেকেই আমাদের মন প্রত্যাসন্ন পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। একটা খটকা লাগে অভির চরিত্র-প্রসঙ্গে। তার স্বভাবত অনাসক্ত পথিক-মনকে আরও সংসার-বিমুখ করবার জন্য তার জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন প্রয়োজন ছিল কি? মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম-সূত্রে যুক্ত বলেই সে মুক্তিপ্রাণ, এ যুক্তি দুর্বল। গোরার বেলায়ও রবীন্দ্রনাথ এই ভুলই করেছিলেন।

বিভূতি আত্মশক্তির বিভূতিতেই অন্ধ; মানুষের তুচ্ছ বাঁচা-মরার প্রশ্নে মাথা ঘামাবার সময় নেই তার। ভৈরব-মন্দিরের স্বর্ণশীর্ষকেও ছাড়িয়ে যায় তার কীর্তির চূড়া। বীরাচারী তান্ত্রিকের মত শবাসনে বসে সে করতে চায় শক্তির সাধনা; জানে না যন্ত্রের সাধনা করতে করতে মানুষ নিজেই শেষে পরিণত হয় যন্ত্রে—অপরের মনুষ্যত্বকে আঘাত করতে গিয়ে দলিত করে নিজেরই মনুষ্যত্বকে।

ধনঞ্জয় বৈরাগীকে এর আগেও আমরা দেখেছি 'প্রায়শ্চিত্ত'-নাটকে। তরুর মত সহিষ্ণু, তৃণের মত বিনম্র এই সদানন্দ পুরুষ শিবতরাই-এর আপামর সাধারণের গরিষ্ঠ গুরু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সংশয়ে বুদ্ধি, সঙ্কটে সহায়। ভাবণের ভাস্বরতায়, অন্তরের শুচিতায়, প্রেমের মহিমায় সে সমস্ত নাটকটির উপর বিকীর্ণ করেছে একটি স্নিগ্ধ প্রভা—তার কণ্ঠের মাধুরীর মধ্য দিয়ে যেন তার অকুণ্ঠ অন্তরটিকে ছোঁওয়া যায়। রাজার মুখের ওপর সে অকুতোভয়ে বলতে পারে, 'আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়'; শুনিয়ে দিতে পারে, 'ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে'। বৈরাগীর ভক্তির মধ্যে যে এতখানি শক্তি থাকতে পারে—কুসুমের মৃদুতার মধ্যে যে বজ্রের দৃঢ়তা লুকিয়ে থাকতে পারে তা ধারণা করাও শক্ত। 'তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাইনে তাই ভয় করি নে।' এই তার চরিত্রের স্বরূপ। এই ভক্তির আদর্শ কবি তুলে ধরেছেন নৈবেদ্যের মধ্যেও (নৈ ৪৫)।

প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সুন্দর সমন্বয় দেখি মন্ত্রীর চরিত্রে। রাজা রণজিতের পরম হিতৈষী তিনি। রাজা কিন্তু তাঁর হিতোপদেশে কান দেন না, ফলে দেখা দেয় সঙ্কট। বাঁধ-বাঁধার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অভাবকে রাজা বিভূতির প্রতি তাঁর ঈর্ষা বলেই সন্দেহ করেন। তাঁর মতে বলের বদলে প্রেম দিয়ে বাঁধলেই সে বাঁধন হয় শক্ত। অভিজিৎকে শিবতরাই-এ পাঠাতে চেয়েছিলেন তিনি দুটি কারণে। প্রথম, হৃদয় জয় করার মন্ত্র সে জানে; দ্বিতীয়, তার ঘরছাড়া, পথ-চাওয়া মনকে সংসার-বন্ধনে বাঁধবার একমাত্র উপায়ই ঐ। কিন্তু এ মন্ত্রণা রাজার মনঃপূত হ'ল না। তিনি চাইলেন দুঃখ দিয়ে প্রজাদের বশ করতে, প্রেম দিয়ে নয়। মতান্তর হ'ল রাজায়-মন্ত্রীতে;—মন্ত্রী সতর্ক করে দিলেন রাজাকে—দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে'। এই সূনৃতটির মধ্যে আমরা তাঁর দূরদৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনের প্রমাণ পাই।

বহুক্ষেত্রেই কিন্তু চরিত্রগুলি তাদের ব্যক্তি-সত্তা অতিক্রম করে জাতি-সত্তায় পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ব্যষ্টি-রূপের বিশিষ্টতা ত্যাগ করে সদৃশগুণবিশিষ্ট এক একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, চরিত্রগুলি পূর্বব্যবস্থিত একটি নাট্যকল্পনায় নির্লিপ্ত উপাদানে পরিণত হয়েছে, নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বেগে পরিণামকে তারা ঘটিয়ে তোলে নি; তা ছাড়া, তাদের মুখের প্রত্যেকটি কথায় একটা শান্ত নিস্পৃহতা ফুটে উঠেছে যা ব্যক্তি-পাত্রের মুখে প্রত্যাশিত নয়। আবেগের প্রবলতা ও উচ্ছলতার অভাবে ট্র্যাজিক-নাট্যের রসটি ঠিক-মত ফুটে উঠতে পারে নি। জয়সিংহের আত্মবলিদানের পর রঘুপতির উক্তি ও ব্যবহারের সঙ্গে অভিজিতের আত্মাহুতির পরে রণজিতের উক্তি ও ব্যবহারের তুলনা করলে এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ মিলবে। প্রচলিত নাট্যরীতিতে চরিত্র-সন্দর্ভ থেকেই হয় প্লটের উৎপত্তি; অপর পক্ষে, এই সব ভাবনাট্যে প্লট অর্থাৎ সন্দর্ভ-পরিকল্পনাটাই আগে, চরিত্র-ভাবনা আসে পরে। অন্য কথায়, এইসব নাটকে চরিত্রের জন্য প্লট নয়, প্লটের জন্যই চরিত্র। এই কারণেই প্রায়শ্চিত্তের বৈরাগী ধনঞ্জয়কে দেখি এই নাটকেও। খুড়া-মহারাজকেও রাজা বসন্ত রায়েরই সগোত্র বলে মনে হয়।

কোন কোন আধুনিক নাট্য-পদ্ধতি প্লটকে অস্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ একে উপেক্ষা করেন নি কোনদিন। প্লটের অর্থ যদি চরিত্র ও ঘটনার সুব্যবস্থিত বিন্যাস হয় তা হলে বলতে হবে একটি

সুচিন্তিত ও সুসংহত সমবায়-রূপ আছে এই নাটকের। এমন একটি ঘটনাও এতে স্থান পায় নি যা রস-সিদ্ধির দিক থেকে অবান্তর। গুরু-ছাত্রের দৃশ্যটি আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বহির্ভূত মনে হলেও আসলে তা নয়। শাসক-পক্ষ-সমর্থিত বিশেষ বিশেষ মতবাদগুলিকে (যেমন ফ্যাসি-বাদ, নাৎসি-বাদ) ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে এইভাবে শিশু-স্তর থেকেই গজিয়ে তুলবার চেষ্টা হয়েছে সব দেশেই। উত্তরকূটও তার ব্যতিক্রম নয়। যন্ত্র-চিন্তার বিষকে ছাত্রদের মনে ছড়িয়ে দেবার এই ব্যাথিত উদ্যম, সমগ্র-রূপ-কল্পনার দিক থেকে আদৌ অবান্তর নয়। গুরুর দুটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল থেকেই গৌরব করতে শেখে তার কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে', 'উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায় একদিন এই সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু।' যন্ত্র-জীবনের নিন্দা এবং মুক্ত-জীবনের জয়গান করেছেন কবি চিরদিনই; যন্ত্র-সভ্যতার প্রতি তাঁর এই উষ্মা নানাভাবে ও আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে। ইলিয়ট, এজরা পাউণ্ড-এর মধ্যেও আছে জীবনের যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এই অসহিষ্ণুতা; 'The Waste Land', 'Polite Essays' প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে এর অচ্ছন্ন অভিব্যক্তি। জীবনের এই নূতন নৈতিক মূল্যবোধ পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তাকেই আলোড়িত করেছে। 'অচলায়তনে', 'রক্তকরবী'তে সর্বত্রই দেখি এরই সঙ্কেত। জৈব-জীবনের পিছনে যে অতিজৈব অর্থটি প্রচ্ছন্ন আছে তাকে আবিষ্কার করা এবং সুষ্ঠু রূপ দেওয়াই সাহিত্যের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য-সিদ্ধির পূর্ণ পরিচয় বহন করছে মুক্তধারা-নাটক।

ইবসেন-এর মত রবীন্দ্রনাথও অব্যবহিত সাময়িক সমস্যার দ্বারা তেমন প্রভাবিত হন নি, আদর্শগত চিরন্তন সমস্যাগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর চিন্তায়। আলোচ্য নাটকেও সেই চিরন্তন সমস্যারই অবতারণা করেছেন তিনি। জীবনের সত্য-স্বরূপ কি? সভ্যতার গতি কোন্ পথে? মানুষ কি তার সমস্ত সুকুমার বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে প্রাণহীন যন্ত্র-জীবনকেই বরণ করে নেবে? 'হিংসার উন্মত্ত,' যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অতিকায় যন্ত্র-রূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর কবি-মানসে যে ব্যথা জেগেছিল, সেই ব্যথার উৎস থেকেই এই নাটকের উদ্ভব। বিজ্ঞানের দানকে কবি অস্বীকার করেন নি কোন দিন। কিন্তু মানুষের মনীষাকে যখন মনুষ্যত্বের নিষ্পেষণের কাজে লাগান হয়, যখন সে কল্যাণের ধ্রুব পথ পরিত্যাগ করে স্বার্থসিদ্ধির সর্বনাশের পথে পা বাড়ায় তখনই তা হয়ে ওঠে ভয়াবহ। যন্ত্র যদি অতিমাত্রায় স্ফীত হয়ে যন্ত্রীর উপরে প্রভু হয়ে বসে, তা হলে মনুষ্যত্বের বনিয়াদ যায় ধ্বসে। প্রশ্নটি তাই মনুষ্যত্বের চিরন্তন অধিকারের প্রশ্ন—অবচেতনা ও অধিচেতনার শাশ্বত দ্বন্দ্ব। যুগে যুগে এইভাবে পশু-শক্তির যূপে বলি-প্রদত্ত হয়েছে মানুষের শ্রী ও ধর্ম। কিন্তু এর সমাধান কোন্ পথে? বল দিয়ে বলকে ঠেকান যায় না, প্রাণ দিয়েই জাগাতে হয় প্রাণকে, মানুষের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন সম্ভব শুধু এই পথেই। গান্ধীজীর অহিংস-নীতির গন্ধটুকু ছড়িয়ে আছে এর সর্বাঙ্গে। এই অহিংস-নীতির প্রতীক ধনঞ্জয়; 'প্রহারেণ'-নীতি তার নয়, 'মারকে না-মার দিয়ে' মারার মন্ত্র তার। এই হিংসা-অহিংসার দ্বন্দ্বে কে জয়ী হবে, তার ওপরই নির্ভর করছে মানুষের ভবিষ্যৎ। কিন্তু অভিজিতের প্রাণোৎসর্গ সার্থক হয়েছিল কি? এ পৃচ্ছার উত্তর নেই নাটকটির মধ্যে; বাঁধ-ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই এর পটক্ষেপ; সিদ্ধান্তের সঙ্কেতটা রয়ে গিয়েছে উহ্য। হয়ত কবির মতে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাণের অভিযানটাই এখানে বড় কথা, সিদ্ধির সম্পূর্ণতাটা নয়। কিন্তু যন্ত্রীর যন্ত্র-জয়ের চেয়ে তার চিত্ত-জয়ই তো আরও গৌরবের—সেই তো স্থায়ী কল্যাণের পথ। এ দিক দিয়ে বিচার করে প্রশ্নটিতে কবির চিন্তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। সৃষ্টিকে আঘাত করলে স্রষ্টাকে উত্তেজিত করা হয় মাত্র, তার দৃষ্টির রূপান্তর ঘটান যায় না। অতএব আঘাত-স্থানটির নির্বাচনে কবির হিসাবে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে যা হোক, মত ও পথ—ভাব ও আদর্শ এসব সাহিত্যের উপাদান-মাত্র, কবি-মনের রসায়নে জারিত হয়ে এরা পরিণত হয় বিশুদ্ধ স্বর্ণে; মুক্তধারা-নাটকটিও এ সত্যের ব্যতিক্রম নয়।

রত্নাকর

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

সুখলাল দুই বারের জেলফেরতা দাগী আসামী। আজ ছয় মাসের উপর হ'ল এবার জেল থেকে খালাস পেয়েছে। কিন্তু সময়টা এবার তার মোটেই ভাল যাচ্ছে না। এই ছয় মাসের ভেতর একটা বড় শিকার জুটল না—দশ-পনেরটা যা জুটে ছিল সে ত মশা মেরে হাত কালি করা—মজুরী পোষায় না। ফলে ব্যারাকপুরের ফুলমণির বাড়ীতে আর তার স্থান হচ্ছে না। জেল থেকে বেরুলে কিছুদিন ফুলমণি তাকে আদর করেই নিয়েছিল বটে, কিন্তু দুটি মাসের ভেতর সে পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী তার হাতে দিতে পারে নাই। তা ছাড়া হারাধন নামে এক ব্যাটা জুয়াড়ী এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে এসে ফুলমণির বাড়ীতে আসন গেড়ে বসেছে—কাজেই তার স্থান এখন পথে পথে।

সুখলালের জীবনেতিহাস বিচিত্র। পাঁচ বছর বয়সের সময় তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল নামকরা গুণ্ডার সর্দ্দার মতিলাল। তার পর থেকে সে গুণ্ডার আড্ডায় আড্ডায় মানুষ। বছর দশেক বয়স থেকেই তার হাতেখড়ি। পকেট থেকে খুচরো পয়সা—মনিব্যাগ তুলে নেওয়া এই সব। ছোট ছেলে দেখে ধরা পড়লে প্রথম কিল-চড়ের উপর দিয়েই যেত। কুড়ি বছর বয়সে তার প্রথম শ্রীঘর যাত্রা। এখন বয়স তার সাতাশ-আটাশের ভেতর।

পিতামাতার কথা তার মনে পড়ে না—কোন আত্মীয়-স্বজন তার কোনদিন ছিল কিনা তাও সে জানে না। সারাটা জীবন ধরে দেখেছে চোর, জুয়াচোর আর গুণ্ডার দল। আর দেখেছে এই সব আড্ডার কাছাকাছি যে সব স্ত্রীলোক তাদের। সুরা আর পাপে পঙ্কিল যে পথ—সেই পথ; এই পথেই এত দিন ধরে সে চলে এসেছে। জুয়াচোর, চোর, আর দেহবিলাসিনী—বারবনিতা এ দুই রূপ ছাড়া জগতে অন্য নরনারীর রূপ সে বড় একটা দেখে নাই।

আজ সুখলালকে হঠাৎ বড় অভিভূত করে ফেলেছিল—এমন আর তার জীবনে কোন দিন ঘটে নাই। দমদম স্টেশনে বিকেলের দিকে চুপ করে বসেছিল—ভেবেছিল সন্ধ্যার দিকে রানাঘাটগামী কোন একটা গাড়ীতে উঠে আজকের অদৃষ্ট পরীক্ষা করবে।

একখানা থ্রুু ট্রেন একেবারে প্লাটফরমের উপরে এসে গেছে এমন সময় হঠাৎ একটি ছোট ছেলে দৌড় দিয়ে লাইন পেরুতে নেমে গেল।

আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল সমস্ত লোক—গেল, গেল—মুহূর্ত্তমধ্যে ছেলেটি একেবারে শেষ হয়ে যাবে। ঝপ করে লাফ দিয়ে লাইনের ভেতরে নেমে গেল একটি লোক, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঠেলে দিল ছেলেটাকে লাইনের বাইরে। কিন্তু নিজে আর সামলাতে পারল না। দুখানি পা চাকার তলায় একেবারে পিষে গেল। উঃ, সে কি রক্ত! লোকজন ধরাধরি করে প্লাটফরমের উপরে নিয়ে এল। মিনিট পনের বেঁচেছিল—সেই পনের মিনিট ধরে শুধু তার মুখে লেগেছিল একটা কথা—কানাই, আমার কানাই বেঁচে আছে ত? লোকটি ছেলেটির বাবা! মৃত বাপের বুকের উপরে পড়ে ছেলেটির সে কি কান্না! সুখলাল শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পারল না—প্লাটফরমের এক প্রান্তে ঘাসের উপরে এসে শুয়ে পড়ে রইল বহুক্ষণ। শেষে রাত গোটা নয়েকের সময় মনটা একটু ভাল হলে রানাঘাটগামী এই গাড়ীটায় চড়ে বসেছে সুখলাল।

নৈহাটিতে গাড়ী একেবারে খালি হয়ে গেল। শীতের রাতের এগারটা অনেক রাত। ওপাশের বেঞ্চিতে জন দুই লোক আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে—বোধ হচ্ছে অনেক দূর যাবে।

এপাশের বেঞ্চিতে একটিমাত্র বৃদ্ধ একটা টিনের সুটকেশ মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শিকারীর দৃষ্টি সুখলালের—সুটকেশটার দিকে তাকিয়েই তার মনে হ'ল এটার ভেতরে কিছু মাল আছে। কামরার মেঝেয় পা ঠুকে ঠুকে মাথার কাছে গিয়ে বসল। না—লোকটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুখলাল। গাড়ী ততক্ষণ কল্যাণী ছাড়িয়ে এসেছে। সুখলাল ভাবছিল শিমুরালী স্টেশনটির কথা। সেটা তার জানা জায়গা। লাইন ধরে বরাবর উত্তর দিকে কিছুটা এলে আর জনমানবের সাড়া নেই। একটা মস্ত বড় প্রান্তর শুধু ছোট ছোট আগাছায় ভরা—তারই মাঝে মাঝে দুই-একটা শ্যাওড়া, গাব ও নিম গাছ মাথা খাড়া করে রয়েছে। আরও কয়েকবার এইখানে এসে কাজ পেয়েছে সুখলাল।

মদনপুর থেকে গাড়ী ছাড়বার সময় ধাক্কা লেগে বৃদ্ধের মাথাটি এক পাশে খানিক গড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুখলাল আর একটি ধাক্কা দিয়ে মাথা থেকে সুটকেশটি একেবারে আলাদা করে দিল। শিমুরালী ষ্টেশনে গাড়ী থামতে না থামতেই সুটকেশটি গায়ের চাদরে ঢেকে নেমে হন্‌হন্ করে উত্তর দিকে হেঁটে চলল সুখলাল।

একটি ঝাওড়া গাছের তলায় এসে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে সুটকেশটি ভেঙে একে একে ভেতরের জিনিস খুঁজে দেখতে লাগল সে। ইস্ বাপরে। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিল সুখলাল। একগাদা নোট—টর্চের আলো ফেলে গুণে দেখল পুরোপুরি পাঁচশ'।

টাকাগুলি ভাল করে কোমরে গুঁজে পুনরায় টর্চের আলো ফেলে সুটকেশটা খুঁজে দেখতে লাগল। একখানা পুরনো ধুতি, গামছা ছাড়া অন্য জিনিষ বিশেষ কিছু নাই। সুটকেশের ওপরের দিকে একখানি খামের চিঠি গোঁজা ছিল—সেখানা খুলে দেখল। না. খামখানির ভেতরে কিছু নাই—কেবল একখানি চিঠি। কাঁচা কাঁচা মেয়েলী হাতের লেখা। কি মনে করে টর্চের আলোয় চিঠিটা পড়ে ফেলল সুখলাল।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, তোমার কাছে পর পর দুখানা চিঠি দিয়েছি। একখানারও ত জবাব দিলে না! আমার শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়েছে বাবা। এবার আর বাঁচব না। পেটে হাতে পায়ে জল লেগেছে। সব সময় জ্বর থাকে। তাই নিয়ে এদের সংসারের কাজ করতে হয়। যখন না পারি শুয়ে পড়ি। দিনরাত গালাগাল শুনতে হচ্ছে। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও বাবা। আজ যদি মা বেঁচে থাকত—তুমি কি এমনি করে চুপ করে থাকতে পারতে? পাঁচ শ' টাকা কি কোনমতেই যোগাড় হয় না বাবা? টাকা নিয়ে না এলে এরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—উলটো তোমাকেই হয় ত অপমান করবে। আজ দেড় বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে—এর ভেতর তোমাকে দেখি নি বাবা। যে প্রকারেই হোক টাকাটা যোগাড় করে আমাকে নিয়ে যাও নইলে আর হয়ত আমাকে দেখতে পাবে না বাবা। ইতি—

তোমার স্নেহের
মনোরমা।

খামের উপরে চোখ বুলিয়ে দেখল সুখলাল—ঠিকানা লেখা রয়েছে শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, ৩নং রাধা বোস লেন, কলিকাতা। কি ভেবে চিঠিখানা খামের ভেতরে ঢুকিয়ে জামার পকেটে রেখে দিয়ে উঠে পড়ল সুখলাল। ভাঙা সুটকেশ সেখানেই পড়ে রইল।

আধ ঘণ্টার ভেতর একটা ট্রেন আছে—ধরতে পারলে রাত সাড়ে বারটায় ব্যারাকপুরে পৌছান যায়। স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে চলল সুখলাল।

২

ব্যারাকপুর নেমে রেললাইন ধরে হেঁটে চলল সুখলাল। পল্লীটির কাছাকাছি এসে পৌছে গেছে আর কি—দুই-একটি খলিত গানের কলি তার কানে ভেসে আসছে। ঐ ত দূরে ফুলমণির ঘরে এখনও আলো জ্বলছে—আজ আর সেখানে স্থান পাবে না। আশে পাশের কারু ঘরে আজ গিয়ে উঠবে—এই রাত্রিতেই সেখানে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসবে। মোট কথা সাড়ম্বরে জানিয়ে দিতে হবে ফুলমণিকে সে আর কেলনা কেউ নয়—রীতিমত কদর আছে তার। তার পর কাল দিনের বেলায় সুযোগ বুঝে ফুলমণির ঘরে ঢুকে খানদশেক দশ টাকার নোট তার সামনে ছড়িয়ে দেবে। টাকাগুলো লুব্ধ দৃষ্টি মেলে কুড়িয়ে নেবে ফুলমণি। তার পর আর তাকে পায় কে! কয়েক মাসের মত ত নিশ্চিন্দি!

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল সুখলাল। কিন্তু এ কি হ'ল—হঠাৎ রেললাইনের উপরে বসে পড়ল যেন সে। মাথা ঘুরে নাকি? কই না ত। কি হ'ল সুখলালের সে নিজেই ভেবে পেল না। কি একটা অনুভূতি যেন সির সির করে বুকের ভেতর থেকে মাথার দিকে উঠতে লাগল তার। চোখ বুজল সুখলাল। বন্ধ চোখের ভেতরে জ্বল জ্বল করে উঠল তার কয়েক লাইন কাঁচা হাতের আকাবাঁকা লেখা—"আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও বাবা। আজ যদি মা বেঁচে থাকত তুমি কি এমনি করে চুপ করে থাকতে পারতে! পাঁচশ' টাকা কি কোন মতেই যোগাড় হয় না বাবা।"

একি হ'ল সুখলালের। কোথা দিয়ে এ দুর্বলতা এসে তার মনের ভেতরে বাসা বাঁধল। পাঁচ মিনিট গেল—দশ মিনিট গেল সুখলাল তেমনি ঠায় বসেই রইল। অবশেষে ঘণ্টাখানেক বাদে সে উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু পা চালাল স্টেশনের দিকে।

স্টেশনে এসে একটা আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়াল সুখলাল। কি মনে করে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে খুলে দেখল—চিঠিখানা এসেছে কৃষ্ণনগরের আনন্দ পালিত রোডের হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী থেকে। কতক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবল তার পর নিকটে একটা খালি বেঞ্চে গা এলিয়ে দিল।

ভোরের দিকে তার ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একখানা আপ ট্রেন শব্দ করে স্টেশনে এসে থামল। গাড়ীখানার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল সুখলাল—লালগোলার গাড়ী—কৃষ্ণনগর হয়ে যাবে। তড়াক্ করে লাফ দিয়ে একখানা কামরায় উঠে বসল সে। গাড়ী ছেড়ে দিল। সুখ-

লাল বসে বসে ভাবতে লাগল। আজ সে নিজেই বুঝতে পারছে না কি করছে সে। কে একজন যেন তার দেহের ভেতরে ঢুকে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আজকের সুখলাল আর গতকালের সুখলাল কোন মতেই এক ব্যক্তি নয়। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত টেনে নিয়ে এল সুখলালকে কৃষ্ণনগর শহরে আনন্দ পালিত রোডে। সেখানে যদি হরেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বসন্ত চক্রবর্ত্তীকে দেখা পায়—কি করবে সে—কি বলবে তাকে সে? কিছুই তার জানা নাই—যা হয় হবে যা ঘটে কপালে ঘটবে। এও এক রকমের বেপরোয়া হয়েছে সুখলাল।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর এক ভদ্রলোক বললেন—হরেন চাটুজ্যের বাড়ী খুঁজছেন আপনি? সে ত আমাদেরই পাশের বাড়ী। হাঁ হাঁ, বসন্ত চক্রবর্ত্তীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছিল—কই বসন্ত চক্কোত্তি ত আসেন নি; কাল তাঁর মেয়েটি মারা গেছে!

—মারা গেছে!

—হাঁ কাল সকালে।

পথের ধারের একটা গাছের ছায়ায় অনেকক্ষণ বসে রইল সুখলাল। তার পর ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে চলল। তার মন আজ ক্রমাগত এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে যাচ্ছে এই অনুভূতির জোয়ারে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিছুতেই স্বভাবে ফিরতে পারছে না।

কলকাতার গাড়ীতে চড়ে—বেঞ্চির এক পাশে চুপ করে সে চোখ বুজে বসেছিল। চোখের উপরে ফুটে উঠছিল টুকরো টুকরো ছবির মত।—বুড়ো মানুষ, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারে অনেকগুলো পোষ্য। কোন কারখানায় হয়ত সামান্য মাইনের কাজ করে, সংসারে অভাব-অনটন নিত্য লেগে আছে। যা কিছু শেষ সম্বল ছিল খরচ করে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছে। তবু সব টাকা যোগাড় হয় নি—তাই হয় ত পণের পাঁচশ' টাকা কম পড়েছিল। তাই ত মেয়েটিকে আজ দেড় বছরের ভেতর নিয়ে যেতে পারে নি। আজ দেড় বৎসর ধরে না খেয়ে তিল তিল করে টাকা জমিয়ে এই পাঁচশ' টাকা করেছিল। এর প্রতিটি নোটে কত যে বুকের রক্ত জড়িয়ে আছে—কত যে আশা-আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে এর খবর কে রাখে। সুখলালের মনে হ'ল তার কোমরের নোটগুলি যেন জীবন্ত হয়ে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে।

গাড়ী থেকে নেমে সুখলাল দেখতে পেল শিয়ালদহ ষ্টেশনের এক পাশে একটি বুড়ো লোক দুই হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল সুখলালের। এই লোকটিই নয় ত? তার মুখখানা ত সে দেখতে পায় নি—গায়ে এমন একটা চাদরই হয়ত জড়ান ছিল। ধীরে ধীরে লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। প্লাটফরম প্রায় খালি হয়ে গিয়েছে ততক্ষণ।

হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন চাপা গলায় ডাকল—আরে সুখলাল যে—

সুখলাল তাকিয়ে দেখল তার একজন পুরনো সাঙাৎ।

—কি করছিস্ এখানে।

—এ লোকটি কে ভাই—কাঁদছে কেন বল ত?

লোকটি এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল—আরে এ ত পাগল আজ সাত-আট দিন এখানেই ঘুরছে। তার পর কোথা[illegible] গেছিলি? যাবি না বারাকপুর?

—না রে এখন যাব না।

—কেন, মনের দুঃখে সন্নিসি হবি নাকি—তো[illegible] ফুলমণির বাড়ীতে যে গুলজার করে বসে আছে হারাধ[illegible] জুয়াড়ী।

সুখলাল জবাব দিল না—সব কথা হয়ত ভাল করে তা[illegible] কানেও গেল না।

—আমি যাই ভাই, ঐ ইস্টিশান থেকে রাণাঘাটের গাড়ী ধরব।

ধীরে ধীরে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এল সুখলাল। আজ দু'দিন ধরে সে বিশেষ কিছু খায় নি। পেট জলে যাচ্ছে বাইরে এসে খানদুই রুটি আর তরকারী কিনে খেল। তা[illegible] পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে কলকাতার রাস্তায় নেমে পড়ল সে।

সারাটা দিন সে পথে পথে ঘুরে বেড়াল—পরের দি[illegible] বিকেলের দিকে ৩নং রাধা বোস লেনের বাড়ীটার কা[illegible] এসে পৌঁছল সুখলাল। ছোট একখানা একতলা ভাঙ বাড়ী—বাইরের দেয়ালটা হাড় জিরজিরে—রোয়াকটি ভেঙে চুরে এবড়োখেবড়ো হয়ে পড়েছে। সেই রোয়াকটার উপ[illegible] চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। কদাচিৎ ভিতর থেকে এক-আধ টুকরো কথার শব্দ ভেসে আসছে। সাগ্রহে কা[illegible] পেতে রইল সুখলাল। অনেকক্ষণ পরে দরজা ঠেলে উদ্দে[illegible] হীন ভাবে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। সারা দেহে দারিদ্র্যে[illegible] ছাপ—চোখেমুখে যেন একটা চাপা আতঙ্ক। সুখলালে[illegible] দিকে খানিকটা তাকিয়ে রইল মেয়েটি। সুখলাল ডাক দি[illegible]—শোন ত খুকী।

মেয়েটি এগিয়ে এল।

—তোমার নাম কি?

—আরতি।

—তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

—তোমার বাবা কোথায়?

—তাঁকে আজ দুপুর বেলা পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

—পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে? কেন?

—বাবা নাকি কোম্পানীর পাঁচশ' টাকা চুরি করেছেন? বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেললে। বললে—ওরা মিথ্যে বলেছে আমার বাবা কোনদিন চুরি করেনি—খুব ভাল লোক আমার বাবা।

—বাড়ীতে তোমার আর কে কে আছেন?

—পিসীমা আছেন আর আমার ছোট ছোট দুটি ভাই আছে।

একটা বুদ্ধি মাথায় এল সুখলালের। কোমর থেকে নোটগুলি বের করে একখানা কাগজে জড়িয়ে মেয়েটির হাতে দিয়ে বলল—এটা তোমার বাবার কাছ থেকে পথে পড়ে গিয়েছিল আমি কুড়িয়ে পেয়েছি—তোমার বাবা বাড়ী ফিরে এলে দিও—এখন তোমার পিসীমার কাছে যাও গে।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—এর ভেতরে কি আছে?

—আমি জানিনে—তোমার পিসীমাকে দিয়ে এস, আমি বলছি। মেয়েটা ভিতরে চলে যেতেই সুখলাল পথে নেমে দ্রুতপদে চলতে লাগল লক্ষ্যহীনের মত।

জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

যে মহলেই যাই না কেন, যে প্রসঙ্গই উঠুক না কেন, কোথা হইতে জিনিষপত্রের দুর্মূল্যের কথা উঠিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ ত প্রকাশিত হয় এবং কখনও কখনও অতি কটু বাক্যও ব্যবহৃত হয়। জানি না এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন্ খানে কতটা দায়ী এবং তাঁহারা ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করিতে পারেন। তবে এই কথা জানি কি শহরে কি পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণ এই সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট। এইরূপ তীব্র অসন্তোষের ফল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মোটেই শুভ নহে এবং যদি কোন উপায়ে যতটা সম্ভব তাঁহারা ইহার প্রতিকার করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।

আমরা—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা—প্রতিদিনই জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং "সংসার" চালাইব কি করিয়া সে কথাও ভাবি, কিন্তু কোন্ জিনিষের মূল্য কখন্ হইতে কত বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে সে সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখি না—মনে করি আজ আলুর দাম দুই এক আনা বাড়িয়াছে, কাল হয়ত কমিয়া যাইবে—এইরূপ সব জিনিষের অল্প বিস্তর দাম বাড়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমাদের এই কথাই মনে হয় এবং আমরা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের পরিমাণ কমাইতে পারি না। যদিও ক্রমশঃ আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া "সংসার" চালান আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইয়াছে তথাপি দৈনন্দিন ব্যয় হ্রাস করিতে পারিতেছি না। সাধারণতঃ গৃহিণীরা কমানোর পক্ষপাতী মোটেই নহেন। তাঁহারা বলেন, "তোমরা যাকে পুষ্টিকর খাদ্য বল তা কি ছেলেমেয়েরা এখন পাচ্ছে, এতেই কুলাতে পারছি না, এর চেয়ে কম করলে সকলকে কি খেতে দেব, তার চেয়ে স্পষ্ট বলে দাও সকলে উপোস কর"। না হয় রবীন্দ্রনাথের মোক্তার কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিবেন, "তবে ছেলেগুলো না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও চলিয়া যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় চালাইতে পারিবে"। গৃহিণীদের কথার সত্যতা মেনে নিতেই হয়। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে কয়জন ছেলে-মেয়েদের সমান ভাবে উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারছি; যাই-হোক অশান্তি বা মনকষাকষি নিবারণ করিবার জন্য কর্ত্তারা বলেন, "যাক্ গে, যা হবার হবে, যত দিন পারি চালিয়ে যাই, কোথায় গিয়ে ঠেকব বা কি রকম ধাক্কা খাব কে জানে।" কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকেই ঠেকেছেন এবং বেশ ধাক্কা খাচ্ছেন। জানি বলেই এই কথা লিখছি। ঠেকার কিম্বা ধাক্কার উদাহরণ দিলাম না। সেই সকল উদাহরণ বড়ই করুণ।

গত ১১শে জুনের "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন কখন হইতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন্ জিনিষের দাম কত পরিমান বাড়িয়াছে। তাঁহারা ৩৫টি জিনিষের মূল্যের হিসাব ধরিয়া দেখাইয়াছেন যে ১৯৫৫ সনের জুন মাসের তুলনায় ১৯৫৬ সালের জুন মাসে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে এই ৩৫টি জিনিষের সামগ্রিক (overall) মূল্য শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে এবং ১৯৫৬ সনের জানুয়ারী মাসের তুলনায় শতকরা ২৬ ভাগ বাড়িয়াছে। অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় খরচের জন্য ১০০৲ টাকা লাগিত, বর্ত্তমানে ১২৬৲ টাকা লাগিতেছে। যাঁহাদের আয় সীমাবদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে সমস্যা কত কঠিন সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার মোটামুটি সহজ অর্থ হইতেছে যে টাকায় এক বৎসর পূর্ব্বে ৩০ দিন চলিত এখন সেই টাকায় ২২।২৩ দিন চলিবে। হয় খরচ কমাও, না হয় অবশিষ্ট ৭।৮ দিন উপোস দাও। খরচ হয়ত কমানো যায়, কিন্তু তাহার ফলে কি সবল সুস্থ কর্ম্মঠ ভবিষ্যতের নাগরিক সৃষ্টি হইবে?

ষ্টেটসম্যানের হিসাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

জিনিষের নাম	মূল্য জুন'৫৬	জানু'৫৬	জুন'৫৫	১৯৫৬ জানুয়ারীর তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা	১৯৫৫ জুনের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা
চাউল প্রতি সের	।/০	।৶১০	।৶১০	২০	২০
ডাল প্রতি সের মসুর	।৵০	।৶০	।৵০	৪৩	৬৬
মুগ কাঁচা	।৵০	।/০	।৶০	১১	৪৩
মুগ ভাজা	১।০	১৲	১৲	২৫	২৫
তারতম্য				২৬	৪৫
সবজী প্রতি সের					
আলু	।/০	।১০	।৵০	১০০	৫০
বেগুন	৸০	।০	।০	২০০	৫০
পটল	৷০	—	।৵০	—	২০
তারতম্য				১০০	৪০
মাছ প্রতি সের					
রুই (কাটা)	৩৸০	২৸০	৩৲	৩৬	২৫
রুই (ছোট)	২।০	১৸০	২৷০	৪৩	১১
ইলিস	৩।০	২।০	১৷০	৫৫	১০০
তারতম্য				৪৫	৪৫
মাংস প্রতি সের					
ভেড়া	২৷০	২৷০	২৷০	বাড়ে নাই	
ছাগল	২।০	২।০	২।০		
গরু	১।০	১।০	১।০	কমে নাই	
তারতম্য		...		...	
ডিম (২০)					
মুরগী	২।০	১৸৵০	২।০	৩৩	১১
হাঁস	২।০	২৲	২।০	২৫	—
তারতম্য				২৩	৫৫
রন্ধনের সামগ্রী মসলা, ঘি ইঃ					
সরিষার তৈল					
প্রতি সের	২৵০	১।৵০	১।০	১১	৪২
ভেজিটেবল ঘি ২ পাঃ	২।/১০	২।১০	২৲	১৪	৩০
নারিকেল তৈল					
প্রতি সের	২৵০	১৷০	১৷০	২১	২১
মাখন (১ পাঃ)	৩।০	৩।০	৩।০	৮	—
গাওয়া ঘি প্রতি সের	৮।০	৮৲	৮।০	৬	—
হলুদ /১	১।০	১৸০	১৸০	১৪	ভাগ কম
লঙ্কা /১	২।০	২৲	১।০	২৫	৬৭
সুপারি /১	৩।০	৩৲	২৸০	১৭	২৭
চিনি	৸৵০	৸/০	৸/০	৮	৮
তারতম্য				৭.৫	৭.৫
কয়লা ১ মণ	১৸১০	১৸০	১৸০	২	২
বস্ত্রাদি					
ধুতি শাড়ী ১ জোড়া					
মিডিয়ম	৯।০	৮।০	৮৵০	১২	১৪
ফাইন	১১৸০	১০।০	১০।০	১২	১৫
সুপার ফাইন	১৫।০	১৯।০	১৩৲	১৫	১৭
সার্টিং (প্রতি গজ)					
লং ক্লথ (সাধারণ)	১/০	৸৶০	৸৶০	১৩	১৩
আদ্দি	২৷৵০	১৷৵০	১৷৵০	২৭	২৭
কেমব্রিক	২।৵০	১৸৵০	১৸৵০	২৭	২৭
ছেলেদের সট	৩৲	২।৵০	২।৵০	১৪	১৪
সার্ট (হাফ হাতা)	৩।০	২৸৵০	২৷৵০	১৩	১৩
তারতম্য				১৭	১৭
সামগ্রিক বৃদ্ধি				২৬	২০

উপরোক্ত হিসাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সকল জিনিষের দাম সমান ভাবে বাড়ে নাই। চাউল, ডাল, সবজী, মাছ, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, লঙ্কা, সুপারি এবং বস্ত্রাদির মূল্য বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অথচ আমাদের জীবন নির্বাহের জন্ত এই জিনিষগুলি অতি প্রয়োজনীয়। মাংসের মূল্য বাড়েও নাই, কমেও নাই, হলুদের দাম কমিয়াছে—কারণ কি? আমরা জানি সরবরাহ ও চাহিদা অনুসারে জিনিষের দাম বাড়ে কমে, সরবরাহ যদি বেশী থাকে চাহিদা কম হয় জিনিষের দাম কমে, সরবরাহ যদি কম হয় চাহিদা যদি বেশী হয় দাম বাড়ে। তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে যে মাংসের বেলায় সরবরাহ ও চাহিদা সমান সমান আছে সেইজন্ত মাংসের দাম বাড়েও নাই, কমেও নাই। আর হলুদের বেলাতে কি মনে করিতে হইবে যে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী আছে। কিছু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে চাউলের মূল্যের উপরেই আর সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে। চাউলের দর কমিলেই আর সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য কমিবে। চাউলের দর ত ক্রমবর্দ্ধমান তবে মাংসের দর স্থির কেন, হলুদের দরই বা হ্রাসের দিকে কেন। আমরা সাধারণ লোক এই সকল কথা বুঝিতে পারি না—অর্থনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন।

ভারতের সামুদ্রিক রাজ্য

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য তিন হাজার মাইলের উপর। সুদীর্ঘ উপকূল থাকা সত্ত্বেও ভারতের ভৌগোলিক সীমা-সংলগ্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সিংহল ব্যতীত অপর কোন উল্লেখযোগ্য দ্বীপ নাই। ভারতের ভূগোলের ইহা একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মূল ভূখণ্ড হইতে প্রায় সাত শত মাইল দূরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ইরাবতীর ব-দ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরীপ নিগ্রেইস ও আন্দামানের উত্তর প্রান্তের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১২০ মাইল। নিকোবরের শেষ প্রান্ত ও সুমাত্রা'র মধ্যে দূরত্ব আরও কম, কিঞ্চিদধিক নব্বই মাইল। ভৌগোলিক দাবীতে না হইলেও ঐতিহাসিক কারণে দ্বীপপুঞ্জ দুইটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত। ইহাই ভারতের একমাত্র সামুদ্রিক রাজ্য।

আন্দামান নামের সহিত একটা অপ্রীতিকর স্মৃতি জড়িত। ভারত ও ব্রহ্মদেশের গুরু অপরাধে দণ্ডিতদের নির্ব্বাসন ভূমি এবং স্বাধীনতা-পাগল দেশপ্রেমিকগণের বন্দীশালা ছিল আন্দামান দীর্ঘ সাতাশী বৎসর। বহুকালের বেদনার স্মৃতি আমাদিগকে আন্দামানের প্রতি বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গের পরিচয় লাভ স্বাধীন দেশের নাগরিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ জ্ঞান নাগরিকদিগকে তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। আন্দামানের ক্রত-ক্ষয়িষ্ণু আদিবাসিগণ একটি নৃতাত্ত্বিক প্রহেলিকা। শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সত্যান্বেষী বিজ্ঞানীগণ আন্দামান ও নিকোবরে সমীক্ষা অভিযান পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের জনৈক প্রাক্তন অধ্যাপক ১৯৫১ সন হইতে তিন বৎসরকাল আন্দামানীদের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের রীতিনীতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাত বৎসর আগে আমাদের ডাঃ গুহ এবং চার বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ সরকার দুই দল নৃতত্ত্বানুসন্ধানীসহ আন্দামানে সমীক্ষাকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা যেখানে তথ্যসংগ্রহে আগ্রহান্বিত, সেই অঞ্চল সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আমাদের শোভা পায় না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্দামানে চার হাজার পরিবার, কমবেশি বিশ হাজার ভারতীয়, স্থাপিত করিবার প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। চলতি বৎসরের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ৫৭৫টি বাস্তুহারা বাঙালী পরিবার আন্দামানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। আমাদের এই সকল স্বজন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের পরপারে অভিনব পরিবেশে কি ভাবে কালযাপন করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। আন্দামান ও নিকোবরের ১৯৫১ সনের জনগণনায় সদ্য-প্রকাশিত বিবরণী এবং অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থাদির সাহায্যে এখানে ভারতের সামুদ্রিক রাজ্যের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হইবে।

উৎপত্তি, অবস্থান ও আয়তন—ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদেশের পশ্চিমস্থ আরাকান ইয়োমা পর্ব্বতমালা প্রসারিত হইয়া সুমাত্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অজানা অতীতে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে নিগ্রেইস অন্তরীপ ও সুমাত্রার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতাংশ বসিয়া গিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। কোকোদ্বীপসমূহ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং উহাদের আশপাশের অন্যান্য দ্বীপ এই নিমজ্জিত পর্ব্বতমালার উন্নত শীর্ষদেশ বই আর কিছুই নহে। ভৌগোলিক হিসাবে কোকোদ্বীপাবলী আন্দামানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহারা ব্রহ্মদেশের অধিকারে আছে। কোকো, আন্দামান ও নিকোবরপুঞ্জের দ্বীপসমূহ উত্তর হইতে দক্ষিণে পর পর অবস্থিত থাকিয়া একটি ধনুকাকার বাঁকা মালার রূপ ধারণ করিয়াছে। মালয় উপদ্বীপ যেন এই ধনুকের ছিলা। মাঝখানে রহিয়াছে সুগভীর আন্দামান সাগর। ছয়টি সুপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা আন্দামান সাগর পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরের সহিত যুক্ত এবং পূর্ব্বদিকে মালাক্কা প্রণালী শ্যাম উপসাগরের সহিত ইহার সংযোগসাধন করিয়াছে। জাপান দ্বীপপুঞ্জ ও জাপান সাগরের সহিত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপমালা ও আন্দামান সাগরের বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

কোকো, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৯২° ও ৯৪° পূর্ব্ব-দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত। শিলঙের প্রায় সোজা দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এই দ্বীপমালা বিরাজমান। ৬°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ১৩°৩৪´ উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নিকোবর ও আন্দামান উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ আন্দামান ও নিকোবরের সম-অক্ষাংশে অবস্থিত।

আশী মাইল প্রস্থ ও তিন হাজার ফুটের অধিক গভীর দশ ডিগ্রী প্রণালী আন্দামান হইতে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে আন্দামান ও কোকো দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র-নিমজ্জিত পর্ব্বতের এক শিখরে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অন্য শিখরে অবস্থিত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বৃহৎ আন্দামান ও ক্ষুদ্র আন্দামান, এই দুই নামেই দীর্ঘকাল পরিচিত ছিল। পরে দেখা গিয়াছে চারিটি অতি সঙ্কীর্ণ প্রণালী দ্বারা বিভক্ত পাঁচটি দ্বীপকে অভিন্ন মনে করিয়া বৃহৎ আন্দামান নাম দেওয়া হইয়াছে? বৃহৎ আন্দামানের প্রধান দ্বীপ পাঁচটির নাম উত্তর হইতে দক্ষিণে যথাক্রমে উত্তর-আন্দামান, মধ্য-আন্দামান, দক্ষিণ-আন্দামান, বারাটাং ও রাটল্যাণ্ড দ্বীপ। বৃহৎ আন্দামানের দৈর্ঘ্য ১৫৬ মাইল। ইহার চারিদিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে। বৃহৎ আন্দামানের দক্ষিণে ৩১ মাইল চওড়া ডাংকান প্রণালীর পরপারে ক্ষুদ্র আন্দামান। ইহার দৈর্ঘ্য ২৬ মাইল ও প্রস্থ ১৬ মাইল। আন্দামানের দ্বীপসংখ্যা বাকি ২০৪। এই দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বাধিক দৈর্ঘ্য ২১৯ মাইল এবং সর্ব্বাধিক

প্রস্থ ৩২ মাইল। স্থলভাগের মোট পরিমাণ ২,৫০৮ বর্গমাইল, বাঁকুড়া জেলার প্রায় সমান।

উনিশটি দ্বীপ লইয়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উহাদের সাতটিতে লোকের বসতি নাই। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বাধিক দৈর্ঘ্য ১৬৩ মাইল এবং সর্ব্বাধিক প্রস্থ ৩৬ মাইল। জনগণনার বিবরণী অনুসারে ইহার আয়তন ৭০৭ বর্গমাইল, বিষ্ণুপুর মহকুমার সমান। আন্দামান ও নিকোবরের ভূমির মোট পরিমাণ ৩,২১৫ বর্গমাইল, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার মিলিত আয়তনের সমান।

ভূ-প্রকৃতি—বৃহৎ আন্দামানের দ্বীপ কয়টি পাহাড়ময়। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা রহিয়াছে। পাহাড় ও উপত্যকা অতি নিবিড় উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যানী আচ্ছাদিত। পাহাড়, বিশেষতঃ পূর্ব্বভাগে, বেশ উচ্চ। উত্তর আন্দামানের ২,৪০০ ফুট উচ্চ জিন (saddle) চূড়া হইতে ক্রমনিম্ন কয়েকটি চূড়ার পর রাটল্যাণ্ড দ্বীপের চূড়া ১,৪২২ ফুটে শেষ হইয়াছে। উত্তর প্রান্ত ব্যতীত ক্ষুদ্র আন্দামানকে সমতলক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। আন্দামানে নদী নাই; নিত্যবহা ছড়ার সংখ্যাও নগণ্য।

আন্দামানের গভীর দাঁতকাটা উপকূলে বেশ কয়েকটি নিরাপদ পোতাশ্রয় ও জোয়ার চলা খাড়ি আছে। বহু স্থলে দেখা যায় খাড়ি ঘিরিয়া রহিয়াছে গরাণ বৃক্ষ সমাকীর্ণ জলাভূমি।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্ব্বত্রই বিচিত্র ও মনোহর। অপেক্ষাকৃত নিরালা খাড়ির প্রবালক্ষেত্রে কি বিচিত্র নয়নাভিরাম রঙের খেলা! আন্দামানের পোতাশ্রয়ের দৃশ্য আয়ারের হ্রদ কিলারনির সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। উহারা যে ব্রিটিশ হ্রদ স্মরণ করাইয়া দেয় এ বিষয়ে মতভেদ নাই। পোর্টব্লেয়ার পোতাশ্রয় বিশেষরূপে কাম্বারল্যাণ্ডের ডারওয়েন্টওয়াটার হ্রদের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের স্মৃতি ইংরেজদের মনে জাগ্রত করিয়া থাকে।

নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়। বৃহৎ নিকোবরের পাহাড়ই সর্ব্বোচ্চ, ২,১০৫ ফুট। ক্ষুদ্র নিকোবরে তিনটি চূড়া ১,৩৫৩ ফুট হইতে ১,৪২৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠে মিঠা জলের অভাব। কার নিকোবরে ভূপৃষ্ঠের জল নাই বলিলেই চলে। ভূগর্ভস্থ জল কিন্তু অল্প খনন করিলেই পাওয়া যায়। একমাত্র বৃহৎ নিকোবরেই বেশ বড় ও সুন্দর তিনটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার একটি ছোট নদীর নাম গঙ্গা।

নানকৌড়ি নামে একটি স্থলবেষ্টিত বৃহৎ পোতাশ্রয় আছে। আর একটি পোতাশ্রয় অতি ছোট। নোঙর করিবার অন্যান্য স্থানগুলি উন্মুক্ত সাগরের অগভীর তলদেশ মাত্র।

দ্বীপকয়টিতে বেশ কেয়ারি দৃশ্য চোখে পড়ে। কার নিকোবর প্রবালে আবৃত সমতল দ্বীপ; চৌরাও সমতল কিন্তু দক্ষিণাংশে একটি মালভূমি সদৃশ পাহাড়, টেরেশা একটি বাঁকা পাহাড়ের শ্রেণী; বম্পোকা একটি মাত্র পাহাড়, উহা নাকি আগ্নেয়গিরি; টিলাঙচঙ একটি দীর্ঘ সংকীর্ণ পাহাড়; কামোর্টা ও নানকৌড়ি, দুই-ই পাহাড়ে দ্বীপ, ট্রিংকাট সম্পূর্ণ সমতল, কাচচাল পাহাড়ময়; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নিকোবর পার্ব্বত্য দ্বীপ। সমুদ্রতটে নিরবচ্ছিন্ন নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী কার নিকোবরকে উষ্ণমণ্ডলীয় রূপদান করিয়াছে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘ সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে বনবৃক্ষের আবির্ভাবে চৌরা, টেরেসা, বম্পোকা, কামোর্টা ও নানকৌড়ি উপবনের মত দেখায়। সমুদ্র হইতে কাটচাল এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নিকোবরের দৃশ্য বেশ রমণীয়। নিকোবরের শোভা সুন্দর, কোন কোন স্থানে অতীব মনোহর।

ভূতত্ত্ব—ভূতাত্ত্বিক বিচারে আন্দামান আরাকান ইয়োমার দক্ষিণাভিমুখী সম্প্রসারিত অংশ। দুইটি পাললিক শিলাশ্রেণীর এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; পোর্ট ব্লেয়ার ও আর্কিপেলেগো নামে উহারা পরিচিত। পরিবর্ত্তিত আগ্নেয় শিলা এবং আগ্নেয় গিরিসম্ভূত শিলা উহাদের মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। পোর্ট ব্লেয়ার সিরিজ আরাকানের নিগ্রেইস সিরিজ হইতে অভিন্ন। ধূসর বেলে পাথর ও তাহার নীচে শ্লেট জাতীয় নরম শিলা। স্থানে স্থানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ও ধূসর রঙের চূণা পাথর। চূণাপাথর মৌচাকের মত ঝাঁঝরা। কয়লা, বালি ও শ্বেত কর্দ্দমে গঠিত আর্কিপেলেগো শিলাশ্রেণী। দুইয়ের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার সিরিজই অধিকতর পুরাতন। ইহাতে ক্রোমাইট, অ্যাসবেসটস ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজের সন্ধান করা উচিত। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য উত্তম প্রস্তর, ইট প্রস্তুত করিবার ভাল লাল মাটি ও লালচে মার্ব্বেল পাথর পোর্ট ব্লেয়ারের অপরাধী উপনিবেশে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানের গৈরিক মৃত্তিকা গর্জ্জন তেলের সহিত মিশ্রিত করিলে ঘরের চালে ব্যবহারের জন্য উত্তম প্রলেপ প্রস্তুত হয়। পোর্ট ব্লেয়ার পোতাশ্রয়ে নেভি বে পাহাড়ের আশপাশে ব্যবসায়ের উপযোগী অভ্র দেখা যায়।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তামা ও টিনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা পরীক্ষিত হয় নাই। কামোর্টা ও নানকৌরির সাদা মাটি বৈজ্ঞানিক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে।

বনজসম্পদ—উষ্ণমণ্ডলীয় নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যানী আন্দামানের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। একই অক্ষাংশে অবস্থিত থাকায় আন্দামানের বৃক্ষাদি ইন্দোচীনের বনজের সগোত্র। মালয় জাতীয় তরুলতাও ইহার সহিত মিশ্রিত আছে। আন্দামানের বন উপকূলীয় ও অন্তঃপ্রদেশীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। আর্থিক হিসাবে উপকূলের বনাঞ্চলই অধিকতর মূল্যবান।

উপকূলের গরাণের বন বহুবিস্তৃত ও মূল্যবান। তাল জাতীয় প্যান্ডানাস ও নিপা বৃক্ষ সাগরতীরে বেড়া-সৃষ্টিকারী গাছপালার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদেরও আর্থিক মূল্য আছে। আন্দামানের উপকূলে ঝাউ ও নারিকেল বৃক্ষের অভাব বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। অদূরে ক্ষুদ্র আন্দামানে ঝাউ এবং ককো ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর। তটভূমির বনে ইন্দো-মালয় বৃক্ষাদির সুস্পষ্ট লক্ষণ বর্ত্তমান।

প্রকৃত আন্দামানীয় বন চিরহরিৎ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। বৃক্ষ-

গাছ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে লতার গুচ্ছভার। পত্রপতনশীল বৃক্ষের এক এক চাপ ও বাঁশের ঝাড় মাঝে মাঝে দেখা যায়। শৈল শিরায় বৃক্ষ খর্বাকৃতি ও নিবিড় লতাজালে আচ্ছন্ন। উৎকৃষ্ট বৃক্ষ জন্মে পাহাড়ের ঢালে। আন্দামানের আভ্যন্তরীণ অরণ্যের বৃক্ষাদির বেশ কিছু অংশ বিশেষ ভাবে এই দেশেরই গাছপালা, সাধারণতঃ অন্য দেশের বনজের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য নাই। কিন্তু কয়েক প্রকার বৃক্ষ আন্দামান সাগরের পরপারের টেনাসেরিমের অরণ্য বৃক্ষের সমজাতীয়।

আর্থিক হিসাবে মূল্যবান কাঠ পরিমাণে যেমন প্রচুর তাহাদের রকমারিও বহু। আন্দামানের কাঠের রাজা পাদাউক সেগুনের সমকক্ষই শুধু নহে, কোন কোন বিষয়ে সেগুন কাঠকে ইহার নিকট হার মানিতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় পাদাউকের খুব আদর। তার পরই স্থান গর্জন কাঠের। গর্জন বৃক্ষের তৈল বৎ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গরাণ কাঠে টেলিগ্রামের তারের থাম হয়। ধূপ ও পপিতা দেয়াশলাইর বিশেষ উপযোগী। প্লাইউড ও প্যাকিং-কেসের জন্য এখানকার বহু কাঠের চাহিদা প্রচুর।

আন্দামানের অরণ্য হইতে এখন বার্ষিক ১৩৫,০০০ টন কাঠ সংগ্রহ করা হয়। দ্বীপগুলির বহুলাংশই অরণ্যময় হইলেও সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত অঞ্চলের কাঠ সংগ্রহ করা পূর্বে সম্ভব হইত না। উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলের গাছ কাটিতে কাটিতে বন ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ এই দুই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। হাতিতে-টানা ট্রাম গাড়ীর লাইন বসাইয়া কাঠ আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতীয় বনবিভাগের পদ্ধতি অনুসারে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। দ্বীপ-পুঞ্জের বনবিভাগের অধিকর্তার মতে এই ১৩৫,০০০ টন কাঠের জন্য ৭৫০ বর্গ মাইল বনাঞ্চলই যথেষ্ট। সুতরাং প্রায় ১,৭০০ বর্গমাইল ভূমি অরণ্যমুক্ত করিয়া চাষের জন্য রাখা যাইতে পারিত। কিন্তু ভারতে কাঠের দারুণ অভাব হেতু সম্প্রতি চাষের জন্য কেবল-মাত্র ৩০০ বর্গ মাইল সমতল ও তরঙ্গায়িত ভূমি রাখিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কাঠের জন্য রক্ষিত এই বন হইতে ভবিষ্যতে বার্ষিক প্রায় ৬৭৫,০০০ টন কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। বনবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পোর্ট ব্লেয়ারের করাত-কল এশিয়ার বৃহত্তম করাত-কল বলিয়া বিবেচিত হয়।

নিকোবরের বনজ-সম্পদের বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। তবে উহা যে আন্দামানের বনসম্পদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা নিঃসন্দেহ।

জীবজন্তু—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোন স্তন্যপায়ী হিংস্র জন্তু ছিল না। কামোর্টা দ্বীপে পাদরীদের দ্বারা পরিত্যক্ত গো-মহিষাদি বুনো হইয়া গিয়াছে। এক প্রকার শূকর বা বন-বিড়াল খাদ্যের জন্য আন্দামানীরা শিকার করিয়া থাকে। আন্দামানে নানা প্রকার বিষধর সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নিকোবরে নদীগর্ভে, সমুদ্রতটে এবং অন্য কোন কোন স্থানে কুমীর দেখা যায়। ক্ষুদ্র নিকোবর, বৃহৎ নিকোবর ও কাটচাল দ্বীপে বানরের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক।

আন্দামান ও নিকোবরের উপকূল রেখা প্রায় ১,২০০ মাইল দীর্ঘ এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রায় ১৮,০০০ বর্গ মাইল। মৎস্য সম্বন্ধীয় সরকারী গবেষণা বিভাগ পোর্ট ব্লেয়ারে কার্য আরম্ভ করিয়াছে। মৎস্য ধরা ও উহার ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ হইলেও বর্তমানে উহা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বড়শী আর ক্ষেপলা জাল মাছ ধরিবার প্রধান হাতিয়ার। এই উপায়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার মণ মাছ ধরা পড়ে।

জলবায়ু— আন্দামানের জলবায়ু সমভাবাপন্ন, শীত ও গ্রীষ্মে উষ্ণতার প্রভেদ অতি অল্প। চৈত্রের শেষার্দ্ধ ও বৈশাখের প্রথমার্দ্ধ বৎসরের উষ্ণতম কাল, সেই সময় গড় চরম উত্তাপ ৮৯° ও নিম্নতম তাপ ৭৫°। অগ্রহায়ণের মধ্য ভাগ হইতে ফাল্গুনের মধ্য ভাগ পর্যন্ত তাপ সর্বাপেক্ষা কম থাকে সুতরাং ইহাকে শীতকাল বলিতে হয়। কিন্তু তখন চরম উষ্ণতা ৮৪°-৮৮° এবং নিম্নতম উষ্ণতা ৭৩°-৭৪°। কলিকাতায় শীতকালের চরম উষ্ণতা আন্দা-মানের গ্রীষ্মকালের চরম উষ্ণতার সমান। কলিকাতায় শীত ও গ্রীষ্মের চরম উষ্ণতার প্রভেদ ২৫°, আন্দামানে ঐ প্রভেদ মাত্র ৩° হইতে ৫°। জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগে ১১০°-১১২° উত্তাপে যখন কলিকাতার লোক ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে আন্দামানে তখন কলিকাতার শীতের মত মনোরম মৃদু উষ্ণতা। আন্দামানের গ্রীষ্ম-কালে স্নিগ্ধকর সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাপ হ্রাস করিলেও গুমট সম্পূর্ণ ভাঙিতে পারে না। জলবায়ুর উপর সামুদ্রিক প্রভাবের দরুন শীত ও গ্রীষ্মের প্রভেদ বিশেষ অনুভূত হয় না। সারা বৎসর ধরিয়া প্রায় একটানা মৃদু উষ্ণতা চলিতে থাকে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং শহরে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৪৫,১২৮ ও ১২৬ ইঞ্চি; পোর্ট ব্লেয়ারে বার্ষিক গড় বারিপাতের পরিমাণ ১২৩ ইঞ্চি। কিন্তু সমগ্র আন্দামানের গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৪০ ইঞ্চি।

বৃষ্টিপাতহীন মাস পোর্ট ব্লেয়ারে নাই। জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত একমাসে বারিপাত সর্বাধিক, ২২ ইঞ্চি। ঐ সময়ে জলপাইগুড়ি শহরে বৃষ্টি হয় ২৬ ইঞ্চি। জলপাইগুড়ির আর্দ্রতম মাস আষাঢ়ের শেষার্দ্ধ ও শ্রাবণের পূর্বার্দ্ধ, বৃষ্টিপাত ৩২ ইঞ্চি। সেই সময়ে পোর্ট ব্লেয়ারে বৃষ্টিপাত জলপাই-গুড়ির অর্দ্ধেকেরও কম, সাড়ে পনর ইঞ্চি মাত্র। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত হইতে বিদায় লইবার পর কার্ত্তিকের শেষভাগ হইতে ছয় মাস কাল এই দেশ থাকে বৃষ্টিহীন। কালে-ভদ্রে যে বর্ষণ হয় তাহা অকালের ফলের মত প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর। পোর্ট ব্লেয়ারে কিন্তু এই সময়ে ২৫ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। এই জল বহিয়া আনে উত্তর-পূর্ব

মৌসুমি বায়ু। আন্দামান ও নিকোবর উভয় মৌসুমির বায়ুরই সেবা লাভ করে।

এদেশের কালবৈশাখীর মত দুই দ্বীপপুঞ্জেই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকাল বেলা বৃষ্টি একা আসে না, সঙ্গে থাকে ঝড়ো হাওয়া আর বজ্রনির্ঘোষ। উত্তমণ্ডলীর ঝড়ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এই সকল ঝড় এত জল বহিয়া আনে যে, পোর্ট ব্লেয়ারে চৈত্র মাসে একদিনে ৮ ইঞ্চি এবং বৈশাখ মাসে একদিনে ১০ ইঞ্চির অধিক বারিপাত দেখা গিয়াছে।

জলঝড় সঙ্গে করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে। প্রথম আক্রমণের পরের বারিপাত যেন বৃষ্টি নহে, জলের ধারা। জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন প্রতি মাসে পোর্ট ব্লেয়ারে বিশ দিন বর্ষণ হয়। আশ্বিনি ঝড় এই সকল দ্বীপেও বহিয়া থাকে। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের সংখ্যা বেশি নহে।

নিকোবর আন্দামান অপেক্ষা নিরক্ষরেখার অধিকতর নিকটবর্তী সুতরাং উহার উষ্ণতাও অধিক। সারা বৎসর ধরিয়া প্রবল বারিপাত হয়। ভীষণ ম্যালেরিয়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয়ান-দের ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

পূর্ব্বকথা—কেহ কেহ বলেন, আন্দামান ও নিকোবর নাম দুইটি ভারতীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন। ভারতের 'হনুমান' মালয় ভাষায় 'হান্দুমানের' মধ্য দিয়া আন্দমানে পরিণত হইয়াছে। ভারতের অনার্য্য অধিবাসী আর্য্যদের নিকট ছিল 'রাক্ষস'। সেইরূপ আন্দামানের আদিবাসিগণ তাহাদের মতে ছিল বানর, হনুমানের সগোত্র বা 'হনুমান'। 'নিঃকাপড়' (বস্ত্রহীন, উলঙ্গ) রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে নিকোবর। ভারতীয়গণ নিকোবর অর্থে বুঝিত উলঙ্গদের দেশ। জনগণনার অধিকর্ত্তা শ্রীগুপ্তের মতে আন্দামানিগণ রামায়ণে বর্ণিত তাম্রমুখ আম, মীন, মাংসভোজী দ্বীপবাসী কিরাত।

বাণিজ্যপথের পার্শ্বে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ দুইটি প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে পরিচিত ছিল। টলেমির গ্রন্থে উহাদের উল্লেখ দেখা যায়। এই অঞ্চলের মধ্যযুগীয় মানচিত্রে বরাবর ইহারা চিহ্নিত থাকিত। অঞ্চলটি ছিল বাণিজ্যপোতের পক্ষে বিপজ্জনক। ঝড়ে ও জলমগ্ন পাহাড়ের আঘাতে জাহাজডুবি হইত। জলদস্যুর উপদ্রব পোত চালনার বিপদ আরও বৃদ্ধি করিত। বিপন্ন নাবিকগণ এই সকল দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলে উৎপীড়িত ও নিহত হইত।

১৭৮৮ অব্দে বাণিজ্যপথ জলদস্যুমুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে জরিপের কার্য্যে পারদর্শী আর্চিবল্ড ব্লেয়ারের উপর আন্দামানে এক উপনিবেশ স্থাপনের ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অর্পণ করে। স্থির হইল দণ্ডিত অপরাধীদিগকে শ্রমিকরূপে তথায় প্রেরণ করা হইবে। নিজের নামানুসারে পরবর্ত্তী কালে যে বন্দরের নামকরণ হইয়াছে, ব্লেয়ার উপনিবেশের জন্য সেই স্থান নির্ব্বাচন করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভ্রাতার আগ্রহাতিশয্যে সামরিক সুবিধার অজুহাতে উত্তর দিকে কর্ণওয়ালিস বন্দরে উপনিবেশটি স্থানান্তরিত করা হয় ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। নূতন স্থানের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বহু দুঃখকষ্ট ভোগের পর ঔপনিবেশিকগণ ১৭৯৬ সনে উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। দীর্ঘকাল আন্দামান অধিকারের আর কোন চেষ্টা করা হয় নাই। জলদস্যুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামানে পুনরায় উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইল। এবারেও পোর্ট ব্লেয়ার নির্দ্ধারিত হইল উপনিবেশের স্থান। সিপাহী বিদ্রোহের পর বহু বিদ্রোহী দলত্যাগী সৈনিক এবং তাহাদের সমর্থকদিগকে লইয়া তদানীন্তন ভারত সরকারকে মহা ফাঁপরে পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৫৮ সনে ৭৭৩ জন স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক বন্দীকে আন্দামানে প্রেরণ করিয়া সাতাশী বৎসর স্থায়ী বন্দীনিবাসের পত্তন করা হইল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামান ও নিকোবর একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে স্থাপিত হয়। সেই বৎসরই বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনে আসিয়া আত-তায়ীর হস্তে নিহত হন। এই শোচনীয় ঘটনায় আন্দামানের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নব স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত বাঙালী তরুণদের বন্দীশালারূপে আধুনিককালে আন্দামান কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় ১৯৪২ সনের ২৩শে মার্চ হইতে ১৯৪৫ সনের ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর জাপানী-দের অধিকারে ছিল। প্রথম দিকে তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিত। কৃষির উন্নতিসাধন করিয়া খাদ্যের দিক হইতে আন্দামানকে প্রায় আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল। শেষের দিকে মিত্রপক্ষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহাদিগকে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করিবার সন্দেহে জাপানী সৈনিকেরা অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে থাকে। দ্বীপ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহারা সমস্ত সরকারী কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। মিত্রপক্ষের বোমা বর্ষণে আন্দামানের সরকারী করাত-কলটি ধ্বংস হইয়া যায়। আন্দামান পুনর্দখলের পর ভারত সরকার বন্দী উপনিবেশরূপে উহার ব্যবহার রহিত করিয়া দেন; সকল অপরাধী-দের দণ্ডের অবশিষ্টাংশ মকুব করা হয় এবং যাহারা ইচ্ছুক তাহা-দিগকে সরকারী ব্যয়ে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সুবিধা দান করা হয়। প্রায় ৪,২০০ লোক এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আন্দামান ত্যাগ করে।

ইউরোপীয়গণ আন্দামানকে এড়াইয়া চলিত, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী, সম্ভবতঃ তাহার পূর্ব্ব হইতেই নিকোবর ধর্মপ্রচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পর্তুগীজ, ফরাসী, মোরাভিয়ান, প্রুশিয়ান, ইটালিয়ান, অষ্ট্রিয়ান, ডেনিশ ও ইংরেজ পাদ্রিগণ নিকোবরে যীশুর বাণী প্রচারের জন্য মরণপণ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে। দুরন্ত ম্যালেরিয়া তাহাদিগকে এই সকল দ্বীপে টিকিতে দেয় নাই। এখন পর্য্যন্ত নিকোবর শ্বেতাঙ্গদের মৃত্যুশালাই রহিয়া গিয়াছে।

ক্যার নিকোবরে একটি গির্জা আছে বটে, কিন্তু তাহার যাজক দেশীয় লোক। পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর আগে উপনিবেশ স্থাপনের অভিপ্রায়ে ডেনগণ নিকোবর অধিকার করিয়াছিল। তিন বৎসরের মধ্যেই উপনিবেশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ইহার পর আসে অষ্ট্রিয়ানগণ। তিন বৎসরে তাহারাও ডেনদের দশা প্রাপ্ত হয়। অষ্ট্রিয়ানদের আগমনে ডেনগণ ক্ষুব্ধ হয় এবং ১৭৮৪ সন হইতে ১৮০৭ সন পর্য্যন্ত নানকৌড়ি পোতাশ্রয়ে ক্ষুদ্র একদল রক্ষী নিযুক্ত করে। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সময় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সাত বৎসরকাল ইংরেজের দখলে ছিল। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে উহা পুনরায় ডেনদের হস্তে অর্পণ করা হয়। ১৮৬৯ সনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ডেন সরকারের নিকট হইতে আপোষে নিকোবরের অধিকার লাভ করে। আন্দামান বন্দীনিবাসের অধীনে নানকৌড়ি পোতাশ্রয়ে একটি নূতন বন্দীনিবাস স্থাপিত হইল। ১৮৮৮ সনে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

লোক-পরিচয়—আন্দামান ও নিকোবরের লোকসংখ্যা ৩১,০০০ হাজার। পশ্চিমবঙ্গের বাঁশবেড়ে শহরের জনসংখ্যার সমান। সিউড়ি শহর ও আন্দামানের লোক একই রূপ, প্রায় ১৯,০০০। বিষ্ণুপুর থানার সোনামুখী শহরের লোক অপেক্ষা নিকোবরের লোক সংখ্যা অনেক কম। সংখ্যায় অল্প হইলেও দ্বীপপুঞ্জ দুইটির লোক কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। আন্দামানের উনিশ হাজার লোকের প্রধান ভাগ দুইটি, আদিবাসী ও আন্দামানবাসী ভারতীয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই উপ বিভাগ রহিয়াছে। এখানে এই সকল ভাগ ও উপবিভাগের পরিচয় প্রদান করা হইবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তিন সোপানের মধ্যে বর্গীকরণ অন্যতম। আন্দামানের আদিবাসীদিগকে অন্য কোন বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এরা যেন একাই এক শ্রেণী। ইহাদের উৎপত্তির ইতিহাস রহস্যাবৃত। গভীর সমুদ্র পরিবেষ্টিত দ্বীপে ইহাদের আগমন সম্ভব হইয়াছিল কিরূপে, ইহাই প্রশ্ন। আদিবাসীদের পুরাণ বা সমষ্টিগত স্মৃতির অভাবে সমস্যার জটিলতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথ্যের অভাবে কল্পনা প্রশ্রয় পায়। পণ্ডিতগণ ইহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। দৈহিক গঠন এবং সভ্যতার স্তরের দিক হইতে আন্দামানীদিগকে মালয়ের সিমাং ও ফিলিপাইনের আয়েতাদের সহিত তুলনা করা চলে। এজন্য অনেকে অনুমান করেন আদিকালে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চল জুড়িয়া বিশাল এক মনুষ্যজাতি বাস করিত। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশ বসিয়া গিয়া জলমগ্ন হইয়া পড়ে। আন্দামানীরা এই নূতন সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন পর্ব্বত-শীর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদবধি বাস করিয়া আসিতেছে। এই মতই এখন বহুজন স্বীকৃত।

আন্দামানীদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের অন্যান্য কারণও রহিয়াছে। যে সকল জাতি বাঁচিয়া আছে তন্মধ্যে নিগ্রিটো জাতিই প্রাচীনতম। আকৃতি ও আচারে আন্দামানিগণ নিগ্রিটো জাতির একমাত্র অবিমিশ্র অবশেষ। বহু সহস্র বৎসর বহির্জগতের সহিত সংস্রবশূন্য থাকিবার ফলে ইহারা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রিটিশের আগমন পর্য্যন্ত ইহাদের পরিবেশ ছিল অপরিবর্ত্তিত; জনসংখ্যায় স্বল্পতা হেতু খাদ্যাভাব ঘটে নাই, সুতরাং বাঁচিবার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল না। অভিব্যক্তির মূল কারণের অভাবে আন্দামানী সমাজে, আচারব্যবহারে এবং দৈহিক বা মানসিক ব্যাপারে ক্রমবিকাশ ঘটিতে পারে নাই। সকল দিক দিয়াই ইহারা রহিয়াছে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ। সেই সুদূর অতীতের বার্ত্তা ইহারা বহন করিয়া আনিয়াছে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আন্দামানের আদিবাসিগণ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের অভিমুখে চলিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের পরিচয় গ্রহণের অভিপ্রায়ে নৃতত্ত্ববিদ্ ও বিজ্ঞানীগণ আন্দামানে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংগৃহীত বিবরণ তুলিয়া দিবার স্থান ইহা নহে। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য জনসংখ্যার আলোচনা। আন্দামানের আদিম-অধিবাসীদের প্রধান তিনটি বিভাগ এখন দেখিতে পাওয়া যায়: উপকূলের আন্দামানী, বনাঞ্চলের জাওরা ও ক্ষুদ্র আন্দামানের ওঙ্গে। জাওয়া ও ওঙ্গেরা আন্দামানের আগন্তুকদের উপর এখনও খড়্গহস্ত; সুবিধা পাইলেই আক্রমণ করিয়া থাকে এবং প্রতি-আক্রমণে তাহারা বন্দী হয় অথবা জীবন হারায়। সুতরাং ইহাদিগকে গণনা করা সম্ভব নয়, দূর হইতে দেখিয়া ইহাদের সংখ্যা অনুমান করা হইয়াছে মাত্র। জনগণনার অধিকর্ত্তার অনুমান অনুসারে বৃহৎ আন্দামানের উপকূলবাসীদের বর্ত্তমান সংখ্যা মাত্র ২৩ জন; ইহারাই সভ্যতার দানগ্রহণকারী মিত্র আদিবাসী। শতবর্ষ পূর্ব্বে বন্দীনিবাস স্থাপনের সময় ইহাদের সংখ্যা চার-পাঁচ হাজার বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। জাওয়াদের সংখ্যা ধরা হইয়াছে ৫০ জন এবং ওঙ্গেদের সংখ্যা ১৫০ জন। এই হিসাবে আদিবাসীদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২২৩ জন। এই অনুমান যে ঠিক নহে তাহা তিনি নিজেই পাদটীকায় স্বীকার করিয়াছেন। ১৯২৩ সনে ডাঃ সিপ্রিয়ানি ক্ষুদ্র আন্দামানের ওঙ্গেদের মধ্যে তিন মাস বাস করিয়াছিলেন। তিনি চারি শতের অধিক ওঙ্গে গণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ওঙ্গেদের মোট সংখ্যা পাঁচ-ছয় শতের মধ্যে। ১৯৫২ ৫৩ সনের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে আদিবাসীদের বর্ত্তমান সংখ্যা ২২৩ জন নহে, প্রায় ১০০০। তথাপি ইহাদের দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুতার প্রমাণ থাকিয়াই যায়। ১৮৫৮ সনের ৬,০০০, ১৯৫৩ সনে ১০০০-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯৫১ সনের জনগণনায় আদিবাসী ছাড়া অপরদের নামকরণ হইয়াছে 'আন্দামানবাসী ভারতীয়'। পরস্পরের মধ্যে বিভেদ লোপ করিবার উদ্দেশ্যে এই নূতন নামকরণ। আন্দামানবাসী ভারতীয়দের সামাজিক অবস্থা বুঝিবার জন্য আমরা এখানে তাহাদের উপ-বিভাগের আলোচনা করিব।

আন্দামানজাত—আন্দামানের বন্দীনিবাসে নারী কয়েদীও প্রেরিত হইত। ১৯০৫-৬ সনে ১৩,৯৮১ জন ছিল পুরুষ, এবং ৭১৫ জন ছিল নারী কয়েদী। বন্দীনিবাসের নিয়ম অনুসারে দণ্ডভোগের পর 'স্বাবলম্বী' হইলে পুরুষ কয়েদীগণ চীফ কমিশনারের

অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে পারিত। সধবা কয়েদীদিগকে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইত না। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি স্বীকার করা হইত। কেবলমাত্র স্বজাতির মধ্যেই বিবাহের নিয়ম ছিল। বিবাহে হিন্দুপ্রথা অনুসৃত হইত এবং চীফ কমিশনারের দপ্তরে উহা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদের বিবাহে অসুবিধা ছিল না। এরূপ বিবাহের সন্তান সন্ততি local born বা আন্দামানজাত বলিয়া পরিচিত। গুরু অপরাধে দণ্ডিত পিতামাতার সন্তানের চরিত্র কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে পঞ্চাশ বৎসরের ব্যবধানে যে দুইটি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সারাংশ এখানে দেওয়া যাইতেছে। ১৯০১ সনের জনগণনার অধিকর্ত্তা লিখিয়াছেন, "শৈশবে ইহারা দীপ্তিমান্, মেধাবী ও সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান্ থাকে। তরুণ বয়সে ইহারা অস্বাভাবিক উগ্রতা বা পরস্ব-অপহরণ-প্রবণতার পরিচয় দেয় না। কিন্তু সাধারণ নীতিজ্ঞান যে অতি নিম্ন স্তরের তাহা সুস্পষ্ট। মেয়েরা অতি অল্প বয়সেও প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকে। আন্দামানের প্রকৃত বাসিন্দা বলিয়া একটা উদ্ধত অভিমান, মানসিক ক্ষিপ্রতা, কিন্তু কর্ম্মে আলস্য, কায়িক শ্রমে অনিচ্ছা এবং বয়োবৃদ্ধ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি অসম্মানের ভাব তাহাদের আচরণে প্রকাশ পায়।"

"বংশগতির প্রভাব উগ্রতায় নহে, হীনতায় প্রকাশিত হয়। বয়স্কগণ কলহ ও মোকদ্দমাপ্রিয়। তাহারা যত পারে ধার করে; জমি হইতে যত শস্য উৎপাদন করা সম্ভব তাহা করে না; প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধনের চেষ্টায় বহু সময় ব্যয় করিয়া থাকে। এই বর্ণনা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অনেকে ন্যায়বুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, শ্রমশীলতা এবং আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়াছে। মোটের উপর যতটা আশঙ্কা করা গিয়াছিল, ইহারা তদপেক্ষা ভাল। সরকারের উপর নির্ভর করিবার ঝোঁক এই সম্প্রদায়ের বড় বেশী।"

১৯৫১ সনের গণনা-পরিচালক বলেন: "আন্দামানের জনসমষ্টির প্রধান অংশই হইতেছে 'আন্দামানজাত' জনগণ। উনিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই প্রায় দশ হাজার। ইহাদের ধারণা যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃত মালিক এরা, অন্যান্য আগন্তুকেরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। ইহা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে একটা হীনতাবোধ সদাজাগ্রত। মোটামুটি ধরিলে ভারতের সমপর্য্যায়ের লোকের অপেক্ষা ইহাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল।

"কর্তৃপক্ষ ও রাজবিধির প্রতি শ্রদ্ধা ইহাদের চরিত্রের লক্ষণীয় উপাদান। ইহাদের বাসস্থানের আশপাশে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই। 'আন্দামানজাত'দের দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, বংশগতির সহিত অপরাধের কোন সম্পর্ক নাই। অপরাধ প্রবণতা জন্মগত নহে, অবস্থাগত।

"ভারতীয় জাতিগঠনের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ এক পরীক্ষা এই 'আন্দামানজাত'দের মধ্যে চলিতেছে। ইহারা জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও প্রাদেশিক বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে অবাধ বিবাহ ভেদবুদ্ধি লোপ করিয়া ঐক্য স্থাপন করিতেছে। এই ঐক্য সাধনের সহায়ক হিন্দুস্থানী ভাষা সকলেরই ভাবের বাহন। ধর্ম্ম ইহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজ ও বৈষয়িক ব্যাপারে ধর্ম্মের স্থান নাই। এই মিশ্রণের ফলে একটি কৌতূহলোদ্দীপক, ক্ষিপ্র ও বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন এক নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।"

উদ্বাস্তু—১৯৪৫ সনে আন্দামান পুনর্দখলের পর কয়েদীদিগকে মুক্তিদান ও ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনেচ্ছুকদিগকে সরকারী ব্যয়ে পৌঁছাইয়া দিবার সুবিধা দান করা হয়। প্রায় ৪০০০ লোক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের এই সুযোগ গ্রহণ করে। ইহার ফলে কম বেশী ৩০০০ একর জমি পতিত পড়িয়া রহিল। ভারতে যখন খাদ্যাভাব তখনও আন্দামানের জনগণ খাদ্যের জন্য ভারতের মুখাপেক্ষী। 'অধিক খাদ্য ফলাও' ধ্বনি তোলা হইল বটে কিন্তু লোক নাই, খাদ্য ফলাইবে কে? চাষীর অভাব পূরণের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী চাষীদিগকে আন্দামানে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইল।

বাঙালী উদ্বাস্তুর প্রথম দল আন্দামানে প্রেরিত হয় ১৯৪৯ সনে। এই দলে ছিল ১৭১টি পরিবার। ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রতি পরিবার এক জোড়া মহিষ, একটি দুগ্ধবতী গাভী, চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ ও নগদে মোট ২,৩৩৩ টাকা পায়। এই দলে সাতটি ছুতার পরিবারও ছিল। পরের বছর আসে ৪১টি চাষী পরিবার। ছয় বৎসরে পরিশোধের কড়ারে এই দলের প্রত্যেক পরিবার ঋণ পাইয়াছিল ২,০০০ টাকা। উভয় দলের প্রতি পরিবারকে ৫ একর নিম্ন ভূমি এবং ৫ একর পাহাড়ের ঢালের জমি দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫১ সনের জানুয়ারীতে আসিয়াছে ৩৪টি শ্রমজীবী এবং ৪৭টি কারিগর ও ব্যবসায়ী পরিবার। ইহাদের সাহায্যের সর্ত্ত ও পরিমাণ ১৯৫০ সনের অনুরূপ। এই দলের কয়েকজন ম্যাট্রিক যুবক সাধারণ মজদুরের কাজ করিতেছে। ১৯৫১ সনের ফেব্রুয়ারীতে উদ্বাস্তুদের সর্ব্ব মোট সংখ্যা ছিল ১,৫০০। দক্ষিণ আন্দামানের পতিত জমিতে চাষবাসের জন্য ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ হইতে ১,৮৬১ জন উদ্বাস্তু আনয়ন করা হইয়াছিল। উহাদের ৩৩৪ জন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। যাহারা রহিয়াছে তাহাদের কার্য্যকলাপ বিশেষ সন্তোষজনক বলা যায় না। 'হতাশা ও পরাজয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে; দীর্ঘকাল সরকারের দানে প্রতিপালিত হইবার ফলে আলস্য ও জড়তা বাসা বাঁধিয়াছে তাহাদের দেহে। দান পাইয়া সরকারী দানের উপর দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মনে হয়। অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এ কথা অবশ্য সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সাধারণ ব্যবহার সরকারী নীতি পরিবর্তনের

কারণ হইয়াছে। আন্দামানের শ্রমিক ও অন্ন সমস্যা দূর করিবার জন্ত শ্রমিক ও কৃষকের প্রয়োজন। বাঙালী উদ্বাস্তু দ্বারা এই অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ হইতেছে। মধ্য ও উত্তর আন্দামানের ২০,০০০ একর ভূমি অরণ্যমুক্ত করিয়া ৪০০০ পরিবার বা ২০,০০০ লোক বসতির ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই বসতি বাঙালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে অর্দ্ধেক লোক নেওয়া হইবে। বাঙালী উদ্বাস্তু প্রেরণের সময় তাহাদের কর্ম্ম ক্ষমতার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বর্ত্তমান সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ৫৭৫টি পরিবার আন্দামানে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে আছে ৪০০ খ্রীষ্টান কারেন। শ্রমিক-রূপে আসিয়া তাহারা এখন উন্নতিশীল কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। তাহারা সরকারের সাহায্যে নিরপেক্ষ সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারা এখন ভারতীয় নাগরিক।

আন্দামানের উন্নয়নে বর্মীদের দান প্রচুর। ইহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক। ৯৭০ জন বর্মী ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করিবে না, আন্দামান ছাড়িতেও অনিচ্ছুক।

ইহা ছাড়া আছে মালাবারের মোপলা সম্প্রদায়। মোপলা বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট লোক, তাহাদের সন্তান এবং স্বেচ্ছায় আগত মোপলাদের লইয়া বেশ এক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। নবাগত-দের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বাড়িতেছিল যে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ নিবারণের উদ্দেশ্যে মোপলাদের আন্দামানে আসিবার অনুমতি প্রদানে কড়াকড়ি করিতে হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু ভাষার সারণিতে দেখা যায় মালয়ালম ভাষী পুরুষ ১,৭০৩ এবং নারী ১,১১২। নারী ও পুরুষের হারে প্রভেদ অল্প। স্থায়ী বাসিন্দার মধ্যেই এরূপ হইয়া থাকে। মনে হয়, ইহারাই মোপলা এবং ইহাদের সংখ্যা ২,৮১৫।

এই হিসাবের বাহিরে যাহারা আছে তাহারা চলার পথের অতিথি। কাজের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহারা আন্দামান ত্যাগ করিবে। শ্রমিকেরা আন্দামানে আসে এক বৎসরের চুক্তিতে। বনের শিবিরসমূহের মোট লোক সংখ্যা ২,৫৫২। ডক ও করাত-কলে অনেকে কাজ করিয়া থাকে। উরাঁও এবং তামিল ভাষী শ্রমিকের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক মনে হয়। উরাঁও ভাষী পুরুষ ১,০২৪ ও নারী ৪১; তামিল ভাষী পুরুষ ১,১৭৩; নারী ৪০১।

নিকোবরী—নিকোবরের অধিবাসী ও আন্দামানের আদিবাসী যে এক জাতীয় নহে তাহা উহাদের আকৃতি, গঠন, বর্ণ ও মানসিক শক্তির তারতম্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। আবলুসের মত কাল আন্দামানীরা নাকি পৃথিবীর কৃষ্ণতম মানুষ। নিকোবরীদের বর্ণ পীতাভ বা লালচে পাটল। আন্দামানী খর্ব্ব, ৫ ফুটের কম উচ্চ; নিকোবরীর গড় উচ্চতা ৫ ফুটের বেশী। আন্দামানীর গড় ওজন এক মণ পাঁচ সের, নিকোবরীর ওজন দেড় মণের অধিক। নিকো-বরীদের নাক চেপটা, চক্ষু বাঁকা, মুখ বড়। পণ্ডিতদের মতে নিকোবরীগণ বর্মী ও মালয়ীদের সগোত্র। কিন্তু নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জে ইহাদের আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। উনিশটি দ্বীপের মধ্যে বারটিতে লোকের বসতি আছে। সকল দ্বীপের নিকোবরীই এক খণ্ডজাতির অন্তর্ভুক্ত। পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা স্থানিক, বংশগত নহে। বৃহৎ নিকোবরের সোম পেনগণ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আদি নিকোবরীর নিদর্শন। ইহাদের মালয়ী আকৃতি সুস্পষ্ট। নারীগণ বল্কল এবং পুরুষেরা অন্যান্য নিকোবরীদের মত কটিবাস পরিধান করিয়া থাকে। সকল নিকোবরীদের কটিবস্ত্রের পশ্চাতে একটি লেজ পরিবার রীতি আছে।

আন্দামানীগণ ক্ষীয়মাণ, নিকোবরীগণ বৃদ্ধিশীল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এক শত বৎসরে আন্দামানীদের সংখ্যা ৬০০০ হইতে ১০০০-এ নামিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে পঞ্চাশ বৎসরে নিকোবরীদের সংখ্যা হইয়াছে প্রায় দ্বিগুণ। নিকোবরে ১৯৪১ সনে বিদেশী ছিল ২০০; ১৯৫১ সনে বিদেশীর সংখ্যা এক শতের অধিক নহে। নিকোবর রহিয়াছে নিকোবরীদেরই দেশ কিন্তু আন্দামান এখন বিদেশীদের উপনিবেশ। আন্দামানের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি কৃত্রিম, বহিরাগত-সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। নিকোবরে লোকের হ্রাসবৃদ্ধি জীব-বিদ্যার স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। নারীদিগকে দেশে রাখিয়া বহু পুরুষ অর্থোপার্জ্জনের জন্য আন্দামানে আসিয়া থাকে। সুতরাং আন্দামানে পুরুষ ১২,৭৩৪ এবং নারী মাত্র ৬,২২৮, পুরুষের অর্দ্ধেকের কম। নিকোবরে নারী ও পুরুষের সংখ্যার মধ্যে প্রভেদ অল্প; পুরুষ ৬,৩২১, নারী ৫,৮৮৮। শিল্প-শহর বার্ণপুরে পুরুষের হাজার প্রতি নারী ৫২৬, আন্দামানে নারীর হার ৫৩৭। উত্তর প্রদেশের প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৯১০, নিকোবরে ৯০০। বিদেশী পুরুষের বাহুল্য নিকোবরে নাই, নারীর হারে তাহাই সূচিত হইতেছে।

জনবিন্যাস—দক্ষিণ আন্দামানের ৫০-৬০ বর্গমাইল স্থানে, বন্দিনিবাস অঞ্চলে, ১০,০০০ লোকের বাস। অন্যান্য দ্বীপ জনহীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বন্দিবাসের ৫,০০০ একর কৃষিভূমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে। এখানে বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ২৮০, আসামের আড়াই গুণ, উড়িষ্যার ঘনতা হইতে কিছু বেশী।

নিকোবরের বিভিন্ন দ্বীপেও বসতির ঘনতার তারতম্য বিস্তর। ঊনচল্লিশ বর্গমাইল কার নিকোবরের লোকসংখ্যা ৮,৩৭৪। চৌরা দ্বীপের আয়তন মাত্র তিন বর্গমাইল। সেখানে লোক ১,০৭৬ সুতরাং ঘনতা ৩৫৮.৭। এই দুই দ্বীপের ৪২ বর্গমাইল স্থানে নিকোবরের তিন চতুর্থাংশের অধিক লোকের বাস। পক্ষান্তরে ৩৩৩ বর্গমাইল বিস্তৃত বৃহৎ নিকোবরের লোকসংখ্যা মাত্র ১৮১।

নিকোবরীদের বিভিন্ন দ্বীপে ছড়াইয়া পড়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পুরাতন স্থান ত্যাগের স্বাভাবিক অনিচ্ছা ছাড়াও

আর একটি বাধা আছে। নারিকেল ও অন্যান্য ফলমূল ইহাদের প্রধান খাদ্য। যতকাল নারিকেল গাছে ফল না ধরে নূতন স্থানে তাহাদের বাঁচিবার উপায় থাকিবে না। এজন্যই ইহারা কার-নিকোবর ও চৌরার পুরাতন নারিকেল বাগান আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহে।

কৃষি—আন্দামানে ৮,০৫৪ একর জমিতে চাষ চলিতেছে। প্রধান শস্য ধান, উৎপাদন প্রতি একরে ১৫ হইতে ২০ মণ। গম চাষের পরীক্ষা চলিতেছে কিন্তু সুফলের আশা কম। গোল আলু উৎপাদনের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইয়াছে। আখ খুব ভাল জন্মে। বাঙালী উদ্বাস্তুগণ ভাল ডাল ও লঙ্কা উৎপন্ন করিতেছে। ভারতীয় সকল সব্জীই এখানে জন্মিয়া থাকে। জাপানী অধিকারের সময় তাহারা টেপিয়োকা, মিঠা আলু ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করিত। পাহাড়ের গায়ে থাক কাটিয়া সিকিমীদের মত ধান উৎপাদনের সফল প্রয়াসের পরিচয় কোন কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। বৃষ্টিপাত যখন কম থাকে জলসেচ সমস্যা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীর রক্ষা করিয়া সমুদ্রের লোনা জল বাধা দেওয়া সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে অসংস্কৃত দেওয়ালের ফাটল দিয়া সমুদ্রের জল প্রবেশ করিবার ফলে ৫০০ একর জমি চাষের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। নারিকেল বৃক্ষ আছে প্রায় চার হাজার একর ভূমির উপর। রবার বৃক্ষ ৪৩০ একর, কাজু বাদাম ১১৬ একর, কফি ৩৭ একর এবং ম্যান্ডোরীন ৮ একর জমিতে আছে।

আন্দামানে শতকরা ২৪ জন কৃষিজীবী। নিকোবরে উদ্যান-পালক (planter) আছে, কৃষিজীবী নাই। নারিকেল ও সুপারি-বাগান নিকোবরীদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। আন্দামান খাদ্যশস্যে এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, ভারতের মূল ভূখণ্ড হইতে অর্দ্ধেক শস্য আমদানী করিতে হয়।

আন্দামানে ভূমির মালিক গবর্ণমেণ্ট। কৃষকগণ সরকারের নিকট হইতে জমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পত্তন নিয়া থাকে। অন্যান্য মজুরের মত এখানে ক্ষেত-মজুরের বিশেষ অভাব।

বিবিধ তথ্য—আন্দামানে ক্ষুদ্রায়তন, বৃহদায়তন শিল্প বা কুটীর-শিল্প নাই বলিলেই চলে। শিল্পকর্ম্মী হিসাবে যাহাদিগকে দেখান হইয়াছে তাহারা করাতী, ছুতার, খরাদী (turner) প্রভৃতি কাঠের কারিগর। কাঠের প্রাচুর্য্য হেতু আন্দামানের ভাল বাড়ি কাঠের তৈরি। সুতরাং কাঠের কারিগর বেশী থাকাই স্বাভাবিক। ধাতু-শিল্পিগণ হয় সেকরা, লোহার, টিনের ঝালাইকর অথবা সরকারী জাহাজ মেরামত কারখানার কারিগর। দুই-চার জন তাঁতী, দর্জ্জি, নারিকেল তৈল ও ঘি-মাখন প্রস্তুতকারক আছে। কাতা, দড়ি, বেত ও বাঁশের দ্রব্যাদিও হয়। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোং পোর্ট ব্লেয়ারে কাঠের পাত তৈরি করিয়া থাকে।

জনগণনার পরিভাষায় নিকোবরের শিল্পশালা তথাকার সুপারি-বাগ আর নারিকেলবাগান। বহু শিশু এবং প্রায় সকল নারীই পিতা ও স্বামীর সহিত এই সকল বাগানের কাজে নিযুক্ত থাকে।

খুচরা দোকানীরাই আন্দামানের বাণিজ্যের কোঠায় পড়িয়াছে। এখানে ব্যাঙ্ক বা বীমা-ব্যবসায় নাই। নিকোবরে নারিকেল ও সুপারির বিনিময়ে বিদেশীদের সহিত কারবার চলে।

আন্দামানের অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশের অধিক লোক সরকারের বনবিভাগে, করাত কলে, ডকে ও সরকারী দপ্তরখানায় কর্ম্মে রত আছে। আন্দামানে বেকার নাই।

পোর্ট ব্লেয়ারই এই রাজ্যের একমাত্র শহর, লোকসংখ্যা ৮,০১৪। বিজলি বাতি, কলের জল, পিচের রাস্তা ও ট্যাক্সির ব্যবস্থা থাকিলেও উহা পল্লীবেশমুক্ত হয় নাই। কলিকাতা হইতে পোর্ট ব্লেয়ার ৭৮০ মাইল দূরে অবস্থিত; কলিকাতা হইতে দিল্লীর দূরত্ব আরও বেশী।

আন্দামানে উচ্চ বিদ্যালয় একটি, মধ্যবিদ্যালয় দুইটি, প্রাথমিক বিদ্যালয় উনিশটি ও বুনিয়াদি বিদ্যালয় পাঁচটি আছে।

১৯৫৪-৫৫ সনে আন্দামান ও নিকোবরের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় এবং ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

গঙ্গার উপরে সেতু [ফোটো : লেখক
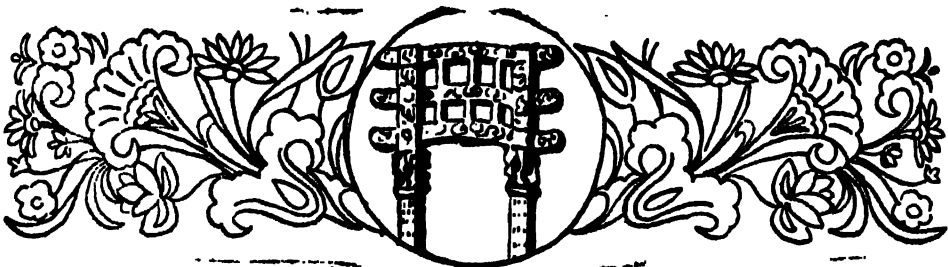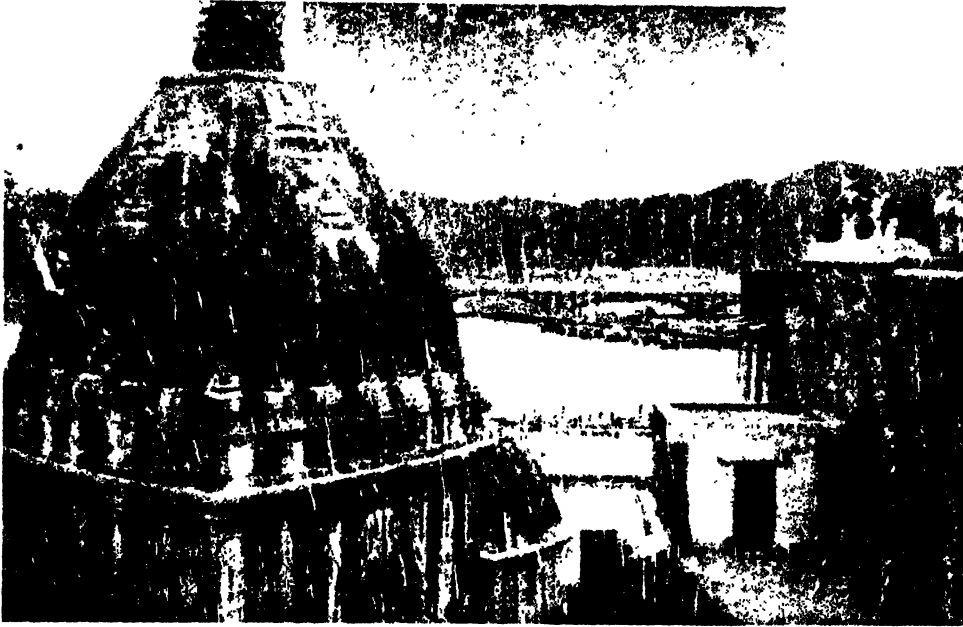
"যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ"

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আকাশবাণীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান শোনার আশায় কাঁটা ঘোরাচ্ছি, হঠাৎ অগুন্তি লোকের কলরবে যেন বেতার যন্ত্রটি ফেটে পড়বার মত অবস্থা। ব্যাপার কি! আস্তে আস্তে সমস্ত গোলমাল পেছনে রেখে প্রশ্ন শুনতে পেলাম, "সাধুজী, কুম্ভ-স্নানের মাহাত্ম্য কি?" উত্তর শুনলাম, "মোক্ষলাভ হয়।" অর্থাৎ, আর ফিরে আসতে হবে না এই পৃথিবীতে—। জড়িয়ে পড়তে হবে না পাপে-তাপে; দুঃখ পাবে না প্রতিদিনকার দারিদ্র্যের কশাঘাতে, শোকে দগ্ধ হতে হবে না পরম প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায়। কিন্তু কবি বলেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" মানুষ মোক্ষ চাইবে, কিন্তু সেই মোক্ষ চিত্তশুদ্ধির।

এবারে হরিদ্বারে ছিল অর্দ্ধকুম্ভ। প্রায় লাখ পাঁচেক লোক মহাবিষুব সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে হর কি পৈড়ীর ঘাটে স্নান করে দেহমন শীতল করবার চেষ্টা করেছে। অন্যান্য বারের অনুপাত হিসেবে আশা ছিল প্রায় তের কি চৌদ্দ লাখ লোক আসবে স্নান করতে। কাজেই আশানুরূপ লোক হয় নি বলতে হবে। এর কারণ হিসেবে কেউ কোন বিশিষ্ট মত খাড়া না করলেও প্রয়াগের গতবারের ভয়াবহ দুর্ঘটনা লোককে কিছু পরিমাণে পেছন টেনেছে বলে মনে হয়। তবে কর্তৃপক্ষ এবার যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

স্নানের ঘাট হিসেবে হর কি পৈড়ী ঘাট খুবই মনোরম। তবে একসঙ্গে অনেক লোক যেমন ওখানে স্নান করতে পারে না, তেমনি ঘাটে আসবার রাস্তা সঙ্কীর্ণ বলে, ভিড়ের চাপে যে-কোন সময় বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা বর্তমান। কিন্তু সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে এ অসুবিধা দূর করতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষের। প্রয়াগের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে এবারকার যোগাযোগ-ব্যবস্থায় কোন ফাঁক রাখবার ঝুঁকি নিতে পারেন নি কর্তৃপক্ষ। কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে যে ব্যবস্থা হয়েছিল তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। লোকজনের যাতায়াত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটে আলাদা পুল তৈরী হয়েছিল গঙ্গার উপর। কোথাও ভিড় জমতে দেওয়া হয় নি কোন সময়ে। তা ছাড়া অল্প দূরে দূরে মাইকের ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিল যাত্রীদের খবরাখবর। প্রায় চল্লিশখানা বিশেষ ট্রেন কিছু সময় অন্তর অন্তর হরিদ্বারের ষ্টেশন কাঁপিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ফিরতি পথের লোককে নিয়ে ছুটোছুটি করছিল; এদের সময়-সঙ্কেতও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল মাইকের মারফত। ঘাটে ওস্তাদ সাঁতারুর ব্যবস্থা করে যাত্রীদের হঠাৎ ডুবে মরার সম্ভাবনাকে বাতিল করেছে। মোট কথা, কোন উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনাবিহীন এরূপ সুচারু ব্যবস্থা লোকের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনবে সন্দেহ নেই।

যেখানে এত লোকের সমাগম সেখানে মহামারী যেন ওৎ পেতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। তাই যেমন স্নান-ঘাটের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি পথ-ঘাট, পান-ভোজন এবং সবার উপর যাত্রী-সাধারণের স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়ে সর্ব্বতোমুখী শুচিতার প্রতি নিষ্ঠাও বজায় রাখা দরকার পুরামাত্রায়। কেননা ব্যবস্থা যতই নিখুঁত হোক না কেন জনসাধারণ তা মানতে না চাইলে বা আমাদের মধ্যে কাজ করছে—সেটি এই যে, আমাদের নাগরিক চেতনা খুব কম। আমার অবহেলার জন্য আর দশ বা হাজার লোকের ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি সচেতন নই! এ বিষয়ে দায়িত্ববোধ বাড়লে যে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ সহজ ভাবে রক্ষিত হতে পারে তাই নয়, তা ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের দিক থেকে গাফিলতি করবার সাহসই থাকে না যদি আমরা সচেতন হই!

পথের ধারে সাপুড়ে ফোটো: লেখক

এ সব বাদ দিয়েও এবারকার হরিদ্বারের ব্যবস্থা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পোকা-মাছির অভাব, রাস্তার পরিচ্ছন্নতা, দেহমনের শুচিতা রক্ষা করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের আপিসটিতে এই নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। কর্ম্মসচিবগণ শহর ও স্নানঘাটের ব্যবস্থা পরিদর্শন করে এসেছেন দপ্তরে। কোথাও কিছু নেই, কোথা থেকে হঠাৎ একটা মাছি উপপ্রধানের টেবিলের উপর বন বন করে ঘুরে পাক খেতে লাগল।

বাধার সৃষ্টি করলে বিধিব্যবস্থা আর নিষেধের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পুণ্যলোভাতুর মানুষের গাফিলতি অনেকখানি। থুতুফেলা নাকঝাড়ার কথা ছেড়েই দিলাম; বসন্তের টিকা এবং কলেরার সুই বা প্রতিষেধক হিসেবে খুবই জরুরি তা এড়িয়ে চলতে মানুষের চেষ্টার অবধি নেই। কাগজে কাগজে এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও নামকাওয়াস্তে একটা ডাক্তারী দলিল সংগ্রহ করার চেষ্টা থাকে, কেউ বা অনুরোধ জানায় যার সত্যিকারের দলিল আছে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওটি হস্তগত করবার। অর্থাৎ, নিজের কিংবা আর যার যাই ঘটুক না কেন যাওয়া চাই-ই। তবে এবারে হরিদ্বারে ঢোকবার সবগুলি পথে দু'জায়গায় বিশেষ কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকার ফলে এমনি অপব্যবহার একেবারে নির্ম্মূল না করতে পারলেও অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অশিক্ষা ও কুসংস্কার এর জন্য অনেকাংশে দায়ী একথা সত্য, কিন্তু এর উপর আর একটি মনোভাব খুব গোপনে

অধস্তন কর্ম্মচারীরা একটু শঙ্কিত হ'ল বৈকি। কি সর্ব্বনাশ, একেবারে থানার মধ্যেই চোর! কয়েক সেকেণ্ড মাত্র! মাছিটা দু' চার পাক ঘুরে অবশ দেহে পড়ে মরল টেবিলের উপর। উপপ্রধান এবার পরিহাস করে বললেন, "ওহে ছেলের দল, দেখেছ তোমরা যে মক্ষিকাকুল নিধনযজ্ঞে ব্রতী হয়েছ তারই প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমাদের দপ্তরে এসে হাজির হয়েছিল, কিন্তু

ভীমগদার একাংশ [ফোটো: লেখক

পথিমধ্যে ওর দেহে যে বিষের আঘাত লেগেছিল তাতে আর ও নিজেকে সামলাতে পারল না।"

আর একটি বিশেষ উদ্যোগ এবারকার মেলার আকর্ষণ বাড়িয়ে ছিল, তা কৃষি-প্রদর্শনী। নানা রকমের ছবি ও সহজবোধ্য কথায় গরু, মোষ প্রভৃতি বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রজনন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আজ আমরা জাতীয় উদ্যোগ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্য্যায়ে। সাফল্যের জন্য চাই সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা—তা সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয় হোক। যেখানে লাখ লাখ লোক নিজের তাগিদে জড়ো হয় সেখানে এই সুযোগে এমনিধারা সকলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় ও ভাবে বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা একান্ত কাম্য।

এ ছাড়া রথদেখা কলাবেচার সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয়। সাধুবেশে ভিখিরী, পথের ধারে সাপুড়ে, পথে পথে, আনাচে কানাচে খেলনা খাবার এবং আরও কত দরকারী অদরকারী জিনিষের দোকান। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রশ্ন বড় নয়! কত মা এসেছেন মাসীর কোলে ছেলে রেখে, দাদু-দিদিমণিরা এসেছে কত নাতি-নাতনীর আবদার-ভারী মুখকে পেছনে ফেলে, তা ছাড়া আরও কত চোখের জল, মিনতি কিবতি পথে মনকে উদ্বেল করছে! কোন পুণ্যই সার্থক হবে না যদি ফিরে গিয়ে বাকস-পেটরা খুলে সবাইকে খুশী করতে না পারা যায়। যদিও বিদেশী মাল আর চটকদার খেলনায় বাজার ছেয়ে আছে তথাপি কিছু কিছু দিশী মাল যে বেচাকেনা হয় না তা নয়। এটুকু সহায়তা না পেলে দেশী শিল্প যে একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যাবে!

সাধুর শোভাযাত্রা; অদূরে গঙ্গার ঘাট

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে মত ও আখ্যায়িকা অনেক প্রচলিত। কারুর মতে সমুদ্রমন্থনে অমৃতকুম্ভ নিয়ে দেবাসুরে লড়াই হয় বার দিন ধরে, সে সময়ে যে চার জায়গায় (হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী) অমৃত কুম্ভ রক্ষা করা হয়েছিল সেখানে সে তিথি উপস্থিত হলে কুম্ভমেলা হয়। কেউ কেউ বলেন, রামানন্দজী নামে এক প্রভূত প্রভাবশালী সাধুর নেতৃত্বে শিষ্য সম্প্রদায় ন্যূনাধিক তিন বছর পর পর যে ক্রম পর্য্যায়ে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী ভ্রমণ করে ধর্ম্মপ্রচার ও বিপক্ষ দলন করতেন সে ক্রমানুসারেই কুম্ভমেলার প্রবর্ত্তন। মতান্তরে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িককালে এর উৎপত্তি এমনি ধারণা আছে। (এর প্রবর্ত্তনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য ১৩৬০ সাল মাঘ মাসের প্রবাসীতে কুম্ভমেলা শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

মুখ্যতঃ পুণ্যলাভের আশায় লাখ লাখ লোকের সমাগমে কর্ত্তৃপক্ষের উপর সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কঠিন দায়িত্ব এনে দেয়। কিন্তু বিচার করে দেখলে এ-সব অনুষ্ঠানের একটা জাতীয় স্বার্থের দিক আছে যাকে জাগিয়ে তুলতে কোন প্রচেষ্টাই নগণ্য নয়। এই যে অগণিত লোক একে অপরের গা ঘেঁষে স্নান করছে, কেউ কাউকে চিনছে না, কিন্তু তবুও একান্ত অজ্ঞাতে মনে করিয়ে দিচ্ছে এরা, আমি, সবাই একই দেশের অধিবাসী—এই যে বিচিত্র চেহারা, বিভিন্ন ভাষাভাষী এরা আর আমি সকলেই ভারতবাসী। জাতীয় ঐক্যবোধ সম্পর্কে যে সন্দেহ, যে বিরোধ আজ আমাদের অনেকের মধ্যে জেগে উঠেছে তাতে এমনি জনসমাবেশ আমাদের মনের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক করতে অনেকাংশে সহায়ক বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে।

অঙ্গার

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

নিউ মার্কেটের ঠিক সামনে "পল এণ্ড সন্স" কেমিস্ট এণ্ড ড্রাগিস্টের দোকানে, পাশের সিঁড়ির গায়ে ছোট একটা পিতলের সাইনবোর্ড—ডাঃ এ. এ. এ্যরন্—খানিন। কিছু দিন আগেও এ সাইনবোর্ডটা ছিল না। ডাঃ এ্যরন্ যে বাঙালী একথা অনেকেই জানত না। যারা জানত তারা আজ কেউ বেঁচে নেই বললেই চলে; একজন ছাড়া—তার নাম এ. আঢ্য। অরূপরতন আঢ্যের বয়স সত্তর পার হয়ে গেছে। তিনি রিটায়ার্ড ইঞ্জিনীয়র। খুব বৃদ্ধ বটে কিন্তু জরাগ্রস্ত নন। লম্বা চেহারায় বাঁক ধরে নি, কিন্তু মুখে লম্বা চুরুট। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সঙ্গে মানানসই গোঁফ। চুরুটের ধোঁয়ায় শুধু যে সেগুলোই তামাটে তা নয়, হাসলে দাঁতও তামাটে দেখায়। মাথার চুল একেবারে ছোট করে ছাঁটা, কেবল কপাল আর তালুর ওপরের চুল একটু বড়। সিঁথে দু ফাঁক টেরী আঁচড়ানো চলে। পরণে ধুতি, গলাবন্ধ সাদা কোট, হাতে মোটা বেতের লাঠি, পায়ে মোজা ও এলবার্ট জুতো।

রোজ আসেন ডাঃ এ্যরনের বাড়ী সকাল-সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে। ডাঃ এ্যরন আরও কিছু বেশী বয়সের হবেন। তাম্রাভ রুক্ষকে ইউরেশিয়ান রং, স্থূলকায় এবং টাগা গোঁফ-দাড়ি। পরনে দামী স্যুট, খুব উচ্চ অঙ্গের আভিজাত্যপূর্ণ। চোখে দামী ফ্রেমের চশমা আঁটা। মাথা-জোড়া চকচকে টাক।

ডাঃ এ্যরন নড়তে পারেন না, বলাই ভাল। চাকা-লাগান চেয়ার যথেচ্ছ চালিয়ে নিয়ে বেড়ান। তবে হাঁটতে চাইলে হাঁটতে পারেন। অত্যধিক স্থূলতার জন্য নড়তে চান না।

একমাত্র অরূপ আঢ্যই জানতেন এ, এ, মানে একনাথ আইচ। এ্যরন নামটি কোথা থেকে পেলেন সেই কাহিনী বলার জন্যই এই ভূমিকা।

অরূপ আর একনাথ উভয়েই 'এ' মার্কা 'এ' ক্লাস ছাত্র। কলকাতা পাশে চন্দননগরে মানুষ। ফরাসী, ইংরেজী, সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য। পরবর্তীকালে অরূপ পড়ে ইঞ্জিনীয়ারিং আর একনাথ ডাক্তারি। দু'জনেই এজন্য ফরাসী জাহাজে প্যারিস যায়।

তার পর অরূপ দেশে চাকরি পেয়ে ফিরে আসেন। আর একনাথ হঠাৎ প্যারিস থেকে অন্তর্হিত হয়ে বার্লিনে গিয়ে পাকাপাকি বসবাস সুরু করেন। কারণ এক জার্মান ইহুদী তরুণীর প্রণয়ভিক্ষায় সাফল্য; ফলে বিবাহ এবং বার্লিনের বুকে বসে জীবিকা উপার্জন। প্রথম জীবনের সেই সাহেব-সাহেব খেলায় প্রমত্ত যুবক নতুন নাম নেন—এ, এ, এ্যরন। কারণ স্ত্রীর নাম ছিল রুথ এ্যরন।

এখন যখনই দুই বন্ধু একত্রিত হন, বেশীর ভাগ কথা হয় এই রুথ এ্যরনকে নিয়ে। একনাথ যুদ্ধের ডামাডোলে তাকে ফেলে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রুথ ফিরে আসছে ভারতে। শুনে একনাথ আতঙ্কিত। আতঙ্ক সেই স্ত্রীর দাপট। বিবাহিত জীবন ছিল নিঃসন্তান। স্ত্রীর ছিল শরীর খারাপ বাই, তৎ-সহযোগে ছিল ডাঃ এ্যরনের প্রতি অনাদর ও উপেক্ষার অভিযোগ। দীর্ঘকাল এই কয়টি উপসর্গসঙ্কুল ঘরণীকে নিয়ে বাস করার ফলে আতঙ্ক স্বাভাবিক।

ডাঃ এ্যরন তার পেয়েছেন সেই রুথ ভারতবর্ষে আসছেন। ছাড়পত্র পেয়েছেন। টাকার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। অর্ডার গেছে টমাস কুকের সঙ্গে সেই ব্যবস্থা পাকা করতে।

এ্যরন সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন,—"খবরদার, নগদ টাকা দিও না;—কোম্পানীকে বলো যদ্দ যা চায় দিতে, যেন নগদ টাকা না দেয়। টাকা দিলে ও হয় ত ইস্তাম্বুলে নেমে বলবে 'কেপটাউনে যাব', কেপটাউনে গিয়ে বলবে 'উরুগুয়ে চলেছি'। ভাই, ওকে কলকাতাতেই এনে ফেলার ব্যবস্থা কর। আমি ভেবেছিলাম, শান্তি পাব! পাব কেন? বুড়ো বাপকে কম কষ্ট দিয়েছি আমি?"

ডাঃ এ্যরন তাঁর চাকাওয়ালা চেয়ারে বসে বসে তাঁর আসন্ন বিপৎপাতের কথা চিন্তা করছেন, এমন সময়ে তাঁর ঘরের দরজায় বেল বাজল। তাঁর আর্দালি খবর দিলে একটি ভদ্রলোক আর একটি মুসলমান ফেরিওয়ালা দাঁড়িয়ে।

"কি চায়?"

"হুজুরকে কি বলবে। জরুরী।"

রোগী ভেবে ডাঃ এ্যরন সম্মতি দিলেন।

ঘরে ঢুকল কলকাতার ফুটপাথে যেমন লুঙ্গিপরা ফেরি-ওয়ালা দেখা যায়, পুরনো মাল বিক্রী করে, তেমনই একটি যুবক। তাঁর সঙ্গের লোকটির মাথার চুল পাকা বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। এমনই ভগ্নস্বাস্থ্য, কিন্তু চোখ দুটি মমতায় ও করুণায় আচ্ছন্ন। পরনে বাঙালী ভদ্রলোকের সাজ—ধুতি, শাদা শার্ট আর পায়ে বিদ্যাসাগরী লাল চটি।

ডাঃ এ্যরন মুখ তুলে চাইলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে মুসলমানটি বললে—"আপনার কি কোনও ডাক্তারি বই চুরি গেছে?"

ডাঃ এ্যরন অবাক—"কই. না!"

লোকটা তার হাতের তিন-চারখানা বই একসঙ্গে সামনের মেঝেয় নামিয়ে বলল—"দেখুন ত, এ বই আপনার কিনা!"

নেহাৎ কর্ত্তব্যবোধে ডাঃ এ্যরন একখানা বই তুলে নিলেন। দেখেই কিন্তু চমকে উঠলেন। তার পর সোজা হয়ে বসলেন। অন্য বইখানা হাতে নিলেন। দু'চার বার নাড়াচাড়া করেই হঠাৎ তৃতীয়খানার মলাট দেওয়া কাগজ খুলে ফেলে দিতেই কয়েকটি গোলাপের পাঁপড়ী পড়ে গেল। সেগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে হাতের তেলোয় রেখে শুঁকতে চাইলেন। গন্ধ না পেয়ে বললেন—"এতদিন কি গন্ধ থাকে?"

আর্দালি বুঝতে না পেরে বললে—"হুজুর!"

সম্বিৎ পেয়ে ডাঃ এ্যরন বললেন—"কোথায় পেলে এ বই?"

লোকটা সোৎসাহে বললে—"কেন হুজুর? আপনার বই?"

কথা না বলে ধীরে ধীরে ডাক্তার এ্যরন কোলের উপর বইখানা রাখলেন। হাতের মুঠোয় গোলাপ পাঁপড়ি তখনও গুঁড়ো হচ্ছে।

লোকটা বললে—"এমনি বই দশ বারোখানা এই লোকটা এনেছে। আমি ত জানি হুজুর এ সব কত দামী বই। সবই যে ডাক্তারির বই। বড় বড় অক্ষরে এ, এ, লেখা। ভুল কি হয়? লোকটা কিছুতেই কবুল করতে চায় না কার বই। তাতেই ত সন্দেহ হ'ল! এই কারবারি একজন খেয়াল করে বললে আপনার নাম এ, এ, আপনি ডাক্তার, তাই আপনার কাছে এসেছি। আমার দোকান মার্কেটের বাইরে ফুটপাথে। আপনার নাম এ পাড়ায় ভাল করেই জানা হুজুর। আপনার বই—আপনারই বাড়ীর সামনে বেচে যাবে, একেবারে সামনাসামনি, তাজ্জব হিম্মৎ লোকটার। পুলিসে খবর দি' হুজুর?"

ডাঃ এ্যরনের তখনও কোন সম্বিৎ নেই। তিনি কেবল একখানা বই রাখেন, অন্যখানা দেখেন। যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছেন। লোকটার কথাও তত মন দিয়ে শোনেন নি।

ডাঃ এ্যরনের আত্মবিহ্বল ভাব দেখে আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—"এ বই কি আপনার চেনা?"

"চেনা? হ্যাঁ খুবই চেনা। তবে আজকের কথা ত নয়। ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। আপনি এ বই কোথা থেকে পেলেন? গোলাপ পাঁপড়িগুলোর গন্ধ নেই দেখতে পাচ্ছি।"

"এ বই? এ আমার পৈতৃক। আমার পিতা ডাক্তারি পড়বার সময় কিনেছিলেন।"

"আপনার পিতা?" বিস্মিত এ্যরন জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার পিতা? জীবিত তিনি?"

প্রভাহীন দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে ভদ্রলোক বললেন—"জীবিত? না, জীবিত কি করে হবেন? মা বিধবা। —নাঃ আমার পিতা জীবিত নেই। ঠিক জানি না।"

"মা বিধবা, অথচ পিতা জীবিত কিনা ঠিক জানেন না। আপনি কি উন্মাদ না জোচ্চোর?"

ফেরিওয়ালা ব্যস্ত হয়ে বললে—"হুজুর, লোকটা বিলকুল হারবাগ। পুলিসেই দিন। ডাক পুলিস?"

ডাঃ এ্যরন বিরাট চিৎকার করে বললেন—"পুলিস? এ ব্যাপারে পুলিস কি করবে? এ সব কি তোমার বই? তোমার এত গরজ কেন? খসে পড়।"

লুঙ্গীপরা লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল—"আজ্ঞে আমি ত ভাল জেনেই এসেছিলাম। হুজুরের হারানো বই পাইয়ে দিয়ে কিছু বকশিশের আশা ছিল হুজুর।"

"বকশিশ? বকশিশ চাই?" ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পাঁচ টাকার নোটখানা!—"ভাগো, যাও।"

সেলাম দিয়ে লোকটি ত পালিয়ে বাঁচল।

সেই ভদ্রলোক তখনও দাঁড়িয়ে।

বাপ তার বেঁচে আছে কিনা জানে না। মা বিধবা তবু কেন...

ডাঃ এ্যরন লোকটিকে বললেন—"বসুন।" কিন্তু এই বসুন বলার আগে আধ ঘণ্টা সময় এমনই কেটে গেছে। এ বুড়োও জানে নি কোথা দিয়ে কেটেছে, ও বুড়োও জানে নি কোথা দিয়ে কেটেছে!

হঠাৎ ডাঃ এ্যরন বললেন—"এ রকম বই আপনার আর ক'খানা আছে?"

ভদ্রলোক বললেন—"দুটো আলমারী ভর্তি। আমার মাতামহ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই আমার পিতৃদেবকে পড়ার জন্য এ বই কিনে দেন—আমার মাতৃদেবী স্মৃতি হিসেবে এ বই কখনও কাছছাড়া করেন নি।"

"তবে আজ করছেন কেন?"

"আজ? আজ বড় দুর্দিন। যুদ্ধের পর ব্যাঙ্ক ফেল, পূব বাংলার ভাগ, সব মিলিয়ে যা ছিল এখন তার ছায়াও

নেই। আমার যোগ্যতাও সামান্য। কখনও কোনও কাজ শিখি নি। অ-কাজের নেশায় পরিপক্ব। বাগান, বাজনা আর মা এই তিন নিয়েই জীবন কাটিয়েছি। বিবাহ করার কথাও কখনও মনে আসে নি; অ-কাজের নেশা যাদের পায় তাদের এমনই হয়। মা-ই আমার সব আনন্দে আনন্দময়ী। কিন্তু আর বুঝি থাকে না আনন্দ। দুর্দিন চরম। মায়ের কষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না, তাই লাইব্রেরিটা বিক্রী করে কিছু সংগ্রহ করে একখানা দোকান করে চালাবো ভাবছিলাম।"

"এই বয়সে কি দোকান করবেন আপনি? ব্যবসা বাণিজ্যও যে জানার দরকার হয়।"

"কলকাতায় বিদেশী ভাষার বইয়ের দোকান নেই।—সেই দোকান আর কিছু বিদেশী সাময়িক পত্রিকা।"

"আপনি বিদেশী ভাষা জানেন?"

"মা জানেন, তিনিই শিখিয়েছেন!"

"আপনার মা বিদেশী ভাষা জানেন? চমৎকার! কি কি ভাষা জানেন?"

"ইংরিজী ত জানেনই, ফরাসী, জার্মান আর ইটালিয়ানও জানেন।"

"বেশ ভাল জানেন?"

"আমি তাঁরই কাছে শিখেছি। আমি ভাল জানি বলে অনেকে বলে।"

"হঠাৎ তিনি বিদেশী ভাষা শিখলেন কেন?"

"বোধ হয় সখ ছিল। বলতেন—সব জানতে শিখতে হয়। কখন কোথায় দরকার হয় শেখা ভাল। আমাদের বংশে বহু ভাষা শেখা নাকি নতুন নয়।"

"বাঃ বাঃ, তা হলে ত আপনি কাগজেও লিখতে পারেন।"

লোকটি বললে—"না, আমি গুছিয়ে কিছুই করতে পারি না। ডাক্তারেরা বলেন, আমার মন ও চিত্ত অশান্ত, অবাধ্য আর অসুস্থ। মাতৃগর্ভকালীন জীবনেই আমার একটা বড় ধাক্কা লাগে. মানসিক ধাক্কা।"

"তাই নাকি? কেন?"

"সঠিক জানি না, তবে মায়ের পক্ষে একটা বড় ধাক্কা, যার ফলে আমার মা প্রায় পুরো গর্ভকালই অর্দ্ধউন্মাদিনী ছিলেন। তাতেই লোকে ভাবত আমি যীশু বা শ্রীচৈতন্ত গোছের কিছু একটা হব। হলাম অকর্মণ্য!"

"না, না, অকর্মণ্য কেন? নিজেকে অত ছোট ভাবতে নেই, বাইরে থেকে কেই-বা আমরা কাকে চিনি?"

"কিন্তু আমি ত কোন কাজেই এলাম না। মানুষের যখন কাজ করার বয়স তখন ত আমি একেবারেই বিহ্বল ছিলাম। অল্পেই সংজ্ঞা হারাতাম। এখন অনেকটা ভালই বরং।"

"হ্যাঁ, এখন থেকে ভালই থাকবেন। ভয় করবেন না।" ডাক্তারের কণ্ঠে ভরে উঠল সান্ত্বনার মধুতাপ।

লোকটি বলল—"কিন্তু একটা কথা জানার ভারি ঔৎসুক্য হচ্ছে। জানতে পারি কি?"

হঠাৎ ডাঃ এ্যরন অনুভব করলেন যে, তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং তাঁর সমস্ত জীবনের আয়াসলব্ধ ইউরোপীয় শালীনতার বিরুদ্ধে আপাত অনাবশ্যক প্রশ্নজালে তিনি এই বাঙালী বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করেছেন, তাঁর পারিবারিক সংবাদ সম্বন্ধে তাঁকে উদ্ব্যস্ত করেছেন। অথচ এই ভদ্রলোক তাঁর সম্বন্ধে একটি কথাও ত জিজ্ঞাসা করেনই নি, বরং এতক্ষণে একটি প্রশ্ন করার জন্য সবিনয় অনুমতি চাইছেন। ডাঃ এ্যরন বললেন—"অবশ্যই, কি বলুন?"

"আপনি বললেন বইয়ের মালিককে আপনি চেনেন। জানতে পারি কি, কি ভাবে আপনি তাঁকে চেনেন? আপনি ত জার্মান; ইহুদী ত বুঝতেই পারছি। লোকটাকে যে বললেন, বইগুলো আপনার সে ত আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই বললেন। কিন্তু কি করে চেনেন তাঁকে?"

"কি করে জানলেন আমি জার্মান ইহুদী?" প্রশ্ন করেন ডাক্তার ইংরেজী ছেড়ে জার্মানে।

ভদ্রলোকও ইংরেজী ছেড়ে জার্মানে বললেন—"আপনার ইংরেজী বলার ধরনেই। নামে বোঝা যায় ইহুদী; এ্যরন নাম ইহুদীর হয়।"

"কি করে জানলেন?"

"মাকেই বলতে শুনেছি।"

"আপনার মা বুঝি এ্যরন নামের জার্মান কারুকে চেনেন?"

হেসে লোকটি বলে—"না না; মা সে ধরনেরই নন। মা একেবারে সেকেলে। খাটি বাঙালী হিন্দু মহিলা। তবে মায়ের জানার পরিমাপটা আমাদের ধারণার বাইরেকার জিনিস।"

"তাই নাকি?" বলে ডাঃ এ্যরন আবার কোন্ চিন্তা-সাগরে ডুব মারলেন।

বৃদ্ধ আবার বললেন—"আমার পিতার বই আপনার চেনা, কি করে চিনলেন?"

"চেনা এই হাতের লেখা। এই লোকটি প্যারিসে পড়বার সময় আমার সহপাঠী ছিলেন। তাই এ হস্তলিপি আমার পরিচিত। আপনার অমত না হলে আপনার

লাইব্রেরি কিনে নিতে আমার অমত নেই। আমি এখনও চিকিৎসা করি কিনা! বইগুলি আমার কাজে লাগবে। তা ছাড়া আপনি ত আমার আত্মীয়-বন্ধুর সন্তান। আমাদ্বারা যদি কোনও উপকার হয়...”

বৃদ্ধ অভিভূত হয়ে বললেন—“বড়ই অনুগৃহীত হলাম।”

“দাম?” ডাঃ এ্যরন জিজ্ঞাসা করেন।

“যা দেন; আপনি ত বইয়ের দাম জানেন। আপনি আর কি কম দেবেন? আপনি ঠকাবেন না, আমি জানি।”

হেসে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন—“কি করে জানেন?”

ভদ্রলোক বলেন—“আপনার বয়স, আপনার চেহারা, আর আপনার চোখের দৃষ্টি।”

“কি পেলেন এই দৃষ্টিতে?”

“কি? কি করে বলব? অনেক দিন ধরে চাইছিলাম এমনই কারুকে দেখি। হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার পর মন যেন বলছে যাকে চাইছিলাম সেই লোকটিই এই।”

হাসতে হাসতে ডাক্তার বললেন—“তাই নাকি? তাতেই বুঝলেন ঠকাব না? যারা ঠকায় তারা এমনি চেহারা নিয়েও ঠকায়। যান আপনার মায়ের কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব বলবেন। সব বই, দুটো আলমারির সব বই, ঐ মেহগনির আলমারিসমেত কত দাম?”

ঘাবড়ে গিয়ে বৃদ্ধ বললেন—“কিন্তু আলমারির কথা, মেহগনির আলমারির কথা আপনি কি করে—”

উত্তেজিত হয়ে ডাঃ এ্যরন বলেন—“বলবেন দাম দেব আঠারো হাজার ছ-শ’ তিন টাকা আর দু’ছড়া সোনার মালা।—এতে হবে কি, হবে কি এতে? জিজ্ঞাসা করবেন।”

বিহ্বল বৃদ্ধ বলেন—“করব; কিন্তু আপনি এ সব জানেন...”

“অনেক জানি ছোকরা, অনেক জানি। কাল দুপুরের মধ্যে খবর না দিলে হয় ত এ জিনিস কেনা আর হয়ে উঠবে না। সময় নেই—কাল দুপুর; কেমন?”

লোকটি উঠে বেরিয়ে যাবেন। ডাঃ এ্যরন দোর খুলে দিচ্ছেন। দেখলেন সিঁড়ি দিয়ে তাঁর বন্ধু অরূপরতন উঠে আসছেন। লোকটি বেরিয়ে গেল। অরূপরতনকে নিয়ে ডাঃ এ্যরন তাঁর বসবার জায়গায় ফিরে এলেন।

অরূপরতন ত ডাক্তারকে পায়ে হেঁটে কারুকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দেখে অবাক।

“দেখলে অরূপ, কে নেমে গেল?” বিষণ্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার।

“কে বল ত? তুমি উঠে এসে এগিয়ে দিচ্ছ, বিসমার্ক কি জিহোভা নন ত?” দাড়িতে হাত দিয়ে অরূপরতন জিজ্ঞাসা করেন।

উদাসকণ্ঠে ডাক্তার বলেন—“বন্ধু, আজ তুমি এমন এক-জন লোককে দেখলে যার মত হতভাগ্য আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই, যদি না তুমি আমায় ধর।”

অরূপ বলল—“তোমার জীবন ত নাটক আর নাটকীয় ভাবে ভর্তি। এও তারই একটা হবে হয় ত। সে কথা পরে হবে। আপাততঃ তোমায় যা জানাতে এলাম। শ্রীমতী কাল এসে পৌঁছচ্ছেন। প্লেন যদি কাল ঠিক সময়ে পৌঁছয়, আমি তাঁকে নিয়ে তোমার ঘরে ঢুকব বিকেল পাঁচটায়।”

“শুনে আমার প্রাণ জল হয়ে গেল।”

“মিসেস্ এ্যরনকে এত ভাল লেগেছিল এককালে, আজ এত খারাপ লাগল কেন?”

এ্যরন বসে পড়েছিলেন তাঁর আরাম-কেদারায়, পাইপটায় জোর টান দিচ্ছিলেন। “সে ভাল লাগার রোমাঞ্চ আমার আজও মনে হয়। তখন মনে হয়েছিল আমি যেন মন্ত্রে আবিষ্ট ইচ্ছাশক্তিহীন চলমান পিণ্ড। তাই ত রুথের সঙ্গে প্যারিস ত্যাগ। রুথের প্রথম প্রেম; মনে নেই তোমার অরূপ সে সব দিন?”

খুব মনে ছিল অরূপের। কোনমতেই সেই দুরন্ত প্রেম থেকে অরূপ তাকে ফেরাতে পারে নি। বাংলা দেশ থেকে চিঠির পর চিঠি আসে। অরূপের ওপর দিয়ে কি ঝড়ই গেছে। অরূপের মাধ্যমে জামাতাকে ফিরে পাবার কত চেষ্টা একনাথের শ্বশুরের। হঠাৎ একনাথ বিশাল ইউরোপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অরূপ একলা দেশে ফিরেছে। পারে নি একনাথের খবর আনতে। চেষ্টা করেছে একনাথের শ্বশুর আর স্ত্রী কনকের সঙ্গে দেখা করে। অতখানি আশা জলাঞ্জলি হয়ে যাবার পর একনাথের পরিবারের প্রতি অরূপের কোনও কর্তব্য আছে কিনা জানতে চন্দননগরে গিয়ে তাদেরও কোন খবর পেল না সে। সে কথাও একনাথকে জানাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোথায় একনাথ কে জানে?

চন্দননগরের বুকে এই বিপৎপাত অক্ষয় হয়ে রইল। হাই কমিশনার, ফরাসী পররাষ্ট্র দপ্তর, সর্বত্র খোঁজ করার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। হয় ত আরও চেষ্টা চলতে পারত; তার মধ্যে এল প্রথম মহাযুদ্ধ। সব গুলিয়ে গেল অতলে। কোথায় অরূপ, কোথায় কনক, কোথায় কনকের বাপ, কিছুরই আর হদিস রইল না।

“অথচ আজ আমি কোথায়? রুথ ভেবেছিল সন্তান

পাবে, গৃহিণী হবে। সংসার রচার মত মেয়েই ছিল বটে। ও জানল সন্তান হবে না, সার্জিক্যাল অপারেশনও হবে না। প্রথম প্রথম ভেঙে পড়লো শুধু। তার পরে রাগ, আমার ওপরে রাগ। বিধাতার চক্রে ওতে আমাতে দেখা, বিধাতার চক্রে প্রেম। ওর জন্ম, ওর দেহের ব্যর্থতার জন্ম, আমার এই ব্যর্থতাকে ও যেন রাগ দিয়ে চেপে পিষে মারতে চায়। উন্মত্ত লাভাস্রোতের মত ওর জীবনের উদ্গার ওকে আমাকে পারিপার্শ্বিককে জ্বালিয়ে দিতে লাগল। ইহুদীরা ত মদ বিশেষ খায় না, আর মেয়ে মাতাল তখনকার দিনে এই জাতটার মধ্যেও একটা ব্যভিচার বলেই গণ্য হ'ত। যে দিন রুথ প্রথম মদ খেল সেদিন খুবই বিস্মিত হলাম। কিন্তু এখন মদের মধ্যে ডুবেই থাকে ও। আমার মনে করে যেন ওর জীবনের হলাহল। অথচ আমি এখনও, এখনও অরূপ ওকে দেখি সেই প্রথম দিনের রুথ। ভুলতে পারি না ওর দৌলতে আমি প্রেমের কি রূপ সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি...''

অরূপ বিরক্ত হয়ে বলে—"থাকগে তোমার স্তবগান। হাজার বার শুনেছি, আবার কেন ?''

"বলতে দাও, অরূপ। আর আজ আমার বলার একটা বন্যা এসেছে। বিশ বছর ধরে নিবিড় করে বেঁধেছে ও ; মনে পড়লে মনে পড়ে যায় এ দেশের সীতা-শৈব্যার কথা। তখন বার্লিনে স্বল্প আয়, চলে না। ইহুদীরা ওকে ত্যাগ করেছে, জাতিগত ব্যাপারে ওরা এত গোঁড়া। সেই অস্বচ্ছলতার মধ্যে হাসিমুখে ও আমায় নিয়ে সংসার করেছে। বিবাহ হ'ল যখন আমাদের পরিপূর্ণ আয়। সেদিন যেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ। সে আনন্দের মধ্যে আমরা নাম বদল করলাম। ও হ'ল রুথ আইচ-এ্যরন, আমিও হলাম এক-নাথ আইচ-এ্যরন। এত দিনে আইচ-এ্যরন এ্যরনে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু হু-হু করে তখন উপার্জন। আমার যশ সমগ্র মধ্য ইউরোপে ব্যাপ্ত। অর্থ উপার্জন করে ঐশ্বর্য একত্র করলাম। ঐশ্বর্য হয় অরূপ, হয় না শান্তি। সন্তানহীন জীবনে নির্ঝর মরুভূমি। মা হবে না জানার পর পাগল হয়ে উঠল রুথ। মদ খেতে খেতে ও যেন পিশাচী হয়ে উঠল। কত রোগে পড়ল, মরতেও ত পারত, মরল না। আমার জীবনে শেলের মত বেঁচে রইল। একটা যুদ্ধ গেল, দুটো যুদ্ধ গেল। ইহুদীর মেয়ে পালিয়ে রইল আমেরিকায়। ডাক্তার বলে নাৎসীরা আমায় ছাড়ে নি। ব্যাভেরিয়ার এক বন্দীশালায় ডাক্তার হিসাবে আটকে রাখল। রুশেরা ব্যাভেরিয়া দখল করারপর যুগোশ্লাভিয়া-ইরাণ হয়ে জন্ম-ভূমিতে ফিরে আসি। এসে অবধি প্রার্থনা করেছি রুথের সঙ্গে যেন আর আমার দেখা না হয়।...শুধু মরতে চাই এখন।

"গিয়েছিলাম চন্দননগর। শিশুবয়সের পরিচিত স্থান, নাড়ীর ধ্বনি বাজে পথের চলায়। সেই স্কুল, চার্চ, বটের তলা, বাজার। সেই ঘাটের চাতাল যেখানে তোমায়-আমায় প্রথম খেলার পরিচয়। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল একটি সন্ধ্যার কথা। বেনারসী-পরা সেই সন্ধ্যাটির সুখময় কনে'-চন্দনের টিপ। স্তিমিত ভ্রূ-লতার তলায় ভীত-শঙ্কিত একজোড়া চোখ। পাছে বিলাতে গিয়ে ডাকিনীদের খপ্পরে পড়ে যাই তাই ভাবী শ্বশুর ও পিতৃদেব পরামর্শ করে গেঁথে দিলেন। বেশ ছিল মেয়েটি। নরম, সুশ্রী, চন্দনের টিপের মত। আমায় ফুলের পাঁপড়ি মুঠোয় মুঠোয় এনে দিত, ওর মাথায় ছড়িয়ে যাতে খেলা করি। প্রথম ছ-শ' তিন টাকা বরপণ ঠিক হয়। বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করে বাবা কি করলেন জানি না, বিবাহ-বাসরে বাবা আমায় আঠারো হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রী করলেন। দুই মায়ের জন্ম দু'ছড়া হারও চান। আমার মা বহুদিন আগে মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুরমশায় টাকা দিয়ে জামাই কিনলেন। দু'ছড়া হারের মধ্যে এক ছড়া যোগাড় হ'ল, অন্য ছড়া যোগাড় হ'ল না। মনে পড়ে জলজলে ঘটনা। শ্বশুরমশায় হার ছড়ার জন্ম সময় চাইছেন, বাবা ইতস্ততঃ করছেন। ফস্ করে সেই বালিকাবধূ তার গলা থেকে হার খুলে আমার বাবার হাতে রাখল। বাবা হার নিলেন। আঠারো হাজার ছ-শ' তিন টাকা আর দু'ছড়া সোনার হারে আমি শ্বশুরের কেনা হয়ে গেলাম। তখন ভেবেছিলাম বিশ্বসংসারে এই মেয়ে ছাড়া আর কোথায় কি থাকতে পারে! শ্বশুরমশায় বই কিনে দিলেন, দিলেন মেহগনির দুটো আলমারি, তাতে বই থাকত। ডাক্তারী বই, ফরাসী, ইংরেজিতে লেখা। সেসব বইয়ের ভেতরে কনকের রাখা গোলাপ পাঁপড়ি। বইয়ে গোলাপ পাঁপড়ি রাখা তার একটি সখ ছিল। এই-ভাবে মাত্র শেষ বছরটি আমি আর কনক স্বামীস্ত্রী ভাবে থাকতে পাই। নইলে কনক থাকত তার হস্টেলে, চন্দন-নগরে ; আর আমি থাকতাম কলকাতায়। শ্বশুরমশায়ের কড়া শাসন ছিল।...তার পর প্যারি—তিন বছর—তার পর নিরুদ্দেশ। তার পর জার্মানী—ওঃ কত দীর্ঘ, দীর্ঘ কাল। মন থেকে কনক মুছে গিয়েছিল। চন্দননগরে, কলকাতায়, কোথাও ভাবি নি কনক আবার জীবনে ফিরে আসবে। মনের সুড়ঙ্গপথের এফোঁড়-ওফোঁড় হয়েছিল রুথ আর রুথের আতঙ্ক! অতীত আর ভবিষ্যৎ। তার প্রেমও যত দারুণ, তার অত্যাচারও তত নিদারুণ, অথচ ."

থেমে গেলেন ডাক্তার এ্যরন।

"অথচ— ?" প্রশ্ন করেন একনাথ।—"অথচ কি ?"

"অথচ আজ সিঁড়ি দিয়ে যাকে নামতে দেখলে সে কে জান অরূপ ?"

"কে সে ?"

"আমারই ছেলে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ। হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি ? কনকের গর্ভজাত আমারই সন্তান। আমি যখন কনককে ত্যাগ করে যাই তখন কনকের সন্তান সম্ভাবনা হয়। আমি জানি নি। আর প্যারিতে যাবার পর আমি যে ডুব সাঁতারে ডুব দিলাম, উঠলাম একেবারে আজ এপারে ;—নইলে কনক আর আমি, মাঝে সমুদ্র।"

"ভুল করছ একনাথ। সমুদ্রই নয় শুধু। সমুদ্রের মাঝে দ্বীপের মত আমি তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সন্তানের কথা। আমি জানতাম। প্রতিবার হেসে উড়িয়ে দিয়েছ। একটা গুণগান তোমার আমায় করতেই হবে—রূপকে নিয়ে যখন ডুবে ছিলে তখন সব নোঙর ছিঁড়েই ডুবেছিলে। সততার অভাব তোমার হয় নি। সেই ছেলে ? বুড়ো ছেলে বল। পঞ্চাশ বছর হবে!"

"হোক পঞ্চাশ। আরও বেশী হোক। সন্তান ত! সে ছেলে জার্মান, ইটালিয়ান, ইংরেজী, সংস্কৃত সবই জানে। তার মা শিখিয়েছে। আভিজাত্যে টলমল করছে। অভিনব সভ্যতার অভিনব অবদান। মা মানুষ করেছে—ভারতের মা মানুষ করেছে ভারতের ছেলে তার পিতার সমকক্ষ হবার স্পর্দ্ধায়..."

উৎফুল্ল হয়ে অরূপ বল্লেন—"চিত্রাঙ্গদা মানুষ করেছে বভ্রুবাহনকে!"

"সেই ছেলে খেতে না পেয়ে আজ বই বেচতে এসেছে। বাপের পড়া ডাক্তারী বই। সেই মেহগনির আলমারিতে রাখা বই। তার গায়ে এ, এ, লেখা। বইওয়ালা চোর ভেবে আমার ছেলেকে আমারই কাছে ধরে এনেছে।"

"বললে তুমি পরিচয় ?" আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করেন অরূপ।

"পারি ? পারি পরিচয় দিতে ? অপরাধী আমি, এত সহজে পারি ? যে মহিমময়ী নারী নীরব তপস্যায় স্বামীর সন্তানকে হোমশিখার মত সঞ্চয় করে জ্বালিয়ে রেখেছে এই পঞ্চাশ বৎসর কাল, যে মহিমময়ী নারী স্বামীর আদর্শে এতটুকু কালিমা না দিয়ে সুশিক্ষা দিয়ে ছেলেকে লালিত করেছে, সে আজ পঞ্চাশের পাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিল ছেলেকে দ্বীপান্তরের বন্দীর কাছে—তার কাছে আমি পারি আমার গ্লানিময় পরিচয় দিতে ?"

"তুমি না পার আমি পারি। বল ঠিকানা, আমি যাব।"

"জানি তুমি যাবে। যাবে জেনেই ইচ্ছে করেই আমি তার ঠিকানা নিই নি। কাল আসতে বলেছি বই নিয়ে। আসবে, কি বল ? আসবে না ?"

"নাম কি ?"

"তাও জিজ্ঞাসা করি নি। না করেছি নেই—নেই। আসবে ত সে ? কি বল ? আসবে, আসবে। আমি জানি আসবে!"

তাই এল।

পরের দিন চারটের সময়। আর্দালি কার্ড আনতেই ডাক্তার এ্যরন খুব শক্ত হয়ে আত্মসম্বরণ করে বল্লেন—"ভিতরে আন।"

সেই ভদ্রলোক!

এসেই এ্যরনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। দুই বুড়ো তখন দু'জনে জড়িয়ে ধরল।

অনেকক্ষণ।

দু'জনেই বসলেন।

ডাক্তার এ্যরন বল্লেন—"কি হ'ল ? বই ?"

ভদ্রলোক বল্লেন—"মা বল্লেন বই বেচবেন না, বই তাঁর। আমায় কিনতে পারেন। আমি তাঁর তত আপন নই, তত মায়ার নই, ঐ বইগুলো যত আপন, যত মায়ার।"

ডাক্তার এ্যরন বল্লেন—"পারবেন তোমার মা তোমায় বেচে দিতে ?"

"মা পারবেন।"

"কি করে জানলে ?"

"আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।"

"মা কি বল্লেন ?"

"মা বল্লেন 'ছেলে কিনতে যারা জানে তাদের বেচতেও জানতে হয়'।"

শক্ত হয়ে ডাক্তার এ্যরন বললেন—"কত দাম দিতে হবে ?"

ইতস্ততঃ করতে লাগলেন ভদ্রলোক।

ডাক্তার এ্যরন বললেন—"আর সময় নেই, তাড়াতাড়ি বল কত দাম।"

"মা বলেছেন, তাই আমি বলতে সাহস করছি—"

অসহিষ্ণু হয়ে ডাক্তার বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ বল। সাহস কর, দেরী করো না। যত দাম হয়, যত দাম—আমি দেব। আমি তোমার মার দাবী পূরণ করব।"

"মা বল্লেন 'একটি নারীর সম্পূর্ণ যৌবন!' দিতে পারেন ? পারেন দিতে আপনি ?"

কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। "পারেন

না আপনি ; আংরাকে পল্লবিত মঞ্জরী করে তোলা আপনার সাধ্যায়ত্ত নয়।"

ডাঃ এ্যরন উঠতে পারলেন না।

কোলাহল শুনে চোখ চেয়ে দেখেন অরূপ আর রুথ এ্যরন এসে পড়েছে।

এসেই রুথ চীৎকার সুরু করেছে—"নোংরা—ইঁদুরের জাত সব—কেবল নোংরামি—আসছি জেনেও নীচে নেমে রিসিভ করতে পার নি। লজ্জার কথা! আমার চেয়ে দামী সঙ্গ ঐ বুড়োটার—নোংরা বুড়োটা?—কই হুইস্কি-টুইস্কি—কই, বেয়ারা!..."

বেয়ারা দৌড়ে এসে হুইস্কির গেলাস তৈরি করতে লেগে গেল।

অরূপ বলল—"আজও ত লোকটিকে নেমে যেতে দেখলাম। নাম-ঠিকানা নিয়ে রেখেছ ত?"

"না, আজও ভুলে গেছি।" বললেন ডাক্তার এ্যরন।

"আর বইয়ের লেনদেন?"

উদাস দৃষ্টি মেলে বুকফাটা কণ্ঠস্বরে ডাক্তার এ্যরন বললেন—"মিটিয়ে দিয়েছি, এ জন্মের মত মিটিয়ে দিয়েছি!

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

মনে হয় তুমি কত আপনার কত জনমের সাথী,
অনাদি অতীত যুগ-যুগ ধরি' আছে যেন পরিচয় ;
কত শত নব জনমের মাঝে জীবন-বাসর রাতি
মিলাইয়া গেছে, এ জীবনে তাই নূতন অভ্যুদয়।

বিশ্বপথের পথিক, তবুও মনে যেন নেশা লাগে,
মনে জাগে যেন নীড়ের স্বপ্ন বসুধার এক কোণে,
তুমি আছ মোর প্রীতির অমিয়া জীবনের পুরোভাগে ;
বেহাগের মাঝে হৃদয় আমার আশাবরী যেন শোনে।

শুধাই তোমারে বন্ধু আমার, কেন এত ভালোবাসো ?
আপনার মত কেন এত ভাবো, কেন মোরে কাছে টানো ?
'এই দুনিয়ার ভবঘুরে আমি' যত বলি তুমি হাসো,
আমি ত বুঝি না মনের খবর, তুমি শুধু একা জানো।

ও সব কিছু না—বন্ধু আমার শোনো বলি তুমি শোনো,
মনের ও সব খেয়াল-খুসীর খাপছাড়া পাগলামি ;
ধরণীর ধূলি-ধূসরিত প্রেম আমাদের নেই কোনো,
স্বার্থবিহীন সার্থক প্রীতি ঝরে শুধু দিবাযামী।

রূপে-রসে ভরা এই ধরণীতে মিলিব না মোরা কভু,
মিলিব যে মোরা প্রাণের তীর্থে হৃদয়ের মোহানায়,
জগৎ জানিবে আমরা অমিল, মিলেছি আমরা তবু,
পরিচয়-হীন আমরা অজানা, পরিচিত অজানায়।

ইটালীতে এক বৎসর

শ্রীপ্রতিভাকুমার কুণ্ডু

এগার

৩০শে আগষ্ট '৫৪। নেপলসে এসেছি পরশু, কিন্তু আজ সকাল পর্য্যন্তও শহর পরিক্রমার সুযোগ পাই নি। অথচ লোকে বলে, See Naples and then die. দেখার সময় যদি নাই পাই ত যাবার বেলায় ভাবা যাবে, লোকে কি না বলে!

নেপলসের সমুদ্রতীরের রমণীয়তা নাকি অতুলনীয়! দূর থেকে ভিসুভিয়াসকে এক নজর দেখারও সময় পাই নি। সমুদ্রতীরে যে যাই নি! এখানকার সাদাসিধে ও মিশুকে লোকদের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলারও অবসর পেলাম না। নেপলসের খানাপিনার যে এত সুখ্যাতি পশ্চিম দুনিয়ায়, তারও একটু প্রমাণ নেব, সে সুযোগও করে নিতে পারিনি। সান কার্লোয় অপেরা না হোক অন্তত ওর সাজসজ্জাটাও ত দেখে আসা উচিত ছিল, তাও ত গেলাম না।

এত সব হবে কোত্থেকে! আমার আমি ত পরশুই পৌঁছে গেছি। কিন্তু আমার মিলান থেকে পাঠান মালপত্রগুলো এল কিনা, এই খবরটুকু জানবার জন্যই ত কাল সারাটা দিন এ-রাস্তা ও-রাস্তা করতে হ'ল। এক ট্রাভেল এজেন্সির মারফত পাঠিয়ে ছিলাম। সারা দিনে পথার্থে অনেক অর্থ দিলাম। অনর্থও দু' একটা বাধালাম। সন্ধ্যের মুখে প্রায় অসমর্থ অবস্থায় হঠাৎ সেই ট্রাভেল এজেন্সীর অফিসের সামনে এলাম। অথচ ঐ রাস্তা দিয়েই কম করে বার দুয়েক খুঁজে গেছি, কিছুই চোখে পড়েনি। অবিশ্যি চোখে পড়ার কথাও নয়। অফিস দোতলায়, তার ওপর সিঁড়ির মুখে দু'ইঞ্চি চৌকো প্লেটে বিবর্ণ অক্ষরে অফিসের নামটি লেখা। অলৌকিক ক্ষমতা না থাকলে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভবই।

যাই হোক, শেষ খবর হ'ল আমার লোটা কম্বলগুলি বাহাল তবিয়তেই জাহাজ কোম্পানীর অফিসে জমা আছে।

তাই ত আজ সকালে লয়েড ত্রিয়েস্তিনোর অফিস খুলতেই হাজির হয়েছি। না, মাল ঠিকই আছে। বেমালুম বেহাত হয় নি।

—আরে, কুণ্ডু যে! এখানে কি করছ?

আমি ত প্রায় চমকে উঠেছি। আকাশ বাণী নয় ত! দেখি, কলকাতার বন্ধু বঙ্কিম ঘোষ।

আমি বললাম—তুমি এখানে কি করছ? ছিলে ত মিশিগানে!

—মধুদার দোকানে ডালমুট কিনছি। মাধবীর চিঠি নিয়ে এসেছে ওর ছোট ভাই। একটু ডালমুট দিয়ে হাতে রাখতে হবে ত?

—ও সব পুরনো হেঁদো কথা রাখ। কাল 'ভিক্টোরিয়া'তে যাচ্ছিস নাকি?

—হাঁ। সেই রকমই ত কথা আছে। তুই?

—আমিও। ভালই হ'ল।

টিকেটগুলি দেখিয়ে সব ঠিকঠাক করে আমরা রাস্তায় নামলাম। বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল—এখন কোথায় যাবি, কিছু ভেবেছিস?

—চল না পম্পেই হারকিউলেনিয়াম যাই। সন্ধ্যেয় আবার ফিরে আসব।

—চল, পড়েছি তোর হাতে, ঠ্যাঙে কি আর বাধা না ধরিয়ে ছাড়বি?

হারকিউলেনিয়াম যাবার বাস ধরলাম দু'জনে। বাস ত নয় যেন টাট্টু। টগবগিয়ে চলেছে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথে যে বাসগুলি ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, এ বাসের অবস্থা তার চেয়েও বোধ হয় কাহিল। জোরে চলবার আগ্রহ ষোল আনা। প্রচেষ্টা হয় ত বার আনা। কিন্তু মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দে আমাদের ভিরমি লাগে প্রায়।

পম্পেই, ইটালী

রাস্তা পাথর বাঁধান। দোকানপাটগুলি যেন পোস্তার আলু-পটি। বাসের ভেতরে চারদিকের চাপে সোজা খাড়া হয়ে আছি। রড ধরার কোন প্রয়োজনই নেই!

বঙ্কিমের দিকে আমার তাকাবার সাহসই হচ্ছিল না। মুখ ভেংচে দেবে হয় ত।

ও হঠাৎ বলল—ও জাহাজের টিকেট দুটো তুই ছিঁড়ে ফেলতে পারিস। এখনি ত একটা ট্রাম কি ট্রাকের সঙ্গে ঠোকর খেয়ে

রাস্তায় কাপড়-শুকানো

বাসটা লোহার স্ক্র্যাপ হয়ে যাবে। আর আমরা পিকাসোর কম্পোজিশন হয়ে নামব।

আমি বললাম—আমাদের দেশের বাসগুলি কি উড়ে উড়ে চলে? এর চেয়েও ঢের ঝরঝরে বাস আমাদেরও আছে।

—আহা, আমি সেটা ত অস্বীকার করছি না। আমি বলছি, এই যে লড়বড়ে বাসটাকে ডারবির ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, সত্যিই যদি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয় ত তখন কি হবে?

—অ্যাকসিডেন্ট হলে যা হয় তাই হবে। ব্যতিক্রম ঘটবে না নিশ্চয়ই। ডাক্তার এসে মাথায় ফেটি বাঁধবে। মরে গেলে কাগজে নাম ছাপা হবে।

—যা হয় হবে, দুর্গা দুর্গা!

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অক্ষত শরীরেই হারকিউলেনিয়ামে এলাম। ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়, ছোট্ট এক টুকরো জনপদ ছিল সে সময়ে। এখন, ভাঙ্গা দেওয়াল, অক্ষত পাথর-বাঁধান সরু রাস্তা কয়েকটা পরিমার্জিত অথচ জীর্ণপ্রায় আবাসিক বাড়ী—এই হ'ল হারকিউলেনিয়ামের উন্মুক্ত কবর।

এখন ইঁট কাঠের টুকরো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে। কিন্তু ক্ষত সারছে না। বেমানান হচ্ছে। দোষ কার জানি না, মিস্ত্রিরও হতে পারে, হাতুড়ি-বাটালিরও হতে পারে। কিংবা আমাদের চোখেরও হতে পারে। হারকিউলেনিয়ামে পরিরক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে-চেষ্টা প্রায় বিফল বলা চলে।

বঙ্কিম আর আমি ট্রেনে চেপে বেলা একটায় পম্পেই এলাম। পম্পেইতে ট্রেনটা খালি হয়ে গেল। সবাই টুরিষ্ট। আবার দেখলাম ট্রেনটা ভর্তি হয়ে গেল। পম্পেই থেকে প্রায় একই সংখ্যক লোক উঠল। আর এত লোক কেনই বা আসা যাওয়া করবে না? দেশে-বিদেশে পম্পেইর নাম ত বহুল বিজ্ঞাপিত। এ কি আমাদের পাঁচমারি যে, যখন রাষ্ট্রপতি স্বাস্থ্য-অন্বেষণে ওখানে গেলেন তখনই লোকে কাগজ মারফৎ জায়গাটির নাম জানল? নইলে কে পাঁচমারির খোঁজ রাখত? অবিশ্যি পম্পেইর যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, পাঁচমারির বেলায় তা শূন্য। কিন্তু তা হলে বলতে হয়, যে লোক ইতিহাসের অতীত ঘেঁটে দেখে না সে কি পম্পেই না দেখে ফিরে আসবে? না। এই প্রচার-সর্বস্ব যুগে সব চেয়ে আগে চাই সারা বিশ্বময় ব্যাপক বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিম ত প্লাটফর্মে পা দিয়েই বলল—খালি পেটে রোমান সভ্যতার কালচার আমার সইবে না। আগে কিছু খাই চল। অনেক কালচার করেছি।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে পাঁচ সিকে করে দক্ষিণা জমা দিয়ে ধ্বংসাবশিষ্টের সাড়ম্বর খনিত পম্পেইতে ঢুকলাম।

সামনেই কতকগুলো দেওয়াল, আর, দেওয়ালবিহীন বাড়ীর মেঝে ও উঠোন। এ সবের মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানা মাপের থাম। রোমান স্থাপত্য-নিদর্শন যেখানেই আছে, সেখানেই এই স্তম্ভকুলের প্রাচুর্য। আর এই সব ধ্বংসাবশেষগুলোর পেছনে অদূরে ভিসুবিয়াসকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। পম্পেই ও ভিসুভিয়াসের মাঝখানে একফালি ঘন সবুজ জমি।

এই গ্রীক-রোমান শহরের এলাকা বেশ বড়ই ছিল। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অ্যাপোলোর মন্দির, জুপিটারের মন্দির, গৃহস্থ-বাড়ী, বিচারালয়, ইত্যাদি। সবই অবশিষ্ট যদিও, গোটা ত কিছুই নেই।

এই ধ্বংসাবশেষের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'হাজার বছরের পুরনো পম্পেইর কথা ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ হয়। ঐ উদ্যানবাটিকায় বসন্ত সন্ধ্যায় কে যেন লায়ার বাজাত। বাজারের পথে মালিককে তার ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে চাবুক মারতে দেখা যেত। কোন এক

বিশেষ বৈকালিক উৎসবে এম্ফিথিয়েটারের জনকলরবে উল্লাসের জোয়ার বইত।

তার পর উনআশি খ্রীষ্টাব্দের এক অশুভ দিনে হঠাৎ শমন এল। ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ঝড় পম্পেই হারকিউলেনিয়ামের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল। দুটো জনবহুল জনপদের সমাধি হ'ল। আবার কবর খোঁড়া হ'ল। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বাড়ল। দিকে দিকে প্রচারিত হ'ল পম্পেই শহরের কথা। দর্শক আসতে লাগল।

হারকিউলেনিয়াম : ইটালী

আর আজ স্বামী-স্ত্রীতে হানিমুনে এসে সন্ধ্যার নিরিবিলিতে লাভাদের শব্দ শোনার প্রয়াস করে। প্রত্নতত্ত্বের ছাত্ররা দেওয়ালের নক্সার গবেষণায় হয়ত ফটো তোলে নয়ত ইট পাথর সংগ্রহ করে। টুরিস্টরা এক ডজন স্ন্যাপ নেয় ও আধ ডজন পিকচার পোস্টকার্ড কেনে। আর যার কিছু করার নেই, সে হয়ত তেমন কারও সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে, নয় ত কুটিল কটাক্ষে বিষম অবজ্ঞা-ভরে ভিসুভিয়াসের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে।

৩১শে আগষ্ট '৫৪। আজ বঙ্কিম আর আমি নেপলস-এর এ-মাথা ও-মাথা চষে ফেললাম। বাছা খাবার খেলাম। সমুদ্র-তীরে নানা রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। দ্রষ্টব্য স্থানগুলোতে একবার করে বুড়ি ছুঁয়ে এলাম।

নেপলসের বিখ্যাত পিৎসা (Pie, সেঁকা মশলা চাপাটি ধরণের খাবার) সত্যিই সুস্বাদু। সমুদ্র-ধারটিও মনোরম। বেড়াবার পক্ষে ম্যারিন ড্রাইভের চেয়েও সুন্দর, বিশেষ করে যে দিকটায় নতুন বাড়ীঘর তৈরি হচ্ছে।

এই শহরের লোক দেখলাম বেশ মিশুক ও কিছুটা সরল। ওরা যেমনি গরীব তেমনি অলস। ভাল খাওয়া ও গান বাজনা করা ওদের খুব প্রিয়। গরীব বলেই বোধ হয় কিছু লোক বিদেশীদের ঠকাবার ফিকির খোঁজে। কিছু দেখলাম ভিক্ষাও করে।

দক্ষিণের ঠিক উল্টো উত্তরের মিলানের লোকগুলো। মিলানবাসীরা মোটেই মিশুক নয়। কাজের সময় পথে ব্যস্ততাই বিশেষ করে চোখে পড়ে। ওরা গরীব নয় এবং ভিক্ষা করতে কাউকেই দেখি নি।

এই প্রভেদের কারণও আছে সুস্পষ্ট। ইটালীর শিল্প যা কিছু সবই উত্তরে। দক্ষিণে খালি চাষ ও বাস। অতএব যা খুব স্বাভাবিক তাই ঘটেছে।

নোংরা ও সরু গলি নেপলসে দেখার জিনিস। বোধ করি ইউরোপে আর দ্বিতীয়টি নেই।

সকালবেলায় ফেরিওয়ালা কানে তালা ধরিয়ে বক্স-গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে যায়। ও নিজে যত চেঁচায় তার চেয়ে জোরে খট খট করে পাথুরে রাস্তায় ওর গাড়ীর চাকা। বৃদ্ধ যুবকেরা বাড়ীর সিঁড়িতে জমায়েত হয়। ওদিকে বাচ্চারা রাস্তার আবর্জনা-ধোয়া গায়ে মেখে খেলা সুরু করে দেয়। আর সবচেয়ে মজার দৃশ্য হ'ল রাস্তার এপারে-ওপারে দড়ি টাঙিয়ে জামা-কাপড় শুকানো। অবিশ্যি

হারকিউলেনিয়াম : ইটালী

উপায়ও নেই। ওদের বাড়ীতে বারান্দা ত নেই-ই এমন কি খোলা উঠানও নেই। অগত্যা।

এর পরও লোকে কেন যে বলে, See Naples and then die, আবিষ্কার করতে পারছি না।

বার

৪ঠা সেপ্টেম্বর '৫৪। পরশু জাহাজে উঠেছি। বাড়ী ফিরছি কথাটা ভাবলেই কেমন একটা হঠাৎ-পুলকে মনটা নেচে উঠছে। এই সমুদ্রের অফুরন্ত জল ঠেলে ঠেলে আবার একদিন বোম্বাইয়ের ডাঙ্গাতে গিয়ে ঠেকব। 'সুইট হোমে' পা দিয়েই 'এটা কর সেটা কর'র তুফান তুলে বাড়ীর লোকেদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলব।' 'লেসাণ্ডে'র দোতলায় বসে মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে হয়ত ভাবব, কত যুগ যেন বাংলা বলি নি। নয়ত বাধো বাধো ঠেকছে কেন!

পম্পেই : ইটালী

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ডেকে দাঁড়িয়ে আর কত কি যে ভেবে যেতাম কে জানে। বঙ্কিম এসে বলল, চল একটু খেলি।

—কি খেলবি?

—টেবল টেনিস।

—চল।

জাহাজে দল পাকাতে বেশী সময় লাগে না। আমাদের দলটাও দিন দুয়েকের মধ্যেই বেশ ভারী হয়ে উঠল। মাদ্রাজের শিল্পী মিঃ পানিকার, গুণ্টুরের পিল্লাই, করাচীর খাঁ সাহেব আর আমরা কলকাতার জনা চারেক। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রে চারবেলা নিয়মিত আড্ডা বসছে। যথারীতি মিঃ পানিকার ও বঙ্কিম বকবক করে চলে, খাঁ সাহেব ফোড়ন কাটেন, আমি শুনে যাই আর বেশ উপভোগ করি, পিল্লাই হঠাৎ কোন কোন দিন উঠে পালিয়ে যায়।

যাবার সময় অবিশ্যি বলেই যায়—দেখি, কেউ একলা বসে আছে কি না।

আমি জানি, জাহাজে একলা বসে থাকার মত তিনজন আছে। একজন আশী বছরের বৃদ্ধা। অপরটি একটি কিশোরী, ওর একটা পা খোঁড়া, হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়। তৃতীয় জন হ'ল, পিল্লাই। প্রায়ই দেখি, হয় ঐ বৃদ্ধা নয়ত ঐ কিশোরীটির সঙ্গে বসে পিল্লাই গল্পগুজব করছে। আর যখন কাউকেই পায় না, নিজেই একলা বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

জানি না, আর সবার কেমন মনে হয়, কিন্তু আমার কাছে ফেরবার পথে জাহাজের দিনগুলি যেন ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে আসতে লাগল। সব কিছুই কেমন যেন পুরনো মনে হয়। হয় ত আমারই দোষ এটা, সব সময় নতুন কিছু খুঁজে বেড়াবার প্রবৃত্তিটা।

সেই একই রকম আড্ডা বসছে, দফায় দফায় খাচ্ছি, পোর্ট এলে চিঠির তাড়া নিয়ে বসছি ও পোর্টে টহল দিতে যাচ্ছি, লাউঞ্জে সেই কালো কফি আর ঘুরে-ফিরে কনসার্টেও সেই একই সুর, রাত্রে নিয়মিত 'হাউসি হাউসি' ও টম্বোলায়, হারছি জিতছি, জাহাজের অর্দ্ধেক লোক যখন 'সি-সীক্‌' তখন আমরা গুটিকয়েক প্রাণী এক ফোঁটাও জলীয় পদার্থ না খেয়ে লবঙ্গ চুষে ডেকের উপর খোলা হাওয়ায় বসে আছি। ফ্যান্সি ড্রেস বলের জন্ম রোজ এক-বার করে ভাবতে বসি কি পোষাক পরা যায়, ক্যাপ্টেন্স ডিনারের জন্ম জিবটাকে শানাচ্ছি, এই ত সেই খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়।

ভূমধ্যসাগর পার হলাম, কিন্তু সুয়েজ খালের যেন শেষ নেই। কবে যে আসবে এডেন, কবে আসবে বম্বে।

১২ই সেপ্টেম্বর '৫৪। আজ ডায়েরীটা খুলে বসেছি। ভাবলাম, আর একবার দেখি, পরিচিতির পাতায় কে কি লিখেছে।

সানরেমোর যার সঙ্গে বাগান দেখেছিলাম, সেই জার্মান ছেলেটি রুডল্‌ফ লিখেছে—যে কয়েক ঘণ্টা আমরা একসঙ্গে রইলাম এর কথা আমি কোনদিন ভুলব না। ইচ্ছে হয়, তোমার কথা, তোমার দেশের কথা অনেক শুনি। কিন্তু তুমি ভাল জার্মান জান না, আর আমি ভাল ইটালীয়ান জানি না। তবু যেটুকু শুনলাম, যেটুকু জানলাম, যেটুকু শিখলাম, তার জন্ম তোমাকে ধন্যবাদ দিই।

মিলানের বান্ধবী সারিরাপিয়া লিখেছে—আমিও এর একটা পাতায় আচড় কাটলাম।

ফিলিপিনের ওরেঞ্জিও লিখেছে—

"I shall pass this way but once! any good therefore that I can do or any kindness that I can show, let me do it now. Let me not defer or neglect i, for I shall not pass this way again."

ইন্দ্র লিখেছে—

Remember! Friendships are like wine—older they are, more precious they become! Go where thy glory take you! But wh rever the glory takes thee don't forget me. Not good-bye but so long!

মিলানের একটি ইটালীয়ান বন্ধু লিখেছে—ভারতবর্ষ আমার কাছে একটি কাল্পনিক সব-পেয়েছির দেশ, যেখানে আমি কখনও যেতে পারিনি। ভাষা, আচার-ব্যবহার সব কিছুই আমাদের থেকে ভিন্নতর। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী ও ঐকান্তিক। সময় চলে যাবে, হয় ত আমাদের আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব মনে গাঁথা থাকবে সব সময়ের জন্য।

সহদেব শুধু লিখেছে—মায়...। আর কিছু লেখে নি। হয় ত বাহ্যিক উচ্ছ্বাসে লিখবার মত মনের আগ্রহটি চাপা পড়ে গিয়েছে।

শিল্পী পানিকার শুধু একটি কার্টুন এঁকে দিয়েছেন।

লেখক বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

পারিস, ভেনিস, রোম সব হলে দেখা
এই কথা বাকি থাকে শেখা—
যেখানেই যাই আমি, আমারেই সঙ্গে নিয়ে যাই,
সে কোন অবাক দেশ, সেই ভার যেখানে নামাই।

যাযাবর লিখলেন—স্মরণের বেলাভূমিতে পরিচিতির ঢেউ কি লেখা লেখে, কি ছবি আঁকে?

বুদ্ধদেব বাবু ও 'যাযাবরে'র সঙ্গে আলাপ এই ফিরতি জাহাজেই।

পুরনো দিনের রোমন্থন মনটাকে উদাস করে দেয় ঠিকই, তবে তারই মাঝে আনন্দও জোগায়। আবার যখন পথে পা দেব, পাথেয় হয়ে রইবে পরিচিতির এই পাতাগুলি। কোন অলস

নেপলসের গলি : ইটালী

মধ্যাহ্নে অথবা কোন কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় এই স্মৃতি-রোমন্থন মনটাকে বহু দূর দেশে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

সমাপ্ত

শিব ওঙ্কার

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রতি কাঁটার পদ্ম হোক বসন্ত-কুসুমানন্দ সুন্দর।
যত বাধা-অশান্তি আলেয়াকান্তি জাদুক ভ্রান্তি অন্তর।

হোক সত্য অমৃত-বন্ধন',
জানি মিথ্যা বেদনা মরণ-চেতনা, মিথ্যা গরল-জল্পনা।
হোক তুফান-ক্লান্ত হৃদয় শান্ত লভি' শ্রীচরণ-বন্দর;
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

ঐ শৈল-বিটপি বীথিকা
গায় ঝরনার সুরে যেমন অদূরে তোমার গগন-গীতিকা,
যেন তেমনি তোমার আলোকঙ্কার দেয় দিশা কোথা অম্বর;
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

যেন জীবনের বাধা বন্ধন,
সাধি' মুক্তিলীলার ছন্দ তোমার ক্রন্দনে রচে নন্দন।
যেন শঙ্কিত প্রাণ শোনে পেতে কান বেসুরারো বুকে মন্থর
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

যুগ যুগান্তরের প্রার্থনা:
আনো দীপান্তরের বুকে রোদনের রূপান্তরের মূর্ছনা
যেন ভয়ঙ্কর হর বরাভয় আনে আনন্দ শঙ্কর!
শুনি' তোমার শঙ্খ ডমরু-ডঙ্ক পঙ্কজ হোক কঙ্কর।

প্রেমের বোধোদয়

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

"শুনি তোমার নাম যে বাজে, রেশমী রেশের ছন্দে
ভোর আরতির ঘণ্টাতে কোন মন্দিরে আনন্দে।
তুমি তো সেই নারী
রূপের কথা কয়েছিল সোনার খাঁচার সারী।
পায়ে চলার পথ যেখানে মাঠের শেষে এসে
থমকে গিয়ে চমকে উঠে কূলের বাঁশে ভেসে,
সূর্য্য ডোবে দূরে
উতলা কালো এলোকেশের গন্ধ হাওয়ায় উড়ে।
রাত দুপুরে চাঁদ উঠে আর কোথায় কোকিল ডাকে,
মক্ষিরাণীর স্বপ্নবিভোর মৌমাছিরা চাকে,
সেই তো, বুলু, তুমি
ঝিঁঝিঁঝিমি নেশায় পাওয়া আবছা বনভূমি।
মোর জীবনের মৃদঙ্গে যে তুমি মধুর বোল
ঘর-ভোলানো দূর সাগরের সুরের কলরোল;
ছিলেম ঘাসে বসে
তাই তো তারা স্বর্গছাড়া পড়লে বুকে খসে।"
তেপান্তরের মায়াপুরীর খোলে ছায়ার দ্বার
বললে বুলু, "রামধনুকের কথার গাঁথো হার?
দেখতে যদি চেয়ে
পাপড়ি-ঢাকা লজ্জা-মাখা সাধারণ এক মেয়ে!
ফোটা ফুল আর ঝরা চাঁদের ইতিহাসের পাতায়
মোর পরিচয় অধিক তো নয়, সত্য করে যা, তাই।
হিয়ায় হিয়া দোলে
উছল রসের প্লাবন বাজে কালের শাসন খোলে।
নতুন-তারার-আলোয়-খোঁজা আধ-বোঝা এই চোখে
আদি কবির ছন্দধারা ফাগুন আদি শ্লোকে,
ওষ্ঠাধরে লিখা
পলাশবনের রাবণচিতার সর্ব্বনাশী শিখা।
কিসের বিষাদ, নিলাজ নিষাদ? মরুক জীবের ভয়,
তরুণ করো করুণাহীন এ হৃদয় মন জয়।
সুন্দর বৈশাখী!
চঞ্চলতার অঞ্চলে নাও এক অকূলে ঢাকি।
বাঁচার মরণ তোমার চরণ, পাই যে জীবন আরো,
আমার ছুটি উঠবে ফুটি, বাঁধতে যদি পারো।
উদয় হলে বোধ
ভালবাসা পাওনা দেনার শুধায় পরিশোধ।
ময়ূরকণ্ঠী ঘোমটা টানে পারের বধূ-বেলা,
তিমির বাসর, সুরের আসর, আগুন সুরার খেলা।
নিঝুম নিশুত রাতে
সৌরভে ঘুম নামবে নিবিড় স্নিগ্ধ শিশির পাতে।"

এক ফোঁটা জল

শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

গত বছর এধারে একবারে বৃষ্টি হয় নি। তার ফলে চাষীর ঘরে ধান তেমন ওঠে নি। দু'চার বিঘা করে যে যা রোপণ করেছিল, তার সব ধানই ঋণ শোধ করতে সুদে আসলে মালিকের মরাইয়ে উঠেছে। খাল, বিল, নদী, নালা সব এর মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আখ আর এবার পোঁতা হয় নি। মুগ, মুসুরীও তেমন হয় নি। এ অঞ্চলে এবার বড্ড জলকষ্ট হয়েছে।

হরিরামপুর গ্রামটির নাম। গ্রামবাসীরা সব গোপ, দিগার, মণ্ডলের দল—চাষবাসই প্রধান জীবিকা। কেবল এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে। সে একটু খাকা গোছের লোক, অবস্থা কিছু ভাল। সামনে গন্ধেশ্বরী নদী চলে গেছে। ছোট নদী, মানুষ-ঘেরা নদী। একে মরা নদী; তার উপর গত বছর বর্ষা না হওয়ায় বেচারা একবারও কাঁপতে পায় নি, গতবার বেচারার জীবনে বসন্তের ছোয়াচটুই লাগল না। দারোকেশ্বর নদের সঙ্গে এর যোগাযোগ রয়েছে। দারোকেশ্বরে বান এলে, তার আঁচ পাওয়া যায় এতেও। বর্ষায় বান এলে সে জলের রেশ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ক্ষীণ আকারে থাকে। চাষীরা স্রোত টেনে টেনে এক এক জায়গায় বালি তুলে পাড়ে শালগাছের ডাল বেঁধে ছিচ চালায় বা দনি লাগিয়ে জল তুলে গন্ধেশ্বরীর পাড়ের বালিমাটির জায়গায় জায়গায় গুনা চাষ করে। তাতে কোন রকমে চাষীদের চলে যায়। বড় গৃহস্থের মোটা আয়ও হয়। এবার সে সবের বালাই নেই। বালি তুললেও এক ফোঁটা জল নেই। কি রোদের তেজ—ঘর থেকে বেরোন দায়। চাষীরা সব গালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

কেষ্ট বললে, বউ আজ আর শরীর বয় না—আজকের মত চাল আছে?

বউ মতিসুন্দরী বললে, ওকথা বলে আর লজ্জা দাও ক্যানে, সবাই ত জান।

কেষ্ট আর কথা না বাড়িয়ে বললে, তা হলে যাই—আর পারি না বাপু। বাউরি মালদের কাজ কি চাষীদের দ্বারা হয়। আর মুখুজ্জেও হয়েছে সেই রকম। বার আনা চুয়া (চৌকা) মাটি কেটে কে কবে পরিবারের আর নিজের দুটো লোকের পেট চালাতে পারে। সারাদিন মাটি কাটলেও চৌদ্দ আনা এক টাকার বেশী রোজগার নেই।

হঠাৎ কেষ্টর মুখে চোখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, হাঁ গো বউ চল্ ক্যানে আমার সঙ্গে?

বউ সুন্দরী বললে, কুথা গো?

—মাটি কাটতে। আমি কাটব, তুই বইবি। এ দুর্ভিক্ষের বছরে সবাই ত মেয়ে মরদে মুখুজ্জের মরা পুকুরে পাঁক তুলতে যাচ্ছে।

সুন্দরী বললে, আমি লারব।

—লারব ক্যানে, চল না; দু'দিন কাটব, একদিন বিশ্রাম লুব। তা ছাড়া মুখুজ্জেও কাল বলছিল।

—কি বলছিল?

কেষ্ট বললে, বলছিল বউকে আনিস নেই ক্যানে? দু'জনে মাটি তুললে বেশী পয়সা পাস।

সুন্দরী বললে, বেশী রোজগার হয় না গো? সোমত্ত বউ মাটি কাটবে, ঝুড়িতে করে পাহাড়ে তুলবে তা দেখতে তা হলে মুখুজ্জের বেশ লাগবে, না—তুমি কিন্তু আমার বড় সোহাগের সোয়ামী হয়েছ।

কেষ্ট বললে, তবে থাক। আজ ধার করে এ বেলা চাল আনিস, বৈকালে শোধ দেব। কেষ্ট হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

সুন্দরী ডাকল, এই, ওগো শুনছ।

—কি বলছিস?

সুন্দরী হাত নেড়ে ডাকল।

কেষ্ট কাছে এসে দাঁড়াল। সুন্দরী বললে, আমি যে বলেছিলাম তার কি হ'ল? পাশের গাঁয়ের জাত ভাইরা সব অবস্থা ফাপিয়ে ফেলেছে। শুনছি কেউ কেউ কোঠা বাড়ী তুলেছে। এ গাঁয়েও ত হরিঠাকুরপোর সংসার বেশ চলছে।

কেষ্ট কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল, দূর ও আমি পারব না। জল-মিশান কাজ আমার দ্বারায় হবেক নেই।

—হবেক নেই ক্যানে, সবাই পারলে তুমিই বা পারবে নাই ক্যানে? কেষ্ট কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। সুন্দরী মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল।

পাশের গ্রামের চাষী গোপরা অনেকেই দুধের ব্যবসা ধরেছে। কেউ বা ধার করে গাই কিনেছে, কেউ বা পরের কাছে দুধ কিনে জল মিশিয়ে শহরে বেচতে যাচ্ছে। শহরের মোহ পেয়েছে তাদের, শহর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। লাভও কম নয়। দু' সের খাঁটি দুধ, তার সঙ্গে আধ সের তিন পোয়া জল মিশালেও চলে। মোষের দুধ হলে ত কথাই নেই। বটের ক্ষীরের মত পুরু দুধ। দু' সের দুধে তিন পোয়া জল মিশালেও কেউ ধরতে পারে না। বার আনা দশ আনা সের। চাই কি, সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সাইকেল কিনেছে, দুধের ড্রাম কিনেছে। লাঙল, কাস্তে

ফেলে সাইকেলে চেপে ড্রামে দুধ ভর্ত্তি করে শহরে চলেছে। অফিসের বাবুরা তাদের আশায় বসে আছে। দুধ না এলে বাবুদের সকালে চা খাওয়া হয় না, দোকান বন্ধ, বাচ্চাদের কান্না বেড়ে ওঠে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, পাশের গাঁয়ের চাষীরা চাষ ছেড়ে দেবে, দুধের ব্যবসাই এবার সকলে করবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কেষ্টকে এত করে ক'দিন ধরেই বলা হচ্ছে, সে ও কথায় কান দিচ্ছে না। মনের মত স্বামী না হলে মেয়েদের এমনি দুঃখই হয়। আবার বলা হচ্ছে, চাষীরা কি চাষ ছেড়ে দুধ বিকতে পারে—জমি মা লক্ষ্মীকে ছেড়ে অন্য জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাবে?

তা ছাড়া তাদের জমি মা লক্ষ্মীই বা কই? নিজের বলতে ত মোটেই বিঘা দুই যোল জমি। তাতে ক'মাস যায়? ভাগ চাষ নইলে গতি নেই। গ্রামের আশেপাশের সব জায়গাই ত বাইরের লোকদের; শহরের বাবুদের কাছে অনেক খোশামোদ করে ভাগে নিতে হয়, আর হরি মুখুজ্জের যা বিঘা ত্রিশেক জমি আছে। কিন্তু সত্যি যারা মাটির একান্ত বন্ধু, যারা মা বলে জানে মাটিকে তাদের ত ঐ দু'চার বিঘা কি খুব জোর আট-দশ বিঘার বেশী জমি নেই।

কেষ্ট কি দিয়ে এবার চাষই বা করবে? বলদগুলি ত কঙ্কালসার হয়ে গেছে—এক ফোঁটা জল নেই, ডাঙ্গায় ঘাসের চিহ্ন নেই, বাঁধে নদীতেও জল নেই। অন্য বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর ঝড় হ'ত, জল হ'ত মাঝে মাঝে। কচি কচি ঘাস গজাত, সিরিস গাছের ফল পড়ত। গরুগুলি খেয়ে বাঁচত। এবার কি ও গরু নিয়ে চাষ করা যাবে?

সুন্দরী আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। কিন্তু ভাবলে আর কি হবে? বুড়োরা বলছে এর যা হোক একটা বিহিত করতে হবে।

রাতও একটু হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে রাত আটটা অনেক রাত বইকি। বাজে কাজে কেরোসিন আর কে খরচ করে, দু'পয়সার কেরোসিন হলেই এক রাত চলে যায়। দিনের ভাতই জল দেওয়া থাকে—রাত্রে আলু পেঁয়াজ ভাজা আর ভাত খেতে যা কেরোসিনের ডিবেটা দরকার হয়। তার পর সকলে গরমের রাতে উঠানে তালাই কি খুব জোর মাদুর পেতে কি কখনও বা 'সিজ' (বিছানা) পেতে শুয়ে পড়ে। আজ সেই যে সকালে কেষ্ট গেছে এখনও ফেরার নাম নাই—সুন্দরী ঘর বার করছে।

গরমও পড়েছে ছাই সেই রকম। আষাঢ় এল, অন্য বছর এত দিন বীজ ধান ফেলা হয়েছে। একবার করে লাঙ্গল দেওয়া হয়েছে জমিতে। এবার তাও এখনও হয় নি।

কিন্তু কেষ্টর হ'ল কি? আ, কি পাখিটা এত 'কুক' 'কুক' করে কদম গাছটায় ঠুকরে চলেছে। 'ফটিক জল, ফটিক জল' বলে ওটা আবার এত চেঁচায় কেন? মর মুখপোড়া—জল, জল—পাখি কোথা, দেবতা যে কাণা দেখতে পায় না, তার দৃষ্টি এবার গেল।

বাইরে থেকে কেষ্টর গলা শোনা গেল।

সুন্দরী বললে, এত রাতে আসা ক্যান—ঘরের কথা কি মনে থাকে নাই?

কেষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, জানিস শহরের রায় বাবুদের বাড়ী গেছলাম, দশ বিঘা জমি ভাগ চাষ করব ঠিক করে এলাম।

—এাই?

—এই লয়—মুখুজ্জের সঙ্গে সলা পরামর্শ করলাম, কৃষি-লোনের জন্যে দরখাস্ত করব।

সুন্দরী বললে, বলি চাষ ত করবে তা ধানের কিছু করলে? কি দিয়ে চাষ হবেক? মুনিস, মাহিন্দার চাই না—ধান চাই না?

কেষ্ট বললে, রায় বাবু বললে, ধান ত মরাইয়ে নাই তবে কিছু টাকা দেব। কি করি বল্ এবার দেড়া সুদেও কেউ ধান ধার দিচ্ছে না।

সুন্দরী বললে, তবে চাষ ছাড়। হাড়সার গরুগুলি দিয়ে চাষ হবেক নাই—পরিশ্রমই সার। আর ও মুখুজ্জে মিনসের কথার কোন দাম আছে—বুড়া বয়সে ওর ভীমরতি ধরেছে।

মুখুজ্জে—আর মুখুজ্জে। মুখুজ্জের নাম করলে সুন্দরী জ্বলে ওঠে। কিন্তু যুগোপযোগী মানুষ মুখুজ্জে, অদ্ভুত মানুষ। সে গ্রামের সকলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, আবার প্রয়োজনে সকলের যেন নিকট আত্মীয়। আজ যে তার ত্রিশ-চল্লিশ বিঘা জমি আছে, সে ইতিহাসও অপূর্ব্ব। গাঁয়ে দলাদলি হয়েছে, কীর্ত্তন হয়েছে, পূজা-পার্ব্বণ হয়েছে—মুখুজ্জে তার পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক-জনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লেলিয়ে দিয়েছে। ঝগড়াঝাটি, মারামারি, মোকর্দ্দমা লেগেছে তাদের মধ্যে। আর মুখুজ্জে এক পক্ষকে টাকা দিয়ে পলতে উস্কিয়েছে—ফলে জমি এসেছে তার হাতে। প্রয়োজনে গাঁজা, মদও খেয়েছে কিন্তু নেশা তাকে বশে আনতে পারে নি। এ সব খেয়েছে বিশেষ কারণে; কেবল জমি মা লক্ষ্মীকে ঘরে আনবার জন্যে।

মুখুজ্জে বলে, জমি লক্ষ্মীকে আনতে গেলে একটু এ মোড় ও মোড় না ঘুরে সোজা রাস্তায় গেলে সে আসবে কেন?

সে যে কষ্টের জিনিষ—বড় আদরে মা আমার।

কিন্তু প্রকৃত রূপ তার ধরা পড়ে নি। এক জনকে গ্রাস করে, আবার নতুন কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে।

সুন্দরী বলে, লোকটার এর চেয়েও আর একটা খারাপ দোষ আছে—লোকটা একটু উপরচোপো। নিজের কন্যা বড় হয়েছে, দু'দিন পরে জামাই আসবে তবু আর স্বভাব বদলাল না। মর, মর হতভাগা। আমাকে শুদ্ধ ইসারা করে মিনসে।

ও-বেলায় ভিজে ভাত খেয়ে কেষ্ট উঠছে—বাইরে হরি দিগার ডাকলে, কেষ্ট আছ, বৌঠান রইছ?

সুন্দরী একটা চাটাই পেতে দিয়ে বলল, বসো ঠাকুরপো—বসো। কেষ্ট বললে, কি খবর হরি?

হরি কোনরূপ ভণিতা না করে বললে, গতবার চাষ হয় নাই—এবারও আবার হবার আশা নাই। মরা আকাশ, একবিন্দু জলা-মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই—কেবল সাদা সাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ।

আষাঢ় মাসের আজ বারো দিন চলছে; বীজ ফেলা হ'ল না এবার। ঠায় দাঁড়িয়ে মরতে হবেক।

কেষ্ট বললে, কপাল রে ভাই—আর বিধাতার হাত।

হরি বললে, গুহ বাবুরা আর একটা দোকান খুলেছে। আরও দুধ চাই, তুমি আমার সঙ্গে দুধ নিয়ে চল না।

কেষ্ট অন্যমনস্কভাবে বললে, হাঁ রে হরি, কেমন লাভটাভ হয়?

হরি বললে, মন্দ হয় না—এই তো ছাতনার জান্ত ভাইরা দালান তুলেছে।

সুন্দরী অবাক হয়ে বললে, সত্যি ঠাকুরপো?

হরি বললে, বিশ্বাস না হয় কেষ্ট যেয়ে এক দিন দেখে আসুক।

সুন্দরীর মনে ঝড় উঠল। এক নিমেষে সে দেখতে পেল তার স্বামী চলেছে মাথায় ঝুড়ির উপর দুধে ভর্ত্তি ভার নিয়ে শহর অভিমুখে। মুসলমান ব্যবসায়ীরা এসে বলদ দুটো দু'কুড়ি পাঁচ টাকায় কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কেষ্ট বলছে দূর ছাই, সে কি আগে জানত—তা হলে কতদিন চাষ ছেড়ে দিত। আজ সেও কোঠা-বাড়ী তুলতে পারত, হয়ত সাইকেলও একটা কেনা হ'ত।

সুন্দরী বললে, ঠাকুরপো আমি বলছি তোমার দাদা কাল থেকে যাবেক।

হরি বললে, তা হলে আমি আজ উঠি—কাল বিকাল থেকে কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

হরি চলে গেলে কেষ্ট বললে, বউ এ কি করলি—শেষকালে চাষীর ছেলে হয়ে আমি চাষ ছাড়ব?

সুন্দরী রাগতস্বরে বললে, না, উপোষ দিয়ে মরবে।

কেষ্টর মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, বড় অশ্বত্থ গাছটার প্রাণটুকু যেন কে এক নিষ্ঠুর হঠাৎ নিয়ে নিল।

তালাই পেড়ে কেষ্ট শুয়ে পড়ল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিছানায় একটু শুতে না শুতেই চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে এল। সুন্দরীও গৃহস্থালীর কাজ সেরে লম্ফটা ফু দিয়ে নিভিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে কেষ্টকে নড়িয়ে সুন্দরী বললে, ওগো শুনছ।

—হু।

সুন্দরী বললে, তুমি রাগ করেছ কি?

—না।

—আমি একবার বাইরে যাচ্ছি, তুমি একটু জেগে থেকো।

—দাঁড়িয়ে থাকব কি?

—না, আমি যেতে পারব।

সামনে একটু জায়গা তালপাতা আর বাঁশ দিয়ে ঘেরা। ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। সুন্দরী যেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, পেছন থেকে একটা বলিষ্ঠ হাত এসে তার ডান হাতটা চেপে ধরল।

—কে?

—চুপ, আমি গো আমি···।

—আমি···আমি কে···?

বলিষ্ঠ হাতখানা উঠে গেল সুন্দরীর মুখের উপর। মুখ টিপে বললে, আস্তে—আমি মুখুজ্জে—তোমার রূপের কাঙাল।

সুন্দরী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল কিন্তু তা নিমেষের জন্য। তার পর সে হাতখানা চট করে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, দূর, দূর মুখপোড়া—ঝাঁটিয়ে বিষ দাঁত ভেঙে দোব। ওগো শুনছ?

ভিতর থেকে শব্দ এল, কি?

—একটু কাছে এসে দাঁড়াও ত।

মুখুজ্জে ছুটে পালিয়ে গেল। কেষ্ট বাইরে এসে বললে, কার সঙ্গে চেঁচাচ্ছিস রে?

সুন্দরী বললে, একটা হাড়ী-খেকো কুকুর তেড়ে এসেছিল—তাই দূর দূর করছিলাম।

রাত আর বোধ হয় বেশী নেই। দু'একটা পাখী ডাকতে আরম্ভ করেছে, আর দু'তিন ঘণ্টা রাত আছে। কিন্তু কেষ্টর আর ঘুম ধরল না। সারাদিন রোদে ঘুরে আর তামাকের চুটি টেনে মাতটা চড়া হয়ে গেছে। নানা রকম চিন্তা এসে ঘিরে ধরল তাকে। রাত কাটলে তার পক্ষে অশুভ দিন খবর নিয়ে আসবে, বলবে, ওরে আর চাষ নয়—দুধ বিকতে চল। হায়রে, অত বছর এতদিন জলে-ভেজা মাটির একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়েছে। দু'একটা চিল, কাক, বোনা, শালিক পাখী কেঁচো আর সোদা পোকা ঠোঁট দিয়ে ধরছে। জল পড়ছে কখনও জোরে, কখনও আস্তে। এ ধারে বলে ছাগলতাড়া জল হচ্ছে—কখনও বৃন্দাবনি বর্ষণ হচ্ছে, কখনও ধারা নেমেছে। হায় দেবতা! বুড়োরা বলছে, আর দু'একদিন দেখে অষ্ট প্রহর হরিনাম করবে—যদি বৃষ্টি-দেবতা প্রসন্ন হন।

উঃ, কি অসহ্য গরম—ঘরে টেকা দায়। কেষ্ট বাইরে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর হঠাৎ তার মনে হ'ল যেন শীতল বাতাস বইছে, যেন সামনের থেকে কি একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। কেষ্ট এগিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল—হরি, নিবারণ, সতীশ কে কোথায় আছিস, ওরে দেখবি।

প্রত্যেকের দরজায় দরজায় কেষ্ট গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল, উঠ রে, উঠ—গন্ধেশ্বরীতে বান এসেছে।

দেখতে দেখতে গ্রামখানা কোলাহলমুখরিত হয়ে উঠল। গন্ধেশ্বরীতে হড়পা (হঠাৎ) বান এসেছে। বান ক্রমশঃ বাড়ছে। অত কোথায় বোধ হয় জোর বৃষ্টি হয়েছে, তারই চিহ্ন নিয়ে শুভ সংবাদ বহন করে এনেছে গন্ধেশ্বরী। মরা গন্ধেশ্বরী এবার নাচছে, দুলছে, আমোদে খেলা করছে।

কেষ্ট বললে, তোরা দেখছিস কি—কোদাল, ঝুড়া নিয়ে আয়। পাহাড় দিয়ে গন্ধেশ্বরীকে বেঁধে জমিতে জল নিয়ে যেতে হবেক।

বুড়ো হরিহর বললে, একটু অপেক্ষা কর বাবা—সকাল হউক; জলের টান একটু কমুক, তখন পাহাড় বাঁধার ব্যবস্থা করিস।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হ'ল না।

সতীশ সকলকে সজাগ করে চেঁচিয়ে বললে, আকাশটা পানে চেয়ে দেখ—কেমন ধরে আছে।

বিদ্যুৎক্ষণের মধ্যে সারা আকাশটা কাল হয়ে উঠল। গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডেকে উঠল—গুর-গুর-গুর-গুর।

কোথায় যেন বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে না ?

কেষ্ট বললে, আমার গায়ে এক ফোটা জল পড়েছে যে।

কিন্তু বিরহকাতরা মেয়ের সলজ্জ চোখের কান্নার মত ফোটা ফোটা জল কেন ? না, না, এক ফোটা, দু'ফোটা জল নয়—এবার আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল।

কেষ্ট ছুটে এল। সসব্যস্ত হয়ে ডাকল, বউ কোদালটা দে—জমির আল (আইল) বাঁধতে যাব।

সুন্দরী কেষ্টর ডান হাতটা চট করে ধরে বললে, সকাল না হলে তোমায় যেতে হবেক নাই লক্ষীটি।

কেষ্ট সুন্দরীকে হড় হড় করে বাইরে টেনে নিয়ে এল। বললে, বউ বছরের প্রথম জল—ভিজ—ভিজে নে।

বহু-প্রত্যাশিত বৃষ্টির ধারা তাদের সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়ে পরিষ্কার করে দিতে লাগল।

সুন্দরী বললে, তোমায় আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে চাষীকে চাষ ছাড়তে বলে ভুল হয়েছে গো।

কিন্তু তখন কে কার কথা শুনে। অশ্রান্ত মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ আর বাজ পড়ার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

কীটসের প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

মাতা দিল মৃত্যুরোগ কাল যক্ষ্মা বিষ
পিতা দিল দারিদ্র্য চরম,
শেলী দিল পাশে ঠাঁই, দিল শুভাশিস
হাণ্ট দিল বন্ধুত্ব পরম।

হৃদয় সঁপিল ক্যানী তব শীর্ণ হাতে
চ্যাপম্যান হোমারের স্বাদ
সেভার্ণ করিল সেবা মরণ শয্যাতে
ল্যাম্ব তোমা দিল সাধুবাদ।

স্বদেশ তোমারে দিল ব্যথা অনাদরে
লকহার্ট বিষশর হানি,
কল্পনা বৈভব দিল গ্রীস অকাতরে
রোম দিল চির শয্যাখানি।

বিধাতা তোমারে দিল দুর্ল্লভ অজেয়
কবিশক্তি দিব্য অনুপম,
সেই সঙ্গে দিল স্বল্প আয়ুর পাথেয়
শরদভ্রে ইন্দ্রধনুসম।

প্রকৃতি তোমারে দিল তৃতীয় নয়ন
সত্য শিব সুন্দরে হেরিতে,
অসীমে যাত্রায় দিল মহাকাল স্থান
সনাতন সোনার তরীতে।

আমি বাঙ্গলার কবি বিংশ শতাব্দীর,
তবু আমি সগোত্র তোমার।
স্মরিয়া তোমার ঋণ নত করি শির
প্রণিপাত দিনু লক্ষ বার।

শেলীর প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

মহাসিন্ধু ছাড়া কেবা তোমার সে বিরাট আত্মারে
বহিতে, সহিতে কিম্বা ধরিতে বা পারে ?
তাই তারি মাঝে আত্মা হইল বিলীন
তাহারি অসীমে তব ধ্বনিতেছে বাণী নিশিদিন।

মহাকাল তব সৃষ্টি বৈজয়ন্ত রথে
নিয়ে গেল যুগে যুগে দেশে দেশে অনন্তের পথে।
অমর হইয়া আছ সৃষ্টির মাঝারে,
ডুবিবে না, ভাসিবে তা নিত্যকাল কাল পারাবারে।

অস্থিমাংসময় দেহ তরঙ্গ ঠেলিয়া দিল কূলে
গৃধ্রের আহার্য্য ভাত, বাইরনও যায় নাই ভুলে
খুঁজে নাই তাই শবাধার
করিল অনল যোগে তারে ভস্মসার।

সুন্দরের বৈতালিক অসুন্দর অসহ্য তোমার।
পাছে ব্যাধি জরা শোক করে অধিকার,
সে শঙ্কায় তনু তব যৌবন শোভন
অনন্ত-যৌবনসিন্ধু—ঊর্ম্মি করে করিলে অর্পণ।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৌদ্ধ চিন্তা

শ্রীস্মরণকুমার আচার্য্য

ভগবান বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী এক অপরূপ শিল্প-সুষমার পরিমণ্ডলে স্থাপিত। ধর্মপ্রচারক বুদ্ধদেব খণ্ডিত, সীমায়িত। আপন সম্প্রদায়ের সীমার মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশের যে পথগুলি তিনি নির্দেশ করেছেন, সর্বকালে সর্বদেশে সেগুলির মূল্য সম্বন্ধে হৃদয়বান মানুষ সন্দেহাতীত।

রাজভোগ বিলাসের মোহময় জালাবরণ ছিন্ন করে বুদ্ধদেব যেদিন জন্মমৃত্যু-সমাকীর্ণ এই বিশ্বের পটভূমিতে এসে দাঁড়ালেন সেদিন তাঁকে সর্বাধিক পীড়িত করেছিল মানবাত্মার দুঃসহ অবমাননা। তাই বুদ্ধদেবের সাধনার মূল কথাই হ'ল মানুষকে তার আত্যন্তিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা; দুঃখ, জরা আর পশুত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে পরম সত্তায় উন্নীত করা—এই ত মুক্তি—নির্বাণ। দীর্ঘ সাধনায় মানব-মুক্তির মন্ত্র লাভ করলেন তিনি—মৈত্রী, করুণা, প্রেম। লোভ, হিংসা, দ্বেষ আর স্বার্থপরতা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে খণ্ডিত করছে, বিদ্ধ করছে, আকর্ষণ করছে অতলস্পর্শ অন্ধকারের গহ্বরে যেখানে মানুষ পশুর সঙ্গে এক বন্ধনে বাঁধা।

ভগবান তথাগত চাইলেন এই ভয়াবহ দুঃখের অন্ধকূপ থেকে মানুষকে মৈত্রী, করুণা আর প্রেমের জ্যোতির্লোকে নিয়ে যেতে। তিনি অষ্টমার্গের নির্দেশ দিলেন—সততাই যার মূলকথা। অষ্টমার্গের প্রতিটি মার্গই একান্ত ভাবে মানবিক মূল্যে সমৃদ্ধ।

যত সহজে এ পথের কল্পনা করা যায় তত সহজে পৌঁছান যায় না সেখানে। এর জন্য মূল্য দিতে হয়। ব্যক্তি-জীবনের অশেষ কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব দেখালেন এ পথে যেতে হলে চাই আত্মত্যাগ, চাই দুঃখবহনের সীমাহীন শক্তি। বৌদ্ধ জাতকের পাতায় পাতায় অসংখ্য আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল কাহিনী এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। বুদ্ধদেব কোন অলক্ষ্য অরূপ দেবতার সাধন নির্দেশ দেন নি। পুষ্পাঞ্জলী দিতে বলেন নি কোন কাল্পনিক দেবতাকে। এই পৃথিবীর ধূলিধূসরিত মানুষকেই তিনি দেবতার সীমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কেবল ভাবজগতের উন্নয়নই সবটুকু নয়, বস্তুজগতেও মানুষকে বিকশিত হতে হবে পরিপূর্ণ রূপে। সুন্দরের সাধনাই মানুষকে জড়জগতের জীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়। তাই ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের অধ্যায় শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞবত্তায় শীর্ষস্থানীয় হ'য়ে আছে। অগণিত বুদ্ধমূর্তি, স্তূপমালা, স্তম্ভ ভারতের নানা প্রান্তে আজও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, শিল্প আর সুরুচির জয় ঘোষণা করছে। বৌদ্ধযুগের বৈভবের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগের সেই বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোন কালে হয় নাই।"

কাল-বিচারে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে বৌদ্ধযুগ থেকে। আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্যে এসেছেন অগণিত চিন্তানায়ক মনীষী। তাঁরা বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বাণী। আজ মানুষ বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতিকে অনায়াসে আয়ত্তে এনেছে। কিন্তু নিপীড়িত মানবাত্মার সমস্যা আজও তেমনি আছে। লোভ, হিংসা আর স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নামমাত্র মূল্যে মনুষ্যত্বকে বলি দেয় মানুষ। রবীন্দ্রনাথ কবি। মানবাত্মার এই ক্লীবতা, এই সঙ্কীর্ণতা ব্যথিত করেছে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ কবিমনকে। তিনিও চাইলেন, প্রতিটি মানুষকে স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে।

আগেই বলেছি বৌদ্ধদর্শনের গভীর তাৎপর্য যাই হোক বৌদ্ধধর্ম মানবতার ধর্ম। মানুষকে কেন্দ্র করেই তার সূচনা এবং শেষ হয়েছে। আর যে পথ ধরে সে এগিয়ে গেছে সে পথ সুন্দরের পথ, শিল্পের পথ। কবিও সুন্দরের সাধক। কিন্তু নিরবলম্ব সৌন্দর্য্য-সাধনা কবির নয়। এই পৃথিবী, এই মানুষ কবির সাধনপীঠ। তাই কবিও চান মানুষকে বরণীয় করে তুলতে।

একান্ত অবশ্যম্ভাবী কারণেই বৌদ্ধ জীবনাদর্শ, বৌদ্ধচিন্তা, বৌদ্ধ শিল্পসংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্ত। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন রুচি আকর্ষণ করেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে। তাই দেখি কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে নানা ভাবে বৌদ্ধ-চিন্তাকে রূপদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মপ্রচারক কিম্বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব কবিকে আকর্ষণ করে নি। সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগের অলক্ষ্যে, সূক্ষ্মদেহে রসসঞ্চারের মত যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভারতবাসীর অন্তরলোককে পরিশুদ্ধ করছে রবীন্দ্রনাথ তারই উপাসক। তিনি বলেছেন—

"সিনেমা ছবিতে, গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে ত ক্ষণকালের বুদ্ধ; সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে বসে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তি প্রেমের অর্ঘ্যে অলঙ্কৃত হয়েছেন তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগ-যুগান্তরের পটে আঁকা হয়ে চলেছে।"

বৌদ্ধধর্মের জটিল দর্শনতত্ত্বে কবি-মন সায় দেয়নি। কিন্তু তার

সর্বব্যাপ্ত মানবপ্রীতি রবীন্দ্রচিত্তকে আলোড়িত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালো মন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে, তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ।"

আত্মত্যাগের এই মহান বাণী কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। হিংসাকে অস্ত্র দিয়ে জয় করা যায় না, জয় করতে হয় প্রাণ দিয়ে—মনে প্রাণে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যকে বিশ্বাস করতেন। তাই বৌদ্ধ জাতকের আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের গল্পগুলিকে নানা ভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁর কাব্য-নাটকে।

সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুসন্ধান করলে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধকাহিনী বিষয়ক রচনার সংখ্যা হবে সুপ্রচুর। কাব্য নাটক, প্রবন্ধ সর্বত্রই নানা ভাবে বুদ্ধের কল্যাণময় করুণাবাণীকে সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করেছেন কবি। এমনকি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনার মধ্যেও বৌদ্ধ আদর্শের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্ত গঙ্গোত্রী ইহার উদ্ভব।"

রবীন্দ্রকাব্যে বৌদ্ধ-প্রভাবিত কবিতা প্রচুর। এইগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলে। ভাগ দুটি যথাক্রমে বৌদ্ধ-কাহিনীমূলক এবং বুদ্ধ প্রশস্তিমূলক।

বৌদ্ধকাহিনীমূলক কবিতাগুলির উৎস রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় একখানি ইংরেজী গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানি থেকে একাধিক কাহিনী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটি কবির স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে নবরূপ ধারণ করেছে।

'কথা ও কাহিনী'র যুগেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক বৌদ্ধকাহিনী-মূলক কবিতা রচনা করেন। এর কারণও খুব স্পষ্ট। 'চৈতালি' থেকেই রবীন্দ্রকাব্যে একটি নূতন সুর ধ্বনিত হয়েছে। বর্তমান বাস্তব জগতের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে কবি প্রাচীন ভারতের মহৎ জীবনে প্রবেশ করেছেন। 'কল্পনা' আর 'নৈবেদ্যে' এই সুর আরও স্পষ্টতর। ভাবলোকে কবি ভারতকে ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে দেখেছেন, জীবনেও চাই তার প্রতিফলন। তাই কবি মুখ ফিরিয়েছেন বৌদ্ধ-কাহিনীর দিকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এক সময় আমি যখন বৌদ্ধকাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারার উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।"

১৩০৪ সাল থেকে ১৩০৬ সালের মধ্যে তিনি যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, পূজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠকাহিনী কাব্যগুলি রচনা করেন। আত্মত্যাগ, দুঃখ-জয়ের মহান আদর্শে এই খণ্ড কাব্যগুলি সমুজ্জ্বল। কাহিনীগুলির মধ্যে মহৎ জীবনাদর্শের বাণীটি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে সহজেই স্পর্শ করেছিল। তাই কবি-হৃদয়ের সহানুভূতি লাভ করে কাহিনী-গুলি নবজন্ম লাভ করেছে। এগুলি মহৎ জীবনের চিত্রশালা। কাহিনীগুলির কাব্যরূপেই কবি সন্তুষ্ট থাকেন নি, পরবর্তী কালে এর অনেকগুলিকেই তিনি নাট্যরূপ দান করেছেন।

বুদ্ধ প্রশস্তিমূলক কবিতাগুলির অধিকাংশই কবির শেষ বয়সের রচনা। যুদ্ধ-পীড়িত বিশ্বে মানুষের হাহাকার রবীন্দ্রনাথকে কাতর করে তুলেছিল। হিংসার ঘাতপ্রতিঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য কবি স্মরণ করেছেন ভগবান তথাগতের করুণা আর মৈত্রীর বাণী। ভিক্ষু, বোরোবুদুর, সিয়াম, বুদ্ধদেবের প্রতি, বুদ্ধ-জন্মোৎসব প্রভৃতি কবিতাগুলি পরিশেষ (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বুদ্ধভক্তি নবজাতক কাব্যগ্রন্থে এবং পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের সতের সংখ্যক কবিতা 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটির রূপান্তর। বোরো-বুদুর, সিয়াম প্রভৃতি কবিতাগুলি যাভা ভ্রমণ কালে বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে লিখিত। বোরোবুদুরের অপরূপ শিল্পকলা আজও মানুষের অন্তরে বুদ্ধের অমর প্রেমবাণীর সাড়া জাগায়। তাই কবি বলেছেন:

"কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমের প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"

সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহারের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত 'বুদ্ধ-দেবের প্রতি' কবিতায় হিংসাজীর্ণ বিশ্বে বুদ্ধের অমৃতবাণী আহ্বান করেছেন—

'চিত্ত যেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিত আয়ু
আয়ু কর দান।'

বুদ্ধভক্তি কবিতায় বর্তমান বিশ্বের বুদ্ধপূজারীদের কবি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করেছেন। বুদ্ধদেবের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে আজ মানুষ চলেছে প্রাণ হনন করতে। বুদ্ধ-বাণীর এই চরমতম পরিহাস কবিকে বেদনা দিয়েছে।' তাই তীব্র বিদ্রূপবাণ হেনেছেন কবি। 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় ভূমিকায় কবি লিখেছেন:

"জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানী সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্কলন থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনীগুলির কাব্যরূপ দান করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে নাটকীয়তার আভাস তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন। কবি নিজেই বলেছেন:

"এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটি মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।"

কাব্যায়িত বৌদ্ধ-কাহিনীগুলির অনেকগুলিকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নাট্যে এবং নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন।

বৌদ্ধ-কাহিনী অবলম্বনে কবির প্রথম নাট্যসৃষ্টি 'রাজিনী।'

নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের 'মহাবস্তু অবদানে'র অন্তর্গত একটি কাহিনী নাটকটির মূলে আছে। কবি-প্রতিভার স্পর্শে এই কাহিনীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে বিস্তর। মালিনী রচনা কালে (১৩০৩) কবির মনে চলেছে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধ। প্রকৃত ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের কোন্ আদর্শ মানবের পালনীয়? অনুভূতিহীন, রসহীন আচার-সর্ব্বস্বতাই কি ধর্ম্মের স্বরূপ? এই সময়ের একাধিক কাব্যনাট্যে কবি এই সমস্যার সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।১

ক্ষেমংকর সনাতন ধর্ম্ম আচারকেই পালন করে চলেছে। তার হৃদয়ে দুর্ব্বল অনুভূতির কোন স্থান নেই। কিন্তু তারই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সুপ্রিয় অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। ধর্ম্মের প্রাণহীন আচার-আচরণ তাকে বিড়ম্বিত করেছে। মালিনী সত্যধর্ম্মের উপাসিকা। কি এই সত্যধর্ম্ম? এই সত্যধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের ছদ্মবেশ তাতে আর সন্দেহ থাকে না। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবকল্যাণ ও হৃদয়াবেগের ধর্ম্ম। মালিনীর ধর্ম্মও তাই। নারী ধর্ম্মসাধনায় অপাংক্তেয় নয়। কর্ম্ম-জীবনের মত ধর্ম্মজীবনেও নারী পুরুষের কল্যাণ-লক্ষ্মী। যেখানে তাদের দূরে রাখা হয়েছে সেখানেই ঘটেছে অনর্থ। সুজাতার অন্নেই একদিন গৌতম প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

১৩১৭ সালে প্রকাশিত 'রাজা' নাটকখানিও বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে লেখা। বৌদ্ধসাহিত্যের কুশজাতক কাহিনী নাটকটির উৎস। বাইরের রূপ-বৈভব দিয়ে সুদর্শনা পেতে চেয়েছিল রাজাকে। কিন্তু ব্যর্থ হতে হ'ল। তার পর সুরু হ'ল অন্তর-লোকের সাধনা—ধরা দিলেন রাজা।

রূপ-অরূপের এই তত্ত্বটি রবীন্দ্র-দর্শনের মূল কথা। মানসীর যুগ থেকেই কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপলোক পার হয়ে ইন্দ্রিয়াতীত রূপের সাগরে ডুব দিতে চেয়েছেন। উল্লিখিত বৌদ্ধকাহিনীতে কবি সমর্থন লাভ করেছেন তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা। রাজা নাটক সম্বন্ধে কবির মন্তব্য:

"অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, সে প্রভু কোন বিশেষরূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই। যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এই নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

বৌদ্ধ জীবন-জিজ্ঞাসার মৌলিক সত্যটিও এই।

রাজার কিছুদিনের ব্যবধানে রচিত 'অচলায়তন' নাটকটি প্রত্যক্ষতঃ বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে লেখা না হলেও এটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার পরিবেশে পরিকল্পিত। এখানেও সেই ধর্ম্মের সত্যরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা। সেই শুষ্ক আচারকেন্দ্রী ধর্ম্ম সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়ানুভূতি জড়িত ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব। অচলায়তনে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলিও লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 'নটীর পূজা', 'কথা'র যুগে লেখা 'পূজারিণী' কবিতাটির নাট্যরূপ। অজাতশত্রু হিংসাধর্ম্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধের অহিংসা-ধর্ম্মের বিরোধ। এ-বিরোধ অস্ত্রের বিরোধ নয়, প্রাণের বিরোধ। শ্রীমতীর প্রাণোৎ-সর্গের পটভূমিতেই ধর্ম্মের মহত্ত্ব স্থাপিত। শ্রীমতীর আত্মত্যাগ কবির কল্পনাপুষ্ট জীবনাদর্শকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই শ্রীমতীর নাটকীয় জীবনকে তিনি নাট্যরূপে বেঁধে দিলেন। 'নটীর পূজা' নাটকে কবি স্বয়ং বৌদ্ধ ভিক্ষু উপালির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ জীবনাদর্শের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধার এটিও একটি সাক্ষ্য।

অবদান শতকের আর একটি বৌদ্ধকাহিনী অবলম্বনে 'চণ্ডালিকা' রচিত। চণ্ডালকন্যা প্রকৃত বুদ্ধ শিষ্য আনন্দকে চেয়েছিল মোহ-মুগ্ধতার সীমায়। কিন্তু কোন্ শক্তি তাকে বাঁধবে! সে তাকে বাঁধল মন্ত্রতন্ত্র আর ইন্দ্রজাল দিয়ে। কিন্তু বাইরের বাঁধন তো ক্ষণস্থায়ী। পরমকারুণিক বুদ্ধের কৃপায় আনন্দ মুক্ত হ'ল সে বন্ধন থেকে। মন্ত্রতন্ত্র আর বাইরের বন্ধনের শক্তিকে আবার তুচ্ছ প্রমাণ করলেন কবি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই মৌল তত্ত্বটির সুন্দর কাহিনীরূপ কবি পেয়েছেন বৌদ্ধ-সাহিত্যে।

নাট্যরূপকে আরও সুন্দরতর করে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস দেখা গেল নৃত্যনাট্যে। সেখানেও তিনি বৌদ্ধ চিন্তাকে দূরে রাখতে পারেন নি। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা পূর্ব্বে নাট্যকৃত চণ্ডা-লিকার নৃত্যনাট্যরূপ। অনুভূতির সীমাকে আরও সুদূরপ্রসারী করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। নৃত্যনাট্যই তার উপযুক্ত বাহন। কাহিনী নির্ব্বাচনেও উপযুক্ততার কথা কবি ভুললেন না—তাই বৌদ্ধকাহিনী 'চণ্ডালিকা' আর 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের রূপ লাভ করল। 'শ্যামা' 'পরিশোধ' কাব্যখণ্ডের নাট্যরূপ।

বৌদ্ধধর্ম্মের সুরুচি, পরিচ্ছন্নতা, সর্ব্বমানবিক আবেদন কবির বহু রচনার রসদ জুগিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে বৌদ্ধ আদর্শ কেবল সাহিত্যেই আবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রচেতনাতেও ভারতবর্ষের বৌদ্ধ আদর্শ অনুকরণীয় এই ছিল কবির মত। তিনি বলেছেন—

"এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কাণা হইয়া আছে।"

সর্ব্বব্যাপ্ত মানবপ্রেম, মানব কল্যাণের আদর্শ, মানুষের ইহ-লৌকিক পারলৌকিক উন্নতিবিধান, পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ—এই নিয়েই বৌদ্ধসংস্কৃতি। ভারত যদি এই পথ অনুসরণ করতে পারে তবেই তার সাত্ত্বিক উন্নতি—এই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি বলেছেন—

"ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখ রূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্য্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষাদান করিয়াছিল। সেই জন্য ভারতবর্ষ সেদিন ধর্ম্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল।"

১। 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস' প্রভৃতি কাব্য নাটকগুলি দ্রষ্টব্য।

মিলন

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

আড়াই বছরের ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠল, বলল, "মার কাছে যাব।" অমিয় কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারে না, বলে, "ওই যে ওদিকে দেখছ মণি, ওই ওখানে, কেমন একটা নীল পাখি এসে বসেছে—।" কিন্তু খোকনের কান্না আর থামে না। বহু চেষ্টা করেও সে খোকনের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাতে পারল না। অমিয় বিব্রত বোধ করল।

অপর দিকে মেয়েটিও অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল খোকনের দিকে। তার পর একবার অমিয়ের দিকে তাকায়, আর একবার খোকনের দিকে তাকায়। অমিয়র সঙ্গে ছ'একবার চোখা-চোখিও হয়ে গেল ইতিমধ্যে। এতে অমিয় আরও বিব্রত মনে করল নিজেকে। কিন্তু মেয়েটি কিছু না বলে হঠাৎ এসে খোকনকে অমিয়ের কাছ থেকে নেবার জন্যে ছ'হাত বাড়িয়ে বলল, "দিন্, খোকনকে আমার কাছে দিন।" যেন অমিয়র অনুমতি এখানে অবান্তর, এই ভাবেই সে প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই অমিয়র কাছ থেকে খোকনকে তুলে নিল। অমিয় একটু সম্বিৎ পেয়ে বলল, "ওকে আপনার সামলাতে বিব্রত হতে হবে।" মেয়েটি কিছু না বলে শুধু একটু হাসল। আশ্চর্য্য, অমিয় দেখল, খোকন কিন্তু মেয়েটির কাছে গিয়ে একেবারে চুপ। সে মেয়েটির ঝোলান চুলের দিকে এক এক বার তাকাচ্ছে আর এক এক বার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাচ্ছে—আর তার চোখের জল মাখান মুখে একটা প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠছে। কিন্তু এ ভাবে আর একজনের কাছে ছেলেটিকে দিয়ে অমিয়ও স্বস্তি বোধ করছিল না। সে ছ'একবার চেষ্টা করেছিল খোকনকে নেবার—কিন্তু খোকন যেন তার বাবাকে ইতিমধ্যে ভুলে গেছে। সে কিছুতেই আসবে না মেয়েটির কোল থেকে। মেয়েটিও যে অমিয়র দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করছে এমন বলে মনে হ'ল না। বরং অমিয়ই বলল, "আপনার কাপড় জামা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওর জুতার ধুলোতে—বরং আমায় ওকে দিন।" মেয়েটি হাসল, বলল, "থাক্ না আমার কাছে খানিকক্ষণ।"

কিন্তু এই খানিকক্ষণটা যে এ রকম ভয়াবহ হয়ে দেখা দেবে এ কথা মেয়েটিও কল্পনা করতে পারে নি—অমিয় ত নয়ই। যেখানে অমিয়র নামবার কথা সেখানে অমিয়র নামা হ'ল না। মেয়েটি যেখানে নামবে সেখানেই ওকে নামতে হবে, তাছাড়া উপায় কি? মেয়েটির নামবার সময় হলে অমিয় চেষ্টা করল খোকনকে নেবার। কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হ'ল না, বরং হ'ল উল্টো—ছেলেটি তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল। মেয়েটি অমিয়কে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথায় নামবেন?"

"আমার যেখানে নামার দরকার ছিল, অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি। এখন দেখুন বাস থেকে নেমে একবার চেষ্টা করা যাক্। হয়ত রাস্তায় ও আমার কাছে আসতে পারে।"

কিন্তু বাস থেকে নেমেও যখন খোকন কোল থেকে নামল না, তখন সুলেখাই বলল অমিয়কে, "চলুন না, আমাদের বাড়ী, এই কাছেই।"

অমিয় বলল,—"কিন্তু—"

কথাটি তাকে শেষ করতে দিল না সুলেখা, বলল, "কিন্তু, কি করছেনই বা বলুন আপনি? আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, এখনি ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে।"

সত্যিই এতক্ষণ ত অমিয় আকাশের দিকে তাকায় নি। দেখল সারা পশ্চিম আকাশ জুড়ে কালো মেঘ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। একটু ইতস্ততঃ করে অমিয় বলল, "এটা কিন্তু অত্যন্ত উৎপাত হচ্ছে আপনার উপর।"

অবশ্য অমিয়কে সুলেখার বাড়ীতে আসতেই হ'ল। দরজার কাছে পা বাড়িয়ে সুলেখা নীচু গলায় বলল, "খোকনের মা কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়বে।"

এগিয়ে বলল, "আসল গণ্ডগোল ত সেইখানেই—খোকনের মা প্রায় ছ'মাস হ'ল মারা গেছে।"

'ইস' আপনা থেকেই সুলেখার মুখ থেকে বেরল। তার পর সে সম্পূর্ণ ভাবে একবার অমিয়র মুখের দিকে তাকাল, কি যেন হঠাৎই খুঁজল সেখানে, তার পর তাকাল খোকনের দিকে। খোকনের দৃষ্টি তখন পড়েছে ঘরের ভেতর ফুলদানির ফুলের উপর। সে হাত বাড়াল সেই দিকে। খোকনকে নামিয়ে রেখে সুলেখা তাড়াতাড়ি গেল ফুলদানির কাছে, তার পর সব ফুলগুলি এনে খোকনকে দিল। অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, "আসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" 'না যাই'—কি যেন ভাবতে ভাবতে অমিয় উত্তর দিল।

ওদিকে আকাশ জুড়ে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হয়ে গেছে। একটা চেয়ারের উপর বসে অমিয় ভাবছিল এই আশ্চর্য মেয়েটির কথা। কোথা থেকে সম্পূর্ণ এক অচেনা লোককে অত্যন্ত সঙ্কোচ-হীন ভাবে ঘরে ডেকে নিয়ে এল, একটুমাত্র বাধল না, বা একটুমাত্র সঙ্কোচের ধার দিয়ে গেল না। অথচ এই মেয়েটির কথায় বার্ত্তায়, আচারে আচরণে এমন একটা স্নিগ্ধভাব আছে, এমন একটা ভদ্র ব্যবহার আছে যেটা অমিয়র আর কোন মেয়ের কাছে দেখেছে বলে হঠাৎ মনে হ'ল না। ইতিমধ্যে খোকন গেছে সুলেখার সঙ্গে অন্তঃপুরে—সেখানে খোকনকে নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ জমে গেছে

এর [illegible]

খানিকক্ষণ পরে সুলেখার বাবা রামরতন বাবু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ইনি নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। তার পর অমিয়র সঙ্গে আলাপ করলেন। একটু আস্তে আস্তে কথা বলেন; বললেন, "এই হাঁপানির টানটি আমাকে কাবু করেছে—তাই অনেক আগেই প্রফেসারি থেকে রিটায়ার করেছি। এখন যেন একলা বড় হাঁপিয়ে উঠি। তোমাদের—তোমাদের বলছি বলে যেন কিছু মনে করো না বাবা—"

'আজ্ঞে না, আপনি আমায় তুমিই বলবেন' অমিয় বলল।

'হ্যাঁ ছেলেদের প'ড়িয়ে পড়িয়ে এমন বদভ্যেস হ'য়ে গেছে যে, মুখ থেকে আপনিই যেন তুমি বেরিয়ে পড়ে।'

তারপর ক্রমে অমিয়র পরিচয় নিলেন, অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গেছে শুনে দুঃখ করলেন। সুলেখার মার মৃত্যুর কথা বললেন। বড় মেয়ের বিয়ের গল্প করলেন, কথা তাঁর যেন আর শেষ হয় না। আর শেষ হয় না যেন বৃষ্টির। সে যে বৃষ্টি নেমেছে, এখনও একবার ধরবার নাম পর্যন্ত নেই। ইতিমধ্যে ঘরে দুবার চা এসে গেছে। ঘড়িতে যখন রাত ন'টা বাজে তখন সুলেখা আবার ঘরে ঢুকল—ঢুকে বাবার কানে কানে কি বলল। চমকিয়ে উঠে বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ বাবা অমিয় তুমি আজ এখানে খেয়ে যাবে।'

'সে কি কথা'—অমিয় সাত হাত জলের মধ্যে পড়ল। 'না না, সে কি, সে না হয়—' ওর বিব্রত ভাব দেখে সুলেখা হেসে বলল। আর হাসতেই সুলেখার চোখের সঙ্গে ওর চোখ এক মুহূর্তের জন্ম মিলল। তার পর সুলেখাই চোখ ফিরিয়ে নিল অন্যধারে—আর চোখ ফেরাতেই অমিয়র এক অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ে গেল—সুলেখা ঘাড় ফিরাতেই অমিয়র চোখে পড়ল সুলেখার চিবুকের বাঁ ধারে একটা তিল; আর সেই গ্রীবার অপূর্ব্ব ভঙ্গি, হুবহু এক। অমিয় এক মুহূর্ত্ত চোখ ফিরাতে পারলে না। সমস্ত অতীত যেন এক মুহূর্ত্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

তার পর খেয়েদেয়ে ঘুমন্ত খোকাকে নিয়ে সে যখন ট্যাক্সিতে উঠল, তখন রাত সাড়ে দশটা। আর আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা যখন ট্যাক্সিতে বসে অমিয় ভাবল তখন সবটাই যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হ'ল। কোথায় যাবে বলে সে বেরিয়েছিল, আর কোথায় অযাচিত ভাবে সে এক অজানা অচেনা বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী চলল।

বাড়ী ফিরতেই অমিয়র মা জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাঁরে এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? আমি ত ভেবে ভেবেই সারা। যা বৃষ্টি নেমেছিল আমি ত খোকনের জন্ম ভেবেই অস্থির।'

অমিয় বলল, 'সে এক কথা মা, শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।' বলে সে সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত করল। সব শুনে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম বললি রামরতন মিত্তির, প্রফেসার? কোথায় থাকে বললি—কাঁটাপুকুরে? আচ্ছা' বলেই মা বললেন 'যা শুতে যা, অনেক রাত হয়েছে'।

কিন্তু অমিয়র মা যে রামরতন বাবুকে চিনতেন একথা অমিয় কি করে জানবে? আর কি করেই বা সে খবর রাখবে ইতিমধ্যে রামরতন বাবুর বাড়ীতে তার মা সুলেখাকে দেখে এসেছেন—দেখে এসে মুগ্ধ হয়েছেন। আরও বেশী আশ্চর্য হয়েছেন সুলেখার সঙ্গে তাঁর মৃতা পুত্রবধূর মিল দেখে। অনেকটা একই রকম দেখতে। খোকনের ভুল ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়ত এই মিলের জন্যই সে বলেছিল, 'মার কাছে যাব।'

কিন্তু অমিয়র মনকে ভরে রেখেছে, সুলেখার সেই গ্রীবাভঙ্গীর আর সেই চিবুকের বাঁদিকের তিল। যে তিল আর যে গ্রীবাভঙ্গি অমিয়কে কেবল শান্তার কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রথম বার যাকে বিয়ে করেছিল অমিয় সেও তার মায়ের পছন্দ মতই—কিন্তু বিয়ে করেও অমিয় ভুলতে পারে নি শান্তাকে। শান্তার সঙ্গে যে তার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয় সে কথা অমিয় জানত, শান্তাও জানত। শান্তা জানত যে অমিয়র যে স্বভাব তাতে সে অসবর্ণ বিয়ে করে তার মার মনে আঘাত দিতে পারবে না। তবুও সহপাঠিনী শান্তার বিয়ের পর থেকে অমিয় যেন কেমন বিষণ্ণ, কেমন অদ্ভুত হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর শান্তারও অমিয়র এই ভাব চোখ এড়াতে পারে নি। এমনকি, এর পর মায়ের বার বার অনুরোধে অমিয় যখন ইলাকে বিয়ে করে তখনও যে সে বিয়েতে সে সুখী হয় নি শান্তার চোখকে তাও এড়িয়ে যেতে পারে নি। তার পর অনেক বারই শান্তা অমিয়র বাড়ীতে এসেছে, ইলার সঙ্গে ভাব করেছে নিজে থেকেই। একদিন অমিয়কে শান্তা নিজেই বলল, নিভৃতে, চোখ দুটো মাটিতে রেখে—'আমার জন্যেই বৌদির জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।'

অমিয়র সেদিন হঠাৎ রাগ হ'ল শান্তার উপর—তার কথাটা একবারও শান্তা বলল না, শান্তার জীবনে অমিয়র কি একটুও স্থান এখন নেই? অমিয় শুধু বলল একান্ত বিষাদ স্বরেই—'ওর জীবন কেন নষ্ট হবে শান্তা? আমি ত ওকে সবই দিয়েছি।' শান্তা চকিতে একবার অমিয়র মুখের দিকে চাইল—যেন অমিয়, যে তাকে কোন দিন অপমান করে নি, আজ তাকে চরম অপমান করল, আর সে নিজে যেচে সেই অপমান যেন কুড়োল। তার পর থেকে শান্তা আর অমিয়র সঙ্গে দেখা করে নি। বোধ হয় অমিয়কে সে একেবারেই ভুলে গেছে।

কিন্তু তার মা এদিকে অন্য কাণ্ড করে বসে আছেন! একদিন অমিয় যখন খেতে বসেছিল তখন মা বললেন, 'আমি রামরতন বাবুকে কথা দিয়ে এসেছি অমিয়। জানি, তুই আমার কথার উপর কথা বলতে পারবি না।'

অমিয় বলল, 'কিন্তু আমি যে আর বিয়ে করব না মা।'

মা রেগে গেলেন—'বেশ ত তোর যা ইচ্ছে হয় করগে। আমি আর কদিন বাঁচব, কিন্তু খোকনকে কে দেখবে?'

অবশেষে কোন কথাই টিকল না। অমিয়র জীবনের সঙ্গে সুলেখার জীবনের যোগসূত্র খোকনকে দিয়েই রচিত হ'ল।

বিয়ের পর একদিন ইলা'র ছবির তলায় দাঁড়িয়ে সুলেখা বলল অমিয়কে, 'আচ্ছা, অনেকে বলেন দিদির সঙ্গে আমার নাকি অনেকখানি মিল আছে। কিন্তু আমি ত ছবি দেখে কিছুই বুঝতে পারি না। আচ্ছা, সত্যি কি মিল কিছু আছে?'

অমিয় সেদিকে না চেয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা না হলে খোকন ভুল করবে কেন?' এর বেশী সে কিছুই বলতে পারল না। কি করে বলবে, অমিয় এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী মিল আছে শাস্তার সঙ্গে—শাস্তার গ্রীবাভঙ্গির সঙ্গে, শাস্তার গালের তিলের সঙ্গে?

বার্দ্ধক্যে বর্ষা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আজি ঝরঝর বরষায়
কবিরা হাঁকিছে দরজায়—
দোর খোল ভাই মেঘভরা ঐ
আকাশেতে শোন্ ঝম্‌ঝম্,
ভুলে যা দুঃখ গান গাই মোরা
শোন্ বসে তুই হরদম্।
আমি তাহাদের আহ্বান শুনে
নাই পাহি কোনো ভরসাই,
বার্দ্ধক্যের জরা মোর দেহে গরজায়,
থমকিয়া বসি আধখানা খোলা দরজায়।
বৃষ্টির ছিট্ বাঁচাইয়া চলি
মন করে তবু আনচান,
যৌবন হায় ঝ'রে গেছে কবে
তবু কেঁদে ওঠে মনপ্রাণ—
ইহাদেরি ডাকে, নিজেরে ভুলিয়া ক্ষণকাল,
সাধ যায় ওরে পরিতে স্বপ্ন মায়াজাল।
ছুটে যায় মন মেঘের মাদোলে
শুনিতে ঝড়ের খ্যাপা গান,
ঝম্‌ঝম্‌ঝম্ ছন্দেরি করি দাক্ষপান।
দেওয়ালের গায়ে টাঙানো রয়েছে দরপণ,
তখনি তাহাতে জরার মূর্ত্তি করিয়া নিজের দরশন—
ঘুচে যায় হায় সকল স্বপ্ন হতাশে অমনি চমকাই,
বাজ ফেটে হেঁকে তখন আমারে ধমকায়।

অট্টহাসিয়া বিদ্যুৎ করে উপহাস,
জানেনা সে মোর তিনদিন থেকে উপবাস।

পাঁচদিন থেকে নাড়ীতে রয়েছে লেগে জর,
হাওয়া লাগিলেই শীতে কাঁপে দেহ থরথর,
বেরসিক সম জানলাটা তাই
আধখানা রেখে ঢাকিয়া,
বিদ্যুতালোক চোখে মুখে নিই মাখিয়া।

বার্দ্ধক্যের জর ও জরার অভিশাপ,
তাই দিয়ে হায় শেষযাত্রায়
জীবনকে আজ করি মাপ।

আনন্দ সুখ গুঞ্জনের আজি মন তার,
ঝরে গেছে তার ছায়ানট মেঘমল্লার।
জানলার ফাঁকে হাওয়া লেগে তাই চমকাই,
বিদ্যুৎ মোরে বক্রে কাটিয়া ধমকায়,
মনে মনে তাই পাই না যে ভাই বর্ষায় আজি ভরস
বৃদ্ধের লাগি নয় ওরে এই বরষা।

তবু ভালো লাগে বিদ্যুৎ হানা মেঘের বাদ্য হরদম্,
ভালো লাগে তবু বৃষ্টির ধারা ঝম্‌ঝম্।
মনের কোণেতে লুকানো যে আছে যৌবন,
বয়স ঝরেছে ঝরেনি তো ভাই যৌবন।
বদ্ধদুয়ার ঘরে বসে তাই দেহ নিয়ে জরা জর্জ্জর,
চোরের মতন শুনিতেছি বসে ঝর্ঝর ঝর ঝর্ঝর।

ভ্রম-সংশোধন—গত আষাঢ় সংখ্যায় "দুর্দ্দিনের ডাক" কবিতাটির লেখক শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বাংলা লিপি সংস্কার

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

বাংলা টাইপের বর্তমান রূপটি বহুলাংশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশের শতবার্ষিকী গত বৎসর (১৯৫৫ খ্রীঃ) মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইল। 'বর্ণপরিচয়' (দ্বিতীয় ভাগ) এর প্রয়োজনেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রেসের টাইপ লইয়া ভাবিতে হইয়াছে ধরিয়া লইলে বর্ণপরিচয়ের প্রথম সংস্করণ ও আধুনিক লাইনো বা মনোটাইপে মুদ্রিত যে কোন গ্রন্থ হইল বাংলা টাইপের মুদ্রিত রূপের দুই মেরু-প্রান্ত। বাংলা টাইপের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্তি বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ ভুলিয়াছে, কিন্তু প্রেসের টাইপ কেসে এই কীর্তিটি স্বীকৃত হইয়া আছে। আজও প্রেসে টাইপ সাজাইবার রীতিটিকে 'বিদ্যাসাগরী' বলা হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল বাংলা লিপি লইয়া বিশেষ কেহ মাথা ঘামান নাই। অন্ততঃ লিখিত প্রবন্ধে ইহার বিশেষ কোন নজীর পাই না। তবে প্রেসের সুবিধার্থে কখনও কখনও একটু-আধটু পরিবর্তন হইয়া থাকিতে পারে। বাংলা লিপিতে যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে এবং প্রচার ও আন্দোলনের দ্বারা তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন—এ বিষয়ে প্রথম বোধ-করি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী। প্রবন্ধের পাদটীকায় পত্রিকা-সম্পাদক লিখিয়াছেন, "এই প্রবন্ধে বর্ণবিন্যাসের ও বর্ণের রূপের যে নূতন রীতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহা লেখক মহাশয়ের নিজস্ব; সাহিত্য পরিষৎ এই নূতন রীতি সম্বন্ধে কোন মতামত এ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই এবং তজ্জন্য কোন রূপে সম্প্রতি দায়ী নহেন।" দায়ী না থাকিলেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুসৃত অভিনব লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই যুগে যত্নের সহিত এইরূপ প্রবন্ধ ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া পরিষদ নিজেকে বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র এইখানেই থামেন নাই। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে একখানি ব্যাকরণ (পরিষদ গ্রন্থাবলী নং ৩৮) প্রকাশ করেন। সেই ব্যাকরণে বহুল ভাবে সংস্কৃত (reformed) লিপি ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাকরণে এবং পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় লিপি সংস্কার বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব এবং বাস্তব প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা পরে প্রসঙ্গতঃ বিবৃত করিব। এখানে শুধু ইতিহাসের কথাটুকু উল্লেখ করিতেছি। ব্যাকরণ ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ব্যতীত ১৩১৬ কার্তিকের ও ১৩১৭ বৈশাখের প্রবাসীতে 'বাঙ্গলা অক্ষর' নামে আচার্য যোগেশ চন্দ্রের দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর বহুকাল লিপি সংস্কার বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবগুলি দীর্ঘকাল প্রস্তাবাকারেই রহিয়া গেল, কোন মুদ্রাকর বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব লইলেন না।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে ও চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "Type Sub-Committee of the Bengal Text-books Committee" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সদস্য ছিলেন: রবীন্দ্রনাথ (চেয়ারম্যান), শ্রীরাজশেখর বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। এই সমিতিকে রবীন্দ্রনাথ 'অক্ষর সমিতি' বলিতেন। সমিতির প্রথম অধিবেশনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার টাইপ সংস্কার বিষয়ে এক দীর্ঘ ও বিশদ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন এবং সমিতিও তাহার কয়েকটি ধারাবাহিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরকারের প্রস্তাবিত সংস্কারের অনুকূল অভিমত প্রকাশ করে। অক্ষয় বাবু এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় কর্মনিরত ছিলেন এবং 'বাংলা টাইপ ও কেস' নামে তিনটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রবাসীর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঁচ দফায় সম্পূর্ণ হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনটির পরে আর প্রকাশিত হয় নাই।

যাহা হউক, উপরোক্ত 'অক্ষর সমিতি'র প্রস্তাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন—সাধারণে, বিশেষত সাহিত্যিক ও লেখক মহলে এই লিপি চলিবে কিনা। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি:

"আমাদের বিশ্বভারতী, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রবাসী যদি তোমার এই ছক অবলম্বনে ছাপতে সুরু করে, তা হলে সাধারণই বল, আর অসাধারণ সাহিত্যিকই বল ক্রমে এই ছকের মত লিখতে আর ছাপতে বাধ্য হবে।"

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী কিম্বা প্রবাসী কেহই যত দূর মনে হয় এই ছক মানিয়া লন নাই বা তাহা অনুসরণ করিবার দায়িত্ব পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সাধারণ-অসাধারণ সাহিত্যিকেরাও লিখিতে বাধ্য হন নাই। আসল কথা, লিপি সংস্কার কেবল প্রস্তাব পাস, সমিতি গঠন বা প্রবন্ধ রচনার ব্যাপার নয়, সুপরিকল্পিত ভাবে কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান, মুদ্রাকর, টাইপ-ফাউণ্ডার এবং বর্ণপরিচয় (primer) রচয়িতার সক্রিয় সহযোগিতায় কাজ চালাইতে হইবে, এরূপ কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি হয়

নাই। লিপি সংস্কারের দিকে এ পর্যন্ত আমূল পরিবর্তনের দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া যে সুপরিকল্পিত বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা হইল বাংলা লাইনো টাইপ আবিষ্কার। বিশ্ববিদ্যালয় 'অক্ষর সমিতি'র প্রস্তাবের উপরই প্রধানতঃ ভরসা করিয়া লাইনো টাইপের লিপি সংস্কার করা হয়। লাইনো টাইপের প্রসঙ্গে স্বর্গতঃ সুরেশচন্দ্র মজুমদারের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে নিঃসন্দেহ।

বাংলা লাইনো টাইপ আবিষ্কারের পর হইতে অদ্যাবধি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কিছু কিছু বই ও প্রশ্নপত্র, কয়েকটি বাংলা সংবাদপত্র এবং অধুনা কতকগুলি প্রেসে ছাপা পুস্তক নূতন লাইনো টাইপের লিপিতে ছাপা হইয়া বাজারে বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি লাইনো টাইপের বহুল প্রচার হইয়াছে এবং বাজারে বাংলা টাইপ-রাইটারও আসিয়া গিয়াছে। লোকে প্রথম প্রথম কষ্ট করিয়া এবং অনেক আপত্তি করিয়াও বটে—লাইনো টাইপ পড়িতে সুরু করিয়া আজকাল বেশ সহজে পড়িতে পারে। কিন্তু তাহাতেও বাংলা লিপি সংস্কারের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। আজও শিশুগণকে প্রথম পাঠের সময় 'ত' এবং ু ফলা শিখিয়াও কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে 'ত য়ে র ফলা হ্রস্ব উ' লিখিবার সময় মাত্রাযুক্ত 'এ' লিখিয়া তাহার পাশে একটি উর্ধ্বমুখী শুণ্ড জুড়িয়া দিতে হয়! 'ত' এবং 'ু' লিখিতে জানিয়াও 'কিন্তু'র বেলায় 'ন' এর নীচে 'ও' লিখিয়াই বুঝিতে হয় 'ন-তয়ে হ্রস্ব উ'কার লিখিয়াছে! 'ক' এবং 'ত' লিখিতে শিখিলেও 'ক-য়ে ত' লিখিতে পারিবার কোন নিশ্চয়তা নাই! উপায় নাই, অদ্যাবধি কোন প্রথম ভাগ লাইনো টাইপে ছাপা হয় নাই। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত যাঁহাদের এই বিষয়ে অগ্রণী হইবার কথা তাঁহারা না আগাইয়া আসিবেন ততদিন পর্যন্ত শিশুরা 'স্বাস্থ্য' লিখিবে পড়িবে 'স্বাস্থ্য' এবং বানান করিবে 'স-য়ে হ-য়ে য-ফলা স্থ্য'!

যাহা হউক, ইতিহাসের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অক্ষর সমিতির চেষ্টা ব্যতীত আর একটি প্রয়াসের কথা উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা হইল, বাংলা দেশে রোমক লিপি সমিতির আন্দোলন। যদিও বাংলা লিপি সংস্কার ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ইঁহারা পুরাপুরি বাংলা ছাঁটিয়া বাদ দিয়া সেই স্থানে রোমান লিপি প্রচলনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তথাপি বাংলা লিপি ব্যবস্থার যে সকল গলদের কথা এই সমিতি উল্লেখ করিয়াছিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ। ড. চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৫ সনে "Calcutta University Phonetic Studies" এ "A Roman Alphabet for India" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুনীতিবাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেবনাগরী জাতীয় ভারতীয়, ফার্সী, আরবী ও রোমান—এই তিন পদ্ধতিরই গুণাগুণ বিচার করিয়া ভারতীয় পদ্ধতির তিনটি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন—

(1) Complexity of the letters,

(2) Syllabic and not purely alphabetical character of writing,

(3) Use of conjunct characters, involving the necessity of additional abbreviated forms of a great many of the letters, and in some cases the development of entirely new additional letters . . . very fine founts of complicated conjuncts and other letters are economically unsuitable, they are apt to get blurred, broken and so become useless in a short time . . . the conjunct consonants increase the cost and the time and labour required in printing and they form an extremely cumbersome business.

১। অক্ষরের জটিলতা ২। বর্ণাশ্রয়ী লিপির পরিবর্তে যুগ্মাক্ষরিক লিপি ৩। যুক্তাক্ষরের ফলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন অক্ষর সৃষ্টি···ইহা ছাড়া অন্যান্য দোষের মধ্যে যুক্তাক্ষরের খুব সূক্ষ্ম টাইপগুলি বেশি দিন টিঁকে না,···যুক্তব্যঞ্জন মুদ্রণ ব্যয়, সময় ও পরিশ্রমসাধ্য। এবং সবকিছু মিলিয়া এক দুরূহ জটিলতা সৃষ্টি করে।

কথাগুলি দেবনাগরী সম্বন্ধে বলা হইলেও বাংলা টাইপ সম্বন্ধে সমান ভাবে প্রযোজ্য। বাংলা ও ইংরেজী টাইপ কেসের তুলনা করিতে যাইয়া সুনীতি বাবু জানাইতেছেন :

In Roman type cases . . ., there are in all 152 chambers for types plus numerals, brackets and punctuation marks and all accessories in the shape of spaces, leaders, etc. (The capital letters in English mean a duplication of 28 type chambers, included within the 152). Contrasted with this in the Bengali type case, there are 455 chambers. . . . In printing, Bengali no less than 563 separate type-items are required.

রোমান টাইপ কেসে সংখ্যা, চিহ্ন ইত্যাদি ব্যতীত ১৫২টি ঘর আছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় বাংলায় ৪৫৫টি ঘর এবং বাংলা ছাপিতে সর্বসাকুল্যে ৫৬৩টি ভিন্ন ভিন্ন টাইপের সাহায্য লইতে হয়।···

কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার কল্পনা করুন। অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত সমাজ পরম নির্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন এবং এই ৫৬৩টি অক্ষরের গন্ধমাদন টাইপ কেস সম্মুখে রাখিয়া সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড গণনার ন্যায় দুঃসাধ্য কাজে ব্রতী রহিয়াছেন কম্পোজিটরের দল। দেশে লাইনো টাইপ আসিয়াও ইঁহাদের দুঃখের অবসান ঘটে নাই। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ নাকি এক লিপি সংস্কার সমিতি গঠন করিয়া এ বিষয়ে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চান।

এইবার সংক্ষেপে লিপি সংস্কার কল্পে যে সকল প্রস্তাব করা

হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য উপস্থাপন করিব। আমার নিজের প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই পর্যন্ত যাঁহারা লিপি সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই প্রেসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কারের কথা বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে উচ্চারণের সহিত সঙ্গতিবিধানের কথাও রহিয়াছে। প্রেসের সমস্যা লিপি সংস্কারের কার্যে একটি বিশেষ চিন্তনীয় বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল প্রেসের কথা স্মরণ করিলেই চলিবে না। হস্ত লিখিত লিপির সুবিধার কথাও মনে রাখিতে হইবে। এই কারণে যাহাতে লেখনী অধিক না তুলিয়া টানা লেখা যায় এবং অক্ষরগুলির শেষ প্রান্তটি দক্ষিণমুখী হইয়া দ্রুত লিখনে সাহায্য করে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া, প্রথম শিক্ষার্থীদের কথাও ভাবা দরকার। ইংরেজীতে বর্ণমালার ২৬টি অক্ষর শিখিলেই শিক্ষার্থীর অক্ষর পরিচয় সাঙ্গ হয়, কিন্তু বাংলার স্বর ও ব্যঞ্জনের বর্ণমালা শিখিয়াও সব অক্ষর চেনা যায় না, যুক্তাক্ষরের নামে শিশুকে নিত্য নূতন অক্ষররূপের পরিচয় লাভ করিতে হয়।

লিপি সংস্কারের ব্যাপারে একটা বিপ্লবাত্মক আমূল পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়। কেননা ভাষার ন্যায় লিপিরও একটা নিজস্ব ধারা আছে, তাহার ভিতর দিয়াই সে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়; অকস্মাৎ আইন করিয়া তাহাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা ফলবতী হওয়া দুষ্কর। সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত লিপি-পদ্ধতি হওয়া প্রয়োজন বটে, তবে ইহাও সত্য যে, পরিপূর্ণ ভাবে বিজ্ঞানসম্মত ছক মানিয়া পৃথিবীতে কোন ভাষার লিপিই লিখিত হয় না। যেটুকু অসুবিধা থাকিবে তাহা মানুষ আপন কলম চালাইবার সময় নিজ নিজ ব্যবস্থা মত সহজ করিয়া মিলাইয়া লইবে। বস্তুত এখনও লিখিত ও মুদ্রিত লিপির মধ্যে যে ফাঁক, তাহার কারণ ইহাই।

যাহা হউক এইবার বর্ণমালা ধরিয়া আলোচনা সুরু করা যাক।

'অ'—ইহার সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রস্তাব নাই।

'অ' লিখিতে যদিও মাঝে কলম উঠাইতে হয়, তৎসত্ত্বেও ইহার রূপ বা লিখন পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ কেউ করেন না। বিশেষত, শব্দের প্রথমে ভিন্ন মাঝে 'অ' প্রায় লিখিতেই হয় না, শব্দের মাঝে আসিয়া হঠাৎ কলম উঠাইতে লেখার গতি যতটা ব্যাহত হয়, প্রথম বর্ণে তুলিতে ততটা হয় না।

'আ'—সম্বন্ধেও একই কথা।

'ই'—সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দে* ভিন্ন আর কাহারও প্রস্তাব নাই। দে মহাশয় বাংলা 'ই' তুলিয়া দিয়া নাগরী 'इ'র প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা অনাবশ্যক। ই ও इ উভয়েই সমান জটিল, ই-র পরিবর্তে इ লিখিয়া কোন সুবিধা হইবে না। 'ই' সম্বন্ধে প্রেসের একটি আপত্তি থাকিতে পারে। 'ই' মাত্রার উপরেও খানিকটা স্থান জুড়িয়া থাকে। কিন্তু বাংলা বর্ণ-মালার বহু অক্ষর ও বহু চিহ্নই এই দোষে দোষী। ঝটিতি ইহার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

'ঈ'—সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা বিচার যোগ্য। *(পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ইহার ফলে, 'ই' এর সঙ্গে দীর্ঘ 'ঈ'-এর একটা সামঞ্জস্য থাকিবে, যেমন উ, ঊ-এর বেলায় আছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম শিক্ষার্থীদের লিখিতে শিখিবার সময় 'ঈ' লিখিতে যাইয়া পেন্সিলের উত্থান-পতন আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য। তাহার ফলে অধিকাংশেরই 'ঈ' লেখা অসুন্দর।

'উ, ঊ'—সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব নাই।

'ঋ'—সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দে 'ঋ'-এর পার্শ্বস্থিত 'া' চিহ্নটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অনাবশ্যক দাঁড়িটি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। 'ঋ'-এর অন্য কোনরূপ সংস্কারের প্রস্তাব আমার নাই। তবে, ঋষি, ঋতু, ঋণ, ঋজু প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ভিন্ন বিশেষ কোন প্রচলিত শব্দ ঋ-যুক্ত নয়। ঐ কয়েকটি শব্দের জন্য বর্ণ-মালায় একটি অক্ষরকে স্থায়ী আসন দেওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া দেখা দরকার। ঐ কয়েকটি শব্দকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় লিখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বোধ হয় জ্যেষ্ঠ ৠ-এর ন্যায় কনিষ্ঠ ঋ-কেও বর্ণমালা হইতে চিরতরে বিদায় দেওয়া যায়।

ঌ—এই অক্ষরটি এখনও কিরূপে কোন কোন বর্ণপরিচয়ে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বুঝিতে পারা মুশ্‌কিল।

ঋ, ৠ, ও ঌ লিপি সংস্কারের এক্তিয়ারের বাহিরে, তবে ইহারা বর্ণমালা হইতে অপসৃত হইবার পথে। সেই পথেই আর একটু ত্বরান্বিত করিবার জন্য উপরোক্ত কয়েকটি কথা বলা হইল।

এ, ঐ, ও, ঔ—সম্বন্ধে শ্রীপান্নালাল দে মহাশয় অ-য়ে ে, ৈ, ো, ৌ-কার দিয়া কাজ সারিতে চান। কিন্তু ইহা অনাবশ্যক। লিপি সঙ্কোচ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, লিপি সংস্কার আমাদের আলোচ্য বিষয়। এ, ঐ, ও, ঔ-এর মাত্রাহীনতার কারণ বোধ হয় ত্র এবং ত্ত-এর অবস্থিতি। ত্র ও ত্ত-এর সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। যাহা হউক, যতদিন ত্র, ত্ত আছে, ততদিন এ হইতে ঔ পর্যন্ত অক্ষরকে মাত্রাহীন থাকিতেই হইবে, পরে মাত্রান্বিত করিতে হইবে।

আকার, ইকারাদি চিহ্ন—

'ি' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাব—ি আগে না লিখিয়া ব্যঞ্জনের পরে লেখা উচিত। কেননা উচ্চারণ ও বানানের সময় আমরা ি-কারটি পরেই বলিয়া থাকি। তিনি 'বি' না লিখিয়া 'ব'-এর পরে উলটাইয়া 'ি' লিখিবার পক্ষপাতী। এই সম্বন্ধে আমার একটি বক্তব্য আছে—আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন কোন অক্ষর লিখিবার সময় তাহার শেষ প্রান্তটি যেন ডানদিকে শেষ হয়, তবে পরের অক্ষরটি ধরিতে সুবিধা হয়, লেখার গতিও বাড়ে। ি-কে উলটাইয়া লিখিলে লিখিবার সময় আমাদের পিছাইতে হইতেছে। অথবা 'ী'-এর সহিত

* ১১।২।৫৮ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা।

একরূপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই কারণে আমি বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাব মানিতে পারিলাম না। আমরা ি ব্যঞ্জনের পূর্বে, কিন্তু ী ব্যঞ্জনের পরে লিখি—এই অসামঞ্জস্য ঠিক নয় বটে, তবে উভয় ক্ষেত্রেই লেখার ক্ষিপ্রতা ঠিক কথা ইহা লক্ষণীয়। এখানে যেরূপ উচ্চারণের সহিত লিখনপদ্ধতির বিপর্যয় ঘটিয়াছে, ইংরেজীতেও সেইরূপ উচ্চারণ ও বানানের মধ্যে বিষম বিপর্যয় আছে, 'but' ও 'put' তাহার প্রমাণ।

ু, ূ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নীচে না লিখিয়া ব্যঞ্জনের পাশে ব্যঞ্জনের সমস্থান জুড়িয়া লেখার ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে প্রেসের space বাঁচিবে, লেখার গতিও ব্যাহত হইবে না। এই প্রস্তাবানুযায়ী লিখিলে লেখা দ্রুততরই হইবে। বিদ্যানিধি মহাশয় একই ভাবে ু স্থলে ডবল ড্রপ্ট লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় নূতন এর ন্যায় কু লিখিলেও ক্ষতি নাই। ডবল ড্রপ্ট-এর আকৃতিটি একটু জটিল। ইহা ছাড়া রু, রূ, লিখিবার রীতি অবিলম্বে তুলিয়া দেওয়া দরকার। লাইনো টাইপ ইহা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত 'কিন্তু' লিখিবার সময় 'ু' টিকে ত-এর সহিত এক অঙ্গরূপে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহা প্রাচীন বাংলা হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে উহাও আপত্তিকর। দুই তিন রকম ু প্রথম শিক্ষার্থিগণের নিকট একটা অনাবশ্যক বোঝাস্বরূপ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ু, ূ কে ব্যঞ্জন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনের উকারান্ত রূপ পৃথক পৃথক ভাবে না রাখিয়া পৃথক 'ু' ও 'ূ' দিয়া কাজ চালানো যাইবে, এবং প্রেসের অক্ষরের সংখ্যা কমিবে। কিন্তু তদপেক্ষা বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবই অধিকতর গ্রহণীয়। আর বস্তুতঃ অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবানুযায়ী লিখিতে গেলেও অবশেষে বিদ্যানিধি মহাশয়ের রূপই ধারণ করিবে। অক্ষয়বাবুর নির্দেশ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: (প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৫৩)। গু, শু, সু, হু প্রভৃতি লিখিবার রীতি বর্জনীয়।

ঋ-কার—বিদ্যানিধি মহাশয় ৃ টিও 'ু'-এর মত মাত্রা হইতে লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পূর্বোক্ত কারণে ইহাও গ্রহণযোগ্য। হ-এর সহিত ৃ যোগ করিবার জন্য যে নূতন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যথা 'হৃ'—তাহা বর্জনীয়।

'ে' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় ি-এর মত 'ে' টিকেও ব্যঞ্জনের পর লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার যুক্তিতে যে কারণে বিদ্যানিধি মহাশয়ের ি গ্রহণযোগ্য নয়, সে কারণেই উলটানো 'ে' অচল।

ৈ। সম্বন্ধেও একই কথা।

পান্নালালবাবু ো কারের পূর্বের অনাবশ্যক 'ে' টুকু তুলিয়া দিতে চান। ইহার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে ো-কার উচ্চারণের ভূমিকায় ে-কারের রেশ রহিয়াছে। তাই লিখিবার সময় এ-কারের রেশটুকু রাখিলে প্রথম শিক্ষার্থীকে বুঝাইতে সুবিধা হয়। ৌ-কার সম্বন্ধে উভয় পক্ষেরই যুক্তি প্রবল। তবে বিদ্যানিধি মহাশয় একটি নূতন চিহ্নের প্রস্তাব করিয়াছেন—ঈষৎ ঈ-এর জন্য ী ব্যবহার। এই পরিপ্রেক্ষিতে পান্নালালবাবুর 'ী' চলে না।

এইবার ব্যঞ্জনবর্ণের প্রসঙ্গে আসা যাক।

ক বর্গ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব নাই।

চ বর্গে ছ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আছে—ব-এর মত চ-এর পেট কাটিয়া 'ছ' লেখা। ইহাতে বিশেষ কাজ আগাইবে না। অধিকন্তু প্রেসের প্রুফ যাঁহারা দেখেন তাঁহারা বলিতে পারেন ব এবং র-এর মধ্যে কি পরিমাণ গণ্ডগোল হয়। সেই গণ্ডগোল চ, ছ-এর ক্ষেত্রেও দেখা দিবে।

ট বর্গে কোন প্রস্তাব নাই।

ত বর্গে 'ত' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় ত-এর ত্রিশঙ্কু অবস্থা নিরসন করাইয়া উহাকে মাত্রার সহিত যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবার কথা নয়। বস্তুতঃ 'ত' যে মাত্রার সহিত যুক্ত নহে এই তথ্যটি অনেকের কাছে জ্ঞাত নয়। 'ধ' সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে। ধ-এর আঁকড়িটি ঊর্ধ্বমুখী না করিয়া পাশে দীর্ঘ উ-এর মত লিখিলে অনেক সুবিধা হইবে। যে-কোন যুক্তব্যঞ্জনে ধ-এর চেহারা ওইরূপই হইয়া থাকে যথা দ্ধ। যুক্তব্যঞ্জন লিখিবার সময় একপ্রকার 'ধ', খুচরা লিখিবার সময় অন্যরূপ 'ধ' এই অসঙ্গতিটি কাটাইবার ইহাই সহজ পথ।

'ভ' সম্বন্ধেও বিদ্যানিধি মহাশয়ের ত-এর ন্যায় একই কথা বলিয়াছেন। 'ভ'-কেও মাত্রার সহিত যুক্ত করা প্রয়োজন।

'ষ'-লিখিবার বিদ্যানিধি মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ সুবিধা দেখিতেছি না। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

য-এর বর্তমান রূপ লইয়া সকলেই প্রায় বিরূপ। কেহ য-এর স্থানে নাগরী য চালাইতে চান, কেহ য-এর নীচের বিন্দুটিকে মূল অক্ষরের সহিত জুড়িয়া দিতে আগ্রহী। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) সকলেরই যুক্তি বিন্দুটিকে পৃথক রাখিতে গেলে লিখিবার সময় কলম তুলিতে হয় এবং প্রেসেও কিছুদিন পর বিন্দুটি উহ্য হইয়া যায়। প্রেসের ব্যাপার সম্বন্ধে বলিতে পারি না, তবে ইংরেজীতেও বিন্দুওয়ালা অক্ষর আছে i j। এবং 'য' লিখিতে কলম না তুলিতে হইলেও তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় য ও প্রস্তাবিত 'য' গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। নাগরী য গ্রহণের বিরুদ্ধে আমার যুক্তি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ব, ক, ধ ও য একই জাতীয় অক্ষর হওয়ায় লিখিবার সুবিধা হয়। য লিখিতে হইলে নূতন ধরনের অক্ষর শিখিতে হয়। তা ছাড়া আমাদের লিপিতে অসুবিধা আছে বলিয়া অপর ভাষার লিপি হইতে ধার লইব, এই যুক্তিটিও আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হয় না। বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবিত ড়, ঢ় এবং য় সম্বন্ধেও য-এর যুক্তিই প্রযোজ্য।

অন্তস্থ 'ব' সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় যে নাগরী ব-এর প্রস্তাব

করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও আমার একই কথা। আর অন্তস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ যখন অন্য অক্ষরের সাহায্যে বাংলায় লিখিবার ব্যবস্থা আছে, তখন অন্তস্থ 'ব' বর্ণমালা হইতে বাদ দিলেই বা ক্ষতি কি?

'ৎ'-টি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিনব আবিষ্কার। কিন্তু বর্তমানে উহাকে বাদ দিলে ভাল হয়, ত-এ হসন্ত দিয়াই কাজ চলে।

তিনটি স-এর সংযুক্তিকরণ সম্বন্ধে পান্নালালবাবু একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অবান্তর, লিপি সংস্কারের এক্তিয়ারের বাহিরে।

'ং'-টি সম্বন্ধে অনেকের মত ব্যঞ্জনের পর মাত্রার উপরে একটি বিন্দু দিয়া অনুস্বার লেখা উচিত। ব্যঞ্জনযুক্ত ঙ, ঞ সম্বন্ধেও একই বিন্দু ব্যবহৃত হইবে। এবং যে বর্গের ব্যঞ্জনের সহিত ব্যবহৃত হইবে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ বুঝাইবে। উদাহরণ—চঁচল—চ-এর সহিত যুক্ত বলিয়া বিন্দুর উচ্চারণ ঞ বুঝিতে হইবে। বর্গ ভিন্ন অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইলে বিন্দুর অর্থ হইবে অনুস্বার যথা: অহং। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি। তবে সন্তান-এর বেলায় এ নিয়ম খাটিবে না অর্থাৎ সংতান লেখা চলিবে না। 'বঙ্গ' কথাটিকে 'বঙগ' লিখুন এই অনুরোধ। কেননা 'ঙ্গ' অক্ষরটিকে বিলোপ করা প্রয়োজন।

এইবার যুক্তাক্ষরের পালা। যুক্তাক্ষরগুলিকে লাইনো টাইপের ন্যায় যতদূর সম্ভব ভাঙিয়া দিতে হইবে। এই বিষয়ে লাইনো টাইপের অক্ষরগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বাংলায় যুক্তাক্ষর সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলির অংশবিশেষকে অনেক সময় হারাইতে হইয়াছে—'হ্ম' বা ক্ষ তাহার প্রমাণ। ইহার ফলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলিকে প্রথম শিক্ষার্থী খুঁজিয়া পায় না। উর্দুতে এই ব্যবস্থা আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়া 'মিলাওট' সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার ফলে উর্দু লিপিতে এক অনাসৃষ্টি ঘটিয়াছে।

যুক্তাক্ষর ভাঙিবার নামে 'ক্ষ'-টিকে ভাঙিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা ক্ষ-এর উৎপত্তি হইতে ইহার প্রয়োগের মধ্যে কোন যোগ-সূত্র নাই। ক্ষ-টির অভ্যন্তরে যে দুটি বর্ণ লুক্কায়িত রহিয়াছে 'ক্ষ' তাহাদের নিঃশেষে হজম করিয়াছে। সুতরাং ক্ষ-টিকে বর্তমানে নূতন অক্ষর বলিয়া ঘোষণা করিয়া হ-এর পাশে স্থান করিয়া দেওয়া হউক। রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠে তাহাই করিয়াছেন; উহাকে যুক্ত খ বলা ভাল। শুধু একটি কথা, ক্ষ-এর সহিত ণত্ববিধানের একটি বিধি জড়িত। উহার অভ্যন্তরে 'ষ' আছে বলিয়া পরবর্তী ন, ণ হইয়া যায়। ইহার ব্যবস্থা করার জন্য ক্ষ র ষ-এর সঙ্গে ক্ষ-কে জুড়িয়া দিলেই আইন বাঁচিবে।

রেফ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঘুচাইয়া দিলে (যাহা বহু পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে) প্রেসের অনেক টাইপ কমিবে, প্রথম শিক্ষার্থীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।

লিপি সংস্কারের প্রথম ধাপহিসাবে আমি যুক্তাক্ষরগুলিকে পাশা-পাশি লিখিবার বিরোধী। ইহাতে হসন্তের ব্যবহার অনাবশ্যকরূপে বাড়িয়া লেখার রূপ দুষ্করূহ হইয়া দাঁড়াইবে। কিছুকাল উহারা একে অপরের স্কন্ধেই বাস করুক। যুক্তাক্ষরে 'ধ' ব্যবহারের একটু অসুবিধা আছে। 'ধ'-কে কাহারও স্কন্ধে চড়িতে হইলে ধ-এর আঁকড়ির সম্যক বিকাশস্থান থাকে না। এই বিষয়ে আমার প্রস্তাব মতো ধ-এর রূপটিকে পরিবর্তন করিয়া ব করিলে সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

যুক্ত অক্ষরগুলিকে ভাঙিয়া একের স্কন্ধে অপরকে জুড়িয়া লিখিলে কয়েকটি অক্ষর প্রথম প্রথম একটু দৃষ্টিকটু লাগিবে। যেমন—ত্ত, ত্ত, ক্র—ক্‌র, ঞ্চ—ঞচ, জ্ঞ—জঞ, ত্র—ত্‌র, হ্ন—হন। এইগুলিকে প্রথম ধাপে হাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়া আমার ধারণা। অক্ষগুলি সম্বন্ধে চোখ ও হাত অভ্যস্ত হউক, পরে এই অক্ষরগুলির রূপ পরিবর্তনের কথা ভাবা যাইবে। এমনও হইতে পারে উপরোক্ত অক্ষর কয়টিকে ব্যতিক্রম হিসাবে নবলিপির সহিত এক পংক্তিতে বসাইয়া লওয়া হইবে। কেবল 'ষ্ণ' সম্বন্ধে আমার একটি নিবেদন। কি বিষ্ণু, কৃষ্ণ, কি তৃষ্ণা কোন ক্ষেত্রেই আমরা 'ষ' এবং ণ-এর উচ্চারণ করিতে পারি না—'ষ এবং ণ'-এর উচ্চারণ করিয়া থাকি। আমার মনে হয় 'কৃষ্ণ' এইরূপ না লিখিয়া কৃষণ লিখিলেই গোলমাল মিটিয়া যায়, উপরন্তু আমাদের একটি ভুল উচ্চারণের হাত হইতে রেহাই দেওয়া হয়।

ইহার পর 'ফলা'র কথা। য-ফলা সম্বন্ধে দে মহাশয় নাগরী য-ফলা প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি বাংলা য-ফলাটি অনাবশ্যক পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু তাহা হইলে তো অনেক অক্ষরকেই পা বা হাত গুটাইয়া বসিতে হয়। আর ্র-ফলাটি পা ছড়াইয়া বসিলেও উহা লিখিতে কাহারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফলাগুলি কত সহজলেখ্য হইয়াছে তাহার নিদর্শন ট-ফলা। যদিও যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রস্তাবানুযায়ী ট-ফলার আর থাকিবার অনুমতি নাই, তথাপি ব্যতিক্রম বলিয়া ট-টিকে বজায় রাখিলে মন্দ হয় না।

আমার একটি বক্তব্য আছে রেফ সম্বন্ধে। আমরা রেফটি সাধারণতঃ যে ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারণ করি, তাহার মাথায় বসাইয়া থাকি, কেহ কেহ পরেও বসাইয়া দেন। আবার অনেকে ঠিক কোথায় বসানো উচিত তাহা না জানিয়া যত্রতত্র লাগাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে একটী বিধিসম্মত ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। আমার মনে হয় উচ্চারণানুগ করিয়া উহাকে ব্যঞ্জনের পূর্বে বসাইলে ভালো হয়। যথা—স্বর্গ।

প্রচলিত হসন্তের রূপটিকে পরিবর্তন করিবার বিশেষ প্রয়োজন আমি অনুভব করিতেছি না। তা ছাড়া ভাষায় যত কম হসন্তের প্রয়োগ করা যায় ততই ভালো। বস্তুত বাংলায় শব্দান্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণের কোন নিয়মের বালাই নাই—মত্ কিন্তু যত, অথচ দুইটিকেই একভাবে লেখা হয়, দিক্ কথাটির ক-এ হসন্ত আছে, কিন্তু কয়জন তাহা লিখিয়া থাকেন?

ইহার উপায় কি? আমার মনে হয়, হসন্তের বিধিটিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া পাঠকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়িলে হস চিহ্ন ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন।

বর্ণমালার অন্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সূচনায় বলিয়াছিলাম, বর্ণমালায় লিপি পদ্ধতিতে অবৈজ্ঞানিক প্রথা রহিয়াছে, তাহাকে বিজ্ঞানের নিয়মের ছাঁচে বলপূর্বক ফেলিলে সুবিধা হইবে না। সেই কারণে আমি কেবল প্রচলিত প্রবণতাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিছু কিছু সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছি। আমার প্রস্তাবে, প্রেসের অক্ষর সংখ্যা বিশেষ না কমিলেও, অক্ষরের লেখ্যরূপে অনেকখানি সরলতা আসিবে মনে হয়।

বর্ণমালা ছাড়িয়া সংখ্যা লিখন পদ্ধতির দিকে চাহিলেই বুঝা যাইবে কিরূপ অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন পদ্ধতিকে আমরা অতি সহজে মানিয়া লইয়াছি। একমাত্র রোমান সংখ্যা ভিন্ন কোন ভাষায় সংখ্যা লিখনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যবোধ নাই। অথচ তাহাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় কি?

প্রবন্ধের উপসংহারে একটু নিবেদন আছে, সেইটুকু সারিয়া লই। ভাষার ক্ষেত্রে যেরূপ আইনের হুমকি কখনও কার্যকারী হয় না, লিপির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। এইরূপ বলিতে হইবে বলিলেই লোকে বলিবে না, লিখিতে হইবে বলিলেই লোকে লিখিবে না। এই সকল বিষয়ে বিপরীত দিক হইতেই নিয়ম চলিবে অর্থাৎ লোকে যেরূপ লিখিবে তাহাকেই মানিতে হইবে। ভাষা ও লিপি পূর্ণ গণতন্ত্রপন্থী। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু বলিয়া বুঝাইয়া সংস্কার করা দরকার। কিন্তু এই সংস্কারকে প্রবর্তন করাইবার যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে আমরা চেঁচামেচি করিয়া কতটুকু করিতে পারিব? স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয়ও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই।

নূতন লিপি চালাইবার দুই একটি সূত্র এইবার আলোচনা করিব। প্রথম ধাপে,

(১) বিশ্বভারতী, সাহিত্য-পরিষদ ইত্যাদি বিজ্ঞ প্রকাশকেরা অত্যন্ত কঠোর নিয়ম করিয়া নূতন লিপি তাহাদের গ্রন্থে ব্যবহার করুন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রেসে মুদ্রিত ও স্কুল কলেজে পাঠ্য সবকিছুর ক্ষেত্রে নব লিপি ব্যবহার করুন।

(৩) অন্ততঃপক্ষে ২।৩টি অভিজাত মুদ্রক নূতন লিপির বই ছাপিতে সুরু করুন।

(৪) একটি সমিতি গঠন করিয়া অনবরত প্রচার ও অন্ততঃ-পক্ষে একটি সাময়িকপত্র নব লিপিতে ছাপার ব্যবস্থা করা হউক।

সবশেষে যে সূত্রটি উল্লেখ করিতেছি সেইটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

(৫) শিশুদের বর্ণপরিচয় (primer) গুলিতে এই নব-লিপি ব্যবহৃত হউক। তাহার ফলে শিশু-বয়স হইতেই তাহারা এই লিপি দেখিতে অভ্যস্ত হইবে, ধীরে ধীরে চোখ তৈরী হইবে। তাহাদের শিখাইতে যাইয়া অভিভাবক ও শিক্ষকগণকেও নবলিপির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ইহার ফলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সম্পাদিত হইতে পারে।

সবশেষে একটি বিনীত নিবেদন রাখিতেছি। সাহিত্য-পরিষদ-এর এক সভায় শ্রদ্ধেয় শ্রীসন্তোষকুমার বসু কথাটি বলিয়াছিলেন। লিপি সংস্কার বিষয়ে যে ব্যবস্থা বা কার্যক্রমই লওয়া হউক না কেন, তাহা যেন একক ভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণ করা না হয়। বাংলা ভাষার অপর অংশীদার পূর্ববাংলার কথাও মনে রাখতে হইবে। এবং সেই কারণে পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত-সমাজের সহিত একত্রে বসিয়া যে কোন সিদ্ধান্ত লওয়া কর্তব্য। বসু মহাশয়ের এই কথাটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই। প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্টে বিভিন্ন প্রস্তাবের নূতন লিপির রূপ দেওয়া হইল। ইহাদের সহিত মিলাইয়া পড়িলে প্রবন্ধে বর্ণিত বক্তব্য বুঝিতে সুবিধা হইবে।

প্রস্তাবিত নূতন অক্ষর

ম্যাডাম কামা

শ্রীআরতি সেন

স্বাধীনতা দিবসের দিন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে আজ আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকি। যে দেশসেবক ও দেশসেবিকারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করি, সে সম্মান ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে পৌঁছুবে ম্যাডাম কামার উদ্দেশ্যে। কারণ তিনিই প্রথম উত্তোলন করেছিলেন ভারতের জাতীয় পতাকা সুদূর বিদেশে জার্ম্মানীতে ১৯০৮ সনের ১৮ই আগষ্ট দিবসে।

এই ভুলে যাওয়া নারীর জীবনবৃত্তান্ত এতদিন প্রায় অজ্ঞাত ছিল, ব্রিটিশ শাসনের আমলে এই বিপ্লবী মহিলার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের খবরাখবর কারুরই হয়ত জানবার সুযোগ ঘটে নি। এখন মনে হয় ভারতের প্রত্যেকটি মহিলা জানুক এই মনস্বিনী মহিলার দুঃসাহসের ইতিহাস।

ম্যাডাম কামা ছিলেন জাতিতে পার্শী, তাঁর জন্ম বোম্বাইয়ে। তাঁর বাবার নাম সোরাবজী ফ্রেমজী প্যাটেল। সোরাবজী ছিলেন মস্ত ব্যবসায়ী। বাপ মেয়েকে অনেক সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের পরিবেশে মানুষ করেছিলেন, কিন্তু মেয়ে সে সুখৈশ্বর্য্যে প্রলোভিত ছিলেন না। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অতি সহজ ও সরল। গরীব দুঃখীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না এবং মহিলাদের যে-কোন সংগঠন-মূলক কার্য্যে তাঁর সহায়তা ছিল সর্ব্বপ্রথম।

ম্যাডাম কামার পুরো নাম ছিল ভিক্ষু ভিকায়জী কামা। তাঁর জন্ম হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ম্যাডাম কামা ছিলেন তাঁর বাবার আদরের সন্তান। তাঁর ভাইরাও ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী। ভিক্ষুজীর বিয়ে হয়েছিল বোম্বাইয়ে রুস্তম কামার সঙ্গে। তাদের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

ম্যাডাম কামার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নি, কিন্তু তার জন্য তাঁর আক্ষেপ ছিল না; জনসাধারণের জন্য তিনি যে কাজ করতেন তাতেই ছিল তাঁর আনন্দ।

একসময়ে ম্যাডাম কামার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়, ডাক্তাররা রোগ ধরতে না পারায় ম্যাডাম কামাকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর তিনি চলে যান প্যারিসে এবং সেখানেই তিনি বসবাস স্থাপন করেন। ইউরোপে যাওয়ার পর বহু ভারতীয় রাজনৈতিকের সঙ্গে ম্যাডাম কামার পরিচয় হয়। লণ্ডনের 'হাইড পার্কে' ম্যাডাম কামা প্রায়ই সভা করতেন এবং 'ভারতের লোকদের উপর ইংরেজের অত্যাচার' এই কথাটাই বার বার বলতেন। স্বাধীনতাপ্রিয় যে সকল ইংরেজ সেই সভায় যেত তারা এই শীর্ণকায়া রমণীর ভারতে ইংরেজ শাসনের

ম্যাডাম কামা

বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ ও সেই শাসনকে বিপুল অবহেলার মনোবৃত্তি দেখে অবাক হয়ে যেত। এই কারণেই ইংরেজ সরকার ম্যাডাম কামাকে ইংলণ্ড ত্যাগ করবার আদেশ দেন এবং তিনি প্যারিসে যেতে বাধ্য হন।

প্যারিসে ম্যাডাম কামা একটা বোর্ডিং হাউসে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করেন এবং পরে সেটাই ইউরোপবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মিলবার একটা আস্তানা হয়ে উঠে। ভারত ছাড়বার আগে পর্য্যন্ত ম্যাডাম

কামার রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্দামতা বা সে বিষয়ে তাঁর কার্য্যকলাপের কিছু জানা যায় না। ইউরোপে থাকাকালীন নানা যায়গা থেকে ম্যাডাম কামার কাছে সাহায্য ও উপদেশের আবেদন নিয়ে লোক আসত, অনেক রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিমন্ত্রণ আসত বক্তৃতা দেবার জন্ত। ম্যাডাম কামা যখনই সেখানে বক্তৃতা দিতেন তার বিষয়বস্তু ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী।

১৯০৬ সনে বীর সাভারকর ও কৃষ্ণবর্ম্মার সঙ্গে ম্যাডাম কামার পরিচয় হয়। এই দু'জনের অনুপ্রেরণাতেই ম্যাডাম কামা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার সুযোগ পান। কৃষ্ণবর্ম্মার জন্ম হয়েছিল ভারতবর্ষে, কিন্তু মৃত্যু হয় জেনিভাতে। ম্যাডাম কামা যখন প্যারিসে ইনিও তখন প্যারিসে। এই সময়ে এঁরা ও আরও কয়েকজন মিলে চুপে চুপে "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লিগ" প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল কিকরে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যায়। ম্যাডাম কামা ছিলেন এই গুপ্তদলের একজন বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী।

ভারতবর্ষের আজ নূতন জাতীয় পতাকা হয়েছে, আর এর পূর্ব্বের জাতীয় পতাকা ছিল মুসলমান রাজাদের সময়। মাঝখানে ভারতবাসীকে মাথা নোয়াতে হ'ত ইউনিয়ন জ্যাকের কাছে। এই ক্ষুদ্রকায়া বীর রমণী ম্যাডাম কামাই প্রথম কল্পনা করেন ভারতবাসীদের একত্র করতে হলে একটি পতাকার তলে আনা দরকার। তিনি কল্পনা অনুযায়ী পতাকা তৈরিও করেছিলেন এবং তা উত্তোলন করেছিলেন সুদূর জার্ম্মানীতে। তার পতাকার রং ছিল সবুজ লাল ও কমলা রং, সবুজ রংটার উপরে সুতো দিয়ে তোলা ছিল আটটি পদ্মফুল, কমলা রঙের উপরে হিন্দীতে লেখা ছিল "বন্দেমাতরম্" আর লাল রঙের উপরে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতীক বোঝাতে আঁকা ছিল পাশাপাশি সূর্য্য ও চন্দ্র।

জার্ম্মানীতে সোস্যালিষ্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে ম্যাডাম কামা তাঁর নিজের পরিকল্পিত পতাকা উত্তোলন করে সেদিন ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ভারতের জাতীয় পতাকার প্রথম কল্পনা ও সৃষ্টির সম্মান ম্যাডাম কামারই প্রাপ্য।

সেদিনকার এই সোস্যালিষ্ট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন 'হের সিঙ্গার'। আর সেই অধিবেশনে হাজার ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন যার অধিকাংশই ছিল ইংরেজ। এই ইংরেজরা সেখানে কোন্ মতলবে এসেছিল সেটা চিন্তা করে দেখবার বিষয়।

ম্যাডাম কামা সেখানে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মিঃ হিনসম্যান বলে একজন বড় ইংরেজ সোস্যালিষ্ট তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কামার এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশই তাতে সায় দেয়।

এই প্রস্তাবকে সামনে রেখে ম্যাডাম কামা এক জোরাল ভাষণ দিয়েছিলেন, এর মর্ম্ম ছিল—ব্রিটিশের শাসন ভারতবাসীর যতদূর সম্ভব ক্ষতি করছে, পৃথিবীতে যত মুক্তি-অভিলাষী মানুষ আছে সকলেরই এই দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত করবার প্রস্তাবে সহানুভূতি দেখান উচিত।

লালা লাজপত রায়কে মান্দালয়ে অন্তরিত করা সম্বন্ধে ম্যাডাম কামা বলেছিলেন: "ইংরেজের এই দারুণ অন্যায় আমাদের অন্তরকে প্রজ্জলিত করেছে। আমি আশ্চর্য্য হই কি করে কোন মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে এ আশা করতে পারে যে, আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে এ অত্যাচার সহ্য করব। আমার ইচ্ছে করে যে কারাগারের দ্বার নিজে ভেঙে দিয়ে আমি লজপত রায়কে মুক্ত করে আনি।"

এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বেই ১৯০৫ সনে প্যারিসে তিনি "বন্দেমাতরম্" নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। কাগজখানি প্রায় আট-ন' বৎসর চলেছিল। এই কাগজে তিনি ভারতে ইংরেজ শাসনকে আক্রমণ করে বার বার ইংরেজকে ভারত-ত্যাগের কথা শুনিয়েছেন।

সেই সময়ে তিনি 'তলোয়ার' নামে আরও একখানি কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাগজের নাম দেখেই বোঝা যায় সে পত্রিকাখানি ছিল বিপ্লবপন্থী। এ কাগজও বেশীদিন স্থায়ী হয় নি।

১৯০৭ সনে সার্ উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলির হত্যা-ব্যাপারে ম্যাডাম কামা, বর্ম্মা, রাণাজি, এবং সাভারকরকে বন্দী করবার কথা হয়। কিন্তু একমাত্র সাভারকর ছাড়া আর সকলেই সেই সময়ে ফ্রান্সে অবস্থান করাতে ইংরেজ তাঁদের কিছুই করতে পারে নি। সাভারকর সেই সময় ইংলণ্ডে থাকাতে একমাত্র তাঁকেই তারা আইনতঃ বন্দী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাকে বিচারের জন্ত জাহাজে করে ভারতবর্ষে আনবার সময় তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন এবং সাঁতরে ফ্রান্সের কূলে এসে উপস্থিত হন। ফরাসী সরকার তাকে বন্দী করে ইংরেজের হাতে সঁপে দেন, তিনি ভারতবর্ষে নীত হন। ফলে তাঁর দীর্ঘকাল কারাবাস করতে হয়।

১৯১৪ সনে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ম্যাডাম কামা প্যারিস ত্যাগ করে মার্সেলিস যান এবং সেখানে ভারতীয় সৈন্তদের অস্ত্র ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। তার অভিযোগ ছিল যে, এযুদ্ধে ভারতবর্ষের কোন স্বার্থ নেই।

এই ব্যাপারে ফরাসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ভিচিতে ও পরে বোর্ডোয় রাখেন। ইংরেজ তাঁকে তাদের হাতে সমর্পণ করবার জন্ত ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানায়, কিন্তু ফরাসী সরকার সে অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকার করেন এবং নিজেরাই প্যারিসের বাইরে একটা দুর্গে ম্যাডাম কামাকে বন্দী করে রাখেন।

যুদ্ধ অবসানের পর ম্যাডাম কামা মুক্ত পান এবং প্যারিসেই বসবাস করতে থাকেন। কারাবাসের ফলে তিনি তখন জীর্ণশীর্ণ, কিন্তু তাতে তাঁর মনের বল এতটুকুও কমে নি। মুক্তি পেয়েই ম্যাডাম কামার প্রধান কাজ হ'ল রাশিয়ান বিপ্লবী খুঁজে বার করা যারা ভারতীয় কয়েকজন বিপ্লবীকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারে।

লেনিনও ম্যাডাম কামাকে বহুবার রাশিয়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু ম্যাডাম কামা লেনিনের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি তখন ভারতবর্ষে আসবার জন্ত উন্মুখ কিন্তু ইংরেজ তাঁকে ভারতে আসবার ছাড়পত্র দেয় নি। ১৯৩৪ সনে ৭৪ বৎসর বয়সে ম্যাডাম কামার স্বাস্থ্য যখন একেবারেই ভেঙে পড়তে লাগল তখন সেই কারণেই ম্যাডাম কামা ভারতে আসবার অনুমতি পেলেন।

১৯৩৫ সনে বোম্বাইয়ে এসে ম্যাডাম কামা সোজা পার্শী জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার মালপত্র ইতিপূর্ব্বেই তদানীন্তন গোয়েন্দা বিভাগ হাতে নিয়েছিল। খানাতল্লাস করে তাঁর জিনিসপত্র থেকে তারা পেল কিছু নিষিদ্ধ কাগজপত্র ও তাঁর পরিকল্পিত কিছু জাতীয় পতাকা। কাগজপত্রগুলো ছিঁড়ে ফেলা হ'ল, আর তাঁর সাধের জাতীয় পতাকাগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

১৯৩৬ সনে ১২ই আগষ্ট হাসপাতালেই এই মহীয়সী মহিলার জীবনাবসান ঘটে। তখন তিনি ৭৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা। প্যারিসে থাকাকালীন ম্যাডাম কামা তাঁর সমাধির উপর লিখে রাখবার জন্ত তাঁরই প্রাণের এই কয়েকটি কথা রচনা করেছিলেন :

"He who loses his liberty loses his virtue. Resistance to tyranny is obedience to God."

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বানেতে ভারতের রাষ্ট্রদূতের আবাসস্থল থেকে একটি বই ছাপা হয়েছে। এই বইয়ে ভারতের জাতীয় পতাকার অনেক বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু সবচেয়ে আগে আছে ম্যাডাম কামার নমুনা দেওয়া পতাকার ছবি।

ম্যাডাম কামা আজ মৃত, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় পতাকা ভারতের গৌরব বহন করবে ততদিন পর্য্যন্ত জাতির গৌরব এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতি আমাদের মনে জাগরুক থাকবে নিশ্চয়।

প্রেম-ভালবাসা

শ্রীলীলাময় দে

প্রেম-ভালবাসা কি যে বলে সব
বুঝি নাকো ছাই আমি
ফুট-পাথে শুয়ে যত ভাই-বোন
কাটায় দিবস-যামি
তারা কি করিছে মৃত্যু সাথে
চুপি চুপি কানাকানি
মাটি ভালবেসে মাটি কি হতেছে
দর্শন দশা জানি ?
প্রেম আমি জানি ফুলের সুরভি
নির্ম্মল বায়ে বয়
উর্দ্ধ আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়
মাটির সে কিছু নয়।

মাটির যা কিছু মাটিরে ছাড়ায়ে
যত উর্দ্ধেই যাক
মাটিতে তাহারে ফিরিতেই হয়
পশিলে মাটির ডাক।
পঞ্চ শরের পঞ্চম বাণে
মনে দেহে ডাকে বান
সর্ব্ব কাজেই সব কিছু ভুলে
শুধু করে আনচান।
প্রেম-ভালবাসা শুধু ফাঁকা ভাষা
কিছু নয় কিছু নয়
মাটির বুকের প্রেম-ভালবাসা
কর্ম্মে ফলিত হয়।

স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে
যদি কিছু থাকে ভুল
প্রেম-ভালবাসা সেই কাননের
মায়া মরীচিকা ফুল।

রাহুল-মাতা

শ্রীইন্দিরা দেবী

খেয়ালী বলে বিধাতা পুরুষের দুর্নাম আছে, কিন্তু খেয়ালের প্রতিযোগিতায় ইতিহাস-বিধাতা তাঁকেও অনায়াসে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর সোনার তরীর পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সেই সঙ্কীর্ণ পরিবেশে যাঁরা স্থান লাভ করেন তাঁরা নিতান্তই ভাগ্যবান।

যুগ থেকে যুগান্তরে কালস্রোতে ভেসে চলেছে এই তরী, কিন্তু যাঁরা তাতে স্থান পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বেশীর ভাগকেই ফিরে আসতে হয়েছে ঠাঁই নাই, 'ঠাঁই নাই ছোট এ তরী'—এই কথা শুনে।

যাঁদের ঠাঁই হ'ল না তাঁদের মনে হয়ত দুঃখ নেই। তবু এমন এক-একটি চরিত্র ইতিহাসের চলমান পর্দায় চকিতে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায় যিনি স্থান পেলেন না বলে অন্যদের পক্ষে দুঃখ বোধ করা স্বাভাবিক। এমনই একটি চরিত্র রাহুল-মাতা।

ইতিহাস-বিধাতা তাঁর সবটুকু অভিষেকবারি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন রাহুল-পিতার উপর, রাহুল মাতার জন্য তাঁর ভাণ্ডারে একটি বিন্দুও অবশিষ্ট নেই। রাহুল-মাতার কথা ভাবলে মনে পড়ে কবিগুরুর 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের গোড়ার কথা।

"কবি তাঁর কল্পনা উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার জন্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী, ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতা দেবীর ছায়াতলে অবহেলিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেক বারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চন হইল না? হায় অব্যক্ত-বেদনা দেবী উর্ম্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মত মহাকাব্যের সুমেরু শিখরে একবার মাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায়-বা তোমার অনস্তশিখর তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।"

উর্ম্মিলার মতই অব্যক্ত বেদনা রাহুল-মাতার। কিন্তু কবি তাঁর কল্পনাবিলাসী মন নিয়ে কল্পলোকে যথেচ্ছ বিহার করেন। তাঁর অনন্তপ্রসারী কল্পনার আকাশে কত প্রাণীই বিচরণ করে; তাঁর চোখে কেউ ধরা পড়ে কেউ পড়ে না। কবি তাঁর নায়ক বা নায়িকার যূপকাষ্ঠে অনায়াসে বলি দেন পার্শ্বচরিত্র অভিনেতাদের। তাই অভিযোগের ক্ষেত্র সেখানে স্বভাবতঃই স্বল্পপরিসর। কিন্তু ইতিহাসের রাজ্যে কল্পনা ব পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই। সেখানে সমস্তক্ষণ দাঁড়িপাল্লায় সত্যমিথ্যার দর যাচাই চলছে। তবু এমন এক-একটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায় যেখানে ইতিহাস-বিধাতার দৃষ্টিকে অপক্ষপাতদুষ্ট বলা চলে না। এমনই চরিত্র রাহুল-মাতা।

সুন্দরী কিশোরী একদিন অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করে, অলঙ্কারভূষিতা হয়ে কপিলাবস্তুর শাক্যরাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। শাক্য রাষ্ট্রনায়কের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর উপযুক্ত মর্য্যাদার আসন তাঁর জন্য পূর্ব্ব থেকেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেই মর্য্যাদা থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। কিন্তু শাক্যনায়ক আশা করেছিলেন নববধূর সংস্পর্শে তাঁর পুত্রের মতিগতিতে পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাবে। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী শুদ্ধোদনের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। পুত্রের সহজাত সংসার বৈরাগ্যের প্রবৃত্তি এই কিশোরী রাজবধূর সান্নিধ্যে অপসৃত হবে এই ছিল শুদ্ধোদনের অন্তরের কামনা। সুতরাং শাক্যবধূরূপে গোপা যে মুহূর্ত্তে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন সেই মুহূর্ত্ত থেকেই শুদ্ধোদন এবং মাতা প্রজাবতীর আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঘিরে একটি নিশ্চিন্ততার দুর্গ রচনার প্রয়াস করেছিল। এই দুর্গের দুর্ভেদ্যতার কষ্টিপাথরে বিচার হবে রাজবধূ গোপার রাজ-অন্তঃপুর প্রবেশ করার সার্থকতা, অলঙ্কার ভার অপেক্ষাও দুর্বহ এই ভাবটি এই তরুণীর মনে সেদিন কোন সংশয়ের ছায়াপাত করেছিল কিনা কে জানে।

তার পর গতানুগতিক ভাবে অন্তঃপুরের যবনিকার অন্তরালে অতিক্রান্ত হয়ে চলল রাজবধূর প্রাত্যহিক জীবনের গতি। সুখে দুঃখে আশায় ভয়ে আনন্দে কল্পনার রামধনুতে বিচিত্রমধুর হয়ে উঠেছিল উদ্ভিন্ন যৌবনা এই নারীর জীবন। তারপর একদিন রাজবধূ লাভ করল নারী-জীবনের চরম সার্থকতা—মাতৃত্ব। রাহুল ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ-অন্তঃপুর ও রাজধানী উৎসবমুখর হয়ে উঠল। সেই দিনটি রাহুল-মাতার জীবনে অবিস্মরণীয়। তাঁর মনে হ'ল অন্তঃপুরে প্রবেশ মুহূর্ত্তে শাক্যকুলের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরে রচিত হয়েছিল, পুত্র রাহুলের রূপ ধরে সেই আকাঙ্ক্ষা যেন আজ তাকে সার্থকতায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে। কিন্তু রাহুল-মাতার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মাত্র ক'টি মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগ করলেন। একদিন রাত্রির দ্বিতীয় যামে নবজাত পুত্রকে বুকে জড়িয়ে রাহুল-মাতা যখন গভীর ঘুমে অচেতন, সমগ্র রাজপ্রাসাদ

নিস্তব্ধ, পথপ্রান্তর নির্জন, তখন সকলের অলক্ষ্যে সিদ্ধার্থ নিক্রান্ত হলেন মানুষের মুক্তির সন্ধানে। সমগ্র মানব ইতিহাসে এই নিক্রমণের মুহূর্তটি শাশ্বত হয়ে রইল। কিন্তু রাহুল মাতা এই মুহূর্তটিকে অভিনন্দন জানাতে পেরেছিলেন কি? আদর্শের প্রেরণায় সিদ্ধার্থ ব্যক্তিগত জীবনের সুখ, ঐশ্বর্য্য অকাতরে বিসর্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজবধূ গোপার জীবন সে আদর্শনিষ্ঠার প্রভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি। সেদিন আদর্শ নিষ্ঠার প্রেরণা অথবা বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণসাধনের সম্ভাবনা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পতির অভাবকে এতটুকু লাঘব করতে পারে নি। রাজবধূর জীবন এবার পর্য্যবসিত হ'ল রাহুল মাতার জীবনে। রাহুল মাতা —এই একটিমাত্র পরিচয়ই তিনি পেতে চাইলেন জীবনের সার্থকতা। কিন্তু বধূ জীবনের এই অকাল বিদায় মাতৃ-জীবনে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিল কিনা ভাবতে স্বভাবতঃই সংকোচ। মাত্র ক'টি বছর আগে আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে যে কিশোরী অনাগত ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে পদার্পণ করেছিলেন, নিক্রমণের মুহূর্তটি তাঁর জীবনকে বিকৃত করে তোলে নি কি?

পরদিন ছন্দকের মুখে যখন সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের সংবাদটি প্রচারিত হ'ল তখন গোপা দুঃসহ বেদনায় ভূমি-শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল, জীবনের পাত্র তিক্ততায় ভরে উঠেছে। তিনি কেশ ছেদন ও অলঙ্কার বর্জ্জন করে কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বেছে নিলেন। মাতৃত্বের গৌরব দিয়ে তিনি চাইলেন নারী জীবনের রিক্ততাকে পূর্ণ করতে। কিন্তু এ অবলম্বনটুকুও ভাগ্যবিধাতা তাঁর কাছে থেকে ছিনিয়ে নিলেন।

শুদ্ধোদনের উপর্য্যুপরি অনুরোধে বুদ্ধ কপিলাবস্তু দর্শনে এসেছেন। রাজধানীর উপকণ্ঠে ন্যগ্রোধ আরামে অগণ্য শিষ্য পরিবৃত হয়ে তিনি অবস্থান করছেন। পরদিন প্রভাতে তিনি যথারীতি ভিক্ষাপাত্র হাতে রাজধানীর পথে নিক্রান্ত হলেন। রাজপথের দুই পার্শ্বে যত গৃহ ছিল তার বাতায়ন থেকে পুরনারীগণ সেদিন গভীর শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে যখন এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীটিকে দেখছিলেন তখন রাহুল মাতাকে বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। দুর্জ্জয় অভিমানে আহত হয়ে তিনি স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আপন কক্ষে। পরে শুদ্ধোদন বহু উপরোধে বুদ্ধকে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণে সম্মত করালেন। মাতা প্রজাবতী যখন স্নেহরসে অভিষিক্ত করে পুত্রের সামনে আহার্য্য তুলে ধরলেন তখন রাজ-অন্তঃপুরের প্রত্যেকটি নারী অন্তরাল থেকে তথাগতকে সম্ভ্রম জড়িত চক্ষে দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনও এই দর্শনপ্রার্থিনীদের মধ্যে রাহুল-মাতাকে দেখা যায় নি। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁরা তাঁকে বুদ্ধদর্শনের সুযোগ গ্রহণের উপদেশ দিলে তিনি শান্ত সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"তাঁর যদি নিজের প্রয়োজন থাকে তা হলে তিনিই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।" কতখানি আত্মত্যাগের স্পৃহা আর সংযম আর অভিমান এই নারীর মনে সেদিন সঞ্চিত হয়েছিল তার পরিমাপ ইতিহাসের পাতায় নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত রাহুল-মাতারই জয় হ'ল। প্রিয় শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত আর মৌদগল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ নিজেই এলেন রাহুল মাতার কাছে। অধীর আবেগে চঞ্চল হয়ে গোপা বহুবাঞ্ছিত পরমপুরুষের চরণে লুটিয়ে পড়লেন, পরমুহূর্ত্তে শিষ্যদের দেখে সম্বৃত হয়ে তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। দু'জনের মধ্যে কোন বাক্য বিনিময় হয়নি। শুদ্ধোদনের কাছে গোপার কৃচ্ছ্রসাধনের কথা শুনে তথাগত শুধু বললেন, 'রাহুল মাতা যথোচিত কাজই করেছেন।' তার পর যতদিন বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে ছিলেন তত দিন রাজপ্রাসাদে তিনি আতিথ্যগ্রহণ করেছেন। রাহুল-মাতা অন্তরাল থেকে তাঁকে দর্শন করতেন; কিন্তু একান্তে তাঁর দর্শন লাভের কোন আকাঙ্ক্ষাই তিনি প্রকাশ করেন নি।

বুদ্ধ যেদিন কপিলাবস্তু ছেড়ে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন সেদিন রাহুল-মাতা পুত্রকে ডেকে রাজপথে বুদ্ধকে দেখিয়ে বললেন, "রাহুল, এই শ্রমণ তোমার পিতা, এর কাছ থেকে তুমি তোমার পিতৃধন চেয়ে নিও।" বুদ্ধদেব আহার্য্য গ্রহণের জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। মায়ের নির্দ্দেশে বালক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললে—'শ্রমণ, আমার পিতৃধন দিয়ে যাও।' বুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর হয়ে রইলেন। তার পর রাহুলের সঙ্গে কিছুক্ষণ তাঁর অন্য বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা হ'ল। বালক পিতৃধনের কথা ভুলে গেল। কিন্তু রাহুল-মাতা ভোলেন নি। তিনি আজ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নির্বাসনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে স্থিরসঙ্কল্প। বুদ্ধ আহারান্তে যখন প্রাসাদ থেকে নিক্রান্ত হতে উদ্যত তখন মায়ের নির্দ্দেশে রাহুল আবার তার পিতৃধনের দাবী জানাল। বুদ্ধ তাকে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন। রাজপুরী থেকে বেরিয়ে রাজপথ দিয়ে বুদ্ধ চলেছেন ন্যগ্রোধ আরামে—সঙ্গে জনকয়েক শিষ্য, সকলের পিছনে বালক রাহুল। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল রাহুল মাতা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আজ তাঁর সারা অন্তর বৈরাগ্যের ছায়ায় পরিপূর্ণ। শোক দুঃখের অতীত তাঁর মন। ন্যগ্রোধ আরামে বুদ্ধের নির্দ্দেশে সারিপুত্র রাহুলের হাতে তুলে দিলেন তার সুকুমার দেহে চীবর বস্ত্র আর তার কানে

শোনালেন বুদ্ধের অমৃতময় বাণী। সংবাদ পেয়ে শুদ্ধোদন ছুটে এলেন। প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হল। রাহুল ফিরে এলো না। সে পিতৃধন পেয়েছে, প্রাচুর্য্যের ঐশ্বর্য্যে তার প্রয়োজন নেই।

শেষ অবলম্বনটুকু রাহুল-মাতা স্বেচ্ছায় অবহেলায় ত্যাগ করলেন। ইতিহাসের পাতায় বুদ্ধের আত্মত্যাগ আর সাধনার কথা সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে কিন্তু রাহুল-মাতার আত্মত্যাগের কাহিনীতে মুখর হয়ে উঠে নি ইতিহাসের পাতা। তাঁর আত্মত্যাগের মুহূর্ত্তটি মহাভিনিষ্ক্রমণের মুহূর্ত্তের মত চিহ্নিত হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে নি। অন্তঃপুরের যবনিকার অন্তরাল ছিন্ন করে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। লক্ষ লক্ষ নরনারীর স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠে নি তাঁর জীবনের কাহিনী। কোনও শিল্পী পাথরে অথবা তুলির রঙে রেখাঙ্কিত করেন নি তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি। ইতিহাস তার ললাটে এঁকে দেয় নি জয়তিলক। শাক্য রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করার মুহূর্ত্তে যাঁর জীবনের উদয়াচল চকিতে একবার দেখা দিয়েছিল, তাঁর জীবনের অস্তগিরি চিরকালের মত ঢাকা পড়ে রইল বিস্মৃতির অন্তরালে।

নির্ব্বাণ পরিচয়

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বর্ত্তমান যুগে 'নির্ব্বাণ' শব্দটি এমন একটি শক্তি বহন করে যে, শব্দটি শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্মের কথাই মনে পড়ে। তার কারণ স্বরূপে বলা যায় বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ সমার্থক অমৃত, অক্ষর, সত্য, জ্যোতিঃ, পরায়ণ, শরণ প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ গৃহীত হলেও ঐ পরম পদটিকে অসাধারণ শক্তিমণ্ডিত করে একমাত্র ঐ একটি শব্দ দ্বারাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। আর্য্য ধর্ম্মের বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে নির্ব্বাণ শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও ঐ পদটিকে ভগবৎপ্রাপ্তি—মোক্ষ-অমৃত-নির্ব্বাণ এইরূপ নানাবিধ শব্দের সাহায্যে তুল্যভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে বলে একটি শব্দেরই উপর গুরুত্ব পতিত হয় নি। আরও একটি কারণ এই যে, আর্য্য ধর্ম্মানুসারে ব্রহ্ম বা ভগবৎসত্তায় চিরস্থিরত্বই অমৃতত্ব বা নির্ব্বাণ শব্দের অভিধেয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রহ্ম বা শাশ্বত ভগবৎসত্তা অস্বীকৃত বলে ঐ পরম পদটি প্রকাশ করবার আর কোন উপায় নেই, আর তাতেই হয়েছে বহুবিধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

নির্ব্বাণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবৈষম্যও লক্ষ্য করবার মত। আর্য্যধর্ম্মে নির্ব্বাণ শব্দটি নির্-উপসর্গযোগে গত্যর্থক 'বা' ধাতু থেকে ভাবে অনট করে নিষ্পন্ন। 'বান' অর্থাৎ গতি বা চাঞ্চল্য, 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ গতিহীনতা বা স্থিরত্ব। এ ভাবে মানসিক যাবতীয় গতি বা বাসনাজনিত চাঞ্চল্যের চির অবসানে পরমামৃতে ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠাই নির্ব্বাণ বা মোক্ষপদের অভিধেয় হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে 'বান' অর্থ বন্ধন-নিব্বান বা নির্ব্বাণ—বন্ধনহীনতা অর্থাৎ তৃষ্ণার বন্ধনহীনতাই নির্ব্বাণ। তৃষ্ণা বা বাসনাই জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সাধনা দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয়ে বন্ধনাশ, সুতরাং দুঃখরাহিত্য, তাতেই বন্ধনহীনতা আসে বলে নিব্বান। লক্ষ্য প্রায় একরূপ হলেও ব্যুৎপত্তিভেদ ঘটেছে। বান শব্দের বন্ধন অর্থটি ধাতু প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শুদ্ধিপূত করে রক্ষা করা কঠিন। অবশ্য বন্ধন 'বানব', তা থেকে 'বান'—এ ভাবে অপভ্রষ্ট শব্দরূপে পরিগণিত হতে পারে এবং পালি ভাষাতে গৃহীতও হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বাণ শব্দের যোগার্থ যাই হোক, নির্ব্বাণ পদাভিধেয় তত্ত্বটি গভীর এবং তাকে চরম লক্ষ্য বলেই বৌদ্ধানুসারিগণ গ্রহণ করেছেন। নির্ব্বাণের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় আচার্য্য 'অনুরুদ্ধ' "অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ" গ্রন্থে বলেছেন, নির্ব্বাণ লোকোত্তর বিষয়রূপেই পরিগণিত। যার উৎপত্তি ও বিনাশ রয়েছে তাই হ'ল লৌকীয়, লোকোত্তর সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন—"কতমে ধম্মা লোকুত্তরা"? চত্তারো চ অরিয় মগ্গা, চত্তারি চ সামঞ্ঞ ফলানি অসঙ্খতা চ ধাতু, ইমে ধম্মা লোকুত্তরা তি" অর্থাৎ চার প্রকার আর্য্য মার্গ, চার প্রকার শ্রামণ্য ফল বা মার্গজ ফল এবং অসংস্কৃত ধাতু, এই সব ধর্ম্মই লোকোত্তর। এই চারি আর্য্যসত্য দ্বারা শ্রামণ্য ফলের অন্তর্গতই হ'ল নির্ব্বাণ বা পরমপদ। এই নির্ব্বাণ স্বভাবানুসারে অদ্বিতীয়, কিন্তু অভিব্যক্তির স্তরভেদে দ্বিবিধ—"সউপাদি শেষ নিব্বান," আর 'অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ' উপাদি হ'ল পঞ্চস্কন্ধেরই নামান্তর। কামনা, বাসনা উপাদানাদি দ্বারা এদের পরিজ্ঞান হয় বলে পঞ্চ স্কন্ধকে উপাদি বলা হয়। উপাদির অভাব অনুপাদি। অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভের পক্ষে পঞ্চশীলাদির অনুসরণ, যোগমার্গ এবং তপঃপূত প্রজ্ঞার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সকল অধিকার লাভ কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। এই কঠিন সাধনায় নানাবিধ স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়, সাধনার চরম কালটিই হ'ল অনুপাদি শেষ নির্ব্বাণ, তার পূর্ব্বে ক্রমধারায় অগ্রসর হয়ে সাধক যখন যাবতীয় ক্লেশগ্রাম ও বাসনাদি অতিক্রম করে যান, কেবলমাত্র মূল স্কন্ধ পঞ্চক অবশিষ্ট

থাকে অর্থাৎ তার কার্য্যকারিতা স্তব্ধ হয়ে যায়; তখন তাকে বলা হয় "স—উপাদিশেষ নির্ব্বাণ", আর তদূর্দ্ধে উত্থিত হয়ে সাধক যখন স্কন্ধপঞ্চকের বিলয় করে দেন, "সর্ব্ববিধ্বংস"—অর্থাৎ কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা, এমন কি মূল ধাতুগুলিও বিলীন হয়ে যায়—তখন বলা হয়, অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ।

পূর্ব্বোক্ত এই তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঠিক যেন আধ্যাত্মশাস্ত্রের সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধির বর্ণনা। সবিকল্প সমাধিতে মন ব্রহ্মে বিলীন হয়েও সম্পূর্ণ ভেদহীন হতে পারে না, স্বকীয় সত্তা এবং সাধ্যসাধকভাব বিদ্যমান থাকে। তথাপি যাবতীয় পার্থিব ক্লেশ বিদূরিত হয় বলে পরমানন্দেরও উপলব্ধি আসে। তারই ঊর্দ্ধে সর্ব্ববিধ ভেদবোধ বিলয় করে আপন সত্তাটিকেও ব্রহ্মের মধ্যে হারিয়ে একীভূততাই নির্বিকল্প সমাধি। দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রের নির্ব্বাণও এপথেই আপনরূপ প্রকাশ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নির্ব্বাণকে প্রত্যক্ষগম্য বলেছেন—আর্য্যমার্গ জ্ঞানের সাহায্যে এর প্রত্যক্ষ করা হয়। "সচ্ছিকাতব্বং" অর্থাৎ সাক্ষাৎ করবে। এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন এসে পড়ছে যে নির্ব্বাণ যদি সাক্ষাৎকরণীয় তত্ত্ব হয়ে থাকে তবে "সুঞ্ঞা শূন্য"—এই সর্ব্বশূন্যতাময় অভাবাত্মক তত্ত্বটির সঙ্গে বিরোধ ঘটে। সর্ব্বাস্তিত্বরহিত অভাবাত্মক তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণ অসম্ভব। বিশেষত, প্রত্যক্ষ বিষয়তা দ্বারা এর বিদ্যমানতাই স্বীকার করা হ'ল। সুতরাং এ তত্ত্ব নিতান্ত অভাবাত্মক হতে পারে না, আর—বিদ্যমানতা স্থির হলে তত্ত্বরূপে তার পারমার্থিকতাই স্বীকৃত হ'ল, 'অসৎ' হতে পারে না। অথচ বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণকে শূন্য, অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। এই অসঙ্গতি সমাধানের জন্যে বৌদ্ধব্যাখ্যাতৃগণ বলে থাকেন—শূন্য কথাটি এখানে সর্ব্বাস্তিত্ব শূন্যতা অর্থে প্রযুক্ত হয় নি: পাণ্ডিত্যাভিমানী বিরোধী ব্যক্তিগণই অস্তিত্বশূন্যতারূপ অভাবাত্মকতা প্রকাশ করেছেন। নির্ব্বাণ রাগদ্বেষমোহশূন্য, এমন কি সর্ব্ববিধ সংস্কারশূন্য—অবিদ্যাশূন্যতত্ত্ব, এজন্যই এই তত্ত্বটিকে শূন্য বলা হয়। "ভবনিরোধো নিব্বানং····· নিব্বানং ভগবা আহ সব্ব গন্থ পমোচনং" (সংযুত্তনিকায়)। আর এ তত্ত্বটি রাগাদি নিমিত্ত রহিত বলেই অনিমিত্ত ও প্রণিধি অর্থাৎ আসক্তি বা তৃষ্ণা রহিত বলে অপ্রণিহিত। বস্তুতঃ তা' এক অদ্বিতীয় নিত্যতত্ত্ব। তাই, তাকে, অনন্ত, অচ্যুত, অকৃত, অনুত্তর বলে অভিহিত করা হয়। এর আর শেষ বা অবসান নেই বলে তা অনন্ত। কোনরূপ চ্যুতি নেই বলে অচ্যুত: "নিব্বান পদং অচ্চুতং" (সুত্তনিপাত) প্রত্যয়াদি দ্বারা কৃত নয় বলে অকৃত বা নিত্য এবং এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন তত্ত্ব নেই—তা সর্ব্বোত্তম, এ জন্যে অনুত্তর। এ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের বাণীতে তাই প্রকাশিত হয়েছে. তিনি বলেছেন—"অত্থি ভিক্খবে অজাতং অকতং অসঙ্খতং", মজ্‌ঝিমনিকায়ে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের বাণী অধিকতর স্পষ্ট, সেখানে তিনি বলেছেন—অজাতং অজরং···অমতং···অনুত্তরং··· নিব্বানং অজ্ঝগমং"—জন্মহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন এক সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব সুতরাং নিত্য ধ্রুব।

এই নিত্য তত্ত্বটিকে তা হলে নির্ব্বাণ শব্দে পরিচিত করা হ'ল কেন? এর উত্তরে তাঁরা বলে থাকেন, তৃষ্ণাই সর্ব্ববিধ বন্ধনের হেতু। তৃষ্ণা প্রাণিগণকে কাম-রূপ অরূপ যাবতীয় লোকে বন্ধন করে, নানাবিধ ঘোর কর্ম্মে আবদ্ধ রাখে, দুঃখসাগরে ডুবিয়ে রাখে। এই তৃষ্ণার ক্ষয়েই দুঃখেরও ক্ষয়। নির্ব্বাণে তৃষ্ণার ক্ষয় সাধিত হয়, তৃষ্ণার আত্যন্তিক ক্ষয়ই তৃষ্ণার নির্ব্বাণ বা দুঃখনির্ব্বাণ। "তণ্হায় বিপ্পহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি" (সুত্তনিপাত) অর্থাৎ তৃষ্ণার বিনাশই নির্ব্বাণ একথা বলা হয়। "নির্ব্বাণ" শব্দটি এখানে উপমাকারে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তৃষ্ণাটি যেন প্রদীপের তৈল এবং দুঃখ হ'ল দীপ-শিখা। তৈল হেতু দীপশিখা প্রজ্বলিত থাকে, তৈলাভাবে সব শেষ, নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। এই দীপ-নির্ব্বাণের উপমায় এখানে দুঃখ-নির্ব্বাণের পরিচয়ে 'নির্ব্বাণ' শব্দ দ্বারা এ তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে। "নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং প্রদীপঃ।" (সুত্তনিপাত)

এতাদৃশ ব্যাখ্যায় আবার পূর্ব্ব প্রশ্ন ঘুরে এল যে, নির্ব্বাণ তত্ত্ব তা হলে দুঃখাবসানমাত্রই—অর্থাৎ অভাবাত্মিকা সর্ব্বশূন্যতা। তাতে এ তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণতা প্রভৃতি বিবৃতির সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বিরোধ পূর্ব্বাবস্থায়ই থেকে যায়। এজন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে—নির্ব্বাণ শান্ত স্বভাব। ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়—তদ্বিধ দুঃখের নিরোধই শান্তি। এই শান্তির অপর পরিচয় সুখ। সুখ হলেও তা বিষয়জনিত সুখ নয়। "নতু বেদয়িতং সুখং"। ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাণের স্বরূপ পরিচয়ে বলেছেন, "নির্ব্বাণং পরমং সুখং": মজ্‌ঝিম নিকায়ের একই অধ্যায়ে দু' বার ও ধম্মপদে দু' বার নির্ব্বাণকে পরম সুখ বলা হয়েছে।

"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খারা পরম দুখা।
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং॥" সুখবগ্গো, ইত্যাদি।

অর্থাৎ ক্ষুধা কঠিন রোগ, সংস্কার দারুণ দুঃখ, এজন্য ধীমান্ এই সত্যটি উপলব্ধি করে পরমসুখরূপ নির্ব্বাণ প্রত্যক্ষ করেন। এই পরম সুখোপলব্ধির উপায়রূপেই পূর্ব্বোল্লিখিত স উপাদি শেষ নির্ব্বাণ ধাতু ও অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতু এই দু'টি প্রকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ ভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে আমরা নির্ব্বাণের পরিচয়ে যে তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত হতে দেখছি, তাকে উপনিষদের সে অদ্বিতীয় পরম অমৃত-তত্ত্ব থেকে ভিন্ন বলে দূরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, এই যে পরম সুখাভিধেয় নির্ব্বাণ, তা যদি দুঃখাদি-শূন্য বলে শূন্য, আর স্বভাবতঃ "অজর, অমত, অকত" বলে অনন্ত ও ধ্রুব নিত্য হয়ে থাকে, তবে উপনিষদের পরম আনন্দ তত্ত্ব থেকে তার পার্থক্য কি দিয়ে করা যেতে পারে? বিশেষতঃ পরম সুখ আর সে পরম আনন্দ একার্থক। যে আনন্দ "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ", "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "ভূমৈব সুখম্" প্রভৃতি অজস্র শ্রুতিতে পরমসুখরূপী আনন্দাত্মক ব্রহ্মতত্ত্ব উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্যরূপ অমৃততত্ত্ব বলে পরিচিত, সেই অমৃততত্ত্বই যদি নির্ব্বাণেরও স্বরূপ হয়ে থাকে তবে উভয়ে যে একই তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হয়েছে এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ

বিচারের কোন অবকাশই থাকে না। পক্ষান্তরে অনুকূল মতবাদই সুদৃঢ় হয়ে উঠে যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে যেমন "অত্থি ভিক্‌খবে অজরং অমতং অকতং...নিব্বানং..." প্রভৃতি বুদ্ধবাণীতে—অজর, অমৃত, অকৃত এবং অভয় পরায়ণ প্রভৃতি শব্দে নির্ব্বাণকে বিশেষিত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি উপনিষদেও এই একই তত্ত্ব ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যক্ত রয়েছে—

"এতদ্বৈ প্রাণায়ামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্"—ইত্যাদি। (প্রশ্নোপনিষৎ)।

যদিও এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তি উঠতে পারে যে, মাণ্ডুক্য-কারিকায় দেখা যায় আচার্য্য গৌড়পাদ স্পষ্ট করেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে উপনিষদুক্ত মতের প্রভেদ দেখিয়েছেন, বলেছেন—"নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" ইত্যাদি। তথাপি এখানে গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় আচার্য্য গৌড়পাদ বিস্তৃত কারিকাবলম্বনে যে অদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেছেন, তাতে স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তে বাহ্যমাত্রের অসংরূপতা, জ্ঞানমাত্রের সত্তাস্থাপন প্রভৃতি দ্বারা বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে একান্ত সাম্যই যেন দেখান হ'ল, যে কথা আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন—"যদ্যপি বাহ্যার্থনিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তু-সামীপ্যমিত্যাদি"—। এই আশঙ্কা অপনোদনের জন্য উভয়ের অধিকতর সাম্য সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখাবার অভিপ্রায়েই এখানে গৌড়পাদ বলেছেন—

"ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মা তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্।"

অর্থাৎ উপনিষদের অজাত সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৌদ্ধমতের একান্ত সাম্য থাকলেও যেমন পরমার্থদর্শী পুরুষের জ্ঞান কখনো বিষয়াদিতে লিপ্ত হয় না স্বকীয় স্বভাব বলে নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গরূপে অবস্থিতি করে, ঠিক তেমনি যাবতীয় আত্মাই (সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ) এবং তদীয় জ্ঞানও কোথায়ও লিপ্ত হয় না স্বভাবতঃই অসঙ্গরূপে বিরাজমান। একমাত্র স্থিরস্বভাব অসঙ্গ পুরুষই আগন্তুক দোষে লিপ্ত বলে মনে হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ তিনি সর্ব্বদাই এক-স্বভাব-অসঙ্গ-নির্ম্মল। এ তত্ত্বটি বুদ্ধদেব বলেন নি। এটুকুই পার্থক্য। এর তাৎপর্য্য হ'ল পরমাত্ম-চিন্তায় বিলীন হলে বিষয়াতীত ব্রহ্মের উপলব্ধিতে যে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভেদবর্জ্জিত পারমার্থিক অদ্বয়াবস্থার সংপ্রাপ্তি বা লাভ ঘটে—তা' প্রকৃতপক্ষে কোন উপার্জ্জিত তত্ত্ব লাভ নয়। এই অবস্থাটি শাশ্বত একরূপ। দোষনিবন্ধন তা এতকাল পরিজ্ঞাত হয় নি, দোষ নিরস্ত হওয়াতে স্বরূপ পরিজ্ঞাত হ'ল মাত্র। যেমন সূর্য্য ভাস্বরস্বভাব, মেঘের বিরোধিতায় দৃষ্টিগোচর হয় নি বলে সূর্য্যে কোন ধর্ম্ম সংক্রামিত হয়েছে বলা ভুল—সূর্য্য আবৃতও হন নি, প্রকাশিতও হন নি যেমন ছিলেন তেমনটিই আছেন। মেঘ কেটে গেল বটে, সূর্য্যের নূতন স্থিব উদ্ভব হয় নি। এই আত্মার ক্ষেত্রেও তাই, প্রকৃতপক্ষে বদ্ধনও হয় নি, তিনি মুক্তও হন নি—যেমন ছিলেন তাই আছেন—এই হ'ল উপনিষদের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধমতে এই চিরস্থির একস্বভাব আত্মতত্ত্বের স্বীকৃতি নেই বলে এই রীতিতে ব্যাখ্যা চলে না—এইখানেই পার্থক্য ঘটেছে।

কিন্তু তাতেও মূল সত্যের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে নি বলেই আমরা মনে করি। কারণ এই বিরোধটিকে দার্শনিক চিন্তাধারার একটি প্রকারান্তররূপে গণ্য করা যেতে পারে। বৌদ্ধমতে শাশ্বত আত্মা-বলে পৃথক তত্ত্ব স্বীকার করা হয় নি, সবই ক্ষণভঙ্গুর, আত্মাও চিত্তাতিরিক্ত নয়, চিত্তপ্রবাহকেই আত্মা বলে ব্যবহার করা হয়। যোগাভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ নানাবিধ স্তর অতিক্রম করে চিত্তের যখন রূপ-অরূপ, কুশল-অকুশল সমুদয় অবস্থার ঊর্দ্ধে উঠে দাঁড়ান সম্ভব হয়, সেই অবস্থায় যে উপলব্ধি—"সর্ব্বমনিত্যং দুঃখং ক্ষণিকং—ইত্যাদি এবং তৎপরবর্ত্তী যে চরম অবস্থা "নির্ব্বাণং পরমং সুখং" বা পূর্ব্বে বলা হয়েছে "অনুপাদিশেষ নিব্বান ধাতু"—যখন কোন কিছুরই, স্কন্ধাদিরও, বোধ নেই, সেই অদ্বয়াবস্থার সঙ্গে উপনিষদুক্ত মতের সত্যিকারই কি খুব গুরুতর পার্থক্য কিছু রইল? তাই দেখি, উপনিষদ্ যেমন বলেছেন ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচয়ে—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং" তেমনি নির্ব্বাণ পরিচয়েও খুদ্দকনিকায়ে বলা হয়েছে, সূর্য্যচন্দ্রাদি সেখানে প্রকাশমান নন অথচ সেখানে অন্ধকার নেই—

"ন তত্থ চন্দিমা ভাতি তমো তত্থ ন বিজ্জতি...
...অথরূপা অরূপা চ সুখ-দুক্‌খা পমুচ্চন্তি।"

বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থাদি আলোচনা করে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যে পরিচয় আমরা পেলাম, তা' থেকে যদি এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ কথাটি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাস্তিত্ব রহিত শূন্যাত্মকতা নয়, রাগদ্বেষাদি অবিদ্যাশূন্যতাময় নিত্য-অমৃত-তত্ত্ব,—তা হলে এ সিদ্ধান্তও সমর্থন করা যায় যে, বস্তুতঃ আর্য্য-উপনিষদের মূল সত্য ব্রহ্মাত্মক অমৃততত্ত্বই বুদ্ধদেবের এই নির্ব্বাণ। এই বিশ্লেষণে আজ একথাও তা' হলে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান্ বুদ্ধ হিংসাপ্রধান যাগ-যজ্ঞাদির নিন্দাকারী হলেও হিন্দুসভ্যতার প্রতিপক্ষরূপে কখনও আবির্ভূত হন নি এবং আমাদেরই ঔপনিষদিক মূল্য সত্যকে আচার-প্রধান বহিরনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম থেকে কোষমুক্ত করে কঠিন জ্ঞানমার্গের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নূতন দৃষ্টির নূতন আলোকে উদ্‌ভাসিত করেই দিয়েছিলেন—তাই তিনি প্রকৃতই বিষ্ণুর অবতার!!

হিন্দু বিধবাবিবাহ আইনের শতবার্ষিকী

এম. ভি. রামনরাও

(প্রাক্তন সম্পাদক, "ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক")

১৮৫৭ সনে জাতি যদি ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামের উৎসব করে, তবে এই বৎসরেই ভারতীয় নারীগণেরও তাঁদের মুক্তির শতবার্ষিকী পালনের অধিকার আছে। কারণ ভারতীয় নারীগণের মুক্তি বস্তুতঃ আরম্ভ হয় ১৮৫৬ সনের হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন থেকে। এই আইনটির পূর্বে কি ছিল এবং পরেই বা কি হয়, তা বলতে গেলে শোনাবে এক ভয়ঙ্কর ও মর্মন্তুদ কাহিনীর মত। ক্ষীণভাবে হলেও হিন্দু বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অন্ধসংস্কার এখনও দেশের বহু অঞ্চলে কোন না কোন আকারে বর্তমান। দেশাচার ধর্মের মুখোশ পরতে এখনও ছাড়ে না। তা এখনও লোকের গলা টিপে ধরে আছে।

গোঁড়াদের যুক্তি ছিল, হিন্দু বিধবাবিবাহ বেদ ও উপনিষদে নিষিদ্ধ। কিন্তু এ যুক্তি অনেক পূর্বেই নস্যাৎ হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায় হিন্দু বিধবাগণের পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁরা নিষ্ঠুর "সতীদাহ" প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তা নিষিদ্ধ করেন। যে অভিশপ্ত বিধান বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করে তাকে বৈধ শবদেহে পরিণত করেছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হয়। তার ফল ১৮৫৬ সনের আইনটি। এই আইনটি পরিশেষে হয়ে দাঁড়ায় দৈবানুগ্রহের মত। এই আইন সংস্কারকের বাহুতে বল সঞ্চার করে সামাজিক দোষগুলির বিরুদ্ধে আরও শক্তি ও প্রত্যয়ের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁকে সাহায্য করে।

হিন্দু বিধবাবিবাহ আইনের দ্বারা এই ভাবে আইন-বিষয়ক অসুবিধা দূর হলেও হিন্দু বিধবা পূর্বের মতই ঘৃণার পাত্র ও অন্ধসংস্কারের লক্ষ্য হয়ে থাকে। আর তার বিবাহ পূর্বের মতই সুকঠিন থেকে যায়। এই বিবাহের ফলে সমাজ-চ্যুতি ঘটত এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতন ভোগ করতে হ'ত। যাঁরা অত্যন্ত বলিষ্ঠচেতা কেবল তাঁরাই সমাজকে গ্রাহ্য করতেন না। কাজেই বিধানটি দীর্ঘকাল অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। বর্তমানের অস্পৃশ্যতা আইন ভঙ্গ করা যেমন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য, তেমনি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে হৃদয়হীন সমাজ কর্তৃক সমাজচ্যুত ও একঘরে করাটাকে যদি আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হোত তা হলে বিষয়টি জোরদার হয়ে উঠত এবং আন্দোলনটিও গতি লাভ করত। তবে সামাজিক অন্ধ-সংস্কারের কঠোরতা ও নির্মমতা সত্ত্বেও সংস্কারকগণের সেবা-কার্যে শৈথিল্য বা বাধা ঘটে নি।

বিষয়টির মধ্যে একটি নিষ্ঠুর অসঙ্গতি আছে এই যে, হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের ফলে উচ্চবর্ণীয়দেরই সমাজচ্যুতির কঠোরতা ভোগ করতে হয়, কিন্তু নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা বর্তমান। হিন্দুধর্মের ছত্রছায়াতলেই কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত। এ এক বিচিত্র রীতি বলে মনে হয়। কাজেই হিন্দু-সংস্কারককে বোঝাপড়া করতে হয় প্রথা ও অন্ধসংস্কারে ফাটলধরা এক সমাজের সঙ্গে। আর ওগুলো হচ্ছে ধোঁয়াটে অসঙ্গতি ও হেঁয়ালীঢাকা এক ঐতিহ্যেরই অংশ।

ষাট বৎসরের অল্প কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ দেশে যখন পণ্ডিত বীরেশলিঙ্গম্, যাঁকে যথার্থরূপেই বলা হয় দক্ষিণের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হিন্দু বিধবাবিবাহকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন প্রচণ্ড সামাজিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। বাংলা ও উত্তরদেশে এই আন্দোলনের সমর্থকগণ ছিলেন। তাই সেখানে সামাজিক বা নৈতিক বিক্ষোভ জাগ্রত না করেই আন্দোলনটি দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশে, যেখানে ধর্ম জগদ্দল পাথরের মত সমাজের বুকে চেপে বসেছিল এবং দেশাচার লাভ করে-ছিল শ্রদ্ধার আসন, সেখানে নূতন আন্দোলনে দরকার হয়েছিল ধর্মযোদ্ধার ঐকান্তিক উৎসাহ ও যাজকের অনন্ত আগ্রহ। বীরেশলিঙ্গম্ ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। তাঁর অস্ত্র ছিল পবিত্র শাস্ত্রবচন, আর বিষয়টি যে ন্যায়সম্মত এই বিশ্বাসের মধ্যে তিনি ছিলেন সুরক্ষিত। এই ভাবে অস্ত্র-

সজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়ে তিনি নির্ভীক বীরের মত হিন্দু বিধবাগণের পক্ষে সংগ্রাম করেন। তাঁকে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের সক্রিয়, এমনকি সহিংস প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অগ্রসর হতে হয়।

একদিকে সুপ্রাচীন ও ঘৃণিত প্রথা, অপরদিকে যা ন্যায় তা করবার নৈতিক তাড়না ও আবেগ। সমাজ ছিল এই দু'টির মাঝখানে। বীরেশলিঙ্গমের উদাত্ত আহ্বান দক্ষিণে সমাজকে আলোড়িত করে তোলে এবং গোঁড়াদের সুদৃঢ় শক্তিসত্ত্বেও বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয়। আর গোঁড়ারা দম্পতীকে সমাজচ্যুত করে নিজেদের শক্তি জাহির করে। বিবাহিত তরুণ দম্পতীকে যে কি দুর্দশা সইতে হ'ত তা লেখকের মাতা-পিতা প্রায়শঃই বর্ণনা করতেন। তাঁরাও ছিলেন তাঁদের সময়কার লোকগুলির ক্রোধের বলি। তাঁদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হ'ত না; গ্রাম-সীমায় প্রায় আচ্ছাদন-হীন কুটিরে জীবন-যাপন করেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত; রাত্রে গ্রাম যখন নিশুতি হ'ত, গ্রামবাসীরা শুয়ে পড়ত কেবল তখনই, তার পূর্বে নয়, তাঁরা পুণ্যতোয়া গোদাবরী থেকে জল আনতে পারতেন।

বর্তমানে ও ধরনের নির্যাতন কল্পনা করা যায় না সত্য, কিন্তু বিশেষ করে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে এখনও শুগুলি দেখা যায়। তবে তার রূপ নিরীহতার ছদ্মবেশে আবৃত। এখনও দেখা যায় জাফরানী রঙের স্থূল বস্ত্রাবরণে ঢাকা মুণ্ডিতশির যা হচ্ছে হিন্দু নারীর বৈধব্যের অতি ভয়ঙ্কর ও বীভৎস কলঙ্কধ্বজা। এখনও হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত বিধবা কপালে বর্ণ-চিহ্ন ধারণের অধিকারী নয়। এখনও এই অন্ধ-সংস্কার আছে যে, যদি পথে বার হয়েই আপনি প্রথমে কোন বিধবাকে দেখেন, তা হলে আপনার ব্যবসায় একদম মাটি। গোঁড়াদের তূণে হিন্দু বিধবাদের বিরুদ্ধে আরও কত অস্ত্র আছে তার হিসাব করা অনর্থক। তবে এগুলি আজও আছে, এবং কখন কখন এগুলির রূপ অসহনীয়। এ হ'ল আমাদের সামাজিক পরিতৃপ্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান এবং কৃষ্টি ও সভ্যতা যে কেবল বাইরেটাই স্পর্শ করছে তার প্রমাণ।

এখন আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, বর্ণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। আমরা এমন এক ব্যবস্থার বিবর্তনের চেষ্টা করছি যাতে অসাম্য বিদূরিত হবে। আমরা বিবাহ-ব্যাপারের নারীর সম্পত্তিতে অধিকার ও উত্তরাধিকার আইনের সংস্কারের চেষ্টা করছি; চেষ্টা করছি, নারীর অবস্থার উন্নতির। তথাপি আমরা এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে পারি না যে, এক শ' বৎসর পরেও যাঁরা আমাদের মধ্যে শিক্ষিত বলে পরিচিত তাঁরা বিধবাবিবাহ ব্যাপারে পশ্চাদপদ।

১৯২৯ সনের শিশুবিবাহ নিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে সমস্যাটি এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। শিশু-বিধবা আর হতে পারে না। কিন্তু বিধবা, শিশু বা প্রাপ্ত-বয়স্ক যেই হোক, এখনও গোঁড়াদের মনে যে ভাবের উদ্রেক করে তা সাধারণ মানবোচিত ব্যবহার নয়। হিন্দুগণ বিধবা ও কুমারী, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য চিন্তা করবেন না, তা সে বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারেই হোক বা সামাজিক কোন আচার-আচরণেই হোক। কোন প্রকার বিরূপতা প্রকাশ হওয়া অনুচিত।

এক শ' বৎসর যে, ভারতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপুল পরিবর্তন এনেছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ঘটনা। আবার, ঐ সঙ্গে একথাও সত্য যে, দেশের সামাজিক বিবেক প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণা ও অনড় কুসংস্কার থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। সমাজকল্যাণ কেবল লোকের সাধারণ ভাবে আর্থিক অবস্থার উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অনিষ্টকারী কুসংস্কার প্রতিরোধ করা এবং যে কোন প্রকার সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোকের বিবেককে জাগ্রত করাও তার কর্তব্য।

হিন্দু বিধবার আইনের দিক দিয়ে মুক্তির শতবার্ষিকী সমাজ এখনও যে মানসিক পীড়ন ভোগ করছে তা থেকে তাকে মুক্ত করবার প্রয়াসে অনুপ্রেরণা দান করবে।

আমার পরিচারক বন্ধু

এম. এস. সাবেরওয়াল

১৯৫২ সনের আগষ্ট মাস থেকে আমি ভারতের রাজধানীতে বাস আরম্ভ করি। আমার মনোভাব ও জ্ঞানের দরুন নিজেই নিজের প্রতি আমি ছিলাম অসন্তুষ্ট। আমার ধারণা হ'ল, নিজেকে আরও ভাল করে জানতে চেষ্টা করা উচিত। অন্তর্দর্শন ও অতীতদর্শনে বুঝলাম, আমার মধ্যে অনেক ত্রুটি জমেছে। ভাবতে লাগলাম, কেমন করে আমি ঐ সব বদ-অভ্যাসগুলো গড়ে তুলেছি। ছায়াচিত্র-স্রোতের মত আমার চোখের সামনে দিয়ে পর পর চলে গেল, আমার শৈশব, আমার কৈশোর ও আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠকাল। পাশাপাশি পরীক্ষা করলাম শত শত তরুণ-তরুণীর জীবন যারা ছায়া-চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভের উন্মাদনায় তাদের যৌবন ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে। বাড়ি ছাড়বার পর তারা হয়েছে

তাদের পরিবারের দুশ্চিন্তার কারণ; আর, এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার ফলে তাদের জীবন হয়েছে নিষ্ফল ও নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ।

যে অঞ্চলে বাস করতাম, তার চারধারে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম শ্রমজীবীদের একদল কিশোরকে। তারা নিকটস্থ বস্তিতে বাস করে, বিদ্যালয়গামী ছাত্রদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায় এবং রাস্তা থেকে আধপোড়া সিগারেট কুড়িয়ে ধূমপান করে থাকে। আগে থাকতেই বুঝতে পারলাম, ভবিষ্যতে তারা কি হয়ে উঠবে। তাদের প্রকৃতি ছিল গুণ্ডার মত। তারা আশ-পাশের বাড়িগুলোর ফুলের টব ও সাসি ভাঙত, আর রৌদ্রে শুকোতে-দেওয়া কাচা কাপড়-গুলো চুরি করত। তাদের দৈহিক, মানসিক ও ভাবগত অবস্থা ও দীন বেশভূষা থেকে এই সিদ্ধান্ত করলাম যে, এরা হচ্ছে প্রাক-অপরাধপ্রবণ কিশোর। তাদের ভাষা ছিল রুক্ষ ও অশ্লীল। চারধারের বাড়িগুলিতে বা বয়স্ক ব্যক্তিদের গায়ে ঢিল মারাতে ছিল তাদের আনন্দ। এই প্রবণতা ও যুক্তিহীন আচরণের কারণ, দারিদ্র্য, গৃহে নিরাপত্তাহীনতা, মাতা-পিতার স্নেহ-ভালবাসার অভাব এবং পথিকদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এই ভাবে প্রাক-অপরাধপ্রবণতা নিম্নলিখিত কারণগুলি থেকে উদ্ভূত হচ্ছিল—

(ক) বস্তি, নৈতিকসঙ্কট, সস্তা ধ্বংসাত্মক ও নীচ সৃজনাত্মক কাজকর্ম, (খ) অবহেলা, শিক্ষার সুযোগের অভাব, (গ) স্বাস্থ্যবিধিবিরোধী, অস্বাস্থ্যকর ও অসুখকর আবহাওয়া এবং পরিবেশ। এই কিশোরদের জীবনযাত্রার নৈতিক ও আর্থিকমানের কথা চিন্তা করে, তাদের জন্যে আমার মন দুঃখে ভরে উঠল। উপলব্ধি করলাম, এ বিষয়ে কিছু করতেই হবে। জানতাম যে তামাকের নেশা থেকে মুক্তি নেই। এই থেকে স্বাস্থ্য ও সুখ বিনষ্ট হচ্ছিল। এর পরিণামে জাতীয় অবনতি ও দুঃখ। তাই তাদের কাজকর্ম সংযত করবার সংকল্প করলাম।

সংকল্প গ্রহণের পর আমার স্থানীয় বন্ধুগণের সঙ্গে আলোচনা করলাম। আমার অনুজ আমাকে সাহায্য করল। আমরা উভয়ের বন্ধুগণকে নিয়ে একটি দল গড়ে তুললাম। কাজ আরম্ভ করতেই লাভ করলাম একটি যুব-সম্প্রদায়ের সহযোগিতা। অপরাধপ্রবণতার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হলাম।

আমরা কাজ আরম্ভ করলাম, প্রথমে স্থানীয় পরিচারক-দের পূর্ব পাটেলনগরের "ইলেকট্রিক পোস্টের" কাছে জড় করে। আমাদের প্রথম দলটির মধ্যে ছিল দুই ভাই। তারা আমার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে বাবুর্চি ও পরিবেশকের কাজ করত। তারা সিগারেটের পর সিগারেট খেত—ইংরেজীতে যাদের বলে "চেন স্মোকার"। তাদের মনিব ছিলেন মাতাল। তিনি "ঠাণ্ডি আলমিরাতে" সঞ্চয় করে রাখতেন বোতল কয়েক হুইসকি ও রম্। ছেলে দুটির ক্ষুধা ছিল প্রচণ্ড। মনিবের বাড়ি থেকে নিরাপদে যা-কিছু চুরি করতে পারত তাই-ই রাক্ষসের মত গিলত। এই ভাই দুটি বয়সে কিছু বড় ছিল, এবং মাইনেও পেত ভাল। তাই প্রতি রাত্রে যে-সব স্থানীয় গৃহস্থ-বাড়ির পরিচারকদের সঙ্গে আড্ডা জমাত তাদের কাছে ছিল তাদের খাতির। এক-ঘেয়ে ঘরোয়া কাজে বিরক্ত হয়ে তারা মনিবদের আচার-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করত। আমি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরম্ভ করলাম। যে-কোন ভাষায় সবচেয়ে মিষ্টকথা সম্ভবতঃ "তুমি আমার বন্ধু।" এই কথাগুলি যখন অন্তরের সঙ্গে বলা যায় তখন কানে সঙ্গীতের মত বাজে। তাই তাদের বলতাম, "তোমাদের সকলকে খুব ভালবাসি। তোমরা আমার বন্ধু।" তাদের প্রধান ভাবনার বিষয় ছিল, তাদের ঘর-সংসার ও তাদের বহুক্রোশ দূরের গৃহ-কোণ। এই হ'ল তাদের জগৎ। সারাদিনের ক্লান্তিকর কাজের পর আমোদ-প্রমোদের জন্যে একত্রে জমায়েৎ হওয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাতে উপস্থিত হতে লাগল অনেকে। তাদের যে কতকগুলো কু-অভ্যাস আছে সে কথাটা আমি এড়িয়ে যেতে লাগলাম; তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে থাকলাম। তাদের মনে ধারণা হ'ল, জীবনে অগ্রসর হবার, উঠে দাঁড়াবার এবং আরও বড় কিছু লাভ করবার উপায় বার করতেই হবে। তারা লেখা-পড়া করতে সম্মত হ'ল। আমাদের কর্মীদের মধ্যে একজন তাদের হিন্দী শিক্ষা দিতে লাগলেন, আর একজন গান-বাজনার দল গড়ে তাদের শিখাতে লাগলেন গান। স্থানীয় এক নারী-কর্মী রান্নার কৌশলে আরও উন্নতি কিসে হয় তার শিক্ষা দিতে লাগলেন আর রন্ধনশালায় ও গৃহে যে স্বাস্থ্য-রক্ষা নিয়মগুলি পালন করা দরকার তা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আমার উপর ভার দেওয়া হ'ল, প্রত্যেকের জীবন সম্বন্ধে পূর্বাপর সংবাদ নেওয়া এবং কি উপায়ে তাদের জীবনকে উন্নত করা যায় তা অনুসন্ধান করা।

চণ্ডু ছেলেটি ছিল চমৎকার। তার অন্তরে ছিল ভাল-বাসা। সে ছিল অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। কিন্তু সে অবিরাম সিগারেট টানত আর ছিল মদখোর। সিগারেট ধরাবার সুন্দর একটি কল নিয়ে সে ক্লাসের মধ্যেও সকলকে সিগারেট খেতে উৎসাহিত করত। দেখা গেছে, নেশার দ্রব্য ছাড়াই কেউ নেশাখোর হয়ে ওঠে নি বা সিগারেট না ধরিয়ে কেউ

সিগারেটখোর হয় না। কাজেই ওগুলো যাতে হাতে না পড়ে তা করা দরকার। রোগ হবার আগেই তার গোড়া মারতে হবে। একদিন চণ্ডু যখন বলছিল, কি করে নেশা ধরা যায়, তখনই সেখানে আঘাত দেওয়া হ'ল। লোকে একদিনেই নেশাখোর হয়ে ওঠে না। নেশার অভ্যাসটা ক্রমে বাড়ে। প্রথমে লোকে সিগারেট ধরে। চণ্ডু বললে, "আমি নিজে সিগারেট খাই। কিন্তু সেটা কোন কাজের কথা নয়। তার পর মদ ধরলাম। প্রায়ই মদ খাই।" আর সেই সঙ্গে বার বার বলতে লাগল, "সেটা কোন যুক্তি নয়। মনে হয়, আমাদের সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা দরকার। খুব নেশা হয়। ওটা খারাপ।" সকলেই তার স্বীকারোক্তিতে খুশী হ'ল। সে সিগারেট ছেড়ে দিলে।

আমরা সকলেই তার সম্বন্ধে সতর্ক হলাম, তাকে দেখা-শোনা করতে লাগলাম। সে পাংশু হয়ে গেল। অবশেষে সফল হ'ল। সে সিগারেট ও মদ ছেড়ে দিলে। তার দেখাদেখি তার অধিকাংশ বন্ধু তাই করলে। আমরা খুশী হলাম। এই সকল পরিচারকগণের অধিকাংশই আসে দারিদ্র্যপীড়িত কাংড়া, কশৌলী, আলমোড়া ও মুশৌরীর পর্বতীয় অঞ্চল থেকে। যখন তারা শহরে কাজ করতে আসে তখন অনেকেই চলে আসে মাতা-পিতাকে না জানিয়েই। আমরা প্রত্যেককেই ভাল করে জানবার সুযোগ পেলাম। তাদের মাতা-পিতার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করে তাতে সফলও হলাম। এখন কোন গৃহ-পরিচারকের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা ও কথাবার্তায় তার নাম মনে করতে পারি বা না পারি, যখন জানতে পারি সে দেশে গিয়েছিল এবং তার প্রিয়জনদের সঙ্গে বড় সুখে কিছুদিন কাটিয়ে এসেছে তখন আমরাও সুখ বোধ করে থাকি।

এই সংশোধিত কিশোর পরিচারকগণ আমার ও আমার বন্ধুদের বহুসংখ্যক অপরাধপ্রবণদের ফিরিয়ে আনবার কাজে খুব বড় সহায় হয়েছিল। পথের ছন্নছাড়া ছেলেগুলোকে সংশোধন করতেও তারা আমাদের সহযোগিতা করত। আমরা পথের ছেলেগুলোকে জড় করে তাদের ঝগড়া মারা-মারি না করতে উপদেশ দিই। আমরা অন্তরে ভালবাসা ও দরদ নিয়ে তাদের কাছে যাই। তাতে তাদের জিনে নিই। তাদের আশ্রয় দেবার মত আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাদের সাহায্য করবার মত টাকাও আমাদের নেই। তবুও তাদের কাজে লাগবার মত উপায় পেয়েছিলাম।

আমি জুতোয় চিক তুলতে শিখেছিলাম, তাও একজন বড় সেনাপতির কাছ থেকে। আসবাবপত্র ও মেঝে পালিশের কৌশলও জানতাম। আমার বন্ধুগণ এই সব ছন্নছাড়া, ভবঘুরে কিশোরদের একদিন বিকালে মিষ্টকথায় ভুলিয়ে এক জায়গায় জমায়েৎ করলেন। আর আমি তাদের সামনে হাতে-কলমে কাজ করে দেখালাম। সেই সঙ্গে বললাম, কি ভাবে তারা কিছু কিছু উপার্জন করতে পারে। তাদের শিখবার কৌতূহল বৃদ্ধি পেল, এবং তারা কৌশলটি শিখেও নিলে। তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক কৌটো করে পালিশ, একটা বুরুশ ও একটুকরো ন্যাকড়া এবং একটা জল রাখবার পাত্র জোগাড় করতে আমাদের লাগল এক মাস। জুতো পালিশকরা বৃত্তিটার ভেতরকার কথাটা কি তা তারা জানত। তাই কিছু করে রোজগার করতে তাদের বেশি দিন লাগল না। এখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কনট-সার্কাসে দিন ৩।৪ টাকা রোজগার করে। আর যারা কিছু দিন আগে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা ধূমপান নিবারণ করার জন্যে একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা বোধ করে থাকে। আমাকে প্রায়ই বলে, "বাবু, চিনিকে মারুন। সে এখনও সিগরেট ফোঁকে।"

আজ মোহনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমায় বললে, "বাবু, আপনি আমাদের কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনার জুতো জোড়া পালিশ করতে দেবেন না? এখন আমি রোজগার করি। আপনার দরদ আর সাহায্যেই তা হচ্ছে। না হলে ভিখারী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম। আমার কথা বিশ্বাস করুন, কালু, চিনি, পান্নু, রামু, সুরিন্দর আর আমাদের অন্য সব বন্ধু ভিখারী হয়ে থাকত। কিন্তু আপনি কি আমাদের পুলিস আর মিউনিসিপালিটির জুলুমের হাত থেকে বাঁচাবেন না?"

এই দৃশ্য আমার অন্তরকে পুলকিত করে তুলল। আমরা যা লাভ করেছি আমার বন্ধুরা সকলেই তার জন্য গর্বিত।

উত্তর অঞ্চলের সভাপতিগণের ও আহ্বায়কগণের সম্মেলন

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রীয় সমাজকল্যাণ পরামর্শদাতা সংস্থার উপরোক্ত সম্মেলনে, পরিকল্পনা কমিশনের ইউনিয়ন মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বলেন, "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রের অর্থ হচ্ছে, সর্বোদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ।" তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রের অর্থ কেবল এই নয় যে, তাতে হবে শিল্পোন্নতি বা তার দ্রুত জাতীয়করণ। আর গণতন্ত্রের অর্থও মাথাভারী সমাজব্যবস্থাও নয়। এই দু'টিকে লাভ করতে হলে, কল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলিকে দরিদ্রতম নাগরিকটি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সকল নাগরিককেই তাঁদের সহনাগরিকগণের সেবায় যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে।

শ্রীনন্দ কর্মিগণকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, সমাজ কল্যাণকে বাড়তি বা অবসর সময়ের কাষ বলে মনে করা যেতে পারে না। এই কাজ করতে হবে সুসংবদ্ধ পথে। তিনি আরও বলেন, যদি সমাজতান্ত্রিক সমাজ লাভ করতে হয় এবং যদি গণতন্ত্র রক্ষা করতে হয় তা হলে ক্রমেই বেশি করে স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টা করতে হবে, কেবলমাত্র সরকারের কাজের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

গোড়ার দিকে শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান, সংস্থাটির কাজের একটা বিবরণ দেন। তাঁর বিবরণ দানের উদ্দেশ্য ছিল ওয়েলফেয়ার একসটেনসন সার্ভিস সেণ্টারের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন কোন মহলে যে গোলমেলে ধারণা আছে তা দূর করা। তিনি বলেন, "সি. পি. এ-র ও আমাদের কাজের কোনটিই কারও উপর গিয়ে পড়ে নি। কারণ আমাদের ওয়েলফেয়ার একসটেনসন প্রজেক্ট বিশেষ ধরনের মানুষদের যেমন, নারী, শিশু, বিকলাঙ্গ ও অপরাধপ্রবণদের জন্য কাজের ভার নিয়েছে। কম্যুনিটি প্রজেক্টের কর্মতালিকায় এদের কোন সেবার ব্যবস্থা নেই।"

শ্রীমতী দেশমুখ আরও বলেন, "এই কেন্দ্রগুলিকে বিভিন্নবিষয়ক কাজের কেন্দ্র করে গড়ে তোলবার প্রভূত চেষ্টা চলছে। নারীগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক শিক্ষা, হাতের কাজ শিখবার ব্যবস্থা, শিশু ও প্রসূতি নিকেতন, শিশুস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা—এই সকল কাজেরও ভার নেওয়া হয়।"

দিল্লী স্টেট বোর্ড সম্মেলনটির আয়োজন করেন। সম্মেলনটির উদ্বোধন হয় ১৯৫৬ সনের ৪ঠা এপ্রিল এবং চার দিন চলে। এই সময়ের মধ্যে পঞ্জাব, পেপসু, হিমাচল প্রদেশ, বিন্ধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, জম্মু ও কাশ্মীর, আজমীঢ় ও রাজস্থানের সভাপতি ও আহ্বায়কগণ যোগ দেন এবং তাঁদের বিবরণী পাঠ ও তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সমস্যাগুলির আলোচনা করেন।

সকলেই উপলব্ধি করেন যে, বর্তমানে একজন গ্রাম সেবিকা ও একজন ধাত্রী মাত্র এই দু'জন কর্মী যথেষ্ট নয়, আরও একজন করে লোক দরকার যিনি প্রত্যেক কেন্দ্রে হাতের কাজ শিক্ষা দেবেন। চেয়ারম্যান বলেন, প্রত্যেক কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই একজন করে শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্মেলনে যোগদানকারী আহ্বায়কগণ বলেন, "শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাইয়ের চেয়ে ধাত্রীদের সাহায্যই বেশি কাজের হবে।" কিন্তু চেয়ারম্যান তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে, প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করে শিক্ষিত ধাত্রী নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। তবে তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক প্রজেক্টের জন্যই একজন করে ধাত্রী নিযুক্ত হতে চলেছে। আগামী পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায়, দেশের স্বাস্থ্য পরিকল্পনার অংশ হিসাবে যে শত শত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হবে আহ্বায়কগণ তার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।

আহ্বায়কগণ তাঁদের কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট নয়, এ প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা চান তার দ্বিগুণ অর্থ ৫ পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু চেয়ারম্যান কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করে বলেন, টাকার পরিমাণ এখন বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। তবে বাইরের দান তাঁরা সংগ্রহ করতে পারলে কেন্দ্রীয় সংস্থা কিছু বেশি টাকা সাহায্য করতে পারেন।

প্রতি কেন্দ্রের সংগঠন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। যে সকল সদস্য সমাজ-কল্যাণ কাজে অত্যন্ত আগ্রহশীল থাকা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে বা অন্য কারণে সক্রিয় সহযোগিতা করতে অক্ষম তাঁদের জায়গায় যাঁরা কাজ করতে পারেন চেয়ারম্যান সেই সকল ব্যক্তিকে গ্রহণের পরামর্শ দেন।

তিনি আরও বলেন যে, বাড়ীগুলি কেবল প্রসূতি-নিকেতনরূপে ব্যবহৃত হবে না, সেখানে অন্যান্য সমাজ-কল্যাণ কাজেরও ঠাঁই করে দিতে হবে। দান আদায়েরও ব্যাপক ও প্রবল চেষ্টার প্রয়োজন।

সম্মেলনে সভাপতিগণ ও আহ্বায়কগণ নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা আলোচনার মূল্যবান সুযোগ লাভ করেছিলেন।

ভারতে সমাজকল্যাণমূলক সাংবাদিকতা

শ্রীপাতঞ্জলী ভদ্রেন্দু

১৮৩০ সন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথার অবসান করলেন। গোঁড়া হিন্দুসম্প্রদায় সতীদাহ প্রথা অবসানের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন, "স্বামীর সঙ্গে সহমরণ প্রত্যেক হিন্দু রমণীর পুণ্য কর্ম।" রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রগতিশীল গোষ্ঠীদের নিয়ে তাঁর কাছে পাল্টা আবেদন পেশ করলেন। তাতে গোঁড়া সম্প্রদায় সপারিষদ রাজার কাছে আর একটি আবেদন পাঠালেন; আর, রায়গোষ্ঠী গোঁড়া সম্প্রদায়ের ঐ আবেদনকে নস্যাৎ করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতে লাগলেন। পরিশেষে বিলাতের প্রিভি কাউনসিল লর্ড বেন্টিঙ্কের আদেশের পক্ষে তাঁদের রায় দিলেন। ফলে বাগবিতণ্ডার অবসান হ'ল। ইতিমধ্যে দু' পক্ষেরই মতামতকে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি পত্রিকার জন্ম হয়েছিল। ভারতে সেই সম্ভবত সমাজকল্যাণমূলক সাংবাদিকতার প্রারম্ভ।

ভারতে ১৭৭৬ সনে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও পত্রিকার সঙ্গে জনসাধারণের প্রথম সংযোগ হয় (ইংরেজী) ব্রাহ্মিনিক্যাল ম্যাগাজিন, (বাংলা) সংবাদ কৌমুদী, (ফারসী) সিরাৎ-উল-আখবর্ প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলির মারফৎ। সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় এগুলি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাগুলি ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে অর্থপূর্ণ ও অক্ষয় ছাপ রেখে গেছে। পরে সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সমাজকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে দেশের নানা অংশে অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে বিশিষ্ট ছিল, লোকেশের 'দীনবন্ধু', গোখেলের 'সোস্যাল রিফরম', রাণাডের 'ইন্দুপ্রকাশ', বীরেশ লিঙ্গমের 'বিবেক বর্ধনী', নটরাজনের 'ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফরমার', এম. কে. গান্ধীর 'হরিজন', এম. কে. মুন্সীর 'সোস্যাল রিফরমার' ও নায়েরের 'দি রিফরমার'। পরবর্তীকালে বহু সমাজসেবী শিশু, নারী, তরুণ প্রভৃতির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

এখন দেশে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন বিষয়ের অনেক পত্রিকা বর্তমান। সাধারণ সংবাদপত্রের সঙ্গে সমান তালে সেগুলি প্রকাশিত হয়।

'দি ইণ্ডিয়ান কাউনসিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার' দিল্লী থেকে প্রতি মাসে 'নিউজ বুলেটিন' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে তাঁদের কাজকর্মের সংবাদ থাকে। এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা শিশুকল্যাণ কর্মীদের উৎসাহ দেন। পশ্চিমবঙ্গের শিশুকল্যাণ পরিষদ প্রকাশ করেন 'দেবানামপ্রিয়।' তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রচনা প্রকাশিত হয়। নিখিল-ভারত নারী সম্মেলন নিউ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন 'রোশনি।' এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ন্যায়-বিচার ও সাম্য স্থাপন।

বোম্বাইয়ের "দি টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স" প্রকাশ করেন, দুখানি পত্রিকা—'দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ সোস্যাল ওয়ার্ক' ও 'কর্মযোগী।' এ দুইয়ের মাধ্যমে তাঁরা সমাজসেবায় জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন।

ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সংঘ দিল্লী থেকে 'বন্য-জাতি' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার উদ্দেশ্য উপজাতির সেবা। এইগুলি ছাড়া আরও বহু পত্রিকা আছে। সেগুলির উল্লেখ স্থানাভাববশতঃ করা গেল না।

যা হউক, আমাদের সমাজকল্যাণমূলক সাংবাদিকতার ঐতিহ্য এমন যে তার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি। এখন সেগুলির সঙ্গে প্রকাশিত হয়, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের (সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের) দু'খানি মূল্যবান পত্রিকা 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার' ও 'সমাজকল্যাণ।' পত্রিকা দু'খানি গুরুকর্মভার সম্পাদন করছে।

গঙ্গা

শ্রীমতী সাবিত্রী গোয়েল

প্রথম শৈশবের কথা মনে করতে গেলেই গঙ্গার অন্তর কিছুটা ব্যথিত ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে—সেই শৈশব যখন সে নিজের খুশিমত কাজ করতে পেত, যা চাইত পেতও তাই। কিন্তু সে অনেক বছর আগের কথা। সে তার মায়ের মুখ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। সে যখন দু' বছরের তখন তিনি মারা যান। তার বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। তবে আর সকলের বেলায় যেমন হয়ে থাকে তার বিমাতা তেমন ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্য রকমের। তার এই নতুন মা ছিলেন চমৎকার। তাকে খুব যত্ন করতেন। বরং তার যত্নটা হ'ত অতিরিক্ত। তাঁর ক্রমাগত আদর-যত্নে ছোট্ট গঙ্গা উত্যক্ত হয়ে উঠত। দামী পুতুলের বায়না ধরে সে আর মাটিতে শুয়ে পড়তে পেত না। কারণ তার নতুন মা তাকে তার বাঞ্ছিত

সামগ্রীটি দিতেন। কিন্তু তাকে দিনের মধ্যে অনেকবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার ভীষণ ঝঞ্ঝাটে পড়তে হ'ত। মায়ের অবাধ্য হবার আনন্দ থেকে সে এই ভাবে বঞ্চিত হ'ত, তবে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে নয় একটা সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে। তাতেই হ'ত তার পরাভব।

সে যখন শৈশব ছাড়ল তখন আবার পড়ল, ওর চেয়ে কঠোরতর এক শৃঙ্খলার মধ্যে। তার বহু খেলার সাথীর কাছে স্কুল এক ভয়ঙ্কর জায়গা। তবে তার কাছে সে রকমটা হয় নি। তার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পোশাক, ঠিক সময়ে বইপত্র কেনা, বাস না পেলেও স্কুলে হাজির হওয়া—এই সব তার প্রতি স্কুলের শিক্ষিকাগণের স্নেহ ও প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। আর সে ছিল তার সহকর্মিণীগণের রাণী। তার প্রকৃতির মধ্যে ছিল প্রভুত্বসূচক একটা ভাব, অন্তরে ছিল দুঃসাহসিক কর্মে নিযুক্ত হওয়ার একটা প্রবণতা।

তবে বাড়ীতে তাকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত ভবিষ্যতের গৃহিণীর কাজকর্মগুলি। সেই সঙ্গে তার প্রতিটি কাজ পরীক্ষা করে তার অভিভাবকেরা তাকে সংযত করতেন। বলতেন, "গঙ্গা, ও রকম করে পা দুলিয়ো না। ওটা বিশ্রী! চুপ! ও রকম করে চেঁচিও না।...খারাপ অভ্যাস...চুমুক দিয়ে খাবার সময় ঠোঁটে ও রকম বিশ্রী আওয়াজ করো না, তোমাকে পরের ঘরে যেতে হবে।...তোমার শাশুড়ী ও সব পছন্দ করবেন না ...তোমার শাশুড়ী কি বলবেন...ওর জন্যে একদিন তোমায় তাড়াবে।...তোমার ভাইয়েদের নকল কর না।...মেয়েদের পরের ঘরে যেতে হয়।..."

"গোল্লায় যাক তোমাদের পরের ঘর।...আমি সেখানে যাচ্ছি না।" রাগে লাল হয়ে এই কথা বলেই গঙ্গা ছুটে পালাত।

আর তখন শুনতে পেত তার মা-বাবা হাসতে হাসতে বলছেন, "মেয়েটা বড় মিষ্টি কিন্তু ওর মেজাজ!..."

তার বাবা গর্বের সঙ্গে বলতেন, "ব্যাপারটা তা নয়। ও নিজের খুশিতে চলে...ওর সাহস আছে..."

"নিজের খুশিমত চললে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ওর হবে মুশকিল। ওর ফলে মেয়েরা মুশকিলে পড়ে।"

গঙ্গা আর কিছু শুনতে পেত না। সে কাঁদত। তার নিজের মাকে মনে পড়ত যে আর ইহজগতে নেই। তার যৌবনোন্মুখ অন্তরে সে কত ছবি আঁকত, কিন্তু যা সে গড়ে তুলতে চাইত তার আদর্শের মহান সৌন্দর্যের সঙ্গে তার একটিরও মিল হ'ত না। তার নতুন মায়ের সুন্দর ও করুণা মাখা মুখখানি তার চোখের সামনে বার বার এসে পড়ত। কিন্তু তার নিজের মা তার কল্পনা থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন যেমন করে তিনি এই পার্থিব জগতে তার বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছেন।

গঙ্গার স্বামী শিক্ষিত। কিন্তু তাদের জমিদারী সরকারী আইনে চলে যাবার ও তার পিতার মৃত্যুর পর সে তাদের গ্রামের বাড়ীতেই বাস করে। অনুপস্থিত জমিদারদের দিন শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট জমি নিজের হাতে রাখবার জন্যে তাকে চাষ-আবাদ করতে হয়। গঙ্গা তার শাশুড়ীর যে রূপ কল্পনা করেছিল তিনি সে রকমের কোন রাক্ষসী নন। গঙ্গার পোশাকে-আচরণে, পান-ভোজনে কোন দোষ তিনি দেখতে পান না। তিনি তাঁর গৃহলক্ষ্মীর হাতেই সংসারের সব ভার তুলে দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, মা মিছামিছি ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে অনাবশ্যক গোলমাল করতেন। সে এখানে তার রূপ ও নিপুণতা নিয়ে স্বামীর ঘর ও অন্তর সাজিয়ে বসেছে।

গঙ্গার সন্দেহ কিন্তু শীঘ্রই আবার তার মনে উদয় হ'ল। তার শাশুড়ী, আর সকলের মতই স্থির বিশ্বাস করতেন যে, প্রথা ও সমাজ বধূর জন্যে যে ঠাঁইটুকু নির্দেশ করেছে সে থাকবে সেইখানেই। বধূর অবগুণ্ঠনের উদ্দেশ্য অন্যের চোখে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়। ওটা থাকবে বরাবরের জন্যে এবং তার নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করবে, যেমন করে বাড়িতে তার মা তাকে ওদিকে রক্ষা করেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, তার মায়ের শিক্ষা বৃথা হয়েছে। কিন্তু কেন তিনি তাকে বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি দিতেন? তাকে আদৌ স্কুলে পড়াবার এবং সাংঘাতিক পরীক্ষাগুলো পাস করাবার দরকার কি ছিল? কেন আঠারো বছর ধরে সে বাইরের জগতে বেড়াতে পেয়েছে? তার সেই শিশুকাল থেকে কেন তাকে পর্দার আড়ালে রাখা হয় নি? তা হ'লে ত আর সে তার পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠত না। তাকে যদি একজনের ওপর নির্ভরশীল হতেই হয় তা হলে তার প্রথম গৃহ থেকে কেন তাকে উন্মূলিত করে আনা হ'ল? কেন তাকে প্রতি বারেই একজন করে নতুন মা নিতে হবে?

এখন তার বোধ হতে লাগল, তার জীবনের প্রতি স্তর ক্রমেই হবে আরও শোচনীয়। তার পুরনো বাড়ীর জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল! তার বিমাতা যিনি তাকে বাইরে যাবার স্বাধীনতা দিয়ে ছিলেন তাঁর জন্যে মন কেমন করতে লাগল। মন ব্যাকুল হ'ল তার বাবার জন্যে। তিনি তার সাহস ও নিজ থেকে কর্মোদ্যোগের জন্যে গর্ব অনুভব করতেন। যারা নিরক্ষর মূর্খ তারা কত সুখী! তাদের বিবেকের দংশন অনুভব করতে হয় না। যারা শক্তিহীন তারাও সুখী!

বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল কিন্তু চাপ হতে লাগল বেশি। লোকে বলে, একসঙ্গে বাস করতে করতে বোঝাপড়া বাড়ে। কিন্তু এখানে পর পর প্রত্যেক দ্বন্দ্বে পার্থক্যটা আরও উদগ্র হয়ে উঠতে লাগল। গোড়ার দিকে গ্রামখানি তার কাছে ছিল নতুন। তাই বেশি সময় সে বাড়িতেই থাকত। ক্রমে অনেকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। সে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া শুরু করে। তার অপরাধের গুরুত্ব বাড়তে লাগল নিষেধের বেড়াজালের বাঁধুনির সঙ্গে সঙ্গে।

তাদের গ্রামখানা পড়েছিল কমিউনিটি প্রজেক্টের চৌহদ্দির মধ্যে। সরকারী কর্মচারীরা তার স্বামীকে তাদের কাজে সাহায্য করবার জন্যে বেশ সহজেই হাতের কাছে পেয়ে গেল। যে মহিলা কর্মীটির হাতে সমাজ-শিক্ষার ভার ছিল তিনি একেবারে তাদের বাড়ি চড়াও করলেন। গ্রামে একজন শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্না মহিলাকে পেয়ে তিনি ত অবাক। তিনি গঙ্গাকে গ্রাম-সেবিকা হবার পরামর্শ দিলেন। গঙ্গা সোৎসাহে তাতে সম্মত হ'ল।

কিন্তু বাড়িতে উঠল সোরগোল। "ঘরের বউ" কি করে গ্রামে বার হবে, লোকে তাকে দেখবে? বড় ঘরে কেউ কোথাও এ রকম শুনেছে? গঙ্গাকে কাজের ভার দেওয়া হ'ল, কিন্তু সে বাড়ির বার হতেই পারলে না। একটি মাস কেটে গেল, সে কিছুই করলে না। সে সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করলে, এমন কি তার স্বামীরও। সে চুপচাপ পড়ে ভাবতে লাগল, মন গেল হতাশায় ভরে। সে যে খুবই অসুখী তা প্রত্যেকেরই নজরে পড়ল। তার অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এক জোয়ার যা তাদের চোখে ধরা পড়ছিল না। আর সেই জোয়ারের আঘাতে তার চারধারে যে পিঞ্জর গড়ে উঠেছিল তার কাঠামো যাচ্ছিল ভেঙে চুরমার হয়ে।

না, নিজের ঘরে সে বন্দিনী হয়ে রইবে না।

সে কি গঙ্গা নয়—যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর আনন্দ ও শক্তির চির-উৎস? সে স্বয়ং নিষ্কলুষতা। গঙ্গা তার স্বামীর কাছ থেকে এই শপথ আদায় করেছিল যে, সে তার পথের বাধা হবে না। সে সমাজ-কর্মী হবার সঙ্কল্প করলে। এই সঙ্কল্প তার অন্তরে নিয়ে এল শান্তি। অন্তরের শান্তি দৃঢ়তাকে পুষ্ট করে তুলতে লাগল।

সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তার স্বামীকে বললে, "আমি চলে যাচ্ছি।"

তার স্বামী আশ্চর্য হয়ে বললে, "কোথায়?" সে তখন ডেস্কে বসে খুব ব্যস্ত হয়ে কাগজপত্র দেখছিল।

গঙ্গা বললে, "থানাপুরে···মহিলাদের শিক্ষাশিবিরে। তোমরা যদি না চাও, আমি আর ফিরে আসব না।" শেষের কথাগুলি বললে তার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে। শৈশবের সেই উদ্ধতভাব তার মধ্যে ফিরে এসেছে। মুক্তি ছাড়া তার কাছে আর সব তুচ্ছ। স্বাধীনতা চাই-ই। এ ভাবে সে বেঁচে থাকতে পারে না। তার শাশুড়ীকে, স্বামীকে, বাড়ি-ঘরকে সে হেয়জ্ঞান করতে লাগল; এমনকি নিজেকেও সে হেয়জ্ঞান করতে লাগল এত দিন নিজকে বিসর্জন দিয়েছিল বলে। সেই মুহূর্তে সে ঐ সব শৃঙ্খল ভেঙে ফেলছিল। তাকে যদি মারতে মারতে মেরেও ফেলা হয় তবুও সে নিরস্ত হবে না।

তার কথাগুলির অর্থ তার স্বামীর মনে এক চমকে খেলে গেল। রাগ-বিস্ময়শূন্য অন্তরে সে গঙ্গার দিকে নীরবে তাকাল। গঙ্গা তার নব সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। মাত্র সিদ্ধান্তই তার মুখে এনেছে এক নতুন ভাব। তাঁর ঠোঁট দুখানি দৃঢ় সংবদ্ধ। গঙ্গা যৌবনে, উদ্যমে টলমল করছে। তার স্বামীকে ছেড়ে সে একা সংসারের পথে বেরিয়ে পড়তে চায়? নিজের সর্বনাশ করতে সে কি গঙ্গাকেও ধ্বংস করবে?

"এই তোমার জন্যে মনিঅর্ডার···"

"কি করেছি যে আমি টাকা পাব? তুমি কি মনে কর, আমি টাকা চাই?"

কিন্তু তার স্বামীর কান তার কথার দিকে ছিল না। সে তাড়াতাড়ি মনে মনে হিসেব করছিল···সে কিসে জড়িয়ে পড়বে, সর্বনাশে বা আশীর্বাদে? নগদ টাকা। মা এটা খুব পছন্দ করবেন। গ্রামে তার মতও অবস্থাপন্ন চাষী আছে যাদের কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু তারা বাড়তি টাকা দিতে পারে না। সে তার মাকে এগুলো দিয়ে খুশী করতে পারবে।

সমাজ-শিক্ষা কর্মচারী রঞ্জনার কথা তার মনে এল। মহিলাটির কি নৈতিক চরিত্র নেই? ইজ্জৎ নেই? না, সে সব যথেষ্ট আছে। তার নিজের চেয়েও বেশী আছে। জেলাশাসকের সঙ্গে সে কি রকম করে কথা বলে। তার চেয়েও ভাল ভাবে। একদিন তার স্ত্রীও ঐ রকম করে কথা বলবে। সেও একদিন হবে সমাজ-শিক্ষা কর্মচারী। কেবল ওর চাই ওর নিজের পথে চলবার স্বাধীনতা।

হঠাৎ বহুকালের বোঝা থেকে সে হ'ল মুক্ত। সে উপলব্ধি করলে, তা যেন তার অন্তরকে এতকাল পীড়ন করছিল। সে বলে ফেললে, "তুমি আমার আশীর্বাদ নিয়ে যাও। আজ থেকে তোমার ইচ্ছামত পথে তুমি যাত্রা কর।"

সেইক্ষণটিতে এক স্বাধীন পুরুষ মুখোমুখী হ'ল এক স্বাধীন নারীর—যে তার চিরজীবনের সাথী।

ভারতবর্ষে ভেষজ শিল্পের প্রসার

ডক্টর মোহিনীমোহন বিশ্বাস

বর্তমান ভেষজ শিল্পসমূহের উৎপত্তি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং তখন প্রাচীন ফারমাকোপিয়াসমূহ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভেষজ শিল্পের ক্রমোন্নতি দেখা দিতে লাগল এবং সেই সঙ্গে ক্রমশঃ দেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ভেষজ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠল। ভারতবর্ষও বিভিন্ন শ্রেণীর ভেষজ দ্রব্য, রাসায়নিক এবং এণ্টিবায়োটিকস প্রস্তুতের প্রতি মন দিল। ক্রমশঃ ভেষজ প্রস্তুতের জন্য দেশব্যাপী একটা সাড়া পড়ে গেল।

ভেষজ শিল্পকে মূল দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম অংশ বিবিধ রাসায়নিক ও ভেষজসমূহের উৎপাদন সম্বন্ধে। দ্বিতীয় অংশ উৎপন্ন দ্রব্যাদির মান ও মাত্রা নির্ণয় করে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ সাধন। এই দুই অংশের পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক। এই সকল ভেষজ দ্রব্য তৈরীর জন্য কতকগুলি মূল রাসায়নিক (basic chemicals) প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। রঞ্জন শিল্প (dye-stuff industry) জার্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। এই শিল্পের জন্য প্রস্তুত রঞ্জন দ্রব্যাদি সমগ্র পৃথিবীর বাজার জুড়ে বসেছে। রঞ্জন দ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিকসমূহ বিবিধ ভেষজ শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। এজন্য ঐ সব দেশের রঞ্জন ও ভেষজ উভয়বিধ শিল্পই প্রচুর উন্নতি সাধন করেছে। সুতরাং রাসায়নিক ও ভেষজ উভয়বিধ শিল্পের মধ্যে একটি আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ভেষজ শিল্পের প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। মেপাক্রিণ, প্যালুড্রিণ, পেনিসিলিন্ প্রভৃতি নূতন নূতন ঔষধের আবিষ্কার হ'ল। গবেষণা দ্বারা ভিটামিন ও হরমোন প্রভৃতি আরও বহু নূতন ঔষধের সন্ধান মিলিল। আমেরিকা আজ গবেষণা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, টেরামাইসিন প্রভৃতি আরও অনেক ঔষধের উৎপাদনে মূল অংশ গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ভেষজ শিল্পে দীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য ভেষজসমূহ ব্রিটিশ শাসনের সময় এদেশে আমদানী হয়। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈরি হ'ত এবং দেশবাসী ঐ সব ভেষজ দ্রব্যের গুণাবলীতে এত সন্তুষ্ট ছিল যে, পাশ্চাত্ত্য ঔষধের প্রচার বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষে ভেষজ শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা হ'ল। ক্রমশঃ পশ্চিম ভারতের বরোদা রাজ্যের শ্রীটি. কে. গাজ্জর এবং রাজমিত্র বি. ডি. আমিন এর চেষ্টার ফলে এই শিল্পের আরও উন্নতি দেখা দিল। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ফলে এই শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি দেখা গেল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভেষজ দ্রব্যের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল এবং আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ একেবারে বন্ধ হ'ল। যুদ্ধের পর আবার পূর্বাবস্থা ফিরে এল এবং ভেষজ শিল্পে আবার অবনতি ঘটল। ১৯৩০ সনে আবার চেষ্টা আরম্ভ হ'ল এবং সিরাম, ভ্যাক্সিন, ইথার, ক্লোরোফরম, ন্যাপথালিন, ক্রিসল প্রভৃতি প্রস্তুত হতে লাগল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভেষজ শিল্পে আরও উন্নতি দেখা গেল। এফিড্রিন্, স্যানটোনিন্, ষ্ট্রিকনিন্, মরফিন্, এমিটিন্, এট্রোপিন্ প্রভৃতি এলক্যালয়ড জাতীয় ঔষধ প্রস্তুত হতে আরম্ভ হ'ল। সিরাম ভ্যাক্সিন তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং ভেষজ শিল্পে প্রচুর উন্নতি সাধিত হ'ল। এমন কি কতিপয় ঔষধের রপ্তানীও আরম্ভ হ'ল। ক্রমশঃ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা দেখা গেল এবং বিদেশী শিল্পপতিগণের দ্বারা ভারতবর্ষে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এর ফলে ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি দেখা দিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর গত কয়েক বৎসরে ভেষজশিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। ১৯৫৫-৫৬ সনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্য শেষ হবে। এই পঞ্চবর্ষকাল ভেষজ শিল্পের উন্নতির পথে কতকগুলি অন্তরায় সৃষ্ট হয়েছে তা দূরীভূত করতে পারলে এ শিল্পে প্রচুর উন্নতি সাধিত হবে। সর্ব্ব প্রথম অন্তরায় হ'ল ভেষজ শিল্পের উপযুক্ত মান নির্দ্ধারণ এবং প্রয়োজন মত ভেষজ দ্রব্যের মান উন্নয়ন। উক্ত উন্নয়ন কার্য্যের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি মেনে চলা উচিত :—

(১) কাঁচা মাল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য আরও কঠোর হওয়া আবশ্যক।

(২) ভেষজ দ্রব্যের আধারসমূহ যথাসম্ভব বিলাতীর সমতুল্য হওয়া আবশ্যক।

(৩) বাজার হতে ভেজাল ও জাল ঔষধ উচ্ছেদ করবার জন্ত ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা দরকার।

প্রথমোক্ত নির্দ্দেশ মানলে ভেষজসমূহের মান নির্দ্ধারণ করা সহজ হবে। ভেষজ দ্রব্যসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সঠিক হওয়া একান্ত দরকার। এ কারণ ভেষজ রাসায়নিকের দায়িত্ব খুব বেশী। মেজর জেনারেল এস, এল, ভাটিয়ার মতে ভেষজসমূহের সঠিক বিশ্লেষণ এবং রাসায়নিক পরীক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং ভেষজ শিল্পের উন্নতির পক্ষে তা অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় নির্দ্দেশেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ভেষজ দ্রব্যের আধারসমূহ এবং প্যাকিংয়ের গুরুত্ব বিশেষ কম নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ উপাদান থেকে শিশি-বোতল প্রভৃতি তৈরি হওয়া আবশ্যক। শিশি-বোতলের কাঁচের প্রকৃতি এবং গঠন উন্নত ধরনের হওয়া আবশ্যক এবং বিলাতীর সমকক্ষ যাহাতে হয় তার প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচের সংস্পর্শে রাখলে ভেষজ-দ্রব্যাদির মান কম হয় এবং কিছুদিন পরে অব্যবহার্য্য হয়ে যায়। তৃতীয় ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আইন সংক্রান্ত এই আইন জনসাধারণের হিতার্থে এবং এই আইনভঙ্গকারীদের সাধারণ দুষ্কৃতিকারীদেরই মত শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। ভেষজসমূহ তৈরি করবার জন্য রাসায়নিক এবং শিক্ষিত ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে। ঔষধের কারখানাগুলিও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত হবে এবং ঔষধ বিক্রয়ের জন্ত লাইসেন্স দেওয়ার কড়াকড়ি করতে হবে। বাজারে বিক্রয়ের জন্ত যে ঔষধ আমদানী করা হবে মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করতে হবে যাতে ভেজাল ঔষধ না বিক্রয় হয়। ঔষধের দোকানের মালিকগণ এবং গৃহস্থেরা সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত ঔষধের শিশি-বোতলগুলি নষ্ট করে ফেলবেন যাতে করে ফিরিওয়ালারা ঐগুলি হাতে না পায়। এই সমস্ত ব্যবহৃত শিশি-বোতলগুলি ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারীদের হাতে পড়লে তারা ভেজাল ঔষধ তৈরি করে ঐগুলিতে ভরে আবার বাজারে বিক্রয় করবে এবং তাতে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হবে।

১৯৫৫ সনে দিল্লীতে নিখিলভারত ভেষজ বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনকালে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি কেন্দ্রীয় পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। তিনি দেশীয় ঔষধের মানোন্নয়নের এবং ভেজাল বন্ধের জন্ত বলেন। দেশীয়

শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি উৎসাহ দেন। তিনি বলেন, এ দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের মান হয়ত কিছুটা নামান যায় কিন্তু ঔষধের মান সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বর্তমানে কয়েকটি ভেষজ তৈরির কারখানা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। মেজর জেনারেল এস, এস, সোখের পরিকল্পনানুযায়ী ভারত সরকার পুণা শহরের নিকট পিম্প্রীতে পেনিসিলিন তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। এই কারখানায় ভারতবর্ষের বার্ষিক ২০,০০০ বিলিয়ন ইউনিট চাহিদার মধ্যে প্রায় ৯০০০ বিলিয়ন ইউনিট তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেনিসিলিন উৎপাদনের মাত্রা ১৫০০০ বিলিয়ন ইউনিট বৃদ্ধি পাবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বেসরকারী কারখানার সাহায্যে পেনিসিলিনের ঘাট্‌তি অংশ পূরণ করতে চান।

ম্যালেরিয়া কীটঘ্ন ঔষধসমূহ—যেমন বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড (বি, এইচ, সি) এবং ডি, ডি, টি বৎসরে ২০০০ টন তৈরী হয়—যদিও বার্ষিক চাহিদা ৫,৫০০ টন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইথার, ক্লোরোফর্ম, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্ এবং সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট্, এমোনিয়াম ও পটাসিয়াম ব্রোমাইড প্রভৃতি কয়েকটি রাসায়নিক প্রস্তুতে প্রচুর উন্নতি সাধন ঘটেছে। ভিটামিন ঘটিত ঔষধের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে চলেছে। সাধারণতঃ এসকরবিক এসিড (ভিটামিন সি), থায়ামিন, নিকোটিনিক এসিড, রাইবোফ্লেভিন (ভিটামিন বি ২) পাইরিডক্সিন, প্যানটোথেনিক এসিড, ফলিক এসিড এবং ভিটামিন বি ১২—এই কয়েকটি উপাদান দ্বারা গঠিত ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন কে এবং ভিটামিন ই ঔষধে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত ভিটামিনগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গবেষণাগুলির মধ্যে কয়েকটি ম্যালেরিয়ার ঔষধ যেমন প্লাসমোচিন, এটিব্রিন, প্যালুড্রিন, কয়েকটি সালফনামাইড জাতীয় রোগনিরোধক ঔষধ, হামের জন্য গামা গ্লোবুলিন, কীটঘ্ন ঔষধ যেমন ডি, ডি, টি ও বি, এইচ, সি, এণ্টিবায়োটিক যেমন পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন এবং ক্লোরাম্‌ফেনিকল স্থান পেয়েছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে ভেষজ বিষয়ক গবেষণার প্রচুর আদর হয়েছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ এবং কাউন্সিল অব সায়াণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের তত্ত্বাবধানে দেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে কয়েকটি সালফনামাইড জাতীয় ঔষধ, কুষ্ঠরোগের জন্য সালফোন, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার ঔষধ এবং এণ্টিবায়োটিক্‌স সম্বন্ধীয় গবেষণা কার্য্য হচ্ছে। কাউন্সিল অব সায়াণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের তত্ত্বাবধানে (১) দেশীয় গাছগাছড়া, (২) রাসায়নিক সংশ্লেষণ দ্বারা প্রস্তুত ম্যালেরিয়ার ঔষধ (৩) এণ্টিবায়োটিক ও কীটঘ্ন ঔষধসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত গবেষণা মন্দিরে সালফা ড্রাগস রাওলফিয়া প্রভৃতি গাছড়া জাত ঔষধ, কুষ্ঠরোগের সালফোন জাতীয় ঔষধ, লিভার একষ্ট্রাক্ট এবং এণ্টিবায়োটিক ঔষধ প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এই সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। বিলাত থেকে আমদানী রাসায়নিক হতে কয়েকটি ঔষধ তৈরী হচ্ছে এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এই শিল্পের উন্নতির অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভেষজশিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশে প্রচুর সাফল্য দেখা গেছে। ভেষজ এবং রসায়ন শিল্পে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এই শিল্পের অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত করেছে। ভারত সরকারের আমদানী নীতির পরিবর্ত্তন করে ক্রমশঃ দেশীয় শিল্পের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিলে এ শিল্পের আরও উন্নতি হবে। আশা করি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত হবে এবং ভারতবর্ষ ভেষজ শিল্পে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে পারবে।

স্বীকৃতি

আষাঢ় (১৩৬৩) 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত "মানুষ" শীর্ষক নাটিকাটি ১৩৬১ সালের শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিত "বালক সাধু" নামে নিবন্ধের ছায়াবলম্বনে রচিত।

“এর শুভ্রতাই
এর বিশুদ্ধতার
পরিচায়ক”
বলেন অনুভা গুপ্ত
“সেইজন্যেই
আমি সর্ব্বদা
লাক্স টয়লেট
সাবান
ব্যবহার করে
থাকি”
ভারতে প্রস্তুত
LUX
TOILET SOAP
অনুভা গুপ্ত বলেন:
“আপনার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখতে হলে ভালভাবে মেখে নিন...”
“লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত ফেনা—কি সৌরভময়”।
“তারপর ধুয়ে মুছে ফেলুন— আপনি এত তাজা অনুভব করবেন।”
“সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে বড় সাইজ ব্যবহার করুন —যা আমি করি।”
চিত্র-তারকা
সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 479-X52 BG
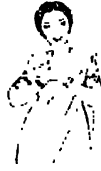
"বুদ্ধ প্রসঙ্গ"

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

জ্ঞান তপস্বী স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ঘোষ রচিত, প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র, ১৩৩০, ভাদ্র, ১৩৩১ ও কার্ত্তিক ১৩৩৪ সংখ্যাতে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে* সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে গৌতম বুদ্ধের আত্মচরিত, সাধনা ও সিদ্ধি এবং নির্ব্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা আছে।

প্রথমেই গৌতমের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। ইহা গতানুগতিক জীবনী নহে। ত্রিপিটক গ্রন্থে প্রাপ্ত বুদ্ধের নিজস্ব উক্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া, লেখক বিচারপূর্ব্বক ঐতিহাসিক প্রণালীতে জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:

১। গৌতম বাল্যকালে ভোগ-বিলাসের মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন।

২। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, এই তিনটি বিষয়ে চিন্তা করিয়া (দৃশ্য দর্শন করিয়া নহে) তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন।

৩। তিনি অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেন নাই। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন মাতাপিতা অশ্রুমুখ হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

৪। গৌতম গৃহেই কেশশ্মশ্রু ছেদন করাইয়া এবং গৃহেই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গৌতম দুই জন যোগীর শিষ্য হন। তাঁহাদের একজন আলাড়-কালাম এবং অন্যজন রামপুত্র উদ্রক।

গৌতমবুদ্ধ যোগের নবম স্তর (বা অন্তিম স্তর) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি ইহার সপ্তম স্তর পর্য্যন্ত আলাড়-কালামের নিকট এবং অষ্টম স্তর উদ্রকের নিকট শিক্ষা করেন।

আলাড়মুনি ঐ সপ্তম স্তরকে এবং উদ্রকমুনি অষ্টম স্তরকেই যোগের শেষ স্তর মনে করিতেন। কিন্তু গৌতম উহাকে অসম্পূর্ণ জানিয়া গভীর তপস্যার দ্বারা সর্ব্বশেষে নবম স্তর প্রাপ্ত হন। ঐ স্তরকে বৌদ্ধ-শাস্ত্রে "সংজ্ঞাবেদিত নিরোধ" (Complete suppression of consciousness and sensation) বলা হইয়াছে।

আলাড় ও উদ্রকের নিকট গৌতমের যোগশিক্ষার এই ইতিহাস প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মহেশচন্দ্রও ইহা তাঁহার গৌতম-জীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উদ্রকের আশ্রম ত্যাগ করিয়া উরুবেলা গ্রামে গৌতম যখন তাঁহার সর্ব্বশেষে তপস্যা সুরু করেন এখন অপূর্ব্ব মনঃসমীক্ষণের দ্বারা কি ভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে ভয়কে পরাভব এবং কাম, ব্যাপাদ (—অপরের অশুভ কামনা, বিদ্বেষ-বুদ্ধি) এবং হিংসাকে দূর করিলেন, তাহার অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা মহেশচন্দ্র তাঁহার এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরিত্র গঠনে এবং মনুষ্যত্ব অর্জনে আগ্রহশীল ব্যক্তি ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

গৌতমের ধ্যানপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গৌতম স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি দেহকে স্থির করিয়া, বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, এক দিবারাত্রি, দুই দিবারাত্রি, তিন দিবারাত্রি, চারি দিবরাত্রি, পাঁচ দিবারাত্রি, ছয় দিবারাত্রি এবং সাত দিবারাত্রি···বাস করিতে পারি।"

"আমার যখনই ইচ্ছা হইত, তখনই আমি···প্রথম ধ্যানে··· দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে,···চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বিহার করিতাম।"

গৌতম যখন সমাধিস্থ হইতেন তখন বাহিরে প্রলয়কাণ্ড ঘটিলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত না। ইহার দৃষ্টান্তও মহেশচন্দ্রের গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে:

বুদ্ধ যেখানে ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন সেখানে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। ঐ বজ্রপাতে তাঁহার সন্নিকটে দুইজন কৃষক ও চারিটি বলীবর্দ্দ বিনষ্ট হয়। তথাপি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় নাই।

ইহার পর বুদ্ধ-প্রচারিত আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধ-প্রচারিত এই মার্গকে বুদ্ধ স্বয়ং প্রাচীনমার্গ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা তিনি নির্ম্মাণ করেন নাই, আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীনকালের সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ এই মার্গে বিচরণ করিতেন। ত্রিপিটকে, বুদ্ধ-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে এই কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। মহেশচন্দ্রও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বুদ্ধের সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহারের বিষয় সংক্ষেপে বিধৃত করিয়া গ্রন্থকার সর্ব্বশেষে নির্ব্বাণতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে নির্ব্বাণের প্রতিশব্দ, লক্ষণ ও বর্ণনা এবং উপনিষদ হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অনুরূপ বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করিয়া লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ব্রহ্ম এবং নির্ব্বাণ এক।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মকে এক প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে সমুদয় উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,

---

* বুদ্ধ প্রসঙ্গ। মহেশচন্দ্র ঘোষ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, সংখ্যা ১১৯। বিশ্বভারতী, ৬৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য আট আনা।

তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ ত্রিপিটকাদি প্রাচীন গ্রন্থের পরবর্তী। তাহাদের কেহ কেহ যে বৌদ্ধ প্রভাবপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া মাণ্ডূক্য (মাণ্ডুক্য নয়) উপনিষদের (গৌড়পাদের আগমশাস্ত্র বা মাণ্ডূক্যকারিকাও দ্রষ্টব্য) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তাহা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে,প্রাচীন ভারতের সাধনার ধারা বিচিত্র হইলেও তাহার মধ্যে ঐক্য ছিল। সকলেরই লক্ষ্য ছিল, মুক্তি, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। এই শব্দগুলি পৃথক হইলেও উহাদের ভাব এক। শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধমতের বহু সাধক ঐ তিনটি শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।

বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ বা বৈদিকদের মোক্ষ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি যে একই অবস্থা তাহা মহেশচন্দ্র উদ্ধৃত নির্ব্বাণের এই বর্ণনা হইতেই বোঝা যাইবে :

রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, এবং মোহক্ষয় ইহাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়। সংযুক্ত, ৪ ২৫১। ঐ ৪ ২৬১। ঐ ৪।৩৭১।

নির্ব্বাণ অমৃত। মজ্ঝিম, ১।১৬৭।

ধম্মপদে ও বহু স্থানে (নির্ব্বাণ অর্থে) অমৃত ও অমৃতপদের কথা আছে। ধম্মপদ, ১১৪, ৩৭৪ শ্লোক।

নির্ব্বাণ অজর, অমর, অশোক। থেরিগাথা।

নির্ব্বাণ অভয়, অকুতোভয়। সংযুক্ত, ১।১০২ ইতিবৃত্তক; ১১২।

নির্ব্বাণ শিব। সুত্তনিপাত, ৪৭৮।

নির্ব্বাণ পরমসুখ। ধম্মপদ ২০৩, ২০৪ শ্লোক। মজ্ঝিম, ১।৫০৮—৫১০। অঙ্গুত্তর ৪ ৪১৪।

অনুরূপ আরও বহু বাক্য মহেশচন্দ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও, অশ্বঘোষ প্রভৃতি দার্শনিকগণ নির্ব্বাণের ও পরমার্থের যে সব উপমা ও বিশেষণ দিয়াছেন, তাহা হইতেও বোঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের পরমতত্ত্ব, পরমার্থ, নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। যথা—

"দগ্ধ-ইন্ধন-অনলবৎ।" বুদ্ধ-চরিত, চতুর্দ্দশসর্গ।

"শান্ত, অজর, অমর, পরমপদ।" ঐ দ্বাদশসর্গ; ১০৬ শ্লোক।

"ধ্রুবপদ।" ঐ চতুর্দ্দশসর্গ।

শূন্যবাদী নাগার্জ্জুন ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় পরমার্থের বর্ণনা দিয়াছেন :

"অনিরোধ, অনুৎপাদ, অনুচ্ছেদ, অশাশ্বত।" মূলমধ্যমককারিকা, ১.১।

মহাভারতও বলিতেছেন, "এরূপ অবস্থায় শাশ্বতই বা কি উচ্ছেদই বা কি?" শান্তিপর্ব্ব, ২১৯।৪১

"পরমার্থ সদ্ নহে অসদ্ নহে, সুখ নহে, দুঃখ নহে।" বোধিধর্ম্মাবতারপঞ্জিকা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

"অনাদি ব্রহ্মকে সদ্‌ও বলা যায় না অসদ্‌ও বলা যায় না।" বেদান্তদর্শন, ৩।২.১৭।

"যাঁহার লক্ষণ নাই, তাঁহাকে অস্তি-নাস্তি দুই-ই বলা যায়।" মহাভারত, শান্তি, ২১৮।২৬।

"ব্রহ্ম সুখও নহে, দুঃখও নহে।" মহা, শান্তি, ২৫০।২২।

"পরমার্থ স্বভাব হইতেছে—সর্ব্বদ্রষ্টব্যপ্রশমিত, শিবলক্ষণযুক্ত, সর্ব্বকল্পনাজাল বিরহিত, জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তস্বভাবসমন্বিত, শিব। পরমার্থ অজর, অমর, অপ্রপঞ্চ, শূন্যতাস্বভাববান্ নির্ব্বাণ। মন্দবুদ্ধি এবং অস্তিত্বনাস্তিত্বাদি মতবাদে অভিনিবিষ্ট, আসক্ত বা আবদ্ধ বলিয়া অজ্ঞজন ইঁহাকে দেখিতে পায় না।" মূলমধ্যমককারিকাভাষ্য, ৫.৮।

"এই পরমতত্ত্বকে কোনরূপেই বুদ্ধির গোচরে আনা যায় না। কেমনে তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিবে? সমস্ত উপাধি বর্জ্জিত হওয়ায় কিরূপে কোন কল্পনায় তাহাকে দেখিবে? কল্পনার ও অতীত হওয়ায় তাহা শব্দের বিষয়ীভূত নহে। শব্দ হইতেছে কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক, যাহা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তাহা কেমন করিয়া শব্দের বিষয় হইবে? সেই অনভিলাপ্য পরমার্থতত্ত্বকে কিভাবে প্রতিপাদন করিবে।

"যদি পরমার্থতত্ত্ব কায়-বাঙমনের বিষয়ীভূত হইত, তাহা হইলে তাহাকে পরমার্থতত্ত্ব সংজ্ঞা দেওয়া যাইত না।" বোধিবর্থাবতারপঞ্জিকা, ৯ম, পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য ইহা উপনিষদেরই পুনরুক্তি।

ব্রাহ্মণ বাস্কলী যখন বাহ্বকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এবং বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী যখন বিমলকীর্ত্তিকে অদ্বয় (পরমার্থ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন উভয়েই নিরবতা বা নিরুত্তরতার দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন, ৩।২।১৭। বিমলকীর্ত্তি নির্দ্দেশ, Eastern Buddhist, vol, IV. 1927, pp. 177-83 দ্রষ্টব্য।

বৈদিক ও বৌদ্ধ, কে কাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহার আলোচনা, এই সমালোচনাকে দীর্ঘ করিয়া তুলিবে। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় সাধনায় এই উভয় ধারাই এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

সুধী মহেশচন্দ্রের এই মূল্যবান প্রবন্ধ তিনটি পুস্তকাকারে শুভ পরিনির্ব্বাণ জয়ন্তী দিবসে প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগ বাংলা দেশের বিদ্বৎ সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

সাহিত্য-প্রকাশিকা—প্রথম খণ্ড। সম্পাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য দশ টাকা।

বিশ্বভারতী গবেষণাবিভাগে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত মূল্যবান্ গবেষণা করিয়া থাকেন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ নানা পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থমালার মারফত তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী অ্যানালস্'-এর অনুকরণে সম্প্রতি তাঁহারা বাংলায় 'সাহিত্য-প্রকাশিকা' নামে এক নূতন গ্রন্থমালা প্রকাশের সূচনা করিয়াছেন। ইহাতে বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণার ফল প্রকাশিত হইবে। ইহার প্রথম খণ্ডে আছে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'কবি দৌলত কাজির সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' এবং শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার নাথ সাহিত্য'। ঘোষাল মহাশয় মধ্যযুগের মুসলমানী বাংলা-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ'—'সতী ময়না'র দৌলত কাজি লিখিত অংশের একটি শোভন সংস্করণ এই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। হামিদী প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণ ও পরলোকগত মৌলভি আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানি পুথি আলোচ্য সংস্করণের অবলম্বন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে কোথাও নাই। প্রাচীন কোন গ্রন্থ প্রকাশের সময় উহার উপলভ্যমান হস্তলিখিত পুথি ও উহার কোন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার যে প্রথা পণ্ডিতসমাজে চলিয়া আসিতেছে তাহার অনুসরণ বর্তমান সংস্করণে করা হয় নাই। তাই ইহাতে অন্য পুথির কথা দূরে থাকুক আবদুল করিম সাহেবের পুথিখানিরও কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই—ইহার বা হামিদী প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণের কোন দোষগুণের আলোচনাও করা হয় নাই। আলোচ্য সংস্করণের কোন বৈশিষ্ট্যের কথাও ইহাতে বলা হয় নাই। গ্রন্থখানি সাধারণতঃ সতী ময়নামতী বা লোর চন্দ্রানী নামে পরিচিত—বর্তমান সংস্করণে কোন কারণ নির্দেশ না করিয়াই উহাকে 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কাহিনীতে ময়নামতী, রাজা লোর ও চন্দ্রানী সকলের কথাই আছে সত্য, তবে নামকরণে সকল প্রধান চরিত্রেরও উল্লেখ করা হয় না। গ্রন্থের বিস্তৃত ভূমিকায় গ্রন্থসম্পাদক মহাশয় অনেক মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছেন—যথা গ্রন্থকারের পরিচয়, গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইহার উপর বিভিন্ন প্রাচীন কবিদের প্রভাবের বিবরণ ও ইহার ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। গ্রন্থমধ্যে অনেক নূতন শব্দ ও বিচিত্র প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলি 'শব্দসূচী'তে সংগৃহীত ও সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সূচীতে এই জাতীয় সমস্ত শব্দেরই সঙ্কলন ও বিস্তৃততর আলোচনা বাঞ্ছনীয়। ভূমিকায় উদ্ধৃত অংশগুলি সম্পর্কে বর্তমান সংস্করণের স্থলে হামিদী প্রেস প্রকাশিত সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রদত্ত হওয়ায় বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়।

'বাংলার নাথ-সাহিত্য' একটি সুলিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ। ইহাতে এই সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তবে 'এ আলোচনা তত্ত্বপূর্ণ বা তথ্যপূর্ণ নয়, সাহিত্যিক সমালোচনা'। এই প্রসঙ্গে গোরক্ষনাথ-মনীনাথের কাহিনী ও গোপীচাঁদের কাহিনীর বিভিন্ন অংশের এবং বিভিন্ন লেখকের রচনার বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের মধ্যে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের যে নিদর্শন রহিয়াছে সেগুলির দিকে সাহিত্যিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সমস্ত আলোচনার শেষে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নাথ সম্প্রদায়ের 'সাহিত্যে প্রাণ আছে, লাবণ্য আছে, সুরুচি আছে, স্বাদ আছে, সেই সঙ্গে আছে একটি স্বাতন্ত্র্য। এর মধ্যে যে পরিমাণ কাব্যের বীজাণু আছে সমালোচনার অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তুললে এর কুলীন সাহিত্যের সমাজে পাংক্তেয় হবার দাবী অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।' এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অপরাপর বিভাগ আলোচনা করিলে তাহাদের মধ্যেও কিছু কিছু সৌন্দর্যের নিদর্শন মিলিতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মুখ্যতঃ সাধারণ লোকের চিত্তবিনোদনের জন্য রচিত এই সাহিত্য বর্তমান যুগের শিক্ষিত পাঠকের রস-পিপাসা তেমন ভাবে মিটাইতে পারে না। তথাপি প্রাচীন সাহিত্য যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের কর্তব্য—এই সাহিত্যের মধ্যে যে সমস্ত সুন্দর জিনিষ পাওয়া যায় সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করা এবং যথোচিত ভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া সেগুলিকে গুণীদের দরবারে উপস্থিত করা। শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কর্তব্য সুন্দররূপে পালন করিয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পরিক্রমা—শ্রীতুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর্ট এণ্ড লেটারস্ পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। বোম্বাই হইতে আওরঙ্গাবাদ-দৌলতাবাদ তথা হইতে অজন্তা-ইলোরা—পরিক্রমার পথ মাত্র এইটুকু। এই সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে ভারত-তীর্থের অখণ্ড রূপটিকে ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন লেখক। অজন্তা-ইলোরা বিশ্ব-সুধীজনের শিল্প-তীর্থ। শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, বস্তুনীতিবিদ্ প্রভৃতি নানা গুণীজন এর শিল্প-সৃষ্টিকে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির মান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকও সেই চেষ্টা করিয়াছেন—একটু পৃথক ভাবে। শিল্প-বস্তুটিকে তন্ময় চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া অনেকের মত তাহার এক-একটি অংশ লইয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন নাই লেখক, পটভূমি সমেত বস্তুর সমগ্র সত্তাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। রাষ্ট্ররূপের বিবর্তনের মধ্যে শিল্পীরা কোন্ যুগে কি ভাবে প্রথম সৃষ্টির কাজটি আরম্ভ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইতিহাসের ধারা-বিবরণী সাধারণতঃ নীরস হইয়া থাকে। কিন্তু এই বইখানিতে বৌদ্ধযুগ হইতে মুসলিম যুগ, মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয় ও পতন কাহিনী, নিজামশাহী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সহিত কিংবদন্তী কাহিনী সংযুক্ত হওয়ায় বক্তব্যটি আগাগোড়া সরস হইয়াছে। ইহার সঙ্গে আছে বিদগ্ধজনোচিত সময়োপযোগী মন্তব্য। সব মিলিয়া ভ্রমণ-কাহিনীটি উপাদেয় হইয়াছে। সবচেয়ে প্রশংসার কথা—শিল্প বা প্রকৃতি রূপমুগ্ধ মন কোথাও ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিষয়বস্তুকে আচ্ছন্ন করে নাই। পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে ভাষা, লেখাতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় যথেষ্ট। লেখক ভ্রমণ করিয়াছেন খোলা চোখে, দু'পাশের দৃশ্য ও বস্তুকে গ্রহণ করিয়াছেন রসনিবিষ্টচিত্তে। শিল্প-শৈলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় অবশ্য দেন নাই, কিন্তু প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-তৃষ্ণার পরিমাণটিকে যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও পাঠককে জানাইয়া দিয়াছেন। এক কথায়, পরিক্রমার পথটি ইতিহাসের দূরবর্তী কালে বিস্তৃত হইলেও সুধী পাঠক বিনা ক্লেশে লেখকের অনুবর্তী হইতে পারিবেন।

ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি নিঃসন্দেহে বাংলা-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীগুণময় মান্না। বেঙ্গল পাবলিশার্স। দাম সাড়ে চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মার্ক্সপন্থী শ্রীগুণময় মান্না সমাজশক্তির সংঘর্ষের পটভূমিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন তাহা অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছতার অভাবে সার্থক হইয়া উঠে নাই। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যকে মার্ক্সীয় ছাঁচে ফেলিয়া কোনরকমে একটা কাজ-চলা গোছ ব্যাখ্যা দিতে হইলেও যে পরিমাণ অধ্যয়ন ও মননসাধন করিতে হয় তাহার অভাব পুস্তকখানিতে লক্ষ্য করা গিয়াছে। ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার সুলিখিত ভূমিকায় পুস্তকের এই দৃষ্টিভঙ্গীগত ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানির সর্বত্রই এই ধরনের অত্যদ্ভুত ব্যাখ্যাজাত অপুষ্টি লক্ষ্য করিয়াছি। স্থানে স্থানে ন্যায়শাস্ত্রগত হেত্বাভাস দোষও ঘটিয়াছে। যিনি মার্ক্সবাদের দ্বন্দ্ব-নীতিকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার-প্রয়াসী হইবেন তাঁহার এই ধরনের বিচ্যুতি নিন্দনীয়। একটি উদাহরণ দিই। গুণময়বাবু লিখিয়াছেন: 'স্বদেশী আন্দোলনের দুইটি দিক, একদিকে নৈরাশ্য ও তজ্জনিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামী মনোভাব, অন্যদিকে আন্দোলনের উচ্চ আদর্শ, যাহার মধ্যে এই আন্দোলনের বাল্যপূর্তি ও উল্লাস নিহিত আছে।' (পৃঃ ৫৮) মানুষের আদর্শ হইল সাময়িকভাবে অলব্ধ বস্তু। এই আদর্শ মানব-মনের অভাববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ ও না-পাওয়ার বেদনা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। যে মুহূর্তে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হয় তখন সে আর আদর্শ থাকে না। আদর্শের মধ্যে না-পাওয়ার বেদনা আছে। বীক্ষণশক্তি হয়ত সে বেদনার দ্বন্দ্বে আনন্দের সন্ধান পায়। তবু সে আনন্দ বাল্যপূর্তির 'উল্লাস' নয়। লেখক এই সহজ সত্যটিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

পুস্তকখানির ভাষা মোটামুটি ভাল। রচনাশৈলী সাবলীল। ছাপার ভুল বড় একটা চোখে পড়িল না। মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

ডালডা আমার পক্ষে ভালো
DALDA
ডালডা
ডালডা
মার্কা
বনস্পতি

অন্তরাল—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। নবযুগ প্রকাশনী। ১-সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা-১৭। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাস। কবি-সাহিত্যিক সাহা মহাশয়ের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সমালোচ্য পুস্তকখানিতে জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের মনের উপর কি ভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাহাই তিনি নায়ক অজয়, নায়িকা অসীমা ও রেবার চরিত্রের মাধ্যমে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অসীমার সহিত অজয়ের বিবাহ ঠিক ছিল কিন্তু একটা পারিবারিক গোলযোগে তাহা স্থগিত থাকে। অসীমা কিন্তু অজয়ের পথ চাহিয়া দিন গোনে। অজয় এই গোলযোগের জন্য অন্যত্র চলিয়া যায়। অসীমার মায়ের আহ্বানে একসময় অজয় ফিরিয়া আসিলেও অসীমাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে। কারণ অজয় তখন রেবাকে কেন্দ্র করিয়া এক স্বপ্ন-সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। অসীমা এত খবর রাখিত না বলিয়াই অজয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং একটা মটোর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। অজয় এবং রেবার মধ্যের সম্বন্ধ তাহার কাছেও গোপন রহিল না। তার পরে নানা ঘটনার সাহায্যে অজয় ও রেবার মধ্যে একটা সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিল—এইখান হইতেই নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া জটিল হইয়া উঠিল প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রীর জীবন। আবর্ত রচনা করিয়া চলিল তাদের চলার পথে। এবং শেষ পরিণতি ঘটিল অসীমার বিলাত যাত্রার পর অজয়ের মৃত্যু-চিন্তা রচনা করিয়া।

স্থানে স্থানে উপন্যাসখানি কিছুটা দুর্বল মনে হইয়াছে, রেবার চরিত্রটি অনবদ্য হইয়া উঠিতে পারিত যদি তার বিগত জীবনের অতি বাস্তব ঘটনাগুলি অতটা নগ্নভাবে দেখান না হইত। অজয় বেশী ভাবপ্রবণ। অসীমা অপূর্ব সৃষ্টি। পার্শ্ব চরিত্রগুলি চমৎকার ফুটিয়াছে। প্রচ্ছদপট ও ছাপা সুন্দর। ভাষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

দক্ষিণাপথে—শ্রীমানসচরণ সাহা। ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

ভ্রমণ-কাহিনী। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় তীর্থস্থান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়। লেখক তাঁর দরদী চোখ দিয়া যাহা দেখিয়াছেন সুললিত ভাষায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শুধু মামুলী বর্ণনা-কাহিনী নয়। মাদ্রাজ ও তাহার আশেপাশের বহু অঞ্চলের উপর তিনি কিছুটা নূতন আলোকপাত করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন।

প্রতীক্ষা—শ্রীসমীরণ রুদ্র। রুদ্র এণ্ড কোং লিঃ। ৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

বড় গল্প। ব্যর্থ প্রয়াস।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ডাকের চিঠি—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য। ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪৫। দাম আড়াই টাকা।

গ্রন্থখানি লেখকের নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে অদৃশ্য বন্ধুর উদ্দেশ্যে লিখিত উনত্রিশখানি পত্রের সমষ্টি। কতকগুলি পত্রে বাংলার যে অংশে তিনি ছিলেন সে অংশের, বিশেষতঃ বর্ষার চিত্রগুলি সুন্দর, স্নিগ্ধ ও কোমল। কয়েকখানি পত্রে স্থানীয় কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা আছে যেগুলি লেখকের রস-সৃজনীশক্তির পরিচায়ক। গ্রন্থখানিকে উপন্যাস বা কতকগুলি গল্পের এক-সূত্রে গ্রন্থনের সমষ্টি বলা যায় না। এক নূতন পথ ধরেই রচনাটি সম্পূর্ণ হয়েছে। ভাষা সুমিষ্ট ও স্বচ্ছন্দগতি। রসিক পাঠকজনের কাছে যে গ্রন্থখানির সমাদর হবে এমন আশা করা যায়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দৃষ্টফল চিকিৎসা—প্রাণাচার্য্য কবিরাজ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রায় প্রত্যেক রোগের আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। শুধু শাস্ত্রীয় ঔষধ পাচন প্রলেপ তৈল প্রভৃতিই নয়, জনসাধারণের নিকট যাহা টোট্‌কা বলিয়া পরিচিত গ্রন্থকার সেইসব ঔষধেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি একজন যশস্বী চিকিৎসক। আশা করি, এগুলি ব্যবহারের ফল তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ডাক্তারের পক্ষে যেমন ডাক্তারি হ্যাণ্ডবুক কবিরাজের পক্ষেও এই গ্রন্থখানি সেইরূপ প্রয়োজনীয়। শুধু তাঁহারা নন গৃহস্থমাত্রেরই ইহা প্রয়োজনীয়। বইখানা ঘরে থাকিলে গৃহিণীরা সময়ে অসময়ে সহজলভ্য পাতার রস, গাছের ছালের চূর্ণ প্রভৃতি সুলভ ঔষধের সাহায্যে ছোটোখাটো বহু রোগেরই চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এরূপ একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া কবিরাজ মহাশয় সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

পূষা—শ্রীতারক ঘোষ। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা।

এক ফালি ঘাস—শ্রীসুধীর সেন। আলোক-সংঘ। করিমগঞ্জ, আসাম। দাম এক টাকা।

কয়েদী—শ্রীসুধাংশুকিরণ ঘোষ। দ্বারিকা প্রেস এণ্ড পাব্লিকেশন। উত্তর-বাংলা, শিলিগুড়ি। দাম পাঁচসিকা।

বল্লরী—পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম অনুসন্ধান সমিতি। কাটোয়া, বর্দ্ধমান। দাম আড়াই টাকা।

সব কখানিই কবিতার বই। পূষাখানির নামের প্রেরণা এসেছে উপনিষদ্ থেকে: "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" প্রথম কবিতাতে ঐ শ্লোকেরই ছায়া পড়েছে। কিন্তু সব কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবের নয়। জীবনের সুখ দুঃখ প্রেম সৌন্দর্য্য কবির মনকে স্পর্শ করেছে, তারই অনুভূতিকে কবি সুন্দর রূপ দিয়েছেন। জগতের কত শোভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল

মনের এ আয়নায় ছবি হাসে, ফের মুছে যায়।
এ জীবন ভরে গেল মরে-যাওয়া মধুর মায়ায়।

সব কবিতাতেই একটি গভীর আন্তরিক সুর বেজেছে। রচনায় শৈথিল্যের নিদর্শন নেই।

'এক ফালি ঘাসে'ও খাঁটি কবি-মনের পরিচয় আছে। রচনা স্নিগ্ধ মধুর। কোন কোন কবিতায় বাংলার পূর্ব্বপ্রান্ত ও আসামের পাহাড় বন ঝরণার মনোরম ছবি উঁকি দিয়ে যায়। আবার কোথাও কোথাও রেলগাড়ি বা কারখানার দৃশ্য চোখে পড়ে। একদিকে—

"তবুও ছায়ারা আসে অরণ্যের কোল হতে নেমে,"
"মৌচাক রচি বনানীর ছায়—ঝাউ সরলের বন",

অন্যদিকে—

"টানেলের মুখে ঝড়ের আবেগে ছুটে অজগর ট্রেন",
"কেবলি ড্রিলিং মেশিনের গানে ডেকে আনে উল্লাস।"

'কয়েদী'র অনেক কবিতা নজরুলের ব্যর্থ অনুকরণ। "আমি বিদ্রোহী বীরবর, আমি এ যুগের তাণ্ডব" কিংবা "আমি জালিমের বুকে সমসের হানি সংসারে করি প্রশাসন"—এ যুগে সমাদর পাবে বলে মনে হয় না। "আমি নাচব, আমি নাচব' পদ লিখে ঘোষণা করা কি ভাল হয়েছে?

'বল্লরী'তে পুরানো এবং নতুন মুসলমান কবিদের কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। সবগুলি ভাল বলতে পারি না, তবে মুসলমান কবিরাও বাংলা ভাষার সেবায় আনন্দ পেয়েছেন ও পাচ্ছেন এবং তাঁদের অনেকের দানে বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, এ সত্য সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

বসন্তবাহার—শ্রীগোপাল ভৌমিক। গ্রন্থজগৎ। ৭-জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য দেড় টাকা।

নূতনত্বের আগ্রহে কোন কোন কবি-যশঃপ্রার্থী ভয় লাগিয়ে দেন। মনে হয়, কাব্য-জগৎ থেকে বুঝি বিদায় নিল রূপ, রং, সুর, তাই রঙিন মনের সন্ধান পেলে ভাল লাগে, আশ্বস্ত হই। গোপালবাবুর 'বসন্তবাহার' রং আর সুর নিয়েই এসেছে। কঠোর বাস্তব পরিবেশের মধ্যেও এনেছে রং আর সুর।

"চৌবাচ্চায় জল ঝরে রুজি রোজ সুর তোলে ফের।
* * *
ফোটালে চায়ের জল, পেয়ালা পিরিচ শুনি বাজে"

তারই মধ্যে এক টুকরো স্বপ্ন:

"বিদিশার রাজকন্যা, কি তোমার নাম ?"

বিনিদ্র মধ্যরাত্রে—"পৃথিবী ঘুমায়, রাজপথে শুনি টুংটাঙ রিকশায় ।"

কোনদিন মনে জাগে হারানো পূর্ব্ববঙ্গের ছবি :

"বিজন গাঁয়ে কুটীরখানি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা,
আকাশ জুড়ে দেখি শুধু হাজার তারার মালা ।"

সে-দেশের পরিচিতা তরুণী আজ "লেডি টাইপিষ্ট ম্যাকেঞ্জি লায়ালে ।"

'গুহাশ্রিত' নাগরিক জীবনে কখনও মন বলে উঠছে :

"শিলীভূত এ জীবনে চাই তবু সমুদ্রের ঝড় ।"

কোথাও কোথাও লঘু চাপল্য বা অসতর্কতা কবির ভাব-সৌন্দর্য্যকে ঈষৎ ক্ষুন্ন করেছে।

"যৌবন-হিল্লোলে দুলে সে-দিন সিঁড়িতে
সময় দেখালো স্বামী দেহবল্লরীতে"—বড়ই চটুল ।

"হনলুলু থেকে কামাচকাটকা" আর "প্রাণকোরোকিল"

কবিতায় শ্রুতিকটু । কোথাও কোথাও পংক্তিবিন্যাস ছন্দের অনুগামী হয় নি । মুদ্রণকালে এবিষয়ে দৃষ্টি রাখলে ভাল হ'ত।

মনের কোণে—শ্রীস্নেহলতা দেবী । চীন-ভারত সংস্কৃতি । ঠাকুর পুকুর, ২৪ পরগণা । দাম দুই টাকা ।

লেখিকা বয়সে প্রবীণা, তাঁর কবিতাগুলিতেও প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য্য আছে। অথচ তাঁর মনোভাব নিতান্ত 'সেকেলে' নয়। নতুন যুগের যে সকল মহৎ আদর্শ মানুষকে তার সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং সার্ব্বজনীন মিলনের পথ প্রশস্ত করেছে, তার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলা। ছন্দ ও ভাষায় অভিনব প্রয়াসের প্রতি তাঁর লোভ নেই, মনের কথা অভ্যস্ত রীতিতে সহজ করে বলেই তিনি খুশী। তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত মন বেছে নিয়েছে পরিচিত ভাষার সরল সুগম পথ। 'সাহিত্যের এ কমলবনে নাই বা হ'ল স্থান', তা নিয়ে কবির আক্ষেপ নেই।

'থাকুক না সে অনাদরে
দখিন বায়ে উতল তবু গন্ধবিহীন প্রাণ'।

'প্রথম অসহযোগ', 'নেতাজী-স্মরণে', 'ভারতভিক্ষা', 'ইলা মিত্র' প্রভৃতি কবিতায় কবির আদর্শপ্রবণ দেশপ্রেমিক হৃদয়ের পরিচয় পাই। কৃষক-কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে জমিদার-ঘরের বধূ ইলা মিত্র পাকিস্থান কারাগারে বন্দিনী। মর্ম্মস্পর্শী তাঁর লাঞ্ছনার কাহিনী। লেখিকা তাঁকে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। শেষ কবিতা 'চড়ুই চড়ুই'—তাদেরই কথা নিয়ে—বড়ই মনোজ্ঞ এবং সরস।

"প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক, চল রাতের মত বিশ্রাম করি।
না—না—না, এখন আর গোলমাল নয়।
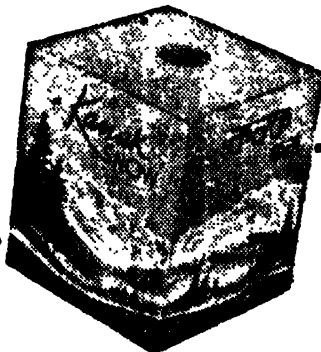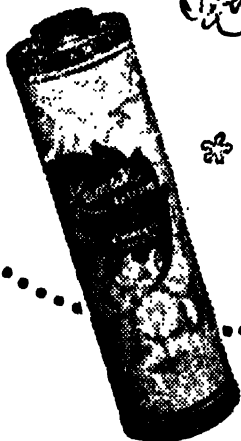
চুপ কর বাচ্চারা সব, আর কথা নয়।
এখন পাখার ভিতর গোট গুজরে নিয়ে
যার যার ঘুমের চেষ্টা দেখ দেখি।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছবিতে রামায়ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। শিশু সাহিত্য সংসদ লি., ৩২।এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য ১৷০।

লেখা ও ছবি দুই-ই খ্যাতনামা শিল্পী রচিত। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আগাগোড়া তিন-রঙা ছবির সাহায্যে বলা হইয়াছে। ছবির নীচে নীচে রামায়ণের সমগ্র ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, বড় বড় ঝকঝকে হরফে মুদ্রিত লেখাগুলি সহজেই চোখে পড়ে। ছবিগুলিতে সেকালের হুবহু চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রাসাদে, শহরে পোশাকে, পরিচ্ছদে, যানবাহনে, সব কিছুতেই অতীতকালের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের ছাপ। রামায়ণের যুদ্ধে বীরের ও রাক্ষসের ভীষণ যুদ্ধ প্রভৃতি ছেলেরা বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে উপভোগ করিবে। ছবিগুলি অতি সুন্দর, নয়নরঞ্জন ও ভাবব্যঞ্জক। প্রকাশক ও শিল্পী উভয়ের কৃতিত্বই প্রশংসনীয়।

ওলোট্ পালোট—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ১৷০।

কতকগুলি মজার কবিতা চিত্রে রূপায়িত করিয়া কিশোরদের জন্য রচিত হইয়াছে। কবিতা ও ছবিগুলি রঙীন কালিতে মুদ্রিত, ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত মলাট। ছবিগুলি যেমন মজাদার, কবিতাগুলিও তদ্রূপ। কবিতাগুলি দেশের ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া রচিত। বর্তমানে সর্বত্রই 'ওলোট পালোট', ছাগল ও গরু হিংস্র হইয়া নিরীহ পথচারীকে শিং নাড়িয়া গুঁতাইয়া ফিরিতেছে, হিংস্র বাঘ খাঁচা হইতে বাহির হইয়া মানুষের সহিত প্রেম করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, রামছাগলে 'ঘোড়ার ডিম' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, 'মেছো মানুষ' জলবিহারী হইয়া মাছ ও কুমীরের সঙ্গে মিতালী করিতেছে, ইত্যাদি। 'পঁচিশ বছর পরে' ও 'আকাশকুসুম' বিজ্ঞানের বর্তমান অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার ও পদ্ধতি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'বিশ বছর পরে' কলের মানুষ পোষাক পরিয়া বোতাম টিপিয়া অফিস যাইবে, পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবে, কলের পুলিস, কলের দারোয়ান, কলের পেয়াদা সব কাজ করিবে, কলে অঙ্ক মানুষ করিবে, ছেলে পড়াইবে, কারও কিছু ভাবনা থাকিবে না, সবই কলে করিবে। আকাশকুসুমের সন্ধানে মানুষ স্বচ্ছন্দে গ্রহ-নক্ষত্রে বিচরণ করিবে, আকাশ বাতাস ও জল হাওয়ার গতি ও প্রকৃতি গবেষণা করিয়া বেড়াইবে।

পুরু কাগজে সুমুদ্রিত বইখানি ছেলেরা আমোদের সহিত উপভোগ করিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় ছাত্রদের সভায় বক্তৃতারত
পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু

বিদর্ভের "বিদরি ওয়ার্কস সেণ্টারে" রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
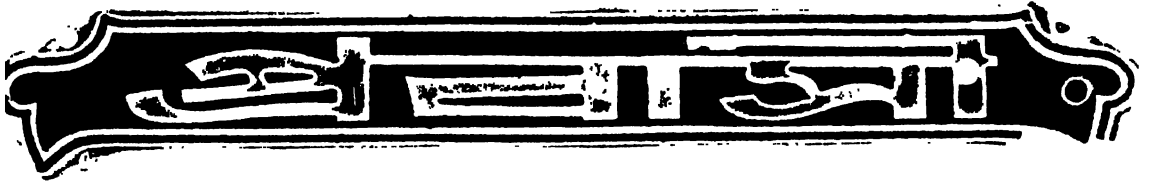
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
১ম খণ্ড } ভাদ্র, ১৩৬৩ } ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

এই বৎসরের স্বাধীনতা দিবস, ঘরে ও বাইরে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা-পূর্ণ ছিল। বিগত মাসে আমাদের বাংলা দেশের প্রায় নিঃশেষিত ভাণ্ডার শূন্য হইতে শূন্যতর হইয়া গিয়াছে দুইটি বন্যের তিরোধানে। বস্তুতঃ পক্ষে এবার আনন্দের দিন বিষাদ কালিমাপূর্ণ ছিল। তাহা সত্ত্বেও নূতন আশা ও নূতন উদ্দীপনার আবাহন যথাযথ ভাবে করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং তাহা উচিতই ছিল।

বহির্জগতে সুয়েজ খাল লইয়া পাশ্চাত্য দেশের শক্তিবর্গ প্রায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে করিতে থাকে। সেই সঙ্গে মার্কিন দেশকেও আহ্বান করা হয় মিশরের এই স্বাধীনতা প্রকাশে বাধা দেওয়ার জন্য। বোধ হয় এই আকস্মিক অধিকার লোপে ঐ দুই দেশের অধিকারীবর্গের "সাময়িক মস্তিষ্কবিকার" ঘটে।

মার্কিন দেশেরও বর্ত্তমান অধিকারীবর্গ একটু গোলমাল বাধাই-বার উপক্রম করেন। প্রকৃতপক্ষে সুয়েজ খাল লইয়া এই যে বিষম সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে ইহার প্রধান কারণও মার্কিন অধিকারীবর্গের কার্য্যকলাপ।

সোভিয়েট-বিরোধী শক্তিপুঞ্জের মিশর-বিদ্বেষ কিছুদিন যাবৎ ক্রমেই বাড়িতেছে। উহার কারণ মিশর আরব জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে ক্রমেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—যাহার ফলে উত্তর-আফ্রিকায় আরবদিগের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং এশিয়ায় বাগদাদ চুক্তির বিরোধে মিশরের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে। এবং মিশর দেশের বর্ত্তমান অধিনায়ক নাসের এই সকল বিষয়ে মুক্তভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিয়া অনেকক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন কার্যক্রমে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেন।

অতএব নাসেরের পতন ইহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কেননা নাসেরের নেতৃত্বে মিশর দ্রুতগতিতে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত ও শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। সুতরাং নাসেরকে অপদস্থ ও ব্যর্থপ্রয়াস না করিলে এই পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বিশেষভাবে ব্যাহত হইতে বাধ্য। বিশেষতঃ যখন নাসের বিনা দ্বিধায় সোভিয়েট-গঠিত শক্তিবর্গের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ব্যবস্থা সচল করিলেন তখন তাঁহাকে ধ্বংস করার চেষ্টায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অধীর হইয়া উঠিলেন।

মিশরের সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নূতন আসওয়ান বাঁধের উপর নির্ভর করিতেছে এবং এক হিসাবে নাসেরের সমস্ত দেশ-প্রগতি পরিকল্পনাও ঐ ব্যবস্থা-সংযুক্ত। এই সমস্ত বিচার করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন দল স্থির করিলেন যে, ঐ বাঁধ নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যবস্থাই বানচাল করিতে হইবে। কি ভাবে সহসা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভাঙিয়া ইঙ্গ-মার্কিন দল ঐ বাঁধ নির্ম্মাণে অর্থসাহায্য অস্বীকার করেন তাহা এখন সর্ব্বজনবিদিত।

আমরা মার্কিন কাগজের অধিকাংশেই প্রথমে দেখি যে, মিশরের প্রতি এই রূঢ় ব্যবহারে একটা উল্লাসের ঢেউ বহিতেছে। এমন কি নিউইয়র্ক টাইমসের মত সংবাদপত্রও যাহা লেখে তাহার ভাবার্থ, "বড় আশায় আসিয়াছিল মিশরের রাষ্ট্রদূত অর্থ সাহায্যের জন্য, মিশর প্রতি-শ্রুতিও দেয় যে সোভিয়েট হইতে অর্থ সাহায্য সে লইবে না। মিঃ ডালেস তাহাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় মার্কিন দেশ অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত নহে। মিশর রাষ্ট্রদূত হতভম্ব হইয়া ফিরিয়া যায়···। অন্য দিকে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষও কোন কারণ না দেখাইয়াই সাহায্য দানে অস্বীকার করেন। এইবার নাসেরের পতন অনিবার্য্য, কেননা আমরা জানি সোভিয়েটও আসওয়ান ব্যাপারে সাহায্যদানে প্রস্তুত নহে।"

এইরূপ উল্লাসধ্বনি ব্রিটিশ ও ফরাসী সংবাদপত্র জগতেও ধ্বনিত হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই আসিল সুয়েজ খাল জাতীয়করণের সংবাদ। সেই আকস্মিক "বিনা মেঘে বজ্রপাতে" কি ভাবে পাশ্চাত্য দল স্তম্ভিত ও পরে ক্ষিপ্ত হয় তাহাও এখন জগৎবিদিত। কিন্তু এশিয়াখণ্ডে ও স্পেন, গ্রীস ইত্যাদি দেশে নাসেরের কার্য্যের পূর্ণ সমর্থন আছে। মার্কিন দেশ উহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ-আয়োজনে বাধা দেয়। তাহার পরের অবস্থা এখনও তরলই রহিয়াছে।

আমাদের দেশেও ঠিক ঐ ভাবেই অধিকার ও দায়িত্ব এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে বিকৃত বিচারের ফলে গুজরাট অঞ্চলে প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। কোথায় যে তাহার শেষ তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই।

স্বাধীনতা দিবসে শ্রীনেহরুর ভাষণ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরু যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার চুম্বক আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। দেশে যেভাবে "গণআন্দোলন" চলিতেছে সে সম্পর্কে যে তাঁহার উদ্বেগের কারণ আছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। রাষ্ট্রধ্বংসকারী, ক্ষুদ্রচেতা ও স্বার্থ সর্বস্ব কতিপয় মুষ্টিমেয় দলের প্ররোচনায় এইরূপ বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন, না হইলে দেশের অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক-যুবতীর অধিকাংশ উচ্ছন্ন যাইবে :

"১৫ই আগষ্ট—ভারতের নবম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য পূর্বাহ্নে ঐতিহাসপ্রসিদ্ধ লাল কেল্লার প্রাকার হইতে এক বিরাট জনসমষ্টির নিকট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই আশা প্রকাশ করেন যে, আগামীকাল লণ্ডনে যে সম্মেলন আরম্ভ হইবে, উহাতে মিশরের মর্যাদা ও সার্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুয়েজ খাল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান উদ্ভাবিত হইবে।

তিনি আরও বলেন যে, সুয়েজ খাল সমস্যা গুরুতর সম্ভাবনা-সমূহ দ্বারা পূর্ণ। তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বল প্রদর্শন বা প্রয়োগ দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কোন স্থায়ী সমাধান উদ্ভাবনের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী দাবানলের সৃষ্টি করিবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় দেশে হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কার্যে রত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, সংসদে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, কোনও রকম ভীতিপ্রদর্শনেই তাহার পরিবর্তন করা হইবে না।

শ্রীনেহরু দুঃখবিজড়িত কণ্ঠে বলেন, যাহারা হিংসার পক্ষপাতী, তাহারা এই দেশের—বুদ্ধ ও গান্ধীর—মহান ঐতিহ্যের উত্তরসাধক নহে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধ যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা কোটি কোটি ভারতবাসীর মনে জাগরূক রহিয়াছে। উহাই ভারতের মন্ত্রবাণী—প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ। গান্ধীজীও ঐ একই আদর্শের দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন—নিরস্ত্রভাবে অহিংস উপায়ে শত্রুর সহিতও সংগ্রাম করা যায়।

বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, এই সকল লোক—বিপুল ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের পর লব্ধ আমাদের স্বাধীনতার মূল ও ভিত্তি ধ্বংস করিতে চাহে। হিংসা কি সমস্যা-সমূহের সমাধানের উপায়? অতীতে কি লোকে তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কখনও হিংস পন্থা অবলম্বন করিয়াছে? আমার পক্ষে বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এই দেশের যুবকগণ গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত এবং তৎকর্তৃক প্রদর্শিত পথ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়াছে।"

ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা-মায়ের কৃতী সন্তান যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই একে একে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেশের এই চরম দুরবস্থার মধ্যে আমাদের এই পরম স্নেহশীল গুরুও লোকান্তর গমন করিলেন।

হরেন্দ্রকুমার বাস্তবিকই এ যুগের প্রায় সকল বাঙালীরই গুরু-স্থানীয় ছিলেন। জ্ঞানে, গুণে, দানে তাঁহার যে কীর্তি তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও মানবপ্রেম কিরূপ উচ্চ ছিল তাহার বর্ণনা অসম্ভব। তাঁহার উদার হৃদয়ে ছোট-বড়, দোষী গুণী, নির্বোধ সুবোধ ইহাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে কোনও পার্থক্যের স্থান ছিল না। বস্তুতঃই এই স্নেহশীল সদাপ্রসন্ন সজ্জন বাইবেলের Good Samaritan-এর প্রতীক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা অতি শ্রদ্ধেয় গুরুর বিয়োগক্লেশ অনুভব করিতেছি :

"বাংলার অন্যতম খ্যাতনামা মনীষী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের প্রাক্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক জনপ্রিয় রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭৭ সনের ৩রা অক্টোবর (১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন) কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ভারতীয় খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে এবং কলেজে তিনি বরাবরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯২ সনে কলিকাতার রিপণ কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন এবং ১৮৯৬ সনে রিপণ কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

"স্কুলে পড়ার সময়েই তিনি ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজের হাতখরচের পয়সা হইতে স্কট ও ডিকেন্সের গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া ঐগুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। ইংরেজীর প্রতি এই আকর্ষণের জন্যই তিনি বি-এ ক্লাসে ইংরেজীতে অনার্স গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যখন বি-এর চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পড়াশুনায় বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁহার মনও গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয় এবং তিনি বি-এতে অনার্স ছাড়িয়া দেন।

"বি-এতে অনার্স ছাড়িয়া দিলেও ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণের কোন লাঘব হয় নাই। ফলে তিনি ইংরেজীতেই এম-এ পড়িতে যান এবং ১৮৯৮ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

"এম-এ পাস করার পরে কয়েক মাস তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ঐ স্থানে কার্যকালেই তিনি বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। রাজচন্দ্র কলেজে কিছু দিন অধ্যাপনার পর সেখানকার প্রিন্সিপাল অন্যত্র গমন করায় তরুণ হরেন্দ্রকুমার কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন।

"১৮৯৯ সনে তিনি সিটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৪ সন পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯১১ সনে ইংরেজী সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ইংরেজীতে প্রথম পিএইচ-ডি।"

"১৯১১ সন হইতে ১৯১৪ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর লেকচারার ছিলেন। ড. মুখার্জির বিদ্যাবত্তা ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকারের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখার্জির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্যার আশুতোষের অভিপ্রায় অনুসারেই ড. মুখার্জি ১৯১৬ সন হইতে ১৯১৮ সন অবধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময়ে ড. মুখার্জি স্যার আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিরও প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ হইতে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইন্সপেক্টর পদে কার্য্য করেন। ১৯৩৭ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৮ সন হইতে ১৯৪০ সন অবধি তিনি নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সন হইতে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত তিনি নিখিল-ভারত খ্রীষ্টান পরিষদের সভাপতি পদে বৃত ছিলেন। তিনি ১৯৩৯ সন হইতে ১৯৪৪ সন পর্যন্ত নিখিল-ভারত খ্রীষ্টান পরিষদের জেনারেল অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ছিলেন।

"১৯৩৭ সন হইতে ১৯৫২ সন পর্যন্ত তিনি অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময়েই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাহা রাজনীতির ক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করে। পরিষদের ভিতরে তাঁহার পারদর্শিতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং তিনি পরিষদকক্ষে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের এক অংশের মুখপাত্র, জাতীয়তার অন্যতম উদ্গাতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরিষদে লীগ-কংগ্রেস বিরোধে তিনি কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেন এবং এই কারণে প্রদেশের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে প্রদেশের বাহিরেও তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে।

"১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর ড. মুখার্জি ভারতীয় গণপরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে ড. মুখার্জিই ভারতীয় সংবিধান রচনার অধিকাংশ বিতর্ককালে গণ-পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ১৯৫১ সন পর্যন্ত তিনি গণ-পরিষদের সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৭ সন হইতে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত তিনি মাইনরিটি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

১৯৫১ সনের ২৫শে অক্টোবর ড. মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন এবং ১লা নবেম্বর তারিখে উক্ত কার্যভার গ্রহণ করেন।

"জীবনে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থের প্রায় সবই তিনি দেশের ও দশের কল্যাণে দান করিয়া গিয়াছেন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৪ লক্ষ টাকার অধিক তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ইহার মধ্যে ৯ লক্ষ টাকা তিনি রাজ্যপাল হওয়ার পূর্ব্বেই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য একটি ট্রাষ্ট গঠনে উক্ত অর্থ প্রদত্ত হয়। ১৯৫২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি আরও এক লক্ষ টাকা দান করেন। সর্ত্ত থাকে যে, উহার সুদ হইতে বাংলার সন্তানদিগকে প্রতি বৎসর সামরিক শিক্ষার জন্য দেরাদুন প্রিন্স অব ওয়েলস সামরিক শিক্ষালয়ে প্রেরণ করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে তিনি তাঁহার মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতন হইতে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে একটি ধনভাণ্ডারে ৫ হাজার টাকা করিয়া দান করিয়া আসিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য উক্ত ফাণ্ড ব্যবহৃত হইবে; তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে উক্ত ফাণ্ডের নামকরণ করা হইবে।

"রাজ্যপাল রূপে ড. মুখার্জির অপর এক কীর্ত্তি এই যে, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিরক্ষাকল্পে দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা ধনভাণ্ডার খোলেন এবং ঐ ভাণ্ডারে ৫ লক্ষাধিক অর্থ সংগ্রহ করেন। উক্ত সংগৃহীত অর্থে দার্জিলিং-এর 'ষ্টেপ এসাইড'কে (এখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) কেন্দ্র করিয়া 'দেশবন্ধু স্মৃতি চেষ্ট ক্লিনিক' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আরোগ্যের পর যক্ষ্মারোগীদের বসবাসের জন্য একটি যক্ষ্মানিবাস নির্ম্মাণের নিমিত্তও তিনি যক্ষ্মা-আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই জন্যও তিনি অর্থসংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন

সমবায় প্রথার উন্নয়ন পরিকল্পনা

সমবায় প্রথা সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে পরিসংখ্যান তালিকা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫৫ সনে ভারতবর্ষে মোট ২১৯,২৯৮টি সমবায় সংস্থা ছিল। এই সমিতিগুলির মোট সভ্যসংখ্যা ১.৮০ কোটি এবং তাহাদের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৩০ কোটি। মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ সমবায় প্রথার আওতায় পড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমবায় প্রথার বিস্তৃতি সমান নয়; ক শ্রেণীর প্রদেশগুলিতে ইহা অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু, এবং গ শ্রেণীর প্রদেশগুলিতে সমবায়ের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে।

ভারতবর্ষের সমবায় প্রথার একটি প্রধান দোষ কৃষিঋণ সমিতিগুলির প্রাধান্য। মোট ২,১৯,২৯৮টি সমিতির মধ্যে কৃষিঋণ সমিতিগুলির সংখ্যা ১,৪৩,৩২০ অর্থাৎ ৭৮·৮ শতাংশ। ইহার ফলে অন্যান্য প্রকার সমবায় সংস্থাগুলি উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কৃষিঋণ সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা অত্যল্প হওয়ার ফলে এইগুলি লাভ রাখিতে পারে না, ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অল্প সভ্যসংখ্যা, স্বল্পায়তন কার্য্যকরী এলাকা, অল্প মূলধন এবং অতিরিক্ত ঋণগ্রহণ এই সমিতিগুলির দুর্ব্বলতার কারণ। সেই কারণে সর্ব্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান সমিতি অনুমোদন করিয়াছেন যে, কৃষিঋণ সমিতির কার্য্যকরী এলাকা বিস্তৃত করা অতি অবশ্য প্রয়োজন এবং কয়েকটি গ্রাম জুড়িয়া একটি কৃষিঋণ সমিতি অবস্থান করিবে। ভারতে প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের মোট ৩ শতাংশ ...ায়

সমিতিগুলি হইতে আসে। ১৯৫৫ সনে কৃষিঋণ সমিতির মোট দাদনের পরিমাণ ছিল ৩৫·৪৮ কোটি টাকা। কৃষিঋণ সমিতির নিজস্ব অর্থের পরিমাণ ৩৮ শতাংশ; আমানতের পরিমাণ ৯ শতাংশ এবং গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৫৩ শতাংশ। এই অতিরিক্ত পরিমাণে বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভরতা—সমবায় প্রথার দুর্বলতার পরিচায়ক।

, কৃষিঋণ সমিতিগুলির আধিক্য দেখা যায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র এবং পঞ্জাবে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে অ-কৃষিঋণ সমিতির প্রাচুর্য্য দেখা যায় এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ মাদ্রাজ, বোম্বাই, অন্ধ্র ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে সীমাবদ্ধ। সমবায় আন্দোলনে বাংলা দেশের অনগ্রসরতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে মোট ৯টি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী সমবায় ব্যাঙ্ক আছে। বলা বাহুল্য যে, কোনও কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক বাংলা দেশে নাই। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় যে, কৃষিপ্রধান বাংলা দেশে দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণের প্রয়োজন নাই, অথবা এখানকার কর্ত্তৃপক্ষের ইহা ঔদাসীনতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক?

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ৯,৩৪৮টি অ-কৃষিঋণ সমিতি আছে এবং ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ২৮ লক্ষ। ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন মাত্র ৭৮ কোটি টাকা। কৃষিঋণ সমিতির তুলনায় অ-কৃষিঋণ সমিতির আমানতী অর্থের পরিমাণ অধিক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অ-কৃষিঋণ সমবায় প্রথা উন্নয়নের জন্য জোর দেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি যে ছয়টি সমবায় শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ ইদানীং অ-কৃষি সমবায়ের দিকে ঝোঁক দিতেছেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে সমবায় কৃষি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সম্প্রতি মুসৌরীতে সর্ব্বভারতীয় যে সমবায় অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, চলতি বৎসরে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যাবলী অঞ্চলে অন্ততঃ পাঁচ শত সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। সর্ব্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান সমিতির সুপারিশ অনুসারে সমবায় প্রথার সহিত ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থা জড়িত করা হইবে। সেই অনুসারে আগামী চার বৎসরে ১৩০০ ক্রয়বিক্রয় সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত চলতি বৎসরে ২২টি কেন্দ্রীয় গুদামঘর তৈয়ার করা হইবে কৃষিজাত দ্রব্য মজুত রাখিবার জন্য।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মিশন যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা ভারত সরকার অনেকদিন যে কেন প্রকাশ করেন নাই তাহা বুঝা যায় না। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক কমিশনের অভিমতগুলি সুযুক্তিপূর্ণ এবং সমালোচনা যাহা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে গঠনমূলক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য বিশ্বব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। এই প্রশংসা শুধু যে অর্থনৈতিক উন্নতির (যথা, জাতীয় আয়-বৃদ্ধি কিংবা উৎপাদনবৃদ্ধি) জন্য করা হইয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য কতকগুলি অবদানও বিশ্বব্যাঙ্ক কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন। যেমন, জনসাধারণের মধ্যে আশার উদ্দীপনা ও জাতীয় জাগৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা এবং বিশ্বাস। ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই জাতীয় মনোভাব অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কম্যুনিটি পরিকল্পনাদ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ যে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে ব্যাঙ্ক কমিশন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সম্পদ বিষয়ে ব্যাঙ্ক মিশন কতকগুলি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, যথা,—(১) ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, (২) সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্য্যাবলী—যাহা জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগে তাহার জন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যনির্দ্ধারণ করা—ইহাতে রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, এবং (৩) বিচক্ষণতার সহিত নূতন নূতন কর ধার্য্য দ্বারা রাজস্ব-আয় বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সাধারণের উদ্বৃত্ত করার প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ না হয়। ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা স্বীকার করিলেও মিশন অভিমত দিয়াছেন যে, পরিকল্পিত পরিমাণে ঘাটতি ব্যয় করিলে ইহা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে গ্রহণ করা সাধ্যাতীত হইবে না, এবং ইহার ফলে দেশের মূল্যমান বৃদ্ধি পাইবে ও টাকার মূল্য হ্রাস পাইবে।

মিশনের অভিমতে সরকারী রাজস্ব-আয় বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। যথা, রেলওয়ে রেট বৃদ্ধিকরণ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ ও সেচকার্য্যের জন্য জল সরবরাহের উপরে কর স্থাপন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বন্দর-কর স্থাপন। বর্দ্ধিত জাতীয় আয়ের কতক অংশ পুনরায় মূলধনসৃষ্টির জন্য নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য সরকারী শক্তি সরবরাহ, সেচকার্য্য ও যানবাহনের প্রতিষ্ঠান-গুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত দেখাইতে হইবে। কারণ, ইহাদের উপর অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে এবং সেইজন্য সরকারী মূলধনসৃষ্টির ইহারা হইবে প্রধান উৎস।

এই অনুমোদনগুলির যথার্থতা অবশ্যস্বীকার্য্য। সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সেবা-ভারের (service charges) পরিমাণ অত্যল্প হইলে তাহা জাতীয় অর্থনৈতিক অপচয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং ইহাতে নূতন মূলধন সৃষ্ট না হইয়া বর্ত্তমান মূলধন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ভারত সরকার এই বিষয়ে বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইলে তাঁহাদের রাজস্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রেল টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; আভ্যন্তরিক বিমান যানবাহনের মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবপর এবং অন্যান্য পথযানের সেবাভারও বৃদ্ধি করা যায়। তবে দ্রব্যবহনের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যদিকে শক্তি সরবরাহের খরচ বাড়াইতে হইলেও

ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ বিবেচনা করিতে হইবে, একই হারে কর বৃদ্ধি করিলে চলিবে না।

করনীতি ব্যাপারে বিশ্বব্যাঙ্ক মিশন উদ্বৃত্ত রক্ষার জন্ম জনসাধারণকে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী। ইহার প্রধান উপদেশ এই যে, মূলধনসৃষ্টির হার উন্নয়ন করিতে হইলে ব্যক্তিগত আয়ের উপর প্রত্যক্ষ কর সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি করা চলিবে না, ইহাতে বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন সৃষ্টি ব্যাহত হইবে এবং জাতীয় আয়ের পরিকল্পিত বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হইবে না। ব্যাঙ্ক মিশন মনে করেন যে, ভারতে প্রত্যক্ষ করের হার অত্যধিক হওয়ার দরুন বিদেশী বেসরকারী মূলধন ভারতে আসিতে ভরসা পায় না। বিদেশী মূলধন আসিলে তাহার সঙ্গে আসিবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং তাহাতে ভারত দুই ভাবেই উপকৃত হইবে।

বিশ্বব্যাঙ্ক কমিশনের অভিমত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, কমিশন একটি জিনিষ বোধ হয় ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। তাহা এই—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। ইহার ফলে বেসরকারী ব্যক্তিগত ক্ষেত্র কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত হইতে বাধ্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ সরকারী ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হইবে আর এক তৃতীয়াংশ আসিবে ব্যক্তিগত বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারও মোট ব্যয়ের মাত্র এক-চতুর্থাংশ আসিয়াছে বেসরকারী ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হইতে অর্থাৎ, বিগত পাঁচ বৎসরে বেসরকারী ক্ষেত্র মোটে পাঁচ শত কোটি টাকার মূলধন সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং ইহার বাৎসরিক গড়-পড়তা হার দাঁড়ায় ১০০ কোটি টাকায়, ইহা আদৌ আশাপ্রদ নহে। ভারতীয় বেসরকারী শিল্পপতিরা risk capital নিয়োগে একেবারেই উৎসাহী নহেন, তাঁহারা নিরাপদে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রয় করিবার জন্ম অধিকতর আগ্রহশীল। সুতরাং, বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মূলধনসৃষ্টির প্রধান দায়িত্বভার আছে রাষ্ট্রের উপর, বেসরকারী ব্যক্তিগত ক্ষেত্র কেবল অনুপূরক হিসাবে কার্য্য করিতেছে। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ সৃষ্ট হইতেছে সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা।

আর একটি কথা। সরকারী সেবাভারের বৃদ্ধি করিলেই তাহা বর্দ্ধিত হারে মূলধনসৃষ্টিতে সাহায্য করে না। ইহার বড় নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা। সবার অজ্ঞাতে রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থার সব কয়টি বাস রুটেই ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে পরিবহন ব্যবস্থার মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ব্যাঙ্ক মিশনের মতে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অতিরিক্ত উচ্চাশার পরিচায়ক। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে অভিমত দিয়াছিলাম, ব্যাঙ্ক মিশনও প্রায় সেই অভিমত দিয়াছেন। মিশন সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত—এই অবস্থায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার গুরুভার ইহার পক্ষে বহন করা সম্ভবপর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, এই অতিরিক্ত পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি তথা মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য। সেই কারণে ব্যাঙ্ক মিশন সন্দেহ প্রকাশ করেন, ভারত সরকার যে পরিমাণে ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহের জন্ম কুটীরশিল্পের উপর নির্ভরশীল তাহাতে ব্যবহারিক দ্রব্য দেশের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন অনুসারে পাওয়া যাইবে না, ফলে, দ্রব্যমূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইবে ও পরিকল্পনার ব্যয় দ্বিগুণ হইবে। শিক্ষিত ও উপযুক্ত-সংখ্যক কর্ম্মচারীদের অভাবও একটি বড় অসুবিধা।

ব্যাঙ্ক মিশন বিদেশী মূলধন আমদানীর পক্ষপাতী, কিন্তু মিশন মনে করেন, ভারতবর্ষে শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত ভাবে বিদেশী মূলধন আমদানীতে আপত্তি করেন, কারণ বিদেশী মূলধনের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী মূলধন আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

ইণ্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন

গত ২৭শে জুলাই আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা বা ইণ্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন গঠনের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির উদ্দেশ্য হইল বেসরকারী ব্যবসায়-প্রচেষ্টায় অর্থসাহায্য করা। ইহা বিশ্বব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক অনুমোদিত সংস্থা। বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণের জন্ম যেরূপ সরকারী গ্যারাণ্টির প্রয়োজন হয়, নূতন আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থ হইতে ঋণগ্রহণের সময় সেরূপ কোন সরকারী গ্যারাণ্টির প্রয়োজন হইবে না। ৩১টি দেশ কর্পোরেশনের সদস্য হইয়াছে। কর্পোরেশনের বর্ত্তমান মূলধন ৭,৮৩,৬৬,০০০ মার্কিন ডলার। কর্পোরেশনের মূলধন গঠনে যে সকল রাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহারা হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৩,৫১,৬৮,০০০ ডলার), যুক্তরাজ্য (১,৪৪,০০,০০০ ডলার) ফ্রান্স (৫৮,১০,০০০ ডলার), ভারতবর্ষ (৪৪,৩১,০০০ ডলার) এবং জার্ম্মান ফেডারেল রিপাবলিক (৩৬,৫৫,০০০ ডলার)। কানাডা, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও সুইডেন প্রত্যেকে দশ লক্ষ ডলার বা ততোধিক দান করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের অপরাপর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হইল—বলিভিয়া, সিংহল, কলম্বিয়া, কষ্টারিকা, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, মিশর, এল সালভাডর, ইথিওপিয়া, ফিনল্যাণ্ড, গুয়াতেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, আইসল্যাণ্ড, জর্ডান, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পানামা ও পেরু।

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মার্কিন ছাত্রদের চিত্রপ্রদর্শনী

মার্কিন ফুলব্রাইট ছাত্রবিনিময়-পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল মার্কিন ছাত্র ভারত, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, নেদারল্যাণ্ডস, মিশর এবং যুক্তরাজ্যে অধ্যয়ন করে, আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক নগরীতে এইরূপ ত্রিশ জন ছাত্রের অঙ্কিত একটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। ডুভীন-গ্রাহাম গ্যালারীতে এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন গ্যালারীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাসংস্থা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রবিনিময় সংক্রান্ত ফুলব্রাইট আইন পাস হয়। তখন হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মার্কিন ছাত্র ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। উহাদের মধ্যে ২৩০ জন চিত্রশিল্প সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। বর্ত্তমানে ফুলব্রাইট পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫টি বিভিন্ন দেশে মার্কিন ছাত্রগণ অধ্যয়নে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

ব্রায়নি সম্মেলন

পৃথিবীতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতির জন্য যে কয়টি রাষ্ট্র বিশেষ ভাবে সচেষ্ট রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে ভারত, আফ্রিকা মহাদেশে মিশর এবং ইউরোপে যুগোশ্লাভিয়ার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। তিন মহাদেশের এই তিনটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্গত ব্রায়নি দ্বীপে একটি সম্মেলনে মিলিত হন। ১৮ই ও ১৯শে জুলাই এই দুই দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন—ভারতের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু, মিশরের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী গামাল আবদেল নাসের, প্রধানমন্ত্রী টোসিপ

সহযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহারা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে "বিস্তারিত মতবিনিময়" করেন। আলোচনান্তে ২০শে জুলাই একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

তিন জন রাষ্ট্রপ্রধান বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলির প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের পুনরুল্লেখ করিয়া বলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রজোট সৃষ্টি হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার বিলোপসাধন প্রয়োজন। অস্ত্র নিয়ন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া তাঁহারা বলেন যে, কালবিলম্ব না করিয়া সকলপ্রকার আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে যাবতীয় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ত্রিনেতৃবর্গ গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সকল আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাই সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাসৃষ্টির প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে সকল রাষ্ট্রেরই সদস্য-পদ পাওয়া উচিত।

বিশ্বশান্তিকে অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন-ব্যবস্থাকে দ্রুততর করিবার প্রচেষ্টার উপর তিন রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ জোর দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা "আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সহযোগিতার গুরুত্ব" সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ তহবিল (Special U.N. Fund for Economic Development) গঠন করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করা প্রয়োজন এবং বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহকে অব্যাহত করিবার প্রয়োজনীয়তার উপরও তাঁহারা জোর দেন।

ব্রায়নি সম্মেলনের শেষে নেতৃত্রয় যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, উত্তেজনা ও সম্ভাব্য বিরোধের প্রধান তিনটি এলাকা হইতেছে—মধ্য-ইউরোপ, সুদূরপ্রাচ্য এবং ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চল। নয়াচীন সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত সুদূরপ্রাচ্যের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং নেতৃত্রয় আশা করেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে গণতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তাঁহারা আরও আশা করেন, যে সব রাষ্ট্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য-পদের জন্য আবেদন করিয়াছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদ অনুযায়ী যাহাদের সদস্য-পদের যোগ্যতা আছে তাঁহাদের সদস্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

তাঁহাদের অভিমতে মধ্য-ইউরোপের সমস্যা জার্ম্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই গুরুতর সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে জার্ম্মান জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী করা প্রয়োজন।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংঘাতের ফলে মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান তাহাদের নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে করা উচিত। সকলেরই ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া উচিত, তবে মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের স্বাধীনতার স্বীকৃতির উপরই সকল সমাধানের ভিত্তি হওয়া সমীচীন। প্যালেষ্টাইনের পরিস্থিতি বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বান্দুং সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, নেতৃত্রয় তাহার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

আলজিরিয়া সমস্যার উল্লেখ করিয়া যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, প্রশ্নটি যে কেবল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাই নহে, আলজিরিয়ার জনগণের স্বাধীনতা দাবির মৌলিক অধিকার স্বীকৃতির দিক দিয়া এবং ঐ অঞ্চলে শান্তিপ্রচেষ্টার সাফল্যের দিক বিবেচনা করিয়াও ইহার আশু সমাধান প্রয়োজন। আলজিরিয়ার জনগণের স্বাধীনতার দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া নেতৃত্রয় বলেন যে, ঐ প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের সকল প্রচেষ্টাকেই তাঁহারা সমর্থন করিবেন। আলজিরিয়াতে অবস্থিত ইউরোপীয় অধিবাসিবৃন্দের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু সেজন্য আলজিরিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবির ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকৃতির পক্ষে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নহে। বর্ত্তমানে আলজিরিয়াতে এক হিংসাত্মক এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহার অবসান করিয়া অবিলম্বে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে এবং উভয় পক্ষই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজিলে প্রশ্নটির শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে।

আসওয়ান বাঁধ ও সুয়েজ খাল

মিশরের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মিশর সরকার নীলনদের উপর

আসওয়ান নামক স্থানে যে একটি উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক তজ্জন্য মোট ২৭ কোটি ডলার অর্থসাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ ১৯শে জুলাই ঘোষণা করা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন তাহাদের পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থসাহায্য করিবে না। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্য হইতেও মিশর বঞ্চিত হয়। প্রতিশ্রুতিপালনের অস্বীকৃতির কারণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বলেন যে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাঁধ নির্ম্মাণের অর্থনৈতিক দায়িত্বপালনের ক্ষমতা মিশরের নাই। উপরন্তু বাঁধ নির্ম্মাণ সম্পর্কে মিশর নীলনদের তীরবর্ত্তী অপরাপর রাষ্ট্রগুলির সম্মতিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই দুইটি কারণের কোনটিই যে সাহায্যদানের অস্বীকৃতির প্রকৃত কারণ নহে সে সম্পর্কে সকল দলের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণই একমত। যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মিশরের সম্পর্কের উন্নতি এবং মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণাত্মক বাগদাদ চুক্তির বিরোধিতার জন্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী মিশরের নাসের সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা আসওয়ান বাঁধের ন্যায় ঐতিহাসিক কার্য্যের কৃতিত্ব নাসেরকে দিতে স্বীকৃত নহেন বলিয়াই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

আসওয়ান বাঁধের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়া যদি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ আশা করিয়া থাকেন যে, মিশর চাপে পড়িয়া তাঁহাদের দ্বারস্থ হইবে তবে পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। ব্রায়নি সম্মেলনের সমাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্ত্য শক্তিদ্বয় সাহায্যদানের অস্বীকৃতি ঘোষণা করে। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রেসিডেণ্ট নাসের ২৬শে জুলাই সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের ঘোষণা দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর দেন। তিনি বলেন যে, ব্রিটেন এবং আমেরিকা ৭ কোটি ডলার সাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়াছে। সুয়েজ খালের বার্ষিক আয় ১০ কোটি ডলার—মিশর সেই অর্থ দ্বারা আসওয়ান উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিবে।

সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণ করার ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারী মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মিলিত আমন্ত্রণক্রমে ১৬ই আগষ্ট হইতে লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলিতেছে। মিশর এবং গ্রীস আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সম্মেলনে যোগ দেয় নাই। মিশর ঘোষণা করিয়াছে যে, মিশরের সার্ব্বভৌমত্ব হানিকারক সুয়েজ খাল সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থাই সে মানিয়া লইবে না।

পাকিস্থানের অর্থনৈতিক প্রগতি

পাকিস্থানের নবম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রচারিত একটি সরকারী বিবৃতিতে স্বাধীনতালাভের পর পাকিস্থানের অর্থনৈতিক প্রগতির এক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, দেশবিভাগের ফলে নানা সমস্যায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্থানের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পাকিস্থান সরকার কোন ত্রুটি করেন নাই। পাকিস্থান গঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই একটি উন্নয়ন বোর্ড (Development Board) গঠন করিয়া তাহার উপর সকল উন্নয়নমূলক প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভার দেওয়া হয়। পরে বোর্ডের কাজ একটি পরিকল্পনা কমিশন এবং একটি অর্থনৈতিক পরিষদের (Economic Council) উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৫০ সনে কলম্বো পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর পাকিস্থান সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি ষট্‌বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে মোট ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। তন্মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে ১২০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হয়। ঐ ষট্‌বার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যের মধ্যে একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করাই এই দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে একটি কর্ম্মসূচী রচনা করিবার জন্য ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে একটি পরিকল্পনা-বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত বোর্ড কর্তৃক যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রায় ২৭০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হইবে।

সরকার একটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদও গঠন করিয়াছেন। এই পরিষদের কাজ হইল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থনৈতিক, বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দান করা। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি, চার জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে তিন জন করিয়া মন্ত্রী এই পরিষদের সদস্য।

১৯৫৫-৫৬ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে পাকিস্থানকে বিভিন্ন রাষ্ট্র মোট ১৪৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেয়—তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনার সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ হইল ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত।

উক্ত পাঁচ বৎসরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা-খাতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ও ২০০ কোটি টাকা। সমগ্র উন্নয়নমূলক ব্যয়ের প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ অর্থ আসে বৈদেশিক সাহায্য হইতে। দেখা যাইতেছে যে, উন্নয়নমূলক ব্যয়ের অধিকাংশই মিটানো হয় পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ সম্পদ হইতে।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার হিসাব লইলে দেখা যায়, ১৯৫১-৫২ সনে যেখানে মাত্র ৪১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা

ব্যয়িত হইত, ১৯৫৪-৫৫ সনে সে স্থলে ব্যয় হয় ৮১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সনে উন্নয়নমূলক কার্যে সরকারী ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সনে সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৫·৪ ভাগ; ১৯৫৪-৫৫ সনে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের শতকরা নয় ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল উন্নয়নমূলক কার্যের ফলে পাকিস্থানের অর্থনীতির বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। জাতীয় আয়বৃদ্ধির পরিসংখ্যান হইতে এই উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৯-৫০ সনে মাথাপিছু গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ২২৫৲ টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সনে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ২৩৭৲ টাকা।

গোল্ড কোষ্ট নির্ব্বাচন

আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গোল্ড কোষ্টে সম্প্রতি যে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রহিয়াছে এই কারণে যে, উক্ত নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপরই গোল্ড কোষ্টের স্বাধীনতা এবং কমনওয়েলথভুক্তির প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। এই নির্ব্বাচনের ফলে গোল্ড কোষ্ট প্রথম আফ্রিকান সদস্য হিসাবে কমনওয়েলথে যোগদানের অধিকারী হইবে।

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ: কনভেনশন পিপলস পার্টি (বর্ত্তমান সরকারী দল) ৭১টি আসন; জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (প্রধান বিরোধী দল) ১২টি আসন, নর্দ্দান পিপলস পার্টি ১৫টি আসন এবং অন্যান্য ৬টি আসন। গোল্ড কোষ্টের এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার মোট আসন-সংখ্যা হইল ১০৪টি।

গোল্ড কোষ্টের ভবিষ্যৎ সংবিধান গঠনের বিষয় সম্পর্কে কনভেনশন পিপলস পার্টি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দেয় সে সম্পর্কে গোল্ড কোষ্টের জনগণের অভিমত নির্দ্ধারণের জন্য গত মে মাসে ব্রিটিশ উপনিবেশ-সচিব লেনক্স বয়েড গোল্ড কোষ্ট সরকারকে একটি সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে, নির্ব্বাচনের পর গোল্ড কোষ্ট আইনসভা যদি "যুক্তিসঙ্গত সংখ্যাধিক্যে" স্বাধীনতার দাবি জানাইয়া কোন প্রস্তাব পাস করে তবে ব্রিটিশ সরকার তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন। গত ৩রা আগষ্ট গোল্ড কোষ্ট আইন-সভায় ৭২-০ ভোটে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায়, ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া অবিলম্বে গোল্ড কোষ্টকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিবেন।

স্বাধীনতালাভের পর গোল্ড কোষ্টের নূতন নাম হইবে ঘনা এবং এই নূতন নামেই রাষ্ট্রটি কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হইবে।

টেলিফোন বিভাগ সম্পর্কে অভিযোগ

২৩শে শ্রাবণ "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসানসোল টেলিফোন বিভাগের কর্ম্মপ্রণালীর সমালোচনা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রথম যখন টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা হয় তখন নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক ফিয়ের বিনিময়ে বরাকর, কুমারডুবি, ডিসেরগড়, কুলটি, নিয়ামতপুর, বহুলা, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি কেন্দ্রের সহিত অতিরিক্ত ফি ব্যতিরেকেই কথাবার্ত্তা বলা চলিত। কিন্তু টেলিফোন কর্ত্তৃপক্ষ একের পর এক এই সকল সুযোগ-সুবিধা অপহরণ করিলেন এবং এক বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া অতিরিক্ত ফি ছাড়াই টেলিফোনযোগে কথাবার্ত্তা বলিবার যে অধিকার জনসাধারণের ছিল তাহা সঙ্কুচিত করিয়া সেই সুযোগ কেবলমাত্র আসানসোল শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিলেন। "অথচ পূর্ব্বেকার বিস্তৃততর এলাকার সুযোগ-সুবিধার জন্য যে বাৎসরিক ফি ধার্য্য ছিল তাহাই বজায় থাকিল, তাহা হইতে এক পয়সাও কমান হইল না।"

টেলিফোন কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কার্য্যের সমালোচনা করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, "টেলিফোন বিভাগের এই ব্যবস্থা কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহা মনোপলী ব্যবসার একটা 'গা-জোরী' ব্যবস্থা মাত্র।...সরকারী টেলিফোন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের বক্তব্য—হয় তাঁহারা আমাদের পূর্ব্ব অধিকার ফিরাইয়া দিউন নতুবা টেলিফোন বাবদ 'করের পরিমাণ কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দিউন। শাঁখের করাতের মত দুই দিক দিয়া আমাদের কাটিতে চলিবে কেন?"

কলিকাতায়ও টেলিফোনের বিল বিষয়ে অনেক স্থলে হিসাবের অদ্ভুত গরমিল দেখা যায়, আমাদেরও এই অভিজ্ঞতা আছে। বলা বাহুল্য বিল বেশীই হয়, কম নয়।

সরকারী শিক্ষানীতি

"বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকায় ১২ই শ্রাবণ সংখ্যায় এক সংবাদে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে বর্দ্ধমানরাজ কলেজটি 'Government Sponsored' কলেজে পরিণত হওয়ার ফলে কলেজে ছাত্র-ভর্ত্তির সংখ্যা ১,৫০০ হইতে এক হাজারে কমাইয়া আনা হইয়াছে। কলেজটিতে ছাত্রভর্ত্তির সংখ্যা হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভর্ত্তি হইতে অপারগ ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসর হইতে কলেজটিতে বি-কম শ্রেণী খোলা হইবে বলিয়া পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি হইবার ফরমও দেওয়া হয়। কিন্তু পরে আবার ঘোষণা করা হইল যে, এ বৎসর বি-কম ক্লাস খোলা হইবে না। এই বৎসর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়ায় কলেজে শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুক ছাত্রসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের ছাত্রভর্ত্তি সংখ্যা হ্রাস করিবার সিদ্ধান্তের করিবার ফলে বর্দ্ধমানে এক শিক্ষাসঙ্কট দেখা দিয়াছে। কিন্তু সরকারী নীতির দুর্ব্বোধ্যতার এখানেই পরিসমাপ্তি নহে। বর্দ্ধমান বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় যথাসময়ে একটি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ খুলিবার জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট

হাসপাতালে রাখাই সাব্যস্ত হয় তবে কাহার রক্ষণাবেক্ষণে তাহাকে রাখা হইবে? পাস-করা ধাত্রীর ব্যবস্থা কোথায়?"

এইরূপ অবস্থায় যত দিন পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত নূতন পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থারূপে প্রসূতি ওয়ার্ডটি চালু রাখা এবং সেজন্য একজন পাস-করা ধাত্রী নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন যে, একজন মেডিক্যাল অফিসারের পক্ষে যদি দেখাশুনা করার অসুবিধা ঘটে তবে কলিকাতা ও অন্যান্য মফস্বল শহরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্থানীয় বেসরকারী চিকিৎসকদিগকে অবৈতনিক চিকিৎসক হিসাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

ত্রিপুরায় আসন্ন দুর্ভিক্ষ

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক খাদ্যাভাব এবং বন্যার ফলাফল সম্পর্কে "সমাজ" পত্রিকা লিখিতেছেন, "ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও তৎপরবর্ত্তী খাদ্য এবং আর্থিক সঙ্কটে রাজ্যের সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়াছে—বিশেষতঃ অর্থনৈতিক দিক হইতে। মধ্যবিত্ত এবং অল্পবিত্ত শ্রেণীর লোকদের যৎসামান্য নগদ ও অন্যবিধ সঞ্চয় যা কিছু ছিল দুর্ভিক্ষ ও বন্যাবিধ্বস্ত অবস্থা হইতে স্থিতিশীল হইতে গিয়া তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলে ১৫ টাকা কেন, ১০ টাকায়ও চাউল কিনিবার সামর্থ্য এখন আর অধিকাংশ লোকের নাই। দরিদ্র ত্রিপুরার জনগণ দরিদ্রতর হইয়াছে এবং অপ্রতিরোধ্য রূপেই তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে

কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের ভাগ্যে ইহা অপেক্ষাও ভয়াবহ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে। আউশ ধান বিনষ্ট হওয়ায় এবং যৎসামান্য পরিমাণ ধান রক্ষা হইয়াছিল, মহাজনদের ঋণশোধেই তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে যে ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে, আগামী ফসলও আশানুরূপ না হইবার আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ায় তাহা আরও বেশী ভয়াবহ এবং ব্যাপকতর রূপে দেখা দিবে। "কোন কোন ক্ষেত্রে আগামী ফসলের বীজধান সংগ্রহ করিতে গিয়া বর্ত্তমানের খোরাকের ধানও বিক্রয় করিতে হইতেছে, ফলে খাদ্যাভাব হ্রাস পাইতেছে না এবং অতিরিক্ত দর হেতু চাষের পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত ও ফসল রেহান দিতে হইতেছে। ত্রিপুরার কৃষকদিগকে সুদীর্ঘকালীন শোষণের উৎপীড়ন আজ যেন শতগুণে ভয়াবহরূপে গ্রাস করিতেছে, সুযোগ বুঝিয়া অবস্থাসম্পন্নেরা বীজধান সরবরাহ অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দর বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে।" বহু কৃষিক্ষেত্র বীজধানের অভাবে অনাবাদী থাকিয়া যাইতেছে।

যদি রাজ্য সরকার অবিলম্বে রাজ্যের কৃষি এলাকাগুলিতে বিনা-মূল্যে বা অল্পমূল্যে বহুল পরিমাণে বীজধান সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন তবেই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের আশা থাকিবে। তাহা না করা হইলে ভবিষ্যতে যে অবস্থা দেখা দিতে পারে তাহার আভাস দিয়া "সমাজ" লিখিয়াছেন, "চলতি খাদ্যসঙ্কটে ভারত সরকারকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খেসারত দেওয়ান হইয়াছে, আমন ফসল না হওয়ায় পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করিতে না পারিলে আগামী দুর্ভিক্ষে খেসারতের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকার মধ্যে থাকিলেই স্বল্প বলিয়া মনে করা উচিত হইবে।"

ত্রিপুরার বর্ত্তমান দুর্গতির জন্য ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া "সমাজ" বলেন যে, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য চাউলের প্রকৃত অভাব অপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণই অধিকতর দায়ী। খাদ্যপরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিলে ইহাদের দৌরাত্ম্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য আনীত চাউলের মূল্য অপেক্ষা আনয়ন ও সাব-সিডির জন্য বেশী অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কিছু ক্ষতি দিয়াও যদি কৃষকদিগকে সাহায্য করা হয় তবে হয়ত ত্রিপুরার আসন্ন দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব না হইতেও পারে।

"সমাজে"র উক্তি আংশিক ভাবেও সত্য হইলে সরকারের সবিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ত্রিপুরা সরকারের অযোগ্যতা

ত্রিপুরা রাজ্য হইতে প্রকাশিত প্রায় সকল পত্রপত্রিকাতেই ত্রিপুরার বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নানারূপ অভিযোগ করা হইয়া থাকে। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক বন্যা এবং খাদ্যসঙ্কটকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল অভিযোগের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সরকার অবশ্য এই সকল অভিযোগ কি চক্ষে দেখেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই—তবে একই প্রকার অভিযোগের পুনরাবৃত্তিতে মনে হয় না যে সরকার এ বিষয়ে কোন দৃষ্টিপাত করেন।

১২ই আগষ্ট এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সেবক" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যসরকার রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে সকল রিপোর্ট প্রেরণ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সঠিক নহে। পার্লামেণ্টে ত্রিপুরা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে এই সকল ভ্রান্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই সরকারী উত্তর দেওয়া হয়, ফলে পার্লামেণ্ট ত্রিপুরার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হন। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া "সেবক" লিখিতেছেন:

"সংবাদে দেখা যায় গত ৬ই আগষ্ট লোকসভায় ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যার আলোচনা করিতে লোকসভার অধ্যক্ষ মহোদয় অনুমতি প্রদান করেন নাই। তৎসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, গত ৩১শে মে হইতে ২রা জুনের পর ত্রিপুরায় কোন বন্যা হইয়াছে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট জানেন না। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর এই উত্তরে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগরে যে ভয়াবহ বন্যা হইয়া গিয়াছে এবং এই বন্যায় দুই জনের সলিল-সমাধিও হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই অথবা দিল্লী হইতে এই সম্পর্কে কিছু জানিতে চাহিলে ত্রিপুরা সরকার প্রকৃত তথ্য সরবরাহ

করেন নাই। কৈলাসহর ও ধর্মনগরের সাম্প্রতিক বন্যা লোকের ঘরবাড়ী প্লাবিত করিয়াছে, পাকা আউশ ফসল ও সদ্য-রোপিত আমন ধান্যের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। এই দুই মহকুমায় গত কয়েক মাস যাবৎ ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং সাম্প্রতিক বন্যায় খাদ্যাভাব ও অন্যান্য সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের নিকট আজ ইহা স্পষ্টরূপেই দেখা দিয়াছে যে, প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়া স্থানীয় সরকার রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। সাম্প্রতিক একটি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। উপদেষ্টা শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় এবং জেলাশাসক কৈলাসহরের সাম্প্রতিক বন্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পরস্পরবিরোধী। জেলাশাসকের বিবৃতি কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। জেলাশাসক বলিয়াছেন, কৈলাসহর মহকুমার ২৫ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বন্যা হইয়াছে এবং আউশ কিংবা আমন ধান্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। উপদেষ্টা শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ আমাদের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "কৈলাসহরে বন্যাঞ্চলে বন্যার জলে ৭৫ ভাগ ফসল বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে পনর হাজার মণ চাউল প্রেরণ করিলে ঐ মহকুমার অর্দ্ধেক লোক অর্থাৎ ৩৫ হাজার লোক খাদ্যাভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আমন ধান্যের বীজ ইতিমধ্যে প্রেরণ না করিলে আগামী আমন ধান্যের ফলন অসম্ভব।"

"সেবক" আরও লিখিতেছেন:

"চীফ কমিশনার ত্রিপুরাবাসীর নিকট সরাসরি দায়ী নহেন, অতএব তাঁহার সরকার যে-কোন বিরূপ তথ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করার অধিকার পাইয়াছেন এবং বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা এই অধিকার তাঁহাকে দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আগরতলার বাজারে যখন চাউল দিনে-দুপুরে ৪০।৪৫৲ টাকায় বিক্রি হইতেছিল তখন পার্লামেণ্টে খাদ্যসচিব আগরতলায় চাউলের দর ২৮৷৷০ আনা বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। খাদ্যসচিবের এই উক্তি সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহার এই উক্তিতে আগরতলাবাসী কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে কি মনে করিয়াছিল তাহার ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থায় যে কেবল ত্রিপুরাবাসীই নাজেহাল হইতেছে তাহা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বনামধন্য মন্ত্রিবর্গকেও বহুবিধ অসুবিধায় পড়িতে হয়—তাহাই আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

আমরা এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আসানসোলে বাসগৃহ-সমস্যা

ভারতের সকল শহরাঞ্চলেই আজ বাসগৃহ-সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন কারণেই শহরাঞ্চলে অধিবাসীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বাসগৃহের সংখ্যা সেই অনুপাতে বিশেষ বাড়ে নাই; গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতা ইহার একটি কারণ। শহরাঞ্চলে বাসগৃহের অভাবের সামাজিক ফল হইয়াছে সুদূরপ্রসারী।

সাধারণ দ্রব্যমূল্যমান বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই আজ জীবিকানির্ব্বাহ নিরতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়াছে; ফলে, একদিকে স্বল্পবিত্ত জনসাধারণের পক্ষে নূতন গৃহনির্ম্মাণ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতে গৃহ-সমস্যার তীব্রতা কমিতে পারিতেছে না। অপর দিকে এই সুযোগে এক দল বিবেকশূন্য মুনাফালোভী বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদিগকে নানাভাবে বিব্রত করিতেছে। ক্ষেত্রবিশেষে ভাড়াটিয়ারাও যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতেছে না তাহা নহে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে একদল সমাজবিরোধী মনোভাবাপন্ন বাড়ীওয়ালা এই সমস্যাকে মূলধনরূপে কাজে লাগাইয়া মুনাফা লুটিতেছে।

আসানসোলে গৃহ-সমস্যার সুযোগ লইয়া এইরূপ এক দল দায়িত্বজ্ঞানহীন বাড়ীওয়ালা কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থানীয় সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন: "আসানসোলে বহু বাড়ীওয়ালা আছেন যাঁহারা ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে নিয়মিত ভাড়া আদায় করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীতে বাস করার সুখ-সুবিধার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। বাড়ীকে যে বাসযোগ্য রাখার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে ইঁহারা একেবারেই উদাসীন। মাসে মাসে ভাড়াটা আসিলেই হইল; ইহার অধিক ভাড়াটিয়ার সহিত আর কোন সম্বন্ধ নাই। সময়মত অল্পস্বল্প মেরামত করিয়া দিলে বাড়ীগুলি যে ভাড়াটিয়াদের কতকটা আরামের যোগ্য থাকে সে বোধ বাড়ীওয়ালাদের যেন থাকিয়াও নাই। বাড়ীভাড়া যেন ষোল আনা লাভের ব্যবসাই থাকে, তাহা হইতে এক পয়সাও যেন খরচ করিতে না হয়।"

গৃহসংস্কারে বাড়ীওয়ালাদের এইরূপ নিঃশঙ্ক ঔদাসীন্যের ফলে ভাড়াটিয়াদিগকে নানারূপ বিপদে পড়িতে হয়। এইরূপ বিপদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি বুধাগ্রামের একটি বাড়ীতে দিনের বেলা অল্পবয়স্ক একটি ঘুমন্ত শিশুর উপর ছাদ ভাঙিয়া পড়িলে অল্পের জন্য সে রক্ষা পায়।

উপসংহারে পত্রিকাটি বলিতেছেন, "যাহারা ভাড়া আদায় করেন অথচ দীর্ঘদিন ধরিয়া বাড়ী মেরামত করেন না বাড়ীতে যাহারা বাস করে তাহাদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখেন না তাঁহাদের এই সমাজবিরোধী কার্য্যের জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারা যায় সরকারকে আমরা তাহাই উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

পুলিস ও বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী

১৭ই জুন পুলিস কর্ত্তৃক হোশিয়ারপুরে বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী জনতার উপর গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করেন তাহার রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য

প্রসঙ্গে এই আগষ্ট মাদ্রাজের ইংরেজী দৈনিক "হিন্দু" পত্রিকা লিখিতেছেন, বেসরকারী তদন্তটির রিপোর্ট হইতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবির সারবত্তাই প্রমাণিত হইয়াছে। মূলতঃ পুলিসী জুলুমের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য গঠিত বেসরকারী কমিটি যে সকল তথ্য আহরণ করিয়াছেন তাহাতে পুলিস এবং বিক্ষোভপ্রদর্শনকারী জনতা উভয়েরই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ দিন পুলিস যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতো কাহিনীর সমাপ্তি নহে। ১৭ই জুনের ঘটনাবলী পূর্ববর্তী কয়েক দিনেরই সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির পরিণতিস্বরূপ ঘটিয়াছিল। কমিটির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কয়েকটি দল পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বলপূর্বক ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। ঐ সকল বিক্ষোভপ্রদর্শনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যাধিক্য। ১৭ই জুনের পূর্বদিন স্ত্রীলোক-বিক্ষোভকারীদের ব্যবহার বিশেষ নিন্দনীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, "স্ত্রীলোকগণ যে ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রশংসা করা যায় না। তাহারা অত্যন্ত জঘন্য এবং প্ররোচনামূলক ধ্বনি ব্যবহার করে। তাহারা যে ভাষা প্রয়োগ করে তাহা অতি নিম্নস্তরের—সেই সকল ধ্বনি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই রিপোর্টটি কলঙ্কিত করিতে চাহি না।"

"হিন্দু" লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের বিরূপ আচরণে কমিটি যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সকল সুবিবেচক নাগরিকই তাহার সহিত একমত হইবেন। তবে এই সকল শোচনীয় ঘটনার দায়িত্ব সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির উদ্যোক্তাদের উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত, কারণ স্ত্রীলোকগণ স্বেচ্ছায় ঐ সকল সভা-শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল এরূপ চিন্তা অলস মস্তিষ্কের পরিচায়ক। স্পষ্টতঃই তাহাদের স্বভাববিরোধী এরূপ বিক্ষোভপ্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে নানা ভাবে প্ররোচিত করা হইয়াছিল।

নানাবিধ প্ররোচনা সত্ত্বেও ১৬ই জুন পর্যন্ত পুলিস সংযম হারায় নাই। কিন্তু পরদিবস সকল প্রকার সংযম পরিত্যক্ত হয়; ১৭ই জুন অন্ততঃ কিছুসংখ্যক পুলিস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জনতাকে শিক্ষা দিতে হইবে। ঐ দিন পুলিসী আক্রমণের ব্যাপকতা, তীব্রতা এবং নির্বিচার লাঠিচার্জ হইতে স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা অপেক্ষা প্রতিশোধস্পৃহাই পুলিসের মনে প্রবল আকার ধারণ করে। তদন্ত কমিটির অভিমতে কিছুসংখ্যক পুলিস যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। জনসাধারণ দৌড়াইয়া পলাইয়া গিয়া অথবা দূরবর্তী গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও ঐ সকল প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। বস্তুতঃ অধিকাংশ পুলিসই সেদিন কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল—তাহা না হইলে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে বিক্ষোভকারী জনতার প্রতি তাহারা ঐরূপ হিংস্র আচরণ করিতে পারিত না। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি পুলিসের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কমিটি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগকে ধাক্কা দেওয়া অথবা তাহাদের চুল ধরিয়া টানা প্রভৃতি ঘটনার পশ্চাতে কোনরূপ যৌন প্রেরণা ছিল না; কিন্তু পুলিস যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেছিল তাহা সন্দেহাতীত। এই ব্যবহারের ফলে পুলিস আইনশৃঙ্খলা সংরক্ষণের ভার ব্যতীত বিচারকের ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপ ব্যবহার করিয়া পুলিস নিতান্ত নিন্দনীয় আচরণ করিয়াছে। পুলিসের কর্তব্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সেজন্য যতটা কিছু করণীয় তাহা করা। অপরাধের বিচারের দায়িত্ব পুলিসের নহে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধের বিচার এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য সম্পর্কে পুলিসবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিলে অবশ্যম্ভাবী রূপে পুলিসের উপর জনসাধারণ শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিবে।

বারাসাতে চুরির প্রাদুর্ভাব

সম্প্রতি বারাসাত মহকুমায় চুরির উপদ্রব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রায় প্রত্যহই কোন-না-কোন চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চোরেরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের তালা ভাঙিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিতেছে। এইরূপ ঘন ঘন চুরির ফলে বারাসাত অঞ্চলে গৃহস্থদের মনে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্থানীয় এক সাপ্তাহিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্তা" লিখিয়াছেন যে, চোরদের সন্ধান সংগ্রহের তৎপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে কোথায় কোন্ মূল্যবান দ্রব্যটি রহিয়াছে প্রখর অধ্যবসায়ের সহিত তাহারা তাহার নির্ভুল সন্ধান লয়।

বারাসাতে এই চুরির উপদ্রব প্রতিরোধে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করিয়া উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, দিনের পর দিন চোর ও চুরির সংখ্যা উদ্বেগজনকরূপে বৃদ্ধি পাইলেও পুলিশ উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধ-ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। এ অবস্থায় গৃহস্থের একমাত্র সহায় হইতে পারেন পাড়ার যুবকগণ। তাহারা যদি স্বেচ্ছাব্রতী হইয়া নিজেদের পাড়ায় প্রতিরোধবাহিনী গঠন করিয়া রাত্রে নিজ নিজ এলাকা পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে তবেই এই উপদ্রব হ্রাস পাইতে পারে।

সর্পদংশনে মৃত্যু

প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বহুলোক সর্পদংশনে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। বর্ষাকালেই এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য ঘটে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দংশিত ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় অসহায় ভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করে। সর্পদংশনের চিকিৎসার জন্য যে 'এন্টিভেনম' ইনজেকশন প্রচলিত আছে তাহা বহুস্থানেই দুর্লভ। উপরন্তু, উহার অত্যধিক মূল্য হেতু দরিদ্র রোগীদিগের পক্ষে এই ঔষধের সদ্ব্যবহার করিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

গ্রাম অঞ্চলে সর্পদংশনে মৃত্যুসম্পর্কিত সমস্যাটির প্রতি জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ২৫শে শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভাগীরথী" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, এই বৎসরও সর্পাঘাতে মৃত্যুর বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সর্পাঘাতে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডে এবং স্থানীয় প্রবীণ চিকিৎসকদিগকে সরকারের পক্ষ হইতে বিনামূল্যে 'এন্টিভেনম' ইনজেকশন সরবরাহ করিলে সমস্যাটির আংশিক প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

বাংলার বর্তমান অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ তাহার পূর্বসূরী প্রতিভা গৌরবকে অবহেলা ও বিস্মৃতি। আজ লোকে ভুলিতে চলিয়াছে যে, বাঙালী যাহা কিছু অধিকার বা গৌরব আজ ভোগ করিতেছে তাহার প্রায় সবকিছুরই ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এক দল আদর্শবাদী দেশনেতা—যাঁহারা উনবিংশ শতকের শেষাংশ হইতে বর্তমান শতকের প্রথম চতুর্থাংশ বাংলায় তথা ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে স্বায়ত্তশাসন কি ছিল এবং বর্তমানে তাহা কি দাঁড়াইয়াছে উহার পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণে বুঝা যায়:

"রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার এক স্মৃতিসভায় সভাপতিরূপে কলিকাতা মহানগরীর বর্তমান মেয়র অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯২৩ সনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সহিত ১৯৫১ সনের আইনের তুলনা করিয়া বলেন, পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে স্বায়ত্তশাসনের সকল ক্ষমতা গিয়াছে। "পৌর প্রতিষ্ঠানে আমাদের একটি অভিযোগ যে, আমরা কেন সরকারী দপ্তরের প্রত্যঙ্গ হইয়া থাকিব? কেন আমাদের উপর সরকারের আধিপত্য থাকিবে?"

"মেয়র বলেন, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই সুরেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। তিনি এই ক্ষেত্রে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু মেয়র বলেন, তাহার পর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯২৩ সনের আইনের পরিবর্তে ১৯৫১ সনের আইন প্রণীত হইয়াছে।

"মেয়র অধ্যাপক ঘোষ বলেন, তাঁহার সহিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কথোপকথনকালে ডাঃ রায় জানিতে চাহেন, তিনি (ডাঃ রায়) মেয়র হইয়া যাহা যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, আমি তাহা করিতে পারি না কেন? আমি জবাব দিয়াছি, আপনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের আইনে মেয়র ছিলেন, আমি আপনার আইনে মেয়র।

"সোমবার কলিকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এইদিন সকালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে কার্জন পার্কে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীসতীনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

"সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজে (অধুনা পরিবর্তিত নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) এক স্মৃতিসভা হয়।

"ব্যারাকপুরে গঙ্গাতীরে সুরেন্দ্রনাথের চিতাস্থলে অনুরাগী ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অপরাহ্নে সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউটে এক স্মৃতিসভা হয়।

"সন্ধ্যায় মধ্য-কলিকাতা অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক স্মৃতিসভা হয় এবং উহাতেই সভাপতিরূপে মেয়র অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ সুরেন্দ্রনাথের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত খেদ প্রকাশ করেন এবং বলেন, সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি যে বাঙালীর চিত্ত হইতে মুছিয়া যাইতেছে তাহা এই জনবিরল সভাই প্রতিপন্ন করিতেছে। বাংলার এই আচরণে বাংলার লজ্জিত হওয়া উচিত।

"এই সভায় কার্জন পার্কের নাম সুরেন্দ্রনাথ উদ্যান রাখা সমীচীন—এই অভিমত প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহাতে বলা হয়, প্রতি বৎসর এই মঞ্চে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহা উপেক্ষা করা হইতেছে। যে পার্কে রাষ্ট্রগুরুর মর্মরমূর্তি আছে তাহার নাম সুরেন্দ্রনাথ উদ্যান রাখিবার জন্য "এই সভা দাবি করিতেছে।"

স্বাধীনতা-দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী

স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাণী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে নূতন কিছুই নাই, তবে জাতীয় ঐক্যসম্পর্কিত তাঁহার বাণী তাঁহার নিজপ্রদেশের লোকেরা মানিয়া লইলে দেশের উপকার হইবে।

"নয়াদিল্লী, ১৪ই আগষ্ট—রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছেন:

ভারতের স্বাধীনতালাভের নবম বার্ষিক শুভ দিনে আমি আমার দেশবাসীর উদ্দেশে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। আজিকার দিন আত্মোৎসর্গের দিন। আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত করণীয় রহিয়াছে, আজ সেগুলির পর্যালোচনা না করিয়া আমি থাকিতে পারি না। যাহাতে আমাদের এই রমণীয় দেশ হইতে দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, সেইভাবে আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে। আমাদের দেশের পুনর্গঠন ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজ অত্যন্ত জরুরি।

আর একটি অনুরূপ জরুরি কাজ হইতেছে আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ দেশবাসীর মধ্যে জাগ্রত করা। এই কাজেই আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমাদের একথা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, জাতীয় ঐক্যসাধন ব্যতীত বাস্তব সম্পদবৃদ্ধির

প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যাহত হইবে তাহা নহে, যথার্থতঃ বিফল হইবে। সম্প্রতি কয়েক মাস আমরা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন ব্যাপারটির চূড়ান্ত রূপায়ণের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি। কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থে নয়, পরন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে আমরা রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন। এক সময়ে পুনর্গঠনের কাজে কতকগুলি অশোভনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতি ও অনুমোদনসহকারে রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য গঠনের অনুকূলে যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা সংসদের এক মহতী কীর্তি হিসাবে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পুনর্গঠনের বিষয়টিকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিব এবং বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা রূপায়ণের জন্য সদিচ্ছা ও ধৈর্য সহকারে অগ্রসর হইব।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন রূপায়ণের চেষ্টা হইতেছে। আমি সানন্দে একথা স্বীকার করি যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা যে সুফল লাভ করিয়াছি তাহাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। সকল দিকে আমাদের সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সম্ভবপর সকল প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব হইতেছে তাহাদের নিজেদের সামাজিক মর্যাদার কথা ভুলিয়া গিয়া জাতিগঠনের এই বিশাল কার্যে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করা। এই প্রসঙ্গে আমি কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিতে চাই। ভারী ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের কর্মসূচী বর্তমানে রূপায়িত হইতেছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই আমাদের কয়েকটি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় অতি-প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা ক্ষুদ্র শিল্প গঠন করিতে পারিব এবং তাহার ফলে আমাদের বেকার-সমস্যা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির সাফল্য লাভে যদিও আমরা সুখী তাহা হইলেও আমি বলিতে চাই যে, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নীতির ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে আমরা যে সুনাম অর্জন করিয়াছি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রতি যে সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্য প্রদর্শিত হইতেছে, যদি আমরা পুনর্গঠনের কাজে সাফল্য লাভ করিতে পারি এবং সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক সদিচ্ছার মধ্য দিয়া শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারি তবেই তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

আমেদাবাদে মাৎস্যন্যায়

আমেদাবাদে কি প্রকার বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রবিপর্যয়ের তাণ্ডব চলিতেছে তাহা এখন সর্বজনবিদিত। উহার তৃতীয় দিনের বিবরণ নিম্নে আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণের দলের এই উচ্ছৃঙ্খলতার পিছনে স্বার্থান্বেষী তথাকথিত "নেতা"দিগের উস্কানী আছে। গুজরাটে অন্যত্র আরও শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে :

"আমেদাবাদ, ৯ই আগষ্ট—সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আজ পুলিসের গুলীবর্ষণে পাঁচ জন লোক নিহত হয়। ইহা লইয়া গত দুই দিনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইল ১২ জন। আজ সারাদিন পুলিসের গুলীবর্ষণ, লাঠি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের ফলে মোট ৪১ জন আহত হয়। তাহাদের মধ্যে চার জনের আঘাত গুরুতর। ইহা লইয়া গত দুই দিনের হাঙ্গামায় মোট ১৪৫ জন আহত হইল। পুলিস ও রক্ষীদের প্রায় ২৪ জন আহত হয়। দমকলবাহিনী জানাইয়াছে যে, তাহাদের দশ জন লোক আহত হইয়াছে।

জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী মধ্যরাত্রের কিছু পূর্বে জানান যে, সমগ্র শহরের অবস্থা শান্ত। পুলিস কর্মচারী আরও জানান, শহরের ১৪টি স্থানে গুলীবর্ষণ করা হয় এবং মোট ৮৯ রাউণ্ড গুলী বর্ষিত হয়।

আমেদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য বেলা দুই ঘটিকা হইতে সমগ্র আমেদাবাদ শহরে ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ফু জারী করিয়াছেন।

কার্ফু বলবৎ রাখার কাজে পুলিসকে সাহায্য করিবার জন্য অদ্য বেলা ৩টার সময়ে সৈন্যদল তলব করা হইয়াছে।

আজ রাত্রে জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী জানান যে, শহরের অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৭টার পর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই বটে, তবে রাস্তায় কিছু লোক ঘোরাফেরা করিতে থাকে।

কংগ্রেস এম. এল. এ. শ্রীমগনলাল আর. প্যাটেলের পুত্র ডাঃ নরুভাই মগনলাল প্যাটেলের তলপেটে গুলীবিদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসমর্থিত এক সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ প্যাটেল তাঁহার বাসভবনের ত্রিতলে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় গুলীবিদ্ধ হন

ভারত সরকার কর্তৃক দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্য গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক ধর্মঘট আহূত হয়। সেই অনুযায়ী শহরের ছাত্রগণ ধর্মঘট করে এবং গতকল্য বেলা ২টা পর্যন্ত ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার পর অবস্থা ছাত্র নেতাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়।

লোকসভায় আমেদাবাদ প্রসঙ্গ

আমেদাবাদে যাহা চলিতেছে সে বিষয়ে লোকসভায় শ্রীনেহরু ও বিরোধীদলের মধ্যে বাদানুবাদের বিবরণ আমরা আংশিক ভাবে আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত করিলাম। পণ্ডিত নেহরুর অভিযোগ

যে ভিত্তিহীন এ কথা কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিবেন না। দেশে একদল লোক আছেন যাঁহারা নিজের ও নিজ দলের স্বার্থে যে কোন প্রকার অনাচারের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত, তাহাতে দেশের ও দশের অপকার কতটা হইবে তাহার বিচার মাত্রও তাঁহারা করেন না। তবে এক্ষেত্রে দোষী কে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

"নয়াদিল্লী ১০ই আগষ্ট—'প্রকাশ্যে হিংস পন্থায়' সংসদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করার যে মনোভাব দেশে দেখা দিয়াছে, আজ সংসদে রাজ্য পুনর্গঠন বিলের তৃতীয় দফা আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাহার নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'ইহা মূলতঃ সমগ্র গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও পদ্ধতির বিরোধী।' তিনি দেশে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং সংসদের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করার ব্যাপারে সহায়তা করিতে সদস্যদের নিকট সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানান।

বিরোধী দলের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় বারবার বাধা দেন এবং তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করেন।

আমেদাবাদে পুলিসই হিংসায় উস্কানি জোগাইয়াছে বলা সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার—প্রধানমন্ত্রী এই কথায় যখন পুনরাবৃত্তি করেন তখন প্রথম বাদানুবাদ আরম্ভ হয়।

বিরোধী সদস্যগণ—'সরকারী সিদ্ধান্তেই উস্কানি দেওয়া হইয়াছে।'

"প্রধানমন্ত্রী ক্রোধকম্পিত স্বরে বিরোধী সদস্যদের নিকট জানিতে চাহেন যে, তাঁহারা হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়াছেন কিনা। তাঁহার অভিযোগ এই, বিরোধী সদস্যরাই এরূপ কাজে উস্কানি দিতেছেন।

বিরোধী সদস্যগণ সকলে উঠিয়া দাঁড়ান এবং উচ্চৈঃস্বরে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, তাঁহারাই শুধু কঠোর ভাষা প্রয়োগে পারদর্শী নন।

"বিরামহীন চীৎকারের মধ্যে অধ্যক্ষ সকলকে শান্ত হইতে আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, শ্রীচাটার্জ্জি ও শ্রীহীরেন মুখার্জ্জি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যখন প্রধানমন্ত্রী অনুরূপ কঠোর ভাষায় উহার জবাব দিতেছেন, তখন তাঁহাকে বাধা দেওয়া অসঙ্গত।

"আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীনেহরু রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের নীতি ভাষার ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করার বিরোধী। অবশ্য এক ভাষাভাষী রাজ্য গঠিত হইতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস মূলতঃ এক ভিন্ন বিষয়ের সমর্থক। ভাষা নিঃসন্দেহ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু উহাকে রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণের সহিত কখনও গুলাইয়া ফেলা উচিত নয়।

"তিনি বলেন যে, ভাষাগত রাজ্য গঠনের নামে গত চার মাস যাবৎ দেশে যে সব ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা অতিশয় নিন্দার্হ। একটি রাজ্যের সীমা কোথায় নির্দ্ধারণ করা হইল, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এ সম্পর্কে বৈষয়িক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিকটা বিবেচ্য। রাস্তাঘাটে লড়াই করিয়া ও হাঙ্গামা বাধাইয়া এবং গুলী চালাইয়া ও অগ্নিসংযোগ করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় না।

"অতঃপর তিনি বলেন যে, সংসদের ক্ষমতায় সংশয় প্রকাশ করা দুর্ভাগ্যের বিষয়। সময় সময় সংসদ সদস্যগণই এ জাতীয় সংশয় প্রকাশে উস্কানি দিয়াছেন। ইহাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, সংসদকে উহা বিবেচনা করিতে হইবে। যেভাবে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে এবং উহাতে যেরূপ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রায় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। ইহা বন্ধ করার জন্য কোন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট অথবা অ-কম্যুনিষ্ট—যে দলেরই হউক না কেন, ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

"প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সীমা-ঘটিত বিরোধে কোনরূপ রাজনৈতিক বা বৈষয়িক প্রশ্ন জড়িত নয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে উহা প্রবল ভাবাবেগের প্রশ্ন হইতে পারে। সরকার এই ভাবপ্রবণতা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যখন দুইটি ভাবাবেগের সংঘাত উপস্থিত হয় তখনই যত কিছু গোলমাল ঘটে। এ বিষয়ে যে মূলনীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়, তাহা প্রথম হইতেই মানিয়া চলা হইতেছে।

"তিনি বলেন যে, ভারতের ঐক্য, নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করাই গবর্ণমেণ্টের প্রথম ও প্রধান নীতি। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই প্রত্যেকটি যুক্তি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সরকারের দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক। আর সবই ইহাদের অনুসারী। রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে জনসাধারণের সর্ব্বাধিক পরিমাণ সমর্থন লাভেই সরকার ইচ্ছুক ছিলেন। 'আসুন আমরা বলি, বহুলাংশে এই সমর্থন আমরা পাইয়াছি।'

"স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সঙ্গে সরকার পরামর্শ করেন নাই বলিয়া শ্রীচ্যাটার্জ্জি যে অভিযোগ করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী তাহা অস্বীকার করেন। শ্রীচ্যাটার্জ্জি যদি বলেন যে, এ-লোক বা সে-লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, তাহা হইলে উহ সর্বদা সত্য হইবে না। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করা হয় নাই, একথা সত্য। কিন্তু কংগ্রেস-বহির্ভূত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। 'একাধিক বার এই বিষয়ে শ্রীচ্যাটার্জ্জির সঙ্গে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।'

"সাম্প্রতিক হাঙ্গামার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, 'একটি ভাষাগত এলাকার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা এক বিপজ্জনক ব্যাপার। ইহাকে উৎসাহিত করা অনুচিত। আশা করি, ইহা কেউ পছন্দও করেন না। আমি আগের চেয়েও এখন ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন পরিকল্পনার বেশী বিরোধী। এই সব রাজ্য নিজ নিজ খেয়ালের বশবর্তী এবং বৃহত্তর প্রশ্ন আমল দেয় না। সুতরাং কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী হইলেও এক্ষণে আমার ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি এখন বৃহৎ রাজ্য গঠনে বিশ্বাসী। ভারতের ঐক্য এবং [illegible]

উন্নয়নের পটভূমিকায় প্রত্যেকটি বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন।'

"তিনি আরও বলেন যে, গোলযোগ ও হাঙ্গামায় শিল্পোন্নয়ন হইবে না। সুতরাং অবাধ আলোচনা, অবাধ মত-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ ও বিতর্কের সুযোগ লাভ করা যাইতে পারে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু উহা নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিতে হইবে। রাস্তার লড়াই দ্বারা জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করা যাইত না। কিছুসংখ্যক লোক সম্প্রতি যেভাবে সত্যাগ্রহ চালনা করিতেছে তাহা গান্ধী ধারণা করিতে পারেন নাই।

"শ্রীনেহরু বলেন যে, পঞ্জাবের জন্য যে আঞ্চলিক সূত্র উদ্ভাবন করা হইয়াছে তাহা সমালোচনা করার আদৌ কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। পঞ্জাবের আন্দোলনে প্রমাণিত হয় যে, আন্দোলনকারীরা উহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই এবং উহা বুঝিতে পারিয়া থাকিলেও তাঁহারা অন্য কিছু করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্যা সমাধানের পক্ষে উহা আদর্শ ব্যবস্থা, ইহা তাঁহার বক্তব্য নয়। তবে নিখুঁতভাবে বিচার করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। 'আপনারা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন এবং সংসদ তাহা অনুমোদন করেন। উহাই আইনে পরিণত হয়। কিন্তু সারা দেশের অবস্থা কি? আপনারা উহা লইয়া লড়াইয়ে মত্ত। ইহা কি সভ্য দেশের ব্যবস্থা। ইহাই কি আমাদের রাজনীতিবিদ্‌দের পথ?'

"উপসংহারে তিনি বলেন যে, সংসদে কোন কিছু গৃহীত না হইলেই তাহার মীমাংসা পথে-ঘাটে করার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু জনসাধারণ উহার বিরোধী। ভারত এক বিরাট দেশ। এখানে ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তায় সংসদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করা মূলতঃ গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ও পদ্ধতির বিরোধী।"

পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র

নিম্নস্থ সংবাদে পাকিস্থানের "কাজীর বিচারে"র পরিচয় পাওয়া যাইবে :

"হিলি, ৩১শে জুলাই—হিলি (পশ্চিম দিনাজপুর) পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাইতেছে যে, সামরিক বাহিনীর উপর খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টনের ভার ন্যস্ত হওয়ার পর মজুতদারদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সৈন্যগণ অনুসন্ধানকারীদের সহায়তায় শহরে ও গ্রামে ঘুরিয়া মজুতদারদের খোঁজ লইয়া বহু পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেছে। ধান্য চাউল গম যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাই সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত দরে (চাউল ২০৲, ধান্য ১২৲, গম ১৭৲) মজুতদারদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া উহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য দিতেছে; কোন কোন ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্য দিতেছে কিংবা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া মজুতদারদের উপর নানাভাবে জুলুম করিতেছে।

সম্প্রতি বগুড়া জেলার একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে সৈন্যেরা অনুসন্ধান করিয়া ১৫ বস্তা চাউল পায়। এই চাউল তাঁহার নিজের খাওয়ার জন্য রাখা হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও সামরিক আদালতের বিচারের পর শহরের সাত মাথা রাস্তায় তাঁহাকে প্রকাশ্যে ৫ ঘা বেত মারা হয়। উহার পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সমস্ত শরীরে ভালভাবে 'ঘি' মালিশ করিয়া পরে লেবুর রস মাখান হয়। তৎপর একজন বলিষ্ঠ সৈন্যদ্বারা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুকের সাহায্যে পাঁচ বার তাঁহাকে আঘাত করা হয়। প্রত্যেক বার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়িতে থাকে। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য শহরের হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। ঐ অবস্থাতেই তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়। উহার পর তিন মাসের জন্য তাঁহার সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়

শহরের জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে ২ ঘা বেত মারিবার পর তাহার সংজ্ঞা লোপ পায়। সিভিল সার্জ্জনের পরামর্শে তাহাকে রেহাই দেওয়া হয়। ধুপচাচিয়া গ্রামের ফটিকচন্দ্র কুণ্ডুর বাড়ীতে মাত্র ৫০ মণ চাউল পাওয়ায়, প্রকাশ্য রাস্তায় বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে বেত্রদণ্ড হইতে রেহাই দিয়া অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সোনাতলা গ্রামের জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নিকট ৫০০ মণ চাউল পাওয়া যায়। সৈন্যরা সম্পূর্ণ চাউল আটক করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে নির্দ্ধারিত ২০৲ টাকার স্থলে ১৫৲ টাকা দরে বিতরণ করে। পাঁচবিবি থানায় জনৈক বিহারী ব্যবসায়ীর গুদামে কয়েক বস্তা গম পাওয়া যায়, এজন্য তাহাকে ৩ ঘা বেত ও ৯০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বগুড়া শহরের ডাঃ টি. আহম্মদ সাহেবের বাড়ীতে ২০০ বস্তা গম পাওয়া যায়। গুদামের চাবি আনিতে দেরী হওয়ায় সৈন্যরা লাথি মারিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তাঁহার সমস্ত গম ১৫৲ টাকা স্থলে মাত্র ৭৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হয়। উক্ত শহরের দানশীল ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মোঃ খবির রহমান সাহেবের বাড়ীতে ৫০ হাজার মণ চাউল পাওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁহার আবেদনক্রমে ও স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি আবেদনে বলেন যে, এই মজুদ চাউল প্রতি বৎসর এই সময়ে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে। ইহা ব্যবসায়ের জন্য মজুত করা হয় নাই।

রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় মজুতদারদের খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য ইট ও সিমেণ্ট পূর্ণ বস্তা পিঠে চাপাইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে ঘুরাইয়া শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি পাঠান্তর

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের আত্মা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ধর্ম, ইতিহাস, মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য—সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্‌গীতা তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ, হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মহাভারতের যুদ্ধ আনুমানিক ১৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাযুদ্ধের সময় গীতা প্রচার করেন। কিন্তু বর্তমান আকারে মহাভারত এবং তাহার অংশ গীতা ০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নহে। এই জন্য তাঁহারা মনে করেন যে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ভাগবত ধর্মের মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহা আক্ষরিক ভাবে তাঁহার উক্তি নহে। ভক্তগণের নিকট ঐতিহাসিক-দের কথার যাহাই মূল্য হউক না কেন, এই গীতায় যে পাঠান্তর ও প্রক্ষেপ আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।* অভিনব গুপ্ত (জন্ম ৯৫০—৬০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার শ্রীভগবদ্‌গীতার্থ সংগ্রহে কয়েকটি পাঠান্তর এবং কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা প্রচলিত গীতায় দৃষ্ট হয় না (দ্রষ্টব্য : ডক্টর কান্তিচন্দ্র পাণ্ডে রচিত "Abhinava Gupta", vol. I, pp. 52-55)। আমি এখানে একটি সুবিখ্যাত শ্লোকের পাঠান্তর উদ্ধৃত করিতেছি—

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মাংশং সৃজাম্যহম্‌॥
(৪র্থ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)

প্রচলিত পাঠ "আত্মানং"।

এখন বিচার করিতে হইবে এই দুই পাঠের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত পাঠ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।"

"আত্মানং সৃজাম্যহং" পাঠে ভগবানের পূর্ণাবতার বুঝাইতে পারে (আত্মাকে অর্থাৎ মহাত্মাকে প্রেরণ করি—এ অর্থও হইতে পারে) কিন্তু "আত্মাংশং সৃজাম্যহং" পাঠে ভগবানের অংশাবতার বুঝাইবে। এখন দেখা যাউক মহাভারতে এবং অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বলরামের ন্যায় অংশাবতার বলা হইয়াছে কিনা।

মহাভারতে—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্‌ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্‌।

অনুবাদ—

যিনি নারায়ণ নামে সনাতন দেবদেব, প্রতাপশালী বাসুদেব মনুষ্য মধ্যে তাঁহার অংশ ছিলেন। (আদিপর্ব ৬৭।৭১।)

পুনশ্চ মহাভারতে—

স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত, একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্‌।
তৌ চাপি কেশাবিশতাং যদূনাং
কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ ;
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব,
যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ ;
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব,
কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ।
(বৈবাহিক পর্বাধ্যায়)

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—

"নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল ; শুক্লকেশ বলদেব রূপে আর কৃষ্ণকেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন ; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব বলে।"

ভাগবতে—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ, ক্লেশ ব্যায়ায় কলয়া
সিতকৃষ্ণ কেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ, কর্মাণি চাত্মমোহি-
মোপনিবন্ধনানি। ২।৭।২৬

বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদ—

"অনন্তর ভগবান্‌ নারায়ণ অসুরাবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমর্দিত পৃথিবীর ক্লেশ হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশস্বরূপে রামকৃষ্ণ রূপ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাব্যঞ্জক নানা কার্য্য করিলেন।"

---

* I think, too, that the original Bhagavadgita was much shorter and that the work in the present form contains many more interpolations and additions than are assumed by Garbe (Winternitz, "A History of Indian Literature", Vol. I, p. 436).

বিষ্ণু পুরাণে—

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ॥৫৯
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥৬০

বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদ—

"হে মহামুনে। ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া, আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার জন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে।"

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি অংশাবতার হন, তবে গীতায় নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোক ও তৎসদৃশ শ্লোকগুলি যাহা পরমব্রহ্মের প্রতি প্রযোজ্য, কিরূপে তাঁহার উক্তি হইতে পারে?

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭।৭

হে ধনঞ্জয়। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে মণি সকল যেমন গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতে সর্ব (বিশ্ব) গ্রথিত রহিয়াছে—

ইহার উত্তর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতায় প্রদান করিয়াছেন।

ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।১২
পরং হি ব্রহ্মকথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।১৩

(এক্ষণে) পুনরায় আমি তাহা সমগ্ররূপে বলিতে সক্ষম নহি। আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়া সেই পরমব্রহ্ম (প্রত্যাদিষ্টবাণী) কহিয়াছিলাম। (মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব, ১৬ অধ্যায়)।

বেদান্তদর্শনেও সূত্রিত হইয়াছে যে, জীবের মুখে পরম ব্রহ্মের বাণী উচ্চারিত হয়।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধ ভূমা হ্যস্মিন্। ১।১।২৯

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ। ১।১।৩০

এই দুই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে যে ইন্দ্রের উক্তি আছে "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব" (আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা, এইরূপ জ্ঞানে আমি যে আয়ু ও অমৃত আমার উপাসনা কর) এবং শ্রুতিতে যে বামদেবের উক্তি আছে—"অহং মনুরভবং সূর্যশ্চ" (আমি মনু ও সূর্য হইয়াছিলাম) তাহা পরমব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

এইরূপ মতবাদ ইসলামীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রেও (সুফীমতে) স্বীকৃত হইয়াছে। বিখ্যাত সুফীসাধক মৌলনা রুমী তাঁহার মসনভী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

মর্দানে খুদা খুদা না বাশদ্।
ওলয়কিন্ আয্ খুদা জুদা ন বাশদ ॥
গুফ্‌তঃ-এ-উ, গুফ্‌তঃ-এ-আল্লাহ্ বুওদ্।
গরচি দর্ হুলকুমে, আব্দুল্লাহ্ বুওদ্ ॥

মর্মার্থঃ খোদার লোক খোদা হন না। কিন্তু খোদা হইতে পৃথকও হন না, তাঁহার উক্তি আল্লাহের উক্তি, যদিও মানুষের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত।

প্রসিদ্ধি আছে যে, সুফীসাধক মনসুর হল্লাজ (তাপসমালা দ্রষ্টব্য) "আনাল্ হক" (আমি সত্য খোদা) বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মবিদ্। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মতুল্য" হন ("ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি") ইহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, আঙ্গিরস ঘোর মুনি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মহাভারতের মোক্ষ পর্বে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ উপমন্যু মুনির নিকট হইতে দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ২৮টি আগম শিক্ষা করিয়াছিলেন। হরিবংশে কথিত হইয়াছে যে, দুর্বাসা মুনি শ্রীকৃষ্ণকে চৌষট্টিটি অদ্বৈত আগম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইহা পরবর্তী মত। উপনিষদে পূর্ণাবতারবাদ উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা অনেক মনীষীর মত। ধর্মের ইতিহাসে পূজ্যপাদ ধর্মপ্রবর্তকগণকে পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরের সমতুল্য জ্ঞানে পূজা-অর্চনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

১৭

ব্রজবিহারী বাবু এসে যা দেখলেন—তাতে শঙ্কিত না হয়ে পারলেন না। সমস্ত আসরটা যেন থম্ থম্ করছে। একটা বিস্ফোরণ যেন আসন্ন। সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ মাঝখানকার সবচেয়ে বড় টেবিলটার উপর। খানকয়েক হাইবেঞ্চ জুড়ে টেবিলটি সাজানো হয়েছিল। অন্ততঃ জনচল্লিশেক অতিথির বসবার ব্যবস্থা টেবিলটিতে। নবগ্রামের বিশিষ্ট হিন্দুরা ও খানে বসবেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। কয়েকজন বৈদ্য কায়স্থও আছে। নিতান্ত গোঁড়া যাঁরা—যাঁরা স্বজাতি ছাড়া—উচ্চই হোক আর নিম্নই হোক—কারুর সঙ্গেই এক পংক্তিতে বা টেবিলে খাবেন না—তাঁদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ওপাশে মুসলমানদের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। সাজানো-গোছানোতে কোন তারতম্যই নেই। তবুও গোলাম এসে এই মাঝের টেবিলে বসেছে।

মৌলবী জিয়াউদ্দিন সাহেব গোলামকে বলেছিলেন—ইদিকে গোলাম। আমাদের জায়গা ইদিকে।

গোলাম হেসে বলেছে—আপনাদের মোল্লা-মৌলবী গোঁড়ামি আমার নাই মৌলবী সাহেব। আমি এইখানে সবার সঙ্গে বসব। ইখানে ত দেখি বামুন-বদ্যি কায়েত সব একসঙ্গে বসেছে। মুর্গীর কোর্ম্মার সঙ্গে চচ্চড়ি, পোলাওয়ের উপর লুচি—ইখানে ডবল ব্যবস্থা।

মৌলবী বলেছিলেন—কালীথানের কাটা পাঁঠার শুরুয়াও পড়বে। তাও খাবি তুই?

—তা খাব। আপনি ইখান থেকে সরে থাকবেন, দেখবেন না—তা হলেই হবে। দেশের নতুন হালচাল মৌলবী সাহেব—এখন আর উসব কথা তুলবেন না।

— কিন্তু উঁাদের মধ্যে যদি কারুর আপত্তি থাকে—

—বলুন সে কথা। উঠে যাই।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে সে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কেউ কিছু বলে কিনা তার প্রতীক্ষা করেছিল। বলতে কেউ কিছু পারে নি, কিন্তু মুখ সকলেরই থমথমে হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড একটা ক্ষোভের আভাস ছিল সেই থমথমে ভাবের মধ্যে। শুধু যেন গতিহীন হয়ে আছে। কাল-বৈশাখীর অপরাহ্নের পশ্চিম আকাশের মেঘের মত। শুধু ঝড়ের অভাবে গতিহীন-স্থির, ঝড় উঠলেই বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করে আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

গোলাম আবার বলেছিল—এই দেখুন সব চুপ করে আছেন। কেউ না বলেন না। সেই বঙ্গবিভাগের কাল থেকে ওঁরা বলে আসছেন—হিন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই। সে কি মিছা বলেছেন ওঁরা! না, কি বলছেন ছোটবাবু।

ছোটবাবু অর্থে ইস্কুলের সেক্রেটারী পবিত্রবাবু।

পবিত্রবাবু এদিক দিয়ে উদার লোক, জাতিভেদের কোন সংকীর্ণ সংস্কারই তাঁর নেই। সায়েব-সুবার সঙ্গে প্রকাশ্যেই তিনি একরকম খাওয়া-দাওয়া করে থাকেন। কিন্তু আর একটা ভেদ তিনি মানেন। সে ভেদটা পদস্থতার ভেদ। তিনি খ্রীষ্টান মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে একসঙ্গে খান, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সিডিউল কাস্টের এম-এল-সির সঙ্গে খান, কিন্তু তাই বলে তাঁর প্রজা—এবং উদ্ধতচরিত্র এই গোলাম হোসেনের সঙ্গে খেতে পারেন না। সিডিউল কাস্টের কোন সাধারণ জনের সঙ্গে খাবেন না। শিক্ষায় সম্মানে পদস্থতায় যিনি তাঁর সমশ্রেণী তাঁর সঙ্গে খাবেন

তিনি—অন্য কারুর সঙ্গে নয়। স্বজাতি সমবর্ণ বলে তিনি তাঁর বাড়ীর রাঁধুনী-বামুন বা গোমস্তার সঙ্গে খাবেন না। পবিত্রবাবু ছাড়া আরও যাঁরা ছিলেন—তাঁদেরও মনোভাব তাই। তা ছাড়াও এ ক্ষেত্রে আরও একটু কিছু ছিল। এটি ঠিক পার্টি নয়, ডিনারও নয়, এটিতে সামাজিক সংস্পর্শ যেন একটু বেশী হয়েছে পার্টির চেয়ে।

পবিত্রবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন—গোলামের বাচালতায়।

গোলাম কিন্তু ঠিক বাচালতা করে নাই। বেশী কথা সে বলেছে এটা ঠিক, প্রগলভতাও ছিল—তাও সত্য তবু ঠিক বাচালতা সে করে নাই। জীবনে সে অভ্যুদয়ের স্বাদ পেয়েছে। সে স্বাদের নেশায় এবং পুষ্টিতে সে সবল ভাবে মাথা তুলতে চায় স্বাভাবিক ভাবেই। সকলের সঙ্গে সমান হয়ে এই জাগরণের ক্ষণে একসঙ্গে পথচলার আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাও তার ছিল।

ব্রজবিহারী ভাবছিলেন—তিনি গিয়ে গোলাম হোসেনকে অনুরোধ করবেন কিনা। এদিকে হিন্দুমহলে গুঞ্জন উঠতে সুরু হয়েছে।

এ কি অন্যায় ?

ওদিকে মুসলমানদের চোখের দৃষ্টিও যেন আসন্ন অপমানের আশঙ্কায় নিনিমেষ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই সময়টিতেই পিছন দিকে শিবনাথের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন ব্রজবিহারী বাবু।

"—আপনাদের সকলের কাছে আজকের অপূর্ব্ব এই প্রীতি-সম্মেলনে আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

শিবনাথ একখানা চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আবার সে বললে—পুনরাবৃত্তি করলে কথাটি। বার-দুয়েক তার কণ্ঠস্বর—বক্তব্য সমবেত জনতার গুঞ্জনের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু শিবনাথ থামলে না। তৃতীয় বারেই সকলের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হ'ল। তার পরই একটি মুহূর্ত্ত এল, স্তব্ধতার মুহূর্ত্ত।

শিবনাথ সেই মুহূর্ত্তে আরম্ভ করলে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ধর্ম্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা। দীর্ঘ সে করলে না, তীব্রও কিছু বললে না। বললে এ অন্যায়, এ গত যুগের মনোভাব। সে যুগ পার হয়েছি আমরা। সকলে পারি নি। কতক পারি নি—কতক পেরেছি। আসুন, আমরা যারা, হিন্দু মুসলমান ইহুদী খ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ পারসীক, ধর্ম্ম-ভেদে মানুষে মানুষে ভেদ আছে বলে মানি নে, যারা ধর্ম্ম এবং জীবন বিশ্বাসকে কাচের বাসনের মত ভঙ্গুর বলে মনে করি নে—তাঁরা সকলে মিলে আসুন একটি আলাদা খাবার আসর পাতি। বিরোধ আমরা চাই নে। যাঁরা যা মানেন মানুন। আমরা যা মানি সে মেনেই চলি। আমাদের আসরে হোস্ট হবেন আমাদের পূজনীয় আগেকার এসিস্টাণ্ট হেড মাষ্টার ব্রজবিহারী বাবু এবং চীফ গেষ্ট হবেন—শম্ভু গড়াঞী, যে ছাত্রটি এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইউনিভারসিটিতে ফার্স্ট হয়েছে তার দাদা। আর স্পেশাল গেষ্ট হবেন আমাদের বন্ধু গোলাম হোসেন।

তার পরই সে গোলামকে উদ্দেশ করে বললে—

—এস গোলাম, স্পেশাল গেস্ট বলে তোমার বসে থাকলে চলবে না। এস, সাহায্য কর আমাকে। আমাদের টেবিল-চেয়ার আমরাই পেতে নেব। এস।

গোলাম প্রসন্ন চিত্তেই ও টেবিল থেকে উঠে এল।

শিবনাথের বলার ভঙ্গি এবং বক্তব্যের মধ্যে আশ্চর্য্য একটি প্রসন্ন অথচ দীপ্ত হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। যে স্পর্শটি আকস্মিক সমাগত কোন স্নিগ্ধ শীতল বাতাসের ঝলকের মত কালবৈশাখীর বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জকে শান্ত এবং ক্লান্ত করে দিয়ে আসন্ন বিপর্য্যয়টাকে দূরে সরিয়ে দিলে, এবং উল্টে দিগন্তের সন্ধ্যা-সূর্য্যের শেষ রাঙা আলোকে নিজের বুকে প্রতিফলিত করে একটি রক্তসন্ধ্যার বাসর সাজিয়ে দিলে।

ব্রজবিহারী বাবু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শিবনাথকে বললেন—আমি প্রার্থনা করছি যেন তোমরা এমনি করেই সকলে মিলে সকল দ্বন্দ্ব এবং বাধাবন্ধ অতিক্রম করে নতুন দিনের সমাজ গড়ে তুলতে পার।

সুর সকল জনের মনেই লেগেছিল। পবিত্রবাবু খেলেন ও টেবিলে বসে, কিন্তু খাওয়ার পরে এসে এই টেবিলে ব্রজবাবুর পাশে একখানা চেয়ার নিয়ে বসে বললেন; শিবনাথ, তুমি আবৃত্তি কর। ওই কবিতাটি আবৃত্তি কর—হে মোর চিত্ত—পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে।

শিবনাথ ছেলেবেলা থেকেই ভাল আবৃত্তি করে।

শিবনাথের আপত্তি নাই কিছুতে। সে দাঁড়িয়ে উঠল।

আবৃত্তি শেষ করে বসে সে বললে—রবি একটা ইংরেজী আবৃত্তি করুক। বলুন ওকে।

পবিত্রবাবু প্রশ্ন করলেন—রবি ?

—আমাদের এখানে পড়ত। এবার এম-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। অঙ্কে অবশ্য ও ভালই বটে, কিন্তু ইংরেজীতেও কম ভাল নয়। আর অভিনয় করতে পারে সবচেয়ে ভাল। বিশেষ করে ইংরেজী নাটকে অভিনয় করবার ঝোঁক খুব।

হেসে বললে—তার উপর ওর ওই সুন্দর চেহারা। ইউরোপ-আমেরিকা হলে ও চলে যেত ষ্টেজে কিংবা ফিল্মে। কিন্তু আমাদের দেশে তা ত হবে না। অভিনয় করতে গেলেই বদনাম। এ যুগে শিশিরবাবু, নরেশবাবু, তিনকড়ি-

বাবু, অহীনবাবু, দুর্গাদাসবাবু থিয়েটারে নেমেও এখনও জাতে তুলতে পারেন নি। নাও রবি, তুমি একটা আবৃত্তি কর।

রবি সারাক্ষণটাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। সে যেন মুহ্যমান হয়ে গেছে। মৃদু স্বরে সে বললে—শরীরটা আমার ভাল লাগছে না ভাই।

শিবনাথ বললে—তা না হয় একটু কষ্ট হ'ল তোমার। আমরা ত আনন্দ পাব! ওঠ-ওঠ। তুমি সেই রোমিওর পার্ট করেছিলে স্কটিশে—রোমিওর সেই জায়গাটা—

It is the east and Juliet is the Sun—

রবি একটু চুপ করে থেকে বললে—না, ও জায়গাটা নয়, আমি অন্য জায়গা থেকে আরত্তি করছি। লাষ্ট সিন রোমিওর—লাষ্ট পিস—How aft when men are at the point of death—ওখান থেকে সুরু করছি।

রবি সত্যই সুন্দর আবৃত্তি করে। তার কণ্ঠস্বর ভরাট—তার সঙ্গে মাধুর্য্য আছে। উচ্চারণও চমৎকার। আকাশের দিকে মুখ তুলে উদাস কণ্ঠস্বরে সে আবৃত্তি আরম্ভ করলে।

Have they been merry!

Which their keepers call

A lightning before death. O, how may I

Call this a lightning.

O my love my wife

Death, that hath suck'd the

honey of thy breath,

শ্রাবণ-রাত্রির বাতাসের মধ্যে সজল স্পর্শের মত একটি বেদনার্ত্ততা ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার চিত্ত বেদনায় সকরুণ হয়ে ওঠে। যারা ইংরেজী জানে না, কম জানে অর্থবোধ না হওয়া সত্ত্বেও তারাও অভিভূত হয়ে গেল। চারি পাশে ভিড় জমে উঠল। টেবিলের ধারে সর্ব্বাগ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রবাবু। তাঁর চোখ দুটি আনন্দের দীপ্তিতে ঝলমল করছে। তাঁর ছাত্র এমন আবৃত্তি করছে? তা ছাড়া সেক্সপীয়রের কাব্যামৃত-ধারা পানের আনন্দ! এ শুনলে জীবনে যেন ঝঙ্কার উঠে। সঙ্গীতঝঙ্কার!

রবির আবৃত্তি শেষ হতেই চন্দ্রবাবু গিয়ে তার পিঠে হাত দিলেন। মুখ তাঁর হাসিতে ভরে উঠেছে। বললেন—তুমি আর একবার এম-এ এগজামিনেশন দাও—ইংরেজীতে।

রবি একটু হাসলে। কোন উত্তর দিলে না।

ব্রজবিহারী বাবু বললেন—তাই ত বাংলা ইরেজী দুই হ'ল—সংস্কৃত আবৃত্তি কেউ করতে পারে না? কৈ হেড-পণ্ডিতমশাই কৈ? ছেলেরা যদি না পারে ত পণ্ডিতমশাই কিছু শোনান আমাদের। কৈ পণ্ডিতমশাই?

পবিত্রবাবু বললেন—মন্দ হয় না। পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত আর মৌলবী সাহেব ফারসী। কালিদাস আর হাফেজের বয়েৎ।

—ডাক, ডাক পণ্ডিতমশায় আর মৌলবী সাহেবকে ডাক—শিবনাথ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললে।

ছেলের দল উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দানুষ্ঠানের আস্বাদন তারা সচরাচর পায় না। তার উপর শিবনাথ বলেছে। দেশসেবক শিবনাথ তাদের গোপন মনে অনেক আগে থেকেই গুরুর আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কয়েকজনেই ছুটে চলে গেল।

—পণ্ডিতমশাই! মৌলবী সাহেব!

ব্রজবাবু বললেন—ওঁরা আসতে আসতে শিবনাথ কিংবা রবি তোমাদের কেউ আর একটা আবৃত্তি কর।

শিবনাথই আবৃত্তি করলে—ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর। এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

ছেলেরা ফিরে এসেছিল আবৃত্তির মধ্যেই; তারা পণ্ডিত-মশাইকে পায় নি। আবৃত্তি শেষ হতেই বললে—পণ্ডিত-মশাই চলে গেছেন।

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হলেন—চলে গেছে? কখন? কৈ তাঁকে ত কিছু বলেন নি! এই ত গণ্ডগোলের সূচনার সময়েও রামজয় ছিলেন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন রামজয়; বলেছিলেন, এই সর্ব্বনাশের ভয়েই আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম চন্দ্র। একসঙ্গে একদিনে এক আসরে খাবার ব্যবস্থা করো না। করো না

শিবনাথের বক্তৃতার সময়েও ছিল। সেই সময়েই চন্দ্রবাবু আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে এসে-ছিলেন রামজয়কে পিছনে ফেলে। তার পর আর রামজয়ের খোঁজ করেন নি। ভুলে গিয়েছিলেন। বিচিত্র ভাবে আসন্ন বিপর্যায় ক্ষান্ত হয়ে এমনই মনোরম মাধুর্য্যময় একটি পরিবেশের আবির্ভাবে তিনি আনন্দে ভুলে গিয়েছিলেন রাম-জয়ের কথা। সে চলে গিয়েছে। নিশ্চয় সে খেয়েও যায় নি। হয়ত বা নিজের বিশ্বাসে আঘাত খেয়ে মর্ম্মাহত হয়ে চলে গিয়েছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন চন্দ্রবাবু। তার পরই হঠাৎ বললেন—তা হলে এখানেই থাক মাষ্টার-মশাই। রাত্রি কম হয় নি। শিবনাথ তুমি একটু দাঁড়াও।

শিবনাথকে ডেকে বললেন—তুমি আজ যা করেছ তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।

শিবনাথ একটু হেসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

চন্দ্রবাবু বললেন—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তোমাকে কিছু বলতে চাই আমি।

—কাল আসব আমি।

—না, আমি যাব। আমি যাব তোমার ওখানে। তোমার স্কুল-বোর্ডিঙে আসাটা ঠিক হবে না। পুলিশের এখন বড় কড়াকড়ি। আমি যাব।

রবি সিং এসে দাঁড়াল।

—রবি! কিছু বলবে?

চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করে রবি বললে—আমি এইবার যাব, স্যার।

—যাবে? এই রাত্রে কোথায় যাবে? না-না। তোমার শোবার ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে। যতদূর জানি—শম্ভু তার নিজের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছে।

—আমি শিবনাথের বাড়ীতে যাচ্ছি। ওখানেই আমার গাড়ী রয়েছে। ভোরবেলা রওনা হয়ে যাব। আর শিবনাথ রাজী হলে এই রাত্রেই গাড়ী ছেড়ে দেব, রাত্রে রাত্রে দিব্যি চলে যাব।

ভোরবেলা ব্রজবিহারী বাবু শিবনাথের বাড়ী এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকলেন—শিবনাথ! শিবনাথ! শিবনাথ তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রায় সমস্ত রাত্রিটাই রবির সঙ্গে গল্প করেছে। প্রায় রাত্রি তিনটের সময় রবি তার গাড়ী ছেড়েছে। ক্রোশ তিনেক পথ, সাতটা বেলা হতে হতে সে বাড়ী পৌঁছে যাবে। সে আর শোয় নি।

শিবনাথকে ডেকে দিলেন তার মা।

—শিবনাথ বেরিয়ে এল। কি স্যার! এই ভোরবেলা? ও—এই ভোরের ট্রেনে চলে যাচ্ছেন বুঝি?

—না। কিন্তু রবি কোথায়?

—রবি? সে ত চলে গেছে স্যার। সমস্ত রাত্রিই আমরা গল্প করেছি। রাত্রে তিনটের সময় আমি শোবার জন্যে উঠলাম—ও বললে আমি আর শোব না ভাই, গাড়ীতেই শুই—গাড়ী চলুক, সাতটা নাগাদ বাড়ী পৌঁছে যাব।

—চলে গেছে রবি? ব্রজবিহারী বাবুর কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটে উঠল।

শিবনাথ বললে—মাষ্টার মশাইকে বঙ্গবালার সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে রাজী করুন স্যার। রবি বঙ্গবালাকে বিয়ে করতে চায়, সত্যি ভালবাসে। সমস্ত রাত্রি আমার সঙ্গে ওই কথাই বলেছে। এত তাড়াতাড়ি চলে গেল ওই জন্যেই। ওর বাবা মাকে বলবে, রাজী করবে, লোক পাঠাবে স্যারের কাছে। স্যার যেন ফিরিয়ে না দেন।

ব্রজবাবু স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। শিবনাথের কথা শেষ হয়ে গেল, তবুও স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

শিবনাথ বিস্মিত হ'ল এবার। ব্রজবিহারী বাবুর মুখে-চোখে যেন অপরিসীম বেদনার ছায়া পড়েছে। সে বেদনা যেন ফেটে পড়তে চাচ্ছে; প্রাণপণে তিনি আত্মসম্বরণ করে রয়েছেন। কিন্তু তাও পারছেন না; দুই চোখের কোণ থেকে দুটি জলধারা নেমে আসছে। এসেছে আগেই, হাই-পাওয়ার চশমা সীমারেখা পার হওয়ার পর শিবনাথ দেখতে পেলে। সে এবার উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে স্যার? স্যার?

—বঙ্গবালা—

—কি স্যার?

—সে বিষ খেয়েছে শিবনাথ।

—বিষ খেয়েছে?

—হ্যাঁ। কল্কে ফুলের বীজ। একটু চুপ করে থেকে আত্মসম্বরণ করে বললেন—কাল রাত্রে তোমরা সকলে চলে এলে—আমি মাষ্টার মশাইয়ের ওখানে গেলাম। ওই কথাটাই বলতে গেলাম। রবির ওই আবৃত্তি শুনে আমার মনে হয়েছিল—ওগুলি ওরই প্রাণের কথা। নইলে দুঃখের এমন সুর ফুটে উঠত না। আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম বঙ্গবালা কোথায়? কারণ ওর সামনে বা ওকে শুনিয়ে এ আলোচনা করতে আমি চাই নি। শুনলাম—সে শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালবেলা পায়ের আঙুলে হুঁচোট খেয়ে নখ উঠে গিয়েছিল, সন্ধ্যেবেলা থেকে সেটাতে খুব বেদনা হয়।

চুপ করলেন ব্রজবিহারী বাবু। তার পর বিষণ্ণ হেসে বললেন—ওটা তার ছুতো। মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী ভালমানুষ লোক, কিছু সন্দেহ করেন নি। বললেন—বঙ্গবালার গায়ে হাত দিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর যে, যেন কপালটা একটু গরমও ঠেকছে। নইলে আমরা যখন চা খেলাম—বঙ্গবালা যখন আমাদের পরিবেশন করলে—তখনও ত তাকে এতটুকু খোঁড়াতে দেখি নি! ওটা বঙ্গবালা বোধ হয় কাঁদবার জন্যেই অজুহাত তৈরি করেছিল। রবিকে ভালবাসা সেও ভুলতে পারে নি। যাই হোক—বঙ্গবালা ঘুমিয়েছে জেনে আমি মাষ্টার মশায়ের কাছে কথাটা পেড়েছিলাম। মাষ্টার মশায় বললেন—ও কথাটা ভুলে যাওয়াই ভাল ব্রজবাবু। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি বঙ্গবালাকেও জিজ্ঞাসা করেছি। সেও হাসিমুখে বলেছে আমাকে। আমার ছেলে নেই, ওই আমার ড্রিম—আমার স্বপ্ন সফল করবে। ওকে আমি এম এ পাস করাব। প্রফেসরী করবে। না হয় ত—বি-এ পাস করে এখানে গার্লস হাই স্কুল করবে।

আমি এখানে প্রথম হাই স্কুল করেছি—ফর দি বয়েজ। আমার মেয়ে করবে হাই স্কুল ফর দি গার্লস। দিস ইজ মাই ড্রিম। তা ছাড়া—আরও একটা কথা তিনি বললেন। কথাটা আমি একেবারে ফেলে দিতে পারলাম না শিবনাথ।

—উনি বললেন—দেখুন ব্রজবিহারী বাবু, রবির মত ছেলের সঙ্গে বঙ্গবালার মত মেয়ের বিয়ে হওয়াও উচিত নয়। রবি রাজী হলেও দেওয়া উচিত নয়। রবি রূপবান ছেলে—গুণবান ছেলে, অবস্থাও ওদের ভাল। বঙ্গবালা আমার কালো মেয়ে। আমি গরীব শিক্ষক। আজ হয় ত একটা ইমোশনের বশে রবি বঙ্গবালাকে বিয়ে করতে চাইলেও চাইতে পারে। চাইবে না বা চায় না বলেই আমার ধারণা। আপনি যেটা বলছেন সেটা আপনার অনুমান মাত্র। আবৃত্তি ভাল যারা করে তারা হাসির কথায় হাসায়, দুঃখের কথায় কাঁদায়। ওর আবৃত্তি আবৃত্তিই শুধু। যদি আপনি যা বলছেন তাই হয়—তবে সেটা একটা সাময়িক ব্যাপার—টেম্পোরারী ইমোশন। এখন সেইটের বশে বিয়েও হয় ত করতে পারে রবি। কিন্তু এর পর—সমস্ত জীবনটা পড়ে থাকবে। রবি বিলেত যাবে। হয় ত ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। কিংবা একটা বড় চাকরে। হয় ত আই-সি-এস। তার পর বঙ্গবালার কালো চেহারার জন্যে ও লজ্জিত হবে অন্য সব বন্ধুবান্ধবদের কাছে। হয় ত এমন একজন কৃতী পুরুষ রূপবান ইয়ংম্যানকে দেখে অন্য মেয়েদেরও মন চঞ্চল হবে; এ সব সোসাইটির অনেক কথাই ত শোনা যায়! তখন? তখন ব্রজবিহারী বাবু—ওর অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন! বললেন—ব্রজবাবু, আই হ্যাড মাই স্যাড এক্সপিরিয়েন্স। আমার ইস্কুল জীবনে আদর্শ ছিল—আমার এক বন্ধু। সে বলত—তার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। গীতা ছিল তার কণ্ঠস্থ। অনেক কৃচ্ছ্র-সাধন সে করত। আমাদের আমলের ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। আমাদের আমল কেন—সকল আমলের ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেদের একজন সে। তাকে দেখলাম—ইংরেজ প্রোফেসরের মেয়েকে দেখে পাগল হ'ল। ক্রীশ্চান হয়ে বিলেত গেল। বাপ ছাড়লে মা ছাড়লে জাত ছাড়লে। আই-সি-এস হয়েছেন। এ সব ছেলেকে আমি ভয় করি ব্রজবিহারী বাবু। রবিকে আমার আরও ভয়—সে রূপবান। এ কথা ভুলে যান। এ কথা না তোলাই ভাল। বিয়ে দিলে—সেকালেই দেওয়া উচিত ছিল। রবি এখন আমাদের নাগালের বাইরে। রবি নিজে উপযাচক হয়ে বললেও এ বিয়ে আমি দেব না।

—ফিরে ঘুরে আবার বললেন—বাপের কাছে ছেলেরা অনেক কিছু—ব্রজবাবু। বঙ্গবালা আমার ছেলের মত। না হয় আমার জন্যে কষ্ট করবে। আমি উঠে চলে গেলাম। শুলাম। সকলেই শুলেন। এর মধ্যে বঙ্গবালা কখন উঠেছে, বাসার পাশেই কল্কে ফুলের গাছ আছে—সেখান থেকে ফল পেড়ে সেই গাছতলাতেই ভেঙে বীজের ভিতরের শাঁসগুলো বের করে তেল মেখে—ঘরে এসে—'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' বলে একখানা চিঠি লিখে—আর একখানা বাবাকে লিখে—শুয়ে পড়েছে। ভোরবেলা গোঙানি শুনে মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়, তিনি মাষ্টার মশাইকে ডেকে তোলেন। তার পর দরজা ভেঙে দেখা গেল সব। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। চেষ্টাও চলছে। কিন্তু অবস্থা দেখে আমার ভাল লাগল না। বাঁচবে না। বাপকে চিঠি লিখেছে, "বাবা আমি আপনার অযোগ্য কন্যা। আপনার স্বপ্ন সফল করবার শক্তি যে আমার নাই। একথা কোন মুখে—কেমন করে আমি বলব? অথচ তাকে নইলেও আমি বাঁচব না। তাই আমি বিষ খেলাম। এ আমার বড় লজ্জা। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।" তাই আমি ছুটে এলাম। রবিকে যদি পাই।

ম্লান হেসে বললে—তাকে পেয়ে কি হবে জানি না, তবে ছুটে এলাম। সে চলে গেছে!

—মাষ্টার মশাই? শিবনাথ প্রশ্ন করলে। তিনি?

—পাথর। পাথর হয়ে গেছেন চন্দ্রবাবু।

ক্রমশঃ

বিষকন্যা
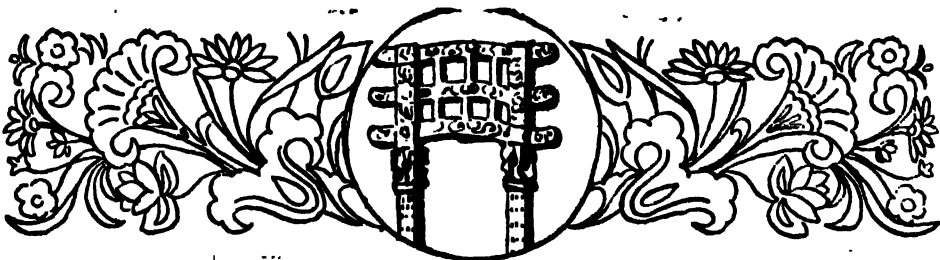
শ্রীকৃষ্ণধন দে

[এককালে এ দেশে রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ গুপ্ত প্রক্রিয়ায় মারাত্মক বিষ প্রয়োগে সুন্দরী নারীর দেহ এরূপ ভাবে বিষাক্ত করা হইত যাহাতে সে-দেহ সম্ভোগ-কারীর অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিত। এই অপরূপ সুন্দরী নারী রাজানুগ্রহ-পালিতা ও "বিষকন্যা" নামে অভিহিতা হইতেন।]

রাজন্, দাসীরে কেন বল, দিতে লাজ
পাঠালে এ অভিসারে
রাজ-অতিথির দ্বারে ?
লেপিয়া অঙ্গে কুঙ্কুম-চন্দন
তুলিয়া চরণে মঞ্জীর-শিঞ্জন
সাজায়ে কুসুমে চারু-বেণী-বন্ধন
আঁকিয়া নয়নে কজ্জল-রেখাটিরে
গরল-কুম্ভ সুধা-ছলনায় ভরি'
গিয়েছিনু দিতে উন্মুখ পিয়াসীরে।

মিলন-ব্যাকুল বিলাস-লীলার ছলে
সে-হাতে রেখেছি হাত,
কেঁপেছে মাধবী রাত !
প্রথম-প্রণয়-স্বপন-বিভোর তৃষিত চোখ
মোর তনুমাঝে দেখেছে নূতন স্বর্গলোক,
ভেবেছিনু মনে এ দেহ-পণ্য ধন্য হোক্
তাহারি পরশে তরুণ বক্ষতলে,
বলেছি তাহারে প্রণয়-বিভোল বাণী
মধুগুঞ্জনে মোহ-চুম্বন-ছলে—

"রূপ-বিহঙ্গী মেলিয়াছে তার ডানা,
ধরিবে না আজ তারে
কামনার অভিসারে ?
তনুর পাত্র ফেনিল তপ্ত সুধায় ভরি
হে মোর তরুণ, তোমারি তরে যে রেখেছি ধরি,
কবরী-মালিকা আশ্লেষে তব পড়ুক ঝরি
ললাটে কপোলে মুছে যাক্ চন্দন,
পাওনি শুনিতে রূপ-হিন্দোলে মোর
উড়ায় দুকূল চঞ্চল যৌবন ?"

একটি নিশার নিরালা মিলন হোক ক্ষণিক,
—তবু সে শুভক্ষণ
আমার পরম ধন !
অজানা মরণ আসিবে কখন সে নাহি জানে,
ভেসেছি দু'জনে কামনা-ফেনিল স্রোতের টানে,
বারে বারে তারে বেঁধেছি হিয়ায় মিলন-গানে
অসহ পুলকে মরণ-তীর্থ-তীরে,
তন্দ্রা-অবশ অচেতন তনুখানি
সারারাত আমি তনুতে রেখেছি ঘিরে !

হে রাজন্, আজ এ দেহ-শোণিতে মোর
করে শুধু ক্রন্দন
চির বিষ-বন্ধন !
রাজার নীতিতে নারীর নীতিতে প্রভেদ তাই,
সোনার বদলে দেহের বেসাতি নাহিক চাই,
গরল-সাগরে, হায় রে, অমৃত কোথায় পাই
প্রেম-বিহ্বল মোহ-চঞ্চল রাতে,
ব্যাকুলা ত্রিযামা শুকতারা পথ চাহি
শিহরি' উঠেছে বিদায়ের বেদনাতে !

তনুর প্রদীপে এ রূপশিখা কি জ্বলিবে শুধু
পতঙ্গ দেহ মাগি
মরণ-আহুতি লাগি ?
দেখাবে না পথ, দেখাবে না আলো অমানিশায় ?
গৃহকোণে তারে দেবে না জ্বলিতে স্নেহছায়ায় ?
একমুঠো সোনা শুধু বিষভরা তনুলীলায়
দিতে চাও তারে ঘৃণ্য এ প্রতিদানে ?
প্রেমের দেউলে, নারীরে ঘাতিকা করি'
রেখো না'ক আর অভিচার-অপমানে !

হিংসা-কুটিল রক্ত-ফেনিল এ রাজনীতি
জানি যে বিষভরা,
চির-কলঙ্কভরা।
বিষকন্যারে হে রাজন্, আজ বিদায় দাও,
তব জয়রথে কোরো না সারথি, মিনতি নাও,
শাশ্বতী নারী করে ক্রন্দন শুনিতে পাও ?
রূপ-পণ্যার জেগেছে প্রেমের ক্ষুধা,
গরল দিয়েছ তনু-যৌবনে ভরিয়া মোর,
মনোযৌবনে আজো যে ক্ষরিছে সুধা !

বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীকালিদাস দত্ত

বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে বারুইপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে পানচাষী বারুইজাতির বাস আছে। প্রবাদ তজ্জন্যই এই গ্রামটি ঐরূপ নামে প্রসিদ্ধ।১

প্রাচীনকালে আদিগঙ্গা নদী ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। উহা তখন কালীঘাট হইতে ক্রমশঃ বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, মাহিনগর, বারুইপুর, সূর্য্যপুর বা নাচনগাছা, মূলটি, দক্ষিণ-বারাসত, জয়নগর-মজিলপুর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর ও ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করতঃ সাগরদ্বীপের দক্ষিণে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িত।২ আজিও বারুইপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে উহার মজা গর্ভ কোথাও নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া, আবার কোথাও বা সঙ্কীর্ণ খালের আকারে বিদ্যমান আছে। উহারই উপর বারুইপুরের বর্ত্তমান হিন্দু শবদাহ-ক্ষেত্র কীর্ত্তনখোলা অবস্থিত।

আদিগঙ্গাতীরবর্ত্তী এই স্থানটির প্রাচীন ইতিবৃত্ত এখনও সংকলিত হয় নাই। সুন্দরবনের অন্তর্গত ২২ নম্বর লট ও দক্ষিণ-গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজা লক্ষ্মণসেন-দেবের দুইখানি তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ ভূমিদান সনন্দ (তাম্রশাসন) হইতে জানিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, সেন রাজগণের শাসনকালে, উক্ত আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ, তৎকালীন শাসন বিভাগ, বর্দ্ধমানভুক্তি ও পূর্ব্বতীরস্থ প্রদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অধীন ছিল।৩

দক্ষিণ-গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত উল্লিখিত তাম্রশাসনখানিতে আরও দেখা যায় যে, তদ্দ্বারা মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেব বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত বেতড্ড চতুরক নামক শাসন বিভাগে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিড্ডর-শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্ম্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। উহাতে ঐ গ্রামের নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা আছে।

উত্তরে—ধর্ম্মনগরী সীমা।
পূর্ব্বে—জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা।
দক্ষিণে—লেংঘ দেব মণ্ডপী সীমা।
পশ্চিমে—ডালিম্বক্ষেত্র সীমা।৪
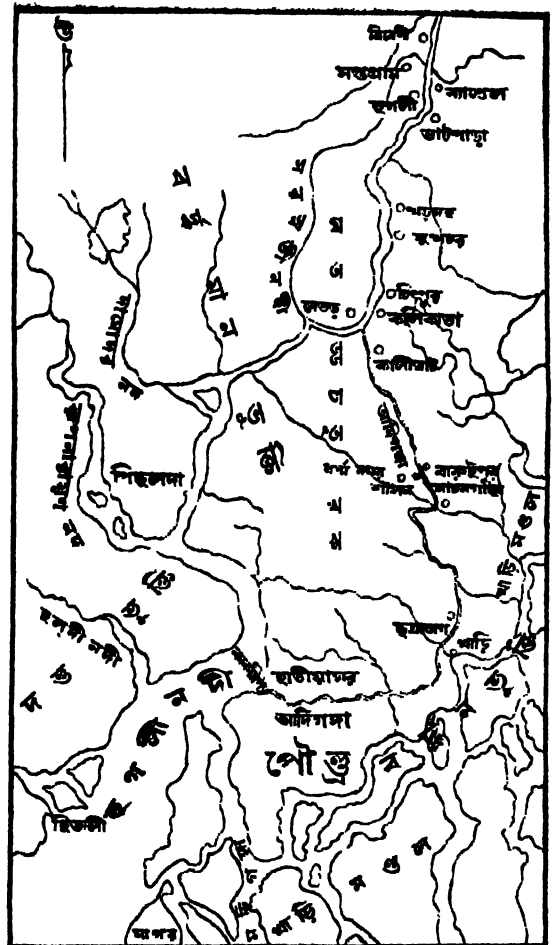
বর্ত্তমান সময় বারুইপুরের সংলগ্ন ও বারুইপুর মিউনিসি-

আদিগঙ্গাতীরে বারুইপুর
(প্রাচীন মানচিত্র হইতে)

1 Bengal District Gazeteer. 24 Parganas. P. 219. By L. S. S. O'Malley.

২। আদিগঙ্গা নদী। শ্রীকালিদাস দত্ত, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৯।

৩। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমানভুক্তি। শ্রীকালিদাস দত্ত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩৫১।

4 Inscriptions of Bengal. Vol. III. Page 97. By N. G. Masumdar.

প্যালিটির অধীন শাসন গ্রামের উত্তরে ধর্ম্মনগর১ নামে একটি প্রাচীন জনপদ ও পূর্ব্বদিকে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর শুষ্ক খাদ আছে। (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ঐ গ্রামটির শাসন নাম এবং উহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমার সহিত উল্লিখিত তাম্রপট্ট লিপিতে বর্ণিত গ্রামটির ঐ দুই দিকের সীমার ঐক্য দেখিলে ঐ জনপদটিই সেনরাজগণের আমলে বিড্ডর-শাসন অথবা উহার অংশ ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বারুইপুরের নাম এনাগাৎ প্রাক্‌মুসলমান যুগের কোন লিপি বা গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

পুরাতন গ্রন্থাদির মধ্যে, ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসানে, চাঁদ সওদাগরের আদি গঙ্গাপথে সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম উহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা :

"কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালীকা পুজিয়া।
চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে॥
ছলিয়ার গাঙ্গ বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগে গিয়া রাজা চাপায় বহিত॥"

উক্ত গ্রন্থ রচনার ৭৮ বৎসর পরে, ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিত হয়। উহা পাঠে বোধ হয়, সেই সময় বারুইপুরের কিয়দংশ আটিসারা নামেও অভিহিত হইত। ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার তীরে তীরে পার্ষদগণসহ ছত্রভোগ-পথে নীলাচল গমনকালে উক্ত আটিসারায় জনৈক বৈষ্ণবভক্ত শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের গৃহে একরাত্রি কীর্ত্তনানন্দে যাপন করেন। উহা এইরূপ :

"হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরেতে॥
সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম।
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়॥
... ...
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভদৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥১

কিছুদিন পূর্ব্বে বারুইপুর বাজারের সান্নিধ্যে, মজাগঙ্গা-তীরে, শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দারুময় বিগ্রহ একটি গৃহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ বিগ্রহ দুইটির গঠনপদ্ধতি, আকার ও ভাবভঙ্গীর সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবকালে কালনা ও নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ বিগ্রহগুলির সাদৃশ্য দেখিলে, উহাদেরও গঠনকাল যে ঐ সময় তাহা বুঝিতে পারা যায়। উহা ভিন্ন ঐ স্থানটিতে যে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিতের ভিটা ছিল তাহারও অন্যান্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সে কারণ সেখানে বরানগর পাঠবাড়ী আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি মঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অধুনা ঐ মঠ ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অতি অল্পপরিসর স্থান আটিসারা নামে অভিহিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার আটিসারাকে একটি নগর ও গ্রাম বলিয়াছেন। উহা হইতে আটিসারা জনপদ যে, ঐ সময় আকারে বড় ছিল তাহা বুঝিতে পার যায়। তৎকালে বর্ত্তমান বারুইপুরের কিয়দংশ উহার অন্তর্গত থাকা সম্ভব।

এই সকল প্রাচীন বিবরণে বারুইপুর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের উক্ত প্রকার উল্লেখ ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিচয় নাই। অধুনা বারুইপুর মেদলমল্ল পরগণার অধীন। মুসলমান রাজত্বকালে শাসন-সৌকর্য্যার্থ যে সমস্ত পরগণা নামক বিভাগের সৃষ্টি হয় উহাও তন্মধ্যে একটি। আইন-ই-আকবরীতে প্রকাশিত রাজা তোডরমল্লের জমাবন্দীতে উহার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখিত আছে যে, ঐ সময় উহার নানাস্থানে জঙ্গল ছিল এবং বারুইপুরের জমিদার চৌধুরীবংশের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে উহা সনন্দ পান।২ তখন তাঁহাদের

---

১ মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেবের উল্লিখিত তাম্রশাসনখানি প্রাপ্তির স্থান দক্ষিণ গোবিন্দপুরের সন্নিকটে অবস্থিত, উক্ত শাসন গ্রামের উত্তরে ঐ ধর্ম্মনগর গ্রামটিও প্রাচীন। অধুনা উহা ধামনগর নামে অভিহিত। হাণ্টার সাহেব উহার এইরূপে পরিচয় দিয়াছেন,

"Dhamnagar is a village in Barnipur sub-division, which contains the house of a Hindu Raja, who drowned himself in order to escape being dishonoured by the Mohamadans. There is a tank in the village in the midst of which grows a pipal tree and the people have a tradition that it springs from the top of a temple buried beneath the water."

—Statistical Account of Bengal. Vol. I. Pages 120-121.

১ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়

2 "It appears that a great part of Maidanmal Fiscal Division was formerly a dense jungle, overrun with wild beasts, and that the ancestor of the choudhuri zemindars obtained a grant of it from the Emperor of Delhi." Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I. Page 119.
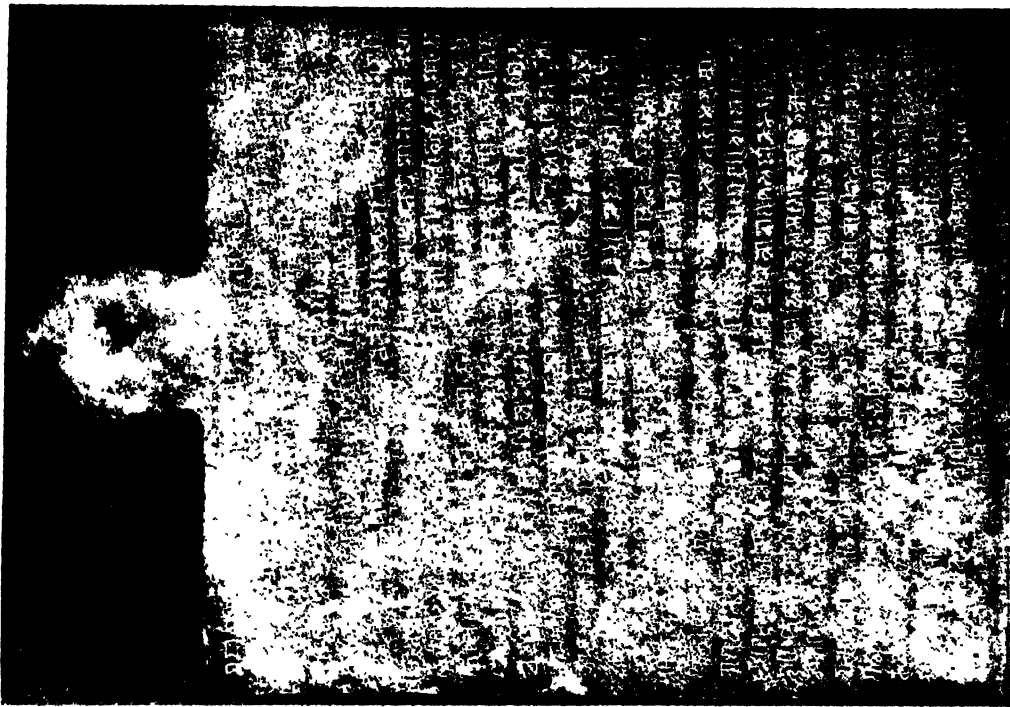
সোনারপুর থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন : সম্মুখভাগ

সোনারপুর থানার দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন : পশ্চাদ্ভাগ

নিবাস ছিল রাজপুরে। সেখানে তাঁহাদের ভিটার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

তাঁহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ রাজা মদন রায়কে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে, (১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে) মুঘল শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা রাজস্ব বাকী পড়ায় ঢাকাতে ধরিয়া লইয়া যান। সেই সময় বাশড়াতে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গল ছিল এবং সেখানে সেই জঙ্গল-মধ্যে মোবারক গাজী নামে একজন দৈবশক্তিসম্পন্ন ফকির থাকিতেন। রাজা মদন রায় তখন নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার দৈবশক্তিবলে ঢাকার দরবার হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করতঃ শিরোপা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। গাজী সাহেবের গান নামক দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রচলিত লোকগাথায় ঐ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।১ বাশড়াতে এখনও গাজী সাহেবের আস্তানা আছে। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের দক্ষিণ বিভাগের ক্যানিং শাখায় ঘুঁটিয়ারি সরিফ ষ্টেশনের সান্নিধ্যে বাশড়ার ঐ আস্তানায় প্রতি সপ্তাহে তাঁহার স্মরণার্থ একটি মেলা হয় এবং উহাতে বহু হিন্দু-মুসলমান যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ঐ সময় সেখানে গাজী সাহেবের গানও হয়। প্রবাদ, ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মদন রায়ই গাজী সাহেবকে সর্ব্বত্র প্রচার করেন। হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে উহার যে উল্লেখ আছে তাহা এই :

"In gratitude to Mobrah Gazi the zominder wished to erect a mosque in the Jungles of Basra for his residence, but he was prevented in a dream He then ordered that every village should have an altar dedica'ed to Mobrah Gazi, the King of the forests and wild beasts ..These altars of Mobrah Gazi are common in every village in the vicinity of jungles, not only in Maidanmal, but in all the fiscal Divisions adjoining the Sundarbans."2

কবি রামচন্দ্র রচিত হরপার্ব্বতী মঙ্গল নামক একখানি পুরাতন পুঁথিতেও পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। উহাতে আরও দেখা যায় যে, রাজা মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী রাজপুর হইতে প্রথমে বারুইপুরে আসিয়া বসবাস করেন ও সেখানে বহু ভূমি দান করিয়া সমাজ স্থাপন করেন। হরপার্ব্বতী মঙ্গলের ঐ অংশ এইরূপ :

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদন মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়।
লিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বন মাঝে দেখা দিলা তায়।
সক্লেতে সহায় হয়ে সবাবে খপন কয়ে
শিরোপা পাইল জমিদারী।
শতকুল সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতিরব
কায়স্থ কুলের অধিকারী।
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বর্ত্ত
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ।
সহায় আনন্দময়ী সর্ব্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী শ্রীমতী রায় রাণী।
করিয়া সমাজ স্থান কত ভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী।"

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী বারুইপুরে ঐ প্রকারে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সূত্রপাত করেন এবং তাহার ফলেই উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের বাসহেতু ক্রমশঃ এই স্থানটি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তজ্জন্য ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে নিমকমহলের সদর দপ্তরখানা ও একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র উল্লেখ যোগ্য।১ নিমকমহলের উক্ত দপ্তরখানার তৎকালীন প্রধান শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী প্লাউডেন ঐ সময় এখানে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী আদর্শে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়টি পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বারুইপুরের খ্রীষ্টান মিশনের অধীন হইয়া যায়।২

ঐ সময় হইতে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের জুলুম ও অত্যাচারে বঙ্গদেশের নানা স্থানে অশান্তির সূত্রপাত হয় ও উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানেও নীলচাষ হইত ও নীল প্রস্তুত করিবার বহু গৃহাদি ছিল। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ছত্রভোগ ও কাটানদিঘী প্রভৃতি গ্রামে ঐরূপ গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৫৫ সালের ১ম সংখ্যায় গাজী সাহেবের গান প্রকাশিত হইয়াছে

2 Statistical Account of Bengal. Vol. I, Page 120.

1 "In the early part of the 19th century it was the head-quarters of the Salt Department in the 24 Parganas, and a Salt Agent and a Medical officer were stationed there." Bengal District Gazetteer. 24 Parganas. L. S. S. O'Malley. Page 219.

2 "A school at Baruipore which had been started in 1820 by Mr. Plowden the Salt Agent, was transferred to the Society for the Propagation of Gospel in 1823."

—24 Parganas Gazetteer. Page 79. By L.S.S. O'Malley

চব্বিশ পরগণার শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণেরও ঐ সময় সদরস্থান ছিল বারুইপুরে। অধুনা বারুইপুরের সদর রাস্তার উপর একটি বৃহৎ উদ্যানমধ্যে বড়কুঠি নামে যে অট্টালিকাটি আছে উহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান কার্য্যালয় ও আবাসস্থান।১ তজ্জন্ত তৎকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় উৎপন্ন নীল বারুইপুরের নীল নামে অভিহিত হইত এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বাজারেও উহার বেশ চাহিদা ছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখের কোম্পানীর গেজেটে উহার এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়:

"We undertand that the best indigo delivered on co: tract for the last year has been manufactured by Messrs. Win and Thos. Scott of Gazipore and by Mr. Gwilt of Barrypore."

প্রাচীন বিবরণাদিতে উল্লিখিত আছে যে, খ্রীষ্টান মিশনরীরাও ঐ সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যে সকল স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করেন তন্মধ্যেও বারুইপুরের কেন্দ্রটি প্রধান ছিল। সে কারণ এখানে সর্ব্বপ্রথম একটি ইষ্টকের বৃহৎ গীর্জ্জাও নির্ম্মিত হয়। উহার মধ্যে ৬।৭ শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারিত।২ উহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। উহা ভিন্ন ঐ সময় মৃত দুই জন ইংরেজ পাদ্রীর গোরস্থানও আজিও শ্মশানে যাইবার পথে দেখা যায়।

উপরোক্ত কারণে বহুদিন হইতে চব্বিশ পরগণায় বারুইপুরের গুরুত্ব থাকায় ইংরেজ সরকার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর বারুইপুর, প্রতাপনগর, জয়নগর ও মাতলা বা (ক্যানিং) এই চারিটি থানা লইয়া একটি মহকুমা গঠন করতঃ উহারও সদরস্থান এখানে স্থাপন করেন। উহা বারুইপুর মহকুমা নামে প্রসিদ্ধ হয় ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। তজ্জন্ত এখানে মহকুমা হাকিমের আদালত ও মহকুমা পুলিশের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়।১ সার ষ্টুয়ার্ট কলভিন বেলী, পরে যিনি বঙ্গদেশের ছোটলাট হন, এই মহকুমায় প্রথম মহকুমা শাসক ছিলেন।২ তাঁহার পরে এখানে যে কয়জন বাঙালী মহকুমা শাসক আসেন তন্মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি

আটিসারাতে শ্রীঅনন্তপণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত দারুময় শ্রীশ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বিগ্রহ

১ ঐ অট্টালিকাটির পশ্চাতে নীলকরগণ একটি খাল কাটাইয়া উহা আদিগঙ্গা নদীর সহিত সংযুক্ত করেন। উহারা তাঁহারা তখন নৌকাযোগে বারুইপুর হইতে ছত্রভোগ ও কাটানদিঘী প্রভৃতি স্থানে নীলপ্রস্তুতের কারখানাগুলিতে যাতায়াত করিতেন। ঐ খালের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে।

2 Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I. Page 99.

1 Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I, Page 99.

2 Bengal Under the Lieutenant Governors.—Buckland. Vol. II. Page 837.

এখানে অনেকদিন ছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় এখানকার পথঘাট প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুর্গেশনন্দিনীও ঐ সময় এখানে লিখিত হয়।

মজিলপুরনিবাসী সাধক ও সাহিত্যিক কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের রচনায় উহার উল্লেখ আছে। তিনি তখন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বারুইপুরে থাকিতেন। কিরূপে তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের আলাপ পরিচয় হয় ও কিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময় বারুইপুরের আদালতে বিচারকার্য্যের মধ্যেও দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিতেন তাহার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

"বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়। তখন ইংরাজি ১৮৬৪ সাল। সে বৎসর ৫ই অক্টোবর সাইক্লোনে (cyclone ডায়মণ্ডহারবার, কুল্পি, মুড়াগাছা, টেঙ্গরা বিচি, করঞ্জলী, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মনিরটাট প্রভৃতি গ্রাম নষ্ট হইয়া যায়।...এই দৈবদুর্ঘটনায় প্রদেশস্থ বহুসহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিতহৃদয় হইয়া কয়েকজন ধনশালী পার্শী, কতিপয় ইংরাজ কর্ম্মচারী ও প্রদেশের জমিদারবর্গের কেহ কেহ যথোচিত সাহায্য দান করিয়া সত্বরই একটি প্রচুর ধনভাণ্ডার স্থাপন পূর্ব্বক ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। বঙ্কিমবাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাইল, চিঁড়া, লবণ, কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েকখানা পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাদি সঙ্গে আমাকে লোকের দুর্ভিক্ষ ও পরিধেয় কষ্ট দূর করিবার জন্য মহেশ্বর নদের (হুগলী নদীর) পার্শ্ববর্ত্তী টেঙ্গরা বিচি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধরপুরে পাঠান। গঙ্গাধরপুরে যাইবার সময় পথে বহুসংখ্যক শবদেহ খালে, বিলে, ধান্যক্ষেত্রে ভাসিতেছে এবং পথের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্যেও বনে জঙ্গলে, বৃক্ষোপরি ও ভূতলেও ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে নরকের দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে, দেখিলাম। আমি ৩।৪ দিন সেখানে থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি সপ্তাহের ব্যয়ের মত প্রত্যেক পরিবারকে বণ্টন করিয়া দিয়া মজিলপুরে ফিরিয়া আসিলাম এবং বঙ্কিমবাবুকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম ও দ্রব্যাদির হিসাব দিলাম। তিনি আমার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমবাবু দুর্ভিক্ষকার্য্যের আধিক্য প্রযুক্ত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার ভার অল্পদিনের জন্য গ্রহণ করিলেন এবং ডায়মণ্ডহারবার হইতে বাবু হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন ও দুর্ভিক্ষকার্য্যের জন্য মজিলপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আমি দুর্ভিক্ষকার্য্যে বঙ্কিমবাবুকে যেরূপ সাহায্য করিতেছিলাম, হেমবাবুকে সেইরূপ করিতে লাগিলাম। সাইক্লোন প্রযুক্ত কেবল এই দুই মহকুমাই (বারুইপুর ও ডায়মণ্ডহারবার) দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়াছিল।

এ সময় ১৮৬৪ সালের নূতন রেজিষ্টরি আইন অনুসারে মহকুমায় নূতন রেজিষ্টরি অফিস খোলা হইল। হেমবাবু আমাকে তাঁহার (বারুইপুরের) নূতন রেজিষ্টরি অফিসের হেডক্লার্ক পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু বারুইপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে আমি বঙ্কিমবাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাভাবিক দয়ার্দ্রচিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মোকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম।

এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমনকি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার study-room-এ প্রস্থান করিতেন এবং চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া ফিরিতেন না।"[১]

কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের রচনায় বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সময় অবস্থানকালের আরও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। সরকারী কার্য্যে গভীর ভাবে নিযুক্ত থাকিলেও তখন উহার চাপে তাঁহার সাহিত্য সাধনায় কোন ত্রুটি ঘটিত না। উহার প্রতি তিনি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন তাহা তাঁহার আদালতের কার্য্যের মধ্যেও দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্ব্বোক্তরূপ উল্লেখ হইতে জানা যায়। তিনি বারুইপুরে প্রত্যহ আদালতের বিচার ও তৎকালীন মহকুমা শাসকের গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াও রাত্রে নিয়মিত ভাবে চারি ঘণ্টাকাল অধ্যয়ন করিতেন। কালীনাথ বাবু উহারও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :

"আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখনই শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন কিম্বা সে সময় আমাকে আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কোন পুস্তকবিশেষ পড়িতে বলিতেন। আমি পড়িতাম তিনি শ্রবণ করিতেন এবং স্থলবিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭॥ হইতে ১১॥ পর্য্যন্ত তাহার পাঠের নিয়ম ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই Light reading ছিল না। তৎসমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয় আমার স্মরণ আছে, তাহাতে progressive development of species বিষয়ে লেখা ছিল।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল থাকায় উক্তরূপে গ্রন্থাদি পাঠ ও শ্রবণ ব্যতীত সময় সময় সুবিধা পাইলেই হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারাও জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করিতেন। কালীনাথবাবু এবিষয়েও যাহা বারুইপুরে প্রত্যক্ষ করেন তাহার উল্লেখ এইরূপ :

"এ সময় বারুইপুরের সন্নিহিত রামনগরনিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষ সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়া অল্প-স্বল্প চিকিৎসা ব্যবসাও চালাইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের একজন সুবিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। কোন এক বৎসর তিনি কলেজের সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়া একটি সুন্দর অণুবীক্ষণযন্ত্র পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বঙ্কিমবাবুর সহিত মহেশবাবুর আলাপ হওয়াতে মহেশবাবু সেই অণুবীক্ষণটি দিনকতকের জন্য বঙ্কিমবাবুর ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। প্রতিদিন অপরাহ্নে সেই অণুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ এবং জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থজাতির পরীক্ষা হইত। পরীক্ষার সময় আমিই তাঁহার একমাত্র নিত্যসঙ্গী থাকিতাম।"[৩]

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কার্য্যকালে

---

(১) বঙ্কিমচন্দ্র (১)—শ্রীকালীনাথ দত্ত, প্রদীপ, আষাঢ়, ১৩০৬।
(২) ঐ, ঐ
(৩) ঐ ঐ

বারুইপুরের পথঘাট প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। উহা ভিন্ন তিনি তখন বারুইপুরের অধিবাসীদেরও বিপদে-আপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। উহারও একটা উদাহরণ কালীনাথবাবুর রচনা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও পরহিতৈষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কালীনাথবাবু লিখিতেছেন :

"একদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যে থামিয়া গেল। কিন্তু থামিতে না থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটি বজ্রপাত হইল। তাহার ৪।৫ মিনিট পরে একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারিতে সংবাদ দিল রাজকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ু হইয়াছে। শুনিবামাত্র বঙ্কিমবাবু কাছারির সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাজকুমারবাবুর বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। আমরা বজ্রাহতের বাটীতে গিয়া দেখিলাম···নীচের ঘরে তিনটি লোক একটি মাদুরে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল। সেই বেচারাই তখন মৃত্যুমুখে পড়ে।···রাজকুমারবাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থানে মুখাবৃতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমারবাবু সেদিন প্রাতের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছেন।···আমরা বজ্রাহত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরি সাহেব সেখানে অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য, অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্রও দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবকটির চৈতন্যোদয়ের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কোন চেষ্টা সফল হইল না।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সময়ের পরেও অনেকদিন বারুইপুরে ছিলেন। উহারও উল্লেখ কালীনাথবাবুর উক্ত রচনায় পাওয়া যায়। উহা এই :

"আমি আমার নূতন কার্য্যে বারাসাতে চলিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বারুইপুরে ছিলেন। তখন আমি যখনই বাটীতে আসিতাম বারুইপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়া আসিতাম না। তিনি সকল সময়ই তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন—আদালতের কার্য্যের সময়ও তাঁহার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই।"[২]

১ বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীকালীনাথ দত্ত, প্রদীপ, শ্রাবণ, ১৩০৩।
২ ঐ ঐ

২০শে আষাঢ় রবিবার, বারুইপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম স্মৃতিসভায় পঠিত

আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রয়াণে

শ্রীমহাদেব রায়

জন্মতিথি করি' শেষ 'স্বস্তিকে'র আম্রবনচ্ছায়ে,
শক্তি-অর্চনার তত্ত্ব গেলে রাখি শারদার পায়ে,
শারদ বোধন লগ্নে। মহাকাল ধ্বনিল অন্তরে—
শত শরতের মূর্তি, হে আচার্য, শারদার বরে
দেখ এ অঙ্গনে তব। তবু কেন লভিল নির্বাণ
বাণীর অর্চনা-রত সুবর্ণের দীপ অনির্বাণ
না ফিরিতে জন্মদিন? চির-দীপ্ত মেধাতপস্যার
মহাশূন্যে রচে শিখা দশদিকে করিয়া বিস্তার
জ্ঞানের গৌরব-দীপ্তি। বহু বিদ্যাগর্ভ বঙ্গবাণী
লভিল যে পুত্র-করে বহুধা-প্রদীপ্ত মূর্তিখানি,
আশাহতা বঙ্গমাতা সেই পুত্রশোকে মুহ্যমান,
সহস্র সন্তান তাঁর কাঁদে স্মরি মহামূল্য দান—
মূল্যঋণ শোধে ব্রত-নিষ্ঠা আজি সমগ্র জাতির
রচিবে কি আলোকিত পথ সপ্তনবতি স্মৃতির?

চতুর্দশপদী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আবার এলাম ফিরে এক দিন। করে আকর্ষণ।
কে যেন সর্বদা ডাকে অন্ধকার সেই ত্যক্ত ঘরে—
যেখানে নামে না হাওয়া, ভৌতিক স্তব্ধতা কাজ করে,
ধুলায় ধূসর মাটি—মানুষের নেই পর্যটন,
সেখানে এলাম ফের। দাঁড়ালাম। বিস্মৃত-স্পন্দন—
অনেক আশ্চর্য সন্ধ্যা, গীতস্রোত-মূর্চ্ছনা ভিতরে ;
এখানে ওখানে ঘুরে খুঁজলাম—বহুকাল পরে
স্থানে স্থানে স্নিগ্ধ ঘ্রাণ, ধূলিস্তরে লুপ্ত পদাঙ্কন।

নিবিড় জঞ্জাল থেকে, কড়ি-কাঠে, বিবর্ণ দেয়ালে
সামান্যই ইতিকথা—বিস্মৃত-সমুদ্রতল থেকে
—মণিমুক্তা পাওয়া যায়। প্রেতাশ্রিত ইটের কংকালে
ইতিহাস সাড়া আনে—তারপর কুয়াশায় ঢেকে
কোথায় হারায়। শুধু অস্ফুট করুণ হা-হা স্বর

বাহুলে মেয়ে

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রবন্ধের নাম হইতে যদি কেহ মনে করেন, ইহা একটি বাহুলে মেয়ের কাহিনী, তবে তাহা ভুল হইবে। অবশ্য ইহা মেয়েদেরই করুণ কথা।

এবার ঝড়-বৃষ্টিজনিত ভীষণ দুর্য্যোগ যখন আরম্ভ হয়, তাহার তৃতীয় দিনে একটি কন্যার বিবাহসংক্রান্ত আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে তাহাকে বিবিধ মূল্যবান অলঙ্কারাদি-ভূষিতা করিয়া পাত্রপক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা এবং ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত ও আপ্যায়িত করা হইল। উদ্দেশ্যবিহীন নিতান্ত লঘুভাবে হইলেও, পাত্রপক্ষের একটি বয়স্ক ব্যক্তিকে নিম্ন মনে মৃদুস্বরে বলিতে শুনিলাম, 'মেয়েটি বাহুলে'।

সামগ্র ভারতে কিনা জানি না, সারা বাংলা ব্যাপী ত বটেই, এই অভাবনীয় দুর্য্যোগ আজ প্রায় সাত দিন ধরিয়া চলিতেছে। কেননা মেয়েটি বাহুলে। কথাটির মধ্যে গুরুত্ব কিছু না থাকিলেও এ কথা আজ নূতন নহে। একটি ছেলে ও মেয়েতে বিবাহ হয়—কিন্তু বিবাহের সময় বৃষ্টিবাদল হইলে—কথার কথা হইলেও অনেক সময়ই শুনা যায় 'মেয়ে বাহুলে'। ছেলে কখনও বাহুলে হয় না বা হইতে পারে না। এই মত আরও কোন কোন মর্য্যাদা (?) সর্ব্বদাই আমাদের মেয়েদের জন্যই নিৰ্দ্দিষ্ট আছে। নারী প্রকৃতি, সৃষ্টিরক্ষার মূল। অন্য দেশের কথা জানি না, এখানে তার জন্ম মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিতে ঘোষিত হয় না। মেয়ের বিবাহ 'কন্যাদায়', বিবাহ হইলে মেয়ে পার করা হয়, মৃত্যুতে মরণাশৌচ স্বল্পদিনের। প্রাচীন ভারতে কোনও সময়ে মেয়েদের উপনিষদ বেদাদি অধ্যয়নও নাকি নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। বিধি-ব্যবস্থা আইন-কানুন প্রণয়নের আমরাই মালিক হইয়াছি। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত অনেককিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। আজ আর আমাদের মেয়েরা একেবারে শিক্ষাহীনা, কেবল গো-পূজা, শিব-পূজাদিরতা, পিতামাতার গৌরীদানের পাত্রী নহে। শহর অঞ্চলে ক্রমে স্কুল-কলেজে তাহাদের স্থান দেওয়ার সমস্যা শিক্ষাবিভাগকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। কি বিবাহ ব্যাপারে, কি আর্থিক দিক হইতে তাহাদের জন্য পিতামাতার ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং সরকারের সহায়তা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানের বিধিব্যবস্থায় মেয়েদের বিবাহসংক্রান্ত বাধা দূরীভূত করার প্রচেষ্টার অভাব নাই।

কন্যা সম্প্রদানকালে সামর্থ্যমত সালঙ্কারা অবস্থায় দানই প্রশস্ত। কিন্তু যে দিন-কাল দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সামর্থ্যের কথা বিবেচ্য নহে; পাত্রপক্ষের দাবি অবশ্য দেয়। এটা এখন সামাজিক ব্যবস্থাই বলিতে হয়। এই সকলের কথঞ্চিৎ প্রতিবিধান জন্যই হউক বা সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই হউক, আর নারী-জাতির প্রতি দরদের জন্যই হউক, নূতন বিধানে আজ কন্যাকে পিতৃবংশের কোন দায়িত্ব লইতে না হইলেও সে পুত্রদের ন্যায় পিতার সম্পত্তির তুল্যাধিকারিণী। দুর্ভাগ্যক্রমে বৈধব্য ঘটিলে সন্তানদের সহিত স্বামীর সম্পত্তিরও সমান অংশীদার। এই প্রসঙ্গে যে কথাটায় মনে ব্যথা দেয়, তাহাই এখন বলিতেছি।

অধুনা শিশু বা কিশোরী কন্যার বিবাহ আর বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু এখনও খুব কম ক্ষেত্রেই কন্যা স্বেচ্ছায় পতি নির্ব্বাচন বা বরণ করিয়া লয়—বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র বা পাত্রপক্ষের কন্যা দেখার প্রথা এখনও ঠিকই আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যা এখন বয়স্থা এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বের তুলনায় তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, শিক্ষা এবং আত্মসম্মান জ্ঞানে অনেকেই সমৃদ্ধ। বিবাহের জন্য মেয়েদেখার মধ্যে প্রধান দেখিবার যাহা, তাহা হইতেছে কন্যার রূপ। ছেলেটির গাত্রবর্ণ যদি আবলুস কাষ্ঠের অনুরূপও হয় তাহারও আবশ্যক দুধে-আলতা বা চম্পকবর্ণা বধূ। আর কন্যা যেহেতু কন্যা, তাহার পছন্দ-অপছন্দের কোন কথা থাকিতেই পারে না। অবশ্য নূতন উত্তরাধিকার আইনের বলে কুরূপা ধনী-কন্যার পক্ষে হয়ত এখন পাত্র পছন্দ করা কতকটা সহজ হইতে পারিবে। অন্ততঃ তাহাদের বিবাহ তেমন বাধিবে না। অবশ্য ইহা স্থলবিশেষ। এ সব কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভদ্রঘরের যুবতী বা যৌবনসীমায় উপনীতা কন্যার রূপ যাচাই করার এই লজ্জাজনক প্রথা কি আমাদের সমগ্র নারীজাতির প্রতি অবমাননা-কর নহে? ইহা প্রতিরোধের উপযুক্ত সাহস বা বল বর্ত্তমানে সমাজের না থাকিতে পারে, কিন্তু যে সরকার অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিবার জন্য, জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর—এমন-কি অবৈধ সন্তানের পিতৃসন্তানের দ্বারা তাহার সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী হওয়ার কথা পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেছেন, সে সরকার কি কোন বিধান প্রণয়নের দ্বারা এই নিন্দনীয় কুপ্রথা তুলিয়া দিবার কোন উপায় চিন্তা ও প্রতিকার করা প্রয়োজন বোধ করেন না?

চোর

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়

ছ'জায়গায় টুইশানী সেরে রাত দশটার সময় বাড়ী ঢুকে হাত-পা ধুয়ে সবে খেতে বসেছি এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, মাষ্টারমশাই বাড়ী আছেন ?

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেলাম। মল্লিকা সামনে বসে খাওয়া দেখছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, রাত দুপুরে আবার কে এল ?

কথার উত্তর না দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম—আবার কোন ডাক আসে কিনা। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না আবার ডাক এল, মাষ্টারমশাই বাড়ী আছেন নাকি ?

খাওয়া ফেলে রেখে উঠে পড়লাম। মল্লিকাকে বললাম—দাও, এক ঘটি জল দাও—আঁচিয়ে নি, আর ভাতটা ঢাকা দিয়ে রাখ, দেখি এসে খাওয়া হয় কিনা।

মল্লিকা গজ গজ করতে করতে জল এনে দিলে। তাড়াতাড়ি কুলকুচো করে হারিকেনটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে চাপ-বাঁধা অন্ধকার, দু'পা গেলেই মনে হয় অন্ধকার যেন আমায় গিলে খেতে আসছে। চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, এত রাতে কে আসতে পারে ? কলকাতা থেকে আসার শেষ ট্রেনও ত বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তাতে নিশ্চয় কেউ আসে নি, তবে ?

উঠোনের দরজাটা খুলে বাইরে বেরুলাম। অন্ধকারে দশ হাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না। ভুষো-মাখানো লণ্ঠনটা মাথার উপর তুলে ধরে হাঁকলাম, কে ?

দূরে কিছু একটা নড়ে উঠল, খানিক বাদে পরিষ্কার হ'ল—মানুষই। কাছে আসতে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম—না, পরিচিতদের কেউ নন। এক হাতে একটা পুঁটলি-মত, বগলে একটা ভাঙা ছাতা, চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করা কঠিন—পঞ্চাশও হতে পারে, ষাটও হতে পারে, আবার সত্তর হওয়াও বিচিত্র নয়। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কপালে রগে নীল রঙের শিরা-উপশিরাগুলো মাকড়সার জাল বুনেছে, চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়ে দুনিয়ার অনেককিছু অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখার হাত থেকে যেন নিষ্কৃতি পেয়েছে। পরনের জামাকাপড় থেকে পায়ের ছেঁড়া জুতো অবধি সর্ব্বত্র দারিদ্র্যের নির্ম্মম কশাঘাতের চিহ্ন। এ ভদ্রলোককে এর আগে কখনও দেখেছি বলে ত মনে হয় না।

আমাকে ওরকম ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, কি ভায়া, চিনতে পারলে না, আমি সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী।

সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী ? আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম, আমার চেনা জানার মধ্যে সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী কে আছে ? স্মৃতির পর্দ্দায় একের পর এক অসংখ্য পরিচিত মুখ ভেসে উঠল, কিন্তু না, সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী বলে সেখানে ত কেউ নেই।

অস্বস্তিভরে বললাম, দেখুন কিছু মনে করবেন না, আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারছি না।

ভদ্রলোক কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন, বললেন, চিনতে পারছ না, সে কি ? সেই যে তোমাদের ইস্কুলে গিয়েছিলাম মাসকয়েক আগে একটা চাকরীর খোঁজে—মনে নেই ?

ওহো ! এইবার মনে পড়েছে বটে। মাসছয়েক আগে এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন আমাদের ইস্কুলে একটা চাকরী খালি আছে শুনে। এর আগে কোথাকার এক ইস্কুলে যেন চাকরী করতেন, সম্প্রতি সেখানে কমিটির সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। আমাদের বললেন, কারও চোখরাঙানি সহ্য করতে পারি না ভাই, এই জন্যে আমার এক জায়গায় বেশী দিন চাকরী করা হয় না। এর আগেও অনেক জায়গায় করেছি, কিন্তু সব খানেই ওই এক ব্যাপার—স্পষ্ট কথা বলি বলে কারও সঙ্গে মতে মেলে না। এরা অবিশ্যি পরে আমায় ক্ষমাটমা চেয়ে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। আর আসবে নাই বা কেন, থার্টি-ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সড টিচার কি পথেঘাটে মেলে—কিন্তু আমি সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছি, বলেছি সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী যেখান থেকে একবার চলে আসে সেখানে আর দ্বিতীয় দিন পা দেয় না।

তার পর একটু থেকে ভারিক্কি চালে বলেছিলেন, আরে আর সবায়ের মত যদি পেটের ধান্দাতে চাকরী করতে যেতাম তা হলেও না হয় কথা ছিল। চাকরীর পরোয়া আমি করি ? ঘরে আমার জমি রয়েছে, গরু রয়েছে—খাওয়া-পরার কথা আমায় কোনদিন ভাবতে হবে না। তবে নেহাত ঘরে বসে থাকব, তা ছাড়া ছোকরা বয়েস থেকেই টিচিং লাইনের উপর আমার একটা ঝোঁক আছে, তাই এখানে-ওখানে মাষ্টারী করে বেড়াই। এখন আবার এটা একটা

'হবি'তে দাঁড়িয়ে গেছে, কিছুদিন যদি বসে থাকি ত হাঁপিয়ে উঠি।

যাবার সময় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেম, এটা অবশ্য 'ফিল্ড-আপ' হয়ে গেছে, কিন্তু এমনও ত হতে পারে—পরে কিছুদিন বাদে আর একটা খালি হ'ল, কিংবা এ ইস্কুলে না হোক আশপাশের কোন ইস্কুলে হ'ল। যাই হোক ঠিকানাটা দিয়ে গেলাম, যদি কোথাও খালি হয় ত একটা খবর দিও, বুঝলে ?

বলেছিলাম, আচ্ছা।

তা সে ত প্রায় মাসছয়েক আগেকার ঘটনা, এত দিন বাদে সেকথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। কাছেপিঠে এর মধ্যে মাষ্টারা-কাষ্টারীও কোথাও খালি হয় নি যে মনে পড়বে। ঠিকানা যেটা রাখতে দিয়েছিলেন তাও কোথায় হারিয়ে ফেলেছি, অতএব চিঠি দেওয়ার কথা ত আর উঠতেই পারে না। আর ভদ্রলোক যে এতদিন বাদেও সেকথা মনে রাখবেন তাই বা কে ভাবতে পেরেছে।

বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, তা হঠাৎ—

সিদ্ধিনাথবাবু কৈফিয়তের সুরে বলতে লাগলেন, গিয়েছিলাম ওপারে শুকদেবপুরে একটা পোষ্ট খালি আছে শুনে, তা গিয়ে শুনলাম পোষ্ট একটা খালি আছে বটে কিন্তু বি-টি না হলে তাঁদের চলবে না। কি আর করব, ফিরতে হ'ল সেখান থেকে। কলকাতায় যাবার লাষ্ট ট্রেন এপার থেকে রাত ন'টায় ছাড়ে আমার জানা ছিল, এসেছিলামও সেই মত, তা এসে শুনলাম ট্রেনটা বেরিয়ে গেছে আধ ঘণ্টা আগে, নতুন টাইমটেবিলে টাইম নাকি পালটে দিয়েছে। মহাবিপদে পড়লাম, রাত দুপুরে এখন যাই কোথা। হঠাৎ মনে পড়ল তোমার কথা, তুমি যেন বলেছিলে, তুমি নিত্যানন্দপুর থেকে যাতায়াত কর। ইষ্টিশান মাষ্টারকে বললাম তোমার কথা, বলতেই চিনলেন। বললেন, ভালই হ'ল মশায়। রাতদুপুরে এখন কোথায় থাকতেন, কি খেতেন তার নেই ঠিকানা, তার চাইতে চেনা-শুনো লোক যখন রয়েছে তখন চলে যান, আমি না হয় একটা খালাসী দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে সঙ্গে করে আলো ধরে পৌঁছে দিয়ে আসুক। তা সেই লোকটিই আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল তোমার দোরগোড়া অবধি।

সিদ্ধিনাথবাবু বলা শেষ করে একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসলেন। আমি মুহূর্তখানেক চিন্তা করে বললাম, আচ্ছা, আসুন আপনি, ভেতরে আসুন।

সিদ্ধিনাথবাবুর বাঁকা দেহ সোজা হয়ে উঠল, আমি সামনে সামনে আলো নিয়ে এগোতে লাগলাম। দালানে ঢুকে সিদ্ধিনাথবাবুকে একখানা চৌকির উপর বসিয়ে রেখে বললাম, আপনি বসুন এখানে, আমি আসছি।

দালানের লাগাও রান্নাঘর। কপাট ভেজানো ছিল ভিতর থেকে, ঠেলে ভিতরে ঢুকে আবার ভেজিয়ে দিলাম। মল্লিকা বসেছিল গুম হয়ে, একটু ইতস্ততঃ করে বললাম—ইয়ে, মানে ভদ্রলোকের খাওয়া হয় নি, দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারবে ?

মল্লিকা ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, শুধু ভাতই খেতে হবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, তার মানে ?

মল্লিকা তরকারীর ঝুড়িটা পায়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, কাল হাটবার মনে আছে ?

মাথা চুলকালাম, সত্যিই ত, কাল হাটবার আমারই মনে ছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আচ্ছা তুমি উনুনে আগুন দাও গে, আমি উঠোনের গাছ থেকে না হয় দুটো পেঁপেই পেড়ে আনছি।

সেই রাত্রে আবার লগা কাঁধে করে দুপদাপ শব্দে পেঁপে পাড়লাম। সেগুলিকে ঘরে নামিয়ে রেখে দালানে সিদ্ধিনাথবাবুর কাছে ফিরে এসে দেখলাম ভদ্রলোক নির্বিকার বসে রয়েছেন।

খেতে বসিয়ে বললাম, খেতে আপনার কষ্ট হবে দাদা, ঘরে তরকারীপাতি কিছুই ছিল না।—সিদ্ধিনাথবাবু গোগ্রাসে গিলতে গিলতে এক ফাঁকে বলে উঠলেন, তাতে কি হয়েছে, বাইরে থাকতে গেলে কি আর ঘরের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় আশা করতে গেলে চলে ?

খেয়ে উঠে বললেন, একটা পান দিতে হবে যে ভাই, আর ভাল কথা, একটা মশারির ব্যবস্থা করো। তোমাদের এখানে যা মশা দেখছি তাতে মশারি না হলে শুতে পারা যাবে না। আমার আবার বিনা মশারিতে শোয়া অভ্যেস নেই কি না।

রান্নাঘরে ঢুকে কপাট ভেজিয়ে দিয়ে মল্লিকাকে বললাম, শুনলে তো ?—মল্লিকা এবার ফেটে পড়ল, বলল, শুনলাম ত। কিন্তু ওঁর কি আক্কেল, রাতদুপুরে পরের বাড়ী এয়েছেন, দুটো খেতে পেয়েছেন এই ঢের, তা নয় আবার বিছানা করে দাও, মশারি খাটিয়ে দাও—হাজার বায়নাক্কা। নাও, এখন ছেলেগুলোকে মশায় খাক, তোমাতে ওতে মশারি নিয়ে গিয়ে ছাতের ঘরে শোও গে যাও।

অপরাধীর মত বেরিয়ে এলাম। সিদ্ধিনাথবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে পান চিবোচ্ছিলেন, বললাম—আসুন, উপরে আসুন।

ছাদে উঠে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, বাঃ, ঘরটি তো বেশ চমৎকার।

উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বোধে চুপ করে রইলাম।

সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ মশারিটা টাঙাও, আমি একটু ছাতটায় ঘুরে আসি, কেমন?

বললাম, দেখবেন অন্ধকারে যেন পড়ে যাবেন না, না হয় আলোটা নিয়ে যান।

সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, না না, তার দরকার নেই, তারার আলোয় আলসে-টালসে বেশ দেখা যাচ্ছে। তুমি বরং মশারিটা টাঙানো হয়ে গেলে আমায় বলো।

খানিকবাদে মশারী টাঙানো হলে বললাম, মশারি আমার টাঙানো হয়ে গেছে।

সিদ্ধিনাথবাবু বাইরে থেকে উত্তর দিলেন, এই যে যাই।

ঘরে এসে বললেন, বাঃ, তুমি যে দেখছি সব কমপ্লিট করে ফেলেছ, কিন্তু আমার কোটখানাকে এখন কোথায় টাঙাই।

ময়লা তালিমারা কোট, তার আবার টাঙানোর জায়গা। একবার ইচ্ছে হ'ল বলি—মাটিতে নামিয়ে রাখুন। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে বললাম, দেখুন দিকি ওপাশের দেওয়ালে একটা হুক আছে কিনা।

সিদ্ধিনাথবাবু সেদিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে।

বললাম, ওইখানে টাঙিয়ে রাখুন।

সিদ্ধিনাথবাবু কোটটি খুলে সন্তর্পণে সেই হুকের মাথায় টাঙিয়ে রাখলেন। দেখলাম আদুল গায়েই কোট চাপিয়েছিলেন। আমাকে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, কি দেখছ ভায়া, কোটটা? বড় চমৎকার জিনিষ হে। শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম সবকিছু আটকায়। আজকালকার দিনে এমন জিনিষটি আর পাওয়া যাবে না।

তার পর এ পকেট ও পকেট হাতড়ে চ্যাপ্টা একটা টিনের কৌটো বার করলেন। ভিতর থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা নিজে দাঁতে চেপে ধরে অপরটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও ভায়া, ধর।

সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললাম, আজ্ঞে না, আমার চলে না।

সিদ্ধিনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, আমিও বিড়ি বড় একটা খাই না, তবে একঘেয়ে সিগারেট খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেলে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে এক-আধটা খাই।

তার পর আর এক পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের খোল এনে ভিতর থেকে কাঠি বার করতে গিয়ে বললেন, ঐ যাঃ! আসার সময় ভেবেছিলাম ইষ্টিশান থেকে একটা দেশলাই কিনে নেব, তা আর কেনা হয় নি। তোমাকে ত একটু কষ্ট করতে হচ্ছে ভায়া, নীচে থেকে একটা দেশলাই এনে দিতে হচ্ছে।

বিরক্তি চেপে নীচে থেকে দেশলাই এনে দিলাম। সিদ্ধিনাথবাবু বিড়িটাকে ধরিয়ে অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই দেশলাইটা ফেলে রাখলেন কোটের পকেটে। সামান্য জিনিষ বলে আমি আর সেকথা উল্লেখ করলাম না, ভাবলাম হয়ত সত্যিই ভুল করেছেন।

সিদ্ধিনাথবাবু বিড়ি ধরিয়ে আগে একটা সুখটান দিয়ে নিলেন, তার পর নাক মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি আর দেরি করো না ভায়া, শুয়ে পড়।

আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি হবে। দিনের গুমোট আবহাওয়া কেটে গিয়ে বাইরে এখন হু হু করে হাওয়ার দাপটা দিচ্ছে। পাশে বসে সিদ্ধিনাথবাবু নিঃশেষিতপ্রায় বিড়িটাকে প্রাণপণে টেনে চলেছেন। টানের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের স্পর্শ পেয়ে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিটুকু থেকে থেকে দীপ্ত হয়ে উঠছে, তারই ক্ষীণ আভায় সিদ্ধিনাথবাবুর মুখের এক পাশটা অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ, শিথিল বলিরেখাঙ্কিত চামড়া, অতিমাত্রায় উঁচু চোয়ালের হাড়, দড়ির মত স্ফীত অসংখ্য নীল রঙের শিরা-উপশিরা, কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ, সবকিছু একই সাক্ষ্য বহন করছে—নিদারুণ দারিদ্র্য। এত চেষ্টা করেও সিদ্ধিনাথবাবু সে দারিদ্র্যকে যে গোপন করতে পারলেন না, এ তাঁর ভাগ্যের পরিহাস।

বিড়িটায় শেষ গোটা-কয়েক টান দিয়ে সিদ্ধিনাথবাবু সেটাকে জানলা গলিয়ে বাইরে বার করে দিলেন। মশারিটা ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভায়া, ঘুমোলে নাকি?

নিস্পৃহ কণ্ঠে বললাম, না।

সিদ্ধিনাথবাবু লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে হাত-পাগুলো টান করতে করতে বললেন, এক এক সময় মনে হয় কি জান ভায়া, মনে হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই দিনকয়েকের জন্যে। সংসারে থাকলেই ত শুধু নেই নেই, আর দাও দাও শুনতে হবে, তার চাইতে কোথাও যদি চলে যাওয়া যায় দিনকয়েক তবু নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যাবে।

বলেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একটু পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, অবিশ্যি অভাব-অনটন আর কার ঘরে নেই, সে কথা নয়। কথা হচ্ছে কি এই বয়সে আর দায়িত্বের বোঝা বইতে ভাল লাগে না, দেহমন দুই-ই এখন একটু বিশ্রাম চায়।

হাসি পেল, সত্যকে চাপা দেবার কি প্রাণান্তকর প্রয়াস। উনি যে দরিদ্র সে কথাটা উনি কাউকে জানতে দিতে রাজী নন, অথচ ওঁর দারিদ্র্যের জীবন্ত প্রমাণ যে ওঁর চেহারায় পরিস্ফুট সে কথাটা মুহূর্ত্তের জন্যেও ওঁর মাথায় উদয় হচ্ছে না। অদ্ভুত মানুষের এই সামাজিক-প্রতিষ্ঠা-বোধ।

কথার ধারা অন্য খাতে বইতে সুরু করেছে দেখে সিদ্ধিনাথবাবু প্রসঙ্গ পাল্টালেন। বললেন, কোথাও কিছু নেই বুঝলে ভায়া, কর্ত্তাদের হঠাৎ কি যে খেয়াল হ'ল হুকুম-জারী করে দিলেন বি-টি ছাড়া আর মাষ্টার রাখা হবে না। বোঝ ব্যাপারখানা। আরে আজ না হয় এত বি টির চলন হয়েছে, নতুবা তোরা যেকালে পড়েছিলি সেকালে ক'টা বি-টি ছিল, তাদের কাছে পড়েই ত তোরা আজ এক-একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে গেলি, না কি? তা নয়, কে যে ওঁদের মাথায় ঢুকিয়েছে ভগবান জানেন, ওঁদের ধারণা হয়েছে ট্রেনিং না পেলে মাষ্টাররা আর কেউ পড়াতে পারবে না। কি ছেলেমানুষি ব্যাপার বল দিকি। আজন্মকাল আমরা মাষ্টারী করে খাচ্ছি আমরা জানব না পড়াতে, জানবে যত ওই ছ' মাসের ট্রেনিং পাওয়া তিন দিনের ডেঁপো ছোকরারা! কি যে সব ভাবে -

একটু থেমে আবার পুরনো কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, আবার শুনছি নাকি বলছে- যারা এখনও ট্রেনিং নাও নি তারা সব এই বেলা গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসো গে। ভাবো দিকি একবার ব্যাপারখানা। কলেজ ছেড়েছি আজ প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ হ'ল, এখন যদি আবার সদ্য পাস করা ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে—একসঙ্গে বসে লেকচার নোট করতে হয় তা হলেই ত গেছি। তা ছাড়া চাকরী ত আছে বড়জোর আর বছর তিন কি চার, এখন পনের টাকা মাইনে বাড়লেই বা কি আর না বাড়লেই বা কি।

একটু থেমে আবার বলতে সুরু করলেন, গিয়েছিলাম ওপারে শুকদেবপুরে একটা পোষ্ট খালি আছে শুনে, তা সেখানেও শুনলাম ওই বি-টি চাই। সেক্রেটারী বললেন, কি করব মশাই, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, বি-টি না রাখলে গবর্ণমেন্টের গ্র্যান্ট-ইন এড বন্ধ হয়ে যাবে। কি আর করব, ফিরতে হ'ল সেখান থেকে। নিজের কপালকেই দুষলাম, ত্রিশ বছর এক্সপিরিয়েন্সের চাইতে এক বছর ট্রেনিঙের দাম হ'ল বেশী।

একটা ভারী নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ পেলাম।

খানিক বাদে আবার সুরু করলেন, ইংরেজীর টিচার হয়ে ঢুকেছিলাম পনের টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে, তা সে কি আজকের কথা? তখন আড়াই টাকা মণ চাউল ছিল, পাঁচ সিকে জোড়া ধুতি ছিল, জিনিসপত্তরের বাজারে এখনকার মত এমন আগুন লাগে নি। পনের টাকা মাইনেয় একটা সংসার তখন হেসে-খেলে চলে যেত। আর এই সেদিনও ষাট টাকা করে মাইনে পেয়েছি, দু'মণ চাল কিনতেই সব ফাঁক। মাসের পনের দিন যেতে না যেতে স্কুল থেকে আগাম নিতে হ'ত। আর এখনকার কথা ত না বলাই ভাল, এখন মাথাই নেই তার মাথাব্যথা।

বলেই যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। আমার দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আমি অবিশ্যি জেনারেল সেন্সেই কথাটা বলছি। আমার মত এক আধ জনের না হয় জমিজমা থাকতে পারে, কিন্তু সবার ত আর তা নেই। শতকরা নিরানব্বই জনেরই ত এই অবস্থা, না কি ভায়া?

কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতাটা বোধ হয় নিজের কানেও বেজে-ছিল, তাই আপনা থেকেই চুপ করে গেলেন। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্যে আমিও আর কোন উচ্চবাচ্য না করে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম।

সত্যি সত্যিই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই, মাঝ-রাতে হঠাৎ যখন ঘুমটা ভাঙল, খেয়াল হ'ল সিদ্ধিনাথবাবু পাশে নেই। ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলাম। জানালা দিয়ে বাইরের পানে এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল সিদ্ধিনাথবাবু বসে রয়েছেন আলসের গায়ে হেলান দিয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে। হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা, মাথাটা ঈষৎ হেলে পড়েছে পেছন দিকে, কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ মেলে ঊর্দ্ধ আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কি দেখছেন একমনে।

পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সিদ্ধিনাথবাবু তখনও তন্ময় হয়ে আকাশের তারা গুনছেন। একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালাম, সিদ্ধিনাথবাবু তবু টের পেলেন না। খানিক অপেক্ষা করে থেকে নীচু গলায় বললাম, দাদা এখনও ঘুমোন নি!

সিদ্ধিনাথবাবু যেন চমকে উঠলেন। তাকিয়েই সামনে আমাকে দেখতে পেয়ে একটু থতমত খেয়ে বললেন, এই যে ভাই উঠি, ঘরে বড্ড গুমোট দিচ্ছিল কিনা তাই একটু বাইরে এসে বসেছি।

হঠাৎ আমার ডান হাতখানা চেপে ধরলেন সিদ্ধিনাথবাবু। নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে সবিস্ময়ে ওঁর মুখের পানে ফিরে তাকালাম। সিদ্ধিনাথবাবু অনুনয়ের সুরে বললেন, একটু বস না ভাই।

অভিভূতের মত বসে পড়লাম। সিদ্ধিনাথবাবু খানিকক্ষণ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে বলে উঠলেন, তোমার কাছে কিছু লুকোব না ভাই, অনেক দিন বাদে আজ পেট ভরে খেতে পেলাম।

ইচ্ছে হ'ল থামতে বলি, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। সিদ্ধিনাথবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় মনের অবস্থাটা কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই একটু ম্লান হেসে বললেন, টাকাটা যে অচল যে চালাতে এসেছিল সেও জানে, যাকে চালাতে এসেছিল সেও বুঝতে পেরেছে। এক্ষেত্রে দুই পক্ষই যদি চেপে যায় তা হলে ভদ্রতাটা হয়ত বজায় থাকে, কিন্তু তাতে কি আর আসল সত্যটা চাপা পড়ে?

কথাটার ঠিক জবাব খুঁজে পেলাম না।

একটু থেমে আবার বললেন, ছিলাম জমিদার-ঘরের ছেলে, হ'তে হ'ল ইস্কুল মাষ্টার, একেই বলে কপালের ফের। আর ওই জন্যেই বোধ হয় ক্ষিদেটাকে এখনও ঠিক বাগে আনতে পারলাম না।

আবার একটু থেমে বললেন, নতুবা দেখ না, চোখের সামনে দেখছি বউ না খেয়ে মরছে, ছেলে না খেয়ে মরছে, সে সব সহ্য হচ্ছে। অথচ নিজে না খেয়ে মরতে হবে এই কথাটাই ভাবতে গেলে যেন আঁতকে উঠি। চাকরীর ছুতো করে এর-ওর-তার বাড়ী ঠিক খেয়ে আসি।

কথা শেষ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু অদ্ভুত রকমের হেসে বললেন, শুনে ঘেন্না হচ্ছে না ভাই? হওয়াই স্বাভাবিক।

অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। ছাতের কোণে তালগাছটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাতার স্তূপের ভেতর থেকে কোন এক মুমূর্ষু পক্ষী-শাবকের অন্তিম চীৎকার কানে আসছে, বোধ হয়, তক্ষকের কবলে পড়েছে। ওধারে নারিকেলগাছের মাথাটা হাওয়ায় দুলছে, অনবরতই যেন কার প্রস্তাবের উত্তরে 'না' জানিয়ে চলেছে। আকাশে ক্ষীণ এককালি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে, এমন আলোর জোর নেই যে, কাছের রোহিণীটাকে অবধি ঢাকা দেয়। দূর থেকে কয়েকটা বিবদমান কুকুরের ক্ষীণ কোলাহল মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে। পাশের আমবাগানটা থেকে একটি রাতজাগা পাখী অনেকক্ষণ থেকে একটানা ডেকে চলেছে কক্—কক্—কক্।

সিদ্ধিনাথবাবু বলে চলেছেন, বুঝলে ভাই, ভেবে দেখলাম পুরুষকার কুরুষকার ওসব বাজে কথা, দৈবই আসল। সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, তাতে কেউ যদি কষ্ট পায় পাক, তার জন্যে আর সবাইয়ের কষ্ট করতে যাওয়াটার ত কোন মানে হয় না। মনকে এক এক সময় বুঝাই এই বলে, দেখ, তুমি যদি না-ই খেতে, তাতেই কি আর সবাইয়ের খাওয়া জুটত? তা যখন জুটত না, তখন কেন তুমি উপোস করে থাকবে? একজন মরেছে বলে তার সঙ্গে আর একজনের মরাটার ত কোন মানে হয় না!

একটু থেমে আবার বললেন, বাড়ীতে আমি সবাইকে বলে দিয়েছি, মনে কর আমি মরে গেছি। আমি মরে গেলে যেমন করে সংসার চালাতে এখনও ঠিক তেমনি করেই চালাও।

একটা মামুলি সান্ত্বনা-বাণী উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সিদ্ধিনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে পারলাম না। জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়ে মানুষ যখন নৈরাশ্যের শেষসীমায় এসে উপস্থিত হয় তখন সে দৈববাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ওরকম নৈরাশ্য যে একদিন আমার জীবনেই আসবে না তাই বা কে বলতে পারে?

হঠাৎ সিদ্ধিনাথবাবু আমার হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠলেন, ভাল চাও ত এখনও এ লাইন ছেড়ে দাও ভাই। এর চাইতে যদি মুদীখানার দোকান খুলে বস তো সেও ভাল, তাতে তবু ভাত-কাপড়টা হবে, এ লাইনে তাও নেই। আদর্শবাদের গালভরা বুলি শুনাতেও ভাল, বলতেও ভাল কিন্তু তাতে পেট ভরে না। তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে মাষ্টারি করা সেকালে হয়ত চলত, কিন্তু একালে আর চলে না। একালে আর সবায়ের মত মাষ্টারদেরও সমাজ আছে, সংসার আছে, সচ্ছলভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। এতে করে আদর্শের মান হয়ত কিছু ক্ষুণ্ণ হবে, কিন্তু সেটুকু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

একটু থেমে আবার সুরু করলেন, এ লাইনের আর একটা মজা হচ্ছে কি জান, কয়েক বছর যদি মাষ্টারি কর ত আর অন্য কোন কাজ ভাল লাগবে না, আফিংয়ের নেশার মত পেয়ে বসবে এই মাষ্টারির নেশা। এই আমার যেমন এখন হয়েছে চাকরী নেই তবু অন্য কোন কাজ করব না। অবশ্য অন্য কোন কাজ যে পাবই এমন কোন কথা নেই—না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, কিন্তু তা হলেও পাবার চেষ্টা করি নি। এখন আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, কেউ যদি বলে, আপনাকে মাইনে দিতে পারব না আপনি মাষ্টারি করুন, আমি তাতেই রাজী হয়ে যাব। তুমি বললে বিশ্বাস

করবে না ভায়া, এখনও আমি রোজ দশটায় বাড়ী থেকে বেরুই আর চারটায় বাড়ী ফিরি, সারাটা দিন বসে থাকি গাঁয়ের স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরে একটা পিটুলীগাছের গোড়ায়। বসে বসে শুনি মাষ্টাররা পড়াচ্ছে, ছাত্রেরা পড়ছে সুর করে করে। শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে দিন কেটে যায় টের পাই না। চমক ভাঙ্গে ছুটির ঘণ্টা বাজল, তখন তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় নেমে পড়ে পা চালাতে সুরু করি, পাছে ছাত্রেরা বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে ফেলে ঐ অবস্থায়।

কতক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলাম ছু'জনে খেয়াল নেই। চমক ভাঙল পাশের তালগাছের মাথা থেকে ককিয়ে ওঠা একটা পেঁচার কর্কশ চীৎকারে। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম চুল ভিজে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল হেলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। সিদ্ধিনাথবাবু পাশে নিথর হয়ে বসেছিলেন, বললাম, ওঠা যাক দাদা, এইবার।

সিদ্ধিনাথবাবু সুপ্তোত্থিতের মত বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই যে ভাই উঠি

সকাল হতেই হাটে চলে গিয়েছিলাম, ফিরে আসতেই সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, কলকাতায় যাবার ট্রেনটা ক'টায় ভায়া ?

বললাম, কেন, এ বেলাই যাবেন নাকি ?

সিদ্ধিনাথবাবু পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলে উঠলেন, না গিয়ে উপায় কি ভায়া। তুমি ত খানিক বাদেই খেয়ে-দেয়ে স্কুলে চলে যাবে, তখন বৌমা যদি আমায় একা পেয়ে সম্মার্জ্জনী হাতে নিয়ে তাড়া করেন তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছ ? তার চাইতে বাপু সময় থাকতে থাকতেই চলে যাওয়া ভাল।

ওঁর বলার ধরন দেখে হেসে ফেললাম, বললাম, সে যা হয় হবে'খন, আপনার ট্রেনের এখন দেরি আছে। তার আগে আপনি এখান থেকে নাওয়া-খাওয়া করে যাবেন।

সিদ্ধিনাথবাবুর মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, তোমাকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করব ভায়া, আগেকার দিন হলে না হয় বলা যেত রাজা হও, কিন্তু এখন ত আর তা চলবে না, এখন তার চাইতে যদি পার ত বরং একটা কেউ কেটা গোছের কিছু হয়ো।

হাসতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। সিদ্ধিনাথবাবুর আসল রূপটি চোখের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। নিষ্করুণ দারিদ্র্য ওঁর মনের মধ্যে এমন একটা নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে যার ফলে কোথাও তিনি এক বেলার বেশী ছু'বেলা আহার পাবার কথা ভাবতেই পারেন না। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আমন্ত্রণ জানায় তা হলে আনন্দে হয়ে উঠেন উচ্ছ্বসিত।

দেখে শুনে শঙ্কা জাগে মনের মধ্যে, আমারও কি একদিন ওই অবস্থা হবে।

ছোট মেয়ে বিনু কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাই নি, সিদ্ধিনাথবাবুই বললেন, পেছনে ওটি কে ভায়া ?

চমকে পিছু ফিরে তাকিয়ে বললাম, ও, এটি আমার ছোট মেয়ে বিনু। তাকে বললাম, এই পেন্নাম কর, জ্যাঠাইশাই হন।

সিদ্ধিনাথবাবু যেন চমকে উঠলেন, বললেন, কি নাম বললে ভায়া ?

একটু বিস্মিত হলাম, বললাম, ভাল নাম বিনতা, ডাক নাম বিনু।

ওঃ, সিদ্ধিনাথবাবু হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বিনু নীচে চলে যেতে বললেন, কিছু মনে করো না ভায়া, ওই নামে আমারও একটি মেয়ে ছিল কিনা, তাই হঠাৎ তোমার মুখে তার নাম শুনে একটু চমকে উঠেছিলাম।

বুঝলাম হয়ত কোন বেদনার কাহিনী জড়িয়ে থাকবে ও নামের সঙ্গে, তাই ও নিয়ে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

সিদ্ধিনাথবাবু নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, আমার বিনুও থাকলে ঠিক অত বড়টিই হ'ত, ওই রকমই শান্ত-শিষ্ট ছিল মেয়েটি। ছোটবেলা থেকেই অসুখে অসুখে ভুগত বলে ওর অসুখ নিয়ে কেউ আর বড় একটা মাথা ঘামাতাম না। নেহাত যখন বুঝত জ্বর আসছে তখন নিজেই একটা কিছু টেনে নিয়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ত, তার পর জ্বর ছাড়লে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়ে ভায়েদের সঙ্গে বসে পড়ত পিঁড়ি পেতে। এই রকমই চলছিল, হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল মেয়েটার হাত-পাগুলো ফুলতে সুরু করেছে। কাছেই চেনা-শুনা এক ডাক্তার ছিল, দেখালাম, ডাক্তার দেখে বললে, এনিমিয়া—রক্তাল্পতা। বললাম, ওষুধ ? বললে, এর আর ওষুধ কি ? ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তাতে আর কি হবে ? এর দরকার এখন পুষ্টিকর খাদ্যের। আঙুর, বেদানা, নাসপাতি এই সব খাওয়াতে হবে, পারবেন ?

শুনে আর দাঁড়ালাম না ভাই। যাদের পেটে ভাত জোটে না তাদের কাছে আঙুর, বেদানার কথা বলা মানে ঠাট্টা করা নয় কি ? তা ছাড়া আমায় ত শুধু ওই একটির মুখের দিকে চাইলেই হবে না, আরও ক'টিকে আমায় দেখতে হবে। মনকে বোঝালাম এই বলে, কত ঘরেই ত

এ রকম রোগা ছেলে-পুলে রয়েছে, সবাই কি আর আঙুর, বেদানা খাওয়াতে পারছে? বাঁচার হলে এমনিতেই বাঁচবে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, অবিশ্যি বাঁচল না শেষ পর্য্যন্ত। ইদানীং তার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ভাল করে হাঁটতেও পারত না। বেশীর ভাগ সময়ই হয় এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকত, নয় আমার কোলে কোলে ঘুরত। বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, শেষের দিকে চেঁচিয়ে কাঁদার মত ক্ষমতাটুকুও তার ছিল না।

সিদ্ধিনাথবাবু থামলেন। আমারও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাড়াতাড়ি এ প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার জন্তে বললাম, বেলা অনেক হয়েছে দাদা, এবার নীচে চলুন।

—এই যে ভাই উঠি, সিদ্ধিনাথবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সিদ্ধিনাথবাবু, টেনে টেনে বারকয়েক শ্বাস গ্রহণ করে বললেন, বাঃ, খাসা বাস ছাড়ছে ত হে। বৌমা কি হালুয়া-টালুয়া কিছু তৈরি করছেন নাকি?

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, দেয়াল ধরে সামলে নিলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর মুখের পানে চেয়ে দেখি আশ্চর্য্য! একটু আগেও সেখানে যে গভীর বিষাদের ছায়া দেখেছিলাম তার চিহ্নমাত্রও কোথাও নেই। তার জায়গায় উগ্র হয়ে ফুটে উঠেছে প্রচণ্ড লোভ। ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল, একটু আগেও মানুষটির উপর সহানুভূতি হচ্ছিল ভেবে নিজেরই যেন লজ্জাবোধ হতে লাগল।

দালানে নেমে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, তুমি তা হলে ভাই একটু অপেক্ষা কর, আমি চট করে একবার মুখটা ধুয়ে আসি, কেমন?

উত্তর দেবার প্রবৃত্তি ছিল না, তবু বললাম, আচ্ছা।

খেতে খেতে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, ভারি চমৎকার হয়েছে হে, কিসমিসগুলো এক একটা যা ফুলেছে যেন ঠিক রসগোল্লার মত। তার পর আমাকে নিরুত্তর দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি হয়ত ভাবছ যার বাড়ীতে সবাই উপোস করে থাকে সে এমন নিশ্চিন্দি হয়ে খায় কি করে? কিন্তু ওই যে বললাম ভাই, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি, আমি ভাববার কে?

সামনের পেঁপেগাছটায় একটা পেঁপে পেকে ছিল, সেই দিকে চেয়ে বললেন, বাঃ, পেঁপেটা ত খাসা, রাঁচির নাকি ভায়া?

বললাম, না, এমনি দিশী পেঁপে, আপনা থেকেই হয়েছে।

সিদ্ধিনাথবাবু খানিক লুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে বললেন, দেখে কিন্তু বোঝবার উপায় নেই। পেঁপেটা দিও দিকি ভায়া বীজ করব, আস্তই দিও নিয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে।

বললাম, আচ্ছা।

ন'টা বাজতেই সিদ্ধিনাথবাবুকে বললাম, আপনি চানটান করে নিন দাদা, আপনার ট্রেন ত ন'টা বিয়াল্লিশে।

সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, তোমার ট্রেন ক'টায়?

বললাম, আমার ট্রেন আপনার একটু পরে, দশটা চারে, আমিও অবশ্য আপনার সঙ্গেই খেয়ে নেব। আপনি আগে চানটা করে আসুন, আমি তারপর যাচ্ছি।

খেতে বসে সিদ্ধিনাথবাবু বললেন, মাছের ঝোলটা বেড়ে হয়েছে হে। বৌমাকে বল না আর হাতাখানেক দিয়ে যেতে, ভাতক'টাকে সব একেবারে মেখে নি।

বললাম, ওগো, দাদাকে আর হাতাখানেক ঝোল দিয়ে যেও।

দড়াম্ করে রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল। পরমুহূর্ত্তেই এককড়া ঝোল নিয়ে এসে সবটা সিদ্ধিনাথবাবুর পাতে উল্টে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে গেল মল্লিকা, যাবার সময় দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে গেল মুখের উপর। এত দ্রুত সবকিছু ঘটে গেল যে বাধা দেবার অবসর অবধি পেলাম না।

সিদ্ধিনাথবাবু খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমার মুখের পানে, তার পর বোকার মত একটু হেসে বললেন, গরম কড়া কিনা, তাই হঠাৎ কাৎ হয়ে গিয়েছিল।

বলেই আবার খাওয়ায় মন দিলেন।

বেরোবার সময় কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই সিদ্ধিনাথ-বাবু বলে উঠলেন, কি সর্ব্বনাশ!

বললাম, কি হ'ল?

সিদ্ধিনাথবাবু পাংশুমুখে বললেন, কোটের পকেটে পাঁচটা টাকা ছিল ভাই, পাচ্ছি না—কাল ট্রেনে আসতে আসতে ঘুমিয়েছিলাম সেই সময় নিশ্চয় পকেট মেরেছে। একটা টাকা ত না দিলেই নয় ভায়া, যাবার সময় ট্রেনের টিকিটটা ত অন্ততঃ কাটতে হবে। আমি অবিশ্যি গিয়েই তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।

একটা রূঢ় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ দিয়ে, ওঁর মুখের পানে চেয়ে সেটাকে সংযত করে নিলাম। সেই রক্তহীন কোলা কোলা মুখ, শিথিল বলি-জর্জ্জরিত চামড়া, অতি-মাত্রায় স্পষ্ট চোয়ালের হাড়, কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ সব-কিছুর ভেতর দিয়েই দেখতে পেলাম স্পষ্ট ভিক্ষার্থীর

প্রত্যাশা। দ্বিরুক্তি না করে একটা টাকা এনে দিলাম উপর থেকে।

সিদ্ধিনাথবাবু বেরিয়ে যেতেই খেয়াল হ'ল—ওঁর ছাতাটি ঝুলছে আলমারীর মাথায়। ছোট ছেলেকে বললাম, ওরে যা দিকিনি, মাষ্টারমশাই এখন বেশীদূর যান নি, দৌড়ে ছাতাটা দিয়ে আয় দেখি।

সে তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললে, এই নাও না তোমার ছাতা, জ্যেঠামশাই ভুল করে তোমারটা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

মনে পড়ল আমার ছাতাটা ওই একই জায়গা থেকেই ঝুলছিল বটে, তবে ভুলটা ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত কে জানে।

টিফিন পিরিয়ডে টিচার্স-রুমে বসে ওই কথাই ভাবছিলাম। অভাব ত থাকে অনেকেরই, কিন্তু তা বলে অভাবের সঙ্গে স্বভাবটাও কি সবারই ওঁরই মত নষ্ট হয়। এক হিসেবে ভেবে দেখলে মানুষটার উপর ঘৃণা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু সহানুভূতির স্পর্শ থেকে গেল।

অঙ্কের টিচার হরিপদবাবু পাশ থেকে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার শচীনবাবু, এসে অবধি দেখছি অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। বাড়ীতে গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছে নাকি?

মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললাম, না সে সব কিছু নয়, এই ভাবছিলাম একটা কথা।

হরিপদবাবু উৎসুক নেত্রে বললেন, কি কথা শুনিই না।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, সিদ্ধিনাথবাবুকে মনে আছে, সেই যে আমাদের স্কুলে একবার এসেছিলেন চাকরীর খোঁজে।

হরিপদবাবু বাধা দিয়ে বললেন, থাক্ আর বলতে হবে না, তিনি কাল আপনার ওখানে গিয়েছিলেন ত?

বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, কি করে বুঝলেন?

হরিপদবাবু বিরস কণ্ঠে বললেন, তার কারণ আপনার মত আমিও একজন ভুক্তভোগী। আর শুধু আমিই বা কেন, রমেনবাবু, তারকবাবু, নিতাইবাবু, শিবনাথবাবু, নৃসিংহবাবু, মদনবাবু, তিনকড়িবাবু, পণ্ডিতমশায় কেউই বাদ যান নি। সব জায়গাতেই গেছেন ওই এক ছুতো করে চাকরী-বাকরীর কিছু খোঁজ হ'ল কিনা। আরে চাকরী-বাকরীর খোঁজই যদি নিতে হয় ত একটা চিঠি দিয়ে দিলেই পারতেন। তা নয়, জানে গিয়ে যদি পড়া যায় ত একটা বেলার খাওয়া নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর এই দুর্ব্বৎসরের দিনে বিনা টিকিটে গিয়ে যদি একটা বেলা খাওয়া পাওয়া যায় ত মন্দ কি?

ভূগোলের টিচার যতীনবাবু নতুন এসেছেন। এতক্ষণ চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, কার কথা বলছেন হরিপদবাবু।

হরিপদবাবু বিতৃষ্ণাভরে বললেন, সিদ্ধিনাথ গাঙ্গুলী। এককালে নাকি মাষ্টার ছিল, এখন চাকরীর ছুতো করে এর ওর তার বাড়ী খেয়ে বেড়ায়।

যতীনবাবু যেন চমকে উঠলেন। হরিপদবাবুর সেটা নজর এড়ায় নি। চেয়ারখানা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পাশে বসে বললেন, কি ব্যাপার বলুন দিকি, ভদ্রলোককে চিনতেন নাকি এর আগে?

বেশ বোঝা গেল যতীনবাবু অস্বস্তি বোধ করছেন। হরিপদবাবু সেটা বুঝতে পেরে বললেন, আরে মশাই এ হচ্ছে নিজেদের কলীগদের মধ্যে, এখানে বললে কোন কথা ত আপনার বাইরে বেরুচ্ছে না। সিদ্ধিনাথবাবু সম্বন্ধে যদি কিছু জানেন ত নির্ভয়ে বলতে পারেন এখানে।

তবু যতীনবাবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে যে সব টিচার ওদিকে বসে গল্প করছিলেন তাঁরা এদিকে একটা মুখরোচক বিষয়ের অবতারণা হয়েছে দেখে নিজেদের আড্ডা ভেঙে দিয়ে সবাই যতীনবাবুকে ঘিরে দাঁড়ালেন। বেশ খানিকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও উনি কোন উচ্চবাচ্য করছেন না দেখে হরিপদবাবু অধৈর্য্য হয়ে বললেন, কি ব্যাপার যতীনবাবু, আপনি যে ঠোঁটে তালা এঁটে বসে রইলেন।

যতীনবাবু অস্বস্তিভরে বললেন, দেখুন আপনারা যখন ধরেছেন আমি বলছি, কিন্তু দেখবেন কথাটা যেন বাইরে প্রকাশ না হয়।

হরিপদবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, সেদিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন মশাই। আপনার কথা আমাদের ক'জন ছাড়া আর কারুর কানে উঠবে না।

যতীনবাবু সুরু করলেন, এর আগে কিছুদিন আমি দিনঘাটা হাই ইস্কুলে চাকরী করেছিলাম, সেই সময় সিদ্ধিনাথবাবু ছিলেন ওখানকার ইতিহাসের টিচার। আমি যখন গেলাম তার কিছুদিন আগেই উনি ঢুকেছেন। শুনলাম এর আগে যে ইস্কুলে চাকরী করতেন, সেখানে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় সম্প্রতি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। আমাদের বললেন, চাকরীর পরোয়া আমি করি না ভায়া, থার্টি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সড্ টিচার—আমার আবার চাকরীর ভাবনা? যে

লণ্ডনে কমনওয়েল্‌থ-প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন : (ডান দিক হইতে) শ্রীবন্দরনায়ক, শ্রীজবাহরলাল নেহরু, মিঃ এস. জি. হল্যাণ্ড, মিঃ সেণ্ট লরেণ্ট, সর্‌ এণ্টনি ইডেন, মিঃ আর. জি. মেঞ্জিস, মিঃ জে. জি. ষ্ট্রিগডম, মিঃ মহম্মদ আলি, লর্ড ম্যালভার্ন

বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পালাম বিমানঘাটিতে পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরুর অভ্যর্থনা
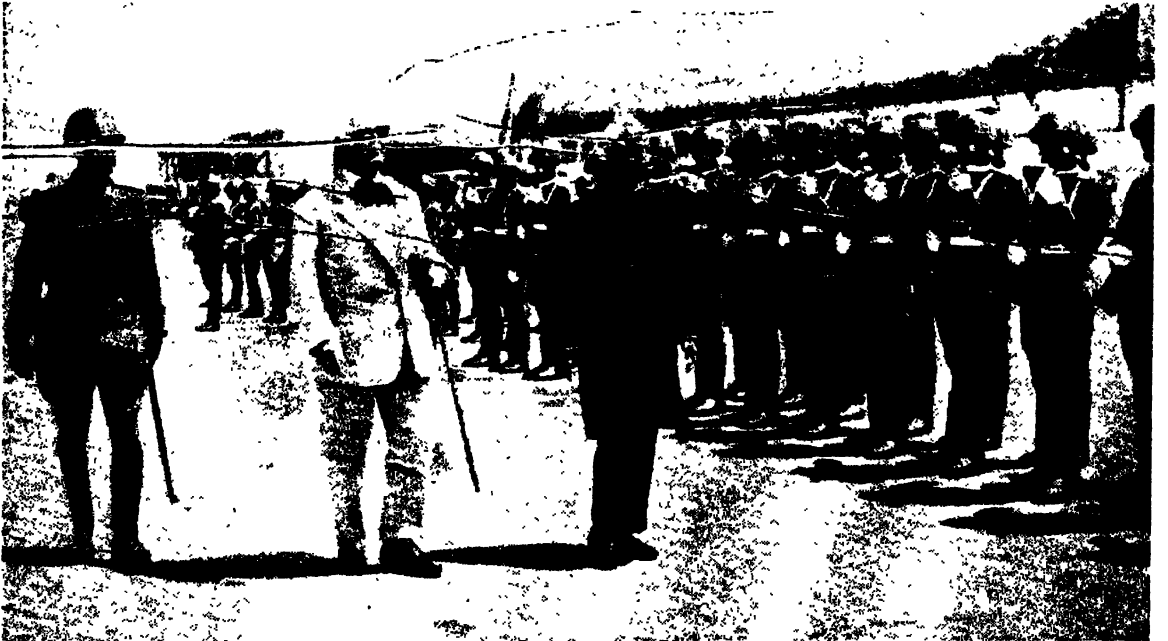
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক রুমানিয়ার বুখারেস্টে একটি 'গার্ড অব অনার' পরিদর্শন

ইস্কুলে যাব সেই ইস্কুলেই লুকে নেবে। তাও যদি আর সবাইয়ের মত পেটের ধান্দায় চাকরী করতে যেতাম তা হলেও না হয় কথা ছিল। ঘরে আমার জমি রয়েছে, গরু রয়েছে, পেটের ভাতের কথা আমায় ভাবতে হয় না। তবে ওই যে বললাম মাষ্টারী হচ্ছে আমার একটা 'হবি', চুপচাপ ঘরে বসে থাকা আমার পোষায় না। নতুবা কি দায় পড়েছিল আমার মত লোকের ষাটটা টাকার জন্তে বিদেশে বিভুঁয়ে এত কষ্ট সহ্য করে পড়ে থাকার?

সামনে আমরা বলতাম, সে ত বটেই, আড়ালে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতাম। আসল অবস্থাটা ত জামা কাপড়ের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। একটা ময়লা তালিমারা কোট, তা কি শীত কি গ্রীষ্ম খালি গায়ের উপর চড়িয়ে ইস্কুলে আসেন। ঘামে ধুলোয় তার এমন চেহারা হয়েছে যে তার আসল রঙ কি ছিল তাই নিয়ে গবেষণা করা চলে। পরনের কাপড়খানার দিকে ত তাকানো যায় না, পায়ে মান্ধাতার আমলের ন্যাকড়ার জুতো। এই সব দেখে কি পরিমাণ জমিজমা আছে সে ত সহজেই আন্দাজ করা যায়।

থাকতেন স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ী, ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। খাওয়া-দাওয়াটা ওখানেই হয়ে যেত।

একটু চুপ করে থেকে আবার সুরু করলেন যতীনবাবু, কিছুদিন যেতেই একটা জিনিষের উপর সবারই নজর পড়ল, বুকসেলার্স পাবলিশার্সদের কাছ থেকে যে সব টেক্সট বই, নোট বইয়ের 'স্পেসিমেন কপি' আসে কিছুদিন বাদেই সব যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়। প্রথম প্রথম সবাই ব্যাপারটা দেখেও দেখলেন না। ভাবলেন পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা জিনিষ বৈ ত নয়, অভাবী মানুষ যদি নিয়েই থাকেন কি আর করা যাবে, পুরনো বইয়ের দোকানে অর্দ্ধেক দামে বেচে কতই বা আর পাবেন। তা ছাড়া টেক্সট বই, নোট বইয়ের 'প্রেজেন্টেশান কপি' ও ত এক রকম ইস্কুলেরই প্রাপ্য। তাদের ত আর বই কিনতে হয় না, যা কিছু হয় সব ওর থেকেই, তবে এক্ষেত্রে একজন টিচার সবকিছু নিচ্ছেন এই যা। কিন্তু তা বলে ওই নিয়ে ত একটা কেলেঙ্কারী করা যায় না, তাতে ওঁর ত বদনাম বটেই, ইনষ্টিটিউটেরও কলঙ্ক।

একটু থেমে যতীনবাবু বললেন, অবশ্য কেলেঙ্কারী ঠেকানো গেল না শেষ পর্য্যন্ত। একদিন টিফিন পিরিয়ডের সময় হেড মাষ্টারমশাই হন্তদন্ত হয়ে টিচার্সরুমে ঢুকে বললেন, আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। চেম্বার্সের টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ডিক্সনারীখানা পাওয়া যাচ্ছে না, আপনারা কেউ কি নিয়েছেন?

সবাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। একে একে সকলেই জানালেন, না, তারা কেউ নেন নি।

সিদ্ধিনাথবাবু একপাশে পাংশুমুখে বসেছিলেন, হেডমাষ্টার মশাই তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, সিদ্ধিনাথবাবু আপনি?—সিদ্ধিনাথবাবু থতমত খেয়ে বললেন, না আমি নিতে যাব কেন?

বাংলার টিচার রতনবাবু বললেন, আপনাকে কাল যেন চারটের পর লাইব্রেরী ঘরে দেখেছিলাম সিদ্ধিনাথবাবু, কি বই নিচ্ছিলেন আপনি?

সিদ্ধিনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, সে আমি অঙ্ক বই নিচ্ছিলাম।

হেড মাষ্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কি বই?

সিদ্ধিনাথবাবু বিবর্ণ মুখে বসে রইলেন, কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

হেড মাষ্টারমশাই কঠিন কণ্ঠে বললেন, দেখুন সিদ্ধিনাথবাবু, আপনার উপর সন্দেহ আমাদের এক দিনে হয় নি। তবে এত কাল যে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি তার কারণ এতদিন যে জিনিষগুলো যাচ্ছিল সেগুলো এতই সামান্ত যে তাই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করাটা ঠিক হ'ত না। তবে এবার যে জিনিষ গেছে তার পর আর চুপ করে থাকা চলে না। আপনি যে নিয়েছেনই এমন কথা আমি বলছি না, তবে আমাদের সন্দেহ নিরসনের জন্তে আপনার ঘরখানা আমরা একবার দেখব। আশা করি আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই?

সিদ্ধিনাথবাবু জড়ের মত বসে রইলেন, হাঁ, না কিছুই বললেন না। হেড মাষ্টার মশাই আদেশের ভঙ্গীতে বললেন, তা হলে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। টিফিন শেষ হতে এখনও দেরি আছে, এখন যদি আমরা বেরিয়ে পড়ি টিফিনের মধ্যেই ঘুরে আসতে পারব।

একজন টিচারকে চার্জে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সিদ্ধিনাথবাবু পুতুলের মত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চললেন। একদল ছাত্র মজা দেখার জন্তে পিছু নিয়েছিল, হেড মাষ্টারমশাইয়ের রক্তচক্ষু দেখে তারা ফিরে গেল।

রাস্তার পাশেই চাকরদের ঘরের সঙ্গে একখানা ঘর। দরজার সামনে এসে সিদ্ধিনাথবাবু পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে শেষে বিরক্ত হয়ে হেড মাষ্টারমশাই বললেন, চাবি বার করুন সিদ্ধিনাথবাবু।

সিদ্ধিনাথবাবু তেমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কথা কানে ঢুকল কি না বোঝা গেল না।

হেড মাষ্টারমশাই রেগে গিয়ে নিজেই ওঁর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বার করলেন। তালা খুলে ভিতরে ঢোকার আগে সিদ্ধিনাথবাবুকে বলা হ'ল, ঢুকুন সিদ্ধিনাথবাবু।

সিদ্ধিনাথবাবু তেমনি নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন. এবারেও কথা কানে ঢুকেছে কি না বোঝা গেল না।

শেষে একরকম জোর করেই ওকে ভিতরে ঢোকানো হ'ল। তার পর আমরা ঢুকলাম, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম মুহূর্ত্তখানেকের জন্ম। দারিদ্র্যের যে বীভৎস মূর্ত্তি সেদিন চোখে পড়েছিল আজও তা ভুলতে পারি নি। নীচু, খোয়া উঠা, স্যাঁৎসেঁতে ঘর, তারই এক কোণ থেকে আর এক কোণ অবধি লম্বা হয়ে শুকোচ্ছে একটা ছেঁড়া কাপড়, সে কাপড় পরে কেউ যে লজ্জা নিবারণ করতে পারে এ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঘরের পিছন দিককার জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাছে পথ চলতে লোকের নজরে পড়ে। ঘরের এককোণে জড়ো করা রয়েছে দোমড়ানো একখানা মাদুর আর তুলো বার করা একটা বালিশ, অনুমান করলাম ওইটিই শয্যা। একপাশে একটা দড়ির আলনা থেকে ঝুলছে একখানা ওয়ার-বিহীন গলে-পড়া কাঁথা, একটা ময়লা হাতকাটা ফতুয়া আর তেলচিটে রঙান গামছা। ঘরের মেঝেয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে একটা কাঁচভাঙা লণ্ঠন, কানাভাঙা কলসী, চটা-উঠা কলাই করা গেলাস, মরচে-ধরা টিনের মগ, গোটাকয়েক পোড়া বিড়ি আর গুচ্ছেরখানেক দেশলাইয়ের কাঠি। একপাশে একটা আধ-খাওয়া পাকা বেলে পিঁপড়ে ধরো জায়গাটা জঘন্ত হয়ে উঠেছে।

ঘরের আসবাব বলতে চোখে পড়ল একটা চটা-উঠা টিনের তোরঙ্গ, যদি কিছু থাকে ত ওরই মধ্যে আছে। হেড মাষ্টারমশাই বললেন, বাক্সের চাবিটা দিন সিদ্ধিনাথবাবু।

সিদ্ধিনাথবাবু কোটের পকেট আঁকড়ে ধরে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, চাবি ছাড়বেন না কিছুতে।

হেড মাষ্টারমশাই নিষ্করুণ কণ্ঠে বললেন, যতীনবাবু, দেখুন দিকি কুলুপটা ভাঙা যাবে কি না।

পুরনো মরচে-ধরা কুলুপ, একটা টান দিতেই সবসুদ্ধ খুলে এল। ডালা খুলতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ভিতরে কি আছে দেখবার জন্তে।

রাশীকৃত বাজে কাগজ আর পুরোনো চিঠির স্তূপ। হেড মাষ্টারমশাই অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, আপনি বাক্স উল্টে দিন যতীনবাবু।

ওঁর কথামত বাক্স উল্টে দিলাম। বাজে কাগজ আর পুরনো চিঠির স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চেম্বার্সের সেই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ডিক্সনারী আর তার সঙ্গে খানকয়েক নোট বইয়ের 'স্পেসিমেন কপি', সেগুলো ইস্কুলে আসার পর বোধ হয় পুরো এক হপ্তাও পেরোয় নি। সিদ্ধিনাথবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি উনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, মুখের সব রক্ত সরে গিয়ে মুখখানাকে দেখাচ্ছে যেন মড়ার মুখ।

দম নেওয়ার জন্তে একটু থামলেন যতীনবাবু, তার পর আবার সুরু করলেন, সেই দিনই ডিসচার্জ্জড্ হলেন সিদ্ধিনাথবাবু। যার বাড়ীতে থাকতেন তিনিও সব শুনতে পেয়ে সেইদিনই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন। পরে শুনেছিলাম সেদিন রাত্রে নাকি উনি সেক্রেটারীর কাছে গিয়েছিলেন ফিনান্সিয়াল অবস্থার কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইতে। সেক্রেটারী হাঁকিয়ে দেন এই বলে যে, চোরের ঠাঁই নেই আমার ইস্কুলে।

এর পর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তবে লোক মুখে শুনি এখনও নাকি এখানে-ওখানে চাকরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

যতীনবাবু থামলেন।

এর পর প্রায় মাস ছয়েক কেটে গেছে। সিদ্ধিনাথবাবুর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন টিফিন পিরিয়ডে টিচার্স-রুমে বসে হরিপদবাবু বললেন, আজ আপনাদের একটা জোর খবর দেব।

সবাই সমুৎসুক নেত্রে ওঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

হরিপদবাবু বলতে লাগলেন, অনেকদিন বাদে সেই সিদ্ধিনাথবাবু আবার কাল রাত দশটার সময় এসে হাজির। দেখে ত পিত্তি জলে গেল, বললাম, কি মনে করে? তাতে একগাল হেসে বললেন, এই ভায়ার কাছেই এসেছিলাম। ভাবলাম অনেকদিন কোন খবর পাই নি, একবার দেখে আসি কিছু খোঁজ-খবর হ'ল কি না।—শুনে পা থেকে মাথা অবধি জলে গেল। বললাম, ঢের ঢের বেহায়া লোক দেখেছি মশায়, আপনার মত দু'কান কাটা কোথাও দেখি নি। চাকরীর খবর নিতেই হয় ত একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে খবর নিলেই পারতেন, তা নয় বলা নেই কওয়া নেই রাত দুপুরে হুট্ হুট্ করে যে লোকের বাড়ী এসে হাজির হলেন, কে এখন আপনার জন্ত ভাতের থালা সাজিয়ে বসে আছে বলুন দেখি?

একটু দম নিয়ে হরিপদবাবু আবার সুরু করলেন, একেই বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ বলে মন-মেজাজ বেশ ভাল ছিল না,

তার উপরে ও কথা শুনে গেল মাথায় রক্ত চড়ে। রাগের মাথায় মুখে যা এল দিলাম আচ্ছা করে শুনিয়ে। বললাম, খাসা ব্যবসা ফেঁদেছেন মশাই, চাকরীর ছুতো করে আজ এর বাড়ী কাল ওর বাড়ী দিব্যি খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছেন। তাও যদি বুঝতাম সত্যিকারের অভাবী লোক, তা হলেও না হয় কথা ছিল। আপনার মত গুণী লোকের আবার অভাব কি মশাই, একদিন সিঁধ দিলেই ত আপনার সাত দিনের খোরাক উঠে আসবে। অত সহজ উপায় থাকতে আপনি এই সব করে বেড়াচ্ছেন কিসের জন্যে।

সবাই নড়ে চড়ে বসলেন। দ্বিতীয় টিচার তারক বাবু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, আপনি বললেন এ কথা ?

হরিপদবাবু টেবিলে সজোরে একটা চাপড় মেরে বললেন, বলব না মানে ? একবার ছেড়ে হাজার বার বলব, স্পষ্ট কথা বলতে হরিপদ ভয় পায় না। বললাম, 'আপনার গুণের কথা ত জানতে আর কারও বাকি নেই মশায়। সাপকে বিশ্বাস করা যায় তবু চোরকে বিশ্বাস করা যায় না। আপনার মত চোর-জোচ্চোরকে রাত দুপুরে বাড়ীতে ঢুকিয়ে শেষে কি বিপদে পড়ব ?'

একটা হিংস্র উল্লাস সবার চোখে মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। একজন প্রশ্ন করলেন, তার পর ?

হরিপদবাবু বললেন, তার পর আর কি। ধরা পড়ে ত বাছাধনের মুখখানি ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তখনও অবধি চৌকাঠ পেরোয় নি, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্ত্তির মত। আমার তখন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, চোর জোচ্চোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার মত সময় ছিল না, দিলাম মুখের উপর দরজা বন্ধ করে। সকালবেলা উঠে দরজা খুলে দেখলাম নেই, ভাবলাম যাক্ আপদ বিদেয় হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া করে ট্রেন ধরব বলে ইষ্টিশানে আসছি, দেখি একটা সাঁকোর ধারে জনকয়েক কুলি জটলা করছে। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার রে ? সে বললে বাবু, একজন লোক গলা দিয়েছে কাল রাত্তিরে, আজ সকালবেলা তার মুণ্ডুটা পাওয়া যাচ্ছে না।—তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি একটা কবন্ধ পড়ে আছে উপুড় হয়ে। সে দেহ দেখে আর কেউ চিনতে পারবে না বটে, কিন্তু আমি পারলাম। সে কোট যে একবার দেখেছে সে আর দ্বিতীয় দিন ভুল করবে না।

নতুন শহর

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রান্তর ছায় ইঁট কাঠে আর কলরবে ভরে দিশপাশ,
আর, মজুর কামিন মিস্ত্রী ছুতার করে ঠন্ ঠন্ ঠুকঠাক,
শহর গড়িছে, মুখর আকাশ, বুকে বুকে ভরে নিশ্বাস,
আর সূর্য্য যেন সে প্রাণশিখাভরা আলো মধুঝরা মৌচাক।

কত সৌধপ্রাসাদ-শীর্ষ সুদূরে মেঘের মুকুটে ঝলকায়
হেথা ঝকঝক করে কোঠাবাড়ীগুলি মানুষে মানুষে ভরপুর
আজ সুপ্তির দেশে এলো জাগরণ, ইতিহাস পাতা ওল্‌টায়
তাই পায়ের পরশে পথে ছায়া কাঁপে, নব নব পথ বন্ধুর।

সন্ধ্যার আলো রং ছুঁয়ে যায়, ঝিক্‌মিক্ করে কার্নিশ,
জান্‌লার কাঁচে মুঠো মুঠো আলো আগুনের মত জলছে
সোফায় কৌচে আলমারি-গায় ঝকঝকি ওঠে বার্নিশ
চা'র পেয়ালায় ঠুনঠান্, কত কলগুঞ্জন চলছে।

রাত নামে, সেই ভূতপ্রেত-হানা মাঠ নির্জন দিক্‌হীন,
বুড়ো বটগাছে ব্রহ্মদৈত্য, মেলেনাকো তার উদ্দেশ,
কবে আলেয়ার শিখা নিবে গেছে, থেমেছে ঝিঁঝিঁর ঝিন্‌ঝিন,
কালের পাথার পার হয়ে তরী পৌঁছলো এসে কোন্ দেশ ?

আঁধার-সাগরে বিদ্যুৎ-বাতি কক্ষে কক্ষে ঝলমল,
শতেক জাহাজ স্থির হয়ে যেন, বুঝি বা গমন উন্মুখ,
দখিনা বাতাস কাঁপে পর্দায় পালের মতন চঞ্চল,
ক্যাবিনে ক্যাবিনে কেহবা ঘুমায়, কেহ বুঝি জাগে উৎসুক

মৃত্যুনিথর মরুভূর বুকে এলো জীবনের কল্লোল,
কর্ম্মমন্ত্রে ওঠে সঙ্গীত ভোর থেকে ভর রাত্রি,
তন্দ্রা ভেঙেছে, জনতার বুকে লাগে সিন্ধুর ঢেউ-দোল,
ওঠে পড়ে ভাসে কাতারে কাতার হাজার হাজার যাত্রী।

শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রথমেই বলিতেছি আমি শিক্ষাবিদ্ নহি এবং শিক্ষাব্রতীও নহি। তবে কলিকাতার ও পল্লী-অঞ্চলের কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত বহু দিন হইতে সংযুক্ত আছি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সহিতও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলাম। ইহার ফলে যে সামান্য ও অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহার উপর নির্ভর করিয়াই কয়েকটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

এই কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায় বা বিভিন্ন স্তরের বালক, যুবক প্রভৃতির উপযোগী পৃথক পৃথক শিক্ষা-প্রণালী এখনও চূড়ান্ত ভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতীগণও এখনও একমত হইতে পারেন নাই; নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও মতের ঐক্য নাই; যাঁহাদের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার অর্পিত রহিয়াছে তাঁহারাও নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। প্রত্যেক স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ) শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বহু আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে ও হইতেছে, বহু কমিটি, কমিশন বসিয়াছে, কিন্তু কোন প্রণালী বা পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় নাই, পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণেরও এ সম্বন্ধে খুবই অভিযোগ আছে।

পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ (প্রধানতঃ কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি সম্প্রদায়) বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে আদৌ সন্তুষ্ট নহেন। প্রধানতঃ, সমাজে শিক্ষিতদের একটা সম্মানজনক স্থান আছে এই ধারণায় এবং লেখাপড়া শিখিলে একটা ভাল চাকরী পাওয়া যাইবে এই আশায় পল্লী অঞ্চলের কৃষক ও শিল্পী সম্প্রদায় তাঁহাদের সন্তানদিগকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু স্থানীয় বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষা লাভের পর এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ বা আবহাওয়ার গুণে কৃষক-সন্তান বা শিল্পীর সন্তান পৈতৃক পেশাকে অসম্মানজনক পেশা বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করেন ও তৎপ্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য ও অবহেলাই দেখা যায়, শিক্ষার গতি বা মান যতই বাড়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য এবং অবহেলা ততই দৃঢ় হয়। কৃষক-সন্তান পিতা বা অভিভাবকের সহিত মাঠের কাজে যোগদান করেন না, কুমোরের সন্তান চাকে বসেন না। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চাকরী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহারা বিদেশে চলিয়া যান এবং যাহা উপার্জ্জন করেন তদ্দ্বারা নিজেদের ব্যয়ই প্রধানতঃ বহন করিতে পারেন, পিতাকে বা অভিভাবককে অতি সামান্য আর্থিক সাহায্য করেন। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া এবং ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণের কথাই বলিলাম। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া বা ম্যাট্রিকুলেশন কিম্বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণ যদি কোন রকমের চাকুরী সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা গ্রামেই পিতা বা অভিভাবকদের বাড়ীতেই থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেন না। তাঁহারাও খুবই অসুখী মনে দিন যাপন করেন এবং ইহাদের পিতা বা অভিভাবকগণ কম অসুখী হন না; একে ত শিক্ষিত সন্তানের কোন রকম সাহায্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হন, ইহার উপর শিক্ষিত সন্তানের পরিচ্ছদের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অধিকতর ব্যয় করিতে হয়। আমার নিজের অঞ্চলে এইরূপ উদাহরণ আছে, এইরূপ শিক্ষিত যুবকদের এবং তাঁহাদের অভিভাবকদের অভিযোগ ও অনুযোগের কথা জানি। অবান্তর হইলেও এই প্রসঙ্গে ইহা হইতে উদ্ভূত আর একটি পরিস্থিতির কথা বলিতেছি। আমার পল্লীর গৃহের অতি পুরাতন পরিচারকের (জাতিতে দুলে) ভ্রাতুষ্পুত্র স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরীর অনুসন্ধানে আছে। সে একদিন আমার গৃহে আসিয়াছিল, পরিষ্কার ধুতি জামা জুতা পরিধান করিয়াই আমার নিকটে আসিয়াছিল এবং আমি তাহাকে আমার সামনের চেয়ারেই বসিতে বলিয়াছিলাম, সেও বসিয়াছিল, এমন সময়ে আমার পরিচারক (তাহার জ্যাঠা) আমার নিকটে আসিল—এবং ঘরের মেঝেতেই বসিল, ভ্রাতুষ্পুত্র চেয়ার হইতে উঠিল না, কিম্বা জ্যাঠাকে কোন সম্মান দেখাইল না। ভ্রাতুষ্পুত্রের পিতারও আমার পরিচারকের ন্যায় কৌপীন বস্ত্র, অনাবৃত দেহ, কাঁধে গামছা—চাষের কাজ করেন। অতি সাধারণ কৃষক। সেই দিনও কলিকাতায় এই রকম একটি ঘটনা ঘটিল। উড়িষ্যাবাসী একজন "হালুইকর ব্রাহ্মণ" আমার খুবই পরিচিত, কলিকাতায়ই থাকেন, আমার নিকটে প্রায়ই আসেন—এবং আসিয়া ঘরের মেঝের উপরই বসেন—হাঁটুর উপর বস্ত্র পরিধান করেন, অনাবৃত দেহ, কাঁধে একখানা গামছা থাকে। তাঁহার পুত্র আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সর্টহাণ্ড' শিখিতেছে এবং চাকরীর সন্ধানও করিতেছে। "হালুইকর ব্রাহ্মণ" একদিন তাঁর পুত্রকে আমার নিকট লইয়া আসিলেন—বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণের হাঁটুর উপর বস্ত্র, অনাবৃত দেহ এবং কাঁধে গামছা, কিন্তু পুত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ধুতি, জামা, জুতা পরিহিত, হাতে রিষ্ট ওয়াচ আছে। ব্রাহ্মণ মেঝের উপর বসিলেন, পুত্রকে চেয়ারে বসিতে বলিলাম, তিনি চেয়ারে বসিলেন। এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি ত হইবেই, দৃষ্টিকটু হইতে পারে—কিন্তু নিবারণ করিবার উপায় নাই।

সকল সম্প্রদায়ের বা সকল স্তরের বালক ও যুবকগণের শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষিতব্য বিষয় প্রভৃতি একই ছাঁচে ঢালিলে সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালী, পৃথক পাঠ্য বিষয়

প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করিলে খুব সম্ভব সমস্তার সমাধান কতকটা হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, একই সম্প্রদায়ের সকলের শিক্ষার প্রয়োজন সমান নহে, আর্থিক সামর্থ্যও সমান নহে। সুতরাং প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুসারেও শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। একজন কৃষক তাঁহার সন্তানকে স্থানীয় এমন এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন যেখানে তাঁহার সন্তান কিছু দিন অধ্যয়নের পর কিঞ্চিৎ লেখা-পড়া শিখিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরনের কৃষি-কাজও শিখিতে পারে। কৃষকের এমন আর্থিক সামর্থ্য নাই যে, বৎসরের পর বৎসর তাঁহার সন্তানের এইরূপ শিক্ষার জন্ত ব্যয় ভার বহন করেন। কৃষক ইহাই চান যে, তাঁহার সন্তান শিক্ষা সমাপ্তির পর কৃষি-কাজেই ফিরিয়া আসিবে। শিল্পীর সন্তানদের উপযোগী এই রকম শিক্ষারও প্রবর্ত্তন করা উচিত।

সুতরাং পল্লী-অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত এমন বৃত্তিমূলক প্রাথমিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহার সুযোগ ও সুবিধা বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে গ্রহণ করিতে পারে। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি-শিক্ষাকেই প্রাধান্ত দিতে হইবে—তবে স্থানীয় প্রধান প্রধান শিল্পসমূহের উৎকর্ষসাধনের উপযোগী শিক্ষাও তাহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শিক্ষারই প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ স্তর থাকিবে। প্রাথমিক শিক্ষার পর যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রগণ মাধ্যমিক এবং উচ্চ স্তরের শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। প্রত্যেক স্তরের, বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-প্রণালী এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও আবহাওয়া এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে শিক্ষাকালীন সময়ে এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রগণ গ্রামের প্রতি, নিজ নিজ পরিবেশের প্রতি এবং পৈতৃক পেশার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিবার সুযোগ না পান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় প্রায়ই বলিতেন —"Do not lift the boys of the countryside out of their own environments. পরে তারা আর গ্রামে ফিরে যেতে চাইবে না।" তাঁহার এই কথা যে কত সত্য তাহা আমরা অনেকেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে যে, কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর পল্লীগ্রামের অনেক ছেলেই কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যেই থাকিতে চান—গ্রামের প্রতি যেন বিমুখ হন—কারণ গ্রামের রাস্তাঘাট ভাল নহে, সেখানে বিজলিবাতি নাই, সিনেমা নাই, হেয়ার-কাটিং সেলুন নাই, রেস্তোরাঁ নাই, খবরের কাগজ নাই; তেমন সঙ্গীও নাই। সেখানে পুষ্করিণীতে স্নান করিতে হয়, মাঠে মলত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ অনেক অসুবিধা আছে। এইজন্তই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যদি ২৪ ঘণ্টার জন্ত কলিকাতার ডিক্টেটার করা হয় তিনি প্রথমেই Hardinge Hostel ভূমিসাৎ করেন। সুতরাং যতটা সম্ভব শিক্ষাকালীন অবস্থায় ছাত্রদিগকে শহরমুখী না করিয়া গ্রামমুখী করা বিশেষ দরকার।

পল্লী-অঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘরবাড়ী ইত্যাদি এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে পল্লীর জনসাধারণ উহাকে ইন্দ্রপুরী মনে না করেন, তবে উহা নিশ্চয়ই উন্নত ধরনের হইবে এবং উহা পল্লী-অঞ্চলের আদর্শ হইবে—এবং ঐ আদর্শ অনুসরণ করা জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে। একটি উদাহরণ দিলে আমার কথাটা হয়ত স্পষ্ট হইবে; আমার গ্রামের বিদ্যালয়ের আমি সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে বিদ্যালয়ে একটি 'সেপটিক্ প্রিভি' করিতে হইবে, আমি বলিলাম, "একটি 'সেপটিক্ প্রিভি' করিতে হইলে অন্ততঃ ৪০০৲ টাকা খরচ হইবে; বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০০ শত ছাত্র, একটি "প্রিভি" করিলে প্রয়োজন মিটিবে না, আরও একটি কথা এই যে, ফ্লাশিং-এর ব্যবস্থা করা যাইবে না—জল টানিয়া 'প্রিভি' পরিষ্কার করিতে হইবে, 'প্রিভি'র নিকটে জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে, গ্রামে মেথর নাই, 'প্রিভি' নোংরা হইলেই বা কে পরিষ্কার করিবে? সুতরাং বিদ্যালয়ের জন্ত আমি 'সেপটিক্ প্রিভি'র পক্ষপাতী নহি, ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড বা বোর হোল লেট্রিনের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, বিদ্যালয়ে ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড বা বোর হোল লেট্রিনের ব্যবস্থা দেখিলে গ্রামের অনেকেই হয়ত উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইহার সুবিধা দেখিয়া এই বিষয়ে প্রচার-কার্য্য করিবেন।" প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার কথা সমর্থন করিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিতেছি—জেনারেল এডুকেশন অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার সময়ে শহরের ছাত্রগণ যে সকল সুযোগ ও সুবিধা পান পল্লী-অঞ্চলের ছাত্রবৃন্দ সে সকল সুবিধা ও সুযোগ পান না। প্রায় সকল বিষয়েই তারতম্য দেখা যায়। পল্লী-অঞ্চলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, গ্রন্থাগারের অভাব, মেধাবী ছাত্রের অভাব, উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব এবং আরও অনেক বিষয়েই অপ্রতুল আছে। সুতরাং পরীক্ষার মানের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করা দরকার।

এখন শিক্ষক সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতেছি। প্রাচীন যুগের "গুরুর কাল" আর ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং গুরুর ব্রত, আদর্শ, বিদ্যাদান প্রভৃতি আলোচনা করিলে কোন ফল হইবে না। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষক ও শিক্ষাদানের কথাই আলোচনা করিতে হইবে। আমরা জানি প্রাচীনকালের পাঠশালার দরিদ্র "গুরু-মশাই" জনসাধারণের নিকট হইতে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতেন বর্ত্তমান যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহা সর্ব্বত্র পান না। ইহার কারণ অনেক থাকিতে পারে; কিন্তু এই কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, বর্ত্তমান যুগে জীবনযাত্রার মানই হইতেছে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জনের প্রধান সোপান। সুতরাং একজন শিক্ষককেও এইরূপ জীবনযাত্রার মান রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক) শিক্ষক-গণের বেতনের হার বিভিন্ন। যে সকল বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষা

পর্ষৎ হইতে আর্থিক সাহায্য পান সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার সম্প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সকল বিদ্যালয় অনুমোদিত (recognised) কিন্তু আর্থিক সাহায্য পান না বা গ্রহণ করেন না সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট নাই। আমার অভিমত এই যে, প্রত্যেক অনুমোদিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনের হার সমান হওয়া উচিত। কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন শিক্ষকের যোগ্যতার উপরেই প্রথম দৃষ্টি রাখেন এবং যোগ্য শিক্ষকের উপযুক্ত দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই যেন শিক্ষকগণের বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হয়। বরং অধিকতর কৃতী ও মেধাবী স্নাতকগণকে শিক্ষকের কার্য্যে আকর্ষিত করিবার জন্য শিক্ষকগণের বেতন ভাতা ইত্যাদির হার অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রধানতঃ শিক্ষকের শিক্ষকতার গুণে, সাহচর্য্যে এবং আদর্শেই ভবিষ্যতের নাগরিক প্রস্তুত হইবে। কেবল পঠিতব্য বিষয় শুষ্কভাবে বুঝাইয়া দিলেই শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্পাদন শেষ হয় না—ছাত্রগণের মনে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি জন্মাইয়া দিতে হইবে—এবং এই প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় সে বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে হইবে। শিক্ষকদের আদর্শেই ত ছাত্রদের মধ্যে চারিত্রিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হইবে। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এই কথা প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকগণের প্রতি অধিকতর ভাবে প্রযোজ্য। প্রধানতঃ তাঁহাদের দ্বারা প্রস্তুত ভিতের উপরেই ত ভবিষ্যতের ইমারত দাঁড়াইবে। কিন্তু দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকগণ সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। তাঁহাদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি খুবই অল্প, আবার অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা শিক্ষাদান-কার্য্যে উপযুক্ত নহেন। সাধারণতঃ কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন ম্যাট্রিক-ট্রেনড শিক্ষক হইলেই প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকের উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহারা প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন তাঁহারা জানেন Matric-trained শিক্ষকের উপযুক্ততা কতটুকু। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। "স্পেশাল ক্যাডারের" শিক্ষকগণের দুরবস্থার কথা জানি, তাঁহাদের উপযুক্ততার কথাও জানি। ইহার দ্বারা বেকার সমস্যার হয়ত আংশিক সমাধান হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তারে বা উপযুক্ত শিক্ষাদানে কোন সাহায্যই হয় নাই। এমন অনেক উদাহরণ জানি তৃতীয় বা দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বহুদিন যাবৎ শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, বর্ত্তমানে "স্পেশাল ক্যাডারে"র শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারাই ভবিষ্যৎ নাগরিকের শিক্ষার ভিত্তি গঠন করিবেন।

ভাঙা বাড়ী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

নদীর কিনারে একটি ত্রিতল বাড়ী,
কারুকাজ করা গৃহ দক্ষিণ-দ্বারী।
দাঁড়ায়ে রয়েছে ভাঙা,
জবা ফুটে আছে রাঙা,
ছাদের পাশটা আধেক গিয়াছে ছাড়ি'।

২

ঘাট হতে আর নাহিক পথের চিনে,
সরু একপদী ভরিয়া গিয়াছে তৃণে।
পরিজন কেহ নাই
জঙ্গল ভরা ঠাঁই
ফাটলেতে তার পেঁচা ডাকে রাতে দিনে।

৩

বিশাল রাজ্য সুপ্রাচীন রাজধানী
নিঠুর নিয়তি কোথায় লয়েছে টানি'।
যুগের কৃষ্টি হায়—
মিলিয়াছে সিকতায়,
বাড়ী ভাঙিয়াছে—বেশী কি হয়েছে হানি ?

৪

ছোট হোক—তবু দেখে মনে পড়ে তাকে,
'দ্বারা' 'বৈশালী' 'মথুরা' 'অযোধ্যাকে।'
ফুরায়েছে উৎসব,
গত তার গৌরব,
বড়র বেদনা ছোটকে আঁকড়ি' থাকে।

৫

ওই বাড়ীটির ক্ষীণ প্রদীপের আলো
দীনতার ছবি—তবুও লাগিত ভাল।
সে আলোতে ছিল তথা—
কত রূপ, কত কথা,
তারকা একটা আলেয়া হইয়া গেল।

৬

দেখি যবে তাকে মলিন চন্দ্রালোকে,
স্বপন-কুহেলি বিছায় সে মোর চোখে।
পড়ে কুতূহলী প্রাণ,
কি যেন উপাখ্যান—
লিখিত ভগ্ন চিত্রলিপির শ্লোকে।

কালিদাস-সাহিত্যে 'যমক'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন শব্দালঙ্কারের মধ্যে 'যমক' অলঙ্কার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যমক বলিতে বুঝায়—একটি শ্লোকের মধ্যে একই শব্দের দুই বা ততোধিক প্রয়োগ। যমকের সর্ব্বাধিক প্রয়োগ দেখা যায় মহাকবি কালিদাসের 'নলোদয়' নামক কাব্যে। নলোদয়ের চারিটি সর্গের মোট ২১৭টি শ্লোকের মধ্যে প্রায় দুই শত শ্লোকের প্রত্যেক শ্লোকে চারিটি করিয়া একই শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, নলোদয় কাব্য কালিদাসের রচনা নয়, কিন্তু যখন শ্লোকের পর শ্লোকের প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকে এক রকমের চারিটি করিয়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তখন মনে হয় মহাকবি কালিদাসের মত ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি ছাড়া এরূপ কবি-প্রতিভার পরিচয় অন্য কোনও কবির দেওয়া কি সম্ভব? সভ্যজগতে সংস্কৃত ব্যতীত এমন কোনও ভাষা আছে বলিয়া জানা নাই, যে ভাষার কোনও কাব্যে বা পদ্যে পর পর দুই শত শ্লোকের প্রত্যেকটি শ্লোকে বা 'ষ্ট্যাঞ্জায়' একই প্রকার শব্দের চারিবার করিয়া প্রয়োগ আছে। যাহাই হউক, এখানে কতকগুলি উদাহরণ দেখানো যাইতেছে।

'যোজনি নাগোপীতশ্চচার যো বল্লবাঙ্গ নাগোপীতঃ।
ভূর্যে নাগোপীতঃ কংসাদ্যো দ্বেষমেব নাগোপীতঃ॥'

নল ১।২

এখানে, এই শ্লোকে 'নাগোপীতঃ' শব্দের চারিবার প্রয়োগ আছে, তবে প্রত্যেকটি নাগোপীত শব্দ যে এক একটি মূল শব্দ তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্যার্থমূলক দুইটি বা তিনটি শব্দ সন্ধি ও সমাসের দ্বারা একত্র করিয়া নাগোপীতঃ শব্দ গঠন করা হইয়াছে। শ্লোকটির অর্থ মহাকবির টীকাকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেওয়া গেল—

১ম—যোজনি নাগোপীতঃ—যঃ না+অগোপীতঃ অজনি, যে 'না' অর্থে পুরুষ ('নৃ' শব্দের প্রথমার এক বচন), 'অগোপীতঃ' শব্দের অর্থ কোনও গোপীর গর্ভে জন্ম নয়, অর্থাৎ যে পুরুষ কোন গোপীর গর্ভে জন্মান নাই—দেবকীর পুত্র।

২য়—যো বল্লবাঙ্গ নাগোপীতঃ চচার—যঃ বল্লব+অঙ্গনা +গো+পীতঃ চচার; যিনি, 'বল্লব' শব্দের অর্থ গয়লা, 'অঙ্গনা' অর্থে মেয়েরা, 'গো' মানে চক্ষু, 'পীত' অর্থে পান করা হইয়াছে, 'চচার'—বিহার করিতেন। গয়লাদের নারীরা যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা পান করিতেন, অর্থাৎ প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে দেখিতেন।

৩য়—ভূর্যে নাগোপীতঃ—ভূঃ যেন+অগোপি+ইতঃ, 'অগোপি' শব্দে অর্থ রক্ষা করা হইত, যাঁহার দ্বারা পৃথিবী রক্ষিত হইত; 'ইতঃ' শব্দটিকে পরের শব্দগুলির সহিত ধরিতে হইবে।

৪র্থ—নাগোপীতঃ—নাগঃ+অপি+ইতঃ, 'নাগঃ' অর্থে সর্প, 'ইতঃ' শব্দের অর্থ পরাজিত হইয়াছিল, সুতরাং অর্থ হইবে, যাঁহার দ্বারা সর্পও অর্থাৎ কালিয় নাগও পরাজিত হইয়াছিল।

'কংসাদ্ যো দ্বেষমেব ইতঃ'—কংসের নিকট হইতে যিনি হিংসা ছাড়া আর কিছুই পান নাই।

পুরা শ্লোকটির অর্থ হইবে, যিনি কোনও গোপীর গর্ভে জন্মান নাই (দেবকীর পুত্র), যাঁহার রূপসুধা গোপদের নারীরা চক্ষুদ্বারা পান করিতেন, যিনি পৃথিবীর রক্ষা করিতেন, যিনি কংসের নিকট হইতে হিংসা ছাড়া আর কিছুই পান নাই, এবং যিনি কালিয় নাগকেও দমন করিয়াছিলেন, তিনি বিহার করিতে লাগিলেন।

আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

'সোঽথ পরমহস্তেন প্রাপি নলেনোৎসবঃ পরমহস্তেনঃ।
স্ফুরিতপরমহস্তেন প্রবভৌ রবিণেব তৎপুরং পরমহস্তেন॥'

নল-১।৩৩

এই শ্লোকটিতে 'পরমহস্তেন' শব্দটির চারিবার প্রয়োগ আছে, এবং অধিকাংশ স্থলে অন্যার্থমূলক কয়েকটি শব্দকে সন্ধি ও সমাস দ্বারা যুক্ত করিয়া 'পরমহস্তেন' শব্দটি গঠন করা হইয়াছে। এখন ইহার অর্থ করা যাউক।

প্রথম চরণের অন্বয়—অথ পরমহস্তেন নলেন স পরমহস্তেনঃ উৎসবঃ প্রাপি। কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ; প্রথম 'পরমহস্তেন' শব্দের অর্থ 'পরম' অর্থাৎ সুন্দর বা আজানুলম্বিত বাহুযুক্ত নলের দ্বারা; দ্বিতীয় 'পরমহস্তেনঃ' শব্দের সন্ধি ভাঙ্গিলে দাঁড়ায়—পর+মহ+স্তেনঃ—'পর' অর্থে শত্রু, 'মহ' অর্থে উৎসব, আর 'স্তেন' কথাটির অর্থ অপহৃত, সুতরাং মানে হইবে, 'যে সভা শত্রুদের উৎসব-সভার সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছিল—সমস্ত চরণের অর্থ হইল, অনন্তর আজানুলম্বিত, বাহু নল সেই উৎসব-সভায় (দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায়)

প্রবেশ করিলেন, যে সভা শক্রদের সকল উৎসব-সভার সৌন্দর্যকে পরাজিত করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চরণের অন্বয়—তেন তৎপুরং স্ফুরিত পরমহস্তেন রবিণা অহঃইব পরং প্রবভৌ।

এখানে তৃতীয় 'পরমহস্তেন' শব্দের 'পরম' অর্থে উৎকৃষ্ট, 'হস্ত' অর্থে কিরণ রবিণা শব্দের বিশেষণ, সুতরাং অর্থ হইবে যেমন রবির প্রস্ফুরিত উৎকৃষ্ট কিরণ পাইলে। চতুর্থ 'পরমহস্তেন' শব্দের সন্ধি ভাঙিলে পাওয়া যায় পর+অহঃ+স্তেন; 'পরং' অর্থে উৎকৃষ্ট 'অহঃ' মানে দিবস, 'স্তেন' শব্দের অর্থ তাহা দ্বারায়। দ্বিতীয় চরণের অর্থ হইল, রবির উৎকৃষ্ট কিরণ পাইলে সুন্দর প্রভাতের যেরূপ শোভা হয় নল প্রবেশ করাতে সেই প্রাসাদেরও সেইরূপ শোভা হইল।

সমস্ত শ্লোকটির অর্থ—অনন্তর আজানুলম্বিতবাহু নল সেই উৎসব সভায় (দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায়) প্রবেশ করিলেন, যে সভা শক্রদের সকল উৎসব-সভার সৌন্দর্যকে পরাজিত করিয়াছিল; এবং রবির প্রস্ফুটিত উৎকৃষ্ট কিরণ পাইলে প্রভাতের যেরূপ শোভা হয়, নল প্রবেশ করাতে সেই প্রাসাদেরও সেইরূপ শোভা হইল।

মহাকবির আর একখানি কাব্য 'রঘুবংশ' হইতে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব—

'নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে
নভস্তলশ্যামতনুং তনূজম্।
খ্যাতং নভঃ শব্দময়েন নাম্না
কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্॥' রঘু-১৮৬

এই শ্লোকটিতে চারিবার 'নভঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে, চারিটির কোনটিই সন্ধিসূত্রে দ্বারা বদ্ধ কয়েকটি শব্দের সমষ্টি নয়। শ্লোকটির অর্থ হইল—আকাশবিহারীগণও (গন্ধর্বেরাও) তাঁহার যশোগীতি গাহিতেন। তাঁহার একটি পুত্রলাভ হইল, যাঁহার দেহ ছিল 'নভস্তল' অর্থাৎ আকাশের মত শ্যামবর্ণ, এবং যিনি নভঃমাস অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের মত প্রজাদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

আর একটি উদাহরণ

'তেন দ্বিপানামিব পুণ্ডরীকো
রাজ্ঞামজয্যোঽজনি পুণ্ডরীকঃ।
শান্তে পিতর্যাহৃত-পুণ্ডরীকা
যং পুণ্ডরীকাক্ষমিব শ্রিতা শ্রীঃ॥' রঘু—১৮৮

এই শ্লোকটির চারিটি চরণে চারিটি 'পুণ্ডরীক' শব্দের প্রয়োগ আছে। অর্থ দেওয়া গেল—তিনি (রাজা নভঃ) হস্তীদিগের মধ্যে পুণ্ডরীক নামক দিগ্‌গজের মত অপর রাজাদিগের অজেয় পুণ্ডরীক নামক এক পুত্রের জন্ম দিলেন, পিতার মৃত্যুর পর যাঁহাকে পুণ্ডরীকা অর্থাৎ শ্বেত-পদ্মধারিণী লক্ষ্মী পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ পদ্মলোচন শ্রীবিষ্ণুর মত আশ্রয় করিয়া রহিলেন।*

এতক্ষণ যে শ্লোকগুলি দেখাইলাম, তাহাদের চারি-চরণের প্রত্যেক চরণে একবার করিয়া একই শব্দের চারি-বার প্রয়োগ আছে, এইবার এমন শ্লোক দেখাইব যাহার প্রত্যেক চরণে একই প্রকার শব্দের চারিবার পাশাপাশি প্রয়োগ রহিয়াছে। যেমন—

'করমাকর মাকর মাকর মাকলয় ব্যসনং মম পাহি হরে।
দরতো দরতো দরতো দরতো বিকৃতৈর্মরুতাং
সুকরত্বমপি।' নল-১১৪৫

এই শ্লোকটির প্রথম চরণ দেখিলে মনে হয় যেন 'রমাক' এই শব্দের পর পর চারিবার প্রয়োগ রহিয়াছে, এবং দ্বিতীয় চরণেও ঠিক সেই ভাবে মনে হয় বুঝি চারিটি 'দরতো' শব্দ পাশাপাশি বসানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত তথ্য তাহা নহে, মহাকবি কতকগুলি বিভিন্ন শব্দকে সন্ধি ও সমাসের দ্বারা এমন অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত যুক্ত করিয়াছেন যে, দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় যেন একই শব্দের এক সঙ্গে চারিবার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রথম চরণের শব্দগুলির যদি সন্ধি ও সমাস ভাঙিয়া ফেলা যায়, চরণটি তাহা হইলে, এইরূপ দাঁড়াইবে—

ক রমাকর, মাকরং আকরং আকলয় ব্যসনং মম পাহি হরে। 'ক' (সম্বোধন) শব্দের অর্থ ব্রহ্মণ্, 'রমাকর' শব্দের 'রমা' অর্থে লক্ষ্মী, সুতরাং রমাকর অর্থে বুঝিতে হইবে যিনি লক্ষ্মীশ্রী প্রদান করেন, এমন যে ব্রহ্মণ্। 'মাকরং আকরং' অর্থে মকর নামক জলজন্তুর খনি অর্থাৎ সমুদ্র, 'আকলয়' অর্থে জানিও, 'ব্যসনং' কথার অর্থ বিপদ, 'মম' মানে আমার, 'পাহি হরে'র অর্থ হে হরি, রক্ষা কর। প্রথম চরণের অর্থ হইবে—হে লক্ষ্মীশ্রী প্রদানকারি ব্রহ্মণ্, আমার বিপদ-সমুদ্রের (মকর নামক জলজন্তুর খনির) মত হইয়াছে, অতএব হে হরি, আমায় রক্ষা কর।

দ্বিতীয় চরণের শব্দগুলির—সন্ধি ও সমাস ভাঙিলে এইরূপ হয়—

দরতঃ+অদরত+উদর+তোদ+রত মরুতাং সুকর, ত্বমপি বিকৃতৈঃ (মাং পাহি)। 'দরতঃ' শব্দের অর্থ ভয়

* বাংলা ভাষাতেও 'যমকের' অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন—
'জমি হ'ল আট কালি
খাজনা দিতে হবে কালই।
বামুন ভেবে হ'ল কালি
বলে 'মা, কি করলি কালী।'

হইতে, 'অদয়ন্ত' মানে অনল্প, 'উদর' অর্থে অভ্যন্তরে, 'তোদ' অর্থে দুঃখ, 'রত' শব্দে অবস্থিত বুঝায়, অর্থাৎ অনল্প (অত্যন্ত বেশী) দুঃখের মধ্যে অবস্থিত যে ভয়, সেই ভয় হইতে। 'মরুতাং' অর্থে দেবতাদের, 'সুকর' মানে মঙ্গলকারী কিংবা সুন্দর হস্তযুক্ত, 'ত্বমপি' মানে তুমিও, 'বিরুতৈঃ' অর্থে আশ্বাসবাক্য দ্বারা 'মাং পাহি' কথাটা ধরিয়া লইতে হইবে, যাহার অর্থ আমায় রক্ষা কর।

সমস্ত শ্লোকের অর্থ—লক্ষ্মীপ্রদানকারি ব্রহ্মণ্, আমার বিপদ সমুদ্রের মত হইয়াছে জানিবেন; হে হরি, দেবতাদেরও মঙ্গলকারী আপনি, আমার এই অত্যধিক দুঃখের মধ্যে অবস্থিত ভয়ের প্রকোপ হইতে সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা আমায় রক্ষা করুন।

এইবার এমন একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, যাহার অর্থ সহজে বুঝা যায়।

'যতো যতো যতো যতো রবের্মরীচি সঞ্চয়ঃ।
মহান্ধকার সঞ্চয় স্তত স্তত স্তত স্ততঃ॥' নল-২।৪৯

প্রথম চরণে 'যতঃ' শব্দের ও শেষ চরণে 'ততঃ' শব্দের চারিবার করিয়া প্রয়োগ রহিয়াছে। অর্থ হইবে—

প্রথম 'যতঃ' অর্থে যে হেতু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'যতঃ'র মানে যেখান হইতে, যেখান হইতে, চতুর্থ 'যতঃ' মানে চলিয়া গেল।

'ততঃ' অর্থে সেই হেতু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'ততঃ'র অর্থ সেইখানে সেইখানে: চতুর্থ 'ততঃ' অর্থে বিস্তৃত হইল।

সমস্ত শ্লোকটির অর্থ—যে হেতু রবির কিরণসমূহ যেখান হইতে যেখান হইতে চলিয়া গেল, সেই হেতু, সেইখানে সেইখানে মহা অন্ধকারের রাশি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

আম

শ্রীস্মরজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি দুটো আমগাছ প্রকাণ্ড বাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা একটু ছোট. অপরটা বেশ মোটাসোটা—মোষের পিঠের মত গুঁড়িটা লম্বা হয়ে যেন প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে ধরেছে বেল-গাছের ভেতর দিয়ে। একধারে ছোট ডালটায় ধাক্কা খেয়ে বেঁকে গেছে ধনুকের মত। এটার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। যদি অপরটায় আম ধরে তবে লম্বা বাঁশ-বাখারি বাড়িয়ে ধরলেই ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়বে চোখে মুখে।

বড়ু, অটল আর বনমালী। ওদের প্রাণে নতুন স্বপ্ন, চোখে মুখে রক্তিম দিনের ছন্দ; ভাবে আমের কথা। এই ছোট গাছ ঘিরে কত কথা, কত গল্প সুরু হয়। আর কয়টা দিন পরেই আমের মুখ দেখবে।

দীর্ঘ মাঘ-ফাল্গুন মাস যেন আর কাটতে চায় না। আজ চৈত্রের কাছাকাছি একটা নতুন স্বপ্ন,অজানা পুলক এনে দেয়। অড়হর গাছে চৈত্রের হাওয়ার ভারে নূপুর বাজে। হাওয়ার দাপটে দাপটে পথের ধুলো ঘূর্ণি হয়ে উঠে ভেসে যায় চঞ্চল স্রোতে দিগন্তরে। মনে পড়ে যাচ্ছে সিঁদুরপুলী গাছটার কথা। পালেদের ছোট্ট ডোবাটার পাশ দিয়ে গিয়ে পশ্চিম ধারে একটা চাঁপা ফুলের গাছ, আর তার পাশেই একটা মন্দির। ছাতলা পড়ে কালো রঙে ছোবানো হয়ে গেছে। ঠিক ওরই পাশে গাছটা। এই ক'দিনেই কি অসম্ভব বেড়ে উঠেছে ঠিক ওর মেজদির বিয়ের পর যেমনটি হয়ে উঠেছিল; সেই সাত দিনের পর তার চোখমুখের ভাব। তবে কি ওতেও এ বছর আম আসবে।

মুকুল এল প্রতি ডালে গুঁড়ি গুঁড়ি করে। ভেবেছিল ও-গাছে আর মুকুল আসবে না। যে গাছে পাতা গজায় সে গাছে কি আর মুকুল আসে? চিন্তায় ভুল হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় গত বছরের কথাটা। টুসী আম গাছটা আর সিঁদুরপুলী গাছটার পাতাও গজাল, মুকুলও এল, আম ধরল তার হাড়ে গোড়ে। তবুও কত গভীর ব্যথা, কত উদ্বেগ এই কয়টি দিনের মধ্যে। যে কয়টা মুকুল আসবে,কুয়াশায় দেবে ঝরিয়ে কিছুটা। যে কয়টায় আম ধরবে তাও বানরে খাবে, কিছু শুকিয়ে পড়বে গাছের তলায় ঠস ঠস করে।

চৈত্রের মাঝামাঝি এই কথাগুলিই বেদনায় সুর হয়ে ভাসত বড়ুর মনের দুকূল ছাপিয়ে। আমগাছের দিকে তাকিয়ে থাকে, ফিরে দাঁড়ায় চলতে চলতে পথে। কালু চাকরকে বলে, 'কালুকা, দেখ ত এ বছর এতে আম থাকবে কি?' কালু যেন আকাশ থেকে পড়ে।

হেসে হেসে বলে, 'মোটেই এসবেনে বাবু—মোটেই না।' খেতে বসতে গিয়ে মনে পড়ে যায় একটি দিনের কথা। 'আম হলে দুটো চাটনি বানিয়ে দিও ত মা বুঝলে?' বলে বতু ভাতের থালা কাছে নিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে উত্তরের অপেক্ষায়। রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে, ছোট বড় কত আম চিক চিক করছে। স্বপ্ন যায় টুটে। অনুতাপ জাগে, চোখের সামনে সবই আছে, হাতের ছোঁয়ায় কেন পায় না, এতই দুর্লভ বস্তু তা কে জানে!

বৈশাখের কাছাকাছি একদিন এই স্বপ্নই জাগ্রত করে ধরল চোখের সামনে কোন এক গোপন শিল্পী। গন্ধে, বর্ণে, ছন্দে, বৈচিত্র্যে একেবারে ঠিক ঠিক করে হাজির করেছে। একি স্বপ্ন! না, ছুটে এসেই দেখল বতু গাছের কাছে কেমন ধরেছে ডালে ডালে। সারা গাছটাকেই যেন ছেয়ে ফেলেছে। দুটো গাছেই এসেছে। বেলগাছের ভিতর দিয়ে যেটা চলে গেছে সেটার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। হাতের সামনে যা আছে তাই নিয়েই যত ভাঙাগড়া।

সেদিন থেকে আমগাছের তলা ছেড়ে আর নড়ে না বতু।—খেলাঘরের সবকিছু এনে বিছিয়ে দিলে। দেশলাইয়ের বাক্স, টিনকাটা, সিগারেটের টিন, ভাঙা টর্চলাইট, গোটাকতক কড়ি, কয়েকটা নতুন কাপড়ের গোলাপী ছবি, একটা বিয়ের কবিতা, কতকগুলি লোহার চাকতি পয়সার দুঃখ বাঁচিয়েছে! পাঠশালা থেকে এসেই একবার আসত। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কেমন যেন ধোঁয়াটে স্বপ্নময় পৃথিবী। খই ফোটার মত ঘেঁটু ফুলে ভরে গেছে চারপাশ। আবার পাঠশালা যাবার আগে—পড়ায় মোটেই মন বসে না। তাই পড়ার সরঞ্জামও সব এনে বিছিয়ে বই হাতে গাছের পানে চেয়ে বসে থাকে। অবসর আর কতটুকু, তাও এই গাছতলায় গাছতলায়।

দুলু বতুর সম্পর্কে মামা হয়। সমবয়সী কি দু'চার মাসের ছোট-বড়। নাকের কাছটায় একটা কাটা দাগ। কলকাতায় থাকে। সে এসেছিল দিনকয়েক আগে। তাকে কত আমের কথা শুনিয়েছে। গোপন পথগুলি আস্তে আস্তে চিনিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে মা চিঠি দিয়েছিল দুলুকে। 'আর, এসে যা হোক দুটো কচি আম নিয়ে যা'—বাবা অম্বল খেতে ভালবাসে। দুলুকে নিমন্ত্রণ করার পক্ষপাতী বতু অবশ্য ছিল, কিন্তু এভাবে ঝরিয়ে পেড়ে নিয়ে যাবে এ কথায় সায় দিতে পারে নি কোনদিন। তাই প্রার্থনা এইটুকু—দুলুর এ মতিভ্রম যেন কোন দিন না হয় ভগবান। ইতিমধ্যে এদিকের ব্যাপারও অনেকটা এগিয়ে গেছে। দারুণ গরম পড়েছে তাই সকালে স্কুলের বন্দোবস্ত হয়েছে। আম কুঁচিও নির্ভাবনায় বেড়ে উঠেছে সতেজ সবুজ হয়ে।

ভোরের স্কুল সব দিক দিয়েই ভাল। সকাল সকাল উঠেই একবার আমতলায় ঘুরে আসে বতু। তার পর স্কুলেও সেই আমেরই কথা। যার সঙ্গে ভাব তাকেই বলছে, চল্ না দেখে আসবি—সত্যি কি মিথ্যে—এক ডালে চৌদ্দ-পনরটা।

বৈশাখের মাঝামাঝি—সেদিন রবিবার। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মা শুয়ে পড়েছেন ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে। পিছনে বতু আজ অনেকটা শান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে আগে থেকেই। চারিদিকেই অনেকটা নীরবতা। রাজুর মা এতক্ষণ বাসন মাজছিল। কড়ামাজার শব্দ আর জল-পড়ার শব্দ সব একে একে মিলিয়ে গেল। এবার উঠে গেছে নিশ্চয়ই। আর কিছুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু বৈশাখের এই দুপুরবেলা একটা পানকৌড়ি ডাকছে থেকে থেকে। আর নির্জ্জন জলার ধারে কোকিলের স্বরটাও নেহাত মন্দ ঠেকছে না। 'খোকার মা গো'—বলে যে পাখীটা ডাকে সেটাও ডাকছে থেকে থেকে। মাঝে মাঝে একটা আগুনের হাওয়ার মত এসে পাতলা চুল উড়িয়ে দেয়। আর একটা ডাক বতু শুনেছিল বাতাসীর মায়ের কাছ থেকে, বোড়া সাপের একটা ডাক; ওরা ঠিক এমনি করে ডাকে। বতু আজ শুয়েই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়ের হাতটা গা থেকে নামিয়েই দেখতে পেল বতু, অটল আর বনমালী দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠানের কাঁঠাল গাছটার তলায়। আস্তে আস্তে কুলুঙ্গির ধার থেকে কাগজে মোড়া কি একটা নিয়েই ছুট দিল সোজা ছোট পুকুরের ধার দিয়ে, পিঠুলী গাছের কাছ দিয়ে আকন্দ গাছটা ফেলে রেখে, তার পর সামনেই সেই পাশাপাশি গাছ দুটো। একটা প্রকাণ্ড বড়, অপরটা অপেক্ষাকৃত ছোট। কচি কচি আম ধরেছে। বড় গাছটার একটা ডাল চলে গেছে বেল গাছের ভেতর দিয়ে, সেখানে নাগাল পাওয়া যাবে না। গাছের তলায় যেতেই মিলল একটা বড় বাখারি। কোন এক লোভাতুর তাদেরই মত এসে, অসহায় হওয়ার জন্যেই হোক বা ঠিকমত কায়দা করতে না পারার জন্যেই হোক ফেলে রেখে গেছে। বতু, অটল আর বনমালী ওটাকে ধরে ঠিক মাঝের বোঁটায় লাগিয়ে নাড়া দিতেই পড়ল গোটাকতক। কচি পাতাও পড়ল তার সঙ্গে। আরও চেষ্টা করবে ভাবল, কিন্তু ঘেমে উঠেছে অসম্ভব। এক হাতে বোঁটা লাগা আম, তাই অপর হাতে ঘামে-ভেজা চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলল, 'অটল, নিয়ে আয় থেঁতো করে।' অটল ছুটল পড়ি কি মরি করে, বতু গলা বাড়িয়ে দ্বিতীয় বার বলল, 'আর আসবার সময় একটা কলাপাতা—।'

একটু পরেই অটল ফিরে এল। বলল, 'বাড়ীর সবাই উঠে পড়েছে, বকবে যে! এই নে, কলাপাতাটা ধর।'

কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অথচ বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। অত সহজে মেটবার নয়। সমস্ত আনন্দটুকু যেন এক মুহূর্ত্তে মুক্তিলাভ করতে চাইছে। তাই সরাসরি শান বাঁধানো ঘাটের ধারে নেমে গিয়েই ঝামা দিয়ে থেঁতো করে, কলাপাতার ঠোঙা। তার পর মুখে ধরিয়ে বতু যে লঙ্কা আর নুনের গুঁড়ো এনেছিল তাই ছিটিয়ে দিয়ে সুরু করে চোঁ চোঁ টান। কিন্তু কি চমৎকার লাগে। খেতে খেতে আর ঠিক তাল থাকে না। গল্ গল্ করে অস্বাভাবিক ভাবে গড়িয়ে পড়ে, চোখে মুখে। সবার মুখ দিয়েই একটা ঝোল টানার মত সুড়ুৎ করে শব্দ

বেরিয়ে আসে। আরও টান—তারপর হঠাৎ যেন কার শব্দ পেয়েই যে যার জায়গা ছেড়ে চোঁচা দৌড়। কিন্তু পাড়ের ধারে এসে দেখল বাবা কুকুরটা চুক চুক করে জল চাটছে।

এর পর আরও কিছু দিন কেটেছে, তাও ওই আমেরই স্বপ্নে। গোটা পনর দিন কেটেছে। পুরো দুটি সপ্তাহে আমগুলি আরও বেড়ে উঠেছে। আবার সেই আমের গল্প, আমেরই ছেঁচকি খাওয়া। যেখানেই দু'জন, পাঁচ জন সবার মুখে একই কথা। সেই ছোট পুকুরের ধারে 'চালতা' আমগাছটা এ বৎসর ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওদিককার আশা ছাড়তে হবে। 'নাকতোলা' গাছের তলায় ঘন ডাগর ঝোপটা আর নেই—সব ফাঁকা হয়ে গেছে। 'পরী'রা কেটে নিয়ে গেছে ধান সিদ্ধ করবার জন্যে। গত বৎসরের মত বিরাট সুবিধাটুকুতে যেন বাধা দিয়েছে। দু'পাশের ফাঁকা মাঠ যেন গিলতে আসছে। আর তার পাশের কল্কে ফুলের গাছের কাছে কাল বাগদীর বড় বড় চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। সব ক'টি গাছই বেড়ে উঠেছে অযত্নে, অগোছালো ভাবে বনবাদাড়ের মাঝখানে। কোন বিলাসী মানুষের সচেতন মনের পরিচয় ঘটে নি কোনটাতেই। অথচ ফল ধরবার পর থেকেই একটা শান্তি বুকে জুড়ে দিয়ে গৃহস্থের একটা সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খেতে বসতে গিয়ে ভাত রোচে না মুখে। 'মা যদি একটু আমের অম্বল দাও ত সব ক'টা ভাত খেয়ে নিতে পারি!' বলে উঠে বতু। মা বলে, 'মুখপোড়া, সারাদিন বাকড়ে আম ছেঁচকি গিলছে তবুও আশা মেটে না—আবার আমের অম্বল।' মুখের রং পাল্টাল বেশ বুঝতে পারা গেল। মনে হ'ল বতু সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আলোতে, চেনা হয়ে গেছে সবটুকু। ফাঁস হয়ে গেছে তার গোপন রহস্য।

আরও কিছুদিন কেটেছে। ঝড়-বাদলেও কিছু ঝরে গেছে। ছোট ছেলেরা কোন্ ভোরে ফিরছে আম কুড়িয়ে—তার পর আমের অম্বল খাচ্ছে। দুপুরে গোটাকতক দোরে পড়ে প্রখর রৌদ্রে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা 'কড়ের' মা তাই উনুনে ঠেলে দিয়ে ধান সিদ্ধ করছে। উঠানে, তক্তপোশের ধারে, ঘুটের মাচার, কুলুঙ্গির ভিতর তেলের শিশির কাছে, আরশির পাশে ঘাপটিমারা চুপসে-পড়া সেই আমটির দিকে তাকালে রাখালীর মায়ের আশী বৎসরের দেহটির ছবি মনে পড়ে যায়। পথে আম, ঘাটে আম, ছোট-বড় গড়াগড়ি। অনেকটা ডাগর আগের চেয়ে, পরিমাণে অনেক বেশী। তবুও কিন্তু ছেঁচকির কথাটা ঠিক মনে থাকে।

ক'দিনই খেতে বসে উঠে পড়েছে বতু। আজও উঠে পড়ল। বলল, 'আর খেতে পারছি নে মা মোটে।' ভাত ফেলে উঠে রোয়াকে গিয়েই বারকতক বমি। তাতেও আমেরই কুঁচি সব। শরীরটা কাহিল হয়ে গেছে, তাই বিছানায় পড়ে থাকতে হচ্ছে আজ ক'দিন। স্কুলে যেতে হবে না, কিন্তু এ অবস্থায়ও কোথা থেকে একটা অস্ফুট আনন্দ ভর করে মনকে। যারা এমন একটি ছুটি ভোগ না করেছে তারা বুঝবে না। কোথা থেকে যে একটু শান্তি একমুঠো আনন্দের সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়ে যায়। শুয়ে শুয়ে মনের ভিতর থেকেই সবটুকুকে ভেবে নিতে গিয়ে আনন্দ। বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। ঘোষেদের বউ পাতা কুড়িয়ে ফিরছে এত বেলায়। ওপাশে বারটার ট্রেনটা ধুকতে ধুকতে চলে গেল মাটি মাড়িয়ে। নিস্তব্ধ পৃথিবীকে যেন শাসন করে গেল একবার। মা আজ বড় ব্যস্ত। কাকগুলি জ্বালাতন করছে। বাটনা-বাটার একটা শব্দ আসছে। এর পর বাসনগুলো মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর বাবা আসবে ষ্টেশনের ধার থেকে ঠিক দুপুরবেলায়। বাবাকে ভাত বেড়ে দিয়ে তবে ছুটি এ বেলাকার মত। কি রকম একটা ঘোর লেগে গেছে চোখে-মুখে। স্কুলের ছেলেরা চলে গেছে স্কুলে। এতক্ষণ হয়ত পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। আর আজকের দিনে যারা গেল না স্কুলে, তারাই যেন সমস্ত সময়টুকুকে জড়িয়ে ধরে আলাপ জমাল। বেলা আরও বেড়ে উঠেছে। রৌদ্র পড়ে গরম চাটুর মত তেতে উঠছে পৃথিবীর মাটি। তার পর বেলা যায় পড়ে। স্কুলের ছুটি হয়। অটল, বনমালী আবার আসে। আরও আম দিয়ে যায় বতুকে জানালা গলিয়ে। নাড়ে-চাড়ে গন্ধ শোঁকে, লুকিয়ে রেখে দেয় বালিশের তলায়, কেউ যদি দেখে ফেলে।

বমি হবার পর থেকেই কিন্তু বতুর এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। স্কুল ত বন্ধ হয়েছে। এখানে থাকলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে গাছতলায় গাছতলায়। কারও কথা কানে নেবে না। এখানে থাকলে ও নাকি পাগল করে মারবে সকলকে। একান্ত নিরুপায় হয়েই চলে যেতে হ'ল বতুকে মামার বাড়ী। এ মামার বাড়ী যাওয়া না জেনে যাওয়া বুঝতে পারল না বতু।

ঘণ্টাতিনেকের পথ। গ্রাম থেকে একেবারে শহরে। ট্রেন থেকে নেমেই বাবাকে জিজ্ঞেস করে বতু, 'এখানে কেন আম গাছ নেই বাবা? সব লাইট পোষ্ট লাগানো।' এখানকার লোকেরা হয়ত আম দেখে নি জীবনে। সামান্য আম দেখলেই লাফিয়ে উঠবে। আশেপাশে ট্রাম বাস মোটর ট্যাক্সি—এ ছাড়া পথে আসতে আসতে যতটুকু চোখে পড়েছে হাওড়ার পুল, গঙ্গা, জি. পি. ও, মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ আরো সব কত বড় বড় বাড়ী ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রঙচঙে সব দোকান সাজান পরিপাটি করে। ডুবে যায় বতু এ সব দেখতে দেখতে। কিন্তু আমের রূপটুকু মোটেই ভুলতে পারছে না।

ট্রেন থেকে নেমেই হাঁটা একটু, তার পর বাস। ফের আবার খানিকটা হেঁটে এসেই মামাদের বাড়ীটা—হলদে রঙের। দরজাটা দিনরাত বন্ধ থাকে। তার ওপর আবার খিলের ওপর খিল। ওদের বাড়ীর কথাটা চিন্তা করল একবার। চারিদিক ঘেরাও নেই, দরজাও নেই; কোন কালে হয়ত ছিল, আজ রয়েছে তার শেষ চিহ্ন। চারিদিক ফাঁকা সব—কুকুর বিড়াল উঠান দিয়ে গিয়েই মাঠে নেমে যাচ্ছে। এ সময়ে ভাবতে বেশ ভালই লাগছে এখানে

নামা পর্য্যন্ত আদৌ তার ভাল লাগে নি, কেমন যেন ভার ভার।···বাবা চলে যাচ্ছে এক মাসের জন্যে শহরে, কর্ম্মক্ষেত্রে। ভোরের ঘুম-জড়ানো চোখে বতু এসে দাঁড়িয়েছে খিড়কির দরজাটার কাছে। বুঝতেই পেরেছে একটা বিদায়ের তোড়জোড় সুরু হয়েছে। মা বাসি কাপড় ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজাটার কাছে। মজা ছোট পুকুরের কালো জল ভাঙা আরশির মত সাদা আকাশের ছোট্ট একটু স্মৃতি জড়িয়ে ধরে রেখেছে—কোন তরঙ্গ নেই—উদ্দামতা নেই। সন্ধ্যায় শুকনো শুকনো গলায় মিটমিটে আলোর পাশে দালানে এসে বসল গোপী কৈবর্ত্ত। এ বছর ধানের দর বাড়বে—নদীটার জল বাড়ছে—হরিহরপুরের মুসলমানেরা ক্ষেপেছে চুরি ডাকাতি বেড়ে যাবে—'আপুনিরা সাবধানে থেকো।' ওর মুখে এ সব কথা বেশ মানায়। বতু শুনছে কথাগুলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে। রাত্রে ঝড় আর জলের গতিবেগ বেড়ে উঠল। সকালে লোকজন জড়ো হয়ে গেল বতুদের বাড়ীর পিছনটায়—কতকগুলো বড় বড় পায়ের ছাপে ভর্ত্তি।···

চুলু ওপর থেকে দেখেই নীচে নেমে এসেছে। বতু আর বতুর বাবা এসেছে। দরজা খোলা হ'ল। প্রণামের পালা সারা হ'ল। বৈঠকখানায় ঘর খুলল। জলখাবার এল। গল্প জমল তার পর—অনেক কথা হ'ল, পড়াশুনার কথা। মাষ্টারদের কথা, আরও অনেক কথা। কিন্তু মনে মনে আমের কথাটা মোটেই ভুলতে পারছে না বতু।

কথা কইতে কইতে অনেকেই সরে পড়ল। চুলুর বাবা আর বতুর বাবা নিজেদের কথা বলছেন। একটু স্থির হয়ে বসে থেকেই বতু চলল চিলের ছাদে চুলুকে নিয়ে! দু'তলা বাড়ীর এই চিলের ঘরটায় কেউ বড় একটা আসে না। রোদের দিনে আমচুর বড়ি শুকোয় না তার পর ফাঁকা থাকে—চড়ুই পাখী ডাকে ক'টা। দু'জনে বসেছে মুখোমুখি হয়ে। একজন গ্রাম থেকে এসেছে, সমস্ত কথা বলতে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলে বোধ হচ্ছে। যেন খালি খালি বোধ হচ্ছে—এতখানি চলার পথ যেন বাজে। ওখানে মনে হ'ত নিজেই কত বিরাট, পৃথিবীটা খুব ছোট, আর এখানে মানুষ ক্ষুদ্র, পৃথিবীটা বৃহৎ। দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। রংটা রৌদ্রে ঘুরে কালো হয়ে গেছে। চোখ-মুখ বসা। চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।

চুলু চেয়ে আছে মুখের দিকে তাই জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল, 'এখানে কেন আমগাছ নেই মামা। চুলু বলল, 'বাবা ত বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসে আম।

আবার একটু চুপচাপ। একটু চাইছে পরস্পরের পানে। লজ্জা ভেঙে যাচ্ছে ক্রমেই। বতু বলল, 'একটা চিঠি দিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে পেয়েছিস?' চুলু খুশির সুরে বলে, 'হাঁ, লিখেছিলি এখানে আম হয়েছে খুব আসিস! তার পর কালি দিয়ে সেই আমের একটা ছবি এঁকেছিস—সেই যে!—গম্ভীর হয়ে গেল বতু। খানিকটা বেশ চুপচাপ কাটল। তার পর হঠাৎ বাজীকরের মত কস করে একটা আম ধরল চোখের সামনে। শিউরে উঠল চুলু বলল, 'কোথায় পেলি রে—এনেছিস?' কোন সাড়া শব্দ নেই। বতু আবার এ পকেট ও পকেট জামার তিনটে, প্যান্টের দুটো পকেট থেকে বার করল গোটাদশেক মাঝারি আকারের সবুজ রঙের আম। একটা মুক্তির আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠছে চুলুর ভিতরটা। কোথায় যাবে জানালার ধারে, না দরজার কাছে মাথায় আসছে না। একবার উঠে পড়েছে জায়গা ছেড়ে। বলল, 'কি হবে রে?' বতু বলল, 'লুকিয়ে রাখ, কেউ যেন না দেখে—পরে দেখবে হে চকি করব'!

অম্বিকা-কালনায়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিপুরের মানুষ যদি বলে—'অম্বিকা-কালনা দেখি নি.' তার চেয়ে আশ্চর্য্যের আর কিছু নাই। অথচ এমন অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদের জীবনে অহরহ ঘটছে। শান্তিপুর থেকে অম্বিকা-কালনার দূরত্ব সামান্যই, মাত্র তিন মাইল। ভাগীরথীর এ-পার ও-পার দুটি জায়গা —খেয়া-নৌকায় পারাপারের সুব্যবস্থায় মোটেই দুস্তর নয়।

অম্বিকা-কালনা বর্দ্ধমান জেলার একটি সমৃদ্ধ গঞ্জ। ধান, চাল, আলু, খন্দ-কুটার লেনদেনে এর বাজার জমজমাট। এখানে আদালত ও রেজেষ্ট্রি আপিস আছে; স্কুল, কলেজ, সিনেমা, ধানকল আছে। স্থানটি আর একটি কারণে প্রসিদ্ধ বলে—এইগুলিকেও 'এহ বাহ্য' বলে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। অর্থাৎ ধর্ম্মমণ্ডলীতে একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে অম্বিকার। সাড়ে চারশো বছর পূর্ব্বে যখন ক্ষুৎমার্গের গ্লানিভারে হিন্দু সমাজের নাভিশ্বাস উঠেছিল, তখন নদীয়া নগরীতে পরম শক্তিধর এক মহাপুরুষ প্রেমধর্ম্মের বন্যায় সমস্ত গ্লানি ভাসিয়ে দিয়ে মানবধর্ম্মকে নব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই প্রবল প্রেম-বন্যার বেগ শুধু নদীয়া নগরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি—তার আশপাশের বহু গ্রাম জনপদ ভাসিয়ে—পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূল-ভাগ প্লাবিত করেছিল। অম্বিকা ত ঘরের দুয়ারে।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ বহুবার শান্তিপুরে আসেন। শান্তিপুর থেকে কালনায় এসেছিলেন তাঁরই এক সতীর্থ ভক্ত গৌরদাস পণ্ডিতের আশ্রমে। সে কারণে—বৈষ্ণব মহাজন ও ভক্তবৃন্দের কাছে অম্বিকা পুণ্য তীর্থভূমি। ছেলেবেলায় দেখেছি—শান্তিপুরের রাসের মেলায় বাংলা দেশের দূরদূরান্তর থেকে বহু যাত্রী আসতেন। বাংলা ছাড়িয়ে—আসাম-প্রান্তের মণিপুর রাজ্য থেকে আসতেন হাজার হাজার যাত্রী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর—বাংলা বিভাগের দরুন পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রীদল ত আসেই না, মণিপুরী যাত্রীর সংখ্যাও কমে গেছে। তখনকার দিনে, তাঁরা প্রথমে আসতেন নবদ্বীপে। পূর্ণিমায় সেখানকার রাস দেখে—শান্তিপুরে পৌঁছতেন দ্বিতীয়া তিথিতে ভাঙ্গা রাসের শোভাযাত্রা দেখতে। বাবলায় সীতানাথের পাট—ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের সাধন গোফা প্রভৃতি দেখে এরা পাড়ি দিতেন অম্বিকায়। সেখান থেকে কাটোয়া ঝামটপুর প্রভৃতি বৈষ্ণব-তীর্থ দেখে কোন কোন দল বৃন্দাবন ধাম পর্য্যন্ত যেতেন। এসব দলের মধ্যে মণিপুরী দলগুলিই ছিল সবচেয়ে বড়। এক একটি দলে স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবক মিলিয়ে আশী-নব্বই জন মানুষ থাকত। এরা যখন হাঁটা-পথে অম্বিকা কালনার দিকে রওনা হতেন—আমরা কিশোর ছেলেরা এদের পথিপ্রদর্শকের কাজ করতাম এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ নিজ নিজ উপবীত দেখিয়ে এদের কাছ থেকে হাতে-কাটা সুতার চমৎকার পৈতা আদায় করে নিতাম। এই আদায় কার্যটি—একটি কৌতুককর খেলার অঙ্গস্বরূপ ছিল।

অম্বিকা-কালনা কি কারণে বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়েছে—সে কাহিনী গৌর-গৌরীদাস মিলন-প্রসঙ্গে বলব।

বর্দ্ধমান রাজবংশও অম্বিকাকে ধর্ম্মমণ্ডলীভুক্ত করার জন্য বহু আয়োজন করেছেন। এদের প্রতিষ্ঠিত অনন্ত বাসুদেব মূর্ত্তি ও মন্দির, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বিগ্রহ, লালজীর দেউল এবং একশো-আট শিবালয় বহু ভক্তিপ্রাণ যাত্রীকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা অম্বিকা নগরের বৈশিষ্ট্য।

শান্তিপুরের অধিবাসী হয়ে তিন মাইল দূরবর্তী এই পুণ্যতীর্থ না দেখার অপরাধ মনে মনে অনুভব করেছি কতবার। সত্যই কি ইতিপূর্ব্বে দেখি নি কালনাকে? দেখেছি ত অনেকবার। সে দেখার রঙ ছিল আলাদা। বর্ষায় গঙ্গা দুকূল হারিয়ে যখন সমুদ্র হয়েছে, তখন শান্তিপুরের ঘাট থেকে বাচখেলার নৌকায় চেপে সারা রাত জলভ্রমণ করেছি দল বেঁধে। হরিপুর বেলেডাঙ্গা বাগাঁ-চড়ার কোলে কোলে চলেছে নৌকা, সাহেবডাঙ্গা মেথিডাঙ্গা পেরিয়ে গুপ্তিপাড়া ছুঁয়েছে—কালনার ঘাটে লেগেছে। অকূল দরিয়ায় সারারাত দশ-বিশ মাইল ঘুরে বেড়ানো—কি নেশা যে ধরিয়েছে মনে। সেই নেশার ঘোরে কালনার মাটি ছুঁয়েও, কালনাকে খুঁজে পাই নি। দিনের বেলায় দু'একবার লালজী দর্শনে এসেছি। সে বয়সে যা দেখার কথা তাই দেখেছি—মন্দির, বাড়ী, মূর্ত্তি। শুধু ঐশ্বর্য্যের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখে ফিরে এসেছি, কালনাকে ছুঁতে পারি নি। জমির দলিল রেজেষ্ট্রির ব্যাপারে কয়েকবার গিয়েছি কালনায়, দেখেছি দোকান-পসার, বাজার-হাট, পথ-ঘাট, মোক্তার-মুহুরী—মনে রেখাপাত হয় নি। ফুটবল টীমের সঙ্গে কালনা গিয়েছি—বলখেলার মাঠে হৈ-হল্লোড় হয়েছে বিস্তর—তার মধ্যে কালনা কোথায়? এ ছাড়া আত্মীয়কুটুম্বও আছেন কালনায়। নিমন্ত্রণরক্ষার্থে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশাও হয়েছে, কিন্তু সে সময়ের কালনা আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের মতই। সত্য কথা বলতে কি কোন ক্ষেত্রেই কালনা একটুও রেখাপাত করে নি মনে।

তাই এবার যখন কালনায় পাক্ষিক পত্রিকা ভাগীরথীর অন্যতম সম্পাদক শ্রীমান বিনয়কৃষ্ণ—কালনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন—বিশেষ উৎসাহ বোধ করি নি। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলকেও ওঁরা কালনা দেখবার জন্য বহু দিন ধরে বলছেন। বাগল মহাশয়ও আজ কাল করে কালক্ষেপ করছিলেন। এবার দু'জনকেই একসঙ্গে পাকড়াও করলেন বিনয়কৃষ্ণ। শেষ পর্য্যন্ত দু'জনকেই এক যাত্রায় সমান ফল ভাগ করে নিতে হ'ল।

হাওড়া থেকে আমরা কালনা যাত্রা করলাম ; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকেই।

হাওড়া থেকে যাত্রা—কাজেই চার মাইল পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী হ'ল। এ যেন সম্পূর্ণ একটি নূতন দেশ দেখবার জন্য যাত্রা করলাম।

শ্রীমান বিনয় ত আমাদের সঙ্গে ছিলেনই, কালনা-নিবাসী শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাসও আমাদের সঙ্গী হলেন। বেশ কাটল গাড়ীতে। রাত আটটায় ষ্টেশনে পৌঁছে রিক্সা নিলাম দু'খানা। রাতের কালনা —যদিও বিজলী আলোয় পথ-ঘাট স্পষ্ট—দূরের বন ঝোপ প্রান্তর অন্ধকারে ঢাকা। ষ্টেশন থেকে বার হয়ে একটু দূর এসে বাঁদিকে পড়ল কারখানা। এ পথ আগে ছিল জনমানবশূন্য। সন্ধ্যার পর এ পথে ধন-প্রাণ নিয়ে চলা বিপদজনকই ছিল। খুন রাহাজানির কত ব্যাপারই ঘটে গেছে। আজ উদ্বাস্তুরা এসে এর দু'ধারের বনজঙ্গল নির্মূল করে বসতি স্থাপন করেছে। কারখানার গা ঘেঁষেও ওদের ঘরবাড়ী উঠেছে। আজ প্রাকৃত কিংবা অপ্রাকৃত কোন ভয়ই নিশীথ রাতের পথিককে বিচলিত করতে পারে না।

কারখানা থেকে সামান্য এগিয়ে বাঁদিকে কালনা কলেজ ভবন ; ডান দিকে রাজ-স্কুল। তার পর অম্বিকা বিদ্যালয়। ষ্টেশনের সোজা রাস্তা শেষ করে শহরের আঁকাবাঁকা সরু পথে সাইকেল রিক্সা ঢুকল। পথের একটুখানি যা আলো—চারদিকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। তারই মধ্যে পাক খেতে খেতে চলেছি আমরা ; এমনি করে আধ ঘণ্টায় ঠিকানায় পৌঁছে গেলাম।

পরের দিন সকালে দেখলাম কালনাকে। শ্রীমান বিনয়ের বাড়ী ছোট দেউড়ির কাছে—একেবারে গঙ্গার কূলে। বাড়ীর সামনে কালনা-বর্দ্ধমান সড়ক। এই পথে নিত্য-নিয়মিত বাস চলাচল করে। তেমাথার মোড়ে একটি প্রকাণ্ড ঝুরি-নামা বটগাছ। ছোট ছোট পান-বিড়ি সিগারেটের দোকানও রয়েছে। পথের আশেপাশে আরও দু'একটি ছোটখাটো মুদিখানার দোকান, দু'চারখানা চালাঘর, এখানে ওখানে অযত্নবর্দ্ধিত ঝোপঝাপ। আসশ্যাওড়া, গাবভেরেণ্ডা, বাংচিতা ও বাকস গাছের ঝোপ। পিটুলি, নোনা আতা, ধলা আঁকড়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বড় গাছও নজরে পড়ে। সবচেয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে ঐ বিরাট বনস্পতি—বটগাছ। বিস্তৃত স্থান জুড়ে ফেলেছে ছায়া, অসংখ্য শাখায় আশ্রয় দিয়েছে নানা জাতের পাখীকে। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রতপ্ত দুপুরে ওর তলায় এসে যে না বসেছে—সে কোন মতেই এর মহিমা বুঝতে পারবে না।

শহর দেখবার আগেই স্নান সেরে নেব ঠিক করলাম। দু' মিনিটের রাস্তা গঙ্গা। একটি প্রকাণ্ড ধানকলের পাশ দিয়ে যেতে হয়। বলা বাহুল্য—এই অঞ্চলে যত চালের আড়ত—তত রয়েছে ধানকল। অবশ্য সবগুলিই খাস কালনায় নয়। কালনা থেকে বাঘনাপাড়া যেতে মাঝ পথে পড়ে নিভুজি। এক সময়ে এই নিভুজি ধানকলের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও আছে, তবে নিভুজির সেই আগেকার দিনের জমজমাট ভাব নাকি আর নাই। তখন অধিকাংশ ধানকলের মালিক ছিলেন বাঙালী, আজ সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য।

ধানকলের পাশেই গঙ্গার উঁচু পাড়। দেড়তলা-দু'তলা সমান উঁচু। কিছুকাল পূর্ব্বে এই পাড়ে ছিল গঙ্গার ভাঙন। সে সময়ে গঙ্গার খেয়াল খুশির উপর কালনার জীবন-মরণ নির্ভর করত। এ অঞ্চলের গঙ্গা কীর্ত্তিনাশার মতই ভয়ঙ্করী—সর্ব্বনাশা খেলার খেসারত দিয়ে কত ঘরবাড়ী জোতজমি গ্রাম-শহর গঞ্জ-বাজার যে জলসাৎ হয়েছে—তার লেখাজোখা নাই। পাথর দিয়ে বাঁধানো পাথুরে মহলটাও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল কয়েক বছর আগে। মহিষমর্দ্দিনীর পূজামণ্ডপও যায় যায় হয়েছিল। ভাঙনের ঘা খেয়ে খেয়ে শহর হয়েছে সঙ্কীর্ণ—দ্বিভুজের মত প্রসারিত। কতটুকুই বা শহর। আর কিছুদিন অব্যাহত থাকত যদি পাড়-ভাঙার খেলা—কালনার অস্তিত্ব তা হলে মুছে যেত। সৌভাগ্যের বিষয় এখন রুদ্রাণী পরিণত হয়েছেন বৈষ্ণবীতে—সংহারের খেলা থামিয়ে তিনি পালয়িত্রীর অভয় পাণি মেলে ধরেছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে কালনাবাসী।

এ গঙ্গা কলকাতার আবিল-সলিলা গঙ্গা নয়। এর দু'পাশের কোথাও নেই অতিকায় কলকারখানা, চিমনির উদ্যত আয়ুধ—যা ধূমধর ক্ষেপে আকাশকে করে বাষ্পমলিন। এর কাঁচস্বচ্ছ সলিলের আয়নায়—আকাশ প্রতিবিম্ব দেখছে দিনে রাত্রিতে—মানুষ শুচিস্নিগ্ধ হচ্ছে অবগাহনে ; ওপারে দিগন্তবিস্তৃত চরভূমিতে সবুজের বন্যা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুঁড়েঘর—আম জাম নারকেল গাছ। সেই প্রান্তর আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময়ে আকাশকেই জড়িয়ে ধরেছে স্নেহভরে। আকাশ মাটির এমন সহজ প্রীতিবন্ধন বড় একটা চোখে পড়ে না। দু'একটা নৌকা চলেছে মন্থর গমনে—জাহাজ ষ্টীমারের ঘর্ঘরনাদ নাই—গতির প্রতিযোগিতা নাই। তরঙ্গের উৎক্ষেপ নাই, আবর্ত্ত নাই—অথচ স্রোতময় পরিপূর্ণ জীবন।

স্নান সেরে স্নিগ্ধদেহে ফিরে এলাম।

এসে দেখি স্থানীয় কয়েকজন এসেছেন আলাপ করতে। একটু পরে মহকুমা-শাসক শ্রীদুর্গাদাস মজুমদার, তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান মানবেন্দ্র পাল, চিত্রশিল্পী শ্রীমান মহীতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি এলেন। আলাপ সুরু হ'ল।

শ্রীযুত মজুমদার মহাশয়ের জ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসাপ্রবৃত্তি প্রশংসনীয়। শুধু মহকুমার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ইনি নিশ্চিন্ত নন—মহকুমার আশেপাশে দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে যত ইতিহাসগন্ধী গ্রাম বা প্রান্তর আছে সবগুলির তথ্যানুসন্ধানে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিকে সাধ্যমত নিয়োজিত করেছেন। কোন্ দেব-দেউলের গঠন-পারিপাট্যে কোন্ ভূস্বামী বা রাজবংশের প্রভাব পরিস্ফুট, কোন পাষাণ-মূর্ত্তিতে বাংলার শিল্পছোঁয়া কতটুকু লেগেছে, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবীমূর্ত্তিগুলি হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে,

প্রাচীন বট-অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে স্থিত হয়ে কি ভাবে গণমনে প্রভাব বিস্তার করেছে ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলল। ভাগীরথীর দুটি তীরে একদা যে গাঙ্গেয় সভ্যতা জন্মলাভ করে বাংলা দেশকে মহিমান্বিত করেছিল—তার সূত্রানুসন্ধান করলে দেখা যাবে বন-জঙ্গলে ঘেরা মঠ, মন্দির, অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ, সিন্দুর-আবৃত শিলা-মূর্তি, পোড়ামাটির নক্সা, ইটের কারুকার্য্য প্রত্যেকটিই মূল্যবান দলিল। প্রাচীন বাংলাকে উদ্ধার করতে হলে এগুলির সাহায্য অপরিহার্য্য। একদা গাঙ্গেয় সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল নবদ্বীপ—অম্বিকা থেকে এর দূরত্ব বেশী নয়। বল্লাল ঢিবি, চাঁদ কাজির সমাধিস্থান, দাঁইহাটের ভাস্কর পণ্ডিতের ঘাট, কাটোয়ার নিমাই সন্ন্যাসের স্থান, ফুলিয়ায় হরিদাসের সাধনগোফা, বাগাঁচড়ায় চাঁদ রায়ের ভিটা, পাণ্ডুয়ার মন্দির আর প্রাচীন সপ্তগ্রামের সীমানা, হংসেশ্বরী মন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্র, লুপ্ত সরস্বতী ও বেহুলা নদী···সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে প্রাচীন বাংলার পরিচয়পত্র। কালের বালুস্তরে ঢাকা পড়েছে লেখা, প্রত্নতত্ত্বের খনিত্র দিয়ে বালু আবরণ সরিয়ে এই সব উদ্ধার করতে না পারলে নবীন বাংলার প্রাণসত্তাটিকে চিনে নেওয়াই দুষ্কর। এ সবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক প্রবাদ, কিংবদন্তী ও ছড়া। ইতিহাস তৈরীর মালমশলায় এগুলিও তুচ্ছ নয়।

অম্বিকা নগরের উৎপত্তির মূলে এমনই একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

সে অনেক দিন আগেকার কথা। জায়গাটি তখন ঘন জঙ্গলে ভর্তি ছিল। রাজা-জমিদারেরা শিকার বা অন্য কোন কারণে কালে-ভদ্রে এসব পথে যাতায়াত করতেন। একদা বর্দ্ধমানাধিপতি লোকলস্কর নিয়ে, হাতীতে চেপে এই পথ দিয়ে যেতে যেতে বনের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন। বুঝলেন এই ঘণ্টাধ্বনি দেব-পূজার সঙ্কেতচিহ্ন। বনের মধ্যে দেবতা? শব্দ অনুসরণ করে গভীর বনমধ্যে পৌঁছলেন রাজা। পৌঁছে দেখেন—এক তেজপুঞ্জ-কলেবর ব্রাহ্মণ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট স্থাপনা করে শক্তিপূজা করছেন। পরিচয়ে জানলেন, ব্রাহ্মণের নাম অম্বরদ, ঘটস্থাপিতা উপাস্য দেবী হলেন শক্তিরূপিণী অম্বিকা। রাজা বন-জঙ্গল কাটিয়ে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে দিলেন। দেশে দেশান্তরে প্রচারিত হ'ল দেবী-মাহাত্ম্য। দেবীর নামানুসারেই স্থানটির নাম হ'ল অম্বিকা।

গঙ্গাতীরে রমণীয় স্থান—দেবীপীঠ। ধার্ম্মিক মানুষ এসে বাসা বাঁধল অম্বিকায়। কিন্তু সব মানুষই তো মোক্ষকামী নয়। কেউ কেউ স্থানটিকে ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য আহরণের অনুকূল মনে করল। এদেরই কর্ম্মতৎপরতায় অম্বিকা গঞ্জের মর্য্যাদা লাভ করল এবং ধন জনে পরিপূর্ণ হয়ে নগর পদবীতে অধিরূঢ় হ'ল।

ইংরেজ আমলের আগে পর্য্যন্ত এই নগরের নাম ছিল অম্বিকা। হিন্দুরাজত্বের অবসানে এর সমৃদ্ধি দেখে তৎকালীন বাংলা-শাসক পাঠানরা এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করে, একজন কাজীর অধীনে কিছু সৈন্য রেখে এটিকে অন্যতম শাসনকেন্দ্রে পরিণত করলেন। পাঠান রাজত্বকালে অম্বিকা নগরী আরও ঐশ্বর্য্যশালী হ'ল—তার পরিচয় বাইশটি বাজারের অস্তিত্বে জানা যায়। রেনেল্ডস-এর ষ্ট্যাটিসটিক্সে এই বাইশ বাজারের উল্লেখ আছে। তারই ভগ্নাংশ স্বরূপ নিচুজী বাজার, বালির বাজার প্রভৃতি দু'একটি বাজার আজও বিদ্যমান। এই সময়ে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা যে পাড়াতে বাস করতেন—তার নাম ছিল নৃপপল্লী—বর্ত্তমানে নেপপাড়া নামে পরিচিত।

পাঠান রাজত্বের অবসানে মোগল সম্রাট আকবর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য যখন পনেরটি সুবায় ভাগ করেন, তখন বাংলার সুবাদার এই অম্বিকা নগরীতেই রাজ্যশাসন-কেন্দ্র বহাল রাখলেন এবং এর সীমা বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম থেকে কাটোয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত করে—নাম দিলেন 'অম্বিকা-মুলুক'। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত 'অম্বুয়া মুলুক'—অম্বিকা মুলুকের অপভ্রংশ মনে হয়। ওলন্দাজদের আঁকা তৎকালীন মানচিত্রেও 'অম্বুয়া' শব্দ লিপিত আছে। তার পর ইংরেজ আমলে 'অম্বিকা' কি করে কালনায় নামান্তরিত হ'ল তার তথ্য রহস্যাবৃত।

যাই হোক, ইংরেজ আমলেও কালনার জমজমাট ভাব। ক্রমে আইন-আদালত বসল, ব্যবসার প্রসার হ'ল, গঞ্জের ঘাট মহাজনী নৌকায় ছেয়ে গেল। ষ্টীমার খুলল হোরমিলার কোম্পানী—কালনা থেকে কলকাতা। মানুষ এবং মালের চলাচল বেড়ে গেল। ধান, চাল, পাট, গুড়কুটা, আলু, আকের গুড়, প্রভৃতি নানা পণ্যের আমদানী-রপ্তানিতে গঞ্জ সরগরম হয়ে উঠল।

নানা ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের মানুষ ভিড় জমাল যদি—খ্রীষ্টান পাদরীরাই বা বাদ যাবে কেন? ওরাও বেসাতি খুলল ধর্ম্মান্তরিতকরণের। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজানোর ভুয়া নীতিতে ওরা আস্থাবান নয়। কালনার পূর্ব্ব সীমায় হাঁসপুকুরে আস্তানা গেড়ে ওরা খুলল মিশনারী হাসপাতাল। বিলেত থেকে এল ভাল ভাল ডাক্তার। দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি দুই নিরাময় করার চেষ্টা চলল যুগপৎ—ভাল ওষুধ ও মথিলিখিত সুসমাচার বিলিয়ে। রোগ আরোগ্য হতে লাগল। অশন-বসন সংস্থানের আশায় আকৃষ্ট হয়ে কিছু মানুষ গ্রহণ করল নূতন ধর্ম্ম।

এর পিঠাপিঠি ব্রাহ্মধর্ম্মের ঢেউ এসে পৌঁছল কালনাতে।

আজ অবশ্য হাসপাতাল উঠে গেছে—হাঁসপুকুরের দিকে কার্য্য-তৎপরতাও কমে গেছে। কোন ধর্ম্ম নিয়ে উগ্র উত্তেজনার প্রকাশ কোথাও চোখে পড়ে না।

আলাপ-আলোচনা অন্তে আমরা শহর দেখতে বার হলাম। প্রথমে এলাম অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে। সুউচ্চ প্রাচীন মন্দির—কালের নখরাঘাতে জর্জ্জরিত। মন্দিরের গায়ে বট অশ্বত্থ শিশুরা মাথা তুলেছে—পলস্তারা খসে খসে পড়ছে। সম্প্রতি জমিদারি-প্রোথা লোপ।

বিগ্রহের ভোগরাগ তো বন্ধ হয়েইছে—সেবাপূজাও উঠে যাবার মুখে। পূজারীরা ভক্তি অথবা মমতাবশতঃ কোন মতে পূজাটুকু চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজ সংসারের অভাব মিটিয়ে কতদিন এ ভাবে পূজা চালাতে পারবেন—জানি না।

সিঁড়ি দিয়ে উঁচু চত্বরে উঠে মন্দিরের গায়ে অপূর্ব্ব শিল্প নিদর্শন দেখে আমরা তো অবাক। পাথরের কাজ নয়, পোড়ামাটির কাজ। ছোট ছোট নকসা, ছবি, কাহিনী। পুরাণ-কাহিনী ছাড়াও—লোকযাত্রার চিত্রও রয়েছে উৎকীর্ণ। শিল্পী মহীতোষ বিশ্বাস একটি অপূর্ব্ব টেরাকোটা শিল্প-সৃষ্টির পানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। চাঁদ উঠেছে আকাশে—উৎসুক মায়েরা কেউ ছেলে কোলে—কেউ বা ছেলের হাত ধরে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই দৃশ্য। একটি দু'টি নয়—অনেকগুলি মা ও ছেলের বিচিত্র ভঙ্গীতে চিত্রখানি চিরকালের মাতৃহৃদয়কে মেলে ধরেছে। এ ছাড়া বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, ব্রহ্মার ধ্যান, লক্ষ্মীর বিবাহ, সেকালের আসা-সোটা বন্দুকধারী দ্বাররক্ষকের ছবিও রয়েছে। এই সব ছবি একটু একটু করে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরাতত্ত্ববিদরা এদিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রাচীন বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির নমুনাটুকু অন্ততঃ ধরে রাখতে পারবেন। চমৎকার মূর্ত্তি অনন্ত বাসুদেবের, কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহ বা ঠাকুরের সিংহাসন ও বেশবাস দেখলে মন বেদনায় টন টন করে ওঠে।

মন্দির যেমন পুরাতন, শহরের ধাঁচেও তেমনি পুরাতনত্ব প্রকট। পাতলা ইঁটের খাটো খাটো কোঠাঘর, আঁকা-বাঁকা সরু গলি, মজাহাজা পুকুর, লতাগুল্ম-ঘেরা ইঁটের স্তূপ, নোনাধরা দেওয়ালের পতনোন্মুখ দেহ। কিছু চালাঘরও আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ কোঠাতেই নূতনত্বের ছোঁয়াচ। বিজলী আলো রয়েছে, রেডিও বাজছে, একতলা বা তিনতলা যেমন বাড়ীই হোক—বর্ত্তমান কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা ওদের কোথাও না কোথাও রয়েছে। বর্দ্ধমান-রাজের সমাজবাড়ীর বিরাট অট্টালিকা—ভাবগাম্ভীর্য্যে এখনও অদ্বিতীয়। নূতন আর পুরাতন দুই সমাজবাড়ী মিলিয়ে কালনায় অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। সমাজবাড়ী অর্থে রাজবংশের সমাধি-সৌধ।

এর মধ্যে আঁকা-বাঁকা গলিপথ দিয়ে বৈষ্ণব মহাজন শ্রীভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে পৌঁছলাম। এই আশ্রমের ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীশ্রী নামব্রহ্ম-জিউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি-অবশ্য আছে—কিন্তু নামব্রহ্মই এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ঊর্দ্ধদেশে ইনি স্থাপিত। নাটমন্দিরে নানা বৈষ্ণব সন্ত সাধুর ছবি ও তারকব্রহ্ম নাম প্রভৃতি দেওয়ালের শোভা-বর্দ্ধন করছে। প্রাত্যহিক নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থাও দেখলাম।

মন্দিরের পিছনে ভগবানদাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির। যে দীন পর্ণকুটীরে বসে বৈষ্ণবচূড়ামণি অহোরাত্র নাম জপে শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করতেন, সেই খানেই ওঁর নিরাভরণ সমাধি। জাগতিক সমস্ত উপাধি ও ঐশ্বর্য্যের ব্যাধিমুক্ত একটি নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি ইঁদারা চোখে পড়ল—যার সিঁড়ি জল পর্য্যন্ত নেমে গেছে। জনশ্রুতি—বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাস্নানে অশক্ত হয়ে পড়লে বাবাজী কূপে নেমে গঙ্গাস্নান করতেন। কেমন করে করতেন? কেন, ভক্তের আন্তরিক আহ্বানে কূপ অথবা নদী পুষ্করিণীতে গঙ্গার আবির্ভাব কি ভারতীয় সন্ত-জীবনে নূতন কথা? মন 'চাঙ্গা' (চৈতন্যযুক্ত) হলে 'কাঠিয়ামে' (ডোবাতে) গঙ্গার আবির্ভাব এই বহুশ্রুত প্রবচনটি কে না জানে! মনশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি ঘটলে কূপ, পথল, তড়াগ, নদী—সব বারিতেই ত কলুষ-নাশিনী অভিন্নকায়া।

তার পর আর একটি আশ্রম দেখলাম—সারস্বত সাধনার পীঠক্ষেত্র। বহু পুরাতন 'পল্লীবাসী' কাগজের নাম শোনা ছিল—চোখে দেখলাম তার কার্য্যালয়। দেখে বিস্মিত হবেন না—এমন লোক এ যুগে বিরল। মাত্র কাঠা চারেক জমির উপর সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরহীন একখানা বাড়ী, যার মধ্যে খড়ের চালায় ছাওয়া দু'খানি ছোট ঘর ও তিন দিকের পাঁচিলের মাথায় একচালার বারান্দা। মাঝখানে ছোট একফালি উঠান। উঠানের একপ্রান্তে ফল-ভারে অবনত একটি কিশোর আম গাছ—মাঝখানে জবা টগর মল্লিকা গোলাপ মিলিয়ে ছোট একটি ফুলবাগিচা। মাঝখানের একচালার বারান্দায় পল্লীবাসীর হাতে-ঠেলা মুদ্রাযন্ত্রটি রয়েছে, ডান পাশের বারান্দায় কম্পোজিং সেকশনের ব্যাপার—অর্থাৎ, কাঠের কেসে হরফ সাজানো রয়েছে। আর বাম দিকের বারান্দা জুড়ে র‍্যাকে সাজানো রয়েছে পল্লীবাসীর পুরাতন ফাইল। তার একপাশে ঘরের মধ্যে সম্পাদকের দপ্তর। একখানি তক্তপোশের উপর একখানা আধ-ছেঁড়া মাদুর বিছানো। পল্লীবাসীর ফাইলে ধুলো জমেছে প্রচুর এবং কাগজও হলদে হয়ে এসেছে। শুধু কালনা কেন—বাংলার মফস্বলের অন্যতম দীর্ঘজীবী পত্রিকা এটি। পত্রিকাটির বয়স ষাট বছর। শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পল্লীবাসী প্রকাশিত হয়।

দু' একখানা ফাইল টেনে চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। অনেক পুরাতন দিনের কথা—গ্রাম, সমাজ, রাজনীতির অনেক সংক্ষিপ্ত সংবাদ···ইতিহাসের এরাও হেলাফেলার সামগ্রী নয়।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকার মন্দিরে। সুসংস্কৃত নূতন মন্দির—গঠন-প্রণালীতে অভিনবত্ব আছে। চার চালার ছাউনির মত মন্দিরের মাথাটি। মন্দির-গাত্রে শিল্প-কাজ নাই। সচরাচর যে ধরনের মূর্ত্তি দেখা যায় বিগ্রহটি সে ধরনের নয়। ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি—অথচ বরাভয়দায়িনী। অম্বরীষ ঋষি যে ঘটে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেই মৃন্ময় ঘটটিও সযত্নে রক্ষিত হয়েছে মন্দিরে।

এই মন্দিরটির ঠিক সামনে শ্মশানকালীর মন্দির। শ্মশান

এখান থেকে বেশ খানিকটা দূর হলেও এককালে স্থানটি যে গঙ্গা-তটশায়ী ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

এর পর একটু এগিয়ে পড়ল কালনার বাজার। বাজারের পূর্ব্ব ধারে লালজী মন্দির। বিরাট জায়গা নিয়ে এই দেবালয়। মূল মন্দিরের দু'পাশে একশো আট শিবমন্দির। শ্বেত ও কৃষ্ণ দু' রকম পাথরে নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি। তিন খানি রথ রয়েছে খড়ের ছাউনির মধ্যে। মাস দুই পরে সুরু হবে রথের উৎসব। সোজা উল্টো দু'টি রথেই প্রচুর ভিড় হয়। সামনের বিস্তীর্ণ বাজারে বসে রথের মেলা। পণ্য—গাছপালা, পাখী, পেতে, ধামা, কুলো, কাঁঠাল আনারস থেকে পাঁপরভাজা পর্য্যন্ত। এখন তালপাতার সেপাই বা ভেঁপু বাঁশী বিক্রী হয় না, তার বদলে রঙীন বেলুন আর প্ল্যাসটিক পুতুলের রাজত্ব।

পূর্ব্বে লালজীর ভোগের বরাদ্দ ছিল রাজকীয়। প্রতিদিন সাড়ে বাহান্ন টাকার ভোগের বরাদ্দ ছিল—ক্ষীর, মিষ্টি, লুচি, ছানা, দই ইত্যাদি। দর্শনার্থী কোন বিদেশী ব্রাহ্মণ গেলে—তিনিও অতিথি হিসাবে সংকৃত হতেন। কিন্তু হায়, সেদিন আর নাই। এখন লালজীর জমিদারির আয় বন্ধ হয়েছে—মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকায় রাজ-প্রতিষ্ঠিত সব ক'টি বিগ্রহের সেবাপূজা চালানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলিকে লালজীর বাড়ীতে আনাবার আয়োজন হচ্ছে। আপত্তি করেছেন কালনা-বাসীরা। ওঁরা বলেন, আবাস-মন্দির থেকে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে স্থানচ্যুত করে—এ ভাবে মেসবাড়ী সৃষ্টি করার কল্পনাটাই তো বেদনাদায়ক। হয় রাজা পূর্ব্বব্যবস্থা বহাল রাখুন, নতুবা রাজ্য সরকার এর ভার নিন। জমিদারির উপস্বত্ব থেকে এতকাল দেবসেবা চলেছে বটে, দেবতা তো প্রজার রক্ত শোষণ করে প্রভূত সুখ-বিলাসে পরিপুষ্ট হন নি। বরং দেবসেবার নরনারায়ণকেই পোষণ করা হয়েছে। দেবসেবকগণের কথা বলছি। পূজারী, বেশকার, সূপকার, ভৃত্য, মালী, দারোয়ান··· কত পরিজন ঠাকুরের। ঠাকুর উপবাসী থাকলে পরিবারসহ এদেরও অনশন অবধারিত। ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বত্রই আশঙ্কার ছায়া নিবিড় হয়েছে। চিন্তার বিষয়ই ত। স্থানচ্যুত দেবতার সঙ্গে বৃত্তিচ্যুত মানুষের কি দশা ঘটবে—সহজেই অনুমেয়।

বাজার দেখে—শহরের শেষ সীমান্তে এসে পড়লাম। ক্রমে বাড়ীঘর শেষ হয়ে গেল। মাঠের মাঝখান দিয়ে চলেছি। আশেপাশে আগাছা গুল্মের ঝোপ—চোরকাঁটা ভরা মাঠ—তার মাঝখানে পায়ে-চলা সরু পথ। গঙ্গার পাড় থেকে জায়গাটা বেশ উঁচু—শহরের সংস্রব বর্জ্জিত। একটা পরিত্যক্ত বাড়ী—একটি ভাঙা পাঁচিল পথে পড়ল। কয়েক শতাব্দীর পিছনে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

আরও খানিকটা এগিয়ে এমন একটি জায়গায় পৌঁছলাম যা সমস্ত কালনাকে আড়াল করে দাঁড়াল। সাড়ে চার শো বছর আগেকার পুরাতন ইতিহাসের পাতা খুলে গেল সামনে। এখানে মানব-মহিমা-স্নাত চির তাপর হরফগুলি দিয়ে জীবনের-সঙ্গে-জীবন-যোগ-করার কাহিনী লিখে রেখেছেন মহাকাল।···অতি প্রশস্ত সিমেণ্ট বাঁধানো গোলাকার বেদী ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এক সুপ্রাচীন তিন্তিড়ি বৃক্ষ। গাছটির অবস্থান ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে। প্রকাণ্ড একটি আতপত্র মেলে—নিদাঘ-তাপক্লিষ্ট কোন পরম আরাধ্য জনকে স্নেহসুশীতল ছায়ায় পরিতৃপ্ত করার কি গভীর নিষ্ঠা তিন্তিড়ীর। চারদিকের শাখাবাহুগুলি প্রায় ভূমি স্পর্শ করে—পরম ধনকে যেন আগলে রেখেছে রৌদ্র-স্পর্শ থেকে।

এই বৃক্ষতলে ছিল নিমাইয়ের সতীর্থ সুহৃৎ পণ্ডিত গৌরীদাসের কুটির। সন্ন্যাস নেবার কিছুদিন আগে শান্তিপুর থেকে নিমাই এসেছিলেন অম্বিকায় গৌরীদাসের সঙ্গে দেখা করতে। নৌকায় বৈঠা বেয়ে হরনদী দিয়ে নিমাই এসে পৌঁছলেন অম্বিকায়। সঙ্গে কীর্ত্তনীয়া বাসু ঘোষ। এই তেঁতুলগাছতলায় তাঁদের প্রথম মিলন হ'ল। হাতের বৈঠা গৌরীদাসকে দিয়ে শক্তি সঞ্চার করলেন নিমাই। বৈষ্ণব মহাজনের বর্ণনা :

> গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহি এ বৈঠায়।
> এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়।
> ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।
> এত বলি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে।

বৃক্ষতলে ছোট বেদীগাত্রে স্মৃতিফলকে লেখা আছে : গৌর-গৌরীদাস মিলন ক্ষেত্র।

দ্বিতীয় বার এসে নিমাই স্বহস্তলিখিত একখানি পুঁথি গৌরীদাসকে দিয়ে যান।

তৃতীয় বার আসেন সন্ন্যাস নিয়ে। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ সংবাদে গৌরীদাস মর্ম্মাহত হয়েছিলেন—তবু প্রভুকে দেখে তাঁর আনন্দ ধরে না। গৌরীদাস অনুরোধ করলেন —প্রভু যেন সন্ন্যাস নিয়ে এইখানেই বাস করেন। প্রভু বললেন, গৌরীদাস এমন কথা বলো না। তুমি আমার আর নিতাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি পূজা কর। তুমি নিশ্চয় জেনো—তার মধ্যে আমরা বাস করব।

প্রভু নিজে উপস্থিত থেকে নিম কাঠ থেকে দুই ভায়ের প্রতিমূর্ত্তি তৈরি করালেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দারুমূর্ত্তিদ্বয়ের অভিষেকাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। এই মূর্ত্তি দুটিই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিতাইয়ের সর্ব্বপ্রথম বিগ্রহমূর্ত্তি—গৌরীদাস প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অদ্যাপি বিদ্যমান।

কিন্তু দারুমূর্ত্তি নড়ে চড়ে না, কথাও বলে না। গৌরীদাস বললেন, এ মূর্ত্তি নিয়ে কি করব আমি? তোমরা দু'জনে থাক।

যেমন বলা—সেই কাঠের মূর্ত্তি চলতে আরম্ভ করল—প্রকৃত নিতাই গৌর হয়ে গেলেন কাষ্ঠবৎ। অমনি গৌরীদাস দারুমূর্ত্তির সামনে এসে বললেন, না, না—আমার ভুল হয়েছে, তোমরা থাক।

যেমন বলা—দারুমূর্ত্তি স্থাণুবৎ হয়ে গেল। প্রকৃত নিতাই গৌর সজীব হয়ে উঠলেন।

গৌরীদাস ব্যাপার দেখে নিজের মন্দ ভাগ্য বলে কাঁদতে লাগলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি বললেন, সখা—দেখলে ত আমরা দুই অভিন্ন মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তিকে ইচ্ছা তুমি রাখতে পার। তবে কথা দিচ্ছি—তোমার জীবনকাল পর্য্যন্ত—এই কাঠের মূর্ত্তিতেই প্রকৃত মূর্ত্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে ভজন কীর্ত্তনাদি লীলা করব, তুমি যা খেতে দেবে তাই খাব। আর যত দিন কোন ভক্ত পাঁচ দণ্ডকাল একাগ্র চিত্তে আমাদের দর্শন করে আকর্ষণ করে নিয়ে না যায়—ততদিন তোমার মন্দিরেই থাকব আমরা।

এই জন্য আজ পর্য্যন্ত সামান্য ক্ষণের জন্য বিগ্রহ-দর্শনের ব্যবস্থা। যাকে বলে ঝাঁকি দর্শন।

দেড় শ' বছর আগে একবার শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণীর সত্যাসত্য পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে বড় অদ্ভুত কাহিনী।

প্রায় দেড় শ' বছর আগে একদিন এক অকিঞ্চন বৃদ্ধ বৈষ্ণব গৌরীদাস প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরের সামনে এসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, সব জায়গাতেই ত দেখি দুয়ার খুলে দেবদর্শনের ব্যবস্থা—এমন কোন জায়গা কি নেই যেখানে মন্দিরের দুয়ার আপনা-আপনি খুলে গিয়ে ঠাকুর দেখা দেন?

যেমন বলা—মন্দিরের দুয়ার খুলে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রকট হলেন।

পূজারী ত স্তম্ভিত! বুঝলেন—এই অকিঞ্চন বৈষ্ণব সামান্য ব্যক্তি নন—অনায়াসে ইনি শ্রীবিগ্রহের প্রাণসত্তাকে আকর্ষণ করে নিতে পারেন।

পূজারী আকুল হয়ে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, তুমি যদি গৌরীদাসের প্রাণধন হও ত দরজা বন্ধ কর।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব অলৌকিক লীলার আস্বাদ পেয়ে পরম আনন্দলাভ করলেন এবং সেই লীলা অহরহ আস্বাদ করবার জন্য শ্রীপাট অম্বিকায় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রয়ে গেলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ নামসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীভগবানদাস বাবাজী।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ছায়াশীতল তেঁতুলতলায়। ঝির-ঝির করে বাতাস বইছিল, সমস্ত শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল। অম্বিকার প্রাণসত্তাটিকে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে অনুভব করছিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদপূত বৈষ্ণব-তীর্থে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর অতি প্রিয় ভজন গানের দু'টি ছত্র বার বার মনে পড়ছিল :

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহী এ জে পীড় পরাঈ জাণে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান ন আণে রে।

বৈষ্ণব জন তিনিই—যিনি পরের দুঃখ বুঝতে পারেন। পরের কষ্ট মোচন করেন, (কিন্তু) মনে অভিমান রাখেন না।

আলোর মুক্তি

শ্রীসুবোধ রায়

"আলো চাই, আলো চাই"—প্রাণ কহে কাঁদি
আঁধারের সাথে তারে কে রাখিল বাঁধি।
কেবা যেন খেলাচ্ছলে জীবন-উদয়াচলে
ডাকিয়া আনিল হায়! প্রদোষ আঁধার!
সে গভীর গুহা হতে নাহিক নিস্তার।

আঁধারে আরাম-ঘুম তাই লাগে ভাল,
"বেদনা-সাধনা-অগ্নি কেন দিছে আলো?"
মন কহে বার বার! স্বপন-বিলাস তার
চুরি করে আনে কত সুবর্ণ-রতন,
লুকাতে সে চোরাধন কতই যতন!

সহসা জাগিয়া ওঠে ঝঞ্ঝা বজ্রাসুর।
রুদ্রের ভৈরব-ভেরী, হুকার মৃত্যুর
শিয়রে জাগায়ে তোলে—অশ্রুনদী কলরোলে
পরাণের কূলে আনে প্রলয়-প্লাবন,
বিভীষিকা মাঝে ঘটে নব জাগরণ।

পরাণ কাঁদিয়া বলে—"আলো, কোথা আলো?
নিজ বক্ষ-সমিধেতে জ্বালো তারে জ্বালো।
বিলাস-আরাম-শয্যা আনে যে দুঃসহ লজ্জা
যাক্ দূরে প্রদোষের স্বপন-আঁধার,
মুক্ত হোক্ আলোকের জ্যোতি-পারাবার।

ভূস্বর্গের যাত্রী

শ্রীমহাদেব রায়

পূজার ছুটির দুই দিন আগে দুর্নিবার আকর্ষণ হইল কাশ্মীর যাত্রায়। যে সুযোগ মিলিয়াছে, তাহা পরিহার করিলে জীবনে আর হইবে না। তাই শত দায়-দায়িত্বকে দূরে সরাইয়া ঐ সুদূরের আকর্ষণে বাহির হইয়া পড়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ফিরিতেছি। স্ব-গৃহ হইতে একেবারে নিঃসঙ্গ বাহির হইয়া সুদূর তীর্থে পাড়ি দিব—এ কোন্ দুর্মতি!

প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের অভিযোগেরও অন্ত নাই। অবশ্য, সকলকে সঙ্গে পাইলে সত্যই চরিতার্থ হইতাম। পলে-পলে, দণ্ডে-দণ্ডে ইহাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া অবর্ণ্যে যাত্রার রথে পথে-পথে নূতন সম্পদ বহন করিয়া লইয়া যাইতাম। ফিরিবার পথে ভূ-স্বর্গের সম্পদ ছাড়া, বন্ধুদের—সকলের অন্তরের সুধায় নিজের অন্তর ভরিয়া লইয়া পুনশ্চ এই ভূমিতে নামিয়া নূতন স্বর্গ রচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু নিরুপায়। অগত্যা গৃহ হইতে একাকী নিক্রান্ত হইতে হইল।

যে অবস্থায় গৃহের জঞ্জাল ছাই-চাপা দিয়া একাকী বাহির হইয়া আসানসোলে পৌঁছিয়া সহযাত্রী বান্ধবকে ধরিলাম, সে এক বিরাট কাহিনী। সে কাহিনী বর্ণনায় অবসর এখন নয়। কিন্তু বাহির হইতে না পারিলে, বন্ধুবরও যে আসানসোল হইতে নামিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গৃহমুখী হইতে পারেন, সেই কথাই দুইটা দিন আর দুইটা রাত ভাবিয়াছি। কথা ছিল—তিনি কলিকাতা হইতে রওনা হইবেন, আমি মধ্যপথে আসানসোলে মিলিত হইব। দৈবাৎ বাধা ঘটিলে, আমার ত হইলই না, তাঁহারও সংশয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়শঃ দেখা যায়, উভয়তঃ সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়।

উভয়েরই কিন্তু সৌভাগ্য। যথাস্থলে—যথানির্দিষ্ট লগ্নে মিলিত হইলাম। যে ভাবে অনশনে—জাগরণে—বহু সমস্যার আংশিক সমাধান—স-কলহ অথবা নির্ব্বাক সমাপ্তি করিয়া বাহির হইয়াছি, খোড়দৌড় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যান অবলম্বন করিয়া আসানসোলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে পৌঁছিয়া শুধু এই কথাই মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী"। অন্তর্যামী অন্তরের কথা ঠিক ঠিক টের পান। অন্তরের একাগ্রতা হইলে, ভাবনা-বাসনা নিষ্ফল হয় না। মানসের এই যে একটা চরিতার্থতা, এই চরিতার্থতা আসানসোল হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত পথ যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

২

দিল্লীতে আসিয়া পড়িলাম। সেই ইন্দ্রপ্রস্থ। ব্যাসদেবের বর্ণনার কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে পড়িল কুরু-পাণ্ডবের কথা, মনে পড়িল—তাঁহাদের ইন্দ্রপ্রস্থের কথা। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীন চিহ্ন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আজ আর হইবে না।

—সে ইন্দ্রপ্রস্থও নাই। কল্পনার নেত্রে তাহার স্বরূপ সন্দর্শনে যেটুকু আনন্দ, সেটুকু লালন করিতে করিতে ভাবিতেছি—আজকার দিল্লীর কথা।

১২ই অক্টোবর (১৯৫৩) বেলা আড়াইটায় এই গাড়ী হাওড়া ছাড়িয়াছে। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে কয়েক ঘণ্টা অবস্থিতি ঘটিবে। তবে 'তুফানে'র সঙ্গে এবার বিচ্ছেদ হইল। রাত্রি দশটায় এখান হইতে অন্য গাড়িতে উঠিয়া পুনশ্চ অগ্রগতি। কিছুক্ষণ পুরাতন শহরের বুকে স্বচ্ছন্দে চোখ বুলাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারা যায়।

কালীবাড়ী, নয়া দিল্লী

বন্ধুর সাহচর্য্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহির হওয়া গেল। বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে—রাস্তা আলোয় আলোময়। তবু ভিতরের অন্ধকার যাইবে কেন? এই যে ধূম্র-ধূলিজালের মধ্যে লোকজন গিসগিস করিতেছে, সওদাগর সওদার জালবিস্তারের সহস্র কল্পনায় বিভোর, সিঙ্গল্ ট্রামগাড়ী (কলিকাতার মত দুই বগির গাড়ী নয়, এক বগির) হু-হু করিয়া চলিয়া গেল, ইহার মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থই বা কোথায়, আর নয়া দিল্লীই বা কোথায়? নয়া দিল্লী আজ শুধু ভারতেরই প্রাণকেন্দ্র নয়, জগৎ-জোড়া সম্পর্কের নূতন কেন্দ্র। না দেখিতে পাইতেছি সেই নূতনকে, না পুরাতনকে; তাই বলিতেছিলাম যে, বৈদ্যুতিক আলোকে অন্ধকার যাইতেছে না।

কোথায় কিরূপ গৃহে পণ্ডিত শ্রীনেহরু আমেরিকা, কাশ্মীরের সংযোগ-বিয়োগের চিত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঘর্ম্মাক্তকলেবর, তাহা কি

দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কথা? ঐ ত লাল-কেল্লাও কাছে, জুম্মা মসজিদও নিকটেই—দুইটিরই বাহিরের অংশ ত অনেকখানিই দেখা যাইতেছে। আলোকে না হয় ভিতরে গিয়া কক্ষে কক্ষে, সোপানে সোপানে উদ্যানে উদ্যানে তাহার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উপভোগ করা যাইত। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, সন-তারিখ, নির্ম্মাতা-উৎসাহ-দাতা বিভাগ-বিশেষ ইত্যাদির তথ্যাবধারণে বাহ্য জ্ঞানও না হয় কতকটা হইত। কিন্তু তাহাতে কি অন্ধকার যায়? লালকেল্লা বা জুম্মা মসজিদ মোগল যুগের মহাকীর্ত্তি। উহাদের প্রথম দেখিলে, বা স্মরণ করিলে, সেই কীর্ত্তির কথাই মনে পড়ে। কিন্তু তাহার পিছনে পিছনেই আসিয়া উপস্থিত হয় ইংরেজের স্মৃতি। কোন্‌টার কি রূপ তাহার আলোচনাও এখানে বাহুল্য। ঐ দুই স্মৃতিকে অস্পষ্ট—বা অর্দ্ধস্পষ্ট করিয়া আজ উজ্জ্বল হইয়াছে এক ভারতীয় গরিমা। 'লালকেল্লা' বলিতেই অন্তরে জাগে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-বৎসল মহাবীর সুভাষচন্দ্রের বীর্য্য-বিভূতি-ধ্বনিত উক্তি—"দিল্লী চলো, লালকেল্লা দখল কর"। জুম্মায় এক ভাই আমার প্রার্থনারত হইয়া থাকুন, অন্য ভাই মনে মনেও তাহার ব্যাঘাত ঘটাইবে না—এই মহাভাবে ভারতীয়ের সুপ্ত আত্মার যথার্থ জাগরণ। মত ও পথের পার্থক্য লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে যেখানে, কলহ, সেখানে ধর্ম্মও অন্তর্হিত, জাতীয়তাও তিরোহিত। ধর্ম্ম-তিতিক্ষার পূর্ণতা ভারত-বর্ষেই সাধিত হইয়াছে। আবার সে মহাভাব হইতে বিচ্যুতিও ঘটিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মে তিতিক্ষাই মনুষ্যে দেবত্ব—কোন ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি বিরূপ না হইয়া নিজ নিজ বোধে শ্রদ্ধাপর থাকিয়া স্বরূপ উপলব্ধি কর। ইহার অধিক বোধ নাই, ইহার অধিক জ্ঞান নাই, ইহার অধিক আলোক নাই। প্রকৃত পক্ষে, জুম্মাই বলি, লাল-কেল্লাই বলি, কুতবমিনারই বলি, আর, আজিকার সেক্রেটারিয়েট, বিড়লামন্দির, ছায়ামন্দির প্রভৃতির কথাই বলি, চর্ম্মচক্ষুতে দেখিলেই কি দেখা হয়? উহার অভ্যন্তরে—মর্ম্ম-গৃহে, কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে হইবে। বন্ধুবর বহুবার দিল্লী দর্শন করিয়াছেন। বড় সুন্দর কথা বলিলেন—"অট্টালিকায় যা নেই, অট্টালিকার আত্মায় তা আছে, সন্ধান করুন। দিল্লীর মধ্যেই ভারত—মহা-ভারত লুকিয়ে আছে। সমগ্র ভারতের সারভূত আত্মার ছবি খুঁজে পাবেন এখানে। যুধিষ্ঠিরও আছে, পৃথীরাজও আছে, কুতবউদ্দীনও আছে। ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিন্ন দেশী মহাত্মা, দুরাত্মাও আছে—পল ব্রাণ্টনও আছে, হেষ্টিংসও আছে। কবির কথায় যে 'শক-হূনদল পাঠান-মোগল এক দেহে লীন' হয়ে আছে এই ভারতে তা ত দিল্লী দেখেই বুঝতে হবে। প্রাচীনের সঙ্গে নবীন সংযুক্ত হয়েছে এখানে। ঐ ত রাজঘাট! নব ভারতের নবীন স্রষ্টা ঐখানেই শায়িত হয়েছেন শেষ শয্যায়। তাঁকে যেখানে বিভ্রান্ত ভারতীয় সন্তান ভূ-পাতিত করল, সে-ও ত ঐ অদূরেই। ভেবে দেখুন—এই রাজপথে চলতে চলতে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের করুণ সুর সংযুক্ত হয়ে আপনার অনুভূতিতে এক নবীন আবেগময়ী চেতনায় সঞ্চার করছে কিনা।"

ভাবিলাম—বন্ধুবরের কথাই ঠিক। ইতিহাসও নয়, ফটো-গ্রাফও নয়, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য মিশ্রিত হইয়া যে অনুভূতি আর উপলব্ধি জাগায়, তাহারই লোলুপতা—যুগে যুগে ভাবে ও রসে। তাহারই জন্য পাঠক চায় গল্প, দর্শক চায় ছবি—ভিন্ন ভিন্ন রসের রসিক বিভিন্ন আধারে চায় ভিন্ন ভিন্ন রস।

দিল্লীর প্রসঙ্গে বন্ধুবরকে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র কথা বলিতেই তিনি সোচ্ছ্বাসে বলিলেন—"বাস্তবিকই অতি-সরস চিত্র! আচ্ছা, দিল্লী দেখা যাবে'খন ফেরার পথে। বই পড়ে কি দিল্লী দেখা হয়? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নতুন মনের নতুন চোখ বুলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে কি পাওয়া যায়।...এখন চলুন—সময় হ'ল।"

দ্রুতপদে ফিরিতে হইল। ষ্টেশন বড়। দিল্লী ষ্টেশনের গাম্ভীর্য্য বিখ্যাত। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে, কি নিকটে—কি দূরে—শহর পর্য্যন্ত কি সুদর্শনা নগরীর নয়ন-মনোহর শোভা বা লক্ষণীয় পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টিগোচর হইল না। নয়া দিল্লী, কেমন চোখে দেখি নাই আজও, শুধু নামই শুনিয়াছি। বন্ধুবর আশ্বাস দিয়াছেন—ফিরিবার পথে হইবে। তাই সই। আশা মহাশ্বাসা।

৩

১৪ই অক্টোবরের প্রভাত। অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে জনবাহুল্যের কলকোলাহল নাই। বাহিরে পরিচ্ছন্নতার অপূর্ব্ব শ্রী বড় ভাল লাগিল। শরতের প্রভাতের সোনালী রোদ অমৃতসরকে অমৃতময় করিয়াই যেন চোখে ধরিল।

নগর-পরিক্রমায় চারি-পাঁচজন করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া টাঙ্গা ভাড়া করা গেল। সমগ্র দলটি আমাদের ছোটখাটো নয়—ছাব্বিশ জন—নয়টি নারী, দুইটি বালিকা, বাকি সব পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে পাচক, পরিবেষক, নায়ক আছেন। তীর্থযাত্রী গাড়ির খ্যাতনামা পরিচালক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের পরিচালনায় আমরা সব ভূ-স্বর্গের যাত্রী। কুণ্ডু মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ফকিরচন্দ্র আমাদের নায়ক। দলের পরিচয় আপাততঃ থাক। এখন অমৃতসরের পরিচয় গ্রহণে অগ্রসর হই।

কথিত আছে—নানকের ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া আকবর গুরু রামদাসকে অমৃতসর নগর দান করেন। আজ অমৃতসর শিখদের মহাতীর্থ।

গুরু রামদাসই নাকি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তিন-তলা মর্ম্মরের মন্দির নির্ম্মাণ করান। অতি বৃহৎ পুষ্করিণী, চতুষ্কোণ—চারি কোণ শ্বেত পাথরে বাঁধানো, উপরে কালো পাথরের কাজ আছে। পুষ্করিণীর মধ্য হইতে স্বর্ণ-মন্দির উঠিয়াছে।

কনকে মণ্ডিত মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় কনক-কিরণ—অঙ্গে-অঙ্গে, সোপানে-চত্বরে, পুকুরের জলে শরতের প্রভাত-তপনের দিব্য বিভূতি।

মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গ যে স্বর্ণ-বসনে আচ্ছাদিত, সে বসনের উপর যে শত সহস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য, তাহার পরিচয় আর কতটুকু

সম্ভব ? গৃহে গৃহে লৌহ কপাট—তাহাদের উপরটাতেও কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য। সুবর্ণের উপর কারুশিল্প শুধু কি মোগল যুগের ? পূর্ব্বের পরের বহু দক্ষতার মহিমাকে এই সুবর্ণ-বসনে ক্ষোদিত চিত্রকলা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

মস্তকে আচ্ছাদন দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। শিখেরা গুরু গোবিন্দের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া মস্তকে কেশপাশ ধারণ করিয়াছে

লক্ষ্মীনারায়ণ (বিড়লা) মন্দির, নয়া দিল্লী

—এবং সেই মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া রাখাও গুরুরই আদেশ। পুষ্করিণীর বুকের উপর উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ইষ্টক-প্রস্তরের পথ অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। একতলা, দোতলা, তিনতলা পর্য্যবেক্ষণ পরিক্রমা করা গেল। স্বর্ণে স্বর্ণময় মন্দিরের এক অঙ্গ হইতে আর এক অঙ্গে চোখ ফিরাইয়া দেখি সবই বিস্ময়। বিস্ময়কে রূপ দান করিতে না পারিলে কি মহিমময়ের মহিমাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় ? অভ্যন্তরে পূজার বস্তু শুধু এক বৃহৎ হস্তলিখিত পুস্তক—নাম 'গ্রন্থসাহেব'। অক্ষর-ব্রহ্ম অক্ষরের মধ্যে বিধৃত। পাঠক-পূজক—পঠনে পূজনে—আরাধনে ভজনে সেই একের মহিমাকে অন্তরে বরণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

দোতলার অনতিবৃহৎ ভজন-সভায় শুনিলাম—মহিমময়ের মহিমা-জ্ঞাপক অন্তর-গলানো সুরের রস। ভজনের স্বর-বিতানে লীলাময়ের লীলা-চাঞ্চল্য যেন সমগ্র অন্তরে অজ্ঞাত এক লোকের আকর্ষণের কম্পন জাগাইয়া গেল। দ্বিতলের দরজার বাহিরে আসিতে শুনিলাম —কেহ বলিতেছে—'সুন্দর'—কেহ তাহার ইংরেজী শব্দটির প্রথম অংশে অধুনাতন কৌলীন্যবর্দ্ধক অযথা জোর দিয়া বলিতেছে— 'ব্বী-ইউটিফুল'।

না, অমৃতসরের সুপ্রশস্ত সুবর্ণ-মন্দিরের অঙ্গে অঙ্গে যে লাবণ্য, তাহার পরিচয় দিতে আর পারিলাম না। দুই একটি অংশের প্রতি-কৃতি দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। বাহিরের অঙ্গনে উত্তর দিকে এক প্রকাণ্ড কুলগাছ—কিংবদন্তী উহা পাঁচ শত বৎসরের অধিক কাল দাঁড়াইয়া আছে। অতি পুরাতন গাছ বটে।

স্বধাম খড়্গপুরে কর্ম্মনিরত এক পাঞ্জাবী অফিসারের সঙ্গে সহসা সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাঁহার স্বদেশ—আমাদের বিদেশ। সপরিবারে স্বদেশে আসিয়া দেবধামে পূজা দিতে আসিয়াছেন। তীর্থযাত্রার পথে সহসা স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতে অন্তরে এক ভাব-চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। দলে দলে পাঞ্জাবী নর-নারী নিজেদের পোশাক পায়জামা আর অঙ্গাবরণে আবৃত হইয়া গ্রন্থসাহেবকে পূজা দিতে, প্রণাম করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইঁহাদের মুখে-চোখে একটা অসম্ভব তৃপ্তির সুপরিস্ফুট ভাব-মহিমা। বহিরাগত যাত্রীদের মুখে-চোখে নূতন দর্শনের কৌতুক-কৌতূহলের ছবি। মন্দিরের নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্যে, অপরিমেয় স্বর্ণ-সম্ভারে সে কৌতুক যতখানি চরিতার্থ, ধর্ম্মকে ধরিবার জন্য ততখানি আগ্রহ কি এই দর্শকদলের আছে ? পূজারী, পূজারিণীরা যে আসিতেছে, তাহাদেরই বা কতখানি আকুলতা সেদিক দিয়া ? তীর্থে তীর্থে তীর্থপতির স্বরূপ অপেক্ষা বাহিরের ঐশ্বর্য্যই গতানুগতিক তীর্থ-স্রোতকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। তীর্থ ভ্রমণে অন্তরের সঙ্গে এই একটা চিরন্তন রফা করিয়া মানুষ চরিতার্থতার তৃপ্তি চায়।
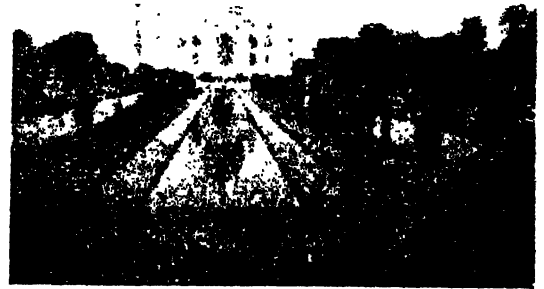
সন্ধ্যাবেলায় "তাজ"

অথবা, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহার সেইরূপ পূজা। অন্তরের মধ্যে যিনি লুকাইয়া হাসিতেছেন, তাঁহাকে যে যতখানি শক্ত করিয়া ধরিবে, ততখানিই ভাবিতে পারিবে—তাহার কমিবেশি হওয়ার তো কোনই উপায় নাই। হাজারকরা নয় শত নিরানব্বই জন আমরা ছুটি নূতন বহিরঙ্গ দর্শনের অপরিতৃপ্ত কৌতূহল মিটাইতে। নতুবা অমৃতসরের সুবর্ণ-মন্দিরে গ্রন্থসাহেবের সুস্পষ্ট পরিচয়, কি নানকের প্রকৃত পরিচয় লওয়ার জন্য কে কতখানি গা করিতেছে ? অথচ, হেন নর নাই, হেন নারী নাই যে সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে সন্তরণশীল অগণিত মহাকায় "মহাশোল" মৎস্যের বন্ধ-বদ্ধ গতি-লীলা দেখিয়া অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া স্থির হইয়া

যাঁহার উদ্দেশে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াই পরম তৃপ্তি, তাঁহার শ্রীচরণে কে কতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে পারি, সেই ত্যাগেরই মহিমময় রূপ তো মন্দিরের ঐশ্বর্য্যসম্ভারে।

দর্শকের দল প্রখ্যাত মন্দির হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। হিন্দুর বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির এ শহরের এই লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। কিন্তু সুবর্ণ-মন্দিরের কলা-চাতুর্য্য, মাধুর্য্য-গাম্ভীর্য্য, বৈভব-গৌরব দর্শন করিয়া আর কি এখানে তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায়? তরুণ-তরুণীরা বাহির হইতে পারিলেই যেন বাঁচেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এক এক কক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইয়া দেব-বিগ্রহের স্বরূপ শুনিতে শুনিতেই ললাটে যুক্ত-করের স্পর্শ দান করিয়া বিদায় মাগিতেছেন।

ইহার পরই পৌঁছানো গেল জালিয়ানওয়ালাবাগে। সরু-গলিপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ইংরেজের অপকীর্ত্তির সুস্পষ্ট স্মৃতি-চিহ্ন দেখিয়া বক্ষের স্পন্দন যেন সহসা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল। হঠাৎ যেন এক ঝলক রক্ত মাথায় উঠিয়া গেল। জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস পড়িয়া এ জাতীয় গভীর বেদনাবোধ হয় নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া আজ যে অনুভূতি হইল, তাহা সুতীব্র। জালিয়ানওয়ালা নামে এক পাঞ্জাবীর বাগান ছিল এটি। ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটি উহা ক্রয় করে। ইহা কিন্তু কুখ্যাতিলাভ করিয়াছে ইংরেজের অপকীর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ করিয়া। ঘটনাটির চিহ্ন বাগানের বাড়ী এবং হলের দেওয়ালে, উত্তর দিকের দোতলা-তেতলা বাড়ীর দেওয়ালে, উত্তরদিকের এক বিশালকায় কূপে সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। দেওয়ালে সেই কবেকার গুলির দাগ আজও স্পষ্ট। গুলির চোটে কোন দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় কোম্পানী-বাগান দেখা গেল—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাগান। দেশবাসীর প্রমোদকল্পে রচিত, ইংরেজদের উত্তান অবশ্যই নয়। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কোম্পানীই বা আজ কোথায়? রজনীতে উদ্যান আলোকে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিল। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলা চলে। ইহার কৃত্রিম শোভাসজ্জা রক্ষাকল্পে সরকার সমানেই যত্নবান রহিয়াছেন বোঝা গেল।

আজ শারদীয়া ষষ্ঠী। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে পূজার অঙ্গনে এতক্ষণ দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ অধিবাসের মন্ত্রধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। আর আমরা কয়েকজন তীর্থ-সহচরে মিলিয়া মেঘাচ্ছন্ন শারদ শুক্লা ষষ্ঠীর অর্দ্ধস্পষ্ট কৌমুদীতে অমৃতসরের কোম্পানীর বাগান পিছনে ফেলিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

৪

১৫ই অক্টোবর। শারদীয়া সপ্তমীর সন্ধ্যা। সপ্তমীর চাঁদ মেঘে ঢাকা। পাঠানকোটের রাজপথ প্রশস্তও নয়—পরিচ্ছন্নও নয়। অসময়ে শহর দেখার উদ্দেশ্যই বা কতটুকু সাধিত হইবে? বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্যের ও আমার মাথায় টুপি কেনা গেল। কাশ্মীরের শীতে শিরস্ত্রাণ। কেহ বলিতেছে, বরফ পড়িতেছে—প্রচণ্ড শীত পড়িয়া গিয়াছে। এত বিলম্বে কেন বাহির হইলেন? শুনিয়া হৃৎপিণ্ডের রক্ত চঞ্চল হইতেছে। তৃতীয় সঙ্গী কৃতবিদ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত সামন্ত, মিতভাষী সুরসিক। পাঠানকোটের রাস্তায় রাস্তায় স্মিত মিত ভাষণে টুপি কেনার ব্যাপারকে রসের আসরে পরিণত করিলেন। একটি কথা তাঁহার মনে আছে—পাঠানকোটের টুপিতেও যদি কাশ্মীরের শীত না যায়, তবে কলিকাতার শীতবস্ত্র আনা ত একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল।

বন্ধুবর সামন্ত এক কক্ষের সঙ্গী এই চার দিন। ইহারই মধ্যে ইহার অন্তরের পবিত্রতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। আলাপে-আলোচনায় ইহারই মধ্যে দেখিয়াছি, ইহার স্বভাব-কোমল মানসের পটে সুদীর্ঘকালের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা একটা দিব্য ভাবের মন-মনোহর ছবি অঙ্কন করিয়াছে। দূর দেশে যাত্রার পথে এহেন সঙ্গীকে একই কক্ষে এত অন্তরঙ্গ ভাবে পাওয়া সৌভাগ্য বিবেচনা করিয়াছি। পার্শ্বের কক্ষেই কালীবাবু আছেন সপরিবারে। স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা সঙ্গে আছেন। কালীবাবু ব্যবসায়ী মানুষ—কিন্তু আচরণে ব্যবসাদার নহেন। পাশের কক্ষ হইতে অহরহ আমাদের সযত্ন তত্ত্বাবধানে নিরত। অথচ কি স্পষ্টবক্তা। দিব্যি আরামে চলিয়াছি। এতগুলি লোকের সংসার। দ্বিতীয় শ্রেণীর বগী—কুণ্ডুবাবুর তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেন। পরিচালকদের পরি-চালনায় ত্রুটি নাই। বরং বিস্মিত হইতে হয়—গাড়ীর মধ্যে এমন পঞ্চোপচারের প্রাতরাশ, দশোপচারের মধ্যাহ্ন আর ষোড়শোপচারে নৈশ ভোজ্যের আয়োজন করে কি করিয়া?

কাহার নিকট কতটা ঋণী হইতেছি, তাহা ব্যক্ত করার সাধ্য নাই। দুই কথায় সর্ব্বজনের ঋণ স্বীকার করিয়া যতটুকু ঋণমুক্তি লাভ করিতে পারি। বৃহৎ সংসারে ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ভুল বোঝাবুঝি আছেই, আমাদের মধ্যেও যে তাহা না ঘটিয়াছে, তেমন নয়। তবু বলিব—সকলের মধ্যে এমন একটা সৌভ্রাত্র, এমন একটা সহানু-ভূতি, এমন সমবেদনা—এমন একটা সহায়তাদানের ভাব সজাগ ছিল যে, উহা সুদূরের যাত্রাপথে—তথা পুনর্যাত্রাপথে মহামূল্য পাথেয় রূপে গণ্য হইয়াছে।

এই তিন দিনের মধ্যেই নায়ক ফকিরচন্দ্রের বন্ধু কালোবাবু, টি-টি-আই ভাষবাবু (ইহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত), মেদিনী-পুরের রেণুমাতা তাঁহার দুই কন্যাসহ এক পরিবারভুক্ত গোষ্ঠীর আচরণে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। আসানসোলে এই গাড়ীতে উঠিয়াই সৌম্যদর্শন সুবোধবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপে আকৃষ্ট হই। তীর্থে তীর্থে তিনি নিজের ক্যামেরায় ছবি তুলিয়াছেন আর জনে জনে উপহার দিয়াছেন।

সঙ্গীদের বেশীর ভাগ পরেরই তারিখের পূর্ব্বাহ্নেই জ্বালামুখী তীর্থে যাত্রা করিয়াছেন বাসযোগে—রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেখা নাই। ১৬ই প্রভাতে সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। সারা রাত্রি যাপিয়া যে দুর্ভোগ ভুগিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিতে প্রত্যেকেই

যায়। একজন মাঝি হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাই ফিরিতে বিলম্ব—আর সমস্ত রাত্রি বেঘোরে বেজায় শীতে শোচনীয় অবস্থা। শীতের দুঃসহ ক্লেশ সকলকেই ভোগ করিতে হইয়াছে। বিছানা-পত্র ত সঙ্গে লইয়া যান নাই। জগন্মাতার অন্ত মূর্ত্তি জ্বালামুখী—প্রদীপের শিখারূপে পার্ব্বত্য মন্দিরে নিজের প্রভা বিস্তার করিতেছেন—বলিতে বলিতে সবিতাদি যেন ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

স্বর্ণমন্দির, অমৃতসর

ইঁহারই সেখানে ক্লেশ হইয়াছে বেশী। মুখে-চোখে শ্রান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট—অথচ, অন্তরের আনন্দ-হর্ষ যেন উপচাইয়া পড়িতে চাহিতেছে সেই মুখে-চোখেই। আশ্চর্য্য এই স্ত্রীলোকটি। দেহ-ভার বহনের ক্ষমতা নাই, এদিকে সুদূর তীর্থে বাহির হইয়াছেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিতে কেহ সঙ্গে নাই। পতি যে তাঁহার কোন প্রাণে একাকিনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, ভাবিতেও রোমাঞ্চ হয়। অঙ্গের স্থূলতায় সবিতাদি একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ—ট্রেন কিংবা বাস হইতে নামিবার সময়ে তাঁহার পা রাখিবার জন্য একটি টুল, কিংবা চৌকি—অভাবে বাক্স পাতিয়া দিতে হইতেছে, নতুবা কাঁপিয়া অস্থির। কিন্তু এই নামার সময়েই তাঁহার যত হৃৎকম্প। দূর পথের গতি-বিধিতে কিন্তু তাঁহার সাহস আর শক্তি দেখিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। সবিতাদির এই দেহের মধ্যে যে স্নেহপ্রবণ সুকোমল হৃদয়টি লুকাইয়া আছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াই আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। অথচ, তাঁহার কতটুকুই বা সহায়তা করিতে পারিয়াছি।

৫

১৬ই অক্টোবর মহাষ্টমী—শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ভট্টাচার্য্যের উপবাস। জগন্মাতার পূজা গাড়ীর কামরাতেই। ভক্তিসহকারে চণ্ডীপাঠ শুনিতে শুনিতে যেন এই দেশের ঋষিদের মুগ্ধ চিন্তার রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলাম। কাশ্মীরের যাত্রাপথে আনুষঙ্গিক এই মহামূল্য ফললাভের কথা জীবনে বিস্মৃত হইবার নয়।

অপরাহ্ণে রেলের কামরা ছাড়িয়া শ্রীনগরের বাস ধরিলাম। এবার জম্মু দিয়া শ্রীনগরে যাত্রা। আগে রাওলপিণ্ডি দিয়া শ্রীনগরে যাওয়া যাইত। সে পথ ছিল সোজা। দেশ-বিভাগের ফলে সে পথ এখন বন্ধ হইয়াছে। এখন জম্মু হইয়া দীর্ঘতর পার্ব্বত্য পথে শ্রীনগর যাইতে হয়। জম্মু হইতে শ্রীনগরের পার্ব্বত্য পথ নব-নির্ম্মিত। ভারত সরকারের সহযোগিতায় জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা এই পথ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বলা বাহুল্য—এই পথের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা জম্মু-কাশ্মীর সরকারের হাতে।

এই পথে পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর ২৬৬ মাইল। পার্ব্বত্য পথ জম্মু হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে 'বানিহাল পাস' পর্য্যন্ত। বানিহাল নয় হাজার ফুট উঁচু। সেখান হইতে ক্রমশঃ তিন হাজার ফুট নিম্নে অবতরণ করিয়া কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছিতে হয়—কাশ্মীর উপত্যকা ছয় হাজার ফুট উঁচুতে এক বিশাল সমতল ভূমি।

পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত বাসের ভাড়া সাধারণতঃ ২৭৲ টাকা। কাজেই যাতায়াতে ৫৪৲ টাকা। এবার পূজার আগে কিছুকাল যাবৎ শ্রীনগরের পণ্যসম্ভারের বিক্রয় কম হওয়ায় জম্মু কাশ্মীর সরকার সমস্ত প্রদেশ হইতেই ভ্রমণকারীদের আহ্বান করিয়াছেন, যাহাতে বিভিন্ন পণ্যের বিক্রয় বেশী হয়—ঘাটতি পূরণ হইয়া যায়। পাঠানকোট পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া (ভারতের যে-কোন

অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরের একাংশ

স্থল হইতেই) কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত বাসের ভাড়া ৫৪৲ টাকা স্থলে মাত্র ২৩৲ টাকা। তাই এবার চতুর্দ্দিক হইতেই কাশ্মীরে যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী। এবার যত বাঙালী কাশ্মীরে আসিয়াছেন, বা যত জিনিষ-পত্র কিনিয়াছেন, আগেকার সংখ্যা কিংবা পরিমাণের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না—এবার যাহাকে বলে 'রেকর্ড'। এ অক্টোবরে তাই হঠাৎ শ্রীনগরের বাজারে জিনিষপত্রের দাম দ্বিগুণ। এমনি ত কোন জিনিষ দর না করিয়া সেখানে কিনিবার উপায় নাই, তার উপর ক্রেতার ভিড় হইলে ত কথাই নাই। আর সেই ভিড়ই হইয়াছে এবার বেশী।

পাঠানকোট হইতে ডি. লুথ্র কোম্পানীর দুইটি বাসে আমরা সমস্ত যাত্রী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া শ্রীনগরে যাত্রা করিয়াছি। একদল কিছুক্ষণ আগে, অবশিষ্ট কয়েকজন পিছনে। পিছনের দলে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য, ডক্টর সামন্ত, কালীবাবু, শ্যামবাবু আর আমি কাছাকাছি আছি। একজন পাচক ও একজন ভৃত্য সঙ্গে। আমাদের বাস জম্মুতে পৌঁছিতে রাত্রি সাড়ে আটটা হইল। কাজেই জম্মুতেই অবস্থিতি করিতে হইল। বাস অবশ্য এই পার্ব্বত্য পথে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত চলিবার অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু আজ ইহার পর রাত্রি বারোটার মধ্যে কোন বাসযোগ্য স্থলে 'বাস' পৌঁছিবে না—জম্মুর মত স্থানে ত নহেই। তাই রাজনগরের আশ্রয়ে আমাদের রাত্রিবাস স্থির হইয়া গেল। রাত্রিবাসের কথা বলিবার আগে জম্মু পর্য্যন্ত পথের পরিচয় একটু দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

পাঠানকোট হইতে দুই-চার মাইল পশ্চিমে আসিয়া উত্তরমুখী হইলাম। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ। দুই পাশে শরবন। দক্ষিণে এবং কোথাও কোথাও বামেও আম্রকানন ভূ-প্রকৃতিকে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। শরতের অপরাহ্নের স্নিগ্ধ, মায়াময় শ্যামলিমায় শ্যামল শুভ্র শরবনের চিক্কণতা পল্লবঘন আম্রকাননের স্নিগ্ধতার পাশে পাশে এক সগোত্র মিশ্র রূপ-চিত্রের নয়নমনোহর যাদু রচনা করিয়াছে। এই যাদুর উপর আর এক নয়নভুলানো ইন্দ্রজাল দেখিলাম দক্ষিণে দক্ষিণবাহী খালে। ইরাবতীর জল খাল কাটিয়া দক্ষিণে ভারত-ভূমিতে চালনা করা হইতেছে। খালের মধ্যে স্রোতের গতি—ভরা নদীর স্বচ্ছ সলিলে নৃত্যশীল তরঙ্গের বুদ্বুদ-চিত্রিত ছবি নয়ন-সমক্ষে ধরিল—সুগভীর স্রোতের জল শ্যামল স্বচ্ছ—তাহাতে পুঞ্জীভূত শ্বেত বুদ্বুদের রাশীকৃত রজতশুভ্র রূপদ্যুতি নৃত্য করিতেছে—'ছলছল কলকল টলটল' তরঙ্গেই স্রোত নিয়ে চলিয়াছে। বেলা চারিটায় লখনপুরে পৌঁছিলাম। ভারত-রাষ্ট্রের সীমারেখা। এখানে আমাদের ছাড়পত্র অনুসারে মালপত্র দেখাইয়া ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিতে হইবে। সে পালা সারা হইল। আমাদের দুই দলের দুইটি বাসই এখানে মিলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফকির কুণ্ডু অল্প সময়ের মধ্যেই দুই ভাগের তদ্ভোগের পালা সারিয়া ফেলিলেন, আমাদের গায়ে এতটুকুও আঁচড় লাগিল না। আগের বাসটি আগে ছাড়িয়া দিল। সেটি থামিবে গিয়া 'কুড' নামক পার্ব্বত্য বসতিতে। আমাদেরটি থামিবে জম্মুতে।

লখনপুর ছাড়িয়া বাস ইরাবতীর পুলে উঠিল। প্রকৃতপক্ষে এই ইরাবতীই অধুনাতন ভারতের যথার্থ সীমারেখা। ইহা পার হইলেই জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য। প্রশস্ত পার্ব্বত্য নদী ইরাবতী। ইহারই জল পূর্ব্বোক্ত ঐ খাল দিয়া চালনা করা হইতেছে। এখানে নদীকে দেখিলাম শুষ্ক। নদী পার হইয়া বঙ্গজননীর সুসন্তান শ্যামাপ্রসাদের ধৃত হওয়ার স্থান প্রত্যক্ষ করিলাম। বুকের ভিতরটা সহসা যেন হু হু করিয়া উঠিল।

বেলা চারটায় পাঠানকোট ছাড়িয়াছি। রাত্রি সাড়ে আটটায় জম্মু পৌঁছানো গেল। পাঠানকোট হইতে জম্মু পর্য্যন্ত এই রাস্তাটি সমতলের উপর দিয়াই চলিয়াছে। জম্মু শহর সমতলে নহে, পার্ব্বত্য উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সুরম্য স্বাস্থ্যপ্রদ রাজ-নিবাস। রাস্তার পাশে এক হল-ওয়ালা বিপণিশ্রেণীর একটি পাঞ্জাবী হোটেলে ডাল-রুটি খাইয়া পাশেরই এক এক কামরা'র ভাড়াটিয়া অতিথি-নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। শ্যামবাবু পরদিনের যাত্রার লগ্ন স্থির করিতে বহু ছুটাছুটি করিলেন। ডি লুথ্রর অন্য গাড়ীতে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। সে গাড়ী কখন, কি সর্ত্তে বাহির হইবে জানা যাইতেছে না। অধিনায়ক সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তবু আমরা ফাঁপরে পড়িলাম। সকলেরই দুশ্চিন্তা। একটি করিয়া দড়ির খাটিয়াতে জনে জনে শয্যা বিস্তার করা গেল। কিন্তু সুনিদ্রার ক্ষেত্রই নয়। বাড়ী যেন পোড়োবাড়ী, বিশেষ পরিচ্ছন্ন ত নয়ই প্রশস্তও নয়। উচ্চ ভূমিতে হইলেও চারিদিকে চালুতে, নিম্নে জঞ্জাল—জঙ্গল প্রচুর, কাজেই মশকাদির অভাব নাই। তাহার উপর মহাষ্টমী বলিয়াই নাকি পাশেরই শিবমন্দিরে অষ্টপ্রহর তুলসী-রামায়ণ পাঠ হইতেছে। মিষ্ট কণ্ঠ কানে ভাল লাগিলেও, নিদ্রার ব্যাঘাতের বহু কারণের উপর এটিও একটি অতিরিক্ত কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাহত নিদ্রার রাত্রি সঙ্গসুখে কাটিল বলিয়া অনিদ্রার অস্বস্তি তেমন অনুভব করা গেল না।

ঊষার পার্ব্বত্য নগরীর আলোক-অন্ধকারে মিশ্রিত অর্দ্ধপরিস্ফুট শ্রী মনোহর লাগিল। প্রভাতের আলোকে সুরম্য প্রাসাদ, সুদৃশ্য মন্দির, নয়নাভিরাম কানন, দূরে সুউচ্চ তুষারশুভ্র পর্ব্বতশিখরশ্রেণীর আকাশস্পর্শী বেষ্টন, নগরীর খণ্ড খণ্ড উচ্চ ভূমি, উঁচু-নীচু পরিচ্ছন্ন রাজপথ—সব মিলিয়া জম্মু চোখের উপর অপূর্ব্ব নূতন রূপে প্রতিভাত হইল। জম্মু প্রশস্ত রাজ্য। তাহার রাজ-নিকেতন জম্মু নগরী। জম্মুর মহারাজা গুলাব সিং কাশ্মীর ক্রয় করিয়া জম্মু ও কাশ্মীর উভয় রাজ্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এখন বহু ঝঞ্ঝাবাত্যা অতিক্রম করিয়া জম্মু, কাশ্মীর এক সঙ্গে যুক্ত হইয়া 'জম্মু-কাশ্মীর' নামে যুক্ত সরকারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। শীতকালে কাশ্মীরে যখন অত্যধিক তুষারপাত হয়, তখন জম্মু শহরেই মহারাজা সপার্ষদ অবস্থান করেন। জম্মু শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য রঘুনাথজীর মন্দির আর রাজপ্রাসাদ। এখন আর দেখা হইল না, ফিরিবার পথে দেখা যাইবে। বেলা এগারটায় নয় জন আরোহীর বাস ছাড়িল। আমরা ছিলাম সাত জন। দুই জন বাহিরের আরোহী উঠিলেন।

৬

পার্ব্বত্য পথে এই সব বাসে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক যাত্রী কোন-ক্রমেই লওয়া হয় না, লওয়া চলে না। এ পথে বাস চালনা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। এই সব বাসের চালকের দক্ষতা একান্ত প্রশংসনীয়। বেশীর ভাগ পঞ্জাবের অধিবাসীই এখানে বাসচালকের কাজ গ্রহণ করে। কি তাহাদের কুশলতা! অতি অল্প ব্যবধানে

দিক্ হইতে দিগন্তরে ঘূর্ণ্যমান বাস চড়াই-উতরাইয়ে দ্রুতগতিতে ছুটিতেছে, অথচ চালক একটা হর্নের শব্দ করে না। বিপরীত দিক হইতে সমানে বাস ছুটিয়া আসিতেছে, ঘন ঘন মোড় ফিরিতে হইতেছে, তবু চালক যেন নির্বিকার। অতি ঊর্দ্ধে চলিবার সময় নিম্নে দেখা যায় বিপরীতমুখী বা একই দিক হইতে আগত বাসের গতি—মনে হয় ধীরে চলিতেছে, পর্ব্বতের গায়ে অসংখ্য রাস্তা, উপর হইতে যেন পর্ব্বতের সুষমাসুন্দর দেহে কণ্ঠের হারাবলী বলিয়া মনে হয়। অতি ঊর্দ্ধে বাসে ভ্রমণকালে যেমন একটা বিস্ময়ের আনন্দ সমস্ত অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়, তেমনই অন্তরে একটা ভয়ের শিহরণও জাগিয়া উঠে।—স্বর্গের দোলায় দোদুল্যমান হওয়ার আনন্দ এক দিকে, আর চালকের বংসামান্য অনবধানতায়, পতনের আশঙ্কাও

ডাল হ্রদ, কাশ্মীর

অন্য দিকে। আঁকাবাঁকা বিঘ্নসঙ্কুল এই পার্ব্বত্য পথে চালক এতটুকু অসাবধান হইলেই, হাজার হাজার ফুট নিম্নে সমস্ত যাত্রী লইয়া বাসের চুরমার হওয়ার কথা। কিন্তু সেরূপ দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না।

রাত্রি ন'টায় পার্ব্বত্য বসতি "বানিহালে" অবস্থান করিতে হইল। শীতের প্রকোপ এ যাত্রায় এই প্রথম অনুভব করা গেল। পার্শ্বভাগে পার্ব্বত্য তটিনী চন্দ্রভাগা বহিয়া চলিয়াছে। সুগভীর স্রোত তাহার। অপরাহ্নের রৌদ্রছায়ার খেলায় চন্দ্রভাগায় বঙ্কিম গতি দেখিয়া অভিনব রূপমোহে অভিভূত হইয়াছি। এখন দেখিতেছি—"বানিহালে"র উচ্চভূমির দ্বিতল বসতিগৃহের দ্বিতীয় তল হইতে তাহার উদার মনোহারিত্ব। এই বিপুল সৃষ্টিতে সমুদ্রের বিশালতা দৃষ্টিকে করে সম্মুখে প্রসারিত, তুঙ্গ পর্ব্বতের উচ্চতা করে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত, আর উচ্চ পার্ব্বত্য পথে বঙ্কিম স্রোতস্বতীর পাশ দিয়া চলিতে চলিতে মনে হয়—সুন্দরের সঙ্গে নয়নের আনন্দের সহযাত্রা। চন্দ্রভাগার পাশ দিয়া অগ্রসর হইবার সময় তাহার পুলক অনুভব করিয়াছি। দ্বিতলে উদার শৈত্যে কম্বলাবৃত হইয়া ছবিরের মত বসিয়া থাকিলেও পার্শ্ববর্ত্তিনী স্বচ্ছ-প্রবাহা ঐ তটিনীর সঙ্গে শান্ত শীতল পরিবেশে নয়নের যেন প্রীতি-মধুর সহযাত্রা অনুভব করিতে লাগিলাম।

শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া ভোজনগৃহে গিয়া প্রাতঃরাশ সারা গেল। ওদিকে নয়নপাত করিয়া দেখি—পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় সূর্য্যের কিরণ হরিতের উপর গলিত স্বর্ণের আভরণ বিস্তার করিয়াছে। যাত্রীরা কিন্তু এবার চঞ্চল হইয়াছে। আর এখানে নয়—'আগে চল্ আগে চল ভাই'। চালক এখনও প্রস্তুত হইতে পারে নাই, কিন্তু বিলম্বই বা তার কতটুকু! দু'দশ মিনিট মাত্র। ধৈর্য্যহীনতার এই লক্ষণে মানবের শোভনতা—শালীনতার চিহ্ন যেন কোথায় লুপ্ত হইয়া যায়। ড্রাইভার নীরবে ধীর স্থির গতিতে বাসে উঠিয়া নির্ব্বাক কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া বাস ছাড়ায় সঙ্কেতধ্বনি করিল। যাত্রীদলের কণ্ঠে তখন তুমুল আনন্দধ্বনি। বেলা এখন আটটা।

গিরিসঙ্কটের নাম বানিহাল। সাত শত ফুট দীর্ঘ প্রসিদ্ধ সুড়ঙ্গ-পথ পার হইলাম। গিরিসঙ্কটে অগ্রসর হইয়া অতি উচ্চে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমান গতিবেগে অগ্রগমন আর অতি নিম্নে নিরীক্ষণে যুগপৎ এক অব্যক্ত আনন্দ ও আশঙ্কার বিচিত্র আলেখ্য মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠে। এই মানসচিত্রের প্রতিচ্ছবি ভাষার রেখায় বুঝি কোনক্রমেই সুস্পষ্ট হওয়ার নহে। নয় হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া আরোহীদের মুগ্ধ কণ্ঠে ভীষণ-সুন্দর দৃশ্য দর্শনের আনন্দ-

চশমশাহী

ধ্বনি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভয়ালের সুন্দর রূপই যেন এখানে মানসের অব্যক্ত আনন্দ রচনা করে। কখনও বামে, কখনও-বা দক্ষিণে দেখিতেছি উত্তুঙ্গ তুষারকিরীট গিরিমৌলি। অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে তুঙ্গতায় বেষ্টন করিয়া উত্তুঙ্গ ধরাধরকে যেন ধরণীর যথার্থ ধারকরূপে চিত্রে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। চিরস্মরণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সাদরে স্মরণের মণিকোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম।

কোথায় শ্রীনগর এখনও অনুমানই করিতে পারিতেছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমতল ভূমিতে অবতরণ করিলাম। এইবার

কাশ্মীরের উপত্যকা সুরু হইল বুঝিলাম। এই ত এক নূতন অভিজ্ঞতা—বিচিত্র-দর্শন নবভূমি প্রত্যক্ষ করিলাম। বঙ্গভূমিরই অনুরূপ শ্যামল শস্যক্ষেত্রকে দুই পাশে রাখিয়া পীচঢালা সুপরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথে যানটি আমাদের হু হু করিয়া চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে সরল সমুন্নত সফেদা বৃক্ষের সারি বরাবর সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। ইহারা যেন উপত্যকাভূমির গৌরবে উজ্জ্বল অঙ্গরক্ষী সাজিয়া আছে।

এযাবৎ পর্ব্বতগাত্রে দেখিয়া আসিতেছিলাম—ক্রমোন্নত পর্ব্বতের দেহেও সোনালি ফসলের চতুষ্কোণ ক্ষেত্রগুলি থাক কাটা থাক কাটা—ধান, গম তরকারির চাষ। সূর্য্যের সোনার কিরণে পক্ক শস্য ঝলমল করিতেছে। স্থানে স্থানে নির্ঝরিণীর জল আটকাইয়া চাষের ব্যবস্থা। গিরিগাত্র কত উর্ব্বর হইতে পারে, তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া সমতল ভূমিতে নামিয়াছি। নয় হাজার ফুট উঁচুতে উঠিয়া সেখান হইতে তিন হাজার ফুট নামিলে এই কাশ্মীরের উপত্যকা। সমুদ্রতল হইতে ছয় হাজার ফুট উচ্চে এই যে আশী মাইল দীর্ঘ ও পঁচিশ মাইল প্রস্থ—অর্থাৎ, দুই হাজার বর্গমাইলের সুশ্যামল সমতল ভূমি, এই ত এক মহাবিস্ময়। শুধু এই একটি কারণেই ইহার "ভূস্বর্গ" নামের সার্থকতা অনেকখানি উপলব্ধি করিলাম। সফেদাবৃক্ষের সারির মধ্য দিয়া উভয় পার্শ্বে বঙ্গভূমির সমগোত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়াছি। একেবারে বাংলা দেশ! কিন্তু এ কি ফসল? অতি ক্ষুদ্র হরিদ গুল্মের মস্তকে পাংশু পুষ্প সুশোভিত হইয়া বড় বড় চতুষ্কোণ ভূখণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। জাফরানের গাছ। বাংলা দেশের সিমগাছে যে রকমের ফুল হয়, অনেকটা সেই রঙের ফুল। গাছ কিন্তু অতি ছোট। ঐ ফুল হইতেই রক্তরাগ জাফরানের জন্ম বলিয়া শুনিলাম। কত আদরণীয় সামগ্রী—এক তোলার দাম চার টাকা। সেই ফুলে আলো জাফরানের লীলাভূমি সন্দর্শন করিলাম—চোখ জুড়াইয়া গেল। ক্ষেত্রময় জাফরানের রং—ভূস্বর্গের সার্থক এক বর্ণসুষমায় নয়ন ভরিয়া গেল। অভিনব দর্শনে অন্তরলোক ভাবসৌন্দর্য্যে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

কাশ্মীর উপত্যকার শ্যামলাঞ্চলা ভূমির বক্ষে পপলার-শোভিত প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীনগরে যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা বারোটা। আকাশে-বাতাসে আলো-ছায়ায় শীতের মধ্যাহ্নের প্রভাব সুপরিস্ফুট। টাঙ্গার ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম—শ্রীনগরের এমনকি শ্রী! ভূস্বর্গের রাজধানীর এমনকি রূপ-লাবণ্য!

সহসা অদূরে এক প্রকার মহীরুহের পত্রাবলীর বর্ণবৈভব চোখে পড়িল—পার্ব্বত্য পথেও স্থলে স্থলে দেখা গিয়াছে, তবে এমন শ্রেণীবদ্ধও নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠও নয়। এ যেন অভিনব বৃক্ষের অভিনব নন্দনবন। নাম নাকি চিনার। বঙ্গদেশের মহুয়াবৃক্ষের সঙ্গে ইহার কায়ার কতকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহার পত্রাবলীর বর্ণবৈচিত্র্যই সমধিক শোভা-সজ্জার নিলয়। ক্ষণে ক্ষণে ইহাদের বর্ণের পরিবর্ত্তন নয়নগোচর হয়। তবে, স্বর্ণবর্ণ আর ঈষৎ লোহিতের মিশ্রণে অহরহ ইহাদের অপরূপ রূপমাধুর্য্য; বিশ্বে উহার তুলনা আছে কিনা জানি না, কিন্তু পত্রের এ সৌন্দর্য্য আর কোথাও চোখে পড়ে নাই কোনদিন।

আমাদের বাসও নির্দিষ্ট হইয়াছে "চিনারবাগে"। চিনারের বাগান। সারি সারি মহাকায় মহীরুহ বর্ণ সজ্জায় বরবপু আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অদূরেই "ডাল" হ্রদের ফটক। ফটকের রশি দুই দক্ষিণে—অনতিপরিসর অগভীর পয়োবিস্তারী খালের উপর আমাদের গৃহ-তরী নির্দিষ্ট হইয়া আছে। গৃহ-তরীর নাম জেসমিন। ইহাতেই শ্যামবাবু, বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য দুইটি কন্যাসহ শ্রীমতী রেণুবালা, সবিতা দিদি, স-সন্তান দাশবাবু আর আমি। বৈঠক গৃহসহ পাঁচ-পাঁচটি পৃথক কক্ষ এই নৌ-গৃহে। এইরূপ চারিটি নৌগৃহে আমাদের সমগ্র দল বিভক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ বাস সুরু করিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আচার্য যোগেশচন্দ্র

শ্রীসুখময় সরকার

নয় বৎসর পূর্বের কথা। আমি তখন বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র। একদা এক প্রবীণ অধ্যাপক আমায় বলিলেন, "তুমি যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয়কে জান?" আমি বলিলাম, "নাম শুনেছি, আর অনেকদিন আগে একবার দেখেছি—যখন রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় এসেছিলেন, তখন তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "এখন তাঁর বয়স হয়েছে; নিজে কিছু লিখতে পারেন না। প্রবন্ধ লিখবার জন্য একজন অনুলেখক দরকার। আমাকে একটি ছেলে যোগাড় করে দিতে বলেছেন। যদি ইচ্ছা কর, শীঘ্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।"

আমার এক সতীর্থ ইতিপূর্বে কিছুদিন বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুলেখকের কাজ করিয়াছিল, কাজটা সহজ ছিল না বলিয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। বাঁকুড়া কলেজের পশ্চিমে দুই-তিন মিনিট হাঁটিয়া গেলেই তাঁহার স্বস্তিকাঙ্কিত দ্বিতল আবাস-গৃহ। বাড়ীটির চারিদিক তরুলতায় আবেষ্টিত। দুইটি উচ্চ ইউক্যালিপটাস গাছ প্রবেশ-দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বাড়ীটির গাম্ভীর্য বর্ধিত করিতেছে। শহরের কোলাহল এখানে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রবেশ-দ্বারের দুইটি অনুচ্চ স্তম্ভের উপর ভূতলের সহিত প্রায় ২৩° ডিগ্রী কোণ করিয়া নির্মিত দুইটি শঙ্কু। প্রথমে ইহাদের প্রয়োজন বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিয়াছি সেগুলি সূর্যঘড়ি। উহাদের সাহায্যে স্থানীয় কাল নির্ণীত হয়, মধ্য-দিবায় শঙ্কুর ছায়া থাকে না। গৃহটির প্রাচীর-গাত্রে দৃষ্টি পড়িল। একটি চতুষ্কোণ বেষ্টনীর মধ্যে খোদিত আছে:

পূর্বালিন্দং গৃহং যস্মাৎ স্বস্তিকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
স্বস্ত্যর্থং স্বস্তিকাঙ্ক্ষ স্বস্তিকাখ্যং কৃতং ততঃ॥
শকগতে ১৮৪৮

বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত একটি অপরূপ সূর্যমূর্তি। পরে শুনিয়াছি, ইহা কোতুলপুরের নিকটে এক গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে পাওয়া গিয়াছিল।

চতুর্দিকের পরিবেশ স্বভাবতঃই একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটাইয়া মনকে বিদ্যানিধি মহাশয়ের দর্শন লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। সতীর্থ কপাটে টোকা মারিতেই ভিতর হইতে একটু সাড়া পাওয়া গেল। এক মিনিট পরে স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন। বার্ধক্য-কৃশ, আকুঞ্চ-দেহ, শিথিলচর্ম, পলিত-কেশ শ্মশ্রু, প্রসন্নদৃষ্টি যেন এক ঋষিমূর্তি। দেখিলেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। শীতের বৈকাল। হিমানী-পাত আরম্ভ হইয়াছে। জরাক্রান্ত দেহকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন। পুরাতন পশমী পেন্টুলনের উপর মোটা তসরের ধুতি, পায়ে মোজা ও শান্তিনিকেতনের নাগরা, উর্ধ্বাঙ্গে পর পর দুইটি কি তিনটি চাদর।
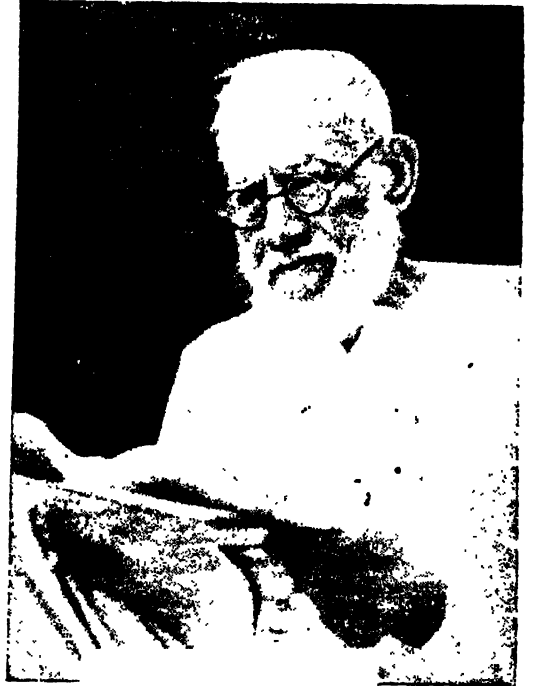
আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

আমরা প্রণাম করিতেই বলিলেন, "কে?"

আমার সতীর্থ খুব জোর গলায় সংক্ষেপে আমার পরিচয় এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলে তিনি বলিলেন, "বেশ বেশ! দেখি তোমার খাতাটা।"

আমার হাতে একটা খাতা ছিল। তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার জননীর লিখিত গীতার কয়েকটি শ্লোক ছিল। অত্যন্ত মোটা লেন্সের চশমার কাছে খাতাটি ধরিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "এ কার লেখা?"

"মায়ের।"

"মায়ের ? তোমার মামাবাড়ী কোথায় ?"

"বেলেতোড়ে।"

"বটে! বিধদ্বল্লভ মহাশয়ের গ্রামে ? তুমিও দেখছি পণ্ডিতার পুত্র।" এই বলিয়া তিনি খাতার আর একটা পাতা উলটাইয়া আমার হাতের লেখা দেখিলেন এবং বলিলেন, "তোমার হাতের লেখাটি ত চমৎকার। কিন্তু ঙ, ঙ, ঙ—এ সব পুঁটলি দিয়ে লিখেছ কেন ? তবে দেখছি, তুমি রেফ-যুক্ত দ্বিত্ব বর্জন করেছ। পারবে, তুমি পারবে। তোমার বানান ভুল হয় ?"

"না।"

"আচ্ছা। তা হলে কাল থেকে কলেজ ছুটি হলেই এখানে চলে আসবে। গায়ে চাদর দিয়ে আসবে। ফিরবার সময় ঠাণ্ডা পড়তে পারে।"

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ! ঠিক সময়ে এসেছ। ঐ যে আলমারিতে কতকগুলো ফাইল দেখছ ওর মধ্যে যেটার উপর লেখা আছে 'ভাষা ও সাহিত্য', সেইটা নিয়ে এস।" ফাইল আনিতে গিয়া দেখি, কোনটার উপর 'ভাষা ও সাহিত্য', কোনটার উপর 'উদ্ভিদবিদ্যা', কোনটার উপর 'শিল্প ও কলা', কোনটার উপর 'জ্যোতির্বিদ্যা', কোনটার উপর 'সমাজতত্ত্ব', আবার কোনটার উপর 'শিক্ষা-সংস্কার' লেখা রহিয়াছে। আর একটা বেশ মোটা ফাইলের উপর লেখা আছে 'চণ্ডীদাস'। তখন এসবের মর্ম কিছুই বুঝি নাই; ধীরে ধীরে সমস্তই বুঝিয়াছিলাম।

প্রথম দিনেই তিনি আমায় একটা প্রবন্ধ লেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, তিনি তামাক টানিতে টানিতে বলিয়া যান, আর আমি লিখিতে থাকি। প্রবন্ধের নাম 'জয়দেবের লবঙ্গাদি বসন্ত-পুষ্প'। লেখা শেষ হইলে 'প্রবাসী'তে পাঠানো হইল, প্রকাশিত হইল। কয়েকদিন পরে লেখা হইল 'জয়দেবের দুকূল'। তাহাও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইল।

একদিন হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ওদিকে কি দিয়ে ঝুড়ি তৈরী হয় ?"

আমি বলিলাম, "বাঁশ, বেত—"

"বেত!" তিনি বিস্মিত হইলেন। "বাকুড়া জেলায় বেত! আচ্ছা, তুমি শনিবারে বাড়ী গিয়ে একটা বেত নিয়ে এস ত।" বেত আসিল। কিন্তু এ কি বেত! কাঁটা নাই, বাঁশের মত পাতাও নাই। তিনি যেন মহা সমস্যায় পড়িলেন।

"দেখ ত অমরকোষ। হেমচন্দ্র দেখ। ভাবপ্রকাশ দেখ। বৈদ্যক-নিঘণ্টু দেখ।"

আলমারিতে স্তরে স্তরে বই সাজানো। সমস্ত বই খুঁজিয়া সিদ্ধান্ত হইল, বাঁকুড়ায় আমরা যাহাকে 'বেত' বলি, তাহাই 'বেতস'; ইহা বেত্র নহে। বেতসের পর্যায় শব্দ অনেক আছে; তন্মধ্যে বঞ্জুল, নিচুল, বানীর—এই তিনটি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "তাই ত! জয়দেবের 'মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জ', কালিদাসের 'বানীর গৃহ', ভবভূতির 'নীরন্ধ্র-নীল-নিচুলানি' নিশ্চয় এই বেতস। লেখ, লেখ, একটা প্রবন্ধ লেখ। একটা নয়, দুটো। বাংলায় 'প্রবাসী'র জন্য, ইংরেজিতে 'মডার্ন রিভিয়ু'র জন্য।" প্রবন্ধ লেখা হইল। প্রবাসী ও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হইল।

এইরূপে আমি কেবল যন্ত্রের মত তাঁহার প্রবন্ধ লিখিতে থাকি; কিন্তু তাঁহার রচনার মূল্যও বুঝি না, আর তাঁহার প্রত্যেকটি রচনা যে মৌলিক গবেষণাপ্রসূত তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও ছিল না।

কিছুদিন পরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে স্যর যদুনাথ সরকার, সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস ও মনোজ বসু, পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে আসিলেন। নূতন চটিতে 'অপূর্ব কুটীরে'র সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভা হইল। সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাকে অশেষ সম্মানে এবং আচার্য উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। ডক্টর সুনীতি-কুমার প্রমুখ মনীষিগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-নির্গলিত বাণী পঠিত হইল। সেই দিন হইতে বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল।

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই নানা বিদ্যায় তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। প্রথম প্রবন্ধগুলি রচনাকালে মনে হইত, তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। কিন্তু অল্পদিন পরে 'বাংলাভাষার প্রসার চিন্তা', 'বাংলা নবলিপি', 'ভারতের বিচার্য', 'কন্যাদের বিবাহ' ইত্যাদি প্রবন্ধের অনু-লিখন করিতে করিতে বুঝিলাম, তিনি ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রতত্ত্বেও ব্যুৎপন্ন। শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য প্রথম বৎসর 'শারদোৎসব', পর বৎসর 'আচারের উৎপত্তি ও প্রয়োজন', ক্রমে ক্রমে 'বার মাসে তের পার্বণ', 'পুরাণে চন্দ্র', 'অগস্ত্যোপাখ্যান', 'রামোপাখ্যান' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখিত হইল। আর মনে হইল, ইনি বৈদিক সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যায়ও পারঙ্গম। 'কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার' লিখিত হইলে বুঝিলাম, ইনি অসাধারণ শিক্ষাবিদ্। এইরূপে ধীরে ধীরে সকল

বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। প্রত্যহ নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়া একদিকে যেমন নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম, অন্য দিকে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া একপ্রকার অস্বস্তিও হইত। এক-একদিন রাত্রে নিদ্রা হইত না। অথবা তরল নিদ্রায় তাঁহাকেই স্বপ্ন দেখিতাম। পরে পরে বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণায়ক 'ধ্রুবতারা' ও 'রুদ্র' প্রবন্ধ লেখা হইল। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রচার্য তত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম। প্রাণে স্বস্তি আসিল। বুঝিলাম, পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁহাকে যে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সার্থক।

পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান্দের বিদ্বেষপ্রসূত মত খণ্ডন করিয়া তিনি উপজীব্য, ব্যাখ্যা ও গণিতফল—এই তিন উপায়ে অভ্রান্ত ভাবে ভারতকৃষ্টির কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। অখণ্ডনীয় জ্যোতিষিক প্রমাণদ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন, ঋগ্‌বেদ-সংহিতা খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৮০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয় এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রী-পূ ১৪৪২ অব্দে সংঘটিত হয়। আমি আজন্ম হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি নিরতিশয় ভক্তিমান ; কিন্তু তাহা যেন কতকটা অন্ধের ভক্তি ছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্রের সংসর্গে আসিয়া আমার ভক্তি অধিকতর দৃঢ়মূল হইয়াছে, কারণ ইহা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাঁহার প্রবন্ধের জন্য আমাকেই চিত্র লিখিতে হইত। কোন্ চিত্র কিরূপ হইবে, তাহা তিনি কম্পিত হস্তে একটা পেন্সিল দিয়া স্কেচ করিয়া দিতেন। যখন আঁকিতাম, তখন সকৌতুক প্রসন্ন নেত্রে লক্ষ্য করিতেন। জ্যোতিষিক প্রবন্ধের জন্য চিত্রে কোনও তারা (star) ছোট-বড় হইয়া গেলে খুঁত খুঁত করিতেন। মনের মত হইলে আনন্দে অধীর হইয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতেন। একদিন একটা চিত্র লিখিতেছি, আচার্যদেব পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় সহসা সমস্ত ঘরখানা আরক্ত আলোকে ভরিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে উর্বশী এসেছে, চল, চল, দেখে আসি। অনন্তকে* ডাক, গাড়ী নিয়ে আসুক।"

মোটরগাড়ীতে চড়িয়া উর্বশী দেখিতে চলিলাম। শহর ছাড়াইয়া অহল্যাবাঈ রোড্ চলিয়া গিয়াছে ; গাড়ী প্রায় দুই মিনিট ছুটিয়া বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে উপস্থিত হইল। ভাদ্র মাসের বৈকাল, মাঠ জলে পূর্ণ। দূরে দূরে পলাশ, মহুয়া ও শালের বন। এক মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ জ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছে। আচার্যদেব নিনিমেষ নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেন। ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। পরদিন আমি আসিতেই বলিলেন, "দেখ, আলমারিতে একটা ফাইল আছে 'বৈদিক কৃষ্টি' ; তাতে একটা ছাপা প্রবন্ধ আছে 'উর্বশী'। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বের কর। একটু সংশোধন করে নাও।" উর্বশী প্রবন্ধ সংশোধিত হইল। উর্বশী কে, এখানে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। পরে এই প্রবন্ধটি 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

প্রথম পরিচয়ের দিনকয়েক পরে আমি তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার জন্ম কোন্ সালে ?" মৃদু হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন—

"সপ্তদশ গজপৃষ্ঠে ইন্দু অন্তরিত।
তুলাদণ্ডে বেদ লয়ে গুরু উপনীত।"

কিছু না বুঝিয়া আমি হাঁ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "বুঝলে না ? ১৭৮১ শকে ৪ঠা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবারে আমার জন্ম।"*

আর একদিন বলিলাম, "আমি যখন কলকাতায় ছিলাম, তখন এক ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন, আপনি নাকি ব্রাহ্ম। সত্য কি ?"

তিনি বলিলেন, "কেন, সে লোকটির এমন ধারণা হবার কারণ কি ?"

"আমি জানি না। তবে অনুমান হয়, আপনার আমলের বহু মনীষীই—যেমন রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, জগদীশচন্দ্র—ব্রাহ্ম ছিলেন ; এই জন্যই বোধ হয় তিনি আপনাকেও ব্রাহ্ম মনে করেছেন।"

"না, আমি ব্রাহ্ম নই। আমি হিন্দু, আমি শাক্ত। আমার পিতাও শাক্ত ছিলেন। আমার পূর্বপুরুষ রাজা রণজিৎ রায় ঘোর শাক্ত ছিলেন ; গভীর রাত্রে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে জপ করতেন। ভারত-ইতিহাসে গুর্জর-প্রতিহারদের কথা পড়েছ ত ? আমি তাদেরই বংশধর।"

কিছুকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "ব্রাহ্ম বলতে তোমরা কি বোঝ, কে জানে ? রামানন্দবাবু ত ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত খাঁটি হিন্দু। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বিজয়াদশমীর দিনে আমি তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে যেতাম, তাতে তাঁর কি আনন্দ ! তাঁর বিন্দুমাত্র হিন্দুবিদ্বেষ ছিল না। তিনি নিজেকে উচ্চ, অপরকে নীচ মনে করতেন না। এই উদারতার জন্য হিন্দুমহাসভা একবার তাঁকে সভাপতিত্বে বরণ করেছিলেন।"

যোগেশচন্দ্র শাক্ত, শক্তির উপাসক। কিন্তু কে এই শক্তি। তিনি কখনো তাঁহাকে 'জগদম্বা' কখনো 'রাণী

---

* অনন্তকুমার রায় আচার্যদেবের দ্বিতীয় পুত্র।

* সপ্তদশ=১৭, গজ=৮, ইন্দু=১। তুলা—কার্ত্তিকমাস, বেদ=৪, গুরু=বৃহস্পতিবার।

বিশ্বেশ্বরী' বলিতেন। 'রাণী বিশ্বেশ্বরী' পুস্তকে তিনি এই শক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, বিদ্যুৎপ্রভা, মহিমময়ী সেই নারী স্বচ্ছন্দে হরিপৃষ্ঠে বসিয়া আছেন। তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠ দীর্ঘ-রশ্মি, রশ্মির প্রান্তে কতকগুলা পিণ্ড বদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি বালিকার ন্যায়, সূত্রবদ্ধ লোষ্ট্র ঘূর্ণনের ন্যায় সেই বিপুল পিণ্ডগুলা অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন দ্বারা ঘুরাইতেছেন। তিনি কভু হসিত-বদনা, কভু ভীমা।......গৃহিণী যেমন যষ্টিদ্বারা দুগ্ধ আবর্তন করেন, এক বর্ষীয়সী দিগন্তব্যাপী 'নভস্ত' (Nebula) আবর্তিত করিতেছেন। ফেনপুঞ্জ বলয়াকারে ভ্রমণ করিতেছে, অধোগত উর্ধ্বগত হইতেছে, আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছে।...এক বালিকা অণুকে কন্দুক করিয়া উৎক্ষেপ করিতেছে, লুফিয়া ধরিতেছে। এক নয়, দুই নয়, শত নয়, কোটি নয়। আহা কি কান্তি! কি মুক্তাফলের লাবণ্য সর্বাঙ্গে মুদ্রিত হইতেছে! কি প্রসন্না! কি মুগ্ধা! কি অভিরামা! মনে হইতে লাগিল, কত কালের চেনা, জানা, হাতে মানুষ-করা আমার বিজয়া কন্যা ক্রীড়া করিতেছে।"

আচার্য যোগেশচন্দ্রের বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেই এই শক্তির কথা আসিয়াছে। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'তে যিনি "ওঁ ঐং বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুত হইয়াছেন, ইনি সেই অনন্ত লীলাময়ী মহাশক্তি। দর্শন-ব্রহ্মা ও সাহিত্য-সাবিত্রী যোগেশচন্দ্রের হৃৎপদ্মাসনে সৃষ্টির ধ্যানে বিভোর হইয়া অঙ্গাঙ্গি ভাবে নিরন্তর বিরাজ করিতেন। বিজ্ঞান ছিল তাঁহাদের পাদপীঠ, কলা তাঁহাদের ছত্র-চামর এবং ভক্তি তাঁহাদের অঙ্গ সুরভি। যোগেশচন্দ্রের সকল বৈজ্ঞানিক রচনার মধ্যে জ্ঞানের পরমান্ন ভক্তির কর্পূরে সুবাসিত হইয়াছে। তিনি যেন তর্জনী উত্তোলন করিয়া পাঠককে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, "বিজ্ঞান শিখ, কিন্তু সাবধান! নাস্তিক হইও না।"

আর একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত বাঁকুড়ার লোক নন, জন্মস্থান কোথায়?"

তিনি বলিলেন, "আরামবাগের নিকটে দিগড়া গ্রামে। কিন্তু আমি এখন পুরাপুরি বাঁকুড়ী হয়ে পড়েছি হে। এখন আর মনেই পড়ে না যে, আমি হুগলী জেলার মানুষ, বাঁকুড়াকে ভালবেসে ফেলেছি।"

"আপনি কি অবসর নেবার পর এখানে এসেছেন?"

"না। দশ বৎসর বয়সে আমি এখানে প্রথম আসি। তখন আমার পিতা এখানকার সবজজ। অক্টোবর মাসে এসেছিলাম। তিন মাস বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। তাতেই একটা প্রাইজ পেয়েছিলাম। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে ইংরেজিতে হাতেখড়ি হ'ল। অক্টোবর মাসে পিতার কাল হ'ল। আমি দেশে ফিরে গেলাম। ম্যালেরিয়ার ধ্বংস। সে কি সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া! দু'বৎসর বেঁচে ছিলাম কি মরে ছিলাম, জানি না। ম্যালেরিয়ায় তখন দেশ উজাড় হতে চলেছে। আমি ওখানকার যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন সে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা মাত্র সাত জন। বৎসর দুই পরে ম্যালেরিয়া কমলে বর্ধমান মহারাজার স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখান থেকেই এণ্ট্রান্স পাস হয়েছিলাম।"

পরে নানা প্রসঙ্গে তাঁহার উচ্চ শিক্ষালাভের কথা এবং কটকে র্যাভেনশ' কলেজে প্রায় ছত্রিশ বৎসর অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন। তার পর ষাট বৎসর বয়সে তিনি কিরূপে বাঁকুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিলেন, তাহার কথাও মাঝে মাঝে বলিতেন। কটকে তাঁহার সমস্ত যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়াছে। সেখানে কি ভাবে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত, তাহা মাঝে মাঝে তন্ময় হইয়া বর্ণনা করিতেন। যখন গান্ধীজী চরকা-আন্দোলনের সূচনা করেন তাহার বহু পূর্বে বিধুনিধি মহাশয় কিরূপে কটকেই উন্নত প্রণালীর চরকা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং 'প্রবাসী'তে তাহার সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন; কেমন করিয়া কটকে স্বদেশীভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন, এই সকল বর্ণনা শুনিতে শুনিতে মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ জন্মিত। কেমন করিয়া খণ্ড-পড়াগড়ে তিনি 'পঠানী সান্ত'কে (চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত) আবিষ্কার করিলেন, সে কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন-দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বাঁকুড়ায় আসিবার পর ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তিনি 'বাঁকুড়া-লক্ষ্মী' পত্রিকায় বৃক্ষরোপণ ও পালনের উপকারিতা সম্বন্ধে এক বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন; ইহাতে প্রাচীন শাস্ত্রের উক্তি এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমরা 'বনমহোৎসব' করিয়া থাকি, মনে করি ইহা নূতন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই উৎসব প্রচলন করিবার কয়েক বৎসর পূর্বেই যোগেশচন্দ্র এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন।

কাল অতিক্রান্ত হইতে লাগিল, আচার্যদেবের সহিত পরিচয় নিবিড়তর হইল। তিনি আমায় ভালবাসিলেন। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে ভালবাসারও সৃষ্টি হইল। আমি কোন দিন কোনও কারণে আসিতে না পারিলে তিনি বলিতেন, "তুমি আমার হাত, তুমি আমার চোখ, তুমি না আসাতে আমার সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে।" আমি শত কাজ ফেলিয়াও তাঁহার নিকট না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। পূর্বে আমার ধারণা ছিল, মানুষ বৃদ্ধ হইলে খিটখিটে হয়, পণ্ডিত হইলে দাম্ভিক হয়; কিন্তু যোগেশ-

চন্দ্রের সংসর্গে আসিয়া আমার সে ধারণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে। যে-কেহ তাঁহার সহিত কিছুকাল মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই জানেন আচার্য যোগেশ-চন্দ্র ছিলেন "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" ইত্যাদি শ্লোকের জীবন্ত ভাষ্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যখন তাঁহাকে সংবর্ধিত করিতে আসেন, তখন সংবর্ধনা সভায় তিনি বলিয়াছিলেন,"কলকাতা থেকে এত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান ব্যক্তি আমাকে সংবর্ধনা করতে এসেছেন, এতে আমার লজ্জা হচ্ছে, নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে ; কারণ আমি এমন কিছু বড় কাজ করি নি, যার জন্য এত সম্মান আমার প্রাপ্য হতে পারে।"

আর এক দিনের কথা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাঁকুড়া শাখার অধ্যক্ষ স্বামী অরূপানন্দজী তাঁহাকে সঙ্ঘের বার্ষিক মহোৎসব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন, "স্বামী, (তিনি 'স্বামীজী' বলিতেন না) আমি এতকাল যে বিদ্যার চর্চা করে এসেছি, সে সব ত অপরা বিদ্যা। আপনারা পরাবিদ্যার সাধক ; সে ক্ষেত্রে আমি আপনাদের কাছে শিশু মাত্র। আমি ধর্মসভার সভা-পতি হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

কেহ তাঁহার 'বিদ্যানিধি' উপাধির অর্থ 'বিদ্যার সমুদ্র' বলিলে তিনি বলিতেন, "না, ও ব্যাখ্যা চলবে না। আমি বিদ্যার নিধি নই, বিদ্যাই আমার নিধি, আমার মাথার মণি।"

ভগবদ্গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ পড়িয়াছি,—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।" বিদ্যানিধি মহা-শয়ের চরিত্রে আমি এই লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থ Ancient Indian Life-এর জন্য তিনি যখন রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার পাইলেন, সাহিত্য-সাধনার জন্য কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁহাকে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক দানে সম্মানিত করিলেন, 'পূজাপার্বণ' নামক সম্পূর্ণ মৌলিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি যখন রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার লাভ করিলেন, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে যখন কলিকাতার বিদ্বৎসমাজ তাঁহাকে 'আচার্য' উপাধি দানে ও অশেষ সম্মানে ভূষিত করিলেন, তখন তাঁহাকে যেমন 'বিগত স্পৃহ' দেখিয়াছি, আবার তাঁহার প্রাণপ্রিয় গুণবান্ পুত্র ক্যাপ্টেন সত্যকুমার রায়ের মৃত্যুতেও তাঁহাকে সেইরূপ 'অনুদ্বিগ্নমনা' দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে দুই বার চক্ষুরোগে এবং বর্ষাকালে প্রায়ই উদরাময়ে ভুগিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও অপ্রসন্ন দেখি নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে অনেক সুখের এবং অনেক দুঃখের কারণ ঘটিয়াছে, সে সব আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই ; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ নির্বিকার থাকিতেন। কারণ ইহা অল্পদিনের সাধনার ফল নহে।

দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে কখনও রোগে শয্যাগত থাকিতে দেখি নাই। নিরানন্দ কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় তিনি জানিতেন না। তিনি বয়োধর্মে ক্ষীণ-দৃষ্টি, ক্ষীণ-শ্রুতি ও ক্ষীণ-শক্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু জীবন তাঁহার নিকট দুর্বিষহ হইয়া যায় নাই, সংসার হইতে পলায়নের জন্য তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত ছিলেন না। বেদের ঋষির ন্যায় বোধ হয় তাঁহার অন্তরে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে থাকিত, "জীবেম শরদঃ শতম্, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্, প্রব্রবাম শরদঃ শতম্, অদীনাঃ স্যামঃ শরদঃ শতম্, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।"

বিপুল খ্যাতি এবং বিপুলতর পাণ্ডিত্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসিকতা নষ্ট করিতে পারে নাই। শহরের অসংখ্য ছেলেমেয়ের এবং যুবক-যুবতার তিনি ছিলেন 'দাদু'। আমাকে তিনি মাঝে মাঝে 'গণেশ' বলিয়া ডাকিতেন। অর্থাৎ তিনি বেদব্যাস আর আমি তাঁহার অনুলেখক গণেশ। বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা সম্বন্ধে যখন প্রবন্ধ লেখা হইত, তখন তিনি মাঝে মাঝে স্মিতহাস্যে বলতেন, "গণেশ, বেশ বুঝে বুঝে লিখবে। কারণ আমার এই লেখাই ত 'কমপ্লিট' নয়। আমার লেখার মধ্যে যে অভাব রয়ে গেল, তোমাকে তা পূরণ করবার চেষ্টা করতে হবে।" তাঁহার কথা শুনিয়া লজ্জিত হইতাম ; তাঁহার অসমাপ্ত কার্য আমি সম্পূর্ণ করিতে পারি! আবার তিনি যে আমায় গৌরব দান করিতেন, তাহাতে আনন্দে আমার বুক ফুলিয়া উঠিত।

বিশ্বভারতীর জন্য 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে পর তিনি একদিন আমায় বলিলেন, "বাঁকুড়ায় অনেক পূজা-পার্বণ প্রচলিত আছে, যা আমি জানি নে। তুমি সেগুলোর একাউন্ট লিখতে চেষ্টা করো।" তাঁহার উৎসাহে আমি 'জিতাষ্টমী' লিখিলাম এবং তাঁহারই আবিষ্কৃত সূত্রাবলম্বনে উক্ত পার্বণের কালনির্ণয় করিলাম। প্রবন্ধটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইলে তাঁহার আহ্লাদের অবধি রহিল না। কারণে অকারণে, কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেই তাহাকে বলিতেন, "সুখময়, আমার উত্তর-সাধক হবে।"

অল্পবুদ্ধি আমি মনে করিতাম, সত্যই বুঝি আমি তাঁহার উত্তর-সাধক হইতে পারিব। তাঁহার সেই উৎসাহের শক্তিতে দিনকয়েকের মধ্যে 'ইন্দ্রপরব', 'ইতুপূজা', 'তুষু পূজা', 'শিবের গাজন', 'ধর্মের গাজন' 'রোহিণী উদয়' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। সে সকল প্রবন্ধ যখন তাঁহার নিকট পাঠ করিয়া শুনাইতাম, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় [illegible]

উঠিত। কয়েক দিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি, দানের সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু হায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও তাঁহাকে 'ডক্টরেট' দেন নাই। পরলোকগমনের মাত্র তিন মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল।

একদিন তিনি আমায় বলিলেন, "গণেশ, আর বোধ হয় বেশী দিন নয়। খুচরো প্রবন্ধ লিখে আর সময় নষ্ট করব না। যে সব প্রবন্ধ আগে লেখা হয়েছে আর তুমি ইদানীং যে সব প্রবন্ধ লিখলে, সেগুলো একত্র করে বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে হবে। এক এক জাতের প্রবন্ধ এক-একটা বাণ্ডিল করে বাঁধো। বিশ্বভারতী আমার একখানা বই ছাপতে চান। তাঁদের 'পূজাপার্বণ' দেব। এম. সি. সরকার একখানা বই চান। ওঁদের দেব 'পৌরাণিক উপাখ্যান'। আর সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করবেন 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল'। তা ছাড়া গুরুদাস চাটুজ্জেকে একখানা আর ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীকে খান দুই বই দিতে হবে। সোসিওলজিক্যাল টপিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো একত্র করে নাম দাও 'কোন্ পথে?' ভাষা সম্বন্ধে সব প্রবন্ধ একত্র করে নাম দাও 'কি লিখি?' চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও একখানা পৃথক বই হবে। তা ছাড়া আমার আগেকার ছাপা 'শঙ্কুনির্মাণ', 'রত্নপরীক্ষা' আর 'পত্রালী' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ করতে হবে। কিছু কিছু সংশোধন দরকার। সব রেডি কর।"

কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমে 'পূজাপার্বণ' শেষ হইল। বিশ্বভারতী তাহা প্রকাশ করিলেন। তার পর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট 'কোন্ পথে' পাঠানো হইল এবং প্রকাশিত হইল। পরে 'পৌরাণিক উপাখ্যান' প্রকাশ করিলেন এম. সি. সরকার। গত বৎসর সাহিত্য-পরিষদ 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' প্রকাশ করিয়াছেন। ওরিয়েন্টের নিকট দুইখানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাঠানো হইয়াছিল; তাঁহারা কি করিলেন, বলিতে পারি না। এখনও বোধ হয় 'চণ্ডীদাস' ও 'দেশীয় কলা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া তাঁহার আলমারিতেই পড়িয়া আছে।

অবস্থা-বিপর্যয়ে আমাকে বাঁকুড়া ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে হইল। যখন বিদায় লইতে গেলাম তখন সেই জ্ঞানতপস্বীর চক্ষুও অশ্রুতে ভরিয়া গেল এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন শুধু একটি কথা, "মঙ্গল হোক।" একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলাম, কিন্তু পত্রালাপ কখনও বন্ধ হয় নাই। প্রত্যেক পত্রে তিনি আমার কল্যাণ কামনা করিতেন এবং লিখিতেন, "লোক অভাবে আমার শব্দকোষ সংশোধন করিতে পারিতেছি না—তুমি কি আর বাঁকুড়ায় ফিরিবে না?" এ বৎসর পূজার সময় বাঁকুড়ায় ফিরিয়া যাইব এবং তাঁহার জ্ঞান-সাধনায় সহায় হইব, এই ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিতেছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ।

জ্ঞানতপস্বী তাঁহার সাধনা প্রায় সমাপ্ত করিয়া চিদানন্দলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমাদের জন্য তিনি যে জ্ঞানের ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, সুচিরকাল আমরা তাহা হইতে অমৃত আহরণ করিয়া জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আলমারিতে পড়িয়া আছে, কে তাহা প্রকাশ করিবে? তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থ 'এষ্ট্রনমিক্যাল ল্যাণ্ডমার্কস অব ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুইটি' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি টেবিলের উপর ফাইলে বাঁধা পড়িয়া আছে, তাহা প্রকাশের দায়িত্ব কে লইবে? তাঁহার আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপি ট্রাঙ্কের মধ্যে বোঝাই করা আছে, তাহাই বা কে প্রকাশ করিবে? কে তাঁহার শব্দকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার ভার লইবে? "চণ্ডীদাস স্মৃতি-মন্দির" প্রতিষ্ঠার জন্য বাঁকুড়া-পশুচিকিৎসালয়ের নিকটস্থ জমিটুকু প্রার্থনা করিয়া আচার্যদেব বহুবার জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। কিন্তু বাঁকুড়াবাসীর সাড়া নাই। বাঁকুড়ায় পুরাকৃতি ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কতবার কতরূপে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু খুব কমই সহযোগিতা পাইয়াছেন। বাঁকুড়ার কত মূল্যবান প্রাচীন পুথি, কত সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ, জৈন, সূর্য ও চণ্ডীমূর্তি যে অবহেলায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাঁকুড়াবাসী প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মতিথি পালন করিত, সেদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিত, অনেকে অনেক প্রকার প্রতিশ্রুতি দিত, কিন্তু পর দিন তাহা আর কাহারও মনে থাকিত না। জ্ঞানের ঐ উজ্জ্বল দীপ দিগ্‌বিদিকে রশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে নির্বাপিত হইল; কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য যে, সেই আলোকচ্ছটায় আমাদের ঘরের আঁধার দূর করিতে পারিলাম না।

সূর্যস্নান

শ্রীউমা দেবী

১

সূর্যালোকে স্নান করি প্রতিদিন প্রভাত-সন্ধ্যায়,
উজ্জ্বল রৌদ্রের আভা ঝলসায় মসৃণ ত্বকের
সহজ সোহাগ-সুখে। হৃদয়ের অলকানন্দায়
বিম্ব-প্রতিবিম্বে জ্বলে মণি-মুক্তা দীপ্ত আবেগের।
সূর্য কত দূরে আছে? কত কোটি সহস্র যোজন?
তবু সে ধরেছে আজ রশ্মিময় রাজছত্রখানি,
পৃথিবী পায়ের তলে ছিল লঘু শ্যামল চিক্কণ
অকস্মাৎ সূর্যস্নেহে হয়েছে সে দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণী।
সূর্য যতদূর থাক—প্রতিদিন প্রভাত-সন্ধ্যায়
আমি স্নান করি তার বহমান কিরণের স্রোতে,
নয়নে ছোঁয়াই, রাখি নিশীথের শিথিল তন্দ্রায়
চিত্ত বিকশিত করি পুষ্প-প্রায় প্রভাত-আলোতে।
মুঠি ভরে তুলে নিই রাগরক্ত সূর্যের আবীর
ছড়াই—রাঙাই সুখে দুই হাতে সৈনিকের তীর।

২

এত নীল গাঢ় নীল—এত নীল আকাশ তোমার
সে নীলে নয়ন যেন ডুবে যায় পাখীর মতন,
একটু ঝিলিক শুধু লাগে এসে রোদের সোনার
একটু হাওয়ায় কেঁপে ভেঙে যায় দেহ-আয়তন।
তোমার রূপের গর্বে গরবিণী করেছ আমায়,
নীরন্ধ্র যৌবন-বনে আমি যেন নব পর্যটক—
কান পেতে শুনি কি যে মর্মরিত অরণ্যছায়ায়
অজস্র লাবণ্যলোভী নিরলস তরুণ পাঠক।
এত নীল গাঢ় নীল—এত নীল আকাশ তোমার,
সে নীল লাবণ্য-স্রোতে ভেসে উঠি বুদ্বুদের মত,
ভেসে উঠি, ভেঙে যাই—ডুবে যাই, শত বাসনার
সোনালি আলোক লেগে জ্বলে উঠি উষায় সতত।
সে নীল নিবিড় হলে রজনীর তিমির ছায়ায়
তোমার রূপের গর্বে দীপ্তি পাই নক্ষত্র-মালায়।

৩

এমন বর্ষার দিনে বার বার শুধু তারি নাম
মনে মনে ফিরে ফিরে বারে বারে করে গুঞ্জরণ,
সোনার সুতার মত ঝরে যায় বৃষ্টি অবিরাম
বিকালের আলো-লাগা সোনা-ঝরা চিক্কণ বর্ষণ!
আমিও বাড়াই হাত, করি দেহ মুক্ত আবরণ
নরম বৃষ্টির কণা গায়ে লাগে রেশমের মত,
চোখ বুঁজে অনুভব করি ক্রমে প্রবল বর্ষণ
অজস্র সোহাগে নামে নাম-মধু পান করি যত।
আহা—তারি ছায়া বুঝি এত দিনে ছেয়েছে আকাশ,
আহা তারি তনুস্পর্শে বুঝি এত শীতল পবন,
কোমল ধারায় তারি হৃদয়ের আদর আভাস—
হেসে মেঘের ফাঁকে হাসে তারি চোখের কিরণ।
রৌদ্রালোক লেগে ধরা অকস্মাৎ করে ঝলমল
হৃদয় কখন হ'ল তারি সঙ্গে প্রশান্ত নির্মল!

৪

সৈনিক তোমার চক্ষে নীলদ্যুতি শাণিত ইস্পাত,
যে নীলে ধিক্কৃত হয় আকাশেরও উদার মহিমা,
যে নীল-চাঞ্চল্য ক্ষুব্ধ সমুদ্রকে করে না দৃকপাত
সে নীল আশ্বাসে আজ হৃদয়ের আশারা অসীমা।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীরভোগ্য নারীর হৃদয়,
হৃদয়-নদের আশা-তরঙ্গের তুরঙ্গ চঞ্চল,
কোমল কাতর কৃতি আজ আর শুনো না নিদয়
ঝরানো বকুল ফুলে বেঁধোনা এ শাড়ীর অঞ্চল।
হে সৈনিক! সূর্য তুমি, চিনে নাও আপন সংজ্ঞায়—
শীতল মেরুর দেশে গলে যায় পার্বত্য তুষার,
বাতাসে বরফ জমে, পাখীদের পাখা ঝরে যায়,
অশ্রুঝঞ্ঝনায় আনো মাঙ্গলিক নবীনা উষার।
সৈনিক! তোমার চক্ষে নীলদ্যুতি শাণিত ইস্পাত
খণ্ডিত এ পৃথিবীর শবাধারে করো না দৃকপাত।

দুরন্ত দিয়াশলাই

এণ্টন শেখভ

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার মৌলিক

৬ই অক্টোবর। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণ রাশিয়ার কোন এক প্রদেশের দ্বিতীয় বিভাগের পুলিস সুপারের আপিস। ফিটফাট পোশাকে সজ্জিত এক যুবক সেখানে প্রবেশ করল। খবর পাওয়া গেল যে, মার্ক ইভানোভিচ ক্লাউজভ নামে একজন অবসরভোগী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী খুন হয়েছেন। যুবকের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ—তার হাবভাবে প্রবল উত্তেজনা। তার চাহনিতে বিভীষিকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—হাত দুটি তার থর্ থর্ করে কাঁপছে।

"কার সঙ্গে আমার কথা বলবার সৌভাগ্য হচ্ছে?" পুলিস সুপার জিজ্ঞেস করলেন।

"সিয়েকভ, ক্লাউজভের দেওয়ান। কৃষি ও যন্ত্রপাতি বিশারদ।

পুলিস সুপার উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিম্ন-বর্ণিত অবস্থা লক্ষ্য করল।

কৌতূহলী জনতা ক্লাউজভের বাসগৃহের চারদিকে জমায়েত হচ্ছে। লোমহর্ষণ খুনের সংবাদ চারিদিকে বিদ্যুদবেগে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ছুটির দিন। আশপাশের গ্রামগুলি ভেঙে সেখানে যেন জড়ো হয়েছে। কথাবার্তায় গল্পগুজবে চারিদিক সরগরম। কারও মুখ বিবর্ণ, কারও বা চোখে জল। ক্লাউজভের শয়নকক্ষের দুয়ার ভেতর হতে তালাবন্ধ।

ভাল করে দরজাটা পরীক্ষা করে সিয়েকভ বলে উঠল, "জানালা দিয়ে নিশ্চয়ই খুনীরা পালিয়েছে।"

তারা জানালার লাগাও বাগানে প্রবেশ করল। গা ছমছম করা একটা অলক্ষুনে ভাব যেন জানালাতে লেগে আছে। জানালার গায়ে ফিকে সবুজ রঙের এক পরদা, তার একটি কোণ ভিতরের দিকে মুড়ে আছে। সেটির ফাঁক দিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখা সম্ভব হচ্ছিল।

পুলিস সুপার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কেউ কি জানালা দিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখেছেন?"

বাগানের মালী ইফ্রেম বলে উঠল, "না, হুজুর। আতঙ্কে সবাই যখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, তখন কারও কি ভেতরে চেয়ে দেখবার সাহস আছে?—বেঁটে পক্বকেশ বৃদ্ধ মালী হলে কি হবে, কথা ক'টা সে বহুদিনের অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সরকারী কর্মচারীর মত বলে উঠল।

জানালাটির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলিস সুপার বললেন, "হায়, মার্ক ইভানিচ, তোমার কপালে যে অশেষ দুর্গতি আছে তা কত বার তোমায় বলেছি—কিন্তু তুমি তাতে কানই দাও নি। লাম্পট্যের পরিণাম কখনও ভাল হয় না।"

সিয়েকভ বলে উঠল, "ইফ্রেম না থাকলে ব্যাপারটা আমাদের ধারণার বাইরেই থেকে যেত। অঘটন যা কিছু ঘটেছে তা সে-ই প্রথম আবিষ্কার করেছে। ভোরবেলাতেই আমার ওখানে গিয়ে সে বলেছে, 'এত বেলাতেও কর্তা আজও ঘুম থেকে উঠছেন না কেন? সারা হপ্তা তিনি ঘরের বাইরে আসে নি।—ওর কথা শুনে আমি যেন থ' মেরে গেলাম। আমার মনে হঠাৎ আতঙ্ক ঝলকে উঠল। তাই ত গত সপ্তাহের শনিবার থেকে তার সঙ্গে ত আমার দেখা হয় নি। আজ হচ্ছে আর এক রবিবার। সাত-সাতটা দিন হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়।"

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুলিস সুপার বলে উঠলেন, "আহা, বেচারী—এমন একজন সুচতুর, সুশিক্ষিত, সদাচারী ভদ্রলোক—এ মুল্লুকে তার যে আর জুড়ি নেই, সে যে কেউ জোরগলায় বলতে পারে, কিন্তু একেবারে লম্পট, মাতাল—স্বর্গের দুয়ার ওর জন্য খোলা থাক। তার বিষয়ে কোন কিছুতেই আমি আশ্চর্য্য হব না।"

সাক্ষীদের একজনকে ডেকে সে বলল, "ষ্টিফান, এখখুনি আমার বাড়ী গিয়ে আনড্রুস্কাকে পুলিস ক্যাপ্টেনের কাছে পাঠিয়ে দাও। ঘটনাটি সে তাঁকে জানিয়ে আসুক। তাকে বল মার্ক ইভানিচ খুন হয়েছে। হাঁ, আর ইন্সপেক্টরের কাছে দৌড়ে যাও। কাজ ফাঁকি দিয়ে আরাম করে সে কত দিন আর বসে থাকবে? সে যেন চট করে এখানে চলে আসে। তার পর যত শীগগির পার তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিকোলাই ইরমোলিসের কাছে যেয়ে তাকে এখানে এখখুনি আসতে বল। আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়াও, আমি একটা চিঠি দিচ্ছি।"

পুলিস সুপার বাড়ীর চারদিকে সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন রাখলেন। তার পর দেওয়ানের ওখানে চা পান করতে গেলেন, দশ মিনিট পরে ওখানে টুলের উপর বসে তাকে অতি যত্নে মিষ্ট দ্রব্য ও চা নিঃশেষ করতে দেখা গেল।

সে সিয়েকভকে বলে যাচ্ছিল, "একবার ভাবুন দেখি, একবার ভেবে দেখুন—একজন ভদ্রলোক দস্তুরমত প্রতিষ্ঠাবান ভদ্রলোক—পুশকিনের ভাষায় যাকে 'দেবকুলপ্রিয়' বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—তার কি পরিণাম—কোথায় কোন অন্ধকূপে সে নেমে গিয়েছিল। লাম্পট্যের শেষ ধাপে সে নিজেকে ফেলে দিয়েছিল, আর দেখুন সে রাতারাতি খুন হয়ে গেল।"

ছ'ঘণ্টা বাদে তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে গাড়ী করে থামলেন। বেশ লম্বা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। নিকোলাই ইরমোলিচ চুবিকভ নামে পরিচিত ষাট বছরের বৃদ্ধ পঁচিশ বছর ধরে এই বিভাগে পরিশ্রম করে চুল পাকিয়েছে। সচ্চরিত্র, সুচতুর, পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ লোক বলে সারা জেলার লোকে তাকে সম্মান করত।

তার সঙ্গে ছিল তার অনুচর ডুকভস্কি, ছাব্বিশ বছরের দীর্ঘকায় তরুণ, তার সহকারী ও সেক্রেটারী হিসাবে সে এসেছিল।

সিয়েকভের কক্ষে প্রবেশ করে সকলের সহিত করমর্দন-পর্ব শেষে চুবিকভ বলে উঠল, "ভদ্রমহোদয়গণ, এ কি সম্ভব? এ কি সম্ভব? মার্ক ইভানিচ! খুন! না, এ অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

পুলিশ সুপার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, "যা বলেছেন! হায় ভগবান! গত সপ্তাহের শুক্রবার দিনই না তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল, টারাপস্কোভোর সেই মেলাতে, তার খাতিরে আমায় তার সাথে এক গ্লাস 'ভডকা' মদ্য পর্যান্ত পান করতে হ'ল।"

'যা বলেছেন', পুলিস সুপার আবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল। তারা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাদের বিস্ময়, আতঙ্ক ভাষায় প্রকাশ করে প্রত্যেকে চা-পানের পর ঘটনাস্থলে ফিরে এল।

পুলিস ইন্সপেক্টর জনতার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "পথ ছেড়ে দাও।"

গৃহে প্রবেশ করে ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমই শয়নকক্ষের দরজাটা পরীক্ষা করে দেখা সুরু করলেন। দরজাটা দেবদারু কাঠের তৈরী ছিল, হলদে রং করা ঐ দরজাটা নিয়ে কেউ যে ঘাটাঘাটি করে নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। প্রমাণ-স্বরূপ কোন চিহ্ন তাতে বর্ত্তমান নেই। দরজাটা ভেঙে তারা ঘরে ঢুকতে উদ্যত হ'ল।

কুঠার ও বাটালির আঘাতে খট খট কড় কড় শব্দে অবশেষে বেশ বিলম্বে দরজাটা যখন খুলে গেল, ম্যাজিস্ট্রেট তখন আশপাশের লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যারা ঘটনাটির সাথে জড়িত নন, তাঁরা দয়া করে সরে যান, তদন্তের সুবিধার জন্যই আমি আপনাদের এই কথা বলছি—ইন্সপেক্টর, কাউকে ঢুকতে দিও না।"

চুবিকভ, তার সহকারী ও পুলিস সুপার দরজাটি খুলে ফেলল, এবং বেশ সসঙ্কোচে একজনের পর একজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। দৃশ্যটি ছিল এই: নিরালা জানালা, তার পাশে মস্ত-বড় একটা কাঠের পালঙ্ক। তার উপর প্রকাণ্ড পালঙ্কের গদি। অবিন্যস্তভাবে একটি লেপ গদিটির উপর পড়ে আছে। মেঝের কোঁচকানো অবস্থায় একটা বালিশ পড়ে রয়েছে। রূপার একটা রিষ্টওয়াচ শয্যার পাশে ছোট একটি টেবিলের উপর রাখা। পাশে ছড়ানো রয়েছে বিশ কোপেক মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা। গন্ধকের তৈরী কয়েকটা দেশলাই কাছে পড়ে আছে। সেই শয্যা, টেবিল আর এক কোণে একটি চেয়ার ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র ঘরে ছিল না। খাটের নীচে দৃষ্টিপাত করে পুলিস সুপার দুই ডজন শূন্য মদের বোতল, একটি পুরানো টুপী আর এক কলসী 'ভডকা' মদ্য দেখতে পেল। ধুলামাখা একপাটি বুটজুতা নীরব সাক্ষী হয়ে টেবিলের নীচে পড়ে ছিল। ঘরের ভিতর চারিদিক লক্ষ্য করে চুবিকভ ভ্রূকুটি করে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রেগে বলল, "বদমাশের দল!"

ডুকভস্কি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু মার্ক ইভানিচ কোথায়?" কর্কশ স্বরে চুবিকভ জবাব দিল, "থাক তোমায় আর এতে মাথা গলিয়ে কাজ নেই। ভা'ল করে দরজাটা একবার পরীক্ষা করে দেখ। জীবনে আমার এই দ্বিতীয় বার অভিজ্ঞতা হ'ল।" তার পর নিম্ন কণ্ঠে পুলিস সুপারকে বলে উঠল, "ইভগ্রাফ কুজমিচ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। আপনার তা মনে আছে নিশ্চয়ই। ধনী ব্যবসায়ী পোর্টিটভ খুন। ঠিক একরূপই ঘটনা। বদমাশেরা তাকে খুন করে লাসটি জানালা দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল।"

জানালার কাছে গিয়ে পরদাটা একধারে একটু টেনে চুবিকভ সাবধানে ওতে ধাক্কা দিল। জানালা খুলে গেল।

"খুলে গেল দেখছি, তা হলে নিশ্চয়ই এটা আটকানো ছিল না, হাঁ, বুঝতে পারলাম, জানালার গায়ে কিছু চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ কি? এই দেখ এইখানে হাঁটুর চিহ্ন, কেউ এদিক দিয়ে বাইরে চলে গেছে, জানালাটা আমাদের সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

ডুকভস্কি বলল, "মেঝের টাটকা কোন বিশেষ চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না, রক্ত কিংবা কোন আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না, একটা খালি সুইডেনের দেশলায়ের বাক্স কুড়িয়ে পেলাম। এই যে এটা এখানে। মার্ক ইভানিচ কখনও ধূমপান করত বলে ত মনে পড়ে না। সে ত গন্ধকের দেশলাই ব্যবহার করত, সুইডেনের দেশলাই ত কখনও তার কাছে দেখি নি, যাক দেশলাইটা ঘটনাটির হয়ত বা একটু সঙ্কেত দিতে পারে।"

তার দিকে হাত তুলে চুবিকভ জোরে বলে উঠল, "ওহে, দয়া করে বাজে বক বক বন্ধ কর না। এখনও ও ওর দেশলাই নিয়ে মেতে আছে। এ সব উত্তেজনাপ্রবণ লোকদের আমি সইতে পারি না। দেশলাই খুঁজে খুঁজে হয়রান না হয়ে তুমি বরং বিছানাটা একবার পরীক্ষা কর।"

শয্যা পরীক্ষা করে ডুকভস্কি জানাল, "রক্ত কিংবা কোনকিছুর দাগ এতে লেগে নেই। টাটকা ছেঁড়া কোন স্থানও দেখতে পাচ্ছি না। বালিশের উপর যেন কামড়ানোর দাগ বসে আছে। বীয়ার জাতীয় কোন তরল পদার্থ লেপের উপর ছিটকে পড়েছিল, গন্ধ ও স্বাদে তা বেশ টের পাচ্ছি। শয্যার সাধারণ অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন এখানে একটা ধস্তাধস্তি কিংবা হাতাহাতি হয়ে গেছে।"

ধস্তাধস্তি যে হয়ে গেছে তা তুমি না বললেও আমি জানি। ধস্তাধস্তির কথা ত তোমার কাছে জানতে চাই নি, সে চিহ্ন না খুঁজে বরং তুমি…।"

একপাটি বুটজুতোও এখানে দেখতে পাচ্ছি, আর একপাটি কিন্তু নেই।"

"বেশ, তাতে হ'ল কি?"

"কেন, সে যখন পা থেকে জুতো খুলেছিল, তখন ওরা তাকে শ্বাসরোধ করে মেরেছে। দ্বিতীয় বুটজুতোটি তার আর খুলবার অবসরই হয় নি, তার আগেই তারা তাকে…।"

"ও দেখি আবার বকা সুরু করল, ওকে শ্বাসরোধ করে মেরেছে তা তুমি কেমন করে জানলে ?"

"বালিশের উপর দাঁতের দাগ রয়েছে। বালিশটাও কুঁচকে পড়ে আছে, বিছানা থেকে ছ'ফুট দূরে ওটা ছুড়ে ফেলা হয়েছে তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

"তবু তর্ক করছে, বাক্যবাগীশ কোথাকার ! আমাদের বরং বাগানটির ভেতরে যাওয়া উচিত। এখানে বক বক না করে তুমি বরং বাগানটি ঘুরে দেখে এস,তোমার সাহায্য ছাড়াই এখানের কাজ আমি সারতে পারব।"

বাগানে গিয়ে তাদের প্রথম লক্ষ্য ও পরীক্ষার বস্তুই ছিল ঘাসের উপর কোন চিহ্ন আছে কিনা। দেখা গেল জানালার নীচের ঘাসগুলি কে যেন মাড়িয়ে গেছে। জানালারকাছে লতানো কুঞ্জটাও পদদলিত বলে মনে হ'ল। কতকগুলি ভাঙা গাছের ডগা আর কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া ডুকভস্কি কুড়িয়ে পেল, লতার উপর ঘন নীলবর্ণের পশমী সুতাও কয়েকগাছা পাওয়া গেল।

ডুকভস্কি সিয়েকভকে জিজ্ঞেস করল, "ওর পরনে সবশেষে কি রঙের সুট ছিল ?"

"ক্যাম্বিস কাপড়ের সুটটার রং ছিল হলদে।"

"চমৎকার ! তা হলে ওদের কারও পোশাক নিশ্চই গাঢ় নীলবর্ণের ছিল।" লতানো কুঞ্জের কিছু অংশ ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল। কাগজে মোড়া অবস্থায় কর্তিত অংশ কিছু পড়ে ছিল। ঠিক সেই সময় পুলিস ক্যাপ্টেন সিটাকভস্কি ও ডাক্তার টুটিয়েভ এসে পৌঁছল। সম্ভাষণ-পর্ব শেষ হলে পুলিস ক্যাপ্টেন তার কৌতূহল চরিতার্থ করতে প্রস্তুত হ'ল। ডাক্তার চেহারায় বেশ লম্বা কিন্তু, বেজায় কৃশকায়, চোখ দুটি কোটরে ঢুকে গেছে, নাকটা তার ছিল লম্বা আর চোয়ালটা বেশ দৃঢ়। কোন সম্ভাষণ না করে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে সে নির্দ্বিবাদে একটি গাছের গুঁড়ির উপর বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "সার্দিয়ানরা আবার বিদ্রোহ আরম্ভ করেছে, ওরা যে কি চায় তা বুঝে উঠতে পারি না। অষ্ট্রিয়া অষ্ট্রিয়া, এ তোমারই কাজ !"

বাইরে থেকে জানালাটা পরীক্ষা করে কোন ফলই হ'ল না, আশপাশের ঘাস ও ঝোপঝাড় থেকে মূল্যবান কয়েকটি তথ্য আবিষ্কৃত হ'ল—ডুকভস্কি ঘাসের উপর অনেক দূর পর্যন্ত রক্তের দাগ দেখতে পেল—জানালা হতে বাগানে কয়েক গজ পর্যন্ত দাগটা লেগে ছিল। একটা ঝোপের মধ্যে বাদামী রঙের বড় ঝোপে এসে মিশে দাগের রেখাটি শেষ হয়েছে, সেই একই ঝোপের নীচে আর একপাটি বুটজুতো পাওয়া গেল—যার জুড়ি জুতোটি শয়নকক্ষে পাওয়া গিয়েছিল।

'দাগটা পুরাতন রক্তের চিহ্ন', ডুকভস্কি বেশ পরীক্ষা করে বলে উঠল।

রক্তের কথা শুনে ডাক্তার উঠে একবার পরীক্ষা করে দেখল। সে বলল, "হ্যাঁ, এ রক্তের দাগই বটে।"

ডুকভস্কির দিকে চেয়ে একটু বিদ্রূপের সুরে চুবিকভ বলে উঠল, "রক্ত যখন পাওয়া গেছে তখন নিশ্চয়ই ওকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়নি।"

"শোবার ঘরে ওকে শ্বাসরোধ করে অচৈতন্য করা হয়েছিল, আবার যদি ও বেঁচে ওঠে এই ভয়ে কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওকে একেবারে খুন করা হয়েছে। এইখানে সে যে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল,ঝোপের নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্তের ছোপেই তা বোঝা যায়। তারা হয় ত তখন তাকে বয়ে নিয়ে যাবার কিংবা বাগানের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য কোনকিছুর সন্ধানে ফিরছিল।"

"বেশ, কিন্তু বুটজুতোটি ?"

"বুটজুতোটি হতে বোঝা যায় আমার অনুমান সত্য। বুটজুতো খুলে সে যখন শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তাকে খুন করা হয়েছে। সে একপাটি কেবল পা থেকে খুলেছে, আর একপাটি—যেটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে সেটা প্রায় আধখানা খুলেছিল, তার দেহ যখন টেনে নেওয়া হচ্ছিল তখন আর একপাটি আপনা হতেই পা থেকে খুলে যায়।"

চুবিকভ ঠাট্টা করে বলল, "আহা, কি তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা ! ওর দিকে একবার চেয়ে দেখুন, কি সুন্দর ভাবে সে সবকিছু বের করে ফেলেছে। তোমার অনুমানগুলি আগে থেকেই প্রচার না করা শিখতে চেষ্টা কর। বাজে তর্ক না করে কিছু ঘাস নিয়ে পরীক্ষাও ত করতে পার।"

চারিদিক পরীক্ষার পর, ঘটনাস্থলটির একটা খসড়া তৈরি করে তারা রিপোর্ট লিখতে ও খাওয়া-দাওয়া সারতে দেওয়ানের গৃহে চলে গেল।

খাবার টেবিলেও তাদের আলোচনা চলতে লাগল। 'রিষ্টওয়াচ, রৌপ্যমুদ্রা এবং অন্যান্য যাবতীয় জিনিষ কিছুই খোয়া যায় নি, এমনকি হাতের স্পর্শ পর্যন্ত তাতে পায় নি। চুবিকভ বলা আরম্ভ করল, "দুয়ে দুয়ে চারের মতই স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, অর্থলাভে এই খুনটা করা হয় নি।"

ডুকভস্কি যোগান দিল, "শিক্ষিত কোন লোক এ কাজটা করেছে।"

"কি থেকে তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে ?"

"সুইডেনের এই দেশলাইয়ের বাক্স থেকে আমি এটা অনুমান করছি, চাষাভুষো লোকেরা এখনও এর ব্যবহার শেখে নি। জমিদার তালুকদার গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকই এর ব্যবহার জানে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বদমাশেরা সংখ্যায় অন্ততঃ তিনজন ছিল, দু'জন তাকে ধরেছিল আর তৃতীয় জন তার শ্বাসরোধ করেছিল। ক্লাউজভ যে বেশ বলিষ্ঠ ছিল তা গোড়া থেকেই তারা অনুমান করেতে পেরেছিল।"

"সে যদি নিদ্রিত থাকে তা হলে তার গায়ের জোরে কি আসে যায় ?

"পা থেকে যখন সে তার বুটজুতো খুলছে তখন খুনীরা তার

ওপর আক্রমণ চালায়, বুটজুতো খুলবার সময় সে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ছিল না।"

"সব কিছু অনুমানের উপর ভিত্তি করে গল্প খাড়া করে কোন লাভ নেই, বরং খাবার দিকে মন দাও।"

ইফ্রেম মদের পাত্রটা টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে বলে উঠল, "হুজুর, আমার মনে হয় এই জঘন্য কাজটা নিকোলাস্কা ছাড়া আর কেউ করে নি।"

সিয়েকভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "খুবই সম্ভব।"

"এই নিকোলাস্কাটি কে?"

ইফ্রেম বলল, "হুজুর, কর্তার বেয়ারা, ও ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারে না। ও একটা বদমাশ, হুজুর। একে পাঁড় মাতাল তার উপর লম্পট। ভগবান যেন ওরূপ আর একটি মর্ত্যলোকে না পাঠান। কর্তার 'ভডকা' সে নিয়ে আসত, তাকে ঘুম পাড়িয়ে যেত। ও ছাড়া আর কে এর মধ্যে থাকতে পারে? হুজুর, তা ছাড়া শুড়ীখানায় শয়তান একদিন আমার কাছে গর্ব্ব করে বলেছে যে কর্তাকে ও খুন করবে। সবের মূলে রয়েছে সেই আকুস্কা, সেই নচ্ছার মেয়ে। পূর্ব্বে সে এক সৈনিকের সঙ্গে ও ঘর করত, কর্তার নজর ঐ দিকে যায়, মেয়েটাকে কর্তা নিজের মহলে নিয়ে আসে, নিশ্চয়ই ও ব্যাটা এতে ভয়ানক চটে যায়। মদের ঘোরে এখনও সে রান্নাঘরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সে এখন কেঁদে কেঁদে আকুল, কর্তার জন্যই সে যে কাঁদছে এই কথা সবাইকে বোঝাতে চাইছে।

সিয়েকভ তখন বলে উঠল, "নিশ্চয়ই আকুস্কার জন্য যে কেউ ক্ষেপে যেতে পারে। সে একটা সৈনিকের স্ত্রী, একটি চাষী মেয়ে কিন্তু মার্ক ইভানিচ তাকে স্বর্গরাজ্যের অপ্সরা মনে করত, ওর মধ্যে মায়াবিনীর কোন শক্তি ছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট লাল একটি রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "আমি মেয়েটিকে দেখেছি, আমি ওকে চিনি"। ডুকভস্কির মুখ লাল হয়ে উঠল, সে তার চোখ নামাল। পুলিস সুপার আঙুল দিয়ে খাবারের পাত্রে টুংটাং আওয়াজ করতে লাগলেন। পুলিস ক্যাপ্টেন কাশতে কাশতে তার হাত-ব্যাগের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। ডাক্তারের মনেই কেবল আকুস্কা কিংবা অপ্সরার প্রসঙ্গ কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল না। চুবিকভ নিকোলাস্কাকে হাজির করতে হুকুম দিল। নিকোলাস্কা এসে হাজির হ'ল। মেজাজ খিটখিটে, অল্প বয়স, নাকে চাকা চাকা দাগ, বুকটা তার ভিতরে বসে গেছে। পরনে মনিবের দেওয়া পুরানো প্যান্ট। সিয়েকভের ঘরে প্রবেশ করে সেলাম ঠুকে চুবিকভের সামনে সে বসে পড়ল। ঘুমের ঘোর তার চোখে তখনও লেগে আছে, মদ এত বেশী টেনেছিল যে ভাল করে দাঁড়াতেও পারছিল না।

চুবিকভ প্রশ্ন করল, "তোমার মনিব কোথায়?"

"হুজুর, তিনি খুন হয়েছেন।"

এই কথা বলতে বলতে নিকোলাস্কা ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"খুন যে হয়েছে তা আমরা জানি, কিন্তু তার লাসটা কোথায়?"

"সবাই বলছে সেটা নাকি জানালা দিয়ে টেনে বাইরে নেওয়া হয়েছে, আর বাগানের ভিতর গোর দেওয়া হয়েছে।"

"বেশ···তদন্তের ফলাফল তা হলে রান্নাঘরে জানাজানি হয়েছে ···মোটেই ভাল নয়···তোমার মনিব যখন খুন হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে? সেদিন শনিবার ছিল—তাই নয় কি?"

বকের মত লম্বা ঘাড়টা উঁচু করে মাথা তুলে নিকোলাস্কা চিন্তা করতে লাগল। "হুজুর তা আমি বলতে পারি না···বড় বেশী মদ খেয়েছিলাম···কিছুই মনে নেই।"

হাত দুটি কচলাতে কচলাতে দাঁত বের করে ডুকভস্কি আস্তে আস্তে বলে উঠল, "একটা ওজর।"

"বেশ, তোমার মনিবের ঘরের জানালার নীচে রক্তের দাগ কেন?"

নিকোলাস্কা মাথা খাড়া করে চিন্তা করতে লাগল। পুলিস ক্যাপ্টেন বললো, "আর একটু চটপট চিন্তা করে দেখ দেখি।"

"এখুনি বলছি হুজুর, ও একটা সামান্য ব্যাপার! একটা মুরগীর গলা কেটে দিয়েছিলাম। ওটা আমার হাত থেকে পাখা নাড়তে নাড়তে দৌড়ে চলে যায়, ওর রক্তই ওখানে লেগে আছে।"

প্রতি সন্ধ্যায় নূতন নূতন স্থানে নিকোলাস্কা সত্য সত্যই যে একটা করে মুরগী মারত তা ইফ্রেমও স্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে আধখানা ধড়কাটা একটি মুরগীকে যদিও কেউ বাগানে দৌড়ে যেতে দেখে নি তথাপি এটা রীতিমত অস্বীকার করা গেল না। ডুকভস্কি হেসে বলল, "আর একটা ওজর একেবারে নির্ব্বোধের ওজর।"

"আকুস্কার সঙ্গে তোমার কোন ব্যাপার ঘটেছিল?"

"হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমিই মহাপাপী।"

"তোমার মনিব বুঝি তোমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছে?"

"না মোটেই নয়। আমাদের সামনে উপস্থিত এই ভদ্রলোক আইভান মিহাইলিচ সিয়েকভ উনিই আমার কাছ থেকে ওকে ফুসলে নিয়ে গেছেন, তার পর কর্তা ওর কাছ থেকে ওকে কিনে নিয়েছে। এই হচ্ছে আসল ঘটনা।"

সিয়েকভ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বাঁ দিকের চোখটা সে কচলাতে লাগল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওকে লক্ষ্য করে ডুকভস্কির তার কারণ নির্দ্ধারণ করতে দেরি হ'ল না, দেওয়ানের পরনের সেই গাঢ় নীলবর্ণের প্যান্ট—এতক্ষণ যেটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল, এখন তার নজরে পড়ল, লতানো ঝোপে পাওয়া সেই নীল সুতোর কথা তার মনে পড়ে গেল, চুবিকভও তার দিক থেকে সন্দিগ্ধভাবে সিয়েকভের পানে তাকাতে লাগল।

নিকোলাস্কাকে সে বলল, "তুমি এখন যেতে পার।"

"মিষ্টার সিয়েকভ আমি আপনাকে এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? গত সপ্তাহের শনিবারে আপনি নিশ্চয়ই এখানে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, দশটার সময় আমি মার্ক ইভানিচের সাথে নৈশ ভোজন শেষ করেছি।"

"বেশ তার পর ?"

সিয়েকভ ঘাবড়ে গেল—টেবিল থেকে সে উঠে পড়ল।

ভাঙা ভাঙা জড়ানো কথায় সে বলতে লাগল,"তারপর···তারপর আমার ঠিক মনে নেই—ঐ সময় আমি একটু মাত্রা ছাড়িয়ে মদ্য পান করেছিলাম। কখন এবং কোথায় যে আমি ঘুমিয়েছিলাম তাও আমার স্মরণ হচ্ছে না···আপনারা সবাই আমার দিকে অমন ভাবে তাকাচ্ছেন কেন ? আমিই যেন তাকে খুন করেছি—আপনাদের ভাবে তাই মনে হচ্ছে।"

"ঘুম থেকে উঠে আপনি কোথায় পড়ে আছেন দেখলেন ?"

"চাকরবাকরদের রান্নাঘরে আমি ঘুম থেকে জাগি···সকলেই তারা তা স্বীকার করবে। কিন্তু কি করে সেখানে গেলাম তা আমি বলতে পারব না।"

"অযথা উত্তেজিত হবেন না—আপনি আকুল্কাকে চেনেন কি ?"

"হ্যাঁ তবে বিশেষ ভাবে নয়।"

"সে কি ক্লাউজভের জন্ত আপনাকে ছেড়ে গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ,···ইক্রেম, হুজুরদের আর কিছু খাবার দিয়ে যাও, ইওগ্রাফ কুজমিচ, আপনি এক পেয়ালা চা খাবেন কি ?"

তার পর পাঁচ মিনিটের জন্ত একটা অস্বস্তিকর পীড়াদায়ক নীরবতা, ডুকভস্কি নির্ব্বাক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার সিয়েকভের মুখের উপর ন্যস্ত। সিয়েকভের মুখখানা বিবর্ণ, নীরবতা ভেঙে গেল চুবিকভের কণ্ঠস্বরে।

সে তখন বলছে, "মৃতের ভগিনীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্ত আমরা ঐ বড় বাড়ীটাতে যেতে চাই। তার কাছে নিশ্চয়ই তথ্যপূর্ণ সাক্ষ্য মিলবে।"

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পাওনা ধন্যবাদটি সিয়েকভকে জানিয়ে চুবিকভ আর তার সহকারী বড় বাড়ীটাতে চলে গেল। পঁয়তাল্লিশ বছরের এক ভদ্রমহিলা সামনে দাঁড়িয়ে--ক্লাউজভের ভগিনী। তিনি তখন বিগ্রহ-পূজায় রত। ওদের হাতের ব্যাগ ও মাথার টুপি দেখেই তিনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন।

আরম্ভটা চুবিকভই করল। "আপনার বিগ্রহ-সেবায় বাধা দেওয়ার জন্ত মাপ চাচ্ছি। একটা অনুরোধ আপনার কাছে আমাদের আছে। আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে. সবাই সন্দেহ করছে—আপনার ভ্রাতা কোন প্রকারে খুন হয়েছেন। ভগবানের বিধান আপনি ত জানেনই—মহামান্য জার কি সামান্য চাষী কেউই মৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না। আপনার কাছ থেকে কি কিছু তথ্য এ বিষয়ে আমরা সংগ্রহ করতে পারি—যা এ ঘটনায় কিছু আলোকপাত করতে পারে।"

কথা কয়টা শুনে মারিয়া ইভানোভনার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মুখটা হাতদুটি দিয়ে আবৃত করে মারিয়া বলে উঠল, "দোহাই আপনাদের ও বিষয় আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আমি কিছুই—একেবারে কিছুই বলতে পারব না, আমি কিছুই পারব না, আমি কি করতে পারি ? না—না, আমার ভায়ের সম্বন্ধে কোন কিছুই আমি বলতে পারব না। তার চাইতে বরং মরা আমার পক্ষে সহজ।"

চোখের জলের বান ডাকিয়ে মারিয়া ইভানোভনা অন্য ঘরে চলে গেল। ওর ঐ ভাব দেখে সরকারী কর্ম্মচারীদ্বয় পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে পশ্চাদপসরণ করল।

বেরুতে বেরুতে ডুকভস্কি শপথ করে বলল, "একটা পিশাচী, একেবারে আস্ত পিশাচী, মনে হয় ও কিছু জানে এবং জেনেও লুকোচ্ছে, আর ওর ঝিটার ভাব দেখেও কেমন একটু বেখাপ্পা মনে হ'ল, একটু দাঁড়াও না, পিশাচীর দল সব কিছু আমি টেনে বের করছি বলে।"

সন্ধ্যাকাল। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ। চুবিকভ ও তার সহকারী গাড়ী করে বাড়ী ফিরছে। মনে মনে সারাদিনের ঘটনাগুলি মিল খুঁজে বেড়াচ্ছে, উভয়েই পরিশ্রান্ত, উভয়েই নীরব। রাস্তায় কথাবার্ত্তা বলা চুবিকভের ধাতের বাইরে। যদিও বাচাল তবুও ডুকভস্কি বৃদ্ধের সম্মানার্থ নিজেকে সামলে নিচ্ছিল, শেষের দিকে অবশ্য আর নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারল না, ও বলতে সুরু করল, "ঐ নিকোলাস্কা যে এর সঙ্গে জড়িত তা নিঃসন্দেহ। ওর চেহারা দেখলেই এটা বেশ বোঝা যায়। ওর ওজরগুলিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছে। অপরাধের উস্কানি আসলে ওই দিয়েছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ও কেবলমাত্র ভাড়া-করা খুনী। আপনার এ বিষয়ে কি মত ? বিচক্ষণ সিয়েকভও এতে নিতান্ত বাজে অংশ গ্রহণ করে নি। তার নীলবর্ণের প্যাণ্ট, তার হস্ত-বুদ্ধিতা, খুনের পরে ভয়ে চাকরদের রান্নাঘরে রাত্রিযাপন, তার ওজর ও আকুল্কার প্রসঙ্গ সবই তাকে দোষী সাব্যস্ত করে।"

"বলে যাও বন্ধু, তোমারই জয়গান ঘোষিত হবে, তোমার মতে আকুল্কাকে চিনলেই খুনী দলের একজন হতে হবে। ওহে উগ্রমস্তিষ্ক, তোমার অপরাধের তদন্ত না করে বোতলের দুধ খাওয়া উচিত। ধর তুমিও আকুল্কার পিছনে ধাওয়া করতে—তার কি এই অর্থ হয় যে তুমিও ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত।"

'আকুল্কা মাসখানেকের মেয়াদে আপনার গৃহেও পাচিকা ছিল, তবু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছি কি ? সেই শনিবার রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে তাস খেলেছি, আপনাকে দেখেছি তাই বলে কি আমি আপনার পিছু পিছু ধাওয়া করব তাই বলতে চান, মশায়, স্ত্রীলোকটির প্রশ্ন এখানে আসছে না। প্রশ্নটি হচ্ছে বিশ্রী বিরক্তিজনক, হীন প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি—বিচক্ষণ যুবা প্রতারিত হতে চায় নি—দেখতে পাচ্ছেন তার অহঙ্কার। প্রতিশোধ সে নিতে চেয়েছিল। তার পর তার পুরু ঠোঁট দুটিতে তার কামুকতার লক্ষণ প্রকট। আকুল্কার সঙ্গে অপরাধ তুলনাকালে কেমন করে

সে তার লালসার ভাব প্রকাশ করছিল—ঐ শয়তান যে কামানলে দগ্ধ হচ্ছে তা নিঃসন্দেহ। আহত আত্মমর্য্যাদা আর অপরিতৃপ্ত কামনা তাকে বিষিয়ে তুলছিল। খুন করার পক্ষে ঐ যথেষ্ট। দু'জন আমাদের হাতে ধরা পড়েছে, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? নিকোলাস্কা ও সিয়েকভ তাকে ধরেছিল। কে তা হলে তাকে শ্বাসরোধ করে কাবু করেছে? সিয়েকভ ভীরু প্রকৃতির—সহজেই সে দমে যায়—একটা কাপুরুষ বললেও চলে। নিকোলাস্কার স্তরের লোক বালিশ দিয়ে মুখ চেপে ধরে না—তারা বরং কুঠার কিংবা হাত-দা দিয়ে খুন করে—কোন তৃতীয় ব্যক্তি অবশ্যই তার শ্বাসরোধ করে ধরেছিল, কিন্তু কে সে?" টুপিটা তার চোখের উপর ডুকভস্কি টেনে নিল, সে গভীর চিন্তামগ্ন। গাড়ীখানা ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহ পর্য্যন্ত না যাওয়া অবধি সে চুপ করেই ছিল।

গৃহে প্রবেশ করে ওভারকোট খুলতে খুলতে সে বলল, "ঠিক মনে পড়েছে, ঠিক মনে পড়েছে, নিকোলাই ইরমোলিচ এটা যে এতক্ষণ কেন আমার মনে পড়ে নি তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তৃতীয় ব্যক্তি কে তা জানতে চান?"

"দয়া করে একবার থাম না! খাবার তৈরী হয়েছে, খেতে বস। চুবিকভ ও ডুকভস্কি খেতে বসল, ডুকভস্কি এক গ্লাস ভডকা ঢেলে পান করল। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে বলতে লাগল, তৃতীয় ব্যক্তি একজন স্ত্রীলোক। সে সিয়েকভের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্লাউজভের শ্বাসরোধ করেছিল, হাঁ আমি সেই নিহত ব্যক্তির ভগিনীর কথাই বলছি—মারিয়া ইভানোভনা।"

চুবিকভ ভডকা পান করতে করতে একটু কেশে নিয়ে ডুকভস্কির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

"তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ? মাথার কি কিছু গোলমাল আছে? মাথা ধরেছে কি?"

"আমি বেশ ভাল আছি। ধরুন আমি প্রকৃতিস্থ নই, কিন্তু আমাদের উপস্থিতিতে স্ত্রীলোকটির থ' মেরে যাওয়ার মানে কি করেন? কোনকিছু জানাতে তার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে—আপনি মনে করেন? ধরুন এটা সামান্য বিষয় মেনে নিলাম। বেশ! কিন্তু তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিকটাও একবার ভেবে দেখুন। তার ভাই ছিল তার দু'চক্ষের বিষ। সে গভীর ভগবদ্‌বিশ্বাসী প্রাচীনপন্থী আর তার ভাই ছিল লম্পট, দুশ্চরিত্র, নাস্তিক—তাদের দু'জনের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। লোকে বলে, সে যে শয়তানের অনুচর তা তার ভগিনীকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল। সে তার ভগিনীর সামনেই ধর্মের কথা বলত।"

"বেশ, তাতে হ'ল কি?"

"কিছুই বুঝছেন না বুঝি? স্ত্রীলোকটি ছিল প্রাচীনপন্থী খ্রীষ্টধর্মে ঘোর বিশ্বাসী, অন্ধ বিশ্বাসের মোহে সে তাকে হত্যা করেছে! দুষ্ট, লম্পট, চরিত্রহীন এক ব্যক্তিকেই সে কেবল হত্যা করে নি, তার সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টে অবিশ্বাসী এক ব্যক্তির শত্রুতায় হতেও পৃথিবীকে রক্ষা করে সে তার ধর্মের জন্য একটা মহান্ কাজ করেছে বলে বিশ্বাস করে। এসব প্রাচীনা, মোহমুগ্ধ অন্ধবিশ্বাসীদের আপনি চেনেন না। আপনার স্তারেভস্কি পড়া উচিত। লিয়েকভ ও পেটচারস্কি এ বিষয়ে কি বলেন জানেন? এ নিশ্চয়ই সে—আমি আমার জীবনপণ করে বলতে পারি। সেই তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে! পিশাচী! আমরা যখন গেলাম তখন সে কি তার বিগ্রহসেবার ভান করছিল না শুধু আমাদের ধোকা দেবার জন্য! সে তখন মনে মনে বলে যাচ্ছিল, "আমি এখানে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকব—ওরা আমাকে ধর্মশীলা, শান্ত, সমাহিত মনে করে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না।" পাপকার্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এইভাবে কাজ করে। নিকোলাই ইরমেলিচ দয়া করে এই কাজটার সম্পূর্ণ তদন্তের ভার আমার হস্তে অর্পণ করুন, আমিই কাজটা শেষ করি, আমিই আরম্ভ করেছি—আমাকেই শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে দিন।"

চুবিকভ মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল। ভ্রূকুটির সঙ্গে সে বলল, "কঠিন তদন্তগুলি আমিই শুধু করতে পারি। এতে মাথা না গলানোই তোমার পদের যোগ্য। আমি যা বলি তাই তুমি লিখে যাবে, এই তোমার কর্ত্তব্য কাজ।"

কপাটটা খটাস করে লাগিয়ে ডুকভস্কি লজ্জারক্ত মুখে অধোবদনে বেরিয়ে গেল।

ওর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে চুবিকভ বলে উঠল, "আস্ত ক্ষ্যাপা কোথাকার, বেশ চালাক চতুর—কেমন অতিমাত্রায় চটপটে, মেলা থেকে একটা চুরুটের বাক্স কিনে ওকে আমায় উপহার দিতে হবে।"

পরদিন ভোরবেলা। ক্লাউজভকার চেয়ে তরুণবয়সী এক চাষী এসে উপস্থিত। মাথাটা তার দেহের আয়তনে বেশ বড়। ঠোঁট দুটি খরগোসের মত। তার নাম হ'ল ডানিস্কো; একটি মেষ-পালক। তার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য মিলল।

তার বক্তব্য, "আমি একটু মদ খেয়েছিলাম। গভীর রাত্র পর্য্যন্ত আমি আমার বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম। মদ খেয়ে বাড়ী ফেরবার পথে গাটা একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য স্নান করতে নামলাম। তখন কি দেখতে পেলাম জানেন? দু'জন লোক কালো একটা কি ভারী জিনিষ বয়ে বয়ে নদীর তীর ঘেঁষে যাচ্ছে। ওদের লক্ষ্য করে চীৎকার করে বললাম, "তোমরা বাপু কে? ওরা ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তারা মাকারেভ শাকসজীর ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ওটা আমাদের মনিবের দেহ না হয়েই যায় না। যদি না হয় তবে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে।"

সেই দিনই সন্ধ্যায় সিয়েকভ ও নিকোলাস্কাকে গ্রেপ্তার করে রক্ষী-পরিবেষ্টিত করে জেলা সদরে চালান দেওয়া হ'ল, শহরে কয়েদখানায় তাদের আটক করে রাখা হ'ল।

দুই

বার দিন পর।

ভোরবেলা। সবুজ রঙের একটা টেবিল। সামনে বসে

তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিকোলাই ইয়মেলিচ। সংবাদপত্রে ক্লাউজভ সম্পর্কিত মামলার ঘটনা সে পড়ছিল। খাঁচায় আবদ্ধ নেকড়ে বাঘটির ন্যায় ডুকভস্কি কক্ষটির মধ্যে চঞ্চল পদে পায়চারি করছিল।

কাঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলে উঠল, "সিয়েকভ ও নিকোলাস্কার অপরাধ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত আছেন, কিন্তু মারিয়া ইভানোভনার অপরাধ আপনি অস্বীকার করছেন কেন? তার বিপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য কি পাচ্ছেন না?"

"আমি যে এটা একেবারেই বিশ্বাস করছি না তা কি আমি বলেছি? এ হতে পারে আমি স্বীকার করি—কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নই···কোন অকাট্য প্রমাণ, কোন স্পষ্ট সাক্ষ্য এ বিষয়ে আমি পাচ্ছি না, সবই মনগড়া···অন্ধ বিশ্বাস, মতভেদ, মন-কষাকষি ইত্যাদি।"

"হায় রে, আইনজ্ঞের দল! পরিত্যক্ত একটা কুঠার আর রক্তমাখা একটা বিছানা এই ত আপনারা চান। বেশ, আমি সেটাই আপনার কাছে প্রমাণ করছি। ঘটনাটির মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য ছেড়ে দিন। আপনার এই মারিয়া ইভানোভনাকে সাইবেরিয়া পাঠানো উচিত। আমি এটা প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি। যদি মনগড়া প্রমাণ আপনার কাছে যথেষ্ট না হয় তবে না হয় কিছু বাস্তব চাক্ষুষ প্রমাণই দিচ্ছি···তাতে আপনি বুঝতে পারবেন—আমার সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য! কেবল আর একটু আমাকে বলে যেতে দিন!"

"তুমি কি বলতে চাও?"

"সেই সুইডেনের দেশলাই! আপনি কি ভুলে গেছেন! আমি কিন্তু ওটা ভুলি নি! নিহত ব্যক্তির কক্ষে কে ওটা জ্বালিয়েছিল তা আমাকে বের করতে হবে! নিকোলাস্কা কিংবা সিয়েকভ কেউই ওটা জ্বালায় নি—কেননা তাদের তল্লাসী করে এরূপ কোন দেশলাই পাওয়া যায় নি, কিন্তু কোন তৃতীয় ব্যক্তি ওটা জ্বালিয়েছিলেন—তিনিই মারিয়া ইভানোভনা। আমি এটা প্রমাণও করব, কেননা আমাকে সেই অঞ্চলটা ঘুরে একটু তদন্ত করতে দিন।"

"বেশ, বেশ, এবার বস দেখি—আমরা বরং আসামীদের একটু জেরা করি।" ডুকভস্কি বসে পড়ল। লম্বা নাকটা তার সংবাদ-পত্রের অন্তরালে ডুবিয়ে দিল।

ম্যাজিস্ট্রেট চেঁচিয়ে বলল, "নিকোলাই টেটসভকে নিয়ে এস।"

নিকোলাস্কাকে এনে হাজির করা হ'ল। মুখখানা তার একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দেহ কাঠির মত কৃশ। সে ভয়ানক ভাবে কাঁপছে।

চুবিকভ বলা সুরু করল, "টেটসভ, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তুমি চুরির দায়ে দণ্ডিত হয়েছিল। আবার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তুমি দ্বিতীয় বার চুরির অপরাধে দণ্ড পেয়েছিলে?···সব আমরা জানি।"

নিকোলাস্কার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। ম্যাজিস্ট্রেটের এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান তাকে অবাক করে দিল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই বিস্ময় তার শোকে রূপান্তরিত হ'ল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তার মুখচোখে জল দেবার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

ম্যাজিস্ট্রেট আবার চীৎকার করে বললেন, "সিয়েকভকে নিয়ে এস।"

সিয়েকভকে হাজির করা হ'ল। বার দিন পরে যুবকটির মুখাকৃতি আর চেনা যায় না। সে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। মুখখানা রক্তহীন, পাণ্ডুর আর চাউনি উদাসীন।

চুবিকভ বলে উঠল, 'বসুন মিঃ সিয়েকভ। আশা করি আজ আপনার একটু সুমতি হয়েছে। আগের মত মিথ্যে কথা বলবেন না। এত দিন ক্লাউজভ হত্যার ব্যাপারে আপনি নির্দোষ এই কথাই বলে এসেছেন—যদিও আপনার বিপক্ষে প্রচুর সাক্ষ্য বর্তমান। আপনার আচরণ যুক্তিহীন, অপরাধ স্বীকার দোষক্ষালনের পথে বেশ সহায়তা করে। এই শেষবার আমি আপনাকে আবার বলছি। এবারও যদি আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার না করেন ত কাল কিন্তু আর সময় পাবেন না, বলুন, বলুন, বলে ফেলুন···।"

সিয়েকভ ধীরে ধীরে বলে উঠল, "আমি কিছুই জানি না, আমার বিপক্ষে আপনাদের কি যে সাক্ষ্য তাও আমার জানা নেই।"

'ও আপনার বৃথা চেষ্টা। বেশ, তা হলে ঘটনাটি আমিই বলছি। শনিবার সন্ধ্যার সময় আপনি ক্লাউজভের কক্ষে বসে তার সঙ্গে একত্রে ভডকা ও বীয়ার পান করেছিলেন, ডুকভস্কি সিয়েকভের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল—ঘটনাবিশ্লেষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে আর দৃষ্টি নামায় নি। নিকোলাই আপনাদের পরি-চর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। রাত বারটা হতে একটার মধ্যে মার্ক ইভানিচ শয্যাগ্রহণ করবে বলে আপনাকে জানায়। সে প্রতিদিনই সেই সময় নিদ্রার জন্য শয়ন করে। যখন সে তার পা থেকে বুটজুতো খুলে ফেলেছে এবং আর এক পাটি বুটজুতো খুলতে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে আপনাকে তার জমিদারী সম্বন্ধে গোটাকয়েক উপদেশ দিচ্ছিল তখন কোন সঙ্কেত পেয়ে আপনি ও নিকোলাই একযোগে আপনাদের মাতাল মনিবকে ধরে গায়ের জোরে চিৎ করে বিছানায় ফেলে দিলেন, একজন তার পায়ের উপর আর একজন তার মাথার উপর বসে পড়েন। তার পর যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনারা আগেই এ বিষয়ে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলেন এবং যিনি আপনার পরি-চিত—কালো পোশাকপরা সেই স্ত্রীলোকটি তখন ঘরে প্রবেশ করে। সে বালিশটা তুলে নিয়ে ঐ দিয়ে তার শ্বাসরোধ করে। এই হাঙ্গামার সময় বাতি নিভে যায়। স্ত্রীলোকটি তার পকেট থেকে সুইডেনের এক দেশলাই বের করে বাতি জ্বালায়, কেমন, তাই নয় কি? আপনার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি সত্য ঘটনা বলে যাচ্ছি। তার পর এই ভাবে তাকে মেরে ফেলে এবং এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে আপনারা তার লাসটা জানালা দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে আসেন। লতানো ঝোপটার কাছে ওটা ফেলে রাখেন। যদি সে হঠাৎ চেতনা ফিরে পায় এই ভয়ে আপনারা কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওকে আঘাত করেন। তার পর লাসটা বয়ে নিয়ে গিয়ে আর একটা ঝোপের কাছে কিছুক্ষণ ফেলে রাখেন—কিছুকাল বিশ্রাম ও চিন্তা করে আবার ওটা নিয়ে চলেন বেড়া ডিঙিয়ে অবশেষে ওটা নিয়ে আপনারা রাস্তায় চলতে থাকেন।

তার পর নদীর তীরে পৌঁছে একজন চাষীকে দেখে আপনারা ভয় পেয়ে যান। কিন্তু এ কি, এ কি, আপনার হ'ল কি ?"

ধোপার কাচা কাপড়টির ন্যায় সাদা হয়ে সিয়েকভ টলতে টলতে উঠে পড়ল।

সে বলে উঠল, "আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! বেশ তাই—তাই হোক, কেবল দয়া করে আমাকে একটু বাইরে যেতে দিন।"

সিয়েকভকে বাইরে নিয়ে আসা হ'ল। আরাম করে সটান হয়ে দাড়িয়ে চুবিকভ বলে উঠল, "যাক অবশেষে ও এটা স্বীকার করে নিল। একেবারে দমে গিয়েছিল, কি কায়দা করেই না আমি তাকে ধরে ফেলেছি।"

ডুকভস্কি হাসতে হাসতে বলল "আর সেই কালো পোশাক-পরা স্ত্রীলোকটির কথাও অস্বীকার করে নি। তা সত্ত্বেও ঐ সুইডেনের দেশলাইটি নিয়ে আমি বড় গোলে পড়েছি—এ আর আমার সহ্য হচ্ছে না—আচ্ছা আমি তা হলে আসি।"

ডুকভস্কি টুপি পরে বাইরে বেরিয়ে গেল। চুবিকভ আকুষ্কাকে জেরা করা আরম্ভ করল। আকুষ্কা যে এ বিষয়ে কিছুই জানে না, তাই সে জানাল।

সন্ধ্যা ছয়টা। ভয়ানক উত্তেজিত ভাবে ডুকভস্কি ফিরে এল। জীবনে আর কখনও সে এত উত্তেজিত হয় নি। তার হাত দুটি এমন ভাবে কাঁপছিল যে, সে তার ওভারকোটটিও খুলতে পারছিল না। মুখখানা তার উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কোন খাটি সংবাদ না নিয়ে সে ফেরে নি।

ঝড়ের বেগে চুবিকভের কক্ষে প্রবেশ করে একটা আরাম-কেদারায় ঝুপ করে বসে পড়ে সে বলে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি। আমি দিব্যি করে বলছি, আমার যেন আমার নিজের প্রতিভায় আস্থা হচ্ছে না। শুনুন, আমাদের সবকিছু গোল্লায় যাক, শুনে একেবারে থ' মেরে যাবেন। বেশ কৌতুকের কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়। তিন জন এ যাবৎ আপনার পিঞ্জরে আছে—তাই নয় কি ? আমি চতুর্থ এক আততায়ী আবিষ্কার করেছি—সে স্ত্রীলোক। আর কি স্তরের স্ত্রীলোক জানেন ? তাকে শুধু স্পর্শ করবার লোভে আমি দশ বছরের আয়ু কমিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ঘটনাটি শুনুন, আমি গাড়ী করে সারা ক্লাউজভকা ঘুরে বেড়ালাম—আঁকাবাঁকা ভাবে অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে তদন্ত করলাম। পথে সুইডেনের দেশলাই খুঁজে খুঁজে সারা দোকানপাট, সরাইখানা ইত্যাদি দেখে বেড়ালাম। প্রত্যেক স্থানেই নেই, নেই শুনতে পেলাম। এ পর্য্যন্ত আমি খুঁজেই আসছিলাম। অন্ততঃ বিশবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পড়েছিলাম। সারাদিন ধরে কেবল খুঁজেই যাচ্ছি। কেবল এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার খোঁজার জিনিষ আমি পেয়ে গেছি। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে এক দোকানে এক ডজন ঐ দেশলাইয়ের বাক্স পেয়ে গেলাম। দেখা গেল তার মধ্যে একটা বাক্স খোয়া গেছে—আমি তথখুনি জিজ্ঞেস করলাম, কে এই দেশলাইটা কিনেছে ? উত্তর পেলাম, কোন ভদ্রমহিলা—তার নামধাম এই সেই ইত্যাদি। তাঁর ঐ দেশলাই বেশ পছন্দ হয়েছিল—কেননা ওটা জ্বালাবার সময় বেশ কড় কড় শব্দ হয়, কালক্ষ থেকে তাড়ানো আমার মত একটা ভবঘুরে বেহায়া লোক দ্বারা কি মহৎ কাজ অনেক সময় সাধিত হতে পারে তা আমাদের ধারণার বাইরে। আজ থেকে আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শিখব! চলুন, চলুন এবার কাজ আরম্ভ করি।"

"যাব, কোথায় যাব ?"

"তাঁর কাছে সেই চতুর্থ আততায়ীর কাছে—আমাদের তাড়াতাড়ি করা উচিত। তা না হলে অধৈর্য্য হয়ে আমি একেবারে ফেটে যাব, জানতে চান কি কে সেই স্ত্রীলোক ? সম্পূর্ণ আপনার ধারণার বাইরে, আমাদের বৃদ্ধ পুলিশ সুপার ইভগ্রাফ কুজমিচের তরুণী ভার্য্যা অলগা পেট্রোভনা, তিনিই হলেন চতুর্থ ব্যক্তি, তিনিই সেই দেশলাই কিনেছেন।"

"তুমি···তুমি···তুমি কি বিকৃতমস্তিষ্ক ?"

"কেন—এ খুবই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ, তিনি ধূমপান করেন, দ্বিতীয়তঃ, তিনি ক্লাউজভের সঙ্গে গভীর প্রণয়াবদ্ধ। ক্লাউজভ কোন এক আকুষ্কার জন্য তার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেছিল। হায় রে—প্রতিহিংসা! আমার এখন মনে পড়েছে। একদিন রান্নাঘরে ওদের দুজনকে ফিসফাস করতে দেখেছিলাম। স্ত্রীলোকটি ওকে শাসাচ্ছিল, ও মনের সুখে মেয়েটির দেওয়া চুরুট টেনে টেনে ধোঁয়াটি ওর মুখের উপর ছাড়ছিল, যাক আসুন, আমার সঙ্গে আসুন···তাড়াতাড়ি করুন—সন্ধ্যা যে প্রায় হয়ে এল আমাদের এখনই রওনা হওয়া উচিত।"

"মস্তিষ্ক আমার এতদূর বিকৃত হয় নি যে, একটা দুঃস্থ বালকের জন্য একজন শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহিলার শান্তির ব্যাঘাত করতে যাব।"

"শ্রদ্ধেয় ভদ্র, আপনি একজন গণ্ডমূর্খ—তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হবার মোটেই যোগ্য নন। কোনদিন আপনাকে আমি তিরস্কার করতে সাহসী হই নি—কিন্তু এবার আমাকে তাই করতে বাধ্য করলেন। আপনি একজন নীচ মূর্খ বৃদ্ধ, আপনার মাথা খারাপ! আসুন নিকোলাই ইয়েমোলিচ, আমি আপনাকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট অস্বীকার করে হাত নাড়লেন আর গভীর বিরক্তিতে থুতু ফেলতে লাগলেন।

"আমি আপনাকে করজোড়ে মিনতি জানাচ্ছি—আমার জন্য নয়, তবে ন্যায়বিচারের জন্য। আমাকে দয়া করুন—জীবনে শুধু একটি বারের জন্য দয়া করুন।"

ডুকভস্কি হাঁটু গেড়ে তার সামনে অনুনয় জানাতে লাগল।

"নিকোলাই ইয়েমোলিচ ভাল করে কথা শুনুন। যদি আমি ঐ স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভুল করে থাকি তবে আমাকে লম্পট, গর্দ্দভ বা খুশি বলবেন। ভয়ানক জটিল ধরনের ঘটনা—তা ত আপনি জানেনই। অনেকটা উপন্যাসের মত। এই কাজের খ্যাতি সারা রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে। তারা কেবল প্রধান প্রধান জটিল

ঘটনায় জন্যই আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তদন্তে নিয়োগ করবে। অপরিণামদর্শী বৃদ্ধ, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রূযুগল কুঁচকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও টুপিটা মাথায় তুলে নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

তিনি বললেন,"বেশ, চল, তোমার মাথায় দেখছি শয়তান চেপেছে। চল, চল—যাওয়া যাক।"

ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ীটা পুলিস সুপারের গৃহের দরজায় যখন থামল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

চুবিকভ কলিং বেল টিপতে গিয়ে বলল,"আমরা নরাধম, পশু—কেবল শান্তিপ্রিয় লোকদের ব্যাঘাত করে বেড়াই।"

"কিছু ভাববেন না, মনে কিছুই করবেন না, ঘাবড়াবেন না। আমরা বলব যে, আমাদের গাড়ীর একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে।"

চুবিকভ ও ডুকভস্কি দরজায় তেইশ বৎসর-বয়স্কা দীর্ঘগঠন স্বাস্থ্যবতী এক স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পেল। কালো কুচকুচে তার ভ্রূ-যুগল আর ঠোঁট দুটি ছিল রক্তের মত লাল। অলগা পেট্রে ভনা নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে। মুখখানা তার হাসিতে উদ্ভাসিত করে সে বলে উঠল, "বা, কি সুন্দর···আপনারা ঠিক আমাদের নৈশ ভোজনের সময় উপস্থিত হয়েছেন। ইভগ্রাফ কুজমিচ বাড়ীতে নেই···সে পুরোহিতের ওখানে গেছে। ওকে ছাড়াই আমরা আরম্ভ করতে পারি, বসুন, তদন্তের জন্য আপনারা এসেছেন কি?"

বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করে আরাম-কেদারায় বসে চুবিকভ বলা শুরু করল, "হ্যাঁ, গাড়ীর একটা স্প্রিং ভেঙে গেছে, বুঝেছেন···।"

ডুকভস্কি ফিস ফিস করে বলল, "ওকে চট করে এ বিষয়ে জেরা করে বোকা বানিয়ে দিন।"

"একটা স্প্রিং···হ্যাঁ-হ্যাঁ আমরা এইমাত্র এখানে এসেছি।"

"ওকে ঘাবড়ে দিন, আমি বলছি—আপনি যদি বিস্তারিত বলা শুরু করেন তা হলে সে সব বুঝে ফেলবে।"

দাঁড়িয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে চুবিকভ বলল, "তোমার যা খুশি তাই কর—আমাকে রেহাই দাও—আমি পারি না—তোমার রান্না জিনিষ তুমিই খাও।"

পুলিস সুপারের স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজের লম্বা নাকটা কুঁচকে ডুকভস্কি বলল, "হ্যাঁ, সেই স্প্রিং—আমরা দেখুন—নৈশ ভোজনে আসি নি—ইভগ্রাফ কুজমিচের সঙ্গেও দেখা করতে আসি নি। আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই—দেখুন, মার্ক ইভানিচ যাকে আপনি হত্যা করেছেন—সে কোথায়?"

পুলিস সুপারের স্ত্রী হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভাঙা ভাঙা কথায় বলতে লাগলেন, "কি? কোন্ মার্ক ইভানিচ?"

সহসা তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। "আমি—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"সরকারের আইন বিভাগের তরফ থেকে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি। ক্লাউজভ কোথায়? এ ঘটনা আমাদের সব জানা হয়ে গেছে।"

ডুকভস্কির দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "কার কাছে শুনলেন?"

"কোথায় সে দয়া করে আমাদের জানাবেন কি?"

"কিন্তু কি করে আপনারা জানতে পেলেন? কে আপনাদের বলল?"

"আমরা সব জানি, আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে আমি আবার আপনাকে সে কোথায় জিজ্ঞেস করছি।"

ভদ্রমহিলার হতবুদ্ধিতায় একটু সাহস পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তখন তাঁর কাছে গেলেন।

"আমাদের বলে ফেলুন—আমরা চলে যাচ্ছি নতুবা···"

"তাকে পেয়ে আপনারা কি করবেন?"

"ওসব প্রশ্নের দরকার কি? আমরা আপনার কাছে সংবাদ জানতে চাচ্ছি। আপনি কেঁপে উঠছেন—হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন হাঁ সে খুন হয়েছে আর আপনিই যে তাকে খুন করেছেন তা আমরা জানি। আপনার সহকারীরাই আপনাকে ধরিয়ে দিয়েছে।"

পুলিস সুপারের স্ত্রীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। হাত কচলাতে কচলাতে তিনি ধীরে ধীরে বলে উঠলেন, "এদিকে আসুন। তাড়া-তাড়ি করুন। ঐ বাগানবাড়ীর মধ্যে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ভগবানের দোহাই আমার স্বামীকে এ কথা বলবেন না। আমি আপনাদের অনুনয় জানাচ্ছি, তাঁর পক্ষে এ সংবাদ বিষময় হবে।"

মস্ত বড় একটা চাবি দেওয়াল থেকে নিয়ে পুলিস সুপারের স্ত্রী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগলেন। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে তাঁরা বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। চারিদিক অন্ধকার। কিছুক্ষণ আগে এক পসলা ঝির ঝির করে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলা আগে আগে চলতে লাগলেন। লম্বা লম্বা ঘাসবনের মধ্য দিয়ে জল কাদার মধ্যে চপ চপ শব্দ করতে করতে চুবিকভ ও ডুকভস্কি তার পিছু পিছু যাচ্ছিল। মস্ত বড় বাগান। আর জলকাদা তাদের পায়ে ঠেকল না। সামনে চষা জমি। অন্ধকারে গাছের অবয়ব-গুলি একটু একটু দেখা যাচ্ছে। তরুশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে আবছা অন্ধকারে একটি ছোট বাগানবাড়ী নজরে পড়ল।

ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "ঐ হচ্ছে বাগানবাড়ী, কাউকে বল-বেন না যেন, এই আমার অনুরোধ।"

বাগানবাড়ীর দরজায় চুবিকভ ও ডুকভস্কি মস্ত বড় একটি তালা লাগানো আছে দেখতে পেল।

চুবিকভ তার সহকারীকে বলে উঠল,"তোমার দেশলাই ও মোম-বাতি নিয়ে প্রস্তুত থাক।"

তালাটা খুলে ফেলে পুলিস সুপারের স্ত্রী অতিথিদের বাগান-বাড়ীতে প্রবেশ করতে দিলেন। ডুকভস্কি মোমবাতি জালিয়ে পথ দেখে চলতে লাগল। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলের উপর একটি ভোজনপাত্র। ঠাণ্ডা রান্নাকরা তরকারী ওতে রয়েছে। আর এক পাত্রে একটু চাটনি।

"এগিয়ে যাও।"

তারা পরের কক্ষটির মধ্যেও প্রবেশ করল। সেখানেও একটা টেবিলের উপর রান্না-করা এক ডিশ মাংস। এক বোতল ভডকা, ছুরি, কাঁটা, চামচ ইত্যাদি সবই রয়েছে।

"কিন্তু কোথায় সে, সেই লাসটা কোথায়?"

পুলিস সুপারের স্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে বিবর্ণ হয়ে ফিস ফিস করে উত্তর দিলেন, "সে উপরের তাকে আছে।"

মোমবাতিটা এক হাতে নিয়ে আর এক হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ডুকভস্কি উপরের তাক পর্যন্ত উঠে গেল। মস্ত বড় একটা পালংকের গদি। তার উপর শায়িত একটা স্থির, অচঞ্চল, দীর্ঘ মনুষ্যদেহ। শরীর থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ বেরুচ্ছে। অনেকটা নাকডাকার মত। চীৎকার করে ডুকভস্কি বলে উঠল, "ওরা আমাদের সবাইকে জব্দ করেছে। সব গোল্লায় যাক! এ সে নয়! কোন জ্যান্ত নিরেট গর্দ্দভ এখানে শুয়ে আছে। ওহে, তুমি কে? তুমি জাহান্নমে যাও!"

দেহটি যেন শিস দেবার মত একটি শব্দ করে নিশ্বাস টেনে নিল, তার পর একটু নড়ে উঠল। ডুকভস্কি কনুই দিয়ে তাকে গুঁতো দিলে। সেই দেহটি তার হাত দু'টি তুলে, সোজা হয়ে মাথা খাড়া করে উঠে বসল।

ভীষণ মোটা কর্কশ কণ্ঠে সে বলে উঠল, "কে আমাকে গুঁতোচ্ছ? তুমি কি চাও, বলত?"

মোমবাতিটা অপরিচিতের মুখের কাছে তুলে ধরে ডুকভস্কি আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। দেহটির রক্তিম নাসিকা, অবিন্যস্ত চুল, ঘনকৃষ্ণ গোঁফ—এক প্রান্ত ঊর্দ্ধপানে কুণ্ডলী পাকিয়ে দর্পভরে সবাকে অসম্মান করছে, এই সব লক্ষণ হতে তাকে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী ক্লাউজভ বলে চেনা গেল।

"আপনি...মাক...ই-ভা-নি-চ। অসম্ভব!"

ম্যাজিষ্ট্রেট উপরের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

"হ্যাঁ, এ আমিই, আর আপনি ডুকভস্কি। এখানে আপনারা কি মাথামুণ্ডু চান বলুন ত? আর নীচে ঐ কদাকার মাথাটি কার? ভগবান, তোমার কাছে ক্ষমা চাই, এ দেখছি আমাদের তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট! সারা দুনিয়া পড়ে থাকতে কি জন্য আপনারা এখানে পচে মরতে এসেছেন?"

তাড়াতাড়ি নেমে এসে ক্লাউজভ চুবিকভকে আলিঙ্গন করল, অল্গা পেট্রোভনা এই অবসরে দরজার ফাঁক দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল।

"যাক যে কারণেই আপনারা এখানে এসে থাকুন, চলুন এখন একত্র বসে একটু মদ্যপান করা যাক। লা-লা-লা-লা-লা-লা চলুন একটু মদ চালাই! কে আপনাদের এখানে আনল? আমি যে এখানে আছি কেমন করে তার খোঁজ পেলেন? যাক তাতে কিছু আসে যায় না! একটু মদ্য পান করুন!"

ক্লাউজভ আলো জ্বালিয়ে তিন গ্লাস ভডকা ঢেলে নিল।

অঙ্গুলি সঞ্চালন করে ম্যাজিষ্ট্রেট বলে উঠল, "আসল কথা কি জানেন? আমরা আপনাকে একেবারেই চিনতে বা বুঝতে পারছি না। একি আপনিই না আর কেউ?"

"আসুন ত মশায়...আমাকে লম্বা একটা ধর্ম্মের বক্তৃতা দিতে বলেন কি? বিন্দুমাত্র ঘাবড়াবেন না! এই যে, ডুকভস্কি মহোদয়, আপনার ভডকাটি পান করে ফেলুন! বন্ধুগণ, চলুন আমরা বাকী সময়টা...এ কি, আপনি অমন হাঁ করে কি দেখছেন? খেয়ে ফেলুন!"

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত হাত তুলে ভডকাটা পান করে ম্যাজিষ্ট্রেট বলে উঠলেন, "এ সব সত্ত্বেও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি এখানে কেন?"

"আমি এখানে থেকে যদি আরাম পাই তবে কেনই বা থাকব না?" ক্লাউজভ ভডকা পান করে একটু মাংস চিবিয়ে নিল।

"আমি এখানে পুলিস সুপার মহাশয়ের স্ত্রীর সঙ্গে অজ্ঞাতবাস করছি তা ত দেখতেই পাচ্ছেন। ভূতের মত পোড়ো বাগান-বাড়ীর ভাঙা ভিটেয় বন্যপ্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে বাস করছি—যাক তা হলে এবার ওটা পান করে ফেলুন। বুড়ো দাদু বুঝতেই ত পারছেন মেয়েটির জন্য মনটা আমার যেন কেমন করে উঠেছিল। তার প্রতি আমার করুণা উথলে উঠল। আর সেই জন্য আমি এই পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীতে আস্তানা গড়ে তুললাম, ক'দিন আমার বেশ ভূরিভোজন হচ্ছে। সামনের সপ্তাহে এই নিবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছি।"

ডুকভস্কি বলে উঠল, "একেবারে ভৌতিক ব্যাপার!"

"এখানে ভৌতিক আবার কি আছে?"

"একেবারে ধারণার অতীত! দোহাই ভগবান, আপনার এক পাটি বুটজুতো কি করে বাগানে পড়েছিল?"

"কোন বুটজুতো?"

"যার একপাটি আমরা শয়নকক্ষে পেয়েছি।"

"ও জেনে আপনাদের কি লাভ? ও ত মশায়, আপনার ব্যাপার নয়। কিন্তু আগে মদটা ত পান করুন। সব জাহান্নামে যাক। আমাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে যখন তুলেছেন তখন মদ আপনার খেতেই হবে। শুনুন, ঐ বুটজুতো সম্বন্ধে মজার এক গল্প আছে। অল্গার এখানে আসবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। একটু মাত্রা ছাড়িয়ে খেয়েছিলাম। আমার বাড়ীর জানালার নীচে এসে সে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে। মদের ঘোরে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একপাটি বুটজুতো আমি ওর দিকে ছুড়ে মারি। সে জানালা বেয়ে উপরে এসে বাতি জ্বালল, আর মদ খাওয়ার জন্য লাঠি দিয়ে বেশ কয়েক ঘা আমার পিঠে দমাদম মারল। এখানে এত দিন যথেষ্ট ভূরিভোজন হয়েছে। ভডকা আরও কত সুস্বাদু জিনিষ। কিন্তু, এ কি, আপনারা আবার চললেন কোথায়? চুবিকভ, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকবার ঘৃণায় থুথু ফেলে বাগানবাড়ীর বাইরে চলে এলেন, অবনত মস্তকে অধোবদনে ডুকভস্কি তার অনুসরণ করল।

উভয়েই নীরব ; তারা গাড়ীতে গিয়ে বসল, তার পর গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।

পথটা এত দীর্ঘ ও জনবিরল জীবনে আর কখনও তাদের মনে হয় নি। উভয়েই নির্ব্বাক ! ক্রোধে উত্তেজনায় সারা পথটা চুবিকভ কাঁপছিল।

জামার কলারটা উঁচু করে ডুকভস্কি মুখখানা ঢেকে বসেছিল। তার ভয় হচ্ছিল পাছে চারিদিকের এই অন্ধকার আর এই টিপ টিপ বৃষ্টি তার মুখ হতে লজ্জার কাহিনীটা টের পেয়ে বসে।

গৃহে ফিরে ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার টুটিয়েভকে তার জন্ম অপেক্ষা করতে দেখতে পেল : ডাক্তার টেবিলে বসে 'নেভা' সংবাদপত্রের পাতা উল্টাতে উল্টাতে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

বিষন্ন হাসিতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলে উঠল, "পৃথিবীতে আজ কিনা হচ্ছে, অষ্ট্রিয়া আবার উঠে পড়ে লেগেছে এবং গ্ল্যাডষ্টোনও এতে জড়িত আছেন।"

টুপীটা টেবিলের নীচে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চুবিকভ কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল, "ওহে নরাধম, আমাকে আর জ্বালিও না বলছি। হাজার বার তোমাকে বলেছি যে, রাজনীতির চর্চ্চা আমার ভাল লাগে না। এখন রাজনীতি আলোচনার সময় নয়।" তার পর ডুকভস্কির দিকে চেয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ওর দিকে সঞ্চালন করে বলে উঠল, আর তুমি যতদিন জীবিত আছ আজকের এই ঘটনা আমি ভুলব না।"

"কিন্তু ভাবুন ত, সেই সুইডেনের দেশলাই, গোড়াতেই কেমন করে আমি ধরে ফেলেছিলাম।"

"চুলোয় যাক তোমার দেশলাই ! ওটা নিয়ে তুমি গিলে খাওগে ! এখন বিদায় হও, আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি কি যে করে ফেলব তা আগে থেকে কিন্তু বলতে পারি না। তুমি আর আমার সামনে এস না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুপীটা হাতে নিয়ে ডুকভস্কি বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে সে মনে মনে স্থির করল,"আজ আমাকে পুরো-মাত্রায় মদ খেয়ে নেশায় চুর হয়ে পড়ে থাকতে হবে।" এই ভেবে সে শুঁড়ীখানার দিকে চলতে লাগল।

বাগানবাড়ী থেকে গৃহে ফিরে পুলিস সুপারের স্ত্রী বৈঠকখানায় তার স্বামীকে অপেক্ষা করতে দেখলেন।

তাঁর স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করলেন,"তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে কেন এসেছিল ?"

"তারা যে ক্লাউজভকে খুঁজে পেয়েছে তাই জানাতে এসে-ছিল। এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে তারা তাকে অবস্থান করছে দেখতে পেয়েছে, কি মজার ব্যাপার ভেবে দেখ দিকিন।"

পুলিস সুপার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার পর দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ করে বলে উঠল, "হায়, মাক ইভানিচ—মাক ইভানিচ, তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম মদ্যপান ও লাম্পট্য কখনও কারও ভাল করে না। আমি তোমাকে ঠিক এইরূপই বলছিলাম, কিন্তু তুমি তাতে কর্ণপাতও কর নি !"

অমিতাভ

শ্রীউমাপদ নাথ

এই পৃথিবীর কুলালচক্রে ভব ভবিষ্যৎ নিতি ;
সত্য এখানে জরা ও মরণ, মিথ্যা সুখ ও স্থিতি।
অনিত্য মায়া জাঁকায় আসর ; অন্ধ মোহের ঘোর
দিবালোকে পরে সাধুর সজ্জা, রাত্রে সিঁদেল চোর।
রাজার হস্তে শাসনদণ্ড, জোয়াল প্রজার কাঁধে :
উভয়ের চোখে বলদের ঠুলি—মৃত্যু দুয়েরে বাঁধে।
সেই ভবপীঠে এসেছিলে তুমি। মৃত্যু, জরা ও রোগ
দেখিলে চক্ষে মানুষেরে সদা দিতেছে কি দুর্ভোগ।
লৌকিক পথে করিলে সাধনা, বিচার করিলে মনে
কোথা সে রন্ধ্র শনির প্রবেশ ঘটে যেথা প্রতিক্ষণে।
শত জিজ্ঞাসা করিলে হাজির—একটি জবাব চাই,
দেহ তোক লয়, অন্তত তবু ছাড়িব না এই ঠাঁই।

কঠোর পণের দৃঢ়তর ছবি উপোসী অস্থিগুলি
রহিল অটল। সে চিত্র আঁকে এমন কি আছে তুলি ?
এক যুগ-কাল ক্ষয় হয়ে গেল, তুমি তবু অক্ষয়,
আসন ছাড়িলে যেদিন সেদিন দুই হাতে বরাভয়।
তপ্ত কটাহে ঢেলে দিলে তব শান্তির শীত নীর,
খুলে দিলে চোখ—সৃজিলে ধর্ম্ম, তথাগত মহাবীর !
আমরা এখনও চাই নির্ব্বাণ—জীবন-দীপের নহে,
নিত্য ক্লেশের ; লক্ষ মৃত্যু এখানের কালীদহে।
সহস্র নাগে বেষ্টিত প্রাণ, মৃত আয়ু ক্ষীয়মাণ :
অন্তরে চাহি তোমার হাতের সুদক্ষ পরিত্রাণ।
ওগো অমিতাভ, নিয়ে চলো সেই আলোকের মহাদেশে
চিত্ত যেখানে নিয়ত নীরব, আনন্দ অবশেষে।

আমরা এখনও প্রতীক্ষা করি, উঁকি দিই প্রতি ঘরে
গোপনে কোথায় আসিলে বা তুমি যুগ-নির্ব্বাণ তরে।

গান

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

নিকটতম তুমি দূরে নও
তুমি দূরে নও
তুমি দূরে নও—
হৃদয়ের প্রীতি-পুষ্পে
তুমি প্রীত হও
তুমি প্রীত হও !

বাণী তব কানে শোনা যায়
রূপ তব চোখে দেখা যায়—
স্পর্শ তব লাগে সারা গায়
কে বলে তোমা দূরে রও !

মোহে যবে রই অচেতন
জাগাইতে কত না যতন—
কত না দুখ-বেদনায়
বারে বারে কর সচেতন !

কাহারেও ছাড়িবে না যে
সকলেরে টানিবে কাছে—
ধন্য তব প্রেম দয়াময়
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরা দাও ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

১´ 0 ১´ 0
II পা্ ধা্ সা সা | সা -া সা রা I রা গা গা -া | -া -া গা রসা I
নি ক ট ত ম ০ তু মি দূ রে ন ০ ০ ও তু মি০

১´ 0 ১´ 0
সা সরা র্রা -া | -া -া সা ন্া । ধন্া ধন্া সা -া | -া -া -া -া ।
দূ রে ন ০ ০ ও তু মি দূ রে ন ০ ০ ০ ও

১´ 0 ১´ 0
সাঃ সা সা রা | গা পা পপা -মা । গা -া -া -া | -া -া গা রসা ।
হৃ দ য়ে র প্রী তি পু০ ষ্ পে ০ ০ ০ ০ ০ তু মি০

১´ 0 ১´ 0
সা রা রা -া | -া -া সা ন্া । ধন্া ধন্া সা -া | -া -া -া -া ।
প্রী ত হ ০ ০ ও তু মি প্রী ত হ ০ ০ ০ ও ০

১´ 0 ১´ 0
II { রা রা রা রা | গা পা পা পধা । ধা -া -া -া | -া -া -া -া ।
বা ণী ত ব কা নে শো না০ যা ০ ০ ০ ০ ০ য়্ ০

১´ 0 ১´ 0 [-া]
পা -র্সা না ধা | পা পগা পা মা । গা -া -া -া | -া -া -া (মা) } ।
রূ প্ ত ব চো খে০ দে খা যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

১´ 0 ১´ 0
গপা পা পা হ্মা | পা পা পা হ্মা । ধপপা -া -া -া | -া -া -মা -গা ।
স্প র্শ ত ব লা গে সা রা গা০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

১´ 0 ১ 0
গা পা মা গা | রসা -ন্া সা গরা । গা -া -া -া | -া -া -া -া I
কে ব লে তো মা০ ০ দূ রে০ র ০ ০ ০ ০ ০ ও ০

১´ 0 ১´ 0
II { সা সা সা সা | ন্া ধ্া ন্া সা । রা -া -া -া | -া -া -া -া ।
মো হে য বে র ই অ চে ত ০ ০ ০ ০ ০ ন ০

১´ 0 ১´ 0 [-া -া]
ন্‌া সা রা গা | রা গা পা মা I গা -া া -া | -া -া (-রা -া)} I
জা গা ই তে ক ত না থ ত ০ ০ ০ ০ ০ ন ০

১´ 0 ১´ 0
গা পা পা ক্ষা | পাঃ -ক্ষাঃ পা না I ধপা -া -া -া | -া -া -মা -গা I
ক ত না ছ খ ০ বে দ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

১´ 0 ১´ 0
গা পা মা গা | রা সা ন্‌ধ্‌া ন্‌া I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
বা রে বা রে ক র স০ চে ত ০ ০ ০ ০ ০ ন্‌ ০

১´ 0 ১´ 0
{ রা রা রা -া | গা পা পা পধা I ধা -া -া -া | -া -া -া -া I
{ কা হা রে ও ছা ড়ি বে না যে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0 [-া]
পা র্সা না ধা | পা পা গপা মা I গা -া -া -া | -া -া -া (-মা)} I
স ক লে রে টা নি বে০ কা ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ 0 ১´ 0
গপা পা পা ক্ষা | পা -া পা ক্ষা I ধপপা -া -া -া | -া -া -মা -গা I
ধ ন্য ত ব প্রে ম্ দ য়া ম০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

১´ 0 ১´ 0
গা পা মা গা | রা সন্‌া সা গরা I গা -া -া -া | -া -া -া -া II
হৃ দ য়ে হৃ দ য়ে০ ধ রা০ দা ০ ০ ০ ০ ০ ও ০

দিন ও রাত্রি

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

উষা এসে খুলে দেয় পূর্বাশার উদয়-তোরণ ;
রাত্রির নিথর বুকে জাগে মৃদু পুলক-কম্পন,
প্রিয়-আগমনক্ষণে উৎকণ্ঠিতা প্রেয়সীর হৃদয়ের যেন দুরুদুরু !
তার পরে হয় সুরু
সপ্তাশ্ববাহিত এক-চক্র রথে
সবিতার প্রদক্ষিণ ক্রান্তি কক্ষ-পথে।
তমস্বিনী যামিনীর যোগনিদ্রা ভেঙে যায় ;
আলোকের আঁধারে লুকায়
রাত্রির বুকের মণিগুলি ;
স্বপ্ন যাই ভুলি !
স্বপ্নাসবে অবলীঢ় মন
রূঢ় দিবালোকে দেখে সংগ্রামের কঠিন স্বপন।
অস্ফুট জ্যোতির পদ্ম একে একে দলগুলি খোলে,
বর্ণালীর সপ্তরশ্মি পরকাশে আলোকের শুভ্র-শতদলে !
নিকট নিকটতর হয়, দূর যায় আরো দূরে সরি,
নেপথ্যে রহিয়া যায় রাত্রির কণ্ঠের হার—স্নিগ্ধ শতনরী !
চক্র ঘুরে যায় ;
প্রতীচীর প্রত্যন্তসীমায়
কারা যেন আবীর ছড়ায় !
রাত্রি, দিন আর—
দুই রূপ একই সত্তার ;
গোধূলির দেহলীতে 'শুভ-দৃষ্টি' হয় দু'জনার !
সহসা ঝাঁপায়ে পড়ে লীয়মান তপনের কোলে
নিশীথিনী ঝাঁপে তারে পুঞ্জপুঞ্জ নিবিড় কুন্তলে।

দীর্ঘ-বিরহের পরে এ ক্ষণ-মিলন ;
অনুরাগে আঁকে রবি বিদায়ের রক্তিম চুম্বন !
প্রভাত-সন্ধ্যায় দেখি পিরীতির বিপরীত রীতি ;
দিনের চিতায় ঘটে সহমৃতা রাত্রির বিস্মৃতি।
দিন-রাত্রি, রাত্রি-দিন এই মত যায় আর আসে,
লুকোচুরি খেলা ভালোবাসে।
পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিয়ে ভাবি যা গিয়াছে
অখণ্ডের অন্তরেতে আছে, তাহা আছে।
জন্ম-মৃত্যু 'মান'-চিহ্ন জীবন-ছন্দের,
অন্তরা-সঞ্চারী ঘুরে শেষ হয় সমে আনন্দের !
মৃত্যু সে তো লুপ্তি নয়, জীবনের ক্ষণ-আবরণ ;
সুপ্তিতে প্রতীত হয় লুপ্তির বিভ্রম !
সাহান্তের দিন মোর অলক্ষ্য-অদূরে
অপেক্ষা করিয়া আছে মরণ-বঁধুরে।
বিদেহী বিরহী মন পাবে না কি ফিরে
মৃত্যুর পাথারে তার হারানো মণিরে ?
তিমিরের বক্ষ বিদারিয়া জ্বলিবে না আলোকের জয়,
হবে নাকি জীবনের নব অভ্যুদয় ?
নাই যদি হয় ?
অসত্তার অতলেতে জীব-সত্তা যদি পায় লয় ?
শুষ্ক এই শূন্যবাদে মন নাহি ভরে
চিত্ত-সূচী চেয়ে রয় ধরিত্রীর 'চৌম্বক-উত্তরে'।
মন মোর মরিতে চাহে না
না শুধিয়া ধরণীর স্নেহের এ দেনা।
এ মা'টিরে কোন্ প্রাণে ভুলি ?
সাধ হয় জন্মে জন্মে অঙ্গে মাখি এর পুণ্য ধূলি !

লবণ-উৎপাদন ও কুটীরশিল্প

অধ্যাপক শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস (সান্যাল)

লবণের উৎপত্তি : মানুষের নিত্য ব্যবহারের একান্ত আবশ্যক দ্রব্য-গুলির মধ্যে লবণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। নানা ক্ষেত্রে ইহার নানাবিধ প্রয়োগ ছাড়াও শরীর ধারণের জন্ম ইহা অপরিহার্য্য। মানুষ যখন হইতে কাঁচা মাংস আহারের অভ্যাস ত্যাগ করিল, তখন হইতেই তাহাকে খাদ্যের মাধ্যমে পৃথক ভাবে লবণ গ্রহণের অভ্যাস করিতে হইল। কাঁচা মাংসে প্রতি আড়াই মণে অন্ততঃ আধ সের নুণ থাকে। কাঁচা মাংস ব্যতীত শাক-সব্জী, ফল, মাটি, সাধারণ জল, সর্ব্বপ্রকারের শিলা প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই কম বেশী ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভূমণ্ডলে যে সব বস্তু অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, এলুমিনিয়ম প্রভৃতির সহিত লবণের নামও উল্লেখযোগ্য।

সাঁকোর নীচে সমুদ্রের সহিত যুক্ত খাল, অদূরে গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা

কিন্তু নানা বস্তুতে লবণের অস্তিত্ব থাকিলেও উহা কেবলমাত্র কয়েকটি উৎস হইতেই লাভজনক ভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব। সমুদ্র, লবণ-হ্রদ, লবণ-কূপ প্রভৃতির লবণোদক হইতে এবং শুষ্ক লবণ-হ্রদ (যেমন সম্বর হ্রদ) ও লবণ-পাহাড় হইতে প্রভূত পরিমাণে লবণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণ। সমুদ্রজাত লবণ সম্বন্ধে বলা যায় যে, পৃথিবীর মোট তের কোটি দশ লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী যে সমুদ্র রহিয়াছে তাহার সমগ্র নিম্নদেশ যদি সমুদ্রজাত বিভিন্ন প্রকারের লবণ* একই উচ্চতায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে ঐ স্তরের উচ্চতা দাঁড়াইবে ১৯৬ ফুট, আর উহার ১৫৫ ফুটই হইবে আমাদের সাধারণ লবণ।

লবণোদক উত্তোলনের পাম্প-গৃহ ও সঞ্চালন নালাসমূহ

বাংলার লবণ : লবণ-উৎপাদন-প্রথা ভারতের একটি প্রাচীন শিল্প। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতবর্ষ লবণে স্বাবলম্বী ছিল। শেষোক্ত সময় হইতে ইংরেজ সরকার বিলাতের লবণশিল্পের সমৃদ্ধির জন্ম লিভারপুল ও চেশায়ার কোম্পানীগুলিকে ভারতে নুণ আমদানী করিতে উৎসাহ দিতে থাকে এবং তদবধি ভারতীয় নুণের উপর নিয়মিত শুল্কভার চাপাইয়া এই লবণশিল্পকে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথে আগাইয়া দেয়।

ভারতবর্ষ পুনরায় ১৯৫৩ সনে লবণ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভারত ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সনে কিছু কিছু নুণ নেপাল, পূর্ব্ব-পাকিস্থান, জাপান এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকায় রপ্তানি করিতেও সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বার্ষিক প্রায় সাত কোটি মণ নুণ প্রয়োজন হয়। সোডা-অ্যাস, কষ্টিক-

---

* সমুদ্রের জলে ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট, ক্যালসিয়ম সালফেট, ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম সালফেট, পটাসিয়ম ক্লোরাইড, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিকেই রসায়ন-শাস্ত্রে লবণ বলা হয়—খাদ্যের সহিত যে নুণ গ্রহণ করা হয় তাহা সোডিয়ম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ নামে পরিচিত।

সোডা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্ত নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া ওঠায় ফলে ইহার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানে, ক্ষুদ্র বৃহৎ যে-কোন আয়তনে লবণ প্রস্তুত প্রক্রিয়া জীবিকার্জনযোগ্য একটি লাভজনক শিল্প। কিন্তু এই শিল্পে বঙ্গদেশ এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য ও বিবিধ শিল্পের প্রয়োজনে বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ মণ নুণ ব্যবহৃত হয়; ইহার মধ্যে মাত্র দুই লক্ষ মণ বাংলা দেশে প্রস্তুত হয়। ইহার পর দুর্গাপুরে সোডা-অ্যাস কারখানার কাজ সুরু হইলে অতিরিক্ত পনর লক্ষ মণ নুণের প্রয়োজন হইবে। এই মোট পঁয়ষট্টি লক্ষ মণ লবণ পশ্চিমবঙ্গেই প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। লবণ-শিল্পে বাংলার একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, এই কারণে লবণ-প্রস্তুত-প্রণালীর, বিশেষ করিয়া সমুদ্রের লবণোদক সম্পর্কীয় প্রক্রিয়ার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

লবণ প্রস্তুতের সাধারণ প্রণালী : পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ

পাম্পের সাহায্যে লবণোদক উঠাইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেরণ

দেশসমূহ অল্পাধিক লবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। লবণ উৎপাদনে বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হয় :

(১) সমুদ্র, লবণ-হ্রদ ও লবণ-কূপের লবণোদক এবং লবণাক্ত মাটির দ্রাবণযুক্ত জল হইতে সূর্য্যতাপে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া।

(২) লবণোদক কৃত্রিম উপায়ে আগুন বা ষ্টীমের সাহায্যে বাষ্পীভবন অথবা 'শূন্যে বাষ্পীভবন' (evaporation in vacuum) প্রক্রিয়া। শেষোক্ত প্রথা সাধারণতঃ বিশুদ্ধ নুণ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(৩) লবণোদক হিম প্রয়োগে জমাটকরণ প্রক্রিয়া। লবণোদক সম্পৃক্ত জমাইলে নিম্নতাপমাত্রায় অধিকাংশ জল বরফে পরিণত হয় এবং সম্পৃক্ত লবণোদক পৃথক হইয়া পড়ে; পরে এই সম্পৃক্ত লবণোদক হইতে কৃত্রিম তাপপ্রয়োগে লবণ প্রস্তুত হয়—এই প্রথায় উত্তর ইউরোপের অতিশয় শীতপ্রধান দেশগুলিতে নুণ প্রস্তুত হয়।

(৪) পাহাড়ের লবণ-খনি হইতে সাধারণ উপায়ে খনন-প্রক্রিয়া (যেমন সৈন্ধব লবণ—ইহার খনি পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত সুলেমান রেঞ্জে অবস্থিত); অপর এক ক্ষেত্রে, প্রথমে লবণ-পাহাড়ের মধ্যে নলদ্বারা জল প্রবেশ করাইয়া লবণোদক সংগ্রহ করা হয়, পরে কৃত্রিম তাপ প্রয়োগে উহা হইতে লবণ প্রস্তুত করা হয় (হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি পাহাড় অঞ্চলে, যেখানে নুণ পাহাড়ে মাটির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, সেই সব স্থানে এই পদ্ধতিতে নুণ সংগৃহীত হয়—এই প্রথায় গুণে এবং পরিমাণে নুণ ভাল হয় না)।

সমুদ্র-লবণ উৎপাদনে আবশ্যক ব্যবস্থা : পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র সুন্দরবন ও কাঁথির সমুদ্র-উপকূলই লবণ উৎপাদনের উপযোগী স্থান। কাঁথি উপকূলে মাত্র দুইটি (পুরুষোত্তমপুরে দি গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী ও দাদনপাত্রবাড়ে দি বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী) এবং সুন্দরবন অঞ্চলে একটি (শিশিরগঞ্জে পাইওনীয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী) উল্লেখযোগ্য কারখানা। এই সব কারখানায় সূর্য্যতাপে সমুদ্রের লবণোদক বাষ্পীভূত করিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়; ইহাদের নুণ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নুণ অপেক্ষা উচ্চ স্তরের এবং খাদ্যের সহিত গ্রহণের খুব উপযোগী। অবশ্য কিছু-সংখ্যক লোক মাত্র কয়েক একর জমি লইয়া ক্ষুদ্রাকারে সূর্য্যতাপে সমুদ্রের লবণোদক সংগ্রহ করিয়া ঘরে আগুনের জ্বালে নুণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় প্রস্তুত নয় বলিয়া অনেকের নুণ নিম্নস্তরের হইয়া পড়ে। সূর্য্যতাপে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লবণ উৎপাদনের কারখানায় জন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজন :

(১) নিয়মিত ভাবে কম খরচে সমুদ্রের জল সরবরাহের ব্যবস্থা—ইহার জন্ত কারখানাটি সমুদ্রের যথাসম্ভব নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনটি পন্থায় লবণোদক সংগৃহীত হইয়া থাকে।

(ক) স্বল্পপরিসর খালের সাহায্যে কোটালের সময় সমুদ্রের জল কারখানার রিজার্ভার অংশে স্লুস গেট দ্বারা প্রবেশ করাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

(খ) সমুদ্র হইতে কারখানার ধার দিয়া খাল লইয়া গিয়া প্রতি জোয়ারের সময় (সাধারণ জোয়ার-ভাটা প্রত্যহই হয়) পাম্পের সাহায্যে প্রয়োজনমত লবণোদক উঠাইয়া লইতে হয় (কোম্পানী অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক)।

(গ) জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল আসে—এমন স্থান পর্য্যন্ত পাইপ লাইন লইয়া গিয়াও জল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

(২) একটি বিস্তীর্ণ উন্নত জায়গা, ইহার কিছু অংশে থাকে আপিস, গুদাম (স্থায়ী গুদামঘরটি সমুদ্র-উপকূল হইতে দূর অঞ্চলে নির্ম্মাণ করাই বাঞ্ছনীয়), কয়কচ লবণ চূর্ণ করার যন্ত্র ইত্যাদি; বাকি অধিকাংশ স্থান 'আল' দিয়া ঘেরা কতকগুলি ক্ষেত্র, নালা, পথ এবং বাঁধে বিভক্ত থাকে। ক্ষেতের 'উপরিতল', নালা এবং আলের ধারগুলি এমন বদ্ধ ধারা তৈয়ারী হওয়া আবশ্যক যেন বিভিন্ন জমির

মধ্য দিয়া গমনকালে লবণোদক কোন অবস্থাতেই জমিতে বিশেষ শোষিত হইয়া না যায়। আঠালো মাটির সহিত লবণোদক মিশ্রিত করিয়া মথিয়া লইলে উহা দ্বারা লবণোদক-প্রবাহের স্থানগুলিতে আস্তরণ দেওয়া যায়। বিভিন্ন কারখানায় এই ব্যবস্থায় আস্তরণ দিয়া ভাল ফল পাওয়া যাইতেছে।

লবণ প্রস্তুতের একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় যে ক্ষেত্রগুলি প্রয়োজন হয়, তাহা তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত থাকে:

(ক) রিজার্ভয়ার: ইহা জল ধরিয়া রাখার জন্য বৃহদায়তনের একটি আলবন্দী ক্ষেত্র। এখানে সমুদ্র হইতে উত্তোলিত লবণোদক ১৮ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীরতায় সঞ্চয় করা হয়; উহা একটা নির্দ্দিষ্ট ঘনত্বে না আসা পর্য্যন্ত এখানেই আবদ্ধ থাকে। লবণোদকের ভাসমান মলিন বস্তুগুলি এখানে তলায় থিতাইয়া পড়ে।

(খ) কনডেন্সার: ইহা কয়েকটি আলবন্দী ক্ষেত্রের সমষ্টি; ইহার মোট ক্ষেত্রফল সাধারণতঃ রিজার্ভয়ার অংশ অপেক্ষা বেশী। ইহার মধ্য দিয়া রিজার্ভয়ারে নির্দ্দিষ্ট ঘনত্বপ্রাপ্ত লবণোদক প্রায় ৮ ইঞ্চি গভীরতায় সঞ্চালিত হয়; আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হইবার কালে বাষ্পীভবনের ফলে লবণোদকের ঘনত্ব বাড়িতে থাকে।

আঠালো মাটি ও লবণোদক দলিয়া ক্রিষ্টালাইজার-ক্ষেত্রের উপরিতল প্রস্তুত করা হইতেছে

(গ) ক্রিষ্টালাইজার: ইহা একটি আলবন্দী ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে, কনডেন্সারে নির্দ্দিষ্ট ঘনত্বপ্রাপ্ত লবণোদক প্রায় দুইইঞ্চি গভীরতায় রক্ষিত হয়। এখানে লবণোদক আরও বাষ্পীভূত হয় এবং লবণ ছোট বড় দানার (করকচ) শেষদ্রব (mother liquor) হইতে ধীরে ধীরে পৃথক হইতে থাকে। লবণ জমা হইবার পর শেষদ্রব নিঃশেষে বাহির করিয়া দিবার জন্য ক্ষেত্রটি এক দিকে একটু ঢালু করা থাকে।

ক্রিষ্টালাইজারের গঠনই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপরিতল বা ধার দিয়া শোষণদ্বারা যাহাতে লবণোদকের অপচয় না ঘটে তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। এখানে সম্পৃক্ত লবণোদকের অপচয় ঘটিলে সময়ের এবং পূর্ব্বাংশে অর্থব্যয়ের তুলনায় লবণ প্রস্তুত হইবে কম। বিশেষজ্ঞরা শোষণজনিত অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে অক্সিক্লোরাইড সিমেন্ট (ইহা ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড ও তামার গুঁড়ার সাহায্যে প্রস্তুত হয়) ক্রিষ্টালাইজারের উপরিতল নির্ম্মাণের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু বলিয়া অনুমোদন করেন।

(৩) পথ ও বাঁধ: বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিদর্শন, সংস্কার, ক্রিষ্টালাইজার হইতে লবণ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কতকগুলি প্রশস্ত (প্রায় চার ফুট) পথের প্রয়োজন হয়। সমগ্র কনডেন্সারটির মধ্যে মধ্যে আবার কতকগুলি অল্পপরিসর (প্রায় আড়াই ফুট) বাঁধ থাকে, এইগুলিও পরিদর্শন এবং সংস্কারকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাঁধগুলির প্রত্যেকটির এক এক প্রান্তের কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে, যাহাতে লবণোদক আঁকা-বাঁকা পথে কনডেন্সারের বিভিন্ন ক্ষেতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সহজে বাষ্পীভূত হইতে পারে। পথ ও বাঁধগুলির ধার ক্রমশঃ নীচের দিকে ঢালু থাকিলে বিভিন্ন ক্ষেতের লবণোদকের ঢেউ উহাদের ক্ষতি করিতে পারে না। স্থানে স্থানে এই পথ ও বাঁধগুলি বিভিন্ন ক্ষেতের আবেষ্টনী বা আলের কাজও করে।

(৪) নালা: ইহাদের সাহায্যে প্রয়োজনমত লবণোদক রিজার্ভয়ারে, সেখান হইতে কনডেন্সারে অথবা সেখান হইতে ক্রিষ্টালাইজারে প্রেরণ করা হয়। ইহা আবার লবণ পৃথক হইবার পর শেষদ্রবকে ক্রিষ্টালাইজার হইতে বাহির করিয়া দূরে পাঠাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক পৃথক নালা থাকে।

(৫) ঘনত্বমাপক: 'বমে' এককে (Degree Baume—তরল পদার্থের ঘনত্ব মাপার জন্য এক ধরণের একক) লবণোদকের ঘনত্ব মাপার জন্য ল্যাক্টোমিটারের ন্যায় ইহা একটি কাঁচের যন্ত্র। লবণ-শিল্পে ইহা একটি সরল অথচ অতি-প্রয়োজনীয় যন্ত্র। সামান্য নির্দ্দেশ পাইলে নিরক্ষর লোকও ইহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়।

লবণ প্রস্তুতের একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে আবশ্যক মোট জমির পরিমাণ নির্ভর করে ক্রিষ্টালাইজারের ক্ষেত্রফলের উপর। ক্রিষ্টালাইজার ক্ষেত্রটি প্রস্থে ৩৫ ফুট হইতে ৪০ ফুটের মধ্যে হইলে উহার উভয় পার্শ্বের পথের উপর দাঁড়াইয়া লম্বা হাতলযুক্ত কাঠের পাটার সাহায্যে অনায়াসে লবণ সংগ্রহ করা যায়—ক্রিষ্টালাইজারের জমিতে দাঁড়াইয়া লবণ সংগ্রহ করিলে উহার উপরিতলের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে; দৈর্ঘ্যের পরিমাণ মোট জমির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লওয়া হয়। যদি ক্রিষ্টালাইজারের ক্ষেত্রফল ৩৫ ফুট × ৪৫ ফুট অর্থাৎ ১৫৭৫ বর্গফুট লইতে হয়, তাহা হইলে রিজার্ভয়ার কনডেন্সার অংশে অন্ততঃ উহার দশ গুণ অর্থাৎ ১৫,৭৫০ বর্গফুট (আবহাওয়া ভেদে এই জমির পরিমাণ কম বা বেশী হইতে পারে) জায়গা থাকা প্রয়োজন। আবার রিজার্ভয়ারের তুলনায় সাধারণতঃ কনডেন্সার অংশে জায়গা রাখা হয় বেশী (আদর্শ ব্যবস্থায় রিজার্ভয়ার অংশে তিন ভাগ এবং কনডেন্সার অংশে প্রায় চার ভাগ)।

প্রকৃত প্রণালী : বৎসরের সকল ঋতু লবণ প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী নহে। বাংলা দেশে সাধারণতঃ ডিসেম্বর হইতে জুনের

একশত একর জমিতে কারখানা নির্ম্মাণের নক্সা

মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্র সাড়ে ছয় মাস কাল (যদি বর্ষা আগে সুরু না হয়) লবণ প্রস্তুতের অনুকূল সময়। কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে স্থানে স্থানে আট মাসেরও বেশী সময় ব্যাপী নুণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কারণ প্রথমতঃ, বাংলার বর্ষা হয় বেশী; দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা প্রভৃতি নদনদী হইতে বিপুল পরিমাণে 'মিঠা জল' সমুদ্রে মুক্ত হওয়ার জন্ত বাংলা উপকূলে সমুদ্র-জলের লবণের ভাগ অন্যান্ত স্থান অপেক্ষা কম দাঁড়ায়—শেষোক্ত কারণে বাংলা উপকূলের লবণোদকের স্বাভাবিক ঘনত্ব সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে কাজে লাগাইবার মান অপেক্ষা নীচে থাকে।

নবেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথমে সমুদ্র-জল যখন ২°বমে'তে পৌঁছায়, তখন উহা পাম্পের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে রিজার্ভারে সঞ্চয় করা হয়। এখান হইতেই সুরু হয় লবণ প্রস্তুতের প্রকৃত প্রণালী। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া লবণোদক সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—প্রথমতঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লবণোদকের একটা বিস্তৃত উপরিতল প্রাপ্তির জন্য বাষ্পীভবন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘনত্ব লাভ হেতু লবণ ব্যতীত ক্যালসিয়ম কারবনেট, ক্যালসিয়ম সালফেট প্রভৃতি লবণোদকের অন্যান্ত দ্রব্যগুলি পৃথক হইয়া পড়ে।

রিজার্ভারে সঞ্চিত অবস্থায় লবণোদকের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হইতে থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যে উহার ঘনত্ব বাড়িয়া যায়। ঘনত্ব যখন প্রায় ১০° বমে'তে আসে, তখন হইতে ক্যালসিয়ম কারবনেট নীচে জমিতে থাকে; এই বস্তু ক্ষেত্রের উপরিতলকে দৃঢ় করে, ফলে জমিতে লবণোদকের শোষণ হ্রাস পায়। লবণোদক দশ ডিগ্রী ঘনত্ব প্রাপ্ত হইলে উহা কনডেন্সারে সঞ্চালিত হয়।

লবণোদক কনডেন্সারের মধ্যে প্রবেশ করার পর হইতে বাঁধযুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হইবার কালে উহার বাষ্পীভবন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং ঘনত্ব বাড়িতে থাকে। প্রায় ১৭° বমে'তে ক্যালসিয়ম কারবনেট সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়ে। এই ঘনত্বে আবার দেখা যায় ক্যালসিয়ম সালফেট ধীরে ধীরে জিপসমরূপে তলায় জমা হইতেছে। ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে জিপসম জমিতে থাকে। এখানে ঘনত্ব ২২° না হওয়া পর্যন্ত লবণোদক আবদ্ধ থাকে। কোথাও কোথাও কনডেন্সারের দুই বা তিন অংশে ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রিজার্ভারের ন্যায় কনডেন্সারের ক্ষেত্রও উক্ত কারবনেট এবং জিপসমের সাহায্যে দৃঢ় হইতে থাকে। জিপসম একটি প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক দ্রব্য; কিন্তু জমি প্রস্তুতের সুবিধার্থে উহা প্রথম কয়েক বৎসর সংগ্রহ না করাই বাঞ্ছনীয়। লবণোদক বাইশ ডিগ্রীতে পৌঁছিলে উহা ক্রিষ্টালাইজারে প্রেরিত হয়।

লবণোদকে লবণের সহিত অন্যান্ত দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে বলিয়া ক্রিষ্টালাইজারে আসার পর লবণোদক সাধারণতঃ ২৩.৫° বমে'তেই সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে; এই অবস্থায় লবণের দানা শেষদ্রব হইতে কেবল পৃথক হইতে আরম্ভ করে। ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে লবণ জমা হইতে থাকে, উহার দানাও ক্রমে বড় হইয়া কাঁকরচরূপে দেখা দেয়; এই সঙ্গে কিছু কিছু জিপসমও জমিতে থাকে। লবণ শেষদ্রব হইতে ত্রিশ ডিগ্রীর ঊর্দ্ধেও পৃথক হয়, কিন্তু কোন ক্রমেই ২৯.৮ ডিগ্রীর ঊর্দ্ধে ক্রিষ্টালাইজারে লবণ জমিতে দেওয়া

সমীচীন নহে। কারণ এই সময় হইতে ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়ম সালফেট প্রভৃতি দ্রব্য শেষদ্রব হইতে পৃথক হইয়া লবণের সহিত নীচে পড়িতে থাকে; ঘনত্ব আরও বাড়িতে থাকিলে উক্ত বস্তুগুলির পরিমাণও বাড়িতে থাকে; আহার্য্য নুণের সহিত অধিক পরিমাণে এই বস্তুগুলির বিদ্যমানতা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অবশ্য সাধারণ নুণের মধ্যে জিপসম ও উক্ত দ্রব্যগুলি কিছু পরিমাণে থাকিয়াই যায়। কাজেই ২৯'৮° হইলেই শেষদ্রব কুষ্টালাইজারের বাহিরে সরাইয়া দিতে হয়।

শেষদ্রব হইতে স্পর্শমুক্ত, পরিষ্কার করকচ নুণ সংগ্রহ করিতে হইলে কুষ্টালাইজার হইতে শেষদ্রব বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় উহাতে সম্পৃক্ত (প্রায় ২৩°) লবণোদক প্রেরণ করিতে হয়। এই সম্পৃক্ত লবণোদকের উপস্থিতিতে পূর্ব্বের লবণ দ্রবীভূত হয় না, উপরন্তু কাঠের পাটার সাহায্যে লবণ-সংগ্রহের সময় উহা ধৌত এবং পূর্ব্বের শেষদ্রব হইতে স্পর্শমুক্ত হইয়া উঠে। লবণ প্রস্তুত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি দ্বারা কুষ্টালাইজারে পর পর কয়েকবার লবণ জমাইয়া পরে উপর উপর হইতে তুলিয়া লইলেও নির্ম্মল করকচ লবণ পাওয়া যায়। সংগৃহীত করকচ কয়েক দিন কুষ্টালাইজারের ধারে পথের উপরে শুকাইয়া করকচ চূর্ণ করার যন্ত্রে পাঠাইতে হয় (কুটীর-শিল্পে একটি সিমেন্ট-করা স্থানে ছোট লোহার রোলারের সাহায্যে নুণ চূর্ণ করা যাইতে পারে); সেখানে করকচ চূর্ণ হইলে উহা গুড়া নুণরূপে গুদামে সঞ্চিত হয়।

কুষ্টালাইজারে কাঠের পাটার সাহায্যে লবণ সংগ্রহরত একজন শ্রমিক

যে শেষদ্রব কুষ্টালাইজার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে আর একটি পৃথক কুষ্টালাইজারে পুনরায় বাষ্পীভবন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, এপসম সল্ট পটাসিয়ম ক্লোরাইড প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যও প্রস্তুত করা যায়। ত্রিবাঙ্কুর, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি কতিপয় স্থানে কোন কোন সংশ্লিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

কাঁথি অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের কয়েকটি বাস্তব তথ্য পরিবেশন করিলে বিষয়টিতে আর একটু আলোকপাত করা হইবে। কাঁথির গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী সমুদ্র হইতে দেড় মাইল দূরে ৮০ একর (মোট জমি ১২৫ একর) উন্নত জায়গায় লবণ প্রস্তুত করিতেছে। কারখানার ধার দিয়া একটি খাল গিয়াছে; প্রয়োজনীয় লবণোদক ৩০ ও ২২ অশ্ব-শক্তির দুইটি পাম্পের সাহায্যে উঠাইয়া লওয়া হয়। মোট উন্নত জায়গায় ৬৮ একর স্থানে একটি কুষ্টালাইজার এবং রিজার্ভয়ার-কনডেন্সার মিলাইয়া দশটি রাখা হইয়াছে। ডিসেম্বর হইতে প্রায় ছয় মাস এখানে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নুণ প্রস্তুত হয়। লবণ তৈরির কয়েক মাস ষাট-পঁয়ষট্টি জন শ্রমিক
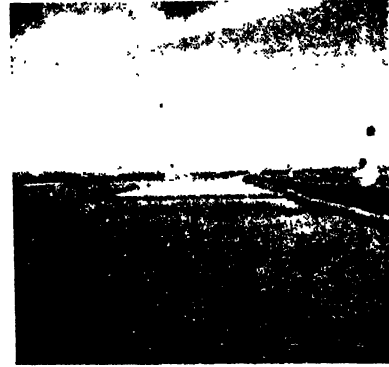
মৃত্তিকানির্ম্মিত একটি কুষ্টালাইজারের স্থানে স্থানে সংগৃহীত লবণের স্তূপ

কাজ করে। উৎপন্ন লবণের পরিমাণ প্রতি বৎসর বাড়িতেছে—১৯৫৪ সনে প্রস্তুত হইয়াছে ২৩,০০০ মণ, ১৯৫৫ সনে ৩২ ০০০ মণ—কোম্পানী আশা করেন, তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে ৪০,০০০ মণ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন। প্রতি মণ নুণের উৎপাদন-মূল্য দাঁড়ায় দেড় টাকা, শুল্ক দিতে হয় মণপ্রতি দুই আনা, আর বিক্রয় করা হয় প্রতি মণ দুই টাকায়। সমস্ত নুণ কাঁথি অঞ্চলেই কাটতি হইয়া যায়। এখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নুণ প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু রিজার্ভয়ার ও কনডেন্সার আদর্শ ব্যবস্থা অনুযায়ী সাজানো হয় নাই, আর সংশ্লিষ্ট কোন রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ধারের ব্যবস্থাও নাই।

অপর একটি কারখানায় কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে মাত্র আড়াই একর জায়গায় প্রথম বৎসর ৭০০ মণ এবং দ্বিতীয় বৎসরে (মাত্র পাঁচ মাসে) প্রায় ১,৩০০ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি—সূর্য্য-তাপে লবণ প্রস্তুতের মোটামুটি প্রণালী হইলেও সময় এবং আর্থিক ব্যয়ের অনুপাতে লবণের পরিমাণ নির্ভর করে কতকগুলি বাহ্যিক অবস্থার উপর। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, বায়ুর গতিবেগ, লবণোদকের উপরিতলের মুক্ত ক্ষেত্রফল প্রভৃতি বাষ্পীভবনের সাধারণ নীতি ব্যতীত লবণোদকের প্রাথমিক ঘনত্ব, লবণোদক সরবরাহের ধারাবাহিকতা, বারিপাত, ভূমির দুর্ভেদ্যতা, বন্যা ও ধূলার ঝড় হইতে রক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণগুলির দ্বারা লবণের উৎপাদন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একটি কারখানা স্থাপনে প্রথম অবস্থায় কিছু কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন হয় ; এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সরকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুন্দরবন অঞ্চলে সূর্য্য-তাপ ভিন্ন কৃত্রিম তাপের সাহায্যে ও সমুদ্রের লবণোদক হইতে লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেখানে সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিলে কম খরচে লক্ষ লক্ষ মণ ঝোপঝাড়ের কাঠ যোগাড় হয়। সেখানে আগুনের তাপ ও লবণোদকের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করিয়া মোটামুটি ভাল নুণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে সব অঞ্চলে জমি এবং কাঠ কোনটারই প্রাচুর্য্য নাই সেখানে কাঠের মিতব্যয়িতার জন্য আয়ত্তাধীন জমির মধ্যে লবণোদকের ঘনত্ব বাষ্পীভবনের সাহায্যে কিছুদূর বাড়াইয়া লইয়া, পরে বড় বড় পাত্রে কৃত্রিম তাপ-প্রয়োগে লবণোদক সম্পৃক্ত করিয়া উহা হইতে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে (Burma Process)।

যন্ত্রে করকচ চূর্ণ করার প্রক্রিয়া পরীক্ষারত কয়েক জন ছাত্র

লবণের ব্যবহার : লবণের ব্যবহার নানাবিধ। সংক্ষেপে, ইহা পাকস্থলী, রক্ত প্রভৃতির মধ্যে নানা ক্রিয়া সম্পাদনদ্বারা শরীরের স্বাভাবিক সজীবতা বজায় রাখে ; গভীর উত্তপ্ত খনিতে কিংবা কারখানার অত্যধিক গরম স্থানে তাপজনিত মাংসপেশীর আকুঞ্চন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহা জলের সহিত ব্যবহৃত হয় ; ইহা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অপূর্ণতাজনিত কতিপয় গলগণ্ড দমনে পটাসিয়ম আইয়োডাইডের সহিত ব্যবহৃত হয়। খাদ্য-সংরক্ষণ-প্রক্রিয়ায়, যেমন মৎস্য, মাংস, মাখন, পিষ্ট-ফল, তরিতরকারি প্রভৃতি লবণ প্রয়োগে সংরক্ষিত হয়।

লবণ হইতে সোডা-অ্যাস, কষ্টিক-সোডা, ক্লোরিন, সোডিয়ম-সালফেট প্রভৃতি বহু রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে ; ইহাদের প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। চামড়া ট্যান করার কাজে, সাবান প্রস্তুতে, মাটি ও চীনা-মাটির পাত্রে চিক্কণ-লেপ (glaze) প্রয়োগে এবং বস্ত্রাদি রঞ্জনে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

লবণের আধুনিক প্রয়োগ দেখা যায়, কৃষিক্ষেত্রে কতিপয় সব্জী ও ফলের চাষে সার হিসাবে ব্যবহারে, এবং কাঠ 'পরিপক্ব-প্রক্রিয়া' (seasoning) ও রাস্তা নির্ম্মাণ বিষয়ক গবেষণাকার্য্যে।

করকচ চূর্ণ করার যন্ত্র হইতে চূর্ণীকৃত লবণ নামিয়া আসার দৃশ্য

কুটীর-শিল্পরূপে লবণ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা : লবণের বহুবিধ ব্যবহার এবং বাংলা দেশে লবণ উৎপাদনে বিরাট ঘাটতি থাকায় বাংলার সমুদ্র-উপকূলে লবণশিল্পের প্রভূত সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুন্দরবনে এবং কাঁথি অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের জন্য সরকারের বহু খাস-জমি পতিত আছে (সুন্দরবন অঞ্চলে ৪২০০ একর এবং কাঁথির উপকূলভাগে ৫৬০০ একর জায়গা এখনও অনুন্নত রহিয়াছে)। সরকারী হিসাব দেখা যায়, ইহার প্রতি একর জায়গা উন্নত করিতে ৬০০৲ টাকার মত প্রয়োজন হয় (ইহা অপেক্ষা কম খরচে বেশী জমি উন্নত করার সম্ভাবনাও রহিয়াছে)। শোনা যায়, সরকার এই জমিগুলি উন্নত করিয়া লবণ উৎপাদনের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন ; প্রয়োজনীয় লবণোদক সরবরাহের ব্যবস্থাও সরকার হইতে করা হইবে বলিয়া জানা যায়।

কিন্তু যাঁহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ব্যক্তিগত অথবা সমবায়-প্রচেষ্টায় কায়িক পরিশ্রম দ্বারা লবণ উৎপাদনের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের এই পরিকল্পনায় কোন ব্যক্তি মাত্র কয়েক একর জমি লইয়াও সাধারণ কৃষিকার্য্যের তুলনায় অনায়াসে কুটীর-শিল্প হিসাবে নুণের চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করিবেন। এই পরিকল্পনায় বাংলার আবশ্যক মোট ৬৫ লক্ষ মণ লবণই প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য কাঁথি অঞ্চলে বেসরকারী জমিও উন্নত করিয়া কুটীর-শিল্পের আয়তনে লবণ উৎপাদনের সুযোগ রহিয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর লবণ উৎপাদন বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১) অনুযায়ী গ্রামবাসীদিগকে লবণ উৎপাদনে যে সুযোগ
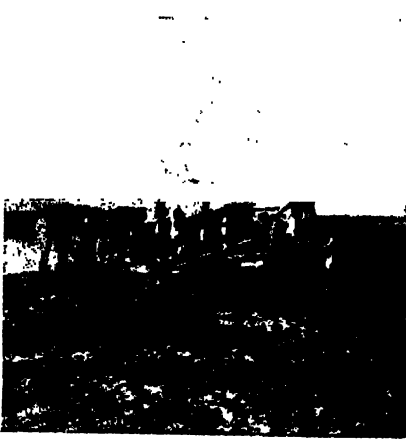
নৌকায় লবণ বোঝাই করার দৃশ্য। এই লবণ বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গার মধ্য দিয়া কলিকাতা অঞ্চলে চালান দেওয়া হয়

দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বর্ত্তমান সরকারের নীতি অনেক উদার। উক্ত চুক্তিতে লবণ উৎপাদনের স্থানগুলির নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকেই শুধু লবণ প্রস্তুত ও উহা সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হইত। কিন্তু এই সামান্ত সুযোগও ছিল আবার নানা বাধানিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বগ্রামের বাহিরে লবণ বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল; উহা পদব্রজে ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে এক স্থান হইতে

সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী আবহাওয়াজ্ঞাপক মানমন্দির

অপর স্থানে বহন করা চলিত না। ভারত সরকারের নূতন নীতি অনুযায়ী নিজ অধিকারভুক্ত দশ একর পর্য্যন্ত জমিতে যে-কোন ব্যক্তি অবাধে, বিনা শুল্কে এবং বিনা লাইসেন্সে লবণ প্রস্তুত করিতে পারেন—উৎপন্ন লবণ সঞ্চয়, পরিবহন এবং বিক্রয়ের বেলায়ও কোন বাধা-নিষেধ নাই। সরকারের এই নীতি কুটীর-শিল্পে লবণ উৎপাদন ব্যাপারে খুবই উৎসাহোদ্দীপক

সিমেণ্ট-নির্ম্মিত ক্রিষ্টালাইজারে লবণ-সংগ্রহ

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, বঙ্গোপসাগরের ঝটিকাপ্রবাহে বাংলার সমুদ্র-উপকূল মধ্যে মধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে, ফলে এখানকার লবণশিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়। কিন্তু ইহাতে পশ্চাৎপদ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কারণ নাই। এই অবস্থায় সরকারী সাহায্যে বা ঋণগ্রহণ দ্বারা পুনরায় কাজ আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব। সদিচ্ছা লইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙালী যেখানেই শ্রমশীলতা প্রদর্শন করে, সেখানেই তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ইহা অবিসংবাদী সত্য।*

* প্রবন্ধের তথ্যগুলি (১) লবণ বিশেষজ্ঞ কমিটির ১৯৫০ সনের রিপোর্ট, (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-সংস্থা, (৩) কারিগরী সাহায্যকারী কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়রের আপিস এবং (৪) দি গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর কারখানা হইতে সংগৃহীত।

আলোকচিত্রগুলি গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী ও বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

করঙ্কবাহী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বহুকাল পরে সেদিন প্রভাতে
প্রথম নয়ন মেলি
মনে হ'ল আজ দেখে নিই ভাল করে
ফেলে-আসা দিন, রাত্রি, দিনের শেষে।
আজ মনে পড়ে কদাচ কখনো
চমক লেগেছে হঠাৎ হাওয়ার ডাকে,
চোখে মুখে আলো পড়েছে কখনো
ললিতে কঠোরে অপরূপ সূর্যের।
বনে বনে মন ছুটেছে কখনো,
সুগন্ধঘন ফুলের কেয়ারি হতে
দু'একটি ফুল তুলিয়াছি আনমনে।
সে ফুল কখন ঝরিয়া গিয়েছে প্রিয়ার কবরী হতে
কিছু ত পড়ে না মনে।
পূর্ণিমারাতে অঢেল জ্যোৎস্না
অমাবস্যার নীরন্ধ্র কালো রাতি
কখন এসেছে কখন গিয়েছে চলে
কিছু আজ মনে নাই,
মনে নাই মোর কণ্টকবনে কুসুমচয়নে এসে
শোণিতলেখায় কার প্রিয় নাম
লিখে নিয়েছিনু বুকে;
কোন নিরুপমা দিয়েছিল হাতে
তার জীবনের প্রথম ফুলের কুঁড়ি।

আজ মনে হয় যেন
স্বপ্নের ঘোরে ছিনু এতদিন
সে স্বপ্ন যেন আধ-আধ মনে পড়ে—
মনে পড়ে যেন এতকাল আমি ছিলাম ঘুমের দেশে
সেথা ঘুম ঘুম সবার নয়ন
চোখে মুখে আঁকা চেনা ও অচেনা ছবি,
সে ছবি তখন ছিল না আমার চোখে
ছিল না'ক তার সুখশিহরণ দেহে
ছিল না আমার মনের গোপন কোণে
কোনো অভিলাষ সুখমিলনের
বিরহ-কাতর ব্যথার বিহ্বলতা।
ছিল না আমার স্বপ্নে কি জাগরণে
ইহকাল পরকাল;
এ জগৎ হতে দূরান্তরের আর এক জগতে যেন
চলেছিনু আমি চির পথিকের করঙ্ক বহি হাতে;
কৃপণের ধন রেখেছিনু তাতে সাজাইয়া সযতনে
অনেক দিনের পথে পথে চাওয়া
অনেক পাওয়ার অমূল্য ধনগুলি;
আজি ঘুম ভেঙ্গে প্রথম আলোকপাতে
দেখিনু অবাক হয়ে
মুঠি মুঠি সোনা সূর্যকিরণে
মুগ্ধ নয়নে আলোর ঝিলিক হানে।
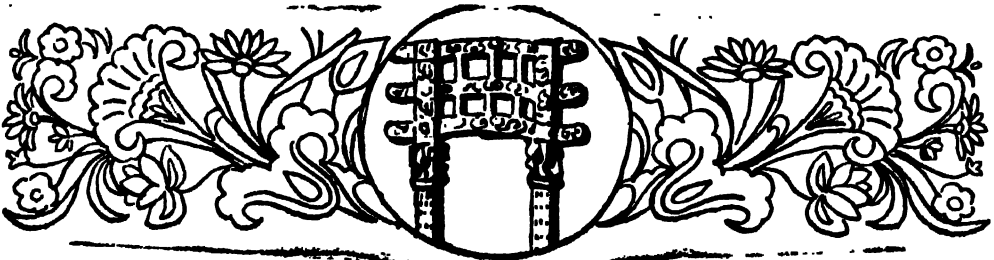
অগ্নিসদৃশ সৎপুরুষ তিলক

বিনোবা

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

সৎপুরুষ দুই প্রকারের। এক হইতেছে, সূর্যের মত আলো দান করিয়াও তাঁরা অলিপ্ত থাকেন, কাহারও উপর আক্রমণ নাই। তাঁর আলোর ব্যবহার লোকে যেভাবেই করুক, তার পাপ-পুণ্যের ভাগী সূর্য নয়; কিন্তু আলো তাঁর সকলের পক্ষে সমান লাভজনক। দ্বিতীয় হইতেছে—উনানে প্রকাশ আগুনের তুল্য, তাঁহারা রান্নার কাজে সহায়তা করেন। সূর্য ব্যাপক। অগ্নি বিশিষ্ট। সূর্য ভাত রাঁধে না। সেবার রূপে অগ্নি এরূপ কার্য করিয়া থাকে। দুইয়েরই আলো আছে, উষ্ণতা আছে। কিন্তু একের মুখ্য ধর্ম আলো আর অপরের মুখ্য ধর্ম উষ্ণতা। এই যুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস সূর্যসদৃশ সৎপুরুষ ছিলেন আর তিলক ছিলেন অগ্নিসদৃশ সৎপুরুষ। অগ্নির মত সেবাকারী সৎপুরুষের স্মৃতি আত্মীয়ের স্মৃতিরই মত। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও তিলককে আমাদের নিজেদের আত্মীয় মনে হয়।

যে ভাব আমাদিগকে তিনি দিয়াছিলেন তাহা আজও কাজ করিতেছে। হয়ত কিছুদিন পরে তিনি লুপ্ত হইয়া যাইবেন। তখন তাঁহা দ্বারা প্রসূত ভাব বা গুণ কার্য করিবে। এভাবে মনুষ্য-জীবনের স্মৃতি অব্যক্ত হইতে থাকে, কিন্তু তাহা কাজ কম দেয় না, বরঞ্চ অধিক দেয়। অব্যক্ত আকর্ষণ, ব্যক্ত আকর্ষণ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী শক্তিশালী।

যেদিন তিলক গেলেন, সেদিন গান্ধীজীর উদয় হইল। কেহ কেহ এই উপমাও দিয়াছিল—পূর্ণিমাতিথিতে যেমন সূর্য অস্ত যায় আর পূর্ব দিক পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় তেমনই তিলক মহারাজ গিয়াছেন আর গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগের আরম্ভ হইয়াছে। দাদাভাই নৌরোজী জনসাধারণকে স্বরাজ্যের 'নিশ্চয়ে' উদ্বুদ্ধ করেন আর গীতার সেই আদ্য শিক্ষা আমাদের সামনে ধরেন—যতদিন বুদ্ধি 'নিশ্চয়' না হয় ততদিন কর্মযোগের প্রারম্ভ হইতে পারে না। গীতা দ্বারা তিলক এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'নিশ্চয়' হইলে পর সাধককে নিশ্চয় একাগ্র হইতে হয়। সব দুঃখের অংকুর গোলামী—একথা বলিয়া তিলকজী তাদের সম্বন্ধ স্বরাজের সহিত জুড়িয়া দিতেন। 'নিশ্চয়ে' 'একাগ্রতা' আসিয়াছে ত 'ফলের চিন্তা ছাড়িয়া সাধনা' আরম্ভ করা চাই এবং সকল শক্তি ও চিন্তা সাধনায় লাগাইয়া দেওয়া চাই—গীতার এই তৃতীয় শিক্ষা গান্ধীজী আমাদের দিয়াছেন। এভাবে এই তিনের পথপ্রদর্শনে যে মহাপ্রযত্নের সৃষ্টি হইয়াছে তার ফলস্বরূপ আমরা স্বাধীন হইয়াছি।

লোকমান্যের জীবন-দর্শন

দাদা ধর্মাধিকারী

অনুবাদক — শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

লোকমান্যের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তাই তাঁহার বিভূতিতে বৈচিত্র্যের বিলক্ষণ স্ফূর্তি হইয়াছিল। কিন্তু এক দিকে তাহা সীমাবদ্ধও ছিল। দেশবাসীর দোষ-প্রদর্শনের দিকে তিনি তাঁহার চতুরস্র প্রতিভার ব্যবহার কচিৎই করিয়াছেন, করিয়াছেন তাহা পক্ষান্তরে তাহাদের মনে আত্মগৌরব ও আত্মাভিমান জাগ্রত করার দিকে। গণিত ও জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি তাঁহার গভীর ছিল। বেদের প্রাচীনতা সপ্রমাণ করার নিমিত্ত এবং আর্যদের আদি নিবাসে তথ্য নিরূপণের জন্য তিনি নিজ জ্যোতিষজ্ঞানের নিয়োগ করিয়াছিলেন। কালগণনার ভারতীয় পদ্ধতিকে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকসম্পাতে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীদপ্তরী মহোদয়ের দ্বারা তিনি 'করণগ্রন্থ' লিখাইয়া লন আর স্বয়ং 'পঞ্চাঙ্গ-সংস্কার সমিতি'র সভাপতি হন। আজও মহারাষ্ট্রে 'তিলক-পঞ্চাঙ্গ' নামে এক পঞ্চাঙ্গের (পঞ্জিকার) প্রচলন আছে। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, গণিতজ্ঞ তথা জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা, ইতিহাস সংস্কারক, পত্রিকা-প্রবর্তক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্যের রচয়িতা, এক বিদগ্ধ দার্শনিক ইত্যাদি অনেক রূপে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার বিবিধ প্রবৃত্তির মূলে ছিল একই দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—তাঁহার পুরুষার্থের প্রবাহ একই খাতে বহিয়াছিল—আর তাহা হইতেছে ভারতের মহিমা ও মর্যাদা বাড়ানো, ভারত কোন গুণে অপর কোন দেশ হইতে হীন নয়, একথা সপ্রমাণ করা। তাঁহার কাছে দেশ ছিল সর্বস্ব। কেহ কেহ ত এ পর্যন্তও বলিয়াছেন যে, দেশের অভ্যুদয়ের জন্য যদি তাঁহাকে স্বর্গ ও ধর্ম, এমনকি সত্যও ত্যাগ করিতে হইত ত তাহা করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সত্য ও অহিংসা পরম ধর্ম ত বটেই। কিন্তু মাতৃভূমি এই দুইয়ের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। স্বদেশ-নিষ্ঠা তিলকের পক্ষে ছিল এক অতি তীব্র স্বাভাবিক প্রেরণা। তাই তাঁহার সমগ্র জীবন দেশভক্তি ও স্বাধীনতা-প্রীতির এক রোমাঞ্চকর মহাকাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল। 'সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি' (যে দেবতাকেই নমস্কার কর, অন্তে তাহা কেশবের চরণেই গিয়া পৌঁছে), তদ্রূপ তাঁহার প্রতিভার সকল বিকাশ ভারতের মহিমা বাড়ানোর জন্য অন্তে জন-আত্মাতেই অর্পিত হইত।

'দেশ বড় কি দেব বড়?' 'মানব বড় কি দেবতা বড়?' ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহার সামনে কখনই উপস্থিত হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, "গোলামের দেবতা নাই। গোলামের মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় কোন দেবতা আসেন না। যেখানে মানব নাই, দেবতা সেখানে কোথা হইতে আসিবেন?" এই দৃষ্টি হইতে নৈতিক আন্দোলনের ও ধর্মীয় উৎসবের সমাবেশও তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে করিয়াছিলেন। গণপতি উৎসবের মত নিছক ধর্মীয় উৎসব তিলকের প্রেরণায় লোকজাগৃতির এক মহান্ সাধনে পরিণত হইয়াছিল। মদ্য-পান নিষেধ নৈতিক আন্দোলন, কিন্তু সরকারকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্য তিলক উহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল—উহার ফলে সরকারের আয় কমিবে, সরকার বিব্রত হইবে।

সংক্ষেপে, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, কলাত্মক, সাংস্কৃতিক তথা নৈতিক আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনের সহায়ক করা ছিল লোকমান্য তিলকের লক্ষ্য। স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, মদ্যপান-নিবারণ, বয়কট এ সবকেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের অঙ্গরূপে ব্যবহার করাতে ছিল তাঁহার আগ্রহ। গঠনকার্য যেমন ছিল গান্ধীজীর আন্দোলনের মুখ্য কথা, তদ্রূপ তিলকের এই সকল উদ্যোগ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গ।

ইংরেজ সরকারের সহিত আচরণে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি বলিতেন 'প্রতি সহকার'। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে তিনি ভারত সরকারকে তারযোগে জানান যে, সংস্কার সম্বন্ধে প্রতি-সহকার নীতি তিনি অনুসরণ করিয়া চলিবেন। তখন হইতে ঐ শব্দটিকে লোকে তাঁহার জীবন-বিষয়ক ব্যবহারনীতি বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। যাঁহারা নিজেদের লোকমান্যের অনুগামী বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা বলেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে 'অসহযোগ' ছিল গান্ধী-নীতির দ্যোতক আর 'প্রতি-সহকার' বা 'প্রতি-সহযোগ' ছিল লোকমান্যের নীতির সূচক। প্রশ্ন উঠিতেছে—ভাল, অসহযোগ বা প্রতি-সহযোগ কি জীবনের সিদ্ধান্ত হইতে পারে? অসহ-

যোগকে গান্ধীজী মানব-জীবনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সমাজে যখন মন্দের প্রতিকার করার আবশ্যকতা দেখা দিত তখন উহার প্রতিকারার্থ লোককে তিনি অহিংসার অনুকূল অসহযোগের আশ্রয় লইতে বলিতেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন নিজেই এক কু পদার্থ ছিল, তাই উহার সহিত অসহযোগের নীতি গান্ধীজী অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অসহযোগ মন্দের সহিত, ব্যক্তির মন্দ আচরণের বা ব্যক্তির সহিত কখনও নয়, এই সাবধানতার শঙ্খ-নিনাদ সব সময় তিনি করিতেন। গান্ধীজীর অসহযোগ ছিল ইংরেজ সরকারের সহিত, ইংরেজদের সহিত ছিল না। তাৎপর্য এই যে, সহযোগই কেবল জীবনব্যাপী নীতি হইতে পারে; অসহযোগ হইতেছে নৈমিত্তিক প্রতিকার-পন্থা। উহা মানুষের নিত্যধর্ম নয়, অবশ্য নৈমিত্তিক কর্তব্য।

'প্রতি-সহযোগ' জীবন-দর্শন হইতে পারে না

'প্রতি সহযোগ' শব্দটিই তাৎপর্যপূর্ণ। উহার অর্থ: অপরের সহযোগের জবাবে সহযোগ। এখানে সহযোগের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের উপরে। একদিক হইতে অভিক্রমই উহার হাতে চলিয়া যায়। সে যদি সহযোগ করে ত আমরা সহযোগ করিব, যদি অসহযোগ করে ত আমরা অসহযোগ করিব। আর সে যদি কিছু না করে ত আমরাও কিছু করিব না! ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের নিজস্ব কোন জীবন দর্শন এবং নিরপেক্ষ ব্যবহার-নীতি নাই। আমাদের জীবন আর জীবন-নীতি এক জবাবী প্রতিধ্বনি মাত্র হইয়া যায়। ইহাই যদি লোকমান্য তিলকের জীবন-নীতি হইত তবে তিনি নিজের দিক হইতে দেশসেবা আরম্ভই করিতেন না। আর না করিতেই ঐ লোকোত্তর পরাক্রম ও ত্যাগ। তাঁহার লোকসংগ্রহ ও লোককার্য নিরপেক্ষ সহযোগের উদাহরণ, প্রতি-সহযোগের নয়। ইংরেজ রাজত্বকে তিনি যদি এক দুর্ঘটনা ও অনিষ্টের আকর মনে করিতেন তবে উহার সহিত তাঁহার সাধারণ নীতি ও সাধারণ বৃত্তি কেবল অসহযোগেরই হইতে পারিত। এমন অবস্থাও ত দাঁড়াইতে পারিত, যে অবস্থায় ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্যই উহার সহিত সহযোগ করা বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইতে পারিত। সে অবস্থায় সহযোগ বাস্তব পক্ষে ঐ রাজ্যের সহিত অসহযোগ বলিয়াই গণ্য হইত। বেশী করিয়া বলিলে একথাই বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজ সরকারের সহিত ব্যবহারে তখনকার অবস্থায় প্রতিসহযোগ এক সাময়িক নীতি ছিল। উহা কখনও লোক-মান্য সদৃশ লোক-সংগ্রহপরায়ণ ব্যক্তির জীবন-দর্শন হইতে পারে না। সাধারণতঃ সর্বভাবে সহযোগ আর যেখানে আবশ্যক সেখানে পরিমিত অসহযোগ, ইহাই ব্যতিক্রমশূন্য জীবন-নীতি হইতে পারে। ইহাতে অসহযোগের পরিস্থিতি সৃষ্টির দায়িত্ব প্রতিপক্ষের। আমরা যখন 'প্রতি সহযোগ' বলি তখন সহযোগ আরম্ভ করার দায়িত্ব অন্যের উপর ছাড়িয়া দিই আর নিজেরা প্রতীক্ষা করিতে থাকি। কিন্তু যখন প্রত্যসহযোগ (প্রতি + অসহযোগ) বলি, তখন অসহযোগের কারণসৃষ্টির দায়িত্ব অপরের উপর ছাড়িয়া দিই আর সহ-যোগের মুখ্য ধর্মের অভিক্রম (initiative) নিজ হাতে রাখি। অতএব লোকমান্যের রাজনীতির যথার্থ বর্ণনা করিতে গেলে উহাকে 'প্রতি-সহযোগ' বা 'প্রতি সহকার' না বলিয়া 'প্রত্যসহযোগ' বা 'প্রত্যসহকার' বলা অধিক সঙ্গত হইবে। তার কারণ অসহযোগই বহুক্ষেত্রে 'প্রতিযোগী' (বিরুদ্ধ), অর্থাৎ অপরের সহিত সহযোগ করা যখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে তখনই অসহযোগের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। সহযোগ নিত্য ও নিরপেক্ষ। অসহযোগ প্রাসঙ্গিক ও নৈমিত্তিক। অন্যের জীবনের সহিত সহযোগ, কিন্তু উহার মন্দের সহিত অসহযোগ—ইহাই কেবল জীবনের সূত্র হইতে পারে।

এই দৃষ্টিতে আমরা যদি লোকমান্যের জীবন দর্শন ও ব্যবহার-নীতির বিচার করি তাহা হইলে সত্যাগ্রহে সেই দর্শন ও সেই নীতির পূর্ণবিকশিত রূপই দেখিতে পাইব। অর্থাৎ তিলক ও গান্ধী, গোখলে ও তিলক, গান্ধী ও মার্কস, এরূপ শৈব-বৈষ্ণববাদ পদ্ধতির সাম্প্রদায়িক মতবাদ হইতে আমরা নিজ লোকজীবন মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইব। স্বাধীনতার মন্ত্রদ্রষ্টা লোকমান্য তিলকের পুণ্যতিথি উপলক্ষে আমরা যেন এই সংগঠনী সৃষ্টি স্বীকার করিয়া লই। ১৯২০ সনের ৩১শে জুলাই মধ্যরাত্রিতে লোকমান্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয় আর ১৯২০ সনের ১লা আগষ্ট প্রাতঃকালে অসহ-যোগের সূত্রপাত হয়! গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন, 'লোকমান্য চলিয়া গিয়াছেন, লোকমান্য চিরায়ু হউন'।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধাবলী

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবাসীর প্রথম বর্ষ হইতে ইহার নিয়মিত লেখক-শ্রেণীভুক্ত হন। অর্দ্ধ-শতাব্দীরও ঊর্দ্ধকাল তিনি এই পত্রিকায় রচনা পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই সকল রচনার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী এখানে প্রদত্ত হইল। বিদ্যানিধি মহাশয় পরবর্ত্তী কালে প্রকাশিত তাঁহার বহু পুস্তকে এই রচনাগুলির কতকাংশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পার্শ্বের সাংকেতিক চিহ্ন প্রবাসীর বর্ষ ও মাসের নির্দ্দেশক, যেমন, ২।৯= ২য় বর্ষ, ১৩০৯, নবম সংখ্যা, পৌষ।

ফিনল্যাণ্ডের প্রাচীনতম কৃষক সমিতি

১৮০৩ সনে দক্ষিণ ওস্ট্রোবোথনিয়ার ইলমায়োকি যাজক-পল্লীতে কৃষকদের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপে, হয়ত বা সমগ্র পৃথিবীতেই এইটিই এই ধরনের প্রথম সংস্থা। ইলমায়োকি দীর্ঘকাল যাবৎ ফিনল্যাণ্ডের অধ্যাত্মশক্তির কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। যাজক-পল্লীর সেই পুরাতন নৈতিক শক্তি এখনও সময় চলিতেছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি, ফলে সমগ্র ইউরোপেই যেন আলোড়নের সৃষ্টি হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই সঙ্কট-সময়ে, বিশেষ ভাবে ওস্ট্রোবোথনিয়ার সমতল অঞ্চলসমূহে ইলমায়োকির ন্যায় যাজক-পল্লীগুলিতে জনগণ তরবারির উপর যতটা লাঙ্গলের ফালের উপর ততটাই উচ্চ মূল্য আরোপ করিতে শিখিল। হয় ত সেখানে

কৃষক সমিতি কর্তৃক ইলমায়োকিতে সংরক্ষিত একটি 'উইণ্ড মিল' বা বায়ুচালিত যন্ত্র

লোপ পায় নাই। পুরনো কৃষক সমিতির কাজ এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে, যদিও ইহার কর্মপ্রচেষ্টা আজ খাঁটি কৃষিকর্ম অপেক্ষা যাজক-পল্লীর প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রাখিবার দিকেই অধিকতর কেন্দ্রীভূত।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে—দেশে তদ্রূপ সমিতিসমূহ গড়িয়া উঠার সত্তর বৎসর আগে, যখন উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ফিনল্যাণ্ডের জীবনে দেখা দিয়াছিল চাঞ্চল্য এবং বিপর্য্যয়, রাশিয়ার সেই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ইহা অধিকতররূপে উপলব্ধ হইয়াছিল যে, যুদ্ধে ফিনল্যাণ্ডের যত সন্তান মরিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে দুর্ভিক্ষে।

দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ঐ বৎসরের একটি স্মরণীয় দিবসে সাত জন মহৎ লোক একত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন ইলমায়োকিতে। তাঁহারা মিলিত ভাবে "অর্ডার অব দি নাইটহুড অব পীস" নামে একটি শান্তি-সংসদ গঠনে উদ্যোগী হইলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে

এই সাত জনেই একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য—"কৃষি-কর্ম্মে যথোচিত পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক ইহার সদস্যদের অবস্থার উন্নতি-বিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রচেষ্টায় সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ-সৃষ্টি।"

প্রকৃতপক্ষে ইলমায়োকি কৃষক সমিতির জন্ম হয় ১৮০৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর। ইহার প্রথম সভা সম্পর্কে সংরক্ষিত 'মিনিট'গুলিতে অনেক চিত্তাকর্ষক বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "যেহেতু সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে, কৃষিকর্ম্ম মুখ্যতঃ নির্ভর করে তৃণভূমি কর্ষণের উপর সেইজন্য ইহা শৈবালাচ্ছাদিত, জলায় উৎপন্ন ঘাসে পূর্ণ একটি প্রান্তরকে কৃষিকার্য্যের উপযোগী এবং ইহাতে তৃণবীজ বপন করিতে হইলে একরপ্রতি কত খরচ পড়িবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সমিতি অধিকতর যত্নের সহিত ফার্টিলাইজার সংগ্রহের একটি উপায় উদ্ভাবন এবং সেগুলিকে ঢাকিয়া একস্থানে জমা করিয়া রাখা অথবা খোলা জায়গায় ফেলিয়া রাখা এ দুইয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ তাহা নির্দ্ধারণ করাও স্থিরীকৃত করিয়াছে।

সে ছিল এক প্রাণবন্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার সময়। পরীক্ষণের পর চলিল পরীক্ষণ এবং অচিরে ইহার ফল পরিলক্ষিত হইল সমগ্র যাজক-পল্লীতে। ফিনল্যাণ্ডের যাবতীয় যাজক-পল্লীর মধ্যে ইলমায়োকি যাজক-পল্লীতেই প্রথম ঘরের ছাদে টালি ব্যবহৃত হইল। ইহা কার্য্যকরী হইল কৃষক সমিতির পরামর্শক্রমে। বার্চ্চ গাছের ছালের দাম যে চড়তির পথে, উক্ত সমিতিই প্রথম তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে এক বোঝা বার্চ্চ গাছের ছালের দাম ছিল চার বিলি ডলার, আর এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে দশ বিলি ডলারে। এমনকি তাহারও আগে ১৮০৫ সনে সমিতি ইলমায়োকির জন্য গ্রামীণ অর্ডিনান্স বা বিধির একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। তাহাতে ক্ষেতে বা বাগানে বেড়া দেওয়া, জল নিষ্কাশন, অগ্নিকাণ্ডে সাহায্য মূলক ব্যবস্থা এবং সাধারণ ভাবে জনসমাজ উপকৃত হয় এমন সব অন্যান্য কৃত্য সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঐ অর্ডিনান্স জেলার গবর্ণর কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং এক হাজার কপির এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হয়ত ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর হইয়াছিল ডেরি ফার্ম্ম বা গো-মহিষাদি রক্ষণ-কেন্দ্রের উপর সমিতির প্রভাব। সমিতি প্রথম প্রজননের (breeding) জন্য অশ্ব ক্রয় করে ১৮১৯ সনে। পরের বছর একটি ইংলণ্ডীয়-আরবী প্রজনন-অশ্ব ক্রীত হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যে ইহা বারটি বাচ্চার জন্মদান করে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সমিতি ইংলণ্ড হইতে একটি বার্কশায়ার শূকর এবং শূকরী সংগ্রহ করে। স্পেন হইতে ইতিপূর্ব্বেই ভেড়ার পাল সংগৃহীত হইয়াছিল।

যতই বৎসর গড়াইয়া চলিল ততই কৃষি-উন্নয়নকল্পে সমিতির কার্য্যাবলীর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল সমগ্র পশ্চিম ফিনল্যাণ্ডের উপরে। অতঃপর ১৯০৯ সনে প্রকৃত কৃষিসম্পর্কিত
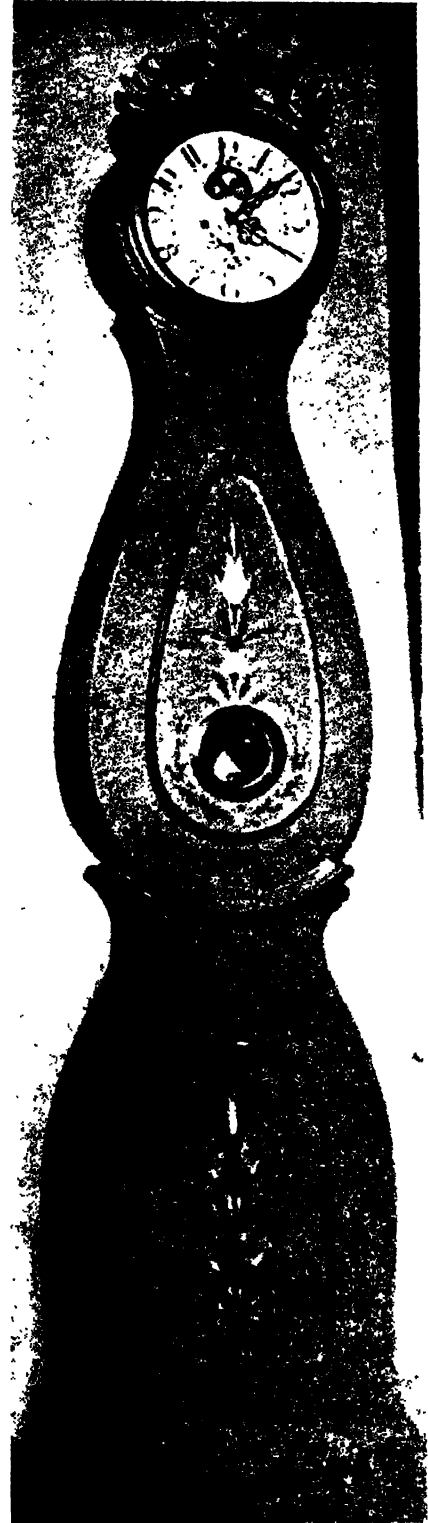
ইলমায়োকির কাঠ পলিশকারী কর্তৃক নির্ম্মিত ঘড়ি।

দাঁড়াইল স্থানীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অভিভাবকস্বরূপ। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইল ইলমায়োকি মিউজিয়ম। আজিকার দিনে ইহাই ফিনল্যাণ্ডের বৃহত্তম গ্রামীণ মিউজিয়ম এবং কৃষক সমিতিই এখনও ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

মিউজিয়ম ভবনকে প্রায়শঃই গীর্জ্জা বলিয়া ভুল করা হয়। অবশ্য ইহার হেতুও আছে। ইহার গঠনকৌশল ইলমায়োকির প্রাচীন গীর্জ্জার অনুরূপ এবং আগেকার দিনে অপরাধিগণকে যেখানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত তাহার পার্শ্বে 'ওল্ড চার্চ পার্কে' ইহা অবস্থিত।

মিউজিয়মে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার হইতে সমিতির কর্ম্মতৎপরতা এবং জন্মস্থানের প্রতি ইলমায়োকির অধিবাসীদের গভীর প্রীতি এ দুয়েরই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সংগ্রহশালা দর্শকের মনকে ১৫৯৬ সনের

সমিতির সাত জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের অন্যতম কুসতা ভুলফ ওয়াসাস্তয়েনার একটি গাড়ী। তিনটি শ্বেত অশ্ববাহিত এই শকটটি মিউজিয়মে উপহার দেওয়া হয়

এই মিউজিয়মে কল্লি পরিবার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ঘড়ি একটি গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইলমায়োকি যাজকপল্লী হইতেই উদ্ভব হইয়াছিল ঘড়ি নির্ম্মাতা কল্লি পরিবারের। কল্লিঘড়ি ফিনল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র এবং সম্ভবতঃ এই দেশের সীমানার বাহিরেও পরিচিত।

একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ মিউজিয়মে নূতন সংযোজিত হইয়াছে—ইহা ফিনল্যাণ্ডের বৃহত্তম বেসরকারী মুদ্রা-সংগ্রহসমূহের অন্যতম। এইটি গড়িয়া উঠিয়াছে ইলমায়োকির মুদ্রাতত্ত্ববিদগণের দানে।
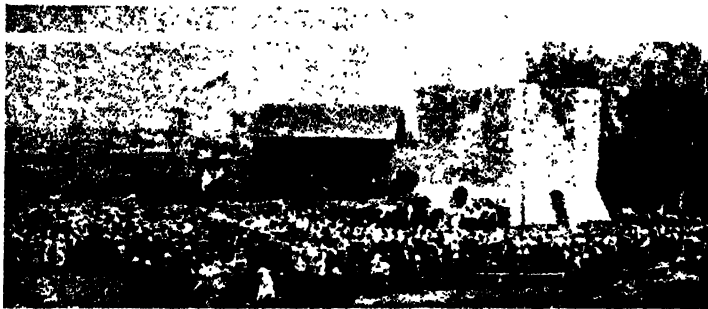
"ক্লাব ওয়ারে" লব্ধকীর্ত্তি জাকো ইলকার সম্মানার্থে নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। পাঁচ জন অনুগামীসহ তাঁহাকে এখানে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়

'ক্লাব ওয়ারে'র মহান কৃষক-নেতা ইলকার শৈশবকালে লইয়া যায়। সেই অতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ওস্ট্রোবোথনিয়ার পাঁচ শতাব্দীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক দ্রব্য এখানে সংরক্ষিত আছে।

ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কিত বিভাগটি এই দিক দিয়া অতুলনীয় যে, যে সকল লোক ইহা সৃষ্টি করেন তাঁহারা আজও জীবিত আছেন এবং ওখানে গিয়া নিজেদের তৎকালীন সাজসরঞ্জাম দেখিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মিউজিয়মের বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়কের কথা। এই ব্যক্তিই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রসদের ঝুলিতে করিয়া আনা সাদা পতাকাটি সংগ্রহশালায় দান করেন—এই পতাকার নীচে দিয়াই ব্রিটিশ কূটনৈতিকগণ পুরোভাগের সৈন্য-বাহিনীকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি যখন পতাকা দান করেন তখন তাঁহার পরনে ছিল যুদ্ধকালীন একটি পরিচ্ছদ।

যাজক-পল্লীর কর্ষিত অঞ্চলের আয়তন প্রায় দশ হাজার বিঘা—এই বিস্তীর্ণ জমির উপর অন্ততঃ চার হাজার গোলাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। শতাব্দীকাল যাবৎ এই সকল তৃণক্ষেত্রের উপর গো-মহিষ চরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের চারণভূমিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বহু বিচিত্র রোমাণ্টিক কাহিনী। তৃণভূমির মাঝখানে সমিতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে একটি অট্টালিকা। ইহার বুরুজের উপর হইতে যে দৃশ্য নজরে পড়ে তাহা বাস্তবিকই রমণীয়।

অন্যান্য ভবনগুলির মধ্যে কোন কোনটি স্মৃতিসদন—সমিতিই এগুলির তত্ত্বাবধান করেন—কোনটিতে আছে বায়ুচালিত যন্ত্র, কোনটি বা শস্যাগার। সমিতির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মিঃ ভিলহো সিয়রা খুব যথাযথ ভাবেই ইহার উদ্দেশ্যের কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কৃষক সমিতির কল্যাণে যাজক-পল্লীটি দক্ষিণ ওস্ট্রো-বোথনিয়ার একটি আদর্শ পল্লী এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হয়।

ম. ভ.

আন্দামানে সমাজ-কল্যাণকর্ম্ম

নির্ম্মল এস, পেণ্ডারকার

ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি আন্দামান, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে এত বিভিন্ন জাতির লোক যে থাকতে পারে এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

যে সকল অরণ্য অঞ্চলে আদিম জাতীয় লোকেদের বাস সেগুলো সভ্য মানুষের সংস্পর্শ লাভ করে নি। সুতরাং সমগ্র ভূমির শতকরা আশী ভাগেরও অধিক নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ এবং জারোয়াদের অধ্যুষিত বলে দুর্গম্য।

হয়ত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশে জারোয়ারা যে-কোন অপরিচিত লোক দেখলেই গুলি চালায়। তাদের বশে আনবার চেষ্টা চলছে একমাত্র পুলিস বিভাগের মাধ্যমে। উক্ত বিভাগের লোকেরা ছোট নৌকা করে নিয়মিত ভাবে দ্বীপে যায়। তারা সমুদ্রতীরের কাছে রান্নার বাসন-কোসন নিরাপদ দূরত্বে রাখে এবং জারোয়ারা যখন সেগুলো কুড়াতে থাকে তখন তাদের উপর (অবশ্য সমুদ্র থেকে) নজর রাখে। তাদের বশীভূত করবার এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি দ্বারা এ পর্য্যন্ত কিন্তু সামান্যমাত্রই সাফল্য অর্জ্জিত হয়েছে। পোর্ট ব্লেয়ার, মায়া বন্দর মিডল আন্দামানস্ এবং লং আইল্যাণ্ডের অন্যান্য স্থানের বসতিসমূহের জনসমষ্টির অধিকাংশই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত কয়েদীদের বংশধর। তাদের মধ্যে জনকতক এখন বাগান ইত্যাদির মালিকানার দরুন প্রভূত বিত্তশালী হয়েছে এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জনকে বাস্তবিকই সুশিক্ষিত বলা যেতে পারে। শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয় স্থানীয় প্রশাসন বিভাগে। অন্যান্যদের বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনায় নিপুণ (Skilled) এবং অ-নিপুণ (unskilled) শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগানো হয়। তা ছাড়া প্রধানতঃ বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারত থেকে শরণার্থী এবং শ্রমিকদের সমাগম তো চলছে অবিচ্ছিন্ন ভাবেই। এই সমস্ত লোকেদের জন্যই এখানে কিছু কিছু সমাজ-কল্যাণ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্থানীয় শ্রমজীবীদের একটা বৃহৎ অংশকে স্বভাবতঃই বন- অতি সামান্য আয়, স্বল্প শিক্ষা অথবা শিক্ষাহীনতা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অভাব ইত্যাদির দরুন তাদের জন্যে কোনও জনহিতৈষণামূলক সামাজিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে।

করাতের কলে কর্ম্মে নিযুক্ত আছে ১,২০০ শ্রমিক। এই মিলের অশক্ত এবং বৃদ্ধ কর্ম্মীদের জীবিকানির্ব্বাহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ১৯৫৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ত্তমান শ্রমিক কল্যাণ সমিতি এবং এর নামকরণ করা হয় "আন্দামান মাইনর ফরেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিজ সোসাইটি"। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—জরাগ্রস্ত এবং অশক্তদের সেই সকল কাজে পুনর্নিয়োগ করে সাহায্য করা যেগুলিতে তারা তাদের যেটুকু কর্ম্মক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করতে পারে। বেতের কাজ, বাস্কেট তৈরি, সমুদ্রশঙ্খ ইত্যাদি পালিশ করা—এ সকল হচ্ছে তাদের সাধারণ বৃত্তি। কারুকার্য্য-করা খণ্ড খণ্ড খেলনার জিনিষ সম্বলিত প্রদর্শন-গৃহ এবং মিলের গৃহ রক্ষিত সূক্ষ্ম বেতের কাজ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। স্থানীয় বাজারে এই সকল দ্রব্য বিক্রী হয় এবং বাইরে সেরা বাজারে পাঠানো হয়। এ সকল থেকে যা আয় হয় তা তাদের জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট। এখানে একথা উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এই সকল দ্বীপে কল্যাণকর্ম্মের উন্নয়নকল্পে ১৯৫৫-৫৬ সনের জন্যে ৩,৫০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেছেন।

সরকারী বিদ্যালয়টি অনেক দূরে বলে উক্ত অঞ্চলে শিশুদের জন্যে একটি স্কুল খোলা অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৩ সনের ১লা এপ্রিল হাডো শিশুদের জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সমিতি আর একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোড়ায় "এ. এম. এফ. আই. এস", "শ্রমিক কল্যাণ ফণ্ড" এবং সহানুভূতিশীল সাধারণের দানে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হ'ত। ১৯৫৫ সনে স্থানীয় সরকারের তরফ থেকে বিদ্যালয়টি ৫০০৲ টাকা সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত হয়।

হলে—এটি আসলে কিন্তু কারখানার শ্রমিকদের ক্লাব ঘর। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অর্থসংস্থান হলে, এটিকে যত সত্বর সম্ভব কোনো উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে নেওয়া। এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে মাত্র চতুর্থ মান পর্য্যন্ত। প্রধান শিক্ষককে নিয়ে এখানে শিক্ষক আছেন চার জন। ছাত্রদের নিকট থেকে নামমাত্র বেতন হিসাবে প্রতি মাসে নেওয়া হয় চার আনা করে। ছাত্রদের উৎসাহিত করবার নিমিত্ত তাদের বিনামূল্যে বই, শ্লেট, ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বিদ্যালয়ের খরচ চালাতে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে কতকটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, কেননা ছাত্রদের নিকট থেকে সংগৃহীত বেতনের দ্বারা যা আয় হয় তার পরিমাণ এর ব্যয়ের তুলনায় খুবই কম।

বিদ্যালয়টি পরিপাটীরূপে সাজানো গুছানো। জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ছবি,মানচিত্র,আবহাওয়ার চার্ট ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা হয় দেওয়ালে এবং প্রত্যেকটি ক্লাস এমন ভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যায় যাতে অন্যান্য ক্লাসের কার্য্যপরিচালনায় খুব কম ব্যাঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা নব্বই জন। শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে হিন্দী। তামিল, তেলুগু এবং বাংলা ভাষায়ও ছাত্রদের পাঠাভ্যাস করানো হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ মানের ছাত্রেরা বাড়তি কাজ হিসাবে বাস্কেট তৈরি, কাঠের কাজ ইত্যাদিও করে থাকে। ছেলেরা তাদের নিজেদের ছোট ছোট হাতে তৈরি ডেস্ক ব্যবহার করে বলে গর্ব্ববোধ করে। নিম্নমানের ছাত্রেরা বেতের কাজ, কাগজের কাজ, নাট্যাভিনয়, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি বিষয় শিক্ষালাভ করে। সাধারণ পাঠ্যতালিকার অতিরিক্ত "আন্দামানের কাঠ" সম্পর্কে একটি বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, আমি বাস্তবিকই তার প্রশংসা না করে পারলাম না। শিশুদিগকে কাঠের প্রকারভেদ এবং রকমারি কাঠের ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই কারখানার শ্রমিকদের সন্তান এবং যেহেতু তাদের পক্ষে নিজের কর্ম্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান সেজন্যে এবিষয়ে জ্ঞানলাভ তাদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য।

শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতিও দেওয়া হয় সমান মনোযোগ। নিয়মিত পাঠ আরম্ভ হওয়ার আগে তাদের রোজ শারীরিক ব্যায়াম করতে হয়। বিশ্রামের সময় সকল শিশুকে গুঁড়ো দুধ এবং যারা বেশী দুর্ব্বল তাদের দেওয়া হয় ভিটামিন ট্যাবলেট। নিয়মিত ভাবে ওজন নিয়ে তা লিখে রাখা হয়। অপ্রচুর অর্থের যাতে পরিপূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার হয় সে জন্যে চরমতম কর্ম্মনৈপুণ্য বজায় রেখে চলা হয়।

১৯৫৫ সনে লং আইল্যাণ্ডে খোলা হয় আর একটি স্কুল, বর্ত্তমানে তাতে আছে একটি মাত্র ক্লাস। গ্রামবাসীদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দিকেও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে—তাদের গুঁড়ো দুধ এবং ভিটামিন ট্যাবলেট দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে জঙ্গলের অভ্যন্তরভাগেও এ সকল বিতরণ করা হয়ে থাকে। "এমকিস" স্বয়ং খুব বড় সংস্থা না হলেও এটি যেমন কর্ম্মশক্তিতে তেমনি নূতন পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ। মনে হয় এই সংস্থাটি প্রতি নববর্ষে নূতন দায়িত্বভার গ্রহণ করে নিজের কর্ম্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করছে। ১৯৫৪ সনের ১লা আগষ্ট এই সংস্থার উদ্যোগে হাড্ডো শিশুদের জন্যে একটি শিশু-রক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সনের জন্যে সমপরিমাণের ভিত্তিতে ৩,০০০৲ টাকা এবং ১৯৫৫-৫৬ সনে অসমপরিমাণ সাহায্যের ভিত্তিতে দেড় হাজার টাকা দান হিসাবে লাভ করেছে।

ঐ অঞ্চলের যে-কোন শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোক তার শিশুকে উক্ত শিশুরক্ষণাগারে পাঠাতে পারে। এখানকার শ্রমজীবী সম্প্রদায় কিন্তু এত অনুন্নত যে, কোন ভাবাদর্শকে গ্রহণ করতে তারা পরাঙ্মুখ। ওখানে শিশুদের পরিচর্য্যা করা হ'ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু মায়েরা গোড়ার দিকে শিশুদের পাঠাত অকাল্প অনিচ্ছার সহিত।

এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু মনে হয় যে, শিশু-রক্ষণাগার এখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয় নি। বর্ত্তমানে শিশুদের মোটসংখ্যা মাত্র বার থেকে তেরোটি। সকাল সাতটা থেকে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত একজন তত্ত্বাবধায়িকা (Matron) এবং দু'জন আয়া তাদের দেখাশুনা করে। শিশুদের স্নান করিয়ে পরিষ্কার পোশাক পরানো হয়। তার পর তাদের দেওয়া হয় গুঁড়ো দুধ এবং ভিটামিন ট্যাবলেট। শিশু-রক্ষণাগার তাদের জন্যে 'লিনেন'যুক্ত কাঠের তৈরি ছোট খাটের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রত্যেক শিশুকে তার কাপড়-চোপড়, তোয়ালে, লিনেন ইত্যাদির জন্যে আলাদা করে একটি ড্রয়ার দেওয়া হয়েছে।

যথোচিত বিশ্রামের পর শিশুরা খেলনা নিয়ে খেলায় ব্যাপৃত হয়।

তাদের সম্পত্তি হচ্ছে দোল খাওয়ার জন্যে কাঠের ঘোড়া, কাঠের ব্লক, রঙীন ছিদ্রযুক্ত গুটিকা এবং অনুরূপ নানা টুকিটাকি জিনিষ। এ পর্য্যন্ত এখানে যত শিশু প্রতিপালিত হয়েছে তন্মধ্যে কনিষ্ঠতমটির বয়স প্রায় দেড় মাস। শিশুদের বয়স অত্যন্ত কম বলে তাদের লেখা এবং পড়া সম্পর্কে কোন পাঠ দেওয়া হয় না, কিন্তু যাদের মধ্যে অল্পবয়সেই মানসিক সক্রিয়তার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় তাদের রঙীন গুটিকা গুনতে শেখানো হয়। সাড়ে এগারটার সময় তাদের দেওয়া হয় অন্নপূর্ণা কাফেটেরিয়া থেকে আনীত খাদ্য। তাদের মধ্যে

যে সকল ছোট বাচ্চার পক্ষে কঠিন খাবার গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয় তাদের আবার খাওয়ানো হয় গুঁড়ো দুধ। যে পাত্রে এই খাবার পরিবেশিত হয় তার পরিচ্ছন্নতার দিকে থাকে তত্ত্বাবধায়িকার সজাগ দৃষ্টি। শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং মাঝে মাঝে ওজন নেবার জন্তে একজন লেডি ডাক্তার শিশু-রক্ষণাগার পরিদর্শন করেন। শিশু-রক্ষণাগারের তত্ত্বাবধানে আসার পর শিশুদের স্বাস্থ্যের রীতিমত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পরিচালকগণ আশা করেন যে, এ সকল সুফল শিশুরক্ষণাগারের প্রতি শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের আস্থা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হবে—আজ অবশ্য তাদের অধিকাংশই এ সম্বন্ধে উদাসীন।

সময়ের স্বল্পতানিবন্ধন পোর্ট ব্লেয়ারের পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে অনুষ্ঠিত সমাজকর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু আমি অবগত হই যে, ক্ষুদ্র আকারে সমাজ-কল্যাণ প্রচেষ্টা সেখানেও চলছে। প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে সেখানে বাঙালী, দক্ষিণ ভারতীয় এমনকি ব্রহ্মদেশীয় কারেনদের পর্য্যন্ত সামাজিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এখানকার লোকসমষ্টির জাতিগত বৈসাদৃশ্য কিন্তু সমাজ-কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনাপূর্ণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার পথে কোন দিক দিয়েই বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি। আমি এটা উপলব্ধি করলাম যে, ভাষা আচার-ব্যবহার অথবা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পার্থক্য এমন কোন প্রতিবন্ধ নয় যার দরুন মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি ব্যাহত হতে পারে।

গৃহসজ্জা সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশ

ঘরের প্রবেশ-পথ সকল সময়েই রাখতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পা-পোষ শুধু বিছিয়ে রাখলেই হ'ল না, তা ব্যবহার করা দরকার, আর শিশুদের এই শিক্ষা দিতে হবে যে, তারা যেন পায়ের ধুলোকাদা ঝেড়ে ঘরে ঢোকে।

ঘরের দেয়ালে অসংখ্য পেরেক মারবেন না এবং উদ্ভট পাঁচ-মিশেলি ছবি আর তার সঙ্গে বিভিন্ন বৎসরের এবং ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার একই কক্ষে ঝুলিয়ে রেখে জগা-খিচুড়ির সৃষ্টি করবেন না; কিংবা "লঙ্কায় সীতা" প্রতিকৃতির পাশেই পাখা-হাতে রক্তিম গণ্ডযুক্ত জাপানী সুন্দরীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবিসমূহ স্থাপন করাটাও ঠিক হবে না। যে সকল ফিকে-হয়ে যাওয়া গ্রূপ ফোটোগ্রাফে আপনাকে এবং আপনার পূর্ব্বপুরুষদের দেখায় মটরদানার মত সেগুলি টাঙানো থেকেও আপনি স্বচ্ছন্দে বিরত থাকতে পারেন। প্রাচীর-সজ্জার জন্তে একটি কিংবা দুটি ছবিই যথেষ্ট। আপনার আত্মীয়স্বজনের ছবি টাঙানোর ভাবাবেগ চরিতার্থ হতে পারে একটি উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ এলবামের দ্বারা যা আপনি নিজেই তৈরি করতে পারেন। কথাবার্ত্তার সময় দেয়ালের উপর পা তুলে দেবার অভ্যাসকে উৎসাহ দেবেন না। দেয়ালের কাজ ঘরের ভার রাখা—পায়ের নয়। ঠিকমত বলতে গেলে এই বিষয়টি যদিও গৃহের আভ্যন্তরীণ সজ্জার আওতায় পড়ে না তথাপি এই অভ্যাস আপনার গৃহস্থালির পরিচ্ছন্নতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত।

সিঁড়ি—মাকড়সাদের সিঁড়িতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত রকমারি নক্সার জাল বুনতে দেবেন না। এটা যে কেবল দেখতেই কুশ্রী তা নয়, এতে কালি-ঝুল লেগে থাকে এবং ঘরও অপরিষ্কার দেখায়।

প্রচুর ঝালর-লাগানো বস্ত্রাবরণী দ্বারা সিঁড়িতের বাতি-গুলোকে ঢেকে রাখবেন না। এতে যে কেবল আলোই বাধাপ্রাপ্ত হয় তা নয়, এই আবরণীগুলো হয়ে দাঁড়ায় ধুলো, ময়লা এবং মাকড়সার জালের আধার, একটি সাদাসিধে কুড়ি বা এনামেলের আবরণই হবে কাজ চলবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাস-কক্ষ—বাস-কক্ষে সকল রকমের আসবাবপত্র জড়ো করে রাখবেন না। আসবাবপত্র যেন গোটা মেঝের তিন-ভাগের এক ভাগের বেশী জায়গা জুড়ে না থাকে। আসবাব-পত্র বলতে কিন্তু বুঝতে হবে হালকা, ব্যবহারোপযোগী কাঠের অথবা বেতের জিনিষ; মোটা গদি স্প্রিং ইত্যাদি লাগানো "ভিক্টোরিয়ান সোফাসেট" নয়।

সংসারের যাবতীয় বিছানাপত্র গুটিয়ে বাস-কক্ষের এক-কোণে জড়ো করে রাখবেন না। এই উদ্দেশ্যে সৌরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত "বাক্স দিওয়ান" বিশেষ উপযোগী। এর সুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে সমস্ত বিছানাপত্রের স্থান ত হয়ই, তা ছাড়া আরামে বসাও যায়।

জানালাগুলোকে আলমারীরূপে ব্যবহার করবেন না। প্রায়শঃই অনেক বাড়ীতে এমন সব জানালা দেখতে পাওয়া যায় যা সকল সময়েই বন্ধ রাখা হয় এবং সেগুলোতে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকে শিশি-বোতল, টিন, পুরনো

খবরের কাগজ এবং এমন সব অন্যান্য জিনিষ যা কোন-না-কোন সময়ে সহজে নাড়াচাড়া করা যেতে পারে। দিনের অধিকাংশ সময়েই জানালাগুলি যতদূর সম্ভব খোলা রাখতে হবে।

যে সকল পরিবারকে ক্রমাগত একস্থান হতে অন্য স্থানে বদলী হতে হয় তাদের আসবাবপত্রের সমস্যার সমাধান হতে পারে ব্লকে'র দ্বারা। ১৪ ইঞ্চি চওড়া, উঁচু এবং লম্বা কাঠের ব্লক তৈরি হতে পারে হয়—সকল দিক ঢাকা অবস্থায় অথবা একটা দিক খোলা রেখে। এই ধরনের কতকগুলি ব্লকের দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন মিটতে পারে। একটি ছোট টেবিল ঢাকনা এবং কারুকার্য্যবিশিষ্ট পাত্র (vase) যুক্ত একটি ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে ঘরের মাঝখানের টেবিলরূপে। কক্ষের আয়তন অনুসারে, এই সকল ব্লক পাশাপাশি দুই-তিন সারিতে রেখে বিভিন্ন আকারের দিওয়ান তৈরি করা যেতে পারে। এর উপরিভাগে সুজনি দিয়ে ঢেকে একটি গদি স্থাপন করে শয়নাদির উপযোগী দিওয়ান তৈরি হয়। অতিরিক্ত ব্লকগুলিকে অনুরূপ ভাবে পুস্তকাধার এবং কোণের টেবিলরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বেগ পেতে হয় না। এগুলিকে আকর্ষণযোগ্য করে রাখবার জন্যে প্রয়োজন—মাঝে মাঝে বালিশ কর, আর এটা ত আপনি নিজেই করতে পারেন। বিচিত্রিত মৃৎপাত্রগুলি নয়নানন্দকর। আপনার অনিয়মিত অবসর সময়ে রং তুলি দিয়ে ভাসা ভাসা ভাবে সখের কাজ করবার চেষ্টা করবেন। কয়েক প্রকার পোষ্টারের রং আর একটি তুলি বিকশিত করে তুলবে আপনার ভিতরকার সৃজনী-শক্তিকে। প্রাথমিক প্রয়াস যদি সাফল্যমণ্ডিত না হয় এবং একটি রং আর একটি রঙের উপর গড়িয়ে যায়, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি দেখবেন যে, মাত্র একটি রঙীন পাত্র আপনার গৃহকোণকে শোভমান করে তুলতে পারে। আপনি যদি নক্সা আঁকার চেষ্টা করেন তা হলে নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যগত রচনা শৈলী এবং নমুনার অনুসরণ করে চলবেন। সাধারণ পরিবেশের সঙ্গে এই পদ্ধতিরই সামঞ্জস্য বেশী।

হরেক রঙের খাদির তৈরী তাকিয়াগুলোর ধুলোবালি ঝেড়ে সাফ করে পাঁচিলের নিকট মাদুরের উপর রাখলে তাতে কক্ষের একটি বিশিষ্ট রূপের খোলতাই হয়। চর্বি-জাতীয় জিনিষ অথবা কেশ তৈলের দাগ যাতে দেওয়ালের সৌন্দর্য্য নষ্ট না করে সেজন্যে দেওয়ালে মাদুর এঁটে-দেওয়া যেতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন নোটিশ বোর্ডে আঁটবার কতকগুলো আলপিন এবং নক্সাহীন সাদাসিধা বুনট।

কক্ষের ভিতরে সারি সারি কাপড়-চোপড় থাকলে সমস্ত জায়গাটাই একটা অপরিচ্ছন্ন ভাব ধারণ করে। শুকাবার জন্যে কাপড়-চোপড় মেলে দিতে হবে উঠানে অথবা বাইরে একসারিতে। জানালায় এবং দরজার খিলের উপর যাতে সার্ট ইত্যাদি ঝুলিয়ে না রাখতে হয় সেজন্যে পোশাক-পরিচ্ছদের একটি র‍্যাকের ব্যবস্থা করা উচিত।

বাসগৃহ যাতে দেখতে সুন্দর হয় খুশীর সঙ্গে সে বিষয়ে উদ্যোগী হোন এবং এ সম্বন্ধে চিন্তা, পরীক্ষা ও ঠিকমত সাজানো-গুছানোয় কিছু সময় ব্যয় করুন। শেষ পর্য্যন্ত দেখবেন, ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বকিছু মিলিয়ে আপনার মনে এই ছাপ পড়বে যে, কক্ষটি অনাড়ম্বর ভাবে পরিচ্ছন্ন, কিন্তু রুচিসম্মত রূপে সজ্জিত।

পার্ব্বতীবাঈ

নীরা কার্ভে

১৮৭০ সালে রত্নগিরি জেলার দেবরুখে পার্ব্বতীবাঈয়ের জন্ম হয়। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগিনী ছিল দশটি। তাদের ছিল ছোট একটি জোত আর নিজস্ব একটি বাড়ী। তা ছাড়া পার্ব্বতীবাঈয়ের বাবা শ্রীবালকৃষ্ণ যোশীর ছিল ছোটখাটো মহাজনী ব্যবসা। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হচ্ছিল অধিকতর শোচনীয় এবং সেজন্যে তাঁর মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'ত। দশ বৎসর বয়সে শ্রীমহাদেবরাও আঠাভালের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল। মহাদেব-রাও গোয়ায় শুল্ক আপিসে মাসিক পনর টাকা বেতনে কাজ করতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁদের কয়েকটি সন্তানের জন্ম হ'ল, কিন্তু বেঁচে রইল মাত্র একটি ছেলে—নাম তার নারায়ণ। পার্ব্বতীবাঈয়ের স্বামী যখন গোয়া থেকে বদলী হলেন তখন কতকটা আরামে তাঁদের জীবন কাটতে লাগল, কিন্তু বিধাতা কপালে সুখ লেখেন নি। নূতন জায়গার আবহাওয়া তাঁর স্বামীর সহ্য হ'ল না, সেখানে যাবার পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পার্ব্বতীবাঈয়ের বয়স যখন কুড়ি বৎসর, মাত্রা

তখন তাঁর জীবনে নেমে এল বৈধব্যের অভিশাপ। নিজস্ব একটি বাড়ী কিংবা সঞ্চিত অর্থ কিছুই রেখে যান নি মহাদেবরাও। তখন আবার বাপমায়ের কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া পার্ব্বতীবাঈয়ের গত্যন্তর রইল না। সেখানে যাবার পরে দেশাচার অনুসারে পার্ব্বতীবাঈয়ের মস্তক মুণ্ডিত করা হ'ল। প্রতি মাসে এই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির দুঃখ যে কি গভীর তা কল্পনা করতে পারবেন কেবল ভুক্তভোগীরাই। এমনি ভাবে সেখানে পার্ব্বতীবাঈ জীবন কাটাতে লাগলেন এবং তাঁর অবস্থা তার পিতামাতাকে করে তুলল অত্যন্ত অসুখী। হয় ত এমনি ভাবেই তাঁর দিন চলে যেত, কিন্তু অধ্যাপক কার্ভের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর (বায়া) বিবাহের দরুন ঘটল এর ব্যতিক্রম। পার্ব্বতীবাঈও ছিলেন তাঁর মায়ের মত একটু রক্ষণশীল এবং এই বিয়ে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। সদ্যবিবাহিতা বায়ার কিন্তু ইচ্ছা যে, পার্ব্বতীবাঈ থাকেন তাদের সঙ্গে পুণায়, কিন্তু তাঁর মা ছিলেন এর বিরোধী। তাঁর আশঙ্কা ছিল, পার্ব্বতীবাঈও না শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বোনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ইচ্ছুক হয়ে আবার বিয়ে করে বসেন। অবশেষে পার্ব্বতীবাঈ তাঁর দেবরের সঙ্গে মিরাজে অবস্থান করা স্থির করলেন আর ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন পুণায়।

ছয় মাস পরে একদিন অধ্যাপক কার্ভে, বিধবারা যাতে নিজেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন তদুপযোগী শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি হোম বা সদন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর আদর্শের কথা পার্ব্বতীবাঈকে বুঝিয়ে বললেন। তিনি পার্ব্বতীবাঈকে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে এবং তিনি তাঁকে সাহায্য করতে রাজী আছেন কিনা তা জানাতে অনুরোধ করলেন। পার্ব্বতীবাঈ তাঁকে বললেন যে, তিনি তাঁর আদর্শ উপলব্ধি করতে পারছেন না বটে, তবে হোষ্টেলে রাঁধুনী হিসাবে কাজ করতে পারবেন। আন্না (ড. কার্ভে এই নামেই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন) কিন্তু জানতেন যে, এর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্টতর কাজ করবার যোগ্যতা তাঁর আছে এবং তিনি যাতে "টিচার্স সার্টিফিকেট" পেতে পারেন সেজন্যে তাঁকে 'হোম ক্লাসে' যোগ দেবার নির্দ্দেশ দিলেন। এমনি ভাবে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পার্ব্বতীবাঈ একেবারে গোড়া থেকে পড়াশুনা সুরু করলেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষাক্রম (course) সমাপ্ত করলেন।

ইতিমধ্যে আশ্রমের কাজ যথারীতি সুরু হয়ে গেছে। আন্নার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবার এবং তাঁর পরিকল্পনাসমূহের কথা জানবার সুযোগ লাভ করলেন পার্ব্বতীবাঈ। এমনি ভাবে বিধবাদের স্বাবলম্বিনী করবার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার মনে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হ'ল। অবশেষে ১৯০২ সনে বিধবাদের কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন এবং আশ্রমে যোগদান করলেন আজীবন কর্ম্মী (Life worker) হিসেবে। এই সংস্থায় তখন আবাসিক হিসাবে থাকতেন আঠার জন শিক্ষার্থিনী। তাদের আহার এবং বাসস্থান ব্যবস্থার তদারক করতেন পার্ব্বতীবাঈ। আশ্রমে কর্ম্মীর সংখ্যা কম থাকায় তাঁকে একাধারে হতে হয়েছিল তত্ত্বাবধায়িকা (Superintendent), শুশ্রূষাকারিণী (Nurse) এবং সেবিকা (Attendent)। কিছুকাল পরে আরও কর্ম্মীরা এসে আশ্রমে যোগ দিলেন এবং পার্ব্বতীবাঈকে পাঠানো হ'ল অর্থসংগ্রহের জন্যে। বিশ বৎসরের অধিককাল প্রচুর বাধা ও অসুবিধার ভিতর দিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং সংগ্রহ করেন প্রায় এক লক্ষ টাকা। তাঁর কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দরুন বিধবাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে সমাজে সাধারণের মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন হয়, তার মূল্য ছিল এই সংগৃহীত অর্থের চেয়ে ঢের বেশী। মহারাষ্ট্রের বাইরে ভ্রমণকালে ইংরেজী ভাষা জানা না থাকায় পার্ব্বতীবাঈ অসুবিধা বোধ করতেন, ফলে যদিও তখন তিনি পা দিয়েছেন চারের কোঠায় তথাপি ঐ ভাষা শিখবার বাসনা তাঁর মনে জাগল। আন্না তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন একটি কনভেন্ট স্কুলে, কিন্তু শিক্ষকগণ তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন বলে এখানে তার বিশেষ উন্নতি হ'ল না।

একবার আন্নার মনে হ'ল যে, পার্ব্বতীবাঈ যদি বিদেশে যান তা হলে ইংরেজী ত তিনি শিখতে পারবেনই, উপরন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে নারী-কল্যাণ-সংস্থাগুলি কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাও স্বচক্ষে দেখবার সুযোগলাভ করবেন। এমনি ভাবে খুব কম ইংরেজী-জানা, একজন গোঁড়া হিন্দু বিধবা আমেরিকায় প্রেরিত হলেন ১৯১৭ সনে—সে আজ চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা।

গোড়ায় তিনি থাকতেন ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলিতে ওয়াই. ডবল্যু. সি. এ. হোষ্টেলে। তাঁকে অনেক ধকল সহ্য করতে হ'ত। বহু পরিবারে এবং একটি হাসপাতালে তিনি কাজ করতেন পরিচারিকা রূপে। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে তিনি চলে যান নিউইয়র্কে, কিন্তু সেখানে গিয়েও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল—ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত একটি শ্রমিক-কল্যাণ সম্মেলনে নারী-শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ লাভ করলেন তিনি। এখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল নারী-শ্রমিকদের এক নেত্রীর সঙ্গে। তিনি শুধু যে তাঁকে কাজই দিলেন

তা নয়, নিজের বাড়ীতে তাঁর থাকার ব্যবস্থাও করলেন। তাঁরই আনুকূল্য একজন তর্জ্জমাকারীর সহায়তায় পার্ব্বতী-বাঈ কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করতে সমর্থ হলেন। এমনি ভাবে ১৯২০ সনে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে তিনি কিছু অর্থসংগ্রহ করেন এবং আশ্রমের জন্যে দান হিসেবে একটি মোটরকারও পেয়েছিলেন। কাজ থেকে অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত, এমনকি তার পরেও তাঁর কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছিল অব্যাহত। দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে তিনি পারেন নি বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি এমন এক পুত্রের জননী হয়েছেন যিনি বাস্তবিকই মহারাষ্ট্রের রত্নস্বরূপ। পার্ব্বতীবাঈয়ের এই কৃতী সন্তান হিঙ্গন সংস্থার জন্য দান করেছেন এক লক্ষ টাকা।

পার্ব্বতীবাঈ লোকান্তরিতা হন ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসে, পঁচাশী বৎসর বয়সে। হিঙ্গন কলেজটির নূতন নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই নামানুসারে। আশ্রমের উন্নতিকল্পে তাঁর ত্যাগ ও সেবার জন্যে সকলের মনে যে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত, এটা হচ্ছে তারই দ্যোতক। চলিত বৎসরে এই ট্রেনিং কলেজের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ভবন নির্ম্মিত হবে—বর্ত্তমান বৎসরেই অনুষ্ঠিত হবে হিঙ্গন স্ত্রীশিক্ষা সংস্থার হীরক-জয়ন্তী উৎসব।

কুষ্ঠরোগীদের পুনর্ব্বাসন

টি. এন. জগদীশন

'অক্সফোর্ড কনসাইজ ডিক্সনারী' অনুসারে পুনর্ব্বাসন কথাটার মানে হইতেছে "সুযোগ-সুবিধা, খ্যাতি অথবা যথোচিত অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা"। কাজেই পুনর্ব্বাসনের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন কাহারও ক্ষতি সাধিত এবং তাহার মর্য্যাদা অথবা অবস্থার হানি হয়। কোনও ব্যক্তি যখন রোগে ভোগে তখন কখনও কখনও সে অশক্ত হইয়া যাইতে পারে; কাজেই তাহার পুনর্ব্বাসনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তা ছাড়া নিজের কাজ করিতে গিয়া অথবা যুদ্ধজনিত দুর্ঘটনায় কোনও ব্যক্তি যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখনও তাহার পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। গত যুদ্ধের সময়ে পুনর্ব্বাসন কথাটির তাৎপর্য্য বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সমৃদ্ধতর হইয়াছে। তখন পুনর্ব্বাসন কথাটার মানে দাঁড়াইল আর্থিক প্রাচুর্য্যের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা অপেক্ষাও বেশী কিছু। এই বিষয়টির উপর যথাযথভাবেই জোর দেওয়া হইল যে, প্রকৃত পুনর্ব্বাসন তখনই হয় যখন পুনর্ব্বাসিত ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক সামাজিক পারিপার্শ্বিকে বাস এবং কাজকর্ম্ম করে। কেননা সকল মানবীয় প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কর্ম্মে নিয়োগ নয়—কল্যাণসাধন; এবং ব্যাপকতর সামাজিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সুযোগ-সুবিধাসমূহও কল্যাণপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত।

পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে এই আধুনিক ধারণা কুষ্ঠরোগীদের বেলায় কতটা প্রযোজ্য তাহা দেখা যাক। কুষ্ঠব্যাধির ক্ষেত্রে পুনর্ব্বাসনের সমস্যা দেখা দেয় দুইটি কারণে। এই রোগ সম্বন্ধে সাধারণের মনে বদ্ধমূল কুসংস্কারের জন্য কোনও কুষ্ঠরোগীর কর্ম্মক্ষমতা বিনষ্ট না হইলেও অথবা যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ, সে রোগসংক্রমণ-দোষ হইতে মুক্ত এবং তাহার দ্বারা সাধারণের বিপদাশঙ্কা নাই একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাহার পক্ষে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা অথবা কাজে ফিরিয়া যাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাধির ফলে ক্ষতের আকারে রোগীর এমন কতকগুলি বিকলাঙ্গতা এবং অক্ষমতার সৃষ্টি হয় যে, রোগী দেখে তাহার পক্ষে নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি চালাইয়া যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণের কুসংস্কার ছাড়া ব্যক্তিগত অক্ষমতাও লাভজনক কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলপ্রদ আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার দরুন যাহাদের রোগ থামিয়া যায় তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তির পথে বলিয়া কুষ্ঠব্যাধি সম্পর্কিত পুনর্ব্বাসন-সমস্যা এখন বিশেষ জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কুষ্ঠব্যাধি হইতে যাহারা আরোগ্যলাভ করে সেই বিপুল-সংখ্যক লোকের কর্ম্ম এবং অন্নসংস্থান সম্পর্কিত বর্ত্তমান

পরিস্থিতি এত জটিল যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একথা ঠিকই বলা হইয়াছে যে, আজিকার দিনে যিনি কুষ্ঠ ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহার অবস্থা ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা বাস্তবিকই শোচনীয়, কেননা শেষোক্তের পক্ষে কুষ্ঠ স্বাস্থ্য নিবাসে অথবা উপনিবেশে আশ্রয়লাভ করিয়া উপযুক্ত পরিচর্য্যাধীনে থাকার ব্যবস্থা হইতে পারে।

যে রোগীর দেহ বীজাণুমুক্ত হইয়াছে, কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান যেমন তাহাকে স্থান দিতে নারাজ তেমনি নিজের বাড়ীতেও সে অবাঞ্ছিত। ইহা খুবই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার যে, কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাধীন রোগীরা মুক্তির দিনটিকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। "ক্ষুধার্ত্ত মেষ প্রত্যাশী হইয়া তাকায়, কিন্তু তাহাকে খাবার দেওয়া হয় না।"

এখন, খাওয়ানোই যদি একমাত্র প্রয়োজনীয় কাজ হইত তাহা হইলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হইয়া যাইত। "ক্ষুধার্ত্ত ভেড়ার পালে"র বুভুক্ষা খাদ্য ছাড়া অন্য জিনিষের জন্য ঢের বেশী। সংসারে একটি আশ্রয় পাইবার জন্য—এমন সম্মান-জনক আশ্রয় যাহা তাহাদিগকে দিবে স্বাবলম্বনের মর্য্যাদা —তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

পুনর্ব্বাসন উপনিবেশগুলি স্বভাবতঃই এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে। "বিরাটায়তন জমি লইয়া সেখানে এমন একটি কৃষি-উপনিবেশ স্থাপন করা হোক যেখানে থাকিবে কোনও একটি কুটীর শিল্প চালু করিবার প্রবণতা"— এই ধরনের নির্দ্দেশ প্রদান করা হইবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি আমাদিগকে কতকগুলি পুনর্ব্বাসন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করিতে পারে। আমি কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, কতকগুলি বৃহদায়তন উপনিবেশ খোলার প্রয়াস বাঞ্ছনীয় নয় কেননা তাহার দরুন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সুস্থতালাভের পর এক প্রতিষ্ঠান হইতে অপর প্রতিষ্ঠানে গিয়া আশ্রয়লাভ করিবার সুবিধাটুকু মাত্র হইবে। যে ব্যবস্থার ফলে প্রাক্তন রোগীদের বিশেষ বিশেষ কলোনিগুলিতে স্থায়ীভাবে থাকিতে হয় তা পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিয়া দেয়, কেননা পুনর্ব্বাসন মানেই স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা। স্বল্পকালীন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে না কেননা তাহাতে কুষ্ঠব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচলিত কুসংস্কার গভীরতর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করিতেছি, অভিজ্ঞ কর্ম্মীদের মধ্যেও তাহা ধীরে ধীরে শিকড় গাড়িতেছে। "আমেরিকান লেপরসি ফাউণ্ডেশনে"র প্রেসিডেণ্ট মিঃ পেরি বার্জ্জেস তাহার "বর্ন অব হোপ ইয়াস" পুস্তকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন :

"যদিও এখনও পর্য্যন্ত আমি ইহা উপলব্ধি করিতেছি যে, কতকটা স্বাধীন জীবনযাপন-প্রণালী এবং কর্ম্মসূচী সংবলিত এই সকল স্বাবলম্বী উপনিবেশের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা পুরনো পৃথক-করণের পদ্ধতি অপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে উন্নততর, তথাপি আমাকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই কয় বৎসরে আমার মতের বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উপনিবেশসমূহ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বধারণা সম্পর্কে আমি আর তেমন উৎসাহী নই। বিষয়টি সামগ্রিক ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায় ইহার দরুন সাধারণের অজ্ঞতা, ভয় এবং কুসংস্কার গভীরতর হইয়া, বিপদাশঙ্কা বাড়িয়া উঠিবে মাত্র।"

তাহা হইলে আমরা কি করিব? আমার মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে যে কাজটির ব্যবহারিক উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী তাহা হইতেছে—বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাক্তন কুষ্ঠরোগীদের জন্য কতিপয় আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। ইহা সত্য যে, সাধারণতঃ কুষ্ঠ উপনিবেশে কোন না কোন প্রকার বৃত্তি-শিক্ষার পদ্ধতি চালু থাকে। কিন্তু কুষ্ঠ মিশনের মিঃ বেইলি দেখাইয়াছেন যে, এই পদ্ধতি ও পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থার মধ্যে একটা ফাঁক সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা, উপনিবেশে রোগী যে বৃত্তি শিক্ষা করে এবং অন্যবিধ যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তাহা এমন নয় যাহার দৌলতে সে বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে লাভজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে। কাজেই আমি প্রস্তাব করি যে, এই সকল নূতন শিক্ষণকেন্দ্রে আমাদিগকে সযত্নে এমন কতকগুলি বৃত্তি নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ অথবা একযোগে কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা অনুসৃত হইতে পারে। তৈরী জিনিষগুলি হইবে সাদাসিধা ধরনের, কিন্তু সেগুলির জন্য যাহাতে বড় বাজার পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যকরণীয়। এই উদ্দেশ্যে সরকারী বিভাগ-গুলির দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং এমন কতকগুলি সাদাসিধা জিনিষ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সমীচীন যাহা ব্যাপক আকারে তাহাদের প্রয়োজনে লাগিবে। আজিকার দিনে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের চাহিদা দেখা দিয়াছে তখন আমাদের কেন্দ্রসমূহের পক্ষে কোন কোন বিশেষ বিষয়ে কারিগর, যন্ত্র-শিল্পী ইত্যাদি তৈরি করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন বিশেষ ভাবে উপযোগী হইবে। পরিণামে কুষ্ঠ-ব্যাধিমুক্ত পুরুষ অথবা নারী যথোচিত শিক্ষালাভ এবং প্রস্তুতির পরে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং লাভজনক বৃত্তি অবলম্বনে উদ্যোগী হইতে পারিবে। এই সকল জিনিষ বাজারে বিক্রয়ের সমস্যা লইয়া যেন প্রাক্তন রোগী মাথা না ঘামায়। 'হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ'র মত কোন এজেন্সি অথবা বস্তুতঃ যে-কোন সমাজকল্যাণ সংস্থা, কর্ম্মীর দ্বারা উৎপাদিত জিনিষগুলি লইয়া গিয়া তাহার তরফে বাজারে বিক্রি

করিবার জন্ত আগাইয়া আসিবে। উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে অম্বর চরকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যাহারা কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত তাহারা অনায়াসে ইহা দ্বারা কাজ করিতে সমর্থ হইবে। প্রস্তাবিত শিক্ষণকেন্দ্রগুলির সহিত এমন কোন সংস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া আবশ্যক যাহা পুনর্ব্বাসন-সংক্রান্ত শল্য-চিকিৎসা (Surgery) এবং শারীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এখন উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে যে, কুষ্ঠ হইতে সঞ্জাত অক্ষমতা এবং বিকলাঙ্গতা বহুলাংশে পরিহার্য্য এবং ইহা সারানোও যাইতে পারে। ভেলোরের ডাঃ পল ব্র্যাণ্ড এই দিক দিয়া স্মরণীয় কাজ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, যথোচিত শারীর চিকিৎসা এবং শল্য-চিকিৎসা দ্বারা কুষ্ঠরোগীদের বিকল হাত আবার কর্ম্মক্ষম হইতে পারে। যাহাদের কুষ্ঠরোগ আছে তাহাদের জন্ত সর্ব্বাধিক উপযোগী এবং ফলপ্রদ কাজের পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্তও ডাঃ ব্র্যাণ্ড পরীক্ষণ চালাইতেছেন। যন্ত্রপাতি অদল-বদল করিয়া তিনি এই সকল হস্ত দ্বারা কাজের উপযোগী নূতন যন্ত্রপাতি চালু করিতেছেন। ভেলোরস্থ নবজীবন নিলয়মের যে সকল রোগী শারীর চিকিৎসা এবং শল্যচিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে তাহারা এমন কয়েক প্রকারের খেলনা তৈরি করে যেগুলি বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করেন ডাঃ ব্র্যাণ্ড। তিনি কিন্তু ইহা বুঝিতে পারেন যে, খেলনা তৈরি তাঁহার কেন্দ্রের পক্ষে উপযোগী হইলেও অন্তান্ত কেন্দ্রের পক্ষে ঐ সকলের উপযোগিতা নাও থাকিতে পারে, কাজেই আমাদিগকে খুব সুস্পষ্টরূপে চিন্তা করিয়া অন্তান্ত সম্ভাব্য বৃত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ডাক্তার ব্র্যাণ্ড সত্যই বলিয়াছেন, "যে পর্য্যন্ত না রোগী নিজেই আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে নিজের তত্ত্বাবধান এবং জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় সেই পর্য্যন্ত তাহার সামগ্রিক পুনর্ব্বাসনই হইবে আমাদের চরম লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা স্বল্পে আমরা তুষ্ট হইব না।"

আমার আশঙ্কা হয় যে, যাহা করা হইতেছে তাহা অপেক্ষা যাহা করা উচিত তৎসম্বন্ধে আমি বেশী কথা বলিতেছি। আর ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ভাবী কৃত্যসমূহের পরিকল্পনা করিতে হইবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে। সাধারণ সমাজকর্ম্মী স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিবেন, "সামাজিক সমস্যাসমূহের অন্যতম কুষ্ঠব্যাধি নিবারণে উৎসাহী সমাজকর্ম্মী আমি, কিন্তু কুষ্ঠরোগীদের পুনর্ব্বাসন সংক্রান্ত পরিস্থিতির জটিলতা দূরীকরণের জন্ত আমি কি করিতে পারি?" ইহার উত্তরে বলা যায়, আপনার কতকগুলি করণীয় কাজ আছে। প্রথমে কিন্তু জানা এবং উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, আজ কুষ্ঠ একটি চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি; কুষ্ঠব্যাধি হইতে সৃষ্ট বিকলাঙ্গতা ও অক্ষমতা নিবার্য্য এবং ইহার প্রতিকার করাও যাইতে পারে। আপনি এমন উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারেন, কেবলমাত্র যাহাতে কুষ্ঠরোগীদের জন্ত পুনর্ব্বাসনমূলক ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে অবলম্বিত হইতে পারে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় যাহা আশা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ। কুষ্ঠ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আমরা প্রত্যেকে যদি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করি তাহা হইলে পুনর্ব্বাসন বলিতে একটি অবজ্ঞাত শ্রেণীর প্রতি দয়াপ্রদর্শনের অতিরিক্ত আর কিছুই বুঝাইবে না। আমি এই আশা পোষণ করি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, দেশের বিভিন্ন অংশে আমার পরিকল্পিত শিক্ষণকেন্দ্রের অনুরূপ কেন্দ্রসমূহ খোলা হইবে। আমার আশা এই যে, প্রতিষ্ঠার পর এই সকল কেন্দ্রের প্রতি সাধারণভাবে সমাজকর্ম্মীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে যে নূতন আদর্শ আমি উপস্থাপিত করিয়াছি সেগুলি যাহাতে ঐ সকল কেন্দ্রে কর্ম্মে রূপায়িত হয় সে বিষয়ে তাহারা অবহিত হইবে। আজিকার দিনে কুষ্ঠরোগীদের সেবাকার্য্যে নিরত কর্ম্মীদের যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তন্মধ্যে একটি এই যে, অন্যান্য কেন্দ্রের সমাজকর্ম্মীরা কুষ্ঠব্যাধি সম্পর্কে প্রায়শঃই সেকেলে ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহার দায়িত্ব কুষ্ঠরোগীদের সেবাকার্য্যে নিরত কর্ম্মীর যতটা, সাধারণ সমাজকর্ম্মীরও ঠিক ততটাই। আমাদিগকে এই বাণী চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং আমাদের কথায় যাহাতে সকলে কর্ণপাত করে সেই দাবি উত্থাপন করিতে হইবে।

এখনো অনেক দুঃখ

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

এখনো অনেক দুঃখ বাকি
এখনো রাত্রির দেশে তুমি উষা রয়েছ অ-ধরা।
ঘুমের তিমিরতীরে
বেদনার জাল পেতে রাখি—
ধরা যদি পড়ো, জানি
সাথী হতে হবে স্বয়ংবরা॥

যাদের চাহি না, হায় নিত্য তারা আসে কৃপা ক'রে'
মুখে হাস্য, মনে ক্ষোভ, জনতার মাঝে রহি একা।
যাদের সময় হয়
আমার সময় নিতে হরি'
তাদের মতন হলে
হয়তো এখনি দিতে দেখা॥

গোপনে স্বপ্নের মত ঘুমের অতলে গান করি
আমার বুকের ভাষা ভালবাসা পায় না কোথাও,
তুমি তো সামান্যা নও
তাই বুঝি দূরে সুর ধরি'
ঘুমের অতলে রহি
চিত্ত শুধু আশ্বাসে দোলাও?

ঘুম হতে ওঠো প্রিয়, সত্যকার জাগরণে জানি,
আমার জাগার গানে ওরা তো মানে না, পরিহাসে,
তুমিও মানো না, তাই
এখনো জাগো না অভিমানী,
এখনো বালিকা বুঝি?
মন নেই মিলনবিলাসে?

যে-মেয়ে শৈশবে আজও খেলা করে পুতুলের পাশে
মা হয়ে খাওয়ায় দুধ, মেয়ে হয়ে নিজেই পুতুল—
জেগে জেগে ঘুম যায়,
একটুতে কাঁদে, কভু হাসে—
তুমি কি উপমা তার?
তুমিও মাটির সমতুল?

মাটির উপমা তুমি? মাটির পৃথিবী মনোরম?
মন ছাড়া সব আছে, মন ছাড়া দিতে পারো সব!
দীপ্ত চোখ, লুব্ধ ঠোঁট
মুগ্ধ হাসি অনন্ত উপমা?
পতঙ্গের পক্ষপাশে
তুমিও কি অগ্নির তাণ্ডব?

নির্জনের অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত মত্ততার ফুল—
এ ফুলে ভ্রমর যারা কি যে মধু পায় জেগে জেগে
অভিমানে তেড়ে বেড়ে
অহরহ শাসান তো হল,
মারণের অভিচারে
রাত্রিরে রাঙায় রণোদ্বেগে!

এখনো অনেক দুঃখ বাকি
এখনো রাত্রির দেশে কাঙালজীবনে নাই ঘুম,
উষার সন্ধানে কবি
আজও আমি তিমিরে একাকী
প্রথম প্রেমের মত
প্রত্যাশায় নিথর নিঝুম!

আমার প্রথম মোকদ্দমা

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
অনুবাদক—শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

[অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যবহারজীবী হিসাবে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে অনেকেই জানেন, কিন্তু ব্যবসার প্রারম্ভে প্রথম মোকদ্দমা পাইয়া তাঁহার মনে কি ভাব উদয় হইয়াছিল, কি ভাবে হাকিমের কাছে তিনি সেই মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরই বা কি বক্তব্য আছে তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ও উপকারার্থে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য তাঁহার লিখিত প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা হইল]

ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল আমি আইন ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছি। সেজন্য ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, এই ব্যবসায়ে কি করিয়া সফলতালাভ করা যায় লোকে তাহা জানিতে চাহিবে, কিন্তু উত্তরে আমি কোন কারণই দর্শাইতে পারিব না। প্রশ্নোত্তর ধরণে আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

প্রশ্ন—সফলতা লাভ করিতে হইলে আইন বিষয়ে পাণ্ডিত্যই কি একান্ত আবশ্যক?

উত্তর—হাঁ, কতকটা আবশ্যক বটে, তবে আইন বিষয়ে পাণ্ডিত্য বলিতে শুধুই আইন-জ্ঞান ও তাহার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা বুঝিলে চলিবে না, আইনের ব্যবহারিক কার্যকারিতাও বুঝিতে হইবে। তবে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে ইহাই যে একান্ত আবশ্যক এবং নিশ্চয়ই একজনকে বড় আইনজ্ঞ করিবে তাহা বলা যায় না।

প্রশ্ন—বসিয়া থাকিলেই কি ব্যবসায়ে সাফল্য ও উন্নতিলাভ হইতে পারে?

উত্তর—ব্যবসার কোন এক অবস্থায় ইহার খুব প্রয়োজন হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রারম্ভে ইহার কোন সুযোগই আসে না।

প্রশ্ন—তবে কি সাধারণ জ্ঞানের ও পরিশ্রমী হওয়ার আবশ্যকতা আছে?

উত্তর—এগুলি অনেকটা সাহায্য করে বটে, কিন্তু শুধু এগুলিতেই হয় না এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

প্রশ্ন—তবে কি বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং মানবচরিত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলে কিছু সাহায্য হয়?

উত্তর—ঐগুলি খুবই দরকার বটে, তবে শুধু ঐগুলিতেই হইবে না।

প্রশ্ন—তবে সফলতালাভ করিতে হইলে এই সমস্ত গুণগুলির সমন্বয়ই কি আবশ্যক?

উত্তর—সত্য কথা বলিতে কি, এক ব্যক্তিতে এই সমস্ত গুণাবলীর সমন্বয় দেখা যায় না। দেখা গেলেও উহা খুবই দুর্লভ। আর যদি এই গুণসমূহের সমন্বয়ই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভে একান্ত আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আইন ব্যবসায়ে কেহই সফলতালাভ করিতে পারিত না। সেই জন্য আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই বলিতে হয়, আইন ব্যবসায়ে কিসে সাফল্য অর্জিত হয় তাহা জানা বড় কঠিন ব্যাপার। সাফল্য খানিকটা সুযোগ-সুবিধার উপর এবং অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু ইহা যে শুধুই আকস্মিক তাহাও বলা যায় না। বিবাহ যেমন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, আইন-ব্যবসাও সেইরূপ লটারি বা স্ফূর্তি-খেলার মত তাহা বলা যায় না।

আমি যখন আইন ব্যবসা আরম্ভ করি তখন উপরে বর্ণিত অনেক গুণই আমার ছিল না, কারণ তখন আমার বয়স খুবই কাঁচা। যে অবস্থায় আমি এই ব্যবসায়ে যোগদান করি তাহা বলিলে আমার মনে হয়, অনেক নূতন ব্যবহারজীবীর উপকার হইবে। উপমাস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ভগ্নপোত যাত্রীরা বালুকাময় বেলাভূমিতে পদচিহ্ন দেখিয়া যেমন আশায় বুক বাঁধে, এই ব্যবসায়ে নবীন আগন্তুকেরাও সেইরূপ আশান্বিত হইবেন।

আমি যখন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করি—কলিকাতায় যেটুকু সাধারণ বিদ্যালাভ করা যায়, তখন তাহাও আমি অর্জ্জন করি নাই। আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম। তখনকার দিনে বি-এ পরীক্ষা জানুয়ারী মাসে হইত। কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া বি-এ পাসের পর, কিংবা অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেবের মত গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিলাভ করিবার পর, বিলাত গেলে আমার সুবিধা হইবে, আমার পরিচিত দু'এক জন অধ্যাপক আমাকে এইরূপ পরামর্শ দেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া বি-এ পরীক্ষার ছয় মাস পূর্ব্বেই বিলাত যাত্রা করি। অভিভাবকদের সম্মতি না লইয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম বলিয়া আমার আর অপেক্ষা করিবার অবসর ছিল না। সুযোগ আসিবামাত্রই আমাকে 'চম্পট' দিতে হয়। ছয় মাস বা ততোধিক কাল অপেক্ষা করিতে হইলে আমার এই দুঃসাহস দেখাইবার সুযোগ হয়ত আর আসিত না। অভিভাবকেরা আমার এই অভিপ্রায় অবগত হইবার পর বাধা দিবার জন্য সম্ভবতঃ যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। সুতরাং ভরা বর্ষার সময় "সিটি অব আগ্রা" জাহাজে কলিকাতা হইতে বরাবর লণ্ডন গিয়া পৌঁছি ত্রিশ দিনে—তখনকার দিনে জাহাজে ত্রিশ দিনই লাগিত। বিলাতে পৌঁছিয়াই আমি 'লিঙ্কনস ইনে' ভর্ত্তি হই। পাঁচ বৎসর আমি ঐখানেই পড়িয়াছিলাম। যে সামান্য অর্থ লইয়া আমি বিলাত যাত্রা করিয়াছিলাম ইনের ফি ইত্যাদি দিতে তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহা হইলেও ছাত্র পড়াইয়া আমি

এখন রেক্সোনায় *নতুন* একটা কিছু আছে !

তৎলব্ধ অর্থ দ্বারা ফরাসী, জার্মান, স্পেনিস ও ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা করিয়া আনন্দলাভ করিতাম।

তিন বৎসরের মধ্যে 'ইন' ও আইন বিদ্যা-সমিতি হইতে আমি বহু পুরস্কার এবং বৃত্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি ব্যারিষ্টারির শেষ পরীক্ষা দিবার জন্ত কোন দিন চেষ্টাও করি নাই, পাস করার কথা দূরে থাকুক। ঐ বৎসরে ঈষ্টার টারমে শেষ পরীক্ষায় পাস করিবার জন্ত 'বারষ্টো বৃত্তি' দেওয়া হয়। আমি উহাই লাভ করিবার চেষ্টার অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ অসুখে পড়ায় পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইতে পারি নাই। পরবর্ত্তী শীতকাল আসিবার পূর্ব্বেই চিকিৎসকগণ আমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। সুতরাং আমি ক্রমে ক্রমে যে সব পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিয়াছি তাহারই জোরে শেষ পরীক্ষা না দিলেও আমাকে ব্যারিষ্টার করিবেন কিনা আমি 'ইনের বেঞ্চার'দের তাহা জিজ্ঞাসা করি। লর্ড হবহাউস ঐ বৎসর 'ইনে'র কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি আমাকে বিপন্মুক্ত হইতে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। উপরোক্ত পুরস্কার ও বৃত্তি পাওয়ার সময় যাঁহারা আমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, 'বেঞ্চার'গণ তাঁহাদের মতামত লইয়া আমাকে পরীক্ষা দেওয়া হইতে অব্যাহতি দেন (একমাত্র তাঁহাদেরই অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল) এবং ৭ই জুলাই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি ব্যারিষ্টার হই।

সুতরাং আমি যখন আইন ব্যবসায় আরম্ভ করি তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন 'ডিগ্রি' ছিল না; ব্যারিষ্টারির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ হইলেও তাহাও আমি পাস করি নাই। আইনের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্ত আমি—প্র্যাক্‌টিস করেন এমন ব্যারিষ্টার বা সলিসিটারের চেম্বারেও কোনও দিন প্রবেশ করি নাই এবং সেজন্ত আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। ভারতবর্ষের কিংবা ইংলণ্ডের কোন বিতর্কসভার আমি কোন দিন সদস্য ছিলাম না বা কোন দিন কোন তর্কযুদ্ধেও যোগদান করি নাই। আমি যেরূপ স্বল্প বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান লইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলাম, খুব কম লোককেই সেরূপ ভাবে ঐ ব্যবসা আরম্ভ করিতে দেখা যায়। যে স্থলে আমি

ব্যবসায় আরম্ভ করি—সেখানকার কোন জজ, ব্যারিষ্টার বা সলিসিটারদের আমি চিনিতাম না; এবং আমাদের পরিবার সেখানে সম্পূর্ণই অপরিজ্ঞাত ছিল। ব্যবসায় করিতে অন্ততঃ যে সব বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে জানাশুনা থাকিলে সুবিধা হয় তাহার কিছুই আমার ছিল না। বহু দিন হইতে চলিল কিন্তু বর্ত্তমানে আমি যখন সেই সময়কার কথা চিন্তা করি তখন আমার নিজের অযোগ্যতা ও দুঃসাহসিকতার কথা মনে করিয়া আশ্চর্য্য হই। আইন ব্যবসায়ে সফলতার পক্ষে যেমন গুণ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে অজ্ঞতাই অসাফল্যের আংশিক বা একমাত্র কারণ বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড ওয়েষ্টবেরী সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। লর্ড চ্যান্সেলার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল সর্ রিচার্ড বেথেল। লর্ড চ্যান্সেলার হইবার পর, আইন বিষয়ে কোন এক বিশেষ ধরণের মত দিলে সলিসিটার সর্ রিচার্ড বেথেলরূপে তিনি সেই বিষয়েই বহু পূর্ব্বে কিরূপ বিপরীত মত দিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন লর্ড ওয়েষ্টবেরী বলিয়াছিলেন—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এরূপ মত দিতে পারে, সে বর্ত্তমানে আমি যে উচ্চপদে সমাসীন তাহা অধিকার করিয়াছে।"

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পূজার ছুটির পর হাইকোর্ট খুলিলে আমি ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করি। আইন ব্যবসায় পক্ষে তখনকার কোর্টের অবস্থা আমার খুব সুবিধাজনক মনে হয় নাই। সংখ্যা ও গুণ হিসাবে কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষের সমস্ত আইন ব্যবসায়ীদের অপেক্ষা তখন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। মহা মহা রথীরা তখন এখানে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, যথা—পল, উড্রফ এবং এভান্স; মনোমোহন ঘোষ, ডব্লিউ. সি বনার্জ্জী এবং টি. পালিত; সি. পি. হিল, টি. এ. আপকার এবং এম. পি. গ্যাসপার; জুনিয়রদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ মিত্র এবং লালমোহন ঘোষ; উইলিয়াম গার্থ এবং আর্থার ডুল। ইঁহাদের সকলেরই জুনিয়র হিসাবে মাঝামাঝি রকমের কাজ (মক্কেল) ছিল। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক বেকার জুনিয়র (ভারতবর্ষীয়ই বেশী) ছিলেন—যাঁহাদের নাম, যশ বা অর্থপ্রাপ্তি না হওয়ায় বৎসরের পর বৎসর বাসগৃহ হইতে বার লাইব্রেরী পর্য্যন্ত আসা-যাওয়া করিয়াই কালক্ষেপ করিতে হইত। এই শেষোক্তদের সংস্পর্শেই আমাকে বেশী আসিতে হইয়াছিল এবং আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আমার ন্যায় সহায়সম্বলহীন আগন্তুকের এখানে নাম করার আশা খুবই কম। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা খুবই অপ্রীতিকর মনে হইতেছিল, কি করিব বুঝিতে পারিতেছিলাম না এবং অন্য কিছু করিবার মত আমার শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল না। প্রত্যহ আমার মত নিরানন্দ ও হতাশভাবাপন্ন শতাধিক সমব্যবসায়ীদের সহিত একই ভাবে বার-লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করিয়া কালক্ষেপের পালা আরম্ভ হয়।

কিন্তু ঘোর দুর্দিনের পরেও আবার সুদিন আসে। আমার সুদিন এইভাবে আসিয়াছিল—সলিসিটার আপিসের এক শিক্ষানবীশ (articled clerk) প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে আমার সহিত চার বৎসর পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার সহিত আমার কোন অন্তরঙ্গতা বা বন্ধুতা ছিল না। এই ব্যক্তির নাম যাদবচন্দ্র দত্ত। পরে ইনি হাইকোর্টের একজন চতুর ও কর্ম্মদক্ষ এটর্নী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই গতায়ু হন। তিনি সত্যই সজ্জন ব্যক্তি। আমি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করার কয়েক মাস পরে এক শনিবার অপরাহ্নে তিনি একটি অসমর্থিত মোকদ্দমার কাগজপত্র (যাহার উপর দুই মোহর অর্থাৎ ৩৪৲ টাকা ফি লেখা ছিল) সহ আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। শুধু তাহাই নহে, আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তিনি আমায় নগদ ৩৪৲ টাকা দেন তখনকার দিনে কোন এটর্নীই কোন জুনিয়র ব্যারিষ্টারকে মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত নগদ পারিশ্রমিক দিতেন না। এইরূপ জুনিয়রদের পারিশ্রমিক পাইতে পরবর্ত্তী পূজার অবকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। সুতরাং এই মোকদ্দমাটি দ্বিগুণ সমাদরের সহিত আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। হাকিমের নিকট মুখ খুলিবার সুযোগ হইবে বলিয়াই যে শুধু এই মোকদ্দমা এত সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহাই নয়, তখন টাকার এত দরকার ছিল যে, নগদ অর্থপ্রাপ্তি হইবে বলিয়াই আমি মোকদ্দমাটি লইয়াছিলাম। আপনারা কি মনে করেন, এই মোকদ্দমা পাইয়া আমি খুব উল্লসিত হইয়াছিলাম বা বাগ্মিতা দেখাইবার ইচ্ছায় খুব অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম? সে সব কিছুই মনে করিবেন না। মোকদ্দমা পাইয়া আমার ভীষণ ভয় হইয়াছিল। ভয় এইজন্য পাছে আমি এটর্নীর প্রার্থিত ডিক্রী না পাই, কিংবা কোর্টের রীতি, কার্য্যবিধি বা বক্তৃতা দিবার কলা-কৌশলে অনভিজ্ঞ থাকায় শুধু ৩৪৲ টাকার লোভে (যদিও টাকার তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল) আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া ফেলি। প্রথম অর্জ্জিত অর্থ পাইয়া খুশীমনে কোন প্রকারে গৃহে পৌঁছিয়া-ছিলাম বটে, কিন্তু সোমবার সকালে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ভয়ই আমাকে মারাত্মক ভাবে পাইয়া বসিয়াছিল। সোমবার আসিল এবং আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র লাল-নীল পেন্সিলে দাগ দিয়া আর মোকদ্দমার প্রত্যেক কথাটি আমার স্মৃতি-পটে মুদ্রিত করিয়া লইয়া হাকিমের সম্মুখে যেখানে আইনজীবীরা বসেন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পরবর্ত্তীকালে হাকিমের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমি সত্যই মোকদ্দমাটির কাগজের লাল ফিতা খুলিয়াছি কিনা (অর্থাৎ মোকদ্দমাটি সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছি কিনা) জানিবার জন্য আমার এটর্নী যেরূপ ব্যাকুল থাকিতেন তাহার সঙ্গে তখনকার সময়ের কত প্রভেদ! জাষ্টিস ট্রেভেলিন ছিলেন জজ। তিনি নিজেও কিছুদিন পূর্ব্বে হাইকোর্টেরই ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। ব্যারিষ্টারি করিবার সময় তিনি অনেক নূতন অনভিজ্ঞ ব্যবহারজীবীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যথাসময়ে মোকদ্দমার ডাক হইলে আমি কাগজপত্র সহ প্রস্তুত

হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম, কারণ মামলাটি আমার মানসপটে অঙ্কিত ছিল। আমি বলিলাম—"হুজুর, নিম্নলিখিত অবস্থায় টাকা ধার দেওয়ার জন্য এইটি একটি হ্যাণ্ডনোটের মামলা।"

জজ প্রশ্ন করিলেন—"কি ভাবে ধার হইয়াছিল?" আমি তাঁহার প্রশ্নের কোন অর্থ না বুঝিয়াই কখন, কবে ও কি অবস্থায় টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে যাইতেছিলাম। জজ কিন্তু সে সব না শুনিয়া ইতিমধ্যেই সমনজারির এফিডেভিট পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে আমি জানিয়াছিলাম—অসমর্থিত মোকদ্দমায় কিভাবে সমনজারি হয় সেইটিই বিশেষ জরুরি ব্যাপার। প্রতিবাদীর উপর সরাসরি সমন ধরানো হইয়াছে এবং এ বিষয়ে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না বুঝিয়া তিনি আমাকে আর বেশী বলিতে না দিয়া সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন। কি করিব আবার আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এটর্নীকেই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান বা অনুপস্থিত সাক্ষীকে ডাকিয়া দিতে বলিব, না কোর্টের চাপরাসীকেই সাক্ষীকে ধরিয়া আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে বলিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আসলে আমাকে সে সব কিছুই করিতে হয় নাই। কারণ আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এটর্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না করিতেই সাক্ষী কাঠগড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এটর্নী এখন আমায় সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতে বলেন, কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই জজ আরজিতে গ্রথিত হ্যাণ্ডনোটটি সাক্ষীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করেন—প্রতিবাদী সেটি তাঁহার উপস্থিতিতেই সহি করিয়াছিল কিনা? সাক্ষী সে প্রশ্নের উত্তর দিলে এবং আমি তাঁহাকে আর কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্বেই জজ আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—আসল-বাবদ ও সুদ-বাবদ কত তাঁহার প্রাপ্য। এবারও সাক্ষী উত্তর দেওয়ার পর জজ হুকুম দেন—এত টাকা আসল ও এত টাকা সুদের জন্য ডিক্রী দেওয়া হইল। অতঃপর জজ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, "মিঃ সিংহ, মোকদ্দমা শেষ হ'ল, আর কিছু জিজ্ঞাসা নাই।" আমিও মামলা শেষ হইল জানিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম।

সুতরাং কোর্টে প্রথম মোকদ্দমা করার অভিজ্ঞতা ত আমার এই; কিন্তু সত্যই যদি ইহাকে আদৌ মোকদ্দমা করা বলে তবেই যে ভাবে মোকদ্দমা করিয়াছিলাম, তাহাতে যে দ্বিতীয় মোকদ্দমা পাইবার আর আশা নাই, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে খুব অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা বলা যায় না। কারণ আমার ঐ এটর্নী শিক্ষানবীশ বন্ধুটি পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখুন, মোকদ্দমা পরিচালনা করা কত সহজ, আমি নিশ্চিত যে দ্বিতীয় মোকদ্দমা আমি যখন আনিব তখন আপনি আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে তাহা করিতে পারিবেন।" কিন্তু এই দ্বিতীয় মোকদ্দমা আসিতে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং সুদীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল নিজের উপর যুক্তিসঙ্গত আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে।*

---

* "My First Brief"—By Lord Sinha (*The New Empire*, 24th. December, 1925) হইতে অনূদিত।

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সাংস্কৃতিক সম্মেলন

গত ৭ই ও ৮ই জুলাই পুরীধামে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বর্গ-দ্বারস্থিত শাখাকেন্দ্রের দ্বাবিংশতি অধিবেশন উপলক্ষে দুইটি বিরাট সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উৎকলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীনীলকণ্ঠ দাস এম.এল.এ. এবং উড়িষ্যার রাজস্ব ও শিক্ষা-সচিব শ্রীরাধানাথ রথ যথাক্রমে সম্মেলন দুইটিতে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের অন্যতম প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ও লোকসেবক সমাজের সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীলিঙ্গরাজ মিশ্র, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বামী পরমানন্দজী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী জাতিগঠনে ধর্মের দান সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীসত্যবাদী ত্রিপাঠী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর হোতা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। স্বামী বেদানন্দজী মাননীয় অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া সঙ্ঘের সেবা ও গঠনমূলক কার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা করেন।

অতঃপর রক্ষীদল বিবিধ ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করে। ভজন-কীর্ত্তন, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ দরিদ্রনারায়ণ সেবা, ছায়াচিত্রযোগে ভাষণ, ধর্ম্মব্যাখ্যান প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীযুক্ত রথ সঙ্ঘ-পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী কর্তৃক সমাগত ভক্ত জিজ্ঞাসুগণকে সাধনোপদেশ প্রদত্ত হয়।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন

সম্প্রতি শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে (যক্ষ্মা হাসপাতাল) স্বর্গত কালীচরণ ও গৌরমোহন পাইন স্মৃতিকক্ষ এবং পরলোকগত বীরেন দত্তের স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত শল্যচিকিৎসাগারের উদ্বোধন ও তিনটি স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন।

উক্ত স্মৃতি-কক্ষটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মেসার্স জি. এম. পাইন নামক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ ও শ্রীচৈতন্যচরণ পাইন সেবায়তনকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শল্যচিকিৎসাগার স্থাপনের জন্য বীরেন দত্তের মাতা শ্রীমতী সুপ্রভা দত্ত দান করিয়াছেন প্রথম কিস্তিতে দশ হাজার টাকা। ইহা ছাড়া লোকান্তরিতা বীণাপাণি ঘোষের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার স্বামী ৺জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের একজিকিউটরগণ পনর হাজার টাকা এবং পরলোকগত বীরেন্দ্রকুমার সাহার স্মৃতিরক্ষার্থ মেসার্স বি. কে. সাহা ম্যাণ্টাল ওয়ার্কস সাড়ে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহারই স্বীকৃতিস্বরূপ স্মৃতিফলক তিনটি স্থাপিত হয়। স্মৃতি-কক্ষ ও শল্যচিকিৎসাগারের উদ্বোধন এবং স্মৃতিফলকগুলির আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বলেন, "শ্রীভগবান আমাকে লোক-কল্যাণমূলক এই কার্য্যের সহিত যুক্ত করিয়াছেন। অযাচিত ভাবে যাহা পাইয়াছি, তাহা যেন দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি। আর সেই সেবায় যাহা কিছু পরমার্থ, তাহা যেন আপনারা সকলে ভোগ করেন। আমার গুরু মহারাজ বলিতেন—আমরা মালী, বীজও আমাদের নহে, জমিও আমাদের নহে, কিন্তু কোথায় বীজ ফেলিলে তাহার বিকাশ ঘটিবে সেটুকু আমরা জানি।"

সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, দেশের মধ্যে যক্ষ্মারোগের বিস্তার বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমতাবস্থায় এই হাসপাতালে যে কিছু রোগী চিকিৎসার সুযোগ পাইতেছে ইহাও একটা সৌভাগ্য। সেবায়তনের এই আদর্শ সমগ্র দেশে প্রসারলাভ করুক।

অধ্যাপক ড. শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী উদ্যোক্তাদিগের সেবাব্রতের প্রশংসা ও এই প্রয়াসের সাফল্য কামনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

ভাণ্ডারের সভাপতি ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত ও অন্যতম কর্ম্মী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সভাস্থলে নিম্নলিখিত দানগুলি সংগৃহীত হয়: শ্রীচৈতন্যচরণ পাইন ২,৩০১৲, শ্রীমতী শান্তা চৌধুরী (জামশেদপুর) ১০০১৲, ডাঃ এস. সি. লাহা ১০০০৲, শ্রীসাধনচন্দ্র হালদার, শ্রীশরৎকুমার রায়, শ্রীমহাদেবচন্দ্র পালিত ও শ্রীমতী মাধবীলতা দত্ত প্রত্যেকে ১০১৲, শ্রীসুনীল ঘোষ ৫১৲। শ্রীমতী জ্যোৎস্না বসু ও শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী প্রত্যেকে এক গাছা সোনার চুড়ি দান করেন।
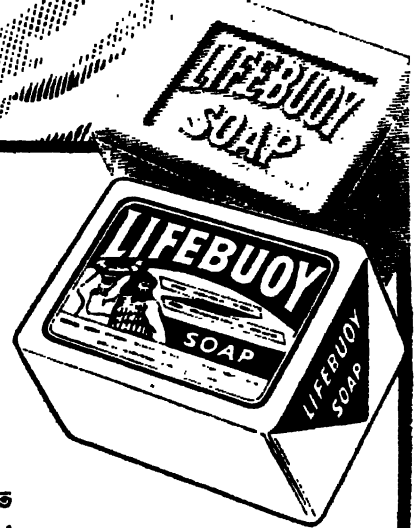
আলোচনা

"মধুসূদন দত্ত কি এক জন ?"

শ্রীস্নেহাংশু আচার্য্য

গত ১৩৬২ আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল দুটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যোগেশবাবু ঠিকই বলেছেন যে, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়াও আর একজন মধুসূদন দত্ত তখনকার দিনে হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন এবং পরে উক্ত হিন্দু কলেজেই তিনি শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হন। এই দ্বিতীয় মধুসূদন দত্ত ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে কিছুদিন লেখাপড়া করে মধুসূদন হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন হিন্দু কলেজ গরানহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ী থেকে উঠে এসে পটলডাঙ্গায় হেয়ার সাহেবের জমির উপর তৈয়ারী কলেজ-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধুসূদন কলেজে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সিনিয়র স্কলারশিপ অধ্যয়ন শেষ করে মধুসূদন নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন পড়েছিলেন। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদে মাতার আপত্তি হওয়াতে তিনি ঐ কলেজ ছেড়ে দেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়ার পর মধুসূদন ১৮৩৬ সন হইতে হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে কাজ করেন। হেয়ার সাহেবের অন্তিম-কালে (১লা জুন ১৮৪২) মধুসূদন হিন্দু-কলেজের শিক্ষক ছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু-সময়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে মধুসূদন হিন্দু কলেজের শিক্ষকতাকার্য্যে ইস্তফা দিয়ে মুৎসুদ্দি হন। এবং 'গিসবোর্ন' কোম্পানী ও অন্যান্য স্থানে কাজ করেন। ৩৩নং ফিয়ার্স লেনে নিজের উপার্জ্জনে একটি দোতালা বাড়ী কেনেন।

এই মধুসূদন বহু দিন ৮নং ওয়ার্ডের কমিশনার ছিলেন। যে বৎসর সরকার কমিশনারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন, সেই বৎসর মধুসূদন ও অপর সাতাশ জন কমিশনার সরকারের এই আচরণের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। এ ছাড়া তিনি বহু দিন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

১৯০৩ সনে ২১শে নবেম্বর তারিখের 'ষ্টেটসম্যানে' মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ এই ভাবে প্রকাশিত হয়:

"Obituary—The death is reported at Calcutta on Monday, of Babu Madhusudan Dutt, a well-known resident of this city. The deceased was an orthodox Hindu and one of David Hare's favourite scholars. He was educated in the Hindu College, where after finishing his education he served as a teacher for a few years. He afterwards became a Banian to the late firm of Messrs. Gisbourne & Co., and served in other mercantile firms also. He was a Municipal Commissioner and Honorary Magistrate for several years."

আশা করি, এই উদ্ধৃতাংশ দুই জন মধুসূদনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীকরণে সবিশেষ সহায়ক হবে। কবি মধুসূদনের ছয় বৎসর আগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু লোকান্তরিত হন, কবি মধুসূদনের মৃত্যুর সাতাশ বৎসর পর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাশি বৎসর। এঁর জীবনের অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য ১৩৩১ সনে শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত (মধুসূদন দত্তের পৌত্র) প্রকাশিত জীবনচরিতে আছে।

সামান্যবাদ (Universals)—শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, কাব্য-ন্যায়তীর্থ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২॥০ টাকা।

সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, দার্শনিক তর্ক বিচারই সারস্বত ক্ষেত্রে জাতির সমৃদ্ধি সূচনা করে। ন্যায়দর্শনের বিচিত্র ক্রমবিকাশ প্রধানতঃ পূর্ব্ব-ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে প্রায় সহস্র বৎসরব্যাপী বাদ-বিচারের ফলে সাধিত হইয়াছিল। যে সকল বিষয়ে বৌদ্ধদের সহিত হিন্দুদের গুরুতর মতভেদ প্রকট হইয়া উঠে—তন্মধ্যে একটি হইল সামান্যবাদ। বৌদ্ধমতে (ভাবরূপ) সামান্য বা জাতিপদার্থ নাই। উদয়নাচার্য্যের অল্প পূর্ব্বে বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত জিতারি "জাতি-নিরাকৃতি" নামে ক্ষুদ্র প্রকরণ রচনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে পাঁচটি অধ্যায়ে তর্কবহুল সামান্যবাদের বিশ্লেষণ ও ক্রমবিকাশ যথাসম্ভব সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। যে সকল মূলগ্রন্থ হইতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাদের আলোচনায় প্রবীণ পণ্ডিতদের মাথাও ঘূর্ণিত হয়। উদীয়মান অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নবীন বয়সেই ঐ সকল গ্রন্থের দুরূহ গ্রন্থি ভেদ করিয়া মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহা বিশ্লেষণাত্মক রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রথম কৃতিত্বকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি এবং আশা করি, ঈশ্বরবাদাদি অন্যান্য তর্কজালজড়িত বিষয়েও তাঁহার নিপুণ লেখনী পরিচালিত হইবে। এ জাতীয় দার্শনিক তর্ক বিচারমূলক বাংলাগ্রন্থের রচনা বাংলা সাহিত্যের একটা দৈন্য দূর করিয়া কৃতার্থ হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (সরল বাংলা অনুবাদ)—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। প্রথম খণ্ড: বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ। ওরিয়েণ্টাল পাবলিশিং কোং, ১১ডি আরপুলি লেন, কলিকাতা—১২। পৃ ৪২—মূল্য ৸০ আনা।

উপনিষদের নিগূঢ় অধ্যাত্মবিদ্যা পৌরাণিক যুগে "শতসাহস্রী" এক মহারামায়ণ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া প্রচলিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পরিণতি লাভ করে। বত্রিশ হাজার শ্লোকাত্মক এই গ্রন্থ এত উপাখ্যান ও বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে অনেক সময় মূল বিষয় হারাইয়া যায়। অধ্যাত্মশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রে সম্যক্ কৃতপ্রবেশ না হইলে ইহার অনুবাদ করা কঠিন। বিনয় সহকারে সরল অনুবাদ বলিয়া প্রকাশিত এই রচনা বস্তুতঃ এক অভিনব বস্তু। অধ্যায়বিভাগ তুলিয়া দিয়া, উপাখ্যান ও দৃষ্টান্তভাগ সংক্ষিপ্ত করিয়া, ঋষির ভাষা ও ভাবপ্রবাহ অবিকৃত রাখিয়া গ্রন্থের মর্ম্ম সরল বাংলায় প্রকাশ করা প্রায় অসাধ্য। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি গ্রন্থকার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সারসঙ্কলন ও অনুবাদক্ষমতাবলে এই অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এ জাতীয় বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণকালে প্রায়ই অশুদ্ধিবহুল হয়—সুখের বিষয় গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধিবর্জ্জিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থের বাকী অংশ সঙ্কলন করিয়া সুযোগ্য গ্রন্থকার বাংলা দেশে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের ধারা সংরক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নরেশ গ্রন্থাবলী—(প্রথম খণ্ড)। উত্তরায়ণ (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৮৸০ আনা।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একদা আক্ষেপ করিয়াছিলেন, 'দেহ-পট সনে নট—সকলি হারায়।' কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উক্তিটি বহুলাংশে সত্য। চোখের সামনে দেখিলাম—কয়েকজন শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিলেন এবং সাহিত্য-জগৎ হইতে অপসৃত হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়াও গেলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। জীবিত লেখকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও প্রায় বিস্মৃতের দলে। বহুকাল লেখনী-চালনা না করার ফলে আধুনিক পাঠক-মহলে ইনি একরূপ অপরিচিতই। অথচ এক সময়ে শরৎচন্দ্রের পরে ইঁহার গল্প চরিত্রগুলি লইয়া কম হৈ চৈ হয় নাই। সমাজ-প্রচলিত কতকগুলি ধারণা, রীতি ও ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড কশাঘাত—ইঁহার কাহিনীর বিষয়বস্তু। 'রাজগী' ও 'শুভা' উপন্যাস দু'খানির নাম প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থাবলীতে 'রাজগী', 'কাটার ফুল' ও 'সতী' এই তিনখানি উপন্যাস সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। জমিদারী-প্রথা বিলোপ করিয়া প্রজাকে ভূমিস্বত্বে প্রতিষ্ঠিত করার দৃষ্টান্ত 'রাজগী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'কাটার ফুলে' একটি অস্পৃশ্য মেয়েকে ভদ্রসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়, 'সতী' উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে লেখকের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বিদ্যমান। সবগুলি কাহিনীই বিশিষ্ট এবং বিদ্রোহের সুরে অনুপ্রাণিত।

ইতিমধ্যে যুগপরিবর্ত্তন হওয়াতে পুরাতন সমাজে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—কতকগুলি সমস্যা পূর্ব্বের মত তীব্র নাই। এ সব সত্ত্বেও নরেশচন্দ্রের কাহিনীগুলির বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য-কর্ম্মের মধ্যে উদার মানবতাবোধের মূল সুরটি আধুনিককালের পাঠকেরা ধরিতে পারিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না—প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি চব্বিশটি কাহিনীর সমষ্টি। বিভিন্ন লেখক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়াছেন। লেখকদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; কয়েকজন অপরিচিত। পরিমল গোস্বামী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নলিনীকুমার ভদ্র, গোপাল ভৌমিক, মন্মথকুমার চৌধুরী, স্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী, প্রভৃতি অনেকেই লিখিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ একবার এক ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, এ কথা অনেকেরই অপরিজ্ঞাত। গল্পটির নাম 'ফ্যানটম আওয়ার', প্রেত-মুহূর্ত। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত সেই অপূর্ব্ব গল্পটিও পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি নানা ধরনের। গল্পচ্ছলে কথিত সত্য ঘটনা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। এগুলি ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া রচনার মধ্যে একটা আন্তরিকতার ছাপ আছে। মনের মধ্যে বিস্ময় জাগাইবার শক্তি অনেকগুলি গল্পেই আছে। কাহিনী-বর্ণিত ঘটনাগুলির নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া মনোবৈজ্ঞানিকের পক্ষে হয়ত অসম্ভব নয়, গল্পগুলির অন্তর্নিহিত বিস্ময়টুকু কিন্তু সাধারণ লোকের মনকে আলোড়িত করিবে। ছোট গল্পের আঙ্গিকে লেখা অনেকগুলি কাহিনীই সুরচিত। তন্মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মিডিয়াম', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'অবাঞ্ছিত উপদ্রব', নলিনীকুমার ভদ্রের 'অদৃশ্য হস্ত', চিত্তরঞ্জন দেবের 'অবনীন্দ্রনাথের রোগমুক্তি', কিরণচাঁদ দরবেশের 'সাপের বিষ', পরিমল গোস্বামীর 'অধর সরকার' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না" পাঠকের উপভোগ্য হইয়াছে।

ছোটদের গোর্কির "মা"—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র অনূদিত। শিশু-সাহিত্য সংসদ, ১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত যে কয়খানি উপন্যাস রসজ্ঞের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ম্যাক্সিম গোর্কির "মাদার" তাহাদের অন্যতম। নিপুণ চরিত্রচিত্রণে, স্বাভাবিক ঘটনাসংস্থানে, বাস্তবের বিচিত্র প্রকাশে এবং আদর্শের মহিমায় বইখানি অতুলনীয়। গ্রন্থকার ছোটদের জন্য এই প্রসিদ্ধ উপন্যাসখানির অনুবাদ করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্যে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু মৌলিক রচনায় নয়, অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। ছোটদের জন্য লিখিত বলিয়া এই রুশীয় উপন্যাসখানিকে কিছু সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে। কাজেই লেখক ভাবানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ স্বচ্ছন্দ সাবলীল অনুবাদ শিশু-সাহিত্যে বিরল। গোড়ায় গোর্কির জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ছোটদের জন্য রচিত হইলেও বইখানি বড়দেরও উপভোগ্য। বইখানি যে জনপ্রিয় হইয়াছে পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রিয়া ও পৃথিবী—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য ২, টাকা।

গল্পে, কবিতায়, চরিত-রচনায় অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। কল্লোলযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের তিনি অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠকদের অপরিচিত নয়; পুরাতন হয়েও তারা নূতন, রস-মাধুর্যে, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। দেহ-আত্মার মিলিত চেতনায় প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষ্য করি প্রথম কবিতায়। অপর কবিতাগুলিতেও প্রবুদ্ধ কবি-মনের পরিচয় পাই। 'আমরা' কবিতায় শুনি যুগমানসের বাণী:

"না-মানা যুগের মোরা মানুষ, বেসাতি মোদের কালি-কলুষ
চোখে জ্বলিছে তাজা জলুস, কিছু না পাওয়ার নেশা।"

আজ 'পরম পুরুষের' গ্রন্থকার 'প্রিয়া ও পৃথিবী'র কবিকে আড়াল করে আছেন, কিন্তু তবু মনে হয়, কবি-মনটিতেই বোধ হয় তাঁর প্রকৃষ্টতম পরিচয়।

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪।২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ২, টাকা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তি-মন্দিরের দ্বার উন্মোচনের জন্য কত বীর আত্মোৎসর্গ করে গেছেন। তাঁদের আত্মদানের ফলে আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তবু আমরা আমাদেরই সমাজের এক অংশকে পূজা-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। এই অন্যায়ের অবসান হউক, সর্ব্বমানবের পুণ্য মিলনে সমাজ সুস্থ, সুন্দর ও সবল হউক, এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে কবির অন্তর থেকে। তিনি মুক্তির পূজারী—কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বহু কবিতা রচনায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। 'দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র' এক গৌরব-দিনের স্মারক। বিদেশীর ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে যাঁরা মাতৃভূমির মুক্তিকল্পে জীবন দিয়ে গেছেন, তাঁদের নাম দেশবাসীর অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে থাকুক। তাঁদের পুণ্য-স্মৃতি জড়িত হয়ে রইল এ গ্রন্থের সঙ্গে। আদর্শের মহিমায় এবং রচনার পরিচ্ছন্নতায় আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি হৃদয়গ্রাহী।

সতর বৎসর পূর্ব্বে বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, সম্প্রতি সরকারের অনুমোদন লাভ করে নব-সজ্জায় পুনঃপ্রকাশিত হ'ল।

নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...

মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো·

মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো।

নির্ম্মলার বাসা

না এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...

মুন্নার খ্যালনাটা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?

পরে

দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!

ভদ্রলোকেরা কি পরিস্কার করে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য...

মালতির বাসা

নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা দিয়ে এসেছো...!

হ্যাঁ - আর তোমার তোয়ালে-টাও দিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে-

সান্‌লাইট সাবান

ভারতে প্রস্তুত

কাপড়কে আরও টেকসই করে।

S. 234-X52 BG

নব্য-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ২৲ টাকা।

"ইন্দ্রিয়াতীত মনোময় পুরুষ দিয়েছে এক বাস্তবের পরিচয়—কিন্তু সে একটি বাস্তবমাত্র। এ ছাড়াও বাস্তব আছে। অধ্যাত্ম-পুরুষ যে জগতের পরিচয় দেয়, তাও তেমনি বাস্তব, হয়ত, আরও বেশী বাস্তব—কারণ জড়-বাস্তবের নিগূঢ় মূলই সেইখানে।" বিজ্ঞান-পন্থার অপূর্ণতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পূর্ণ সত্যকে জানতে হলে বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে যেতে হবে। যুক্তি সহকারে মনোজ্ঞ ভাষায় লেখক এই কথাই বলতে চেয়েছেন। চিন্তাশীলতা ও প্রকাশ-দক্ষতাগুণে তিনি প্রবন্ধ-সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। এ গ্রন্থেও তাঁর মনস্বিতার পরিচয় পরিস্ফুট। এর কোন কোন প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশুতরু—শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৲ টাকা।

বাণী ও বীণা—শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়। বাণীবিতান, গোবরডাঙ্গা, ২৪-পরগণা। মূল্য ১৲ টাকা।

মনোগন্ধা—শ্রীরাধামোহন মহান্ত। ভারতী গ্রন্থ প্রকাশনী, বালুরঘাট, দিনাজপুর। মূল্য ২৲ টাকা।

নিরবদ্য—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ আনা।

মধুবাগ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ৫০এ সাতকড়ি মিত্র লেন, কলিকাতা—১১। মূল্য ৷০ আনা।

কত সময়ে দেখেছি, নাম-করা কবির কবিতা পড়ে খুশী হতে পারি না, অথচ নাম-না-জানা কবির কোনও কোনও রচনায় প্রকৃত রসের সন্ধান পাই। এই পাঁচখানি কবিতার বই পড়তে গিয়ে সেই কথা মনে হ'ল। সব ক'খানি সার্থক রচনা নয়, কিন্তু অন্ততঃ প্রথম দু'খানিতে কবি-মনের পরিচয় আছে।

'শিশুতরু'র কবি রবীন্দ্ররীতির অনুরাগী, ফলে তাঁর ভাষায় এবং ছন্দে মার্জ্জিত শ্রী ও লাবণ্য এসেছে। ভাবের ক্ষেত্রে তিনি আপন মনেরই অনুসরণ করেছেন।

'বাণী ও বীণা'য়—দুপুর, খোকনসোনা, চৈত্র এল, রূপকথা, আকাশ-সাগর এবং শিশুপাঠ্য কবিতা—'কেমন জব্দ' উপভোগ্য। 'মনোগন্ধা'তেও কবিত্বের সৌরভ আছে। ছোট্ট ঘরের, আগামী এবং ঋতুচক্রে কল্পনার মায়া-স্পর্শ লেগেছে।

'নিরবদ্যের' কবিতাগুলি অনবদ্য মনে হ'ল না।

'মধুবাগে' ভ্রমরগুঞ্জন শুনলাম, মধুসঞ্চয় বোধ হয় এখনও বাকি।

১। ভূদানের জয়গান। ২। সত্যের জয়গান।—নিশিকান্ত মজুমদার। পোঃ কেওড়াতলা, ২৪-পরগণা। মূল্য প্রত্যেকখানি ৵০।

প্রথমখানি পদ্যে, দ্বিতীয়খানি পদ্যে ও গদ্যে রচিত আদর্শমূলক প্রচার-পুস্তিকা।

অনু-যমক কাব্য—শ্রীকেশবলাল দাশ। গীতিকাঞ্জলি-ভবন, বনগাঁ, ২৪-পরগণা। মূল্য ৩৲ টাকা।

লেখক মলাটে নামের পূর্ব্বে 'কবি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কবিত্বের দৃষ্টান্ত :

"কুকুর পুকুর হতে মারিল কাতর।
কাতরে হেরিয়া কন্তা হলেন কাতর।"

এ জাতীয় ছড়া-কাটার দিন চলে গেছে ভেবে আমরাও কাতর।

মৌনমুখ—শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী। ডি. এম. লাইব্রেরী। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

বস্তি-জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস। জীবনের ক্লেদপঙ্ক ও মহত্ব—উভয়ের চিত্রই ফুটেছে। রচনায় পরিণতি না এসে থাকলেও শক্তির পরিচয় আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পথের কথা—শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী, এম-এ। ডি. এম. লাইব্রেরী. ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—১৭৯, মূল্য ২৲।

লেখক বহু দিন যাবৎ সাঁওতাল-পরগণার মিহিজামের অধিবাসী। পল্লীতে বাস করিয়া জীবিকা অর্জনের পথ কিরূপে সুগম করা যায়, প্রবন্ধগুলিতে লেখক সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপদেশগুলি মূল্যবান এবং বর্ত্তমান বেকার ও বাস্তুহারা সমস্যার দিনে বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। স্বাধীন ভারতের সরকার ও জনগণ দেশের পল্লী-জীবনে নূতনভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে চান এবং এজন্য ইতিমধ্যেই বহু কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল হইয়াছে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়। সমালোচ্য পুস্তকের লেখক ও দেশের অন্যান্য যাঁহারা আজীবন পল্লীবাসী এবং গ্রামের প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে সেই সকল কর্মী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং উপদেশ সরকার যদি কাজে লাগান তাহা হইলে পল্লী-উন্নয়নের আদর্শ যে কার্য্যে পরিণত হইতে সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক যে সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই—অর্থসমস্যা ও গ্রাম, চাষের গোড়ার কথা, লাভজনক ফলের আবাদ, মৎস্য-সমস্যা, দুগ্ধসমস্যা, বন্যাসমস্যা, গ্রাম ও স্বাস্থ্য, অর্থসমস্যা ও কলকারখানা, আদর্শ ও জগৎ, খাদ্যসমস্যা ইত্যাদি।

গ্রন্থকার নিজে একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, সুতরাং তাঁহার লিখিত রোগ এবং প্রতিকার সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলিও খুবই মূল্যবান।

১৯৩৪ সনে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এত দিন পরে ইহার দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই পুস্তক হইতে গ্রামের কল্যাণকামীরা অনেক কার্য্যকরী পন্থার নির্দেশ পাইবেন।

১। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রগঠনের পথে, ২। উন্নততর কৃষিকার্য্য, ৩। উন্নততর স্বাস্থ্য, ৪। উন্নততর বাসগৃহ।

উপরোক্ত পুস্তকগুলি ভারত সরকারের 'দি পাবলিকেশনস্ ডিভিশন, দিল্লী' হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

প্রথম পুস্তকে স্বরাজলাভের খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পুস্তকে কৃষির উন্নতিবিধানের জন্য কর্ত্তব্যের নির্দেশ আছে, প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে, এই দেশে জাপান প্রভৃতির অনুকরণে উন্নততর কৃষির ব্যবস্থা না করিলে খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব নহে।

তৃতীয় পুস্তিকায় সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কি করা অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা এবং সরকারের কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্থ পুস্তিকায় স্বল্প ব্যয়ে কিরূপে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা যায় তৎসংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য তথ্য আছে।

রাশিয়া, চীন, আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচার-পুস্তিকায় বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। এই সময়ে আমাদের সরকার দেশবাসীর মঙ্গলে দেশীয় ভাষায় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রচারে উদ্যোগী হইবেন ইহা খুবই বাঞ্ছনীয়। ভারতের জনগণের সহযোগিতার উপরেই যে সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে একথা ... একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

আগমনী
হীতোম বিশ্বাস

বিহার-শহীদ স্মারক
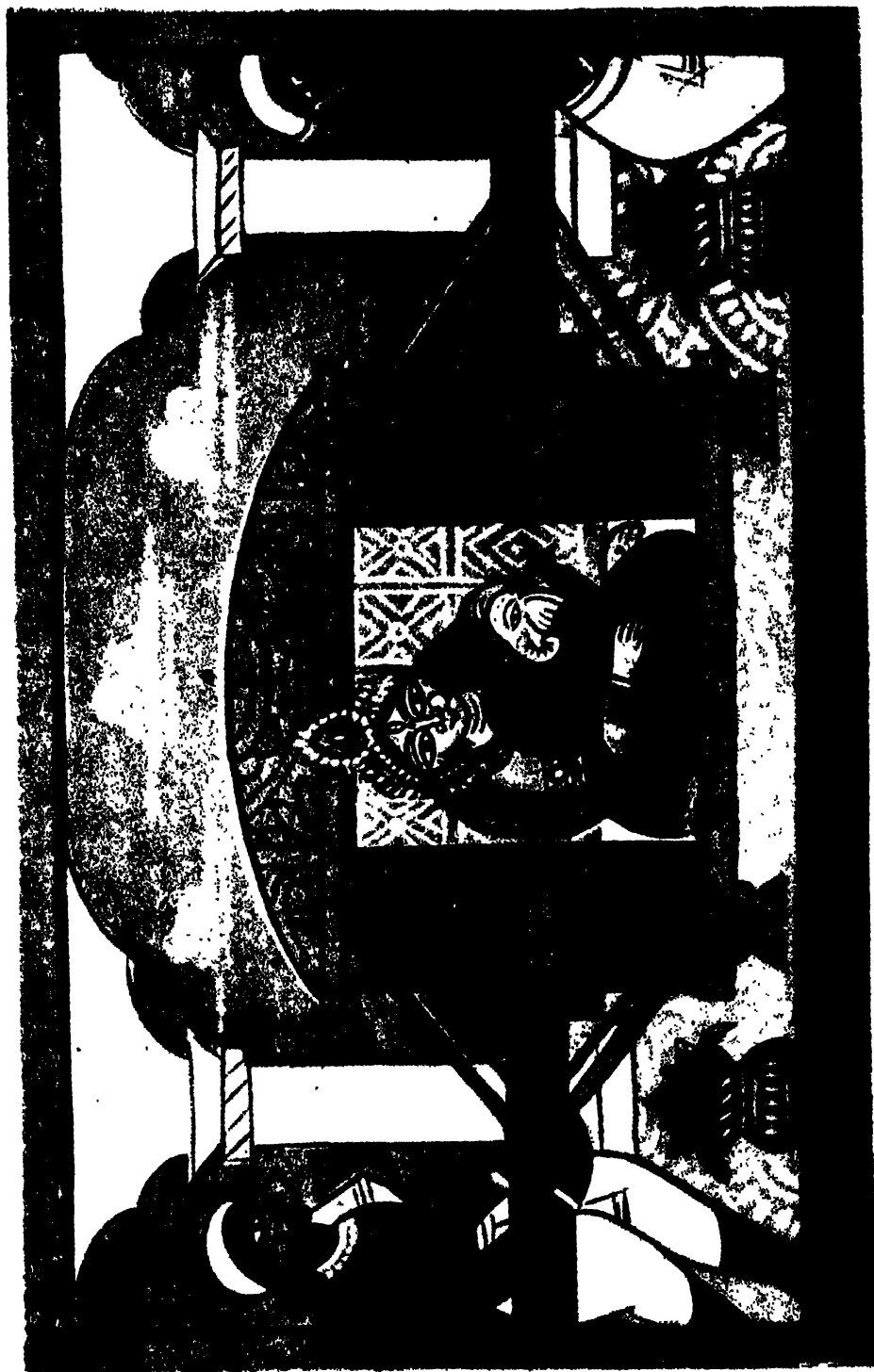
অভিযানে নিহত বালকের মৃতদেহ বহন [ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৬৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের অবস্থা

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাপান যাত্রার প্রাক্কালে সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতি দিয়াছিলেন। তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ছিল। সেই বিবৃতি আমরা এই মাসের বিবিধ প্রসঙ্গের শেষের দিকে উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে ঐ বিবৃতির কিছু আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই বলি যে, এদেশের, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ভূমির সন্তান যাহারা তাহারা সম্পূর্ণভাবে এতদিন অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের ও শাসনযন্ত্রের মধ্যে কোনও সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগের চিহ্ন এতাবৎ আমরা দেখি নাই। খাদ্য ও খাদকের মধ্যে সম্পর্ক যাহা, দুগ্ধবতী গাভী ও পশ্চিমা গোয়ালার সম্পর্ক যাহা তাহাই আমরা এতদিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বাঙালীর সমস্যা যাহা কিছু তাহার নির্ণয় এতাবৎ শুধু দুই জাতীয় লোকের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ভিন্ন প্রদেশীয় বণিক সম্প্রদায়, দ্বিতীয়তঃ উদ্বাস্তু। পশ্চিম বাংলার সন্তান-সন্ততি বলিতে আমাদের দয়াময় শাসকবর্গ বুঝিয়াছেন তাঁহাদের দলগোষ্ঠীগত যাহারা তাহারা মাত্র। প্রকৃত-পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বলিতে তাঁহারা কলিকাতার বাহিরে যে কিছু আছে তাহা ভুলিয়াই থাকেন। তবে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে সজাগ যাঁহারা তাঁহারা নির্ব্বাচনের কথা মনে রাখিয়া নিজ নিজ দলের চাঁইদের উপদেশমত কিছু কিছু লোকদেখানো কাজই করিয়াছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও চাঁইয়ের দল বেশী সজাগ হওয়ায় তন্নবিত্তের উন্নয়ন খাতের টাকা আদায় করিয়াছেন। তাহাও উপকারে লাগিয়াছে শহরে—গ্রামাঞ্চলে অতি সামান্য। আজ নির্ব্বাচনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং এই বিবৃতি।

অবশ্য উন্নয়ন কিছুমাত্র হয় নাই এ কথা আমরা বলি না। খাদ্য-পরিস্থিতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সরল হইয়াছে। তাহার জন্য কতকটা কৃতিত্বের দাবী প্রাদেশিক সরকার করিতে পারেন। যদিও মূল্যবৃদ্ধি ও আনুসঙ্গিক পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টিতে চাষীর উৎসাহ বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধিই মূল কারণ এবং অন্য যাহা তাহাও কেন্দ্রীয় সরকারের অতি অনিচ্ছা ও অবহেলা সত্ত্বেও, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাপ্রসূত উপকার। ইহা ভিন্ন মফস্বলে স্থানে স্থানে পথঘাটের উন্নতি হইয়াছে, যাহার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই দুই জন মন্ত্রীর প্রাপ্য, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও কংগ্রেসী চক্রান্তে নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছিলেন। অন্য অন্য বিষয়ে যাহা উন্নয়ন হইয়াছে তাহার পনের আনা মুনাফা লইয়াছে অবাঙালী।

সমস্যার কথা ডাক্তার রায় বলিয়াছেন অবশ্য। কিন্তু মূল সমস্যার কথা তিনি উল্লেখই করেন নাই। সেটি পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সমস্যা। অবশ্য ডাক্তার রায় যদি এক দল লোকের মত মনে করেন যে, ঐ নির্ব্বিবাদী ও প্রায়-নির্জ্জীব প্রাণী-সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই তবে আমাদের কিছুই বলিবার থাকে না। কেননা প্রাণহীন, শক্তিহীন আক্ষেপ ও প্রলাপ-সর্ব্বস্ব মনুষ্যের অধিকার বলিয়া কিছুই নাই।

অথচ এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত—যাহাদের একদল বিকৃতমস্তিষ্ক অর্ব্বাচীন "বুর্জ্জোয়া" আখ্যা দিয়া ভূমানন্দ লাভ করেন—শুধু বাংলার ও বাঙালীর নহে, সমস্ত ভারতের প্রগতির অভিযানে প্রধান সহায়ক ছিল। দেশের সংস্কৃতি, প্রগতি ও স্বাতন্ত্র্য লাভে তাহার অবদান ও আহুতি অতুলনীয়। আজ বাঙালীর যে দ্রুত অবনতি ও দুর্দ্দশা চলিয়াছে তাহার মূল কারণ তাহার অসহায় ও বন্ধুহীন অবস্থা। সে নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়াছে সর্ব্বতোভাবে। ভাবের উচ্ছ্বাসে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া এখন তাহার দুরবস্থার শেষ নাই। তাহার শিক্ষার মানের চরম অবনতি ঘটিয়াছে। জীবনযাত্রার মান ত কোথায় নামিয়া গিয়াছে তাহা বলা ভার। তাহার অভাব-অভিযোগ শুনিবারও কেহ নাই, প্রতিকারের কথা ত দূরে থাক!

উপরন্তু রহিয়াছে—ও থাকিবে—উদ্বাস্তু সমস্যা। আমরা জানি পূর্ব্ববঙ্গ-আগত উদ্বাস্তু কি নিদারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। এবং এ কথাও আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে ঐ সমস্যা ফেলিয়া রাখিয়াছেন। তবে এ কথাও ঠিক যে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়াছেন তাহার অপব্যবহারই বেশী হইয়াছে; কেন্দ্রীয় দপ্তরে একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসন অসম্ভব। সহস্র কোটি টাকায়ও কিছু হইবে না। আমরা বলিতে বাধ্য যে, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়, কেননা সমস্যার মূলে যে বিষাক্ত কারণ রহিয়াছে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্রও হয় নাই।

ধর্মনিষ্ঠা না রাষ্ট্রদ্রোহিতা ?

বোম্বাইয়ে অবস্থিত ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত "ধর্মগুরু" শীর্ষক পুস্তকে ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ যে পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন সমুচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা প্রয়োজন। ভারতের অনতি-প্রাচীন ইতিহাসের কথা স্মরণ রাখিলে এইরূপ আলোচনার তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করা সহজতর হইবে।

মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতার জন্যই ভারত আজ দ্বিধাবিভক্ত। ভারত-বিভাগে মুসলমানদের কোন লাভ হয় নাই—পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হইয়াও পাকিস্থান মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য কল্যাণসাধন করিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা আজ পাকিস্থানের মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকটও এরূপ পরিষ্কার হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রাক্-স্বাধীন যুগে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ধুয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন পাকিস্থানে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের বিরোধিতা করিতেছেন। বিলম্বিত হইলেও তাঁহাদের এই মানসিক পরিবর্ত্তন প্রগতিকামী জনমতের অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই পরিবর্ত্তিত আত্মসচেতনতা এখনও দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

দেশবিভাগে যদিও সাধারণভাবে মুসলমানগণ লাভবান হন নাই তথাপি তাহাতে হিন্দুদের ক্ষতি হইয়াছে অপরিসীম। আজ লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার উচ্ছন্ন যাইবার মুখে। পরিস্থিতির এই বিবর্ত্তনে হিন্দুদের দায়িত্ব একেবারেই যে নাই তাহা নহে, কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদের স্বেচ্ছাচারিতা-জনিত অন্যায়ের তুলনায় হিন্দুদের সেই দায়িত্ব রাজনৈতিক দিক হইতে নিতান্তই নগণ্য। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মুসলমানদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার প্রয়াস করার মধ্যেই হিন্দুদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নিকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। মুসলমান-প্রধান পাকিস্থান যে সুপরিকল্পিত উপায়ে হিন্দুদিগকে উৎখাত করিয়াছে, হিন্দু-প্রধান ভারত মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা করে নাই। বোধ হয় সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবেই তাহারা বিশ্বের নিকট ভারতের মর্য্যাদা সর্ব্বপ্রকারে অবনমিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

তাহা না হইলে "ধর্মগুরু" পুস্তকটি সম্পর্কে যে ধরনের আন্দোলন চলিয়াছে তাহা ঘটিত না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারপিট, লুঠপাট, সবই হইয়াছে। বহুভাবে হিন্দু-মন্দির অপবিত্র করা হইয়াছে। ভারতের বুকের উপর দিয়া রাষ্ট্রদ্রোহী শ্লোগান তোলা হইয়াছে—"পাকিস্থান জিন্দাবাদ।" পাকিস্থান জিন্দাবাদ বলিতে আমাদেরও অবশ্য কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বলা হইতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে তাহা বলা হইতেছে তাহাই বিশেষরূপে বিচার্য্য। "পাকিস্থান জিন্দাবাদ" ধ্বনির সহিত হিন্দুস্থানকে (যদিও ভারতের নাম হিন্দুস্থান নহে) নিপাত করিতে চাহিলে সমগ্র ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ভারতীয় মুসলমানদের একাংশ যে অশোভন আচরণ করিয়াছেন তাহার কারণ কি? "ধর্মগুরু" পুস্তকটি কোন হিন্দু (এমনকি কোন ভারতীয়েরও) লেখা নহে। ইহা কোন নূতন পুস্তকও নহে যে, মুসলমানগণ প্রথম প্রকাশে উত্তেজিত হইয়াছেন। প্রায় পনর বৎসরেরও অধিককাল, দুইজন শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নাগরিক কর্তৃক লিখিত এই পুস্তকটি বাজারে চলিতেছিল, কিন্তু কোন মুসলমান তাহাতে আপত্তি করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। যেই মাত্র পুস্তকটি একটি ভারতীয় প্রকাশভবন কর্তৃক পুনঃ-প্রচারিত হইল তখনই ঐ সকল মুসলমানদের খেয়াল হইল যে, ইসলাম ধর্মকে উচ্ছন্নে দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইহার পরও যখন আপত্তি তোলা হইল প্রকাশভবন কর্তৃক তৎক্ষণাৎ পুস্তকটির প্রচার বন্ধ করা হইল—আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও। ইহার পরও যে, কোন মুসলমানের বিক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে, তাহার কোন বিচারসহ যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু যেখানে ধর্মের সম্মানের প্রশ্ন গৌণ, হিন্দুস্থানের মুণ্ডপাতই আসল উদ্দেশ্য সেখানে ত এই সকল যুক্তি কাজে আসিবে না—যেমন আসে নাই প্রাক্-স্বাধীন যুগে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনপ্রণালী সম্পর্কে। তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামি ও স্বার্থসাধনই সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সম্মুখে সর্ব্বাগ্রগণ্য কর্ত্তব্য ছিল। সেইরূপ স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে ভারতকে উচ্ছন্নে দেওয়ার চেষ্টাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া তাহারা স্থির করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাকথিত কংগ্রেসী মুসলমান নেতৃবৃন্দও এই সকল আপত্তিকর আন্দোলনকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন।

৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে, ৭ই সেপ্টেম্বর পাটনা শহরে দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণপতাকা সহ বিক্ষোভ-প্রদর্শনের পর উত্তর-প্রদেশের কংগ্রেসী এম. এল. এ. মৌলানা এম. রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের এক সভায় "ধর্মগুরু" পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীমুন্সীর কৈফিয়তে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং শ্রীমুন্সী ও ভারতীয় বিদ্যাভবনের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যকারী পুস্তক প্রকাশের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্যও দাবি জানান হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভারত ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে জিগীর তোলা হইয়াছে, পুস্তকটির লেখক অথবা প্রথম প্রকাশকের বিরুদ্ধে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই। কারণ বোধ হয়, তাহারা শ্বেতাঙ্গ মার্কিন, খ্রীষ্টান—অর্থাৎ মনিব-মুরুব্বী; ভারতীয় হিন্দু অথবা মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান নহে।

ভারতীয় মুসলমান-সমাজের যে অংশ সুস্থ মনোভাবাপন্ন এবং চিন্তাশীল তাঁহাদের নিকটও আজ একটি বিরাট প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারাও কি ধর্মীয় গোঁড়ামিকে বিচার-বুদ্ধির উপর

স্থান দিয়া এখনও নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকিবেন ? কোন ঘটনার গুণাগুণ বিচার না করিয়া কেবলমাত্র ধর্ম্ম বিপন্ন এই জিগীর তাঁহারা কি এখনও নীরবে সমর্থন করিয়া যাইবেন ? "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকে ইসলাম ধর্ম্ম সম্পর্কে যে সকল কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হইয়াছে কোন হিন্দুই তাহা সমর্থন করেন নাই। হিন্দুমহাসভার ন্যায় হিন্দু প্রতিষ্ঠানের সভাপতিও ঐ সকল মন্তব্যের নিন্দা করিয়াছেন। অপর ধর্ম্ম সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে অনুরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য এখনও আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম্মীয় গোঁড়ামির ব্যাপকতা অন্যান্য কোন রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যেই নাই। ইন্দোনেশিয়া, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ইসলামের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের বাহক হইয়াও অশোভন ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের প্রয়োজন ব্যতিরেকে পাকিস্থানের মুসলমানগণও কোন অশোভন ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি প্রকাশ করেন না ("ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি সম্পর্কে ঢাকায় যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইয়াছে, ভারতীয় মুসলমানদের আচরণের তুলনায় তাহার সংযমের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না)। একজন মুসলমান মৌলবী হওয়া সত্ত্বেও মৌলানা ভাসানীর পক্ষে অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণে কোন অসুবিধা হয় না। ভারতীয় মুসলমানগণ যে কেন এরূপ অযৌক্তিক মনোভাব ত্যাগ করিতে পারেন না তাহা নিতান্তই রহস্যময়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের চিন্তানায়কগণের আচরণ সম্পর্কেও অনিবার্য্যরূপেই কয়েকটি মন্তব্য আসিয়া পড়ে। ফাঁকিবাজি দ্বারা বাজিমাতের যে বিপজ্জনক ঝোঁক আজ সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছে, শ্রীমুন্সীর ব্যবহারে তাহারই প্রতিফলন দেখিয়া আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভারতীয় বিদ্যাভবনের পুস্তক নির্ব্বাচন ও প্রকাশ সম্পর্কিত দায়িত্ব তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। না পড়িয়া তিনি কোন্ বিচারে "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি প্রকাশের সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। শ্রী কে. এম. মুন্সীর মত খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতও যে এরূপ আচরণ করিতে পারিলেন, প্রকৃতই তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়!

সুয়েজ খাল ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট

মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণে ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশেষভাবে ব্রিটেন যে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অযৌক্তিকতা এরূপ প্রকট যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের নিতান্ত অনুগত সদস্যগণও অস্বস্তি প্রকাশ করিয়াছে। সুয়েজ খাল যে মিশরের অবিচ্ছিন্ন অংশ এবং সুয়েজ খাল কোম্পানীকে জাতীয়করণের অধিকার যে মিশরের রহিয়াছে সে সম্পর্কে কেহই প্রশ্ন তুলিতে সাহস করে নাই। সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চলাচলে যদি মিশর বিধিনিষেধ আরোপ করিত তবে অবশ্য প্রতিবাদের একটি কারণ থাকিত। কিন্তু মিশর স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছে যে, সুয়েজ খাল দিয়া কোন দেশের জাহাজ চলাচলেই মিশর বাধা দিবে না। উপরন্তু, কোম্পানীর অংশীদারগণকে মিশর ক্ষতিপূরণ দিতেও স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সকল দিক পর্য্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে যে, সুয়েজ খাল জাতীয়করণের বিরুদ্ধে ব্রিটেন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যে আপত্তি তুলিয়াছে তাহার মূল কারণ সামরিক। যদিও ১৮৮৮ সনের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধকালীন এবং শান্তিকালীন সকল সময়েই সুয়েজ খাল সকল দেশের জাহাজের নিকট অবারিত থাকিবে বলিয়া বলা হইয়াছিল তথাপি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের অনুমতি ব্যতীত সুয়েজ খাল দিয়া কোন রাষ্ট্রেরই জাহাজ যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুয়েজ খালের উপর ব্রিটিশ প্রভুত্বের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তীকালেও ব্রিটেনের পরোক্ষ সমর্থনে মিশর সুয়েজ খাল দিয়া ইস্রাইলের জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ও ইটালী যখন উত্তর আফ্রিকায় তুর্কি সাম্রাজ্যভুক্ত ট্রিপলী আক্রমণ ও অধিকার করে তখন স্থলপথে তুর্কি ফৌজের প্রতিরোধ অভিযান সুয়েজ খাল পার হওয়ার বাধা পায় ইংরেজের কাছে। ফলে ব্রিটিশ-মিত্র ইটালী প্রায় বিনা যুদ্ধে তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ দখল করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজের অবাধ গতিবিধি রুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ব্রিটেন বর্ত্তমানে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে, উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে তাহার বিশেষ কোনই গুরুত্ব নাই। অপরাপর রাষ্ট্রের নিকট সুয়েজ খালের কর্ত্তৃত্ব ব্রিটেনের হাতে থাকা অপেক্ষা মিশরের হাতে থাকা অনেক দিক হইতেই অধিকতর সুবিধাজনক মনে হইতে পারে। সুয়েজ খাল সম্পর্কে ব্রিটেনের উদ্বেগের প্রধান কারণ এই যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ হইলে সুয়েজ পথে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল আমদানীর পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। উপরন্তু সুয়েজের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিলে অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তারেরও সুযোগ থাকে। সুতরাং আন্তর্জাতিক জাহাজের গতিবিধির স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটেনের উদ্বেগ তাহার আসল উদ্দেশ্যের উপর ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবার একটি প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যুদ্ধব্যতিরেকে আর যতপ্রকারে সম্ভব ব্রিটেন মিশরের উপর চাপ দিয়াছে। সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ব্রিটেন মিশরের ষ্টার্লিং মুদ্রা আটক করিয়াছে। যুদ্ধের হুমকী দিয়া মিশরকে কাবু করিবার প্রচেষ্টায় সাইপ্রাসে সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজের সমাবেশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই অছিলায় সাইপ্রাসের স্বাধীনতার দাবিও ব্রিটেন দূরে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

২৬শে জুলাই মিশর সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনটি প্রধান পাশ্চাত্ত্য শক্তি ব্রিটেন

লণ্ডনে মিলিত হন মিশরের বিরুদ্ধে যুক্তব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য। সম্ভবতঃ আসন্ন নির্বাচনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সশস্ত্র সংঘর্ষে আগ্রহান্বিত না হওয়ায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধোদ্যমে বিশেষ বাধা পড়ে এবং অবশেষে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সুয়েজ সমস্যা সমাধানের আয়োজন করা হয়। উপরোক্ত তিনটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ব্যতীত আরও একুশটি রাষ্ট্রকে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। তন্মধ্যে মিশর ও গ্রীস সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়। ১৬ই আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত লণ্ডনে বাইশটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে সুয়েজ সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতেও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অযৌক্তিক মনোভাব বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। এবং সেহেতু অতি স্বাভাবিক কারণেই সম্মেলনে কোন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

সম্মেলনের প্রথম দিনেই মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ জন ফষ্টার ডালেস পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে একটি চার দফা পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্যতীত পাকিস্থান, তুরস্ক, ইথিওপিয়া সমেত উপস্থিত অপরাপর সকল রাষ্ট্রই ডালেস প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ শেপিলভ একটি সাত দফা খসড়া পরিকল্পনা সম্মেলনে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ভারতীয় প্রস্তাব পেশের পর ভারতীয় প্রস্তাবের অনুকূলে সোভিয়েট প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। মিশরও ভারতীয় প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা করিতে সম্মত হয়, কিন্তু ভোটের জোরে ভারতীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে বলা হয় যে (১) সুয়েজ খাল পরিচালনার ভার একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর অর্পিত হইবে। একটি চুক্তি অনুযায়ী এই বোর্ড গঠিত হইবে এবং ইহাতে মিশরেরও প্রতিনিধি থাকিবে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই এককভাবে ইহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। (২) যথোপযুক্ত ব্যবস্থার মারফত মিশর তাহার ন্যায্য পাওনা পাওয়ার অধিকারী হইবে এবং এই ব্যবস্থা এইরূপ হইবে যাহাতে মিশরের স্বার্থ এবং সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। (৩) জাতীয়কৃত সুয়েজ খাল কোম্পানীকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে; (৪) শেষোক্ত দুইটি বিষয় অর্থাৎ মিশরকে ন্যায্য প্রাপ্য দান এবং কোম্পানীকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে মতবিরোধ ঘটিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্ত্তৃক মনোনীত একটি সালিশ তাহার নিষ্পত্তি করিবেন।

সোভিয়েট প্রতিনিধি শেপিলভ ডালেস-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ঐ প্রস্তাবে প্রকৃত অবস্থা অথবা মিশরের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। তিনি বলেন যে, সুয়েজ খাল পরিচালনাকল্পে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থ হইবে—মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সমতুল। সুয়েজ খাল সমস্যার দুইটি দিক—একটি জাতীয়করণের প্রশ্ন এবং অপরটি অবাধ জাহাজ চলাচলের প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কেই আলোচনা চলিতে পারে। সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর জোর দিয়া শেপিলভ বলেন, মিশরের সহিত আলোচনা ব্যতিরেকে কোন সমাধানই কার্য্যকরী হইতে পারে না। এই আলোচনার জন্য ১২ই সেপ্টেম্বর একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য মিশর যে প্রস্তাব করে শেপিলভ তাহার সমর্থন করিয়া বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ এবং মিশরের উপর ঐ বৃহত্তর ছেচল্লিশটি রাষ্ট্র সম্মেলন আহ্বানের ভার দেওয়া হউক।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলুইন লয়েড রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত বৃহত্তর সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান সম্মেলনের আলোচনার মধ্য হইতে একটি নীতি ঘোষিত হউক। সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর একটি খসড়া নীতি ঘোষণা (draft declaration of principles) রচনা করিয়া তাহা উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেন।

২০শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ মেনন ভারতের পক্ষ হইতে পশ্চিমী পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া একটি পাঁচ দফা পরিকল্পনা সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।

শ্রীমেননের প্রস্তাব নিম্নরূপ:—

(ক) সুয়েজ খালের পরিচালনা সংক্রান্ত ১৮৮৮ সনের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তিটির অন্তর্গত নীতিসমূহ পুনর্ব্বিবেচনা এবং বর্ত্তমান সময়ে উহার যে সমস্ত সংশোধন করা প্রয়োজন তাহা করিয়া খালটির সংরক্ষণ ও ন্যায়সঙ্গত শুল্ককর (খালটি ব্যবহারের জন্য) আদায়ের ব্যবস্থার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখের জন্য ঐ চুক্তি পর্য্যালোচনা করা হউক। শুল্কর যাহাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে আদায় করা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুয়েজ খাল রক্ষা ও পরিচালনা করিতে হইবে এবং উহার সুযোগ-সুবিধাও যাহাতে সকল জাতিই পাইতে পারে সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। খালটিকে সর্ব্বাবস্থায় ও সময়ে উপযুক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

(খ) 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা এমনকি ১৮৮৮ সনের চুক্তির স্বাক্ষরকারী ও খালের সমস্ত ব্যবহারকারীদের একটি সম্মেলন আহ্বানের বিষয় পর্য্যন্ত বিবেচনা করা হউক।

(গ) মিশরীয় মালিকানা ও মিশরকর্ত্তৃক খাল পরিচালনা ক্ষুণ্ণ না করিয়া খালের ব্যবহারকারীদের স্বার্থ ও সুয়েজ খালের জন্য গঠিত মিশরীয় কর্পোরেশনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার বিষয় বিবেচনা করা হউক।

(ঘ) ভৌগোলিক দিক হইতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে খালের ব্যবহারকারীদের লইয়া একটি উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করা হউক এবং এই সংস্থার উপর সংযোগ রক্ষা ও পরামর্শদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হউক।

(ঙ) মিশর সরকার সুয়েজ খালের জন্য গঠিত মিশরীয় কর্পোরেশনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট পেশ করিবেন।

এই পাঁচ দফা পরিকল্পনার মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, দ্রুত সুয়েজ খাল সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা অবশ্যপ্রয়োজন। এই কথা মনে রাখিয়াই প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা আরম্ভের জন্য একটা পথের সন্ধান দিবার নিমিত্ত এই প্রস্তাব করা হইতেছে—

(১) মিশরের সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি, (২) সুয়েজ খাল মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি জলপথ বলিয়া স্বীকৃতি, (৩) ১৮৮৮ সনের কনষ্টাণ্টিনোপোল চুক্তি অনুযায়ী সকল জাতির অবাধে খাল ব্যবহারের অধিকার স্বীকার, (৪) ন্যায়সঙ্গত জলকর ধার্য্য করিতে হইবে এবং খালের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের অধিকার কোনওরূপ বাছ-বিচার না করিয়া সকল জাতিকে দিতে হইবে এবং (৫) খালটি সর্ব্বসময়ের জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং (৬) খালটির ব্যবহারকারীদের স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৮৮৮ সনের চুক্তিতে সুয়েজ খালের অবাধ ব্যবহারের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। শ্রীমেননের পরিকল্পনায় ঐ বিষয় উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সনের ৩১শে জুলাই মিশর ঘোষণা করে যে, মিশর তাহার সমস্ত আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা, ১৮৮৮ সনের চুক্তি এবং ১৯৫৪ সনের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তিতে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিবে।

কিন্তু ভারতের প্রস্তাবগুলি পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের মনঃপূত হইল না। ২২শে আগষ্ট শ্রী মেনন পুনরায় সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-দিগকে অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহারা মার্কিন প্রস্তাবটি না গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন নিষ্ফল হয়।

সম্মেলনের ফলাফল কিরূপে মিশরের নিকট উপস্থিত করা হইবে সেই সম্পর্কেও ভারত ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমর্থনে নিউজিল্যাণ্ড প্রস্তাব করে যে, ডালেস প্রস্তাবের সমর্থনকারী দেশগুলির মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধি মিশরের নিকট মার্কিন প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিবেন এবং তাহার ভিত্তিতে মিশর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত কিনা তাহা জানিয়া আসিবেন।

ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনসহ ভারত নিউজিল্যাণ্ড-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলে যে, মার্কিন প্রস্তাবটি সম্মেলনের একাংশের সমর্থন পাইয়াছে—এই অবস্থায় উহাকে সম্মেলনের অভিমত বলিয়া চালানো উচিত হইবে না। নিউজিল্যাণ্ড পরে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লয় এবং পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের পক্ষ হইতে ঘোষণা করে যে, তাহারা অষ্ট্রেলিয়া, ইরাণ, ইথিওপিয়া, এবং সুইডেনকে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ রবার্ট মেঞ্জিসের সভাপতিত্বে মিশরের সহিত মার্কিন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সম্মেলনের কার্য্যবিবরণী-সম্বলিত একটি দলিল মিশরের নিকট প্রেরণের জন্য সম্মেলনের সভাপতি মিঃ সেলুইন লয়েডকে অনুরোধ করিয়া ফ্রান্স একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহাও গৃহীত হয়। এই-রূপেই সুয়েজ সম্পর্কে প্রথম লণ্ডন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অবসান হয়।

২৪শে আগষ্ট লণ্ডনে এক বিবৃতিতে ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, সুয়েজ সম্মেলনে ভারত যে প্রস্তাব পেশ করিয়া-ছিল তাহার পিছনে ভারতের কোন কায়েমী স্বার্থ জড়িত ছিল না। আলোচনার উপযোগী মনে করিয়া যে-কোন পরিকল্পনা লইয়াই মিশর আলোচনা করুক না কেন ভারত তাহাতেই খুশী হইবে। তিনি আরও বলেন যে, মিশর যদি মেঞ্জিস মিশনের সহিত দেখা করেন তবে ভারত খুশীই হইবে। ২৭শে আগষ্ট কায়রো হইতে ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেণ্ট নাসের পঞ্চশক্তি সুয়েজ কমিটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত আছেন। পঞ্চশক্তি প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ মেঞ্জিস সাক্ষাৎকারের স্থান হিসাবে জেনেভা অথবা কায়রোর উল্লেখ করেন। শেষ পর্য্যন্ত কায়রোতেই আলোচনা হওয়া স্থির হয়।

৩০শে আগষ্ট কায়রো হইতে প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সুয়েজ খালের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পশ্চিমী পরিকল্পনার সমর্থনে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ারের বিবৃতির সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, ডালেস পরিকল্পনা সুয়েজ সমস্যা মীমাংসার ভিত্তি হিসাবেও গ্রহণযোগ্য নহে।

প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত আলোচনার জন্য মিঃ মেঞ্জিসের নেতৃত্বে পঞ্চশক্তি প্রতিনিধিদল ২রা সেপ্টেম্বর কায়রোতে উপনীত হন। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মেঞ্জিস মিশন প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত আলোচনা চালান। আলোচনা বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয় বলিয়াই প্রকাশ। শেষ পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে পশ্চিমী পরিকল্পনা গ্রহণ করাইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মেঞ্জিস মিশন ১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন।

১১ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে একটি যুক্ত ইঙ্গ-ফরাসী বিবৃতিতে বলা হয় যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনায় প্রেসিডেণ্ট নাসেরের অসম্মতির ফলে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ১২ই সেপ্টেম্বর সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে একটি জরুরী বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যর এণ্টনী ইডেন বলেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাষ্ট্র-সঙ্ঘ স্বস্তি পরিষদে সুয়েজ পরিস্থিতির কথা জানাইয়া দিয়াছে। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই সমস্যার উত্থাপন সম্ভাবনার বহির্ভূত মনে করেন না—তবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। স্যর এণ্টনী সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, "কিন্তু আমরা প্রয়োজন হইলেই জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অগ্রসর হইয়া রহিয়াছি। ব্রিটেন তাহার সামরিক সতর্কতা কোনক্রমেই শিথিল করিবে না। এক মাস পূর্ব্বে যদি সামরিক সতর্কতা

যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমানেও উহা যুক্তিযুক্ত।"

সার এণ্টনী বলেন, "কর্ণেল নাসেরের কার্য্যকে জাতীয়করণ বলিলে সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে। আমি 'বলপূর্ব্বক অধিকার' কথাটি বেশী যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। ইহাতে যদি কেহ ক্ষুব্ধ হন ত আমি বলিব যে আমি কাহাকেও আঘাত দিতে চাহি না—আমাদের একটি নূতন ও অত্যন্ত কুৎসিত শব্দ সৃষ্টি করিতে হইবে, যে আমার নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না। কর্ণেল নাসের যাহা করিয়াছেন তাহা হইল খালটির আন্তর্জ্জাতিক সত্তার বিলোপসাধন।"

সার এণ্টনী ইডেন উক্ত ভাষণে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বলেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি "ব্যবহারকারী সমিতি" গঠন করিবেন যাহা সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। তিনি বলেন যে, মিশর যদি এই "ব্যবহারকারী সমিতি"র কাজের বিরোধিতা করেন বা সহযোগিতা না করেন তবে মিশর ১৮৮৮ সনের কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি ভঙ্গ করিবে।

পরদিন ১৩ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেস "ব্যবহারকারী সমিতি" গঠনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, মিশর যদি ব্যবহারকারী সমিতির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জাহাজকে সুয়েজ খালপথে যাইতে না দেয় তবে গুলীর জোরে সুয়েজ খালে যাতায়াতের কোন অভিপ্রায় যুক্তরাষ্ট্রের নাই।

"ব্যবহারকারী সমিতি"র প্রস্তাবে সুয়েজ খাল লইয়া সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় লোকসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বশেষ প্রস্তাবটি দ্বারা মিশরের রাষ্ট্রীয় অধিকার লঙ্ঘন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আলোচনার পথ বন্ধ করিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐরূপ একতরফা প্রস্তাবে সমস্যা সমাধানের কোনই উপায় নাই।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে শ্রীনেহরু "বিস্ময় এবং দুঃখ" প্রকাশ করেন।

সুয়েজ খালের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ১০ সেপ্টেম্বর মিশরের পক্ষ হইতে প্রেসিডেণ্ট নাসের রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী দেশগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া এক আলোচনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ব্রিটেন সেই প্রস্তাব বিবেচনা করিতে অস্বীকার করে। মিশরের প্রস্তাবটি ভারত পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করে এবং উহা আলোচনা করিয়া দেখিবার জন্য ভারত ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আগষ্ট মাসে লণ্ডন সম্মেলনে যোগদানকারী বাইশটি রাষ্ট্রের আর একটি সম্মেলন আহ্বানের অনুরোধ জানায়। হাউস অব কমন্সে ১১ই সেপ্টেম্বর সার এণ্টনী ইডেন যে ভাষণ দেন তাহার পূর্ব্বেই ভারতের অনুরোধ ব্রিটিশ সরকারের হাতে পৌঁছায়, কিন্তু ব্রিটেন ভারতের প্রস্তাব সম্পর্কেও কোন বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করে নাই।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১২ই সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে সুয়েজ অঞ্চলে শান্তিভঙ্গের যে আশঙ্কা দেখা দেয় সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণক্রমে সিংহল, ব্রহ্ম, পাকিস্থান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ ভারত সরকারের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। মিশর সরকারের আমন্ত্রণক্রমে ভারতের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর কায়রোতে উপনীত হন।

ইতিমধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী এবং প্রাক্তন সুয়েজ খাল কোম্পানীর চাপে উক্ত কোম্পানীর অ-মিশরীয় পাইলট কর্ম্মচারীবৃন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্মত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই ভাবে দক্ষ কর্ম্মীদিগকে অপসারণ করিয়া সুয়েজ খাল পরিচালনায় বাধা দিবার যে চেষ্টা করা হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মিশরীয় পাইলটগণ যথেষ্ট দক্ষতার সহিত উপযুক্তসংখ্যক জাহাজকে খালের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়া হইতে কিছুসংখ্যক দক্ষ পাইলট আসিয়া পড়ায় সুয়েজ খালপথে জাহাজ চলাচলে এখনও কোন বিঘ্ন দেখা দেয় নাই।

যদিও সুয়েজপথে জাহাজ যাতায়াতে এখনও পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন দেখা দেয় নাই তথাপি পশ্চিমী জাহাজ কোম্পানীগুলি তাহাদের জাহাজে বাহিত মালের ভাড়া শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি

সম্প্রতি রাজ্যসভায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে তিনটি সমস্যা কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, এবং এই তিনটি সমস্যা হইতেছে—ক্রমহ্রাসমান বৈদেশিক মুদ্রার আয়, দেশে মূল্যবৃদ্ধি এবং উপযুক্ত শিক্ষিত শ্রমিকের অভাব। দেশের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ইহার ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় সরকারী খাতে নির্দ্ধারিত ৪,৮০০ কোটি টাকা হইতেও অধিক হইবে। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি উভয়েই পরস্পরকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে। এই অবস্থায় পরিকল্পনা কমিশন নূতন নূতন করবৃদ্ধি দ্বারা রাজস্ব আয়বৃদ্ধির পরিকল্পনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, পরোক্ষ কর ধার্য্যদ্বারা ব্যবহার হ্রাস তথা মূল্যনিয়ন্ত্রণ করা। সম্প্রতি মিল বস্ত্রের উপর উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য এইরূপ চিন্তাধারার বাস্তব রূপ। অন্যান্য প্রকার ব্যবহার শুল্কের আরোপ সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন চিন্তা করিতেছেন। অদূর-ভবিষ্যতে হয়ত মোট বাৎসরিক সম্পত্তির উপরও প্রত্যক্ষ কর ধার্য্য করা হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমহ্রাসমান সঞ্চয় আর একটি কঠিন সমস্যারূপে

উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধি করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ কোটি টাকা খরচা করিয়া কয়েকটি মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করিতেছেন। ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং মুদ্রার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। গত তিন বৎসর ধরিয়া গড়ে প্রায় ৭৩০ কোটি টাকা করিয়া ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত থাকিত; বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৬৩১ কোটি টাকায়, অর্থাৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং হ্রাস পাইয়াছে। যাহা হউক সম্প্রতি যে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গম ধার ব্যাপারে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি খানিকটা পূরণ করা সম্ভবপর হইবে। আশা করা হইতেছে যে, আগামী বৎসর আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি কিছু শান্ত হইলে ভারতবর্ষ আমেরিকার নিকট হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিবে এবং তাহার দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ঋণ দ্বারা সত্যকার ভাবে দেশের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হইবে না, এবং সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন দেশগুলির সহিত পারস্পরিক ভিত্তিতে বাণিজ্যিক চুক্তি করিতেছেন; সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে দ্রব্যবিনিময় চুক্তি হইয়াছে তাহার জন্ত স্বর্ণ কিংবা বৈদেশিক মুদ্রা খরচা করিতে হইবে না, ইহাতে প্রায় ৪৮০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিবে।

মূল্যপরিস্থিতি স্থায়ী না হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খরচ যে আরও বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সজাগ আছেন। সাধারণ পাইকারী দ্রব্যমূল্যমান বৃদ্ধি পাইয়া সম্প্রতি ৪২০তে দাঁড়াইয়াছে, গত বৎসর এই সময়ে ইহার পরিমাণ ছিল ৩৪২। গত বৎসর এই সময় সর্ব্বভারতীয় ব্যবহারিক দ্রব্যের মূল্যমান ছিল ৯২; এ বৎসর ইহা এখন দাঁড়াইয়াছে ১১০এ। মূল্যমান হ্রাস করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতেছেন এবং আর্থিক ঋণ লইতেছেন। তৃতীয় পন্থা হিসাবে কোনও কোনও বিলাস-সামগ্রীর আমদানীর উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে। মূল্যপরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখার জন্ত প্ল্যানিং কমিশনের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে যাহাতে কয়েকজন সভ্য সদাসর্ব্বদা মূল্যপরিস্থিতিকে নিরীক্ষণ করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, গত পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হইয়াছে মোট ৫০৬ কোটি টাকা; বৎসর হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৫২ সনে ঘাটতি ছিল ২৩২ কোটি টাকা, ১৯৫২-৫৩ সনে ৩১ কোটি টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সনে ৫২ কোটি টাকা; ১৯৫৪ ৫৫ সনে ৮৫ কোটি টাকা এবং ১৯৫৫-৫৬ সনে ১০৫ কোটি টাকা। বিগত পাঁচ বৎসরে বিদেশী সরকারসমূহের নিকট হইতে দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে ৯৭ কোটি টাকা এবং অদৃশ্য খাতে পাওয়া গিয়াছে ৩৮৩ কোটি টাকা। অদৃশ্য আমদানী খাতের মধ্যে পড়ে আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ঋণ, বিদেশীদের ভ্রমণের জন্ত বৈদেশিক মুদ্রা লাভ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে সাহায্যলাভ (যেমন, Point Four Programme এবং Technical Aid Programme)। এই সকল সাহায্য ও দান ধরিলে দেখা যায় যে, গত পাঁচ বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজ্যে চলতি হিসাবে ২৬ কোটি টাকা আয় মোট লেন-দেন ব্যাপারে ঘাটতি হইয়াছে ১২৩ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,২০০ কোটি টাকায়। বহির্বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি প্রায় গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ ১৯৪৯ সনের মুদ্রাবিনিময় মূল্যহ্রাস। ভারতীয় মুদ্রা-মূল্যহ্রাসের পর হইতেই ভারতের আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারে ঘাটতি স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে, রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং সেই খাতে ভারতের প্রাপ্য মুদ্রার পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে, কারণ ডলার দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ তাহার রপ্তানীর জন্ত প্রতি ১০০৲ টাকায় ৪৪৲ টাকা কম পায়। শুধু তাই নহে, ডলার দেশগুলি হইতে আমদানীর জন্তও ভারতবর্ষকে শতকরা ৪০৲ টাকা বেশী দিতে হয়, সুতরাং দেখা যায় যে, মুদ্রাবিনিময় মূল্যহ্রাস যেন শাঁখের করাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহা দুইদিকেই কাটে—আমদানী ও রপ্তানী উভয় ব্যাপারেই ভারতবর্ষকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার আর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইয়াছে যে, ভারতের আভ্যন্তরিক মূল্যমান তথা উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ডলার দেশগুলি হইতে (প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) ভারতবর্ষ অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেছে, ইহার ফলে তাহাকে অতিরিক্ত হারে ডলার প্রদান করিতে হয়, কিন্তু আমদানীর তুলনায় ডলার দেশগুলিতে ভারতবর্ষের রপ্তানী প্রায় সীমাবদ্ধ, ইহার ফলে ডলার ঘাটতি ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডলার দেশগুলিতে ভারতীয় রপ্তানী হ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ ডলার দেশ হইতে আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেওয়ায় এই দেশগুলিও ভারতবর্ষ হইতে আমদানীর পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে; গত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ ডলার দেশগুলিতে ৬৬৬ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছে এবং ৮৬৩ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে; মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯৬ কোটি টাকায়। ষ্টার্লিং দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের গত পাঁচ বৎসরে ৭ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে; ইউরোপের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের ঘাটতি হইয়াছে ২৬২ কোটি টাকা এবং ষ্টার্লিং এলাকার বাহিরে অবশিষ্ট দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি টাকা।

এই ঘাটতির অধিকাংশই পরিপূরিত হয় বিদেশ হইতে বিনা-মূল্যে প্রাপ্ত অর্থসাহায্য, বিদেশী ঋণ ও আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত ঋণ দ্বারা। তাই জোরগলায় কেন্দ্রীয় সরকার বলেন, বহির্বাণিজ্যে চলতি হিসাবে (Current Account) তাঁহাদের

লাভ হইয়াছে। কিন্তু মূলধনী লেনদেন ব্যাপারে দেনার দায়ে যে তাঁহাদের টিকি বিক্রী তার কিস্তিতে তাঁরা কায়দা করে চাপিয়া যান। আর বিদেশের দানে ভিক্ষার ঝুলি হয়ত ভর্ত্তি হয়, কিন্তু তাহা চিরন্তন কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না এবং তাহার দ্বারা দেশের আত্মমর্যাদা বাড়ে না; কৃপার পাত্র হইয়া থাকা যায়। বহির্বাণিজ্যে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার পরিস্থিতি যেন বন্যাবিধ্বস্ত পদ্মার তীরভূমি যার তলা বহুদূর পর্য্যন্ত জলে খাইয়া গিয়াছে, কখন ধ্বসিয়া পড়িবে কে জানে। তাই উপরের অবস্থা দেখিয়া সত্যিকার অবস্থা বিচার করা যায় না।

মূল্যমানবৃদ্ধির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। ব্যবহারিক দ্রব্যের উপর অধিক হারে উৎপাদন শুল্ক বসাইয়া দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস করা যায় না এবং তাহাতে দ্রব্যমূল্যও কমিবে না। ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি খরচে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য, এ হেন অবস্থায় বেশী দ্রব্য ব্যবহার করিও না বলিয়া উপদেশ দেওয়া নিরর্থক, ইহাতে আসল সমস্যার সমাধান হয় না, ধামাচাপা দেওয়া হয় মাত্র। অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক দ্রব্য সরবরাহ মূল্যমান বৃদ্ধির একটি উত্তম উত্তর।

চা-অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট

১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকার চা-অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন; এই কমিশন সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কমিশন আশা করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতে ৭১ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ আগামী পাঁচ বৎসরের পর ভারতের চা উৎপাদন আরও ৪·৫ কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইবে। কমিশনের অভিমতে চা-শিল্প ভারতের বৃহত্তম সংস্থাগত কর্ম্মপ্রদানকারী মালিক; ইহাতে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। যদিও ইদানীং ভারতে আভ্যন্তরিক চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি চায়ের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। চা-উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে কর্ষিত এলাকা এবং উৎপাদনের পরিমাণে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। চা-শিল্প ভারতের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনকারী শিল্প এবং ভারতে প্লাই কাঠের সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

উত্তর ভারত, ডুয়ার্স এবং পশ্চিম বাংলার তেরাই অঞ্চলে একরপ্রতি গড়ে চা উৎপাদনের হার সর্ব্বাধিক। দক্ষিণ ভারতে আন্নামালাই এলাকায় একরপ্রতি চা-উৎপাদনের হার অধিক। দক্ষিণ ভারতে সারা বৎসরই চায়ের চাষ করা হয়, যাহা উত্তর ভারতে হয় না। চা-শিল্পে মোট ১১৩ কোটি টাকা নিয়োজিত আছে। ইহার মধ্যে ৭২·৫৫ কোটি টাকার (অর্থাৎ ৬৪·২ শতাংশ) মালিক বিদেশীরা, এবং ৪০·৫১ কোটি টাকার মালিক ভারতীয় শিল্পপতিরা (অর্থাৎ ৩৫·৮ শতাংশ)। গত ১৯৩৯ সন হইতে ১৯৫৩ সনের মধ্যে ভারতীয় মালিকানায় পরিমাণ ১০·৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই পরিমাণে বিদেশী মালিকানা হ্রাস পাইয়াছে।

কলিকাতায় ১৩টি এজেন্সী হাউস উত্তর ভারতের ৭৫ শতাংশ চা-উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাদের মধ্যে ৭টি কোম্পানী ৫০ শতাংশ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাঁচটি কোম্পানী ৩৬ শতাংশ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯৫৪ সনে কলিকাতার নীলামে বিক্রীত চায়ের পরিমাণের অর্দ্ধেক আটটি এজেন্সী হাউস ক্রয় করিয়াছিল। কলিকাতায় খুচরা চা বিক্রয়ের ৮৫ শতাংশ দুইটি বিখ্যাত ফার্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হয়।

অনেকের ধারণা ছিল যে, আন্তর্জ্জাতিক চা চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে ভারতে চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। কমিশন কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইহাদের অভিমতে আন্তর্জ্জাতিক চা চুক্তির সভ্য হওয়াতে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ এই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে চা চাষ করা যাইতে পারে ততখানি জমিতে এখনও চাষ আবাদ করা হয় নাই, সুতরাং চায়ের কৃষি-জমি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক চা চুক্তিকে চালু রাখার জন্য কমিশন অভিমত দিয়াছেন, কারণ ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় চা-শিল্পকে পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হয়। তবে ভবিষ্যতে চুক্তিগ্রহণকালীন ভারতবর্ষ যেন তাহার আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বজায় রাখে।

ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারে চায়ের কাটতি বৃদ্ধি করার জন্য কমিশন বিশেষ সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে, আভ্যন্তরিক বাজারের ক্রয়শীলতা অত্যধিক এবং চা-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে আভ্যন্তরিক বাজারের উপর। রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে একটি রপ্তানী উন্নয়ন কমিটি নিয়োগের জন্য কমিশন অভিমত দিয়াছেন, এই কমিটি বর্ত্তমান চা বোর্ডের অধীনে কর্ম্ম করিবে। আভ্যন্তরিক বাজারের গুরুত্ব থাকিলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, চায়ের আন্তর্জ্জাতিক বাজার হারাইলে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। বিলাতের নীলাম ব্যবস্থাই আজ প্রধান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বিলাতে ভারতীয় চায়ের নীলাম-ব্যবস্থা থাকার ফলে মধ্য-প্রাচ্যের বাজারে ভারতীয় চা রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। অথচ বিলাতের নীলাম-ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ দেশে এবং ডোমিনিয়ন দেশগুলিতে ভারতীয় চা রপ্তানী ব্যাহত হইবে। লণ্ডনে নীলাম হওয়ার ফলে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় চায়ের কাটতি আশানুরূপ হইতেছে না। এই কারণে সম্প্রতি একটি টী ডেলিগেশন বিলাতে গিয়াছে উদ্দেশ্য—কি ভাবে বর্ত্তমান নীলাম-ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করা যায়।

মূল্যবৃদ্ধি ও সরকারী নীতি

গত কয়েক মাস যাবৎ নিত্যব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যের বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উভয়বিধ দ্রব্যেরই বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনে যে অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাস দেখা দিয়াছিল, বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধি আংশিকরূপে তাহার সমপূরক হইলেও মূল্যবৃদ্ধির গভীরতর কারণ রহিয়াছে। কৃষিজাত

দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস হওয়ার জন্যই মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তথায় চাউলের বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ—ঘাটতি রাজস্বনীতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (deficit financing)। কিন্তু সরকার পক্ষ এখনও তাহা পুরাপুরি স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। পরিকল্পনা-কালে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে স্বাভাবিকরূপেই মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। ইহার উপর ঘাটতি রাজস্বনীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমালোচনা মুখ্যতঃ এই দৃষ্টিকোণ হইতেই করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় প্রতিকারের উপায়ও অবশ্য সরকারের হাতে রহিয়াছে—তবে সেই সকল ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার মত প্রশাসনিক যোগ্যতার নিতান্তই অভাব। ইহার উপর নানারূপ প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক গোঁড়ামির জন্য সমস্যার বৈজ্ঞানিক এবং নিরপেক্ষ আলোচনা ও সমাধান কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনসাধারণের দুর্ভোগ কিন্তু বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর্থিক সঙ্গতির দিক হইতে যে যত দুর্ব্বল, চাপ তাহার উপর সেই পরিমাণে বেশী পড়িয়াছে। অর্থাৎ, যে অসাম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্য লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার পদ্ধতিতে সেই অসাম্যকে আরও বাড়াইয়া তোলা হইতেছে। আহার, বাসস্থান ও পরিধেয়ের সংস্থান করা আজ বিশেষ দুর্ঘট হইয়াছে—শিক্ষার কথা ত না বলাই ভাল।

মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য সরকার কাপড়ের উৎপাদন-শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, মূল্যমান আরও বৃদ্ধি পাইলে জনসাধারণ কম কাপড় কিনিবে এবং তখন কাপড়ের মূল্য পুনরায় হ্রাস পাইবে। অর্থনৈতিক তর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করিতে এই সকল যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। হয়ত উন্নততর জীবনযাত্রার মানসম্পন্ন দেশে এই সকল অর্থনৈতিক যুক্তির বাস্তব উপকারিতাও রহিয়াছে। কিন্তু যে দেশে বার্ষিক জনপ্রতি কাপড়ের ব্যবহার দশ গজও নহে সেই দেশে আরও কম কাপড় কিনিবার পরামর্শ দেওয়া জনসাধারণকে বিদ্রূপ করার নামান্তর নহে কি ?

জাতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন

জাতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশন ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীএইচ. এম. প্যাটেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্পোরেশনের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে বোম্বাই নগরে। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরও বোম্বাই নগরেই স্থাপিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনবীমা কর্পোরেশনের পাঁচটি আঞ্চলিক প্রধান কার্য্যালয় থাকিবে—কলিকাতা, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে। সমগ্র ভারতে কর্পোরেশনের তেত্রিশটি বিভাগীয় আপিস এবং ১৮০টি ব্রাঞ্চ আপিসও স্থাপিত হইবে। পনর জন সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সর্ব্বভারতীয় নীতি নির্দ্ধারণের ভার উক্ত বোর্ডের উপরই অর্পিত হইয়াছে।

গত জানুয়ারী মাসে জীবনবীমা জাতীয়করণের ঘোষণা যখন সরকারী ভাবে করা হয় তখন তাহা যেরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল—জীবনবীমা কর্পোরেশন সেইরূপ অবিমিশ্র সানন্দ অভ্যর্থনা লাভ করে নাই। বিভিন্ন দিক হইতেই কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন হইয়াছে। কর্পোরেশনের সংগঠন, কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি এবং সদর কার্য্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েই নানাবিধ প্রশ্ন উঠিয়াছে। সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পীকার লোকসভায় জীবনবীমা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী নিয়োগনীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে।

জীবনবীমা জাতীয়করণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে জীবনবীমার প্রসারসাধন। কিন্তু জীবনবীমা কর্পোরেশন যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে উহা গ্রামাঞ্চলে সাফল্যজনক রূপে কাজ করিতে পারিবে না বলিয়া 'ইকনমিক উইকলি' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন।

গাঁজা চাষীর খাজনা হ্রাস

১২ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নবনিযুক্ত আইনমন্ত্রী শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র সরকারপক্ষ হইতে জানান যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে সরকার রাজ্যের গাঁজা চাষীদের একরপ্রতি দেয় খাজনার হার ৬০ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৯ টাকা ধার্য্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার ফলে পূর্ব্বে যেখানে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার গাঁজা চাষীর নিকট হইতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা খাজনা আদায় হইত, এখন হইতে সে স্থলে মাত্র ৪৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে।

উৎপন্ন শস্যের হিসাবে খাজনা দিবার প্রথা—সাজা, ভাগ, কুখোরার প্রভৃতি নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও হুগলী প্রভৃতি আটটি জেলাতেই বিশেষভাবে সাজা প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক জমিদারী-ব্যবস্থার বিলোপসাধনের পর সরকারই এই সকল অঞ্চল হইতে সাজা খাজনা আদায় করেন। ফসল হউক আর নাই হউক প্রথা অনুযায়ী চাষীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য খাজনা হিসাবে প্রতি বৎসরই দিতে হয়। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন শস্যে দেয় খাজনার মূল্য অন্যান্য একই ধরনের জমির নগদ টাকার দেয় মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সরকার বিভিন্ন চাষীদের দেয় খাজনার মধ্যে এই বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই সাজা খাজনা হ্রাস করিয়া সাজা কৃষকদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

সাঁজা চাষীদের খাজনা হ্রাস সম্পর্কিত সরকারী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বারাসাত বার্ত্তা" সমতুল জমিতে সাজা প্রথায় ও নগদ টাকায় দেয় খাজনায় বিশেষ তারতম্যের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, সরকার কর্ত্তৃক জমির মালিকানা গ্রহণ করিবার পর অবস্থার জটিলতা আরও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। "পূর্ব্বে সাজা চাষী ফসল দিয়া উপরস্থ মালিকের খাজনার দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক জমিদারী গ্রহণের পর ফসলচুক্তি খাজনার ক্ষেত্রে বড় অসুবিধা দেখা দিয়াছিল। সরকার ধান্ত লইয়া খাজনা মিটাইতে পারিতেছিলেন না, খাজনা আদায়কারী তহশীলদারেরা ঐরূপ ক্ষেত্রে ধান্তের একটি দাম ধরিয়া নগদ টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন। উহার ফলে পাশাপাশি দাগের জমির মধ্যে দেয় খাজনার ব্যবধান আরও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওলাধান্ত (ধানের পরিবর্ত্তে সমমূল্যের টাকা) দিয়া খাজনা প্রথা তুলিয়া দিয়া একরপ্রতি নয় টাকা (অন্তর্বর্ত্তী-কালীন) খাজনা প্রবর্ত্তন করিয়া শুধু কৃষিজীবনের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন মাত্র নহে, প্রগতিশীল নীতির সম্যক পরিচয়ও দিয়াছেন।"

পাকিস্থানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

পাকিস্থানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর হইতে পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকায় যে অস্থিরতা দেখা দিয়াছে এখনও পর্য্যন্ত তাহা স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। এইরূপ অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণ প্রথমতঃ অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক এবং তৃতীয়তঃ দলগত। এই সকল কারণপরম্পরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, কোনটিকেই পৃথক করিয়া দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত প্রশাসনিক এবং ভৌগোলিক কারণও রহিয়াছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান—যাহার ফলে পাকিস্থানের দুইটি অংশ সহস্রাধিক মাইল দ্বারা বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে—পাকিস্থানের রাজনীতিতে একটি বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের প্রথম ধাক্কা কাটাইবার পূর্ব্বেই যাহার প্রকাশ পায় পূর্ব্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক আন্দোলন এবং তাহা দমনকল্পে পাকিস্থান সরকারের কঠোরতার মধ্য দিয়া। পূর্ব্বপাকিস্থানের বাঙালীরাই পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক; কিন্তু অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং সরকারী প্রতিপত্তির দিক হইতে তাহারা পশ্চিম পাকিস্থানের অধিবাসীদের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে। বাঙালীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিকে দাবাইয়া রাখিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টার মধ্যেই পাকিস্থানের রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে লীগ দল শোচনীয় রূপে পরাজিত হইল, কিন্তু কেন্দ্রে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। উপরন্তু দাঙ্গার ষড়যন্ত্র করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক সরকারকে পদচ্যুত করা হইল। পরে যখন এই দমননীতির নিষ্ফলতা প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন গণপরিষদ ভাঙিয়া দিয়া নূতন পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচিত হইল, কিন্তু সেখানেও গণতন্ত্রবিরোধী পদ্ধতিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের সমতা বজায় রাখা হইল। পশ্চিম পাকিস্থানে লীগনীতির অসারতা প্রতিপন্ন হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, সেই সুযোগে কেন্দ্রে লীগদলেরই আধিপত্য বজায় রহিল। কিন্তু ঘটনার বিবর্ত্তনে সেই ব্যবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী হইল না। অবশেষে লীগদলকে গদী ত্যাগ করিতে হইল। বিরোধী আওয়ামী লীগের নেতা (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) জনাব এইচ. এস. সুরাবর্দী পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন।

পাকিস্থানের মুসলিম লীগ দলভুক্ত প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী ২৩শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর) প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জ্জার নিকট তাঁহার মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লীগদলের সদস্যপদেও ইস্তফা দেন। চৌধুরী মহম্মদ আলী বলেন যে, লীগ সদস্যদের কুৎসারটনার জন্যই দুঃখের সহিত তাঁহাকে লীগের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছে। লীগ ত্যাগ করার পর তিনি আর প্রধানমন্ত্রী থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না বলিয়াই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদেও ইস্তফা দিতে মনস্থ করেন। প্রেসিডেণ্ট মির্জ্জা তাঁহাকে নূতন করিয়া মন্ত্রীসভা গঠনের জন্ত আহ্বান করিলে তিনি তাহাও প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট বিরোধীদলের নেতা সুরাবর্দীকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্ত আহ্বান করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হন। ১২ই সেপ্টেম্বর সুরাবর্দী প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন।

পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ দল সংখ্যালঘিষ্ঠ। জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইল ডাঃ খাঁ সাহেবের রিপাবলিকান পার্টি। ডাঃ খাঁ সাহেব প্রথমে আওয়ামী লীগের সহিত সম্মিলিতভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, রিপাবলিকান দল সর্ত্তহীনভাবে মিঃ সুরাবর্দীকে সমর্থন করিবে। নবগঠিত সুরাবর্দী মন্ত্রীসভায় ১২ জন সদস্য থাকিবেন। বর্ত্তমানে নয় জনের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে—চার জন আওয়ামী লীগের সদস্য এবং পাঁচজন রিপাবলিকান দলের সদস্য। মন্ত্রীদের নাম: জনাব এইচ. এস. সুরাবর্দী, আবতুল মনসুর আহম্মদ, আহম্মদ দিলদার এবং আহম্মদ আবতুল খালেক (সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য); এবং গোলাম আলী তালপুর, সর্দার আমীর আজম, আমজাদ আলী, মিঞা জাফর শা এবং ফিরোজ খাঁ নূন। অন্যান্ত মন্ত্রীদের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে বলিয়া জানান হয়।

প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী ও প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জ্জা উভয়েই বাঙালী হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্থানের একদল রাজনৈতিক নেতার উষ্মা জন্মিয়াছে বলিয়া "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিতেছেন। সুরাবর্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের সংবাদে পূর্ব্বপাকিস্থানে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীসভায় পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রাক্তন গবর্ণর ফিরোজ খাঁ নূনকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করায় পূর্ব্বপাকিস্থানে বিশেষ বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়াছে।

জিন্নাহ খাঁ যুব বাঙালীদিগকে আরবী বর্ণমালার মাধ্যমে বাংলা শিক্ষাদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙালীরা তাঁহার মনোনয়নে সন্তুষ্ট হয় নাই।

পাকিস্থানের মন্ত্রীসভা বদলের সংবাদে মার্কিন মুলুকেও বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অন্যতম দাবি ছিল পাকিস্থানকে সকল যুদ্ধজোটের বাহিরে রাখা। সিয়াটো এবং বাগদাদ চুক্তি এই নীতির বিরোধী। সুরাবর্দী এখনও তাহার পররাষ্ট্রনীতি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন নাই।

ইতিমধ্যে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকাতেও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আবুহোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির কোনটিরই সমাধান করিতে না পারায় উহা ক্রমশঃই জনসমর্থন হারাইতে থাকে। ইহার প্রতিফলস্বরূপ বিধানসভায় যুক্তফ্রন্ট দলেও ভাঙন দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য গণতন্ত্রবিরোধী কার্য্যক্রম গ্রহণ করে এবং বিরোধী (আওয়ামী লীগ) দলকে ক্ষমতায় আসন হইতে দূরে রাখিবার জন্য গবর্ণর ফজলুল হককে চাপ দিয়া বিধান সভার নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন স্থগিত রাখে। কিন্তু এত করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত আবুহোসেন মন্ত্রীসভা টিঁকিতে পারিল না। পনর মাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ৩০শে আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী আবুহোসেন সরকার গবর্ণরের নিকট তাঁহার মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং যথারীতি তাহা গৃহীত হয়।

৩১শে আগষ্ট রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জ্জা পূর্ব্ব-পাকিস্থানে শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া ১৯৩ ধারা প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট-ত্রাণের উহাই একমাত্র উপায় ছিল। ঐ দিনই প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের গবর্ণর আবুল কাসেম ফজলুল হক পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা আতাউর রহমান খাঁকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। ইতিমধ্যে খাদ্যাভাবে বিব্রত গ্রামবাসী জনতা ভুখা মিছিল বাহির করিলে ২০শে ভাদ্র ঢাকায় পুলিস তাহাদের উপর গুলী চালনা করে, ফলে প্রায় ২৪ জন আহত হয়। প্রতিবাদে পরদিন ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক সর্ব্বাত্মক হরতাল হয়। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গবর্ণর ইস্কান্দার মির্জ্জাকে ঢাকায় আসিবার জন্য অনুরোধ জানান।

গবর্ণরের আহ্বানে আওয়ামী লীগের নেতা আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হন এবং ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি কার্য্যভার গ্রহণের শপথ নেন। প্রথমে পাঁচ জন লইয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আতাউর রহমান খাঁ, আবদুল মনসুর আমেদ, শেখ মুজিবর রহমান, (সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য), কফিলউদ্দিন চৌধুরী (স্বতন্ত্র দল) এবং মাহমুদ আলী (গণতন্ত্রী দল)। পরে আওয়ামী লীগ হইতে আরও চার জন এবং সংখ্যালঘুদের মধ্য হইতে মন্ত্রীসভায় তিন জন সদস্য মনোনীত হন, যথা: শ্রীমনোরঞ্জন ধর (কংগ্রেস), শ্রীশরৎ মজুমদার (কংগ্রেস) এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইউ. পি. পি.); জনাব মসিউর রহমান, আবদুর রহমান খান, খয়রাত হোসেন এবং মহম্মদ মনসুর আলী (সকলেই আওয়ামী লীগের সদস্য)। এই সাত জন ১৮ই সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করেন।

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আতাউর রহমান প্রথমেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দেন। ৫ই সেপ্টেম্বর গুলী চালনা সম্পর্কে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্তেরও আদেশ দেওয়া হয়। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের খাদ্যসঙ্কট মোচনের জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া আতাউর রহমান খান বলেন, "খাদ্য পরিস্থিতিকেই অগ্রাধিকার ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে।"

সরকারের দুর্নীতিপোষণের অভিযোগ

২০শে ভাদ্র "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকা লিখিতেছেন:

"বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের নানা অভাব-অভিযোগ ও অব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এবং ঐ সঙ্গে হাসপাতালের দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে আমরা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাহিয়াছি। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার কথা, বাস্তব ঘটনা হইতে আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, কি কংগ্রেস সরকার দুর্নীতি দমনে কাহারও সাহস ও আন্তরিকতা নাই। মাঝে মাঝে দুর্নীতি দমনের ভড়ং দেখাইলেও ঐ কার্য্যে অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার মত নৈতিক শক্তি কংগ্রেসের নাই। কংগ্রেস সরকারের লোক-দেখানো দুর্নীতিদমন অভিযান যে কতবড় নির্লজ্জ ধাপ্পা তাহা বর্দ্ধমান হাসপাতালের আর-এম-ও ঘটিত ব্যাপারে বর্দ্ধমানের জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

পত্রিকাটি এই সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ: বিজয়চাঁদ হাসপাতালের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ পাইয়া স্থানীয় সমাজকর্মীদের সহায়তায় ১৪ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এনফোর্সমেণ্ট পুলিস হাসপাতালের রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার শ্রী চক্রবর্ত্তীকে উৎকোচ গ্রহণকালে নাকি হাতেনাতে ধরিয়া ফেলেন। পুলিস উক্ত চিকিৎসকের নিকট হইতে চিহ্নিত ষোল টাকার নোট হস্তগত করেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নাই। ২১শে জুলাই বর্দ্ধমান জেলা মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভায় এই সম্পর্কে পূর্ণ তদন্তের দাবি জানান হয়, কিন্তু সরকারপক্ষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলেন যে, যেহেতু রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার একজন গেজেটেড অফিসার, ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা উক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। এই অবস্থায় আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি অভিযুক্ত অফিসারটিকে নাকি মাসিক পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত সহ কলিকাতায় একটি হাসপাতালে বদলির আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"বর্দ্ধমানের ডাক" এই প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, হাসপাতালের দুর্নীতি সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার পত্রিকাটির উপর বিশেষ বিরূপ হন এবং তিনি "বর্দ্ধমানের ডাকে"র বিরুদ্ধে সরকারের নিকট নাকি একটি লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করেন। সম্প্রতি কোন কারণ না দেখাইয়া সরকার পক্ষ হইতে উক্ত পত্রিকার সরকারী বিজ্ঞাপন দান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিগত তিন বৎসর যাবৎ সরকার ঐ পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছিলেন; হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণ সম্পর্কে পত্রিকা-কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্ত্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুরের সহিত দেখা করিলে শ্রীমাথুর নাকি বলেন যে, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বর্দ্ধমানের জেলাশাসকও নাকি পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেন যে, "বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকার বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন অভিযোগ নাই এবং তাঁহারা ঐ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার জন্য কোন সুপারিশ করেন নাই। এই সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্তই উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্যের প্রচার-অধিকর্ত্তার নিকট ইহার পর একটি পত্র দেওয়া হয়, কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া যায় নাই।

"বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকায় এই অভিযোগের একটি সরকারী উত্তর বিশেষ প্রয়োজন।

ধুলিয়ানের দুরবস্থা

মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান শহর এককালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং সুপ্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল ছিল। বৎসরের পর বৎসর পদ্মানদীর ভাঙনের ফলে পুরাতন ধুলিয়ান শহরের অধিকাংশই আজ নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ক্রমাগত ভাঙনে ধুলিয়ানের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া ১৮ই ভাদ্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন, ধুলিয়ান আজ ধ্বংসের পথে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতিরোধ করিয়া এবং নদীপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ধ্বংসোন্মুখ অঞ্চলগুলিকেও বাঁচাইবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ভারতেও বাঁধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা নদীনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আবেদন সত্ত্বেও ধুলিয়ানের দুরবস্থার প্রতি সরকারী মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। গঙ্গায় একটি বাঁধ দিলেই ধুলিয়ান শহরের ভাঙন প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র তাহাই নহে, "সেই সঙ্গে জেলার অর্দ্ধেকেরও অধিক অঞ্চল উপকৃত হইত। গঙ্গাব্যারেজ হইলে ভাগীরথী নদী চিরপ্রবহমাণা নদীতে পরিণত হইত। ভাগীরথীর সহিত যে সব অঞ্চলের নিগূঢ় সম্পর্ক সে সব অঞ্চলও ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিত। বন্যার প্রকোপ কমিয়া যাইত। জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করাও সহজ হইত।"

কিন্তু গঙ্গাবাঁধের এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতে একটি বাঁধ নির্ম্মাণ আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনাতে এই বাঁধের কথা সম্পূর্ণরূপেই বাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অবশ্য ঐ বাঁধনির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে; তবে এখন পর্য্যন্ত ঐ সংক্রান্ত কোন কাজই আরম্ভ করা হয় নাই।

জিয়ান শহরের আর একটি স্থায়ী সমস্যা হইল বন্যার প্রকোপ। সাঁওতাল পরগণা হইতে বাহির হইয়া একটি পাহাড়ী নদী ধুলিয়ানের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পাহাড় হইতে যখন নদীপথে নামিয়া আসে তখন তাহার প্লাবনে সবই ভাসাইয়া লইয়া যায়। 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' লিখিতেছেন:

"এই বৎসর হঠাৎ প্রবল বন্যা আসিয়া শস্য ও গবাদির ভীষণ ক্ষতি করিয়াছে। গত ২৪শে আগষ্ট বন্যায় জল বৃদ্ধি হইয়া ধুলিয়ান অঞ্চলের চরম ক্ষতি করিয়াছে। বৎসর বৎসর কি এই ভাবে উক্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে? ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?..."

পত্রিকাটির অভিমতে একটি সুপরিকল্পিত নদীনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দ্বারা এই বন্যার প্রকোপজনিত সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। ময়ূরাক্ষী খাল নির্ম্মাণের পর নদীনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মুর্শিদাবাদ জেলায়ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা, তাহার সমস্যাবলী ও সমস্যাপূরণের ব্যবস্থা—এ সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতি ২২শে ভাদ্রের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:

"পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাপান পরিভ্রমণে যাইবার প্রাক্কালে বিগত ২১শে ভাদ্র রাইটার্স বিল্ডিংএ এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক সংখ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আগমন এবং বেকার সংখ্যায় বৃদ্ধিহেতু এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর যে প্রবল চাপ পড়িয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমবায়ের ভিত্তিতে সারা রাজ্যব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে পারিলে ঐ সব সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হইতে পারে।

রাজ্যের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনাকালে ডাঃ রায় বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে মজুত চাউল ও গম দিয়া যে সাহায্য করিতেছেন তাহাতে তাঁহারা অন্ততঃ আগামী ফসল না উঠা পর্য্যন্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে সঙ্কট কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন, এরূপ আশা রাখেন।

জাপান পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, জাপানের শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদনই গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে হইয়া থাকে। তাই জাপানে ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পগুলির কি ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন করা হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্যই তিনি

জাপানে যাইতেছেন। ভারতে বিভিন্ন শিল্পকে ভারত সরকার এই বিচারের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দিয়া থাকেন যে, সংশ্লিষ্ট শিল্প যত পরিমাণ পাইতে চাহে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ সিকিউরিটি উহাকে দেখাইতে হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলির পক্ষে ঐ ধরনের সিকিউরিটি দেখান সম্ভব নহে। অথচ সরকারের দিক হইতে সমস্যা এই যে, উপযুক্ত সিকিউরিটি না থাকিলে প্রদত্ত ঋণের টাকা পরে ফেরত পাইতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এই জন্য এই দেশে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতি তত আশাপ্রদ হইতেছে না। কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন যে, জাপান সরকার আইনগত বিধানাবলীর সাহায্যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে যথোচিত অর্থসাহায্য দিবার একটা উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি জাপানে এইটাই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, এবং জানিতে চেষ্টা করিবেন যে, জাপান কিভাবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মূলধন জোগায় এবং রাষ্ট্রের সেই প্রাপ্য ঋণের টাকা কিভাবে শিল্পগুলি হইতে আদায় করিয়া লয়।

রাজ্যের খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন, ইহা আনন্দের কথা যে, গত পাঁচসালার মধ্যে শেষ তিন বৎসরে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সনে এই রাজ্যে প্রচুর ফসল হয়। কেহ কেহ এই ফলনবৃদ্ধি জলবৃষ্টি ভাল হওয়ার জন্য হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি বলিতে চাহেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হওয়ার ফলে এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের বর্দ্ধিত ফলন এত উল্লেখযোগ্য হইয়াছে যে, এমনকি ১৯৫৫-৫৬ সনে প্রবল বন্যা হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্য কোনক্রমে জনসাধারণকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন ধরনের রিলিফের কাজ চালাইয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরে এই রাজ্যে খাদ্যোৎপাদনের অবস্থা ১৯৪৩ সনের মত নীচু পর্য্যায়ে কোন সময়ই নামিয়া যায় নাই। গত এপ্রিল মাস হইতে এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু উহা শুধু এই রাজ্যেই নয়, অন্যান্য রাজ্যেও খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট চাউল ও গম দিয়া এই রাজ্যকে সাহায্য করিতেছেন।

উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, এই রাজ্যটি উদ্বাস্তু-সমস্যায় অতিশয় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিশ লক্ষের অধিক উদ্বাস্তু পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে এই রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছে। ফলে, এই রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য নানারূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে যে জমি আছে তাহা উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সমস্যার সমাধানের জন্য নিঃসন্দেহে অপ্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব কৃষিজীবীদের শতকরা ৭০ জনেরই পরিবার পিছু দুই একরেরও কম জমি আছে। এই অবস্থায় উদ্বাস্তুদের জন্য রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গে জমি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করিতে অরবিন্দ সমবায় পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্যে বেকার লোকের সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে—আর ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বেশী—তাহাতে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। সত্য বটে যে, তাঁহারা ছোট বড় শিল্প গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ সব শিল্প-পরিকল্পনার কর্ম্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইলেও সম্ভাবনার তুলনায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হইয়াছে। তবু এই ক্ষেত্রেও সমবায় ভিত্তিতে অধিক সংখ্যায় কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী চাউল, অত্যাবশ্যক অন্যান্য দ্রব্য—বিশেষ করিয়া মাছ ও সরিষার তেলের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই সব দিকে জনসাধারণের আর্থিক চাপ যাহাতে কিছু হ্রাস পায় তজ্জন্য দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। রাজ্য সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে কতকগুলি আর্থিক সুবিধা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের মাগগীভাতার হার দুই টাকা করিয়া বৃদ্ধি, ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাউল কিনিতে মণকরা ২ টাকা করিয়া কম দাম দিবার সুযোগ ও পূজার সময়ে ছয় মাসের কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এক মাসের বেতন অগ্রিম দিবার ব্যবস্থার কথা মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন এবং জানান যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটি সুযোগ দানের জন্য রাজ্য সরকারের বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ এবং অগ্রিম বেতন বাবদ বার্ষিক প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা লাগিবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং স্পনসর্ড কলেজগুলির অধ্যাপকদের বেতনের সমহার প্রবর্ত্তনের কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

পূজার সময় অল্পমূল্যে বস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ডাঃ রায় বলেন যে, কমমূল্যে বস্ত্র সরবরাহের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু বস্ত্র দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ বস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু ঐ বস্ত্র যাহাতে চোরাবাজারে না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজ্য সরকার ঐ পরিকল্পনাটি কিভাবে কার্য্যকরী করা যায় তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু চোরাবাজারে যাইবে না, অথচ প্রকৃত যাহাদের দরকার তাহারা কাপড় পাইবে এরূপ ব্যবস্থা করা অল্প সময়ের মধ্যে কঠিন কাজ।

ডাঃ রায় প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলাফল পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঐ পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হইয়াছে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের গর্ব্ববোধ করিবার সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান। কংগ্রেস সরকার ১৯৪৭ সনে প্রথম যখন এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ইহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ১৯৫১-৫২ সনে যখন প্রথম পাঁচ-

রাজ্য-পরিকল্পনা চালু করিবার উদ্যোগ হয় তখন এরূপ হিসাব করা হইয়াছিল যে, পাঁচ বৎসরে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গে ৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। অথচ প্রথম পাঁচসালা শেষে দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন উন্নয়নকার্য্যের জন্য মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৯৪৭ সন হইতে হিসাব ধরিলে এই রাজ্যে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাবদ মোট ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়া ডাঃ রায় মনে করেন। পাঁচসালা সময়ে উন্নয়নকার্য্যে ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৩৬·৯ ভাগই সমাজসেবামূলক কার্য্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়। ঐ একই সময়ে প্রায় ১৩ কোটি টাকা রাস্তা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। ডাঃ রায় বলেন যে, একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া সত্যই আনন্দ হয় যে, রাজ্যের জনসাধারণ বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছে।

বিধানমণ্ডলীর কর্মক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারের সাফল্য সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে, গত পাঁচ বৎসরের শাসনকালে কংগ্রেস সরকার বহুবিধ জনহিতকর আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে জমিদারী দখল আইন এবং ভূমি সংস্কার আইন দুইটি সত্যই বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা। ঐ দুইটি আইন যদি যথোপযুক্তভাবে কার্য্যকরী করা যায় তাহা হইলে তাঁহারা এই রাজ্যের সমগ্র চেহারাটাই পাল্টাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীতে সর্বশেষ যে পঞ্চায়েত বিল পাশ হইল তাহাও বিশেষ কল্যাণকর ব্যবস্থা।"

উদ্বাস্তু সমস্যা

পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদিগের পুনর্ব্বাসনের অন্তরায় যাহা আছে তাঁহার একটি বিবৃতি সম্প্রতি পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী শ্রীরেণুকা রায় দিয়াছেন। উহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"২৯শে আগষ্ট—বুধবার নয়াদিল্লী বঙ্গভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় বলেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান বৎসরে কেন্দ্র হইতে আরও বেশী পরিমাণ টাকা রাজ্য গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীমতী রায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা লইয়া কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে দিল্লীতে রহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬-৫৭ সনের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার। অন্যথায় পুনর্ব্বাসনের কাজ বিলম্বিত হইবে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯৫৫-৫৬ সনের কার্য্যবিবরণীতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন বাবদ মোট ব্যয়ের একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উদ্বাস্তুদের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ২৮৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ২০১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্থানের বাস্তুহারাদের জন্য। ইহাদের সংখ্যা হইতেছে—৪৭ লক্ষ। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত ৩৯ লক্ষ উদ্বাস্তুর জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৮৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণ হইল ৬৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট নিম্নরূপ :

(১) পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের বাবদ : ১৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

(২) পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং

(৩) পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বাবদ : ১৭ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ৬৬ কোটি টাকা মোট বরাদ্দের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের জন্য রাখা হইয়াছে মাত্র ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অংশ হইতেছে ১৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। এই টাকার মধ্যে পুনর্ব্বসতির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে মাত্র ৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পর্য্যায়ক্রমিক কার্য্যসূচী স্থির করিয়াছেন তজ্জন্য সাড়ে দশ কোটি টাকার দরকার। পরিকল্পনা কমিশন স্থির করিয়াছিলেন যে, উদ্বাস্তুরা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়া আসিতেছে তাহাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ সংশোধনের প্রশ্নটি পরে বিবেচনা করা হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা বিবৃত করিয়া শ্রীমতী রেণুকা রায় বলেন যে, বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা হইতেছে ৩০ লক্ষ ৯ হাজার এবং উদ্বাস্তু শিবিরগুলির লোকসংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার। যে সকল উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৮ হাজার। ১৯৫৫-৫৬ সনের শেষ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন ঋণ বাবদ মোট ৩৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের চলিয়া আসার বিরাম নাই। কাজেই ইহাদের সকলের পুনর্ব্বাসন একটা গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্যার গুরুত্ব লোকে এখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে বটে, কিন্তু বাংলার বাহিরের বেশীর ভাগ লোকেরই অবস্থার গুরুত্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর ইহার চাপ সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের আর কোন উপায় নাই। আর পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে সমাধানের কোন উপায় যদি উদ্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে আমরা হয়ত এমন অবস্থায় পৌঁছিব, যখন পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জন্য দাঁড়াইবার মত স্থানই শুধু অবশিষ্ট থাকিবে।"

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু

কিছুদিন যাবৎ পুনর্ব্বার উদ্বাস্তুর দল পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে। উপরন্তু তাহাদিগকে রাজনৈতিক ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করার প্রথা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। সংবাদপত্রের এ বিষয়ে দায়িত্ব যাহা তাহা আমরা পালন করিতেছি না। বিশেষতঃ এক শ্রেণীর সাংবাদিক ভুল তথ্য ও সম্পূর্ণ বিপরীত ভিত্তির সমর্থন করিয়া উদ্বাস্তু ও তাহার আশ্রয়দাতা এই দুইয়েরই সম্বন্ধ তিক্ত হইতে তিক্ততর করিয়া ফেলিতেছেন। সৌরাষ্ট্র হইতে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুর প্রকৃত সংবাদ নীচে দেওয়া হইল। উহাদের বিষয় বাংলা সংবাদপত্রে কি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও আমরা জানি:

"নয়া দিল্লী, ১২ই সেপ্টেম্বর—অদ্য লোকসভার শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তীর এক প্রশ্নের উত্তরে পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বলেন যে, গত ৬·৭ মাস যাবৎ প্রতি মাসে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ৩০ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু ভারতে আসিতেছে। পক্ষান্তরে ১৯৫৪ সনে প্রতি মাসে ১০ হাজার এবং ১৯৫৫ সনে প্রতি মাসে ২০ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছে।

শ্রীখান্না আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারকে পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ করিতেছেন যে, নবাগত উদ্বাস্তুদিগকে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হউক। পশ্চিমবঙ্গে যে ৩০ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু রহিয়াছে তাহাদের পুনর্ব্বাসনই কঠিন দেখা যাইতেছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করেন, সৌরাষ্ট্রের বাঁটোয়া ক্যাম্পে প্রেরিত ১০ জন উদ্বাস্তু যুবতীকে গত আগষ্ট মাসে একদিন গভীর রাত্রিতে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিতে হইয়াছিল কিনা এবং স্থানীয় লোকগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল কিনা? ক্যাম্পে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটিয়াছিল?

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না উত্তরে বলেন, প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৭ই আগষ্ট অপরাহ্নে বাঁটোয়া ক্যাম্পের ২৪ জন নারী, ১০ জন পুরুষ ও ৭১ জন পোষ্য একুনে ১০৫ জন ক্যাম্প ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা করে।

তাহাদের ক্যাম্প ত্যাগের কারণ—(১) ক্যাম্প পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু দূরে অবস্থিত, (২) যে ক্যাশ ডোল দেওয়া হয় তাহা অপর্য্যাপ্ত, (৩) ক্যাম্পে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা অপর্য্যাপ্ত, (৪) তাহারা পশ্চিমবঙ্গ হইতে দূরে কোন স্থানে বাস করিতে অনিচ্ছুক।

ক্যাম্পের ঘটনা সম্বন্ধে কোন নিরপেক্ষ তদন্ত করান হইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী বলেন যে, সরকার তদন্তের কোন কারণ দেখেন না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত জি. বি. পন্থ অদ্য লোকসভায় বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ত্রিপুরায় এত অধিকসংখ্যক উদ্বাস্তু আসিয়াছে যে, তথায় আর নূতন উদ্বাস্তুর স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

তিনি আরও বলেন যে, উদ্বাস্তুগণ জাল এমিগ্রেশন কার্ড দেখাইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতেছে। এইরূপ প্রবেশ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করা যায়, অতঃপর জাল এমিগ্রেশন কার্ড লইয়া কোন ব্যক্তি ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না।

পণ্ডিত পন্থ বলেন যে, গত কয়েক মাসে পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের আগমন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে ২০,০২২ জন উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন মাসে এত অধিকসংখ্যক উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে নাই। গত ১৮ মাসে ৫০ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে।"

পাকিস্থানের ঋণ-প্রার্থনা

পাকিস্থানে খাদ্য সমস্যা ক্রমেই সঙ্গীন দাঁড়াইতেছে। তাহার আভাস নিম্নের সংবাদে পাওয়া যায়:

"ঢাকা, ১৩ই সেপ্টেম্বর—পাকিস্থান গতকল্য ভারতের নিকট ৩০ হাজার টন খাদ্যশস্য ঋণস্বরূপ চাহিয়াছে। এই পরিমাণ খাদ্যশস্যের অধিকাংশই চাউল।

পূর্ব্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আতাউর রহমান অদ্য প্রাতঃকালে করাচী হইতে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সাংবাদিকগণকে ইহা জানাইয়া বলেন যে, পাকিস্থানের খাদ্যসচিব বর্ত্তমানে রোমে আছেন। ইটালী হইতে ৫০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিবার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই পরিমাণ চাউল তথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মিঃ আতাউর রহমান বলেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে দ্রুত খাদ্যশস্য প্রেরণার্থ ভারত তাহার বন্দরের বিবিধ সুযোগ পাকিস্থানকে দিতে চাহিয়াছিল। করাচীর কেন্দ্রীয় সরকার দুই মাস পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে ইহা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব প্রাদেশিক সরকার ভারতের এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোন উৎসাহই দেখান নাই।

তিনি বলেন যে, সরকার আগামী বৎসরের জন্য পাঁচ লক্ষ টনের সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ভাণ্ডার গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ টন হিসাবে তিন বৎসরের জন্য পনর লক্ষ টনের সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ভাণ্ডার গঠনের পরিকল্পনাও করা হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে দুই হাজার টন চাউল আসিতেছে। কিন্তু জাহাজের অসুবিধাই প্রধান সমস্যা।"

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বাহিরের উস্কানির ফলে এদেশে সম্প্রতি যে সকল হাঙ্গামা ঘটিয়াছে তাহার একটির সংবাদ নীচে দেওয়া হইল:

"জব্বলপুর, ১৩ই সেপ্টেম্বর—আজ শহরে এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ছয় জন লোক আহত হইবার পর শহরে ১৪৪ ধারা জারী

করিয়া জনসমাবেশ ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। গোহালপুর মহল্লায় এই হাঙ্গামা হয়। আজ সন্ধ্যা ৭টা হইতে আগামী কল্য সকাল ৬টা পর্য্যন্ত কার্ফু জারী করা হইয়াছে।

গত রাত্রে মতিনালা মহল্লায় গণপতি উৎসব উপলক্ষে স্থাপিত গণপতি মূর্ত্তিটি ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়; ইহার প্রতিবাদে আজ হিন্দুদের দোকানপাট বন্ধ থাকে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিস মতিনালা মহল্লার একজনকে গ্রেপ্তার করে। ইতস্ততঃ মারপিটের ফলে ২০ জনের অধিক লোক আহত হইয়াছে। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় একশত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

হনুমন্তিয়া মহল্লায় ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্যের অভিযোগে পুলিস ৫০ জনের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইটপাটকেল নিক্ষেপ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, ঘর-বাড়ীর ক্ষতি সাধনের কয়েকটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিড়ি শ্রমিকগণ যে অঞ্চলে বাস করে ঐ অঞ্চলের রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে তামাক ও তৈয়ারী বিড়ি ছড়ান দেখা যায়।

১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া অনুমান পাঁচ শত ছাত্র কৃষ্ণ-পতাকাসহ শহরের প্রধান রাস্তায় পরিভ্রমণ করে; কিন্তু কিছুকাল পরই ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া যায়। সকালবেলার দিকে দুই-একটি দোকান লুঠের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু পুলিস আসিয়া পড়ায় উহা ব্যর্থ হয়।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও ইতস্ততঃ মারপিটের ফলে শহরে ২০ জনের অধিক ব্যক্তি আহত হয়। শহরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সম্পর্কে অদ্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় এক শত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।"

"জব্বলপুর, ১৩ই সেপ্টেম্বর—গণপতি উৎসব উপলক্ষে প্রধানতঃ মুসলিম এলাকা মতিনালা ওয়ার্ডে স্থাপিত গণেশ মূর্ত্তিটি গতকল্য ভগ্ন হওয়ায় প্রতিবাদে অদ্য এক মিছিল বাহির করা হয়। প্রকাশ, কতিপয় মুসলমান রাষ্ট্রবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। মিছিলকারীরা এই সমস্ত মুসলমানের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানাইয়া ধ্বনি করিতে করিতে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

শহরে অননুমোদিতভাবে অবস্থানের জন্য পুলিস একজন পাকিস্থানী মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই পাকিস্থানী মুসলমানটি মুসলিম লীগের আইন-সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য মৌলানা বুরহান-উল হকের পুত্র।"

শিক্ষকের বেতন

এতদিন পরে আমাদের সরকারী মহলে শিক্ষা সম্পর্কে কিছু চৈতন্যের উদয় হইয়াছে দেখিয়া আমরা কিছু আশান্বিত হইয়াছি। শিক্ষকের ভরণ রক্ষা করা যে কত বড় অত্যাবশ্যক সরকারী দায়িত্ব তাহা সভ্য-জগতে সকলেই জানে। আমাদের শুধু অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত কংগ্রেসী দলের চাঁইদের সে জ্ঞান ছিল না। সংবাদটি আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নরূপ দিয়াছেন:

"রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে এই নূতন গ্রেড চালু করা হইবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আগামী পাঁচ বৎসরে এই খাতে মোট ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ বহনে সম্মত আছেন।

এই নূতন গ্রেড প্রবর্ত্তনের পর যে সকল বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষক মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা এবং মাগ্‌গী ভাতা ২৫৲ টাকা পাইতেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন ৫৫৲ টাকা হইবে এবং মাগগী ভাতা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। ক শ্রেণীর ট্রেইণ্ড ম্যাট্রিকুলেট প্রাথমিক শিক্ষক পাইবেন বেতন ৫৫৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২।০ (বর্ত্তমান বেতন ৫০৲ টাকা এবং মাগ্‌গী ভাতা ১২।০), খ শ্রেণীর ম্যাট্রিকুলেট অথবা ট্রেইণ্ড শিক্ষক পাইবেন মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২।০ (বর্ত্তমান বেতন মাসিক ৪৫৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২।০); গ শ্রেণীর নন্-ম্যাট্রিক অথবা 'আনট্রেইণ্ড' শিক্ষক পাইবেন মাসিক বেতন ৪০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা ১২।০ (বর্ত্তমান বেতন মাসিক ২০৲ টাকা এবং মাগগী ভাতা১২।০)। এই শ্রেণীর শিক্ষকেরা বর্ত্তমানে সমাজসেবামূলক কাজের ভাতা হিসাবে মাসিক ৭।।০ টাকা পান; অক্টোবর মাস হইতে তাঁহারা এই ভাতা আর পাইবেন না।

সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের বিভালয়সমূহ ও রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মোট ৭৪,৩৫৮ জন প্রাথমিক শিক্ষক আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী স্পনসর্ড কলেজসমূহে অধ্যাপকগণের পদানুযায়ী বেতনের হার প্রত্যেকটি সমান রাখা হইবে বলিয়া রাজ্য সরকার স্থির করিয়াছেন, এরূপ জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৩টি স্পনসর্ড কলেজের মধ্যে ১৩টি বিভিন্ন জেলা সদরে ১০টি সহরতলী অঞ্চলে থাকিবে। ইহা ছাড়া মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ৪টি এবং সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের অধীন ৬টি কলেজ থাকিবে।

এই সকল স্পনসর্ড কলেজের প্রত্যেকটিতে অধ্যাপকমণ্ডলীর বেতনের হার নিম্নরূপ:

প্রিন্সিপাল—৫০০৲-৭০০৲; ভাইস-প্রিন্সিপাল—২৫০৲-৪৫০৲ এবং অতিরিক্ত মাসিক ভাতা ৫০৲; সিনিয়র লেকচারার—২৫০৲-৪৫০৲; লেকচারার—১৫০৲-৩৫০৲; ডেমনেষ্ট্রেটার—১০০৲-১৫০৲। প্রকাশ, উক্ত কলেজগুলির ঘাটতি টাকা রাজ্যসরকার বহন করিবেন।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ২৫শে আশ্বিন ১৩৬৩ (১১ই অক্টোবর ১৯৫৬) হইতে ৭ই কার্ত্তিক ১৩৬৩ (২৪শে অক্টোবর ১৯৫৬) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর হইবে। এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি—এতদ্‌বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য।

কর্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী।

মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ওঁ প্রাণায় নমো যস্য সর্বমিদং বশে।
যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥
প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।
প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
ওষধয়ঃ প্রজায়ন্তেথো যাঃ কাশ্চ বীরুধঃ ॥
যদজ স তমুংখিদেন্ নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যাম রাত্রী
নাহঃ স্যাম ব্যুচ্ছেৎ কদাচন ॥

অথর্ববেদ, ১১।৪।১—২১।

"সমস্ত জগতে এক বিরাট প্রাণের লীলা চলিয়াছে। বিশ্বের সর্বত্র এই প্রাণের প্রভাব। সমস্ত সৃষ্টিই এই প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণ সর্বনিয়ন্তা, সকলকে চালনা করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য এই বিরাট প্রাণেরই অভিব্যক্তি। এই প্রাণ সমস্ত প্রজার—সমস্ত প্রাণীর রক্ষক। অতীত, অনাগত, বর্তমান, সকল কালের সকল সৃষ্টি এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাহাকে আমরা জীবন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকি, যাহাকে আমরা মৃত্যু মনে করিয়া ভয় পাই, সেই তথাকথিত জীবনমৃত্যু এই বিরাট প্রাণের অঙ্গ, অংশস্বরূপ।

"এই অখণ্ড, অনন্ত প্রাণই জীবনরূপে, মৃত্যুরূপে, শোক-রূপে, রোগরূপে, বিরহদহন দুঃখরূপে, আমাদের ন্যায় সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্রদৃষ্টি প্রাণীর নিকট খণ্ডরূপে, বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

'যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ'
'প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা'
'জীবনমৃত্যু নাচিছে তাহার পায়ের তলে'
'অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ'
'শূন্যে শূন্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা যত।
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।'

'সেই একই প্রাণ, চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থের অন্তরে দিব্যলোকে বিরাজ করিতেছে। আবার বরষার বারিধারারূপে এই পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে।

"এই বিরাট প্রাণ, যদি এক মুহূর্তের জন্য, এক নিমেষের জন্যও সরিয়া যাইত, তবে তৎক্ষণাৎ চন্দ্রসূর্য নিভিয়া যাইত, দিবারাত্রি বন্ধ হইয়া যাইত, বিশ্বসৃষ্টি লুপ্ত হইত।

"সৃষ্টির সর্বত্র এই প্রাণের উপাসনা চলিয়াছে। আমরা এই মহাপ্রাণকে প্রণাম করি।"

যে বিরাট প্রাণের অনুভূতি প্রাচীনযুগের বৈদিক ঋষি এই বৈদিক সূক্তের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই বিরাট প্রাণের অনুভূতিই আধুনিক যুগের ঋষি-কবি তাঁহার এই "প্রাণ" শীর্ষক কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন:

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকশে পল্লবে পুষ্পে; বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন ॥" নৈবেদ্য।

আমাদের কবি এই অনন্ত প্রাণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন—এই প্রাণ মাতৃরূপে বিরাজ করিতেছেন। জীবনমৃত্যু তাঁহার দুই স্তন। প্রাণিগণ সেই মাতৃরূপা অনন্ত প্রাণের ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্যপান করিতেছে। যখন তিনি স্তন হইতে স্তনান্তরে তাহাদের সরাইয়া লইতেছেন, তখন তাহারা শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেছে:

"স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"
'মৃত্যু', নৈবেদ্য।

হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, এই ক্ষুদ্র মানবজীবন নিঃশেষ হইলেই প্রাণ নিঃশেষ হয় না। সুতরাং এই সীমাবদ্ধ মানবজীবনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা নিতান্তই হাস্যকর।

"...মৃত্যুভয়
কী লাগিয়া হে অমৃত। দু'দিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব ?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব ?" নৈবেদ্য।

কিসের ভয় ? কিসের ভাবনা ? এই বিশ্বে প্রাণের হাট বসিয়াছে। সেই প্রাণের হাটে বারে বারে আমাদের তরী ভিড়িবে :

"আমাকে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে
বারে বারে এই জীবনের প্রাণের হাটে।" গীতবিতান।

নানা রূপে, নানা ভাবে এই বিশ্বজগতে আমরা আনাগোনা করিব। আমাদের এই আসা-যাওয়া চিরদিনের :

"নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।"
'চির-আমি', গীতবিতান।

এই 'অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসিতে' পারিয়াছিলেন তিনি। তাই জীবনমরণ তাঁহার নিকট দোলারোহণের ন্যায় আনন্দদায়ক মনে হইত। তিনি বলিয়াছেন, যেন কোন্ এক গানের তালে তালে কেহ আমাদের কোলে লইয়া নিজে দুলিতেছেন এবং দোলা দিতেছেন। এই দোলায় দুলিতে দুলিতে যখন আমরা সম্মুখের দিকে আসিতেছি, তখন আনন্দে হাসিয়া উঠিতেছি। আবার দোলা যখন পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতেছে, তখন ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেছি :

"চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল!
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সম্মুখে যখন আসি
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সম্মুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে মোরা করি গোল।
চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।"
'মরণদোলা', উৎসর্গ।

ভারতবর্ষ জীবনমৃত্যুকে এই রূপেই দর্শন করিয়াছে। বৈদিক ঋষি গাহিয়াছেন :

নমস্ত আয়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ ॥
অথর্ব, ১১।৪।৭।

"হে অনন্ত প্রাণ! কখনো তুমি সম্মুখে আসিতেছ। কখনো তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতেছ। কখনো তুমি দণ্ডায়মান। কখনো তুমি উপবিষ্ট। যখন তুমি সম্মুখে, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি পশ্চাতে, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি দণ্ডায়মান, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি উপবিষ্ট। তখনও তোমায় নমস্কার।"

যাহা আমাদের নিকট বিভীষিকাময় মৃত্যু তাহা কবি ও সাধকের নিকট নব নব দেশে, নব নব রমণীয় রাজ্যে প্রবেশ করিবার লোভনীয় পথ :

"নব নব প্রবাসেতে, নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে ; * *
নব নব মৃত্যু-পথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"
'জন্ম ও মরণ', উৎসর্গ।

"মরণেরি পথ দিয়ে ওই আসছে জীবন মাঝে"

ভয় কি ? আসুক মৃত্যু। সেই অজানা, অচেনাকে প্রিয়তমরূপে বরণ করিয়া লইব।

"মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য-অনুগতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।

সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর
বিজনরাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।" গীতাঞ্জলি।

পরিণতবয়সে দেহত্যাগের এক বৎসর পূর্বেও কবি এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এখানে তিনি মরণকে বধূ এবং জীবনকে বর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন :

"ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ—
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।"
'ধূসর গোধূলিলগ্নে', জন্মদিনে।

মরণকে তিনি মধুররূপে দর্শন করিয়াছেন; অথচ এই পৃথিবীকে, এই মানবজীবনকে তিনি প্রাণভরে ভালবাসিতেন। এই পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁহার নিকট মধুময় ছিল :

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দে বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।' "
'মধুময় পৃথিবীর ধূলি', আরোগ্য।

পৃথিবীকে এত ভালবাসিলেও তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন :

"কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে।" 'জন্মমরণ', উৎসর্গ।

মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে তিনি বলিয়াছেন :

"—আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয় ;
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সংগমে।"
'পথের শেষে' জন্মদিনে।

সর্বদেশের সর্বমানবের চেতনাকে যাহা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, মহাকবির সেই চেতনার নির্ঝরিণী 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের 'সাগর-সংগমে' মিলাইয়া গিয়াছে।

সেই 'দৃষ্টি হইতে শান্তিঝরা' 'নয়নভুলানো' 'প্রসন্ন প্রশান্ত' প্রাণবান্ পার্থিব রূপ আর আমরা দেখিতে পাইতেছি না!

ইহা কম দুঃখ নহে। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তেমন অপূর্ব সম্পদ, উত্তরাধিকারীর জন্য, কবে, কোথায়, কোন্ পিতা, কোন্ গুরু, কোন্ কবি রাখিতে পারিয়াছেন?

যে সম্পদ হাতে লইয়া আজ প্রত্যেক ভারতবাসী, প্রত্যেক মানব, দৃপ্তকণ্ঠে বলিতে পারে :

"যেনাহমমৃতঃ স্যাম্—"

"যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারি"—এমন মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন।

ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।*

---

* ২২শে শ্রাবণ প্রভাতে, শান্তিনিকেতন-মন্দিরে অন্ততম আচার্যের ভাষণ।

ভাস্করের "ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

দশ বেদান্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম "ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ" প্রবর্তক ভাস্কর তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের জন্যই জগতে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর সুবিখ্যাত "উপাধিবাদ" সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হচ্ছে।

রামানুজ, নিম্বার্কপ্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকদের ন্যায় ভাস্করের মতেও, চিৎ বা জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণুপরিমাণ ও বহুসংখ্যক।

কিন্তু এই সকল বৈদান্তিকদের সঙ্গে ভাস্করের মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই যে, তাঁর মতে জীবের উক্ত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও বহুত্ব আদিম বা অনাদি কাল থেকে বিদ্যমান ও অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী নয়, অর্থাৎ নিত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, কিন্তু কেবলমাত্র "ঔপাধিক", আগন্তুক ও অনিত্য, অথবা যতদিন পর্যন্ত উপাধি থাকে তত দিন পর্যন্তই কেবল স্থায়ী।

এই প্রসঙ্গে ভাস্করের নিজস্ব, মৌলিক উপাধিবাদের বিষয় আলোচ্য। ভাস্করীয় উপাধিবাদানুসারে সংসারাবস্থায় বা ব্রহ্মের কার্যাবস্থায় জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন; কিন্তু প্রথমে বা ব্রহ্মের কারণাবস্থায়, জীব ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল; এবং পরে বা প্রলয়কালে ও মোক্ষকালে জীব পুনরায় ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন হবে।

এরূপে সংসারাবস্থায় বা ব্রহ্মের কার্যাবস্থায়, জীব অংশ, কার্য ও আশ্রিত রূপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন, যেহেতু অংশ অংশী থেকে, কার্য কারণ থেকে, আধেয় বা আশ্রিত আধার বা আশ্রয় থেকে ভিন্নাভিন্ন। ভাস্কর বলছেন:

"তথা কার্যকারণয়োর্ভেদাভেদাবনুভূয়তে।"

(ব্রহ্মসূত্র—ভাষ্য ২-১-১৮)

এস্থলে ভাস্কর প্রধানতঃ কার্যকারণ সম্বন্ধের সাহায্যেই ঈশ্বর ও জীবজগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। কার্য-কারণ সম্বন্ধ 'তাদাত্ম্য' বা 'অনন্যত্ব' সম্বন্ধ। 'অনন্যত্ব' কিন্তু 'অভিন্নত্ব' নয়, 'ভিন্নাভিন্নত্ব'। প্রথমতঃ কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়, সেজন্য কার্য কারণের অবস্থাবিশেষ মাত্র এবং কারণাত্মক বা কারণস্বরূপ। কারণ ব্যতীত কার্যের স্থিতিই অসম্ভব, ত্রিকালেই কার্য কারণাধীন। অশ্ব ও মহিষ যেমন পরস্পর ভিন্ন, কার্য ও কারণ তেমনি দেশতঃ ও কালতঃ ভিন্ন কোনও দিনও নয়। এইদিক থেকে কারণ ও কার্য অভিন্নস্বরূপ।

কিন্তু পুনরায় কারণ ও কার্য ভিন্নস্বরূপও সমভাবে। এই ভিন্নতার কারণ নিয়ে বলা হচ্ছে। যেমন, সমুদ্র ও তরঙ্গ, অগ্নি ও শিখা, বায়ু ও প্রাণাদি বৃত্তির সম্বন্ধ। তরঙ্গ সমুদ্রাত্মক, সমুদ্রস্বরূপ বলে সমুদ্র থেকে অভিন্ন; পুনরায় তরঙ্গরূপে সমুদ্র থেকে ভিন্ন। শিখা অগ্নি থেকে অগ্নিস্বরূপ বলে অভিন্ন, শিখারূপে ভিন্ন। প্রাণাদি বায়ু থেকে বায়ুস্বরূপ বলে অভিন্ন, প্রাণাদি রূপে ভিন্ন। এরূপে কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। কার্য-কারণ সম্বন্ধকে শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধও বলা যেতে পারে, যেহেতু কার্য কারণের শক্তিবিক্ষেপ বা শক্তির প্রকাশই মাত্র। যথা—সমুদ্রের শক্তির প্রকাশ তরঙ্গ, কিন্তু পাষাণে সে শক্তি নেই বলে, পাষাণে কোনদিন তরঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এরূপে শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ "অনন্যত্ব" বা ভিন্নাভিন্নত্ব সম্বন্ধ।

সুতরাং সংসারকালে ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ কেবলা-ভেদও নয়, কেবল ভেদও নয়, কিন্তু ভেদাভেদ। একদিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন; অন্যদিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এই অভিন্নতা ও ভিন্নতার হেতু কি? প্রথমতঃ অভিন্নতার হেতু পূর্বেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ কার্যরূপী জগৎপ্রপঞ্চ কারণরূপী ব্রহ্মের স্বরূপের পরিণাম, অবস্থান্তর বা অভিব্যক্তিই মাত্র। সেজন্য জীবজগৎ ব্রহ্মস্বরূপ বা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভিন্নতার হেতু হ'ল "উপাধি"। এই "উপাধি"ই ব্রহ্মস্বরূপ বা ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন জীবজগৎকে সংসারাবস্থায় ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বা পৃথক্ করে রাখে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এ স্থলে ভাস্কর পরিণামবাদসম্মত ও বিবর্তবাদসম্মত উভয় প্রকারের উদাহরণই দিয়েছেন। তাঁর মতে, জীব ব্রহ্মের অংশ—অনাদি, অবিদ্যা ও কর্মাত্মক উপাধিজনিত অংশ—যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, কর্ণমধ্যস্থিত আকাশ মহাকাশের অংশ (উপাধি—কর্ম); বা দেহমধ্যস্থিত প্রাণ বায়ুর অংশ (উপাধি—দেহ)। প্রথমটি পরিণামবাদীদের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বিবর্তবাদীদের প্রিয় উদাহরণ। ভাস্কর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম উদাহরণটির কথাই বলেছেন; অথচ সাধারণ পরিণামবাদীদের ন্যায় স্ফুলিঙ্গকে অগ্নির পরিণাম সাক্ষাৎ ভাবে না বলে, তিনি তাকে অগ্নির উপাধিজনিত অংশই মাত্র বলছেন। যেমন তিনি ১-৪-২১ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলেছেন

যে, অনাদি, অবিদ্যা ও কর্মরূপ উপাধির দ্বারা বিচ্ছিন্ন জীব ব্রহ্মের অংশ ; যেমন, স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, কর্ণপটাহ মধ্যস্থিত আকাশ আকাশের অংশ, শরীর মধ্যস্থিত প্রাণ বায়ুর অংশ। সেজন্য সংসারী জীব ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন: স্বরূপতঃ অভিন্ন, উপাধিবশতঃ ভিন্ন।

২-৩-৪৩ সূত্রভাষ্যে, ভাস্কর বদ্ধ জীবকে কি অর্থে ব্রহ্মের "অংশ" বলা যায়, সে বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। "অংশ" শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন "অংশের" অর্থ হতে পারে "কারণ" বা দ্রব্যবিভাগ। প্রথম অর্থে তন্তুকে বস্ত্রের অংশ বলা হয়, যদিও তন্তু বস্ত্রের কারণস্থানীয়। দ্বিতীয় অর্থে বলা যেতে পারে "আমরা পরিষদদ্রব্যের অংশী", বা সেই সকল দ্রব্য বিভাগ করে আমরা গ্রহণ করছি। কিন্তু জীবকে যখন ব্রহ্মের অংশ বলা হয়, তখন এই দুটি অর্থে বলা হয় না, অন্য অর্থে বলা হয়।

"উপাধ্যবচ্ছিন্নস্তানন্তভূতস্য বাচকোঽয়মংশ শব্দ প্রযুক্তঃ যথাগ্নেৰ্বিস্ফুলিঙ্গস্য।" (২-৩-৪৩, পৃ. ১৪০)

এ স্থলে "অংশ" শব্দটির অর্থ : উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন, অনন্য অংশ, যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ। অর্থাৎ সমগ্র দ্রব্যটি থেকে একটি অংশ উপাধি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন হয়ে যায়, অথচ দ্রব্যটি থেকে সেই অংশটি "অনন্য" বা স্বরূপতঃ অভিন্ন। সমগ্র দ্রব্য থেকে এরূপে স্বরূপতঃ অভিন্ন, অথচ উপাধি দ্বারা ভিন্ন অংশটিই প্রকৃত "অংশ"। এই অর্থেই জীব ব্রহ্মের অংশ।

এস্থলে ভাস্কর পূর্বের ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশ-কর্ণছিদ্র, বায়ু-প্রাণ এবং একটি নূতন মন-বৃত্তির উদাহরণ দিয়েছেন। কামপ্রমুখ মনোবৃত্তি যেমন মন থেকে উপাধিবশতঃ ভিন্ন, যদিও স্বরূপতঃ অভিন্ন, জীবও ব্রহ্ম থেকে ঠিক তাই।

"স চাভিন্নাভিন্ন-স্বরূপোঽ ভিন্নরূপং স্বাভাবিকমৌপাধিকং তু ভিন্নরূপম্।" (২-৩-৪৩)

অর্থাৎ জীব ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন—সংসারকালে ভিন্ন, মুক্তি ও প্রলয়কালে অভিন্ন। ঈশ্বর থেকে জীবের ভিন্নতা ঔপাধিক, অভিন্নতা স্বাভাবিক।

ভাস্কর তাঁর উপাধিবাদ প্রপঞ্চনা কালে বারংবার "অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের" উদাহরণ দিয়েছেন বলে, বোঝা যায় যে, তাঁর মতে "উপাধি" মিথ্যা বা অসত্য নয়,—কারণ, স্ফুলিঙ্গ ত অগ্নির সত্য বাস্তব অংশই, মিথ্যা বা অবাস্তব নয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ভাস্করের মতে অনাদি, অবিদ্যা ও তজ্জনিত সকল কর্মই 'উপাধি' (১-৪-২১)। অন্য একস্থলে ভাস্কর বলছেন যে, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, এবং তাদের গুণ কাম-লোভাদিই 'উপাধি'। (২-৩-২৯-৩০)। অতএব ভাস্করের মতে অনাদি অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন বলে মনে করে এবং সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ফলে, সে জন্মজন্মান্তরভাগী হয়ে জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এরূপে এই অচিৎ বা জড় বস্তুই উপাধিরূপে জীবকে সংসারকালে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন করে তোলে।

অতএব ভাস্কর "উপাধি"র সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, যা "ঔপাধিক" তা "অপারমার্থিক" বা মিথ্যা নয়। "ন চৌপাধিক-কর্তৃত্বম্ অপারমার্থিকম্।" (২-৩-৪০)। "স্বাভাবিক" ও "ঔপাধিকে"র মধ্যে প্রভেদ এই নয় যে, প্রথমটি সত্য, দ্বিতীয়টি অসত্য—প্রভেদ কেবল-মাত্র এই যে, প্রথমটি নিত্য বা চিরকালস্থায়ী, দ্বিতীয়টি অনিত্য বা অল্পকালস্থায়ী। ভাস্করের মতে যা অনিত্য, অর্থাৎ আগন্তুক, কালক্রমে আগত, প্রথম থেকে, অনন্তকাল থেকে বর্তমান নয়—তা অসত্য নয়। যেমন, একটি বস্তুতে বা পাত্রে প্রথমে তাপের অস্তিত্ব না থাকতে পারে, যদিও পরে অগ্নির সংস্পর্শে এলে সেই একই বস্তুতে বা পাত্রে তাপের আবির্ভাব হয়। এস্থলে সেই বস্তুর "তাপ" নামক গুণটি অনিত্য নিশ্চয়, কারণ তা নিত্যকাল বস্তুটিতে বিদ্যমান নয়, কালক্রমেই তাতে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এই ভাবে "অনিত্য" হলেও তাপ নিশ্চয়ই "অসত্য" নয়। সেজন্য ভাস্করের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধিটি বর্তমান, ততক্ষণ ঔপাধিক গুণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য—উপাধির বিলয়ে স্বভাবতঃই তারও বিলয় হয়। যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি বা পাত্রটি অগ্নির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হয়ে আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটির বা পাত্রটির তাপও বিদ্যমান এবং সেই তাপ সম্পূর্ণ সত্য। অগ্নির অভাবেই তাপেরও অভাব হয়। এই ভাবে তাপ পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং সেজন্য তা অনিত্য, কিন্তু কোনক্রমেই অসত্য নয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী যে বর্তমান, তা অনিত্য হলেও তাকে অসত্য বলবে কে? কারণ যেটুকু তার সসীম অস্তিত্ব, সেটুকুই ত সত্য।

এরূপে শঙ্করের "উপাধি" ও ভাস্করের "উপাধি"র মধ্যে প্রভেদ অনেক। শঙ্করের মতে, যা ঔপাধিক তা অপারমার্থিক, কারণ যা পারমার্থিক তা কোনদিনই বাধিত হয় না, অস্তিত্ব-বিহীন হয় না। এরূপে শঙ্করের মতে "সত্য" এবং "নিত্য" সমার্থক। যা সত্য, তা নিত্যকাল সত্য, চিরস্থায়ী, অবাধিত-স্বরূপ। কিন্তু ভাস্করের মতে, "সত্য" ও "নিত্য" সমার্থক নয়—যা সত্য, তা নিত্যও হতে পারে অনিত্যও হতে পারে। অল্পস্থায়ী বস্তুও এই অর্থে সত্য বস্তু।

এরূপে ভাস্করের মতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ স্বাভাবিক, অর্থাৎ সত্য ও নিত্য, অতীত, বর্তমান,

ভবিষ্যৎপ্রমুখ সর্বকালে, সৃষ্টি, প্রলয়, মুক্তিপ্রমুখ সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ—ঔপাধিক, অর্থাৎ সত্য ও অনিত্য, কেবল সৃষ্টি বা সংসার অবস্থাতেই বিদ্যমান।

উপাধির বিলয়ে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন উপাধি ঘট ভগ্ন হলে, ঘটাকাশ মহাকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়, যেমন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লবণকণা সমুদ্রজলের সঙ্গে এক হয়ে যায়—তেমনই প্রলয় ও মুক্তিকালে জড়দেহাদি রূপ উপাধিবিমুক্ত জীবও ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সেই অবস্থায়, জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বাত্মক হয়।

ভাস্কর মতে "উপাধি"র প্রকৃত অর্থ কি তা উপলব্ধি করলে, তিনি কি অর্থে জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও অণুত্বকে "ঔপাধিক" বলে গ্রহণ করেছেন তা স্পষ্ট হবে। তাঁর মতে জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হ'ত, তা হলে সে সর্বদাই কর্মকারী, ক্রিয়াশীল হ'ত। কিন্তু সকাম কর্মের ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী ও ভোগের ফল সংসার বলে, সে ক্ষেত্রে জীবের সংসারদশাও কোনদিন শেষ হ'ত না। সেজন্য স্বীকার করতেই হয় যে, জীবের কর্তৃত্ব নিত্য ও স্বাভাবিক নয়, অনিত্য ও ঔপাধিক, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জীব দেহমনঃ-সংশ্লিষ্ট বা জড়-উপাধি-সংশ্লিষ্ট থাকে, ততদিন পর্যন্তই কেবল সে কর্তৃত্বশীল, যেমন যন্ত্রাদিসমন্বিত হলেই তক্ষ কর্তা, সময়ে নয়; অথবা ইন্ধন সংশ্লিষ্ট হলেই অগ্নি ধূমস্রষ্টা, অন্যথায় নয়। বলা বাহুল্য, "উপাধি"র পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে, জীবের ঈদৃশ ঔপাধিক কর্তৃত্ব কোনক্রমেই অপারমার্থিক বা মিথ্যা নয়। অর্থাৎ, জীব নিত্যকর্তা বা সর্বদাই কর্মকারী না হলেও, সংসারদশায় তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপেই সত্য। সেই সময়ে অবশ্য জীব ব্রহ্মের অধীন।

একই ভাবে জীবের ভোক্তৃত্ব ও অণুত্বও ঔপাধিক, অথবা জীবের সংসারকালীন গুণই মাত্র। স্বভাবতঃ জীব কর্মফল ভোগবিহীন ও সর্বব্যাপী।

জীবের বহুত্বও এই ভাবে ঔপাধিক কিনা, সে বিষয়ে ভাস্কর স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। তা সত্ত্বেও ভাস্করের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যান, যেমন লবণকণা সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়; সুতরাং জীবের বহুত্বও যে তাঁর মতে ঔপাধিকই মাত্র, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কেবল জীবের জ্ঞাতৃত্ব ঔপাধিক নয়, স্বাভাবিক। জীব ব্রহ্মস্বরূপ বলে, সর্বকালে, সর্বাবস্থাতেই সে ব্রহ্মেরই ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা।

অশ্বারোহী বীর

শ্রীকালিদাস রায়

অশ্বারোহী বীর তুমি, কোষে তব অসি খরশান,
বর্শা তব শোভে বাম হাতে।
ভালে দৃপ্ত কান্তি কই? কি চিন্তায় মুখ তব ম্লান
চোখে কেন দীপ্তি নাহি ভাতে?
জিপ্‌চারী যত সেনা উপেক্ষিয়া তোমা চলে যায়
রণে কেহ ডাকে না'ক তোমা?
তোমার গিয়াছে দিন! নানা রণযন্ত্রে ধরা ছায়,
আসিয়াছে গোলাগুলি, বোমা।
গেছে সে শৌর্য্যের দিন, গর্ত্ত খুঁড়ি লুকায়ে সৈনিক,
দূর হতে মারণাস্ত্র ছাড়ে,
মুখোমুখি যুদ্ধ নেই, নিরাপদে রহি বৈমানিক
হত্যা করে হাজারে হাজারে।

এই কাপুরুষ-যুগে বীর তব ফুরায়েছে কাজ
কি হবে শানায়ে আর অসি?
সমুদ্রের পরপারে শোন গর্জ্জে আণবিক বাজ,
গ্রামে ফিরে খাও জমি চষি।
কি হইবে অশ্বটির? ও অশ্বেরে ভালবাসো বড়?
বেচিতে হইবে বড় ক্লেশ?
জানো কি খেলিতে পোলো? তার চেয়ে এক কাজ করো,
জকি হয়ে খেল গিয়ে রেস।
দিন ফুরায়েছে বলি হে বীর হয়ো না ম্রিয়মাণ,
ফুরায় যে সকলেরেই দিন।
সগৌরবে রবে তুমি, না ডাকুক রণ-অভিযান,
কাব্যে তুমি রবে মৃত্যুহীন।

কালিদাস সাহিত্যে আইন আদালত

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

কালিদাসের কাব্য ও নাটকগুলি পড়িলে মনে হয় মহাকবির সময় এখনকার মত পৃথক আদালত বলিয়া কিছু থাকিত না, এবং বেতনভোগী বিচারক নিযুক্ত করার প্রথা তখনও চালু হয় নাই। রাজসভার এক অংশে একটি 'ধর্ম্মাসন' বা 'ব্যবহারাসন' পাতিয়া রাখা হইত এবং দিনের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেশের রাজা রাজকার্য্য সারিয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া সেই ধর্ম্মাসনে বসিতেন, আর প্রজাদের মধ্যে যাহাদের নালিশ করার কিছু থাকিত রাজার সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে তাঁহার নিকট আর্জ্জি পেশ করিতে হইত। আইনজীবী অর্থাৎ উকীল-মোক্তারদের তখনও সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং বাদী ও প্রতিবাদীদের যাহা কিছু বক্তব্য সমস্ত নিজেদের বলিতে হইত, সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণ করার ব্যবস্থাও ছিল, রাজা তাহাদের অভিযোগ ও প্রত্যুত্তর শুনিয়া বিচার করিতেন এবং রায় দিতেন। রাজা যদি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন বা অন্য কোন কারণবশতঃ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিতেন, তখন তাঁহার কোনও মনোনীত মন্ত্রী তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সেদিনের বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া মামলার পূর্ণ বিবরণ রাজার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

কালিদাসের যে আইন সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তাহা 'বিক্রমোর্ব্বশী'র নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়:

বিভাবিতৈকদেশেন দেয়ং যদভিযুজ্যতে ॥"

বিক্রম, ৪র্থ অঙ্ক

অর্থাৎ, সাক্ষ্যের দ্বারা যদি কোনও বস্তুর একাংশের চুরি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে হয়।"

এখানে বুঝা যাইতেছে যে, তখনকার দিনে দেশের এই আইন ছিল—যদি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইত যে, কোনও ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্যের একাংশ চুরি করিয়াছে, তাহা হইলে অপহৃত সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করার দায়িত্ব তাহার উপর আসিত, ও না পারিলে দণ্ডভোগ করিতে হইত। মহাকবি এই আইন যে জানিতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এই শ্লোকটিতে কতকগুলি আইনঘটিত পারিভাষিক শব্দও রহিয়াছে, যেগুলি মহাকবির ভাল ভাবে জানা ছিল। যেমন, 'বিভাবিত', ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ যাহার অর্থ মল্লিনাথ করিয়াছেন, 'সাক্ষ্যাদিভিঃ সাধিতঃ'—অর্থাৎ, বিভাবিত মানে সাক্ষ্যদ্বারা যাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

'অভিযুজ্যতে' কথাটিও আইন সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দ বলিলেও বলা যাইতে পারে, অর্থ—যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে।

'রঘুবংশের' সপ্তদশ সর্গে সূর্য্যবংশের এক রাজা অতিথির জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে মহাকবি বলিতেছেন—

স ধর্ম্মস্থসখঃ শশ্বদর্থিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়ং।
দদর্শ সংশয়চ্ছেদ্যান্ ব্যবহারানতন্দ্রিতঃ ॥

রঘু—১৭।৩৯

রাজা অতিথি সর্ব্বদা অর্থী (বাদী) এবং প্রত্যর্থী (প্রতিবাদী)-দিগের জটিল মামলাগুলি স্বয়ং আলস্যবিহীন হইয়া 'ধর্ম্মস্থ' অর্থাৎ সভ্যদিগের সহায়তায় দেখিতেন। এখানেও দেখা যাইতেছে, রাজা স্বয়ং বিচার করিতেন, এবং যে সমস্ত মামলা জটিল বলিয়া তাঁহার মনে হইত, সভাসদ-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেগুলির বিচার করিতেন। আইন সম্বন্ধে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ এ শ্লোকেও পাওয়া গেল, যেমন 'অর্থী'—বাদী; 'প্রত্যর্থী'—প্রতিবাদী; 'ব্যবহারান্'—মামলাগুলির; এবং 'ধর্ম্মস্থ'—যাহার অর্থ মল্লিনাথ করিয়াছেন 'সভাসদ্'। আমার মনে হয়, তখনকার দিনের ধর্ম্মস্থগণ, যাঁহাদের সহিত রাজা পরামর্শ করিয়া জটিল মামলাগুলির বিচার করিতেন, তাঁহাদিগকে আধুনিক কালের 'জুরি' বলা যাইতে পারে। 'ধর্ম্মস্থ'দিগকে 'জুরি' বলা যাইতে পারে বলিলাম এই জন্য যে, মল্লিনাথ এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যেখানে মহর্ষি বলিতেছেন, 'ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ' অর্থাৎ রাজা মামলা-গুলি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিয়া দিবেন। এই সকল বিদ্বান ব্রাহ্মণ যে কেবল রাজসভার সভ্যদের মধ্য হইতে লওয়া হইবে যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বিধান দেন নাই, কিংবা রাজসভার বাহির হইতে সাধারণ সৎ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের পরামর্শ লওয়া নিষিদ্ধ একথাও বলেন নাই; সুতরাং যে-কোনও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের, মামলার বিচার করার সময় রাজা পরামর্শ লইতেন ইহা যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এখনকার সময়ের জুরি বলিলে অত্যুক্তি হইবে কেন? তাহা ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম্ম' শব্দে আইনও বুঝায়, সুতরাং ধর্ম্মস্থ বলিলে বুঝিতে হইবে সেই সব সভ্য, আইন সম্বন্ধে যাঁহাদের অল্লাধিক জ্ঞান ছিল।

মহারাজ অজের প্রসঙ্গে মহাকবি বলিতেছেন:—

'নৃপতিঃ প্রকৃতীরবেক্ষিতুং ব্যবহারাসনমাদদে যুবা।'

রঘু—৮।১৮

অর্থাৎ, যুবক রাজা প্রজাদের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ বুঝিবার জন্ত 'ব্যবহারাসনে' বসিতেন। 'ব্যবহার' শব্দে আইনঘটিত ব্যাপার বুঝায়, সুতরাং 'ব্যবহারাসনে' বসিতেন এই কথার অর্থ সভার মধ্যে যে পৃথক্ আসনটি বিচারকার্য্য সম্পন্ন করার জন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল, যুবক রাজা সেই আসনে বসিয়া প্রজাদের মধ্যে কে দোষী কে নির্দ্দোষ বিচার করিয়া দেখিতেন।

তখনকার দিনে হয়ত 'রাজকার্য্য' বলিলে বুঝাইত প্রজাশাসন, রাজস্ব আদায় ইত্যাদির তদারক করা, আর 'পৌরকার্য্যে'র অর্থ ছিল প্রজাদের আইনঘটিত সমস্তার মীমাংসা করা, উত্তরাধিকার নির্ণয় করা ইত্যাদি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র ষষ্ঠ অঙ্কে এই শব্দ দুইটির একত্র প্রয়োগ দেখা যায়। মহারাজ দুষ্যন্তের এক মন্ত্রী রাজা অসুস্থ বলিয়া রাজসভায় আসিতে না পারায়, তিনি রাজার হইয়া সমস্ত কাজ সারিয়া এক পত্রে রাজার জ্ঞাতার্থে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'রাজকার্য্যস্ত বহুলতয়া একমেব ময়া পৌরকার্য্যং প্রত্যবেক্ষিতং তদ্দেবঃ পত্রারোপিতং প্রত্যক্ষীকরোতু'—অর্থাৎ 'রাজকার্য্য আজ অত্যন্ত বেশী থাকায় মাত্র একটি পৌরকার্য্য দেখিবার ফুরসত পাইয়াছিলাম, এই পত্রে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল, মহারাজ দেখিয়া লইবেন।'

এই পৌরকার্য্যটি কি তাহা মন্ত্রী রাজাকে জানাইতেছেন, 'ধনবৃদ্ধি নামক কোনও বণিকের নৌকা দুর্ঘটনায় জলে ডুবিয়া মৃত্যু হওয়ায় এবং তাহার সন্তানাদি কেহ না থাকায় তাহার সঞ্চিত বহু কোটি মুদ্রা রাজসরকারের প্রাপ্য হইতেছে।' মন্ত্রী মহাশয় আরও জানাইতেছেন যে, বণিকের কয়েকটি বিধবা পত্নী রহিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সে যুগে যদি কোনও ধনী ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী বা পত্নীরা স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিতেন না, জীবনস্বত্ব ভোগেরও তাঁহাদের অধিকার ছিল না, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইত।

'শকুন্তলা' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ইহাও দেখা যায় যে, চুরি করার অপরাধ প্রমাণিত হইলে রাজা ইচ্ছা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শূলে চাপাইয়া মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন (শূলাদবতার্য্য হস্তিপৃষ্ঠে সমারোপিতঃ)।

মৃত্যুদণ্ড যে কেবল শূলে চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, তরবারির ঘায়া কাটিয়া ও মারিয়া ফেলার ব্যবস্থা করা হইত। 'বিক্রমার্কচরিতে' পাওয়া যায়, গহনার লোভে পড়িয়া এক শিশুহত্যাকারীর সম্বন্ধে রাজসভার সদস্তেরা রাজাকে বলিতেছেন, 'ওকে শতখণ্ডে কাটিয়া শকুনিদের কলার করিয়া দেওয়া হউক।'

পত্নী ত্যাগ করা তখনকার দিনে স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, স্বামী ইচ্ছা করিলে যে কোনও কারণে অনায়াসে পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারিতেন, আইনের কোনও বাধা ছিল না।

'শকুন্তলা'র পঞ্চম অঙ্কে কণ্বশিষ্য শারঙ্গরব শকুন্তলাকে রাজসভায় আনিয়া দুষ্যন্তকে বলিতেছেন :

তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা বিশ্বতোমুখী॥

অর্থাৎ, 'ইনি আপনার পত্নী, ত্যাগ করিতে হয় ত্যাগ করুন, গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করুন,পত্নীর প্রতি স্বামীর যা খুসী করার অবাধ অধিকার আছে।' তবে যে কোনও কারণে বা বিনা কারণে পত্নীত্যাগ আইনে বাধিত না বটে, লোকে কিন্তু অকারণে পত্নীত্যাগকারীকে ঘৃণা করিত ; 'শকুন্তলা'র সপ্তম অঙ্কে দেখা যায়, রাজা দুষ্যন্ত অকারণে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করায় মারীচাশ্রমের তাপসীরা বলিতেছেন, 'সে ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগকারীর নাম কে উচ্চারণ করিবে।'

মহাকবির যুগে 'অসবর্ণ বিবাহ' আইনের চোখে অসিদ্ধ ছিল না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে পাওয়া যায় মহারাজ অগ্নিমিত্রের এক পত্নীর একটি অসবর্ণ ভ্রাতা ছিল, সুতরাং অগ্নিমিত্রের শ্বশুর যে ক্ষত্রিয় ছাড়া অপর জাতের একটি নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে, এবং অসবর্ণ বিবাহের সন্তান হইলেও সমাজে তাঁহার পদমর্য্যাদা কিছু কম ছিল না, কারণ ঐ নাটকে দেখা যায়—বিদিশারাজ তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের সীমানারক্ষার্থ এক দুর্গের সেনাধ্যক্ষ করিয়া দিয়াছিলেন।

সেকালে 'গান্ধর্ব্ববিবাহ'ও যে আইনত সিদ্ধ ছিল তাহাও শকুন্তলা নাটক পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে কেবল চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া গোপনে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়াছিলেন, যে বিবাহে পুরোহিত ছিল না, এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বা কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান এ সবের কিছুই হয় নাই, তবু সকলে শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের ধর্ম্মপত্নী বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের পুত্র সর্ব্বদমন ভরত নাম লইয়া পিতৃসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

জ্বালা

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

কাশীতে গোধূলিয়ার দক্ষিণ দিকটায় একটা আস্তাবল ছিল সেকালে। তার এক ধারে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, সাইনবোর্ড—ডাঃ অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তখন সবে খদ্দর আর স্বদেশী চালু হয়েছে। গান্ধী আসেন নি। অনুশীলন সমিতি, সুরেন বাঁড়ুজ্যে আর বারীণ ঘোষ আসর জাঁকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের সেই সময় থেকে খদ্দর পরার অভ্যাস ছিল।

আমার আজ ঠিক মনে নেই—ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ক'জন ছেলে; কারণ বাড়ীটা ছেলেদের আড্ডা ছিল। ক'টি আবার ভাইপোও ছিল। ভাই মৃত, তাই তাঁর নিজের ছেলেদের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিল সবাই। বোধ হয় সাতটি বা আটটি ছেলে ছিল।

হারাধনের দশটি ছেলের মত পর পর দু'তিনটি জেলে গেল, একটি ফাঁসী গেল, একটি ফেরার হ'ল, ডাক্তার নিজে মারা গেলেন। বাড়ীতে সর্ব্বদা পুলিশ ঘোরাফেরা। আর ছেলেগুলি হ'ল নজরবন্দী। সে বাড়ী যেন এক ভীমরুলের চাক। তার ত্রিসীমানায় পারত-পক্ষে কেউ যেত না। আমার যেতে হ'ত মাঝে মাঝে, ওদের মৃতাশৌচ বা জাতাশৌচ পড়লে শালগ্রাম শিলার পূজা আরতি ইত্যাদি করতে।

ওদের বাড়ীর সমীরের বয়স আমার বয়স প্রায় এক, কিছু বড় হবে হয়ত সমীর।

সেবার শুনলাম ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মারা গেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম শালগ্রাম-পূজা ইত্যাদিতে ডাক পড়ল না। কথায় কথায় মাকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, "হ্যাঁ মা, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মারা গেলেন, কৈ পূজোর জন্য কেউ গেল না ত।" মনে মনে সন্দেহ ছিল—পুলিস এপিডেমিকের ভয়ে ও-বাড়ী যাওয়া পুরুতবাড়ী থেকেও বন্ধ হয়েছে হয়ত।

মা তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "শালগ্রাম ওরা আর পূজো করে না। ওদের বাড়ীর শালগ্রাম ত আমাদের বাড়ীতে উনি এনেছেন। এখন পূজো এখানেই হয়।"

বাবাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। সমীরদের বাড়ীতে এক-কালে কত আড্ডা দিয়েছি, সুখে দুঃখে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ও তাঁর স্ত্রী—আমরা তাঁকে জেঠাইমা বলতাম, আমার বাবা ও মা সবাই যেন একই বৃহত্তর পরিবারের অঙ্গীভূত ছিলেন। আজ সেই পুরানো মধুর ওপর চট করে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সহ্য করতে পারি নি।"

বাবার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানলাম এইটুকু—

সমীর লবণ আন্দোলনের সময় যতবারই ধরা পড়েছে—বয়সে ছাড়া পেয়েছে। এমনি ও বার বার ছাড়া পেয়েও সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিল। কাশীতে ধরপাকড় বাঙালীপাড়ায় একটু বেশী কড়াকড়ি ভাবেই চলতে লাগল। বিভূতি বাঁড়ুজ্যে, শচীন বক্সী, রাজেন লাহিড়ী, এরা সব কাশীর আসামী এবং পাঁড়েঘাট থেকে মুন্সীঘাট, গণেশ মহল্লা থেকে রাণামহল—এইটুকু জায়গার মধ্যেই অজস্র গলিঘুঁজিতে এদের কাজ। কাশীর বাঙালী ছেলেদের জব্দ করতে তখন যতীন বাঁড়ুজ্যে বড় আর যতীন বাঁড়ুজ্যে ছোট—দুই জাঁদরেল দারোগাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তবু ছোকরারা দমে না। রোজই একটা না একটা 'ভজোকটো' লেগে আছে। পুলিশ ত নাজেহাল।

এর মধ্যে নতুন এই শিকরেগুলোর জ্বালায় বাজ আর ঈগল হাতছাড়া হবার জো। আট থেকে বারো বছরের ছেলেগুলি রেজায় উৎপাত সুরু করেছে। যেমন লর্ড উইলিংডনের দরবার ফতোয়া বা অর্ডিনান্স ছাড়ার অন্ত নেই, তেমনি তার জবাবে কংগ্রেস-মার্কা গোপন অর্ডিনান্স বেরুতেও দেরি হয় না। সরকার বললেন, কংগ্রেস দপ্তর বে-আইনী, কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিল, সহরের সব বাড়ীর গায়ে "কংগ্রেস দপ্তর" নোটিস লাগাও। হ'লও তাই। রাতারাতি কাজ শেষ। বিস্মিত নগরবাসীরা সকাল হতেই দেখল, তাদের বাড়ীর গায়ে লালমাটির ছোপ-ধরানো ছাপা হরফ—"কংগ্রেস দপ্তর" —এমনি প্রত্যেক বাড়ীতে। যাঁরা উক্ত নাম জল সংযোগে মুছে দিলেন, তাদের বাড়ীতে ঢিল, পথে কলার খোসা, গলায় পা-পিছলানো, বাজারে ধাক্কা প্রভৃতি অহিংস দুর্ঘটনা এত বৃদ্ধি পেল যে, একালের চ্যাংড়াদের নিন্দায় কাশীর ঘোলাটে বাতাস আরও বেশী ঘোলাটে হয়ে উঠল।

এ সবই যে, ঐ শিকরেগুলির কাজ সরকার বাহাদুর তা জানতেন। অর্ডিন্যান্স বিলির ব্যাপারে এই অনুমান প্রত্যক্ষ হয়েও দাঁড়িয়েছে। এবার কর্ত্তারা নতুন ব্যবস্থা চালালেন। সমীরদের মত ছেলেদের ধরে দিনকতক চুনার দুর্গে আটকে রেখে সটান মারধোর লাগানো, জলে চুবানো, তার পর পথে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু আরও বাড়তে লাগল অত্যাচার। পরে সমীর হারিয়ে গেল।

সমীরের মার বিশেষ করে সমীরের জন্যই ভাবনা ছিল। বসন্তে সমীরের একটা চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া ওর শরীর দুর্ব্বল। কিন্তু দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ওদের সুন্দর "গুষ্টি"র মধ্যেও সমীর দেখতে ছিল আরও সুন্দর ও নম্রস্বভাব। মাথার চুল, ঘন কালো আর কুঞ্চিত। অমন গোলগোল গুটি-পাকানো চুল চট করে চোখে পড়ত না। বড় বড় ভাসা চোখ। দেখলেই মন খুশী হয়ে উঠত।

সমীরের মা, আমাদের জেঠাইমা, বার বার বাবার কাছে আসতেন, আর কান্নাকাটি করতেন। ডাঃ চক্রবর্তীর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি রোজ নিত্যনিয়মিত দোকান খোলেন, বন্ধ করেন। যেন এ সব ঘটনা তাঁর অক্ষরেখার বাইরের গ্রহবিবর্তন। সুতরাং জেঠাইমার ভরসা একমাত্র আমার পিতৃদেব।

কিন্তু সমীর তখন রাজনৈতিক কাজে পাকা ঘুটি। দাবার ছকে বড়ে পেকে যেমন গজ-মন্ত্রী হয়ে বসে ওর অবস্থা তাই। ওকে কেউ খুঁজে বার করতে পারল না। দু' এক দিন এ বলে দেখেছি, ও বলে দেখেছি, ব্যস—কিন্তু দেখা তাকে যায় না।

বহু কাল কেটে গেছে। সমীরের কথা সাধারণ লোকে ভুলতে বসেছে। হঠাৎ সমীর কাশীর সমাজে এসে মূর্তিমান বিদ্রোহের মত উপস্থিত। সে বিবাহ করে ফিরেছে, সঙ্গে তার স্ত্রী। স্ত্রীটি আর কেউ নয় গঙ্গা—আমাদের রাজাঘাটের বজ্রী মাঝির মেজমেয়ে। কাশীতে এই মাঝি-মাল্লাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই পরিষ্কার বাংলা বলতে কইতে পারে। কিন্তু তাই বলে বাঙালী অবাঙালী সমাজে মিল খায় নি, তার কারণ কাশীর হিন্দুস্থানীর গোঁড়ামি। বজ্রী মাঝির মেয়ে গঙ্গার রং ছিল মিশকালো, কিন্তু বাকি সবকিছু রমণীয়ত্বে ভরা। তবে সমীরের চেয়ে বয়সে সে সামান্য কিছু বড়। বজ্রী নিজে মেয়েকে তো ঘরে ঢুকতে দেয়ই নি, তার ওপর বার বার গিয়ে ডাক্তার চক্রবর্তীকে বলে এসেছিল সমাজে এ পাপের প্রশ্রয় যেন তিনি না দেন। ডাক্তার চক্রবর্তী আর কিছুর জন্য না হোক নিজের এবং ভায়ের মেয়েদের বিবাহ ইত্যাদির কথা ভেবে সমীরকে ঘরে জায়গা দিলেন না।

সমীর আর গঙ্গা একটুও দমল না। বাঙ্গালীটোলাতেই ঘর ভাড়া করে তারা থাকতে লাগল এবং সদর্পে বলতে লাগল যে, তারা স্বামী-স্ত্রী। সমীরকে যেদিন ডাক্তার চক্রবর্তী বাড়ী থেকে বের করে দেন সেইদিনই তিনি তাঁর প্রিয় শালগ্রামটিকেও বাড়ীর বাইরে এনে বাবার জিম্মায় দিয়ে যান। বাবার কাছেই শোনা কথা—বলে যান নাকি—'সমীরকে ঘরে রাখার সাহস আমাদের হয় না। তাকে নিগ্রহ করে শালগ্রাম পূজোর সার্থকতা আমার কাছে রইল না ছোটকর্তা। আপনি নিন শালগ্রাম—আর দেশমাতা নিন সমীরকে। তা হলেই আমার ছুটি। ব্যস।' এ ঘটনার কিছুদিন পরেই ডাক্তার চক্রবর্তী মারা যান!

সমীর তো এসে রইল গঙ্গাকে নিয়ে। আমার সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হয়, গঙ্গার ধারে নাইতে গিয়ে দেখা হয়। দেখলেই হাসে। আমি সাহস পাই না। কেমন যেন ওকে আমার চেয়ে বেশী ভারিক্কি বোধ হয় যদিও তখন বি-এ পড়ি। ও পুলিসকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পাকা তিন বছর ঘাপটি মেরে রইল, এখন আবার একটা অসবর্ণ বিবাহ করে সমাজের বুকে চেপে বসে আছে—সবটা জড়িয়ে বড়ই অদ্ভুত ঠেকে, মনে হয় সমীর আমার চেয়ে অনেক বড়। অভিজ্ঞতায় বড়, কাজে বড়, হৃদয়ে বড়, সাহসে বড়। আর বড় জগতের সবার বড় রহস্য-লোকের আবিষ্কর্তা হিসাবে—অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তার কাছে। গঙ্গাকে ও বিবাহ করেছে।

সমীর জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছিল চমৎকার একটি উপায়। সে সকালবেলায় খবরের কাগজ বেচত, আর সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয় হোষ্টেলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করত। এমনি করে তার অসামাজিকতার যত প্রচার সমাজের ভেতরে বাধার প্রাচীর তুলতে লাগল, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের আদর্শের আলো তত উঁচু থেকে ওর অন্তর বাহিরকে প্লাবিত করতে থাকল।

আর গঙ্গাও চুপ করে বসে থাকত না। গুটিগুটি সে ম্যাট্রিক পাস করল, আই-এ দিল, বি-এ পাস করল।

আমিও এতদিনে ট্রেনিং কলেজে মাষ্টারি পড়তে গেছি। দেখি গঙ্গাও আমাদের সঙ্গে পড়ছে।

সমীর এর মধ্যে জেলে গেছে। মাস কয়েক হ'ল ছাড়া পেয়েছে বটে, কিন্তু তার আর সে চেহারা নেই। একেবারে ভেঙে গেছে স্বাস্থ্য। পেটের ভেতর একটা যন্ত্রণা সদাসর্বদা ওকে যেন শূলবিদ্ধ করে রেখেছে। মর্ফিয়া না খেলেই যন্ত্রণায় চীৎকার করে।

এই সময়টা আমি ওদের খানিকটা কাছাকাছি এসে পড়লাম।

সমীর একদিন ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—"স্বদেশী-টদেশী সবই ভুয়ো। সত্যি এই মনটা। বাঁধে না দড়িতে, বাঁধে না জেলে, মন একেবারে মজার বাড়া করে রাখে। ইংরেজের সঙ্গে লড়েছি, সমাজের সঙ্গে লড়েছি—হেরে গেলাম এই মনটির কাছে। এই রোগ, এই যন্ত্রণা! আমার মন খাক্ হয়ে গেছে···"

"কি বলছিস তুই?" বললাম আমি, 'তোর মন তো রাজা রে, কে করলে তোর মনকে এমন?"

"প্রেম! লোকে বলে গঙ্গাকে ভালবাসতাম না, কর্তব্যবোধে বিয়ে করেছিলাম। নাইন্টি পার্সেণ্ট ওয়ার্কাররাই তাই বলে। গঙ্গা আর আমি একটা গ্যাঙ্গে ওয়ার্ক করেছি। একদিন চুনারের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। ওর মাথায় মাছের ঝাঁকা, আমার কাঁধে বাঁক; বাঁকে বড় বড় রুই কাৎলা। মাছগুলোর পেট হাতড়ে আর কে দেখছে। কিন্তু শুনলাম, মোগলসরাইয়ে সেদিন বাঁড়ুজ্যে নিজে আছে। সাহস হ'ল না। একটি পাথরকাটার বাড়ীতে খড়ের গাদায় রাত কাটালাম। শীতকাল। খড়ের মধ্যে শুলাম। ও ছিল জলন্ত কয়লা। পোড়ালে না, আলো ধরিয়ে দিলে। তার পর দেখেছি যতক্ষণ ও আমার চোখে চোখে থাকত ততক্ষণ আলোটা থাকত না। অদর্শনেই মরে যাই! তাই আর বড়াই করি না! দেশ নয়, জাতি নয়, কুলকন্যা নয়, পুরুষত্ব নয়, নিজের প্রাণের দায়ে ওকে মাথায় গঙ্গা করে রেখেছি।"

"বড় আনন্দ হ'ল ভাই। তোর কথায় আজ সাহস পেলাম।" "কিসের সাহস?" "শচীনদা আর সুরেনদাকে দেখে দেখে মনে হ'ত এক একজন সন্ন্যাসব্রতী যেন এক একখানা কষ্টিপাথর। ভাবলাম তোদেরও প্রেম হয়?"

"প্রেম? প্রেম এর নাম? প্রেম কি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে

দেয় ? এ জ্বালা, দাবদাহ, তুষানল। এখন বুঝি। জেল থেকে বেরিয়ে শৈবেশকে দেখলাম। বললাম, "গঙ্গা কৈ, গঙ্গা আসে নি ?" ও বললে, 'তার কলেজ, আসতে পারে নি .' মনে হ'ল ছুটে আবার জেলে ঢুকে পড়ি।"

বললাম, "এ তোর অন্যায় রাগ। আমি ওর সঙ্গে পড়ি। আমি জানি ও সত্যই মন দিয়ে পড়াশুনা করে…"

আঁতকে উঠল যেন সমীর। বললে, "চুপ কর, চুপ কর তুই। মা জানি নি, বাপ জানি নি, দেশ জানি নি, পার্টি জানি নি—নিজের আজন্মবর্দ্ধিত সংস্কারকে অবহেলায় ত্যাগ করেছি ওর কাছে আত্মদান করে—ওকে দিয়ে এই দুরন্ত, অনন্ত মন। দেহ তো চাই নি তার বিনিময়ে। চেয়েছি শুধু মন! সে মন আবার সে পড়াশুনোয় দেয় কি করে ? সে মন আর কাকে কি করে দেওয়া যায় ?" খানিকটা চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "গঙ্গা আর আমার নেই। দেশেরও নেই। সে এখন তার নিজের; সে এখন তার নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। বর্ত্তমান, অতীতের সম্রাজ্ঞীর মহিমাকে তুচ্ছ করে সে তার নিজের ভবিষ্যতের নিকট দাসখত লিখে দিয়েছে।" থেমে আবার বলল, "এ আমার আঁতের ব্যথা। ডাক্তার বলে ইণ্টেষ্টাইন, আমি বলি অন্তর—'আঁত' কথাটি কোথা থেকে এল কে জানে…" বলে হাসবার চেষ্টা করলে।

সত্যই ওর ইণ্টেষ্টাইন্যাল টিউবারকিউলোসিস—গঙ্গা জানে। কলেজের পাশে কুলবাগানে কুল খেতে গিয়েছিলাম। দেখি গঙ্গা আর দু' চারটি মেয়ে। ওরই মধ্যে একটু সুবিধামত কথাটার আঁচ দেবার চেষ্টা করতেই ও বললে—"প্রেম করে প্রেমিক মরে; কথাটা আজ নূতন নয়। কিন্তু কৃষ্ণবিরহে কি রাধার ইণ্টেষ্টাইন্যাল টিউবারকিউলোসিস হয়েছিল?" হেসে বলল, "যদি হ'ত তা হলে কীর্ত্তনীয়াদের পদাবলী কেমন হ'ত, জানতে সাধ যায় ঠাকুর মশায়।" হাসতে হাসতে ব্যঙ্গ করতে লাগল।

অবাক হয়ে গেলাম। "আচ্ছা, ওর টাকাতেই ত পড়ছ। তবু এসব কি করে বলছ ? ও তোমার জন্য কি ত্যাগ করছে জান ত গঙ্গা ? কি জীবন ? কি সমাজ ?"

একটা কুল কামড়াতে কামড়াতে ও বলল, "তোমরা না পুরুষ ? কর্ত্তব্য আর কাঁদুনিতে জোট পাকাও কি করে ? টাকা জিনিষটা খরচের জন্যই। রোগে খরচ না করে শিক্ষায় খরচ করছি। শুনতে রূঢ় হলেও, প্রয়োগে যুক্তিযুক্ত। রোগীর জন্য হাসপাতাল আছে, ছাত্রের জন্য বিদ্যালয়। হাসপাতাল ফ্রী, বিদ্যালয় টাকা চায়। আমি ত কিছু অপব্যয় করি নি। আর যেন কি বললে ? কৃতজ্ঞতা—না ?"

"কৈ তা ত বলি নি !" থতমত খেয়ে আপত্তি জানালাম।

"বলছ বৈ কি ? ওর ত্যাগ ! জীবন আর সমাজ। সত্যিকার জীবন ত ত্যাগ করার জন্যই। ত্যাগই যদি সে করতে পারত, এ কথা উঠত না। চেষ্টা করেও ছিঁচকে চোর আদত্তকমণি চুরির কথা ভাবতেও পারে না। মেয়ে মানুষকে মানুষ আর মেয়ে বলে যারা প্রেম করে তারা ত্যাগ করেছে কি হয় ত জান না ? কিন্তু এসব কথা বলছি কেন ? নিশ্চয় তিনি তোমায় আলোচনা করতে পাঠান নি।"

রাগ করে বললাম, "থাক, গঙ্গা থাক। তোমার কাছে এর বেশী আশা করাই অন্যায় হয়েছিল। সমীর বন্ধু। তার কষ্ট দেখতে না পেরে বলছি।"

'তার কষ্ট ? সে খবর কি তুমি রাখ ?"

"বাজে কথা বাড়াব না তোমাদের কথায় যাওয়া আমার অন্যায়ই হয়েছে।"

"একটা অন্যায় নয়; অনেক অন্যায় করছ! সমাজত্যাগের কথাটা বড্ড শোনালে, বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে, মাঝির ঝিকে, কলির ব্যাসদেবরা…। শুনে যাও, শকুন-সমাজ থেকে শকুন যখন ময়ূর সমাজে যায়, তখন ময়ূরের ব্যথা কি হয় সে খোঁজ ময়ূর নিকগে, শকুনের ব্যথা শকুনই জানে। বোঁটা থেকে বিচ্ছেদ কাঁটা-ফলেরও যা, অমৃত-ফলেরও তাই। এগুলো বেদান্তের ভেকি নয়, একেবারে খাঁটি সত্য।"

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। বললাম, "তবে কোন লজ্জায় এখনও ওকে নিয়ে ঘর করছ, ওর টাকায় আছ ?"

জ্বল জ্বল করছে ওর চোখ দুটো। যেন তাকাতে পারা যায় না। ও বলল, "শুনবে কেন ? শুনবে ? ওর ঘর করি ওর মৃত্যু অবধারিত জেনে। ওর টাকা নি, ও খুশী হবে বলে।" তার পরেই বিরক্ত হাসি হেসে বললে, "তা ছাড়া টাকাটা কাজেই লাগাচ্ছি। যতদিন পারি, যতটা পারি শুষে নিই ?"

ঘৃণায় ক্ষোভে ক্লান্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বিষ ঢেলে বললাম, "ও ! কি লোভ টাকায় তোমাদের ?"

"আজ জানলে ? এত উপায় থাকতে মেয়েরাই টাকার জন্য অলঙ্কারের জন্য দেহের ব্যবসা অবধি করে, তা জান না ?"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, "তোমারও কি তবে এটা ব্যবসা ?"

হাসতে হাসতে বলল, "নয় কেন ?…কিন্তু চটছ কেন তুমি ?"

"চটি নি—বরং শান্ত ভাবেই বলছি—ছেড়ো না ওর হাড়ে যত টাকা সব শুষে নাও। মলেও ছেড়ো না—মড়া বেচলেও কঙ্কালটারও দাম পাবে, জানা আছে ত !"

না দমে গঙ্গা বললে, "না জানা থাকলে, মোটা কমিশনে তোমায় তখন দালাল রাখা যাবে। কঙ্কালখানা যদি পাই ত বেশী দামেই বেচব, ছাড়ব না। হাড় ঘষে ঘষে পাশার ঘুটি করে বেচব দাম হবে লাখ টাকা—" বলেই ছুটে চলে গেল।

কোথায় যেন অন্যায় করলাম। একটা দারুণ অপরাধবোধ জ্বলে জ্বলে আমায় পোড়াতে লাগল। সমীর [illegible]

কালো, আগুন ধরায় না জালা ধরিয়ে দেয়। সেই জালা। সমীরের জালা।

যতই চেষ্টা করি পড়ায় মন দিতে, পারি না। হোষ্টেল সুপার বন্ধুলোক। গিয়ে একটা কিছু অজুহাত দিতেই বললেন, "সাঁতার কেটো না মিথ্যার সমুদ্রে—বাইরে যেতে চাও যাও। পুলিস হাঙ্গামা করো না। বাঙালী ছাত্রকে আমার ঐ এক ভয় করে, আর কিছু নয়।"...

আমি সমীরের বাড়ী এসেছি। বেশী রাত নয়। গলির মধ্যে বিরাট বাড়ী। অমন বিশ ঘর লোক থাকে। সদর দেওয়া হয় না অনেক রাত পর্য্যন্ত। চারতলার উপর সমীরের ঘরে আলো জলছে। উঠে গেলাম। শীতের রাত। দরজা দেওয়া। গঙ্গা হয়ত পড়ছে। আমি জানালার পরদার ফাঁকটা দিয়ে একটু দেখবার চেষ্টা করে যা দেখলাম—স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

গঙ্গা আর সমীরকে দাম্পত্য জীবনের কোন নিরবকাশ ছবিতে দেখব না—জানতাম। কেবল দেখতে চেয়েছিলাম গঙ্গার পড়ায় কতটা বাধা পড়বে। ছাত্রজীবনে অন্য কারুর পড়ায় পতিয়ান উঁকি দিয়ে দেখার লোভ হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু পরিবর্ত্তে যা দেখলাম তা অদ্ভুত। সমীর যেন মড়ার মত নিশ্চপ পড়ে আছে। গঙ্গা তার মাথাটা কোলে করে বসে আছে, ওর দু'গালে জল চক্ চক্ করছে।

আমি যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে পা টিপে টিপে পালালাম।

পরের দিন ক্লাস—পরের দিন গঙ্গা। শীতের বাতাসের সঙ্গে রোদের তেজ মিশে প্রকৃতিকে সতেজ শিহরণে রোমাঞ্চিত করছিল। গাছে, ঘাসে, পাতায়, ফুলে রং আর রোদ মিলে মনকে খুশীতে দুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ যদি ঘরে প্রজাপতি ঢোকে, বা মৌমাছি গান গেয়ে যায় প্রোফেসারের কথাগুলো যেন ভুলে যাই। চোখ চেয়ে আছে গঙ্গার মুখে, মন বাঁধা পড়ে আছে কাল রাতের দৃশ্যে, বুদ্ধি কপাল চাপড়াচ্ছে গতকাল দুপুরের কথাবার্ত্তার বন্ধ কপাটের পাশে।

কি করে কখন কথাটা পাড়ব পাড়ব করে সেদিনটা গেল, তার পরদিনও গেল। রোদের তাত আরও রসগর্ভ, বাতাস আরও যৌবনদীপ্ত, মৌমাছি আরও দুরন্ত, প্রজাপতি আরও চকিত। সাহস হচ্ছে না গঙ্গার তরঙ্গের সামনে পড়ে নাজেহাল হবার।

পরের দিন গঙ্গা ক্লাসে এল না।

বিকালে ওর বাড়ী গেলাম। গঙ্গার ক্লাস কামাই হয় না। সমীর একা বাড়ী ছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বিছানা থেকে পড়ে গেছে। আর গায়ে এই শীতেও ঘাম। আমি যেতেই ছেলেমানুষের মত ডুকরে কেঁদে উঠল। "এসেছিস—বিষ দিয়ে দে আমায়, বিষ দিয়ে দে। কত খেলেছি, কত দিনের সাথী তুই—কর, আমার এই উপকার কর। বিষ দিয়ে মেরে—আমায় এই নরক থেকে মুক্তি দে।"

আমি কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিলাম। বললাম, "গঙ্গা কৈ?"

সমীর ফিসফিস করে বললে, "কাল রাতে একটি মাঝির ছেলে—মনে হ'ল তুলসীঘাটের ঘাসীরামের ছেলে ত্রিলোক—ডাক দিলে। প্রায়ই রাতে ওর সঙ্গে চলে যায়...আমি বললাম—'আজ যেও না কাল আমার ব্যথা বাড়ার দিন। আমি আর বেশী দিন নেই... কালই হয়ত শেষ হয়ে যাব।' রইল না। বললে, 'মরবে কেন? মরবে না এত সহজেই! যন্ত্রণা ত হবেই, আমি থাকলে তার কতটুকুই বা লঘু হবে। যে ডাক এসেছে, জান ত তাকে আমি ঠেলতে পারব না।' তখন যে ভিতরে বাইরে কি জালা কি বলব! সহ্য না করতে পেরে বললাম, 'পারবেই না ত, পারবে কেন; এ যে তোমার মাঝি-পাড়ার ডাক!' কিন্তু রইল না, চলে গেল। বিষ দিও, এখনই দিও; নইলে আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যাব।"

আমি দেখলাম মর্ফিয়া রয়েছে; সিরিঞ্জও রয়েছে। খুব অল্প করে একটা ফোঁড় দিলাম বসিয়ে। চলে যেতে পারলাম না। মর্ফিয়া দিয়ে চলে যাই কি করে? রইলাম। ও ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আর গেলাম না। গঙ্গার বই নিয়েই পড়তে লাগলাম। রাত হ'ল গভীর। শীত করতে লাগল, অগত্যা গঙ্গার বিছানায় শুয়ে পড়লাম, ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল। আলো জলছে। দেখি এক বিছানায় একই লেপের ভিতরে গঙ্গা আর সমীর ঘুমুচ্ছে। সমীর আমায় দেখল, আঙুল দিয়ে ইশারা করল—শব্দ করতে বারণ করল। সমীরের শীর্ণ আঙুলগুলি গঙ্গার মাথার চুল নেড়ে দিচ্ছে।

আমি ঘর ছেড়ে এলাম। শুকতারা তখন বাসরজাগা শেষ করে অস্তঘাটে পা ধুতে পা বাড়িয়েছে।...

পরের দিন কলেজে গঙ্গা নেই। আবার গেলাম বিকেলে। সমীর আজ ভাল আছে।

"গঙ্গা কৈ?"

"কি কাজে গেছে। কাল তোর খুব কষ্ট গেছে না? গঙ্গা তোর খুব প্রশংসা করছিল। বলছিল, 'আমার চেয়েও ও তোমায় বেশী ভালবাসে।' তাই নাকি রে? গঙ্গার চেয়ে বেশী ভালবাসা? হাঃ হাঃ হাঃ! সে আবার কেমন ভালবাসা? কিন্তু খুব এসে পড়েছিলি কাল। না এলে মরেই যেতাম!"

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললাম, "সেটা আর এমন খারাপ হ'ত কি? তুইও ত তাই চাস।"

হেসে বললে, "যন্ত্রণা যখন হয়, তখন তাই চাই। কিন্তু এখন আর মৃত্যু চাইতে ইচ্ছে করে না।"

"ত্রিলোকের কথা মনে হলেও করে না?"

ম্লান হেসে বললে, "সে আর আমি কি করব! চাঁদ কোন্ গগনে ঘোরাফেরা করে, ভেবে ভেবে মন খারাপ করলে কি আর চাঁদের দিকে চাওয়া যায়?"

"ধন্য আমার চাঁদ রে!" বিরক্ত হয়ে বললাম।

"রাগ করিস কেন ? খাবার জিনিষ, ধরার জিনিষ, ছোঁয়ার জিনিষের বাছবিচার চলে। যা আলো, যা মায়া, যা স্বপ্ন, তার আবার বাচ-বিচার কি ? আমার স্বপ্ন অন্ত কেউ দেখলে কি স্বপ্ন এঁটো হয়, না অপবিত্র হয় ?"

"আর কাল তোমাদের সেই শোয়া ? সেই কুণ্ডললাইন ? সেও কি জ্যোতি আর স্বপ্ন ?"

"আয়, আয়, বোস। বড্ড রাগ তোর। রাগ হলেই সংস্কৃত বলতে থাকিস, বেশ লাগে শুনতে। একটু হর্লিকস করে দে। নিজে চা করে খা।"

"আমার কথার জবাব দে।"

"হ্যাঁ, সেও জ্যোতি, মায়া, স্বপ্ন।"

"কাল বলেছিলি জ্বালা, আজ হ'ল জ্যোতি ?"

"জ্যোতিই জ্বালা, জ্বালাই জ্যোতি। আমি যখন হীরে তখন তা জ্যোতি, আমি যখন কয়লা তখন তা জ্বালা। দোষ গঙ্গার নয়, দোষ প্রেমের নয়, দোষ আমার এই রোগজর্জর দেহখানার ; দোষ এই রোগপাণ্ডুর মানসলোকের।"

পরের দিন আমি গঙ্গাকে না বলে পারি নি—"ত্রিলোকের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করতে টাকার বাধা আছে বুঝি ?"

কলেজে বেশী কথা বলার দায় ছিল তখন। গঙ্গা বললে, "আপনারা ভদ্রলোক। বড় ধাক্কা খেলে মাটির প্রতিমার মত গুঁড়ো হয়ে যাবেন। ত্রিলোক—আমি—আর টাকার হিসেব করতে গিয়ে ভদ্রতার লাজলজ্জাটুকু আর খোয়াবেন না। ও লজ্জা আমাদের অমানান হলেও আপনাদের মুখোশ—পরম প্রয়োজনীয়।"

কার আর এর পরে মেজাজ ঠিক থাকে !

কিন্তু শেষরাতে হঠাৎ ধাক্কাধাক্কি। বেশী রাত অবধি পড়া অভ্যাস। সকালের ঘুমটি নষ্ট হওয়া আমার সয় না। বিরক্ত হয়ে উঠে দেখি ও পাড়ার বিশু পানওয়ালা চিঠি নিয়ে হাজির। গঙ্গা লিখেছে—"এখনি আসুন।" রাতের আকাশে তখনও ঘুম জড়ানো। নক্ষত্রগুলি কুয়াশার পারে বড় বড় চোখে মিট মিট করে চাইছে।

গিয়ে দেখি গঙ্গা প্রায় সব গুছিয়েই ফেলেছে। শবদেহটা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে আছে। ঘর একেবারে নিশ্চিহ্ন খালি। হাতে একখানা ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিয়ে বলে দিল—'শ্মশানে যেতে পারব না, দাহও করতে পারব না। ভোর হয়ে এল। আলো ফোটার আগে আমার অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। বিশুকে বলেছি, আরও লোক আসবে। সূর্য্য ওঠার আগেই আগুন ধরিয়ে দিও। কেমন ?'...তার পর চোখের পানে চেয়ে বলল, "না দিলেও ক্ষতি নেই। নিতান্তই যদি না দাও, পচেই যায়, হাড় কখানা রেখে দিও। লক্ষ টাকায় বিক্রী করব ; মনে আছে তো ?"

ততক্ষণে বিশু আর দু'জন লোক এসে পড়েছিল। আরও এক জন লোক। সে ত্রিলোক।

গঙ্গা আসন্ন যুদ্ধের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বিচক্ষণ সেনাপতির মত দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "বিশু সব ঠিক ?"

বিশু বলে, "হ্যাঁ !"

"ত্রিলোক, তুমি ?"

ত্রিলোক বলে, "ভেবে নাও। যদি যেতে চাও, এখখুনি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না।" ওর কণ্ঠস্বর রুক্ষ। "কিন্তু যাবে কি ? ভেবে নাও।"

গঙ্গা স্থির কণ্ঠে বললে, "ভেবেছি !" সমীরের মুখের ঢাকাটা খুলে খানিকটা চেয়ে ঢাকাটা গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। বললে, "চল—আর নয়।" চলে গেল।

পুড়িয়ে দিলাম সমীরকে। সমীরের মা শ্মশানে এসে যে কান্নাটা কেঁদেছিলেন তা দেখলে পাষাণও গলে যায়।...

এলাহাবাদে ইংরেজীর অধ্যাপনা করি। তার পেলায় হর্দোই থেকে। গঙ্গা লিখছে—"এখুনি আসবে !"

হর্দোই ষ্টেশনে নেমে দেখি গাড়ী নিয়ে লোক তৈরী।

গাড়ী থামল হর্দোই মিউনিসিপ্যাল, স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের আবাসস্থলে। তারই একটা ঘরে গঙ্গা শুয়ে। বসন্ত হয়েছে। মরছে।—

আমি বসলাম পাশে।

গঙ্গা বলল, "একটা কথা না বলে মরতে পারছি না তাই। আমি মাঝির মেয়ে, গঙ্গায় বাস। এখানে আমি মরতে চাই না। বসন্ত হয়েছে। কেউ আমায় যেতে দেবে না। কাশীতে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু একটা কথা রেখ—আমার চিতার ছাই নিয়ে তোমার বন্ধুকে যেখানে পুড়িয়েছিলে, ছড়িয়ে দিও। গঙ্গায় হাড় কেন, না কেন জানতে চাই না। কিন্তু এইটে কর। সেই গঙ্গা, সেই কাশী আমার।"

আমি ম্লান হেসে বললাম, "কেন, ত্রিলোক ?"

মুখ ফিরিয়ে নিল গঙ্গা।

সে কাঁদছিল।

"কাঁদছ তুমি ?"

"না। রোগের যন্ত্রণা। বোবা যন্ত্রণায় ওরকম জল পড়ে।"

ত্রিলোকও খানিক পরে লক্ষ্ণৌ থেকে বাসে এসে পড়ল।

কিন্তু ততক্ষণে গঙ্গা মরে গেছে।...

চিতা জ্বলছিল।

সেই সময়ে ত্রিলোকের কাছেই প্রথম শুনি যে আসছে আগষ্টে বিদ্রোহ হবে। জোর তৈরি চলছে। গঙ্গা আর সমীর এই সময়ে থাকলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কাজ খুব ভাল চলত। কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ-এর মধ্যে দুটি ভাল ঘাঁটি রইল না। এরা ছিল টাকা সংগ্রহ আর চলাচলের মুখ্য কর্ম্মী। কাগজ বিক্রীর অজুহাতে ধনী সমর্থকদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ঘরে থেকে গঙ্গা ঘাড়ে করেছে তখন থেকে সে অনন্যচিত্ত হয়ে এই কাজ করেছে। যদি কখনও দাম্পত্য-জীবনের নেশায় সমীরকে একটু বেশীক্ষণ পেতে চেয়েছে, সমীর সুদৃঢ় শাসনে ওকে ওর সংগ্রামপথে

চালিত করেছে। প্রেম নয়, সমীরের রোগ নয়, একমনে এক-ভাবে কাজ করেছে।

সমীর শয্যা নিল। সমীরের স্থান নিল ত্রিলোক। সংগ্রাম চলল অব্যাহত।

"এ কথা সমীর জানত না?" অপরাধীর মত প্রশ্ন করি।

"জানত না? আমি তো তারই হাতে গড়া। তবে শেষটায় গাল দিত। রোগের যন্ত্রণায় সহ্যশক্তি কমে গিয়েছিল। গঙ্গাকে এক দণ্ড ছাড়তেও মায়া হ'ত। তবু গঙ্গা চেষ্টা করেও থাকতে পারে নি তো। যখনই ভাল হ'ত বলত, 'আমি এক জন; আমার জন্য ব্রত তুমি নষ্ট কর না। বহুর ব্রত তোমার মাথায়। রোগীর কথায় কাজ করা তোমার চলবে না।' বলতে গেলে একরকম তাড়িয়েই দিত।"

"কিন্তু..."

"হ্যাঁ, শেষ অবধি বলত, আর ক'টা দিন গঙ্গা? তার পরে তো দেশ থাকবে, যন্ত্রণায় বলত। এমনকি অপবাদও দিত মাঝে মাঝে।"

"আমিই গঙ্গাকে শেষে বলতাম সমীরের কষ্ট আমার সহ্য হয় না। চুলোয় যাক্ দেশ। আরামে মরতে দাও ওকে।" গঙ্গা সমীরকে বলত, নিজের সিঁথির সিঁদুর দেখিয়ে, "এই সিঁদুরের মত দেশ। মিটে গেলেও প্রীতি যায় না। একবার লাগালে হয়; লেবাও নেবে না, ধুয়ে দাও ঘোচে না, মাথার মাণিক। দেশ তোমার পরে নয়; তোমার সমানে সমানে, মাথায় মাথায়। তোমায় আমি খুব চিনি। গঙ্গা তোমার কেউ নয়, দেশই তোমার সব। যেদিন গঙ্গা দেশ ছেড়ে তোমায় নিয়ে থাকবে, সেদিন তুমি গঙ্গাকে আর কাছে থাকতে দেবে না। আর ফিরে এসে যদি দেখি গঙ্গার অভাবে মরে রয়েছ, তবু জানব আবার মিলন হবে।' আমার সামনেই বলেছে একদিন অনেক আঘাত খেয়ে।"

"তোমার সামনে?"

"হাঁ। গঙ্গা আমার খুড়তুতো বোন ছিল। আমার দিদি।"

"দিদি? অথচ..."

"হাঁ আপনিও, সমীরদাও ভুল করেছেন। আমার জো ছিল না কিছু বলি। গঙ্গার সর্ত ছিল পরিচয় লুপ্ত করে দেবার। নইলে এ ব্রতে আমি হাত দিতে পারতাম না।"

"এসবের দরকার আমার চিত্তকে স্পর্শ করে না। এতো শুধি কেন? মরবার সময়েও ত আমায় কিছু বলতে পারত।" মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছি।

"কার মরবার সময়ে?"

"কেন সমীরের মৃতদেহ যেদিন ফেলে আসে সেদিন?"

"ওঃ, সেদিন! জৌনপুর প্যাসেঞ্জার না ধরতে পারলে একটা ভয়ানক অপরাধ হ'ত সেদিন। কাককে টাকা দেবার কথা ছিল। কে জানি না। কিন্তু জৌনপুর সবাইয়ে যেতেই হ'ল সেদিন। একটুও সময় ছিল না।...আর তার পর কাশীতে ও আর কিছুতেই যেতে চাইল না।"

আমার মনে হ'ল দু'দিনের দুটি ছবি:

একদিন যেদিন গঙ্গার চোখে হঠাৎ জল দেখেছিলাম, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। আর অন্যদিন সমীরের বুকে গঙ্গার মাথা। সমীর গঙ্গার চুল নেড়ে দিচ্ছে।

আজ গঙ্গা সেই বুকে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম পেয়েছে।

স্মরণী

শ্রীশান্তি পাল

সোনার প্রতিমা ভাসায়ে দিয়াছি অশ্রুমতীর জলে,
প্রাণের বাসনা বলি দিছি সব যুপকাষ্ঠের তলে।
প্রাণ-উৎপল শুধু পড়ে আছে শূন্য বেদীর মূলে,
চাঁদমালাখানি রহিয়া রহিয়া বাতাসে উঠিছে দুলে।
আজি মনে পড়ে পুরাতন কথা প্রথম মিলন-রাতি,
শত উদ্বেগে, শত উৎসবে উন্মুখ হয়ে মাতি,
মুখে মুখ দিয়া বুকে বুক দিয়া কানে কানে কত কথা;
কত বছরের মৌন ব্রতের পরে সেই মুখরতা!
শ্যাম শস্পের গালিচা ফেলিল উষর মরুরে ঢাকি।
রতি-মদনের, গৌরী-শিবের হ'ল যেন মাখামাখি;
উতলা হয়ো না,—কহিল আমারে, বিদায়বেলার কালে,
চোখের আড়ালে গেলে নাহি যাবে প্রাণের অন্তরালে,
কত না সুষমা কত না মাধুরী কত না মায়ার ডোরে,
বাঁধিয়া আমারে উঠেছিল ফুটে, আমার আঙিনা ভরে।
আজি মনে পড়ে সেই মুখখানি স্নিগ্ধ নয়ন দুটি,
সেই বাহুলতা সেই আঁখিজল সেই হেসে লুটোপুটি।
সেই স্মৃতি নিয়া বিজনে বসিয়া বিরহ-পাথার মাঝে,
জীবনের পাতা উলটি' দেখিতে কত ব্যথা বুকে বাজে।
তার কায়া নাই, ছায়া জেগে আছে, পাছে পাছে মোর ঘুরে,
গভীর নিশীথে শুনি গ্রহতারা কাঁদিছে বেহাগ-সুরে।
সারা ধরণীতে কোথা বসন্ত, জ্বলে দুরন্ত চিতা,
মরম চিরিয়া লিখে যেতে চাই মরণের নব গীতা!

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন স্কুলে "অপরের মতামত"

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রীষ্মকাল কেবল ছুটির মাস নহে—সময়টা আন্তর্জাতিক মেলামেশা এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানেরও বটে। জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে অতলান্তিকের উভয় তীরের ছাত্র, শিক্ষক এবং নানা দেশের লোক দলে দলে এই সময় সাগর পাড়ি দিয়া সভা সম্মেলনে যাগ দেয় এই সম্মেলনগুলিতে এরূপ লোকসকল সমবেত হয় যাহাদের মত একেবারে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু আশ্চর্য্য মনে হইলেও এই সকল সম্মেলন হয় খুবই কার্য্যকরী এবং সার্থক। লোকে ইহাতে নূতন জ্ঞান লাভ করে, কারণ আলোচনা হয়—অপর দেশের লোকের সঙ্গে এক শান্ত এবং বন্ধুত্বের পরিবেশের মধ্যে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন স্কুল এরূপ একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্মেলনের নিদর্শন। এই স্কুলের উদ্যোক্তারা প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালীন ত্রৈমাসিক আলোচনী (সেমিনার) সভায় কয়েকজন বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেন। যাঁহারা আমন্ত্রিত হন তাঁহাদের মধ্যে থাকেন—প্রতিভাবান এবং উদীয়মান তরুণ শিক্ষক, সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক ও শিল্পী—অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে যাঁহাদের নিজ নিজ দেশে চিন্তানায়ক হইবার সম্ভাবনা আছে।

গত বৎসরের সেমিনারে যোগ দিয়াছিলেন ইউরোপের নানা দেশ হইতে কুড়ি জন আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কুড়ি জন। অবশ্য এশিয়া বলিতে এখানে কয়েকজন ভারত-বাসী, ইন্দোনেশীয়, এক জন মিশরীয়, এক জন তুর্কী, কয়েক জন পাকিস্থানী, এক জন ইস্রায়েলী এবং এক জন জাপানীকে বুঝাইতেছে।

যদি বলা হয়, অতিথিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল তবে অল্পই বলা হইবে। আমেরিকায় যতটা শান্তিতে এবং আরামে তাঁহারা থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এক জন মহিলা-কবি হারভার্ডে আসিবার পথে 'কুইন মেরী' জাহাজে তাঁহার পাসপোর্ট হারাইয়া ফেলেন। ইমিগ্রেশন অফিসার তাঁহাকে অবশ্য আমেরিকায় পদার্পণ করিতে দিলেন—মাত্র হাসিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ক্রীষ্টোফার কলম্বসের পরে এই প্রথম আজ আইন অমান্য করা হইল।" দুই সপ্তাহ পরেই মহিলা-কবি ডাকে পাসপোর্ট ফেরত পাইয়াছিলেন। 'কুইন এলিজাবেথ' নামক জাহাজে পাসপোর্টখানি পাওয়া গিয়াছিল—সেখানে পাসপোর্ট কিরূপে গিয়াছিল কেহ জানে না।

হারভার্ডে দুই মাস অবস্থানকালের মধ্যে সেমিনারের সভ্যগণ আমেরিকার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নেতার কথা বা বক্তৃতা শোনার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মিষ্টার হ্যারল্ড ষ্ট্যাসেন, মিষ্টার জেম্স ফার্নহাম এবং অন্যান্য বিখ্যাত রাষ্ট্রবিদ্‌গণ, শিল্পপতি, শ্রমিক-নেতা ও চিন্তাজগতের অন্যান্য নেতৃস্থানীয়-গণ আমন্ত্রিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিদেশী শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করেন।

এই সকল মামুলি বক্তৃতার পরে তাহাদিগকে বোষ্টনের চতুষ্পার্শ্বের কারখানা, শ্রমিকসঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র, সংবাদপত্রের কার্য্যালয় প্রভৃতি দেখানো হয় এবং এইরূপে সেমিনারের সভ্যেরা মার্কিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে। গত বৎসরের ছাত্রেরা কেবল মার্কিন জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই খুশী হয় নাই, কোন কোন সভ্য সংকারগৃহ দেখিতে চাহিয়াছিল। অবশ্য তাহাদের এই ইচ্ছা পূরণ করা হইয়াছিল। পরিদর্শনের সময় সেমিনারের প্রত্যেক মহিলা-সভ্যাই উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার জাতীয় ক্রীড়া 'বেসবল' দেখিবার জন্যই উৎসাহ ছিল বেশী। ইহা দেখিতে কেহই ছাড়ে নাই। যে সকল বিদেশী এই খেলা প্রত্যক্ষ করে নাই তাহারা হয় ত মনে করিবে যে, আমেরিকানরা কখনো খেলায় উত্তেজিত হয় না। অবশ্য যাহারা খেলা দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা খেলার কিছু বুঝে নাই, তবুও তাহারা খুবই আনন্দ পাইয়া-ছিল। তাহারা খেলার খুবই তারিফ করিয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ হইয়াছিল সেমিনারের বিভিন্ন সভ্য-গণের মধ্যে যে যোগাযোগ বা মিলন হয় তাহা দ্বারা। তাহারা একুশটি বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিশেষ সুযোগ লাভ করে। বহু সভা ও সম্মেলনে নানা দেশের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ হইতে জাতীয় জীবনের চিত্র উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সকলেই অপর দেশের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের খবরাখবর জানিবার সুযোগও পাইয়াছে।

একজন ইতালীয় সভ্য—যিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমস্যা সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক, তিনি ভারত, ইন্দোনেশীয়া এবং পাকিস্থানের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিতে পারিয়া সুখী হইয়াছিলেন। সোভিয়েটের বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানিতে উৎসুক একজন ফরাসী প্রতিনিধিকে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশীয় কেন্দ্রের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। জার্মান সভ্যগণ তাঁহাদের দেশকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা সম্পর্কে দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের সহিত ফরাসী সহকর্মীদের বহু মজার তর্কবিতর্ক হইয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত এই সেমিনারে কোন নির্দ্দিষ্ট সূচী ছিল না—যে-কোন সাম্প্রতিক বিষয় লইয়া আলোচনা সুরু হইত। ১৯৫৪ সনের আলোচ্য বিষয় ছিল—জার্মান জাতির পুনরায় অস্ত্রসজ্জা (rearmament), গতবারের (১৯৫৫) বিষয় ছিল নিরপেক্ষতা (neutrality)।

সেমিনারের প্রত্যেক সভ্যকেই তাহার নিজের পছন্দমত যে কোন বিষয়ে আমেরিকান শ্রোতাদের নিকট বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হইত। ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় সভ্যেরা যখন তাঁহাদের দেশের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন তখন বক্তৃতা-গৃহ শ্রোতৃমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। ফরাসীরা যখন 'মেণ্ডেস ফ্রান্সের পরে ফরাসী দেশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিত তখনও শ্রোতাদের বেশ সমাগম হইত, কিন্তু আলোচনার সময় দেখা যাইত, আমেরিকান শ্রোতারা ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর 'ব্যবসায়ী যুগল' কর্ত্তাকে বুঝিতে অক্ষম।

বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রায়ই মতের মিল হইত না, তবুও এক সৌহৃদ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আলোচনা চলিত। শ্রোতারা বক্তার নিকট হইতে জানিতে চাহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী—তাহা তাহাদের মনের মত হোক বা না হোক। আবার বক্তাও শ্রোতৃবৃন্দ মনের কথা জানিতে চাহিত। ইহাতে বাগবিতণ্ডা কলহের সৃষ্টি হইত, দূরের কথা বন্ধুত্বের সৃষ্টি করিত—বিদেশী এবং আমেরিকান শ্রোতার মধ্যে নূতন সৌহার্দ্দ্যের সূত্রপাত হইত।

এরূপ বিভিন্ন সেমিনারের আলোচ্য বিষয়গুলির ফলাফল পর্য্যালোচনা এবং যাহারা এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সেমিনারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের এক-একটি সম্মেলনে আহ্বান করিলে সুফল লাভের আশা করা যায়। প্রতি দিন সমস্যাগুলির পরিবর্ত্তন হইতেছে সুতরাং উপাত্ত(data)গুলিরও সংশোধন প্রয়োজন। এজন্য পূর্ব্বে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে যোগদানকারী সকলকে আগামী গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে এক সম্মেলনে আহ্বান করিবার কথা হইয়াছে। এইরূপে দেশ-বিদেশের তরুণগণের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদান বর্ত্তমানে যেরূপ চলিতেছে, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা আরও বাড়িয়া চলিবে এবং স্থায়ী মিলনক্ষেত্র রচনা হইবে।

(ইউনেস্কো)

মেলি আঁখি জীবনের প্রথম প্রভাতে

শ্রীমায়ারাণী মৌলিক

মেলি আঁখি জীবনের প্রথম প্রভাতে—
আমারে পেয়েছ তুমি আপনার সাথে
শৈশব-ক্রীড়ায়, মমতারূপিণী আমি ছিনু তব সাথী
কৈশোরের, আমি তব কিশোরী বান্ধবী,
আমি তব যৌবনের প্রথম উন্মেষ।
মধু যামিনীতে তুমি বাসরশয্যায়, প্রতীক্ষা
করেছ যার আকুল আগ্রহে
আমি ছিনু উপলক্ষ তার।
তোমারি প্রদীপে আলোরূপে বিচ্ছুরিত
হয়েছি নিয়ত, নিত্য তব ধূপে
নিজেরে দহিয়া আমি বিলায়েছি গন্ধ আপনার।
নিদাঘ মধ্যাহ্নকালে বিশ্রামের ক্ষণে
সুরাগত বেণুস্বরে আমার কণ্ঠস্বর
পেয়েছ শুনিতে। ভ্রান্তিরূপে
কত বার এসেছি সম্মুখে, আমিই করেছি পার
সেই ভ্রান্ত পথ হাত দুটি ধরে।
ভোগে আমি সঙ্গিনী তোমার, ত্যাগে আমি
চির দিন গুরু। সংসারের রুক্ষ
পথে চির দিন আমি তব পথ-প্রদর্শিকা।
জীবনের সায়াহ্নে আমারে ডেকেছ তুমি
আকুল আহ্বানে, কৃতাঞ্জলিপুটে
অর্পণ করেছ ভক্তি আমার চরণে
বিদায়-গোধূলি ক্ষণে মৃত্যুরূপে
মুক্তিরূপা আমি, তোমারে বেঁধেছি চির
অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

বিহার-শহীদ স্মারক, সমগ্র কম্পোজিশন

[ভাস্কর—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সখী-সংলাপ"   ফটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলক

জন্ম—২৩শে জুলাই, ১৮৫৬   মৃত্যু—১লা আগষ্ট, ১৯২০

জীব-জগতে রূপ ও রং

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাণীজগৎ রূপ ও রঙের সমারোহে, স্বভাবজ চাতুরী ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ জীবজন্তু এদের ভিতর বিকশিত হয়ে উঠেছে সুন্দর বর্ণচ্ছটা, বিশ্ব-প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, পৃথিবীর মনোরম কান্তশোভার স.ঙ্গ বর্ণ মিলিয়ে তাল রেখে নিখুঁত ভাবে গড়ে উঠেছে এরা। বর্ণ-বৈচিত্র্য যেমন সারা জীবকুল জুড়ে, বিপুলা ধরণী যেমন বিভিন্ন প্রতিবেশে প্রতিপালন করেছে নূতন নূতন জীবদের—তেমনি নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়, প্রকৃতির নিরব:চ্ছন্ন পটভূমিকায় এদের জন্ম মৃত্যু, আহার-বিহার, সংসারযাত্রা ঘরকন্না। নিত্যদৃষ্ট পোকাদের কথাই ধরা যাক: কি বিপুল বৈষম্য এদের—আকারে, প্রকৃতিতে ও বর্ণে। গুবরেপোকাদের লক্ষ্য করে দেখবেন, পরস্পরের ভিতর দুস্তর ব্যবধান। পাখীরা সংখ্যাতীত। সংখ্যার দিক থেকে যেমন প্রজাপতি বা শামুক-গুগলির তুলনা মেলা ভার, তেমনি আকৃতিতেও এদের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। জীবকুলের দৈহিক রূপান্তরের জন্য প্রতিবেশ অনেকটা দায়ী। অবশ্য পরিবর্তন রাতারাতি হয় না, দুই-এক জন্ম বা বংশ-পঙক্তিতেও নয়, সহস্র সহস্র বৎসর অবলীলাক্রমে পার হয়ে যায় কথঞ্চিৎ অদলবদল হতে। উদাহরণস্বরূপ তিমি সীল সিন্ধুঘোটকদের কথা উল্লেখ করা যায়, এরা মাছ গোত্রের নয় মোটেই—হাতী বাঘ বরাহদের মত স্তন্যপায়ী। বৃহদায়তন দেহ নিয়ে গমনাগমনে অসুবিধা নিবন্ধন এবং আত্মরক্ষার্থে একদা এদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল গভীর সমুদ্রজলে, জলে বাস করে ক্রমশঃ এরা জলচর হয়ে উঠেছে।

প্রাণীদেহের পরিবর্তনের মূল কারণ—স্থানীয় জলবায়ু, গাছপালা ভূমির অবস্থান খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির তারতম্য। সমগোত্রের ভিতরেও অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় এগুলির বৈষম্যে। দুর্যোগ দৈব-দুর্বিপাক (যেমন তুষারযুগের হিমবাহ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে) প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হলে জীবকুলেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। খাদ্যান্বেষণে বা আত্মরক্ষার্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে পরিবর্তন হয়, যেমন হয়েছে ডোরাকাটা জেব্রা, লম্বাগলা জিরাফ ও বিশালদেহী গণ্ডারদের মধ্যে। অথচ এদের পূর্বপুরুষ এক। মাংসাশী, উদ্ভিদ-ভোজী ও তৃণভুকদের পূর্বপুরুষ একই শাখার অন্তর্গত, খাদ্যের বৈষম্য জীবনযাত্রা-পদ্ধতিকে ক্রমান্বয়ে ভিন্ন মুখে পরিচালিত করে অবশেষে স্বতন্ত্র প্রজাতির (species) সৃষ্টি করেছে। জীবনের প্রধান কথা—প্রতিবেশের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা। যে ব্যক্তি বা জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে অসমর্থ, প্রকৃতির রাজ্য থেকে তার চিরতরে বিদায় অবশ্যম্ভাবী। তাই আত্মরক্ষায় তাগিদে জীব পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মিলে-মিশে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে চায়, অর্থাৎ ব্যক্তির মনে আত্মরক্ষাবৃত্তি সবচেয়ে প্রবল হওয়ায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও অবস্থার মধ্যে নিজেকে স্বভাবে, ব্যবহারে, আচারে-আচরণে খাপ খাইয়ে নেবার অভিলাষ সুতীব্র। নিম্ন-জীবকুলে হয় ত শ্রেণীভেদে, জাতিভেদে এ বাসনায় তারতম্য বর্তমান, তবু এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তা হলে দেখা যাচ্ছে—দৈহিক আকৃতি গঠনের এবং পরি-বর্তনের মূলে রয়েছে প্রতিবেশের প্রভাব।

আত্মরক্ষা-পদ্ধতি সাধারণতঃ দুই রকম। প্রথমতঃ, শারীরিক শক্তিমত্তার সাহায্যে প্রতিবেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, কৌশল অবলম্বন ও নিত্য নব উপায় উদ্ভাবনে প্রতিবেশকে আপন বশে রাখা। দৈহিক পরাক্রম, বিশাল অবয়ব ক্রোধ-প্রবণ, হিংস্রস্বভাব-যুক্ত প্রাণীর অভাব হয় নি পৃথিবীতে কোনদিন। অতিকায় ডাইনো-সর-টেরডক্টিল গোষ্ঠী, অমিতপ্রতাপ খড়্গদন্তী বাঘ, বিশাল বেলুচী-থেরিয়াম—আবির্ভাবের প্রথম যুগ থেকেই এদের রূপ জমকাল ছিল না। জৈব-বিবর্তনের ধারায় লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এরা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রথম ডাইনসর আধুনিক কুকুরের চেয়ে বৃহৎ ছিল না, আবার এদেরই বংশধর একদিন এক শত ফুট দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। স্থূল, মাংসল দেহ, বিশ ফুট দীর্ঘ গলা, পঁচিশ ফুট লেজবিশিষ্ট 'ডিপ্লোডেকাস' বাস করত জলাবাদা অঞ্চলে নির্বিঘ্নে, যুগ যুগ ধরে এদের শারীরিক আয়তনই বৃদ্ধি হয়েছিল, বুদ্ধির বিকাশ আদৌ ঘটে নি। হাতীর অদ্ভুত রূপ যেমন সাধারণের কাছে বিস্ময়কর, বিজ্ঞানীর কাছেও তেমনি। খাদ্যসংগ্রহের কাজে গজদন্ত ছুরির ব্যবহার (মূল উৎপাটনে) হ'ত অধিক, তাই এদের বৃদ্ধি। অস্থিহীন শুণ্ডের ব্যবহার জলপানের প্রয়োজনে, তথা ডালপালা ভাঙার জন্য প্রয়োজন প্রকাণ্ড উপযোগী। ক্ষুদ্র জীবেরাই কালক্রমে বিশাল হয়ে উঠে, কঠিন বর্মে বা আঁশে দেহ আবৃত হয়ে যায়, আত্মরক্ষা এবং আক্রমণে সুসজ্জিত হয়ে উঠে, দন্ত খড়্গ শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ-নখযুক্ত শক্তিশালী থাবার উদ্গম হয়। এরা সাধারণতঃ বলবান ও বৃহদায়তন।

অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান প্রাণী আত্মরক্ষা করে চাতুর্য দ্বারা, শত্রুকে ধাপ্পা দিয়ে প্রতারণা করে পালিয়ে। শারীরিক পরাক্রম সর্বক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হয় না, সেখানে কাজে লাগে উদ্ভাবনী শক্তি। সদা-সতর্ক তৎপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সম্ভাব্য বিপদ এবং অনাগত শত্রুর গতিবিধির দিকে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা যেন বিপদজ্ঞাপক যন্ত্র, সামান্য সংকেতেই পলায়নের চম্পট দিতে দ্বিধা করে না। এই ধারায় সুক-ভাবে অভিব্যক্তি হয়েছে—এবং দলপতির শৃঙ্খলাবিধানে প্রতি-কূল আবহাওয়া ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান অনেক স্থলে দেখা

গিয়েছে। দারুণ শীতে আ াশের বিলুপ্তি হয়ে দেহ রোমশ হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে হয়ে গজিয়েছে পালকের আচ্ছাদন। তুষারযুগে অনেক দানবাকৃতি প্রাণীরা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল অথচ লঘুপদ চতুর প্রাণীরা অঙ্গে রোমশ আচ্ছাদনের উদ্ভব হওয়ায় হিমশীতল পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিল। পুরাকালে ম্যামথদের বিচরণভূমি ছিল তুষারাবৃত সাইবেরিয়া-প্রান্তর, সেজন্য এরা ছিল লোমশদেহ। এখনকার হাতীরা থাকে গ্রীষ্মাঞ্চলে—দেহ নির্লোম। পর্ব্বত-উপত্যকার জীব—লামা ইয়াক আলপাকা কস্তুরী চমরী গাইদের দেহ আবৃত ঘন লোমে। জলের বাসিন্দাদের দেহ নগ্ন চিক্কণ, এক কুমীরের শক্ত আ াশ ছাড়া, জলচারী প্রাণীদেহে আবরণ বড় একটা দেখা যায় না। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল স্থানে কোমল দেহরক্ষায় আ াশের উপযোগিতা। গণ্ডারের গায়ের উপরিভাগের চর্ম্ম সুকঠিন, তাকে ছুটাছুটি করতে হয় ঝাসঝোপের জঙ্গলে। কণ্টকীলতা, বৃক্ষাদিতে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে অবশিষ্ট থাকত না কিছুই যদি না পুরু চর্ম্মের আবরণে দেহ ঢাকা থাকত।

এটা জানা কথা যে, শত শত শতাব্দী ধরে এক একটি ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে। কোন প্রান্তরে যদি বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গিয়ে ঊষর মরু দেখা দেয়, রসালো লতাপাতা হয় নিশ্চিহ্ন সেখানে সাধ করে পড়ে থাকবে কোন নির্ব্বোধ। কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে এমন এক দল ছিল, যারা কাঁটাগাছ খেয়ে, বহুদিন জলপান না করে মরুবালুকার উপর থপাথপ পা ফেলে চলাফেরা করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল—উট তাদের বংশধর। গায়ের রঙ, কুঁজ-বিশিষ্ট আকৃতি, দুই-ই মরুভূমির রঙ ও রূপের সঙ্গে চমৎকার মিশ খেয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার মরুতে দুই এক জাতের গিরগিটি আছে—পৃষ্ঠদণ্ড সমন্বয়ে তাদের চর্ম্ম যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে বোধ হয়, তারা যেন কাঁটাগুল্ম-সমন্বিত রৌদ্রদগ্ধ বালুকার চিক্কণ অঙ্গ। সুন্দর-বনের দীর্ঘ ঘাস পাতা ঝোপের জলাজমিতে রাজাবাঘের রক্তিম আস্তরণের উপর কালো ডোরা দেখতে ভাল, আবার উত্তমরূপে আত্ম-গোপন করে থাকবার পক্ষেও প্রশস্ত। উপরের দিকে যেমন তৃণ-লতাগুল্মের জড়াজড়িতে ডোরা মিশে যায় বেমালুম, দূর হতে কিছু দেখা দুষ্কর—নীচের দিকের শ্বেত তেমনি ভূমির রঙে অবলুপ্ত।

লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাকে শত্রুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে গোপন রেখে শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা প্রায় সকল মাংসাশী জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম। এতে যুগপৎ আক্রমণ আত্মরক্ষা চলে। চতুষ্পার্শ্বস্থ পরি-বেশের অনুরূপ হয়ে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয়ই এক একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি, জীবজগতে এদের প্রয়োগ অবাধ। নিরামিষাশী ও নিরীহ প্রাণীদের পক্ষে বহির্জগতের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে দেহ একীভূত করে রাখা অপরিহার্য্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্য্যরশ্মি সাধারণতঃ পড়ে খাড়াভাবে, মসৃণ দেহে ছায়া ও প্রতিফলন সুস্পষ্ট করে তোলে বেশ দূর থেকেও। সেকারণে এখানকার জীবজন্তুদের পশ্চাদ্ভাগকে উদরাপেক্ষা ধূসর করে আলোছায়ার প্রতিফলনকে নিষ্ফল করতে জেব্রার কালো ডোরা, জিরাফ ও চিতার ধূসর বুটি, নিকট হতে চকচক করে, কিন্তু তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে এবং বৃক্ষলতাদি-সমাকীর্ণ জঙ্গলে সূর্য্যের আলো এদের একেবারে লুপ্ত করে দেয়, আধ-আলো আধ-ছায়া আ াধারের মাঝে সাড়া পাওয়া কঠিন। মেরুপ্রদেশ তুহিন এবং শীতের রাজ্য, শ্বেত সেখানে রাজা ; পশুপক্ষী জলচর সবাই শুভ্র হিমানীবর্ণের, সীল সিন্ধুঘোটক ভল্লুক পেঙ্গুইন সবার চর্ম্মেই শ্বেতের প্রাচুর্য্য। গভীর সমুদ্রের অধিকাংশ প্রাণীই নীলাভ-শ্বেত, চতুষ্পার্শ্বস্থ নিথর অন্ধকার অবস্থার সহিত এদের রঙের অপরূপ সমন্বয়। সমুদ্রের শুক্তি শঙ্খ অনেকেই দেখেছেন, কাঁকড়া ইত্যাদি অন্যান্য প্রাণীরাও বর্ণচোরা, কাঠবিড়াল ও অধিকাংশ পক্ষিকুল গাছপাতা মেটে বকল ছোট ডালপালার সঙ্গে আশ্চর্য্য অন্তরঙ্গতায় মিশে থাকে—চেনা কঠিন। পেচক সাধারণতঃ ধূসর বকল রঙের। কোকিল কাক কিম্বা বুলবুল বৌ-কথা কও এরা কৃষ্ণ বর্ণের, টিয়া চন্দনা নীলকণ্ঠরা সবুজ নীল, বৃক্ষে আত্মগোপনের পক্ষে উভয়ই উপযুক্ত। আকাশে যারা উড়ে বেড়ায় তাদের গায়ের ছাই রং আকাশের আশমানী রঙের সঙ্গে মিলে থাকে, আর পীতাভ মৃত্তিকার ছায়া নিম্নভাগে পড়ে নীলাভশ্বেত আভায় মিলিয়ে রাখে। প্রতিবেশানুরূপ নিজেদের বর্ণ ও আকৃতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে হিংস্র প্রাণীরা আক্রমণের সময়। বাঘের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; কুমীরদের সময় সময় শুষ্ক কাঠের গুঁড়ির মত নিঃসাড়ে পড়ে থেকে শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরতে বা লেজের ঝাপটায় তাকে অতর্কিতে জলে ফেলে দিতে দেখা গেছে। জাগুয়ার ব্রেজিলের ঘন অরণ্যানীর সঙ্গে মিশে থাকে ; মালয়ের স্যাঁতসেঁতে বনে চুপিসাড়ে পড়ে থাকে বিরাট পাইথন, আসামে এবং বর্ম্মায় বোয়াময়াল গাছের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ওৎ পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিকার-প্রতীক্ষায়। মাংসাশী প্যাণ্ডার শ্বেত ও কৃষ্ণ রং বেশ মিশে যায় পাহাড়ী বাঁশ-ঝাড়ের পরিবেশে। অনেক ভ্রাম্যমাণ যাযাবর প্রাণীর রং ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তনশীল—যেমন, ক্যাটল মাছ ও আমাদের নিত্যদৃষ্ট বহুরূপী। লেমিং ও আর্টিক শৃগাল, আলপাইন শশক, নকুলজাতীয় আরমিন ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বর্ণপরিবর্ত্তনে সক্ষম। আমেরিকান স্কাঙ্ক পূতি-গন্ধ নির্গত করে আত্মরক্ষার প্রয়াসে।

রক্ষাবর্ণ ছাড়া জীবকুলে আর এক উপায়ে সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হয়। প্রাণীজগতে উচ্চ স্তরে বর্ণবৈচিত্র্যের উন্মেষ প্রণয়-অভিসার-লীলা হতে। ইতর প্রাণীজগতে দেহের আচ্ছাদন দেহের ছন্দ-সুষমা শ্রী সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দৈহিক শক্তির অধিকারী হয় পুরুষ, স্ত্রী-জাতীয়া ইতর প্রাণীরা সাধারণতঃ রূপহীন. বিশেষত্ববর্জ্জিত। জীবন-সংগ্রাম যেমন আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তীব্র. প্রণয়-ব্যাপারেও তেমনই কঠোর সংগ্রামশীলতা। রূপগুণের পসরা সাজিয়ে বসতে হয় বেচারা পুরুষদের, জয়মাল্য সমেত কন্যালাভের আশায়। প্রেমের হাটে উমেদার অগণিত, কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে তা নির্ভর করে অনেকটা বাঞ্ছিতার মর্জ্জির উপর। বসন্তসমাগমে প্রাণী-জগতে দেখা দেয় সৌন্দর্য্যের সমারোহ। সাড়া পড়ে যায় যথাসম্ভব বিচিত্র বর্ণসম্পদে নিজ নিজ দেহ সুসজ্জিত করবার—স্বর্ণ-পাখী,

টুনটুনি, জলমোরগ, চন্দনা, ফেজেন্টদের কারও পক্ষ, কারও পুচ্ছ, কারও ঝুঁটি সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যে, রূপের ছটায় বর্ণসমাবেশে হয়ে উঠে মনোহর, তখন পরস্পরকে পরাজিত করতে অক্লান্ত চেষ্টা। মেঘ-মেদুর আকাশতলে ময়ূরীর সপ্রশংস বরণদৃষ্টি এসে পড়ে অপূর্ব্ব পেখমবিস্তারে নৃত্যরত ময়ূরের পানে। বলশালী প্রাণীরও চিত্তস্ফুরণ হয়। মত্ত বারণ নামে মরণপণ রণে শ্রীলাভের আশায়, কুরঙ্গের শৃঙ্গোদ্গম হয়, সিংহ কুমীররা যেন নবযৌবন ফিরে পায়, ম্যানড্রিলরা অদ্ভুত রক্তবর্ণ হয়ে উঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে যুদ্ধে নামে বনমানুষরাও, প্রত্যেকে হয় সৌন্দর্য্যে, না হয় অস্ত্রসজ্জায় বিক্রমে হয়ে উঠতে চায় অনুপম। পাখী ও প্রজাপতিদের মধ্যে দেখা যায়—উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে পক্ষ আন্দোলনে প্রণয়িনীর চক্ষে নিজেদের সুন্দর প্রতিপন্ন করবার অকুণ্ঠ প্রয়াস। জীববিদ একে অভিহিত করেছেন যৌন-নির্ব্বাচন নামে। এখানে উদ্যোগী মনের সক্রিয় প্রভাব অবিসংবাদিত রূপে দেহকে অপরূপ শোভায় দেয় সাজিয়ে, অথবা নবচেতনার উন্মেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদ্বুদ্ধ করে। ফ্রয়েড বলেছেন—রুচি, রসময় কল্পনা ও সৌন্দর্য্যভাবের জন্ম প্রেমকে কেন্দ্র করে—ডারউইনের যৌন-নির্ব্বাচন আলোচনায় তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত এবং মানব-আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হতেই এই ভাববৃত্তির গঠন হচ্ছিল জৈব-বিবর্ত্তন ধারায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, ফুলের সুষমা ও গন্ধের বৈচিত্র্য-সম্পাদন পতঙ্গকুলের অবদান। চমৎকার রং ও সৌগন্ধের আকর্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গকুল মধু-লোভে এসে বসে ফুলে ফুলে, একটির পরাগ অন্যটিতে মাখিয়ে বংশবিস্তারে সাহায্য করে। ভ্রমর-সমাগম না হলে বর্ণ হয় মলিন, গন্ধ থাকে না, ফুলের জীবনই ব্যর্থ।

রূপ ও রঙের ব্যাপ্তি জীবজগতে অত্যন্ত অধিক এবং জীবন-সংগ্রামে এর মূল্য প্রায় অপরিমেয়। রক্ষাবর্ণের আরও প্রকারভেদ আছে যার সাহায্যে ভীরু নিরীহ অমেরুদণ্ডী (সময় সময় মেরুদণ্ডীরাও) জীব আত্মরক্ষার পন্থা উদ্ভাবন করে। এই অপরূপ পন্থার পিছনে সহজাত বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই এমন কথা জোর করে বলা চলে না। এর নাম অনুকৃতি, সাধারণতঃ কীটেরা ভোল পাল্টে শত্রুর চক্ষে ধূলা দেবার প্রয়াস করে নানা ভাবে। প্রজাপতি ও শুয়াপোকার কয়েকটি 'জাত' সুস্বাদু—পশুপক্ষীর ভোজ্য; আবার কয়েকটি 'জাত'কে সকলে সযত্নে এড়িয়ে চলে, এরা বিস্বাদ, অনেকে দুর্গন্ধযুক্ত। অনেক স্থলে স্বাদু কীটেরা ভোল বদলে অবিকল দুর্গন্ধ কিংবা বিস্বাদ কীটের মত হয়ে থাকে—প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এইরূপ পরিবর্ত্তনে হয়ত কুলস্মৃতির প্রভাব থাকে। আফ্রিকার এক জাতের মাছি বর্ণ আকার আচরণে অনেকটা মৌমাছির ন্যায়, সেই সুযোগ নিয়ে ডিম পাড়ে এদেরই গৃহে—ঠিক কোকিলের অনুরূপ আচরণ। ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, লাভালাভ সন্তান-সন্ততির মনে খানিকটা দানা বাঁধে—সে যতই অল্প হউক না কেন। বাবুই প্রভৃতি কয়েক জাতের পাখীদের নীড়-রচনা সুন্দর কারুশিল্প, শুয়াপোকা বা মথের গুটিনির্ম্মাণ ও উত্তর আমেরিকার বীবরদের ঝরণায় বাঁধ দিয়ে জাঙ্গাল নির্ম্মাণ স্থাপত্য-বৃত্তির চমৎকার নিদর্শন। কীটকুলকে অনেক স্থলে আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত পরি-বর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে নিতে দেখা গেছে। নির্ম্মল উন্মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গে যে ঝুল-ধুলোর প্রলেপ পড়েছে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশে, কারখানা-সমন্বিত শহরগুলির আকাশে যে সব মথ ও কীট ভেসে বেড়ায় তারা ধূসর-কৃষ্ণ, অথচ এক শতাব্দী পূর্ব্বে এ রঙের কোন কীট ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যমের সকল প্রয়াস এক্ষেত্রে, সন্তান-সন্ততি প্রাণধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলেছে এগিয়ে। গাছ, সতেজ পাতা, ঝরাপাতা, কচি ডাল, শুষ্ক ডাল বল্কলের আকৃতি গঠন পরিবেশ এবং রঙে একাত্ম-হয়ে-থাকা কীট আছে প্রচুর। সজিনা ফুলে এক জাতের মাকড়সার বাস, তারা শ্বেত; পূর্ণ সবুজ মাকড়সা দেখা যায় কুমড়ো শাক, লাউ শাকে। প্রজাপতির জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একবার দেখলাম—পাতার উপর পাখীর বিষ্ঠা যেন ঈষৎ আন্দোলিত হ'ল, ভাল করে চেয়ে দেখলাম অবিকল ঐ বর্ণের এক শূক। এক বৈজ্ঞানিক গিরগিটির শূক-শিকার পর্য্যবেক্ষণে নিরত ছিলেন। শূকটি অকস্মাৎ তির্য্যক গতিতে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন মনে হতে লাগল—কচি ডাল একটি, গিরগিটিপুঙ্গব ত হতভম্ব ও প্রতারিত। বাঁশ-পোকাদের বিচিত্র অনুকৃতি আশ্চর্য্যান্বিত করে পর্য্যবেক্ষককে, অধিকাংশ সময়েই এরা অচঞ্চল অবস্থায় কঁ্যাকড়া ও ছোট ছোট ডালের পরিবেশে নিখুঁত ভাবে আত্মগোপন করে থাকে—সরু সরু হাত পা দেহ ও রঙে কোন তফাৎ ধরা পড়ে না। ঘাস-পাতা রঙের ছোট প্রজাপতি, অবিকল পত্রাকৃতি ডানার কীট অনেকেই দেখেছেন। এদের দেহগঠন-কৌশলে কি মনে হয় না যে, বংশপরম্পরায় প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়াসের এ হ'ল সুষ্ঠু পরিণতি! আমেরিকায় এক জাতের ম্যান্টিস—পক্ষবিস্তারে ঠিক পাতার মত, কোন ক্ষুদ্রাকৃতি জীব এল ভ্রম করে পাতায় বিশ্রাম করতে, অমনি উদরসাৎ হ'ল। এমন অনেক প্রজা-পতি গুটিপোকা মথ আছে যারা বিপদের আশঙ্কামাত্রেই এমন রূপ-ধারণে অভ্যস্ত যে, তার তারিফ না করে পারা যায় না। অনেকে মৃতের মত নিশ্চল নিথর হয়ে পড়ে থাকে, কেউ কেউ ধাপ্পা দিতে ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কেনিয়ায় এক জাতের গিরগিটি আছে—বিপদের আভাস পেলে তাদের মুখাবয়ব এমন ভয়াল রূপ পরিগ্রহ করে· যেন পুরাকালের ডাইনসর। কীটবিদ ব্রেগার আফ্রিকায় এক জাতের ফড়িং দেখেছিলেন যারা সাপের মত হিসহিস শব্দ করতে ওস্তাদ।

সমুদ্রতলের অধিবাসীদের অনেকের রক্ষাবর্ণ তথা পরিবেশের উপযোগী আকৃতির উদ্ভব হয়েছে। প্রবালদ্বীপসমূহের প্রতিবেশী মাছগুলি ঠিক ঐ বর্ণের: অতলান্তিকে সারগোসা সাগর জলজ গুল্মলতায় বদ্ধ, সেখানে মাছ ইত্যাদি জীব অদ্ভুত ভাবে প্রতিবেশ-অনুরূপ হয়ে উঠেছে। জল-অশ্ব নামে মাছের প্রতিকৃতি অনেকেই হয় ত দেখেন নি। এদের আকৃতি কিন্তু একেবারে

নতাগুল্মঝোপের ভার। আবার অনেকে দেহের সঙ্গে গুল্ম শ্যাওলা ইত্যাদি বহন করে বেড়ায় শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে, কাঁকড়া সী-এনিমন এ বিষয়ে সুদক্ষ: শুক্তি-শামুকের খোলসেরও ব্যবহার হয় এ কাজে। নানা ভাবে দেহকে পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে অদৃশ্য রাখলে শুধু যে শত্রুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে জীবনরক্ষা হয় তাই নয়, শিকার ধরাও চলে বেশ সহজে। পশ্চিম ইণ্ডিজের সূর্য্যমাছ (একশাবের জাতি) গভীর জলের প্রাণী; উজ্জ্বল দ্যুতি-সংযুক্ত টোপ এর উপরোষ্ঠ থেকে একখানি লম্বা দড় দিয়ে গাঁথা, থাকে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্বভাগে ১১০ ফ্যাদম নীচে; জোনাকির মত উজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রলুব্ধ হয়ে আসে অন্য প্রাণীরা এবং পৌঁছে সোজা এদের উদরে। সুগভীর সমুদ্রের অনেক প্রাণী কদকবাসের মত নীলাভ উজ্জ্বল দ্যুতিবিশিষ্ট। নিকষ তিমিরলোকে বাস অতএব দেহস্থিত এই জান্তব জ্যোতি পথ আলোকিত করে থাকে খানিকটা, ভূমধ্যসাগরের জেলীমাছ, জাপান সাগরের স্কুইড, মধ্য-আতলান্তিকের হাঙর, সমুদ্রতলস্থিত নানা জাতের চিংড়ি ও অন্যান্য পোকা অনবিস্তর আলোকবিচ্ছুরণে সক্ষম। জলতলের অসংখ্য রহস্যময় বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাণীর দেহস্থিত সক্রিয় আলো অন্যতম। আত্মরক্ষা, বিশেষতঃ খাদ্য-সন্ধানে এর উপযোগিতা সমধিক।

প্রাণীজগতে আত্মরক্ষা আত্মগোপন শিকার বংশরক্ষা প্রণয়ে সাফল্য প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বলাভের জন্য রূপ রং ও অনুকৃতির উদ্ভব এবং ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালে হয়েছে এর পরিপূরণ। জন্মগত এই স্বভাবগুলির উদ্ভব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, এই হ'ল হাক্সলী পোল্টন মূলার প্রমুখ জীবতত্ত্ববিদদের অভিমত। চতুর পিতামাতা, সন্তানসন্ততি ও তাদের বংশ জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে, একটি ধারা কোন বিশিষ্ট উপায়ে জীবন যাপন করে। তাদের স্বভাব বদলায়; ধরণ-ধারণ আচার-আচরণে ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জমে জমেই সৃষ্টি হয় জাতীয় বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুলস্মৃতি; কৌশল আয়ত্ত করে পরিবেশে বদলায় রূপ রং দেহাকৃতি। যারা প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনই সব মনে করে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ করতে অনিচ্ছুক তারা নিম্নস্তরের প্রাণী। শুয়াপোকা গুটিপোকার আত্মরক্ষা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলে ব্যক্তিগত প্রয়াসের মূল্য বুঝতে পারা যাবে। ঠিক মনের অংশটুকু বললে হয় ত সবখানি বলা হয় না, প্রাণের সর্ব্বময় প্রচেষ্টা ব্যতীত আক্রমণাত্মক অনুকৃতি ও সাবধানী বর্ণ নিরর্থক, অন্ততঃ এদের প্রয়োগ ও ফলপ্রদ কার্য্যকারিতা ত বটেই। নিরীহ কীট পতঙ্গ শূক প্রজাপতি মথদের শত্রুসংখ্যা নগণ্য নয়। হন্তাদের চেয়ে এরা দ্রুতগামী বা সতর্ক নয়, সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন করে গোড়াপত্তন করতে হয়েছে—রূপ ও রং বদলে বিরক্তিকর অথবা বিপজ্জনক প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে, ভয় দেখিয়ে বা ঘৃণা উদ্রেকের প্রবঞ্চনায়। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্যের কথা, কিন্তু একটি দুটি জন্মে এ হেন বৃত্তি-গঠন অসম্ভব। প্রাণান্তকর প্রয়াসে সঞ্চিত হয়েছে আত্মরক্ষার অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির আবিষ্কার করেছে নূতন পন্থা, অভিনব পদ্ধতি, বংশপরম্পরায় স্তূপীকৃত হয়েছে জাতিগঠনের উপাদান—একেই আমরা বলেছি কুলস্মৃতি। রূপ রং অনুকৃতি এরই অমূল্য দান।

আগমনী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

থামে না থামে না, বৃষ্টি থামে না, আকাশ আকুল মেঘে,
নীলের বিলাস মুছে গেছে বুঝি কালোর ছোঁয়াচ লেগে।
দূর দিগন্তে উঁকি দিয়ে গেল, তাহারে গেল না পাওয়া,
বনে প্রান্তরে এখনো যে ফেরে মত্ত উতল হাওয়া,
অশ্রান্ত সুর—বাজে নি মধুর এখনো দূরের বাঁশী,
এখনো ফোটে নি, এখনো ঝরে নি শুভ্র পুষ্প রাশি।
বেদনা-বিবশ এখনো দিবস, রাত্রি জ্যোৎস্নাহারা,
ঝ'রে পড়ে শুধু ঝর ঝর ঝর এখনো বৃষ্টিধারা।
তোমরা জানো না কেউ,
মনের মাঝারে উঠেছে আমার অশ্রু জলের ঢেউ।

তবু জানি জানি বর্ষা থাকে না, অম্লান হয় দিন,
শরতের সুরে সহসা কখন্ বাজে জীবনের বীণ্।
যবনিকা কবে উঠে যায়, হেরি ঊর্দ্ধে অসীম নীল,
মনের সঙ্গে খুঁজে পাই সেই মুক্তাকাশের মিল।
রজনী সে হয় রজত-বরণী, ধরণী মাধুরীভরা,
স্বর্ণ-আলোকে উচ্ছলি ওঠে তটিনী কলস্বরা।
স্নিগ্ধ বাতাসে কুসুমের মৃদু গন্ধ ভাসিয়া আসে।
এস গো আলোকে, এস আনন্দে, এস জীবনের পাশে।
গাই তারি আগমনী,
মধুর মন্ত্রে হৃদয়ে হৃদয়ে সে গান উঠুক রণি'।

তার পর চলে গেল অনেক দিন।

অনেক সংঘাত অনেক সংঘর্ষ অনেক ঝড় অনেক প্লাবন অনেক ভাঙাগড়া—অনেক বৎসর পার। প্রায় পঁচিশ বৎসর। দুটো যুগ। বারো বছরে নাকি একটা যুগ। কিন্তু যুগান্তর বললে ভুল হবে। যুগান্তর ত বারো বছরে অনেক হয়েছে, কিন্তু বহু যুগান্তরেও এত বড় পরিবর্তন হয় নি। কালান্তর হয়ে গেল। একটা বিস্ময়কর কালের সূর্যোদয় হ'ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল।

বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। দেশ ভাগ হ'ল। ভারতবর্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেলে। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনির মধ্যে, জীর্ণদেহ শীর্ণকায় কোটি কোটি মানুষের আনন্দ-কলরোলের মধ্যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ল।

চৈতন্ত ইনষ্টিটুশনেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্তন ভাঙার দিকে নয়, গড়ে গড়ে সে বড় হয়েছে। অনেক বড়। বড় বড় বাড়ী হয়েছে; ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কত শিক্ষক এসেছেন—চলে গেছেন। পুরনো কালের শিক্ষক আর কেউ নেই—থাকবার মধ্যে আছেন চন্দ্রবাবু। সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ চন্দ্রভূষণ বাবু। মাথার চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে। তবু তাঁর দেহ এখনও সমর্থ আছে। তবে তিনি আর এখন হেডমাষ্টার নন—তিনি চৈতন্ত ইনষ্টিটুশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে এক ঘণ্টা করে ইংরেজী পড়ান, আর ইস্কুলের পরিচালনার দিকটা দেখেন। ঠিক সেই সাড়ে দশটায় এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়ান। সামনে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছেলেরা এসে দাঁড়ায়। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে সুর করে স্তোত্রপাঠ করে—

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণঃ—

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরম নিধানম্॥

পাঁচ শ'র কাছাকাছি ছেলের সংখ্যা। সমবেত কণ্ঠ আকাশ স্পর্শ করে। প্রার্থনার শেষে ক্লাস আরম্ভ হয়—চন্দ্রভূষণ বাবু সেই প্রাচীন নিয়মমত একবার সকল ক্লাস ঘুরে আসেন। সঙ্গে থাকেন নতুন হেড মাষ্টার। নতুন হেডমাষ্টার এখন বসন্তবাবু; চন্দ্রবাবুর কাছে সে বসন্ত। এই ইস্কুলেরই ছাত্র। বিশ্বগ্রামের পাশের গ্রামেই বাড়ী। মাখনবাবু সেকেণ্ড মাষ্টার চলে যাবার পর সে সেকেণ্ড মাষ্টার হয়ে ঢুকেছিল। এখানে চাকরি করতে করতেই সে এম-এসসি এবং বি-টি পাস করেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার থেকে হয়েছিল এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার—তার পর হেডমাষ্টার হয়েছে। ইস্কুলের ক্লাসগুলি দেখে আসার পর চন্দ্রবাবু ইস্কুলের হিসেবনিকেশ, চিঠিপত্র এবং ইস্কুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন। আপনার মনে কাজ করে যান। জেয়াউদ্দিন চলে গেছে। রামজয় চলে গেছে। সঙ্গী নাই, সাথী নাই। চন্দ্রবাবু একা। থাকবার মধ্যে আছে জীবনের সাথী ইস্কুল—চৈতন্ত ইনষ্টিটুশন।

দুপুর বেলা বারোটার পর তিনি বাসায় যান। শূন্য ঘর —কেউ নাই। বঙ্গবালার মৃত্যুর পর সত্যবতী বেশী দিন বাঁচেন নি। বছর দুয়েক বেঁচে ছিলেন; তাও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চুপচাপ বসে থাকতেন। শুধু কুমারী বয়স্কা মেয়ে দেখলেই অধীর অস্থির হয়ে উঠতেন। বলতেন — বিয়ে হয় নি কেন? হ্যাঁ গো মা বিয়ে কর না কেন? অভিভাবিকা সঙ্গে থাকলে তাদের কাউকে মিনতি করতেন —বিয়ে দাও মা, মেয়ের বিয়ে দাও। দেরি করো না। দেরি করো না। কাউকে কটুকাটব্য করতেন—স্বার্থপর, লজ্জা নাই; ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেন্না। বেরিয়ে যাও—তোমাদের মুখ দেখলে পাপ—মুখ দেখলে পাপ!

ভাগ্য ভাল সত্যবতীর—দু'বছরের বেশী যন্ত্রণা সইতে হয় নি। চন্দ্রবাবু তাঁর মৃত্যুশয্যায় বসে মনে মনে প্রার্থনা করতেন—মুক্তি দাও—ভগবান—সত্যবতীকে তুমি মুক্তি দাও।

শিংগঞ্জ ঘরে এসে স্নান সেরে তিনি পূজায় বসেন।

সে পূজা তাঁর নিজস্ব মতের পূজা। ওই বঙ্গবালার মৃত্যুর পর থেকে তিনি পূজা করছেন। বঙ্গবালার মৃত্যুর দিন রাত্রে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন ইস্কুলের সিঁড়ির উপর। রাত্রি তখন অনেক। সমস্ত বোর্ডিং স্তব্ধ। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাষ্টার ক'জন শুধু অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না পারছেন কাছে এসে বসতে, না পারছেন ঘরে গিয়ে শুতে। কাছে বসেছিলেন শুধু ব্রজবিহারী বাবু। তাঁর মত লোকও কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। একা কথা বলছিলেন শুধু চন্দ্রবাবু। সে কথা শুধু ইস্কুলের কথা। ইস্কুলের নতুন একখানি বাড়ী হবার কথা হচ্ছিল তখন। চন্দ্রবাবু সেই নতুন বাড়ীর কথা বলে যাচ্ছিলেন।

বাড়ীখানা পূর্ব্বধারী হলে কিন্তু আয়তনে কিছু ছোট হবে। না ব্রজবিহারী বাবু? মানে এবার যে রেজাল্ট হয়েছে—তাতে ছেলে আমাদের বাড়বে। যে প্ল্যান করেছিলাম, আমার বিবেচনায় সে প্ল্যান বদলে বড় করা উচিত।

কি বলবেন ব্রজবাবু? কি উত্তর দেবেন?

চন্দ্রবাবু উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নি। বলেই চলেছিলেন—আর ওই খড়ের চাল বোর্ডিংটা। ওটার অবস্থা বড় খারাপ হয়েছে। ওটাকে ভেঙে—মাটির দেওয়াল—পাকা মেঝে আর রাণীগঞ্জ টাইলের ছাদ—বাংলো টাইপের একটা বোর্ডিং। এখন একোমোডেশন ওতে পঁচিশ-ছাব্বিশ জনের—ওটাকে পঞ্চাশ জনের একোমোডেশন করে করলে—ব্যস—এখনকার মত নিশ্চিন্ত। কি বলেন?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন—হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। মনে হচ্ছিল—চন্দ্রবাবু জলে ডুবে যাচ্ছেন—তিনি তাঁকে উদ্ধার করতে এসে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তিনিও জলে যাচ্ছেন। তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না। পঙ্গু হয়ে গেছেন।

তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন রামজয় পণ্ডিত। পণ্ডিত শ্মশানে গিয়েছিলেন—সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন বাড়ী কিন্তু বাড়ীতে থাকতে পারেন নি, থাকতে চেষ্টা করেও পারেন নি—এই প্রায় মধ্যরাত্রে উঠে এসেছেন চন্দ্রকে দেখতে।

রামজয় এসে পাশে বসে চন্দ্রভূষণের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন—চন্দ্র—চিতা মৃতকে ভস্ম করে, আমরা কলসীর জলে বঙ্গমার চিতা নিভিয়ে এসেছি; চিন্তা—শোক —জীবন্তকে দগ্ধ করে, অন্য জলে নেভে না, ওকে চোখের জলে নেভাতে হয়। তুমি একটু কাঁদ চন্দ্র।

ব্রজবিহারী বাবু সুযোগ পেয়ে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কান্না ত আসছে না রামজয়! আর আমি কি কাঁদতে পারি? মৃত্যু অনিবার্য্য, শোক মিথ্যা; আমি শিক্ষক, আমি জ্ঞানের তপস্বী, আমি কি করে কাঁদব—এই এত ছেলে যারা আমার কাছে শিক্ষা পেতে এসেছে, এরা ভবিষ্যতে শোকে দুঃখে যে তা হলে বানের মুখে কুটোর মত ভেসে যাবে। আর—

কথা বন্ধ করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেছিলেন—কান্না নাই। কান্না আসছে না।

রামজয়ও এবার স্তব্ধ হয়েছিলেন।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—অগস্ত্য ঋষির গল্প বল তুমি। রামজয়, জ্ঞান আমার চোখের জলের সমুদ্র অগস্ত্যের মত নিঃশেষে পান করে নিয়েছে।

রামজয় বলেছিলেন—তুমি দীক্ষা নাও চন্দ্র।

—দীক্ষা?

—হ্যাঁ। হিন্দুর সন্তান, দীক্ষা নাও। তুমি পাবে।

—পাব? মানে বলছ—

—ভগবানের দয়া।

উত্তর দেন নি চন্দ্রবাবু। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে থাকতে থাকতে বলেছিলেন —ওঃ কালপুরুষ নক্ষত্রের পিছনে লুব্ধকটা জ্বলছে দেখ! ডগ-স্টার!

তার পর বলেছিলেন—ওই হ'ল কর্কট। দাঁড়াটা দেখছ? ওরই পাশে সিংহ। ওই তুলা।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—রাত্রির আকাশের দিকে তাকালে ঈশ্বরকে না মেনে উপায় থাকে না।

এর পর তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। মহাকবির কাছে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন—আমি শোকার্ত্ত। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। বিশ্বসংসার শূন্য। সান্ত্বনা কিসে আমাকে বলুন।

মহাকবি তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—আনন্দের ধ্যানে।

—আনন্দের ধ্যানে? কিন্তু আনন্দকেই যে আমি হারিয়েছি।

মহাকবি বলেছিলেন—যাঁর সৃষ্টিতে রূপ রস সঙ্গীত কোমলতা মিষ্টতার শেষ নাই—তিনিই আনন্দ। তাঁর ধ্যানেই শোকও মধুর হয়ে ওঠে, শূন্য পূর্ণ হয়।

ওখানেই উপাসনা-মন্দিরে তিনি মহাকবির উপাসনা শুনে এসেছিলেন। গান শুনেছিলেন—

মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হ'ল শেষ।

আর শুনেছিলেন—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু!

ফিরে আসবার সময় মহাকবিকে প্রণাম করে বলেছিলেন—আমি পেয়েছি।

মহাকবি বলেছিলেন—তাঁকে ধ্যান কর। সব বেদনা ওই ধ্যানেই বিগলিত হয়ে আনন্দে পরিণত হবে। পাহাড়ের মাথায়—বরফ হিমশীতল; মৃত্যুর স্পর্শ তাতে। সেই বরফ গলে জলধারা হয়ে নামে, সে তখন সাক্ষাৎ জীবন। নিজের বেদনাকে আনন্দের ধ্যানে বিগলিত করো।

ফিরে এসে সেই দিন থেকে তিনি এই পূজা করেন। উপচার নেন না, উপকরণ নেন না। শুধু বসে ধ্যান করেন। মনে মনে বলেন—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।

পূজা শেষ করে আহারান্তে আবার যান ইস্কুলে।

সন্ধ্যায় নিজে বসে উপাসনার আসর পরিচালনা করেন। তারপর বোর্ডিঙের প্রতি ঘরে ছাত্রদের কাছে গিয়ে হেসে বলেন—কি অনুপপত্তি বল!

ছেলেদের 'অনুপপত্তি'র গল্প জানতে বাকী নেই। চন্দ্রবাবুই বলেন—প্রায়ই মধ্যে মধ্যে 'বুনো রামনাথের' কথা বলেন।

ছেলেরা মিলিয়ে পায় ওই গল্পের সঙ্গে চন্দ্রবাবুর জীবন।

চন্দ্রবাবু মাইনের সব টাকাই ছাত্রকল্যাণে ব্যয় করেন। নিজের জন্য বরাদ্দ মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা।

হঠাৎ সেদিন।

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাস। সেদিন শনিবার। চন্দ্রবাবু ডাকলেন—রমণ।

রমণ—রাধারমণ ইস্কুলের চাকর। কেষ্ট চলে গেছে। তার জায়গায় রমণ এসেছে। রমণ এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রবাবু বললেন—যাও, এই নোটিশ সব ক্লাসে ঘুরিয়ে নিয়ে এস।

ইস্কুলের ছুটির শেষে সব ছাত্রকে হলে সমবেত হতে হবে। চন্দ্রবাবু কিছু বলবেন।

চন্দ্রবাবুর মুখ থমথম করছে। এ তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না, এ তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না—ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছে।

দরখাস্ত করেছে—বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে তারা বিজ্ঞানবাদে বিশ্বাসী। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চন্দ্রবাবু ইস্কুলের হিতাকাঙ্ক্ষী স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি হলেও সেকালের মানুষ। একদিকে তিনি গোঁড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী ধার্ম্মিক—অন্য দিকে তিনি প্রায় ডিক্টেটারের মত অটোক্র্যাট। প্রতিটি ছাত্রকে তিনি ইস্কুলের প্রথমেই হিন্দুমতে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠে বাধ্য করেন। কেউ আপত্তি জানালে তাকে শাস্তির ভয় দেখান। তাঁর ভয়ে আমরা আমাদের বিশ্বাসমত চলতে পারি না। ভারতবর্ষ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে ধর্ম্মের এই কঠোর অনুশাসন অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। অতএব আমাদের প্রার্থনা—ইস্কুলের প্রারম্ভে প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় এই নির্দ্দেশ দেওয়া হউক।

এ দরখাস্তের ভাষা তাঁর পরিচিত। লেখক কে তা তিনি জানেন।

সীতেশ এ দরখাস্তের লেখক। সীতেশ তাঁরই ছাত্র। এখান থেকে কিছু দূরে তার বাড়ী। সীতেশ কৃতী ছাত্র। এখন এখানকার এসিস্টাণ্ট হেড মাষ্টার। তিনিই তাকে এখানে এনেছেন। কিছুদিন আগেও তিনিই তাকে রাজনৈতিক আবর্ত্তের সংঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি জানেন। সীতেশই যে ছেলেদের মধ্যে এই নিরীশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক তা তিনি জানেন। ছেলেদের নিয়ে সে ছুটির পর আজ এখানে কাল ওখানে সভা করে বেড়ায়—তা তাঁর অবিদিত নয়। এই সংগঠনের নাম ময়দান ক্লাব।

এই ময়দান ক্লাব যখন সীতেশ প্রথম তৈরি করে তখন তিনি এটা কল্পনা করেন নি; তিনি উৎসাহিত করেছিলেন।

হঠাৎ সব প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সেদিন—এই দিন পনের আগে রামজয় তাকে বলে

গিয়েছিলেন। রামজয় অনেক দিন ইস্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন। তবু মধ্যে মধ্যে রামজয় আসেন। ইস্কুলের বর্তমান হেড পণ্ডিত রামনাথ সেও এখানকার ছাত্র; বি-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ—রামজয়ের ভক্ত এবং দীক্ষায় তার শিষ্যও বটে। রামজয় পুত্রহীন, তার দৌহিত্রেরা যজমানদের সাধারণ কাজগুলি চালায় বটে কিন্তু বিশেষ ক্রিয়া তাদের দিয়ে হয় না; তখন রামজয় নিজে যান। বেশী দূরের জায়গা হলে রামনাথকে পাঠান। রামনাথ রামজয়ের কাজ করে আসে, রামজয় রামনাথের ইস্কুলের কাজ চালিয়ে যান। গত বার রামনাথ কঠিন রোগে প্রায় ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিল, রামজয় ছয় মাস তার কাজ করে দিয়েছিলেন। পনের দিন আগে রামজয়ের এক শিষ্যের বাড়ীতে বিশেষ একটি ক্রিয়াতে রামজয় রামনাথকে পাঠিয়ে নিজে দিনতিনেক পড়িয়ে গেছেন। শেষ দিন বলে গেলেন—আমি আর আসব না চন্দ্র। তুমিও এবার সর। মানে মানে সরে পড়। আমার কথা শোন।

হেসে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কেন?

—মানে ভগবানের রাজ্য গেল এইবার ভূতের রাজ্য হ'ল—ভূত নয় চন্দ্র প্রেত। সরে পড়। সরে পড়। আমি তাই আজই সরলাম—আর কোনদিন আসব না হে। রামনাথের সাহায্য নিয়ে যজমানি চালাতে হলে আসতে হবে সুতরাং যজমানিও শেষ।

—কি হ'ল?

—সীতেশকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার প্রিয় ছাত্রকে।

বলেই রামজয় চলে গিয়েছিলেন। সীতেশকে ডাকতে হয় নি; সীতেশ নিজেই এসেছিল—চারটি ছাত্র নিয়ে। মিন্টু, জীবেন, সরোজ, দ্বিগেন। তাদের হাতে এক দরখাস্ত।

—এরা এসেছে সার একটা দরখাস্ত নিয়ে।

—কিসের দরখাস্ত?

—পণ্ডিতমশায়ের সম্বন্ধে এরা কিছু বলতে চায়।

—রামজয় সম্পর্কে?

—হ্যাঁ। ওদের যাচ্ছেতাই বলেছেন। জীবেন একটা কবিতা লিখেছিল—তাই পড়ে—

জীবেনের খাতায় সংস্কৃতের টাস্ক দেখতে গিয়ে পণ্ডিত কবিতাটি পেয়েছিলেন। কবিতাটি পড়ে বলেছিলেন—অ বাবা গোপাল—অ মাণিক, জীবেনচন্দ্র—

—আমাকে বলছেন সার?

—বলছি আমার ভোজপুকুরের হেয়াদ করে—তোমার ছাপার পুরুষের মুখে ছাই দিয়ে—হ্যাঁ বাবা বরাহগোপাল এ কোন পচা বিলের শালুক তুলেছ বাবা? এঁ্যা? এ কি? বলে নিজেই পড়েছিলেন—

> জারুজালেম মক্কা কাশীর মন্দিরচূড়া
> গির্জের চূড়া মসজিদের মাথা
> কাঁপছে—থর থর কাঁপছে—
> মানুষ জেগেছে—মাতন লেগেছে
> তারা হৈ হৈ করে চাপছে
> ও চূড়ার মাথায়।
> ভাঙবে—চুরমার করে ভাঙবে—
> ওগুলোর ভিতরের কদর্য অনাচার
> ভণ্ডামি আর বিশ্বের সেরা মিথ্যা—
> ঈশ্বর—যার অস্তিত্ব
> ওগুলোর অন্ধকারের ছায়াবাজিতে
> সে উড়ে যাবে—উপে যাবে।
> বাজাও দামামা। পোড়াও ক্রশ।
> ভাঙো, চুরমার কর পুতুল।
> ফুঁ দিয়ে ওড়াও মিথ্যে।

আর তিনি পড়তে পারেন নি। রাগে অধীর হয়ে খাতাখানা আছড়ে ফেলে দিয়ে জীবেনকে যা মুখে এসেছে তাই বলেছেন।

জীবেনের প্রপিতামহ করত গুরুগিরি। পিতামহ করত পুরুতগিরি। বাবা পুরুতগিরিও করে, চাকরিও করে। জীবেনের বাপও রামজয়ের ছাত্র। তাই বাপ-পিতামহ প্রপিতামহ তুলে বলেছেন—ওরে বেটা—ওই ভণ্ডামি, ওই মিথ্যাচারের অন্নেই যে তোর পেট ভরে রে বরাহ।

জীবেন বলেছিল—তাই ত আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না ভেতরের কথা।

রামজয় আর একবার গালিগালাজ করে উঠে চলে এসেছেন। হাত ধুয়ে লাইব্রেরী হয়ে ইস্কুল থেকে চলে গেছেন। এখন ছেলেদের দরখাস্ত—রামজয় পণ্ডিত যেন আর এ ভাবে ইস্কুলে না আসেন। তিনি অক্ষম বৃদ্ধ, পড়াতে পারেন না। তার উপর তিনি পড়ান না, শুধু গল্প করেন।

দরখাস্তখানা পড়ে চন্দ্রবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র যেন ফেটে যাবে বলে মনে হ'ল। বজবালার মৃত্যুর পর ক্রোধ তাঁর হয় নি। এই প্রথম।

চন্দ্রবাবু দরখাস্তখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

—যাও। তোমরা যাও।

ছেলেরা চলে গিয়েছিল। সীতেশ ছিল।

—সীতেশ।
—স্যার।
—এ দরখাস্ত তোমার লেখা?
—হাঁ স্যার। ওরা আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ করেছিল। আমি উচিত মনে করেছিলাম। কারণ ছেলেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। আপনার জানা উচিত।

তার পরদিন থেকেই তিনি লক্ষ্য করছেন জীবেনদের দল স্তোত্রপাঠের সময় থাকে না। স্তোত্রপাঠ শেষ হবার পর ইস্কুলে ঢোকে।

দিনতিনেক পর তিনি ওদের ডেকেছিলেন। আসতেই প্রশ্ন করেছিলেন—তোমরা দেখি স্তোত্রপাঠের সময় থাক না, কেন জীবেন?

—আসতে দেরি হয়ে যায়, স্যর।
—সকলেরই? এবং আগে হ'ত না—হঠাৎ হতে লাগল?

চুপ করে ছিল সকলে। ঠিক এই সময়ে সীতেশ পাশের ভূগোলের ম্যাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিল—স্পীক আউট! সত্য কথা বল!

জীবেন এবার বলেছিল—ভাল লাগে না।
—ভাল লাগে না?
—হোয়াট?
—আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মেও না।
—কিন্তু এ ইস্কুলে স্তোত্রপাঠের নিয়ম কম্পালসারি। ইংরেজ আমলেও বন্ধ করতে পারে নি।
—ইংরেজের সে অধিকার ছিল না। আমাদের আছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রবাবু।

সীতেশ বলেছিল—বেশ ত তোমরা এস, ইচ্ছে হলে চুপ করে থেকো। নয় ত ক্লাসে বসে থেকো।

—নো। স্তোত্রপাঠ না করলে এ ইস্কুলে পড়া হবে না। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্ড। গো।

ছেলেরা চলে যেতেই তিনি সীতেশকে বলেছিলেন—তোমার ময়দান ক্লাব তুমি বন্ধ কর।

—বন্ধ করব?
—হ্যাঁ।
—না স্যার তা আমি করব না।

সীতেশ চলে গিয়েছিল।

তার পর এই দরখাস্ত। উপর থেকে দরখাস্তখানি পাঠানো হয়েছে তাঁর মতামতের জন্ম। না—কৈফিয়তের জন্ম।

এ দরখাস্তও সীতেশের লেখা। এতেও লেখা আছে—চন্দ্রবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি গোঁড়া ধার্ম্মিক। ইস্কুলের কোন ছেলেই প্রার্থনা-সভায় যেতে চায় না। কিন্তু তাঁর কঠোর শাসন ডিক্টেটরশিপের নামান্তর।

বসন্তের হাতে নোটিশ দিয়ে মাথা ধরে তিনি বসে রইলেন।

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

টক্‌টক্‌ শব্দে ঘড়িটা চলছে।

ঢং শব্দে একটা বাজল।

—মাষ্টারমশাই!
—কে?
—আমি স্যার বসন্ত।
—বসন্ত!
—হ্যাঁ স্যার। আপনি এখনও স্নান করেন নি, খান নি!
—আজ ছুটির পরই ছেলেদের ডেকেছি। আজ দেড়টায় ছুটি।
—আজ থাক স্যার।
—থাকবে? কেন?
—হ্যাঁ স্যার। মনে হচ্ছে গোলমাল হবে।
—গোলমাল?
—হ্যাঁ স্যার। আমার অনুরোধ আজ থাক।
—না। থাকবে না বসন্ত।
—স্যার।
—না—না—না। তুমি বলছ ওরা আমার কথা শুনবে না?

সীতেশ ঘরে ঢুকল।

—না স্যার। ওরা আপনার কথা শুনবে না। ওরা ষ্ট্রাইক করবে।

—অলরাইট।

উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রবাবু। দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে হলে দাঁড়ালেন—তার পর চলতে সুরু করলেন—সঙ্গে সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন—গুড বাই বয়েজ, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। আই সাবমিট মাই রেজিগনেশন। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমি ঈশ্বর মানি—তোমরা ঈশ্বর মান না—তোমাদের শিক্ষা দেবার শক্তি আমার নেই। গুড বাই। গুড বাই। টলছেন তিনি, গলা কাঁপছে।

গোটা ইস্কুলটা স্তম্ভিত।

সীতেশ যেন কেমন হয়ে গেল।

বসন্ত নির্ব্বাক। যখন তার কথা সে খুঁজে পেলে তখন সে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে ডাকলে—মাস্টারমশাই!

দীর্ঘ পদক্ষেপে টলতে টলতে চন্দ্রবাবু তখন পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। সামনের দিকে।

—মাষ্টারমশাই! মাষ্টারমশাই!

পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন চন্দ্রবাবু। কর্ম্ম তাঁর শেষ হয়েছে। বিড়বিড় করে কি বললেন—যেন বললেন—

—বন্দে মা! বন্দ্বালা!

সমাপ্ত

ভুবনেশ্বরে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেন এসে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে থামল। মালপত্র এবং জিনিষ নামানোর পালা সাঙ্গ হতে না হতে কে কে মোট বইবে তা নিয়ে কুলিদের দ্বন্দ্ব সুরু হ'ল। যাই হোক, মোট-বহন সমস্যার যদি বা সমাধান হ'ল, রিক্সাওয়ালারা আবার 'রণং দেহি রব' ঘোষণা করলে। গরীব ওরা। দুটো বেশী পয়সা বাঙালী বাবুদের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে, এই নিয়েই ওদের যত বাগবিতণ্ডা। চারখানা রিক্সা করে আমরা কোন ক্রমে ষ্টেশনের গণ্ডী পার হলাম। ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার রাজধানী হয়েছে। তা ছাড়া এটি একটি নামকরা তীর্থস্থানও বটে। কিন্তু ষ্টেশনের কোথাও পারিপাট্য বা আভিজাত্যের ছাপ নেই। ভুবনেশ্বরের নামের গরিমার সঙ্গে ষ্টেশনের সামঞ্জস্য নেই। আলোগুলি এত ক্ষীণ যে, সমস্ত ষ্টেশনটাই যেন কালো কালো আবছায়াতে ঢাকা।

বিন্দু-সরোবর

চলেছি রিক্সায়, পিছনে ফেলে রেখে 'ক্যাপিটাল'। ক্যাপিটালের বিজলীবাতিগুলি দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন আকাশের উজ্জ্বল তারা—সত্যিই অন্ধকার রাত্রে ভারি সুন্দর লাগে এ দৃশ্য। আমাদের গন্তব্য স্থান পুরাতন ভুবনেশ্বরের রামকৃষ্ণ মিশন। পথে আলো নেই বললেই হয়। বহু দূরে দূরে এক একটি মিটমিটে বাতি জ্বলছে। মনে হচ্ছে যেন প্রেতপুরীর মধ্য দিয়ে রিক্সা চলেছে। দু'একবার রিক্সাওয়ালারা পথের বাঁকে আসল পথ ছেড়ে পাশের নালার উপর দিয়ে রিক্সা চালিয়ে ফেললে অন্ধকারে। রিক্সা উল্টে যায় নি এটা ভাগ্য বলতে হবে।

রাত্রি প্রায় আটটার কাছাকাছি, রামকৃষ্ণ মিশনের গেষ্ট হাউসে আশ্রয় লাভ করলাম। নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা সঙ্গেই ছিল। এখানকার মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে আমাদের শয়নের অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধান করে গেলেন।

পরের দিন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙতেই ভুবনেশ্বর ষ্টেশন ছেড়ে পুরীর পথে অগ্রসর পুরী এক্সপ্রেসের হুস হুস শব্দটাই সর্বপ্রথম কানে এল। চোখে পড়ল, জানালার ফাঁক দিয়ে মিশনের বাগানের সারি-বাঁধা নাগেশ্বর ও নাগলিঙ্গম গাছগুলি। এ বাগানের অনেক গাছই

লিঙ্গরাজের মন্দির

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বহস্তরোপিত। পুন্নাগ, কাঞ্চিনা প্রভৃতি গাছগুলি স্বামীজী দক্ষিণ ভারত হতে সংগ্রহ করে সযত্নে এই বাগানে রোপণ করেছিলেন। স্থানটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে তিনি প্রায়ই ভুবনেশ্বরের মিশনে অবস্থান করতেন। গেষ্ট-হাউসটি বলাঙ্গীরের মহারাণীর দান। এক সময় এটি তাঁর স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল। বহির্বাটীতে তাঁর মেমসাহেব গভর্নেস বাস করতেন। এখন এটিও অতিথি অভ্যাগতদের বাসস্থান রূপেই মিশন-কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

সেবাশ্রমের পরিবেশটি চমৎকার। বাগান-ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ী। থরে থরে ফুল ফুটে রয়েছে নানান রকমের। ইউক্যালিপটাস গাছ, ঝাউচারা, আম্রকুঞ্জ, আতাগাছ, শ্রীফলবৃক্ষ, আরও কত কি। সকালে গুন গুন গান করতে করতে ব্রহ্মচারী মহারাজেরা পুষ্পচয়ন করছেন।

প্রস্তরনির্মিত লাল রঙের গেষ্ট হাউসটি, দু'পাশে তিনখানা করে দু'খানা ঘর নীচে। দু'খানা ঘর উপরে। মাঝে হলঘর। সেখানে দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে মহাপুরুষদের বড় অয়েল পেন্টিং, মেঝের বসানো আছে মার্বেল পাথরের বড় গোল টেবিল; তার উপরে সুবৃহৎ আলোর সেজ। মেঝেটিও মর্ম্মরমণ্ডিত।

স্বামীজী বললেন, 'কেদার-গৌরীকুণ্ডে স্নান করে লিঙ্গরাজের পূজো করাই শ্রেয়ঃ।' বেরিয়ে পড়লাম কেদার-গৌরীকুণ্ডের উদ্দেশে। অভিজাত ক্যামেরা সঙ্গে নিলে, আমরা নিলাম জলের পাত্র, দুধকুণ্ডের জল আমব, ও জলের দুগ্ধমী শক্তি সর্বজনবিদিত।

কেদার-গৌরীকুণ্ড ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বোত্তর কোণে প্রায় আধ মাইল দূরে। এটি একটি পাথরে বাঁধানো নৈসর্গিক প্রস্রবণ। দক্ষিণ দিকে স্নানের জন্য পাষাণ-সোপানশ্রেণী, প্রস্তরনির্ম্মিত একটা বাঘের মুখ দিয়ে জল গৌরীকুণ্ডে বয়ে পড়ছে। সেই জল কেদার কুণ্ডে আসছে আর সেইখানেই জনসাধারণের স্নানপর্ব্ব সমাধা হচ্ছে। এই কুণ্ডের তলদেশেও প্রস্রবণ আছে। জলের রং দুধে নীল, জল সুশীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। শিবপুরাণের মতে গৌরীদেবী স্বহস্তে এই কুণ্ড খনন করেন। কপিলসংহিতা বলেন, এই কুণ্ডের জল পান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কুণ্ডের তীরে কেদারেশ্বর শিবের মন্দির ও গৌরীদেবীর মন্দির আছে। গৌরীদেবীর মন্দিরটি লাল পাথরের এবং স্থাপত্য-শিল্প-সম্ভারে সমৃদ্ধ। কেদারেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন। এর গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর। প্রবেশ-

বহু বাহুবিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি
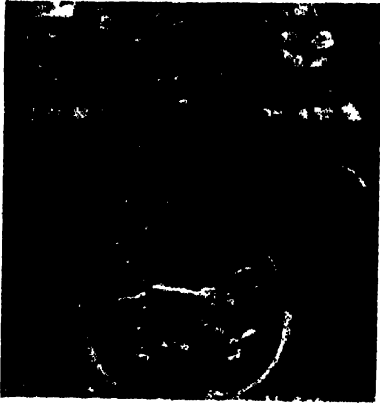
দ্বারের চৌকাঠের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। গৌরী-মন্দিরে উৎসব হয় শীতলা ষষ্ঠীর দিন। তখন ভুবনেশ্বরের বিজয়মূর্ত্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে গৌরীদেবীকে বিবাহ করতে আসেন। আনন্দে অবগাহন স্নান সারা হ'ল। সত্যই কুণ্ডটির জলের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। স্নান করে উঠতেই পাণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ। সে আক্রমণ হতে অব্যাহতি পেয়ে ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরের দিকে যাত্রা করলাম শিব-পার্ব্বতীকে প্রণাম করে।

পথে বিন্দুসরোবর পড়ল। বিন্দুসরোবরের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীটি এই :—শিব-শম্ভু পৃথিবীর সকল তীর্থ-সলিল বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ করে অসুর-নিধনে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পার্ব্বতীর তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য এই বিন্দুসরোবরের প্রতিষ্ঠা করেন। মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা শৈলবিদারণপূর্ব্বক প্রথমে একটি বাপী প্রকাশ করেন। এটি শঙ্কর বাপী নামে খ্যাত। কিন্তু পার্ব্বতী দেবী কোন প্রতিষ্ঠিত সরোবর হতে জলপানের অভিলাষ প্রকাশ করায় এই বিন্দুসরোবরের প্রতিষ্ঠা হয়। অনন্ত বাসুদেব ক্ষেত্রপাল রূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে বাস করেন। পশ্চিম তটে মঠ শিবালয় শোভা পাচ্ছে।

সরোবরের মধ্যেও একটি মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রায় সময় ভুবনেশ্বর ঠাকুরের সুবর্ণ-বিগ্রহকে চতুর্দ্দোলা বা মণিবিমানে চড়িয়ে নৌকাযোগে বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রতিদিন বহন করে এনে জলমধ্যস্থিত মন্দিরে স্নান, বিহার ও অর্চনাপর্ব্বের সমাধা করা হয় —এই সকল অনুষ্ঠান চলে বাইশ দিন ধরে। বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে তিনশ' ফুট, প্রস্থে সাতশ' ফুট এবং এর গভীরতা প্রায় ষোল ফুট।

রাজারাণীর মন্দির
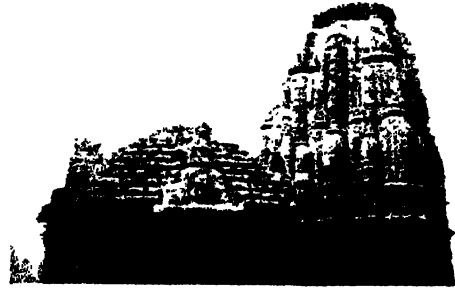
রাস্তার উপরেই অনন্তবাসুদেবের মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন এবং শিল্প-নৈপুণ্যের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন। বিমান, জগমোহন নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ এই চার অংশে মন্দিরটি বিভক্ত। গর্ভ-গৃহে একটি বেদীর উপর দণ্ডায়মান অনন্ত, সুভদ্রা ও বাসুদেব এই তিনটি মূর্ত্তি। অনন্তদেবের মূর্ত্তির মাথায় সপ্তফণাযুক্ত সর্প। দক্ষিণ হস্তে হল ও বামহস্তে মুষল। গর্ভ মন্দির অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রদীপের শিখাও মূর্ত্তিদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মন্দিরগাত্রে ভট্টভবদেবের শিলালিপি সংলগ্ন আছে। এই শিলালিপি অনুসারে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মন্দিরটি একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। আবার কারও কারও মতে মন্দিরটি অনঙ্গ ভীমদেবের কন্যা হৈহয়রাজবধূ চন্দ্রিকা দেবী বা চন্দ্রা দেবীই নির্ম্মাণ করান। মন্দিরটি দর্শন করে যেমন আনন্দ পেলাম, দুঃখ পেলাম তেমনি এর অব্যবস্থা দেখে।

অনন্ত বাসুদেবকে প্রণাম করে লিঙ্গরাজের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে দুটি ত্রিতল প্রস্তরনির্ম্মিত ধর্ম্মশালা পড়ল। এদের মধ্যে দুধওয়ালা ধর্ম্মশালাটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মশালা পার হতেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের প্রস্তর-প্রাচীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে যুগে মন্দিরকে সুরক্ষিত করার জন্য তার চতুষ্পার্শ্বে দুর্ভেদ্য প্রাচীর-বেষ্টনী নির্ম্মাণ করা হ'ত, নতুবা বিধর্ম্মীর আক্রমণে সে মন্দির বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য সুদৃঢ় পাষাণ-প্রাকার থাকা সত্ত্বেও কালাপাহাড়ের নিষ্ঠুর হস্ত হতে উড়িষ্যার খুব কম মন্দিরই পরিত্রাণ পেয়েছিল। লিঙ্গরাজের মন্দিরেও কালাপাহাড়ের বিধ্বংসী হস্তের ছাপ জাজ্বল্যমান। অনেকগুলি মূর্ত্তির হস্ত, পদ বা মস্তক বিনষ্ট হয়ে গেছে। কালের সুল হস্তাবলেপেও হয়ত কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে

থাকবে। তবুও একথা অনস্বীকার্য্য যে, উৎকীর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে শিল্পীর সাধনা এমন ভাবে বিধৃত হয়ে আছে যে, লিঙ্গরাজ মন্দির আজ প্রায় আটশ' বছর পরেও কলিঙ্গ-স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে বিদ্যমান।

বিশাল সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রহরারত দুটি সিংহমূর্ত্তি। ভেতরে প্রবেশ করেই চোখে পড়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তার দক্ষিণে, বামে, সম্মুখভাগে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের মন্দির। লিঙ্গরাজের মন্দিরটিই প্রধান। মন্দিরের গর্ভ গৃহে বসুধা বিদীর্ণ করে উত্থিত ভুবনেশ্বর মহাদেব বিরাজ করছেন। মস্তকে তাঁর ব্রহ্মা, নাভিদেশে বিষ্ণু, পাদদেশ বিধৌত করে প্রবাহিত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। পাণ্ডাঠাকুর এই রূপই বললেন। তিনি কয়েকটি চিহ্নও দেখালেন সঙ্কীর্ণ জলধারায়। মন্দিরচত্বরে নাটমন্দিরের পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের বিশাল বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট। পাণ্ডাঠাকুর এখানে একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করলেন। বৃষটি তিনটি পদ তুলে আছে। চতুর্থ পদ তুলে দাঁড়াবে কলিযুগের শেষে। বৃষটি তখন বিন্দুসরোবরের জল পান করবে, লিঙ্গরাজকে পিঠে নিয়ে প্রলয়-তাণ্ডবে সারা পৃথিবী ধ্বংস করে আবার নূতন সৃষ্টির সূচনা করবে। অবশ্য বৃষের পা তিনটি একটু তোলা বটে, শয়ন করেছিল, উত্থানের উদ্যোগ করছে—এই ভঙ্গিমাতে স্থপতি এটিকে স্থাপন করেছেন। পাণ্ডাঠাকুরের মুখে মৃদু হাসি এবং কথায় দৃঢ় বিশ্বাসের আভাস। তাই তর্ক পরিহার করে মন্দিরের দিকে চোখ ফেরালাম।

রাজারাণী মন্দিরের শিল্প-সুষমা

ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চতায় প্রায় একশ' পঁয়ষট্টি ফুট। পশ্চিম দিকের চত্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শিবালয় আছে। পাণ্ডাঠাকুরের কথায় একটি কুড়ি ফুট উচ্চ মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। এটি নাকি মূল মন্দির অপেক্ষাও প্রাচীনতম। এটির গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট নিম্নে। পাণ্ডাঠাকুরের মতে এইখানেই আদি লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। পশ্চিম কোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির, অপর পার্শ্বে গোপালিনীর মন্দির। লিঙ্গরাজের মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগ-মণ্ডপ। তৎপশ্চাতে পর্য্যায়ক্রমে নাটমন্দির, জগমোহন, মূলমন্দির ও গর্ভগৃহ। জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদের মত চূড়াকার, উচ্চ চারিটি সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ দ্বারা বিধৃত। এটির দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের বাম পার্শ্বে চতুরস্রগৃহে পিত্তলময়ী অর্চ্চা মূর্ত্তিগুলি রক্ষিত। এগুলি ভুবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্ত্তি।
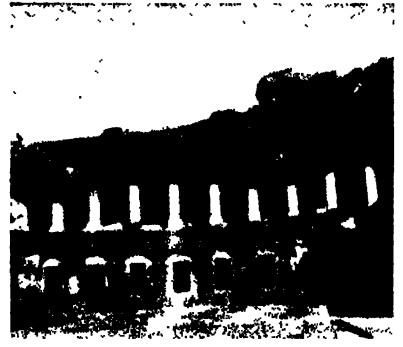
রাণীগুম্ফা, উদয়গিরি

মন্দিরের একপার্শ্বে রামায়ণের, অপর পার্শ্বে মহাভারতের ঘটনাবলী খোদিত। দক্ষিণে গণেশমূর্ত্তি। এটিও শিল্পনৈপুণ্যে অপূর্ব্ব। এত বড় সিদ্ধিদাতা মূর্ত্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। উত্তর দিকের পশ্চাদ্‌ভাগে নিম্নপার্ব্বতী মূর্ত্তি বিরাজমানা। এই মূর্ত্তিটি কোণারক হতে স্তনযুগল ও নাসিকা ছিন্ন অবস্থায় ভুবনেশ্বরে আনীত হয়। কালাপাহাড়ের হাতে মূর্ত্তিটি লাঞ্ছিত হয়েছে। তাই মন্দিরের ভেতরে এর স্থান হয়নি, মন্দিরের পিছনের অপ্রধান অংশে অনাদৃত ভাবে পড়ে আছে। অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশলে মণ্ডিত এই মূর্ত্তিটি। এর অঙ্গের অলঙ্করণ আর শাড়ী পরার বিচিত্র ভঙ্গিমা নয়নের পরিতৃপ্তিসাধন করে। এই মূর্ত্তিটি সার্থক শিল্পীর শিল্প-ব্যঞ্জনার ভাবরূপকে মুগ্ধ দর্শকের দৃষ্টিতে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। রাজানুগ্রহ এবং অখণ্ড অবসর না পেলে এরূপ কারুশিল্পের বিকাশ কখনই সম্ভবপর নয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির কেশরী-রাজবংশের যযাতি কেশরী, অনন্ত কেশরী এবং ললাটেন্দু কেশরীর অতুলনীয় কীর্ত্তি।

লিঙ্গরাজের পূজা সেরে বেলা প্রায় এগারটায় সেবাশ্রমে ফিরে এলাম। মধ্যাহ্নে কিছু বিশ্রামের পর বেলা তিনটের সময় রিক্সা করে ছ'মাইল দূরবর্ত্তী উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, পাহাড় দুটি দেখার জন্য যাত্রা সুরু করলাম। লালমাটি ও কাঁকরের রাস্তা। ধূসর প্রান্তর আর শ্যামল বনানী, দূরে দূরে শিশু পাহাড়গুলি যেন আকাশ স্পর্শ করার উদগ্র কামনা নিয়ে সবে হামাগুড়ি দিতে সুরু করেছে। হয় ত কোন এক অনাগত যুগে এরাই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালায় পরিণত হবে। বাঁদিকে ধউলিগিরি দাঁড়িয়ে আছে অশোকের শিলালিপি বক্ষে ধারণ করে। উড়িষ্যার নবনির্ম্মিত রাজধানীর মধ্য দিয়ে রিক্সা চলেছে। মাঝে মাঝে বড় বড় অট্টালিকাগুলি অতিক্রম করে যাচ্ছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এ স্থানটি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য

ছিল। কত নাগ-নাগিনী অবলীলাক্রমে এখানকার বিরাট বিরাট মহীরুহে দোলা খেত। আজ এ নগরী, একটা প্রদেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্র। ক্যাপিটালের পরেই এরোড্রোম অতিক্রম করা গেল। এবার আবার প্রকৃতির হাতছানি। কিছুক্ষণ পরে পথের ধারে একটি কুণ্ড নজরে পড়ল। রিক্সাওয়ালারা বললে, এর নাম ভীম-কুণ্ড। ভীম একাদশীতে এখানে বড় মেলা বসে। আরও মাইল দুই অতিক্রম করে আমরা বৌদ্ধ জৈন যুগের গৌরববাহী উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে উপনীত হলাম। দু'ধারে দুটি পাহাড়। মাঝে রাস্তা। এই রাস্তা চলে গেছে কটক ও পুরী পর্যন্ত। এই রাস্তাই দুটি পর্ব্বতের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান। পর্ব্বত দুটির পূর্ব্বনাম কুমার পর্ব্বত ও কুমারী পর্ব্বত। পরিব্রাজক হিউ-এন্-সাং তাঁর রোজ-নামচায় পর্ব্বত দুটির এই নামেরই উল্লেখ করেছেন। এখানে এক সময় পুষ্পগিরি সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ ও জৈন যতিরা পঠন, মনন,

উদয়গিরির আর একটি গুম্ফা

নিদিধ্যাসনে ব্যাপৃত থাকতেন। পুষ্পগিরি নামের সার্থকতা আজও উপলব্ধি করা যায়। পাহাড় দুটিতে অজস্র পুষ্প থরে থরে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। কেউ কেউ মনে করেন, অশোকের গুরু উপগুপ্তও এই পর্ব্বতের গুহাতে যোগসাধনা করেছিলেন। দুটি পর্ব্বতেই ছোট বড় সুন্দর সুন্দর অনেক গুহা বা গুম্ফা আছে। এদের মধ্যে বৈকুণ্ঠ গুম্ফা, ব্যাঘ্র গুম্ফা, সর্পগুম্ফা, তত্ত্বগুম্ফা, অনন্তগুম্ফা, দুর্গা-গুম্ফা, গণেশগুম্ফা নির্ম্মাণ-কৌশলে সমধিক প্রসিদ্ধ। কয়েকটি গুহাতে পালি ভাষায় সুপ্রাচীন শিলালিপি ক্ষোদিত আছে। গুম্ফা-গুলির প্রশান্তি ও অখণ্ড স্তব্ধতা যোগসাধনার পক্ষে একান্ত অনুকূল।

উদয়গিরির সবচেয়ে বড় গুম্ফা হ'ল, রাণীগুম্ফা। নামের ইতিহাস কি তা জানি না। কোন সে রাণী যাঁর জীবনালেখ্য পালি-ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বিধৃত হয়ে আছে? কোন সে ভিক্ষুণী যিনি পার্থিব ভোগপ্রাচুর্য্য পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়ে গিরিকন্দরে শিলাসনে পরমার্থচিন্তায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন? কালের যবনিকা সে মহীয়সী মহিলার প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়েছে। তবুও গুম্ফা জেগে আছে। গুম্ফাটি দ্বিতল। উপরে নীচে বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপর হতে নীচে পাহাড়ের স্বাভাবিক জল-ধারাকে পয়ঃপ্রণালীযোগে সুন্দর ভাবে জলসরবরাহ-কার্য্যে লাগানো হয়েছিল। সে চিহ্ন স্থানে স্থানে খণ্ডিত হলেও আজও বিদ্যমান। কতকগুলি গুহার নির্ম্মাণকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী, আবার কতকগুলি আরও অনেক পরেকার।

খণ্ডগিরি

য় কলিঙ্গরাজ খারবেলের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। খণ্ডগিরিতে জৈন সম্প্রদায়ের তিন রকমের তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি নূতন পরিচ্ছন্ন মার্ব্বেল পাথরের মন্দিরে রক্ষিত আছে। এখান-কার দেবসভা গুম্ফার দেবদেবীমূর্ত্তিগুলি এখনও অম্লান। সূর্য্যের আলোক মিলিয়ে যাবার পূর্ব্বে আমরা খণ্ডগিরি হতে নেমে পড়লাম, পিপাসার্ত্ত হয়ে স্থানীয় ধর্ম্মশালার কূপের জল পান করলাম। ধর্ম্ম-শালাটি ভাল। রিক্সাওয়ালাদের তাগিদে আর অধিকক্ষণ থাকা সম্ভব হ'ল না, তাই উদয়গিরি, খণ্ডগিরি পশ্চাতে ফেলে রেখে পুরাতন ভুবনেশ্বরের দিকে যাত্রা শুরু করতে হ'ল।

পরের দিন প্রত্যুষে মুক্তেশ্বর ও রাজারাণীর মন্দির দেখার জন্য যাত্রা করলাম। আজই দ্বিপ্রহরে নীলাচলে নীলমাধব দর্শনে চলে যেতে হবে। এখানে মন্দিরের প্রাচুর্য্য লক্ষণীয়। এখানকার আনাচে কানাচে সাড়ে সাতশ মন্দির-কেশরী রাজবংশের আমলে বৌদ্ধ-জৈনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পাণ্ডাদের অত্যুৎসাহে গড়ে উঠেছিল একান্ত রাজানুগ্রহে। আজ তার অধিকাংশ ভগ্ন, কিন্তু তবুও অনেক-গুলি অতীতের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। একদিকে বৌদ্ধদের প্রভাব—অপর দিকে সেই প্রভাবের গর্ব্বকে খর্ব্ব করার জন্য ব্রাহ্মণ-দের অক্লান্ত চেষ্টা। তাই ভুবনেশ্বরে গড়ে উঠল অজস্র মন্দির। বৌদ্ধদের জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মফল—জ্ঞানমার্গের ব্যাপার। সাধারণ মানুষ তা বুঝত না। তবুও তারা মানত বৌদ্ধদের, গ্রহণ করত তাদের ধর্ম্ম। এ যেন গড্ডলিকা। কিন্তু বেশীদিন এ গড্ডলিকা-প্রবাহ চলল না। স্রোত বইল উল্টোদিকে। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। সদ্গুরুকে দক্ষিণা দিলে গুরু

পরিত্রাণ করেন কর্মফল থেকে। লোকে ব্রাহ্মণদের কথায় ভুল করলে। সাধারণকে সংসারী করার জন্তে মন্দিরে মন্দিরে তাই বুঝি প্রেমাভিসারের চিত্র চিত্রিত হ'ল। বৌদ্ধধর্মের উপর সাধারণের আস্থা কমে গেল, হ'ল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান। উদয়গিরি খণ্ডগিরি শুধু স্মৃতি-স্মারণিক হয়ে রইল।

খণ্ডগিরির একটি গুম্ফা

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের প্রবেশ-পথে ওষ্ঠ সধীর আটটি মূর্ত্তি একটি প্রস্ফুট পদ্মের চারিধারে নৃত্যরত অবস্থায় শোভা পাচ্ছে। মন্দিরটি প্রাচীন ও অন্ধকারাবৃত। অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত দেবতাকে আঁধার-যবনিকা তুলে দর্শন দুর্লভ, পূজক অর্থলোভী। তিনি দক্ষিণা কত দেব সেইটে স্থির করতেই অনেকখানি সময় নষ্ট করালেন। যাই হোক, তবু তিনি মন্দিরগাত্রে কয়েকটি দুর্লভ শিল্প-সুষমার নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। একটি মস্তক কিন্তু আট বাহু এবং অনুরূপ পদ-বিশিষ্ট একটি মূর্ত্তিকে তিনি বিভিন্ন ভাবে হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করে চারটি বিভিন্ন মনুষ্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করালেন। এখানকার বহুবাহু-বিশিষ্ট শিবমূর্ত্তি শিল্প-কলায় এক অনুপম নিদর্শন। সময় অল্প, তাই দ্রুতগতিতে মিউনিসিপ্যাল পার্ক অতিক্রম করে রাজারাণীর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক রাজার রাণী বিরাগিণী হয়ে চলে যান। রাজা তাঁর জন্ত এই মন্দির নির্মাণ করান। কথাটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না, তবে মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য যে উচ্চশ্রেণীর এ বিষয়ে ভিন্নমত নেই। প্রস্তরে ফুটে রয়েছে থরে থরে পদ্ম। মিথুনমূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন বিমোহন ভঙ্গীতে

মিউনিসিপাল পার্ক—দূরে মুক্তেশ্বরের মন্দির

দণ্ডায়মান। আবার ঠিক তার পরেই স্নেহময়ী জননী সন্তানকে বক্ষ-সুধা পান করিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করছেন। অশ্বারূঢ়া বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি, বেণীরচনারত চকিত-নয়না বামাকুল, কুণ্ডলীকৃত নাগিনীমূর্ত্তি, অষ্টবসুমূর্ত্তি প্রভৃতি শিল্পের দিক থেকে অনবদ্য অবদান। মানবের জন্মমুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে তার সমগ্র জীবনধারা যেন পাষাণে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় রূপায়িত হয়ে আছে। যেন কোন শিল্পী একান্তে রং তুলি দিয়ে একদিকে মানব-জীবনের উদগ্র কামনা এবং অপর দিকে স্নেহ, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যবিধান করেছেন। মন্দিরটি নিঃসন্দেহে স্থাপত্যশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।*

* প্রবন্ধের আলোকচিত্রগুলি শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত।

বাংলার মহিলা-সাহিত্যিক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

অনেকেরই হয়ত জানা আছে, মাত্র দেড়শ' দু'শ' বছর আগেও আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে—এটা একটা প্রায় বদ্ধমূল সংস্কার ছিল। অবশ্য মেয়েরা লেখাপড়া একেবারেই যে শিখতেন না তা নয়—যেমন, হটী বিদ্যালঙ্কার, ময়মনসিংহ গীতিকার কবি চন্দ্রাবতী প্রমুখ বিদুষী মহিলাদের নাম আমরা জানতে পারি, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। সাধারণ ঘরে দু'-একটি প্রতিভাশালিনী মেয়ে হয়ত কোনক্রমে সামান্য পড়াশোনা শিখতেন, কিন্তু সে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

আমরা ছোটবেলায় 'নারী-শিক্ষা' নামে একখানি বইয়ে "জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন" শীর্ষক একটি লেখায় নিম্নোক্ত কথাগুলি পড়ি—"মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবেক" ইত্যাদি।

ইংরেজ আমলে রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে সমাজে নানা পুরানো প্রথা ও সংস্কারের পরিবর্ত্তন হতে সুরু হ'ল। রাজার মত বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তির চেষ্টায়ই যে বিশেষ ভাবে সমাজ উন্নয়ন বা সমাজের সংস্কার সুরু হয়েছিল একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তার আগে আমাদের দেশের মহিলারা ছিলেন শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন। যখন আমরা বহু সাহিত্যিক মহিলার দানে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ দেখতে পাই, তখন স্বতঃই সেই অন্ধকার যুগের কথা মনে পড়ে যে কালে হয়ত কত প্রতিভা অনাদরে অবলুপ্ত হয়েছে। উপযুক্ত সুযোগের অভাবে বিকশিত হতে পারে নি কত মহিলা-কবির কবিত্বশক্তি।

সেকালে বামাবোধিনী পত্রিকায় অনেক মহিলার রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু প্রথম প্রতিভাশালিনী মহিলা লেখিকা বলতে পারা যায় স্বর্ণকুমারী দেবীকে। ইনি স্বনামধন্যা। মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, শিশুপাঠ্য বই, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয় লিখেছেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভারতী' সম্পাদনার ভারও পরে তিনি নিয়েছিলেন।

এঁর বহু পরে আমরা পেলাম আর একজন মনস্বিনী লেখিকাকে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী বলা যায়—শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে। ইনিও নানা বিষয়ে লেখনী চালনা করেছেন, কিন্তু কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পেয়েছি নিরুপমা দেবীকে। 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'শ্যামলী' ইত্যাদির আর এক প্রতিভাশালিনী প্রখ্যাতা লেখিকা।

অনুরূপা দেবীর অগ্রজা সুরূপা দেবীও ছিলেন একজন সুলেখিকা,—ইন্দিরা দেবী এই ছদ্মনামে লিখিত তাঁর উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য।

১৩১৮ সাল থেকে যেন অকস্মাৎ বাংলা কথাসাহিত্যে বহু লেখিকার আবির্ভাব হতে লাগল। তাঁদের ভাবধারা নূতন, রচনা-শৈলীও অভিনব। তাঁরা সাহিত্য জগতে কতকটা আলোড়নের সৃষ্টি করলেন।

বছর কয়েক পরে বেরুল 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় সংযুক্তা দেবীর 'উদ্যানলতা'। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী দুই বোনে মিলিত ভাবে উপন্যাসখানি লিখেছিলেন। তখন এই উপন্যাস সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের মনে কি কৌতূহলই না জেগেছিল। তখনকার দিনে মেয়েরা এমন নতুন ধরনের প্লট নিয়ে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন নি। কবি কামিনী রায়ের পর যে সকল উচ্চশিক্ষিতা লেখিকার দানে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হয়েছে তন্মধ্যে এঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সে সময়কার লেখিকাদের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়া, আমোদিনী ঘোষ, গিরিবালা দেবী, সরোজকুমারী দেবী ও সরোজ-কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জনের রচনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এঁরা বেশীর ভাগই কথাসাহিত্যেই নাম করেছেন। কিন্তু শুধু কথা-সাহিত্যে নয়, কাব্যসাহিত্যেও মহিলাদের দানের পরিমাণ কম নয়।

গত শত বর্ষের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে বহু প্রতিভাশালিনী মহিলা কবির আবির্ভাব হয়েছে। সেকালের মহিলাদের মধ্যে মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, সরলা দেবী প্রভৃতির নাম সুপরিচিত। বিনয়কুমারী ধর, লীলা দেবী—এঁদের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়েছে, বইয়ের সংখ্যাও কম, তাই এঁদের কাব্যকৃতি আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হতে চলেছে। অবশ্য কবি লীলা দেবীর নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর লীলা-পুরস্কার নামে একটি স্মৃতি-পুরস্কার-দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলা কবিদের মধ্যে কামিনী রায়ের রচনা যেমন বলিষ্ঠ ভাবময় তেমনি চিত্তোদ্দীপক। আলোছায়া, "মাল্য ও বিসর্জ্জন", অম্বা নাটিকা তাঁকে অমর করে রেখেছে। প্রায় তাঁর সমকালীন লেখিকা 'অর্ঘ্য', 'প্রবাহে'র কবি শ্রীমতী সরলাবালা সরকার। ইনি অন্যান্য নানা বিষয়ে আজও লিখে চলেছেন।

আধুনিক কালের কবিদের মধ্যে আমরা পাই বাতায়নের কবি উমা দেবীকে। তিনি ও নিরুপমা দেবী এক সময়ে কাব্যসাহিত্যেও খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। তিনিও এক সময়ে নবপর্য্যায় 'পরি-চারিকা' সম্পাদনা করতেন, এখন বস্তুবরা গ্রাম উদ্যোগ কর্ম্মী। কবি রাধারাণী দেবী অপরাজিতা দেবী এই ছদ্মনামেও অনেক কবিতা লেখেন। পড়লে মনে হয় যেন দুই ভাবে দুই ভঙ্গীতে দুই জন

লেখিকার অপূর্ব্ব কাব্যরচনা। উমা দেবী (রায়), রাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী এঁরাও শক্তিশালিনী লেখিকা। আধুনিক মহিলা কবিদের মধ্যে শ্রীউমা দেবীর রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।

প্রবাসিনী বঙ্গমহিলাদের মধ্যেও আমরা অনেক লেখিকাকে পেয়েছি। পূর্ণশশী দেবী (আম্বালা), প্রতিভা দেবী (এলাহাবাদ), হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী (পাতিয়ালা, হিন্দী লেখিকা), কবি সরোজকুমারী দেবী (সম্বলপুর) প্রভৃতি আরও অনেক প্রবাসিনী সাহিত্য চর্চা করেছেন। বিমলা দেবীও (জয়পুর) কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। এঁর কথিকা ও কবিতা উপভোগ্য।

চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের মধ্যে 'বঙ্গনারী' অনিন্দিতা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। ছদ্মনাম 'বঙ্গনারী' নামে লিখতেন। "আগমনী" নামে এঁর একখানি সুচিন্তিত প্রবন্ধ সংগ্রহ আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী "নারীর উক্তি" নামক পুস্তকখানিতে প্রচুর চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। কবি রাধারাণীও নানা সমস্যা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

পত্রিকা সম্পাদনা ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে থাকেন নি। স্বর্ণকুমারী দেবীর "ভারতী" সম্পাদনার কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তার পরে তাঁর দুই কন্যা সরলা দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবীকেও আমরা ভারতী সম্পাদিকা রূপে দেখতে পাই। "মেয়েদের কথা" নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কল্যাণী দেবী। "জয়শ্রী"র লীলা রায়, "মহিলা"র আশা দেবী, "মহিলা মহলের" কমলা দেবী—এঁরাও পত্রিকা-সম্পাদিকা হিসাবে নাম করেছেন। এই প্রসঙ্গে সেকালের "ভারতমহিলা" "সুপ্রভাত" সম্পাদনাতে কুমুদিনী বসু (মিত্র) ও সরযূবালা দত্তের কথাও স্মরণীয়।

অনুবাদ সাহিত্যেও নারীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—শ্রীমতী পুষ্প বসু, নারায়ণী দেবী প্রমুখ কেউ কেউ। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় আমরা পেয়েছি ডক্টর রমা চৌধুরীকে।

রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' ভ্রমণ সাহিত্যে এক অনুপম সৃষ্টি। শিশু-সাহিত্যে সুখলতা রাও, ইন্দিরা দেবী, লীলা মজুমদারের লেখা স্মরণ করে রাখবার মত।

রন্ধনকলায় পটীয়সী প্রজ্ঞাসুন্দরীর রন্ধনবিদ্যা সম্পর্কিত বইগুলির মধ্যে "আমিষ ও নিরামিষ আহার" প্রভৃতির নাম করা যায়। উপনিষদের অনুবাদে শ্রীমতী চিত্রিতা গুপ্তও এক নতুন পথ দেখিয়েছেন। বহু বঙ্গমহিলা সাহিত্য-শিল্পকলা ইত্যাদি নানা উপচারে বঙ্গবাণীর অর্চনা করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি নি। সরসীবালা বসু, সরসীবালা সিংহ, ইন্দিরা গুপ্ত, হেমনলিনী দেবী, নীহারবালা দেবী প্রভৃতি বহু লেখিকার সুলিখিত রচনা এখনো পুরানো 'ভারতী', 'প্রবাসী' 'পরিচারিকা', 'ভারতমহিলা', 'সুপ্রভাতে'র পৃষ্ঠা'য় পাওয়া যাবে। অতি সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক রচনার ক্ষেত্রে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য।

এযুগের প্রথম কবি কামিনী রায়ের ভাষা'য় বলি—

"আজ মনে আশা জাগে, এক পরম আশা
তোরা শুনে যা আমার আশার স্বপন
শুনে যা আমার আশার কথা।"

এ ছিল তাঁর ভারতের স্বাধীনতার আশার স্বপন।

আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মহিলাদের দানে পুষ্ট হচ্ছে দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে এমন প্রতিভার বিকাশ হবে যা দেশ-কাল অতিক্রম করে ভাস্বর হয়ে নিরবধিকালের মাঝে আসন পাবে।

সাধারণের মধ্যে অসাধারণ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যাঁহাদের ভাগ্যে খ্যাতি জুটে, জনসাধারণের সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা নিতান্ত মুষ্টিমেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের যশঃ ছড়াইয়া পড়ে, তাঁহারা কোনও এক বিশেষ গুণের পরিচয়ে অকস্মাৎ এরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। এরূপ যশের আবির্ভাব-তিরোভাবের কোনও স্থিরতা নাই। যাঁহারা জীবনের শেষ পর্যন্ত এবং মরণের পরেও খ্যাতির অধিকারী হইয়া যান, তাঁহারা ভাগ্যবান।

পরিচয় লাভ করিবার সৌভাগ্য লইয়া অনেকেই হয়ত জন্মায় নাই। কিন্তু এই জনসাধারণের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের স্থানীয় লোক ব্যতীত অপরে কোনও নাম শুনে নাই। কবি টমাস গ্রে "Elegy" কবিতায় ইঁহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ মহত্ত্বের যে সকল বীজ হয়ত সাধারণ লোকের মধ্যে খুব বেশী থাকে, কতক সুপ্ত, কতক প্রকাশিত, কিন্তু ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ বলিয়া নাম-প্রচার যে পরিমাণ হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ত্যাগ, সংযম প্রভৃতি গুণের পরিমাণের তুলনাই হয় না। ডবলিউ. ভি. চ্যানিং বলেন :

"Among common people will be found more of hardship borne manfully, more of unvarnished truth, more of religious trust, more of that generosity which gives what the giver needs himself, and more of a wise estimate of life and death, than among the most prosperous."

ভাবার্থ—"ধনী বিত্তশালী অপেক্ষা সাধারণের মধ্যে সাহসের সহিত বিপদে সহিষ্ণুতা, খাঁটি সত্যের প্রতি অনুরাগ, নিজের যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা পরার্থে দান, জীবন ও মৃত্যুর প্রতি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করিবার লোক অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।"

পণ্ডিতপ্রবর ঋষিকল্প স্বর্গত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের রত্নমালা" গ্রন্থে এরূপ কয়েকটি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ গুণের অধিকারী মহাপুরুষের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র ঘরে অনুসন্ধান করিলে আমরা অনেকের মধ্যে এরূপ মহাপুরুষের মাঝে মাঝে পরিচয় পাইয়া থাকি। মনীষী উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মলাভ করিয়া শিক্ষা, সেবা, ত্যাগ এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ও মাধুর্য্যে বহু খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে "সোম প্রকাশ"—সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি এ. এস. স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ন্যায়কুলে ধন্ত, লোকে তাঁহাকে না ভুলিয়া মনের মন্দিরে নিত্য সেবা বা পূজা করিয়া থাকে। আবার তাঁহার আদর্শে যে সকল ছাত্র নিজেদের গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমসাময়িক ছাত্র যুবকদের মধ্যে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল ছাত্রদের মধ্যে স্বর্গীয় উমাচরণ ঘোষ অন্যতম।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতৃপিতামহের বাসভূমি বলিয়া অধুনা-প্রসিদ্ধ ২৪-পরগণার কোদালিয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে উমাচরণ ২২শে পৌষ ১২৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারে সর্ব্বদাই অভাব ছিল। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলে—অলৌকিক বা আকস্মিক গৌরব লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। এই পর্য্যন্ত বলা যায়, পল্লীতে বাসকালে এমন কোনও জনহিতকর কাজ ছিল না, যাহাতে উমাচরণকে পাওয়া যাইত না। সে যুগে বাঙালীর গ্রাম্য যে সকল খেলা দৌড় সাঁতার শক্তির পরীক্ষা ছিল, উমাচরণের নাম ছিল সবার উপর। তাঁহার দীর্ঘ সুদৃঢ় দেহ, বলিষ্ঠ গঠন প্রায় অনন্যসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সরকারী চাকুরিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্ম সিভিল সার্জ্জন সাহেবের নিকট উপস্থিত। সাহেব একবার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "Take off your coat, young man;" উমাচরণ অনাবৃত দেহে সন্দেহাকুল চিত্তে অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন, সাহেব কিন্তু কাগজ লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন। শেষ হইলে কাছে আসিতে বলিলেন, নিজে দাঁড়াইয়া উঠিয়া উমাচরণের এক কাঁধে হাত দিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন এবং বলিলেন, "There's your certificate, my boy, you need no examination"। তাঁহার চাকুরি-ক্ষেত্র ব্রহ্মে এক পুলের উপর তিনি একদিক হইতে পারে হাঁটিয়া আসিতেছেন, উল্টা দিক হইতে তিন শিখ জোয়ান আসিতেছেন। ঠিক পার হইবার সময়, পাশাপাশি হইলে একজন ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছা মরদ হায়।" দুঃখীর ঘরে অভাবের মধ্যেও কেমন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহার জীবনের ইতিহাসে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি গ্রাম্য বদভ্যাস কুসংস্কার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। গুরু উমেশচন্দ্রের শিক্ষা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহা কর্ম্মজীবনে পালন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। মাতৃভক্তি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি যে প্রেম ছিল, তাহা নিতান্ত বিরল। বয়সে প্রায় আড়াই বৎসর বড় হইয়াও, তিনি ভ্রাতার প্রতি স্নেহপূর্ণ যে সম্ভ্রম দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, সৎ গুণের পরিচয় পাইলে বয়সের তারতম্য উপেক্ষা করিয়া যাহা তিনি নিজ ক্রটি বলিয়া মনে করিতেন তাহাতে যথেষ্ট কুণ্ঠাবোধ করিতেন।

যৌবনে তিনি এপস শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অতি শীঘ্র বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া তারাচরণ সঙ্গীত

শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং একদিন দুই ভ্রাতার কলিকাতার বাসা হইতে আখড়ায় যাইতে থাকেন। প্রায় আখড়ার সন্নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার স্মরণে আসে যে, প্রবেশ করার সঙ্গেই আখড়ায় তাঁহার হাতে সাজা হুঁকা তামাক দেওয়া হইবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তরে লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়েন। কনিষ্ঠের সম্মুখে ধূমপান করার কুণ্ঠা, তাঁহার বদভ্যাসের কথা কনিষ্ঠের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িবার চিন্তায় তিনি গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠেন। পা আর চলে না দেখিয়া শ্যামাচরণ জ্যেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার হঠাৎ কোনও অসুখ হইল কিনা ? বহু কষ্টে আমতা আমতা করিয়া, ভ্রাতাকে লুকাইয়া তিনি যে ধূমপান অভ্যাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। বলিলেন, "দেখ, আখড়ায় গেলেই সেখানে ওস্তাদ—সেখানে সবাই তামাক খায় কিনা—হুঁকো এগিয়ে দেবেন—।" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ বলিয়া উঠিলেন, "তামাক খেতে শিখেছ, বুঝি ?" শ্যামাচরণ প্রকৃত ব্যাপার অন্ততঃ বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া তিনি লজ্জার মধ্যেও স্বস্তি বোধ করিলেন। শ্যামাচরণ বলিলেন, "খেতে হয় তুমি খেও, গান শিখতে গিয়ে আমি নেশা শিখতে পারব না।" এই ভাবে একটা সম্মতি পাইয়া তিনি সে-যাত্রা রক্ষা পাইলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং শ্যামাচরণের মৃত্যুর বহুকাল পরেও নিজ বার্দ্ধক্যে পুরাতন স্মৃতির মধ্যে কনিষ্ঠের নিকট নিজ দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হওয়ায় কাহিনী সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত বলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, সে যুগে বড় আখড়ায় নেশার মধ্যে তাম্রকূট একটি সামান্য উপকরণ ছিল, অন্যান্য যাহা ছিল তাহা উমাচরণকে কখনও স্পর্শ করে নাই। আর এই রূপদ শিক্ষা তাঁহার জীবনে বহুকাল পরে এক পুরাতন সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার কাহিনী পরে বলিব।

তামাক ব্যতীত বাতরোগে ভুগিয়া তিনি অহিফেন সেবন সুরু করিয়াছিলেন প্রৌঢ় বয়সে। পঞ্চাশ বৎসর তামাক খাইবার পর এক সময় তাঁহার অসুস্থতার জন্য ডাক্তার বলিলেন, "দিন দুই তামাক বন্ধ রাখলে কেমন হয়, উমাচরণবাবু ?" তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ভালই হয়।" দু'তিন দিন গেল, যাহাদের অভ্যাস তাঁহাকে যথানিয়মে তামাক সাজিয়া দেওয়া, তাহারা জিজ্ঞাসা করে যে, কখন গড়গড়া আনিয়া দিবে ? ডাক্তারবাবু দিনকয়েক পরে আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তামাক আরম্ভ করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন উমাচরণ বলিলেন, "ওটা ছেড়ে দিয়েছি, অভ্যাসবশে খেতাম ; রোগ যখন অভ্যাসে বাধা দিলে, তখন তাকে আর প্রশ্রয় দিই কেন ?" তার পর বহু বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তামাক আর ব্যবহার করেন নাই।

সেইরূপ তাঁহার আফিম ব্যবহার পরিত্যাগের কাহিনী সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার মনের শক্তির পরিচয় দেয়। তাঁহার এক পুত্র বেশী চা পান করিতেন ; এবং প্রায়ই অজীর্ণ রোগে ভুগিতেন। চিকিৎসক চা পরিত্যাগ করিতে বলেন, অন্ততঃ চা ব্যবহার হ্রাস করিবার নির্দেশ দেন। তিনি সেই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করেন। তাহার উত্তরে পুত্র বলিয়াছিলেন, "আমায় চা ছাড়তে বলেন, আপনি কি আফিম ছাড়তে পারেন ?" তদুত্তরে পিতা সামান্য দুটি কথা উচ্চারণ করিলেন, "বলিস কি ?" বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে তিনি আফিম পরিত্যাগ করিলেন—প্রায় কুড়ি বৎসরের অভ্যাস, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুত্র চা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে তিনি কতগুলি মত পোষণ করিতেন এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেন। বহু বিষয়ে তিনি সংস্কারমুক্ত ছিলেন। পুত্র-কন্যাদের বিবাহের ব্যাপারে তিনি ঠিকুজী-কুষ্ঠীর বিচারে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি এ বিষয়ে দুটি গল্প বলিতেন। একটি এখানে উল্লেখ করা গেল :

এক মহাতপা ঋষি দয়াপরবশ হইয়া কাক-মুখ হইতে পতিত এক স্ত্রী-মূষিক শিশু পালন করেন। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার তপের বিঘ্ন হওয়ায় বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান সুপাত্রে অর্পণের জন্য চিন্তা করিলেন। অমিতবীর্য্য সূর্য্যদেবকে দান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্মরণ করিলে সূর্য্যদেব আসিয়া প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার শক্তি বিচার করিয়া যদি পাত্রী দানে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে ইহাও বিচার্য্য যে, পর্জ্জন্যদেব যখন আমায় ঢাকিয়া ফেলেন তখন আমার আর কোনও শক্তিই থাকে না ; অতএব তাঁহাকেই কন্যা দান করা উচিত।" মেঘ আসিলেন ; বলিলেন, "পবন আমাকে উড়াইয়া দিতে পারেন, সুতরাং তিনি আমা অপেক্ষা বলবান এবং উপযুক্ত পাত্র।" পবন বলিলেন, "হিমালয়কে তিনি শত চেষ্টায়ও পরাজিত করিতে পারেন নাই।" হিমালয় আসিয়া বলিলেন, "তাঁহার বহিরাবরণ ঠিক আছে, কিন্তু সহস্র সহস্র ইঁদুরে তাঁহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়াছে। অতএব সপ্রমাণিত হইল যে, জগতে ইঁদুরই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান। ঋষি মনে মনে হাসিলেন ; বলিলেন, "ভবিতব্য"। শুভদিন দেখিয়া মহাসমারোহে ইঁদুরের সহিত সগোত্রে বিবাহ হইয়া গেল।

সত্যের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল। প্রথম যৌবনে সরকারী চাকুরি পাইবার পরেও তিনি এক ফৌজদারী মামলায় আসামীর দণ্ড গ্রহণ করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। তাঁহার গ্রামবাসী এক সম্ভ্রান্ত এবং বয়স্ক গোয়ালা তাঁহাকে "দাদা" সম্বোধন করিতেন। তিনি দুষ্টপ্রকৃতিবশতঃ উমাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গী ভাবে লইয়া একদিন তাড়ি খাওয়াইয়া দেন। উমাচরণ সপ্তাহ শেষে বাড়ী আসিয়া শুনিলেন এবং সেই ভদ্রলোককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক! তুমি সন্তোষকে তাড়ি খেতে শিখিয়েছ নাকি ?" হঠাৎ প্রশ্নে ভদ্রলোক চমকিয়া গিয়া আমতা আমতা করিতে থাকেন। তখন প্রশ্ন করিলেন, "সে তোমাকে কি বলে,—?" "কাকা"। দৃঢ়স্বরে উমাচরণ বলিলেন, "তবে এই হ'ল কাকার কাজ ? তোমার পুরস্কার হওয়া চাই।" বলিয়া পা হইতে চটি লইয়া ভদ্রলোকের এক গালে

প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "যেন যদি শুনি, তার জন্ত আর একটা পান আর এক পাটি চটি তোলা রহিল।"

ঘটনা হইল উমাচরণের ভিটার উপর, সাক্ষী কেহ রহিল না। কেবল মাত্র উমাচরণ এবং —র মুখে শোনা কথা। নালিশ হইল; ফৌজদারী কোর্টের আসামী সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত: সাজা হইলে চাকরি যাইতে পারে, বদনাম এবং অফিস রেকর্ড প্রভৃতি খারাপ হইবে। উমাচরণের পক্ষে ভাল উকিল নিযুক্ত হইল। উকিলবাবু বড় সন্তুষ্ট যে, কোন সাক্ষীই নাই; আসামীকে ঘটনা অস্বীকার করিবার পরামর্শ দিয়া নিশ্চিন্ত; খালাস হইবে। আসামীর কাঠগড়ায় উমাচরণ। ফরিয়াদীর উকিল সাক্ষী খাড়া করিবেন, ফরিয়াদীর জবানবন্দী হইবার পর, দ্বিতীয় সাক্ষী ডাক হইবার পূর্ব্বে ফরিয়াদী হাকিমকে বলিলেন, 'হুজুর! (অভ্যাসবশত বলিয়া বসিলেন) দাদাবাবুকে, অর্থাৎ আসামীকে ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হউক।' কাজ সহজ করিবার জন্ত হাকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেন উমাচরণবাবু? তবে আপনি আসামী, আমার প্রশ্নের উত্তর এখন নাও দিতে পারেন।" মুহূর্ত্তের জন্ত কাছারি নিস্তব্ধ নীরব: আসামীর উকিল জিজ্ঞাসুমুখে উৎগ্রীব হইয়া আছেন; মনে একটা বিশ্বাস লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান আসামী নিতান্ত একটা বোকার মত জবাব দিবেন না। উমাচরণ সহজ কণ্ঠে বলিলেন, 'হাঁ হুজুর, আমি দোষী—কাকা হয়ে ভাইপোকে তাড়ি খাইয়েছে, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারি নি।' হাকিম নামমাত্র জরিমানা করিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিলেন।

মিথ্যার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, অতিরঞ্জিত করিয়া কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন।

অপরাধ করিয়া সত্য কথা বলিলে তাঁহার নিকট সাত খুন মাপ ছিল। স্কুলে ছেলেদের বয়স কমাইয়া লিখাইবার কথা তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিত; পাওনাদারকে সত্য বলিয়া ঋণ পরিশোধের সময় লইতে তাঁহার লজ্জা ছিল না। আবার যেদিন যে অর্থ দিবার স্বীকৃতি দিতেন, তাহাতে কোনও রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবার সুযোগ থাকিত না। "বড়বাবু" কথা দিয়াছেন জানিলে উত্তমর্ণ নিরস্ত হইয়া যাইত। এই সত্যপালন ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্ত তাঁহাকে কখন কখনও মিউনিসিপ্যালিটি স্কুল-কমিটিতে অপ্রিয় হইতে হইয়াছে, কিন্তু বিচলিত দেখা যায় নাই।

অর্থ সম্বন্ধে তিনি নিরাসক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কেহ কোনও দিন তাঁহাকে উৎকোচ দিবার প্রস্তাবে সাহস পান নাই। উপার্জ্জনের অর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতাচরণকে সমস্ত পাঠাইয়া দিয়া শুধু নিজের খরচটুকু মাত্র রাখিয়া দিতেন। পেন্সনের পর তাঁহার টাকা ছেলেরা খরচ করিয়াছে; তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা তিনি কখনও লন নাই। তাহারা কে কত পায় তাহা নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন না।

পাঁজির মজির দিয়া কাজকর্ম্ম দিন উপস্থিত করা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। নিজে কোনও তর্কে বিশেষ যোগ দিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার এক গল্প ছিল:

অতি প্রত্যূষে এক তিলকচন্দনধারী মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পথিপার্শ্বে প্রস্রাব করিতে বসিয়াছেন; ঘটনাচক্রে তাহা পূর্ব্বমুখ বা দিক। তিনি উঠিবার পূর্ব্বে অপর এক পণ্ডিত আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইতেই দ্বিতীয় পণ্ডিত সংস্কৃতভাষায় বহু শ্লোক সাহায্যে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, পণ্ডিত হইলেও তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ব্যবহারিক জ্ঞান কণামাত্র থাকিলে পূর্ব্বাস্য হইয়া তিনি মূত্রত্যাগ করিতেন না। প্রথম পণ্ডিত শাস্ত্রাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিজ কার্য্যের সমর্থন এবং প্রতিপক্ষের ভুল বুঝাইতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল; দু'জনেই গলদঘর্ম্ম, মুখে অনর্গল সংস্কৃত বাক্য নির্গত হইতেছে এবং ফেনা উঠিয়া গিয়াছে; মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা নাই।

হেনকালে এক কৃশ বৃদ্ধ কৃষক, মাথায় জড়ানো একখানা ছোট গামছা, পরিধানে (পাজীজীর ধরণে) কটিবস্ত্র, হাতে-পায়ে, গায়ে কৃষি লক্ষণ কর্দ্দমের চিহ্ন, ক্ষীণ যষ্টি হাতে ধীর পদক্ষেপে বিবদমান পণ্ডিতদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। ক্লান্ত তর্কচূড়ামণিরা মুক্তির আশায় সেই কৃষককে মধ্যস্থ মানিয়া লইলেন।

বলিলেন, "বাবা, তুমি বুড়ো হয়েছ, জগতে অনেক কিছু দেখেছ, শুনেছ। তুমি আমাদের এই তর্কের মীমাংসা করে দিয়ে যাও। তুমি বলত বাবা, পূর্ব্বাস্য হয়ে প্রস্রাব করা প্রশস্ত না পশ্চিমাস্য প্রশস্ত?" দ্বিতীয় পণ্ডিতও প্রায় সেইরূপে পশ্চিমাস্য উপবেশনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বলিলেন।

কৃষক ত হতভম্ব হইয়া পড়িল। সে বলিল, "দা'ঠাকুররা, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তোমাদের মত পণ্ডিতের ঝগড়ার কি আমি সালিশ দাঁড়াতে পারি? একটু একটু পায়ের ধুলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের মঙ্গল হোক, গ্রামবাসী সকলের মঙ্গল হোক, আমায় ছেড়ে দাও, দা'ঠাকুর, অনেক বেলা হয়েছে, বাড়ী যাই।"

তাঁহারা নাছোড়বান্দা; এই পথ ছাড়া তাঁহাদের মুক্তি নাই। আবার মধ্যস্থ যাকে তাকে মানা যায় না। এই বৃদ্ধ কৃষক যদি উপায় না করে তবে দিন যামিন্যো সায়ং প্রাতঃ সকল সময় তর্ক হইতে পারে, কিন্তু মীমাংসা কৈ?

তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কৃষক সম্মত হইয়া তাঁহাদের তর্কের বিষয় বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি বলছ দা'ঠাকুর, ঝগড়া ত দেখছি তোমাদের 'আস্য' নিয়ে, পূব-পশ্চিম সে ত পরে মীমাংসা হবে।" কৃষক শুনিল আস্য মানে, চলতি কথায়, "মুখ"।

তখন সে যোড়হস্তে ভটস্থ হইয়া বলিল, "আমার পক্ষে কি এর বিচার করা সম্ভব? আমি মুখ্যু মানুষ, এসব ত বড় কথা। তা

ছাড়া কাজের খাতিরে আমাদের এই সকল বিচার করবার সময় কৈ দা'ঠাকুররা।"

এই বলিয়া সে প্রথমে এক পণ্ডিতের মুখের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল, "এ দা'ঠাকুর যে মুখে বলছেন আমরা এ মুখেও মুক্তি: আবার (অন্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ও দা'ঠাকুর যে মুখে বলছেন, ও মুখেও মুক্তি। আমাদের অত মুখের বিচার করতে গেলে কাজ চলবে কি করে?"

তখন পণ্ডিতরা বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, আমাদের তর্কের যেমন বিষয়বস্তু, মীমাংসা তদনুরূপ হয়েছে। এ হাঙ্গামা না করে চলে গেলে আর মুখ অপবিত্র হ'ত না।"

অবথা যুক্তিতর্ক নিবারণের ইহা অপেক্ষা সরল উদাহরণ মেলা কঠিন। ইহাতে গ্রাম্যভাষার দোষ আছে, সন্দেহ নাই: কিন্তু সাধু ভাষায় ইহাকে প্রকাশ করিতে গেলে প্রচুর অর্থহানি ঘটার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

এই ভাবে তিনি নানা গল্পের ভিতর দিয়া আত্মীয়-পরিজন বন্ধুমহলে শিক্ষা দিতেন। একদিন শ্যামাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র তামাক সাজিয়া আনিয়া তাঁহার তক্তাপোশের ধারে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁ দিতেছে এবং কলিকার নীচের রন্ধ্র হইতে সুবাসিত ধূম নির্গত হইতেছে। তিনি বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন। সেই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "ভাখ, ছোট ছেলেরা যে তামাক খেতে শেখে তাতে তাদের দোষ কতটা—আর আমার মত অভিভাবকের দোষ কতটা তা কেউ বিচার করে না, ছেলেটারই নিন্দে করে, তাকে মারধোর করে। তোর মুখটা কলকের আগুনের আভায় কত সুন্দর দেখাচ্ছে, আর তোর নাকে তামাকের মিষ্টি গন্ধ যাচ্ছে, যে গন্ধের লোভ আমার মত বুড়ো মানুষকে টানে বলে এত বড় একটা নেশা তোর বাপের ধমক খেয়েও ছাড়তে পারি নি। তুই কলকের আগুন দিয়ে আনছিস সেই ভেতর বাড়ী থেকে; যাতে আমার লোভ, তাতে ছেলে বয়সের পরীক্ষা হিসাবে তুই যদি একটা টান্ দিস, তাতে দোষ তোর বেশী, না আমার বেশী? এটা বিচার করবে কে?"

এই বলিয়া একটু থামিলেন; পরেই বলিলেন, "আমি কি বলি, জানিস? তুই তামাক খেতে শিখলে তার অপরাধ হবে তোর জ্যাঠাবাবুর, তোর ত নয়? আমি জানি, তুই এমন কাজ করতে পারিস না, যাতে আমার বদনাম হতে পারে; সে কাজ তোর দ্বারা সম্ভব নয়। কি বলিস?"

ভ্রাতুষ্পুত্র বলিল, "সে ত ঠিক কথা।"

তাহাতেও তাঁহার মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। কৈশোরে নূতন জ্ঞান লাভের প্রেরণা, তামাকের (সুগন্ধের) প্রতি লোভ, হয়ত বা সঙ্গীদের কাহারও কাহারও বদভ্যাস প্রভৃতির প্রভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র তামাক-টানা শিখিতে পারে, সেই জন্য বলিলেন—"এ কথা কি ভুলতে পারি, তুই শ্যামাচরণের ছেলে, যে জীবনে একদিন এক টিপ নস্যি পর্য্যন্ত নিলে না।"

যেটুকু দুর্ব্বলতা কিশোরের মনে উদয় হইতে পারিত, তাহার চরম অস্ত্র পিতার নাম, পিতার গুণগ্রামের অবতারণা করিয়া একেবারে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

উমাচরণের বয়স যখন ৭০ বৎসর তখন একদিন শুনিলেন কোদালিয়ার পাশের গ্রামে একটি রজকবংশীয় যুবক যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। একদিন রজকরা সংখ্যায় অনেক ছিল। কিন্তু ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের রজক জুটিলেও ঘটনাকালে সমর্থ পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মায় মৃত্যু হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কেহ শব স্পর্শ করিবে না। রজক জাতির পুরোহিত ১০-১২ ক্রোশ দূরে ভিন্ন গ্রামে থাকেন; কেহ সংবাদ দিতে যাইবার মত লোক নাই; গেলেই যে পুরোহিত ঠাকুরকে পাওয়া যাইবে এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। সবিশেষ প্রশ্নে উমাচরণ এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন।

গ্রামের মধ্যে শব পড়িয়া রহিল, সংসারে অতি বৃদ্ধা মাতা আর এক বালিকা বধূ শব আগলাইয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে, পল্লীর বাতাস সেই করুণ সুর সাধ্যমত বহন করিয়া প্রতিবেশীদের পৌঁছাইয়া দিতেছে। উমাচরণের কানে কথাটা পৌঁছিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র উমেশচন্দ্রের স্পর্শলাভে ধন্য হইয়াছিল। উমাচরণ সেই কথা স্মরণ করাইয়া উমেশচন্দ্র কর্তৃক শববহনের কাহিনী বিবৃত করিলেন। সেই মহাপুরুষের ছাত্র বলিয়া তখনও তাঁহার কি গৌরব! সেই বৃদ্ধ বয়সেও সকল সময় শিক্ষাগুরুর নাম স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। গ্রামের মজুর ডাকিয়া শববহনের জন্য চালি প্রস্তুত করাইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যে শব চালিতে উঠাইয়া একদিকে নিজে অপরদিকে সেই বালিকা বধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যে গৃহ হইতে শব বাহির করিয়া আনিলেন। দেশের "বড়-বাবু" বৃদ্ধ উমাচরণের সঙ্কল্প ও কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া রজকদিগের মধ্যে সমর্থ লোক আসিয়া সমস্ত ভার লওয়ায় উমাচরণ গৃহে ফিরিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল উমেশচন্দ্রের কাহিনী বলিয়া আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন।

উমাচরণ বাংলার একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিসে নিযুক্ত হইয়া উক্ত আপিস হইতে বদলি হইয়া ব্রহ্মের একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আপিসে চলিয়া যান। ব্রহ্মের সমস্ত আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষক বা "ইন্‌স্পেক্টর" হিসাবে কার্য্যব্যপদেশে সারা ব্রহ্ম রেলে, গো-শকটে, অশ্ব ও হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়াছেন। যৌবনে তিনি ব্রহ্মে পৌঁছেন এবং সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল সেখানে কাটাইয়াছেন। মাঝে মাঝে ছুটি পাইয়া কোদালিয়ার আসিতেন। তখন যে সকল ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালী ব্রহ্মে গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই নানারূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ দোষ স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু দ্বারকানাথ, উমেশচন্দ্রের স্নেহধন্য উমাচরণের নামে অতি নিন্দুকেও কোনও দিন কলঙ্কলেশ অর্পণ করিতে পারে নাই। তিনি অল্পকাল মধ্যেই

সারা ব্রহ্মের বাঙালীদের মধ্যে "কর্তামশাই" বলিয়া পরিচয় লাভ করেন, কারণ কোনও গুরুতর বিষয়ে তিনি প্রধান হইয়া মত দিতেন, গুরুকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন। তাঁহার দায়িত্ববোধ ছিল অপরিসীম এবং বহু অপরিণামদর্শী যুবক উমাচরণ এবং তাঁহার বন্ধু কুঞ্জবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) সাহায্যে কত গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন এবং তাহাদের ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাহার হিসাব কে রাখে? উমাচরণ ১৯০৮ সনের শেষ ভাগে ব্রহ্ম হইতে অবসর লইয়া আসেন কিন্তু "কর্তামহাশয়" নাম সেখানে তাহার পরেও বহু বৎসর যাবৎ লোকে সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছে:

উমাচরণ দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা শ্যামাচরণ দেহরক্ষা করেন। শ্যামাচরণ বিধবা পত্নী, অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই পুত্র ও অনূঢ়া এক কন্যা রাখিয়া গেলেন। বিবাহিতা কন্যা কাশীতে স্বামীগৃহে বাস করিতেছিলেন। মধ্যবিত্তের সংসার; ইহার উপর সম্বলহীন দু'তিনটি পোষ্য বাড়ীতে। এক মাসে (ডিসেম্বর ১৯০৮) নিজের পেন্সন, নির্দিষ্ট ভাতা ও শ্যামাচরণের মৃত্যু সব মিলিয়া মাসিক সাড়ে চারি শত টাকা আয় কমিয়া উমাচরণের পেন্সন মাত্র সম্বল করিয়া নিজ বিরাট পরিবার ও শ্যামাচরণের সংসারের ভার তিনি লইয়া বসিলেন। কেহ তাঁহাকে এই ভাবে নত হইয়া পড়িতে দেখেন নাই। কেবল বৃদ্ধা মাতা যখন শোকে চীৎকার করিতেন, তিনি নিকটে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন। শ্যামাচরণের শ্যালকরা তখন সিমলা-কলিকাতা দপ্তরের বড় কর্মচারী, উমাচরণ একদিনের জন্য শ্যামাচরণের পুত্রদিগকে মাতুলালয়ে বাস করিয়া জীবনে উন্নতিলাভ করিবার পরামর্শ দেন নাই। অর্থাভাবের মধ্যে কোদালিয়ার বাড়ীতে একসঙ্গে বহু লোক বাস করা হেতু পারিবারিক মতবিরোধ, বিতণ্ডার বহু ঊর্দ্ধে উমাচরণ আপনাকে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কোনও দিন তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখেন নাই। পুত্রাধিক স্নেহে শ্যামাচরণের সন্তানদের তিনি পালন করিয়াছেন; সংসারে অভাবের মধ্যেও ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষার কোনও অসুবিধা হইতে দেন নাই।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ভ্রাতা শ্যামাচরণের শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য উমাচরণ "পড়া" বন্ধ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছাত্রেরা তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। উমাচরণের জ্ঞানের গভীরতায় অত্যন্ত সুনাম ছিল। কলিকাতায় ঠাকুর বাড়ীর কোনও পদস্থ কর্মচারী তাহা অবগত ছিলেন। যখন রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরেজী রচনায় গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তখন উমাচরণের ডাক পড়িল। উমাচরণ কৃতিত্বের সহিত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিচালনা করিয়াছেন এবং বৃদ্ধকালেও রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে রচিত বহু কবিতা নিজে আবৃত্তি করিতেন। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিশক্তি অটুট ছিল। উমাচরণ বলিতেন, রবীন্দ্রনাথ যখন দশ বা একাদশ বর্ষ বয়সে অভিমন্যু বধের উপর কৌরবদের সম্বন্ধে লিখিলেন যে তাহারা নিজেদের মধ্যে যতই উৎসব করুক, অন্যদিকে "জনরব শত জিহ্বা করিয়া বিস্তার" পৃথিবীর লোকদিগকে জানাইতেছে, "সপ্তরথী বেড়ে মারে একাকী কুমার" তখন উমাচরণ বুঝিয়াছিলেন যে, একদিন ঐ বালক জগতে কবিত্বের একটা বড় আসন লইবে। "এত অল্প বয়সে ঐরূপ ভাব ও ভাষা কোথা থেকে আসে" জিজ্ঞাসিত হইয়া "মাষ্টারমশাই" ছাত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, লেখক তাহা নিজেই জানেন না; বোধ হয় আপনা থেকে এসে কলমের মাথায় দেখা দেয়। উমাচরণ অনেক কবিতা মুখস্থ বলিতেন, যাহা কবির সংগৃহীত রচনাবলীর মধ্যে দেখা যায় না।

গুরু-শিষ্যের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহু বৎসরের ব্যবধানেও নষ্ট হয় নাই। উমাচরণ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। "বড়লোকের" সহিত গায়ে পড়িয়া আলাপ করা বা তাহার সুযোগ গ্রহণ করা তিনি আত্মসম্মানের হানিকর বলিয়া মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন যশঃ প্রতিভায় সারা পৃথিবীতে খ্যাত, তখনও উমাচরণ দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বা যোগাযোগ রাখিতেন না। পেন্সন লইবার পরে একদিন কলিকাতা হইতে ঘুরিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে তিনি পরিবারের লোকদিগকে বলিয়া কোদালিয়া হইতে রওনা হইলেন। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন যে, তিনি রবি ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ উদ্দেশ্য বা কি এবং ফলাফল কি হইল জানিবার জন্য শ্রোতারা উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। ছাত্রের কৃতিত্বে তিনি যে আনন্দ ও গৌরবলাভ করিয়াছেন তাহা এতদিন জ্ঞাপন করা হয় নাই; মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই কর্তব্য পালন করিয়া ত্রুটি সংশোধন করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

ফল যাহা হইয়াছে তাহাতে বক্তা শ্রোতা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রবেশ দ্বারে গিয়া জানিলেন, ভিতরে রবীন্দ্রনাথ আছেন, কিন্তু দ্বারোয়ান পথ ছাড়ে না, দর্শনের উদ্দেশ্য না জানিলে পথ ছাড়িতে পারে না। উমাচরণ কেবল মাত্র বার্দ্ধক্য ও বহু দূর হইতে আসিয়াছেন এই দুই দাবীতে দ্বারোয়ানকে পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। এখন আর তাঁহার কোনও বিলম্ব সহ্য হয় না। "বুড়ো লোক" শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাতের অনুমতি দিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিলে নমস্কার করিয়া—প্রতিনমস্কার পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে—উমাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিনতে পারেন?" গুরুশিষ্যের দু'জনেরই দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, সাক্ষাতের ব্যবধান হয়ত চল্লিশ বা ততোধিক বৎসর। বিস্ময়ে দুই জনেই বিমূঢ়; একজন চিনিয়া, অপর জন না বুঝিয়া।

কবি বৃদ্ধকে আসন গ্রহণের উপরোধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আগন্তুকের স্বর তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া থাকিবে; কেবল বলেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান কিছু বলবেন না।"

আর দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা ললাট পার্শ্বে মৃদু আঘাত

করিতে লাগিলেন, যেন মস্তিষ্ক ধাক্কা খাইয়া পুরাতন স্মৃতিকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেয়। "হঠাৎ বিস্মৃতি ছুটে, সাধু (কবি) ফুকারিয়া উঠে, ঠিক বটে ঠিক!"—

"কে? মাষ্টারমশাই না?" গুরু ইহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া মাত্র বলিতে পারিলেন, "চিন্‌লেন কেমন করে?"

কবির প্রথম অনুযোগ, যদি তাঁহার অনুমান সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে "চিন্‌লেন" অর্থাৎ আপনি সম্বোধনে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইতেছে। তখনও পর্য্যন্ত আগন্তুককে আসন গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় নাই। "মাপ করবেন, মাষ্টারমশাই, নমস্কার করি নি, বসতে বলতেও ভুলে গেছি।" আরও বলিলেন, "আপনার গলা (স্বর), মাষ্টারমশাই! আপনার সেই রূপকের সুর আমার কানে বেজে উঠল। এখনও (গান) চর্চ্চা ছাড়েন নি ত, মাষ্টারমশাই।"

উমাচরণ বলিলেন যে, সুযোগের এবং সঙ্গীর অভাবে আর সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্ভব হইয়া উঠে না; একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর বহুক্ষণ পুরাতন কাহিনী আলোচনা হইল, যে আসরে মাষ্টারমশাই গান করিবার সম্ভাবনা, ছাত্রের সেখানে উপস্থিত থাকিবার কি আগ্রহ ছিল, সে কথাও হইল। মাঝে মাঝে কেন আসেন না, সে অনুযোগ করিলেন কবি। পরেই বলিলেন যে গুরুকে আসিতে বলায় নিশ্চয়ই তাঁহার অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু গুরু স্বেচ্ছায় তাঁহার বাল্যে সে অধিকার দান করিয়াছেন, কারণ তিনিই আসিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, এখন যেন সেই অধিকার হইতে শিষ্যকে বঞ্চিত না করেন; কারণ ইহাতে তাঁহার একটা পুরাতন অধিকার বা স্বত্ব (prescriptive right) জন্মিয়া গিয়াছে।

এই আলাপসূত্রে পরে রবীন্দ্রনাথ উমাচরণকে তাঁহার পতিসার জমিদারীর হিসাবরক্ষক করিয়া পাঠাইয়াছেন; উমাচরণের বার্দ্ধক্য ও অপরাপর অসুবিধার আপত্তি উপেক্ষা করিয়াছেন। যে পত্র দ্বারা তিনি কর্ম্মচারীর নিকট উমাচরণের পরিচয় করাইয়া দেন, তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ আর পাইবার উপায় নাই। মাত্র সমাদরে মাস কয়েক সেখানে থাকিয়া উমাচরণ ফিরিয়া আসেন; বৎসরাধিক কাল বাদে আবার ডাক পড়িলে উমাচরণ গিয়া বলিয়া আসিলেন, যে ভাবে জমিদারীর খাতাপত্র রাখা হয়, তাহা ইংরেজী প্রথায় "অডিটের" উপযুক্ত নয়; আর জমিদারীর যে অবস্থা তাহাতে কবির সম্পত্তি কাব্যেই থাকা ভাল, আর্থিক ব্যবস্থায় কড়াকড়ি হইলে কিছু অনর্থ ঘটিতে পারে সুতরাং যতটা "কড়ি" আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা শ্রেয়ঃ। হাস্যপরিহাসে কিছু সময় কাটিল। উমাচরণ আর পতিসর যান নাই, কবির সহিতও আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

ছাত্র-গৌরবে উমাচরণের অহঙ্কার করিবার কথা। স্বর্গীয় লোকেন পালিত তাঁহার অপর ছাত্র। দানবীর সার তারকনাথ পালিতের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং বিদ্যা ও বিনয়ের অধিকারী হইয়া লোকেন্দ্র সকল শ্রেণীর লোকের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সার টি. পালিতের গৃহে উমাচরণের যে "খাতির" ছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

লেডী পালিত পুত্রদের শিক্ষার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহার শিক্ষা ও শাস্তি দিবার ভঙ্গী কিরূপ বিস্ময়কর ছিল এই সময় তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকেনের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। পাঠে বিশেষ মনোযোগ ছিল না এবং অপরের পাঠে অসুবিধা করিতেন। উমাচরণ নবনিযুক্ত শিক্ষক; ঐ ছাত্রটিকে তখনও বিশেষ আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। "বড় লোকের ছেলে", শাস্তি দিতেও সাহস হয় না। তিনি জানিয়াছিলেন ছেলেদের শিক্ষার ভার তাঁহাদের মাতাঠাকুরাণী স্বহস্তে রাখিয়াছেন এবং ছেলেরা মাতাকে বেশ ভয় করে।

উমাচরণ একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যদি ঐরূপ দুষ্টামি চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহার মাকে খবর দিতে হইবে। কোনও দিন উমাচরণ লক্ষ্য করেন নাই; সেদিন দেখিলেন কালো চওড়া কস্তাপাড় শাড়ীর নিম্নাংশ দুই ঘরের মধ্যে খোলান দরজার নীচে এক বার সরিয়া গেল মাত্র, মানুষ লক্ষ্য করা গেল না। স্বর শোনা গেল, "ছেলে মাষ্টারমশাইকে দেওয়া আছে, আস্তাবলে ঘোড়ার চাবুক আছে। যদি শাসন করতে হয়, মাষ্টারমশাই করবেন, পড়ার সময় ওটা মাষ্টারমশায়ের কাজ; ছেলের মার নয়।" কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল, ছাত্র ও শিক্ষক কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইল না। ছেলে সেই দিন হইতে যে শান্ত হইল, আর কদাপি অবাধ্য হয় নাই। উমাচরণ বুঝিলেন ছাত্ররা কি করে এবং তাহাদের পড়া কেমন হয় তাহা লক্ষ্য করিবার সতর্ক প্রহরী পাশের ঘরে থাকেন।

এক সময় উমাচরণের এক বন্ধুপুত্র লোকেন পালিত মহাশয়ের সুপারিশের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে। সে অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারেন নাই; তাহা ছাড়া ছাত্রের সহিত বহু বৎসর সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন লোকেন পালিত মহাশয়ের সরকারী কার্য্য-কাল অবসান হওয়াতে নূতন এক কাজে লিপ্ত আছেন। আর হয়ত সাক্ষাৎ হইবে না এই মনে করিয়া সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া পালিত মহাশয়ের আপিসে উপস্থিত হইলেন। এক টুকরা কাগজে নাম লিখিয়া পাঠাইবার এক মিনিটের মধ্যে ডাক পড়িল। তখন দুই-তিন বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্ন জলযোগ চলিতেছিল। ঘরে প্রবেশ করিতে যে স্বল্প সময় লাগিয়াছে, তাহার মধ্যেই সমস্ত প্লেট, গ্লাস প্রভৃতি অপসারিত হইয়াছে বা হইতেছে, বন্ধুরা প্রায় তড়িতাহতের মত স্থানচ্যুত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছেন। বোঝা গেল, সেই কাগজের টুকরা একটা বিপ্লব ঘটাইয়াছে। উমাচরণ যখন প্রবেশ করিতেছেন তখন দেখিলেন লোকেন দাঁড়াইয়া তাঁহার মূল্যবান কোটের এক কোণ দিয়া একটি ছোট গ্লাসের অবস্থান চিহ্ন জলের দাগ মুছিতেছেন আর মাষ্টার মহাশয়ের আগমন-পথ দরজার দিকে ব্যস্ততার সহিত লক্ষ্য

করিতেছেন। লোকেনের অবস্থা দেখিয়া সহজেই মনে হইল যে, গোল জলের দাগ একটি পেগ বা অতিক্ষুদ্র উত্তেজক পানীয় ধরণের আধার সূচিত করে বলিয়া গুরুর সম্মুখ হইতে সেই চিহ্ন দূর করিবার প্রচেষ্টা। বেহারা সবই ঠিক করিয়াছে, কিন্তু ঐ সামান্য জলের দাগের আর কি দাম তাহা জানিত না বলিয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করে নাই। প্রকৃত পক্ষে দুই হাতে কোটের কোণ টানিয়া জল মুছিবার চেষ্টা করিতে না গেলে উমাচরণ তাহা লক্ষ্যও করিতেন না। সমাদর-আপ্যায়নের আতিশয্যে উমাচরণ অভিভূত হইয়াই ফিরিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট জলের দাগ মুছিবার প্রচেষ্টার মধ্যে লোকেন যে গুরুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া তিনি বিমোহিত হইয়াছেন এবং শতকণ্ঠে শিষ্যের শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন।

গুরুশিষ্যের এ সম্পর্ক আর বিদ্যমান নাই, সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন পালিত প্রভৃতি স্বনামধন্য বাঙালীও বোধ হয় খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের "রাখাল মহারাজ" প্রথম জীবনে উমাচরণের সহিত এক মেসে বাস করিতেন। তিনি বলিতেন, ঐ ভদ্রলোকের ইতরভদ্রনির্বিশেষে অমায়িক ব্যবহার ও কথা বলার ভঙ্গী মেসের সকলকে মুগ্ধ করিত; প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। উত্তরকালে সাংসারিক অশান্তি, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে উমাচরণ গিয়া রাখাল মহারাজের সহিত নিরিবিলি আলাপ করিয়া আসিতেন। মহারাজের জন্য শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

যৌবনে তিনি গুরুতর কারণে কচিৎ অতিরিক্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বাড়ীর ব্যবহারের জিনিষপত্র আছাড় দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতেন —তাঁহার পরবর্ত্তী কোনও রাগের কারণ হইলে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বের কোনও ভগ্ন তৈজসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেন এবং ক্রোধ দূর হইলে বিশেষ অনুতপ্ত হইতেন। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর সংসারে একসঙ্গে অত লোক, অত অর্থাভাব এবং ক্রুদ্ধ হইবার অপরাপর যথেষ্ট কারণ প্রায়ই থাকিত, কিন্তু তাঁহাকে শান্তভাবে তাহা দমন করিতে দেখা যাইত এবং যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ক্রোধের কারণ হইত, পরে তাহাকে কাছে বসাইয়া নানা গল্প-উপদেশ দ্বারা দোষত্রুটি দেখাইয়া ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিতেন।

সাধারণতঃ তাঁহার স্বভাব ছিল শান্ত, ধীর, স্নেহশীল, গম্ভীর ও স্পষ্টভাষী আবার মজলিসে বসিলে গল্প, কথায়, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেন। গৃহপালিত পশু বিশেষতঃ গাভীর উপর ছিল তাঁহার অশেষ যত্ন। একই সময় তাঁহার বাড়ীতে দুইটি খুব বড় দুগ্ধবতী গাভী ছিল, একটি সাদা এবং অপরটি মিশ কালো এবং নাম কালিন্দী। এইটি বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিল এবং তাহার পালক এবং উমাচরণের মাতা ছাড়া কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, ভীষণ গুঁতা মারিত। অসতর্ক হইয়া তাহার নিকট গিয়া পড়িলে আর রক্ষা ছিল না। সেই গাভী ছিল উমাচরণের অদ্ভুত বশীভূত। ব্রহ্ম হইতে তিনি দুই-তিন বৎসর অন্তর ফিরিতেন, কিন্তু তাঁহার আসিবার পর সেই গাভীর দড়ি খুলিয়া তাঁহার নিকট আনিতে হইত, তাহা না হইলে হয় ত দড়ি ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিত। ছুটির যে কয়টি দিন তিনি বাড়ী থাকিতেন সে কয় দিন সেই দুর্দ্দান্ত গাভী বাড়ীর বাহিরে উঠানে বাগানে তাঁহার নিকটে নিকটে ফিরিত আর তিনি তাহার গলকম্বলে হাত বুলাইতেন। খাঁচার পাখী দেখিলে তিনি বড়ই ব্যথা পাইতেন, কারণ এ ভাবে স্বাধীনতা হরণ করিয়া আনন্দ লাভ করা তিনি পছন্দ করিতেন না।

অযথা মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া তাঁহার বড়ই পীড়াদায়ক ছিল। একবার বাড়ীতে এক পরিচারিকা আসে; বেশ পরিষ্কার স্নানাদি করিয়া শুচি শুদ্ধভাবে বাড়ীর কাজকর্ম্ম করে। কয়েকদিন বাদে তাহার গ্রাম হইতে উমাচরণের এক বৃদ্ধ আত্মীয় আসিয়া পরিচারিকাটিকে দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এই স্ত্রীলোকটি জাতিতে বাগ্দী; একেবারে অস্পৃশ্য, জল আচরণীয় ত নয়ই। সুতরাং বাড়ীটা ম্লেচ্ছের বাটী, সেখানে জাতিধর্ম্ম সবই বিপন্ন।

উমাচরণ শুনিয়া বহু অনুনয়ে আত্মীয়কে নিরস্ত করিলেন কারণ এ কথা মেয়েটির কাণে গেলে সে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইবে। আত্মীয় কয়েক দিন থাকিবার জন্য আসিয়াছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবার ভয়ে অবস্থানকাল সংক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন বাড়ীর বয়স্কা বৃদ্ধাদের পালা। উমাচরণ বলিলেন, যে লোকেরা অপরিচ্ছন্ন সেই অশুচি; ভগবানের দৃষ্টিতে ত মানুষে মানুষে কোনও ভেদাভেদ নাই। তাহা ছাড়া একটি নিরীহ নিরপরাধ স্ত্রীলোক বাড়ীর মেয়ের মত থাকিয়া সকলের সেবা করিতেছে, তাহাকে জাতির দোহাই পাড়িয়া বিদায় দিলে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা কষ্ট হইবেন —সকলের অপেক্ষা বড় কথা সে কি মনে করিবে; বাড়ীর অপরাপর মেয়ে হইতে সে ভিন্ন কিসে? কি তার অপরাধ? তাহার মনে ব্যথা দিলে বাড়ীর হঠাৎ কোনও অকল্যাণ হইতে পারে সে কথা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত।

সকলেই বুঝিয়া বা মানিয়া না লইয়াও নিরস্ত হইল; কিন্তু তিনি তাঁহার বৃদ্ধ মাতার জল রান্না প্রভৃতির জন্য বাড়ীর অপর এক মহিলাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভার দিলেন; কারণ তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার যুক্তি মাতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে; অন্তরে নহে। তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারের উপর আঘাত করিলে মাতা মনে দুঃখ পাইতে পারেন সুতরাং সেখানে তিনি আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

তাঁহার চরিত্রে কৃতজ্ঞতা ছিল অতিমাত্রায় জাগরূক। তাঁহার প্রয়োজনে যিনি একসময় কোনও সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তিনি কখনও ভুলিতেন না। নিতান্ত ন্যায়নীতির বিরুদ্ধ না হইলে সর্ব্বতোভাবে উপকারীর ঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবান্ থাকিতেন। পল্লীর এক যুবক তাঁহার সেবার জন্য ব্রহ্মে তাঁহার সহিত কয়েক

বৎসর কাটাইয়াছিলেন ; তাঁহার আহারাদির তদ্বির-তদারক করা ছাড়া বিশেষে ক্ষুদ্র বৃহৎ রোগে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। উমাচরণের সহিত এই সেবক একসঙ্গে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। উমাচরণের পরিবারে তাঁহার নাম ছিল অমৃত কাকা বা "খুড়ো"। কেহ তাঁহাকে কখনও অসম্মানের কথা বলিতে সাহস করে নাই। প্রকৃত, যাহারাই বাড়ীতে নিয়মিত মজুর দিত, পরিচারকের কাজ করিত তাহারা কেদার কাকা, ননীকা, হরিদা এবং পুরাতন পরিচারিকারা মানকুমারী দিদি, পঞ্চি পিসি প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত হইত। ইহার কোনও ব্যতিক্রম হইত না, হইবার প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হইত না। ইহাই ছিল বাড়ীর বা পরিবারের আবহাওয়া।

পল্লীর মঙ্গলজনক কাজে ডাকিলে তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত। তাহা ছাড়া নিজ ভিটার উপর চাষবাস লইয়া নিজ হাতে কাস্তে খুর্পি লইয়া সর্ব্বদা কাজ করিতেন। বাড়ীর কোথাও জঙ্গল, লতা-পাতা ঘাস জন্মিয়া থাকিতে পারিত না ; সর্ব্বদা তিনি তাহা পরিষ্কার করিতেন। তাঁহার পরিচ্ছন্নতা-প্রীতি চাষের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইত। নূতন চাষে তাঁহার যত্ন ছিল অশেষ এবং দেশ-দেশান্তরে গিয়া নানাবিধ আমগাছে কলম বাঁধিয়া আনিয়া বাগানে বসাইতেন। ফলে তাঁহার বাগানে যতপ্রকার ভাল জাতের আমগাছ পাওয়া যাইত, তাহা কোথাও কচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রকাণ্ড ভিটায় নারিকেল গাছ ছিল না ; তাঁহার মাতার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বংশে কোন অতীত যুগে নারিকেল গাছ বসাইয়া একটা "হানি" হইয়াছিল ; সুতরাং নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করা ঐ সংসারের চিরাচরিত প্রথাবিরুদ্ধ। পল্লীগ্রামে এই প্রথা সাধারণতঃ শাস্ত্রবাক্য পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়া থাকে : তিনি বহুকাল মাতৃবাক্য পালন করিলেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি ভিটার উপর শতাধিক নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বলিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যদি অমঙ্গল হয় তাঁহার অপরাধে অপরের সাজা হইবার কথা নহে। বলা বাহুল্য, ইহার পর সুস্থ শরীরে তিনি অনেক কাল জীবিত ছিলেন এবং পরিবারেও কোনরূপ গুরুতর অমঙ্গল হয় নাই। তাঁহার বংশধরেরা ডাব ও ঝুনা খাইয়া, বিক্রয় করিয়া আনন্দে দিনাতিপাত করিয়াছে।

মৃত্যুকে তিনি অতি স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বদা তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক পত্র লিখিয়া রাখেন। মৃত্যুর পর তাহা একটি চাবিহীন সামান্য কাঠের বাক্স হইতে পাওয়া যায়। এই বাক্সের মধ্যে জনমজুরদের জন্য দেয় রোজের সামান্য টাকা-পয়সা, চাষ সংক্রান্ত ছুরি এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি থাকিত। সংসারে ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল। বহু লোকের পরিবারে তিনি সম্পূর্ণরূপে জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করিতেন।

জানুয়ারী ১৯২৫ সনের ২৪ তারিখে তিনি লেখেন :

"আমার মৃত্যুর সময় হইয়াছে ; গত ২৩ পৌষ তারিখে আমি ৭৩ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ৭৪ বৎসর বয়সে পড়িয়াছি, সুতরাং আমি দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে আমার মৃত্যু হইলে আক্ষেপের কারণ নাই। আমার মনে হয় আমি হঠাৎ মারা যাইব। তোমাদিগকে কিছু বলিয়া যাইতে পারিব না। তজ্জন্য তোমাদের (পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র) অবগতির জন্য আমার ইচ্ছা লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি :

"যতদিন একান্নভুক্ত পরিবারে থাকিতে পার থাকিও। কিন্তু যখনই দেখিবে যে, কোন কারণে পরস্পর মনোমালিন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তদণ্ডে পৃথক-অন্ন হইবে। মনোমালিন্য আরম্ভ হইবামাত্র পৃথক হইলে তাহা আর বাড়িতে পারিবে না, পরস্পর ভ্রাতৃভাব থাকিবে। নতুবা মনোমালিন্য হইতে ক্রমশঃ শত্রুভাব জন্মিবে, তাহাতে পরে বিষময় ফল ফলিবে। একান্নভুক্ত পরিবার বরাবর কোথাও থাকে না, থাকিতে কখনও শুনি নাই। যদিও তোমরা থাকিতে পার, সংসার বৃদ্ধি হইলে তোমাদের পুত্রেরা কখনও থাকিতে পারিবে না।

"বিষয় সম্পত্তি প্রায় কিছুই নাই। সামান্য বাড়ীঘর ও বাগান যাহা আছে, তোমরা যখন পৃথকান্ন হইবে, আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর আপোষ বিভাগ করিয়া লইবে। সালিশী ডাকিবারও প্রয়োজন নাই। পরস্পরের সুবিধামত বিভাগ করিয়া লইও। যদি তাহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে মনে কর, তাহা কেহই ধরিও না। সামান্য বিষয় লইয়া কখনও আদালতে যাইও না।

"তোমাদের ও তোমাদের পুত্রকন্যাদের ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করি।"

অপস্মার রোগে তিনি পরম শান্তির মধ্যে ১৩৩২ সন ১লা ফাল্গুন ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই উপদেশপূর্ণ গল্প শোনা যাইত। তাহা পারিবারিক "হিতোপদেশ" বা "পঞ্চতন্ত্র" বলিলে ভুল হয় না।

ভূস্বর্গের যাত্রী

শ্রীমহাদেব রায়

৭

নৌগৃহের অভ্যন্তরে বসতির কক্ষে কক্ষে শয্যাস্থান, শৌচাগার, বৈঠকের গৃহ। মেঝের কার্পেট পাতা, কার্পেট কাশ্মীরের স্বকীয় সাধারণ সম্পদ। বৈঠকখানায় চেয়ার, টেবিল, সোফা, টেবিল-আয়না, ছবি—কক্ষ সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত। পথের ক্লান্তিতে ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে কোথাও আর বাহির হওয়া সম্ভব হইল না, রাত্রিতে সুনিদ্রার আশায় শয্যাগ্রহণ করা গেল। কিন্তু তৃতীয় প্রহরে শৈত্যের আধিক্যে নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিচে কম্বল পাতা আছে তোশকের উপর, উপরেও লেপের উপর কম্বল দিলে তবে এ শীতের হাতে পরিত্রাণ। আমার একটি মাত্র কম্বল সম্বল—সেটি নিচে পাতা। উপরের লেপ বরফ হইয়া আসিতেছে। পাশেই বন্ধুবর সুখে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিতেছি। লেপ-কম্বল জড়াইয়া বক্রধনুর আকারে প্রহরার্দ্ধ কাল পড়িয়া রহিলাম। শেষে আর না পারিয়া তারস্বরে চণ্ডীপাঠ সুরু করিলাম—বন্ধুবরের নিদ্রা ভাঙিল, বাঁচিলাম। এবার সমানে আনন্দভোগ করার অবসর হইল। আমি ভজন সুরু করিলাম—বন্ধুবর শ্রোতা।

নৌগৃহে দশ দিন অবস্থান করিতে হয়। আট আটটি রাত্রি আমার এক কম্বলে এই দুর্ভোগে কাটিয়াছে। নবম দিনে শ্রীনগরের নূতন কম্বল ক্রয় করিয়া সুখে নিদ্রা দিয়াছিলাম। দুই রাত্রি যে দুর্ভোগের হাত হইতে বাঁচিয়া সুখে নিদ্রা দিতে পারিয়াছি, তাহাও কম কথা নয়। অক্টোবরেই এখানে চতুর্দ্দিকে তুষারপাত হয়। শুনিলাম, নবেম্বরে স্থানীয় লোকেরা অনেকেই অগ্নি-গড় হইয়া—অঙ্গাবরণের মধ্যে আগুনের পাত্র রাখিয়া সর্ব্বদেহে তাপ-সঞ্চারের ব্যবস্থা করে।

দাশবাবু উড়িষ্যাবাসী বাঙালী। ধনী হইলেও ধনের অহঙ্কার নাই। যাহাকে বলে—অমায়িক সজ্জন। ছেলেটিও তাঁহার তেমনই সরল। কাশ্মীরের জিনিষ কেনায় এক বিড়ম্বনা দেখিলাম। কোনও জিনিষ দর না করিয়া কোথাও কেনার উপায় নাই, সে দোকানেই কি আর ফেরিওয়ালার নিকটই বা কি! এমন একটি দোকান শ্রীনগরে মিলিবে না যেখানে একদরে জিনিষ বিক্রয় হয়। শুধু শ্রীনগর কেন, সমগ্র কাশ্মীরেই দ্রব্যসামগ্রীর যথার্থ মূল্যের দ্বিগুণ কিংবা তাহারও বেশী মূল্য হাঁকিয়া বসে, কত কমাইবে কমাও। কাশ্মীরে আসিয়া যিনি স্বয়ং প্রথম সওদা করিতে ছুটিবেন তিনি ঠকিবেনই। বাঙালী বেশী আসিলে হঠাৎ জিনিষের দাম বাজারে তিন গুণ চড়িয়া যায়—যায় শাক-বেগুন পর্য্যন্ত। যাঁহারা স্থানীয় বাজারের হাল-চাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বা সুপরিচিত, তাঁহাদের সঙ্গে না গেলে ঠকিতেই হইবে। দাশবাবু একাই নিজের শাল ও কম্বল কিনিয়া এবং ছেলের নূতন গরম কোট-প্যাণ্ট করাইতে গিয়া রীতিমত ঠকিয়াছেন। তবু তাঁহার আত্মতৃপ্তি আছে, বেশী দাম দর নাই নিশ্চয়ই। কি জানি তাঁহার মন খারাপ হয়, এজন্য আমরা কেহ উচ্চবাচ্য করিলাম না।

ঝিলম নদী

দর্শনীয় স্থানের পরিচয়লাভের মানসে পরদিন পূর্ব্বাহ্নেই তথ্য সরবরাহের আপিস ইনফরমেশন ব্যুরোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বাহ্নে অফিসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। পুনরায় অপরাহ্নে গেলাম—এবার দেখা হইল। ঐকান্তিক সৌজন্যে অফিসর শ্রীত্রিসল আমাদের সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনগরের দ্রষ্টব্য স্থলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া অবশেষে প্রসঙ্গক্রমে ভারত সরকার ও জম্মু-কাশ্মীর সরকারের পারস্পরিক সম্মতিতে যৌথ কার্য্য-কারণ-ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করিলেন। সম্প্রতি শিক্ষার সৌকর্য্যবিধানে স্থানীয় সরকার যে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া সমধিক উল্লাস বোধ করিলাম।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে বন্ধুবর ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ঝিলমের উত্তরের উপকূলে নগরীর শ্রেষ্ঠ অংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমুন্নত রাজপথে পরিক্রমা সুরু করিয়াছি। স্থান-কালের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে অপ্রত্যক্ষ স্মৃতি-রেখা সার্থকরূপে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল—"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা"। অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তরাগ যখন স্রোতের উপর পড়িয়াছে, তখন সমুদ্ভাসিত তরলিত সুধার যেন নবজবার সঙ্গে সম্মিলিত নব পলাশের রাগরশ্মির নৃত্য-ছন্দ অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলাম। পরপারে দক্ষিণ তটে সারি সারি দেবদারুর ছায়া স্রোতের তলদেশে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি রচনা করিয়াছে। ঊর্দ্ধে বৃক্ষের সুশ্যামল পত্র-পল্লবাচ্ছাদিত দেহ যেমন মন্দিরাকৃতি, স্রোতের মধ্যে প্রতিবিম্বের আকারও তদ্রূপ। স্রোতের

তলায় সারি সারি ছায়া-রূপ—বড় মনোহর। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিলাম—"আঁধারে মলিন হ'ল খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।"

আজই প্রথম কবিগুরুর 'বলাকা' কবিতার যথার্থ মর্ম্মবোধ করিলাম। এতদিন যেন উহা সুস্পষ্টই হয় নাই। কবির নিজেরই লেখা কবিতাটির ইতিহাস মনে পড়িল। কার্ত্তিকের নির্ম্মল আকাশের নীচে বোটের ছাদে বসিয়া কবি পায়ের তলায় ঝিলমকে দেখিতেছেন সায়াহ্নে। কবি বলিয়াছেন—'আমি ঝিলম নদীর যেখানে ছিলাম, সেখানে নদীটি খুব বেঁকে গেছে।' বস্তুতঃ, আমরা দেখিয়াছি—শ্রীনগরের কটিদেশে ঝিলমের গতি যেন কতকগুলি বক্র স্রোতোরেখার শ্রেণী। অদূরে 'শঙ্করাচার্য্য' পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিলে,

নেহরু পার্ক, 'ডাল' লেক

এই স্রোতোরেখাগুলিকে পর পর চত্রিত ভুজঙ্গ-গতি তরঙ্গায়িত শ্যামল সুন্দর স্থল-রেখাচিত্রের মত মনে হয়। শ্রীনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বদিন (২৬শে অক্টোবর) 'শঙ্করাচার্য্যে' আরোহণ করিয়া এই চিত্র-শ্রেণী বিমুগ্ধ নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছি। দর্শনের তৃপ্তি ছন্দোবদ্ধ করিয়া বিশিষ্ট সুরসিক ও রসস্রষ্টা বান্ধবদের করকমলে উপহারও প্রেরণ করিয়াছি। দুইটি ছত্র প্রত্যক্ষ করা ছবির সঙ্গে মনে গাঁথা আছে।

"ভুজঙ্গের গতি কেহ শ্রীশঙ্করে হেরি
আঁকাবাঁকা ঝিলমের স্রোতোরেখা হেরি।"

প্রথম দিনের ঝিলম দর্শনে 'বলাকা'র রস-স্বরূপ মর্ম্মে মর্ম্মে যেন একটা ছন্দের নর্ত্তন রচনা করিল। একদিকে দেখিতেছি—বক্র তটিনীর পরিবেশে নয়ন-মনোহর সুষমার আলেখ্য, অন্যদিকে অনুভব করিতেছি—কবির মানস-গত চিরন্তন গতিধর্ম্মের কথা। "বুনো হাঁসের" মতই আমরাও চিরন্তন গতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই জীবনের যাত্রাপথ অতিবাহন করিতেছি। লোকে লোকান্তরে—জীবন হইতে জীবনান্তরে এই গতি-ধর্ম্মের জয়। 'বলাকা' পাঠ আজই সার্থক মনে হইল।

সন্ধ্যার পর বোটে ফিরিলাম। আমাদের বোটগুলির মালিক স্থানীয় অধিবাসী জনাব সালাম খাঁ। বলিষ্ঠ, সমুন্নতকায়, খর্জুরদেহ, সুপুরুষ বর্ষীয়ান—লেখাপড়া বেশী না জানিলেও বহু পরিচয়ের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধমনা। আমরা ইনফরমেশন ব্যুরোতে গিয়াছিলাম। শুনিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া খুন। হিন্দী ভাষায় তিনি মন্তব্য করিলেন—আমার কাছেই ত সমগ্র কাশ্মীরের পরিচয় পাইতে পারেন। প্রসঙ্গক্রমে অফিসারদের সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

৮

আগেই বলিয়াছি—চারিটি নৌ-গৃহে আমাদের সমগ্র দল বিভক্ত হইয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে সব পরিক্রমায় বাহির হয়। কোন দিন দুই দলে, কোন দিন বা একই সঙ্গে সকলে একযোগে বাসে যাত্রা করিয়াছি দূরবর্ত্তী স্থলের দৃশ্য দর্শনে। 'পহলগাঁও' বা, 'গুলমার্গে' যাত্রা এই ভাবে। কাছাকাছি স্থলে বা শহর পরিক্রমায় বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য আর আমি প্রায়শঃ একসঙ্গে বাহির হইয়াছি। খালে 'ডালে' প্রধান যান নৌকা। এখানে বলে 'শিকারা।' শিকারাগুলি সব সাজানো—ছক-কাটা, গদি আঁটা মনোহর বর্ণের বালর তাহাতে। সব যেন নব বর-বধূর স্বচ্ছন্দ-বিহারের উপকরণে সুমণ্ডিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরই শিকারায় উঠিয়া একদিকে না একদিকে যাত্রা আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যক্রমের অন্তর্গত হইয়াছে। শিকারায় উঠিয়াই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমার তন্দ্রা ভাঙাইবার জন্য বন্ধুবরের কত চেষ্টা। কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতেন—"Beauty goes a-begging claiming a look-up". একবার চোখ দু'টো দয়া করে' খুলুন না! সত্য সত্যই এ সুর-পুরীর সবই সুন্দর। নারীকুল বর্ণ-বিভায়, গঠন-সৌষ্ঠব এবং লাবণ্যশ্রীতে সুর-সুন্দরীদেরই গৌরব প্রকাশ করিতেছে। পুরুষদের বলা চলে রীতিমত সুপুরুষ। ভূ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ত কথাই নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—স্বর্ণ-বর্ণ আর লোহিত আভার মিশ্রণে চিনারের পত্রাবলীই শ্রীনগরের অতুলনীয় শ্রী-সুষমার শ্রেষ্ঠ উপাদান রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তার পর, স্বচ্ছসলিলা হ্রদ সরোবর আর বাঁকা নদী একদিকে যেমন জলময়ী স্নিগ্ধ ললিত সৌন্দর্য্য-ছাতি বিস্তার করিতেছে, অন্য দিকে তেমনই স্তব্ধ গিরিশ্রেণী উন্নত শিরে নগরীকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া যেন দিব্য লাবণ্যের মায়াজাল রচনা করিয়াছে।

তবু বহু বঙ্গবাসীই শ্রীনগরের শ্রী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। নগরীর পুরাতন হর্ম্ম্যরাজির পুরানো ইষ্টকের মলিন বর্ণ, আর ঝিলমের ঘাটে-ঘাটে গৃহ-পরিত্যক্ত কর্দ্দম-পানীয় এবং বহু ইষ্টকালয়ে অঙ্গরাগের অভাব তাহাদের নিতান্ত বিরাগ উৎপাদন করিয়াছে। নগরীর যে অংশে ভবনাদির বা রাজপথের কৃত্রিম শোভাসজ্জা—সেইটুকুই বা তাঁহাদের একটু নয়ন রঞ্জন করে, ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য, পর্ব্বতের উপর এমন জলের লীলা, অসংখ্য গৃহ-তরীর চাকচিক্য কোনটিই তাঁহাদের মন ভুলাইতে পারে নাই।

বন্ধুবর ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন—ছয় হাজার ফুট উর্দ্ধভূমিতেই সমতল বঙ্গের সাদৃশ্য রচনা করিয়া জলে স্থলে যে সুইজারল্যাণ্ডের লাবণ্যকে অতিক্রম করিয়াছে, সেই ভূ-প্রকৃতির যথার্থ সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করার দৃষ্টি চাই। ইহাকেই বলে—eyes and no eyes—চোখ থাকিতেও যাহারা অন্ধ, তাহাদের চোখ কে খুলিয়া দিবে?

কাশ্মীরে অবস্থিতির তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২০শে অক্টোবর মধ্যাহ্নে ডাক্তার সামন্ত, কালীবাবু এবং শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য সহ নৌ-বিহারে ঝিলমের সপ্ত সেতু অতিক্রম করিতেছিলাম—সেতুগুলির নিম্ন দিয়া নৌকা-বিহার। কাষ্ঠনির্ম্মিত সাতটি সেতু ঝিলমের উভয় তটস্থিত বসতির মধ্যে সংযোগ রচনা করিয়াছে—নদীর দুই তটেই নগরী। মজবুত কাঠে সেতু রচনার কৌশল মুগ্ধ নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। কালীবাবু সেতু-রচনায় কলা-কৌশল বুঝাইতেছিলেন—পূর্ত্ত-বিভাগের কাজে তাঁহার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কম নয়। ঝিলম হইতে বহু খাল কাটিয়া নগরীকে বেষ্টন করা হইয়াছে। সেই সব খালে অসংখ্য মহাকায় কাষ্ঠ ভাসিতেছে। ঐ সকল কাষ্ঠেই সেতুগুলি রচিত। ঐ সব কাঠ চেরাই করিয়াই নৌ-গৃহও রচিত হয়। ইষ্টকালয়ের সংখ্যা কম, ভাড়ার বাড়ী নিতান্ত অল্প, নৌ-গৃহই ভাড়াটিয়াদের, এমনকি স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যেও অনেকের বসতির উপায়।

প্রথম বা প্রধান সেতুটির নাম—"আমীরা (সংক্ষেপে, মীরা) কদল"। সেতুকে কাশ্মীরী ভাষায় বলে 'কদল'। এই প্রথম সেতুর উপবিভাগে নগরীর যে বিপণিশ্রেণী, উহাই শ্রীনগরের মধ্যে সর্ব্বাধিক পণ্যবহুল।

স্রোতের উজান পথে যাইতেছি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অভিমুখে। রঘুনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতার শুভ্র-দেহ সুচিক্কণ প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলাম—হিন্দু ব্যবসায়ীর নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির। এ অঞ্চলেও সেই ত্রেতাযুগের অবতার সপার্ষদ অর্চ্চিত হইতেছেন দেখিয়া উত্তর ভারতে ধর্ম্মার্চ্চনার একটা ভাবসাম্য উপলব্ধি করিলাম। দেবাদিদেব মহাদেব আর হনুমৎ-সেবিত লক্ষ্মণ সমেত শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা সমগ্র অঞ্চলে। শিলা-দেহ বিষ্ণু এবং সূর্য্যের পূজাস্থানও পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে সেগুলি সংখ্যায় অল্প।

মন্দিরের বহির্ভাগে প্রশস্ত চত্বরের বক্ষে দুইটি যুবতী ছাত্রীকে এক সংস্কৃতের অধ্যাপকের নিকট বেদান্তশাস্ত্রের পাঠ লইতে দেখিলাম। প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীদের এই ভাবে প্রাচ্য শাস্ত্র অধ্যয়নের সুব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া নয়ন-মন বিমুগ্ধ হইল। বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য সহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়ানো শুনিতেছিলাম—বেশ ভাল লাগিতেছিল। কালীবাবু তাড়া দিলেন—শিকারাওয়ালা চঞ্চল হচ্ছে, আসুন তাড়াতাড়ি।

অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে আমাদের নৌগৃহে পদধূলি দিতে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া পুনশ্চ শিকারায় উঠিলাম। ধীরে ধীরে সাতটি সেতু অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঝিলমের 'এনিকাটে' গিয়া উপস্থিত হইলাম। অপরাহ্ণের তৈর্য্যক্ রবি-রশ্মি এনিকাটের উচ্ছ সিত তরঙ্গের বক্ষে নৃত্য করিতেছে। এনিকাটের দক্ষিণ দিকে বিরল-বসতি গৃহাবলী যেন পল্লীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।

নিশাতবাগ

এনিকাট দিয়া ঝিলমের জল ভিন্ন পথে চালনা করিয়া স্বরাষ্ট্রের কৃষির কল্যাণে নিয়োজিত করা হইতেছে—প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে এই পয়োরাশির কল্যাণে বঞ্চিত হইয়াছে, সেকথা মিথ্যা নয়।

খরস্রোতা গম্ভীরা তটিনী ঝিলমের বক্ষে সপ্ত-সেতুস্থানের মাধুর্য্য-দর্শন সমাপ্ত করিয়া অবশেষে এনিকাটের সুপ্রশস্ত বক্ষে লহরী-লীলায় রশ্মির হাস্য উপভোগ করিলাম। আজিকার পরিক্রমা সার্থকতায় মণ্ডিত হইল। দিনটা সার্থক হইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে দুই বন্ধুতে শিকারাযোগে উত্তরমুখী হইলাম। চিনারবাগের খাল হইতে ডাল হ্রদে গিয়া পড়িলাম। শাজাহান ও জাহাঙ্গীরের রচিত কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ দুটি উদ্যান—নিশাতবাগ ও শালিমারবাগ দেখিতে চলিয়াছি। প্রথমে সোজা শালিমারবাগে নৌকা লইয়া যাইতে বলিলাম, ফিরতিপথে নিশাতবাগ দেখিয়া আসার সঙ্কল্প।

ডাল হ্রদের বক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছি। চোখে পড়িল ভাসমান সব্জির বাগান। দূরে দেখা যাইতেছে—বাংলা দেশের বাবলা গাছের মত গাছ ডাল হ্রদের বুকের উপর—সারি সারি গাছ। এ গাছ কাশ্মীরের ভূমিতে আগেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জলেও যে এ গাছ জন্মে তাহা এই প্রথম দেখিলাম। ইহার নাম 'উইলো'। 'উইলো' গাছে অনেক স্থলে হাউস বোটও বাঁধিয়া রাখা হয়।

এই হ্রদের জলে কমল, কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প ত জন্মেই, আশ্চর্য্যের কথা জলের উপর ফসলও হয়। কেমন করিয়া হয়, তাহাই বলিতেছি। দেখিতে অনেকটা উলুখড়ের মত, কিন্তু বেশ শক্ত ও স্থূল এক প্রকার তৃণ জন্মায় এই জলে। উহার উর্দ্ধভাগ কাটিয়া লইয়া মাদুর তৈয়ারি করা হয়। নিম্নভাগ জলের মধ্য হইতে উপরি-ভাগ পর্য্যন্ত ভাসিতে থাকে। তাহার উপর জলের শ্যাওলার সঙ্গে

মাটি দিয়া তাল পাকাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ঐগুলিতে এক একটি তরকারির বাগান হয়—লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ভাসমান শস্তের বাগান এক একটি মাপিয়া বিক্রয় করা হয়। কখনও কখনও এই সব সব্জিবাগ মালিকের অজ্ঞাতসারে অনেকে সরাইয়া লয়। কাশ্মীরে 'ফসল চুরি'র তথ্য উপলব্ধি করিলাম। প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝা যাইত না—প্রত্যয় জন্মিত না।

নিশাতবাগের আর একটি দৃশ্য

ডাল হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশের কিছু বেশী। শিকারায় অগ্রসর হইতে হইতে দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে 'নগিনাবাগ' দেখা গেল। ওখানে আর যাওয়া হইবে না। দূর হইতে চিনারের বর্ণ-বৈভব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যথাস্থানে অবতরণ করিয়া সে সৌন্দর্য্য আর প্রত্যক্ষ করা হইবে না। শুনা গেল—সাহেবেরা ওখানে স্নান-পানে আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। অদূরেই 'হরিপর্ব্বত'। হরিপর্ব্বতের কেল্লার মধ্যে নাকি কালীবাড়ী আছে। হ্রদের বক্ষে পর্ব্বত—তাহার উপর দুর্গ—সৌন্দর্যে ও তুঙ্গতায় মিশ্র-মনোহর রূপের গরিমা দূর হইতে অনুভব করিলাম।

শিকারাওয়ালাকে নির্দ্দেশ দিলাম—প্রথমেই চল সোজা শালিমারবাগে, তার পর নিশাতবাগ হইয়া ফেরা যাইবে। কাছাকাছি পৌঁছিয়া নৌকা রাখিয়া স্থলপথে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলাম। শালিমারবাগের ফটকে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের রূপমাধুর্য্য একবার দেখিয়া লইলাম। ধাপে ধাপে সিঁড়িতে উঠিয়া উচ্চ ভূমিতে দেখা গেল এক-খণ্ড সুবিশাল উদ্যান-ভূমি। আবার ধাপে ধাপে সিঁড়িতে উঠিয়া উচ্চতর ভূমিতে এমনি আর এক উদ্যান। এ ধরণের সতেরটি স্তরে উদ্যানাবলী সুসজ্জিত। প্রতিটি উদ্যানের মধ্যভাগে চতুষ্কোণ সুবৃহৎ চত্বর—তাহার চারিধারে বাঁধানো পায়ে চলার পথ। এই সব চত্বর বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও লতায় মণ্ডিত—অসংখ্য পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত। প্রতিটি উদ্যানে মহীরুহও অনেক—চিনার বৃক্ষও বেশী।

ক্রমাগত উপরে উঠিবার পথে পথে এইরূপ মনোহর পুষ্প-সজ্জা, আর বিটপীর শোভা। সর্ব্বোচ্চ স্তরে মহামহীরুহের কাননের নির্জ্জনতায় বসিয়া দূরে নিম্নভাগে প্রশস্ত ডাল হ্রদের বক্ষে অস্তগামী সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শন এক উপভোগের বিষয়। শুনা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এই স্থলে বসিয়া মুগ্ধ নেত্রে 'ডালে'র শোভা উপভোগ করিতেন। স্তরে-স্তরে উদ্যান-রচনায় এমন কারু-কৌশল আর কোথাও প্রত্যক্ষ করি নাই। উপযুক্ত স্থলে যথাযোগ্য রূপ-রচনায় প্রযত্ন আজও পান্থকুলের পরম আনন্দ এবং গভীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তবু ত উদ্যানের আজ আর আগেকার সে রূপ নাই। প্রতিটি স্তরের চতুষ্কোণে যে অসংখ্য কৃত্রিম জলের ফোয়ারা, সেগুলি নির্জ্জলা অবস্থায় আজ যেন নির্জীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ হেন কাননেরও আজ যেন উদাস মূর্ত্তি—যেন সে উল্লাস নাই, আনন্দ নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই।

এবার ডাল হ্রদের ভিন্ন স্রোত ধরিয়া কতকটা দক্ষিণ-পূর্ব্বে আসিয়া নিশাতবাগে অবতরণ করা গেল। শালিমারবাগেরই অনুরূপ গঠন-কৌশল এ উদ্যানেরও। সেই স্তরে স্তরে সর্ব্বোচ্চ উদ্যানতলে উঠিতে হইবে। এক এক স্তরে সুবিশাল মনোহর উদ্যান। কতগুলি সিঁড়ি, খেয়াল করিয়া গোনা হইল না। তবে দেখিয়া মনে হইল—শালিমারবাগের মত এ উদ্যান ততখানি উদাস মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। জলের ফোয়ারাগুলির অবশ্য একই অবস্থা—যেন উদাসীন। জলসরবরাহের ব্যবস্থা অবশ্যই আছে, নতুবা, স্তরে স্তরে বিচিত্র পুষ্পের কানন কিরূপে ভারে ভারে পুষ্পের সজ্জা লইয়া বিরাজ করে। সরকারের সযত্ন প্রয়াসের কথা কিছু শুনা গেল। কিন্তু তাহা রূপ-বিলাসী সম্রাট শাজাহানের স্বরচিত উদ্যানের রূপ-রক্ষায় পর্য্যাপ্ত প্রযত্ন বলিয়া প্রত্যয় হইল না। শুনা যায়—রাজমহিষী মমতাজের পিতা আসফজার তত্ত্বাবধানে এই উদ্যান রচিত হয়। রাজপরিবারের প্রাচীন স্মৃতির সঙ্গে চিনারের রক্তরাগ হৃদয়কে অনুরাগের মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ডালের বুকে অস্তরবির রশ্মিরেখার প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে নিশাত-বাগে সাজাহান ও মমতাজের বিহার-চিত্র মানস-পটে সমুদ্ভাসিত হইল।

শ্রীনগরের বহু দর্শনীয় রূপৈশ্বর্য্যের বিপুল আয়তন রচনা করিয়াছে এই দুইটি উদ্যান। শ্রীনগরের অভ্যন্তরে নাগরিক রূপ-রচনায় ত্রুটি বা স্বল্পতা কোন কোন দর্শককে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে বা বক্ষোদেশে এই যে মনুষ্যহস্ত-রচিত রূপ-সজ্জা, ইহা কাহাকে না বিমুগ্ধ করিবে!

১০

পরদিন সকালে সকলে মিলিয়া বাসে পহলগাঁও যাত্রা করা গেল। পহলগাঁও শ্রীনগর হইতে বাট মাইল দূরে। যাওয়ার পথে

দক্ষিণে, বামে জাফরানের ক্ষেত আর লিদার নদী হইতে আগত বিলামমুখী খালের স্বচ্ছ ধারা দৃষ্টির উপর কোমলতার তুলি বুলাইয়া দিল।

শ্রীনগর হইতে ষোল মাইল দূরে পড়ে অবন্তীপুর। কেহ কেহ বলিল—মহাভারতের সুবিখ্যাত অবন্তীপুরের ধ্বংসাবশেষ ওখানে বিদ্যমান। কাশ্মীরের বিশেষ বিবরণে দেখা যায়—উহা কাশ্মীর-রাজা অবন্তীবর্মণের কীর্ত্তির সাক্ষী হইয়া আছে।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি পহলগাঁওয়ে পৌঁছানো গেল। স্তরে স্তরে উন্নত হইতে উন্নততর গিরিমালা স্থানটিকে তিন দিকে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে পাইনের ঘন বন লঘু হরিতের উপর গুরু হরিতের শোভা রচনা করিয়াছে। নিম্ন-ভাগে 'লিদার' নদীর স্বচ্ছ ধারা নয়ন-মনোহর। তিন দিকের বৃত্তাকার গিরিশ্রেণী তুষার-কিরীট শীর্ষে ধরিয়া হরিতের উপর শুভ্র শোভায় মনোহারিত্ব সম্পাদন করিয়াছে।

এই কয়দিনে কাশ্মীরের যতখানি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছি, পহলগাঁওয়ের শোভা তাহাকে হার মানাইল।

অমরনাথ যাত্রার প্রথম গ্রাম হিসাবেই ইহার নাম হইয়াছে পহলগাঁও। অমরনাথ এখান হইতে মাত্র একত্রিশ মাইল। কিন্তু ক্রমোচ্চ পার্ব্বত্যপথেই অগ্রসর হইতে হয়। ঝুলন (শ্রাবণী) পূর্ণিমাতে তুষারের শিব-মূর্ত্তি দর্শন অমরনাথের তীর্থকৃত্যরূপে একান্ত আকর্ষণের বস্তু হইয়া আছে। তাহা ছাড়া, প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদেও অমরনাথের বৈশিষ্ট্য গরিমাদীপ্ত।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন সুরু হইয়া গেল। নাগরিক ভাষায় যাহার নাম 'পিকনিক', আর বাংলার গ্রাম্য সৌন্দর্য্য যে নামের সঙ্গে বিজড়িত, সেই বনভোজন পর্ব্বের প্রাথমিক অধ্যায় রচিত হইতে লাগিল। সঙ্গীরা অনেকেই অশ্বারোহণে ক্রমোন্নত পার্ব্বত্য-পথে বিহার করিতে ছুটিলেন। স্থানীয় কাশ্মীরীরা ঘণ্টা হিসাবে বা পথের দূরত্ব হিসাবে ভাড়ায় ঘোড়া দিতেছে। ঘোড়ার মালিকই ঘোড়াকে চালনা করিবে। আরূঢ় ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া বসিয়া থাকিলেই হইল। যাহার কোনদিনই অশ্বারোহণের অভ্যাস নাই, সেও স্বচ্ছন্দেই দিব্যি আরামে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। অশ্বগুলি পার্ব্বত্যপথে লঘু গতি, দ্রুত গতি—দুইয়েই বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। অশ্বারূঢ় পর্য্যটকের পতনের বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা থাকে না।

তবু বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য আর আমি অশ্বারোহণের সুখ-সম্ভোগে আকৃষ্ট না হইয়া ডাকঘরে গেলাম চিঠি লিখিতে। শহরটাও একটু দেখার অভিলাষ। দুইখানি পোষ্টকার্ডে দূরস্থিত দুই আত্মীয়কে পহলগাঁওয়ের প্রাকৃতিক সুষমার কথাই বেশী করিয়া জানাইলাম।

সত্য সত্যই কাশ্মীরের পার্ব্বত্য সুষমা হিসাবে পহলগাঁওয়ের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। গুল্মার্গকেই অবশ্য সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। পহলগাঁও তাহারই পরবর্ত্তী। তবে স্থানের জাতি-বিচার হিসাবে দুইটি নানা বিষয়ে পৃথক-ধর্ম্মী। গুল্মার্গ এক জাতির, আর পহলগাঁও আর এক জাতির। ধরিতে গেলে, গুল্মার্গের অধিকতর উচ্চতাই সৌন্দর্য্য-নিলয়ের প্রশস্ততার উপাদান রচনা করিয়াছে। এক হিসাবে পহলগাঁও গুল্মার্গের মহিমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে পহলগাঁও কাশ্মীরের মধ্যে অতুলনীয়। স্বীয় পরিবেশে ইহার প্রাকৃতিক গরিমাও যে অতুলনীয় তাহাও স্বীকার করিতেই হয়।

পহলগাঁওয়ের পালসা হোটেলটিও বেশ সুন্দর। মাসিক এক শ' টাকা হইলেই হোটেলে একজনের খরচ চলিয়া যায়। ঘরগুলি সব কাঠের তৈয়ারী।
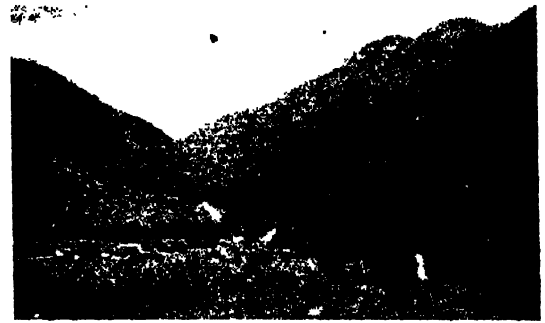
পহলগাঁও

পহলগাঁওয়ে খাদ্যদ্রব্যও বেশ সস্তা। মধু, মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ—সবই সুলভ। স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু বেশীর ভাগই দরিদ্র।

বেলা দুইটায় শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত সমতলে পাতা পাতিয়া সকলে মিলিয়া কলমুখর ভোজনানন্দের পর্ব্ব সমাধা করা গেল—খিচুড়িতে সুরু করিয়া পাঁপরে পরিসমাপ্তি।

স্থানটি ছাড়িয়া আসিতে মন চাহে না। তবু তো আসিতেই হইবে। আমাদের পুনর্যাত্রা সুরু হইল।

পহলগাঁও হইতে শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বিশ মাইল দক্ষিণে মার্ত্তণ্ড-মন্দির দর্শনীয়। শোনা যায়—সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। মন্দির-নির্ম্মাণের সুযোগ্য স্থল নির্ব্বাচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকের পরিবেশ যেন অলৌকিকতার আবরণে দেব-মহিমায় পুণ্যপীঠ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শ্বেত-প্রস্তরের সূর্য্যমূর্ত্তি দেব-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর—এই পঞ্চবিধ দেবোপাসকে ভারত পঞ্চ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এ অঞ্চলে প্রাচীন সৌর উপাসনার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিলাম এরূপ ভারতে আর অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এক কোণার্কের সূর্য্য-মন্দির বাদ দিলে, সূর্য্যপূজার স্থায়ী চিহ্ন ভারতে অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না।

চারি মাইল দক্ষিণে আসিয়া চোখে পড়িল—'অনন্তনাগ' তীর্থ। কাশ্মীরী ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ প্রস্রবণ। এখানে একটি গন্ধকের প্রস্রবণ আছে। অনন্তনাগ তীর্থে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার শ্বেত-

প্রস্তরের মূর্ত্তি দেখা গেল। প্রাচীন শিল্পীর শিল্প-কুশলতা দেবদেহের গঠন-পারিপাট্যে আর সুষমা-সৌষ্ঠবে যেন দীপ্ত হইয়া আছে। অনন্তনাগ তীর্থের পার্শ্ব দিয়া মার্ত্তণ্ড খালের জল বহিয়া যাইতেছে—স্বচ্ছধারা। পহলগাঁও হইতে লিদার নদীর এই খাল বাহির হইয়া ঝিলমে গিয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীরে পার্ব্বত্য নদী, প্রস্রবণ আর খালের জলে যতখানি চাষ হয়, বৃষ্টির জলে ততখানি হয় না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এখানে নিতান্ত কম। প্রাকৃতিক নদী বা প্রস্রবণ থাকা সত্ত্বেও খালের জলের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। খালের জলেই ধানের চাষ হয় বেশী। গম বা মকাইয়ের ত কথাই নাই।

অনন্তনাগ তীর্থে বাহিত জল বাঁধানো চৌবাচ্চায় আংশিক আবদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের 'ল্যাটা' জাতীয় মাছে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই তীর্থের সংলগ্ন শহরের নাম ইসলামাবাদ—বড় বাণিজ্যকেন্দ্র একটি। এখানকার পশমে তৈয়ারী বড় গালিচা বা গালিচার আসন প্রসিদ্ধ। স্থানীয় ভাষায় গালিচার নাম 'গাব্বা'। কালীবাবু বহু টাকার গাব্বা কিনিলেন। এক একটি প্রকাণ্ড কক্ষ আচ্ছাদনের উপযোগী। কিন্তু দরকষাকষি করিয়া কেনার মধ্যে দেখিলাম বিক্রেতার প্রথম দাবির সঙ্গে প্রদত্ত ক্রয়-মূল্যের বহু পার্থক্য। আগেই বলিয়াছি, কাশ্মীরে দর না করিয়া কোন জিনিষই কেনা যায় না। বিক্রেতা প্রথমে যাহা দাবি করিবে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ স্বীকার করিলে শেষ পর্য্যন্ত দাবির অর্দ্ধেকে গিয়া দাঁড়াইবে।

১১

২৫শে অক্টোবর রবিবার অপরাহ্নে অনেকে মিলিয়া চশমাশাহী দেখিতে গেলাম। ডাল হ্রদ দিয়া শিকারায় না গিয়া এবার গেলাম টাঙ্গায়। কাশ্মীরী ভাষায় 'চশমা' শব্দের অর্থও প্রস্রবণ। চশমাশাহী প্রস্রবণের জল অতি স্বচ্ছ, পরিপাকের পক্ষে একান্ত অনুকূল পানীয়। অনেকেই প্রস্রবণের উদ্গত বারিরাশি অঞ্জলি ভরিয়া আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন।

তার পর সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরের চত্বরে উঠা গেল। অদূরেই শ্রীনগরের মর্ম্মবিদারী সুবিখ্যাত শ্বেত প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। শ্যামাপ্রসাদের অন্তিমের কারাগৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মনটা যেন উদাস হইয়া গেল। ললাটে সংযুক্ত করপুট স্পর্শ করিয়া সেই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করিলাম। স্মৃতিগত মনোবেদনার সঙ্গে চশমাশাহীর সমুচ্চ চত্বরের গাত্র-ভিত্তির লতা, পাতা ও পুষ্পের মনোহর বর্ণ-বৈচিত্র্য মানসপটে চির-করুণ রাগরেখা আঁকিয়া গেল। অভিজ্ঞ টাঙ্গাওয়ালার মুখে শুনিয়াছি, ঐ প্রাসাদে বড় বড় লোক আসিয়া বাস করেন। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর হইতে ঐ গৃহে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—জনশূন্য বন্দপুরী নিষ্প্রাণ কায়া লইয়া অসীম শূন্যে রুদ্ধ শ্বাসের স্মৃতি-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। যেদিন প্রথম নিশাতবাগ দেখি, সেদিনই দূর হইতে এই প্রাসাদ প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। কোজাগরীর সায়াহ্নে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষ-বিষাদের ভাবমিশ্র অভিব্যক্তি হইয়াছিল সেদিন নৌগৃহে পৌঁছিয়া।

ডাল হ্রদে, আর শালিমার বাগে
করিনু বিহার নব অনুরাগে,
মরমের আঁখি সে নিশাতবাগে
শ্বেত-প্রাসাদের ভিয়া
দেখিল—কাঁদিছে বাংলা মায়ের
বরণীয় সেই বীর তনয়ের
স্মৃতি-তর্পণে আজি মরতের
ব্যথা-স্মৃতিটুকু দিয়া।

সেদিন শ্রীনগরের বক্ষে বঙ্গের কোজাগরীই যেন লক্ষ্য করিতেছিলাম। বঙ্গশ্রীই যেন শ্রীনগরের শ্রীরূপে মূর্ত্তিমতী—এই ভাবদৃষ্টির অন্তরালে বঙ্গজননীর সুসন্তানের বিয়োগ-ব্যথা আশ্রয় লইয়াছিল।

দেখিলাম—

হোথা জোছনায় ঝিলমের তীর
মায়াময়ী দেবদারু অটবীর
রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুক্তাময়ীর
চিত্রিত রূপে হাসে,
চাঁদিনী পশিছে মর্ম্মের মূলে
ঝিলম উঠিছে তাই দুলে' দুলে'
আলোকিতা গৃহ-তরী কূলে কূলে
মায়াপুরী যেন ভাসে।
স্নিগ্ধ আলোকে শ্রীনগর হাসে
রজত-ধারায় ধরাতল ভাসে
কোজাগরী হেথা যেন পরকাশে
বঙ্গের জোছনায়,
চির-নিদ্রায় তনয় যাহার
অভিভূত, উঠে তারই হাহাকার
শ্বাসে-উচ্ছ্বাসে মর্ম্ম-বিদার
পাষাণ-দ্রব হিয়ায়।

কোজাগরীর সন্ধ্যায় সৌন্দর্য্যানুভূতির অন্তরালে যে করুণ গাথা আশ্রয় লইয়াছিল, আজ চশমাশাহীর সৌন্দর্য্যের পাশে তাহাই প্রত্যক্ষরূপে নবীভূত হইয়া হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

চশমাশাহী হইতে আজ আবার উত্তর মুখে শালিমারবাগে চলিলাম। শালিমারবাগ পর্য্যন্ত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উর্ব্বর ভূমির মত ধান্যভূমি বা তরিতরকারির ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হইল। শালিমারবাগে নামিয়া আজও একবার এই মনোহর উদ্যানের প্রথম স্তরে উঠিয়া অল্পক্ষণের মত চতুর্দ্দিকের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম। অপরাহ্নের

সূর্য্য ডাল হ্রদের অভ্যন্তরে রশ্মিরেখায় প্রতিবিম্ব রচনা করিয়াছে। হ্রদের বারিরাশির মধ্যে পর্ব্বতের প্রতিবিম্বও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সেখান হইতে আরও উত্তরে গিয়া 'পীরসাহেবে'র পীঠ দর্শন করিলাম। পীরসাহেবের নাম—সৈয়দ মীরাক। সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার। শুনা গেল—তিনি পারস্য হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। পীরসাহেব কথা বেশী বলেন না। যে-কেহ গিয়া দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া আসে। প্রশ্নের বা উত্তরের ক্ষেত্র নয় এটি। যাঁহারা যান, সকলকেই মিছরি বা, ফল (আখরোট কি বাদাম) দিয়া আপ্যায়িত করেন। বর্ষীয়ান হইয়াছেন—বয়স আশীর উপর হইবে। কিন্তু মুখে চোখে একটা সমুজ্জ্বল দিব্য বিভা। একত্র অবস্থানকারী শিষ্য গোলাম মহম্মদ ও এনায়েত হোসেনের সঙ্গে বার্ত্তালাপে বুঝিলাম—বর্ণ-ভেদের বোধাতীত এই মহাপুরুষ মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ থাকেন।

বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য সমগ্র জীবন ধরিয়া মহাপুরুষ দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। আজ উনি পীরসাহেবের দর্শনমাত্রেই অলৌকিক শক্তি উপলব্ধি করিয়া ফিরিবার পথে আমায় মহাপুরুষদের কথাই বলিতে লাগিলেন। সমস্ত পথ তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে নিজের ব্যর্থ জীবনের নিষ্ফল বিলাপ অন্তরের মধ্যে গুমরিয়া ফিরিতেছিল।

পীরসাহেবের পীঠের কিছু উত্তরেই 'হারওয়ান' হ্রদ। এই হ্রদের স্বচ্ছ, সুপেয় পানীয় সমগ্র শ্রীনগরে পরিবেশন করা হয় কাঠেরই পাইপ দিয়া।

শান্ত, স্থির পরিবেশে, সন্ধ্যার আলোকে বাম ভাগে তখত-ই-সুলেমান পাহাড়ের গায়ে রাজভবনের বহির্ভাগ দেখিতে দেখিতে ফিরিতেছি—প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ ভবন—অভ্যন্তরে আলোকমালায় আলোকিত।

দক্ষিণ পার্শ্বে ডাল হ্রদের উপর 'নেহরু পার্ক' তখন আলোক-মালায় ঝলমল করিতেছে।

টাঙ্গাওয়ালা আবেগভরে বলিয়া উঠিল—আভি ক্যা দেখতে হেঁ বাবু? শেখ আবদুল্লাকে টাইম ও পার্ক সামকো হররোজ উজ্জ্বলতা ওজ্জ্বলতা। বর্ত্তমানে জম্মুর পথে কুদের দক্ষিণে কারাভবনে আবদ্ধ প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লার সময়ে নিত্য সন্ধ্যায় এই পার্ক মহোৎসবের হর্ষে মুখরিত থাকিত। পার্কটি 'শের-এ-কাশ্মীর' শেখ আবদুল্লারই প্রতিষ্ঠিত।

১২

কাশ্মীরের 'উলার' হ্রদে নৌ-বিহার এক প্রশস্ত দৃষ্টিবিস্তারের সুপরিসর ক্ষেত্র সম্মুখে ধরে। হ্রদের পরিধি প্রায় পনের মাইল। কাশ্মীর-উপত্যকার মধ্যভাগে কিয়ৎ উত্তর-পশ্চিমে এই হ্রদ। এই হ্রদে অপরাহ্ণের নৌ-বিহারে ঝটিকায় নৌকাডুবির আশঙ্কা সমধিক।

শ্রীনগর হইতে প্রায় সাতাশ মাইল দূরে 'ট্যাঙমার্গ'। ট্যাঙ-মার্গ হইতে ঘোড়ায় বা ডুলিতে 'গুলমার্গে' উঠিতে হয়। গুলমার্গের উচ্চতা প্রায় ৯০০০ ফুট। গুলমার্গের অর্থ গোলাপবাগ—গোলাপের বাগিচা।

সমগ্র কাশ্মীর-উপত্যকায় মধ্যে গুলমার্গের পার্ব্বত্য সুষমা যে অতুলনীয় সেকথায় উল্লেখ আগেই করিয়াছি। সুশ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মুক্ত গিরিপাদের আশেপাশে ঘন পাইনের বন। শিলঙের শোভার সঙ্গে ইহার যেন অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। আগে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজই ছিল বেশী। এখন অনেক কম।

গুলমার্গের ৪০০০ ফুট ঊর্দ্ধে খিলেনমার্গ। প্রাকৃতিক পার্ব্বত্য সুষমায় খিলেনমার্গ যেন কাশ্মীরের শিরঃশোভা রচনা করিয়া রাখিয়াছে, আর, গুলমার্গ হইল কণ্ঠভূষা।

শালিমারবাগ

এইরূপ পার্ব্বত্য সুষমায় আধার কাশ্মীর-উপত্যকায় আমাদের মাত্র দশ দিনের অবস্থিতি। তাহাতে কি সমস্ত জিনিষ দেখা হয়, না সর্ব্বত্র যাওয়া সম্ভব? বহু দর্শনীয়ের মধ্যে ক্ষীর-ভবানী দর্শনও আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। শ্রীনগর হইতে বাসযোগে প্রায় বিশ মাইল দূরে মন্দির। ভক্তের দৃষ্টিতে মহামায়া এখানে নিশ্চয়ই ক্ষীর-প্রিয়া হইয়াছেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় নাকি দেবীর তিথি-উৎসব পালন করা হয়।

আগামী কাল এই রূপৈশ্বর্য্য-নিকেতন পরিহার করিয়া যাইতে হইবে। তখ্‌ত্‌-ই সুলেমান বা, শঙ্করাচার্য্যগিরিতে আজ পূর্ব্বাহ্ণে আরোহণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম। প্রেরণা যোগাইলেন কালী-বাবু আর কলিকাতার ডাক্তার বাবু। 'দেখবেন কি শান্ত পবিত্র পরিবেশ, কি জ্যোতির্ম্ময় দেব-দেহ, কি চতুষ্পার্শ্বের শোভা!' আরোহণ করিয়া দেখিয়াছি—বন্ধুদ্বয়ের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

বন্ধুবর ভট্টাচার্য্যকে আরোহণকালে রীতিমত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল এবং ক্ষীণতনু হইয়াও আমি বরং স্বচ্ছন্দেই আরোহণ করিলাম। হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়া স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শনে পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিলাম উভয়ে তিন বার দেবদেহ প্রদক্ষিণ করিয়া যখন মন্দিরের মধ্যে উপবেশন করিলাম, তখন অনুভব করিলাম—যেন এক মহা-শান্তি বিরাজ করিতেছে। ভারতের বহুস্থলে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বহু শিবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এখানকার এ শিবলিঙ্গের তুলনা খুঁজিয়া পাই না। পর্ব্বতের উপরে দেবমন্দিরের বহির্ভাগেও

নিবিড় শান্তি—অভ্যন্তরে দেব-দেহে অপূর্ব্ব স্বর্ণ-শ্যাম কান্তিতে সমুজ্জ্বল দ্যুতি।

আরও উপভোগের বিষয় এই যে, এখান হইতে নিম্নবর্ত্তী সমগ্র শ্রীনগরের শোভাসন্দর্শন যেন অভিনব আলেখ্যদর্শন। দূরে আঁকা-বাঁকা ঝিলমের সর্পিল গতির দিকে চাহিলে চোখ আর ফিরানো যায় না। সমগ্র শ্রীনগরের শোভানিরীক্ষণ সম্পর্কেও সেকথা প্রায় সমানেই প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া, শ্রীনগরের পরিধি অতিক্রম করিয়াও চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত অবাধ দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া যায়। কাশ্মীরের উপত্যকাকে একরূপ সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করারই যেন পরম সুযোগ। উর্দ্ধদেশ হইতে আরক্ত চিনারের ফাঁকে ফাঁকে নগরীর ভবনশ্রেণী, উন্মুক্ত সমতলে অবস্থিত গৃহাবলী ঠিক যেন সমস্তরে সুশোভিত সহস্র চিত্রের সমাবেশ বলিয়া মনে হয়। অন্যদিকে সুপ্রশস্ত ডাল হ্রদের বক্ষে অসংখ্য সজীব বাগান শ্যামল জলাধারে সুশ্যামল চতুষ্কোণের চিত্র রচনা করিয়াছে।

দিব্য উপভোগের মধ্যে কতিপয় ছত্র রচনা করিয়া বন্ধুবরকে শুনাইলাম—

> বক্ষী-ঘেরা পুরী যেন পপলার-চিনারে,
> শ্যামল শস্যের ক্ষেত ডালের মাঝারে
> সম-চতুষ্কোণ—শ্যাম-সৌন্দর্য্য-নিলয়
> নয়নের-তৃপ্তি-চিত্র কি বৈচিত্র্যময়!
> দূরে হিমশীর্ষ শৈলমালা স্বর্গ চুমি',
> নিম্নে যেন স্বপ্ন-রাজ্য বৈজয়ন্তীভূমি,
> আঁকাবাঁকা ঝিলামের বারম্বার হেরি—
> অতৃপ্ত আঁখির-নেশা রহে মোরে ঘেরি।

১৩

স্বর্গ হইতে বিদায়ের পূর্ব্ব রাত্রিতে নৌগৃহের বৈঠকে কত আলোচনা কাশ্মীরের! টুরিষ্ট ম্যাপে কাশ্মীরের কথা পড়া গেল।

কাহিনীতে রহিয়াছে—উপত্যকাটি এককালে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। উন্নত ভূমিতে অতিকায় এক দানব বসবাস করিত। নরহত্যা করিয়া সে নর-মাংসেই জীবনধারণ করিত। মহামুনি কাশ্যপের তপস্যায় মহাদেবী আবির্ভূত হইয়া দানবকে নিধন করেন। দেবীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটি প্রস্তরে এক মহা-পর্ব্বত হয়। মহামুনি কাশ্যপ পর্ব্বতের মধ্যে হ্রদের জল নিষ্কাশনের পথ করিয়া দেন। মুনির নাম অনুসারে উপত্যকার নাম হয়—'কাশ্যপ মীর'। উহা হইতেই নাকি 'কাশ্মীর' নাম হইয়াছে। তথ্যের রহস্য আজ কে উদ্ঘাটন করিবে? তবে ভূতত্ত্ববিদেরাও নাকি অনেকে এ বিষয়ে একমত যে, কাশ্মীর এককালে জগতের মহাসমুদ্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত এক বিশাল সমুদ্রই ছিল।

আজ কাশ্মীরে শতকরা দশ জন হিন্দু, নব্বই জন মুসলমান। হিন্দু রাজা ললিতাদিত্য বা অবন্তীবর্ম্মণের কোন দুর্নামের কথা ইতিহাসে দেখা যায় না। 'রাজতরঙ্গিণী'তে কাশ্মীরের বহু ইতিকথা লিপিবদ্ধ আছে।

মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইলে হিন্দু-নির্য্যাতন সুরু হয়, হিন্দুর কীর্ত্তিও ধ্বংস হইতে থাকে। এ বিষয়ে সেকেন্দর শাহের কুখ্যাতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান সম্রাট জয়নাল আবেদীন মহামনা আকবরের ন্যায় উদার ছিলেন। প্রজাদের তখন সুখও ছিল।

সম্রাট আকবর কাশ্মীর জয় করেন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তদবধি মোগল সম্রাটগণ এখানে রাজত্ব করিতে থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জম্মুর রাজা গুলাব সিং শিখযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এক কোটি টাকা দিয়া ব্রিটিশরাজের নিকট হইতে কাশ্মীর ক্রয় করেন। ভূতপূর্ব্ব রাজা হরি সিং—গুলাব সিং-এরই বংশধর। হরি সিং-এর পুত্র করণ সিং বর্ত্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা।

দেশটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তবে বহুকালের পীড়নে দেশবাসীর মেরুদণ্ড যেন আজ ভগ্ন। অধিকাংশ অধিবাসীই অতি দরিদ্র। শীতের দেশ। অথচ অধিকাংশ লোক শীতবস্ত্রে বঞ্চিত। উড়িষ্যাবাসী কিংবা মাদ্রাজপ্রদেশবাসী অতিদরিদ্র মানব-সমাজের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহাদের আরও দরিদ্রই মনে হয়। যাহারা ভারবাহী কুলির কাজ করে তাহারা বেশ বলিষ্ঠ। ইহাদের আচরণে একটা ভীরুতা লক্ষ্য করা যায়। যাহারা শ্রমিক সংগ্রহ করে তাহাদের নিকট ইহারা পর্য্যাপ্ত শ্রমমূল্য পায় না। তাই এই সব শ্রমিক কাজের জন্য হাহাকার করিলেও লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। সংগ্রহকারীরা অন্য লোকের দ্বারা প্রহার করাইয়া এই সব শ্রমিককে কাজে লাগায়। অম্লান বদনে ইহারা ঐ প্রহার সহ্য করে দেখিয়াছি।

কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পশমিনা—একপ্রকার ছাগলের লোম। পশমিনা অল্প দামেরও আছে, বেশী দামেরও আছে। এক গজ পশমিনার মূল্য এক শত টাকা পর্য্যন্ত দেখা যায়। পশমিনা হইতে শাল তৈয়ারী হয়। কাশ্মীরী শাল সুবিখ্যাত। শালে পাড়ের কাজও অতি মনোহর। কাশ্মীরী তোষ, ধোসা, মলিদাও কম প্রসিদ্ধ নয়।

কাশ্মীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম শিল্প সুপ্রসিদ্ধ। শালের মত শাড়িরও পাড়ের কাজ উল্লেখযোগ্য। কাঠের বাসন, খেলনা, আসবাব, রূপার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য—সব কিছুতেই নয়নমনোহর কারুকার্য্য। এই সব দ্রব্যের উপর কাশ্মীরী শিল্পীদের যে কারুকার্য্য তাহার তুলনা ভারতের অন্যত্র মিলিবে না।

কাশ্মীরের রেশমও প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরী রেশম ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। আবার ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রেশমও কাশ্মীরে আমদানী করা হয়। বিদেশী রেশম হইতে কাশ্মীরে শাড়ি তৈয়ার করা হয়। পশমিনা এবং রেশমে মিশাইয়া একপ্রকার রিংশাল তৈয়ার করা হয়—উহা স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য্য। এক একটি রিংশাল এত হালকা যে মুঠার মধ্যে রাখা যায়।

শ্রীনগরে রেশমের কারখানা একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। কিরূপে রেশমের তন্তু তৈয়ার হয় তাহা দেখিবার জিনিষ। তাহা

ছাড়া শাড়ি, শাল, আলোয়ান, কাঠের খেলনা আসবাব প্রভৃতি তৈরীর কয়ায় ছোট-বড় শিল্পাগার নগরীর সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে।

কাশ্মীরের গিরিজাত প্রস্তর বহুপ্রকারের—স্বল্পমূল্য হইতে বহুমূল্য প্রস্তরের ফেরিওয়ালা বা বড় ব্যবসায়ী অসংখ্য।

বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পসম্ভারে সুসমৃদ্ধ এই দেশও নিজের দারিদ্র্যকে দূর করিতে পারে নাই, ইহাই নিতান্ত দুঃখের কথা।

ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ধৈর্যশীল। ফেরিওয়ালাদের ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ লইয়া ফেরি করিতে দেখা যায়—শাল, শাড়ি, পাথর ও জাফ্রান। শিকারা লইয়া কত লোকে বিভিন্ন দ্রব্যের সওদা করিয়া ফেরে। শিল্পজাত দ্রব্যের দরকষাকষিতে আর জিনিষ কোনক্রমে ক্রেতার হাতে পছাইয়া দিতে ইহাদের অসীম ধৈর্য। এরূপ সুপটু বিক্রেতা কম দেখা যায়।

১৪

২৮শে অক্টোবর বুধবার পূর্ব্বাহ্নেই পুনর্যাত্রার পর্য্যায় সুরু হইল। পথে 'কুড' নামক গিরি-নিবাসে রাত্রি যাপন করা গেল। যাত্রীদের শয্যা-ব্যবস্থায় প্রথম একটু বিভ্রাটের সূচনা হইলেও, অঙ্কুরেই উহার অবসান ঘটিল। পরদিন প্রভাতে বাসে উঠার সময় পূর্ব্বরাত্রির উষ্মা সহসা একটা তিক্ততার সৃষ্টি করিল। এই সময়ে পরিচালক ফকিরচন্দ্র কুণ্ডুর ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

বেলা দশটায় জম্মুতে পৌঁছিয়া 'মেট্রো' হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। বহু যাত্রী জম্মুর সুবিখ্যাত মন্দির দেখিয়া আসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন—"এক লক্ষ শালগ্রাম-শিলার নিত্য পূজা হচ্ছে।"

পাঠানকোটে পৌঁছিয়া কুণ্ডু স্পেশালের নির্দ্ধারিত দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণে তৎপর হইলেন। এখন ঘরের টান। পিছনে ফেলিয়া-আসা ভূ-স্বর্গের মায়া এখনও কিন্তু আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

এক বান্ধবকে পত্রে লিখিলাম :

ক্ষীণ পুণ্যে সেই মর্ত্ত্যলোকে পুনরায়
মাগিতে হইল স্বর্গ হইতে বিদায়
শঙ্করে জানায়ে নতি। আটাশে প্রভাতে
স্বর্গ চিনারের বন রাখিয়া পশ্চাতে
চলি দ্রুত রাজপথে। দীর্ঘ গিরি-পথ
শত ক্রোশ রূপে রসে ভরি মনোরথ
নব রক্ত-রাগে রাঙাইয়া ভাবে ভাবে
বিলাল ঐশ্বর্য্য-রাশি, ইরাবতী-পারে
সমাপ্তি রচিল আসি,—পুনঃ গৃহ-পথে
সাজিতেছে জনে জনে সেই বাষ্প-রথে
স্বর্গ-বাস করি শেষ। এখনও নিমেষ
পড়িতে চাহে না যেন স্মরি' সেই দেশ—
দশ দিন সমারোহ উপভোগে যার
ক্ষয় নাই অবসান কৌতুক হিয়ার
একটি দিনের তরে। হ'ল তাই ক্ষীণ
পুণ্য স্বল্পকালে—যেন অতিথির দীন
প্রবেশিনু মহীলোকে স্বর্গ-বাস ছাড়ি,
এ ভূলোকে চলে তীর্থে তীর্থে তাড়াতাড়ি···

৩০শে অক্টোবর সকালে দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। একমাত্র দিল্লীতে প্রচলিত মোটর সাইকেল যানে পর পর রাজঘাট, কুতুব মিনার সেক্রেটারিয়েট, পার্লামেন্ট ভবন, কালীবাড়ী ও বিড়লামন্দির দর্শন করা গেল।

ফিরিবার পথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিল্লী দেখানোর আশ্বাস দিয়াছিলেন বন্ধুবর ভট্টাচার্য্য। আজ কিন্তু কয়েক ঘণ্টায় দিল্লী পরিক্রমা সম্পন্ন করিতে হইল। আজই তিনি আমাদের ছাড়িয়া একাকী গৃহমুখী হইবেন।

রাজঘাটে মহাত্মার সমাধিভূমি—অতি প্রশস্ত শান্ত পরিবেশে স্থির-কায়া সমাধিভূমির মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত চত্বরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির মহাপীঠ। ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া সকলেই মানস-পূজা সম্পাদন করিলেন। স্মৃতি-পূত মানসে যেন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার কমল ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ কুতুব মিনার, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, লালকেল্লা ও জুম্মা মসজিদের সঙ্গে নবীন কীর্ত্তি পার্লামেন্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট, কালীমন্দির—বিশেষ করিয়া বিড়লা মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অতি দ্রুতগতির মধ্যে দিল্লীদর্শনের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে হইল। নবীন কীর্ত্তির মধ্যে বিড়লা-মন্দিরের প্রশস্তি অল্প কথায় হইবার নয়। কয়েক ঘণ্টায় দেখিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সামগ্রীও ইহা নয়। সুবিশাল মন্দির, অতুলনীয় দেব-বিগ্রহ, গাত্র-ভিত্তিতে অপরূপ কারুকলা তথা শাস্ত্র-বচন—সব মিলাইয়া নবীন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। কোটি কোটি অর্থব্যয়ে উহার নির্ম্মাণ ও অপরূপ শোভাসজ্জা রচনা করা হইয়াছে।

নয়া দিল্লীর পথে চারি পাঁচ শ্রেণীতে অজস্র সাইকেলের গতি এক নয়নমনোহর শৃঙ্খলার চিত্ররূপে অবলোকন করিলাম।

বন্ধুবরের সঙ্গ হারাইয়া যাত্রীদলের মধ্যে এক একদিনে আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন, প্রয়াগ ও বারাণসীর ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়াছি। আগ্রার তাজমহল, আগ্রার কেল্লা, ইৎমদ উদ্দৌলা—মথুরার পথে আকবরের সমাধিভূমি সেকেন্দ্রা, মথুরায় দ্বারকাধীশ, বৃন্দাবনের প্রবেশমুখে অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন বিড়লামন্দিরে সুন্দরতর বিষ্ণুমূর্ত্তি, গীতারথ, গীতাস্তম্ভ, বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে অসংখ্য মন্দির, বিগ্রহ ও বন, প্রয়াগের প্রবাহ-সঙ্গমে শুভ্রতা-নীলিমার অপূর্ব্ব সমন্বয়, ভরদ্বাজের আশ্রম, আনন্দ-ভবন এবং বারাণসীতে দ্বিতীয় বার দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, বেণীমাধবের ধ্বজা, ভারত-ভবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া যেন পৃথক পৃথক ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়াছি।

শেষ বিদায়

শ্রীঅন্নদামোহন বাগচী

[উত্তরপাড়া—গঙ্গার উপর একটি বাড়ী। পশ্চাতে গঙ্গা বয়ে চলেছে। দরজা খুললে সবই দেখা যায়। সময়—পূর্ব্বাহ্ণ। একটা খাটের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রোগজীর্ণ মাইকেল মধুসূদন শুয়ে আছেন। চেহারা ক্লিষ্ট ও কান্তিহীন। শুধু প্রতিভাদীপ্ত অপূর্ব্ব-উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখেই তাঁকে চেনা যায়। পায়ের দিকে গৌরদাস বসাক উপবিষ্ট। পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে—কেউ যেন নিজের দৈহিক গ্লানি সজোরে চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে অপরিসীম যন্ত্রণার অভিব্যক্তি কণ্ঠে সহসা প্রকাশ পাচ্ছে। এ কণ্ঠ মাইকেল-পত্নী হেনরিয়েটার।]

মধুসূদন। (বালিশ থেকে মাথা তুলে, কান পেতে আর্ত্তনাদ শুনে বিচলিত কণ্ঠে) না, না গৌর, এ কিছুতেই হতে পারে না।

গৌর। (সবিস্ময়ে) কেন, কি হতে পারে না মধু?

মধু। হেনরিয়েটাকে এ অবস্থায় ফেলে আমার কিছুতেই হাসপাতালে যেতে মন সরছে না ভাই।

গৌর। তোমার সবই ভাল মধু—ঐ এক দোষ। চিত্তের অস্থিরতা কোনদিনই তোমাকে লক্ষ্যে পৌঁছুতে দিল না।

মধু। এবং দেবেও না কোনদিন। (সহসা বালিশ থেকে মাথা তুলে তীব্র কণ্ঠে আবৃত্তির সুরে) ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিশাল বারিধিবারি—ঊর্ম্মিমালা গলে, যেমতি আছাড়ি পড়ে দিগন্তের বুকে প্রচণ্ড আক্রোশে, সহস্র ফেনিল বাহু মেলি ধরিবারে চায় বুঝি বিধাতার পদ। তেমতি—বঞ্চিত আমি ধরণীর রূপরসগন্ধপানে—কোন অভিশাপে? কিসের লাগিয়া ভাগ্যে মোর এত বিড়ম্বনা? বিক্ষুব্ধ পরাণ নিতি শুধাইছে এই কথা স্রষ্টারে আমার!

গৌর। থাক ভাই—আর না। তোমার এই শরীরে এত কথা বলা ঠিক নয়। মুখে মুখে কবিতা-রচনার স্ট্রেন তো আর কম না।

মধু। কথা কইতে আমাকে বাধা দিও না গৌর। আর কয়দিনই বা কইতে পারব?

গৌর। পাগল! ও-কথা বলতে নেই। ছিঃ!

মধু। সত্যি আমি পাগল গৌর। আমি উন্মাদ···আমি চির অশান্ত।

গৌর। (হেসে) তোমাকে উন্মাদ বলব—এত বড় ধৃষ্টতা আমার কেন—কারও নেই ভাই।

মধু। একজন বাদে। উন্মাদ বলে আমাকে গাল দিলেন। শুনে একটুকুও রাগ হ'ল না। মনে হ'ল ঐ তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে উনি যেন এক গৌরবের মুকুট আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। মাথা নত করে বসে রইলাম—অপমানে নয়, প্রাপ্তির পূর্ণতায়।

গৌর। কে তিনি? বিদ্যাসাগর?

মধু। ওঃ···নো···নো। বিদ্যাসাগর—ভাট ওসান অফ লার্নিং। হি ইজ রিয়েলি গ্রেট। হি হ্যাজ দি জিনিয়াস এণ্ড উইজডম অফ এন এনসেণ্ট সেজ, দি এনার্জি অফ এন ইংলিশ-ম্যান—এণ্ড দি হার্ট অফ এ বেঙ্গলী মাদার। তাঁর কথা আমি মুখে বলে শেষ করতে পারব না গৌর। তিনি আমাকে কিনে নিয়েছেন সব দিক দিয়ে। তাঁর মহত্ত্ব দিয়ে—তাঁর দয়া, দান, আর দাক্ষিণ্য দিয়ে। বিদ্যাসাগর ইজ আনডাউটেডলি গ্রেট—কিন্তু আমি যাঁর কথা বলছি—হি ইজ গ্রেটার।

গৌর। কে তিনি—বলেই ফেল না।

মধু। মানুষ তেতো তাড়াতাড়ি গেলে—কিন্তু মিষ্টি-মিঠাই রসিয়ে রসিয়ে খায়। ছোট মাছ বঁড়শির একটানে ডাঙায় উঠে পড়ে, কিন্তু বড় মাছকে খেলিয়ে তুলতেই যে আনন্দ! অধীর হয়ো না বন্ধু, তিনি হচ্ছেন পরমহংসদেব। ভাট গ্রেট সেণ্ট এণ্ড এ মাইটিয়ার ফিলজফার।

গৌর। (করজোড়ে উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে—হেসে) তাঁর সম্বন্ধের ভাষাই পৃথক।···

মধু। (মৃদু হেসে) ভাষা যাই হোক—তার তাৎপর্য নির্ভর করে প্রয়োগের উপর। উনি সেদিক দিয়ে খুবই ট্যাক্টফুল। এই জীবনে দেশে-বিদেশে কত রকমেরই যে লোক সব দেখলাম—কেউ বা স্বার্থপর,—কেউ কুটিল—কেউ কুচক্রী। আর তারই মাঝে মাঝে মেঘের কোলে বিদ্যুৎঝলকের মতই কত নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, আর মহৎ। নিষ্করুণ ব্যথার মাঝে যেন শান্তির প্রলেপ!

গৌর। তুমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলে কেন?

মধু। আমি কি গিয়েছিলাম? উনিই আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে টানে—তেমনি। রাণী রাসমণির ছোট জামাই মথুর বিশ্বাসের বড় ছেলে দ্বারিক আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন বারুদ-ঘরের সাহেবদের সঙ্গে ওদের যে মামলা চলছিল—সেই ব্রিফটা কোনগতিকে আমার হাতে এসে পড়ে এবং সেই সূত্রেই আমার সেখানে যাওয়া।

গৌর। কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত সে মামলার ফল?

মধু। সাহেবরা হেরে গিয়ে এক্সপ্লোসিভ স্টোর ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হ'ল। (একটু থেমে) হ্যাঁ, কি বলছিলাম—, ভাট পরমহংসদেব। যখন দ্বারিকের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম—তখন কেন জানি না ওঁকে দেখবার জন্য বড্ড কৌতূহল হ'ল। গেলাম। দোরগোড়ায় জুতো খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কে যেন একজন আমার পরিচয় দিল ওঁকে। উনি যতক্ষণ

লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন রীতিমত খোশগল্পের আমেজ নিয়ে। আমার নাম শুনে এক বালক আমাকে দেখেই মুখ বন্ধ করলেন। কি ব্যাপার? না—ও ধর্মত্যাগী···ওর সঙ্গে কথা বলব না। এখন কথা বললে তো আর ওকে বাদ দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তাই বলব না তো কারও সঙ্গেই বলব না।···সবই বুঝলাম। অবশেষে প্রণাম করে বললাম: ছেলে ভুল করে গায়ে ধুলোমাটি মাখলে বাবা মা কি সন্তানকে ত্যাগ করেন? আমার কথা শুনে মুখ খুললেন, বললেন: তুই একটা আস্ত উন্মাদ! কি পেলি ধর্মত্যাগ করে? ওরে—ওখানে যে সবই এক। যত গোলমাল সব এই এখানে। শুনে রাগ তো হ'লই না, মনে হ'ল—অন্তরের সব ক্ষোভ সব গ্লানি কে যেন আগুনে জল ঢেলে নিভিয়ে দিল। অবশেষে কথা না বলার ত্রুটি ধরে নিলেন—একখানা রামপ্রসাদী গান শুনিয়ে দিয়ে। উঃ কি বিরাট পারসোনালিটি!

[পাশের ঘর থেকে হেনরিয়েটার কাতরোক্তি ভেসে এল। মধুসূদন বিচলিত হয়ে উঠলেন।]

ঐ···ঐ শোন গৌর! আমাকে একটিবার ওর কাছে নিয়ে চল ভাই। আমি একবার ওকে দেখি।

গৌর। (সমবেদনার কণ্ঠে) দেখবে বৈ কি ভাই, ব্যস্ত হয়ো না।

মধু। (গৌরদাসের হাত চেপে ধরে) দোহাই গৌর, তুমি আমাকে কলকাতায় যেতে বলো না ভাই। চাই না আমি হাসপাতালে যেতে। ওকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতেও চাই না। ও যদি না আমার পাশে থাকে, আমার যে সবই অন্ধকার গৌর।

গৌর। সেই জন্যই তো তোমার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা দরকার।

মধু। কলকাতায় হাসপাতাল ছাড়া এখানে কি আমার চিকিৎসা কোনমতেই সম্ভব নয় গৌর?

গৌর। (অধোবদনে) সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম চেষ্টাই ত করলাম ভাই—হয়ে উঠল না। এই সময় সাগরদাঁড়ি থেকে তোমার আত্মীয়েরা যদি কিছু টাকা পাঠাতেন তা হলে—ইট উড হ্যাভ বিন অফ ইমমেন্স ভ্যালু। তোমাকে হাসপাতালে পাঠাবার কোনই দরকার হ'ত না। যে ভাবেই হোক এখানেই দু'জনকে ম্যানেজ করতে পারতাম।

মধু। (তীব্র রোষে) আত্মীয়! আত্মীয় কাকে বলছ? আত্মীয় তারা আমার নয়—তারা আমার শত্রু। আমার যথাসর্বস্ব তারা লুটেপুটে খাচ্ছে আর আমি এখানে দুয়ারে দুয়ারে পরের সাহায্য ভিক্ষে করছি। আমারই বাড়ীতে তারা বাস করছে—আর আমি আছি পরের বাড়ীতে। আমারই পয়সায় সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দশ গাঁয়ের লোকের চিকিৎসা হচ্ছে—আর আমি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে চলেছি। আর আমার স্ত্রী দু'ফোঁটা ওষুধের অভাবে রোগের যন্ত্রণায় দিনরাত আর্তনাদ করছে। আত্মীয় তারা আমার নয়—তারা দুরন্ত কালসাপ। (উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন।)

গৌর। এই দেখ! কথায় কথায় তুমি ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ মধু—এখন থাম ভাই।

মধু। উত্তেজনা কোথায় দেখলে গৌর! এ ত শুধুই আত্মদাহ। কিন্তু যদি পারতাম সেই ভলকানিক ইরাপশান্ দেখাতে··· অন্তরের কপাট খুলে দেখাতে পারতাম যদি সেই প্রচণ্ড বিসুবিয়াসের অগ্নিদাহ—তবেই হয় ত আমার সকল জ্বালা, সব অশান্তি চিরদিনের মত থেমে যেত।

গৌর। এই দেখ···তুমি ঘেমে উঠলে! দুর্বল শরীরে এতটা সইবে কেন?

(পকেট থেকে রুমাল বের করে মধুসূদনের কপালের ঘাম সযত্নে মুছিয়ে দিতে দিতে)

আর একটি কথাও না বলে একটু শুয়ে পড় ত। দশটা বাজে—গাড়ী আসবারও সময় হয়ে গেল।

(জোর করে মধুসূদনকে শুইয়ে দিলেন।)

মধু। একটা কাজ তোমাকে করতে হবে গৌর। আমার অবর্তমানে কোনদিন যদি 'মেঘনাদ বধে'র নতুন এডিশান ছাপা হয়—তা হলে একটা জায়গা থেকে কয়টা কথা বাদ দিতে হবে। ঐ যেখানটায় আছে 'গুণবান যদি পরজন—আর গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়:—পর—পর সদা।' আজ আমার মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির ঘোর কেটে গেছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—আত্মীয়ের চেয়ে পর ঢের আপন। আত্মীয় মারতে চাচ্ছে—আর পর তার অনন্ত করুণায় পক্ষপুট বিছিয়ে ধরে তাই প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে। আমি ভুল লিখেছিলাম ভাই।

গৌর। এইবার আমি গরম দুধ আনি—তুমি খেয়ে নাও। গাড়ী আসবার সময় হয়ে এল।

মধু। (ব্যাকুল কণ্ঠে) আর যদি কোনদিন ফিরে না আসি, এই যাওয়াই যদি আমার শেষ যাওয়া হয়? তা হলে···তা হলে··· আমার হেনরিয়েটা'র কি হবে গৌর? কে ওকে দেখবে? কোথায় ও দাঁড়াবে?

গৌর। (ধরা গলায় নত দৃষ্টিতে) যে গড কবরিড···যদি তেমন দুর্দিন আসেই—আই এসিওর ইউ নট টু বি লিষ্ট ওয়ারিড

মধু। (আশ্বস্ত কণ্ঠে) যে গড ব্লেস ইউ গৌর। তোমাকে আমি আর একটা ভার দিয়ে যাব ভাই।

(বালিশের তলা থেকে একটা কাগজ বের করে গৌরের হাতে দিয়ে)

কাল অনেক রাতে—বাড়ী যখন নিশুতি হয়ে গেল, গঙ্গার কণ্ঠের কুলুকুলু গান শুনতে শুনতে এটা লিখেছি। জীবনে অনেক আশা ছিল—কিছুই তার ফলল না। তাই আর বড় কিছু আশা করতে ভয় হয় গৌর। হয় ত আমার দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া লেগে তা নির্মূল হয়ে যাবে। তাই ছোট্ট একটুখানি আশাকে বুকের কোণে আঁকড়ে ধরেছি। যদি সার্থক না হতে পারে···তা হলে যেন আশাহত বুকের পাঁজরা না ভেঙে ফেলে। ছোট্ট আশার মত ছোট্ট ব্যথার কাঁটা হয়েই যেন তা ফুটে থাকে।

গৌর। (কাগজখানা হাতে নিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন)
দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধি-স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম)
মহীর পদে—মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি—শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি—কপোতাক্ষ তীরে—
জন্মভূমি। জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নাম—জননী জাহ্নবী।
(পাঠ শেষ করে সবিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে চেয়ে)
এর মানে ?

মধু। আই উইশ ইট টু বি এনগ্রেভড ওভার মাই গ্রেভ হোয়ার আই লাই ইন ইটার্ন্যাল স্লীপ।

গৌর। (কোঁচার খুটে চোখ মুছে অভিভূত কণ্ঠে) বেশ, তাই হবে ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(বাইরে গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হ'ল)

গৌর। (একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখে) ঐ ত—কলকাতার বাবার গাড়ী এসে গেছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি দুধটা নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

[দেয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে হেনরিয়েটার প্রবেশ। প্রচণ্ড জ্বরের তাপে চোখ লাল—নাসারন্ধ্র স্ফীত···সমস্ত শরীর টলছে। শরীরের সুতীব্র গ্লানি জোর করে চেপে রাখবার একটা আকুল প্রয়াস চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। কোনমতে এগিয়ে এসে হেনরিয়েটা মধুসূদনের মাথায় কম্পিত হাত রাখলেন।]

মধু। (চমকে) কে ? হেনরিয়েটা ! তুমি ? তুমি কেন এ শরীর নিয়ে এখানে এলে ডার্লিং ? যাবার আগে আমি ত তোমার কাছে যেতামই।

(হাত ধরে পাশে বসিয়ে সস্নেহে)

তোমার কাছে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত আমার শেষ বিদায় নেওয়া যে অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

(হেনরিয়েটা কোন কথা না বলে মধুসূদনের কোলের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মধুসূদনও অশ্রুসজল নয়নে পরম স্নেহে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।)

হেনরিয়েটা। (অশ্রুসিক্ত নয়নে, কম্পিত কণ্ঠে) আমার জন্য তুমি একটুও ভেব না। থিঙ্ক অব ইওরসেল্ফ। আই হ্যাভ গট ইওর লাভ এজ মাই গাইড। ইট উইল লিড মি টু দি এণ্ড। ডোণ্ট ইউ ওয়ারি ডার্লিং···ডোণ্ট ইউ···

(আকুল আবেগে দুই হাত দিয়ে মধুসূদনের মুখখানা তুলে ধরে)

প্লীজ···প্লীজ ডার্লিং, ডোণ্ট ইউ শেড টিয়ার্স। ডোণ্ট ইউ নো··· ইট উইল ব্রেক মাই হার্ট ইনটু পিসেস। প্লীজ গিভ মি এ পার্টিং স্মাইল···এন ইটার্ন্যাল চিয়ার টু কমপেট মাই সরোজ এণ্ড ডিস্ট্রেস।

মধু। (হেনরিয়েটাকে জড়িয়ে ধরে) হেনরি ! হেনরি ! মাই বিলাভেড হেনরি ! তুমি আমাকে কিছুতেই যেতে দিয়ো না হাসপাতালে। ওখানে গেলে আমি আর বাঁচব না। তুমি আমাকে ধরে রাখ শক্ত করে···কেউ যেন আমাকে ছিনিয়ে নিতে না পারে।

হেনরিয়েটা। ডোণ্ট বি সিলি ডার্লিং। হাসপাতালে তোমাকে যেতেই হবে। এণ্ড আই উইল ওয়েট টিল ইউ কাম ব্যাক কমপ্লিটলি রেকভার্ড।

মধু। যদি এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হয়···আর যদি ফিরে না আসি···তবে···তবে কি হবে ?

হেনরিয়েটা। (মধুসূদনকে সত্রাসে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে) ও···ডার্লিং···নো···নো। ডোণ্ট ইউ সে সো···

নেপথ্যে গৌর। মধু !

মধু। (হেনরিয়েটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চোখ মুছে) এস।

(গৌরের প্রবেশ। পিছনে দুধের বাটি হাতে কবি-কন্যা শর্মিষ্ঠা।)

গৌর। দুধটুকু খেয়ে নাও আগে—নইলে জুড়িয়ে যাবে।

মধু। সবই একদিন জুড়িয়ে যাবে গৌর—থেমে যাবে এই অফুরন্ত কোলাহল। থামবে না শুধু জীবনের স্রোত আর তার অনন্ত প্রবাহ। 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে—চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবননদে !'

গৌর। এখন কাব্য রাখ তো—লক্ষ্মীছেলের মত খেয়ে নাও আগে।

মধু। (শর্মিষ্ঠার দিকে হাত বাড়িয়ে) দে মা খেয়ে নিই। তোর গৌরকাকা না হলে হয় তো মেরেই বসবে খাবার দিনে। ওর অসাধ্য কিছুই নেই।

গৌর। তুমি এই শরীর নিয়ে আবার এঘরে কেন এসেছ হেনরিয়েটা ? যাবার আগে আমরাই তো যেতাম তোমার কাছে।

হেনরিয়েটা। প্লীজ গৌর—ডোণ্ট এবিউজ মি টু-ডে। আজকের মত আমাকে রেহাই দাও—

গৌর। তুমি তো জান না—তোমার গায়ে কত জ্বর এখন ?

হেনরিয়েটা। জানি। আই ক্যান ফিল। কিন্তু না এসে যে পারলাম না গৌর। তুমি তো সবই জান। সংসারে ও ছাড়া যে—আই হ্যাভ গট নান সো বিলাভেড···সো ডিয়ার।

[দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। নেপথ্যে গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

গাড়োয়ান। বহুৎ দের হোতা হ্যায় সাব। এতনা ধুপমে বহুৎ তকলিফ হোগা সব কোইকো। জলদী করিয়ে—

গৌর। (ব্যস্তভাবে) এই যে হয়ে গেছে...আমরা এলাম বলে। না, না, আর দেরি নয়। মধু, তুমি আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে নেমে এস।

[হাত বাড়িয়ে দিলেন। মধুসূদন গৌরের হাত ধরে অতি কষ্টে অতি সন্তর্পণে নেমে এলেন খাট থেকে]।

মধু। (হেনরিয়েটার হাত চেপে ধরে) ডার্লিং তা হলে যাই।

[হাতে চুম্বন করলেন]।

হেনরিয়েটা। (অশ্রুসজল নেত্রে) যাও। মে গড গিভ ইউ কুইক রেকভারি।

মধু। (শর্ম্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে) মা, ভাল হয়ে থেকো। আর তোমার মাকে দেখো।

[গৌরদাসের হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে হেনরিয়েটার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন]

শর্ম্মিষ্ঠা। (উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে এসে) বাবাকে এ তুমি কি বললে মা? 'যাও' যে বলতে নেই—বলতে হয়—'এসো'।

[হেনরিয়েটা উদভ্রান্তের মত উঠে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে যেতে চাইলেন, কিন্তু চৌকাঠে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ বেরিয়ে আসতে গিয়ে যেন মাঝপথে থেমে গেল জোর করে। ঐ অবস্থায় মেঝেয় পড়ে থেকেই মধুসূদনের গমনপথের দিকে চেয়ে উন্মাদিনীর মত আর্ত্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন।]

হেনরিয়েটা। লিসন্ ডার্লিং। তুমি...তুমি এসো...আবার এসো...

[এ আহ্বান কেউ শুনতে পেল না। মধুসূদন ও গৌরদাস ততক্ষণে লন পার হয়ে গাড়ীর মধ্যে উঠে পড়েছেন। অসহ্য যন্ত্রণা ও আকুল আর্ত্তিতে মেঝের মুখ গুঁজে হেনরিয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। কান্নার চাপে পিঠের দিকটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। শর্ম্মিষ্ঠা সজল চোখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—রোরুদ্যমানার ব্যথাতুর চিত্তের বিক্ষোভ কতক্ষণে শান্ত হয়। বাইরে ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে যাবার শব্দ হ'ল।]

যবনিকা

আনন্দ-বিলাস

শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরী-রাণী! তোমার চুমার উছল-সুরা চঞ্চলিয়া
প্রাণের 'পরে স্বপ্ন জাগায় বাতাস-মুখর অলিন্দে,—
তোমার গোলাপ-পাপ্‌ড়ি অধর আবেগ ভরে বিহ্বলিয়া
সুধার ধারে অঝোর ঝরে আমার অধর-অনিন্দ্য।

আজকে সাঁঝে তরুণ পরাণ তাজা রঙের দীপ্তিতে
উঠল জেগে চপল হাওয়ায় হাস্নু হানার গন্ধেতে!
মুগ্ধ আঁখি অরূপ রূপে, হৃদয় খুশী তৃপ্তিতে,
ভাবনা সকল যায় দূরে যায়, মুক্ত সকল দ্বন্দ্বেতে!

মিলন-পাগল মলয়-অনিল ঢেউ তুলেছে বিভঙ্গে,
সুবাস যে তার কেশের 'পরে নৃত্য জাগায় সুছন্দে!
সাগর-দোলায় দুল্‌ছে যেন উতল-ফেনতরঙ্গে,
সুনীল-আকাশ আলোয় আলো প্রাণের চরম আনন্দে!

চাঁদের আলো ফুলের চোখে নয়ন হেরে রূপ যবে:
পাপড়িগুলো উল্লাসে তাই বিলায় আমোদ গন্ধেতে!
তারার আলো ঠিক্‌রে পড়ে মিলন-রাতের উৎসবে—
বাতাস বিভোর সৌরভেতে মত্ত-মাতাল ছন্দেতে!

পুষ্প-হাসি রাশি রাশি ঝরল যে তাই আচম্‌কায়:
গানের রেশে সুরের কলি পুষ্পিত তার স্পর্শেতে!
সকল বেদন উধাও-হাওয়ায় কোন্ সুদূরে মূর্চ্ছা পায়!—
কান্না সুরু হলো তবু—সে কি মিলন-হর্ষেতে?

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন

শ্রীআশুতোষ বাগচি

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণবপদকর্তাদের কাল থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত কয়েক শতাব্দী ধরে যুগে যুগে বহু কবি-কোবিদ-কণ্ঠ বঙ্গ-কাব্য-নিকুঞ্জ ললিত-মধুর সঙ্গীতে নিরন্তর ঝঙ্কৃত করে রেখেছে—কখনও ছেদ পড়েনি। 'নূতন যুগ-সূর্য্য' রামমোহন ভারতে যে নব-যুগের উদ্বোধন করেন তারই ঊষাকালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। তার পরে, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর থেকেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবি-মনীষিগণের—শেষে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা ভাষায় যে ভাবগঙ্গাবতরণ হয়েছে তার ভীম-কান্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ, তার নিত্য-নব-ছন্দের বিচিত্র ঊর্ম্মি-লীলা বাঙালীর চিত্তকে উদ্বেলিত মোহিত করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অল্প দিন পরেই ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ কান্তকবি রজনীকান্ত সেন পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ তখন কাটোয়ায় মুন্সেফ, আর জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ রাজসাহীর শীর্ষস্থানীয় উকীল। এঁরা দু'জনেই সংস্কৃত ও ফার্সিতে বিদ্বান ছিলেন, গুরুপ্রসাদ ইংরেজীও ভালো জানতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, সেকালে জজ সাহেবের অনুগ্রহে উকিল হওয়া যেত, কেবল তাঁর কাছে নাম-মাত্র একটা পরীক্ষা দিতে হ'ত। গোবিন্দনাথ ও গুরুপ্রসাদ—দুই ভাইয়ে হরিহরাত্মা সম্বন্ধ ছিল।

কর্ম্মোপলক্ষে গুরুপ্রসাদ কিছুকাল বৈষ্ণবপ্রধান কালনা-কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে ছিলেন; তখন তিনি সযত্নে বৈষ্ণব-মহাজনপদাবলী অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন, আর নিজে ব্রজবুলিতে প্রায় সাড়ে চার শ' পদ রচনা করে ১২৮৩ সালে 'পদচিন্তামণি' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গীতে শিক্ষা না থাকলেও স্বাভাবিক পটুতা ছিল। যখন তিনি স্বরচিত পদগুলি গাইতেন, তখন তাঁর দুই চোখে ধারা বয়ে যেত—শিশু রজনীকান্ত পিতার এই ভাবাবেগ দেখতেন।

রজনীকান্তের মাতুলও বাংলাভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ছোট ছোট কবিতা লিখতেন। কবির মাতা মনোমোহিনীর কাব্য-সাহিত্যে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল; তিনি কবি হেমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন; অনেক সময় ছেলেকে নিয়ে গদ্য-পদ্য গ্রন্থ আলোচনা করতে ভাল-বাসতেন। কবির জন্মের পর মাতা শিশুকে নিয়ে স্বামীর কাছে কালনাতে যান। কান্তকবির শৈশবকাল পিতার কর্ম্মস্থানেই কাটে; তাই তিনি আশৈশব নবদ্বীপ-অঞ্চলের ভাষাতেই অভ্যস্ত হন। একটু বড় হতেই তাঁকে রাজসাহীতে জ্যেঠার কাছে রেখে সেখানকার জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। ছেলেবেলায় তিনি খুব অস্থির ও দুরন্ত ছিলেন—সারাদিন খেলাধুলায় মেতে থাকতেন। বালকের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল, তাই সারা বৎসর তেমন পড়াশুনা না করেও পরীক্ষায় বরাবর সগৌরবে উত্তীর্ণ হতেন। তাঁর জ্যেঠতুত দাদা কালীকুমার বালকের লেখাপড়ায় তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি ছিলেন একজন এম্-এ, বি-এল। এই কালীকুমার বালকের স্বাভাবিক কবিতা-রচনাশক্তিকে উৎসাহ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেন।

১২৮৮ সালে রজনীকান্ত এন্ট্রান্স পাস করে রাজসাহী কলেজে এফ্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ১২৯০ সালে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়। পত্নী হিরণ্ময়ী ভাল বাংলা লেখাপড়া জানতেন; স্বামীর কবিতা পড়ে অনেক সময় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন আর কবিতার বিষয় নির্ব্বাচন করে দিতেন। রজনীকান্ত এই সময়ে সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ কাব্য ও নাটকগুলি যথেষ্ট যত্ন করে পড়েন। ১২৯১ সালে এফ্-এ পাস করে তিনি কলিকাতায় সিটি কলেজে বি-এ পড়েন।

পূজার ছুটিতে রজনীকান্ত যখন বাড়ী যান সেই সময় (১২৯২ সালে) তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, আর তার কয়েকদিন পরেই তাঁর জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথও পরলোক গমন করেন। এর পূর্ব্বে (১২৮৪ সালে) কবির দুই উপার্জ্জনশীল জ্যেঠতুত দাদা বিনোদনাথ ও কালী-কুমারের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ গোবিন্দ-নাথ তখন অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে ছিলেন; দুইটি যুবক কৃতী পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে তিনি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেন নি। গোবিন্দনাথ যখন ওকালতি করতেন তখন বহু ছাত্র ও দুঃস্থ লোক তাঁর বাসায় আশ্রয় পেয়েছে। গুরুপ্রসাদ তাঁর বেতনের সব টাকাই অগ্রজকে পাঠিয়ে দিতেন। দান-ধ্যানে দু'ভাইয়ের উপার্জনের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় হয়ে যেত; যা-কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হ'ত তার সমস্ত অর্থ রাজসাহীর ইন্দ্রনাথ কাঁইয়ার কুঠিতে গচ্ছিত ছিল। কুঠি ফেল পড়ায় তাঁদের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট হয়; আর অল্পকালের ব্যবধানে পরি-বারের উপার্জনশীল ব্যক্তি কয়জনেরই মৃত্যুতে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তাঁরা দরিদ্র হয়ে পড়েন। যাহোক, দারুণ অসচ্ছলতার মধ্যে সিটি কলেজ হতে ১২৯৫ সালে রজনীকান্ত বি-এ পাস করেন এবং ১২৯৭ সালে বি-এল পাস করে রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করেন।

কর্ম্মজীবনের সুরু থেকেই কবিতা-রচনা, গীত-চর্চ্চা, নাটক-অভিনয় প্রভৃতিতে রজনীকান্তের অধিক আকর্ষণ ছিল, আর বেশী সময় আমোদ-প্রমোদেই কেটে যেত। ওকালতিতে তাঁর মন ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৩১৭ সালে কুমার শরৎকুমার রায়কে

কান্তকবি একখানি পত্রে লিখেছিলেন, "আমি আইনব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।" ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয়ও রাজসাহীতে ওকালতি করতেন। নাট্যামোদী বলে রাজসাহীতে তাঁরও খুব নাম ছিল; আমাদের ছেলেবেলায় তাঁর প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর এই নাট্যপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি। রজনীকান্ত কায়মনে তাঁদের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকের অভিনয়ে রজনীকান্ত রাজার ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

রজনীকান্ত গোড়ার দিকে যে-সব কবিতা লেখেন তা প্রকাশ করতে চান নি—স্বভাবতঃই তিনি আত্মপ্রচার-বিমুখ ছিলেন। রাজসাহীর একটি সাহিত্য-প্রাণ যুবক সুরেশচন্দ্র সাহা ১৩০৪ সালে 'উৎসাহ' নামে একখানি মাসিকপত্র বের করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় রজনীকান্তের কয়েকটি কবিতা 'উৎসাহে' প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালে সুরেশচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে তাঁর শোকসভায় রজনীকান্তের একটি গান গাওয়া হয়, তার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি:

অফুটন্ত মন্দার-মুকুল;
সে কেন ফুটিবে হেথা?—বিধাতার ভুল!
কোন্ অভিশাপভরে, ধরায় পড়িল ঝরে,
শচীর কুন্তলরূপী বিলাসের ফুল।

স্থানীয় সকল অনুষ্ঠানেই রজনীকান্তকে গান রচনা করতে ও গাইতে হ'ত। উপস্থিতমত (improptu) কবিতা ও গান রচনায় তাঁর অসামান্য শক্তি ছিল। সাময়িক প্রয়োজনে অত্যল্প সময়ে লিখিত হলেও গানগুলি উচ্চস্তরের ছিল। নিম্নোদ্ধৃত গানটি তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ:

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা-কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে?
জাগাও বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'তোমরা ও আমরা' কবিতায় প্যারডি লেখেন 'আমরা ও তোমরা' নাম দিয়ে; রজনীকান্ত 'তোমরা ও আমরা' নামে দ্বিজেন্দ্রলালের প্যারডির পাল্টা প্যারডি লেখেন। তার একটু এখানে উদ্ধৃত করি—'আমরা মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো, আর তোমাদের চাই গদি; আমাদের শাক-পাতাটা হলেই চলে গো, আর তোমরা বোলাও দধি! তথাপি যদি কোন কাজে পাও ত্রুটি গো, স্বাস্থ্যে হালুয়া লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো, না হ'লে আমরি! কর কি ভ্রূকুটি গো, কিংবা চড়টা চাপড়টা দাও'—ইত্যাদি রজনীকান্ত অনেক উপাদেয় হাস্য-ব্যঙ্গ-কৌতুক কবিতা রচনা করেন। এ বিষয়ে রজনীকান্ত অনেকটা ডি, এল, রায়ের অনুসরণ করেন, আর এ জন্য সকলে তাঁকে রাজসাহীর ডি, এল রায় বলত। এখানে তাঁর বহু কৌতুক-কবিতার একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করি:

'রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতি,
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি,
এসব করিয়া বাহির বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
দণ্ডক কাননে ছিল কটা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এসব করিয়া বাহির···।
ক' আঙুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল কটা টিকটিকি,
গৌতমসূত্রে বেশমসূত্রে প্রভেদ কি কি,
এসব করিয়া বাহির···।
কৃষ্ণের বাঁশিতে ছিল কটা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গাঁদা,
কোন মুখ হয়ে হয় লঙ্কা বেঁধা,
এসব করিয়া বাহির···।
বাদশা হুমায়ুন কাটতো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কিনা Sherry
মীরাবাঈ কানে পরত কিনা ঢেঁড়ি,
এসব করিয়া বাহির···।
পেয়েছি একটা তাম্রশাসন,
ক্রতুর ক'খানা ছিল কুশাসন
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন,
এসব করিয়া বাহির বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

রজনীকান্ত অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেন; সেগুলিতে সুর-সংযোগ করে এবং নিজে গান করে দিনের পর দিন বন্ধু বান্ধবদের আনন্দবিধান করতে থাকেন; কিন্তু সেগুলি ছাপতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে তাঁর হিতৈষী সুহৃদ অক্ষয়কুমারের ঐকান্তিক আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে ১৯০২ সনে কবির প্রথম পুস্তক 'বাণী' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার ১৩১৯ সালের

কার্ত্তিক-সংখ্যা 'মানসী'-তে এই কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশের নিম্নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন: "কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনা-প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সঙ্গীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে; মজলিসে সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে। তথাপি সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনা-প্রতিভা ছিল, কিন্তু আত্ম-প্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের একটি জ্ঞাতব্য কথা।

"সেবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্ত একখানি ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় তীর হইতে রজনী ডাকিলেন,—'দাদা ঠাঁই আছে?'

"তাঁহার স্বভাব এইরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্পকাল পূর্ব্বে 'সোনার তরী' বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; হয়ত আশা ছিল, আমি বলিয়া উঠিব—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।'

"আমি বলিলাম,—'ভয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে পার, আমি ধানের ব্যবসায় করি না।'

এইরূপে দুইজনে কলিকাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীন্দ্র-নাথের আমন্ত্রণে বোলপুরে যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকট উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের ইতস্তত দূর হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্ত বলিলেন—'সমাজ-পতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না।'

"মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালোচনার ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল, তাহার এইরূপ অভ্রান্ত পরিচয় পাইয়া প্রিয় বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া নূতন কবির পরিচয় না দিয়া, গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গীত-সুধাপানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকে কিছু করিতে হইল না; সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ইহার পর এলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের পরে রজনীর সঙ্গীত যখন দশ জনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল।"

১৩১২ (ইং ১৯০৫) কান্ত-কবির দ্বিতীয় কবিতা-গ্রন্থ 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয়। ('বাণী' 'কল্যাণী' পর্য্যায়ের ভাষা ও ভাব-সমৃদ্ধ আর একটি গীতি-গুচ্ছ কান্ত-কবির তৃতীয় পুস্তক 'অভয়া'।) এই সময় বাংলা দেশে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। কান্ত-কবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই' 'আমরা নেহাত গরীব আমরা নেহাত ছোটো' প্রভৃতি 'স্বদেশী' গান বাংলার হাটে-মাঠে-বাটে বালক-বৃদ্ধ সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে, আর কবির খ্যাতি দেশময় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নব-গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে কান্তকবি কলকাতায় আসেন। ২১শে অগ্রহায়ণ পরিষদ-ভবনের দোতলায় স্থানাভাবে একতলায় হলঘরেও সভা হয়—রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। ভিড় ঠেলে উপরে যেতে না পারায় কান্তকবি নিচের সভাতেই যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ সভায় সমাগত সকলের নিকট কান্ত-কবির পরিচয় দিয়ে তাঁকে স্বরচিত গান গাইতে অনুরোধ করেন। তিনি দুটি গান গেয়ে সমবেত জনমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন।

এর প্রায় দু'মাস পরে ১৩১৫ সালের ১৮ই ও ১৯শে মাঘ রাজসাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হয়; আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "সেই সময় রজনীবাবুর সহিত পরিচয়ের প্রথম সুযোগ ঘটে। সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা-সঙ্গীত প্রভৃতি করাইবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন—তিনি থাকিতে এ ভার আর কে লইবে? সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে রাজসাহীর সাধারণ পুস্তকাগারে সম্মিলনে উপস্থিত সাহিত্যিকগণের আনন্দবিধানার্থ আয়োজন হয়। সম্মিলনের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে ক্ষেত্রে রজনীবাবুই অভ্যর্থনাব্যাপারে প্রাণস্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া স্বরচিত হাসির গান একটা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; সভাস্থল হাস্যরবে মুখরিত হইয়া উঠিল নির্মল হাস্যরসের উৎস হইতে নিঃসৃত সুধাপান করিয়া সকলেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন। জানিতাম, আমাদের এই দুর্দ্দিনে প্রাণে প্রফুল্লতা সমাগম করিয়া সজীব রাখিবার জন্ত পশ্চিমবঙ্গের এক দ্বিজেন্দ্রলালই আছেন, জানিলাম উত্তরে সহোদর—রজনীকান্ত তাঁহার যোগ্যতম সহকারী।

সভাভঙ্গের পর রজনীবাবু আমার নিকট আসিয়া আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন। এরূপ সাদর সানুরাগ সম্ভাষণের জন্ত আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁহার গানে ও কবিতায় যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার সহৃদয়তায় ততোধিক মুগ্ধ হইলাম।"

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবি মারাত্মক কর্কট রোগে আক্রান্ত হন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ত তাঁর উপার্জ্জন বন্ধ হয়ে যায়: নিঃস্বপ্রায় কবি চিকিৎসার্থ যখন মেডিক্যাল কলেজের কটেজ ওয়ার্ডে ছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জনের চির-সহায় স্বর্গত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আর রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎকুমার রায় কবিকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করেন। তা ছাড়া, সেদিনের বরেণ্য বাঙালীমাত্রেই হাসপাতালে কবির সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্ত প্রকারে সাহায্য করে রোগ-তাপিত ও দৈন্য-পীড়িত কবির মানসিক শান্তি বিধানে

যথাসাধ্য চেষ্টা করে বাঙালী জাতির মুখরক্ষা করেন। নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে দুর্ব্বল শীর্ণদেহ কবি দুখানি ছোট কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন। তার একটির নাম 'অমৃত'—রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অনুসরণে, আর একটি—'আনন্দময়ী' ভক্ত-কবি রামপ্রসাদের ধরনে।

রবীন্দ্রনাথ কান্ত-কবিকে দেখতে একদিন (২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭) হাসপাতালে যান। কবির রোজনামচা থেকে তার কিছু বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করি :

রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন আর কান্ত-কবি লিখে উত্তর দিচ্ছেন।

এই trachestomy করে বেঁচে আছি। আর কথা কইতে পারি না। আমি মহা আহ্বানে যাচ্ছি। আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান, মহাপুরুষ।

—আমি যখন বুঝলেম যে এই উৎকট ব্যথা Penal Code নয়—এ কেবল আগুনে ফেলে আমার খাদ উড়িয়ে দিচ্ছে, আমাকে কোলে নেবে বলে—তখন বুঝলাম প্রেম। তার পর সব সচ্চি। একবার দেখতে বড় সাধ ছিল, নইলে হয়ত কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত—সে দেখা আমার হ'ল। এখন বলুন, শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

—কি শক্তি আপনার নাই? অর্থ-শক্তি? তার যে গৌরব তা আমি এই যাবার বাজার বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তার জন্তে মানুষ 'মানুষ' হয় না। এই যে মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা আমার জন্ত দিবারাত্রি দেহপাত করছে, এরা কি আমাকে অর্থ দেয়? ওদের প্রাণটা দেখুন, ওরা কত বড়লোক।

—* * * আমি 'রাজার' অভিনয় করেছি। অমন কাব্য অমন নাটক কোথায় পাব? রাজার পার্ট আজও আমার অনর্গল মুখস্থ আছে, আমার মাথা যেমন ছিল, তেমনই আছে—

"এ রাজ্যেতে
যত সৈন্ত যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

একবার দেবতাকে শোনাতে পারলাম না।

—* * আমার ছেলেমেয়ের মুখে একটি গান শুনুন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তিবালা ও ছেলে ক্ষিতীন্দ্র গাইল 'বেলা যে ফুরায়ে যায় খেলা কি ভাঙে না হায় অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী।' কান্ত-কবি নিজে তাদের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজালেন। সেই দিন বিকেলে তিনি এই গানটি রচনা করেন ও রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন—

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব্ব করিতে চুর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছে দূর।
ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া, গর্ব্ব করিছে চুর।
যায়নি এখনো দেহাত্মিকামতি,

এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি সেই ধারণায় হয়ে আছি ভরপুর ;
তাই সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার কবিতা ভালবাসে দেশ,
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে, বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে গর্ব্ব করিতে চুর।

রবীন্দ্রনাথ ১৩ই আষাঢ় কান্ত-কবিকে নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি প্রেরণ করেন :

"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোন মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক

এ বাক্যেতে

> যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
> লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
> পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
> ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরও তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্লিষ্ট, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য।

* *

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। বিধাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে —অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি।"

বৎসরাধিককাল দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করে ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র রাত্রি সাড়ে আটটার কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যুবক-দল বহুদিন পূর্ব্বে কান্ত-কবির রচিত সুপরিচিত গান 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে' গাইতে গাইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাঁর নশ্বর দেহ বহন করে নিয়ে যায়।

ভক্ত পিতার কবিত্ব-শক্তি ও গানের কণ্ঠ ও কানের উত্তরাধিকার নিয়েই কান্ত-কবি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ-মাতৃকুলের অনুকূল পারিবারিক প্রতিবেশ, জননীর কাব্যানুরাগ ও সাহিত্যালোচনা, জ্যেষ্ঠ কালীকুমারের সহৃদয় উৎসাহ বালক-বয়সেই তাঁর প্রতিভার উন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করে। যৌবনের কর্ম্মস্থলে অক্ষয়কুমারের মত সুপণ্ডিত, মার্জ্জিতরুচি সাহিত্যিক-বন্ধুর নিত্য সঙ্গ ও উদ্দীপনা তাঁর কবি-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশে যে প্রভূত সহায় হয়েছিল এরূপ অনুমান হয়। কবি দীর্ঘায়ু হলে বাংলা কাব্য-সাহিত্য তাঁর রচনা-সম্পদে আরও সমৃদ্ধ হ'ত—এতে সংশয় নাই।

তাঁর কবিতা-গ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কবিতা বা গান আছে। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক গানগুলির ভাষা বিদ্যুদ্‌গর্ভ, তার ধ্বনি মেঘ-মন্দ্রের মত গুরুগম্ভীর—জয়দেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ভাবসম্পদ অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁর ভক্তিরসাপ্লুত গানগুলি সব চেয়ে গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী বলে মনে হয়—কবির একান্ত-হৃদয়ের আত্মনিবেদনের (ইম্‌প্রেশন) ছবিগুলি চিরদিনের জন্য অন্তরে অঙ্কিত হয়ে যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিগত কয়েক বৎসরে ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে বাঙালীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। কান্ত-কবি লোকান্তরিত হয়েছেন ১৩১৭ সালে। এখন আর বোধ হয় কপিরাইটের বাধা নাই। কবির পুস্তক-সংখ্যা মাত্র সাতখানি। পরিষদ যদি তাঁর সবগুলি কবিতা সংগ্রহ করে একত্রে প্রকাশ করেন তবে আর একটি মহৎ কাজ হয়।*

* এই প্রবন্ধ-রচনায় স্বর্গত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের 'কান্ত কবি রজনীকান্ত' গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি।—লেখক

দুই নম্বর গুমটি

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

তিনশ' পঞ্চাশ নম্বর ডাউন ট্রেনটা এখন যাবে। এখন এই ভোর পাঁচটায়। গুমটি-ওয়ালা মদন সিং এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে, ঠিক গুমটি গেটের পাশে, হাতে সবুজ বাতি। লাইন ক্লিয়ার। কিন্তু আজ এত দেরি করছে কেন গাড়ীটা? চঞ্চল হয়ে ওঠে মদন, তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে।

অবশেষে গাড়ীটা এল। ধোঁয়ায় ধূলি উড়িয়ে, কয়লা ছড়িয়ে, ঝড়ের মত, অতি দ্রুত গতিতে। সবুজ বাতি দেখাল মদন।

বর্ষাকালের সকাল। ভোর হলেও চারদিক থমথমে মেঘলান— ব্যর্থপ্রেমিকের মুখের মত। কেবল ঐ ষ্টেশনের আলোগুলি জ্বলছে টিমটিম করে।

গাড়ী পেরিয়ে গেল। গাড়ীর পেছনে মিলিয়ে-আসা ঐ লাল আলোর বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে মদন, শালার গাড়ী, এই বর্ষার সকালে যাবি ত যা, সময়মত চলে যা, যাতে দু'মিনিট দাঁড়িয়েই আবার ঘরে ফিরে শুতে পারি, ঘুমোতে পারি সকাল সাতটা পর্য্যন্ত।

সাতটায় তাকে উঠতে হবে। সাতটা দশ মিনিটে লালগোলা মেল। তখন গুমটি গেট বন্ধ করতে হবে, সবুজ পতাকা দেখাতে হবে।

কিন্তু পাঁচটায় আসে না এ গাড়ী, কোনদিনই আসে না। এ গাড়ীর নাম গয়া-প্যাসেঞ্জার। গয়া থেকে আসে ব্যাণ্ডেল-নৈহাটি হয়ে। আগে এ লাইনে আসত না এ গাড়ী। তখন সুবিধে ছিল মদনের। রাত বারোটা সাতচল্লিশে বার্ণপুর প্যাসেঞ্জার পার করে দিয়ে দিব্যি ঘরে এসে শুতে পারত মদন, ঘুমাতে পারত আরাম করে, আর পারত পার্ব্বতীর পাশে শুয়ে তার দেহের উত্তাপ উপভোগ করতে। কিন্তু এখন আর তা হয় না। এখন ভোরে উঠতে হয়। তা হোক, তাতেও অসুবিধে ছিল না মদনের যদি সময়মত চলে যেত এ গাড়ী। কিন্তু কোন দিনই সময়মত আসবে না এ ট্রেন। আর মদন বাইরে এই বর্ষার দিনে, প্রচণ্ড শীতে, সবুজ বাতি হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে, ভিজবে, কাঁপবে শীতে। ঘোড়ার ডিমের চাকরি। যদি সে সব ছেড়ে চলে যেতে পারত! কিন্তু যাবে কি করে মদন? সাইত্রিশ বছরের মদনের ঘরে, কুড়ি বছরের পার্ব্বতী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অবোধ প্রেম, আর গভীর অনুরাগে ভরা, নরম বুক, লতানো দেহসৌষ্ঠব। যখন চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবে মদন, তখনই ভাবে পার্ব্বতীর কথা। পার্ব্বতীর টান, তার চোখের নীরব কামনার শিখা, আর ঘরের হাতছানি, আজও সে মায়া ভুলতে পারে নি মদন, কাটাতেও পারে নি।

এতক্ষণে আকাশটা ঝকঝকে হয়ে চনচনে রোদ উঠেছে। দাঁতন ভাঙতে যাচ্ছিল মদন। কিন্তু ও কি? সিগন্যাল-পোষ্টের নীচে কালোমত ওটা কি? কুকুর নয় ত? এক রাশ জমে-থাকা থক্-থকে রক্তের মধ্যে পড়ে আছে জন্তুটা। মাথাটা নেই, কাটা পড়েছে ট্রেনে।

তাড়াতাড়ি হেঁটে এল মদন, না, কুকুর নয়, পাঁঠা। টেনে তুলে সে, হাসল মনে মনে, পাঁঠাও নয়, ছাগী। তা ছাগীই সই— ডান হাতে ছাগীটাকে তুলে নিয়ে ফিরে এল মদন। কাক উড়ল মাথার ওপর, পাখা ঝাপটাল দু'একটা চিল, ফোটা ফোটা রক্ত ঝরল প্রাণহীন দেহটি থেকে।

রেল লাইনের ধারে বাস করে মদন। ট্রেনে কাটা-পড়া ছাগল গরু আর হাঁস মুরগী প্রায়ই তার কপালে জোটে। ভাগ্য তার আর কিছুতে না হোক, এদিকে প্রসন্ন। গো-মাংস সে খায় না, বিক্রী করে দিয়ে আসে আর্দালী বাজারের হানিফ কসাইয়ের কাছে। পাঁঠার ছাল বেচে দেয় লোকমন মিঞা বাস্তুকরের দোকানে। আর পাঁঠা ছাগলের মাংস সে নিজে কতক খায়, কতক বিক্রী করে দিয়ে আসে হরেন বাবুর রেস্তোরায়। সে মাংসে বাবুরা আরাম করে চপ-কাটলেট খায়। এ মন্দ নয়, বরং ভাল ব্যবসা—ভাবছিল মদন, খোয়া-পাথর আর রেললাইন থেকে পা বাঁচিয়ে হেঁটে যেতে যেতে। আরও লাভের উপায় আছে মদনের। কাঁচা টাকা আর সোনার বোতাম, ফাউণ্টেন পেন আর হাতঘড়ি, আংটি আর মনি-ব্যাগ— এ সব লাভ হামেশা হয় না, হয় মাঝে মাঝে, যখন বাড়ী থেকে বাবু সেজে বেরিয়ে, রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে কেউ কাটা পড়ে দুর্ঘটনায়। নিজের বাড়ীর কাছাকাছি হলে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মদন। এতে মোটা লাভ, তার এক মাস কি দু'মাসের মাইনের চেয়েও অনেক বেশী। কিন্তু সে দুর্ঘটনা ত সব সময়ে হয় না, যখন হয়, কপাল খোলে মদনের। যখন হয় না, তাতেও দুঃখ কি আপসোস করে না মদন।

গয়া প্যাসেঞ্জার এ ছাগল খতম করল, তা ভালই হ'ল, খাওয়াও চলবে, টাকাও ফিরোবে—ঘরে ফিরে এসে পার্ব্বতীকে বললে মদন

উঠানে কুয়োর স্নান করছিল পার্ব্বতী। ভিজে কাপড়ের আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল সুডৌল বুক, আর জল-ঝরা শরীরের চোখ-ভোলানো লাবণ্য। মাথার ঘোমটা আর গায়ের কাপড় একটু টেনে সে হাসল তার রূপোবাঁধানো দাঁত মেলে, কানপাশা দুলিয়ে।

মাথায় পাগড়ি বেঁধে, একটা বিড়ি ধরিয়ে মাংস কাটতে বসল মদন। কৃশ শরীর তার, মুখটা রুক্ষ-বিকৃত গোড়াটে, সে মুখে এক

জোড়া ছুঁচালো গোঁফ। গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিলে উজ্জ্বল হাসির রেখা, খুশী হয়েছে মদন।

রক্তমাখা হাত নেড়ে, ছাগীর ছাল ছাড়িয়ে, মদন মনে মনে বললে, অনেক মাংস হবে আজ। তার পর পার্বতীকে ডাকলে মদন।

পার্বতী কাছে এল। একমুহূর্ত তাকাল মাংসের দিকে, বললে, এতগুলো মাংস পাক করবে কে?

—কেন তুমি করবা?

—হামি পারব না। সাচ্চা কথা তুমাকে বুললাম, হাঁ।

—না পারবে ত বেচে দেব। খাওয়াও হবে, দুটো পয়সাও হবে। মদন হাসল পার্বতীর দিকে তাকিয়ে। এদিকে বেলা বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। রোদ উঠল ঘরের চালে, গাছের পাতায়।

বেলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল মদন। পার্বতীর পানে চেয়ে বললে, অ পার্বতী, কেলেগ দেখাও না, নৈহাটি লোকাল আসছে—এখুনি আসবে।

একগাল হেসে, সবুজ পতাকা হাতে, বারান্দায় এসে দাঁড়ায় পার্বতী। সিগন্যাল ডাউন, গুমটি গেট বন্ধ, লাইন ক্লিয়ার। মাটি কাঁপিয়ে, বড় তুলে, ধুলো-ধোঁয়া উড়িয়ে হেলে-দুলে চলে গেল নৈহাটি লোক্যাল। আর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পার্বতী, এত বড় গাড়ী, সরু সরু দুটো লাইনে কি ভাবে দৈত্যের মত ছোটে। এত লোক কোথায় যায় রোজ? সে নিজে গুমটি-ওয়ালার স্ত্রী হয়েও কতকাল ট্রেনে চড়ে নি। ভিতরে এসে একটা লাঠি হাতে মদনের পাশে বসল পার্বতী। মাঝে মাঝে লাঠি ঘুরাল মাথার উপর—কাক চিল তাড়াবে সে।

মদনের পাশে বসে আব্দার করলে পার্বতী, অনেকদিন সে ট্রেনে চড়ে নি, শ্যামনগরে বেড়াতে যাবে ট্রেনে চড়ে। হাসল মদন, বললে, মাষ্টারবাবু ছুটি দিচ্ছেন না, তার কি করব। ছুটি দিলে ত তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেই পারি।

মুখ কালো করে বললে পার্বতী, ছুটি আর তুমাকে দিবে নি, মাষ্টারবাবু, হাঁ।

একটু থেমে মাংসগুলোর দিকে আর একবার তাকিয়ে পার্বতী বললে, এতগুলান মাংস, শিবু-বোনাইকে কিছু দিলে হ'ত।

বুকের ভিতর কে যেন হিংস্র থাবা বসালে মদনের। গম্ভীর মুখে হাতের কাজ করে চলল সে, একভাবে, একমনে, কোন জবাব দিলে না পার্বতীর কথার। শিবু-বোনাই ওরফে শিবুকে বিশ্বাস করে না মদন, এমনকি, শিবু সম্বন্ধে ধারণাও খুব ভাল নয় মদনের। শিবুকে সে পছন্দ করে না মোটেই। তবুও পার্বতীকে একথা কখনও বলে নি মদন, প্রকাশও করে নি কোন দিন, নিজের মনোভাব।

সেদিন সন্ধ্যার বাড়ী ফিরে এসে মদন দেখলে, উঠোনে খাটিয়া পেতে বসে শিবু, আর অদূরে চৌকাঠের উপর বসে আছে পার্বতী। পাশে হ্যারিকেনটা নিভে আসছে। দুজনে হাসছে, গল্প করছে, আর বিড়ি ফুঁকছে। মদন গিয়েছিল কুলি-গ্যাঙের বস্তিতে, কুলি-সর্দারের ঘরে। ফিরে এসে শিবুকে দেখে খুশী হ'ল না মদন। শিবু হাসল দাঁত বের করে, কুথায় গিছলে মদনদা?

—কুলি-গ্যাঙে, বলেই ঘরে ঢুকল মদন। একটু পরে ফিরে এল জামা খুলে, একটা বিড়ি ধরিয়ে। শিবুর দিকে তাকাল মদন—দু'চোখে অবজ্ঞা। শিবুকে মদন চেনে, প্রায়ই তাকে দেখে টিটাগড়ে ঐ বস্তির পাশে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে কোন রাত-জাগা মেয়ের হাত ধরে কথা বলছে সে। মাথায় বড় বড় চুল, পেশীবহুল বলিষ্ঠ শরীর, চাকরি করে কাঁকিনাড়া পাটকলে, ছুটির পর প্রায়ই এসে বসে মদনের উঠানে। পার্বতীর সঙ্গে কথা বলে, দু'চারটে কথা বলে মদনের সঙ্গে, তার পর ফিরে যায়। মদও যে গেলে না তা কে বলবে? কিন্তু মনে যা ভাবে মদন, মুখ ফুটে তা বলতে পারে না। কারণ, একদেশের লোক শিবু, তার উপর দূরসম্পর্কের আত্মীয়, তা ছাড়া অন্য কারণও আছে। মদন যে এর আগে আর একবার বিয়ে করেছিল, তা শিবু ছাড়া, এখানে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে, আর কেউ জানে না। ঝগড়া-বিবাদ করলে শেষে পার্বতীর কানেই কথাটা তুলে দেবে শিবু, এই আশঙ্কা মদনের। আর পার্বতী যদি শোনে একথা—তা হলে?

তা হলে কি হবে তাই ভেবেই শিবুকে কিছু বলে না মদন। সবকিছু সয়ে যায় মুখ বুজে। সাইত্রিশ বছরের মদনের আশঙ্কা হয় কি জানি কখন, কুড়ি বছরের পার্বতী বেঁকে বসে, ঘরে ফিরে যায়। যদি বলে, তোমার ঘর আর করব না—যদি সে সুখী না হয় মদনের সংসারে। কাঁচের মত ঠুনকো মন পার্বতীর, সে মন যদি ভেঙে যায়!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছিল মদনের—দোজ-বরে সব পুরুষেরই যেমন হয়। পার্বতীই একদিন বলেছিল, শিবু দাস ঠিক আমার বোনাইয়ের মত দেখতে। আমার সে বোনাই বেঁচে নেই আজ পাঁচ বছর, কলেরা হয়ে মরেছিল। সেই থেকে শিবুর উপর পার্বতীর দুর্বলতা যেন ধরা পড়েছে মদনের চোখে। এতে খুশী হয় নি মদন বরং চিন্তিত হয়েছে। শিবুকে পার্বতী ডাকে শিবু-বোনাই। এ ডাক মদনের মনে হিংসা জাগায়, জাগায় আশঙ্কা আর সন্দেহ।

শিবু নেমে যাওয়ার পরই, একটা দুর্ঘটনা ঘটল, ঠিক মদনের গুমটির পাশে, গেটের লাগোয়া লাইনে। গাড়ী থামতে থামতেও এগিয়ে গেল অনেক দূর, প্রায় প্লাটফর্মের কাছাকাছি। রেলের গার্ড, ড্রাইভার, পুলিশ আর জনতার ভিড় যেখানে হয়েছে তারও বেশ খানিকটা আগে। বছর তিরিশের ট্রেনে-কাটা-থাওয়া লোকটির পাশে গিয়ে বসল মদন—আঙুল থেকে ছিনিয়ে নিলে আংটি, কব্জি থেকে ঘড়ি আর পকেট থেকে মনিব্যাগ, কলম।

লোকজন এল, পুলিস এল। জেরা চলল, কার পরিচিত, কোথায় থাকত তার খোঁজখবর নেওয়া হ'ল। আর মদন একপাশ

জলে-থাকা মজের পাশে দাঁড়িয়ে জিব দিয়ে দুঃখসূচক শব্দ করতে লাগল, চুকচুক। আর কাঁচরাপাড়া লোক্যাল ট্রেনটাকে সে গাল দিলে, শালার কাঁচরাপাড়া লোকালরা, উজবুক, বুরবক শালা—

ঘড়ি সে বিক্রি করে দিলে ফিল্মওয়ালা লোকদের দেখবে, শেষ দিলে পলতা জলকলের মজিদ মিঞাকে আর আংটিটা সে কাউকে দিলে না। ব্যাগের টাকা আর দু'আনী সোনার আংটিতে ঝিক্‌-মিকে সরু হার গড়ালে মদন। শ্যামনগরে রথের মেলা এল। পার্ব্বতী বললে, মেলায় নিয়ে যাবা না?

পার্ব্বতীর হাত ধরে মদন বললে, মাষ্টারবাবু ছুটি দিল নি, কি করে মেলাতে যাব। আর উ মেলাতে কি আছে? তার চেয়ে ভাল জিনিস তুমাকে আমি দিব, লিচ্চয় দিব। পার্ব্বতী কিন্তু এতেও খুশী হ'ল না, গজরাতে লাগল। তখন পার্ব্বতীর গলায় হার পরিয়ে দিলে মদন, আদর করলে। এবার পার্ব্বতী তুষ্ট হ'ল।

আর এক দিন। সন্ধ্যায় ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে ডাক পড়ল মদনের। মদন গিয়ে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। ষ্টেশনমাষ্টার বললেন, আমার নাতির মুখেভাত, একটা পাঁঠা বা খাসি জোগাড় কর। বাজার থেকে কিনবি না, গ্রাম থেকে আনবি। দু'টাকা সস্তা হবে।

—আজ্ঞে তা গুমটি গেটের কি হবে? কেলেগ ধরবে কে? মাথা চুলকাল মদন।

—কেন তোর বউ দেখবে, পারবে না?

—আজ্ঞে পারবে।

পরদিন সকালে মদন বের হ'ল। ষ্টেশনমাষ্টারের নাতির মুখে-ভাত। মাংসের ব্যবস্থা করতে চলল মদন।

আষাঢ় মাস। আকাশে ঘনঘটা মেঘ। বৃষ্টি পড়ছিল ক্রমাগত, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস। সারাদিন এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে ত্রিশ টাকায় দুটো খাসি কিনে ফিরল মদন। ফিরল তিন মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে। রেল লাইন ধরে ধরে খাসি দুটোকে নিয়ে হেঁটে আসছিল সে।

তখন বৃষ্টি আরও জোরে চেপে এল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না মদন, রেললাইনের নুড়িতে হোঁচট খেয়ে রক্ত ঝরছিল পা থেকে। তবুও হেঁটে আসছিল সে।

প্রায় এসে পড়েছে মদন। এই ত সেই কালভার্ট, যার পাশে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে ডিসট্যান্ট সিগন্যাল। আর ঐ ত সম্মুখে ব্যারাকপুর ষ্টেশন, আলো জ্বলছে ষ্টেশনের। কিন্তু এ কি? কালভার্টটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মদন। প্রবল বর্ষায় মাটি ধুয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে শক্ত মাটিতে জমাট করা কালভার্টের বাঁধ, আর যেন ধ্বসেও গেছে খানিকটা। বেরিয়ে পড়েছে পলেস্তারা, ভাঙা জীর্ণ ইটের সারি। মাষ্টারবাবুকে জানাতে হবে, বলতে হবে কালভার্টের অবস্থা, ভাবলে মদন আরও খানিকটা এগিয়ে।

সারা শরীর ভিজে গেছে মদনের, মাথাটাও ভিজেছে। টুপটাপ জল ঝরছে গায়ের জামা থেকে, মাথা থেকেও। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এল মদন।

ষ্টেশনমাষ্টার খুশী হলেন খাসি দুটো দেখে। দুটোই একরকম, জোড়া মেলানো যেন। খয়েরি রঙের খাসি, কপালে সাদা জোরা-কাটা, হৃষ্টপুষ্ট তেলচকচকে চেহারা দুটোরই। খুশী হয়ে হেসে ষ্টেশন মাষ্টার বললেন, পরশু এসে দুপুরে এখানে খাবি।

—আজ্ঞে, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মদন।

ফিরে আসার সময়ে খাসি দুটো মদনের দিকে চাইল, শীতার্ত সিক্ত শরীরে দু'জোড়া অসহায় আর ভীরু চোখের চাউনি বড়ই করুণ যেন। ওদের দিকে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে আবার পথ ধরলে মদন। সারা পথ কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে আসছিল সে। ভাবছিল, ঘরে ফিরে পার্ব্বতীকে বলবে, একটু গরম গরম 'চা-পানি' খাওয়াতে—শরীরটা যেন ভিজে আরসম্ভ হয়ে গেছে মদনের। দু' পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল মদন। এই যা, ভুলে গেছে সে, বলতে ভুলে গেছে মাষ্টারবাবুকে—কালভার্ট ধ্বসে পড়ছে। যাক্‌, কাল সকালে যখন আসবে তখনই বলবে সে। এখন এই রাত্রে, বৃষ্টিতে ভিজে আর যেতে ইচ্ছে করল না মদনের। তা ছাড়া তার ঘরের কাছেই এসে পড়েছে মদন। ঐ ত তার গুমটি, গুমটি গেটের লাল আলো জ্বলছে সঙ্কেত-প্রহরীর মত। আরও হেঁটে এল মদন, পা চালিয়ে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখলে বাইরে থেকে গুমটি বন্ধ, কিন্তু বন্ধ জানালার ফাঁকে ফাঁকে একটু আলোর ছটা, আর ঘরের ভেতর লণ্ঠনের মৃদু আলো। বৃষ্টি থামে নি। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে তখনও। আর গুমটির পাশে সমকোণ-আকৃতি নিমগাছ থেকে জল ঝরছে, শোকাশ্রুর মত। ভেতরে বারান্দায় উঠতে ঘর থেকে কলকল হাসির শব্দ পেলে মদন, পেলে হাতভরা চুড়ির রিণি-ঝিণি আওয়াজ। আর এক পাট খোলা জানালায় দেখলে...

দেখেই থমকে দাঁড়াল মদন। সমস্ত শরীরটা এল স্থির হয়ে। এই মুহূর্তে নিজেকে নিদারুণ স্নায়বিক আঘাত-পাওয়া কোন মানুষের মত মনে হ'ল মদনের। আর মনে হ'ল দুটো কান, কপাল, আর মাথা যেন পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

কোন কথা বললে না মদন। তেমনি পা টিপে টিপে বেরিয়ে গুমটি ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে বসল সে। তার পরের মুহূর্ত-গুলো কাটল নিদারুণ উত্তেজনায়, ঝড়ের মত। মনে হ'ল যেন তার চোখের উপর দিয়ে ঝড় তুলে, হুঙ্কার করে ছুটে যাচ্ছে শত শত গয়া প্যাসেঞ্জার, নৈহাটি আর কাঁচরাপাড়া লোক্যাল ট্রেন। দুটো হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে বসে রইল মদন। তার পর এক সময়ে শুনলে, ভিতরে কপাটখোলার শব্দ হ'ল, আর পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল শিবু দাস। বাইরের জানালাও খুলল, সেখানে পার্ব্বতীর মুখ মিলিয়ে গেল।

বুকে চলেছে তোলপাড়, লুকিয়ে রইল মদন অন্ধকারে, ঝোপের পাশে। শিবু দাসের মুখোমুখি হ'ল না সে। আর তখন বৃষ্টিভেজা সেই রাত্রে, থেকে থেকে ঝড় বইতে সুরু করল, ঝড়ে দুলে উঠল,

কেঁপে উঠল, রেল লাইনের দু'পাশের গাছপালাদি, শাখাপ্রশাখা—নীল লতা আর হাড়িভাঙা বন। তারাও যেন মাথা কুটল সে ঝড়ো হাওয়ায়।

সে রাত্রে পার্ব্বতীকে বলি বলি করেও কিছু বললে না মদন। রাত্রে পার্ব্বতীর হাতের রান্না খেতে পর্য্যন্ত ঘৃণা বোধ হ'ল মদনের। সে কিছু খেলে না, বললে, শরীর খারাপ। এমনকি পার্ব্বতীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও যেন ইচ্ছা করছিল না মদনের। ঘিনঘিন করছিল সারা গা, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মনে হচ্ছিল, পার্ব্বতীর ঐ শরীর ত শিবুর সেহলগ্ন হয়েছে। ঐ বাহু, সেখানেও ত শিবুর উত্তপ্ত রক্তের স্পর্শ। আরও মনে হ'ল মদনের, দেবে নাকি পার্ব্বতীর গলাটা টিপে, কিংবা ঘরে-তুলে-রাখা গাঁইতির আঘাতে দেবে নাকি মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ করে? অন্ধকার দুর্য্যোগভরা বর্ষার এই রাত্রে কেউ জানবে না, শুধু মদন নিষ্কৃতি পাবে পার্ব্বতীর হাত থেকে। এ পার্ব্বতী তাকে সুখী করবে না, শান্তিও দেবে না। শুধু পুড়িয়ে মারবে তিলে তিলে ক্ষয় করে, প্রতারিত করবে প্রতিদিন, প্রত্যেক মুহূর্তে।

শিবু! পার্ব্বতী! পার্ব্বতী ডাকে শিবু-বোনাই। নির্লজ্জ! দাঁতে দাঁত ঘষে মদন, ফুলতে থাকে হিংস্র কোন বন্য জানোয়ারের মত।

হয় ত পার্ব্বতীকে খুন করত মদন বর্ষণমুখর ঐ নিশীথ রাত্রে। কিন্তু তখনই মনে পড়ল মদনের। মনে পড়ল, বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ের কোমল মুখ। যে তার প্রথম জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ আর কামনা-বাসনা বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, প্রতীক্ষা করছে বন্ধ্যা নারীর মত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর সন্তান-সন্ততিতে ভরা সংসার —কবে সে পাবে? কিন্তু সে নিজেও ত প্রতারণা করেছে, ছলনা করেছে। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ের কথা বলে নি পার্ব্বতীকে, গোপন রেখেছে।

বিছানায় শুয়ে পড়ল মদন। কিন্তু ঘুম এল না সে রাত্রে। পার্ব্বতীও শুতে এল মদনের পাশে, অন্যদিনের মত। আর কিন্তু রোজকার মত পার্ব্বতীকে কাছে টেনে নিলে না মদন, বরং তার কাছ থেকে হাত দুই সরে গিয়ে শুয়ে রইল, বালিশে মুখ গুঁজে। আর স্বামীকে বার বার নীচু চোখে তাকিয়ে দেখলে পার্ব্বতী।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে মদন অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধু একবার বললে, ঐ শিবু রোজ রোজ আসে কেনে? উয়ার মতলব কি?

—আমি কি জানি? জবাব দিলে পার্ব্বতী, আর কোন কথা বললে না পার্ব্বতী। স্বামীর মনের কথা জানতে পেরেছিল কিনা কে জানে? স্বামী সন্দেহ করছে হয়ত, অনুমান করলে পার্ব্বতী। সেকথা ভাবল মদনও। পার্ব্বতী কি জানতে পেরেছে মদনের মনের কথা? কি ভাবছে সে—এই মুহূর্তে তারই পাশে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে।

পরদিন ভোরবেলা। তখনও ফরসা হয় নি আকাশ। শুধু পাখীদের ঘুম ভেঙেছে গাছের ডালে ডালে। মদন উঠল ঘুম থেকে অন্য দিন যেমন উঠত। এখনি আসবে তিনশ' পঞ্চাশ নম্বর ডাউন ট্রেন, গয়া প্যাসেঞ্জার। ভয়াট-গেট বন্ধ করবে সে, ফ্ল্যাগ ধরবে। তার পর গাড়ী চলে যাবে ঝড়ের মত। পার্ব্বতীকে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখলে না মদন। কোথায় গেছে পার্ব্বতী? হয় ত বাইরে হাত-মুখ ধুতে, হ্যাঁ, সত্যিই তাই গেছে পার্ব্বতী, রোজ যেমন যায়। কুয়োর পাড়ে রেখে গেছে তার লালপেড়ে সাদা শাড়ী।

বাইরে এসে দাঁড়াল মদন। সিগন্যাল পড়েছে, গয়া প্যাসেঞ্জার আসছে। ঐ ত বাঁকের মুখে ইঞ্জিন। কিন্তু ও কি? হঠাৎ থেমে পড়ল যেন! হ্যাঁ, থেমেই পড়েছে গাড়ীটা, কালভার্টটার কাছে।

সে কি? ড্রাইভার নামছে, গার্ডসাহেব নামছে; অনেক যাত্রীও নামছে। সবাই ছুটছে কালভার্টের দিকে। ফ্ল্যাগ হাতে ছুটল মদনও। কাছে এসে দেখে—পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী! মাথাটা ঘুরে গেল মদনের। পায়ের নীচে মাটিও যেন সরে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি যেন অন্ধকার হয়ে এল, মনে হ'ল পার্ব্বতী এখানে কেন? তবে কি···

তবে কি আত্মহত্যা? গাড়ীর নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পার্ব্বতী? কিন্তু কেন? গত রাত্রের সব ঘটনা চোখের সামনে ভাসতে লাগল মদনের। এ কি তারই পরিণাম? অনুতাপ থেকে আত্মহত্যা?

একরাশ রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পার্ব্বতী। যে তলে বিকৃত হয়ে গেছে সর্ব্বাঙ্গ, কেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে শরীরের নিম্নাংশ। আর রেল লাইনের পাশে পাথর, স্লিপার আর ঘাসে ছড়িয়ে থাকা রক্ত জমে আসছে ধীরে ধীরে, যেন নরবলি হয়ে গেছে একটু আগে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গার্ড সাহেব বললেন, এ আত্ম-হত্যা।

ড্রাইভার বললে, না, তা নয়, সিগন্যাল ডাউন, গাড়ী নিয়ে আসছিলাম, দেখলাম কালভার্টের কাছে লাইনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত তুলছে। যেন থামাতে চায় গাড়ী। কিন্তু ব্রেক করতে করতে ঠিক সময়মত গাড়ী থামানো গেল না। নেমে দেখি কালভার্ট ধ্বসে গেছে। ও হয় ত দুর্ঘটনা বাঁচাতে গিয়েছিল।

খবর পেয়ে শিবুও এল। মাথা কুটল, মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ে সে বলল, হা ভগবান! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল ভগবান! দু'চোখে অশ্রুবন্যা, শিবু বলতে লাগল, কাল রাত্রে তুমি ফিরতে দেরি করলে মদন-দা, আমি কি করি, শেষে পার্ব্বতীর সঙ্গে কড়ি খেলে সময় কাটালাম আর ওকে পাহারা দিলাম। বড় ভয় পেয়েছিল পার্ব্বতী।

পাশে বসে মুখ নীচু করে সব শুনতে লাগল মদন। দু'চোখ ঝাপসা, ঝাপসা চোখেই সে একবার শিবুর দিকে তাকাল। কোন কথারই উত্তর দিলে না মদন। কি জবাব দেবে? সব জবাব দিলে শুধু কান্নায়। অজস্র কান্নায় সে তার প্রেম ভালবাসা, মমতা নিবেদন করলে পার্ব্বতীকে।

দুই নম্বর গুমটির পাশে চার জোড়া রেল লাইন, সোজা সমান্তরাল, কখনও বা বিসর্পিত। আর সে রেল লাইনের পাশে পাশে পাথর-স্লিপার আর সিগন্যাল পোস্ট ছড়িয়ে আছে, এগিয়ে গেছে অনেক দূর, যত দূর এগিয়ে গেছে এ রেল লাইন। এই রেল লাইনের ধারে দুই নম্বর গুমটিতে এখনও বাস করে মদন। এখনও লাইনে দুর্ঘটনা ঘটে, ছাগল-পাঁঠা-গরু কাটা পড়ে, মানুষও কাটা পড়ে। কিন্তু কিছুই হোয় না মদন।

চোখের সম্মুখে ট্রেনে কাটা-পড়া কাউকে দেখলে, মনে পড়ে মদনের, তারুণ্যের কোমলতা আর অনাস্বাদিত জীবনের বহু নীরব কামনাভরা একখানা মুখ, সে মুখ পার্বতীর। গুমটিওয়ালার স্ত্রী পার্বতী, ট্রেন দুর্ঘটনা বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। ভেবে ব্যথা, বেদনার্ত মনেও ক্ষণিকের জন্যে গর্ব অনুভব করে মদন—গুমটি-গেটের পাশে, সবুজ বাতি হাতে দাঁড়িয়ে কখনও কখনও তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

নব দেবালয়

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে আধ্যাত্মিকতা যে রূপ লাভ করেছে, এমন পৃথিবীর অন্যত্র কচিৎ দেখা যায়। সেই জন্য ভারতীয় ভাস্কর্য্যকে অপ্রাকৃত বলা হয়েছে। অধুনাতম সময়েও ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের ধারা প্রবাহিত রয়েছে, দেখতে পাওয়া যায়। ইদানীং যে সব নূতন নূতন প্রাসাদ ও অট্টালিকা মাথা তুলেছে, তার অধিকাংশই ঐশ্বর্য্য ও ব্যবহার-সৌকর্য্যের দিক থেকে গড়া। তবে অনেক স্থলে মিশ্রশিল্পও চোখে পড়ে। বহু ব্যয়ে এবং অল্প ব্যয়ে অনেক হর্ম্ম্য, দেবালয় এবং আশ্রমও নির্ম্মিত হয়েছে, যার ভিতর আধ্যাত্মিক রূপ ফুটে বেরিয়েছে। এই প্রবন্ধে একটি দেবালয়ের পরিচয় দেব, যা স্বল্প ব্যয়ে অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে গঠিত, কিন্তু ভাল করে দেখলে যার ভিতর ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ আধুনিক রূপের প্রকাশ দেখা যায়।

এই দেবালয়টি কলিকাতায় ৭৮বি, আপার সার্কুলার রোডে শহরের ভিতর অবস্থিত। ১৮৮৩-৮৪ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দেবালয়টি নির্ম্মাণ করান। এটি 'নব দেবালয়' নামে পরিচিত। ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় একটি বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রকে স্রষ্টা ও শিল্পী বলেন। কথাটি অতি সত্য। কেশবচন্দ্রের বহুমুখীন প্রতিভা—যেমন সমাজ-গঠনে, নব ধর্ম্মরচনায়, 'নবসংহিতা' প্রণয়নে, 'নববৃন্দাবন' নাটকে, তেমনি আবার কমলকুটীর, কমলসরোবর, যোগ-কুটীর, নব দেবালয়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতির গঠনে প্রকাশ পায়। তিনি যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য সাধনারও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, নব দেবালয়টি তার একটি সাক্ষ্য।

১৮৬৮-৬৯ খ্রীঃ তাঁর অনুপ্রেরণায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটির চূড়ার উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং অনেক অর্থব্যয়ে তা সম্পন্ন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তখনকার নূতন আদর্শটিকে স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। সে সময়ে ছিল 'শ্লোকসংগ্রহের' যুগ, অর্থাৎ ভারতবর্ষে সম্মানিত সকল ধর্ম্ম ও সকল শাস্ত্রের একত্র সমাবেশ সাধনের প্রয়াস। রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বেই যুক্তি বিচারের সাহায্যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রের ভিতর যে সাধারণ সত্য নিহিত আছে, তা প্রকাশ করে যান এবং জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষ একত্রে সেই সাধারণ সত্যের ভূমিতে মিলবে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ করেন ১৮৩০ খ্রীঃ। তার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, তারই নূতনতম বিকাশ দেখা গেল ব্রহ্মানন্দের 'শ্লোকসংগ্রহ'* প্রকাশে। 'ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে'র গঠনে হিন্দুর মন্দির, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা, মুসলমানের মস্‌জিদের আকৃতির সম্মিলনে সেই আদর্শ প্রকাশিত হ'ল। সকলের একত্র সমাবেশই হ'ল তখনকার অধ্যাত্ম আদর্শ। এই আদর্শ সনাতন কাল থেকেই ভারতের জীবনে দেখা গিয়েছে। নূতন যুগে তাই আবার নূতনতম ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

এই সমন্বয়ের চিন্তা ও আদর্শ ক্রমশঃ বিস্তৃতি এবং গভীরতা লাভ করে নববিধানের নূতন আদর্শ দেখা দিল। ইতিহাস নূতনরূপে গৃহীত হ'ল—যুগে যুগে যত ধর্ম্মবিধান সমাগত হয়েছে, সকলের ভিতর অন্তরঙ্গ যোগ নববিধানে প্রকাশিত হ'ল। নববিধানের মূলকথা হ'ল সকলকে গ্রহণ এবং যে পথে মানুষকে সেই সমন্বয়ে অগ্রসর করে দেয়, তার সাধন। বুদ্ধদেব যেমন একদিন 'মধ্য পথের' কথা বলেছিলেন, কোন দিকেই চূড়ান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়বে না, মাঝখানে চলে আসবে, তা হলেই 'আমিত্বের' এমন অবস্থা হবে যে, সত্য বা প্রজ্ঞা তার কাছে সহজে প্রকাশিত হবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নব-

---

* গ্রন্থটি ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিধানে ঘোষণা করলেন যে, বর্ত্তমান যুগে যে ধর্ম্মের প্রকাশ, ধর্ম্মের সামীপ্য ঘটেছে, তার সকলকেই নিতে হবে। কি করে? প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির 'সামঞ্জস্য' করে। যদি কোনটির সঙ্গে কোনটির সামঞ্জস্য না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার ভিতর গলদ আছে। আবার নূতন করে নূতন চোখে দেখবে, সামঞ্জস্য প্রকাশিত হলে তখন বুঝবে যে, সত্য লাভ করেছ। সামঞ্জস্যেই সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ, সামঞ্জস্যেই অহিংসা ও অনন্ত-মিলনের উপায়। এই সামঞ্জস্য অন্তরের বস্তু, বাহিরের নয়। 'নব দেবালয়ে'র অনাড়ম্বর আকৃতিতে সকল ধর্ম্মের বাহিরের পূজাগৃহাকৃতি বা শাস্ত্র-বাক্য-সংগ্রহ স্থান পায় নি। আরও ভিতরে যেখানে 'চারি বেদের মিল হয়েছে'* তার পরিচয় দেয় 'নব দেবালয়'। দেশে দেশে, কালে কালে প্রকাশিত পথগুলির সামঞ্জস্যের যে আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তঃপুর দেখা যায়, তারই ছবি এখানে চিত্রিত হয়েছে।

পুরাতন পত্রিকায় নব দেবালয়ের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত হ'ল। ব্রহ্মানন্দের সহ-সাধক গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ১লা আশ্বিন, ১৮০৬ শক (১৮৮৪ খ্রীঃ) 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় লেখেন :

"গত বৎসর শ্রীআচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র যখন রুগ্ন ও ভগ্ন দেহে হিমালয়-শিখরে বাস করিয়া 'যোগ-বিজ্ঞান' ও 'নব-সংহিতা' এই দুই অমূল্য তত্ত্বশাস্ত্র জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন, তখনই স্বীয় কলিকাতাস্থ ভবনে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন।" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমস্ত জীবন প্রত্যাদেশের ঝড়ে গড়া, তাই স্বল্প ৪৫ বৎসরের জীবনের ভিতর তিনি আমাদের এমন সকল জিনিষ দিয়ে যেতে পেরেছিলেন, যা কল্পনার অতীত। 'নব দেবালয়'টিও দেখা যাচ্ছে, প্রত্যাদেশের ঝড়।

গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন—"যার আজ্ঞা হইয়াছে, তাঁর ঘর হইবেই। তিনি আপন বাড়ীর কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া ইট কুড়াইয়া জননীর আলয় নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেবালয়-নির্ম্মাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া কলিকাতায় বন্ধুদিগের নিকটে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন ও দেবালয়ের একটি আদর্শ স্বয়ং অঙ্কিত করিলেন।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, 'নব দেবালয়ে'র আদর্শ কেশবচন্দ্র স্বয়ং অঙ্কিত করেন—হিমালয় শিখরে বসে। সে সময়ে তাঁর অসুস্থতার ঔষধরূপে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে ছুতারের কাজ, ছবি আঁকা প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকতে হ'ত। নব দেবালয়ের আদর্শ অঙ্কন তার ভিতর করেছিলেন। ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খ্রীঃ তাঁকে সিমলা থেকে কলিকাতায় আনা হয়। তাই গিরিশচন্দ্র লেখেন :

"এখানে পদার্পণ করিয়াই তিনি দেবালয়-নির্ম্মাণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ও প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রতি তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। দেবালয়ের চূড়া ইত্যাদির আদর্শ অঙ্কিত করিয়া পাঠাইবার জন্য জলপাইগুড়ির একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়কে* অনুরোধ করিয়া পাঠান।"

এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে, চূড়াটির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। স্ব-অঙ্কিত আদর্শকে ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে ঠিক করিয়ে নেবার ব্যবস্থাও তিনি করছেন। তিনি কেবল ভাবুক নন, কত তাঁর গভীর জ্ঞান, কত দিকে তাঁর চিন্তা, তারও সাক্ষ্য এতে পাওয়া যায়। নব দেবালয়ের ভিত্তি-নির্ম্মাণ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

"ভিত্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পর, আচার্য্যদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, প্রত্যেক প্রেরিত (তাঁর সহ-সাধক) কোদালীযোগে ভিত্তির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিবেন ; তদনুসারে সকলেই কোদালী হস্তে করিয়া কিছু কিছু ভূমি খনন করেন।...প্রার্থনান্তে স্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করেন ও দুই একখানা করিয়া ইট গাঁথিতে প্রেরিতদিগকে বলেন। একে একে সকল প্রেরিতই গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকের গাঁথনি জমাট হয় না। তাহা দেখিয়া তিনি বলেন যে, তোমরা দুইখানা ইট জুড়িতে পারিতেছ না, তোমাদের দ্বারা মিলন অসম্ভব। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ অধিক এক মাসের মধ্যে প্রাচীর ও ছাদ হইয়া দেবালয় একপ্রকার প্রস্তুত হইয়া উঠে।"

১লা জানুয়ারী ১৮৮৪ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র যথারীতি 'নব দেবালয়' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৮ই জানুয়ারী ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া পরম জননীর ক্রোড়ে স্থানলাভ করেন। এই দেবালয়টি তাঁর শেষ দান ও তাঁর আধ্যাত্মিক শিল্প প্রতিভার জলন্ত সাক্ষ্য-স্বরূপ আজও বর্ত্তমান। প্রতিষ্ঠার দিনে তিনি যে প্রার্থনা করেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

"এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালাম, এ স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দি। প্রিয় ভাইগণ, তোমাদিগকেও

* 'নবনী-তাপ-বিধন' উপদেশ।

* ইনি কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভগিনীপতির ভ্রাতা।

বলি, তোমরাও মার ঘরখানি সাজাইয়া দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও; মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মার পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন, তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া, দেবদেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান, এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে।...মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ, সুস্থতা, বিষম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ সুখ।"

২

এবার 'নব দেবালয়ে'র শিল্প-নৈপুণ্যের আলোচনা করা যাক। রয়াল একাডেমী অব আর্টের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিল্পী বন্ধুবর শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বসে বহুক্ষণ ধরে 'নব দেবালয়' দেখবার সুযোগ ঘটেছে। ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে, ভারতীয় শিল্পরীতিকে, নববিধানকে কি চমৎকার মূর্ত্তি দান করা হয়েছে এই 'নব দেবালয়ে'; বাহিরকে ছেড়ে, ভিতরে প্রবেশ করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও বর্ত্তমান, সকল ধর্ম্মের সাধনার মর্ম্মকথার অপূর্ব্ব সমন্বয় করা হয়েছে। অতি সহজ অনাড়ম্বর, কিন্তু বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের নিখুঁত আদর্শ এই নব দেবালয়ের গঠনে প্রকাশ করেছেন। সমন্বয়াচার্য্য কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ও ইঙ্গিতে ঐ সময়েই মহামহা সমন্বয়ভাষ্য রচিত হয়েছিল,—বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য, শ্রীমদ্গীতাপ্রপূর্তি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমন্বয় ভাষ্য, নানক প্রকাশ, কোর্‌আন্‌শরীফ ও হদিস্, Oriental Christ ও ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকায় অতুলনীয় সমন্বয় সাহিত্য প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'নব দেবালয়ে' নববিধানের আধ্যাত্মিক আদর্শকেও প্রকাশ করেছেন।

প্রথমেই চোখে পড়ে নব দেবালয়ের পাদদেশে দুটি গুহাকৃতি কোটর। ঐ দুটি যেন বলছে যে, ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা সাধন না করে উপরে উঠা যায় না। তার পরে, চার ধাপ সিঁড়ি ও তার দু'ধারে দুটি ছ'কোণা থাম। ছ'কোণা থাম দুটি মনে করিয়ে দিল বৈচিত্র্যের কথা।

"রূপভেদপ্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতিচিত্রং ষড়ঙ্গকম্।"

বিশ্ব বৈচিত্র্যে গঠিত—সেই বৈচিত্র্যে সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হতে হবে।

উপরে উঠবার চারটি সিঁড়ি, যেন সাধনমার্গের চারটি ধাপ—যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান। 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' ব্রহ্মানন্দ কয়েক বৎসর ধরে সাধু অঘোরনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিকে এই তত্ত্বই শিক্ষা দিয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রশস্ত রোয়াক। ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন, এটি ভক্তদের জন্যে, তাঁরা মার নাম কীর্ত্তন করে নৃত্য করবেন অনুরাগ ও মত্ততায়।

ভিতরে প্রবেশের দরজা চারটি, তার মধ্যে আবার একটি ছোট। যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানই আবার পরীক্ষা করে নেবার জন্যে সামনে দণ্ডায়মান। যোগের দরজাটি ছোট, যোগীকে দেহ সঙ্কুচিত করে ঢুকতে হবে। প্রতি দরজার উপরে শিবমন্দিরের আকারের আর্চ—মঙ্গলময়ের কৃপা মাথার উপর যেন সদাই উপস্থিত—তার ভিতরে জ্যোতির প্রতীক-স্বরূপ নানা বর্ণের কাঁচের ভিতর একটি প্রদীপ ও আলোক-শিখার মত রেখা অঙ্কিত। কার্নিশগুলি ভিতর দিকে ঢোকানো, যেন অন্তর্মুখীনতারই পরিচয় দিচ্ছে। দরজার আশেপাশে দেওয়ালের গায়ে গায়ে আটটি থামের আকৃতি বৌদ্ধ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক সত্য ও যোগশাস্ত্রের অষ্টসিদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার কেশবের প্রিয় চূড়াটির দিকে একবার দেখি। সবার উপরে নববিধান-অঙ্কিত রৌপ্য-পতাকা যেন সত্যের মহিমা ঘোষণা করছে। তার পরেই ক্ষুদ্রাকৃতি শিবমন্দিরের মতন গঠন যেন 'শিবমে'র প্রতীক হয়ে, তার পাদদেশে অঙ্কিত লতাপাতা ফুল 'সুন্দরমে'র প্রতীকরূপে শোভা পাচ্ছে। 'সত্য শিব সুন্দরে'র অপূর্ব্ব সমন্বয়! তারপর ভারতীয় মন্দিরের গঠনরীতি অনুসারে আবার অপেক্ষাকৃত বড় শিবমন্দিরের ও তার পাদদেশে লতাপাতা ফুলের যোজনা করা হয়েছে। এই শিবমন্দিরটির মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি* ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, Religion-এর সঙ্গে Science-এর মিলনের নিদর্শনরূপে শোভা পাচ্ছে। বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হ'ল নববিধানের নূতন কথা—সেটিও এখানে সুন্দররূপেই স্থান পেয়েছে। চূড়াটির ভিতর সত্য শিব সুন্দরের অপূর্ব্ব সমন্বয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ভিতর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থান করে দিয়ে, অতীত ও বর্ত্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধন করেছেন।

এবার দেবালয়ের ভিতরে প্রবেশ করি। ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় ভিতরকে বলেছেন—"মার খাস দরবার।" সত্যই খাস দরবার, যেন গম্ গম্ করছে। একটি উচ্চ বেদী, তার উপর আচার্য্যের বসিবার আসন, গৈরিকবস্ত্র, একতারা,

* ভাই গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধেও ঘড়িটির উল্লেখ আছে।

সম্মুখে কমণ্ডলু, নববিধান-অঙ্কিত রৌপ্য-পতাকা ও পুথি। বেদীর সম্মুখভাগে ও উভয় পার্শ্বে প্রেরিত মণ্ডলীর নামাঙ্কিত মর্ম্মর প্রস্তর ও বসিবার আসন। পশ্চিম পার্শ্বে মহিলাদিগের উপাসনায় বসিবার স্থান।

সহজ অনাড়ম্বর স্থাপত্যের ভিতরেও যে গূঢ় আধ্যাত্মিকতাকে এভাবে প্রকাশ করা যায়, তা উপলব্ধি করে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করলাম। কোন সত্যই হারিয়ে যায় নি—কোন সত্যই অব্যবহার্য্য হয় নি—সমস্তই যে বর্ত্তমানের উপকরণ হয়ে রয়েছে—এই সত্যই আজ সমস্ত পৃথিবীকে কেবল উপলব্ধিতে নয়—সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনে সার্থক করতে হবে—তবেই নূতন জগতের অভ্যুদয় হবে। কেশবের এই বাণীই 'নব দেবালয়ে'র ভিতর দিয়ে ঘোষিত হচ্ছে।

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য এই যে, বহু মনীষী ব্যক্তির সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ ও সুবিধা আমার ঘটিয়াছে। এই সকল মনীষী ব্যক্তিদের মধ্যে ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয় একজন ছিলেন। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—Small things show a man, অর্থাৎ ছোটখাটো জিনিষের দ্বারাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়; এই কথাটা আমি খুবই মানি। সেইজন্য তাঁহার মত বিরাট মানুষের দুই-একটি ক্ষুদ্র কাজের উদাহরণ ও দুই-একটি সাধারণ কথা বলিয়া তাঁহার ভিতরকার মানুষটির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার মত অযোগ্য মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সন ও তারিখ মনে নাই (সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯২৬ সন), তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, তিনি তখন Inspector of Colleges। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর অভিমুখী মেল জাহাজে তিনি চাঁদপুর যাইতেছিলেন, কুমিল্লা বা ঐ দিকের অন্য কোন কলেজ পরিদর্শনের জন্য। গোয়ালন্দের পরবর্তী ষ্টেশন (ফরিদপুর-টেপাখোলা) হইতে আমি ঐ জাহাজে উঠি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি 'কেবিনে' প্রবেশ করি। উক্ত 'কেবিনে' দুইটি শয্যা ছিল, একটি শয্যাতে ড. মুখার্জ্জী শয়ান ছিলেন—তখন তাঁহাকে চিনিতাম না, আর একটি শয্যা খালি ছিল, এবং আমি সেই শয্যাটি দখল করিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া ড. মুখার্জ্জী উঠিয়া বসিলেন এবং আমার পরিচয় গ্রহণ করিলেন, নিজের পরিচয়ও দিলেন—তাঁহার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহার পদধূলি লইয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম। আমি বিদেশী পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ছিলাম। প্রণাম করিবার পরে তিনি যেন অন্যরকম মানুষ হইয়া গেলেন—আমি দেখিতে পাইলাম আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি তাঁহার চোখেমুখে ফুটিয়া উঠিল। এমনকি তিনি আমার পারিবারিক সকল পরিচয় গ্রহণ করিলেন। আমি কৃষি বিভাগে কাজ করি শুনিয়া তিনি কৃষি-বিষয়ক উন্নতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন, বলা বাহুল্য, তাঁহার নিকট আমাকে অনেক বিষয়েই হার মানিতে হইল—দেশের যুবকগণকে গ্রামমুখী ও কৃষিমুখী করিবার দিকেই তাঁহার আগ্রহ বেশী দেখিলাম। এই সম্পর্কে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সহিত জাহাজে আমি বেলা দেড়টা হইতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ছিলাম। অপরাহ্নে তিনি একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ খুলিয়া কিছু আহার্য্য দ্রব্য বাহির করিলেন—এবং উহা দুই ভাগ করিয়া একভাগ আমাকে খাইতে দিলেন—পাঁউরুটি, কলা, সন্দেশ প্রভৃতি ছিল। ঐ ব্যাগের মধ্যে তাঁহার হুকা, কলিকা, তামাক, টিকা প্রভৃতিও ছিল। তাঁহার পরিচারক তামাক সাজিয়া আনিল। ঐ জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ও ছিলেন। চাঁদপুর পৌঁছিয়া ড. মুখার্জ্জীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যখন বিদায় গ্রহণ করিলাম—তিনি বলিলেন, "কলিকাতায় যাইলে আমার সহিত দেখা করিবেন, আপনার নিকট হইতে কৃষি সম্বন্ধে আমার অনেক জানিবার বিষয় আছে।"

ইহার পর তাঁহার সহিত অনেক দিন দেখা না হইলেও মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইত। সেই সকল চিঠিতে কৃষির উন্নতির কথাই থাকিত। ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু মনে হয় এই সময় তিনি "Calcutta Review"-এ কৃষি সম্বন্ধে দুই-একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মধুপুরেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অধিকতর সুযোগ হইয়াছিল। মধুপুরে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের বাড়ীতে আসিতেন এবং আমিও সেখানে যাইতাম। সেখানেই দিনের পর দিন তাঁহার সহিত দেশের নানাবিধ সমস্যা (প্রধানতঃ কৃষি) সম্বন্ধে আলোচনা হইত; পরে মধুপুরে 'বাহার বিঘা'র তাঁহার বাড়ীতে আমার যাতায়াতও আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময় শ্রীমতী বনবালা মুখোপাধ্যায়ের স্নেহে

প্রস্তুত নানাবিধ উপাদেয় আহার্য্য ভোজন করিবারও সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ড মুখার্জ্জীও মধুপুরে 'অরুণোদয়ে' (আমার শ্বশুরালয়ে) আমার সহিত দেখা করিবার জন্য কয়েকবার আসিয়াছিলেন। তিনি যখন আসিতেন আমি খুবই লজ্জিত হইয়া পড়িতাম। তিনি বলিতেন, "কেবল Return visit দিতে আসি নাই, গল্প করিতেও আসিয়াছি।" মধুপুরেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাকে একটি পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলাম এবং এই বিষয়ে তাঁহার আর্থিক সাহায্য চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহা রক্ষা করিবার পর এই বিষয়ে মনোযোগ দিব। আমার পরিকল্পনাটি মোটামুটি এইরূপ ছিল: মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কুড়ি জন যুবককে কোন কৃষিক্ষেত্রে হাতেকলমে দুই বৎসর কৃষি-শিক্ষা দিবার পর তাঁহাদের লইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠিত করিতে হইবে। প্রত্যেকের মূলধন হইবে পাঁচ হাজার টাকা; কিন্তু এই মূলধনের টাকা তাঁহারা অগ্রিম দিতে সক্ষম হইবেন না; কোন দানশীল দেশপ্রেমিক ব্যক্তি এই উদ্দেশে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। প্রত্যেক যুবককে পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে এক লক্ষ টাকা তাঁহাদের মূলধনের জন্য বণ্টন করা হইবে। বৃহৎ আকারের একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে এবং উহা সমবায় প্রণালীতে পরিচালিত হইবে। উক্ত মূলধনের অনুপাতে প্রয়োজনমত ঋণ সমবায় বিভাগ হইতে পাওয়া যাইবে। কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবার পর তৃতীয় বৎসর হইতে প্রত্যেক যুবক প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা করিয়া দিয়া পাঁচ বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ করিবে। এইরূপে সাত বৎসর পর উহাদিগকে প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা ফিরিয়া আসিবে। সেই সময় পুনরায় কুড়ি জন যুবককে ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষা দিবার পর উপরোক্ত প্রণালীতে আর একটি সমবায় কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে—এইরূপ ভাবে প্রতি সাত বৎসর অন্তর একটি করিয়া কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইবে। এই সম্বন্ধে উপযুক্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইবে। ড. মুখার্জ্জী পরিকল্পনাটি মোটামুটি সমর্থন করিয়াছিলেন। মধুপুরে অবস্থানকালে তিনি আমাকে তাঁহার জীবনের অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, সে সব কথা যেমন মোমাঞ্চকর তেমনি শিক্ষাপ্রদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কোন "ইউরোপীয়ান ফার্মে" একটি উচ্চপদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনে এইরূপ উচ্চপদ বাঙালীকে বা ভারতীয়কে দেওয়া হইত না। সেইজন্য সেই ইউরোপিয়ান ফার্মের কর্তৃবৃন্দ তাঁহাকে একটি ইংরেজী নাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবেক ইহাতে সায় দেয় নাই—ইহার ফলে তিনি সেই পদ পান নাই। এইরূপ তাঁহার জীবনের অনেক কথাই আমাকে বলিয়াছিলেন।

বক্তৃতাদানরত ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত, এবং চিঠি পত্রের আদান-প্রদান চলিত। পরে তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে স্মরণে

রাখিয়াছিলেন। ১৯৫১ সনের ২৪শে জুলাই আমার গ্রামে (হুগলী জেলার আটপুর গ্রাম) খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহোদয়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় প্রথম ভূমি-সেনা (Land army) গঠিত হয়—এবং বনোৎসব অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত

শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির, আঁটপুর

হয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, ড. মুখার্জ্জী 'ভূমি-সেনা' হইবার জন্য এবং আটপুর যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রফুল্লবাবুর নির্দ্দেশে ২০শে জুলাই ডক্টর এইচ. কে. নন্দী (কৃষি বিভাগের অধিকর্তা), শ্রী এস. সি. রায় (কৃষি বিভাগের উপ-অধিকর্ত্তা) এবং আমি ড. মুখার্জ্জীর তিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে তাঁহাকে আটপুরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে যাই, তিনি আটপুর যাইতে সম্মত হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নির্দ্দিষ্ট দিনে আটপুর যাইতে সক্ষম হন নাই। সেই দিন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহোদয় আটপুর যান। ড. মুখার্জ্জী তাঁহার মারফত আমাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। সেইপত্রে তিনি নিকট-ভবিষ্যতে আটপুর যাইবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন।

উক্ত ইংরেজী ১৯৫১ সনের নবেম্বর মাসের প্রথমেই তিনি পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করেন—রাজভবনে যাইবার দু' তিন দিন পূর্ব্বে (২৮শে অক্টোবর) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কর্ম্মচারী শ্রীসুশীলকুমার আচার্য্য ও আমি ড. মুখার্জ্জীর সহিত তাঁহার তিহি শ্রীরামপুরস্থ ভবনে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় সেখানে শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী এম-এল-সি এবং আরও দু' একজন ছিলেন। ড. মুখার্জী অনাবৃত দেহে চেয়ারে বসিয়া তাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, "এইবার আমার প্রচুর অবকাশ থাকিবে, তোমার সঙ্গে কৃষি-বিষয়ক আলোচনা করা যাইবে।" মধুপুরে ঘনিষ্ঠতা হইবার পর হইতেই তিনি আমাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই সময় একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে। ঐ পাড়ারই একটি যুবক ড. মুখার্জীর নিকট আসেন। যুবকটি ইলেকট্রিকের কাজকর্ম্ম জানেন। তিনি ড. মুখার্জীকে বলিলেন, "আপনি লাটসাহেব হইয়াছেন আমাকে একটা কাজ দিন"। ড. মুখার্জী বলিলেন, "আমার বাড়ীতে দু' একটি আলো জ্বলে আমি তোমাকে আর কি কাজ দোব?" যুবকটি বলিলেন, "আপনার এই বাড়ীতে নয়, লাটসাহেবের বাড়ীতে"—তখন ড. মুখার্জ্জী বলিলেন, "সে বাড়ী ত আমার হইবে না, আমাকে থাকিতে দিবে, তবে ভাড়া দিতে হইবে না—যাহাদের বাড়ী তাহারাই ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা করিবে।" তার পর ড. মুখার্জী যুবকটিকে বলিলেন, "লাটসাহেব হইয়াছি বটে, কিন্তু ইহার জন্য ভবিষ্যতে আমাকে খুবই মুশকিলে পড়িতে হইবে, এই চাকরী চলিয়া যাইবার পর কোন জায়গায় আমার আর কোন চাকরী মিলিবে না—চাকরীর জন্য যাহাদের নিকট দরখাস্ত করিব সকলেই বলিবে তুমি লাট-সাহেব ছিলে তোমার উপযুক্ত আমরা তোমাকে কি চাকরী দিব? তুমি বাপু হাতের কাজ শিখিয়াছ তোমার কোনদিন কাজের অভাব হইবে না, আমারই হইবে।" এইরূপ হাসি-কৌতুকের মধ্যে তাঁহার এই ক্ষুদ্র উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রমের মর্য্যাদা ও হাতে-কলমে কোন কাজ শেখার প্রতি তাঁহার কত অনুরাগ ছিল। শ্রীসুশীল আচার্য্য মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম ড. মুখার্জী কড়া-পাকের সন্দেশ খাইতে খুব ভালবাসেন—যাইবার সময় সুশীলবাবু বলিয়াছিলেন কিছু কড়াপাকের সন্দেশ লইয়া গেলে ভাল হয়; কিন্তু আমরা লইয়া যাইতে পারি নাই। এই কথা তাঁহাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "আজ যদি লইয়া আসিতেন ভালই হ'ত—রাজ-ভবনে গেলে ত আর লইতে পারিব না—অনেক বেড়া টপকাতে পারলে তবে আমার কাছে সন্দেশ পৌঁছবে—আবার ঘটে যাবে লাটসাহেব ঘুষ নেয়।"

১৯৫২ সনের মার্চ্চ মাসের ১৬ই তারিখে আটপুর পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়—প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি। তাঁহাকে আটপুর যাইবার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মনে করাইয়া দিই—এবং বলি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জুলাই মাসে আপনার আটপুর যাওয়া হয় নাই, কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল একেবারে লাটসাহেব হিসাবেই আমার গ্রামে যাইবেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যাবলী দেখিয়া তিনি এবং তাঁহার সেক্রেটারী শ্রী এইচ. সি. সেন বলেন, মার্চ্চ মাসের একটি দিনও খালি নাই। শ্রীযুক্ত সেন আরও বলেন, ইহার উপর মার্চ্চ মাস—দারুণ গ্রীষ্ম—মোটরে যাইবার রাস্তা

মন্দির, আঁটপুর

নাই, মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে যাইতে হইবে—পঁচিশ মাইল যাইতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগিবে। আমি স্পেশাল ট্রেনের কথা তুলিয়াছিলাম—যাহাতে কম সময় লাগে। স্পেশাল ট্রেনের কথা শুনিয়া ড. মুখার্জী বলিলেন আমার জন্ত আবার স্পেশাল ট্রেন! আমি স্পেশাল ট্রেন চাই না। রাজ্যপালের নানাবিধ অসুবিধার কথা ভাবিয়া সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সেন তাঁহার আটপুর যাইবার তত পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু কি জানি কেন ড. মুখার্জী এত অসুবিধা সত্ত্বেও আটপুর যাইবার জন্ত প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—এবং ২৮শে মার্চের প্রাতের ও মধ্যাহ্নের নির্দিষ্ট কাজ বাতিল করিয়া ঐ দিন আটপুর যাইবার দিন ধার্য্য করিলেন। তিনি বলিলেন, মাননীয়া শ্রীমতী বন্ধবালা মুখোপাধ্যায়ও তাঁহার সহিত যাইবেন, আমারই অতিথি হইবেন। ঠিক সাধারণ মানুষেরই মত জিজ্ঞাসা করিলেন,আমি কি খাওয়াইব। কি খাওয়াইব তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন অত বেশী করো না, শুকতোটা করো। এইখানেই শেষ হইল না, তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সেন বলিলেন, "আপনি এখন রাজ্যপালের আটপুর যাইবার দিন ঘোষণা করিবেন না। হুগলী জেলার শাসকের মতামত লইতে হইবে।" ২০শে মার্চ আমি শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের চিঠিতে জানিতে পারি যে, ২৮শে মার্চ রাজ্যপাল আটপুর যাইবেন। চিঠির সঙ্গে তাঁহার বিস্তৃত 'প্রোগ্রাম'ও পাইলাম। চিঠি পাইবার পরই পুলিস বিভাগের উচ্চ, মধ্য, নিম্নপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ আমার আটপুর গৃহে গমন করিয়া নানাবিধ অনুসন্ধান করিলেন—যথা রাজ্যপাল কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া কোন কোন স্থানে যাইবেন--কোথায় কি অনুষ্ঠান হইবে, আমার ক্ষুদ্র ভবনের কোন ঘরে রাজ্যপাল বিশ্রাম করিবেন, কোন ঘরে মধ্য ভোজন করিবেন—ইত্যাদি। সকল স্থানেই তাঁহাদিগকে রাজ্যপালের নিরাপত্তার জন্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পুরাতন নিয়মাবলীর কি এখনও অবসান হয় নাই? তাঁহারা উত্তরে "না" বলিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, যে মানুষটি আসিতেছেন তাঁহার প্রতি কাহারও কোন বিদ্বেষ ত থাকিতে পারেই না, বরং ভালবাসা ও প্রীতিতে জনসাধারণ তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিবে।
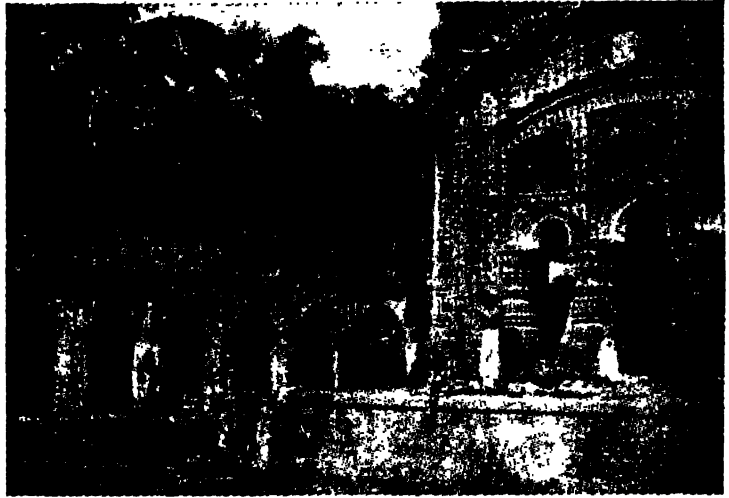
২৮শে মার্চ রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী বেলা ১০টার সময় মার্টিনের রেলে আটপুর পৌঁছিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে ডোমজুড় পর্যান্ত মোটরে গিয়াছিলেন এবং ডোমজুড়ে ট্রেনে উঠিয়াছিলেন। অবশ্য ট্রেনের সহিত তাঁহার জন্ত একটি "সেলুন" সংযুক্ত ছিল, কলিকাতা হইতে ডোমজুড় ৮।১০ মাইল। ডোমজুড়ে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত সরকারী বিভাগের এবং মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ত ছিলেনই, আমাদের পক্ষেও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীসুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। অতি সাধারণ ধুতি, কোট পরিহিত সাধাসিধে মানুষটি সেলুনে উঠিলেন, সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ছোট সুটকেস—কে বলিবে রাজ্যপাল! লোকজন চতুর্দিকে, পুলিস পাহারার অন্ত নাই, কিন্তু যাঁহার জন্ত এত আয়োজন তাঁহার সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই—সাধারণের মধ্যেই তিনি যেন একজন। তাঁহার সেলুনে অনেকেই উঠিয়া পড়িলেন—কোন আপত্তি নাই—বরং খুসী। সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিবার পর আমার পকেটে হাত দিয়া বলিলেন সিগারেট আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ষ্টেশনের ভেণ্ডারের নিকট হইতে সিগারেট কিনিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় তাঁহাকে সিগারেট দিলেন। এই রকমই ছিলেন আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। আত্মভোলা মানুষ।

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ মাননীয়া শ্রীমতী বন্ধবালা মুখার্জী রাজ্যপালের সহিত আঁটপুর যাইতে পারেন নাই। আঁটপুর ষ্টেশনে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল—ষ্টেশনে আটপুরের "ভূমি-সেনানীর দল" কোদাল স্কন্ধে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার অভ্যর্থনার অন্তান্ত আয়োজনও ছিল—যেমন ব্যাণ্ড, বালিকাগণ কর্তৃক শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি। পথের দুই পার্শ্বে বালক-বালিকাগণও পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ষ্টেশন হইতে আটপুর মিত্র-বাড়ী ৪।৫ মিনিটের পথ; মোটরে যাইতে যাইতে রাজ্যপাল আমাকে বলিলেন—"আমার জন্ত এত আয়োজন করেছ কেন, এত খরচ কেন করলে, এত লোককে কেন কষ্ট দিলে?" আমি যথাযথ উত্তর দিলাম; বাস্তবিক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত বিশেষ কিছুই খরচ হয় নাই, এমনকি একটি কটকও প্রস্তুত করা হয় নাই। যা সামান্ত

আয়োজন ছিল, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল। এত ভীড়ের মধ্যেও তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ভুমি-সেনার কোদালসমূহ নূতন ও চক্চকে, কোদালে মাটির কোন লাগই ছিল না। মোটরে যাইতে যাইতেই বলিলেন—"কোদাল-গুলো কি ঘাড়ে বইবার জন্ত, মাটি কাটবার জন্ত নয়?" এই কথা তিনি অনেক দিন ভুলিতে পারেন নাই; আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের বহুদিন পর যখন ড. হীরেন্দ্রকুমার নন্দী (কৃষি বিভাগের অধিকর্ত্তা) তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাকেও তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন—ড. নন্দীর মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম।

বেলা ১০টা হইতে প্রায় বেলা ২টা পর্যান্ত রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্র কুমার মুখার্জী আঁটপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। আঁটপুর মিত্র-বাটির রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শিশু-প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ, মিত্র-বাটীর আটচালায় পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ, মিত্র-বাটীর প্রাচীন বকুলতলার সম্মুখস্থ মাঠে খেলা-ধুলা দেখা প্রভৃতি তাঁহার "প্রোগ্রামে"র মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল। শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরের উপরেও তিনি উঠিয়াছিলেন এবং উঠিবার সময় আর সকলের মত জুতাও খুলিয়াছিলেন; মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। খেলা-ধুলার মধ্যে মন্দ্রদেশীয় একজন লোক একটি খুব লম্বা বাঁশের উপর তাহার চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স্কা মেয়েকে উঠাইয়া নানা রকম অদ্ভুত ও লোমহর্ষক খেলা দেখাইয়াছিল। পরে সে যখন রাষ্ট্রপালের নিকটে আসিয়া বখশিশ ও সার্টিফিকেট চাহিয়াছিল, রাজ্যপাল বিরক্তিসহকারে তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার মেয়ের সর্বনাশ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ আর তোমাকে আমি বখশিশ ও সার্টিফিকেট দিব, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তোমাকে জেলে পাঠাইতাম। রাজ্যপাল মহোদয়ের এই উক্তি শুনিয়া আমাদের সকলেরই চেতনা জাগিল যে, এইরূপ খেলায় কোন উৎসাহ দেওয়া মনুষ্যত্বের বিরোধী।

আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন রাজ্যপালের "প্রোগ্রামে"র মধ্যে ছিল না, কিন্তু লেখকের অনুরোধে তিনি উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে স্বীকৃত হন; এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে উহা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ঘোষণা করিবার পরই জেলাশাসক কি জানি কেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন তাঁহার অনুমতি না লইয়া রাজ্যপালকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা বলা ও ঘোষণা করা আমার পক্ষে খুবই অন্যায় ও অসঙ্গত কাজ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া জেলা শাসকের সহিত স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ও আমার অপ্রীতিকর এবং অবাঞ্ছনীয় তর্ক-বিতর্ক হয়। জেলাশাসক আরও বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজ্যপালকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতে দিবেন না। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জেলার পুলিস বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীর এই বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না। রাজ্যপালকে যখন জেলা শাসকের আপত্তির কথা শুনান হইল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যখন ঘোষণা করা হইয়াছে তখন তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন, আরও বলিয়াছিলেন—"উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ এখনও ইংরেজ আমলের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই; গ্রামের জন-সাধারণের সহিত তুমি জড়িত—ইহাদের সহযোগিতাতেই ত গ্রামের উন্নতি সম্ভবপর হইবে—তোমার ঘোষণার পর আমি যদি বিদ্যালয়ে না যাই তুমি লোকের বিশ্বাস হারাইবে এবং তোমার পক্ষে উন্নয়নের কাজ করা কঠিন হইবে।" আঁটপুর হইতে ফিরিবার সময় তিনি বিদ্যালয় পর্যান্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রেন ছাড়িবার সময় হওয়ায় জন্ত তিনি বিদ্যালয়-গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম তাঁহার জন্ত ট্রেন ৫।৭ মিনিট দেরী করিয়া ছাড়িবে—এই আশ্বাস ষ্টেশন-মাষ্টার আমাকে দিয়াছেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি চাই না আমার জন্ত ট্রেন দেরীতে ছাড়ে—ইহার ফলে কত লোকের কত দিকে কত অসুবিধা হইতে পারে—এইজন্ত অন্যান্ত ট্রেনের যাতায়াতের ব্যাঘাতও ঘটিতে পারে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আঁটপুরে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আঁটপুরে গমন উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু সম্রান্ত বেসরকারী ব্যক্তি এবং বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী আঁটপুর গমন করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে F. A. O-র Veterinary Expert Dr. Forsythe-ও ছিলেন। সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াই ড. মুখার্জী ঠিক নিজের বাড়ীর মতই দেহ অনাবৃত করিলেন—হাত, মুখ ধুইলেন, পরে বিছানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দেহ অনাবৃত রহিল—সেই অবস্থাতেই সকলের সঙ্গে দেখা করিলেন—Dr. Forsytheকে বলিলেন, see, how I live in private। Dr. Forsythe বিছানার এক ধারে বসিয়া তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। অনেক মহিলা, যুবতী, বালিকা প্রভৃতি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন—সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আপন জনের মত কথা। বালিকা ও যুবতীদের বলিলেন—সাবান মেখো, পাউডারও মাখতে পার, কিন্তু লিপষ্টিক কখনও ব্যবহার করো না—ঠোঁটে, গালে, নখে রং মেখো না। আমার পরিচারকের বালক পুত্র একটা বড় তালপাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল, তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন—তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে বলিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—আমার গৃহে প্রবেশ করিবার পরই রাজ্যপালের একজন চাপরাশী ছোট সুট-কেশটির ভিতর হইতে একটি ডাবা হুকা, তামাক, টিকা প্রভৃতি বাহির করিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। আমার এক পুত্র কলিকাতা হইতে রূপা-বাঁধান হুকা, তামাক, টিকে প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিল—সেও তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। রাজ্যপাল বলিলেন, রূপা-বাঁধান হুকার তামাক খাইবেন না, তাঁহার নিজের হুকায় খাইবেন—তবে আমার পুত্র কর্ত্তৃক আনীত তামাক খাইয়া দেখিবেন—তাঁহার তামাক ভাল না আমার পুত্রের তামাক ভাল। নিজের তামাক ও পুত্রের তামাক খাওয়ার পর পুত্রকে বলিলেন,

দক্ষিণ দিক হইতে—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং
তদীয় পত্নী শ্রীমতী বনবালা মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে

তোমারটাই ভাল হে, যাবার সময় যা থাকবে নিয়ে যাব। বাস্তবিকই ফেরবার সময় শালপাতায়-মোড়া অবশিষ্ট তামাকটুকু নিজেই সুটকেশে পুরে নিলেন। আমার কেন, অনেকেরই ধারণা এই যে, তামাকের ভালমন্দ তিনি তেমন বিচার করেন নি, আমার পুত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃই তাহার আনীত তামাক তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—আমার পুত্রকে আনন্দ দেবার জন্যই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আমি রাজ্যপালকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের সহিত চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খাইবেন, না মেঝেতে সাধারণের সঙ্গে কুশাসনে বসিয়া কলাপাতায় খাইবেন—তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—আমি এই খালি গায় মেঝেতে বসে সকলের সঙ্গে খাব—খেলেনও তাই—কলাপাতা, মাটির খুরি ও গেলাস। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য—তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। ইনি কি মানুষ না দেবতা। খাবার সময় সকলের সঙ্গেই কত রকমের হাসিঠাট্টার গল্প—আর রান্নার ভূয়সী প্রশংসা—অথচ বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাধারণ ব্যঞ্জনাদিই প্রস্তুত হইয়াছিল। আমি বিভিন্ন স্থানের খাওয়া দাওয়া দেখিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। আমার ভাগিনের ড. পূর্ণেন্দুকুমার বসু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) রাজ্যপালের সহিত এক পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল। তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম রাজ্যপাল শুক্ত খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন একটা তরকারির নাম করুন, যা ভারতের আর কোথাও প্রচলিত নেই, কেবল বাংলা দেশেই প্রচলিত এবং বাংলা দেশের প্রিয়।" কেহ বলিল, মোচা, কেহ বলিল থোড়। রাজ্যপাল বলিলেন, 'শুক্ত।' আমি তাঁহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, আপনাকে সামান্য আহার্য্য দিব—সবই আমার গ্রামে উৎপন্ন—কলিকাতা হইতে কিছুই আনি নাই, দই ও মিষ্টি খাইবার সময় তিনি বলিলেন, দই ও মিষ্টি নিশ্চয়ই কলকতা থেকে এনেছ—আমি তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলাম, তাঁহার ধারণা ভুল—এ দুইটি জিনিষও আমার গ্রামের। তিনি আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যখন বলিলাম একটি মিষ্টির দাম ছয় পয়সা মাত্র। ভোজন সমাপান্তে তিনি আমাকে বার বার বলিতে লাগিলেন—তুমি নিজে উপস্থিত থেকে আমার চাপরাশীদের এবং আর সকলকে খাইয়ে দাও—তাড়াহুড়োতে ওদের যেন না খেয়ে ফিরে যেতে হয়—আমি তাঁহাকে উত্তরে বলিলাম—আপনার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই প্রায় খাওয়া হয়ে গেছে—আমি পৃথক পৃথক স্থানে একই সঙ্গে সকলের খাবার ব্যবস্থা করিয়াছি—আপনি আসিয়া দেখুন। বাড়ীর আশেপাশে—রাস্তায় পুলিস বিভাগের যে সকল লোক পাহারা দিতেছিলেন তাঁহাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলিলাম, সে ব্যবস্থাও

হইয়াছে এবং তাঁহাকে ব্যবস্থা দেখাইলাম। তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ভোজনের পর তিনি যখন শয্যায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে তামাক দিবার কথা কেহ বলিল। তিনি বলিলেন, এখন তামাকের কথা শুনিলে তাঁহার চাপরাশী খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবে—এখন বলিও না, এমন দরদী মনই তাঁহার ছিল। এই কথা শুনিয়া আমার পুত্র তামাক সাজিয়া আনিল। আমার গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমার পুত্র তাঁহাকে অনুরোধ করিল বাড়ীর উঠানে যাইয়া তাহাদের সহিত ছবি তুলিতে হইবে। যদিও তাঁহার A. D. C. সময়ের অল্পতার জন্য তাড়া দিতেছিলেন—তথাপি রাজ্যপাল ছবি তুলিতে স্বীকৃত হন, বাস্তবিক তিনি কোন অনুরোধ সহজে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। ছবি তুলিবার সময় আমার পুত্র তাঁহার গলায় একটি মালা পরাইয়া দেয়, তিনি মালাটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে ছবি তুলছি আবার মালা পরব কেন?

রাজ্যপাল যখন আঁটপুর ত্যাগ করেন বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই একবাক্যে বলিল, "আবার আসিবেন—আমরা আবার আপনার দর্শন লাভ করিতে চাই।" আমাদের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী সেলুনের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া দুই হস্তে সকলকে নমস্কার করিলেন—মুখে মধুর হাসি, গভীর আনন্দের ভাব। বাস্তবিক আঁটপুর পরিত্যাগের পর সকলেই একটা শূন্যতা অনুভব করিয়াছিল। প্রিয়জন চলিয়া গেলে হৃদয় যেমন ব্যথিত হয়—রাজ্যপাল চলিয়া যাইবার পর সেইরূপ ব্যথা অনেকেই অনুভব করিয়াছিল। আমার নিজের কথা না বলাই ভাল।

আঁটপুর প্রদর্শনী সম্বন্ধে রাজ্যপালের অভিমত এই:

It gave me great pleasure to attend the Rural Welfare Show organised by the Rural Welfare Society at Autpur (Hooghly) on the 28th March, 1952. Besides a Baby show, arrangements were made for an exhibition of improved varieties of vegetables, paddy and fruits and also of fertilizers conducive to such improvement. Exhibitions of this kind held in typical villages are calculated to give a fillip to scientific agriculture and betterment of the conditions of life in our rural areas so essential to our national economy. I congratulate the Rural Welfare Society on the enterprise shown by it in the matter under the able guidance of its energetic Secretary, Sri Debendra Nath Mitra.

Sd|- H. C. Mukherjee.
(Governor of West Bengal).

Raj Bhavan
Calcutta.
The 9th April, 1952.

ইহার পর অনেক সভা সমিতিতে তাঁহার সহিত যখন দেখা হইত তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "গ্রামের কাজ কেমন চলছে?" আমি বাধাবিপত্তির উল্লেখ করিতাম—তিনি বলিতেন "ছেড়ো না।" বহুদিন পর আমার বন্ধু শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ধর আমন্ত্রিত হইয়া যখন তাঁহার ভবনে যান—তখনও রাজ্যপাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবেন কেমন আছে, তার Rural welfare work কেমন চলছে?"

বাস্তবিক আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি অফুরন্ত ছিল। একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি ষ্টেট বনমহোৎসব কমিটির একজন সভ্য। রাজ্যপাল উহার সভাপতি। ১৯৫৪ সনের জুন মাসে রাজভবনে এক সভায় স্থির হয় যে, একজন সরকারী বিশেষজ্ঞ এবং একজন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ বেতারের মারফত কথাবার্ত্তার ভিতর বনমহোৎসবের কথা বলিবেন। এই বেসরকারী ব্যক্তিটি কে হইবে এই আলোচনা যখন চলিতেছিল, তখন রাজ্যপাল আমার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন—ঐ ত আমাদের বেসরকারী লোক রয়েছে। ১৯৫৫ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী আঁটপুর বার্ষিক পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমি শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে জানাই যে, তিনি রাজ্যপালের সহিত অসুস্থতাবশতঃ আঁটপুর যাইতে পারেন নাই, এইবার তাঁহাকে যাইতেই হইবে—এইবারে আমি রাজ্যপালকে নিমন্ত্রণ করি নাই। শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় মহোদয়াকে লিখিত চিঠির উত্তর রাজ্যপাল মহোদয় নিজে আমাকে দিয়াছিলেন।

(Governor of West Bengal)
No. 344-H.E.
Raj Bhavan
Calcutta,
14th February, 1955.

My dear Rai Bahadur,

I am replying to your letter No. 166-EX, dated the 12th February, addressed to my wife, in which you ask her to be present at Autpur, your native village, in connection with the prize distributions of the Rural Welfare Show and of the local High School.

As Mrs, Mukherjee has to make a broadcast on the afternoon of the 27th February, she regrets she is unable to accept your invitation and has asked me to offer you her apologies.

With best regards.

Yours Sincerely
Sd/- H. C. Mukherjee.

Rai Bahadur D. N. Mitra.
175 A, Raja Dinendra Street.
Shambazar, Calcutta—4.

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। আমি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নিযুক্ত ম্যাপটিং পার্লে

স্কুলের এড-হক কমিটির সম্পাদক। এই কথা রাজ্যপাল জানিতেন এবং দেখা হইলেই স্কুলের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। গত ৬ই জুলাই আমি রাজ্যপালকে এক পত্রে কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলের প্রাঙ্গণে ২১শে জুলাই সকাল ৯টার সময় 'বনমহোৎসব' অনুষ্ঠানে তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিবার জন্য অনুরোধ করি এবং মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি কামনা করি; সেই সঙ্গে ইহাও লিখি যে, কার্যের অতিরিক্ত চাপে তিনি একান্তই যদি না আসিতে পারেন, আমরা মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালাকে আমাদের মধ্যে পাইলে খুবই উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব। সত্য কথা বলিতে কি আমি পত্র লিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার আসার সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ ছিল। ৭ই জুলাই 'হরতাল' ছিল, ৮ই জুলাই রবিবার ছিল। ৯ই জুলাই আমি রাজ্যপালের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পি. আর. সিংহ মহাশয়ের চিঠিতে জানিতে পারি যে, রাজ্যপাল এবং মাননীয়া শ্রীমতী বঙ্গবালা উভয়েই আমাদের নিমন্ত্রণ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এত শীঘ্র যে এইরূপ উত্তর পাইব, ইহা মোটেই আশা করি নাই। ২১শে জুলাই ঠিক ৯টার সময় রাজ্যপাল ও মাননীয়া শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা ব্যারাকপুর রাজভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। উভয়ের মুখেই কি হাসি, কি আনন্দ—এই বিদ্যালয় তাঁহাদের নিকট অতি পরিচিত—তাই এই বিদ্যালয়ে আসার জন্য এত আনন্দ। সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা—অল্প বয়স্ক একজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয়কালে রাজ্যপাল বলিলেন, আমি যদি ছাত্রী হতাম তোমার কাছে পড়তাম না, এরকম আরও কত কথা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে শিক্ষা-বিভাগের অধিকারিক ড. পরিমল রায় যখন বাংলায় ভাষণ দিতে-ছিলেন তখন রাজ্যপাল আমাকে বলিয়াছিলেন, "ড. রায়ের ইংরেজী বক্তৃতা শুনিয়াছি, খুব ভাল বলেন, বাংলাতেও দেখছি কম নয়। পরে রাজ্যপাল নিজে যখন ভাষণ দেন তখন তাঁহার ভাষণে বলিয়া-ছিলেন, "ড. রায়ের ভাষণের পর আমার আর কিছু বলবার নেই। তাঁর কাছে মনে মনে হার মানলেও বাইরে কিন্তু হার মানব না।" এই রকমই সহজ, সরল, খোলা মানুষ ছিলেন—আমাদের রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী।

রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে প্রথমেই বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম এত জায়গায় এত লোক আমাকে ডাকছে—আমার পাড়ার লোক আমাকে ডাকছে না কেন—তাই আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে এক পেয়ালা চা খেয়েই ব্যারাকপুর থেকে ছুটে এসেছি।" তখন কে জানিত নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁর এত নিকটে। তাই মনে হয় সেদিন যদি রাজ্যপাল ড. হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীকে আমাদের মধ্যে না পাইতাম—জীবনে আর পাওয়া যাইত না। তাঁর আগমন উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে জনসমাগম, যে উদ্দীপনা, উৎসাহ, আনন্দ দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি চিরকাল মনের মধ্যে জাগরূক হইয়া থাকিবে। অতিথিগণকে স্বাগত জানাইবার সময় অন্তরের সহিত বলিয়া-ছিলাম—"আপনাদের পদধূলিতে এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পবিত্র হয়ে রইল, এই দিনটি বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।" মৃত্যু তাহাই করিল। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আর তিনি কখনও আসিবেন না। আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গেল। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনার এ আসা আসা হ'ল না—একদিন আপনাকে informally আসতে হবে, এবং স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণের ও ছাত্রীবৃন্দের সঙ্গে মাটিতে বসে কলাপাতায় খেতে হবে।" তিনি বলেছিলেন, "পূজোর আগেই আসব—এক মাস আগে নোটিশ দিও।" আর বলেছিলেন, তোমার গ্রামের মত গুড় খাওয়াবে ত?

২১শে জুলাই ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ে আসিয়া-ছিলেন—আর ৭ই আগষ্ট অপরাহ্ণে আকস্মিকভাবে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার জীবনও যেমন মধুর, শান্ত ছিল—মৃত্যুও তেমন মধুর ও শান্ত হইল—২০।২৫ মিনিটের মধ্যেই ঈশ্বর তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইলেন। আমার প্রতি তিনি যে স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। সারা ভারতবর্ষের ও বিদেশের অগণিত ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজেই তৃপ্ত হইলাম।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন:

Whether as Vice-President of the Consti-tuent Assembly or as Governor, Dr. Mukherjee never lost the character of a simple citizen of India. He was a man of scholarship learning and deep humanity. He had lived unostenta-tiously and died quietly. He was a great public servant and a fine example of a great chris-tian.

প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যেক কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য।

পাপ

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায়

ভবনাথ ডাক্তার এক হাতেই মাথার চুল ধরে টানতে লাগলেন, যদি তাঁর আর একটা হাত আর থাকত! তা হলে হয়ত এই রোগীকে ও রকম ভাবে তাঁর চোখের সামনে মারা যেতে হ'ত না। এ অঞ্চলে এমন এক জন অভিজ্ঞ ডাক্তার নেই যার উপর এই রকম একটা সূক্ষ্ম অথচ বেপরোয়া অপারেশনের ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। তবু শেষ চেষ্টায় মহিম ডাক্তারকেই ডাকতে পাঠালেন তিনি—বললেন, আমার নাম করে বলগে এখখুনি আসতে—একটুও দেরি করো না।

রোগীর চোখ তখন ঘোলাটে হয়ে আসছে, হাত নেড়ে সে বারণ করল ডাক্তারকে। মুখ থেকে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ শুধু বেরুল। ভবনাথ ডাক্তার ওর মুখের কাছে নিজের মাথাটা নিয়ে গেলেন। শুনলেন, বিকৃত কণ্ঠে রোগী বলছে, আর দরকার নেই ডাক্তারবাবু, এ আমার পাপ, আপনার পাপ।

চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। রোগীর জটা ও শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হ'ল একে যেন কোথায় কোনদিন দেখেছেন। কিছুতেই ঠিক মনে করে উঠতে পারলেন না। রোগী নিজেই বলল, আপনি আমায় চিনতে পারলেন না ডাক্তারবাবু, আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছিলাম। চিনেছিলাম আমার দুশমনকে সামনে দেখে। কিন্তু আপনার উপর আমার কোন রাগ নেই। রোগী হাঁপাতে লাগল। ডাক্তারবাবু বললেন, থাক্, তুমি আর কথা বল না, আমার যতখানি করবার ছিল আমি করেছি। একটা অপারেশন করতে পারলে শেষ চেষ্টা করা যেত, কিন্তু—

একটু করুণ হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, জান ত আমার ডান হাতটা নেই, তাই পারলাম না।

রোগীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, ডাক্তারবাবু, পাপ আমার, আমি, আমিই—

চমকে উঠলেন ভবনাথ ডাক্তার। ঝুঁকে পড়ে বললেন, তুমি? রামলাল?

একটু হাসল রামলাল—চিনতে পেরেছেন তা হলে? একটু উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সে সংজ্ঞাহীন হয়ে গড়িয়ে পড়ল। ডাক্তার পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘাটের কাছে অশ্বত্থ গাছটা যেখানে অন্ধকারে জমাট বাঁধিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার তলায় নৌকাটা একবার পাক খেয়েই মুখটা ঘুরিয়ে তড়িৎ-গতিতে এগিয়ে এসে কাদায় মুখ গুঁজল। নৌকা থেকে উপেন্দ্র মাঝি তড়াক করে নেমে নৌকার মুখটাকে দু-হাত দিয়ে সামলে ধরল। আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাট পিছল, তার উপর কাঁটা পড়ে যেতে অনেকখানি কাদা মাড়িয়ে তবে ডাক্তার উঠতে হয়। চারিদিকে একটানা ঝিঁঝিঁর আর্তনাদ আর জোনাকির মিটমিট আলো ছাড়া আর কিছু শ্রুতি বা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, শুধু ইছামতীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া। ভবনাথ ডাক্তার টর্চ ঘুরিয়ে ফেলতেই অশ্বত্থ গাছটার তলা থেকে কে একজন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন ভবনাথ ডাক্তার। এবার সম্পূর্ণ ভাবে টর্চটা তার দিকে ফেললেন, একটা মানুষকে ভূতের মতন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। উপেন্দ্র হাঁকল,—কে ওখানে?

লোকটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল গাছের তলা থেকে। রামলালের অগ্রদয়মাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে উঠলেন ভবনাথ। উপেন্দ্র নৌকার ওপর যাথা সড়কিটা বাগিয়ে ধরল।

রামলাল এগিয়ে আসতে আসতে বলল—একটু আস্তে কথা বলবেন ডাক্তারবাবু। আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। বড় বিপদ।

—তোমাকে যে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে?

—তা জানি, কিন্তু এখন আমায় ধরা দিলে চলবে না। সময় হলে নিজেই ধরা দেব।

—কি ব্যাপার? ভবনাথ ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার ছেলের বড় অসুখ। মহিম ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন শেষ চেষ্টা একবার করে দেখতে আপনার কাছে। আমার নিজের বাড়ীতে থাকবার উপায় নেই, কি করে যে খবর নিচ্ছি আর কি করেই যে দিন কাটাচ্ছি তা ভগবানই জানেন। রামলালের গলার স্বর অদ্ভুত করুণ। অমন যে দাগী আসামী, যে খুনজখমকে গ্রাহ্য করে না ডাক্তারের টর্চের আলোতে তার চোখের জল চক্ চক্ করে উঠল।

পুরো দেড় দিন বাইরে কাটাবার পর ভবনাথ ডাক্তার ক্লান্ত। প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন তিনি—তোমরা আমায় কি ভেবেছ শুনি? আমি একটা ভূত না দেবতা? আমারও কি দেহ নেই, বিশ্রাম নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই? তা ছাড়া তোমায় এখন পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে, তোমার সঙ্গে গিয়ে আমার একটা ফ্যাসাদ হয় তাই তুমি চাও?

যে লোকটা কোনদিন কোন কিছুতেই ভয় পায় নি, শত অত্যাচারেও যে লোকটা অনভিভূতের অশ্বত্থ গাছের মতনই

অবিচলিত সেই রামলাল এবার ভবনাথ ডাক্তারের পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল। বলল—এবারকার মতন দয়া করুন ডাক্তারবাবু। আর কখনও এমন কাজ করব না।

ডাক্তার একটু হাসলেন। বললেন, ও কথা ত তুই অনেকবারই বলেছিস। জমিদারবাবুর পা ছুঁয়েও ত কতবার প্রতিজ্ঞা করেছিস, কিন্তু পেরেছিস কি স্বভাব ছাড়তে?

রামলাল বলল—আমি আমার ছেলের দিব্যি দিয়ে পিতিজ্ঞে করছি ডাক্তারবাবু; ছেলে ভাল হয়ে গেলে আর কখনও এ কাজে হাত দেব না।

অবশেষে ভবনাথ ডাক্তারকে নৌকার মুখ ঘোরাতেই হ'ল। ক্রমাগত আধ ঘণ্টা হাল ধরে থেকে উপীন্দর ক্লান্ত। অবস্থাটা রামলাল বুঝল। কোন কথা না বলে সে হাল ধরল এগিয়ে। সে যে কত বড় পাকা মাঝি তা তার নৌকা-চালানো দেখেই ভবনাথ ডাক্তার বুঝলেন। বুঝলেন যখন ঐ ইছামতীর উপর দিয়ে সে খাড়াই পার হবার চেষ্টা করল। ভবনাথ ডাক্তার বললেন—তুই ত বেশ পাকা মাঝি দেখছি। তা এ কাজ করিস না কেন?

—বুঝি সবই ডাক্তারবাবু, কিন্তু মন না মতি? রাত্তিরের আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে তখন কে যেন আমায় ডাকে, ঘরে স্থির থাকতে পারি নে। রক্তের মধ্যে কি যেন কিলবিল করে ঘোরে।

ডাক্তার কোন কথা বললেন না। নৌকা নদী ছেড়ে খালের ভেতর ঢুকল। ডাক্তার বললেন—এখানে নৌকা ঢোকালি যে?

—এখানে না' না থামালে ধরা পড়বার ভয় আছে। আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। বলে সে আঘাটায় নৌকা বাঁধল। নৌকা থেকে নেমে ভবনাথ ডাক্তার রামলালের পিছু পিছু বনের মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে এগিয়ে চললেন। ভবনাথ ডাক্তারের মতন লোকেরও একবার গাটা ছমছম করে উঠল। চারিপাশে অন্ধকার যেন জটা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে খুন করে ফেললেও কেউ সাক্ষী থাকবে না। ভবনাথ ডাক্তার বুকপকেটে একগাদা নোট একবার চেপে ধরে দেখলেন। না, কাজটা তিনি ভাল করেন নি। উপেন্দ্রকে সঙ্গে করে আনলেও হ'ত। রামলাল দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। জীবনে ও যে খুন করেছে ক'টা তা ডাক্তারবাবু বলতে পারেন না। কিন্তু রোগের কথায় খেয়াল থাকে না। কেস যত জটিল হয়, ভবনাথ ডাক্তারের আগ্রহ সেই দিকে তত বেশী হয়। বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ রামলাল বলল—এখানে বাতি জ্বালাবেন না। বলে, সে একটু থেমে মুখ দিয়ে পেঁচার ডাকের আওয়াজ নকল করে তিন বার ডাকল। ডাক্তারের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। এ রকম পরিস্থিতির মধ্যে তিনি জীবনে পড়েন নি। অমন ডাকসাইটে প্রতাপ ভবনাথ ডাক্তারেরও বুকে কি যেন একটা অজানা আশঙ্কার উদ্রেক হ'ল। তাঁর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির ভেতর টিপটিপ শব্দ শুনতে পেলেন। রামলাল কি যে ইঙ্গিত বুঝল সেই জানে, ভবনাথ ডাক্তারকে বলল —আসুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার এগিয়ে চললেন। ডাকতে হ'ল না, খিড়কি-দরজা খোলাই ছিল। ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার দেখলেন, সেই অন্ধকারের ভেতরেও, একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল, সে-ই দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরে ঢুকে ডাক্তার দেখেন এক কোণে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। আর মেঝের ওপর একটা ছেলে, বছর দু'তিন হবে—নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার বললেন—প্রদীপে চলবে না, লণ্ঠন জ্বাল। তার পর অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। একদৃষ্টে রামলাল তাকিয়ে ছিল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার ঘাড় ফিরাতেই রামলাল বলল—কি রকম দেখলেন, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন—অত উতলা হয়ো না, কিন্তু কথা দিতে পারছি না। আজকের রাত্তিরটা যদি টিকে যায় ত বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এখনই আমার একটা ওষুধ দরকার। কিন্তু—

রামলাল সাগ্রহে তাকাল। ওর দিকে চেয়ে ডাক্তার বললেন —এ ওষুধ এখানের কোন ডাক্তারখানায় পাবে না। আমার বাড়ীতে আছে। তা তুমি গেলেই ত ধরা পড়ে যাবে। ওষুধ আনবে কে?

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন—তুমি এক কাজ কর। উপেন্দরের কাছে যাও, তাকে এই চিঠিটা দিয়ে বল—আমার কম্পাউণ্ডারকে ডেকে চিঠিটা দিতে। সে ওষুধ বার করে দেবে। তুমি ততক্ষণ উপেন্দরের বাড়ীতে অপেক্ষা কর। এ ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি নে। তোমার কাছে টাকা আছে?

শুষ্ক মুখে তাকাল রামলাল, ঠোঁটটা জিব দিয়ে চাটল একবার। ঝনাৎ করে বাইরে শেকলের শব্দ হ'ল। রামলাল বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একগাছা সোনার চুড়ি এনে হাজির।

যেন সাপ দেখে চমকে উঠলেন ভবনাথ ডাক্তার। বললেন— না না চুড়িটুড়ি থাক। আচ্ছা তুমি যাও।

রামলাল হেঁট হয়ে ডাক্তারবাবুর পায়ের ধুলো নিল। ধরা-গলায় বলল, আপনি আমার যা উপকার করলেন ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ও সব থাক্। চোখ তাঁর রাগে লাল হয়ে উঠেছে। এ চোখের সামনে ভয় পায় না এমন কোন লোকই এ অঞ্চলে নেই। ডাক্তার ভবনাথ একরোখা লোক, কটুভাষী। নিন্দা-প্রশংসায় এখানে তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি সমান ভাবে জড়ানো। অদ্ভুত তাঁর চিকিৎসার ধারা, অনেক রোগীকে তিনি প্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু লোকটি অত্যন্ত বদমেজাজী। তাঁকে ঘিরে দু'একটা কুৎসা যে এ অঞ্চলে রটে নি তা নয়, কিন্তু সাধারণে বুঝতে পারে না, এর কতখানি সত্যি, কতখানি মিথ্যে। কারণ, কুৎসা রটানোর মূলে তাঁর শত্রুপক্ষীয় লোক। আর ভবনাথ ডাক্তারের কোন রকম নোংরা কাজে লিপ্ত থাকার কোন প্রমাণই নেই। তবু লোকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানেই থাকে।

রামলাল তাড়াতাড়ি চলে গেল। ডাক্তার তাঁর ব্যাগ থেকে ওষুধপত্র বার করে একবার শূন্য ঘরের চারিদিকে তাকালেন। জাল

পর অন্তরালবর্তিনীকে উদ্দেশ করে জোরে বললেন—এখুনি খানিকটা গরম জল চাই।

দাওয়ার ওপর থেকে ডাক্তার ভবনাথ একটি মেয়েকে নীচে উঠানে নেমে যেতে বুঝলেন। তার পর শুনলেন রান্নাঘরে জল গরম করার শব্দ। কিছুক্ষণ পরেই জল গরম হয়ে এল। ডাক্তার বললেন—এখানে একবার আসতে হবে। বাচ্চাটাকে ধরতে হবে। ডাক্তার ছেলেটিকে আস্তে আস্তে তুলে ধরে ওর বুকে ফ্লানেলের টুকরো জড়াতে লাগলেন।

মেয়েটিকে ভবনাথ ডাক্তারের যতখানি আড়ষ্ট মনে হয়েছিল ঠিক ততখানি আড়ষ্ট আর মনে হ'ল না। বরং ডাক্তারের কাছে তার কার্যকলাপ সাধারণ মেয়েদের চেয়ে বেশী চটপটে মনে হ'ল। শুধু চটপটে নয়, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতীও মনে হয়। ডাক্তার তাকে ছেলেটির হাত সোজা করে ধরতে বললেন—আর ইন্‌জেকশনের নীডলটা মুছতে মুছতে একবার মেয়েটির দিকে তাকালেন। মেয়েটির ঘোমটা খসে গেছে, একদৃষ্টে সে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আর মেয়েটির দিকে চোখ ফেরাতেই ডাক্তারের হাতের নীডলের ওপর স্পিরিট ঘষা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। অনিন্দ্য মেয়েটির মুখ, অপূর্ব তার মাদকতা। একটু বিষণ্ণ ভাব মেয়েটির চোখ-দুটাতে এনে দিয়েছে ঘাসের উপর প্রভাতের শিশিরের কোমলতা। রাত্রি-জাগরণে, ক্লান্তিতে, উদ্বেগে সে মুখ যেন আরও বিষণ্ণ কোমল হয়ে উঠেছে। এই ঘরে, এই পরিস্থিতিতে এই রকম একটি মেয়ের সাক্ষাৎ যেন একটা অভাবনীয় ব্যাপার। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে ডাক্তার দেখলেন তার নিটোল দুটি হাত, তার মরালশুভ্র গ্রীবা, উত্তুঙ্গ শিখরচূড়ার রূপ দেখলেন তার বুকে।

ভবনাথ ডাক্তার শুনেছিলেন রামলালের বৌ খুব সুন্দরী। এ নিয়ে অনেক আলোচনাও তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু সে যে এমন অপরূপ এ তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। ডাক্তারের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যেতেই মেয়েটি মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। আর তার চোখে পড়ল ডাক্তারের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি। নাকি ইছামতীর জলে পূর্ণ চাঁদ উঁকি মারল, তার কালো জলে ধীরে ধীরে? একটু তাকিয়ে থেকেই সে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। ডাক্তারও অপ্রতিভ হয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। কিন্তু হঠাৎ এ কি হ'ল তাঁর? তিনি ভুলে গেছেন এক নিভৃত পল্লীর এক নিরালা গৃহে তিনি বসে আছেন, তাঁর সামনে ভেসে উঠল প্রথম যৌবনের দিনগুলি। অনেক স্বপ্ন অনেক কল্পনায় গড়া তাঁর দিন-গুলি।...

রামলাল ফিরে এসে ওষুধ দেওয়ার পর ছেলেটির মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে তিনি অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তার পর যখন রামলালের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন পূবের আকাশ সাদা হতে আরম্ভ করেছে। রামলালকে বললেন; ভয়টা কেটে গেছে, তবে সাবধানে থাকতে হবে। সেদিন আরও একটা কাজ তিনি করলেন, যা তিনি জীবনে করেন নি। রামলালের হাতে তাঁর বিগত দেড় দিনের সমস্ত উপার্জিত অর্থ ঢেলে দিয়ে এলেন, অর্থগৃধ্নু ডাক্তার ভবনাথ।

এর পর তিন দিন পর পর একই সময়ে রামলাল এসেছে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায়, নিয়ে গেছে ডাক্তারকে সঙ্গে করে নিজে। ডাক্তারও যেন ঠিক সেই সময় নৌকা ভিড়িয়েছেন ঘাটে। রোগী ছাড়াও কি যেন একটা আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে যেত।

জমিদার চন্দ্রকান্তবাবুর আশ্রিত রামলাল। পুরুষানুক্রমে এই জমিদার-বংশের সঙ্গে তাঁরা জড়িত। বার ভুঁইয়ার আমল থেকে এই জমিদারবংশ আর রামলালের বংশ পাশাপাশি কাজ করেছে অনেক রাত্রিতে, এই ইছামতীর বুকে ডুবেছে অনেক নৌকা, ঝরে গেছে অনেক নির্দোষ প্রাণ। পুলিস অনেক বার রামলালকে ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু পেছনে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রকান্ত-বাবু। এও কারুর অজানা নয়। অনেক বারই প্রমাণাভাবে সে খালাস পেয়েছে, কিন্তু বহু বৎসরই তার কেটেছে জেলে জেলে। পুলিসের দারোগাবাবু একবার রামলালের বউয়ের সঙ্গে কি এক অভদ্র ব্যবহার করেন। পদ্মিনী, রামলালের বউ, সেকথা চন্দ্রকান্তবাবুকে জানায়। চন্দ্রকান্তবাবু দারোগাকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়ে কি কথা বলেন। তার পর থানার দারোগা বা জমাদার কেউই ওধারে এগোতে সাহস করত না। চন্দ্রকান্তবাবুর আশ্রয়ে পদ্মিনী বনপদ্মের মতনই ফুটেছিল। ভবনাথ ডাক্তার এ কথাটা জানতেন।

চতুর্থ দিনের দিন রামলাল এল না। সে রাত্রিরে নদীর ধারে ডাক্তার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কেউই এল না। বাড়ীতে এসে তিনি ঘুমোতে পারলেন না। তার পর ভোরের দিকে একটা অত্যন্ত খারাপ স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

পরদিন শুনলেন, রামলাল ধরা পড়েছে। তবে তার ধরা দিতে আপত্তি ছিল না, ছেলে ভাল হয়েছে এতেই সে সুখী। দারোগাকে বলেছিল, আর দু-এক দিন পরে হলে দারোগাকে আর কষ্ট করতে হ'ত না, নিজেই সে থানায় যেত।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় ভবনাথ ডাক্তার বললেন উপেন্দরকে নৌকা ঠিক করতে। গোলার দিকে যাবেন। না এসে ডাক্তার পারলেন না। পদ্মিনীর সঙ্গে ডাক্তারের কি যেন এক নীরব বোঝাপড়া চলছে। ডাক্তার দেখেছিলেন তার চোখে এক ভীরু কপোতীর শঙ্কা—যে শুধু খুঁজছে একটি নীড়, যেখানে সে পেতে পারে পরম আশ্রয়। শুধু চকিত চাহনির ভিতর ডাক্তার পদ্মিনীর আর এক রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে রূপে পদ্মিনীর চোখের বিদ্যুৎ মাটির প্রদীপশিখার মতনই নরম হয়ে আসছে।

আর পদ্মিনী দেখেছিল ডাক্তারের ভেতর একই রূপের আর এক অভিব্যক্তি—রামলাল ইছামতীর এক পাড়, যে পাড় ইছামতী শুধু তার শক্তি দিয়ে ভাঙে, যে শক্তিতে আছে ধ্বংস করার এক উদগ্র আগ্রহ; পদ্মিনীর রূপ সে চোখে নেশা ধরাতে পারে নি। সে রাত্রিরের অন্ধকারের ভেতর আর এক আহ্বান শুনতে পায়।

আর ডাক্তারের ভেতর পদ্মিনী দেখেছিল সেই শক্তির আর এক রূপ। এ শক্তি ইছামতীর আর এক পাড় গড়ে—যে পাড়ে নূতন নূতন চর পড়ে, নূতন শ্যামলিমা দেখা দেয়। রামলাল জীবনকে শেষ করে যে শক্তিতে, ডাক্তার ভবনাথ জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় সেই শক্তিতে। পদ্মিনী দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। সেদিন ডাক্তার পদ্মিনীর বাড়ীতে তার ছেলেকে পরীক্ষা করেছিলেন এমন সময় পদ্মিনী ঘরের ভেতর ঢুকল। ডাক্তার তার দিকে তাকালেন। পদ্মিনীর চোখের সঙ্গে ডাক্তারের চোখ মিলল। তার পর পদ্মিনী বলল—আমার বুকটা কেমন করছে ডাক্তারবাবু।

ভবনাথ ডাক্তার লাফিয়ে উঠে তাকে ধরতেই পদ্মিনী ডাক্তারের কোলে ঢলে পড়ল।

দু'বছর পর রামলাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরল এক গভীর রাত্তিরে। এবার আর সে পেঁচার ডাক ডাকল না। কিন্তু ঘরের দরজায় তার সাঙ্কেতিক আওয়াজে যখন পদ্মিনী সাড়া দিল না তখন সে অবাক হ'ল। এক লাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠে দেখে দরজার গোড়ায় একজোড়া জুতা। দেখে সে থমকে দাঁড়াল। তার পর কি ভেবে আর সাড়া দিল না। বাড়ীর বাইরে একটা ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু শেষ রাত্তিরের আলোতে সে লোকটাকে চিনতে ভুল করল না।

ডাক্তারের দরজা ভেঙে সেদিন কে যে ঘরে ঢুকেছিল তা জানা যায় নি। কিন্তু যেই ঢুকুক তার উদ্যত অস্ত্র ডাক্তারের গলার কাছে নেমে থেমে গিয়েছিল কি ভেবে কে জানে। শুধু ডাক্তারের ডান হাতটা ছিন্ন করে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। ডাক্তার পুলিসের কাছে বলেন তাঁর কাকেও সন্দেহ হয় না।

তার পর বহু বৎসর কেটে গেছে। রামলাল চন্দ্রকান্তবাবুরই অধীনে আর এক মহলায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে। এখান থেকে সে জায়গাটা অনেকটা দূর। ডাক্তার আর রামলালের খবর রাখেন নি, পদ্মিনীরও না। এক হাত কাটা নিয়েই তিনি এখনও ডাক্তারি করেন এবং তাঁর খ্যাতি চিকিৎসক হিসেবে বেড়েছে বৈ কমে নি। কিন্তু সেই কটুভাষী অর্থগৃধ্নু ডাক্তারের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তাঁকে কেউ চড় মারলেও তিনি প্রতিবাদ করেন না। সে রকম রোগীকে তিনি যে শুধু বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন তা নয়, ক্ষেত্রবিশেষে নিজের পয়সায় তার ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারের নাম এখন সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

রামলালের চোখের দু'কোলে জল বাঁধ মানল না। কখন যে তার জ্ঞান হয়েছে ডাক্তার টের পান নি। নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে ছিলেন। রামলালের হাতটা নড়তেই তাঁর তন্ময়তা ভাঙল। রামলাল ফিসফিস করে বলল—মরবার সময় আপনি আমায় মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। আপনার হাতটা আমিই নিয়েছিলাম, কিন্তু মারতে পারি নি ছেলেটার মুখ চেয়ে। পদ্মিনীকে আমি ঘরে রাখতে পারি নি—ছেলেটা মারা যাবার পর সে যে কোথায় চলে গেল। সারা জীবন তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু—

রামলাল চোখ বুজল। আস্তে আস্তে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। শেষ কথা বলে সে ঢলে পড়ল—মাপ চাই ডাক্তারবাবু—

ভবনাথ ডাক্তার তীব্র আগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠে রামলালের হাতটা একহাতে ধরে যখন ঝাকুনি দিলেন তখনও রামলাল সাড়া দিল না।

একটা হাত না থাকার জন্যে যে ডাক্তার একটু আগে আক্ষেপ করছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী রামলালের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেওয়ার জন্যে তাঁর আক্ষেপ যে কত গভীর তা কে বুঝবে! একটু, আর একটুও যদি বেশী সময় পেতেন ভবনাথ ডাক্তার!

কেনোপনিষদের বৈশিষ্ট্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

সামবেদীয় "তলবকার ব্রাহ্মণের" নবম অধ্যায়ে এই উপনিষদখানি গুরু-শিষ্য সংবাদ আকারে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ব্ব আট অধ্যায়ে বিবিধ যজ্ঞ ও উপাসনা অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং ভগবদ্মুখী করার প্রসঙ্গ আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'কেন' শব্দ থাকায় এই শ্রুতির নামকরণ "কেনোপনিষদ" হয়েছে।

এই উপনিষদের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে: ঋষি সোজাসুজি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করেন নি, কিংবা 'নেতি নেতি' শব্দে দিক-দর্শনের প্রয়াসী হন নি। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির অংশাংশের সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে, জীবের ভগবদ্ অনুভূতি ও সাক্ষাৎকারের সম্বন্ধ, ঋষি সাঙ্কেতিক ভাবে 'আদেশ' বলে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাচ্ছে।

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ—প্রভৃতি চারি প্রশ্নে শিষ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, চিৎ-জড় সম্বন্ধনির্ণয়ের অবতারণা করেছেন। প্রথম প্রশ্ন: অন্তঃকরণ কাহার সত্তায় স্ফূর্ত্ত, সঞ্চালিত ও বিষয়ে ধাবিত; দ্বিতীয় প্রশ্ন: প্রথম (প্রধান?) প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত; তৃতীয় প্রশ্ন: বাগিন্দ্রিয় কাহার শক্তিতে ক্রিয়াবন্ত; চতুর্থ প্রশ্ন: কোন্ দেব চক্ষুকর্ণকে (কার্য্যে) নিযুক্ত রেখেছেন।

গুরু বললেন, (যিনি) শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাগিন্দ্রিয়ের বাক্, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু, (তাঁকে জেনে) ধীর (জ্ঞানী) পুরুষ জীবন্মুক্ত হন এবং মৃত্যুর পরে অমৃতত্ব লাভ করেন। ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ বা অন্তঃকরণ তথায় (ব্রহ্মসমীপে) যায় না। ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ আমি জানি না; মন ও ইন্দ্রিয়গুলি যা গ্রহণ করে, তদ্ অন্যৎ, তাহা অন্য (ব্রহ্ম নন)। আচার্য্য আমাকে এই রকম বুঝিয়েছেন।

এর পরের পাঁচ শ্লোকে গুরু আরো স্পষ্ট বলেছেন, যাঁর শক্তি নিয়ে বাগিন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত, বাক্য তাঁকে কেমন করে প্রকাশ করবে? [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন, পৃথিবীর সকল বস্তু এঁটো হয়েছে, কেবল ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট হন নি।] যিনি মনকে মননশীল করেছেন, তাঁকে মন জানবে কেমনে? [যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।] যাঁর শক্তিতে চক্ষু দেখে, তাঁকে চক্ষু দেখবে কেমন করে? যাঁর দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় শুনে, শ্রোত্র তাঁকে শুনবে কেমনে? প্রাণ যাঁর দ্বারা ক্রিয়াবন্ত, প্রাণ তাঁর হদিস পায় না: তিনিই ব্রহ্ম, নেদং যদিদং উপাসতে। একেবারে সাফ বলে দিলেন, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন ও প্রাণ দ্বারা তুমি যাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানে যজ্ঞ, উপাসনা কর, যথার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ তা নয়।

শেষে গুরু বললেন, ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে তোমাকে যা উপদেশ দিলাম, তা শুনে তুমি যদি ভাব, তাঁকে বিলক্ষণ জেনেছি, তবে তোমার বড় ভুল হবে। শিষ্য এর উত্তরে নিবেদন করলেন, ব্রহ্মানুভূতি ভালরকম আমার হয়েছে, তা বলি না, তবে কিছুই বুঝি নি তাই বা কেমন করে বলি?

এর পরের তিন শ্লোকে শ্রুতি ঔপনিষদিক মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। যে মহাপুরুষ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তিনি নিরভিমান হন এবং বলেন, অসীম ব্রহ্মসাগরের কণামাত্রের দর্শন পেয়েছি। আর গর্ব্বভরে যিনি জানান, ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিকট ব্রহ্ম অজানিতই রয়েছেন। প্রতিবোধবিদিতং শব্দের অর্থ আমার মনে হয়, বোধিবিজ্ঞান, যা অনুভূতি-সাপেক্ষ, তাই অমৃতলাভের সেতু। 'আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং, বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতং' এই পদটি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়। আত্মা (গুহাহিতং, হৃদয়কমল মধ্যস্থিত পরমাত্মা) হতে বীর্য্য (পরাবিদ্যালাভের শক্তি) আসে, বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়। তৃতীয় শ্লোকে শ্রুতি বলেছেন, দুর্লভ এই মনুষ্যজন্মে ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে বিচিন্ত্য, অবহিত জানাই সত্যম্, কল্যাণ, নতুবা মহতী বিনষ্টিঃ।

এর পরে গুরু এক আখ্যায়িকার অবতারণা করে পরম ব্রহ্মের অচিন্ত্য বীর্য্য, অপূর্ব্ব মহিমা ও অপার কারুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়, পূর্ব্বকল্পের সাধনবলে কতক দেবতা ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যের তদারকিতে নিযুক্ত আছেন। ব্রহ্মার অসুরবংশীয়েরা মধ্যে মধ্যে শাসনকার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই অসুরেরা "পক্ষীলের" মান-মর্য্যাদা মানে না, আপোষ-মীমাংসায় ভূর্ভুবঃ-লোকের বিস্তৃত ভূখণ্ড তাদের দেওয়া সত্ত্বেও যখন তারা স্বর্গরাজ্যে হানা দিয়ে ধনরত্ন, স্ত্রীকন্যা হরণ করে তখন অহিংসপন্থী দেবগণও যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। পুরাণে পড়ি, একবার অসুরদের ভারী ভারী মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে দেবগণের পুরাকালীন অস্ত্রাদি হীনপ্রভ হয়েছিল। তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুত্রকলত্র, বিত্ত ও রাজ্য ফেলে পালিয়ে বেড়ান। অবশেষে ব্রহ্মার পরামর্শে উত্তর-হিমালয়ের প্রসিদ্ধ 'বিজ্ঞানী' দধীচির আশ্রমে আসেন ও তাঁর পূত অস্থি এবং প্রাণ-বিনিময়ে নির্ম্মিত বজ্রনামা 'এটম বোমা' সংগ্রহ করে অসুরদের মার দিয়ে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ঋষি এমনি এক যুদ্ধের পরবর্ত্তী দৃশ্য বর্ণনা করেছেন।

অসুরদের পরাভূত করে দেবগণ সুরপুরে সুখাসীন; নৃত্যগীতবাদ্য ও সোমরস বণ্টনের আনন্দে সকলে নিজ নিজ বলবীর্য্য ব্যাখ্যানে প্রমত্ত; "ব্রহ্মদেবেভ্যো বিজিগ্যে" ব্রহ্মই যে দেবগণের

বিজয়ের মূলে, এই সত্য একেবারে বিস্মৃত, অহঙ্কারে মাতোয়ারা দেবগণ আকাশে প্রোজ্জ্বল দিব্য এক যক্ষমূর্তি দেখলেন। তাঁরা অগ্নিকে বললেন, 'জাতবেদ' জেনে এসো কিমিদং যক্ষং। অগ্নিদেব দ্রুত যক্ষসমীপে উপস্থিত হলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন, কো অসি? অগ্নি বুক ফুলিয়ে বললেন, আমি জাতবেদ, চরাচরে প্রসিদ্ধ অগ্নি। যক্ষ বললেন, কিং বীর্যং? অগ্নি উত্তর দিলেন, আমি চরাচর বিশ্ব পুড়িয়ে ছারখার করতে পারি। যক্ষ একগাছি তৃণ অগ্নির সম্মুখে রেখে বললেন, এই তৃণটি দহন কর। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও অগ্নিদেব তুচ্ছ একগাছি তৃণ দগ্ধ করতে অপারগ হয়ে দেবসভায় ফিরে হেঁটমুখে বললেন, ঐ দিব্য যক্ষকে জানা আমার শক্তিতে কুলোয় নি। তখন পবনদেবকে পাঠানো হ'ল। তিনিও প্রভঞ্জন-মূর্তিতে উনপঞ্চাশ বায়ু প্রয়োগ করে তৃণটিকে একচুল স্থানভ্রষ্ট করতে পারলেন না। শেষে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, হে মঘবন, আপনিই জেনে আসুন, কিমিদং যক্ষং। শশব্যস্তে ইন্দ্রদেব সেখানে যেতেই যক্ষ অন্তর্ধান করলেন ও সেই আকাশে বহু শোভমানা হৈমবতী উমা আবির্ভূতা হলেন। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, (ভগবতী) কে এ যক্ষ এসেছিলেন? 'সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বম ইতি।' (ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী শঙ্করী) ইন্দ্রকে জানালেন, উনিই ব্রহ্ম, ওঁর মহিমাতেই তোমরা বিজয়ী হয়েছ।

শ্লোকে নিবদ্ধ ঐ বাক্যগুলিকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ভগবতীর দর্শনমাত্রেই ইন্দ্রদেবের হৃদয়ে পরাজ্ঞান স্ফূর্ত হয়েছিল। পরবর্তী ৪।৪ ও ৪।৫ শ্লোকদ্বয়ে যে বিদ্যুৎ-ঝলকের উল্লেখ আছে তা থেকে অনুভব করা যায় যে, শ্রুতিতে ছন্দোবদ্ধভাবে বর্ণিত ব্রহ্মদর্শন ও পরাজ্ঞান লাভ এক নিমিষে সংঘটিত হয়, পার্থিব সময়ের মাপ-কাঠিতে উহা গণনা করা উচিত নয়। লেখকের গীতানুরাগী এক প্রবীণ বন্ধুর দৃঢ় প্রত্যয় যে, শ্রীভগবদ্গীতার প্রত্যেক শ্লোক হুবহু ঐ ছন্দাকারে শ্রীভগবানের মুখপদ্ম থেকে বিনিঃসৃত হয়েছিল। কেউ যদি অনুযোগ করেন যে, ধনুর্ধরগণ যোদ্ধারা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্ত, তখন এ দুই-আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী প্রশ্ন ও উত্তর কি সহজবুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে? ভাবের আতিশয্যে তিনি বলেন, "শ্রী ভগবানের অচিন্ত্য মহিমায় সকলি সম্ভবে।" মাত্র ১৫/২০ মিনিট ঝিমানোর মধ্যে পুরা এক জীবননাট্য অনেকেই দেখেছেন। তবে যোগারূঢ় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিমেষমধ্যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগের গূঢ়মর্ম এবং বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে তাঁর প্রিয়তম সখার ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ও অজ্ঞান মোহ নষ্ট করেছিলেন, তা বুঝতে বাধা কোথায়? 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো এলে ঝরঝর তা ছড়িয়ে পড়ে, একটু একটু করে অন্ধকার দূর হয় না।' শান্ত, সমাহিত ধ্যান-পরায়ণ ঋষিদের হিরণ্ময় কোষে যে সমস্ত ভগবদ্ চিৎকণ 'ব্রাহ্মতত্ত্ব' (প্রকাশিত হয়েছিল), তাই গুরু-শিষ্যপরম্পরায় শ্রুত এবং অর্বাচীন কালে মুদ্রিত ছন্দোবদ্ধ উপনিষদাবলী।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়—১। করুণৈক সিন্ধু শ্রীভগবান্ তাঁর ভক্ত দেবগণকে মিথ্যাভিমানরূপ পতন হতে রক্ষা করবার জন্য যক্ষরূপে এসেছিলেন। ২। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষোত্তম ভগবান্ দেবগণকে তাঁর বলবীর্য্যের ক্ষুদ্র একটু নমুনা প্রত্যক্ষ করিয়েই অন্তর্হিত হলেন। এতদ্বারা দেবগণের অহমিকা একেবারে চূর্ণ হয়েছিল। ৩। যক্ষ-রূপী ব্রহ্মের অন্তর্ধান ও হৈমবতী উমার আবির্ভাব এবং ইন্দ্রকে দিব্যজ্ঞান প্রদান দ্বারা শ্রুতি কি ইঙ্গিত করেছেন যে, আদ্যাশক্তি ভগবতীই জীবকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন; প্রধান উপনিষদগুলির কোথাও এই ভাবের ইঙ্গিত পাই নি। মুণ্ডকের প্রথম শ্লোকেই পুত্র ব্রহ্মাকে 'সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিদ্যাম'র উপদেষ্টা বলা হয়েছে। এ অবশ্য 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে', আরণ্যক ঋষির পরিচয়; জীবকে দর্শন দ্বারা পরাবিদ্যা প্রদানের আলোচনা নয়।

পরবর্তী দুই শ্লোক কেনোপনিষদের বৈশিষ্ট্য। ভগবদ্ দর্শনের যে সাঙ্কেতিক আদেশ সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে, তার তাৎপর্য্য অনুভবসাপেক্ষ: ৪ ৪ শ্লোক ইষ্টদর্শন ও তদনুভূতির সূত্র—"তস্য এষ আদেশো, যৎ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ, ইতি ইত্ ন্যমীমিষত আ, ইতি অধিদৈবতম।" অর্থ: এ বিষয়ে এই আদেশ, এটা বিদ্যুৎ চমকানোর মত, যথা আঁখির এক পলক-মত; এ আধিদৈবিক। ব্রহ্মদর্শন—"বিজলী চমকে, অরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।" নেত্রের এক পলক মাত্র স্থায়ী এই দর্শন। এর পরের ৪ ৫ শ্লোকে দর্শনান্তে পরম ব্যাকুলতা ও বিরহের অভিব্যক্তি সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে। "অথ অধ্যাত্মং, যৎ এতৎ গচ্ছতি ইব চ মনঃ অনেন চ এতৎ উপস্মরতি অভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ।" অর্থ: এখন আধ্যাত্মিক, যে, মন যেন চলছে, নিরন্তর স্মরণ করছে, অনেন (এই মন দ্বারা) সঙ্কল্প (তীব্র আকাঙ্ক্ষা) জাগে। অদর্শন জনিত 'তদ্বিরহে পরম ব্যাকুলতা' মাত্র পাঁচটি শব্দে সারাজীবনের বিরহবেদনার রূপ ফুটে উঠেছে।

দুইটি বিষয়ে এখানে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ইষ্ট ও ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "যাকে সর্বদা দর্শন করি, কত রূপে, কত বর্ণে। কিন্তু অখণ্ডের ঘরে যখন চলে যাই, মনবুদ্ধির পারে, আরও ঊর্ধ্বে, তখন জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সব একাকারে লয় হয়। সে অবস্থা থেকে বহু স্তর নীচে নেমে তবে মনবুদ্ধির লোকে ফিরে আসি। আরও নেমে এলে তবে তোদের কিছু জানাতে পারি।" রূপ ও অরূপ, সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মদর্শনের এমন সরল সহজ বিবৃতি শাস্ত্রেও দুর্লভ।

শ্রুতি দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং।' (কঠ ২.২৩; মুণ্ডক ৩.২.৩)। ইনি যাকে বরণ করেন, এঁর দ্বারাই লভ্য; তাকেই পরমাত্মা নিজ তনু (যথার্থ স্বরূপ) জানিয়ে দেন। প্রবচন, মেধা, বহুশ্রুতি এমন-কি কেবল তপস্যার দ্বারা তিনি লভ্য নন। ঋষি শ্বেতাশ্বতর 'তপঃ প্রভাবাৎ, দেবপ্রসাদাৎ চ' ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

নিরাধারা ব্রহ্মে স্থিত জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, যে দেহপাত হয়, এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ দেব অপিচ শ্রুতি, স্মৃতি বলেছেন। চকিতের ন্যায় যক্ষ ও হৈমবতী উমার রূপদর্শনের উল্লেখ এখানে আছে। ব্রহ্ম-দর্শন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, 'ব্রহ্ম সাগরের দর্শন, স্পর্শন বা এক গণ্ডূষ জলপান করলে জীব অমর হয়ে যায়, দিব্য-জ্ঞানে সমাহিত থাকে।' "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।" অথণ্ডের ঘরে রূপের কল্পনা নাই, জ্যোতির উল্লেখ আছে। 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম্ অগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" (কঠ ২।২।১৫)। অর্থাৎ, যে আলো বা জ্যোতির জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয় প্রদান করে, সূর্য্য-চন্দ্র-তারাপুঞ্জ-বিদ্যুৎ-অগ্নি প্রভৃতি যে আলো প্রকাশ করে, ব্রহ্মরূপের কণামাত্র নিয়ে সে-সব উদ্ভাসিত, প্রকাশিত। ভাষায় সেই দিব্যরূপের বর্ণনা ব্যর্থই হবে।—তিনি যখন যক্ষ, উমা, অথবা ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করে সাধককে কৃপা-পূর্ব্বক দর্শন দেন, তখন তাও পার্থিব কোন আলো বা জ্যোতির সদৃশ কি তুল্য হতে পারে না। ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে, 'নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত।' একজন লিখেছেন, 'শত চন্দ্রোদ্ভাসিত পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্নাসাগর।' বাউল গানে আছে, 'প্রভাত-সন্ধ্যায় দীপ্যমান করে।' "সে প্রভু যব আওল, সকল আঁধিয়া শ্যাম ভেল, গুপত কুছু না রওল, যেয়া পরাণ পুতল ভেল। মুঝে পাগল বনাওল —নিঠুর নীমিখে মিলাওল।" একজন লিখেছেন,..."সেই চিদানন্দ ঘন শ্যামসুন্দর, আর সেই শ্যাম শ্যাম অঙ্গকান্তি—চিদাকাশ পরিব্যাপ্ত করেছিল। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, তথা দ্বৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত—সকল তত্ত্ব ঐ এক অনুভূতিতেই পরিস্ফুট। আছে মাত্র ঐ রূপ-বিগ্রহ, বাকি সব তাঁরই অঙ্গকান্তি, যতদূর যতদূর দৃষ্টি চলে ঐ শ্যাম শ্যাম আভা। উহাই অব্যক্ত মূলাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ।" ইনি 'শ্যাম' শব্দে তাকে ব্যক্ত করেছেন।

দ্রষ্টার সমীপে তখন কোন গোপন রহস্য নাই; প্রাণপুত্তলী আনন্দে, দিব্যসত্তায় ভরপুর। ক্ষণিকের এই দর্শন সারাজীবনের হাসি-কান্না ও বিরহে পর্য্যবসিত হলেও 'ঐ মধুরং মধুরং বহুরপি মধুরং' দিব্য স্মৃতি জীবকে 'অভীক্ষ্ণং উপস্মরতি' নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ রাখে। এই চকিত দর্শন যে মনবুদ্ধির কল্পনা নয়, ওদের এলাকার বাইরে, তা অচিন্ত্য, অব্যক্ত রূপমাধুরী এবং জীবনব্যাপী অদর্শনে ও ব্যর্থ প্রয়াসে প্রতীত হয়। 'আমি না ভাবিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।' সেই শ্যামশ্যাম আভা মনোময়—বিজ্ঞানময় কোষ ছাপতে পারে না, শত সাধনারও ফুটে উঠে না।

এর পরে ৪।৬ শ্লোকে ব্রহ্মোপাসনার প্রকরণ-স্বরূপ, প্রাণি-মাত্রেরই প্রিয়তম ও প্রার্থনীয় এই ব্রহ্মকে 'তদ্বন' নামে উপাসনা করবার উপদেশ দিয়ে বলেছেন, জীব মাত্রেই তাঁকে চায়। অতএব ব্রহ্মদর্শন, নিরন্তর উপস্মরণ ও উপাসনা-পদ্ধতির বর্ণনা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। উপসংহারে, শিষ্য পুনরায় বলেছেন, গুরুদেব আমাকে উপনিষৎ উপদেশ করুন। ঋষি উত্তরে জানালেন, তোমাকে রহস্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যা বলেছি, তুমি গ্রহণ করতে পার নাই। এ তপ, দম, কর্ম্ম, বেদ বেদান্ত জ্ঞানে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ, অপাপবিদ্ধ হবে তখন অন্তে স্বর্গলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

মহিলার কৃতি

হাপাভেসির রেক্টরের পত্নী মিসেস নোরা পয়হোনেন এমন একজন কৃতী মহিলা যিনি গল্পগুজবে সময় কাটান না, কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লইয়া সকল সময় ব্যাপৃত থাকেন।

ফিনল্যাণ্ডের এই কৃতী মহিলা সম্পর্কে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হেলসিঙ্কির একটি পত্রিকায় এ ধরনের উক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। রেক্টরের পত্নী কর্তৃক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং উদ্যান-রচনা-বিদ্যা শিক্ষাদানকল্পে প্রতিষ্ঠিত রমণীয় বাগান এবং ক্ষেত-সমন্বিত "হাপাভেসি ডোমেষ্টিক সায়েন্স স্কুল" নামক সংস্থাটির কাজ এখনো পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। বৎসর দুই পূর্ব্বে রাষ্ট্র ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন তাঁহার সমশ্রেণীয়া নারীদের জীবন ছিল গৃহকোণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী এবং সূচিশিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন রেক্টরের পত্নীর পক্ষে ফিনল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে উদ্যান-রচনা এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মত অভিনব উদ্যোগে হাত দেওয়া কেমন করিয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তৎকালে অবশ্য অনেক শিক্ষিত পরিবারের কন্যারা সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য প্রবল প্রেরণা অনুভব করিতেছিলেন। গোড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইবার ইচ্ছা ছিল সলপেরির রেক্টরের কন্যা নোরা পয়হোনেনের, কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হইল। অতঃপর এই কারেলিয়ান তরুণী পরিণীতা হইলেন। বিবাহের অনতিকাল পরেই তাঁহার স্বামী ওস্ট্রোবোথনিয়ার হাপাভেসিতে রেক্টরের পদ লাভ করেন।

রন্ধন-বিদ্যায় তাহারা ছিল কারেলিয়া এবং পূর্ব্ব ফিনল্যাণ্ডের বাসিন্দাগণ অপেক্ষা অধিকতর অনগ্রসর। ওখানে রান্নাবান্নায় যে স্বল্প-পরিমাণ তরি-তরকারী ব্যবহৃত হইত তাহা দেখিয়া ধর্ম্মযাজকের এই

রচনাবক নোরা পয়হোনেন

তরুণী বধূ নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। শালগম ও গোল আলু ছাড়া আর কিছুর ব্যবহার তাহারা জানে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নোরা পয়হোনেন ইহার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং উত্তর অঞ্চলের এমন দূরবর্ত্তী একটি জেলায় তরিতরকারী ও ফলমূল উৎপাদন-কার্য্যে অগ্রণী

প্রচুর ফলন হইতে পারে একথা বিশ্বাস করিতে চাহিত না। আজিকার দিনে কিন্তু ওস্ট্রোবোথনিয়ার অধিকাংশ পরিবারের খাদ্য—মুখ্যতঃ শূকর মাংসের 'সসে'র সঙ্গে গোল আলু, মাংস এবং গোল আলু অথবা দুধ এবং গোল আলু মাত্র এই কয়টি উপকরণেই পর্যবসিত নহে।

শ্রীমতী পয়রোনেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হাপাভেসি রেক্টরিতে তাঁর স্বগৃহে প্রথম শিক্ষায়তনটি প্রতিষ্ঠিত করেন—এটি চৌদ্দ বৎসরকাল এখানেই ছিল। অবশেষে পয়রোনেন-পরিবার কর্তৃক হাপাভেসির আলাস্মা জোতটি ক্রীত হয় এবং ইহার গড়ানে জায়গায় নোরা পয়রোনেন একটি রমণীয় উদ্যান তৈরি করেন। উহাতে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তুষার-কঠিন জামজাতীয় (berry) ফলের ঝোপ এবং রকমারি আপেল ফলের গাছ জন্মানো লইয়া পরীক্ষণ চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস প্রথমতঃই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত, অবশ্য মাঝে মাঝে সাফল্যলাভও করিতেন তিনি। কিন্তু কখনো তিনি হতাশ হইতেন না এবং ভগবানের সাহায্যের উপর তাঁহার বিশ্বাসও শিথিল হইত না। তিনি যখন প্রথম এখানে আসেন তখন আলাস্মা জোতে ছিল একটি মাত্র গাছ যাহা আজও প্রধান অট্টালিকাটিকে দান করে স্নিগ্ধ ছায়া। এখন উদ্যানের শোভাবর্দ্ধক অসংখ্য গাছ এবং বনঝোপ ছাড়া ফলের বাগানে আছে প্রায় দুই শত ফলবান বৃক্ষ আর তৃণাচ্ছাদিত ও কৃত্রিম উত্তাপে রক্ষিত উদ্ভিদ-নিকেতনে (greenhouse) জন্মাইতেছে দ্রাক্ষালতা। এখন নিকটবর্তী অঞ্চলের সবগুলা গৃহেরই লাগাও আছে অন্ততঃ কয়েকটি 'বেরি' ঝোপ এবং ষ্ট্রবেরি উৎপাদনের ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি; আর ফলমূলের চাষ তো হইয়া দাঁড়াইয়াছে অতি সাধারণ ব্যাপার। যে ওস্ট্রোবোথনিয়ার লোকেরা সহজে 'ঘাস' খোয়াইতে চায় না, 'ঘাস-পাতা' আহারে তাহাদের রুচি জন্মাইতে গিয়া গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কন্যা এবং তরুণী বধূদের অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে ফিনল্যাণ্ডের সকল স্থান হইতে শিক্ষার্থিনীরা আসিয়া ভর্তি হইয়াছে এই প্রতিষ্ঠানে। ফলে, শালগম এবং গোল আলু ছাড়া অন্যান্য তরিতরকারীও যে ফিনল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে পারে এই জ্ঞান প্রসারলাভ করিয়াছে। কতিপয় শিক্ষার্থিনী আসিয়াছিল সুইডেন হইতে। ক্রমে ক্রমে সেণ্ট পিটার্সবার্গ এবং ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনসমূহে বিদ্যালয়টি পুরস্কার, এমনকি প্রথম পুরস্কার পর্যন্ত লাভ করিতে লাগিল। হাপাভেসির

বিগত শতাব্দীতে হাপাভেসি রেক্টরিতে উদ্যানরচনারত মেয়েদের কোদাল চালনা এবং জলপাত্র বহন

প্রদর্শিত ফলমূলাদির প্রতি সাধারণের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল দুইটি কারণে। প্রথমতঃ সেগুলি উত্তর অঞ্চলে উৎপন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ গুণের দিক দিয়াও অতি উৎকৃষ্ট। নিঃসন্দিগ্ধরূপে ইহা প্রমাণিত হইল যে, কতকগুলি বিশেষ জাতের উদ্ভিদ ছাড়া, দক্ষিণ অঞ্চলের দেশসমূহের অনুরূপ সব্জী-বাগানের (kitchen garden) চারাগাছ উত্তর ফিনল্যাণ্ডেও জন্মায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলের গাছ লইয়া হাপাভেসি স্কুলে যে পরীক্ষণ চালানো হয়, উত্তর ফিনল্যাণ্ডে তাহাই ঐ ধরনের প্রথম পরীক্ষণ। বারংবার ব্যর্থতার পর অবশেষে সাফল্য অর্জিত হইল। পরীক্ষণকার্য কিন্তু শেষ হয় নাই, এখনো তাহা সমান উৎসাহের সঙ্গেই চলিতেছে। ১৯৫৬ সনে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিরাট ফল প্রদর্শনীতে উক্ত বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদর্শিত আপেলগুলি সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

যে বিদ্যালয়টির ছাত্রীসংখ্যা গোড়ায় ছিল আট জন মাত্র, আজ তাহা পরিণত হইয়াছে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে—এখন এখানে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা কার্যে নিযুক্ত আছেন এবং কতিপয় গৃহও নির্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টির এই উন্নয়নের জন্য স্বভাবতঃই যেমন ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীকে তেমনি উত্তরসাধকদিগকে আর্থিক দিক দিয়া বিরাট ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রেক্টর-গৃহিণী উদ্যান-রচনা বিষয়ে তাঁহার উৎসাহকে সঞ্চারিত করিয়া দেন আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে, তাদের দ্বারা আবার অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে তাঁর নাতি-নাতনীরা। কাজেই বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান-গণ এবং ইহার শিক্ষক-শিক্ষিকারা হইতেছেন পয়রোনেন-পরিবারের

তৃতীয় 'পুরুষ'। শ্রীমতী পয়হোনেনের পরে প্রধান শিক্ষিকার পদে অধিষ্ঠিতা হন তাঁহার কন্যা মাইজু, তার পরে উক্ত পদ লাভ করেন তাঁর আর এক মেয়ে এলমা। এলমার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র মার্ত্তি, তাঁর বিধবা পত্নী ইরজা পয়হোনেন বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টির শীর্ষস্থানীয়া। ইরজা পয়হোনেনের কন্যাদ্বয়—আনুজা পয়হোনেন এবং আন্না-লিসা মালকাভারা এবং তাঁর স্বামী মারত্তি মালকাভারা এই তিন জনেই সম্প্রতি উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইদানীং রাষ্ট্র তাহাদের মাহিনা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমতী ইরজা পয়হোনেন বলেন যে, তাঁহার শাশুড়ীর আমলে

মাইজু এবং এলমা কর্তৃক 'বেরীহি'তে উৎপন্ন বিরাট আকারের শস্য প্রদর্শন

যখন প্রতিষ্ঠানের কর্ম-সম্প্রসারণকল্পে নূতন গৃহনির্ম্মাণের এবং পুরনো ঘরগুলি মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিত তখন তাহাদিগকে প্রায়শঃই এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত যে, "ভগবানই করিবেন টাকাকড়ির ব্যবস্থা"। সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন হওয়ার যে আত্মপ্রসাদ তাহাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রণীদের একমাত্র পারিশ্রমিক। এলমা পয়হোনেন সম্বন্ধে এই ধরনের একটি পারিবারিক কাহিনী প্রচলিত আছে। "এই বৎসর এলমার পালা। তিনি পাইয়াছেন নূতন জুতার ফিতা আর একটি সাবানের ট্যাবলেট।"

বয়স্ক-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিনা মাহিনায় শিক্ষাদান, শিশুদের মধ্যে উদ্যান-রচনা সংক্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টা সংগঠন, নিজের প্রিয় গাছ-পালা সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত বক্তৃতাপ্রদান ইত্যাদি স্থানীয় অন্যান্য কল্যাণকর্ম্মেও ছিল নোরা পয়হোনেনের ঐকান্তিক আগ্রহ। নিজের কন্যা মাইজুর সহযোগিতায় তিনি উদ্যান-রচনা সম্পর্কে সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করেন।

মিসেস পয়হোনেনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গোড়াকার দিকের ফসমূল ও তরিতরকারীর একটি প্রদর্শনী

আলাস্মার গ্রীনহাউস হইতে স্থানীয় গৃহিণীরা লইয়া আসেন টম্যাটো এবং শশার চারাগাছ, ঈষৎ বিব্রত চাষীরা "মায়ের দিনের" জন্য কিনিতে আসে গোলাপফুলের শুকনো পাপড়ি, ওদিকে বিদ্যালয়ের লিলি অব দি ভ্যালি আর সুগন্ধি টিউলিপ পুষ্পসমূহ সুশোভিত করে নিকটবর্ত্তী শহরগুলির পুষ্প-ব্যবসায়ীদের গৃহের বাতায়নকে। হাতে ছড়ি এবং মাথায় গরমকালের টুপী-পরা নোরা পয়হোনেনকে আজ আর তাঁর প্রিয় গ্রীষ্মকালীন উদ্যান-ভূমিতে বিচরণ করিতে এবং ক্ষেতের সহকারীকে বৃক্ষরোপণের জন্য নূতন স্থান নির্দ্দেশ করিতে (তিনি অনবরত তাঁর বাগানের রূপের অদলবদল করিতেন) দেখা যায় না সত্য, কিন্তু তাঁর কৃতি-সমূহের ফল আজ অনুভূত হইতেছে সমগ্র ফিনল্যাণ্ড জুড়িয়া।

ন. ভ.

সর্প-দংশন-চিকিৎসা

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ

সাপ একটি নিছক বাস্তব পদার্থ। কিন্তু এ সত্ত্বেও সর্প-দংশন-চিকিৎসার নামে কত বুজরুকিই না আমাদের দেশে প্রচলিত আছে! কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, মশায়, মন্ত্রে না বিশ্বাস করলেন, কিন্তু দ্রব্যগুণ? দ্রব্যের গুণে বিশ্বাস করব না, কেমন করে বলি! কিন্তু দ্রব্যগুণ বলতে 'দ্রব্যের গুণ' ত বোঝায় না—বোঝায় দ্রব্যের অলৌকিক গুণ, অর্থাৎ যে গুণ এ দ্রব্যে নেই সেই গুণ। অন্ততঃ সাধারণ্যে এই অর্থে দ্রব্যগুণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই দ্রব্যগুণ শব্দটির বাহার্থের আড়ালে অনেক কিছু বুজরুকিই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

এই সব বুজরুকিকে অবশ্য পুষ্ট করছে সাপুড়েরা—যারা সাপ-খেলা দেখিয়ে দু'পয়সা রোজগার করে। বিষ-দাঁতওয়ালা কোন সাপের ঘাড় চেপে ধরে সেই সাপ যদি কেউ জনসাধারণকে দেখায়, তা হলে তারা খুব বিস্মিত হবে না। তারা ভাবে, ঘাড় চেপে রাখা হয়েছে—সুতরাং সাপ কামড়াবে কেমন করে। কিন্তু যদি কোন সাপকে ছেড়ে দিয়ে খেলা দেখানো হয়, সেই সাপের বিষ-দাঁত ভাঙা থাকলেও যে খেলা দেখায় তাকে জনসাধারণ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করে। আসলে কোন্ সাপের বিষ-দাঁত আছে, কোন্ সাপের বা বিষ-দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার ধৈর্য্য বা সময় আমাদের নেই। উদ্ধতফণা বিষধর সাপ দেখে আমরা ভয় পাই। সুতরাং সেই সাপকে নিয়ে যখন কেউ খেলা দেখায়, তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না—তাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করি এবং তার নানাবিধ বুজরুকিতে বিশ্বাস করি।

সর্প-দংশন-চিকিৎসার নামে আমাদের দেশে যে সমস্ত সংস্কার প্রচলিত আছে, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা অবশ্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তা সত্ত্বেও এগুলি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, সর্প-দংশন-চিকিৎসার একটি বড় কথা হ'ল সময়। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাউকে সাপে কামড়ালে ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট করা হয়। ফলে শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করা হলেও সর্পদষ্ট ব্যক্তি বাঁচে না।

এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন

অনেকেই প্রশ্ন করেন, সর্পাঘাতের সত্যি সত্যি কোন ঔষধ আছে কিনা? এ প্রশ্ন অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ কিছুদিন আগেও সর্পাঘাতের কোনও কার্য্যকরী ঔষধ ছিল না। কিন্তু এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কৃত হওয়ার পর সে কথা আর বলা চলে না।

একটি সুস্থ ও সবল ঘোড়ার গায়ে কয়েক মাস ধরে সইয়ে সইয়ে অতি অল্প পরিমাণ সর্প-বিষ ইন্‌জেক্‌শ্যন দেওয়া হতে থাকে। মারাত্মক পরিমাণের সর্প-বিষ না দেওয়াতে ঘোড়াটি মরে না—বিষক্রিয়ার কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায় মাত্র। প্রতি বারে অবশ্য বিষের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, মারাত্মক পরিমাণের সর্প-বিষও ঘোড়াটিকে কাবু করতে পারছে না! এর কারণ সুস্পষ্ট। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিতভাবে সর্প-বিষ ইন্‌জেক্‌শন করার ফলে ঘোড়াটির রক্তে জন্মে বিষসহন ক্ষমতা। ফলে, মারাত্মক পরিমাণের বিষ ইনজেক্‌শন করলেও ঘোড়াটির কিছু হয় না। এইরূপ ঘোড়ার রক্ত থেকে সর্পাঘাতের একমাত্র কার্য্যকরী ঔষধ এন্টিভেনিন তৈরী করা হয়। আমাদের দেশে বোম্বাইয়ের হপকিন ইনষ্টিটিউটে (Haffkine Institute) এই ঔষধ তৈরির ব্যবস্থা আছে।

বিষের ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে বিষধর সাপগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: (ক) স্নায়ুর উপর প্রধানতঃ যাদের ক্রিয়া এবং (খ) রক্তের উপর প্রধানতঃ যাদের ক্রিয়া। আগে এই দুই জাতের সাপের জন্যে দু'রকম এন্টিভেনিন তৈরি করা হ'ত। সেক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল যে, ইন্‌জেক্‌শন দেবার পূর্ব্বে কোন্ জাতের সাপ কামড়েছে তা জানা দরকার হ'ত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দু' জাতির সাপেরও জন্যে একই ইন্‌জেক্‌শন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তরল অবস্থায় এন্টিভেনিনের কার্য্যকারিতা বেশী দিন থাকে না। সেইজন্যে পল্লী-অঞ্চলে এন্টিভেনিন সংগ্রহ করে রাখার বিশেষ অসুবিধা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে এন্টিভেনিনকে শুষ্ক করা সম্ভব হয়েছে। তাই এই ঔষধের কার্য্যকারিতা বহু দিন পর্য্যন্ত অটুট থাকে। ইনজেক্‌শন দেবার সময় শুষ্ক এন্টিভেনিন পরিস্রুত জলে মিশিয়ে নিতে হয়।

সর্ব্বতোভাবে ভাল ফল পেতে হলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির শিরার মধ্যে এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া দরকার। কিন্তু শিরার মধ্যে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্যতীত নিরাপদ নয়। এন্টিভেনিন ঔষধ আছে অথচ আশেপাশে নির্ভরযোগ্য কোন চিকিৎসক নেই—এক্ষেত্রে কি করা যাবে? ত্বকের নীচেই এন্টিভেনিন ইন্‌জেক্‌শন করা উচিত। ত্বকের নীচে ইন্‌জেক্‌শন তত ফলপ্রদ না হলেও অনেক উপকার

করে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিজেও ত্বকের নীচে এন্টিভেনিন ইন্‌জেকশন দিতে পারে—অবশ্য অচেতন হয়ে পড়লে আলাদা কথা।

অতীত সংস্কারের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ এবং এন্টিভেনিন ইন্‌জেকশনের দুষ্প্রাপ্যতা—এই দুই কারণে আমাদের দেশে বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টেরও কর্তব্য আছে। সুদূর পল্লী-অঞ্চলে এন্টিভেনিন ইন্‌জেকশন যাতে সুলভ হয় এবং পল্লীবাসীরা এর ব্যবহারে যাতে সচেতন হয়ে উঠে, সে সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপ কামড়ায় খুব আকস্মিকভাবে। সুতরাং হাতের কাছে বা আদৌ এন্টিভেনিন ইন্‌জেকশান পাওয়া না যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত:

(ক) বাঁধন: সাপের বিষ রক্তের সঙ্গে দেহের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কাউকে সাপে কামড়ালে দষ্ট স্থানের কিছু উপরে তৎক্ষণাৎ একটি জোর বাঁধন দেওয়া উচিত। আরও কিছু উপরে দ্বিতীয় একটা বাঁধনও দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ সরু শক্ত দড়ি জোরে বেঁধে বাঁধন দেওয়া হয়। শণের দড়ি হলে ভাল হয়। রবারের সরু নল পাওয়া গেলে সবচেয়ে ভাল। অভাবে নিজের কাপড় বা পৈতা ছিঁড়ে বা রুমাল দিয়ে বাঁধন দেওয়া যেতে পারে। দড়ির বাঁধনকে অধিকতর সুদৃঢ় করার জন্যে একটি সরু কাঠ, উড পেন্সিল বা গাছের ডাল ইত্যাদি আড়াআড়িভাবে এ বাঁধনের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে পাক দেওয়া যেতে পারে। এরূপভাবে বাঁধন দিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তির কষ্ট হতে পারে; কিন্তু সেকথা ভাবলে চলবে না। সোজা কথা, বাঁধন এমনভাবে দেওয়া উচিত যে, দষ্ট স্থানের রক্ত দেহের হৃৎপিণ্ডে বা অন্যান্য স্থানে যেন ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

অবশ্য বাঁধন দিলেই হবে না। বাঁধনের দ্বারা অনেকক্ষণ রক্ত চলাচল বন্ধ রাখলে বাঁধনের নীচে পচ ধরতে পারে। এই কারণে দশ বা পনের মিনিট অন্তর তিন-চার সেকেণ্ডের জন্যে বাঁধন সামান্য আলগা করে দিতে হয়।

(২) কর্তন: সাপ ছোবল মারার জন্যে দষ্ট স্থানে যে বিষ ঢোকে, যতদূর সম্ভব তা বার করে দিতে হবে। বিষ বার করতে হলে রক্ত বার করতে হবে—কারণ রক্তের সঙ্গেই বিষ বেরিয়ে আসবে। যে জায়গায় বিষদাঁতের দাগ দেখা যাচ্ছে, সে জায়গাটা ঢেরা চিহ্নের (×) আকারে সিকি ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি গভীর ভাবে কেটে দিতে হবে। সাধারণতঃ বিষদাঁতের দুটি দাগ দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক দাগের জায়গা অনুরূপভাবে কেটে দিতে হবে। কাটবার সময় সম্ভব হলে খেয়াল রাখা উচিত, হাতের উপর যে সূক্ষ্ম ঝিল্লী আছে তা অথবা কোন প্রধান রক্তবহা-নাড়ী যেন নষ্ট না হয়।

কাটা যেতে পারে। কাটবার আগে উহা আগুনে পুড়িয়ে বা ফুটন্ত গরম জলে কিছুক্ষণ রেখে শোধিত করে নিতে হয়—যাতে তার গায়ে কোন মারাত্মক জীবাণু না লেগে থাকতে পারে।

দষ্ট স্থানে সাপের বিষদাঁত অনেক সময় আটকে থাকে। বিষদাঁত তুলে ফেলা উচিত। বড় একগাছা চুল দষ্ট স্থানে টান করে বুলালে বিষদাঁত লেগে আছে কিনা বোঝা যাবে।

(৩) শোষণ: বিষদাঁতের দাগের জায়গা কাটার ফলে আপনা থেকে যে পরিমাণ রক্ত বেরোয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ রক্ত বার করা দরকার হয়ে পড়ে। শোষণের দ্বারাই এই অতিরিক্ত রক্ত বার করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শোষণের দ্বারা অতিরিক্ত রক্ত বার করা একান্ত আবশ্যক।

পায়ে বা হাতেই সাধারণতঃ সাপে দংশন করে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে বাঁধন দেওয়া সহজ। কিন্তু গলা, পিঠ ইত্যাদি জায়গায় সাপে কামড়ালে বাঁধন দেওয়া ত চলে না। সে ক্ষেত্রে শোষণের দ্বারা অতিরিক্ত রক্ত বার করা অপরিহার্য্য হয়ে উঠে।

অতিরিক্ত রক্ত বার করতে হলে চিকিৎসকদের দ্বারা ব্যবহৃত রক্ত-শোষণ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া সবচেয়ে ভাল। কাঁচের বা ধাতুর তৈরী একটি ছোট পাত্রের সঙ্গে রবারের পাম্প যুক্ত থাকে। পাত্রটি দষ্ট স্থানের উপর উপুড় করে রেখে পাম্প টিপলেই দষ্ট স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে ঐ পাত্রের ভিতর জমা হতে থাকে। সর্প-দংশন চিকিৎসার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে দু'রকমের পাত্র থাকা দরকার: (১) দেহের কোন সমতল অংশে সাপে কামড়ালে তার জন্যে প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসের গোল মুখবিশিষ্ট পাত্র এবং (২) আঙুল ইত্যাদি দেহের কোন গোলাকার অংশে সাপে কামড়ালে তার জন্যে সরু ডিম্বাকার মুখবিশিষ্ট পাত্র।

দষ্ট স্থান থেকে রক্ত শোষণের জন্যে স্তন-শোষকযন্ত্রও (Breast pump) ব্যবহার করা যেতে পারে।

রক্ত-শোষণ-যন্ত্রের অভাবে রক্ত শোষণের জন্য কেউ কেউ নিম্নলিখিত দুটি উপায়ের একটির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন: (১) একটি ছোট কাঁচের বা পিতলের গেলাসের ভিতর সামান্য স্পিরিট ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দষ্ট স্থানের উপর উপুড় করে জোরে চেপে ধরতে হয়। গেলাসটি দষ্ট স্থানে আটকে যায় এবং দষ্ট স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে তার ভিতর জমা হতে থাকে। অথবা, (২) দষ্ট স্থানের পাশে আটা বা ময়দা দিয়ে একটা ছোট প্রদীপের মত তৈরি করে তার মধ্যে কর্পূর জ্বালিয়ে একটি গেলাস তার উপর উপুড় করে জোরে চেপে ধরতে হয়। এ ক্ষেত্রেও গেলাসটি দষ্ট স্থানে আটকে যায়—এবং দষ্ট স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে তার ভিতর জমা হতে থাকে। বলা বাহুল্য, খুব সতর্কতার সঙ্গে এ দুটি উপায়ের সাহায্য নেওয়া উচিত। কারণ সর্পদষ্ট ব্যক্তির গায়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একটি কথা আমাদের খুব ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার।

রক্তের সঙ্গে মেশা দরকার। যে ব্যক্তির মুখে (মাড়ি ইত্যাদিতে) ও পাকস্থলিতে কোন ঘা বা কাটা নেই, সে যদি সাপের বিষ এমন কি খায়, তা হলেও তা তার পক্ষে মারাত্মক হবে না। রক্তে মেশবার আগে পেটের মধ্যে সাপের বিষ তার প্রাণহানিকর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

সর্প-বিষ সরাসরি রক্তের সঙ্গে না মেশা পর্যন্ত প্রাণহানিকর নয় বলে রক্ত-শোষণ-যন্ত্রের অভাবে কোন সুস্থ ব্যক্তি সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্ট স্থান চুষে রক্ত বার করে দিতে পারে। এতে তার কোনও ক্ষতি হবে না। সর্পদষ্ট ব্যক্তির কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া এই কাজের ভার নিতে পারেন। সাপ যদি এমন কোন জায়গায় কামড়ায় যে জায়গা সর্পদষ্ট ব্যক্তির নিজের পক্ষে চোষা সম্ভব, তা হলে সে কাজ সে নিজেও করতে পারে।

প্রত্যক্ষ ভাবে মুখ দিয়ে রক্ত চোষার লোকের যদি অভাব ঘটে, তা হলে দষ্ট স্থানে শিঙা বা সরু বাঁশের নল বসিয়ে রক্ত শোষণ করে নেওয়া যেতে পারে।

বলা বাহুল্য, রক্ত শোষণের জন্যে উপরি-উক্ত যে কোন উপায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হোক না কেন, প্রয়োজনবোধে তার পুনরাবৃত্তি করা দরকার।

(৪) ব্যবস্থা: বেশ খানিকটা পরিষ্কার জলে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মাত্র কয়েকটা দানা গুলে যে পাতলা দ্রবণ (weak solution) তৈরি হবে, তা দিয়ে দষ্ট স্থান ধুয়ে ফেলা উচিত। সর্প-বিষ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের গাঢ় দ্রবণ (অর্থাৎ একটু-খানি জলে অনেকগুলি দানা দিয়ে তৈরী দ্রবণ) অথবা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা দষ্ট স্থানে দেওয়া উচিত নয়। এতে কুফল লাভের হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(৫) আশ্বাসদান: সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেন অত্যধিক ভীত না হয় অথবা ছুটাছুটি না করে। নতুবা রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে সর্পবিষ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে নির্বিষ সাপে কামড়ালেও সর্পদষ্ট ব্যক্তি এত ভীত হয়ে পড়েছে যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির মন যাতে অস্থির হয়ে না পড়ে, সেই কারণে তাকে সব সময়ে আশ্বাস দিতে হবে। এই আশ্বাস দান যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়, কতগুলি বিষয় স্মরণ রাখলে তা বোঝা যাবে। ভারতবর্ষে প্রতি একশত সাপের মধ্যে মাত্র কুড়িটি মারাত্মক বিষধর সাপ। আবার এই কুড়িটি মারাত্মক বিষধর সাপের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ মাত্র দশটি সাপের কামড় শেষ পর্যন্ত প্রাণহানিকর হয়। তা হলে মোটামুটি বলা চলে, প্রতি একশত সর্পদষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নব্বই জন বিনা চিকিৎসাতেই বেঁচে উঠতে পারে। অবশ্য কেবল বাংলা দেশ ধরলে মারাত্মক বিষধর সাপের অনুপাত সামান্য বেশী—এবং সেই হিসাবে বিনা চিকিৎসায় সর্পদষ্ট ব্যক্তির বেঁচে উঠার অনুপাত সামান্য কম।

যা হোক, আমাদের দেশে সাপের ওঝার বুজরুকির দাপট এত বেশী কেন, বুঝে দেখুন।

মারাত্মক বিষধর সাপ কামড়ালেই যে মানুষ মরতে বাধ্য এ কথা ঠিক নয়। ঠিকমত কামড়াতে না পারায় যে পরিমাণ বিষে মানুষ মরে, সে পরিমাণ বিষ ঢালবার সুযোগ সে নাও পেতে পারে। ঠিক পূর্বে হয় ত সে অন্য কোন জন্তু-জানোয়ারকে কামড়েছে। সুতরাং যে পরিমাণ বিষে মানুষ মারা যায়, সে পরিমাণ বিষ তার বিষ-গ্রন্থিতে তখন নাও থাকতে পারে।

মারাত্মক বিষধর সাপে কামড়েছে কিনা, সুনির্দিষ্ট ভাবে এ কথা জানতে পারলে বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু তা জানবার উপায় এই প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা মনে গেঁথে রাখা যেতে পারে যে, যে-কোন সাপের কামড়ের পর দশ মিনিট কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে বিষধর সর্প-দংশনের যদি কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তা হলে ঐ কামড়ে কোন ভয়ের কারণ নেই।

সর্পদষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাকে গরম চা বা কফি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অতি-উত্তেজক দ্রব্য কোন ক্রমেই দেওয়া উচিত নয়।

সর্প দংশন-পেটিকা: আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে সাপের কামড়ে অনেক লোক মারা যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া আরও কয়েকটি দেশে সাপের অভাব নেই। কিন্তু সে সব দেশে সাপের কামড় থেকে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে।—সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থায়। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ কোন ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। আমাদের দেশের প্রত্যেক চিকিৎসকের উচিত, সঙ্গে একটা করে সর্প-দংশন-পেটিকা রাখা। এই সর্প-দংশন-পেটিকায় নিম্নলিখিত জিনিস-গুলি থাকবে:—(১) খানিকটা রবারের সরু নল, (২) এক-পাশ ধারাল জীবাণুমুক্ত সেফটি-রেজরের ফলা, (৩) অন্ততঃ দুটি এড্রিনেলিন অ্যাম্পুল, (৪) সর্প দংশন-চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নির্মিত রক্ত-শোষণ-যন্ত্র, (৫) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটি দানা, (৬) খানিকটা পরিষ্কৃত জল, (৭) খানিকটা ব্যাণ্ডেজ।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন সরকারী কর্মচারী বা সেবাব্রতী ব্যক্তি কাজের প্রয়োজনে পল্লী-অঞ্চলে গেলেন। কিন্তু তাঁকে আর ফিরে আসতে হ'ল না—সাপের কামড়ে তাঁর প্রাণ গেল। সেদিন শিক্ষা-বিভাগের এক মহিলা কর্মচারী পল্লী-অঞ্চলে কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান—কিন্তু রাত্রেই সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সাপের কামড়ে মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি বেদনাদায়ক। এই সব সরকারী কর্মচারী ও সেবাব্রতী ব্যক্তিরা পল্লী-অঞ্চলে সফরের সময় যদি একটি করে সর্প-দংশন-পেটিকা সঙ্গে করে নিয়ে যান, তা হলে হঠাৎ সাপে কামড়ালে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করতে পারবেন।

তুরুপ

শ্রীউমাপদ নাথ

বয়স হলেও বয়সের ছোঁয়া লাগে নি দেহে। চোখ বাঁচিয়ে তাকে শাসিয়ে রাখেন গৌরীশঙ্করবাবু। স্বচ্ছ পাতলা কাচের কোমর-চাপা গ্লাসটার বাইরে থেকেও চোখে পড়ে ভিতরকার জাফরানি পানীয়ের রক্তচক্ষু আস্ফালন। সেটা শুধু পানীয়ের নয়, গৌরীশঙ্করবাবুরও ভিতরের জিনিষ।

বড় বাংলো-বাড়ীটার গেটে চকচকে ব্রোঞ্জের প্লেটে কালো হরফে লেখা রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর, সি. আই. ই। দুখানা কোলিয়ারী, তিনটে আয়রণ মাইন, দুখানা ভ্যানাডিয়াম ডিপজিট আর দুখানা কেওলিন কোয়ারির মালিক রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর। নামমাত্র পার্টনার অবশ্য আছে একজন সঙ্গে। রণছোড়লাল টেগারিয়া, মাত্র চার আনার অংশীদার। কিন্তু চার আনার শরিক হলে কি হবে, রেসের সুদক্ষ ঘোড়ার কাছে রেসকোর্স যেমনি, টেগারিয়ার কাছে ব্যবসাও তেমনি; নখের আয়নায় রয়ে গিয়েছে হার-জিতের অমোঘ ইঙ্গিত।

টেগারিয়ার সাফল্য তার নিজস্ব অর্জন। নিজের মেহনতের সাক্ষী, অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফসল। প্রথম জীবনে বিয়ে করবারই ফুরসত হয় নি। বলেছে, আগে সাকসেস, তার পর সংসার। সাফল্যের অনেকখানি হাতের মুঠোয় এনে বিয়ে করল এই ক'মাস আগে চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে। বয়স বেশী হলেও বৌটি পেয়েছে নিখুঁত। সুশীলার বাবাও বরের বয়স দেখেন নি, দেখেছেন বরকেই। তাঁর দৃষ্টিতে ও বয়সটুকু কিছুই নয়, যখন সৌভাগ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যও রয়েছে সুন্দর।

সুশীলার বয়সও সেইজন্যে একটু বাড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন তার বাবা। চব্বিশ ছাড়িয়ে পঁচিশে পড়ে পাত্রস্থ হয়েছে সুশীলা। যৌবনের মধ্যাহ্ন অপরূপ করছে তখন। আয়ত চোখের স্বচ্ছ হ্রদ দুটোয় নীল নির্জনতার নিমন্ত্রণ।

টেগারিয়ার তবু ফুরসত নেই সেই নিমন্ত্রণ-লিপি পড়ে দেখবার, সেই স্নিগ্ধ সলিলে একটু অবগাহন করবার। মগজের মধ্যে কিলবিল করে শুধু কোলিয়ারি, কেওলিন, আয়রণ আর ভ্যানাডিয়াম। কিন্তু বৌকে সুপয়া বলতে বাধ্য হয়েছে টেগারিয়া। বিয়ের পরই ত চার আনা থেকে পাঁচ আনায় উঠেছে তার শেয়ার। রায় বাহাদুর বলেছেন, তোমার সিনসিয়র মেহনতের মূল্য এটা।

এক আনা শেয়ার বাড়াটা বড় কম কথা নয়। ওয়াটারএকটা চাপাতে চাপাতে একটা খুশির শিস দিয়েছিল টেগারিয়া। ঠোঁটের আগায় একটু হাসির ভাব এসেছিল, তার সুলক্ষণের পুরস্কার দিয়েছিল—আদর করে নামের শেষ অক্ষরটাকে বাদ দিয়ে।

আর রায় বাহাদুর? তিনি হলেন আলাদা ধরনের মানুষ। যেমন গাড়ীর ঘোড়া আর রেসের ঘোড়া, খটাখট এগিয়ে চলে নাক দিয়ে তেজ আর খবরদারির তপ্ত হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে—পিছনে ভ্রূক্ষেপহীনতার ধূলিজাল উড়িয়ে দিতে দিতে। দু' একটি চোটকে থোড়াই কেয়ার করেন তিনি। ঘায়েল হয়েও বলেন, পরোয়া নেই—ঠিক হায়।

'ওর' থেকে ভ্যানাডিয়ামটাকে নিংড়ে নিতে পারলে মস্ত একটা সমস্যার সমাধান হয়। সারা ভারতে ভ্যানাডিয়ামের ডিপজিট অতি অল্পই। রায়-টেগারিয়ার হাতে তার প্রায় অর্দ্ধেকটাই। এই ভ্যানাডিয়মকে কাজে লাগাতে পারলে কৃত্রিম উপায়ে কলঙ্কহীন ষ্টীল তৈরি করবার আর দরকার হবে না। ষ্টীলের চাইতেও হবে এটা অনেকগুণ বেশী মজবুত। উচ্চ ধরনের ইস্পাত-শিল্পের একটা লোভনীয় জীবন্ত সম্ভাবনাকে চোখের সামনে এগিয়ে ধরে রায়-টেগারিয়ার ভ্যানাডিয়াম-বেল্ট দুটো।

রায় বাহাদুরের হাত থেকে ঐ ভ্যানাডিয়ামের পাহাড় দুটোকে ছিনিয়ে নেবার স্বপ্ন দেখল টেগারিয়া। ব্যবসায়ীর মগজে ঝিলিক মেরে উঠল সর্বগ্রাসী লোভাগ্নির একটা অপরূপ ঝলক। টেগারিয়ার চোখের সামনে সোনার মিনার, আর মনে চিন্তার জট—বুদ্ধির মারপ্যাঁচ। খেয়াল-খুশির মানুষ রায় বাহাদুরকে হাতে আনা যাবে না তার কূটবুদ্ধির জালে ফেলে?

মার্কিন কোম্পানীর বিরাটাকার যন্ত্রপাতি সব এসে পড়ে রয়েছে, খাড়াও হয়ে গিয়েছে প্রায় অর্দ্ধেকটা কারখানা। 'ওর' হলেই এখন কাজ আরম্ভ করা যায়।

ভ্যানাডিয়ামের বেল্টে ব্লাস্টিং আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খাদানে খাদানে পাথর ভাঙবার কাজ চলছে অবিরাম। রায় বাহাদুর এখন বেশীর ভাগ সময় পাহাড়ের উপরেই থাকেন। নতুন ছোট বাংলো তৈরি হয়েছে সেখানে। দিনান্তে একবার নেমে আসেন নিচে। টেগারিয়ার সঙ্গে কারখানার কনস্ট্রাকশন একবার ঘুরে দেখেন। নিচের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ দেখবার ভার রয়েছে টেগারিয়ার উপর।

তার সমগ্র বিচক্ষণতা নিয়ে কাজের তদারক করে চলেছে টেগারিয়া। দিনরাত কাজ চলেছে। রাত্রেও বাসায় বাবার

করে দিয়েছে। নিজের আদরের জিনিষের মত করে গড়ে তুলেছে, ভ্যানাভিয়ার ওয়ার্কসটা।

রঙিন পানীয়ের ভিতর অতুলনীয় সৌভাগ্য আর কৃতিত্বের স্বপ্নজাল বুনে চলেন রায় বাহাদুর পাহাড়ের মাথায় বসে, আর নিচে টেগারিয়ার চোখে সুকঠিন হয়ে উঠে বুভুক্ষার ইস্পাত ঔজ্জ্বল্য। যেমন করেই হউক ভ্যানাডিয়ামটা তার চাই-ই।

ধনায়মান সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ের প্যাঁচালো সড়কটা মনে হয় দীর্ঘকায় কুণ্ডলীকৃত একটা সরীসৃপের মত। সেই কুটিল নির্জনতার গা বেয়ে বেয়ে সাবধানে উঠে আসে হাল্কা ষ্টেশন-ওয়াগনখানা। মাথায় উঠে আবার মুখ ঘুরে যায় গাড়ীর, রায় বাহাদুর বাংলোয় নেই। খবর পাওয়া গেল নিচে গিয়েছেন। কিন্তু নিচে আবার কোথায় গেলেন রায় বাহাদুর এই সন্ধ্যেবেলায়! বড় বাংলোয় গেলেন নাকি? বড় বাংলো মানে সেটলমেন্ট-এর টা সেই বাস গৃহ— গৃহিণী আর গৃহস্থালি রয়েছে যেখানে। কিন্তু গৃহের বেড়া ত অনেক দিনই ভেঙে ফেলেছেন রায় বাহাদুর, নিজের খেয়াল নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন খাস কুঠিতে। শুধু টেগারিয়া কেন, ছোট বড় কর্মচারীরা সবাই জানে এ কথা। এমনকি বাজারের লোকেরাও।

গাড়ী ঘোরাতে ঘোরাতে সুভদ্রার দিকে একবার পিছন ফিরে তাকাল টেগারিয়া। তেমনি জড়সড় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে সুভদ্রা। ঘন যৌবনের মধ্যে আর একটা বনথবিশেষ। টেগারিয়া ডাক দিল, সুভদ্রা!

সুভদ্রা তেমনি নিঃশব্দ। তার মনের গভীরে আরও নিঃশব্দে বয়ে চলেছে দুর্দান্ত একটা ঝড়—একটা প্রচণ্ড ঝাঞ্ঝা-বিক্ষোভ। সেই কালবৈশাখীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে ও কেমন করে? যতই ছোট হোক, অনুভূতির ত বোধগুলো কি আর খসে পড়ে মানুষের মন থেকে! ওরও সতীত্ব আছে, নারীত্ব আছে, মন আছে—শুধু যৌবনবতী একটা জীবমাত্র নয়। ভাবনায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে সুভদ্রা।

না খেয়ে খাদানে এসেছিল একদিন বধূ। খাদানে ভাত নিয়ে এসেছিল সুভদ্রা। স্বামীকে ভাত-জল খাইয়ে ঘরে ফিরে গেল, অজান্তে সারা অঙ্গে বয়ে নিয়ে গেল বড় সাহেবের দুর্দম লোভদৃষ্টির তীক্ষ্ণ শরগুলো। জাতে যাই হোক না কেন, সুভদ্রা যেন রূপের খনি। প্রকৃতির মেয়ে সুভদ্রা অপ্রকৃতিস্থ করে গেল রায় বাহাদুরকে। তাঁর কাছে মনে হ'ল একখানা রূপোর খনির চেয়েও ওর দাম বেশী।

কথাটা প্রকাশ পেল টেগারিয়ার কাছে। স্বার্থান্ধ টেগারিয়ার হাতে একটা সুযোগ উপস্থিত হ'ল যেন। যেন এসে গেল একখানা উঁচুদরের রঙের তাস। তুরুপ মেরে বাজি জিতে নেবার একটা সুযোগ ত বটেই।

অনেক তকলিফ করে ভেট যোগাড় করে এনেছিল আজ টেগারিয়া।

মালিকের মোটরে বসে হিমদেহ বিবশ-অঙ্গ ঐ সুভদ্রা! ডাকের সাড়া দিতে ইচ্ছে করল না তার। অসংখ্য প্রশ্নের ভিড়ে ওর মন তখন বিক্ষুব্ধ। একটা ছবির আতঙ্কের মত এক কোণে দেহটাকে জড়ো করে রেখেছে মাত্র।

সামনেই ছোট একটা কালভার্ট। তলা দিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী। শুধু বর্ষাকালেই জেগে ওঠে, এখন কেবল শুক্‌নো খাদটা। কালভার্টের সামনেই খুব ঘোরালো একটা বাঁক। পাশ দিয়েই খাড়া খাদ। ব্রেকে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে নামাতে লাগল গাড়ী। রাস্তার সবটাই বাঁক, লাইটের ফোকাসে সামনের দু-তিন গজ ছাড়া বাকী রাস্তাটুকু সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে। হর্ণ দিতে দিতে সাবধানে গাড়ী নামাতে লাগল টেগারিয়া।

হঠাৎ আর একটা হর্ণ এল কানে। গাড়ী আসছে নিচে থেকে। বড় সাহেবের গাড়ী নিশ্চয়ই। যাক, সাহেব তবে ফিরছেন। দেখতে দেখতে নিচের গাড়ীটা এগিয়ে এল অনেকটা নিকটে—হয়ত কয়েক গজের আড়ালেই। ইলেকট্রিক হর্ণের একটা পাল্টা জবাব দিয়ে গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল টেগারিয়া। কসিং এক্যোমোডেশন নেই এখানে। হয় টেগারিয়াকে পিছুতে হবে, নয় সামনের গাড়ীকে।

নিচের গাড়ীখানা কাঁচ করে এসে থামল টেগারিয়ার গাড়ীর সামনে। হাঁ, রায় বাহাদুরের গাড়ীই। ফিকে সবুজ রঙের সেই নিউ মডেল ক্যাডিলাকখানা। রায় বাহাদুর নেমে পড়লেন গাড়ী থেকে, সামনে টেগারিয়াকে দেখেই বাতি নিবিয়ে দিলেন চট করে। কিন্তু তার আগেই টেগারিয়া দেখে ফেলেছে ওকে। মাথা ঘুরে গেল টেগারিয়ার। চার আনা—পাঁচ আনা—ভ্যানাডিয়াম, সব ঘুরতে লাগল মাথার ঐ নতুন-বসানো যেন চাইনের মত। আড়ষ্ট সুভদ্রার চেয়ে অনেক বেশী আড়ষ্ট হয়ে গেল তার মুখগুলো।

রঙের উপরেও রঙ চড়িয়েছেন রায় বাহাদুর। ষ্টেশন-ওয়াগনের সামনে বাতি-নেবা ক্যাডিলাকের গদীতে সেই রঙের টেকাটি আগেই এক ঝলক দেখে ফেলেছে টেগারিয়া।

ভাবী গৃহিণীদের জন্য কলেজ

ডাঃ হেলেন আদিসেশিয়া

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অথবা পাশ্চাত্ত্যে যাহা গার্হস্থ্য অর্থনীতি বলিয়া অভিহিত হয় তাহা আজ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয় উভয় স্তরেই অধ্যয়ন এবং আচরণের বিষয়রূপে দ্রুত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষণ অধিকারে (Directorate of Extension and Training) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্প্রসারণ কর্মের (Home Science Extension Work) সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী স্তরে ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান-অনুশীলন এবং জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনাসমূহে ইহার স্থান সম্বন্ধে প্রাকৃত জনের মনে এখনও অস্পষ্টতম ধারণা বিদ্যমান।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বসাধারণের ধারণা

সাময়িক পর্যবেক্ষকের নিকট গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের মানে—কোন ব্যয়সাধ্য স্কুল অথবা কলেজে রন্ধন, সেলাই এবং কাপড়চোপড় ধোলাই করা শেখা। বোবৈকদর্শীদের মতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বালিকাদের যে প্রণালীতে ভাত এবং ডাল রান্না করিতে শেখায়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাহা "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি" বলিয়া বর্ণিত হয়। ইহার দরুন তাহাদের পিতামাতার যা খরচ পড়ে তা বিস্ময়কর, অথচ তিন চার দশক আগে তাহাদের পিতামহীরা কোন স্কুলে না গিয়া ঐ সকল জিনিস উৎকৃষ্টতররূপে রাঁধিয়া, ভোজনবিলাসীদের রুচিকর খাদ্য যোগাইয়া তাহাদের রসনার পরিতৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হইত। যাহারা ঠিকমত ওয়াকিবহাল নহে, তাহাদের মতে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় (College) এমন একটি স্থান যেখানে বালিকা পতিলাভের পূর্ব পর্যন্ত অকাজে সময় নষ্ট করে। যে রসিক স্বামীর স্ত্রী গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট তিনি ঠাট্টা করিয়া বলেন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শেখানো হয় প্রাথমিক সাহায্য—দগ্ধ খাবারের প্রতি প্রযোজ্য প্রাথমিক সাহায্য।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসৃত সীমাবদ্ধ পাঠক্রম। যে সকল স্বল্প-মেধা ছাত্র এরূপ বিষয়সমূহের অনুশীলন করে যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার তেমন প্রয়োজন হয় না তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার সমস্তরে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানকে স্থাপিত করার জন্যও এই সকল প্রতিষ্ঠান দায়ী। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বস্তুতঃ যে অবস্থায় আছে তৎসম্পর্কিত প্রকৃত সত্যের সঙ্গে উপরোক্ত ধারণার ব্যবধান খুব বেশী নয়।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের মূলসূত্র এবং ক্ষেত্র

ব্যাপকতম এবং সর্বাপেক্ষা দার্শনিক অর্থে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান হইতেছে বাঁচিয়া থাকার শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের জন্য ব্যবস্থিত, অধিকতর বিদ্যালয়গত কলাপ্রধান শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে যে, সমসাময়িক জীবনধারা এবং চিন্তাধারার সঙ্গে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার রহিয়াছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সমকালীন জীবন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া তো দূরের কথা, ভারতীয় জীবনের যে মূলগত ভিত্তি গৃহ এবং পরিবার তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান সমস্যাসমূহও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের খাঁটি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের মূলনীতিসমূহের উদ্ভব হইয়াছে—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, বিভিন্ন কলাশাস্ত্র এবং মানবতা সম্পর্কিত অনুশাসনাবলী হইতে। উপরোক্ত মৌলিক বিষয়সকল অনুশীলনের ফলে উদ্ভূত বিষয়সমূহের মাধ্যমে, মানুষের আধ্যাত্মিক মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের এবং যে সকল কারণ এই ধরনের বৃদ্ধির জন্য দায়ী সেগুলির সঙ্গে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। একটি উন্নতিশীল সমাজের তরুণদের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ইহা বিকাশলাভ করিয়াছে। মূল্যবান উপপত্তি (Theory) এবং আচরণের মাধ্যমে ইহা নির্ভরযোগ্য-জ্ঞান অর্জনের পন্থাসমূহ প্রদর্শনের প্রয়াস পায় এবং এমনি ভাবে কিরূপে সাফল্য ও সন্তোষের সঙ্গে জীবন যাপন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেয়। ভারতীয় জীবন-

শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস পায় যাহা শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান-সম্মত গার্হস্থ্য জীবন-গঠনের মূল নীতিসমূহের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি এই সঙ্কটের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আপোষরফা করিয়া চলিবার সামর্থ্য প্রদান করিবে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পাঠক্রম

এই উদ্দেশ্য কেমন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে? গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজে পাঠ্যতালিকার বিষয়বস্তু বলিতেই বা কি বুঝায়?

গৃহে সুখে-স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচিয়া থাকা, স্বাস্থ্য-নীতির উচ্চ মান, পুষ্টি এবং পথ্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী, গৃহের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য, গৃহস্থালির কাজে টাকাকড়ির নিপুণ ব্যবহার, সৎ নাগরিকত্ব এবং সামাজিক দায়িত্ব—গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠক্রমে এইগুলিই হইতেছে মূলগত বিবেচ্য বিষয়। বিজ্ঞানসম্মত গৃহস্থালির মূলনীতিসমূহের অঙ্গীভূত এই সকল বিষয়ের দরুন—রন্ধনবিদ্যা, ধোলাইখানা, সূচিকর্ম্ম, গার্হস্থ্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, পথ্যাপথ্য বিচার, পুষ্টি, শারীরবৃত্ত এবং শারীর স্থান, স্বাস্থ্যনীতি, মাতৃনীতি, প্রাথমিক সাহায্য ও গৃহে পরিচর্য্যা এবং তৎসহ অশক্তদের পথ্য, গৃহিণীপনা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পৌর বিজ্ঞান, ভাষা-শিক্ষা, শিক্ষার মূলনীতি, শিক্ষা সংক্রান্ত মনস্তত্ত্ব, শিশু-মনস্তত্ত্ব এবং পিতৃ-মাতৃকৃত্য (parentcraft) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়সমূহে ব্যাপকভাবে আচরণমূলক শিক্ষাদান, নার্সারী স্কুলে শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই সকল বিষয়ক ঔপপত্তিক এবং ব্যবহারিক উভয়বিধ জ্ঞান গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাঠ্যতালিকার সহায়ক স্বাস্থ্যপ্রদ কর্ম্ম-প্রচেষ্টাসমূহও—নাট্যাভিনয়, সাহিত্য এবং বিতর্ক-সভা, ব্যায়াম, সুকুমার কলা এবং সমাজ-সেবাও ইহার অন্তর্গত—ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৃহরচনার নূতন দিগন্ত

বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও একথা বলা চলে যে, ভারতের গৃহরচনা-কলা ভারতীয় সংস্কৃতির মতই প্রাচীন। ইহা একদিকে যেমন মূলগতভাবে সত্য, অন্যদিকে তেমনি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের আনুকূল্যে ভারতীয় গৃহিণী বিজ্ঞানের এবং বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সেরা জিনিষকে কাজে লাগাইতে পারেন। জীবনচর্য্যার কৌশল সম্বন্ধে একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টিতে ইহা তাঁহাকে সহায়তা করিয়া থাকে এবং ইহারই দৌলতে তিনি নিজের চিন্তা এবং কর্ম্মকে যাচাই করিয়া দেখিবার এমন প্রচুর সুযোগ লাভ করেন যে, তাঁহার জীবন গড়িয়া উঠে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর এবং ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে সাহায্য করিবার অবস্থায় তিনি উপনীত হন। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ভাবেই অপরিহার্য্য জাতীয় সেবামূলক কৃত্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সূচনা এবং গতি-প্রকৃতি

সাধারণ খেলাধুলা, যৌথ কর্ম্মপ্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতাসমূহের সামাজীকীকরণ, পুতুল রাখা, দোকানে ক্রীড়া এই সকল প্রাগ্-বিদ্যালয় কর্ম্মসূচী গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের প্রাথমিক নীতি-সমূহের উপলব্ধিকে সহজসাধ্য করিয়া থাকে। কেননা শৈশব-জীবন বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় এই সকল অভিজ্ঞতা হইতেছে জীবন-চর্য্যার কৌশলের মূলগত ভিত্তি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিখানো হয় শারীরবৃত্ত, স্বাস্থ্যনীতি, সাধারণ বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের মাধ্যমে। অনেকগুলি উচ্চ বিদ্যালয় রন্ধনবিদ্যা, ধোলাইখানার কাজ এবং সূচীশিল্প-শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া থাকে। উত্তর প্রদেশে আবার উচ্চ বিদ্যালয়-স্তরে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে। কিন্তু বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাকালের খুঁটিনাটির দিক দিয়া ভিন্ন ভিন্ন কলেজে ইহার বিভিন্নতা দেখা দেয়। কোন কোন পাঠক্রম শিখানো হয় দুই বৎসরের অধিক কাল, অন্যান্য-গুলির শিক্ষা-সমাপ্তিতে আবার তিন হইতে চার বৎসরেরও বেশী সময় লাগে। অবশ্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাদান প্রথম প্রবর্তিত হয় লেডি আরউইন কলেজে; বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে প্রথম উক্ত বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কৃতিত্ব কিন্তু মাদ্রাজের, ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয় বরোদা এবং এলাহাবাদে। ১৯৫১ সনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Education) আমন্ত্রণে লেডি আরউইন কলেজ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহের মধ্যে ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মৌলিক বিজ্ঞানসমূহ পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেখানে পুষ্টি ও পথ্যাপথ্য বিষয়ে উচ্চ স্তরের বিদ্যালয়গত শিক্ষাদানের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, আবার কোথাও বা গার্হস্থ্য কলা-কৌশলের ব্যবহারিক দিকসমূহের উপর ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়া থাকে।

ডিপ্লোমা স্তর, আণ্ডার গ্রাজুয়েট স্তর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর স্তর এই ত্রিবিধ স্তরেই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে—তদনুসারে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় মুখ্য বিষয়রূপে। ইহার

পাশাপাশি অনুরূপ ভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে গ্রাজুয়েট-দিগকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানেরও রেওয়াজ আছে।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসার : 'দি লেডি আরউইন কলেজ'

প্রায় চার দশক পূর্ব্বে একদল পুরোবর্ত্তিনী নারী—যাঁহারা নিখিল ভারত নারী সম্মেলনে যে সকল আদর্শকে দায়স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, সেই সকল আদর্শদ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা নারীদের জন্য প্রচলিত শিক্ষা, বিশেষ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রদত্ত শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যাচাই করিয়া দেখেন। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার ফলে নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমের একান্ত ভাবে বিদ্যালয়গত পদ্ধতি এবং সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত ইহার পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুতির এবং ভারতীয় নারীজাতির বিশিষ্ট প্রকৃতির (Genius) অনুকূল একটি নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তিপত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত এই অগ্রণী নারীদল এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠেন যেখানে তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের নিকট ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইল যে, এই ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তরুণী নারীরা সার্থক ভাবে বাঁচিয়া থাকার এবং গৃহ-রচনার উপযোগী ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে।

নিখিল ভারত নারী সম্মেলন শ্রীমতী হান্না সেনকে মহিলাদের জন্য এমন একটি কলেজ সংগঠন এবং প্রশাসনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন যেখানে ভারতীয় নারী লাভ করিবেন বাঁচিয়া থাকার জন্য তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার ব্যবহারিক সুযোগ-সুবিধা এবং তাহা হইবে তাঁহার বিশিষ্ট সমাজের মূলগত প্রয়োজন, ধরণধারণ এবং সংস্কৃতির উপযোগী। শ্রীমতী হান্না সেন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অধ্যয়নের অগ্রণী প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতে—না সমগ্র এশিয়াতে এই কলেজকে দান করিয়াছেন ইহার বর্ত্তমান মর্য্যাদা। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১২ জন ছাত্রী লইয়া ইহার কাজের সূচনা হয় আর আজ ইহার ছাত্রীদের মধ্যে আছে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া পূর্ব্ব-আফ্রিকা, জ্যামাইকা, ম্যাডাগাস্কার, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পর্য্যন্ত আগত চারি শতাধিক ছাত্রী।

১৯৪৭ সনে হিংসাবিদ্বেষ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার নিরানন্দ দিনগুলিতে ঐ মহাবিদ্যালয় কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ইহা পাকিস্থান হইতে পলায়িত বারো লক্ষ ছিন্নমূল নরনারীর জন্য দেশের সকল স্থান এবং বিদেশ হইতে দান হিসাবে প্রাপ্ত বস্ত্রসমূহের বিহিত ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বস্ত্র-সংগ্রহ-ভাণ্ডার রূপে কাজ করিয়াছিল। দান হিসাবে প্রাপ্ত বস্ত্র সংগ্রহ, সেগুলি পৃথক পৃথক শ্রেণীতে সাজানো, ধোলাই করা, রোগবীজাণুমুক্ত করা, বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদগুলিকে নির্দ্দিষ্ট আকারে তৈরি করা, এবং বিভিন্ন বাস্তহারা শিবিরে সেগুলি সরবরাহ ইত্যাদি কাজে শক্তি নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয় একটি গোটা কার্য্যকালের (term) জন্য নিজের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা স্থগিত রাখে। ১৯৪৭ সনে বিভিন্ন উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু-শিবিরে বিমানযোগে প্রেরিত বহু মণ চাপাটি এবং শুকনো ডাল রন্ধনে সহায়তার জন্য মহা-বিদ্যালয়ের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিল উদাত্ত আহ্বান।

সরকারের তরফ হইতে অনুপূরক (supplementary) খাদ্যশস্য সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য মহাবিদ্যালয়ের নিকট বারকতক অনুরোধ আসিয়াছে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি সেই অনুরোধ রক্ষাও করিয়াছে। অতি-সাম্প্রতিক কালে মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ, খাদ্যের অঙ্গ হিসাবে এ পর্য্যন্ত উপেক্ষিত সাধারণ ভারতীয় শাকসবজিসমূহে ভিটামিন পদার্থ আবিষ্কারের গবেষণায় ব্যাপৃত আছে।

১৯৩২ সনে ডিপ্লোমা প্রদানকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে যে মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, দিন দিন তাহার শক্তি-বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে ১৯৫১ সনে ইহা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইয়া গেল। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে বি-এসসি ডিগ্রি দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, অতঃপর শিক্ষক-শিক্ষণে বি-এড ডিগ্রি দানেরও রেওয়াজ হইল। পুষ্টি বিষয়ে এবং শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ বিষয়ক জ্ঞানসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে একটি "মাষ্টারস ডিগ্রি" প্রদানের পরি-কল্পনাও খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

সম্প্রতি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কে অধ্যয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রধান প্রধান গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অতি শৈশব-কালের শিক্ষাবিভাগের সংযোজনা—গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান-অধ্যয়নের এই বিকাশোন্মুখ অধ্যায়কে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। দি লেডি আরউইন কলেজ নার্সারি স্কুল কর্ত্তৃক দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—এক দিকে যেমন ইহা দ্বারা শহরতলীর শিশুদের, বিশেষ ভাবে শ্রমোপজীবিনী মায়েদের শিশুদের জন্য প্রাগ্-বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত কলেজের সমাজসেবামূলক যে উদ্দেশ্য তাহা সাধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কে গবেষণাকার্য্য প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্ভাবিত এক দ্রুত প্রসরণশীল পরিকল্পনায়

অন্তর্ভুক্ত একটি গবেষণাগারের কেন্দ্রস্থল রূপেও ইহা কাজ করিয়া থাকে। সম্প্রতি লেডি আরউইন কলেজে অনুষ্ঠিত শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রথম ভারতীয় সম্মেলনে এই অঞ্চলে ব্যাপক অধ্যয়ন এবং গবেষণার উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে এবং ভারতের জাতীয় পুনর্গঠন-প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার আমন্ত্রণ মহাবিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

শিশু-কল্যাণের নূতন সীমান্তরেখা

শ্রী কে. জি. সৈয়ীদাইন

এই সম্মেলন কর্তৃক "শিশু-কল্যাণের নূতন সীমান্তরেখা" নামে যে মুখ্য বিষয়বস্তু নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার উপযোগিতা এবং চিত্তাকর্ষণ ক্ষমতা আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা তাহা জানিতে আমার ইচ্ছা হয়। যে যুগে আমরা বাস করিতেছি এক অর্থে তাহা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বহু দিক দিয়া নূতন সীমান্তরেখার সম্মুখীন হওয়ার পুলক-শিহরণ অনুভব করিতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দী সম্বন্ধে সামগ্রিক ভাবেই একথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা এমন এক শতাব্দী যখন পৃথিবী তথা ভারতের নিকট একদিকে যেমন উপস্থাপিত হইয়াছে বিরাট চ্যালেঞ্জ, সৃষ্টি হইয়াছে নানা সুযোগ-সুবিধা, অন্য দিকে তেমনি বহু দুঃখদুর্গতিও বিশ্ববাসী তথা ভারতবাসীকে করিয়া তুলিয়াছে জর্জ্জরিত, এবং অনেক দিক দিয়া ইহা আমাদের জীবনের পদ্ধতিকেই বদলাইয়া দিয়াছে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শান্তির পথে অবস্থানুযায়ী আমাদের নিজস্ব পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ, এমন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যাহা কোনও বিশেষ শ্রেণীকে নয়, কিন্তু আমাদের সমগ্র জন-সমাজের প্রত্যেককে উৎকৃষ্ট ধরনের জীবন-যাপনে সমান অংশীদার করিবে—ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে আমরা এই 'চ্যালেঞ্জের' সম্মুখীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। অভিনব এবং প্রসরণশীল সীমান্তরেখা আবিষ্কার করিতে গিয়া নূতন মহাদেশ আবিষ্কারকদিগকে যে ধরনের এডভেঞ্চারের সম্মুখীন হইতে হয়, আমার মতে উপরোক্ত এডভেঞ্চার তদপেক্ষা কম রোমাঞ্চকর এবং চিত্তাকর্ষক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আমেরিকায় গত শতাব্দীতে ছিল—নৈসর্গিক সীমান্তরেখাকে সম্প্রসারিত করিবার পরিকল্পনা আর সেই উদ্দেশ্যে জঙ্গল এবং জলাভূমি পরিষ্কার করা হইত, নির্ম্মাণ করা হইত নূতন নগরী এবং শহর, বশীভূত করা হইত প্রকৃতির দুরন্ত শক্তিনিচয়কে। আজ আমাদিগকে এ ধরনের প্রাকৃতিক সীমান্তরেখা আবিষ্কারার্থ অজ্ঞাত স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু আমাদের কৃত্য বাস্তবিকই ঢের বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং ইহার জন্য আমাদের অদৃষ্টে পুরস্কারও জুটিবে অধিক। আমাদিগকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, আধিব্যাধি এবং কুসংস্কারের সীমান্তরেখাকে এমন ভাবে সম্প্রসারিত করিতে হইবে যে, আমাদের দেশের সেই সকল লক্ষ লক্ষ নর-নারী যেন পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী হয় যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সুযোগলাভে বঞ্চিত ছিল। দুনিয়ার প্রাকৃতিক রূপকে আকর্ষণযোগ্য করা একটা বড় রকমের কৃতি সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেয়ঃ সামাজিক নীতির দ্বারা সংঘটিত সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার; সমাজের ক্ষত যাহার দৌলতে হয় নিরাময়, সামাজিক অন্যায় অবিচারকে যাহা করে দূরীভূত এবং যাহা পরিহার্য্য দুর্ভাবনার বোঝা হইতে মানুষের ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ককে নিষ্কৃতি দেয়। ইহাই সেই মহান্ কৃত্য যাহা লইয়া সম্প্রতি আমরা ব্যাপৃত আছি। কি পরিমাণ সাফল্যলাভ আমরা করিব তাহা নির্ভর করে আমাদের মানসিক সততা এবং আমাদের হৃদয়ের সংবেদনশীলতার উপর।

এখন আমি আমাদের প্রবন্ধসমূহের লক্ষ্যবস্তুর লক্ষণ-নির্দ্দেশ করিতেছি। আমাদের বাস্তব কর্ম্মসূচীসমূহ যে ভাবে পরিকল্পিত তাহাতে অগ্রাধিকারগুলি সম্পর্কিত ধারণা ঠিকমত স্পষ্টীকৃত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত নই। ইহা কতকটা প্রমাণিত হয় এই বিষয়টি হইতে যে, আমরা অত্যন্ত বৃহৎ শিল্প এবং যন্ত্রবিদ্যা সম্পর্কিত পরিকল্পনার রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইতেছি, কিন্তু যথোচিত সমাজসেবা-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হই নাই। যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ফলে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট এবং সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি এবং এই যুক্তির বৈধতা আমি অস্বীকার করি না যে, ধন প্রথমে উৎপাদন করিতে হইবে, তারপরে আসিবে

হয় সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যসমূহের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার, নতুবা জনগণের মধ্যে বিতরণের প্রশ্ন। আমি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই যুক্তিও গ্রহণ করিতে রাজী আছি যে, বর্তমান 'পুরুষে'র লোকেরা পরবর্তী বংশধরদের জন্ত উৎকৃষ্টতর এবং প্রশস্ততর জীবনের সৌধ-রচনাকল্পে "নিজেদের পাকস্থলীকে আঁট করিয়া বাঁধিবে" এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক পিপাসাকেও যতদূর সম্ভব সংযত করিবে। আমি কিন্তু একথা মনে না করিয়া পারি না যে, উন্নততর উৎপাদন এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রবর্তন এই উভয় দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতেই ঐ যুক্তির উপর খুব বেশী জোর দেওয়া বা ইহাকে খুব দূরপ্রসারী করা সমীচীন হইবে না এবং এটা প্রত্যাশা করাও আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় যে, বর্তমান 'পুরুষে'র লোকের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্ত অবিমিশ্র ত্যাগ স্বীকার করিবে। কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্র এবং আশ্রয়ের ব্যাপারে নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবসরবিনোদন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধেও এমন কতকগুলি ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা আছে যাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত এখনই আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন—এমন কি ইহার দরুন যদি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আমাদের গতি কতকটা মন্দীভূত হয় তাহা হইলেও ঐ দিকে আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি আমরা তাহা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা কেবল যে, জনগণের কর্মনৈপুণ্যই বাড়াইতে পারিব তাহা নয়, তাহাদের কল্যাণবোধও জাগ্রত হইবে এবং বৃহৎ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণের জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী উৎসাহেরও সৃষ্টি হইবে। জনগণের আদর্শবাদকে উদ্বুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত হইবে বাস্তবতাবোধ এবং এই উপলব্ধি দ্বারা যে, আত্মার আকুতি যদি বা থাকে মানুষের রক্ত মাংসের শরীর কিন্তু দুর্বল।

এই কথাগুলি সাধারণ ভাবে যেমন সমাজসেবা কর্মের ক্ষেত্রে তেমনি সমগ্র জন-সমাজের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু শিশু সমাজের সমস্যার নিরিখে যখন আমরা এই সমস্যাকে বিচার করিয়া দেখি তখন বিষয়টি প্রভূত পরিমাণে ঘোরালো হইয়া উঠে এবং আপোষরফা করিবার অবকাশ অল্পই থাকে। পাশ্চাত্যের জনৈক শিশুহিতৈষী বিংশ-শতাব্দীকে "শিশুদের শতাব্দী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় না যে, এখনও পর্য্যন্ত আমরা আমাদের দেশের তরফ হইতে ঐ দাবি করিতে পারি। এ বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নাই যে, যেমন আমাদের সামাজিক বিবেকবুদ্ধি তেমনি বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদাগুলির জন্তও এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠাই প্রয়োজন। আর সকল বিষয়ে আমরা খরচ কমাইয়া আনিতে পারি, কিন্তু আমাদের শিশুদের বেলায় ব্যয় সঙ্কোচ করা সমীচীন হইবে না। সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং সভ্য বলিয়া আমাদের সকল দাবি ফাঁকা আওয়াজের মত শুনাইবে যদি না অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেশের শিশুদের জন্য উন্নততর বাসস্থা—একেবারে মূলগত ভাবে উন্নততর ব্যবস্থা করিতে পারি। প্রায়শঃ বিভিন্ন দিক দিয়া যে সকল ওজুহাত দেখানো হয়, অন্ততঃ এক্ষেত্রে তৎসম্বন্ধে আমাদের পক্ষে অসহিষ্ণু হইয়া উঠাই সমীচীন হইবে। প্রথম তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম দুর্দিনে গ্রেট ব্রিটেন যদি এই সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে পারে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের উপর যতই বিপদপাত হউক না কেন, শিশুদিগকে দুর্গতি ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে কোন যুক্তিবলে অপেক্ষাকৃত কম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাদের লক্ষ্য হইবে ইহা অপেক্ষা নিম্নগামী? আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—অবশ্য যদি এখনও ইহা যথারীতি আপনারা অবগত না হইয়া থাকেন—এই উভয় যুদ্ধেরই পরিসমাপ্তির পর দেখা গেল যে, উচ্চতা, ওজন এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সকল দিক দিয়াই ব্রিটিশ শিশুদের উন্নতি হইয়াছে, যুদ্ধকালে তাহাদের মাধ্যাহ্নিক খাদ্য সরবরাহের কাজ এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাঘটিত কর্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয় নাই। এমনকি যে, বোমাবর্ষণের ফলে লণ্ডন নগরী জনশূন্য হইয়া যায় তাহাও শিশুদের সমক্ষে প্রামাণ্য অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া এই বিষয়ক শিক্ষালাভের সুযোগ উপস্থাপিত করে। এক দেশের পক্ষে যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, অন্তদেশও নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাহা করিতে পারে—অবশ্য ইহার জন্ত প্রয়োজন সেই একই ধরনের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং মূল্যবোধ।

অবশ্য এই ধারণা আমি জন্মাইয়া দিতে চাই না যে, আমাদের দেশে শিশুদের জন্য কিছুই করা হইতেছে না। ইহা আত্মপ্রসাদের বিষয় যে, যেমন সরকারী তেমনি স্বেচ্ছা-মূলক সংস্থাসমূহও শিশু-কল্যাণকর্মের উন্নয়নকল্পে বেশ কতকগুলি কর্মসূচীর প্রবর্তন করিয়াছে এবং পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মত শিশুদের পরম বন্ধু এবং অনুরাগী রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত সরকারের পক্ষে ইহার অন্যথাচরণ করাও সম্ভবপর হইত না। প্রধানতঃ নারী এবং শিশু-কল্যাণকর্মে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের প্রতিষ্ঠা এই দিক দিয়া একটি বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও বহুবিধ কৃত্য রহিয়াছে—যেমন প্রাক্‌প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিশু-বাগ (Children's Park) খোলা, বালভবন এবং শিশু যাদু-

ষরের পরিকল্পনা প্রণয়ন, 'শঙ্কর'স উইকলি'র সহিত সংশ্লিষ্ট সেই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাহার দৌলতে আমাদের শিশুদের লেখা এবং ছবি সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, শিশুদের স্বাস্থ্যঘটিত সমস্তার প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান যত্ন, শ্রম ও সমাজসেবা শিবিরের (Labour and Social Service Camps) স্কুলে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক এবং পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রবর্ত্তন, যুব হোষ্টেল, দেশ-প্রদক্ষিণ-পরিকল্পনা, অল্পবয়স্ক অপরাধপ্রবণ এবং শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া অপটু অন্যান্য শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ। এ সমস্ত ভাল ব্যবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দেশের সমস্যার সামগ্রিক পরিসরের তুলনায় ইহা যথেষ্ট ভালও নয়, যথোচিত কল্পনাশক্তির দ্যোতকও নয়। এই ধরনের সম্মেলনের এবং শিশু-কল্যাণমূলক ভারতীয় পরিষদের (Indian Council for Child Welfare) মত সংস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—সরকার এবং সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ গভীরভাবে এই সমস্যার উপর কেন্দ্রীভূত করা এবং বর্ত্তমান কর্ম্মসূচীতে কোথায় ফাঁক রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার ও এমন কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশপ্রদান যাহা বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহের সংহতিবিধান করিয়া তাহাদের গতি-বেগকে করিয়া তুলিবে দ্রুততর।

এই সম্পর্কে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তন্মধ্যে যেটিকে আমি মুখ্য সমস্যা বলিয়া মনে করি, আপনাদের বিবেচনার্থ তাহা কি আমি সাহসপূর্ব্বক উল্লেখ করিতে পারি ? প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার-সমূহ, সরকারী উদ্যোগে সংগঠিত পর্ষদ, কমিটি এবং ডিপার্টমেণ্টসকল, স্থানীয় সংস্থাগুলি, স্বেচ্ছামূলক সংগঠনসমূহ —তন্মধ্যে কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত, কতকগুলি আবার এখনও নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করিতে পারে নাই—প্রভৃতি এমন অনেকগুলি বিপুলসংখ্যক সংস্থা আছে যাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে শিশু-কল্যাণকর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে এবং এমন বহু কল্যাণকৃৎ উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও আছেন যাঁহারা শিশু-কল্যাণক্ষেত্রে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। এই সকল কল্যাণ-কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে কড়াকড়িবিশিষ্ট সারূপ্য অথবা বহু বিধিনিষেধের বেড়াজালে এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে আবদ্ধ করার সমর্থন আমি করিতেছি না সত্য, কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, যে অ-যথেষ্ট জনবল এবং অপ্রচুর অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, যাহাতে তাহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় সেজন্য পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টাসমূহের সংহতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রয়োজনাবলী সম্বন্ধে সযত্ন অনুসন্ধানের ফলে ইহা প্রমাণিত হইতেপারে যে, এক দিকে যেমন কতকগুলি ক্ষেত্রের চাহিদা অপেক্ষাকৃত উত্তম-রূপে মিটানো হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি এমন কতিপয় ক্ষেত্র আছে যেগুলির প্রতি মোটেই নজর দেওয়া হয় না, এবং শেষোক্ত গুলিই হইতেছে উপযুক্ত ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্তব্য সরকারী এবং বেসরকারী আর্থিক সাহায্য সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ভাবে কেন্দ্রীভূত করা যাইতে পারে। বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে মানসিক জড়তাগ্রস্ত শিশুদের প্রতি যে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না, সেকথা আমি উল্লেখ করিতে পারি। অথবা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিতে পারা যায়, জনাকীর্ণ নাগরিক অঞ্চলে শিশু বাগ (Childrens Park) এবং ক্রীড়াভূমির অবিদ্যমানতার কথা যাহার দরুন শারীরিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়াই তাহাদিগকে বহুবিধ বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়।

অপেক্ষাকৃত সামান্য অর্থবল দ্বারা কি কি ধরনের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সংগঠিত করা সম্ভব তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে, বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিপুণ তথ্যানুসন্ধান এবং মূল্য-নির্দ্ধারণকে ভিত্তি করিয়া করিয়া গঠিত ব্যাপক কর্ম্মনীতি হইতে, এবং এজন্য আমাদের বহু বৎসর অপেক্ষা করিবারও প্রয়োজন নাই। আমি ইহার কারণ খুঁজিয়া পাই না যে, কেন কোন পৌর কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণ পার্কে শিশুদের জন্য এমন সুপরিকল্পিত প্রান্তসমূহ পৃথক করিয়া রাখেন না যেখানে তাহারা স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করিতে এবং কতকগুলি যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং সাদাসিধা উপকরণের সাহায্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন সংহত কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং তাহা কেবলমাত্র রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারী স্তরে নয়, উপরন্তু—এবং বাস্তবিকই তাহা কোন কোন দিক দিয়া অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ—স্থানীয় স্তরেও। আমাদের দেশে আশু-প্রয়োজনীয় যে জিনিষটির অপ্রতুল তাহা জাতীয় এবং রাজ্য উভয় স্তরে উচ্চাঙ্গের নেতৃত্বের অভাব ততটা নয়—ভগবানকে ধন্যবাদ যে এই মহার্ঘ্য বস্তুর কিয়ৎ পরিমাণ অধিকারী আমরা এবং ইহারই সহায়তায় আমরা অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদ-আপদ কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছি—যতটা স্থানীয় নেতৃত্বের ও পৌর গৌরববোধের। নিজেদের সমাজের ঐ সকল সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত ছোট এবং বৈপ্লবিক শক্তিশালী দলসমূহের অবিদ্যমানতাও আমাদের আর একটি গুরুতর অভাব। আমার মতে এই ক্ষেত্রে কাজের অগ্রসূচনা করার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সংস্থা হইতেছে

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন সংস্থাসমূহ—নেতৃত্বের ভূমিকাও স্বতঃই তাহাদের জন্ত নির্দিষ্ট। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা তাহাদের পক্ষে অধিকতর সহজসাধ্য হইতে পারে। কেননা এ বিষয়ে যদি একটা সুপরিকল্পিত কর্ম্মনীতি থাকে তাহা হইলে পিতা-মাতা অথবা সাধারণের পক্ষে তাহাদের শিশুদের জন্তই উদ্দিষ্ট কল্যাণ-পরিকল্পনাসমূহ সম্পর্কিত অনুরোধ এড়ানো কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। উপরন্তু যে সকল উদ্দেশ্য দূরবর্ত্তী ও নৈর্ব্যক্তিক, কাজেই বাস্তব নয় অথচ যেগুলির জন্ত সাধারণ নাগরিক-দিগকে বিভিন্ন প্রকারের কর দিবার জন্ত অনুরোধ করা হয় তদপেক্ষা যে সকল ভালো কাজ ধরাছোঁয়ার মধ্যে আছে এবং সরাসরি এখানে এবং এখনই আমাদের জন্ত করা হইতেছে তাহার নিমিত্ত টাকা দেওয়া অধিকতর সহজ।

দ্বিতীয়তঃ রহিয়াছে আইন প্রণয়নের সমস্যা—অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাই না। নিকৃষ্টতম ধরনের শোষণ এবং সামাজিক অনাচারের হাত হইতে শিশুদের রক্ষা করিবার জন্ত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপকভাবে আমরা পরিস্থিতিটিকে বিচার করিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। ইহা করা প্রয়োজন উচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে এবং আমি আশা করি যে, শিশু-কল্যাণ আইন এবং কার্য্যতঃ তাহাদের প্রয়োগ (Childwelfare laws and their Enforcement) সম্বন্ধে এই কনফারেন্সে যে আলোচনার পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা এই দিকে পথনির্দ্দেশের সহায়ক হইবে।

তৃতীয়তঃ আসে আর্থিক সংস্থানের প্রশ্ন। দেশের দারিদ্র্যসত্ত্বেও, একথা সত্য যে আমাদের এমন অনেক বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র দাতব্য ট্রাষ্ট বা অছি কর্ত্তৃক ব্যবস্থাকৃত সম্পত্তি আছে যেগুলির সামগ্রিক আয় কোটি কোটি টাকায় গিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বর্ত্তমানে এই সমস্ত ফণ্ড যথোচিতরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না। ইহার জন্ত কখনও কখনও দায়ী অব্যবস্থা অথবা অবিশ্বস্ততা—এবং কখনওবা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। আমাদের সমাজে যে সকল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহার দরুন "দাতব্য উদ্দেশ্যসমূহ" কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্তভাবে এবং কল্পনামূলক ভাবে ব্যাখ্যা করার এবং যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানে এই সকল ফণ্ডের—যাহা মোটের উপর জাতীয় সম্পত্তি—যাহাতে যথোচিত ব্যবহার হয় সেজন্ত আইনের সাহায্যপ্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমি অবগত আছি যে, কোনও কোনও রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু অধিকতর সাহসের সহিত এই সমস্যার সমাধানকল্পে কাজ সুরু করা আবশ্যক এবং শিশু ও অন্যান্ত বঞ্চিত শ্রেণীর প্রয়োজনকে, মূল দাতারা যে উদ্দেশ্যে ঐ অর্থদান করিয়াছিলেন তাহার উপরে স্থান দিতে হইবে, কেননা বর্ত্তমানে এক্ষেত্রে বরং সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়া থাকে। হয় ত এই ইঙ্গিত দেওয়া পুরাপুরি 'অধর্ম্ম' নাও হইতে পারে যে, অনেকগুলি বহুদিন প্রতিষ্ঠিত ট্রাষ্টের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উক্ত উদ্দেশ্য যথারীতি সিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বৃহত্তর সূত্র ছাড়া, যুক্তরাজ্যের "শিশুকে বাঁচাও ভাণ্ডারে"র (Save the Children Fund) "এক সপ্তাহে এক পেনি" (Penny a week) এই আবেদনের অনুরূপ ক্ষুদ্র কিন্তু ব্যাপক পরিকল্পনাসমূহও আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। এই সমস্ত সংগঠিত প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা স্থানীয় কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যসমূহের নিমিত্ত বেশ মোটা রকমের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি। এরূপ সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, দরিদ্র এবং প্রায়-দরিদ্র লোকেরা কেবলমাত্র তাহাদের অপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তিদের দয়ার দানের উপর নির্ভরশীল না হইয়া নিজেদের শ্রম এবং স্বল্প-পরিমাণ অর্থ একত্র জড়ো করিয়া তাহাদের শিশুদের একান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে পারে। এমনি ভাবে বহু সজাগ এবং সমাজ-সচেতন জন-সমষ্টি বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের চেষ্টায়ই বিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং শিশুবাগ গড়িয়া তুলিয়াছে। কল্যাণকর্ম্মের এই গণ্ডীকে প্রশস্ততর করিবার জন্ত আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে। বস্তুতঃ এই ধরনের হিতকর্ম্মের অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে যদি পরস্পরের হাতে হাত মিলাইয়া সমাজ-সেবাকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। জাতি হিসাবে এখনও আমরা সমবায় পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিবার উপযোগী শক্তি অর্জ্জন করি নাই, কিন্তু এই নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন —কেননা ইহা ছাড়া যেমন আমাদের প্রকৃত মূল্যনির্দ্ধারণের অনুশীলন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ হইবে না, তেমনি আমাদের প্রচেষ্টাসমূহও ফলপ্রদভাবে কার্য্যকরী হইবে না। বস্তুতঃ সমবায়মূলক কর্ম্মের নেহাইয়ের উপরেই ব্যষ্টি এবং সমষ্টির চরিত্র ও মতবাদ নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়া গড়িয়া উঠে এবং এমন কোনও সমাজ-কল্যাণকর্ম্মও নাই যাহাতে আমরা শিশু-সেবামূলক কৃত্য অপেক্ষা অধিকতর সার্থকতার সহিত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। এই ক্ষেত্রে অপরাপরদের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্ত আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং এই পরিষদের মত যে সকল সংস্থা যেমন 'ক্লিয়ারিং হাউস' তেমনি

যোগাযোগ স্থাপনকারী এজেন্টরূপে কাজ করিয়া থাকে সেগুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে আসিতেছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্ম্মে নিয়োগের সমস্যা—এতদ্ব্যতীত বিশেষ ফললাভ সম্ভবপর নয়। অবশ্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের উৎসাহক সেই সকল লোকের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না, যাঁহারা সমাজকর্ম্মকে কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন। কেননা, তাহা নির্ম্মমভাবে ঐ কর্ম্মক্ষেত্রের উপর গণ্ডী টানিয়া দিবে এবং অনেক স্বতঃপ্রবৃত্ত, নিষ্ঠাবান ও আদর্শবাদী কর্ম্মীকে করিবে নিরুৎসাহ। তাহা সত্ত্বেও একথা আমি ভাল করিয়াই উপলব্ধি করি যে, এই ক্ষেত্রে সংগঠনের স্তরে এবং প্রতিকার্য্য বহুবিধ দুরূহ সমস্যার সমাধানকল্পে গবেষণার ক্ষেত্রে—উভয়ত্রই বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অনেকে এটা বুঝিতে পারেন না যে, শিশু এমন একটি অত্যন্ত সুকুমার এবং জটিল জৈব সত্তা, কোন অজ্ঞ আনাড়ী লোকের দ্বারা যাহার যথোচিত তত্ত্বাবধান এবং শিক্ষাদান সম্ভবপর নয়। যে-কোনও সমাজে অথবা সম্প্রদায়ে সামাজিক শক্তিসমূহের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক ক্রিয়া যে কত জটিল সে সম্বন্ধেও তাঁহারা সমভাবে অনবহিত। এখন সযত্ন গবেষণা এবং প্রকৃত মূল্যনির্দ্ধারণ ব্যতীত এ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হওয়া আমাদের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর নয় যে, আমাদের কল্যাণেচ্ছা-প্রণোদিত কিন্তু ভ্রান্ত জ্ঞান-প্রসূত নীতি এবং কর্ম্মপন্থাসমূহের কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া, কি ব্যষ্টিগত কি কি সমষ্টিগত উভয় ভাবেই শিশুদের উপর হইয়া থাকে। সুতরাং আমি এমন একটি জাতীয় নীতির সপক্ষে ওকালতি করিব যাহা কর্ম্মীদের শিক্ষাদানকে দিবে উচ্চ অগ্রাধিকার। এই বিষয়টি প্ল্যানিং কমিশনেরও সুস্পষ্ট স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে এবং কমিশন কর্তৃক ইহার উপর গুরুত্বও আরোপিত হইয়াছে।

আমি আর আপনাদের সময় লইতে চাই না। আমি জানি না যে, আমি এমন কিছু বলিয়াছি কিনা যাহা ইতি-মধ্যে আপনারা অবগত হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যতটা দাবি করিতে পারি তদপেক্ষা ঢের বেশী এই সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন। কিন্তু আমাদের আসন্ন সমস্যা নূতন কথা বলা ততটা নয় যতটা সেই সকল আদর্শ এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার বাস্তব রূপায়ণের জন্য তৎপর হওয়া যেগুলি ইতিমধ্যেই কি এই দেশে কি অনুরূপ সমস্যাসমূহের সম্মুখীন অন্যান্য দেশে উভয়ত্রই অনুমোদিত হইয়াছে। সুতরাং আসুন এই পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা আগাইয়া চলি।*

* 'দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারে'র ন্যাশনাল কনফারেন্সে' শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারীর ভাষণ।

বাউল গান

শ্রীকামিনীকুমার রায়

বাউল গান সংগ্রহের দিকে অনেকদিন হইতেই সুধী-সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই এই গানের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। আমি এখানে আমার বিবিধ সংগ্রহ হইতে কয়েকটি বাউল গান পাঠক-পাঠিকাদের পরিবেশন করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাজিগ্রামনিবাসী শ্রীশ্যামসুন্দর শীল হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত। শ্যামসুন্দর নিজে বাউল নহেন, কিন্তু তাঁহার এই সত্তর বৎসর বয়সে বহু বাউলের সঙ্গে তিনি ঘুরিয়াছেন এবং তাঁহাদের মুখে বাউল গান শুনিয়া শুনিয়া স্মৃতিপটে সেগুলি ধরিয়া রাখিয়াছেন।

বর্ত্তমানে অবসরমুহূর্ত্তে, কখনও বা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই স্বাভাবিক কণ্ঠে দুই-একটি মাত্র গান গাহিয়া থাকেন। তিনি অতি সরল ভাবেই স্বীকার করেন, এই সকল গানের গূঢ়ার্থ তিনি জানেন না, জানিতে কখনও চেষ্টাও করেন নাই। বাউলদের সংস্রবে যাইবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল, বাউল গান তাঁহার ভাল লাগে, তাই আনন্দের খোরাক হিসাবেই এই গান তিনি শিখিয়াছেন এবং গাহিয়া থাকেন। এই সকল গানের কথা আপাত দুর্ব্বোধ্য হইলেও যে গভীর তত্ত্ব ইহাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, সুর তাহার প্রকৃত বাহন রূপে তাহা শ্রোতার অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছাইয়া দেয়।]

১

আপন দেশে যে জন বসে
চিন্‌তে পারে আপনারে
ধন্য বলি তারে।
বিজাতি এক অধিকারী
বিলাতে আসল বাড়ী
কলিকাতা হয় কাচারি
হুগলী নদীর পাড়ে।
লাকসাম হইতে লাইন খুলিয়ে
বাহাত্তর হাজার আমদানী মাল
রপ্তানী হয় করাচী বন্দরে।
উত্তরে নেপাল ভুটান
পশ্চিমে বেলুচিস্থান
দক্ষিণে লঙ্কাপুরী
মণিপুর পুব ধারে।
আর এক খানা আছে জানা দিল্লীপুর শহরে
খাট্‌বে না তার আইনের বিচার
তাহার নিকট কুচবিহারে।
আপন দেশ গয়া কাশী
সদায় বাজে শঙ্খ বাঁশী
হরিদ্বারে শব্দ করে, শুনা যায় কানপুরে
লণ্ডন থাইক্যা চাইয়া দেখ
সিন্ধু নদীর পাড়ে।
গঙ্গা আর যমুনা মিলে
ত্রিবেণী নামটি ধরে।
সোনার ভারত হইল মুরদ
জালালুদ্দিন চিনল নারে
মেয়ে মেয়ে বেচাকেনা
রমণীর বাজারে।

২

ছাড়িলে এই দেশ
পাবিনে উদ্দেশ
কেন ঘুর' দেশ বিদেশ
ঘরে আইলে না।
কাম ক্রোধ লোভ মায়া
এই সমস্ত ছাইড়া দিয়া
মাইবা ঘরেতে বস যাইয়া
মনরে আমার।
আসিয়া ঘরের দুয়ারে
ডাকিতেছে তোমারে
তুমি থাক দূরে দূরে
কাছে আইস না।
ঘরের ভিতর ঢুকলে পরে
দেখতে পারবে নজর কইরে
হায়রে কলিকাতা শহর
চিড়িয়াখানা।
(কত) হস্তী বাঘে খেলা করে
সাপ পলায় ময়ূরের ডরে
ফুল বাগিচা সরোবরে
আজব কারখানা।

ঢাকার নবাবের বাড়ী
তিনি থাকে দিল্লীপুরী
মণিপুরে তার কাচারি
সঙ্গে দুইজনা।
দুই পাশে দুই ফেরেস্তা
আইন মত করে ব্যবস্থা
দোয়াত কলম কাগজের বস্তা
সঙ্গে রাখে না।
মণিপুরে বইছে কর্ত্তা
যাইতে অতি সোজা রাস্তা
মাল বিকাইছে অতি সস্তা
ডাইনে পাশে ডাকাইত
দালান বাড়ী করছে পাকা
বাকী রাখছে না।
হায়রে কলিকাতা শহর
জলের উপর বান্‌ছে ঘর
করিতেছে থর থর
ঠিক থাকে না।

৩

পারঘাটায় মানুষ কি আর মারা যায়।
ঘাটে লাগাইয়া তরী, আশাগাড়ি,
বইসে ভাবছ কিনারায়।
জোয়ার ভাটা যে নদীতে
আসা যাওয়া সেই পথেতে
মানুষের স্তন মিশাইয়া
মনের মানুষ ধরা যায়
বালুচড়ায় কুম্ভীরের ভিড়
শেষে পাবে পথের উদ্দিশ
দিবে হলদি গায় মাখিয়ে
ভব নদীর পাড়ে গিয়ে
কুম্ভীর পৃষ্ঠে পাড়া দিয়া
সহজে পার হওয়া যায়।
আলেকচান কয় মনরে সোনা
কোন্ নদীর জল হয় যে লোনা,
কোন্ নদীর জল মাখন ছানা
হংস হইয়ে ভেসে যায়।
পারঘাটায় কি…

৪

আজগবি কল গহুর চান্দের ঘরে।
চৌদিকে ব্রহ্মাণ্ডের খবর
আন্‌ছে প্রেম তারে।
রসের খাম্বা প্রেমের তার,
দেখতে লাগে চমৎকার,
আনন্দে ভুবন শোভা করে।
যে ধইরাছে আসন তারে
ঝড় বাতাসে পায় না তারে,
ভবনদী পার হইয়া যায়
তারে তারে তারে।
না জাইনে মোর তারের কল,
কাম-তারে খোয়াইলে বল,
এমনি রসে শরীরের বল তাই ঝরে (?)
প্রেমের বাক্স নাক্সাকার
মধ্যে আছে চক্রাকার
এক টিপেতে সব শহরের
খবর কইতে পারে।

৫

নবদ্বীপে এল নূতন গোমস্তা।
হরির নাম সম্বলে, যে জন চলে
বাণিজ্যে সোজা রাস্তা।
নৌকা খোল নিষ্কপটে,
লাগাইয়া সুজনার ঘাটে
মাল কিনিও ভবের হাটে
রসিকজনার নিকটে।
কত বিজারা মাল হাটে আসে,
খরিদ করলে ঠেকবে শেষে,
লাভ হবে না কিন্তু শেষে
আসলে হবে খাস্তা।
পরমহংস পুঁজ মাত্র,
শ্রীগুরু মূলাধার পাত্র
জমা খরচ দেশকালপাত্র
রাইখ অতি পরিষ্কার।
হরেকৃষ্ণ হরি বইলে
দিত প্রেমের প্রসার খুইলে
ভাবের ভাবী গায়ক পাইলে
খুইলে দিত প্রেমের বস্তা।
মাণিকচান কয় রাজ বেপারী,
হাটে গেলে নয় বেপারী
খুব হুসিয়ারে প্রেম বাজারে
করতে হয় দোকানদারী।
আসলের ধন চুরি হইলে
ঠেকবে রে নিকাশের কালে,
নিবেরে যমরাজায় জেলে
ঘটবে বিষম ব্যবস্থা।

শোভা সেন
সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন
লাক্স
টয়লেট
সাবান
"একমাত্র বিশুদ্ধ সাবানই
এত শুভ্র হতে পারে"
তিনি বলে থাকেন
লাক্স টয়লেট সাবান বিশুদ্ধ। এই সাবানটার দুধের মত শুভ্রতাই আপাত দৃষ্টিতে এর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। এই শুভ্র বিশুদ্ধ সাবানটী নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি দেখবেন সরের মত মোলায়েম, সুগন্ধী এই ফেণা কি ভাবে আপনার ত্বকের যত্ন নেয়... কি ভাবে ত্বককে সুন্দর করে তোলে! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে এবং খরচ সাশ্রয়ের জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।
LUX
TOILET SOAP
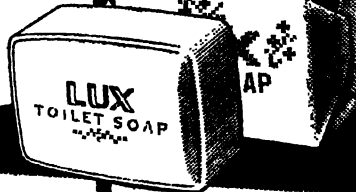
রবীন্দ্র-সঙ্গীত

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠসঙ্গীতবিদ্দের সমপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আসন এ কথা বলতে কোনও বাধা নেই। এখানে আমি তাঁকে শুধু সঙ্গীত-বিদদের কোঠায় ফেলে আলোচনা করতে চাই না, আমি বলতে চাই সঙ্গীতস্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' পাঠে জানা যায়, বাল্যকালে তিনি ওস্তাদী সঙ্গীতের আব-হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। একথা বলাই বাহুল্য সে যুগে আজকের মত আধুনিক সঙ্গীত জন্মলাভ করে নি। কীর্তন, বাউল আর শ্যামাসঙ্গীত অবশ্য ছিল, কিন্তু সে-সব মুখ্যতঃ বৈরাগী ও সাধকদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। ওস্তাদরা সে যুগে সঙ্গীত-শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ভারতীয় সুরবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলতেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে সে পদ্ধতি যে বেশ স্থায়ী আসন নিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট গানগুলিতে। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার তাঁর কবি-মনে সে সময় বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি এ প্রভাব তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত ছিল—তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন পরিণত বয়সে যখন তাঁর কবিচিত্ত যথেষ্ট বিকশিত হয়ে উঠেছে, বাংলার মৃত্তিকা, আকাশ, বাতাস অফুরন্ত শ্যামলিমায় যখন তিনি অনুভব করলেন বাংলা দেশের গান হবে বাংলারই মৃত্তিকাসঞ্জাত, বাউলের একতারার সুরঝঙ্কার আর কীর্তনের আখরে যখন তিনি তন্দ্রাবিষ্ট—তখনও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে সকল গানের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতকেও তিনি ধরে রেখেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সাহায্যে সঙ্গীতের ভিৎকে দৃঢ় করতে হবে। হয়ত তিনি বুঝেছিলেন, স্বরসাধনায় সিদ্ধি-লাভ করতে হলে প্রাচীন রীতিকে মেনে নিতে হবে। তাঁর প্রথম জীবনের অমর গানগুলিতে তিনি পূর্বের দেওয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের

সুর বজায় রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। পরে কীর্তন, বাউল সুরকে সম্মানের আসনে তিনি বসিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের সুরকে বিদায় দেন নি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাই শুধু মনে হয় বার বার—আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মাধুর্যের উপাসক। এর মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন সত্য শিব আর সুন্দরকে। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মাধুর্য যেমন তিনি মেনে নিয়েছেন, তেমনি পরিণত বয়সের গানগুলির সঙ্গে প্রচলিত পল্লী-গীতি সুরের মিতালিও ঘটিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যেখানে মাধুর্য সেখানে সৌন্দর্য, সেখানেই আনন্দ—সর্বোপরি সঙ্গীতের চরম সার্থকতা।

সমন্বয় তাই আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। শুধু কানের পরিতৃপ্তি বা সাময়িক তৃপ্তিবিধানই সঙ্গীতের ধর্ম নয়, এর কাজ সুদূর-প্রসারী। মনকে ভাবের প্রাচুর্যে ভরিয়ে দেয় গান। এই জন্যে সঙ্গীতের সুর, তান, ছন্দ, লয় যেমন তার অঙ্গ তেমনি বাণীও তার একটি অঙ্গ। এই অঙ্গটিকে পরিপুষ্ট করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

এই কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এত সমাদর লাভ করতে পেরেছে। তাই দেখতে পাই আজ অর্ধশতাব্দী ধরে এই সুসম্পূর্ণ সঙ্গীত শুধু যে বাংলায় ঘরে ঘরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তা নয় ভারতের, চতুর্দিকে এর প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী—তাই শুধু কীর্তন আর বাউল সুর নয়, নানারূপ সুরের মিশ্রণে তিনি এক বিশিষ্ট সঙ্গীত-তরঙ্গেরও সৃষ্টি করলেন। ভাষা, কাব্য, সাহিত্য, ভাস্কর্য—যে-কোনও শিল্পই হোক না কেন সবই যুগে যুগে তার রূপে, তার ছন্দে নূতনত্ব এনেছে। সঙ্গীত কেন তবে এক বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থাকবে। সঙ্গীতকে তাই তিনি নূতন রূপ দিলেন—এক কথায় বলা যায় 'মুক্তি'। সঙ্গীতের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এই পরিবর্তনের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। এই থেকেই যুগে যুগে সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ ঢঙ আর বিশেষ বিশেষ ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

কালের মন্দিরা বেজে চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে—তার সঙ্গে সুরেরও হয়েছে পরিবর্তন। প্রকৃত স্রষ্টা কখনও পুরাতনকে আকড়ে ধরে থাকতে পারেন না। সৃষ্টির ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বৈচিত্র্যকে করেন আহ্বান।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বৈচিত্র্যের মূর্ত্ত প্রতীক। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা অভাব ছিল—সেটা হচ্ছে বাণীর অভাব, যেমন সুর তার উপযোগী তেমনি বাণী ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের এই অভাব পূরণ করেছেন। ভাব আর সুরের অপূর্ব

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মত উচ্চ পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যায় কি না? আমার মতে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত অবশ্যই ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে। তার কারণ—রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সবকিছুই আছে। এই সঙ্গীত হচ্ছে সুরের অক্ষয় ভাণ্ডার। পূর্ববর্তী কালে রচিত তাঁর গানগুলি, যেমন—"মন্দিরে মম কে," "কমল মুকুলদল খুলিল", "শুনলো শুনলো বালিকা" "বিদায় করেছ যারে নয়নজলে", "তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে", "মরণ তুঁহু মম শ্যাম সমান" প্রভৃতি অসংখ্য গান ক্লাসিক্যাল রীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ সুরে সংগঠিত। এর পর তিনি লোকগীতিতে আকৃষ্ট হন, আকৃষ্ট হন বাউল আর কীর্ত্তনে। সেই সকল সুরেও তিনি গান বেঁধেছেন। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। রুচি অনুযায়ী বেছে নেওয়া যায় তাঁর গান।

এ কারণে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সকল সঙ্গীতশিক্ষার্থীর পক্ষে আয়ত্ত করতে বার বার চেষ্টা না করার, বা নির্বাচন না করার কোনও কারণ দেখি না। যাঁর যে দিকে রুচি তিনি সে ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত থেকে তাঁর ইচ্ছামত গান নির্বাচন করে নিতে পারেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই অপরিহার্য।

এমন প্রাণবন্ত চিত্তদ্রাবক সঙ্গীতের আরও প্রসার ঘটুক এই কামনাই সকল সঙ্গীতবিদের হৃদয়ে যেন জাগরূক থাকে।

———

ডালডা
আমার
পক্ষে
ভালো
ডালডা মার্কা বনস্পতি
দিয়ে রান্না করুন
শুধু রান্নার জন্যই ভালো নয় — পুষ্টিকরও বটে!

ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চা ও কোষ্ঠী-বিচারের সূত্রাবলী—

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ত্রী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য দশ টাকা।

প্রাচীন ভারত জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সকল ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ তাহাদের অন্যতম। জাতকের জন্মকালে তাহার জন্মস্থানের আকাশে, ভ-চক্রে রব্যাদি নবগ্রহের—পাশ্চাত্ত্য-মতে হার্শেল (প্রজাপতি), নেপচুন (বরুণ) ও প্লুটো (রুদ্র) এই তিনটি গ্রহেরও, অবস্থান হইতে তাহার জীবনের ফলাফল নির্দ্দেশ ফলিত জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না তাহা লইয়া বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই। কিন্তু বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্প্রতি শিক্ষিতসাধারণের অবজ্ঞামূলক মনোভাব দূরীভূত হইয়া কতকটা অনুরাগের লক্ষণ প্রকট হইতেছে। এই সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারঙ্গম শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল মহাশয় জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক এই বিরাট গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া এক মহান্ কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই পুস্তকে স্বল্প পরিসরের মধ্যে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত ভারতে ফলিত জ্যোতিষচর্চ্চার যে চিত্তাকর্ষক এবং ধারাবাহিক ইতিহাস—ইহা আংশিক ভাবে প্রথম প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়—প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে লেখকের জ্ঞানের পরিধি এবং তথ্যপরিবেশন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনার পথিকৃৎ হইবার গৌরব বাগল মহাশয়ই প্রথম অর্জ্জন করিলেন। তাঁহার এই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতে ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা শুরু হয় প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋগবেদের কাল হইতে। লেখক বলিতেছেন—"ঋগবেদের সময় মাত্র ফলিত জ্যোতিষের জ্ঞান সাধারণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।"

মিশর দেশে প্রথম রাশিচক্রের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে, লেখক যুক্তিতর্ক এবং প্রমাণ-প্রয়োগে তাহার নিরসন করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, রাশিচক্র প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ভারতবর্ষে এবং গ্রীসের মাধ্যমে ইহা পাশ্চাত্ত্যে প্রচারিত হইয়াছিল। লেখক বলিতেছেন—"বস্তুতঃ নানা প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহাই অনুমান করা সঙ্গত হইবে যে, ভারতীয় আর্য্যগণের সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের প্রস্রবণ গ্রীকদেশের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিল-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া ইউরোপে বেগবতী স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়াছিল।" (পৃ. ৮)। ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রীক এবং আরবীয় জ্যোতিষের প্রভাব সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া সামান্য নাড়াচাড়া যাঁহারা করেন তাঁহারাই দ্রেক্কাণ (Decanate) শব্দটির সহিত পরিচিত আছেন। ইহা মূলতঃ মিশরীয় ভাষার শব্দ। গ্রীক এবং ল্যাটিন জ্যোতির্ব্বিদগণ মিশরীয় জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে এই শব্দটি ধার করেন, পরে ভারতীয় জ্যোতিষেও রাশির এক-তৃতীয়াংশ বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দশম ভাব বুঝাইতে ব্যবহৃত "মেষূরণ" এবং মূল কেন্দ্র অর্থে প্রযুক্ত "কণ্টক" (kentra শব্দের রূপান্তর) শব্দদ্বয়ও মূলতঃ গ্রীক শব্দ। বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর জ্যোতিষিগণ যে তাজিক জ্যোতিষ হইতে বর্ষপ্রবেশ গণনা করিয়া থাকেন তাহা আরবের দান। "আরবী "তাজিক" গ্রন্থ নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।" এমনি ভাবে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষের স্বকীয়তা এবং পরবর্ত্তীকালে গ্রীস, রোম, আরব, প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের জোতিষশাস্ত্রের প্রভাবে ইহার 'বিকৃত রূপ' এ দুয়েরই সঙ্গে গ্রন্থকার সাকল্যের সহিত পাঠকসাধারণের পরিচয়সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতিষের এই আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শুধু যে আমাদের কৌতূহলই নিবৃত্ত করে তাহা নয়, জাতীয় গৌরব সম্বন্ধেও আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে।

ঐতিহাসিক দিকের কথা ছাড়িয়া, এবার কোষ্ঠীবিচারের সূত্রাবলী সম্বন্ধে আলোচনায় লেখক যে মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দিই। এ বিষয়ে বর্ত্তমান পুস্তকের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত আরবীয় মঞ্জিল বা নক্ষত্রচক্র এবং চৈনিক সিউ বা নক্ষত্রচক্র, প্রাক-মিশরীয় রাশিচক্র, জাপানী রাশিচক্র ইত্যাদির চিত্র। এই সমস্ত ইতিপূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানবিষয়ক কোন বাংলা গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট

স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
L. 263-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রীক জ্যোতিষী টলেমীর মতে গ্রহগণের শুভ এবং পাপ সংজ্ঞা, গ্রহগণের জড়ধর্মী কারকতা এবং পিথাগোরাসের সূত্রানুসারে সপ্তগ্রহের প্রভাবে স্বরসপ্তক সম্পর্কিত আলোচনা পাঠকদের সমক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা নূতন দিক উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

পুস্তকখানির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের যাবতীয় জটিল বিষয় বিশদভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বহু জ্যোতিষিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের ন্যায় সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে অনাবশ্যক ভাবে ভারাক্রান্ত এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য করিয়া তোলা হয় নাই। অষ্টম অধ্যায়টি—যাহাতে বরাহের 'বৃহজ্জাতক', 'বাদরায়ণ জাতক' কল্যাণবর্ম্মার 'সারাবলী' 'মুশ্রুতসংহিতা' প্রভৃতি অবলম্বনে যৌন নিয়মরক্ষা সম্পর্কে জ্যোতিষিক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত দম্পতিকে সযত্নে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ইহাতে গ্রহপ্রভাবে সুসন্তানের জন্ম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে যৌন উদ্দীপনার কারণ ইত্যাদি বিষয় এমন সহজবোধ্য ভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, সাধারণ পাঠকেরও অনায়াসে বিষয়জ্ঞান জন্মিবে। স্ত্রী-জাতক (সপ্তদশ) অধ্যায়ে দম্পতির পারস্পরিক প্রীতির আকর্ষণ, স্বামী এবং স্ত্রীর মনের সাম্য লক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সারগর্ভ জ্যোতিষিক বিচার-সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক বিবাহিত নরনারীর অনুধাবনযোগ্য।

পরিশিষ্ট সহ একবিংশতি অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থে উপরোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়া গ্রহফল, নক্ষত্রফল, রাশিফল, দ্বাদশ ভাব বিচার, গোচরফল বিচার, বিংশোত্তরী ও অষ্টোত্তরী দশা বিচার ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশে চন্দ্রস্ফুট অনুযায়ী বিংশোত্তরী ভোগ্য দশা, অষ্টোত্তরী দশার সারণী, বিষুবকাল বা Sidereal Time এবং মানবের শরীরচিহ্নাদি দ্বারা জন্মপত্রিকা গণনাপদ্ধতি প্রদত্ত হওয়াতে গ্রন্থখানি শুধু সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণই নয়, জ্যোতির্বিদগণের পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়কও হইয়াছে।

জ্যোতিষ গুরুমুখী বিদ্যা। প্রাচীন ভারতে গুরুর প্রমুখাৎ শুনিয়া শিষ্য এই বিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিতেন। এই বিষয়বস্তু অনুযায়ী পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটটি খুবই সুসঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চার গৌরবোজ্জ্বল দিনের—অদিতিকালের পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বিষুবমিলনের সময় কৃতযুগের আবির্ভাবের আদিমতম জ্যোতিষচর্চ্চার নিদর্শনের চিত্র। বালগঙ্গাধর তিলক এবং আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ মনীষিগণ ৮০০০—৫০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ইহার কাল নির্ণয় করিয়াছেন। অদিতিতে যে যজ্ঞের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি বহু ঋকমন্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে।

কালপুরুষের অঙ্গবিভাগের (পৃ. ১৭১) যুক্তিগত ভিত্তিপ্রদর্শনের ছবিটি গ্রন্থকারের মৌলিক পরিকল্পনার পরিচায়ক। কালপুরুষের মস্তকোপরি রাশিচক্রের চিত্রে বর্ত্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে বিষুবরেখার উপর মেষরাশিকে স্থাপনপূর্ব্বক পর পর দ্বাদশ রাশির চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া তিনি বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই মূল্যবান গ্রন্থের নিন্দা করিতে যদিও মনে সরে না তথাপি—'কৃতকার্য্য লাভ', 'উদ্দেশ্য সফলকাম হইল', 'নিজের আত্ম-পরিচয়' প্রভৃতি ইহার কয়েকটি ছোটখাটো ভাষাগত ত্রুটির দিকে আমরা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে পুস্তকখানি শুধু পূর্ণাঙ্গ নয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া বাহির হইবে।

ভারতে জ্যোতিষচর্চ্চা ও কোষ্ঠী-বিচারের সূত্রাবলী রচনায় লেখক যে বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন, শ্রমশীলতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ জ্যোতিষে গভীর ব্যুৎপত্তি, বিচার-নৈপুণ্য এবং বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ঐকান্তিক যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে রচিত এই গ্রন্থখানি আকরগ্রন্থের মর্য্যাদালাভ করিয়াছে, ইহার দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে—আগামী বহু বৎসর ইহা জ্যোতিষশাস্ত্রালোচকদের দিগদর্শনের সহায়ক হইবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

জলধর সেনের আত্মজীবনী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। ৫ বর্ত্তক পাবলিশার্স। ৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

জলধর সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তিনি যখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তার আগে 'হিমালয়' ও 'প্রবাসের পত্র' পড়ে আমরা এই পরিব্রাজকের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলাম। মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে মুগ্ধ হই। কখনও কারুর প্রশংসা ছাড়া নিন্দা শুনি নি তাঁর মুখে। তিনি ছিলেন উদার আত্মভোলা মানুষ। সুদীর্ঘকাল সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করার ফলে তাঁর মধ্যে একটা উদাসীন মনোভাব যেন স্থায়ীভাবে আসন নিয়েছিল। দুঃখে-বিপদে তাঁকে সর্ব্বদা অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে-সম্পদে বিগতস্পৃহ দেখেছি। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে তিনি কখনও সচেতন ছিলেন না। পরোপকার ও আর্ত্ত মানবের সেবাই ছিল তাঁর ধর্ম্ম। পাগল হরনাথের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন তিনি। গৃহী হয়েও তিনি একান্তভাবে গৃহগত-প্রাণ হতে পারেন নি। কিন্তু গৃহস্থের কর্ত্তব্যে তাঁকে কখনও অবহেলা করতে দেখি নি। সাধকের লক্ষণ ছিল তাঁর মধ্যে। আমরা তাঁকে "দাদা" বলতাম। সাহিত্য-সমাজে তিনি ছিলেন সকলেরই জলধর দাদা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করে জলধর

সেনের অনুরাগী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। লেখক "জলধরদাদা"র নিজের মুখে তাঁর ছেলেবেলার কথা থেকে সুরু করে কাঙাল হরিনাথ ও লালন ফকিরে প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত বিবিধ গল্প শুনে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন; 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় এই কাহিনীগুলি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

আত্মকথা ছাড়াও এই গ্রন্থখানির শেষে জলধরদার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংশ্লিষ্ট করায় পুস্তকখানি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লিখিত জলধর সেনের সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য 'পরিশিষ্ট' রূপে সংযুক্ত হওয়ায় বইখানি অধিকতর মূল্যবান হয়ে উঠেছে। একদা বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে রসিকজন-সমাজে যিনি আপন চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি উপহার দিয়ে লিপিকার একটি মূল্যবান সাহিত্যকৃত্য সম্পাদন করেছেন বলে মনে করি। বইখানির রচনা-কৌশল উপভোগ্য।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রামকমল সেন ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

এখানি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত ৭২তম গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' কিংবা 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ছাড়াও বাংলায় বহু কৃতী সন্তানের জীবনবৃত্তান্ত আধুনিক যুগের সামনে ধরিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়দ্বয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। ইহাদের দানেও সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা সমৃদ্ধ। পুস্তকগুলির বৈশিষ্ট্য হইল—অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর-স্ফীত উচ্ছাসপূর্ণ স্তুতিগান এগুলিতে নাই, কল্পনা-রঞ্জিত ঘটনার সমাবেশও চোখে পড়ে না—শুধু মানুষ ও তাহার কর্ম্মকৃতির তথ্যপূর্ণ বিবরণে এক একটি চরিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বাংলা দেশ এবং বাঙালীকে জানিতে হইলে তাহার নানাদিক প্রসারী কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও সদ্গুণরাশির বিবরণ জানা প্রয়োজন। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র গ্রন্থগুলি এই দিক দিয়া এক একখানি চমৎকার দর্পণস্বরূপ। আত্মবিস্মৃত বাঙালীর সামনে এইগুলি সাজাইয়া দিয়া রচয়িতারা অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

নীল পাখী—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

"ব্লু-বার্ড" মরিস ম্যাটারলিঙ্ক কৃত পৃথিবীখ্যাত একখানি রূপক নাটক। বাংলা ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন—শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযামিনীকান্ত সোম। কিন্তু গল্পের আকারে সর্ব্বপ্রথম ইহার রূপদান করেন শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩১ সালে। সম্প্রতি এখানির তৃতীয় সংস্করণ চলিতেছে।

রূপক নাটক—ছোট ছেলেরা তো দূরের কথা—বয়স্কেরাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। বিষয়ের সঙ্গে মূল সুরটিকে বজায় রাখিয়া কিশোর-চিত্তোপযোগী করিয়া সে জিনিস পরিবেশন করাও কম কঠিন নহে। অথচ শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অত্যন্ত অনায়াসে সাবলীল ভাষায় কাহিনীটিকে চিত্তহারী ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। নীল পাখী হইল আনন্দ। স্বপ্নে ও জাগ্রতে এই আনন্দ আয়ত্ত করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিতেছে। এখানে পৃথিবীর সমস্ত শিশুর প্রতিভূস্বরূপ দুটি ছোট ছেলেমেয়ে পদে পদে বাধা ও বিরোধ ঠেলিয়া আনন্দলাভের জন্য যাত্রা করিয়াছে। এই আনন্দ-সন্ধান-কাহিনীটিকে লেখক সুকৌশলে সর্ব্বজনের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

করে দেখ—(দ্বিতীয় খণ্ড)। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ২৯৪।২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ সিকা।

বিজ্ঞানের প্রতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য হাতে-কলমে শিক্ষণীয় কতকগুলি বিষয় বইটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলি একাধারে আনন্দবর্দ্ধক এবং শিক্ষাপ্রদ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফায়ার এলার্ম তৈরীর ব্যবস্থা, কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা, ডিমের লাটু, পৃথিবীর ঘূর্ণনের পরীক্ষা, চুম্বকের খেলা, জলের উপাদান বিশ্লেষণের ব্যবস্থা, গাছে ইচ্ছামত ফল ধরানো, মাছ কি জলে ডুবে মরে প্রভৃতি বিষয়গুলির উল্লেখ করা যায়। শুধু কিশোররা নয়—বড়রাও এই প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা প্রমোদিত ও উপকৃত হইবেন। বলা বাহুল্য, বইখানির প্রথম খণ্ড বহু কিশোর-কিশোরীকে উৎসাহিত করায় দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে—পরিষদের উদ্দেশ্যও সার্থক হইয়াছে।

পথ্যবিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ। বঙ্গজ্যোতি প্রকাশকমণ্ডলী। ২৩৮-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। মূল্য তিন টাকা।

সুনির্ব্বাচিত পথ্য যে রোগ আরোগ্যের পরম সহায়ক—এটি সর্ব্বকালের চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকে। ঔষধ না খাইয়া শুধু পথ্যের

নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খেলনা ফেলতো·
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো।
নির্ম্মলার বাসা
মা এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
মুন্নার খেলনাটা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
ভোবলো কিন্তু কি পরিস্কার করে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খেলনা নিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ· আর তোমার তোয়ালে· টাও নিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে-
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
কিন্তু আমি তো আছড়াইনা, - আমি যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনী ফেঁসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছাড়েই পরিস্কার করে কাচে – আর সেইজন্যে কাপড় টেঁকেও বেশী দিন।
সত্যিই! সানলাইট সাবানে বিনা আছাড়েই সাদা আর ঝকঝকে পরিস্কার হয়-কাপড় টেঁকেও বেশী দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেকসই করে।
S. 234-X52 BG

বিধান মানিয়া ছোটখাটো রোগ বা উপসর্গ আরাম হয়, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে পথ্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটি উপদেশ দেওয়া বা নেওয়ার সুযোগ বড় একটা হয় না, অজ্ঞতাও ইহার অন্যতম কারণ। অভিজ্ঞ চিকিৎসক আলোচ্য পুস্তকখানিতে বহুদিনের এই অভাবটি দূর করিয়াছেন। পথ্য সম্বন্ধে তিনি শুধু দীর্ঘদিনব্যাপী অভিজ্ঞতার কথাই বলেন নাই, বিভিন্ন রোগ অনুযায়ী আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পথ্যগুলির বিচার, শ্রেণীবিভাগ, খাদ্যমূল্য প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বইখানি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রতি গৃহস্থ-ঘরে রাখার উপযোগী।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাঙালী জাতি পরিচয়—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ। সাহিত্য সংস্থা, ১৪৩।১, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

বঙ্গসমাজ বহু জাতিবর্ণে বিভক্ত। এক এক জাতির মধ্যে আবার বহু শাখাপ্রশাখা। এক ব্রাহ্মণের মধ্যেই রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, আচার্য্য, সপ্তশতী প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে। এত জাতিবিভাগ বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। রক্ষা এই, এখানে দক্ষিণের মত 'পঞ্চম' নাই। এই গ্রন্থে শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তিলি, কর্ম্মকার, তন্তুবায় কংসবণিক, উগ্রক্ষত্রিয়, কুম্ভকার, সূত্রধর, তাম্বুল-বণিক, মাহিষ্য, নাথ বা যোগী, সচ্চাষী, কপালী, এবং নমঃশূদ্র—এই আঠারটি জাতির পরিচয় দিয়াছেন। এই জাতি-পরিচয় দিতে গিয়া গ্রন্থকারকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, বহু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, বহু পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সহিত প্রত্যেক জাতির গোত্র, পদবী ও শ্রেণীর কথা লেখক আলোচনা করিয়াছেন, জাতির উদ্ভব এবং ঐতিহ্যের কথাও বলিয়াছেন। শুধু অতীত লইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, বর্ত্তমানে এই সব জাতির শিক্ষাদীক্ষা কিরূপ, বৃত্তি কি, কর্ম্ম কি, ইহাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি কাহারা, কাহারাই বা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এইরূপ বহু জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বিভিন্ন সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে নানাবিধ সামাজিক বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৬০ পৃষ্ঠার হইলেও বইখানি বহু তথ্যে সমৃদ্ধ। যাঁহারা সমাজতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে নানা ভাবে সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন। বইখানি সুলিখিত। সাধারণ পাঠকও নানা বিষয় জানিতে পারিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীশ্রীসর্ববানন্দ জীবনালেখ্য—শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পাতিপুকুর, সাধুর বাগান, কলিকাতা—২৮। মূল্য আড়াই টাকা।

সর্ববিদ্যাসিদ্ধ মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দনাথ বাংলার শাক্তসম্প্রদায়ের মুকুটমণি। তাঁহার অলৌকিক সিদ্ধিবৃত্তান্ত তৎপুত্র শিবনাথ "সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—তাহা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাঁহার জীবনালেখ্য এতকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল—গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে এই অভাব মোচন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মহাপুরুষের বংশধর এবং বিশেষ আবেগসহকারে ও প্রচুর অনুসন্ধান করিয়া অত্যাপি হিমালয়ে অলৌকিকভাবে জীবমান উক্ত মহাপুরুষের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিবনাথের গ্রন্থে নাই এইরূপ অনেক বৃত্তান্ত ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনা বাংলার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—কিন্তু শক্তিসাধকের জীবনী বাংলা ভাষায় অত্যন্ত বিরল। আমরা তজ্জন্য সাদরে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি কৃষ্ণানন্দ পূর্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনীও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থটি মুদ্রাকরপ্রমাদ ও অশুদ্ধির হাত এড়াইতে পারে নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যা দেখেছি ও শুনেছি তার কিছু—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। এস্. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ৫৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ১৭২। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকারের বয়স এখন তেয়াত্তর বৎসর। এই দীর্ঘ জীবনের কাহিনী তিনি অতি সরল ও সহজ ভাষায় সংক্ষেপে এই পুস্তকখানিতে পরিবেশন করিয়াছেন। তিনি সুবিখ্যাত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের অন্যতম ভ্রাতা। একটি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মপরিবারে তাঁহার জন্ম। পরিবার বৃহৎ হওয়ায়, এবং দীর্ঘকাল বিভিন্ন স্থলে সরকারী শিক্ষা-বিভাগে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত থাকায় গ্রন্থকার নানা ধরণের লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং বিবিধ সমাজকল্যাণকর কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজের কথাপ্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ও তিনি কিছু কিছু লিখিয়াছেন। বইখানি সুপাঠ্য। একটি শতকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপী এই জীবনে অনেক জ্ঞাতব্য এবং শ্রোতব্য ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা সাধারণ পাঠকেরও ভাল লাগিবে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। বর্ত্তমান বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষে এই ধরনের বইয়ের বিশেষ উপযোগিতা আছে পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রাজকন্যা—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সিগনেট বুক শপ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ধূলি-মলিন এই জীবনের পথ; তবু কবির চোখে সেই চিরন্তনী রাজ-কন্যার স্বপ্ন। তারই আভায় প্রতিটি মুহূর্ত মায়াময়। ফুল পাতা পাখী তার রহস্যপুরীর খবর নিয়ে আসে, বিশ্বভুবন তার রূপের রাজ্য।

"আমলকী মহয়াশাখায়
মেতেছে 'বসন্তবৌরী' হরিয়াল।
ঘণ্টা বাজে গরুর গলায়
টুংটাং। পাতা ঝরে। কী জীবন ছড়ানো এখানে।"

এমনি সর্বব্যাপী জীবন-স্পন্দন অনুভব করেছেন কবি।

জনতার সঙ্গীত নয়, সৌন্দর্য্যপ্রেমিক একটি নিভৃত সুর-সাধনার পরিচয় রয়েছে এই কাব্যে। মৃদু কোমল সুর নেশা ধরিয়ে দেয় মনে, চার পাশের কলরব স্তিমিত হয়ে আসে।

"......অনেক মরুতৃষ্ণা নিয়ে ফিরে
যখন ভাবি বিজন ঘরে অন্ধকার তীরে
উছলে পড়ে কেবল জল ছল-ছলানি সুর"

তখন ক্ষণেকের জন্যে ভুলে যাই কলকাতার এই কঠিন বাস্তব পরিবেশ। কবিও ভুলে যেতে চান। যে গ্রামের বুকে কেটেছে তাঁর বাল্য আর কৈশোর:

"তার নদী মাঠ বন আলো হাওয়া মুক্ত আকাশের
স্মৃতি যে পাগল করে।"

কত সময়ে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর হৃদয় মিলে গেছে এক সুরে। 'পল্লীর একটি দুর্যোগের রাত্রি':

"বর্ষায় বিক্ষুব্ধ রাত্রি সর্ব্বহারা এখানে কান্নায়
ভেঙে পড়ে"

কবির অন্তরেও শুনি তারই ধ্বনি:

"আমারো বুকে কী কান্না—পূব থেকে পশ্চিমের দিকে
গাছের শাখার মত ঝড়ের অক্ষর যায় লিখে।"

সুরহীন কাব্যপরীক্ষার যুগে এমন সুরময় কবিতার সন্ধান পাওয়া পাঠকের সৌভাগ্য।

বাঙলা সাহিত্য-পরিচয়—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রত্ন-সাগর গ্রন্থমালা, ৭-জে পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তার ইতিহাস-রচনার এবং রস-বিচারের প্রতি লেখক ও পাঠক-সমাজের আগ্রহ বাড়ছে। আলোচ্য গ্রন্থে আদি এবং মধ্যযুগের কিয়দংশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব্বগামী ঐতিহাসিকগণের কাছ থেকে উপকরণ নিয়ে গ্রন্থকার সেগুলি ছাত্রগণের তথা সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে সযত্নে গুছিয়ে বলেছেন। প্রথমে বাংলাদেশ, তার অধিবাসী এবং বাংলা লিপির পরিচয় দিয়ে তিনি মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ-কাব্যের বিবরণ দিয়েছেন। অল্পের মধ্যে যাঁরা তথ্যসংগ্রহে অভিলাষী তাঁরা বইখানি পড়ে উপকৃত হবেন।

উদ্বাস্তু সংহিতা—স্বামী রুদ্রচৈতন্য। অশোক লাইব্রেরী। ১৫।৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা।

অধ্যাত্মভাবমূলক কয়েকটি পত্রের সমষ্টি। লেখক উদ্বাস্তুরূপে পূ পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। সেই কারণে তাঁর বইয়ের নাম উদ্বাস্তু-সংহিত

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপ

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প—শ্রীনারায়ণ ম বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা দাম তিন টাকা।

দেশবিভাগের ফলে বাঙালীর জীবনে এক মহা সমস্যা ও সঙ্কট উ পূর্ব্বাংশের যে মানুষগুলি তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ও আর্থিক স্ব পরিত্যাগে বাধ্য হয়ে পশ্চিমাংশে এসে বসবাসের একটু ঠাঁই ও জী কোন উপায়ের জন্য আকুল, এই সমস্যা ও সঙ্কট তাঁদের জীবনে বেশী। আবার এঁদের মধ্যে যাঁরা পি. এল. অর্থাৎ সরকারী দা উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁদের জীবন যেন অনড়। স্থায়ী বসবাসের একটু আশ্রয় ও জীবিকা অর্জ্জনের একটি নিশ্চিত পথ—এ দুটির প আশা তাঁদের নেই। গ্রন্থখানির উপজীব্য—পশ্চিমবঙ্গের এক অঞ্চলের সরকারী পি. এল. ক্যাম্পবাসী এই সকল হতভাগ্য। কিন্তু রচনায় কাহিনী যতটা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী আছে সেখানকার স কর্ম্মচারিগণের। বস্তুতঃ প্রধান চরিত্রগুলিই ইঞ্জিনীয়ার, ঠিকাদার, প্রভৃতি। জনৈকা পরমাসুন্দরী, নিঃসহায়া তরুণী ক্যাম্পবাসিনী ও ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে রোমান্স এবং পরিশেষে উভয়ের উদ্বাহবন্ধনে হওয়ার ঘটনা সমগ্র রচনাটির উপর বেশ একটা সুষমা করেছে। হতভাগিনী, সর্ব্বক্ষেত্রে নির্য্যাতিতা, নিষ্কলুষ ও স্বল্প কুসুমের করুণ কাহিনীটি সংযোজনের উদ্দেশ্য যেন গ্রন্থের ক বৃদ্ধি। এই কাহিনীটি পৃথক একটি বড় গল্পের চমৎকার উপ যা হউক, লেখক সকল চরিত্রই বাস্তব জীবন থেকে সংগ্রহ করে নিপু সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান হয় বুঝি বা কোন একটি চরিত্রের অন্তরালবর্ত্তী। কাহিনীটির অধিকাংশ চ "টাইপ"। তাই তাদের কোথাও পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন নেই। তারা পাঠকের মনকে পীড়া দেয় না, কৌতুক ও আনন্দরসের সৃষ্টি যেমন প্রৌঢ় ও বেপরোয়া সঞ্জীব চৌধুরী। লেখকের ভাষা ঝরঝরে, বে ও শ্রীসম্পন্না।

গ্রন্থখানি পাঠককে যেমন আনন্দ দেবে তেমনি চিন্তার খোরাক যোগ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মেলা

শ্রীপ্রভাতেন্দুশেখর মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বুদ্ধের সম্বোধিলাভ
সাঁচি স্তূপের পূর্ব্ব তোরণের "রিলিফ"

সাঁচি স্তূপ

[ফোটো—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ গুপ্ত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
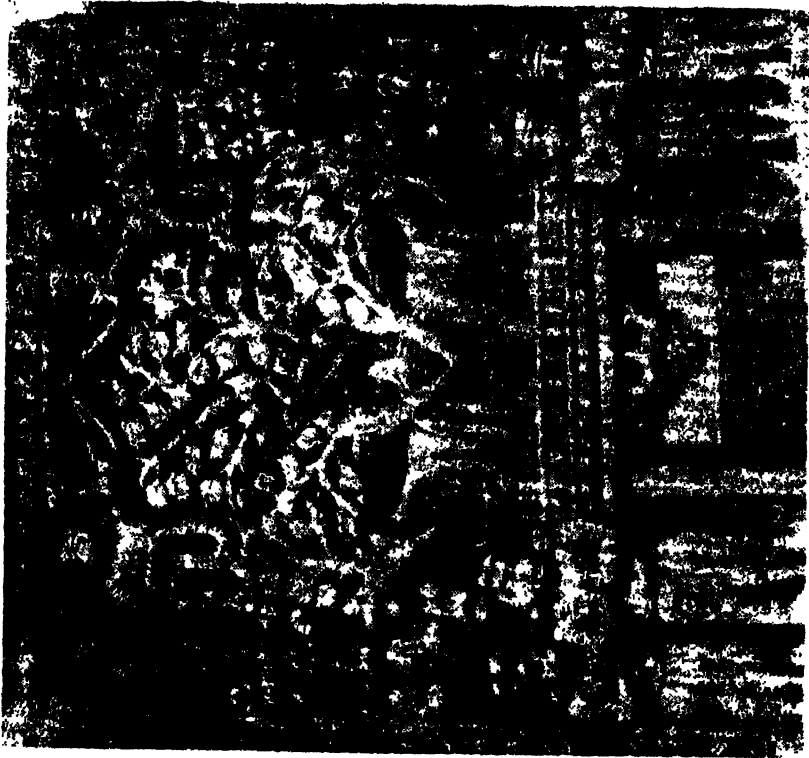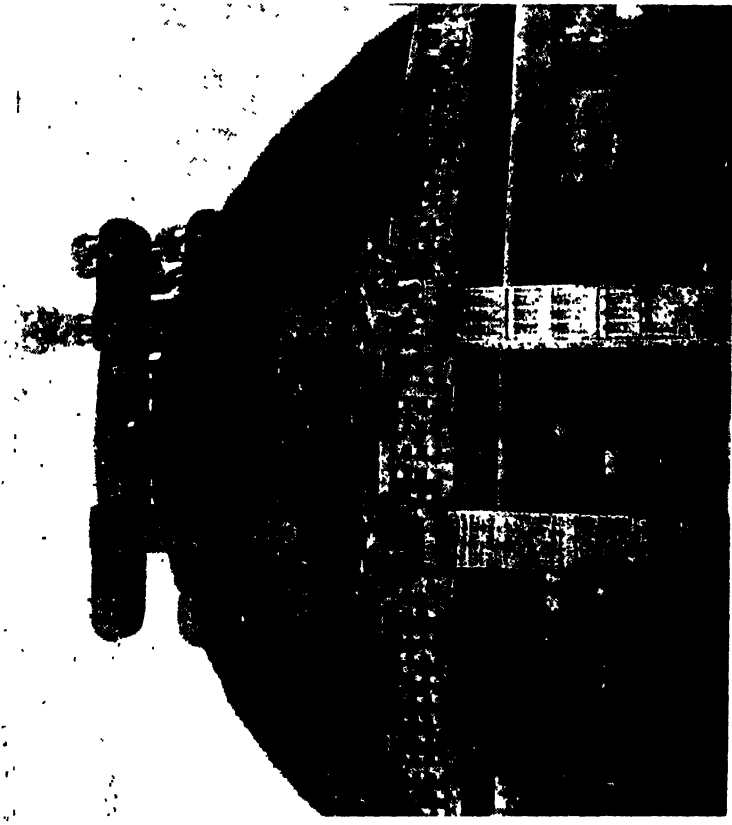
৬৩শ ভাগ
২য় খণ্ড } কার্ত্তিক, ১৩৭৩ { ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শারদীয়া

আনন্দের পূজা আগতপ্রায়। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আজ যে দুর্দৈবের অভিশাপ পড়িয়াছে তাহাতে আনন্দও যেন বিষাদমিশ্রিত, অবসাদপূর্ণ। একে ত দেশের লোক সম্বিৎহীন ও অবসন্ন-হৃদয়, উপরন্ত এই বিষম বিপদ। লক্ষ লক্ষ নরনারী আশ্রয়হীন, আর্ত্ত, ভয়বিহ্বল। এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

তবুও আমাদের শক্তির আবাহনে মনে বল আনিতে হইবে, যাহাতে বিপদের সম্মুখে আমরা হতচৈতন্ত না হইয়া পড়ি। দৃঢ় চিত্তে মনে রাখিতে হইবে এই বাঙালীর অগ্নিপরীক্ষা। মনে রাখিতে হইবে এই পূজায় আর্ত্তের সেবা ও দরিদ্রনারায়ণের পূজাই হইবে চরম আরতি ও আহুতি।

প্রতি বৎসর এই সময়ে দুঃখ-দ্বন্দ্ব, ভয়-ক্লেশ সবকিছু ভুলিয়া আমরা বিমল আনন্দ উপভোগ করি। এবার লক্ষ লক্ষ গৃহহারা দুর্ভাগার পক্ষে কোনই উপায় নাই, যদি না আমরা নিজের আনন্দের অংশ মুক্তহস্তে তাহাদের দিয়া পূজা সার্থক করি।

আর্ত্তের পরিত্রাণে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবশ্য পালন করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি আমরা পাইয়াছি, কিন্তু যেরূপ ব্যাপকভাবে বন্যার প্রকোপে দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহাতে শুধু সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এবারকার পূজায় সকলেরই উচিত নিজেদের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া আর্ত্তত্রাণে সাহায্যদান। এ বিষয়ে কলিকাতার নাগরিকগণ ইতি-মধ্যেই অনুরোধ পাইয়াছেন, অন্যত্রও এই আবেদন প্রচারিত হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

বহুদিন পূর্ব্বে, যখন দেশ স্বাধীন ছিল না তখন, উত্তরবঙ্গের প্লাবনের ধ্বংসলীলা হইতে সেই অঞ্চলের লোককে পরিত্রাণ করার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উদ্যোগী হইয়া এক সমিতি সংগঠন করেন। দীর্ঘদিন সেই সমিতির স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে। এখন প্রয়োজন সেইরূপ বহু সমিতির।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

রাজ্য পুনর্গঠনের ত শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আর যে ঐ ভাবে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা মনে হয় না। এখন আমাদের উচিত একটা হিসাব-নিকাশ করার, যে, আমরা কোথায় দাঁড়াইয়া আছি। সম্মুখেই ত নির্ব্বাচন, সে সময় প্রত্যেক নির্ব্বাচনপ্রার্থীই দেশ ও দশকে স্বর্গে তুলিবার প্রতিশ্রুতি দিবেন। কিন্তু নির্ব্বাচন শেষ হইলেই ত পাঁচ বৎসরের মত নিশ্চিন্ত। তখন কে কাহার খোঁজ রাখে? অথচ উপযুক্ত প্রতিনিধির অভাবে এই বিভক্ত ও অভিশপ্ত বাংলা যেরূপে প্রতিপদে বঞ্চিত হইয়াছে এরূপ আর কোনও প্রদেশ হয় নাই।

আমাদের চিন্তা করার শক্তি যদি এখনও থাকে তবে আমাদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমরা সমষ্টিগতভাবে অনুন্নত জাতির পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িব। আমাদের ছিল শিক্ষা ও বুদ্ধির গৌরব। শিক্ষার যে কিরূপ দুরবস্থা তাহা আমরা এই সংখ্যায়ই অন্যত্র দেখাইয়াছি।

দেশের চাষীর কিছু উন্নতি হইয়াছিল ধান-চালের মূল্যবৃদ্ধিতে এবং চাষের উন্নতিতে। তাও ত আজ লক্ষ লক্ষ চাষী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল বন্যায়। দেশের শ্রমিক ত প্রায় সবই অবাঙালী এবং দেশের শ্রমিক নেতাদিগের কার্য্যকলাপে দেশে নূতন কোনও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা দুষ্কর, পুরনো যাহা ছিল তাহাও ত ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। কোন পথে এই অবস্থা হইতে দেশকে ফিরাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ কি আমাদের নাই? মিলিয়া পরামর্শ করার আপত্তি নাই নিশ্চয়। মনে হয় আজও আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারি প্রাচীন গৌরব, বাঙালীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহার হৃত আসনে, যদি শুধু ভাবোচ্ছ্বাসে বিভ্রান্ত না হইয়া আমরা ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কারে দেহ-মন নিয়োগ করি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, পথিকৃৎ যদি কেহ ডাক দেয়, তবে দেশের লোক সাড়া দিবে, কেননা গালভরা স্লোগানে ও উন্মার উচ্ছ্বাসে দেশকে যে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা এখন সকলেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশই আক্ষেপ ও বিলাপে সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি চাহেন, কিন্তু কিছু লোক পথও খুঁজিতেছেন। তাঁহাদের দলে যদি আমরা সকলে যোগদান করি, পথ পাওয়া যাইবেই।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন

ভারতীয় পার্লামেন্টে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনাকালে পণ্ডিত নেহেরু বলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা হইতে আরও ৪০ শতাংশ অধিক উৎপাদন করা প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৬·১৬ কোটি টন; সেই তুলনায় উৎপাদন হইয়াছে ৬·৫৮ কোটি টন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইতেছে এবং এ বৎসর দেশব্যাপী বন্যার প্রকোপে ঘাটতি আরও অধিক পরিমাণে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন-লক্ষ্য ৭·৫ কোটি টনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রধানতঃ শিল্পের পরিকল্পনা এবং কৃষি তথা শস্য উৎপাদন উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচের জন্য মোট খরচ হইবে ১,০৮৩ কোটি টাকা। ইহা মোট খরচের ২২·৫ শতাংশ। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচের জন্য মোট খরচ হইয়াছে ৮৫৮ কোটি টাকা এবং মোট খরচের ইহা ছিল ৩৪·৪ শতাংশ। মোট অর্থের পরিমাণে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনা হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২২৫ কোটি টাকা অধিক খরচ করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারেও অধিক পরিমাণে খরচ ধার্য্য করা হইয়াছে। যথা, বন্যা নিবারণের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় মাত্র ১৭ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য ১০৫ কোটি টাকা খরচ করা হইবে। সুতরাং কৃষির দিকে যথোপযুক্ত নজর রাখিয়া যদি শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে সরকার অধিকতর মনোযোগ দেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রকার কৃষি-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ১৫ শতাংশ, তৈলবীজ ২৭ শতাংশ, ইক্ষু ২২ শতাংশ, তুলা ৩১ শতাংশ এবং পাট ২৫ শতাংশ। সম্প্রতি কতকগুলি কারণে প্ল্যানিং কমিশন মনে করেন যে, খাদ্যশস্য উৎপাদনের নির্দ্ধারিত লক্ষ্য যথেষ্ট নহে; কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭·৫ কোটি টনে বৃদ্ধি পাইলেও দৈনিক গড়ে প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ১৮·৩ আউন্স করিয়া খাদ্য পাইতে পারিবে। ইহা প্রায় আড়াই পোয়ার সামিল। যদিও বর্ত্তমানের পরিমাণ হইতে এই পরিমাণ অধিক তথাপি ইহা অনুমান করা হইতেছে যে, ভবিষ্যতে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইলে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য কম হইবে। সেই কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ঘাটতি ব্যয়ের খরচ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অবস্থায় বস্ত্র ও খাদ্যশস্যের সরবরাহে প্রাচুর্য্য না থাকিলে কালোবাজারী ফাটকা বিস্তার লাভ করিবে। তৃতীয়তঃ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন অধিক হইলে ইহার রপ্তানী দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পক্ষে সুবিধা হইবে।

এই সকল চিন্তাধারায় পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মুসৌরীতে প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রীদের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশন জাতীয় অর্থনৈতিক দিক হইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, দুঃখের বিষয় যে, এই অধিবেশনের আলোচনা ইত্যাদি স জনসাধারণের গোচরের জন্য কিছুই প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা জনসহযোগিতা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আগ্রহ ও উ দেখান। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাপার জাতীয় অর্থনীতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্বন্ধে সকলেরই জানিবার অ আছে। এই অধিবেশনে একটি কার্য্যকরী কমিটি নিযুক্ত কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের নূতন লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য। এই ক প্রস্তাব করেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত লক্ষ্য প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইবে; সেই কারণে কৃষিদ্রব্যের উৎ নিম্নলিখিতভাবে বর্দ্ধিত হারে হওয়া প্রয়োজন: খাদ্যশস্য কোটি টন হইতে ৮·১৫ কোটি টন হওয়া প্রয়োজন, ইহা ব উৎপাদন হইতে ১·৬৫ কোটি টন অধিক। তুলার উৎপাদন লক্ষ গাঁইট হইতে ৫৮ লক্ষ গাঁইটে বৃদ্ধি পাইবে। কাঁচাপা উৎপাদন ৫০ লক্ষ গাঁইট হইতে ৫৫ লক্ষ গাঁইটে উন্নীত হইবে তৈলবীজ ৭১ লক্ষ টন হইতে ৭৮ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হই প্রথম সংখ্যাগুলি দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত লক্ষ্য। মু অধিবেশন নূতন প্রস্তাবিত লক্ষ্যগুলিকে গ্রহণ করিয় বলিয়া প্রকাশ। খাদ্যশস্য উৎপাদনের নূতন নির্দ্ধারিত বর্ত্তমান উৎপাদন হইতে ২৫ শতাংশ অধিক হইবে। সু পণ্ডিত নেহেরুর প্রস্তাবিত ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি গৃহীত হয় নাই, উচিত ছিল, কারণ বাস্তবতার দিক হইতে ইহা যথার্থ হই পণ্ডিত নেহেরুর অভিমতে আদর্শ কৃষি-খামারগুলিতে ৪০ শ শস্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং এই পরিমাণে খাদ্যশ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। কৃষি-অভিজ্ঞেরা বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রই দেশের সকল কৃষিক্ষেত্র নহে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিক ক্ষেত্রে এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যাবলী ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদ পরিমাণ কেবলমাত্র ২০ হইতে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আ কৃষি-ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা ব বুঝায় প্রয়োজনীয় সেচব্যবস্থা, সারসরবরাহ, ঋণপ্রদান ব্য এবং উচ্চতর কৃষিকার্য্যের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। এইগুলির অ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবেই আছে, সেই জন্যই কর্ত্তৃপক্ষ পরিকল্প লক্ষ্য আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে চান।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের কৃষিভূমির পরি সর্ব্বাধিক। অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিলের মোট ভূমির মাত্র শতাংশ ভূমি কৃষিযোগ্য; কানাডায় ৪ শতাংশ ভূমি কৃষিযো চীন ও রাশিয়ার মোট ভূমির ১১ শতাংশ কৃষিযোগ্য এবং আমেরি যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ শতাংশ জমিতে কৃষি সম্ভবপর। সেই তুল দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের মোট জমির ৪৫ শতাংশ কৃষিযো আবার মোট কৃষিভূমির পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। সোভিয়েট রাশি

কৃষিভূমির মোট পরিমাণ ৫৫·৬ কোটি একর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭·৮ কোটি একর এবং ভারতবর্ষের ৩৬·৬ কোটি একর। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষের জমির উৎপাদিকা-শক্তি অত্যল্প। ১৯৪৯ সন হইতে ১৯৫১ সনে ভারতবর্ষে একরপ্রতি গড়ে ৫৮৭ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সময়ে দেখা যায় যে, রাশিয়ায় একরপ্রতি গড়ে উৎপাদনের হার ৮৩০ পাউণ্ড। চীনদেশে ৮৭৪ পাউণ্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৯৪৯ পাউণ্ড। ১৯৫৩ সনে ভারতবর্ষে একরপ্রতি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

সুতরাং দেখা যায় যে, আধুনিক উপাদান দ্বারা জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর এবং সেই কারণে মুসৌরী অধিবেশনে নির্দ্ধারিত উৎপাদনের উচ্চতর লক্ষ্যগুলিকে কার্য্যকরী করার সম্ভাবনা আছে, যদি অবশ্য কৃষিব্যবস্থায় কতকগুলি উন্নতিসাধন করা হয়। কৃষি-ঋণের ব্যাপক প্রচলন হওয়া অতীব প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন পরিবহন-ব্যবস্থার বিস্তৃতি। কিন্তু মানবীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলেও ভারতীয় কৃষিকে একটি অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয় এবং ইহা হইতেছে মৌসুমী বায়ুর খামখেয়াল। দেখা গেল যে, মৌসুমী বায়ুর বিরুদ্ধে এখনও পর্য্যন্ত মানুষের কোনও বুদ্ধিই কার্য্যকরী হয় নাই। প্রকৃতির উপর বিজয়-গৌরবের আশা লইয়া বহু-বিঘোষিত নদী-পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু দিন দিনই যেন বন্যার প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে, আর এ বৎসর তো কথাই নাই। এখন বাংলা ও বিহারবাসী ভাবিতেছে, হায় দামোদর, তুমি ও তোমার পরিকল্পনাগুলি কোথায় গেল। দামোদর উত্তর দিতে পারিলে বলিত—টাকাগুলি অবশ্য বন্যার জলের মত ভাসিয়া গিয়াছে, তবে সমুদ্রে যায় নাই।

উৎপাদন-বৃদ্ধির আর একটি বড় প্রতিবন্ধ হইল ভারতের ভূমি-বন্টনের অব্যবস্থা। ভূদান দ্বারা যাঁহারা এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমানে নিশ্চয়ই নিরুৎসাহ হইয়াছেন। আর সরকারী ভূমিবন্টন-ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে, অন্ততঃ বাংলাদেশে। জমিদারী-প্রথা বিলোপের পূর্ব্বে কৃষিজীবীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ছিল ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক এবং এই সংখ্যা ভবিষ্যতেও থাকিয়া যাইবে। আইনের ফাঁক রাখিয়া ভূমিহীন কৃষকের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ত্তৃপক্ষ করিয়া দিয়াছেন। আইন করা হইয়াছে যে, প্রত্যেকে মাথাপিছু ২৫ একর করিয়া জমি রাখিতে পারিবে; ফলে জমিদারেরা ভাই, বোন, খুড়ী, মাসতুতো ভাই প্রভৃতির নামে ২৫ একর জমি দেখাইয়া সমস্ত জমিটাই নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়া দিতেছেন। পুরাতন কাঠামোই নূতন আকারে চালু করা হইল। ইহাতে বেকার কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎপাদন ব্যাহত হইবে।

কয়লার অভাব

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আসানি কয়লার অভাব হইতেছে; সম্প্রতি জুলাই মাস হইতে টনপ্রতি কয়লার মূল্য বৎসামান্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কয়লার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। বাংলা-বিহার কয়লাখনিগুলিতে ভারতের ৮০ শতাংশ কয়লা উৎপাদিত হয়। এই এলাকায় কয়লার মূল্য টনপ্রতি (প্রায় সাড়ে সাতাশ মণ) ৩৲ টাকা করিয়া ভারত সরকার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কারণ কয়লাখনির মালিকেরা তাঁহাদের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে খুচরা বিক্রেতারা মণপ্রতি চারি আনা করিয়া মূল্যবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কি হিসাবে তাহা অবশ্য তাঁহারা বলেন নাই। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়লা সরবরাহে অভাব পড়িতেছে, অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় কয়লা পাওয়া যাইতেছে না।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৯৬০টি কয়লার খনি আছে এবং ৪৭৫টি যৌথ কোম্পানী ইহাদের মালিক। কয়লা-শিল্পের মোট মূলধন ২২·৪২ কোটি টাকা এবং দৈনিক ৩,৪০,০০০ শ্রমিক কার্য্য করে। ১৯৫৫ সনে ৩·৮২ কোটি টন কয়লা উৎপাদিত হইয়াছে। কলিকাতায় অবস্থিত কোল কমিশনারের হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে চাহিদার তুলনায় কয়লা উৎপাদনে ঘাটতি আছে। কোল কমিশনারের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

(কোটি টন হিসাবে)

বৎসর	উৎপাদন	চাহিদা	বরাদ্দ	প্রেরণ (Despatches)
১৯৫০	৩·২৩	৩·৪৭	৩·৪৩	২·৭১
১৯৫১	৩·৪৪	৩·৭১	৩·৫০	২·৯২
১৯৫২	৩·৬৩	৩·৯০	৩·৪৭	৩·১১
১৯৫৩	৩·৫৯	৩·৭৫	৩·৬৩	৩·০৭
১৯৫৪	৩·৬৮	৩·৯৪	৩·৯০	৩·১৯

সর্ব্বভারতীয় শিল্প আদালত (কয়লার খনি বিবাদসংক্রান্ত) বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষে কয়লার আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনে ঘাটতি হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের পরিমাণ কি উপায়ে হিসাব করা হইল? এই পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তি খানিকটা কাল্পনিক হইতে বাধ্য। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি আভ্যন্তরিক সরবরাহে ঘাটতি পড়ে তাহা হইলে ভারতবর্ষ হইতে কয়লা রপ্তানী করিতে দেওয়া হয় কেন? ১৯৫২ সনে ভারতবর্ষ ২৫ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী করিয়াছে, অর্থাৎ ঐ বৎসরের উৎপাদনের প্রায় সাত শতাংশ আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়াছিল, ঐ বৎসর কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩·৬৩ কোটি টন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বৎসরে গড়ে ভারতের আভ্যন্তরিক কয়লার প্রয়োজন প্রায় ৩·৪০ কোটি টন। ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সনে প্রতি বৎসর প্রায় ১৩ লক্ষ টন করিয়া কয়লা রপ্তানী করা হইয়াছে।

এই কয় বৎসর কয়লার কোন অভাব হয় নাই ; হঠাৎ ১৯৫৬ সনের শেষের দিকে কয়লার অভাব হইতেছে কেন।

এই "কেন"র কারণ দেখা যায় যে, পরিবহন ব্যবস্থার অযোগ্যতা এবং অসামর্থ্য। ভারতীয় রেলপথসমূহের আঞ্চলিক বিভাগ ব্যবস্থার পর হইতেই কয়লা পরিবহন ব্যবস্থায় রেলপথের উদাসীনতা ও অযোগ্যতা প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছে। উপরের তালিকা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পরিমাণে কয়লা উৎপাদন হয় তাহার সমস্তটাই ব্যবহারের জন্ত খনি হইতে চালান দেওয়া হয় না। যুদ্ধের সময় হইতেই মালগাড়ীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে এবং ইদানীং সেই নিয়ন্ত্রণে প্রায় অরাজকতা সুরু হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যদিও নিয়ন্ত্রণের কাঠামো এখনও বজায় রাখা হইয়াছে। ১৯৫৫ সনের শেষে কয়লাখনিগুলিতে (pit-head) প্রায় ৩৬ লক্ষ টন কয়লা জমায়েত ছিল। ১৯৫৬ সনের যে মাসে কয়লাখনির মুখগুলিতে ৩৮·৩৪ লক্ষ টন কয়লা উদ্বৃত্ত ছিল।

সুতরাং বর্ত্তমান কয়লার অভাবের কারণ কম উৎপাদন নহে, এই ব্যাপারে সরকারী কৈফিয়ৎ সম্পূর্ণরূপে ভুল। কয়লার অভাবের জন্ত দায়ী রেল পরিবহন ব্যবস্থার অযোগ্যতা। পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান ভারতবর্ষের চেয়েও ছোট দেশ ; কিন্তু তাহাদের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ভারতবর্ষের চেয়ে অধিক। পোল্যাণ্ডের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৯ কোটি টন ; ফ্রান্সের ৫ কোটি টন এবং জাপানের ৪ কোটি টন।

সংখ্যাতথ্য সংগ্রহ

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্ভুল সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব অনেক। কমনওয়েলথ দেশগুলির পরিসংখ্যানবিদগণ সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনার জন্ত এবং তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নিমিত্ত সম্প্রতি লণ্ডনে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনের অধিবেশন চলে ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সম্মেলনে কমনওয়েলথের সকল দেশের প্রতিনিধি এবং এই প্রথম, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিরও প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। ইহা ছাড়া আইরিশ প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিসংখ্যান-দপ্তর এবং কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক কমিটি হইতে পর্য্যবেক্ষকগণও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার উদ্যোগে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইহা কমনওয়েলথ পরিসংখ্যানবিদদের চতুর্থ সম্মেলন—প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সনে লণ্ডনে, দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯৩৫ সনে অটোয়াতে এবং তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সনে ক্যানবেরাতে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে ব্রিটেনের সংখ্যাতথ্য গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে "জন কিংসলী" লিখিতেছেন : "ব্রিটেনে পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্ত দুইটি প্রধান গোষ্ঠী কাজ করিয়া থাকে একটি সরকারী ও একটি বেসরকারী। গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আছে যে, বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয় তাহাও সরকারী পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

"কিন্তু শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা না পাইলে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থার এতটা উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইত না। ব্রিটিশ শ্রমশিল্প ফেডারেশন ও অন্তান্ত শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান যে কাজ করেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লৌহ ও ইস্পাত ফেডারেশনের মাসিক বুলেটিন ও অন্তান্ত অনুরূপ বিশেষ ধরনের সাময়িক পত্রী সরকারী পত্রিকাদির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জাহাজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 'লয়েডস রেজিষ্টার' ও ব্রিটিশ চেম্বার অব শিপিং-এর সঙ্কলনসমূহ বিশ্বের সর্ব্বদেশে ব্যবহৃত হয়।"

অবশ্য প্রচলিত পরিসংখ্যানের অধিকাংশই সংগৃহীত হয় সরকারী প্রচেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরখানা হইতে সংগৃহীত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর। এই দপ্তর 'মান্থলী ডাইজেষ্ট অব ষ্ট্যাটিষ্টিক্স', 'ইকনমিক ট্রেণ্ড' এবং 'এনুয়াল অ্যাবষ্ট্রাক্ট অব ষ্টাটিষ্টিক্স' এই তিনটি প্রধান পত্রিকা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত করে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের অন্ততম প্রধান কাজ হইল জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ও জাতীয় আয়-ব্যয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্তসার এবং শ্রমশিল্প উৎপাদনের মাসিক হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করা।

মিঃ কিংসলী লিখিতেছেন : "মার্চ্চ মাসে বাজেটের প্রারম্ভে জাতীয় আয়ের প্রাথমিক হিসাব এবং আগষ্ট মাসে বার্ষিক বিবরণীতে জাতীয় আয়ের বিশদ হিসাব প্রকাশিত হয়। এই হিসাবগুলি বর্ত্তমানে বহু সমস্যা বুঝিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে, কারণ লভ্য সম্পদ ও তাহার ব্যবহার সম্পর্কিত বিবরণাদি ইহার মধ্যেই পাওয়া যায়।"

যদিও ব্রিটেনের পরিসংখ্যান গ্রহণের পদ্ধতি কোন দেশ অপেক্ষাই নিম্নস্তর মানের নহে তথাপি উহার ক্রমোন্নতির জন্ত অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর 'ন্তাশনাল ইনকাম ষ্ট্যাটিষ্টিক্স—সোর্সেস এণ্ড মেথডস' নামক যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে ব্রিটেনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ হইবে।

মিঃ কিংসলী লিখিতেছেন : "সম্প্রতি ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ত্রৈমাসিক হিসাব প্রকাশিত হইবে এবং লগ্নী ও মজুত সম্পর্কে এবং পারিবারিক বাজেট সম্পর্কে আরও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জানেন যে নীতি-নির্দ্ধারণের ব্যাপারে পরিসংখ্যানকে কাজে লাগাইতে হইলে উহাকে কেবল ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য করিলেই চলিবে না, সহজলভ্যও করিতে হইবে।"

রাজ্য পুনর্গঠনের ফল

"আনন্দবাজার পত্রিকা" নূতন ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। আমরা নীচে তাহা দিলাম :

রাজ্য পুনর্গঠন আইন এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি হস্তান্তর আইন অনুসারে আগামী ১লা নবেম্বর হইতে ভারতীয় রাজ্যসমূহের সীমানা পুনর্নির্দ্ধারিত হইবে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে অন্ধ্র-প্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই ১৪টি রাজ্য লইয়া ভারত রাষ্ট্র গঠিত হইবে। ইহা ব্যতীত ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও থাকিবে। সেগুলি হইল—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, লাক্ষা দ্বীপ ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা।

'ক', 'খ', ও 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির পার্থক্য লোপ পাইবে এবং রাজপ্রমুখের পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে।

নিম্নে রাজ্যসমূহের সীমানা ও জনসংখ্যা দেওয়া হইল :

রাজ্য		সীমানা (বর্গমাইল হিসাবে)	জনসংখ্যা (কোটি হিসাবে)
পশ্চিমবঙ্গ	...	৩৩,২৭৯ (আনুমানিক)	২ কোটি ৬১ লক্ষ ৩০ হাজার
অন্ধ্রপ্রদেশ	...	১,১০,২৫০	৩ কোটি ২২ লক্ষ
আসাম	...	৮৪,৯২৪	৩ কোটি ৯০ লক্ষ
বিহার	...	৬৮,৮৩০ (আনুমানিক)	৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩০ হাজার
বোম্বাই	...	১,৮৮,২৪০	৪ কোটি ৭৮ লক্ষ
জম্মু ও কাশ্মীর	...	৯২,৭৮০	৪৪ লক্ষ
কেরালা	...	১৪,৯৮০	১ কোটি ৩৬ লক্ষ
মধ্যপ্রদেশ	...	১,৭১,২০০	২ কোটি ৬১ লক্ষ
মাদ্রাজ	...	৫০,১৭০	৩ কোটি
মহীশূর	...	৭২,৭৩০	১ কোটি ৯০ লক্ষ
উড়িষ্যা	...	৬০,১৪০	১ কোটি ৪৬ লক্ষ
পঞ্জাব	...	৪৬,৬১৬	১ কোটি ৬০ লক্ষ
রাজস্থান	...	১,৩২,৩০০	১ কোটি ৬০ লক্ষ
উত্তরপ্রদেশ	...	১,১৩,৪১০	৬ কোটি ৩২ লক্ষ

ট্রামকর্মীর হঠকারিতা
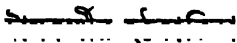
কয়দিন পূর্ব্বে বিনা নোটিশে, অতিশয় অন্যায় ও অযৌক্তিক ভাবে ট্রামের যে ধর্ম্মঘট হয়, সে সম্বন্ধে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র মন্তব্য আমরা আংশিকভাবে নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রমিক-নেতা এম-পি, মহোদয়ের মনস্তত্ত্ব বোঝার সম্বন্ধে "আনন্দবাজার পত্রিকা" তারিফ করিয়াছেন। কিন্তু এম-পি মহাশয় ত সাধারণ শ্রমিক-নেতা মাত্রেই যে কথা বলেন ও যেভাবে দলীয় স্বার্থ ও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের লোকের ক্ষতি করিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করেন না, তাহার বাহিরে কিছু বলেন নাই।

দেশের লোক যদি জড়ভরত হয় ও দেশের শাসনতন্ত্র যদি শিথিল হয় ত অন্য আর কি হইবে?

"সমগ্র শহরের পক্ষে উৎপীড়নমূলক অকারণ ধর্ম্মঘট হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য ট্রামকর্মীদিগকে সকল দিক হইতে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল, তাহার উত্তরে কর্মীরা জানাইয়াছেন যে, ধর্ম্মঘট তাঁহারা চালাইয়াই যাইবেন। একেবারে মনুমেণ্টের তলায় সভা করিয়াই তাঁহারা এ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ; সংশয়ের কোনও হেতু নাই। সুতরাং অসহায়ভাবে দুর্ভোগ ভূগিতে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া শহরবাসী-দের আর কোনও গত্যন্তর নাই।

"এ অবস্থায় আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। কলিকাতা শহর হইতে ট্রাম চলাচল একেবারে উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। পালাজ্বরের মত মধ্যে মধ্যেই ট্রাম ধর্ম্মঘটের ক্লেশভোগ করা অপেক্ষা ট্রাম চলাচল একেবারে না থাকা অনেক ভাল। লোকে জানিবে ট্রাম নাই ; তাহারা তদনুযায়ী আপনাদের কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া লইবে, আর ট্রাম না থাকিলে অন্যান্য উপযুক্ত যানবাহনও তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। শহরে যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয় লোকের সুবিধার জন্য, লোককে বিপাকে ফেলিবার জন্য নহে। ট্রাম-কর্মীরা যেরূপ নিত্য নিত্য ধর্ম্মঘটে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে শহরে ট্রাম চলাচল-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে লোকের বিপাকের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ট্রাম চলিবে এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া লোকে জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মে অগ্রসর হয়। অকস্মাৎ একেবারে অথৈ জলে পড়িয়া যায়।

"পনর লক্ষাধিক লোকের যাতায়াত-ব্যবস্থা এইভাবে খেয়াল-খুসিক বিপর্য্যস্ত করিয়া এবং লোককে অসহ্য দুর্গতির মধ্যে ফেলিয়া মনুমেণ্ট-তলায় সভায় নিতান্ত নির্লজ্জভাবে এই ধর্ম্মঘটের সমর্থনে জনসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। আরও নির্লজ্জের মত বলা হইয়াছে যে, "দেশের সম্মান" রক্ষার জন্য এই ধর্ম্মঘট করা হইয়াছে। "দেশের সম্মান" বস্তুটা নিতান্তই সস্তা হইয়া পড়িল দেখিতেছি। ট্রাম কর্ম্মচারীরা যে কয় দলে বিভক্ত তাঁহাদের মধ্যে 'কর্মী সঙ্ঘে'র প্রতিনিধি উক্ত সভায় বলেন যে, এই সময়ে ধর্ম্মঘট করা উচিত নহে। তাঁহাকে শ্লেষ ও উপহাস করিয়াই বসাইয়া দেওয়া হয়। ইহার উপর একজন অতি বুদ্ধিমান এম-পি নেতা ধর্ম্মঘটী-দিগকে ভরসা দিয়াছেন যে, কলিকাতার লোকেরা তাহাদের পশ্চাতে আছে, কারণ ব্রিটিশ কোম্পানীই ত এই ধর্ম্মঘট ঘটাইয়াছে! এম-পি নেতা মহাশয়ের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতার তারিফ করিতেছি, কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না, বেলগাছিয়ায় যে কর্ম্মচারীকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মঘটের উদ্ভব তিনি বিলাতী নহেন, খাস দেশী।

"ট্রামকর্মীরা যখন আপনাদের খেয়ালখুসিক এই যথেচ্ছ আচরণ করিয়া চলিয়াছেন তখন শহরের পনর লক্ষাধিক লোক এবং

বাহিরের আরও কয়েক লক্ষ লোক তাঁহাদের সেই- খেয়ালের নিগ্রহ ভোগ করিতেছে। নিত্যকার জীবনের যাতায়াতের প্রয়োজন ত রহিয়াছেই, তাহার উপর একদিকে বন্যা, অপরদিকে বাংলার ও বাঙালীর প্রধান জাতীয় উৎসব—পূজা। উভয় কারণেই যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। এক বন্যার দরুনই প্রায় গোটা শহরের লোককেই উদ্ভ্রান্ত হইয়া কত ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। কোন না কোন প্রকারে প্রায় প্রত্যেকেই এই দারুণ দুর্বিপাকের সহিত জড়িত। সংবাদ চাই, সাহায্য চাই, আরও কত প্রয়োজন। এই অবস্থায় ট্রাম ধর্ম্মঘটের দ্বারা স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত করা হইয়াছে। এ যেন জনসাধারণের উপর দণ্ড উদ্যত করিয়া বলা হইতেছে, 'আমাদের দাবি আদায় করিয়া দাও না হইলে এই দুর্ভোগ ভোগ কর।'

"কিন্তু অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া এই দুর্ভোগ ভুগিতে আমরা আর সম্মত নহি। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ইতঃপূর্ব্বেই আমরা একাধিকবার বলিয়াছি। সমাজের সকল কাজ সকলে না লইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি কাজ এমন আছে যেগুলি লইলে খুশিমত ধর্ম্মঘটের অধিকার থাকিবে না বা আদৌ ধর্ম্মঘটের অধিকার থাকিবে না। লোকের যাতায়াত-ব্যবস্থা সেইরূপ একটি কাজ। সমাজের পক্ষে নিত্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই ব্যবস্থার মধ্যে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কাজ লইবেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই লইতে হইবে যে, খুশী হইলেই তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান ধর্ম্মঘটের ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘটের সাধারণ নিয়ম পর্য্যন্ত পালিত হয় নাই। এ ধর্ম্মঘট কেবল লোকবিরুদ্ধ নহে, আইনবিরুদ্ধও বটে।"

বারো মাসে ছাব্বিশ হরতাল

পশ্চিম বাংলার একটি গুণ আছে। যদি কেহ কার্য্য বন্ধ করার প্রস্তাব দেয়, কারণ যাহাই হউক, তবে হাজার হাজার স্বেচ্ছাচারী "সেবক" মহানন্দে পরের কার্য্য পণ্ড নামিয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমরা লিখিয়াছিলাম।

বিগত হরতাল সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। "নিজের নাক কাটিয়া যাত্রাভঙ্গ" ব্যাপারে যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহাদের বিষয় আর কি লিখিব? দেশ ও দেশবাসীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীর আক্কেল হইবে না।

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ, শ্রী এইচ. সি. কর সহ ২৯ জন সলিসিটর ও এডভোকেট শ্রীমিহির ধর গুপ্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ তেওয়ারী সহ ৩১ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শ্রীসতীশচন্দ্র শা, শ্রীমনোহর গাঙ্গুলী সহ ৯ জন ব্যবসায়ী নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন:

"কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছেন। প্রত্যেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিকই মনে করেন যে, মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করা উচিত এবং তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সঙ্গত।

এই ধর্ম্মঘটের উদ্যোক্তারা যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে। এই ধর্ম্মঘট সফল হইলে কাজকর্ম্ম বন্ধ হইবে এবং উহার ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইবে। এই উৎপাদন হ্রাসের ফলে আরও ঘাটতি হইবে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে।

কর্ম্মীদের মজুরির ক্ষতি হইবে ও উহার ফলে তাহাদের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই ধর্ম্মঘটের ফলে জনসাধারণের অসুবিধা ত হইবেই, তাহা ছাড়া ক্রেতা ও শ্রমিকদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে। ঘন ঘন ধর্ম্মঘটের ফলে জনগণের মনে নিরাপত্তার ভাব নষ্ট হইবে ও অস্থিরতা দেখা দিবে, উহা আর্থিক ক্ষেত্রে কার্য্যসম্প্রসারণের বিরোধী। এই শ্রেণীর ধর্ম্মঘটের ফলে যদি পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে না ও উহার ফলে জনগণের দুর্দ্দশা ঘনীভূত হইবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ ও জনগণের ভবিষ্যতের দিক হইতে এই প্রকার ঘন ঘন বাধ্যতামূলক কর্ম্মবিরতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।"

অন্নাভাবের একটি কারণ

পশ্চিম বাংলা হইতে পাকিস্থানে চোরাই চালান এক বৃহৎ ব্যাপার। খাদ্যশস্য ত যাইতেছেই, উপরন্তু কাপড় ঔষধ চোরাই গহণাপত্র ধাতু ও ধাতব দ্রব্যাদি ত প্রতিদিন যায়। যাঁহারা এই চালান ব্যাপারে 'পালের গোদা' তাঁহাদের অধিকাংশেরই গায়ে মোটা কংগ্রেসী ছাপও আছে। পুলিস ত এই ব্যাপারে বিলক্ষণ দু'পয়সা পায়। সুতরাং "বিশিষ্ট কংগ্রেস এম-এল-এ", অরণ্যে রোদন করিয়া কি করিবেন? নিম্নের সংবাদ একটি নমুনা মাত্র:

"নদীয়া জেলার ভারত-পাক সীমান্তে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া কিছু-কাল যাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে চোরাই চালান চলিতেছে, তাহা এখনও অনেক স্থানে পুরাপুরি অব্যাহত আছে বলিয়া বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, এখনও রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া বহু পরিমাণ চাউল প্রত্যহ পাকিস্থানে পাচার হইতেছে।

আরও প্রকাশ, এক শ্রেণীর পুলিসের সহিত যোগসাজশ করিয়া একদল অসাধু ব্যবসায়ী এমন পটুতার সহিত এই জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী বেআইনী চোরাই কারবার চালাইতেছে যে, উহা বন্ধ করিতে বিধানসভায় স্থানীয় সদস্যগণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।

প্রকাশ, নদীয়া সীমান্তের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস এম-এল-এ সম্প্রতি চাউলের ঐরূপ চোরাই চালানের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই চোরাকারবার এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"

বন্যাপীড়িত পশ্চিমবঙ্গ

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দুই-তিন দিনব্যাপী প্রবল বারিপাতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ বন্যাপ্লাবিত

হইয়াছে। এই বন্যার প্রকোপ অভূতপূর্ব্ব। বন্যার ফলে প্রায় দশ লক্ষেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে নদীয়া, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী প্লাবনে, জীবন ও সম্পত্তির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বিশেষ ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। ফলে, জল কমিবার পরও তাহাদের দুর্দ্দশার কোন উপশম হয় নাই। সর্ব্বত্রই অন্নাভাব, জলাভাব এবং বাসস্থানের অভাব বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরই স্বাভাবিক নিয়মে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন স্বচক্ষে এই ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এই প্রচণ্ড প্লাবনে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দ্দশার এক চিত্র আঁকিয়া আড়াই কলমব্যাপী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ২১শে আশ্বিন কলিকাতার "যুগান্তর" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, বন্যার প্রত্যক্ষ ক্ষতি ছাড়াও পরোক্ষ ক্ষতির পরিমাণও কোন অংশে কম নহে। "...জল নামিয়া যাওয়ার পরে দুর্দ্দশা ও দুর্গতি অধিকতর ভয়াবহ ও বিপৎসঙ্কুল। ময়লা জল প্রবেশের ফলে পানীয় জলের কূপ ও পুকুরগুলি দূষিত হইয়া গিয়াছে; ক্ষেতে, পথে-মাঠে-ঘাটে মৃত পশুদেহগুলি পচিয়া দুর্গন্ধ ও বিভিন্ন মারাত্মক রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে। মশা ও মাছির উপদ্রব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, খাদ্যের অভাবে রোগ-বীজাণুর সঙ্গে যুঝিবার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, যানবাহন ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত। আর ব্যাপক দুর্দ্দশার ও ক্লেশের সুযোগ লইয়া মওকা লুটিবার জন্য ব্যবসায়ীরা পূর্ব্ব হইতে মজুত মালের দর চড়াইয়া দিয়াছে। এরূপ কার্য্যকলাপ এদেশে নিত্যনৈমিত্তিক হইলেও ইহা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের কি শোচনীয় অধঃপতনই না সূচিত হইতেছে। এই বিপর্য্যয় হইতে সঞ্জাত জটিল উপসর্গগুলি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া পড়িবে। মাত্র এক মাস পূর্ব্বে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বন্যার জন্য মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতি হইয়াছিল। এখন পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অংশে অন্যান্য জেলাগুলিও বিপন্ন হওয়ায় স্বাভাবিক ফসলের তুলনায় আগামী অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে অনেক কম আমন ফসল উঠিবে। গত বৎসরও এই রাজ্যে কম ফসল হইয়াছিল। সেজন্য গৃহস্থের ঘরে আদৌ কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আগামী বৎসর খাদ্যের ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী, সে সুযোগে দর চড়াইবার জন্যও চেষ্টার কসুর হইবে না। এ সম্পর্কে এখন হইতেই সরকারী তরফের সতর্কতা আবশ্যক। নতুবা আগামী বৎসর খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।"

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতি দমন সরকারের সম্মুখে এই দুইটি প্রধান আশু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তবে কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় যে এই বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে, "যুগান্তর" তাহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। জাতির এই গভীর দুর্দিনে সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য।

দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীসুখদেবপ্রসাদ বর্ম্মা একটি বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত বাঁধগুলি না থাকিলে পশ্চিমবঙ্গে বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ আরও অধিকতর ভয়াবহ হইত। অপরপক্ষে জনসাধারণের এক অংশ এই অভূতপূর্ব্ব বন্যা দেখিয়া নদী-পরিকল্পনাগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। "যুগান্তর" লিখিয়াছেন, "আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, ইহার মধ্যে কোন পক্ষই সাম্প্রতিক বন্যার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই। প্রথমে শ্রীবর্ম্মার অভিমতই আলোচনা করা যাউক। ডি. ভি. সি'র বাঁধগুলি নির্ম্মিত হইতেছে পশ্চিম বাংলা সীমান্ত পার হইয়া বিহারের এলাকায়। ময়ূরাক্ষীর কানাডা বাঁধও তথৈবচ—বিহারে সাঁওতাল পরগণা জেলার সীমান্তে। বিহার-রাজ্যের রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা কিংবা পালামৌ জেলার পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টি হইলে মাত্র সে জলটাই ঐ সকল বাঁধের মধ্যে আটক করা সম্ভব। কিন্তু আবহাওয়ার রিপোর্টে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বন্যার পূর্ব্বে ঐ সকল অঞ্চলে বৃষ্টির আদৌ প্রাচুর্য্য ছিল না। অতিবৃষ্টি হইয়াছিল পশ্চিম বাংলার জেলাগুলিতে, বাঁকুড়া-বীরভূম হইতে আরম্ভ করিয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও কলিকাতার দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত। সে জল বিহারের এলাকায় বিভিন্ন বাঁধে আটক করার কোন সম্ভাবনা ছিল না, আর সেরূপ দাবিও হাস্যকর। মাত্র আসানসোল মহকুমায় ও দুর্গাপুরের পশ্চিমদিকে ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি পরিমাণ অতিবৃষ্টির কতকটা জল দুর্গাপুরে নীচু বাঁধের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল—কিন্তু ডি. ভি. সি'র পক্ষে তাহাও সম্পূর্ণ আটক করা সম্ভব হয় নাই। ডি, ভি. সি'র উঁচু বাঁধগুলিতে অতিবর্ষণের জল মজুত না হইলেও যে সকল প্রচারবিশারদ এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে ডি. ভি. সি পরিকল্পনার সার্থকতা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎকট কল্পনাশক্তিকে তারিফ না করিয়া উপায় নাই। আর এই ব্যাপারে সবার উপরে টেক্কা দিয়াছেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, বন্যার জল আটক করার জন্যই বহু কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ বাঁধগুলি তৈয়ারি করা হইয়াছে কিনা? আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেই কি তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হইত? তাহা হইলে এই উপলক্ষে একটা ভুয়া কৃতিত্বের দাবি তুলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশের কারণ কি? অন্যদিকে, যাঁহারা এই বিপর্য্যয়ের মূলে ডি, ভি, সি'র বাঁধগুলির ব্যর্থতা অনুমান করিতেছেন—তাঁহারাও সুবিচার করেন নাই। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পশ্চিম বাংলার অতিবর্ষণের জলটা ঐ সকল বাঁধের মধ্যে আটক করা দুঃসাধ্য। অতএব বাঁধ দিয়া এই বন্যা রোধ করা সম্ভব ছিল না। বন্যা রোধ করাও বাঁধের উদ্দেশ্য নয়। বাঁধ দিয়া মাত্র বন্যার প্রচণ্ডতা হ্রাস করা যায়, কিন্তু উহা বন্ধ করা যায় না।"

সেই জন্য নদীগুলির সংস্কারসাধন করিয়া জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। উপসংহারে "যুগান্তর" লিখিতেছেন:

"বাঁধ তৈয়ারীর ও কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা-উন্নয়নের জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে—কিন্তু অতিরিক্ত জল হইলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথে সেটা নামাইয়া দেওয়ার উপযোগী ব্যবস্থাদির জন্য সে তুলনায় এক শতাংশ অর্থও ব্যয় হয় নাই, এমনকি এসম্পর্কে কোন পরিকল্পনাও নাই। ফলে, শুধু পশ্চিম বাংলা কেন—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, বোম্বাই, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক অঞ্চলেই নদীগুলির গর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া উঠিতেছে। আর প্রতি বৎসরেই কোন না কোন স্থানে ভয়াবহ বন্যা হইতেছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে উড়িষ্যার প্রচণ্ড বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি পরিদর্শনকালে পণ্ডিত নেহরু এই বিষয়টির গুরুত্ব উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তার পর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি নিজেও কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ের দ্বারা জলনিকাশের জরুরী প্রয়োজনই প্রকৃতি আর এক বার স্মরণ করাইয়া দিল। এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করিলে ভবিষ্যতে আরও গুরুতর বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। কর্তৃপক্ষ এখনও সতর্ক হউন।"

উত্তরবঙ্গে শিক্ষার উন্নতিসাধন

উত্তরবঙ্গে শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া ১৫ই আশ্বিন "জনমত" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে: "উত্তরবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২।০ বা ৩ জন। সুতরাং পশ্চিম বাংলার এই অনুন্নত অংশের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার যে ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উচ্চ শিক্ষা লইতে হইলে উত্তরবঙ্গবাসীকে কলিকাতায় ছুটিতে হয়। ব্যয়সাপেক্ষ এই শিক্ষার জন্য তাই উত্তরবঙ্গের সাধারণের আগ্রহ কম। কাজেই উচ্চশিক্ষার সকল সুযোগ যদি উত্তরবঙ্গে করিয়া দেওয়া যায় তবে জনসাধারণের আগ্রহ তাহাতে বাড়িবে এবং দ্রুত হারে উচ্চশিক্ষা সাধারণ লোক গ্রহণ করিবে।"

উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে প্রস্তাবিত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হইলে উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইতে পারে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "জনমত" লিখিতেছেন যে, সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া জলপাইগুড়িতেই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমীচীন। উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপর উপযুক্ত স্থান দার্জ্জিলিং—কিন্তু ব্যয়বহুল, দুর্গম এবং সকলের স্বাস্থ্যানুগ না হওয়ায় ঐ স্থানটি নির্ব্বাচন যুক্তিযুক্ত হইবে না। জলপাইগুড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমর্থনে যুক্তি দিয়া "জনমত" লিখিতেছেন: "উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় জলপাইগুড়ির সহিত বিভিন্ন স্থানের সংযোগ সহজ ও সুবিধাজনক। শহরটি উত্তরবঙ্গের মোটামুটি কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে স্থানলাভ সহজ হইবে, বর্ত্তমানে এখানে বাড়ী-লাভও সম্ভব হইবে। আর শিক্ষার যে পরিবেশ এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাহা বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। শিক্ষায় অনগ্রসর স্থানেই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি আর্থিক সাহায্য ও সহায়তা জলপাইগুড়ি হইতে বিপুলভাবে পাওয়া সম্ভব। চা-শিল্প সরকারকে যে কর দিয়া থাকে তাহার একাংশ হইতেই সমগ্র উত্তরবঙ্গের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা যায়। জলপাইগুড়ির চা-করগণ এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন।

বাংলার ছাত্র-ছাত্রী

পশ্চিম-বাংলার আশা-ভরসার আধার আমাদের সন্তান-সন্ততি। তাহাদের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ যে মানসিক বিকার দেখা দিয়াছে তাহার একটি তদন্ত বিশেষ প্রয়োজন। আংশিকভাবে সে কাজ শিক্ষা-বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মী যাহা করিয়াছেন তাহার বিবরণ নীচে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত হইল।

তদন্তে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা গভীর নৈরাশ্যজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয় সম্যক্‌ভাবে হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। শুধু মাত্র অনুযোগ অভিযোগ বা উপদেশে কোনও ফল হইবে না, কেননা রোগ বহু দূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রয়োজন অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিরূপণ ও পরিচালন। নহিলে জাতির ধ্বংস আর রোধ করা যাইবে না।

বিশেষজ্ঞদের এই কাজে লাগাইয়া, বিজ্ঞ লোকের ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদিগের সাক্ষ্য, এবং প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন:

আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য, নিয়ম না মানা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শিক্ষকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার অভাব, জীবনের গুরু এবং গভীর দিক অপেক্ষা চটুল ও হাল্কা বিষয়ের প্রতি ছাত্রসমাজের ঝুঁকিয়া পড়ার প্রবণতা প্রভৃতির ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা—এক কথায় সমাজের সকল স্তরের জন-সাধারণের মনে নিয়তিশয় উদ্বেগ ও গভীর হতাশার সঞ্চার হইয়াছে।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব গবেষণা সংস্থা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'আচরণ-সমস্যা' সম্পর্কে যে নমুনা তদন্ত পরিচালনা করেন, উহার ফলাফলে ঐ সমস্যার মৌলিক দিকটা উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঐ তদন্তকালে দেখা যায় যে, তদন্তের আওতাভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শতকরা ৯৪টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীই "শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর" এবং তাহাদের মধ্যে পড়াশুনায় অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা ছাড়া

গড়ে শতকরা ৮০টি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই আলস্য এবং দায়িত্বজ্ঞানের অভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলে ২৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐ তদন্ত পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে ৩০টি বালিকা বিদ্যালয়। ৫০০ জন শিক্ষক এবং ১৪০ জন শিক্ষয়িত্রী তদন্তকার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন।

তদন্তের পর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উহার ফলাফল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহাতে লক্ষ্য করা যায় যে, উল্লিখিত সমস্যাগুলি ছাড়াও গালমন্দ করা, অশ্লীল কথা বলা অথবা লেখা, স্কুল পালানো, কুসঙ্গ, যৌন অপরাধ-প্রবণতা, অপরের উপর দোষারোপের প্রবৃত্তি, বিনা কারণে ক্লাসের সহপাঠীদের বিরক্ত করা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেদের মধ্যেই অধিকতর সক্রিয়। ছাত্রীদের মধ্যে ধূমপান এবং জুয়াখেলার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরাই সাধারণ নৈতিক এবং চারিত্রিক মান বজায় রাখিতে অধিকতর আগ্রহশীল।

কিন্তু ছাত্রীদের মধ্যে যে সকল প্রবণতার আধিক্য লক্ষিত হয় তন্মধ্যে ঔদ্ধত্য, অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব করাইবার আকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার, বিবাদপ্রবণতা, অপরের কুৎসা রটনা, অবাধ্যতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে এইরূপ মনে হয় যে, কোন কোন শ্রেণীর ছাত্রীদের আচরণও সমস্যামূলক হইতে চলিয়াছে। অভদ্র অথবা কর্কশ আচরণ, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, কোপন স্বভাব, আলস্য, হীনম্মন্যতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি ত্রুটিবিচ্যুতি ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

উল্লিখিত প্রবণতাগুলি ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষার সময় নকল করা, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, সিনেমায় আসক্তি প্রভৃতি প্রবণতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের মধ্যে যেমন শৃঙ্খলার অভাব, স্কুলের কাগজপত্র নষ্ট করা এবং গুজবের প্রতি প্রীতি অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, ছাত্রীদের মধ্যেও তেমনি বাচালতা এবং গল্পগুজব করার আসক্তি ব্যাপকভাবে দেখা গিয়াছে।

উল্লিখিত তদন্তে দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের অধিকাংশই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য, শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, আলস্য এবং দায়িত্বজ্ঞানের অভাবের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঐ চারিটি সমস্যাই সাধারণ এবং উহাদের ব্যাপকতাই সর্ব্বাধিক। কুসঙ্গ, যৌন অপরাধপ্রবণতা, যৌন বিষয়ে জ্ঞানলাভের অত্যধিক আগ্রহ, প্রতারণা, চৌর্য্য, স্কুল পালানো প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যদিও গুরুতর তবুও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মতে ঐ সকল প্রবণতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায়শঃ লক্ষিত হয় না। যে সকল সমস্যা ছাত্রছাত্রীর ভাবাবেগ এবং সামাজিক সমস্যার সহিত সম্পর্কযুক্ত—যেমন, বিনা কারণে সহপাঠীদের বিরক্ত করা, কোপন স্বভাব, অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা, বিবাদপ্রিয়, লজ্জাপ্রবণতা, ঔদ্ধত্য, অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব করাইবার উদগ্র আগ্রহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে খুব কমসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই গুরুত্ব দিয়াছেন। পক্ষান্তরে শতকরা ৬৬ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, পড়াশুনায় অমনোযোগ, আলস্য, দায়িত্বশীলতার অভাব, কুসঙ্গ এবং যৌন অপরাধপ্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, স্কুল পালানো, প্রতারণা, যৌন বিষয়ে জ্ঞানলাভের অত্যধিক আগ্রহ প্রভৃতি সমস্যার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীগণ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধপ্রবণতার উপর শিক্ষয়িত্রীদের তুলনায় শিক্ষকগণ বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন।

উপরের বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, শিক্ষকগণ, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও পড়াশুনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যে সকল সমস্যার সহিত সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব জড়িত, সেই সকল সমস্যা স্বীকার করিয়া লইলেও অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই উহাদের উপর তেমন গুরুত্ব দেন নাই।

শিক্ষা ও মনস্তত্ত্ব গবেষণা সংস্থার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী কে, পি. চৌধুরীর নির্দ্দেশে উহার জনৈকা গবেষণা-কর্মী শ্রীমতী নীলিমা দাস ঐ তদন্ত পরিচালনা করেন।

"ধর্ম্মগুরু" পুস্তক ও পাকিস্থান সরকার

ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং মার্কিন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত বিশ্বের ধর্ম্মগুরুদের জীবনীসম্বলিত একটি পুস্তকে হজরত মহম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ভারত ও পাকিস্থানের একশ্রেণীর মুসলমান নিতান্ত অশোভন আচরণ করে। পাকিস্থানের আন্দোলনের বিশৃঙ্খলতা সরকার (অন্ততঃ পূর্ব্বপাকিস্থানে) দৃঢ় হস্তেই দমন করেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পরই পূর্ব্ব পাকিস্থান বিধানসভায় ভারতে "ধর্ম্মগুরু" পুস্তকটি প্রকাশের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার ভারত সরকারের নিকট এই সম্পর্কে একটি প্রতিবাদ-লিপিও প্রেরণ করিয়াছেন। পাকিস্থান সরকারের এই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ।

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" পত্রিকার ৩রা আশ্বিন সংখ্যায় "আগুন লইয়া খেলা" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ধর্ম্মগুরু" পুস্তক লইয়া সাম্প্রদায়িক উস্কানিদানের নিন্দা করিবার পর বলা হইয়াছে :

"পূর্ব্বপাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল যাবৎ আমেরিকার প্রকাশন কোম্পানীর সাহায্যে তথা হইতে এই প্রদেশের জন্য স্কুল পাঠ্যপুস্তক ছাপাইয়া আনিতেছিলেন। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানা পুস্তকে হজরত মহম্মদের ছবি থাকায় ফলে

উহা মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসবিরোধী বলিয়া ঐ পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রচলন বন্ধ করিতে হইয়াছে। ডেভিসের লিখিত পুস্তকে হজরত মহম্মদের সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি ছিল। ঐ পুস্তক যথারীতি পূর্ব্বপাকিস্থানের শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারেই স্কুলপাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ছাত্রদের পড়াইতে গিয়া শিক্ষক মহাশয়গণের দৃষ্টিতে ঐ সকল অবমাননাকর উক্তি ধরা পড়িল। তাঁহারা শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ঐ পুস্তকখানা পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত করাইলেন। পাকিস্থান মুসলিম রাষ্ট্র—শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সকলেই মুসলমান—তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া কি করিয়া এই পুস্তক এই দেশেই চলিয়া গেল—তাহার কোন কৈফিয়ত এই সকল সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট কেহ চাহিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।"

এই সম্পর্কে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকুই বলা যাইতে পারে যে, কলিকাতার জনৈক প্রকাশকের পুস্তকে হজরত মহম্মদের একটি প্রতিকৃতি থাকার দরুন প্রকাশককে ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু "ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্থানে"র মুসলমান ইসলামিক কর্ণধারগণ যখন হজরত মহম্মদের প্রতিকৃতিসম্বলিত পুস্তক "ইসলামিক" ঐতিহ্যপূর্ণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন তখন ইসলামের ধ্বজাধারী কেহ তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করাও প্রয়োজন মনে করে না। হয় ত পুস্তকের লেখক এবং প্রকাশক শ্বেতকায় মার্কিনী বলিয়াই কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। যাহাই হউক তাহারা ত ভারতীয় নহে, অথবা হিন্দুও নহে—কাজেই তাহাদের আচরণে এবং বক্তব্যে হজরত মহম্মদের অবমাননা হইলেও তাহাতে ইসলাম ধর্ম্ম কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

খাদ্যাভাবে মৃত্যু

"বারাসাত বার্ত্তা" ৮ই আশ্বিন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন: "ইংরেজ আমলে বিগত দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যাভাবে মানুষ পথের উপর মরিয়াছে, তাহাদের মৃতদেহ আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই দেখেন নাই—তাঁহারা তখন কারান্তরালে বন্দী ছিলেন। খাদ্যাভাবে মানুষ কেমন করিয়া পথের উপর মরে এবং তাহাদের মৃতদেহ দেখিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যই বোধ করি গত শুক্রবার (২১।৯।৫৬) বারাসাত রেল ষ্টেশনের পার্শ্বে উন্মুক্ত পথের উপর অজ্ঞাতনামা জনৈক ২৮।৩০ বৎসরের তরুণ মরিয়া পড়িয়া ছিল। মনুষ্যদেহের যে স্থানে খাদ্য থাকে তাহার পেট বলিয়া চিনিবার মত কোন বস্তু ছিল না। হাত পাগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত হাড়গুলি চর্ম্মনার দেহের বাহিরে ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষের মরণেরও একটি শালীনতা আছে; আত্মীয়-পরিজনের অশ্রুপাত বিলাপের সম্মুখে মানুষের মৃত্যু শুধু স্বাভাবিক নহে, মানুষ মাত্রেরই কাম্য। উহার বাহিরে যাহা ঘটে তাহা নেহাত দুর্ঘটনা। কিন্তু প্রকাশ্য পথের উপর চলনশক্তিরহিত ক্ষীণ মানুষ, কুকুর-বিড়ালের মত মরে—আজিকার এই নজির আমাদের সভ্যসমাজ ও জাতীয় জীবনে কলঙ্কপাত করিল।"

পত্রিকাটি বারাসাত মহকুমায় খাদ্যাভাবের পূর্ব্বপ্রকাশিত সংবাদ প্রকাশের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বুভুক্ষু লোকেরা খাদ্যের দাবিতে ১৯শে সেপ্টেম্বর মহকুমা-শাসকের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাহাদের দাবিগুলি বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী চাউলের দাম কমিয়াছে বলিয়া যে বিবৃতি দেন সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "বারাসাত বার্ত্তা" লিখিতেছেন: "তাঁহার আত্মপ্রসাদে আমরা বিঘ্ন ঘটাইতে চাহি না। তবে সবিনয়ে বলিতে ইচ্ছা করি—যেখানে কাজের অভাবে মানুষ বেকার বসিয়া আছে সেখানে নামতি দরের চাউলের মূল্যের সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন বুভুক্ষু জনতার অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র। সেই চাউল কে কিনিবে? যদি অনাহারে মৃত হতভাগ্য তরুণ উহা কিনিতে পারিত তবে তাহাকে ঘর, আত্মীয়-পরিজন ফেলিয়া পথের কুকুরের মত মরিতে হইত না এবং এইরূপ নরকদৃশ্যও বারাসাতবাসীকে দেখিতে হইত না। বারাসাতের ক্ষুধার্ত্ত মানুষ সরকারের খয়রাতি সাহায্য চাহিয়াছে—উহার কতখানি দেওয়া হইয়াছে? হাবড়ার নারী-শিশুর আর্ত্ত ক্রন্দন কি থামিয়াছে? দেগঙ্গার বিপন্ন কৃষক-সমাজের আর্ত্তনাদ কি থামিয়াছে? ক্ষুধার্ত্ত মানুষের মুখে দুই মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিতে কি বারাসাতে স্বল্পমূল্যের খাদ্যসামগ্রীর দোকান খোলা হইয়াছে?"

বারাসাত মহকুমার খাদ্যসঙ্কটে জননেতাদের নিস্ক্রিয়তার সমালোচনা করিবার পর উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপসংহারে বলা হইয়াছে: "আমরা অনাহারে মৃত হতভাগ্য তরুণের মৃত্যুতে লজ্জায়, ঘৃণায় ও পরিতাপে দগ্ধ হইতেছি, দেশের মানুষ যদি এইভাবে পশুর মত পথে-ঘাটে মরে তবে ভারতবর্ষের আজিকার গৌরব দাঁড়াইবে কোথায় এবং ভবিষ্যৎ জাতির নিকট উহার কি জবাব থাকিবে। আমরা পুনরায় জাতীয় সরকারের নিকট মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বারাসাতের ভুখা সমাজের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করিতেছি।"

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন ও ভারত সরকার

সম্প্রতি লোকসভায় এক বিবৃতিতে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ত্রিপুরায় যে উদ্বাস্তু আসিয়াছে তাহার পর ত্রিপুরায় আর নূতন উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উল্লিখিত বিবৃতির সমালোচনা করিয়া "সেবক" পত্রিকা ৭ই আশ্বিন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার দরুন তাহাদিগকে ভারতের অপরাপর রাজ্যে, এমনকি সুদূর আন্দামান দ্বীপে পর্য্যন্ত প্রেরণ করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসনের কোন সুরাহাই কেন্দ্রীয় সরকার করিতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের আগমন নিষিদ্ধ করা নিতান্তই বিস্ময়কর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

"সেবক" লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা সরকার হইতে প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁহার বিবৃতি দিয়াছেন:

"দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমনে ত্রিপুরার উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা হইলে এক বিরাটসংখ্যক উদ্বাস্তুর ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু কি ত্রিপুরা সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার সেই দিকে নজর না দিয়া উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপারটিকে এমন ভাবে ঘোলা করিয়াছেন যে, আজ তাহাদিগকে বলিতে হইতেছে ত্রিপুরায় আর নূতন উদ্বাস্তুর স্থান নাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে নিজেদের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি বলিয়া আমরা মনে করি।"

কিন্তু উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যাপারে কেবলমাত্র ভূমির মাধ্যমে সমস্যার প্রতিকারের চিন্তা না করিয়া সরকার যদি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সুপরিকল্পিত পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতেন তবে, "সেবকে"র অভিমতে, "ত্রিপুরায় যে পরিমাণ উদ্বাস্তু আসিয়াছে তাহার সমপরিমাণ উদ্বাস্তু গ্রহণ করা ত্রিপুরার পক্ষে অবাস্তব বলিয়া মনে করা যায় না।"

রিক্সাচালক

মানুষ কর্ত্তৃক রিক্সাটানা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সম্প্রতি যে প্রচেষ্টা চলিতেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে রিক্সাচালকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ১লা আশ্বিন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন, "বড়লোকেরা গরীব মানুষের দারিদ্র্যের সুবিধা লইয়া তাহাদেরকে দিয়া গরু-মহিষের মত ভার বহনের কাজ করাইয়া লইবে, ইহা খুবই অন্যায়—ইহা প্রত্যেকের মনুষ্যত্ববোধে আঘাত করে। সবই স্বীকার করি, কিন্তু একটা কথাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, পেটের দায়ে ও বিকল্প কাজ পায় না বলিয়া লোকে রিক্সা টানিতে বাধ্য হয়। আজ সারা ভারতে কয়েক লক্ষ লোক রিক্সা টানিয়া রুজি-রোজগার করে। মনুষ্যত্বের নামে রিক্সাটানা বন্ধ করিলে ইহারা দাঁড়াইবে কোথায়?..." একমাত্র বহরমপুর শহরেই প্রায় এক হাজার রিক্সাচালক রহিয়াছে—রিক্সাটানা বন্ধ হইলে ইহাদের রুজি-রোজগারের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার দিনে হঠাৎ রিক্সাটানা বন্ধ করিয়া দেওয়া তাই ঠিক হইবে না বলিয়া পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যেন রিক্সাচালকদের আর্থিক ক্ষতি না হয় অথচ সেই সঙ্গে তাহাদের স্বাস্থ্য ও অপরাপর স্বার্থও রক্ষিত হয়।"

বর্দ্ধমানের রাস্তাঘাট

"বর্দ্ধমানের ডাক" পত্রিকার ৮ই আশ্বিন সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাসমেত বহুসংখ্যক রাস্তা চলাচলের প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অযোগ্য। রাস্তাগুলির ব্যাপক সংস্কার ত দূরের কথা, সাধারণভাবে রাস্তাগুলির উপর কাজচলা গোছের মেরামতেরও কোন ব্যবস্থা নাই।"

দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাস্তার দৃষ্টান্ত দিয়া বলা হইয়াছে যে, বর্দ্ধমান-কালিগ্রাম এবং কাটোয়া-দাঁইহাট রাস্তা দুইটি পাকা হইলে, সংস্কারের অভাবে এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে যে বহুদিন যাবৎ বাস চলাচল বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, যে সকল অঞ্চলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য কম্যুনিটি প্রোজেক্ট এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক গঠিত হইয়াছে সেখানেও রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি হয় নাই। রাস্তাগুলি ভাঙ্গিয়া না পড়া পর্য্যন্ত সেগুলি মেরামতের কথা কাহারও মনেও আসে না। সময়মত যথারীতি রাস্তাগুলির সংস্কারসাধন না করিয়া ঐগুলি প্রায় অগম্য হইয়া উঠিলেও সংস্কার করিলে অধিকতর সরকারী অর্থ ব্যয় হয় এবং সরকারী অর্থ যত অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাগমের সুযোগও তত বৃদ্ধি পায় বলা হইয়াছে। প্রকাশ যে, সংশ্লিষ্ট "সরকারী বিভিন্ন বিভাগ এবং জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনীয়র, ওভারসিয়র, সাব-ওভারসিয়র প্রভৃতি শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ হয় রাস্তাগুলি তদারক করেন না—আর না হয় সময়ে কাজে হাত দেওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হাত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া থাকেন। রাস্তা, সাঁকো, নর্দ্দমা প্রভৃতি সংস্কারের জন্য সাধারণের পক্ষ হইতে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে, 'পেব্লিক'দের কথায় কর্ণপাত করা কর্ত্তাব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশ্য সাধারণের পক্ষ হইতে অনেক সময় যথোচিত সহযোগিতা করা হয় না, তাহাও আমরা স্বীকার করি।"

বর্দ্ধমান হাসপাতালে মেট্রনের দৌরাত্ম্য

বর্দ্ধমান শহরের বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্পর্কে জেলার প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রেই নানারূপ অভিযোগ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল অভিযোগ প্রতিকারের কোন প্রকৃত চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। হাসপাতালের বিরুদ্ধে সর্ব্বশেষ অভিযোগ মেট্রন শ্রীমতী সুষমা নিয়োগীর (ভূতপূর্ব্ব মিস টমাস) বিরুদ্ধে। ১৪ই সেপ্টেম্বর "দামোদর" পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে:

"বর্দ্ধমান ১৩ই সেপ্টেম্বর, বিজয়চাঁদ হাসপাতালের নার্সদের অবহেলার ফলে প্রায় আরোগ্যপ্রাপ্ত একটি যুবক গত ১০ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৪।টায় মারা গিয়াছে। রোগীটির প্যাপটিক আলসার হয়, অপারেশন হইবার পর সপ্তাহকাল সুস্থ অবস্থায় থাকে। চিকিৎসকের নির্দ্দেশমত পথ্য না দিয়া একসঙ্গে সমস্ত দিনের খাবার খাওয়াইয়া দিবার ফলে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া যায়।"

সংবাদে আরও প্রকাশ যে, পূর্ব্বে এই ধরনের কঠিন রোগীর পথ্য পৃথকভাবে রান্নার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান মেট্রনের আদেশে নাকি পূর্ব্ব-অনুসৃত ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে। রোগীটিকে হাসপাতালের সাধারণ রান্না মাছ, ডিমসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ ও দুধ একসঙ্গে বেশী পরিমাণ খাওয়ানো হইলে রোগীর পেটে যন্ত্রণা হইতে থাকে এবং অচিরেই প্রাণত্যাগ করে।

অপর একটি ঘটনার সংবাদে প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক পার্লামেণ্টের সদস্যের স্ত্রীসহ তিন জন মহিলা হাসপাতালে ভর্ত্তি হইলে শিক্ষানবিশী নার্সদের দ্বারা তাঁহাদের ইন্‌জেকশন দেওয়ানো হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের ইন্‌জেক্‌শনের স্থান পাকিয়া উঠে। এম-পি মহাশয়ের চেষ্টায় অস্থায়ী সিভিল সার্জ্জন এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিতে আসেন এবং ষ্টাফ নার্স দিয়া ইন্‌জেক্‌শন দিবার নির্দ্দেশ দিয়া যান। "দামোদর" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, "সিভিল সার্জ্জনের এই আদেশে মেট্রন অসন্তুষ্ট হন এবং অজ্ঞাত কারণে শনিবার রাত্রি হইতে রবিবার সমস্ত দিন সারা হাসপাতালের রোগীদের ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া বন্ধ হয়। সিষ্টার বিশ্বাস রবিবার সকালে হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়া এ বিষয়ে সিভিল সার্জ্জনকে রিপোর্ট করেন নাই। রবিবার বৈকালে সিষ্টার দে কেবিনের রোগিণীদের পরিদর্শন করিতে আসিয়া নির্ব্বাক হইয়া চলিয়া যান। নার্সগণ রোগীদের সহিত নির্দ্দয় ও অসহযোগমূলক আচরণ করেন। রবিবার রাত্রে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়। রবিবার সন্ধ্যায় ডিউটি থাকা সত্ত্বেও সিষ্টার দে'কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।"

২৯শে ভাদ্র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই ঘটনা দুইটির উল্লেখ করিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন, "হাসপাতালে আগত আর্ত্তদের প্রতি সেবাব্রতচারিণী ভারতীয় মহিলাদের এই হৃদয়হীন অবহেলার বিবরণ দেখিয়া লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হইতেছে। হাসপাতালের চিকিৎসকের নির্দ্দেশ সেবিকা মানিবে না। এমনকি সিভিল সার্জ্জনের আদেশও মেট্রনের ইঙ্গিতে পালিত হইবে না, উপরন্তু হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কি কৈফিয়ত দিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

মেট্রন শ্রীসুষমা নিয়োগীর আচরণের সমালোচনা করিয়া "দামোদর" লিখিতেছেন :—

"শুনিয়াছি, তিনি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন বলিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। সিভিল সার্জ্জন হইতে বড় বড় চিকিৎসক পর্য্যন্ত নাকি তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র। সুদীর্ঘ আট বৎসর তিনি এই হাসপাতালে চিরস্থায়ী স্বত্ব বহাল করিয়া বাঙালী ভদ্রঘরের কন্যা নার্সদের প্রতি চরম দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার যথেচ্ছাচারের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করিলে তাঁহার শালীনতা রক্ষা করাও দুঃসাধ্য বলিয়া আমাদের জানা আছে। আমরা ইহার পূর্ব্বে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়াছি এবং সসম্মানে তাঁহাকে বর্দ্ধমান হইতে অন্যত্র গ্রহণ করিতে সরকারকে পরামর্শও দিয়াছি। কিন্তু তিনি এমনই অঘটনঘটন-পটীয়সী যে, সকল বাণই তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। বর্দ্ধমান তাঁহার লীলাক্ষেত্র। এখানেই তিনি মালয়ালী হইতে বাঙালী বধূ হইয়াছেন, কিন্তু 'বুক ভরা মধু—বঙ্গের বধূ' হইতে পারিলেন না। আমাদের পক্ষে ইহা নিতান্তই আক্ষেপের কথা।"

"বর্দ্ধমান বাণী" পত্রিকাতেও ২৯শে ভাদ্র ও ৫ই আশ্বিন সংখ্যা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিজয়চাঁদ হাসপাতালের মেট্রনের অপসারণ দাবি জানানো হইয়াছে।

করিমগঞ্জে ভেজাল দুগ্ধের দৌরাত্ম্য

"ভেজাল দুগ্ধের দৌরাত্ম্য" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "যুগশক্তি" (৫ই আশ্বিন) লিখিতেছেন :

"বর্ত্তমানে করিমগঞ্জ শহরে খাঁটি দুগ্ধ সংগ্রহ করা এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নেহাত প্রয়োজনের খাতিরে (মুখ্যতঃ শিশুদের জন্য) শহরবাসী অনেকেই দুগ্ধ বলিয়া যে পদার্থ অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই Condemned Milk Powder এবং নদী-নালার জলের মিশ্রণ মাত্র। শহরবাসী নাগরিকদের অধিকাংশই শিক্ষিত এবং সমাজচেতনাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই শোচনীয় অবস্থার গুরুত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। সরকার এবং পৌর কর্ত্তৃপক্ষও এই ব্যাপারে সমভাবে উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছেন।"

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, শহরে যে পরিমাণ দুগ্ধ সরবরাহ করা হয় তাহার অধিকাংশই ভেজালপূর্ণ। চতুর বিক্রেতারা নানা অজুহাতে দুগ্ধ পরীক্ষা ব্যবস্থা এড়াইয়া যায়। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে দুগ্ধ পরীক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটিতেই ভেজাল ধরা পড়িয়াছে। "কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভেজাল দুগ্ধ বিক্রেতাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইলে বিচারকরা তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াও যে কারণেই হউক তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অল্প জরিমানা করিয়াই রেহাই দেন। এইরূপ জঘন্য অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হওয়াই বাঞ্ছনীয় নহে কি?..."

উপসংহারে পত্রিকাটি লিখিতেছেন :

"আমরা আশা করি সরকার, পৌর কর্ত্তৃপক্ষ এবং নেতৃস্থানীয় নাগরিকগণ এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে আশু মনোযোগী হইবেন, দুষ্কৃতকারীদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হওয়া যেমন একদিকে প্রয়োজন, অন্য দিকে তেমনি খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হওয়া অত্যাবশ্যক।

উপযুক্ত পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধের অভাব ভারতের নাগরিক জীবনের একটি প্রধান সমস্যা। ভারতের প্রায় প্রত্যেক নগরী ও শহরগুলিতে বর্ত্তমানে এই সমস্যা বিশেষ তীব্রতা লইয়া দেখা দিয়াছে। লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র কঠোর শাস্তি প্রদান (অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধান অবশ্যই করিতে হইবে) দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। চাহিদার অনুপাতে দুগ্ধসরবরাহের পরিমাণ যত দিন কম থাকিবে তত দিন দুগ্ধে ভেজাল মিশাইবার ঝোঁক থাকিবেই। সে ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ সমাধানের পথ হিসাবে পৌর প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারকে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সরকার

অথবা পৌর প্রতিষ্ঠানকে যদি এই দায়িত্ব সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে হয় তবে সর্ব্ব স্তরে প্রশাসনিক সততার পুনঃপ্রবর্ত্তনকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পাকিস্থানে মাল আটক

৭ই আশ্বিন সাপ্তাহিক "সেবক" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"আগরতলা, ২০শে সেপ্টেম্বর—"স্থানীয় ব্যবসায়ীমহলের সংবাদে প্রকাশ, আগরতলায় আনয়নের জন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য—কয়লা, টিন, সিমেন্ট, সরকারী চাউল ইত্যাদি বহুবিধ দুই কোটি টাকা মূল্যের মাল বিগত ২৮শে আগষ্ট হইতে আখাউড়া রেল ষ্টেশনে পাক মুদ্রায় রেলভাড়া দেওয়া সংক্রান্ত এক আইনগত প্রশ্নে আটক পড়িয়া আছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ৯ বৎসর যাবৎ স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ পাক মুদ্রায় রেলভাড়া দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এ যাবৎ পাক সরকার কোন সময়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই এবং পাক রেলওয়ে প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুই কোটি টাকা রেলভাড়া ত্রিপুরা হইতে মালভাড়া বাবদ পাইয়াছেন।

"তিন সপ্তাহ কাল যাবৎ কোন মাল আখাউড়া হইতে না পৌঁছায় এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি পড়িয়াছে এবং সমস্ত দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এইরূপ অচল অবস্থায় পড়িয়া ব্যবসায়ী মহল ত্রিপুরায় অগৌণে রেল লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন।

"সংবাদে প্রকাশ, পাক রেল কর্তৃপক্ষ পাক মুদ্রার প্রশ্ন তুলিয়া মাল আটক করেন নাই। সীমান্ত এলাকার কর্ম্মরত জনৈক মিলিটারী সুবেদারের কারসাজিতে উপরোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

"মাল আটক পড়ায় মালের উপর প্রত্যহ ডেমারেজ চার্জ্জ লাগিতেছে। প্রকাশ, ডেমারেজ চার্জ্জ প্রায় দশ হাজার টাকা দিতে হইবে।"

ঢাকাস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের চেষ্টায় অবশেষে নাকি সরকারী চাউলের ওয়াগনগুলি খালাস করা সম্ভব হয় এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে আগরতলায় কিছু কিছু মাল পৌঁছিতে থাকে।

১৪ই আশ্বিন এই বিষয়ে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "সেবক" পত্রিকা পাকিস্থানের মধ্য দিয়া মাল সরবরাহ ব্যবস্থার এইরূপ অনিশ্চয়তাজনিত জনসাধারণের দুর্দ্দশা এবং জাতীয় অর্থের অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আগরতলা-আসাম সড়কটির নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্রুততররূপে সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী অকর্ম্মণ্যতার সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন :

"যে আসাম-আগরতলা রাস্তার স্বপ্ন আমাদিগকে দেখান হইতেছে তাহার কার্য্য কোনকালেও সম্পন্ন হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। এই সড়ক গত নয় বৎসর যাবৎ নির্ম্মিত হইতেছে। অথচ নয় বৎসর পরেও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয় যে, চলিত বর্ষায় এই রাস্তা দিয়া সর্ব্বমোট এক খানাও গাড়ী চলাচল করিতে পারে নাই। কেন গাড়ী চলাচল করিতে পারে নাই কিংবা কেন সড়কের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয় না তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিব না। আমরা ইহাই জিজ্ঞাসা করিব, লক্ষ লক্ষ নরনারীর জন্য পরিবহন-ব্যবস্থার সুরাহা করার মিথ্যা প্রলোভন দেওয়ার অধিকার ভারতীয় সংবিধানে কোন গণতান্ত্রিক সরকারকে দেওয়া হইয়াছে কিনা ? ৪,০০০ বর্গমাইল একটি রাজ্যের পরিবহন-ব্যবস্থা সুদীর্ঘ নয় বৎসরেও সম্পন্ন করা যায় না—ইহার চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।"

বেআইনি মদ চোলাই

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার মূলে যে নীতিজ্ঞান তাহা যদি দেশের লোকে হারাইয়া ফেলে তবে যে অবস্থা হয় তাহার পূর্ণ উপলব্ধি আমরা আজ করিতেছি। উপরন্তু এক শ্রেণীর লোক এখন কলিকাতায় আসা-যাওয়া করে যাহাদের উদ্দেশ্যই আইনভঙ্গ করিয়া নিজ স্বার্থপূরণ। তাহারই একটি দৃষ্টান্ত আমরা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে নীচে তুলিয়া দিলাম :

"শনিবার পুলিস বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি মসজিদের ভিতর হইতে বেআইনী মদ চোলাইয়ের একটি গুপ্ত কারখানা আবিষ্কার করে এবং এক শত মণের অধিক গাঁজানো মদ ও সাত গ্যালন চোলাই করা মদ উদ্ধার করে। দুপুর দেড়টা নাগাদ মসজিদের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে নিভৃত নির্জ্জনে চোলাইরত দুই ব্যক্তিকেও পুলিস হাতেনাতে ধরিয়া ফেলে। এই ব্যাপারে জড়িত আরও কয়েকজন নাকি পলাইয়াছে। ধৃত এবং পলায়িত ব্যক্তিরা উদ্বাস্তু বলিয়া পুলিসের ধারণা।

বেলেঘাটা মেন রোডের উপর সরকার বাজারের পাশেই একটি সরু গলির ভিতর এই মসজিদ—বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত। এখন সেইখানে নমাজও হয় না, আজানের ডাকও শোনা যায় না। তবে ইতঃপূর্ব্বে গত দাঙ্গার সময় আজানের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে যখন ঘন ঘন 'আল্লা হো আকবর' আওয়াজ শোনা যাইত তখন নাকি এই মসজিদের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও বোঝাই থাকিত, স্থানীয় লোকজন সেই অভিযোগই করে।

এখন সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র নাই। কিন্তু সম্প্রতি সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছে এই মদ চোলাইয়ের কারখানা। মসজিদের সম্মুখভাগে চতুষ্কোণ চত্বরের নীচে ৪০ ফুট লম্বা একটি বিরাট সুড়ঙ্গ। ইহার ভিতর ৭০-৮০ মণ মদ ধরার মত বিরাটাকার চৌবাচ্চা,

অগণিত বিপুলাকৃতি হাঁড়ি, ফুটবল ব্লাডার, জল সরবরাহের পাইপ, জল ইত্যাদি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের বিরাট ব্যবস্থা।

জঙ্গলাকীর্ণ মসজিদের বাইরে পূতিগন্ধময় জরাজীর্ণ অবস্থা: ভিতরে রহস্যময় পাতালপুরী। আর এই পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ-পথ দিয়াই মাসিক হাজার হাজার টাকার আসা-যাওয়া। পুলিস অতর্কিত অভিযানে এই রহস্যময় পাতালপুরীর সন্ধান পায় এবং দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিদ্বয় উভয়েই উদ্বাস্তু। মসজিদের পাশেই কয়েক ঘর উদ্বাস্তুর বাস।

পুলিস এই সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান চালাইতেছে।"

পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিল চুরি

সম্প্রতি সংবাদপত্রে নিম্নস্থ সংবাদটি প্রকাশিত হয়। পরে পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র এই খবরের অধিকাংশই সাফাই গাহিয়া পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত তথ্য যে কি তাহা আমরা সকলেই জানি, সুতরাং দেশে যে অন্তর্ঘাতী গুপ্তচর ও শত্রুর পঞ্চমবাহিনী রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। হইতে পারে যে, আসামীর স্বীকারোক্তি কিছু অতিরঞ্জিত। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তর যে সজাগ নহে তাহার প্রমাণ ত এই দলিল চুরিই:

"নয়াদিল্লী, ২২শে সেপ্টেম্বর—আজ নয়াদিল্লীর অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরাজেন্দ্র সিং-এর নিকট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্ম্মচারী সাদিলাল কাপুর যে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হইয়াছে। ভারত সরকারের অতিশয় গোপনীয় কতকগুলি দলিল ও নথিপত্র অপহরণের দায়ে সাদিলাল অভিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী তাঁহার স্বীকারোক্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন অফিসারকেও জড়াইয়াছেন। পুলিসের ধারণা, আসামীর স্বীকারোক্তিমূলে অনুসন্ধান চালাইলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে একটি আন্তর্জাতিক গুপ্তচর-চক্রের অস্তিত্ব আছে বলিয়া পুলিস সন্দেহ করিতেছে।

দিল্লীর পুলিস কর্তৃপক্ষ বলেন যে, অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ দ্বারা দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টির জন্য একটি গুপ্তচর-দল ক্রিয়াশীল রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা সন্দেহ করেন। তাঁহারা আশা করেন যে, আসামীর স্বীকারোক্তির ফলে তাঁহারা এই গুপ্তচর-চক্র নির্মূল করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। মামলা দেখিবার জন্য আদালত-কক্ষে বহু দর্শক সমাগম হইয়াছিল। একজন মাত্র পুলিস কর্ম্মচারী সাদিলালকে আদালত-কক্ষে লইয়া আসে এবং কয়েকজন নারী-পুলিস তাঁহার সঙ্গে স্ত্রীকে লইয়া আসে। তাঁহার স্ত্রীর কোলে এক বৎসরের একটি শিশু ছিল।

প্রকাশ যে, সাদিলাল পূর্ব্বে অপর একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি গোপনীয় দলিলপত্র ও ফাইল একজন বিদেশী চরের হস্তে দিয়াছিলেন।

যে বিদেশী চরের নিকট ফাইলের কাগজপত্র দেওয়া হইয়াছিল, সে ভারত ছাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দুই জন বিদেশী কূটনীতিবিশারদও হঠাৎ ভারত হইতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ফাইলসমূহ সুয়েজ সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি রাজনৈতিক প্রশ্ন-সংক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ মেননের কায়রো যাত্রার প্রাক্কালে দেখা যায় যে, ফাইলসমূহ উধাও হইয়াছে।"

সমাজ উন্নয়ন

পণ্ডিত নেহরু যাহা বলিয়াছেন তাহা আশার বাণী। কিন্তু কবে সুদিন আসিবে তাহার কোনও চাক্ষুষ লক্ষণ ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ত শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয়ও চালু হইয়াছে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ কি এখনও হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইয়াছে?

"নয়াদিল্লী, ৩০শে সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সমাজ-উন্নয়ন কর্ম্মসূচীকে 'গ্রামীণ ভারতের মনোমুগ্ধকর উপকথার এক নূতন অধ্যায়' বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্র এবং অসংখ্য গ্রামে এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। শত সহস্র গ্রাম্য কর্ম্মী ও সংগঠনকারী প্রভৃতি এই নাটকের অভিনেতা। প্রত্যেক নরনারী ও এমনকি শিশু পর্য্যন্ত উহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিধেয়।"

ভারতে সমাজ উন্নয়ন কর্ম্মসূচী উদ্বোধনের বার্ষিকী উপলক্ষে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মুখপত্র 'কুরুক্ষেত্র' প্রদত্ত এক বিশেষ বাণীতে প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, "সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এক্ষণে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। ভারত সরকারের একটি নূতন মন্ত্রণালয় এই নামে গঠিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ একমাত্র আমাদের দেশেই এজাতীয় একটি দপ্তর আছে। ইহাতে শুধু সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সেবাসম্প্রসারণ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্ত্তনই প্রমাণিত হয় না, ইহার গুরুত্বেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দায়িত্বও অর্পিত হইয়াছে। গত চার বছরে শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দের নেতৃত্বে এই কাজ যতটা আগাইয়াছে, তাহাতে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই নূতন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে।

দ্রুত খাদ্যোৎপাদন বাড়িতেছে। সমস্ত গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও আমি সম্প্রতি বার বার উল্লেখ করিয়াছি। উহাদের উপরই বৈষয়িক উন্নতি মূলতঃ নির্ভরশীল। তবে মানুষ গড়িয়া তোলাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য।

জনসাধারণের নিকট আশার বাণী বহন করা, তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জাগাইয়া তোলা এবং কঠোর ও সহযোগিতামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করাই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আসল কাজ।"

বন্যায় সরকারী সাহায্য

"কান্দি, ৭ই অক্টোবর—সরকার যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তদের জন্ত ব্যাপকভাবে সাহায্যকার্য্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গকে তাহার বর্তমান দুর্দশায় জন্ত সর্বপ্রকার সাহায্যদানের আশ্বাস দেওয়ায় রাজ্য সরকার এখন সাহায্যদানের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন। সাহায্যকার্য্যের জন্ত ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

আজ এখানে ডাক বাংলোতে অনুষ্ঠিত বন্যার্তদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরবর্তী তিন মাসের জন্ত প্রতি মাসে পাঁচ লক্ষ মণ চাউল প্রেরণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রী জৈন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু উদ্বেগ সহকারে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ ও ক্রমাগত বন্যার ফলে গত ২০ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ যে চরম দুর্দশাভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রী জৈন বলেন, "আজ আপনাদের দুর্গতি সমগ্র ভারতের দুর্গতি। আপনারা যে চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহাতে আমি মর্মাহত হইয়াছি।"

সংস্কৃত কমিশন

ভারত সরকার ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত একটি সংস্কৃত কমিশন গঠন করিয়াছেন। ৫ই অক্টোবর এই কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ড. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিশনে অধ্যাপক এস. কে. দে সহ আরও আট জন সদস্য রহিয়াছেন। পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ আর. এন. দণ্ডেকার এই কমিশনের সদস্য-সম্পাদক।

কমিশনের সম্মুখে কাজ হইল মুখ্যতঃ দুইটি—প্রথমতঃ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করা এবং সংস্কৃত পঠন-পাঠন ও গবেষণার উন্নতিসাধনের পরামর্শ দেওয়া; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত পঠন-পাঠনের প্রচলিত পদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখা এবং তাহার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা।

কমিশন যাহাতে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে পারেন সেইজন্ত যথাযোগ্য ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হইয়াছে। ছয় মাসের মধ্যেই কমিশন রিপোর্ট পেশ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ৭ই অক্টোবর ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নয়াদিল্লীতে কমিশনের প্রথম আনুষ্ঠানিক অধিবেশন বসে।

একটি সংস্কৃত কমিশন নিয়োগের জন্ত বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছিল। সুতরাং এই কমিশন গঠন সময়োচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোন জাতিই তাহার ঐতিহ্যকে বিস্মৃত থাকিয়া মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালীকে একটি আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের পক্ষে এই কথাটি বোধ হয় আরও বেশী করিয়াই প্রযোজ্য হইতে পারে। বহু বৎসরের পরাধীনতায় ভারতবাসী সত্যই আপনাকে ভুলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় লালিত ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতের (এবং এশিয়ার) সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের কোন সুযোগই নাই। এইরূপ বক্তব্যের অর্থ এই নহে যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কোনই মূল্য নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যথেষ্টই মূল্য রহিয়াছে এবং সে শিক্ষা আমাদিগকে পূর্ণমাত্রাতেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির উপযোগী করিয়া গড়িতে হইবে। ভারতীয় জীবনবোধ এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন নবসৃষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সুষ্ঠু বিকাশের জন্ত অবশ্যপ্রয়োজন—কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা যাহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছি তাহারা কেহই দেশের ঐতিহ্যকে অনুধাবন করিবার শিক্ষাও পাই নাই, চেষ্টাও করি নাই (অবশ্য এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম রহিয়াছে)। অপর দিকে যাহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকায় তাঁহাদের অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সুপরিকল্পিত সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের একটি সুসঙ্গত রীতি প্রবর্তন করা যায় কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব

বোম্বাই রাজ্যে আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। ইউনাইটেড প্রেস নিম্নলিখিত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন :—

"বোম্বাই ৬ই অক্টোবর—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ বোম্বাই বিধানসভায় বলিয়াছেন যে, ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনে বোম্বাই রাজ্যে মোট ৩,৮২৪টি আত্মহত্যা ঘটে। উহার মধ্যে ১,৯৪১জন পুরুষ ও ১,৯৮৩ জন স্ত্রীলোক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ঘরোয়া ঝগড়া, দীর্ঘকাল যাবৎ রোগভোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি, দুর্ব্যবহার, প্রণয়ে নৈরাশ্য প্রভৃতি এই সকল আত্মহত্যার কারণ। দারিদ্র্য, বেকার ও দেউলিয়া অবস্থার দরুনও অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যা ঘটিয়াছে।"

আইনানুযায়ী আত্মহত্যার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রই পুলিশের গোচরে আসিবার কথা। সেই দিক হইতে বিচার করিলে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত পরিসংখ্যানটি সঠিক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

মাত্র একটি রাজ্যে (মোট লোকসংখ্যা ৩,৫৯,৫৬,৩৫০) দুই বৎসরে ৩,৮২৪ জন আত্মহত্যা করিয়া জীবনত্যাগ করিয়াছে—খবরটি সত্যই উদ্বেগজনক। মুখ্যমন্ত্রী আত্মহত্যার যে কারণগুলি

বলিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় মুখ্যতঃ সেগুলি সবই সামাজিক। সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে এই প্রকার আত্ম-হত্যাও নিরোধ করা যাইতে পারে। সম্পদের উৎপাদন এবং তাহার বিতরণ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যই এই সকল সামাজিক ক্ষত-সৃষ্টির জন্য দায়ী। জাতীয় ধনবৈষম্য দূর করা ভারতের জাতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য ক্রমাগতই অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে।

পাকিস্থানী রাজনীতি

সম্প্রতি পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে চলিয়াছে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী শীঘ্রই যে জাতীয় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী থাকিবে, না একটি সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী (যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ভোটাধিকারী হইবেন) জাতীয় সভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির প্রতিনিধি-বর্গকে নির্ব্বাচিত করিবেন সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য পাকিস্থানের জাতীয় সভা ৮ই অক্টোবর হইতে ঢাকা নগরীতে আলোচনারত রহিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে পাকিস্থানের জাতীয় সভার ইহাই সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন।

পশ্চিম-পাকিস্থানের বিধানসভা সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী গ্রহণের বিরোধিতা করিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বিধানসভা প্রায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমেই সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে ভোট দিয়াছে। এখন জাতীয় সভা এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তবে সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম-পাকিস্থানের রিপাবলিকান দলের সদস্যগণ আপন আপন মতামত অনুযায়ী ভোট দিতে পারিবেন। জাতীয় সভার অধিবেশনের স্থান, সরকারী মনোভাব এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সাধারণ আচরণ হইতে মনে হয় যে, জাতীয় সভা সংযুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের অপকীর্ত্তি এবং ভারতে তাহাতে ইন্ধন যোগায় একদল অন্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদী—যাহাদের নেতৃত্বে ছিল মুসলিম লীগ। এই রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ হইয়াছে পাকিস্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকা হইতে মুসলিম লীগের (প্রকৃতপক্ষে) সম্পূর্ণ অপসারণের মধ্য দিয়া। হিন্দু মুসলমান দুই জাতি এই "মূল্যবান" তত্ত্ব আজ পাকিস্থানের কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা বলেন না। এই সুস্থ পরিবর্ত্তনেরই অপর পদক্ষেপ হইল স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বিলোপসাধন। অবশ্য সংখ্যাগুরু মুসলমানদের পক্ষে এখন যৌথ নির্ব্বাচকমণ্ডলীই অধিকতর সুবিধাজনক। তথাপি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচক-মণ্ডলীব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসারতা বুঝিতে পারিয়া পাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিন্দুগণ যে যৌথ নির্ব্বাচনব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় মিলে।

বিশ্ব আণবিক সংস্থা

বিশ্বের একাশীটি দেশের প্রতিনিধি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে একটি বিশ্ব আণবিক সংস্থার খসড়া সংবিধান আলোচনার জন্য সম্মিলিত হন। সর্ব্বসমেত সাতাশীটি রাষ্ট্রকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। তন্মধ্যে ৮১টি রাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করে। ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ঐ সম্মেলনের কার্য্য সুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রমুখ বারটি দেশ এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। এই কয়টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গই প্রস্তাবিত বিশ্ব আণবিক সংস্থার খসড়া সংবিধানটি রচনা করে।

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের পরি-চালনাধীনে একটি বিশ্ব আণবিক সংস্থা গঠনের জন্য মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সম্মুখে ১৯৫৩ সনের ৮ই ডিসেম্বর প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সর্ব্বপ্রথম একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পর বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত বারোটি রাষ্ট্র একটি বিশ্ব আণবিক সংস্থা গঠনের জন্য বাস্তব কার্য্যক্রম গ্রহণ করে। এই বারোটি রাষ্ট্র ১৯৫৬ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই এপ্রিল এই সময়ের মধ্যে ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলনে মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত সংস্থাটির জন্য একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে। বর্ত্তমান সম্মেলনে ঐ খসড়াটি আলোচনার পর গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাষ্ট্রসংঘের সদস্য ৭৬টি রাষ্ট্র ব্যতীত আরও যাহাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় সেই সকল রাষ্ট্র হইল: পশ্চিম জার্ম্মানী, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মোনাকো, মরক্কো, সান মারিণো, সুদান, সুইজার-ল্যাণ্ড, টিউনিসিয়া, ভ্যাটিকান সিটি এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। কিন্তু চীনা সাধারণতন্ত্রকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য কোন আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। কার্য্যতঃ ৮১টি দেশ সম্মেলনে উপস্থিত থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত ইহাই বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

এই সম্মেলন সম্পর্কে যে সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত বিশ্ব আণবিক সংস্থার গঠন ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। প্রস্তাবিত সংস্থা হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আণবিক সাহায্য দানের যে সকল সর্ত্ত আরোপ করার প্রচেষ্টা হইতেছে, ভারতপ্রমুখ কয়েকটি রাষ্ট্র তাহার বিশেষ বিরোধিতা করিয়াছে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ২৫শে আশ্বিন ১৩৬৩ (১১ই অক্টোবর ১৯৫৬) হইতে ৭ই কার্ত্তিক ১৩৬৩ (২৪শে অক্টোবর ১৯৫৬) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর হইবে। এই সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা-পরিবর্ত্তন, প্রবাসী-অপ্রাপ্তি—এতদ্বিষয়ক চিঠিপত্র "ম্যানেজার প্রবাসী" এই নামে প্রেরিতব্য। কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী।

রীতি ও বৃত্তি

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

'স্টাইল' কথাটা আজকাল শোনা যায় লোকের মুখে মুখে। লেখা এবং খেলা, উভয়ত্রই এসে পড়ে স্টাইলের প্রসঙ্গ। কিন্তু বস্তুটা আসলে নিরাকার ব্রহ্মের মতই অনির্বাচ্য। এর সম্বন্ধে একটা আবছা-গোছের ধারণা হয় ত আছে আমাদের মনের মধ্যে; কিন্তু বিষয়টা এমনই যে বুঝিয়ে বলতে গেলেই সেটা আরও অস্পষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া, ধারণার ব্যাপারেও ঐক-মত্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই বিদগ্ধজনের দরবারে একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠেই পেশ করতে হয় নিজের বক্তব্যটি। সুবিধা বা অসুবিধার কথা এই যে, এই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, এদেশে এবং বিদেশে, আলোচনা নেহাত কম হয় নি। সুবিধা এই যে, পূর্বসূরিদের পথ ধরে প্রধান প্রধান মতবাদগুলির পর্যালোচনা করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়ত সম্ভব হতে পারে। অসুবিধার কথা, বাঁশবনে ডোমকানা হওয়ার আশঙ্কাও আছে যথেষ্টই। যা হোক, বিষয়টা খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে, লাভ না থাকুক, ক্ষতি অন্ততঃ কিছু নেই।

একদল আলঙ্কারিক ছিলেন এ দেশে যাঁরা কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে রচনা-রীতির উপরই জোর দিয়েছেন বিশেষ করে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, কাব্যের আত্মাই হ'ল রীতি। রীতির অর্থ করেছেন এঁরা 'বিশিষ্টা পদ-রচনা'। চমৎকৃতি-বাদী হরিপ্রসাদ কাব্যকে চিহ্নিত করেছেন, 'বিশিষ্ট শব্দরূপ' এই লক্ষণে। প্রত্যেক পদবন্ধ বা বাক্যের মধ্যেই থাকে তিনটি জিনিষ—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং আসত্তি। যোগ্যতার অর্থ পদার্থসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকা; 'রোদে ভিজছে' কিংবা 'জলে পুড়ছে' বললে বাক্যত্বের হানি হয়। আকাঙ্ক্ষা বলতে এঁরা বুঝেছেন, 'প্রতীতি-পর্যবসান-বিরহ' অর্থাৎ বাক্যে পদার্থের নিরপেক্ষতার অভাব। 'গো-অশ্ব-নর-বানর' ইত্যাদি পদোচ্চয় বাক্য নয়, কারণ গো-শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয় শ্রোতার অন্তরে, তার উত্তর নেই অশ্বাদি-শব্দের মধ্যে। কাজেই এই নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ অন্যোন্য-নিরপেক্ষ পদোচ্চয়কে বাক্য বলা যায় না। আর আসত্তি হ'ল দুই বা ততধিক সন্নিহিত পদের অবিচ্ছিন্ন অন্বয়। কিন্তু এ তো গেল সাধারণ পদ-রচনার কথা। পদবন্ধকে বিশিষ্ট করে তোলা যায় কোন্ মায়ায়? কেউ বলেন শব্দ-সৌষ্ঠবে, কেউ বলেন অলঙ্কার-সংযোগে,* কেউ বা বলেন অর্থের রমণীয়তা-প্রতিপাদনে;† চমৎকার-সৃষ্টির কথাও বলেন কেউ কেউ। সে যা হোক, অভিধা-মূলক বাক্য যে কাব্যের রসত্ব-সাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন এক-বাক্যে; নতুবা অর্থকে 'রমণীয়'-বিশেষণে বিশেষিত করা হ'ত না, কিংবা চমৎকার-সৃষ্টির প্রসঙ্গও উঠত না। বাক্য 'রমণীয় অর্থ' অর্থাৎ লোকোত্তর আহ্লাদ উৎপাদন করে, কিংবা 'চমৎকার' অর্থাৎ বিদ্বজ্জনের চিত্ত-বিস্তার সাধন করে তখনই যখন সে বাচ্যকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে এবং লক্ষ্য থেকে ব্যঙ্গ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

অতএব ব্যঞ্জনার দিক থেকে শব্দ-সৌষ্ঠবের দান এবং স্থান কতটুকু সেই আলোচনাই করা যাক প্রথমে। 'সুষ্ঠু' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ,—অর্থ ও ধ্বনির দিক থেকে যা একান্ত সঙ্গত, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যা আমাদের শ্রুতিকে তৃপ্ত করে মনের ভিতর মহলে চলে যায় এবং বাচ্যকে অতি-ক্রম করে এক অচিন্তিতপূর্ব অর্থের দ্যোতনা করে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কাব্য-চিন্তায় কৈশিকী, ভারতী, সাত্বতী, আরভটী প্রভৃতি বৃত্তির কল্পনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে রসই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য; কাজেই কেবলমাত্র রস-সাধক বাক্যকেই 'সুষ্ঠু' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রসের পরিপোষের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব বৃত্তি* অর্থাৎ পদ-বিন্যাস-পদ্ধতির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কৈশিকীর মধ্যে পাওয়া যায় দুটি বড় গুণ, প্রসাদ ও মাধুর্য; যে গুণ থাকলে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থটি প্রতিভাত হয় বাক্যটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই, পদ-প্রবন্ধের সেই স্বচ্ছ সৌকুমার্যের নামই প্রসাদ-গুণ; মাধুর্য নির্ভর করে অনেকটা কল্পনার কম্রতা ও অনক্তত্রতার উপর। পূর্বাচার্যগণের মতে এই বৃত্তি বা স্টাইল শৃঙ্গার-রসের পক্ষে খুবই উপযোগী। বীর ও রৌদ্র-রসের সহায়ক আরভটী, কারণ এর মধ্যে আছে ওজোগুণ, আছে শব্দ ও সমাসের সমারোহ; গৌড়ী রীতির সঙ্গেই এর সমধর্মিতা। 'মেঘনাদ-বধে'র মেঘমন্দ্র প্রবন্ধগুলি এই বৃত্তির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

---

* কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ। (কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি)

† রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্। রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনক-জ্ঞান-গোচরতা। (রসগঙ্গাধর)

* রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষোবৃত্তিঃ। (লোচন)

অনিবার্যক্রমেই আর একটা ব্যাপার এসে পড়ছে এর থেকে। কোন্ ভাব কোন্ বৃত্তির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে সুষ্ঠু-ভাবে, সে কথা ভেবে নিতে হবে গোড়াতেই। বস্তুতঃ, রসোচিত রূপটি কবি-মানসে উদ্ভাসিত হয় অনায়াসে। এই সূক্ষ্ম শিল্প-দৃষ্টি—এই 'কবিত্ব-বীজ' নিহিত থাকে প্রত্যেক রূপদক্ষের অন্তরে। তবুও শাস্ত্র-পরিশীলন ও রচনা-চর্চারও প্রয়োজন আছে। কারণ কবিত্বই ত কাব্যত্বের একমাত্র হেতু নয়; কাব্য-মাধুরীর অনেকটাই নির্ভর করে কলা-চাতুরীর উপর। নিরন্তর কাব্য-চর্চার ফলে চিত্ত পরিমার্জিত হয় এবং ঔচিত্য-বোধ অর্থাৎ রুচি গড়ে ওঠে। এই কারণেই কাব্য-সম্পদের কারণ-নির্দেশ-প্রসঙ্গে আচার্য দণ্ডী নৈসর্গিক প্রতিভার সঙ্গে সংশয়রহিত বিদ্যা ও অবিরত অভ্যাসের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'অভিযোগ' ও অনুশীলনের গুণে পূর্ব-বাসনা জাগ্রত হয় এবং কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা আসে। কতকটা এই ভাবেরই আভাস পাই ভাসের উদ্ধৃত উক্তিতে —'মথ্যমান অরণি থেকে যেমন অগ্নি উদ্‌গত হয়, খন্যমান ভূমি থেকে যেমন নীর নির্গত হয়, তেমনি রচনা-প্রযত্নের ফলে কাব্য-রসের উৎসেকও অসম্ভব নয়।' বাস্তবিক, রচনার রুচিরতা নির্ভর করে উচিততার উপর—সৌষম্যের উপর নির্ভর করে সুষমা *। ঔচিত্যবোধের অভাবে রচনা হয়ে পড়ে অসদৃশ ও অরুচিকর এবং রসোৎপত্তি হয় ব্যাহত।

স্টাইল-অর্থে রীতি এবং বৃত্তি দু'টি শব্দই প্রচলিত আছে অলঙ্কার-শাস্ত্রে। তবে রীতির শ্রেণীকরণ করা হয়েছে প্রধানতঃ ভৌগোলিক পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা-রীতির গুণাগুণ অবধারণ করেই কল্পিত হয়েছে বৈদর্ভী গৌড়ী, পাঞ্চালী, প্রভৃতি রীতি-বিভাগগুলি। অপর পক্ষে, বৃত্তি-ব্যবস্থাটি পরিকল্পিত হয়েছে রস-সৃষ্টির সাধকরূপে। রস-সাধনের যোগ্যতা আছে এমন সব শব্দের সমাবেশই শুধু করা চলে কাব্যে। বিশ্রুত কবি ও সমালোচক এলিয়ট 'auditory imagination' অর্থাৎ শ্রুতিমূলা কল্পনার কথা বলেছেন তাঁর কোন এক নিবন্ধে। এই কল্পনার বলে শব্দ ও ছন্দের ধ্বনিগত তাৎপর্যটি স্বতই প্রতিভাত হয় শিল্পীর অন্তরে এবং সেই সব শব্দই বেছে নেন তিনি, যেগুলি আমাদের চেতনার বহিস্তর দিয়ে অনুস্রুত হয়ে অন্তরের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছয়। ভারতীয় অলঙ্কারেও আর্থী ও শাব্দী উভয়বিধ বৃত্তি ও ব্যঞ্জনাই স্বীকার করা হয়েছে। কৈশিকাদি অর্থ-বৃত্তির অন্তর্ভূত ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্য প্রভৃতি গুণগুলিও পরিবাহিত হয় ভাবগর্ভ শব্দ-সন্দোহের মাধ্যমেই। এইগুলি ছাড়া গ্রাম্যা (কোমলা), উপনাগরিকা, পরুষা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ-বৃত্তিও ব্যবস্থিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। 'গ্রাম্যা' সরলা পল্লী-ললনার মতই কোমলা, সুকুমার-অনুভূতি-প্রকাশের অনুকূল; উপনাগরিকার মধ্যে পাই বিদগ্ধ-নাগরিকার মার্জিত রুচি, হাস্যশৃংগারাদি রস-সৃষ্টির সহায়ক এটি; পরুষার প্রকৃতি একটু রুক্ষ—রৌদ্রাদি রসের ক্ষেত্রেই এর উপযোগিতা। 'লোচন'-কারের মতে বৃত্তিগুলিই কাব্যের জননী—'বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ'। সুতরাং বৃত্তি-ব্যবহারে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন, নতুবা অনুচিত শব্দ ও অর্থের সন্নিবেশে রস-সিদ্ধি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ভৌগোলিক রীতি-বিভাগ কতকটা কৃত্রিম ও কাল্পনিক, কারণ একই অঞ্চলের কবি ও লেখকদের ভাষা-শৈলী ঠিক একই প্রকার হয় না, কিংবা হতেও পারে না। বৈদর্ভীর প্রশংসা এবং গৌড়ীর নিন্দার মধ্যে অসূয়ার গন্ধই পাওয়া যায়।

কথা উঠতে পারে, বাক্ এবং অর্থ এরা ত পার্বতী-পরমেশ্বরের মতই পরস্পর-সম্পৃক্ত, এদের পৃথক করে দেখা সম্ভব হয় কি করে? পৃথক করে দেখা হয়ও না আসলে; প্রবৃত্তিগত পক্ষপাতের জন্যেই কেউ অর্থগত, কেউ বা শব্দগত বৃত্তির উপর জোর দেন এইমাত্র। শব্দ বললেই আসে অর্থের কথা, আর অর্থ বললেই এসে যায় শব্দের প্রসঙ্গ, কারণ অর্থবদ্ধ, বিবিক্ত ধ্বনির নামই 'শব্দ'। অনুগুণ-শব্দ-সংযোগের মাধ্যমেই অভিরূপ অর্থের উদ্বোধন সম্ভব হয়। বাক্যে কাব্যত্ব-সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন শব্দার্থের সুচিন্তিত ও পরিমিত প্রয়োগ। ঔচিত্য-বোধ না থাকলে সন্দর্ভ কিছুতেই রসানুরূপ হতে পারে না। কিন্তু শব্দার্থকে যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নেবার যোগ্যতা আছে ক'জনের? কাজেই পদ-বন্ধ-সম্বন্ধে একটা শিথিল মনোভাব দেখা যাচ্ছে আজকাল চারিদিকে। আমাদের শব্দ-ভাণ্ডারে রজনীও আছে, শর্বরীও আছে; নারীও আছে, রমণীও আছে; সৌদামিনীও আছে, ক্ষণপ্রভাও আছে;—এক একটি শব্দের কত না পর্যায়-শব্দ ভাষায় প্রচলিত; কিন্তু কোন্ শব্দটি কোথায় ব্যবহার করলে তা রুচিসম্মত ও রস-সম্মিত হবে তা বুঝব কি করে, যদি না শব্দার্থ সম্বন্ধে আমার প্রত্যয় হয় সুপ্রতিষ্ঠিত? শব্দের জন্যই শব্দ-ব্যবহারের অথবা শব্দের অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক সাহিত্যে আদৌ বিরল নয়। 'যমুনা-পুলিনের তটে তটে' কিংবা 'বিনীত বিনয়ে', 'গীতির ছন্দোময়ী রূপ' প্রভৃতি শিথিল প্রয়োগ আধুনিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় যত্র-তত্র। উপাদান অর্থে 'অবদান,' পেশীবহুল অর্থে 'পেশল' শব্দের সাক্ষাৎও না পাওয়া যায়

* উচিতং প্রাহুরাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ। (ক্ষেমেন্দ্র)

এমন নয়। এর জন্তে দায়ী আমাদের শব্দ-শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। বিদ্যার্থীদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন এ বিষয়ে হন আর একটু অবহিত এবং অলঙ্কার-প্রয়োগ-সম্বন্ধেও হন আর একটু সংযত। তরুণ মনের ধর্মই হ'ল অহেতুক উচ্ছ্বাস—ফেনিল ভাষার মুকুরে ভাবের মুখ-দেখা। কিন্তু বয়স একটু বাড়লেই বোঝা যায় কত বড় ফাঁকি লুকিয়ে আছে এর তলায়। বস্তুতঃ, ঔচিত্যই হ'ল কাব্যসূপের লবণ—মাত্রার তারতম্য হলেই বিপদ, সব লাবণ্য মাটি। ঔচিত্যবোধের সঙ্গেই সংসক্ত আছে প্রসাদাদি যাবতীয় গুণ; রীতি বা বৃত্তি, যত গুণ-গুম্ফিতই হোক না, রসোচিত না হলে তা বন্ধ্যা।

অলঙ্কার-কল্পনার ব্যাপারেও মিতাচার ও উচিতত্ত্বার অভাব দেখা যায় অনেক সময়। কণ্ঠে মেখলা কিংবা কটি-তটে হারের আরোপ, প্রণতের প্রতি শৌর্য কিংবা শত্রুর প্রতি করুণা-প্রদর্শন, ইত্যাদি অনুচিত আচরণ রুচির অভাবই সূচিত করে। ঔচিত্য থেকে বিচ্যুত অলঙ্কারও গুণ না হয়ে হয় দোষেরই আস্পদ: 'বিষায়তে গুণগ্রামঃ ঔচিত্যপরিবর্জিতঃ'। অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গীর, ভাবের সঙ্গে ভঙ্গীর সংসক্তিরই অন্ত নাম ঔচিত্য; ক্ষেমেন্দ্র একে বলেছেন কাব্যের জীবন, আর রস তার আত্মা। বামন যে রীতি অথবা বিশিষ্ট পদ-রচনাকে কাব্যের আত্মা বলেছেন তার কারণ এই যে, একমাত্র অনুরূপ পদ-বন্ধেই রসাপত্তি সিদ্ধ হয়।

কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের একটি প্রখ্যাত উক্তি স্মরণীয় এই প্রসঙ্গে: তাঁর মতে কাব্যের জন্তে প্রচলিত বাগ্‌রীতিই যথেষ্ট। অকৃত্রিম আবেগ-প্রকাশের জন্ত কৃত্রিম বাক্-শৈলী অনাবশ্যক। ভাবের সঞ্চারই যদি তাৎপর্য হয় কাব্যের, তা হলে অলঙ্কার-সম্ভার যে ভার হয়ে থাকে তার দেহে তাতে সন্দেহ নাই। পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত একটু বদলে বলেছিলেন, দৈনন্দিন ভাষা কাব্য-রূপায়ণের পক্ষে পর্যাপ্ত হলেও প্রয়োগ-পদ্ধতির নির্বাচন সময় সময় প্রয়োজন হতে পারে। কোলরিজ মোটামুটি এই মত মেনে নিলেও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারেন নি; কাব্যে অলঙ্কারের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। যাকে বলা যায় 'রীতির দীপ্তি' 'splendour of diction' ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ তাকেই বলেছেন, 'প্রাণশূন্য প্রগল্‌ভ বাগ্‌-জাল' 'gaudy, inane phraseology'। অলঙ্কারের অতিরেক দোষের সন্দেহ নাই, কিন্তু অলঙ্কার-রিক্ততা গুণ কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। তথ্য-পরিবেশন

* উচিতস্থানবিন্যাসাদ অলংকৃতিরলংকৃতিঃ। (ক্ষেমেন্দ্র)

সাহিত্যের ধর্ম নয়; বার্তা-সাহিত্য ভারতে নিন্দিতই হয়েছে প্রাচীনকালে, যদিও বাস্তবতার নামে কিছু ইজ্জত পাচ্ছে এ যুগে। তবুও 'লজ্জতে'র কথাটাও একেবারে ভুললে চলবে না; ব্যঞ্জনার আগে আছে রঞ্জনা। মনের দ্বারী হ'ল শ্রুতি; তাকে খুশী করতে না পারলে ভাবের রঙমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলবে না। কাব্যকলার ক্ষেত্রে উচিত মিলে থাকে ললিতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে—এদের বিচ্ছেদে কাব্য-শরীরের অঙ্গহানি ঘটে। কাজেই অলঙ্কারকে একেবারে বহিষ্কার করা যায় কেমন করে? আধুনিক কাব্যে প্রায়ই লক্ষিত হয় ভাষা ও ভূষার মধ্যে এই সঙ্গতির অভাব, যেন রিক্ততা ও অতিরিক্ততার মধ্যে কোন মধ্য-পন্থাই নেই। অলঙ্কার-শাস্ত্রে স্বভাবোক্তির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে; এর লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে এই-রূপে—'চারু যথাবদ্ বস্তু-বর্ণনম্'। যথাযথ বস্তু-বর্ণনার আদিতে 'চারু' বিশেষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বস্তুর প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে এবং কোনরূপ অলঙ্কারের সাহায্য না নিয়ে চারুতা সম্পাদন করতে হবে। অবশ্য চারুতা বলতে তাঁরা বুঝেছেন অগ্রাম্যতা। গ্রাম্যতার সপক্ষে ওকালতি করেও চারুতার কথা শেষ পর্যন্ত চিন্তা করতে হয়েছে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে। এ দেশে কিন্তু আভরণকে আবরণ বলে মানা হয় নি কোন দিনই, যদিও তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বীকার করা হয়েছে। বাহ্য, আভ্যন্তর ও বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে নিরূপিত হয়েছে এর ত্রিবিধ রূপ। বস্ত্র-মাল্য-মণ্ডন প্রভৃতি বাহ্য, দন্তপরিকর্ম অলক-কল্পনা প্রভৃতি আভ্যন্তর, স্নান-ধূপ-বিলেপন প্রভৃতি বাহ্যাভ্যন্তর; অন্ত কথায় শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং শব্দার্থ-অলঙ্কার। কিন্তু শরীরীকৃত না হলে হার ভার হয়ে চেপে থাকে অঙ্গে। 'সঙ্গত' যখন ছাপিয়ে ওঠে সঙ্গীতকে, সঙ্গতির অভাব ঘটে তখনই। সত্যকার অনুভূতি ও আবেগ অভিরূপ চিত্র-কল্পনার মধ্য দিয়েই মূর্ত করে আপনাকে। 'রসাক্ষিপ্ত' অনুভূতিগুলি অভিব্যক্তির আমুখে একবারে রূপ নিয়েই ফুটে ওঠে, কাজেই প্রকাশ-রূপ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়গুলির একটি বিশেষ সাঙ্কেতিক তাৎপর্য আছে এবং অন্তরের গূঢ়তম অনুভূতিগুলি শুধু সঙ্কেতময় রূপকের ভাষাতেই প্রকাশিত হতে পারে। আত্মাকে যেমন দেহসত্তা থেকে পৃথক করা যায় না, ঠিক তেমনি রসকেও তার প্রকাশ-শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়; বিশ্বনাথের কথায় 'প্রকাশ-শরীরাদ্ অনন্য এব হি রসঃ'। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে হয় যে বচনের মধ্য দিয়ে তা কখনই উপমা-নিরপেক্ষ হতে পারে না। 'সূর্য অস্তমিত, চন্দ্রের উদয় হয়েছে আকাশে, পাখীরা সব দলে

'লে চলেছে কুলায়ের দিকে'; এই বার্তা বা স্বভাবোক্তিকে কাব্য বলা চলে কি? বাক্যকে কাব্য-প্রপানকে পরিণত করতে হলে উপমা-রূপকাদির সংযোগে তাকে বিশিষ্ট করে তুলতেই হবে। তবে বচন-রচনার যে বিশিষ্টতা আসে ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা থেকে তার মধ্যে প্রশংসার কিছু নেই; মুদ্রাদোষ বিশিষ্ট হলেও তা দোষই। লেখাটা 'অমুকে'র বলে চেনা গেলেই তার মূল্য বেড়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি বিশিষ্ট তাঁদের কল্পনার মৌলিকতা তথা কলা-কর্মের অনন্যতায়। এঁদের বাগভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য এসেছে দৃগ্‌ভঙ্গীর সূক্ষ্মতা থেকে। স্টাইলের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে মনীষী বার্ফো বলেছেন, 'Style is the man himself'—স্রষ্টা মানুষটি তার সৃষ্টি থেকে অভিন্ন—প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার অন্তরতম সত্তাটি উদ্‌ভাসিত হয়। ফ্লোবেয়ার স্টাইলকে বলেছেন, 'স্বকীয় ভঙ্গীতে জীবনের আস্বাদ'। জীবন দর্শনের এই স্বতন্ত্রতাই সাহিত্য ও শিল্প-কলার উদ্ভব-ভূমি।' শেকভ বলেছিলেন গোর্কিকে, 'তুমি রূপদক্ষ, তোমার সংবেদনা গভীর ও গঠনশীল; তোমার বর্ণনাগুলিতে রয়েছে তোমার নিজের হাতের সুস্পষ্ট স্পর্শ। এই ত চাই।' কথাচ্ছলে-বলা তাঁর এই মন্তব্যটি থেকে যে জিনিষটি পাই সেটি হ'ল ভাব ও রূপের অব্যবহিততা ও অনিবার্যতা। জগৎ ও জীবনকে নিজের চোখে দেখা এবং অনুভূত সত্যটি মনের ছাঁচে যে রূপ ধরা দেয় ঠিক সেই-রূপেই তাকে তুলে ধরা রস লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ। সজীব ও উজ্জ্বল অনুভূতিই সাহিত্য-সৌন্দর্যের আকর, কারণ, এই অনুভূতি একান্ত বিশিষ্ট। বিশিষ্টতা-প্রসঙ্গে কবি-গুরু গ্যেটে বলেছেন, সামান্য বা অবিশেষকে নিয়েই কবির কারবার, কিন্তু এই সামান্যকে অসামান্য বা বিশেষ করে তোলার মধ্যেই নিহিত আছে শিল্পের শক্তি, এবং এই বিশেষ দৃষ্টির উপরই শিল্পের প্রতিষ্ঠা। উদ্‌ভিদ্যমান প্রত্যেকটি ভাব অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে পরিণত হয় ভাব-মূর্তিতে। কবির কাজ, মনোলীন সেই ভাবরূপটিকে অপরের আস্বাদ্য রস-রূপ দেওয়া; এর জন্যই প্রয়োজন হয় শিল্প-কৌশলের। একটি অনুচ্ছেদকে কাটকুট করে অভীষ্ট-গঠনটি দিতে ফ্লোবেয়ারের মত কথা-কোবিদেরও দিনের পর দিন চলে যেত। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের রচনায় কাটকুট বড় কম করেন নি। দূর থেকে দেখে যে কাব্য-বিগ্রহটিকে অনায়াস-প্রসূত বলে মনে হয় তার পিছনে যে কি প্রয়াস লুকিয়ে আছে বাইরের লোকে তা জানতেও পারে না। আসল কথা, মনের নিভৃত ভাবচ্ছবিটিকে সহৃদয় সামাজিকের আস্বাদযোগ্য করে তুলতে হলে রূপ-স্থাপনায় বিন্যাস-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে; প্রতি রূপটি অভিরূপ না হলে রসাপত্তিতে ব্যাঘাত ঘটে।

সেক্সপীয়রের রচনা প্রতিরূপ-কল্পনায় বিশিষ্ট; কালিদাসের উপমা ত অনুপমা, আর উপমার যাদুকর রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই উপমা-সম্ভারেরর জন্তে এঁদের সৃষ্টি রসভ্রষ্ট হয়েছে কি? বিশ্ব-জীবনের সঙ্গে আত্মজীবনের অন্তরঙ্গতাই এঁদের অনুপম কারু-সৃষ্টির নিভৃত উৎস। ভামহ বলেন, সাহিত্যের আয়তক্ষেত্র অলঙ্কারের অলংহারে পরিব্যাপ্ত। গূঢ় গভীর অনুভূতিগুলির যথাবৎ বর্ণনা সম্ভব নয়; কাজেই আশ্রয় নিতে হয় বক্রোক্তির। বাক্যের বাচ্যার্থ প্রসারিত হয় এই বক্রোক্তির সাহায্যেই এবং স্ফুরিত হতে থাকে সহৃদয় শ্রোতার অন্তরে; বাক্য সমাপ্ত হয়ে গেলেও তার অনুরণন থামে না। এক অর্থে বক্রোক্তিমাত্রই অলঙ্কার, স্বাদহীন সাদা কথাও অপূর্ব হয়ে ওঠে ভাষণ-ভঙ্গীতে। বামনের মতে চারু যা, সুন্দর যা তাই অলঙ্কার।*

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: 'মাষ্টারমশাই মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপান বহির বাহিরের দক্ষিণ হাওয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন।' এই বাক্যটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বক্রোক্তির সাহায্যে যে অনন্যতা ও অপূর্বতার স্বাদ এনে দিয়েছেন, স্বভাবোক্তির দ্বারা তা কখনই সম্ভব হ'ত না। যদি বলা যেত 'মাষ্টারমশাই আমাদের পড়ার বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের বইও পড়তে দিতেন; তা হলে তথ্যের দিকে থেকে হয় ত তা ত্রুটিহীন হ'ত, কিন্তু তার আস্বাদ হয়ে যেত অনেক ফিকা। মোট কথা, সোজা সাদা কথার বদলে কাকু বা শ্লেষ দিয়ে ঘুরিয়ে বলতে পারলে তার ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি বেড়ে যায় অনেকখানি, আর এই ধ্বনি থেকেই হয় রসের উৎপত্তি—মনের রসনায় লেগে থাকে তার স্বাদটুকু। আবার দেখুন: 'চেনাশোনার সাঁঝ-বেলাতে' অথবা 'ফিরেছিলে আপন মনের গোপন অলিগলি'—উক্তি দুটির মধ্যে অলঙ্কারগুলি এমন একাত্ম হয়ে মিশে আছে ভাবের সঙ্গে, যে তাদের অলঙ্কার বলে আর চেনাই যায় না; অভিনব গুপ্ত একেই বলেছেন, রসবদ্‌ অলঙ্কার। বক্রোক্তির উপযোগ ভিন্ন এদের অর্থের রমণীয়তাটুকু আসত কি? আর চলতি কথাতেই কি আমরা অজ্ঞাতসারে কম অলঙ্কার ব্যবহার করি? একটা উদ্বেগ কেটে গেলে আমরা কি বলে উঠি না, 'বাঁচা গেল; কি ভাবনা যে হয়েছিল, ঘাম দিয়ে এখন জ্বর ছাড়ল।' আমরা 'জলের মত টাকা খরচ করি', 'বাদুড়-ঝোলা হয়ে ট্রামে বাসে যাওয়া-আসা করি,' 'হাটের

* 'বাচ্যো হৃদয়াবর্জকো অর্থপ্রকারান্তরবক্তোহলংকারাঃ'

মাঝে হাঁড়িও ভাঙি।' খুঁটিয়ে তালিকা দিতে গেলে 'মহাভারত' হয়ে পড়বে। ফল-কথা, আবেগের ভাষাই হ'ল বক্রোক্তি, এ ছাড়া অন্য পথ নেই। ভূষণ দূষণ হয়, মধু বিষ হয়ে ওঠে তখনই যখন হয় তার অপচার। যথাতথ্য সাহিত্যের ধর্ম নয়; জীবনের উজ্জীবন, লৌকিকের অলৌকিকে উদ্গতিই তার প্রাণ। ব্যঙ্গ্যার্থের অভিব্যঞ্জনের শক্তি নেই যে ভাষার সে ভাষা সাহিত্যে অচল। বক্রোক্তি-প্রসঙ্গে আচার্য মম্মট বিশেষ করে কাকু এবং শ্লেষের উল্লেখ করলেও রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক অথবা রসোদ্বোধক প্রত্যেকটি অলঙ্কারই এর আওতায় পড়ে। বিশ্ববিশ্রুত মনীষী এরিস্টটল-এর অভিমতটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—'প্রকৃত বাস্তবতা প্রাকৃত বাস্তবতা থেকে স্বতন্ত্র। বস্তু সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি ভাব-কল্পনার দ্বারা অনুবিদ্ধ না হলে তা সৃষ্টি হয়ে ওঠে না।' অমূর্ত 'সত্য' রস-মূর্তিতে আরোপিত হলে তবেই হয় 'সুন্দর'। সাকারের উপাসক কবি—সুন্দরের সাধক; অরূপকে অপরূপ অর্থাৎ বিশিষ্ট বাণীরূপ দেওয়াই তাঁর ধর্ম। বাগ্-ধেনু থেকেই ক্ষরিত হয় রসদুগ্ধ; যে রীতি বা বৃত্তি রস-রূপায়ণের যত অনুকূল সেই রীতি বা বৃত্তিই সাহিত্যের পক্ষে তত উপযোগী। শিল্পজীবী ও শিল্পীর মধ্যে ভেদরেখা টেনে দেয় ঔচিত্য-বুদ্ধি।

ঋতু-বাসর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

গ্রীষ্ম

বুক-ফাটা মাটি যেথা এক ফোঁটা জল চায়
  দুপুরের ঝলসানো আকাশের প্রান্তে,
রং-হারা পাকা পাতা টুপ্-টাপ্ ঝরে' যায়
  কখন যে সেটা কেউ পারে নাক' জানতে।
হিস্ হিস্ লাগল যে কা'রা ছুরি শানাতে,
  আগুনের হল্‌কায় দুই চোখ ধাঁধল,
পুকুরের কাদাজল ভরে পচা পানাতে,
  জিরজিরে গরুগুলো কা'রা গোঁজে বাঁধল।
ঘাস সব জ্বলে যায়, খাঁ-খাঁ করে সারা মাঠ,
  হা-হা করে মেঠো ঝড় বুক-ফাটা হাসিতে,
উলুখড় শুয়ে যায়, বাঁশঝাড় নুয়ে যায়,
  তালগাছ ছুঁয়ে যায় ওড়া-ধূলিরাশিতে।
এক ফোঁটা নীল নেই, পুড়ে যেন যায় চোখ,
  আকাশ দেউলে হ'ল সব নীল হারিয়ে,
নেই "বউ-কথা-কও," নেই আজ "খোকা-হোক,"
  পাতা-ঝরা গাছগুলো কাঁপে ঠায় দাঁড়িয়ে!

বর্ষা

ব্যাঙের ঘ্যাং-ঘ্যাং, আকাশের গুর্-গুর্,
  স্যাঁত-সেঁতে পথঘাট উদাসীন সাজল,
ডোবা-খানা-নদী-নালা জলে টই-টুম্বুর,
  বৃষ্টির ঝুম্ ঝুম্ চারদিকে বাজল।
বকগুলো গাছ ছেড়ে বিলে এসে করে ভিড়,
  ঝাপ্‌টায় সাদা ডানা এলোমেলো বাতাসে,
রূপের দেমাকে কেয়া ফেটে হ'ল চৌচির,
  ছেয়ে গেল নদীতীর ভিজে বন-কাপাসে।
মেঘে মেঘে বাড়ে বেলা আঁধারের দেশে যে,
  কালো মাঠে ঝড় বুঝি অভিমানে ফুলছে,
বীজধান-চারাগুলো সবুজেতে গা মেজে
  পূবের হাওয়ার তালে মাথা নেড়ে দুলছে।
মনে হয় এ পৃথিবী রাত-দিন কাঁদে বুঝি,
  চাঁদ আর সূর্যিকে ফেলেছে সে হারিয়ে,
সান্ত্বনা পেতে তাই লয় বিদ্যুতে খুঁজি,
  মেঘে মেঘে সেও দেয় হাতখানি বাড়িয়ে।

শরৎ

নীল ও সবুজে আজ বাঁধে মিতালির ডোর,
  আলোছায়া লুকোচুরি খেলে মাঠে দুপুরে,
কামরাঙা-ডালে বসে ঘুঘু ডাকে দিনভোর,
  মাছরাঙা উড়ে উড়ে ডুব দেয় পুকুরে।
নীচে সাদা কাশফুল সাদা মেঘে ডাকে—"আয়,"
  হাসে আজ ফুলে-ফুলে-আলো-করা বন যে,
আকাশের বুক চিরে বক-সারি উড়ে যায়,
  বোঁটা-রাঙা শিউলিরা চাঙ্গা করে মন যে!

বহুদিন পরে আজ দল বেঁধে প্রজাপতি
বন-সেঁজুতির ডালে ভিড় করে বসল,
ফড়িং-এর ছোঁয়া পেয়ে শিহরে "লজ্জাবতী",
জড়সড় হতে গিয়ে নীলফুল খসল।
কে যেন ছড়ায়ে গেছে মাঠে খৈ মুঠো মুঠো,
সাদা সাদা কাশ-ফুল দোল খায় হাওয়াতে,
সাঁওতাল ছেলে ভাবে আকাশের নেই ফুটো,
জলঝরা থেমে গেছে দেওতার দয়াতে।

হেমন্ত

ধানে ধানে ভরা মাঠ, ঝলমলে পথঘাট,
রোদ-যে পরশমণি দেয় সোনা ছড়িয়ে ;
কলমিলতার ফুল বাতাসে দোদুল-দুল
পুকুরের বুকে দেয় সাতনরী ছড়িয়ে।
শিশিরভেজানো মাটি, ফুটেছে আলতাপাটী,
ফুটেছে শাপলা ফুল ডোবা বিলখানাতে,
পুঁই-মাচা আলোকরা মেটুলিতে রংধরা,
রোদ্ করে ঝিকমিক্ শালিকের ডানাতে।
সুর ওঠে সারাদিন পাকাধানে রিন্-ঝিন্,
লক্ষ্মী এলেন যেন বাজায়ে নূপুর,
শঙ্খচিলের ডাকে টুনটুনি বসে থাকে
পাতার আড়ালে ভয়ে সারাটি দুপুর।
পেয়েছে হিমের ছোঁয়া নেমেছে কুয়াসা ধোঁয়া,
খেজুর রসের বাসে মাতে সমীরণ,
রাতের নূতন হিমে গাছভরা কচি সিমে
শিশির বাঁধিতে চায় চাঁদের কিরণ।

শীত

উত্তুরে বাতাসের সপাসপ বেত খেয়ে
গাছ থেকে টপাটপ পাকা পাতা ঝরল,
রাশি রাশি কাটা ধান পড়ে আছে ক্ষেত ছেয়ে
গন্ধ-উতলা মাঠ কোন্ মায়া ধরল !

বাষ্পের আবছায়ে আকাশে খুঝি ওঠে
বাধা আর নাই তার পানে চোখ মেলিতে,
শীতে হয়ে জড়সড় বুড়োরা রৌদ্রে জোটে,
ছেলেরা-যে ভুলে যায় পথে-ঘাটে খেলিতে।
সাঁঝ কি সকালে আর নদী বা দীঘির কূলে
ওঠে না মধুর ধ্বনি কাঁকনে ও কলসে,
উত্তুরে হাওয়া আসে সাম্যের ধ্বজা তুলে,
নাহি আজ ভেদাভেদ শ্রমী আর অলসে।
হিমময়ী রাত্রি কি সেজেছে তপস্বিনী,
কুয়াসার ছাই মেখে যোগাসনে বসল ?
রুক্ষ তরুর শাখা যেন জটা-লম্বিনী,
ধরণীর শ্যাম-স্নেহ-বন্ধন খসল ?

বসন্ত

বসন্ত দিল রং মনে বনে ছড়ায়ে,
আকাশে বাতাসে নামে পুলকের বন্যা,
মঞ্জুল কুসুমের উত্তরী উড়ায়ে
বনানী যে দেবদাসী নর্তনধন্যা।
আম্র-মুকুল-ঝরা গন্ধ উতলা পথে
মন যেন হতে চায় সুদূরের যাত্রী,
তৃষ্ণা-বিধুরা দিবা আসে কল্পনারথে,
মঞ্জু-স্বপনে আসে বিহ্বলা রাত্রি।
চম্পার অভিসার কনক-প্রদীপ জ্বালি' ;
বকুলের সৌরভে বনবীথি উতলা,
কুঙ্কুমরঙা ফুলে পলাশ ভরেছে ডালি
কৃষ্ণচূড়ায় কার দোলে পীত-মেখলা।
আকাশ দিয়েছে ডাক সাজি' বরসজ্জায়,
গোধূলির মেঘে-আঁকা স্বপনের পুরীতে,
"কথা কও"—ডাকে পাখী, ধরণী যে লজ্জায়
রাঙা হ'ল কিংশুক-অশোকের কুঁড়িতে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ব্রজেশের পত্র পড়ে আকাশ থেকে পড়লেন সুষমা। এর আগেও ত অনেকগুলি পত্র এসেছে—এমন তাৎপর্য্যহীন বেসুরো কোনটাই নয়। বিয়েটা ওদের নতুন হয় নি, অভিভাবকদের যাচাই-পছন্দেও শুভকাজ সুসম্পন্ন হয় নি। রীতিমত না হোক, পূর্ব্বরাগের সামান্য ছোঁয়াও যেন ছিল। এই পত্র পড়ে মনে হয়—কিন্তু কেন এমন পত্র লিখল ব্রজেশ?

পত্রখানি আর একবার তুলে ধরলেন চোখের সামনে। এইবার নিয়ে চার বার পড়া হবে। লেখা স্পষ্ট, অর্থ কিন্তু স্পষ্ট নয়।

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

মা, আশা করি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলটা যদি এই সঙ্গে জানাতে পারতাম। অবশ্য দেহের দিক দিয়ে স্বাস্থ্য আমাদের ভালই, সর্ব্বাঙ্গীণ বলতে পারছি না—মনটা জড়িয়ে আছে বলে। কেন এমন ঘটল—জানি না। মিতা কিছু দিন থেকে কি যেন ভাবছিল। প্রায় লক্ষ্য করছিলাম—মোটর-ভ্রমণে ওর স্পৃহা কমে গেছে, আলাপে উচ্ছ্বসিত হয় না, আহারেও কেমন বিতৃষ্ণা।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, শরীর খারাপ?

একটু হেসে বলল, না।

ভাবলাম শহরের একঘেয়েমিতে অমন হয়েছে। বললাম দেশে যাবে?

ও খুশী হয়ে উঠল। বলল, যাব। কবে যাবে?

বললাম, কালও যেতে পারি।

বেশ—কালই চল।

ওর আগ্রহ দেখে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি এখানে।

জানেনই ত কয়েকটা মৌজা নিয়ে এখানে একটা তালুক আছে আমাদের। এখানকার কাছারীবাড়ীটা ঠিক নদীর ধারে। তার পিছনে—একেবারে নদীর উপরেই একটা ইমারত তুলেছিলেন বাবা। বিঘাকতক জমি পাঁচিল ঘিরে—নানা ফলফুলের গাছ বসিয়ে মাঝখানে বাংলো প্যাটার্ণের একখানা দোতলা বাড়ী। সেই বাড়ীর বারান্দা থেকে চাইলে সামনে পিছনে—সব জিনিসই পটে আঁকা ছবির মত দেখায়। মিতা খুশী হয়ে উঠল—আঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

রহস্য করে বললাম, শহরের ধুলা আর ধোঁয়ায় বুঝি হাঁপ ধরে-ছিল?

না—ধুলা শহরে নেই। ধোঁয়া থাকলেও তেমন অসহ্য লাগে না। অসহ্য এই ভিখিরীগুলো। পথে ফুটপাথে আর পার্কে যেন ওদের মেলা বসেছে। ময়লা ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ চুল, হাড্ডিসার চেহারা—দেখলেই মনে হয় তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ বুঝি আবার ফিরে এল।

তা ওদের এত ভয় কেন তোমার? ওরা তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায় না। বললাম।

না হোক, ওদের সহ্য করতে পারি না। কেমন তোমাদের সরকার—এদের বিলিবন্দোবস্ত করতে পারে না।

বললাম, সরকার ত চেষ্টা করছেন প্রাণপণে—

ও উত্তেজিত হয়ে উঠল, ছাই চেষ্টা! তা হলে দিন দিন ওদের সংখ্যা বাড়ত না।

বললাম, জান, ভারত ভাগ হয়ে উদ্বাস্তুর সংখ্যা কত বেড়েছে? সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন এ সব সামলাতে।

এমন ভাগ করা দেশ নেওয়া কেন? যাই বল বাপু—শহরটা আর বাসের যোগ্য রইল না।

বললাম, তোমার কথাগুলো আর কেউ শুনলে ভাববে—তুমি ওদের ঘৃণা কর।

এই কথায় ওর চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। ভিজে গলায় বলল ও, সত্যি না। ঘেন্না ওদের একটুও করি না। দেখে কষ্ট হয়, মায়া হয়, সহ্য করতে পারি না।

জানি না কেন ওর এই ভয়? এই ছবির মত জায়গায় যদি ওর মন সুস্থ হয়—যদি ভয় ঘোচে—জানব এখানে আসা সার্থক হ'ল।

কয়েকটা জিনিস আমায় জানাবেন কি? ওর খুব ছেলেবেলা-কার মনের ভাব। মানে সেই সময়ের খেয়াল-খুশি আবদার রাগ কিংবা আনন্দ কোন্ কোন্ ব্যাপারে বেশী করে ফুটে উঠত। অবশ্য এত কাল পরে সে সব মনে আনাও শক্ত। তবু একটু চেষ্টা করে যে ঘটনাগুলো বিশেষ ভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল—সেইগুলি যদি জানান। জানতে চাইছি এই জন্যে—একজন মনোবিদ্ ডাক্তার-বন্ধু আমাকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছেন। এলোমেলো ঘটনার সুতোগুলো এক করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান তিনি। তিনি বলেন, এটি অবহেলার বস্তু নয়। এই মনের ভাবকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

আপনার চিঠি পেতে দেরি হলেও ক্ষতি নাই। ঘটনাগুলো এক সঙ্গে মনে না পড়ে—একটু একটু করে জানাবেন। আমি সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করে নেব। ঘটনার পাশে ওর বয়সটা উল্লেখ করবেন। সম্ভব হলে সালটিও। আর কিছু না।

চিঠি পড়ে নতুন করে ভাবতে বসলেন সুষমা। পৃথিবীতে নানা ধরণের মানুষ, চিত্তবৃত্তি সকলের সমান নয়। একজন যা ভালবাসে

—অন্যের তাতে বিরাগ। একই বস্তুতে আসক্তি বা উপেক্ষা রুচি অনুযায়ী ঘটে। এর মধ্যে বিপদটা কোথায় তিনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু ব্রজেশ যা লিখেছে—ভয়ের ব্যাপারই। এমন দু'একটি দৃষ্টান্ত তাঁর মনে পড়ল। পাড়াতেই দেখেছেন! বসু-গৃহিণী তাঁর সমবয়সী। বউ হয়ে দু'জনে প্রায় এক সময়ে এই পাড়াতেই আসেন। প্রথম থেকেই জয়া (বসু-গৃহিণী) ফিটফাট থাকত। অগোছাল ঘর দেখলে ও দু'দণ্ড সেখানে বসত না। কাউকে সকাল বিকেল একই কাপড় পরে থাকতে দেখলে মন্তব্য করত—স্বাস্থ্যের পক্ষে ওই অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। সেই জয়া গৃহিণী হয়ে বাড়ীটা আয়নার মত ঝকঝক্ করে রেখেছিল। ওর ঘরে একটি জিনিসও অগোছাল পড়ে থাকত না. সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যেত। তার পর? সেই জয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে হয়েছে এক শুচি-বায়ুগ্রস্তা রমণী। উচ্ছিষ্ট অনাচার নিয়ে খুঁতখুঁতুনি নয়—খুঁতখুঁতুনি ঘর ধোয়ামোছা সাজানো গোছানো ফিটফাট রাখা নিয়ে। দিনরাত ধোয়ামোছা করে হাতে পায়ে হাজা পাঁকুই চিরস্থায়ী বাসা নিয়েছে। ডাক্তার বলেন, এ রোগ সারবার নয়।

সেন-কর্ত্তার ছিল আর এক বাই। রাত্রিতে তিন চারবার উঠে পরীক্ষা করতেন শোবার ঘরের দরজায় ভাল করে খিল আঁটা হয়েছে কিনা। তার আগে সদর অন্দর সব দরজায় লাগাতেন চাবি। এত করেও তাঁর সন্দেহ ঘুচত না। ক্রমে সন্দেহ গেল বেড়ে—যার ফলে সারা রাত খিল দেওয়ার আর খিল খোলার শব্দ শুনত পাড়ার লোক। তার পরে···রাঁচিতে দু'বছর আছেন, কোন উন্নতিই নাকি হয় নি।

না, এ সব ভাবলেও মনটা কেমন করে ওঠে। মনঃসমীক্ষা নিয়ে ডাক্তাররা যেন বাড়াবাড়ি সুরু করেছেন। সুমিতার কথা ভাল করে ভেবে দেখবেন। মেয়েটি চিরদিনই আদুরে। বেশী বয়সের সন্তান—আর একমাত্র সন্তান। শুধু তাই নয়—ওর জন্মের বৎসরে মিঃ মুখার্জ্জীর পদোন্নতি হয়—মোটা একটা লিফট পান। আরও দু'বছর পরে একশো বিঘে ধান-জমি কেনেন—তৈরি করেন প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের পদস্থ ব্যক্তি—কনট্রাক্টাররা ত সর্ব্বদাই শ্রীচরণকমলেষু। এই সম্মান-বৈভব সুমিতা না এলে কি ঘটত? সুমিতা যখন আট বছরের মেয়ে—তখন একটা ব্যাপার ঘটে। ঠিক কথা—এটা লিখে জানাবার মত।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে সুরমা লিখলেন:—

১৯৪২ এর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বিকেলে গাড়ী বার করতে বলেছেন মিঃ মুখার্জ্জী—আমরাও পোশাক বদলে নেমে আসছি—হঠাৎ সুমিতা বলল, মা—সেই লোকটা আজ এসেছিল কেন?

কোন্ লোকটা? শুধোলাম।

যাকে বাবা একমাস আগে টাকা দিয়ে বললেন, এই নিয়ে ব্যবসা করগে—এমন করে কারও কাছে হাত পাতবে না। সে দিন ত টাকা দিলেন বাবা, তবে আবার ও এল কেন?

ও বলছে—সে টাকা খরচ হয়ে গেছে।

তবে বাবা আজ টাকা দিলেন না কেন?

রোজ রোজই কি টাকা দেওয়া যায়? বললাম।

কেন—বাবা ত মেলাই টাকা উপার্জ্জন করেন—তার থেকে ত দেওয়া যায়।

রাগ হ'ল মেয়ের অবুঝপনায়। বললাম, আছে বলেই দিতে হবে তার মানে কি? যখন চাকরি থাকবে না—কোত্থেকে তখন টাকা আসবে? সব দিয়ে থুয়ে শেষ পরে ওর মত কি ভিক্ষে করবেন?

ব্যস, যেমন বলা—মেয়ে গুম্ হয়ে গেল। আর কোন কথা না বলে নেমে এল, মোটরে বসল। সারাটা পথ প্রায় চুপ করেই রইল। উনি বললেন, বেবি, চুপ করে আছিস যে?—এমনি। তার পর বাড়ী ফিরে অবশ্য অনেক কথা বলল। কিন্তু আসল কথাটা যে ভোলে নি—সে বুঝলাম শোবার সময়। বলল, মা দিলেই বুঝি জিনিস ফুরিয়ে যায়?

বললাম, যায়, আবার যায়ও না।

ও বলল, কি জিনিস ফুরায় না।

কেন—বিদ্যা। পড়িস নি—যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

ও বলল, ও হ'ল আলাদা জিনিস। কিন্তু টাকা? ফুরায় ত?

ফুরোয়। এখন ঘুমো। এই ত সামান্য ঘটনা—এর থেকে তোমার মনঃসমীক্ষক কি তথ্য খুঁজে পাবেন বলতে পার?

উত্তর এল দিন কয়েক পরে:

এমনি ছোটখাটো ঘটনা, কিংবা এর চেয়েও তুচ্ছ ব্যাপারে, যা 'কিছু না' বলে শুনবার পরমুহূর্ত্তে ঠেলে দিই বিস্মৃতির অতলে—অবশ্যই জানাবেন। আমার বন্ধু নোট রাখছেন এবং এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন—আশা করি।

তা হলে আরও ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করব কি? ভাবলেন সুরমা। যে বয়সে আকাশের চাঁদ ধরে দেবার বায়না ধরে ছেলে-মেয়েরা—আর না পেলে কাঁদে, সেই বয়স থেকে—না রাজপুত্র রাজকন্যার গল্পে পক্ষীরাজ ঘোড়া আর সাত সমুদ্র তের নদীর কথা জানতে চাওয়ার ক্ষণে—অর্থাৎ আধজ্ঞানের সময় থেকে সেব ঘটনাগুলি? হাঁ—মনে পড়ছে একটি কথা। মেয়েটি যে পরের দুঃখ দেখতে পারে না—তেমন ঘটনা একটি মনে পড়ছে।

সুরমা লিখলেন:

বেবীর বয়স তখন পাঁচই হবে—একটা জিনিস হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একদিন। জান ত—বাংলা দেশে একতারা বা খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে ভিখারী বৈরাগীরা। বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছে—জয় রাধে কৃষ্ণ বলে সাড়া জাগিয়ে গোপীযন্ত্রে সুর তোলে

সখী-সংলাপ

দম্পতি — ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিং

মজুর রমণী

চাষী

[ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

এরা। এরা খুব ভুললেই—বেবী যেখানে থাক—ছুটে আসত সদর দুয়ারে। এমনকি খাবার ফেলেও ছুটত। ভিখারীরা ওকে আদর করে ডাকত—রাধারাণী। কেউ বা বলত—শুধু রাণী। আমি হয় ত ছোট রেকাবীতে করে চাল নিয়ে আসছি—ও আমার হাত থেকে সেটা টেনে নিতে চাইত। বুঝতাম—নিজের হাতে ভিক্ষে দিতে চায়। ওর হাত দিয়েই দেওয়াতাম ভিক্ষে। ভিখারীরা খুশী হয়ে বলত—রাজরাণী হও মা। আনন্দে ওর মুখখানা ঝক্‌ঝক্ করে উঠত। আর একটু বড় হলে নিজেই সাজিয়ে আনত রেকাবি। চালের সঙ্গে একটা আলু—কখনও একটি পয়সা—কখনও বা দু একখানা বাতাসা।

এক এক দিন বলত, আচ্ছা মা, ওরা যা বলে সত্যি হয়?

মেয়েকে খুশী করবার জন্ত বলতাম, একমনে প্রার্থনা করলে কেন হবে না। দেখিস তুই রাজরাণী হবি।

আর একখানা পত্রে লিখলেন:

কিন্তু বাবা—মেয়ে জেদীও ছিল ভীষণ। যেটি চাইত—না পেলেই এমন করত। অবশ্য কান্নাকাটি রাগ গোসা এসব কিছুই না। মনেই হ'ত না—চাওয়া জিনিষ না পেয়ে ওর দুঃখ হয়েছে। সে সম্বন্ধে পরে কোন উচ্চবাচ্য না করাতে বরঞ্চ মনে হ'ত—ওর চাওয়াটা সাময়িক খেয়াল মাত্র। অবশ্য চাওয়ার অবকাশও মিঃ মুখার্জ্জী দিতেন না। ছেলেরা যা চায়—সে সব অমনিই আসত, যা চায় না—তাও নিজের পছন্দমত কিনে আনতেন।

একদিন ও বলল, মা, তোমরা নিয়ম করে দিয়েছ—ভিখারীরা শুধু রবিবারে আসবে। অন্ত দিন এলে ভিক্ষে দাও না কেন?

বললাম, ছুটির দিন হাতে সময় থাকে—ভিক্ষে দেবার সুবিধা, তাই

কেন, আমার ত কাজ নেই, আমি ওদের ভিক্ষে দেব।

দিলেও ভিক্ষে।

সে মাসে হিসেব হ'ল এক মণ চাল বেশী খরচ হয়েছে। মুখার্জ্জি কিছু বললেন না—আমি বুঝলাম—এভাবে ভিক্ষে দিলে চলবে না। শুধু ভিখারীই বাড়ছে না সংখ্যায়—ভিক্ষা-বস্তুর পরিমাণও বাড়ছে। ছোট রেকাবি ভর্তি না হলে ওর মনের খুঁত-খুঁতুনি যায় না। মেয়েকে পাকে-প্রকারে বললাম, গায়ে মাখল না।

বললাম চাকরটাকে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। রবিবার ছাড়া ভিখারী এলেই ও যেন তাড়িয়ে দেয়।

পরের দিন ভিখারী এলো না। মেয়ের কি আকুলতা! হাঁ মা—আজ কেউ এলো না কেন? সবারই কি অসুখ করেছে? বললাম, বোধ করি ভিন্ন গাঁয়ে গেছে। মেয়ের মুখের ছায়া দূর হ'ল। পরের দিন সেই প্রশ্ন। বললাম, হয়তো আজ কি বিয়ের নেমন্তন্ন খাচ্ছে। বড় বড় কাজে দু'তিন দিন ধরে দীয়তাং ভোজ্যতাং চলে ত। চার দিন কাটল নেমন্তন্নর দোহাই দিয়ে। পাঁচ দিনের দিন মেয়ে বলল, আর? বললাম, হয়ত কোন মেলায় গেছে। দশ-বিশ দিন ধরে মেলা চলে কিনা। এই কথায় মেয়ের মুখের ছায়া দূর হ'ল না। হয়ত ভাবল—কে জানি ওরা কতদিনে আসবে!

ওরা রবিবারেই এলো। সেদিন নিষেধের বেড়া দেওয়ার দরকার হয় নি। চাকরটা বাজারে গিয়েছিল। ভিখারী আসতেই মেয়ের সে কি আনন্দ! ভিক্ষে দিতে ছুটল। বলল, হাঁ গা—তোমরা এ ক'দিন আস নি কেন? নেমন্তন্ন কেমন খেলে? কোথায় মেলা দেখলে?

দোতলার বারান্দা থেকে ওর প্রতিটি কথা শুনতে পেলাম।

কিন্তু তখন হাতের ঢিল ছুটে গেছে, হাত-পথ নাই। মেয়ে ফিরে এলো, মুখ থমথমে। আড়চোখে দেখলাম, কিছু বললাম না। দেখি না কি অভিযোগ করে। কোন অভিযোগই করল না। ক্রমে ওর মুখের ছায়া কেটে গেল। বিকেলে দেখলাম—সম্পূর্ণ সুস্থ মেয়ে।

পুনশ্চঃ

ভাল কথা—এই ঘটনা যখন ঘটে—তখন ওর বয়স সাত।

পরের রবিবার ভিখারীর সাড়া পেয়েও ও ভিক্ষে দিতে গেল না। আশ্চর্য্য হলাম। বললাম, কিরে, ভিক্ষে দিবি না? না—শরীরটা ভাল লাগছে না। সে কি রে? গায়ে হাত দিয়ে দেখি—গা ঠাণ্ডা। আশ্বস্ত হলাম। ভিক্ষে দিয়ে ফিরে আসতে বলল, আমার শরীর খারাপ—ভিক্ষে দিলে যে!

ষাট-ষাট। বলে ওকে কোলে তুলে নিলাম।

পরের পত্রে লিখলেন:

তিন বছর পরে ওর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হয়। ভুগেছিল পনেরো দিন। যেদিন পথ্য করল—আমায় হেসে বলল, মা, মাঝে মাঝে জ্বর হওয়া ভাল—ডাক্তাররা বলেন, নয়?

কি জানি বাপু!

আর সংসারের পক্ষেও ভাল। একটু থেমে বলল।

কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

এই ধর মা কেন—বাড়তি খরচগুলো বেঁচে যায়। ভাল খাবার আসে না বাড়ীতে—ভিক্ষে দিতে হয় না।

দশ বছরের মেয়ের মুখে এই কথা! এর থেকে কি অনুমান করবেন—তোমার মনঃসমীক্ষক? তিন বছর আগে সেই ভিখারী তাড়ানোর বেদনা? শিশুর মনে কোন দাগই পাকাপাকি ভাবে লাগে না। প্রতি দণ্ডে হাসি আনন্দ দুঃখ অভিলাষের আলোছায়া যাওয়া আসা করে ওদের মনে। যাই হোক, আমি লক্ষ্য করেছি—কারও দুঃখের কথা শুনলে ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠত—ও ভাল করে ঘুমুত না, আহারে ওর রুচি চলে যেত। এসব অবশ্য দিন দু'তিন থাকত, তার পর যেমন মেয়ে তেমনি। ভাল ভাল পোশাক পরে বেড়াতে যাওয়া, বইয়ের গল্প পড়া ও নানা দেশের গল্প শোনা; সিনেমা, সার্কাস, এগজিবিশন—সবকিছুতেই

ওর রুচি প্রবল। কাজেই দুঃখীর দুঃখ-মোচন চিন্তায় ওর মনে অশান্তি থাকতে পারে এ কল্পনা আমরা কেউ করি নি। আজও করি না।

তার পর একখানি দীর্ঘ চিঠিতে লিখলেন :

কাল চিঠিখানা তাকে দেওয়ার পর একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটা ঘটেছিল আরও পাঁচ বছর পরে—তখন ওর বয়স ষোল ছাড়িয়েছে। সেইবারই ও ম্যাট্রিক দিয়েছে এবং জল্পনা-কল্পনা চলছে কোন্ ডিভিশনে পাস করে কোন কলেজে ভর্তি হবে।

সায়াল নেবে—না আর্টসে থাকবে সে আলোচনাও চলছে। গ্রীষ্মের বন্ধে ও বলল, পাড়াগাঁ দেখব মা।

পাড়াগাঁয়ে থাকেন এমন আত্মীয়ের নাম মনে পড়ল না—কোন রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করলাম।

দু'দিন পরে সেই কথা, মা—চল না কোথাও।

বললাম, বাংলার বাইরে যাবি ?

না, বাংলার পাড়াগাঁ দেখব। পানাপুকুর, নদীনালা, বন-বাদাড়, মাঠক্ষেত এই সব দেখব।

বুঝলাম, কোন বই পড়ে ছবিটা মনে উজ্জ্বল হয়েছে। বললাম মিঃ মুখার্জিকে।

মিঃ মুখার্জি বললেন, বেশ ত, চল সবাই মিলে যাওয়া যাক।

কোথায় ? কেন আমার পিসীমা এখনও শ্বশুর-ভিটে আগলাচ্ছেন। বিরাট বাড়ী ; শুনেছি পুকুর বাগানও সে দেশে যথেষ্ট। কম শুধু মানুষ। ভয় হয়—যদি ম্যালেরিয়া ধরে ? তা দু'টো দিন ডাবের জল খেয়ে মশারি টাঙিয়ে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

সেই গ্রামেই এলাম। এত বন দেখব ভাবি নি, এমন প্রকাণ্ড পুরীও কল্পনা করি নি। সদর অন্দর নিয়ে তিনটে মহল। বাড়ীর উঠোনেও গাছপালা—ইমারতের গায়ে বট-অশ্বত্থের চারা ; দালানে বাদুড় চামচিকা আর পায়রা বাসিন্দা। কোনকালে পলস্তারা পড়েছিল দেওয়ালের গায়ে, এখন জরতী নারীর মত পাতলা ইটের পাঁজর বার করে প্রকাণ্ড ইমারত কালের পদধ্বনি শুনছে আর ঝিমুচ্ছে।

এসব দেখে কিন্তু মেয়ের ভারি আনন্দ। এ-ঘর ও-ঘর, সিঁড়ি ছাদ, উঠোন পুকুরঘাট···চঞ্চল পায়ের আর বিরাম নাই।

সন্ধ্যাবেলায় পিসীমাকে বলল, দিদিমা, এগুলো সারাও না কেন ?

পিসীমা হেসে বললেন, নাতনী, পেরে উঠি না যে।

কেন, রাজমজুর ডাকিয়ে আনা কি এমন শক্ত কাজ !

পিসীমা বললেন, আজ ডাকলে ওরা আজই আসবে। কাজ না পেয়ে ওদের অবস্থাও ত ভাল নয়। কিন্তু নাতনী এ ত এক আধ টাকার খেলা নয়, কোথায় পাব টাকা ?

আর কিছু বলল না মিতা—আমাকে রাত্রিতে শুধোল, মাগো, দেখতেই তো পাচ্ছিস। বিষয়-সম্পত্তি সবই খুইয়েছেন। এই ভিটে আর দুটো নারকেলগাছ মাত্র ভরসা। অথচ একদিন ছিল যখন ওঁর দুয়োরে হাতী বাঁধা থাকত।

বল না মা সেই গল্প।

গল্প শেষ করে বললাম, চিরদিন সমান যায় না। কখনও নৌকোর ওপর গাড়ী—কখনও গাড়ীর ওপর নৌকো। মশাইয়ের দানধ্যান ছিল অনেক। সেই পথ দিয়েই মা-লক্ষ্মী চলে গেলেন।

খুব দান-ধ্যান করলে এমন হয় বুঝি ? ও শুধোল।

হয় না ? কথায় বলে কলসীর জল ঢালতে ঢালতে ফুরিয়ে যায়। এও তাই। পিসেমশাই মারা যাবার পর পিসীমা সর্বস্বান্ত হলেন।

মেয়ে বলল, দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

উনি ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

আচ্ছা আমি বলব, দেখি নড়েন কিনা।

বৃথা চেষ্টা। পিসীমা বললেন, যে ক'টা দিন আছি এমনি শান্তিতে যেন থাকি। অনেক সুখ ভোগ করেছি, আর নয়।

ভেবেছিলাম এক সপ্তাহ থাকব, মেয়ে জিদ ধরল, থাকব না।

বললাম, তোদের আসতেও যতক্ষণ—যেতেও ততক্ষণ। বুড়ো বয়সে ভাল লাগে না দৌড়দৌড়।

এখানে থাকলে আমি অসুখে পড়ব কিন্তু।

মেয়ে নিয়ে এক রকম পালিয়েই এলাম।

ব্রজেশ লিখল : তার পর আর কিছু মনে পড়ে না ?

লিখলেন সুরমা : তার পর কলেজে পড়তে ও হোষ্টেলে চলে গেল, কোনমতেই বাড়ী থাকতে চাইল না। দু' বছরে আই-এ পাস করে ফিরে এলো। তার পর বিয়ের হাঙ্গামা। তা ছাড়া ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদের মনে নতুন জগৎ গড়ে ওঠে। সব কথা মা বাপের কাছে খুলে বলে না ত।

কিছু দিন পরে একখানা প্রশ্ন সম্বলিত কাগজ পাঠিয়ে ব্রজেশ লিখল : আমার বন্ধু এই উত্তরগুলি চেয়েছেন—আপনার কাছে। যদি আপত্তি না থাকে—ঘরগুলি পূরণ করে দেবেন।

প্রশ্নাবলী দেখে বিস্মিত হলেন, বিরক্ত হলেন সুরমা। কে এই অদ্ভুত মনঃসমীক্ষক ? মেয়ের রোগনির্ণয় করতে বসে গর্ভধারিণীকে কয়েকটি উদ্ভট প্রশ্ন করেছেন। মনঃসমীক্ষকের নিজের মনের খবর ভাল করে জানা আছে কি ? এই কি প্রশ্নের ধরণ ?

প্রথম প্রশ্ন : ধন ঐশ্বর্য্য আপনার ভাল লাগে কি ?

এ যুগে কে এমন বুদ্ধিহীন মানুষ আছে যে, দ্বিধাহীন ভাবে উত্তর দেবে। না, ভাল লাগে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নও এমনি অবান্তর। অর্থ, অলঙ্কার অথবা সম্পত্তি নষ্ট হলে আপনার খুব কষ্ট হয় কি ?

এ প্রশ্ন সংসারী মানুষকে কোন সংসারী মানুষ করে না। সংসার-

সবচেয়ে অদ্ভুত প্রশ্ন পেয়েছি : পৃথিবীতে আপনার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোন্‌টি ? অর্থ-সম্পত্তি, স্বামী, কন্যা, কোন বৃত্তি অথবা আপনি নিজে ?

সূক্ষ্ম বিদ্রূপময় হাসি সুরমার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। আমাকে আমি ভালবাসতে পারি কি ? স্বামী নয়, সন্তান নয়, ধন-সম্পত্তি নয়, ধর্ম নয়, লেখা নয়—শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা ! অহোরাত্র আত্মচিন্তা ? যখন প্রেমে ভরপুর—তখনও, যখন স্নেহে বিগলিত—তখনও ? সম্পদ গৌরবে পরিপূর্ণ হয়েও—ঈশ্বরকে দিনান্তে স্মরণ করবার সময়েও ?

লিখলেন : নিজেকে কে না ভালবাসে ? অর্থে কোন সংসারী বীতস্পৃহ ? সম্পত্তি নষ্ট হলে কার মন বা অক্ষুব্ধ থাকে ? এ সব প্রশ্ন কোন কারণেই সঙ্গত নয়। এর উত্তর ইচ্ছে করেই দিলাম না। আশা করি তোমার মনঃসমীক্ষক এমন উদ্ভট প্রশ্ন আর করবেন না।

কিছুদিন পরে উত্তর এল ব্রজেশের : যা, মনঃসমীক্ষক বলেছেন—মিতার জন্ত চিন্তার কোন কারণ নেই। বয়স আর একটু বাড়লে ওর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে। এখন কাঁচা মন আর পাকা মনে বুঝাপড়া চলছে বলেই এত হাঙ্গামা। ও যখন স্বাভাবিক ভাবে ভিক্ষে দিতে পারবে ভিখারীকে, নিজের ছেলেমেয়েদের সাজিয়েগুজিয়ে নিজে নিখুঁত প্রসাধন করতে পারবে, আমি জানুক না কিনি ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে পারব প্রচুর এবং ছেঁড়া কাপড়, ময়লা জামা, ভাঙা কেওলান, ফুটো চালা, নোংরা বস্তী, হাড়জিরজিরে উলঙ্গ শিশুর মিছিল ভেদ করে আমাদের মোটর চলবে অনায়াস গতিতে —আর সেই গাড়ীতে বসলে দু'ধারের দৃশ্য আমাদের মনে কোন রেখাপাত করবে না—তখনই নাকি আমরা—মানে মিতা আর আমি হব পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্থ মানুষ। এটা আমার কাছেও পরমাশ্চর্য্য মনস্তত্ত্ব, অথচ এইটাই নাকি সাম্প্রতিক কালের পরম সত্য।

এর পরের পত্রে লিখলে ব্রজেশ : কাল লক্ষ্য করলাম—এক জন দুঃস্থ আত্মীয় এসে দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। মিতা তাঁকে একটি টাকা দিয়ে বলল, আর হাতে নেই, থাকলে দিতাম।

আত্মীয় চলে গেলে বললাম, সত্যিই টাকা নেই ?

মিতা হেসে বলল, আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। এখানে মিথ্যা এমন ভয়ানক কিছু নয়।

ওর কথা শুনে ভাবলাম কিছুক্ষণ। কথাটা হঠাৎ শুনলে কেমন লাগে। এক কালের আদর্শ বা নীতিতে অল্প ধাক্কা দিয়ে যায়। কিন্তু সে ধাক্কা সামান্তই।

সব কথা বললাম ডাক্তারকে।

ডাক্তার বললেন, অসুখের বড় ধাক্কা সামলেছে মিতা, সামান্ত একটু দুর্ব্বলতা আছে শুধু।

আপনি কি বলেন ?

রাখালের বেণু

শ্রীকালিদাস রায়

রাখাল, তোমার বেণু আজো বাজে অনুখন,
যে শোনে শিহরি উঠে তার সারা তনুমন।
কালিন্দী উজান চলে
কঠিন পাষাণ গলে
চঞ্চল হয়ে টলে ভূধরের অণুকণ।

শিহরিয়া উঠে তরু তাই ফুটে কলিফুল,
বেণুতান শুনে ফুলে তাই জুটে অলিকুল।
নদীরে সিন্ধু টানে
ধায় সে বন্ধু পানে,
গৃহী ত্যজে সংসার মোরা তায় বলি ভুল।

সেই বেণুতান শুনে আজো চলে অভিসারে
পাগলিনী যত রাধা কোন বাধা না বিচারে।
ধায় তব বেণুরবে
গোষ্ঠের ধেনু সবে
আজো তব বেণু বাজে অন্তর অবিথারে।

তব বেণু বেজে চলে শুনিতে কি সবে চায় ?
যদি শোনে গৃহকোণে মন বসে তবে তায় ?
পাছে পশে বেণুতান
রোধে তুলা দিয়ে কান,
কান খাড়া করে আছে ক'জনে এ ভবে হায় ?

আল্-বীরুণীর ভারতীয় ভূগোল

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১

আহমদের পুত্র আবুরৈহান মহম্মদ আল্-বীরুণী নামে খ্যাত। তিনি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। গজনীর মামুদের সহিত তিনি ভারতে আগমন করেন। তাঁহার রচিত "তহকিক্ মা লিল হিন্দ" সম্ভবতঃ ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ হইতে আমরা ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার ও আইন-কানুনের বিস্তৃত বিবরণ পাই। বেবার্টির মতে আল্-বীরুণীর গ্রন্থের নাম তারিখ-ই-হিন্দ নহে। ডাঃ সাচাউ কর্তৃক আল-বীরুণীর 'ভারত' গ্রন্থখানি বিষয়-সূচি ও ব্যাখ্যাসহ সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আলোচনাগুলি অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। সুবিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ বিবরণ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ হইলেই আমাদিগের বিশেষ কার্য্যে আসিবে। তাঁহার ভারতীয় ভূগোলের জ্ঞান মনে হয় খুব বেশী ছিল না। তিনি যে মৎস্য, আদিত্য ও বায়ু পুরাণের অংশবিশেষ মাত্র পড়িয়াছিলেন, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। চারিটি দিক অনুযায়ী বায়ুপুরাণ হইতে এবং নয় দিক অনুসারে বরাহমিহির-সংহিতা হইতে দেশগুলির নাম তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কূর্মের অবস্থিতি অনুযায়ী ভারতের দেশ এবং জাতিদিগের বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত 'Geographical Essays' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের কূর্মবিভাগ বা কূর্মনিবাস অংশে ভারতের দেশের ও জাতির একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই সকল দেশ ও জাতিসমূহের অধিকাংশ মার্কণ্ডেয় পুরাণের নবখণ্ড অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশ দেশ ও জাতির নাম ঠিকমত নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। আল্-বীরুণীও এই মত পোষণ করেন।

আল্-বীরুণীর মতে তানেশর, লোহরাণী, কচ্ছ, বাগ, বারোই, সোমনাথ, কনাহৎ (কাম্বে), ভান, লারান, বল্লভ, কাঞ্চী বা কাঞ্চী এবং দর্বদ উপকূল স্থান বলিয়া পরিচিত। কচ্ছ ও সোমনাথের জলদস্যুরা সমুদ্রে জাহাজগুলিতে ডাকাতি করিত। দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চীপুর একটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ বলিয়া খ্যাত ছিল। এই কাঞ্চীপুর দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। নগরের পশ্চিমে শিবকাঞ্চী অবস্থিত। বিষ্ণুকাঞ্চী শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত। শিবকাঞ্চীর মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন আর বিষ্ণুকাঞ্চীতে মন্দিরটি পরে নির্মিত হয়। কাহারও কাহারও মতে কাঞ্চী বা কঞ্জিবরম তিনটি ভাগে বিভক্ত—(১) বৃহৎ কাঞ্চী, (২) ক্ষুদ্র কাঞ্চী, (৩) পিলেয়ার কোলিয়াম। এই প্রাচীন নগরটির উপর শৈব, বৌদ্ধ এবং জৈন এই তিনটি ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। কঞ্জিবরমের কামাক্ষী মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কৈলাসনাথের মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আছে। কচ্ছপেশ্বর মন্দিরে কূর্মরূপী বিষ্ণু শিবকে পূজা করিতেছেন দেখা যায়। নগরের পশ্চিমে বিষ্ণুকঞ্জিবরমে বৈকুণ্ঠ-পেরুমল মন্দিরে বিষ্ণুর বহু প্রকার মূর্তি প্রস্তরে খোদিত আছে।

আল্-বীরুণীর মতে চীন দেশের নিকটে পূর্ব দ্বীপগুলিকে জাবাজের দ্বীপ বলা হইয়াছে। হিন্দুগণের নিকট ইহারা সুবর্ণ-দ্বীপ নামে পরিচিত। আল-বীরুণী লঙ্কার বিপরীত দিকে অবস্থিত রামেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে ২ ফারসাক দূরে অবস্থিত (এক ফারসাক চার মাইল)। দশরথের পুত্র রাম এই বাঁধ নির্মাণ করেন। বর্ত্তমানে ইহা কতকগুলি পৃথক পর্বত মালার সমষ্টি এবং ইহার মধ্যে সমুদ্র প্রবাহিত। আল্-বীরুণী লঙ্কাকে পৃথিবীর শিখর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সরণদীব বা সিংগলদীব বা সংগলদীব বা সিংহল দ্বীপ লংকা হইতে অভিন্ন এবং ইহা একটি উপসাগরে অবস্থিত। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং অপর তিন দিকে সুবৃহৎ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত আছে।

হিন্দুদের মতে পৃথিবী গোলাকার ও সমুদ্রবেষ্টিত; গলবেষ্টনীর ন্যায় পৃথিবী সমুদ্রে অবস্থিত এবং গলবেষ্টনীর ন্যায় একটি গোলকার সমুদ্র পৃথিবীতে অবস্থিত। শুভ গলবেষ্টনীর সংখ্যা (যাহাকে দ্বীপ বলা হয়) সাতটি এবং সমুদ্রের সংখ্যা তদ্রূপ। দ্বীপগুলি এবং সমুদ্রগুলি এরূপ ভাবে অবস্থিত যে প্রত্যেক দ্বীপ পূর্ববর্তী দ্বীপের দ্বিগুণ এবং প্রত্যেক সমুদ্র পূর্ববর্তী সমুদ্রের দ্বিগুণ বলিয়া আল্-বীরুণী বর্ণনা করিয়াছেন। মৎস্য এবং বিষ্ণু পুরাণদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া সাতটি দ্বীপের বর্ণনা তিনি দিয়াছেন। মধ্যবর্তী দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ। জম্বুবৃক্ষ হইতে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। ইহার আকৃতি একটি শকটের ন্যায়। দক্ষিণদিকে ইহার সম্মুখভাগ দেখা যায়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, দক্ষিণ ও উত্তর দিক হইতে ইহাকে একটি ধনুকের ন্যায় দেখায়। ইহার রজ্জু টানিলে ধনুকোটি বা রামেশ্বরে একটি শিখরের সৃষ্টি হয়। ভারতের আকৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা বলেন ভারতবর্ষ উত্তরে সুবিস্তৃত দক্ষিণে একটি শকটের সম্মুখভাগের ন্যায় দেখায় এবং ইহা সাতটি সমান ভাগে বিভক্ত। ভারতের প্রকৃত আকৃতির বর্ণনা এইরূপ। চৈনিক গ্রন্থকার ফা-কাই-লি-টো এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। শাকদ্বীপে সাতটি বৃহৎ নদী আছে। ইহাদের মধ্যে একটি গঙ্গার ন্যায় পবিত্র। ইহার অধিবাসীরা ধার্মিক ও দীর্ঘায়ু। মৎস্যপুরাণের মতে কুশদ্বীপে সাতটি পর্বত আছে। নদীর মধ্যে যমুনা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিষ্ণু পুরাণের মতে অধিবাসীরা সৎ এবং পাপবর্জিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে

পর্ব্বত, নদী এবং রাজ্য আছে। এখানকার লোকেরা ধার্ম্মিক ও সৎ। শাল্মলী বা শাল্মলদ্বীপে পর্ব্বত ও নদী দেখা যায়। ইহার অধিবাসীরা পবিত্র, দীর্ঘায়ু, ক্রোধবর্জ্জিত এবং অমায়িক। শীতে কিংবা গ্রীষ্মে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। গোমেদ-দ্বীপে দুইটি বৃহৎ পর্ব্বত এবং দুইটি রাজ্য আছে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ইহার অধিবাসীরা ধর্ম্মভীরু। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর দ্বীপ। ন্যগ্রোধবৃক্ষ হইতে পুষ্কর দ্বীপের নাম-করণ করা হইয়াছে। এখানকার লোকেরা দীর্ঘজীবী ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষাশূন্য। আল্‌-বীরূণী বলেন ভারতবর্ষ কেবল যে ভারতকে বুঝায় তাহা নহে। কোন একটি মহাসাগর ভারতকে অতিক্রম করে নাই। কেবলমাত্র একটি অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এই সাতটি দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ এবং ভারতবর্ষ সাধারণতঃ অভিন্ন।

বৌদ্ধেরা বলেন, পৃথিবীতে যে সকল দ্বীপ আছে, জম্বুদ্বীপ তাহাদের মতে একটি। ইহাদের মতে দ্বীপের সংখ্যা আটটি; সাতটি নহে এবং কতকগুলি সমুদ্রের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। জৈনদের মতে কতকগুলি দ্বীপ ও সমুদ্রের নূতন নাম পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়, মৎস্য এবং বায়ুপুরাণ এবং মহাভারতের মতে ভারত নব ভাগে বিভক্ত। নয়টি দ্বীপের মধ্যে আটটি দ্বীপ প্রকৃত ভারতের নহে, বৃহৎ ভারতের অন্তর্গত, এবং ইহারাই ভারতীয় উপদ্বীপ-বেষ্টিত দ্বীপ এবং দেশ নামে পরিচিত। আল্‌-বীরূণী এবং আবুল ফজল বহুদিন পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছেন। ভারতীয় উপদ্বীপ নবমদ্বীপ বলিয়া পরিচিত; ইহা সাগরবেষ্টিত এবং কুমার দ্বীপ নামে খ্যাত। দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ইহা এক হাজার যোজন বিস্তৃত। ভারতের এইরূপ বর্ণনা বৌদ্ধ-দিগের নিকট অবিদিত।

আল্‌-বীরূণী বলেন যে, কনোজের (কান্যকুব্জ) চতুষ্পার্শ্ব দেশ ভারতের মধ্যদেশ বলিয়া পরিচিত। ইহা একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র, কারণ পুরাকালে এখানে সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি এবং বীরের আবাসস্থান ছিল। কান্যকুব্জের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হয়। অতএব আল্‌-বীরূণীর মত সঠিক নহে। বস্তুতঃ ইহার পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত, দক্ষিণে শরাবতী অথবা সললবতী পর্য্যন্ত, পশ্চিমে থূন এবং উপথূন পর্ব্বত এবং উত্তরে উশীরগিরি বা উশীরধ্বজ পর্ব্বত পর্য্যন্ত মধ্যদেশ বিস্তৃত। ব্রাহ্মণগ্রাম, থূন এবং স্থানীশ্বর অথবা থানেশ্বর অভিন্ন। হরিদ্বারের নিকটস্থ কংখলের উত্তরদিকে অবস্থিত উশীর গিরি পর্ব্বত এবং উশীরধ্বজ অভিন্ন। কাহারও কাহারও মতে সিওয়ালিক পর্ব্বতমালা এবং উশীর গিরি অভিন্ন। কোন একটি পরবর্ত্তী বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিমালয় ও পারিপাত্র পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যদেশ অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন—কজংগল নগরের পূর্ব্বদিকে, সললবতী নদীর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে, শতকর্ণিক নগরের দক্ষিণে, ব্রাহ্মণগ্রাম থূনের পশ্চিমে এবং উশীরধ্বজ পর্ব্বতের উত্তরে মধ্যদেশ অবস্থিত ছিল।

আল্‌-বীরূণী ষোলটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কনোজ, মাহুর (মথুরা), অনহিলবার (পত্তন), মালবের অন্তর্গত ধার, মুসলমান কর্ত্তৃক পুরাতন রাজধানী জয় করিবার পর কান্য-কুব্জের অস্থায়ী রাজধানী বারী এবং বজান হইতে ভ্রমণ আরম্ভ হয়। ষোলটি ভ্রমণ বৃত্তান্তের তালিকা এইরূপ—(১) কান্যকুব্জ হইতে এলাহাবাদ এবং তার পর ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়া কাঞ্চী পর্য্যন্ত এবং আরও দক্ষিণ দিকে; (২) কনোজ অথবা বারী হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত এবং তার পর গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত; (৩) কনোজ হইতে পূর্বদিকে কামরূপ (কামরু) পর্য্যন্ত এবং উত্তর দিকে নেপাল এবং তিব্বত সীমানা পর্য্যন্ত; (৪) কনোজ হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ উপকূলস্থ বনবাসী পর্য্যন্ত; (৫) কনোজ হইতে বজান অথবা গুজরাটের তৎকালীন রাজধানী নারায়ণ পর্য্যন্ত; (৬) মথুরা হইতে মালব রাজধানী ধার পর্য্যন্ত; (৭) বজান হইতে ধার এবং উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত; (৮) মালবের অন্তর্গত ধার হইতে গোদাবরীর দিকে; (৯) ধার হইতে ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত তান পর্য্যন্ত; (১০) বজান হইতে কাথিয়াড়ের দক্ষিণ উপকূলে স্থিত সোমনাথ পর্য্যন্ত; (১১) অনহিলবার বা বর্ত্তমান পত্তন হইতে বোম্বাইয়ের উত্তরে পশ্চিম উপকূলস্থিত তান পর্য্যন্ত; (১২) বজান হইতে ভাটী হইয়া সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত লোহরাণী পর্য্যন্ত; (১৩) কনোজ হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত; (১৪) কনোজ হইতে পাণিপট, এটক, কাবুল এবং গাজনা পর্য্যন্ত; (১৫) বরহান হইতে কাশ্মীরের রাজধানী আদিষ্ঠান পর্য্যন্ত; (১৬) মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিন্ন হইতে উপকূল ধরিয়া সেতুবন্ধ (সিংহলের বিপরীত দিকে আদমের সেতু) পর্য্যন্ত।

আল-বীরূণীর মতে খুরাসান, পারস্য, ইরাক, মোসুল এবং সিরিয়ার সীমানা পর্য্যন্ত দেশ বৌদ্ধদেশ বলিয়া বিদিত ছিল। বারাণসী এবং কাশ্মীর হিন্দু বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। সোম-নাথের নিকট দৈহকদুর্গ রসায়নগ্রন্থ-প্রণেতা নাগার্জুনের বাস-ভূমি ছিল। ধার মালবদিগের রাজধানী বলিয়া পরিচিত এবং ভোজদেব এখানে রাজত্ব করিতেন। বল্লভ বল্লভী নগরের শাসক ছিলেন। ভিনসেণ্ট এ. স্মিথের মতে বল্লভী দেশ (ওয়ালা) পূর্ব কাথিয়াড়ে অবস্থিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে ওয়ালা গুজরাটের উপদ্বীপভাগে অবস্থিত। কান্যকুব্জের পশ্চিমে সিন্ধুদেশ। সুবৃহৎ কনোজ শহর গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। গঙ্গার পূর্বদিকে বারী শহরকে রাজধানী করিবার পর কনোজ শহরের অধিকাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। মথুরা (মহুর) যমুনা নদীর পূর্বদিকে বিদ্যমান ছিল। মথুরা হইতে যৌন এবং কনোজ ২৮ কারসক দূরে অবস্থিত। কনোজ ও মথুরার উত্তরে দুই নদীর মধ্যে থানেশ্বর (তানেশর) বিদ্যমান। কনোজ হইতে প্রায় ৮০ কারসক ও মথুরা হইতে প্রায় ৫০ কারসক দূরে ইহা অবস্থিত। আল-বীরূণীর মতে স্থানেশ্বর বা স্থানীশ্বর বা তানেশর শব্দটি স্থাণু ও ঈশ্বর এই দুই শব্দের সংযোগে গঠিত। আল-বীরূণীর মতে কুরুক্ষেত্রের সুবিখ্যাত কুরুক্ষেত্র থানেশ্বরের দক্ষিণে ছিল। ইহা

আম্বালার দক্ষিণে ৩০ মাইল ও পাণিপটের উত্তরে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রয়াগ (বর্ত্তমান এলাহাবাদ) হইতে যেখানে গঙ্গা সাগরে পতিত হইয়াছে ইহার দূরত্ব ১২ কারসক হইবে। আল-বীরূণী প্রয়াগ বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রয়াগ—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বারী হইতে বরাবর গঙ্গা নদী ধরিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে নিম্নস্থানগুলি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—(১) অযোধ্যা (অযোদহ) নগর বারী হইতে ২৫ কারসক; (২) বারাণসী (বর্ত্তমান বেনারস) ২০ কারসক; (৩) শারওয়ার বারাণসী হইতে ৩৫ কারসক; (৪) পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) অথবা কুসুমপুর ২০ কারসক; (৫) মুঙ্গিরি (বর্ত্তমান মুংগের) ১৫ কারসক; (৬) গঙ্গাসাগর বা গঙ্গা সায়র যেখানে গঙ্গা সমুদ্রে পড়িয়াছে ৩০ কারসক। কনোজ হইতে পূর্ব্বদিকে ১০ কারসক দূরে বারী অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন অযোধ্যা হইতে ২৫ কারসক দূরে ইহা অবস্থিত।

নৈপাল বা বর্ত্তমান নেপাল একটি উচ্চ প্রদেশ বলিয়া বর্ণিত আছে। ভোটেশ্বর তিব্বতের প্রথম সীমানা। কনোজ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গঙ্গার পশ্চিম দিকে ৩০ কারসক দূরে জজাহুতি বিদ্যমান; ইহার রাজধানীর নাম খজুরহ। গোয়ালিয়র এবং কালঞ্জর ভারতের দুইটি প্রসিদ্ধ দুর্গ, জজাহুতি ও কনোজের মধ্যে অবস্থিত। কালঞ্জর বুন্দেলখণ্ডের একটি সুবিখ্যাত পার্বত্য দুর্গ। গুপ্তযুগে ইহা চেদির রাজধানী ছিল। দহাল দেশের রাজা ছিলেন গাংগেয়। ইহার রাজধানীর নাম তিয়াউরী। আল-বীরূণীর মতে সমুদ্রের উপকূলে বনবাসী অবস্থিত। গুজরাটের রাজধানী বজান এবং রাজৌরী (রাজোরী) কনোজের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিদ্যমান। প্রথমটি ২০ কারসক এবং দ্বিতীয়টি ১৫ কারসক দূরে অবস্থিত। রাজৌরী রাজপুরী রাজওয়ারী হইতে অভিন্ন। কনোজ ও বজানের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, মথুরা ও কনোজের মধ্যে সেই দূরত্ব দেখা যায় অর্থাৎ ২৮ কারসক। ৫ কারসক দূরে অবস্থিত ভৈলসান হিন্দুদের একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে মহাকালের পূজা হয়। উজ্জন হইতে ভৈলসানের মধ্যে দূরত্ব ১০ কারসক। ভৈলসান মালবের অন্তর্গত। মালবের রাজধানী ধার ৭ কারসক দূরে ছিল।

মৈবার (রাজপুতনার অন্তর্গত বর্ত্তমান মেবার) বজান হইতে ২৫ কারসক দূরে ছিল। জত্তরৌর (জেজুত্তর বা জেজভুক্ত) মেবারের রাজধানী। জত্তরৌর হইতে মালব এবং ইহার রাজধানী ধারের দূরত্ব ২০ কারসক। উজৈন (উজ্জয়িনী, গ্রীক ওজেনে) ধারের পূর্ব্বদিকে ৭ কারসক দূরে বিদ্যমান। নমবুর নর্ম্মদা তীরে এবং মন্দগীর গোদাবরী তীরে অবস্থিত। আল-বীরূণীর মতে ধার হইতে নামীর ৭ কারসক দূরে এবং মহরট্টদেশ (মহারাষ্ট্রদেশ) ১৮ কারসক দূরে ছিল। কোঙ্কন প্রদেশ এবং ইহার রাজধানী তান সমুদ্রের উপকূলে ২৫ কারসক দূরে বিদ্যমান ছিল। আল-বীরূণীর মতে মধ্যদেশের উত্তর-পশ্চিমে গন্ধর্ব্ব দেশ ছিল এবং ইহা গন্ধার হইতে অভিন্ন। আল-বীরূণী বলেন, সৌবীর দেশ মূলতান ও জহ্রাবর একই। তিব্বত প্রাচীন তিব্বত। কবিতান (কুবিতন) কপিস্থল এবং বর্ত্তমান কপূর্থলা একই দেশ। কাহারও কাহারও মতে বারোই ও বরোদা অভিন্ন। ভাতুল নিম্ন হিমালয় প্রদেশে বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যে অবস্থিত। আল-বীরূণীর মতে তাম্রপর্ণদেশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বজান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনহিলবারে যাওয়া যায়। ইহা বজান হইতে ৬০ কারসক দূরে। সোমনাথ সমুদ্র উপকূল হইতে ৫০ কারসক দূরে অবস্থিত। অনহিলবার বা অনলবাত উত্তর বরোদার অন্তর্গত বর্ত্তমান পত্তন দেশ। বজান হইতে পশ্চিম দিকে ৫০ কারসক দূরে মূলতান। মূলতানবাসীরা বলিত যে, মূলতানে বর্ষাকাল নাই। সর্ব্বপ্রথমে মূলতানের নাম ছিল কাশ্যপপুর, পরে হংসপুর, বগপুর, সাম্বপুর এবং মূলস্থান নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভাতী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধু নদীর মোহনায় লোহরাণী অবস্থিত, কনোজ হইতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ৫০ কারসক দূরে শীর্ষারহ বিদ্যমান ছিল। জালন্ধরের রাজধানী দহমাল ১৮ কারসক দূরে এবং রাজগিরির দুর্গ ৮ কারসক দূরে রহিয়াছে। উত্তর দিকে কাশ্মীর ২৫ কারসক দূরে। কনোজ হইতে পশ্চিম দিকে ১০ কারসক দূরে কুতীতে যাওয়া যায়। আনার দেশ মিরাট এবং পানিপথ ১০ কারসক দূরে ছিল। মীরাট ও পানিপথের মধ্যে জৌন বা যমুনা নদী প্রবাহিত। উত্তর-পশ্চিম দিকে আদিত্যহৌর, বজ্জনীর, লৌহাবুর (বর্ত্তমান লাহোর) এবং মন্দহুকুর বিদ্যমান। চন্দ্রভাগা (চন্দ্রাহ), বিলাম (ঝেলাম), ওহিন্দ (ওহিন্দ), পেশোয়ার (পুরসাবর), কাবুল (কাবীশ) এবং যাজনা অবস্থিত। আল-বীরূণী বলেন, তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী মারীকল ও পূকল নামে পরিচিত ছিল।

কাশ্মীর (কশ্মীর) দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি উপত্যকায় বিদ্যমান। এই দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক হিন্দুদের অধিকারভুক্ত এবং পশ্চিম অংশ বিভিন্ন রাজাদের হস্তগত ছিল। ইহার উত্তর ভাগ এবং পূর্ব্বদিকের কোন একটি অংশ তুর্কীদের অধীনে ছিল। তিব্বতের মধ্য দিয়া ভোটেশ্বর শিখর হইতে কাশ্মীরের দূরত্ব প্রায় ৩০০ কারসক হইবে। আল-বীরূণী বলিয়াছেন, কাশ্মীরের অধিবাসীরা পদব্রজে গমন করে এবং ইহারা হস্তী বা অন্ত পশুর উপর আরোহণ করে না। ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পাল্কী ব্যবহার করেন। দেশের স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইহারা সচেষ্ট ছিল। এই কারণে তাহারা প্রবেশ-দ্বার সযত্নে রক্ষা করিত। আল-বীরূণী আরও বলেন যে, পুরাকালে তাহারা দুই-এক জন বিদেশীকে বিশেষতঃ ইহুদিদিগকে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিত। কিন্তু এখন তাহারা অজ্ঞাত হিন্দুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। বব্বহান নগর হইতে কাশ্মীরে প্রবেশ করিবার শ্রেষ্ঠ পথ আছে। আদিস্থান ইহার রাজধানী ছিল। কাশ্মীর নগরটি ঝিলাম নদীর তীরে ৪ কারসক স্থান ব্যাপীয়া রহিয়াছে। গাজনা ও পঞ্জাবে দীর্ঘকাল বাসকালে তিনি কাশ্মীর সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করিতে

পারিয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিতবর্গের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং কাশ্মীরের লৌহুর দুর্গ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথাও বলিয়াছেন। লৌহুর এবং লোহারা দুর্গ অভিন্ন। পিরপঞ্জল পর্ব্বতমালার দক্ষিণ ঢালুভূমিতে অবস্থিত বর্ত্তমান লোহরিন লৌহুর দুর্গের স্থান নির্ণয় করে।

রাজতরঙ্গিনীর লোহরকট্ট এবং লো-কট দুর্গ একই। কাহারও কাহারও মতে লৌহুর, লোহরকট্ট এবং বর্ত্তমান লোহরিণ অভিন্ন। আল-বীরূণীর মতে রাজগিরি ও লৌহুর দুর্গদ্বয় দুর্ভেদ্য স্থান। উত্তর সুরান উপত্যকায় একটি স্থানে রাজগিরি অবস্থিত। কাশ্মীরের রাজধানী আদিষ্ঠান বলিতে শ্রীনগরকে বুঝায়। কাশ্মীর (টলেমির কাসপাইরা) পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত। এই নগরটি পাণিনি ও পতঞ্জলি উভয়েরই নিকট পরিচিত ছিল। স্রগ্‌ধরাস্তোত্রম্‌ প্রণেতা কাশ্মীরের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিয়া পরিচিত। মধ্যন্তিক নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে এই স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্ত পাঠান হইয়াছিল। ইসলামাবাদের পূর্ব্বে তিন মাইল দূরে একটি ঢালুভূমিতে মার্ত্তণ্ড নামে সূর্য্য-মন্দির অবস্থিত। ইসলামাবাদ হইতে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। শ্রীনগর হইতে উনিশ মাইল দূরে পান্দ্রেথানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। কাশ্মীর বা কশ্মীর শৈবধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙের সময়ে কাশ্মীর রাজ্য ৭,০০০ লি বিস্তৃত ছিল (এক লি=ইংরেজি মাইলের এক-ষষ্ঠাংশ)। ইহার চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই রাজ্যের রাজধানীর পশ্চিম দিকে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। ইহার জমি উর্ব্বর এবং এখানে খাদ্য, ফল ও ফুল প্রচুর পাওয়া যাইত। জলবায়ু শীতল ছিল। দেশবাসীরা সুন্দর ও বিদ্যানুরাগী ছিল। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি শেষ হইবার পর মোগগলিপুত্ত তিস্‌স বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্ত এই স্থানে আসেন। অশোকের যুগে ইহা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বরামূলার (বরমূলার) সম্মুখে উস্কারা নগর (উস্কুর বা উস্কর) নামে পরিচিত। ইহার মধ্য দিয়া ঝেলাম (ঝিলাম) নদী প্রবাহিত। হিউয়েনসাঙের মতে বরামূল প্রাচীন হুষ্কপুর বা হুবিষ্কপুর নামে বিদিত। কনিষ্কের ভ্রাতা যুবরাজ হুষ্ক বা হুবিষ্ক হুষ্কপুর নির্ম্মাণ করেন। গিলগিট, অস্বীর (বর্ত্তমান হসোর, অস্তোর) এবং সিলটস (চিলাস) তর্ত্তরার্জান নামে তুর্কীজাতির নগরসমূহ।

আল-বীরূণী বায়ুপুরাণ ও বরাহমিহিরসংহিতা হইতে নগর ও দেশের একটি তালিকা দিয়াছেন। বর্ত্তমান অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া এখানে ইহাদের মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাচীন কুরুদেশ বলিতে কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বরকে বুঝাইত। সোনাপট, আমীন, কর্ণাল এবং পাণিপথ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীর মধ্যে কুরুদেশ অবস্থিত। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে দেখা যায় যে, কুরুগণ প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় জাতিগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। তাহারা পঞ্চালদিগের সহিত সর্ব্বদা সম্পর্কিত ছিল। কুরুদেশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও লোকেদের উল্লেখ বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। হস্তিনাপুর কুরুদের প্রাচীন রাজধানী। ইহা যুক্তপ্রদেশের বর্ত্তমান মীরাট জেলার অন্তর্গত গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ইহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর নিকটস্থ বর্ত্তমান ইন্দ্রপৎ)।

পঞ্চাল দেশ দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র (বেরিলি জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান রামনগর) এবং দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য (যুক্তপ্রদেশের ফরকাবাদ জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান কম্পিল)। সর্ব্বপ্রথমে দিল্লীর উত্তর ও পশ্চিমে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে চম্বল নদী পর্য্যন্ত পঞ্চাল দেশ বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান বুদাউন ফরকাবাদ এবং যুক্তপ্রদেশের সংলগ্ন দেশগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য ছিল। কুরুদের ন্যায় পঞ্চালগণ বৈদিক সভ্যতার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বৈদিক-সাহিত্যে কতিপয় পঞ্চাল নরপতির নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়ে পঞ্চাল উত্তর-ভারতের একটি বৃহৎ ও ক্ষমতাশালী দেশ। জৈন ও বৌদ্ধ-সাহিত্যে পঞ্চালের উল্লেখ আছে।

শাল্বেরা প্রাচীন ভারতের একটি বিশিষ্ট জাতি। মহাভারতের মতে শাল্বদেশ কুরুক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিত। ইহা সাবিত্রীর পতি সত্যবানের পিতার রাজ্য ছিল। মৎস্যপুরাণের মতে শাল্বগণ সম্ভবতঃ আলোয়ার রাজ্যভুক্ত কোন একটি দেশে বাস করিত। মহাভারতের মতে শাল্বপুর বা সৌভগনগর ইহাদের রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয়। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ইহারা পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

মথুরা শূরসেনদিগের রাজধানী ছিল। ইহা যমুনা তীরে অবস্থিত। এখানে বহুকাল ধরিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত ছিল। যাদবগণকে পরাজিত করিয়া কংস মথুরার অত্যাচারী শাসক হইয়াছিল এবং পরে কৃষ্ণের হস্তে তাহার মৃত্যু হয়। মেগাস্থিনিসের সময়ে মথুরা বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। মথুরায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি বাস করিত। হিন্দুদিগের নিকট মথুরা পবিত্র নগর এবং সাতটি তীর্থস্থানের মধ্যে ইহা একটি কারণ এখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। মেগাস্থিনিসের সময়ে মথুরা মৌর্য্যরাজ্যের একটি অংশ ছিল। কুষাণগণের রাজত্বকালে ইহা পুনরায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়াছিল।

বৎস কিংবা বংশ রাজ্যের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকট বর্ত্তমান কোসম)। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙের মতে বৎসভূমি প্রায় ৬,০০০ লি বিস্তৃত ছিল।

মধ্যদেশের কুন্তল দেশ চুনারের সমীপবর্ত্তী কুন্তিল হইতে অভিন্ন। পশ্চিমদিকস্থ কুন্তলগণের ইতিহাসে কোন স্থান নাই। তবে দাক্ষিণাত্যের কুন্তলেরা ঐতিহাসিক যুগে প্রাধান্য লাভ করে। বোম্বাইয়ের দক্ষিণ এবং মহীশূরের উত্তর দিক কুন্তলদেশের অন্তর্গত।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে রাজনৈতিক ইতিহাসে কাশী (বেণারস) একটি

বৃহৎ এবং প্রতিপত্তিশালী রাজ্য ছিল। কাশীর রাজারা কোশল রাজাদের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিল। আবার কখনও কখনও কোশল কাশী রাজ্য জয় করে। বুদ্ধের সময় হইতে কাশীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লোপ পায়। কিছুকালের জন্য ইহা কোশল ও মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সর্বশেষে দেখা যায় যে, কাশী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কাশীর রাজধানী ছিল বারাণসী। এইখানে বুদ্ধদেব তাঁহার সর্বপ্রথম ধর্ম প্রচার করেন।

কুরু ও পঞ্চালের পূর্বদিকে এবং বিদেহের পশ্চিমে কোশল অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে নেপালের পর্বতমালার মধ্যে কোশলের উত্তর সীমানা। গণ্ডকী নদী ইহার দক্ষিণ সীমানা এবং কপিলাবস্তুর পূর্বদিকে ইহার পূর্ব সীমানা ছিল। ম্যাকডোনেল এবং কিথের মতে গঙ্গার উত্তর পূর্বদিকে কোশল অবস্থিত। ইহা আধুনিক আউধ রাজ্য হইতে অভিন্ন। কোশলের দুইটি ভাগ ছিল—উত্তর এবং দক্ষিণ। উত্তর ভাগের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী এবং দক্ষিণ ভাগের রাজধানী সাকেত। রামায়ণ ও মহাভারত এবং কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যা সর্বপ্রথম রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয় এবং পরবর্তী রাজধানী সাকেত। বুদ্ধদেবের সময়ে অযোধ্যা একটি নগণ্য নগরে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের ছয়টি বৃহৎ শহরের মধ্যে সাকেত এবং শ্রাবস্তী দুইটি। কেহ কেহ মনে করেন যে, সাকেত এবং অযোধ্যা অভিন্ন। কিন্তু মিঃ ডেভিডস বলেন, এই দুইটি নগর বুদ্ধের সময়ে বর্তমান ছিল। শ্রাবস্তী আউধে অবস্থিত। যুক্তপ্রদেশের গণ্ডাক এবং বাহ্রেক জেলার সীমানায় অবস্থিত রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরস্থ সাহেট-মাহেট নামে সুবৃহৎ নগরস্তূপ হইতে শ্রাবস্তী অভিন্ন।

মগধ বলিতে বিহারের বর্তমান পাটনা এবং গয়া জেলাকে বুঝায়। ইহার সর্বপ্রথম রাজধানী ছিল গিরিব্রজ বা পুরাতন রাজগৃহ। বৌদ্ধধর্মের ইহা একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। অশোকের সময়ে ইহার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। প্রাচীন বৌদ্ধযুগে ইহা একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। উত্তর প্রতিবেশীর সহিত এবং পঞ্জাবের পশ্চিমরাজ্যের সহিত বিবাহ ও অপর কোন সূত্রে মগধেরা বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়াছিল।

প্রাগজ্যোতিষ একটি অনার্য জাতি বলিয়া পরিচিত। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহা একটি অসুর-দানব রাজ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। মহাভারতের মতে ইহা উত্তরদিকে অবস্থিত কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায়, ইহা পূর্বদিকে। প্রাগজ্যোতিষপুর কামরূপের রাজধানী। কামাখ্যা অথবা গৌহাটী হইতে ইহা অভিন্ন। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাগজ্যোতিষ এবং কামরূপ একই দেশ। প্রাগ-জ্যোতিষ বলিতে আমরা সমগ্র আসাম, উত্তর বাংলা, রংপুর এবং কুচবিহারকে বুঝি।

বর্তমান তমলুক, তাম্রলিপ্তিক বা তাম্রলিপ্ত অভিন্ন। রূপ-ইহা প্রাচীন সুহ্ম রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং মৌর্যশাসিত মগধ রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল।

প্রাচীনকালে বঙ্গ বলিতে আধুনিক বাংলার একাংশকে বুঝাইত। প্রাচীন বঙ্গের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে সমতট (বর্তমান ফরিদপুর) এবং তাম্রলিপ্তের (বর্তমান তমলুক) উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ বলিতে পূর্ব বাংলাকে বুঝাইত। বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ পূর্ববাংলার অন্তর্গত।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বর্তমান মাদুরার বৃহত্তর অংশ এবং তিনে-ভেলি জেলা ও দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুর পাণ্ড্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাম্র-পর্ণী নদীতীরস্থ কোলকাই ইহার সর্বপ্রথম রাজধানী এবং ইহার পরবর্তী রাজধানী মদুরা (দক্ষিণ মথুরা)। কেহ কেহ বলেন যে, পাণ্ড্যদেশ বলিতে মদুরা, রামনাদ, তিনেভেলি জেলাগুলি এবং সম্ভবতঃ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণ অংশকে বুঝাইত। ইহা তাম্রপর্ণী ও কৃতমালা অথবা বেগাই নদীর জলে ধৌত হইত।

কেরল বা চের কূপক কিংবা সত্যদেশের দক্ষিণে একটি দেশ। ইহা মধ্য ত্রিবাঙ্কুরের কন্নেটি পর্যন্ত বিস্তৃত। কাহারও কাহারও মতে ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং মালাবার জেলা লইয়া কেরল বা চেরদেশ গঠিত। কোয়েম্বাটোর জেলা এবং সালেম জেলার দক্ষিণাংশ কঙ্গু দেশ নামে পরিচিত ছিল। কেরল বা চের দেশ পেরিয়ার নদীর জলে ধৌত হইত। এই নদীর তীরে কোচিনের নিকটে ইহার রাজধানী বঞ্জি অবস্থিত ছিল।

বনবাসী রাজ্য ঐতিহাসিক যুগে উত্তর কানাড়ায় একটি সুবিখ্যাত দক্ষিণদিকের অঞ্চল ছিল।

বামন পুরাণের মতে মারাঠা বা মহারাষ্ট্র দেশ উত্তর গোদাবরীর জলে বিধৌত হইত। ইহা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী স্থান। অশোক এই দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মহাধর্মরক্ষিতকে প্রেরণ করেন।

কপিশা নদী (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান কাসাই) হইতে দূরে বংগের দক্ষিণে কলিঙ্গ দেশ বিদ্যমান ছিল। ইহা দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। বৈতরণী নদীর দক্ষিণস্থ বর্তমান উড়িষ্যা এবং ভিজাগাপত্তম্ পর্যন্ত দক্ষিণে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত। কূর্ম পুরাণের মতে অমরকণ্টক পর্বত ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাতিগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খারবেলের রাজত্বকালে কলিঙ্গনগর কলিঙ্গের রাজধানী ছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত সংলগ্ন-স্তূপগুলি এবং বংশধারার তীরে অবস্থিত মুখলিঙ্গম্ ও কলিঙ্গনগর অভিন্ন।

সুরপারক একটি সমুদ্র বন্দর এবং ইহা বোম্বাইয়ের সাঁইত্রিশ মাইল উত্তরে থানাজেলার অন্তর্গত সুপারা বা সোপারা হইতে অভিন্ন। ইহা বেসিনের প্রায় চার মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায় যে, ভারতের পশ্চিমভাগে আভীরগণ বাস করিত। পরবর্তী পুরাতত্ত্ববিদগণ বলেন, আভীরেরা

অধিবাসী ছিল বলিয়া মনে হয়। আল-বীরুণী তাহাদিগকে ভুল করিয়া দক্ষিণের অধিবাসী বলিয়াছেন। মহাভারতের মতে ইহারা পশ্চিম রাজপুতনার অধিবাসী ছিল।

সুরাষ্ট্র বলিতে বর্ত্তমান কাথিয়াওয়াড় এবং গুজরাটের অপর অংশগুলিকে বুঝায়। শতোদিকা নদী সুরাষ্ট্র দেশের সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙের মতে এই দেশ সু-ল-ছ নামে বিদিত। টলেমির মতে সৈরাষ্ট্রেনে এবং সুরাষ্ট্র অভিন্ন। আল-বীরুণী ভুল করিয়া সুরাষ্ট্রকে দক্ষিণ দিকে স্থান দিয়াছেন।

ভোজগণ দক্ষিণ দেশের লোক। তাহারা প্রাচীনকালে মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে বাস করিত। কথিত আছে, তাহারা কুরু-পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপুরুষ যযাতির পুত্র দ্রুহ্যুর বংশসম্ভূত ছিল। ইহারা শূরসেনদিগের রাজধানী মথুরা নগরে বাস করিত। আল-বীরুণী ভুলক্রমে ভোজগণকে পশ্চিমে স্থান দিয়াছেন।

মালবেরা সর্বপ্রথম পঞ্জাবে বাস করিত। ক্রমশঃ তাহারা উত্তর ভারতের অনেক স্থানে বাস করিয়াছিল। রাজপুতানা, মধ্যভারত যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং প্রাচীন লাটদেশে (ব্রোচ, কচ্ছ, বড় নগর, আমেদাবাদ) সর্বশেষে ইহারা বর্ত্তমান মালবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ইহারা পাণিনির যুগ হইতে সমুদ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত নিজেদের জাতীয় সংঘ ভালভাবে রক্ষা করিয়াছিল।

মেকল দেশের অধিবাসীরা বর্ত্তমান অমরকণ্টক পর্বতে এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশগুলিতে বাস করিত। প্রাচীনকালে অমরকণ্টক পর্ব্বতমালা মেকল নামেই পরিচিত। এই পর্ব্বতমালা হইতে নর্ম্মদা উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা মেকলসুতা, মেকলকন্যা ও মেকলা নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে আনর্ত্ত বা আনর্ত্ত দ্বারকার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ এবং কেহ কেহ বলেন যে ইহা বড় নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলা।

পুরাণের মতে ভোগবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটি দেশ। মনে হয়, ইহা গোদাবরী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। মার্কেণ্ডয় পুরাণের মতে ভোগবর্দ্ধন, মৌলিক, অশ্মক ও কুন্তলদিগের সহিত দক্ষিণ দিকে বাস করিত। বায়ু, মৎস্য এবং মার্কেণ্ডয় পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, বৈদর্ভগণ দক্ষিণ দেশে বাস করিত। চৌল্য বা চালুক্য উত্তর দিকস্থ রাজপুত জাতি। ইহারা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দিগকে শাসন করিত। কিরাতগণ ছিল অনার্য পার্ব্বত্য জাতি; ইহারা উত্তরাপথবাসী।

ত্রিগর্ত্তের লোকেরা একটি ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া পরিচিত। ইহারা গণতন্ত্রভুক্ত। মহাভারতের মতে ইহারা পঞ্জাবের একটি জাতি। বর্ত্তমান জলন্ধর ও প্রাচীন ত্রিগর্ত্তদেশ অভিন্ন। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, ত্রিগর্ত্তদেশ ও কাংগ্রা অভিন্ন। আল-বীরুণী ভুল করিয়া উত্তর দিকে অপরান্তের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। অপরান্ত পশ্চিম অঞ্চলে স্থিত। ইহাই উত্তরকোঙ্কণ নামে পরিচিত। বাহ্লিক দেশ উত্তর দিকে অবস্থিত। চন্দ্রের মেহরৌলি স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, বাহ্লিকগণ সিন্ধুর অপর দিকে বাস করিত। টলেমির সময়ে ইহারা ও বাকৃট্রিওই অভিন্ন ছিল।

আর্য্য-সভ্যতার সর্ব্বপ্রাচীন যুগ হইতে গন্ধার ভারতের একটি অংশ ছিল। গন্ধার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। কিন্তু ইহার স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বর্ত্তমান পেশোয়ার ও রাওয়লপিণ্ডি জেলা গন্ধারের অন্তর্গত। রিজ-ডেভিডস-এর মতে গন্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) পূর্ব্ব-আফগানিস্থানের জেলা-বিশেষ। ভিনসেণ্ট এ. স্মিথও এই মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব্ব-আফগানিস্থান লইয়া গন্ধার রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পুষ্কলাবতী (পুষ্করাবতী) এবং তক্ষশীলা (তক্সিলা) গন্ধারের প্রাচীন রাজধানী ছিল।

পারজিটার সাহেবের মতে চর্ম্মখণ্ডিক সমরকন্দ হইতে অভিন্ন। মৎস্যপুরাণে দশেরকের উল্লেখ আছে। দশেরক দেশের লোকেরা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে লম্পাকগণ উত্তর দিকে বাস করিত। কানিংহাম সাহেবের মতে লম্পাকদেশ বর্ত্তমান লমঘন হইতে অভিন্ন। লাসেন সাহেবও এই মত পোষণ করেন।

যোন বা যবনগণ গ্রীকদিগের বংশসম্ভূত ছিল। ইহারা আইয়োনিয়ন নামে পরিচিত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহাদের বিশিষ্ট স্থান ছিল। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, কম্বোজ, গন্ধার, কিরাত এবং বর্ব্বরের ন্যায় ইহারা উত্তর ভারতে বাস করিত।

পুরাণগুলিতে সিন্ধু এবং সৌবীরদিগকে যুক্তভাবে দেখা যায়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ইহাদের পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। মার্কেণ্ডেয়-পুরাণের মতে ইহারা উত্তর দিকে বাস করিত। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় হূণ এবং মদ্রদিগের সহিত ইহারা পশ্চিম দিকে বাস করিত। আল-বীরুণী বলেন যে, সৌবীর, মুলতান এবং জারাওয়ার একই দেশ; কিন্তু হৈমকোষের মতে সৌবীর দেশ এবং কুণালক অভিন্ন।

জীবন বন্দনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জীবন সবার বড়, এই কথা জেনো শুধু প্রিয় !
কেন অশ্রু ? সুখদুঃখে নহে নহে পরিমাপ তার,
নূতন বিস্ময় সেথা, নিত্য সেথা নব আবিষ্কার,
জীবন পরম সত্য, সে মহান্, অনির্ব্বচনীয় ।

জানি জানি প্রেমে এই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা,
দুঃখভরা ধরাতলে—জানি প্রেমে স্বর্গ আসে নামি,
তবুও তবুও জানি প্রেমে শুধু তুমি আর আমি,
বিশ্ব বিস্মরণ হয়—আসে যবে প্রেমের বারতা ।

মাধুর্য্যে মণ্ডিত প্রেম, তার চেয়ে বড় এ জীবন ।
কত স্মৃতি, অনুভূতি, কি বিস্মৃতি, কত অভিজ্ঞতা,
কি অতৃপ্তি, কি বাসনা, কি আনন্দ, কি গভীর ব্যথা !
জীবনের বেদনায়—সব নিয়ে—সেই নিবেদন ।

শুধু সুন্দরের মাঝে কেন খুঁজি নিয়ত সান্ত্বনা ?
একেলা সৌন্দর্য্য শুধু জীবনের নহে উপাদান,
সুন্দরে ও অসুন্দরে সেথা বুঝি নাহি ব্যবধান,
জীবনের পথে নিত্য ভয়ঙ্কর করে আনাগোনা ।

জীবন বিচিত্র আর কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার !
হৃদয় কাঁদিয়া মরে, তারা চায় অকুণ্ঠ প্রকাশ ।
পূর্ণ অভিব্যক্তি ? তার এ জীবনে কোথা অবকাশ ?
চিত্রে গানে কাব্যে তাই সে বিচিত্রে হেরি বার বার ।

জীবন পড়ে না ধরা, সে চঞ্চল, সে যে শুধু চলে,
আমরা আঁকিতে পারি শুধু এক মুহূর্ত্তের ছবি,
সেখানে সার্থক মোরা, সেইখানে আমরা যে কবি,
বর্ণের যোজনা করি আমাদেরি তপ্ত অশ্রুজলে ।

বার বার প্রশ্ন করি, সে প্রশ্নের মেলে না উত্তর,
প্রতীক্ষায় দিন কাটে, অনন্ত এ জীবন-জিজ্ঞাসা,
সমাধান পাব তার একদিন, আছে তবু আশা ।
সত্যে খুঁজি ? সত্য সে যে কল্পনার নিত্য সহচর ।

দ্বার খোল, রহস্যের চিরুদ্ধ দ্বার খোল দ্বারী !
স্বপ্ন ও বাস্তবে গড়া এ জীবন, তাহার স্বরূপ
কে জেনেছে ? পরিচয় কে পেয়েছে ? সে যে অপরূপ !
জীবনের গান গাই আমি কবি জীবন-পূজারী ।

কাঞ্চনজঙ্ঘায়

শ্রীউমা দেবী

মনে হয়—মনে হয়—একটি ইচ্ছার মেঘ হয়ে
আরক্ত চুনির মত একটি তৃষ্ণাকে বুকে বয়ে
ভেসে যাই—দূর থেকে দূরান্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘায়
পৃথিবীর শেষ হলে আকাশের নীল সীমানায় ।
সেখানে রহস্যভরা নিশীথের নীলকান্তময় সিংহদ্বার
মুক্ত হলে—ফুলবন লাল নীল সাদা আর সোনালি তারার
শোনায় সঙ্গীত তার ভ্রমর পাখার
যখন স্বপ্নের রেণু ঝরে গিয়ে দক্ষিণ হাওয়ায়
কুয়াশার মতন ঘনায়—
আমার প্রাণের কাছে এসে
ভালোবেসে
কি যেন সে চায় দিতে—চায় !

আমি তো ইচ্ছার মেঘ—তাও ক্রমে বাষ্প হয়ে যাই
নীলাভ সুরভি ভীরু ধূপের শরীর নিয়ে তাই—
হৃদয়ের দেশে এসে এমনি মিলাই—
যত ঘুম-নামা চোখে জলে যাওয়া প্রাণেদের
পুড়ে যাওয়া বাসনার ছাই !
তাই মনে সাধ জাগে পুরন্ত—ভরন্ত এক ইচ্ছার
প্রবল মেঘ হয়ে
আরক্ত চুনির মত বিদ্যুতের মত দীপ্ত একটি
তৃষ্ণাকে বুকে বয়ে
ভেসে যাই দূর থেকে দূরান্তরে যেখানে—যেখানে—মন চায়
হয়তো বা বাসনার সোনার বসনে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘায় !

ঐ তুষারের দেশে—তুষারের কোলে এসে ঘুমাবে না মন ?
ভাঙা ভাঙা মেঘ-বনে একটি ফুলের মত হারাবে না
রক্তরাঙা সন্ধ্যার মতন ?
একটি রঙীন তৃষ্ণা তুষার-স্নানের শেষে
হতে পারে শান্ত ও শীতল,
ভরন্ত প্রাণের এক ইচ্ছার প্রবল মেঘ
হতে পারে কুয়াশার মত সুকোমল—
ঐ দূরান্তরে হিম কাঞ্চনজঙ্ঘায়
যেখানে পৃথিবী এসে শেষ হয় আকাশের নীল সীমানায়
হৃদয়ের নীলাভ ছায়ায়—
...কাঞ্চনজঙ্ঘায়—দূর কাঞ্চনজঙ্ঘায়—

কেশবচন্দ্র সেন : প্রথম জীবন

(১৮৩৮-১৮৫৯)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পূর্ব্বাভাষ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র সেনকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম দুই জন ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্যতর বলিয়া 'ধর্ম্মতত্ত্বে' উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ উক্তি দ্বারা এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণের যেসব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই কেশবচন্দ্রে বিদ্যমান ছিল। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মনেতা, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির একান্ত সেবক। কিন্তু এ সকলের উপরে ছিলেন তিনি সত্যিকার দরদী মানুষ। মানুষের তথা স্বদেশবাসীর উন্নতি ছিল তাঁহার লক্ষ্য। এই উন্নতির মূলাধার যে ধর্ম্মবোধ তাহা জানিয়া তিনি মনুষ্যসমাজকে ধর্ম্ম বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন। আর এই কারণেই তাঁহাতে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে এত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজী-বাংলা একটি বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বড় ছোট কয়েকখানি জীবনী-গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ছেচল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ভারতীয় জীবনের নানা দিকের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রয়াস সমাজজীবনে এমন এক আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল যাহার তুলনা আধুনিক কালে খুব কমই মেলে। কেশব-সাহিত্যে, কেশব-জীবনী-গ্রন্থে এই সকলের ছাপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। কিন্তু কেশব-জীবনের সব কথা ইহাতে ধৃত হয় নাই, হয়ত তাহা সম্ভবও ছিল না। কেশব-জীবন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, শিক্ষা ও অন্তবিষয়ক রিপোর্ট এবং পুস্তক-পুস্তিকাদির সাহায্যও আমাদের লইতে হয়। প্রচলিত কেশব-সাহিত্য এবং এই সকল নূতন আকর হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে কেশব-জীবনী নূতন করিয়া আলোচনার সময় আসিয়াছে। কেশবচন্দ্রের বহুমুখী কর্ম্মপ্রয়াস জাতীয় জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে ইহা হইতে তাহা আমাদের নিকট সম্যক প্রতিভাত হইবে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

কলুটোলায় সেন-পরিবারে কেশবচন্দ্রের জন্ম। সেন পরিবারের কথা বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয় আমাদের স্বতঃই মনে পড়ে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেন* নব-বঙ্গেরও অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃত, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রসাধনা নানা বিষয়েই তিনি উৎসাহী কর্ম্মী ও নেতা ছিলেন। ধর্ম্ম এবং সামাজিক

রামকমল সেন

ব্যাপারে রামকমল ছিলেন রক্ষণশীল, তথাপি জাতির উন্নতিমূলক যতকিছু প্রচেষ্টা, সমুদয়েই তাঁহার ঐকান্তিক সংযোগ লক্ষ্য করি। রামকমল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, ধনে মানে কলিকাতা-সমাজের একজন প্রধান হইয়াও তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-যাপন-প্রণালী ছিল অতি সাদাসিধা ; তিনি 'হরি' নাম জপে আনন্দ পাইতেন, স্বপাকে রান্না করিয়া যৎসামান্য আহার করিতেন। নিয়ম-সংযমে রামকমল ঐ সময়ে এক জন আদর্শ হিন্দু বলিয়া গণ্য হন।

রামকমল সেনের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিমোহন সেনগুপ্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকর্ম্মীরূপে খ্রীষ্টানবিরোধী আন্দোলনে একান্ত ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ে'র তিনি ছিলেন অন্যতর সম্পাদক। অন্যান্য দেশকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান, যেমন—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও সূচনা অবধি যুক্ত ছিলেন। রামকমল সেন

---

* 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত 'রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়' পুস্তকে রামকমল সেন সম্বন্ধে নির্ভর-

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হিন্দু কলেজের সঙ্গে মিলিত হন; জীবনের শেষ বৎসর (১৮৪৪) পর্য্যন্ত তিনি ইহার একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ হিন্দু কলেজের ছাত্র। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন (জন্ম ১৮১২) কলেজের প্রথম যুগের একজন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেন (১৮১৪-৪৮) কেশবচন্দ্রের পিতা। তিনিও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। জ্যেষ্ঠ হরিমোহন রামকমলের জনকল্যাণ প্রচেষ্টাসমূহের ধারক ও বাহক ছিলেন। মধ্যম পুত্র প্যারীমোহন পিতৃদেবের ভগবদ্ভক্তি,

প্যারীমোহন সেন

নিষ্ঠা ও সংযমের অধিকারী হইলেন। কলেজের পাঠ সমাপনান্তে প্যারীমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্রোগ সাহেবের হাউসের মুৎসুদ্দী ছিলেন। এই হাউসের পতনে তিনি ঋণগ্রস্ত হন। পিতা রামকমল সেন একই কালে দুইটি কর্ম্ম করিতেন—বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী ও টাঁকশালের দেওয়ানী। রামকমলের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ হরিমোহন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন, টাঁকশালের কাজ পাইলেন প্যারীমোহন। তিনি এই পদ লাভ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সুদিন ফিরিয়া আসে। সেকালের নিয়ম অনুসারে অল্প বয়সেই প্যারীমোহনের বিবাহ হয়। স্বগ্রাম গৌরীভা (ডাকনাম, গরিফা)-নিবাসী গৌরহরি দাসের কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে। ১৮৪৮ সনে পূজার ছুটির পর প্যারীমোহন অকালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। প্যারীমোহন মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া যান। পুত্রদের নাম—নবীনচন্দ্র সেন, কেশবচন্দ্র সেন এবং কৃষ্ণবিহারী সেন। নবীনচন্দ্র বিশেষ সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। সমাজের কল্যাণে তাঁহার সার্থক প্রয়াস ভারতবাসী মাত্রেই আজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। তিনি 'হিন্দু ফেমিলি এন্যুয়িটি ফণ্ডে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী। কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী মধ্যমাগ্রজ কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এলবার্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ রূপে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সুধীমাত্রকেই বিস্মিত করিত। অগ্রজদের মত তিনিও স্বল্পায়ু ছিলেন (১৮৪৮-৯৫)।

কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ সনের ১৯শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এই সনে আরও দুই জন মনীষী আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণদাস পাল। ধর্ম্মপ্রাণ রামকমল নবজাত

সারদাসুন্দরী দেবী

পৌত্রের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মাতা সারদাসুন্দরী লিখিয়াছেন, "আমার শ্বশুর মহাশয় কথায় কথায় 'পর্য্যন্ত' বলিতেন, কেশবের জন্মের পর বলিয়াছিলেন (কেশবকে লক্ষ্য করিয়া), 'এই পর্য্যন্ত আমার মতন হইবে। ইহাকে দিয়া তোমার খুব সুখ হইবে।'"* রামকমল কেশবচন্দ্রকে 'বিশু' বলিয়া ডাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্র প্যারীমোহনকে বলেন, "Peary ! your son Bisu is destined to be a great man—a religious reformer",† অর্থাৎ 'প্যারী, তোমার পুত্র বিশু একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে—একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক হইবে।' রামকমলের পৌত্রপৌত্রীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র তাঁহার বিশেষ স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রামকমল প্রত্যহ 'হরি' নাম জপ করিতেন; পরিবারের পুত্র, কন্যা এবং পুত্রবধূদেরও তিনি 'হরি' নাম জপ করিতে উপদেশ দিতেন। পিতা প্যারী-মোহনের মাধ্যমে কেশবচন্দ্র এই নাম পাইয়াছিলেন। পরবর্তী

---

* কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃ. ৭

† *Life of Dewan Ramcomul Sen*—Peary Chand Mitra, 1880, p. 88.

কালে ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিমূলক সাধন-প্রণালী প্রবর্ত্তনে কেশবচন্দ্র যে উৎসুক হইয়াছিলেন তাহার মূল পাই তাঁহার পারিবারিক ঈশ্বর-আরাধনার মধ্যে।

ছাত্রজীবন

প্রথম পর্ব্ব—বাল্য ও কৈশোর : কেশবচন্দ্র ধনী পরিবারের সন্তান ; তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপ-ব্যবহার যে তদুপযুক্ত হইবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরেজী কেশব-জীবনীতে কেশবচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র গৌরীভার অধিবাসী, সেন-পরিবারের আত্মীয়। সেন-পরিবারের লোকেরা পূজার ছুটিতে যখন স্বগ্রামে যাইতেন তখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহাদের আচার-আচরণে বিস্মিত হইতেন। প্রায় সমবয়সী এবং আত্মীয় হইলেও ঐ সময় কেশবের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্র তেমন মিশিতে পারিতেন না। কলিকাতায় আসিবার পর হইতেই তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কেশব-সম্পর্কিত পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ উক্ত ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ইহা হইতে বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইতে পারিবেন।

শৈশবে গৃহে বসিয়া 'গুরু'র নিকটে কেশবচন্দ্রের পাঠাভ্যাস সুরু হয়। তিনি ১৮৪৫ সনে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র তখন কলেজের ছাত্র। সে সময়ে হিন্দু কলেজে ধনী-পরিবারের ছেলেরা বেশীর ভাগ অধ্যয়ন করিতেন। সেন-পরিবারের সন্তানেরাও বংশপরম্পরায় এখানে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহারা অন্যান্য ধনীর দুলালদের মত ছিলেন না। রামকমল স্বয়ং সাহিত্যসেবী, এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অন্যান্য শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁহার প্রগাঢ় যোগ—এসব কারণে তাঁহার পরিবারে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চ্চার একটি মহনীয় পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। অন্যান্য সন্তানদের মত কেশবচন্দ্রও শৈশব হইতেই পাঠে সবিশেষ মনোযোগী হন। তিনি সুদর্শন, অমিয়কান্তি, মিষ্টালাপী, আর সেই শৈশব হইতেই মানব-দরদী। কলেজের শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না। জুনিয়র বিভাগের প্রতি শ্রেণীতেই তিনি পাঠোৎকর্ষ দেখাইয়া পুস্তকাদি পুরস্কার পান। হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগের তৃতীয় শিক্ষক টি. ষ্টারজন (T. Sturgeon) তাঁহার উদ্দেশে ১৮৫০ সনে বলিয়াছিলেন, 'the little boy with a big head'। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র দ্বাদশ বৎসর। ইংরেজী ও পাটীগণিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এ কথা হয়ত অনেকে জানেন না যে, এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চায়ও কেশবচন্দ্র বিশেষ অগ্রসর হন। ১৮৫১-৫২ সনের সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে 'হিন্দু কলেজ' অধ্যায়ে স্কুল-বিভাগের সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রাপ্ত সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রদের একটি বিবৃতি আছে। ইহাতে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই তথ্যটি আমরা পাই :

SENIOR SCHOOL DEPARTMENT
Second Class
Keshub Chunder Sen . . . Vernacular.

এই তালিকায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

কেশবচন্দ্র সেন (উনিশ বৎসর বয়সে)

ঠাকুরের মধ্যম পুত্র এবং প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস) কেশবচন্দ্রের সময়েই কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে কেশবের পরিচয় ও হৃদ্যতা জন্মে। তিনিও পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। গভীর অভিনিবেশ এবং কঠোর পরিশ্রম সহকারে

কেশবচন্দ্র এই সময়েই বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নে রত হন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন :

"Keshub prepared his lessons industriously, and added patient labour to natural genius. This habit of hard work and systematic industry equally distinguished him at all times of life."*

অর্থাৎ, কেশবচন্দ্র কঠোর পরিশ্রম সহকারে পড়া তৈয়ি করিতেন। এই প্রতিভার শ্রমশক্তি সঙ্গে একত্র হওয়ায় তিনি জীবনে এতখানি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কেশব-পত্নী জগন্মোহিনী দেবী

কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, বিশেষতঃ রামযাত্রা শৈশবে কেশবচন্দ্রের বড়ই প্রিয় ছিল। শৈশব হইতেই এই সকল শ্রবণ করিয়া কেশবচন্দ্র ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান আহরণ করিতে থাকেন। তিনি সমবয়সীদের লইয়া রামযাত্রা অভিনয় করিয়াছিলেন। গিলবার্ট নামক এক সাহেব হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একবার ম্যাজিক দেখান। কেশবচন্দ্র গৃহে গিয়া সমবয়সীদের সম্মুখে প্রায় হুবহু উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন এবং সকলকে আনন্দ দান করেন। তিনি কোন বিষয় দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নিজে তাহা করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন।

দ্বিতীয় পর্ব, যৌবন : কেশবচন্দ্র ১৮৫৩ সন নাগাদ স্কুল বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হন। কিন্তু এই বৎসরের প্রথমেই হিন্দু কলেজ লইয়া কলিকাতায় ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কলেজ এই সময় সরকারী আওতায় আসে : কলেজের অধ্যক্ষ-সভার কর্তৃত্ব তখন খুবই হ্রাস পায়। সভার প্রতিবাদ সরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করিলে, হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন ১৮৫৩, ২রা মে তারিখে। কলেজের নাম হইল—হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। এখানে এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন কলিকাতা—ওয়েলিংটনের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়। কলুটোলা সেন-পরিবারের অধ্যক্ষ হরিমোহন সেন এই প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন এবং পরিবারের সন্তানদের হিন্দু কলেজ ছাড়াইয়া এই নূতন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কেশবচন্দ্রও হিন্দু কলেজ হইতে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন সুরু করিলেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলেন, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে এই নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হয় এবং ইহার ফলে তাহাদের পাঠে অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। হিন্দু কলেজে যে সব বিষয় তিন বৎসর পরে পড়িতে হইত, এই সময়েই তাঁহাকে তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি এসকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হইল। তিনি এই অভাব আর কখনও পূরণ করিতে পারেন নাই। সেক্সপীয়র, মিলটন, বেকন প্রভৃতি ভাবগর্ভ গ্রন্থাদি পড়িয়া ইংরেজী সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা করিতেন। বিখ্যাত সেক্সপীয়রবিদ্ ডি. এল. রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়াছিলেন। অন্যান্য বহু বাঙালী মনীষীর মত কেশবচন্দ্রের সেক্সপীয়র-প্রীতি রিচার্ডসনের আশ্চর্য্য শিক্ষারই ফল। সেক্সপীয়র কৃত নাটকের অভিনয়-স্পৃহা এই সময়ে তাঁহার মনে উজ্জীবিত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, বৎসরখানেক পরে, ১৮৫৪ সনে, কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, হিন্দু কলেজে তিনি আর পূর্ব্বের মত পাঠে উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। কলেজে অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র লেখেন :

"Henceforth his educational career was not at all brilliant. He toiled at it with all his might; he was more than passable in English; he did tolerably well in history; he had a liking for chemistry, and spent a lot of money in buying a set of apparatus; he did very well indeed in mental and moral philosophy, but he was at desperate odds in trigonometry and conic sections"*

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, Second Edition, p. 55.

ইংরেজী, ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়ে কেশবচন্দ্র বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন; কিন্তু ত্রিকোণমিতি এবং কনিক সেকশ্যন, বা এককথায় অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁহার মন একেবারে বিরূপ হইয়া উঠিল। অঙ্কনের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল বটে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছুতে তাঁহার মন বসিত না। একারণ জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াও, তিনি আর শোধরাইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে ১৮৫৪-৫৫ সনে হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুলে বিভক্ত হইল। কেশবচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্র ১৮৫৮ সনে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। এখানে স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও কেশবের সমসময়ে, ১৮৫৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে গিয়া ভর্তি হন। উভয়ের মধ্যে এই সময় আলাপ পরিচয় হওয়া বিচিত্র নয়। ১৮৫৬-৫৮, এই দুই বৎসর কেশবচন্দ্র কলেজের পাঠ্যাতিরিক্ত দর্শনশাস্ত্র (Mental and Moral Philosophy) অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন—তাঁহারা প্রায়ই কেশবচন্দ্রকে কলেজ-লাইব্রেরীতে এই বিষয়ক পুস্তকাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে দেখিতেন। কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রিচার্ড জোনসের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন কেশবচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্র লিখিতেছেন :

"He (Keshub) was exceedingly attached to Mr. Jones, the professor of philosophy, who took a great deal of interest in his progress and gave special attention to his training, for all which Keshub was looked upon by students in general as a sort of youthful philosopher."

কেশবচন্দ্র এই সময়ে অধ্যয়ন ও অনুধ্যানে কিরূপ তৎপর ছিলেন, প্রতাপচন্দ্র সে সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কিছু কিছু লিখিয়াছেন। কেশবচন্দ্র প্রতিদিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী—মেটকাফ হলে সকাল ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শনের গ্রন্থাদি তাঁহার বিশেষ পাঠ্য বিষয়; তন্মধ্যে দর্শনের ইতিহাস পাঠে তিনি যত আনন্দ পাইতেন এমন আর কিছুতেই নয়। তিনি মিল্টন, ইয়ং-এর কবিতাও পাঠ করিতেন, সেক্সপীয়রের তো তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী। তবে তিনি উপন্যাস আদৌ পছন্দ করিতেন না। সর্ উইলিয়ম হ্যামিলটনের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না। ভিক্টর কুঁজোর গ্রন্থাবলী তিনি অহরহ পাঠ করিতেন। জে. ই. ডি. মোরেল, ম্যাকোষ, থিয়োডোর পার্কার, মিস কবের রচনাবলীও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি এড়াইত না। এমার্সনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার মত ঐরূপ বিভিন্ন বিষয়ের নিয়মিত পাঠক তখন কচিৎ দেখা যাইত।* প্রতাপচন্দ্র আরও বলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিবার পূর্ব্বেই কেশবচন্দ্র এই সকল গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মবিষয়ক প্রাথমিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন।

মেটকাফ হলে কেশব কর্তৃক এইরূপ অধ্যয়ন কলেজ-ত্যাগের পরেই বেশীর ভাগ চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের শেষ দুই বৎসরের মধ্যে কেশব-জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ব্যাপার ঘটে। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে কেশবচন্দ্র সেই তরুণ বয়সেই আত্মোন্নতিমূলক ও সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"From eleven o'clock in the morning till about six o'clock in the evening, he read regularly everyday in Metcalfe Hall, which is the only large public library we have in Calcutta. He read theological and metaphysical works mostly, the history of philosophy being his delight. He read some poetry such as Milton and Young, he gloried in Shakespeare at all times, but he hated novels of all kinds. He was an intense admirer of Sir William Hamilton, and poured over the works of Victor Cousin. He read J. E. D. Morell and M'Cosh; loved the works of Theodore Parker, Miss Cobbe and praised Emerson. He was a versatile and vorations reader in those days.

"His mind has already formed the conception of religion before he knew anything of the Brahmo Somaj."—*The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen.*—By P. C. Mozoomdar, p. 69.

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen,* p. 61.

হস্তক্ষেপ করেন। এই সময়ে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার ধর্মমতের বিবর্তন সুরু হয় এই সময় হইতে। এসব বিষয় এখন সংক্ষেপে বলিব।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

প্রতাপচন্দ্রের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, বিভিন্ন সদগুণবশতঃ, বিশেষতঃ নিরত অধ্যয়ন ও অনুধ্যান হেতু, কেশবচন্দ্র কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ডিরোজিও-যুগের 'একাডেমিক এসোসিয়েশন'-এর মত এসময়েও কলেজের যুব-ছাত্রগণ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত ১৮৫৭ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সভার সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিডীর (১৮২৬-৬২)।

বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্র এই সোসাইটির ছাত্র-উদ্যোগীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বেই সমবয়স্ক এবং বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধুদের লইয়া ছোটখাটো ক্লাব, সংঘ ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেখানে সাহিত্য ও পাঠ্য বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা হইত। প্রতাপচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্দেশ্য স্বল্প কথায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—"The culture of literature and science", অর্থাৎ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন। প্রতি মাসে সভার একটি করিয়া সাধারণ অধিবেশন হইত। এই সভায় ছাত্র, অধ্যাপক ব্যতীত ঐ সময়কার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগদান করিতেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, ইউনিটেরিয়ান পাদ্রী সি. এইচ. এ. ড্যাল এবং চার্চ মিশনরী সোসাইটির পাদ্রী জেম্স লঙের মধ্যে বাদবিতণ্ডা যুব-সভ্যদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য অথচ শিক্ষাপ্রদ হইত।* মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষানুরাগী বক্তাদের দ্বারা সোসাইটির অধিবেশনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হইত।

সোসাইটির একটি অধিবেশনের বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে† পাইয়াছি। এই অধিবেশন হয় ২০শে আগষ্ট ১৮৫৭ দিবসে। প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মিঃ কার্কপেট্রিক। সভার আরম্ভেই সভাপতি হেলিডীর এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এমন একটি হিতকারী সভার প্রতি যেমন সংবাদপত্র তেমনি জনসাধারণ সমান উদাসীন। এই সভায় কুড়ি বৎসরের নিম্নবয়স্ক আশী-নব্বই জন ছাত্র, পাদ্রী ড্যাল এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কার্কপেট্রিকের বক্তব্য বিষয় ছিল—"On the Duties of Man", বা মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে। বক্তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পরে সভাপতি অধ্যাপক হেলিডীর রসায়নশাস্ত্রের, বিশেষতঃ কৃষি-রসায়নের চর্চায় জন্য যুবকগণকে উপদেশ দেন। কেননা এই বিষয়ের চর্চায় সমাজের আশু কল্যাণ সম্ভব। পাদ্রী ড্যাল আলোচনায় যোগদান করিয়া একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ সংবাদপত্রে যেরূপ বাহির হইয়াছিল সেইরূপই এখানে উদ্ধৃত হইল :

"He (Dall) strongly reminded his hearers that they should never forget this valuable axiom 'Truth helps Truth,' and that every new discovery should have, and did have, for its object, an amelioration in the social condition of mankind. They should reflect that man was made of power, of wisdom, of justice, of love, and such being the cases it ought to be one of their main and principal endeavours in this world to render themselves useful, useful to themselves, useful to their friends, useful to their neighbours, and to the rest of the world."

ড্যাল সাহেব বলেন, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব-জাতির কল্যাণ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রত্যেককেই শক্তি, জ্ঞান, ধর্মবুদ্ধি, প্রেম দিয়াছেন। এজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজেদের, বন্ধুদের, প্রতিবেশীদের এবং জগদ্বাসীর হিতসাধন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বৎসরখানেকের মধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিখ্যাত বেথুন সোসাইটির ১৮৫৭ সনের বার্ষিক বিবরণে এই সোসাইটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

"The (Bethune) Society has much pleasure in recording that its example has been followed by some of the distinguished students of the Presidency College, who have established an Association for the purpose of discussing literary and scientific subjects, and it is sincerely hoped it may live long and increase in usefulness."*

সোসাইটি যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বেথুন সোসাইটি উহাকে অভিনন্দিত করেন।

কলুটোলা ইভনিং স্কুল

কলুটোলা ইভনিং স্কুল বা সান্ধ্য বিদ্যালয় আর একটি প্রতিষ্ঠান যাহার সঙ্গে কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থায়ই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। কলুটোলা সেন-পরিবারের যুবকগণ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিনব শিক্ষায়তনটি স্থাপন করেন। এরূপ বিদ্যালয় এতদঞ্চলে ছিল না। প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ছাত্রদের এবং যাহারা দিনমানে কর্মে লিপ্ত থাকে, তাহাদের নিমিত্ত এই সান্ধ্য বিদ্যালয়টির সূচনা। কেশবচন্দ্রের ইংরেজী জীবনী-গ্রন্থে প্রতাপচন্দ্র এ বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।† সেন-পরিবারের যুবকগণ নব্যশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ। ইংরেজী সাহিত্য, কাব্য, নাটকের আলোচনায়

---

* ঐ, পৃঃ ৬৫।

* *The Bengal Hurkaru*, January 22, 1858.

† *The Life and Teachings of Keshub Chunder*

তাঁহারা মশগুল। সেক্সপীয়র অধ্যয়ন তখন নব্যশিক্ষিতদের একটা ফ্যাশনে দাঁড়াইয়াছিল। কলুটোলায় সেন-পরিবারের যুবকগণও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা নিজেরা জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, অর্জ্জিত জ্ঞান সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিতেও অগ্রণী হইলেন।

কলুটোলায় সান্ধ্য বিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন নিয়মিত ভাবে পড়াইতেন। শিক্ষাদান ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনে কেশবচন্দ্রের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব ছিল। "Lex" নামে এক পত্রপ্রেরক ১৮৫৭, ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলুটোলা ইভনিং স্কুলের একটি বিবরণ দিয়া সংবাদপত্রে* একখানি পত্র লেখেন। পত্রশেষে বিদ্যালয় পরিচালনে কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে:

"In conclusion we cannot be so thankless as to refrain from acknowledging the warmth of heart, the highness of spirit, the honesty of purpose and the amiableness of disposition of Babu Keshub Chunder Sen, who has all along taken and still takes a very active part in the instruction of the students and the management of the school."

কেশব-চরিত্রের সুন্দর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণে এবং ছাত্রদের শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু উল্লেখ আমরা এখানে পাই।

বিদ্যালয়টির তখন দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছিল। মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় ইহা কতটা উন্নতিলাভ করে—তাহারও বিবরণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যালয়ে তখন বাট জন ছাত্র অবেতনে অধ্যয়ন করিতেছিল। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় মাত্র পঁচিশ টাকা। সেন-পরিবারের যুবক ও আত্মীয়েরা স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে ছাত্রদের পড়াইতেন। উক্ত পরিমাণ টাকা চাঁদা দ্বারা আদায় হইত। প্রথম বৎসরে সাড়ম্বরে ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষা দেশী-বিদেশী বিদগ্ধ জনের সম্মুখে গৃহীত হয়। সেযুগে স্কুল কলেজের বার্ষিক পরীক্ষাগুলি একটি উৎসবের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িত। বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সনের জানুয়ারী মাসে, এবং ইহাতে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত বাগ্মী ভারতহিতৈষী জর্জ টমসন। তিনি এই সময় দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভেই ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া সত্তর জনে দাঁড়ায় এবং তাহাদের শিক্ষার মান বিবেচনা করিয়া সাতটি শ্রেণী খোলা হয়। প্রথম বৎসরে শিক্ষকগণ কেহই বেতন লইতেন না, দ্বিতীয় বৎসরে ছাত্র-বৃদ্ধি হেতু বেতন দিয়া কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। পল্লীর মুসলমানগণও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহাদের জন্য বিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলা হইয়াছিল। উক্ত পত্রে কলুটোলায় সেন-পরিবারের যুবকদের ত্যাগপূত সেবাব্রতের বিশেষ প্রশংসা আছে। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হয় তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। দুই বৎসর যাবৎ বিদ্যালয়টি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হইল। ১৮৫৮, ২১শে জানুয়ারী "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেন-পরিবারের যুবকদের, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সেবাব্রত যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, 'পেট্রিয়টে'র উক্তি তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 'পেট্রিয়ট' "The Colootollah Evening School" শিরোনামায় অংশতঃ লেখেন:

"Some well-meaning gentlemen belonging to the family of Baboo Hurrymohun Sen have founded this benevolent institution of boys of the poor and the working classes, the days, hours of whose life are occupied in anxieties and labours for the acquisition of their daily bread. It has stood the trial and vicissitudes of existence for two years, and bids fair to continue and prosper. . . . If there is any heterogeneous population of Calcutta whose faculties should be developed and feelings cultivated by the improving and humanising influence of education, it is the working and industrial classes of the city. Much of the intensity and violence of the struggle that is now going on between principle and prejudice will lessen. Indian Society will take a refreshing and encouraging tone and the work of progress and reform will become comparatively easy. The blessings of consolation and happiness will be diffused among the poor, and health will mark the cheerful faces of labourers and mechanics. The evening school is a novelty in India. . . . We would like to see a net-work of such useful and benevolent institutions spread over Calcutta and rear a body of industrious and intelligent men, an honour to themselves and a pride to their countrymen."

'পেট্রিয়ট' বিলাতের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের কথাও এই প্রসঙ্গে বলেন। কলুটোলায় বিদ্যালয়টি যাহাতে স্থায়িত্বলাভ করে সে সম্বন্ধে তিনি কলিকাতার দেশী-বিদেশী প্রধানগণকে সজাগ ও সচেষ্ট থাকিবার নিমিত্ত আবেদন জানান। এহেন বিদ্যালয়টিও কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না। প্রতাপচন্দ্র বলেন, ইহা তিন কি চারি বৎসরকাল চলিয়াছিল। বিদ্যালয়টি পরিচালনা-কালেই ১৮৫৭ সনে কেশবচন্দ্র আর একটি সভা বা সম্প্রদায় গঠন করেন এবং ক্রমে তাহার জন্যই নিজের সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োজিত করেন। একটু পরে তাহা বলিতেছি।

বিবাহ

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে, আঠারো বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। ১৮৫৬ সনের ২১শে এপ্রিল কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে বালীগ্রাম-নিবাসী চন্দ্রনাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠা

---

* *Hindu Intelligenceer*, March 2, 1857.

কন্যা জগন্মোহিনী দেবীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হইল। ঐ দিন খুব ঝড়বাতাস হয় এবং গঙ্গা-পারাপারে কষ্টের অবধি ছিল না। কেশবচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার জননী সারদাসুন্দরী দেবী অনেক কথা লিখিয়াছেন।* এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পরের কথা তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :

"বিয়ের পর বৌ এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলেন, নয় বৎসর বয়সে আমি তাঁহাকে লইয়া আসি, সেই পর্য্যন্ত আমারই নিকট ছিলেন। আমার ও আমার বড় মেয়ে ভুলেশ্বরীর যত্নে বৌ ক্রমে ক্রমে সুশ্রী ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি সুন্দরী হইলেন। ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌ-এর শ্রী ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়িতে লাগিল।"

বিবাহের অব্যবহিত পরে কেশবচন্দ্রের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা তিনি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তখনও স্বীয় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু সংযম-নিয়মাদি অভ্যাস দ্বারা কৃচ্ছ্রসাধনে রত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়, এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম। এই সকল হইল কখন? আঠার, উনিশ, কুড়ি বৎসরে। যখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব, সংসারের বাড়ী যেখানে করিব, দেখি, এই জায়গাই ত শ্মশান। সংসারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু সংসারের ভয় জানিতাম। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসার আরম্ভ করিতে হইবে।...আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর অধীন করিব? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে স্ত্রৈণ হইব না; কেননা স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে মরিতে দেখিয়াছি।"‡ ইত্যাদি ইত্যাদি।

"গুড উইল ফ্রাটার্নিটি"

কেশবচন্দ্র ধনীর সন্তান, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত ; কিন্তু নিয়ত অধ্যয়ন অনুশীলনের ফলে তাঁহার মনে এক ধরনের নীতিবোধ ইতিমধ্যেই জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি আমিষ আহার পরিত্যাগ করিলেন, নিয়ম-সংযমে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। নিয়ম-সংযমের মধ্যেই তাঁহার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইল। ত্যাগপূত সেবাধর্ম্মে তাঁহার নিয়ম-সংযমের প্রথম অভিব্যক্তি ; দ্বিতীয় অভিব্যক্তি এই 'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি' প্রতিষ্ঠায়। কেশব-ভক্ত এবং কেশব-সহযোগী প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, এই সংস্থাটি মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ একটি ধর্মীয় সংস্থা। সেন-ভবনের এক কক্ষে কেশবের নেতৃত্বে কয়েকজন বন্ধু ও সহযোগী মিলিত হইতেন এবং ব্যক্তিগত মনের ভাব ও চিন্তাগুলি সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন। কেশবচন্দ্র বিভিন্ন উচ্চভাবপূর্ণ গ্রন্থাদি হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন, এবং অন্যেরা তাহা মনোযোগের সহিত শুনিতেন। ড. চামার্স-এর "Enthusiasn" শীর্ষক রচনা এবং থিওডোর পার্কারের "Inspiration" বিষয়ক উপদেশ কেশব-কর্তৃক সাগ্রহে এবং সোৎসাহে পঠিত হইত। এই সভাটি ১৮৫৭ সনে স্থাপিত হয় এবং দুই বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে। সভার অধিবেশনে উক্ত গ্রন্থাদি হইতে পাঠ ব্যতীত কেশবচন্দ্র প্রায়ই উপস্থিতমতে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের প্রাণে সেই সময়েই এক অভূতপূর্ব্ব আবেগ এবং অননুভূতপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার হইত। এ সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্রের কথাগুলিই এখানে উল্লেখ করি :

"At the Goodwill Fraternity which continued its activity for full two years, Keshub often preached extempore in English with great enthusiasm. Nay, all his intelligence, energy, and moral earnestness became ignited with an ascetic glow that burned fiercely in him. Every young man who heard him became similarly excited. He drew men chiefly by his enthusiasm. He spoke loud and long, poured forth a torrent of words and feelings, becoming often hoarse and exhausted at the end of his discourse."*

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে, 'গুড উইল ফ্র্যাটার্নিটি'র অধিবেশনে বক্তৃতা-দানের ফলে ক্রমশঃ কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতাশক্তিরও স্ফুরণ হইতে থাকে। সভার নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের আহ্বান করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘ দুই বৎসর পরে ১৮৫৮ সনের ১৯শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এ সময় তিনি আহূত হইয়া সেন-ভবনের এই ফ্র্যাটানিটির সভায় আগমন করেন। তাঁহাকে আনয়ন ব্যাপারে কেশবচন্দ্র অগ্রণী হইয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র প্রমুখ কেশবচন্দ্রের সহযোগিগণ দেবেন্দ্রনাথ-দর্শনে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও তিনি (প্রতাপচন্দ্র) উক্ত কেশব-জীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন।

ধর্ম্মমত বিবর্ত্তন

'গুড উইল ফ্র্যাটানিটি' স্থাপনের সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত একটি অপূর্ব্ব রূপ পরিগ্রহ করে। কলুটোলা সেন-পরিবার বৈষ্ণব। ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে প্রেম তাঁহাদের মজ্জাগত। পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে কেশবচন্দ্রের মনে এক প্রকার নীতিবোধ এবং ধর্ম্মভাব পুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার মন পরিপূর্ণ সায় পাইল না। কলুটোলায় এক বাংলা শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। ঐ সময়ে কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব ধর্ম্মবোধ দেখিয়া তিনি এই সমাজের কিছু কাগজপত্র তাঁহাকে দিলেন। ইহার মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর বিখ্যাত বক্তৃতা "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ"ও ছিল। কেশবচন্দ্র এই

* কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃ. ৪১-৪।

‡ জীবনবেদ, সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ২৮।

* *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen*, pp. 67-9.

* ঐ, পৃ. ৬৮।

বক্তৃতা পাঠে ব্রাহ্মধর্ম্মমুখী হইলেন।* তিনি প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করণান্তর সঙ্গোপনে ব্রাহ্ম-সমাজের কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরণ করিলেন। ইহা ১৮৫৭ সনের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন প্রবাসে।

ইহার বৎসরখানেকের মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাত হরিমোহন কুলগুরুর নিকট অন্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের দীক্ষার দিন ধার্য্য করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই সময় কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন-কালে কেশবচন্দ্রের বন্ধুতা হয়। তাঁহাকে ধরিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন। মহর্ষি মৌখিক কোন পরামর্শ দেন নাই। কেশবচন্দ্র নিজেই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের দিন প্রত্যুষে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই ব্যাপারে হরিমোহন খুবই অসন্তুষ্ট হন। কেশব ছাড়াই অন্যদের দীক্ষা গ্রহণকার্য্য সমাধা হইল। কেশব-জননী লিখিয়াছেন :

"ভাশুরপো মোহিন, যোগীন, ও কেশবের দীক্ষা হইবে সব ঠিক্, গুরু আসিয়াছেন, মহা ঘটা, লোক খাবে। ওমা, সকালে উঠিয়া দেখি, কেশব নাই, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছেন। কেশব সমস্ত দিন এলেন না। আমি মনে করিলাম বুঝি খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। আমি অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি দুপুরের সময়ে কেশব বাড়ীতে ফিরে এলেন, আমার জামাই যাদবের নিকট আমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া একখানি বই ও কাগজ আমার কোলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম, প্রথমেই,

তুমি কার কে তোমার
তুমি কারে বল রে আপন
মিছে মায়ার নিদ্রাবশে
দেখেছ স্বপন।

এই কবিতাটি পড়িবার পর আমার মন একেবারে জল হইয়া গেল।"†

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মধ্যে একজন দৃঢ়সংকল্প, শক্তিমান, ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের সন্ধান পাইলেন। কেশবচন্দ্রও শতবিধ অসুবিধা এবং নির্যাতন-নিপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একান্ত ভাবে যোগ দিলেন।

নাটক-অভিনয়

সেকসপীয়রের প্রতি সে সময়কার শিক্ষিত জনের অনুরাগ, এবং কেশবচন্দ্রের সেকসপীয়র-প্রীতির কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার এই প্রীতি সেকসপীয়রের কোন কোন নাটকের অভিনয় দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে অনুক্রামিত করিতে তিনি যত্নপর হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৮ সন নাগাদ হ্যামলেটের অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই অভিনয়ে হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'লিয়ারটেজ' এবং নরেন্দ্রনাথ সেন 'ওফেলিয়া'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া একটি রীতিমত রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হয়। তাঁহাদের এই কার্য্যে সেন-পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।*

সেন-পরিবারের যুবকগণ মুরলীধর সেন ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে আর একটি অভিনয়ের আয়োজন করেন ১৮৫৯ সনের প্রথম দিকে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টার অনুকূলে উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবা-বিবাহ নাটক' লেখেন। সেন-পরিবারের যুবকগণ ইহার অভিনয় করিতে উদ্যোগী হন। রঙ্গমঞ্চের নাম দেওয়া হয় 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার।' বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটীর বিখ্যাত রামগোপাল মল্লিকের ভবনে—যেখানে পূর্ব্বে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালার দৃশ্যপটগুলি মিঃ হলবাইন আঁকিয়া দেন। এই রঙ্গমঞ্চে বিধবা-বিবাহ নাটকখানি দুই বার—২৩শে এপ্রিল ও ৭ই মে (১৮৫৯) সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিনয় দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। 'সংবাদ প্রভাকর' (১৪ মে ১৮৫৯) এই অভিনয়ের একটি বিবরণ প্রকাশিত করেন। ইহাতে পাই :

"...সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সহযোগে পূর্ব্বতন মেট্রোপলিটান কলেজ বাটীতে এক সুরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত করিয়া কয়েক বার যেরূপ শ্রবণ-মনোহর ও গোচর-সুখকর অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গলাভাষায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সুদক্ষ কুশীলব মহাশয়েরা অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কুশীলবের অভিনয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। আর ঘটনাস্থলের প্রতিকৃতির অধিকাংশই এরূপ চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে তাহা দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রঙ্গস্থলের কাল্পনিক কার্য্য বোধহয় না। অধিক কি কহিব,...দর্শকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রশংসা করিয়াছেন...।"

'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্র রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন। অভিনয় দ্বারা সমাজ-কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।‡

---

* রাজনারায়ণ বসু লেখেন : "কেশবচন্দ্র আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন।"—রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৭৮।

† কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃঃ ৬৯।

* প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরেজী কেশব-জীবনীতে (পৃ. ৬১) এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

‡ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং, পৃ. ৫১-২।

রাখী-পূর্ণিমা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

একজন অবিবাহিত রিসার্চ স্কলারের কাছে যে মেয়েলি হাতের ঠিকানা লেখা রঙিন ফিতায় বাঁধা ছোট একটি পার্শেল আসতে পারে একথা দিল্লী ইউনিভার্সিটি হোষ্টেলের ছাত্রদের কল্পনায়ই আসে নি। তাই সেটার বিষয়ে তাদের অসাধারণ কৌতূহল। কয়েকটি বন্ধু আমার ঘরে এসে দেখতে চাইল পার্শেলটার ভেতরে কি আছে। সেটা খুললে তার থেকে বেরুল রুপালি ঝালর-দেওয়া, দু'দিকে সুতো বাঁধা প্রাচীন কালের সৈন্যদের বাহুতে বাঁধবার রক্ষাকবচের মত একটা জিনিস, তবে খুব হাল্কা। তার সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠি। বন্ধুদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্ত বললাম, সেটা রাখী। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে উত্তর ও মধ্যভারতের বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখী বেঁধে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে থাকে। ভাই দূরে থাকলে রাখীটা তাকে পাঠিয়ে দেয়।

সেটা আমার বোন পাঠিয়েছে কি না, তারা জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললাম, আমার বোন নেই।

তবে সে কে?

সে আমার পাতানো বোন।

পাতানো বোন? সে আবার কেমন?

যথাসম্ভব বুঝিয়ে বলা হ'ল।

বন্ধুরা চলে গেলে ছোট চিঠিখানা খুলে পড়লাম। বহু কথা মনে পড়ল,—পাঁচ বৎসর আগেকার।

তখন আমি ইন্দোরে পড়ি। রমেশ আমার কলেজের সহপাঠী এবং হোষ্টেলের গৃহসঙ্গী ছিল। দু'জনার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। একবার তাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার পর থেকে সে প্রায়ই বলত, আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে যাবে। কিন্তু বড় ছুটিতে আমি নিজ বাড়ীতে চলে যাই, তার সঙ্গে যাওয়া হয়ে উঠে না। সেবার একদিন প্রাতে সে একখানা চিঠি নিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললে, "এবার আমি বাড়ী চললাম, রাজেশকুমার! তোমারও আমার সঙ্গে আসতে হবে।" চিঠিখানা তার বোন লিখেছে। রমেশ পড়ে শোনালে, "দাদা, অনেকদিন তোমাকে নিজ হাতে রাখী বাঁধতে পারি নি, এবার বাড়ী আসতেই হবে, অবশ্য, অবশ্য।"

রমেশ ও গৌরীরাণী বাপমায়ের দুটি মাত্র সন্তান। ভাই বি-এ পড়ে, বোনটি ম্যাট্রিক পাস করে বাড়ী থেকেই আই-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। বাপ গরীব, মিডিল স্কুলের মাষ্টার, ছেলের পড়ার সাহায্য করাই তাঁর পক্ষে কঠিন। রমেশ কতকটা পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থে, কতক নিজে প্রাইভেট টিউশন করে, পড়ার খরচ চালায়।

রমেশ বললে, "তোমাকে নিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন সপ্তাহখানেক থেকে আসব। আর কয়েকদিন আগে থেকেই যাব।" আমি সম্মত হলাম।

কলেজ কামাই করে শ'খানেক মাইল রেল-ভ্রমণের ব্যবস্থা হ'ল। বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করে, নর্ম্মদা নদী পেরিয়ে, একটা জংশনে ঘণ্টা আটেক বসে আর একটা গাড়ী ধরে ইন্দোর ছাড়বার প্রায় আঠারো ঘণ্টা পরে রমেশদের বাড়ী পৌঁছতে হবে। রমেশ সকাল থেকে বোনের জন্যে রাখীবন্ধনের উপহার কিনতে লাগল।

গাড়ীতে যখন উঠলাম তখন দেখা গেল তার চোখ লাল, গায়ে জ্বর। সে বললে, ওটা কিছু নয়, বাড়ী গেলেই সেরে যাবে। জংশনে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম তার জ্বরটা বেড়ে গেছে, সে একটু দুর্ব্বলও হয়ে পড়েছে। থার্ড ক্লাসের টিকিটখানা সেকেণ্ড ক্লাসে পরিবর্ত্তিত করে ওয়েটিং রুমে তাকে শুইয়ে দিলাম। কিন্তু সে যে-পর্য্যন্ত নিজের পকেট থেকে টিকিটের অতিরিক্ত পয়সাটা না দিয়েছে সে-পর্য্যন্ত তার মনে শান্তি নেই। রমেশ গরীব বলে টাকাপয়সা বিষয়ে তার অতিরিক্ত সতর্কতা।

মধ্যরাতে গাড়ী এল। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যখন উঠতে যাব তখন দেখি তা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলিতেও কেউ দরজা খুললে না। এদিকে শ্রাবণের আকাশ থেকে ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। গার্ডকে ডাকলাম, কিন্তু তাঁর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হ'ল না। গার্ড বলে গেলেন ও-কামরায় বার্থ খালি আছে। গাড়ীর থামবার সময় ফুরিয়ে এল। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর একজন লোক ভেতর থেকে বললেন, দরজা সকাল ছ'টায় খোলা হবে। রমেশকে নিয়ে কোনরকমে পাশের ইণ্টার ক্লাসের কামরায় ঢুকলাম। জ্বরের ঘোরে রমেশ প্রলাপ বকতে লাগল, "আমি চিনি ওসব নবাবের বেটাদের! বোম্বাই শহরে থেকে থেকে মনে করে দুনিয়ার আইন-কানুন শুধু তাদের আরামের জন্য, অন্যের কোন অধিকার নেই।" সে উত্তেজিত ভাবে বললে, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে জায়গা থাকতে সে ইণ্টার ক্লাসে বসবে না, চেন টেনে গাড়ী থামাবে। অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করা গেল। তার জ্বর জেনে একজন ভদ্রলোক নিজের বিছানাটা গুটিয়ে তার জন্যে জায়গা করে দিলেন। আমি রমেশকে আস্তে আস্তে বললাম, "বোম্বাইয়ের সবলোকই একরকম নয়।" রমেশ শুয়ে পড়ল, কিন্তু কাশির জন্য ঘুমুতে পারল না। এ কাশিটা নতুন উপসর্গ।

গন্তব্য ষ্টেশনে যখন নামলাম, তখন দূরের আকাশে সোনালি আভা দেখা দিয়েছে। প্রভাতের মিঠে বাতাসে রমেশও কতকটা সুখ বোধ করতে লাগল। টাঙ্গায় চড়ে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে

রমেশদের বাড়ীর দিকে চললাম। স্থানটিকে শহর না বলে বড় গ্রাম বলতে হয়।

একটি সুন্দর খাপরার ছাউনির ছোট বাড়ীর সামনে টাঙ্গা থামল। সুমুখে বাগান, ফুলে ভরা। বাগানের ফটক খুলে ঢুকতে যাব এমন সময় ভেতর থেকে রমেশের বৃদ্ধ পিতা বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ের চামড়া কোল হয়ে এসেছে, কিন্তু আগুনের মত রং, আর সরল উন্নত দেহ। আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই পেছন থেকে এল রমেশের বোন গৌরীরাণী। মেয়ে বাপের রং ও চেহারা পেয়েছে। গৌরী বাস্তবিকই গৌরী। অতি ফর্সা রং, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, সারা দেহটি প্রথম তারুণ্যের প্রভায় উজ্জ্বল। কালো চুলের দুটি বেণী দু'দিকে ঝুলে পড়েছে, মুখে নির্ম্মল হাসি। শুধু 'গৌরী' নামটিই যে তার সার্থক তা নয়, যে-কোন 'রাণী' তার রূপ ও সুন্দর চোখ দুটি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত।

তখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন রমেশের মা। মনে হ'ল তিনি অসুস্থ, দেহ কতকটা ভেঙে পড়েছে।

বৃদ্ধা বললেন, "গৌরী ভোর চারটা থেকে উঠে বসে আছে।" গৌরী বললে, "কাল কখন গাড়ীতে উঠেছিলে, দাদা?" মায়ের চোখে রমেশের অসুখ ধরা পড়ল। তিনি বললেন, "বাবা, তোমার শরীরটা ত ভাল দেখা যাচ্ছে না। কি হয়েছে?"

রমেশ বললে, "কিছু না, শুধু পথের ক্লান্তি, বিশ্রামে সেরে যাবে।" কিন্তু মায়ের মনে প্রত্যয় হ'ল না। তিনি তার কপালে হাত দিয়ে বললেন, "তোর ত জ্বর রমেশ!" আমি তার অসুখের বিষয় খুলে বললাম। রমেশকে ঘরে নিয়ে মেঝের বিছানা পেতে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

আমি তার পিতার সঙ্গে ডাক্তার ডাকতে চললাম। যাবার পূর্ব্বে গৌরী আমাদের চা খাইয়ে দিলে। পথ চলতে চলতে বৃদ্ধ বললেন গৌরীই এই সংসারটা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ভোর পাঁচটাতে উঠে, বাসন মাজা ঘর নিকানো থেকে আরম্ভ করে চা, জল-খাবার তৈরি, রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া সবই সে করে। আবার সব কাজের মাঝে নিজের পরীক্ষার পড়া পড়ে। স্কুলে ও খুব ভাল ছাত্রী ছিল। শুধু পড়ায় নয়, গানে, নাচে, খেলায়, সবটাতেই সবার প্রথম।

বৃদ্ধ দুঃখ করে বললেন, দারিদ্র্যের জন্য এ পর্য্যন্ত মেয়েটিকে সৎপাত্রস্থা করতে পারেন নি। তবে আশায় আছেন, রমেশ বি-এ পাস করলে একসঙ্গে দু'জনারই বিয়ে দেবেন।

ডাক্তার এসে রোগী দেখলেন। বললেন, "নিমোনিয়া সন্দেহ হচ্ছে, তবে এখনও ঠিক বলা যায় না।" ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখলাম, ডাক্তারের জ্ঞান যত, তাঁর ডিসপেন্সারীতে ঔষধের ব্যবস্থা সে অনুযায়ী নেই। ডাক্তারখানা থেকে ফিরতে ফিরতে মনে হ'ল, যদি রমেশের নিমোনিয়া হয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী হবে সেই সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা, যারা ভেতরে বাঙ্ক খালি থাকা সত্ত্বেও দরজা খুলে দেয় নি।

বাড়ীতে বসে বসে লক্ষ্য করলাম, গৌরীরাণী পরম উল্লাসে গৃহের নানা কাজ করে যাচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছিল সে যেন হাঁটছে না, মাটিতে ঈষৎ পা ফেলে হাওয়ার উপর দিয়ে চলছে। মুখে হাসি লেগেই আছে। ভাইকে পেয়ে সে বাস্তবিকই খুশী হয়েছে। কিন্তু আমার সামনে এলে তার চোখ নীচু হয়ে যায়, সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে। সেটা যে শুধু আমি অপরিচিত বলে, তা মনে হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কারণ বুঝতে পারলাম। রমেশ একমাত্রা ঔষধ খেয়েই ভেবেছে অসুখ সেরে গেছে। প্রফুল্ল মুখে মায়ের সঙ্গে বহু কথা পেড়েছে। আমি শুনলাম, মায়ের কাছে উচ্ছ্বসিত ভাবে আমার কথা বলছে। মা বললেন, "তোমার বন্ধু বড়লোকের ছেলে, নইলে তার সঙ্গে আমাদের গৌরীর বিয়ের আলাপ করতাম।" রমেশ বাধা দিয়ে বললে, "ওসব কথা তুলো না মা। সে কি মনে করবে?" মা বললেন, "কেন, সে যদি গৌরীকে পছন্দ করে?" "ওসব কথা থাক্ মা," বলে রমেশ কথাটা চাপা দিলে।

ঘরে রমেশকে একা পেয়ে বললাম, "মায়ের সঙ্গে কি সব আলাপ হচ্ছিল, রমেশ?"

সে একটু বিব্রত ভাবে বললে, "কিছু মনে করো না, রাজেশ-কুমার। মা বুড়ো মানুষ, আমাদের স্বল্লাভের ছেলে দেখলেই মেয়ের বিয়ের কথা ভাবেন।" একটু মুচকি হেসে বললে, "তোমার ত মিস গুপ্তাই রয়েছে।" মিস গুপ্তা আমাদের সহপাঠিনী, তার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা চলে, রমেশের কাছে আমি তার প্রশংসা করেছি। কিন্তু এখন বললাম, "ও সব বাজে বকো না, রমেশ?" সে আমার স্বরের কটুতায় অবাক হ'ল। মায়ের সঙ্গে দাদার এসব আলোচনা গৌরী অবশ্য শুনেছে। এখন বুঝতে পারলাম কেন আমার সামনে জলখাবার রাখবার সময় তার সুকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি কপোলের উপর বিন্যস্ত হয়েছিল, চোখের পাতা নুয়ে পড়েছিল, উজ্জ্বল দৃষ্টিটি ঢেকে দিয়েছিল।

একা বসে বসে ভাবতে লাগলাম, রমেশের মায়ের কথাটি—"সে যদি গৌরীকে পছন্দ করে?" রমেশ ভেবেছে তা অসম্ভব, কারণ আমার ত মিস গুপ্তাই রয়েছে। "মিস গুপ্তা আমার কে, আমি বা মিস গুপ্তার কে?" গৌরীকে পছন্দ! হাঁ, জগতে যদি কোন দিন কোন মেয়েকে পছন্দ করি তবে সে গৌরী। ভাবলাম, যদি আমি ভীষ্মের চিরকৌমার্য্যের ব্রতও ধারণ করতাম, আর আমাকে বলা হ'ত, গৌরারাণী তোমার হাতে মঙ্গলসূত্র পরতে প্রস্তুত, তুমি তা পরাতে প্রস্তুত আছ?—তবে আমি সে ব্রত ভঙ্গ করে প্রস্তুত হতাম!

বিকালের দিকে ডাক্তার এসে রমেশকে দেখে বললেন, নিমোনিয়া সন্দেহ নেই। ডাক্তার আমার কাছে দুঃখ করলেন, চিকিৎসার আধুনিক ঔষধ তাঁর কাছে নেই, তা শুধু বড় শহরে

পাওয়া যেতে পারে। আমি ইন্দোর গিয়ে সে ঔষধ আনব বললাম। সেদিন সন্ধ্যায়ই রওনা হব স্থির হ'ল।

বৃদ্ধ এদিক-ওদিক ঘুরে এসে আমায় বললেন, "একটি দিন দেরি করে যাও বাবা! জানলাম ঔষধের দাম বেশী, আমি কাল পর্য্যন্ত টাকা যোগাড় করে দেব।" আমি বললাম, "টাকা চাই নে, আমি সব ব্যবস্থা করব।" বৃদ্ধের মুখের শুষ্ক ভাব দেখে বললাম, "আমি রমেশের বন্ধু, তার জন্তে কিছু করা আমার কর্ত্তব্য নয় কি?

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৌরী আমার জন্ত রাত্রির আহার তৈরি করে রেখেছিল। সে তা পরিবেশন করতে করতে দাদার অসুখের কথা আলোচনা করতে লাগল। সে অসুখের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম। "বললাম ইন্দোরে যে প্রসিদ্ধ বাঙালী ডাক্তার আছেন আমি তাঁর পরামর্শ নেব এবং দরকার হলে তাঁকে এখানেও আনবার ব্যবস্থা করব। গৌরী আশ্বস্ত হ'ল। আমি যখন ষ্টেশনে যাবার টাঙ্গায় উঠতে যাব তখন গৌরী একটা ছোট থলে এনে বললে, এর মধ্যে সকালের জলখাবার রয়েছে, আমি যেন খাই। আমাকে দিয়ে ব্যাগটা খুলিয়ে থলেটা তার ভিতর রাখল। আমি তাকে কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, "রমেশের প্রতি দৃষ্টি রেখ, তাকে বেশী নড়াচড়া করতে দিও না।"

পথে যেতে যেতে ভাবলাম, কি আশ্চর্য্য মেয়েদের মন! ভাইয়ের জন্ত এত উৎকণ্ঠা, অথচ অতিথির খাবার-দাবার ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই।

গাড়ীতে বসে শুধু গৌরীর কথাই মনে হতে লাগল। এই একটি মেয়ে সমস্ত পরিবারটির প্রাণস্বরূপ। তার কি অক্লান্ত পরিশ্রম, কি উৎসাহ, সর্ব্ববিষয়ে কি তৎপরতা! অথচ কচি বয়স, আঠারোর বেশী নয়। এক একবার ভেসে উঠতে লাগল তার কোমল মুখ, নির্ম্মল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শুচিসুন্দর দেহের কান্তি।

বসে বসে বাইরের দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইলাম। বহুদূর পর্য্যন্ত দু'দিকে বন, সবুজ পাতার উপর শুভ্র জ্যোৎস্না ঝলসে উঠছে। জানি না মনের ভিতর কি অপূর্ব্ব যাদু আছে যার প্রভাবে ঐ জ্যোৎস্নাস্নাত সবুজ বনানীর সঙ্গে গৌরীরাণীর দেহের রূপচ্ছটা মিলে আসতে লাগল! যেদিকে তাকাই সেদিকেই যেন দেখি পেছনে ফেলে-আসা ক্ষুদ্র গৃহকোণের কর্ম্মক্লান্ত তরুণ মুখখানির অপূর্ব্ব সুষমা সর্ব্বত্র রূপায়িত হয়ে উঠছে!

প্রভাতে যখন গৌরীরাণীর দেওয়া থলেটি খুললাম, তখন অবাক হয়ে দেখলাম, খাবার জিনিষগুলোর নীচে, একটা ছোট মেয়েলি রুমালে কি বাঁধা। খুলে দেখলাম, সোনার হার। মনে হ'ল গৌরীর গলায় তা দেখেছি। আসবার সময় সেটা যে গলায় ছিল না, তা লক্ষ্য করি নি। সঙ্গে একটি ছোট চিঠি।

"দাদার ওষুধ নাকি খুব দামী। এ সঙ্গে আমার হারটা দিলাম। আমার একান্ত অনুরোধ, এটা বিক্রি করে ওষুধ কিনবেন। অবশ্য, অবশ্য। গৌরীরাণী।"

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত আমি নির্ব্বাক হয়ে চিঠিখানা হাতে নিয়ে বসে রইলাম। তার পর মনে হ'ল শেষ কথা দুটো কোথায় শুনেছি। হাঁা রমেশের কাছে যে চিঠি দিয়েছিল তারও শেষটা ছিল, "অবশ্য, অবশ্য।"

জানি না সহযাত্রীরা আমার চোখের আকস্মিক সজল ভাব লক্ষ্য করেছিল কি না।

ইন্দোরে মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না করে আমি ঔষধ সংগ্রহের কাজে লেগে গেলাম। প্রসিদ্ধ বাঙালী ডাক্তারের অন্তরের যে পরিচয় পেলাম, তা লোকের মুখের বর্ণনার চাইতেও বেশী। তিনি নিজে ঔষধের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন, দরকার হলে যেন তাঁকে টেলিফোনে 'ট্রাঙ্ককল' দি', তিনি ট্রেনে আসবেন।

ফিরে বাড়ীর কাছে আসতে দেখলাম ফটকে দাঁড়িয়ে গৌরীরাণী আমার টাঙ্গাটা লক্ষ্য করছে। থামতেই বললে, "ঔষধ পেয়েছেন?" মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। আমি নামতেই আমার হাত থেকে ঔষধের বাণ্ডিলটা নিলে। তার পর সলজ্জভাবে বললে, "আমার উপর তো রাগ করেন নি?"

"তুমি তোমার হার দিয়েছিলে বলে?"

সে তার ঠোঁটের উপর হাতের আঙুল রেখে আমাকে জানালে, কথা যেন না বলি। পেছনে তার বাবা আসছিলেন।

ডাক্তার ডেকে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা হ'ল। ডাক্তার বললেন ফুসফুসের দুটো দিকই ধরে গেছে। রোগীর বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

রাত্রিতে রোগীর শুশ্রূষার জন্ত ডাক্তার একজন কম্পাউণ্ডার পাঠালেন, পাড়ার লোকও এল। আমি বরফ এনেছিলাম, তা আইসব্যাগে ভরে মাথার উপর রাখা হ'ল। মধ্যরাত্রে অন্তদের বিশ্রাম দিয়ে আমি গিয়ে বসলাম। রমেশ অসাড়ের মত পড়ে ছিল, চাপা কাসি, কঠিন নিঃশ্বাস। অবস্থাটা ভাল মনে হ'ল না।

প্রথম রাত্রে গৌরী একবার দেখে গিয়েছিল, বলেছিল খানিক ঘুমিয়ে আবার আসবে। মধ্যরাত্রের পরে এল, আলুথালু চুল—মনে হ'ল হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এসেছে। বললে, আপনি গিয়ে ঘুমুন আমি বসছি। বললাম, "তুমি বড় ক্লান্ত গৌরী, ঘুমোও গে।"

"আপনি ত সারাদিন ধরে ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন।" বলে সে একটা হাতপাখা নিয়ে ভাইয়ের বিছানার পাশে বসল এবং তার মাথায় পাখা করতে লাগল। আমি আইসব্যাগ সরিয়ে বসলাম। দেখে খুশী হলাম গৌরী আমাকে আপনজন বলেই মনে করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মাথা ঢুলতে লাগল, হাত থেকে পাখাটা খসে গেল। ধীরে ধীরে, নিজের অজ্ঞাতে, সে ভাইয়ের বালিশে মাথা রেখে পাশে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে ঘুমে অচেতন হয়ে গেল। তার একটা হাত অজ্ঞাতে এসে আমার গায়ে ঠেকল, কয়েকটা চুলের গুচ্ছ আমার উপর ছড়িয়ে রইল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হয়ে সম্মুখে শায়িত কোটিমেশরো...

দিকে চেয়ে রইলাম। দু'জনার মুখের একই আদল, কিন্তু একটি মুখ ম্লান, মৃত্যুর ছায়ায় পাণ্ডুর; রুক্ষ; অপরটি উজ্জ্বল, রক্তিম, ফুলের মত কোমল। একদিকে পুরুষের দেহ, রোগের প্রকোপে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে, অপরদিকে সুকুমার নারী-দেহ সুষুপ্তির ক্রোড়ে তরুণ জীবনের অপূর্ব্ব গরিমায় লীলায়িত, রেখায়িত হয়ে পড়েছে। তার কেশগুচ্ছের ক্ষীণ স্পর্শ, তার শুভ্র হাতটির মৃদু চাপ আমার স্পর্শেন্দ্রিয় অতিক্রম করে যেন মনের কোন অতল গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

হঠাৎ আমার মনে একটা খেয়াল চাপল। ধীরে ধীরে উঠে আমার ঘরে এলাম, গৌরীর হারটা বের করলাম। ভাবলাম সেটা আস্তে আস্তে ঘুমন্ত অবস্থায় তার গলায় পরিয়ে দেবো। পরদিন সকালে যখন সে সেটা তার গলায় দেখবে তখন ভারি মজা হবে। কিন্তু রোগীর ঘরে এসে মনে খটকা বাধল। ভাবলাম হার পরিয়ে দেবার সময় যদি গৌরীর মা কিংবা বাবা, অথবা আমার ঘরে যে ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারটি ঘুমিয়ে আছে সে সেখানে আসে আর তা দেখতে পায়, আর ভাবে, আমি হার পরাচ্ছি না, গলা থেকে হার খুলে নিচ্ছি—তবে? অথবা, যদি গৌরী হার পরাবার সঙ্গে জেগে যায়, তখন—আমি যে হার পরাচ্ছি তা তো আর জানবে না—সে কি মনে করবে? অনেক অসাধারণ কাজই পূর্ব্বাপর বিবেচনায় বাধা পায়, আমারও তাই হ'ল। যদি ওসব বিবেচনা না করে হার পরিয়ে দিতাম, আর যেমন ভেবেছিলাম, গৌরীকে বলতাম সেটা আমার 'আশীর্ব্বাদ', তবে হয়ত ভবিষ্যৎ অন্য রূপে গড়ে উঠত।...

যাহোক আমি আবার বেরিয়ে এলাম। আমার আসা-যাওয়ার শব্দে রমেশের পিতার ঘুম ভেঙেছিল, অথবা হয়ত উনি জেগেই ছিলেন; বললেন, কি বিষয়?—আমি বললাম, গৌরী রোগীকে পাখা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।—তখন গৌরীর মা বেরিয়ে এসে রমেশের ঘরে গেলেন এবং পাখাটা তুলে নিজ হাতে রমেশের মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। মেয়েকে ধাক্কা দিলেন, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। তখন তিনি ঘুমন্ত কন্যার মাথাটা রোগীর বালিশ থেকে সরিয়ে নিজ কোলের উপর রাখলেন। আমি নীরবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, জগতের বড় বড় চিত্রকররা শিশুকোলে তরুণী মাতার চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু কেউ তরুণী কন্যা কোলে বৃদ্ধা মায়ের ছবি এঁকেছেন কি? আমি চিত্রকর হলে আঁকতাম।

গৌরী জেগে উঠে বসল, অবস্থাটা বুঝে লজ্জা পেল। আর মায়ের মুখের পানে অবাক হয়ে চাইল। তার পর মা-মেয়েকে তাদের ঘরে পাঠিয়ে আমি রোগীর কাছে গেলাম। তার অবস্থাটা বড়ই খারাপ বোধ হচ্ছিল।

প্রভাতে উঠে ইন্দোরের ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেলাম। ঘণ্টাচারেক সময় লাগল। এসে দেখি বন্ধুর জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। কিছুক্ষণের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

গৌরী শুধু কেঁদে আকুল হ'ল তাই নয়। সে ভাইয়ের মৃত্যুটা স্বীকারই করবে না। শব নেবার সময় সহসা সে সমস্ত ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল। ভাইকে আঁকড়ে ধরে রইল, নিতে দেবে না। গৌরী তার আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে কাকেও মরতে দেখে নি, মৃত্যুর নির্ম্মমতার সঙ্গে তার এই প্রথম পরিচয়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে কে সান্ত্বনা দেবে? গৌরীকে কে বুঝাবে। এ পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল রমেশ অকালে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয়েছে, পরিবারটি অকূলে ভেসেছে। আত্মীয়বান্ধব প্রতি-বেশীরা আসেন, চুপ করে বসে থাকেন। তার পর চলে যান। আমিও তিন দিন পর্য্যন্ত নীরবেই বসে রইলাম। শুধু দেখলাম, গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে গৃহকার্য্যে লেগে গেছে, মুখ বুজে চোখের জল মুছে নিজ কর্ত্তব্য করে যাচ্ছে।

আমি মনে মনে স্থির করলাম নিজ স্থানে গিয়ে আমার এক জন আত্মীয়কে দিয়ে রমেশের পিতার নিকট চিঠি লেখাব—বিয়ের আলাপ করে। বলব, আমি তার পুত্রের স্থান পূরণ করব। সঙ্কল্প করলাম, তাঁদের দুশ্চিন্তার অবসান করাব, যদিও শোকের অবসান হবে না।

চতুর্থ দিনে কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ লোক এলেন। তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি বললেন, "ভাই, শোক করে কি হবে, সবই ভগবানের ইচ্ছা। এবার ধৈর্য্য ধর।"

রমেশের পিতা আর্ত্ত কণ্ঠে বললেন, "কি করে ধৈর্য্য ধরি, দাদা! সর্ব্বস্ব পণ করে রমেশকে মানুষ করছিলাম, ভগবান তাকে নিয়ে গেলেন। তার বিহনে আজ আমরা নিরাশ্রয়, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

অপর ভদ্রলোকটি বললেন, "এবার নিজের কর্ত্তব্য কর, তোমার মেয়ের বিয়ে দাও।"

"মেয়ের বিয়ে? আমার মত নিঃস্ব লোকের মেয়ে কে নেবে দাদা?"

"তোমার মেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা। তার বিয়ে হওয়া কঠিন হবে না। বিয়ে হয়ে গেলে তোমরা দু'জনে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেবে।"

গৌরী হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে থমকে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে এগিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠের সামনে পেয়ালাটি রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পিতার দিকে চেয়ে বললে, "বাবা, আপনি ওভাবে মন খারাপ করবেন না। ভাবুন আমি আপনার মেয়ে নই, ছেলে। আমি আপনাদের নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলে নিজে আশ্রয় নিতে রাজী হব না।" তার পর স্বর একটু চড়িয়ে বললে, "আজ সর্ব্ব সমক্ষে শপথ করছি, আমি বিয়ে করব না, আমার নিজের সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে উপার্জ্জন করব, মা বাবার ভার নেব, তাঁদের আজীবন ভরণপোষণ করব।"

সকলে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। গৌরীরাণীর সুন্দর কোমল চোখ দুটি থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটি বললেন, "সাবাস মা। কিন্তু তুমি মেয়ে-ছেলে হয়ে পুরুষের মাথার বোঝা কেমন করে নেবে, মা?"

গৌরী ধীরে ধীরে বললে, "আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি, এবার আই-এ পরীক্ষা দেব, পাস করে স্কুলে চাকরি করব। তাতে আমি অনায়াসে এ পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারব। তা ছাড়া, আমি আরও পড়ব, বি-এ, এম-এ পাস করব—আমার দাদা যা করত আমিও তাই করব।"

সবাই চুপ। গৌরী ধীরে ধীরে চলে গেল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেদিন গৌরীর বৃদ্ধ মামা এসে পরিবারের দেখাশোনা করতে লাগলেন। আমি এবার যেতে চাইলাম। গৌরী বললে, আজ না, কালকের দিন থেকে যান।"

জানলাম, পরদিন রাখী-পূর্ণিমা। গৌরী ভোরে উঠে, ঘর নিকিয়ে, স্নান করে, ভাইটির ঘরের মেঝের একটা পিঁড়ি পেতে সামনে বড় থালাতে ফুল, চাল, গমের অঙ্কুর, চন্দন, এ সব সাজাল। তার পর নিজ ঘরে গিয়ে ভাল একটি শাড়ী পরল, কানে দুল লাগাল আর হাতে সোনার চুড়ি। তার পর ধীরপদে আমার ঘরে এসে বললে, "আজ রাখী-পূর্ণিমা। দাদাকে রাখী পরাব বলে ডেকে এনেছিলাম। আজ দাদা নেই। আপনি তার বন্ধু। আপনিই দাদার হয়ে আমার রাখী নিন্।"

আমি স্নান করে ধুতি জামা পরে তার ঘরে গেলাম। সে আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, তার উপর চাল বাধিয়ে দিলে। কানে গমের অঙ্কুর ছোঁয়ালে। আর আমার ডান হাতে একটি সুন্দর রুপালি রাখী বেঁধে দিলে।...এখনও আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠে তার সে স্নেহশীতল স্পর্শ, তার সরল সুন্দর চোখ দুটি, তার শুভ্র কপোলের উপর অশ্রুবিন্দু, আর তার তপস্যাশুচি কোমল ঠোঁট দুটির অপূর্ব্ব দৃঢ়তা।

পেছন থেকে তার মা আমার হাতে রমেশের-আনা উপহারগুলি তুলে দিলেন। আমি একে একে সেগুলি তাকে দিয়ে মনে মনে শুভেচ্ছা জানালাম। অবশেষে আমার পকেট থেকে তার সোনার হারটি বের করলাম। সেটার সঙ্গে ইন্দোর থেকে দামী পাথর বসানো একটি পেণ্ডেণ্ট কিনে লাগিয়েছিলাম। হারটি তুলে তার গলায় পরিয়ে দিলাম।

গৌরী আমার সামনে মিঠির থালা রেখে শান্ত ভাবে বললে, "আপনি যখন যেখানে থাকেন, শ্রাবণের প্রথমে আমার কাছে ঠিকানা পাঠাবেন। আমি প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় আপনাকে রাখী পাঠাব। আজ থেকে আমি আপনার ধর্ম্মের বোন।"...

সেই শ্রাবণ-পূর্ণিমার রাতে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার মধ্যে মাইলের পর মাইল ট্রেনে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। সারাটি রাত সে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে কেটেছিল। পরের বৎসর ছুটিতে গৌরীদের দেখতে গিয়েছিলাম। গৌরী আই-এ পাশ করে মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারি করছিল। এখন আর হাওয়ার ওপর দিয়ে চলে না, তবে মনে অদম্য উৎসাহ। উনিশ অতিক্রম করে দেহের তারুণ্য আরও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

একজন প্রতিবেশী গৌরীর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুল-লেন। গৌরী আমাকে একান্তে বললে, "শুনেছি ইজিপ্টের রাজ-বংশে ভাই-বোনে বিয়ে হ'ত। ভারতবর্ষে সেটা হয় না।"...

গৌরীরাণীর চিঠিখানা বার বার পড়লাম। সে এবার প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বি এ পাস করেছে। তা এক বৎসর পূর্ব্বেই হবে, তবে মায়ের অসুখের জন্যে পরীক্ষা দিতে পারে নি। এখন ঘরেই এম-এ পড়া আরম্ভ করেছে। আগামী বৎসরে যদি মায়ের শরীর ভাল থাকে তবে বি-টি পড়তে বড় শহরে যাবে।

দিল্লী ইউনিভারসিটির ছাত্রাবাসে প্রেসিডেণ্টের ইলেক্‌শন চলেছে, এক এক বার তরুণকণ্ঠের কলধ্বনিতে সারা বাড়ীখানা মুখরিত হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে আমি গৌরীরাণীর চিঠিখানার সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখলাম, তার জন্য ছোট একটি উপহার পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল, গৌরীরাণী,—জ্যোৎস্নারাতের অপরূপ রূপস্বপ্নের মত। তার পর, তাকে সরিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল, দীপ্ত-মুখ, উন্নত-শির গৌরীরাণী, চোখে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কণ্ঠে অটল শপথ-বাণী। ভেসে উঠল, গৌরীরাণী, আমার ধর্ম্মের বোন।

চিঠিখানার শেষে লিখলাম, "গৌরীরাণী, যদি এতকাল আমি তোমাকে ভাইয়ের মত স্নেহ না করে থেকে থাকি, তবে আমায় ক্ষমা কর, বোন্। আর ঈশ্বরের কাছে বল আমি যেন তোমার উপযুক্ত ভাই হতে পারি।"

সসম্ভ্রমে তার রাখীটি হাতে বাঁধলাম।

যোগব্যায়াম ও স্বাস্থ্যরক্ষা

শ্রীনীরদ সরকার

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যেরূপ স্বাস্থ্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় তাতে আমাদের জলবায়ুর অনুকূল এমন সমস্ত ব্যায়ামের প্রচলন হওয়া উচিত যার দৌলতে ছোট বড় প্রত্যেকেই নানা কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অল্প সময় ব্যয়ে উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। স্বাস্থ্যোন্নয়নকল্পে আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বিজ্ঞানসম্মত ভঙ্গী বা আসন কিংবা যোগব্যায়াম নামে অভিহিত, তা অনায়াসে সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়া কত সহজ ও হিতকারী—এত সহজ ও সকলের কল্যাণকর আর কোনপ্রকার ব্যায়াম নাই বললেই চলে। এই সমস্ত ভঙ্গী যে-কেউ সহজে অভ্যাস করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। শুধু দৈহিক নয়, মানসিক উৎকর্ষের জন্তও ইহার উপযোগিতা অপরিসীম। এজন্ত কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই—উঠোন, বিছানা, বারান্দা ও ছাদে সকাল বা সন্ধ্যা যে-কোন সময় সুযোগ বুঝে দু'চারটি ভঙ্গী অভ্যাস করলেই যথেষ্ট। ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে এই ব্যায়াম আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। দেহের স্নায়ুগ্রন্থিকে সক্রিয় ও সবল এবং পরিপাক-শক্তিকে বজায় রাখতে এই আসন যেমন অদ্বিতীয় তেমনি আবার নানাবিধ পুরাতন ও জটিল রোগ দূরীকরণে এবং দেহকে বিভিন্ন রোগের হাত হতে মুক্ত রাখতে ও জরা নিবারণ করতেও এর তুলনা নেই। বয়স, দেহের গঠন, দৈহিক আধিব্যাধি, সহ্যশক্তি ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে প্রত্যেকের নিজ নিজ সহনশীলতা ও সাধ্যানুযায়ী আসন করতে হয়। প্রথম অবস্থায় আসনের ভঙ্গী নির্ভুল ভাবে হয় না। তবে সেজন্ত ভাবনার কিছু নাই, অভ্যাস করতে করতে ভঙ্গী যেমন আয়ত্তে আসে ও নির্ভুল হয়, তেমনি সহজসাধ্যও বোধ হয়। কোন গৃহীরই একবারে একাসনে তিন মিনিটের বেশী থাকা সমীচীন নয়, আর আসন অভ্যাসের সময় এমন ভাবে কোন পোশাকই পরতে নেই যাতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। ল্যাংগোট, জাংগিয়া পরলেও তা ঢিলা করে পরতে হয়, আসন অভ্যাসের সময় নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে হয়। গোড়ার দিকে বেশীক্ষণ ও অতিরিক্ত মাত্রায় আসন করা ঠিক নয়, যার যতটুকু সাধ্য তাকে ততক্ষণ ও ততটুকুই করতে হবে। অভ্যাস করতে করতে সহজ বোধ হলে ও ভঙ্গী আয়ত্তে এলে ধীরে ধীরে সময় বাড়াতে হবে। প্রতিটি আসনের পরেই সুষ্ঠুভাবে রক্ত চলাচলের জন্ত "শবাসন" অবশ্যই করণীয়। দ্রুত আয়ত্তে আনার জন্ত ও আশু ফল লাভের আশায় দেহের বিকৃতি ঘটিয়ে বা দেহকে ক্লেশ দিয়ে কোন ভঙ্গী করতে নেই। মোটামুটি সুস্থ থাকার জন্ত দু'চারটি বা দু'তিনটি আসন করলেই চলে। যাদের দৈহিক সামর্থ্য আছে তারা বেশী ব্যক্তিরা স্থিতি ও গতি উভয় প্রকারেরই অভ্যাস করবে। আসনের ভঙ্গী স্থিতিতে করলে হয় "আসন" আর গতিতে করলে হয় "খালি হাতে ব্যায়াম"। ছোটরা কিন্তু স্থিতিতে না করে গতিতে করবে। তবে ছোটরা স্থিতিতে করলে আধ মিনিট থেকে এক মিনিটের বেশী সময় যেন অভ্যাস না করে।

এখানে আসনের কয়েকটি চিত্র ও বিবরণ দেওয়া হ'ল। এর মধ্য হতে আসনের গুণাগুণ বুঝে ছোট, বড়, কিশোর, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, সুস্থ, অসুস্থ যে-কেহ দু' চারটি বা প্রয়োজনমত বেশী আসন করলে উপকৃত হবে। এই আসনের কল্যাণে রোগীরা নীরোগ হবে, আর যারা সুস্থ তারা আরও সুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে মহা আনন্দে কালাতিপাত করতে পারবে। যারা ভঙ্গী বেশী করতে চায় তারা একবারে পাঁচ-ছ'টির বেশী না করে সময় ও আসন ভাগ করে সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাও করতে পারে। আর যাদের মোটেই সময় নেই তারা দু' তিনটি করলেও বিশেষ ফল পাবে। আসন খালি মেঝের বা মাটিতে না করে পাতলা গদি কিংবা কম্বলের উপর করতে হয়, যাতে পেশী ও হাড়ে তেমন কষ্ট বোধ না হয় কিংবা ব্যথা না লাগে।

এখন আসনগুলো কি ভাবে করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।

শবাসন

চিত্রের ভঙ্গীর মত চিৎ হয়ে শুয়ে সমস্ত শরীর আলগা করে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে শুয়ে থাকাই শবাসন। শবাসনে দেহের পূর্ণ বিশ্রাম ও ক্লান্তি দূর হয় এবং সুষ্ঠুভাবে রক্ত চলাচল হয়।

শবাসন

সর্ব্বাঙ্গাসন

চিৎ হয়ে শুয়ে, পা জোড়া করে সোজা উপরের দিকে তুলে দুই হাতের কনুই ভেঙে হাতের চেটো কোমরের নীচে পিঠে রেখে সাধ্যমত জোর দিয়ে ঠেলে দিয়ে কাঁধ হাত পা পর্য্যন্ত সোজা কর। (কনুই দুটো ছড়িয়ে যেন না থাকে। যতদূর পারবে সমান্তরাল রাখবে। তা হলেই হাতের চেটো পিঠে ঠিক ভাবে রেখে সুষ্ঠুভাবে ঠেলে দিয়ে কাঁধ হাত পা পর্য্যন্ত সোজা করতে অসুবিধা হবে না।) থুতনি যেন কণ্ঠে সংলগ্ন হয়। প্রথম অবস্থায় হয়ত চিত্রের মত সোজা বা শুদ্ধ হবে না। তার জন্ত ভাবনার কিছু নেই, অভ্যাস করতে করতে শুদ্ধ হবে। ভঙ্গীটি প্রথম অবস্থায় শুদ্ধ না হলে সে

ফল হবে না, তা কিন্তু নয়। যে যতটুকু করবে সে ততটুকুই ফল পাবে। পা তুলে হাত পিঠে দিয়ে পিঠ ঠেলে ধরে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে চিত্রের মত হয়ে যতক্ষণ পার থেকে, হাত পিঠ থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে পা নামিয়ে ২০-৩০ সেঃ শবাসন করে পুনরায় ঐরূপ কর। এই ভাবে এক এক বার যতক্ষণ পার থেকে শবাসন করবে। এইরূপ পর পর তিন বার করবে ও প্রতিবার করবার পরই শবাসন করবে। অভ্যাস করতে করতে আসন সহজ বোধ হবে ও শুদ্ধ হবে—তখন প্রত্যহই একটু করে সময় বাড়াবে অর্থাৎ চিত্রের ভঙ্গীর মত একটু একটু বেশী সময় থাকতে চেষ্টা করবে। এই ভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন সহজে অনেকক্ষণ থাকতে পারবে এবং একবারে তিন মিনিটের বেশী থাকতে পারবে ; তখন আর পর পর তিন বার না করে একবারে তিন মিনিট করবে। সকাল, সন্ধ্যা দুই বেলা বা এক বেলা যে-কোন সময়ই এই আসনটি করা যায়। এ আসনটি করার পর মৎস্যাসনটি অবশ্যকরণীয়। সর্ব্বাঙ্গাসন অপ্রয়োজনীয় মেদ কমায়, ক্ষুধা বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। দৈহিক কর্ম্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবী করে। যৌবন গ্রন্থি (থাইরয়েডের অন্তর্মুখী রস স্বাভাবিক ভাবে নিঃসরিত করায় যোগশাস্ত্রমত এই আসন সর্ব্বভীতি দূর করে এবং যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে। এ দ্বারা মেয়েদের জরায়ুঘটিত নানারূপ ব্যাধি হতে দেয় না, বা হলেও এই আসন অভ্যাসে সত্বর দূর হয়। যারা গর্ভিতে করবে তারা পা তুলে দুই তিন সেকেণ্ড থেকেই নামিয়ে দেবে। এই ভাবে পাঁচ বা দশ বার করবে।

মৎস্যাসন

পদ্মাসন বা আসনপিঁড়ি করে বস। পদ্মাসন বা আসনপিঁড়ি রেখেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে পিঠ তুলে, বুক উঁচু করে, মাথা মাটিতে

মৎস্যাসন

রেখে দুই হাত দিয়ে, দুই পায়ের আঙুল ধরে চিত্রের মত হও এবং শ্বাস স্বাভাবিক রেখে সাধ্যমত যতক্ষণ পার এই ভঙ্গীতে অবস্থান করে হাত ছেড়ে পিঠ নামিয়ে, পা খুলে শবাসন কর। যাদের বুক কবুতরের বুকের মত ও হাঁপানী আছে তারা এই আসনটি পর পর তিন বার করবে। যাদের ঐ ধরনের দৈহিক ত্রুটি এবং অসুখ নেই তাদের একবার করলেই চলবে। সর্ব্বাঙ্গাসন তিন বার করলে মৎস্যাসন একবার, আর একেবারে তিন মিনিট সর্ব্বাঙ্গাসন করলে মৎস্যাসন একেবারে এক মিনিটই যথেষ্ট। যাদের বুকে দোষ আছে, তারা তিন বার অথবা একবারে তিন মিনিট করবে—প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে। এ আসনটি গর্ভিতে করবার দরকার নাই। এ আসন অভ্যাসে হাঁপানী সারে, শ্বাসনালী মোটা হয়, ফুসফুসের জোর বাড়ে। বুকের বেষ্টনীর চাড় বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন যাদের বুক কবুতরের বুকের মত, তাদের সে দোষ (বিশেষ করে ছোটদের) দূর করে। এই আসনে উপযৌবন গ্রন্থির রস ঠিকভাবে নিঃসৃত হয়। সর্ব্বাঙ্গাসনে যৌবনগ্রন্থির রস নিঃসরণ বেশী বা কম হলে মৎস্যাসন করলে উপযৌবন গ্রন্থির রস নিঃসৃত হয়ে এর সমতা রক্ষা করে। সর্ব্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন অভ্যাসে দেহে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়ামের সৃষ্টি হয়। এই আসন ম্যালেরিয়ার দোষ দূর করে।

শশকাসন

দুই হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া করে, গোড়ালির উপর বস। কপাল হাঁটুতে লাগিয়ে মাথা মাটিতে রেখে, দুই হাত দিয়ে পায়ের

শশকাসন

গোড়ালি ধর এবং নিতম্বদেশ যতদূর পার তুলে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে চিত্রের ভঙ্গীর মত হও, এ অবস্থায় সাধ্যমত যতক্ষণ পার থেকে উঠে বস এবং একটু বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় ঐরূপ কর অথবা একটু শবাসন (২০-৩০ সেকেণ্ড) করে তারপর এর পুনরাবৃত্তি কর। এইভাবে পর পর তিন বার করতে হবে। শেষবারের পর এক মিনিটকাল শবাসন কর। একটু সহজসাধ্য বোধ হলে ক্রমেই সময় বাড়াবে। যখন তিন মিনিটের বেশী সময় অনায়াসে থাকতে পারবে তখন একেবারে তিন মিনিটকাল থাকবে ও একবার করবে। তার পর এক মিনিটকাল শবাসন করবে। তখন আর তিন বার করবে না। আবার বেশীক্ষণ পারলেও তিন মিনিটের বেশী থাকবে

মা। এই আসন লম্বা হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মস্তিষ্ক পরিচালনার ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া পেটের মেদ কমায়, মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়া নরম করে এর দৌলতে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এ আসনটি যারা গতিতে করতে চায় তারা মাথা মাটিতে রেখে কপাল হাঁটুতে লাগিয়ে হাত দিয়ে গোড়ালি ধরবে এবং নিতম্বদেশ তুলে দু'তিন সেকেণ্ড হাত ছেড়ে মাথা তুলে বসবে ও পুনরায় করবে। এইভাবে পাঁচ হতে দশ বার করবে।

ধনুরাসন

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। দুই পায়ের হাঁটু ভেঙে দুই হাত পেছনে নিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের গোড়ালির উপর সন্ধিস্থল ধরে পা পিছন ও উপরের দিকে ঠেলে হাঁটু, মাথা ও বুক মাটি হতে যতদূর পার তোল। হাত যেন সোজা থাকে। এইরূপ ভাবে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে সাধ্যমত যতক্ষণ পার থেকে, হাত ছেড়ে পা সোজা করে হাত দুই পাশে সোজা করে রেখে উপুড় হয়েই শবাসন কর অথবা চিৎ হয়ে শবাসন কর। শবাসনে ২০-৩০ সেকেণ্ড বিশ্রাম করে পুনরায় হাত দিয়ে দুই পায়ের গোড়ালির উপর পায়ের সন্ধিস্থল ধরে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে চিত্রের মত সাধ্যমত সময় থেকে ২০-৩০ সেকেণ্ড শবাসন কর।

এই ভাবে পর পর তিন বার করবে, প্রতিবারের পর এক বার করে শবাসনে বিশ্রাম করবে, কয়েকদিন অভ্যাস করলে যখন সহজ বোধ হবে তখন একটু একটু করে সময় বাড়াবে ও একটু বেশী সময় থাকতে চেষ্টা করবে। এই ভাবে যখন অনেকক্ষণ থাকতে পারবে অথবা তিন মিনিটের বেশী সময় থাকতে সমর্থ হবে তখন পর পর তিন বার না করে একেবারে তিন মিনিট করবে। অথবা যখন তিন মিনিট পারবে তখন এক বারের বেশী করতে নেই ও তিন মিনিটের বেশীও করতে নেই। যারা গতিতে করবে তারা পা ধরে মাথা, বুক ও হাঁটু তুলে ২-৪ সেকেণ্ড থেকেই ছেড়ে দেবে। স্থিতিতে থাকবে শ্বাস স্বাভাবিক আর গতিতে যারা করবে তারা মাথা বুক হাঁটু তুলবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস গ্রহণ করবে আর ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করবে। সংখ্যা ৫-১০ বার। যাদের আমাশয়ের দোষ আছে, তাদের এ আসনটি করতে নেই। এই আসনে যকৃত ও প্লীহার দোষ দূর করে; ক্ষুধা বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, বুকের বেষ্টনীর হাড় বাড়ায়, মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়া নরম করে, পেটের মেদ কমায় ও কোমরের ব্যথা নীরাময় হয়।

উষ্ট্রাসন

দুই পায়ের হাঁটু ভেঙে বস। দুই হাত পিছন দিক দিয়ে গোড়ালি ধরে কোমর বুক যতদূর পার সম্মুখ দিকে ঠেলে এগিয়ে দাও এবং শ্বাস স্বাভাবিক রেখে চিত্রের মত যতক্ষণ পার থেকে কোমর পিছন দিকে এনে বস অথবা শবাসনে ২০-৩০ সেকেণ্ড বিশ্রাম নাও ও পুনরায় চিত্রের মত কর। এইভাবে পর পর তিন বার করবে। প্রতিবারের পর একবার করে শবাসন করবে। কিছুদিন অভ্যাসের পর যখন সহজসাধ্য হবে তখন একটু একটু সময় বাড়িয়ে বেশীক্ষণ থাকতে চেষ্টা করবে। এইভাবে সময়

উষ্ট্রাসন

বাড়িয়ে যখন তিন মিনিটকাল থাকা সম্ভবপর হবে তখন পর পর তিন বারের বদলে একেবারে তিন মিনিটকাল অভ্যাস করবে এবং পরে এক মিনিট শবাসন করবে। (শ্বাসক্রিয়া যেন স্বাভাবিক থাকে।) যাদের আমাশয়ের দোষ আছে তাদের কিন্তু এটি করতে নেই। যারা গতিতে করবে তারা পাঁচ থেকে দশ বার করবে। চিত্রের মত হবে ও ছেড়ে দেবে। এই আসনে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, বুকের বেষ্টনীর হাড় ও খাঁচার আয়তন বাড়ে, শ্বাসনলী মোটা হয়, উপরন্তু এই আসন মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়া নরম করে।

আকর্ণ ধনুরাসন

দুই পা সম্মুখদিকে জোড়া ও লম্বা করে বস। দু'হাত দিয়ে দুই পায়ের আঙুল ধর। বাঁ পা ও বাঁ হাত সোজা রেখে ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান হাত দিয়ে টেনে ডান পায়ের পাতা ডান কাণের কাছে এনে যতক্ষণ পার থেকে, পা ছেড়ে, ডান পা লম্বা করে, ডান হাত সোজা রেখে বাঁ পা টেনে বাঁ কানের কাছে আন ও সাধ্যমত যতক্ষণ পার থেকে বিশ হতে ত্রিশ সেকেণ্ড শবাসন কর অথবা একবার ডান পা তার পর একবার বাম পা এইভাবে এক এক পা পর পর তিন বার করে এক মিনিট শবাসন কর। শ্বাস কিন্তু স্বাভাবিক থাকবে। প্রথম অবস্থায় চিত্রের মত শুদ্ধ নাও হতে পারে। অভ্যাস করতে করতে ভঙ্গীও শুদ্ধ হবে। যখন সহজ হয়ে যাবে তখন এক এক পা দেড় হতে তিন মিনিট কাল থেকে এক মিনিট কাল শবাসন করবে। যারা গতিতে করবে তারা চিত্রের মত পায়ের পাতা টেনে কানের কাছে আনবে ও ছেড়ে দিয়ে অপর পা টেনে কানের কাছে এনে ছেড়ে দেবে। এইভাবে এক এক পা পাঁচ হতে দশ বার করবে। শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এতে

আরম্ভকারীদের এইভাবেই করা উচিত। আকর্ণ ধনুরাসনে ভঙ্গী অন্ত রূপও আছে। সেভাবে না করলেও চলে। সে ভঙ্গীটি করতে ডান পা বাম হাতে ও বাম পা ডান হাতে ধরে (ডান হাতের উপর

আকর্ণ ধনুরাসন

দিয়ে বাম হাত দিয়ে ডান পা ধরতে হবে) ডান হাত দিয়ে বাম পা টেনে ডান কানের কাছে আনতে হবে। তার পর পা ছেড়ে হাত বদলে ডান হাতের নীচে দিয়ে বাম হাত দিয়ে ডান পা ধরে টেনে ডান পায়ের পাতা বাঁ কানের কাছে আনতে হয়, এবং পা বদলে বদলে করতে হয়। যে-কোন দুই প্রকারের এক প্রকারেই করা চলে, তবে চিত্রের মত করাই ভাল। এই আসনে পেশীর জড়তা কমায়। ছোটদের শরীর বাড়তে অত্যন্ত সাহায্য করে। পেশীকে বেশ নরম করে। দেহের ক্লান্তি দূর করে ও কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নিম্নাঙ্গের শিরা উপশিরা স্নায়ু ও পেশীকে স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ রাখে।

ভদ্রাসন

দুই পায়ের হাঁটু ভেঙে পায়ের পাতায় ভদ্রাসন (পায়ের চেটো) লাগাও এবং হাঁটু দুটি মাটিতে রেখে দুই পায়ের গোড়ালি জোড়া অবস্থায় নীচপেটের শেষে লাগিয়ে দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে চিত্রের মত হও। শ্বাস স্বাভাবিক রেখে, সাধ্যমত যতক্ষণ পার অবস্থান করে হাত ছেড়ে দাও এবং পা সোজা করে বিশ হতে ত্রিশ সেকেণ্ড বিশ্রাম নাও অথবা শবাসন কর। তার পর পুনরায় চিত্রের ভঙ্গীর মত কর। এইভাবে পর পর তিন বার করতে হবে। অভ্যাস করতে করতে যখন সহজ বোধ হবে এবং বেশীক্ষণ থাকতে পারবে তখন আর তিন বারের প্রয়োজন নেই। একবারে তিন

ভদ্রাসন

মিনিটকাল করবে। যারা গতিতে করবে তারা চিত্রের মত করবে ও ছেড়ে দেবে। এইভাবে পর পর পাঁচ হতে দশ বার করতে হবে। সর্বশেষে এক মিনিট শবাসন করবে।

এই আসন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতে বিশেষ সাহায্য করে। বিবাহিতা মেয়েরাও এ আসন অভ্যাস করতে পারেন। এই আসন আয়ত্ত হলে সন্তান-প্রসবের সময় ডাক্তারের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না। একটু বয়স হয়ে গেলেই অনেকের পক্ষে এ আসনটি অভ্যাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই ছোটবেলা থেকে অভ্যাস করা সমীচীন।

জানু শিরাসন

দুই পা সম্মুখ দিকে লম্বা করে বস। বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে গোড়ালি তলপেটের (নীচপেটের) শেষে লিঙ্গমূলে স্পর্শ করে বাম পায়ের পাতা ডান উরুতে ঠেকিয়ে দুই হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল ধর। তার পর মাথা নীচু করে হাঁটুতে বা হাঁটুর একটু উপরে কপাল ঠেকিয়ে, শ্বাস স্বাভাবিক রেখে সাধ্যমত যতক্ষণ পার থেকো মাথা তুলে হাত ছেড়ে বাম পায়ের অনুরূপ ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে বাম পায়ের উরুতে ডান পায়ের পাতা ঠেকিয়ে দুই হাত দিয়ে বাম পায়ের আঙুল ধরে মাথা নীচু করে বাম পায়ের হাঁটু বা হাঁটুর একটু উপর কপাল ঠেকিয়ে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে সাধ্যমত যতক্ষণ পার থেকে মাথা তুলে হাত ছেড়ে বিশ হতে ত্রিশ সেকেণ্ড শবাসনে বিশ্রাম কর ও পুনরায় বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পা ধরে চিত্রের মত কর। এইভাবে পর পর তিন বার করবে। একবার বাম পা ভেঙে ডান পায়ে, আবার ডান পা ভেঙে বাম পায়ে কপাল

ঠেকিয়ে বিশ হতে ত্রিশ সেকেণ্ড শবাসন করবে। এই ভাবে পর পর তিন বার করবে। পর পর দুই পায়ে করে এক বার শবাসন করবে। ক্রমেই একটু একটু করে সময় বাড়াবে। যখন এক এক পায়ে দেড় মিনিট করে পারবে তখন এক এক পায়ে একবার করবে। তার পর এক মিনিট শবাসনে বিশ্রাম করবে। যেন

জানু শিরাসন

শ্বাস স্বাভাবিক থাকে। সামর্থ্য থাকলেও খুব সহজভাবে যদি এক এক পায়ে তিন মিনিটকাল থাকা যায় তা হলে, এক এক পায়ে তিন মিনিটও থাকা যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় যে যতটুকু পারবে থাকবে। তবে প্রথম অবস্থায় অনেকেরই কপাল হাঁটুতে আসবে না। এমনকি পাও সোজা থাকতে চাইবে না। তার জন্ত ভাবনার কিছু নাই—যে যতটুকু পারবে করবে। প্রয়োজন হলে একটু একটু বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। যারা গতিতে করবে তারা মাথা নীচু করে কপাল হাঁটুতে লাগাবে। দু'তিন সেকেণ্ড রেখেই তুলবে ও পা বদল করবে। এই ভাবে এক এক পা পর পর পাঁচ হতে দশ বার করবে। শ্বাস, মাথা নামাতে নামাতে ত্যাগ ও তুলতে তুলতে গ্রহণ (যারা গতিতে করবে তাদের) আর যারা স্থিতিতে করবে তাদের শ্বাস স্বাভাবিক—এই আসনে ছোট-দের দেহ বাড়তে সাহায্য করে। ছোট বড় প্রত্যেকেরই ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, পায়খানা স্বাভাবিক করায়—সূর্য্যগ্রন্থিকে অত্যন্ত প্রবল করে ও রাখে—বহুমূত্রের দোষ দূর করে এবং হতেও দেয় না। পেটের মেদ কমায় ও শিরদাঁড়া নরম করে।

পশ্চিমোত্তানাসন

দুই পা জোড়া করে সম্মুখে প্রসারিত করে দিয়ে বস, দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের আঙুল ধর। তার পর ধীরে ধীরে উপরাঙ্গ সম্মুখ দিকে এগিয়ে দিয়ে মাথা হাঁটুতে বা হাঁটুর একটু সম্মুখে লাগিয়ে চিত্রের মত যতক্ষণ পার অবস্থান কর তার পর মাথা তুলে হাত ছেড়ে বিশ হতে ত্রিশ সেকেণ্ড শবাসন কর অথবা বিশ হতে ত্রিশ সেকেণ্ড বসে থেকেই পুনরায় হাত দিয়ে পা ধরে চিত্রের মত কর। এইভাবে পর পর তিন বার করতে হবে, শ্বাস যেন স্বাভাবিক থাকে। প্রতিবারের পর বিশ হতে ত্রিশ সেকেণ্ড শবাসন অথবা বসে বিশ্রাম করবে। শেষ বারের পরও ওরূপ করতে হবে। শেষ বারের পর অবশ্য এক মিনিটকাল শবাসন করবে। প্রথম অবস্থায় অনেকেরই চিত্রের মত বুক পেট উরু স্পর্শ করবে না। সেজন্য চিন্তার কিছু

পশ্চিমোত্তানাসন

নেই—অভ্যাস করতে করতে চিত্রের মত ভঙ্গী আয়ত্ত হয়ে যাবে। তখন ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে অনেক বেশী সময়ও এ অবস্থায় থাকা যাবে। যখন বেশী সময় অবস্থান করা সম্ভব হবে তখন একবারে তিন মিনিটকালও একবার করলেই চলবে। যারা যোগপ্রিয় তাদের বুক পেট উরুতে তেমন চাপ পড়বে না। তাদের একটু হাঁটু ভেঙে নিয়ে অভ্যাস করতে হবে। যাতে বুক পেট উরুতে বিশেষভাবে চাপ পড়ে। যারা গতিতে করবে তারা হাত দিয়ে পা ও মাথা ধরে মাথা লাগাবে ও তুলবে। এইভাবে পাঁচ হতে দশ বার করতে হবে। মাথা নোয়াতে নোয়াতে শ্বাস ত্যাগ করতে ও তুলতে তুলতে নিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। যারা স্থিতিতে করবে তাদের শ্বাসক্রিয়া হবে স্বাভাবিক।

এই আসনে বিশেষ ভাবে যকৃত ও প্লীহার দোষ দূর হয় ও সুস্থ হয়। প্রাতঃকালীন পাতলা পায়খানার রোগ বা যাদের পায়খানা পাতলা হয়, সে দোষ দূরীভূত হয়ে কোষ্ঠ স্বাভাবিক হয়। এই আসন ক্ষুধা বাড়ায়, মেরুদণ্ডের হাড়ের জোড়া নরম করে, পেটের মেদ কমায়।

অর্দ্ধকূর্ম্মাসন

দুই পায়ের হাঁটু ভেঙে গোড়ালির উপর বস। হাঁটু যেন জোড়া থাকে। হাতের চেটো জোড়া করে দুই হাত সোজা করে উরুর উপর বুক ও পেট রেখে কপাল মাটিতে রাখ এবং হাত লম্বা হাতের আঙুল হতে কনুই পর্য্যন্ত মাটিতে স্থাপন কর। উরুর উপর যেন বুক ও পেটের খুব চাপ পড়ে আর নিতম্ব যেন গোড়ালিতে চেপে থাকে। (চিত্র দেখ) এই ভাবে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে যতক্ষণ ক্ষমতায় কুলায় অবস্থান করে উঠে বস ও পুনরায় চিত্রের মত কর। এই ভাবে পর পর তিন বার করতে হবে ও প্রতিবারের পর ২০-৩০ সেকেণ্ড শবাসনে অথবা বসে বিশ্রাম

করবে। শেষবারের পর এক মিনিটকাল শবাসন করবে। যখন বেশীক্ষণ থাকতে পারবে, তখন আর তিন বারের দরকার হবে না।

অর্দ্ধকূর্ম্মাসন

একেবারে তিন মিনিটকাল এক বার অভ্যাস করবে। শ্বাস—স্বাভাবিক। গতিতে না করলেও চলে। এই আসন বয়স্কদের যে কোন প্রকার যকৃতের দোষ ও আমাশয় দূর করে এবং যকৃতকে বিশেষ সুস্থ রাখে।

হলাসন

সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। দুই হাত সোজা মাটিতে রেখে (হাতের চেটো যেন মাটিতে থাকে) পা জোড়া ও সোজা করে তুলে মাথার পিছনে এনে মাটিতে রেখে চিত্রের মত হও এবং শ্বাস স্বাভাবিক রেখে সাধ্যমত যতক্ষণ পার থেকে, পা ঘুরিয়ে এনে ২০-৩০ সেকেণ্ড শবাসন কর। পুনরায় চিত্রের মত কর ও শবাসন কর। শ্বাস স্বাভাবিক রেখে চিত্রের মত পর পর তিন বার এবং প্রতিবারের পর এক বার করে শবাসন করতে হবে। একটু বয়স্ক ও স্থূলকায় ব্যক্তিদের পক্ষে এ আসনটি প্রথম অভ্যাস করা কিছু
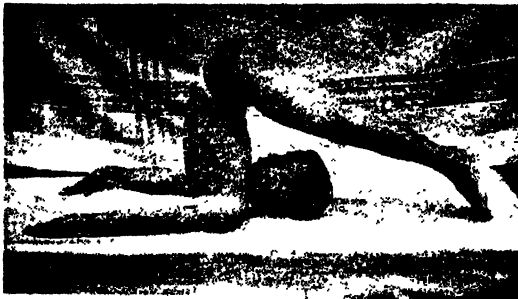
হলাসন

কঠিন হতে পারে, কিংবা নির্ভুল ভাবে করা সম্ভব নাও হতে পারে। তা বলে হতাশার কিছু নেই, অভ্যাস করতে করতে ভঙ্গিও নির্ভুল হবে, সহজসাধ্যও মনে হবে। ভঙ্গি যখন সহজ হবে ও অনায়াসে অনেকক্ষণ থাকা যাবে তখন এক বারে তিন মিনিটকাল করতে হবে, আর পর পর তিন বারের দরকার হবে না। যারা গতিতে করবে তারা শ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে পা তুলে চিত্রের মত মাথার পিছনে মাটিতে স্থাপন করবে। দু'তিন সেকেণ্ড রেখেই পা তুলে শ্বাস গ্রহণ করতে করতে পা পূর্ব্বস্থানে রাখবে। (সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে।) এইভাবে একটানা ৫।১০ বার অভ্যাস করতে হবে। এই আসনটির ১০।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্থিতিতে করতে নেই। আর যুবকেরা এ আসনটি শুধু মেঝে বা তক্তপোষে করবে না, একটা মোটা তোয়ালে বা পাতলা তোশক অথবা কম্বলের উপর অভ্যাস করাই সমীচীন। অভ্যাসের সময় যেন ঘাড়ের পিছনে জোর না লাগে। এই আসন অভ্যাসে যে-কোন প্রকার টনসিলের দোষ দূর হয় ও টনসিলকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখে। এই আসন দেহের অপ্রয়োজনীয় মেদ কমায় এবং হজেও দেয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, ক্ষুধা বাড়ায়, হাড়ের জোড়া নরম করে এবং একেবারে মেদহীনদের প্রয়োজনীয় মেদ সৃষ্টি করে।

গোমুখাসন

পা জোড়া করে সম্মুখের দিকে ছড়িয়ে বস। ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে বাম পায়ের উপর দিয়ে এনে ডান পায়ের গোড়ালি বাম

গোমুখাসন

দিকের কটির নীচে লাগাও। তার পর বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে পায়ের গোড়ালি ডান দিকের কটির হাড়ের নীচে লাগাতে হবে। দুই পা-ই কিন্তু মাটিতে থাকবে। (চিত্রে দেখ।) এখন ডান হাত উপরে তুলে কনুই ভেঙে হাতের চেটো পিঠে নাও আর বাম হাত বাম দিকে ঘুরিয়ে পিছনে নিয়ে ডান হাতের অঙুল ধর। এই ভাবে যতক্ষণ ক্ষমতায় কুলায় ততক্ষণ অবস্থান করে পা বদলে ও হাত বদলে চিত্রের অনুরূপ ভাবে ধর। একবার ডান পা উপরে আর একবার বাম পা উপরে—এইভাবে পর পর তিন বার কর, অর্থাৎ পা বদলে বদলে এক এক পা তিন বার করে উঠানোর পর এক মিনিটকাল শবাসন করবে। যখন যে পা উপরে থাকবে তখন সেই হাত উপরে থাকবে। হাঁটুর উপর যেন হাঁটু পরস্পর সংলগ্ন থাকে। যাদের উরু মোটা, তাদের কিন্তু হাঁটুতে হাঁটু সংলগ্ন হয় না। আবার অনেকে হাত দিয়ে পিছনে হাত ঠিক ধরতে পারে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে ধীরে ধীরে সবই ঠিক হয়ে যায়। হাত দিয়ে যদি পিছনে হাত ধরা নাও যায়, তার জন্ত ভাবনার কিছু নেই। যখন যে পা উপরে থাকবে তখন সেই হাত উপরে নিয়ে ও অপর হাত পিছনে নিয়ে ঠিক যতদূর পারা যায় ঐ ভাবে থাকবে। তবে পায়ের উপর যেন পা ও হাঁটুর উপর যেন হাঁটু থাকে। অভ্যাস করতে করতে যখন সহজ বোধ হবে এবং বেশী সময় থাকা যাবে তখন এক এক পা তিন বার না করে এক এক পায়ে দেড় থেকে তিন মিনিটকাল করে এক মিনিট শবাসন করবে। এই আসন করার সময় ল্যাংগোট বা জাঙ্গিয়া না পরাই ভাল। ছোট বড় স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকেরই এ আসনটি করা উচিত। ঐ আসনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় বিশেষ সহায়ক। হালকা ব্যায়াম বা আসনের পর অথবা রাত্রে শোবার আগে বিছানায় বসে যে কোন সময় এ আসন করা যায়। এর অভ্যাসে একশিরা হয় না; যাদের এই রোগ আছে, এই আসন অভ্যাস করলে তারা নিরাময় হতে পারে। এর দ্বারা অনিদ্রাজনিত ব্যাধি দূর হয়ে সুনিদ্রা হয়। শরীরকে স্বাভাবিক রাখার পক্ষে এই আসন বিশেষ উপযোগী।

শীর্ষাসন

অর্দ্ধচক্রাসন

বজ্রাসনে লেখক
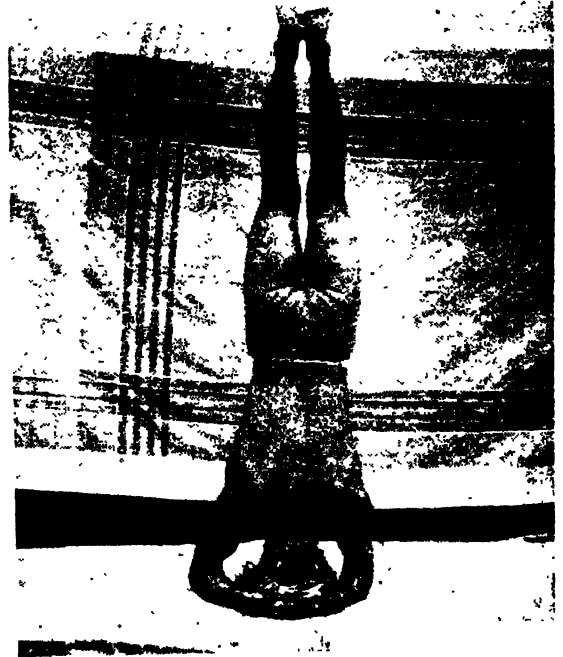
শীর্ষাসন

দুই পায়ের হাঁটু ভেঙে বসে দুই হাতের আঙুলে আঙুল নিবদ্ধ করে মাথা মাটিতে রাখ এবং আঙুলে আঙুল নিবদ্ধ অবস্থায়ই দুই হাতের চেটো মাথার পিছনে মাটিতে স্থাপন কর। কনুই স্বাভাবিক অবস্থায় ছড়িয়ে মাটিতে রেখে হাঁটু মাটি হতে তুলে পায়ের আগা ধীরে ধীরে কাছে এনে একটু টাল সামলে তুলে পা সোজা কর। চিত্রের মত হয়ে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে যতক্ষণ সাধ্য অবস্থান কর এবং পা নামিয়ে অর্দ্ধ মিনিটকাল বসে তার পর শবাসন কর। মাথার তালু যেন সোজা মাটিতে না থাকে। গোড়ার দিকে কারও সাহায্য নিয়ে অথবা দেওয়ালের কাছে গিয়ে অভ্যাস করতে হয়। আর মাথার নীচে একটা তোয়ালে দিয়ে নিতে হয়। অভ্যাস করতে করতে যখন অনায়াসে অনেকক্ষণ থাকতে পারবে তখন একবারে তিন মিনিটকাল থাকলেই যথেষ্ট, তবে দৈহিক সামর্থ্য থাকলে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত এই ভঙ্গীতে অবস্থান করা যেতে পারে। শীর্ষাসন করে একটু বসে বিশ্রামান্তে শবাসন করা উচিত। যাদের পিত্ত ও লিভারের দোষ আছে তাদের সকালে অভ্যাস করা উচিত নয়, সন্ধ্যাবেলা করাই ভাল। তা ছাড়া দন্ত, চক্ষু ও কানের রোগ যাদের আছে তাদের এ আসন করা সমীচীন নয়। এ আসন মস্তকস্থিত শিবসন্তীগ্রন্থি সুস্থ করে ও সুস্থ অবস্থায় রাখে। মানুষের জীবনীশক্তি ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করতে এটি অতুলনীয়।

প্রেমের কথামালা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

ওদের কাছে তোমার আছে স্বল্প পরিচয়
নয় সে দূরের মানি,
ভোর পেয়ালায় চা'য়ের চেয়ে আর তো বেশী নয়
চিনির টানাটানি।
দুলিয়ে বেণী দাও শাড়ীটার মেরুন্ হাওয়ায় ঢেলে,
একমুঠো সুর উড়িয়ে ফেলে একলা ছাদের ছেলে।
বুলু ওরা বলে বলুক, আপত্তি নেই মোটে
আটপৌরে ঐ ডাকে,
শুকনো ঘাসের গন্ধটুকু কালো কাকের ঠোঁটে
নিমের পাতার ফাঁকে।
বুলিয়ে দেব আমার মনের রঙমহলের তুলি
এক পলকেই পালক ঝলক বুলুয়া বুলবুলি।
ঘুমের নেশা টুটবে তোমার ছাদের সবুজ টবে
ডাকব আমার নামে,
হঠাৎ-ফুলের চোখের তারায় চমক যে তার রবে;
নীল আকাশের খামে
সাঁঝ-সকালের ভালবাসার গোপন চিঠিখানি
কিসের ক্ষুধায় বসুমতী বক্ষে নেবে টানি!
ওরা ভাবে কি আর পাবে, তাই অকারণ শুধু
রয় না অবাক চেয়ে,
লুকাও খবর পাহাড়তলীর কমল, বনের মধু,
নীপছায়ার মেয়ে!

প্রজাপতির আনাগোনায় রঙীন অলিগলি
রাতের ভোমর খোঁজে কেবল নীলকমলের কলি।
অনেক বেণু, অনেক বীণা বাজিয়ে গেল কারা
দেশ-বিদেশের গুণী।
তুমি আমার বিজনবেলার সোহাগী একতারা,
সুরের বেণী বুনি।
কান্না-হাসির কাঁকন পরাই, অভিমানের মালা
হায় অকারণ ঘোমটা বারণ···শুভদৃষ্টির পালা।
পণ্ডিতের' দণ্ড দিবেন ব্যাকরণের ভুলে
শাপবে ইতিহাস।
এলিয়ে দিলে রাতের কালোয় কখন খোঁপা খুলে
কেশের উল্লাস!
দাঁড়াও এসে এক নিমেষে বাতায়নের পাশে,
কুড়িয়ে তুলি ছড়িয়ে পড়া তারার মণি ঘাসে।
বুলু ওরা বলে বলুক, করবো না কো মানা,
বুলুয়া মোর থাক।
মল্লারে মেঘ মেলবে প্রথম আষাঢ় দিনের ডানা
তোমায় দিলে ডাক।
দিনদুপুরের কারখানাতে ওঠে উঠুক ধোঁয়া,
তোমার নামে চাঁপার চোখে চাঁদের আলোর ছোঁয়া।

মিশ্র ডায়েরী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ঘুরে ফিরে যখন গঙ্গার ধারটিতে এসে বসলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আমার পেছনে পড়ে রয়েছে ডায়মণ্ডহারবার শহরটা। রাস্তাটাই হচ্ছে বাঁধ। উত্তরে একটু এগিয়ে গেলে এই বাঁধের নীচে বাঁদিকে পড়বে থানা আর আদালতের বাড়িগুলা। ডান দিকে সারি সারি দোকান। আরও এগিয়ে বড় খালটা। পুল পেরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে নূতন বসতি, সম্রান্ত পল্লী; ডায়মণ্ডহারবারের বালিগঞ্জ। একমুঠি শহর ডায়মণ্ডহারবার শেষ হয়ে গেল।

বেশ লাগে কিন্তু। যখনই আসি, দেখি কিছু-না-কিছু বেড়েছে। কলকাতাও বাড়ছে। বেড়ে হচ্ছে বিকৃত, শ্রীহীন; ডায়মণ্ডহারবারের বৃদ্ধিটা শ্রীবৃদ্ধি; এই জন্যে ওখানে হাঁপিয়ে উঠলে এখানে আসি ছুটে মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টার জন্য; বেলে এসে বাসে ফিরে যাওয়া। জায়গাটাকে ভালবাসি বলে এখানে রাত কাটাতে চাই না, বাসা বাঁধতে চাই না। কে জানে, অতিপরিচয়ে আবার কি গ্লানি বেরিয়ে আসবে। ডায়মণ্ডহারবারের এইটুকু বাস্তবেই আমি সন্তুষ্ট; বাকিটুকু আমার স্বপ্নে থাকে অম্লান অক্ষয় হয়ে।

ছবিটুকু মনের মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়ে গঙ্গার ধারটিতে এসে বসেছি। আমার শেষ বাস আটটায়; এখনও দেরি আছে।

ঘুরে ফিরে এসে এই জায়গাটিতে বসবার আমার সময়ও এই। এইখানে ডায়মণ্ডহারবারের বাস্তব আর স্বপ্ন মিলেছে সবচেয়ে নিবিড় হয়ে, যেমন নিবিড় হয়ে মিলেছে দিনের বাস্তবের সঙ্গে সন্ধ্যার স্বপ্ন। এখানে এসে আমি বসি স্থান আর কালের ত্রিবেণী সঙ্গমে। চতুর্বেণী বলাই ঠিক, ত্রিবেণী কথাটা ব্যবহার করলাম চালু বলে, যুগযুগান্তের ট্রাডিশন-পূত বলে।

আমার বাঁদিকে এই প্রশান্ত বাঁধের রাস্তা সোজা চলে গেছে কাকদ্বীপ, তার মানে নিবিড় সুন্দরবন আর অনন্ত সমুদ্রের যাত্রী। সামনে আমার বিরাট বিস্তৃত নদী, নিতান্তই একটি ক্ষীণ বনরেখা তাকে অনন্ত আকাশের সঙ্গে করেছে পৃথক, সন্ধ্যা আর একটু গাঢ় হয়ে এলেই সে পার্থক্যটুকু যাবে ঘুচে।

অনন্তের সঙ্গে আরও একটা যোগ অনুভব করি যখন এসে বসি,—আমার বাঁয়ে প্রসারিত থাকে দক্ষিণ, সামনেও প্রসারিত থাকে তারই গোধূয়—অস্তরাগ-লাঞ্ছিত পশ্চিম।

সন্ধ্যার ছায়া আরও গাঢ় হয়ে আসতে ওপারের নীল তটরেখা মুছে গিয়ে নদীর ওদিকটা হয়ে উঠল সীমাহীন। আকাশে যা একটু মলিন লালচে আভা লেগে ছিল সেটুকুও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল; সন্ধ্যাতারাটা হয়ে উঠল দীপ্ত। অদূরে খেয়াঘাট থেকে একটি নৌকা বোধ হয় সন্ধ্যার ট্রেনের যাত্রী নিয়ে ওপারের দিকে পাড়ি জমাল। আরও কেউ যাবে নাকি?—পাল তুলে দিয়েও জড়ানো আওয়াজে গোটা-কতক ডাক দিল মাঝি—বোধ হয় ওপারেরই কয়েকটা জায়গার নাম করে। আজ হাওয়া একটু জোরই, আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘও রয়েছে, বোধ হয় এই শেষ খেয়া।... একটি যাত্রীবাহী নৌকা ঢেউয়ের দোলা খেতে খেতে এগিয়ে আসছিল—মাঝগঙ্গায় একটি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে হতে; সেটিও এসে খেয়াঘাটের নৌকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনন্তের দু'দিক থেকে এই যে যাওয়া-আসার নিত্যলীলা এর কথা ভাবতে ভাবতে অনেকখানি আত্মবিস্মৃতই হয়ে পড়েছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমার বেঞ্চিটার পাশটিতে এসে বসলেন।

বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, সুপুরুষই এবং সু-স্বাস্থ্য। এ-দিকে ভাবটা যেন একটু বিষণ্ণ, কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে যেন একটু অন্যমনস্ক রয়েছেন, এবং মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে একটু অধৈর্য্যও।

গায়ে পড়ে আলাপ করা আমার অভ্যাস নয়, তবে প্রায় জনহীন জায়গায় পাশাপাশি দুটি লোক একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকাটা অস্বস্তিকর, তা ভিন্ন ভদ্রলোক এমন মনমরা হয়ে বসে আছেন, মনে হ'ল দুটো কথা করে একটু অন্যমনস্ক করে দিলে বোধ হয় সেটা ভালোই হয়। একটা আলাপের সূত্র ধরতে যাচ্ছিলাম। উনিই হঠাৎ একটু মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি এখানকারই লোক?"

বললাম—"না, আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এখানে; এসেছি।"

কথাটা মিথ্যা, একেবারে বোল আনাই; কেননা

মূলেই স্ত্রী নেই তার কন্যা থাকতে পারে না, এবং যার কন্যা নেই তার কন্যার শ্বশুরবাড়ি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন কাজ নেই, ডায়মণ্ডহারবারের মত একটা অকিঞ্চিৎকর জায়গায় শুধু ঘণ্টা দু'তিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, এ ধরনের সত্যভাষণে শ্রোতার কৌতূহল উদ্রেক করে এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে, শেষে হাজারটা মিথ্যা না এনে ফেললে আর সামলে উঠতে পারা যায় না। অনেক অভিজ্ঞতার পর দেখেছি গোড়াতেই এ ধরনের একটি নির্জলা মিথ্যায় বেশ কাজ হয়।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"আপনার নিজের মেয়ে ?"

বেশ একটু সচকিত হয়েই ফিরে চাইলাম মুখের দিকে। হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন ? আমি যে অকৃতদার এটা জানলেন কি করে ? দৈবজ্ঞ নাকি ? একটু বেশ অপ্রতিভও হয়ে পড়েছি। তবে সে ভাবটা চেপে হেসে বললাম—"পরের মেয়েকে নিজের বলে চালাতে অন্য কোথাও সাহস হলেও তার শ্বশুরবাড়িতেও চালাতে গেলে..."

ভদ্রলোকই এবার অপ্রতিভ হয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন—"না, না, সে কথা বলছি না...মানে—মানে..."

বারদুই এইরকম আমতা আমতা করে হঠাৎ আগের মত বিষণ্ণ-গম্ভীর হয়ে বললেন—"একটা ব্যাপার হয়েছে...বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি তাইতে..."

"কি ব্যাপার !"—আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলাম।

"আমার একটি মেয়ে আসবে ওপারে সুন্দরগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে..."

আমি বাধা দিয়ে বললাম—"কিন্তু আর কখন আসবে ?"

"আসবেই ; আসতেই হবে তাকে, আর সেইটেই হয়েছে ভাবনার কথা। দেখে এলাম, এইমাত্র যে নৌকোটা এল তাতে আসে নি। এর পরে আসা মানে...অবিশ্যি পাড়ি এখানে রাত করেও জমায়, কিন্তু আজ যে রকম আকাশের অবস্থা..."

কথাটাকে স্পষ্ট করতে ভয় পেয়েই যেন দু'বার থেমে থেমে গেলেন। একটু চুপচাপ যে গেল তার মধ্যে পকেট থেকে একটা ছোট্ট ডিবে বের করে বাঁ হাতে একটু নস্য ঢেলে নাকে চালান দিলেন। তার পর সামনে একটু মুখটা বাড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়ার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিটাকে ঠেলে আমায় প্রশ্ন করলেন—"দেখুন ত দূরে নৌকোর মতন কিছু নজরে ঠেকছে ? আমার দৃষ্টি এখন আর বেশীদূর যায় না।"

বললাম—"না, কিছুই নেই।...ঢেউগুলোর জন্যে মনে হচ্ছে ও রকম। আপনি কিন্তু নিশ্চিন্দি থাকুন। এরকম আকাশ দেখে কোন মাঝিই নৌকো ছাড়বে না। বিশেষ করে মেয়েছেলে নিয়ে।"

"কিন্তু ছাড়তেই হবে, ঐ মেয়েছেলে রয়েছে বলেই।"

আমায় মূঢ়ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন—"আপনি নিয়তি বলে জিনিসটাকে বিশ্বাস করেন না ?"

একটু যেন কেমন কেমন ঠেকছে। আমি উত্তর করলাম—"করি। কিন্তু তার চেয়ে বেশী করি মানুষের বিচারশক্তিকে।...আপনি অযথাই বড় বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন যেন ; এটা ঠিক নয় ত।"

ভদ্রলোক আমার যুক্তি থেকে কিছু সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছেন কিনা বুঝতে পারলাম না, তবে একটু চুপ করে রইলেন ; তার পর হঠাৎ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন—"আমি রেবাকে ঠিক এইখানটিতে একদিন এই রকম সন্ধ্যায় কুড়িয়ে পাই ; সেদিনও নদী এই রকম...এখুনি সে রকম হয়ে উঠবে আর কি..."

আশ্চর্য্য নিয়তি বন্দী ত। আমি কথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আপনার নিজের মেয়ে নয় তা হলে ?"

ভদ্রলোক বললেন—"মাপ করবেন। আমি অকৃতদার। নিজের মেয়ে নয় বলেই তখন আমি ওরকম ভাবে একটু অভদ্র ভাবেই প্রশ্নটা করে বসি আপনাকে। এর জন্যেও ক্ষমা চাইছি। এটা একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে আমার,—কারুর মেয়ের কথা শুনলেই ফস্ করে যেন আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—আপনার নিজের মেয়ে ? বড় লজ্জায় পড়ে যাই, আপনার কাছে ত তবু ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাওয়া গেল একটা, সব ক্ষেত্রে ত পাওয়াও যায় না..."

হেসে বললাম—"ক্ষমা চাইবার আর কি হয়েছে এতে ?..."

ভদ্রলোক ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি ঠেলে একটা উদ্বিগ্ন নিশ্বাস মোচন করে বললেন—"না, ঢেউই।"

আমার কথাটা বোধ হয় কানে যায় নি। ডিবেটা বের করে এক টিপ নস্য নিলেন—বেশী বিচলিত হলে ওটা বোধ হয় ওর অজ্ঞাতসারেই হয়ে যায়—তার পর নিজের কথার জের ধরেই বলে চললেন—"নিজের মেয়ে কি জিনিস জানি না বলেই কথাটা বেরিয়ে যায় আমার মুখ দিয়ে। আমি রেবাটাকে সত্যিই বড় ভালবাসি মশাই। আমি নিজে সংসার করি নি—এর পরে আর করবার সাহসও নেই। কিন্তু ঢেউয়ের দয়ায়—দয়াই বলুন বা নিষ্ঠুরতাই বলুন—কুড়িয়ে-পাওয়া এই মেয়েটাকে নিয়ে আমার এতই ভালবাসার একটা অশান্তি যে আমার মনে সর্বদাই একটা প্রশ্ন লেগে থাকে—তা হলে যাদের নিজের মেয়ে আছে, তাদের কি

কয়ে দিন কাটে! আচ্ছা আপনার পুত্রসন্তান আছে ?”

মিথ্যাটা যথাসম্ভব ছোট করেই বললাম—“আছে… একটি।”

“মেয়ে ?”

“দুটি।”—মনে হ'ল সবই একটু বলতে গেলে মিথ্যাটা যেন ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কোথায়।

“তিনটির মধ্যে ছেলে মাত্র একটি, তা হলে ত আপনি আরও ঠিক করে বলতে পারবেন—আচ্ছা, আপনারা কি ছেলের চেয়ে মেয়েকে বেশি ভালবাসেন ?”

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় পরোক্ষ যুক্তির আশ্রয় নিলাম, বললাম—“দেখেছি মেয়ের উপর টানটা যতদিন থাকে ততদিন ছেলের চেয়ে বেশীই থাকে, অর্থাৎ যতদিন না শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চোখের আড়াল হচ্ছে, তারপর স্বভাবতঃই কমে আসবার কথা ত ?”

“তাই আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু কৈ ? বিয়ে দেওয়ার পর এ যে আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। পরের মেয়ে নিয়ে এ কি জ্বালা বলুন ত ? চোখের আড়াল হয়েছে, কোথায় নিশ্চিন্দি হব, না আরও অষ্টপ্রহর অশান্তি।”

প্রশ্ন করলাম—“কি ধরনের অশান্তি ?”

ভাবলাম, মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, দেখি যদি কোন চিকিৎসা বাতলাতে পারা যায়।

উত্তর হ'ল—“মনে হয় হারাব। যেমন কোথা থেকে কে হাতে তুলে দিয়ে গেল, তেমনি কোথা থেকে কে এসে নিয়ে যাবে…”

ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে এক টিপ নস্য নিলেন। তন্ময়-করা আমাদের অদ্ভুত আলোচনার মধ্যে ইতিমধ্যে আকাশের খণ্ড মেঘপুঞ্জ স্থানে স্থানে যুক্ত হয়ে উঠেছে। হাওয়াটা একটু বেড়েছে, বাঁধের পাকা শানের গায়ে ঢেউয়ের আছড়ানি গেছে বেড়ে। নদীর অর্দ্ধেকটাও আর দেখা যায় না।

বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। হাতটা ঝেড়ে বললেন—“অন্য কেউ নয়—এই ঢেউ। এই ঢেউই সেদিন যেমন তুলে দিয়েছিল হাতে, তেমনি কেড়ে নেবে ..”

মুশকিলে পড়া গেল। এ দৃশ্য থেকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার ভদ্রলোককে। বললাম—“বড় বেশী ভালবাসেন মেয়েটিকে, তাই আপনার ও রকম মনে হচ্ছে। চলুন ওঠা যাক। আজ আর কখনও আসে ?”

“আসবেই…আমাকে হারাতেও হবে আজ…”

চোখ দুটো অন্ধকারেও দীপ্ত হয়ে উঠেছে। কাঁপছেন একটু একটু। আমি পিঠে হাত রেখে আশ্বাস দিয়ে বললাম —“এত অন্ধের মতন নিয়তিকে মেনে নিতে আছে ?—এ যুগে যখন প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণ…”

“তা যদি না হবে ত তাকে এই নদীর ওপারেই বিয়ে দিতে গেলাম কেন ? না দিয়েই পারা গেল না কেন ? এ নদীকে, এ জায়গাটাকে আমার এত ভয় করা সত্ত্বেও ? .. বলুন।”

নাকে নস্য টিপে ধরলেন।

বিমূঢ় হয়ে গেছি, এ বাতুলতার কি উত্তর দিই ? ..তার পরেই পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিউরে উঠলাম। নদীর যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার ওদিকে অন্ধকারের গহ্বর থেকে একটা করুণ আর্ত্তনাদ—“বাবা !…”

ঝড়ের দোলায় দোল খাওয়া, টানা, দীর্ঘ ; আর নিঃসংশয় ভাবে স্পষ্ট !

উঠে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক। ডান হাতটা আওয়াজ লক্ষ্য করে গঙ্গার দিকে বাড়িয়ে বললেন—“ঐ শুনুন, শুনছেন ? ..ডাকছে ! কি হ'ল ? কি ওটা দেখুন ত ! …নৌকো নয় ?…ঐ যে সাদা পাল উলটে পড়ল, ঐ !… ঐ !…”

নৌকার পাল নয়। যেখান থেকে অন্ধকারে লুপ্ত তার ঠিক এদিকে সংঘর্ষ লেগে দুটো ঢেউ ভেঙে পড়ল। বললাম। বলতে বলতেই উঠে পড়েছি কিন্তু, এগিয়ে সামনে ঝুঁকে চোখ দুটো ঠেলে দিয়েছি। নৌকা নয়, কিন্তু শব্দটা স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট যেন—“বাবা !…বাবা !…বাবা !…গেলুম !…”

শেষ আকুতি ঝড়ের শব্দটাকে যেন ঠেলে উঠছে। তার পরেই সমস্ত শরীরটা আবার নূতন করে ঝমঝম করে উঠল—কানের পাশেই “যাই মা !—আসছি ! ..”

আমি ঘুরে শক্ত করে ওঁর একটা হাত ধরে ফেললাম, একটু রুক্ষভাবেই প্রশ্ন করলাম—“কোথায় যাবেন ?”

অদ্ভুত এক বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। চেয়ে আশ্চর্য্য সে উগ্র উৎকণ্ঠার ভাবটা একেবারেই নেই আর, সে কম্পন নেই, বাঁ হাতে নস্যের ডিবেটাও শিথিল ভাবে ধৃত। একটু চেয়ে থেকে ফিরলেন, একটু হাসি ঠোঁটে করে বললেন—“না, ও ত যাবেই—কি হবে গিয়ে আর ?”

সমস্ত শরীরটা আলগা হয়ে গিয়ে বেঞ্চে বসে পড়লেন।

ওর হতাশ নিষ্ক্রিয়তাই আমার হঠাৎ আবার সাড়া এনে দিলে শরীরে ; যথাসাধ্য ত করতে হবে, মৃত্যুর সামনে জীবনের প্রতি জীবনের শেষ কর্ত্তব্য, বৃথা জেনেও। খেয়াঘাটের দিকে পা বাড়ালাম।

এবার উনি উঠে আমায় ফেললেন ধরে।

“কোথায় যান ?”

বললাম—"দেখি যদি দু'একটা নৌকো বের করে দিতে পারি।"

"আমার কথা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?…বেশ, দেখুন" বলে নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে হাতটা আলগা করে দিয়ে বসে পড়লেন।

ছুটেছি। সঙ্গে সেই আর্ত কণ্ঠ। কয়েকটা লাফেই খেয়া-ঘাটে নেমে পড়লাম, কি রকম হয়ে গেছি একেবারে।

"ওগো, তোমরা নৌকো খুলে দেবে না? শুনতে পাচ্ছ না ডাক?"

কয়েকটা নৌকার মাল্লা ছৈয়ের মধ্যে থেকে একটু ত্রস্ত-ভাবেই গলুইয়ে এসে দাঁড়াল।

"কৈ বাবু?…ও ত বাতাসের শব্দ…তুফান উঠবে এখুনি।"

আমি স্পষ্ট শুনছি—"বাবা!…বাবা!…গেলুম!" সেই শব্দটাই যেন আকাশ বাতাস ছেয়ে রয়েছে।

"কি আশ্চর্য!…শুনতে পাচ্ছ না তোমরা! কারুর কানে যাচ্ছে না—বাবা!—বাবা!…গেলুম" ঐ ত…।"

"কৈ বাবু? ..ও ত হাওয়া!…মানষের আওয়াজ চিনব না?"

"তোমরা যাবে না!- তোমরা ভীতু! তোমরা মানুষ নয়!..."

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বকেই চলেছি যা মুখে আসছে। জড়া-জড়ি করে কি সব হালকা মন্তব্য করতে করতে ওরা যে যার কাজে চলে গেল।

যাবে না। একটা অসহ্য অবস্থা, লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম একটা নৌকায়, জোর করে কিছু একটা করতেই হবে, কিন্তু পা বাড়িয়েই হঠাৎ মনটা আবার ঘুরে গেল। যে হাতে আছে এখনও, তাকে ছেড়ে দিয়ে যে সত্যই নিয়তি-কবলিত তার দিকে হাত বাড়িয়ে একি ভুল করতে বসেছি!

কিন্তু তখন ভুলের যা হবার হয়ে গেছে। এসে দেখি বেঞ্চিটা শূন্য, কেউ নেই, শুধু ছড়িগাছটা বেঞ্চিতে আগের মতই ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে।

ক'দিন থেকেই মনটা বড় খারাপ রয়েছে, কিছুই ভাল লাগছে না।

এইরকম কিছু না ভালো লাগার অবস্থায় বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি; বেশীর ভাগ ডায়মণ্ডহারবারের ওদিক থেকে।

ডায়মণ্ডহারবার কিন্তু বোধ হয় চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল আমার কাছে। জাহাজ, খাল, প্রশস্ত গঙ্গা, গঙ্গায় ধারের বিস্তীর্ণ রাজপথ—কিছুই আজ টানে না; মনে পড়ে যায় মাঝ-গঙ্গা থেকে সেই করুণ আহ্বান, আর সেই শূন্য বেঞ্চি।

এবার ফিরে যাব ঠিক করেছি। বসুধা আপিসে একটা কাজ ছিল, ভাবলাম আজ গিয়ে সেরে ফেলি ওটা। আমি আর আমার এক বন্ধু পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে আছি। সামনে সম্পাদক; টেবিলে বাঁদিকে রয়েছেন লালকুঠির রাজা শিকার-পোশাকে। শিকারের গল্প হচ্ছে।

ডান দিকের ভদ্রলোকটিকে আমি চিনি না, কিন্তু মনটা যেন বড় আকর্ষণ করছেন। বেশ গোলগাল চেহারাটি, সাহেবী স্যুট পরা, বয়স চল্লিশের ভেতর। আমাদের মত গল্পই শুনছেন, মাঝে মাঝে এক-আধটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, ওঁকেই—"কৈ, আইসেন-হাওয়ারের সঙ্গে ট্রাঙ্ক-কনেকশানটা পেলেন?"

"না, এখনও…"

সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিং-ং-ং করে টেলিফোনের ট্রাঙ্ক কলের টানা ঝনঝনানি। "এই যে, এসে গেছে"—বলে ভদ্রলোক এগিয়ে মাউথপীসটা তুলে নিলেন।

"Hallo! Is that the President?" (হ্যালো ইজ ভাট দি প্রেসিডেন্ট?)

সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আমেরিকার রাষ্ট্র-পতির কণ্ঠস্বরও ভেসে এল, অতি ক্ষীণ, কিন্তু স্পষ্ট—

"Speaking" (স্পীকিং)।

"This is Sorkar. Arranging a tour of the U.S.A. Could you help?" (দিস ইজ সোরকার। অ্যারেঞ্জিং এ টুর অফ দি ইউ-এস-এ। কুড্ ইউ হেল্প?)

"Sure" (শ্যুওর)।

"Thanks" (থ্যাঙ্কস)।

'No mention" (নো মেনশ্যান)।

রিসিভারটা রেখে দিয়ে গম্ভীরভাবে আবার চেয়ারটাতে বসে পড়লেন। অতি চমৎকার কাটা কাটা ইংরেজী। একে-বারে নিখুঁত স্টাইল।

মনে হ'ল আর সবাই-ই চেনেন, তেমন কোন বিস্ময়ের ভাব নেই। অস্বীকার করব না, আমি শুধু বিস্মিতই নয়, বেশ একটু অভিভূত হয়ে পড়েছি। এত দূরের ট্রাঙ্ক-টেলিফোন কখনও শোনা নেই, তার উপর একেবারে প্রেসি-ডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে! ..এমন অবস্থা হয়েছে যে, অসঙ্গতিটুকু ধরবার ক্ষমতাও সাময়িক ভাবে হারিয়ে বসে আছি।

সম্পাদক আমার বিমূঢ় ভাবটা বেশীক্ষণ থাকতে দিলেন

না, পরিচয় করিয়ে দিলেন—বিশ্বখ্যাত যাদুসম্রাটের ভাই।”

বিমূঢ় ভাবটা কিন্তু অত শীঘ্র ত যাওয়ার নয়, আমি ওঁকেই প্রশ্ন করলাম - "কবে যাচ্ছেন আপনি আমেরিকায় তা হলে ?”

যাদুকর শুধু একটু ঠোঁট চেপে হাসলেন। আরও সবাই। সম্পাদক আবার একটু হেসে বললেন—"কথাটা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হয় নি, ওদিকেও ইনি, এদিকেও উনি।”

"মানে ?..."

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও নিজের কাছেই পেয়ে গেছি, নস্ত নেওয়ার অছিলাতে মুখের কাছে হাত নিয়ে যাওয়ার রহস্তও। প্রশ্ন করলাম—"ভেন্‌ট্রোলোকিজম ?”

যাদুকরের দিকেই চেয়ে প্রশ্নটা করেছি। উনি একটু হাসলেন। এত নিখুঁত হরবোলার অভিনয় আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। দৃষ্টিটা পর্যন্ত ওরই। মুখের দিকে দৃষ্টিটা কয়েকবারই ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়তে লাগল। তার পরে একটা ব্যাপার হ'ল। প্রশংসার দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল—দেখা মুখ নয় ?

আমার বিমূঢ় ভাবটার জন্তে টেবিল-মজলিসের কথাবার্তা একটু চেপে গিয়েছিল, আবার চালু হ'ল। বন্ধু বললেন—"এবার কিছু খেলা দেখান্; ইনি নতুন লোক...”

তাসের খেলা, রুমালের খেলা, টাকা ওড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে রহস্তও পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছেন যাদুকর। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পশার সম্বন্ধে মন্তব্যও করে যাচ্ছেন—অন্ত সাধনার মতই সর্বদাই নিয়ে পড়ে থাকতে হয়—যখন যেটার সুবিধা সেই অনুযায়ী—নয় ত হাত নষ্ট হয়ে যায়, গলা নষ্ট হয়ে যায় ...বোলচালের, সিচুয়েশন সৃষ্টির ক্ষমা যায় কমে।

মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছে মন্তব্যগুলো, একটানা নয়; কেননা আমি ভয়ানক অন্তমনস্ক হয়ে গেছি। সমস্ত মনটাকে জড়ো করেছি আমার স্মৃতির গোড়ায়।...একটু একটু যেন আলো এসে পড়ছে কোথা থেকে। আমার চোখ আর কান একেবারে উদগ্র হয়ে উঠেছে—কণ্ঠস্বরের প্রত্যেকটি পর্দা, বলার প্রত্যেকটি ভঙ্গী...দেখেছি—দেখেছি—হয় ত এত স্পষ্ট নয়, হয় ত আধা-আলোয়, কিন্তু দেখেছি ঠিক।...করবই বের। ভদ্রলোক যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ছেন আমার মনোনিবেশে, যেন—কি বলব ?—লুকাতে চান ?

"ভেন্‌ট্রোলোকিজমের রহস্ত হচ্ছে...”

কি বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, আমি আস্তে আস্তে ডান হাতটা বাড়িয়ে ওর বাঁ হাতের উপর রাখলাম, একটু গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, গত রবিবার সন্ধ্যায় ...আপনি ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলেন ?”

যাদুকর ধরা পড়ে যাওয়ার ভাবে একটু লজ্জিত হয়ে হেসে মাথা দোলালেন।

আমার সমস্ত চৈতন্ত যেন একটি চিন্তায় এসে জড়ো হয়েছে। প্রশ্ন করে চললাম—"সেই খেয়াঘাটের কাছে—মাঝগঙ্গায় সেই শব্দে—আপনার ডুবন্ত মেয়ের—আপনার পালিত কন্তার...”

সবাই কুতূহলী হয়ে মুখ বাড়িয়ে এসেছেন। বাইরে থেকে একজন কর্মচারী এসে বললেন—"মেয়েরা সবাই এসে গেছেন, ডাকছেন।”

পাশের ঘরেই বাড়ির মেয়েরা এসেছেন। যাদুকর একটা বৈঠকী অভিনয় দেবেন; হাতের খেলা, হরবুলি...

উঠে পড়ে আমার পিঠে একটা হাত দিয়ে আবার একটু হাসলেন। বললেন -"প্র্যাক্‌টিশ।...কিন্তু বড় শক্ দিয়ে ফেলেছিলাম আপনাকে সেদিন, মাফ করবেন।”

বার-দুই মুখটা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতেই বেরিয়ে গেলেন।

পরমাণবিক শক্তি

শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী

আজ হতে প্রায় এগার বছর আগে দ্বিতীয় মহাসমরের পরিসমাপ্তি ঘটলেও আজও বিশ্ববাসীর মনে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসে নি। গত কয় বছর পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলিকে আমরা যেমন শান্তির বাণী আওড়াতে শুনেছি, তেমনি আবার পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা বিশ্ববাসীকে স্ব স্ব ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন রেখেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত বিকিনি এটল দ্বীপে আমেরিকা কর্তৃক পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ বহুবার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়া কর্তৃক ঠিক কতগুলি পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তার সঠিক বিবরণ না পাওয়া গেলেও, তারা সাইবেরিয়ার মরুপ্রদেশে এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে জানা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশও অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অনতিদূরে মন্টিবেলোর দ্বীপে একটা পরমাণবিক বোমা ফাটিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করে ফেলেছে। অথচ এই বোমা ফাটাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে পূর্ণ শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা, নিরস্ত্রীকরণ ও মানব-কল্যাণকর সলাপরামর্শ সমান গতিতেই চলেছে। যে সব শক্তি এ সকল পরমাণবিক বিস্ফোরণের জন্যে দায়ী তাঁরাই আবার একবাক্যে স্বীকার করেছেন, "পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করা মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। ইহা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।" নিজেদের দেশ থেকে বহু দূরে পরমাণবিক বোমা ফাটিয়ে এসে তাঁরা নিশ্চিন্তে মানবহিতৈষণার ভান করছেন। নিজেদের দেশে এখনও কোন ক্ষতি হয় নি মনে করে, তাঁরা এখনও নিশ্চিন্ত।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর নানা দেশে ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে, তাই পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কুফল সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই জাপানের অন্তর্গত হিরোশিমা ও নাগাসিকির বিপর্য্যয়ের কথা আমাদের মনে হয়। বিগত মহাসমরের শেষ ভাগে আমেরিকানগণ এখানে পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করে। যারা বিস্ফোরণের অতি নিকটে ছিল, তারা পরমাণবিক শক্তির তেজে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে মরে যায়। যারা একটু দূরে ছিল, তাদের সকলের মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে না ঘটলেও, এই বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সৃষ্টি হয়, তার ফলে এই সব লোকের রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা অসম্ভব রকম কমে যায়। ফলতঃ কিছুদিনের মধ্যে এরা মারাত্মকভাবে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। তা ছাড়া তাদের অন্যান্য তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগ হয়। অনেকের ভীষণ জ্বরের সঙ্গে কঠিন রক্তাল্পতা দেখা দেয়। বহু লোকের মাথার চুল উঠে গেল। অনেকের পুনঃ পুনঃ বেশীমাত্রায় রক্তপাত হতে থাকে। মনে হয়, রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা চলে যাওয়াতেই এরূপ রক্তপাত হতে থাকে। বাইরের রক্ত শরীরে সঞ্চালিত করে এবং পেনিসিলিন ইত্যাদি এণ্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে এই তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগের উপশম করা সম্ভব হয়েছে বটে, তবে চিকিৎসকগণ আশঙ্কা করেন—এই সব রোগীদের সন্তানগণও এই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবমুক্ত হতে পারবে না।

দীর্ঘ দিন সামান্য মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity) সেবনের কুফল সম্বন্ধে এবার কিছু বলা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, যেসব শ্রমিক রেডিয়ামঘটিত লবণ নিয়ে কাজ করতেন তাদের প্রায়ই হাড়ে কর্কট রোগ (bone cancer) হ'ত। তাঁরা এই লবণ দিয়ে রাতে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ঘড়ির ডায়াল ও বাড়ীর নম্বর-প্লেট ইত্যাদি তৈরি করতেন। এই কাজে প্রায়ই তাঁদের রং লাগাবার তুলি জিভ দিয়ে চাটতে হ'ত, তাই তাদের এই রোগ হ'ত বলে চিকিৎসকগণ মনে করেন। চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্গত জোয়াকিমসথলের ইউরেনিয়াম খনিতে কর্ম্মরত শ্রমিকদের প্রায়ই ফুসফুসের কর্কট রোগে ভুগতে দেখা যেত। এই সব তেজস্ক্রিয় উপাদান হতে নির্গত তেজ ও নিউট্রনসমূহ দেহের গ্রন্থিগুলিকে (tissues) তড়িৎশক্তি-প্রভাবে ভেঙে ফেলে (ioni.e)। ফলে দেহগ্রন্থির অণুগুলির মধ্যেও একটা ভাঙন ধরে। তার সঙ্গে জনন-কোষেও (genes and chromosomes) ভাঙন ধরে। রক্তের জলীয় অংশ ভেঙে উদ্যান এবং অম্ল-উদ্যান সৃষ্টি করে। তার পর পাচক-গ্রন্থির ক্রিয়াও ব্যাহত হয়। কোষের আমিষ অংশও (protein) ভেঙে যায়। সাধারণতঃ বিভাজক কোষসমূহের উপর (dividing cells) তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

কতটুকু পর্য্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না, তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করেছেন। ইঁদুর, খরগোশ ইত্যাদি প্রাণীর উপর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, তেজস্ক্রিয়তা সেবনের মাত্রার উপরই কেবল তার কুফল নির্ভর করে না, কুফল পরীক্ষা করতে হলে শরীরের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থির উপর বিভিন্ন মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কতটুকু তাও দেখতে হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, ৫০০ শক্তির রঞ্জন রশ্মি (500 unit roentgen units) একটি মানুষের সারা দেহে চালনা করলে সে মরে যাবে, অথচ এই তেজের দ্বিগুণ তেজ মানুষটির বাহুর চামড়ার উপরিভাগে প্রয়োগ করলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। চামড়ায় একটু জ্বালা করবে মাত্র। দেখা গিয়েছে, একটি পিঁপিড়েকে মারতে যতটা তেজ দরকার, একটা ইঁদুরকে মারতে তার চেয়ে বেশী তেজ দরকার

হয়। একটা খরগোশকে মারতে আরও একটু বেশী তেজ লাগে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রাণীর উপর এবং তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের উপরে তেজস্ক্রিয়তার কুফল বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। সেই জন্য তেজস্ক্রিয়তার কুফল সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে নানা দেশের জীবজন্তুর উপরও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আজ পর্যন্ত গবেষণাকার্য্য যতদূর এগিয়েছে, তাতে মনে হয়, প্রতিদিন ০·৫ রঞ্জন তেজ সেবন করলে মানুষের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হবে না। তবে আরও কয়েক বছর অতিবাহিত না হলে এ কথার সত্যতা যাচাই করে দেখা যাবে না।

গত কয়েক বৎসরে পরীক্ষাচ্ছলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে কয়টি পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হ'ল, মানব ও অন্য প্রাণীর স্বাস্থ্যের উপর তার কতটা কুফল হয়েছে, এবার তা নিয়ে একটু আলোচনা করব। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন মাত্র কয়েক দিন আগে পৃথিবীর ক্ষমতালিপ্সু শক্তিগুলিকে যেভাবে তেজস্ক্রিয়তার কুফল সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন, তাতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। তিনি ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদের অভিমত থেকেই প্রমাণ করে দেন, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কত ভয়াবহ। ব্রিটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিলের একটি বিবরণে বলা হয়েছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের কপালে কি আছে বলা যায় না। আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স একটি রিপোর্টে বলেছেন যে, এভাবে পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকলে ১৯৬২ সনের মধ্যে বিশ্বের প্রত্যেকটি লোক সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার কবলে পতিত হবে। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিকিনিতে প্রথম পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের তের মাস পরে তেজস্ক্রিয় জল এই মহাসাগরের দশ লক্ষ বর্গমাইল ব্যেপে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীযুক্ত মেনন, ঐ সময় আরও বলেন, আগুন যেমন নিভে যায়, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব তেমন নিভে যায় না, বরং এর প্রভাব বহুদিন থাকে। জাপানের ফলমূল তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে, এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে —ইতিমধ্যেই কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণ এখানকার কতগুলি খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল ও শাকসব্জী পরীক্ষা করে তাতে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছেন। ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের শতকরা দুই জনের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। মেনন আরও বলেছেন, স্ট্রেডিও ট্রনশিয়াম পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট একটি মারাত্মক পদার্থ। এটি হাড়ের গ্রন্থি আক্রমণ করে টিউমার সৃষ্টি করে। শাকসব্জীর মধ্য দিয়ে ইহা গরুর পেটে যায়, তার পর সেই গরুর দুধ খেয়ে মানুষও সেই ট্রনশিয়াম আহরণ করে। মেননের উক্তিতে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবের যে ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল সকলেই তা স্বীকার করেন।

বটিবেলোয়ে ব্রিটিশ কর্তৃক পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরই আমরা খবর পেয়েছি, অষ্ট্রেলিয়ায় তেজস্ক্রিয় বারি বর্ষিত হয়েছে। কলিকাতারও বৃষ্টির জলে তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর হবে সে সম্বন্ধে এখনও জানা যায় নি। ইংলণ্ডের ধারে কাছে পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নি, অথচ সেখানকার শিশুদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ট্রনশিয়াম পাওয়া গিয়েছে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংসদের (World Health Organisation) একটি বিবরণ থেকে জানা যায়, অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশেই হৃদযন্ত্রের রোগের পর কর্কট রোগই (cancer) সবচেয়ে বেশী প্রাণহানির কারণ হয়েছে। এই সংসদের (Epidemiological and Vital statistics Report") থেকে জানা যায় যে, এই শতাব্দীর প্রথম থেকে প্রায় ২৬টি দেশে জনসাধারণের পরিপাক-শক্তির দুরারোগ্য রোগ দেখা গিয়েছে। কেবল ১৯৫৩ সনে জাপানের যতগুলি লোক কর্কট রোগে মারা যায়, তাদের শতকরা ৭০·৩ জন পেটের কর্কট রোগে মরে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বিশ্বে ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে। কলিকাতায় ক্যান্সার রোগ বেড়েছে কিনা এবং বেড়ে থাকলে তার কারণ কি, সে সম্বন্ধে এখন থেকে খুব সূক্ষ্ম গবেষণা করা দরকার।

এখন যেমন অধিকাংশ দেশই একবাক্যে স্বীকার করে যে, পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো মানবের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনই প্রায় অধিকাংশই কল্যাণকর কার্য্যে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহারের খুবই পক্ষপাতী। শান্তি-কার্য্যে পরমাণবিক শক্তি মানুষের খুব উপকার করবে এরূপ উচ্চাশা আজ অধিকাংশ ব্যক্তিই পোষণ করেন। শান্তির সময় পরমাণবিক শক্তিকে কি কি কাজে প্রয়োগ করা হবে তা নিয়ে নিত্য নূতন চমকপ্রদ জল্পনা-কল্পনা শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ শান্তির জন্য পরমাণবিক শক্তি সৃজন-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং ইতিমধ্যেই অনেক জায়গায় কাজও সুরু হয়ে গেছে। শোনা যায়, আমাদের ভবিষ্যৎ রেলগাড়ী, জাহাজ ও কলকারখানা ইত্যাদি পরমাণবিক শক্তিতে চলবে। ইংলণ্ডের ক্যালডার হলে যে নতুন পরমাণবিক শক্তি সৃজনকেন্দ্রটি স্থাপিত হচ্ছে তাতে নাকি একটি ছোট শহরে যতটা যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন তা সৃষ্ট হবে, চিকিৎসাশাস্ত্রেও পরমাণবিক শক্তি খুব ফলপ্রদ হবে, এরূপও অনেক চিকিৎসক মনে করেন।

এবার আমাদের স্থির মনে যাচাই করে দেখতে হবে যে, শান্তির সময়ে পরমাণবিক শক্তি দ্বারা আমাদের যতটা উপকার সাধিত হবে তার তুলনায় ক্ষতি হবে কতটুকু। পরমাণবিক শক্তিকে যান্ত্রিক শিল্পে প্রয়োগের পিছনে দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, অতিরিক্ত উৎসাহের আতিশয্য। দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, যে ভাবে যান্ত্রিক শিল্পে কয়লা ও তৈল ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে একদিন কয়লা ও খনিজ তৈল ফুরিয়ে যাবে—তা দু'শ বছর পরই হোক আর তিন শ' বছর পরেই হোক। তখন যান্ত্রিক শিল্পে মানুষকে এক অচল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আগে থাকতে পরমাণবিক শক্তিকে যান্ত্রিক শিল্পে প্রয়োগ করতে পারলে, দু শ' বছর পরের একটি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এখন কথা হচ্ছে, পরমাণবিক শক্তি সৃজন-যন্ত্র (atomic reactor) থেকে যে পরমাণবিক শক্তি পাওয়া যাবে, তার তেজ সেই কারখানায় কর্মনিরত শ্রমিক ও নিকটস্থ অন্যান্য অধিবাসীদের শরীরে প্রবেশ করবে কিনা এবং করলেও তা কতটা ক্ষতিকর হবে। বৈজ্ঞানিকগণ আশ্বাস দিচ্ছেন যে,এরূপ একটি যন্ত্রে এরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যাতে শ্রমিকদের শরীরে ক্ষতিকর পরিমাণে তেজ প্রবেশ করতে না পারে। এজন্ত দু'প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রথমতঃ পরমাণবিক শক্তি সৃজন যন্ত্রগুলি পুরু কংক্রীটের বা সীসার পাত দিয়ে আবৃত রাখা হবে যাতে করে তার ভেতর থেকে তেজ না বের হতে পারে। যন্ত্রে সৃষ্ট শক্তির পরিমাণ অনুসারে সৃজন-যন্ত্রের আবরণ কতটা পুরু হবে তা ঠিক করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হচ্ছে—লেবরেটরিতে এমন একটি করে যন্ত্র থাকবে যার সাহায্যে লেবরেটরির তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে দেখা যায়। এই যন্ত্র-সাহায্যে লেবরেটরির বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র এবং এমনকি কর্মীদের শরীরে তেজস্ক্রিয়তা প্রবেশ করেছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা যায়।

তবে দীর্ঘদিন পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে কাজ করলে শ্রমিকের তেজস্ক্রিয়তাজনিত রোগ যে হবে না, তাই বা এখন কে হলফ করে বলতে পারে? কারণ—বৈজ্ঞানিকদেরও ত এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অল্পদিনের। আবার এও ত হতে পারে, একটি স্থানে বহুদিন পরমাণবিক শক্তি সৃজন যন্ত্র (atomic reactor) চালু থাকতে থাকতে, হয় ত কোনদিন তেজস্ক্রিয়তা আবরণ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসে আবহাওয়া তেজস্ক্রিয় করে দিতে পারে। আবার দুর্ঘটনা যে হবে না, তাও ত কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তবে এ দুর্ঘটনা ঘটলে ফল অতি ভয়াবহ হবে—বোধ হয় নাগাসিকি ও হিরোশিমার বিপর্যয়ের থেকে কোন অংশে কম হবে না। অনেকে হয় ত বলবেন, পৃথিবীর সব কয়টি আবিষ্কারের ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যাবে, একদল লোক মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে যে আবিষ্কার করে যায়, পরবর্তী যুগের মানুষ তার ফল ভোগ করে। কিন্তু পরমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে সে কথা খাটবে না। কারণ ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সাধিত হয়েছে, তাতে জীবনহানি হলেও মুষ্টিমেয় লোকের হয়েছে। ডিনামাইট এক সময় সবচেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্র বলে লোকে মনে করেছিল, তাতে স্থানবিশেষের লোকেরই প্রাণহানি হয়েছিল। জেপলিন আবিষ্কারের সময় কয়েক জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দুর্ঘটনায়ও লোক মারা যায়। তাদের সংখ্যা হয় অল্প। কিন্তু পরমাণবিক শক্তি অজানায় সেবন করতে করতে ধীরে ধীরে তুষের আগুনের মত মানুষের জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। কেবল মানুষবিশেষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা বংশানুক্রমিক বিস্তৃত হবে। যেদিন বৈজ্ঞানিকগণ এর কোন প্রতিষেধক আবিষ্কারে সমর্থ হবেন, তার আগেই বহু মানুষের যা ক্ষতি হবে তা হবে অপূরণীয়। পৃথগন্যুক্ত কার্য্য সুরু করে দেবে। পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের আর একটি মহা অসুবিধা হচ্ছে—এই সব কারখানা থেকে যে সব ছাই ও আবর্জনা ইত্যাদি বেরুবে তারাও তেজস্ক্রিয়। সুতরাং এগুলি ফেলাও মহা সমস্তার ব্যাপার। সমুদ্রে ফেললে জল তেজস্ক্রিয় হবে, মাটিতে ফেললে গাছপালা জীবজন্তু তেজস্ক্রিয়তার কবলে পড়বে। সুতরাং এটিও একটি বিপৎসঙ্কুল সমস্তা।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পরমাণবিক শক্তির এত কুফল থাকাসত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ আজ নিজেদের রাজ্যে পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রাশিয়ার সহযোগিতায় মিশর তাদের দেশে একটি বিরাট পরমাণবিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই পরমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সুরু হয়ে গেছে। বোম্বাইয়ে এই কারখানা হবে। প্রস্তাবিত কারখানার জন্ত লোক নেওয়া ও তাদের যথারীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন শক্তিগর্বে গর্বিত মানব আজ আর আণবিক শক্তির ভয়াবহতার কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

সারা পৃথিবী জুড়ে এমন ভাবে পরমাণবিক শক্তি-সৃজন কারখানা স্থাপিত হতে থাকলে, মানবের বৃহত্তর স্বার্থের প্রভূত ক্ষতি হবে. তা পূর্বেই বলেছি। স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় মানুষের আর কোন সম্পদ নেই। স্বাস্থ্যই যদি নষ্ট হ'ল, তবে পরমাণবিক শক্তি নিয়ে আমরা কি করব? সেজন্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের আজ সমস্বরে বলা উচিত—কেবল পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে পরমাণবিক শক্তি-সৃজন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও পরিত্যাগ করতে হবে। এ দাবির পেছনে কোন রাজনৈতিক দলাদলি থাকা উচিত নয়। মানব-কল্যাণের জন্ত সকল দেশে আজ পরমাণবিক শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। কয়লা ও পেট্রোলের স্থলে পরমাণবিক শক্তি ছাড়া অন্ত কোন জ্বালানি ব্যবহার করা চলে কিনা, সে সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্ত আমাদের বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদিগকে এখন থেকে অনুরোধ জানাতে হবে। বিস্তৃত ভাবে সকল দেশে পরমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সময় এখনও হয় নি। এই শক্তি নিয়ে খেলা করবার আগে, আটঘাট বেঁধে নিয়েই খেলায় নামা ভাল। কারণ এ খেলায় বিপদ শুধু খেলোয়াড়ের নয়—সকল মানবজাতির। পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও মানব-স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে বহু দিনের নিশ্চিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে ব্যাপক ভাবে পরমাণবিক শক্তি-সৃজন কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত নয়। মনে হয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে লোকালয় হতে বহু দূরে কোন স্থানে এরূপ গবেষণার জন্ত একটি পরীক্ষামূলক পরমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপন করলে ভাল হয়। সেখানে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর গবেষণা ও তার সুফল এবং কুফল সম্বন্ধে নিশ্চিত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তার পর বৈজ্ঞানিকগণ উপদেশ দিতে পারেন, এরূপ পরমাণবিক কারখানা ব্যাপক ভাবে স্থাপন করা যায় কিনা। সামান্ত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপন করা মানুষের

মেয়ে যখন মা হয়

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য

জাতির মৌলিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপর। শিশুই ভবিষ্যৎ জাতির ধারক ও বাহক। আবার মাতাই শিশুর গর্ভধারিণী, প্রসূতি ও প্রতিপালিকা। সুতরাং মাতৃকল্যাণ ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য বৈপ্লবিক-দৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা একান্তই প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকার ও আন্তর্জাতিক জরুরী শিশুকল্যাণ সংস্থা (UNICEF) এবং ভারতের নবগঠিত সমাজ-কল্যাণ পর্ষৎ কতকগুলি কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছেন। প্রসূতিসদন, শিশুভবন প্রভৃতি উক্ত কার্য্যসূচীর বহিরঙ্গ। কিন্তু আসল প্রস্তুতি আরও বিরাট। আমরা জানি—বহু অঞ্চলে শিক্ষণপ্রাপ্তা স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকাগণ তাদের এলাকায় ঘুরে ঘুরে কাজ করে বেড়ান। দেশের সর্ব্বত্র এরূপ পরিকল্পনা এখনও বিস্তৃত হয় নি সত্য; কিন্তু কাজ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন প্রতি পল্লীতেই মাতৃকল্যাণের সূচনা অদূর ভবিষ্যতে রূপ পরিগ্রহ করবে। নারীর মাতৃত্বের প্রারম্ভ থেকে শিশু-জন্মের পর কয়েক বৎসর ধরে স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকাদের দৃষ্টি রাখতে হয়। ফলে ক্রমে ক্রমে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে এবং প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। দেশের যে যে অঞ্চলে উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয়েছে, সেখানে এর বাস্তব কার্য্যকারিতা অভূতপূর্ব্বভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু পরিকল্পনা শুধুমাত্র মৌখিক সমর্থন লাভ করলে দেশের ও সমাজের আসল কর্ত্তব্য বাকি থেকে যাবে। কল্যাণের মঙ্গলদীপ প্রতিগৃহে প্রজ্বলিত করতে হবে, প্রত্যেক পরিবারের বিধি পালন করতে হবে। প্রত্যেক গৃহস্থ যখন এদিকে ব্যক্তিগত ভাবে নূতন করে দৃষ্টি দেবে, তখন সত্যই মঙ্গলদীপের আলোকে সমগ্র জাতির অঙ্গন আলোকিত হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে শাস্ত্রের অনুশাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রসূতি ও শিশুকল্যানের যে ভাবগম্ভীর ও শুচিশুদ্ধ বিধি প্রচলিত ছিল, তাও প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে সেই সব কথা আলোচনা নিশ্চয়ই অবান্তর হবে না।

মেয়ে যখন কুমারী থাকে, তখন তাকে পূজা করার বিধি দেখতে পাই। গৃহিণীরা যথারীতি কুমারী মেয়েদের দেবীজ্ঞানে অর্চ্চনা করেন। পূজাপ্রাপ্তা কুমারীর মনে তখন যে ভাবের উদয় হয়, তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। মেয়ে যে একটি সামান্য মেয়েই নয়, শুধু কুমারী নয়, সে যে ভাবী বধূ, গৃহিণী ও মাতা—এই বোধ তার মনে সঞ্চারিত হয়। ভবিষ্যতে মা হবার জন্য তার এই প্রস্তুতি মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। মাতৃত্বেই যে নারীর সার্থক পরিণতি—এই মধুর সম্ভাবনার ছবি কুমারী-পূজার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হতে সাহায্য করে। মেয়ে কিশোর বয়সে পদার্পণ করলে প্রকৃতি তার দেহে মনে নব বসন্তের পত্রপুষ্পসম্ভার সাজাতে আরম্ভ করে, ভূমি যেন নববর্ষায় স্নেহাশিস লাভ করে ধন্যা হয়। কুমারী মেয়ে সীমন্তে সিন্দুর দিয়ে গৃহলক্ষ্মীরূপে স্বামীর অঙ্গনে পদপাত করে। সেই মেয়ে যখন মাতৃত্বের সম্ভাবনার লাজরক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠে, তখন তাকে কেন্দ্র করে পরিবারে শুভ উৎসবের মাঙ্গলিক চিহ্নিত হয়। এ যেন প্রস্ফুটিত অজস্র পুষ্পের মহোৎসব, যেন ভাবী মাতৃত্বের আগমনীর অগ্রিম অভিনন্দন।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।' অর্থাৎ মানুষ জন্মের সময় শূদ্র হয়ে পৃথিবীতে আসে, সংস্কার পালন দ্বারা সে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। জন্মের সময় জাতিধর্মনির্বিশেষে সব মানুষই গুণগত ভাবে সমান থাকে। পরে বুদ্ধি ও বিদ্যার সাধনা এবং শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া অনুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মণোপযোগী সত্ত্বগুণ অর্জন করতে সমর্থ হয়। ভারতে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনকে নিছক জৈব কামনার অভিব্যক্তিরূপে না দেখে ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়েছে। জনক-জননীর মন যাতে পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হওয়ার পরিবর্ত্তে শুদ্ধ ও সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেজন্যই শাস্ত্রানুমোদিত নানারূপ সংস্কার-কার্য্যের বিধান দেওয়া আছে। চিত্রকর স্থূলভাবে চিত্রের অঙ্কন সুরু করে বার বার তুলিকা লেপন দ্বারা চিত্রের পূর্ণতা আনেন। তেমনি মানবদেহে সত্ত্বগুণের পূর্ণতা ঘটে সংস্কারমার্জ্জনার দ্বারা।

স্বামী-স্ত্রীর প্রথম মিলনের দিন যে সংস্কারবিধি পালনের প্রথা আছে, তাকে বলা হয় গর্ভাধান। বর্ষার জলসিক্ত উর্ব্বরা ভূমিতে সুপুষ্ট বীজ বপন ও তৎপরবর্ত্তী নানারূপ তত্ত্বাবধান দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা থাকে। সন্তানকামী নরনারীর পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হ'ল—অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পত্নীর মনে পবিত্র ভাব উৎপাদন করে স্বামী শুদ্ধ মনে তার সহিত মিলিত হবেন। উভয়ের মনে শান্তি ও মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্য বেদমন্ত্র

ও সুগন্ধী পুষ্পমাল্য পরিধান করাও শাস্ত্রের বিধি। জৈব আবেদনকে কামনার ঊর্দ্ধে উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা অতীব নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

শাস্ত্রমতে পরবর্তী সংস্কারের নাম পুংসবন। সাধারণতঃ তিন থেকে চার মাসের মধ্যে নানাভাবে ভ্রূণ নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। ইহা ব্যতীত, তিন মাসের মধ্যে প্রসূতির গর্ভস্পন্দন হয়, অর্থাৎ ভ্রূণে জীবনীশক্তি অনুভূত হয়। সেজন্য তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যেই পুংসবন সংস্কার সম্পাদনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে। পুংসবন অর্থে পুত্র সন্তানের উৎপাদক সংস্কার। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা কন্যা অপেক্ষা পুত্র সন্তান লাভ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। সেজন্য এই অনুষ্ঠান দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণকে স্পন্দনের ঠিক পূর্ব্বেই পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়। তবে প্রথম গর্ভের সময়েই এই সংস্কার পালনের কথা। তথাপি পরবর্তী অনুষ্ঠানের পক্ষে এবং সাধারণ ভাবেও গর্ভস্পন্দনের সময়কে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তায় ইহা প্রতিবারেই প্রযোজ্য হতে পারে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রসূতির মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তার দ্বারা গর্ভাবস্থায় আলস্য, ভয়, বমনেচ্ছা, অবসাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয় এবং শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। অনুষ্ঠানের সময় পরিষ্কার শিলার উপর সম্ভব হলে শিশিরজলে মুকুলিত বটপত্রগুচ্ছ পেষণ করে তার রস বধূর নাসায় দিতে হয়। এই প্রথার উপকার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৃতীয় সংস্কারকে সীমন্তোন্নয়ন বলা হয়। গর্ভগ্রহণের সূচনার পরও স্বামী অনেক সময় স্ত্রীর সহিত মিলিত হন। কিন্তু পুংসবন সংস্কারের পর অর্থাৎ গর্ভস্পন্দনের পর, মিলনে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি—এমনকি, মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে। সেজন্য পুংসবন সংস্কারের পর চতুর্থ মাসে সীমন্তোন্নয়নের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আমাদের দেশের মেয়েদের সীমন্তে সিন্দুর লেপন করার অর্থ বিবাহ ও শাস্ত্রানুসারে নারী-পুরুষ মিলনের আইনানুগ অনুমোদন। গর্ভের চতুর্থ মাসে সীমন্তোন্নয়ন অর্থাৎ সীমন্ত থেকে সিন্দুর তুলে দেওয়ার অর্থ স্ত্রীর পক্ষে পতিগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা। এই সংস্কার-সাধনের পর স্ত্রী প্রসবকাল পর্য্যন্ত কোনভাবে অঙ্গলিপ্তা, প্রসাধিতা ও শৃঙ্গারবেশিনী হতে পারবে না।

পঞ্চম মাসে গর্ভিণীকে পঞ্চামৃত দেওয়ার একটি প্রথা প্রচলিত আছে। নারী তার দেহের অভ্যন্তরে প্রাণকোষের মাধুরী দিয়ে একটি অঙ্কুরিত প্রাণে যে রস ও রক্তের সঞ্চারে মগ্ন থাকে, তার পরিবর্দ্ধনের জন্য পরিপোষকতা প্রয়োজন। তাই সারবান্ খাদ্যবস্তুর সাহায্যে ভাবী মাতার দেহের পুষ্টিসাধন করার বিধি আছে। দুগ্ধ চিনি, ঘৃত, মধু ও দধি—এই পঞ্চামৃত মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভাবী মাতাকে সেবন করাতে হয়। গৃহিণীরা গর্ভিণীকে যে সাধ-ভক্ষণ করান, তার মূলেও প্রায় একই ব্যাপার।

নারী যখন আসন্নপ্রসবা হন, তখন স্বভবতঃই তাঁর মনে ভাবী সন্তানের জন্মকালীন শুভাশুভ অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ ও ভয়ের আবির্ভাব ঘটে। সেই সময় প্রসূতির মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আসন্নপ্রসব-কালে পতির পক্ষে সোষ্যন্তীকর্ম্ম নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করার বিধি আছে। এই সংস্কারসাধন দ্বারা প্রসূতির মনে প্রসবকালীন সঞ্চারিত ভয় দূর হয়ে সাহসের সঞ্চার হয়।

অতঃপর সন্তান-প্রসবের পর জাতকর্ম্ম। সন্তান জন্ম-গ্রহণ করার পর পরিষ্কার শিলায় পেষিত যবচূর্ণের দ্বারা তার জিহ্বা মার্জ্জনা এবং স্বর্ণ দ্বারা ঘৃতপ্রাশন করাতে হয়। স্বর্ণপিষ্ট ঘৃতের গুণ বহু প্রকার, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে একথার উল্লেখ আছে। স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষ নাশ হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং প্রসব যন্ত্রণার দরুন শিশুর রক্তে সম্ভাব্য ঊর্দ্ধগতি দোষও বিনষ্ট হয়। ঘৃত দ্বারা মল পরিষ্কার হয়, বলাধান হয় এবং শরীরের তাপবৃদ্ধি হয়। সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে এই প্রথা যে উপকারী, তাতে সন্দেহ নেই। জাতকর্ম্মের পরই ধাত্রী নাড়ী ছেদন করবে। শিশুর নাড়ী ছেদন করার জন্য শাস্ত্রোক্ত নিয়ম রয়েছে।

আমাদের দেশের শাস্ত্রোক্ত সংস্কারবিধি আলোচনা করে দেখা যায় যে, গর্ভিণী এবং গর্ভস্থিত শিশুর দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য যথেষ্ট বিধি রচিত হয়েছে। শিশু ও প্রসূতি-কল্যাণ যে জাতির সর্ব্বজনীন স্বাস্থ্যের ভিত্তিস্বরূপ, একথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকার ও মনীষিগণ উপলব্ধি করতেন। আমরা চর্চ্চার অভাবে ও দীর্ঘকালীন পরাধীনতার চাপে অনেক কিছুর মত স্বাস্থ্যের দিকে অবহেলা করে এসেছি। নূতন করে স্বাস্থ্যবিধি পালন শিখবার দিনে প্রাচীন প্রথা স্মরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। অবশ্য বর্ত্তমান বিংশ শতকের বহুপ্রকার পরিবর্ত্তনের যুগে শাস্ত্রোক্ত প্রথা যথাযথ ভাবে পালন করা সকলের পক্ষে ও সকল সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে। আমাদের আধুনিক বিশেষজ্ঞগণও প্রসূতি এবং শিশুরক্ষার জন্য বহুবিধ নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। সকলের স্বাস্থ্য রক্ষা ও বর্দ্ধনের জন্য এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতে এক সবল ও শক্তিশালী মানবসমাজ গড়ে তোলার দিকে প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারী সচেতন হবেন এবং অনগ্রসর ব্যক্তিদের নিজেদের স্তরে টেনে তুলবেন—স্বাধীন দেশের এ এক বিরাট আশা।

কল্পলোক

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

অরুণের স্ত্রী করুণা। দু'জনের বয়স প্রায় এক—সাতাশ কি আটাশ। অরুণের অবস্থা মাঝামাঝি, ছোট ভাড়াটে ফ্ল্যাটে বাস করে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি, অনেক রাত, আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ, খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছে জ্যোৎস্না। ঘুমিয়ে আছে পাশাপাশি অরুণ আর করুণা। একটি হাতের উপর মাথা রেখে অরুণ কাত হয়ে শুয়ে আছে, মুখের একটা দিকে আলো, আর একটা দিক অন্ধকার। করুণার খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখের উপর, ঠোঁট দুটি হাসি-হাসি।

অনেক দূরে ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজে। বাতাসে জানালার পর্দা দুলতে দুলতে হঠাৎ তা খুলে যায়, প্রকাণ্ড একটা সাদা পাখীর মত ডানা মেলে দূর হতে দূরে গিয়ে মিলিয়ে যায়। জানালাটা বড় হতে থাকে, আস্তে আস্তে দেয়ালগুলো কাগজের টুকরোর মত আলগা হয়ে খসে পড়ে। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে, সেই শুভ্র আলোর ধীরে ধীরে ঘর দ্বার, বিছানা, অরুণ করুণা সব মিলিয়ে যায়। একটু পরে আবছায়া একটা ছবি ফুটে উঠে, ক্রমে তা স্ফুটতর হয়—দেখা যায় একটা নতুন দেশ, পথের দুধারে গাছের শ্রেণী, একপাশে বাগান, ফুল ফুটে আছে অফুরন্ত, তারই আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে একখানা ছোট অথচ ছবির মত সুন্দর মাটির ঘর। পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে দূরে একটা শহরের দিকে। সেই পথ ধরে আসে এক যুবক, মুখ দেখা যায় না, চাদর বাতাসে উড়ে, হাতে তার একগাদা বই আর খাতা। হঠাৎ ঝড়ের মত বেগে মস্ত বড় একখানা দামী মোটর আসে, অন্যমনস্ক যুবক সেদিকে খেয়াল করে না—ঘ্যাচ করে মোটরখানা তার এক ইঞ্চি দূরে থেমে যায়, চমকে উঠে যুবক, বইখাতা ছিটকে পড়ে চারিদিকে। একজন মহিলা মোটর থেকে মাথা বার করেন।

মহিলা। (ভুরু বাঁকিয়ে) ছেলেমানুষ নন অথচ পথ চলতে জানেন না।

(যুবক সেকথায় কান দেয় না, চাদর সামলে বইপত্র সংগ্রহ করে)

মহিলা। (বিরক্তির সঙ্গে) এসব লোকের পথে বেরুনো উচিত নয়।

যুবক। (বই কুড়োতে কুড়োতে) উচিত হচ্ছে এক শ্রেণীর মেয়েদের মোটর দিয়ে পথে ছেড়ে দেওয়া।

মহিলা। এক শ্রেণীর মানে?

যুবক। (না তাকিয়ে) এক বিশেষ শ্রেণীর—

মহিলা। (কঠিন ভাবে) বিশেষ শ্রেণীর মানে?

যুবক। (না ফিরে) যে শ্রেণীতে পড়ে যাবতীয় জীব যারা পথচারীর—

মহিলা। (বিরক্ত ভাবে) জীব! সরে যান পথ থেকে।

যুবক। (না ফিরে) কি করছি আশা করি দেখতে পাচ্ছেন।

মহিলা। (অসহিষ্ণু ভাবে) তাড়াতাড়ি করুন।

যুবক। (ধীরে সুস্থে বই তুলে চাদর দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে) কি বস্তু ধুলোয় পড়েছে তা যদি জানতেন।

মহিলা। (বিদ্রূপের স্বরে) কি বস্তু!

যুবক। কাব্য।

মহিলা। (খিলখিল করে হেসে উঠে) সরে যান, আমার সময় নষ্ট করবেন না।

যুবক। (এতক্ষণে এগিয়ে এসে) আহা, কেন নষ্ট হবে, আসুন কাব্য আলোচনা করা যাক।

মহিলা। (যুবককে দেখে চমকে উঠে) কে! অরুণ!

অরুণ। (মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে) এ কি করুণা! তুমি এখানে?

করুণা। তোমাকে এখানে এমন ভাবে দেখব এ আমি কল্পনাও করি নি।

অরুণ। আমিই কি কল্পনা করতে পেরেছি যে তোমাকে এই অবস্থায় এখানে দেখব?

করুণা। (মোটর থেকে নেমে এসে) ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। এখানে কি করছ।

অরুণ। কিছু না, মাঝে মাঝে আসি এখানে।

করুণা। মাঝে মাঝে! তা হলে বল সর্ব্বদাই আসা যাওয়া কর। কেন বল ত?

অরুণ। কোন বিশেষ কারণ নেই।

করুণা। সত্যি বলছ?

অরুণ। বললাম ত বিশেষ কোন কারণ নেই, তবে এখানে একখানা বাড়ী করেছি।

করুণা। আমাকে গোপন করে এত কাণ্ড করেছ!

অরুণ। (বিরক্ত ভাবে) তোমাকে বলি বলি করেও বলা হয় নি। ভাল কথা—তুমি এখানে কেন?

করুণা। বিশেষ কোন কারণ নেই।

অরুণ। সত্যি বলছ?

করুণা। (হেসে উঠে) আমিও এখানে একখানা বাড়ী করেছি।

অরুণ। মোটরও কিনেছ দেখছি।

করুণা। বহুদিনের সখ ছিল।

অরুণ। তোমার বাড়ীটা কোথায়।

করুণা। শহরের পূবদিকটাতে, দেখেছ বোধ হয় যেদিকে বড় বড় বাড়ী আছে। সবচেয়ে বড় বাড়ীখানা আমার।

অরুণ। ওদিকে আমার যাতায়াত নেই।

করুণা। তোমার বাড়ীটা কোন দিকে ?

অরুণ। এই যে সামনেই, এ ফুলবাগান আমারই। এস ভিতরে—দেখবে।

(অরুণ আগে যায়, অনুসরণ করে করুণা। কাঠের ছোট্ট ফটকটা ঠেলে তারা বাগানে ঢোকে, একটু এগিয়ে গিয়ে একটা কদমগাছের নীচে দাঁড়ায়।)

অরুণ। কেমন দেখছ আমার মালঞ্চ ! এখানে বসা যাক।

(দু'জনে বসে)

করুণা। (চারিদিকে তাকিয়ে) মালঞ্চ কোথায় ? এ ত দেখছি আগাছা-ভর্ত্তি জঙ্গল।

অরুণ। জঙ্গল ! এত ফুল, এত শ্যামলতা, এত পাখিপাটা, একে জঙ্গল বলছ !

করুণা। জঙ্গল নয় ত কি ? লাল সুরকির বড় বড় পথ কোথায় ? অর্কিড, পাম, ক্রোটন কোথায় ? ম্যাগনোলিয়া, রোডোডেনড্রন, লাজেরস্ট্রোমিয়া কোথায় ? এ ত দেখছি যতসব চেনা ঘরোয়া গাছ ; শিউলি, বকুল, চাঁপা, কদম, বেলি, চামেলি আর টগর।

অরুণ। ঘরোয়া বলেই ভাল লাগে, গন্ধ পেয়েই ফুল চিনে ফেলি, বোটানির বই খুলতে হয় না। আচ্ছা, দেখেছ নদীর ধারে ঝাউগাছ বাতাসে কেমন দুলছে।

করুণা। (সভয়ে) কত বড় নদী ! কি নদী ওটা ? এদেশে তো নদী নেই !

অরুণ। (সোৎসাহে) আছে বৈ কি। নদী না হলে আমি থাকতে পারি নাই, আমার ঘরের পাশে চাই মস্তবড় কূলে কূলে ভরা নদী, যাতদিন শুনব তার কলকল ছলছল গান। ওর কোন নাম ছিল না, আমি নাম দিয়েছি পদ্মা। জানই ত আমার জন্ম পদ্মানদীর পারে।

করুণা। নদী দেখলে আমার ভয় করে।

অরুণ। তোমার জন্ম শহরে কিনা তাই। দেখছ, ওপারের গাছপালা, খেয়াঘাটের ছোট্ট ঘর, কলসী কাঁখে গাঁয়ের মেয়ে দুটি, বাঁকের মাথায় পালতোলা নৌকো, আহা, ছবির মত সুন্দর দেখাচ্ছে। সারাদিন ঘরের দাওয়ায় বসে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) ঘর কোথায় ?

অরুণ। ঐ যে চাঁপাগাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে।

করুণা। ছোট ঐ মাটির ঘরখানা ! ওটা তো মালীর ঘর।

অরুণ। না, না, ঐ আমার ঘর। ছোট বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর, দেয়ালে দিয়েছি আলপনা, চালে তুলে দিয়েছি মাধবীলতা।

করুণা। দেখতে যদি আমার বাড়ী, সে একটা প্রাসাদ। তোমার কোলকাতার ফ্ল্যাটের তিনটে ঘর যত বড় তার চেয়েও বড় এক একখানা ঘর। মেঝে সব মার্ব্বেল। হালকা, পলকা সস্তা জিনিষ সেখানে নেই, ঘরে বসলে মনে হয় ঘরে বসেছি।

অরুণ। ঘরে বসলে আমার ঘরের কথা মনেই হয় না। গৃহটা ত আসল নয়—আসল হচ্ছে গৃহিণী।

করুণা। ভাল বাড়ী দেখতে বললেই তুমি ঐ কথা বল। ওটা যুক্তিই নয়।

অরুণ। সত্যিই বলছি, আসবাব দিয়ে ঠাসা, বাড়ীর কথা ভাবতে গেলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

করুণা। দম বন্ধ হয় তোমার ছোট ঘরে, হাত পা ছড়িয়ে বসবারও স্থান নাই।

অরুণ। মন কিন্তু ছড়িয়ে যায়। কবিতার বই নিয়ে যখন বসি তখন কাব্যের সঙ্গে বাস্তব মিলে যায়।

করুণা। কাব্যই তোমাকে অকেজো করেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে বললেই তুমি ভয় পাও। চোখের সামনে কতজন শেয়ার বাজারে ঢুকে বড়লোক হয়ে গেল, তুমি যেমন ছিলে এখনও তেমন।

অরুণ। কিন্তু যাই বল আনন্দে আছি।

করুণা। (হেসে) ওটা ফাঁকা আনন্দ। ভারী জিনিষ, ভাল আর দামী জিনিষ ছুঁয়ে, ধরেই তো আনন্দ।

অরুণ। তাই ত দেখছি অনেক ভাল ভারী আর দামী জিনিষ দেহে ধারণ করেছ। গয়নাগুলো অবশ্যই গিলটি নয়, পাথরগুলোও আসল হীরে !

করুণা। (হেসে) গিলটিও নয়, নকলও নয়, খাটি ও আসল। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল ত ?

অরুণ। (বিব্রত ভাবে) হ্যাঁ, তা মন্দ নয়, বেশ, সুন্দর বৈ কি।

[মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে]

অরুণ। তোমার গাড়ীর হর্ণ বাজছে যে ! কোন দুষ্টু ছেলে নয় ত ?

করুণা। আমাকে ডাকছে।

অরুণ। (আশ্চর্য্য হয়ে) তোমাকে ডাকছে ! কে ?

করুণা। দেখতে পাও নি, গাড়ীতে আমার পাশে বসে ছিল !

অরুণ। (অবাক হয়ে) না, দেখি নি—কে সে ?

করুণা। আমার বন্ধু।

অরুণ। তোমার বন্ধু আবার কে ? নাম বল না।

করুণা। আমার এ দেশের বন্ধু, নাম জানলেও চিনতে পারবে না।

অরুণ। তা হলে একটি বন্ধু [illegible]।

অরুণ। (শ্লেষের সঙ্গে) বোধ হয় আদর্শ পুরুষ।

করুণা। আদর্শ না হলেও বুদ্ধিমান পুরুষ, হালকা কাব্য নিয়ে সময় নষ্ট করে না, শেয়ার বাজারে মাথা খাটিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করে।

[বাগানের পথ দিয়ে আসে একটি মেয়ে, খোঁপায় ফুল গোঁজা, গলায় ফুলের মালা]

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) ইনি কে?

অরুণ। এই, একটি মেয়ে।

করুণা। চেন না বুঝি।

অরুণ। চিনি বৈ কি।

করুণা। পরিচয় বলতে আপত্তি আছে?

অরুণ। না, ইনি হচ্ছেন আমার বান্ধবী।

করুণা। তা হলে একটি বান্ধবী চয়ন করেছ!

অরুণ। (জবাব দেয় না)

করুণা। (শ্লেষের সঙ্গে) বোধ হয় আদর্শ নারী।

অরুণ। আদর্শ না হলেও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। ওর সঙ্গে কাব্য আলোচনা করে খুবই আনন্দ পাই।

[মেয়েটি কাছে আসে]

করুণা। আপনাদের মাঝকে হঠাৎ এসে পড়েছি, অপরাধ নেবেন না।

নবাগতা। বেশ করেছেন, আপনি নিশ্চয়ই অরুণের খুবই পরিচিত কেউ!

করুণা। (হেসে) অনেক দিনের আলাপ। আমার নাম করুণা, আপনার নাম কি?

নবাগতা। আমার নাম চকিতা।

করুণা। চকিতা! নামটা যেন আগে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে! ওহো, সেই যে তুমি একটা গল্প লিখেছিলে, একটি কবিতা-পাগলা মেয়ের কথা, নাম দিয়েছিলে চকিতা। তাই না?

অরুণ। হাঁ, লিখেছিলাম।

করুণা। চেহারাটাও যেন দেখা মনে হচ্ছে!

চকিতা। অসম্ভব, আপনাকে আমি আগে কখনো দেখি নি।

করুণা। বসুন।

(চকিতা করুণার পাশে বসে)

করুণা। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কিন্তু কালিদাসের কালের 'মনোহারিকার' মত দেখাচ্ছে।

"কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পারো করবী"

(অরুণকে লক্ষ্য করে) তোমার মুখে শুনে শুনে আমারও মুখস্থ হয়ে গেছে।

অরুণ। বর্ষায় চকিতা এমনভাবে সাজতে ভালবাসে।

করুণা। (হেসে উঠে) বর্ষা! পৌষের মাঝামাঝি, এখন বর্ষা কোথায়?

অরুণ। পৌষের মাঝামাঝি! কি যে বলছ তুমি—এ ত আষাঢ়ের মাঝামাঝি।

করুণা। (আবার হেসে ওঠে)

(গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠে, একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়, কদমের রেণু ঝরে পড়ে)

অরুণ। (উল্লসিত হয়ে) ঐ শোনো। শুনছ, মেঘ ডাকছে। দেখ পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তারই পটভূমিতে সাদা বকের সারি উড়ে চলেছে। দেখ, নদীর ওপারে বৃষ্টি নামল।

করুণা। (অবাক হয়ে) ব্যাপার কি বল ত?

অরুণ। আমি যে বর্ষা ভালবাসি তাই এদেশে বারমাস বর্ষা। দু' চার দিন শরৎ, দুচার দিন শিউলি ফোটে। শীত গ্রীষ্ম এ দেশে নাই।

করুণা। আমি কিন্তু ভালবাসি শীত, মিঠে রোদ আর পরিষ্কার আকাশ। আমার ওদিকটায় তাই ঝরঝরে খটখটে পৃথিবী। আমার বাগানে চমৎকার কারনেশন, ক্রিসেনথেমাম, ডালিয়া আর সুইট পি ফুটেছে, একদিন গিয়ে দেখে এস।

অরুণ। আর আমার বাগানে ফুটেছে কেয়া, কদম, কামিনী। আজ একটা কবিতা লিখেছি শোন। (পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে)

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) তুমি কবিতা লেখ? অবাক কাণ্ড, শুনি নি ত কখনও!

চকিতা। সুন্দর কবিতা লেখে অরুণ।

অরুণ। এখানে এলে কবিত্বের যেন উৎসমুখ খুলে যায়— ভাব, ভাষা, ছন্দ স্রোতের মত বেরিয়ে আসে।

চকিতা। অরুণ মস্ত বড় কবি, মস্ত বড় বলাও ভুল হ'ল, আমার মতে ও শ্রেষ্ঠ কবি। কি গভীর ভাব, কি অপূর্ব্ব ভাষা— কবিতা যেন ছবি হয়ে ফুটে ওঠে।

করুণা। এসব কিন্তু নূতন খবর।

অরুণ। শোন কি লিখেছি (কাগজ তুলে নেয়)

করুণা। (হেসে) পড়বে কেমন করে! চশমা কোথায়, হারিয়েছ বুঝি?

অরুণ। চশমা! ভেঙে গুড়ো করে নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছি।

করুণা। চশমা না হলে যে তুমি অন্ধ! চশমা আর তুমি ত অবিচ্ছেদ্য!

অরুণ। ঐ জন্যেই ত ওটার উপর আক্রোশ, ঐ জন্যেই ত ফেলে দিয়ে মুক্তিলাভ করেছি। শোন, পড়ছি—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মত নাচে রে।
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরী ডাকিছে সঘনে
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।

চকিতা। (উচ্ছ্বসিত ভাবে) কি সুন্দর, কি চমৎকার।

করুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) এ ত রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা, বহুবার তোমাকে পড়তে শুনেছি!

অরুণ। না, এ আমার।

চকিতা। রবীন্দ্রনাথ এত ভাল কবিতা লিখতে পারেন না।

অরুণ। এ কবিতা আমার কেননা আমি এর প্রাণদান করেছি। একদা রবীন্দ্রনাথ এর কাঠামো তৈরি করেছিলেন, কিন্তু আমি কত মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে, কত নিঝুম দুপুরে, কত বাদল-সন্ধ্যায় কত অন্ধকার শ্রাবণ-রাত্রিতে অনুভব দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দিয়ে একটু একটু করে জীবন্ত করে তুলেছি—এ আমারই কবিতা।

চকিতা। এ অরুণেরই সৃষ্টি।

করুণা। (হাই তুলে) তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই।

অরুণ। আরও আছে শোন।

করুণা। (বাধা দিয়ে) থাক—থাক।

(বাগানের কটক খুলে হালফ্যাশানের স্যুট-পরা একটি যুবক এগিয়ে আসে)

অরুণ। ইনিই বুঝি তোমার বন্ধু!

করুণা। হ্যাঁ।

অরুণ। আসুন, আসুন, (চাপা গলায়) নামটা কি?

করুণা। অশোক।

অরুণ। আসুন অশোকবাবু, স্বাগত। আপনার পরিচয় ইতিমধ্যেই পেয়েছি।

অশোক। আমার সৌভাগ্য। হঠাৎ এসে পড়ে আপনাদের আলোচনা ব্যাহত করলাম ত?

অরুণ। আরে না না। বরং আলোচনায় যোগ দিতে এলেন বলে খুশী হলাম। কাব্য সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

অশোক। কাব্য! হ্যাঁ, তা আজকাল বইয়ের বাজারে কাব্যের চাহিদা কিছু বেড়েছে। কবিতার লাইনগুলো যদি পিরামিড প্যাটার্ণ অথবা চৌরাস্তা কেস প্যাটার্ণে ছেপে মলাটটা জমকালো করে বার করা যায়, তাহলে বুঝলেন, প্রেজেন্টেশনের বাজারে বেশ বিক্রি আছে।

অরুণ। (বিরক্ত ভাবে) আমি ঠিক ওকথা বলছি না, আমি বলছি কি, সৃষ্টির দিক থেকে এই লাইন ক'টা:

"ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা—

অশোক: (হেসে) চমৎকার হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যসৃষ্টির দিকটায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে; সেই হিসেবে কৃষিসংক্রান্ত বিষয় কবিতায় লেখা হলে চাষীদের মধ্যে প্রচারের বিশেষ সুবিধে হবে। ঠিক লিখেছেন—'ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা, নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা', অর্থাৎ বর্ষা হওয়া চাই ও ধানগাছের চারা বাতাসে দোলা চাই, তা হলেই সে গাছ জোরালো হবে এবং ফলন বেশী হবে। এইটাই ত জাপানী পদ্ধতি! ধরুন ফলন যদি দেড়া হয় আর ধানের বাজারদর যদি মণপ্রতি ৫৮৵/১৫ থাকে তা হলে—

অরুণ। (দুটি হাত উঁচু করে বাধা দিয়ে) একটু থামুন, দয়া করে একটু থামুন—

অশোক। (থেমে গিয়ে) কি বলছেন?

অরুণ। বলছিলাম কি আপনার রসবোধ ভারি সূক্ষ্ম। আপনাকে দেখে আমার একটি বন্ধুর কথা মনে হচ্ছে, শেয়ার-বাজারে কারবার করে অনেক টাকা করেছে। ঠিক আপনার মত মহা বিজ্ঞ লোক, দেখতেও অনেকটা আপনার মত—

করুণা। কার কথা বলছ—পরেশবাবুর কথা?

অরুণ। হ্যাঁ, দেখেছ কথা বলবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত এক!

অশোক। (হাসতে থাকে)

অরুণ। হাসিটিও মিলে যায়।

[গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে ওঠে]

চকিতা। (গুন গুন করে গান গায়) আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে—

করুণা। এইবার মনে পড়েছে, এতক্ষণ ভাবছিলাম এত চেনা মনে হচ্ছে কেন? গান শুনে মনে পড়ে গেল, পাশের বাড়ীর মালতী সারা বর্ষাটা ঐ গান গায়। তার সঙ্গে চকিতার চেহারারও আশ্চর্য্য মিল—চেয়ে দেখ!

চকিতা। (হাসতে থাকে)

করুণা। দেখ, দেখ, হাসিটি পর্য্যন্ত মিলে যাচ্ছে, সেই মাথাটি একটু কাত করে হাসা!

[গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে ওঠে, দমকা হাওয়া আসে]

চকিতা। (উচ্ছ্বসিত হয়ে) নদীতে ঢেউ উঠেছে, কি সুন্দর! নৌকোতে পাল তুলে দিয়ে যাব-নদীতে যাবার কথা ছিল, যাবে না?

অরুণ। তুমি যাও—আমি যাচ্ছি।

[চকিতা গান গাইতে গাইতে চলে যায়]

অশোক। (ঘড়ি দেখে) বেলা তো অনেক হ'ল, এখন তা হলে—

করুণা। তুমি গাড়ীতে গিয়ে বসো, আমি আসছি।

[illegible]

অরুণ। অশোকবাবুকে দেখে আমার ভারি ভাল লেগেছে। তোমার সব মত উনি মেনে নেন?

করুণা। সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নেন।

অরুণ। সব কথা শোনেন?

করুণা। অবশ্যই।

অরুণ। কখনো রাগ করেন না?

করুণা। কখখনো না।

অরুণ। সব সময় শেয়ারবাজারের কথা বলেন?

করুণা। সব সময়।

অরুণ। (গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে) ঠিক চকিতার মত, সব মত মেনে নেয়, সব কথা শোনে, কখনো রাগ করে না, সব সময় মুখে কবিতা।

করুণা। (অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে) ভাল লাগে?

অরুণ। (ভেবে চিন্তে) লাগে।

করুণা। সত্যি করে বলো।

অরুণ। (গম্ভীর ভাবে) মাঝে মাঝে ভাল লাগে না।

করুণা। মাঝে মাঝে আমারও ভাল লাগে না।

অরুণ। (আস্তে করুণার হাতখানি ধরে) সত্যি বলছ?

করুণা। সত্যিই বলছি।

[হঠাৎ আকাশে মেঘ ঘনতর হয়, বকুলতলায় অন্ধকার নেমে আসে, অরুণ আর করুণাকে দেখা যায় না, ঝালক মিলিয়ে যায়। একটু পরে অন্ধকার হালকা হয়ে আসে, ফুটে ওঠে অরুণ-করুণার শোবার ঘর। পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে দু'জনে, করুণার হাতটি অরুণের হাতের মধ্যে। ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, রোদ এসে পড়েছে বিছানায়।]

পল্লীগীতি—কাজরী গান

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের মধ্যপ্রদেশ উত্তর-প্রদেশ, গুজরাট, রাজপুতানা ইত্যাদি স্থানে শ্রাবণ মাস নারীদের অতি আনন্দের দিন। সারা শ্রাবণ মাস নারীরা উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে দোলনায় দোলে আর কাজরী গান গায়। শ্রাবণের শেষ পূর্ণিমায় রাখীবন্ধন উৎসবের অনুষ্ঠান করে নারীরা কাজরী গান ও ঝুলায় দোলাপর্ব্ব সমাপ্ত করে।

কাজরী গানে সাধারণতঃ পতিবিরহকাতরা নারীর প্রাণের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়। শ্রাবণের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, থেকে থেকে বিজলী চমকাচ্ছে, দেখতে দেখতে রিম্‌ঝিম্ করে বারিবিন্দু পড়তে সুরু হ'ল। নিশীথরাতে শূন্য শয্যায় বিরহিণীর হৃদয় উতলা হয়ে উঠল। পাগলা হাওয়ার সঙ্গে মন ছুটে গেল দূরে—সুদূরে, যেখানে তার প্রিয় এমনি ব্যাকুল হয়ে তার কথা ভাবছে। তরুণী বিরহিণী দোলনায় দুলতে দুলতে কাজরী গাইছে, আর সে গানে প্রিয়তমের জন্য অধীর উৎকণ্ঠা সুললিত ভাষায় ফুটে উঠেছে—

> বীতী ঔধি আবন কী, লালমন ভাবন কী
> ডগ ভই বাবন কী, সাবন কী রতিয়াঁ।

"আমার প্রিয়তমের আসবার দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, মন শঙ্কায় ভরে উঠেছে, শ্রাবণের রাত সুদীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে।"

আর এক গানে স্বপ্ন দেখে বিরহিণী চমকে বলছে—

> শ্যাম ঘরে নহী, ঘেরি আয়ে বদ্‌রা
> সোওতি রহেউঁ সপন ইক দেখিউঁ রামা
> খুলি গয়ে নৈন, চরিক গয়ে কজরা।

"শ্যাম ঘরে নেই, বাদল ঘিরে এসেছে, হে রাম! শুয়ে এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল, চোখের কাজল ধুয়ে গেল অশ্রুজলে।"

মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটের উৎসব-ভরা শ্রাবণ রাত নারীদের কাজরী গানে মুখরিত হয়ে উঠে। গ্রাম্য নারীরা তাদের হৃদয়ের সুখ-দুঃখ মান-অভিমান কাজরী গানের ভিতর দিয়ে সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছে। সে গানে মিষ্টি সুর আর পদাবলী হৃদয় স্পর্শ করে।

পতি প্রিয়তমা পত্নীকে নানা বসন-ভূষণে সাজাবে তা বিদেশে চলে গেছে রত্নালঙ্কার আনতে, ঘরে বিরহিণী পা[illegible] উদাস মনে গাইছে—

> "নথিয়া কে কারণ হরি মোরে উতরি গইলে পার
> রতিয়া সেজিয়া হো-অকেলী, দিনয়েঁা বতিয়েঁা ন সোইতে
> এক তো রাতি হো বড়ী হায়, দুসরে সঁইয়া বিছুড়ী
> তীসরে সাবণ-কে মহিনওঁা, ঝম্‌ঝম্‌কাতে বদরী।"

"আমার প্রিয়তম আমার জন্য নথ আনতে নদীর ওপারে চ[illegible] গেছে, রাতে শয্যায় আমি একাকিনী, দিনে কা[illegible] বাক্যালাপও সহ্য হয় না। প্রথমতঃ সুদীর্ঘ রাত কাটে ম[illegible]

তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে ভাল পথঘাট এবং কারখানার কর্মীদের বসবাসেরও সুবন্দোবস্ত করা দরকার।

বিগত ১৯৩৪ সনে ব্রিটেনে উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ সম্বন্ধীয় একটা বিশেষ জরুরি-আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষ আইনের ধারা অনুযায়ী সেখানে প্রথম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠিত হয়েছে। এষ্টেটটি ব্রিটেনের উত্তর-পূর্ব এলাকার অন্তর্ভুক্ত টিম উপত্যকায় অবস্থিত এবং এটা গঠিত হবার সময় হ'ল বিগত ১৯৩৮ সন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, এষ্টেটটির মূলধন এসেছে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে, যদিও এটা যৌথ আইন অনুযায়ী রেজেষ্ট্রি করা হয়েছে। এই এষ্টেটের পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কতকগুলো কারখানা-বাড়ী নির্মাণ করে ভাড়া দেবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, অবস্থা অনুযায়ী সেগুলিকে থোক কিংবা কিস্তিবন্দী হারে দাম নিয়ে বিক্রী করে দেবার কথাও বলা হয়েছে। কারখানা-বাড়ীর জন্ত ব্যবহৃত জমির মূল্য পরিশোধ করার জন্ত সরকারই দায়ী। এ ছাড়া এষ্টেটের স্কুল, বাজার, পথঘাট ইত্যাদি সম্বন্ধীয় খরচও সরকারের বহন করার কথা। ক্রমে ক্রমে টিম উপত্যকায় গঠিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের মত ব্রিটেনের অনেক জায়গায় আরও এষ্টেট গঠনের কাজ সুরু হয়ে গেল এবং এষ্টেটের কার্য্যাবলীর পরিধিও বেড়ে যেতে লাগল। যদি ভারতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিকল্পনা ব্যাপক এবং সার্থকভাবে কার্য্যকরী করা হয় তা হলে একদিকে যে রকম জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যাবে অন্তদিকে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবার আশা আছে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় নূতন নূতন কাজ সৃষ্টি হবার ফলে বহু লোক জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজে পাবেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, টাকা রোজগার করতে পারলে মানুষ নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চেষ্টা করে থাকে। কাজেই কারখানায় নিযুক্ত লোকের অর্থব্যয় করার ক্ষমতা যখন বাড়বে তখন অন্যান্ত শ্রেণীর লোক কারখানায় নিযুক্ত না হয়েও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় এবং ছোটখাটো শিল্পের সাহায্য নিয়ে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। তা ছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় যে সব জিনিষ দরকার সে সব জিনিষের অনেকগুলি বাইরে থেকে না কিনে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে ক্রয় করা যেতে পারে। যে এলাকায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠিত হবে সে এলাকায় একদিকে যে রকম পথঘাটের সুবন্দোবস্ত হবে, সে রকম অন্তদিকে শিক্ষার প্রসার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

ব্রিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পের প্রয়োজন অনুসারে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের উদ্দেশ্যও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। প্রথম যখন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন কেবলমাত্র কারখানা-বাড়ী তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল, কেবলমাত্র কারখানা-বাড়ী তৈরি করে ভাড়া দিলে কিংবা বিক্রী করলে চলবে না। এর কারণ হ'ল এই যে, সুষ্ঠুভাবে শিল্প পরিচালনার জন্ত যে অর্থ দরকার সে অর্থের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। অর্থাৎ, আমরা যে কথাটি বলতে চাইছি তা হ'ল এই যে, যদিও শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা হয়ত নেহাত কম ছিল না, তথাপি যেহেতু এঁদের অনেকের পক্ষে কার্য্যকরী মূলধন এবং যন্ত্রপাতির মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হ'ত না সেহেতু এঁরা সুষ্ঠুভাবে শিল্প পরিচালনা করতে পারেন নি। তাই এঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ভাড়া দেবার আয়োজন করা হ'ল। যাঁরা যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাঁরা কিস্তিবন্দী হারে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ লাভ করলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও শিল্প তেমন প্রসারিত হয় নি। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এমন আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'ল যেগুলির ফলে শিল্পের পরিচালকেরা কম দামে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করতে এবং ন্যায্য মূল্যে তৈরী মাল বিক্রী করতে সমর্থ হলেন। তা ছাড়া এষ্টেটের ভিতরেই স্থাপিত বারোয়ারী কারখানায় এঁদের পক্ষে যন্ত্রপাতি মেরামত করাও সুবিধাজনক হ'ল।

প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ভারতে এগারটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠনের জন্ত ইতিমধ্যে আয়োজন করা হয়েছে। বর্ত্তমানে যে-সব জায়গায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠন করা হবে বলে জানা গিয়েছে সে-সব জায়গার নাম হ'ল—রাজকোট, বিরুধনগর, গুইণ্ডি, কল্যাণী, ওখলা, পালঘাট-মালমপুকা, কুইলোন, মহীশূর, আগ্রা, কানপুর এবং এলাহাবাদ। রাজকোট সৌরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বিরুধনগর এবং গুইণ্ডি অবস্থিত মাদ্রাজে। কল্যাণী হচ্ছে পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত। ওখলা দিল্লীতে, পালঘাট-মালমপুকা মালাবারে এবং কুইলোন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অবস্থিত। অনুমান করা হয়েছে, এগারটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের জন্ত যে টাকা ব্যয় করা প্রয়োজনীয় হবে, সে টাকার মোট পরিমাণ পাঁচ কোটির কম হবে না। প্রশ্ন হ'ল, অত টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে। আপাততঃ এই সব এষ্টেট গঠনের জন্ত মোট যা খরচ পড়বে তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরবরাহ করতে রাজী আছেন। তবে টাকাটা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত অন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে না ততদিন পর্য্যন্ত যে-সব রাজ্যে এষ্টেট গঠিত হবে সে-সব রাজ্যের সরকার এষ্টেট পরিচালনার জন্ত দায়ী থাকবেন। শোনা যাচ্ছে, অদূরভবিষ্যতে এমন কতকগুলি আধা-সরকারী ক্ষমতাসম্পন্ন কর্পোরেশন গঠিত হতে পারে যেগুলির হাতে এষ্টেট পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

এত দিন পর্য্যন্ত আমরা দেখে এসেছি, আমাদের দেশে যাঁদের কারিগরী বিদ্যা অর্জ্জন করার সুযোগ হয়েছে তাঁদের বেশীর ভাগের পক্ষে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করা সম্ভবপর হয় নি। অর্থাৎ এঁরা চাকুরি করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আজ যদি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল

এষ্টেটের পরিকল্পনা সার্থকভাবে কার্য্যকরী করা হয় তা হলে এদের পক্ষে ছোট ছোট শিল্প-কারখানা—খোলা সহজ হবে এবং চাকুরি আর প্রধানতম অবলম্বন বলে বিবেচিত হবে না। তা ছাড়া ছোট ছোট কারখানার পরিচালকেরা যাতে দেশের সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী মাল সরবরাহ করার সুযোগ পান সেজন্যও চেষ্টা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে আবার এদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বলা হয়েছে, জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি দপ্তর গঠন করবেন এবং এই দপ্তর শিল্প-কারখানার পরিচালকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। এ ছাড়া প্রত্যেকটি এষ্টেটে যন্ত্রপাতি মেরামত করার জন্য একটি সাধারণ মেরামতি কারখানা খোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভারতের অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রসারিত করা দরকার। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমস্যা শিল্পের প্রসারকে ক্রমাগত ব্যাহত করে চলেছে। তাই সরকার শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি বহুমুখী কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছেন যেটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট গঠন করা। সরকার আশা করছেন, শহর এবং শহরবহির্ভূত এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পথে যে-সব বাধা বিদ্যমান, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপিত হলে সে-সব বাধা দূর হয়ে যাবে।

ভূমি-বণ্টন ও বেকার-সমস্যা

শ্রীঅজিতকুমার বসু

চাষীকে তার পরিবারের ভরণপোষণের উপযোগী জমি বিলি করার প্রয়োজনীয়তা দল ও মত নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববাদিসম্মত। নিছক কোন ভাববিলাস বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা করুণার বশবর্ত্তী হয়ে এ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নি। অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য, প্রশাসনিক ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা, মানবতা, সব দিক দিয়েই এ কথা বহু পূর্ব্বেই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে এ কথা স্বীকৃত হচ্ছে দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য বলেই। জীবীকার উন্নতি, নাগরিক জীবনের সর্ব্বমুখী বিকাশ, জনশক্তি তথা গণতন্ত্রের উন্মেষ, শান্তিময় পরিবেশ, জাতীয় শক্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, স্বাবলম্ব, আত্মবিশ্বাস, অটল দেশাত্মবোধ, এ সবেরই জন্য আশু চাষীর হাতে জমি বিলির অপরিহার্য্যতা যতদিন যাচ্ছে ততই বেশী করে প্রমাণিত হচ্ছে।

কেন যে একথা স্বীকৃত, একটু হিসাব নিয়ে ভূমি তথা চাষী সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেই তা বোঝা যাবে। ১৯৫১ সনের গণনার হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাংলায় মোটামুটি দু'লক্ষ পরিবার (প্রতি পাঁচ জনে একটি পরিবার) ভূমিহীন ক্ষেত মজুর। তা ছাড়া, কৃষিজীবীদের মধ্যে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার পরিবার আছে, যাদের হাতে পরিবার প্রতি এক-আধ থেকে পাঁচ একরের মধ্যে (তিন বিঘায় এক একর) এবং সর্ব্বসমেত ২৮ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩০ একর চাষের জমি আছে। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন (পরিবার প্রতি পাঁচ একর) প্রয়োজনের ৫৬ শতাংশ কম। রাজস্বমন্ত্রী একথা স্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে এদের সংখ্যা সাড়ে ১২ লক্ষ। এই দুই শ্রেণীর ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষী—মোট সংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ পরিবার।

যেসব এলাকায় ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল ও দো-ফসলা অন্তর চাষ হয়, সেসব স্থানে মজুরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা বেশী। তা সত্ত্বেও বছরে এদের আর পাঁচ মাস কোন কাজ থাকে না। অন্যান্য এলাকায় এদের বছরে তিন চার মাসের বেশী কাজ থাকে কিনা সন্দেহ। চাষ ছাড়া অন্যান্য কাজেও মজুরী করে এরা কিছু কিছু আয় করে। কৃষি-মজুরদের আয় ও বেকার সম্বন্ধে যে সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—এরা তিন মাসের অধিককাল বেকার থাকে এবং মাসাধিক কাল নিজের ঘরের কাজে নিযুক্ত থাকে। ঘরের কাজে বিশেষ কোন আয় হয় না বলে উক্ত তথ্যে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ, চার মাসের অধিককাল বেকার থাকে। কাজের সময়েই এরা যা মজুরী পায় (সরকারী তথ্য অনুসারে দৈনিক গড়ে মোট এক টাকা) তাতে এক দিনেরই সঙ্কুলান হয় না। ভাগে চাষ করে যা ফসল পায় তাতেও ছ' মাসের অন্ন সংস্থান হয় না। হাজা শুকোর দরুন ফসল নষ্ট হলে বা চাষ না হলে তো কথাই নেই, এবং চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এক বছর এইভাবে অজন্মা হয়েই থাকে। এদের মধ্যে আবার যারা কৃষি-কার্য্যে ও অন্য কায়িক পরিশ্রমে অক্ষম তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। এদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্ততঃ আট লক্ষ পরিবারের কর্ম্মক্ষমতা সারা বছর অকেজো থাকে। অর্থাৎ, এদের কোন ক্রয়-ক্ষমতাই নেই।

এ ছাড়া এক-আধ থেকে দশ একর জমি যাদের আছে, তাদের মধ্যে যারা নিজ হাতে চাষ না করে ভাগে করায় তাদের সংখ্যা হ'ল আনুমানিক ৩,৮১,৭৮২ পরিবার। এদের হাতে জমি আছে ১৬·৯০ লক্ষ একর। তে-ভাগার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্। বিভিন্ন ধারায় কারসাজিতে বর্গাদার-আইন কাজে লাগে নি। কাজেই আধা ভাগ হিসাবে এদের হাতে পরিবার প্রতি অন্ততঃ দশ একর জমি থাকা দরকার। এদেরও গড়ে শতকরা ৩১ ভাগ জমি কম আছে। প্রস্তাবিত ৩ ও ২ ভাগের হিসাবে আরও

কম হবে। শতকরা উনষাট ভাগ ভরণপোষণের সর্ব্বনিম্ন মান বা ক্রয়-ক্ষমতার অনেক নীচে আছে। এদের মধ্যে আনুমানিক আধা-আধি লোকের জমি ছাড়া অন্য অবলম্বন নেই। সংখ্যায় এরা ২·৩৩ থেকে ২·৬৩ লক্ষ পরিবার।

আবার, উৎপাদনমূলক ও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজে শ্রম বা শক্তি নিয়োগ না করে উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করায় অধিকার যদি স্বীকার না করা হয়, তা হলে এই সব অ-চাষী ভূস্বামীরা অধিকাংশই বেকার।

এর উপর আছে যারা "কৃষিজীবী" নয়। এদের সংখ্যা গ্রামে ৪৪ লক্ষাধিক এবং শহরে ৬২ লক্ষাধিক, একত্রে ১০৬ লক্ষাধিক লোক বা ২১ লক্ষ ২০ হাজার পরিবার।

বেকার-সংখ্যা সম্বন্ধে যে সরকারী তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জানা যায়, কেবল কলকাতাতেই ৫ লক্ষ ১৪ হাজার পরিবারের মধ্যে চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৮ হাজার। এদের মধ্যে ভারতীয় ও সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ২ লক্ষাধিক। এর উপর ৫০ হাজারের বেশী আছে যাদের স্বচ্ছল অবস্থা নয় বা পুরা কাজ নেই। কাজেই নিম্নতম ভরণপোষণ বা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে এদের মধ্যে অন্ততঃ ২০ হাজার লোকের কর্ম্মক্ষমতা অকেজো থাকে। কলকাতার কর্ম্মপ্রার্থীদের মধ্যে লক্ষাধিক লোক বাইরের। এদের বাদ দিয়ে কলকাতার হারে হিসাব করলে বাকি অ-কৃষিজীবী ১৬ লক্ষাধিক পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ সাড়ে তিন লক্ষাধিক সম্পূর্ণ বেকার। গ্রাম অঞ্চলে এদের হার আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

সুতরাং সারা বাংলায় সর্ব্বসমেত বেকারের বা কর্ম্মহীনের সংখ্যা অন্ততঃ ১৩ লক্ষ ১৭ হাজার বা সমগ্র পরিবারের ২৮ শতাংশ। এদের মধ্যে বাঙালী বেকারের সংখ্যা ১৩ লক্ষাধিক বা ২৬ শতাংশ। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, বাংলায় বেকারের সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক। সারা ভারতের অবস্থা এ থেকে সহজেই অনুমেয়—অন্ততঃ ২৫ শতাংশ যে বেকার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের সংখ্যা ৯ কোটি লোক বা ১ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবার। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হারে সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে তা বাড়বে বছর বছর—সারা ভারতে ৫০ লক্ষাধিক এবং বাংলায় সাড়ে তিন লক্ষ। এ ছাড়া এমন পরিবার আছে, যাদের আয় আছে কিন্তু পোষ্য কম। আবার এমন রোজগারী লোক আছে যার পোষ্যই নেই। তা ধরলে বেকার পরিবারের সংখ্যা বাড়বে।

কিছুদিন আগে গ্রামের লোকের জীবিকার মান নির্ণয়ের জন্য যে হিসাব নেওয়া হয়েছিল তা থেকে জানা যায়, ভারতে গ্রামের পরিবার প্রতি বছরে সাংসারিক ব্যয় ১,১৪৩৲ টাকা। উপরোক্ত ১৪ লক্ষ সম্পূর্ণ বেকারদের বা ২৪ লক্ষাধিক আধা-সিকি বেকারদের ব্যয় যে এই অনুপাতে কত হবে তা সহজেই অনুমেয়। এদের আয়ই নেই তো ব্যয় হবে কোথা থেকে!

জাতীয় আয়ের মাথা প্রতি গড় হিসাব ধরলেও এই সব গরীব ও বেকারদের অবস্থা অনুরূপ ভয়াবহ ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণিত হবে না। আবার যদি কৃষি-নির্ভর গ্রামবাসীদের জাতীয় আয়ের হিসাব ধরা হয়, তা হলে অবস্থা আরও ভয়াবহ বলেই প্রতিপন্ন হবে। সমগ্র জাতীয় আয়ের অর্দ্ধেকেরও কম আসে কৃষি থেকে। অথচ, কৃষি-নির্ভর গ্রামবাসীর সংখ্যা অন্যান্যের প্রায় দ্বিগুণ।

এই বিপুলসংখ্যক বেকার তথা ক্রয়-শক্তিহীন লোকের কর্ম্ম-সংস্থান যে কি দুরূহ, তা সকলেই বুঝছেন। এদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ভারতের মত গরীব, পরমুখাপেক্ষী ও কৃষিপ্রধান দেশের প্রকৃত কোন উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, বর্ত্তমান অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে না; সব ভেঙে পড়বে। এ সমস্যার সমাধান কি করে হবে সে আলোচনা এখানে নয়। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, কলকারখানা উন্নয়নমূলক কাজ বাড়িয়ে এদের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ পর্য্যায় এসেছে। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে যে বিপুল ও সাধ্যাতীত ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে তা খরচ হয়েছে বা হচ্ছে। তবুও বেকার-সমস্যার কোনরূপ উন্নতি না হয়ে ক্রমশঃ তা খারাপের দিকে নেমেই এসেছে। এ কথা সরকারও স্বীকার করছেন। শিল্পপতিরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যে খসড়া অভিমত দাখিল করেছেন, তাতেও তা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হয়েছে। এ কথাও স্বীকৃত হচ্ছে যে, কৃষিজাত দ্রব্যের দাম নামতে থাকায় কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতারও যে ক্রমাবনতি ঘটছে তা উদ্বেগজনক। সুতরাং কলকারখানায় সম্প্রসারণের সুযোগ কমে আসছে বৈ বাড়ছে না। তা ছাড়া, কতই বা কল-কারখানা বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় বাড়ান যাবে! তার পুঁজিই বা মিলবে কি করে! কল, কারখানা, খনি প্রভৃতি শিল্পে বর্ত্তমানে যত লোক নিযুক্ত আছে, তাদের প্রায় দেড় গুণ লোক বছর বছর বাড়ছে বা কাজের উপযোগী হচ্ছে। তার উপর এখনই বেকার হয়ে বসে আছে তাদের প্রায় পাঁচ গুণ লোক! সেই জন্যই সকলে একমত হয়েছেন যে, দেশের লোকের ক্রয়-ক্ষমতা বা ভোগ-শক্তি বাড়াতে হবে। বস্তুতঃ শিল্পপতিরা এবার এই ভোগ-শক্তি বাড়ানোর দাবিই বিশেষ জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। চাষীর হাতে জমি বিলির দ্বারাই তা বহুলাংশে সম্ভব। তাই জমি বিলির নীতি গৃহীত বা ঘোষিত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের পরিবর্ত্তনশীল রূপ

২৫শে এপ্রিলের ভোরবেলা। সবেমাত্র আঠারোটি গ্রাম-সমন্বিত এলাহাবাদ কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে সুরু হয়েছে। গ্রামপ্রান্তে অবস্থিত খেরওয়াই কেন্দ্রের গৃহটি ভর্ত্তি হয়ে গেছে চার থেকে আট বৎসর বয়সের শিশুদের দ্বারা। শিশুদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন আছে সেখানে এবং ভারপ্রাপ্ত গ্রামসেবিকা—যিনি একজন অভিজ্ঞা শিক্ষিকাও বটেন—শিশুরা এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিন-চার জন স্ত্রীলোকও অপেক্ষা করছে সেখানে, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ধাত্রীদের দ্বারা কতকগুলো সামান্য অসুখের চিকিৎসা করানোর জন্য।

শিশুদের ধুইয়ে-মুছিয়ে পরিষ্কার করানো হ'ল, তার পর প্রত্যেককে তিন থেকে চার আউন্স হিসেবে দুগ্ধ বিতরণ করা হ'ল। তারপর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাদের লেখাপড়া শিক্ষাদান করা হয়। অল্পবয়স সত্ত্বেও বেশীর ভাগ শিশুই লিখতে এবং পড়তে পারে, কেউ কেউ আবার পড়তে পারে প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত। শব্দার্থদ্যোতক যথোচিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে সমবেত সঙ্গীত করতেও তারা সমর্থ।

ধাত্রী হচ্ছেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্তা এবং যোগ্য কর্ম্মী। কিন্তু যতগুলি রোগীর পরিচর্য্যা করা অথবা সন্তান-জন্মের পূর্ব্বে এবং পরে যতগুলি প্রসূতির চিকিৎসা করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত, ততগুলি তিনি পান না। দৈনিক গড়পড়তা এদের সংখ্যা হচ্ছে দুই অথবা তিন। কেন্দ্রে যে সকল স্ত্রীলোক আসে, তাদের জন্যে তিনি যথোচিত চিকিৎসার বিধান দেন এবং সন্তান-জন্মের পূর্ব্বাবস্থায় গর্ভিণী স্ত্রীলোকদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের পরিচর্য্যা করেন। পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির আহ্বায়িকা শ্রীমতী এস. বর্ম্মা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন। গ্রামসেবিকাদের তিনি বিতরণ করেন কতকগুলো খাদির কাপড়ের টুকরো – সেগুলি দিয়ে তৈরি করতে হয় শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ। এই সমস্ত পোশাক তৈরি হলে, সকাল-বেলাকার ধোয়ামোছার পালার অব্যবহিত পরেই শিশুরা সেগুলো পরবে, তা ছাড়া যখন তারা কেন্দ্রে লেখাপড়া শেখে অথবা খেলাধুলো করে তখনও এগুলো তাদের পরতে হয়।

এখন বেলা দশটা—পয়গম্বরপুর কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছি আমরা—ওখানেও শিশুদের সম্পর্কিত কর্ম্মপ্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে। কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে হাজির হয় প্রায় চল্লিশটি শিশু, সেখানে তাদের লেখাপড়া এবং ছোট ছোট খেলনা ও পুতুল তৈরি করা শেখানো হয়। এই কেন্দ্রে মাতৃনাস্তি-সহায়ক কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু একজন দাই গর্ভিণীদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের পরিদর্শন এবং পরিচর্য্যা করে।

কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত গ্রামসেবিকা পরিণতবয়স্কা স্ত্রীলোকদের এবং বয়স্থা বালিকাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে এবং কোন একটি কারুশিল্প বিষয়ে তাদের উপদেশদানের নিমিত্ত নিয়মিত ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করে থাকেন।

মারছয়া কেন্দ্রে এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখি যে, ওখানকার ভারপ্রাপ্তা গ্রামসেবিকা হচ্ছেন এমন একজন অভিজ্ঞ এবং বর্ষীয়সী নারী যিনি স্থানীয় জন-সমাজের আস্থাভাজন এবং সকলেই তাঁকে সমর্থন করে—শিশুদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের (Literacy) ক্লাসটি পরিচালনা করছেন তিনি। পরিকল্পনা-কেন্দ্রে সমবেত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশটি শিশু, দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিদীপ্ত আনন, সকলেই তারা উৎসুক তাদের লেখাপড়ার জ্ঞান, চরকা চালানোর কৌশল এবং সঙ্গীত-নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে। একদিকে যেমন ছোট ছেলেদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ক্লাস এগিয়ে চলেছে উন্নতির পথে, অন্য দিকে তেমনি অধিকবয়স্কা বালিকারা—তাদের সংখ্যা হবে প্রায় কুড়ি জন—পাখা তৈরি এবং সুতাকাটায় তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে।

গ্রাম পরিদর্শন

এলাহাবাদ উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্তর্গত তিনটি কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয় কতকগুলো চরকা। কেন্দ্রের অধীন গ্রামসমূহের বয়স্থা বালিকারা এগুলোর সাহায্যে সুতো

কাটতে শেখে। গ্রামসেবিকারা অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্লাস পরিচালনা এবং স্ত্রীলোকদের সেলাই, সুতাকাটা অথবা অন্য কোন কারুশিল্প শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে-সপ্তাহে দুই কিংবা তিন দিন সন্ধ্যাকালে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করেন। অচিরেই কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা হবে বালওয়াদির সাজ-সরঞ্জাম, তখন শিশুরা তাদের শারীরিক শক্তিরও বিকাশ-সাধনের পথ খুঁজে পাবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামগুলিতে মাতৃনীতিবিষয়ক সাহায্যের অভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু যেটুকু-বা চিকিৎসাবিষয়ক পরামর্শ এবং ধাত্রীদের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তার সুযোগ-গ্রহণেও গ্রামবাসীরা প্রতিনিবৃত্ত হয় নিজেদের ঐতিহ্যগত কু সংস্কারবশতঃ। গ্রামীণ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক শিক্ষিতা ধাত্রী পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন, কিন্তু যখন তাদের পাওয়া যায় তখন গ্রামের মেয়েরা যাতে তাদের পরামর্শ এবং সাহায্যের সুযোগ গ্রহণ করে তদনুযায়ী শিক্ষা তাদের দিতে হবে। এলাহাবাদস্থিত পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতি, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৫০০০৲ টাকা আর্থিক সাহায্য দ্বারা কমলা নেহরু হাসপাতাল কর্ত্তৃক ক্রীত 'মেডিক্যাল ভ্যানে'র মাধ্যমে চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্যকে গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

নারীদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদান

গ্রামীণ স্ত্রীলোকদের নিমিত্ত অনুষ্ঠেয় কল্যাণকর্ম্মের প্রথম দফা হচ্ছে তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। প্ররোচনা দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কেন্দ্রসমূহের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা-দানের ক্লাসগুলিতে অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য অংশতঃ দায়ী পরম্পরাগত পর্দ্দা-প্রথা এবং গৃহের গণ্ডীর বাইরে আসতে নারীদের অনিচ্ছা। "কন্যাদের আমরা পাঠাব লেখাপড়া শেখবার জন্যে, কিন্তু আমরা নিজেরা চাই এর হাত থেকে রেহাই পেতে"—অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদানের কোর্স সংগঠনের চেষ্টা করতে গিয়ে গ্রামসেবিকাদের প্রায়শঃই এ ধরনের যুক্তির সম্মুখীন হতে হয়।

গ্রামকল্যাণ-কর্ম্ম সুনির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করবে তখনই যখন অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মী পাওয়া যাবে। উত্তরপ্রদেশের অনেকগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রে যে সকল গ্রামসেবিকা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তারা শিক্ষাপ্রাপ্তা নন—যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে তাঁদের কথা, এলাহাবাদের তিনটি প্রোজেক্টে যাঁদের কর্ম্মে নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষণ-কেন্দ্রসমূহ থেকে যেমন যেমন এবং যখন শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীরা বেরিয়ে আসবেন তখনই অশিক্ষিতদের জায়গায় তাঁদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে আর প্রথমোক্তদের হয় শিক্ষণের জন্য কেন্দ্রে পাঠানো হবে, নতুবা বিদায় দেওয়া হবে।

চটপটে শিশু

উল্লিখিত উন্নয়ন-পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-সূচী এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহ দিনের পর দিন সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। এর ফল পরিলক্ষিত হতে পারে শিশুদের উজ্জ্বল এবং উৎসাহদীপ্ত আননে। সাক্ষরতার পথে শিশুদের উন্নতির জন্য তাদের পিতামাতারা যে গর্ব্ববোধ করে তাও এই সকল প্রচেষ্টার সাফল্যের দ্যোতক। এই বিষয়টির মত উৎসাহপ্রদ আর কিছুই নয় যে, কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা-সমূহের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান 'পুরুষে'র গ্রামীণ শিশুদের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা বেড়ে উঠছে—ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যবিধি, লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা ও কোন কারুশিল্পে আত্মনিয়োগ করে নিজেদের অবসর সময়ের সর্ব্বাধিক সদ্ব্যবহার—এসকল বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। গ্রামগুলিতে এই প্রীতিকর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে কল্যাণ প্রোজেক্টের কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা এবং এখন আর পশ্চাদ্-বর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

অপর একটি বিষয়ও কম উৎসাহপ্রদ নয় যে, গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহের জন্য ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড ও গৃহ এবং কেন্দ্রের গৃহনির্ম্মাণকল্পে শ্রমদান করছে। এলাহাবাদ প্রোজেক্টের যে তিনটি কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে পয়গম্বরপুর এবং মারহুয়া কেন্দ্রে গ্রামবাসীরা বিনামূল্যে ভূদান করেছে; পক্ষান্তরে থেরওয়াই কেন্দ্রে, ঠিক গ্রামের বাইরে খোলা মাঠের মধ্যে যে রমণীয় গৃহে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত, সেই গৃহটি নামমাত্র ভাড়ায় প্রোজেক্ট কমিটির দখলে রাখা হয়েছে।

গ্রামীণ লোকেরা গ্রামসেবিকাকে এখন যে সকল গ্রাম নিয়ে কেন্দ্রটি গঠিত সেগুলোর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মেনে নিয়েছে। গ্রামবাসীরা এই কর্ম্মীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তৎপরতার সঙ্গে, অন্যথায় তাকে ভেসে বেড়াতে হ'ত। গ্রামের লোকেরা এটা প্রত্যাশা করে যে, হয় ত তাঁর যোগ্যতা যতটুকু তার চেয়েও বেশী কাজ তিনি গ্রামের নারী এবং শিশুদের জন্যে করবেন। তিনি কেবল সাধারণ কল্যাণ-কর্ম্মে নিয়োজিত গ্রামীণ কর্ম্মী নন, একজন কারুশিল্প শিক্ষা-দাত্রী এবং শিক্ষিকাও বটেন।

পার্ব্বত্য গ্রামকেন্দ্র

শ্রীরতনপ্রভা রায়

টিহরি গাড়োয়ালের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে প্রসারিত হিমালয় পর্ব্বতমালার পাদদেশস্থ পাহাড়গুলোতে এমন কয়েকটি ভগ্ন-জীর্ণ খড়ো-ছাওয়া চালাঘর আছে, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পার্ব্বত্য দৃশ্যের সঙ্গে যেগুলোর বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলোকে কুঁড়ে-ঘর, আস্তাবল এমনকি বাসযোগ্য আস্তানার সঙ্গে ন্যূনতম সাদৃশ্যযুক্ত কোন কিছুরও সমপর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না।

এক শতের কিছু বেশী লোকসংখ্যাবিশিষ্ট, জীর্ণদশাপ্রাপ্ত কতকগুলি কুটীর নিয়ে এই চুপরাইলি নামক পল্লী। এখানেই আকস্মিকভাবে আমি দেখতে পাই—টিহরি গাড়োয়ালস্থ আমাদের প্রথম কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা-কেন্দ্রটিকে। নরেন্দ্রনগর থেকে চম্বাগামী চক্রাকার পথে চক্কর দেওয়ার কালে আমি যে "জেলা কল্যাণকেন্দ্র, চুরপাইলি"—এই সাইনবোর্ডটি দেখতে পাব সে ছিল সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত। এই অঞ্চলে এখানেই প্রথম চেষ্টা চলছে—শিশু, নারী এবং পুরুষদের বুনিয়াদী শিক্ষাদান, অবসরবিনোদের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্য দেওয়ার। একটি আস্তাবলের এক তলায়—যার কোন অংশ সাধারণ একটি কাঠের 'দিভানে'র ভারে ধ্বসে যেতে পারে, আমাদের গ্রামসেবিকার একটি অন্ধকার নোংরা ঘরে আমাদের কেন্দ্রের ঔষধালয়টি অবস্থিত। এই ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়টি উপযুক্ত আস্তানার অভাবে গত আট মাসের মধ্যে প্রায় আধ ডজন স্থান পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু এতে চুপরাইলি এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহ থেকে আগত শিশুদের সংখ্যা আশাপ্রদ। বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠাতে গ্রামবাসীদের যে ঔদাসীন্য বিদ্যমান সেকথা বিবেচনা করলে এটা বেশ উৎসাহজনক বলেই মনে হয় যে, এর 'বালওয়াদি'র রেজিষ্টারী বইয়ে প্রায় ত্রিশটি শিশুর নাম আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসে এই কেন্দ্র থেকে দুই-তিন মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ থেকে। ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত চার মাসের মধ্যে এই কেন্দ্র থেকে প্রায় ছয় শত লোককে চিকিৎসা-বিষয়ক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আমাদের গ্রাম-সেবিকারা প্রসূতিদের পরিচর্য্যাও করেছেন।

চুপারাইলি কেন্দ্রকে কোন দিক দিয়েই আদর্শ কেন্দ্র বলা যেতে পারে না। কিন্তু এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে কর্ম্মীকে যে সকল দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো এবং বিশেষভাবে, টিহরি গাড়োয়ালের অনুন্নত অঞ্চলসমূহের জীবনযাত্রার মান ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল আছেন, তারা জানেন যে, এখানে যে কোন ধরনের কল্যাণ-কর্ম্মের সংগঠনই নিরতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এখানে কল্যাণ-কর্ম্মানুষ্ঠান নিঃসন্দিগ্ধরূপের হতে পারে একজন কর্ম্মীর ত যোগ্যতা, অধ্যবসায় এবং কর্ম্মে আন্তরিকতার কষ্টিপাথর-স্বরূপ যেন। এখানকার পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা এবং আনুষঙ্গিক অসুবিধাসমূহের কথা কল্পনা করাও কঠিন। কোন কোন স্থানে এক বালতি জলের জন্যে আমাদেরগ্রাম-র সেবিকাদের দিতে হয় দুই আনা থেকে চার আনা পর্য্যন্ত, তাও আবার সকল সময় আনতে হয় প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী, নীচেকার পাহাড়ের পাদদেশ থেকে। সেখানে আবার মাছিরও প্রাচুর্য্য এবং প্রায়শঃই একথা ভেবে অবাক হতে হয় যে, সরবরাহ-করা সমগ্র পরিমাণ ডি.ডি.টি. অথবা অন্য কোন কীটপতঙ্গ-বিনাশক দ্রব্য তাদের সংখ্যা কমাতে সক্ষম হবে কিনা।

এটা মানতেই হবে যে, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা প্রতিফলিত হয় জীবনযাত্রার মানের উপর এবং অজ্ঞানতা, অশিক্ষা এবং কুসংস্কার এই তিনটির প্রতি-বন্ধকতার দরুন জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নও সম্ভবপর হয় না, কেননা এগুলো আমাদের যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে করে ব্যাহত। ভারতের জনসমষ্টির এমন কোন অংশকে যদি আমি দেখে থাকি যাদের পরনের ন্যাকড়াটুকু পর্য্যন্ত জোটে না তো তা দেখেছি আমি এই টিহরি গাড়োয়ালে। আমার মানসলোকে তারা প্রতিভাত হ'ল দীর্ঘকাল যাবৎ টিহরি গাড়োয়ালে বসতি-স্থাপনকারী এক রাজপুত বংশের লোক-রূপে, এদের সমাজে পুরুষদের নির্দ্ধারিত কাজ হচ্ছে, অল্প-স্বল্প চাষবাস করা। দিনের বাকী সময়টুকু এরা কাটিয়ে দেয় গল্পগাছা ও ধূমপান করে আর উদয়াস্ত অবিশ্রান্ত খেটে যাওয়া হচ্ছে এদের মেয়েদের অদৃষ্টলিপি।

সাধারণ এক পাহাড়ী মেয়ের দিনের কাজ সুরু হয় কাস্তে হাতে ধানক্ষেতের অভিমুখে দ্রুত ধাবনের ভেতর দিয়ে। বিকেলবেলা সে ঘরে ফিরে আসে, পরিবারের জন্য রান্নাবান্না করে, আবার ফিরে যায় মাঠে, গরু মহিষের করে তদারক, ঘাস কাটে, নিয়ে আসে পরিবারের প্রয়োজনীয় জল, তারপর মন দেয় শিশুদের পরিচর্য্যায়। সন্ধ্যাবেলা তাকে বসতেই হবে দিবসের সংগৃহীত শস্যের তুষ-ঝাড়া এবং ওবেলার খাবারের জন্যে সেগুলোকে যাঁতার সাহায্যে চূর্ণ করার কাজে। কৃষিই এদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন এবং ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন শস্য দ্বারা গড়পড়তা একটি পরিবারের বৎসরে কায়ক্লেশে ছয় মাসেরও যে ভরণ-পোষণ হয় না সেকথা বিবেচনা করলেই এই সকল লোকের দারিদ্র্য যে কত কঠোর তা উত্তমরূপেই কল্পনা করা যেতে পারে। হয় ত এর থেকেই

বুঝতে পারা যাবে কেন এই এলাকার বিপুলসংখ্যক লোক জীবিকার সন্ধানে চলে যায় সমতল অঞ্চলে। বহু বিবাহ এদের সমাজে অতি সাধারণ ব্যাপার, কেননা পরিবারে কোন বাড়তি স্ত্রীলোকের স্থানলাভ মানেই ক্ষেতে এবং গৃহে হাড়-ভাঙা খাটুনির জন্যে একজন অতিরিক্ত সাহায্যকারিণী লাভ। কিন্তু যে বিষয়টি হৃদয়বিদারক তা হচ্ছে এই যে, কোন বালিকার বয়স যখন পাঁচ বছরের কাছাকাছি তখন তাকে করতে হয় একজন পূর্ণবয়স্কা নারীর করণীয় যাবতীয় কাজ। পাঁচ বৎসরবয়স্কা লক্ষ্মী—যাকে বলা যেতে পারে আমাদের বালওয়াদির একমাত্র চটপটে মেয়ে—বিদ্যালয়ে আসা থেকে বিরত হ'ল, কেননা ফসল কাটার জন্য তৎপর হওয়া হয়ে দাঁড়াল তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ঠিক যখন আমি ঐ স্থান পরিত্যাগ করবার উপক্রম করছি তখন সে ফিরে এল মাঠ থেকে—মাথায় সযত্নে সংস্থাপিত সারা দিনের সংগৃহীত শস্যের বোঝা নিয়ে, কপাল বেয়ে তার ঝরে পড়ছিল মুক্তামালার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সুতরাং আমাদের বালওয়াদিতে মেয়েদের উপস্থিতির সংখ্যা স্বভাবতঃই কম।

কেবলমাত্র যখন ঔষধের প্রয়োজন হয় সেই সময় ছাড়া স্ত্রীলোকেরা আদৌ আমাদের কেন্দ্রে আসে না, এমনকি সেই উদ্দেশ্যেও তারা তখনই আসে যখন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত মারাত্মক। অতি সাম্প্রতিককালে মাত্র ডিস্পেন্-সারির উপর গ্রামবাসীদের কিয়ৎপরিমাণ আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রোগাক্রান্ত এবং ব্যাধিক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের মনে এ ধারণা জন্মাতে আমাদের গ্রামসেবিকাদের বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছিল যে, আমাদের কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্তব্য ঔষধাবলী তাদের তাবিজ-কবজ এবং স্থানীয় গাছ-গাছড়া ও টোট্‌কার মতই কার্য্যকরী হতে পারে। এ অঞ্চলে শিশুমৃত্যু এবং সন্তান-জন্মের সময় প্রসূতিমৃত্যুর হার এত উচ্চ যে, তা রীতিমত ভীতিপ্রদ। কোন প্রসূতির বেলায় যে সকল জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে তৎসম্বন্ধে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে একটা সাধারণ ঔদাসীন্য বিদ্যমান। এ সমস্ত 'কেস' যে পর্য্যন্ত না এরূপ খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে, তার দরুন মাতা অথবা শিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে সে পর্য্যন্ত কেন্দ্র কিংবা হাসপাতালের গোচরে আনা হয় না। প্রায়শঃই আমাদের গ্রামসেবিকারা নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বলে বোধ করেন, কেননা আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বুড়ী দাই, কিংবা গ্রামের পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক কেউই তাঁদের উপদেশে কর্ণপাত করে না। এই সকল অঞ্চলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের গর্ভজাত জারজ সন্তানের সংখ্যা প্রচুর। পুরুষ-সমাজ থাকে একাদিক্রমে কয়েক বৎসর বাইরে সমতল অঞ্চলে এবং তার দরুন স্বতঃই সৃষ্টি হয় এই ধরনের জটিল সমস্যার।

কোটস্থিত আমাদের কেন্দ্রের অবস্থান কতকটা উৎকৃষ্টতর এই দিক দিয়ে দেখলে যে, এখানকার লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানকার জনসমষ্টির এক দল হচ্ছে প্রাক্তন সৈন্যবাহিনীর লোক—যারা সৈনিক-জীবন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গ্রামের অবস্থার উন্নয়নকল্পে প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করছে। আমাদের প্রচেষ্টাসমূহে তারা সাড়া দেয় অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে, আমাদের কর্ম্মসূচীগুলিকে তারা করে অভিনন্দিত। আমাদের এখানকার কেন্দ্রে মেয়েদের অনুপস্থিতি এক লক্ষণীয় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। কোট কেন্দ্রের বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র মেয়েদের উপস্থিতির কারণ এই যে, এখানে ইতিপূর্ব্বেই স্থানীয় কোন বিভাগ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের একটি স্কুল আছে। এখানে বিশেষ ভাবে ছোট-খাটো কতকগুলি কারিগরি কাজ সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছিল। আমাদের কেন্দ্রে যারা আসে তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতমা, তিন বৎসর বয়স্ক ঝুমলার প্রতি আমি বরং আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম—কবিতা আবৃত্তি, বর্ণমালার পুনরাবৃত্তি, এমনকি এরূপ কিছু তৈরি করার সার্থক চেষ্টা যা দেখতে খেলনার মত—এই সকল বিষয়েও সে তার সমবয়স্কা, শহরে প্রতিপালিতা যে-কোন শিশুর সমকক্ষ।

যদিও এই সকল অতি সামান্য সূচনা বলে প্রতীয়মান হতে পারে, তথাপি কল্যাণ-সম্প্রসারণ পরিকল্পনাসমূহের প্রবর্ত্তন এবং যে ভারতীয় রেড ক্রশ এই অঞ্চলসমূহে বিস্তর ক্ষেত্রপ্রস্তুতি কর্ম্ম (Spade work) করেছে তার কার্য্যাবলী মনে এই আশারই সঞ্চার করে যে, অশ্রান্ত চেষ্টা এবং অধ্যবসায় দ্বারা অর্জ্জিত হতে পারে অনেক কিছুই। সাফল্যের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে সেই সকল শিশুকে দেখে যারা আমাদের কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে হাজির হয়। যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে অন্য যে-কোন সুস্থ এবং স্বাভাবিক যুবতী মেয়ের মত, পাহাড়ী তরুণীরও যে বুদ্ধিবৃত্তি এবং নূতন ভাবধারা গ্রহণ-ক্ষমতার বিকাশ হতে পারে তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় রামেশ্বরী এবং পরমেশ্বরীর দৃষ্টান্ত থেকে—চম্বা রেডক্রশে যারা এসেছিল সীতা পাঠ শেখবার জন্যে। আজ তারা সেলাইয়ের কলে কাজ করতে পারে, সুতা কাটতে পারে, তারা পড়ছে পঞ্চম শ্রেণীতে এবং স্বাধীনভাবে অন্য যে-কোন স্থানে অনুরূপ কর্ম্ম সংগঠিত করতে পারে। এটা বেশ উৎসাহপ্রদ ব্যাপার যে, অপর একটি কেন্দ্র থেকে সেবামূলক কর্ম্মের জন্য তাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন এই সকল পাহাড়ের সন্তানগণ একত্রিত হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের নিজস্ব রমণীয় পার্ব্বত্যভূমির উন্নয়নকল্পে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে।

হিমাচলের কয়েকটি কল্যাণকর্ম্মকেন্দ্রে

ফ্রেদা বেদী

আমাদের পর্ষদের প্রত্যেক চেয়ারম্যানই কি বয়সের দাবির কথা ভুলে গিয়ে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে সেখানে চলে যেতে পারেন না যাকে বলা হয়েছে 'পরিচিত পৃথিবীর একেবারে বাইরের সেই বিরাট অঞ্চল'। হিমাচল প্রদেশে, আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য পাকদণ্ডি পথে সিমলা থেকে আশী মাইল অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছুলাম রামপুরে। ছোট বাজার এবং জেলা শহর হলেও চিনি উপজাতীয় লোকদের শীতকালীন কেন্দ্র এবং যে পর্ব্বতমালা তিব্বত সীমান্তে চিনিদের স্বদেশাভিমুখে প্রসারিত তার পাদদেশে অবস্থিত বলে রামপুরের একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। রামপুর থেকে উপরের দিকে উঠে আমরা শেষ জীপটিকে দেখতে পেলাম এবং সেখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে মোটর রোডের প্রান্ত-সংলগ্ন পাহাড়ের পার্শ্বদেশস্থ আঁকাবাঁকা পথে এগোতে লাগলাম।

প্রথম আমাদের থামতে হ'ল শিঙ্গলায় এসে। এখানকার প্রবেশপথটি উত্তমরূপে প্রস্তুত একটি রাস্তার উপরে। পঞ্চায়েত সভ্যেরা যখন এটির সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করিয়ে দিচ্ছিল তখন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাদের আনন। তারা বলতে লাগল—"দেখুন শ্রমদান দ্বারা আমরা কি করেছি।" তাদের এই চেষ্টা নিশ্চিতই প্রশংসনীয়। রাস্তার উপরিভাগের দৃঢ়তা সম্পাদন করা হয়েছে চতুষ্পার্শ্বের ক্যাকটাস গাছগুলিকে ভূপাতিত করে এবং কর্দ্দমাবরণের নীচে তাদের স্তরে স্তরে স্থাপন করে। এটা হ'ল চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক মধুর ভাবে শাসানোর হাতেকলমে প্রত্যুত্তর। চেয়ারম্যান তাদের এই বলে শাসিয়েছিলেন যে, রাস্তার যদি উন্নতি-বিধান না হয় তা হলে তিনি কেন্দ্রটিকে এখান থেকে সরিয়ে নেবেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি আমাকে বললেন যে, রাস্তার এই উৎকর্ষের জন্য ইদানীং অর্দ্ধেক কষ্টের লাঘব হয়েছে এবং ঘোড়ায় চড়ে আসতেও আগেকার চেয়ে অর্দ্ধেক সময় লাগে।

শিঙ্গলা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়িকা একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত হিমাচলী গ্রামসেবিকা। এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সুষ্ঠুভাবে। বালওয়াদিতে ছিল সতেরটি প্রাণচঞ্চল শিশু এবং পঁচিশ জন তরুণী ও বয়স্কা স্ত্রীলোক। "তারা আমাকে দুই-এক দিনের ছুটি পর্য্যন্ত নিতে দেয় না।" গ্রামসেবিকা অনুযোগ করলেন—"পাছে আমি আর ফিরে না আসি! আমি তাদের বলি যে, আমি ত এখানে সারা জীবন কাটাতে আসি নি। তখন তাদের চোখের কোলে দেখা দেয় অশ্রুরেখা। শেষ পর্য্যন্ত আমরা এই সব হেসে উড়িয়ে দিই এবং কাজ চালিয়ে যাই।" পাহাড়ী সুন্দরীরা মৃদুভাবে হাসল, শিশুরা করে উঠল উচ্চহাস্য—বেশ একটি হাসিখুশী ভরা পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। যদিও এই কেন্দ্রের চিকিৎসাবিষয়ক দিকটির বিকাশসাধন হয় নি তথাপি হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় অশিক্ষিত সহকারী বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছে এবং অনেকগুলি অসুস্থ শিশুর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। যখন আপনি একথা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন যে, হাসপাতালটি পাহাড়ের চড়াই উতরাই পথে পাঁচ মাইলেরও বেশী দূরে এবং সেখানে যেতে হয় টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে তখন এটা আপনার নিকট খারাপ 'রেকর্ড' বলে প্রতীয়মান হবে না। অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় এখানেও হিমাচলের গ্রাম্য লোকে অধীর আগ্রহে আমাদের প্রথম ধাত্রী এবং শিক্ষাপ্রাপ্তা দাইয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে এবং তারা যখন আসবে তখন তারা হবে গ্রামবাসীদের পক্ষে বিধাতার পরম আশীর্ব্বাদস্বরূপ। মিসেস আমিনচাঁদ কর্ত্তৃক একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণকল্পে অর্থসাহায্যের আবেদনের পরে অপরাহ্ণের অবসান হ'ল। পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান—অর্থসংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত-সদস্য কর্ত্তৃক বিনামূল্যে একটি ছোট নাটকের অভিনয়। জনৈক গ্রামবাসীকে যখন একটিমাত্র টাকা দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করা হ'ল তখন তা এড়াবার জন্যে সে কি কৌশল অবলম্বন করেছিল—দ্রুত মূক অভিনয়ের মাধ্যমে তাই দেখালেন তিনি। যাদের চাঁদা বাকি রয়ে গেছে তাদের নামের একটি কৌতূহলোদ্দীপক তালিকা পঠিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, গৃহমধ্যে নিরাপদে তালাবন্ধ টাকার থলিটি নিয়ে আসবার জন্যে তার ছেলেকে পাঠালে। সেটি আনীত হলে পর অকুস্থলেই তার দেনা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে সাড়ম্বরে সেটি সে খুলে ফেলল। আমরা অভিভূত হলাম এবং সে যখন নৈতিক উপদেশ চালিয়ে যাচ্ছিল আর কড়াকড়িভাবে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে "পরিবার পিছু প্রতি মাসে চার আনা" চাঁদার জন্য আবেদন জানাচ্ছিল তখন আমরা সে স্থান পরিত্যাগ করলাম।

বাতালি কেন্দ্রের বিদ্যালয়-গৃহটি আমাদের মনে জাগিয়ে

ভুলল পুলক-শিহরণ—একদল রাজমিস্ত্রী, করাত এবং তক্তা নিয়ে কর্ম্মরত ছুতোর এবং সাধারণ সাহায্যকারিগণ—তাদের মধ্যে কারুর হাত সক্রিয় আবার কেউ বা দিচ্ছে মৌখিক উপদেশ—এদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এটি গড়ে উঠেছে। ঔষধালয় এবং বালওয়াদি বিদ্যাভবনের নিমিত্ত দুটি চমৎকার ছোট ঘরের দেয়াল ও ফ্রেম ইতিমধ্যেই দাঁড় করানো হয়েছে—একতলায় হবে কর্ম্মচারীদের থাকবার জায়গার ব্যবস্থা। এর সবটুকুই সম্পন্ন হয়েছে "শ্রমদান" বা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত শ্রমের দৌলতে। বোর্ডের নিকট প্রত্যাশী হয়েছিল তারা শুধু ছাদের কাঠামোর জন্তে দস্তার চাদরের মূল্যের নিমিত্ত। "জিঙ্ক শীট"কে তারা "চাদর" এই সুন্দর নামটিই দিয়েছে।

এখানকার শিশুরা হৃদয়কে কি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে! হিমাচল যে লোকনৃত্যে সর্ব্বভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছিল তার মূলে সঙ্গত কারণ রয়ে গেছে। এখানকার ক্ষুদে কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষার্থীদের রক্তের সঙ্গে মেশানো রয়েছে পরিচ্ছন্ন পাদকর্ম্ম এবং চিত্তোন্মাদক সূক্ষ্ম ছন্দোমাধুর্য্যের ঐতিহ্য। ছেলেরা মেয়েদের চেয়েও অধিকতর নৃত্যনিপুণ। আমার বিশেষভাবে ভাল লেগেছিল একটি ছোট বাচ্চাকে, মাথায় ছিল তার একটি মখমলে মোড়া টুপী—টুপীটির এক কোণে শোভা পাচ্ছিল প্রকাণ্ড একটি কাগজের ফুল। যদিও দুপুর-বেলার গরমে শরীর ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছিল তথাপি তার গায়ে ছিল হাতে-কাটা পুস্ত দিয়ে তৈরি একটি বড় কোর্ত্তা—এক বা দুই বছরের শিশুর পক্ষে সেটিকে যথেষ্ট বড় বলতে হবে। কিন্তু তখন ওখানে "পরিদর্শক" (আপনাদের সম্পাদিকা) আসছেন যে, এবং শিশুর কৃতিত্বে গর্ব্বিতা মাতা ভাবছিল, কে জানে হয় ত সেখান থেকে তার ছেলের নাম হয়ে পৌঁছতে পারে বাইরের জগতে। কিন্তু শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ছেলেটির নামটা আমি মনে করতে পারছি না, কিন্তু এখনও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাই, শিশুটি স্বচ্ছন্দে বৃত্তাকারে পদক্ষেপ করছে সুগভীর আত্ম-প্রত্যয় সহকারে এবং নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে চলেছে তার সুললিত সঙ্গীত।

ওখানকার ধাত্রী ছিলেন চিনি থেকে আগত জনৈকা বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী। একটি হাসপাতালে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার মত 'এডভেঞ্চারে'র আনন্দ উপভোগ করবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর, হাসপাতালের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তিনি, এবং তাঁর সঙ্গে ছিল চৌদ্দ বৎসর-বয়স্কা একটি ভাইঝি। আমার উপর আস্থা স্থাপন করে তিনি আমাকে বললেন—আমি একে লিখতে এবং পড়তে শেখাচ্ছি, একে গড়ে তুলতে চাই একজন নার্সরূপে। মুমূর্ষুকে সাহায্য দান নিশ্চয়ই উত্তম 'সেবা'।" "গ্রামবাসীরা কিরূপ সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করেছিল?"—আমি জিজ্ঞেস করলাম। "যে পর্য্যন্ত না সন্তান-জন্মকালে তাদের একজন স্ত্রীলোকের প্রাণবিয়োগের উপক্রম হয় সেই পর্য্যন্ত আমার সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও তারা আমার কাছে ঘেঁষে নি। কোন-না-কোন উপায়ে জীবন্ত অবস্থায় শিশুটির প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করাতে আমি সমর্থ হই—মায়েরও জীবন রক্ষা পায়। আর শিশুটি ছিল একটি পুত্রসন্তান। আরও তিনবার বিপজ্জনক 'কেস'গুলোর বেলায় আমাকে ওরা ডাকিয়েছে এবং ভগবানের কৃপায় তাদের সকলকেই বাঁচাতে আমি সক্ষম হয়েছি। এখন তারা আমাকে সদ্ভাবে, যথোচিত সমাদরেই গ্রহণ করেছে, এবং আর কোন অসুবিধা নেই।"

খুব অধিকসংখ্যক শিশুর মেলা এখানে—সবাই চটপটে এবং বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমি এটা উপলব্ধি করি যে, এই কেন্দ্রে শিশুদের সমক্ষে অন্ততঃ একটি নবজীবনের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

দানশীল টেক সিং, তাঁর নিজের গ্রামে যাতে বিদ্যালয় এবং পুরা কর্ম্মীসংসদসমন্বিত একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে জমি এবং সে স্থানেই একটি একতলা গৃহ দান করেন। সাময়িক হেড কোয়ার্টার্সের জন্ত তিনি দুইটি উৎকৃষ্ট নূতন পাহাড়িয়া কুটীর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করেছিলেন।

শ্রীমতী আমিনচাঁদ কাজের জন্ত প্রস্তুত এবং আগমন প্রতীক্ষা-রত কর্ম্মী পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, স্থানীয় এম. পি. (শ্রীবর্ম্মা) সামাজিক কর্ত্তব্যসমূহ সম্বন্ধে সচেতন স্থানীয় কর্ম্মচারী এবং উৎকৃষ্ট স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ম্মীদল এই তিনের সম্মিলনকেই বলা যেতে পারে "দ্রুত কর্ম্ম সম্পাদনকল্পে" আদর্শ সম্মিলন এবং নিসরু-গ্রাম তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীটেক সিং বাল-ওয়াদির কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহকেও সাফল্যের পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা দেখলাম যে, ঠিক বয়সের ছোট একুশটি শিশু—যাদের বলা যেতে পারে পৌত্রস্থানীয়—তাঁর আছে এবং আশীর্ব্বাদ জানালেন তিনি চিত্তজয়ী হাসি হেসে।

আর একটি শেষ আশা আছে। প্রতি বৎসর দশ হাজারের কাছাকাছি উপজাতীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা চিনি থেকে নেমে আসে নিম্নে অবস্থিত রামপুর শহরের অপেক্ষাকৃত অধিকতর আরামদায়ক জীবনধারার মধ্যে। দুর্ভেদ্য তুষার-প্রাচীরের পেছনে রেখে আসে তারা তাদের স্ত্রী,

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং বহু শিশুকে ছাদ ও প্রাচীর থেকে লম্বা হাতলওয়ালা একপ্রকার কোদালি দ্বারা তুষারস্তূপ অপসারিত করবার জন্তে—তাদের এলাকায় এই তুষার-অবরোধ স্থায়ী হয় অন্ততঃ চার কি পাঁচ মাস। সঙ্গে করে নিয়ে যায় তারা গো-মহিষ, ভেড়া এবং খচ্চরের পাল এবং অল্পবয়স্ক বালকদের। শতকরা পঁচিশ জন চরায় গরু-বাছুর। বাদবাকিরা ক্ষেতে এবং জঙ্গলে বাড়তি কাজ করে। দৈবাৎ তাদের আশ্রয় জোটে গুহায়, তাঁবুতে, ধরমশালাগুলিতে এবং রাস্তার উপরে। চালাঘর নির্ম্মাণ অথবা মানুষ ও গরু-মহিষের জন্ত কোন আস্তানা তৈরি এ দুটিই হচ্ছে উক্ত অঞ্চলে দুইটি একান্ত প্রয়োজনীয় সমাজ-কল্যাণকর্ম্ম। এই সমস্তার চূড়ান্ত সমাধান অবশ্র নির্ভর করে চিনির উন্নয়নের উপর—যার দরুন ওখানকার অধিবাসীদের আর প্রয়োজন হবে না দেশত্যাগ করে স্থানান্তরে যাবার।

অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা এবং পরিবার-পরিকল্পনা

শ্রীলক্ষ্মণপ্রসাদ ও শ্রীলতিকা ঘোষ

'পরিবার পরিকল্পনা' বিষয়টির প্রতি সাম্প্রতিককালে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং আমাদের সরকার-কর্ত্তৃকও ইহার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনার ভাব-ধারণা ভারতের নিকট নূতন নহে। প্রায় শতাব্দীর এক পাদ যাবৎ এদেশে এই আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া আছে—স্বেচ্ছামূলক সংগঠন এবং সংস্থাসমূহ, কিন্তু আর্থিক অনটন এবং এই ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীর অভাবের দরুন এগুলির দ্বারা যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে। ভারতে পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন এখনও রহিয়াছে শৈশবাবস্থায় এবং স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ এবং নাগরিক উভয় সমাজেই সামাজিক অর্থনীতি এবং মনস্তাত্ত্বিক এই দ্বিবিধ বহু সমস্তার উদ্ভব হইতে পারে যদি না জনসংখ্যার অবাধ বৃদ্ধি প্রতিরোধ কল্পে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে তিন কোটি টাকা ব্যয় করিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বৃহৎ পরিবার এবং অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতার মধ্যে যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, বর্ত্তমান প্রবন্ধে একদিকে যেমন তাহা দেখানোর চেষ্টা করা যাইবে অন্ত দিকে তেমনি অল্পবয়স্ক শিশুদের অপরাধমূলক আচরণ নিরোধে পরিবার পরিকল্পনার নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইবে। এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝানো প্রয়োজন যে, অপরাধপ্রবণ বলিতে কাহাকে বুঝায়। অপরাধপ্রবণ সেই ব্যক্তিকেই বলা যায়, যে সামাজিক নীতিসমূহের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না, অর্থাৎ—যে একগুঁয়ে; অসংশোধনীয় এবং অবাধ্যতা যার স্বভাবসিদ্ধ; চোর, অপরাধী এবং পাপাসক্ত লোকেদের সঙ্গে যার মেলামেশা এবং যে দুর্নীতিপরায়ণ, অশিষ্ট আর স্বভাবতঃ বখাটে।

ই. গ্লুয়েক ইহারও প্রমাণ পাইয়াছেন যে, অপরাধপ্রবণ বালকেরা আসিয়া থাকে কতকটা বৃহৎ পরিবারসমূহ হইতে, এই শিশুদের গড়পড়তা সংখ্যা হইতেছে ৬'৮। ভারতীয়দের পরিবার সাধারণতঃ বৃহৎ বলিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের পরিবারবিশিষ্ট ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় এদেশে পরিবারস্থ লোকেদের সামাজিক অপরাধপ্রবণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অধিকতর।

দরিদ্র পরিবারগুলিতে অধিকসংখ্যক লোকের অবস্থানের জন্ত অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যখন স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকল বয়সের লোকেরা একই ঘরে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করিয়া বাস করে তখন শালীনতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে দারিদ্র্য, ঘরে অতিরিক্ত লোকের সমাবেশ এই সমস্তের দরুন শিশুর গার্হস্থ্য পরিবেশ অপরাধের সূতিকাগার হইয়া দাঁড়ায়।

প্রায়ই একথা বলা হয় যে, শারীরিক কষ্ট এবং ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইয়া শিশু অনেক সময় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ভিক্ষাবৃত্তি অথবা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। অপরাধমূলক আচরণের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় অবাঞ্ছিত শিশুদের মধ্যে। দম্পতি যখন চাওয়ার অতিরিক্ত সন্তান লাভ করেন, তখন অবাঞ্ছিত সন্তানেরা বঞ্চিত হয় ভালবাসা হইতে, তাহাদের ঠিকমত দেখাশুনা করা হয় না। তাহাদের পিতামাতারাও তাহাদের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে তেমন মনোযোগ দিতে পারেন না। এই ধরনের শিশুরা প্রায়ই পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং সমাজ-বিরোধী কর্ম্মে লিপ্ত হয়।

এই সকল অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতার প্রতিকার

করিতে হইলে পরিবার পরিকল্পনার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র পরিবার সকলের জন্তই যথেষ্ট অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে। সুপরিকল্পিত এবং সীমাবদ্ধ পরিবার উপভোগ করে বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ শান্তি, সুখ ও সন্তোষ।

এই সমস্তার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিলে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত চেষ্টা করা হইয়াছে সেগুলিকে সমুদ্রে গোস্পদ বলিতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত না ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক অপরাধপ্রবণ শিশুকে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং অধিকাংশ পরিবারকে "ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রামে"র অন্তর্ভুক্ত করা হইবে সে পর্য্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ বাস্তব ভাবে ফলপ্রদ হইবে না।

হিমাচল প্রদেশে পুলিস-বিভাগ কর্ত্তৃক শিশুদের শিক্ষাদান

শ্রীআনন্দস্বরূপ গুপ্ত

অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন-কার্য্য এবং সমাজ-কল্যাণ কর্ম্মে ব্যাপৃত আছে। কিন্তু হিমাচল প্রদেশের পুলিশ কর্ম্মচারীরাই প্রথম ইহা উপলব্ধি করেন যে, পুলিসের লোকেরাও এই ধরনের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়-স্বরূপ যতগুলি সম্ভব রিজার্ভ লাইন, পুলিস ষ্টেশন এবং পুলিস ফাঁড়িতে পুলিস কর্ম্মচারীদের পরিচালনাধীনে শিশুদের ক্লাব সংগঠিত করা স্থিরীকৃত হয়। পুলিস কর্ম্মচারীদের স্বেচ্ছামূলক আনুকূল্যে সাত হইতে সতের বৎসর-বয়স্ক শিশু এবং কিশোরদের জন্ত আমোদ-প্রমোদ, শারীর শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা অক্ষরজ্ঞান এবং নেতৃত্বের শিক্ষাদানের মধ্যে বর্ত্তমানে এই সকল ক্লাবের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। সকল জাতি এবং যাবতীয় বৃত্তি-অবলম্বনকারী পিতামাতাকেই তাহাদের শিশুদিগকে ঐ সকল ক্লাবে পাঠাইবার জন্ত উৎসাহিত করা হয়। বাসস্থান, সাজসরঞ্জাম এবং আর্থিক সংস্থানের কথা বিবেচনা করিয়া ক্লাবের সভ্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

এই রাজ্যে এ পর্য্যন্ত এই ধরনের শিশুদের ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উনত্রিশটি। ক্লাবগুলির সভ্যসংখ্যা ত্রিশ হইতে ষাটের মধ্যে। পুলিস লাইন, পুলিস ষ্টেশন এবং পুলিস ফাঁড়ির গৃহে সুবিধাজনক কক্ষসমূহে ক্লাবগুলি স্থাপিত হইয়াছে। এ সকলের সন্নিহিত খোলা জায়গা খেলাধুলা এবং বাহিরের অন্যান্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার জন্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সমস্ত ক্লাবের প্রত্যেকটিতে প্রতি সভ্যের নিকট হইতে মাসে নামমাত্র দুই আনা করিয়া চাঁদা আদায় করা হয়। এই চাঁদার উদ্দেশ্য—শিশুদের মনে এই বোধ জন্মাইয়া দেওয়া যে, তাহারা ক্লাবে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে তাহাদের নিজেদেরই অর্থে। বাকি খরচের জন্ত ক্লাবগুলিকে নির্ভর করিতে হয়, সাধারণের স্বেচ্ছামূলক দান, বেসরকারী পুলিস ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থসাহায্য ও ঋণ এবং ক্লাবের সভ্যদের উদ্যোগে সংগঠিত প্রমোদানুষ্ঠান দ্বারা লব্ধ অর্থের উপর। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই রাজ্যে, পুলিস কর্ম্মচারীদের তরফ হইতে কোন প্রকার চাপ বা তাহাদের প্রভাব ব্যতিরেকে নিছক স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ক্লাব সাধারণের নিকট হইতে মোটা রকমের অর্থসাহায্য পাইয়াছে। আশা করা যায়, যথাসময়ে সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ হইতেও এই সকল ক্লাবের জন্ত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইবে। এই সমস্ত ক্লাবের প্রত্যেকটির জন্ত গৃহাভ্যন্তরের (indoor) এবং ঘরের বাহিরের (outdoor) শিক্ষা এবং অবসরবিনোদনের সহায়ক কতকগুলি সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—"কম্যুনিটি লিসেনিং স্কিম" অনুযায়ী বেতার-যন্ত্র পাইবার জন্তও চেষ্টা চলিতেছে। সভ্যদের সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক ক্লাবে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বই, পুস্তিকা, মানচিত্র এবং চার্ট রাখিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

খেলাধুলা, শারীর শিক্ষা, সাধারণ বক্তৃতামালা, আবৃত্তি এবং নাট্যাভিনয় ছাড়া, সভ্যদের শক্তি ও রুচি এবং পরিচালন-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট পুলিস কর্ম্মচারীদের বিশেষ গুণ অনুযায়ী প্রত্যেক ক্লাবে একটি খেয়াল-খুশীর (hobby) কেন্দ্র খুলিবারও উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

পুলিস লাইন, পুলিস ষ্টেশন এবং পুলিস ফাঁড়ির ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা পদাধিকার বলে ক্লাবসমূহের 'এক্স অফিসিও প্রেসিডেণ্ট' পদবী লাভ করিয়াছেন। হিসাবরক্ষকের কাজ করিবার জন্ত প্রয়োজন একজন সাক্ষর (literate) কনেষ্টবলের। একজন সেক্রেটারী এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কতিপয় সভ্য নির্ব্বাচিত হয় ক্লাবগুলির সভ্যদের ভিতর হইতে। এমনই ভাবে শিশুদের সংগঠন এবং দায়িত্ব-পালন সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক ক্লাবকে উপস্থিতি, আয়-ব্যয়, সভ্যদের ব্যক্তিগত উন্নতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণী, ক্লাবের সম্পত্তির ষ্টক বহি এবং সভার কার্য্য-বিবরণীর জন্ত একটি 'মিনিট' বহি রাখিতে হয়।

জনসাধারণ এই পরিকল্পনাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত যে সকল ক্লাব সংগঠিত হইয়াছে সেগুলির সভ্যদের মধ্যে ঐকান্তিক উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

আলোচনা

"ম্যাডাম কামা"

ডক্টর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিগত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীআরতি সেন লিখিত "ম্যাডাম কামা" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি ভ্রম-ত্রুটি নজরে পড়িল। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

৪৮২ পৃঃ, ২য় স্তবকে ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ প্রসঙ্গে লেখিকা বলিতেছেন :

"১৯০৬ সনে বীর সাভারকর ও কৃষ্ণ বর্ম্মার সঙ্গে ম্যাডাম কামার পরিচয় হয়। এই দু'জনের অনুপ্রেরণাতেই ম্যাডাম কামা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেবার সুযোগ পান।...... ম্যাডাম কামা যখন প্যারিসে ইনিও তখন প্যারিসে। এই সময়ে এরা ও আরও কয়েকজন মিলে চুপে চুপে "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল কি করে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যায়? ম্যাডাম কামা ছিলেন এই গুপ্তদলের একজন বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী।"

উদ্ধৃত অংশের তথ্যগুলি ভ্রান্ত। বীর সাভারকরের লণ্ডনে পৌঁছার দুই বৎসর পূর্ব্বেই ম্যাডাম কামা শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্ম্মা ও শ্রীসর্দ্দার সিং রাওজী রাণা বি-এ, ব্যার-এট-ল, এই দুই উগ্রপন্থী নেতার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ" নামে কখনও কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয় নাই। ১৯০৫ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ৬৫ ক্রমওয়েল এভিনিউ, হাইগেইট, লণ্ডনে শ্যামাজীর খরিদ করা বাটীতে (ইহাই পরে "ইণ্ডিয়া হাউস" নামে বিখ্যাত হইয়াছিল)। "ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা গুপ্ত সমিতি ছিল না, প্রকাশ্যে গঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল (১) ভারতের জন্য হোমরুল আদায় করা (to secure); (২) তাহা লাভ করার জন্য সর্ব্বপ্রকারে গ্রেট ব্রিটেনে প্রচারকার্য্য চালানো; (৩) স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্যের সুবিধা (advantage) সম্পর্কে ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করা।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা সভাপতি, শ্রীসর্দ্দার সিং রাওজী রাণা, ডক্টর আবদুল্লা সরওয়ার্দি, মিঃ কে. এম, পারিখ, মিঃ গডরেজ এবং অন্য কয়েকজন সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ম্যাডাম কামা একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন।

মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জী অনারারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

১৯০৫ সনের ১০ই মে শ্যামাজীর উদ্যোগে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাডাম কামাই এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসনে বৃত হন

অপর স্থলে (৪৮২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ৪র্থ স্তবকে) আছে "...... ১৯০৫ সনে প্যারিসে তিনি "বন্দেমাতরম্" নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। কাগজখানি প্রায় আট-নয় বৎসর চলেছিল।"

এই তথ্যে ভুল আছে। ১৯০৫ নহে, ১৯০৯ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর "বন্দেমাতরম"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহা সাপ্তাহিক ছিল না, মাসিক ছিল। ইহার উপরে লিখিত থাকিত।

"A monthly organ of Indian Independence।"

ইউরোপে ভারতীয়গণের দ্বারা কখনও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয় নাই।

"বন্দেমাতরম", কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক "বন্দেমাতরম" বন্ধ হইয়া যাওয়ার পরে জেনেভা হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রচারিত হইত প্যারিস হইতে।

প্রথম সংখ্যায় ছিল "We issue this Journal with the object of carrying the high mission and proud tradition of "the Bandemataram" that has been suppressed in Bengal."

পূর্ব্বোক্ত ৪৮২ পৃঃ ২য় স্তম্ভের 'ষষ্ঠ স্তবকে' দেখিতেছি— "১৯০৭ সনে স্যর উইলিয়াম কার্জ্জন ওয়াইলির হত্যা ব্যাপারে ম্যাডাম কামা, বর্ম্মা, রাণাজী এবং সাভারকরকে বন্দী করবার কথা হয়। কিন্তু একমাত্র সাভারকর ছাড়া আর সকলেই সেই সময়ে ফ্রান্সে অবস্থান করাতে ইংরেজ তাঁদের কিছুই করতে পারে নি। সাভারকর সে সময়ে ইংলণ্ডে থাকাতে একমাত্র তাঁকেই তারা আইনতঃ বন্দী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাঁকে বিচারের জন্য জাহাজে করে ভারতবর্ষে আনবার সময় তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন...।"

লেখিকা ইতিহাস-খ্যাত ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। স্যর উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলির হত্যাকাণ্ড ১৯০৭

সনে নহে, ১৯০৯ সনের ১লা জুলাই সংঘটিত হইয়াছিল। সাভারকর তৎপর লণ্ডনে থাকিয়া আসামী মদনলাল ধিংড়ার মামলার যথাযথ তদ্বির করেন। পরবর্তী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে তিনি বন্ধু ও সহকর্মিগণ কর্তৃক স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য প্যারিসে নীত হন, কিন্তু সহসা বন্ধুগণের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি লণ্ডন যাত্রা করেন। ১৩ই মার্চ, রবিবার, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ট্রেন হইতে অবতরণ করামাত্রই তিনি বন্দী হইলেন। পরে জানা যায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের এক রুল মাফিক ওয়ারেণ্টের (ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯১০) বলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সমরায়োজন, যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য, সম্রাটকে ভারতবর্ষের অধিকার-বিচ্যুত করা, অস্ত্র সংগ্রহ করা, ভারত সম্রাটকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ভাবী অভিযোগ এবং তৎসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটি অতিরিক্ত অভিযোগ ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে।

লণ্ডনের বো ষ্ট্রীট কোর্টে তাঁহার প্রাথমিক বিচার হয়, তিনি ইহার বিরুদ্ধে আপীল করেন, হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস দরখাস্ত করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১লা জুলাই এস. এস. মোরিয়া জাহাজে তুলিয়া তাঁহাকে ভারত অভিমুখে প্রেরণ করা হয় এবং পথে "মার্সাইয়ে" তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। ওয়াইলী হত্যার আসামী হইলে তাঁহাকে বোম্বাইয়ে না পাঠাইয়া লণ্ডনেই রাখা হইত এবং লণ্ডনে তাঁহার বিচার হইত। নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন হত্যার সাহায্যকারী হিসাবে তাঁহাকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করা হয়।

অপর স্থলে (পৃঃ ৪৮৩, ১ম স্তম্ভ, ২য় স্তবক) লেখিকা উল্লেখ করিয়াছেন যে, অন্তরীণ হইতে "মুক্তি পেয়েই ম্যাডাম কামার প্রধান কাজ হ'ল রাশিয়ান বিপ্লবী খুঁজে বের করা, যারা ভারতীয় কয়েকজন বিপ্লবীকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারে।" এই তথ্য সম্পূর্ণ অলীক। ১৯০৭ সনেই ম্যাডাম কামার সহকর্মী শ্রীরাণা, আলীপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী হেমচন্দ্র দাসকে রাশিয়ান বিপ্লবীগণ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে বোমা প্রস্তুত ও প্রয়োগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ম্যাডাম কামা ১৯১৯ সনে অন্তরীণ হইতে মুক্তির পর রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক কোনও প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন নাই, হইবার মত স্বাস্থ্য এবং সুযোগও তাঁহার ছিল না।

ম্যাডাম কামার প্রসঙ্গে এই বিবৃতিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯০১ সনে তিনি লণ্ডন গমন করেন এবং প্রথমতঃ দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রচারকার্যে মনোযোগী হন। পরে সত্বরই কাথিওয়াড়ের দুই বিপ্লববাদী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও শ্রীসর্দার সিংজী রাওজী রাণার কার্যে সহযোগিতা করেন।

শোভা সেন
সর্বদা ব্যবহার করে থাকেন
লাক্স
টয়লেট
সাবান
"একমাত্র বিশুদ্ধ সাবানই
এত শুভ্র হতে পারে"
তিনি বলে থাকেন
লাক্স টয়লেট সাবান বিশুদ্ধ। এই সাবানটীর দুধের মত শুভ্রতাই আপাত দৃষ্টিতে এর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। এই শুভ্র বিশুদ্ধ সাবানটী নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি দেখবেন সরের মত মোলায়েম, সুগন্ধী এই ফেণা কি ভাবে আপনার ত্বকের যত্ন নেয়... কি ভাবে ত্বককে সুন্দর করে তোলে! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে এবং খরচ সাশ্রয়ের জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।
LUX
TOILET SOAP
AP
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 489-X52 BG
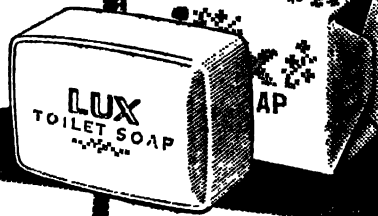
বনমল্লিকা—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। বাসন্তী বুক ষ্টল। ১৫৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

কোন একটা ইংরেজী বইয়ে এক বার আসামের এক কথায় একটি সুন্দর বর্ণনা পড়েছিলাম—Assam is at the back of Beyond, অর্থাৎ আসাম পরিচিত বিশ্বের একেবারে বাইরে। বাস্তবিকই, ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা থেকে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ এই যে পার্ব্বত্যভূমি চীন ও থাইল্যাণ্ডের দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে, রহস্যের দিক থেকে এ বোধ হয় মূল হিমালয়কেও অতিক্রান্ত করে যায়। এবং সেই হেতুই কৌতূহলকে করে আরও উদ্দীপ্ত।

কিন্তু এই কৌতূহল নিরোধ করবার উপকরণ আমরা পাই না। আমাদের দৌড় কামরূপ কামাখ্যা পর্য্যন্ত। কামরূপ নিজেই রহস্যভূমি, আমাদের অনুসন্ধিৎসা ঐখানেই যেন একটা বাধা পেয়ে আবর্ত্তিত হতে থাকে, তার ওদিকে সভ্যতার প্রত্যন্ত দেশে যে গভীরতর রহস্য রয়েছে তা অজানাই থেকে যায় আমাদের কাছে।

ক্বচিৎ কারও দূরাভিযাত্রী মন একটু এগিয়ে গেছে, এই রহস্যলোকে কিছু আলোকসম্পাত করেছে, যেন স্বল্প চকিত আলোকেই আমরা একটা অপরূপ সুন্দর জগতের সন্ধান পেয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। এ সম্পর্কে সর্ব্বাগ্রেই নাম মনে পড়ে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের। এর আগে তিনি "বিচিত্র মণিপুর" ও "আদিবাসীদের বিচিত্র কথা" প্রভৃতি নানা বই দিয়ে বাংলা-সাহিত্যের এদিককার অভাব খানিকটা পূরণ করেছেন। অবশ্য এসবের বেশীর ভাগ তাঁর ব্যক্তিগত অভিযান-লব্ধ নয়, তবে তার জন্য বাংলা পাঠক যে কম লাভবান একথা বলার উপায় নেই।

এর পরে আমরা পেলাম এই "বনমল্লিকা"

'বনমল্লিকা' তথ্যমূলক বই নয়; যদিও তথ্যমূলক বইও যে কত রসঘন হতে পারে তার পরিচয় পূর্ব্বের বইগুলিতে দিয়েছেন নলিনীবাবু। 'বনমল্লিকা' সাতটি গল্পের সমষ্টি। সাতটিই প্রেমের। গল্পগুলি লেখকের স্বকল্পিত নয়। তিনি ভূমিকাতে বলেছেন, সুদূর অতীত কাল থেকে আসামের আদিবাসীদের মধ্যে যে সমস্ত প্রণয়কাহিনী প্রচলিত, মিলস্, গর্ডন প্রভৃতি জাতিতত্ত্ববিদ্‌দের পুস্তক থেকে সঞ্চয়ন করে তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে তিনি গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বইখানির আসল মূল্য এইখানে। কল্পনার সাহায্যে আদিবাসী চরিত্র নিয়েও উৎকৃষ্ট কাহিনী রচনা করা যেত, কিন্তু তাতে তাদের সত্য রূপটি পাওয়া যেত না। এ যা হয়েছে তাতে আদিম আরণ্য জগতের একটি পরম বিস্ময়কর চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যুগযুগাগত সংস্কার-প্রথার মধ্যে জীবনের অলিগলি হয়ে প্রেমের বিজয়-অভিযান সত্যই অপরূপ। আদিম পার্ব্বত্য জীবন সমাজ-বন্ধনে অনেকখানি শিথিল এবং সেই জন্য ভালোবাসা যে সভ্য-জগতের চেয়ে খানিকটা বেশী মুক্তি এবং প্রসার পায় তাতে প্রণয়লীলার অনেকখানি বৈচিত্র্য এনে দেয় সভ্য-সমাজের তুলনায়। আবার, যত মুক্তই হোক, প্রণয়ে আছে সংঘাত, প্রণয়কে এখানেও দিতে হয় পরীক্ষা, যেমন দিতে হয় সভ্য-জগতেও। সেক্ষেত্রেও আদিম মানুষ অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধ হয়ে উঠে প্রেমের স্পর্শে কেমন করে পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠে—দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

এটা গেল কাহিনীগুলির প্লট বা গল্পাংশের কথা। কিন্তু শুধু প্লট নিয়েই কাহিনী দাঁড়ায় না, এবং এইখানে এসে পড়েছে লেখকের কৃতিত্ব। তিনি যে অনুপম ভাষা দিয়ে মণ্ডিত করেছেন গল্পগুলি, যে-ভাবে সমাবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং যে সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি দিয়ে চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতেই সমস্ত কাহিনীগুলি স্বমহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রণয়-কাহিনীর অভাব বাংলায় নেই; বস্তুতঃ বোধ হয় আমাদের কথাসাহিত্যের পনেরো আনাই প্রণয়-কাহিনী। তার মধ্যে এই কাহিনীগুলি নিজের স্বকীয়তায় যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা লেখকের হাতের গুণেই। ভাষারই দুইটি নিদর্শন তুলে দিই—

"ক্ষণকাল পরে তারা দেখলে, একটি অলোকসুন্দরী তরুণী গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামছে; তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হবামাত্রই হকচকিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলে। অবলীলাক্রমে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে সে গুহামুখে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তার পর বিদ্যুল্লেখা যেমন করে চকিতের মত তীব্র রশ্মিচ্ছটায় চোখ ঝলসে কালো মেঘের বুকে বিলীন হয়ে যায়, তেমনিভাবে এক লহমায় গুহাভ্যন্তরস্থ নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করলে।" (পৃ. ২৫)

"বাড়ী থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ধানক্ষেতের অভিমুখে রওনা হ'ল শাংকক। ক্ষেত্রভূমিতে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন দূর দিগন্তলীন পাতকোই

পাহাড়শ্রেণীর ওপর দিয়ে প্রভাতসূর্য আকাশে উঠেছে। বিচিত্রবর্ণানুরঞ্জিত আকাশের পটভূমিকায় নীল পাহাড়ের চূড়াসমূহ চালচিত্রের মত শোভমান। পাহাড়ের পশ্চিম দিককার গড়ানে অংশ এখনও ছায়ায় ঢাকা। নিচেকার উপত্যকাভূমি অজস্র হিমকণায় সমাচ্ছন্ন—কে যেন রহস্যময়ী প্রকৃতির সুপ্ত মুখের 'পরে শুভ্র, সূক্ষ্ম কৌষেয় অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে। সূর্য্যের সোনালী রশ্মিপাতে প্রকৃতির সেই মুখাবরণখানি ঝলমল করছে।"

ভাষার এরকম উদাত্ত সুর, এরকম ধ্বনি-সম্পদ না থাকলে আদিম মানুষের বিচরণভূমি এই বন্য প্রকৃতির পূর্ণ রূপটি ফোটানো যেত না; তার উদ্দাম প্রণয়লীলাকে রূপ দেওয়া যেত না।

আর একটি জিনিস যা লেখকের প্রতি পাঠকের মনকে শ্রদ্ধান্বিত করবে তা তাঁর সংযম। এত বিচিত্র প্রণয়কাহিনী, তার ওপর আদিবাসীদের সমাজ-প্রথায় এত শৈথিল্য কিন্তু একটি পংক্তিতে, এমনকি একটি শব্দেও কোনখানে লেখক তাঁর কাহিনীর শুচিতা নষ্ট করেন নি। অপ্রয়োজনে, অপ্রাসঙ্গিকভাবে যে যুগের সাহিত্যে কথায়-কথায় লালসার ক্লেদ এনে ফেলা একটা সাধারণ রেওয়াজ হয়ে পড়েছে, যে যুগে সুযোগ পেয়েও তার অপব্যবহার না করার সংযমের জন্য লেখককে অভিনন্দিত করতে হয়।

আমাদের যতদূর জানা আছে আসামের এই অঞ্চলের আদিবাসীদের কাহিনী নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ এই প্রথম, প্রণয়কাহিনী নিয়ে তো বটেই। সেদিক দিয়েও লেখক বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ।

সার্থকনামা একখানি বই। মাত্র সাতটি কাহিনী, কিন্তু তাইতেই বনমল্লিকার মদির সৌরভে আগাগোড়া পাঠকের মনকে মাতিয়ে রাখে। রসিকসমাজে বইখানি উপযুক্ত সমাদর হবে বলেই আমরা আশা করি। এবং তার সঙ্গে এও আশা করি যে, লেখক আমাদের মনে যে রসতৃষ্ণা জাগালেন তাকে পূর্ণতর করে পরিতৃপ্ত করতে প্রয়াসী হবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আরাবল্লীর আড়ালে—শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য দেড় টাকা।

বাংলা-সাহিত্যে রাজোয়ারার শৌর্য্য-বীর্য্য, গুণগরিমা, দেশাত্মবোধ ও সতীধর্ম্ম পালনের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সে ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। সেখানে রাজকীয় জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্য-বিলাসের নেপথ্যে—নিরাবরণ নরনারীকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। লেখিকা আলোচ্য গ্রন্থে এই কঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন, সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি রাজ-অন্তঃপুর ও তাহার অভ্যন্তরচারী নরনারীকে গল্পের আসরে হাজির করিয়াছেন। মোগল হারেমের মত সুরক্ষিত এই অন্তঃপুর—খোজা প্রহরী ও নানা নিয়মকানুনের গণ্ডী দিয়া ঘেরা। বাহিরের সাধারণ নরনারীর চোখে—এই ঐশ্বর্য্য মায়া-আলিম্পন আঁকে—মনকে মোহলুব্ধ করে। আরাবল্লী-বুজের সাধারণ ঘরের কন্যারা সুখভোগের আশায় অন্তঃপুরচারিণী হয়। কেহ আসে রাণীদের সঙ্গে উপঢৌকন স্বরূপ কাহাকেও কিনিয়া বা চাহিয়া আনা হয়, কোন কোন দরিদ্র বাপ-মা স্বেচ্ছায় মেয়েকে রাজ অন্তঃপুরচারিণী করিয়া দেন। প্রথমে মেয়েরা আসে পাত্রী হইয়া রাজানুগ্রহলাভের

L. 259-X52 BG

ভারতে প্রস্তুত
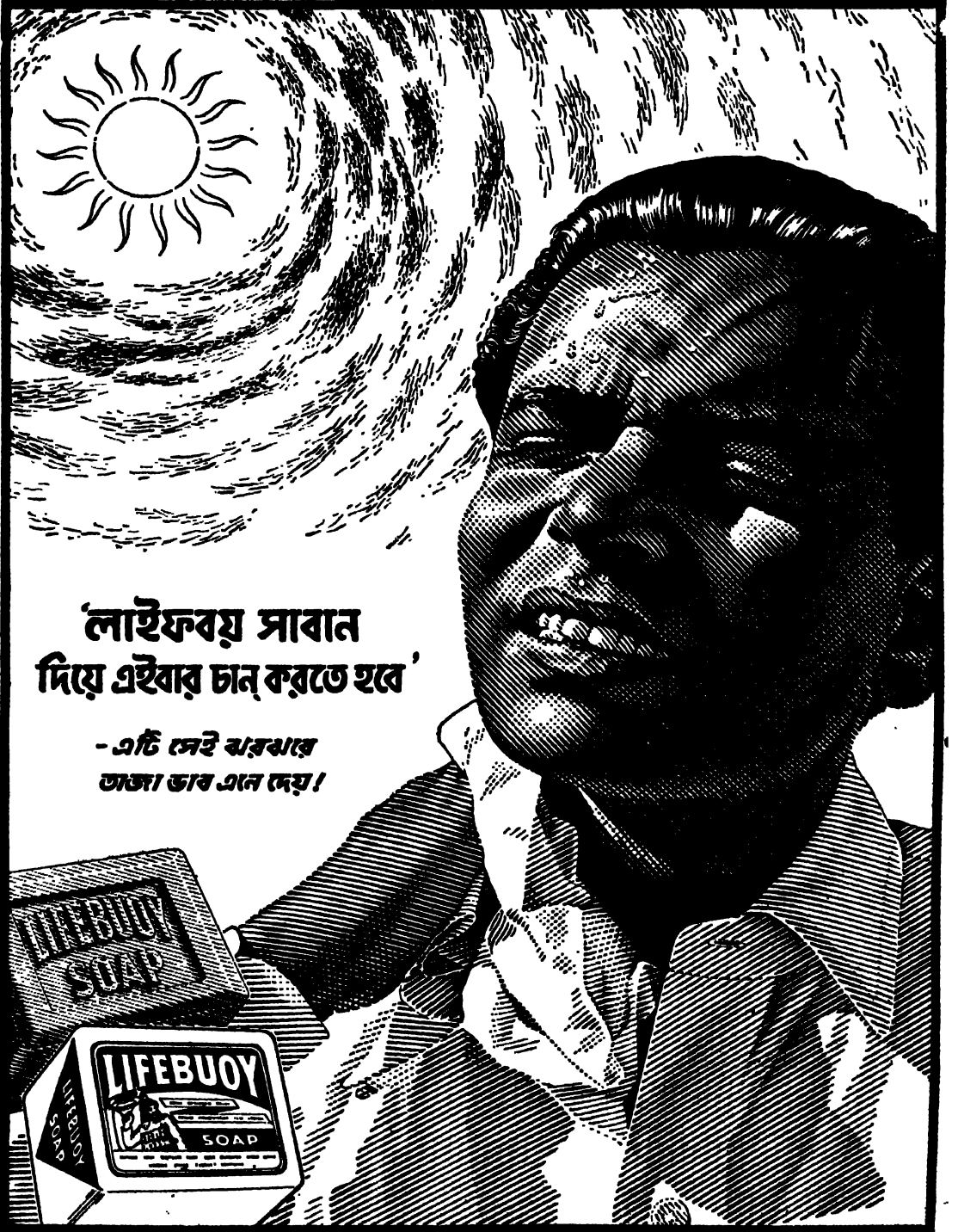
আশায়। রাজানুগ্রহ লাভ করিতে ইহারা নৃত্য-গীত, বাদ্য-যন্ত্র বাদন শিক্ষা করে, অনুগ্রহ লাভ করিয়া 'পর্দ্দায়েৎ' হয়—'পাশোয়ান' হয়। অর্থাৎ, রাণীর মত সম্পদ-সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করে। ক্ষমতা ও পদমর্য্যাদার লোভে পুরুষ আসে অন্তঃপুরে—খুশ নজরজী অর্থাৎ খোজা সর্দ্দার হইয়া। পাশোয়ান-গর্ভজাত লালজী সাহেবদের অন্তঃপুর-বিচরণের অধিকার আছে, কিন্তু রাজপুত্রের মর্য্যাদা ইহারা পায় না। প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের নীচের স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে ইহাদের স্থান। এ ছাড়া অন্তঃপুরে আছেন মাজী সাহেব (রাজমাতা), শ্রেষ্ঠ পত্নী, বড়ারণজী (প্রধানা সখী) ও সাধারণ সখী ও দাসী প্রভৃতি। গল্প ইহাদেরই লইয়া। প্রাসাদ-সীমানায় খণ্ডিত হইলেও—এই সব জীবনের জাঁকজমক আছে, চমক আছে, স্নেহ, প্রেম, ঈর্ষা, দ্বন্দ্বে সমুচ্চিত হইয়া উঠে। অন্তঃপুরের নাটকের একমাত্র নায়ক রাজাকে ঘিরিয়া ইহাদের উৎসব-নাচা-লীলা অবিরাম বহিয়া চলে। এ নাটক বাহ্যতঃ মিলনাত্তক—যদিও যবনিকার অন্তরালে একটি সকরুণ সুরের মূর্চ্ছনা ও নৃত্যতার বেদনা কল্গুস্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে। প্রাসাদ-বৃত্তলীন জীবন বন্দী-জীবনের দুঃসহ জ্বালায় কোন কোন সময়ে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। প্রতিটি কাহিনী শেষ হইলে বেদনার রেশটি মনের মাঝেই রহিয়া যায়।

শুধু বাস্তবনিষ্ঠা দ্বারা নহে—লিপিকুশলতায় গুণেও গল্পগুলি অনবদ্য হইয়াছে। বাংলা কথা-সাহিত্যে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

মন্ত্রী থেকে মিনিয়েল—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নব চেতনা, ৩৯, ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ২।০ টাকা।

নিম্নপদের পিওন হইতে পদমর্য্যাদা-ভারাক্রান্ত মন্ত্রী প্রভৃতিদের লইয়া গল্প। গল্পের ক্ষেত্র অবশ্য সরকারী দপ্তরে সীমাবদ্ধ। সেখানকার আদব-কায়দা, অফিসনীতি বা রাজনীতির খেলা, পদমর্য্যাদা, প্রমোশন, বৃত্তলগ্ন জীবনের সুখ-দুঃখ-ঈর্ষা-সংঘাত, স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ, একটু বা চটুল প্রেম-বিলাসের অভিনয়—সব জড়াইয়া নানা স্তরের পরিচয়। 'দশটি' স্তবকে একটি বৃত্তের ক্রম-উর্দ্ধায়িত কর্ম্মজীবনের ছবি। ছবিগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা-বর্জ্জিত নহে। কোন কোন স্তবকে গল্প জমিয়াছে, কোন কোনটিতে উপন্যাসের ছায়াপাত হইয়াছে। যুগধর্ম্ম-প্রভাবিত সমাজ, পরিবেশ ও জীবন সম্বন্ধে লেখক সচেতন, প্রকাশভঙ্গী প্রশংসার্হ।

বাস্তু পেল বাস্তুহারা—পেই ওয়েই। অনুবাদক—শ্রীঅমল সরকার। কার্ম্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ৬।১ এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৲ টাকা।

উপন্যাসখানি চীনা লেখক পেই ওয়েই কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। দেশ-গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া একটি বাস্তুহারা কৃষক-পরিবার কেমন করিয়া সুস্থ ও সুখী নাগরিকে পরিণত হইল—তাহারই চিত্র আছে গল্পটিতে। গল্পটি বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট। একই সমস্যাপীড়িত দেশে—অনুবাদটি সময়োচিত হইয়াছে; অনুবাদকের ভাষাও সাবলীল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেখুন!
অর্দ্ধেকটী
সানলাইট
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে!
সানলাইটের ফেনার শ্রেষ্ঠত্বই এর কারণ!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
ভারতে প্রস্তুত

শ্লোকসংগ্রহ—নববিধান গ্রন্থপ্রকাশক সমিতি। ৯৫, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃ. ৪৩৮।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন নব্বই বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক যে ক্ষুদ্র শ্লোকসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া এখন মনোজ্ঞ বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ইহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইহুদী, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান, পারসিক ও চৈনিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত এবং হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ-সম্বলিত। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক হইলেও অনেক সাধারণ পাঠকের এবং ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির কৌতূহল নিবৃত্ত করিবে। এ-জাতীয় বহু-ভাষানিবদ্ধ নানা ধর্ম্মীয় বাণীসংগ্রহ অত্যন্ত বিরল।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। দুঃখের বিষয়, এই প্রধান অংশের মুদ্রণে কতিপয় ত্রুটি লক্ষিত হইল, যাহা অনায়াসে সংশোধিত হইতে পারিত। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের স্মৃতিপূত গ্রন্থ বিশুদ্ধাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা দুই-একটি ত্রুটি দেখাইয়া দিতেছি। পৃ. ৩ হইতে সংযুক্ত শিরোনামায় "বেদ-উপনিষদ্" না হইয়া শুধু "বেদ" (১৫ পৃ. পর্য্যন্ত) এবং শুধু "উপনিষদ্" (পৃ. ১৭-৫৭) হওয়া উচিত। পরেও অনুরূপ সংশোধন আবশ্যক—ভাগবতের শ্লোকসমূহ (পৃ ২৩৩-৬৩) "বিষ্ণুপুরাণ" শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছে! এতদ্ভিন্ন অনেক অশুদ্ধ পাঠ লক্ষিত হয়—২৯ শ্লোকে কন্তুবিদ্ধনম্, ৩০৫ শ্লোকে তথা, হিংসা পরমো (পরো হইবে) দমঃ ইত্যাদি। মুদ্রাকরপ্রমাদের সংখ্যাও কম নহে—৭৫ শ্লোকে ভুয় স্থলে ভয়, ২৪৯ শ্লোকে গীতার স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে স্থলে—মুনি—ইত্যাদি।

স্তোত্রমালা—উত্তমাশ্রম। পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী। পৃ. ৩২। মূল্য সোয়া দুই টাকা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে চিত্তশুদ্ধির সর্ব্বজনসুলভ উপায়স্বরূপ স্তোত্রাদি পাঠের প্রথা প্রচলিত আছে। এইরূপ স্তোত্রের সংখ্যা অগণিত এবং তন্মধ্য হইতে নিত্যপাঠ্য উৎকৃষ্ট কতিপয় নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কঠিন কার্য্য। উত্তমাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী একটি সংগ্রহ অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করাইয়াছিলেন—তন্মধ্যে তাঁহার স্বরচিত গান সন্নিবিষ্ট ছিল। পরে তাহা শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ স্বামী দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। বর্ত্তমান সংস্করণটি অধুনা-বিখ্যাত উত্তমাশ্রমের পর পর তিন জন মহাপুরুষের পবিত্র সংস্পর্শে গৌরবান্বিত এবং তাঁহাদের চিত্র দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মনোজ্ঞ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইলেও ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে—কারণ, এ-জাতীয় গ্রন্থ বাজারে বহু পাওয়া গেলেও এইরূপ পবিত্র সমাবেশ অন্য কোন স্তোত্রসংগ্রহে পাওয়া কঠিন।

শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন—শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার। ১০৯।১১-এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। পৃ, ৪৮+৪২৫। মূল্য পাঁচ টাকা।

উপনিষদের একটি বচন আছে—পৌরুষ দ্বিবিধ, 'উচ্ছাস্ত্র' (যাহা অনর্থ ঘটায়) এবং 'শাস্ত্রিত' (যাহা পরমার্থজনক)। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র উচ্ছাস্ত্র পৌরুষ প্রসারলাভ করিয়া মানবজাতির অনর্থ ঘটাইতেছে। গ্রন্থকার ইঞ্জিনীয়ার অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু গুরুকৃপায় তাঁহার শাস্ত্রে বিশ্বাস বিন্দুমাত্র স্খলিত হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রের যে সকল বিষয়ে অশ্রদ্ধার বীজ নিহিত আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এইরূপ ২৯টি প্রশ্নের উত্তর এই বিরাট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরলোক, জাতিভেদ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজঘটিত এবং রাসলীলা, গুরুতত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মঘটিত বিষয়ের আলোচনায় ও বিশ্লেষণে গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি স্বভাবতঃই শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অনুসরণমাত্র নহে—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব ও সদ্গুরুর বাণী এমন এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তাঁহার বিচারবুদ্ধিকে অভিষিক্ত করিয়াছে যে, ঘোর অবিশ্বাসীও মুগ্ধ না হইয়া পারে না। গ্রন্থকারের পরম গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বহু অলৌকিক ঘটনা ও অসংশয়িত উপদেশ এবং নির্দ্দেশ গ্রন্থটিকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থকারের ভাবপ্রবণতা ও ভাষার লালিত্য উপভোগ্য। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষিত লোকের শাস্ত্রবিশ্বাস দৃঢ় হইবে এবং দীক্ষাগ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। নাস্তিকতার প্রবল আকর্ষণের মধ্যে অমৃতের সন্ধান বহন করিয়া আনিয়া গ্রন্থকার প্রকৃত সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ নিবেদন এই সেবাব্রতের পরিণতি এবং একান্ত মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গান্ধী ও মার্কস—কিশোরলাল মশরুওয়ালা। অনুবাদক—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৲। পৃষ্ঠা ১৩৪।

কিশোরলাল ভাই ১৮৯০ সনের ৫ই অক্টোবর এক সম্রান্ত গুজরাটী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। চরিত্রমাধুর্য্যে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। ১৯১৭ সনে তিনি প্রথম গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব কর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় ও নম্র স্বভাবের জন্য শীঘ্রই মহাত্মাজীর প্রিয়পাত্র হন। বহুদিন তিনি গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত 'হরিজন' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সনে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনার্থ মহাত্মাজীর নোয়াখালি পরিক্রমার সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ১৯৫২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছিল।

মার্কসবাদকে কিশোরলালজী সংস্কারমুক্ত হইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতে মার্কসবাদ এবং গান্ধীবাদের তুলনা-মূলক বিচার ও আলোচনা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক।

মহাত্মা গান্ধী ও কার্ল মার্কস উভয়েই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মনীষী। অনেকের ধারণা উভয়ের আদর্শ এক, কেবল আদর্শে উপনীত হইবার পন্থা বিভিন্ন। এক জনের পথ অহিংস, অপরের পথ হিংসার মধ্য দিয়া। কিন্তু আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই মতবাদ দুইটি পরস্পর হইতে কেবল বিভিন্ন নহে, পরস্পর-বিরোধীও বটে। গান্ধী ও মার্কস উভয়কেই একতত্ত্ববাদী বলা চলে। এই একতত্ত্ব কিন্তু উভয়ের নিকট বিভিন্ন। গান্ধীজীর মূলতত্ত্ব 'চৈতন্য', মার্কসের মূলতত্ত্ব 'জড়' এইজন্য গান্ধীজী 'আস্তিক' আর মার্কস 'নাস্তিক'। এইজন্য

গান্ধীদর্শন বলে—জড়ের অস্তিত্ব চৈতন্তের ভিত্তিতে, আর মার্কস-দর্শন বলে জড় হইতেই চৈতন্তের উৎপত্তি। ইহা হইতেই মার্কসদর্শনের 'নিয়তিবাদ' আসিয়াছে।

গান্ধীজী ও মার্কসের লক্ষ্যের মধ্যেও প্রভেদ বর্তমান—রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদের বিচারধারা পৃথক। মার্কসের মতে শ্রেণী-সংগ্রাম, সর্বহারার একনায়কত্ব দ্বারা শ্রেণী-বৈষম্যের অবলুপ্তিসাধন ও ভূমি, খনি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্বস্থাপন, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও কার্য্যকলাপের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত হইতেছে—বর্ণধর্ম (অর্থাৎ কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইয়া শিল্পসমূহের অনুশীলন), সত্যাগ্রহ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকরণ, অহিংসা ও সামাজিক জীবনে যথাসম্ভব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

গান্ধীজী জোর দিতেন নৈতিক ও মানসিক পরিবর্তনের উপর—মার্কস-কথিত পথে—শ্রেণীহীন (হত্যা প্রভৃতি দ্বারা তথাকথিত "বিপ্লব") সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। গান্ধীজীর আসল লক্ষ্য ছিল কিসে মানুষের চারিত্রিক উন্নতি হয়—আর সকলই পন্থামাত্র। তিনি রাজনৈতিক বা আর্থিক কাঠামোর বাহ্য স্বরূপের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। অথচ মার্কসবাদ মনে করে "মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পরিবেশ রচনা করে না। পক্ষান্তরে মানুষের সামাজিক অবস্থা বিবেক নির্মাণ করে।" গান্ধীজীর অহিংসা মার্কসের একনায়কত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন সমস্যার প্রতি গান্ধীজী ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান।

গান্ধীবাদ হইতেছে এক নিশ্চিত আদর্শের প্রতি অগ্রসর হইবার বিশেষ পদ্ধতি। তাঁহার মতে সত্য ও অহিংসা, সমাজে সমমর্যাদা, আত্মোন্নতির সমান সুযোগ, ধন এবং জীবনধারণোপযোগী উপকরণসমূহের সমবণ্টন, রাষ্ট্রীয়-নিয়ন্ত্রণ-পাশ হইতে মুক্তি, বিকেন্দ্রীকরণ, অযান্ত্রিকতা, শান্তি, সদ্ভাব, মৈত্রী, যুদ্ধের আতঙ্কমুক্তি, আইনকানুনের নিগড় হইতে রেহাই পাওয়া, সর্বাধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যযুক্ত অথচ সুব্যবস্থিত সমাজ ইত্যাদি বিষয় এই আদর্শ জীবনের বিভিন্ন অঙ্গ।

অথচ গান্ধীবাদ বলিয়া কিছু গান্ধীজী নিজেই স্বীকার করেন নাই। "আমি তো শুধু নিজস্ব পদ্ধতিতে শাশ্বত সত্যকে দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যাবলীতে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি"—ইহা গান্ধীজীর নিজের কথা।

গান্ধী ও মার্কসের মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ত বটেই, অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তির ধারণাও অস্পষ্ট। এইজন্যই তরুণ-সমাজ আদর্শ-নির্ণয়ে এবং কর্তব্য-নির্ধারণে স্বতঃই বিপথগামী হইতেছেন। 'মার্কসবাদের গতিপ্রকৃতি' শীর্ষক একটি অধ্যায় মূল গ্রন্থে না থাকিলেও উহা এই পুস্তকে সংযোজিত করিয়া অনুবাদক ভাল করিয়াছেন। মহাত্মাজীর উত্তরসাধক আচার্য্য বিনোবা ভাবে এই গ্রন্থের ভূমিকায় গান্ধীদর্শনের যে মনোরম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুস্পষ্ট হইয়াছে।

এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার খুবই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কৃষ্ণকলি—শ্রীতারাপদ রাহা। কথা ভবন। ২৭।২।৩, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য দুই টাকা।

গল্পসংগ্রহ। কৃষ্ণকলি, মাটি আর মানুষ, শিবশঙ্কর, পাশের বাড়ীর বৌ, বাঁশী, নিঃসঙ্গ, সমাপ্তির পূর্বপরিচ্ছেদ ও অনাবশ্যক—এই আটটি গল্প পুস্তকখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। ছোটগল্প লেখায় তারাপদ বাবুর হাত আছে। তিনি মিষ্টি করিয়া বলিতে জানেন—অল্প কথায় গুছাইয়া বলিবার শক্তি ও তাঁহার আছে।

কৃষ্ণকলি, মাটি আর মানুষ, পাশের বাড়ীর বৌ ও নিঃসঙ্গ এই চারিটি গল্প বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলিও মন্দ নয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ধূমকেতু—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র। মেসার্স গোকুলচন্দ্র দত্ত এণ্ড কোং পাবলিশার্স এণ্ড প্রিণ্টার্স। ৯-এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ঈষ্ট, কলিকাতা-১। মূল্য আড়াই টাকা।

ধূমকেতু সম্পর্কে লেখক প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত গগন-পর্য্যবেক্ষণের বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি ধূমকেতু সম্পর্কিত এই তথ্যমূলক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া আমাদের মাতৃভাষার একটি অভাব পূরণ করিলেন। গ্রন্থকার পল্লীবাসী, পল্লীর শান্ত পরিবেশে অবস্থান করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি চর্মচক্ষুর দূরদৃষ্টি দ্বারা গগন-পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন। গগন পর্য্যবেক্ষণে কৃতকার্য্যতালাভের দরুন তিনি আমেরিকা হইতে একটি মূল্যবান দূরবীক্ষণ যন্ত্র উপহার পান। তাঁহার দীর্ঘজীবনের গগন পর্য্যবেক্ষণের সার্থক সাধনার ফল এই ধূমকেতু নামক গ্রন্থখানি। জীবনসায়াহ্নে ইহা প্রকাশ করিয়া লেখক অনুসন্ধিৎসু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহৎ উপকার করিলেন। এই গ্রন্থে পুরাণ ও জ্যোতিষসংহিতায় বর্ণিত ধূমকেতুর পরিচয় এবং বর্তমান বিজ্ঞানে বর্ণিত ধূমকেতু-পরিবারের অবস্থান, তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোধানের সময়নির্ণয় ও ধূমকেতুসমূহের চিত্র, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকগণের জীবন-কথা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির ভিতরে ধূমকেতুর আবির্ভাব ও তিরোধানের সঙ্গে জড়িত এক অহেতুক অমঙ্গলের আশঙ্কা বহু শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে 'ধূমকেতুর' গতিবিধি, ইত্যাদি পরীক্ষার পরে দেখা যাইতেছে যে, ধূমকেতু সৌর পরিবারের সকল জ্যোতিষ্কের তুলনায় অতি দুর্বল এবং নিঃস্ব। ধূমকেতুর ভাগ্যে প্রায়শঃই সূর্য্যের স্নেহ কৃপালাভ হয় না। ধূমকেতু আকাশপথে অতি নিরীহ জীবের ন্যায় ভয়ে ভয়ে বিচরণ করে; কারণ গ্রহসংঘর্ষে তাহার কক্ষচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে। গ্রন্থকার প্রাচীন শাস্ত্র ও বর্তমান বিজ্ঞান এবং প্রাচীন কুসংস্কার সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন। এক কথায় ধূমকেতু গ্রন্থখানি ছাত্র, অধ্যাপক এবং মানমন্দিরের গগন-পর্য্যবেক্ষকগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

এখন রেক্সোনায় নতুন একটা কিছু আছে !
এতটা অনেক...
অনেক...
বেশী সুগন্ধী!
রেক্সোনা সাবানে এখন
অনেক...অনেক
বেশী সুগন্ধ আছে
দীর্ঘস্থায়ী
সতেজতার জন্যে

দেশ-বিদেশের কথা

সাহিত্যিকের সম্মান

প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর দিল্লীর "সাহিত্য আকাদমি" কর্তৃক "আরোগ্য-নিকেতন" শীর্ষক উপন্যাসের জন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন। এই পুস্তকখানি লিখিয়া তিনি ১৯৫৪-৫৫ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি চীন-রাষ্ট্রের আহ্বানে তারাশঙ্করবাবু ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে চীন-যাত্রা করিতেছেন। সেখানে লু-সিন নামক খ্যাত চীনা সাহিত্যিকের বিংশতি মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। লু-সিন আধুনিক চীনা সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া চীন দেশে স্বীকৃত। তারাশঙ্করবাবু তাঁহার মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিবেন। এই উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত তিনি আহূত হইয়াছেন।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

১৯৫৫ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

১৯৫৫ সনে দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে ১৬টি নূতন শয্যা প্রতিষ্ঠা করা হয়—তন্মধ্যে ১৪টি শয্যা জাতিধর্ম্ম-উপজীবিকা-নির্ব্বিশেষে যে কোন যক্ষ্মা রোগীর জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবহার্য্য। অবশিষ্ট দুইটি শয্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম্মচারীদিগের জন্য সংরক্ষিত। ইহা লইয়া সেবায়তনে মোট শয্যার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ত্রিশটি—তন্মধ্যে অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারীদিগের জন্য; এবং ২৮টি ভাণ্ডারের নিজস্ব অর্থে পরিচালিত সম্পূর্ণ 'ফ্রি বেড'। আলোচ্য বৎসরে ৫৯ জন নূতন রোগীকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, আর বর্ষারম্ভে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩ জন। সর্ব্বসাকুল্যে ৭২ জন রোগীর মধ্যে ৪৩ জন বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই রোগমুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। অবশিষ্ট ২৯ জন বর্ষশেষেও হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছিল।

বুকের রোগ চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগ দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার চেষ্ট ক্লিনিকে ১২,৮৯৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৯৫৭ জন নবাগত। রোগীদিগের বাড়ীতে ডাক্তার ও তত্ত্বাবধায়ক পাঠাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা অনুসারে আলোচ্য বৎসরে ১৪৫ জন নূতন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। তন্মধ্যে ৪০ জন অল্প কয়েকদিন পরেই চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দেয় এবং অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ৬৪ জনকে নিয়মিত বহির্বিভাগে গিয়া চিকিৎসা করাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ৪১ জন বর্ষশেষেও বাড়ীতে থাকিয়া ভাণ্ডারের ডাক্তার ও কর্ম্মীদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করাইবার সুযোগ পাইতেছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে মূল্যবান ইঞ্জেকশন, ঔষধ, এ-পি ও পি-পি এবং দুধও সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে রোগীদিগকে সরবরাহ করা হয়।

সাধারণ রোগ চিকিৎসার জন্য চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়ের দুইটি শাখায় আলোচ্য বৎসরে ৯২,৫২০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৬,৯১৪ জন নবাগত। এই বিভাগে প্রতিটি রোগীর জন্য গড় দৈনিক খরচের পরিমাণ তিন আনা পাঁচ পাই।

সেবা-বিভাগের ভাণ্ডারের তরুণ কর্ম্মীরা আলোচ্য বৎসরের যে মাস হইতে পুনরায় মুষ্টিভিক্ষা তুলিতে আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, মুষ্টিভিক্ষা সম্বল করিয়াই ১৯২২ সনে ভাণ্ডারের যাত্রা সুরু হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের শেষ আট মাসে মুষ্টিভিক্ষার দান একত্র করিয়া মোট ৭৩/৫ সের চাউল

পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫৬৮৬ সের চাউল বর্ষমধ্যেই দুঃস্থ গৃহস্থদিগকে বিতরণ করা হয়। ইহা ছাড়া নগদ ১,৪১২৮৬ পাই সাহায্য হিসাবে বিতরণ করা হয়।

কাঁকুড়গাছীতে প্রস্তাবিত প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের জন্ম দ্বিতল গৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্য আলোচ্য বৎসরে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখানে নার্সিং এবং ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে। বাড়ী তৈয়ারীর জন্ত আলোচ্য বৎসরে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ দশ হাজার টাকা দান করেন; মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ভক্ত এবং শিষ্যদিগের নিকট হইতেও দশ হাজার টাকা পাওয়া যায়। ১৬টি শয্যা লইয়া প্রসূতিসদনের কাজ আরম্ভ করার আয়োজন চলিতেছে। ইহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিলে মানিকতলা অঞ্চলে প্রসূতি হাসপাতালের অভাব দূর হইবে।

আলোচ্য বৎসরে ভাণ্ডারের বিভিন্ন বিভাগের জন্ত দেড় লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় হইয়াছিল। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তহবিল, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ, কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা পুলিশের দাতব্য তহবিল, আই-এফ,-এ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অর্থসাহায্য, ব্যক্তিগত চাঁদা ও দান এবং বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ভক্ত ও শিষ্যদিগের নিকট হইতে দান ও সাহায্যের দ্বারা ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের অভাবও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি বিভাগেই সাহায্যপ্রার্থীর তুলনায় স্থানাভাব, সেজন্ত অবিলম্বে বিভাগগুলি সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। প্রসূতিসদনের বাড়ী তৈয়ারী শেষ হইলেও সাজসরঞ্জামের অভাবে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন। মাত্র মুষ্টিভিক্ষার দান সম্বল করিয়া ভাণ্ডারের সূচনা, তার পর দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের সাধনায় ইহা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রথম শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সাহায্যই ইহার সম্বল। প্রতিষ্ঠানটি আরও প্রসারিত করিবার জন্ত তাঁহারাই অগ্রণী হউন।

ঝাড়গ্রাম কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র প্রথম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব

গত ২১শে সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রাম কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠান ও সভার আয়োজন করা হয়। ঝাড়গ্রামের রাজা বাহাদুর শ্রীনরসিংহ মল্লদেব এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই সমাবর্ত্তন উৎসবে শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র ও শিক্ষকগণ বাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-বিভাগের উপ-অধিনায়ক শ্রীদেবীদাস মজুমদার, স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ও ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার আরম্ভে সভাপতি ও প্রধান অতিথি শিক্ষাকেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদিগের কার্য্যকলাপ ও প্রস্তুত বিবিধ সামগ্রী পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিভাগ পরিদর্শনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার প্রথমে শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাদ্রিশেখর দে তাঁহার বিবরণীতে এই শিক্ষাকেন্দ্রের শিল্প-

শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় উক্ত কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা সমাপনান্তে স্ব স্ব পল্লীতে গিয়া স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁহার ভাষণে উপদেশ দেন। তিনি এই শিক্ষাকেন্দ্রের কার্য্যপদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত, এম-এল-এ, বর্ত্তমান কুটিরশিল্পকে সমবায়ের ভিত্তিতে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে কিছু বলেন। শ্রীনলিনীমোহন মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই অনগ্রসর অঞ্চলটিতে উন্নতি সূচিত হইতেছে বলিয়া মন্তব্য করেন।

মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীমহেন্দ্র মাহাত, এম-এল-এ, কারিগরি শিক্ষার যোগদানের জন্ত এই অঞ্চলের যুবকদের উক্ত কেন্দ্রের শিল্প-শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে কারিগরি শিক্ষার সার্থকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অধিবাসিগণের কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে।

পরলোকে সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী ৫৩ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন উচুদরের প্রাবন্ধিক এবং চট্টগ্রাম কলেজে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। সৈয়দ মোতাহের হোসেনের পিতৃভূমি নোয়াখালি, কিন্তু তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছেন কুমিল্লা শহরে, তাঁর মাতুলালয়ে। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। তার পর এম-এ পাস করিয়া ইসলামিয়া কলেজে বাংলার লেক্‌চারার হন দেশ বিভাগের অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে। দেশ বিভাগের পর তিনি চট্টগ্রামে যান। সৈয়দ মোতাহের হোসেন অল্প বয়সে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা, যুক্তিবাদী মন ও মানবিকতা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

জিতেন্দ্রমোহন সেন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় গত ৩০শে আগষ্ট (১৯৫৬) তারিখে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। তিনি ২৫শে এপ্রিল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষাব্রতী এবং সম্পাদকরূপে কেশব একাডেমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জিতেন্দ্রবাবু বিলাতের লীডস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এড, ডিগ্রী লাভ করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস ও সহকারী ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ট্রাক্‌শ্যান্ নিযুক্ত হন। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষরূপে খুব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৯৪৮ সনে অবসর গ্রহণ করেন। পরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভা বহু দিকে বিস্তৃত ছিল। তিনি কর্পোরেশনের শিক্ষা পরিচালনা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এশিয়াটিক্ সোসাইটির অবৈতনিক সেক্রেটারিরূপে কর্ম্ম করেন ও ন্যাশানাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়ান্সেস পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

জিতেন্দ্রমোহন সেন

জিতেন্দ্রমোহন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদকরূপে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেন। কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের সহিত প্রথম হইতে, তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে কয়েকটি শিক্ষামূলক গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন। গত বৎসর হইতে তিনি ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের পরীক্ষা বিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

জীবনের কোন বিপদ-আপদে বা কোন কঠিন কর্ম্মের সম্মুখীন হইয়া তিনি অবসাদগ্রস্ত হন নাই। সুদীর্ঘকাল তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

শ্রীঅমের বসু নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৫৬ সনে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন ও ইতিহাসে ডিসটিংশ্যান লাভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রই ইতিহাসে ডিসটিংশন পায় নাই এবং এই সর্ব্বপ্রথম একজন বাঙালী ছাত্র বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। শ্রীঅমের বসু মধ্যপ্রদেশের চিন্দিমিরি লাহিড়ী কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসুর পুত্র। তাঁহার মাতা শ্রীমতী অমিতা কুমারী বসু একজন সুলেখিকা।
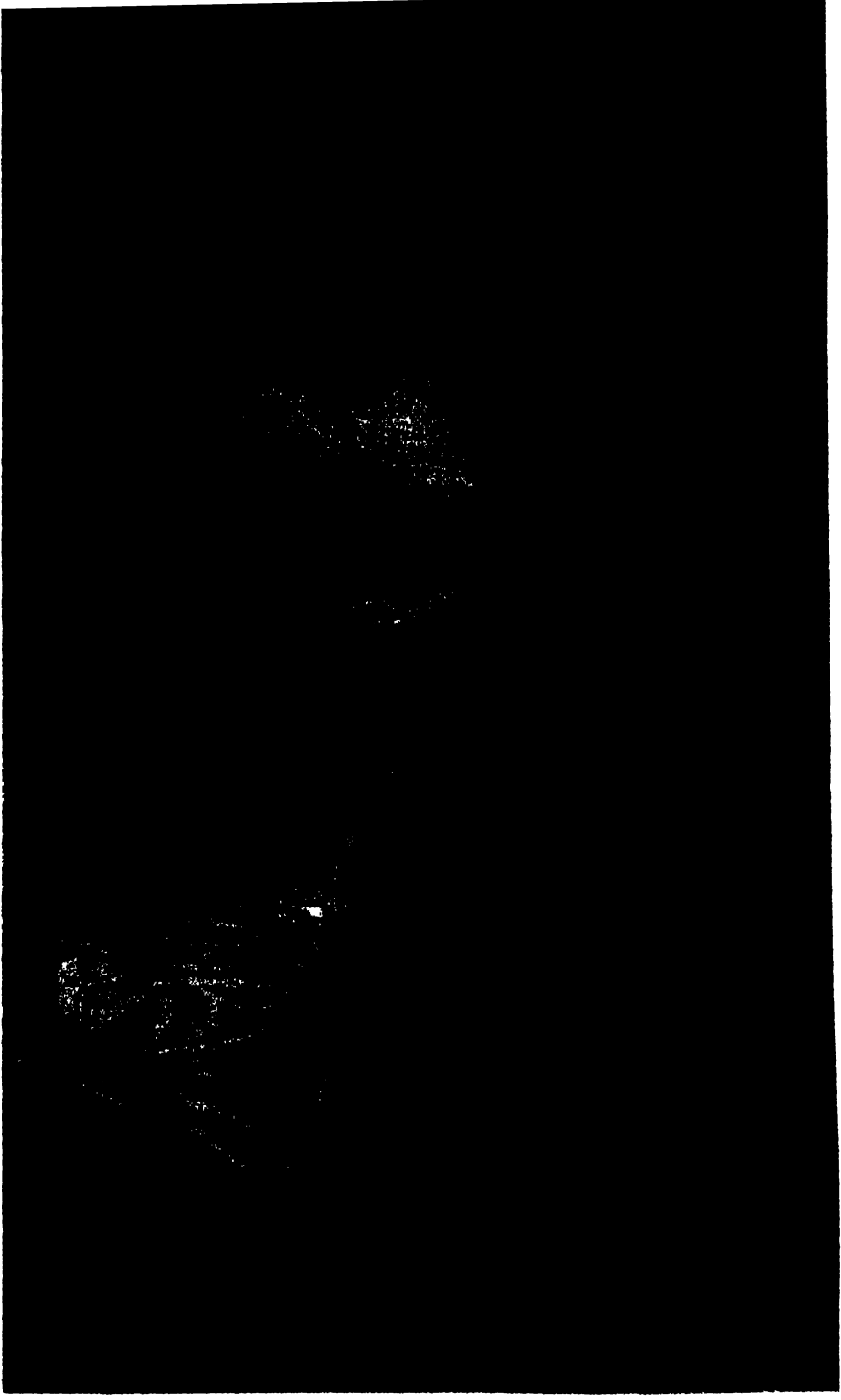
“প্রদীপ ধরিয়া হেরিল সাধুর নবীন গৌরকান্তি”

শ্রীজয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সৈন্যবাহিনীর লোকদের দ্বারা যমুনা নদীর বন্যাপ্লাবিত গ্রামবাসীদের উদ্ধার

ইডেন গার্ডেন্স

[ফটো- শ্রীবরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় এ. আই. সি. সি.

বিগত ২৫শে কার্ত্তিক কলিকাতায় নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে নানা কথার অবতারণা হইয়াছিল, নানা প্রশ্ন লইয়া বিচার ও বিতর্ক হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। কিন্তু দেশের লোকের মনের উপর—এমনকি কলিকাতার জনসাধারণের উপর—যে এই অধিবেশন কোনও ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা ত মনে হয় না।

অবশ্য কলিকাতা এখন প্রাণহীন পান্থশালা। বিদেশী ও ভিন্ন রাজ্যের লোক সেখানে বাস করে এবং নগরীর সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান তাহাদেরই অধিকারে। তাহারা ধনোপার্জ্জন ও জীবিকা অর্জ্জন যাহা করিবার তাহা করিয়া, পান্থশালায় পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া, স্বদেশে ফিরিয়া যায়, নূতন আগন্তুক তাহার পরিত্যক্ত আসন দখল করে। দেশের সন্তান যাহারা তাহারা ত প্রায় অসহায় সম্বিৎহীন অনাথের অবস্থায় আছে। পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তিতে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। সুতরাং এখানে কাহার মনে কে সাড়া জাগাইবে? যে আহরণে, লুণ্ঠনে ও অধিকার অর্জ্জনে ব্যস্ত তাহার সময় কোথায় শুনিবার? যে হৃতসর্ব্বস্ব পথের ভিখারী হইতে চলিয়াছে তাহাকে কোন আশার বাণী শুনাইয়াছেন কংগ্রেসের অধিকারীবর্গ যে সে সাড়া দিবে?

বলিতে কি, এই অধিবেশনে প্রাণময় বাস্তবের পরিচয় আমরা কিছুই পাই নাই। পাইয়াছি শুধু পণ্ডিত নেহরুর চিন্তার এবং কথার প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছায়া। তাহাতে নূতনত্বই বা কি, উদ্বুদ্ধ হওয়ার তূর্য্যনাদই বা কোথায়? পণ্ডিত নেহরু হাঙ্গেরী লইয়া বিব্রত ছিলেন—বিশেষতঃ শ্রীমেননের কার্য্যকলাপে—এই অধিবেশনে তিনি তাঁহার মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার অবসর পাইলেন। ইহা ভিন্ন আর কোন কাজ হইল এই অধিবেশনে?

অধিবেশনের সূচনাই হয় বর্ত্তমানে বিশ্বজগৎ যে শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধ একটি প্রস্তাব লইয়া। প্রস্তাবের ভাষা ছিল অতিশয় তীব্র, এবং আলোচনায় আরও স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ, ফরাসী ও রাশিয়ার কার্য্যকলাপের নিন্দাবাদ হয়। রবিবারের অধিবেশনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের বিবরণীর আলোচনা আরম্ভ হয়, কিন্তু ইন্দোনেশীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রোমিজয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য-ইউরোপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোচনা পুনরায় চলে। পরে মূল প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি হয় এবং গতানুগতিক সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াইয়া এগার শত শব্দের প্রস্তাবটি সমর্থিত ও গৃহীত হয়। শুধু শ্রীগাডগিল উহার প্রতিবাদে বলেন যে, দূর ভবিষ্যতে দেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখানো হইতেছে, তত দিন দেশের লোক বাঁচিবে কি করিয়া সে সম্বন্ধে অধিকারীবর্গ কি বলেন? বলা বাহুল্য, এই সমালোচনার কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অবশ্য শ্রীগুলজারীলাল নন্দ প্রত্যুত্তরে কিছু বাঁধিগতের আবৃত্তি করেন।

আসলে এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থরক্ষা। অর্থাৎ, যাঁহারা বর্ত্তমানে অধিকারী হইয়া নিজেদের দলের স্বার্থে কংগ্রেসকে ডুবাইতেছেন এবং দেশকে বিভ্রান্ত ও সম্বিৎহীন করিতেছেন, এই অধিবেশন হইয়াছিল তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য। এক কথায় আগামী নির্ব্বাচনে যাহাতে তাঁহাদের অন্তঃসারহীন চাটুকারমণ্ডলীর স্বার্থহানি না হয় তাহার চিন্তাই ছিল উপস্থিত মহাশয়গণের শতকরা ৯০ জনের দেহমন ব্যপ্ত করিয়া। সুতরাং এই অধিবেশন যে বাহিরের লোকের কাছে অবাস্তব ঠেকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচনী ইস্তাহার স্থির হইল না। কেন হইল না সে তো বুঝাই যায়।

দেশে প্লাবনের ফলে ব্যাপক ক্ষতি সম্পর্কে উদ্বেগ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তাহাতেও কোন নূতন আশা-ভরসার কথা ছিল না, কেন ছিল না তাহা বলি।

প্লাবন সম্পর্কে পশ্চিম বাংলায় গ্রামাঞ্চল পুনর্গঠন কারণে যে সকল সরকারী ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার মধ্যে দেশী পাঁজায় ইট পুড়াইবার জন্য যে কয়লার ব্যবস্থা হইতেছে, এখানে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করি। আমরা একজন বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ কয়লাখনির মালিকের নিকট হইতে এক বিবৃতি পাইয়াছি। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলা সরকার যে শ্রেণীর কয়লা তিন লক্ষ টন চাহিয়াছেন ঐ দেশী পাঁজায় ইট পোড়াইবার জন্য, তাহাতে ঐ কাজ আদৌ হইবে না; হইবে শুধু কালো বাজারে চড়া দামে ঐ কয়লা বিক্রী। ক্রেতা হইবে বিদেশী প্রথায় প্রতিষ্ঠিত ইটখোলার মালিক।

পশ্চিম এশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ

সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলী পার্ল হারবারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯৪১ সনে ওয়াশিংটনে যখন জাপানী রাষ্ট্রদূত মার্কিন সরকারের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিলেন তখন কোন সতর্কবাণী ব্যতিরেকেই জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পার্ল হারবার বন্দরে মার্কিন রণপোতগুলির উপর আক্রমণ আরম্ভ করে এবং এই ভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে "দ্বিতীয় ফ্রন্ট" প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফ্রন্টের উদ্বোধন হয়। মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ করা হইয়াছে পুরাপুরি "জাপানী" কায়দায়। হুমকি প্রদর্শন বন্ধ করিয়া সুয়েজ খাল জাতীয়করণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি যখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স শান্তিপূর্ণ ভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় সম্মত বলিয়া মিশরের সহিত আলাপ-আলোচনার ভান করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই তাহারা মিশর আক্রমণের শেষ বন্দোবস্তটি সম্পূর্ণ করিতেছিল। জুলাই মাসের শেষ দিক হইতে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিকবাহিনী এবং রসদ যোগানো যখন তাহারা সম্পন্ন হইয়াছে মনে করিল তখনই ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সরকার ইস্রায়েলকে উস্কাইয়া দিল মিশর আক্রমণ করিবার জন্ত। ইস্রায়েল তাহার অতীত ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া (ইস্রায়েল রাষ্ট্রগঠনে ব্রিটেন সর্বপ্রকারে বাধা দিয়াছে) সাম্রাজ্যবাদের চররূপে ৩০শে অক্টোবর মিশর আক্রমণ করিল। আক্রান্ত মিশর স্বভাবতঃই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর দিকে ৩০শে অক্টোবর এক সতর্কবাণীতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সর এণ্টনী ইডেন ঘোষণা করিলেন যে, যদি অবিলম্বে মিশর এবং ইস্রায়েল সকল প্রকার সংঘর্ষ না বন্ধ করে তবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবে। সর এণ্টনী আরও বলেন যে, যাহাতে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া সকল দেশের জাহাজ অবাধ গতিতে চলাচল করিতে পারে সেজন্ত মিশর সরকারকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে যেন মিশর সরকার পোর্ট সৈয়দ, ইসমাইলিয়া এবং সুয়েজ বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সাময়িক ভাবে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্ত মোতায়েনে সম্মত হন।

বলা বাহুল্য, মিশর এই সকল সর্ত মানিয়া লইবে আশা করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সরকার সর্তগুলি আরোপ করেন নাই—বরং যাহাতে মিশর সর্তগুলি গ্রহণের কোন উপায় না পায় সেজন্ত সর্তগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সহিত যথাসম্ভব রূঢ় করিবারই চেষ্টা হইয়াছে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ মিশর সরকার ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কোন সর্তই মানিতে রাজী হন না। কাজে কাজেই "নিরুপায়" ব্রিটেন ও ফ্রান্স "নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও" কেবলমাত্র "গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতি রক্ষার্থে" নিরপরাধ, নিরস্ত্র মিশরবাসীদের উপর তাহাদের মারণাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিতে "বাধ্য" হয়—ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বক্তৃতাতে অন্ততঃ এইরূপই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

৩১শে অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিশরে বলপ্রয়োগে অথবা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন হইতে বিরত থাকিবার জন্ত শক্তিবর্গকে অনুরোধ জানাইয়া যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করে তাহা ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের 'ভেটো' প্রয়োগের ফলে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তাবটি সমর্থন করে। প্রস্তাবটির পক্ষে সাতটি ভোট এবং বিপক্ষে দুইটি (ব্রিটেন ও ফ্রান্স) ভোট পড়ে। দুইটি রাষ্ট্র (অষ্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়ম) ভোটদানে বিরত থাকে। প্রসঙ্গতঃ নিরাপত্তা পরিষদে ইহাই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ভেটো।

সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইস্রায়েল এবং মিশরকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানায় এবং বলে যে, ইস্রায়েল যেন পূর্বনির্দ্ধারিত যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পশ্চাতে তাহার সৈন্ত সরাইয়া লয়। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ভেটোর ফলে এই প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবটির পক্ষে সাতটি ভোট এবং বিরুদ্ধে দুইটি ভোট (ব্রিটেন ও ফ্রান্স) পড়ে। দুইটি রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ম ভোটদানে বিরত থাকে।

সারারাত উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার পর ২রা নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদ এক জরুরী অধিবেশনে ৬৪-৫ ভোটে অবিলম্বে মিশরে যুদ্ধ করিবার জন্ত একটি মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করে। যে পাঁচটি শক্তি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছে তাহারা অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইস্রায়েল, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। তুরস্ক, নেদারল্যাণ্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়ম, কানাডা, লাওস এবং পর্তুগাল ভোটদানে বিরত থাকে। প্রস্তাবে সুয়েজ খাল অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি ও ঐ এলাকায় সৈন্ত এবং সমরাস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করার দাবি জানাইয়া সকল পক্ষকে ১৯৪৮ সনে নির্দ্ধারিত আরব-ইস্রায়েলী যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পিছনে সরিয়া যাইবার, যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ না চালাইবার এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির সর্তাবলী নিষ্ঠার সহিত পালনের জন্ত দাবি জানানো হয়।

৩রা নবেম্বর এক যুক্ত বিবৃতিতে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ইডেন বলেন যে, মিশর ও ইস্রায়েলের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি সৈন্ত মোতায়েন করেন, তবেই ব্রিটেন স্বেচ্ছায় মিশরে তাহাদের সামরিক অভিযান বন্ধ করিতে পারে। ইহার অন্ততম সর্ত হিসাবে মিশর ও ইস্রায়েল উভয়কেই শান্তিরক্ষার জন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্তদলকে মানিয়া লইতে হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্ত গঠিত না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্তদিগকে মিশরে থাকিতে দিতে হইবে।

৩রা নবেম্বর পার্লামেণ্টে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী হেড বলেন যে, মিশরে তখনও ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্ত অবতরণ করে নাই। ৪ঠা নবেম্বর মিশরে সৈন্ত অবতরণের সংবাদ স্বীকার করা হয়। ৫ই নবেম্বর ব্রিটিশ সৈন্ত পোর্ট সৈয়দ অধিকার করে।

৪ঠা নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ অধিবেশনে মিশরে যুদ্ধবিরতি তদারক ও ব্যবস্থাকল্পে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে জরুরি আন্তর্জাতিক

বাহিনী গঠনের প্রস্তাব ৫৭-০ ভোটে গৃহীত হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ উনিশটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। প্রস্তাবে সেক্রেটারী-জেনারেলকে অনুরোধ করা হয় যেন তিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিশরে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা এবং তদারকী করিবার উপযোগী একটি জরুরি রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা পেশ করেন। ৫ই নবেম্বর এক বিবৃতিতে মিশর সরকার আন্তর্জ্জাতিক পুলিসবাহিনী গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঐ একই দিনে সোভিয়েট সরকার ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নিকট একটি 'নোটে' শক্তিদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যদের সহিত রাশিয়া "মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ ব্যাহত ও পুনরায় শান্তিপ্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।" ইস্রায়েলকেও অপর এক পত্রে অনুরূপ ভাবে আক্রমণ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। মার্শাল বুলগানিন-প্রেরিত সতর্কবাণীতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, তাহারা যদি "সর্ব্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত অধিকতর শক্তিশালী কোন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় তবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কি অবস্থা হইবে।" মার্শাল বুলগানিন আরও বলেন, "এই সকল মারণাস্ত্র নৌ ও বিমানবহর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয় না; রকেটের সাহায্যে উহা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।" নিরস্ত্র মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর রকেট আক্রমণের পার্থক্য কোথায়—বুলগানিন প্রশ্ন করেন। বুলগানিন বলেন, "মিশরের যুদ্ধ অন্য দেশেও ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং উহা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে।"

মার্শাল বুলগানিন বলেন, "আমরা বলপ্রয়োগের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ ব্যাহত এবং পুনরায় শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ বদ্ধপরিকর। আমরা আশা করি যে, এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে আপনারা (ইডেন ও মোলেত) যথাযোগ্য বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।"

মার্শাল বুলগানিন শ্রীনেহরুকে এক পত্রে এই সতর্কবাণী প্রেরণের কথা জানান।

৬ই নবেম্বর (অর্থাৎ পরদিন) সকালে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার মিশরে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

৬ই নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী গঠন সম্পর্কে মিঃ হ্যামারশিল্ড তাঁহার চূড়ান্ত রিপোর্ট সাধারণ পরিষদের নিকট উপস্থিত করেন। ৭ই নবেম্বর সাধারণ পরিষদ দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একটিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ পুলিসবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অপরটিতে মিশর হইতে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইস্রায়েলকে সকল সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রস্তাবটি বিনা বাধায় ৬৪-০ ভোটে গৃহীত হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রজোট, মিশর, ইস্রায়েল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ১২টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। মিশর হইতে ইঙ্গ-ফরাসী এবং ইস্রায়েল-বাহিনীকে অপসারণের নির্দ্দেশ দিয়া যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহার পক্ষে ৬৫টি ভোট এবং বিপক্ষে একটি (ইস্রায়েল) ভোট পড়ে। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, লাওস, লুক্সেমবুর্গ নেদারল্যাণ্ডস পর্ত্তুগাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। ভারত ও কানাডাসহ তেরোটি রাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। ১৩ই নবেম্বর এই আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর অগ্রগামী দল মিশরের মাটিতে পদার্পণ করে। শ্রী মেনন ৭ই নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে বক্তৃতায় বলেন, আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী গঠনের অর্থ এই নহে যে, আক্রমণকারীদের সমর্থন করা হইবে।

এই প্রসঙ্গ লেখা শেষ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত মিশর হইতে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইস্রায়েলী সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুযায়ী কার্য্য করিবার কোন লক্ষণ ব্রিটেন বা ফ্রান্সের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হয় না।

ইঙ্গ-ফরাসী সরকার "গণতন্ত্র ও আন্তর্জ্জাতিক আইনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার" জন্যই মিশরে "পুলিসবাহিনী" প্রেরণ করিয়াছিলেন (সরকারী মতে ব্রিটেন ও ফ্রান্স নাকি মিশরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত নহে—যদিও অবশ্য মিশর সরকার এবং অন্যান্য অনেকেই মনে করেন যে একটি যুদ্ধই চলিতেছে)—যখন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই বলিল যে, ইঙ্গ-ফরাসী আচরণ নির্লজ্জ আক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই নহে তখন ব্রিটিশ সরকার বলিলেন "আমরা কিছুতেই ভুল স্বীকার করিব না।"—অর্থাৎ পরিষ্কার ভাষায় পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের নিকট আন্তর্জ্জাতিক আইন, গণতন্ত্র প্রভৃতির একটিমাত্র অর্থই আছে আর সেই অর্থ হইল বিশ্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব এবং শোষণ বজায় রাখিবার জন্য যাহা কিছু করা হইবে তাহাই ন্যায় ও আইনসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে লইবে। তাহা না হইলেই তাঁহারা বলিবেন "রণং দেহি"।

মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের সুদূরপ্রসারী আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব রহিয়াছে। এই সময় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন ছিল—অতীব দুঃখের বিষয় তাহা নাই। বিশেষতঃ পাকিস্থান যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে একটি নূতন প্ররোচনার বিপদ দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আত্মঘাতী কলহেই এশিয়ার দেশগুলি স্বাধীনতা হারাইয়াছিল—দেশবিশেষের জাতীয় স্বাধীনতার উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আক্রমণের এই চরম বিপদের দিনেও যদি অতীত ইতিহাসের শিক্ষা কাজে লাগাইতে এশিয়ার জাতিগুলি অপারগ হয় তবে ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে অন্ধকার।

হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী

হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলী বিশ্বের দৃষ্টি পূর্ব্ব-ইউরোপের উপর নিবদ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্ব-ইউরোপের ঘটনাবলী যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহার সহিত তাল রাখা কঠিন। উপরন্তু সংবাদগুলি এরূপ পরস্পরবিরোধী যে তাহা হইতে কোন পরিষ্কার ধারণা করা বিশেষ সহজ নহে। তবে কয়েকটি ব্যাপার

সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে মন্তব্য করা চলিতে পারে। প্রথমতঃ কম্যুনিষ্ট শাসনে পূর্ব্ব-ইউরোপের জনসাধারণের দুর্গতি এবং ব্যাপক বিক্ষোভ; দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েট জবরদস্তি। ইহার সহিত অবশ্য পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্ররোচনামূলক কার্য্যেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সংক্ষেপে পূর্ব্ব-ইউরোপের সাম্প্রতিক ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ এইরূপ: ২০শে অক্টোবর সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, পোল্যাণ্ডের কমিউনিষ্ট পার্টি পোল্যাণ্ডের জনসাধারণের দাবি আংশিক মানিয়া লইয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন নাকি তাহাতে অসম্মত হয়। যাহাতে পোলিশ কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ "বিপথে" না যান সেজন্য সোভিয়েট ট্যাঙ্ক এবং সৈন্যবাহিনী ও রণপোত পোল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ পোল্যাণ্ডের উপর হইতে তাহাদের সামরিক হুম্‌কি তুলিয়া লন এবং পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবিরোধী কার্য্যকলাপের যে অভিযোগ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র, "প্রাভদা" প্রথমে করিয়াছিলেন সেই অভিযোগও প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় ('প্রাভদা' পত্রিকার জীবনে সম্ভবতঃ এই সর্ব্বপ্রথম এত শীঘ্র এইরূপ "ভুলের" "সংশোধন" হইল)। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে, সোভিয়েট এবং পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোটামুটিভাবে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি মস্কোতে কয়েকদিন পর আলোচিত হইবে। পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে অনেক রদবদল হইবার ফলে পদচ্যুত প্রাক্তন সেক্রেটারী-জেনারেল গোমুলকা পুনরায় নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন। সোভিয়েট জেনারেল রকোসোভস্কি পোল্যাণ্ডের পার্টির পলিট ব্যুরো হইতে অপসৃত হন এবং পরে তিনি মস্কো যাইয়া পোল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতির পদেও ইস্তফা দেন।

পোল্যাণ্ডের উত্তেজনা মিলাইতে না মিলাইতেই হাঙ্গেরীতে বিপ্লব দেখা দিল। ২৩শে অক্টোবর হাঙ্গেরীর ছাত্রগণ একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা করিয়া সরকার ও হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টির ভ্রান্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পঞ্চাশ হাজার লোকের এই শোভাযাত্রায় আটশত সামরিক অফিসারও ছিলেন। কম্যুনিষ্ট রাজত্বে জনসাধারণের কোনই অধিকার নাই; সুতরাং হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট সরকার "বিশুদ্ধ কম্যুনিষ্ট" উপায়ে জনসাধারণকে স্তব্ধ করিতে চাহিলেন—কিন্তু দেখা গেল দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির মুষ্টিমেয় নেতা (তাঁহারাও আবার সকলে নহেন) ব্যতীত সরকারী দলে আর কেহই নাই। এমনকি হাঙ্গেরীর সশস্ত্র বাহিনী পর্য্যন্ত জনসাধারণের উপর বন্দুক চালাইতে অসম্মত। জনসাধারণের এইরূপ "ধৃষ্টতা" সহ্য করা শ্রমিকদরদী এবং বিশ্বজনের গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী কম্যুনিষ্টদের চিন্তাতেও অসহ্য—অতএব হাঙ্গেরীর "সরকারের অনুরোধে" সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনী নিরস্ত্র জনসাধারণকে ("প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকারীদিগকে") শিক্ষা দিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও পরিবর্তন ঘটিল। হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন নেতা—যিনি হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট শাসন কায়েম করিবার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু সকল ব্যাপারে মস্কোর নিকট দাসখত লিখাইয়া দিতে অসম্মত হইবার অপরাধে প্রধানমন্ত্রীর পদ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য-পদ হইতে অপসৃত হন—সেই ইমরে নাজ পুনরায় হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। খাঁটি কম্যুনিষ্টদের মত গদীতে আসীন হইয়াই তিনি ঘোষণা করিলেন, আর আন্দোলন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু জনসাধারণ দাবি তুলিল, হাঙ্গেরীর ভূমি হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ না করা পর্য্যন্ত আন্দোলন থামিতে পারে না। ২৬শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নাজ জনসাধারণের এই দাবি মানিয়া লইয়া বলেন যে, ১৯৫৭ সনের ১লা জানুয়ারীর মধ্যেই হাঙ্গেরী হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ২৫শে অক্টোবর (জুলাই মাসে নিযুক্ত) কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এরণো গেরোকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে জানস্ কাডারকে পার্টির নূতন সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইল, কাডারকে পূর্ব্বে "বিপথগামী" হিসাবে পদচ্যুত করা হইয়াছিল।

কিন্তু সোভিয়েট ট্যাঙ্ক প্রয়োগ অথবা নূতন প্রধানমন্ত্রী এবং নূতন সেক্রেটারী নিয়োগ করিয়াও জনসাধারণের বিক্ষোভ শান্ত করা গেল না। ২৭শে অক্টোবর নাজ তাঁহার সরকার পুনর্গঠন করেন, নূতন মন্ত্রীসভা হইতে ১৫জন পুরাতন মন্ত্রীকে বাদ দেওয়া হইল। মন্ত্রীসভায় কৃষক পার্টির নেতা বেলা কোভাগ্রকে লওয়া হইল। পরদিন নূতন সরকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিলেন। ইমরে নাজ ঘোষণা করিলেন যে, জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী অবিলম্বেই সোভিয়েট সৈন্য রাজধানী বুদাপেস্ত হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে। ইতিমধ্যে ছয়দিনে সংঘর্ষে ২৫০ জন নিহত এবং ৩,৫০০-এরও অধিক লোক আহত হয়।

ঘোষণা অনুযায়ী সোভিয়েট সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইতে থাকে। ৩০শে অক্টোবর হাঙ্গেরীর সরকার ঘোষণা করেন যে, "গণতান্ত্রিক দলগুলি"কে পুনরায় রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং শীঘ্রই পশ্চিমী প্রথায় নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করা হইবে। হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা কাডার ঘোষণা করেন যে যুক্ত নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "সর্ব্বসম্মতভাবে" গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দিনের ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাজ আরও বলেন যে, সোভিয়েট সৈন্যগণকে বিক্ষোভ দমনের জন্য তিনি আহ্বান করেন নাই; সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধানমন্ত্রী এনড্রাস হেজিডুস এবং এরণো জেরো। তিনি আরও বলেন যে, নূতন সরকার আসিয়াই সোভিয়েট সৈন্য সরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানান। ইহা ব্যতীত সরকারী গুদামে শস্যবিক্রয়ের কড়াকড়ি হ্রাস করিয়া সরকারের একটি সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়। সরকারী ঘোষণায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত শান্তি এবং সহযোগিতার কথাও উল্লিখিত হয়।

৩১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নাজ বুদাপেস্তে এক ঘোষণায় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পাদিত ওয়ারস চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। সোভিয়েট সরকারও ৩০শে অক্টোবরের এক ঘোষণায় হাঙ্গেরী হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত জানান। তবে সোভিয়েট ঘোষণায় বলা হয় যে, অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত পরামর্শ না করিয়া 'ওয়ারস' চুক্তি বাতিল করা সম্পর্কে তাঁহারা কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। সোভিয়েট ঘোষণায় অতীত ভুলের কথা স্বীকার করিয়া বলা হয় যে, অন্যান্য কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে আর সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশেষজ্ঞ থাকিবেন কিনা তাহা পুনর্বিবেচনার সময় হইয়াছে।

১লা নবেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারশিল্ডের নিকট লিখিত এক পত্রে হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাজ জানান যে, হাঙ্গেরী 'ওয়ারস চুক্তি' অস্বীকার করিয়াছে। তিনি বৃহৎ চতুঃশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন) নিকট আবেদন জানান তাঁহারা যেন হাঙ্গেরীর নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া চলেন। ২রা নবেম্বর রুশ সৈন্য হাঙ্গেরী আক্রমণ আরম্ভ করে এবং চতুর্দ্দিক হইতে রাজধানী বুদাপেস্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

৩রা নবেম্বর হাঙ্গেরীর সরকার তৃতীয় বার পুনর্গঠিত হয় এবং ইমরে নাজের নেতৃত্বে একটি আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ৪ঠা নবেম্বর রুশবাহিনী বুদাপেস্ত আক্রমণ আরম্ভ করে। মস্কো রেডিও ঘোষণা করে যে, জানস কাডারের নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে একটি নূতন সরকার গঠন করা হইয়াছে এবং হাঙ্গেরীতে "প্রতিবিপ্লব" সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। মস্কো রেডিও হইতে ঘোষিত সংবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে হাঙ্গেরীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ ইমরে নাজ যে আবেদন করিয়াছিলেন কাডার সরকার মিঃ হ্যামারশিল্ডের নিকট লিখিত এক পত্রে সেই অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। মস্কো রেডিওর বিবৃতি অনুযায়ী নূতন প্রধানমন্ত্রী কাডার বলেন, "আমরা প্রতিবিপ্লব দমনে সাহায্য, শান্তি এবং শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট সৈন্যদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।"

১১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সোভিয়েট আক্রমণের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর প্রতিরোধ সক্রিয় থাকে। তাহার পরই প্রতিরোধ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১১ই নবেম্বর মস্কো রেডিও হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, যতদিন উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থা থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত 'ওয়ারস চুক্তি'ও থাকিবে—অর্থাৎ রাশিয়া পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলি হইতে তাহার প্রভুত্ব হ্রাস পাইতে দিবে না (মাত্র ১১ দিন পূর্ব্বেই রাশিয়া ওয়ারস চুক্তি বাতিল করিবার যৌক্তিকতা বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল)।

বুদাপেস্ত হইতে ১৩ই নবেম্বর প্রেরিত রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, মস্কো-বর্ণিত "শ্রমিক" সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকগণ কার্য্যে যোগদানে অনিচ্ছুক। শ্রমিকগণ পাঁচ দফা দাবি জানাইয়াছে—সত্যনিষ্ঠ কম্যুনিষ্ট বেতার তাহা প্রকাশ করে নাই, তবে হাঙ্গেরী হইতে সোভিয়েট সৈন্য অপসারণ, অবাধ নির্ব্বাচন, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ ও হাঙ্গেরীতে মানবিক অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা—এইগুলিই শ্রমিকদের দাবি বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গ লেখা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই।

হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট-মানবতা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কেবলমাত্র বুদাপেস্তেই কুড়ি হাজার লোক নিহত এবং আশী হাজার লোক আহত হইয়াছে শুনা যায়।

হাঙ্গেরীর জনসাধারণের ব্যাপক অংশের জাতীয় স্বাধীনতার এই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনকে কম্যুনিষ্টগণ খাঁটি কম্যুনিষ্ট পদ্ধতিতে "সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—এইরূপ সচেতন ভাবে নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচারের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানকালে বিরল। এখন সোভিয়েট ট্যাঙ্ক এবং সৈন্যবাহিনী সমগ্র হাঙ্গেরী দখল করিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত একটি হাঙ্গেরীর শ্রমিকও কার্য্যে যোগদান করে নাই। শ্রমিকগণ কারখানায় যায়, কিন্তু কাজ করে না। এইরূপ দৃঢ় এবং শান্ত বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল। যদি কম্যুনিষ্টদের কথাই সত্য হয় এবং যদি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তই এইরূপ ভাবে হাঙ্গেরীর অধিকাংশ শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে এইরূপ আত্মত্যাগের মহিমা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে তবে সাম্রাজ্যবাদ অত্যাচারী এবং পররাজ্যগ্রাসী বলিয়া এত দিন আমরা যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছি তাহা বদলানো প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন এবং জনমন জয়ের অপরিজ্ঞাত শক্তির কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সেই কারণেই বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদী চরদের প্ররোচনায় ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের মনে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া কোন যুক্তিবাদী মন স্বীকার করিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের সেই ক্ষমতা থাকিলে মিশরে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ ঘটিত না বা সাইপ্রাসের মত ক্ষুদ্র দ্বীপকে দখলে রাখিতে সমগ্র ব্রিটিশবাহিনীকে নিযুক্ত করিতে হইত না। মিশরে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ঘটায় মিশরীয় জনগণ আনন্দ প্রকাশ করেন নাই—সেখানে সাম্রাজ্যবাদ একটিও সমর্থক পায় নাই। কিন্তু হাঙ্গেরীতে কি দেখা গেল? হাঙ্গেরীর সরকারের সমর্থক দেশে কেহ নাই—সামরিক-বাহিনীও সরকারের বিরোধী। সোভিয়েট বাহিনীর অবস্থা মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও অন্তরূপ ছিল না—অন্ততঃ জনসাধারণের সহিত সম্পর্কের দিক হইতে। ইহা কে অস্বীকার করিবে?

রূঢ় সত্য হইল হাঙ্গেরী এত দিন সোভিয়েট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণে নিষ্পেষিত হইত। যে মুহূর্ত্তে শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা দেখা গেল সেই মুহূর্ত্তেই

হাঙ্গেরীর বীর জনসাধারণ জাতীয় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিলেন। সেই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং সর্বসমর্থনপুষ্ট। হাঙ্গেরীর জনগণের দুর্ভাগ্য, একদিক হইতে ইহা বিশ্বমানবেরও দুর্ভাগ্য—তাঁহাদের সেই জীবনপণ প্রয়াস পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের স্বার্থসন্ধানী প্রচার এবং সোভিয়েট ট্যাঙ্কের ঘর্ঘরের তলায় এখনকার মত চাপা পড়িয়া গেল।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন হাঙ্গেরী সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত তাহার বিরোধিতা করিয়াছে—যে কারণে ভারত বিরোধিতা করিয়াছে তাহা সমুচিতই হইয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বর্ত্তমানে যে ভাবে গঠিত তাহাতে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে উহার হস্তক্ষেপের নীতি স্বীকার করিয়া লইলে সকল দেশেরই জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। সেই দিক হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জের খবরদারীতে হাঙ্গেরীতে নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আনীত পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ভারত সরকার কোন নীতিবিগর্হিত কাজ করেন নাই।

রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ বৎসর

২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। "উত্তরবংশীয়গণকে যুদ্ধের উৎপাত হইতে রক্ষা" এবং "সামাজিক প্রগতি ও বৃহত্তর স্বাধীনতায় সুন্দরতর জীবনযাত্রার সাহায্য" করিবার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানকালে এই আন্তর্জ্জাতিক সংস্থাটির সৃষ্টি হয়। সংস্থাটির কার্য্যারম্ভের সময়—১৯৪৫ সনের ২৪শে অক্টোবর। সদস্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, বর্ত্তমানে উনআশী।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এগার বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক স্বার্থের সহিত জড়িত নহে এইরূপ প্রশ্নের সমাধানে রাষ্ট্রপুঞ্জ বিশেষ কৃতিত্ব সহকারেই কর্ত্তব্যপালন করিয়াছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের "বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলি"র (specialised agencies) ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা, ইউনেস্কো, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসংস্থা প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধ বন্ধ করিবার যে মৌলিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি সেই প্রধান কর্ত্তব্যে সংস্থাটির প্রচেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয় নাই। ইস্রায়েল, কাশ্মীর, কোরিয়া, গ্রীস, সাইপ্রাস, দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতি-বৈষম্য নীতি এবং সর্বশেষে পশ্চিম এশিয়াতে নির্লজ্জ ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ—রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন সমস্যারই কার্য্যকরী সমাধান করিতে পারে নাই।

ইহার কারণ কি? সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ যখন গঠিত হয় তখন প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের মনে পাশ্চাত্ত্য জগতের কথাই ছিল। যুদ্ধজয়ে এশিয়ার জনগণের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক জনসাধারণের জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে দুই-একটি ভাল ভাল কথা বলা হয় বটে, কিন্তু লীগ অব নেশন্‌স কর্ত্তৃক প্রেসিডেণ্ট উইলসনের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি গ্রহণের মত—এক্ষেত্রেও কাহারও তাহা কার্য্যকরী করিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। বৃহৎ শক্তিগুলির গত এগার বৎসরের কার্য্যকলাপ তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসীরা ইউরোপে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, ভিয়েৎনামে অবস্থিত ফরাসী সরকার কিন্তু জাপানীদের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকে—অবশ্য জাপান শেষ পর্য্যন্ত ভিয়েৎনামকে সম্পূর্ণরূপেই কুক্ষিগত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্বভাবতঃই ভিয়েৎনামের জনসাধারণ স্বাধীনতার দাবি জানায় (যুদ্ধের সময়েও তাহারা জাপানীদের বিরোধিতা করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অক্ষুণ্ণ রাখে)। জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী ভিয়েৎনামবাসীদের স্বাধীনতা পাওয়ারই কথা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বৃহৎ শক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী সরকার নয় বৎসর যাবৎ সেখানে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাইয়া জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবিকে স্তব্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, এবং পরে যখন সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপেই হৃতবল হইয়া পড়ে তখন ১৯৫৪ সনে তাহারা কোনক্রমে সেখান হইতে সরিয়া পড়ে। ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজী সাম্রাজ্যবাদও প্রায় অনুরূপ আচরণই করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য বৃহৎ শক্তিগুলি ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিকেই সমর্থন করে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতীয় বৈষম্যনীতি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কিত নীতির সম্পর্কেও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম প্রভৃতি) দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিরই সমর্থন করে। কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কেও ঠিক সেই কারণেই আজও পর্য্যন্ত কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতার লড়াইয়ের একটি ক্ষেত্র হিসাবেই সৃষ্টি হইয়াছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন সেখানে পুরাপুরি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত থাকে—সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভিটোর সংখ্যা দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ যুদ্ধপরবর্ত্তী যুগের ঘটনাবলী পুরাপুরি আঁচ করিতে পারে নাই। যুদ্ধের পরে আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মৃত্যুপণ আন্দোলনের সম্মুখে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিকে পশ্চাতে হঠিতে হয়, ফলে নবজাগ্রত এশিয়া এবং আফ্রিকাও বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রভাবশালী অংশ দাবি করে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শক্তিগোষ্ঠী এই দাবি এখনও সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে সম্মত নহে—তাহা কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেয়ালখুশির জন্য পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ (চীনরাষ্ট্র) এখনও রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

এশিয়া-আফ্রিকার এই নূতন শক্তিকেন্দ্র গঠিত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য শক্তিকেন্দ্রের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণেই আজ পশ্চিমী জোট মরীয়া হইয়া উঠিয়া মিশরের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ চালাইয়াছে।

মিশরে আক্রমণের প্রশ্নেও মৌখিক সহানুভূতি ব্যতীত রাষ্ট্রপুঞ্জ কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থাই এ যাবৎ অবলম্বন করিতে পারে নাই। মিশরে যাহারা আক্রমণ চালাইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা করা হয় নাই। মৌখিক যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হইলেও এখনও ইঙ্গ-ফরাসী দখলকারী ফৌজ মিশরের মাটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় খোলাখুলি ভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল। যাহারা এখনও জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে শান্তিরক্ষার কথা চিন্তা করেন তাঁহাদের পুনর্বিবেচনার সময় আসিয়াছে। যদি বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানটিকে ফলপ্রসূ করিতে হয় তবে তাহার নীতি এবং সংগঠনের আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আজ যে সকল নূতন শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি হইয়াছে, জাতিপুঞ্জের সকল স্তরে আজ তাহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন নিরাপত্তা-পরিষদকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে উহার পুনর্গঠন করা। নিরাপত্তা-পরিষদে ফ্রান্সের স্থায়ী পদ পাওয়ার কোন যোগ্যতা রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেও ছিল না—এখন ত নাই-ই। উপরন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদে এশীয় ও আফ্রিকান প্রতিনিধিত্ব আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপরন্তু প্রয়োজন ভিটো ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা।

রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের সংশোধনের কথা উঠিলেই এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয় যে, বৃহৎ শক্তিগুলির ঐকমত্য ব্যতীত উহা কার্য্যকরী হইতে পারে না—সুতরাং ভিটো ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বা সাধারণ ভাবে সনদেরও সংশোধনের কোন প্রয়োজন নাই। যদি বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের কোন মূল্য থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, "বৃহৎ" শক্তিগুলি কোন ক্ষেত্রেই একমত হইতে পারিতেছে না। সে ক্ষেত্রে এমন একটি সংগঠন দাঁড় করানো প্রয়োজন যাহা বিপজ্জনক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলির উপর ঐকমত্য চাপাইয়া দিতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্ত্তমান সনদের আওতায় ভিটো প্রথার যে মূল্যই থাকুক না কেন, বর্দ্ধিত এশীয় আফ্রিকান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ভিটো ব্যতিরেকেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিবে। যদি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে—এবং যে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত প্রকাশ পায় নাই—তবে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ রাষ্ট্রপুঞ্জকে তাহাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে—ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে কোন সমস্যারই সমাধানের আশা নাই—কার্য্যতঃ কোন সমস্যার সমাধান হয়ও নাই।

ইউনেস্কোর নবম সাধারণ সম্মেলন

গত ৫ই নভেম্বর হইতে দিল্লীর নবনির্ম্মিত বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সংস্থার নবম সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে, এই সম্মেলন এক মাস কাল চলিবে। ১৯৪৬ সনের ৪ঠা নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সংস্থার সৃষ্টি হয়—ঐ বৎসরেই ১৪ই ডিসেম্বর সংস্থাটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থারূপে গণ্য করিয়া উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইউনেস্কোর মূল লক্ষ্য বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির পারস্পরিক পরিচয়ের মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব বৃদ্ধি করা। সংস্থাটির সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে, "যেহেতু মানুষের মনেই যুদ্ধের সূচনা হয়, সেহেতু মানুষের অন্তরেই শান্তির প্রতিরক্ষা গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

ইউনেস্কো কোন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট নহে। উহার কার্য্য সংস্কৃতির প্রচার ও বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করা। ১৯৪৫ সনের নবেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত সংস্থার সদস্যদের আটটি সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে—এই সকল সম্মেলন—হয় সংস্থাটির কেন্দ্রীয়আলয় প্যারিস অথবা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আমন্ত্রণে অন্য কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে প্রতি বৎসরই একটি করিয়া সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু ১৯৫২ সনের প্যারিস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহার পর হইতে দুই বৎসর পর পর একটি করিয়া সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ইউনেস্কোর কার্য্যভার পরিচালনা করেন সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত ২২ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্য্যকরী বোর্ড। ঐ বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ভারতের ড. এ. লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র। ইউনেস্কোর কর্ম্মনীতি নির্ব্বাচনের ভার এই বোর্ডেরই হাতে। সংস্থাটির কার্য্যপরিচালনা দেখাশুনা করেন একটি সেক্রেটারিয়েট—যাহার শীর্ষে রহিয়াছেন ডিরেক্টর-জেনারেল। ডিরেক্টর-জেনারেল ছয় বৎসরের জন্য নিয়োজিত হন। বর্ত্তমান ডিরেক্টর-জেনারেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ডঃ লুথার ইভান্স ১৯৫২ সনে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

ইউনেস্কোর গত দশ বৎসরের কার্য্যাবলী হইতে সংস্থাটির বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর কার্য্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহার ফল প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায় না—অধিকাংশ কার্য্যই ফলপ্রসূ হইতে দীর্ঘ সময় লাগে। শিক্ষা ব্যাপারে ইউনেস্কো একটি প্রচেষ্টার উদ্যোগী হইয়াছে: মৌলিক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন। এই কেন্দ্র দুই প্রকার, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক। মেক্সিকো এবং মিশরে দুইটি আন্তর্জ্জাতিক কেন্দ্র আছে। বিভিন্ন দেশে বিদ্যালয়-প্রথা এবং তাহার উন্নতিসাধনেও ইউনেস্কো সচেষ্ট রহিয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের—উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সহযোগিতাবৃদ্ধিতে ইউনেস্কো সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে বিজ্ঞান-সহযোগিতা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য ইউনেস্কোর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় সুইজারল্যাণ্ডে

একটি গবেষণা ভবন স্থাপিত হইয়াছে। আরও যে একটি বিষয়ে ইউনেস্কো বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা হইল শুষ্ক অঞ্চলের উন্নয়নসাধন।

সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইউনেস্কোর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতি এবং জাতি সম্পর্ক বিষয়ে ইউনেস্কো কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল বিশ্ব কপিরাইট কনভেনশন কার্য্যকরী করা। সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা সম্পর্কিত কনভেনশনটি কার্য্যকরী করা ইউনেস্কোর আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

ইহা ভিন্ন কারিগরি সাহায্য এবং অন্যান্য ব্যাপারেও ইউনেস্কো বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে।

নয়াদিল্লীতে ইউনেস্কোর নবম সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু। সম্মেলনের ঠিক প্রাক্কালেই মিশরে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট আক্রমণ সংঘটিত হওয়ায় সম্মেলনের আবহাওয়া ভারী হইয়া উঠে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণেও তাহারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি মিশর ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, "এখন দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চশীলের মহান্ আদর্শ কেবল কতকগুলি দেশের নিকট নিছক কথার কথা। এই দেশগুলি সমস্যার সমাধানে তাহাদের অধিকতর বলপ্রয়োগের ক্ষমতাই খাটাইবার দাবি করে। অতীতের তিক্ত স্মৃতি এখনও আমাদের মনে রহিয়াছে। অতীতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির অগ্রগতি রোধ করা হইয়াছে এবং সেই তিক্ত অতীতের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি আমরা ঘটিতে দিতে পারি না।"

তিনি বলেন, "ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ কতকগুলি দিক হইতে ভাগ্যবান, কারণ তাহাদের অবস্থা কতকটা ভাল হইয়াছে, কিন্তু আমরা—এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীরা জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ ও হিংসা আমাদের বর্জ্জন করিতে হইবে। এই সংস্থার মত বিশ্ব-সংস্থায় যদি বিরাট মানব-সমষ্টি, বিশেষ করিয়া চীনের মত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে এই সংস্থা যথাযথ ভাবে সক্রিয় হইতে পারে না।"

শ্রীনেহরু আশা প্রকাশ করেন যে, সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ অনগ্রসর দেশগুলির প্রয়োজন সম্বন্ধেই বিশেষভাবে অবহিত হইবেন, "কারণ এই দেশগুলি কেবল খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যেরই কাঙাল নয়—সর্ব্বোপরি ইহাদের সকলেই স্বাধীনতাপ্রিয় এবং কোন কিছুর বিনিময়েই সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে ইহারা রাজী নয়।"

সম্মেলনে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন; ব্রেজিল, ইকুয়াডর, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মানী, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লাইবেরিয়া, পাকিস্থান, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদিগের মধ্য হইতে দশ জন সহ-সভাপতিও নির্ব্বাচিত হন। সম্মেলনে ৭৭টি দেশ অংশগ্রহণ করিবার কথা—কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় প্রথম দিন ষোলটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন নাই।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কুয়োমিণ্টাং-শাসিত ফরমোজার প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে গণতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধিকে ইউনেস্কোর সদস্যপদ দানের জন্য ভারত, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কতিপয় দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধিতায় সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরিবর্ত্তে ৩১-১৬ ভোটে সম্মেলনে চীন রাষ্ট্রকে সদস্যপদ-দান সংক্রান্ত প্রস্তাবটি মুলতুবী রাখিবার জন্য আনীত মার্কিন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগারটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে এবং সতেরটি দেশের প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকেন।

সাইপ্রাসে ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সমালোচনা করিয়া গ্রীস একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ২১-১৪ ভোটে তাহা বাতিল হইয়া যায়।

১৩ই নবেম্বর অধিবেশনে বাজেট লইয়া পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত অনুন্নত দেশগুলির পুনরায় মতবিরোধ প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থার ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেট দশ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত, ব্রেজিল, ফ্রান্স এবং স্পেন যে প্রস্তাব আনয়ন করে তাহা ২৭-২০ ভোটে পাস হয়; ১৯টি রাষ্ট্র অবশ্য ভোট দানে বিরত থাকে। ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট দেয়; সোভিয়েট ইউনিয়ন ভোটদানে বিরত থাকে। ১৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অনুপস্থিত থাকেন।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের নেতা স্যার বেন বাওয়েন টমাস ভোটের ফলাফলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলেন যে, উক্ত প্রস্তাবটি পাস করিয়া সম্মেলন "ছেলেমানুষি" (adolescent) প্রকাশ করিয়াছে।

ব্রিটিশ প্রতিনিধির এই অশোভন উক্তির উত্তরে ভারতের প্রতিনিধি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন, "ব্রিটিশ প্রতিনিধির বক্তৃতায় আমি বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিস্ময়ের আরও বেশী কারণ এই যে, তিনি যে দেশের প্রতিনিধি সেই দেশে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য সব দেশের অপেক্ষা অধিক দিন চালু আছে। সমস্ত গণতন্ত্রেই মতভেদ হইতে বাধ্য, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্ব্বসময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ২৭ ও ২০ ভোটের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য নয়।"

১৩ই নবেম্বর ইউনেস্কোর কার্য্যকরী সমিতির শূন্য পদগুলিতে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, কার্য্যকরী সমিতিতে এশীয়-আফ্রিকান প্রতিনিধির সংখ্যা নয় হইতে কমিয়া সাতে দাঁড়াইয়াছে। ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের স্থলে ডঃ জাকীর হোসেন ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হন।

এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন

এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন নগরীতে—১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে। প্রথম সম্মেলনে ব্রহ্ম, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইস্রায়েল, জাপান, লেবানন, নেপাল এবং পাকিস্থানের সমাজতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। ইহা ভিন্ন আফ্রিকার জাতীয়তা আন্দোলনের প্রতিনিধিবৃন্দও প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। ইউরোপ হইতে যুগোশ্লাভিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থাও প্রথম এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রথম সম্মেলনের অধিকাংশ সময়ই সাংগঠনিক ও আনুষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা নিরূপণেই ব্যয়িত হয়। এশীয় সম্মেলনের সদস্য-সংখ্যা এতদিন পর্য্যন্ত ছিল আট যথা: ভারত, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, ইস্রায়েল, জাপান, লেবানন, মালয় এবং পাকিস্থান। দ্বিতীয় সম্মেলনে নেপাল, সিংহল ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে সদস্যভুক্ত করিয়া লওয়ায় বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে এগার।

প্রথম সম্মেলনে গৃহীত সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ (১) এশিয়ার বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করা; (২) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দলগুলির রাজনৈতিক মনোভাবের সমন্বয়সাধন; (৩) এশিয়ার বহির্ভূত সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সহিত সংযোগস্থাপন; (৪) সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সংযোগস্থাপন; (৫) ঔপনিবেশিক ও নির্য্যাতিত জনসাধারণের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং গণতান্ত্রিক জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিকে নেতৃত্বদান করা; এবং (৬) বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সহযোগিতা করা।

১লা হইতে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত দশ দিন যাবৎ বোম্বাই নগরীতে এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের সংবিধান অনুযায়ী দুই বৎসর অন্তর সম্মেলনের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইবার কথা। কার্য্যতঃ প্রায় চার বৎসর পর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে সদস্য এগারটি দল ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার তেইশটি সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধিগণ পর্য্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক, সমাজতন্ত্রবাদী আন্তর্জাতিক যুব সংস্থা, যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট লীগ এবং ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলন সংস্থা হইতে প্রেরিত সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিবৃন্দও দ্বিতীয় সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী চক্রের অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে কেবলমাত্র মিশরের প্রতিনিধিবর্গ সম্মেলনে যোগদানে অসমর্থ হন। ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ বা-সোয়ে দ্বিতীয় এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

দ্বিতীয় এশীয় সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনের আলোচ্য সূচীতে ছিল (১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি; (২) পরমাণবিক অস্ত্র (৩) নিরস্ত্রীকরণ; (৪) এশীয় শান্তি ঘোষণা; (৫) এশিয়াতে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি; (৬) রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের সংশোধন এবং (৭) ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার জন্য কর্ম্মপন্থা গ্রহণ। পাকিস্থানের প্রতিনিধি কাশ্মীর সমস্যাটিকে আলোচ্য সূচীতে একটি স্বতন্ত্র বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস পান, পরে অবশ্য তিনি সেই প্রয়াস পরিত্যাগ করেন। আর একটি বিষয় পরে আলোচনা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়—তাহা হইল "কমিউনিষ্ট বিশ্বের ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য নিরূপণ"।

পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য সম্মেলন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট আবেদন জানান। হাঙ্গেরী হইতে সমস্ত সোভিয়েট সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট সকল প্রকার পরীক্ষামূলক আণবিক বোমার বিস্ফোরণ এবং পরমাণবিক ও অনুরূপ অস্ত্রাদির ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য আবেদন জানানো হয়।

ইস্রায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোশে শারেট চীন, জাপান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ দানের দাবি জানাইয়া যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, সম্মেলন তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। উক্ত প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের আসনটি চীনকে দিবার জন্যও দাবি জানানো হইয়াছে। হংকং হইতে আগত প্রতিনিধি এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিলে তাহার উত্তরে শারেট বলেন যে, চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইলে বিশ্ব কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, বরং তাহাতে সকলেরই উপকার হইবে। বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন—যদি রাষ্ট্রপুঞ্জকে ফলপ্রসূ করিতে চাওয়া হয় তবে চীনকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়া সম্মেলনের অর্থনৈতিক কমিটির রিপোর্টে উক্ত অঞ্চলে উৎপাদনবৃদ্ধির উপর সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধ অপসারণের দাবি জানানো হয়। উক্ত রিপোর্টে ধাপে ধাপে জাতীয়করণের একটি প্রস্তাবও করা হয়। সম্মেলন অর্থনৈতিক কমিটির রিপোর্টটিও গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু ও ভারত সরকার

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে লইয়া বর্ত্তমানে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারত সরকারের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুই নাকি "জাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট" লইয়া ভারতে প্রবেশ করিতেছে। "জাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটে"র রহস্য যাহাই থাকুক না কেন, উদ্বাস্তু-সমস্যার আরও কয়েকটি বিশেষ দিক রহিয়াছে—যাহার সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা খুবই কম।

আসামের করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক "যুগ-শক্তি" পত্রিকার ২৩শে কার্ত্তিক সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উদ্বাস্তু আগমন-সমস্যা সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে।

যাঁহারা উদ্বাস্তুরূপে ভারতে আগমন করেন তাঁহাদের দুর্গতি ত্রিবিধ—প্রথমতঃ পাকিস্থানে সরকারী, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক নিগ্রহ; দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থানে অবস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনার আপিসে; এবং তৃতীয়তঃ ভারতে অবস্থিত পাকিস্থানী হাই-কমিশনার আপিসে।

পাকিস্থানে সরকারী এবং বেসরকারী নিগ্রহ সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। সুতরাং শেষোক্ত দুইটি দিক সম্পর্কেই বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, পাকিস্থানে অবস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনার আপিস মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে বিশেষ কড়াকড়ি করায় ভারতে আগমনেচ্ছু হিন্দু-গণ অনেক সময়ই বলিতে বাধ্য হন যে, ভারতে গিয়া তাঁহারা কোন সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না। ফলে অধুনা সকল উদ্বাস্তুদিগের সার্টিফিকেটের উপরই লেখা থাকিতেছে, "উদ্বাস্তু হিসাবে কোন সুবিধা দিবার প্রয়োজন নাই।" দ্বিতীয়তঃ, "আইনানুযায়ী পাসপোর্ট ও ভিসাসহ ভারতে প্রবেশ করিয়া পরে কোন ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে ভারতে বসবাসের ইচ্ছাজ্ঞাপক এফিডেবিট করিয়া উহার নকলসহ ঐ পাসপোর্ট ভারতস্থিত পাকিস্থানী হাই কমিশনারের আপিসে জমা দিলে ভারতীয় নাগরিক হওয়া যায় এবং তাহার রসিদ লইয়া উহা উদ্বাস্তু বিভাগে জমা দিলে উদ্বাস্তু হিসাবে যাবতীয় সুবিধা পাওয়ার কথা। কিন্তু পাকিস্থান সরকার ইতঃপূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা এরূপ-ভাবে জমা লইয়া রসিদ দিতে 'বাধ্য' নহেন: ফলে হিন্দুগণ সহজে রসিদ পান না; অথচ প্রকাশ যে, মুসলমানগণ অতি সহজেই তাহা পাইয়া থাকেন। আর এই রসিদ না পাইলে উদ্বাস্তু হিসাবে গণ্য হওয়া ত দূরের কথা, ভারতীয় নাগরিক হওয়াই বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ফলে দেখা যাইতেছে যে, আইনতঃ পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের ভারতে আগমনের বহু পথ খোলা থাকিলেও কার্য্যত এখন সকল পথই বন্ধ হইয়া যাইতেছে।"

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগকে এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে কিন্তু পাকিস্থান হইতে বেআইনীভাবে আগত মুসলমানগণকে এই সকল অসুবিধার কোনটিই সহ্য করিতে হয় না। দুই-এক দিন জেল খাটার পর তাহারা ভারতেই থাকিয়া যায়। ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে পাকিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু পাকিস্থানের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য নহেন—কারণ উহারা যে পাকিস্থানেরই নাগরিক সে সম্পর্কে কোন লিখিত প্রমাণ ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের হাতে থাকে না। "আর বেআইনী আগন্তুক মুসলমানদের কয়জনই বা ধরা পড়ে? শতকরা ৯০ ভাগই বোধ হয় ধরা পড়ে না। তার পরে সংখ্যালঘুদের সুবিধা আদায়ও খুব কঠিন ব্যাপার নহে।" অপরদিকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগের সহিত জালই হউক বা আসলই হউক ফটোযুক্ত মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট থাকে—যে সার্টিফিকেটে পাকিস্থানী চেকপোষ্টের সহি থাকে—সে অবস্থায় হিন্দুদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া খুবই সহজ।

পরিকল্পনার গোলযোগ

পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইল। উত্তম কথা, কেননা বাঙালীর সর্ব্বস্ব গিয়াছে বা যাইতে চলিয়াছে, এখন ভরসা একমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ উচ্চমানের সাধারণ শিক্ষা ও বিস্তৃত কার্য্যকরী শিক্ষা। কিন্তু অন্য অনেক সমস্যা যাহা আছে তাহার ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের আশু সমস্যা উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতি, ইহার পর আছে চিকিৎসার প্রয়োজন ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তি যক্ষ্মায় মারা যায়, ইহাদের মধ্যে হাসপাতালে মাত্র কয়েক হাজারের চিকিৎসা হয়। অধিকাংশ রোগীই গরীব এবং নিজেরা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না বলিয়া বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। ইহাদের জন্য বাংলাদেশের প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপন করা অতি অবশ্য প্রয়োজন।

বেকার-সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া চাকুরীর সংস্থান করা। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প কিংবা জাহাজ-শিল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, ভারতবর্ষের প্রায় ৪,০০০ মাইল সমুদ্রোপকূল; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জাহাজের পরিমাণ এক শতাংশও নয়। একদিন কলিকাতায় নির্ম্মিত জাহাজ ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত? কিন্তু এই সব ব্যাপারে চিন্তা করিবার সময় কোথায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশের সমস্যার চেয়ে চীন, রাশিয়ার সমস্যা লইয়া অধিক চিন্তিত। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সকল ব্যাপারে চিন্তা করিবার প্রয়াস পান বলিয়া কোন ব্যাপারেই চিন্তা করা হয় না। ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু ছয় বৎসরে এবিষয়ে সরকার কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন?

অর্থবিহীন উপদেশ

সম্প্রতি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিয়েছি। অধ্যাপক কবীর বলিয়াছেন যে, বাঙালীর চিন্তা বর্ত্তমানে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, কারণ তাহারা সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে চিন্তা করিতেছে না। কোন অবাঙালী এই কথা বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতাম না। বাঙালী কোন বিষয়ে অভারতীয় চিন্তা করিতেছে সে-কথা অধ্যাপক কবীর বলেন নাই। দ্বিধাবিভক্ত বাঙালী নিজের সমস্যা লইয়া এত বিব্রত যে, অন্য চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার

এখন নাই। আর অধ্যাপক কবীর বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতির রেনেশাঁস বাঙালীর অবদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দুইটি বিষয়ে বর্ত্তমানে বাংলা দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিতেছে—হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার বিরুদ্ধে বাংলা প্রতিবাদ করিয়াছে ও করিতেছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন বিষয়েও বাঙালীর আপত্তি আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ব্যবস্থার পরিকল্পনা অধ্যাপক কবীরের একটি অপকীর্ত্তি; ইহাকে চালু করিবার বিরুদ্ধে সবচেয়ে আপত্তি করিয়াছে বাংলা দেশ, কারণ বাঙালীর চিন্তাশীলতার পিছনে যুক্তি আছে। অধ্যাপক কবীরের উপদেশ এই দুইটি বিষয়কেই ইঙ্গিত করিয়াছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শুধু বাংলা দেশ কেন, অন্যান্য অনেক প্রদেশ আপত্তি জানাইয়াছে। মাঝে মাঝে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্য্যন্ত প্রকারান্তরে তাঁহার আপত্তি জানাইয়া দেন। আর যদি কোন প্রদেশ আপত্তি নাও করে, তথাপি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার অন্যায় জিদের বিরুদ্ধে বাংলা দেশ আপত্তি করিবে, কারণ যা অন্যায় ও অযৌক্তিক তাহার বিরুদ্ধে বাঙালীর চিন্তা চিরকালই আপত্তি জানাইয়া আসিয়াছে।

আর মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে বাঙালীর আপত্তির কারণ এই যে, এই ব্যবস্থার পিছনে রাজনৈতিক চিন্তাধারাই অধিকতর বলবতী। শিক্ষার মান পরিবর্ত্তনকল্পে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার করিয়া টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অর্থাৎ ইহার জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ হইবে। সব বিদ্যালয়ে অধ্যাপক রাখিতে হইবে এবং সকল বিদ্যালয়ের পক্ষে পুনর্গঠন ব্যবস্থা সম্ভবপর হইবে না। ইহার ফলে কতকগুলি বিদ্যালয়ের মান উন্নীত হইবে এবং কতকগুলির হইবে না। তিন বৎসরে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে বাধ্য, এবং সরকারও ইহা চান, কারণ উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধি পায় ইহা তাঁহাদের কাম্য নয়। উচ্চশিক্ষার ফলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং সরকারী অকর্ম্মণ্যতা ও অপকীর্ত্তি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকতরভাবে ধরা পড়ে। অধ্যাপক কবীর বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বাংলাদেশে যত অবাঙালী আছে, ভারতের অন্যান্য কোন প্রদেশে তত বাঙালী নাই। ইহা কি বাঙালীর সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, না সর্ব্বজনীনতার পরিচায়ক? আর বর্ত্তমানে বাঙালী যদি কিছু পরিমাণে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলিয়া থাকে, তবে তজ্জন্য দায়ী বাঙালী নয়, দায়ী সারা ভারতবাসী যাহারা গণ্ডী টানিয়া নিজদিগকে তাহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর বিরুদ্ধে দ্বার আজ সর্ব্বত্রই রুদ্ধ, সুতরাং বাঙালী আজ নিজের ঘরের মধ্যে, নিজের মনের মধ্যে যদি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহার জন্য অনুযোগ করিবার কিছুই নাই—প্রয়োজন সহানুভূতির।

দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী

ভারতের পাঁচ লক্ষাধিক গ্রাম ও নগরে প্রায় বত্রিশ হাজার পাঠাগার রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ পাঠাগারই পাঠাগার রূপে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। জাতীয় এবং শিক্ষাজীবনে পাঠাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সরকার এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে অল্পকাল মাত্র। ভারতে সাম্প্রতিককালে যে কয়েকটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উহাকে এশিয়ার মধ্যে "সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মব্যস্ত এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থাগার" বলা হয়।

গ্রন্থাগারটি ভারত সরকার এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (ইউনেস্কো) সংস্থার যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সনের ২৭শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করেন।

পাঠাগারটি প্রত্যহ বারো ঘণ্টা খোলা থাকে। কোন পাঠকের নিকট হইতেই কোন জমা বা চাঁদা লওয়া হয় না। পুস্তকের জন্য কোন জমা না রাখা হইলেও গ্রন্থাগারের পুস্তক বিশেষ খোয়া যায় নাই—জনসাধারণ তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের অবমাননা করেন নাই। গত পাঁচ বৎসরে গ্রন্থাগার হইতে ষোল লক্ষ বই 'ইস্যু' করা হয়—তন্মধ্যে মাত্র ১৫০টি ব্যতীত আর সকল বই-ই ফেরত পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগারের রেকর্ডের সহিত তুলনামূলক বিচারে দিল্লীর সাধারণ গ্রন্থাগারের রেকর্ড কোন অংশেই ন্যূন নহে।

সাধারণ গ্রন্থাগারটির আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। গ্রন্থাগারটি একটি সামাজিক কেন্দ্র হিসাবে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটায়। ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ের জন্য পাঠাগারে একটি পৃথক বিভাগও রহিয়াছে। গ্রন্থাগারের সামাজিক শিক্ষা বিভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাঠকগণ যাহাতে সুপরিকল্পিত ভাবে তাহাদের অধ্যয়ন-কার্য্য চালাইতে পারেন তজ্জন্য একটি পরামর্শ-দান ব্যবস্থা রহিয়াছে। গ্রন্থাগারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগে সকল প্রকার বিষয়ে রেফারেন্স সংগ্রহে সাহায্যদানের ব্যবস্থা আছে।

গ্রন্থাগারের সাফল্য সম্পর্কে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ১৯৫৫ সনে ব্যাপক অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে, গ্রন্থাগারটি অবিসংবাদিতরূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতায় এইরূপ একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবৎই অনুভূত হইতেছে এবং সেই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পত্রপত্রিকা এবং আলোচনা-সভায় বহুবার উল্লেখও করা হইয়াছে। কলিকাতার মত নগরীতে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার না থাকা নিতান্তই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। বেলভিডিয়ারে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারটি ঠিক সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার বিশ-

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার—উহা ছাত্রদেরই প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি অপর কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার রহিয়াছে বটে, তবে তাহাদিগকেও ঠিক সাধারণ গ্রন্থাগারের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট যে কয়েকটি গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় তাহারা জনসাধারণের সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটাইতেছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের শক্তি এরূপ সীমাবদ্ধ যে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক চাহিদার বেশীর ভাগই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সে সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যায় নাই। আমরা আশা করি, কলিকাতায় একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনে আর অযথা বিলম্ব করা হইবে না।

ভারতে খনিজ তৈল

ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি ক্রমশঃ বৃদ্ধির মুখে, ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খরচ সঙ্কুলান হইয়া উঠিবে না। তাঁহারা আমদানী খরচ বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট, কারণ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যন্ত্রপাতি ব্যতীত তৈল আমদানীতে ভারতের বহু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ বৎসরে ৭৫ কোটি টাকার খনিজ তৈল আমদানী করে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন দাঁড়াইবে ৭০ লক্ষ টনে এবং ইহার আমদানীর জন্য ১২০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হইবে। ভারতে তৈল অনুসন্ধানের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার অন্যূনপক্ষে ত্রিশ কোটি টাকা খরচ করিবেন। কেন্দ্রীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকেশব মালবীয় সম্প্রতি কানাডায় গিয়াছিলেন তৈল নিষ্কাষণ ব্যাপারে ঐ দেশ হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায়। কানাডা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং খনিজ তৈল অনুসন্ধান ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে, শীঘ্রই এই উদ্দেশ্যে তাহারা এ দেশে লোক পাঠাইবে। তৈল অনুসন্ধান ব্যাপারে কানাডার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খুবই উন্নত।

আসাম তৈল কোম্পানীর ভূতত্ত্ববিদ মিঃ মেত্রে সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার মতে আসামের নাহোরকাটিয়া এলাকায় তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ইহাতে বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হইবে। ইহার সঙ্গে ৪·৫ কোটি টন কিউবিক ফুট গ্যাসও পাওয়া যাইবে, এবং এই পরিমাণ গ্যাস প্রায় ৬ লক্ষ টন পেট্রোলিয়ামের সামিল। আসামের শিল্পোন্নতিতে এই গ্যাস খুব প্রয়োজনে আসিবে। ডিগবয় তৈলখনির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান, ইহাতে বৎসরে গড়ে তিন লক্ষ টন তৈল উৎপাদিত হয়। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ টন অপরিশ্রুত তৈলের প্রয়োজন হয়, এখন ইহার ৮ শতাংশ মাত্র এদেশে উৎপাদিত হয়, আগামী কয়েক বৎসরে এই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৬ শতাংশে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

আসাম উপত্যকায় অন্যান্য স্থানেও তৈল আছে বলিয়া প্রাথমিক অনুসন্ধানে ধরা পড়িয়াছে। এখানকার মোরান এলাকায় তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে মোট ৪৩ লক্ষ টন তৈল খরচ হয়। ১৯৬০-৬১ সন নাগাদ ইহার পরিমাণ হইবে ৭০ লক্ষ টন। শুধু আসামেই যাহাতে ৪০ লক্ষ টন তৈল উৎপাদিত হয় তাহার জন্য ভারত সরকার সর্ব্বতোপায় অবলম্বন করিতেছেন। পঞ্জাবের জাওলামুখী এলাকায় তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলা, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রেও তৈল আছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দ্রুত অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। গাঙ্গেয় উপত্যকার আরও অন্যান্য স্থানে তৈলের অবস্থান স্বাভাবিক।

মুদ্রাস্ফীতি, না মন্দার বাজার ?

ভারতে টাকার বাজার বর্ত্তমানে দুইটি বিপরীত গতির সম্মুখীন—একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, অন্যদিকে মন্দা। কয়েকদিন আগে ভারতের অর্থমন্ত্রী টাকার বাজারে মন্দা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মে মাসে ও সেপ্টেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধকল্পে ব্যাঙ্কগুলির উপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করে। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্ক দাদনের সাহায্যে আড়তদারেরা এই দ্রব্যগুলিকে ধরিয়া রাখিতেছে, সেই কারণে বাজারে ইহাদের সরবরাহ কম হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কগুলি টাকার বাজার মন্দা বলিয়া ধুয়া তুলিল এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাহাদের সমর্থন করিলেন। ফলে ব্যাঙ্কগুলির উপর হইতে উক্ত বাধানিষেধগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়।

কিন্তু টাকার বাজার কি সত্যই মন্দা ? অবশ্যই নয় ; ব্যাঙ্কগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে টাকা খাটাইয়াছে, তাহাতেই টাকার বাজারে টান পড়িয়াছে। জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কগুলিকে সময় হুণ্ডীর বিরুদ্ধে (usance bills) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৩০ কোটি টাকা ধার্য্য দিয়াছে। ভারতবর্ষে মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত টাকার বাজার মন্দা থাকে ; কিন্তু সেই সময়েই এত অধিক পরিমাণ ঋণ ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য বৎসরে এই সময়ে ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ঋণ লয় নাই ; ফসল উঠার সময় টাকার বাজার তেজী থাকে (নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত)। টাকার বাজার তেজী হওয়ার প্রারম্ভেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হুণ্ডীর বিরুদ্ধে সুদের হার শতকরা সোয়া তিন হইতে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি অত্যধিক পরিমাণে দাদন দিয়াছে, ইহাতে ফাটকার বাজারে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে

এবং মূল্যমান উপরের দিকে উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের আমানতের ৭০ শতাংশ ইতিপূর্ব্বেই লগ্নী দিয়া বসিয়াছে; টাকার বাজারে তেজী অবস্থা সবেমাত্র সুরু। আন্তর্ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী ঋণের হার সোয়া তিন শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। মূল্যমানকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি করা ও লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা (credit rationing)।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পুনর্নির্বাচন

জেনারেল ডুইট আইসেনহাওয়ার দ্বিতীয় বারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আইসেন-হাওয়ারের এই জয় তাঁহার ব্যক্তিগত জয়। মার্কিন জনসাধারণ রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী আইসেনহাওয়ারকে প্রেসি-ডেণ্টরূপে ভোট দিয়াছেন, কিন্তু রিপাবলিকান দল কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জনপ্রিয়তা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনে তিনি যে-সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন এবারে তিনি তদপেক্ষা অনেক বেশী ভোট পাইয়াছেন। আইসেন-হাওয়ার ৪২টি রাষ্ট্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এডলাই ষ্টীভেনসন অপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছেন, মাত্র ছয়টি রাষ্ট্রে ষ্টীভেনসন আইসেন-হাওয়ার অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন। ১৯৫২ সনে আইসেনহাওয়ার ৩৯টি রাষ্ট্রে এবং ষ্টীভেনসন নয়টি রাষ্ট্রে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেন। প্রায় ৫৬ বৎসর পর এই এক জন রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৯০০ সনে পুনর্নির্ব্বাচনের অত্যল্পকাল পরেই রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিনলে আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর আজ পর্য্যন্ত আর কোনও রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্টই পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। মিঃ রিচার্ড নিক্সন পুনরায় উপরাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মার্কিন কংগ্রেসের উভয় ক্ষেত্রেই ডেমোক্র্যাটিক দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ১৮৪৮ সনের পর এই সর্ব্বপ্রথম এক-জন প্রেসিডেণ্ট বিরোধী কংগ্রেসের সম্মুখীন হইয়াছেন।

আইসেনহাওয়ারের নির্ব্বাচনী প্রচারে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুনর্নির্ব্বাচিত হইলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিপ্ত হইবে না। এডলাই ষ্টীভেনসন আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আইসেনহাওয়ার তাহার বিরোধী। আইসেনহাওয়ারের পুনর্নির্ব্বাচনে মার্কিন বৈদেশিক নীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মিঃ আইসেনহাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হওয়ার খবর নিম্নরূপে আসে।

"নিউইয়র্ক, ৭ই নবেম্বর—মিঃ ডুইট ডি. আইসেনহাওয়ার (রিপাব্লিকান পার্টি) পুনরায় চার বৎসরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মিঃ এডলাই ষ্টিভেনসন (ডেমোক্রাট) বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হইয়াছেন।

ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থী মিঃ ষ্টিভেনসন নির্ব্বাচনে পরাজয় স্বীকার করার অল্প কিছুক্ষণ পরেই বিজয়ী প্রেসিডেণ্ট তাঁহার হর্ষোৎফুল্ল সমর্থকগণকে বলেন—মঙ্গলময় ভগবান আমাকে যতটুকু ধীশক্তি দান করিয়াছেন এবং আমার ভিতরে যতটুকু শক্তি আছে তাহা লইয়া আমি এবং আমার সহকর্ম্মিগণ একটিমাত্র কাজ করিব। সে কাজ হইল স্বদেশে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ আমেরিকাবাসীর মঙ্গলসাধন এবং জগতে শান্তি স্থাপন

মিঃ আইসেনহাওয়ার রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসাবে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে তাঁহার দল জয়ী হইতে পারে নাই। কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই—সিনেটে এবং প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাটদল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসে বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্য সহ এই শতাব্দীতে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

অদ্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত এক তার-বার্ত্তায় মিঃ এডলাই ষ্টিভেনসন বলিয়াছেন, "আপনি কেবল নির্ব্বাচনেই জয়লাভ করেন নাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের গভীর আস্থা অর্জ্জন করিয়াছেন।

অদ্য রাত্রে আমরা রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাট নহি, আমরা আমেরিকান। আমি আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে যে সব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতেছি। আমেরিকান হিসাবে আমরা আপনার শাসনকালের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।"

মৌলানা ভাসানী-নুন সংবাদ

মালিক ফিরোজখাঁ নুন কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সম্পর্কে বিষোদ্গার করেন। উহা অবশ্য তাঁহার মস্তিষ্কের অবস্থার পরিচায়ক। সে সম্পর্কে মৌলানা ভাসানীর মন্তব্য নীচে দেওয়া হইল:

"ঢাকা, ২৬শে অক্টোবর—পূর্ব্ববঙ্গে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব-পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী এখানে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর সমস্যা ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কে ক্ষতস্বরূপ হইয়া থাকা সত্ত্বেও পাকিস্থানী জনগণ 'ভারতকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করে না এবং করিতে পারে না।'

পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন সম্প্রতি রাওয়ালপিণ্ডিতে ও অন্যত্র যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মৌলানা ভাসানী তৎসমুদয়ের সমালোচনা করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন। আওয়ামী লীগের সদর দপ্তর হইতে গত রাত্রিতে এই বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রচারিত হইয়াছে।

মৌলানা ভাসানী তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক কাশ্মীর সমস্যা ও অন্যান্য কতকগুলি সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করিতে হইবে এবং তাহার জন্যই রাষ্ট্রপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে, পাকিস্থান ও ভারতের এবং সর্ব্বোপরি কাশ্মীরের জনগণের সন্তোষজনকরূপে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান পাকিস্থান ও ভারতের জনগণের উদ্ভাবনী শক্তির অতীত নহে।'

রাওয়ালপিণ্ডিতে এবং অন্যত্র পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত অন্যান্য চুক্তি সম্পর্কে মালিক নুন যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, তৎসমুদয় মৌলানা ভাসানীকে 'রূঢ়ভাবে বিস্ময়াহত' করিয়াছে—ইহা ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন যে, অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা বলাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু পাকিস্থানের জনগণ আশা করে যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে তাঁহার বিচারবুদ্ধির পরিচয় দানে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। যাঁহারা কিছুকাল ধরিয়া মালিক নুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহাতে বিচলিত হইবেন না। অতি সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রজোটের নিকট হইতে যথেষ্ট সমর্থন ও সাহায্য না পাইলে রুশীয় রাষ্ট্রজোটের সহিত হাত মিলাইবে।

মৌলানা ভাসানী বলেন যে, আলোচনা, অনুমোদন বা অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য দেশ একবাক্যে বরাবরই সমস্ত বৈদেশিক চুক্তি পার্লামেণ্টে পেশের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ সেই দাবীর উত্তরেই সরকার সেদিন ঢাকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৈদেশিক চুক্তিসমূহ সম্পর্কে শীঘ্রই এক শ্বেতপত্র প্রচারিত হইবে। কিন্তু মালিক ফিরোজ খাঁ নুন অকস্মাৎ বলিয়া বসিলেন যে, সরকার বৈদেশিক চুক্তিসমূহ জাতীয় পরিষদে পেশ করিতে চাহেন নাই। কারণ সরকার রাষ্ট্রের কার্য্যনির্ব্বাহক প্রধানরূপে যে-কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যে-কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং সেই সমস্ত চুক্তি তাঁহারা জাতীয় পরিষদে অনুমোদন করাইয়া লইতে বাধ্য নহেন। মালিক নুন আরও বলিয়াছেন যে. বৈদেশিক চুক্তিসমূহে গোপন ধারাসমূহ আছে বলিয়া সেই সমস্ত চুক্তি আলোচনার্থ জাতীয় পরিষদে পেশ করিয়া তৎসমুদয়ের বিষয়বস্তু ফাঁস করিয়া দেওয়া জনস্বার্থের অনুকূল হইবে না :

মৌলানা ভাসানী বলেন যে, দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এইরূপ উক্তি কেবল যে 'বিস্ময়কর' এবং তাঁহার রাজনীতির প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক তাহাই নহে, অধিকন্তু মালিক নুন যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহা দ্বারা পাকিস্থানের জনগণের দেশপ্রেমের উপরও সরাসরি আঘাত হানা হইয়াছে।

মৌলানা ভাসানী বলেন, 'পাকিস্থানের জনগণই পাকিস্থান সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার সংহতি ও স্বাধীনতাও তাহারাই রক্ষা করিবে। যে সমস্ত মন্ত্রী পূর্ব্বে ছিলেন এবং এখন যে সমস্ত মন্ত্রী শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের অনেকেরই পাকিস্থান গঠনে কোনরূপ অবদান নাই। মন্ত্রীরা নিযুক্ত হইবেন এবং বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ জনগণ চিরকালই থাকিবে।' "

ভারত-তিব্বত যোগাযোগ

তিব্বত নিষিদ্ধ দেশ ছিল। বহু আয়াস-প্রয়াসের ফলে সেখানে বাহিরের লোক যাইত। শুধু পথেরই বিপদ ও কষ্ট অতি ভয়ানক ছিল, কেননা পথ বলিতে পায়ে-চলা পাহাড়ী পথ এবং তাহাও ছিল অতি উচ্চ তুষারময় গিরিসঙ্কটের পরপারে। নীচের সংবাদে জানা যায় যে, বিমান পথে ঐ দুর্গম যাত্রাপথ সুগম ও সরল করার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যদিও অন্ত বাধাবিঘ্ন এখনও আছে :

"নয়াদিল্লী, ২৪শে অক্টোবর—আজ ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ইলুসিন পরিবহন বিমান হিমালয়ের উপর দিয়া সাফল্যের সহিত উড়িয়া গিয়া ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বিমান যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে ১৯৫৪ সনে প্রথম একটি ডাকোটা বিমান এইভাবে হিমালয় অতিক্রম করিয়া গ্যান্‌ৎসের নিকট কিছু ঔষধপত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল।

ইলুসিন বিমানটির নাম দেওয়া হইয়াছে "মেঘদূত"। ইহা আজ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে অনিয়মিত আকাশপথ ধরিয়া পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা আরম্ভ করে। হিমালয়ের উপর দিয়া যাইবার সময় ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪,০০০ ফুটেরও উঁচু কয়েকটি শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া যায়। এই শৃঙ্গগুলিতে এখনও মানুষের পদার্পণ হয় নাই।

মেঘদূত আজ সকাল সাতটায় জোড়হাট হইতে যাত্রা করিয়া সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে লাসা ছাড়াইয়া টাংগুং (ডনসুন)-এ অবতরণ করে। বিমানের সহিত যোগাযোগ রক্ষার এবং উহাকে আবহাওয়ার সংবাদ জানাইবার জন্য পূর্ব্বেই জোড়হাট ঘাটি ও টাংগুং (ডনসুন) বিমান ক্ষেত্রের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছিল।

কাশ্মীর ও ভারত

নিম্নস্থ সংবাদটি পাকিস্থানের এক দলকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, যত দিন যাইতেছে ততই কাশ্মীরের জনমত দানা বাঁধিতেছে এবং ততই ভারত ও কাশ্মীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইতেছে :

"শ্রীনগর, ২১শে অক্টোবর—আজ কাশ্মীর গণপরিষদে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য 'ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।' উপরোক্ত বিধি খসড়া সংবিধানের তিন নম্বর খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

উহা দীর্ঘস্থায়ী উল্লাসধ্বনির মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

পরিষদে রাজ্যের সীমানা নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট যে সব অঞ্চল রাজ্যের অধিপতির সার্ব্বভৌম অধিকার অথবা কর্ত্তৃত্বে ছিল তাহা;' ইহার অর্থ এই যে, এক্ষণে পাকিস্থানের অধিকৃত গিলগিট ও চিত্রলসহ সমস্ত এলাকা কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত।

অপর একটি খণ্ডে রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের উল্লিখিত বিধানাবলী অনুযায়ী 'যে সব বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার আছে, তাহা ছাড়া সকল বিষয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনগত অধিকার থাকিবে।'

শ্রীনেহরুর সমাজতন্ত্রবাদ

এলাহাবাদে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার কল্পিত সমাজতন্ত্রের যে চিত্র দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নস্থ সংবাদে দেওয়া হইল।

মূলতঃ পণ্ডিত নেহরুর মতের সহিত আমাদের মিল আছে। কিন্তু প্রভেদ আছে তাঁহার বাস্তব সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পর্কে। তিনি মনে করেন, রাশিয়া ও চীনের তুলনায় এ দেশে অনেক কম ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া আমরা প্রকৃত সমাজতন্ত্রের আদর্শে পৌছিব। যদি শুধু রক্তপাতই একমাত্র দুঃখকষ্টের প্রতীক হয় তবে তাহা সত্য। কিন্তু যদি বিনা রক্তপাতে একটি জাতি তথা ভারতীয় জনসাধারণের একটি প্রগতিশীল স্তর অভাবে ও অবহেলার ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তবে কি তাহা দুঃখকষ্ট বিনাই হইয়াছে ধরা যাইবে? বাঙালী জাতি ও সমগ্র ভারতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ আজ ধ্বংসের পথে, এ কথা কি কেহই জানে না?

"এলাহাবাদ, ২৭শে অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য বলেন, ভারত যাহাতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমবায়মূলক কমনওয়েলথরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সেজন্য চেষ্টা করিতেছে। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে এখানে সকলে সমানাধিকার ভোগ করিবে।

অদ্য সন্ধ্যায় কে.পি.আই. কলেজ ময়দানে সমবেত ৬০ হাজার ব্যক্তির সম্মুখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনসাধারণ অনেক সময়ে সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝে না। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে সমাজতন্ত্রবাদ কথাটির জন্ম। মুখ্যতঃ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টনই ইহার কাজ। ধনীর ধন ধনীর নিকট হইতে আনিয়া দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করাকেই যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদ মনে করেন, তাঁহারা ভুল করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে ভারী শিল্প জাতীয়করণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহ রাষ্ট্রীকরণ হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নাম এখন ষ্টেট ব্যাঙ্ক। কিন্তু বেপরোয়াভাবে রাষ্ট্রীকরণের ফল ভাল হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। ইহাতে দেশের প্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে এবং কল্যাণ ব্যাহত হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চীনদেশেও ইহাই হইয়াছে। ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ও আরও ১০।১৫ বৎসর লাগিবে।

কৃষি সমবায় সৃষ্টি দ্বারা কৃষকের কষ্ট লাঘব করা যাইতে পারে; ইহা কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। চাষীদের অবস্থার উন্নতি না হইলে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে কি পরিমাণ লৌহ ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় উহা দ্বারাই দেশের প্রগতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তুলনায় ভারতে লৌহের উৎপাদন খুবই সামান্য। প্রভূত ব্যয়ে বিদেশ হইতে লৌহ আমদানী করিতে হয়। এইজন্য বিপুল ব্যয়ে এখানে ইস্পাত উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে।

'ধর্ম্মীয় নেতা' প্রশ্ন লইয়া বিভিন্ন রাজ্যে যে উত্তেজনা ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হইয়াছে প্রধানমন্ত্রী উহার নিন্দা করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িকতা সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে, তাহা না হইলে দেশ ধ্বংস হইবে। যে দেশের জনসাধারণ গুণ্ডামি করে এবং একে অন্যের মাথা ভাঙে সে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

শ্রীনেহরু বলেন, প্রকৃতিকে মানবের সেবায় লাগাইতে হইবে। ইহাই শিল্প-বিপ্লব। এই বিপ্লবের পরিণতির উপর সমাজতন্ত্র নির্ভর করে।"

শিয়ালদহ ষ্টেশন সরান

আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার সম্প্রতি নিম্নের সংবাদটি দিয়াছেন। যদি উহা সত্য হয় তবে বলিতে হইবে এত দিনে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার নানা সমস্যার একটি পূরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অবশ্য আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে "না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই।"

যদি ঐ প্রস্তাব যথার্থই হইয়া থাকে তবে রেল সরাইলে যে বিরাট ভূমিখণ্ড শহরের সাধারণের ব্যবহারে আসিবে, রাজ্যসরকার তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন সে কথা এখনই জানান উচিত। নহিলে কোনও উদ্ভট ব্যবস্থা হইলে জনসাধারণের কষ্ট লাঘব কিছুই হইবে না, সমস্যা যাহা রহিয়াছে তাহা বাড়িবে বৈ কমিবে না।

প্রথমতঃ পথ সরল ও প্রশস্ত করা প্রয়োজন। এখন শহরের উত্তর ও দক্ষিণের যোগাযোগ যে সকল রাজপথে আছে তাহার মধ্যে একমাত্র চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সম্পূর্ণভাবে সুগম। চিৎপুর, কর্ণওয়ালিস ও কলেজ ষ্ট্রীট ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ ও বিষম যাত্রীবহুল। সারকুলার রোড স্থলে স্থলে এত সঙ্কীর্ণ যে মাঝে মাঝে মোটর গাড়ী-যাত্রী এই সব ভিড়ের চাপে অচল হইয়া পড়ে। এইটি শ্যামবাজার হইতে বরাবর সমানভাবে আরও ৩০।৪০ ফুট চওড়া হওয়া প্রয়োজন। রাজাবাজার হইতে ধর্ম্মতলার মোড় পর্য্যন্ত অন্ততঃ আরও ৬০।৭০ ফুট চওড়া হওয়া দরকার।

দ্বিতীয়তঃ মধ্যবিত্ত লোকের বাসের জন্ত অন্ততঃ ছোট বড় এক হাজার হইতে দুই হাজার ফ্লাট ঐ অঞ্চলে হওয়া দরকার। কলিকাতা হইতে বাঙালী তো উচ্ছেদ হইতে চলিল। তাহাদের বাসস্থান, ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় ইত্যাদি এই অঞ্চলে হইলে তাহারা বাঁচিবার ও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় :

"কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বর্তমান শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনটিকে শিয়ালদহের পূর্ব্ব প্রান্তে অনুমান অর্দ্ধমাইল দূরে নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে সরাইয়া লওয়ার প্রস্তাবে রাজ্য সরকার সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় রেল ও পরিবহন দপ্তর এই পরিকল্পনা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মতামত চাহিলে রাজ্য সরকার ঐ প্রস্তাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত করেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশন এবং কলিকাতা নগরীর অস্বাভাবিক ভিড় হ্রাস করায় ও ট্রেন চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থায় জন্ত কেন্দ্রীয় রেল বিভাগ শিয়ালদহ ষ্টেশনটিকে শিয়ালদহের পূর্ব্ব প্রান্তে অপসারণের সিদ্ধান্ত করেন। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের মতামতেরও প্রয়োজন বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত চাহিয়া পাঠান। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা হয় এবং মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত করেন বলিয়া প্রকাশ।

রেল ষ্টেশনটি অপসারিত হইলে বর্তমান ষ্টেশন এলাকায় ভূমি-খণ্ড রাজ্য সরকারের অধীনে আসিবে। ঐ জমির মালিক এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকার। নূতন রেল ষ্টেশন নির্ম্মাণের জন্ত রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে আবশ্যক পরিমাণ জমি দিবেন এবং ঐ জমি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকিবে। জমির বিলি-ব্যবস্থার পর রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভূমিমূল্য বাবদ আনুমানিক দুই কোটি টাকা পাইতে পারেন বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। সম্ভবতঃ ষ্টেশন নির্ম্মাণের জন্ত যে সব জমি দখল করিতে হইবে সেই সব জমির ক্ষতিপূরণ ঐ অর্থ হইতে মিটান হইবে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করিতে প্রথমেই শিয়ালদহ ষ্টেশনের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত খালটিকে বুজাইতে হইবে। রাজ্যসরকারের সেচ বিভাগ উহা বুজাইয়া দিবেন।"

রেলে দুর্ঘটনা

রেলে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কাজে অবহেলার নিদর্শন নিয়তই সংবাদে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে মিস্ত্রী ও ইন্‌স্পেক্‌শন অফিসার দুইয়েরই দোষ আছে :

"শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম্মের গায়ে মঙ্গলবার অপরাহ্নে একখানি লোকাল ট্রেন ধাক্কা মারায় প্ল্যাটফর্ম্মে অবস্থিত একটি জলাধার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে বসবাসকারী তিন জন উদ্বাস্তু আহত হয়। ইহারা ঐ সময় জলাধারটি হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিতেছিল বলিয়া প্রকাশ।

আহত ব্যক্তিদের দুই জনকে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক জনের পা ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহাকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

যে ট্রেনখানি এই দুর্ঘটনার হেতু উহা রাণাঘাট লোকাল (এস ৩৫৬ ডাউন)। উহা বিকাল ২-১৫ মিনিটে শিয়ালদহের (নর্থ ষ্টেশনের) ৩নং প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছায়। কিন্তু প্রকাশ, ইঞ্জিনের ভ্যাকুয়াম ব্রেকটি সাময়িকভাবে বিকল হইয়া পড়ায় গাড়ীর গতি রোধ হয় না এবং জোরের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্ম সংলগ্ন বাফার দুইটির গায়ে এমনভাবে আসিয়া পড়ে যে, বাফার দুইটি প্ল্যাটফর্ম্মের ভিত্তির ভিতরে একেবারে ঢুকিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের সম্মুখভাগের খানিকটা প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে উঠিয়া পড়ে। উহারই ধাক্কায় সেই স্থানে অবস্থিত জলাধারটির ইটের গাঁথুনি ধ্বসিয়া পড়ে। যাত্রিগণের পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জলাধার ২নং ও ৩নং প্ল্যাটফর্ম্মের মাঝখানে লাইনের একেবারে ধার ঘেঁষিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।"

পাটনায় শহীদ-স্মারক

পাঠকদিগের মনে থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বের এক সংখ্যায় প্রবাসীতে শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর রূপায়িত এই স্মারকের চিত্র দেওয়া হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল :

"পাটনা, ২৪শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য এখানে বলেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে বিসর্জ্জিত-প্রাণ শহীদগণের স্মৃতি মনে জাগরূক রাখা এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

১৯৪২ সনের ১১ই আগষ্ট তারিখে পাটনা সেক্রেটারিয়েট ভবনশীর্ষে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করিতে গিয়া যে সাত জন যুবক সেক্রেটারিয়েট ভবনের সম্মুখে পুলিসের গুলিতে নিহত হন, তাঁহাদের স্মরণার্থ উক্ত ভবনের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত শহীদ-স্মারকের আবরণ উন্মোচনকালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ উক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

প্রসিদ্ধ ভারতীয় চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ব্রোঞ্জনির্ম্মিত এই শহীদ স্মারকের রূপদান করিয়াছেন। ঐ শহীদ-স্মারকে শিল্পী যে দৃশ্যটি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই যে, পূর্ণাবয়ব সাত জন যুবক অবিচল সঙ্কল্প লইয়া ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সেক্রেটারিয়েট ভবনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন এবং এই দলের নেতা জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া আছেন। শহীদ-স্মারকে দেখান হইয়াছে যে, বুলেট-বিদ্ধ হইয়া এক জন যুবক পড়িয়া গিয়াছেন এবং অপর এক জন পতনোন্মুখ হইয়াছেন, কিন্তু যুবকদ্বয় তাঁহাদের সঙ্গীদের সহায়তায় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত শহীদ-স্মারকের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিতে ২২ মাস সময় লাগিয়াছে। কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তির সমবায়ে গঠিত এই স্মারকটি এশিয়ায় মধ্যে এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যেও বৃহত্তম। সাতটি মূর্ত্তির একত্রে ওজন ২০ টন এবং মূর্ত্তিগুলি ২০ ফুট উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত।"

দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠন

শ্রীকুমার সুর

ভারতবর্ষ দর্শনের দেশ। এখানে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ রচিত হয়েছে। সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক আপন আপন সূক্ষ্ম চিন্তার বিস্ময়কর বিস্তারে পৃথিবীর বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কি তার বিশ্লেষণাত্মক সুনিপুণ চিন্তা-ধারা, কি তার যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত! পূর্বপক্ষে বর্ণিত অপরাপর মত খণ্ডন এবং উত্তরপক্ষে আপন সিদ্ধান্তের অনুধাবন ও ব্যাখ্যা বিস্ময়কর। এই সূক্ষ্ম চিন্তা এমন এক তুরীয়মার্গে সঞ্চরমাণ যে পশ্চিম দেশের পণ্ডিতেরা ভারতীয় দর্শন-চিন্তাকে জীবন-বহির্ভূত বলে অভিহিত করেছেন। এ কথা অসংশয়ে বলা যায় যে, বিভিন্ন কালের পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে যেসব অর্বাচীন উক্তি করেছেন, উপরোক্ত মত তাদেরই অন্যতম। আমরা জানি ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে মহামতি ম্যাক্সমূলারের মত গ্রাহ্য নয়। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে দার্শনিক হেগেলের উক্তির অযৌক্তিকতা ও অসারতা আমাদের বিস্মিত করে। ভারতীয় দর্শনকে জীবনের সঙ্গে অসম্পৃক্ত বললে ভারতীয় জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। ভারতীয়ের জীবন-জিজ্ঞাসাই ত তার ষড়দর্শন সৃষ্টি করেছে—এ কথার উল্লেখ করেছেন দার্শনিকপ্রবর ডক্টর রাধাকৃষ্ণন।

ভারতীয় জীবনে দর্শনের প্রভাব সুপরিস্ফুট; আমাদের দেশের আউল-বাউলের দল যে গান গায়, যেভাবে কথা বলে তা যেমন দর্শনচিন্তায় ভরপুর, ঠিক তেমনিই আমাদের দেশের চাষাভুষো গরীব গৃহস্থের জীবনে এই দর্শন-চিন্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সম্যক্‌চিন্তা এ দেশের মানুষের মজ্জাগত। দার্শনিক-প্রবর স্পিনোজা যে দর্শন-ভঙ্গীকে 'Sub specie acterintretis' আখ্যা দিয়েছেন তা আমাদের কাছে অলভ্য নয়। আমরা সমস্ত দুঃখের মধ্যে, সকল দুর্যোগের মধ্যেও বিধাতার কল্যাণ-স্পর্শকে খুঁজে পাই। হৃদয়ের দুঃখ, অনাচার লাঞ্ছনাকে ভগবানের দান বলে মেনে নিয়েছি। পরম দুঃখের দিনেও আমরা অদৃশ্য ভগবানকে উদ্দেশ করে আকাশের দিকে চোখ তুলে বলেছি:

> 'তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
> আমার জীবন মাঝে।'

এই সুগভীর দর্শনচিন্তার প্রভাব শিথিল হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। নূতন শিক্ষার মাধ্যমে নূতন দর্শন এসেছে। পশ্চিমী প্রত্যক্ষবাদ ধীরে ধীরে অনুসৃত হয়েছে এ দেশের মানুষের মনের গভীরে। মার্কস, এঙ্গেলস্‌ এবং তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা কিন্তু কাজ করেছেন চুপিসাড়ে। আবার ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ঢেউ এসে লেগেছিল নারিকেল-কুঞ্জ-বেষ্টিত ভারত মহাসাগরের উপকূলে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, তার জীবনদর্শন উচ্চতর জীবনমানকে আশ্রয় করল, তারা বুঝল ধনবৈষম্যের জন্য ভগবান দায়ী নন। মানুষের অসম বণ্টন-ব্যবস্থাই প্রধানতঃ এই অবিচার ঘটাচ্ছে। এই নূতন বোধ, এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় জীবনে বিপর্যয় ঘটাল। দুঃখের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল, প্রতিবাদ উঠল সর্বত্র। ভারতবর্ষের মানুষ পুরানো জীবন-দর্শনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল আর এক নূতন জীবনের সন্ধানে, যেখানে পশ্চিমের কার্যকারণবাদ ও নব্য যুক্তিবাদ অব্যাহত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র আজ আর পঠিত হচ্ছে না। পশ্চিমী কেতাবী দর্শনের প্রতিও পড়ুয়াদের সমান অবহেলা। সমৃদ্ধিময় জীবনের সম্ভাবনা যেখানে সেখানেই আজ মানুষের ভিড়। তাই ত দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে।

আজকের দিনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দর্শন-শাস্ত্রের ক্লাসে ছেলেরা সংখ্যালঘু। দর্শনের প্রধান পড়ুয়ারা প্রায় সকলেই নারী। যাঁদের একদিন বেদপাঠে অধিকার-মাত্র ছিল না, তাঁরাই আজ বেদান্তের নূতন ভাষ্য রচনা করছেন। প্রথম শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে ছেলে নেই বললেই চলে। এ কথা জিজ্ঞাসার অবকাশ আছে যে এমনটা কেন হ'ল? ছাত্রীদের একাধিপত্য কেন ঘটল জ্ঞান-সাধনার তীর্থপথে? উত্তরটা নিহিত রয়েছে কোন অভিমানবীয় আদর্শবাদ বা আদর্শবোধের মধ্যে নয়। সাদাসিধে রুজি-রোজগার ও পেটের চিন্তাই এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ভাল ছেলেরা দর্শন পড়ে না, তারা বিজ্ঞান পড়ে। মেয়েদের রোজগার করার প্রয়োজনটা ছেলেদের চেয়ে বহুলাংশে কম বলে তারাই আজ এই অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাদপীঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। মেয়েরা যে মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করছেন, আগামী যুগের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করবেন। মেয়েরা আজ যে ভূমিকা গ্রহণ করছেন তার পিছনে রয়েছে জাতির ঐতিহাসিক, সামাজিক

ও অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়াশীলতা। রুজিরোজগারের প্রয়োজনের আপেক্ষিক ন্যূনতা ছাড়াও বোধ হয় নারীর স্বভাবসুলভ বিজ্ঞানবিমুখতা তাঁদের দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগের অন্যতম কারণ। সেখানেও খণ্ডসত্যের অনস্তিত্ব প্রমাণ করা দুরূহ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই মান্ধাতার আমলে পাঠ্যতালিকা রচনা করেছিলেন। তার আর পরিবর্তন বা বিবর্ধন হয় নি। মাঝে মাঝে কর্তাদের টনক নড়ে। এখানে ওখানে চুণকাম করা হয়, কিন্তু খোল নলচে বদলে এই পাঠ্যতালিকা যুগোপযোগী করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন কিছুই করা হয় নি। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের আহ্বানে এক বিশেষজ্ঞের দল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করার জন্য দিল্লীতে সমবেত হন। সেই বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে যে সব সুপারিশ করা হয়েছিল তা আজও কার্যকরী হ'ল না। প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এই বিশেষজ্ঞ সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। তবু জানি না কেন আজও দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্যতালিকার আমূল পরিবর্তন হ'ল না। এই পাঠ্যতালিকার প্রাচীনতা ও অনুপযোগিতা দর্শনশাস্ত্রের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের বীতরাগ করে রেখেছে। আমাদের দেশের ন্যায়শাস্ত্রের উৎকর্ষ এরিষ্টটলীয় ন্যায়শাস্ত্রের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও কেন পাঠ্যতালিকায় ওদেশের লজিক এত বড় জায়গা জুড়ে থাকবে? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনচিন্তা অধ্যয়নের জন্য যদি দুই শত নম্বর ধরা থাকে ত পাশ্চাত্য দর্শনের উপর ছয় শত নম্বর দেওয়া হয়। ইংরেজ আমলে কর্তৃপক্ষ যেমন বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করেছেন আমাদের দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে, আজও ঠিক সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। জানি না সময় এবং সুযোগের অভাব অথবা বহুকালপোষিত হীনতাভাব এই বিষম অবস্থার জন্য দায়ী কি না?

দর্শনশাস্ত্রের অর্থকরী শক্তির অভাব ও পাঠ্যতালিকার প্রাচীনতা দর্শনশাস্ত্রকে জনপ্রিয় হতে দিচ্ছে না। আরো সমস্যা আছে। শিক্ষাদপ্তরের কর্তৃপক্ষের আর্থিক কার্পণ্য অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানকার্যকে ব্যাহত করছে। বেসরকারী মফস্বল কলেজে অধ্যাপকদের বেতন নিয়মিত দেওয়া হয় না। তাই বছরের অধিকাংশ সময় সেখানে বিনা অধ্যাপকে কাজ চলে। এ কথা সরকারী এবং বেসরকারী উভয়বিধ কলেজ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অধ্যাপকেরা নিরুপায় হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য এই সব কলেজে যোগদান করেন। সুযোগ-সুবিধা পেলেই তাঁরা অন্যত্র চলে যান ভাল কাজ নিয়ে। কর্তৃপক্ষ আবার অধ্যাপক খোঁজায় কাজে লেগে যান, লোকও পাওয়া যায়। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য। তবে শিক্ষায়তনে অধ্যাপকদের নিরন্তর স্থানান্তরীকরণের ফলে শিক্ষাদানকার্য ব্যাহত হয়। ছাত্রেরা আবেদন নিবেদন করে কর্তৃপক্ষের কাছে তাড়াতাড়ি অধ্যাপক নিয়োগ করার জন্য। যখন সে আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয় তখন তারা ধর্মঘটের ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ে। সেদিন উত্তরবঙ্গের একটি রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রেরা দীর্ঘদিন অধ্যাপক না থাকার জন্য ধর্মঘট করে। রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়গুলির পরিচালন-ব্যবস্থায় এই শৈথিল্য পীড়াদায়ক। রাষ্ট্রের ত অর্থাভাব ঘটে নি। উচ্চতর বেতন দিয়ে অধ্যাপকদের নিযুক্ত করে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার সময় এসেছে। বেসরকারী কলেজগুলিতে আবার সময়মত মাহিনা দেওয়া হয় না। বহু জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক যে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে আজও জ্ঞানসাধনায় রত তাঁদের কথা ভাবা দরকার। আজও মৃতপ্রায় টোলগুলিতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহু মনীষী আত্মগোপন করে রয়েছেন। তাঁদের আর্থিক অনটন ভয়াবহ।

আবার অধ্যাপকেরা বিষয়ভেদে নানারকম হারে বেতন পান। ইংরেজী, অর্থশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপকেরা এক হারে মাহিনা পান, আবার দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃতশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষকেরা ভিন্ন হারে বেতন লাভ করেন। প্রয়োজনের তাগিদে, চাহিদার অনুপাতে শিক্ষকদের কাঞ্চনমূল্য নির্ণীত হয়। আজ বুঝি বেনিয়াবৃত্তি বাংলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাই একজন স্নাতক ইঞ্জিনীয়ারকে সরকার বাহাদুর ২৫০৲-৮৫০৲ টাকা গ্রেডে বহাল করলেও একজন প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীকে ২০০৲-৪৫০৲ গ্রেডে বেতন দিতে তাদের বিবেকে বাধে না। এই স্বেচ্ছাকৃত বৈষম্য যতদিন চলবে ততদিন শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আসতে পারে না। সরকারী কলেজে অবশ্য নিয়মিত বেতন দেওয়া হয় এবং বেতন কিছু কিছু বাড়েও। বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে বেতন আবার কমে। কলকাতার কোন এক সুবৃহৎ কলেজের কথা জানি। সেখানের জনৈক অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন যে, দশ বছর কাজ করার পর অবস্থাবিপর্যয়ে তাঁর চৌদ্দ টাকা মাহিনা কমেছিল। এই ধরণের অদৃষ্টের পরিহাস অনেক অধ্যাপককেই সইতে হয়। নিরুপায় তাঁরা। এই ধরণের সহানুভূতিহীন ব্যবহারের জন্য বেসরকারী কলেজের হর্তাকর্তাদের হয়ত ক্ষমা করা যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কাপড়ের, পাটের [illegible]

সিনেমার ব্যবসায়ে, অথবা কেউ কেউ চোরাকারবারে উদর স্ফীত করে কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে আসন গ্রহণ করবার যোগ্যতা লাভ করেন। শিক্ষাদীক্ষার বালাই তাদের অনেকেরই নেই। কিন্তু যখন দেখি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগ বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নেওয়া হবে নির্ধারিত হারের ন্যূনতম বেতনে এবং পদার্থ বা রসায়নবিদ্যার অধ্যাপকদের নির্ধারিত হারের মধ্যে উচ্চতর বেতনে নিয়োগ করা যেতে পারে তখন কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অস্বচ্ছতার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। এই বৈষম্যমূলক নীতির ফলে ক্রমেই দর্শনশাস্ত্র পঠনেচ্ছু ভাল ছেলেমেয়েরা অন্যান্য বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়বে। কল্পনা-শক্তিহীন এই সব শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ যে ক্ষতি করছেন দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠনের, জানি না কবে কেমন করে সে ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হবে।

এবার শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদার কথা বলি। এখানে বিষয়ভেদে অধ্যাপকদের মর্যাদা বা অমর্যাদার তারতম্য ঘটে না। বড় বড় কর্তারা বক্তৃতামঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন যে, শিক্ষককে সম্মান দিতে হবে। অথচ কার্যতঃ তাদের কোন কথারই মূল্য থাকে না। উদাহরণ দিই। ১৯৫১ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে সরকারী কলেজের লেকচারারদের গেজেটেড অফিসারের পদমর্যাদা দেওয়া হবে বলে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করেন। সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হ'ল ১৯৫৫ সনের নবেম্বর মাসে অনেক টালবাহানার পর। লালফিতার দৌরাত্ম্য আজও সব সরকারী বিভাগেই অব্যাহত আছে। তার উপর আছে বিভাগীয় কর্তাদের অনুদার নিষ্ক্রিয়তা ও অপরিসীম ঔদাসীন্য। এ ত গেল শিক্ষাবিভাগের কর্তাদের কথা। অন্য বিভাগীয় কর্তাদের কথা একটু বলি। নয়াদিল্লীতে ২৬শে নবেম্বরের উৎসব। সাধারণ করদাতাদের অর্থে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অফিসার মহোদয়েরা থাকেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থাকেন; কারা থাকেন না জানেন? যাঁরা আজীবন পুথি পড়ে ডিগ্রীর বোঝা বাড়ান আর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করেন আর এই সব অর্থশালী দোকানদার এবং দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অফিসারদের অপোগণ্ড ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করেন সেই শিক্ষাব্রতীর দল। এ ধরনের আরও হাজারো উদাহরণ আছে। দার্জিলিঙে সেবার নেহরু এসেছেন। রাজভবনের বিরাট প্রমোদ উদ্যানে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে চা-পান সভার আয়োজন করেছেন বাংলা দেশের শাসকগোষ্ঠীর অধিকর্তা। সুদৃশ্য নিমন্ত্রণলিপি প্রেরিত হয়েছে চারিদিকে। স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যাপকদের দুই কপালে 'গেজেটেড' লেবেল আঁটা ছিল তাঁরা পত্র পেলেন। আর সরকারী কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপক এবং বেসরকারী কলেজদ্বয়ের প্রায় সব অধ্যাপকই বাদ পড়লেন। দূর থেকে তাঁরা এই রংচঙে উৎসবের আনন্দের মধুস্বাদ গ্রহণ করলেন আর পরের দিন বড় বড় মণিহারী দোকানে জিনিষপত্র কিনতে গিয়ে দোকানের মালিক বা ম্যানেজারের কাছ থেকে প্রধান-মন্ত্রীর চা-পান সভায় তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনে ধন্য হলেন। সকলেই শিক্ষকদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন এবং তাঁদের জন্য একটা কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে। তার পরেই কা কস্য পরিদেবনা। পাদপ্রদীপ নিভলেই অন্ধকারের প্রশান্তির মধ্যে তাঁদের প্রতিশ্রুতিও সমাহিত হয়। বঞ্চনার দুর্ভাগ্য বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যাপকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

প্লেটো দার্শনিকদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেবার সুপারিশ করেছিলেন। সে সুপারিশ আজ মূল্যহীন। শাসক ত দূরের কথা, সওদাগরী আপিসের নিম্নতম কেরানী হতে হলে আপনাকে দর্শনেতর বিষয়ে স্নাতক হতে হবে। দর্শনের স্থান আজ কোথাও নেই। দর্শন যে মানসিক নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে সমগ্র মানবীয় চিন্তাধারাকে বিধৃত করে দেয় তার মূল্য এ যুগের মানুষ প্রায় বিস্মৃত হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রের পরিবর্তে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা বাণিজ্যগণিত পাঠ করে। এতে যুব-সমাজের মানসিকতার যথাযথ অনুশীলন হচ্ছে না। এরাই যখন আবার 'কর্তাব্যক্তি' হয়ে বসে তখন শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা থাকে না। রাষ্ট্র-পরিচালনায় কল্পনা ও সুষ্ঠু চিন্তার অভাব লক্ষিত হয়। জাতির কর্মে ও মননসাধনার ক্ষেত্রে নৈরাশ্য আসে। এ যুগের শিক্ষাবিদদের এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে। ন্যায়শাস্ত্রকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় করতে হবে স্নাতকপূর্ব সকল পাঠ্যতালিকায়। উচ্চতর শিক্ষায় দর্শনশাস্ত্রকেও স্বীকৃতি দিতে হবে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হিসাবে। যে অপরিণামদর্শী ছাত্রছাত্রীরা ন্যায়-শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রকে সযত্নে পরিহার করে চলছে তাদের আমি দোষ দিই না। দোষ দিই তাদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষাকর্তাদের। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ যুগের ছেলেমেয়েদের ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রবিমুখতার কথা উল্লেখ করে দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে, এযুগের ছাত্রছাত্রীরা লজঞ্জুস খায়, সুপারি চিবানোর কষ্ট তাদের সয় না। ন্যায়-শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র অধিগত করতে হলে মনের যে দার্ঢ্য এবং শক্তি দরকার তা এযুগে দুর্লভ। আজ দেখছি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। আজ অধিকাংশ মহাবিদ্যালয়েই ন্যায়শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্র পঠনেচ্ছু

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। কলেজের পড়ুয়ার সংখ্যা প্রতি বৎসরই স্ফীত হচ্ছে, কিন্তু দর্শনের ক্লাসের বেঞ্চগুলোতে ধুলোর গুরুভার ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে। দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার আশু সমাধান না হলে সম্যক্ চিন্তার, বিরাট চিন্তার কথা অদূর ভবিষ্যতের বংশধরদের কাছে চিরকালই অলভ্য থেকে যাবে।

এ যুগে দর্শনশাস্ত্রের উপযুক্ত অধ্যাপকেরও অভাব ঘটছে। ভাল ছেলেরা নিষ্ঠার সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র না পড়লে ভাল অধ্যাপক কেমন করে তৈরী হবে? নূতন নূতন কলেজ খোলা হচ্ছে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায়। যাঁরা অধ্যাপক হয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অনেকেরই না আছে অধ্যাপক হবার যোগ্যতা, না আছে মননিষ্ঠা। তাই দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা ও ক্রমেই পঙ্গু হয়ে পড়ছে। সরকারও এ সম্বন্ধে উদাসীন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন বেসরকারী কলেজে গবেষণায় যে উৎসাহ দেওয়া হয় সেটুকু উৎসাহ ও সরকারী কলেজে দেওয়া হয় বলে মনে হয় না। প্রায় অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে এবং বাংলা দেশের বাইরে সরকারী ও বেসরকারী সব কলেজেই কোন অধ্যাপক গবেষণা করে কোন ডিগ্রী লাভ করলে কাঞ্চনমূল্যে তার যথোচিত মর্যাদা দেন বিভাগীয় কর্তারা। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য গবেষণায় উৎসাহ দেয়। একথা অনস্বীকার্য যে, কতকটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে গবেষণায় উৎকর্ষলাভ করা সহজসাধ্য হয় না। প্রাচুর্য্যের মধ্যেই সভ্যতার সর্বসুন্দর শতদলগুলি বিকশিত হয়, এমনিধারা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। দর্শনশাস্ত্রীদের আর্থিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর না হলে দর্শনশাস্ত্র পঠনেচ্ছু উপযুক্ত ছাত্র মেলা দুষ্কর হবে এবং আগামীকালে উপযুক্ত শিক্ষকেরও একান্ত অভাব ঘটবে। বর্তমানে উপযুক্ত যাঁরা তাঁরাও শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার জন্য আগ্রহশীল। সরকার তাঁদের অভাব-অভিযোগ দূর করে শিক্ষাবিভাগে স্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা না করে হুকুম জারী করলেন যে, শিক্ষাবিভাগ থেকে অতঃপর কোন অধ্যাপকের আবেদনপত্র অন্যত্র প্রেরণ করা হবে না। কাজেই এই অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য শিক্ষকদের নানান অশিক্ষকোচিত কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

দর্শন এবং তর্কশাস্ত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। নীতি হিসাবে সেটা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য বাংলায় দর্শনশাস্ত্রের যোগ্য পরিভাষার প্রয়োজন। আজও সে পরিভাষা রচিত হয় নি, কারণ কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তাই দেখি বাংলা ভাষায় লিখিত দর্শনশাস্ত্রের পুস্তকে পঠন-পাঠন এবং আলোচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ইচ্ছামত শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করা দোষাবহ। দার্শনিক কান্টকে উত্তরকালের সমালোচকেরা দোষ দিয়েছিলেন তাঁর 'Critique of Judgment' গ্রন্থে এই ধরণের শব্দ-প্রয়োগের জন্য। আমাদের দেশের দর্শনের প্রায় অধিকাংশ লেখক সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তা ছাড়া যে কয়খানি দর্শনের বই বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। অনেক কাজ বাকী আছে। স্নাতকোত্তর বিভাগেও দর্শন-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন মাতৃ ভাষার মাধ্যমে করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন সুলিখিত গ্রন্থাবলীর। বাংলা দেশের দর্শনশাস্ত্রীদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে আর আসতে হবে দেশের জনশিক্ষার নায়কদের। এই নূতন গ্রন্থ-প্রণেতাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, গ্রন্থ প্রণয়নে এমন ভাষা ব্যবহার করা দরকার যে ভাষা এ কালের মানুষের ভাষার সমধর্মী হবে। এ যুগের মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং রুচিগ্রাহ্য করে প্রাচীন ভারতীয় ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের ভাষার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

আমরা অন্যত্র ভারতীয় দর্শন ও ন্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করার জন্য মত প্রকাশ করেছি। সে পরিকল্পনা সার্থক হবে যদি আমরা ঐ প্রাচীন জ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলিকে আধুনিক যুগের গ্রহণযোগ্য ভাষায় পরিবেশন করতে পারি। তবেই দর্শন-শাস্ত্র পঠিত হবে, সমাদৃত হবে বিস্তৃততর পাঠকসমাজের কাছে। উন্নাসিক পণ্ডিত হয়ত বলবেন যে, ভারতীয় সাধনার গোড়ার কথা হ'ল অধিকারভেদ। দর্শনশাস্ত্র সকলের জন্য নয়। তাই তাকে মনোজ্ঞ ভাষায় সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনবেদ্য করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা বলব অধিকারভেদ সুবিধাবাদীর কথা। অর্জনের দ্বারা ত অধিকার সৃষ্টি হতে পারে। যে সাধনায় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজ লাভ করেন, যে সাধনায় দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার অধিকারী হন, সে সাধনার ক্ষেত্র ত অর্গলিত হয় নি। সাধারণ মানুষ পরিশ্রমের দ্বারা, মননের দ্বারা, একাগ্র সাধনার দ্বারা কেনই বা জ্ঞানের নিগূঢ়তম প্রদেশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের অধিকারটুকু লাভ করবে না? সে অধিকার দিতে হলে অগ্রগামীদের যে বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হবে সেটুকু তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে করলেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পুণ্যতোয়া জ্ঞানস্রোতস্বতী আপন কূল প্লাবিত করে ছড়িয়ে পড়বে দেশদেশান্তরে। দেশের আপামর সাধারণ সেই মহৎ জ্ঞানের আলোকে যে নূতন জীবনদর্শন রচনা করবে তার স্বাক্ষর থাকবে এ যুগের

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে, দেশের প্রতিটি পুরুষ ও নারীর জীবন উন্নততর,সমৃদ্ধতর ও অধিকতর সুখী করিয়া গঠন করাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এ কথা সত্য যে, আমাদের সামর্থ্য ও সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। তাহার উপর যুদ্ধ এবং দেশ-বিভাগের ফলে ভারতকে অপূরণীয় ক্ষতি বহন করিতে হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনা রচনার প্রাক্‌কালে যুদ্ধের সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রবর্ত্তিত কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল। খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যবস্তু ও অন্যান্য শিল্পোৎপাদিত ভারী বস্তুর অপ্রাচুর্য্য এবং অনটন পদেপদেই উপলব্ধ হইতেছিল। সেইরূপ অবস্থায় প্রথম পরিকল্পনার চেষ্টা ছিল—দেশকে যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় ফিরাইয়া আনা এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে লগ্নির হার ক্ষুদ্র করা ও পরিকল্পনার আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ না করা। পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি শ্রীজবাহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "অর্থনৈতিক উন্নতির যূপকাষ্ঠে গণতান্ত্রিক কোনও প্রতিষ্ঠানকে বলি দেওয়া চলিবে না।" অর্থাৎ কোনও পরিকল্পনা ক্ষমতাবলে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। সুতরাং দেশবাসীর পরিকল্পনা গ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া এবং "সম্ভবপর সকল শ্রেণীর নাগরিকের মত গ্রহণ করিয়া" পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইয়াছে।

পরিকল্পনা রচনার প্রারম্ভে নেতৃবৃন্দ এই কথা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমাদের দেশে কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুত কার্য্যকরী করিতে হইলে সেই সঙ্গে সমাজ-উন্নয়নের ব্যবস্থাও না করিলে উহা প্রতি পদে ব্যাহত হইবে। দেশের সামগ্রিক দ্রুত উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে দেশের সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উপর। সেইজন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সামাজিক উন্নয়নের কথাও তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে হইয়াছে। সেই আদর্শের অংশ হিসাবে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা ও অসাম্য এবং অসামঞ্জস্যের বিলোপসাধন কর্ম্মসূচীতে স্থান পাইয়াছে। অর্থাৎ, ধনী ও দরিদ্র, নগরবাসী এবং পল্লীবাসীর মধ্যে অত্যধিক অসাম্য ও অসামঞ্জস্য দূর করিয়া অধিকতর সুষ্ঠু সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থাও এমন ধীরভাবে করিতে হইবে যেন সঞ্চয় ও লগ্নির হার ব্যাহত না হয়। এই কারণে সরকারী ও বেসরকারী লগ্নির অংশ (State and Private Sector) পৃথকভাবে ধরা হইয়াছে এবং দুইটিকেই বজায় রাখিতে হইয়াছে। জমির বণ্টন অধিকতর সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠার জন্য জমি-বণ্টন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে অনেক রাজ্যে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ সর্ব্বাধিক কতখানি জমির মালিক হইতে পারিবে তাহারও একটি উচ্চতম সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার কথা বিচার করিলে এই কথা উপলব্ধি করা যায় যে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশকে (১) যুদ্ধপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা ও (২) পরবর্ত্তী পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তুত করা। ইহাতেই বরাদ্দের পরিমাণ হইয়াছিল ২০৬৯ কোটি টাকা (পরবর্ত্তী হিসাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ মোটামুটি ৩১০০ কোটি)। ব্যয় বরাদ্দের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পায়ন ব্যবস্থা ছিল গৌণ—অর্থাৎ মোট বরাদ্দের ৮·৪ শতাংশ, অপরদিকে কৃষি প্রভৃতি বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৭·৪ শতাংশ। সেচ ও আনুষঙ্গিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ২১·০ (৮·১+১২·৯)। পরিবহন ও যোগাযোগে ২৪·০ শতাংশ। সেচ-পরিকল্পনা কৃষি-পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ধরিলে মোট ব্যয়ের ৩৮ শতাংশ কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত ধরা যাইতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকে জাতীয় আয়ের প্রায় সাত শতাংশ নিয়োজিত করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে এই পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। ইংলণ্ডে জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ উন্নয়নে লগ্নি করা হইয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ শতাংশ হইতে ১৬ শতাংশ পর্য্যন্ত লগ্নি হইয়াছে। আমাদের দেশের তুলনায় এই সব দেশ যথেষ্ট উন্নত তথাপি উন্নয়নকল্পে তাহাদের লগ্নির পরিমাণ অনেক বেশী। অপরদিকে রুশিয়ার প্রথম পরিকল্পনার সময় জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ হইতে ৩৩ শতাংশ পর্য্যন্ত উন্নয়নকার্য্যে লগ্নি করা হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে—অনুন্নত দেশে দ্রুত উন্নয়নকল্পে লগ্নির পরিমাণ অধিক না হইলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থায় তাহা সম্ভবপর হয় নাই। প্রথম পঞ্চবর্ষে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রায় ৫৭ টাকা মাত্র। কাজেই এই সামান্য ব্যয়ে ৩৬ কোটির অধিক অধিবাসীর ও ১২ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গমাইল আয়তনের একটি দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করা অতি কঠিন ও কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সঞ্চয় অতি সামান্য। তাহা ছাড়া এত বৃহৎ একটি পরিকল্পনা দ্রুত কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে দেশবাসীর যেরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন, শিক্ষার অভাবে সম্ভবতঃ সেইরূপ পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা সর্ব্বক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষের ষষ্ঠ-পঞ্চমাংশ অধিবাসী অদ্যাবধি নিরক্ষর। সুতরাং কৃষিশিল্প প্রভৃতির উন্নয়নের সহিত সমাজসেবার পরিকল্পনাও কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গৃহ-নির্ম্মাণ, শ্রমিক-কল্যাণ প্রভৃতির জন্য বরাদ্দের ১৬·৪ শতাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। দেশবিভাগের ফলে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা

একটি বৃহৎ সমস্যা রূপে দেখা দিয়াছে। পুনর্ব্বাসনকল্পে ৪'১ শতাংশ নিয়োগ করা হইয়াছে; ইহা ভিন্ন বিবিধ খাতে ২'৫ শতাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। এখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রয়োজনের তুলনায় পরিকল্পনার বরাদ্দ অতি সামান্য।

সুতরাং প্রথম পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই, অর্থাৎ, পঞ্চবর্ষে যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় দেশকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। ইহা সত্য যে, পরিসংখ্যান অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জনসংখ্যাও বাড়িয়াছে এবং অন্যান্য সমস্যাও উদ্ভব হইয়াছে। ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু অভাব মিটিয়াছে অথবা যুদ্ধপূর্ব্ব স্বচ্ছন্দ অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে কিছুই বলা চলে না। ইহাও সত্য যে, জাতীয় আয় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি জীবনধারণের মানের উন্নয়ন হইয়াছে সেকথা কোনও প্রকারেই বলা চলে না। যে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যবহারিক অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি মাত্র, ক্রয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি নহে অথবা দ্রব্যমূল্যের অনুপাতেও ব্যতিক্রম নহে। তবে ১৯৪৮-৪৯ সনের তুলনায় অনেক সচ্ছলতা বাড়িয়াছে এবং মূল্যের অনেক সমতা ফিরিয়া আসিয়াছে। আরও একটি সুফল মনে হয় যে, বণ্টন-ব্যবস্থার সামান্য উন্নতির জন্য সম্ভবতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অধিবাসী জাতীয় আয় বৃদ্ধির অংশ লাভে সমর্থ হইয়াছে। তথাপি যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থা হইতে আমরা অদ্যাবধি বহু দূরে। দ্রব্যমূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থা হইতে যে হারে বাড়তির পথে চলিয়াছে, আয় কিন্তু সেই হারে বৃদ্ধি পায় নাই, অথবা দ্রব্যমূল্য সেই হারে হ্রাসও পায় নাই। সুতরাং জীবনধারণের মান বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিবার সময় এখনও হয় নাই। অর্থাৎ, প্রাণ রক্ষা হইলে বিলাস-দ্রব্য ব্যবহারের কথা ভাবিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। তবে প্রথম পরিকল্পনার ফলে ভিত্তি অনেকখানি প্রস্তুত হইয়াছে বলা চলে এবং গঠনকার্য্য আরম্ভ করিবার কতকটা সুযোগ আসিয়াছে। এক কথায় প্রথম পরিকল্পনায় আমাদের কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা উভয়ের দ্বারাই আমরা কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি।

সেই হিসাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে (১৯৫৬-৬১) উন্নয়নের প্রথম সোপান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৬২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দ হইয়াছে ৪,৮০০ কোটি টাকা; বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন খাতে মোট ২,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। হিসাব হইতে দেখা যায় প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) জাতীয় আয়ের সাত শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে (১৯৫৬-৬১) ১১ শতাংশ পর্য্যন্ত উন্নয়নকল্পে নিয়োজিত হইবে। ইহার অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ফলে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ প্রতি বৎসর ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্চবর্ষান্তে ২৫ শতাংশ বাড়িবে। এই পরিকল্পনায়

প্রথম পরিকল্পনায় আরব্ধ উন্নয়নের ধারাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বজায় রাখা হইয়াছে। তবে আকারে ও প্রকারে এবং অগ্রাধিকারের ব্যাপারে কিছু পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আকারে বৃহত্তর এবং প্রকারেও ইহা ব্যাপকতর। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে—

(১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজের উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত প্রসারণের জন্য "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে" সমাজের পুনর্গঠন করা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করা;

(২) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ ও উৎপাদক দ্রব্যের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা;

(৩) কুটির ও হস্তচালিত শিল্পের দ্বারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উহার ব্যবহার সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা;

(৪) ফ্যাক্টরিজাত ভোগ্যদ্রব্যের যতদূর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি করা; কিন্তু উহাকে কুটির ও হস্তচালিত শিল্পোৎপাদনে বিঘ্নকর না করা অর্থাৎ প্রতিযোগী না করা;

(৫) কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা এবং জমির পুনর্গঠন ব্যবস্থার দ্বারা বণ্টন-ব্যবস্থা এইরূপ সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে গ্রামাঞ্চলের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;

(৬) উৎকৃষ্টতর গৃহ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদানের অধিকতর সুযোগের ব্যবস্থা, বিশেষ ভাবে দরিদ্র জনগণের মধ্যে;

(৭) আগামী দশবৎসরের মধ্যে পূর্ণ কর্ম্ম-নিয়োগ ব্যবস্থার দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান করা;

(৮) পরিকল্পনাকালের মধ্যে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা;

এই সকল উদ্দেশ্যে যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের প্রায় অর্দ্ধাংশ শিল্প ও খনি এবং আনুষঙ্গিক পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, শিল্পোন্নয়নের উপর, বিশেষতঃ মৌলিক শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। খনি ও শিল্প খাতে মোট বরাদ্দ (১৯ শতাংশ) ৮৯০ কোটি টাকার মধ্যে ৬৯০ কোটি টাকা বৃহদায়তন শিল্প ও খনি খাতে এবং ২০০ কোটি টাকা গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতে নিয়োজিত। পরিবহন ও যোগাযোগ বাবদ ১৩৮৫ কোটি টাকা (২৮'৯ শতাংশ); ইহার মধ্যে রেলওয়েসমূহের উন্নয়নের জন্য ৯০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ৪৮৫ কোটি টাকা নিয়োগ করা হইবে। সেচ ও বিদ্যুৎখাতে মোট বরাদ্দ ৯১৩ কোটি (১৯ শতাংশ); ইহার মধ্যে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৪৮৬ কোটি এবং বিদ্যুৎ বাবদ ৪২৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। সমাজসেবায় ৯৪৫ কোটি টাকা (১৯'৭ শতাংশ)। অবশিষ্ট বিবিধ খাতে ৯৯ কোটি টাকা

এখন দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার দ্বিগুণের অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছে।

উন্নয়ন-কার্য্যে অনুন্নত দেশসমূহে কতগুলি বিশেষ সমস্যা দেখা যায়। আমাদের দেশেও সেই সকল সমস্যার অনেকগুলি বিদ্যমান।

(১) অর্থনৈতিক সমস্যা ও সামাজিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। একটির পরিবর্ত্তন ভিন্ন অপরটির পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নয়;

(২) উন্নত দেশের ন্যায় অনুন্নত দেশের সকল ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেন ইত্যাদি মুদ্রা অথবা মুদ্রামানের বিনিময়ে চলে না। উন্নত দেশে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন করা চলে। উপরন্তু যে সব দেশ সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা দেশের সকল সম্পদ করায়ত্ত করিয়া সমুদয় সম্পত্তি ও সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে, তাহারাও ক্ষমতাবলে সমগ্র জাতীয় সঙ্গতি এবং সম্পদ উন্নয়নকার্য্যে বিনিয়োগপূর্ব্বক দ্রুত দেশের উন্নতি বিধান করিতে পারে। কিন্তু ভারতকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও, মধ্যপথ বাছিয়া লইতে হইয়াছে এবং কেবলমাত্র "গণতান্ত্রিক পথেই" তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে;

(৩) উন্নত দেশের বেকার-সমস্যা ও আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। উন্নত দেশে উদ্বৃত্ত মূলধন ও জাতীয় সঞ্চয়ের পূর্ণ ব্যবহার ও নিয়োগের অর্থ ই বলিতে গেলে এক প্রকার বেকার-সমস্যার সমাধান। আমাদের জাতীয় সঞ্চয় ও সঙ্গতি এত সামান্য যে, তাহার পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করিলেও আমাদের সমস্যার অতি সামান্য অংশের সমাধান হইতে পারে মাত্র;

(৪) উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের ইতিহাসে দেখা যায় সেই সব দেশে প্রথমে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ধীরে ধীরে লভ্যাংশের সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত দ্বারা তাহাদের ভারী ও বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে দেশের দ্রুত উন্নয়নে ঐ ধীর পথ অচল। অর্থাৎ, বৃহদায়তন মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব নহে। অপর দিকে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি না হইলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, যদি না সর্ব্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের পথে আমরা যাই। প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশন সর্ব্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের পথ এড়াইয়া যাইতে চাহেন এবং দেশবাসীও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে;

(৫) আমাদের দেশের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনযাত্রার নিম্নমান ও দৈন্য কেবলমাত্র শিল্পোন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই দূরীভূত হইবে না। উপরন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির দ্বারাই শিল্পোন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি স্থায়ী হইবে। আমাদের সামান্য সঙ্গতির মধ্যেই সামাজিক সকল বিষয়ের উন্নয়ন চিন্তা

(৬) প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, উৎপাদন ইহা অপেক্ষা উচ্চহারে না বাড়াইলে শত পরিকল্পনা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান চিরদিন অপূর্ণ থাকিবে। এই সকল সমস্যার বিষয় চিন্তা করিলে পরিকল্পনা প্রণয়নের জটিলতা ও বিঘ্ন উপলব্ধি হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেইজন্য জাতির দ্রুততর উন্নতির কথা প্রথমেই চিন্তা করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যেই দ্রুত শিল্পায়নের চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ণতর কর্ম্ম-নিয়োগের ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লগ্নির জন্য অর্থবরাদ্দের পরিমাণ বেশী কি কম সেই তর্কের অবতারণা না করিয়াও বলা চলে যে, আমাদের সঙ্গতি যতখানি সেই অনুপাতে তাহা অসঙ্গত হয় নাই। সুতরাং যে পরিমাণ ঋণ এবং ঘাটতির দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা অমার্জ্জনীয় ও অত্যধিক বলা চলে না। তাহা ভিন্ন আমাদের আদর্শ গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়া ও দেশবাসীর সম্মতিক্রমে বরাদ্দ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সুতরাং অত্যধিক বরাদ্দ করা সম্ভবপর নহে। এই পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ পর্য্যন্ত লগ্নি হইবে। এই লগ্নির পরিমাণ পরবর্ত্তী পরিকল্পনাসমূহে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ১৬-১৭ শতাংশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে ১৯৬৭-৬৮ সনের মধ্যে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইবে এবং ১৯৭৩।৭৪ সনের মধ্যে জনপ্রতি আয়ও বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে।

বিগত অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করা হইয়াছে (ক) জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বিশেষভাবে বাড়ানো প্রয়োজন, ও (খ) সেই উদ্দেশ্যেই দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষভাবে মূল ও বৃহৎ শিল্পগুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে (গ) অধিকতর কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও দরকার; ইহা ভিন্ন (ঘ) ধনবৈষম্য হ্রাস ও অধিকতর অর্থ নৈতিক সাম্যন্যায়-বিধানের আদর্শের কথাও ব্যক্ত করা হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জীবনধারণের মান উন্নয়নের প্রশ্ন আসিতে পারে? জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয় যে পরিমাণ বাড়িয়াছে, যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থা হইতে দ্রব্যমূল্য তাহার বহুগুণ অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং জাতীয় ও ব্যক্তিগত গড় আয় দ্বিগুণ হইলেও জীবনধারণের মান-উন্নয়ন অধিক পরিমাণে সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। জনগণের নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিলে তাহারা উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা অধিক পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবে। জনগণ অনেক সময় লোভবশতঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিয়াও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে, এমনকি পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পরিহার করিয়া পর্য্যন্ত অন্যবিধ ভোগ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। ইহা অনেক সময় জাতির নৈতিক অবনতির কারণ হইয়া

উঠিতে পারে এবং অবশেষে রাষ্ট্রের পতনও ঘটাইতে পারে। সুতরাং জীবন ধারণের মান উন্নয়নকে আপেক্ষিক বলা চলে। বৈদেশিক দৃষ্টান্ত সর্বক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। দেশবাসীর সহযোগিতা ও ত্যাগ পরিকল্পনা রূপায়ণে সর্বপ্রকারেই কাম্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ত্যাগের একটি সীমা আছে। যাহার সঙ্গতি আছে সেই দান করিতে পারে। কিন্তু যে ভিক্ষাজীবী, সহযোগিতা ভিন্ন তাহার কি দান করিবার থাকিতে পারে? এই দেশে বহু অধিবাসী আছে যাহারা ব্যয়সঙ্কোচের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অধিকতর ব্যয়সঙ্কোচের অর্থ অনাহার ও মৃত্যু। সুতরাং যাহাদের সঙ্গতি আছে তাহাদের অপচয় নিবারণই লক্ষ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্রুত শিল্পায়নের। বর্তমান জগতে নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা বিংশ শতাব্দীর মানুষ অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রীসম্পদে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সমকক্ষ হইতে হইলে শিল্পোন্নয়ন ভিন্ন উপায় নাই। প্রথম অবস্থায় ইহা দ্বারা বহু দেশবাসীর কর্মসংস্থান হইবে, অধিকন্তু দেশের আর্থিক উন্নতিও হইবে। কিন্তু অপর দিকে যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সীমাবদ্ধ হইয়া, ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার আশঙ্কাও আছে কিনা দেখিতে হইবে। জনসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কর্ম-নিয়োগের হার বজায় রাখাও প্রয়োজন। এই সম্পর্কে দুইটি মত উল্লেখযোগ্য একটি মতে কুটির ও হস্তচালিত শিল্পের প্রসার ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা; অপর মতে কুটীর এবং হস্তচালিত শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য নিকৃষ্ট ও উচ্চতর মূল্যের হইবে। সুতরাং জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে না—উৎকৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের একমাত্র উপায় যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহার। তবে এই দ্বিতীয় মতে কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা থাকিলেও সংরক্ষণের উপায় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। প্রথম মত ব্যাপক কর্মসংস্থানের উপায় সম্বন্ধে সুদূরপ্রসারী অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয়। কুটিরশিল্প প্রভৃতি সংরক্ষিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে যন্ত্রাশ্রিত করিয়া আধুনিক ও প্রাচীন পন্থার সমন্বয়সাধন সম্ভব হইবে। বহু দেশে কোনও কোনও সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য কুটিরশিল্পজাত। বৃহৎ ও মূল যন্ত্রাশ্রিত শিল্প প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতানৈক্য নাই।

কৃষি, কুটীর ও অন্যান্য বিবিধ শিল্প (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) এবং বহুবিধ প্রতিষ্ঠান সমবেত ভাবে দেশবাসীর একটি বৃহৎ অংশের কর্মসংস্থান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, ভবিষ্যতে সেই হারে কর্ম-নিয়োগও বৃদ্ধি পাইবে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ভারতবর্ষে কর্মক্ষম অধিবাসীর বর্তমান সংখ্যা আনুমানিক ২২ কোটির অধিক। নিয়োজিত এবং চার কোটির অধিক অধিবাসী ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন, খনি, চাকুরী প্রভৃতিতে নিয়োজিত। বর্তমানে মোট নিয়োজিত জনসংখ্যা আনুমানিক ১৪ কোটি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ অতিরিক্ত অধিবাসীর কর্মসংস্থান হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। পরিসংখ্যান অনুসারে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে অন্য দিকে তেমনই ভবিষ্যতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার কর্মসংস্থান কিছু পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে পারে। যদিও বর্তমান পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও অন্যান্য বহুবিধ বিষয় হইতে ইহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তথাপি ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সঙ্কোচনের বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এখন হইতেই তাহার রক্ষাকবচ রচনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ধনবৈষম্য হ্রাস ও অধিকতর অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা হইবে। ব্যক্তি অথবা শ্রেণী বা গোষ্ঠীর একাধিপত্য ও প্রতিযোগিতার অবসান দ্বারা সাধারণের কল্যাণের জন্য সমষ্টির সকলের সমান অধিকার—ইহা মানিয়া লইয়া সমাজে অধিকতর সুষ্ঠু বন্টন-ব্যবস্থার দ্বারা "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে" সমাজ গঠন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক উপায়েই ইহা সাধন করা হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেরূপ "মধ্যপথের" নীতির কথা ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাকেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের "মধ্যপথ" নীতি বলা চলে। এই সমন্বয় প্রচেষ্টা স্থায়ী হইবে অথবা সাময়িক তাহার বিচার করার সময় এখনও আসে নাই।

পরিকল্পনা রচনার ভিত্তি মূলতঃ এই পঞ্চ বিষয়বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত—(১) কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, (২) সেচ ও বিদ্যুৎ, (৩) শিল্প ও খনি, (৪) পরিবহন ও যোগাযোগ এবং (৫) সমাজকল্যাণ। অর্থাৎ এই পঞ্চ ব্যবস্থার দ্বারাই আমাদের দেশের শ্রীসম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

১। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক আয়োজন করা হইয়াছে। বর্তমানে লক্ষ্য হইবে বিবিধ কৃষি উৎপাদন, কৃষিক্ষেত্রের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি ও বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন হার বৃদ্ধি। ভারতবর্ষের একপঞ্চমাংশেরও কম জমিতে সেচ-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে এক কোটি সত্তর লক্ষ একর (প্রায় ছাব্বিশ হাজার পাঁচ শত বর্গমাইল) জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দুই কোটি দশ লক্ষ একর (প্রায় বত্রিশ হাজার আট শত বর্গমাইল) অতিরিক্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থার আয়োজন করা হইয়াছে। দেশের অবশিষ্ট জমির কৃষিকার্য বৃষ্টি ও বর্ষার জলধারার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় অপর্যাপ্ত বর্ষা দুর্ভিক্ষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ভারতের বার

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এমোনিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা হইতেছে। কৃষি উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ ভূমি সংস্কার ও ভূমি-বন্টন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হইতেছে। কৃষি-ব্যবস্থায় আর্থিক সংস্থানের জন্য পল্লী সমবায় সমিতিগুলির পুনর্গঠন ও প্রসারের ব্যবস্থা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে সমবায় সমিতির সাহায্যার্থে একটি জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী) তহবিল ও একটি জাতীয় কৃষিঋণ (স্থায়িত্ববিধান) তহবিল গঠন করা হইয়াছে। কৃষি-পরিকল্পনা, ভূমিসংস্কার ও ভূমিব্যবস্থা পরিচালনায় পঞ্চায়েতের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

২। সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি সম্ভব হইবে। সেচ উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে।

দেশের সর্বত্র ক্রমশঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে বৃহৎ শিল্প ভিন্ন কুটীর ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পেরও প্রসার হইবে। নিকৃষ্ট কয়লার ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইবে। জলপ্রবাহ উৎপাদিত বিদ্যুৎ ভিন্নও তাপোৎপাদিত বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়ানো হইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জ্বালানি তেল প্রভৃতির ব্যয়ও অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

৩। বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদক শিল্পগুলির সহায়ক হইবে এবং জাতীয় সম্পদ অধিকতর দ্রুত হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। পূর্ব্বে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ও মৌলিক দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। শিল্পায়নের পরবর্তীকালে এই অবস্থার অবসান হইবে। ইহা ভিন্ন শিল্পায়নের দৌলতে উৎপাদন হারও বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের খনিগুলি বৃহৎ শিল্পসমূহের ভিত্তি। খনিজ দ্রব্যের মারফত বিদেশ হইতে শিল্পসম্প্রসারণের উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই জন্য খনিসমূহের উৎপাদন হার বৃদ্ধি করার আয়োজন হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৎসরে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা ছয় কোটি টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লৌহ উৎপাদন ১৯৫৪ সনের ৪৩ লক্ষ টন হইতে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন পর্য্যন্ত বাড়ানোর প্রচেষ্টা হইবে। অন্যান্য খনিজদ্রব্য, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, সীসা প্রভৃতির উৎপাদনও বৃদ্ধি করা হইবে।

৪। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রেলপথ, রাজপথ, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি বহুলাংশে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার ও খনির উৎপাদন বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে পরিবহন ব্যবস্থার উপর। বার লক্ষ পঁচিশ হাজার বর্গমাইলে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৩৫ হাজার মাইল। যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় মোট যাত্রীবাহী গাড়ীর সংখ্যা (১৯৩৮-৩৯ সনে) ছিল ১৮,৭৬৩ এবং মোট যাত্রীসংখ্যা ছিল ৫৩ কোটি। ১৯৫৪-৫৫ [illegible] গাড়ীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬,২০৬টি (অর্থাৎ ১৪ শতাংশ কম) এবং যাত্রীসংখ্যা হইয়াছে ১২৬ কোটি অর্থাৎ আড়াই গুণ অধিক। ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের যুগ্মসম্পাদক ডাঃ এম. এস কৃষ্ণান সম্প্রতি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রেল পরিবহন ব্যবস্থার বর্ত্তমান অবস্থাই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। পরিকল্পনা-কালের মধ্যে চিত্তরঞ্জন কারখানায় বৎসরে ৩০০টি ইঞ্জিন নির্মাণ সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পেরাম্বুরে যাত্রীগাড়ী নির্মাণ কারখানায় বৎসরে ৩৫০টি হাল্কা ইস্পাতের যাত্রীগাড়ী নির্মাণ সম্ভব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বেসরকারী কারখানাগুলির উপর মালবাহী যান (ওয়াগন) নির্মাণের ভার অর্পিত আছে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ৩০ হাজার মালগাড়ীর স্থানে প্রায় ৪১ হাজার নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও যান-বাহন-ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতিবিধান প্রয়োজন। বহির্বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বন্দর-ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হইবে। সাধারণ ও রাজপথ পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নয়নের আয়োজন হইয়াছে।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমাজসেবার গৃহনির্মাণ, পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি অসম্পূর্ণ হইলেও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান পরিকল্পনায় শিক্ষা-প্রসার-ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আশা করা যায়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। শিক্ষার দ্রুত এবং ব্যাপক সম্প্রসারণের উপর পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বৃহৎ পরিকল্পনা থাকিলেও বর্ত্তমানে খুব ব্যাপক নহে। সমাজ-সেবার পরিকল্পনা দেশের উন্নয়নে অনেকখানি সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এখন যদি ধরিয়া লওয়া যায় ১৯৭৬-৭৭ সনে হউক বা না হউক, বিংশ শতাব্দীর অবসানে, অথবা তাহারও পরবর্ত্তী কোনও এক সময় আমরা লক্ষ্যস্থলের সন্নিকটে পৌঁছিলাম, দেশের সম্পদ ও সঙ্গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল, বহুবিস্তৃত শিল্পের দ্বারা উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উৎপাদনও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, নিরক্ষরতার অবসান হইল এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইল। কিন্তু তাহার পর?

পাশ্চাত্য জগতে শিল্পবিপ্লবের ফলে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছিল আমাদের দেশেও তাহা সম্প্রসারিত হইতে পারে কি? অথবা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রতিযোগিতার নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিবে?

আদি যুগের আত্মরক্ষা ও দৈহিক ক্ষুধার বিবাদ, মধ্যযুগের ধর্ম্ম-যুদ্ধ ও পরবর্ত্তী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হইতে এখন আমরা অর্থনৈতিক আদর্শবাদের সঙ্ঘর্ষের আবর্ত্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারি কিনা? সঙ্গতি ও সম্পদের চরম বৃদ্ধিতে এবং দৈহিক স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশে, অর্থনৈতিক সকল চাহিদার পূরণ সম্ভব হইল ও দৈহিক সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিলাম। কিন্তু [illegible]

মুখে-শোনা পুরাতন দিনের গল্প টানে শিশুর মনকে। সামান্য পরিমার্জনা করে এটাকে ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থাই করেছি শেষ পর্য্যন্ত। মনস্তাত্ত্বিকেরা যাই বলুন—আমার মত কৌতূহলী শিশু-মন যাঁদের—তাঁদের এটা ভালই লাগবে আশা করি।

শহর থেকে বেশ একটু দূরে ফাঁকা মাঠে এসে জমল সবাই।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমেছে, শরৎ কালের শেষ প্রহর—ঈষৎ শীতের আমেজ হাওয়ায়। ঘরের মধ্যে পাতলা একটা কম্বল গায়ে দিয়ে বেশ আরাম পাওয়া যায়, কিন্তু মাঠে যারা জমায়েৎ হয়েছে—তারা আরাম প্রয়াসী নয় মোটেই। দেহ ও মনের সব রকম বিলাস দূরে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছে—জনসংশ্রব শূন্য বিজন মাঠে। ওরা আরও এগিয়ে যেতে চায়। বুকে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, রেখা-কঠিন মুখে প্রতিজ্ঞা পালনের দৃঢ়তা এবং চিত্ত ভয়লেশহীন। আঠার থেকে পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে—এগিয়ে ওরা যাবেই। সংখ্যাতেও ওরা আঠারোর বেশী হবে না। পৃথিবী ওদের কাছে অসীম সম্ভাবনায় ভরা, নেপোলিয়নের মত 'আল্পস'-এর বাধাকে ওরা বাধা বলেই গ্রাহ্য করে না। কেন এগিয়ে যাবে না ওরা?

মাঠের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসল একজন পঁচিশ বছরের যুবক। অপর সকলে তার তিন দিক ঘিরে দাঁড়াল। যুবক পিঠ-ঝুলি থেকে বার করল একটা পিস্তল। মাউজার পিস্তল। গোটা-ভরা থলিটা রাখল পাশে। তার পর দেখাতে লাগল, কেমন করে পিস্তলের ট্রিগারে টিপতে হয়, কেমন করে গুলি ভরতে ও গুলি ছুড়তে হয়, একটা গুলি ছুটে গেলে আর একটা কত দ্রুত চেম্বারে আশ্রয় নেয় এবং শেষ টোটা কেমন করে বার করতে হয়। সমস্ত কৌশল শেখাতে শেখাতে বলল, সাবধান, শেষ গুলিটা বার না হওয়া পর্য্যন্ত—নতুন করে গুলি ভরতে যেয়ো না যেন। বড় দূর পাল্লার অস্ত্র। দু'তিন মাইল রেঞ্জ, কাছে ছুটলে লোহার পাত ভেদ করে দেয় অনায়াসে। এই দেখ—

ওদের শেখাতে গিয়ে নিজেই কখন অসাবধান হয়েছে, শেষ গুলিটার হিসাব না রেখে—ট্রিগার টিপেছে এবং তার ফলে প্রমাণিত হয়েছে—ছুটন্ত গুলি উরুদেশ ভেদ করে—পাশে রাখা লোহার পাতটা ফুটো করে আরও খানিকটা দূরে ছিটকে পড়তে পারে কি অনায়াস বেগ নিয়ে।

ভাগ্যিস শহর থেকে দূরে ছিল ফাঁকা মাঠ এবং সন্ধ্যায় এ পথে মানুষজন চলে না। শব্দটা দূর থেকে শোনা গেলেও—পটকা ফাটানোর বেশী বলে মনে হবে না।

দলের আঠার জনের মধ্যে এগার জন ছিল আনাড়ী। বন্দুক ছোড়া ত দূরের কথা, তলোয়ারখানা ভাল করে বাগিয়ে ধরতে পারে না। অথচ ওদেরও চাই। মাত্র সাত জন নিয়ে এত বড় একটা দুঃসাহসিক অভিযান চালানো যায় না। অভিযান না চালিয়ে উপায় কি? টাকা চাই-ই। দু'দশ টাকা নয়, হাজার হাজার টাকা। দু-ইচ্ছায় হাতের মুঠো আলগা করে কি মানুষ? ভিক্ষে বলে চাঁদা চাইলেও নয়, হাসপাতাল কি জলাশয় প্রতিষ্ঠায় যোগাই দিলেও নয়, কিম্বা বিদ্যার্জন করার ব্যবস্থা করব এই আশ্বাসেও নয়। বরং সং তামাসা দেখিয়ে কিছু আদায় করা যায় বটে, সে-ও ত হামেশা করা সম্ভব নয়। সে সুযোগই বা এরা পাবে কেমন করে। দেশের স্বাধীনতা আনা শুনলে ত আঁতকে উঠবে সবাই। রাজ রোষ কি সহজ কথা। অচেতন দেশকে সচেতন বলে প্রমাণ করা এবং তার প্রতি ভক্তি প্রীতি জাগানো এক রকম অসাধ্যই। দেশের শাসকেরা এদের পরিচয়ে কালি ছিটিয়েছে ঘন করে, দেশের সাধারণ মানুষ এদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝতে পারে না। তাই আলোর সঙ্গে সম্পর্ক মাত্র না রেখে—নর চক্ষুর অন্তরালে—এদের ক্রিয়া-কর্ম্ম চলে। সংগোপন বলেই সংশয়। হয়ত বা এই কারণেই সহানুভূতির অভাব।

যাই হোক, আহতকে নিরাপদ জায়গায় গচ্ছিত রাখতে হবে। নতুবা সকলের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। ওর চিকিৎসা চাই। রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করতে হবে সম্পূর্ণরূপে। কাপড়ে পটি বেঁধে—একটু আয়োডিন ঢেলে নিশ্চিন্ত হওয়ার কাজ নয় ...আহতকে কাঁধে করে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে ওরা শহরে পৌঁছল।

আহত সুস্থ হয়ে উঠার অপেক্ষা করলে চলবে না—আগামী কালই পৌঁছাতে হবে নদীর অপর পারে মীরপুরে। তোক অপরিচিত গ্রাম, অজানা পথ—পৌঁছতেই হবে। তারিখ, ক্ষণ, ঘণ্টা, মিনিট সমস্ত হিসাব করা। একটু এদিক-ওদিক হলেই—কথা হানি—জীবন হানিও। আহত শুধু জানত—কোন্ পথ দিয়ে কত সহজে পৌঁছাতে পারা যায় গ্রামে এবং নিষ্ক্রমণের নিরাপদ পথই বা কোথা আছে। ওদিককের ছেলে বলে—পথ ঘাট বন জঙ্গল খানা খাঁড়ি সব ছিল ওর নখদর্পণে। আর সবাই শুনেছে পথের কথা, গ্রামের নাম। ছোট কাগজে রেখা টেনে নির্দেশটা মোটা-মুটি বুঝে নিয়েছে। নক্ষত্রের নিশানায় দিক্ নির্ণয় করে—নদীর নিশানায় গ্রামে পৌঁছাবার কথা। তার পর গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ মানুষের বাড়ীটা চিনে নেওয়া কঠিন নয়। কাজটা কিন্তু কঠিনই। যাওয়া এবং আসায় অন্ততঃ বিশ মাইল পথ। কাগজের আঁকিবুকি দেখে ও কানে শুনে নিরাপদে কার্য্যোদ্ধার করা সহজ নয়। কিন্তু উপায় কি?

নদীর কূলে কূলে নৌকা চলল। অল্প অল্প মেঘ আকাশে, বাতাস বইছে কি বইছে না। গুমোট ভাব। থাকিয় ইউনি-ফর্মে অস্বস্তি লাগছে। নৌকা চালাতে ত রীতিমত গলদঘর্ম্ম অবস্থা। ভাগ্যিস ওদিককার ছেলেরা ছিল দলে ভারি। হাল ধরতে, দাঁড় টানতে এরা পাকা মাঝিরই সগোত্রীয়। গলা ছেড়ে গান গেয়ে যদি দাঁড় টানা যায় যথারীতি করে—কষ্ট দেহেই পৌঁছয় না। কিন্তু এ ত স্ফূর্ত্তি করে বাচ খেলা নয়। নিস্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে নিঃশব্দেই চলতে হবে। গলায় শব্দ ত হবেই না, দাঁড়ের

শব্দও যথাসম্ভব কম। যা কথাবার্ত্তা আগেই শেষ হয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য—তাও ছকা। রাত দুপুরে কাজ শেষ করে ভোরের আলো ফুটবার আগেই ফিরে আসা। জোয়ারে এগিয়ে—ভাটায় ভাটায় ফিরে আসা। ঘণ্টা মিনিটের হিসাবে নির্ভুল না হলে চলে?

কাজটা প্রায় নিখুঁত ভাবেই হ'ল। দু'জনকে নৌকা পাহারায় রেখে পনের জন পাড় ভেঙ্গে গ্রামের মাঠে উঠল। একখানিই মাঠ—এক মাইল লম্বা। বন নেই, কাদা নেই, আলে আলে পথ। খেয়া ঘাট কাছেই। গ্রামে পৌঁছাবার রাস্তাটা হাত পঞ্চাশেক গেলেই পাওয়া যায়। আলের পথ কিন্তু সুগম নয়, স্পষ্ট নয়। আশ্বিনের শেষে সতেজ আমন ধানের চারায় ঢাকা, তা ছাড়া সাপের ভয়। রাত্রিতে খেয়াঘাট নিস্তব্ধ। বাথারির পাটাতনে দু'খানা ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা—একখানা খেয়া নৌকাও রয়েছে। জলের ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে ওদের গায়ে। ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ হচ্ছে—কাঁপছে একটু বা। মাঝি মাল্লারা বাড়ী চলে গেছে। ঘুণি জাল পেতে জেলেরাও নিশ্চিন্তে গেছে ঘুমোতে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

বাড়ী খুঁজে নিতে বেশী দেরী হ'ল না, কাজ হাসিল করতেও নয়। কিন্তু টাকাকড়ি গুছিয়ে নিতে একটু গোলমাল হয়ে গেল। কারা লাঠি বাগিয়ে রুখতে এসেছিল—পিস্তলের গুলির আওয়াজ শুনে পিছিয়ে গেল। পিছিয়ে গেল, পালাল না। দূর থেকে শোর তুলল প্রচুর। উৎসাহী কয়েকজন থানার দিকে ছুটল। মাঝ রাতে জেগে উঠল গ্রাম। ডাকাত—ডাকাত—চীৎকার উঠল।

পুলিন চালনা করছিল দলটিকে। বলল, খবরদার, কায়ার করবে না কেউ। আমরা মানুষ মারতে আসিনি, মানুষ মারব না শুধু শুধু। নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন—তাই করব। পাড় হটে এস, খেয়ার রাস্তা নয়, আল পথে চল।

ওরা নৌকায় পৌঁছল। কালবিলম্ব না করে নৌকা দিল ছেড়ে।

ততক্ষণে সারা গ্রাম জেগেছে, পুলিস এসেছে। বড় বড় মশাল জ্বলে উঠেছে—নদীর দিকে সুরু হয়েছে মানুষের অভিযান। হৈ হল্লা এগিয়ে আসছে নদীর দিকে—মশালের আলো এসে পড়ল নদীর জলে।

পুলিন বলল, জোরে বইঠা বাও। স্রোতের উজানে নয়, স্রোতের সঙ্গে চল বেয়ে।

একজন বৈঠা বাইতে বাইতে বলল, তাহলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ব যে।

হোক, শীগগির পালাতে হবে। ওরা নদীর ধারে পৌঁছবার আগে—নৌকা সরিয়ে ফেলতে হবে।

এত আর মোটর নয় যে ফুলস্পীডে যাবে। আর একজন বলল। পাড় দিয়ে ওরা দৌড়চ্ছে, পারব কেন ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তা ছাড়া, নদীও তেমন চওড়া নয়।

ও পারে লাগাও তবে।

এ-পারের কোলাহল ও-পারেও পৌঁচচ্ছে, ও-পারেও গ্রাম জাগছে। দু'একটা লণ্ঠনের আলো দৌড়চ্ছে মাঠে। এ-পারের চীৎকার ও-পারেও প্রতিধ্বনি তুলছে, ডাকাত, ডাকাত।

তা হলে?

মাঝ নদী দিয়ে নৌকা চালান হবে না, দু'দিক থেকে মার খেতে হবে। ও-পারে কম লোক, ও-পার ঘেঁষেই চলুক নৌকা।

এ দিকের পাড় দেড় তলা সমান উঁচু। সেই উঁচু পাড়ে একে দুয়ে মানুষ জমছে—সৃষ্টি হচ্ছে জনতা। নদীতে যেমন জলের স্রোত, পাড়েও তেমনি জনতা। নৌকার গতিমুখে গতিবেগ মিশিয়েছে। আকাশের পানে চাইল পুলিন। সপ্তর্ষি দিকপ্রান্তে অবস্ত হয়ে গেছে, সন্ধ্যা তারাটি পূবের আকাশে দপ দপ করে কাঁপছে। পিঙ্গল ছোপ ধরেছে আকাশে। সর্ব্বনাশ, রাত্রি কি শেষ হয়ে এল!

জোরসে চালাও নৌকা, দু'খানা দাঁড়ে যত শক্তি আছে জল কেটে এগিয়ে চল। স্রোত-মন্থর নদী, হোক, তবু ত অনুকূল স্রোতে চলেছে নৌকা। হাওয়া থাকলে পাল তুলে দেওয়া যেত। কিন্তু আলো ফুটবার আগেই জনতার নাগাল থেকে দূরে যেতেই হবে। সব শক্তি প্রয়োগ কর।

নদীর উঁচু পাড়ে ক্ষেতখামার আসছে, লতা-গুল্মের ঝোপ মাথা তুলছে, শ্মশান ঘাট জাগছে, কুঁড়ে ঘরও পড়ছে। সবচেয়ে বেশী মাঠের প্রসার। বন্ধ্যা মাঠ—এবং শস্য শ্যামল ক্ষেত। ভোরের মিষ্টি হাওয়া নদীর জল ছুঁয়ে শরীরে এসে লাগছে। কোন্ ঝোপে উঠছে নাম-না-জানা পাখীর কাকলি। এত জোরে দাঁড় টেনেও জনতাকে অতিক্রম করা গেল না! জনতা ঘন হয়েছে; উঁচু পাড় থেকে বড় বড় মাটির ঢেলা নৌকা লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে। ছোড়া হচ্ছে লাঠি, বল্লম। ধনরত্ন লুঠ করে ডাকাতের দল পালাচ্ছে নৌকা করে, ওদের যেন-তেন-প্রকারে ঘায়েল করা চাই। জীবিত অথবা মৃত যেমন করে হোক—ধরতেই হবে। মার শড়কি, বল্লম, মাটির ঢেলা, জখম কর—খুন কর।

পালান ও ধরার খেলা জমে উঠতেই অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। আলো ফুটল।

পুলিন দেখল, পাড়ের উপরে রথ যাত্রার ভীড়। চাষী, মজুর থেকে সম্ভ্রান্ত জামদার—সবাই অংশ নিয়েছে মিছিলে।

পুলিন পিস্তল উঁচিয়ে বলল, থাম বলছি, না হলে গুলি করব।

দলের অন্যান্য ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলছে পুলিনকে, হুকুম দাও, গুলি ছুড়ি। ওদের হটাতে না পারলে ধরা পড়ব আমরা।

না, অপেক্ষা কর। ওরা আমাদের ভাই, ওরা নির্ব্বোধ। জানে না, কি সর্ব্বনাশ করছে ওরা। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

বোঝাতে সুরু করল পুলিন, ভাই সব, আমরা লুঠেরা নই, ডাকাত নই। যে ডাকাত শুধু শুধু ঘরে আগুন দেয়, ধনরত্ন লুঠ করে, মানুষকে ঠেঙ্গিয়ে মারে—

ডাকাত—ডাকাত। মার ওদের। শতকণ্ঠে চীৎকার উঠল।

এখনও বলছি নৌকা থামাও, না হলে কায়ার করব। বজ্রকণ্ঠ

অভিজাত বংশের এক যুবক বন্দুক নিশানা করে চীৎকার করে উঠলেন।

পুলিন-দা, হুকুম দাও। নৌকার আরোহীরা গর্জ্জন করে উঠল।

থাম ভাই। ওদের শান্ত করি। পুলিনও পাড়ের পানে পিস্তল লক্ষ্য করল। শোন তোমরা, যদি বাঁচতে চাও, সরে পড়, নইলে—

সাঁ করে একটা বর্শা নৌকার পাটাতনে বেঁধে গেল।

হুকুম দাও, গুলি চালাই। ষোলটি কণ্ঠ গর্জ্জন করে উঠল।

তার আগেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হ'ল দু'বার। অভিজাত বংশের যুবকটি গুলি ছুড়েছে।

পুলিন শুয়ে পড়ল পাটাতনের উপর। মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুটো বার হয়ে গেল।

না, তীরের লোকেরা মরীয়া হয়ে উঠেছে, কোন কথা শুনবে না ওরা।

রক্তখা'দ পাগল বাঘের মতই ওরা ভয়ঙ্কর। ওদের বিবেক কিম্বা বিচারবুদ্ধি মোহগ্রস্ত। অর্থলুঠনের সোজা অর্থটি স্পষ্ট হয়েছে ওদের কাছে। ওরা শত্রুপক্ষীয়।

আবার বন্দুক তুলেছে সন্ত্রস্ত যুবকটি। বার বার কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে?

ফায়ার। হুকুম দিল পুলিন।

দুম্—দুম্—দুম্। দশ বারটা পিস্তল গর্জ্জন করে উঠল। সন্ত্রস্ত যুবক ত জমি নিলই—আরও জন কয়েক আহত হ'ল। ব্যস, চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে গেল নদীর তীর। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। হাত নাড়তে লাগল। ওরা ভয় পেয়েছে, উত্তেজনা কমে নি।

পুলিন বলল, দিনের বেলায় নৌকা নিয়ে এগুনো যাবে না। পায়ে হাঁটতে হবে, ছুটতে হবে—তবে যদি বাঁচতে পারি। নৌকা ডুবিয়ে দাও। যা কিছু আছে ঝোলায় পুরে ডাঙ্গা পথ ধরি—চল।

নৌকায় একটা ভারি মুগুর ছিল, তাই দিয়ে দমাদ্দম ঘা মেরে মেরে ওরা নৌকার তলাটা ফাঁসিয়ে দিল। জল উঠতে লাগল কল কল শব্দে। পিঠে ঝোলা, হাতে পিস্তল—সবাই লাফিয়ে পড়ল ডাঙ্গায়।

ওদের দেখে জনতা আরও পিছিয়ে গেল।

পুলিন চীৎকার করে বলল, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই, তোমাদের গায়ে হাত তুলব না, তোমরা শুধু সরে যাও। আমাদের চলে যেতে দাও।

গ্রামবাসীরা বহু দূর থেকে ওদের অনুসরণ করতে লাগল। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে গেছে।

ঐ—ঐ—পালাচ্ছে ডাকাতরা, ধর।

ফায়ার।

পুলিনরা তখন আল বাঁধা জমির ও-পিঠে। একটা মরা খালের খাদ ওদের পিছনে।

পিছু হটো, শুয়ে পড়, গুলি চালাও।

এ পারের দিক থেকে গুলির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল। আরও ক'টা লোক পড়েছে হয় ত। ওরা পালিয়েছে।

ওরা কিন্তু পালায় নি। আবার ছুটে আসছে। গুলি চালাচ্ছে—চীৎকার করছে—পাকড়ো—পাকড়ো।

কোন ক্রমে মরা খালের খাদ পেরিয়ে ওরা ঝোপ-জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। বিজন অরণ্য নয়, সামান্য লতা-গুল্মের আড়াল—আধ মাইলটাক জুড়ে একটা পড়ো ভূমিতে ঘন হয়েছে। তার পর ফাঁকা মাঠ, এক মাইল গেলে তবে নদী—ভাগীরথী। নদী পার হতে পারলে ও-পারে বন জঙ্গল পাওয়া যাবে অনেকখানি। পূর্ব্বস্থলীর জঙ্গল। ভাল মত পথ চেনে না কেউ। দূর থেকে দেখাচ্ছে ধোঁয়ার মত—জঙ্গলের আভাস। সন্ধ্যা এসে গেলে সেই জঙ্গলে নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু এত লোক এক সঙ্গে গেলে বিপদ। ঝোপের মধ্যে এসে পুলিন বলল, আমরা সাত জন চাকাকাড় নিয়ে বারাসাত যাব, বাকী দশ জন নদী পার হয়ে যাবে নবদ্বীপ। পার হয়ে যত শীঘ্র পারবে—পোষাক বদল করে নেবে। তার পর কেষ্টনগরে গিয়ে হুকুমের অপেক্ষা করবে।

ফাঁকা জায়গা পড়ে আবার দৌড়। এক মাইল মাঠ, তার পর নদী। সবাই পরিশ্রান্ত। দু'দিন ধরে চলছে উত্তেজনা, ছুটাছুটি, রাত্রি জাগরণ, অনাহারও বটে। কিন্তু এ সকলের চেয়ে জীবন অনেক বড়, জীবনের চেয়ে বড় দেশ। যেমন করে হোক—বাঁচতেই হবে।

পিছন থেকে ছুটো গুলি এসে মাটির ঢেলা ভাঙল। ওরা ফিরে দাঁড়িয়ে এক পশলা গুলি বৃষ্টি করল। পিছনের পাতলা ঝোপ দুলতে লাগল ঘন ঘন। অনুসরণকারীরা পালাচ্ছে। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াবার সাহস নেই ওদের।

পথ শেষ হ'ল, শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত। সূর্য্য কখন মাথার উপরে উঠেছে—কখন পশ্চিমে হেলেছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। ওরা নদীর ধারে এসে বসল। হাত মুখ ধুয়ে আঁজলা ভরে জল পান করল। পিছনে পাহারা রইল দু'জন।

নৌকার সন্ধান করতে লাগল সবাই। কোথায় নৌকা? ফাঁকা নদী। যদিও এটি পারঘাটা নয়, তবু দিন রাত মাল বোঝাই ডিঙ্গি চলে, দেখা যায় দুই একখানা জেলে ডিঙ্গী, পাড়ে বাঁধা থাকে দূরগামী যাত্রী-নৌকা, পাকশাক সেরে নেয় মাঝিরা।

অনেক খুঁজে বাঁকের মুখে পাওয়া গেল একখানা নৌকা। লগি পুঁতে বেঁধে রেখেছে কেউ। ঢেউয়ে ভাসছে, দুলছে—মাঝি-মাল্লা নাই।

দু'একবার ডাক দিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না।

কাছে এসে পুলিন দেখল, নৌকার [illegible]

বসে আছে দু'জন লোক। কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। সম্ভবতঃ ডাকাতের কথা শুনেছে। ওদের কাছে ধনরত্ন নাই, তবু নাম মাহাত্ম্যে কাঁপুনি থামছে না।

এই শোন, বেরিয়ে এস তোমরা। কোন ভয় নেই। আমরা ও-পারে যেতে চাই—পার করে দাও। টাকা পাবে।

অভয় পেয়েও ওদের জড়তা ঘুচল না।

দোহাই বাবু, টাকা চাইনে। পার করতে পারব না।

কেন?

দারোগা সায়েব শাইসে (শাসিয়ে) গেল, খবরদার নৌকো রাখবি নে ঘাটে। কাক্ষেও পার করবি নে। যদি পার কর কাউকে—

হু। তাই বুঝি সবাই নৌকা নিয়ে পালিয়েছে?

পাইলেছে ত। ওনারা বলল—জানে বাঁচতে চাস ত—

আমাদেরও সেই কথা। জান আমাদের বাঁচাতেই হবে। আমাদের পার করে দাও। না হলে তোমাদের জানও—

দোহাই হুজুর, গোঁসা করো না। ওনারা যদি জানতে পারে—

কোন ভয় নেই, সে ব্যবস্থা আমরা করে যাব। তোমাদের হাত পা বেঁধে রেখে যাব নৌকায়। ওরা সন্দেহ করবে না। ধর এই দশটা টাকা—

না বাবু, টাকা লুবো না। আপনারা যে কি দরের ডাকাত—জানলাম ব'স···দোহাই বাবু—টাকা লুবো না।

টাকা ওরা নিলে না। পার করে দেবার আগে প্রণাম করলে প্রত্যেককে। বলল, থানার পুলিশ দারোগাকে জব্দ করতে সাধ হয় না কি বাবু? হয়। কিন্তুক মুমুশিরা যে দলে ভাবি—হাল হাতিয়ার যেলাই। ইস্ত্রি পরিবার না থাকলে—কত ধানে কত চাল বুইঝে দিতাম না?

নির্বিঘ্নে পার হয়ে ওপারে পৌঁছল ওরা। দু'দল চলল দু'দিকে।

একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে আর পারে। নদী এখানে বেশ খানিকটা চওড়া। দেখলে, ওপারে লাল পাগড়ীর দল ছুটোছুটি করছে পার হবার জন্য। কিন্তু নৌকা কোথায়? ওদেরই হুকুম গঙ্গাবক্ষ তরণীশূন্য হয়েছে।

দশ জন গেল মণীরার দিকে, খালি হাতে। ছ'জনকে নিয়ে পুলিন চলল পূর্বস্থলীর দিকে।

একটু নিশ্চিন্ত হতেই ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠল। সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। মুখে কেউ কিছু বলল না বটে—সবাই বুঝল সে চাহনির ভাষা। দেহধর্মের তাড়না উত্তেজনা দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়!

পথের পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম। বনের পথ থেকে একটু ঘুরে যেতে হয়। তা হোক, খাদ্য সংগ্রহ করে ফের বন ফিরে পেলে—অবশিষ্ট পথ অনায়াসে পাড়ি দেওয়া সহজ হবে।

বাঁ দিকের পথ ধরল ওরা। ওদের খাকির পোষাক, উস্কখুস্ক চুল, পিঠের ঝোলা, হাতের লাঠি, কালিপড়া মুখ আর কোটর গত চোখ—বিভীষিকা জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া ডাকাতির কথাটা মুখে মুখে রটে গিয়েছিল। দূর থেকে ওদের দেখে গ্রামের মানুষ যে যেদিকে পারল—ছুট দিল। এরা পৌঁছে দেখলে জন-হীন গ্রাম, শুধু গরু ছাগল হাঁস মুরগীগুলি নিরুদ্বিগ্ন চলাফেরা করছে, আর উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। একখানা চালাঘরের দাওয়ায় পড়ে এক অথর্ব বুড়ী কাতরাচ্ছে।

দোহাই বাবা ডাকাত, মোর জান নিসনে। দোহাই বাবা—

একটানা চীৎকার—বার বার অভয় দিয়েও থামান গেল না।

তখন সবাই মিলে খুঁজতে লাগল—কোথায় কি খাবার আছে। কাঁচা আনাজপাতি, শুকনো চাল কি কাজে লাগবে! চাষার ঘরে মোণ্ডা মেঠাই ত থাকে না, একটা কলসীতে পাওয়া গেল শুকনো চিঁড়ে। পাওয়া গেল খানিকটা গুড়। তাই পরম লাভ! সেই শুকনো চিঁড়ে ঢেলে নিলে পিঠ-ঝুলিতে। সামান্য গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে পুরলে মুখে। দাওয়ায় রেখে গেল গোটা পাঁচেক টাকা, চিঁড়ে গুড়ের দাম। জলখাবার সময় নেই, পিছনে পুলিশ আসছে না?

সন্ধ্যা হয় হয়—জঙ্গলে ঢুকল ওরা। আর একবার চেয়ে দেখল পিছনে। একদল লোক যেন এই দিকেই আসছে।

পুলিন বলল, এখনই অন্ধকার হবে, ভয় পেলে চলবে না। বনের মধ্যে বরাবর গিয়ে আর একটা ফাইট দিতে হবে। মোটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে গুলি চালাব।

কথা মত তৈরী হয়ে দাঁড়াল গুঁড়ির আড়ালে। বনের মধ্যে ঘন অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক, খড়খড়—সরসর কি সব চলে বেড়াচ্ছে। সাপ কি? অনুসরণকারী মানুষের চেয়ে ওরা বেশী খল কি? বেশী হিংস্র?

একটু পরে ভারি ভারি বুটের আওয়াজ, শুকনো পাতা মাড়ানোর মচ মচ শব্দ। অন্ধকার ভেদ করে ভেতরে এগিয়ে আসছে শব্দ। এক একবার টর্চের আলো জ্বলছে। মানুষের গলার চাপা ধ্বনি। চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল নির্বাক অরণ্যে।

ফায়ার।

দুম্—দুম্—দুম্। গুলির শব্দ, পাতাভাঙার শব্দ, জুতোর শব্দ—কান্নাকাটি গোঙানি সব মিলিয়ে অন্ধকার অরণ্যেরই বীভৎস আর্তনাদ। সেই শব্দের সঙ্গে শাখাশ্রয়ী কয়েকটা কাক পাখা ঝাপটে চীৎকার সুরু করে দিলে—কা-কা-কা।

পাঁচ মিনিট পরে পূর্বেকার শান্ত নিস্তব্ধ অরণ্য। গাছের আড়াল থেকে বার হয়ে পরস্পরের হাত চেপে ধরল ওরা, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। ক্ষীণ একটু আলোর রেখা পড়ল বনভূমিতে। টর্চটা জ্বলছে বটে, ব্যাটারীর আয়ু নিঃশেষপ্রায়। জ্বলছে মুমূর্ষু আলোর হাতখানেক মাত্র পথ আবছা দেখা যায়। তাই যথেষ্ট। যতক্ষণ পারা যায় চলতে হবে, বনের অপর পারে পৌঁছতে হবে। জীবন মূল্যবান, তার চেয়েও মূল্যবান দেশ।

কড়া রোদ মুখে এসে পড়তেই পুলিনের ঘুম ভেঙে গেল। নরম বিছানার উপর শুয়ে কোন্ সংসারের স্বপ্ন দেখছে সে। স্বপ্নই ত। উপরে শরতের নীল আকাশ রৌদ্রে ঝলমল করছে, কয়েকটা চিল পাক্ খাচ্ছে তার তলায়। তারও নীচের বট-অশ্বত্থ আম-জামের ঘন সবুজ পাতা রোদে মাখামাখি হয়ে ঝ'লর দোলাচ্ছে। বর্ষার অমৃত ধারা পান করে ওরা প্রচুর স্বাস্থ্য সঞ্চয় করছে, মুক্ত আকাশের তলায় ওদের খুসীর সীমা-পরিসীমা নাই, ওরা স্বাধীন।

স্বাধীন! বিদ্রূপের কথা দিয়ে কে যেন আঘাত করল পুলিনকে। স্বপ্ন জগৎ ফুরিয়ে গেল। চাইল পাশে, সঙ্গীরা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওদের পিঠ-ঝুলিগুলি পাশে এলিয়ে পড়েছে, শিথিল হাতের মুঠোর ধরা রয়েছে পিস্তল। কিন্তু এ কোথায় এসেছে ওরা? চারিদিকে শুধু বিচালীর স্তূপ। একটা খামার বাড়ীই হবে হয়ত। মাঝখানের একটা বিচালী স্তূপে একরকম আত্মগোপন করেই রাত্রিতে পেতেছে শয্যা। এখানে কেমন করে এসেছে? বনের মাঝখানে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে পড়ল। পুলিসরা পাছু হটে বন ছেড়ে গেল, ওরাও অনুকীর্ণ টর্চ জ্বালিয়ে বিপরীত দিকের বনসীমায় পৌঁছবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ধরে চলল ওরা। মাথার উপরে গাছের শাখাপত্রের জাল— আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। কত রাত, কে জানে! সঙ্গে ঘড়ি ছিল না তো। বনের মধ্যে চুপ করে বসে থাকাও চলে না— চলতে চলতে যেখানে হোক পৌঁছতে হবে। না হয় সারারাতই চলবে। চলতে যে হবেই। থামা মানেই আত্মসমর্পণ, মৃত্যু। মৃত্যুর চেয়ে বেশী ব্রতচ্যুতি, কলঙ্ক, অপযশ। সুতরাং পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছিল সবাই। চলতে চলতে এক সময়ে মাথার উপর তারা ঝলমলে আকাশ দেখা গেল, দেখা গেল সপ্তর্ষির নীচের ম্লানজ্যোতি ধ্রুবতারাকে। দিকের নিশানা মিলল। কিন্তু দিক্ নির্ণয় করেই বা কি হবে এই রাত্রিতে! একটু বিশ্রাম চাই।

বন শেষ হ'ল, মাঠ পড়ল। লোকালয় দূরে। ক্লান্ত হ'ল। একটু চলে পাওয়া গেল এই বাঁশের বেড়াঘেরা খামার-বাড়ীটা। আউশ ধান মাড়াই হয়ে এক ধারে সারি সারি মরাইয়ে জমা হচ্ছে। অন্য ধারে স্তূপীকৃত হয়েছে বিচালী। চমৎকার আশ্রয়—রাজকীয় শয্যা। এমন আরাম করে শোওয়া কতদিন যে ঘটে নি! ব্যস, শয়ন, নিদ্রা এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃতি।

ধড়মড় করে উঠে বসল পুলিন—সঙ্গীদের ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল। বেশ খানিকটা বেলাই হয়েছে, পথে বার হওয়া মুশকিল। [illegible] করে এই বেশে—যা সরল গ্রামবাসীদেরও সন্দেহাকুল করে তুলবে। এ বেশ ত্যাগ করতে না পারলে নিস্তার নাই।

গ্রামের মধ্যে না ঢুকে বোপের পাশে পাশে চলতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে সামনেই পড়ল এক ধোপা বাড়ী। কাপড়ের প্রকাণ্ড বুড়ো গাঁঠরি সবে গাধার পিঠে চাপিয়েছে রজক—ওরা এসে সামনে দাঁড়াল।

চমকে উঠল রজক, কে তোমরা?

কাপড় দাও জামা দাও।

খবরদার, চুঁ-শব্দ করেছ কি—পিস্তল উঁচিয়ে ধরল পুলিন।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল রজক। রজক-পত্নীও বাঙনিষ্পত্তি করল না। ছোট ছেলেমেয়েগুলো দাওয়ায় বসে পাথরের খোরায় করে পান্তাভাত খাচ্ছিল, ওরাও চুপ করে রইল।

যে যার গায়ের মাপে জামা বেছে নিল। বেছে নিল ধুতি। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী আর শান্তিপুরী জরি-পাড় এক শ' সুতোর মিহি ধুতি। খাকির পোশাক পুরলে পিঠ-ঝুলিতে, রূপ হ'ল ভুলিল ভন্ন শ্রীবিনায়ক।

এক জন লুব্ধ দৃষ্টিতে পান্তাভাত ভর্তি খোরাটার পানে চেয়ে দেখল। কিন্তু কচি ছেলের মুখের গ্রাস···এগিয়ে গেল ওরা— দশ টাকার দশখানা নোট কাপড়ের গাঁঠরির উপর রেখে।

পোশাক তো বদলানো হ'ল, এবার খাবার চেষ্টা দেখলে হয় না? এক জন বলল।

এ গ্রামে নয়, পাশের গ্রামে চল। ধোপা কি আর ভালো মানুষের মত চুপ করে থাকবে?

পাশের গ্রামে এক ময়রার দোকানের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল সাত জনে। কি আছে মিষ্টি আন তো দোকানী ভাই।

ওদের মুখের পানে চেয়ে দোকানীর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, কাল এক খোলা রসগোল্লা তৈরি করেছি, যত ইচ্ছে খেয়ে নাও বাবুরা।

যত ইচ্ছে খাবই তো। দামটা—

দোহাই বাবু, ওইটি বলো না। দাম আমি নেব না।

কেন দোকানী ভাই? তোমার লোকসান—

লোকসান! আপনাদের বুঝি লোকসান হয় নি কিছু? আপনারা যে—

জান তুমি—আমরা কে?

দোকানীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পরমুহূর্তে ফ্যাকাশে মেরে গেল। বলল, না, না, কিছুই জানি না। খাবে তো তাড়াতাড়ি কর। মুখ তোমাদের শুকিয়ে গেছে—

পুলিন চুপি চুপি বলল সঙ্গীদের, খেয়েই নেয়া যাক। পোশাক বদলেও পরিচয় বদলানো যাচ্ছে না। কথায় বলে—কাকের মুখে বার্তা রটে, এও তাই।

আহার-পর্ব যখন বরাবর পৌঁছেছে—সহকারী ভক্মাধারী লগুড়পাণি এক কালো মূর্তির আবির্ভাব।

শুনছেন বাবুরা, বড়বাবু এত্তেলা পেটিয়েছে, আজ্ঞে হোক।

কে তোমার বড়বাবু?

থানার দারোগা বাবু। চলেন।

কেন, আমরা কি তার হুকুমের চাকর? যা তোর বড়বাবুকে আসতে বল এখানে।

[illegible] চৌকিদার বলল, তকরার করবেন না বাবু, [illegible]
[illegible]

পিকিঙে ভারতীয় পার্লামেন্টারি মিশনের সদস্যদের অভ্যর্থনারত চীন-প্রজাতন্ত্রের 'ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি'র চেয়ারম্যান লিউ শাও-চি

নিউ দিল্লীতে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যদের সহিত ড. বোস মাজা (ডানদিক হইতে তৃতীয়)

পুণা 'নেশন্যাল কেমিক্যাল লেবরেটারি'তে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি

কাঠমাণ্ডুর সিংহদরবারে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক অভিনন্দনপত্র গ্রহণ

লাঠি ঠুকলে। বা—বা—ছুঁচোর গোলাম চারদিকে কোথাকার!

কি! রুখে দাঁড়াল চৌকিদার। কিন্তু পরমুহূর্তেই ন্যাজ-গুটানো কুকুরের মত ছুটে পালাল। পুলিনের হাতে ফণা-উঁচু সাপের মত পিস্তলটা চক্‌চক্ করছে।

থানা কতদূর এখান থেকে?

দোকানী বলল, তা আজ্ঞে—কোশটাক হবে।

বেশ। তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে জল পান করল ওরা। একখানা নোট বার করতেই দোকানী হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল, ছি-চরণে অপরাধী করবেন না বাবু, এমনিতে তো পাপের শেষ নেই।

আচ্ছা, জমা রইল এটা। যদি কোন দিন সুযোগ আসে—কথা শেষ না করে ওরা পথ ধরল।

চলতে লাগল গ্রাম বাঁচিয়ে, মাঠের আল ধরে, ঝোপঝাড়ের কোল ঘেঁষে—মানুষ-জনের সংস্রব এড়িয়ে। বেশ বুঝেছে—অপরিচিত মানুষ দলভারি হয়ে অজানা গাঁয়ে ঢুকলেই সন্দেহ আর কৌতূহল বাড়ায় মানুষের। সাত জন মানুষ—দলটা ভারীই তো।

দুপুরের রোদ খাঁ খাঁ করছে। একটা বিলের ধারে পৌঁছল ওরা। বিলে দু' চারখানা ডিঙি-নৌকা বাঁধা রয়েছে, ছইওয়ালা পারাণি নৌকাও রয়েছে একখানা। বাঁশের লগি পুঁতে—তাতে নৌকো বেঁধে মাঝিরা গেছে ঘরে—এখনই ফিরে আসবে খাওয়া-দাওয়া সেরে। একটু দূরে হিস হিস শব্দ করে কাঠের পাটায় কাপড় আছড়াচ্ছে ধোপারা। মাথায় ওদের চাদরের ফেটি বাঁধা। ধোপানী ক্ষার-সিদ্ধ হাঁড়িটায় কাপড় ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে একটা বাখারি দিয়ে। ঢালু জমিতে চোরকাঁটার উপর মেলে দেওয়া রয়েছে রঙ-বেরঙের শাড়ী, ধুতি জামা, পা-জামা, লুঙ্গি। খালের ধারে একটা শাখাঘন অশ্বত্থ গাছকে ঘিরে খানিকটা ঝোপের সৃষ্টি হয়েছে—আসশ্যাওড়া, কালকাসুন্দা, ভাট, নোনা-আতার ঝোপ। তারই আড়ালে বসে ওরা চারদিক দেখছিল। ভরা পেট, শীতল ছায়া, ঝিরঝিরে হাওয়া—কখন তন্দ্রার আবেশ এসেছে, কে জানে।

তন্দ্রা ভাঙলে দেখলে—ছায়া গাঢ় হয়েছে, সন্ধ্যা হয় হয়।

ওই ছইওলা নৌকোখানা চাই। খাল নিশ্চয় গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। এদিকে গঙ্গা ছাড়া ত কোন নদী নেই। আমরা উত্তর দিকে পাড়ি দেব, বারাসাত পৌঁছব ঐ দিক ধরে গেলে। পুলিন বলল।

নৌকখানা চুরি করবেন? একটি ছেলে বলল।

উপায় কি? চোর বদনাম নতুন হবে না। দেশের লোকের কাছে—বিদেশী প্রভুদের কাছে আমরা খুনে, ডাকাত, লুঠেরা। নৌকখানাও না হয় কর্জের খাতে জমা থাকবে।

বেশ, তবে দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা করা যাক।

, নিশুতি হোক রাত—ঘুমিয়ে পড়ুক পৃথিবী। রাত-জাগা এর সঙ্গে আমরা পাল্লা দিয়ে ছুটব।

তাই হ'ল। সন্ধ্যায় একটানা ঝিঁঝির ডাক থামল, দুই প্রহরের শেয়ালরা ডেকে গেল, বিলের কাছে দূরে দুই একটি আলো চলাচল করছিল—তাও মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ। অন্ধকার অবশ্য ততটা গাঢ় হয় নি, খোলামেলা মাঠে তারাভরা আকাশের নীচে খানিকটা তরল হয়েই থাকে ত।

ওরা উঠল। জলের কিনারায় এল। পায়ের তলায় চক্ চক্ করছে কালো জল—তার উপর তারার চুমকি-বসান ঝিকমিকে একখানি পাতলা ওড়না পেতে কোন নেপথ্যচারিণী অভিসারিকা অপেক্ষা করছে—কে জানে। সে পথে না গিয়ে উপায় কি?

সকাল হ'ল। অজানা জায়গা। চওড়া নদী, গঙ্গাতে পড়েছে নৌকা। এক পাড়ে উঁচু জমি, অপর পারে ঢালু ক্ষেত। প্রাতঃস্নানার্থী কোমরজলে দাঁড়িয়ে স্তোত্র পাঠ করছে; লাঙল কাঁধে হেঁট হেঁট শব্দে বলদ তাড়িয়ে মাঠে চলেছে চাষা; কোন চাষা-বউ মাটির কলসীতে জল ভরছে, কেউ বা কাঠের পাটায় করে এনেছে ক্ষারে সিদ্ধ কাপড় কাঁথার রাশি; উলঙ্গ ছেলে-মেয়েরা চরভূমিতে ছুটছে—লাফাচ্ছে—খেলা করছে। সুস্থ সহজ জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে নদীর দু'পাশে। নদীতেও শান্ত একটি প্রবাহ, মিষ্টি একটি সুর।

কিন্তু নৌকার জীবন এত স্বচ্ছন্দ নয়। দাঁড়ি আর মাঝি ছাড়া অন্য সকলে ছইয়ের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। অন্তঃপুরের মর্য্যাদা সৃষ্টি করে ছইয়ের মুখে টাঙিয়ে দিয়েছে একখানি কাপড়।

এমনি করে একদিন কাটল নির্ব্বিঘ্নে, কাটল আরও একটা রাত্রি। শুধু জল আর দু' এক মুঠো চিঁড়ে খেয়ে কাটল পুরা একটা দিন আর রাত্রি। গ্রামে ঢুকে আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টা করলে না কেউ।

দ্বিতীয় দিনও হয় ত এমনি কাটত, কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে আসা হয়েছে, আর নদীর এধারে গ্রামও বেশ খানিকটা দূরে। ততটা বিপদের ভয় নেই।

ওরা ঠিক করল—চাল ডাল যোগাড় করে নদীর ধারেই পাকাদি করবে। আরও দু' তিন দিন হয় ত কাটবে নৌকায়—নদীর কিনারে পড়বে গ্রাম—পাকশাকের সুবিধা হবে না।

নৌকা কূলে ভিড়িয়ে একজন স্নানার্থীকে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ গ্রাম এটা?

শান্তিপুর।

যাক—অনেকখানি পথ আসা গেছে তা হলে। কোথায় খড়ে নদী ধরে অনেক এগিয়ে বেথুয়া ডাহারির কাছে মীরপুর গ্রামে ঘটনা ঘটল, আর কোথায় গঙ্গানদীর তীরে শান্তিপুর। অনেকখানি পথ—পাকশাক করে—এ বেলাটি পুরো বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

দু'জন মাইলখানেক মাঠ ভেঙে গ্রামে গেল—চাল ডাল হাঁড়ি আর আনাজপাতি আনবে—আর সবাই মিলে তৈরি করল উনুন, যোগাড় করল কাঠ, যথা সময়ে উনুন ধরিয়ে ডাল চাপিয়ে দিল। ডাল নামিয়ে চাপাল ভাত। ক্রমে টগবগ করে ভাত ফুটতে লাগল।

সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ বার হতে লাগল, নাড়ীতে নাড়ীতে পাক দিয়ে ক্ষুধাকে করল তীব্র।

গীগগির একটা ডুব দিয়ে নেয়ে নিই চল।

ভাত বোধ হয় হয়ে গেছে, হাঁড়িটা নামাও।

আর একফুট হবে—এখনও মাঝ রয়েছে। কাঠি দিয়ে দু' চারটি ভাত তুলে টিপে দেখল একটি ছেলে।

মানে—আরও আধ ঘণ্টা ত? অধৈর্য্য কণ্ঠের স্বর।

না, না, বড়জোর দশ মিনিট।

ডালটা কিন্তু তোফা হয়েছে!

এই পেটুক—চাখছ ত?

সত্যি বলছি—মাত্র একটুখানি—

হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হ'ল। দু'জন লোক হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নৌকায়।

সবাই খাড়া হয়ে দাঁড়াল। কি ব্যাপার? স্নানঘাট থেকে খানিকটা তফাতে একটা বাঁকের মুখে ছিল নৌকাখানা, সেইখানেই যেন গোলমাল। সবাই ছুটল।

তার পর আর কেউ ফিরে এল না। হাঁড়িতে টগবগ করে ফুটতে লাগল ভাত, সরা ঢাকা ডাল তেমনি পড়ে রইল—কতকগুলা কাক এসে জমল সেখানে। নৌকা তখন কূল ছেড়ে মাঝ-গঙ্গায় ভেসে চলেছে।

আরও এগিয়ে গেল নৌকা। স্নানঘাট ছেড়ে অনেক দূরে—প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। একটা মর্ম্মভেদী চীৎকার উঠল, ঝপাং করে জলে ভারী দ্রব্য পতনের শব্দ হ'ল। সে শব্দ কারও কানে পৌঁছল না। মাথার উপরে অপরাহ্ণ আকাশে কতকগুলি চিল পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছিল—তারাই যা শুনল—যা দেখল।

নৌকার উপর আর একজনের কাকুতি আর অশ্রু তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

দোহাই বাবুরা—আমাকে মারবেন না। আমি আপনাদের স্বজাত, বাঙালী। আমার ছেলেমেয়ে আছে, বউ আছে। সংসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই উপার্জ্জনের। কি করব, পুলিশের চাকরি—হেড কনেষ্টবলের হুকুম, তাই আপনাদের নৌকোয় লাফিয়ে পড়েছিলাম।

কি করে জানলি যে আমরা ডাকাত?

থানায় খবর পৌঁছেছিল পরশু। আপনারা হাঁড়ি কিনছিলেন, চাল-ডাল আনাজ কিনছিলেন—হেড কনেষ্টবল রাম তরোসে বলল, দিনকাল খারাপ—লোক দুটোর ওপর নজর রাখতে হবে। মীরপুরে একটি জবর ডাকাতি হয়েছে, অনেক মানুষ খুন করে ডাকাতরা পালিয়ে গিয়েছে—যদি ধরতে পারি তা হলে একটি প্রমোশন নির্ঘাত পেয়ে যাব। চল, ওদের ফলো করি। তার আগে থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিই। থানায় খবর পাঠিয়ে ও বাবুদের পিছু পিছু এল।

হু, দেখলে ত হেড কনেষ্টবল প্রমোশন নিয়ে কোন ঊর্দ্ধলোকে গেল। তোমাকেও—

রক্তমাখা ছোরাখানা রোদে ঝলসে উঠল।

দোহাই বাবু, জানে মারবেন না। পা জড়িয়ে ধরল লোকটা।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। অবশেষে পুলিন বলল, তোমাকে বাঁচাতে পারি এক সর্ত্তে।

যা বলবেন, তাই করব বাবু।

আমরা নদীর পথ চিনি না, কলকাতার দিকে যাব, পথ দেখিয়ে দিতে হবে।

দেখ বাবু। যা বলবেন—তাই করব, আমি আপনাদে গোলাম।

ব্যস, ব্যস, চুপ করে বস।

নৌকা তখন বররা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েছে। আর খানিকটা গেলেই বলাগড়ের ষ্টীমারঘাট।

কনেষ্টবল বলল, এদিক দিয়েও যাওয়া যায়, একটু ঘুর হবে, আর একটা পথ আছে সোজা—খানিকটা উজিয়ে যেতে হবে।

নৌকার মুখ ঘুরল।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে—জল স্থল অন্ধকারে মুছে যাচ্ছে; দিক সম্বন্ধে কারও কোন জ্ঞান ছিল না। উজান গঙ্গার স্রোত ঠেলে গেলে যে বারাসতে পৌঁছানো যাবে না—সেটা কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছেলেদের জানা ছিল না; বইয়ের মারফত বাংলাদেশের সঙ্গে যদি বা কিঞ্চিৎ পরিচয় ওদের ছিল, নদীর গতি-প্রকৃতি ও গ্রাম শহরের রীতিনীতি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে ওরা ছিল নিতান্তই অনভিজ্ঞ।

অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ তীর-ভূমিতে অনেকগুলি আলো দেখা গেল। কোন্ গ্রাম এটা? শহর কি? এদিকে নদীর উপরেই তেমন শহরের কথা তো জানা ছিল না। বাঁশবেড়ে, ত্রিবেণী, হুগলীর যে সব জায়গায় ধারে ধারে কলকারখানা বা গঞ্জ বাজার রয়েছে, তারাই সন্ধ্যায় উজ্জ্বল আলোর মালা গলায় ঝুলিয়ে এমনি করে হেসে ওঠে। সেগুলি ত অনেক দূরে। এ কোথায় এলাম আমরা?

কনেষ্টবল বলল, একটা গঞ্জ। এখান থেকে গাড়ী করেও কলকাতায় যেতে পারবেন।

কোন্ গঞ্জ, কি নাম?

আজ্ঞে এই গিয়ে নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

ওকে আমতা আমতা করতে দেখে ওদের সন্দেহ হ'ল। পুলিন বলল, এদিকে ত একটিই গঞ্জ আছে—কালনার গঞ্জ। সেটা গঙ্গার উপরেই, আসবার সময় দেখেছি। সেই দিকেই চলেছি কি?

কালনার গঞ্জ। শুকনো গলায় বিস্ময় ফুটল কনেষ্টবলের।

নাম শোন নি, নয়? বিদ্রূপে শাণিত হয়ে উঠল পুলিনের কণ্ঠ। আচ্ছা শোনাচ্ছি।

পুলিন শক্ত করে চেপে ধরল ওর হাত। বলল, নৌকা ফেরাও।

অপর পার ঘেঁষে চলল নৌকা। একটা চাপা চীৎকার-ধ্বনি উঠতে-না-উঠতে মিলিয়ে গেল।

পুলিন বলল, টর্চ জ্বাল তো। এক টুকরো কাগজ নিয়ে লেখ বড় বড় হরপে, 'বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি'। কি দিয়ে লিখবে? ছুরি দিয়ে হাত চিরে রক্ত বার করে কাঠি দিয়ে লেখ। কালনায় পৌঁছলে সবটুকু রক্তই তো খরচ হয়ে যেত—পুলিশের বড় ঘাটি যে ওটা।

আরও খানিকটা উজিয়ে নৌকা এসে ঠেকল পাড়ে। তীরের গায়ে ঘন জঙ্গল। প্রথম রাতের মেটে জ্যোৎস্নায় যেটুকু দেখা গেল তাতে বিস্তৃত অরণ্যের রূপই ফুটে উঠল।

সবাই নেমে পড়ল। পিঠ-ঝুলি, লাঠি, মালপত্তর আর কনেষ্ট-বল:ক নিয়ে। লোকটার মুখ বাঁধা, চীৎকারের ক্ষমতা নাই।

নৌকো থাকবে এখানে? লগিতে বাঁধব কি?

না। এদিকে ফিরে আসব না আমরা। আর জলপথ নয়—ডাঙ্গা পথে যে করে হোক পৌঁছবই। নৌকো থেকে বশিটা খুলে নাও।

বন শেষ হ'ল—রাত্রিও তখন শেষ হয়েছে। ওরা একটা পাড়াগাঁয়ের কাছাকাছি এসেছে। একটা চত্বর-বাঁধানো বাঁকড়া বকুলতলায় বসেছে। বকুলগাছটা গ্রামেরই প্রান্তে। ওরা শুয়ে পড়ল চত্বরে। এখনও ঘোর লেগে রয়েছে আকাশে, সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া চলবে।

বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেয় নি ওরা—সকাল হতেই আবার চলতে সুরু করেছে। অনেকক্ষণ চলে চলে একটা চায়ের দোকান পেল। দোকানীর কাছে শুনলে, এটা নেহাত অজ পাড়াগাঁ নয়—মফস্বলের শহরের গোত্রে ফেলা যায় একে। শহরের অনেক সুখ-সুবিধা এখানে রয়েছে। ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়—অদূরে মফস্বল শহরে কোর্ট খোলা থাকলে মোটর বাসও যাতায়াত করে। তার পর জংশন-ষ্টেশনে রেলগাড়ী···কেমন করে বারাসাত পৌঁছেছিল ওরা সে কাহিনী কেউ জানে না, কেমন করে আন্দামানে পৌঁছেছিল সে খবর পৃথিবীময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল।

আন্দামানে কেটেছিল বারো বছর।

তার পর? ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে—ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটা আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে।*

---

* বাংলার বিপ্লবী-যুগের একটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে।

ভুলে গেছি তোমা ভগবান

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভুলে গেছি তোমা ভগবান!
চাতকচিত্ত চাহিছে নিত্য অর্থবিত্ত যশ-মান।
কাঞ্চন বলি' মাথে নিই তুলি'
ভুল করি' প্রভু, ছাই আর ধূলি,
সংসার-সুখ—মৃগতৃষ্ণিকা—
তাই পেতে শুধু কাঁদে প্রাণ!

ধরণীর কলকোলাহল,—
তারি মাঝে হিয়া মরিছে ধুঁকিয়া দিবস রজনী অবিরল
কোথায় শান্তি, স্নিগ্ধ নিভৃতি,
পরম তৃপ্তি, শুদ্ধ বিরতি?
জীবনমরণ সাথী তুমি কোথা
ধ্রুবতারাসম অচপল।

ভুলে আছি তোমা দয়াময়!
হাসিছ কি তুমি জীবনযুদ্ধে হেরিয়া আমার পরাজয়?
গগনচুম্বী মোর অহমিকা
মেলি' দিবারাতি লেলিহান শিখা
ধায় গ্রাসিবারে,—ওগো তুমি কই?
দাও প্রসন্ন বরাভয়!

দক্ষিণ দেশে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

উত্তরের মানুষ আমরা দক্ষিণ দেশের গল্প যা শুনেছি, যা পড়েছি তার সঙ্গে সেখানে দেখেছি যা তার অধিকাংশই মেলে নি। তবে সেজন্যে মনে আপশোষ জাগে নি, আনন্দেরই উদয় হয়েছিল। কোন দেশের যে চিত্র চলার পথে পথিকের মানসপটে আঁকা হয়ে যায় তার সবটুকু ভাষায় রূপ দেওয়া যায় না। সেজন্যে দক্ষিণ দিকে যত এগিয়েছি ততই মনে হয়েছে, আসা সার্থক হ'ল। আমার দেশের কেবল উত্তরাঞ্চলই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নয় দক্ষিণের অরণ্যে ও শৈলে, প্রান্তরে ও ক্ষেত্রে, নদী ও সমুদ্রে অশেষ সৌন্দর্য্য ঢালা রয়েছে যার তুলনা উত্তরের কোথাও নেই। এ সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে দক্ষিণের মানুষগুলির অতিথিবৎসলতা, সৌজন্য ও শৃঙ্খলা-বোধ। এদিকে না এলে উপলব্ধি করা যায় না, আমার দেশ কত মহান্, কত বিচিত্র, কত গৌরবের!

তখন ভরা পৌষ। শীতের কনকনে হাওয়ায় উত্তরের মানুষ জড়সড়। আমরাও শীতবস্ত্র জড়িয়ে এক দিন সন্ধ্যায় রওনা হলাম দক্ষিণ দেশে, কেবল ভ্রমণোদ্দেশ্যে নয়। তা হলে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে প্রথম শ্রেণীর আরামে মাদ্রাজ অবধি যাওয়া সম্ভব হ'ত না। মাদ্রাজে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। তাই প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল মাদ্রাজ। একে শীত, তার উপর অন্ধকার রাত্রি ও ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো, তাই কামরার জানালা সন্ধ্যায় সেই যে বন্ধ করা হ'ল তা সারা রাত্রির মধ্যে একবারও খোলা হ'ল না। কেবল সঙ্গীদের পরস্পরের প্রতি এই অনুরোধ রইল যে, চিল্কা হ্রদের তীর দিয়ে গাড়ি যখন যাবে তখন ঘুমিয়ে পড়লেও যেন ডেকে দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকেই পরস্পরকে আশ্বাস দিলাম, "নিশ্চয়ই। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ভোগের আনন্দে অংশীদার থাকলে তা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অতএব দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সকলে এক সঙ্গে চিল্কার জ্যোৎস্না-মাখা সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে।" এত আগ্রহের কারণ, আমরা কেউই চিল্কা দেখি নি। এতদিন দৌড় ছিল খুরদারোডের পথ ধরে পুরী পর্য্যন্ত। তারপর গাল্প গল্পে দীর্ঘ পথ পার হয়ে যেতে লাগলাম। রাত্রিও বেশ গভীর হতে লাগল। সকলেই জেগে আছি চিল্কার আশায় এবং একে একে সকলেই শুয়ে পড়তে লাগলাম নিদ্রার উদ্দেশ্যে নয়, শরীরটাকে মাত্র একটুখানির জন্যে আরাম দিতে। তার পর ক্লান্তি দূর করে যথাসময়ে আবার উঠে বসে সার্সির মাঝ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রির অন্ধকার সরিয়ে দিনের আলো ফুটছে! গোটা উড়িষ্যার সীমানা ছাড়িয়ে আমরা অন্ধ্রের পথ ধরে হু হু করে চলেছি। চিল্কা পড়ে আছে পিছনে, অনেক দূরে। বুঝলাম, সকলেই মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। না হলে চিল্কার তীর দিয়ে যাবার কালে কারও ঘুম ভাঙল না কেন?

কিন্তু সঙ্গীদের এক জন বললেন, "আমি চিল্কা দেখেছি"।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে কিছুটা উত্তেজনার সঙ্গে প্রশ্ন হ'ল, "কথা ছিল কি? যা হোক সকালবেলা তর্কাতর্কির দরকার নেই। কি রকম দেখলে বল। কান দিয়েই দেখা যাক।"

"দেখতে ঠিক পাই নি। তবে শব্দ শুনেছি।"

"কি রকম?" সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"পার হবার সময় একটা ঝম ঝম শব্দ হ'ল। ঐটুকুই যা টের পেলাম। বাকি কিছুই তেমন চোখে পড়ল না। আচ্ছা চিল্কার উপর ত ব্রিজ আছে, না?"

অতঃপর মনের খেদ ঘুচে গিয়ে আমাদের দিন আরম্ভ হ'ল হাস্যরোলের মধ্য দিয়ে। দেখতে দেখতে পূবে শৈলশিরে তরল সোনা ছড়িয়ে গেল। আর সেই আলোয় উত্তরের স্বপ্ন সহসা হ'ল অদৃশ্য, চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'ল এক নূতন দেশ। উত্তরের সেই গাছপালা, সেই গ্রাম, সেই ক্ষেত-প্রান্তর, সেই নদী-জলাশয় যতদূর চোখ যায় কোথাও নেই। সে শীতও সঙ্গে আসতে আসতে পথের কোথায় থমকে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে শীতবস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও গেছে ফুরিয়ে। তার পর থেকে যত অগ্রসর হই ততই শীতবস্ত্রগুলি গা থেকে একে একে খুলতে খুলতে কেবল ধুতি ও লংক্লথের পাঞ্জাবীতে এসে ঠেকল। শেষে এক সময়ে চৈতন্য হ'ল যে, আমরা ত চলেছি পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের দিকে যেখানে রবিকর প্রখর, উদ্ভিদ্জগৎও উত্তরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে উত্তর-ভারতের মত জলভরা গভীর নদী নেই, নেই সেই গগনচুম্বী তুষার-কিরীটী পর্ব্বতমালা, কোন অঞ্চল মরুময়ও নয়, প্রাণীজগতেও আছে পার্থক্য। মানুষগুলির সঙ্গেও পোশাকে, খাদ্যে, আচার-ব্যবহারে, ভাষা ও বর্ণমালায় আমাদের উত্তরের মানুষদের মিল নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়।

না থাক ক্ষতি নেই বরং লাভই হয়েছে। মিল থাকলে কি দেখতে পেতাম আমাদের পথের দুটি পাশ জুড়ে এমন মনোরম বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য? দেখতে পেলাম, তাল-নারিকেলের গাঢ় সবুজ বন, বনের পর বন। তার ফাঁকে ফাঁকে ধানক্ষেতের জমাট হরিৎ রঙ ঢালা। সেই বনরাজি ও ক্ষেতের সীমান্তে দক্ষিণে ও বামে পূর্ব্বঘাট শৈলমালায় বিচিত্রাকার অন্তহীন প্রাচীর। শৈলগুলি উত্তরের মত নিবিড় জঙ্গলময় নয়। কোন কোন শৈলশিরে কতকগুলি তালগাছ এমন ভাবে হেলে রয়েছে যেন দুর্গপ্রাকারের উপর দিয়ে ছুটছে এক দল অশ্বারোহী।

আবার কোন কোন শৈলশিরে এক একটি তালবৃক্ষ প্রহরীর মত খাড়া হয়ে যেন দূর দিগন্তে তাকিয়ে আছে। স্থানে স্থানে নিবিড় ঝাউবন। স্পষ্টতঃই বোঝা যেতে লাগল, সেগুলি পরিকল্পনামত রোপিত হয়েছে। ঐ সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত বাবলা ও বাবলা-জাতীয় একরকমের কাঁটাওয়ালা গাছও দেখা যেতে লাগল প্রচুর। দক্ষিণে কয়লার খনি নেই। লোকে ঝাউ ও ঐ সকল গাছই জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে। "রামেশ্বরম" অঞ্চলে এই কাঁটাগাছগুলোকে লোকে বলে "তার"। ঐ অঞ্চলে বালির রাজ্যে এই গাছের ঘন অরণ্য বিস্তৃত।

পথের দু'পাশে খুঁজতে লাগলাম ছায়াশীতল গ্রাম, বাঁশবন, পদ্ম বা শালুকভরা পুষ্করিণী ও দীঘি যেগুলি আমাদের বাংলাদেশে রেলপথের দু'পাশের নয়নভোলানো কোমল শোভা এবং উত্তর-দেশেও নিতান্ত বিরল নয়। কিন্তু তার চিহ্নও চোখে পড়ল না। নারিকেল বা তালপাতার ছাওয়া চূড়াকার চাল ও মাটির পুরু দেয়াল দেওয়া যে দু-একখানি কুঁড়ে চোখে পড়েই বেগে পিছনে সরে যেতে লাগল, সেগুলিকে মনে হ'ল পরিত্যক্ত। কোথাও মানুষজন দেখি না। দেখি কেবল ক্ষেত, ক্ষেতের পর ক্ষেত। সেগুলিকে কোথাও কোথাও বেষ্টন করে রয়েছে তাল-নারিকেলের ঘনসন্নিবিষ্ট সারি। কোথাও তরঙ্গময় হ্রদসদৃশ সুবিশাল জলাশয়। তার কূলে জলচর পাখী। এই দৃশ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রখর রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যেতে লাগল কৃষাণ-কৃষাণীর।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পৌষ মাসেই চলন্ত গাড়িতে উদয় হ'ল গ্রীষ্মের সঙ্গী ঘর্মের, তবে ললাটে নয়। এবার থেকে বিশেষ করে মাঝারিগোছের রেল ষ্টেশনের কাছাকাছি দেখি কলকারখানা। তার একধারে তালপাতায় ছাওয়া, সুপরিচিত, অপরিচ্ছন্ন শ্রমিক-বস্তি, বড় বড় বিচালির পালা। কোথাও বা ধানম ড়াই হচ্ছে, রাস্তা-পথে চলেছে বড় বড় চাকা লাগানো কাঠের ছোট ছোট গোযান। গরুগুলির শিঙের বড় বাহার—দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই এই রকম দেখেছি। শিং কতকটা হরিণের শিঙের মত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণাগ্র। অগ্রভাগে পিতলের আংটা বসানো। কয়েটিও অনেকটা হরিণের মত দীর্ঘাকার।

অবশেষে বেলা সাড়ে দশটার পর পৌঁছলাম দক্ষিণ-পূর্ব রেল-পথের শেষ ষ্টেশন সমুদ্রতীরের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস, শৈলসঙ্কুল ওয়ালটেয়ারে। স্থানীয় মানুষগুলির বর্ণ, পোশাক ও ভাষায় বোঝা যেতে লাগল আমরা দক্ষিণ দেশে পৌঁছেছি। রেলষ্টেশন, তার উপর বড় রেলষ্টেশন বলে স্থানীয় লোকেরা অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে সামান্য হিন্দী ও ইংরেজী শিখে রেখেছে। আমাদের বাংলা ভাষা দক্ষিণে অধম না হলেও একেবারে অচল। আমরা হিন্দী ও ইংরেজীর মাধ্যমে কাজ চালাতে লাগলাম। সে কাজও দৈহিক ও আহার্য্য সংক্রান্ত। উত্তরের আটা-ময়দা ও সরিষার তেল আমাদের চাল ও নারিকেল তেলের কৃপায় পরিত্যাগ করে অদৃশ্য। সে রকমারি ভাজাও নেই। আছে কলাইয়ের প্রাধান্য। সন্দেশ-রসগোল্লা ও নিমকি-সিঙাড়াদি কোন্ রাজ্যে রয়ে গেছে। এখান থেকে সুরু হয়ে গেল, বড়া, ইডলি, দোসা ও উপমার রাজত্ব। তার সঙ্গে দেখা দিল শাম্বর, সম্বরম ও রসম। আর এল পসারীর মাথায় ও ঠেলাগাড়িতে চড়ে সুপক্ক কদলী, কাজুবাদাম, মুসম্বি ও কমলালেবু আদি। পানীয় এল, কফি ও 'চা'য়'। এত যখন এল তখন আমাদের অতিপরিচিত পাঁউরুটি, মাখন, টফি ও টোবাকুও পিছিয়ে রইল না। তারাও এসে আমাদের সমুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল। অনেকে ছুটলেন স্নানঘরের দিকে দক্ষিণের বড় বড় ষ্টেশনে যার চমৎকার বন্দোবস্ত। সেই ব্যস্ততা, জনতা, কিকিং ঠেলাঠেলি ও খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল ম্লানমুখ, জীর্ণমলিন-কটিবাস, শীর্ণদেহ, রুক্ষাঙ্গ শিশু, কিশোর ও প্রৌঢ়। তাদের কণ্ঠে ক্ষুধার কান্না, রিক্ত হাত দুটি আহার্য্য-প্রার্থনায় প্রসারিত। পুলিসের ভয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে গাড়ির কোলে কোলে ঘুরতে লাগল এক দল বুভুক্ষু। গাড়ির কামরাতেই আমাদের কজনের আহার্য্য সরবরাহ করে গেল। অমনি বিপরীত দিকের জানালায় দেখা দিল কয়েকটি কিশোরের ক্লিষ্ট মুখ। চোখে তাদের কাতরতা। তারা বার বার বলতে লাগল, "শেঠ, উচ্ছিষ্ট অন্নম্।" কিসে যে তাদের ধারণা হ'ল আমরা শেঠপেটি তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। কেবল সেখানেই নয়, দূর দক্ষিণেও সর্বত্রই আমাদের প্রতি ছিল ঐ সম্মানিত সম্বোধন। সুতরাং আমরা "শেঠ" বনে গিয়েছিলাম।

যথাসময়ে গাড়ি আবার চলা সুরু করল, কিন্তু উল্টো দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকে। তাই নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। রেলপথের মানচিত্রখানি স্মরণ করে বুঝলাম এখানে প্রথম কয়েক মাইল এই রকমই হবে। তার পর থেকে রেলপথ গেছে ঘুরে সোজা দক্ষিণে। পথের দু' ধারে পুরুষ ও বিশেষ করে মেয়েদের পোশাকে পরিবর্তন চোখে পড়তে লাগল। ক্ষেতে, পথে, গ্রাম্য কুটীরদ্বারে মেয়েদের পরনে অন্ধ্র ও মাদ্রাজের বৈশিষ্ট্য বড় আঁচলা-দেওয়া রঙিন শাড়ি। রঙের মধ্যে আধিক্য লাল, সবুজ ও নীলের। তারও মধ্যে লাল অধিক। দুটি নাকে নাক-ছাবি; মাথায় দোদুল বেণী। বেণীমূলে ফুল—চন্দ্রমল্লিকা। দক্ষিণের পুরুষদের পোশাকের বাহার ও প্রাচুর্য্য নেই কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। গাড়ি এক একটা বড় ষ্টেশনে থামে আর রঙিন চন্দ্রমল্লিকা ও রক্তগোলাপের লাল পসরা মাথায় পসারী এবং পসারিণী জানালার সমুখে ঘোরাফেরা করে। অন্ধ্র ও মাদ্রাজ চন্দ্রমল্লিকা ও রক্তগোলাপের দেশ। ঐ ফুল দুটিই বোধ হয় সহজলভ্য। তাই কুমারিকা পর্যন্ত প্রতি মন্দিরেই দেখেছি বিগ্রহের গলায় রক্ত-গোলাপের মালা, গোলাপেই বিগ্রহসজ্জা।

দক্ষিণ দিকে যত এগোই ততই পথের ধারে দেখি বিশাল হ্রদ-সদৃশ জলাশয়। হ্রদগুলি কৃত্রিম। কারণ, মাদ্রাজ সুজলা নয়। হ্রদের কূলে গৃহপালিত হাঁসের মেলা ও মাঠে পাল পাল মেষ। তারা আকারে বেশ বড়, কিন্তু প্রায় লোমশূন্য। সেজন্যে কদাকার।

সূর্য্য যখন শৈলশিরে নেমেছে তখন পার হলাম সুবিস্তীর্ণ গোদাবরী, আমাদের প্রাচীন কাব্য-কাহিনীতে যা স্বপ্নলোক প্রবাহিণী। দক্ষিণের হিন্দু অধিবাসিগণের কাছে উত্তরের গঙ্গার মতই তা পুণ্য-তোয়া। দেখলাম, তার যত বিস্তার তত জল নেই, রয়েছে বক্ষভরা শুষ্ক বালু। কিন্তু এই রিক্ত রূপই সব নয়, এক এক সময়ে নদীটি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরে গ্রাম-প্রান্তরে প্লাবন আনে। তার পর সন্ধ্যার

মাদ্রাজের বিখ্যাত রাজাজী হলের সোপানে কয়েকজন প্রতিনিধি—লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র।

তরল অন্ধকারে দেখলাম কৃষ্ণাকে—পূর্ব্বঘাট শৈলমালার বাধা ভেদ করে অপরূপ সৌন্দর্য্যে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। তার দুটি তীরে আলোকের মালা, শৈলোপরিও আলোকসজ্জা। কৃষ্ণার নিকষকালো জলে দুলছে তার দাগ। তার সেতুটি পার হতে হতে সকলেই মুগ্ধ চোখে প্রাচীন কাব্যের উপেক্ষিতা এই সুন্দরী নদীটির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

কৃষ্ণার তীরে যে আলোকময়ী শৈলবেষ্টিতা নগরীটি দেখা গেল সেটি বেজওয়াড়া। এখানে আমাদের সুভাষচন্দ্রের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। নগরীটি একটি বড় রেল এবং শিল্পকেন্দ্রও। কিন্তু কলকাতা থেকে এ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ পথের কোথাও স্থানীয় কারও সঙ্গে আলাপের বা কোন একটি বিশেষ দৃশ্যের অথবা স্থানের আলোকচিত্র তোলার সুযোগ পেলাম না।

পরদিন একটু বেলা উঠতে পৌঁছলাম আমাদের প্রথম গন্তব্য-স্থল মাদ্রাজে। যেমন আমাদের কলকাতার তেমনি মাদ্রাজেরও দেখবার জায়গা অনেক। কিন্তু সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি আমরা, থাকবার ব্যবস্থাও মাত্র তিন দিনের জন্যে। তাই সব কিছু দেখার সুযোগ ঘটল না। সকাল, বিকেল ও সন্ধ্যার পরও কয়েক ঘণ্টা সম্মেলনে যোগ দিয়ে নৃত্য-গীতবাদ্যে কুমারী কমলার অনুপম "ভরতনাট্যমে"র ও গোপীনাথের "কথাকলি" নৃত্য দেখে, রবিশঙ্করের সরোদ বাজনা এবং শুভলক্ষ্মীর গান শুনে কাটাতে হ'ল। সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল বিখ্যাত "রাজাজী" হলে, নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করা হয় বঙ্গোপসাগর-কূলে, প্রস্তরগঠিত সুদৃশ্য "সেনেট হাউসে।" আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে, এমনকি এই কলকাতা শহরের রাজপথেও ভিখারীদের শূন্যগর্ভ মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে গান গাইতে দেখেছি। টেবিল, বাঁধানো বইখাতা, এমনকি পৃষ্ঠদেশ ও শূন্য জঠরও কেউ কেউ গানের সঙ্গে বাজিয়ে সঙ্গত করে। এসব যেমন কৌতুককর তেমনি হাস্যোদ্রেক করে থাকে। কিন্তু যখন দেখলাম ভারত-বিখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে চন্দনচর্চ্চিতললাট, কৃষ্ণাঙ্গ চশমাধারী এক প্রৌঢ় একটি দশ সেরী মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে মৃদঙ্গবাদকের পাশে বসে সমানে সঙ্গত করছেন তখন তাজ্জব বনে গেলাম। উত্তরে বঙ্গদেশে যা নিকৃষ্ট ও অবজ্ঞাত, দূর দক্ষিণে মাদ্রাজে তাই-ই উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত! শূন্যগর্ভ মাটির হাঁড়ি বাণী ও কমলা উভয়েরই কর্ম্মে প্রয়োজন? আবার জলসা অন্তে সেই প্রৌঢ়কে অন্যান্যের সঙ্গে মাল্যভূষিত করবার কালে, বিশেষ করে আমাদের উত্তরের শ্রোতাদের উল্লাসধ্বনি ও করতালি-ধ্বনি সেই বিশাল কক্ষটিকে যখন ভরে তুলল তখন দেখলাম তিনি অবিচলিত। ক্ষিপ্র হাতে এমন ভাবে মালাটি গলা থেকে খুলে ফেললেন, যেন বলতে চান,"এর যোগ্য নই। এ আমায় সাজে না।" তাঁর আঙুলের সেই স্পষ্ট বোলগুলি আজও আমার কানে বাজে!

সকাল থেকে প্রথম রাত্রি অবধি শহর দেখার অবসর ছিল না। একদিন রাত্রে আহারের পর রাত্রি তখন এগারটা হবে আমাদের মধ্যে কয়েকজন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে চললেন। আমরাও তাঁদের অনুসরণের উদ্যোগ করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অগ্রগামী দল ফিরে এসে বললেন, "পুলিশ যেতে দিল না। বললে, সমুদ্রের ধারে বদমায়েশের আড্ডা। বিপদে পড়বে। একটু পরেই শহরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হবে।" মাদ্রাজ শহরে রাত্রি বারটায় পথের বিজলীবাতিগুলি নিবিয়ে দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ বিদ্যুতের খরচ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।

শুনে ক্ষুব্ধ হলাম। মাদ্রাজের বৈশিষ্ট্য সুন্দর সমুদ্রোপকূল। তাও কর্ম্মঠ শান্তিরক্ষকেরা থাকতেও নিরাপদ নয়! যা হোক পর দিন একটু অন্ধকার থাকতেই কয়েকজন মিলে চললাম সমুদ্রতীরে। পথ জনহীন। আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন। মেঘের কূলে কূলে ভোরের আলোর একটু স্পর্শ লেগেছে মাত্র। সমুদ্রকূলে পৌঁছে দেখি, সমুদ্রের জল বিক্ষোভে ফুলে উঠছে, কূলে সগর্জ্জে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের দিক থেকে আসছে ঝড়ের হাওয়া। ধীবরেরা অনেক আগেই ক্যাটামারন ও বড় বড় নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেছে; কয়েকখানি তখনও যাবার উদ্যোগ করছে। কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল আঘাতে কূলে এসে পড়ছে। এই সব ক্যাটামারনের ও নৌকার মালিক কিন্তু তারা নয়। এগুলির মালিক মহাজন। তারা

এগুলি ধীবরদের ভাড়া দেয়। সমুদ্রোপকূলবাসী ধীবরগণ নিঃস্ব। দুটি মাঝবয়সী ধীবর সমুদ্রে বিশাল জাল ফেলে তার এক প্রান্তের মোটা কাছি ধরে প্রাণপণে টানছিল। জালের অপর প্রান্ত ছিল সমুদ্রমধ্যস্থ একখানি বড় নৌকার আরোহীদের হাতে। কিন্তু জলের প্রবল টানে ডাঙার ধীবর দুটি জালখানি ধরে রাখতে পারছিল না। আমাদের দলের প্রায় সকলেই সোৎসাহে কাছি ধরে টানতে টানতে হাত ত্রিশেক জাল তুলে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। জালখানি তখনও অতলে তলিয়ে রইল। ধীবর দুটির মধ্যে প্রবীণ যেটি সে

তাতে দু'জন মাত্র যাত্রী চড়তে পারে। কিন্তু বিদেশী দেখলে যেমন সকল শহরেরই যানচালক সরকারী নিয়ম পকেটে পুরে দাঁও মারবার চেষ্টা করে, তাদের দ্বারাও তেমনি আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় সে আশা পরিত্যাগ করে প্রথম দিকে পদব্রজে চলতে লাগলাম। শুনেছিলাম, স্কুটারওয়ালাদের মত ট্যাক্সীওয়ালারও শিকারী। একই দূরত্বের ভাড়া দু'খানি ট্যাক্সীর মিটারে দু'রকম ওঠে। আমাদের এখানেও যে তা না দেখা যায় তা নয়। উভয় দেশেই সে রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

পুরনো কাঞ্চীর বৃষমূর্ত্তি—লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ছবি।

বিষ্ণুকাঞ্চীর গোপুরম—লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ছবি

কাতর ভাবে হাত বাড়িয়ে পয়সা চাইলে। তাই দেখে একজন পরিহাস করে বললেন, "উপকারের মূল্য নাকি? এ দেশের লোকের উপকার করলে পয়সা চায়?"

কিন্তু তার প্রার্থনার কারণটি আমরা সকলেই জানতাম। দুর্ভাগ্য যে, কারও কাছেই খয়রাৎ করবার মত খুচরা তখন ছিল না। তাই একজন তাকে কড়া তামাকের পাকান সিগারেট উপহার দিলেন। লোকটি তাই পেয়েই খুশী হ'ল।

সেদিনই কিছু বেলায় গেলাম শহরের দক্ষিণাংশে কাপালেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, প্রস্তরবেষ্টিত বিশাল সরোবরটি দেখতে মাইলাপুরমে। ছিলাম পরিচ্ছন্ন, সরকারী মহল্লায় সুদৃশ্য ভবনে। চললাম সেটা ছাড়িয়ে স্থানীয় অধিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে। স্থির করলাম, [illegible] থেকে বাস ধরব। মোটর স্কুটারও পাওয়া যায়।

যা হোক, স্থানীয় সাধারণ অধিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলকে আমাদের উত্তর কলকাতার কতকগুলি অঞ্চলের চেয়ে একটুও পরিচ্ছন্ন দেখলাম না। পথের দু'পাশের গৃহগুলিতে সেই চিরপরিচিত দারিদ্র্যের চিহ্ন; পথেও ভিক্ষুক। তবে একটা জিনিস দেখা গেল, যা আমাদের বাংলায় নেই। দেখলাম, কোন কোন গৃহের সম্মুখে ছেঁচ থেকে শিকেয় ঝুলছে বেশ বড়সড় চালকুমড়ো। কালি বা ভুষো দিয়ে কুমড়োর নাক-মুখ-চোখ-[illegible] এমন করে আঁকা যেন একটি অতিকায় মানুষের বা রাক্ষসের মুখ। কোন কোন গৃহের সম্মুখে তাকড়া দিয়ে তৈরী মানুষের প্রমাণসই মূর্ত্তি। কেমন একটা ধারণা হ'ল, ওগুলিকে রাখা হয়েছে গৃহ ও গৃহস্থের অকল্যাণ দূর করতে—ভূত-প্রেত তাড়াবার উদ্দেশ্যে। পরে আমাদের বাংলায়

একটি মেয়ে যিনি বর্ত্তমানে একজন নামকরা মাদ্রাজী ব্যারিষ্টারের পত্নী তাঁর সঙ্গে আলাপে জানতে পারলাম আমার অনুমানই ঠিক। বললেন, "এখানকার লোকেরা নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন।" বললাম, "আমরাই বা কমটা কি? আর, জাতের বাড়াবাড়ি?" বললেন, "আগের চেয়ে অনেক কমেছে।" তার প্রমাণও আরও দক্ষিণে অনেক পেয়েছি।
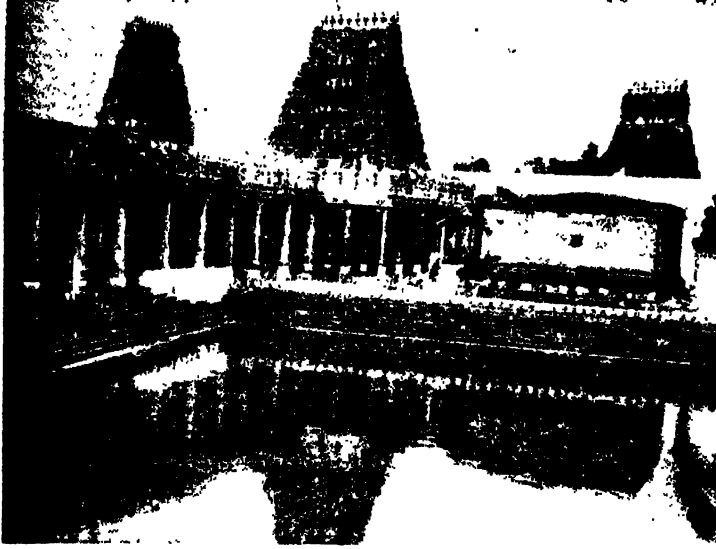
শিবকাঞ্চীর গোপুরম্, বিতান ও সরোবর—লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ছবি

পথে এগোই আর স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করি, "মাইলাপুরে কাপালেশ্বরের মন্দিরে যাবার বাস কোথায় পাওয়া যাবে?" প্রত্যেকেই উত্তর দিলেন, "আইসহাউসের সামনে থেকে। আইস-হাউস এক ফার্লং দূরে।" মাদ্রাজ রাজ্যের সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকেও পথের দূরত্ব পরিমাপ করে থাকে ফার্লঙে। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে "ডালভাঙা" ক্রোশের মত মাদ্রাজের ফার্লংও যে "হাটুভাঙা" হয় তা বুঝতে পারলাম, সেদিন আইসহাউসে পৌঁছতে গিয়ে।

খানিক দূর যাবার পর জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ, আপনারা কে?"

বললাম, "নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি।"

"বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন মাদ্রাজে কেন?"

"বাঙালী অনেক আছেন এখানে। তার পর, এই সম্মেলন ভারতের সকল প্রদেশের সাহিত্যের সঙ্গে যোগ ও সম্পর্ক রাখবার উদ্দেশ্যে এক এক বছর ভারতের এক এক জায়গায় করা হয়।"

"তোমাদের সম্মেলনের কথা খবরের কাগজে পড়েছি বটে। আচ্ছা, মিঃ পিয়ারসন তোমাদের সঙ্গে এসেছেন কি?"

"না। কিন্তু তিনি কে?"

"আসেন নি, তাই ত।" বলে ভদ্রলোক চিন্তিত ভাবে চলে গেলেন।

অতঃপর অপরিচিত মিঃ পিয়ারসনের কথা সকৌতুকে ভাবতে ভাবতে আমরা আইসহাউসের সম্মুখে পৌঁছে বাসে চড়ে চললাম মাইলাপুরম্।

মাদ্রাজের বাসগুলি সরকারী। কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন, যাত্রী-সাধারণও শৃঙ্খলাপরায়ণ। বাস ছাড়বার আগেই ভাড়া দিতে হয়। তবে আমরা বিদেশী বলে আমাদের বেলায় ব্যতিক্রম ছিল। মাদ্রাজের সুদূর গ্রামাঞ্চলেও দেখেছি বাসগুলি শহরের মতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং যাত্রীসাধারণ শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ভদ্র। কোথাও গুরুভার বা বৃহদাকার মালপত্র নিয়ে কাউকেই বাসে চড়তে দেখি নি।

কিছুক্ষণ পরেই কাপালেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছলাম। বিশাল মন্দিরটি কত কালের তা জানবার সুযোগ হ'ল না। দেখলাম, সবই পাথরে তৈরী। সু-উন্নত গোপুরমের (ফটকের) গায়ে চূড়া পর্য্যন্ত গোটা রামায়ণের কাহিনী মূর্ত্তির সাহায্যে রূপায়িত। কাপালেশ্বর আছেন মূল মন্দিরের ভিতর দিকে অন্ধকারে। গোপুরমের চূড়ায় উঠলে বহু ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দক্ষিণের সমস্ত মন্দিরই সুদৃঢ় দুর্গের মত, ভিতরে কুয়া ও সরোবর, চারধারে পাথরের সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর। হাজার কয়েক লোক সেখানে মাসকয়েক অবরুদ্ধ হয়েও নিরাপদে থাকতে পারে। মনে হ'ল মন্দিরটি যেন দুর্গের কাজ করত। বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রত্নতত্ত্বের জনৈক মাদ্রাজী ছাত্রের মুখেও আমার এই অনুমানের প্রতিধ্বনি পরে শুনেছিলাম। তবে এখানকার সরোবরটি রয়েছে সম্মুখে মন্দিরের বাইরে এবং ভিতরেও জল সরবরাহের তেমন ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। পাণ্ডাদের অত্যাচার ও দর্শনপ্রার্থীর ঠেলাঠেলি নেই। কেবল এখানেই নয় মাদ্রাজের কোন মন্দিরেই তা দেখা যায় না। দর্শনার্থীরা যান, ইচ্ছামত দান করেন। না দান করলেও কেউ আদায়ের কৌশল-জাল বিস্তার করে না। সেজন্যে সর্ব্বত্রই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, মন একটুও পীড়িত হয় না। ভিতরে-বাইরে কিছুক্ষণ ঘুরে আবার বাসে চড়ে ফিরলাম আমাদের আস্তানায়।

পরদিন দিনের আলো তখনও দেখা দেয় নি, চললাম কাঞ্চী-পুরম্।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি নির্দ্ধারিত চাঁদা নিয়ে বাসে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে চললেন, কাঞ্চীপুরম্, পক্ষীতীর্থম ও মহাবলীপুরম্ দেখাতে। এগুলি দেখে মাদ্রাজে যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা। বিষুবরেখার কাছাকাছি বলে আমাদের উত্তরের মত শীত-

কালেও সাড়ে পাঁচটায় ওখানে সন্ধ্যা হয় না এবং রাত্রেও শীতে হাড় কাঁপে না। আমরা বাসযাত্রীরা যখন ফিরলাম তখন সকলেরই অঙ্গে এবং মস্তকে পথ ও তীর্থরেণু। তবে যাঁরা সুদৃশ্য মোটর গাড়িতে চড়বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের কথা জানি না। রামপ্রসাদ মাত্র একটি চরণে গয়া থেকে কাঞ্চী পর্যন্ত ঘুরেছেন, আমরাও এক ঘণ্টায় তিন কাঞ্চী—পুরানো, শিব ও বিষ্ণুকাঞ্চী ঘুরেছিলাম। কাঞ্চীতে যাবার কালে পথের দু'পাশে খুঁজেছিলাম আমবাগান ও তেঁতুলগাছ। শোনা ছিল মাদ্রাজে বার মাসই আম ফলে এবং তেঁতুলগোলা জল, যার নাম রসম্, ওদেশে প্রিয় ব্যঞ্জনের মত প্রধান খাদ্যের সঙ্গী। তখনও রসমের স্বাদ লাভ করার সুযোগ হয় নি। কিন্তু সে পথে ও দুটি গাছের একটিরও প্রাচুর্য্য দেখি নি, বড় বড় গ্রাম বা গঞ্জও চোখে পড়ে নি। ক্ষেত ছিল, উদ্ভিদও ছিল কিন্তু শ্যামলতায় সমারোহে ও ঐশ্বর্য্যে তা কোথাও স্নিগ্ধ হয়ে নেই।

প্রথমে পৌঁছলাম পুরনো কাঞ্চীতে। পুরনো কাঞ্চী মাঝারি গোছের একখানি গ্রাম মাত্র। পাথরের মন্দিরটির সারা গায়ে বয়সের ছাপ। সম্মুখে ছয় শ' বছরের একটি পাথরের বৃষ। সেটিও মন্দিরের মতই প্রাচীনত্বের ছাপ নিয়ে স্থির হয়ে রৌদ্র-বৃষ্টি সয়ে বসে বসে কাল গুনছে। বৃষটি একখানি পাথরে তৈরী। মন্দিরের একটি দুঃখময় ইতিহাস আছে। এখন মন্দিরটি প্রায় পরিত্যক্ত। তবে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই সুন্দর তাৎপর্যমণ্ডিত স্থাপত্য শিল্পটিকে রক্ষা করছেন। ইচ্ছা সত্ত্বেও এখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হ'ল না, দুখানি আলোকচিত্র তুলে নিয়ে বাসে চড়ে বসলাম।

এখান থেকে চললাম, শিবকাঞ্চী। কাঞ্চীপুরম্ ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনপদ। এখানকার রেশমী বস্ত্রের খুব খ্যাতি। পথের দু'ধারে জনপদবাসীদের কাঁচা ঘর-বাড়ী। মাঝে মাঝে তন্তুবায়-গণের গৃহ-প্রাঙ্গণে বা গৃহপাশে উন্মুক্ত চত্বরে রঙিন সুতার ফেটি সার সার শুকানো হচ্ছে। প্রতি গৃহের সম্মুখে ও পথের মোড়ে মোড়ে কৌতূহলী নারীপুরুষ ও বালক-বালিকার ছোটখাটো জনতা। অনুমানে বুঝলাম, তাদের কৌতূহলের সামগ্রী আমরা। এক এক জায়গায় জনতা এত বড় ও এমন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল যে, মনে হতে লাগল, আমরা হাটের মধ্য দিয়ে চলেছি অথবা তারা আমাদের বাসগুলি আটকানোর উদ্দেশ্যেই জমায়েৎ হয়েছে। অনেক গৃহসম্মুখে পথের উপরেই চালের গুঁড়ো দিয়ে বড় বড় আলপনা দেওয়া। সেগুলির মাঝখানে চারটি গোময়-গুলি। প্রত্যেকটি গুলিতে একটি করে কুমড়োর ফুল বসানো। এই সজ্জার কারণ কি বুঝলাম না। পাশের এক জন জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে এই মাঙ্গলিকের আয়োজন নাকি?"

বললাম, "হলে আনন্দের কথা ছিল বটে, কিন্তু জনতার চোখে ও অভ্যর্থনার ভাষা ফুটছে না, কণ্ঠও নীরব। হয় ত ওটা ভূত-প্রেত তাড়াবার ব্যবস্থা।"

পরে রামেশ্বরমে গিয়ে এ সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছিলাম, তা শিবকাঞ্চীর গোপুরমের সামনে গিয়ে বাস-গুলি থামল। সেখানে জুতো খুলে সকলে ছুটলাম ভিতরে মন্দিরের দিকে। সুবিশাল ভূমিখণ্ডকে সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরে ঘিরে তার মধ্যে পাথরে গড়া সুদৃশ্য বিতান, মণ্ডপ, মন্দির, পিত্তলের সুদীর্ঘ দীপদান তৈরী ও সরোবর খনন করা হয়েছে। সেই পরিধির মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। শিবকাঞ্চী মন্দিরের একেবারে ভিতর দিকে অন্ধকারে রয়েছেন কৈলাসনাথের বিগ্রহটি। বিতানের ছাদ এমন কৌশলে তৈরী যে, তার ঠিক তলায় কয়েকটি ফোকর দিয়ে বৎসরের এক সময়ে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে মন্দিরাভ্যন্তরের

মহাবলীপুরম্—দূরে সমুদ্র—লেখক কর্তৃক গৃহীত ছবি।

বিগ্রহটিকে আলোকিত করে। তখন এখানে উৎসব হয়। গোপুরম্, স্তম্ভ, মন্দিরগাত্র—সকলই অনুপম শিল্পকাজে সুন্দর। তবে এক তাঞ্জোর ছাড়া আর সবেরই মন্দির-মণ্ডপ বহুদূর থেকে দেখা যায় না, দেখা যায় গোপুরম্।

এখান থেকে কিছু তফাতে বিষ্ণুকাঞ্চী। তার মন্দিরাভ্যন্তরে রয়েছে কষ্টিপাথরের সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি। সকল জায়গাতেই শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি, পার্ব্বতী ও কমলা। দক্ষিণের সকল মন্দিরাভ্যন্তরই অপরিসর ও অন্ধকার। ঘৃত-প্রদীপের আলোয় ও কর্পূর জ্বালিয়ে তার আলোকে ক্ষণিকের জন্যে বিগ্রহ দেখানোর ব্যবস্থা। তবে স্বল্পকালের সেই দেখাই স্মৃতিপটে দীর্ঘকাল থাকে এবং হীরক ও স্বর্ণাভরণের উজ্জ্বলতা বহুদিন মনে ঝলমল করে। দক্ষিণের বিখ্যাত মন্দির-গুলির ধন-সম্পদ বহুকাল থেকে সঞ্চিত হতে হতে বর্ত্তমানে কোটি কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এই দুই স্থানেও আমাদের বেশীক্ষণ থাকার সুযোগ

হ'ল না। দু'খানি আলোকচিত্র তুলে নিয়ে চললাম পক্ষীতীর্থম ও সমুদ্রতটে মহাবলীপুরমের পথে।

দক্ষিণের মন্দির-স্থাপত্য ও শিল্পের আরম্ভ প্রায় চৌদ্দ শ' বৎসর পূর্ব্বে পল্লব-রাজাদের রাজত্বকালে। তার পর থেকে এই শিল্প অন্যান্য রাজবংশের রাজত্বকালে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে। পল্লবগণের পর চোল রাজাদের রাজত্বকালে, বিশেষ করে তামিল দেশ সাহিত্য-শিল্প, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক শাসন প্রভৃতিতে এমন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, এই সময়টাকে বলা হয়, দক্ষিণ ভারতের স্বর্ণযুগ। কিন্তু পল্লবরাজগণের ইতিহাস বিশেষভাবে জানা যায় না। এদের রাজধানী ছিল কাঞ্চীপুরমে এবং বন্দর ছিল সেখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে নারিকেল ও তালিকুঞ্জ আচ্ছাদিত বঙ্গোপসাগরতটে মহাবলীপুরমে। এই দুইয়ের মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় পক্ষীতীর্থম।

ক্রমশঃ

কার্ত্তিক

শ্রীকালিদাস রায়

উমার কুমার তোমারে আমার নমস্কার
হরগৌরীর প্রণয়ের তুমি দেবাবতার।
শিবেরে এড়ায়ে দেবতারা করে স্বর্গভোগ,
ভোগীদের সাথে যোগীশ্বরের রচিলে যোগ।
রুদ্রের রোষ-অনলে মদন নিধন লভে,
পুনঃ অনঙ্গ নবীন অঙ্গ লভিল কবে?
পুরাণের ছেলেভুলানো কাহিনী আমি না মানি,
লভিল সে স্মর নব কলেবর তোমাতে জানি।
ত্রিভুবনে জিনি ভুবনেশ্বরে বিজয় করি,
উমার কোলে সে জনমিল নবরূপটি ধরি।
ভবজিৎ ছাড়া দানবে জিনিবে কে আর ভাবি,
দেবসৈন্যের সেনানীর পদে কাহার দাবি?
চির তারুণ্য স্থির লাবণ্য হেরি তোমার,
চিনিতে নারিল তোমারে স্কন্দ পুরাণকার?
জানিয়া তোমার ভুবনবিজয়ী পরাক্রম
অসীম শৌর্য্য, গেল না তাহার মতিভ্রম?
স্বর্গে ছিল না গজতুরগের অভাব কভু,
ময়ূর তোমার কেন বা বাহন হইল তবু?
উমার কুমার তোমারে আমার নমস্কার,
অনলদগ্ধ মদনেরই তুমি নবাবতার।

হেমন্তে

শ্রীকালিদাস রায়

উষা তোমার আনন কেন শিশির ছলছল?
জাগরণের অরুণরাগে নয়ন জল জল।
মুখে তোমার নেইক ভাষা,
মিটে নি বোন কোন্ পিপাসা?
আমি তোমার দরদী বোন আমায় বল' বল।
বাসক-শয়ন সাজায়ে কি কুঞ্জবনে জাগি
শিউলি ফুলের মাল্য গেঁথেছিলে বঁধুর লাগি?
আজি চাঁদের সুধায় বাতি
যাপিলে কি দীর্ঘ রাতি
উচ্চকিত কর্ণে বহি হৃদয় টলমল?
চপল বঁধু এলোনাক' বিফল হ'ল নিশা,
ছিঁড়িল তনুর সকল ভূষা রইল বুকের তৃষা।
মধুপর্ক ফেললে ছুঁড়ে,
তাই কি অত মধুপ ঘুরে?
সেই ব্যথা কি সায়রে নীলকমল টলটল।
হাঁকিছে কাক, দিচ্ছে বুঝি বঁধুরে ধিক্কার,
হিমেল বায়ু জানায় ব্যথা তোমার প্রতীক্ষার।
নিরাশ নিরাভরণ রূপে
উদিলে আজ চুপে চুপে,
তোমার ক্ষোভের ভৈরবী কি নদীর কলকল।

মধুসূদন গুপ্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মধুসূদন গুপ্তের কৃতি আমাদের স্মরণীয়। একটি কৃতির কথা শিক্ষিত-জন কমবেশী জানেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-কথা এখনও রহস্যাবৃত। কোথায় তাঁহার বাড়ী, পিতৃকুল বা মাতৃকুলের কি পরিচয়—এসবের খোঁজখবরই হয়ত আমরা রাখি না। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব্ব দিকে খানিকটা ভিতরে গিয়া 'মধু গুপ্ত লেন' নামে একটি সরু গলি আছে। প্রতীতি হয়, মধুসূদন গুপ্তের নামে রাস্তাটির এই নামকরণ হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষের কেন সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটি গৌরবময় যুগ। তবে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বলা যায় বিশেষ করিয়া। কেননা পরাধীন অবস্থায়ও আমরা নূতনকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতে খুব প্রয়াসী হই। শল্যবিদ্যা ভারতের এক প্রাচীন বিদ্যা। মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ পরীক্ষা না করিলে শল্যবিদ্যা নিরর্থক। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার মত শল্যবিদ্যাও আমরা চর্চ্চার অভাবে ভুলিতে বসি। শুধু ভুলিয়া গেলে ক্ষতি ছিল না, বড় ক্ষতি মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচারে 'পাপবোধ' জন্মানোয়।

এই পাপবোধের মূলে কুঠারাঘাত, সে কি সামান্য কথা? আজ হয়ত একথা শুনিয়া আমরা হাসিব; কিন্তু সোয়া শ' বৎসর পূর্ব্বে এমনটি ছিল না। তখন শবব্যবচ্ছেদের, অর্থাৎ, মৃত মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার বা কাটাকুটি একটি ভীষণ পাপের ব্যাপার ছিল। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এই মধুসূদন গুপ্ত। তিনি অগ্রণী হইয়া শবব্যবচ্ছেদ করিলেন; তখন আমাদের একটি বহুকালপোষিত কুসংস্কারে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল, আর ইহার ফলে আমাদের সম্মুখে এক নূতন জগৎ খুলিয়া যাইবার পথ পাইল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযোগিতা এবং উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া দেশবাসী এক অভিনব পথে প্রবেশ করিল। মধুসূদনের এই যুগান্তকারী কৃতিকে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি দান করা হয় ১৮৪৯ সনে, প্রথম শবব্যবচ্ছেদ-কার্য্যের ঠিক তের বৎসর পরে। শিক্ষা-সমাজের ("Council of Education") সভাপতি, বড়লাটের আইন-সচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে মধুসূদন গুপ্তের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে আবেগপূর্ণ সুললিত ভাষায় এই কৃতির বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:

"I have had the scene described to me. It had needed some time, some exercise of the persuasive art, before Modusuden could bend up his mind to the attempt; but having once taken the resolution, he never flinched or swerved from it. At the appointed hour, scalpel in hand, he followed Dr. Goodeve into the godown where the body lay ready. The other students, deeply interested in what was going forward but strangely agitated with mingled feelings of curiosity and alarm,

মধুসূদন গুপ্ত

crowded after them, but durst not enter the building where this fearful deed was to be perpetrated; they clustered round the door; they peeped through the jilmils, resolved at least to have ocular proof of its accomplishment. And when Modusuden's knife, held with a strong and steady hand, made a long and deep incision in the breast, the lookers-on drew a long gasping breath, like men relieved from the weight of some intolerable suspense."*

* *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851.* By J. Kerr. Part II, 1853. Pp. 210, foot-note.

এই উক্তিতে বেথুন মধুসূদন গুপ্তের সর্বপ্রথম শবদেহে অস্ত্রোপচারের কথা বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যেও ঐ সময় চারি জন শবব্যবচ্ছেদে অগ্রসর হন। একথা একটু পরে আমরা জানিতে পারিব।

২

গত শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতার 'স্কুল ফর নেটিব ডক্টরস' নামে একটি স্কুল ছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল তত্ত্ব কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রদের 'এপথিকারী' বলা হইত, ইহারা এখনকার 'কম্পাউণ্ডারে'র সমগোত্রীয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেসব ইংরেজ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া এই সকল এপথিকারী চিকিৎসা-কার্য্যে সহায়তা করিত। অবশ্য তাহারা সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইত। পরে, কলিকাতা মাদ্রাসার মেডিক্যাল ক্লাস এবং সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হয় (ডিসেম্বর, ১৮২৬)। এখানে ইংরেজীতে লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃতে অনূদিত হইত এবং ছাত্রেরা এই সকল অনুবাদ-গ্রন্থের মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইতেন। সংস্কৃত কলেজ-সন্নিহিত এক বাটীতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষালাভার্থ একটি হাসপাতাল খোলা হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে। সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন প্রথমাবধি পণ্ডিত খুদিরাম বিশারদ। এখানকার মেডিক্যাল লেকচারার ছিলেন ডাঃ জন গ্রাণ্ট। উক্ত হাসপাতালে গিয়া ছাত্রেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন।

মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীর একজন প্রখ্যাত ছাত্র। তিনি বৈদ্যক বা চিকিৎসাশাস্ত্রে অনন্যতুল্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অধ্যাপক খুদিরাম বিশারদ ১৮২৯ সনের প্রায় মাঝামাঝি হইতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ছাত্রদের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। ইতিপূর্ব্বেই বৈদ্যক শ্রেণীর প্রধান ছাত্র মধুসূদন গুপ্তের পাঠোৎকর্ষ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহারা মধুসূদনকে ১৮৩০, মে মাস হইতে মাসিক ষাট টাকা বেতনে বৈদ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক-পদে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহার এই পদে নিয়োগ হেতু ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সংবাদপত্রের স্তম্ভেও এই বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে।* কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মধুসূদন স্বীয় পদে বহাল রহিলেন। তাঁহার নিয়োগে যে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ভুল করেন নাই, মধুসূদনের পরবর্তী কার্য্যকলাপ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল।

মধুসূদন ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয়—কলিকাতা মাদ্রাসা ও গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যথাক্রমে আরবী ও সংস্কৃতের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যাসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন ইংরেজী গ্রন্থাদি হইতে এই দুই ভাষায় অনুবাদের রেওয়াজ। অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্রই এই অনূদিত গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিত। সব বই-ই গুদামজাত হইয়া অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। ১৮৩৪ সনে চার্লস সি. ট্রেভেলিয়ান হিসাব করিয়া দেখান যে, সরকারের শিক্ষাখাতের কয়েক লক্ষ টাকা এইরূপে আটক পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ অন্য কাহিনী। বৈদ্যক শ্রেণীতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন-সৌকর্য্যার্থে মধুসূদনকেও ইংরেজী বৈদ্যক-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে । তিনি হুপারের "Anatomist Vade-mecum" সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এই পুস্তকখানি ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী নাগাদ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল। মধুসূদন এই পুস্তক লিখিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহস্র টাকা পুরস্কার পান।*

৩

স্কুল ফর নেটিব ডক্টরস, কলিকাতা মাদ্রাসার মেডিক্যাল ক্লাস কিংবা সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণী—কোন স্থলেই উন্নততর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের সুযোগ ছিল না, অথচ তখন এদেশীয়দের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার আবশ্যকতা সরকার নিজ প্রয়োজনেই বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জন গ্রাণ্ট, জে. সি. সি. সাদার্লণ্ড, সি. সি. ট্রেভেলিয়ন, ডাঃ মণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি এবং দেওয়ান রামকমল সেন—এই পাঁচ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন; উদ্দেশ্য—তাৎকালিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসন্ধান এবং উন্নততর শিক্ষা প্রবর্তনের উপায়-নির্ণয়। কমিটি কিছুকাল অনুসন্ধানান্তর এই মর্ম্মে রিপোর্ট দিলেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া একটি কলেজ স্থাপনের দিকে যেন সরকার অবিলম্বে মনোযোগী হন। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৮৩৫, ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন। পরবর্তী ১লা মার্চ্চ হইতে অধ্যাপক নিয়োগ, ছাত্র-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য শুরু হইল। ডাঃ ব্রামলি অধ্যক্ষ, ডাঃ হেনরি হারি গুডিব শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও শল্যবিদ্যার (Surgery) অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। মধুসূদন গুপ্ত ১৭ই মার্চ্চ ১৮৩৫ হইতে এক শত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত বিষয়দ্বয়ের 'ডিমন্‌ষ্ট্রেটর'-এর পদ লাভ করিলেন।

১৮৩৫, ১লা জুন ডাঃ ব্রামলি একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতায় দ্বারা

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় সং, পৃ. ৮-৭।

* কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ, ৩৮। ১৩৫৫ সাল।

কলেজের পাঠনা আরম্ভ করেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর পুনরায় কলেজের অধ্যাপনা সুরু হয় পরবর্ত্তী ২৮শে অক্টোবর। বিভিন্ন বিভাগেই পঠন-পাঠন চলিতে লাগিল। শবব্যবচ্ছেদ সুরু হইতে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। পূর্ব্বে মৃত পশু-দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া ছেলেদের শারীরবিদ্যা বা এনাটমি শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ইহাতে নরদেহের সমস্ত তথ্য জানা সম্ভবপর নয়। শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এদেশীয়দের মনে তখন ঘোরতর কুসংস্কার বিদ্যমান। কিরূপে এই কুসংস্কার বিদূরণে শারীরবিদ্যার সহ-অধ্যাপক অগ্রণী হইয়াছিলেন, বেথুন তাহার চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন; এবং ইতিপূর্ব্বেই তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রামলিও ২৮শে অক্টোবর ১৮৩৬ তারিখের এই প্রথম শবব্যবচ্ছেদের একটি সুন্দর তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মধুসূদন গুপ্তের নামোল্লেখ করেন নাই বটে, তবে তাহাতে তাঁহার প্রথম শবব্যবচ্ছেদের গৌরবের এতটুকুও অপহৃত হয় না। ডাঃ ব্রামলি-প্রদত্ত বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম:

"On that day (28th October, 1836), which may be regarded as an eventful era in the annals of the Medical College, four of the most intelligent and respectable pupils, at their own solicitation, undertook the dissection of the human subject, and in the presence of all the professors of the College and of fourteen of their brother-pupils, demonstrated with accuracy and nicety, several of the most interesting parts of the body, and thus was accomplished, through the admirable example of these four native youths, the greatest step in the progress towards true civilization which education has as yet effected. At the first attempt, all their companions present assisted, and it was delightful to witness the emulation amongst them, in displaying their willingness to recognise the importance of, and adopt a mode of study hitherto contemplated with such honour by their own countrymen . . ."*

ডাঃ ব্রামলির এই উক্তির সঙ্গে বেথুনের কথাগুলি এখানে কতকটা যাচাই করিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেথুন মধুসূদন গুপ্তকে প্রথম শবব্যবচ্ছেদের সম্মান দিয়াছেন। ডাঃ ব্রামলি উপরের উদ্ধৃতিতে মধুসূদনের নাম উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তিনি শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, এবং মধুসূদনের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু বেথুনের এবং ব্রামলির বিবরণ-দুইটির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বেথুন বলেন, ডাঃ গুডিব-সমভিব্যাহারে মধুসূদন গুদামে গিয়া শবব্যবচ্ছেদ করেন, ছাত্রগণ অবাক্ বিস্ময়ে দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ডাঃ ব্রামলি পরিষ্কার বলিতেছেন যে, কলেজের চারিজন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান ছাত্র অন্য ছাত্রদের সহযোগিতায় অধ্যাপকগণের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম অতি নিপুণতার সহিত শব-ব্যবচ্ছেদ করে। এই কার্য্য সম্পাদিত হয় ১৮৩৬ সনের ২৮শে অক্টোবর। ইহার অল্পকাল পরে শিক্ষাবিষয়ক জেনারাল কমিটিকে কলেজ-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর বিবরণ দান প্রসঙ্গে ডাঃ ব্রামলি উক্ত চারি জন ছাত্রের কৃত কর্ম্মের কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। মধুসূদন বাদে বেথুনের অপেক্ষা ব্রামলির অন্য সব কথাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি।

একটি কথা উঠিতে পারে, দুই তারিখে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কিনা। কিন্তু এরূপ ধারণা করিবার কারণ দেখি না। দুই দিনে দুইটি কার্য্য সম্পাদিত হইলে—এবং ইহা যুগান্তকারী বলিয়া ব্রামলি ও বেথুন দুই জনেই উল্লেখ করিয়াছেন—ব্রামলি প্রদত্ত বিবরণে নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ থাকিত। অধিকন্তু হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জে. কার তাঁহার ইংরেজী পুস্তকের* 'মেডিক্যাল কলেজ' অধ্যায়ে উক্ত এক তারিখের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানি ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত। তিনি উক্ত অধ্যায়ে ১৮৫০-৫১ সন পর্য্যন্ত মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। সে যাহা হউক, মধুসূদনের কৃতি সম্পর্কে ডাঃ ব্রামলি উল্লেখ না করিলেও আমরা এখানে বেথুনের কথাকেই মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কার-ও নিজ গ্রন্থে ডাঃ ব্রামলির উক্তিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বেথুনের কথাও পাদটীকায় দিয়াছেন; তিনি এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা মন্তব্য করেন নাই। ডাঃ ব্রামলির বিবরণে উক্ত চারি জন ছাত্র যথাক্রমে—উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্র †

৪

মধুসূদন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। মধুসূদনের উৎসাহ ও ধৈর্য্য ছিল অপরিসীম। কলেজে শিক্ষকতা কালে তিনি অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪০, ১৮ই ডিসেম্বর কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর যে শেষ পরীক্ষা হয় তাহাতে

---

* *Report of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of. Fort William in Bengal for the year 1836*. Pp. 54-5.

* *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851.*

† "Early Years of the Calcutta Medical College" —*The Modern Review* for September and October, 1947, দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান লেখক কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম দিক্‌কার ইতিহাস সমসাময়িক সরকারী নথিপত্র দৃষ্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মধুসূদন উপস্থিত হইয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জেনারাল কমিটির রিপোর্ট হইতে মধুসূদনের বিষয় এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

Anatomy and Physiology

* * *

Modhusudun Goopto (Teacher) Qualified.

Theory and Practice of Surgery

Modhusudun Goopto (Having commenced English late in life had some difficulty in expressing himself, but his answers were correct. Qualified).

Theory and Practice of Physic

Modhusudun Goopto Qualified.

Medical Chemistry, Botany, Materia Medica and Pharmacy

Modhusudun Goopto Qualified.

Practical and Surgical Anatomy. Demonstration with Dead Bodies

Modhusudun Goopto Qualified.*

১৮৪০-৪১ সন নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে কি কি বিষয় অধীত হইত, এই বিবৃতি হইতে তাহা জানা যাইতেছে। মধুসূদন গুপ্ত সকল বিষয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষকগণের উপরের মন্তব্য হইতে জানা যায়, তিনি অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া এ ভাষায় তেমন ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন নাই, তথাপি উত্তরপত্র যথাযথ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া ধরিয়া লন।

সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে লইয়া কলেজের পরীক্ষক বোর্ড গঠিত হইত। পরীক্ষান্তে ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলের কথা জানাইয়া বোর্ড জেনারাল কমিটিকে একটি বিবরণ পাঠাইতেন। কমিটি ইহার উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদের ডিপ্লোমা দিতেন, সরকারকেও অনুরোধ জানাইতেন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ পুরস্কৃত করিতে। এবারের রিপোর্টে (১৮৪০-৪১, পৃ. ৮২) জেনারাল কমিটি লিখিলেন :

"The General Committee of Public Instruction confirmed the Report of the Examiners and Assessors of the Medical College, and College Diplomas were given to the seven students named in the margin. Modhusudun Goopto and Nava Krishna Goopto and the five other youngmen retained their situations in the Medical College, were reported to the Medical Board, and to the Government, as being available for the public service as sub-assistant surgeons."

জেনারাল কমিটি রিপোর্টে বলেন যে, উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত প্রমুখ সাত জন তখনও মেডিক্যাল কলেজের কর্মে লিপ্ত। তাঁহারা মেডিক্যাল বোর্ড এবং গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, এই কর্মীদের তাঁহারা সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রূপে সব সময়েই পাইতে পারেন। মধুসূদন এই পদে উন্নীত হইলেও কখনও কর্ম্মব্যপদেশে অন্যত্র যান নাই; আমৃত্যু মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম শিক্ষক-কর্ম্মীই তিনি রহিয়া গেলেন।

৫

ইংরেজ অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন ব্রিটিশ সৈন্যঘাটির সংখ্যা বাড়াইতে হইল, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ প্রজার চিকিৎসাদিরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইল। এই দুই কারণেই মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ১৮৩৯ সনে একটি হিন্দুস্থানী ক্লাস বা শ্রেণী খোলা হইল যেখানে চিকিৎসাবিদ্যার বিষয়সমূহ ছাত্রদের মোটামুটি শিখাইয়া দেওয়া হইত। কর্ত্তৃপক্ষ এই শ্রেণীর কার্য্যের উৎকর্ষ বিধানে মনোযোগী হইয়া ১৮৪৩-৪৪ সনে ইহা পুনর্গঠিত করেন, এবং মধুসূদন গুপ্তের উপর ইহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। মধুসূদন মেডিক্যাল কলেজের 'ডিমনষ্ট্রেটর অফ এনাটমি এণ্ড সার্জ্জারি' পদে পূর্ব্ববৎ বহাল রহিলেন। ইহার সঙ্গে তিনি এই বিভাগ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার এই নূতন পদের নাম হইল 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ দি সেকেণ্ডারী (বা, হিন্দুস্থানী) ক্লাস।' মধুসূদনের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচার তথা শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা এই শ্রেণীর ছাত্রগণ এ সময় হইতে প্রথম আরম্ভ করেন। মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক এলান ওয়েব এই শ্রেণীর 'ভিজিটর' বা পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন।*

মধুসূদন 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৪৪-৪৫ সনের শিক্ষা-সমাজের ('জেনারেল কমিটি' ইত্যাদির পরিবর্ত্তে ১৮৪২ সন হইতে ইহা 'Council of Education' বা বাংলা 'শিক্ষা-সমাজ' এই নামেই পরিচিত হয়) বার্ষিক রিপোর্টে এই বিষয়টির এইরূপ উল্লেখ পাই :

"There are at present in the press . . . as well as the Bengalee translation of the London Pharmacopœa prepared by Pundit Modhusudun Goopto . . ."†

[এই গ্রন্থখানি ১৮৪৯ সনে প্রকাশিত হয়।]

মধুসূদনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় এবং 'পরিদর্শক' ওয়েবের চেষ্টা-যত্নে হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাত্রগণ অধীত বিষয়ে দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ পরিচয়ও পাওয়া গেল। শিক্ষা-সমাজ ১৮৪৫-৪৬ সনে এই শ্রেণীর পরি-

* *Report of the General Committee of Public Instruction, etc., for 1840-41.* Pp. 79.

* *Report of the General Committee of Public Instruction, etc., for 1943-44.* Pp. 67.

† ঐ, পৃ. ২০

চালনায় অধ্যাপক ওয়েব এবং পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের কৃতিত্ব কথা এইরূপ উল্লেখ করেন :

"The conduct, character, attendance, and attainments of the military class have been most satisfactory and much credit is due to Professor Webb and Pundit Modhusudun Goopto for the proficiency of the pupils in the important branch of study taught by them."

এই শ্রেণীর 'ভিজিটর' অধ্যাপক এলান ওয়েব ১৯শে জানুয়ারী ১৮৪৬ তারিখে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণান্তর উচ্চতন কর্ত্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে তিনি মধুসূদনের কৃতিত্বের কথা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করেন। এখানে ওয়েবের মন্তব্য হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"They (the students) answered very satisfactorily upon the whole, and in a manner which reflects the highest credit upon their excellent teacher of Anatomy and Physiology, Baboo Modhusudun Gooptu; indeed it gave me sincere pleasure to observe in my daily visit at this dissections, that the zeal and exertions of the Baboo are quite as successful here in this first attempt to carry out regular dissections by the military class. (chiefly Mahommedans) as amongst the Hindoo students of the English class."*

এই হিন্দুস্থানী ('মিলিটারী ক্লাস'ও বলা হইত) শ্রেণীর ছাত্রেরা ছিল অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের মধ্যেও শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। অধ্যাপক ওয়েব শুধু মধুসূদনের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যেরই প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, হিন্দু ছাত্রদের মত মুসলমান ছাত্রদেরও যে তিনি শবব্যবচ্ছেদে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কারণেও তিনি ওয়েবের নিকট হইতে সুখ্যাতি লাভ করিলেন। শিক্ষা-সমাজ পরবর্ত্তী বার্ষিক রিপোর্টগুলির কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ অধ্যায়ে হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা বলিতে গিয়া প্রতি বারেই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের অধ্যাপনা, শবব্যবচ্ছেদ-পারিপাট্য এবং সুষ্ঠু পরিচালনার প্রশস্তি করিয়াছেন। ১৮৪৬-৪৭ সনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্রই মধুসূদন গুপ্ত-প্রদত্ত উর্দ্দু নোটগুলির উপর নির্ভর করিয়া ব্যবচ্ছেদ-কার্য্য করিয়া যাইত।† মধুসূদনের অধ্যাপনা-গুণে তাহারা শারীরবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

৬

কর্ত্তৃপক্ষ যে মধুসূদনের গুণপনায় মুগ্ধ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা তাঁহাকে ১৮৪৮ সন নাগাদ প্রথম শ্রেণীর সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পদে উন্নীত করিলেন।‡ ইহার পর বৎসর, ১৮৪৯ সনে মধুসূদন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ এই প্রবন্ধের গোড়াতেই করিয়াছি। ঐ সময়ের বিখ্যাত শিল্পী মিসেস বেলনস মধুসূদনের একখানি তৈলচিত্র আঁকিয়া দেন। বেথুন সাহেব মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে ঐ বৎসরে এই তৈলচিত্রখানি উন্মোচন করেন, এই সময়ে তিনি মধুসূদনের উচ্ছসিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন—এ সব কথা আমরা আগেই পাইয়াছি।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত হিন্দুস্থানী ক্লাস বা শ্রেণীর মত একটি বাংলা শ্রেণী বা বিভাগ খোলার আবশ্যকতাও ক্রমে বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। এ বিষয়ে ১৮৪৩ সনেই দেওয়ান রামকমল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী এবং মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডাঃ এফ. জে. মোএট একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৫২ সনের প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন বাংলা দেশের বিভিন্ন সরকারী কেন্দ্রে, জেলা-শহরে, এমনকি অভ্যন্তর ভাগে গ্রামাঞ্চলেও চিকিৎসকদের প্রয়োজন নিতান্তই অনুভূত হইতেছিল। ১৮৫২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি বাংলা শ্রেণী বা বিভাগ খোলা হইল। হিন্দুস্থানী বিভাগের ন্যায় বাংলা বিভাগেরও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন মধুসূদন গুপ্ত। মেটিরিয়া মেডিকা বা ভৈষজ্য-সংহিতার অধ্যাপক হইলেন শিবচন্দ্র কর্ম্মকার; মেডিসিন বা ভেষজতত্ত্ব অধ্যাপনার ভার পড়িল প্রসন্নকুমার মিত্রের উপর। মধুসূদন স্বয়ং শারীরবিদ্যা বা এনাটমি এবং শল্যবিদ্যা শিক্ষার ভার লইলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ (বাং ১২৫৯) মধুসূদনের 'এনাটমি বা শারীর বিদ্যা' শীর্ষক বাংলা পুস্তক বাহির হয়।

হিন্দুস্থানী বিভাগের মত বাংলা বিভাগেরও উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, ভেষজবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা অনুবাদ ও সংকলন-গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ যেমন ঐ যুগে বিজ্ঞান-চর্চ্চার এক উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠে, সেইরূপ কলেজের বাংলা বিভাগও বঙ্গভাষায় লিখিত সাধারণ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক রচনায় নানাভাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। বাংলা বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা মফস্বল অঞ্চলে চিকিৎসক হইয়া যাইতেন; স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট তাঁহারা 'নেটিব ডাক্তার' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাংলা বিভাগ পরিচালনায় মধুসূদনের কৃতিত্বও আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

৭

মধুসূদনের কর্ম্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে ১৫ই নবেম্বর ১৮৫৬ দিবসে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (২০শে

* ঐ, ১৮৪৫-৪৬, পৃ. ১১৮।

† ঐ, ১৮৪৬-৪৭, পৃ. ৯২

‡ ঐ, ১৮৪৮-৪৯, পৃ. ১১৯

নবেম্বর, ১৮৫৬) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্ত সংবাদ প্রদান-কালে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে একটি পংক্তিমাত্র লেখেন: "উক্ত কলেজের বাঙ্গালা ক্লাসের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার বক্তৃতাকারক বাবু মধুসূদন গুপ্ত পঞ্চত্ব পাইয়াছেন।" পরবর্ত্তী ২২শে নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' মধুসূদন গুপ্ত সম্পর্কে সবিস্তারে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন:

"উক্ত গুপ্ত বাবুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মধুসূদনবাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবসায়ীগণের আদি-পুরুষ ছিলেন, এতদ্দেশীয়েরা বিশেষত হিন্দু জাতিরা মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে স্থানে শব রাখে গোময় জলে সেস্থান পর্য্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়া গেলে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গোময় জলের ছিটা দেন, মৃত দেহের বিষয়ে অদ্যাপিও যে জাতির ঘৃণা ও পাপবোধ রহিয়াছে মধুসূদন বাবু সেই জাতির মধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কার্য্যে সুপটু হইয়াছেন। ঐ বাবুই তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, মধুসূদন গুপ্ত স্বজাতীয় বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরেজী চিকিৎসা বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু সমাচারে ইংরেজ বাঙ্গালী সাধারণ বহু লোক আক্ষেপ করিবেন।"

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে মধুসূদনের সংস্রব ইহার প্রতিষ্ঠা হইতে। দীর্ঘ বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত সাতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মত তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডাঃ টি. ডব্লিউ. উইলসন কলেজের ১৮৫৬-৫৭ সনের বার্ষিক বিবরণ দান প্রসঙ্গে মধুসূদনের মৃত্যু সম্পর্কেও তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্ত্তাকে (Director of Public Instruction) লিখিলেন:

"Baboo Mudoosoodun Gooptu, Lecturer on Anatomy to the Bengali and Hindustani Students, after twenty-two years' service in the college died on the 15th November, 1856. To him a debt of gratitude is due by his countrymen. He was pioneer who cleared a space in the jungle of prejudice, into which others have successfully pressed, and it is hoped that his countrymen appreciating his example will erect some monument to perpetuate the memory of the victory gained by Muddoosoodun Gooptu over public prejudice, and from which so many of his countrymen now reap the advantage."*

মধুসূদনের মৃত্যুর পর ঠিক এক শতাব্দী অতীত হইল। আজকাল কত শতবর্ষ-জয়ন্তী ঘটা করিয়া উদ্‌যাপিত হইতেছে। 'সাধারণের মধ্যে অসাধারণ' এই মানুষটির কথা কি আমরা একেবারে ভুলিয়া যাইব? অথবা, তিনি হয়ত আমাদের এতই আপন হইয়া গিয়াছেন যে, আলাদা করিয়া তাঁহার কথা স্মরণ-মননের আর আবশ্যক নাই।

১৫ই নবেম্বর ১৯৫৬

* *Report of the Director of Public Instruction for the year 1956-57, p. 200.*

আদর্শ মানুষ—দেবেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বাঙলা দেশের সমস্ত ব্যক্তিদের তালিকায় শিক্ষকদের নাম এককালে খুব সম্মানের সহিত গৃহীত হইত এবং বাঙলার অনেক মহাপুরুষ শিক্ষকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এরূপ দেখা যায় ইঁহাদের অনেকেই কেবলমাত্র শিক্ষকতা করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, বাঙলার নানা ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেদের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, রামতনু, নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ), সুরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, শিবনাথ, উমেশচন্দ্র, কৃষ্ণকমল, রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ, অরবিন্দ, হরপ্রসাদ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, গৌরী-শঙ্কর, যাদবচন্দ্র, ললিতমোহন, কালীকৃষ্ণ, সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ এমনকি সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীবৃন্দকে শিক্ষক-রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ তালিকা একান্তই অসম্পূর্ণ।

ইঁহাদের অনেকেই শিক্ষকতার দ্বারা বা মানবজীবনের কল্যাণকর বৃহত্তর ক্ষেত্রে মহান্ কার্য্যদ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আবার অনেকে আছেন যাঁহারা নিজ ছাত্রমণ্ডলী এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে চরিত্রবত্তা, জ্ঞানপিপাসা, সত্যানুরাগ ও দুঃস্থের সেবাকার্য্য প্রভৃতি মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং অপরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এইরূপ শ্রেণীর মধ্যে আমরা দেবেন্দ্রনাথ বসুকে দেখিতে পাই

পিতৃমাতৃ পরিচয়

দেবেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহার পিতা হরনাথ, জানকীনাথের পিতা, নেতাজী সুভাষ ও স্বনামধন্য শরৎচন্দ্রের পিতামহ। দেবেন্দ্রনাথ, হরনাথের প্রথমা স্ত্রী মনোমোহিনীর একমাত্র সন্তান।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে মাতা ও মাতুলদের প্রভাব অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। পারিবারিক অবস্থার সংঘাতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহারই পরিচয় দিয়া দেবেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা যাইতে পারে।

কলিকাতা ইটালীর প্রাচীন অধিবাসী গোবিন্দ ঘোষের দুই পুত্র গোপালচন্দ্র ও যদুনাথ এবং পাঁচ কন্যা ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ইটালীর লোকপ্রিয় জমিদার দেবনারায়ণ দেব-এর সহিত বিবাহ হয়। তৃতীয়া কন্যা বালবিধবা হইয়া পিতা ও ভ্রাতার সংসারে জীবনাতিপাত করেন। কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহ হইবার কয়েক বৎসর পরে একটি কন্যা-সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহার স্বামী তাঁহার অনুগমন করিলে পিতৃমাতৃহীনা শিশু-কন্যা মাতামহ গোবিন্দ ঘোষের গৃহে লালিতপালিত হইতে লাগিল। এই শিশুর নাম মনোমোহিনী এবং ইনিই দেবেন্দ্রনাথের জননী।

দেবেন্দ্রনাথ বসু

দশ বৎসর বয়সে কোদালিয়া-নিবাসী হরনাথের সহিত মনোমোহিনীর বিবাহ হয়। বালিকা বধূ শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় বড়ই কান্নাকাটি করিতেন। একবার হরনাথের পিতা প্রাণমোহন পুত্র-বধূকে লইতে আসিয়া যথারীতি বালিকার রোদনের বিষয় শুনিলেন। কিন্তু সেবার তিনি পুত্রবধূকে লইয়া যাইবেন বলিয়া জিদ ধরিলেন। বালিকার পক্ষ হইতে কয়েক দিন বাদে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব তিনি ক্রোধভরে অগ্রাহ্য করিলেন। সেই দিনই গ্রামে ফিরিয়া পুত্রের আবার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং এই ঘটনা হইতে সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে পাশের গ্রাম হরিনাভিতে রাধাকৃষ্ণ দত্তের কন্যা সত্যভামা ওরফে কামিনীর সহিত পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। কামিনী নেতাজীর পিতামহী।

মনোমোহিনী মাতুলালয়ে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহাকে কোদালিয়ায় লইয়া যাওয়া হয়। হরনাথের অভাবের সংসার, সেখানে দুই সপত্নী কোনরূপে একত্রে সংসার করিতে থাকেন। ইত্যবসরে কামিনীর দুই পুত্র যদুনাথ ও

কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মনোমোহিনীর দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে একমাত্র পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৫ সনে মহালয়ার দিন ইটালীতে ভূমিষ্ঠ হন। মনোমোহিনী অধিকাংশ সময়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন। দেবেন্দ্রনাথের জন্মের পর সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম বাদে কোদালিয়া শ্বশুরালয়ে যাতায়াত প্রায়ই আর ঘটিয়া উঠিত না। দেবেন্দ্রনাথ মাতামহের আলয়ে অত্যন্ত আদরে ছিলেন। সংসারে বিশেষ অস্বচ্ছলতা নাই, তাহার উপর গোবিন্দ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ উভয়ের মিলিয়া বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত মনো-মোহিনী দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গেলেন।

বাল্যকাল ও শিক্ষাব্যবস্থা

দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিবার পর মনোমোহিনীর মাতুলালয় বাসের আরও কারণ আছে। সওদাগরী আপিসে সামান্য উপার্জ্জন, তাহার উপর পুত্র কন্যাসহ সপত্নী বর্ত্তমান। এদিকে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে সযত্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের প্রশ্নও আলোচিত হইতেছে। ইটালীতে মনোমোহিনীর মাতুলালয়ে বিদ্যালাভের একটা আবহাওয়া রহিয়াছে। ভ্রাতা যদুনাথ জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "সিনিয়র" পরীক্ষা পাস করিয়া পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন; সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি বি-এ পাস করেন। সে যুগে ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং যদুনাথের নিকট থাকিয়া শিক্ষালাভের সুবিধা থাকায় দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে আরম্ভ করিয়া তথা হইতে শিক্ষা সমাপন করেন।

তদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে এক পাঠশালায় ভর্ত্তি হন এবং অচিরকালে সহপাঠীদের মধ্যে মেধাবী ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় লাভ করেন। তথা হইতে অধুনালুপ্ত বহুবাজার ভার্ণাকুলার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পাঠ আরম্ভ করেন এবং মধ্য প্রাইমারী (Middle Vernacular Examination) পরীক্ষা দেন এবং বৃত্তিলাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিশোর দেবেন্দ্রনাথ নিজ "উপার্জ্জনে" শিক্ষার ব্যয় বহন করিবে ইহা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের নিকট পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিলেন।

যথাকালে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুস্কুলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। হিন্দুস্কুল তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষাভিলাষী ছাত্রদের প্রায় একমাত্র বিদ্যায়তন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি পাঠে আগ্রহ, বিনয় ও সদালাপে অচিরে শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শিক্ষক-মণ্ডলীর যত্নে ও নিজ অধ্যবসায়ে তিনি সতীর্থদের মধ্যে যশস্বী হইয়া উঠিলেন এবং ১৮৭১ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিলেন। মাতার আর আনন্দের সীমা নাই; পিতা হরনাথ পুত্রগৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁহার মধ্যম পুত্র কেদারনাথ ১৮৬৮ সালে হরিনাভি স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ "জলপানি" পাইয়াছেন। সে দিনে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই পুত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য্য দেখিবার সৌভাগ্য খুব অল্প পিতার ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যাইত।

উচ্চশিক্ষা

দেবেন্দ্রনাথ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। পাঠে শিথিলতা নাই; যৌবনসুলভ ক্রীড়া-আমোদে রুচি নাই। সহ-পাঠীদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি থাকিলেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে মনে মনে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান। দেবেন্দ্রনাথের মানসিক বৃত্তির যে অনুশীলন হইতেছিল, তাহারই বিপরীত অনুপাতে স্বাস্থ্যের দিকে অমনোযোগিতা আসিয়া দেখা দিতেছিল। সুতরাং তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা কতক পরিমাণে হীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ১৮৭৩ সালে এফ-এ বা ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজেই তিনি বি-এ পাঠ আরম্ভ করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লন। ইত্যবসরে তাঁহার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হইয়াছে এবং বহু চেষ্টাতেও তাহার প্রতিরোধ করা সম্ভব হইতেছে না। পরীক্ষার পূর্ব্ব সুনাম রক্ষা করিতে হইবে, বৃত্তি না পাইলে শিক্ষালাভ বন্ধ করিতে হইবে, সুতরাং তিনি স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহার অভিশাপ তিনি সারা জীবনই বহন করিয়াছেন; তখন তাঁহার স্বাস্থ্যের এমন অবস্থা যে আর ঔষধের শিশি সঙ্গে না করিয়া তাঁহার পরীক্ষার কথা চিন্তা করা চলে না। বি-এ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য আরও হীন হইয়া পড়ে। তৎসত্ত্বেও বি-এ পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন ও রৌপ্যপদক ও মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স পাশ করেন এবং ১৮৭৭ সালে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে নীলকান্ত মজুমদার প্রথম ও দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং যথারীতি পুরস্কার লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর।

বিবাহ

ফার্ষ্ট আর্টস (এফ-এ) পরীক্ষা পাশ করিলে আর অন্নসংস্থানের অসুবিধা হয় না। সংসার ও পরিণীতা স্ত্রীর ভার গ্রহণে উপযুক্ত বিবেচনা করা অভিভাবকদিগের মধ্যে একটা সাধারণ প্রচলিত ধারণা ছিল। সুতরাং যখন বি-এ পরীক্ষার পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসে তখন তাহাতে আর কোনও আপত্তিই চলে না।

ফার্ষ্ট আর্টস পাঠকালে কলিকাতা সিমুলিয়ার ঘোষেদের বাড়ী তাঁহার বিবাহ হয়। চণ্ডীদাস ঘোষ তাঁহার সহপাঠী ও বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি এ বন্ধুত্ব স্থায়ী করিবার জন্য দেবেন্দ্র-নাথের সহিত তাঁহার সহোদরা সুখদা মোহিনীর বিবাহের "ঘটকালি" করেন এবং উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মতে পরীক্ষা বিবাহ পূর্ব্বেই

উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। চণ্ডীদাস উত্তরকালে শিয়ালদহ কোর্টের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

কার্য্যারম্ভ

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই তাঁহার অধ্যাপক টনি 'সাহেবে'র সুপারিশে তিন মাসের জন্ত কটক কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের অস্থায়ী পদ প্রাপ্ত হন। কটক যাত্রা লইয়া তিনি বিশেষ চিন্তায় পড়িলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়া আত্মীয়-স্বজনও চিন্তিত। তদুপরি বিমাতা কামিনীর মৃত্যুতে এখন তাঁহার অশৌচ চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় আত্মীয় পরিজনের বাহিরে দূর দেশে যাওয়ায় সাধারণভাবে আপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। অশৌচের জন্ত তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে এবং অন্ত পরিবারে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধানমতে তাঁহার জুতা ব্যবহারে এবং আমিষ ভোজনে কোনও আপত্তি হয় নাই। সে দিনের কটক যাত্রা এ দিনের মত সুগম ছিল না। হয়, গোযানের সাহায্যে বিপদসঙ্কুল স্থলপথে নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। পথ সরল নয়, তাহা ছাড়া অত্যন্ত অসমতল। হিংস্র পশু ছাড়া দুর্বৃত্তের উপদ্রবের অন্ত ছিল না। আর না হয়, জলপথে জাহাজে করিয়া চাঁদবালি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া খালের মধ্যে নৌকা সাহায্যে কটক পৌঁছিতে হইত। তখন অবশ্য কটক সংযুক্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা "বঙ্গ প্রেসিডেন্সী"র অন্তর্গত ছিল এবং সেখানে বাঙালীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কোনও কোনও বাঙালী তখনকার যুগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রায় বাহাদুর হরিবল্লভ বসু অন্ততম। ইনিই পরে কটকে জানকীনাথের ব্যবহারজীব জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

নূতন পরিবেশ ও গিরীশচন্দ্র

নূতন স্থানের আবহাওয়া যুবক দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে উপযোগী হইবে কিনা, তাহাও একটা চিন্তার কারণ ছিল। কটক স্কুলে নিয়োগপত্র পাইবার পূর্ব্বেই তিনি সেখানে কোনও বাঙালীর সাহায্য লাভ করিতে পারেন কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন উত্তরকালে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় সে সময় র‍্যাভেন্‌স কলেজের অধ্যাপক। গিরীশচন্দ্র ১৮৭৬ সালে হুগলী কলেজ হইতে উদ্ভিদ বিভায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সালেই বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়া র‍্যাভেন্‌স কলেজে যোগদান করেন। যখন দেবেন্দ্রনাথের কটক যাওয়া স্থির হইয়া গেল তিনি গিরীশচন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। যাহাতে কটকে গিয়া অহেতুক কষ্ট ভোগ করিতে না হয় সে জন্ত মাইদাস বাজারে নিজ বাসা-বাটীতে স্থান গ্রহণ করিবার জন্ত গিরীশচন্দ্র অনুরোধ জানাইলেন। বলা বাহুল্য, সে অনুরোধ উপেক্ষা করা দেবেন্দ্রনাথের ক্ষমতাতীত ছিল। তৎপূর্ব্বেই গিরীশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও সুমধুর ব্যবহার সহকর্মী ও ছাত্রমহলে তাঁহাকে তখন জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন, তখন নিজ চরিত্রমাধুর্য্যের সহিত গিরীশচন্দ্রের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা যুক্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কটকবাসের প্রথম অবস্থা বিশেষ সুখকর হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তিনি ছাত্রদের সহিত ব্যবহার, ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর বাহিরে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করেন।

গুরু ও বন্ধু

গিরীশচন্দ্রের সহিত প্রথম জীবনে অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হইবার সুযোগ দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হইয়াছিল। বলা-বাহুল্য, গিরীশচন্দ্রের আদর্শ তাঁহার নিকট চির জাগরুক ছিল। অচিরকালের মধ্যে তাঁহাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। দুই পণ্ডিত ও সজ্জনের প্রেম অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত মধুর হইয়া উঠিল। আমরণ দুইজন পরস্পরে ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিয়াছেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে সকল ব্যবধান দূর হইয়া নিকটতম হইয়া উঠিয়াছে। গিরীশচন্দ্রের পুত্র-কন্তারা দেবেন্দ্রনাথকে "কাকাবাবু" এবং তাঁহার পত্নীকে "সই মাসিমা" বলিয়া ডাকিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ গিরীশচন্দ্রকে আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্থান দিয়াছিলেন এবং চিরকাল সমস্ত বিপদে আপদে গিরীশচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছেন ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কটকবাসের তিন মাস দেবেন্দ্রনাথ গিরীশচন্দ্রের নিকট যাপন করিয়াছিলেন। তিনি কোনও দিন মনে করিতে পারেন নাই যে, তিনি আত্মীয় পরিজন হইতে দূরে পড়িয়া আছেন।

দ্বিতীয়বার কটক যাত্রা

কটক স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার তিন মাস গত হইলে দেবেন্দ্রনাথ চলিয়া আসেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সনের জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার কটক যাত্রা করেন। এখন তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কটক কলেজে যোগদান করিলেন। গিরীশচন্দ্রের আবাস তাঁহার জন্ত অবারিত। সঙ্গে পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্তা ইন্দুবালা ও ভ্রাতা জানকীনাথ। সংখ্যায় এতগুলি হওয়া সত্ত্বেও গিরীশচন্দ্র পরম সমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিলেন। সেখানে সপ্তাহাধিককাল থাকিবার পর গিরীশচন্দ্র নিকটেই বাসা স্থির করিয়া দিলে দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে তথায় গমন করেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ

কটকে দুই বৎসরাধিকাল অতিবাহিত হইলে তিনি ১৮৮২ সনের মার্চ্চ মাসে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক হইয়া চলিয়া আসেন। ১৮৯২ সনে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হইলে কৃষ্ণনগরবাসীর আর দুঃখের সীমা ছিল না। কলেজে সতীর্থ ও ছাত্রমহলে দুঃখের ছায়া পড়িয়া গেল। এ বিচ্ছেদ তাঁহাদের বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। মাত্র আট মাস পূর্বে

তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে যান এবং সকলেই মনে করিলেন যে "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছে।"

১৮৯৩ সনে তাঁহাকে হুগলী কলেজে যাইবার নির্দেশ আসে। সেখানে মাত্র মাস দুই অবস্থান করিবার পর তিনি গুরুতর ভাবে পীড়িত হন এবং তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। এইবার আবার পুরাতন বন্ধুত্বের গভীরতা ও প্রেমের নূতন করিয়া পরিচয় লাভ ঘটে। এরূপ পীড়িত অবস্থায় তিনি কলিকাতায় গিরীশচন্দ্রের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গিরীশচন্দ্রই পরমাত্মীয়, তিনি অন্ত কোথাও উঠিবার কথা মনে করিতে পারেন নাই। সেবার অতি কষ্টে তিনি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইলেন এবং সুস্থ হইবার মধ্যেই তাঁহার কৃষ্ণনগর যাইবার অনুমতি আসিলে রোগান্তে কৃষ্ণনগর কলেজে ফিরিয়া যান। কৃষ্ণনগরের সহিত তথাকার ছাত্র ও বন্ধুজনের সহিত বিচ্ছেদ তিনি যেন সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রত্যাবর্তন সকলেরই পরম আনন্দের কারণ স্বরূপ হয় এবং কৃষ্ণনগরে যেন উৎসবে মাতিয়া উঠে। তাঁহার কর্মময় জীবনের অবশিষ্টকাল অর্থাৎ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ২৭।২৮ বৎসর আর কোথাও যাইতে হয় নাই। গেলেও দীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল কৃষ্ণনগর কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ সনে তিনি স্বাস্থ্যের জন্ত কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশই তিনি দেওঘরে কাটাইতেন। তথায় বাসকালে তিনি প্রায় সকল সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছেন; সাধুসজ্জন বিজ্ঞমণ্ডলীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আনন্দে কালযাপন করিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি আরও ক্ষুণ্ণ হয় এবং শরীর দুর্বল হইতে থাকে। ১৯৩১ সনের ১৫ই জানুয়ারী (১লা মাঘ ১৩৩৭) তিনি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া মরধাম পরিত্যাগ করেন।

গুরু-শিষ্য

দেবেন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণনগর কলেজ, দুইটি নাম যেন সংযুক্ত হইয়াছিল। শিক্ষকরূপেই তাঁহার প্রধান খ্যাতি। ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও জ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক চরিত্র যাহাতে বলিষ্ঠ হয়, তাহাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য। কেবল শিক্ষায়তনে নয়, তিনি ছাত্রদের সহিত সকল সময় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। তিনি গাম্ভীর্যের সহিত যে সরস হাস্যালাপ করিতে পারিতেন তাহাতেই তিনি ছাত্রদের নিকট আরও প্রিয় হইয়া উঠেন।

সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় "সেকালের স্মৃতি" (বসুমতী, ১৩৪০ শ্রাবণ, পৃঃ ৫৭৫) প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে ইঁহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, দেবেন্দ্রনাথ বসু আমাদিগকে গণ্ডপাঠে শিক্ষা দিতেন; তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; (অধ্যক্ষ) হিল (এস সি) সাহেব ও দেবেন্দ্রবাবু চমৎকার পড়াইতেন এবং আমাদের সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর প্রকৃতি গম্ভীর ছিল, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এমন সরস রসিকতা করিতেন যে, আমরা সকলেই হাসির চোটে চক্ষু সজল করিতাম। আমাদের হাস্যোচ্ছ্বাসে কৌতুকপ্রিয় গম্ভীর অধ্যাপকের কালো গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে ঈষৎ উন্মোচিত দন্তশ্রেণী দেখিতে পাইতাম। তিনি সময়ে সময়ে বাংলা সাহিত্যেরও আলোচনা করিতেন; তিনি হেমবাবুর 'দশমহাবিদ্যা'র অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন এবং তাহার অধিকাংশস্থল মধুরকণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন।

ছাত্রদের নিন্দা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার তাঁহার এক পুরাতন ছাত্র সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া পদধূলি গ্রহণান্তর বসিয়া গল্প আরম্ভ হইলে পুরাতন দিনে গুরু-শিষ্য সম্পর্কেও আলোচনা উঠিয়া পড়ে; ছাত্রদের আচরণ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে, শিক্ষকদিগের প্রতি আর পুরাতন সম্মান প্রকাশ করেন না। দেবেন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে বলিলেন, দোষ এক পক্ষের নয়, আগে গুরু-শিষ্য যে সম্পর্কে বাঁধা ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; পূর্বে গুরু ছাত্রদের নিকট বিদ্যা স্নেহ, সহানুভূতি ও দৈনন্দিন আচরণ যে সকল শ্রদ্ধা আকর্ষণযোগ্য গুণে বিভূষিত ছিলেন, এখন তাহা নিতান্ত হ্রাস পাইয়াছে; সুতরাং একটা নূতন সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার কথা।

পারিবারিক জীবন

দেবেন্দ্রনাথের এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করেন; কন্যা তাঁহার মাতার সহচরী সঙ্গী হইয়া শিক্ষা লাভ করেন এবং বিবাহান্তে পতিগৃহে গমন করেন। কলেজের ছাত্রদের লইয়া দেবেন্দ্রনাথ পুত্রশোক বা পুত্রের অভাব বোধ করিতেন না। দুঃস্থ, আর্ত, বিপন্ন ছাত্রদের উপর তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। অভাবগ্রস্ত হইয়া যাহাতে কাহারও বিদ্যালাভে অসুবিধা না হয় তাহার জন্ত তিনি সামর্থ্যের অধিক দান করিতেন। কাহারও পীড়ার সংবাদ পাইলে তিনি রোগীর বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিতেন এবং আত্মীয়স্বজনকে সাহস, সাহায্য ও সান্ত্বনাদানে মুগ্ধ করিতেন।

পিতার সংসার হইতে দূরে পালিত হইলেও দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। সাধারণতঃ "বৈমাত্র" শব্দের সহিত ভ্রাতাদের যে অর্থ জড়িত তাহার পূর্ণ ব্যতিক্রম দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জানকীনাথ তাঁহার তৃতীয় বৈমাত্র ভ্রাতা। গ্রামে তাঁহার পাঠের অসুবিধা হইতেছে জানিয়া তিনি তাঁহাকে ইটালীতে মাতামহের বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে পাঠের ব্যবস্থা করায় জানকীনাথ কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কলেজে পাঠকালে জানকীনাথের কলিকাতায় অবস্থান ও পাঠের ব্যয় সম্বন্ধে অসুবিধা ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়াই জানকী-

নাথকে তাঁহার নিকট কটকে লইয়া গিয়াছেন এবং পাঠের সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বৃত্তিলাভ করিয়া জানকীনাথ র‍্যাভেনস কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উত্তরকালে জানকীনাথ কটকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন; তাহার মূলে দেবেন্দ্রনাথ ও পরে (রায়বাহাদুর) হরিবল্লভ বসু। অসুস্থতা বা বার্দ্ধক্য-জনিত ক্লান্তির জন্ত হরনাথ বহুদিন পরিত্যক্ত স্ত্রীর মাতুলালয়ে বাস করিয়াছেন, তাঁহার অপর দুই পুত্র যদুনাথ ও কেদারনাথ প্রয়োজনানুরোধে সেখানে অবস্থান করিয়াছেন এবং এই সহায়তা হইতে কোনও সময় বঞ্চিত হইতে না হয় বলিয়া কেদারনাথ ইটালীতে বাসা করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাস করিয়াছেন।

যখন দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় তখন নিতান্ত প্রেম করিবার মত স্ত্রীর বয়স নয়। তিনি তখন আপনার পাঠ লইয়া 'মশগুল' এবং বালিকাবধূ সকলের নিকট বালিকার আদর লইয়া আনন্দে দিনাতিপাত করে। ক্রমে যখন সুখদাময়ীকে সহকর্ম্মিনীরূপে পাইতে চান তখন দেখেন যে, তাঁহার বিদ্যার একান্ত অভাব। সুতরাং তিনি কর্ম্মের অবসরে পত্নীকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের মনোযোগ নাই, "রোজগার করে স্বামীর সংসার খরচ চালাতে সাহয্য করবার" প্রয়োজন ছিল না। তাহা ছাড়া স্বামীর নিকট পড়াশুনা আরম্ভ করিলে সঙ্গিনী ও শ্বশুরালয়ের বর্ষীয়সীদের বিদ্রূপের সম্ভাবনা বুঝিয়া বালিকা কোনও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নহেন। তিনি অনেক বুঝাইলেন, ফল হইল না। পরে এক শীতকালের গভীর রাত্রিতে দেবেন্দ্রনাথের মাতা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন যে, পুত্রবধূ নীরবে ক্রন্দন করিতেছে। কারণ জানিয়া লইয়া পুত্রকে দ্বার মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন এবং যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। পর দিন হইতে তিনি বধূকে পড়ায় উৎসাহ দিতে লাগিলেন। উত্তর কালে সেই পত্নী সর্ব্বরকমে পণ্ডিত স্বামীর উপযুক্তা হইয়াছেন, বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অধ্যাপকদিগের "পাস-করা" মহিলাদের নিকটও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

দেশপ্রেম

সরকারী চাকুরি করিয়া মনেপ্রাণে স্বাদেশিকতার ভাব বজায় রাখিয়া চলা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না। দেবেন্দ্রনাথ তাহার কিছু ব্যতিক্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাব প্রকাশ করিত। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ইংরেজীতে অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার সামাজিক পারিবারিক পত্রের মধ্যে একটিও ইংরেজী শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না; বাংলায় কথা বলিবার সময় একটিও ইংরেজী শব্দের নামগন্ধও ছিল না। জানকীনাথ প্রতিষ্ঠিত কোদালিয়া দাতব্য কামিনী ঔষধালয়ের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবের সময়, তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হোমিও সম্পাদক বলিয়াছিল যে, "average-এ প্রতিদিন ৪৫।৫০ জন রোগী আসে।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে একান্তে লইয়া গিয়া স্নেহপূর্ণ বচনে বলেন, "বাবা, average-এর কি বাংলা নেই?"

যে সকল ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনা মতামত প্রকাশ করিলে সত্যই সাধারণের মনে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়, সেখানে তিনি অমায়িক ব্যবহারের সহিত সরল ভাষায় মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেন। বিদেশীয় চালচলন বেশভূষার অনুকরণ তিনি অন্তর দিয়া ঘৃণা করিতেন; কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কাহারও মনে ব্যথা দিয়া আপনার মত ব্যক্ত করিতেন না।

দেশের কল্যাণে তিনি নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে আপন মনে কাজ করিয়া যাইতেন। দেশের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া না উঠিলে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। তখনকার দিনে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর লোকের কোনও আস্থা ছিল না। সুতরাং তাহাতে মূলধন নিয়োগ করা ত্যাগের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িত। সে সময়ে কোনও স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাইলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শক্তিমত সেই সকল শেয়ার ক্রয় করিতেন। বৎসরের পর বৎসর তিনি এই কাজ করিয়াছেন। দেশী কারবারের শেয়ার সকল সময় বাক্সে জমা হইয়া থাকিত। কোম্পানী "ফেল" পড়িবার সংবাদ পাইবার পর তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জঞ্জাল দূর করিতেন। তিনি জানিতেন এ অর্থের কোনও প্রতিদান নাই, তথাপি ইহাতে তাঁহার বিরাম ছিল না। তাঁহার এ কার্য্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন একমাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী; তাহা ছাড়া অপর কাহারও জানিবার সুযোগ হইত না। স্ত্রী যদি কখনও এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন তিনি বলিতেন ঐরূপ অর্থনাশে কোনও দোষ নাই। লাভের লোভে নয়, এই ভাবে অর্থ সাহায্য না করিতে পারিলে বিশেষতঃ যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাহারাও যদি না করেন, তাহা হইলে দেশের বৃহত্তর আর্থিক কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। তিনি পত্নীকে বলিতেন, "তোমাদের যেমন ইষ্টদেবতা, আমার তেমনই দেশ; এখানে মতামত চালাতে চেষ্টা না করাই শুভ।"

মাতৃভাষার উপর তাঁহার যে অকৃত্রিম প্রেম ছিল তাহা অনেকেরই জানা নাই। তাহাতে অবশ্য কাহারও কোনও অপরাধ নাই, কারণ দেবেন্দ্রনাথের মনের কোণে যাহা সঞ্চিত হইত তাহা অন্তরঙ্গ ছাড়া অপর কাহারও নিকট প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন না।

সত্যের প্রতি অনুরাগ

তাঁহার কালে সত্যের প্রতি অনুরাগ একটা সংস্কারের মত দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। যাঁহারাই কোনও ক্ষেত্রে নেতৃত্বের স্থান গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের নিকট হইতে অসত্য আশা করা যাইত না। (কালের গতিতে অবশ্য ইহার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।) এ সকলের মধ্যে আবার দেবেন্দ্রনাথের স্থান একটু স্বতন্ত্র ছিল। এখন যে কথা শুনিলে পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে

তাঁহাকে "পাগল" বলিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার আচরণ হইতে যদি কেহ মনে করেন যে, তিনি বঞ্চনার আশ্রয় লইয়াছেন, ইহাও এই সকল মহাপুরুষের নিকট অসহ্য ছিল। তাঁহার নিকট একটি অচল দুয়ানি আসিয়া জোটে। তাহাকে স্বতন্ত্রে রাখিয়া দিবার পূর্ব্বেই একবার খেয়া পার হইবার সময় পাটনীকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভুলক্রমে সেই দুয়ানিটি দিয়া আসেন। বাসায় আসিয়াই সে ভুল ধরা পড়িলে, অবিলম্বে খেয়াঘাটে উপস্থিত হইয়া পাটনীকে পান না। পর পর কয়দিন খোঁজ করিয়া জানিতে পারেন যে এক সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক একটি দু-আনি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা অচল নয়, কেহ লইতে আপত্তি করে নাই; করিলে তাহার নিশ্চয় মনে থাকিত। ইহা জানিয়া দেবেন্দ্রনাথ কয়দিন যে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন তাহা হইতে মুক্তি পাইলেন।

আত্মসম্মান

দেবেন্দ্রনাথের আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং যেখানে তাহা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে তিনি ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আপনার মতামত ব্যক্ত করিতেন। এ সকল ব্যাপারে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা লোককে বিস্ময়াভিভূত করিত। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন এক বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি আসিয়া বলেন যে, তিনি পরম্পরায় শুনিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হয় কলেজ উঠাইয়া দিবেন আর না হয় তাহার মান খর্ব্ব করিয়া ছাড়িবেন। সেই ভদ্রলোক বলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন যে, কলেজে একজন ইংরেজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত না করিলে কলেজের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ভদ্রলোক দেবেন্দ্রনাথের পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার হইতে দেবেন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ও পদমর্য্যাদা হইতে মনে করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ চাকুরির ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহার তোষামোদ করিবেন। ফল বিপরীত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজের উন্নতি সম্পর্কে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কিনা। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে দেবেন্দ্রনাথের বলিবার কিছু নাই; কারণ সরল বিশ্বাসের সহিত তর্ক নাই। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেও তাঁহার এ উক্তি বিচার করিয়া দেখিবার তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও রোষ সেই স্তরে পৌঁছিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, যদি তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষ মহলকে তুষ্ট করিবার জন্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আচরণ নিতান্ত ঘৃণ্য, এত হেয় যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। দেবেন্দ্রনাথের এ মন্তব্যে আগন্তুক ভদ্রলোক অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। সেদিন তিনি বুঝিলেন বাহিরের সেই সৌম্য মূর্ত্তি, বিনয়বচন যাহার নিত্য-সহচর তাহা অগ্নিগর্ভ, কারণ ঘটিলে তাহা বজ্রনিঃস্বনে ফাটিয়া পড়িতে পারে।

"জলেতে যে অগ্নি থাকে মিথ্যা কভু নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।"

কবির এই উক্তি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। যেখানে আত্মসম্মান ও দেশের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা সেখানে তিনি বজ্র কঠিন মূর্ত্তি ধারণ করিতেন।

ন্যায়নিষ্ঠা

সমাজে নানাবিধ কাজে জড়িত থাকিলে সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করা সম্ভব নয়; জগতে কখনও তাহা হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা নিজের বিবেকের কাছে দোষী নয়, অনুশোচনা যাঁহাকে বিব্রত করে না সেরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। বিবেকের নির্দ্দেশে চলিতে গিয়া অনেক সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের বিরাগভাজনও হইতে হয়, কিন্তু ন্যায়ের পথ যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহা উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। একবার এক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি স্থানীয় কোনও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রের পরীক্ষায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। এক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পুত্র প্রায় এক পর্য্যায়ভুক্ত ছিল; মোট বিচারে প্রথমোক্ত ছাত্রটী প্রথম স্থান অধিকার এবং বৃত্তিলাভের উপযোগী বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ মন করেন। ফলাফল প্রকাশের প্রাক্কালে তিনি উক্ত পরীক্ষার ফল, সহকর্মী ও স্থানীয় বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করেন। যখন দুজনেই প্রায় সমান হইয়াছে তখন বহুলোকে ব্রাহ্মণ সন্তানকে বৃত্তি দিবার জন্য অনুরোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে কেবল বিস্মিত হন নাই, যথেষ্ট দুঃখিত হন এবং অন্তরঙ্গমহলে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

দৃঢ়তা

চরিত্রের নানা গুণের একত্র সমাবেশ হওয়ায় এবং নিজের মধ্যে দুর্ব্বলতার বিশেষ অভাব থাকায়, দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহারে ন্যায়ের প্রতি আসক্তি যে রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা সময় সময় কঠোর বা রূঢ় বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি অপরের ন্যায্য যুক্তি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না এবং ত্রুটি সংশোধন করিয়া নিজের ভুল স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এ বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই অপরের পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহান্বিত ছিলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অনেক সময় তাঁহাকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অপরের কাজের বিচার করিতে হইয়াছে। এখানে তাঁহার মধ্যে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী এমনকি কলেজের মালী পর্য্যন্ত পদমর্য্যাদাসম্পন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। ন্যায়নিষ্ঠায় তিনি অনেক কটাক্ষ সহ্য করিয়াছেন।

বাল্য ও বিধবাবিবাহ

সামাজিক মতবাদে তিনি অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ সমর্থন করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষাকে তিনি সমাজকল্যাণে খুব উচ্চ স্থান দিতেন এবং তিনি আপন পরিবারের মধ্যেও ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত প্রয়োগ করিতেন। বাল্যবিবাহে তাঁহার ঘোর আপত্তি ছিল এবং নিজ কন্যার বিবাহ, আত্মীয়দিগের বিশেষ

অনুরোধ বিরক্তি সত্ত্বেও চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

মাতৃভক্তি

দেবেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তির তুলনা খুবই বিরল। জ্ঞান হইবার সঙ্গে দেখিলেন পিতার সংসারে মাতার বিশেষ স্থান নাই; মাতুলালয়ে তিনি দিনযাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ আপনার স্নেহ দিয়া, আচরণ দিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া মাতার বেদনা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিক্ষিত, বিনয়ী, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রে সাধারণতঃ যাহা করে, দেবেন্দ্রনাথ তাহার উপর যাহা করিয়াছেন তাহা দেবীর আরাধনা বলিয়া উল্লেখ করা চলিতে পারে। বৃদ্ধ-কালে, আশী বৎসর বয়সে, মাতাঠাকুরাণী কঠিন রোগে আক্রান্তা হন। পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা "হরিনাম আর গঙ্গাজল" ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে বহু ব্যয়ে ইংরাজ ডাক্তার প্রভৃতি আনা এবং চিকিৎসার বিফলতা প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সে পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই। মাতার মৃত্যুতে তিনি বৃষোৎসর্গ দানসাগর শ্রাদ্ধ করিবেন না তাহা নিশ্চিত, কিন্তু মা যতক্ষণ বাঁচিয়া আছেন ততক্ষণ তিনি "মা", গেলে অভাব হইবেই তাহা ছাড়া শ্বাস যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চিকিৎসা ব্যবস্থা করাই মানুষের ধর্ম্ম, তিনি তাহাই পালন করিতেন।

দরিদ্রনারায়ণ

বিত্তহীন, সহায়সম্বলহীনের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অগাধ প্রেম ছিল। সাধ্যমত তিনি উহাদের সাহায্য করিয়াছেন। সময় ও শৃঙ্খলানুযায়ী কাজ করা তাঁহার নীতি ছিল। যাঁহারা তাঁহার অর্থিক সাহায্য পাইতেন, তাঁহারা যাহাতে "পথ চাহিয়া" না থাকেন, সেই জন্য তিনি কলেজের বেতন পাইলে, স্থানীয় সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়া দিতেন; আর পরদিন সকালে সমস্ত মনিঅর্ডার নিজে লিখিয়া ডাক ঘরে প্রেরণ করিতেন। পোষ্ট আপিসে মনিঅর্ডার বিভাগের কর্ম্মিগণ এ ব্যবস্থার সহিত সুপরিচিত ছিলেন, আরও ছিলেন, যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে চিনিতেন।

পূজা বা কোনও উৎসব উপলক্ষে তিনি অতিরিক্ত অর্থ ও বস্ত্রাদি দান করিতেন। এগুলি তাঁহার বাঁধা নিয়মে চলিত। তাহা ছাড়া কেহ দায়গ্রস্ত হইলে গোয়াড়ী (কৃষ্ণনগর) উত্তরকালে ও দেওঘরের লোকে জানিত দেবেন্দ্রনাথ কাহাকেও নিরাশ করিবেন না। তাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহার পত্নী বেতনের শতকরা একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতেন; সে অর্থে দরিদ্র ও সাহায্যপ্রার্থী ছাড়া কাহারও অধিকার ছিল না।

কর্ম্মপদ্ধতি

দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মপদ্ধতি তখনকার দিনে আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ছিল। যে সময়ের যে কাজ তাহা তিনি এমন ভাবে নিত্য নিয়মিত পালন করিতেন যে, তাহা দৃষ্টে লোকে ঘড়ির সময় ঠিক করিতে পারিত। প্রাতঃকালে তাঁহার ভ্রমণে বহির্গমন ও প্রত্যাগমন দ্বারা বহুলোক বিনা ঘড়ির সাহায্যে আপনার কার্য্যসূচী নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইত।

এককথা বলিলে যথেষ্ট হইবে, জানকীনাথ তাঁহার মহৎগুণের জন্য যত লোকের নিকট ঋণী, তাঁহার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবনদর্শন

কর্ম্মবহুল জীবনে নিজ কর্ত্তব্য পালনে দেবেন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে নানা প্রবল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইয়াছে। অক্লান্ত-দায়িত্বের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু এ সকলের পিছনে তাঁহার নিজস্ব ধর্ম্ম, শান্তিময় জীবনের কথা কখনও ভুলিতেন না। প্রতিদিন কলেজের দায়িত্ব, সামাজিক কাজ প্রভৃতি চুকাইতে পারিলে তিনি মাতা, পত্নী, কন্যা, পরিজন লইয়া আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কলিকাতার কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য দেওঘরে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেখানে তাঁহার লক্ষ্য ছিল শান্তি ও শান্ত জীবন। কোনও দলাদলি বিতণ্ডা, ঐহিক পারত্রিক যুক্তিতর্ক ত্যাগ করা ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার জীবনের নীতি ছিল, "Anything for quiet life" এবং তিনি তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাচীন কাশ্মীরের অধিবাসী

শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থায় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কাশ্মীর একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। একান্তভাবে ভারতবর্ষের অংশ হলেও একদিকে তিব্বত, অন্যদিকে চীন, পশ্চিমে আফগানিস্থান আর তার উত্তরে বহুজাতি সমাগমে প্রাণচঞ্চল মধ্য-এশিয়া এই হিমালয় রমণীয় ভূখণ্ডটির উপর মানব ইতিহাসের প্রায় আদিপর্ব থেকেই এক বিচিত্র মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। আবার সে প্রভাবও বাধাবন্ধনহীন হয়ে সমস্ত উপত্যকায় উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে নি—পার্বত্য দুর্গমতার জন্য, যা কাশ্মীরকে আংশিকভাবে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির এই পরিমিত প্রভাব, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য সেই প্রভাবেরই একান্তভাবে বিবর্তিত হবার সুযোগ, হিমালয়ের শীত-জর্জর জলবায়ু আর তার আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধা প্রাচীন কাশ্মীরের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রাকে একটি অভিনব রূপ দান করেছে। কলহণের ইতিহাস-মন্ত্রিত কাব্যে, ক্ষেমেন্দ্রের বিদ্রূপ জর্জরিত পরিহাস লেখনীতে, বিদেশী পথিকের রোজনামচায় আর পুরাতত্ত্ব কীর্তির ধ্বংসাবশেষে—এই বিচিত্র জীবনধারার রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। সে জীবনধারা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি সমগ্রতার দিকে প্রবাহিত, উত্থান ও পতন, মাধুর্য্য ও তিক্ততা, মহত্ব ও শঠতায় কখনও বা উজ্জ্বল, কখনও বা ম্লান। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—এ জীবন বিশেষ ভাবে কাশ্মীরেরই।

১। জনতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় ভারতবর্ষকে তীর্থ বলেছেন—যেখানে বহু দেশ হতে বহু মানবের ধারা এসে মিশেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কবির এই যে কল্পনা, ভারতের উত্তর সীমায় কাশ্মীররাজ্য সম্বন্ধেও তা সমভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। স্মরণাতীত কাল হতে কত বিদেশীর ধারা যে এখানের পার্বত্য ভূমিতে নেমে এসেছে তার ঠিক নেই। বস্তুতঃ আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্য-স্থলে এসে সেই সব সুদূর অতীতের বহুবিচিত্র জাতির বহুতর নর-গোষ্ঠীর সমাবেশের পরিপূর্ণ হিসাব-নিকাশ নেওয়া একরকম অসম্ভব বললেই চলে। তবু এই আগমন আবির্ভাবের সমস্ত চিহ্ন আজকের দিনেও একেবারে মুছে যায় নি। 'রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে' যারা একদিন কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল তাদের স্মৃতি আজকের মানুষের শোণিতে শোণিতে মিশে আছে। আর শুধু জীবনেরই নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেশের ভাষায়, প্রতি-দিনের কথাবার্তায়, বর্তমান দিনের সংস্কৃতি জীবনেও সেই 'ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল' তাদের অস্তিত্ব কতকটা অন্ততঃ অনুভব করা যায়।

লিখিত ইতিহাসের চৌহদ্দির মধ্যে যে সকল নরগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে তাদের পরিচয় পাওয়া ততটা শক্ত নয়। গ্রীক আর শকগণ অস্থায়ী ভাবে কাশ্মীরের অংশ বিশেষের উপর শাসনকার্য্য চালালেও জন-জীবনকে তেমন কিছু প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু কুষাণদের সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না। কলহণ ত কাশ্মীরের উপর দীর্ঘস্থায়ী কুষাণ রাজত্বের কথা বলেই গেছেন। কুষাণগণ মধ্য এশিয়ার য়ুয়েচি জাতির অন্যতম শাখা। শ্রীনগরের অদূরবর্তী হারওয়ানে আনুমানিক তিন শত খ্রীষ্টাব্দের মাটির কারুকার্য্যখচিত টালি পাওয়া গেছে। এগুলিতে যে-সব মনুষ্যচিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাদের মধ্য এশিয়ার অধিবাসী বলেই মনে হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীর হূণ কবলিত হয়। হিউয়েন সাঙ আর কলহণ—দুজনেই কাশ্মীরের হূণ রাজা মিহিরকুলের নিষ্ঠুর কার্য্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। রাজতরঙ্গিণীতে অনেক হূণ নামও দেখতে পাওয়া যায়। হূণের পরে আসে গুর্জর, সম্ভবতঃ হূণ গোষ্ঠীরই এক শাখা। তিব্বত হতে প্রাচীনকাল থেকে যে কিছু কিছু লোক এসে কাশ্মীরে বসবাস করেছে, সে খবরও কলহণ দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের সমতল ভূমি হতেও বহুলোক কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। অশোকের সময় কাশ্মীর মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে-সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা হতে কিছু কিছু লোক খুব সম্ভব সেখানে গিয়ে থাকবে। অশোকের পরবর্তীকালে কি পরিমাণ লোক যে ভারতবর্ষের নিম্নভূমি হতে কাশ্মীরে গিয়েছিল তার কোনও হিসাব না থাকলেও কাশ্মীরের সংস্কৃত সাহিত্য আর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এ রাজ্যে ভারতবাসীর সমাগমের পরিচয় দেয়। বিখ্যাত পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত ও কবি কলহণের পূর্ব্ব-পুরুষগণ উত্তর-প্রদেশ হতে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। অভিনন্দের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ছিলেন বাংলা দেশের অধিবাসী।

অশোকের সময় থেকে যে-সব বিচিত্র জাতির নরগোষ্ঠী কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে তার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তারও আগে যারা বাইরে থেকে কাশ্মীরে এসেছে, তাদের কথা লিখিত ইতিহাসে নেই। শ্রীনগরের অদূরবর্তী বুরজাহোমে মাটি খুঁড়ে নব্যপ্রস্তরযুগের কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলেও সে যুগের অধিবাসী-দের পরিচয় তা থেকে পাওয়া যায় না।

এ পরিচয় লাভের জন্য অন্য কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কাশ্মীরের ভাষাকে, সে ভাষার শাখাপ্রশাখাকে বিশ্লেষণ

করে দেখা যেতে পারে যে, তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভাষাভাষীদের জাতিগত রূপ লুকিয়ে আছে কিনা। কাশ্মীরী ভাষায় অনেক সংস্কৃত কথা আছে বটে, কিন্তু কাশ্মীরী সংস্কৃতানুগ ভাষা নয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে এ রাজ্যের দীর্ঘকালের সংযোগের ফলেই এসব কথা এখানকার ভাষায় এসে পড়েছে। কাশ্মীরী ভাষা দর্দিভাষার একটি শাখা। দর্দিভাষা সংস্কৃত না হলেও আর্যভাষারই অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে এর নাম পৈশাচী। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ পৈশাচীকে অন্যতম প্রাকৃত ভাষা বলে ব্যাখ্যা করলেও আসলে এটি একটি খুবই প্রাচীন ভাষা, যে ভাষা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত নামে খ্যাতি লাভ করে, পৈশাচী সে ভাষার সহোদরা—দুহিতা নয়। সাধারণতঃ হিন্দুকুশ ও ভারত সীমান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ ভাষা কথিত হ'ত।

আচার্য গ্রীয়ারসন দেখিয়েছেন যে, পৈশাচী ভাষা আর্যভাষা হতে উদ্ভূত হলেও একে ইন্দো-এরিয়ান বা ইরাণীয় কোনটিরই অন্তর্গত বলা চলে না। দর্দি তথা কাশ্মীরীভাষায় কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। ইন্দো-এরিয়ান ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে যেমন তাদের কিছু মিল আছে, তেমনি ইরাণীয় ভাষার সঙ্গেও কতকটা সাদৃশ্য তাদের আছে। অথচ উপরোক্ত কোন ভাষাটিরই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার পূর্ণ সৌসাদৃশ্য নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় আর্যভাষা যখন মূল আর্যভাষা হতে বিচ্ছিন্ন হয় তার পরে, কিন্তু আর্যভাষা ইরাণীয় ভাষায় পরিণত হবার কিছু পূর্ব্বে দর্দিভাষা মূল আর্যভাষা হতে আলাদা হয়ে যায়। গ্রীয়ারসনের একটি ডায়াগ্রামের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টিকে স্পষ্টতর করা যেতে পারে।

```
        আর্য্য......................ইরাণীয়
          |                          |
     ইন্দো-এরিয়ান                    |
    ( ভারতীয় আর্য্য )                 দর্দি
```

ইতিহাসের কোন্ পর্ব্বের কোন্ অধ্যায়ে দর্দিভাষীরা মূল আর্যভাষীদের হতে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়, তা আমাদের অজ্ঞাত। তবে মনে হয় ইন্দো-এরিয়ানগণের ভারত প্রবেশের অল্পকাল পরেই এই দ্বিতীয় বিচ্ছেদ ঘটে। ইন্দো-এরিয়ানগণ কাবুল নদীর উপত্যকায় প্রথমে প্রবেশ করে, তারপর সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাণীয়ভাষীদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ পশ্চিমে মাড, পারস্য ও বেলুচিস্থানে প্রবেশ করে। আর্যগণের আর একটি শাখা পূর্ব্বে পামীর উপত্যকায় আশ্রয় নেয়। পামীর উপত্যকার ভাষা ঘলচা। দর্দিভাষায় ইরাণীয় ভাষার যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, ঘলচা ভাষায়ও সেগুলি বর্ত্তমান। আবার এই ইরাণীয় ঘলচা ভাষায় এমন অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে যেগুলির সঙ্গে ইরাণীয় ভাষাপ্রকৃতির কোনও মিল নেই, অথচ ইন্দো-এরিয়ান ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সেগুলি মেলে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, দর্দিভাষীদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রথমে পামীর উপত্যকায় বাস করলেও পরে পামীরের ঠিক নীচেই তাদের বর্ত্তমান বাসস্থান চিত্রল ও গিলগিটে প্রবেশ করে। চিত্রল ও গিলগিটের অধিবাসিগণ পরে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। দর্দিভাষাসমূহের অন্যতম, কাশ্মীরী, এদেরই ভাষা।

কিন্তু দর্দিভাষী জনগণই কি কাশ্মীরের আদিম অধিবাসী? না কি তার আগেও কাশ্মীরে কোনও জনগোষ্ঠী বসবাস করত? ভাষার বিশ্লেষণ করে এ প্রশ্নেরও উত্তর দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনেক সময় দেখেছেন যে, একটি শক্তিশালী ভাষা কোনও স্থানে প্রচলিত থাকলেও জনসাধারণের অংশবিশেষ অন্য একটি দ্বিতীয় ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাষাকে আঁকড়ে পড়ে আছে। যদি দেখা যায় এই শক্তিশালী ভাষাটি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের প্রচলিত ভাষাগুলিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা হলে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, স্বল্পসংখ্যক জনগোষ্ঠী ভাষিত দুর্ব্বল ভাষাটিই ঐ স্থানের আদিম ভাষা এবং ঐ ভাষাই ওখানকার প্রাচীনতম অধিবাসীদের পরিচয় বহন করছে। দর্দি তথা কাশ্মীরী ভাষা সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণ খাটে। যে অঞ্চলে দর্দিভাষাসমূহ প্রচলিত তার উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণে পুস্তু, ঘালচা প্রভৃতি ইরাণীয় ভাষা প্রচলিত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিভিন্ন ইন্দো-এরিয়ান ভাষা কথিত হয়ে থাকে, পূর্ব্বে বিভিন্ন তিব্বতী ভাষাভাষী অঞ্চল অবস্থিত এবং উত্তর-পূর্ব্বে যে ভাষার চল সেটি একটি অনার্য্যভাষা, হুনজা নগরের বুরুবাস্কি। এই সব ভাষাগুলির মধ্যে বুরুবাস্কির প্রভাবই দর্দিভাষায় বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়, অন্যগুলির প্রভাব খুবই সামান্য। বস্তুতঃ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সমগ্র দর্দিস্থানের ভাষায় নিম্নস্তরে বুরুবাস্কি ভাষার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কাশ্মীরী ভাষাতেও বহু বুরুবাস্কি বাক্য ও পদ অন্তর্লীন। বর্ত্তমানে যে অঞ্চলে বুরুবাস্কি কথিত ভাষা সে স্থান কাশ্মীর হতে বহু দূরে। স্বভাবতঃই অনুমান করা যায় যে, দর্দিভাষী কাশ্মীরীদের পূর্ব্বে হুনজানগরের অধিবাসীরাই কাশ্মীরে বসবাস করত।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন হলে শারীরতত্ত্বের আপেক্ষিক পরীক্ষা না করা পর্যন্ত জাতিতত্ত্বের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। বস্তুতঃ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীর বিজ্ঞানানুগ দেহপরীক্ষার ফলে নির্দ্ধারিত সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারাই কেবলমাত্র অনুমান করা সম্ভব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোন্ কোন্ নরগোষ্ঠীর কতদূর ও কি প্রকৃতির সংমিশ্রণ কাশ্মীরের পার্ব্বত্য-ভূমিতে ঘটেছে। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এমন কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নি। অধিকাংশ কাশ্মীরীরই গায়ের রং দেখা যায় পাতলা বাদামী, শরীরের গড়ন মাঝারি থেকে লম্বা ধরণের। সাধারণতঃ তারা লম্বামুণ্ড। তাদের কপাল বেশ চওড়া, মুখ লম্বাটে, মুখশ্রী সুন্দর, নাক ছোট হলেও বেশ উন্নত ও পাতলা। এই রকম দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধিবাসী আফগানীস্থান, চিত্রল, বালটিস্থান ও উত্তর পঞ্জাবে যথেষ্ট দেখা যায়।

এই জাতীয় নরগোষ্ঠীর আসল বাসস্থান হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্ব্বতের অন্তবর্ত্তী স্থানে। সেখান থেকে তারা উত্তর ভারত ও অন্যান্য স্থানে প্রবেশ করেছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা হতেও আমরা ঠিক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি। খ্যাতনামা নৃতাত্ত্বিক হ্যাডেল এই নরগোষ্ঠীকে ইন্দো-আফগান বলেছেন।

এই ইন্দো-আফগানগণ যারা এক সময় গিলগিট ও চিত্রল হতে কাশ্মীরে এসে প্রবেশ করে,তারাই দর্দি পৈশাচী ভাষীদের পূর্ব্ব-পুরুষ। বর্ত্তমান কাশ্মীরীদের অধিকাংশই এদের বংশধর। আফগানীস্থান হ'তে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকমের। এই নরগোষ্ঠীর সঙ্গে বাইরের অন্য নরগোষ্ঠীর খুব বেশী রকম সংমিশ্রণ হয় নি।

ইতিহাস অবশ্য ইন্দো-আফগান ব্যতীত আরও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর কাশ্মীর আগমনের সাক্ষ্য বহন করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল যাত্রা আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সেখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নি। কিন্তু অনেকে বসবাস করেছে ও তৎকালীন অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণও ঘটেছে। এই সকল নরগোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৈহিক বৈশিষ্ট্য আছে। শকজাতির মুণ্ড মাঝারি, কপাল নীচু, চোখ সরল, নাক লম্বা ও সুগঠিত, চিবুক বহির্মুখী। শকজাতী মূলতে স্তেপ অঞ্চলবাসী প্রাক্মঙ্গিক গোষ্ঠীভুক্ত হলেও কাশ্মীরে প্রবেশ করবার আগেই অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণে আসে। যুয়েচিগণ তুর্কি জাতিভুক্ত। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক হতে এরা ক্ষুদ্রমুণ্ড, এদের মুখ লম্বা ও ডিমের মত, চিবুক চওড়া, নাক লম্বা, চোখ মোঙ্গোলদের মত কালো, ঠোঁট পুরু, চুল কালো, গায়ের রং হলদে থেকে তামাটে বাদামী, দৈহিক গড়ন মাঝামাঝি রকমের। হূণগণ তুর্কি ও তুঙ্গাস গোষ্ঠীর মিশ্রণোদ্ভূত। তাদের শরীর অনেকটা যুয়েচিদেরই মত। তিব্বতীদের মুণ্ড মধ্যমাকৃতি, গায়ের রং হলদে ও গড়ন মাঝারি। ভারতবর্ষ হতে যে-সব নরগোষ্ঠীর আগমন কাশ্মীরে ঘটেছে তাদের দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও যথাযথ ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতেই নানা জাতির সঙ্গে তারা মিশে গেছে।

এই 'শত মানুষের ধারা'র সংমিশ্রণেই কাশ্মীরের 'মহামানব' বিবর্ত্তিত হয়েছে। এই বিবর্ত্তনের কতকটা গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা গেলেও অনেকখানি ইতিহাসই অগোচর রয়ে গেছে। আর যতদিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক ও শারীরতাত্ত্বিক পরীক্ষা গ্রহণ না করা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কাশ্মীরী জাতীর উপর এই সকল বিচিত্র নরগোষ্ঠীর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী সে সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

২। বর্ণভেদ ও বৃত্তি বিভাগ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—শাস্ত্রসংজ্ঞা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতের জনসমাজ এই চারটি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে কোনও কালে এই চারটি বর্ণভেদের মধ্যে জনসমাজ সীমাবদ্ধিত ছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীন ভারতের যে কোনও রাষ্ট্রের দিকে একটু অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই দেখা যাবে সেখানে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্য্যন্ত কত না স্তরভেদ। এর মধ্যে আছে অসংখ্য বর্ণ, সমাজে উচ্চতর হতে নিম্নতর নানাবিধ স্থান এদের; এরা যেন সমাজ সোপানের সিঁড়ি, একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে। প্রাচীন কাশ্মীরের বর্ণভেদ প্রথা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এখানে একদিকে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ গর্ব্বোন্নত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর অন্য প্রান্তে একেবারে অন্ত্যজ কয়েকটি গোষ্ঠী। আর এই দুই সীমা মিলিয়ে দেবার মত মধ্যবর্ত্তী বর্ণ কেউই নেই।

ব্রাহ্মণগণ যে প্রাচীন কাশ্মীরী সমাজে মহামান্য ছিলেন ও সেই হেতু আনুপাতিক সুখ সুবিধা ভোগ করতেন—দামোদরগুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র আর কলহণের নানা লেখার মধ্যে তা বেশ পরিস্ফুট। কাশ্মীরে এই বর্ণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও এটুকু জানা যায় যে, অনেক ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা হতে এখানে এসে বসবাস করেছে। ব্রাহ্মণদের উপার্জ্জনের পথ ছিল বহু রকমের। রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, রাজসরকারের বড় বড় চাকরী হতে আরম্ভ করে পূজা-পার্ব্বণে পৌরোহিত্যে, মন্দিরে পাণ্ডাগিরি ও আরও নানা প্রকার বৃত্তি ব্যবসায়।

নিম্নবর্ণের মধ্যে কলহণ নিষাদগণের উল্লেখ করেছেন। এরা ছিল কাশ্মীরের আদিবাসী। সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে জন্তুজানোয়ার শিকার যারা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে তাদের নিষাদ বলা হয়। প্রাচীন কাশ্মীরে মাঝিমাল্লার কাজে এ বর্ণের লোককে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়। আর একটি নিম্নবর্ণ কিরাত—বনেজঙ্গলে বাস করত এবং জন্তু জানোয়ার ধরে বা মেরে জীবিকানির্ব্বাহ করত। জনতত্ত্বের দিক হতে প্রাচীন সাহিত্যে কিরাত বলতে ব্রহ্ম-তিব্বতীয় নরগোষ্ঠীকেই বোঝায়। রাজতরঙ্গিণীর অনেক জায়গায় ডোম বলে আর একটি নিম্নবর্ণ উল্লিখিত হয়েছে। ডোমদের জীবিকা যে কি ছিল, তা ঠিক বোঝা যায় না। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল শিকারী। আবার অনেকে নাচ গান করে জীবন-যাপন করত। অলবেরুণী তাঁর ভারত বৃত্তান্তে উত্তর ভারতের তদানীন্তন বিভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বংশীবাদক ও গায়ক ডোমদের উল্লেখ করেছেন। অলবেরুণীর ডোম কাশ্মীরের ডোম হতে অভিন্ন কিনা বলা যায় না। রাজতরঙ্গিণীর পাতায় পাতায় সমাজে অন্ত্যজ ডোমদের প্রতি উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছে।

আর একটি নিম্নবর্ণ চণ্ডাল। এরা ছিল যোদ্ধা, অনেকেই খুব ক্রূর প্রকৃতির। দেহরক্ষী বা পাহারাদার কিংবা জল্লাদের কাজ ছিল এদের প্রধান বৃত্তি। ফাহিয়েনের ভারত বিবরণীতে আছে যে, চণ্ডাল সমাজে অস্পৃশ্য, শহরের বাইরে তাদের বাস। ঠিক এতটা না হলেও, প্রাচীন কাশ্মীরেও উচ্চবর্ণের অবিমিশ্র ঘৃণাই এদের ভাগ্যে জুটেছে।

এ ত গেল বর্ণভেদের কথা। এ ছাড়া আরও একটি শ্রেণী-বিভাগ ছিল অধিবাসীদের মধ্যে—সেটা জীবিকায় বৃত্তি অনুসারে।

প্রাচীন কাশ্মীরে সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকার স্বীকার করে নিয়েই সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যারা সমাজের ধনোৎপাদন করত, তারাই যে কেবল উৎপন্ন ধনের ভোগাধিকারী ছিল এমন নয়। বণ্টন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করত—সমাজে কোন্ শ্রেণীর হাতে কতটা উৎপন্ন ধন গিয়ে পড়বে। ভূমিকর্ষণ, শিল্প ও বাণিজ্য —এই তিন পথেই প্রধানতঃ ধনোৎপাদন হ'ত। যদিও কৃষক ভূমি-কর্ষণ করে ফসল ফলাত, রাজশক্তি ও সামন্ত শক্তি—জমির যারা ছিল মালিক, তাদের মর্জির উপর নির্ভর করত সে ফসল কে কতটা পাবে। তেমনি শিল্প ও বাণিজ্য ছিল ব্যবসায়ীদের হাতে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তারাও ছিল স্বাধীন। বণ্টন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রবিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ করত না।

স্বভাবতঃই ধনোৎপাদনের এই তিনটি পথকে কেন্দ্র করে সমাজে নানা বৃত্তি ব্যবসায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধনোৎপাদন ও বণ্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক যুক্ত নয়, এমন অনেক বৃত্তিধারীও সমাজে ছিল —যেমন সৈনিক, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, পুরোহিত বা চাকর-বাকর শ্রেণী। এই সব নানা বৃত্তিধারী বিভিন্ন শ্রেণী যে একই সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছিল এমন নয়। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব নানা বৃত্তি-ব্যবসায় তাদের শাখা-প্রশাখাসহ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল।

কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্যে জমির মালিক ভূম্যধিকারী ডামর-গণের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী এই শ্রেণীর উদ্ভবকাল। পরবর্তী সময়ে এরা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য (৮ম শতাব্দী) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারীদের উপদেশ দিয়েছেন যে, কোনও কৃষককে তার ভরণ-পোষণের জন্ত যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী জমি যেন না দেওয়া হয়। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি যদি তার থাকে, তা হলে এক বৎসরও কাটতে না কাটতেই সে শক্তিশালী ডামর হয়ে উঠবে আর তখন সে কাশ্মীররাজের পরোয়া করবে না। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী নাগাদ ডামরগণ এমনই শক্তিশালী একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে উঠে যে, রাজশক্তিকে শুধু উপেক্ষা করাই নয়, রাজার সিংহাসন পাওয়া-না-পাওয়াও নির্ভর করতে থাকে তাদেরই মর্জির উপর। কোনও কোনও শক্তিমান ও কূটবুদ্ধি নৃপতি ডামরগণকে দমন করবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় ডামরগণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সামন্ত গোষ্ঠীতে পরিণত, তাদের ধনসম্পত্তির সীমা নেই। বিশাল সৈন্ত-দল তাদের অধীনে। সারা কাশ্মীরে পরিব্যাপ্ত তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। কাশ্মীরের রাজা তাদের ভয়ে সর্বদা কম্পমান। ডামরগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের পছন্দমত ব্যক্তিকে রাজসিংহাসন দেবার জন্ত যুদ্ধে লিপ্ত। কাশ্মীররাজ তাদের হাতে পুতুলমাত্র।

ধনলাভের সঙ্গে সঙ্গে ডামরগণের সামাজিক মানমর্যাদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও কলহণ তাদের 'কবন্ধ-ডাকাত' বা 'অস্ত্র হাতে চাষা' বলে বিদ্রূপ করেছেন, তথাপি হিন্দুরাজত্বের শেষভাগে দেখতে পাই রাজ পরিবারের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক আদান-প্রদান চলছে। ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকা গ্রন্থে সমর সিংহ নামে একটি সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ ডামর চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়।

একদিকে কাশ্মীররাজ অন্তদিকে কৃষকগণের সঙ্গে ডামরগণের ভূমিসংক্রান্ত সম্বন্ধ যে কি রকম ছিল, তা জানা যায় না। প্রজা-দের কাছ হতে পাওয়া খাজানা, অর্থমূল্যে বা শস্তরূপে, যাই-ই হোক না কেন, ডামরগণের প্রধান আয় ছিল। কোনও কোনও ডামর ব্যবসাবাণিজ্যও করত।

যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফলে ডামর সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে, সেটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। অনেক সময় বলা হয় কাশ্মীরের সিংহাসনলাভের জন্ত রাজার মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে প্রায়শঃই যে মারা-মারি চলত, তারই ফলে ডামরগণের উর্দ্ধতন হয় ও রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা অসীম শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ বিশ্লেষণ আংশিক ভাবে সত্য। কিন্তু সর্বথা সত্য নয়। অবন্তী-বর্মা ও রাণী দিদ্দার মত শক্তিশালী শাসক ডামরগণ যথেষ্ট শক্তিসঞ্চার করবার পূর্বেই তাদের সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করতে চেষ্টার কসুর করেন নি। আরও পরে, অনন্ত, কলস ও হর্ষের মত খ্যাতিমান রাজারাও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এই সামন্ত গোষ্ঠীকে বিনষ্ট করতে। কিন্তু কেউই যে সফল হতে পারেন নি তার কারণ কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে ডামরগণের অবস্থিতির পক্ষে কাজ করে চলেছিল। কুষাণ রাজত্বকালে কাশ্মীর ছিল মধ্য এশিয়া ও ভারতের বাণিজ্য চলাচলের পথে একটি প্রধান ঘাঁটি। কিন্তু হুণ আক্রমণে মধ্য এশিয়ার পণ্যবাহী পথঘাট যখন বন্ধ হয়ে গেল, কাশ্মীরের বাণিজ্যিক চরিত্রও তখন বদলাল।

অতঃপর অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর প্রধানতঃ কৃষির উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হ'ল। কৃষির উপর একদিক থেকে জোর পড়তে লাগল, অন্তদিকে প্রচলিত জমিদারী ব্যবস্থানুসারে কৃষক অর্থাৎ যে জমি স্বহস্তে চাষ করবে, সে ছিল ভূম্যধিকারীর প্রজা। এই দুই অবস্থা স্বভাবতঃই একটি ভূমিনির্ভর সামন্তগোষ্ঠীর উদ্ভবে সাহায্য করল। তারপর হুণ আক্রমণের কিছুকাল পর হতে যে সামান্ত বাণিজ্যটুকুও পুনরায় চলছিল, মধ্য-এশিয়ার পথ দিয়ে, বন্ধ হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে, মুসলমান শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। ধনোৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন হ'ল ভূমি। সমাজে বর্দ্ধমান জনসংখ্যা কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাব আর ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোক নিয়োগের কোনও সম্ভাবনা না থাকা, পরিশেষে দেশে যে পরিমিত কর্ষণযোগ্য ভূমি ছিল, তার উপরই সমগ্র দেশের উদ্বৃত্ত জনসমাজকে টেনে আনল। জমির রাজস্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল, আর সে

জমি যাদের হাতে এল, স্বভাবতঃই তারা ধনশালী দুর্ধর্ষ এক সামন্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হ'ল।

কৃষিকার্য্যই ছিল কাশ্মীরের বৃহত্তর জনসমাজের ভরণ-পোষণের একমাত্র পথ। কৃষকগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে দুঃখের বিষয়, তেমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তাদের নিজস্ব জমি ছিল কিনা, না থাকলে তারা ভূম্যধিকারীর জমিতে চাষ করত কিনা, তার বদলে কি তারা পেত, ডামরগণের অধীনে যে-সব জমি ছিল না, যে-সব জমির রাজস্ব রাজকর্ম্মচারী আদায় করে রাজসরকারে জমা দিত, সেই কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি ছিল—এ সব প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া শক্ত। তবে কৃষকগণ যে অতি-কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করত এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাদের হাতেই প্রধানতঃ দেশের ধনোৎপাদন ঘটত, কিন্তু সে ধন সম্ভোগে অধিকার তাদের ছিল না। এক দিকে ডামর অন্য দিকে রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণের শোষণ চলত অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের উপর। ক্ষেমেন্দ্র বলছেন যে, শরৎকালে যখন পাকা ধানে মাঠ ভরে যেত, তখনই ছিল রাজাকে রাজস্ব দেবার সময় আর এই রাজস্ব আদায় উপলক্ষ্য করে কায়স্থগণ বেশ দু'পয়সা করে নিত। কোনও কোনও রাজা আবার এমন অত্যাচারী ছিলেন যে, কৃষকদের জন্য উদ্বৃত্ত কিছু না রেখেই মাঠভরা শস্য রাজভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে তুলতেন, বছরের উপর বছর। কহ্লণ বর্ণনা দিয়েছেন যে, যখন সুস্বাদু মাংস ও শীতল সুগন্ধ মদ্যসহযোগে রাজপারিষদগণের ভোজন-পর্ব্ব চলত, তখন গ্রাম্য কৃষকগণের ভাগ্যে জুটত আকাঁড়া চালের ভাত, শুকনো যবের রুটি আর তিতকুটে শাক। জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচারের ফলে সামান্য কৃষকের জীবন এতই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, যে, যখনই দেশে কোনও অন্তর্বিদ্রোহ ঘটত, চাষবাস ছেড়ে তলোয়ার হাতে তখনই সে ছুটত সেই বিদ্রোহে অংশ নিতে।

জনসাধারণের একটি অংশ নানাপ্রকার কারুশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। শিল্প-সংক্রান্ত যে-সব বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে—তাঁতি, স্যাকরা, কামার, পাথর-খোদাইওয়ালা ভাস্কর, কুমোর, চামার ইত্যাদি।

সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প বয়নের জন্য কাশ্মীরের খ্যাতি আজকের নয়। শ্রীনগরের অদূরবর্ত্তী হারওয়ানের ধ্বংসাবশেষে স্বচ্ছ আবরণে সজ্জিত যে নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর কাশ্মীরে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নকারীর অভাব ছিল না। শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় পশমী বস্ত্র বয়নের দিকেই নজর ছিল বেশী। ক্ষেমেন্দ্র ও কহ্লণের লেখায় স্থূল কম্বল, লোহিত কম্বল, কুথা, প্রাবার প্রভৃতি পশমী বস্ত্রের নাম দেখতে পাওয়া যায়। কামার ত সভ্য সমাজের একটি অপরিহার্য্য সম্প্রদায়। জমি চষবার যন্ত্রপাতি থেকে গৃহস্থ জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় খন্তি সাঁড়াশী পর্য্যন্ত সব কিছুই কামারের গড়া। ছোরা, তলোয়ার, তীর, বর্শা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রও কামারেরই তৈরি। পাথরের যে-সব মূর্ত্তি প্রাচীন পুরাকীর্ত্তির মধ্যে পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় পাথরে-খোদাই জনসমাজের একটি অংশ বৃত্তি হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। রাজপরিবারের ও উচ্চকোটি জীবনযাত্রার যে বর্ণনা কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্যে আছে, তা থেকে সমাজে স্বর্ণকার ও মণিকারগণের উপস্থিতি অনুমান করা যায়; অনেক প্রাচীন মূর্ত্তিও বিশদ অলঙ্কৃত আর সে-সব অলঙ্কার যে বাস্তব জীবনেও ব্যবহার করা হ'ত, সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ কি আছে! প্রাচীনকালের মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি পাওয়া গেছে কাশ্মীরের কয়েকটি জায়গায় পুরাতাত্ত্বিক খনন কাজের সময়। কহ্লণের কাব্যে কুমোরণীর নাম পাওয়া যায়। চামার, ছুতোর, খনির শ্রমিক প্রভৃতি আরও কয়েকটি শিল্প কেন্দ্রিক বৃত্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ রাজতরঙ্গিণীতে আছে।

বিদেশের সঙ্গে কাশ্মীরের বাণিজ্য কুষাণযুগে ত বটেই, হয়ত তার কিছু আগে থেকেই চলছিল। ব্যবসা বাণিজ্য চলার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কাশ্মীরের বণিক-সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, কহ্লণের বক্তব্য অনুসারে বণিকগণ কাশ্মীরী সমাজে সংখ্যায়ও যেমন বহুল, তেমনি সমৃদ্ধও। বণিকের অট্টালিকার ঐশ্বর্য্যের কাছে রাজার প্রাসাদও ম্লান। দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমত গ্রন্থেও (অষ্টম নবম শতাব্দী) বণিক ও শ্রেষ্ঠী সমাজের ধন-গৌরবের বিবরণ আছে। সপ্তম হতে নবম শতাব্দী—কাশ্মীরের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধির যুগ। কাশ্মীরের রাজগণ এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে, এমনকি উত্তর-ভারতের কোনও কোনও অংশে বিজয় অভিযান চালিয়ে একটি বৃহত্তর কাশ্মীর সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াস পান। বিজিত অঞ্চলসমূহে এবং সমসাময়িক অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সংযোগ সাধিত হওয়ায় সেই সব দেশে বাণিজ্য বিস্তারেরও সুযোগ ঘটে। বণিক-সমাজের সমসাময়িক সমৃদ্ধি তারই ফল।

দশম শতাব্দীর পর থেকে বাণিজ্যিক ব্যবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বণিকসম্প্রদায়েরও পতন ঘটে। সমাজে আর্থিক শ্রেষ্ঠত্ব হেতু বণিকের যে স্থান ছিল, সে স্থান ভূমি কেন্দ্রিক ডামরের অধিকারে আসে। বণিকগণ প্রধানতঃ টাকা লেন-দেন করে জীবিকা নির্ব্বাহে তৎপর। বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা আর বিশেষ শোনা যায় না। শুধু তাই নয়, কহ্লণের বিদ্রূপাত্মক বাণী "ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বভাবতঃই জোচ্চোর", "তহবিলতছরূপকারী বণিক ধর্ম্মকথা শুনতে সদাই উৎসুক" ইত্যাদি থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, অসৎ-প্রবৃত্তি বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সময়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় ফলে এবং অন্তর্বাণিজ্যের বিশেষ কোনও সুযোগ না থাকায় টাকা লেন-দেনই এ যুগের বণিকগণের প্রধান উপজীব্য। আর টাকা লেনদেনের সূক্ষ্ম পরিধির মধ্যে সৎপথে যথেষ্ট অর্থ লাভের, যা বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সহজেই ঘটতে পারত, সুযোগ কোথায়! তাই রাতারাতি লাভের লোভে লুব্ধ দশম শতাব্দী-উত্তর বণিক-সমাজে এত অসত্য ও বঞ্চনার দেখা মিলছে, এমন মনে করা অন্যায় হবে না।

ধনোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন সব জীবিকার মধ্যে উল্লেখ করা যায় শিক্ষক, গণক, চিকিৎসক, নাপিত, পুরোহিত, সেনাদলের সাধারণ সৈন্য প্রভৃতি। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেও আবার অর্থ ও শিক্ষা-দীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরভেদ ছিল।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ব্যতীত আর একটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তি-ধারী সম্প্রদায় ছিল জনসমাজের মধ্যে। রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারী। রাজকর্মচারীদের মধ্যেও অসংখ্য স্তরভেদ ছিল। সর্ব্বাধিকারী বা প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, কম্পনেশ বা সৈন্যাধ্যক্ষ, মণ্ডলেশ বা প্রদেশপাল, সামন্ত নৃপতি, রাজসভার পণ্ডিত ও কবি, রাজার আত্মীয়বর্গ এ সব নিয়ে একটি উচ্চতর রাজপুরুষ সম্প্রদায় ছিল। এদের নীচে ছিল আমলা সম্প্রদায়, যাকে কাশ্মীরের প্রাচীন সাহিত্যে কায়স্থ বলা হয়েছে। কায়স্থগণের মধ্যে গৃহকৃত্য-মহত্তম, পরিপালক, মার্গেশ, গঞ্জাধীপ, নগরাধীপ, শৌল্কিক, নিয়োগী, গ্রামদিবির, গঞ্জদিবির, নগরদিবির, অধিকরণ-লেখক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর দেখা মেলে।

প্রাচীন কাশ্মীরে কায়স্থ অর্থে কোনও বর্ণভিত্তিক সম্প্রদায় বোঝায় না। সকল শ্রেণীর রাজকর্মচারীর প্রতি কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। কলহণ বলছেন যে, একজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ হতে পারে। কায়স্থগণের মধ্যে পদভেদে নানা শ্রেণী ছিল। একজন নিম্নপদাধিকারী কর্মচারী কালক্রমে উচ্চ পদ পেতে পারত। সবচেয়ে বড় পদ ছিল গৃহকৃত্য মহত্তমের।

কায়স্থগণের অসৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে কাশ্মীরের প্রাচীন লেখকদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। ক্ষেমেন্দ্র খল, নীচ, কুটিল, শঠ প্রভৃতি নানা বিভূষণে তাদের ভূষিত করেছেন। বস্তুতঃ অসদুপায়ে অর্থ-সঞ্চয়ে প্রাচীন কাশ্মীরের কায়স্থ সম্প্রদায়ের জোড়া নেই। রাজশক্তির স্থিতিস্থাপকতার অভাব, রাজার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীরও অদল-বদল, কারণে অকারণে নিম্নপদস্থ কর্মচারীর পদচ্যুতি—এক কথায় নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাই কায়স্থগণের অসৎ পথ গ্রহণ করার প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তিনটি তরঙ্গে কায়স্থগণের কোনও উল্লেখ নেই। চতুর্থ তরঙ্গ হতে কায়স্থগণের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং প্রতি তরঙ্গে নূতন নূতন বহুবিধ পদের উল্লেখ থেকে রাষ্ট্রে কায়স্থগণের ক্রমবৃদ্ধি বেশ বোঝা যায়। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আমলাতন্ত্র অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরেছে সমস্ত সমাজ-জীবনকে। ভূমিই যখন সমাজের ধন উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আর সেইহেতু রাজস্ব লাভের প্রধান স্থল, তখন ভূমি হতে আমলা-বর্গের সাহায্যে যতদূর সম্ভব রাজস্ব আদায় করা ছাড়া রাজশক্তির অর্থসংগ্রহের অন্য কোন উপায়ও ছিল না। এক কথায় ভূমি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক জীবনই কায়স্থ সম্প্রদায়ের ক্রমবর্দ্ধমানতার মূল কারণ।

নারীর অবস্থা

নারী-জীবনের শৈশবকাল পিতৃগৃহেই কাটত। মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো হ'ত। নবম শতাব্দীর সাহিত্যিক দামোদরগুপ্ত মেয়েদের অধীত বিষয়সমূহের মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র, বাৎস্যায়ন, বিটপুত্র, দত্তক ও রাজপুত্রের কামশাস্ত্র, বিশাখিলের কলাশাস্ত্র, দন্তিল রচিত সঙ্গীতশাস্ত্র, বৃক্ষায়ুর্বেদ, অঙ্কনবিদ্যা, সূচীশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, ধাতু-শিল্প, রন্ধন-প্রণালী, মৃত্তিকা পুত্তলি-নির্মাণ ও নৃত্যগীতের উল্লেখ করেছেন। দামোদরগুপ্ত অবশ্য গণিকা সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রণালীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে এই সব তথ্য প্রদান করেছেন, তবু সাধারণ গৃহস্থ জীবনেও যে মেয়েদের অনুরূপ পঠন-পাঠনই চলত, এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না। কলহণ কাশ্মীরী রমণীগণের গুণগান করতে গিয়ে বলছেন যে, তাঁরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই ব্যুৎপন্না ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজপরিবারের মেয়েদের শাসনকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধেও কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হ'ত। রাণী সুগন্ধা ও রাণী দিদ্দা যে রকম কৃতিত্বের সঙ্গে শাসনকার্য্য চালিয়ে ছিলেন, তা থেকে মনে হয় সিংহাসনে আসবার পূর্ব্বেই এ বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

মেয়েদের ঠিক কত বছর বয়সে সাধারণতঃ বিয়ে হ'ত, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে রাজতরঙ্গিণী পড়লে মনে হয় যে, ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে মেয়েদের সম্ভবতঃ বিয়ে হ'ত না। ক্ষেমেন্দ্রের দেশোপদেশেও এমন দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যা থেকে মেয়েদের একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হ'ত বলে মনে হয়।

উচ্চকোটি জীবনে পুরুষের বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। মেয়েদের এক স্বামী বর্ত্তমানে অন্য স্বামী গ্রহণের কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বিধবাগণ বিলাসবর্জ্জিত কঠোর জীবনই যাপন করতেন।

সতীদাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল কাশ্মীরে। একাদশ শতাব্দীতে রচিত কথাসরিৎসাগরে সতীদাহ ঘটনার অনেক উল্লেখ আছে। কলহণের রাজতরঙ্গিণীতে রাজা বা রাজপুরুষের মৃত্যুর পর পত্নীগণ তাঁদের মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাচ্ছেন এমন বহু কাহিনী বিবৃত হয়েছে, কিন্তু শুধু পত্নীই নয়, প্রিয়জন—মা, বোন, সহচর বা সহচরীও অনেক সময় মৃতব্যক্তির অনুগমন করেছেন—এমন দৃষ্টান্তও কলহণ দিয়েছেন।

দেবদাসী প্রথা অতি প্রাচীনকাল হতেই কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার মাধ্যমে, দেবতার কাছে নারীর আত্মসমর্পণের মুখোসের অন্তরালে কামলীলার যে উদ্দাম প্রবাহ চলত, কাশ্মীরের প্রাচীন লেখকগণ তার বর্ণনা দিতে ভোলেন নি। দেবতার সেবার জন্য নয়, মানুষের ভোগের জন্যই যে মন্দিরে দেবদাসী রাখা হ'ত, সে সম্বন্ধে কলহণ একটি চমৎকার গল্প বলেছেন। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী; ললিতাদিত্যের পিতা দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য তখন কাশ্মীরের রাজ-সিংহাসনে। তিনি কয়েকদিনের জন্য এক ধনী বণিকের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে বণিক পত্নী নরেন্দ্র-প্রভার অপরূপ রূপ লাবণ্যে তিনি মুগ্ধ হন। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেও বণিক-পত্নীর মোহ আর তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন না। সুন্দরী পরস্ত্রীকে অঙ্কশায়িনী করবার দুর্দ্দম বাসনায় একদিকে তিনি

যেমন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, অন্যদিকে লোকনিন্দার ভয়ে জোর করে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতেও দ্বিধা বোধ করতে লাগলেন। এমন সময়ে সেই বণিক রাজার মনোগত ইচ্ছা জানতে পেরে অনুরোধ জানালেন তাঁকে, নরেন্দ্রপ্রভাকে রাজরাণী রূপে গ্রহণ করতে। আর তাতেও যদি রাজার কোনও আপত্তি থাকে তা হলে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, স্বীয় পত্নীকে তিনি কোনও মন্দিরে দেবদাসীরূপে রেখে যাবেন। কারণ দেবদাসীকে রাজা সম্ভোগ করতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। কোনও লোকনিন্দার ভয় আর তখন থাকে না।

দামোদরগুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র, কলহণ প্রভৃতির রচনায় রাজপরিবার, রাজপুরুষ বা অভিজাতবর্গের জীবনযাত্রার যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—তা থেকে দেখা যায় যে, অন্ততঃ উচ্চকোটি জীবনে নৈতিক মান মোটেই উঁচুদরের ছিল না। সমাজে পতিতাবৃত্তির বহুল প্রচলন ছিল।

মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত দু-একটি ঘটনা থেকে অনুমিত হয় যে, মেয়েরা ভূসম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারতেন। রাজসিংহাসনে নারীর অধিকার অবশ্যই স্বীকৃত হ'ত।

৪। দৈনন্দিন জীবন

একটি মহৎ সাহিত্য রচনা বা কয়েকটি ললিত শিল্প সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে কোনও জাতির সংস্কৃতির পূর্ণ পরিমাপ করা যায় না। জাতির সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে তার প্রতিদিনের জীবনধারায়, অশনে-বসনে, আচার-ব্যবহারে, ক্রিয়া-কলাপে। কোনও জাতির মানস-সংস্কৃতি তার সমগ্র জীবনচর্চ্চার মধ্যে বিধৃত।

প্রাচীন কাশ্মীরীর প্রধান খাদ্য ছিল ডাল ও ভাত। প্রাচীন কাশ্মীরী সাহিত্যে শালি ধান ও মুদ্গ, কুলত্থ, চর্ণ ও মসুর ডালের উল্লেখ আছে। চাল থেকে যে-সব খাদ্যবস্তু তৈরি হ'ত, তার মধ্যে পিঠে, চিনি দিয়ে পাক করা ভাত, আখের রসে ফোটানো ভাত ও চালের গুঁড়ির খাবার দেখতে পাই। যবের রুটি ও যব থেকে তৈরী পিঠেও লোকে খেত। উৎসব অনুষ্ঠানে চাল ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি রাঁধা হ'ত। কাশ্মীর ফলের জন্য চিরকালই বিখ্যাত। হিউয়েন সাঙ এই পার্ব্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন ফলের মধ্যে নাসপাতি, পিচফল, এপ্রিকট ও আঙ্গুরের নাম করেছেন। কলহণ এখানকার সুমিষ্ট দ্রাক্ষার প্রশংসায় ত পঞ্চমুখ।

দুধ ছিল একটি প্রধান খাদ্য। গরুর দুধ ও মোষের দুধ—দুয়েরই চল ছিল। দুধ থেকে উৎপন্ন হ'ত ঘি, মাখন, ক্ষীর ও দই। মাক্ষিক বা মধু ও শর্করা বা চিনি খাদ্যবস্তুতে মিষ্টান্নের যোগান দিত।

নুন সহজে মিলত না। ক্ষেমেন্দ্রের রচনা থেকে মনে হয় কেবল ধনী ব্যক্তিরাই যথেচ্ছ লবণ ব্যবহার করতে পারতেন। তরকারীর মশলার মধ্যে মরিচ, আদা ও হিং-এর নাম দেখতে পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও রসুনে সহযোগে রান্না খাবার বিশেষ পুষ্টিকর বলে মনে করা হ'ত।

কাশ্মীরের অধিবাসী মাছ-মাংসের ভক্ত ছিল। মৎস্যযূষ বা মৎস্যসূপ দৈহিক শক্তি সঞ্চারের জন্য বিশেষভাবে আদৃত হ'ত। নীলমত পুরাণে বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে মাংস খাওয়ার বিধান আছে। নানারকমের পাখী, মুরগী ও ভেড়ার মাংসের উল্লেখ ত সাহিত্যের পাতায় মেলে। এ ছাড়া ছাগ-মাংসও সম্ভবতঃ খাওয়া হ'ত। কলহণের বিবরণ থেকে মনে হয় একাদশ শতাব্দীতে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে শূকর মাংস খাওয়াটা একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর্য্যটক মার্কোপোলো বলে গেছেন যে, কাশ্মীরের জনসাধারণ চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য মাংস সহযোগে গ্রহণ করত।

মদ্যপান খুবই জনপ্রিয় ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে মদ্যাসক্ত অসংখ্য চরিত্রের দেখা মেলে। নীলমত পুরাণে বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে মদ্যপান আবশ্যিক বলে বিধান দেওয়া আছে। দ্রাক্ষারস ও ইক্ষু-রস থেকে মদ তৈরী হ'ত।

প্রাচীন কাশ্মীরীর বসনভূষণ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও পুরাতাত্ত্বিক উভয় প্রকারেরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পুরুষের বসন তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—নিম্নাঙ্গে অধরাংশুক, তার উপরে অঙ্গরক্ষক এবং মাথায় শিরঃশাট। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে যখন এখানে এসে-ছিলেন তখন অধিবাসীদের চামড়া ও লিনেনের জামাকাপড় পরতে দেখেছিলেন। শীতপ্রধান দেশে পশমী জামাকাপড় স্বভাবতঃই ব্যবহৃত হ'ত। কলহণ এক রকমের পশমী কাঁথা (কুথা) ও জামার (প্রাবার) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলতে ভোলেন নি যে, ভাল যা-কিছু কাপড় জামা তা কেবল বড়লোকেরাই ব্যবহার করতে পেত। গরীবের ভাগ্যে জুটত জন্তুর ছাল বা মোটা শক্ত কম্বল।

বিলাসী ব্যক্তিবর্গের মাথায় লম্বা চুল রাখার রীতি ছিল। অনেকে আবার তাতে চিরুণী গুঁজত। মাথায় পাগড়ী বাঁধার প্রচলন ছিল। ধনী ব্যক্তিরা রেশমের নানারকম শিরোপা ব্যবহার করত। পুরুষগণ মেয়েদের মতই গহনা পরত। আংটি, হার, কুণ্ডল ও বলয় পুরুষের অলঙ্কারের মধ্যে দেখতে পাই। চর্ম্ম-পাদুকার চল ছিল। অনেক সময় জুতার বাইরে নানারকম পুষ্পালঙ্কারের কাজ থাকত। তলায় থাকত লোহার পাত পেটা। ক্ষেমেন্দ্র ময়ূরোপানৎ নামক একপ্রকার মনোরঞ্জন পাদুকার কথা বলেছেন। কাষ্ঠ-পাদুকারও ব্যবহার ছিল।

মেয়েদের পোশাক প্রধানতঃ দু' ভাগে বিভক্ত ছিল—শাড়ী ও জামা। কাশ্মীররাজ হর্ষের রাজত্বকালে অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের জামার হাতা কনুইয়ের তলায় নামত না। নিম্নাঙ্গের বসন আঁট করে সেঁটে চলত। কখনও কখনও মেয়েরা মুখ ঢাকা দেবার জন্য ভেল ব্যবহার করত। অলঙ্কারের মোহ থেকে কাশ্মীরী রমণী মুক্ত ছিল না। হার, কঙ্কণ, কেয়ূর, পারিহার্য্য ও কুণ্ডল ত

ছিলই। এ ছাড়া রাজা হর্ষের সময়ে ফ্যাশনপ্রিয় মহিলাগণ মাথায় পরবার জন্য স্বর্ণ-শেতকপত্রাদি, কপালে তিলক ও বেণীর নীচে ঝোলাবার জন্য কেশান্তবদ্ধ হেমোপবীতকের আমদানী করেন। প্রসাধনের ক্ষেত্রে কর্পূর, চন্দন, জাফরাণ, আলতা ও কাজলের ব্যবহার ছিল। মেয়েরা লম্বা বেণী অথবা খোঁপা বাঁধত ও ফুল দিয়ে তা সাজাত।

শাড়ী ছাড়া পাজামারও প্রচলন ছিল, অঙ্গবাস হিসেবে মেয়েদের মধ্যে। হারওয়ানের মৃন্মূর্তি সে সাক্ষ্য বহন করছে। উসকুরে যে-সব মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে তার গায়ে হার, বালা প্রভৃতি অলঙ্কার আছে। পাণ্ড্রেথান বা পুরাণাধিষ্ঠানে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তির মাথায় ত্রিকোণ মুকুট আছে। অনুরূপ মুকুট যে কাশ্মীরের রাজগণও ব্যবহার করতেন, কলহণের লেখায় সে তথ্য পাই।

খেলাধূলার মধ্যে দাবা ও পাশা বেশ জনপ্রিয় ছিল। জুয়াখেলাও খুব চলত। দামোদরগুপ্ত কন্দুক ক্রীড়ার কথা বলেছেন। শিকার ছিল অত্যন্ত প্রিয় ব্যসন, বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। হারওয়ানের একটি মাটির টালিতে হরিণ-শিকারে উদ্যত অশ্বারোহীর মূর্তি খোদিত হয়েছে। কলহণ রাজা ও রাজপুরুষগণের শিকার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে শৃগাল শিকারের কথা বলেছেন।

নৃত্যগীতের খুবই আদর ছিল প্রাচীন কাশ্মীরী সমাজে। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর হারওয়ান টালিতে বাদ্যরতা গায়িকা ও নৃত্যচঞ্চল পুরুষের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। নীলমত পুরাণে উৎসবে পূজায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুষ্ঠান অবশ্যকরণীয় বলে লিখিত হয়েছে। বিলহণ তাঁর স্বদেশের রমণীর অভিনয় পটুতার প্রশংসা করেছেন। কলহণ বর্ণনা দিয়েছেন নিত্য নৃত্য-গীত অভিনয়-মুখরিত আলোকোজ্জ্বল রাজ-প্রমোদসভার। প্রাচীন কাশ্মীরে ভরতের নাট্যশাস্ত্র পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বইখানার উল্লেখ করেছেন সেখানকার প্রাচীন লেখকগণ।

দামোদরগুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁর দেশে আরামপ্রদ প্রেক্ষাগৃহের অভাব ছিল না। সে প্রেক্ষাগৃহের বসবার আসনগুলি ছিল চামড়ার গদী দিয়ে বাঁধান। দর্শকদের মধ্যে ধনবান শ্রেষ্ঠীপুত্রের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে এই সুসমৃদ্ধ প্রেক্ষাগৃহগুলি কেবলমাত্র বড়লোকদের জন্যই ছিল, এমন মনে করলে অন্যায় হবে না। কলহণের একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সাধারণ লোক খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখত। তার পর হঠাৎ যখন বৃষ্টি নামত তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হ'ত। দারিদ্র্যের সত্যই অনেক দোষ।

রিক্তা বন্যা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আসে নি গ্রামের ইতিহাসে কভু, এমন বৃহৎ বান
প্রণাম করিনু, করিনু তাহার প্রলয়-সলিলে স্নান।
সমভূমি করে দিয়ে গেছে গ্রাম সারা,
পল্লীবাসীরা সকলেই গৃহহারা,
বরুণের জয়যাত্রা করেছে বেশী কিছু হয়রান।

২

ভাঙিয়া ভাসিয়া গেছে ঘর বাড়ী তাতে দুখী না মন,
বিস্ময়ে হেরি সুনীল জলের ভয়াল আস্ফালন।
এ তো অজয়ের নহে রাঙা জল নহে,
তাহাতে দয়া ও দরদের কণা রহে,
এ যে বিদ্রোহ রুদ্ধ জলের, ক্রুদ্ধ এই প্লাবন।

৩

বিবাক্ত বারি পচায়ে ধসায়ে চলে গেল দুর্বার,
আকৃতি তাহার জানিতে দিলে না পরিধি সে হিংসার।
যেন নীল মেঘ সুপ্ত অশনি ভরা—
ক্রুর মানবের কুটিতে এ কি গড়া?
উর্বরতার 'পলি' নাই এতে, লভিল না কিছু ধরা।

৪

অতি প্রবলের সংগ্রাম যেন—অর্থ পাইনে খুঁজে,
দর্পীর থাকে যুক্তি কি কভু? দম্ভে সে যায় যুঝে।
স্ফীত শক্তির ব্যয়েই তাহার সুখ,
সে তো বুঝিবে না, বুঝে না কাহারো দুখ,
ঢক্কানিনাদে বলি দেয়—আর মাৎসর্যকে পূজে।

৫

হেরিনু বিপুল অকূল পাথার, লয়ের নিদর্শন,
এঁকে দিয়ে গেল চক্রবালের চক্ষে নীলাঞ্জন।
ভীম 'সগরায়' উঠিল ঝঞ্ঝা ঝড়,—
ডুবিল সপ্ত ডিঙা সহ মধুকর,
অভাগার কই 'কমলে কামিনী' হ'ল না তো দর্শন

৬

কাঠুরিয়া সাথে করিলাম বাস, ক্লিষ্ট চিন্তা সনে,
ভাগ্য হ'ল না সুরভি স্রোতার ভক্ত আস্বাদনে।
ঘোর অমানিশি শবসাধনায় গেল,
কোথা শিবানীর খণ্ড চন্দ্র আলো?
অমৃতের কোনো খপর নাইকো এ সাগর মন্থনে।

দ্বিরাগমন

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

জামাই এসেছে রায়বাড়ীতে।

রায়বাড়ীতে জামাই আসা এমন কিছু নূতন ঘটনা নয়। দু' মেয়ের বিয়ে হয়েছে, কলকাতাতেই শ্বশুরবাড়ী। স্বামী-পুত্রসহ প্রায়ই তারা আসে, দু'চার দিন থাকেও। কিন্তু গোবিন্দর আসাটা অভাবনীয়। সত্য বলতে কি তার কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। তাই দু' বছর পরে যখন গোবিন্দ দ্বিতীয়বার রায়বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল, রায়গিন্নীর মুখে তখন শুধু বিস্ময়ই ফুটে উঠল না, গোবিন্দকে চিনে নিতে তাঁদের একটু বেগও পেতে হ'ল।

গোবিন্দ সেজন্যে প্রস্তুত ছিল। অবসরপ্রাপ্ত জজ রায়মশাই যে বিশেষ ধনী নন ঘটক সেকথা তাদের কাছে গোপন করে নি সম্বন্ধ করবার সময়। কিন্তু তিনি যে এতটা গরীব গোবিন্দ তা জানত না। বরবেশী গোবিন্দ প্রথম রায়বাড়ীতে এসে একটু বিস্মিতই হয়েছিল। রাস্তায় দুটো চারটে গাড়ীর প্রত্যাশা অবশ্য সে করে নি, কিন্তু সদর দরজায় যে একটা বাত্তি পর্য্যন্ত নেই। আর বাড়ীর ভিতরে বাইরে কোথাও নেই এতটুকু কোলাহলও। বরকে নিয়ে রায়মশাইয়ের সাদা গাড়ীখানা দরজায় দাড়িয়ে রইল মিনিট পাঁচেক। অবশেষে শঙ্খ হাতে করে এগিয়ে এল গুটি তিন চারটি মেয়ে। তাদের চেহারা বা পোশাক কোনটাই রায়বাড়ীর উপযুক্ত নয়। গোবিন্দ পরে জেনেছিল তারা বিমলার বান্ধবী, থাকে ঐ টিনের বাড়ীটায়।

তার পর গোবিন্দ একে একে আবিষ্কার করল অনেক কিছুই। দেখল আট দশজন বরযাত্রী আর বিমলার পাঁচ ছ' জন বান্ধবী ছাড়া নিমন্ত্রিত আর বিশেষ নেই। জানতে পারল দোতলার বারান্দা থেকে যে দুটি তরুণী অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেখছে তারা হ'ল রায়বাড়ীর বড় দুই মেয়ে—সীতা আর গীতা—বিমলার বড়দি আর মেজদি, দু'জনেই এম, এ, পড়ে। আরও জানল চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে ফাঁকে যে তরুণটি গোবিন্দর মেসোর সঙ্গে কথা বলছে ঠোঁট বেঁকিয়ে, সে হ'ল বাড়ীর বড় ছেলে অরুণ রায়—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আর সোনার চশমা পরিহিতা বধূটি হ'ল তারই স্ত্রী—বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা।

বরযাত্রীরাও বুঝতে পেরেছিল। বৈঠকখানা ঘরে তারা বসেছিল আড়ষ্ট ভাবে, অন্দরমহলে এসে তারা যেন জড়ীভূত হয়ে পড়ল। মালাবদলের সময় কেউ এতটুকু চপলতা প্রদর্শন করল না, কনের বান্ধবীদের নিয়ে সামান্য পরিহাসও করল না, এমনকি বরের উদ্দেশ্যে দু'একটা হাল্কা ইঙ্গিতও ছুঁড়ে দিল না। রায়বাড়ীতে পা দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, আরও এক ঘণ্টার মধ্যে তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। চলে গেল বরকর্ত্তা—গোবিন্দর মেসোও। অরুণের উদ্দেশ্যে তার শেষ কথাটা গোবিন্দ শুনতে পেল—তা হলে স্যার, ছেলেটাকে পরশুদিনই পাঠাচ্ছি।

তিন ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে শেষ হয়ে গেল। বিমলার বন্ধুরা বিদায় নিল একে একে। উপর থেকে সীতা গীতার দরজা বন্ধ করার আওয়াজ ভেসে এল। রায়মশাই আগেই শুয়ে পড়েছেন, গিন্নী একবার ছাঁদনাতলাটা দেখে তেতলায় উঠে গেলেন। দরোয়ান বারান্দার আর সিঁড়ির আলোগুলো নিভিয়ে দিল। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। বাসর জাগবে বলে কেউ আড়ি পাততে এল না; দরজা খোলাই রইল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। গোবিন্দ পালঙ্কের পাশে চেয়ারে বসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছিল বাইরের দিকে। এবার বিমলার দিকে ফিরে তাকাল। বিমলার ঘোমটা গলা পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ গোবিন্দর মনে হ'ল বিমলাও কি রায়বাড়ীর মেয়ে নয়? চকিতে নববধূর ঘোমটাটা তুলে ফেলল। ষোল বছরের কিশোরীর ডাগর চোখ দুটি কোন স্বপ্নে-দেখা রাজপুত্রের সন্ধান পেয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে টলমল করছে। বুক থেকে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নেমে গেল গোবিন্দর। না, বিমলা জজবাড়ীর মেয়ে নয়।

অবশ্য বিমলা যে রায়বাড়ীর কেউ নয় তাও ঘটক গোপন রাখে নি। বিমলার মা রায়গিন্নীর দূর সম্পর্কের বোন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে রায়বাড়ীতে এসে উঠেছিল। আত্মীয়তার দাবি নিয়ে নয়, নিজেকে সে কোনদিন রাঁধুনীর পর্য্যায়ের উপরে উঠতে দেয় নি। নিজের মেয়ে বিমলাকেও সর্ব্বদা আগলে রাখত যাতে সে দিদির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে না পারে। কয়েক বছর রায়বাড়ীতে থাকার পর তার সকল চিন্তার অবসান হ'ল। বিমলার তখন দশ বছর বয়স। সেই

বয়সেই বিমলা টুকিটাকি কাজে বেশ চতুর হয়ে উঠেছিল।

আর গোবিন্দ? রাণীগঞ্জের এক কয়লাখনির আপিসে সে রেকর্ড সাপ্লায়ার, মাইনে ষাট। বাবার সামান্য মুদিখানার দোকান থেকে ভাল ভাবে তাদের পেট চলত না, স্কুলের পড়া শেষ না করেই গোবিন্দ চাকরিতে ঢুকেছিল পিওন হিসাবে। পাঁচ বছর পর প্রমোশন পেয়ে গত দু' বছর ধরে সে রেকর্ড সাপ্লায়ারের কাজ করছে। বরযাত্রী হয়ে যারা তার সঙ্গে এসেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য হ'ল তার মেসো—আলিপুরের দেওয়ানি আদালতের কোন উকিলের যেন মুহুরি। গোবিন্দর বন্ধুরা কেউ দপ্তরি, কেউ রেকর্ড-সাপ্লায়ার কেউ বা পিওন।

সকালে শয্যা তুলবার জন্যে গোবিন্দর কাছ থেকে টাকার দাবি করল না কোন তরুণী বা বধূ। ডেপুটি ছেলে আপিসে গেল, মেয়েরা আর পুত্রবধূ কলেজে। বিকেলের দিকে গোবিন্দর মেসো আবার এল। সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসেছে। একটা ট্রাঙ্ক একটা বিছানা আর একটি বালিকাকে নিয়ে গোবিন্দ মেসোর সঙ্গে যাত্রা করল ষ্টেশনের দিকে। বিদায় নেবার সময় বিমলা আকুল হয়ে কাঁদল। কাঁদল সবার জন্যেই। এত কাঁদতে দেখে রায়গিন্নী অপ্রসন্ন মুখে বললেন, অত কাঁদিস নে বাছা, অমঙ্গল হবে। গোবিন্দরও খুব ভাল লাগল না। এত কান্না কিসের? রায়বাড়ী থেকে বেরুতে পেরে বিমলার ভিতরটা কি আনন্দে ফেটে পড়ছে না?

•

একটু ভুল বুঝেছিল গোবিন্দ। শ্বশুরবাড়ী গিয়েই বিমলা দিন গুনতে আরম্ভ করল—কবে দশমঙ্গল আসবে। গোবিন্দ বিস্মিত—বিমলা কি জানে না তার মাসী দ্বিরাগমনের কথাটা বলে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন? মার পরামর্শে গোবিন্দ ব্যাপারটা বিমলাকে জানতে দিল না। আগের দিন আপিস থেকে ফিরে এসে জানাল ছুটি পাওয়া গেল না।

তারপর গোবিন্দ একদিন আবিষ্কার করল বিমলা চিঠি লিখছে মাসীমাকে। দিদিদের আর দাদা-বউদিকেও লিখতে দেখল মাঝে মাঝে। জবাব? হ্যাঁ, তাও আসে বই কি বিজয়া-নববর্ষে।

বিমলার চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। ব্যবহারে একটা সলজ্জ নম্র ভাব। শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "ক'দিন ধরে মাসীর কথা মনে পড়ছে। কিন্তু এখন যাওয়া মানে ত ওঁদের ব্যস্ত করা, নইলে একবার ঘুরে এলে হ'ত।"

শাশুড়ী নিরুত্তর রইলেন। গোবিন্দকেও না জানিয়ে একখানা চিঠি লিখলেন বেয়ানকে। সে চিঠির জবাব এল না।

বিমলার ছেলে হ'ল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। ছেলের মাস ছয়েকের সময় একদিন বিমলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "খালি বন্ধন আর বন্ধন। আর একটু বড় না হলে কি করে বেরুই?"

আর একদিন ছেলেকে কাজল পরাতে পরাতে বলল, "মাসী কিন্তু খুব খুশী হতেন খোকনকে দেখলে।"

কি কারণে গোবিন্দর মেজাজটা অপ্রসন্ন ছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি কি কিছু বোঝ না?"

বিমলা চমকে উঠল। তার পর ম্লান হেসে বলল, "এককালে সত্যিই বুঝতাম না, এখন বুঝি অনেক কিছুই। কিন্তু কলকাতার কথাটা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারি না কেন বল ত?"

রুক্ষতর কণ্ঠে গোবিন্দ জবাব দিল, "পারবে, যেদিন জজবাড়ী থেকে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে।" আরও অনেক কিছু বলে গেল গোবিন্দ। মনের সমস্ত উত্তাপ নিঃশেষে ঢেলে দিল।

বিমলা চুপ করে রইল।

রাত্রিবেলা গোবিন্দ ছাদে শুয়ে রয়েছে মাদুর পেতে। অকস্মাৎ অতখানি উষ্মা প্রদর্শন করে ফেলে স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল গোবিন্দ নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত। বিমলার সেটা চোখ এড়ায় নি। শিয়রের কাছে বসে বলল, "কথাটা যখন উঠেছে খুলে বলাই ভাল। আমার একবার কলকাতায় যাবার ভারি ইচ্ছে করে। সত্যিই কিন্তু মাসীরা লোক খারাপ নন। আমাদের ত উপকার ছাড়া অপকার ওঁরা করেন নি। বিপদের সময় মাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, মা মারা যাবার পর যোগ্য পাত্রের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছেন। মাসী যদি নাই বা বলেন যেতে, আমার কি একটা কর্ত্তব্য নেই? হয়ত ওঁরাও ভাবছেন বিয়ে হয়ে যাবার পর একবার খোঁজও নিলাম না। তা ছাড়া..." গলা ভারী হয়ে এল বিমলার।

"তা ছাড়া কি?"

"জ্ঞান হতেই আমি ও বাড়ীতে মানুষ। ছেলেবেলায় জানতাম শুধু মাকে। মা মারা যাবার পর দেখলাম মাসীকে। মায়ের স্নেহ নয়, তবু সে বাড়ীতেই যে আমি বড় হয়ে উঠেছি। মাকে মাসীর ভিতর খুঁজে পাই নি সত্যি কিন্তু ওঁকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। সমস্ত বাড়ীতে ছড়ানো রয়েছে মায়ের স্মৃতি। বড় বড় দুটো উনুনের কাছে বসে মা রাঁধতেন, মাসী দু' একবার এসে কি বলে যেতেন। আমি বাইরে চৌকাঠের কোণে বসে

থাকতাম একটা পিঁড়েতে। বিকেলে বারান্দায় বসে মাসীমার সঙ্গে গল্প করতে করতে মা আমার চুল বেঁধে দিতেন। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর ছোট ঘরটায় শুয়ে পড়তাম, মা আসতেন কত দেরি করে। আমার ভয় করত—"

বিমলা চুপ করল। দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার চিবুক বেয়ে। মনটা ভিজে উঠল গোবিন্দরও। বিমলার হাতখানা ধরে কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল দোতলার বারান্দায় অলস ভাবে দাঁড়ানো সীতা-গীতার মূর্তি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ রায়ের ঠোঁট বেঁকিয়ে কথা বলা। বিমলার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুমি যেতে পার কিন্তু আমার যাওয়া অসম্ভব।"

বিয়ের অল্পদিন পরেই গোবিন্দ রেকর্ড-সাপ্লায়ারের কাজে ইস্তফা দিয়ে হাতিয়ার ধরেছিল সাধারণ মজুর হিসাবে। একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে সে লেগে রয়েছিল নিজের কাজে। পুরস্কারও পেয়েছিল। ধাপে ধাপে উপরে উঠে এখন সে এসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান। আরও আশা রাখে গোবিন্দ।

প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে গোবিন্দ কলকাতায় যাবে। কিছুদিন থাকতে হবে। বিমলা এসে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে বলল, "প্রতিবারই ত তুমি বলে যাও ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসবে। একবার গিয়েই দেখ না হালচালটা।"

ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভাবল গোবিন্দ। তার পর বলল, "বেশ তাই হবে। এবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েই উঠব।"

খবর পেয়ে অরুণ নিচে নেমে এল। কে? বিমলার বর?

অধ্যাপিকা অনেকক্ষণ ধরে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল আশ্চর্য হয়ে। সেই বিমলার বর এসেছে?

আপিস না থাকলেও রায়মশাই আপিস টাইমে খেয়ে নেন। গোবিন্দও সকাল সকাল বেরুবে। খাওয়া আরম্ভ করে হঠাৎ রায়মশাইয়ের হুঁস হ'ল টেবিলে পুত্রবধূ অনুপস্থিত। বললেন, "বউমা কোথায়?"

রায়গিন্নী পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছিলেন। বললেন, "একটু পরে খাবে।"

"কেন? কলেজ নেই?"

"আছে। একটু পরেই যাবে আজকে।"

"কেন?"

"এমনিই।"

কি জানি যেন গোবিন্দ একটু অস্বস্তি অনুভব করল।

"আপিসের খবর-টবর কি? আগের জায়গাতেই আছ ত? কিসের যেন ছিল ফার্মটা?"

"আজ্ঞে কোল মাইনের আপিস। সেখানেই আছি", জবাব দিল গোবিন্দ।

"চাকরি বেশ ভাল লাগছে ত?"

একটু হাসল গোবিন্দ: "আমাদের আবার ভাল লাগা-লাগি কি? তবে আপিসের কাজ ছেড়ে এখন ফিল্ডওয়ার্ক ধরেছি। গায়ের খাটুনি।"

অরুণ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল, "ফিল্ডওয়ার্ক? খনির ভিতরে নামতে হয়? খুব পরিশ্রমের কাজ তা হলে?"

"আমাদের মত লোকেদের পরিশ্রম না করে উপায় কি দাদা! এই দেখুন না শাবল চালিয়ে চালিয়ে হাতে কি রকম কড়া পড়ে গেছে।"

রায়গিন্নী কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন, "নিজের হাতে কয়লা খুঁড়তে হয়?"

"তা হয় মাসীমা। আমরা কুলি-মজুর মানুষ, নইলে খাব কি?"

রায়গিন্নীর মুখ থেকে সহানুভূতিসূচক একটা শব্দ বেরুল।

কর্তা বললেন, "বাট আই লাইক ম্যানুয়েল লেবার। অন্ততঃ কেরাণীগিরির চেয়ে গতরের কাজ ভাল। কি বল গোবিন্দ?"

"আজ্ঞে যা বলেছেন। কেরাণীগিরিতে থাকলেও একটা কথা ছিল। করতাম ত রেকর্ড-সাপ্লায়ারের কাজ।" জবাব দিল গোবিন্দ।

রায়মশাই চুপ করে গেলেন। আর কোন কথা হ'ল না টেবিলে।

একতলার একখানা ঘর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে গোবিন্দর জন্যে। বিকেলে বাড়ী ফিরে গোবিন্দ জামাটা খুলে রেখে পত্রিকা নিয়ে বসেছে। বাইরে গাড়ীর শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল। গাড়ী থেকে যে তরুণীটি নামল, বহুদিন পরে দেখেও গোবিন্দ তাকে চিনতে পারল—বড় মেয়ে সীতা। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সীতা একবার ভিতরে তাকাল, গোবিন্দকে চিনতে পারল বলে মনে হ'ল না। এখুনি হয়ত উপর থেকে গোবিন্দর ডাক আসবে বা যাবার সময় সীতা দেখা করে যাবে এই ভেবে গোবিন্দ জামাটা গায়ে চড়াল। ঘণ্টাখানেক পরে সীতা চলে গেল। এবার গোবিন্দর ঘরের দিকে তাকালও না।

ন'টার সময় ঠাকুর এসে জিজ্ঞেস করল। "এখন ভাত নিয়ে আসব বাবু?"

নিচেই টেবিল .পাতা হয়েছে ? ভাল করে না বুঝেই বলল, "আনতে পারেন।"

গোবিন্দর ঘরেই চাকর আসন পেতে দিল। কথায় কথায় গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, "গিন্নীমা কি করছেন ?"

"আজ্ঞে মা রেডিও শুনছেন।" জবাব দিল পাচক।

পরদিন গোবিন্দকে আটটার সময় স্নানের ঘরে ঢুকতে দেখে ভৃত্য পরমেশ্বর বলল, "আপনি কি তাড়াতাড়ি বেরুবেন দাদাবাবু ?"

"হ্যাঁ—না; আপিস টাইমেই।"

পাচক ব্রাহ্মণ যথাসময়ে ভাত দিয়ে গেল গোবিন্দর ঘরে। পরমেশ্বর দাঁড়িয়ে রইল কাছে।

আপিস-টাইমেই বেরিয়ে যায় গোবিন্দ। ফিরে কোনদিন দুপুরে, কোনদিন বিকেলে, কোনদিন বা রাত্রে। ফিরে এসে পত্রিকা পড়ে, নয় এক আধটা মাসিকের উপর চোখ বুলোয়। রায়মশাই বাইরে বেরুবার মুখে বা ফেরার সময় দু' একটি কথা বলে যান। গিন্নী একতলায় বড় একটা নামেন না, কাজেই দেখাও হয় না রোজ। অরুণের ফেরার কোন ঠিক নেই, তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি গোবিন্দর।

রায়বাড়ীতে গোবিন্দর পঞ্চম দিবস। সকালে ভাত খাবার সময় গোবিন্দ ঠাকুরকে বলল, "আজ রাত্রে আমার জন্যে ভাত নেবেন না, সন্ধ্যের গাড়ীতেই যাচ্ছি।"

দুপুরেই ফিরল গোবিন্দ। জিনিসপত্র গোছাচ্ছে এমন সময় রায়গিন্নী এলেন। বললেন, আজই যেতে হবে ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ মাসীমা।"

"ছুটি আর নেই বুঝি ?"

"ছুটি ত ঠিক নয়, কাজেই এসেছিলাম। শেষ হয়ে গেল কাজ।"

বিছানাটা বাঁধতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে গিন্নী ডাকলেন, "পরমেশ্বর একটু এসে গোবিন্দকে সাহায্য কর না।"

পরমেশ্বর এল। বিছানাটা বেঁধে সুটকেসটা গুছিয়ে দিল সুন্দর ভাবে। এবার ট্রাঙ্ক। উপরের জামা কাপড় দু'একটা নামাতেই গোবিন্দ চমকে উঠল, "এই যাঃ একেবারে ভুলে গেছি !"

গিন্নী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

তাড়াতাড়ি করে উপরের জিনিসগুলো মাটিতে ফেলে বিমর্ষভাবে গোবিন্দ বলল, "আপনার মেয়ে কয়েকটা জিনিস পাঠিয়েছিল, সেকথা একেবারে ভুলে গেছলাম।"

ট্রাঙ্কের তলা থেকে কতগুলো প্যাকেট বের করে খুলতে খুলতে বলল, "আপনার জন্যে একজোড়া বিষ্ণুপুরী গরদের শাড়ি আর মেসোমশাইয়ের জন্যে সিল্কের থান। বৌদিকে এই মুর্শিদাবাদীটা দিতে বলেছে আর দাদাকে শান্তিপুরী। দাদার ছেলেকে শার্ক স্কিনের এই থানটি দিয়ে স্যুট বানিয়ে দেবেন। সাদা অর্গ্যাণ্ডিটা ওঁর মেয়েদের মানাবে ত ? সীতাদি গীতাদির বিয়ের সময় ও আসতে পারে নি—এই দু'গাছা নেকলেস পাঠিয়েছে, আর জামাইবাবুদের জন্যে আংটি। এই ধুতিটা পরমেশ্বরের আর এটা শৈলর শাড়ি। ড্রাইভারের কোটের কাপড়…দরোয়ানের জন্য একজোড়া পাগড়ির…"

দরোয়ান এসে সংবাদ দিল গাড়ী প্রস্তুত।

দ্রুত হস্তে গোবিন্দ নিজের জিনিসগুলো ভরে ফেলল কোন মতে। পরমেশ্বরকে তাড়া দিয়ে বলল, একটু শীগ্‌গির পরমেশদা।"

দরোয়ান আর চাকর ধরাধরি করে বিছানা বাক্স গাড়ীতে তুলে দিল। রায়গিন্নী প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে। গোবিন্দ তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলে আত্মস্থ হলেন। বললেন, "কিন্তু বাবা আর ক'টা দিন থেকে গেলে বড় খুশী হতাম।"

একটু হাসল গোবিন্দ, "উপায় নেই মাসীমা।"

"তা-তা বিমলাকে কবে নিয়ে আসছ ? কতদিন দেখি নি মেয়েটাকে।"

"সেকথা আমারও মনে হয় মাসীমা। আর আপনার মেয়ে ত সব সময়ই বলছে। কিন্তু কি করি বলুন ! আমি বাঁধা রয়েছি পরের গোলামির শেকলে আর আপনার মেয়ে বাঁধা পড়েছে নিজের বাঁধনে। বুড়ো শাশুড়ীকে ফেলে একদিনের জন্যেও কোথাও নড়বে না আবার এদিকে কান্নাকাটি করবে আপনাদের জন্যে। একেবারে পাকা গিন্নীটি।"

তার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোবিন্দ বলল, "ও, চারটে বেজে গেছে। আর ত সময় নেই মাসীমা। মেসো-মশাই আর দাদা—বৌদির সঙ্গে ত দেখা হ'ল না—আমার প্রণাম জানাবেন ওঁদের।"

রায়গিন্নী আকুল স্বরে বললেন, "কিন্তু বিমলা—"

গোবিন্দ ততক্ষণে চৌকাঠের বাইরে চলে গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে ভারতীয় শ্রমিক আমদানী সুরু হয়। ১৯১১ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিক পাঠানো হইত। ভারতীয় শ্রমিক আমদানীর পর ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও নাটালে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে ভারতীয়েরা ট্রান্সভালে যাইয়া ব্যবসা করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিল। ভারতীয়গণের এই শ্রীবৃদ্ধিতে ট্রান্সভালের শ্বেতাঙ্গ বুয়রগণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। নাটালের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের শ্রীবৃদ্ধিও নাটালের ইংরেজ শাসকগণ সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই। ফলে উনবিংশ শতকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষের সূচনা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০১) পর ট্রান্সভালে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ট্রান্সভালে বুয়র সরকারের ভারতীয় বিদ্বেষ নীতি এবং কার্য্যকলাপকে বুয়র যুদ্ধের অন্যতম কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সনের ৩ আইনের (Law III, 1885) বলে ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের জমি কিনিবার অধিকার বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করা হয়। কোন রাজনৈতিক অধিকারও তাহাদের ছিল না। মোট কথা, ট্রান্সভালের বুয়র শাসকগণ ভারতীয়দিগকে অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয় মনে করিতেন। তাহারা রেলের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিত না। প্রত্যেক ভারতীয়কে ট্রান্সভালে বাস করিবার সরকারী পাস অর্থাৎ অনুমতিপত্র সঙ্গে রাখিতে হইত। পুলিস দেখিতে চাহিলে এই পাস দেখাইতে হইত। রাত্রি নয়টার পর কোন ভারতীয় রাস্তায় বাহির হইতে পারিত না।

১৯০১ সনে ইংরেজ শাসন চালু হইবার পর ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর নূতন নূতন বিধি-নিষেধ আরোপ করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী জোহানেসবার্গে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন (১৯০৩ সন)।

যুদ্ধের সময় ট্রান্সভালের বুয়রগণ নিজেদের ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত ছিল। ফলে ভারতীয় বিদ্বেষও সাময়িক ভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরই ভারতীয় বিদ্বেষ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ১৯০৭ সনের জানুয়ারী মাসে ট্রান্সভাল স্বায়ত্ত শাসন লাভ করে। নূতন ব্যবস্থায় বুয়রগণই ট্রান্সভালের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিল। মার্চ মাসে ট্রান্সভালের আইনসভা একটি আইন পাস করিয়া ঘোষণা করিল যে, ট্রান্সভাল প্রবাসী প্রত্যেক ভারতীয়কে সে দেশে থাকিবার জন্য নূতন অনুমতিপত্র বা পাস লইতে হইবে। ভারতীয়গণ সকলেই সরকারী অনুমতি লইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিল। উল্লিখিত আইনে কেবল নূতন অনুমতিপত্র গ্রহণের কথাই বলা হইল না, প্রত্যেককে নিজ নিজ অনুমতিপত্রে হাতের দশ আঙুলের ছাপ দিতে আদেশ করা হইল। এই আইন 'এশিয়াটিক ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট' বা ১৯০৭ সনের দুই আইন নামে পরিচিত। গান্ধীজী এই আইনকে 'খুনে আইন' নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ভারতীয়েরা এই আইন অমান্য করিবার সঙ্কল্প করিল। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 'সিবিল রেসিষ্টান্স এসোসিয়েশন' গঠিত হইল। এই 'খুনে আইনে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই সত্যাগ্রহের আদর্শের সূচনা এবং বিকাশ হয়। ইতিহাসের অন্তহীন ঘটনা-স্রোতের মধ্যে লক্ষ্য করিলে অনেক ক্ষেত্রেই পারম্পর্য্য, কার্য্য-কারণ সম্পর্ক এবং আদান-প্রদানের সম্বন্ধ চোখে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট মনীষী এবং রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত জে. এন. হফমেয়ের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য:

> "Often there is justice in the working of history. India, though not of its own volition, had given to South Africa one of its most difficult problems (the Indian problem). South Africa, in its turn, likewise not of its own volition, gave to India the idea of civil disobedience."—*Mahatma Gandhi*—Edited by Dr. S. Radhakrishnan, p. 121.

'খুনে আইনে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ সরকারী রেজিষ্ট্রী আপিসে পিকেটিং আরম্ভ করিল। ভারতীয়গণ প্রায় সকলেই আঙুলের ছাপ দিয়া অনুমতিপত্র লইতে অস্বীকার করিল। যাহারা ইহার বিরোধী ছিল, প্রধানতঃ এই পিকেটিঙের জন্যই তাহারাও এই অনুমতিপত্র লইতে পারিল না। ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ট্রান্সভালের বুয়র প্রধানমন্ত্রী জেনারেল বোথাকে

জানানো হইল যে, আইনের জোরে আঙুলের ছাপ লইয়া অনুমতিপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা তুলিয়া দিলে ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় আঙুলের ছাপ দিয়া সরকারী অনুমতিপত্র লইবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে 'খুনে আইন' বাতিল করিয়া দিতে হইবে। বোথা সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

এদিকে ১৯০৭ সনেই ট্রান্সভাল সরকার 'ইমিগ্রেশান রেষ্ট্রিকৃশন এক্ট' বা '১৯০৭ সনের পনের আইন' নামে আর একটি আইন পাস করিলেন। ফলে যুদ্ধের সময় যে সমস্ত ভারতীয় ট্রান্সভাল হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে সেদেশে ফিরিয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যাহাদের বিরুদ্ধে এই আইন, তাহারা কিন্তু একটুও দমিল না।

সরকার দমননীতির পথ ধরিলেন। প্রথমতঃ অজ্ঞাত, অখ্যাত জনকয়েক প্রবাসী ভারতীয়কে নির্দ্দিষ্ট তারিখের (৩১শে জুলাই) মধ্যে অনুমতিপত্র না লইবার অপরাধে 'নিষিদ্ধ আগন্তুক' (Prohibited Immigrant) বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহাদিগকে ট্রান্সভাল ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। ইহারা কিন্তু এই আদেশ অমান্য করিল। ফলে ইহাদের প্রত্যেকেই অল্পদিনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

ইহার পর মহাত্মা গান্ধী এবং নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ভারতীয়কে অনুমতিপত্র না লইবার অপরাধে আদালতে হাজির হইবার আদেশ দেওয়া হইল। হাকিম আদেশ করিলেন যে, আঙুলের ছাপ দিয়া অনুমতিপত্র সংগ্রহ না করিলে তাঁহারা যেন ট্রান্সভাল হইতে চলিয়া যান। তাঁহারা কেহই অনুমতিপত্রও লইলেন না; ট্রান্সভাল ত্যাগও করিলেন না। ১৯০৮ সনের ১০ই জানুয়ারী ইহাদের বিচার হয়। সকলেই অপরাধ স্বীকার করিলেন। কেহই আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন না। গান্ধীজী দুই মাস অ-শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অপরাপর নেতাদেরও কারাদণ্ডের আদেশ হইল। নেতৃবৃন্দের কারাদণ্ডেও জনসাধারণ ভয় পাইল না, তাহাদের উৎসাহও কমিল না। তাহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিল। ১৯০৪ সনে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সাপ্তাহিক এই সময় ভারতীয় জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

সরকার কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। আইন অমান্যকারীদিগকে প্রথম প্রথম সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইত না, সকলকেই অ-শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। পরে প্রত্যেককেই সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হইতে লাগিল। নারী সত্যাগ্রহীদিগকেও অব্যাহতি দেওয়া হইত না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভারতীয়গণ ভয় পাইল না। এই সময় ট্রান্সভালের ভারতীয় বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। তাহার মধ্যে শতকরা ৫ জন অর্থাৎ ৫০০ জনও 'খুনে আইন' (১৯০৭ সনের দুই আইন) অনুসারে আঙুলের ছাপ দিয়া ট্রান্সভালে থাকিবার অনুমতিপত্র লইয়াছিল কিনা সন্দেহ। প্রায় ১৫০ ভারতীয় (মতান্তরে ১২০) আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করে। জেলকর্তৃপক্ষ ভারতীয় বন্দীদিগের সহিত অতিশয় দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইত। জেলে থাকিবার ব্যবস্থাও অতিশয় জঘন্য ছিল। নিগ্রো কয়েদীদের পোশাকই ভারতীয়দিগকেও পরিতে দেওয়া হইত। দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে নিগ্রো কয়েদীদিগকে যে টুপি পরিতে দেওয়া হয় এবং যে টুপি দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে গান্ধীজী নিজে পরিতেন, আজিকার সুপরিচিত গান্ধী টুপি তাহারই পরিবর্ত্তিত রূপ।

আন্দোলনের তীব্রতা এবং প্রসার সরকারকে ভাবাইয়া তুলিল। বোথা সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাট্সের অনুমতি লইয়া 'ট্রান্সভাল টাইম্‌স্' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আলবার্ট কার্টরাইট গান্ধীজীর সহিত জেলে দেখা করিলেন। গান্ধীজীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় ভারতীয় জেলের বাহিরে ছিলেন, মিঃ কার্টরাইট তাঁহাদের সঙ্গেও দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই জানাইয়াছিলেন যে, গান্ধীজীর সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে চাহিলে জেনারেল স্মাট্‌স্ আপত্তি করেন নাই। কার্টরাইটের মধ্যস্থতায় সরকার এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা রফা হইল। ভারতীয়গণ ট্রান্সভালে থাকিবার সরকারী অনুমতিপত্রে স্বেচ্ছায় হাতের আঙুলের ছাপ দিলে সরকার ১৯০৭ সনের দুই আইন প্রত্যাহার করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৯০৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী প্রিটোরিয়ায় গান্ধীজী এবং জেনারেল স্মাট্সের মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের পর—এই ইঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকার—সেই দিনই গান্ধীজী এবং সমস্ত ভারতীয় সত্যাগ্রহী কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইল। ঐ দিনই রাত্রিতে জোহানেসবার্গ মসজিদের প্রাঙ্গণে ভারতীয়গণের এক সাধারণ সভায় গান্ধী-কার্টরাইট রফার সর্ত্তগুলি অনুমোদিত হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী অনুমতিপত্র লইবার জন্য রেজিষ্ট্রি আপিসে যাওয়ার পথে মীর আলম নামে গান্ধীজীর এক পাঠান মক্কেলের নেতৃত্বে কয়েকজন পাঠান তাঁহাকে বেদম প্রহার করে। শ্বেতাঙ্গ পথচারীরা বাধা না দিলে তাহারা হয়ত গান্ধীজীকে মারিয়াই ফেলিত। সকলে ধরাধরি করিয়া

তাঁহাকে কাছেই এক ইংরেজ বন্ধুর আপিসে লইয়া গেল। তিনি তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। জ্ঞানলাভের পর তাঁহাকে ইংরেজ পাদ্রী রেভারেণ্ড জোসেফ জে. ডোকের গৃহে স্থানান্তরিত করা হইল। রেভারেণ্ড ডোকের বাড়ীতে সেই দিনই গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে রেজিষ্ট্রি বিভাগের বড়কর্ত্তা তাঁহার নাম রেজিষ্ট্রি করিয়া তাঁহাকে সরকারী অনুমতিপত্র দিলেন। গান্ধীজী এই অনুমতিপত্রে নিজের দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়াছিলেন। গান্ধীজীর নিষেধসত্ত্বেও মীর আলম এবং পাঠান আততায়ীদিগকে মার-পিটের অপরাধে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ডোক দম্পতীর নিপুণ সেবা-শুশ্রূষায় গান্ধীজী অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পর তিনি নাটালে যান। কয়জন পাঠান ভারবানের এক জনসভায় আবার তাঁহাকে প্রহার করিবার চেষ্টা করে। কয়েকজন বন্ধুর জন্য সে যাত্রা তিনি বাঁচিয়া যান। গান্ধীজীর নাটালে অবস্থান-কালে ট্রান্সভাল-প্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রায় সকলেই নিজ নিজ নাম রেজিষ্ট্রি করিয়া আঙ্গুলের ছাপ দিয়া সরকারী অনুমতিপত্র লইয়াছিল।

সকলেই আশা করিল যে, এইবার 'খুনে আইন' বাতিল করা হইবে। বোথা সরকার এ আইন রদ ত করিলেনই না বরং ইহারই সমধর্মী এবং পরিপোষক একটি নূতন আইন পাস করিলেন। এই শেষোক্ত আইনটি 'এসিয়াটিক রেজিষ্ট্রেশন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট' বা ১৯০৮ সনের ৩৬শ আইন নামে পরিচিত। ট্রান্সভাল বিধান সভায় এই আইন সম্বন্ধে আলোচনা কালে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সরকারকে পরিষ্কার জানাইয়া দেওয়া হইল যে, 'খুনে আইন' রদ না করিলে আবার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করা হইবে।

সরকার কিন্তু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। ১৯০৮ সনের ১০ই আগষ্ট জোহানেসবার্গে ভারতীয়গণের এক সাধারণ সভায় আবার সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে সমস্ত ভারতীয় স্বেচ্ছায় আঙ্গুলের ছাপ দিয়া অনুমতিপত্র লইয়াছিল, তাহাদের অনেকের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া সভাস্থলে এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব করা হইল। সভায় উপস্থিত জনৈক সাংবাদিক এ ঘটনাকে ১৭৭৩ সনের 'বোষ্টন টি পার্টি'র* সহিত তুলনা করিয়াছেন।*

* ১৭৬৭ সনে ইংরেজ সরকার আমেরিকায় আমদানী চায়ের উপর শুল্ক ধার্য্য করিলে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি এই শুল্ক দিতে অসম্মত হয়। ১৭৭৩ সনে বোষ্টনের কয়েকজন নাগরিক রেড-ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে বোষ্টন বন্দরে নোঙ্গর করা চা-বোঝাই কয়খানা বিলাতী জাহাজ হইতে ৩৪২ পেটি চা জলে ফেলিয়া দেয়। 'বোষ্টন টি-পার্টি' নামে পরিচিত এই ঘটনাই আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ।

এইবার সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্য্যায় শুরু হইল। সংগ্রামের এই পর্ব্বে আহমদ মোহাম্মদ কাছালিয়া ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দলে দলে ভারতীয় সত্যাগ্রহী-দের ধরিয়া জেলে পাঠানো হইতে লাগিল। প্রায় সকলকেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। জেল কর্ত্তৃপক্ষ সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের ত্রুটি করিলেন না। অবিচল ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত অত্যাচার তাহারা সহ্য করিল। সরকার তখন ভারতীয়দিগকে জব্দ করিবার জন্য নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। আইন অমান্যকারীদিগকে জাহাজবন্দী করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্ট ইহাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কে শোনে সে কথা?

ক্রমে সত্যাগ্রহে ভাটার টান ধরিল। নেতৃবৃন্দ শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্পে অটল থাকিলেও কর্ম্মীদের দৃঢ়তা এবং মনোবল ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে লাগিল। অনেকেই আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়িলেন। যাঁহারা সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না—তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে—তাঁহারাই বার বার আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের নিজেদের এবং ইঁহাদের আশ্রিত পরিজনবর্গের বাস এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার জন্য গান্ধীজী টলষ্টয় ফার্ম্ম স্থাপন করেন। জোহানেসবার্গ হইতে একুশ মাইল দূরে গান্ধীজীর অনুরাগী বন্ধু জার্ম্মান স্থপতি কালেন বার্কের প্রায় ১,১০০ বিঘার একটি জোত ছিল। তিনি এই জোত গান্ধীকে দান করিলেন।

১৯১১ সনে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের তীব্রতা খুবই হ্রাস পাইল। ১৯১২ সনে গান্ধীজীর অনুরোধে গোপালকৃষ্ণ গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। ভারতীয় সম্প্রদায় রাজোচিত সম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ ও বুয়র পত্রিকাগুলি কিন্তু তাঁহাকে 'কুলিরাজ' আখ্যায় অভিহিত করিল। সরকারের পক্ষ হইতে অবশ্য গোখলের সহিত খুবই ভদ্র ব্যবহার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল বোথা, স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাটস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত এক বৈঠকে তিনি প্রবাসী ভারতীয়গণের সমস্যা এবং অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রিটোরিয়ায় এই বৈঠক বসিয়াছিল। গান্ধীজী ইচ্ছা করিয়াই এই বৈঠকে যোগদান করেন নাই। আলাপ আলোচনা শেষ হইবার পর গোখলে গান্ধীজীকে জানাইলেন যে, সরকার ভারতীয়দিগের সমস্ত দাবিই মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন, ১৯০৭ সনের দুই আইন বাতিল করা হইবে। নাটালের ভারতীয় শ্রমিক এবং তাহাদের পরি-বারের প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের নিকট হইতে মাথাপিছু

বার্ষিক তিন পাউণ্ড হিসাবে কর আদায়ের আইন রদ করা হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আগন্তুকদিগের প্রতি প্রযোজ্য বর্ণবৈষম্যমূলক আইন প্রত্যাহার করা হইবে। গান্ধীজী সরকারী প্রতিশ্রুতির সততা এবং আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে গোখলে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

গান্ধীজীর আশঙ্কা যে অমূলক নহে কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সরকার তিন পাউণ্ড করের আইন রদ করিতে রাজী হইলেন না। ফলে নাটালেও সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সূচনা হইল। এত দিন ট্রান্সভাল প্রবাসী পুরুষ ব্যতীত কাহাকেও সত্যাগ্রহ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই বার দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী কোন ভারতীয়েরই আন্দোলনে যোগ দিবার বাধা রহিল না।

১৯১৩ সনে ইউনিয়ন পার্লামেন্টের একটি আইনের বলে স্বরাষ্ট্রসচিব নিজের খুশিমত যে-কোন ভারতীয়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'নিষিদ্ধ আগন্তুক' (prohibited immigrant) বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার লাভ করিলেন। ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে অবাধে যাতায়াতের অধিকারও এই আইনে হরণ করা হইল। সুযোগ পাইয়া স্বরাষ্ট্রসচিব দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ সমস্ত ভারতীয়কেই 'নিষিদ্ধ আগন্তুক' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে ভারতীয়গণ অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকগণ এই সময় সাধারণ ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াছিল। গান্ধীজী কোন দিনই প্রতিপক্ষের বিপদের সুযোগে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিরুদ্ধ পক্ষের বিপদের সুযোগ গ্রহণ করা সত্যাগ্রহের নীতি এবং আদর্শের বিরোধী। সুতরাং সাময়িক ভাবে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইল।

ঠিক এই সময়েই দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মানুসারে অনুষ্ঠিত সমস্ত বিবাহকে আইনতঃ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই রায়ের ফলে ভারতীয় নারী সম্প্রদায়ের মর্যাদায় আঘাত লাগিল। ভারতীয়গণের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও ঘোরতর বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিল। গান্ধীজী এতদিন আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের যোগদানের সমর্থন দূরের কথা, বরং তাহার বিরোধিতাই করিয়াছেন। এইবার তাঁহার মত বদলাইল, তিনি নারীদিগকে পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান করিলেন। নারীসমাজও তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল। 'টলষ্টয় ফার্ম্ম'বাসিনী ষোল জন এবং ১৮৯৪ সনের শেষভাগে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত ফিনিক্স আশ্রমবাসিনী চার জন ভারতীয় নারী সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ফিনিক্স আশ্রমবাসিনী সত্যাগ্রহী নারীদিগের মধ্যে গান্ধী-জায়া কস্তুরবাই গান্ধীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

'টলষ্টয় ফার্ম্ম'বাসিনী সত্যাগ্রহকারিণীদিগের কেহ কেহ সরকারের অনুমতি না লইয়া নাটাল সীমান্তে প্রবেশ করিলেন। পক্ষান্তরে ফিনিক্স আশ্রমবাসিনীদিগের কেহ কেহ বিনা অনুমতিতে নাটাল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ট্রান্সভালে উপনীত হইলেন। সরকার ইঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিলেন না। তখন ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারী লাইসেন্স না লইয়াই রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করিতে আরম্ভ করিলেন। পুলিস তথাপি নিষ্ক্রিয় রহিল। নারী-সত্যাগ্রহীরা তখন নাটালের কয়লার খনিগুলির কেন্দ্র নিউক্যাসলের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা খনির ভারতীয় মজুরদিগকে ধর্মঘট করিতে উৎসাহিত করিলেন। ফলে কয়লার খনিগুলিতে ধর্মঘট আরম্ভ হইল। জনপ্রতি বার্ষিক তিন পাউণ্ড করের প্রতিবাদেই শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র খনি অঞ্চলে ধর্মঘট ছড়াইয়া পড়িল। সরকারী পুলিস সক্রিয় হইয়া উঠিল। নারী সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯১৩)। এইবার ভাল রকমেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গান্ধীজী নিজে আন্দোলন চালাইবার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। নিউক্যাসল তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইল। হাজার হাজার ধর্মঘটকারী ভারতীয় মজুর নিউক্যাসলে জড়ো হইয়াছিল। ইহাদের অনেকেরই পরিবারবর্গও সঙ্গে ছিল। এত লোকের খাওয়া থাকা এবং তাহাদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা বড় সহজ কথা নহে। নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এবং পরিচালক গান্ধীজীর উপর এই ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। সুষ্ঠু ভাবেই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অকৃপণ সাহায্যে তাঁহার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল। গান্ধীজী ধর্মঘটকারী শ্রমিকদিগকে লইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। পথে যদি ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়—ভাল। না হইলে সকলে পায়ে হাঁটিয়া 'টলষ্টয় ফার্ম্মে' যাইবে এবং সরকারের সহিত একটা মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই থাকিবে। এদিকে খনির মালিকগণ ধর্মঘটের সাফল্য এবং প্রসারে ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে ডারবানে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আহ্বান করিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের সহিত দেখাও করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোনও ফলই হইল না।

১৯১৩ সনের ২৮শে অক্টোবর ধর্মঘটকারীদের যাত্রা শুরু হইল। দুই দিন পর তাহারা পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে চার্লস্টাউনে উপস্থিত হইল। চার্লস্টাউনের পরেই ট্রান্সভালের এলাকা আরম্ভ। ট্রান্সভাল এলাকায় প্রবেশের পূর্ব্বে গান্ধীজী

আবার সরকারের সহিত মিটমাটের চেষ্টা করিলেন। চার্লস্ টাউন হইতে তিনি স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাটসের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে টেলিফোনে জানাইলেন যে, ধর্ম্মঘটকারীরা ট্রান্সভালে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু জেনারেল স্মাটস বার্ষিক মাথাপিছু তিন পাউণ্ড কর তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি (গান্ধীজী) তাহাদিগকে নিরস্ত করিবেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই মর্ম্মে জবাব আসিল—"জেনারেল স্মাটস আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না। আপনি যাহা খুশি করিতে পারেন।"

৬ই নবেম্বর (১৯১৩) চার্লস্টাউন হইতে সত্য ও অহিংসার "দুর্গম এবং সঙ্কীর্ণ পথে"("Narrow and difficult path") ধর্ম্মঘটকারীদের অভিযান সুরু হইল। ইহাদের দলে মোট ২,০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন নারী এবং ৫৭ জন শিশু ছিল। ট্রান্সভালের এলাকায় পড়িবার পর দুই জায়গায় গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু দুই বারই বিচারের সাপক্ষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশেষে ধর্ম্মঘটকারীরা যখন জোহানেসবার্গের কয়েক মাইল দূরে হেডেলবার্গে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইল। আদালতের বিচারে তিনি নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী পাওয়া যায় নাই, কেবলমাত্র তাঁহার সাক্ষ্য এবং স্বীকারোক্তির বলেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। ইহার পর আর একটি মামলায় গান্ধীজীর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহার দুই জন শ্বেতাঙ্গ সহকর্ম্মী এবং অনুরাগী বন্ধু মিঃ পোলক এবং মিঃ কালেনবাকও এই শেষোক্ত মামলায় আসামী ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। গান্ধীজীর কারাদণ্ডের পর বহু ভারতীয় নাটাল হইতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিল। ইহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের পর জেলে পাঠানো হইল। যে সমস্ত ধর্ম্মঘটকারী গান্ধীজীর সহিত চার্লস্ টাউন হইতে ট্রান্সভাল অভিযান করিয়াছিল তাহাদের সকলকে হেডেলবার্গে গ্রেপ্তার করিয়া ডারবানে ফিরাইয়া আনা হয়। তাহাদের সকলকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। এইবার সরকার এক অভিনব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন। নাটালের জেলগুলিতে সত্যাগ্রহীদিগের স্থান সঙ্কুলান হইল না। সরকার ধর্ম্মঘটকারী কয়েদীদিগকে কয়লার খনিগুলিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে জোর করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা হইল। তাহারা কাজ করিতে রাজী হইল না। ফলে, তাহাদের উপর নির্ম্মম নির্যাতন এবং নৃশংস অত্যাচার করা হইল।

এই অত্যাচারের ফলে ধর্ম্মঘট ভাঙিয়া যাওয়া দূরের কথা, নাটালের সমস্ত ভারতীয় শ্রমিক একযোগে ধর্ম্মঘট করিল। নাটালের কয়লার খনি, আখের ক্ষেত এবং কলকারখানা প্রভৃতিতে এই সময় প্রায় ষাট হাজার ভারতীয় শ্রমিক কাজ করিত। তাহারা প্রায় সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিল। গান্ধীজীর কারাদণ্ড এবং সত্যাগ্রহীদিগের উৎপীড়নের সংবাদে তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটালের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোরতর সঙ্কটের আশঙ্কা দেখা দিল। সরকার কঠোর হস্তে ধর্ম্মঘট ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মঘটকারীদিগকে জোর করিয়া নিজের নিজের কাজের জায়গায় পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইল। অনেকেই কাজে ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হইল। প্রায় দু'হাজার ধর্ম্মঘটকারীকে জোর করিয়া কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইল। জায়গায় জায়গায় পুলিশ এবং ধর্ম্মঘটকারীদিগের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হইয়া গেল। পুলিস দু'জায়গায় গুলি চালাইল। নয় জন ধর্ম্মঘটকারী পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারাইল। পঁচিশ জন জখম হইল। অত্যাচার ধর্ম্মঘটকারীদের মনোবল দৃঢ়তর করিল।

এই অত্যাচারের কাহিনী যথাকালে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে পৌঁছিল। উভয় দেশের জনমতই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। বিলাতী খবরের কাগজগুলি ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিল। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্রিকা মন্তব্য করিল যে, ভারতীয় শ্রমিকদিগের অভিযান নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি দৃষ্টান্তরূপে ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।* ভারত সরকার ভারতীয়গণের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কমিশন নিয়োগের দাবি করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সময় ভারতবর্ষের বড়লাট। তিনি প্রকাশ্যভাবেই ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।**

বোথা সরকার, বিশেষতঃ স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল স্মাটসের তখন উভয়সঙ্কট। গান্ধীজীর কথায় স্মাটস্ সাহেবের তখন সাপের ইঁদুর গিলিবার অবস্থা। তিনি ইউরোপীয়দিগকে

* ". . . the march of the Indian labourers must live in memory as one of the most remarkable manifestations in history of the spirit of passive resistance."

** "Your compatriots in South Africa have taken matters in their own hands by organising what is called passive resistance to laws which they consider invidious and unjust. They have the sympathy of India—deep and burning—and not only of India, but all those who like myself, without being Indians themselves, have feelings for the people of this country."

আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সরকার কিছুতেই তিন পাউণ্ড কর তুলিয়া দিবেন না বা ভারতীয় বিরোধী আইনের রদ-বদল করিবেন না। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল যে এই জিদ ছাড়িতে হইবে।

বোথা সরকার স্যর উইলিয়ম সলোমনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিলেন। এই কমিশনের অপর দু'জন সদস্য কর্ণেল ওয়াইলি এবং মিঃ এসেলেন কুখ্যাত ভারতীয় বিদ্বেষী। যে সমস্ত নেতৃস্থানীয় প্রবাসী ভারতীয় জেলের বাহিরে ছিলেন তাঁহারা জানাইলেন যে, সমস্ত সত্যাগ্রহীকে অবিলম্বে কারামুক্ত না করিলে এবং তদন্ত কমিশনে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করিলে ভারতীয় সম্প্রদায় কমিশনের সহিত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিবে না। জেনারেল স্মাটস্ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

এদিকে সলোমন কমিশন প্রথমেই গান্ধী, পোলক এবং কালেনবাককে বিনা সর্তে মুক্তি দিবার সুপারিশ করিলেন। ১৯১৩ সনের ১৪ই বা ১৮ই ডিসেম্বর ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ২১শে ডিসেম্বর তাঁহারা একযোগে জেনারেল স্মাটসের নিকট এক পত্র লেখেন। এই পত্রে জানানো হইল যে :

১। স্যর জন রোজ ইনস্ এবং ডব্লু. পি. শ্রাইনার নামে নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ এবং জনসেবায় তৎপর দু'জন ইউরোপীয়কে সলোমন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করিতে হইবে;

২। সমস্ত সত্যাগ্রহী কয়েদীকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দিতে হইবে

এবং

৩। কয়লার খনি, আখের ক্ষেত, কারখানা প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গায় ভারতীয় শ্রমিক কাজ করে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সেই সমস্ত জায়গায় যাওয়ার অনুমতি না দিলে কোন ভারতীয় সলোমন কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবে না।

পত্রের উপসংহারে বলা হইল যে, এই সমস্ত দাবি না মানিলে আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে। ২৪শে ডিসেম্বর জেনারেল স্মাটসের উত্তর আসিল। তিনি সলোমন কমিশনে নূতন সদস্য গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। ভারতীয়গণ ১৯১৪ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

কিন্তু নূতন করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সরকার এবং ভারতীয়গণের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল। ভারত সরকারের প্রতিনিধি মিঃ রবার্টসন এবং গোখলে কর্ত্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ভারতীয়দিগের বক্তব্য জেনারেল স্মাটস্ এবং সলোমন কমিশনের নিকট পেশ করিলেন। গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ইঁহাদিগকে সাহায্য করিলেন। এইভাবে সাপও মরিল, অথচ লাঠিও ভাঙ্গিল না। অর্থাৎ, ভারতীয়গণ কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিল না, কিন্তু তাহাদের যাহা বলিবার সমস্তই কমিশনকে জানানো হইল।

সলোমন কমিশন সত্যাগ্রহীদিগের সমস্ত দাবি মানিয়া লইবার সুপারিশ করিলেন। ১৯১৪ সনের 'ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট' এই সুপারিশেরই ফল। এই আইনে হিন্দু এবং ইসলামী মতে অনুষ্ঠিত বিবাহের বৈধতা স্বীকার করা হইল। তিন পাউণ্ড কর তুলিয়া দেওয়া হইল। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্ত বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল।

এই আইন পাস হইবার পর মহাত্মা গান্ধী এবং জেনারেল স্মাটসের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান হয়। গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে স্মাটসের সেক্রেটারী মিঃ গর্গেস স্মাটসের পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে জানাইলেন যে, নূতন আইনে ভারতীয়দের যে সমস্ত অভিযোগের উল্লেখ করা হয় নাই, সেগুলিও যথাসম্ভব দূর করা হইবে। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশাধিকার, তাঁহাদের দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কেপ প্রদেশে প্রবেশের অধিকার, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী যে সমস্ত ভারতীয়ের একাধিক ধর্ম্মপত্নী বিদ্যমান, তাঁহাদের পত্নীদিগের স্বামীর সহিত মিলিত হইবার অধিকার উল্লেখযোগ্য। পত্রের উপসংহারে মিঃ গর্গেস জানাইলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচলিত আইনগুলি ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবং বিনিযুক্ত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রয়োগ করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক জেনারেল স্মাটসের নিকট লিখিত পত্র এবং জেনারেল স্মাটসের তরফ হইতে তাঁহার সেক্রেটারীর জবাব 'স্মাটস্-গান্ধী চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির পর আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইল। গান্ধীজী ১৯১৪ সনের 'ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট' এবং 'স্মাটস-গান্ধী চুক্তিকে' দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের 'ম্যাগনা কার্টা' বা মহাসনদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সুন্দরবন বদ্বীপের জমির পুনরুদ্ধার

শ্রীকুমুদভূষণ রায়

অবিভক্ত বাঙ্গলায়, কলিকাতা ও বরিশাল শহরের দক্ষিণে, সুন্দরবন বদ্বীপের আয়তন ৮০০০ বর্গমাইল (চিত্র নং ১)। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন ৩০০০ বর্গমাইল। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই অঞ্চলে ঘন বসতি ছিল এবং প্রচুর ফসল হইত। বহু প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ইহার প্রমাণ-স্বরূপ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাসের (জন্ম নবদ্বীপ ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ) চৈতন্ত ভাগবত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের (১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত চণ্ডী এবং নিমতার কৃষ্ণরামের (জন্ম ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) রায়মঙ্গল হইতে জানা যায় যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও সুন্দরবন সমৃদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, মুসলমান শাসন হইতে ইংরাজ শাসন পরিবর্ত্তনের সময় বিশৃঙ্খল অবস্থায়, পর্ত্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর অত্যাচারে সুন্দরবন জনশূন্ত হইয়া পড়ে। সংরক্ষণ এবং সংস্কার অভাবে বাঁধ ভাঙ্গিয়া লোণা জলে বহু অঞ্চল প্লাবিত হয়।

ইংরাজ শাসনের সময়, জমির পুনরুদ্ধার কাজ আবার আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ২২০১ মাইল লম্বা বাঁধের সাহায্যে ৭৫০০০০ একর বা ১১৭২ বর্গমাইল জমি আবাদে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি জমিদারী-প্রথা লোপ হইবার আগে পর্য্যন্ত প্রত্যেক জমিদারের উপর নিজ নিজ এলাকায় বাঁধের তত্ত্বাবধান করিবার দায়িত্ব ছিল। প্রায়ই বহু স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিত। রন্ধ্রপথে লোণা জল ঢুকিয়া, অতর্কিতে জমি ও গ্রাম প্লাবিত করিত। গৃহস্থের মেটে ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িত। জমির ফসল ও ভাণ্ডারে সঞ্চিত শস্য নষ্ট হইত। পশুখাদ্য ও ঘাসের অভাবে, গৃহস্থ গৃহপালিত পশু বিক্রয় করিত। কাজকর্ম্মের অভাবে অধিবাসীরা প্লাবিত অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। চাষের অভাবে কেহ মৎস্য ধরিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, কিন্তু তাহার সামান্য আয় হইতে গ্রাসাচ্ছাদন কুলাইত না। প্লাবিত অঞ্চলের অধিবাসীরা দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়া পড়িত।

অনেকের মতে, জমিদারী প্রথা লোপের পর. সুন্দরবনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যদিও গত বৎসর ৩৮ লক্ষ ব্যয়িত এবং বর্ত্তমান বৎসর ৩৭ লক্ষ টাকা বাঁধ মেরামত প্রভৃতি কাজের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে তবুও সরকারের জমিদার হিসাবে করণীয় কার্য্য সম্পাদনে উন্নতি লক্ষিত হয় নাই, এরূপ মত আরোপ করিতেছেন।

"Some of the landlord's duties, such as maintaining bunds, are alleged to have been little better served by the Government, though Rs. 38 lakhs were devoted to this purpase last year and Rs. 37 lakhs budgeted this year."—*Statesman*, August 30, 1956.

ভূমি রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী, ক্যানিং অঞ্চলের ১২ মাইল বাঁধ গত আগষ্ট মাসে পরিদর্শন করেন। রাজকোষে অর্থাভাব, সুন্দরবনের উন্নতির অন্যতম বাধা। এই অঞ্চলের বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা এবং বাঁধ সংরক্ষণের ব্যয় ১ কোটি টাকা (স্টেটসম্যান, আগষ্ট ২৫, ১৯৫৬)।

সুন্দরবনের ১৮২৮ বর্গমাইল বাঁধহীন প্লাবিত অঞ্চল

বাঁধ রক্ষিত সুন্দরবনের বর্ত্তমান অধিবাসী প্রায় সকলেই দারিদ্র্যগ্রস্ত। সুতরাং সুন্দরবনে, পূর্ব্ববঙ্গ আগত আশ্রয়-প্রার্থীর স্থান হইতে পারে না, এ বিশ্বাস স্বাভাবিক।

বহু স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, বাঁধ রক্ষিত ৭৫০০০০ একর জমির বিরাট অংশ লোণা জলে প্লাবিত। ভাঙ্গা বাঁধগুলির মেরামত হইলে এবং বাঁধ সুচারুরূপে সংরক্ষিত হইলে, সম্পূর্ণ ৭৫০০০০ একর জমিতে আবাদ হইয়া বৎসরে ১৬ কোটি টাকা মূল্যের ফসল হইতে পারে। সুতরাং অধিবাসীদের উন্নতি সম্ভব।

সুন্দরবনের ৩০০০ বর্গমাইলের মধ্যে, ২২০১ মাইল লম্বা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া ৭৫০০০০ একর বা ১১৭২ বর্গমাইল জমি সংরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং এখনও ১৮২৮ বর্গমাইল অঞ্চল অরক্ষিত অবস্থায় আছে, যেখানে বাঁধ নির্ম্মাণ দ্বারা প্লাবিত অঞ্চলের উদ্ধার করিয়া, আবাদ হইতে পারে। অরক্ষিত অঞ্চলে জমি পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা স্থির করিবার পূর্ব্বে সুন্দরবন বদ্বীপ গঠন সম্পর্কিত তথ্য মনোযোগের সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সিন্ধু প্রভৃতি নদীপথে স্তাঙপো জলপ্রবাহ

তিব্বত ও ভারতবর্ষে, নদীপথের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিব্বতের মানচিত্রে দেখা যায়, স্তাঙপো নদীর অনেকগুলি শাখার (কী চু, যাহার তীরে লাসা নগর, নীয়াঙ চু যাহার তীরে গীয়ানসে নগর, স্তাঙ চু, সাক্যাট্র্যাম চু, প্রভৃতির) প্রবাহ মূলনদীপ্রবাহের বিপরীতমুখী। এই অসাধারণ বিশেষত্বের জন্য একটি ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বপাকিস্থান ও হল্যাণ্ড
মাইল ১০ ০ ১০ ২০ ৩০ ৪০ মাইল
চিত্র নং ১
পশ্চিমবঙ্গের
সুন্দরবন
কলিকাতা
ক্যানিং
বঙ্গোপসাগর
চিত্র নং ২
হল্যাণ্ড
উত্তর
সাগর
রাইন
হল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
চিত্র নং ৩। কুলগাছির প্লাবিত অঞ্চল
জনার্দনপুর
চণ্ডীঘাট
হরিপুর
২০ বর্গ মাইল প্লাবিত অঞ্চল
কুলগাছি
উত্তর
মেহেরপুর
ভাঙাবাঁধ
বাঁধ
চিত্র নং ৪
নদীতে বাঁধাল
চর
কক,খখ,
জোড়া জোড়া
বাঁধাল
চিত্র নং ৫। অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনী
চিত্র নং ৬
বাঁধের ভাঙামুখ বন্ধ
করণ-অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনী
ক
খ
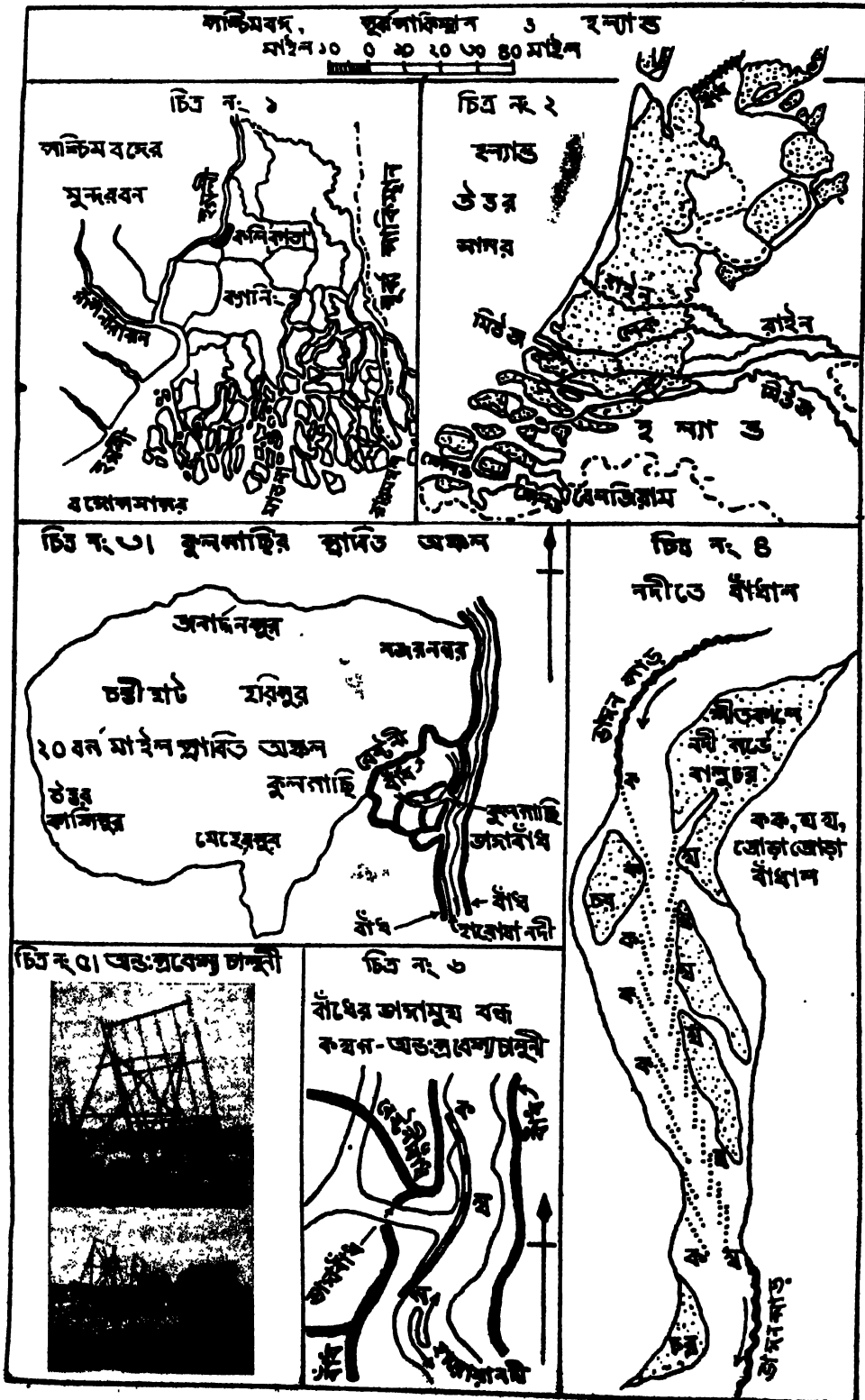
যে, অনতিকাল পূর্ব্বে স্যাঙ্পো নদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল।

বারার্ড ও হেডেন তাঁহাদের পুস্তকে—হিমালয় পর্ব্বত এবং তিব্বতের ভূগোল ও ভূবিদ্যা—লিখিয়াছেন যে, স্যাঙ্পোর জল কোন পথে হিমালয় অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত ছিল, তাহা বলা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের বিবেচনায় স্যাঙ্পোর জল, সিন্ধু, শতদ্রু, গোগ্রা বা গণ্ডক নদীপথে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল।

ভারতবর্ষ বা তিব্বতে, আধুনিক পদ্ধতিতে লিখিত ইতিহাস নাই। বহু প্রাচীন পুস্তকে, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির উল্লেখ আছে, যাহাতে তৎকালীন প্রথানুসারে পৌরাণিক কাহিনীও মিশিয়া গিয়াছে।

তিব্বতীয় পুস্তকে—"পাগ-সাম জোন-জাঙ" (Pag-sam-jon-zang, edited by Sarat Chandra Das)—তিব্বতের কতক অংশ জলপ্লাবিত ছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। মানি-কুম-বুম বা মহিমান্বিত রাজার কাহিনীতে (Mani-Kum-Bum or the Grand King's Legend) উল্লেখ আছে যে, যেখানে লাসা শহর অবস্থিত, সেই অঞ্চল জলপ্লাবিত ছিল। কাঙ্গুর বা কাঞ্জুর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পদ্মসম্ভব মহাপ্রভুর ধর্ম্ম তিব্বতে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, ঐ অঞ্চল জলপ্লাবিত ছিল।

কামরূপের প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে—কালিকা পুরাণ—উল্লেখ আছে যে, তিব্বতে সমুদ্রসদৃশ হ্রদ ছিল যাহার নাম শান্তনুপুত্র কুণ্ড বা ব্রহ্মপুত্র কুণ্ড।

অতএব, প্রাচীন তিব্বতীয় ও ভারতীয় পুস্তক হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তিব্বতের অংশ বিশেষে সমুদ্রসদৃশ হ্রদ ছিল। মনে হয়, পশ্চিমে মানস সরোবর ও রাক্ষস হ্রদ হইতে পূর্ব্ব হিমালয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত এই হ্রদ বিস্তৃত এবং ইহার উত্তরে কৈলাশ ও নিয়েনচিন্তাঙ্গলা পর্ব্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে লডক পর্ব্বতশ্রেণী ছিল।

নাঙ্গা পর্ব্বত শৃঙ্গের উত্তরে বুঞ্জি শহরের নিকটে, সিন্ধুনদ ১৭০০০ ফুট গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বারার্ড ও হেডেনের অভিমত, যে মাত্র সিন্ধুনদের পরিবাহ-ক্ষেত্র হইতে জলপ্রবাহ এরূপ গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করিতে পারিত না। তাঁহাদের আরও অভিমত শতদ্রু, কর্ণালী ও কালী গণ্ডক নদীর হিমালয়ের অপর পারে যে পরিবাহ-ক্ষেত্র আছে, মাত্র তাহার জলপ্রবাহ দ্বারায় হিমালয়ের মধ্যে বিরাট এই সব গিরিখাত সৃষ্টি সম্ভব হইত না।

সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় স্যাঙ্পো হ্রদের জল সিন্ধুনদ পথে প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পড়িত। স্যাঙ্পো হ্রদ ও সিন্ধু পরিবাহ-ক্ষেত্রের মিলিত জলপ্রবাহে সিন্ধুনদকে সমুদ্রবৎ দেখাইত, এজন্য বৈদিক কবিপ্রদত্ত সিন্ধু বা সমুদ্র নাম সার্থক হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের বর্ণনায় সরস্বতীকে বিরাট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সীমাহীন জলপ্লাবক, পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত, এরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং খুবই সম্ভব, বৈদিক যুগের শেষভাগে স্যাঙ্পোর জল সরস্বতী নদীপথে আরব উপসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল।

পরবর্ত্তী যুগে কর্ণালী-গোগরা নদী দিয়া স্যাঙ্পোর জল গোগরা-গঙ্গা নদীপথে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়। পরে গণ্ডক-গঙ্গা নদীপথে স্যাঙ্পোর জল বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে, স্যাঙ্পোর জল ব্রহ্মপুত্র মেঘনা নদী দিয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত আছে।

সুন্দরবন বদ্বীপ

বৈদিক যুগে স্যাঙ্পোর জল আরব উপসাগরে প্রবাহিত ছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীপথে জল প্রবাহের পরিমাণ কম ছিল বলিয়া পলির পরিমাণও কম ছিল এবং সেজন্য গঙ্গা-মেঘনার মোহানায় বদ্বীপ গঠনও কম হইত। গঙ্গা নদীপথে স্যাঙ্পোর জল প্রবাহিত হইবার পর, পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ভাগীরথী ও তাহার শাখানদীর মোহানায় বঙ্গোপসাগরে বদ্বীপ গঠন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চল, বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ দিকে বহুদূর অগ্রসর হইতে থাকে। মনে হয়, সপ্তম শতাব্দী হইতে স্যাঙ্পোর জল ব্রহ্মপুত্র দিয়া মেঘনা নদীপথে বঙ্গোপসাগরে পড়ায়, পশ্চিম সুন্দরবন বদ্বীপ গঠনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব সুন্দরবন বদ্বীপ গঠন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বদ্বীপ স্থলভাগের ক্রমশঃ অধোগমন

ভূজীবনের তৃতীয়ক যুগে সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। প্রাকৃতিক শক্তি পর্ব্বতশ্রেণীকে চূর্ণ করে এবং ভগ্ন পাষাণ স্তূপ নদীর জলে পলিতে পরিণত হইয়া সমুদ্রে পড়ে। সুন্দরবনের বদ্বীপ এই প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইউরোপ মহাদেশে আলপস্ পর্ব্বতশ্রেণীও ভূজীবনের তৃতীয়ক যুগে সৃষ্টি হইয়াছিল, সেজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া পরিগণিত হয়। আলপস্ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে ভগ্ন পাষাণ স্তূপ নদীর জলে পলিতে পরিণত হইয়া উত্তর সমুদ্রে নদীর মোহানায় পতিত হয়। এই পদ্ধতিতে হল্যাণ্ডের বদ্বীপের গঠন হইয়াছে ও হইতেছে।

পর্ব্বত হইতে ভগ্ন পাষাণস্তূপ নদীপথে অপসারিত হওয়ায়, পর্ব্বত ও অধিত্যকার নীচের ভূত্বকের উপরে ওজন ক্রমশঃ কমিতে থাকে। নদীর মোহানায় পলি জমা হইতে থাকায়, সমুদ্রতলে ভূত্বকের উপর ওজন ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। "আইসোস্ট্যাসি"র মূল সূত্র অনুসারে, ভার সমতা বজায় রাখিবার জন্য, পর্ব্বত ও অধিত্যকার উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং বদ্বীপ ক্রমশঃ অধোগমন করিতেছে।

"Under the principle of isostasy or compensation, there is a slow movement of elevation in the hills and uplands, together with a slow movement of subsidence in the deltas."

হল্যাণ্ডে জলাজমি উদ্ধার

এল ডাডলি স্ট্যাম্পস প্রণীত 'বিশ্বজগৎ' পুস্তকের ৪৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে :

হল্যাণ্ড উড়িষ্যা হইতেও ক্ষুদ্র দেশ। রাইন ও মিউজ নদীর বদ্বীপ এবং উত্তরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী জলাজমি ইহার প্রধান অংশ।

"Holland is a tiny country, smaller even than Orissa. It consists entirely of the *delta* of the Rhine and Meuse, with low coastlands to the north."

হল্যাণ্ডের ১২৮৫০ বর্গমাইল জমির এক-পঞ্চমাংশ সাগরাঙ্কের নীচে অবস্থিত। সমুদ্রতীরে বা নদীর পাড়ে বালিয়াড়ি কিংবা বাঁধ না থাকিলে, দেশের অর্দ্ধাংশ বা ৬৬০৩ বর্গমাইল, ঝড়বন্যার সময়, বন্যাপ্লাবিত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে হল্যাণ্ডে জলাজমি উদ্ধার ও জল নিকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২২০০ বর্গমাইল জলাজমি উদ্ধার করা হইয়াছে। নিপুণভাবে উদ্ভাবিত পূর্ত্ত-কার্য্য দ্বারা এবং চলজল বিজ্ঞানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দেশের বিস্তৃত অঞ্চল আবাদ ও বাসোপযোগী হইয়াছে। ছয় শত বৎসর ধরিয়া বদ্বীপের নীচু ও জলাজমি উদ্ধার সত্ত্বেও হল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি হ্রাস পায় নাই। নদীগুলির অবস্থা ভালই আছে এবং সমুদ্রগামী জাহাজ বহু শত মাইল নদীপথে যাতায়াত করিতেছে।

বদ্বীপ জলাজমি উদ্ধার-বিরুদ্ধ মনোভাব

বদ্বীপ জলাভূমি উদ্ধার-বিরুদ্ধ মনোভাব বাংলা দেশে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমান। কোন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস গঙ্গা-বদ্বীপ-বিশেষজ্ঞ একমত হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, সুন্দরবন বদ্বীপ জলাজমি উদ্ধারে বাধা বিঘ্ন আছে এবং ইহার ফলে সমস্ত দেশে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইবার সম্ভাবনা।

"Specialists on the Ganga Delta have unanimously advised against reclamation of land in the Sundarbans on grounds of limitations and the serious repercussion it would have on the future of the country as a whole."—*Statesman*, August 26, 1956.

সুতরাং স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে, এই মনোভাবের জন্যই কি বাঁধ ভাঙিয়া বহু জমি ও গ্রাম জলমগ্ন হইলেও বাঁধ মেরামতের কাজে উপেক্ষা প্রকাশ পায় এবং দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত অধিবাসীদের বহুকালব্যাপী কোলাহল এবং আন্দোলনের পর বাঁধ মেরামত করা হয়।

বাঁধ মেরামতের বিরাট খরচ

বিরাট খরচ, বাঁধ মেরামতে বিলম্বের অন্যতম কারণ। সুন্দরবন অঞ্চলের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী, বেষ্টনী বাঁধ নির্ম্মাণ, শাল বা বাঁশের খোঁটা মাটিতে পোঁতা, মাটি ভর্ত্তি চটের বস্তা বা ইট ভর্ত্তি লৌহতারের জালের গোলক, ভাঙা বাঁধের নালায় ফেলা, এবং কখনও কখনও বোঝাই নৌকা ডোবানো, প্রভৃতি প্রচলিত যথাশাস্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ : ২৭শে আগষ্ট ১৯৫৩ তারিখে, হাড়োয়া নদীতে, কলিকাতার প্রায় ৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত কুলগাছিতে, বাঁধ ভাঙিয়া ২০ মাইল জমি প্লাবিত হয় (চিত্র নং ৩)। পূর্ত্তকার্য্যবিভাগ সেপ্টেম্বর মাসে কাজ সুরু করেন। শালের খোঁটা পোঁতা হয় এবং মাটি-ভর্ত্তি চটের বস্তা ফেলা হয়। কোন ফল হয় না। তখন তিন মাইল লম্বা একটি বেষ্টনী বাঁধ এবং ভাঙা বাঁধের কাছাকাছি আর একটি ছোট বেষ্টনী বাঁধ করা হয়। মাটি-ভর্ত্তি চটের বস্তা বোঝাই সাতটি বড় নৌকা, ভাঙা বাঁধের নালার মধ্যে ডোবানো হয়। ভাঙা বাঁধের নালা বন্ধ হয়। কিন্তু কাজ শেষ করিবার পূর্ব্বেই, উঁচু জোয়ারের জল আসায়, আবার বাঁধ ভাঙিয়া যায়। ইহাতে লক্ষ টাকার উপর খরচ হয়। ১৯৫৪ সন নবেম্বর মাসে পুনরায় ভাঙা মেরামতের কাজ সুরু হয়। শাল ও বাঁশের খোঁটা আবার পোঁতা হয়, মাটি ভরতি চটের বস্তা আবার ফেলা হয়, এবং বেষ্টনী বাঁধ আবার তৈয়ার হয়। ২রা মার্চ্চ, ১৯৫৫ তারিখে বাঁধ মেরামত শেষ হয়। এবার বাঁধ মেরামতের খরচ হয় ৭ লক্ষ টাকা।

একটি মাত্র বাঁধ ভাঙা মেরামতে ৭ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইলে, সুন্দরবন বাঁধ সংরক্ষণের খরচ ১ কোটি টাকা লাগিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এ অঞ্চলের রাজস্ব বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং রাজকোষে অর্থাভাব স্বাভাবিক।

নদীর মহান্ শক্তির ব্যবহার

প্রশ্ন উঠিতে পারে, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী, খোঁটা পোতা, মাটি-ভর্ত্তি চটের বস্তা ফেলা, বেষ্টনী বাঁধ তৈয়ার করা, ইত্যাদি প্রচলিত যথাশাস্ত্র পদ্ধতি, কেন বাঁধ ভাঙা মেরামতের জন্য ব্যবহার করেন? অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহারে কি অন্তরায় আছে?

বিভিন্ন পূর্ত্তকার্য্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিজ নিজ সংস্কারে আসক্তি, অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রধান প্রতিবন্ধক।

ভারতের বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র প্রায় একই রকমের শিক্ষা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেচ বিভাগ, রেল বিভাগ বা অন্য কোন বিভাগে শিক্ষান্তে তিনি যোগ দেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি নিজ নিজ বিভাগ অনুযায়ী যেন ভিন্ন ভিন্ন জাতিভুক্ত হইয়া পড়েন; যেমন উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ দ্বিজাতিভুক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিজাতিভুক্ত হইলেও, বেদ হয়ত তিনি কখনও পাঠ করেন নাই। তথাপিও তিনি নিজেকে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে, সংস্কৃত হইতে বাংলায় ঋগ্বেদ অনুবাদকারী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মণ নহেন। সেচ বিভাগীয় পূর্ত্তকর্ম্মচারী হয়ত নদী নিয়ন্ত্রণের কোন কাজ করিবার সুযোগ কখনও পান নাই; তবুও, রেলের সেতুর নিকট নদী নিয়ন্ত্রণ বা রেল-ষ্টীমার যান পরিবর্ত্তন ঘাট ষ্টেশনে নদী পর্য্যবেক্ষণে যাঁহার সমস্ত কর্ম্মজীবন কাটিয়াছে, এরূপ রেল ইঞ্জিনীয়ার অপেক্ষা, সেচ ইঞ্জিনীয়ার নদী নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নিজেকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন। জল-নিকাশ বা সেচ ও নদী নিয়ন্ত্রণ কি একই বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞান?

জলস্রোতবেগ নদীকে মহান্ শক্তির অধিকারী করিয়াছে—ইহা রেল ইঞ্জিনীয়ারের অভিজ্ঞতা। জলস্রোতবেগের সামান্য বৃদ্ধিতে, নদীর পাড় ও নদীগর্ভের মাটি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গভীর নালার সৃষ্টি করে; আবার জলস্রোতবেগ সামান্য হ্রাস পাইলে, পলি পড়িয়া নদীর গভীর নালা মজিয়া যায়।

বাঁধাল

ষ্টীমার কোম্পানী, বাঁধাল দ্বারা নদীকে, তাহার মহান্ জলস্রোতবেগ শক্তিকে ব্যবহার করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। বাঁধালে মূলতঃ ধারাপরম্পরায়, জোড়ায় জোড়ায়, অভিসারী সরল রেখায়, খাড়া বাঁশ থাকে। (চিত্র নং ৪)

"Bandals consist essentially of a series of pairs of lines of vertical bamboos, each pair converging downstream."

প্রত্যেকটি বাঁশ নদীগর্ভে তিন-চার ফুট পোঁতা হয়। জলস্রোতবেগ মৃদু হইলে, চাটাই প্রভৃতি খাড়া বাঁশের সঙ্গে বাঁধা হয়। প্রতি জোড়া বাঁধালের মধ্য দিয়া জলস্রোতবেগ সামান্য বৃদ্ধি পায়; বাঁধাল ও নদীর পাড়ের মধ্য দিয়া জলস্রোতবেগ সামান্য হ্রাস পায়। জলস্রোতবেগ হ্রাস পাওয়ায়, বাঁধাল ও পাড়ের মধ্যে পলি পড়িয়া নদীগর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইতে থাকে এবং এই অংশের জলপ্রবাহের পরিমাণ কমিতে থাকায়, প্রতি জোড়া বাঁধালের মধ্য দিয়া জলপ্রবাহের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে জল-স্রোতবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জোড়া জোড়া বাঁধালের মধ্যের নদীগর্ভ ক্ষয়প্রাপ্ত ও জল গভীর হয়। এই পদ্ধতিতে চওড়া ও অগভীর নদীতে, গভীর নালা বজায় থাকে এবং ষ্টীমার চলাচলে বাধা থাকে না।

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি

নদীর জল বাড়িলে জলস্রোতবেগ বৃদ্ধি পায় এবং নদীগর্ভ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া খাড়া বাঁশের ভিত্তি অপসারিত করে, সুতরাং বাঁশগুলি পড়িয়া যায় এবং বাঁধাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এজন্য বাঁধালের উন্নতিসাধনের প্রয়োজন হয়। অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি জাতীয় বাঁধালের সুবিধা এই যে, নদীর জল ও জল-স্রোতবেগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, চালুনি নদীগর্ভে স্থায়ী হইয়া থাকে। অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি এক একটি দেখিতে কীলকাকৃতি, ইহার ভিত্তিভূমি চওড়া সমকোণী চতুর্ভুজ দুই প্রান্ত ত্রিভুজ সামনে ও পিছনে সমান্তরাল চতুর্ভুজ। (চিত্র নং ৫)

"Each unit of 'Permeable Screen' consists of a wedge shaped structure, with a wide rectangular parallelogram base, the ends being triangles, while the front and back are parallelograms."

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনি বাঁধালের ন্যায় নদীতে কাজ করে।

ভাঙা বাঁধের মেরামত

যেখানে বাঁধ ভাঙিয়াছে, সেখানে নদীর পাড়ের কিনারা দিয়া, অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির একটি সারি, নদীগর্ভে যথাযোগ্য বিশিষ্ট রেখায় (properly laid alignment with straights joined by transition curves) বসান হইলে চালুনির সারি ও পাড়ের মধ্যে জলস্রোতবেগ হ্রাস পাইতে থাকে। জলস্রোতবেগ হ্রাসের ফলে নদীগর্ভে পলি পড়িয়া নূতন নদীর পাড় সৃষ্টি হইয়া বাঁধের ভাঙা মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে (চিত্র নং ৬)। ক্রমশঃ এই পলির উচ্চতা জলের উচ্চতার প্রায় সমান হইবে। এই নূতন পাড়ের উপরে মাটি ভরিয়া দিলে, ভাঙা বাঁধ মেরামত হইবে।

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির সারি নদীগর্ভে বসান এবং এক বৎসর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভাঙ্গা বাঁধ মেরামতের খরচ, প্রচলিত যথাশাস্ত্র খোঁটা পোঁতা বেষ্টনী বাঁধ—প্রভৃতি পদ্ধতির প্রচণ্ড খরচের তুলনায় অতি সামান্য। উদাহরণস্বরূপ ফুলগাছির ভাঙ্গা বাঁধের জন্য ১৯৫৩-৫৫ সনের ৭ লক্ষ টাকা খরচের পরিবর্ত্তে, অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনিতে ১ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইত না।

অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির ব্যবহারে, নদীকে তাহার জলস্রোত-বেগের মহান্ শক্তি ব্যবহারে সাহায্য করিলে, বাঁধ ভাঙ্গা মেরামত ও সংরক্ষণের খরচ, ১ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ১৪ লক্ষ টাকার মধ্যেই কুলাইবে। সুতরাং সুন্দরবনের বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্বেই বাঁধ সংরক্ষণ সম্ভব হইবে। রাজ-কোষে অর্থাভাব হইবে না।

জোয়ার-ভাটার উচ্চতা বৃদ্ধি

নদীর প্রণালী ক্রমশঃ চওড়া ও অগভীর হওয়ার জন্য, সুন্দরবনের নদীতে জোয়ার-ভাটা জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ধাপার ৫ মাইল নিম্নে বামনঘাটায় বিদ্যাধরীর প্রণালী ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৫০-২৫০ ফুট চওড়া ছিল ; ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে চওড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০ ফুট হয়। বামন-ঘাটার নিকট নদীর বাঁকে নদীগর্ভ সাগরাঙ্কের ৫৯ ফুট নীচে ছিল। অথচ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে পলি পড়িয়া নদীগর্ভ মজিয়া ৪৭ ফুট উঁচু হয় এবং সাগরাঙ্কের মাত্র ১২ ফুট নীচে থাকে। ক্যানিং-এর নিকট মাতলা নদীতে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ার জলের উচ্চতা সাগরাঙ্কের ৬'২৮ ফুট উপরে ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ার জলের উচ্চতা আরও ৩ ফুট বৃদ্ধি পায়।

সুন্দরবনের চওড়া ও অগভীর নদীতে ধারাপরম্পরায়, জোড়ায় জোড়ায় অন্তঃপ্রবেশ্য চালুনির ব্যবহারে সংকীর্ণ ও গভীর, খালের মত, স্থায়ী নালার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাইলে জোয়ার-ভাটার জলের উচ্চতাও কমিবে এবং বহু জলাজমির উদ্ধার হইবে। গভীর নদীতে সারা বৎসর নৌকাযোগে যাতায়াত সম্ভব হওয়ায় সুন্দরবনের অধিবাসীরা তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হয় এরূপ বাজারে অল্প খরচে ও সহজে লইয়া যাইতে পারিবেন। উপযুক্ত লাভ থাকিলে খাদ্য ফসল ফলনের বৃদ্ধি হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গাগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের পুনর্ব্বাসন

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ৩০০০ বর্গমাইল সুন্দরবনে মাত্র ৭৫০০০০ বা ১১৭২ বর্গমাইল জমি ২২০১ মাইল বাঁধের সাহায্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। বহু স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবং বাঁধের ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের জন্য, ৭৫০০০০ একর জমির বহু অংশে প্লাবিত অবস্থার হেতু ফসল হয় না। সুষ্ঠু পূর্ত্তকার্য এবং চলজল বিজ্ঞানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে, সম্পূর্ণ ১১৭২ বর্গমাইল জমিতে বাৎসরিক ১৬ কোটি টাকার ফসলের ফলন হইয়া, সুন্দরবনের বর্ত্তমান অধিবাসীদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইবে।

সুন্দরবনের অবশিষ্ট ১৮২৮ বর্গমাইল জমি, যেখানে এখনও বাঁধ নির্ম্মাণ বা জমির পুনরুদ্ধারকার্য্য হয় নাই সেখানে অনায়াসেই অন্ততঃ ১০০০ বর্গমাইল বা ৬৪০০০০ একর জলাজমি উদ্ধার করিয়া চাষ-আবাদ হইতে পারে। প্রত্যেক পরিবারকে যদি ৫ একর জমি বণ্টন করা হয়, তবে পূর্ব্ববঙ্গাগত ১২৮০০০ পরিবার, বা ৫০০০০০ আশ্রয় প্রার্থীর পুনর্ব্বাসন বর্ত্তমান অব্যবহার্য্য সুন্দরবনের বাঁধবিহীন লবণাক্ত জলাজমিতে সম্ভব। এই ৫০০০০০ আশ্রয় প্রার্থী-দিগের পুনর্ব্বাসন সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ১১৭২ বর্গমাইল বাঁধ রক্ষিত সুন্দরবন অঞ্চলে যে অধিবাসীরা আছেন, তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না।

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীঅজিতকুমার বসুমল্লিক

নিতাই মাঝি লেখাপড়া শিখে নাই বটে, কিন্তু সারা জেলায় তাহার নামডাক, জেলার বাহিরেও সে সম্প্রতি দুই-চারি স্থান হইতে তাহার প্রতিভার স্বীকৃতি পাইয়াছে। মাঝি নিতাই, পটুয়ানিতাই হইয়াছিল, এখন মৃৎশিল্পী হইয়াছে। নিতাই শুধু ডোমপাড়ারই গর্ব্ব নহে, সারা মরাইতলা গ্রামের গর্ব্বস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রামের নাম মরাইতলা। সারা গ্রাম নাকি এককালে ধানের মরাইয়ে ভর্ত্তি থাকিত—সেই জন্তই গ্রামের এই নাম। গ্রাম বড়, বহু পাড়ায় বিভক্ত, গ্রামবাসী সকলেই প্রায় অল্পবিত্তর সম্পত্তিশর। এখনও গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে সারবন্দী মরাই দেখা যায়। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যস্থলে বহুদিনের পুরাতন গ্রাম মরাইতলা। আগে বাহিরের জগতের সহিত তাহার যোগাযোগ রক্ষা হইত কৌশিকী নদীর দ্বারা। কৌশিকীতে তখন জোয়ার-ভাটা খেলিত, পাল তুলিয়া বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত জাহানাবাদে আর ত্রিবেণীতে। এখন নদী বুজিয়া খাল হইয়াছে, মরা সোঁতা বর্ষায় ভরিয়া উঠে, গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায়। এখন বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে জেলাবোর্ডের মাটির রাস্তা, শীত-গ্রীষ্মে পথ ধুলায় অন্ধকার, বর্ষায় আর শরতে হয় কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল—অগম্য।

তবু গ্রামের উন্নতি হইয়াছে, সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে, দোলে ও রক্ষাকালী পূজায় মেলা বসে, স্কুল হইয়াছে, পোষ্ট আপিস বসিয়াছে, ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তারা ছোটখাটো একটা হাসপাতাল খুলিবারও চেষ্টা করিতেছেন। এই গ্রামেরই দক্ষিণ উপান্তবর্ত্তী ডোমপাড়ার বাসিন্দা স্বভাব-শিল্পী নিতাই মাঝি। গ্রামের ছোট বড় সকলেই নিতাইকে ভালবাসে, তাহার প্রশংসাও করে, তাহার মর্য্যাদা সম্পর্কে এখন সকলেই সজাগ—বৃদ্ধেরা সগর্ব্বে বলেন, "আমাদের নিতাই কারিগর," শিক্ষিত সম্প্রদায় বলে," মৃৎশিল্পী নিতাই মাঝি"—মেয়েমহলে বলে, "নিতাই পোটো"। এমনকি বিশ্বনিন্দুক হরি আচার্য্যও তাহার কোন কুৎসা করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে বলে, "আরে দুর দুর, নিতাইটা কি মানুষ! হাসতে পর্য্যন্ত জানে না—খালি বসে বসে ভাবে আর কাদা চটকায়।"

কথাটা সত্য, নিতাই ভাবে আর কাদা চটকায়, আর মূর্ত্তিসমূহ, জীবজন্তু পাখী ফলফুল—আরও কত কি, সার্থক শিল্পসৃষ্টির নিত্য নূতন পরিচয়।

আগে পাইকাররা আসিয়া নিতাইয়ের তৈরী খেলনা বড় বড় ঝোড়ায় সাজাইয়া লইয়া যাইত নামমাত্র মূল্যে। এখন গদাই নাপিতকে দিয়া নিতাই গ্রামের ও আশপাশের মেলায় দোকান খোলায়—মাটির বদলে টাকা আসে, কিন্তু নিতাইয়ের মুখে হাসি আসে না।...

স্বদেশীবাবুরা যেদিন নিতাইয়ের তৈরী কয়েকটি মূর্ত্তি ও খেলনা লইয়া যান সেদিন মরাইতলার কেহ কল্পনাও করে নাই যে নিতাইয়ের তৈরী 'গৌরনিতাই' মূর্ত্তি জেলা শহরের প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সোনার মেডেল নিতাইয়ের গলায় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই ঝুলাইয়া দিবেন, খবরের কাগজে নিতাই মাঝির ফটো বাহির হইবে! কিন্তু নিতাইয়ের মনে সুখ নাই। নিতাই মাঝির সমস্ত সৃষ্টির, তাহার সমস্ত কলানৈপুণ্যের উৎস অন্তরের অন্তঃস্থলের এক সুগভীর বেদনার মধ্যে নিহিত, তাই তাহার অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে না।

নিতাই মাঝি পুতুল গড়ে, খেলনা গড়ে, পট আঁকে, সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, কিন্তু কখনও প্রতিমা তৈরি করে নাই। প্রতিমা তৈরির প্রধান অন্তরায় তাহার জাতি, ডোমের তৈরী প্রতিমা পূজা করিবে কে! নিতাই মাঝি তাহা জানে আর জানে বলিয়াই সে কখনও প্রতিমা তৈরির স্পর্দ্ধা দেখায় নাই। সে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি গড়িয়াছে, কালীয়-দমন, নাড়ুগোপাল, গৌরনিতাই—কত মূর্ত্তি তৈরি করিয়াছে এমনকি মহাদেব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, হরপার্ব্বতী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়াছে, লোকে কিনিয়াছে, ঘর সাজাইয়াছে সেই মূর্ত্তি দিয়া, বহু বাড়ীতেই কাঁচের ঝকঝকে আলমারিতে নিতাইয়ের হাতে-গড়া ঝকঝকে প্রাণবন্ত মূর্ত্তিসমূহ শোভা পায়, কিন্তু তা বলিয়া ডোমের হাতের তৈরী প্রতিমা কিছুতেই ত পূজা করা যায় না। অথচ সরস্বতী পূজায় কয়েকদিন আগে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

গ্রামে ঢি ঢি পড়িয়া গেল যে নিতাই সরস্বতী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছে এবং হাইস্কুলে শ্রীপঞ্চমীর দিন ঐ প্রতিমার পূজা হইবে। গ্রামের সকলেই শুনিল, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস-

সামান্য বিষয় লইয়াও যাহারা ঘোঁট পাকাইতে পারিলে আর কিছু চাহে না সেই অতি-উৎসাহীর দল কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা প্রথমে ছাত্রমহল হইতে সংবাদ লইল, পরে গদাই নাপিতের নিকট হইতে পাকা খবর সংগ্রহ করিয়া একটা হৈ চৈ শুরু করিয়া দিল। গ্রামের প্রায় বারো আনা লোকই একমত হইল, ডোমের তৈরী প্রতিমা কিছুতেই পূজা হইতে পারে না ; এ অনাচার বন্ধ করার জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গ্রামের দুই চারি জন মুরুব্বি পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় ব্রাহ্মণ-সন্তান, ইংরেজিতে এম এ পাস করিলেও শিখা এবং উপবীত ধারণ করেন, ত্রিসন্ধ্যা করেন, স্বপাক আহার করেন, কাহারও দান গ্রহণ করেন না—এক কথায় ব্রাহ্মণের সমস্ত গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি যে এইরূপ একটা অনাচার কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না এ বিশ্বাস সকলের মনেই ছিল। মুরুব্বিদের বক্তব্য ধীর ভাবে শুনিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—প্রতিমা মাটির, মাটি কখনও অশুচি হয় না আর তাহা ছাড়া নিতাই প্রতিমা হিসাবে বিক্রয় করার জন্য গড়ে নাই, শিল্পী আপন মনের খেয়ালে তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়া, তাহার সকল কলানৈপুণ্যকে নিঃশেষে বিকশিত করিয়া চতুঃষষ্ঠীকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়াছে, শাস্ত্রোক্ত দেবীর ধ্যানের সহিত প্রতিমার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য-বিধান করিয়াছে—ঐ প্রতিমা নিপুণ শিল্পীর তৈরী প্রতিমা মাত্র নহে, উহা ভক্ত সাধকের ধ্যানলব্ধ ধন।

গ্রামবাসীরা ছাত্রদের মুখে শুনিল প্রতিমাটি দেখিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজেই উহা নিতাইয়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আসিয়াছেন, অর্থের বিনিময়ে নিতাই দিতে চাহে নাই, কিন্তু ভক্ত ও শিল্প-রসজ্ঞের আগ্রহ দেখিয়া সে তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারে নাই। তখন তাহারা প্রায় সকলেই চুপ করিয়া গেল।

শ্রীপঞ্চমী। প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং পূজা করিয়াছেন। গ্রামের সমস্ত পল্লী হইতেই প্রায় সকল বাড়ীরই লোক আসিয়াছে। প্রসাদ বিতরণের সময় দেখা গেল নিতাই মাঝি আসে নাই। প্রতিমা লইয়া যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ তাহার কানে গিয়া থাকিবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া ফলমূলাদি প্রসাদ লইয়া নিজেই নিতাইয়ের দোকানে চলিলেন। বেশীদূর যাইতে হইল না, দোকানের বাহিরে পথের পাশেই রোদ পোহাইতে পোহাইতেই প্রৌঢ় নিতাই মাঝি একটা পুতুলে রং ফলাইতেছিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে দেখিয়া আভূমি আনত প্রণাম করিয়া বলিল, "মাষ্টার মশাই, আপনি এ-দিকে ?" পূজার দিনে ডোমপাড়ায় মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সে রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে মাটির সরাখানি নিতাইয়ের নিকট নামাইয়া দিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তোমার জন্য মায়ের প্রসাদ এনেছি নিতাই"। নিতাই হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেল, নিজের মনেই বার তিন-চার প্রসাদ কথাটা আওড়াইয়া লইল, তার পর অত্যন্ত কাতর স্বরে বলিল, "মায়ের প্রসাদ আর এ জন্মে পেলুম না মাষ্টার মশাই, ছুটো কালির আঁচড়ও চিনতে পারলুম না"। নিরক্ষর নিতাই মাঝির সমস্ত বুকখানা যেন তীব্র বেদনায় সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

স্মিত হাস্যের সহিত মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "ভুল করো না নিতাই, কালির আঁচড়ের চেয়েও তুলির টান অনেক—অনেক বড়, মা অকৃপণ হাতেই তাই তোমাকে দিয়েছেন, তুমি মায়ের বরপুত্র নিতাই।"—নিতাই মাথা নীচু করিয়া প্রসাদের সরাটা হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইল।...

নিতাই সারা দিন ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। "বরপুত্র" কথাটা তাহাকে বার বার বহু দিনের পুরাতন, অনেক কথাই আজ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আপনার মনেই নিতাই নিম্ন কণ্ঠে 'বরপুত্র' কথাটা ইতিমধ্যে কয়েকবার আবৃত্তি করিয়াছে।...

তখন তাহার বাবা-মা জীবিত ছিলেন। বুড়া বয়সের ছেলে বলিয়া নিতাইয়ের আদরের অন্ত ছিল না। অথচ নিতাইয়ের জন্যই তাঁহাদের কত না লাঞ্ছনা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে!

লাঞ্ছনার সুরু এমনই এক শীতের সকালে।...

"ঠাকুর মশাই"—ডাক দিয়া গোপাল মাঝি একটু থামিল। দূরে রাস্তার উপর হইতে বাড়ীর ভিতরে সে ডাক পৌঁছিল কিনা সন্দেহ। আবার ডাকিল, "ঠাকুর মশাই, বাড়ী আছেন ?" এবারেও সঙ্কোচে তাহার গলাটা কাঁপিয়া উঠিল। চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে নিতাই ততক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, বাবার হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়া বলিল, "জোরে ডাকবি তো!" ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া গোপাল অবাক হইয়া গেল, তাহার সারা মুখ যেন খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, এ নিতাই যেন সে নিতাই নয়, আধঘুমন্ত টানা টানা চোখ দুটি যেন এক অপূর্ব্ব দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করিতেছে। গোপাল মাঝি এত বুঝিল কি না জানি না, কিন্তু ছেলের চেহারার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার চোখ এড়াইল না। গোপাল কেমন যেন হতভ-

স্তব্ধ হইয়া গেল ; তাহার সম্বিৎ ফিরিল নিতাইয়ের অধীর কণ্ঠস্বরে, "বলি ডাকবি না হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি !"

গোপাল বার দুই কাসিয়া গলাটা সাফ করিয়া লয়, তাহার পর গলাটা একটু চড়াইয়াই ডাক দেয়, "ঠাকুর মশাই, অ ঠাকুর মশাই, বলি বাড়ী আছেন"। অপ্রত্যাশিত ভাবেই সাড়া মিলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে সশরীরে বাহির হইয়া আসিলেন, হাতে নারায়ণশিলা।

রাস্তার উপরই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া গোপাল সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানায়, বাবার দেখাদেখি ছেলেও সটান শুইয়া পড়ে। এই রকম একটা ব্যাপারের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। গোপাল মাঝিকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, স্নেহ করে। ঐ রকম সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী নম্র ও সাধু প্রকৃতির লোক মাঝিপাড়ায় কেন সারা গ্রামে আছে কিনা সন্দেহ। খোদ জমিদার শান্তশিব চৌধুরী পর্য্যন্ত বলেন, 'ও শাপভ্রষ্ট, নইলে কি ডোমের ঘরে অমন ছেলে জন্মায় !' গোপাল মাঝিকে সাধারণ ডোম হিসাবে কেহ দেখে না, প্রশ্রয় সে অল্প-বিস্তর সকলের কাছেই পায়, কিন্তু তা বলিয়া সে বামুনপাড়ায় ঢুকিয়া একেবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিবে এ শুধু ধারণার বাহিরে নয়, বিশ্বাসেরও বাহিরে। বাঁ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোখ দুইটা একটু রগড়াইলেন। ততক্ষণ বাপ-ব্যাটা দু'জনেই প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যতদূর সম্ভব রাগটা চাপিয়া রাখিয়া স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন, "কি রে সকালবেলায় একেবারে বামুনপাড়ার মাঝখানে এসে হানা দিয়েছিস বাপ-ব্যাটায়, ব্যাপার কি ?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা কিন্তু গোপালের কানে ধরা পড়িল, নিতাই বুঝিল কিনা বুঝা গেল না। গোপাল একেবারে কেঁচো হইয়া গেল। কথাটা বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ ফোটে না। নিতাই বাপকে ধাক্কা দিয়া বলিল, "বল না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবার নিতাইয়ের দিকে তাকাইলেন, স্নান করিয়া একটি লালপেড়ে কোরা কাপড় পরিয়া আসিয়াছে, সদ্যভেজা চুলগুলি মাথার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে, বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া শ্যামশ্রীতে উদ্ভাসিত এই ঋজুদেহ ছেলেটিকে কিছুতেই গোপালের ছেলে বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না—যেন কায়েত-বামুনের ঘরের ছেলে !

গোপালের কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিন্তাধারার ছেদ পড়িল। "নিতাই বলে লেকাপড়া শিকবে, বছরখানেক ধরে খালি এক কথা, তাই সবাই বললে তবে যা ভটচার্য্যি মশাইকে—" গোপালের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল, "কি লেখাপড়া শিখবে, এ্যাঁ।" যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফাটিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আকস্মিক চীৎকারে এবার শুধু গোপাল নহে নিতাইও ভড়কাইয়া গেল।

"দুর্গা, দুর্গা—সকাল বেলায় উঠেই মুখ দেখতে হ'ল, মা জানি কি আছে বরাতে।" এতক্ষণে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন উষ্মা স্পষ্ট ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিল।

শীতের সকাল, তখনও রৌদ্র গ্রামের পথে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই, গাছের মাথায় মাথায়, পাতায় পাতায় সবে সোনালি সূর্য্যকিরণ কেবল ঝিকমিক করিতে সুরু করিয়াছে। পথে লোকজনও ছিল না, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চীৎকারে দুই-চারিটি কৌতূহলী মুখ দেখা গেল এবং ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যস্থলে ডোম দেখিয়া তাঁহারা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।

গোপাল আর লাঞ্ছনা না বাড়াইয়া নিতাইয়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বামুনপাড়া হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। সারা পথ বাপ-ব্যাটা দু'জনের কেহই কথা বলে নাই। তাহার পর বহুদিন ধরিয়া গোপালকে ও গোপালের স্ত্রীকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনিতে হইয়াছে। কত রকমের কত কথা কত লোকেই না বলিয়াছে, সে সব নিতাই ভুলিয়া গিয়াছে, শুধু মনে আছে হাটে ঝুড়ি কিনিতে গিয়া নিতাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া গোপালকে হারু ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এ্যাঁ এই বুঝি তোর ছেলে, ডোমের ছেলে লেখা পড়া শিখবে, মা সরস্বতীর বরপুত্তুর হবে, বলি আস্পদ্দা মন্দ নয়।" তাহার পর কি নির্যাতনই না সুরু হইল, গোপালকে আর নিতাইকে দেখাইয়া সে কি হাসাহাসি। গোপাল সে হাটে আর ঝুড়ি চুবড়ি বিক্রয় করিতে পারিল না। বাড়ী ফেরার পথে বহুদূর পর্য্যন্ত কয়েকটা ছেলে "বরপুত্তুর, বরপুত্তুর" বলিয়া তাহাদের পিছনে হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়াছিল। আজ মাষ্টার মহাশয়ের মুখে 'বরপুত্র' শব্দ অতীতের সেই বিষাদমলিন দিনকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

নিতাইয়ের সম্বিৎ ফিরিল কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে গ্রামের ভিতর হইতে সন্ধ্যারতির বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে। নিতাই দুই হাত কপালে ছোঁয়াইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—আকাশে শ্রীপঞ্চমীর চাঁদ হাসিতেছে।

কেদারনাথ হইতে বদ্রীনাথ

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন

এবার বদ্রীনাথ দর্শন এবং কেদার হইতে বদ্রীযাত্রার পথের কথা উল্লেখ করিব। হিমালয়ের এই কঠিন পার্বত্য পথে তীর্থদর্শন-মানসে যাহারা বাহির হয়, তাহারা প্রায় সকলেই কেদারনাথ দর্শনান্তে বদ্রীনাথ দর্শন করিয়া এই পরিক্রমা শেষ করে। অবশ্য যাহাদের আরও শারীরিক কষ্ট সহ্য করা এবং আরও অধিক সময় ব্যয় করা সম্ভব হয় এই সঙ্গে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী তীর্থদ্বয় দেখিয়া তাহারা উত্তরাখণ্ডের তীর্থপরিক্রমা সম্পূর্ণ করে। কেদার ও বদ্রীনাথ পরিক্রমার পথে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, ত্রিযুগীনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, উখীমঠ, তুঙ্গনাথ, গোপেশ্বর, গরুড়গঙ্গা, যোশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ পাণ্ডুকেশ্বর প্রভৃতি হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত তীর্থগুলিও এই সঙ্গে দেখা হয়।

কেদারনাথ পর্বতশিখর হইতে বদ্রীনাথের দূরত্ব সোজাসুজি খুব বেশী নয়; কেহ কেহ বলে মাত্র ছয় মাইল; আর পূর্বে একই পূজারী প্রত্যহ কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের পূজা করিত, কিন্তু সেই সোজা পথ আর না থাকায় এখন একশ' এক মাইল পথ ঘুরিয়া কেদার হইতে বদ্রীনাথ যাইতে হয়।

কেদার হইতে পূর্বোক্ত পথে আমরা গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম। পথ একটানা নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। উৎরাই পথে সাত মাইল অতিক্রম করিতে মাত্র দুই ঘণ্টার মত সময় লাগিল। তবে নামিবার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয়, কারণ গড়ানে পথ দিয়া আস্তে হাঁটিয়া চলা সম্ভব হয় না, প্রায় দৌড়াইয়াই চলিতে হয়। চড়াই পথের তুলনায় উৎরাই পথে চলিবার ক্লান্তি অবশ্য অনেকাংশে কম, কিন্তু নামিবার সময় শরীরে অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি লাগে আর একটু অসতর্ক হইলে পায়ে আঘাত লাগিবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

গৌরীকুণ্ড ও রামপুরচটীর মাঝে মূল পথ ছাড়িয়া তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ের উপর ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির অবস্থিত। গৌরীকুণ্ড হইতে উৎরাই পথে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ডান হাতের চড়াই পথ ধরিয়া আমরা ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে চলিতে লাগিলাম। চড়াই পথে দুই মাইল চলিয়া শাকম্ভরী দেবীর মন্দির দর্শন হইল। কথিত আছে, দেবী এই স্থানে শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন। শাকম্ভরী মন্দির হইতে আরও প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া আমরা যখন ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছিলাম তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মন্দিরে ধাতুনির্মিত নারায়ণ-মূর্তি দর্শন করিলাম। মন্দিরদ্বারের সম্মুখে একটি ধুনি প্রজ্বলিত রহিয়াছে দেখিলাম। প্রবাদ, এই ধুনি শিব-পার্বতীর বিবাহের ধুনি, ত্রিকাল ধরিয়া জ্বলিতেছে। যাত্রীরা ধুনি প্রদক্ষিণকালে এক এক খণ্ড কাষ্ঠ অগ্নিতে প্রদান করে। গঙ্গোত্রী যাইবার পথ এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।
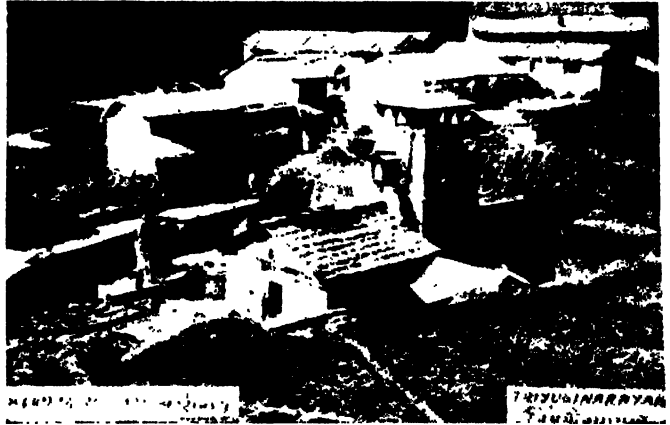
ত্রিযুগীনারায়ণ

ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শনান্তে আমরা আবার মূল পথে ফিরিয়া আসিলাম। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, গুপ্তকাশীর পর এক মাইল পথ আসিয়া নালাচটী অতিক্রম করিয়া আমরা কেদারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কেদারনাথ দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া নালাচটী পর্যন্ত একই পথে আসিলাম। নালাচটী পার হইয়া বাম দিকের উৎরাই পথে মন্দাকিনীর সেতু অতিক্রম করিয়া এবার আমরা বদ্রীনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেতু পার হইয়া চড়াই পথে

আরও প্রায় দুই মাইল চলিয়া সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা যে স্থানে পৌঁছিলাম তাহার নাম উখীমঠ।

বাসুদেব-পৌত্র অনিরুদ্ধ কর্তৃক বাণাসুর রাজকন্যা উষা হরণের যে কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, কথিত আছে, এই স্থানেই তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। উষার নামানুসারে এই ক্ষেত্রের নাম হইয়াছে উষা বা উখীমঠ। শীতের ছয় মাস এখান হইতে কেদারনাথের পূজা নিবেদন করা হয়।

একরাত্রি উখীমঠে বাস করিয়া আমরা তুঙ্গনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তুঙ্গনাথ এই স্থান হইতে বার মাইল দূরে অবস্থিত আর এই বার মাইল পথের ভিতর আট মাইলই প্রাণান্তকর চড়াই। মাঝে কিঞ্চিদধিক ছয়

তুঙ্গনাথ

মাইল পথ ঘন জঙ্গলে আবৃত। তিন বেলা হাঁটিয়া পরদিন বেলা আন্দাজ এগারটায় আমরা তুঙ্গনাথ পৌঁছিলাম। এখানে তুঙ্গনাথ মহাদেবের শিবলিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। পর্বতচূড়ায় অবস্থিত এই মন্দির; উচ্চতা ১২,০০০ ফুটের উপর। কেদার-বদ্রী পরিক্রমায় তুঙ্গনাথই সর্বোচ্চ স্থান। স্থানটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা তবে তুষারাবৃত নহে। মন্দির-প্রাঙ্গণের নীচে একটা স্নানের কুণ্ড আছে, নাম আকাশগঙ্গা; কুণ্ডের জল হিমশীতল। তুঙ্গনাথ মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ পর্বতশ্রেণী একত্রে দৃষ্টিগোচর হয় আর এ নয়নাভিরাম দৃশ্য তুঙ্গনাথ ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

তুঙ্গনাথ হইতে অবতরণ করিয়া সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণ্ডলচটী নামে একটি ছোট চটীতে রাত্রিবাসের জন্য আমরা আশ্রয় লইলাম। অবতরণকালে প্রায় সম্পূর্ণ পথই গভীর বনের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে। এইরূপ গভীর অরণ্য এই পরিক্রমায় আর আমরা পাই নাই।

মণ্ডলচটী ছাড়িয়া পাইলাম গোপেশ্বর। এখানে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। আর মন্দির-প্রাঙ্গণে একটা বিরাট-আকার ত্রিশূল আছে, তাহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর রাজা অনেকমল্লের বিজয়-গৌরব বার্তা খোদিত আছে।

গোপেশ্বর পার হইয়া বদ্রীনাথ গমনের মূল পথের সংযোগস্থল চামোলি আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া পিপুলকুঠী পর্যন্ত যে বাস একটানা চলাচল করে তাহা এই পথ দিয়া যায়। পিপুলকুঠীর দূরত্ব এখান হইতে মাত্র এগার মাইল; আর এই পথটুকু বাসেই চলা সম্ভব হয়; অনাবশ্যক আর পায়ে চলিবার প্রয়োজন হয় না। বহু দিনের পথশ্রমের পর আজ আবার খানিকটা পথ বাসে চলা সম্ভব হইবে জানিতে পারিয়া যার পর নাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, কিন্তু বাসের সংখ্যাল্পতা ও স্থানাভাবের জন্য আমাদের ভাগ্যে আর বাসে চড়া সম্ভব হইল না; শেষ পর্যন্ত হাঁটা-পথেই অগ্রসর হইতে হইল।

কেদারনাথের পথে রুদ্রপ্রয়াগে আমরা অলকানন্দাকে ছাড়িয়া মন্দাকিনীর অববাহিকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম; চামোলি পৌঁছিয়া আবার আমরা অলকানন্দার সহিত মিলিত হইলাম; আর বদ্রীনাথ পর্যন্ত অলকানন্দার অববাহিকা ধরিয়াই বরাবর চলিতে হইবে।

পিপুলকুঠীর পর আসিলাম গরুড়গঙ্গায়। বিষ্ণুর উদ্দেশে গরুড় এই স্থানে তপস্যা করেন, এখানে গরুড়েশ বিষ্ণুর মন্দির আছে। গরুড়গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিবার প্রথা আছে; শোনা যায় গরুড়গঙ্গায় একডুবে যদি কেহ নুড়ি-পাথর তুলিয়া আনিয়া ঘরে রাখিয়া দেয় তবে তাহার আর সর্পভয় থাকে না।

গরুড়গঙ্গার বার-তের মাইল পর আসিলাম যোশীমঠে। ভগবান শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠ এই স্থানে অবস্থিত। মঠ প্রাঙ্গণে জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেব আছেন। এই কারণে এই স্থানকেও জ্যোতির্মঠ বলা হয়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ বা বিদ্যা ও সাধন-কেন্দ্র স্থাপন করেন। পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ, পূর্ব্বে পুরীধামে গোবর্ধন মঠ, দক্ষিণে রামেশ্বর তীর্থে শৃঙ্গেরী মঠ আর উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের ক্রোড়ে এই জ্যোতির্মঠ। এই চারি মঠের সন্ন্যাসিগণকেও তিনি চারিটি

ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন। শঙ্করাচার্যের এই বিধানানুসারে ভারতের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় চারি মঠের সহিত সংযুক্ত হইল এবং মঠ অনুসারে তাঁহাদের উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন হইল। যথা সারদামঠের সন্ন্যাসীদের উপাধি হইল তীর্থ ও আশ্রম, গোবর্ধন মঠের উপাধি বন ও অরণ্য, শৃঙ্গেরী মঠের অধীন সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় আর জ্যোতির্মঠের অধীন গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায়। ব্রহ্মচারীদের উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন মঠের বিভিন্ন হইল, যথা সারদামঠে স্বরূপ, গোবর্ধনমঠে প্রকাশ, শৃঙ্গেরীমঠে চৈতন্য ও জ্যোতির্মঠে আনন্দ; আচার্যের এই নামাকরণ অদ্যাবধি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত রহিয়াছে।

আচার্য আরও বিধান দিলেন যে, চারি বেদ এই চারি মঠে এক এক অংশে প্রাধান্য লাভ করিবে—সারদামঠে সামবেদ, গোবর্ধন মঠে ঋক্‌বেদ, শৃঙ্গেরী মঠে যজুর্বেদ ও জ্যোতির্মঠে অথর্ববেদ। সুতরাং "তত্ত্বমসি" "প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এবং "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই চারি মহাবাক্য যথাক্রমে চারি মঠের অবলম্বন হইল।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবসানে সনাতন বেদান্ত ধর্ম প্রচারকালে শঙ্করাচার্য এই জ্যোতির্মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ও এই স্থানে বহুদিন অবস্থান এবং তপস্যা করেন। বস্তুতঃ উত্তরাখণ্ডের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র তিনি পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতে বেদান্ত-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জ্যোতির্মঠ ছাড়া এখানে নৃসিংহ মন্দির ও দুর্গার মন্দির আছে। শীতের ছয় মাস এ স্থানেই বদ্রীনাথের পূজা হয়।

যোশীমঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম; দূরে চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী এখান হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। আর শীতের প্রথম স্পর্শ এ পথে এখানেই অনুভূত হয়। যোশীমঠ অতিক্রম করিয়া প্রায় দুই মাইল উৎরাই পথে আসিয়া পাইলাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও ধবলীগঙ্গার সঙ্গমক্ষেত্র। সঙ্গম ঘাটের উপর বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। জনপ্রবাদ এই—বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া নারদমুনি এইস্থানে সর্বজ্ঞ হইবার বর লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপ্রয়াগে অপেক্ষা না করিয়া আমরা যোশীমঠের পর আসিলাম পাণ্ডুকেশ্বরে। এখান হইতে বদ্রীনাথ আর এক দিনের পথ।

মৃগরূপী শাপগ্রস্ত পাণ্ডুরাজা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাই এই ক্ষেত্রের নাম পাণ্ডুকেশ্বর। এখানে যোগবদরীর মন্দির আছে। শোনা যায়, স্বর্গারোহণকালে পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে একটা পাহাড়ে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুকেশ্বরে এক রাত্রি যাপন করিয়া আমরা আমাদের মুখ্য ও শেষ গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে বাহির হইলাম। মধ্যাহ্নে পথের শেষ আশ্রয়স্থল হনুমানচটী অতিক্রম করিয়া চড়াই পথে বদরিকাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হনুমানচটী হইতে বদ্রীনাথের দূরত্ব যদিও মাত্র পাঁচ মাইল, কিন্তু এ পথটুকু সম্পূর্ণই চড়াই। আজ আবার তুষাররাজ্যের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলাম। পথও চলিয়াছে একটানা উপরের দিকে। পাহাড়ের গা বাহিয়া বরফ আসিয়া স্থানে স্থানে চলার পথ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। নীচে তুষারাচ্ছন্ন অলকানন্দা। স্থানে স্থানে নদীবক্ষ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে আর তাহার তলদেশ দিয়া প্রবল স্রোত চলিয়াছে। আকাশ ঘন তমসাবৃত হইয়া রহিয়াছে, কনকনে হাওয়া বহিতেছে আর

পাণ্ডুকেশ্বর মন্দির
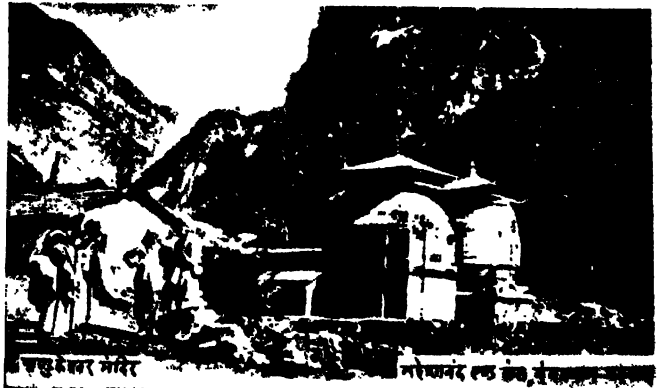
মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভিতর দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ও অস্বাভাবিক শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা বহু আকাঙ্ক্ষিত বদ্রীনাথ পুরীতে প্রবেশ করিলাম। পুরীতে প্রবেশ করিতে যখন আর মাত্র সামান্য পথ বাকি তখন একটা পাহাড়ের বাঁক ঘুরিতেই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বদরিকাশ্রমের ক্ষুদ্র শহর ও মন্দিরচূড়া। বদ্রীনারায়ণের পুণ্যপীঠ, ভূবৈকুণ্ঠ নয়নগোচর হইতেই যাত্রীদল আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। আজ তাহাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হইল; যাত্রা সার্থক হইল, মহাপুণ্য-ফলে বদ্রীনারায়ণের শ্রীচরণপ্রান্তে আজ উপনীত।

সকল যাত্রীর মনেই আজ এই ভাব। ক্রমে আমরা আরও নিকটে আসিয়া পড়িলাম; একটা কাঠের সেতু অতিক্রম করিয়া পুণ্যভূমি স্পর্শ করিলাম।
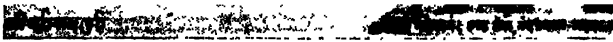
বদ্রীনাথধাম

পৌঁছিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া বদ্রীনাথ দর্শন-মানসে মন্দিরের উদ্দেশে চলিলাম। সোজা পথ চলিয়াছে মন্দিরদ্বার পর্যন্ত। পথের দুই ধারে সারি সারি নানা দ্রব্যের দোকান। শহরটি ছোট কিন্তু সুরক্ষিত; উচ্চ পর্বত চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশে আধুনিক সভ্যতার প্রথম নিদর্শন হিসাবে পথের দুই ধারে সারি সারি বৈদ্যুতিক আলো জলিতেছে।

পথ হইতে মন্দির-প্রাঙ্গণ অনেকটা উচ্চভূমিতে অবস্থিত, অনেকগুলি সোপান উঠিয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছিলাম। কেদার-মন্দিরের ন্যায় এ মন্দিরও দুই ভাগে বিভক্ত, মূল মন্দির ও নাটমন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে নারায়ণের ধ্যানমূর্তি; তাঁহার দুই পাশে অন্যান্য দেবতাগণ, যেন সভা করিয়া বিরাজমান।

মন্দির অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলো নাই; একটি ঘৃতের প্রদীপ জলিতেছে। শ্রীঅঙ্গ নানা বেশভূষায় আবৃত, শুধু মুখ-মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়। মূর্তিটি কৃষ্ণবর্ণ ও বহু প্রাচীন। কথিত আছে, উত্তরাখণ্ডের তীর্থপর্যটনকালে শঙ্করাচার্য যখন বদ্রীনাথ মন্দিরে দেবদর্শন মানসে শুভাগমন করেন তখন তিনি দেখিলেন মন্দিরে বিগ্রহ নাই, তৎপরিবর্তে শালগ্রাম শিলা অর্চনা হইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন—চীন দেশ হইতে অভিযানের ভয়ে তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা অদূরে কোন এক কুণ্ড-মধ্যে বিগ্রহটি রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে কেহ আর তাহা উদ্ধার করিতে পারে নাই। এই কথা শ্রবণান্তে শঙ্করাচার্য স্বয়ং নারদকুণ্ডে অবতরণ করিয়া প্রস্তর-ফলকে পদ্মাসনবদ্ধ চতুর্বাহু বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করেন ও স্বয়ং স্কন্ধে করিয়া মন্দির মধ্যে আনয়ন করণান্তর বদ্রীনাথজীর পূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির-নিম্নেই অলকানন্দা প্রবাহিত; ইহার পুণ্য তটে ব্রহ্মকপাল, যাত্রীরা এই স্থানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দান করে। অলকানন্দা ও মন্দির-প্রাঙ্গণের মাঝে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ থাকায় এই হিমরাজ্যে যাত্রীদের স্নান করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বদরিকাশ্রমের উচ্চতা ১০,৫০০ ফুট; ঠাণ্ডাও কেদার অপেক্ষা অনেক কম।

বহু সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থান করিয়া অধিক রাত্রে চটীতে ফিরিয়া আসিলাম। ক্লান্ত যাত্রী দল সন্ধ্যা সমাগমেই চটীতে ফিরিয়া বিশ্রাম
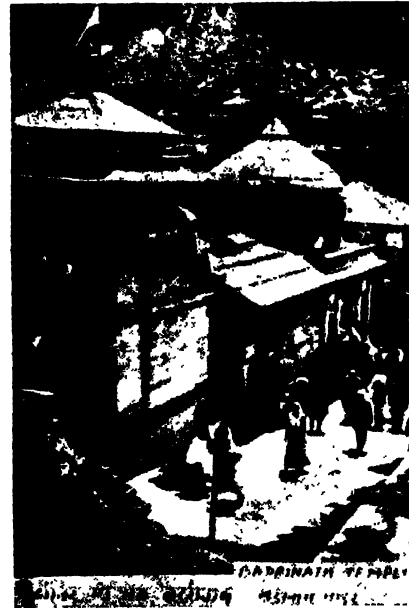
বদ্রীনাথ মন্দির

করিতেছে। নৈশ ভোজনান্তে আমিও শয্যাগ্রহণ করিলাম; সুদীর্ঘ পথশ্রমে দেহমন আজ অবসন্ন। গভীর রাত্রিতে ঠাণ্ডাটা অধিক অনুভূত হওয়াতে নিদ্রা ভাঙিয়া গেল; একবার ঘরের বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম—কি অপূর্ব দৃশ্য। চন্দ্রালোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত

চিরতুষারাবৃত পর্বতশিখর অপরূপ রূপলাবণ্যে মণ্ডিত। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা দিগন্ত ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে আর নিয়ে স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা ধাবমানা অলকানন্দার নিরবচ্ছিন্ন গর্জন। সত্যই কি আজ কবিকল্পিত স্বপ্নপুরীতে আসিয়া উপনীত হইলাম!

কত যুগযুগান্তরের চিরপবিত্র এই তীর্থ, মহাভারতের যুগে পাণ্ডবেরা এই মহাতীর্থ অতিক্রম করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর কত যুগ গত হইয়াছে, কে তাহার সঠিক পরিমাপ করিবে; কিন্তু এই ব্যবধান আজ সব মুছিয়া যাইতেছে। সেই পুণ্যভূমি, চিরনবীন। স্ব-মহিমায় আজিও মহিমান্বিত এই বদরিকাশ্রম, কত ঋষি যোগী মহাত্মার পূত পাদস্পর্শে ইহার ধূলিকণা চিরপবিত্র। কি অপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করিতেছে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষের অন্তরে এই তীর্থরাজ "বদরিকাশ্রম"।

ভূমি-বণ্টন ও জাতির উন্নতি

শ্রীঅজিতকুমার বসু

২

চাষীর হাতে জমি বিলির নীতি গৃহীত বা ঘোষিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার উপযোগী কার্য্যক্রম গৃহীত হয় নি। শুধু কার্য্যক্রম স্থির হয় নি, তা-ই নয়, বহু অন্তরায়ও সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ, আজকাল একটা রব উঠেছে। সকলেই বলতে আরম্ভ করেছেন, বাংলায় জমি কৈ যে বিলি করা হবে? দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁদের হাতে অর্পিত হয়েছে, তাঁরাই একথা তুলেছেন। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন, পরিবারপ্রতি যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ জমি ধার্য্য করা হয়েছে, তা বাদে মাত্র চার লক্ষ একর, বা, সমস্ত জমির মাত্র তিন শতাংশ, বিলি করার জন্য বাড়তি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, বাকী ৯৭ ভাগ, তাঁদের মতে প্রায় সুষম ভাগে চাষীদের হাতেই বণ্টিত হয়ে আছে— বাংলার মুষ্টিমেয় অকৃষকদের হাতে বহু জমি পুঞ্জীভূত হয়ে নেই।

কিন্তু ১৯৫১ সনের গণনার হিসাব তা বলে না। এই হিসাব অনুসারে 'কৃষিজীবী'দের শতকরা ৭০'৭ ভাগ বা মোট ১২,৮৯,৭৬৪টি "কৃষক" ও ২,৬৫,৬২২টি "অকৃষক" পরিবারের হাতে সমগ্র জমির শতকরা মাত্র ২৬'৮ ভাগ বা মোট ৩৪,৩০,০৮৯ একর এবং পরিবারপ্রতি এক-আধ বিঘা থেকে ১৫ বিঘা বা পাঁচ একর পর্য্যন্ত জমি আছে। পাঁচ একরের বেশী ও দশ একরের মধ্যে এবং গড়ে মোট ৩৩,৫০,৭৬৭ একর শতকরা ২৬ ভাগ জমি আছে ২০'৩ শতাংশ কৃষিজীবী বা ১,১৬,১৬০টি "অকৃষক" ও ৩,৩০,৬০৯টি "কৃষক" পরিবারের হাতে। দশ একরের বেশী ও পনর একরের মধ্যে এবং গড়ে মোট ১০,৪৫,৩৮৭ একর শতকরা আট ভাগ কৃষিজীবী বা ২৫,৯২৬টি "অকৃষক" ও ৫৭,৭০৫টি "কৃষক" পরিবারের হাতে। পনের একরের বেশী এবং কুড়ি একরের মধ্যে এবং গড়ে মোট ৫ শতকরা সাত ভাগ) শতকরা ২'২ ভাগ কৃষিজীবী বা মোট ১৭,৪৩১টি "অকৃষক" ও ৩০,৯৮৭টি "কৃষক" পরিবারের হাতে আছে। শতকরা ১'২ ভাগের বা মোট ১০,৮২৮টি "অকৃষক" ১৫,৫৮১টি "কৃষক" পরিবারের হাতে আছে কুড়ি একরের বেশী ও পঁচিশ একরের মধ্যে এবং মোট গড়ে ৫,৯৪,২০২ একর বা শতকরা ৪'৬ ভাগ জমি। শতকরা ১'৮ ভাগ বা মোট ২২,৭৭৮টি "অকৃষক" ও ১৬,৮৯৬টি "কৃষক" পরিবারের হাতে আছে পঁচিশ একরের বেশী এবং মোট শতকরা ২৮ ভাগ বা ৩৫,৯২,২৪০ একর জমি। কাজেই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বহু জমি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

দ্বিতীয় বাধা "কৃষক", "কৃষিজীবী", "কৃষিনির্ভর" প্রভৃতির সংজ্ঞা। প্রস্তাবিত ভূমি-সংস্কার আইনের সংজ্ঞায় যারা "প্রকৃত কৃষক" (Bonafide cultivator), তাদের জন্য কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা হয় নি; যত খুশি জমি রাখার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে। সরকারের মতে এদেরই হাতে বাকী উদ্বৃত্ত জমি আছে। ৩৩ একর সর্ব্বোচ্চ ধরেও বার লক্ষ একর যদি শেষোক্ত এই অকৃষকদের হাতে থাকে, তা হলে, তাদের মোট আছে বড়জোর দশ কি এগার লক্ষ একর। তা হলে অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ একর আছে শেষোক্ত প্রকৃত কৃষকদের হাতে। অর্থাৎ, পরিবারপ্রতি ১৪৮ একর। একথা ঠিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ "প্রকৃত কৃষক"দের হাতে কম জমি আছে এবং "অকৃষক"দের হাতেই আছে বেশী জমি। আর, তা ঠিক হলেও, এত অধিক জমি এক হাতে রাখা ন্যায়সঙ্গত নয় বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

চাষীর হাতে জমি দেওয়ার কথা যে পরিপ্রেক্ষিতে উঠেছে, সে ক্ষেত্রে চাষী বলতে নিজ হাতে লাঙ্গল কোদাল চালিয়ে এবং উৎপাদনের বিভিন্ন কাজে সরাসরি শারীর-শ্রম নিয়োগ করে যারা ফসল ফলায় তাদেরই বোঝায়। কেননা, এদের সংখ্যাও যেমন অনেক বেশী, আর্থিক অবস্থাও তেমনই অতি নিদারুণ। এদেরই জীবিকার

মান উন্নত করার জন্যই জমি বিলির অপরিহার্য্যতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনের সংজ্ঞায় এই মূল উদ্দেশ্যটাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রস্তাবে যে যত বড় ধনী এবং প্রবল, সে-ই তত বড় চাষী, এমনকি রাজা, মহারাজারাও, বড় চাকুরে বড় ব্যবসায়ীরাও। লাঙলে হাত দিলে যারা সমাজে পতিত হয়, তারাও সরকারী সংজ্ঞায় প্রকৃত কৃষক। এদেরই যত খুশি জমি রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। নিজ হাতে চাষ যারা করে সেই সব চাষীরাও সরকারের মতে প্রকৃত কৃষক বটে। কিন্তু এদের মোট সংখ্যার শতকরা আশী ভাগই, বা সমস্ত "কৃষিনির্ভর" পরিবারের শতকরা ৬৮ ভাগ, হয় ভূমিহীন, নয় ত সামান্য জমির অধিকারী। সুতরাং, "প্রকৃত কৃষকে"র আখ্যায় এদের ভূষিত করা হলেও, কার্য্যতঃ আইনের সমস্ত সুযোগ পাবার অধিকারী হ'ল তারাই, যারা চাষী নয়, যারা কৃষির কাজে শ্রম-নিয়োগে বিমুখ ও অক্ষম।

শুধু তাই নয়। প্রস্তাবিত আইন বলবৎ হবার পরও শারীর-শ্রমে অক্ষম ও বিমুখ এই সব লোকদের মধ্যে যাদের একশত বিঘার কম আছে, বা থাকবে তারা একশত বিঘা পর্য্যন্ত জমি বাড়াতে পারবে। প্রকৃত চাষীদের সে অধিকার থাকলেও কার্যতঃ তারা তা পারবে না। কেননা, তাদের ৮০ ভাগ লোকই ত এমন অবস্থায় আছে বা থাকবে যে, তাদের জমি কেনা ত দূরের কথা, বিক্রিই করতে হবে, যেমন আবহমানকাল ধরে হয়ে আসছে। তা ছাড়া, প্রকৃত চাষীরা ততটুকু জমিই সাধারণতঃ রাখে যতটুকুতে নিজেরা গায়ে-গতরে খেটে ফসল ফলাতে পারে। আইন বলবৎ হবার পর হালচাষী ও কৃষি-শ্রমিক ছাড়া আর কেউই জমি কিনতে পারবে না, অন্ততঃ এইটুকু যদি বিধিবদ্ধ হ'ত, তা হলেও মন্দের ভাল হ'ত। তা হলে জমির দাম কম হ'ত এবং চাষীরা কিছু কিছু কিনতেও হয়ত বা পারত। আবার এই সব গরীব চাষীদের ভরণপোষণযোগ্য পাঁচ একর পুরিয়ে দিতে যেখানে দরকার ৩৬,৩৭,৫৬০ একর, (রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন ৩০ লক্ষ একর) সেখানে বলা হচ্ছে—পাওয়া যাবে মাত্র চার লক্ষ একর। তাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ, বর্ত্তমান আইন মালিকদের সপক্ষে। বর্ত্তমান জরীপে তারা সবাই নির্ব্বিঘ্নে নিজেদের "কৃষক" বলে লিপিবদ্ধ করাচ্ছে। আর, উপরোক্ত পরিমাণ জমি পাওয়া গেলেও তা কি ভাবে এবং কাদের বিলি করা হবে, তার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। হতভাগ্য ক্ষেত-মজুররা ত এ আইনের আওতাতেই পড়ে না!—তাদের জন্য কিছুই করা হবে না। সুতরাং, ধনীকে আরও ধনী, অচাষীকে চাষী এবং ভূম্যধিকারী এবং চাষী-মালিককে ভূমিহীন ও ভাগ-চাষী এবং গরীবকে আরও গরীব করার নীতি ও পদ্ধতি সমভাবেই বলবৎ থাকবে। এ ব্যবস্থায় আর যাই হোক এবং যত মহৎ উদ্দেশ্যই এতে নিহিত থাকুক, "সমাজতান্ত্রিক ধরনের" ব্যবস্থা যে এ নয়, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। এ ত গেল কৃষকের সংজ্ঞা সম্পর্কিত ত্রুটি। এ ত্রুটি মূলগত। এই ত্রুটির ফলেই যত গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আরও ত্রুটি আছে অনেক।

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী "সমাজতান্ত্রিক ধরনের" কৃষি-ব্যবস্থার ইমারতের উপরতলার নক্সা নিয়ে সবার আগে পাকা ছাদ ঢালাইয়ের তোড়জোড় শেষ করে ফেলেছেন। তার ফলেই বনিয়াদ কিন্তু ফাঁকা রয়ে গেছে—চাষীর ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। সমস্যা যখন গুরুতর এবং দেশ ও জাতির স্বার্থেই যখন তার সমাধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত, তখন চাষী ও ভূমিহীনদের দরকারমতই সর্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করা দরকার। তা হলে কৃষকদের সংজ্ঞায় গোলযোগ থাকলেও সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য হ'ত না।

জমি নেই, একথা ঠিক নয়। আর তা ঠিক হলে বনিয়াদটাই ত আরও আগেই ঠিক করতে হবে। জমি বেশী থাকলে না হয় আপাততঃ উপরের পরিমাণ বেশী রাখলেও ক্ষতি ছিল না। আবার, যদি ভূমিহীন ও গরীব চাষীর সংখ্যা কম হ'ত এবং মালিকদের সংখ্যা বেশী হ'ত, তা হলেও না হয় অবস্থার গতিকে আপাততঃ ভূমিবণ্টনের কথা চেপে গেলেও সামগ্রিকভাবে কোন বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। আর তা হলে চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের অবস্থা এত শোচনীয়ও হ'ত না; তাদের কদর থাকত। কিন্তু তাও যে নয়, সে হিসাব আগেই দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, "ইকনমিক হোল্ডিং"-এর মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গীর গলদ আছে এবং "পরিবারপ্রতি" পরিমাণ ধার্য্য করার ফলে (মাথাপ্রতি ধরলে হিসাবে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়) হাঁড়ি ভাগ করে হিসাবে ফাঁকি দেওয়া যাবে বা যাচ্ছে।

স্বেচ্ছামূলক শ্রম-দানের দ্বারাই যে এই গরীব দেশের উন্নয়ন-কার্য্য দ্রুততর ও সুষ্ঠু হতে পারে, একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। গরীব চাষী আর ক্ষেত-মজুররাই সে শ্রম-দান করতে পারে, আর কেউ নয়। ভরণপোষণযোগ্য পরিমাণ আপাততঃ না হলেও তাদের চলবে। "ইকনমিক হোল্ডিং" তাদের কাছে বড় কথা নয়। বড় হ'ল তাদের আস্থা আর ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ রচনার বাস্তব অবলম্বন। যে স্বপ্ন তাকে কর্ম্মসমুদ্রে, গড়ার কাজে ঝাঁপ দেবার অপার সাহস দেবে। দেখা দরকার কত বেশী লোককে সন্তুষ্ট করা যায়। হিসাব করলেই বোঝা যাবে তা দুঃসাধ্য নয়। তাদের জন্য আপাততঃ যাদের কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, তাদের সংখ্যাও অতি নগণ্য।

সর্বোচ্চ পরিমাণ ২০ একর ধার্য্য করলে ২৮,৬৫,৯৮২ একর জমি পাওয়া যাবে। ৬ লক্ষ ভূমিহীনদের ২ একর করে এবং ২ একরের কম জমির মালিক গরীব ৬,৩৭,৮০০ চাষীদের ২ একর পুরিয়ে দিতে মোট লাগবে ১৮,১০,৯৯৪ একর। সুতরাং আরও ১০,৫৪,৯৮৮ একর জমি অবশিষ্ট গরীব চাষীদের (৬,৫১,৯৬৪টি পরিবার) পরিবারপ্রতি দেড় একরেরও বেশী দেওয়া যাবে।

আবার, যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৫ একর ধার্য্য করা হয়, তা হলে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে ৩৩,১৭,১৪২ একর। ভূমিহীনদের তিন একর ও তিন একরের কম জমির মালিক চাষীদের তিন একর

চাষীদের প্রাপ্য দেড় বিঘা করে দেওয়া যাবে। ১০ একর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করলে তো কথাই নেই।

উচ্চতম পরিমাণ কম করে ধার্য্য করা কেন হবে না? প্রথমতঃ এতে তুষ্ট হবে প্রায় ১৯ লক্ষ পরিবার এবং এমন পরিবার যাদের শ্রম ও উৎসাহের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করছে। ক্ষতি হবে মাত্র ৬৬ হাজার থেকে ২ লক্ষ পরিবারের। বস্তুতঃ সর্ব্বনিম্ন পরিমাণের তিন গুণের বেশী জমি কাউকে রাখতে দেওয়া উচিত হবে না।

তা ছাড়া, উর্দ্ধতম পরিমাণ ধার্য্য করার সময় কেবল জমির পরিমাণ দেখলেই বা চলবে কেন? এক একটি পরিবারের সামগ্রিক আয় দেখতে হবে। অধিক জমির মালিকদের অধিকাংশেরই অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের বহু পথ আছে—চাকরি, দোকানদারী, ব্যবসা, ডাক্তারি, ওকালতী প্রভৃতি। অনেকে প্রচুর রোজগারও করে থাকেন ঐ সকল বৃত্তি এবং ব্যবসায়ের দ্বারা। এ ছাড়া যে দশ-বার লক্ষ বাগান, পুকুর বা জলাশয়াদি আছে, সেগুলির অধিকাংশেরই মালিক এই সব শ্রেণীর লোকেরাই। এসব থেকে আয়ও হয় প্রচুর। এগুলিই বা ধরা হবে না কেন?

এমন ব্যবস্থা করা উচিত যে, এক একটি পরিবারের সর্ব্বসমেত আয় বাৎসরিক তিন হতে পাঁচ হাজার টাকা ধার্য্য করে তার বেশী আয়ের লোকদের জমি রাখার অধিকার দেওয়া হবে না। যার আয় তার চেয়ে কম হবে, তার যদি জমি থাকে তা হলে তাকে সেইটুকু জমিই রাখতে দেওয়া হবে যাতে তার সর্ব্বসমেত আয় ঐ সর্ব্বোচ্চ আয়ের বেশী না হয়। তা হলে জমি আরও অনেক বেশীই পাওয়া যাবে। জমির যখন অভাব এবং অধিকসংখ্যক লোক, বিশেষ করে যারা ফসল ফলায় তারা যখন অর্থাভাবে ক্লিষ্ট তখন তো নিঃসঙ্কোচে অবিলম্বে এই নীতি অবলম্বন করা দরকার।

আসলে জমির অভাব নেই। অভাব আছে নীতির স্বচ্ছতার এবং কার্য্যক্রমের সবলতার। আশা করা যায় কর্ত্তৃপক্ষ সে অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবেন।

৩

চাষীর হাতে জমি বিলি করলে দেশের ও জাতির পক্ষে তা কত দূর সুফলদায়ক হবে?

কৃষির দরুন বাংলার (জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট অনুসারে) আয় কিছু বেশী হবে বলেই মনে হয়। এখানে অর্থকরী চাষ বেশী এবং সেচ-ব্যবস্থা ও দোফসলার চাষ অন্য কোন কোন প্রদেশের চেয়ে অধিক। তা ছাড়া, চাষ কতকটা সহজসাধ্যও বটে। এই হিসাবে বাংলার কৃষি-আয় আনুমানিক ২২৫ কোটি টাকা। যারা মজুর দিয়ে চাষ করায় তাদের একরপ্রতি আয় আনুমানিক ১৫০ এবং প্রধানতঃ যারা নিজ হাতে চাষ করে তাদের আয় একরপ্রতি আনুমানিক ১৬০ টাকা। এই হিসাবে ৩৩ একরের অধিক জমির মালিক ১৯,৮০৭টি পরিবারের ভাগে এবং নিজ চাষে ৩০,১৭,৮৩৭ একর জমিতে আনুমানিক ৬০,৭৭,৫৩,২১৩ টাকা আয় হয়। পরিবার-প্রতি বাৎসরিক ৩০০০ হিসাবে সংসার চালানোর জন্য খরচ করেও এদের উদ্বৃত্ত হয় আনুমানিক ২৪,৮৩,৩২,২১০ টাকা। ২৫ থেকে ৩৩ একরের মালিক ১৯,৮০৭টি পরিবারের ৫,৭৪,৪০৩ একর জমিতে আয় ৫,৭৭,২৭,৬৯০ এবং বাৎসরিক ২৫০০ টাকা সংসার-খরচ করে উদ্বৃত্ত হয় ৮২,১০,১৯০ টাকা। এর পর, ২০-২৫, ১৫-২০ এবং ১০-১৫ একর, এই তিন স্তরের মালিকদের, যথাক্রমে ২০০০, ১৫০০ ও ১২০০ সংসার-খরচ করে, মোট উদ্বৃত্ত হয় আনুমানিক ৫,৩৮,৫৭,৯১২। ৫-১০ একরের মালিকদের আয় গড়ে ৩৯,২০,৩৯,৭১০ এবং ব্যয় সমপরিমাণ। তবে এই শ্রেণীর মালিকদের চাষের ফসল বেশী এবং গড় আয়ও বেশী। কেননা, জমির প্রতি এদের যত্ন অধিকতর। এর পর আসে গরীব মালিক ও ক্ষেতমজুরদের কথা। এদের মোট আয়, মজুরিতে এবং ভাগ ও নিজ, চাষে ১৪৪ কোটির কিছু বেশী। অর্থাৎ, এদের পরিবারপ্রতি আয় ৬৬৮ টাকা। এদেরও মধ্যে গরীব চাষী-মালিক ও ক্ষেত-মজুর ১৮,৮৯,৭৬৪টি পরিবারের নিজ জমির, ভাগের এবং মজুরির মোট আয় আনুমানিক ১৩৯ কোটি টাকা এবং পরিবারপ্রতি ৭৩৫ মাত্র। ভূমিহীনদের আয় আরও কম—মোট আনুমানিক ৩৩ কোটি টাকা এবং পরিবারপ্রতি ৫৫০ মাত্র। সরকারী তথ্য অনুসারে এদের, গরীব চাষী ও মজুরদের আয় ৬২২ টাকা মাত্র।

পনর একর বা মাথাপ্রতি তিন একর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য্য করে উদ্বৃত্ত ৩৩,১৭,১৪২ একর জমি বিলি করলে ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের আয় বাড়বে (এই জমির দরুন ভাগে ও মজুরিতে যে আয় হয়, তা বাদে) সাড়ে ২৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এই বৃদ্ধি—বাংলার কৃষিজাত জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা দশ ভাগ এবং বেশী জমির মালিকদের উদ্বৃত্ত আয়ের শতকরা ৭৯ ভাগ।

এ ছাড়া আরও বহু দিক দিয়েই আয় বাড়বে। গরীব বলে এদের অনেকেরই ছেলেমেয়েরাও মজুর খাটে। পুরুষের পুরা শ্রমক্ষমতার অনুপাতে ছেলে মেয়ের নিয়োজিত শ্রম, সমগ্র নিয়োজিত শ্রমশক্তির শতকরা ৩৫ ভাগ। চাষীদের হাতে জমি দিলে এবং তাদের আয় বাড়লে ছেলে মেয়েরা মজুরি খাটা ছেড়ে দেবে। তার ফলে মজুরের চাহিদা ও মজুরি বাড়বে। এই কারণে চাষের খরচ বাড়বে বলেও বটে, উপরন্তু মালিকদের জমির পরিমাণ কম হওয়ার দরুনও বটে মালিকেরা জমির ও চাষের উন্নতি ও দোফসলা চাষের বৃদ্ধি করে আয় বাড়াবার চেষ্টা করবেই। সেজন্যও মজুরের চাহিদা ও মজুরি বাড়বে। এক হাতে জমি পুঞ্জীভূত এবং অ-চাষীদের হাতেও অনেক জমি থাকার ফলে বর্ত্তমানে চাষের প্রতি অবহেলা চরমে উঠেছে। কৃষিতে যা প্রয়োজনীয় মজুর পর্য্যন্ত নিয়োগ করা হয় না, অন্যান্য বিষয়ে যত্ন নেওয়া ত দূরের কথা। বর্ত্তমানে একরপ্রতি মাত্র ২৬ জন মজুর বা বিঘা-প্রতি ৯ জন মজুর কাজে লাগানো হয়। চাষীদের আয় বাড়বে বলে তারাও চাষেও বেশী কিছু কিছু মজুর লাগাবে, তেমনই ঘরবাড়ী তৈরি করা প্রভৃতি অন্যান্য কাজেও মজুর নিয়োগ

করবে। ফলে মজুরিতে আয় বাড়বে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ হিসাবে ১৫ কোটি টাকা।

কৃষি-মজুরি বৃদ্ধির এবং মজুরদের কাজের নিশ্চয়তার প্রয়োজনীয়তা সকলেই গভীরভাবে অনুভব করছেন। তার জন্য প্রাথমিক আয়োজনও চলছে। কিন্তু আইন করে তা হবে না। খাটবার লোক বেশী হলে এবং চাষের উন্নতির চেষ্টা না হলে বা চিমে তালে চললে শ্রমিকেরা কম মজুরি নিতে বাধ্য হবে। অজ্ঞ চাষী মজুর ত দূরের কথা, কোন কোন শিক্ষিত মহলেই এ প্রথা বজায় আছে। তা ছাড়া, দু'-চার আনার জন্য আদালতের শরণাপন্ন ত হওয়া যায় না, অজ্ঞ ও গরীবদের পক্ষে ত তা সম্ভবই নয়। মালিকদের দাপটে এবং পুলিস ও মালিকদের ষড়যন্ত্রে এরা আইনমত ভাগের ফসলই নিতে পারছে না বা ভাগ-চাষী বলে জমীপে দেখাতেও পারছে না।

জমির ফসল ও গড় আয় বাড়বে অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ—বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, সামান্য যত্ন নিলেই ফসল বাড়ে শতকরা ৫।৭।১০ ভাগ। জমির উন্নতি, তার তদারক এবং সার প্রয়োগ করলে গড় ফসলের দু' তিন গুণ ফলনবৃদ্ধি হয়ই। এও দেখা যায় যে, সাধারণতঃ কম জমির মালিক এবং বিশেষ করে কৃষির উপর একান্ত নির্ভরশীল মালিক ও চাষীদের জমিতে ফলনও বেশী, একাধিক ফসলের চাষও বেশী। সুতরাং ফলনবৃদ্ধি বাবদ আয় বাড়বে অন্ততঃ ২৫ কোটি টাকা এবং ক্রমশঃ তা দাঁড়াবে অন্ততঃ ৫০।৬০ কোটিতে। অচাষীদের মধ্যে যারা আয় বাড়াতে পারবে না, তারা জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে অথবা তারাই চাষী হয়ে উঠবে। এর ফলেও মধ্যবিত্তদের বেকার-সমস্যা কমবে এবং চাষীরাও কিছু কিছু জমি বাড়াবার সুযোগ পাবে, অবশ্য যদি চাষী ছাড়া আর কারও জমি কেনার অধিকার না থাকে।

কৃষিজাত দ্রব্যের দাম যে উদ্বেগজনক ভাবে নিম্নগামী হয়েছে এবং বাজারের অবস্থা যে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, তারও মোড় ঘুরবে সুষ্ঠু ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার দৌলতে। এই বিপুলসংখ্যক লোকের আয় বাড়ার ফলে ফসলের দাম বাড়বে এবং বাজারে নিশ্চয়তা ও স্থিতি আসবে। এ ছাড়া, চাষীদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার দিকে যাবে এবং বয়স্কা মেয়েরা অবসর ও সুযোগ-সুবিধামত নানা গৃহশিল্পে মন দেবে। এর ফলে, আয়বৃদ্ধি এবং কুটীরশিল্পের প্রসারের পথ খুলবে।

অর্থাৎ, এক কাজেই কয়েকটা প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজ হয়ে যাবে—শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, জমির ও চাষের এবং ফসলের উন্নতি, গ্রামের ও চাষীদের বেকার-সমস্যা হ্রাস, ফসলের মূল্যবৃদ্ধি, বাজারের নিশ্চয়তা, শিক্ষার বিস্তার, কুটীরশিল্পের প্রসার প্রভৃতি এবং চাষীদের আয়বৃদ্ধি তথা ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি অন্ততঃ ৫০ কোটি টাকা। সরকার শত শত কোটি টাকা খরচ করে এবং নানা দিক দিয়ে মাথা ঘামিয়েও যেখানে কূলকিনারা পাচ্ছেন না, সেখানে প্রায় বিনা খরচে এতগুলি জরুরি কাজ হয়ে যাবে এবং দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগুলিতে জনসাধারণের কর্মোদ্যোগ ও প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বহুমুখীভাবে ছড়িয়ে পড়বে। গ্রামে নব জীবনের সূত্রপাত হবে, গতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে, "ফসল বৃদ্ধি" (গ্রো মোর ফুড) আন্দোলনে, ছোট বড় সেচের খাল কাটাতে, বাঁধ বাঁধতে, নিকাশী-নালা কাটতে, সার দিতে, এবং কৃষির উন্নতিসংক্রান্ত আরও অন্যান্য কাজ করতে ক' হাজার কোটি টাকা যে খরচ করা হয়েছে (বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা বাদে), তার ইয়ত্তা নেই! তবুও শতকরা পাঁচ ভাগ উন্নতি হয়েছে কিনা সন্দেহ। গত দু'বছর খাদ্যাবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তার অনেকটাই হয়েছে বৃষ্টি ভাল হয়েছে বলেই। একথা সরকারও স্বীকার করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সনে যে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন বা ৩০'৭৮ কোটি মণ খাদ্য-শস্য বেশী ফলেছে বলা হচ্ছে, তার মধ্যে ৭০ লক্ষ টন বা ১৮'৯০ কোটি মণ ভাল বৃষ্টির দরুনই ফলেছে, একথা পরিকল্পনার কর্তারাই বলেছেন। সুতরাং বৃষ্টির অবস্থা খারাপ হলে সব বানচাল হয়ে যাবে। তখন পরিকল্পনা ফেলে সাহায্যের ঝুলি নিয়ে সরকারকে ছোটাছুটি করতে হবে একদিকে এবং অপরদিকে বাজারের মন্দার সরকারের আয়ও কমবে। তা না হলেও সমগ্র দেশের সমস্যার তুলনায় এ কতটুকুই বা! অথচ এইটুকুর জন্যই ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে।

খরচের বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার বরাদ্দমত টাকাই এখনও খরচ করা সম্ভব হয় নি। এরই জন্য জনসাধারণকে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা বহন করতে হচ্ছে তা তাদের ক্ষমতার সীমা পার হয়ে গেছে। কর বাড়িয়ে বাড়তি বরাদ্দের টাকা উশুল হবে না। সুতরাং পরিকল্পনা ও উন্নতি যতই হোক্, সমস্যার তুলনায় তা নগণ্য। তা ছাড়া, গ্রামের রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি অতি জরুরি কাজ যা হয়েছে বা হবে, তা প্রয়োজনের তুলনায় আরও নগণ্য। অথচ দ্রুত উন্নতি না হলেও নানা দিক দিয়ে বিপদ। তাই স্বেচ্ছামূলক শ্রম-দানের কথা সকলেই বলছেন। গ্রামে নবজীবনের সূত্রপাত হলে, জনসাধারণের মধ্যে কর্মোদ্যোম ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রেরণা এলেই সেই শ্রমদানও আসবে। নিজের জমির উন্নতি, নিজের আয়বৃদ্ধির জন্য খাল কাটতে তারা অগ্রণী হবে। আয়বৃদ্ধির দরুন তারা যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পাবে এবং জমি প্রাপ্তির জন্য তাদের মনে যে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা আসবে, তার ফলেই জনসাধারণ রাস্তাঘাট তৈরি, স্কুল-হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি নিজেদের উন্নতিবিধায়ক কাজেও শ্রম-দানে অগ্রণী হবে। সুতরাং আজ যে পাঁচ টাকার কাজ সরকারকে ২৫ টাকায় করতে হচ্ছে, তার অধিকাংশই হবে বিনা খরচে। সুতরাং জমি বিলির প্রয়োজনীয়তা জরুরি এবং অপরিহার্য।

এক টুকরা জমি যে চাষীর কাছে, গ্রামবাসীর কাছে কি

তা বর্ণনা করা যায় না। এই একটুকরা জমির জন্ত সে যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে লালায়িত। এরই আশায় চাষী দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বয়ে আসছে। এইটুকুর স্বপ্নেই তার মনে কত না ভাঙাগড়ায় তরঙ্গ! সেই জমি পেলে তার বিশ্বাসহীনতা, অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার অবসান হয়ে আসবে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা আর সেই ভবিষ্যৎ গড়ার অদম্য প্রেরণা। আজ ভবিষ্যৎ বলতে তার কিছু নেই. কোন রকমে দিন গুজরাণই তার আজকের একমাত্র চেষ্টা। জনসাধারণের তথা শ্রমজীবীর হতাশা, অবিশ্বাস, অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তা এবং আত্মগ্লানিই দেশের চরম অভিশাপ। তা যদি দূর হয়ে যায় ত আর বাধা থাকবে কি! তা হলে দেশ গড়ে উঠবে হাতে-কোলালে। হ'লই বা দেশ গরীব। জনবল ত আছে অফুরন্ত। সবার আগে কাজে লাগাতে হবে এই জনশক্তিকে। জমি বিলিই তার প্রকৃষ্ট পন্থা।

শেষবর্ষণ

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

কামিখ্যে কবরেজকে সবাই পরোক্ষে 'বোকরেজ' বলে ডাকত—সেটা লোকদের বাড়াবাড়ি। আসলে কামিখ্যে কবরেজ হিসাবে দক্ষ। নৈলে অত বড় বাড়ী, গরু, গাড়ী আর শহরজোড়া বিষয়সম্পত্তি—এ সব হয় কি করে?

আমাদের কথা তাকে নিয়ে নয়। সে কবে মরে হেজে চুকে-বুকে গেছে। আছে তার ছেলেদের দফায় দফায় সাইনবোর্ড "আসল কামিখ্যে কবিরাজের ঔষধালয়"। কামাখ্যা কবিরাজ মারা গেছে একবার। ছেলেরা তাকে মেরে রেখেছে দফায় দফায়।

ওদেরই একজন শুবছিল সালফা-ড্রাগসের তাড়ায়। আগে রোগী আসত। ওদের রামবাণ, যোগরাজ গুগগুল, বসন্ত কুসুমাকর, আর পঞ্চামৃত রসের জন্ত মাড়োয়াড়ীপাড়া থেকে রোগীর কামাই ছিল না। কিন্তু কি যে ছাই এল ষ্ট্রেপ-টোমাইসিন, পেনিসিলিন্—মানুষকে যেন ভূতে পেল। রোগী থাকে না হাতে। কপ কপ খায়, প্যাঁট প্যাঁট ফোটায়, আর চটপট বুক চিতিয়ে বেড়ায়।

প্রথম প্রথম কামাখ্যা কবিরাজের ছেলে তারক কবিরাজ ঐ সালফা-ড্রাগস আর পেটেন্টগুলো গুঁড়ো করে, লেবেল বদলে "নব-রসায়ক", "হিমাস্তক", "স্বর্ণকর্পূর", ইত্যাদি নাম দিয়ে চালাত। পরে রোগীরাও চালাক হয়ে গেল। আর চলে না। অথচ তারকের জাঁক সে বাপের আমলের কুলোপানা চক্করটুকু রাখবেই; তাতে বিষদাঁত ভাঙে, পরোয়া নেই।

বাড়ীতে তখনকার দিনে দোলে দুর্গোৎসবে, পূজা-পার্ব্বণে অবারিত দ্বার ছিল। তিনের বসন্ত বছরে দু'বার। পাঁঠা থেকে লেডিকেনী চলত মেথর থেকে পণ্ডিতের পেটে সার বেঁধে। মানা ছিল না। এখন পাঁঠা দাঁড়িয়েছে কচুতে, লেডিকেনী প্যাঁড়ায়, মেথর এবং পণ্ডিতের দল শুকিয়ে গিয়ে থিতিয়েছে মেহাত চোখাচোখির বিষজিহ্ব আত্মীয়দের ভজনখানেকের কোঠায়। তবু ত কুলোপানা চক্কর, "আসল কামাখ্যা কবিরাজের আদিম ঔষধালয়"।

কেউ বললে বলে, "তোমরা পার। ইংরেজী পড়েছ। বুকের পাটা আছে। সংস্কার, সমাজ, রীতি, আচার-ব্যবহার তোমাদের বুড়ো আঙুলের নাচের পাল্লায় ভেতরে। আমাদের রোজ গঙ্গাস্নান করতে হয়, শালগ্রামে জল ঢালতে হয়। মস্ত করে টিকি রেখে ফুল গুঁজতে হয়। বাপের তর্পণ, বংশের নাম, পারিবারিক রীতি, প্রথা, ডাক, যশ—সব কিছুর পরোয়া করতে হয়। বড়ি টিপে খাই, গজের চাল, দাবার চাল আর দিতে পেলাম কৈ?"

তা বলেন কবিরাজ মশাই। একবার বলতে আরম্ভ করলে থামতে চান না। আর কথায় এমন একটা চাপা দম্ভের সঙ্গে মেশানো শাসালো আত্মপ্রত্যয়ের সুর থাকে, শুনতে বিরোধী হলেও বেশ লাগে।

লোকটি ঢ্যাঙা, শক্ত হাড়ের কাঠামোতে চড়ান চর্ব্বিহীন মাংসের উপর চকচকে চামড়ার বুনুনি। তীক্ষ্ণ নাসা, পাতলা ঠোঁট। নাকের পাশ দিয়ে গভীর খাঁজ দু'গালের মধ্য দিয়ে চিরে চলে গেছে। পাতলা টিকি, চোখে চশমা, তরস্ত দৃষ্টি, ফর্সা রং। ফতুয়া বা গরদের খুব লম্বা পাঞ্জাবীর ওপর গরদের বা শালের চাদর। গায়ে গোলাপ বা খসের আতর। মুখে পানের সঙ্গে কিমাম। হাতে ছড়ি, পায়ে জুতা; গাড়ী চেপে রোগী দেখতে যান। ঠাটটা দিব্যি বজায় রেখেছেন আসল কামাখ্যা কবিরাজের আদিম ছেলে।

আমি বহুদিন বাদে ফিরেছি কাশী। রাস্তায় দেখে গাড়ী থামিয়ে হাঁক পাড়লেন, "কবে এলেন মশায়; দিল্লীর লাড্ডু পেয়ে যে ডুব মারলেন দেখছি। আসবেন না একবার গরীবের ওখানে।"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, এই ত সবে এসেছি। যাব বৈকি।" বলে লজ্জিত হবার অভিনয় করলাম।

এবার একটু নরম গলায় বললেন, "কিন্তু আসবেন ঠিক সন্ধ্যার সময়, চুপিসাড়ে। দিনেও নয়, রাতেও নয়।" কণ্ঠস্বরে যেন ভীতি ও ত্রাস।

বললাম, "কেন? নৃসিংহ অবতার হতে হবে নাকি?"

গাড়ী হাঁকিয়ে দিয়ে বললেন—"নারসিংহী বিসর্জনের ব্যবস্থা।"

কিছুই বুঝি নি সে রসিকতার।

জিজ্ঞাসা করলাম—"নারসিংহীটা কি মশায়।"

কবিরাজ যেন ভয়ে চকচকিয়ে গেল।

"তা'র বা'জ বাকন আপনি। নিন্ নিন্ তামাক খান। ওরে নন্কু, ছ বাব কে কড়া ক'রে হুকোটা দিয়ে যা।"

হুকো হাতে করে কৃতার্থ হয়ে বসে রইলাম। সন্ধ্যা লাগল। কবিরাজবাড়ীর শাঁখ বাজল। কবিরাজ ভক্তিভরে প্রণাম করল। আমিও হুকার ডাটিটা কপালে ঠেকালাম, ওপরে কল্কের আগুন বাঁচিয়ে।

কবিরাজ উঠে পরনের জামার আস্তর ঘষতে লাগল। আমায় বললে, "শুনুন। সরলাকে বলে রেখেছি আপনার কথা। ওপরে চলুন।"

"ব্যাপারটা আগে বলুন—কি ব্যাপার।"

"যাবেন ত চলুন, নৈলে যান্ যে কাজে যাবার। আচ্ছা মশায়, যে কথা বলবার নয়, বলা যায় না, সেকথা বলি কি করে? চলুন।"

অগত্যা উঠি। বালক-বয়স থেকে এদের বাড়ীর ওপরে এসেছি।

এই কবিরাজ তারক আমার স্নানের সঙ্গী ছিল, আড্ডা দিতাম ছেলেবেলায়। ও বরাবর আপনি বলেছে; আমিও তাই। তবু ওদের বাড়ী থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে গেছি। উপরতলায় গেছি বহুবার। তা ছাড়া ঐ সরলা। সরলা আমাদের বাড়ীর পাশে থাকত খুব চিনি সরলার বিয়ের পরই যেন বেশী করে ধরেছে তারক কবিরাজ আমি ওপরে যেতেই বলল, "বসে থাকুন এই চৌকাঠখানায়। সন্ধ্যের আরতি সেরে সরলা এসেই এইখানে আমায় প্রণাম করে। আজ আপনি বসুন। দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, "আরে ছি ছি! এ কি রহস্যের জিনিষ? সরলার কতখানি প্রত্যয় ঐ প্রণামটিতে। ওকে নিয়ে রহস্য করতে নেই।"

"জানি নেই হয়ে উঠেছে রহস্য—কার্স! কথায় কথায় কলহ রাগ। আজ দু'দিন কথা কয় নি আমার সঙ্গে।"

"তবে বললেন, প্রণাম!"

"নাঃ ওটা করে যায়। ব্যস—তার পর কাঁচকলা।"

"কারণ?"

"কিছু নয়! তুচ্ছ! চেয়েছিল জব কুসুম এক'শিশি। আমি অন্যমনস্ক হয়ে যার হাতে দিয়েছি। যাকে ত জানেনই। পক্ষ ফেলচেল দেখতে পারেন না। জেরার পর জেরা। আমি ত অপ্রস্তুত। ওরও বোধ হয় একটু বাক্যযন্ত্রণা সইতে হয়েছিল। কিন্তু করব কি! ভুল ইজ ভুল অ্যাণ্ড দাট ভুলই ত!"

"তা ত বটেই!"

"কিন্তু মানবে না। নো কম্প্রমাইজ—চলছে ত চলছেই। আর আমায় জানেন ত। আমি সব পারি কেবল ওর গোমড়া মুখ সইতে পারি না।"

বলা বাহুল্য, সরলা অপরূপ সুন্দরী ছিল। অপরূপ! সাজাবার মত ওর রূপ। পেয়েও ছিল আদরে-ভরা স্বামী।

সরলা এসেই প্রথম আমায় প্রণাম করল, তার পর তারক কবিরাজকে। নিশ্চিন্তে, নিঃসঙ্কোচে। জিজ্ঞাসা করল, "দাদা কবে এলেন?"

"পরশু। তোমরা ভাল আছ ত সরলা।"

সরলার বড় ছেলের তখন বিশ বছর বয়স। যৌবন পার হয়ে গেছে বহুকাল। তা ছাড়া আটটি সন্তান হয়েছে ওর। রূপ থাকার কথা নয়। তবু যেন পলিমটা রেখে যায় ওর দেহে প্রতিবারের জীবনের বন্যা, বয়স যেন রেখে যায় ঋতু-বিবর্তনের চিরন্তন নবীনতা। নিটোল স্বাস্থ্য, ঝকঝকে রং, সারা দেহে সুবলিত তরঙ্গের লীলা, রেখা নেই বটে, আবর্ত আছে। রেশমী শাড়ীতে, হাতভরা চুড়িতে, কপালের সিন্দুরে, চিবুকের নীচের মেদের ভাঁজে ওর মধ্যে যেন পূর্ণ মাতৃত্বের ঐশ্বর্যময় রূপটি দেখতে পেলাম।

কবিরাজকে প্রণাম সেরে বলল, "ভাল বৈকি, খাচ্ছি, পরছি, উঠতে বসতে আদর আপ্যায়ন—গেরস্তর বৌ আর এর চেয়ে ভাল কি চায়।"

কবিরাজ বলল, "শুনলেন ত, কি কথায় কি উত্তর! বয়স হচ্ছে মা মশায়; না খুকিটি আছেন এখনও। এখন এসব কথা—"

সরলা বললে, "মানায় না জানি। বলি, সেটা অভ্যেস। তাতে কার কি যায় আসে।"

আমি বললাম, "ছি সরলা, এত রাগ করতে নেই। তারকবাবু আমায় একটু আগে বলেছিলেন যে তুমি ওঁকে ভুল বুঝেছ। ভুল করে যে ব্যক্তি লজ্জিত, আর তোমার জন্যে লজ্জা, তাকে যদি তুমি না বোঝ, লোকটা দাঁড়ায় কোথায়?"

"ওঃ ওকালতি করতে এসেছেন। বসুন তবে। কী নিয়ে আসি।"

জলখাবার আনতে গেল সরলা।

কবিরাজ বললে, "বেড়ে বলেছেন ভাই। মিটে যাবে আজই—কি বলেন? কি বোধ হয় আপনার?"

আমি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললাম, "আচ্ছা মিনিমুখ পুরুষ ত আপনি। করেছে রাগ করেছে। যেন আপসে মরে যাচ্ছেন। এ কি নতুন বিয়ে?"

দু'চোখে জল এনে কবিরাজ বললে, "নতুনই ভাই, নতুনই। ওকে যেন নতুন করে পাই রোজ রোজ। কি যে ও আমার—"

যাক ওদের মিটে গিয়েছিল সেদিন।

সে কথা হচ্ছে না।

কথা হচ্ছে সটান পাঁচ বছর পরে। এ কয় বছরে কাশীর উপর দিয়ে বেরিবেরিতে একটা খণ্ড প্রলয় বয়ে গেছে। পাড়াকে পাড়া হয় মরে সাফ হয়ে গেছে, নয় অন্ধ হয়ে মরার বাড়া হয়ে আছে। তাজা তাজা ছেলেমেয়ে বৌগুলো দৃষ্টি হারিয়ে বসে আছে। গলিতে গলিতে দেখা যায় টলটলে চোখ, তাকিয়ে আছে দৃষ্টি নেই। অমন করুণ দৃশ্য আর নেই।

শুনেছিলাম তারক কবিরাজের চোখ গেছে। একেবারে দৃষ্টি নেই। ওর আশা দৃষ্টি ফিরবে—একবার ফিরবেই।

একদিন বলেছে আমায়, "আর কিছু নয় ভাই। একটিবার দেখতে চাই সরলাকে মরবার আগে।"

কিন্তু সে পরের কথা।

আগের কথা আগে সেরে নেওয়া যাক।

ছেলেগুলি অপোগণ্ড। বাপের বিষয় নিয়ে তাল ঠুকে বেড়ায়। কাজকর্ম নেই। দুটি মেয়ের বিয়ে বাকী। বড়টি চাকরি করে, যুদ্ধের বাজারের চাকরি। কবিরাজের আয় বন্ধ। অবস্থা চরম। কবিরাজের মা মারা গেছেন। সরলা এখন পরিপূর্ণ গৃহিণী। কিন্তু তার ভাণ্ডার তখন শূন্য।

মেজ ছেলে কবিরাজী করে। সবে আরম্ভ। কিছু হয় না।

আমি ভেবে চিন্তে সরলার কাছে গেলাম। কবিরাজ তখন স্নানে গেছে গঙ্গায় ছেলের হাত ধরে।

সরলার রূপ ছিল ওর চোখে, প্রসন্নতায়। ওর আর সব ঠিক আছে; কেবল নেই চোখে সেই ছটা এবং মুখে সেই শান্তি। প্রণাম করে বললে, "ভারি অশান্তিতে আছি দাদা।"

"সে তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।" বলতে বলতেই সরলার চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। "মলিন হয়ে গেছ। রোগা যত না হয়েছ তার চেয়ে রোগা দেখাচ্ছে।"

"না, যা ভাবছ সে অশান্তি নয়। গয়না পরি না, শাড়ী পরি না, সাজি না। দেখবে কে দাদা? ইচ্ছে করে আর সাজতে? গান্ধারী চোখে ঠুলি দিয়েছিলেন দাদা। বুঝি না কেন। ঠুলি দিতে হয় না। সারা মন ঠুলি পরে থাকে। ছেলেরা আর করে, বাড়ীঘর জমাজমি যা আছে দুঃখ হওয়ার আমার কথা নয়। দুঃখ তবু হয়। চোখ গেছে সেও আমার দুঃখ নয়, দুঃখ আরও গভীর, আরও মর্ম্মান্তিক।"

সকাল সকাল দুঃখের কথা শুনতে আর কার ভাল লাগে!

তা নয়। দুঃখেরও সুর আছে, জ্যোতি আছে; দুঃখও সুখের মত বুকের স্রোতে প্রবাহ তোলে, চাপা বেদনা জাগায়।

তাতে সরলার দুঃখ! ওকে যেন নবতর রূপে দেখলাম।

চিরদিনের সুখী ও। চিরপূর্ণিমায় আকাশে তৃতীয়ার ক্ষীণতা। চমক লাগায় বৈ কি।

"কবিরাজের খবর ত শুনলাম। এখনই ত তোমার কাছ থেকে সুদ খাবার সময় ওর। এতকাল খাঁটি আসল যা দিয়েছে, আজ ওর দুর্দিনে সেই খাঁটির সুদই ত উপজীব্য। এখন তোমার চোখ, তোমার আনন্দে ওর চোখ ওর আনন্দ ভরে দাও।"

সরলা কিন্তু ঝর ঝর করে কাঁদছিল।

কাঁদতে দেখি নি সরলাকে।

এমন সময়ে ওর বড় ছেলে এল। বললে, "পূবের পাঁচিল ভাঙতে সুরু করেছে দেখে এলাম। তবু কিছু বলতে পারব না মা?"

সরলা বলল, "হ্যাঁরে আমার বুকের পাঁচিলের চেয়েও কি ও দামী?"

রেগে গিয়ে ছেলে বললে, "হ্যাঁ দামী। কান্নাকাটি নিয়ে বিষয় আশয় চলে না।" বলে সে চলে গেল।

সরলা বললে, "দেখলে সুখ আমার? কর্ত্তা ছেলেদের ভিতর দিয়ে বিশ্বাস করবেন না। চোখ গিয়ে অবধি ভয় ঢুকেছে যে বুড় বয়সে ওঁকে সবাই ফেলাফেলা করবে। তাই অমন আমার স্বামী আজ পদে পদে সন্ত্রস্ত, পদে পদে সন্দেহ—কাউকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ কি আমার কম জ্বালা?"

"হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেছে কি না। তাই অমনটা হয়ে গেছেন। এই সময়ে একটু ধীর শান্ত হয়ে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আজ পনের দিন হ'ল বাড়ীতে খান না।"

"সে কি? কেন?"

"ঐ যে শুনলে পাঁচিল। সম্পত্তিই আমার কাল। বাগানের পূব ধারের পাঁচিল। তার ওধারে ত বিশ্বাসদের একটা হাতা আছে। সেখানে নাকি ওরা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।"

"করবে করুক, তাতে তোমাদের কি?"

"আমাদের কপাল। কোথায় তৈরী মন্দির পাওয়া গেছে। সেই পাথরের গাড়ী ওদের হাতায় নিয়ে যেতে হবে। এখন ঘুরিয়ে গলি দিয়ে নিয়ে যেতে খুব খরচ। যদি গাড়ী করে আমাদের বাগান দিয়ে নিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি হয় আর ভাল ভাবে নিরাপদে জিনিষটা পৌঁছয়।"

"তোমাদের পাঁচিল ভেঙে সেই গাড়ী যাবে? এই মতলব?"

"হ্যাঁ।"

চমকে বললাম, "সে কি! এমন কথা কে কবে শুনেছে। পাঁচিল ভাঙা যাবেই ত মামলা। বিশ্বাসরা যা লোক! তাতে ওঁর এখন এই অবস্থা।"

"এই কথাই ত ছেলেরা বলেছিল। ওরা নাকি ফটোগ্রাফায় নিয়ে রেখেছে। পাঁচিল ওরা ভাঙবে, ওরাই গড়ে দেবে বলে ওঁকে বুঝিয়েছে। কিন্তু ছেলেরা বলছে যে, ওদের মতলব ভাল নয়।

এই কথা নিয়ে তুমুল। এখন পনের দিন খাওয়া বন্ধ। আমি যতক্ষণ বাড়ী থাকব ততক্ষণ উনি বাড়ীতে খাবেন না।"

"উনি কি বলেন ?"

"ওঁর ধারণা বিশ্বাসরা ওঁকে ধোকা দেবে না। ছেলেরা গোলমাল করে ওঁর শত্রুবৃদ্ধি করতে চায়।"

"বেশ তা নয় হ'ল। এতে তোমার কি অপরাধ ?"

"গভীর। অমন সব ছেলে গর্ভে ধরা এবং ছেলেদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে অন্ধ স্বামীকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা।"

বলছিল আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল।

সর্পাঘাত করলেও সরলার এত বাধতে পারে না, তারক কবিরাজের কাছে এই আক্ষেপ শুনলে যত বাধে। আমি ত জানতাম ওদের ভিতরকার ব্যাপার।

ভাবলাম আজ এর নিষ্পত্তি করব।

ঠিক সেই সময় সরলা বলল, "আজ তুমি থেকে ওকে খাইয়ে যাও না দাদা।"

"এমনি কোথায় খান ?"

"বেশী দিন বাড়ীতে চিড়ে দই ; নইলে পাশের বাড়ী গোপালের মার ওখানে টাকা দিয়ে।...আমিই রান্না করে ভাত বেড়ে গোপালের মার বাড়ী থালা নামিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু কথা কই না। গোপালের মাই কথা বলে খাওয়ান। গোপালের মাকে একটা করে টাকা দিয়ে আসেন। আমায় গোপালের মা সেটি দিয়ে দেন।"

দুঃখেও হেসে বললাম, "তোমার তবে লাভ হচ্ছে বল।"

"হ্যাঁ, তা বলতে! খুব লাভ। ভাত বেচছি আর অপমান কিনছি। এখন তাও খান না।"

"কেন ?"

"দিনতিনেক আগে চিংড়ি পেলাম। লাউ-চিংড়ি নারকোল দিয়ে রাঁধলাম। উনি লাউ-চিংড়িতে ধনেপাতা ভালবাসেন। গোপালদের বাড়ী ধনেপাতা ঢোকে না, মনে হয় নি। স্বামীর কথা মনে করে রেখেছি, মন আমার তাতেই ছিল। অকপটে নিবেদন করেছি।...লাউ-চিংড়ি মুখে দিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোপালের মা এ রান্না তোমার ? বল তোমার ?' আমি ত তখনও বসে। সে যে কি গলা। আমিই তখন বললাম, 'না আমার। কি অপরাধ আমি করেছি যে আমার সাজা দিচ্ছ ?' কোন কথা না বলে পাত ছেড়ে উঠে গেলেন। মেয়েছেলের সে যে কি মর্মান্তিক সাজা তোমরা বুঝবে না। সেই থেকে এই তিন দিন।"

আমি বললাম, "আচ্ছা আজ খাইয়ে যাব।"

এমন সময় কবিরাজ এসে হাজির।

অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে চেহারা। যেন সে লোকই নয়।

আমি বললাম, "কেমন আছেন কবিরাজ মশাই ?"

তারক বললে, "কে মাষ্টারদা নাকি ? কবে এলেন ? বসুন বসুন অনেক কথা আছে। পূজা করতে বেশী সময় লাগবে না আমার। ততক্ষণ এদের সঙ্গে বার্তালাপ করুন। তার পর অনেক কথা। অন্ধ বলে হেলা করবেন না কথাটা।"

বললাম, "সময় নেই। দুটোর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাব।"

"বেশ ত, যান না। এখানেই খেয়ে যাবেন। সমীরকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিন। আরে খেয়েছেন ত কোনদিন এ অভাগার খুদকুঁড়ো।"

আমি তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেলাম।

তার পর খাবার সময় এল। সরলাকে শুনিয়ে বললাম, "এ কি একটা ঠাঁই কেন ? কবিরাজের জায়গা কৈ ?"

হন্তদন্ত হয়ে কবিরাজ বলল, "আমার নয় ভাই, আমার নয়। আমি এখন খাব না। আমার দেরি আছে। গোপালের মার বাড়ী আমার নেমন্তন্ন।"

এর মধ্যে কবিরাজ আমায় সব কথা বলেছিল, ছেলেমেয়েদের দুর্ব্যবহার, সরলার পুত্রপ্রীতি ও অবহেলা সব। "জানেন মশায়, অন্ধ হয়ে গেছি বলে আর আমায় গণ্য করে না। সৌখীন মানুষ কিন্তু জিদ করে সাজগোজ সব ছেড়েছে। একখানা গয়না গায়ে নেই। সব তুলছে। কবে মরে যাই, তাই সম্পত্তি গোছাচ্ছে।"

যত বাধা দিতে গিয়েছি কেবল আহত হয়ে ফিরেছি। কবিরাজের মনে যেন ভীমরুল কামড়েছে। দেখতে বিকৃত, স্পর্শে সবেদন।

আমি হার না মেনে বললাম, "বেশ ত। গোপালের মা ত আমার অজানা নয়। গিয়ে বলছি উনি থালা এখানেই এনে দেবেন।"

সরলার মুখে চোখে খুশি।

কবিরাজ বললেন, "না ভাই সে হবে না।"

আমি বললাম, "কেন ?"

বলতে ইতস্ততঃ করছে কবিরাজ।

দুর্বল মুহূর্ত দেখে আমি বললাম, "সরলার ওপর রাগ করে খাবেন না, এই ত! কিন্তু কেন রাগ ? ও ত কেঁদে কেঁদে গেল! অন্ধ কি ওকেও করতে চান ?" এই সময়ে সরলা ফুকরে কেঁদে উঠল।

ঘরে তখন আমি, সরলা আর কবিরাজ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আরও নিভৃতে এই বৃত্ত পরিচালনা করার আশায়।

সরলার কান্নার শব্দে কবিরাজ যেন চমকে উঠল। মুখখানা ওর এতটুকু হয়ে গেল। ওর প্রভাহীন চোখ দুটোর মধ্যেও যেন একটা বিহ্বল ঝলক দেখা দিল।

বলল, "এখন কাঁদছ সরলা, কিন্তু কি অপমান অবহেলাই করছ আমার দিনের পর দিন।"

"কি অবহেলা ?"

"অবহেলা নয় ? বার বার ছেলেরা বলে সময়মত নাইতে খেতে—সব চুলোয় দিয়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া

বেড়িয়ে বেড়াও? সরলা জামাকাপড়, স্নানের সময় তেল নেই—এই নিয়ে রোজ ছেলেদের কিচিমিচি, তোমার এক জবাব "আর কয়ব কি দিয়ে? টাকা কৈ, আনবে কে।" কেন আমার টাকায় ত সব করতে। এখন ছেলেদের টাকার বেলাতেই তোমায় টান? এমনি করে থাকা আমার অপদার্থতার মাথায় লাথিরটা মারা নয়? আমিই নয় অন্ধ হয়েছি, তুমি ত হও নি! ক'দিন তোমায় বলেছি একটু কাছে এসো, বসো, সারা দিনে রাতে একবার কি তোমার সময় হয় না? অবহেলা নয়?"

"না নয়। তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। সরলা তোমায় অবহেলা করতে পারে না। কার জন্যে আমি সাজব আজ? কার জন্য এ রূপ সাজাব? সময়ে নাইব, খাব, সখ সাধ করব, কে আমার দেখবে বলো? বোঝ না? মনে নেই গন্ধ-তেল মাখতাম। মা রাগ করতেন বলে লুকিয়ে এনে হাতে দিতে? মনে নেই বিকেলের ডাকে বেরুবার আগে আমায় না দেখে বেরুতে না। মনে নেই রোগী দিয়েছে বলে রোজ মালা এনে দিতে? তখন আমার দিন ছিল। আজ তুমি আমার সব দিন কেড়ে নিয়েছ। তুমি আমার সব সাধ নিবিয়ে দিয়েছ।"

আমি সরলার মাথায় এই প্রথম হাত রেখে বললাম—"ছিঃ সরলা, থেমে যাও। পাগল হয়ে যাবে যে।"

কবিরাজ মাথা নীচু করে বসে আছে।

"না দাদা না। আজ বলতে না পারলেই আমি পাগল হয়ে যাব। বলতে দাও। দিনরাত আসি না। আমি জানি এলে তুমি খুশী হও, শান্ত থাকো। কিন্তু শুধু দেহ নিয়ে বিলাস করা যাদের জীবনে কোন দিন হ'ল না, আজ অজগরের মুখে হরিণের মত ঢুকতে কি তার সাধ যায় না সাহস হয়? যদি চোখে চোখে রাখতে মানুষই থাকতে তুমি। এখন তুমি অন্ধ মানুষ। ভয়ে আসি না, ভয়ে।"

কবিরাজ বললে, "থাক, থাক—থেয়ে নিচ্ছি আমি। খাবার আন।"

আমিও বললাম, "আসুন খাবার।"

কবিরাজ দেখতে পেলে না। কবিরাজের ছেলের বৌ খাবারের থালা নামিয়ে দিয়ে গেল। সরলা আর আসতে পারে নি।

আমি কথাটা ক'াস না করে বসে থাকি। কিন্তু কবিরাজ টের পেয়েছে। পাবে জানা কথা। সাপের কান নেই অথচ এমন শোনে যে সারা-গাটাই কান। কবিরাজের চোখ নেই, তাই ওর নিঃশ্বাসেও দৃষ্টি।

হঠাৎ বললে, "আর এল না বুঝি?"

আমি বললাম, "পারে আসতে? যে ঝড়টা বইল। এত দিনের আদরিণী আপনার; কতটা অবহেলা পেয়েছিল। আজ বলে করে খানিকটা ঝরঝরে হয়েছে।"

খেতে লাগল কবিরাজ। বৌ এসে খাবার পর পর দিয়ে যাচ্ছে। বুঝল যে বৌ বেরিয়ে গেছে। তখন বলল, "কেউ নেই ত ঘরে।...জান্ছ। বলতে পারেন সত্যিই ওর ব্যবহার এমন তিক্তি কেন হয়ে গেল? আমায় যেন মানতেই চায় না। ছেলে ছেলে আর সম্পত্তি সম্পত্তি করেই গেল।"

আমি বললাম, "আপনি পণ্ডিত। আপনাকে কি বোঝাব আমি?—যদি ভীমার্জ্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধি কামুকৌ।

পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈঃ মহারথৈঃ।
পঞ্চ চৈব মহাবীর্য্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ।"

কবিরাজ বললে, "মনে পড়ছে না প্রস্তাবটা।"

মনে করিয়ে দিতে বলতে হ'ল—"জানেন ত কৃষ্ণ চললেন পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৌরবদের কাছে। প্রস্তাব সন্ধি। যাবার মুখে হঠাৎ কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর মত কি? কৃষ্ণা বললেন, 'ভায়ে ভায়ে মিল হয়ে যাবে; কৃষ্ণার বেণী আর বন্ধন হবে না। তাতে কার কি?' তখন অভিমন্যু এসে মাকে জড়িয়ে বললে—'আমি যুদ্ধ করব মা। রাজ্য চাই না আমার, স্বজন চাই না। মা চাই। মায়ের অপমান সহ্য করব না।' আজ আপনার এই অবস্থায় ছেলের ওপর ওর ভরসা। সেও ত আপনার ছেলে বলেই। এতদিন আপনি ওদের চালিয়েছেন, সংসার চালিয়েছেন, এখন ওদের কত বড় দায়িত্ব আপনাকে নিশ্চিন্ত করার। সেই দায়িত্বকে আপনি স্বার্থ বলে সন্দেহ করে ওদের, বিশেষতঃ সরলাকে বড়ই আঘাত করেছেন।"

বিহ্বল চোখ দুটো আলোর দিকে মেলে উদাস কণ্ঠে কবিরাজ বললে, "কোথা দিয়ে এল এই সন্দেহ, এই অনাস্থা। যাবেই বা কোথা দিয়ে। কিন্তু সরলাকে হারাব? সে যে চোখের চেয়েও দামী দাদা!"

সরলা পানের ডিবে হাতে নিয়ে এসে বসেছে তখন।

কবিরাজ বলে চলল, "আমি একেবারে গেছি ভাই! সরলাকে বলে দিও, বুঝিয়ে বলো যে, আমার পাগলী, আমি ওকে ছাড়তে পারি না। ছেলেদেরই ভয়। যদি ওকে হেনস্থা করে। সেই ভয় থেকেই আমার যত সন্দেহ। নইলে—"

আমি বিব্রত হয়ে উঠেছি, এমন সময় সরলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী ফেরার পথে সিঁড়ির মুখে সরলা আমায় হেঁট হয়ে প্রণাম করল।

আমি বললাম, "কি হ'ল?"

সরলা বললে, "ফসল কাটা হয়ে গেলে ক্ষেতের আর বাকি থাকে কি দাদা?"

আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে বললাম, "থাকে সম্ভাবনায় পূর্ণ রিক্ত মাটি, তার দৃষ্টি গোয়ালের বলদ আর লাঙলের দিকে, দুর্বলতম চাষীর মুঠীর পানে, আর তার মন জুড়ে থাকে আষাঢ়ের স্বপ্নকাজল, গভীর মেঘ।"

"তার পর ?" বলল সরলা।

"তার পর—সে নতুন ঋতু'ক ভার দিয়ে যায় নতুন কিশলয়কে জাগিয়ে তোলার জন্ত। চাষী বুড়ো হয়, মাটির তেজ নিভে আসে। শুধু আকাশের বাণী নিত্য নতুন জীবন আনে। বর্ষা নিয়মিত আকাশে দেখা দেয়।"

"ভাল লাগে না তোমার হেঁয়ালী। বল দাদা স্বামী আমার ফিরে পাব কি না ?"

"গেছে কবে ? স্বামী তোমার সীমন্ত জুড়ে জল জল করছে। কালকের তুমিও নেই, কালকের স্বামীও নেই। আগামী দিনের তোমাকে নিয়ে যাও স্বামীর কাছে। নইলে—"

"নইলে কি ?"

"নইলে কবিরাজ বিরহে উন্মাদ হয়ে যাবে।"

"কি করব ?"

না বলে পারলাম না। "আবার বৌ সাজো। ফুলশয্যার নায়িকা। কবিরাজ চায় তোমায় আবার বিয়ে করে।"

এর পর আর কিছু বলা চলে না।

পরের বার কাশী ফিরে দেখি নতুন পালঙ্ক হয়েছে কবিরাজের।

সরলা কবিরাজের সামনে বললে, "কতলাম পালঙ্কখানা, আগেরখানা বড্ড বড় বোধ হচ্ছিল। এখন ছোট একখানাতেই বেশ হয়ে যায়।" কবিরাজ হাসতে হাসতে বললে, "দেখবার মত জিনিষ হয়েছে বটে। সরলার, যাই বল, সখটা পুরোপুরিই আছে।"

আনন্দে আমার চোখ দুটো ছোট হয়ে এল।

অপরিচিতাকে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তোমার রূপের দীপ্তি যখন আঁখির পলকে ঝলকি ওঠে,
আমার মনের পশুটা তখন পায়ের তলায় পড়িয়া লোটে।
জেনো এ সত্য, মিছে নয় কিছু ; অন্তরে আমি মানুষ ভালো
শুধু বাহিরের মুখোশটা বদ ; ভিতরটা নয় মোটেই কালো।

অপলক চোখে চেয়ে মুখপানে মনে হয় তুমি ভোরের তারা
তোমায় করেছি অপমান ভেবে অনুতাপে হই আত্মহারা !
তোমাকে দেখেছি—তারই মুখ-স্মৃতি যদি পারিতাম
রাখিতে ধরে,
যদি এ ক্ষণিক বিবেক আমাকে একা ফেলে হায়
না যেত সরে—

আমার দেহের তমবেদিতে সুপ্ত আছেন দেবতা যিনি
হয়ত তোমার ইঙ্গিতে কবে উঠিতেন জেগে সহসা তিনি।
তোমার রূপের অসাম'ন্ততা নিয়ে যায় যেন অসীমে টেনে
নতজানু হয়ে সমুখে তোমার দিতে চাই পায়ে পৃথিবী এনে।

জাগে মনে মোর স্বপ্নের মতো,—সুখের জীবন পারিত হোতে
যদি যৌবনে ভেসে না যেতাম অলীক নেশায় সুরার স্রোতে,
ক্ষণিক সুখের প্রলোভন ত্যজি রিপুগুলো যদি থাকিত বশে
জীবন আমার ভরে যেত আজ সার্থকতার পুলক-রসে।

যাত্রাপথের কোন বাঁকে কবে পথভ্রান্ত পথিক আমি,
তোমার চরণচিহ্ন হারায়ে হয়েছি এমন বিপথগামী ;
আজ রজনীতে না জানি কখন তোমার রূপের দিব্য ভাতি
আমার আঁধার হৃদয়ে জেলেছে কামনা-বিহীন পূজার বাতি ;

জীবনের এই অবেলায় আজ তোমার উদয় অপরিচিতা,
এনে দিল একি অনুশোচনার তীব্র অনল—অচিন্তিত ?
আজ হতে আমি চলি যদি পুনঃ মহামানবের সাগরতীরে
নূতন আকাশ নূতন পৃথিবী জীবনে কি পুনঃ পাব না ফিরে ?

আমার মানস সরসীর তীরে তোমার রূপের বলাকাগুলি,
উড়িয়ে শিখর আষাঢ় মেঘের অবগুণ্ঠন দেবে না খুলি ?
মুক্ত হবে না আমার তরে কি তোমার ঘরের প্রবেশদ্বার
অপরিচিতা কি হবে না আমার চিরপরিচিতা মতো আপনার।

প্রবাসে শারদীয়া

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বছরের একটা সময় আসে যখন মেঘেরা ধোপদুরস্ত হয়ে আকাশময় ঘুরে বেড়ায় হাওয়ার ডানায় ভর করে। সীমাহীন নীলিমার কোন্ এক কোণ থেকে নীল পরীরা ডাক দিয়েছে—তাই এই দুরন্ত অভিসার।

চাঁদের আলো সারা বর্ষার জলে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে রূপালী রং ধরেছে। রাতের হাওয়ায় শিশিরের আমেজ।

কোণে-কোণে, এখানে-ওখানে, ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র শিউলী ফুল—লাল বোঁটার উপর শুভ্র দেহলতা বিস্তার করে। তার গন্ধ চলেছে হাওয়ার কোলে কোলে, দিকে দিগন্তে, মাঠের প্রায় নেমে-যাওয়া জলের বুকে দোলা দিয়ে, পাকা ধানের শীষে পুলক জাগিয়ে।

বর্ষামুখর রাতের বিরহী হৃদয় আজ মিলনের আশায় পুলকিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। বাংলার আকাশ-বাতাস শরতের মিঠা সুরে মুখরিত। বাঙালীর ঘরে ঘরে জননী লিপি পাঠিয়েছেন—মনে আর আনন্দ ধরে না। মায়ের আগমনী বার্ত্তা বাংলার সীমানায় এসে থমকে যায় না। ছুটে চলে দেশে বিদেশে, যেখানে একটিও বাঙালী আছে, যত দূরেই থাক না কেন, সেও ত মায়ের সন্তান।

যার কর্ম্মে সাময়িক অবসর জোটবার সম্ভাবনা তার আর আনন্দের সীমা নেই। যাদের জুটল না, বা পকেট যাদের ভারল না, তারাও দমবার পাত্র নয়। বাঙালীর কাছে প্রবাসী হলেও মা ত আর পর নয়, সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। শেষ পর্য্যন্ত একটা সভার আয়োজন হয়। পূজো হবে, এটা সবাই একবাক্যে মেনে নেয়। কিন্তু, মেনে নেওয়াই শেষ কথা নয়, এর পেছনে চাই মোটা টাকার জোর, সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, আর একটা বিরাট কর্ম্মী-গোষ্ঠী। অনেক বাদানুবাদ আর প্রস্তাব চলতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত একটা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর পড়ল তারা ছাড়াও কর্ত্তৃত্ব-লোভী লোকের অভাব নেই। যেখানে বাঙালীর সংখ্যা বেশী আর প্রতিপক্ষের পকেটও মোটামুটি ভারী সে ক্ষেত্রে তারা তাদের দাবির জয়যাত্রা আলাদা পূজোর ব্যবস্থা করে। মুশকিলে পড়ে তারা যারা কোন দলেই নেই, দুই পক্ষই চাঁদার খাতায় মোটা অঙ্ক লেখাবার চেষ্টায় থাকে। আলাদা পূজোর বিরুদ্ধে যুক্তি তুলতে গিয়ে চাঁদাদানকারী থেমে যায় শেষ পর্য্যন্ত। দুই পক্ষেরই যুক্তি একেবারে অকাট্য। তাই, খাতায় যা হউক একটা অঙ্ক লিখে দিয়ে নিস্তার পায়।

কর্ম্মী নির্ব্বাচন একটা প্রস্তাবনা মাত্র। সত্যিকারের উদ্যোগ-

পূজামণ্ডপে প্রসাদ-প্রার্থীর দল

পর্ব্ব সুরু হয় তারপর। একটা রবিবার কিংবা ছুটির দিন সকালবেলা আসর বসে সভাপতির বাড়ী, সভার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে গৃহস্বামিনীর নীরব আয়োজন-সম্ভার পরিবেশকে এক সরস হাস্যমুখর করে তুলতে।

সব চাইতে যে প্রশ্নটি সকলের মনে বিশেষ করে দোলা দেয় তা হচ্ছে প্রতিমা গড়া। স্থানীয় কুমোর যে পাওয়া যায় না তা নয়; কিন্তু ওদের উপর ভরসা করে কাজে হাত দিলে শেষ পর্য্যন্ত বেদীর পাশে বড় বড় হরফে লিখে রাখতে হবে কিসের প্রতিমা। তবে এত কি চাঁদা উঠবে যার জোরে একেবারে বাংলা দেশ থেকে কারিগর এনে ঠাকুর গড়াতে পারবে। অনেক ক্ষেত্রেই আয় [illegible] হয়ে উঠে না, তবে কি ঘট পূজো করতে হবে নাকি? নৈব নৈব [illegible]

শুধু মেয়েদের দ্বারা অভিনীত শরৎ চন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' নাটকের একটি দৃশ্য

দুই-চারজন গুণী লোক বেরিয়ে পড়ে যাদের হাতের কাজ মন্দ নয়। তারা জানায়, 'সবার সহানুভূতি পেলে আর কিছুই পরোয়া করে না।' অন্ত পক্ষেও দুই-চারজন গুণীর সন্ধান আছে, তাদের কাছেও অনুরোধ জানানো হয়, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় না।

কিন্তু কাজ যারা সুরু করেছে তাদেরও আর এত সহজে দমলে চলে না। উৎসাহ আর জেদ এ দুটিকে সম্বল করে শেষ পর্য্যন্ত তারা কাজে নেমে যায়। কাঠ-খড় পোড়াতে না হলেও, যোগাড় করতে বেগ পেতে হয় প্রচুর। দশভুজার একটি ছবি সামনে রেখে দুর্গা বলে কাজ সুরু হয়ে যায়। যারা মনে করেছিল তাদের সহায়তা ভিন্ন এ কাজ একান্ত অসম্ভব, তারা কাজের ছলে পাশ দিয়ে ঘুরে যায়, মনে মনে হাসে—'এবার যা হবে তা··'। কিন্তু কাজে যারা হাত দিয়েছে তারাও হাল ছাড়বার পাত্র নয়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও বাড়ী ফিরে কোনও রকমে চায়ে চুমুক দিয়ে চলে যায় কালকের ফেলে-আসা কাজ আরও একটু এগিয়ে দিতে। এমনি করেই বেনা বাঁধা শেষ করে মাটি পারে লাগে। মাটির পর্ব্বও একদিন শেষ হয়।

মাথাগুলি কিন্তু আসে সুদূর কলকাতা থেকেই। রং দেওয়ার পালা সুরু হলেই খোঁজ পড়ে যায় অতসী ফুলের—মায়ের রঙের সঠিক অনুমান করবার জন্য। কোথাও কোন ব্যতিক্রম ঘটবার উপায় নেই—তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। ষষ্ঠী পুজোর শুভলগ্ন এসে যায়। পুরোহিত ঠাকুর তার বরণডালা নিয়ে এসে বেদীর কাছে দাঁড়ান। শিল্পীরা তখনও ব্যস্ত, ঘন ঘন তুলির টান পড়ছে আর ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে ভুলছে না আশ্বাস-বাণী—'এই ত হয়ে গেল বলে।'

আর থাকা চলে না। শিল্পীরা নেমে আসে বেদীর নীচে, শেষবারের মত একবার দেখে নেয় তেমন কোন মারাত্মক ত্রুটি থেকে গেল কিনা। তার পর তাকায় এর ওর মুখের দিকে, দর্শকদের কাছ থেকে তাদের মতামত (অর্থাৎ তারিফ) শোনবার জন্য। কেউ বলে চমৎকার, কেউ সান্ত্বনা জানায়, 'আরে মশাই, এত হাঙ্গামার মধ্যে যা করে তুলেছেন এই ঢের।' ভাবখানা এই যে তেমন একটা কিছু হয় নি। কেউ বলে, 'ওবার বড্ড ভাল হয়েছিল।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন চাঁদা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, অন্যান্যবারের মত আমরা মোটেই জোর জুলুম করব না লোকের উপর, কিন্তু আদায় করব সকল বারের চাইতে বেশী। চাঁদার হার নির্দ্দিষ্ট করবার একটা চেষ্টা হয়, কিন্তু অসম্ভব বলে শেষ পর্যান্ত সে আশা পরিত্যাগ করতে হয় বাড়ী বাড়ী ঘুরে, নানান যুক্তি দেখিয়ে, দশ রকমের কথা শুনে।

তার পর বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের অঙ্ক নির্দ্দেশের পালা। রূপসজ্জা আর আমোদ-প্রমোদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে একটা মোটা অঙ্ক। কেননা, কেবল পূজোতে আছে ভক্তের আত্মপ্রসাদ, চিত্তের প্রসন্নতা, কিন্তু এমন অনেক আছে যারা চায় এ উপলক্ষে গত এক বছরের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভ করতে। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান একেবারে নিরবচ্ছিন্ন তাই একদিকে যেমন চলতে থাকে পূজোমণ্ডপের আয়োজন সবার গোচরে তেমনি নাচ, গান, আর অভিনয়ের তোড়জোড় চলতে থাকে নেপথ্যে।

নাটক নির্ব্বাচন একটা বড় পর্ব্ব। কারুর মত ঐতিহাসিক ছাড়া আবার থিয়েটার কি। কেউ বলে, 'ও হচ্ছে গিয়ে সেকেলে রুচি, আজকাল সামাজিকই চালু।' কেউ কেউ এ দুয়ের একটিতেও সম্মতি দিতে পারে না। তারা চায় হাসির খোরাক যোগাবার মত বই। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় সবারই কথা বজায় থেকে যায়। কেননা, অভিনেতার অভাব নেই, বাহুল্য বললেই হয়—তা ছাড়া তিন দিন ব্যাপী আয়োজন চাই। নাটকের বিষয় নির্ব্বাচনই শেষ কথা নয়, বই নির্ব্বাচন তার চেয়ে কম শক্ত নয়। পাত্রপাত্রী (অবশ্য পুরুষেরাই নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়)—আজকাল মেয়েরা এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে পুরুষের সমান তালে পা ফেলে বড় বড় বই মঞ্চস্থ করতে পিছপা হয় না। নির্ব্বাচন ততোধিক গুরুতর ব্যাপার। সবারই চাই চটকদার ভূমিকা একান্তই যদি নায়ক কিংবা নায়িকা না হওয়া গেল। যা হউক প্রাথমিক একটা নির্ব্বাচন হয় বৈ কি? অনেকেরই মন এ নির্ব্বাচনে সায় দেয় না। টের পাওয়া যায় রিহার্সাল সুরুর দিন, পাত্র-পাত্রীদের অনেকেই অনুপস্থিত। পরিচালক (কোথাও স্বয়ংসিদ্ধ, কোথাও বা মেনে নেওয়া) মহোদয়ের প্রায় কন্যাদায়ের মত ব্যাপার। খোঁজ, খোঁজ, যারা উপাস্থিত, তাদের মধ্যে যারা আসল ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল

তারা জানায় গলদ কোথায়। বলতে গিয়ে কৌশলে তারা নিজেদের অভিযোগ পেশ করতেও কসুর করে না। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন অনেক ওলট-পালট করতে হয়।

এমনি করেই ভাঙা-গড়ার পালা বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেন। মনে মনে, কখন বা প্রকাশ্যেও, প্রতিজ্ঞা করেন—'যথেষ্ট হয়েছে মশাই, ঘেন্না ধরে গেছে আসছে বছর থেকে কে এর মধ্যে থাকে।' কিন্তু বছর ঘুরলেই আবার মনটা কেমন যেন চনচনে হয়ে ওঠে।

অনেক রকম ওলটপালট করেও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবাইকে খুশী করা যায় না। নিরুপায় হয়ে প্রায় সবাই মেনে নেয় এবারকার মত। তবে এখানেই এর শেষ নয়। যাদের সংগঠন-শক্তি আছে তেমনি তরুণের দল বিদ্রোহ জানায় অমুক নাট্য সমিতি, তমুক অভিনেতৃ-সঙ্ঘ গঠন করে। বয়স যাদের বিদ্রোহে সায় দেবার পরিপন্থী তারা সমালোচনা করেই তৃপ্ত হয়, কিংবা ওদের দলে মিশে যায়। বড়র দল—অর্থাৎ যারা তারকা (পুং)—হাসে—'সেদিনের ছোকরা ওরা আবার করবে প্লে!' বড়রা যাই বলুন না কেন—বিদ্রোহীরাও দমবার পাত্র নয়। চটকদার অভিনয়ে বাজিমাৎ করে আসর জমাবার সঙ্কল্প নানান সূত্রে কানাঘুষায় প্রচারিত হতে থাকে। রিহার্সাল যদিও নিয়ম করে রোজই হয় তবু একমাত্র ষ্টেজ রিহার্সাল ভিন্ন অধিকাংশ দিনই অনেক পাত্র-পাত্রী অনুপস্থিত থাকেন। ষ্টেজে মেরে দেওয়ার দলে তারা।

স্বর্গ থেকে ভেসে আসা

প্রথম দিন কোন্ বই মঞ্চস্থ হবে তা স্থির করতে বেশ বেগ পেতে হয়। সে দিন ষ্টেজ বাঁধার কাজ শেষ হতে অনেক দেরী হয় বলে অভিনেতাদেরই হাত দিতে হয়। কাজেই কোন দলই প্রথম দিন অভিনয় করতে স্বীকার হতে চায় না সহজে। শেষ পর্য্যন্ত যে দলই প্রথম দিন অভিনয় করুক না কেন তারা দোষত্রুটী ঢেকে দেয়, মন্তব্য করে—'আরে মশাই, ষ্টেজ বেঁধে পার্ট করা চাট্টি কথা নয়, বসে বসে বলতে সবাই পারে।'

সন্ধ্যে হতে না হতেই অভিনেতারা জড় হতে থাকেন—প্রস্টার প্লেয়াররা অবশ্য একটু দেরীতেই এসে থাকেন। গ্রীণরুমটি দেখবার মত হয়ে দাঁড়ায়। সবাই নিজের মনের মত পোষাক আর মেক-আপের জন্য পেণ্টার কিংবা একটা বড় আয়নার সামনে ভিড় করতে থাকে। ঘোষিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, ঘন ঘন মাইকে বলতে হয়—'অনিবার্য্য কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ানুযায়ী অভিনয় সুরু করতে না পেরে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আর মাত্র কয়েক মিনিট দেরী!' শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য কুর-র-র-র বাঁশী বাজে আর ড্রপসিন ওঠে।

দর্শক গ্যালারীতে—অর্থাৎ ত্রিপল কিংবা সতরঞ্চ-বিছান আসনে প্রথম পঙক্তিগুলি আলো করেন মহিলাবৃন্দ, পেছনে বসে আর দাঁড়ায় ছেলেরা। কয়েকখানা চেয়ার অবশ্য থাকে বহিরাগত সম্মানিত অতিথিদের জন্য।

অভিনয় চলতে থাকে। বিশেষ একটা দিনে হয়ত কোন সরল-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মুগ্ধ দর্শক অভিনেতাকে পুরস্কৃত করতে চায়। কিন্তু দেবার মত সঙ্গে নেই কিছু। শেষ পর্য্যন্ত মেডেল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দেন কর্ত্তৃপক্ষ দর্শকমশায়ের তরফ থেকে। ব্যস, তার পর আর দেখতে হয় না। একের পর এক প্রতিশ্রুতির বন্যা নেমে আসে। বন্ধু মহল যার সঙ্কীর্ণ সে হতভাগ্য ভিন্ন আর সবারই নাম দানের জলে ভাসতে থাকে।

প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দর্শকরা থাকেন নীরব। কিন্তু এমনিতর আসরে সেটি ঘটবার উপায় নেই। এক বছর পর ওটা হয়ে দাঁড়ায় একটা মিলন-কেন্দ্র। সুখ দুঃখের দু'চারটা কথা তাই বিনিময় না হয়ে পারে না। অনেককেই আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—তারা মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করে। চারদিক থেকে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠতে থাকে। মায়েরা শাসন করেন ঐ শিশুদের—'বছরে একটা দিন তাও যদি একটু...'

নাট্যাভিনয় ছাড়া বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করতে হয়। কেননা যারা অভিনয় করতে পারে না অথচ প্রাণে সখ আছে প্রচুর তারা কি তবে কিছুই করবে না। কর্ত্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন আগেই একটা নোটীশ যার করেন আর্টিষ্টদের নাম পেশ করবার জন্য। কা কস্য পরিদেবনা! সখ যাদের বেশী শুধু তারাই এ নোটীশের জবাব দেয়। তার পর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ঘোরাঘুরি আর ধরাধরি করে আরও কয়েকটা নাম যোগাড় করে একটা অনুষ্ঠান-সূচী খাড়া করেন। কিন্তু অনুষ্ঠান সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় অনুরোধের পালা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরোধ মেনে নিতে হয়। অনেক সময় এমনি অনুরোধ সময়াভাবে কিংবা অনিবার্য্য অন্য কোন কারণে প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

বিসর্জ্জনের পথে

মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়। স্থানীয় অধিকাংশ লোকই স্ব স্ব প্রচেষ্টায় ঘর ভরে দ্রষ্টব্য ছড়িয়ে দেন। গুণাগুণের ক্রম নির্ণয়ের জন্য যাঁরা বিচারক নির্ব্বাচিত হন তাঁরা বন্ধ ঘরে বসে স্থির করেন পুরস্কারের যোগ্য নামের তালিকা।

উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার অবসান করে জননী পদার্পণ করেন সন্তানের অঙ্গনে। শাঁখের বদলে মাইকে মাইকে ঘোষিত হয় তাঁর মঙ্গল-গান। দলে দলে আসতে থাকে পূজামণ্ডপে—বালক বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানান বেশে নানান ঢঙে।

গৃহিণীরা শুচিবাস পরিধান করে মাতৃভোগের আয়োজন পূর্ণ করে তুলতে থাকেন। ভারী কাজগুলি থাকে ছেলেদের জন্য। কলহাস্য-মুখরিত অঙ্গন, শুদ্ধোচ্চারিত দেবীমান্ত্রর গম্ভীর নিনাদ, মনকে নিয়ে যায় এক স্বপ্নলোকের দেশে—বছরের বাকী দিনগুলি যেখানে আসে না ভিড় করে হাসি-কান্নার পাড়ি জমাতে।

আস্তে আস্তে অঞ্জলির জন্য ভিড় বাড়তে থাকে। দলে দলে গন্ধ-পুষ্প হাতে লয়ে নিবেদন করে মায়ের চরণতলে স্ব স্ব কামনা—মাতা-পিতা সন্তানের মঙ্গল, স্বামী স্ত্রী উভয়ের দীর্ঘ জীবন, ছাত্র-ছাত্রী আগতপ্রায় পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল।

কাড়াকাড়ি পড়ে যায় প্রসাদের জন্য। শেষ পর্যন্ত একটা লাইন করতে হয় সবাইকে। বহিরাগত অতিথিদের জন্য থাকে আলাদা ব্যবস্থা। হাসিমুখ আর স্বাগত সম্ভাষণে তাদের মন খুশীতে ভরে ওঠে।

সারাটা দিন এমনি হৈ-চৈয়ের মধ্যে কেটে যায়। সন্ধ্যায় বেজে ওঠে আরতির ঘণ্টা। বাংলার বাইরে ঢাক-ঢোলের জমক বাঁধাম মুশকিল। বড়জোর মাঝামাঝিগোছের একটা ঢোলক স্থানীয় কোন আনাড়ীর হাতে পড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে। তাল-বেতালের কথা কারুর খেয়ালই হয় না।

ধূপ ধুনার গন্ধে আমোদিত পূজার অঙ্গন এক দিকে যেমন শঙ্খ-ঘণ্টার আওয়াজে মুখরিত হতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি সবার চোখের আড়ালে চলতে থাকে অভিনেতাদের প্রস্তুতির পালা। আরতি শেষ হতে না হতেই দলে দলে লোক ছুটে চলে ঘরের দিকে পেটের তাগিদ মিটিয়ে অভিনয় কিংবা বিচিত্রানুষ্ঠানের দর্শক হতে। যাদের ঘরের টান নেই, কিংবা পেটের তাগিদ যাদের তেমন প্রবল নয় তারা আর কালবিলম্ব না করে বসে যান প্রথম পঙক্তি অধিকার করে। ক্রমেই ভিড় বেড়ে উঠতে থাকে—বাঙালী-অবাঙালী হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে। অনুষ্ঠানের মর্ম্ম বোঝার দায় অনেকেরই হয়ত নেই। তবুও এরা এসে ভীড় জমায় একটা পরিবর্ত্তনের লোভে, নিত্যকার বৈচিত্র্যহীনতায় ফিরিয়ে আনতে সহজ সুর। অনুষ্ঠান গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে কিংবা বাপের কাঁধে। যবনিকাপাত হলে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। ভাললাগা না লাগার সমালোচনা করতে করতে ফিরে যান নিজ নিজ গৃহে। কর্তৃপক্ষের কাউকে কাউকে কিন্তু থেকে যেতে হয় মণ্ডপে। অনেক চেয়েচিন্তে-আনা কিংবা ভাড়া-করা মূল্যবান সামগ্রী প্রহরা দিতে হয়।

এমান করেই আনন্দোচ্ছাস আর রোমাঞ্চকর পেশার মধ্য দিয়ে তিনটি দিন কেটে যায়। দিনগুলি যেন বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। চতুর্থ দিনে বিসর্জ্জনের বাজনা বিরহ-ব্যথা জাগিয়ে তোলে। গৃহিণীরা বরণডালা নিয়ে মায়ের সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দিয়ে কামনা করেন যে, তাঁর নিজের সিন্দুর যেন অক্ষয় হয়।

বেদীমূল শূন্য করে এক সময় প্রতিমা লরীবোঝাই হয়ে যায়। শূন্য বেদীর দিকে তাকিয়ে মনটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। শিশুরা ভিড় জমায় লরীর মধ্যে। অনেক সাধ্য সাধনা করে ওদেরকে নামিয়ে দিতে হয়—কলের চাকা ঘুরতে ঘুরতে সবাইকে শেষ বারের মত মাতৃদর্শন করিয়ে ছুটে চলে যায় বিসর্জ্জনের জায়গায়।

ফিরে এসে সবাই আবার জড় হয় মণ্ডপে শূন্যবেদীমূল প্রান্তে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে শান্তিবারি ছিটিয়ে দেন সবার মাথার ওপরে, মুখে উচ্চারণ করেন—ওং শান্তি, ওং শান্তি। তার পর চলতে থাকে প্রাণভরা কোলাকুলি। বিচ্ছেদের শেষ দাগটুকুও মুছে যায় সন্তমাতৃবিরহকাতর মানুষের মন থেকে।*

---

* প্রবন্ধের ফটোগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত

কালিদাস-সাহিত্যে অ-ভারতীয়দের কথা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবির সাহিত্যের স্থানে স্থানে ভারতের বাহিরের কয়েকটি দেশের বিবরণ পাওয়া যায়, এবং ভারতের ভিতরেও অ-ভারতীয়দের কথাও কিছু কিছু পাওয়া যায়; এখানে সেগুলি দেখাতে যাইতেছি।

প্রথমে পারস্য দেশের কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। 'রঘুবংশ' কাব্যে—রঘুর দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন—

'পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা ॥'-রঘু—৪।৬০

অর্থাৎ, সেখান হইতে তিনি পারসীক দেশ জয় করার জন্য স্থলপথ ধরিয়া চলিলেন। তাঁহার টীকাকার মল্লিনাথ বলেন যে পারসীক দেশে জলপথেও যাওয়া চলিত, তবে 'সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ' থাকায় রঘুকে স্থলপথ দিয়া চলিতে হইয়াছিল।

পারসীক দেশে যাইয়া রঘু কি দেখিলেন? মহাকবি তাহার বিবরণ দিতেছেন—

'যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।

বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ ॥ রঘু-৪।৬১

'অকালে' মেঘ (বর্ষার নয় শরতের) যেমন পদ্মের অরুণ আভা সহ্য করিতে পারে না, রঘুও তেমনি যবন-নারীদের পদ্মের মত (সুন্দর সুন্দর) মুখগুলির মদ্যপানজনিত রক্তিম আভা সহ্য হইল না।

পারসীকেরা ভারতের লোক নহেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বলা হইত যবন, ও তাঁহাদের স্ত্রীলোকদিগকে বলা হইত যবনী—যাঁহারা দিনের বেলাতেই মদ্যপানান্তে মুখগুলি লাল করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রঘুসৈন্যগণকে তাঁহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দেখিতেছিলেন।

তার পর কি হইল, মহাকবি তাহা জানাইয়া দিতেছেন:

'সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।

শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥'-রঘু ৪।৬২

পাশ্চাত্ত্য দেশীয়দিগের অশ্বসৈন্যগণের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল এবং রণক্ষেত্রে এমন ধূলি উড়িতে লাগিল যে, কেবলমাত্র ধনুকের টঙ্কারের শব্দে প্রতিপক্ষের যোদ্ধাদিগকে চিনিতে পারা যাইতেছিল।

এখনকার দিনে পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বলিতে বুঝায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয়দিগকে, আর তখনকার দিনে পাশ্চাত্ত্য শব্দে বুঝাইত পারসীকদিগকে।

সে তুমুল যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন:

'ভল্লাপবর্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।

তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥'-রঘু ৪।৬৩

তিনি বর্শা লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদের (যবনদের) মধুমক্ষিকা-পরিব্যাপ্ত মৌচাকের মত দাড়িওয়ালা মুখগুলি কাটিয়া রণক্ষেত্র ভরাইয়া দিলেন।

পারসীকদের যে তখনকার দিনেও মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি থাকিত, সেকথা কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা গেল।

সে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কি হইল মহাকবি তাহা বলিতেছেন:

'অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।

প্রণিপাতপ্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্ ॥'-রঘু ৪।৬৪

অবশিষ্ট যবনগণ প্রাণে যাঁহারা বাঁচিয়া রহিলেন, মস্তক হইতে তাঁহারা শিরস্ত্রাণ খুলিয়া রাখিয়া রঘুর শরণাপন্ন হইলেন, মহৎ লোকের ক্রোধ প্রণতি পাইলে শান্ত হইয়া যায়।

মাথা খুলি করাটা যে এখনকার মত তখনকার দিনেও পাশ্চাত্ত্য দেশীয়দের সম্মান নিবেদন করার প্রথা ছিল, এখানে তাহাই দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, পারসীকেরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইলেন, তার পর কি হইল? মহাকবি সেকথা বলিতেছেন:

'বিনয়ন্তে স্ম তদ্যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্।

আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু ॥'-রঘু ৪।৬৫

রঘুর যোদ্ধারা যুদ্ধের ক্লান্তি অপনোদন করার জন্য সে দেশের দ্রাক্ষালতা পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রে অত্যুৎকৃষ্ট চর্মাসন (কার্পেট) পাতিয়া তাহার উপর সকলে মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

পারস্য দেশে যে আঙুর খুব বেশী পরিমাণে জন্মায়, আঙুরের মদ যে সেখানকার এক লোভনীয় বস্তু, ও সেদেশে যে অতি মনোহর কার্পেট পাওয়া যায়, মহাকবি সে তথ্যগুলি ভালভাবে জানিতেন, নহিলে সে দেশের বিবরণ এমন সুন্দর ভাবে দিতে পারিতেন না।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের পঞ্চম অঙ্কেও 'যবন' ও তাহাদের অশ্বারোহী সৈন্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকবি

সেখানে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই—বিদিশার রাজা পুষ্পমিত্র পুত্র অগ্নিমিত্রের উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া অশ্বমেধযজ্ঞে ব্রতী হইয়া রাজধানীর বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব যখন সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে বিচরণ করিতেছিল, সে সময় একদল অশ্বারোহী যবন-সৈন্য তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং এই যবন সৈন্যদলকে পরাজিত করিতে পুষ্পমিত্রের পৌত্র বসুমিত্রকে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, যবনেরা সে সময় ভারতের সীমানার মধ্যে সিন্ধুনদের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য লাভের চেষ্টা করিতেছিল। এখানে মনে হয় যেন যবন বলিতে মহাকবি পারসীকদিগকে বুঝাইতেছেন।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে যবনী পরিচারিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা পুরূরবার প্রাসাদে যবনীরা কার্যে নিযুক্ত হইত। রাজা তাঁহাদের একজনকে ধনুর্বাণ আনিতে আদেশ করিতেছেন, নাটকে এরূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। অবশ্য এই যবনীরা পারস্যদেশীয়া না গ্রীকজাতীয়া তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই।

মহাকবির 'নলোদয়' কাব্যে আরবদেশের মরুস্থলের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকটি দেওয়া গেল :

'ইতিকৃতসামারবতঃ সুরলোকাত্তমুখেন সামারবতঃ।
ন বিরংসামারবতঃ স্থলাদিব নলোৎকমানসামারবতঃ॥'
নল-১।৪১

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করার পূর্বে কিছু পূর্বাংশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। দময়ন্তীর স্বয়ংবর, দেবতারা তাঁহার অসামান্য রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করার বাসনায় সে সভায় আসিয়াছেন, কিন্তু সেখানে নলকে দেখিয়া তাঁহার মত অমন সুদর্শন তরুণ রাজাকে ছাড়িয়া দময়ন্তী যে তাঁহাদের কাহারও কণ্ঠে বরণমালা পরাইবেন এমন ভরসা দেবরাজ ইন্দ্রের রহিল না, তিনি তাই নলকে ডাকিয়া তাঁহাকেই দূত করিয়া দময়ন্তীর কাছে গিয়া বলিতে বলিলেন যে, দেবতারা তাঁহাকে ভালবাসেন ও তিনি যেন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে বরণ করেন। ব্যাখ্যাটি এই :

নলের মুখে দেবতাদের সান্ত্বনা-বাণী (প্রেমনিবেদন-বার্তা) শুনিয়াও হংস যেমন জলজ পদার্থে (পদ্ম ইত্যাদিতে) আসক্ত থাকিলে (জল ছাড়িয়া) আরবের মরুময়স্থলে যাইতে চাহে না, তেমনি দময়ন্তীরও মন নলের প্রতি আসক্ত থাকাতে দেবতাদের কাহাকেও বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাঁহার আসিল না।

এখানে আরবতঃ মারবতঃ স্থলাৎ' অর্থে আরবের মরুময় ভূমি না করিয়া টীকাকারেরা কেবল 'মারবতঃ স্থলাৎ' অর্থে মরুময় ভূমি করিয়া আরবতঃ শব্দটিকে সুরলোকাৎ শব্দটির বিশেষণ করেন, কিন্তু আরবতঃ কথার অর্থ তাঁহারা শব্দায়মান (চেঁচাইয়া) করেন বলিয়া, মনে হয়, দেবতারা যেখানে নলকে অতি গোপনে দময়ন্তীর কাছে পাঠাইতেছেন সেখানে তাঁহারা চেঁচাইতে যাইবেন কেন? ইহা অতি বিসদৃশ ব্যাপার—সুতরাং 'আরবতঃ' শব্দটিকে 'মারবতঃ স্থলাৎ' শব্দগুলির সহিত যুক্ত করিলে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, অতশত বৎসর পূর্বে কালিদাসের মত ভারতের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ আরবের মরুভূমির নাম শুনিলেন কিরূপে যে কাব্যে তাহার উপমা দিলেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যিনি রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে পারস্য দেশের বর্ণনা নিখুঁত ভাবে দিয়া গিয়াছেন, তিনি যে পারস্য দেশের পাশের দেশ আরব ও আরবের মরুভূমির নাম কখনও শুনেন নাই, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা হইতে পারে? তিনি যে আরব, পারস্য, চীন, কাম্বোজ প্রভৃতি বহির্ভারতের দেশগুলির নাম ভালরূপে জানিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে চীনদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম অঙ্কের শেষে মহাকবি লিখিতেছেন :

'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।'

কোনও পতাকাকে যদি প্রতিকূল বাতাসের দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে তাহার (পতাকার দণ্ডের উপরিস্থিত) চীনদেশীয় রেশমবস্ত্রের খণ্ড যেমন পশ্চাৎ দিকে উড়িতে থাকে (দুষ্যন্তের মনও তেমনি পিছন দিকে শকুন্তলার কাছে পড়িয়া রহিল, তিনি যদিও সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন)।

টীকাকার মল্লিনাথ 'চীনাংশুক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন : 'চীনদেশোদ্ভূত বস্ত্র' অর্থাৎ, যে বস্ত্র চীনদেশে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং মল্লিনাথও যে চীনদেশের নাম জানিতেন, তাহা তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

'কুমারসম্ভবের' সপ্তম সর্গেও চীনাংশুক শব্দটি পাওয়া যায়। সেখানে মহাকবি বলিতেছেন যে, পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে হিমালয়ের প্রাসাদ পুষ্প প্রভৃতির মত চীনদেশীয় বস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছিল (কু ৭।৩)।

রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে মহাকবি হূণদেশের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, হূণেরা সে সময় ভারতের উত্তর দিকে পার্বত্য প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিল। রঘু সিন্ধুনদের তীর ধরিয়া কুঙ্কুম অর্থাৎ জাফরাণ-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া হিমালয়ের উত্তরে হূণদেশ আক্রমণ করেন। হূণেরা ভারতীয় ছিলেন না, তাঁহারা মধ্য

এশিয়ার এক জাতি। হুণদেশ জয়ের বৃত্তান্ত মহাকবি এই-ভাবে দিয়াছেন :

'তত্র হুণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্ত বিক্রমম্।
কপোল পাটলাদেশে বভুব রঘুবেষ্টিতম্ ॥'-রঘু-৪।৬৮

অর্থাৎ, সেখানে রঘুর পরাক্রম হুণনারীদের স্বামীদের প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছিল, যাহার জন্ম নারীদের ক্রন্দনের সহিত কপোলে করাঘাতের ফলে তাঁহাদের গণ্ডস্থল পাটলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

হুণরমণীরা যে ক্রন্দনের সময় নিজ নিজ কপোলে করাঘাত করিতেন, মহাকবি এ তথ্যটুকু জানিতেন বলিয়াই একথা লিখিয়াছেন।

হুণ দেশ পার হইয়া কাম্বোজে যাইতে হয়, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কাম্বোজীদের দেশ ছিল ভারতের সীমানা হইতে বেশ খানিকটা দূরে। মহাকবি বলেন :

'কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্যমনীশ্বরাঃ।
গজালান পরিক্লিষ্ট রাক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ ॥'-রঘু-৪।৬৯

কাম্বোজীরা যুদ্ধে রঘুর বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার গজবন্ধন আনত আখরোট বৃক্ষের মত বিজেতার নিকট নত হইতে বাধ্য হইলেন।

কাম্বোজ দেশে যে প্রচুর আখরোট বৃক্ষ জন্মে কালিদাস এ খবর রাখিয়াছিলেন।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে মহাকবি গন্ধর্বদেশের এক অভিবাদন-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ যখন তাঁহার ভারতীয় বন্ধু পুরূরবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন প্রথমে উভয়ে উভয়ের হস্ত স্পর্শ করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপ করমর্দন করিয়া অভিবাদন করার প্রথা যে সম্পূর্ণরূপে অ-ভারতীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারত ও মহাভারত

শ্রীসুবোধ রায়

অধিরথ সূতপুত্র কর্ণ যেই ক্ষণে
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভার অঙ্গনে
ঘোষিল অকুণ্ঠ কণ্ঠে এই মহাবাণী—
'দৈবায়ত্ত মম জন্ম, কুল নাহি জানি।
জানি মোর অধিকার পৌরুষ পরম
জানি এই—মানুষের ধর্ম্ম সে চরম।'

স্মরণ-অতীত এই সেই যুগক্ষণ হ'তে,
এই মহাবাণী-সত্য মহাকালস্রোতে
ভেসে এলো আমাদের জীবনের তীরে,
জিজ্ঞাসে সে—'তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে
কোন দেবতার তরে সাজায়েছ ডালি?
কার উপায়নে রচ তব অর্ঘ্যথালি?
ভীরু যারা, মিথ্যাচারী, সংযমবিহীন,
ক্লিন্ন জীবনের গ্লানি বাহি' নিশিদিন
মানুষের নাম যারা করে কলঙ্কিত,
জাতিগর্ব্বে তারা যদি হইয়া গর্ব্বিত
সমাজের মাঝে আনে অসংখ্য বিভেদ,
তাদের জীবনযজ্ঞ—হীন নরমেধ।
'দূর কর এই হীন মিথ্যা অনাচার,
উচ্চার অকুণ্ঠ কণ্ঠে শুভ সমাচার
মহাভারতের, সেই সনাতন বাণী—
জাতি কুল-বর্ণভেদ কিছু নাহি মানি।
জানি আমি এক জাতি—সে জাতি মানুষ,
জানি আমি এক ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম পৌরুষ;—
যে-পৌরুষ সত্য স্নিগ্ধ, সাধনা ভাস্বর,
যাহার আলোক-স্পর্শে মানব-অন্তর
হয় চিরদীপ্তিমান, জ্যোতির্লোকসম।
মর্ত্তাভূমে মানুষ সে মৃত্যুপারঙ্গম
তখনি হইতে পারে—জীবন তাহার
হয় নিত্য আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার।

ভারতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডক্টর মাজা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একাদশ সভাপতি ডক্টর যোস মাজা নয় দিনের জন্য ভারত সফরে আসিয়া দুই দিন কলিকাতায় ছিলেন। ৭ই অক্টোবর তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশনের এক অভ্যর্থনা-সভায় বলেন যে, পৃথিবীর আদিকাল হইতে যুদ্ধ জিনিষটা মানব-সমাজে রহিয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাকে একেবারে দূর করা যায় নাই। যদি কেহ মনে করেন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সকল জাতির মনকে এরূপ করিয়া পরিবর্ত্তিত করিবে যে, কোন জাতিই আর যুদ্ধ চাহিবে না তাহা হইলে তিনি একটা অসম্ভব জিনিষ কামনা করিবেন মাত্র। যদি মানুষের আধ্যাত্মিক ও যান্ত্রিক উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় তবে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব। দুঃখের বিষয় যান্ত্রিক উন্নতির দিকেই মানুষের ঝোঁক বেশী। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই আবার সকল দেশের সমান আর্থিক উন্নতি আবশ্যক। এজন্য সকল অনুন্নত দেশের নিজেদের মধ্যে খুবই সহযোগিতা দরকার। ডক্টর মাজা এই প্রসঙ্গে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কি করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ইহা সাংস্কৃতিক, আর্থিক এবং সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্যে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতেছে। জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির উপরই বিশ্বশান্তি নির্ভর করে। এক দিনে বিশ্বশান্তি সম্ভব নহে। ভ্রান্ত জ্ঞানের এবং পরস্পর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা হইতেই যুদ্ধের জন্ম হয়। যে পর্য্যন্ত না লাটিন আমেরিকা ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের আর্থিক উন্নতি হইতেছে ততদিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি সম্ভব নহে। ডক্টর যোস মাজা যখন কালীঘাট মন্দিরে নগ্নপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া তাঁহার ললাট চন্দনচর্চ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'চন্দন' শান্তির প্রতীক। ডক্টর যোস এসোসিয়েশনের সভ্যগণকে বলেন, চন্দন চিহ্ন যদি শান্তির প্রতীক হয় তবে তিনি চন্দন-তিলক ধারণ করিয়া পৃথিবীর দেশে দেশে ভ্রমণ করিবেন।
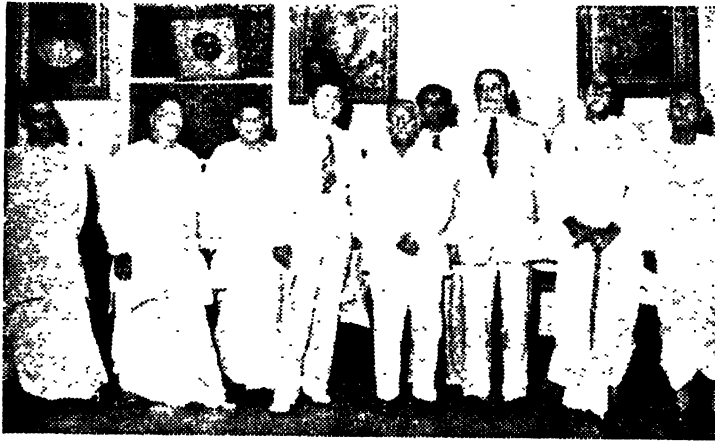
(বাম হইতে) শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, মিঃ মিগুয়েল সেরানো, ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীঅনিল গুপ্ত, ডক্টর যোস মাজা, শ্রীসতীনাথ রায় এবং শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত [ক্রিস্যান্স-এর সৌজন্যে

ঐ দিনই এসিয়াটিক সোসাইটির হলে, সোসাইটির এবং কলিকাতা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। সোসাইটির মূল্যবান গ্রন্থাগার এবং পুরাতন ঐতিহাসিক পুথি-পত্রাদি দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। সোসাইটির সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীসতীনাথ রায়ের অভ্যর্থনার উত্তরে ডক্টর মাজা বলেন যে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। পৃথিবীর লোকে ভারতের মহৎ বাণী এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরমতসহিষ্ণুতার কথা জানে। ডক্টর মাজা স্পেনীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা মিষ্টার মিগুয়েল সেরানো—চিলির চার্জ দ্য এফেয়ার—ইংরেজীতে শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

চিলির ব্যবহারজীবী এবং রাজনৈতিক নেতা ডক্টর যোস মাজা ১৮৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা হয়। তিনি ১৯২৫ সনে চিলি পার্লামেণ্টের সেনেটের নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৫ সনে তিনি পার্লামেণ্টের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষা ও বিচার মন্ত্রী এবং প্রধান মন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চিলির নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র তাঁহার রচিত। তিনি উরুগুয়ে, ব্রেজিল, ডোমিনিকান রিপাব্লিক, হেইটি, পানামা এবং পেরুদেশে রাষ্ট্রদূতের কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ স্থাপিত হইবার উদ্দেশ্যে সানফ্রান্সিস্কো সহরে যে বিশ্বসম্মেলন হয় তাহাতে তিনি চিলির প্রতিনিধি রূপে যোগ দিয়াছিলেন এবং বিশ্ব-সনদ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

সমাজকল্যাণের এদেশীয় কর্ম্মনীতি

ডাঃ জাল ফিরোজ বুলসারা

এশিয়ার সরকারসমূহ এবং জনগণ যুদ্ধোত্তর কালে নিরতিশয় সমাজকল্যাণ-সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অনিবার্য্য কেননা, স্বাধীনতা লোকের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করায় তাহাদের অদৃষ্টের প্রতি এবং মানবের অদৃষ্টকে আলুগা ভাবে হইলেও যথাযথ রূপেই কল্যাণলাভরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। কল্যাণ বলিতে বুঝায় সামগ্রিক ভাবে সমাজের শারীরিক, মানসিক, এবং নৈতিক কল্যাণ। এবং যে সকল উপাদানে সমাজ গঠিত—অর্থাৎ ব্যষ্টি এবং পরিবারসমূহ—তাহাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যতিরেকে কোন শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সামাজিক ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষকদের নিকট ইহা সুপরিস্ফুট হইবে যে, আমাদের সামাজিক কলুষ এবং সমস্যাসমূহের অধিকসংখ্যকেরই উদ্ভব হয় অর্থনৈতিক অভাব হইতে। অনুন্নত দেশসমূহের সমাজকল্যাণ বলিতে তাই মুখ্যতঃ বুঝাইবে উন্নয়নের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর জোর দেওয়া। ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে মাথাপিছু উৎপাদনবৃদ্ধি, উচ্চতর পারিবারিক আয় এবং জাতীয় ধন-সম্পদের সমবন্টন।

অনুন্নত দেশসমূহে সামাজিক কলুষের অর্থনৈতিক ভিত্তি

কাজেই যে ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত শিল্পায়িত দেশসমূহে সমাজকল্যাণ বলিতে অধিকতররূপে বুঝায় এখানে সেখানে উদ্ভূত বেকার-সমস্যার উপশম এবং তদানুষঙ্গিক সামাজিক কলুষের লাঘব, সেক্ষেত্রে অনুন্নত দেশসমূহে সাহায্য এবং পুনর্ব্বাসনকে ব্যাপকভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে আর্থিক সাহায্যের সহিত। শিল্পায়িত পাশ্চাত্য দেশগুলি অভাব অনটনের সমস্যা অথবা জীবনধারণের মূলগত প্রয়োজনসমূহের অল্পবিস্তর সমাধান করিয়াছে এবং আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া সার্ব্বিক সামাজিক নিরাপত্তার সুষ্ঠু স্তরে পৌঁছিয়াছে। অধিকন্ত শিল্পায়িত পাশ্চাত্য সমাজসমূহের জনগণের শতকরা ৫০ হইতে ৮০ ভাগ নাগরিক সেক্ষেত্রে অনুন্নত দেশগুলির জনগণের মধ্যে শতকরা ৮০ হইতে ৯০ জন কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভর করিয়া এবং অধিকতর গ্রাম্য অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে।

সামাজিক সমস্যাসমূহের উপর বহুমুখী অভিযান একান্ত আবশ্যক

কাজেই সমাজকল্যাণের এ-দেশীয় কর্ম্মনীতি স্বভাবতঃই শিল্পায়িত পাশ্চাত্য সমাজসমূহের উপযোগী কর্ম্মপন্থা হইতে মূলতঃ কতকটা ভিন্ন ধরনের হইবে। প্রথমতঃ কৃষিনির্ভর সমাজে সমাজকল্যাণ-সমস্যা ঢের বেশী ব্যাপক এবং অধিকতর জটিল। কাজেই চড়াও করিতে হইবে বিভিন্ন মুখ হইতে। অর্থাৎ কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রের প্রয়োগ, যন্ত্র-বিদ্যা সম্পর্কিত কিসে কি হয় ক্রমে ক্রমে সেই জ্ঞানের প্রবর্ত্তন, শিল্পায়নের বৃদ্ধি, জনগণের মনোভাব এবং আদিম ধরনের জীবনযাপন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন—এসকল উদ্দেশ্যে মূল-গত এবং সামাজিক শিক্ষা এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের ও জীবন-চর্য্যার অভ্যাসের উন্নয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিকল্পিত সরকারী সাহায্যে স্বেচ্ছামূলক সামাজিক প্রচেষ্টাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা

প্রতিকারমূলক এবং উন্নতিবিধায়ক ব্যবস্থাসমূহের প্রয়োগ এমন বিস্তৃত পটভূমিকার উপর করিতে হইবে যে, স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টাগুলিকে পরিপূরণ করা হইবে আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক একটি সুপরিকল্পিত সরকারী প্রোগ্রামের দ্বারা। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার যে-যে উত্তাল তরঙ্গ এক বা অন্যরূপে আফ্রিকা-এশিয়া এবং ওসিয়ানিয়ার মহাদেশসমূহকে প্লাবিত করিতেছে তাহা কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনা নয়, দেশীয় কর্ম্মসূচীসমূহও তাই কেবল পাশ্চাত্য পদ্ধতি কর্ম্মকৌশল এবং রূপের অন্ধ অনুকরণমাত্র হইতে পারে না। মূলতঃ তাহার উদ্ভূত হইয়াছে খাঁটি এদেশীয় প্রয়োজনে এবং দেশীয় পটভূমিকাতেই

তাহাদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইয়াছে। স্থানীয় মানবিক এবং আর্থিক সম্পদের সহায়ে তাহাদিগকে চালু রাখিতে হইবে এবং এগুলি স্বভাবতঃই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ হইবে যখন স্থানীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা মনে রাখা যাইবে আর সুচিন্তিতভাবে জাতীয় উদ্দেশ্যসমূহের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইবে।

অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত বৃহৎ পরিবারসমূহ এবং দৈহিক ক্রটিযুক্ত লোকেদের সমস্যা

অনুন্নত দেশসমূহে যে সমস্যাটি মাথা ঘামানোর কারণ তাহা হইতেছে একদিকে জন্মহারের বিপুল বৃদ্ধি, অন্যদিকে দ্রুত হ্রাসমান মৃত্যুহার এবং ক্রমবর্দ্ধমান পুষ্টিহীনতা। শিল্পান্বিত সমাজসমূহ অন্ধ, মূক-বধির, মৃগী এবং যক্ষ্মারোগী, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ প্রভৃতি তাহাদের সমাজের বিভিন্ন প্রকার দৈহিক অপটুতা-গ্রস্ত জনসমষ্টির পুনর্ব্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিশেষ ধরনের এবং কতকটা ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। অনুন্নত সমাজসমূহের শারীরিক, সামাজিক এবং মানসিক দিক দিয়া অপটুতাগ্রস্তদের সমস্যা কিন্তু এত ব্যাপক এবং শিক্ষিত কর্ম্মী ও প্রাপ্তব্য আর্থিক সংস্থানের পরিমাণ এত কম যে, আপাততঃ তাহাদিগকে কেবলমাত্র ভাসা ভাসা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তাহাদিগকে ব্যাপক আকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকার্য্য এবং শিক্ষামূলক কাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে এই আশায় যে, এক বা দুই পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়া অপটুতাগ্রস্তদের সংখ্যা এমন ভাবে কমিয়া আসিবে যে, আগামী কালের সরকার অধিকতর সম্যক্ ভাবে এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিতে উৎসাহিত হইবেন।

স্বাস্থ্যোন্নয়ন কর্ম্ম এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা

অনুরূপ ভাবে যথোচিত স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক কর্ম্মের ব্যবস্থাও করিতে হইবে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার অনুকরণ করিয়া নয়। কেননা ওদেশে লোকসংখ্যার অনুপাতে রোগীর শয্যাদির যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা দরিদ্র সমাজসমূহের ক্ষমতার বাহিরে। এদেশে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে বিশেষ ভাবে জোর দিতে হইবে, বিদ্যালয়, ফ্যাক্টরি, বয়স্ক ক্লাস, সিনেমা, রেডিও এবং সংবাদপত্র, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, বাজার এবং মেলায় প্রচারকার্য্য ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারসাধনের উপর।

ব্যষ্টিগত কর্ম্ম এবং সমষ্টিগত কর্ম্ম মূলতঃ পৃথক নয়

আমরা একথা বলিতেছি না যে, শিল্পান্বিত সমাজগুলিতে যে সকল পদ্ধতি আঙ্গিক এবং কর্ম্মনীতি পরীক্ষিত ও সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে অনুন্নত দেশসমূহের সমাজকর্ম্মীদের কিছুই শিক্ষণীয় নাই। বস্তুতঃ তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষণের অনেকখানিই প্রদান করিতে হইবে অনুরূপ পদ্ধতিতে আর পরীক্ষিত ও সাফল্যমণ্ডিত আঙ্গিকসমূহ এবং কর্ম্মনীতির প্রণালী শিখিতে হইবে যদিও কার্য্যতঃ তাহাদের প্রয়োগকে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

সামাজিক কর্ম্মনীতির উপর জাতীয় সমাজদর্শনের প্রভাব

সমাজসমূহ তাহাদের অতীতের অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাহাদের দ্বারা গৃহীত সাধারণ জীবন-দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত হয়। কাজেই আমাদের সমাজ-কল্যাণমূলক কর্ম্মনীতি আমাদের গণতান্ত্রিক এবং সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং আমাদের সংস্থা-সমূহেরও বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হইবে। তাহাতে স্থানীয় জনসমাজকে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-গঠনের অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া হইবে এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাসমূহের জন্য যাহাতে তাহারা রাজ্য অথবা কেন্দ্র হইতে আর্থিক কিংবা যান্ত্রিক সাহায্য পাইতে পারে সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের লক্ষ্যবস্তু অনুরূপ

সমাজকল্যাণের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের মূলগত কোন পার্থক্য নাই। কেননা, যেমন ক্ষুধা, জ্ঞান, সামাজিক মর্য্যাদা তেমনি বেদনা ব্যাধি এবং দুর্গতির প্রতি পরাঙ্মুখতাও মানব-পরিবারে সমরূপ এবং সার্ব্বজনীন। এইদিক দিয়া মানুষের মন যখন বিচিত্ররূপী তখন তাহার অভিব্যক্তিও বহুমুখী হইতে বাধ্য। মানুষের মন যখন নিজের ছাড়া অপরের এই ভাবাদর্শ গ্রহণক্ষম এবং সংবেদনশীল তখন সামাজিক কলুষের প্রতিকারের এই আঙ্গিক এবং পদ্ধতিসমূহও এক সমাজ হইতে আর এক সমাজে বিচরণ করিতে এবং গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হইতে বাধ্য। মানব-সভ্যতার বিশেষত্ব এই—ইহা একটি বিশ্ব-জনীন উত্তরাধিকার এবং ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, ভাব এবং আদর্শসমূহের পাখা আছে, তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় অথবা তাহাদিগকে ধার করা হয়। প্রতিকারমূলক উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রয়োগ-পদ্ধতিতে কিন্তু সংস্কৃতির স্তর, সমসাময়িক পরিস্থিতি, মানবীয় এবং আর্থিক সম্পদ এবং মনোভাব অনুযায়ী এক সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের পার্থক্য থাকিতে পারে। এই হইতেছে ঠিক ক্ষেত্র যেখানে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী সমাজকর্ম্মী অনুশীলন এবং তথ্যানুসন্ধান করেন এবং নিজেকে আর তাঁর পদ্ধতিসমূহকে জটিল স্থানীয় সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লন।

বোম্বাইয়ে অন্ধদের নব শিল্পনিকেতন

বোম্বাইয়ে শীঘ্রই অন্ধদের জন্য একটি নূতন শিল্প-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই হোমে গ্রামাঞ্চল হইতে আগত অন্ধদিগকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষাও দেওয়া হইবে।

অন্ধদের জন্য শিল্প-নিকেতনের প্রয়োজনীয়তা

সমগ্র ভারতে অন্ধদের জন্য স্থাপিত সত্তরটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ষাটটিই সাধারণ অন্ধ বিদ্যালয়—এগুলিতে আঠারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক অন্ধদেরই মাত্র ভর্ত্তি করা হয়। অন্ধদিগকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষাদানের কোন সুযোগ সুবিধাই এগুলিতে বিদ্যমান নাই। বিপুলসংখ্যক বয়স্ক অন্ধদিগকে শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধা নিতান্তই অযথেষ্ট। বয়স্ক অন্ধদের জন্য এই ধরণের একটি হোমের প্রয়োজনীতা, কাজেই অপরিহার্য্য।

বোম্বাই রাজ্যে সুযোগ-সুবিধা

এমনকি বোম্বাই রাজ্যেও—যেখানে অন্ধের সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০০—অন্ধদের জন্য আমাদের একটি মাত্র শিল্প-নিকেতন আছে। ওরলির এন. এস. ডি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হোম ফর দি ব্লাইণ্ড নামক প্রতিষ্ঠানটির আবাসিকদের অনুমোদিত সংখ্যা ইতিমধ্যেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং যেখানে ১২০ জন অন্ধের স্থান সঙ্কুলান হওয়ার কথা সেখানে ১৫১ জন অবস্থান করিতেছে। গত বৎসর এই হোমের আবাসিক-গণ বেতের কাজ, তাঁতবোনা এবং ঐকতান বাদন ইত্যাদি দ্বারা প্রায় ৪০,০০০ টাকা রোজগার করিয়াছে। সমগ্র ভারতে অন্ধদের যে-কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা 'রেকর্ড' বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই অসাধারণ সাফল্যলাভ সম্ভবপর হইয়াছিল এইজন্য যে, বোম্বাই সরকার বোম্বাইয়ের যাবতীয় সরকারী আপিসগুলিকে এই নির্দ্দেশ দিয়া আদেশ জারী করেন যে, যেমন চেয়ারগুলিতে নূতন করিয়া বেত লাগানো তেমনি ছোটখাটো কাঠের মেরামতি কাজও এই হোমকে দিতে হইবে। অনুরূপ ভাবে সরকার তাঁহাদের প্রয়োজনীয় ডাষ্টারগুলিও এই হোম হইতে ক্রয় করেন।

কমিটি

এই নব নিকেতনের কার্য্য পরিচালিত হইবে নেশন্যাল এসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইণ্ড নামক সংস্থার উদ্যোগে। বোম্বাই সরকারের শ্রম ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনারেবল শ্রীশান্তিলাল এইচ. শাহকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি প্রভাবশালী ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় সমাজকর্ম্মী শ্রীমতী মিথান জেলাম এই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছে লেঃ জে. এল. নার্দ্দেকার এবং ক্যাপ্টেইন এইচ জে. এম. দেশাই এঁরা দুজন এই নব নিকেতনের কর্ম্মসচিব।

পঞ্চাশ জন অন্ধের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা

হোমের কাজের সূচনা হইবে ১৯৫৬ সনের ১৬ই জুলাই হইতে। প্রথম বৎসরে পঞ্চাশ জন বয়স্ক অন্ধকে ভর্ত্তি করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়াছে পরলোকগত শেঠ কাওয়াসজী মুঞ্চারজি বানাজীর ট্রাষ্টীদের উদার আনুকূল্যের দরুন। অত্যন্ত ঔদার্য্যের সহিত তাঁহারা প্রায় আট হাজার বর্গগজ পরিমিত চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি সমন্বিত একটি প্রকাণ্ড বাংলো, বাৎসরিক নামমাত্র এক টাকা ভাড়ায় নেশন্যাল এসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইণ্ড নামক সংস্থাটির কর্ত্তৃত্বাধীনে অর্পণ করিয়াছেন—যে পর্য্যন্ত এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক অন্ধদের জন্য একটি শিল্পনিকেতন-পরিচালনাকল্পে ঐ সম্পত্তি ব্যবহৃত হইবে ততদিন পর্য্যন্ত উহার কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে উক্ত এসোসিয়েশনেরই উপর।

কৃষি ও শিল্প

এই নব নিকেতনে তাঁতবোনা, বেতের কাজ, বাস্কেট এবং ব্রাশ তৈরি, সঙ্গীত এবং ব্রেইল পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইবে। অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে গ্রামাঞ্চল হইতে আগত অন্ধদিগকে।

পল্লী অঞ্চলে নিজেদের জোতে স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে কৃষি, হাঁস-মুরগী পালন এবং এগুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বৃত্তিসমূহে চরম মাত্রায় শিক্ষাদান করা হইবে।

এই নূতন 'হোম' "দি মুঞ্চারজি, নৌরোজী বানাজী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোম ফর দি ব্লাইণ্ড" নামে অভিহিত হইবে। পরলোকগত শেঠ কাওয়াসজী মুঞ্চারজী বানাজীর ট্রাষ্টীদের চেয়ারম্যানরূপে যিনি উক্ত অন্ধ শিল্পনিকেতনের ব্যবহারার্থে এই উৎকৃষ্ট সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন সেই কুমারী সেরেন-বাঈ- এম. বানাজী এমন একজন ভদ্রমহিলা যিনি বদান্যতা-রূপ পুণ্যকৃত্যে তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁর এই দানের জন্য নগরীর অন্ধেরা তাঁহার নিকট বিশেষ

ভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবে। আশা করা যায় যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে এবং আবাসিকদের কৃতজ্ঞতাবোধের কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠানটি অন্ধদের পুনর্ব্বাসনের স্থায়ী কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে।

দি নেশন্যাল এসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইণ্ড

১৯৫২ সনের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে, বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম নিখিল ভারত অন্ধ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত এই এসোসিয়েশন এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যেই ভাল কাজ করিতে পারিয়াছে। পঞ্চাশ জনের অধিক অন্ধকে বিনিযোগ করা হইয়াছে খোলা শিল্পে। তাহারা দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মীদের ন্যায় একই ধরণের কাজ করিতেছে এবং সমপরিমাণ মজুরি পাইতেছে। এন. এ. বি. অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য দান করিয়াছে এবং কলেজে অধ্যয়নরত অন্ধদিগকে বৃত্তিও প্রদান করিয়াছে। ইহা ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির সহিত একযোগ যেমন অন্ধতা নিবারণ এবং আরোগ্যবিধান তেমনি অন্ধদের পুনর্ব্বাসন, শিক্ষণ, কর্ম্মে নিয়োগ এবং আরোগ্যোত্তর পরিচর্য্যা ইত্যাদি যাবতীয় দিক সংক্রান্ত কতকগুলি নীতিগত বিষয় নির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

এন. এ. বি-র দৃষ্টান্তেই ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট অন্ধ, মূক এবং দৃষ্টিহীনদের জন্য জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

এই ধরনের আরো বহু শিল্প নিকেতনের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা সুস্পষ্ট।

সমাজে অন্ধদের প্রতিষ্ঠা

এ. এইচ. মর্টিমের

অন্ধেরা যাহাতে তাহাদের দৈহিক ত্রুটি অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক মানুষরূপে সমাজে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারে তাহাই হওয়া উচিত যাবতীয় অন্ধ-কল্যাণকর্ম্মের চরম লক্ষ্য। এই নীতির উপরই দেরাদুনস্থ বয়স্ক অন্ধদের শিক্ষণকেন্দ্রের সমগ্র কর্ম্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। সুস্থ ব্যক্তিরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা বলিতে, অন্ধদের বেলায় কেবলমাত্র নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা অর্জ্জনই বুঝায় না, কিন্তু ইহার চেয়েও যে ঢের বেশী সূক্ষ্ম সমস্যা ইহার অঙ্গীভূত তাহা হইতেছে এই যে, তাহারা নিজেদের এমনভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে সমাজও সর্ব্বতোভাবে তাহাদের দৈহিক ত্রুটির কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিবে। আপাতদৃষ্টিতে কার্য্যতঃ ইহা অসম্ভাব্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। তথাপি এমন সব অন্ধ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে যাহাদের অন্ধত্ব তাহাদের স্বাভাবিক আচরণের এত স্বল্প পরিপন্থী যে, সময় সময় তাহাদের সামনে চিঠি এবং কাগজপত্র মেলিয়া ধরিয়া বলিয়াছি—"এটা পড় ত" এবং তাহাদের অন্ধত্বের কথা ভুলিয়া যাওয়ার দরুন বরং বোকাই বনিয়া গিয়াছি।

বিভিন্ন কারিগরী কাজে অন্ধদের যথাযথ শিক্ষণের বেলায় কলাকৌশল সংক্রান্ত খুবই স্বল্প পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সরকারী সংস্থা বলিয়া টি. সি. এ. বি. বেসরকারী প্রচেষ্টার পরিচালনাধীন সংস্থাসমূহ হইতে অনেক দিক দিয়াই অপেক্ষাকৃত ভাল, কেননা শেষোক্তগুলির পরিকল্পনাসমূহকে, অর্থসাহায্যের আকারে সাধারণের সহানুভূতি তাহারা যতটুকু আকর্ষণ করিতে পারে সেই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। টি. সি. এ. বি.কে সরকারী বাজেট হইতে যে ব্যয়বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা বেশ অকৃপণ এবং আমরা কেবল যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম লাভেই সমর্থ হইয়াছি তাহা নয়, যথোচিত কর্ম্মীসংসদ নিয়োগ করিতেও পারিয়াছি। অন্ধদের প্রকৃত শিক্ষণের বেলায় প্রাথমিক প্রধান অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তাহাদের সম্ভাব্য শক্তি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া। আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্মীসংসদে বিশেষ ভাবে প্রকৃত শিক্ষণ বিভাগে—উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য অন্ধ ব্যক্তি থাকিলে তাহা বিশেষভাবে সুফলপ্রদ হয়। সে ক্ষেত্রে হাতে-কলমে প্রদর্শন দ্বারা অন্ধদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করাইতে আমরা সমর্থ হইয়াছি যে, আমরা তাহাদিগকে যে সকল কাজ করিতে বলি তাহা তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত নহে। একবার এই অবস্থায় পৌঁছিলে পর অন্ধত্ব ছাড়া যদি

আর কোনও ত্রুটি না থাকে তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

যে সকল প্রধান বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি গ্রামীণ কারিগরী কাজের ধরনের, যেমন—তাঁতবোনা, উলের জিনিষ বোনা, নেওয়ার তৈরি, মোমবাতি এবং ছাঁচে ফেলিয়া প্লাষ্টিকের বিভিন্ন জিনিষ তৈরি করা ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আছে ব্রেইল এবং টাইপ রাইটিঙের ক্লাস, আর আমাদের সেই পুরনো অবলম্বন সঙ্গীত ত আছেই। আমরা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি শিখাইয়া থাকি চেয়ারে বেত লাগানো তাহাদের অন্যতম। একদিকে যেমন আমরা এই আশা পোষণ করি যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোক এখানে যে সকল বৃত্তি শিক্ষা করে সেগুলি অভ্যাস করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, অন্যদিকে আমরা খোলা শিল্পে (Open Industry) লাভজনক কর্ম্মে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব অন্ধদিগকে কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তার উপরেও বিশেষভাবে জোর দিয়া থাকি। শিল্প বিশেষতঃ যেগুলিতে পৌনঃপুনিকতার দরকার সেগুলিতে এমন বহু কাজ আছে যেগুলি অন্ধেরা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ভ্রাতাদের মতই সুষ্ঠুভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের চেয়েও উৎকৃষ্টতররূপে সম্পন্ন করিতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে গ্রামীণ কারিগরী কাজ আমরা শিখাই তাহা কিরূপে ঐ সকল লোকের উপযোগী হইতে পারে। ইহার জবাব হইতেছে এই যে, এই সকল সাদাসিধা বৃত্তিশিক্ষার দরুন একবার যদি আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি এবং হাতের কাজে দক্ষতা অর্জ্জিত হয় তাহা হইলে অন্ধ লোকের পক্ষে এই ধরনের পৌনঃপুনিক কার্য্য আয়ত্ত করিতে খুব স্বল্পপরিমাণ আয়াস স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যে লোক হস্তচালিত তাঁতে হরেক রঙের নক্সা বুনিতে শিখিয়াছে, সে বাস্তবিকই একটি জটিল ধরনের কার্য আয়ত্ত করিয়াছে এবং অনেকগুলি শিল্পকর্ম্ম সম্পাদনে প্রয়োজনীয়, সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত কম জটিল একটি বা দুটি হাত এবং আঙুল চালানোর প্রণালীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে গিয়া তাহাকে কোন প্রকার অসুবিধায়ই পড়িতে হয় না। আবার যে শিক্ষার্থী মেশিনের অংশগুলি খুলিয়া আলাদা আলাদা করিয়া লওয়া এবং তাহা-দিগকে পুনরায় একত্রিত করা এই দুটি প্রণালী শিখিয়াছে তাহাকে যখন কোন শিল্প-সংক্রান্ত কাজে সাধারণ যন্ত্র চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হয় তখন তাহার মনে থাকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং আপন কাজে যন্ত্রপাতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে এই চিন্তা তাহার মনে মোটেই ভীতির উদ্রেক করে না।

যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোন উদ্যোগের সূচনা হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করিতে উহা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে কেবল-মাত্র তাহা দ্বারাই উক্ত উদ্যোগের সাফল্যের পরিমাপ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে তদনুযায়ী হইতে টি. সি. এ. বি কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছে ? একেবারে গোড়া হইতেই ইহা উপলব্ধ হইয়াছিল যে, কর্ম্ম নিয়োগ-কার্য্যকে বাস্তবভাবে ফলপ্রদ করিতে হইলে উহাকে যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। ইহাও উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে, ঐরূপ সংস্থা গড়িয়া তুলিতে কিছু সময় লাগিবে, উপরন্তু ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, একদিকে যেমন অন্ধদের বিনিয়োগ-কার্য্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক কার্য্যক্রম গৃহীত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের কাজে একজন বা দুইজন যোগ্য অন্ধ ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে—কেবলমাত্র তাহাদের প্রকৃত ক্ষমতার মূল্য নির্দ্ধারণের জন্যই নয়, কিন্তু ইহার চেয়েও যাহা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইতেছে যেমন নিয়োগকারীদের তেমনি তাহাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সহকর্ম্মীদের মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তাহা লক্ষ্য করা। অচিরেই দেখা গেল, অন্ধদিগকে যে তাঁহাদের সংস্থায় লাভজনক ভাবে কর্ম্মে নিয়োগ করা যাইতে পারে অধিকাংশ মালিকই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, কিন্তু মুষ্টিমেয় যে কয়জন অন্ধদিগকে একটা সুযোগ দিতে তৈরী ছিলেন তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদের নিয়োজিত অন্ধব্যক্তি-দের কৃত কর্ম্মে পুরাপুরিই সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাও দেখা গেল যে, অন্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি কর্ম্মরত, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরা মোটের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাববিশিষ্ট।

ইতিমধ্যে বোম্বাই এবং কলিকাতায় দুই-একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজের নমুনা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান এবং কাজের বিশ্লেষণকল্পে কর্ম্মপন্থা গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল তথ্যানু-সন্ধানের ফলে যদিও কলিকাতায় কেবলমাত্র একজন ছাড়া আর কোন অন্ধব্যক্তিকে আশু কর্ম্মে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই, তথাপি এই সকলের দৌলতে আমরা এই আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হই যে, খোলা শিল্পে অন্ধদের সম্ভাব্য বিনিয়োগের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বিদ্যমান। পরে মাদ্রাজ অঞ্চলে কর্ম্মে বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ব্যাপকতর অনুসন্ধান-কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। এই অনুসন্ধানের ফলে ছয় জন অন্ধ লোককে কাজে লাগানো হয়। এই তথ্যানুসন্ধানের প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপেই মাদ্রাজের টি.সি.এ.বি.'র শাখা হিসাবে একটি কর্ম্মে বিনিয়োগ আপিস প্রতিষ্ঠা করা

স্থিরীকৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এই আপিস প্রতিষ্ঠিত হয় খাঁটি পরীক্ষণমূলক স্বল্পমেয়াদী ভিত্তির উপর। এই ধরনের একটি নূতন উদ্যম সম্বন্ধে যেমনটি আশা করা যায়—কাজটি তেমনটি সহজসাধ্য হয় নাই এবং ফলসমূহও প্রদর্শন-যোগ্য হয় নাই। আমাদের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে এগুলি কিন্তু খুবই উৎসাহপ্রদ হইয়াছে, কেননা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যখন যথাযথ ভাবে তাহাদের দ্বারস্থ হওয়া যায় শিল্পপতিরা তখন অন্ধদিগকে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য সুযোগ দিতে তৈরী থাকেন। তদুপরি, নিয়োগকারী এই উদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নিজের বাঁধাধরা পথ ছাড়িয়া অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত আছেন। মোটের উপর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সহকর্মীরাও অন্ধদের প্রতি কোন আনুকূল্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন নাই। এমনটি যে সকল সময়েই ঘটিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু যেখানে অন্ধদের সহিত কর্মরত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকেরা সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে এবং পরিপূর্ণ রূপে সহযোগিতা করে নাই, সেখানে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে বোধগম্য ভাষায় তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং তাহাদের নিকট সমগ্র পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তনে প্রণোদিত করা সম্ভবপর।

কর্ম্ম-নিয়োগের পরীক্ষণ আরম্ভ হইবার পর হইতে আমরা সবশুদ্ধ ৬৭ জন অন্ধকর্ম্মীকে কাজে নিযুক্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। তাহাদিগকে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বা সামরিক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদির কারখানায় ইনস্পেকশন ডিপার্টমেণ্টে কাজে লাগানো হইয়াছে। তা ছাড়া তাহাদিগকে বয়নশিল্পের কারখানায়, দেশলাইয়ের কারখানায়, ভারতীয় টেলিফোন-শিল্পে এবং কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সকলকেই যে শিল্পে নিয়োগ করা হইয়াছে তেমন নহে। কয়েকজনকে পাঠানো হইয়াছে শিক্ষক রূপে অন্ধদের অন্যান্য বিদ্যালয়ে এবং অল্প কয়েকজনকে তাহাদের নিজস্ব তাঁতবোনা অথবা চেয়ারে বেত লাগানো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা হইয়াছে। সরকার এমন একটি বিশেষ ফণ্ড চালু রাখিয়াছেন যাহা হইতে অন্ধদিগকে তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য 'সংস্থাপন সাহায্য' দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিকল্পনার চরম সাফল্য এই বিষয়টি হইতে বিচার করা যাইতে পারে যে, আমরা এখন এমন সব ভাবী শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে অনেকগুলি আবেদনপত্র পাই যাহারা কি ভাবে আমরা অন্ধদের জন্য কর্ম্মের সংস্থান করিয়া থাকি তাহা শুনিয়াছে। টি.সি.এ.বি-তে শিক্ষালাভের এবং তার পর আমাদের ক্ষুদ্র সংস্থাপন সংস্থার মাধ্যমে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে তাহারা উৎসুক।

যাহারা এই ধরনের কাজের ভার গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল তাহাদের প্রতি উপদেশমূলক কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ ইহা মনে রাখা একান্ত রূপে প্রয়োজনীয় যে, "দরিদ্র নিঃসহায় অন্ধে"র জন্য সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া নিয়োগকারীর দ্বারস্থ হওয়া সমীচীন হইবে না। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার যথার্থ পন্থা হইতেছে তাহার মনে এই প্রতীতি জন্মানো যে, অন্ধকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া তিনি কেবল যে কর্ম্মীকেই সাহায্য করিবেন তেমন নয়, ইহার দরুন তাঁহার নিজের ব্যবসায়েরও সহায়তা করা হইবে। কেননা তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে কাজে লাগাইবেন যে তাঁহাকে দিবে উৎকৃষ্ট এবং সৎ কাজ। দ্বিতীয়তঃ ইহাও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, ইতিপূর্ব্বেই কর্ম্মে নিযুক্ত আছে এমন কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া অন্ধকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে না। তৃতীয়তঃ, ইহা নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যে, কর্ম্মে নিয়োগ মালিককে অন্ধ কর্ম্মী গ্রহণের প্ররোচনাদানেই শুধু পর্য্যবসিত হইবে না, অন্ধ কর্ম্মী যাহাতে নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে সেজন্য তাহাকে সাহায্য করা এবং তাহার কর্ম্মে নিযুক্তির পরে যে-কোন সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে তাহার সম্পর্কে তাহাকে সহায়তা করা এই উভয়বিধ কারণে ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিয়া আরও আগাইয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া মালিকের মনে এই ধারণাও জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, 'শিশুর তদারকে'র ভার তাঁর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে না। ইহা একটি বড় সমস্যা এবং অন্ধদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের এখনো প্রচুর শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা কিন্তু এমন সময়ের জন্য সম্মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে পারি যখন এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণকারী অনেকগুলি সংস্থার উদ্ভব হইবে এবং যখন লাভজনক ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত অন্ধ ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য এবং আজব চীজ বলিয়া গণ্য হইবে না।

আরোগ্যোত্তর সেবাকর্ম্মের স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষণ প্রোগ্রামের সূচনা

নির্দ্ধারিত তালিকা অনুযায়ী ১৯৫৬ সনের ১৮ই জুলাই অপরাহ্ণ ছয়টার সময় আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়ে (Delhi School of Social Work)। মিঃ এবং মিসেস গোরে সেখানে ছিলেন অভ্যাগতদের স্বাগত করবার জন্যে। আমরা এগিয়ে গেলাম একটা খোলা জায়গার দিকে যেখানে একটি নূতন কিন্তু সাদাসিধা বাড়ী দ্রুত উপরের দিকে মাথা তুলছে—কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের আরোগ্যোত্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষণ প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত অতিরিক্তসংখ্যক ছাত্রদের অবস্থানের ব্যবস্থা করবার নিমিত্ত।

সকল শিক্ষার্থীরা ত সেখানে উপস্থিত ছিলই, তা ছাড়া সমাজ-কল্যাণকর্ম্মে বহু বিশেষজ্ঞ, সমাজ-কল্যাণ সংস্থাসমূহের ডিরেক্টরগণ, বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এবং অন্যান্য ছাত্রেরাও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আপিস থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন—পর্ষদের সেক্রেটারী আর. এস. কৃষ্ণন, শ্রী পি. ডি. কুলকর্ণী, ও. এস. ডি-র শ্রী ভি. ভি. শাস্ত্রী এবং কর্ম্মী-সংসদের আরও জনকয়েক সভ্য ব্যবস্থাদি হয়েছিল সমাজকর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ-সম্মত। শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাধারণ চেয়ারের আর পুরোভাগে ছিল উক্ত উৎসব দিনের প্রখ্যাত অতিথি, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বি. এন দাতারের এবং দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের চেয়ার। শ্রীগোরে এবং বিদ্যালয়ের প্রশাসক পর্ষদের (Governing Body) চেয়ারম্যান সমভিব্যাহারে যখন এসে পৌঁছলেন তখন বেলা ছয়টা বেজে ত্রিশ মিনিট।

দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী এম এস. গোরে শিক্ষণক্রমের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, "আরোগ্যোত্তর সেবাকর্ম্মের স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষণ কর্ম্মসূচী কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত, আরোগ্যোত্তর সেবাকর্ম্ম এবং সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত দুটি উপদেষ্টা সমিতির অনুমোদনসমূহের অনুসারী। এই সমস্ত কর্ম্মীর শিক্ষণ হবে আংশিক ভাবে গৃহাভ্যন্তরে (indoor) এবং অংশতঃ গৃহের বাইরে (outdoor) এবং আরোগ্যোত্তর সেবামূলক কর্ম্মের আওতায় যে সকল লোকের স্থান হবে, তারা হচ্ছে কারাগারের নিঃস্ব-সদন, মানসিক চিকিৎসালয়, সংশোধনাগার প্রভৃতি থেকে খালাস-পাওয়া লোক। স্বভাবতঃই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত এবং এটা খুবই উৎসাহ এবং আনন্দের বিষয় যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং সহ-যোগিতা করে আসছেন। এই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে ব্যয়-বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে সাড়ে দশ কোটি টাকা।

শ্রীগোরে বললেন, "শিক্ষিত কর্ম্মীর প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে সকলের চেয়ে বেশী। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ, দিল্লী সমাজ-কর্ম্ম বিদ্যালয়কে (Delhi School of Social Work) এই নূতন আরোগ্যোত্তর প্রোগ্রামের রূপায়ণকল্পে তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মী সংসদকে (Supervising Staff) এই শিক্ষণ কর্ম্মসূচী গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করেন। বিদ্যালয় তৎপরতার সঙ্গে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এখানকার শিক্ষণক্রম হবে বক্তৃতামালা, ক্ষেত্রকর্ম্ম (Field-work) এবং সমাজকর্ম্ম বিষয়ে গবেষণার এক মিশ্র কর্ম্মসূচী। শিক্ষণকালে শিক্ষার্থীরা সমাজকর্ম্মের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবেন, তাদের জন্যে দেশব্যাপী ভ্রমণ এবং সমাজ-কল্যাণকর্ম্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করা হবে।

এই শিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রায় এক মাসের জন্যে তাদের পাঠানো হবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে বাস্তব জ্ঞানলাভ এবং কাজের অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করবার জন্যে—যাতে বাস্তব উপায়ে তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। এর দরুন দেশের প্রয়োজন এবং অবস্থা অনুযায়ী এই শিক্ষণের নীতি নির্দ্ধারিত হবে।

প্রারম্ভিক মন্তব্যসমূহ শেষ করে শ্রী এম. এস. গোরে বিদ্যালয়ের গবর্ণর পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী ভাদ্দওয়ারকে, শ্রীদাতারকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করতে বললেন। শ্রীদাতার সুরু করলেন সরস ভঙ্গীতে :

"শ্রীগোরে বললেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেল, সংশোধনাগার ইত্যাদি থেকে খালাস-পাওয়া লোকেদের পুনর্ব্বাসনের বিষয়ে খুবই আগ্রহান্বিত। বস্তুতঃ যখন অপর সকল মন্ত্রণালয় কোনও কিছু গ্রহণ করতে নারাজ হয়, তখন তা এসে হাজির হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং একদিক দিয়ে—আইনসঙ্গত শব্দ ব্যবহার করতে গেলে, একে বলা চলে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধীয় মন্ত্রণালয়।

"এটা আপনাদের বিবেচনা করতেই হবে যে আপনাদের

কাজ হচ্ছে আত্মোৎসর্গের কাজ—এ এমন একটি সর্ব্বতোমুখী কৃত্য বা জাতির উদ্দেশ্যে আপনার শ্রেষ্ঠতম অন্তর-সত্তার, আপনার আত্মার মহত্তম প্রকাশ যে বিধাতা তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। স্ত্রী, পুত্রকন্যা, মাতাপিতা নিয়েই শুধু আপনার পরিবার পর্য্যবসিত হবে না। আপনাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, আপনার পরিবার গঠিত ভারতের ছত্রিশ কোটি নর-নারীকে নিয়ে।"

আগামী পাঁচ বৎসরের জন্যে আমাদের সম্মুখে এমন এক বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মসূচী রয়েছে যার বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভাব্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু এই অসম্ভবকে আপনাদের সম্ভব করে তুলতে হবে। কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্কোচন আপনাদের কাজ নয়, আপনাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রকৃত পথে এদের পরিচালন।

ভারতবর্ষ এক নূতন পরীক্ষণ চালাচ্ছে—গণতন্ত্রের পরীক্ষণ, জনগণকে সৈন্যদলে ভুক্তি (Regimentation) আমাদের কাজ নয়, কেননা জনগণের জীবনে আমরা ততদূর পর্য্যন্তই প্রবেশ করব, তাদের কল্যাণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন। তদুপরি, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমাজ-প্রতিষ্ঠার দায়িত্বভার আমরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছি। কাজেই এটা আমাদের বুঝতে হবে যে, সমাজই হচ্ছে সর্ব্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যষ্টিজীবন আমরা যাপন করতে পারি না। এটাও আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, সমাজের সকল অংশকেই সমস্তরে আনতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী নির্দ্ধন নারায়ণকে ভগবানের তুল্য বলে প্রচার করেছিলেন। এই উক্তিটি কখনও বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না যে, "সাধুসন্তদের অতীত আছে, কিন্তু পাপীদের আছে ভবিষ্যৎ।" আর আপনাদের সম্মুখে রয়েছে এই সকল তথাকথিত পাপীদের পুনর্ব্বাসনের কর্ত্তব্য, যারা হতে পারে আমাদের দেশের ভাবী সাধুসন্ত। এ হচ্ছে একটি মহান্ দায়িত্ব। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, কিন্তু নৈতিক শরণার্থীদের পুনর্ব্বাসন হচ্ছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

সরকারের সম্মুখে যে সমস্যা বিদ্যমান তা কেবলমাত্র স্বাভাবিক নাগরিকদের সমস্যা নয়, কিন্তু যারা হতে পারে আগামীকালের সৎ নাগরিক তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তার রয়েছে—অন্যথায় শেষোক্তরা সমাজের পক্ষে হয়ে উঠতে পারে বিপজ্জনক। এটা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, এখন বিশেষতঃ স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর থেকে সরকার কেবলমাত্র একটি প্রশাসক সংস্থাই নয়। দেশে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো থেকে এটা সুপরিস্ফুট হয়, আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র—যার লক্ষ্য জনগণের কল্যাণসাধন। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এমনিভাবে যে সকল লোকের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন তাদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালনার্থে আমরা নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

এটা লক্ষ্য করে আমরা সুখী হয়েছি যে, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ এমন একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যা ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে আমাদের নিজস্ব। বর্ত্তমানে যে সকল পরিস্থিতি বিদ্যমান সেগুলো পৃথক ধরনের বলে আমাদের কর্ম্মনীতি হওয়া উচিত বাহ্য অবস্থার অনুযায়ী। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদের সমাজে কতকগুলো লোক সামাজিক কলুষের কবলে পড়ে বিপন্ন হয়েছে। তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে। সরকার এই কৃত্যে সহায়তা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। একটা বিশেষ ধরনের সাহায্য তাদের প্রয়োজন এবং সেজন্যে আবশ্যক বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত সমাজ কর্ম্মীবৃন্দ। এ হচ্ছে একটি মহান্ কৃত্য এবং একটি পবিত্র দায়িত্ব। তরুণ-তরুণীগণ, আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আপনারা ব্রতধারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হোন। এ হচ্ছে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের কর্ম্ম। আমি আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলতে পারি, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা অংশ গ্রহণ করেছিলাম তার চেয়েও ভারতের পুনর্গঠন এবং জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের বিরাট কর্ত্তব্য মহত্তর। কেননা, আজকের দিনে ব্যাপকতর সামাজিক সমস্যাসমূহ বিদ্যমান এবং এমন সব সমস্যা রয়েছে যা দেশকে নিয়ে যেতে পারে ভ্রান্ত পথে। এই সমস্তেরই সম্মুখীন হতে হবে বাইরের কোনও সংস্থাকে নয়, কিন্তু আপনাদিগকে সরকারকে এবং জনগণকে।

পুজার পর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত মহাপূজার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার আলোচনা হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বজনীন পুজার কথাও উঠিল। বন্ধু বলিলেন, কলিকাতায় প্রায় ২,০০০ সর্ব্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয়, এবং প্রত্যেক পূজাতে গড়ে এক হাজার টাকা খরচ হয় এই হিসাবে ২০০০ পূজাতে কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ হইবে। সর্ব্বজনীন পূজাতে এইরূপ অনেক ব্যয় হয় যাহাকে অপচয় ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এই অপচয় নিবারণ করিয়া যে পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ব্যয় করিলে মহামায়ার পূজা সার্থক হইবে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন বন্ধু বলিলেন, প্রত্যেক পূজায় গড়ে ১৫০০৲ টাকা ব্যয় হয়—ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। তাঁহাদের উক্তির সমর্থনের জন্য তাঁহারা কয়েকটি পূজার মুদ্রিত হিসাব উদ্ধৃত করিলেন। এই হিসাবে সর্ব্বজনীন পূজা উপলক্ষে মোট ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; এবং পূজার সংখ্যা না কমাইয়া প্রকৃত পূজা করিয়া ১৫ লক্ষ টাকা বাঁচানো যাইতে পারে।

ইহার পর ১৩।১০।৫৬ তারিখের "আনন্দবাজার" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল:

"সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ পত্রের সহিত অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের পূজার আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়া থাকে। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এবার দক্ষিণ কলিকাতার একটি সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রের সহিত গত বৎসরের পূজার যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, উহার আয় ও ব্যয়ের কয়েকটি দফা এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—

আয়ের দিকে দেখা যায়, চাঁদা বাবদ আদায় কিঞ্চিদধিক ৪,৩০০ টাকা, বিজ্ঞাপন বাবদ ৩,০৭৫ টাকা, প্রণামী বাবদ কিঞ্চিদধিক ২৫০ টাকা, জলসা—প্রায় ২,৬০০ টাকা।

এদিকে খরচের দিকে প্রধান প্রধান দফাগুলি এই:

জলসা—প্রায় ৪,৩৫০ টাকা, আলোকসজ্জা—কিঞ্চিদধিক ১,৮২০ টাকা, মণ্ডপসজ্জা—১,৭০০ টাকা, পূজা ও ভোগ—কিঞ্চিদধিক ৬৩০ টাকা, ছাপাই—৬০০ টাকা, বিসর্জন বাবদ ব্যয়—৫৫৬ টাকা, নাটক—প্রায় ৪৭৫ টাকা, প্রতিমা ও সাজসজ্জা—৩৫০ টাকা, মাইক—১৭৫ টাকা, ঢুলী—কিঞ্চিদধিক ৯০ টাকা, লক্ষ্মীপূজা বাবদ ব্যয়—কিঞ্চিদধিক ১১০ টাকা।

লক্ষ্য করিবার বিষয় বিসর্জ্জনের সময় ঢাকী নাকি আনা হইয়াছিল ১০১ জন। ঐ বাবদ ৪ শতের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। উপরের হিসাবে এই ৪ শত টাকা বিসর্জ্জনের ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ব্যয়ের দিকে প্রীতিভোজ অথবা দরিদ্রনারায়ণ সেবা কিংবা পল্লীর বালকবালিকাগণ ও কর্ম্মীদের খাওয়া বা জলযোগ বাবদ ব্যয়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে পূজা-কমিটি দুইটি সদ্ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল কর্জ্জ পরিশোধ—৫০০ টাকা। এটা বোধ হয় পূর্ব্ব বৎসরের দেনা ছিল। সদ্ব্যয়ের আর একটি পরিচয়—বন্যা তহবিল ও দুঃস্থ ছাত্র ও পরিবারের সাহায্য বাবদ ৪৫০ টাকা। বন্যা তহবিল, দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য ও পরিবারসমূহের সাহায্য—এই তিন দফার প্রত্যেক দফায় কত করিয়া ব্যয় হইয়াছে, হিসাবে তাহার উল্লেখ নাই। থাকিলে পূজা কমিটির কর্তাদের দাক্ষিণ্যের হিসাবটা আরও সুস্পষ্ট হইত।

সর্ব্বশেষ কথা: মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১২ হাজার টাকা। যাহা আদায় হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান হয় নাই, প্রায় ১,৭০০ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ইহাদের প্রতি মা দুর্গা বাস্তবিকই প্রসন্না—ভাগের মায়ের ব্যাপারেও প্রায় দুই হাজার টাকা কর্জ্জ পাওয়া গিয়াছে।"

উপরোক্ত হিসাব হইতে অপচয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন হইবে না এবং আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করাও নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সত্য কথা বলিতে হইলে ইহাকে পূজা বলা যায় না, ইহাকে আমোদ-আহ্লাদ এবং "হুল্লোড়" ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, পূজা উপলক্ষ্য মাত্র।

আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের মত লোকের কথা কেই বা শোনে, সরকারী মহলের বা বেসরকারী মহলের কেহই শুনিবেন না, ধৈর্য্যসহকারে তাঁহাদের শুনিবারও সময় নাই। আর যুবকগণের নিকট আমাদের বক্তব্য পেশ করিবার অধিকারও নাই। পরন্তু তাঁহারা চাঁদার জন্য আসিলেই কোন তর্কবিতর্ক না করিয়া কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার নিবৃত্তির জন্য চাঁদা দিতেই

হয়। আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের এই ত অবস্থা। বলা বাহুল্য, আমাদের মত ব্যক্তিগণের সংখ্যা কম নহে। অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার উদাহরণ দিতে পারি।

এক বন্ধু বলিলেন, দেশে নেতৃত্বের অভাববশতঃই সকল দিকে এইরূপ অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। তিনি বলিলেন, আজ যদি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় কিংবা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় নেতা জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা এই বিষয়ে নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করিতেন এবং সম্পূর্ণ না হইলেও বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য হইত না। আজ যদি কলিকাতাবাসী সকল সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বজনীন পূজার সংখ্যা হ্রাস করিয়া এবং অপচয় নিবারণ করিয়া বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সাহায্যের জন্য একটা মোটা টাকা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটা খুব বড় আদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহাদের এই আদর্শ ও কার্য্যের দ্বারা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণ কেবল যে উপকৃত ও উৎফুল্ল হইত তাহা নহে—এইরূপ সমবেদনা ও সহানুভূতি দ্বারা তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অনেকটা লাঘব হইত। কথায় আছে, দুঃখের অংশ গ্রহণ করিলে দুঃখের তীব্রতা প্রশমিত হয়।

একজন বন্ধু বলিলেন, বাস্তবিকই কি দেশে নেতার অভাব আছে? এই প্রশ্নের পর তিনি কয়েকজন সরকারী এবং বেসরকারী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম করিলেন। অপর এক বন্ধু বলিলেন, এই সকল ব্যক্তি নিশ্চয়ই নেতৃস্থানীয়, কিন্তু ইহারা সকলেই যে আগামী "ইলেকশনের" প্রার্থী এবং ইহাদের ভোটের প্রয়োজন—আর ভোট সংগ্রহ করিতে হইলে যুবক সম্প্রদায়ের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে সুতরাং যুবক সম্প্রদায়ের মনোমত কার্য্যাবলী ইহাদিগকে সমর্থন করিতেই হইবে, এমনকি সর্ব্বজনীন পূজার তহবিলে মোটা চাঁদা দিতেও হইবে। মোট কথা, যুবক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রাখিতেই হইবে। অনেকেই এই উক্তির সমর্থন করিলেন, এবং দু'এক জন এই উক্তির সমর্থনে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে এমন সব কথা বলিলেন যাহা লিপিবদ্ধ করিলে হয়ত মানহানির অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। সুতরাং সেই সব কথা আর লিখিলাম না। যাহা হউক, ইহা হইতেই দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, এই বৎসর সর্ব্বজনীন পূজা উপলক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইবে, "হৈ হুল্লোড়" কম হইবে, "লাউড স্পীকারের" ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইত্যাদি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইয়াছে কি? নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, অন্ততঃ "লাউড স্পীকারের" ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় নাই; কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মুখেও শুনিয়াছি যে, তাঁহাদেরও একই রকমের অভিজ্ঞতা।

যতদূর স্মরণ হইতেছে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম কলিকাতায় এবং হাওড়ায় ৪,০০০ পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জানি না, এই ৪,০০০ পূজায় মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং মোট কত টাকা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

পল্লী-অঞ্চলেও সর্ব্বজনীন পূজার ঢেউ প্রবেশ করিয়াছে; তবে কলিকাতার মত "হৈ হুল্লোড়" সেখানে হয় নাই, ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্য নাই। পল্লী-অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের অভিভাবকগণের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের সন্তানগণ পূজার ছুটিতে গ্রামে যান নাই—কলিকাতার পূজার আনন্দ তাঁহাদিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আবার কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি তাঁহাদের সন্তানগণ পূজার ছুটিতে পশ্চিমে গিয়াছিলেন।

যাহা হউক যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়—কি শহর, কি পল্লীগ্রাম—কোন স্থানের পূজাতেই "কাঙালিনী মেয়ের" দিকে কেহই তেমন দৃষ্টি দেন নাই। দিবার হয় ত অবকাশও ছিল না।

পনের বৎসর পূর্ব্বে "Durga Pujah and National Reconstruction" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম:

"A true and faithful worship of the goddess demands of a devotee, not earnest prayer only, but earnest action also, the earnest response to idealism, the earnest pursuit to follow the star, the gleam, and an earnest and arduous devotion to the cause. There can be no greater cause for every thinking man and woman in this country, as long as the appalling backwardness of our country remains, than the uplift of the masses, spiritual, economic and otherwise. And, to this sacred work, on the occasion of this most sacred Durga Pujah let every worshipper of the goddess consecrate himself."

এখন মনে হইতেছে অরণ্যে রোদন করিয়াছিলাম; অবস্থার উন্নতি ত হয় নাই, বরং অবনতি হইয়াছে। এই প্রবন্ধও অরণ্যে রোদন করা ছাড়া কি আর কিছু?

মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীহেনা হালদার

স্বর্ণচম্পার স্বর্ণসম্ভারে
দগ্ধ চৈত্রের সন্ধ্যাকাশ—
রক্ত কিংশুক জ্বালানো যৌবন
নয়নে নেই মৃদু তন্দ্রাভাস।
রাত্রি বুঝি আজ যাত্রী হ'ল কোন্
নিদ্রাহারা দেশে অকস্মাৎ—
দুষ্টু চাঁদ তাই বহ্নি জ্বালিয়েছে
প্রেম-কটাক্ষের পক্ষপাত।
দু' চোখে ঘুম নেই, কোথাও তুমি নেই
আমার আশা সে-ও অসম্ভব—
আলোর তৃষ্ণাতে কৃষ্ণা রজনীর
কৃচ্ছ্রসাধনই যে অবাস্তব!
ক্ষুব্ধ এষণার লুব্ধ প্রেষণায়
দেখায় মরীচিকা ভ্রান্ত প্রাণ—
জীর্ণ সেতারের দীর্ণ এ তারেতে
জাগে কি জীবনের ক্লান্ত গান?
স্বপ্ন-মায়াময় কল্পকামনায়
নেইক' একতিল তৃপ্তি নেই—
অশেষ শংকার মিলিত ঝংকারে
কোথাও রাগিণীর দীপ্তি নেই!
হাওয়া হাতে হাতে, কঠিন কশাঘাতে
আভাসে কানে আসে আর্ত্তি কার?
আমার হৃদয়ের আকুল কান্না যে
বুঝেও বোঝ না সে প্রার্থী কার?
যা' কিছু চাওয়া যায়: সবই কি পাওয়া যায়?
তবু এ একগুঁয়ে অবুঝ মন—
সাহারা মরুদেশে, বৃথাই খুঁজেছে সে
বর্ষাজলে ভেজা সবুজ-বন।
সিক্ত উপাধানে কোথায় সান্ত্বনা?
বরং বেড়ে যায় তিক্ততাই
আর্ত্ত হাহাকারে ব্যর্থ বেদনাতে
ফোটে যে হৃদয়ের রিক্ততাই।
স্বর্ণচম্পার স্বর্ণসম্ভার
দগ্ধ করে দিলে রাত্রিদিন—
রক্ত কিংশুক জ্বালানো যৌবন
মত্ত অনুখন শান্তিহীন।

শেষের কবিতা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মৃত্যু-হতাশ নয়নের ফাঁকে সজল অশ্রু দোলে
মায়ার ভুবন ছিন্ন করিয়া যেতে হবে বহু দূর।
চারি দিকে যেন শোনা যায় অতি করুণ-কোমল সুর,
শত দিবসের স্মৃতি-গুঞ্জন আকুল করিয়া তোলে।
জীবনে জ্বালাতে হয়েছে অনেক স্নেহের প্রদীপশিখা—
চিকণ অধরে বাসনার রাঙা চিহ্ন রেখায় এ কে'
রূপ গরবিণী হাতছানি দিয়ে যৌবনে গেছে ডেকে;
লীলা-চাপল্য দেখায়ে তুমিও কাছে এলে সাহসিকা!
আশা-নিরাশার আলোক ছায়ায় বরষ-পরিক্রমা,
কামনার ধূপ পুড়ে ছাই হোলো—জানো কি সুরজয়া?

রোগে শোকে শত অভাবের মাঝে রহিনু সবার নীচে,
এ জীবনে ঋণ হ'ল নাক' শোধ, সহিতে হয়েছে শ্লেষ;
বসন ভূষণ অশনের তরে পেতে হ'ল বহু ক্লেশ,
কর্ম্মকঠোর প্রতি দিবসের শ্রমজলে ভিজে ভিজে।

সুখের লাগিয়া ভ্রমিনু বিফলে—সঙ্কোচ-সংশয়
পদে পদে মোরে করে প্রতিহত। পলকে পলকে বাধা,
প্রাণ খুলে আর হ'ল না কখন প্রণয়ের সুর সাধা,
দারিদ্র্য যেথা পেতেছে আসন, সেথা সবি বিষময়!
অন্তিমকালে অন্তর কেন অনুশোচনায় জ্বলে,
কুসুমপেলব কর-পল্লব রাখ মোর করতলে।

আয়ু-সবিতার নামে শেষ রেখা শ্রান্ত পথের মাঝে,
চেনা অচেনায় মোহনায় যেন আত্মার অভিসার!
কে যেন আমারে দেখায় অদূরে শান্তির পারাবার!
নিরাশার তীরে এলো কি সন্ধ্যা? কোথায় শঙ্খ বাজে!
প্রাণের খেলায় শেষ কড়িটুকু দিয়ে গেনু তব করে,
শেষের কবিতা ভুলিবে কি তুমি, যদি মোরে মনে পড়ে?

দেশ-বিদেশের কথা

জয়কৃষ্ণ জন্মোৎসব

গত ২৪শে কার্ত্তিক সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ৪৬ ২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে রাজারাও শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সভাপতিত্বে সঙ্গীতশিল্পী শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের কথা বলেন। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার ভাষণে বলেন, শিল্পী জয়কৃষ্ণ জীবনে অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জ্জন করুন এই কামনা করি। শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল শুধু ধ্রুপদ ও ধামারে নয়, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন, রাগপ্রধান এবং ছায়াসঙ্গীতেও সমান কৃতী। তিনি যখন যে বিষয়ে গান করেন, সেই বিষয়েই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শুধু সঙ্গীত-শিল্পীই নন, সঙ্গীতের প্রচার এবং প্রসারেও তাঁর চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীতে, নৃত্যে, মৃদঙ্গ, তবলা ও হারমোনিয়ম (সোলো) বাদনে অংশ গ্রহণ করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

বরদাকান্ত বসু

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য্য বরদাকান্ত বসু গত ২১শে অক্টোবর কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি ইহার উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষকতাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ময়মনসিংহ সিটি স্কুল, ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়, সিটি স্কুল, কলিকাতা প্রভৃতি বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি ছাত্র এবং সহকর্ম্মী সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হন।

ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে প্রতি বরদাকান্তের গভীর বিশ্বাস ছিল। মানুষের সেবাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বহু অনাত্মীয়কে তিনি প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার মত ভগবদ্ভক্ত, নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর, নিরাসক্ত এবং অজাতশত্রু লোক বর্ত্তমান সমাজে বিরল।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

আলোচনা

"সর্পদংশন চিকিৎসা"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়

গত বৎসরও পশ্চিমবঙ্গে ১,৪০০ শত লোক সর্পদংশনে মারা গিয়াছে। দূর গ্রামের লোক ডাক্তার বা "antivenom"-এর সাহায্য পায় না। তাহাদের উপকার হইতে পারে এই ভাবিয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষিত উপায়গুলি লিখিলাম।

শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের 'সর্পদংশন চিকিৎসা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৬৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি অনেক তথ্যপূর্ণ এবং ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই প্রবন্ধটি সকলেরই মনোযোগের সহিত পড়া উচিত। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি কোন কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

ঘোষ মহাশয়ের উল্লিখিত চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমার বক্তব্য নিম্নে লিখিত হইল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সর্পদংশন চিকিৎসা নামধের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখি এবং সে সময়ের Whiteaway Press-এ ছাপাই। তাহার পর উহার আর দুই বার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছিল। এখন ঐ পুস্তিকা দুষ্প্রাপ্য। উহাতে চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বর্ণনা আছে। ঐ চিকিৎসা-প্রণালী এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিতেছি :

বিষাক্ত সাপ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী ফণী বা চক্রধর এবং অপর শ্রেণী ফণাহীন বা চক্রহীন। চক্রধর সাপ মাথা তুলিয়া ফণা বিস্তৃত করিয়া দংশন করে। তাহার দংশনে দুইটি ঘামুখ(puncture) হয়।

চক্রহীন সাপের ফণা নাই—অর্থাৎ তাহারা মাথা বিস্তৃত করিতে পারে না এবং তাহারা মাথা তুলিয়া ছোবল মারে না, তাহারা চু-মারার ন্যায় কামড়ায়। চক্রহীন সাপে কামড়াইলে অনেকগুলি দাগ হয় অর্থাৎ ঘামুখ দুইটির অপেক্ষা অনেক বেশী হয় এবং তাহারা গোলাকারে থাকে। চক্রধর সাপে কামড়াইলে সাধারণতঃ দুইটি দাগ হয় এবং দাগ দুইটি সমরেখাক্রমে অবস্থিত হয়।

চক্রধর সাপে কামড়াইলে তাহার

আসছে! এই ডবল ঢাকনা
দেওয়া নতুন টিন
ডালডাকে সম্পূর্ণ খাঁটী
ও তাজা রাখে
বাইরের ঢাকনা
ভেতরের শীলকরা ঢাকনা
● বিশুদ্ধ ও তাজা ডালডা কেনবার সময় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা অবস্থায় পাচ্ছেন—কারণ টিনে বায়ুরোধক শীলকরা ঢাকনা ডালডাকে সুরক্ষিত রাখে।
● বিশুদ্ধ ও তাজা ব্যবহারের সময়ও ডালডা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও তাজা থাকে কারণ ভালভাবে এঁটে বসা বাইরের ঢাকনাটা ডালডাকে সর্বদাই ধুলোবালি ও মাছি ইত্যাদির থেকে বাঁচিয়ে রাখে।
● খুলতেও কি সুবিধে খুলতে আর ব্যবহার করতে কি সুবিধে!
● পুরোনো খালি টিন কত কাজে লাগে—ডাল চিনি মশলাপাতি রাখতে টিনগুলো সত্যিই খুব কাজে লাগে।
ডালডা আমার পক্ষে ভালো!
ডালডা ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ*, ৫ পাঃ* এবং ১০ পাউণ্ড* টিনে পাওয়া যায়
* এই টিনগুলিতে ডবল ঢাকনা আছে
ডালডা মার্কা বনস্পতি
HVM. 262-X52 BG
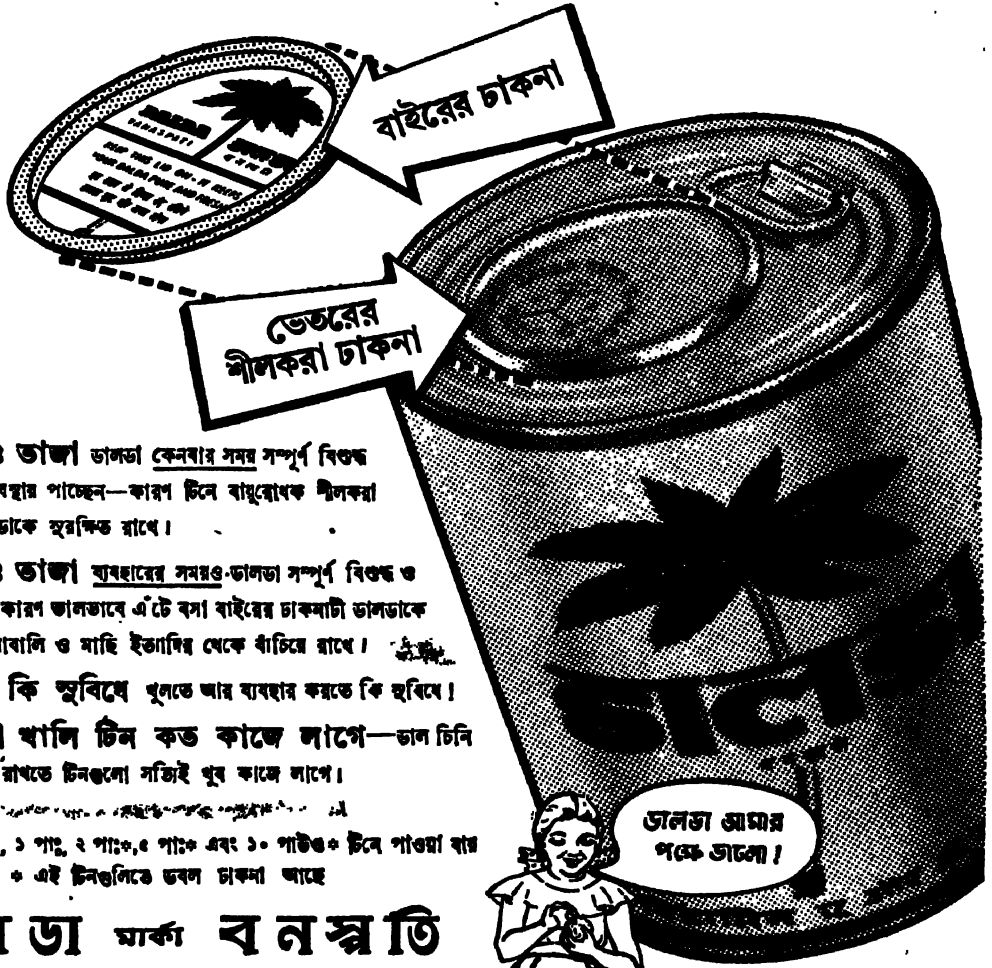
চিকিৎসা "বাঁধা এবং কাটা।" চক্রহীন সাপে কামড়াইলে তাহার চিকিৎসা "বাঁধা ও কাটা" নহে। "বাঁধা ও কাটা"র কোন ফললাভের আশা নাই। তাহার চিকিৎসা বিশিষ্টপ্রথায় উত্তাপ দেওয়া (application of radiated heat).

চক্রধর সর্পদংশন-চিকিৎসা

প্রথমেই বলা হইয়াছে, এই সকল সাপে কামড়াইলে দুইটি দাগ হয়। যদি দেখা যায় দুইটি দাগ হইয়াছে তখন প্রশ্ন উঠিবে ঐ দুইটি দাগ চক্রধর সাপের দংশনজনিত কিনা। যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, দাগ দুইটি চক্রধর সর্পদংশনজনিত তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিবে দষ্ট ব্যক্তির রক্ত সর্পবিষে বিষাক্ত হইয়াছে কিনা। প্রথম প্রশ্নটি সমাধান করিতে হইলে দেখিতে হইবে—দাগ দুইটি ভাসাভাসা (superficial) কিংবা গভীর (deep)। যদি ভাসাভাসা হয় তবে চক্রধর সাপে কামড়ায় নাই। আরও দেখিতে হইবে দুইটি দাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব (intervening space)। যদি ঐ দূরত্ব আধ ইঞ্চির কম বা এক ইঞ্চির বেশী হয় তাহা হইলে চক্রধর সাপে কামড়ায় নাই। যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, চক্রধর সাপে কামড়াইয়াছে তখন দেখিতে হইবে রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে কিনা। এই প্রশ্নের সমাধানে দেখিতে হইবে যে, ঐ ঘামুখ দুইটি হইতে নীলাভ বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে কিনা। যদি উঠিতে দেখা যায় তাহা হইলে চক্রধরে কামড়াইয়াছে। আর যদি বুদ্‌বুদ উঠিতে দেখা না যায় তখন ঐ ঘামুখের কিছু উপর হইতে ছুরি দিয়া চিরিলে যে রক্ত বাহির হইবে তাহাতে যদি নুন (common salt) লাগান যায় তাহা হইলে রক্তের রঙ হয় পরিবর্তিত হইয়া মেটে সিন্দুরের রঙ হইবে অথবা যেরূপ রঙ পূর্ব্বে ছিল সেইরূপই থাকিবে। যদি রঙ পরিবর্তিত হয় তবে রক্ত বিষাক্ত হয় নাই এবং কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। আর যদি রঙ অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে এবং চিকিৎসা করিতে হইবে।

চিকিৎসা : ঘোষ মহাশয় যেরূপ বাঁধন দিবার কথা লিখিয়াছেন সেইরূপ দুই বা ততোধিক বাঁধন দিতে হইবে।

চক্রধর সাপে কামড়াইলে ঘামুখে কিছুক্ষণ বিষ আবদ্ধ থাকে। যতক্ষণ বিষ ঘামুখে থাকে ততক্ষণ ঐ ঘামুখ হইতে নীলাভ বুদ্‌বুদ উঠিতে থাকে। যদি দেখেন এরূপ বুদ্‌বুদ উঠিতেছে তবে

দেখুন!
অর্দ্ধেকটা
সানলাইট
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে!
সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
ভারতে প্রস্তুত

তৎক্ষণাৎ ঐ ঘায়ের কিছু উপর হইতে সুরু করিয়া ঘায়ের উপর দিয়া তাহার নীচে পর্যন্ত খুব গভীর করিয়া চিরিয়া দিলে বিষ দ্রবিত বেগে দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া যাইবে। দুই ঘায়েই ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার পর রোগীর আর কোন বিপদ থাকিবে না এবং আর কাটিবারও দরকার হইবে না। আর যদি দেখেন রক্ত বিষাক্ত হইয়াছে তাহা হইলে নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘায়ে কিছুক্ষণ বিষ আবদ্ধ থাকিবার সময় ঐ স্থলে বিষ একটি ডেলা (clot) প্রস্তুত করে। আর ঐ ডেলা দুই ঘায়েই একটি করিয়া হয়। ঐ ডেলা ঘায়ের নিকটবর্তী শিরা (vein) দিয়া জোঁকের ন্যায় গতিতে উপরে উঠিতে থাকে। ঐ ডেলা উঠিতে দেখা যাইবে। যেখানে ঐ ডেলা জোঁকের ন্যায় গতিতে উঠিতেছে অর্থাৎ ডেলাটি উঠিতেছে এবং একটু নীচে নামিতেছে দেখিবেন তৎক্ষণাৎ ঐ ডেলার কিছু উপর হইতে উহার মধ্য দিয়া কিছু নীচে অবধি গভীর করিয়া চিরিয়া দিবেন। দুইটি ডেলাই ঐরূপে চিরিতে হইবে। চিরিলে ক্ষিপ্রগতিতে ডেলা দুইটি বাহির হইয়া পড়িয়া যাইবে এবং রোগী বিষমুক্ত হইবে আর চিরিবার বা কাটিবার দরকার হইবে না। যেখানে সেখানে কাটিলে কোন উপকার হইবে না, কেবল অনর্থক রক্ত মোক্ষণ করিয়া রোগীকে দুর্বল করা হইবে ও তাহাকে অযথা কষ্ট দেওয়া হইবে।

চক্রহীন সর্পদংশন চিকিৎসা

চক্রহীন সাপ নানা প্রকারের আছে, যথা—বোড়া, কালচ, কালাচ, রক্ত কালচ, সর্পরাজ (বা দোমুখো সাপ)। ভিন্ন ভিন্ন সাপের বিষের লক্ষণ বিভিন্ন প্রকার—যেমন বোড়ায় কামড়াইলে যতদূর বিষ উঠিবে তত দূর দেহ ফুলিবে। কালচ সাপে কামড়াইলে শিবনেত্র হইবে। কালাচ সাপে কামড়াইলে যতদূর বিষ উঠিবে ততদূর এত স্পর্শকাতর হইবে যে, একটি মাছি বসিলেও যন্ত্রণা হইতে হইবে। রক্ত কালচে কামড়াইলে যত দূর বিষ উঠিবে তত দূর লোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইবে। সর্পরাজে কামড়াইলে কিছুক্ষণ বাদে রক্তবমন হইবে। যে-কোন প্রকারের চক্রহীন সাপে কাটুক না কেন তাহার চিকিৎসা একই প্রকার।

চিকিৎসা—যদি কামড়াইবার অল্পক্ষণ পরেই উপস্থিত হইতে পারেন অর্থাৎ যদি বিষ বেশীদূর না উঠিয়া থাকে তবে ঐ স্থান কচি কলাপাতা দিয়া ঢাকিয়া সরাতে গুলের আগুন করিয়া ঐ স্থানে কলাপাতার উপরে তাপ দিতে থাকিবেন। যখন তাপ দিতে দিতে প্রচুর ঘাম বাহির হইয়া যাইবে তখন আর বিপদ থাকিবে না।

যখন চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হইবেন তখন যদি বিষ অনেক দূর উঠিয়া দেহে ছড়াইয়া গিয়া থাকে ত নিয়রূপ করিতে হইবে।

রোগীকে শোয়াইয়া তাহার সমস্ত দেহে শুষ্ক ইন্দুরমাটি অর্থাৎ খুব (pulverised) শুষ্ক মাটি দিয়া মালিশ করিয়া তাহার লোমকূপ সকল বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত দেহ কম্বল বা লেপ দিয়া ঢাকিয়া দিবেন। কেবল কপাল খোলা থাকিবে। তাহার পর নূতন হাঁড়ি আগুনে খুব গরম করিয়া বেড়ী দিয়া রোগীর কপালের কিছু দূরে ধরিয়া ক্রমাগত তাপ দিতে থাকিবে। এই তাপ দিবার সময় রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা হইবে ও পালাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাপ দিতে থাকিবেন এবং দেখিবেন যে, তাহার সমস্ত শরীর হইতে প্রচুর ঘাম বাহির হইতেছে। ঐ ঘাম ঢাকা না খুলিয়া ক্রমাগত মুছাইয়া দিবেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ তাপ দিলে ও প্রচুর পরিমাণ ঘাম নির্গত হইলে রোগীর বিষ বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগী যদি চিকিৎসার পূর্ব্বে অজ্ঞান হইয়া থাকে তাহার জ্ঞান হইবে, তাহার খোনা সুর স্বাভাবিক হইবে, চক্ষের দৃষ্টি স্বাভাবিক হইবে এবং সমস্ত বিপদ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

সংক্ষেপে চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত হইল।

এস্থলে আর একটি চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে বলিবার আছে—এই প্রণালী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানির "হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা" নামক পুস্তকের (পঞ্চদশ সংস্করণ) ৮০৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"সাপে কামড়াইলে মুরগীর ছানার মলদ্বার বা তন্নিকটস্থ স্থান একটু চিরিয়া ঐ চেরা অংশটি দষ্ট স্থানে লাগাইলে রোগীর শরীরস্থ বিষ ক্রমে ছানার মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে একটির পর একটি কুক্কুট-শাবক বা মুরগীর ছানা বিষদুষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ নিঃশেষ হইয়া না যায় ততক্ষণ ক্রমাগত মুরগীর ছানা লাগাইতে হইবে। বিষ নিঃশেষিত হইলে শেষের ছানাটি জীবিত থাকিবে।"

এই চিকিৎসা-প্রণালী ভ্রমাত্মক। ইহা দ্বারা সর্পদষ্ট রোগী বিষমুক্ত হইবে না এবং যদি তাহার রক্ত বিষদুষ্ট হইয়া থাকে, তবে এইরূপে চিকিৎসা করিলে সে রোগী মরিবে। ঐরূপ মুরগীর ছানা ক্ষতমুখে বসাইলে ছানাটি মরিবে নিশ্চয়ই, কেননা মানুষের রক্ত ও মুরগীর রক্ত ভিন্ন প্রকৃতির। ভিন্ন প্রকৃতির রক্তের সহিত মিলিত হইলে মুরগীর ছানা মরিয়া যায়। শেষের মুরগীর ছানাটি মরিবে না, তাহার কারণ দষ্ট স্থান হইতে রক্ত বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া যায়—এ কারণ ভিন্ন প্রকৃতির রক্তের সহিত সংমিশ্রণ হইতে পারে না ছানাও মরে না।

দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী সম্বন্ধে মহেশ ভট্টাচার্য্য কোম্পানির ম্যানেজারকে আমি একাধিক-

স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
– এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

রায় পত্র লিখিয়া জানাই যে, প্রণালীটি ভ্রমাত্মক এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যেন নূতন সংস্করণে উহার উল্লেখ না করা হয়। এ সম্বন্ধে আমার চিঠির জবাব দেন।

—

"আচার্য্য যোগেশচন্দ্র"

শ্রীমঞ্জুলা সানা

'প্রবাসী'র গত ভাদ্র সংখ্যায় আচার্য্য যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীসুখময় সরকারের একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, যোগেশচন্দ্র প্রায় ছত্রিশ বৎসর কটক র‍্যাভেন্‌শ' কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। সুখময়বাবু আরও লিখিয়াছেন—"কেমন করিয়া খণ্ডপড়া রাজ্যে তিনি (যোগেশচন্দ্র) 'পঠানী সান্ত'কে (চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত) আবিষ্কার করিলেন, সে কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।"—উড়িষ্যায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা শুনিয়াছি। ওড়িয়া সাহিত্যের দিকপাল স্বর্গীয় ফকিরমোহন সেনাপতি ত্রিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে যোগেশচন্দ্রকে এই বলিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াছেন:

বনর মালতী পরি পঠানি সামন্তে
সোঢ়ুখিলে যোগেশ তা চিহ্নিলে কেমন্তে।
চিহ্নিণ চিহ্নাই দেলে জগৎ মধ্যর
জুহার যোগেশ ভাই জুহার জুহার॥

অর্থাৎ, পণ্ডিতপ্রবর পঠানী সামন্ত বন-মালতী কুসুমসম প্রস্ফুটিত ছিলেন, হে যোগেশ. তুমি তাহাকে চিনিলে কেমন করিয়া? নিজে তাহার রস আস্বাদন করিলে এবং জগৎকে সেই বিমল পাণ্ডিত্যরসসুধা পান করাইলে, হে ভাই যোগেশ, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

উড়িষ্যায় যোগেশচন্দ্রের কর্ম্মকীর্ত্তির কথা আলোচিত না হইলে, বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁহার পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিবে।

সপ্তপর্ণ—কিরণশঙ্কর রায়। প্রকাশক—কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ৬-১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩্ টাকা।

রাজনীতিজ্ঞ কিরণশঙ্কর রায়কে অনেকে জানেন, সাহিত্যিক কিরণশঙ্কর এ যুগের পাঠকের কাছে একরকম অপরিচিত বলিলেই চলে। সবুজপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত এবং একমাত্র গল্পসংগ্রহের বই সপ্তপর্ণে সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি। নিদর্শন স্বল্পপরিমাণ হইলেও ইহারই মধ্যে লেখকের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সাহিত্যিক কিরণশঙ্কর অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সপ্তপর্ণের সাতটি গল্পে তাঁহার রচনা-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার মাধুর্যে, প্রকাশ-সংযমে, প্রচ্ছন্ন ও নির্দোষ ব্যঙ্গরসসৃষ্টিতে কয়েকটি গল্প বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে। পরিবেশ ও চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের নৈপুণ্য ত রহিয়াছেই, গল্প-পরিবেশন-ভঙ্গিটিও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। রাজনীতিবিদ্ কিরণশঙ্করের ব্যক্তি-মানসের আর একটি পরিচ্ছন্ন দিকের প্রকাশ তাঁহার গল্প-সংগ্রহের একমাত্র বই সপ্তপর্ণ। ইহার সাহিত্যিক মূল্য স্বীকৃতিলাভ করিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পদ্ধতি—ডেভিড কাশম্যান কয়েল। অনুবাদক—শ্রীগৌতম গুপ্ত। পরিচয় পাবলিশার্স, ১৭৫-এ, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। মূল্য ২্, পৃষ্ঠা ১৮২।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলম্বস (১৪৪৬-১৫০৬) আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। স্পেনীয়গণ উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো দেশে আজতেক ও দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে ইঙ্ক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আজ আর এই সকল সভ্যতা বা জাতির চিহ্নমাত্র নাই বলিলেই চলে। ইহা ছাড়াও অন্য বহু জাতি এই বিরাট ভূখণ্ডে বাস করিত যাহাদিগকে সাধারণ ভাবে রেড ইণ্ডিয়ান বলা হয়। কলম্বসের এই ধারণাই ছিল যে, তিনি ইণ্ডিয়া বা ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তিন শত বৎসরের এই নূতন দেশে উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন জাতি বিশেষভাবে ইংরেজ ও জার্মান প্রোটেষ্টাণ্টগণ নানা কারণে পিতৃপিতামহের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। প্রথমে ইংলণ্ডের উপনিবেশরূপে ইহার পত্তন হইলেও, "স্বাধীনতা-যুদ্ধের" পর (১৭৭৬) স্বতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্র। ইহার উন্নতি অল্পদিনে হইলেও এই প্রগতির ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। ১৬০৭ হইতে ১৭৭৬ পর্যন্ত যাহা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ আজ তাহা ৪৮টি রাষ্ট্রের সমবায়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক গঠন কতকটা ইংলণ্ডের ছাঁচে হইলেও মূলতঃ ইহার প্রভেদ সুস্পষ্ট। একদা ইংলণ্ডের শাসন 'পার্লামেন্টারি' আর যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল'। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টের নিকট দায়ী আর যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ কংগ্রেসের নিকট দায়ী নহেন। তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত এবং তাঁহার নিকট দায়ী। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রের প্রধান জন্মগত অধিকার রাজা বা রাণী, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পার্লামেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী তথা কেবিনেটের হাতে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং জনসাধারণের নিকটই দায়ী এবং তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। কংগ্রেস প্রতিনিধিসভা এবং সেনেট তাঁহার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিচার ও অপসারণের ব্যবস্থা অবশ্য আছে।

বর্তমান পুস্তকখানিতে ১৩টি অধ্যায়ে দলীয় রাজনীতি, দলীয় সংগঠন ও ও কার্যধারা, শাসনব্যবস্থা, কংগ্রেস, কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, রাজ্য (States), স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, সরকার ও ব্যবসায়ী, ব্যক্তির অধিকার, আমেরিকার কৃষিজীবীতে সরকার, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং রাজনীতি ও গণতন্ত্র এই বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

একজন আমেরিকান কর্তৃক লিখিত হইলেও পুস্তকখানিতে আলোচ্য বিষয়গুলি খুব নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হইয়াছে। নিজ দেশের ও জাতির দুর্বলতা সম্বন্ধে লেখক অন্ধ নহেন। আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমনকি আদালতও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলমান। ইহাকে মার্কিন জাতির বিশেষত্বও বলা যাইতে পারে। নিগ্রোর প্রতি ব্যবহার মার্কিন জাতির অনুদারতার একটি নমুনা বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিগ্রোকে যে শ্বেতজাতি দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়াছিল, সেই শ্বেতজাতিই তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়াছে এবং তাহাকে সমমর্যাদা দিবার জন্য সে দেশের প্রগতিবাদিগণ চেষ্টা করিতেছেন। যে-কোন জাতির পক্ষে সংস্কার ত্যাগ বা পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। মার্কিন জাতির পক্ষেও ইহা সত্য।

ভারতের সংবিধান রচনায় যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে। আমাদের সরকারের দায়িত্ব পার্লামেন্টারি হইলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের। অবশ্য ভারতের গঠনতন্ত্র পুরাপুরি কাহারও অনুকরণ নহে। প্রত্যেক সংবিধানেই কিছু না কিছু ত্রুটি দেখা যায়। জাতির প্রতিভা এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি এড়াইয়া চলে। একথা সত্য মার্কিন দেশে রাজনীতির নামে বহু দুর্নীতি চলিতেছে। আমাদের দেশেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই সকলের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেছে। মার্কিনের ইতিহাস হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। যুক্তরাষ্ট্র নূতন দেশ হইলেও গণতন্ত্রের পরীক্ষা এখানে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক একথা স্বীকার করিলেও তাহার নিকট হইতে অনেক কিছু ভারতের শিখিবার আছে যদিও কংগ্রেসের আদর্শ ভারতে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশসংগঠন।

এরূপ সুন্দর অনুবাদ-গ্রন্থ দ্বারা বাংলা রাজনৈতিক সাহিত্য পরিপুষ্ট হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত—শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ। প্রকাশক—শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন, শ্রীরাম-আশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী। মূল্য ৪্।

সৃষ্টির পূর্বে এক ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহার যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। সৃষ্টির সময় মহাকাশে যে প্রথম স্পন্দন হইয়াছিল তাহাই প্রণব (ওঁকার) বা নাদ। ইহার অপর নাম শব্দব্রহ্ম। নাদই ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তি। ইহা হইতে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে "নাদ এব মহদ্ব্রহ্ম"। নাদ বা ওঁকার ব্রহ্মের একটি নাম।

উপনিষদ বলিয়াছেন,

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ
কঠোপনিষদ্ ১৷২৷১৫

"সমগ্র বেদে যাঁহাকে পাইবার উপায় বলা হইয়াছে, সমগ্র তপস্যা যাঁহার উদ্দেশ্যে করা হয়, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করা হয়, তোমাকে সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি—ইহা হইতেছে ওম্"। ওঁকারের তিন ভাগ—অ-উ-ম। বিশ্বে সর্বদা ওঁকার-ধ্বনি হইতেছে, সাধনা করিলে সেই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সাধনায় শ্রেষ্ঠ মন্ত্র "সোহং" বা "হংসঃ"। মূলবর্ণ "হংস"। তাহা হইতে অকার হইতে ক্ষকার পর্যন্ত সকল বর্ণ উৎপন্ন হয়। "হংস" মন্ত্র জপ করিতে হইলে "স"কারের সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়, "হং"কারের সহিত নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। এই মন্ত্র জপ করিয়া সমাধি লাভ করা যায়। সমাধি হইলে "আমি আমি" এ ভাবও থাকে না। বিষয়-আসক্তি ত্যাগ করিয়া, অল্প আহার অভ্যাস করিয়া নির্জনে অবস্থানপূর্বক সাধনা করিতে হয়। গুরুর উপদেশ লইয়া সাধনা না করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। যখন বর্ণশিক্ষাতেও গুরুর প্রয়োজন, তখন যোগাভ্যাসে যে গুরু প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ কি? অর্ধরাত্রিকালে হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া নির্জন স্থানে বসিয়া থাকিলে প্রথমে বিবিধ ধ্বনি শোনা যায়, পরে প্রণবধ্বনি শোনা যায়। প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান,—ইহারা যোগের অঙ্গ। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করাকে প্রত্যাহার বলা হয়। শুভ আশ্রয়ে চিত্তস্থাপনের নাম ধারণা। অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের প্রবাহকে ধ্যান বলে। পুস্তকখানিতে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উপরন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি কি, তাহাকে কিভাবে জাগ্রত করিতে হয়, জাগ্রত হইলে তাহার গতি কিরূপ,—এই সকল কথাও আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানিতে উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা এবং যোগ সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ হইতে বহু বাক্য এবং অনেক সাধু মহাত্মা ও সাধকের বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ ডি-লিট মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা যোগমার্গে সাধনা সম্বন্ধে তত্ত্বকথা জানিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিঠে কড়া—মৈনাক। দাশগুপ্ত প্রকাশন ৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ২৸০।

এই গল্পগ্রন্থে বারোটি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে। গল্পগুলি মিঠা এবং কড়া দু'রকমেরই। সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং পরিহাসের ছলে লেখক বর্তমান কালের সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতির পানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টা কতকটা সফল হইয়াছে।

সোয়েদান—শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনগুপ্ত। প্রকাশিকা—শ্রীমতী পূর্ণিমা সেনগুপ্তা। ৯২, বেলতলা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ২॥০ টাকা।

নূতন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। "সোয়েদান" লেখকের কল্পনা-সৃষ্ট ছোট একটি দ্বীপ। পৃথিবীর মানচিত্রের কোথাও ইহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু লোক-চক্ষুর অন্তরালে এমনি একটি দ্বীপের অবস্থিতি নিতান্ত অসম্ভব নয়। এই দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসের নায়ক সাংবাদিক চন্দ্রকমল এমন এক স্বপ্ন-রাজ্য গড়ার কল্পনা করে—সে রাজ্যে চোরা কারবারী থাকিবে না, পেশাদার রাজনৈতিকের ষড়যন্ত্র থাকিবে না। উপন্যাসের সূচনা কিন্তু কলিকাতা শহরে এবং সমাপ্তি "সোয়েদানের" উদ্দেশে যাত্রা করায়। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রকমলের জীবনে দেখা দিল রত্নমণি, নরেন ডাক্তার, মলি, প্রতিমা এবং আরও অনেকে। চন্দ্রকমল মলিকে ভালবাসিল কিন্তু পাইল না—নরেন ডাক্তারের বিষমিশ্রিত পান চন্দ্রকমলের পরিবর্তে হত্যা করিল মলিকে। প্রতিমা মনেপ্রাণে কামনা করিল চন্দ্রকমলকে, কিন্তু ঘটনা-বিপর্যয়ে তাহাকে উন্মাদ হইতে হইল। উপন্যাসে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে একসঙ্গে পাশাপাশি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে অসঙ্গতি আছে, আবার মাঝে মাঝে সহজ ভাষার গুণে চরিত্র জীবন্ত হইয়াও উঠিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

যুঁই—শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্তী। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জয়নগর মজিলপুর, ২৪-পরগণা। দাম দু টাকা।

উপন্যাস। প্রধান চরিত্র যুঁই। তারই নামানুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ করা হয়েছে। পটভূমি মাতলা নদীতীরস্থ হাটসর্বস্ব গাহুলী গ্রাম। লেখক প্রধান চরিত্র ও তার পটভূমির বিকাশ পাশাপাশি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হন নি। গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে বার বার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, স্থানে স্থানে ঘটনা ও সংলাপ অসংলগ্ন এবং অর্থহীন। ভাষা আড়ষ্ট তার উপর ছাপার ভুল বিস্তর—তবে কাহিনীটুকু উপজীব্য ভাল এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীও উদার।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শান্তির বারতা—প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড—স্নেহময় ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত এবং বারাণসী স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট "অযাচক আশ্রম" হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড দেড় টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস বিখ্যাত কর্মযোগী, তিনি তরুণ বয়স হইতে ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং দেশ ও জাতির দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণার্থ দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, মহামারীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অযাচক বৃত্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু নরনারী তাঁহার অনুবর্তী হইয়া ধন্য হইয়াছেন। দেশের বহু স্থানে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সর্বদা ধর্মের সেবায় ও জনহিতকর কর্মে নিয়োজিত। দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণকালে যেখানে সেখানে সংবর্ধনা সভায় ও সমবেত উপাসনা-ক্ষেত্রে সংসার দাবদগ্ধ নরনারীর প্রাণে শান্তিবর্ষণকারী ধর্মনীতি ও সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে এই মহান্ কর্মযোগী এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ যেসব মূল্যবান ভাষণ দিয়াছেন, সেসবেরই অধিকাংশ সংগ্রহক্রমে প্রথম খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় এবং তৃতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় প্রায় চারি শত 'বারতা' পরিবেশিত হইয়াছে। পরমার্থ-সঙ্গীত, নামকীর্তন, স্তবাদি, কবিতা এবং কোন কোন স্থানের অভিনন্দনাদিও খণ্ডত্রয়ে স্থান পাইয়াছে। দীক্ষা, নামের মহিমা, সমবেত উপাসনা, নারী-জাগরণ, দাম্পত্যজীবন, জীবনের কর্তব্য, সমাজের পবিত্রতা রক্ষা, প্রণব উপাসনা, ইষ্টনিষ্ঠা, ধর্মই জাতির প্রাণ, ভক্তিই পরমপুরুষার্থ, গুরুর শক্তি ইত্যাদি বিষয়ক উপদেশাবলী অনুধাবনযোগ্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বাঁকুড়া—
কপুর নিষ্কৃতি—শ্রী...শচন্দ্র রায়। প্রকাশক—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা। ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পৃ, ৮৭: মূল্য দেড় টাকা।

কপুর নিষ্কৃতি ছোটদের একখানি উপন্যাস। তপনকুমার ওরফে কপু আসাম-প্রবাসী বাঙালী ডাক্তারের পুত্র, শৈশবে অতিমাত্রায় কৌতূহলী, যৌবনে জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবন। মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন গৃহস্থের কিছু কিছু জিনিস তাদের অগোচরে সংগ্রহ করা সে অথবা তার দলের কোন ছেলে অন্যায় বলে মনে করে না। চরিত্র-মাহাত্ম্যে এই ত্রুটি তুচ্ছ মনে হয়। আদর্শবাদের মাত্রাধিক্যে কাহিনীর রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

শ্রীতারাপদ রাহা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তীর্থযাত্রী
শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

ইথিওপীয়ার সম্রাট, হাইলে সেলাসী

প্রতিকৃতি

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৬৩ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন ত ঘনাইয়া আসিতেছে। সাধারণ লোকে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব গতবারে আদৌ বুঝিতে পারে নাই। কেহ-বা পার্টি হিসাবে, কেহ-বা "সরকার জব্দ হউক" এই ইচ্ছায়, আবার কেহ-বা নিজের অপরিণতবুদ্ধি সন্তান-সন্ততির উদ্দাম প্ররোচনায় ভোট দিয়াছিলেন। আবার অতি-বুদ্ধিমান যাঁহারা তাঁহারা কোন ভোটই দেন নাই সকল প্রার্থীকেই বঞ্চিত করার জন্য, এবং তাহাতে নিজেদের যে কি ক্ষতি হইবে সেকথা ভাবিবার চেষ্টাও করেন নাই, দিবানিদ্রা ও বিজ্ঞের মত চটুল মতামত প্রকাশ করিয়া ছুটি উপভোগ করিয়াছিলেন। এই অতি-বুদ্ধিমানদের মূর্খতার ফলে ভোটদান ব্যাপারটা প্রহসনে দাঁড়ায় অনেক স্থলে, যাহার ফল আমরা আজ ভুগিতেছি।

ইংরেজী প্রবাদ আছে যে "দেশের লোকের যোগ্যতা অনুযায়ীই সে দেশের শাসনতন্ত্র গঠিত হয়।" ইহা অতি সত্য এবং ইহাও সত্য যে, শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের অধিকার প্রয়োগ ও ব্যবহারের সুযোগ আমরা পাঁচ বৎসরে একবারমাত্র ব্যাপক ভাবে পাই। অর্থাৎ, আজ যাঁহাদের আমরা নির্ব্বাচিত করিব তাঁহারা আগামী পাঁচ বৎসর যদি জীবিত ও চলচ্ছক্তিযুক্ত থাকেন তবে তাঁহাদের সকল কার্য্যকলাপের শুভাশুভ ফলাফল আমাদের পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভোগ করিতেই হইবে। তাঁহাদের দোষে যদি দেশের লোক দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে তাহার প্রতিকার অতি জটিল পথে করিতে হইবে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিকার-চেষ্টায় আরও বিষময় ফলই ফলিয়াছে।

সুতরাং আমাদের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, গত নির্ব্বাচনের পর হইতে আমাদের সকলের, অর্থাৎ বাংলার জনসাধারণের—বিশেষে পশ্চিমবঙ্গভূমির সন্তানবর্গের—অবস্থা কোন্ পথে গিয়াছে এবং সে-পথে যাওয়ার কারণ কি?

দোষগুণ বিচারেও আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করা উচিত, শুধু গালভরা শ্লোগান আওড়াইয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় "যত দোষ নন্দঘোষ" হাঁকিলেই চলিবে না। সরকারের যদি দোষ থাকে তবে সেটা বিচার করিয়া, নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা অবশ্যপ্রয়োজন, কিন্তু গায়ের জ্বালা মিটাইতে গিয়া আরও অযোগ্য লোককে নির্ব্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়াই যাইবে, প্রতিকার কিছুমাত্র হইবে না, শুধু খাল কাটিয়া কুমীর আনাই হইবে। এবং এই কাজই আমরা কতকটা করিয়াছিলাম বিগত নির্ব্বাচনে, অযোগ্য সরকারের বিরুদ্ধে অযোগ্য-তর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচিত করিয়া। ফলে, আজ যদি বলি সরকারী দলের শতকরা ৯৫ জন অযোগ্য, সেই দল বলিবে প্রতিপক্ষের শতকরা ১০০ জনই অযোগ্যতর।

সেই জন্যই সময় থাকিতে বিচার করা প্রয়োজন যে, নির্ব্বাচনের "বাঘে মহিষের লড়াইয়ে" জনসাধারণরূপী উলুখড়ই ধ্বংসের পথে আরও অগ্রসর না হয়। শুধু টিকেট বা ছাপ দেখিয়াই ভোট দেওয়ায় এই বিপদের আশঙ্কা খুবই আছে। সেই কারণে সাধারণের প্রথমেই জানা দরকার—কোন্ কোন্ দলে কি কি রকম লোক প্রার্থীরূপে পাঠানো হইতেছে। কংগ্রেসের ছাপ থাকিলেই সে লোক যে মহাত্মা গান্ধীর বা পণ্ডিত নেহরুর পথের পথিক হইবে না একথা যেমন সত্য, কংগ্রেস-বিরোধী হইলেই সে যে দধীচিতুল্য স্বার্থহীন আত্মত্যাগী হইবে সেকথাও সমান ভিত্তি-হীন।

কংগ্রেস যে জাহান্নামে চলিয়াছে সেকথা সবাই জানে ও বলে, কিন্তু সেরূপ হওয়ার কারণ আমাদের নিষ্ক্রিয় জড়ভরত বৃত্তি অথবা অপোগণ্ড শিশুতুল্য "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ" করায় প্রবৃত্তি।

অনেক বিদগ্ধ চূড়ামণি আছেন যাঁহারা বলিবেন, "ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়" করিয়া লাভ কি? দেশে যোগ্য লোক যদি না থাকে তবে কপালে যে দুঃখ আছে তাহা ঘটিবেই। তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিবৃত্তি গুণ-দোষ ইত্যাদিতে দেশের লোকের মধ্যে ইতরবিশেষ কি কিছুই নাই? অপেক্ষাকৃত ভাল ত আছে, যদি সর্ব্বগুণযুক্ত সর্ব্বদোষমুক্ত কেহই না থাকে। অন্ততঃপক্ষে দোষ-গুণ বিচার করিতে যদি আমরা অগ্রসর হই তবে দলগুলিতেও কিছু সাড়া পড়িবে ত?

আমাদের বুঝা উচিত আমরা, অর্থাৎ বাঙালী, আজ কোথায় দাঁড়াইয়াছি। কর্ম্মী ও শ্রমিকের ক্ষেত্রে সারা ভারতে বাঙালীর স্থান একমাত্র বোধ হয় আসামের উপর, অন্য সকল প্রদেশের নীচে। বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রেও আমাদের স্থান সপ্তম বা অষ্টম। ব্যবসায়ীদিগের কথা বলা বৃথা। আমাদের এই নিদারুণ অবনতি হইয়াছে নানা কারণে, যাহার মধ্যে অন্যতম হইল অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি ও নেতারূপে নির্ব্বাচন।

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন

১৯৫৭ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে—১৩ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান নির্ব্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন ঘোষণা করেন। বিভিন্ন রাজ্যের নির্ব্বাচনের সঠিক তারিখ পরে জানানো হইবে। দিল্লীর ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে একদিনেই নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইবে—অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার রাজ্যে তিন-চার দিন করিয়া লাগিবে। কেবলমাত্র হিমাচল প্রদেশে নির্ব্বাচন-অনুষ্ঠানে বিলম্ব হইবে—কারণ মার্চ্চ মাসের তুষারপাতের সময় ঐস্থানে নির্ব্বাচন-অনুষ্ঠান সম্ভব নাও হইতে পারে।

জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মনোনয়নপত্র দাখলের জন্য প্রার্থীদিগকে আহ্বান জানানো হইবে। ৩১শে মার্চ্চের মধ্যেই নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করা যাইবে বলিয়া শ্রীসেন অভিমত প্রকাশ করেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহার পূর্ব্বেও ফলাফল ঘোষণা করা যাইতে পারে।

আগামী নির্ব্বাচনের জন্য আঠার কোটি সত্তর লক্ষ নাগরিক ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। প্রথম নির্ব্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত নাগরিকের সংখ্যা ছিল সতের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ—তন্মধ্যে শতকরা একান্ন জন কার্য্যতঃ ভোট দিয়াছিলেন। নির্ব্বাচনে আটাশ লক্ষ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হইবে।

রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নির্ব্বাচনের জন্য ২,৫১৮টি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র (৫৮৩টি দুই-আসন বিশিষ্ট কেন্দ্রসহ) হইতে ৩,১০২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। এই আসনগুলির মধ্যে ৪৭০টি আসন তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের জন্য এবং ২২১টি আসন তপশীলভুক্ত উপজাতিদিগের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। এইবার তিন-সদস্য বিশিষ্ট কোন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র থাকিবে না।

লোকসভার ৪৮১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে—তন্মধ্যে ৭৪টি আসন তপশীলভুক্ত জাতীয় এবং ২৯টি আসন তপশীলভুক্ত উপজাতীয় প্রতিনিধিদিগের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

আগামী নির্ব্বাচনের পর পার্লামেন্টে এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতীয়দের প্রতিনিধিসংখ্যা বর্ত্তমান হইতে বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতীয় অর্থনীতির ধারা

সংযুক্ত বাণিজ্য সমিতির সম্প্রতি যে বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে বিদায়ী সভাপতি ভারতীয় অর্থনীতির বেসরকারী ক্ষেত্রের তরফ হইতে কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য। মিঃ জেঙ্কিন্সের প্রথম অভিযোগ এই যে, ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত আয়করের হার অত্যধিক এবং ইহার ফলে উৎপাদনশীল মূলধন যথোচিত পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে না। ব্রিটেনে আয়করের হার অত্যধিক হওয়ার দরুন মূলধন ও ব্যক্তিগত প্রতিভা উভয়েই দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষেও আয়করের উচ্চ হার বর্ত্তমান থাকিলে অনুন্নত বিদেশে ভারতীয় মূলধন ও প্রতিভার বহির্মুখী গতি প্রাধান্য-লাভ করিবে। ইহার উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অবশ্য বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা মূলধনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতেই হইবে এমন কোন নীতির সমর্থক তিনি নহেন। অর্থমন্ত্রীর এই উক্তি অবশ্যই অর্থহীন, কারণ ভারতবর্ষে যখন পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হয় নাই এবং মিশ্র অর্থনীতি স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সেই অবস্থায় অর্থমন্ত্রীর এই উক্তি নিরর্থক। মূলধনের বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে মিঃ জেঙ্কিন্স যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা অবশ্য বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দেশী মূলধনের পক্ষে বিদেশে যাওয়া সম্বন্ধে কিছু কিছু বাধা-নিষেধ আছে। কিন্তু দেশী মূলধনের পক্ষে বিদেশ যাওয়া সম্ভবপর না হইলেও তাহার সামর্থ্য ও প্রয়োগ হ্রাস পাইতে বাধ্য।

বিদেশী মূলধন যাহাতে এদেশে আসে তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বহুপ্রকারে আহ্বান জানাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধের বেড়াজাল এমন ভীতিপ্রদ ভাবে বিস্তারলাভ করিতেছে যে, বিদেশী মূলধন এই দেশ ছাড়িবার জন্য সচেষ্ট। নূতন বিদেশী মূলধনের এই দেশে আসাও সহজসাধ্য নহে, কারণ এই ব্যাপারেও বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় নূতন কর ধার্য্য দ্বারা যেভাবে যৌথ কোম্পানীগুলির উদ্বৃত্ত আমানতের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে তাহাতে বিদেশী মূলধন আতঙ্কগ্রস্ত হইতে বাধ্য। আর ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনে দেশী মূলধনও শিল্পোন্নয়ন অপেক্ষা চোরাকারবারের দিকে অধিক মনোযোগী হইবে।

ভারত সরকার অবশ্য নিজ পক্ষ সমর্থনে বলিতে পারেন যে, সম্প্রতি কিছু পরিমাণ বিদেশী মূলধন ভারতবর্ষে আসিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি নহে—রাজনীতি। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো বজায় রাখার জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই আগ্রহান্বিত, সুতরাং তাহারা বেসরকারী শিল্প-মূলধনকে ভারতে আসার জন্য উদ্বোধিত করে, বিদেশী বেসরকারী শিল্প-মূলধনের অভাবে বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে মূলধন সরবরাহ করিতে হয় —যেমন করিতে হইতেছে কলম্বো পরিকল্পনা কিংবা আমেরিকার কারিগরী অর্থসাহায্য-ব্যবস্থায়। সুতরাং বেসরকারী মূলধনের ভারতে আগমনের পিছনে তাহাদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির উৎসাহদানও নিহিত। এই অবস্থাকে ভারত সরকার অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া যেন তাহার অপব্যবহার না করেন।

ভারত সরকার যদি মনে করেন যে, বিদেশী মূলধনের কোন প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে ইহার আগমন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও প্রায় আট শত কোটি হইতে বার শত কোটি টাকার মত বিদেশী অর্থ-সাহায্যের প্রত্যাশা করা হইয়াছে। ভারত সরকারের উচিত

বিদেশের দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়া নিজের অবস্থা অনুসারে পরিকল্পনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তাহা হইলে আর বিদেশী মূলধনের প্রত্যাশায় থাকিতে হয় না। কিন্তু ভারতের নিজের আর্থিক সম্পদের এত অভাব যে, বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রায় অর্দ্ধেকই বাতিল করিয়া দিতে হয়।

মিঃ জেঙ্কিন্সের দ্বিতীয় অভিযোগ—ভারতীয় আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার বিস্তৃতির বিরুদ্ধে। সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী, যদিও ক্ষমতাশালী ও অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র ধনিকতন্ত্রের সামিল। শ্রীকৃষ্ণমাচারী অবশ্য আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার বৃদ্ধিকে সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু দিন দিন ইহার মধ্যে যে অসদাচার ও অনাচার বৃদ্ধি পাইতেছে সে সম্বন্ধে যথোচিত পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মিঃ জেঙ্কিন্সের তৃতীয় অভিযোগ এই, বর্ত্তমান ভারতবর্ষে সরকারী ও বেসরকারী অর্থনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রকে এমন দ্বিধাবিভক্ত ভাবে দেখা হয় যে তাহাতে এই দুইটি ক্ষেত্রকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কিংবা প্রতিযোগী হিসাবে প্রতীয়মান করা হয় এবং ইহার ফলে দুইটি ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধিত হয় না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও এই দুইটি ক্ষেত্র পরস্পরবিরোধী নহে, তথাপি ভারতের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে বাধ্য।

নূতন করধার্য্য

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি কয়েকটি নূতন বিষয়ে করধার্য্য ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মূলধন বৃদ্ধির উপর করস্থাপন ও অতিরিক্ত আয়করের হার বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এই নূতন করধার্য্য সম্বন্ধে ভারতীয় জনমত বিভক্ত এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক। বিরোধীপক্ষের মতে বৎসরের মাঝখানে এইপ্রকার করধার্য্য অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অন্যায়, বিশেষতঃ এই করগুলি হইতে মোট আয় যখন হইবে মাত্র ১৬ কোটি টাকা। আর যাহারা সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন যে, ১৬ কোটি টাকা আয়কর বৃদ্ধি নেহাত অল্প নহে এবং ইহা পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল। যুদ্ধের সময়ে ও তাহার অব্যবহিত পর হইতেই জমি ও বাড়ী প্রভৃতির মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং হস্তান্তর দ্বারা বহুলোক অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং ধনবৃদ্ধিকর বহু পূর্ব্বেই ধার্য্য হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই কর এত বিলম্বে ধার্য্য করা হইয়াছে যে, স্থাবর সম্পত্তির কেনাবেচার হিড়িক এখন কমতির দিকে। তাই এই কর সম্বন্ধে অভিযোগ ইহার নির্দ্ধারণের জন্য নহে, ইহা নির্দ্ধারণে বিলম্বের জন্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ধনবৃদ্ধিকর ব্যবস্থা আছে, ছিল না ভারতবর্ষে। ধনবৃদ্ধিকর একটি নূতন প্রকার কর ব্যবস্থা নহে, ইহা আয়করের গোষ্ঠীভুক্ত। ধনবৃদ্ধিকে বাদ দিয়া আয়করের যাথার্থ্য নিরূপণ সম্ভব নহে।

নূতন কর স্থাপনের কৈফিয়ত হিসাবে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট খরচ ৪,৮০০ কোটি টাকা হইতে আরও প্রায় ৫০০ শত কোটি টাকা অধিক হইবে। এই খরচ সঙ্কুলানের জন্য করবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রভাবে শিল্পোন্নয়ন হইয়াছে ও হইতেছে, সমাজে ধনিকশ্রেণীর আয়বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মুনাফার হার বর্দ্ধিত হইতেছে, এই অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রে ধনবৃদ্ধিকর আপত্তিজনক হইতে পারে না। জমি এবং বাড়ী সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য জনসাধারণের আয়বৃদ্ধির ফলে বর্দ্ধিত চাহিদার দরুন জমি ও বাড়ীর মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় সাত-আট গুণ, আবার কোন কোন স্থানে ইহারও অধিক। গ্রামাঞ্চলে বহুমুখী পরিকল্পনার (multipurpose projects) ফলে ও নদী-পরিকল্পনার প্রভাবে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় "betterment levy" কিংবা উন্নয়নকর যথার্থভাবেই নির্দ্ধারণ-যোগ্য; উন্নয়নকর ও ধনবৃদ্ধিকরের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কিছু নাই বলিলেও চলে।

কলিকাতার টালিগঞ্জ, রিজেন্ট পার্ক, সাদার্ণ এভিনিউ ও কাঁকুলিয়া, কার্ণ রোড প্রভৃতি এলাকায় আইনসঙ্গত ভাবেই বহু পূর্ব্বে "betterment levy" ধার্য্য করা উচিত ছিল। মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রমিক হারে জীবন-মান উন্নয়নের ফলে সমস্ত প্রকার সম্পদেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধি তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির জন্য বহুলাংশে দায়ী, সুতরাং এই অবস্থায় রাষ্ট্র যদি বর্দ্ধিত সম্পদমূল্যের কিছু অংশ কর হিসাবে গ্রহণ করেন তাহাতে অযৌক্তিক ও অন্যায় কিছু নাই।

১৯৫৬ সনের ১লা এপ্রিলের পর হইতে ধনবৃদ্ধির উপর আয়করের হারে কর স্থাপিত হইয়াছে। সম্পত্তি জাতীয়করণে কিংবা অন্যভাবে হস্তান্তরকরণে যে আয় হইবে, অংশীদারী ব্যবসা বিক্রয়ের ফলে কিংবা বসতবাড়ী অন্ততঃপক্ষে সাত বৎসর অধিকারে রাখার পর যদি বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে এই সকল আয় ধনবৃদ্ধিকরের আওতায় পড়িবে।

বর্ত্তমান আইন অনুসারে ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত সম্পত্তির মূল্য বিবর্দ্ধন করসাপেক্ষ নহে। নূতন আইনে এই সীমা হ্রাস করিয়া দিয়া ৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত করা হইতেছে। অর্থাৎ ইহার অতিরিক্ত মূল্য বিবর্দ্ধনের জন্য কর দিতে হইবে। কিন্তু নিম্ন আয়কারী ব্যক্তিদের জন্য আরও কিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের ক্ষেত্রে ধনবৃদ্ধিসমেত বাৎসরিক মোট আয় যদি ১০,০০০ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে ইহাদের ধনবৃদ্ধিকর দিতে হইবে না। প্রস্তাবিত ধনবৃদ্ধিকর সম্বন্ধে শেষকালে কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। বাড়ীর বিক্রয়মূল্য যদি ২৫,০০০ টাকার কম হয় তাহা হইলে বিক্রেতাকে কর দিতে হইবে না, অবশ্য যদি তাহার দুইটির অধিক বাড়ী না থাকে।

ধনবৃদ্ধিকরের সুপারিশ করেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক কালডর। অধ্যাপক কালডর যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন ভারত সরকার তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কি উপায়ে ভারতে করযাজস্ব বৃদ্ধি করা যায় সে সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য। অধ্যাপক কালডরের মতে ন্যায়বিচারের খাতিরে আয়করের সংজ্ঞা হইতে ধনবৃদ্ধিকরকে বাদ দেওয়া অনুচিত। ইহাতে সমাজে দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং আয়ের নূতন সংজ্ঞায় ধনবৃদ্ধির আয়কেও ধরিতে হইবে। করযাজস্বের একটি প্রান্তিক সীমানা আছে যাহার উপরে গেলে ইহা প্রেরণাশূন্য হয়। বর্ত্তমানে করযোগ্য আয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অস্পষ্টতা আছে। ভারতীয় কর অনুসন্ধান সমিতি ধনবৃদ্ধিকরের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কারণ ইহাতে কর এড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক, এই প্রকার আয় হঠাৎ ও অনিয়মিত, সুতরাং ইহার সত্যকার পরিমাপ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। ৩৫,০০০৲ টাকার বাড়ীর জন্য আইনসঙ্গত ভাবে ২৪,০০০৲ টাকা লইলে এবং বাকী টাকা বে-আইনী ভাবে লইলে (অর্থাৎ গুপ্তভাবে লইলে) কর্ত্তৃপক্ষের টের পাওয়ার কোন উপায় নাই। কিন্তু অধ্যাপক কালডরের মতে ধনবৃদ্ধিকে করের আওতা হইতে বাদ দিলে আয়করকে অধিক পরিমাণে এড়াইয়া যাওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও স্থানীয় জনসাধারণ

দুর্গাপুরে ইস্পাত তৈয়ারী কারখানাটি স্থাপনের সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে তাহাও বিশেষ কম নহে। কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার লোককে গৃহচ্যুত হইতে হইবে। সরকার হইতে এই সকল বাস্তুহারাকে পুনর্বাসন-ঋণ দেওয়া হইলেও ইহারা পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবে না। অধিকাংশ লোকেরই চাষের জমি নষ্ট হইয়াছে—ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ পাইলেও তাহারা চাষের জমি কেহই পাইবে না। রাজ্যের অন্যত্র যাইয়া নূতন ভাবে বসতি করিয়া চাষবাস করাও এই সকল বাস্তুহারাদের পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য নয়। ক্ষতিপূরণের অর্থ পাইবার পর ইহাদের প্রধান ভরসা ছিল এই যে, কারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনক্রমে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, ইস্পাত-কারখানাতে কাজ করিয়াই তাহারা ভবিষ্যতে জীবিক-নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

কিন্তু স্পষ্টতঃই তাহাদের সেই আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। দুর্গাপুর কারখানা ও স্থানীয় জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখের সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" পত্রিকায় শ্রীআবদুস সাত্তার লিখিতেছেন :

"কারখানা স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক নিযুক্ত হইয়াছে। নিযুক্ত ব্যক্তিগণের তালিকা দেখিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের মনে যে আশা-ভরসা ছিল তাহা ভাঙিয়া যাইতেছে। বাহিরের লোক লওয়া হইতেছে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণকে তেমন কোন সুযোগ দেওয়া হইতেছে না বলিয়া আমাদের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা যেখানে হইয়াছে সেটিও বর্দ্ধমান জেলার সীমানাস্থিত। সেখানে গ্রাম ছিল, লোকের বাস ছিল। কারখানার জন্য তাহাদিগকে উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে। কারখানার স্থানীয় অধিবাসীরা যোগ্যতামত সকল প্রকার কাজ পাইবে, তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে এইরূপ একটা সঙ্গত আশা তাহারা পোষণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাদিগকে আশাভঙ্গজনিত দুঃখ-বেদনা ভোগ করিতে হইতেছে। দুর্গাপুরেও যদি ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কারণ হইবে। অনেক সময় বিশেষ যোগ্যতার দোহাই দেওয়া হয়, কিন্তু এমন অনেক কাজ রহিয়াছে যাহার জন্য কোন বিশেষ যোগ্যতার আবশ্যক নাই এবং যে যোগ্যতার আবশ্যক সে যোগ্যতা স্থানীয় অধিবাসীদেরও আছে।

"লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় দক্ষ কারিগরের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রহিয়াছে এবং কেবলমাত্র স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ কর্ম্মী সংগৃহীত হইতে পারে না তাহাও সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে চেষ্টা করিলে বিশেষ ট্রেনিং দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদিগের মধ্য হইতেও কিছুসংখ্যক দক্ষ কারিগর সৃষ্টি করা যায়। অন্যান্যদের সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় স্থানীয় অধিবাসীরাও কাজ পাইবে ইহাই কাম্য। এই সঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার যুবকগণকে সুযোগ দেওয়া হইবে ইহাও সকলেরই আশা।"

"বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"দুর্গাপুরে কারখানা হইলে বর্দ্ধমান জেলার যুবকগণও জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাইবে এই আশা আমরা এখনও রাখি। ইহা না হইলে দুর্গাপুরের পরিবর্ত্তে ভীমপুরে এই কারখানা হইলে কি ক্ষতি হইত? এতগুলি লোককে সাতপুরুষের ভিটাছাড়া হইতে হইত না।"

"বর্দ্ধমানবাণী"র মন্তব্য বিশেষ সমীচীন এবং সময়োচিতই হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান স্থান। এই সকল শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে অপরিসীম ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। কারখানার স্থানসঙ্কুলানের জন্য কৃষক তাহার পিতৃপুরুষের ভিটা এবং ধানের জমি হইতে উৎখাত হইয়াছে—প্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চলের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগাইতে গিয়া গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব হওয়াতে বহু লোক অন্নকষ্টে রহিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণ নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পে ও কারখানায় কাজ পাইলে জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাইত এবং তাহাদের সামগ্রিক ক্ষতির আংশিক পূরণ সম্ভব হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোথাও তাহা হয় নাই, সর্ব্বত্রই বহিরাগত শ্রমিকগণই প্রাধান্য পাইয়াছে। শিল্পের মূলধনের সুদ,-মুনাফা, মোটা বেতনের চাকুরি, শ্রমিকের মজুরি—সকল দিক হইতেই পশ্চিমবঙ্গবাসী শোষিত হইয়াছে। এই দুরবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের নিজেদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষাও বড় কথা এই যে, সর্ব্বত্রই বাঙালীকে

ঠেলিয়া রাখিবার একটি অলিখিত নিয়ম চালু করা হইয়াছে। সেই জন্যই রাজ্যের মধ্যেও অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে আজ আর বাঙালী যুবকের চাকুরি মিলে না।

পরিস্থিতি এইরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, রাজ্য-সরকারকে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি পর্য্যন্ত প্রচার করিতে হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যে নিজ নিজ রাজ্যের অধিবাসীদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ-ব্যাপারে অগ্রাধিকার দানের জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই সরকারী নির্দ্দেশ প্রচলিত ছিল—পশ্চিমবঙ্গে তাহা ছিল না, এখনও নাই। তথাপি নিয়োগকারীদের সঙ্কীর্ণতা আজ সকল শিল্পেই এরূপ প্রকট হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাতে বিচলিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট মি ব্ল্যাক যখন ভারতীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট লিখিত চিঠিতে সরকারী অর্থনীতি বিষয়ে কিছু সমালোচনা করেন তখন এদেশে তাঁহার চিঠি সম্বন্ধে বহু বিরুদ্ধ মন্তব্য করা হয়। কিন্তু গত ১৫ই নবেম্বর মিঃ ব্ল্যাক শ্রীকৃষ্ণমাচারীর নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত। এই চিঠিতে বর্ত্তমানে চারটি পরিকল্পনাকে সাহায্য করিবার জন্য সিদ্ধান্ত জানানো হইয়াছে। এই চারিটি পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় ইস্পাত শিল্পকে (মার্টিন বার্ন) সম্প্রতি দুই কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এই কোম্পানীকে সাড়ে তিন কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ঋণ দেওয়া হইবে রেলপথ উন্নয়নের জন্য; এই কারণে আগামী জানুয়ারী মাসে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি কমিশন ভারতীয় রেলপথ পরীক্ষার জন্য আসিবে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য স্থলপথ-যানবাহনের উন্নতিকল্পে বিশ্বব্যাঙ্ক ১০৫৭ সনের এপ্রিল মাসে একটি অনুসন্ধান কমিশন প্রেরণ করিবে, এবং তাহাদের অনুমোদন অনুসারে ঋণ দেওয়া হইবে। চতুর্থ ঋণ দেওয়া হইবে নদী-পরিকল্পনাগুলির জন্য। যথা: কয়না, হিরাগু, দামোদর ভ্যালির দুইটি নূতন পরিকল্পনা ও বোম্বাইয়ের ট্রম্বে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির জন্য।

বিশ্বব্যাঙ্কের ইঞ্জিনীয়ারগণ বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ে কয়না জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিতেছেন। ইঁহাদের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর বিশ্বব্যাঙ্ক তাহার সিদ্ধান্ত ভারত সরকারকে জানাইবে। যে-সকল পরিকল্পনা বিশ্বব্যাঙ্ক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবে কেবলমাত্র তাহাদের জন্যই ঋণ দিবে। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে ২২৪·৮ মিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ, প্রায় ১১২ কোটি টাকা) ঋণ দিয়াছে কিংবা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ঋণগুলি যথাক্রমে এইরূপ: রেল-ইঞ্জিন পরিকল্পনা ৩·২৮ কোটি ডলার; ট্রাক্টার ও কৃষিযন্ত্র ক্রয় বাবদ ৭৫ লক্ষ ডলার; বোকারো জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা ১·৮৫ কোটি ডলার; ভারতীয় ইস্পাত শিল্প ৩·১৫ কোটি ডলার; দামোদর পরিকল্পনা ১·৯৫ কোটি ডলার; টাটা ইস্পাত-শিল্প ৭·৫ কোটি ডলার; ভারতীয় ইস্পাত-শিল্প ২ কোটি ডলার; ট্রম্বে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা ১ কোটি ডলার ও ভারতীয় শিল্পদান সমিতিকে ১ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সুদের হার বৎসরে শতকরা চার টাকা, সাড়ে চার টাকা।

পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর বিপদ

দেশে ভোগপণ্য প্রস্তুতির যে সকল প্রতিষ্ঠান বেসরকারী মালিকের হাতে আছে, তাহার কোনটাই দেশের লোকের সেবার জন্য নহে। তাহা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের জনসাধারণের রিক্ত পকেট আরও হাল্কা করার ব্যবস্থা মাত্র। সুতরাং শ্রীদেশাইয়ের নিম্নস্থ বিবৃতিতে কাহারও আশ্বস্ত হওয়ার কারণ নাই।

"নয়াদিল্লী, ১৮ই নবেম্বর—ভারত সরকারের বাণিজ্য এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য ব্যবসায়ীদিগকে বলেন যে, কোন পণ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিতে পারে বলিয়া লোকের মনে যাহাতে ভয় না জন্মে তাঁহারা যেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন। ব্যবসায়িগণ যদি এই কাজ করেন তাহা হইলে দেশের ভিতরে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ হইবে।

শ্রীদেশাই রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বলেন যে, "যদি এই কাজ করা যায় তাহা হইলে আমরা আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থায়ও উন্নতিসাধন করিতে পারি। গত নয় মাসের রপ্তানি-বাণিজ্যে আমাদের বিশেষ লাভ হয় নাই বলিয়া আমার মনে হয়।

শ্রীদেশাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মুখবন্ধে বলেন, রপ্তানি-বাণিজ্যের সমস্যা সম্পর্কে এখন তিনি কিঞ্চিৎ আস্থা সহকারে তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারেন; কারণ গতকল্য আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবার পর তিনি এ বিষয়ে আরও কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের জনসাধারণের কোন-প্রকার অসুবিধা না ঘটাইয়া, আমরা কি ভাবে আমাদের রপ্তানির অবস্থার সবচেয়ে বেশী উন্নতিসাধন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করিতে পারি—ইহাই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা। আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, কারণ আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ইহা না করিয়া উপায় নাই।

দেশীয় পণ্যের উপর দেশের লোকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্যের মানবৃদ্ধির যে ঝোঁক দেখা যায়, বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী ডি. পি. কারমারকার রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তাহা উল্লেখ করেন।

এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, যদি এই চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্য বাহিরের মূল্যের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারে তাহা হইলে এইরূপ আশঙ্কা করা অসঙ্গত নহে যে, রপ্তানি-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য আমরা যে চেষ্টা করিতেছি আমাদের সেই চেষ্টা ব্যাহত হইতে

পারে। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার ভিতরে যে সমস্ত অন্তর্নিহিত অসুবিধা আছে তাহা আমরা কিভাবে দূর করিয়া সর্ব্বাধিক চেষ্টায় আত্মনিয়োগের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারি তাহা চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

অতঃপর শ্রীকারমারকার বলেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করিতে আমাদের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, আমাদের বর্ত্তমান আয়ের দ্বারা তাহার সঙ্কুলান করা সম্ভবপর না হইলেও আমাদের সাধ্যানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এই বৎসরের প্রথম নয় মাসে আমাদের রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। রপ্তানি-বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের বৈদেশিক মূল্যমান হ্রাস পাওয়াই ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী বলিয়া মনে হয়।

চৌ-এন-লাই-এর ভারত সফর

ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র-মন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং সহকারী প্রধানমন্ত্রী হো লুঙ ২৮শে নবেম্বর ভারতে আগমন করেন। ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দশ দিন এই দুই চীনদেশীয় রাষ্ট্রবিদ ভারতে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।

২৮শে নবেম্বর নয়াদিল্লীর পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর বিমান ঘাঁটিতে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া চীনের প্রধান-মন্ত্রী চৌ-এন-লাই বলেন যে, চীন এবং ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংযোগস্থাপন করিয়া এশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত ভাবে অধিকতর চেষ্টা করাই তাঁহাদের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার ভারত আগমনের ফলে ভারত ও চীনের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পাইবে।

২৯শে নবেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের এক সম্মিলিত অধিবেশনে ভাষণদান প্রসঙ্গে চৌ-এন-লাই বলেন, ভারতের মত মহান্ রাষ্ট্রকে প্রতিবেশীরূপে পাইয়া চীনের অধিবাসীরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে। ফরমোসা সমস্যার সমাধানের এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের প্রবেশাধিকারের প্রশ্নে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভারত যে দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে তাহার জন্য ভারতের প্রতি চীনের সরকার ও জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চৌ-এন-লাই বলেন যে, সার্ব্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক সংহতিরক্ষার সংগ্রামে ভারতকে চীন সরকার এবং চীনের জনসাধারণ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবে। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমতে কাশ্মীরকে ইঙ্গিত করিয়াই চৌ-এন-লাই উক্ত মন্তব্য করেন।

চৌ-এন-লাই বলেন, ভারত ও চীনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ভারত ও চীনের পররাষ্ট্র-নীতিও সর্ব্বাঙ্গীণরূপে এক নহে। কিন্তু এই সকল পার্থক্য দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সহযোগিতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধের আশঙ্কা দূরীকরণের কাজে ভারত ও চীনের ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া চৌ-এন-লাই বলেন, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের উপর অপর রাষ্ট্রের ইচ্ছা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত যে কার্য্যকরী হইবে না, ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিবে।

পঞ্চশীল ও বান্ধুঙ মনোভাবের প্রতি তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া চীনা প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, উহা দ্বারা কেবলমাত্র চীন ও ভারতের সমস্যাবলীর সমাধান এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীবৃদ্ধিই নয়, এশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রচেষ্টা সম্ভব হইবে। এইরূপে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বিশ্বশান্তি আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারি।

চৌ-এন-লাই আরও বলেন যে, মিশর হইতে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার কার্য্যকরী করা এবং মিশরের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চীন ভারতের সহিত সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক। ইন্দোচীন এবং কোরিয়া যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি সম্পর্কে পঞ্চশীল প্রণয়ন এবং এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন আহ্বানের ক্ষেত্রে ভারতের অমূল্য-দানের প্রশংসা করিয়া চৌ-এন-লাই বলেন যে, ভারত-চীন চীনের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান।

চৌ-এন-লাই বলেন, ঐক্যই বল, মিশরীয় সঙ্কট প্রমাণ করিয়াছে যে, এশীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অধিকতর ঐক্য প্রয়োজন।

৩০শে নবেম্বর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত এক নাগরিক সংবর্দ্ধনার উত্তরে চৌ-এন-লাই বলেন, যে সকল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এত দিন অন্যান্য দেশকে পদানত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের চূড়ান্ত অবলুপ্তির পূর্ব্বে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, এ অবস্থায়ও তাহারা তাহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছে এবং মরণকামড় দিতে ছাড়িতেছে না। মিশরের ঘটনায় তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১ই ডিসেম্বর কলিকাতার ময়দানে এক নাগরিক সংবর্দ্ধনার উত্তরে চৌ-এন-লাই বলেন, "বহু ক্ষেত্রেই ভারত যে চীন হইতে অনেক অগ্রসর—এই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। চীনকে ভারতের নিকট হইতে গভীরভাবে শিক্ষা লইতে হইবে।" তিনি বলেন, "বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের তুলনায় অধিকতর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে আপনাদের অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে। আপনাদের শিল্প-পরিচালনা ব্যবস্থা যথেষ্ট নিপুণ, জলসংরক্ষণ ব্যবস্থা, গৃহনির্ম্মাণ শিল্প, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ছাপাখানা শিল্পে আপনারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আপনাদের কীর্ত্তি অসামান্য।"

তাঁহার ভারত সফরের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় চৌ-এন-লাই বলেন, "আমি ও আমার সহকর্ম্মীরা আপনাদের নিকট

হইতে যে মহান্ ও সাদর-সংবর্দ্ধনা পাইয়াছি তাহার জন্ত প্রথমেই আন্তরিক ধন্তবাদ জানাইতে চাই। চীনের জনসাধারণের পক্ষ হইতে আপনাদের ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাইতেছি। গত ১২ দিনে আমরা যেখানেই গিয়াছি—দিল্লী, পুণা, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, চিত্তরঞ্জন বা সিন্ধ্রি সর্ব্বত্র আমরা ভারতের জনসাধারণের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি। এখন ভারত হইতে বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমরা পুনরায় এক বিশাল ও উদ্দীপনাময় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিলাম। আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। যখনই দেখি যে, ভারত ও চীনের পতাকা উড়াইয়া ও 'হিন্দী চীনা ভাই ভাই' ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত করিয়া হাজার হাজার ভারতবাসী আমাদিগকে স্বাগত অভিনন্দন জানায়, তখনই বুঝিতে পারি যে, ইহা কোনও মতেই কূটনৈতিক সৌজন্ত বা নিয়মানুগ ভদ্রতা হইতে পারে না। ইহা এই দুই মহান্ জাতির হৃদয়ের গভীরে নিহিত দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। সেই বন্ধুত্বই আমাদের বিরাট শক্তির উৎস।"

চৌ-এন বলেন, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত ও চীনের মধ্যে সৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহস্র বৎসর আগে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙ ভারতের নিকট জ্ঞান ও শিক্ষার অন্বেষণে আপনাদের এই সুন্দরী বঙ্গভূমিতে আসিয়াছিলেন। একই সময়ে বাংলাদেশের বিদ্যানুরাগী বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। যদিও এই দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঔপনিবেশিক আঘাতে একদা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তথাপি স্বাধীনতার জন্ত আমাদের সাধারণ সংগ্রাম আমাদের দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সম্প্রীতিকে দৃঢ়তর করিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার মহান্ দেশপ্রেমিক ও কবি রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে এই সহানুভূতি ও সম্প্রীতির বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

"অবশেষে যখন আমরা উপনিবেশিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলাম, তখন যে সকল দেশ আমাদের সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, ভারত তাহাদের অন্ততম।"

চৌ-এন ভারত ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞানবিনিময়ের উপর বিশেষ জোর দেন, কারণ পারস্পরিক জ্ঞান ব্যতীত পারস্পরিক সম্প্রীতি কখনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

মিশরে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নিন্দা করিয়া এবং মিশর হইতে অবিলম্বে সকল আক্রমণকারী সৈন্ত অপসারণের দাবি তুলিয়া চৌ-এন বলেন, "মিশরের জনসাধারণের সংগ্রাম-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা মিশরের জনসাধারণের মহান্ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দৃঢ় সমর্থন করি। মিশরের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ভারতের সরকার ও জনসাধারণ অবিচলিত যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। চীনের সরকার এবং জনসাধারণ এই সমস্তার পরিপূর্ণ সমাধানের জন্ত ভারতের সঙ্গে হাত মিলাইতে এবং সমস্ত শান্তিকামী দেশগুলির ও জনগণের সহিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা করিতে প্রস্তুত। ঔপনিবেশিকতাকে পরাভূত করিবার জন্ত এবং যুদ্ধের আশঙ্কাকে দূর করিবার জন্ত আন্তর্জাতিক সংহতি আরও দৃঢ় করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভারত ও চীন এই দুই জাতির মধ্যে যে মহান্ বন্ধুত্ব ও ঐক্য আমরা ভারতবর্ষে দেখিয়াছি তাহা এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাস প্রবলভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে।"

কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে চৌ-এনকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বলেন :

"আপনার শুভাগমনে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী সৌধকিরীটিনী মহানগরী কলিকাতা আজ ধন্ত হইল। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ও কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষে আমার সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।"

"পৃথিবীর বৃহত্তম একজাতীয় মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি আপনি, পৃথিবীর প্রাচীনতম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারকরূপে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।"

"সুপ্রাচীন কাল হইতে মহা-ভারত ও মহা-চীনের ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রেমের সম্পর্ক। আজ আপনাকে উপলক্ষ করিয়া পুনরায় স্মরণ করি দ্বিসহস্র বৎসরের ভারত-চীন মৈত্রীর কথা; খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সূত্রপাতেই পরিব্রাজক ফা হিয়েনের, সপ্তম শতকের প্রথমার্দ্ধে হিউয়েন সাঙের এবং শেষার্দ্ধে ইৎ সিং-এর ভারত তীর্থাগমনের কথা স্মরণ করি; স্মরণ করি মহাবঙ্গের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাম্রলিপ্তিপত্তনের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতার কথা এবং স্মরণ করি একাদশ শতকে প্রাচীন বঙ্গের সুসন্তান মহাজ্ঞানী অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চীন অভিযানের কথা। ব্যবসায়ের পণ্য আদান-প্রদানের সূত্রে বা সামরিক শক্তির প্রসারের দ্বারা নয়, একান্ত শান্তি ও কল্যাণের পথে, এই দুই মহাদেশের মধ্যে পরস্পর জ্ঞান ও ধর্ম্মের যে বিনিময় ও সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আজিও সমগ্র জগতের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বঙ্গের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেই প্রাচীন সম্পর্ক পুনঃসংস্থাপিত করেন। তাহার পর আপনার আমন্ত্রণে বিগত পাঁচ বৎসর স্বাধীন ভারতের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের, বহু বিদ্বজ্জন ও শিল্পী চীন-ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়া সেই সম্পর্ককে দৃঢ়তর করিয়াছেন। মৈত্রী ও প্রীতির অটুট বন্ধনে আজ উভয় মহাদেশ যে বাঁধা পড়িয়াছে তজ্জন্ত, হে মহাভাগ, আপনাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।"

"নবচীনের পুনর্গঠনে আপনার কর্ম্মনিষ্ঠা, এশিয়ার নবজাগরণে আপনার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সমগ্র প্রাচ্যবাসীকে স্ব-স্ব দেশগঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ১৯৫৪ সনে আপনি ভারতে আগমন করিয়া আমাদের প্রিয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সহিত যে আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রে "পঞ্চশীল"-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বিরোধ-মীমাংসার নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। সেই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আপনাদের

আশা ছিল যে, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র এই নীতি ক্রমশঃ গ্রহণ করিবেন। সেই আশা আজ জগতের নানা মতবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সফল হইতে চলিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর শান্তি-প্রতিষ্ঠার মহৎ কাজে অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

"প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে একদা ভারতের ধর্ম্ম প্রাচীন মহাচীনের সঞ্জ্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, আজ নবমহাচীনের অপূর্ব্ব সঙ্ঘশক্তি পরাধীনতার জড়তা হইতে সগ্রজাগ্রত মহা-ভারতকে উদ্বুদ্ধ করুক।"

"আপনার অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আজ আমি চীন-ভারত-মৈত্রীর জয় ঘোষণা করি।"

পাকিস্থান ও ভারত

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থান যে মিথ্যার ধূলিজাল ফেলিয়াছে তাহাতে এমনকি আমাদের দেশের অনেকের মনে বিভ্রান্তি আসিয়া পড়ে।

পণ্ডিত নেহরু অনেকদিন পরে স্পষ্ট ভাষায় সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নীচে উদ্ধৃত করা হইল :

"নয়াদিল্লী, ৩রা ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী নেহরু আজ রাজ্যসভায় পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিতর্কের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলেন, কাশ্মীর-সমস্যা আবার নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে, এ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আমরা আদৌ উদ্বিগ্ন হই নাই। সমস্যাটি যদি তোলাই হয়, তবে উহার গোড়া ধরিয়া টান দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। সেক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে সমস্যার মূল কথাটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্যই আমরা পরিষদকে অনুরোধ জানাইব। কাশ্মীর-সমস্যার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পাকিস্থানই সেখানে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে।

ভারত পাকিস্থান আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জনাব সুরাবর্দী যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎ-সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, পাকিস্থানীরাজনীতিকদের বদ্ধমূল সংস্কার বা মনগড়া ধারণা হইতে এ ধরনের আশঙ্কা হয়ত দেখা দিয়াছে। এই বিরাট পৃথিবীতে এমন বাস্তববর্জ্জিত আশঙ্কার কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম এশিয়ার বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে একটা জিনিষ সকলেরই চোখে পড়িবে যে, ইসরাইল ও ইঙ্গ-ফরাসী অভিযানের ফলে সেখানে অনৈক্য ও বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। ইহা রোধ করিতে হইলে মিশরীয় ভূখণ্ড হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী হাঙ্গেরীর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে "ভীষণ মর্ম্মান্তিক" বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট যে রাষ্ট্র-পুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেলকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেন নাই, ইহা খুবই পরিতাপের কথা। ইহাতে লোকে যদি অনুমান করিয়া লয় যে, হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নির্ব্বাসনে পাঠাইবার যে অভি-যোগ করা হইতেছে, তাহা সত্য বা আংশিকভাবে সত্য, তবে তাহা অস্বাভাবিক হইবে না।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন, কাশ্মীর-সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া ভারত মোটেই শঙ্কিত হয় নাই। সত্যই যদি উহা তোলা হয়, তবে আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া সমস্যার গোড়া ধরিয়া টান দিতে হইবে। সেক্ষেত্রে আমরা সবার আগে পরিষদকে এই কথাটি বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিব যে, পাকিস্থান প্রথমে কাশ্মীরের উপর হামলা সুরু করিয়াছে কিনা। কাশ্মীরসমস্যার সবচেয়ে বড় কথা হইল, পাকিস্থানই সেখানে আক্রমণকারী এবং এখনও সে আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্থান এখনও অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ এই পররাজ্য আক্রমণের প্রশ্নটি এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। সমস্যার মাঝখানে ধরিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিলে গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাইবে এবং তাহাতে মীমাংসাও কোনদিন হইবে না। মিটমাটের জন্য আমরা সব সময়েই রাজী এবং এজন্য কি করণীয় তাহা পূর্ব্বে আমরা বহু বার বলিয়াছি।

শ্রীনেহরু অতঃপর বলেন, সম্প্রতি ভারতকে আক্রমণ করিয়া পাকিস্থানে বিস্তর বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে। কাশ্মীর গণপরিষদ একটি সংবিধান গ্রহণ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেটিই কারণ। কাশ্মীর গণপরিষদ গত তিন-চার বৎসর যাবৎ এই সংবিধান রচনার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই কাজ ছাড়া গণপরিষদ, আইনসভা হিসাবে ভূমিস্বত্ব-সংস্কার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি ব্যাপারে আইনপ্রণয়নও করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তাঁহারা সংবিধানের চূড়ান্ত রূপদান করিয়া-ছেন এবং সে অধিকার নিশ্চয়ই কাশ্মীরের আছে। ইহা বিচিত্র নয় যে, পাকিস্থানের লোকেরা ইহাতে একটা ধাক্কা খাইয়াছে, কেন-না, ঘটনাপ্রবাহের সহিত তাল রাখিয়া তাহারা চলে না। এই বিরাট দুনিয়ায় কোথায় কি ঘটিতেছে, সে খবর তাহারা রাখে না, এতটা পিছনে তাহারা পড়িয়া আছে। তাহাদের জন্য দুঃখপ্রকাশ ছাড়া আর কি করিবার আছে?

তিনি বলেন, পাকিস্থানে এবং মাঝে মাঝে প্রভাবশালী দুই-চারিটি বিদেশী সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইতেছে যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত যে সকল কথা দিয়াছিল, তাহা সে খেলাপ করিতেছে। এই ধরনের আরও নানা অভিযোগ করা হইতেছে। গত নয় বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দায়িত্বশীল কোন লোক বারংবার যে কি ভাবে এ ধরনের অভিযোগ করিতে পারে, তাহা ভাবিলে আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই।

পাকিস্থানের ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম যে কথাটি মনে রাখা দরকার,

তাহা ইহাই যে, পাকিস্থানই কাশ্মীর আক্রমণকারী (হর্ষধ্বনি)। এই সত্য তাহারা অস্বীকার করিতে পারে? বিষয়টি আমাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে। সবচেয়ে বড় কথা হইল পাকিস্থানই সেখানে প্রথম আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং কাশ্মীরের একাংশে এখনও তাহারা আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। গণভোটের কথা যখন হয় তখন কাশ্মীরসংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশন তাহাদের প্রথম প্রস্তাবে খোলাখুলি ভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জম্মু ও কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানী বাহিনীকে সরাইয়া লইতে হইবে। ইহা আট বছর আগের কথা। কিন্তু সে নির্দ্দেশ আজও পালিত হয় নাই। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালনে কে অপারগ হইয়াছে? অন্যান্য বাধ্যবাধকতার কথা পরে বিচার্য্য।

পাকিস্থানের সংখ্যালঘু

সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ পাকিস্থানের বর্ত্তমান কর্ণধারবৃন্দ বিষোদ্গারে অতি তৎপর হইয়াছেন। কারণ অবশ্য অন্য কিছুই নয়, নিজেদের অযোগ্যতা চাপা দেওয়া এবং অন্যের উন্নতিতে হিংসা। বিদেশে অন্য একদল নীচমনা হিংসাবাদী ইঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া এতদিন গাহিতেছিল। সঙ্গে ছিল অন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এখন মার্কিনদলে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, সুতরাং হিংসাবাদীদিগের দল ওজনে বড়ই কমিয়াছে। কিন্তু আমাদের সরকার এখনও সত্যপ্রচারে সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন।

নিম্নস্থ বিবৃতি পাকিস্থানের দুমুখো নীতির পরিচায়ক। যেমন কাশ্মীরের ব্যাপারে তেমনি সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে পাকিস্থানের চালক বর্গ শুধু অপপ্রচারের জোরে এবং আমাদের প্রচারকার্য্যে অব্যবস্থার সুযোগে সমানে দিনকে রাত করিয়া চালাইতেছে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের হুঁস হইবে কবে?

"নয়াদিল্লী, ১৪ই ডিসেম্বর—উদ্বাস্তু সম্পত্তি আইন পরিচালন ব্যবস্থা সংশোধনের জন্য উত্থাপিত বিল সম্পর্কে বিতর্কের উদ্বোধন করিয়া পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না রাজ্যসভায় এক বক্তৃতায় পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে বাস্তুত্যাগ করিয়া সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভারতে আগমন এবং এই ব্যাপারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিরক্ষায় পাকিস্থানের পুনঃপুনঃ ব্যর্থতার বিস্তৃত বিবরণ দেন। অবশেষে বিলটি রাজ্যসভায় গৃহীত হয়।

শ্রীখান্না বলেন, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ভারতে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে এক পত্র দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া সেই কারণেই তিনি পূর্ব্বপাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের দুর্দ্দশার বর্ণনা দিতেছেন।

তিনি বলেন, ভারতের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাহাদের সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিটি প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ হইতেছে যে, তাহারা ভারতের সুখী নাগরিক হিসাবেই আছে এবং ভারতের কোন অংশের মুসলমানদেরই পাকিস্থান অথবা অপর কোন দেশে চলিয়া যাইবার কোন অভিপ্রায়ই নাই। কার্য্যতঃ নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির পর লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্থান হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া যে পুনরায় বসবাস করিতেছে তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রত্যেকের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ পূর্ব্বপাকিস্থানের হিন্দু সংখ্যালঘুদের অবস্থা হইতেই প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

শ্রীখান্না বলেন, দেশবিভাগের সময় পূর্ব্ব-পাকিস্থানে এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সনে দেশবিভাগের পরে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের হিন্দুদের প্রথম বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হয়। এই সময় প্রায় দশ লক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া আসে। ১৯৪৯ সনে কিছু সময়ের জন্য বাস্তুত্যাগ বন্ধ ছিল, কিন্তু ১৯৫০ সনে পুনরায় পূর্ণবেগে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হয়।

শ্রী খান্না বলেন, ১৯৫০ সালের বাস্তুত্যাগের ফলে অবস্থা এত সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন পাক-প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের মধ্যে বিষয়টি আলোচনার প্রয়োজন হয়। সেই আলোচনার ফলেই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পন্ন হয়। উক্ত চুক্তিতে পাকিস্থান প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অতঃপর হিন্দুরা যাহাতে নিরাপত্তা ও মর্য্যাদাসহ পূর্ব্বপাকিস্থানে বসবাস করিতে পারে সরকার তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। প্রয়োজন না থাকিলেও ভারত সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীখান্না বলেন, পাকিস্থান প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের মনে শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। ১৯৫১ ও ১৯৫২ সনে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ের মধ্যে সাত লক্ষাধিক হিন্দু ভারতে চলিয়া আসে।

১৯৫৩ সনে পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে বাস্তুত্যাগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও বাস্তুত্যাগের হার ছিল গড়ে মাসে ছয় সহস্রাধিক। খুব অল্পকাল এই অবস্থা ছিল এবং ১৯৫৪ সনে বাস্তুত্যাগের হার বৃদ্ধি পাইয়া মাসিক দশ হাজারে দাঁড়ায়। সেই সময় হইতেই বাস্তুত্যাগ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে এবং ১৯৫৫ সনে গড়ে মাসিক হার দাঁড়ায় ২০ হাজার এবং ১৯৫৬ সনের প্রথম ৮ মাসে উহা ৩৫ হাজার পর্য্যন্ত উঠে।

তিনি বলেন, দেশবিভাগের পর এযাবৎ ৪০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে।

পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী অতঃপর পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে গত বৎসর এপ্রিল মাসে পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ্জার সহিত তাঁহার আলোচনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট নানা প্রকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আশ্বাস দেন। সেই সময় এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, পশ্চিম পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে খোকরাপাড়ায় একটি চেক পোষ্ট স্থাপন করা হইবে।

শ্রীখান্না বলেন, আমরা চুক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়াছি এবং

চেক পোষ্ট স্থাপন করিয়াছি এবং ভারত হইতে কোন মুসলমান পাকিস্থানে যায় নাই। কিন্তু পাকিস্থান সম্পর্কে বিপরীত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে সংখ্যালঘুদের আগমন ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে উহা ৫০ হাজার পর্য্যন্ত উঠে।

শ্রীখান্না অতঃপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাক্-ভারত প্রতিনিধিদের সম্মেলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পাকিস্থান হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারত হইতে প্ররোচনা পাওয়ায় প্রতিশ্রুত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও হিন্দুরা ভারতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা সত্য নয়। নয় বৎসরের অধিককাল পাকিস্থানের অনুগত নাগরিক হইবার চেষ্টা করিবার পর তাহারা পাকিস্থানে মর্য্যাদা লইয়া বাস করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছে।

শ্রীখান্না বলেন, অবস্থা এত দূর খারাপ হইয়া পড়িয়াছে যে, সম্প্রতি বাস্তুত্যাগীরা বৈধ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া অথবা জাল সার্টিফিকেট লইয়া ভারতে আসিতেছে তাহাও বিচার করিয়া দেখা হইতেছে।

অতঃপর হিন্দুরা যাহাতে তাহাদের পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার জন্ত তিনি পাক্ প্রেসিডেণ্টকে তাঁহারপ্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং ডাঃ খান সাহেবের নিকট আবেদন জানান।

ভারত ও কাশ্মীর

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সংবাদ যাহা ১৮ই নবেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"শ্রীনগর, ১৭ই নবেম্বর—অদ্য কাশ্মীর গণ-পরিষদে রাজ্যের সংবিধান গৃহীত হয়। উহাতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে এই সংবিধান কার্য্যকরী হইবে।

অন্যান্ত বিষয় ছাড়াও সংবিধানে দুইটি সভা সংবলিত আইন-সভা, স্বাধীন বিচার বিভাগ, নির্ব্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও রাজ্যের জন্ত একটি সাংস্কৃতিক আকাদামী গঠনের বিধান আছে। ইহাতে কাশ্মীরে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ গঠনেরও পরিকল্পনা আছে।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী গণ-পরিষদ বাতিল করার জন্ত খসড়া প্রণয়ন কমিটির সেক্রেটারী সৈয়দ মীর কাসিম যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, গণ-পরিষদে তাহাও গৃহীত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, রাজ্যের জন্ত সংবিধান প্রণয়নের ও উহা গ্রহণ করাইবার কাজ শেষ হইয়াছে এবং সেই জন্তই গণ-পরিষদ বাতিল হওয়া উচিত।

অদ্যকার আলোচনায় যে ছয় জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন তাঁহারা রাজ্যের ভারতভুক্তি-সংবলিত বিধানে আনন্দপ্রকাশ করেন।

মিশরে আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী

৪ঠা নবেম্বর এক জরুরী অধিবেশনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ মিশরে যুদ্ধবিরতি তদারক করিবার জন্ত একটি আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে] নরওয়ে, কানাডা এবং কলম্বিয়া। প্রস্তাবটি ৫৭-০ ভোটে গৃহীত হয়—আঠারটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, মিশর, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ।

স্থির হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে এবং বাহিনীর অধ্যক্ষ হইবেন কানাডার মেজর-জেনারেল ই. এল. এম. বার্ণস। "বৃহৎ" পঞ্চশক্তি (নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ) যথা—ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন (ফরমোসা) হইতে কোন সৈন্ত আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে থাকিবে না বলিয়া স্থির হয়।

৭ই নবেম্বর গৃহীত দ্বিতীয় একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীটির কার্য্যকাল সাময়িক এবং উহা সুয়েজ অঞ্চল হইতে ১৯৪৯ সনে নির্দ্ধারিত মিশর-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি সীমারেখা পর্য্যন্ত মিশরীর অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি টহল দিয়া বেড়াইবে। প্রস্তাবটি বিনা প্রতিবাদে ৬৪টি রাষ্ট্রের সমর্থনে গৃহীত হয় ; মিশর, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সোভিয়েট গোষ্ঠীসহ বারটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উক্ত প্রস্তাবগুলির অনুযায়ী যে আন্তর্জ্জাতিকবাহিনী গঠিত হয় তাহার অগ্রগামী দল ১৩ই নবেম্বর মিশরে সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করে। আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে তেইশটি দেশের সৈন্ত অংশগ্রহণ করিয়াছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত প্রায় চার হাজারের মত আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীর সৈন্ত মিশরে উপস্থিত হয়।

ভারত-সরকার আন্তর্জ্জাতিক বাহিনীতে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্ত পাঠাইয়াছেন এবং তাহা গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় বাহিনীর সৈন্তগণও ইতিমধ্যেই মিশরে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

৭ই নবেম্বর একটি প্রস্তাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েলকে মিশর হইতে সৈন্ত অপসারণ করিবার জন্ত নির্দ্দেশ দেন। প্রস্তাবটি ৬৫-১ ভোটে গৃহীত হয়—দশটি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। ৮ই নবেম্বর ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন যে, কোন্ তারিখে ব্রিটিশ সৈন্ত অপসারণ করা হইবে তিনি তাহা বলিতে পারেন না। ১৯শে নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট লিখিত একটি স্মারকপত্রে মিশর সরকার অভিযোগ করেন যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্ত করিয়া সৈন্ত অপসারণে অযথা বিলম্ব করিতেছে। ২০শে নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ হ্যামারশীল্ড ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েলের নিকট সৈন্ত অপসারণের বিলম্বের কারণ জানিতে চান। উত্তরে ব্রিটিশ সরকার "সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ" এক ব্যাটালিয়ান সৈন্ত অপসারণ করিতে স্বীকৃত হন। ২৪শে নবেম্বর

রাষ্ট্রসঙ্ঘ পুনরায় আর একটি প্রস্তাবে মিশর হইতে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইসরায়েলী বাহিনী অপসারণের দাবি জানায়। প্রস্তাবটি ৬৩-৫ ভোটে গৃহীত হয়; দশটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে; নিকারাগুয়া অনুপস্থিত ছিল। যে পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে তাহারা হইল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইসরায়েল, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড। অপর একটি প্রস্তাবে সুয়েজ খাল পরিষ্কার করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্ত সেক্রেটারী-জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৩রা ডিসেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতায় পররাষ্ট্রসচিব মিঃ সেল্‌ইন লয়েড বলেন যে, মিশর হইতে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদল অবিলম্বে সরাইয়া লইতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকার সম্মত হইয়াছেন। তিনি জানান যে, মিশরস্থিত বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ জেনারেল স্তর চার্লস কেটলীকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—তিনি যেন মেজর-জেনারেল বার্ণসের সহিত সৈন্ত অপসারণের সময় সম্পর্কে যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মিঃ লয়েড আরও বলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অভিমতে গাজা অঞ্চল হইতেও ইসরায়েলী সৈন্ত সরাইয়া ঐ স্থানে আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করা প্রয়োজন।

৬ই ডিসেম্বর প্রথম ব্রিটিশ সৈন্তদল মিশর ত্যাগ করিয়া গৃহ অভিমুখে রওনা হয়।

পণ্ডিত নেহরুর মার্কিন যাত্রা

জগতের এই চরম সঙ্কটের দিনে পণ্ডিত নেহরু চলিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানের সহিত বিচার ও আলোচনায় পরস্পরের মনের কথা জানিতে ও জানাইতে। তাঁহার কার্য্যসূচী নিম্নে দেওয়া গেল:

"নয়াদিল্লী, ১২ই ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আট দিনব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফরের কার্য্যসূচী অদ্য রাত্রিতে এখানে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই কার্য্যসূচী অনুসারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতঃকালে নয়াদিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে লণ্ডনে পৌঁছিবেন। লণ্ডনে কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর আরম্ভের জন্ত রবিবার মধ্যাহ্নে ওয়াশিংটনে পৌঁছিবেন। এই দিন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবেন।

পরদিবস, ১৭ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্টের অতিথি ভবন ব্লেয়ার হাউস হইতে মোটরযোগে গেটিসবার্গস্থিত প্রেসিডেণ্টের খামারবাড়ী পরিদর্শনের জন্ত গমন করিবেন। তথায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই দিন রাত্রিতে প্রধানমন্ত্রী মার্কিন বেতার ও টেলিভিশন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তৃতা প্রচার করিবেন। ১৯শে ডিসেম্বর তিনি স্তাশনাল প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হইবেন।

অতঃপর শ্রীনেহরু বিমানযোগে নিউইয়র্ক গমন করিয়া তথায় দুই দিনব্যাপী অবস্থানকালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারশেল্ড এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ১১শ অধিবেশনের সভাপতি প্রিন্স ওয়ানের সহিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ভবনে সাক্ষাৎ করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ২২শে ডিসেম্বর অটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রিতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ত ২২শে ডিসেম্বর অটোয়া হইতে বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা করিবেন।

আরিয়ালুর রেল দুর্ঘটনা

২৩শে নবেম্বর মাদ্রাজ হইতে ১৭০ মাইল দূরবর্তী আরিয়ালুর নামক স্থানে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন এবং সাতটি বগি সেতুর বাঁধ ভাঙিয়া মরুদয়ার নদীতে পড়িয়া যাওয়ায় ১৫৫ জন নিহত ও আরও শতাধিক লোক আহত হয়। দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করেন—যথাসময়ে সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

২৬শে নবেম্বর পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত ব্যতীত একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্তও করা হইবে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীহিমাংশুকুমার বসু এই তদন্ত পরিচালনা করিবেন।

অনুরূপ দুর্ঘটনা বন্ধের জন্ত সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীশাস্ত্রী বলেন, রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলপথসমূহের সকল সেতু, বাঁধ এবং সেতুর ভিতর দিয়া যে সকল প্লাবন চলিয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষা ও প্লাবনের সময় রেলপথ পর্য্যবেক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রাক্তন নিজাম রেলপথের সেতুগুলি পরীক্ষা করার জন্ত তিন জন ইঞ্জিনীয়ার লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে সকল সেতুর গঠন-প্রকৃতি এবং সেতুর মধ্য দিয়া কিরূপ জল যায়—তাহার সন্ধান লইতে বলা হইয়াছে। সেতুর সংলগ্ন রেলের বাঁধের অবস্থাও পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী আরও জানান যে, যাঁহারা দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছেন তাঁহাদের চিকিৎসার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং ত্রিচিনাপল্লীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্যদানের জন্ত তহবিল খুলিয়াছেন। মাদ্রাজের সিটি সিভিল কোর্টের বিচারক শ্রী ভি. রথনম মুদালিয়র ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্ত নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই তিনি তাঁহার কার্য্য শুরু করিবেন।

১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে গণনা করিলে আরিয়ালুর দুর্ঘটনা ত্রয়োদশ বৃহৎ রেল দুর্ঘটনা। ইহাদের অনেকগুলির মধ্যেই বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় জনসাধারণের ভিতরে রেল বিভাগের

কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে উদ্বেগ দেখা দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। দুর্ঘটনা সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বিতর্কের সময় স্বভাবতঃই রেল বিভাগকে বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। কম্যুনিষ্ট, প্রজাসোশ্যালিষ্ট এবং একজন কংগ্রেস সদস্য রেলবিভাগের, বিশেষতঃ রেলওয়ে বোর্ডের কার্য্যাবলীর কড়া সমালোচনা করেন। মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনী কিন্তু রেল বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার জন্য নিম্নতম কর্ম্মচারীদের উচ্ছৃঙ্খলতাকেই দায়ী বলিয়া অভিহিত করেন।

বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রেল বিভাগের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান রেলওয়ে বোর্ড অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর বোর্ড তিনি চিন্তাও করিতে পারেন না। শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, নিম্নস্তরের কর্ম্মীদের একাংশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিলেও তাহারা রেলবিভাগের উন্নতিবিধানের জন্য বিশেষ দায়িত্ব বহন করিয়াছে।

রেল বিভাগের সমর্থনে রেলমন্ত্রী যাহা বলেন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন। রেল বিভাগের সকল বিভাগই যদি নির্দ্দোষ তবে এইরূপ ঘন ঘন দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির জন্য কি কেহই দায়ী নহে? ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীশাস্ত্রী বর্ত্তমান বোর্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোর্ড কল্পনাও করিতে পারেন নাই। শেষ বিচারে রেল বিভাগের সকল কার্য্যের দায়িত্ব রেলওয়ে বোর্ড এবং রেলবিভাগীয় মন্ত্রীর। মাত্র দুইমাস পূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে হায়দরাবাদের মহবুবনগরে ঠিক অনুরূপ একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার পরই সম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। মহবুবনগর দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে সরকার হইতে জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া বলা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ ভারতের সকল রেলসেতুগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। কিন্তু তাহা করা হইয়াছিল কি?

প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হয় নাই। সেতুগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের নাম স্থির করিতেই দুই মাস কাটিয়া গেল। রেল বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীআলাগেসন বলিয়াছেন যে, এখন হইতে বর্ষার সময় সেতুগুলি পর্য্যবেক্ষণের জন্য স্থায়ী প্রহরার বন্দোবস্ত করা হইবে। তাঁহার কথায় মনে হয় যে, এটি একটি নূতন ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। রেলবিভাগের নির্দ্দেশনামাতেই এই ব্যবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে। যদি এতদিন পর্য্যন্ত এই নির্দ্দেশ কার্য্যতঃ প্রতিপালিত না হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য দায়িত্ব কাহার?

৫ই ডিসেম্বর লোকসভায় রেল বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীআলাগেসন ঘোষণা করেন যে, সেতুর জলনিষ্ক্রমণের পরিমাণ নিরূপণের জন্য শীঘ্রই রেলওয়ে ও সরকারী মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধি লইয়া একটি উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট কমিটি নিয়োগ করা হইবে। ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাক্তন হায়দরাবাদ রাজ্যের জলগাঁওয়ের ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারী রেলওয়ে ইনস্পেক্টর যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহার উপর ৫ই ডিসেম্বর দুই ঘণ্টা স্থায়ী বিতর্কের অবসানে শ্রীআলাগেসান উক্ত ঘোষণা করেন।

প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংবাদে প্রকাশ, বিতর্কের সময় লোকসভায় রেলের কার্য্যপরিচালনার তীব্র সমালোচনা করা হয়। উপযুক্তরূপে রেলসেতুসমূহ রক্ষা না করার কথা উল্লেখ করিয়া এই অভিযোগ করা হয় যে, জলগাঁও দুর্ঘটনার পর রেলকর্ত্তৃপক্ষ সচেতন হইলে মহবুবনগর ও আরিয়ালুর দুর্ঘটনা নিবারণ করা সম্ভব হইত।

উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী সদস্য শ্রীফিরোজ গান্ধী বলেন, জলগাঁও দুর্ঘটনার প্রধান কারণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের শৈথিল্য—রেলপথ ঠিকভাবে রক্ষা করা তাঁহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে, ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, সেতুটি বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল, তথাপি সেই সম্পর্কে কোন যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বিত হয় নাই।

রেলে দুর্ব্বৃত্তের উৎপাত

নীচের সংবাদটি আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। দেশের শান্তিশৃঙ্খলার ব্যবস্থার কতদূর অবনতি হইলে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হয় তাহা ভাবা প্রয়োজন। ইহার প্রতিকার কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে সেকথা জনসাধারণের চিন্তার বিষয়।

"শনিবার সন্ধ্যায় ক্যানিং লাইনের কলিকাতাগামী একটি লোক্যাল ট্রেনের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় একদল দুর্বৃত্ত মত্ত অবস্থায় প্রবেশ করিয়া একজন মহিলা যাত্রীর উপর অশোভন আচরণ করিতে থাকিলে উক্ত কামরায় ৪৫টি যুবক মহিলাকে দুবৃর্ত্তদের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া ভীষণ ভাবে প্রহৃত হন। সন্ধ্যা অনুমান ৬ ঘটিকার সময় ঘুটিয়ারিশরীফ ষ্টেশনে এই ঘটনা হয়। দুর্বৃত্তদের ভয়ে ঐ কামরার অপরাপর যাত্রীরা অন্য কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তালদি ষ্টেশন হইতে ঐ দুর্বৃত্তদল মত্ত অবস্থায় লাঠি হাতে ঐ কামরায় উঠে। তাহারা একজন মহিলাযাত্রীর পায়ের উপর গিয়া পড়ায় মহিলাটি প্রতিবাদ করিয়া উঠিলে দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে গালিগালাজ করিতে থাকে এবং তাঁহার সহিত অশোভন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। ঐ কামরার ভ্রমণরত গড়িয়ার ৪।৫টি চাউল ব্যবসায়ীর ছেলে দুর্বৃত্তদের এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায় এবং মহিলাকে তাহাদের কবল হইতে রক্ষার চেষ্টা করে। দুর্বৃত্তগণ ঐ সময় উহাদের ভীষণ ভাবে প্রহার করে। ভীতিবিহ্বল হইয়া কামরার যাত্রীরা ইতস্ততঃ পলায়ন করে। অভিযোগে প্রকাশ, ঐ ট্রেনে যে সমস্ত প্রহরী ছিল তাহারা নির্ব্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। দুর্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে মহিলাকে এবং যুবককয়টিকে রক্ষায় কোন চেষ্টাই নাকি উহারা করে নাই।

প্রকাশ, পিয়ালী ষ্টেশনে দুর্বৃত্তদলের কয়েকজন নামিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। চাম্পাহাটি ষ্টেশনে ট্রেনখানি থামিলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত চাউল ব্যবসায়ীদের চাউলগুলি ট্রেন হইতে নামাইতে থাকে। কিন্তু ঐ সময় ইউনিফর্ম্মধারী একজন পুলিশ ঐ স্থানে আসিয়া পড়ায় গুণ্ডারা পলায়ন করে।

এই ঘটনার দরুন ট্রেনখানির শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিতে প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব হয়।

ক্যানিং লাইনের ট্রেনে সন্ধ্যার পর ভ্রমণ করা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া শনিবার একজন রেলযাত্রী রেলকর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে ঐ লাইনে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, সন্ধ্যার দিকে ইতঃপূর্ব্বে তালদি, ঘুটিয়াবিশরীফ ও পিয়ালীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে চলন্ত ট্রেনে লুঠতরাজ ও রাহাজানির কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে। যাত্রীদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

কঠোর হস্তে দুর্বৃত্তদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করা একান্ত দরকার বলিয়া যাত্রীসাধারণ বিশেষ ভাবে মনে করেন।

ভারতে খাদ্যশস্য

"নয়াদিল্লী, ২১শে নবেম্বর—কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ রাজ্যসভায় বলেন যে, খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ভারত কবে ও কতখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহা অনুমান করা খুবই শক্ত।

সদস্যবর্গের উপর্য্যুপরি প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, একদিকে যেমন খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি জনসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সেই সঙ্গে পুষ্টির মানেরও উন্নতি ঘটিতেছে। মুখ্যতঃ ইহা চাহিদা ও সরবরাহের প্রশ্ন। দেশে আরও বেশী খাদ্য উৎপন্ন হইলেও ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতেই হইবে।

খাদ্যমন্ত্রী জানান যে, ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সংরক্ষিত শস্যভাণ্ডারে ২,৩৭,৫৪৩ টন খাদ্যশস্য মজুত ছিল।"

আমাদের প্রশ্ন এই যে তবে প্রথম পাঁচসালা নক্সার ফল হইল কি? নক্সায় কি ভুল ছিল?

প্রেস কাউন্সিল বিল

প্রেস কমিশনের আর একটি প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে চলিয়াছে। নীচের সংবাদে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

"১১ই ডিসেম্বর—দুই দিন বিতর্কের পর মঙ্গলবার রাজ্যসভায় প্রেস কাউন্সিল বিল গৃহীত হয়।

তথ্য এবং বেতারমন্ত্রী ডাঃ কেশকার প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ সম্পর্কে ডঃ এইচ এন. কুঞ্জরুর একটি সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ঐ সংশোধন প্রস্তাব অনুযায়ী রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, লোকসভার অধ্যক্ষ এবং ভারতের প্রধান বিচারপতিকে লইয়া গঠিত এক কমিটি প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবেন। মূল বিলে রাষ্ট্রপতির উপর দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। অদ্য রাজ্যসভায় বিলটির আলোচনাকালে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণসংক্রান্ত তিনটি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করিয়া ডাঃ কেশকার বলেন যে, প্রেস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রেস কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থায় কোনরূপ মৌলিক পরিবর্ত্তনে সরকার সম্মত হইবেন না।

প্রেস কাউন্সিল যাহাতে কোন সাংবাদিককে সংবাদের সূত্র-প্রকাশে বাধ্য করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিলে একটি ধারা সন্নিবিষ্ট করার জন্য কংগ্রেসী এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ডাঃ কেশকার বলেন, তিনি ইহা চিন্তা করিতে পারেন না যে, প্রধানতঃ সাংবাদিকদের লইয়া গঠিত কোন সংস্থা কোন সাংবাদিককে সংবাদের সূত্র সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করিতে পারেন, যাহাতে ঐ সাংবাদিক বিব্রত বোধ করিবেন। বিলে এই বিষয় সম্পর্কে কোন ধারা সন্নিবিষ্ট না হইলে সাংবাদিকদের অধিকার ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।"

রাজ্য পুনর্গঠন

১লা নবেম্বর হইতে ভারতের মানচিত্রের বিপুল আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের রাজ্যগুলি যখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মানচিত্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে। ১লা নবেম্বর হইতে নূতন রাজ্যগুলির সৃষ্টি হওয়ায় ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মানচিত্রের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সূচিত হইল।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের প্রশাসনিক ইউনিট ২৯টি হইতে কমিয়া ২০টিতে দাঁড়াইয়াছে। নূতন কুড়িটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই ছয়টি অঞ্চল ব্যতীত অপরাপর চৌদ্দটি রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক কোন বৈষম্য থাকিবে না। নবগঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে বোম্বাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং কেরালা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট।

পুনর্গঠনের পর ভারতের রাজ্যগুলির নাম নিম্নরূপ :

(ক)—রাজ্য

	নাম	রাজধানী
১।	মহীশূর	বাঙ্গালোর
২।	রাজস্থান	জয়পুর
৩।	কেরালা	ত্রিবান্দ্রম্
৪।	অন্ধ্র	হায়দরাবাদ
৫।	বোম্বাই	বোম্বাই
৬।	মধ্যপ্রদেশ	ভূপাল
৭।	পঞ্জাব	চণ্ডীগড়
৮।	উড়িষ্যা	ভুবনেশ্বর
৯।	আসাম	শিলং
১০।	পশ্চিমবঙ্গ	কলিকাতা
১১।	বিহার	পাটনা
১২।	উত্তর প্রদেশ	লক্ষ্ণৌ
১৩।	মাদ্রাজ	মাদ্রাজ
১৪।	জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর

(খ)—কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

১।	দিল্লী	দিল্লী
২।	হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
৩।	ত্রিপুরা	আগরতলা
৪।	মণিপুর	ইম্ফল
৫।	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	পোর্ট ব্লেয়ার
৬।	লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় এবং আমিন দ্বীপ।	

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার প্রখ্যাত লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৮ বৎসর।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১০ সনে তিনি ডুমকায় জন্মগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া তিনি বাঁকুড়াতে আই-এসসি পড়েন। পরে যখন তিনি গণিত বিষয়ে অনার্স লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন তখন হইতেই সাহিত্যরচনার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছদ্মনামে গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরেই বাংলার সাহিত্যজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রায় ৫৭ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, ইতিকথার পরের কথা, সহরবাসের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, সোনার চেয়ে দামী, ভেজাল, বৌ ইত্যাদি গ্রন্থ সবিশেষ পরিচিত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুবই স্বাতন্ত্র্য ও সাহস দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও তাঁহার অকৃত্রিম ছিল। বাংলা সাহিত্য-জগতের সেদিক হইতে ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

কলিকাতার পথঘাট

কলিকাতার লরী, ট্যাক্সীচালক ও কতকগুলি অতি দুর্মতি ও দুর্বিনীত যুবক মোটরচালকের উৎপাতে পথে চলা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে লরীচালকদের অধিকাংশই সর্ব্বাপেক্ষা দুরাচার ও নিয়মশৃঙ্খলার অন্তরায়। ইহাদিগকে কঠোর ভাবে শাস্তি না দিলে নিম্নস্থ ঘটনার পুনরাবৃত্তি অনিবার্য্য।

"বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে এক মর্ম্মান্তিক বাস দুর্ঘটনার ফলে শ্রীশরৎচন্দ্র দাস নামক জনৈক শিক্ষক গুরুতর আহত হন এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বাসের দুই জন কণ্ডাক্টার, এক জন দোকানদার এবং এক জন পথচারীও সামান্য আহত হন। বাসচালককে পুলিস পরে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ৩৬নং রুটের একখানি ফাঁকা বাস বেলা আড়াইটা নাগাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের বাঁক ঘুরিয়া বেলিয়াঘাটা মেন রোডে পড়িবার সময় অকস্মাৎ উহার ব্রেক বিকল হইয়া যায় এবং বাসখানি টাল খাইয়া পার্শ্ববর্তী ড্রেনে পড়িয়া যায়। বাসের সম্মুখভাগ ড্রেনের অপর পার্শ্বে একটি পানের দোকানের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ফলে দোকানী আহত হয় এবং দোকানঘরটির বিশেষ ক্ষতি হয়।

জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতাল

সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা ২৯শে কার্ত্তিক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালটি রঘুনাথগঞ্জ শহরে প্রতিষ্ঠার কথা আমরা বহুদিন হইতেই শুনিতেছি। ইহার জন্ত প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন, স্থান নির্ব্বাচন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণের আলাপ-আলোচনা ও স্থান পরিদর্শন এবং শেষ পর্য্যন্ত কমিটি কর্ত্তৃক সরকার নির্দ্দিষ্ট টাকা জমা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য বহু পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। গত বৎসরের শেষে কিংবা এই বৎসরের প্রথমেই ইহার কার্য্য সুরু করা হইবে এরূপ গুজবও আমরা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে কোন সাড়াশব্দ আমরা পাইতেছি না।"

"ভারতী" বলিয়াছেন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারী দীর্ঘসূত্রিতা রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতেও যে, সকল চেষ্টা করা হইয়াছে এরূপ কথা বলা চলে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উপর অভিভাবকত্ব ছাড়িয়া দিয়া যদি জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে ত এই শ্রেণীর অভিভাবকদের কর্ম্মে শিথিলতা আসাই স্বাভাবিক—এই কথা স্থানীয় জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়া "ভারতী" লিখিতেছেন :

"যখনই আমরা কোন এক গোষ্ঠীর উপর কোন কার্য্যসাধনের ভার দিব তখনই তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি না করেন তৎপ্রতি আমাদের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—ইহাই চিন্তা করিয়া আজ কমিটির সভ্যগণকে, বিশেষ করিয়া ইহার কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে, এই ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হইবার জন্ত যদি আমরা চাপ দিতে না পারি ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উৎসাহী হইয়া উঠিতে না পারি তবে হয়ত উক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপার আরও দীর্ঘ দিন পিছাইয়া যাইতে পারে।"

জঙ্গীপুরে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই একমত। স্থানীয় মহকুমা-শাসক হাসপাতাল কমিটির সভাপতি। তিনি সচেষ্ট হইলে সরকারী বিভাগ অধিকতর সক্রিয় হইতে পারে এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাও ত্বরান্বিত হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বিচারবিভাগের পৃথক করণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে বিচারবিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হইবে। এই সম্পর্কে ১৪ই অগ্রহায়ণ "যুগান্তর" পত্রিকায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ

"বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে শাসনবিভাগ হইতে পৃথক করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্তের ফলে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকদের হাতে আর কোন বিচার-ক্ষমতা থাকিবে না এবং শাসনবিভাগের প্রভাব-মুক্ত হইয়া বিচারবিভাগ একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ আমল হইতেই জাতির নেতৃবৃন্দ আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র সাংবাদিকদের নিকট এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, এই সংস্কারের ফলে জনসাধারণকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচারের সুযোগ দেওয়া হইতেছে এবং দীর্ঘকালের একটি আন্দোলন আজ সাফল্যলাভ করিতেছে। তিনি জানান যে, এই সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন, ভারতীয় সংবিধানের একটি ধারায় এই নীতি স্বীকার করা হইয়াছে যে, শাসনকর্ত্তারূপে যিনি কোন মামলার সহিত কোনভাবে জড়িত রহিয়াছেন তাঁহার হাতে বিচারকর্ত্তার ক্ষমতা রাখা ন্যায়সঙ্গত নয়।

রাজ্যসরকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা সংক্রান্ত মামলাগুলিকে শাসনবিভাগের হাতে রাখা হইবে।

বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করার এইরূপ সিদ্ধান্ত ইতিপূর্ব্বে উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে কার্য্যকরী হইয়াছে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুবিখ্যাত আইনবিদ্ মেরিডিথের কথায় উদ্ধৃতি করিয়া বলা যায় যে, কোন বিচারক মামলার জয়-পরাজয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জড়িত থাকিলে তাঁহার দ্বারা সত্যকার নিরপেক্ষ বিচার হওয়া কখনই সম্ভব নহে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশবিভাগের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন ও শাসন-ব্যবস্থা অটুট রাখা সম্পর্কে তিনি প্রায়ই পুলিশবিভাগীয় কর্মচারীগণের সহিত গোপন সভায় মিলিত হইয়া থাকেন। কাজেই জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কোন বিচারকর্ত্তার যদি পদোন্নতি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ঘটে, তাহা হইলে সেই বিচারকর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ চাহিয়া বিচারের রায় দিবেন, ইহা অসম্ভব নয়। বিচার ও শাসনবিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়াই এই দুইটি ক্ষতকে সমাজ-জীবন হইতে অপসারণ করা সম্ভব।

আইনবিদ্ মেরিডিথের এই নীতি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গে নূতন ব্যবস্থা চালু করিবার পর এই নীতির বাস্তবরূপ পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভার অধিবেশনে অবশ্য স্থির হইয়াছে যে, দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত ফৌজদারীর ১৪৪ ধারায় পূর্ণ দায়িত্ব শাসনবিভাগীয় দপ্তরের হাতে থাকিবে।

বিচারমন্ত্রী আরও জানান যে, নূতন ব্যবস্থা চালু হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের সহিত সদ্য অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশের জন্য আরও ৫৬ জন ছোট-বড় বিচারক প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানের যুক্ত শাসন ও বিচার বিভাগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিচারবিভাগের উপর জেলা-জজ ও হাইকোর্টের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে এবং ইহা একটি সম্পূর্ণভাবে পৃথক বিভাগে রূপান্তরিত হইবে। শাসনকর্ত্তার উপর শাসন-ব্যবস্থা ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব থাকিবে। মহকুমাস্তরের বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থাকেও অনুরূপভাবে বিভক্ত করা হইবে।"

বাংলার আঞ্চলিক বাহিনী

নিম্নে আমরা রাজ্যপালের বক্তৃতার সারাংশ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিলাম।

এই সম্পর্কে আমাদের বলা প্রয়োজন যে, বাংলার আঞ্চলিক বাহিনী বিষয়ে আজ পাঁচ বৎসর কোনও প্রচার বা সক্রিয় চেষ্টার কথা আমরা শুনি নাই। সুতরাং দেশের যুবকগণের দোষ কোথায়?

—"১৭ই নবেম্বর শনিবার আঞ্চলিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শুক্রবার অপরাহ্নে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এক বাণীতে ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীতে আরও অধিক সংখ্যায় যোগদানের আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ এই আঞ্চলিক বাহিনী দেশের প্রতিরক্ষায় সুশৃঙ্খল প্রস্তুতির প্রতীকস্বরূপ। সুতরাং আঞ্চলিক বাহিনীকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা দেশের যুবকদের শিক্ষার একটি মূল্যবান অংশ।

শ্রীমতী নাইডু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দেশের যুবকগণ এই বাহিনীর গুরুত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়। তিনি গুরুত্ব দিয়া বলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে নাগরিক কর্ত্তব্য পালনের ব্যর্থতার ফলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার মূল ভিত্তি বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারে।

১৭ই নবেম্বর আঞ্চলিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় নিম্নরূপ বাণী দিয়াছেন:

'অদ্য অপরাহ্নে আঞ্চলিক বাহিনীর অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই উপলক্ষে আমার এই রাজ্যের যুবকবন্ধুদের আমি এই বাহিনীতে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় যোগ দিতে পুনরায় আহ্বান জানাইতেছি। ইহা নাগরিকদিগেরই বাহিনী; এই বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকেরা আধুনিক যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন, যাহাতে প্রয়োজন হইলে মাতৃভূমির রক্ষায় তাঁহারাও স্থায়ী সেনাবাহিনীর ভ্রাতৃবৃন্দের পাশে দাঁড়াইতে পারেন। স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের দেশরক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে দ্রুত বিরাট বাহিনী গঠন ও শিক্ষণের সময় পাওয়া যায় না। প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি আজ ক্রমশঃ এত জটিল ও ব্যয়বহুল হইয়া পড়িয়াছে যে, একটি

স্থায়ী বিরাট বাহিনী রাখিতে হইলে সকল দেশের আর্থিক অবস্থার উপরই খুব বেশী চাপ পড়ে। ভারতের ক্ষেত্রে একথা আরও অধিক প্রযোজ্য, কেননা এখানে প্রতিটি উদ্বৃত্ত পাই উন্নয়ন-কার্য্যসূচীর জন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, এই রাজ্যে আঞ্চলিক বাহিনীর ডাকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই, রাজ্যের জন্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যায় এবং জেলায় জেলায় এই সংস্থা প্রসারিত করার পরিকল্পনাও সফল হয়, তদুদ্দেশ্যে দলে দলে আগাইয়া আসিবার জন্ত আমি আমার তরুণ বন্ধুদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। দেশের সেবায় বাংলা কখনও পিছাইয়া থাকে নাই, এখনও থাকিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

ড. আম্বেদকর

এদেশের অনুন্নত শ্রেণীর নেতা ও নির্ভীক চালকরূপে ডাঃ আম্বেদকর দীর্ঘ দিন এই দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন। তাঁহার মতামতে অনেক সময় ভুল দেখা গিয়াছে, কিন্তু জানতঃ অসত্যাচরণ তিনি করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুতে তপশীলী শ্রেণী বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইল। নীচে তাঁহার মৃত্যুসংবাদের বিবৃতি দেওয়া হইল।

"নয়াদিল্লী, ৬ই ডিসেম্বর—তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব আইনমন্ত্রী ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর আজ সকালে এখানে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বিগত কিছুকাল যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। গত মঙ্গলবার দিন তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগ দেন। গতকাল মধ্যরাত্রে যখন তিনি শয্যা গ্রহণ করেন তখনও তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আজ সকালে যখন তাঁহার কক্ষে চা লইয়া যাওয়া হয় তখন তাঁহার জীবনদীপ নিভিয়া গিয়াছে।

তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইবার অব্যবহিত পরই মন্ত্রিসভা এবং সংসদের সদস্যগণ তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্ত তাঁহার আলীপুর রোডস্থ বাসভবনে গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, সংযোগরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি রাও প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃতের স্মৃতির প্রতি সম্মান নিবেদনকল্পে আজ সংসদের উভয় সভায় অধিবেশন প্রশ্নোত্তরের পর স্থগিত রাখা হয়। আজ রাত্রি ৮টায় বিমানযোগে তাঁহার মৃতদেহ বোম্বাইয়ে লইয়া যাওয়া হয়।

ভূতপূর্ব্ব আইনমন্ত্রী ও ভারতের সংবিধানের রচয়িতা ড. আম্বেদকরের মৃত্যু-সংবাদে সংসদের সদস্যগণ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। গত পরশুও তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায়ই ছিলেন এবং তাঁহাকে বন্ধুবর্গের সহিত কথা বলিতে ও হাস্যপরিহাস করিতে দেখা গিয়াছিল।

সম্প্রতি দুই লক্ষাধিক অনুগামীসহ তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

রাজ্যসভায় ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁহাকে অস্পৃশ্যদের উপর সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করেন।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

বিগত ১৫ই অক্টোবর, উননব্বই বৎসর বয়সে বহু শাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা নগরীর সিমলা অঞ্চলস্থ তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। ঋষিকল্প মহেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা। তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্ত ১৮৯৬ সালে মহেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড গমন করেন। অগ্রজের নিষেধে সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিতে হইলেও তাঁহার বিলাতযাত্রা নিষ্ফল হয় নাই। লণ্ডনে অবস্থানকালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একাগ্রচিত্তে অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তিনি শিল্প ও স্থাপত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর্য্যটকরূপে মহেন্দ্রনাথ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯০২ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণকাহিনী তিনি লেখেন নাই। তাঁহার 'ন্যাশনাল ওয়েল্‌থ' নামক পুস্তকে এই ভ্রমণের আভাস পাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত সংস্রববশতঃ পুলিশ-কর্তৃক বার বার বাড়ী খানাতল্লাসীর আশঙ্কায় তাঁহাকে তাঁহার অধিকাংশ লেখা এবং কাগজপত্র অগ্নিশিখায় সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকাবলীর মধ্যে 'ষ্টেটাস অফ টয়লার্স', 'লেক্‌চার্স অন এডুকেশন,' 'ন্যাশনাল ওয়েল্‌থ,' 'নিউ এশিয়া', 'নেশন', 'ন্যাচরাল রিলিজিয়ন', 'প্রিন্সিপল্‌স অফ আর্কিটেকচার', 'ডিসার্টেসন অন পেন্টিং', 'মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র', 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ সুপরিচিত। উভয় ভ্রাতার মত মহেন্দ্রনাথ ছিলেন চিরকুমার। তিনি ছিলেন গৈরিক-বিরহিত সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব এবং গভীর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু খ্যাতনামা শিল্পী, সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার ভবনে সমবেত হইতেন এবং তাঁহার আলোচনায় প্রেরণা লাভ করিতেন।

ন্যায়-বৈশেষিক ও বৌদ্ধদর্শন

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য

ভারতীয় দার্শনিক প্রস্থানসমূহের মধ্যে সহনাতিসহন বিচারের সম্যক্ পরিস্ফুরণ প্রধানতঃ ন্যায় ও বৌদ্ধদর্শনের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। সুদূর অতীত হইতে দশম শতক পর্যন্ত প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতীয় দর্শনের যে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহাতে এই দার্শনিকদ্বয়ের স্থান কোন অংশেই ন্যূন নয়। ন্যায়দর্শনের ক্রমবিবর্তনে বৌদ্ধদার্শনিকগণের সূক্ষ্ম বাদবিচার যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছে, অপর পক্ষে বৌদ্ধ দার্শনিকগণও স্বীয় প্রস্থানের ক্রমবিকাশে নৈয়ায়িকগণের নিকট যে কিরূপ ঋণী তাহার ইতিহাস আজিকার দিনে বিস্মৃতপ্রায়। সার্ধ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া উভয়পক্ষের এই বাদবিচার দর্শনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়; আর ইহার ফলে বৌদ্ধদর্শনে ব্যুৎপন্ন না হইলে ন্যায়দর্শনের রহস্যজাল ভেদ করা প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ন্যায়সূত্রকার গৌতম তাঁহার গ্রন্থে প্রত্যক্ষতঃ কোন বৌদ্ধমতের উল্লেখ করেন নাই বটে কিন্তু বাৎস্যায়নের ভাষ্যপাঠে মনে হয়, যেন বহুস্থলে বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের সময় ন্যায়দর্শনের শৈশবাবস্থা। উহার বিচারশৈলীর সূক্ষ্ম দার্শনিকতা প্রকৃতপক্ষে বার্তিককার উদ্দ্যোতকর (ষষ্ঠ শতক) হইতে সুরু হয়। ন্যায়বিচারের সুবর্ণময় যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'ন্যায়বার্তিক'। উদ্দ্যোতকর তাঁহার উক্ত গ্রন্থ রচনার প্রেরণা লাভ করেন 'কুতার্কিক'গণের নিকট হইতে।[১] কিন্তু কে এই 'কুতার্কিক'? ভারতীয় দর্শনের, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে প্রায় সকল প্রস্থানের আচার্যগণ বিরোধী মতাবলম্বীদের এই ভাষায় নির্দেশ করিতেন। এই বিরোধী দর্শনপ্রস্থানের নির্দেশনায় উদ্দ্যোতকরের নীরবতা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি পূর্বপক্ষীয় মত-উপস্থাপনে সর্বত্রই 'অন্যে', 'অপরে', 'ইত্যাহুঃ' বলিয়া আপন কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন। নবম শতকের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট চার্বাকপন্থীকে প্রধানতঃ এই কুতার্কিক পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের মতে দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণ এই 'কুতার্কিক'। বৌদ্ধ ন্যায়-প্রবাহের উৎস এই দিঙ্‌নাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়' গ্রন্থ। ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে দিঙ্‌নাগ বাৎস্যায়ন-মতের খণ্ডন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থপাঠে বৌদ্ধমত সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্কাতবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় মিলিলেও তিনি দিঙ্‌নাগের গ্রন্থের সহিত নিবিড় ভাবে পরিচিত ছিলেন কিনা সন্দেহ। ফলে, বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্বক ন্যায়মত সমর্থনে তাঁহার সুবিস্তৃত প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই কারণেই দার্শনিকধুরন্ধর বাচস্পতি মিশ্রকে বাদবিচারের কণ্টকময় পথে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে—একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহার উদ্দ্যোতকরের সহযোগিতা। তিনি নিজেই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিতেছেন—

> "ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাম্।
> উদ্দ্যোতকরগবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ ॥"[২]

অর্থাৎ, "উদ্দ্যোতকররূপ বৃদ্ধ গাভী পূর্বপক্ষীয় সমালোচনাজালরূপ দুস্তর পঙ্কে মগ্ন হইয়াছে—তাঁহাকে ঐ গভীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করাই আমার এই গ্রন্থরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই পুণ্যসঞ্চয়ের আমি প্রয়াসী"। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে, শাস্ত্র রচনার ও পাঠের উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয়, কিন্তু দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি অর্বাচীন কুতার্কিকগণের বাক্যজালে আচ্ছন্ন শাস্ত্রের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সম্ভাবিত নহে—এইজন্যই উদ্দ্যোতকরের স্বনিবন্ধ রচনার প্রচেষ্টা।[৩] তাৎপর্য-টীকাকার বহু স্থলে দিঙ্‌নাগের কারিকা উদ্ধারপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। অনুমানবিচার প্রসঙ্গ প্রধানতঃ দিঙ্‌নাগ মতেরই দূষণ। কিন্তু এই বিচারের জটিলতা ও দুরূহতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন আমরা পাই উদ্দ্যোতকরোত্তর ন্যায়-গ্রন্থে ও দিঙ্‌নাগোত্তর বৌদ্ধন্যায়গ্রন্থে। একদিকে বাচস্পতি, জয়ন্ত ভট্ট ও উদয়ন, অন্যদিকে শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতি—এই দ্বৈরথ সংগ্রামের ইতিহাস ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যাকাশে চির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে শোভিত থাকিবে। রত্নকীর্তি (৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার 'অপোহসিদ্ধি' গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচন, ন্যায়ভূষণকার, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়াছেন। 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি' গ্রন্থে লেখক জাগতিক বস্তুসমূহের ক্ষণিকত্ব-

---

১। কুতার্কিকজ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ—ন্যায়বার্তিক (মেট্রোপলিটন সং), পৃঃ ১

২। বাচস্পতি মিশ্র—তাৎপর্য টীকা, শ্লোক ৪

৩। দিঙ্‌নাগপ্রভৃতিভিরর্বাচীনৈঃ কুহেতুসন্তমসমুত্থাপনেনাচ্ছাদিতং শাস্ত্রং ন তত্ত্বনির্ণয়ায় পর্যাপ্তমিত্যুদ্দ্যোতকরেণ স্বনিবন্ধোদ্দ্যোতেন অপনীয়ত ইতি—ঐ, পৃঃ ২

দিঙ্‌নাগদূষিতান্ ন্যায়ান্ অন্যাংশ্চ বিকল্পান্ দিঙ্‌নাগসমর্থিতং চ ধর্মমুপেত্য দূষয়তি—ঐ, পৃঃ ১৩৫

প্রমাণ প্রসঙ্গেও পূর্বোক্ত নৈয়ায়িকগণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। জাগতিক বস্তুর স্থিরত্ব-প্রমাণ প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকগণের অন্যতম প্রধান যুক্তি—প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)। রত্নকীর্তি সেই উদ্দেশ্যেই বিস্তৃত ভাবে প্রত্যভিজ্ঞা খণ্ডন করিয়াছেন। 'স্থিরসিদ্ধিদূষণ' শীর্ষক অপর একটি গ্রন্থও তাঁহার রচিত।৪ নৈয়ায়িকমতের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ত্রিলোচনের মতেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় ত্রিলোচনের গ্রন্থই সেকালে সুপ্রচলিত ছিল—বহুদিন যাবৎ উক্ত গ্রন্থকারের কোন গ্রন্থের নিদর্শন মিলে নাই।* আচার্য উদয়ন প্রধানতঃ এই ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি নিরাকরণের জন্যই "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থ রচনা করেন।

অবয়ব (parts) ও অবয়বী (whole) ন্যায়মতে সম্পূর্ণ পৃথক। অবয়বী অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই সমবায় সম্বন্ধ (Inference) ন্যায়মতে নিত্য। বৌদ্ধাচার্য পণ্ডিত অশোক (নবম শতক) অবয়বিনিরাকরণ প্রকরণে নিত্য সমবায় সম্বন্ধ যে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। অবয়বের সমূহাবস্থাই অবয়বী—উহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই—ইহাই বৌদ্ধমত। পূর্বপক্ষীর মত উপস্থাপনে তিনি নামতঃ কাহারও উল্লেখ করেন নাই, বলিয়াছেন 'কণাদশিষ্যাঃ'। আচার্য উদয়ন "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে পণ্ডিত অশোকের মত খণ্ডনপূর্বক অবয়বীর পৃথক অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

যুগপ্রসারী এই বাদবিচারের ফলে পূর্ববর্তী আচার্যগণের মত বহুস্থলে সংশোধন করিতে হইয়াছে। এই দার্শনিক চিন্তাধারার বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়া ভারতীয় মননের ক্ষেত্র এক অমূল্য সম্পদে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দিঙ্‌নাগ প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন—'কল্পনাপোঢ়ম্'। নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকর উহার নিরাস করিলেন। তিনি প্রত্যক্ষলক্ষণে 'অভ্রান্তত্ব' নিবেশ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের অনুবর্তন করিয়া বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিলেন—প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ম্ নামজাত্যাদ্যসংযুতম্।৫ বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বসুবন্ধুর (৪২০-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) সম্মত—অর্থাদ্ বিজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্—এই প্রত্যক্ষলক্ষণের নিরাস করিয়াছেন।৬ বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য টীকা গ্রন্থে ধর্মকীর্তির পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন। মনে হয় ধর্মকীর্তি প্রভৃতির মত খণ্ডনে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু ত্রিলোচনের রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট যাঁহাকে 'বৃদ্ধ নৈয়ায়িক' রূপে অভিহিত করিয়াছেন—এই ত্রিলোচনই হয় ত সেই নৈয়ায়িক। প্রত্যক্ষলক্ষণে 'ব্যবসায়াত্মক' পদটির যৌক্তিকতা বিচার প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র এই গুরু-ঋণ অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।৭ বাচস্পতি মিশ্র বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষলক্ষণের ক্রমবিকাশটি একটি বাক্যে সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"দিঙ্‌নাগস্যৈব কল্পনাপোঢ়মাত্রং লক্ষণমপি তু তদেবাভ্রান্তত্বসহিতং প্রত্যক্ষলক্ষণং মন্যতে স্ম কীর্তিঃ প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তমিতি।"৮ জয়ন্ত ভট্ট আরও বিস্তৃত রূপে ধর্মকীর্তিসম্মত প্রত্যক্ষলক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন।৯

এই জয়ন্ত ভট্ট নৈয়ায়িককুলের এক অভিনব আবির্ভাব। প্রাচীন ন্যায় ও বৌদ্ধদার্শনিকগণের প্রতিটি মতের তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারশৈলীর দ্বারা যাথার্থ্য-অযাথার্থ্য প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকের মত তিনি কোথাও বিনা যুক্তিতে গ্রহণ করেন নাই। বহুস্থলে চিরাগত রীতি হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়াছেন—নূতন মতের উপস্থাপন করিয়াছেন। কাশ্মীরের অন্ধকার পর্বতগুহায় বন্দী অবস্থায় বৌদ্ধমত খণ্ডনে ও স্বমত স্থাপনে যে প্রবল ধীশক্তি, নিষ্ঠা ও সর্বোপরি অননুকরণীয় দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা পৃথিবীর মনন-রাজ্যের এক অপূর্ব সম্পদ। বৌদ্ধের দুর্দমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জয়ন্ত ভট্ট ভারতীয় দর্শনের সকল শাখায় নিষ্ণাত। সুবিস্তৃত ভাবে পূর্বপক্ষীর মতোপস্থাপনের কৃতিত্ব একমাত্র তাঁহারই। একদিকে সূক্ষ্ম দার্শনিকতা অন্যদিকে কবিত্ব—এ দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার গ্রন্থে প্রকট। চার্বাকপন্থীকে তিনি উপেক্ষণীয় (চার্বাকাস্তু বরাকাঃ) বলিয়া খণ্ডন করিতেই প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু বৌদ্ধকে কোথাও নির্বিচারে গ্রহণ করেন নাই। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মনঃকল্পিত নয়, ইহার বাস্তব সত্তা আছে—ইহার প্রমাণে ও বৌদ্ধ যোগাচার মত খণ্ডনে দুর্ভেদ্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। বৌদ্ধগণকে 'মুণ্ডিতকেশ'রূপে সম্বোধন করিয়া ক্ষণভঙ্গবাদ নিরাস করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদী রবি-

৪। "Six Buddhist Nyaya Tracts"- ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি, পৃঃ ৬৮

* আনন্দের বিষয় 'মিথিলা রিসার্চ ইনস্টিটিউট' হইতে ত্রিলোচনের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

৫। প্রমাণসমুচ্চয়, পরিচ্ছেদ ১

যথা সম্যগ জ্ঞানমধিকৃত্য প্রত্যক্ষাদিলক্ষণং কৃতং কীর্তিনা—তাৎপর্যটীকা, পৃঃ ১৩১

৬। ন্যায়বার্তিক (মেট্রোপলিটন সং) ২২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

৭। ত্রিলোচনগুরূন্নীতমার্গানুগমনোন্মুখৈঃ।
যথামানং যথাবস্তু ব্যাখ্যাতমিদমীদৃশম্। তাৎপর্যটীকা, পৃঃ ১১৪

৮। ন্যায়কণিকা, পৃঃ ১১২

৯। ন্যায়মঞ্জরী পৃঃ ৮৬-৯৩

ভূতের মত নিরাশ করিয়া উপহাসচ্ছলে কবি-দার্শনিক জয়ন্ত ভট্ট বলিতেছেন—"ওহে ভিক্ষু! ওঠ, কণভক্ষবাদ নিরাশ করিয়াছি, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে।" (উত্তিষ্ঠ ভিক্ষো! কলিতাশুবাশাঃ সোঽয়ং সমাপ্তঃ কণভক্ষবাদঃ)।

উদ্দ্যোতকরের বহু পরে বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব। ঐ সময়ে মীমাংসকগণের উপর বৌদ্ধমত খণ্ডনের ভার পড়িল। কুমারিলভট্ট, মণ্ডন মিশ্র, প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবৈদান্তিক আচার্য-শঙ্কর, সুরেশ্বরাচার্য ও আনন্দজ্ঞান প্রভৃতি মধ্যযুগীয় দার্শনিক-গণ দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির মত খণ্ডন করিলেন। নবম শতকে ধর্মোত্তর ধর্মকীর্তির সমর্থনে ব্রতী হইলেন। দশম শতকে বাচস্পতি মিশ্র ধর্মোত্তরের মত খণ্ডন করিলেন। একাদশ শতকে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী উদয়নাচার্যের আবির্ভাব। আত্মতত্ত্ববিবেক (বৌদ্ধধিকার) ও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধমতবাদের উপর চরম আঘাত হানিলেন। একদিকে নিরীশ্বর ও নৈরাত্ম্যবাদী বৌদ্ধ-দর্শনের যুক্তিজাল খণ্ডন, অন্যদিকে প্রবলযুক্তির উপর ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব স্থাপনের যে প্রয়াস তিনি করিয়াছেন—তাহাতে উদয়নের নাম দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে চির অম্লান থাকিবে। প্রবাদ আছে—পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশপ্রার্থী উদয়ন, কিন্তু মন্দিরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। আত্মাবমাননায় রোষদীপ্ত উদয়ন দেবমূর্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"ঐশ্বর্যমদমত্তোঽসি মামবজ্ঞায় বর্তসে।
উপস্থিতেষু বৌদ্ধেষু মদধীনা তব স্থিতিঃ॥"

অর্থাৎ, "ঐশ্বর্যগর্বে স্ফীত ওহে দেবতা! আমাকে অবজ্ঞা করিলে, কিন্তু মনে রেখ, বৌদ্ধদের দ্বারা প্রবল ভাবে আক্রান্ত তোমার অস্তিত্বকে রক্ষা করিবার জন্য আমিই ব্রতী হইয়াছি।" উদয়নের এই উক্তি দম্ভের পরিচয় হইলেও উহা যথার্থ। কল্যাণ রক্ষিতের (৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) "ঈশ্বরভঙ্গ কারিকা"র খণ্ডন 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ। উদয়নের ঐ দুর্ভেদ্য যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ-সমূহের প্রচারের ফলেই যে বৌদ্ধদর্শনের অপমৃত্যু ঘটিল—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদর্শনের অবলুপ্তির ইহাই প্রধান কারণ। এই কারণেই ত্রয়োদশ শতক হইতে কোন বৌদ্ধগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাও সত্য যে, পরবর্তী কালের আস্তিক দর্শন প্রস্থানের গ্রন্থসমূহের উৎস এই কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ।

পণ্ডিতগণ মনে করেন, নব্যন্যায়ে যে ভাষার সংযম ও অর্থপ্রাচুর্য তাহা বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণের নিকট হইতে গৃহীত।১০ ইহা আপাতমনোরম হইলেও সত্য নহে। নব্য-ন্যায়ের মধ্যে যে ভাষার বিচিত্রশৈলী ও দুরূহগ্রন্থন দৃষ্ট হয় তাহা গঙ্গেশের আবির্ভাবের বহুপূর্বে একাদশ শতকে উদয়নের গ্রন্থসমূহের মধ্যেই বিদ্যমান। নব্যন্যায়ের সূত্রপাত প্রকৃত পক্ষে উদয়নের সময় হইতে। কিন্তু তাহার বিশিষ্ট রীতি যাহা নব্যন্যায়ের বৈশিষ্ট্য, তাহা অক্ষপাদ গৌতমের সময় হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। বাচস্পতি মিশ্র গ্রন্থের প্রারম্ভে সূত্রকার গৌতমের উদ্দেশে প্রণাম করিতেছেন—"নমামি ধর্মবিজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্যশালিনে। নিধয়ে বাগবিশুদ্ধীনামক্ষপাদায় তায়িনে"॥১১ বাক্যবিশুদ্ধির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন গৌতমের ন্যায় সূত্র।

মহামহোপাধ্যায় সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মনে করেন যে, নব্যন্যায়ের প্রবর্তক প্রকৃতপক্ষে দিঙ্‌নাগ (ষষ্ঠ শতক), গঙ্গেশ নন। গঙ্গেশের সময় হইতে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে প্রথম কেবলমাত্র প্রমাণ লইয়া আলোচনার সূত্রপাত হইল। প্রমেয় পদার্থের আলোচনা এখানে নিছক গৌণ।১২ ন্যায়-সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে একটিমাত্র পদার্থের উপর এই বিশেষ দৃষ্টির হেতু কি? বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে নব্যন্যায় যে প্রধানতঃ প্রমাণশাস্ত্র রূপে দার্শনিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল তাহার একমাত্র কারণ বৌদ্ধদার্শনিকের প্রভাব।১৩ নব্যন্যায়ে প্রমাণের আলোচনা মুখ্য হইলেও উহা সর্বতোভাবে প্রমাণশাস্ত্র কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিচারের অবকাশ আছে। নব্যন্যায়ের মধ্যেও প্রচুর প্রমেয় পদার্থের আলোচনা আছে। রঘুনাথ শিরোমণির গ্রন্থে ন্যায় প্রমেয় পদার্থের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি দেখা যায়। নব্যন্যায়ের বিরুদ্ধে এই মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদনে অধুনা কোন কোন পণ্ডিত প্রযত্ন হইয়াছেন।১৪ প্রাক্‌-গঙ্গেশ ন্যায়দর্শনের গ্রন্থসমূহও মাত্র প্রমেয়শাস্ত্র নহে। সূত্রকার প্রথম সূত্রের প্রথমেই 'প্রমাণ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন এবং প্রমেয়াদি অপেক্ষা প্রমাণকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়ের মধ্যে প্রমাণেরই প্রাধান্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্"।১৫ বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিলেন—"প্রমাণস্য প্রাধান্য-প্রদর্শনার্থঞ্চ"১৬ ও "সাধকতমং প্রমাণং ন তু প্রমাতৃ-

---

10 Th. Stchebatsky, "Buddhist Logic". vol. 1, p.50.

১১ তাৎপর্য টীকা, পৃঃ ১

12 "History of Indian Logic" p. 492.

13 Journal of the Buddhist Text & Anthropological Society pt. 111. 1898. pp 4-5.

14 Cultural Heritage of India vol. 111. (2nd Edn' "Navyanyaya".

১৫ ন্যায়ভাষ্য, পৃঃ ১

১৬ ন্যায়বার্তিক, পৃঃ ১২

প্রমেয়"।১৭ প্রমেয়াদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণতত্ত্বজ্ঞানের অধীন।১৮ সমগ্র ন্যায়সূত্র-ভাষ্য-বার্তিক গ্রন্থে চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনাই মুখ্য। গৌণরূপে প্রমেয় আলোচিত হইয়াছে। উহার আলোচনা বৈশেষিক প্রস্থানের বিবরীভূত। আত্মা সম্বন্ধে ন্যায়দর্শনে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে তাহা বিরুদ্ধবাদী চার্বাক ও বৌদ্ধমতের নিরাসের উদ্দেশেই। চতুর্বিধ প্রমাণের স্থাপন ও পরীক্ষাতেই গ্রন্থের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, ভারতীয় দর্শনে বিচাররীতির প্রথম পরিচয় পাই ন্যায়সূত্রে। এই বিচার-পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনায় মনে হয়, সে সময়েই ন্যায়ানুমত পদার্থসমূহের প্রতিপাদন করিতে সূত্রকারকে বিশেষ তৎপর হইতে হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই তৎকালীন বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। এবং সেই বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে প্রমেয় পদার্থসমূহের আলোচনা করিতে হইয়াছে। ন্যায়সূত্রের এই অলক্ষ্য প্রভাব নব্যন্যায়ে পড়িয়াছে। নব্যনৈয়ায়িকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস কোনক্রমেই বৌদ্ধদার্শনিকগণ হইতে পারেন না। বিশেষতঃ বৌদ্ধ এবং জৈন ন্যায়ের আলোচনা বাংলা দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। এখানে মীমাংসা, ন্যায় ও ব্যাকরণের আলোচনাই সমধিক। দিঙ্‌নাগের গ্রন্থে সর্বপ্রথম তর্কশাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রমাণসমুচ্চয়, ন্যায়বিন্দু, প্রমাণবার্তিক প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের অনুসৃত রীতি যে সব নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে গৃহীত হয় নাই ইহাও সুনিশ্চিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছিলেন :

"From his (Gangesa) time downwards it became customary with the Hindu writers on Nyaya Philosophy to deal only with the topic of Pramana (evidence of knowledge) and nobody cared for the remaining fifteen categories."1

ইহার সমীচীনতা বিবেচ্য। বৈশেষিক পদার্থসমূহকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার প্রয়াসেই গঙ্গেশ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর, সামান্য বা জাতি, অভাব প্রভৃতির তত্ত্বসমীক্ষায় যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন স্বাধীন বিচাররীতির যে ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাই পরবর্তী যুগে নৈয়ায়িকধুরন্ধর রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য, জগদীশ প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ অনুসরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ রঘুনাথ সপ্ত পদার্থের উপরে আরও আটটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব প্রাচীন ন্যায়ের মতই পদার্থ স্থাপনের জন্যই প্রমাণচর্চার সূত্রপাত। এ রীতি ইহার নিজস্ব। সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বাদবিচারের ইহাই সুপ্রসূ ফল। শাস্ত্র ও জ্ঞানধারার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার ইহা স্বাভাবিক পরিণতি।

১৭ ঐ পৃঃ ১৮
১৮ তাৎপর্য টীকা, পৃঃ ৩

1 "Journal of the Buddhist Text Society" pt 111, 1898. p. 6

আল্-বীরূণীর ভারতীয় ভূগোল

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা

২

পর্বতমালা

আল-বীরূনী 'ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ভারতের নদী ও পর্বতের বিবরণ দিয়াছেন। আধুনিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া ইহা আলোচিত হইলে ভূগোলবিদ্‌দিগের বহু উপকারে আসিবে।

মৎস্যপুরাণ হইতে আল-বীরূনী প্রাচীন ভারতের কয়েকটি পর্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুরাণের মতে মেরুপর্বতের সাতটি গ্রন্থি (গ্রন্থি=বৃহৎ পর্বত) আছে, যথা—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিয়াত্র বা পারিপাত্র। মেরু পর্বতের চতুষ্পার্শ্ব সম্পর্কে পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ইহার পূর্ব দিকে মালব পর্বত এবং মহাসাগর; উত্তরে নীল, শ্বেত, শৃংগাদ্রি এবং মহাসাগর; পশ্চিমে গন্ধমাদন ও মহাসাগর; আর দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট ও হিমগিরি এবং মহাসাগর রহিয়াছে।

মেরু পর্বতের চতুর্দিকে নিম্নলিখিত বৃহৎ পর্বতগুলি বিদ্যমান—

(১) হিমালয়—সর্বদা বরফের দ্বারা আচ্ছাদিত।

(২) হেমকূট—ইহা একটি সুবর্ণ শিখর, এখানে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ বাস করিত।

(৩) নিষধ—ইহা নাগদিগের বাসভূমি ছিল।

(৪) নীল—এখানে সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিতেন।

(৫) শ্বেত—ইহা দৈত্য ও দানবদিগের বাসস্থান ছিল।

(৬) শৃংগবন্ত - এখানে পরলোকগত পূর্বপুরুষগণ বাস করিতেন।

এই পর্বতসমূহের মধ্যস্থলে সর্বোচ্চ পর্বত ইলাবৃত বিদ্যমান। সমগ্র পর্বতটির নাম পুরুষ পর্বত। হিমবন্ত ও শৃংগবন্তের মধ্যবর্তী স্থানকে কৈলাস বলে। বিষ্ণুপুরাণের মতে শ্রীপর্বত, মলয়, মাল্যবন্ত, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, ত্রিপুরান্তিক এবং কৈলাস মধ্য পৃথিবীর পর্বত।

হিমালয় কেবলমাত্র বর্ষপর্বত। ইহা ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত। প্রাচীন ভূগোলবিদ্‌দিগের মতে হিমবন্ত, হিমবৎ বা হিমাদ্রি—সুলেমান হইতে পঞ্জাবের পশ্চিম দিক এবং ভারতের সমগ্র উত্তর সীমানা ধরিয়া পূর্বে আসাম এবং আরাকান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পর্বতমালাকেই বুঝায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ হইতে জানা যায় যে, হিমবন্ত সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ধনুকের গুণের ন্যায় বিস্তৃত। হিমালয় পর্বত বা টলেমির ইমাওস গঙ্গা, সিন্ধু, কোয়া এবং সোয়াট নদীর উৎপত্তি স্থান। মহেন্দ্র, মালব, সহ্য, শুক্তিমৎ, ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র—এই সাতটি কুলাচল নামে খ্যাত, কারণ এই সকল পর্বতের প্রত্যেকটি কোন একটি দেশ বা জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাসাগর সঙ্গম এবং সপ্ত গোদাবরীর মধ্যে মহেন্দ্র পর্বত অবস্থিত। গঞ্জামের নিকটে পূর্ব পার্বত্য পথের অংশকে এখনও মহেন্দ্র পর্বত বলা হয়। পারজিটার সাহেব বলেন যে, মহানদী, গোদাবরী ও ওয়েন গঙ্গার মধ্যবর্তী পর্বতমালাগুলি এই নামে বিদিত। গঞ্জাম হইতে বিস্তৃত দক্ষিণে পাণ্ড্যদেশ এবং সমগ্র পূর্ব পার্বত্য পথ পর্যন্ত পর্বতমালাকে মহেন্দ্র পর্বত বলিত। উড়িষ্যা হইতে মাদুরা জেলা পর্যন্ত সমগ্র পর্বত মহেন্দ্র পর্বত নামে খ্যাত। ইহা মলয় পর্বতের সহিত যুক্ত ছিল।

পারজিটারের মতে নীলগিরি হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম পার্বত্য পথের অংশ এবং মলয়গিরি অভিন্ন। পশ্চিম পার্বত্যপথের উত্তরাংশ সহ্য পর্বত হইতে অভিন্ন। সহ্য পর্বত তাপ্তী নদী হইতে নীলগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত। সহ্য গিরির সহিত কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্বতের সংযোগ আছে। ত্রিকূট হইতে ত্রৈকূটকের নামকরণ হইয়াছে। শুক্তিমৎ পর্বত এবং সুলেমান পর্বত অভিন্ন। পারজিটার বলেন, গারো, খাসি ও ত্রিপুরা পর্বত এবং শুক্তিমৎ পর্বতমালা একই। কেহ কেহ বলেন, এই পর্বতমালা হাজারিবাগ জেলার উত্তরে অবস্থিত। আবার কেহ কেহ পশ্চিম ভারতে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। ঋক্ষ এবং বিন্ধ্য—টলেমির মতে ঔকসেনটন (Ouxenton) এবং ঔনডিয়ন (Ouindion) নামে খ্যাত। বর্তমানে বিন্ধ্যপর্বত বলিতে আমরা ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র পর্বতকে বুঝি। টলেমি বলেন যে, ঋক্ষ হইতে টাউনডিস, দোসারণ, আদামস ও ঔনডিয়নের উৎপত্তি হইয়াছে। দোসারণ এবং পুরাণে বর্ণিত দশার্ণ অভিন্ন। নামাদশ ও নামাগাওনা নর্মদা এবং তাপ্তী নামে বিদিত। টলেমি বলেন, নর্মদার উত্তরে বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতের মধ্য অঞ্চলকে ঋক্ষ বলিত এবং বিন্ধ্যপর্বতের অংশকে ঔনডিয়ন বলিত। এই স্থানে নর্মদা ও তাপ্তীর উৎপত্তি দেখা যায়।

আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ সীমানা পারিপাত্র নামে পরিচিত। ইহা কুমারীখণ্ডের সর্বশেষ সীমানা। বর্ত্তমান বিন্ধ্যপর্বতমালার অংশ এবং আরাবল্লী পর্বত পারিপাত্র হইতে অভিন্ন। পারিপাত্র বা পারিয়াত্রের সহিত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্বতমালার সম্বন্ধ আছে।

কৈলাস পর্বত তুন্তেশগিরি নামে বিদিত। ইহা নন্দা নদী কর্তৃক বেষ্টিত। নন্দার অপর একটি নাম গঙ্গা। কুমায়ুন ও গাড়োয়াল পর্বতমালা কৈলাস পর্বতমালার অন্তর্গত। মহাভারতের মতে ইহার অপর নাম হেমকূট। জৈনসাহিত্যে ইহা অষ্টাপদ পর্বত নামে পরিচিত। ইহাতে কয়েকটি উচ্চ শিখর আছে। বৈদ্যুত পর্বত হইতে ইহা অভিন্ন। তিব্বতীয়েরা ইহার নাম দিয়াছে কাংরীন পোচে। মানস সরোবর হইতে পঁচিশ মাইল উত্তরে কৈলাস পর্বত অবস্থিত। এই পর্বতোপরি বদরিকাশ্রম বিদ্যমান।

গন্ধমাদন পর্বত রুদ্র হিমালয়ের একটি অংশবিশেষ। রামায়ণ ও মহাভারতের মতে ইহা কৈলাস পর্বতের একটি অংশ। কথিত আছে, ইহা মন্দাকিনীর জলে বিধৌত হয়। বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরী গ্রন্থে ইহাকে হিমালয়ের একটি শিখর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজা পুরুরবা উর্বশীসহ এই পর্বতের পাদমূলে দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ভাগবতপুরাণের মতে এই পর্বতে ব্রহ্মা আগমন করেন। নন্দমূল নামে এই পর্বতের একটি গুহা ছিল। রাজা বেসন্তর স্ত্রীপুত্রসহ এইখানে বাস করিতেন। বুদ্ধদেব এখানে আসেন। এই পর্বত হইতে অশোকের বৃক্ষটি আনিয়া ঠিক যেখানে বুদ্ধদেব ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন, সেখানে রোপণ করা হয়। তিব্বতের পূর্বদিকে হিমালয়ের মধ্যে শ্বেতপর্বত অবস্থিত। আল-বীরুণীর মতে মেরু এবং নিষধ বা নিষদ হিমালয় পর্বতমালার সহিত যুক্ত ছিল। এই সকল পর্বতমালাকে পুরাণে বর্ষপর্বত বলা হইয়াছে। নিষধ পর্বতের নিকটে বিষ্ণুপদ নামে একটি পুষ্করিণী ছিল। এখান হইতে সরস্বতী নদী উত্থিত হইয়াছে। কৈলাস পর্বতে মন্দ নামে পুষ্করিণী ছিল। ইহা হইতে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি।

নদী

আল-বীরুণী বলেন, ভারতের নদীসকল উত্তরের শীতল পর্বত হইতে কিংবা পূর্বদিকের পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উভয়ই একই পর্বতমালাকে সৃষ্টি করে। আল-বীরুণী ভারতের কয়েকটি নদীর তালিকা দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনা করা হইয়াছে।

সিন্ধু নদীর বিভিন্ন শাখাগুলি সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া নিম্ন ভাগে প্রবাহিত। আল-বীরুণী বলেন, চিনাব বা চন্দ্রভাগার সঙ্গমের উপরিভাগ (বয়িহীদ) সিন্ধু নামে পরিচিত ছিল। অরোর পর্যন্ত নিম্নভাগে ইহা পঞ্চনাদ নামে বিদিত। অরোর হইতে যেখানে ইহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে তাহাকে মিহান বলিত। দেরায়সের বেহিস্তুন শিলালিপিতে হিন্দু নামে ইহার উল্লেখ আছে। জোরাষ্ট্রিয়দের ভেনদিদাদে ইহা হেন্দু নামে পরিজ্ঞাত। ইন্দাস্ উত্তর-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী। ইহা হইতে ইন্দাস শ্রেণীর নামকরণ করা হইয়াছে। চীনদিগের নিকট ইহা সিণ্টু নামে পরিচিত। ইন্দাস নদী আটক অতিক্রম করিয়া প্রায় দক্ষিণ সুলেমান পর্বতমালার দিকে প্রবাহিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সৈন্ধবের উল্লেখ আছে। সিন্ধু বা ইন্দাস এবং সৈন্ধব একই নদী। পাণিনি এবং পতঞ্জলির নিকট এই নদীটি জ্ঞাত। অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র এই নদীতীরে যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সিন্ধুর আর দুইটি নাম ছিল সন্তেহ এবং সঙ্গম। প্লিনির মতে ইন্দাস এবং আরও উনিশটি নদী লইয়া সিন্ধুপুঞ্জ গঠিত হইয়াছে। হাইড্রোয়াটিস, একেসিনিস, হাইপেসিস, হাইদাসপিস, কোফেস, পরেনোস, সপারনোস এবং সাওনাস্—এইগুলি সিন্ধুর নদীর শাখা।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী উত্তর-ভারতের দুইটি ঐতিহাসিক নদী। ইহারা স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত। মনুর মতে এই দুইটি পবিত্র নদীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ বিদ্যমান। সরস্বতী একটি হিমালয়-নদী বলিয়া বর্ণিত আছে। সিমলা এবং শিরমুর দেশের মধ্য দিয়া ইহা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। যে স্থানে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হইয়াছে, মনুর মতে সেই স্থানটি বিনসন নামে পরিচিত। পদ্মপুরাণে গজোদ্ভেদ তীর্থের উল্লেখ আছে। এইখানে সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই পবিত্র নদীর তীরে বহু যাগযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। এই নদী শতদ্রু এবং যমুনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বৈদিক আর্যেরা এই নদীটিকে বিশাল নদী বলিয়া জানিতেন। নদীটি হিমালয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা শিরমুর পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া আম্বালার অন্তর্গত আদবদ্রীর সমতল ভূমিতে মিশিয়াছে। এই নদীর তীরে অম্বিকা বা অম্বিকাবন নামে একটি পবিত্র অরণ্য ছিল। দৃষদ্বতী নদী এবং বর্ত্তমান চিত্রাং অভিন্ন। কেহ কেহ বলেন যে, ঘগর নদী এবং দৃষদ্বতী একই। দৃষদ্বতী এবং কৌশিকীর সঙ্গমস্থান অতীব পবিত্র ছিল। বামনপুরাণের মতে কৌশিকী দৃষদ্বতীর একটি শাখা। গোমতী নদী ঋগ্বেদে উল্লিখিত গোমতী নদী হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ গোমতী বর্ত্তমান গোমল নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে, ইহাই বর্ত্তমান গুমতী। গুমতী নদী

লক্ষ্ণৌয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহা শাজাহানপুর জেলা হইতে উত্থিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

ধূতপাপা নদী এবং তমতীতীয়হ গোপাল অভিন্ন।

দেবিকা নদী হিমালয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। পার্জিটারের মতে দেবিকা নদী এবং রাবী নদীর শাখা দিগ নদী একই। অগ্নিপুরাণ মতে দেবিকা নদী সৌবির দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং সেওয়ালিক পর্বতমালার অন্তর্গত মৈনাক পর্বত হইতে উত্থিত। সরযূ নদীর দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত উত্তরাপথের দেবা বা দেবিকা নদী হইতে এই নদী অভিন্ন। কালিকাপুরাণের মতে দেবিকা নদী গোমতী এবং সরযুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভাগবতপুরাণ হইতে জানা যায় যে, গণ্ডকী নদীর অপর নাম চক্রনদী। ইহা গঙ্গার একটি বৃহৎ শাখা। ইহা দক্ষিণ তিব্বতের পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই নদী বামদিকে চারিটি এবং দক্ষিণে দুইটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তর শাখার নাম বর্তমান গণ্ডক এবং ইহার নিম্ন শাখার নাম রাপ্তী। সারা জেলার অন্তর্গত শোনপুর এবং মজাফারপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুরের মধ্য দিয়া ইহার প্রধান স্রোত গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

কুহু বা কুভা নদীর উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদীর পশ্চিম শাখার মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাই বর্তমান কাবুল নদী। আরিয়ানের কোফেস এবং প্লিনির কোফেন— পুরাণের কুহু এবং কুভা অভিন্ন। টলেমির মতে ইহার নাম কোয়া। সুলেমান পর্বতমালার মধ্য দিয়া এই নদী একটি উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়াছে। এটক বা হাটক-এর যৎকিঞ্চিৎ উপরে প্রবাহিত হইয়া ইহা সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। প্রান্তে ইহা স্বাৎ (আরিয়ানের সোয়াসটস্, সংস্কৃত সুবাস্ত) এবং গৌরি (আরিয়ানের গরোইয়া) নামে দুইটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে।

মুলতানের পূর্বদিকে বিয়া নদী প্রবাহিত। আল-বীরূণীর মতে বিয়ত বা ঝেলাম বা ঝেলাম এবং চন্দ্রাহ নদীর সহিত ইহা পরে যুক্ত হইয়াছে।

কানিংহামের মতে পারা বা পরা নদী পার্বতী নামে পরিচিত। ইহা ভূপাল হইতে উত্থিত হইয়া চাম্বাল নদীতে পতিত হইয়াছে। বিদিশা নদীর সহিত বিদিশা দেশের সম্বন্ধ আছে। বিদিশা দেশ মধ্যভারতের বর্তমান ভিলসা নামে পরিচিত।

কালিদাসের মেঘদূতে সিপ্রা নদীকে একটি ঐতিহাসিক নদী বলা হইয়াছে। ইহার তীরে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর অবস্থিত। গোয়ালিয়র রাজ্যের ইহা একটি নদী। সিতামনের যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে ইহা চাম্বাল নদীতে পতিত হইয়াছে।

শতদ্রু নদী সাটলেজ নামেও পরিচিত। আল-বীরূণীর মতে ইহার নাম সাটলাদর। ইহা গঙ্গার একটি শাখা। ঋগ্বেদের মতে ইহা পঞ্জাবের পূর্বদিকের নদী। আরিয়ানের সময়ে এই নদী কচ্ছ উপসাগরে স্বতন্ত্র ভাবে পতিত হইয়াছে। টলেমি এই নদীর নাম দিয়াছেন যারাদ্রস এবং প্লিনির মতে ইহা হেসিদ্রুস নামে খ্যাত। মানস-সরোবরের পশ্চিম হ্রদের পশ্চিম প্রান্ত হইতে এই নদীর উৎপত্তি। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে প্রাচীনকালে ইহা সিন্ধু নদীতে স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। শতদ্রু ও বিপাশার যুক্তস্রোত ঘগ্‌গর নামে পরিচিত।

নিশ্চিরা নদী নির্বীরা, নিঃস্রতা, নিবারা ও নিচিতা নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ কৌশিকী নদীর সহিত ইহা যুক্ত ছিল। কেহ কেহ বলেন, এই নদী এবং লীলাযান অভিন্ন। লীলাযান নদী গঙ্গার নিকট মোহনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

চর্মন্বতী বা বর্তমান চাম্বাল ইন্দোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে আরাবল্লী পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব রাজপুতানার মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। ইহা যমুনার একটি শাখা।

আল-বীরূণী চন্দ্রভাগার নাম দিয়াছেন চন্দ্রাহ। ইহা হিমালয় পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে চিনাব নামে পরিচিত। জম্মু অতিক্রম করিয়া ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। ঋগ্বেদে উল্লিখিত অসিকনি, আরিয়ানের একেসিনিস এবং টলেমির সন্দবাগা বা সন্দবাল একই নদী।

বায়ুপুরাণের মতে পর্ণাশা বর্ণাশা নামে পরিচিত। ইহাই বর্তমান বনাশী। ইহা পশ্চিম-ভারতের নদী।

ঝেলাম বা ঝিলাম বিতস্তা বা বিতংসা নামে পরিচিত। গ্রীকদিগের বিদাস্‌পিস বা হাইদাস্‌পিস্ এবং এই নদী অভিন্ন। ঋগ্বেদের সময়ে আর্যগণের নিকট এই নদী বিতংসা নামে বিদিত ছিল। বৌদ্ধেরাও এই নামে এই নদীকে জানিত। আল-বীরূণী বলেন, এই নদী হারামকট পর্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে।

ইরাবতী বর্তমানে রাবী নামে পরিচিত। গ্রীকদিগের নিকট এই নদী হাইড্রয়োটিস বা আড্রিস বা রোনাডিস নামে পরিজ্ঞাত। কালিকাপুরাণের মতে এই নদীর উৎপত্তিস্থান ইরা হ্রদ। বাংগাহল পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া পীরপঞ্জালের দক্ষিণ ঢালু ভূমি এবং ধৌলাধরের উত্তর ঢালু ভূমি বিধৌত করে। কাশ্মীরের অন্তর্গত চাম্বার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইহা সর্বপ্রথমে পরিলক্ষিত হয়। চাম্বা হইতে প্রবাহিত হইয়া

লাহোর অতিক্রম করিয়া এই নদী চিনাবের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীকে পতঞ্জলি জানিতেন।

রংপুর জেলার অন্তর্গত ভোমারের উত্তর দিকে করতোয়া নদীর উৎপত্তিস্থান। পাবনা জেলায় প্রবেশ করিয়া এই নদী দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। করতোয়া এবং আত্রাই (আত্রেয়ী) সঙ্গমটি গঙ্গার সহিত যুক্ত হইয়াছে। করতোয়া নদী যমুনার একটি প্রধান শাখা। বাংলা এবং কামরূপ রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে এই নদী এক সময়ে সীমানা নির্দেশ করিয়াছিল।

কৌশিকী নদী বর্তমানে কুশী নামে পরিচিত। বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। রামায়ণের মতে এই নদী হিমালয় হইতে উত্থিত; ইহা একটি বৃহৎ নদী। পারজিটার সাহেব বলেন, এই নদীর গতি সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা আরিয়ানের কস-সোয়ানস নদী বলিয়া বিদিত। ইহার স্রোত দ্রুত এবং তলদেশ অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক।

হিমালয় হইতে সরযূ বা সরভু নদী উত্থিত। এই নদীর তীরে রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সরযূ এবং গঙ্গার সঙ্গমটি রাম ও লক্ষ্মণ দেখিয়াছিলেন। ঘাগরা বা গগরা নামে ইহা গঙ্গার একটি শাখা ছিল। ইহার তীরে প্রাচীন অযোধ্যা নগর অবস্থিত। ইহাই টলেমির সারাবস। বিহারের ছাপরা জেলায় ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বারৈক জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবাহিত একটি শাখার সহিত এই নদী মিলিত হইয়াছে। রামায়ণের মতে অযোধ্যা হইতে অর্ধ যোজন দূরে এই নদী অবস্থিত।

পারজিটার সাহেবের মতে বাহুদা নদী বর্তমানে রামগঙ্গা নামে বিদিত। কেহ কেহ বলেন, বাহুদা এবং ধবলা অভিন্ন। বর্তমানে ধবলা ধুমেলা বা বুরহা রাপ্তী নামে বিদিত। বৌদ্ধ-সাহিত্যের মতে বাহুকা ও বাহুদা একই নদী।

বিপাসা নদী বিয়াস নামে পরিচিত। বিপাসিস্ বা হাইপাসিস্ বা হাইফাসিস এবং বিয়াস অভিন্ন। ইহা সাটলেজ নদীর একটি শাখা। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ইহা একটি স্বতন্ত্র নদী ছিল। বশিষ্ঠ মুনি পুত্রগণের মৃত্যুতে কাতর হইয়া এইখানে আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করেন।

লোহিত বা লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র সদিয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। আসামের ইহা একটি প্রধান নদী। মানসসরোবরের পূর্ব-অঞ্চলে ইহার উৎপত্তি।

গঙ্গার অপর নাম অলকনন্দা, হ্রাদুনি বা হ্রদনী। এই নদী ভাগীরথী এবং জাহ্নবী নামে পরিচিত। লুডউইগ্ সাহেবের মতে অথর্ববেদে উল্লিখিত বরণাবতী এবং গঙ্গা অভিন্ন। গঙ্গাকে ত্রিপথগামিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গঙ্গা এবং সিন্ধু নদীর সঙ্গম পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। বৌদ্ধসাহিত্যের মতে অনোতত্ত হ্রদের দক্ষিণ দিক হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত গঙ্গোত্রী হইতে ভাগীরথীগঙ্গা নির্গত হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে বুলন্দ শহর পর্যন্ত গঙ্গা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। হরিদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গা যমুনার সহিত অনুরূপ ভাবে প্রবাহিত। এলাহাবাদ হইতে রাজমহল পর্যন্ত এই নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত। রাজমহলের নিয়ে বাংলা দেশে এই নদী প্রবেশ করে। গঙ্গা ও যমুনার যুক্ত স্রোত গঙ্গা-সাগরের নিকটে মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। সরস্বতী ও গঙ্গার মোহনার মধ্যে নর্মদা নদীর মোহনা বিদ্যমান।

যমুনা কলিন্দগিরি হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কলিন্দকন্যা বলা হয়। যমুনার তীরে ভরতেরা যুদ্ধে জয় লাভ করে। এই নদীর অপর একটি নাম কালিন্দী। গঙ্গার প্রথম এবং বৃহৎ পশ্চিম শাখা যমুনা নামে বিদিত। যমুনা নদী মথুরা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেরাদুন জেলার পশ্চিম দিকে এই নদী দুইটি শাখার সহিত মিলিত হয়। আগ্রা এবং এলা-হাবাদের মধ্যে যমুনা বাম দিকে চারিটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। চর্মণবতী (চাম্বাল), কালিসিন্ধু, বেত্রবতী (বেটোয়া), কেন এবং পয়স্বী (পৈসুনী) যমুনার শাখা বলিয়া বিদিত। আল-বীরুণী বলেন, যমুনা (যৌন) কনোজের নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার তীরে বহু তীর্থস্থান আছে। চীনদের নিকট ইয়েন-মোক-ন নামে এই নদী জ্ঞাত। শূরসেন এবং কোশলের মধ্যে যমুনা নদী সীমানা নির্দেশ করিত। কার্লোনি হইতে আট মাইল দূরে যমুনোত্রী যমুনার উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রীকরা যমুনাকে ইরণ্যবোয়াস (হিরণ্যবাহ বা হিরণ্যবাহু) বলিত। বালুবাহিনী নামে যমুনার একটি শাখার উল্লেখ স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়। গঙ্গা এবং ঝেলামের (জৈলাম) পশ্চাদ্ভাগে মহাচীন অবস্থিত।

যোরবন্দ নদী কাবুল (কারবীশ) রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত পর্বতসমূহ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি শাখা আছে;

(১) ঘুজক পার্বত্য পথের নদী।

(২) পঞ্চির গিরিদ্বারের নদী।

(৩) সর্বৎ এবং সাওয়া নদী ক্রস্তদুর্গে যোরবন্দ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৪) নুর এবং কীরা নদীদ্বয়।

পূর্সাবর বা পেশোয়ার শহরের সম্মুখে সুবৃহৎ ঘোরবন্দ নদী শাখা দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রবাহিত। আল্‌কান্দাহার (গন্ধার) রাজ্যের নিম্নে বীতুর দুর্গের নিকট ঘোরবন্দ নদী সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে। সীত নদী হিমালয় হইতে উত্থিত হইয়া, কতকগুলি দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। চক্ষু নদী চীন, বর্বর এবং পহ্লব প্রভৃতি দেশগুলিকে জল সরবরাহ করে।*

* এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য :—

ঋক্‌বেদ, অথর্ব্ববেদ, শতপথ-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, কাত্যায়ণশ্রৌতসূত্র, লাট্টায়ণশ্রৌত সূত্র, আশ্বলায়ণশ্রৌত সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ু পুরাণ, কুর্ম্মপুরাণ, কালিকা পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মালবিকাগ্নিমিত্র, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী, অমরকোষ, অভিধান রত্নমালা, S, Konow-কর্পূর মঞ্জরী, বাণের কাদম্বরী, দিব্যাবদান, অবদান কল্পলতা।

S. K. Aiyangar, *Indian History and Culture*, I, 1941; E. C. Sachau, *Al-Biruni's India*; Pargiter, *Markandeyapurana*, Tr.; Cunningham, *Ancient Geography of India*, 1924, Ed.; *Aien-i-Akbari*; N. L. Dey, *Geographical Dictionary*; Hultzsch, *South Indian Inscriptions*; S. R. Sende, *How, Whence and When Maharashtra Came into Being* (*Siddhabharati*, Pt. II); *J.B.B.R.A.S.*, Vol. I, Pt. II; Schoff, *The Periplus of the Erythraean Sea*; *J. A. S. B.* Extra No. 2, 1899; *Indian Antiquary*, 1897; Beal, *Buddhist Records of the Western World*; Legge, *FA-Hien*; Watters, *On Yuan Chwang*; V. A. Smith, *Early History of India*, 4th Ed. and *Asoka*; Mc Crindle, *Ancient India as Described by Ptolemy*; *Annual Report of the Archaeological Survey of India*, Vol. XX; Rice, *Mysore and Coorg from Inscriptions*; Fleet, *Dynasties of the Kanarese Districts*; *Cambridge History of India*, Vol. I; *Vedic Index*, Vol. I; *Imperial Gazetteers of India*, XIV; Wilson, *Vishnu Purana*; Rhys David, *Buddhist India*; *Archaeological Survey Reports*, VIII, XVII; Maxmuller, *Rigveda Samhita*; *Calcutta Geographical Review*, December, 1943; McCrindle, *Ancient India*; Law, *Historical Geography of Ancient India*; *Geography of Early Buddhism*; *Geographical Essays*; *Tribes in Ancient India*; *Indological Studies*, Pt. I; *Geographical Aspect of Kalidasa's Works*, *Al-Biruni's Knowledge of Indian Geography* (*Indo-Iranica*, Vol. VII, No. 4, 1955).

গাভীর ব্যথা

শ্রীকালিদাস রায়

গাভীর ব্যথা কবির প্রাণে গভীর ব্যথা হয়ে
জাগছে রয়ে রয়ে
দুই ধারে ক্ষেত নধর চিকণ ধানের শীষে ভরে,
রাখালেরা যায় নিয়ে তায় মুখটি বেঁধে খড়ে।
দূর ডহরে গেলে তাহার মুখের বাঁধন ঘুচে,
বাছুরটি রয় গোয়ালঘরে ঘাস না মুখে রুচে।
হাম্বা রবে ডাকে,
রাখাল কি আর দেখে ভাবি খুঁজছে গাভী কাকে?
ফসলে মুখ দিলে গাভী পাঁচনবাড়ি খায়।
ফসল এবং ঘাসের তফাৎ সে কি বোঝে হায়?
ফিরলে গোয়ালঘরে,
বাছুরটি তার ছুটে আসে, রাখাল চেপে ধরে।

দিনের শেষে তাহার বাছার যে দুধ পাওয়ার কথা,
নেয় দুয়ে তা মালিক এসে, হায়রে বৎসলতা!
ভরছে কেঁড়ে, দুগ্ধ তাহার ঝরছে অবিরল,
দোহনধারার সঙ্গে গাভীর চক্ষে ঝরে জল।
দুগ্ধ দিতে না পেরে সে বাছুরটিরে তার,
স্নেহ বিলায় দেহটি তার চেটে বারংবার।
হায়রে বাছুর হায়!
দোহন সেত পায়না মায়ের লেহন শুধু পায়।
অসুর মানুষ এমনি করে পশুর মায়ে সেবি'
বানায় তারে দেবী।
দেবীর ব্যথাই এই কবিরেও মানুষ করে তোলে,
সেও যে অসুর পশুর অধম ক্ষণেক তরে ভোলে।

অকালবর্ষণ

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

স্বপ্ন দেখছিল গোকুল বিশ্বাস। আঃ, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বড় আশায় মেঘ এসে জড়ো হয়েছে সারা আকাশ জুড়ে। চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল গোকুলের। দিগদিগন্ত ব্যেপে আসন্ন বর্ষণের ঘন সমারোহ। মেঘের গায়ে মাথায় বিসর্পিত রেখা এঁকে চিড় ধরল একটা চকিতের জন্ম। চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-গর্জ্জনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল—মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে—দিকে দিগন্তরে। মেঘের ডাক 'মাভৈঃ' ধ্বনির মত শোনাল যেন। বৃষ্টি নামল দেখতে দেখতে। ফোঁটায় ফোঁটায়, ধারায় ধারায় বৃষ্টি নামছে। গা, মাথা—গোকুলের সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে তরল আনন্দ ঝরে পড়ছে যেন। তৃষাদীর্ণ মাঠের সে কি তৃপ্তিস্নান! বৃষ্টি নয়—আশীর্ব্বাদের অজস্র ধারা নামছে। বিবর্ণ বিশীর্ণ ধান গাছ-গুলির গায়ে-মাথায় সঞ্জীবনী-সুধা ঝরে পড়ছে যেন।

—এই শুনছ—বলি, ওগো শুনছ—ডাকের সঙ্গে অল্প একটু নাড়া পেতেই ঘুম ভাঙল গোকুলের।

—ইস্, ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে একেবারে। দেখ দিকি, মাদুর বালিশ সব ভিজে সপ সপ করছে কি রকম। পাখাটা গেল কোথায় গো? সরে শোও দেখি একটু।

আঁচল দিয়ে পিঠ আর গলার কাছটা সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে জোরে জোরে হাতপাখা নাড়তে লাগল বউ। ভাদ্রশেষের রাত; ভোর হয়ে আসছে সবে। গাছপালার পাতা নড়ছে না কোথাও একটিও। শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে গেছে যেন বিশ্বপ্রকৃতির। অসহ্য গুমোট গরমের চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন ঘরের মধ্যে। পাশ ফিরে শোয় গোকুল। জল কোথায়! স্বপ্ন—নিতান্ত স্বপ্নই দেখছিল ও। ঘামে ভিজে প্যাচ প্যাচ করছে ওর সর্ব্বাঙ্গ। দেহ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায়, ধারায় ধারায় ঝরে পড়ছিল—বৃষ্টি নয়—ঘাম।

গোটা ভাদ্র মাসটায় আকাশ বর্ষাল না এবার একটি দিনের জন্যেও। অভাবনীয় ব্যাপার বৈ কি! ক্ষেতে ক্ষেতে মাটির বুকে অসংখ্য ফাটল ধরতে সুরু হয়েছে এবার। শীর্ণ ধানচারাগুলি আতঙ্কে শীর্ণতর হয়ে উঠছে দিন দিন। ধরিত্রীর বক্ষসঞ্চিত শেষ স্নেহবিন্দুটিও বাষ্প হয়ে উবে গেছে যেন। মমতাহীন হয়ে উঠছে ক্রমশঃ মাটির মর্ম্মস্থল। পরমায়ু আগলে রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা সুরু হয়েছে শিশু-ধানগাছগুলির মধ্যে। লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোন রকমে গিয়ে গোকুল ক্ষেতটা দেখে এসেছে কাল। নাবী আবাদ এবারের। তা হোক। এই ত সে-দিনও প্রাণ-প্রাচুর্য্যে টলমল করছিল ক্রমবর্দ্ধমান উদ্ভিদ-শিশুগুলি। সত্যি, কচি কচি ধানগাছগুলির দিকে তাকানো যায় না যেন আর। সারা দুপুর ধরে ভাদ্রের তপ্ত রৌদ্র লকলকে জিভ বার করে মাটির স্নেহরস লেহন করে এখন। নিঃশেষিত হয়ে আসছে সে স্নেহরস। নির্ম্মম ভাবে লেহন করতে সুরু করেছে এবার—কচি কচি প্রাণের শেষ অস্তিত্বটুকু। অগণিত উদ্ভিদ-শিশুর অসহায় অন্তিম হাহাকার শুনে এসেছে যেন ও কাল। বৃষ্টি চাই। চাই অজস্র বর্ষণের প্রাণ-স্পর্শ। আজই—এখনই।

তপ্ত নিশ্বাস ফেলে বললে গোকুল, উঃ, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই—ধানগাছগুলি টেকবে না বোধ হয় আর। ক্ষেত সব জ্বলতে সুরু হয়েছে—দেখে এলাম কাল। এবারও আকাল হবে বউ—পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কথা শুনে চমকে উঠল বউ। বউ মহামায়া নানা সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখে এখন। কল্পনায় ওর ইন্দ্রধনুর রঙ ধরে। গত মাসে পঞ্চামৃত মুখে দিয়েছে ও। শুধু অপ্রত্যাশিত নয়—নিতান্ত অভাবনীয় ব্যাপার বৈ কি! না হলে—এই সাইত্রিশ বছর বয়সে···। ভাবতেও কেমন যেন লজ্জা লাগে ওর। খোকা, খুকী যা হোক একটা পেটে এসেছে ওর—এই প্রথম। বউ তাই অশুভ কিছু ভাবতে পারে না এখন। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ও এখন অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রেখা খোঁজে শুধু। আশ্বাস দিয়ে বউ বললে, না গো না। দু'এক দিনের ভেতরই জল নাববে ঠিক দেখ। ভেবো না অত। ঠাকুর মুখ তুলে চাইবেনই ঠিক। কুড়ুলে কোদালে মেঘ উঠেছিল সেদিন। চাদেরও সভা হচ্ছে ক'দিন ধরে। গিন্নীপুকুরের ধারে বেঙ ডেকেছে কাল সারারাত। আজই বৃষ্টি হবে ঠিক—দেখ তুমি।

কোন কথা বললে না আর গোকুল। আজ কাল করে ভাদ্র-মাসের ক'টা দিনই তো কেটে গেল। না—কোন আশাই আর করে না গোকুল। ক্ষেতের যা অবস্থা ও দেখে এসেছে কাল! আশায় আশায় বুক বাঁধুক মেয়েছেলে। স্বপ্ন দেখুক সন্তানসম্ভবা নারী। পুরুষ সে। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে হবে তাকে একা। না—ভরসা করে না সে আর কোন কিছুরই।

সত্যি। বউ মহামায়া দেহে-মনে পালটে যাচ্ছে যেন দিন-দিন। অবকাশের মুহূর্ত্তগুলি ওকে এখন স্বপ্ন দেখায় শুধু। স্বর্ণ-সম্ভাবনায় ভরা কত কি স্বপ্ন সব। নীড়ের মায়াও মনকে ওর আচ্ছন্ন করে এখন ক্ষণে ক্ষণে। ঘর, দোর, উঠান—সবকিছুই নতুন করে আবার নিবিড় সম্পর্ক পাতাতে চাইছে যেন। আধ-ভাঙা জীর্ণ ঘরখানা নতুন প্রাণের স্পর্শ চাইছে আবার। সংস্কার চাইছে জীর্ণ অঙ্গের। সত্যি—আড়ার বাঁশক'খানা না পালটালে

চলে না আর মোটেই। ওদের একটায় দোলনা ঝুলবে খোকার! হাত পা ছুড়ে—হাসতে হাসতে দোল খাবে যে তার খোকনমণি জোরে বর্ষালে ঘরের মেঝে আর দাওয়ায় স্রোত বয় যেন। 'থল' থাকে না আর কোথাও। যা হয় একটা গতি করতেই হবে চালখানার। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে বেড়াবে কোথায় শুনি সোনামণি ওর। ঘরের গা ঘেঁষেই মুখুজ্যেদের ডোবাটা। এবার আকাশে জল নেই তাই। না হলে এমন দিনে কানায় কানায় ভরে যায় ওটা। উঠানে ওর জল ওঠে। ওদিকটায় বাঁশ-বাখারি দিয়ে বেড়া দেওয়া দরকার ভাল করে। দুষ্টটা কি কম ছটফটে হবে! উঠোন ছুরমুশ করে বেড়াবে নিশ্চয়ই সর্বক্ষণ। চোখ এড়িয়ে ডোবার দিকটায় যেতে কতক্ষণ! গেল বছরে দক্ষিণপাড়ার কামার বউয়ের দামাল ছেলেটা! আহা, এমনি করে চোখ এড়িয়ে গিয়েই ত তলিয়ে গিয়েছিল। না—খারাপ কোন চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিতে ভারি ভয় লাগে ওর আজকাল। ওধারে শাশুড়ীর ঘরখানা পড়ে গেছে কবে। ওই ঢিপির ওপরেই ছোটখাটো একচালা ঘর একখানা তুলতেই হবে যেমন করে হোক। ছেলে কি আর ওর খোকাটি থাকবে চিরকাল! বড়সড় হলে সকাল সকাল বিয়ে দেবে ও ছেলের। এ ঘরদোর ছেড়ে দেবে ছেলে-বউকে। আহা—নূতন সাধ-আহ্লাদ শুরু হবে সবে তখন ওদের। নিজেদের জন্যে মাথা গুঁজবার মত যেমন তেমন ঠাঁই হলেই হ'ল একটু। গোয়ালের চালাটারও ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি। বৃষ্টি নামলে কালিন্দীটা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে। আহা বেচারী! মুখপুড়ী আব'র ওরই সঙ্গে একমাস আড়াআড়ি বিয়োবে কিনা। ভালই হবে। হোক আকাশকুসুম। শুয়ে শুয়ে মহামায়া আকাশকুসুমেরই মালা গাঁথে এখন।

বৈকালে সেদিন উঠানে বসে টুকরো টুকরো করে কঞ্চি কাটছে গোকুল। জ্বালানির ব্যবস্থা করছে। উঠানের কোণ থেকে পড়ন্ত রোদটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। ঘাম মুছে আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে গোকুল দূর আকাশের পানে। মেঘ একখানা মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসছে বটে। দুলেপাড়ার ওদিকটায় বাঁশবনের মাথা পর্যন্ত এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে যেন একটু। কিন্তু নামেই মেঘ ও। কাজলের মত ঘন কালো ছায়া নেমেছে কৈ? ও-মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ জুড়োয় না একটুও, তৃপ্তি হয় না হৃদয়-মনের। বিশেষ করে এমন দিনে। কেমন যেন পাংশুটে ধরনের মমতাহীন মেঘ। বুক-ভরা ওর করুণা-সম্পদ কৈ? আধ ঘণ্টার মধ্যেই দমকা হাওয়া এল খানিকটা। শীতল কোমল স্পর্শ লাগল একটু দেহে মনে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ফিস ফিস করে মিনিট কয়েক বর্ষণ করেই সে মেঘ উধাও হয়ে গেল দূরে—দিক্‌প্রান্তের আকাশে। আরও তৃষাতপ্ত হয়ে উঠল যেন মাটির মর্মস্থল। আশার অঙ্কুরও সব মুষড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘর আর দাওয়ার মেঝে ঝাঁট দিয়ে খড়কুটোগুলি জড়ো করছিল মহামায়া। হাওয়া একটু জোরে বইলেই চালের পচা খড়কুটো সব ঝরে ঝরে পড়ে মেঝের সর্বত্র। বিরক্ত হয় না মহামায়া একজন্তে। কোন অনুযোগও নেই ওর মুখে। ভাবে—এ তার অদৃষ্ট। না হলে—জোয়ান মানুষটার শরীর অমন করে ভাঙবেই বা কেন হঠাৎ। লোহার মত মজবুত গতর। দিব্যি খাটছিল খুটছিল। কোথা থেকে পোড়া উকম্ভন্ত হয়েই ত কাল করলে। উঃ, ছ'মাস ধরে একনাগাড়ে কি বিপত্তিই গেছে সে বছর। হাসপাতাল-ঘর, যমে-মানুষে টানাটানি। সেই সঙ্গে পয়সার ছরকট। পায়ে পোষ ধরে গিয়ে শেষটায় সে কি কাণ্ড! পুরা পাটাই বাদ দিতে হ'ত। মা সিদ্ধেশ্বরী—হাঁ মা সিদ্ধেশ্বরীই বাঁচিয়েছেন সে যাত্রায়। সরু হয়ে পা-টা অল্প ছোট হয়ে গেছে—তা হোক। জন্মের মত খোঁড়া হয়ে গেছে বটে—প্রাণটা ত রক্ষা পেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মহামায়া। স্বামীর দিকে নজর পড়তেই বড় আশা করে বলে কেলল কস করে, জাখ, আড়া ক'খানা পালটে যেমন করে হোক ঘরখানাকে ছাইয়ে নিতে হবে কিন্তু। একটু বর্ষালেই মেঝের কি দশা হয় দেখছ ত? অমনি পুরানো বাঁশ-বাখারি দিয়ে ডোবার ধারের ওদিকটায় বেড়া দিয়ে দিও ভাল করে—বুঝলে? রাজ্যের ছাগল-গরু ঢোকে ওদিক দিয়ে।

অপস্রিয়মাণ মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে গোকুলের অন্তরের আকুলতা বেড়েছে তখন অনেকখানি। দৃষ্টি ফেরালে ও। চোখে মুখে বিপুল উৎকণ্ঠা। স্ত্রীর কথাগুলো কানে যেতেই মনমেজাজ বিগড়ে গেল হঠাৎ। খেঁকিয়ে বললে, গা জ্বলে ওঠে তোর কথা শুনলে। সাপের পাঁচ পা দেখিছিস নাকি! মাঠ জ্বলে যাচ্ছে। ঘরে কুটোটি উঠবে না এবার। আমার শরীরেরও এই অবস্থা। রোজ ঘিনঘিনে জ্বর হচ্ছে। পেটে কি দিবি—তাই ভাব এখন বসে বসে। ঘর মেরামতির কথা ভাবিস তখন পরে।

এমন করে আজও আবার খেঁকিয়ে উঠবে যে গোকুল তা ভাবতে পারে নি মহামায়া। মাটির মানুষ বললেই হয় লোকটা। সাত বছর বয়েস থেকে স্বামীর ঘর করছে ও। হাড়মজ্জা—মানুষটায় চিনতে আর বাকী নেই কিছু। গায়ে পড়ে ঝগড়া খুনসুটি করেছে ও কত নিজে। বড় হয়ে—যা-নয়-তাই বলেছেও ও কত কি। কিন্তু, কড়া কথা দূরে থাকুক—রা কাড়ে নি একটাও কোনদিন গোকুল। সেই মানুষ যেন পালটে যাচ্ছে দিন দিন। আধপেটা খেয়ে, শুকিয়ে শুকিয়ে—ভেবে ভেবে, কেমন যেন হৃদয়হীন হয়ে উঠছে মানুষটা। না হলে, সেদিন রাতে অমন কথা মুখ থেকে বার করলে কি করে—ভাবে তাই মহামায়া!

কি আর এমন অন্যায় কথা বলেছিল ও শুনি। ভাল একটা কাঁসার ঝিনুক—আর মজবুত দেখে বেতের দোলনা একটা—সেই দরকার ত হবেই আর দুদিন বাদে। তাই বলেছিল—কার্তিক মাসে গোপীকান্তপুরে রাসের মেলা বসবে ত। দেখ না—মেলাতলায় খোঁজ করে পাও যদি—ঝিনুক আর দোলনা। দরকারের সময়—হাটে আবার পাওয়া যাবে কিনা—ঠিক আছে কিছু?

কথা শুনে একেবারে আলের কেউটের মত ফোঁস করে উঠেছিল

মানুষটা। শুধু বিনুক দোলনা কেন—চূড়ামণি স্যাকরাকে দিয়ে তোর ছেলের পায়ের মল আর কোমরের গোটও গড়িয়ে রাখব এবার।

শুধু রাগের কথা নয়—কথায় যেন বিষ মেশানো। চোখে ওর জল এসে গিয়েছিল সেদিন। সংসারের অবস্থার কথা ও যেন ভাবে না কিছু। সহায়সম্বল বলতে—ঐ ত বিঘেচারেক মাত্র জমি। তাও বাঁধা পড়েছে মুখুয্যে মশায়ের কাছে। গতর খাটালেও সংসার চলে। কিন্তু সেবার শরীরের ঐ রকম হাল হ'ল মানুষটার। তার উপরি-উপরি দুবছর বন্যা হয়ে অজন্মা হয়েছিল। জোতজমি বাঁধা না দিয়ে আর উপায় ছিল নাকি! সুদে আসলে যা দাঁড়িয়েছে এখন—তা শুধতে গেলে জমি ত যাবেই, ভিটেয়ও টান পড়বে। মুখুয্যে মশাই শাসাচ্ছেন রোজ—পোষের আগে টাকা না শুধলে—ভিটেয় ঢোল পেটাবেন তিনি—নিলামে চড়াবেন সব। হাতে পায়ে ধরে কুঞ্জ কয়ালের কাছ থেকে কিছু হাওলাত নিয়ে পেট চলছে এখন কোন রকমে। তাও আসছে মাসের মধ্যে শুধতে না পারলে গাভিন গরুটাকে দিয়ে দিতে হবে কয়াল মশাইকে। একরকম বন্ধকেরই সামিল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও সবই। কিন্তু মেয়েছেলে সে। কি করতে পারে শুনি! দিনে রাতে চোখের জল ফেলে ফেলে কত ঠাকুর-দেবতাকে ত ডাকে সে। কত কি মানত করে। মনে মনে বলে—মুখ তুলে চাও ঠাকুর। বৃষ্টি দাও—ধান দাও—মানুষটার শরীরে বল দাও। আরও কত কি প্রার্থনা জানায়। এসব জেনে শুনেও ফস করে বললে কি না সেদিন—পেটের ছেলেটা তোর—অলক্ষুণে অপয়া।

কথার কি ছিরি! মুখে বাধল না একটু কথাটা বলতে। চমকে উঠেছিল মহামায়া কথাটা শুনে। ছলছল চোখে বলেছিল ও—আকাল—অসময় এসব বুঝেই বুঝি শত্তুরটা পেটে এসেছে আমার! ছেলে হলে—ছেলে যেন একা আমারই হবে। কার বংশরক্ষে হবে শুনি? আমার সাতপুরুষ জল পাবে বুঝি?

কিন্তু বর্ষণপ্রতীক্ষাব্যাকুল মানুষটা ভিতরে ভিতরে তপ্ত রুক্ষ হয়ে উঠেছিল অনেকখানি। এক ঝলক অগ্ন্যুদগারের মত উত্তর বেরিয়ে এসেছিল সেদিন গোকুলের মুখ দিয়ে—বংশরক্ষে হবে না ছাই হবে। যম আমার ও—খেতে এসেছে আমাকে।

শিউরে উঠেছিল মহামায়া। ঠাকুর, এর চেয়ে মাথায় বাজ পড়ল না কেন? কথায় বলে সন্তান। সাতরাজার ধন মাণিকও তুচ্ছ এর কাছে। পাঁচটা নয়—সাতটা নয়। কতদিনের স্বপ্ন-সাধ ওর। অকালে অপ্রত্যাশিত করুণা নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে। চিরবাঞ্ছিত করুণা এ। এক ফোঁটা অমৃতেরই সামিল।

কথা শুনে ক্ষেপে উঠেছিল যেন মহামায়া। বলেছিল—ছোট-লোক কি না—তাই মুখে বলতে তোমার আটকায় না কিছু।

ছোটলোক! হাঁ, ছোটলোকই বটে। স্ত্রী অন্তঃসত্বা—এ-কথা জানার দিন থেকেই গোকুলের মতিগতির অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে যেন। কি এক ধরনের অস্বস্তিকর ভাবনা ভর করেছে ওর দেহে মনে। এ ভাবনা ভবিষ্যতের ভাবনা। দু'টিমাত্র প্রাণীর ছকে বাঁধা সীমায়িত ভবিষ্যৎ নয়। এ ভবিষ্যৎ তার বংশধরের—সেই সঙ্গে বংশধারার। গত সনে ফসল হয় নি ভাল। এ বছরও বর্ষণ নেই এক ফোটা। সামনে আকাল। ভাঙা শরীর ওর। ঋণের বোঝাও বাড়ছে ক্রমশঃ। জমিজমা, ভিটে—সবকিছুই ঘুচবে একে একে। দুর্ব্বিষহ একটা পরিস্থিতি চারদিক থেকে চেপে ধরে নিষ্পিষ্ট করতে চাইছে যেন ওকে। ছোটলোক! হাঁ, মন, মেজাজ, আচরণ—সবকিছুই গোকুলের ছোটলোকের মত হয়ে আসছে যেন। ঠিকই। চোর বদনামও হয়েছে ওর। ছোটলোক না হলে—সামান্য দু' ডাল পুঁইশাক—এ আবার চুরি করতে যায় কেউ। ইদানীং হ্যাংলামিও বেড়েছে যেন বউয়ের। মুখুয্যেদের মাচাভরা পুঁইশাক দেখে দেখে নোলায় জল আসত রোজ মহামায়ার। রাতে সেদিন চুপি চুপি শাক কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছিল গোকুল। মার না খেলেও অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে। বউয়ের জন্যেই শুধু চোর বদনামও হয়েছে ওর। ছোটলোক! স্ত্রীর কথাটা কশাঘাতের মতই বেজেছিল সম্ভবতঃ। ক্ষণিকের জন্যে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েছিল নিশ্চয়ই। না হ'লে—অমন করে সজোরে চড় কষিয়ে দিলে কি করে মানুষটা মহামায়ার গালে! মাথা ঘুরে গিয়ে পড়েছিল মহামায়া মেঝের উপরে। শুধু কি তাই—দাঁতের গোড়া দিয়ে কয় রক্তটা বেরিয়েছে সেদিন!

এই স্বামীই কিন্তু ওর অমন ছিল না কোন কালেই। ছেলে-পুলে ভালবাসে লোকটা চিরকালই। পরের ছেলে মেয়ে নিয়ে কোলেপিঠে করে ঘোরা বাতিক ছিল মানুষটার। সত্যি—ছেলে-পুলে হ'ল না বলে কম কাণ্ড করে নি গোকুল। কত ওষুধপালা মাদুলি—এনে দিয়েছে ওকে দূরদূরান্তর থেকে। এই সেদিনও অসুখ হবার আগে—ছেলের জন্যে আবার একটা বিয়ে করবে বলে কত রাগিয়েছে ওকে। তা ছাড়া, ও পঞ্চামৃত মুখে দেয় যেদিন—সেদিনও রাতে—ছেলে হ'লে ঠিক কার মত দেখতে হবে তা নিয়ে কথা উঠতে কত রাগালে ওকে। সেই স্বামী ওর কি যেন হয়ে গেল এই ক'দিনের মধ্যেই। অনাবৃষ্টি। হাঁ, আকাশের কৃপণতাই শুধু দায়ী এর জন্যে। বর্ষণ চায় মানুষটা। অজস্র ধারাবর্ষণ। পর্য্যাপ্ত করুণাবর্ষণ সেই সঙ্গে। বর্ষণের অভাবেই বিবর্ণ বিশীর্ণ ধানগাছগুলোর মতই মানুষটি শুকিয়ে শুকিয়ে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। রং রূপ সব পালটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। নিশ্চিহ্ন হয়ে উবে যাচ্ছে সেই সঙ্গে হৃদয়-মনের সঞ্চিত সম্পদ। বিবেক-চৈতন্যও তাই বিকৃত হয়ে উঠছে লোকটার।

শেষ পৌষের একটি শীতজর্জ্জর সন্ধ্যা। অভাবনীয় কিন্তু এ সন্ধ্যার রূপ। অকালে মেঘে মেঘে ভরে গিয়েছে সারা আকাশ। পুঞ্জমেঘ ঘনতর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। আসন্ন দুর্য্যোগের আভাস সব দিকে। থম্ থম্ করছে দিগদিগন্ত। ক'মাস ধরে কালাজ্বরে ভুগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে এসেছে গোকুল। ঝিনঝিনে জ্বর

দেহটাকে অবশ্যম্ভাবী একটা পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে নির্মমভাবে। বেশীদিন ও আর বাঁচবে না হয়ত। সেই ভাল। চিরনিশ্চিন্তের প্রতীক্ষায় একটি একটি করে দিন গোনে এখন গোকুল। ইতিমধ্যে জমিজমা সব ঘুচেছে জন্মের মত। ভিটেও ছাড়তে হবে দু'এক মাসের মধ্যেই। নিলামে ডেকে নিয়েছেন সবকিছু মুখুয্যেমশায়। এ জায়গাটায় কলমের আমচারা বসাবেন উনি। সখের আমবাগান করবেন একথা বলে বেড়াচ্ছেন সকলকে। সংসারের মায়া-গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে অনেকটা। অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে ওর মানসপ্রকৃতি। অবসান চায় ও। নিজের অস্তিত্বের অবসান—সেই সঙ্গে নিজের বংশধারারও। নানান ভাবনা ভর করছে গোকুলের মাথায়। অবাঞ্ছিত চিন্তা এসব। হঠাৎ চিন্তায় ওর চিড় ধরল। কানে এল—আদুরীর মার স্নেহার্দ্র কণ্ঠ।—কানা বেটা তোমার কি বলেগো—অ বৌমা! এবেলায় আর ব্যথা-ট্যাথা উঠেছিল নাকি? ভরা দশমাস চলছে মহামায়ার। ভোর থেকেই আজ ব্যথা সুরু হয়েছে একটু। ব্যথা বাড়ছে, কমছে, মিশিয়ে যাচ্ছে আবার। কাজ সেরে আদুরীর মা বাড়ী ফিরছে হয়ত। মুখুয্যেবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে সে। সকালে শুনেছিল হয়ত ব্যথা ওঠার কথা। উঠানে দাঁড়িয়ে খবরটা নিচ্ছে তাই। প্রায়ান্ধকার ঘরের মেঝে থেকে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠ আকুলভাবে চি চি করে করে উঠল একবার। মহামায়ার কণ্ঠ। ক্ষীণ সুরে বললে কোন রকমে দম নিয়ে—আজ রাতেই কিছু হবে হয়ত খুড়ী। জ্বরটাও আজ বেড়েছে তেমনি।

বড় অনুনয়ের সঙ্গে অসহায় কণ্ঠের আর্তিও কানে এল আবার। —পার ত, ভারী রাতে একবার খবর নিও খুড়ী। আমার আর ডাকবার জানাবার কে আছে বল? বাড়ীর মানুষের ত ওই অবস্থা!

জাতে দুলে আদুরীর মা। খালাস টালাস করায় ভাল। নাড়ী কাটে। আশ্বাসভরা আদুরীর মার গলা কানে এল গোকুলের। ছেঁড়া লেপটা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে গোকুল ভাঙা তক্তপোশের উপর। মুখটা বিস্বাদ ঠেকছে আজ বেয়াড়ারকম, গায়ের তাতও আজ বেড়েছে যেন দ্বিগুণ। চিন্তায় চিন্তায় স্নায়ুগুলো নিষ্পিষ্ট হয়ে হয়ে অসাড় হয়ে গেছে পুরোপুরি। ভাবনাহীন চেতনাহীন একটা শূন্যতায় ভরে উঠছে ক্রমশঃ হৃদয়-মন। আরও কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে—আরও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গোকুল পাশ ফিরে শুল।

ওদিকে মেঝের পড়ে পড়ে—জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে অল্প ব্যথা খেতে খেতে—চিন্তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ মহামায়া। সারা চিত্ত জুড়ে—সীমাহীন চিন্তাপারাবার। বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়ে উঠছে অনন্ত চিন্তারাশি। আকুল ভাবে একটা অবলম্বন খুঁজছে মহামায়া। মাথা তুলতে চাইছে মহামায়া—আলোর আশায়—তীরের আশায়—নীড়ের আশায়। পা রেখে দাঁড়াবার মত ঠাঁই চাই একটা—দু'এক মাসের মধ্যেই। শত্তুর—শত্তুরটা অকালে পেটে এল কেন তার। অকালে কেন এ অপ্রত্যাশিত করুণাবর্ষণ! চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল অনেকখানি। অবলম্বন একটা চাই-ই যে তার। একার জন্যে নয়—আর একটির জন্যে। হাঁ, পেটের ওই শত্তুরটার জন্যেই যত ভাবনা। রক্তের সম্পর্কের কেউ কোথাও বেঁচে নেই যে দুঃখ জানিয়ে উঠবে গিয়ে তাদের আশ্রয়ে। সব ঘুচে গেছে। এক কাকা আছে অবশ্য। আপন কাকা নয়—বাপের খুড়তুতো ভাই। রক্তের সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাক—আপনজন ত! কিন্তু হলে কি হবে। তার চেয়ে পর ভাল। না হলে, বিশ বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে ওর—এর মধ্যে একখানা চিঠি দিয়েও খোঁজখবর নিয়েছে কোনদিন। গুড়ের কারবার তার বায়গঞ্জের হাটে। বড় আড়তদার। লোকমুখে অনেক কথাই শোনে মহামায়া। অমন চশমখোর নাকি দুটি নেই দুনিয়ায়। তিনটি বউকে খেয়েছে। ছেলেপুলে হয় নি কারও। তিন কাল গিয়ে এককালে এসে ঠেকেছে। কিন্তু দানপুণ্যি কি তীর্থধর্ম করা চুলোয় যাক দিনরাত শুধু লাভের কড়ি গোনে আর সুদের হিসেব করে। প্রার্থী ভিখারী এলে—কুকুর-শিয়ালের মত তাড়ায় যেন—এমনি স্বভাব। আজ এই অসময়ে তার কাছে গিয়ে উঠলে আশ্রয় মিলবে নাকি। চোখের জলে ভিজিয়ে চিঠি একখানা লিখিয়েছিল ও সেদিন—সব অবস্থা জানিয়ে। কত আশা করেছিল। কিন্তু উত্তর একটা এল কৈ? মনে অনাবশ্যক অভিমান একটু হয় যেন। অশ্রুধারায় নিঃশেষিত হয়ে ধুয়ে যায় আবার সে অভিমান। পেটের ব্যথাটা যেন কমে আসছে একটু। চিন্তাগুলো ক্রমশঃ ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তন্দ্রা আসছে বোধ হয়। কে জানে—জ্বরে জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে হয়ত স্নায়ুগুলো।

ঘুম আর তন্দ্রা—দুঃস্বপ্ন আর আতঙ্ক—এ সবের ভিতর দিয়ে রাত বেড়েছে কখন। প্রহরের পর প্রহর কেটেছে। প্রতি প্রহরে শিয়াল ডেকেছে। গোকুলের কানে কোন আওয়াজই যায় নি আজ। সম্বিৎ ছিল না আজ আর তার। এমন হয় না বড় একটা। তীব্র নিখাদে ধ্বনি উঠল কয়েকবার। আতঙ্ক-ইঙ্গিতময় ধ্বনি যেন। উঠানের নজনে গাছটায় বসে পেঁচা ডাকল একটা। শেষপ্রহরের ডাক। কিন্তু কি বিশ্রী বীভৎস ডাক পেঁচাটার! ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের সীমানায় ধক্ করে আর একটা ধ্বনির ধাক্কা লাগল যেন। অব্যক্ত ভাবাহীন একটা আবেদন-ধ্বনি উঠছে থেকে থেকে মেঝের ওদিক থেকে। গোঙানির মত শোনাল যেন। সৃজন-বেদনার দুঃসহ আলোড়ন সুরু হয়েছে। দ্বিধাবিভক্ত হতে চাইছে যেন মহামায়া। ছটফট করছে তাই আকুল ভাবে। ভাবাহীন অব্যক্ত আর্তধ্বনি আবার ওর মর্মে ঘা দিলে। স্নায়ুর মধ্যে হঠাৎ সচলতার প্রেরণা এনে দিল যেন ওই শব্দটা। তক্তপোশ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এল গোকুল। দেশলাইয়ের মধ্যে এখনও কাঠি আছে গোটা দুই। কিন্তু কেরোসিনের ডিবেটা কোথায়? তা ছাড়া তেল কৈ? যুদ্ধের বাজার। কণ্ট্রোল সব, তায় পাড়াগাঁ। সন্ধ্যা আসে—রাত্রি

আসে। আলো জেলে প্রতিটি সন্ধ্যাকে আর অভিনন্দন জানাতে পারে না এ সংসার। বাইরে মেঘে মেঘে চকিত বিদ্যুৎ-স্ফুরণ সুরু হয়েছে মহা আড়ম্বরে। দরজাটা টেনে খুলে ফেললে গোকুল। আকাশে প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়ে বাজের আওয়াজ ফেটে পড়ল বাঁশবনের ওদিকটায়। ছটফট করছে মহামায়া। আতুরীর মাকে ডাকতে হবে এখনি। এখনি একজন না ধরলে ওর অভাবনীয় কিছু ঘটবে হয়ত। দাঁড়িয়ে থাকা চলে না আর। লাঠিটা নিয়ে কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে পড়ল গোকুল। বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে চোখ ধাঁধিয়ে বজ্রপিণ্ড নামল যেন মুখুযোদের তালগাছটার মাথা ঘেঁষে। বৃষ্টি নামল সঙ্গে সঙ্গে—ফোঁটায় ফোঁটায়—ধারায় ধারায়। দেখতে দেখতে একেবারে মুষলধারায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। অকালবর্ষণ। রোগ, চিন্তা, দুর্বলতা—সবকিছু সরে গেছে তখন চৈতন্যের সীমা থেকে। একটা প্রেরণা ভর করেছে যেন—গোকুলের দেহমনের উপর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে না ঠিক। লাঠির ঠেলা দিয়ে দিয়ে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে যেন গোকুল—দুলে-পাড়ার দিকে। বাঁশবাগানের পথটা পেরিয়ে এখনো যেতে হবে অনেকখানি। পায়ের তলা দিয়ে স্রোত বইতে সুরু হয়েছে। কপির ক্ষেত, আলুর ক্ষেত, মূলো কড়াইশুঁটির ক্ষেত। স্রোত নামতে সুরু হয়েছে সব ক্ষেতে ক্ষেতে। পৌষের শেষে অপ্রত্যাশিত এ বৃষ্টি। আকস্মিক এই বর্ষণের ফলে কত শিশু-উদ্ভিদ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবে হয়ত। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে গোকুল। বাঁচতে চায় ও। বাঁচাতে চায় সে তার অনাগত আত্মজটিকে। নিশ্চিহ্ন হতে চায় না গোকুল। অমর হয়ে থাকতে চায় গোকুল তার বংশধারার মধ্যে। আদিম-অকৃত্রিম প্রবৃত্তি আজ প্রাণপুষ্ট হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। চলার গতির মধ্যে সে প্রবৃত্তির আবেগস্পর্শ লেগেছে যেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল গোকুল। বাইরে দুর্যোগঘন পরিবেশ। ভাঙা ঘরের মধ্যেও অভিনব দৃশ্যপট রচিত হয়েছে তখন। সকালের আলোয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সে ছবি। প্লাবন সুরু হয়েছে ঘরের মধ্যে। স্থল নেই আর কোথাও। স্রোত বইছে যেন মেঝের উপর দিয়ে। এক কোণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে মহামায়া। ভাঙা চাল ফুঁড়ে অবিশ্রান্ত বর্ষণধারা নেমে দেহটাকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বিপর্যস্ত করে এনেছে অনেকখানি। পায়ের কাছে অসহায় ভাবে পড়ে আছে কাদাজলে-মাখা অপরিচ্ছন্ন একটি মানব-শিশু। নিষ্প্রাণ অনড় শিশুর কচি দেহটা ঘিরে স্রোতের আবর্ত রচিত হয়েছে যেন। পা নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল গোকুল। জ্বরে জীর্ণ শরীরটা তার থারাম্মানে বিধ্বস্ত হয়ে এসেছে যেন। পা দুটো ভেঙে পড়তে চাইছে এখনই। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। বুকের ভেতরের কাঁপন দুর্বার হয়ে উঠছে আরও। মাটিতে পড়ে এখনি শেষ নিশ্বাস ছাড়তে চাইছে যেন দেহটা। চেয়ে চেয়ে আজ হঠাৎ চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবার মত অবস্থা হ'ল গোকুলের। ভাদ্রে এমনি বর্ষণের প্রতীক্ষায় একটি একটি করে দিন গুনেছিল গোকুল—আকুলভাবে। অকালে পৌষ-শেষে সেই প্রতীক্ষমাণ দিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করবার জন্যেই কি এই দুর্যোগ নেমে এসেছে আজ!—কিন্তু কেন?

অনেক বেলায় দুর্যোগ থামল যখন—তখনো সংজ্ঞা ফেরে নি মহামায়ার। বাড়ী থেকে কাঠকুটো এনে আগুন জ্বালিয়ে সেঁক তাপ দিচ্ছে আতুরীর মা। আপনজনও এমন করে না বোধ হয়। রোগজীর্ণ সামর্থ্যহীন দেহটায় সব বিক্ষোভ অগ্রাহ্য করে ওষুধ আনতে গিয়েছিল গোকুল। নীলমণি ডাক্তারের কাছ থেকে পুরিয়া পেয়েছে ক'টা। ভাবতে ভাবতে ফিরছে গোকুল। কাল চিঠি এসেছে একখানা। হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। পড়ে দেখবার মত আর সামর্থ্য ছিল না কাল। জ্বরের তাত বেড়েছে তখন। বালিশের তলায় গুঁজে রেখে দিয়েছিল চিঠিটা। কার চিঠি কে জানে! আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও নেই তো কোন চুলোয়। কার চিঠি হবে! ভাবতে ভাবতে ফিরল গোকুল। পুরিয়া একটা জলে গুলে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিলে মহামায়াকে। নিশ্বাস ছেড়ে উঠল গোকুল। ভিজে বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা টেনে বার করলে তাড়াতাড়ি। টানাটানা অক্ষরে লেখা। অল্প ভিজে গিয়ে অক্ষরগুলো থেবড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। লিখছে নীলাম্বর নিয়োগী। রায়গঞ্জের চিঠি। লিখেছে তা হলে মহামায়ার সেই চশমখোর কাকা। অক্ষর-গুলো যেন গিলতে লাগল গোকুল। অচিন্তনীয় কথা সব। কথা নয়—লেখা নয়। সঞ্জীবনী সুধায় ভরা করুণাময় কোন মানুষের বুকের ভাষা যেন। বৃন্দাবনবাসী হবে লোকটা। বিষয়-সম্পত্তির সবকিছু বোকা মহামায়াদেরই দিয়ে যাবে ঠিক করেছে। নিতে আসবে মহামায়াকে দু'একদিনের মধ্যেই। অপ্রত্যাশিত করুণা!

চোখ মেলে এক বার চাইলে মহামায়া। কি যেন খুঁজছে চোখ দুটো। কাকে কাছে চাইছে যেন। চিঠিখানা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল গোকুল মহামায়ার খুব কাছটিতে।

আশাদীপ্ত মন নিয়ে, চিঠিখানা মেলে ধরে গোকুল বললে, "তোর সেই রায়গঞ্জের কাকা চিঠি দিয়েছে, বউ। নিতে আসবে তোকে দু'এক দিনের মধ্যেই। যাবি নাকি সেখানে?"

এ কথার কোনো জবাব দিলে না গোকুলের বউ, শুধু অসহায়, করুণ চোখ দুটি মেলে খোলা চিঠিখানার পানে তাকিয়ে রইল এক-দৃষ্টে—চেতনা যেন তার অসাড় হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

পণ্ডিত রামচন্দ্রজীর শ্রাদ্ধের কাহিনী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বাঙালী স্বদেশেই থাকুন আর প্রবাসেই থাকুন তাঁর ঘরে নিজের দেশের আনুষ্ঠানিক পূজা-পার্ব্বণ করা চাই-ই। বছরে চার বার—লক্ষ্মীপূজা, একবার মনসাপূজা, সরস্বতীপূজা একবার এ তো আছেই, তা ছাড়া নানাবিধ ব্রত-পার্ব্বণ, ষষ্ঠীপূজা, জন্মতিথি উৎসব এসকলও তাঁরা করে থাকেন। সেকালের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে বার-ব্রত আর ষষ্ঠীপূজা, জন্মতিথি, হাতেখড়ি ইত্যাদি অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। এই সব পূজা ব্রত পার্ব্বণ ব্রাহ্মণ ছাড়া করানো যায় না; তা যে দেশেই হোক—মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, যেখানেই হোক, প্রবাসী বাঙালীরা বাঙালী ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করে নিতেন এবং পূজাও যথারীতি হ'ত।

সুদূর রাজস্থানে তাঁরা একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগাড় করে নিয়েছিলেন। নিত্য ও নৈমিত্তিক সব ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁর ডাক পড়ত সকল বাঙালীর ঘরেই।

প্রবাসের মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, গাঙ্গুলী, ঘোষ, বোস, মিত্তির, সেন রায়, গুপ্ত সকলের ঘরেই তাঁর ডাক পড়ত, আসা যাওয়া করতে হ'ত তাকে তাঁদের নৈমিত্তিক কাজে; এ ছাড়া ছেলেমেয়েদের বর্ণ-পরিচয় পড়ানোর পণ্ডিতমশাই বা মাষ্টারও তিনিই। প্রথম ভাগ থেকে বোধোদয় অবধি বাঙালীর শিশুপাল তাঁর হাতেই থাকত। বেতন, সিধা, টাকাটা-সিকিটা দক্ষিণাদি ভালই পেতেন।

পণ্ডিতমশাই বৃদ্ধ হয়েছিলেন, সহসা একদিন গুরুতররূপে অসুস্থ হলেন, তার পর তাঁর মৃত্যু হ'ল।

শোকে মুহ্যমান যজমানেরা খুব আক্ষেপ করলেন। অপুত্রক—তাঁর শেষকৃত্য এবং শ্রাদ্ধশান্তিও জ্ঞাতি কাকে দিয়ে করলেন যেন। তার পর কিন্তু বাড়ী-বাড়ী মহা ভাবনা। সমস্ত শহরের এতগুলি বাড়ীর পূজার হাল ধরে কে? ভাদ্রমাসেই লক্ষ্মীপূজা, তার পর মনসাপূজা, তার পর মাসে মাসে দু' একটি ষষ্ঠীপূজা সকল ঘরেই আছে, জন্মতিথি আছে; কারুর বা ব্রত আছে—দূর্ব্বাষ্টমী অনন্ত চতুর্দ্দশী—সেকালের সংস্কারযুক্ত মন গৃহিণীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এই সব কাজের ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণের অভাব অবশ্য সেদেশে ছিল না। কিন্তু তাঁরা তো পুরুত বামুন নন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতও নন, তাঁরা বড় বড় পদস্থ কর্ম্মচারী—অথবা ডাক্তার কিংবা অধ্যাপক। ঘণ্টা নেড়ে পূজা করবেন বাড়ী-বাড়ী, তাঁরা কেমন করে? নিজের বাড়ীতেই পূজা করবেন কি না সন্দেহ। হয়ত সব ভুলেও গেছেন, কিংবা জানেনই না!

অথচ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁরা বাঙালী পরিবারের দেশাচারসম্মত লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা পূজাদি জানেন কি? হিন্দুস্থানীদের বা সেদেশবাসীদের ঘরে পূজা পার্ব্বণ ব্রত নিয়ম অন্ত রকম, সেগুলোও বাঙালী গৃহিণীরা কিছু কিছু গ্রহণ করেছেন,—যেমন 'সুমতি' (সোমতি) অমাবস্যা' সোমবারে অমাবস্যাব্রত। কিন্তু বাঙালীর ব্রত পূজা অনুষ্ঠানের সমস্যার সমাধান তাতে হয় না।

এখন গৃহিণীরা ভেবে ভেবে আর কূলকিনারা পান না। অবশেষে এক বাড়ীর গৃহিণী ভৃত্যদের বললেন, 'একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণই যোগাড় কর।' একটু দেখিয়ে শুনিয়ে বলে দেবেন গৃহিণীরা। পূজা ত ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বারা চলবে না। না হয় ওদেশীয় মতেই পূজাপাঠ হবে।

দু'এক জন ব্রাহ্মণ দেখা গেল যাঁদের জীবিকা যজন-যাজন পূজা-অর্চ্চনা ও ভিক্ষা। খাঁটি সেকেলে প্রথামত সকলে নিয়মমত কয়েক বাড়ী ভিক্ষা করতে যান, আটা, পয়সা যে যা দেয় এনে গৃহদেবতা শালগ্রাম রামচন্দ্রজী বা রাধাগোবিন্দজীর অর্চ্চনা করেন এবং ভোগ দেন। দাতাকে আশীর্ব্বাদ করে আসেন 'বোলবালা রহে' 'পুত্রপৌত্র বধাই' (বৃদ্ধি) হোক ইত্যাদি।

শেষে লক্ষ্মীপূজা সমাগত, এক জন চাকর তাঁদেরই এক জনকে বাড়ীর গৃহিণীর কাছে এনে উপস্থিত করল।

মলিন, জীর্ণ হাতে বোনা 'রেজী'র (খদ্দর) জামা বা মেরজাই, তাঁতের মোটা ধুতি, মাথারও ময়লা জীর্ণ পাগড়ী, হাতে লাঠি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লোকের দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে নানা স্তব পাঠ করে নাম শুনিয়ে যান। সেদিনও এ বাড়ীর দুয়ারে স্তবপাঠ করছিলেন:

আদ্যাশক্তি দশমহাবিদ্যা একই রূপা মহাকালী।

… … …

বালা, কালী. ভৈরবী, কমলা, তারা চ দক্ষিণাকালী
ছিন্না, ধূমা, ভবানী শক্তি (ভুবনেশ্বরী)
মাতঙ্গী মা, মাতোয়ালী।

তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভৃত্যটি ভিতরে নিয়ে এল, তিনি 'লছমী মাঈ'র পূজা করতে জানেন কিনা। তা হলে পূজা করে দিতে হবে।

অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কানে একটু কম শোনেন। যা হোক দু'বার বলার পর শুনতে পেয়ে বললেন—লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গাদি দেবীর নাম তিনি ভাল করেই জানেন, স্তবও জানেন। পূজা করা এমন আর কি শক্ত কথা। লক্ষ্মী মাঈয়ের পূজা তিনি করে দেবেন। স্নান করে আসছেন।

এলেন পূজার ঘরে। চারদিকে পূজার উপকরণ। কাঁচা মুগের ডাল ভিজানোর নৈবেদ্য, চিনির নৈবেদ্য, চালের নৈবেদ্য,

মাথায় ক্ষীরের সন্দেশ বা কলাকন্দ শোভিত (ওদেশে সন্দেশ নেই), গায়ে পানের খিলি, আশেপাশে ফল সাজানো। জলপানের থালায় ভিজানো ছোলা মটর ও ফলমূল ক্ষীরের মিষ্টি। দেয়ালের গায়ে একটু জায়গায় গোময় ও মাটি লেপে আলপনা দেওয়া হয়েছে যথারীতি। ভাদ্রমাসের পূজায় প্রথামত সেখানে ধান, মান, পান, মরাই, শাঁখ, পেঁচা, গহনা আঁকা। লক্ষ্মী-নারায়ণ-কুবেরের সিঁদুরে-আঁকা ত্রিমূর্ত্তি। আবার মরাইয়ের পাশে কুবের দ্বারীরূপে দণ্ড পাগড়ী ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। জলচৌকীর উপর মা লক্ষ্মী ধানভরা 'বেকে'র (কুনকের) প্রতীকে রেশমের চেলী পরে কুনকেটি ঢেকে ঘোমটা দেওয়া ভাবে বসে আছেন, একটি সোনার নথ (নাকে)—ঘোমটায় আটকানো।

আশেপাশে কোশাকুশী শাঁখ ঘণ্টা ধূপ দীপ প্রদীপ পাণিশঙ্খ বস্ত্র সাজানো। সেদিন মনসাপূজাও হবে, সংক্রান্তি অরন্ধনও। গৃহিণী এবং বধূরা ভক্তিভরে পট্টবস্ত্র পরে বসে আছেন।

ব্রাহ্মণ এলেন, তাঁকে প্রণাম করে কর্ত্রী আসনে বসালেন। পূজার উপকরণের প্রাচুর্য্যে প্রসন্নচিত্ত সন্তুষ্ট পণ্ডিতজী পূজা করতে বসলেন।

কোশাকুশী নেড়ে, আচমন অঙ্গশুদ্ধি করে যথারীতি পূজা আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোথায় লক্ষ্মীস্তব—"ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি!" কোথায় প্রণামমন্ত্র 'বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি'—গৃহিণীদের শুনে ও বলে মুখস্থ হয়ে আছে—পণ্ডিতজী উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন।

গৃহিণীরা শশব্যস্তে নিষেধ করতে লাগলেন,'ও পণ্ডিতজী, লক্ষ্মী-পূজোয় ঘণ্টা বাজাবেন না, বাজাতে নেই।'

আর পণ্ডিতজী! বধির ব্রাহ্মণ তখন আরম্ভ করেছেন স্তব, তাঁর চিরকালের জানা স্তবমালা :

"আদ্যাশক্তি দশমহাবিদ্যা একই রূপা মহাকালী···"

ওমা! গৃহিণীরা হতবুদ্ধি—পণ্ডিতজী এ যে লক্ষ্মীপুজো, এ ত কালীপুজো, নয়, আদ্যাশক্তি নয়,—বলবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু একে তো পূজার আবৃত্তির সময় আর বাধা দেওয়া চলল না, তাতে আবার ব্রাহ্মণ বধির। কিন্তু পণ্ডিতজী মা লক্ষ্মীকে 'আদ্যাশক্তি দশমহাবিদ্যারূপিণী' বলে খুব ভুল করেন নি বোধ হয়। আদ্যাশক্তি কি লক্ষ্মীমাতাও নন!

যাক, গৃহিণীরা বিচলিত ও বিমনা ভাবে পূজা দেখতে লাগলেন। তার পর পণ্ডিতজী সরলভাবে তাঁর বাকি স্তব মনের ঝুলি থেকে বের করলেন, সীতাদেবীর স্তব :

জয় জয় সীতে ব্রহ্মাতীতে,
ভীমা বামা রঘু প্যারী।
রঘুপতি ধ্যান ধরে না তেরো,
তুমহি হো মঙ্গলকারী।

এক কথায় তাঁর জানা নানা স্তবে তিনি লক্ষ্মী ও 'নাগমাতাজীর' পূজা সমাপ্ত করলেন।

'গৃহিণীদের একটু দ্বিধা হলেও ব্রাহ্মণকে দিয়ে পূজা করিয়েছেন তো! নিশ্চিন্ত হলেন।

চালকলার নৈবেদ্যগুলি মিষ্টান্ন, জলপান, সব বেঁধে গুছিয়ে তাঁকে দেওয়া হ'ল। এখন 'দক্ষণা' (দক্ষিণা)?—জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধ। শুনতে পান না ভাল, দেশাচারমতে লক্ষ্মীপূজায় দক্ষিণা দেবার রীতি নেই জানেন না। নিরুপায় হয়ে বলা হ'ল—কাল পাঠিয়ে দেব।

তার পর আশ্বিন মাসে বাড়ীতে একটি ষষ্ঠীপূজা করতে হবে।

ষষ্ঠীমাতা? আচ্ছা। চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনির নাম তিনি জানেন। ষষ্ঠীপূজা? তা করে দেবেন দু জনের নাম করে। যদিও ষষ্ঠী ঠাকুরাণী নামে কোন দেবী ওদেশে নেই। ষষ্ঠীপূজার বিধিমত বটের ডাল, একুশটি খই চুবড়ি, একুশটি ক্ষীরের পুতুল, কাজললতা দিয়ে থোড়া দুধ ভরানোর জন্য একুশটি গর্ত্ত মাটির উপর, সব সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁকে আসনে বসানো হ'ল। এবারে আবার সব নতুন ধরনের উপকরণ। পণ্ডিতজীকে বলা হ'ল, মার্কণ্ডেয় মুনির মত চিরায়ু হয় যেন শিশু, ভাল করে পুজো করুন। নতুন উপকরণে, নতুন দেবতার পূজা, পণ্ডিতজী উপকরণ-সম্ভারে খুশীমনে দৃষ্টিপাত করলেন। তার পর নিজের মত আচমন ও পূজা করে আবৃত্তি আরম্ভ করলেন, এবার শিবের স্তব। মার্কণ্ডেয়-পূজার জন্য।

আক্ (আকন্দ) ধতুরা ভোজন করিহেঁ,
নাগ বরত্ত শটাওয়ে হেঁ (নাগপাশ)
···ঘণ্টালেকর গাল বজায়া
বম্ বম্ বম্ শিব বম্ ভোলা।
সিদ্ধি ঋদ্ধি যে ভর ঝোলা।
কঁহি শীষ (শীর্ষ) কঁহি চরণ কি পূজা,
কঁহি লিঙ্গপূজা বাওয়ে হেঁ (চলেছে)
··· ··· ···
ঘণ্টালেকর গাল বজায়া,
বম বম বম শিব বম ভোলা।

তার পর যথারীতি আদ্যাশক্তির স্তব বলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর অর্চনা আবৃত্তি শেষ করলেন।

ক্রমে গৃহিণীদের অভ্যাস হয়ে গেল। পূজা ত হচ্ছে। মন্ত্রতন্ত্র? তা যে দেশে আছেন, 'যস্মিন দেশে যদাচার'! গুটিকতক সংস্কৃত বচন তাঁদের ত অজানা ছিল না।

ব্রাহ্মণ সব নৈমিত্তিক ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মই করে যান।

সহসা একদিন বিকেলে রাঁধুনী বামুন চাকর সকলে বললে, 'আজ আমরা সকাল সকাল কাজ করে যাব। রাত্রে ফিরতে দেরি হবে, আজ আমাদের নিমন্ত্রণ সকলের।'

এখন রামোয়াভার নিমন্ত্রণ ঠিক আমাদের দেশের মত শুধু ভদ্রলোকদেরই নয়, সেখানে যাঁর বাড়ীতে যে-কোন ক্রিয়া হবে,

তাতে অন্যান্য বাড়ীর কর্তাদের সঙ্গে ভৃত্যদেরও পাঠাবার নিমন্ত্রণ-পত্র দেবার প্রথা আছে। ভৃত্যদের জন্য সে পত্রটি পাতলা হালকা রঙীন কাগজ, তাতে লেখা থাকে "আসামী এক জিবা যে আও" ('একজন লোক নিমন্ত্রণে এস।') গৃহকর্ত্তার ঠিকানা দেওয়া নীচে। এমন পাঁচ-দশ খানা নিমন্ত্রণপত্র সব বাড়ীতে আসত, গৃহকর্ত্তার পদমর্য্যাদা অনুসারে সে সংখ্যা ঠিক হ'ত এবং চাকররা ভুরিভোজ খেয়ে আসত। তা বিবাহ উপনয়ন শ্রাদ্ধ সব-কিছুতেই। লাড্ডু কচুরী, দইবড়া, জিলাপী, লুচী, তরকারী, হালুয়া, এই ধরনের খাদ্যের সমাবেশ তাতে থাকে। ঐ পত্রগুলিকে 'টিকিট' বলা হয়। বাড়ীর চাকরদের পালা করে এক এক দলকে পাঠানোর নিয়ম ছিল। এ নিমন্ত্রণ কখনও সব বর্ণনির্ব্বিশেষে, কখনও শ্রাদ্ধাদি হলে শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দ্ধারিত থাকত।

গৃহিণী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে টিকিট এল কোথায় যাবি? আমার কাছে ত কোন নিমন্ত্রণ টিকিট আসে নি? বাবুজী (কর্ত্তা) দিলেন?'

তারা বললে, 'না, পণ্ডিতজীর নুক্তা' (আদ্যশ্রাদ্ধ) আজ। বহু লোক খাওয়াচ্ছেন। ব্রাহ্মণ আর অন্য দু' চার জাতও আছে। আমাদেরও বলেছেন।

গৃহিণী গালে হাত দিলেন, আহা! ব্রাহ্মণ মারা গেলেন! এই ত সেদিন পূজা করে গেলেন পৌষ মাসের লক্ষ্মীপূজোয়। আহা! কি হয়েছিল? বামুন এবং চাকররা হাসল, বললে, 'না, না, মাজী পণ্ডিতজী মরবেন কেন? মরেন নি। নিজের শ্রাদ্ধ করে রাখছেন। ওঁর ত কেউ নেই—কে পরে শ্রাদ্ধ করবে, তাই বহুত খরচ করে নিজের নুক্তা করছেন। অনেক লোক নিমন্ত্রণ করেছেন।

গৃহিণীর গালের হাত নামল ত না-ই—আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন কি কাণ্ড ওমা, কি আশ্চর্য্য···। আর হাসতে লাগলেন।

তারা রাত্রে ভূরিভোজ খেয়ে বাড়ী ফিরল। পণ্ডিতজী খুব খাইয়েছেন শ্রাদ্ধের পর। বহু ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলেই খুশী হয়েছে পুণ্যাত্মা পণ্ডিতজীর এই 'আগাম শ্রাদ্ধে'র ভোজ পেয়ে। তাদের মতে সত্যিকার বুদ্ধিমান আর পুণ্যবান লোক না হলে এমন করে শেষের দিনের কথা কে ভাবে! পরে ত টাকাকড়িগুলো জমিদার চৌকীদার আর চোরের হাতে পড়ত, বেঁচে থেকে এ একটা ভাল কাজ করলেন। মোটামুটি, তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ হ'ল আর প্রায় পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ এবং অনেক বন্ধুবান্ধব ভোজ খেলেন। শ্রাদ্ধের শয্যা, বস্ত্র, অন্নজল 'থালী' সব তাঁর কোন বন্ধু ব্রাহ্মণ পেলেন।

আসন্ন কাল অবশ্য পণ্ডিতজীর ঘনিয়ে আসে নি। সুতরাং মাঘ মাসের হাড়কাঁপানো পশ্চিমের শীত তুলোর জামা পরে আর বালাপোশ মুড়ি দিয়েই তাঁর কাটল। চৈত্র মাসের লক্ষ্মী-পূজাও এসে করে গেলেন। গৃহিণীরা খুব খুশী। নৈমিত্তিক পূজা, শীতলাষ্টমী, ('শিল আটে') কারুর বাড়ী ছোটখাটো পূজা তাও করলেন যথারীতি। চৈত্রসংক্রান্তির শক্তুদান, জলদান উৎসর্গ করালেন।

বৈশাখ মাস জলদান পর্ব্বেও মন্দ পেলেন না পূজার দক্ষিণা।

আশ্বিন মাস এল। এই মাসে পণ্ডিতজী নানা পূজা করে গেছেন। দেশে তর্পণশ্রাদ্ধ এসে পড়েছে। ঘরে ঘরে তর্পণ চলছে। তর্পণের বার্ষিকী শ্রাদ্ধকে ওদেশে বলে 'কনাপৎ'। 'কনাপৎ' শ্রাদ্ধে খুব সমারোহ করে ব্রাহ্মণ-ভোজন ও লোক খাওয়ানোর প্রথা এখনও রাজস্থানে আছে।

রাত্রে শুয়ে গৃহিণীর মনে পড়ল, 'কনাপৎ' এসে পড়েছে, ঘরে ঘরে তর্পণ আরম্ভ হয়েছে, এ বাড়ীর কর্ত্তাও তর্পণ করছেন। পণ্ডিতজীকে তিথিশ্রাদ্ধের জন্য ডাকতে হবে।

সহসা মনে পড়ে গেল তাই ত। পণ্ডিতজী যে নিজের শ্রাদ্ধ করে রেখেছেন সেটা আদ্যশ্রাদ্ধ। আর 'কনাপৎ'ও করবেন বোধ হয়। কি আশ্চর্য্য, ওঁর মনে পড়ে নি এতদিন যে, এই সব দেবকার্য্য, শুভকাজ উনি কি করে পণ্ডিতজীকে দিয়ে করালেন! কেননা, শ্রাদ্ধ যখন হয়ে গেছে তখন লৌকিক হিসাবে উনি তো মৃত। পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন সবই ত যথারীতি হয়েছে, তখন জীবিত বলে ওঁকে মনে করা ত তাঁর উচিত হয় নি। এক কথায় এখন পণ্ডিতজী ত মৃত বা প্রেতের সামিল। মাঙ্গলিক কার্য্যে মৃত কিংবা অশুচি শরীরের কোনও কাজের অধিকার কি থাকে?

কি করা যায়। এখন মনে যখন হয়েছে—তখন ওঁকে দিয়ে আর কোনও কাজই ত করানো যায় না। উচিত কি? নাঃ, খুব অন্যায় ও ভুল হয়েছে তাঁর। এখন হতে তাঁকে দিয়ে পূজা চলবে না—বাড়ীর কল্যাণ-অকল্যাণের কথা ভাবতে হবে। জীবিত হলেও শ্রাদ্ধ যখন হয়ে গেছে তখন উনি মৃত বা মৃতবৎ। অশুচি ত হলে।

গৃহিণী বাড়ীর লোকদের—রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ও দু'একজন পুরাতন ভৃত্য এবং বাড়ীর পুরাতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথা বললেন।

এমন সমস্যায় ত তারা কখনও কেউ পড়ে নি, কাজেই কে আর কি বলবে। তবে শ্রাদ্ধ যখন হয়ে গেছে, তখন পণ্ডিতজী যে আর বেঁচে নেই—মৃত, এ বিষয়ে সবাই একমত হ'ল এবং এটাও সাব্যস্ত হ'ল যে, দেবকার্য্য চলতে পারে না মৃত বা অশুচি লোকের দ্বারা!

দেখতে দেখতে ভাদ্রসংক্রান্তির লক্ষ্মীপূজা মনসাপূজা গেল। অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষও চলছে—কর্ত্তাদের পিতৃমাতৃ তর্পণ, শ্রাদ্ধের তিথিও এসে পড়ল, পণ্ডিতজীকে কিন্তু আর ডাকা হ'ল না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভৃত্যদের কাছে খবর নিলেন। কবে কি পূজা, পিতৃ-পক্ষের ক্রিয়াকর্ম্ম কবে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও স্পষ্ট জবাব কেউ দেয় না। পূজা কি হয়ে গেছে? কে করলে? অথবা হয় নি, হবে?—জবাব পান না।

অবশেষে বৃদ্ধের এক বন্ধু তাঁকে বলে দিলে, এঁরা বলেছেন, শ্রাদ্ধ করায় তোমার দেহ মৃতের সামিল, কাজেই অশুচি মনে করতে হবে। সুতরাং অশুচি বা মৃত ব্যক্তির দ্বারা পূজা-পার্ব্বণের কাজ কি করে চলতে পারে!

দেওয়ালীর লক্ষ্মীপূজায় খুব ধুম লেগেছে। পণ্ডিতজী বিমনা-ভাবে শুনলেন অন্য ব্রাহ্মণ পূজা করে যাচ্ছে। পূজার কাজ তাঁর অভাবে আটকে থাকে নি। দক্ষিণা, ভোজ্য সব উপকরণের কথাই তাঁর মনে পড়ল। নীরবে ভাবেন বসে বসে। কারুর পরামর্শ চানও না, নেনও না।

অগ্রহায়ণেই শীত এসে পড়ল। পণ্ডিতজী পুরাতন বালাপোশ-খানি জড়িয়ে সারাদিন রৌদ্রে বসে থাকেন, সন্ধ্যায় দু'একখানি শুকনো রুটি খেয়ে খাটিয়াতে শুয়ে পড়েন।

আর ভিক্ষা করতে লোকের বাড়ী যান না, স্তবপাঠ আশীর্ব্বাদও করেন না। যে যা ঠাকুরের সেবায় নিজে থেকে দেয় তাই কোন ক্রমে রান্না করে নেন। আশীর্ব্বাদ করবেন কি করে, ভাবেন··· লোকেরা কৃতশ্রাদ্ধ মৃতের বা মৃতবৎ লোকের আশীর্ব্বাদ কি নেবে?

সহসা শীতশেষের এক দিন সকালে তাঁর চাকররা যজমান-গৃহিণীকে বললে, পণ্ডিতজীর কাল রাত্রে মৃত্যু হয়েছে।

এক বৎসর পূর্ব্বের শ্রাদ্ধভোজী বন্ধুরা সজল চোখে শুধু শবানুগমন করল নীরবে আসল মৃতদেহের। এবার আর শ্রাদ্ধশান্তির কোনও প্রয়োজন নেই। আগেই সব কাজ শেষ করা আছে।

গৃহিণী কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অসুখ করেছিল পণ্ডিতজীর?"

তারা বললে, কিছু না। তিনি বেঁচে থাকতে শ্রাদ্ধ করার জন্য তাঁকে মৃত মনে করায় যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু চুপ করে ভাবতেন।

সনাতনের সন্ন্যাস

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

"বৃন্দাবনের বিরহ-মথিত—ব্যথিত বাঁশরী ডাকে,
ব্রজের দুলাল তৃষিত নয়নে বারে বারে চেয়ে থাকে ;—
মনে ভেসে ওঠে গাগরী-ভরণ কালিন্দী-কালো জলে,
গোপনাভিসার কুঞ্জে কুঞ্জে—কদম্ব-বনতলে ;
আকুল নয়নে—উচাটন মনে বৃন্দাবনে যে চাই ;—"
কহে সনাতন হুসেন শাহেরে—"রাজ-কাজ ভুলে যাই ;
যে মন লইয়া মন্ত্রী তোমার আছিনু হেথায় হায়
সে মন আমার ব্রজের দুলাল কেড়ে নিয়ে চলে যায় ;
পরকীয়া রসে—রাধা-ভাবে জাগে রসাবেশ হিয়াতলে ;—
এ মানসে আর নাহি অধিকার—হারালো যমুনা-জলে।"

২

"ব্রজের রাজার ডাক আসিয়াছে, কি করে রহি গো রাজা?
প্রেমের দারুণ দহনে পরাণ হয় শুধু ভাজা ভাজা।
রাধার হৃদয়—ঘর-করণা যে কি ভাবে ভাসিয়া যায়,
এতদিন আমি বুঝিয়াও তা যে বুঝিতে পারি নি হায়।
তবু মন-কাড়া বাঁশরী বাজিল, বিষয়-বাসনা ফেলি,
সুরের সোহাগে চলিয়াছে মন সুদূরে যে ডানা মেলি।
এত দিন ধরে তব কাজে রাজা, মাথায় ধরিল পাক ;
এ-পারের কাজ এবার ফুরালো, ও-পারের এলো ডাক।
সনাতন যাহা, পেলো সনাতন এত দিন পরে বুঝি ;
হয় তো মিটিবে জীবনের সাঁঝে জীবনের খোঁজাখুঁজি।"

৩

"বিষয়-নিগড়ে বাঁধিতে চেয়ো না ;—আকাশের পানে চাও,
নব-জলধর-কান্তি সেথায় হেরিতে কি নাহি পাও!
চারিদিকে যত শ্যাম-শোভা দেখো, তা'র মাঝে বারে বারে
ভুবন-ভুলানো সে রূপ-ভাতি কি তব মন নাহি কাড়ে?
নয়ন থেকেও দেখি নি যে রাজা, শুনি নি শ্রবণ থেকে,
ব্রজের কিশোর কতবার বুঝি ব্যথা-ভরে গেছে ডেকে ;
কি দারুণ তৃষা করেছে তাঁহারে অধমেরও অনুরাগী!
এতো যে সহিলো, আমি সহিব না কিছু তাঁর প্রেম লাগি!
রাজ-অধিরাজ ওই ডাকে শোনো বৃন্দাবনের পানে।"—
নয়নের জলে ভাসে সনাতন ;—হুসেন অবাক্ মানে।

শাল-মহুয়ার বনে

শ্রীঅপর্ণা দত্ত

শরতের আলোর বন্যা অবাধ মুক্তির বাণী এনেছে বিশ্বে। প্রতিদিনকার কর্মব্যস্ততার হাত থেকে রেহাই পেতে চায় মানুষের মন, শহরের কৃত্রিম আবেষ্টন আর দিনযাপনের গ্লানির হাত থেকে চাই মুক্তি।

সাঁওতাল কুটীর

অজানার দুর্নিবার আকর্ষণে চঞ্চল হয়েছে মন। তুষার-মৌলি হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন রূপ নিরন্তর টানছে যেন। বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে এক মনোরম পার্ব্বত্য পরিবেশে—মণিপুর রাজ্যের সেই মধুর স্মৃতি সারা মন জুড়ে আছে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রতি তাই একটা সহজ আকর্ষণ আছে আমার। কিন্তু সাধ অনেক থাকলেও সাধ্য ত নেই তত। ডালহৌসী দেরাদুন বা আলমোড়া নৈনিতালের আশা ছেড়ে দিয়ে তাই পাড়ি জমাতে হয় দার্জিলিঙের উদ্দেশে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়ল। দূরের ঐ গাছ-পালার আড়ালে ফুলে ফুলে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে আমার ছোট্ট 'প্রান্তিক'। শান্ত নির্জন সেই গৃহকোণটির মায়া ক্ষণিকের জন্য আমাকে ব্যথাতুর করে তুলল। কিন্তু অজানার আকর্ষণ বুঝি আরও প্রবল। তাই সেই বেদনার রেশ কখন ক্ষীণ হয়ে এল বুঝতে পারি নি।

রামপুরহাট স্টেশনে গাড়ী পৌঁছল নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে। সঙ্গীর ওঠার কথা এখান থেকে, কিন্তু স্টেশনে সন্ধান না পেয়ে চিন্তিত হলাম। প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে নজর পড়ল হঠাৎ। মন্থর গতিতে অগ্রসর একটি মূর্তি—তবে সেই ভদ্রসন্তানটি নন, তাঁর বদলে উর্দিপরা আর্দালী—দেখে বিস্মিত হলাম! যাত্রা অসমাপ্ত রেখে নেমে পড়তে হ'ল এখানেই। পশ্চিমবঙ্গের অকালপ্লাবন বিপর্যয় ঘটিয়েছে। শুনলাম সরকারী কর্মচারীরা কেউ নাকি নিজ এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না। জনসেবার অনিবার্য প্রয়োজনে তাঁদের থাকতে হবে জেলার ভিতরে।

আশাভঙ্গের এই আকস্মিকতায় মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। শেষ পর্যন্ত এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম—নাই বা যাওয়া হ'ল দার্জিলিং, এই অবকাশে বীরভূমকে কতকটা দেখে নিলেও ত মন্দ হয় না। এখানে আছে সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় শান্তি-নিকেতন। আছে নান্নুর, কেন্দুবিল্ব, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর। আধুনিক সভ্যতার জয়যাত্রা দেখতে হলে যেতে হয় মাসেনজোরে—কেউ-বা বলেন মশানজোড়—ময়ূরাক্ষীর বাঁধে।

কুষ্ঠ সেবাশ্রম, সাঁওতাল পরগণা

বীরভূমের এখানে সেখানে কত বেড়ালাম, দেখলাম কত, মনের অপূর্ণতা কিন্তু ঘুচল না। সুদূরের আকাঙ্ক্ষা মনে জেগেই রইল।

কে জানত বীরভূমের অদূরবর্ত্তী শালপলাশ আর মহুয়াবনের মনোহরণ রূপের আকর্ষণ হয়ে উঠবে এমনি দুর্নিবার। ভাবলাম বাংলার কোল ঘেঁষে সাঁওতাল পরগণার মনমাতানো রূপ দেখে আসা যাক এই সুযোগে। আবার যাত্রা সুরু হ'ল।

কোজাগরী পূর্ণিমার ভোর। সমস্ত পৃথিবী হাসছে আর হাসছে দূর আকাশের চাঁদ। পূর্বদিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাবের সূচনা। চারিদিক স্তব্ধ, নিঝুম। মনে পড়ল গেল বছর ঠিক এই দিনে গিয়েছিলাম 'টাইগার হিলে' সূর্যোদয় দেখতে। বাস চলেছে 'সুরীচোয়া' এরোড্রোমের পাশ দিয়ে। সেদিন হাটবার। মাথায়, বাঁকে, গরুর গাড়ীতে কত জিনিষ নিয়ে হাটের পথে চলেছে লোক।
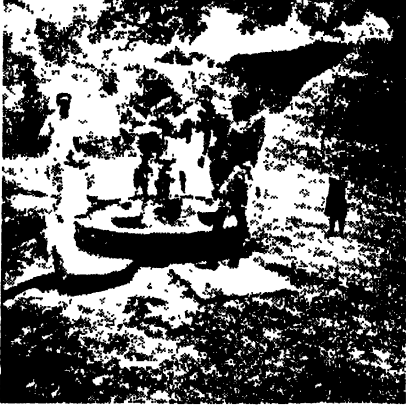
টিউবওয়েল হইতে জলসংগ্রহ

ছোট ছোট জলস্রোত, রুক্ষ প্রান্তর আর বন্ধ্যা জমি ছাড়িয়ে মুক্ত গতিতে ছুটেছে গাড়ী। একটু সকাল হলে দেখলাম গ্রামের ভেতর এসে পড়েছি। গায়ে চাদর জড়িয়ে ঘুমভাঙা চোখে অসীম কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে ছোট ছেলে। পাতার আগুনকে ঘিরে বসেছে বুড়োবুড়ীর দল। উঠানের এক পাশে হাঁস মুরগীদের খাবার দিচ্ছে ঘোমটা টানা বৌ। আদরের ছাগলছানার গলায় দড়ি টানতে টানতে চলেছে ছোট মেয়ে, পিচঢালা পথের উপর শালিকের অশ্রান্ত কিচিরমিচির। পাশে ডোবার ধারে একঝাঁক সাদা বক কি যেন খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। লাল আর সাদা অজস্র শালুক ফুটে আলো করে আছে ডোবার বুক।

পিচঢালা পথ এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে পড়ে রইল সাঁওতাল পরগণার খ্যাত অখ্যাত কত গ্রাম, শাকসব্জী আর অড়হরের ক্ষেত। ধেনোজমি খুব কম। মনে হ'ল জমি এখানে পাথুরে হলেও উর্বর। পরিপুষ্ট ফসলের প্রাচুর্য এবং ফুলের বর্ণাঢ্যতা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় একথা।

হরিপুর, সারসডাঙা, মোহল পাহাড়ী, শিকারীপাড়া কত কি নাম। যাত্রী ওঠানামার পর আবার চলছে গাড়ী। পথের দু'পাশে আম, জাম, কাঁঠাল আর তেঁতুলগাছের সারি। মাইলের পর মাইল এমনি। শালবনের ভিতর দিয়ে পথ চলে গেছে সোজা। ছোট, বড়, মাঝারি অসংখ্য শাল-গাছ। ভোরের বাতাসে কাঁপছে সতেজ সজীব পাতাগুলি রূপালি বালুর বিছানায় শুয়ে সোনার স্বপ্ন দেখছে ময়ূরাক্ষী দূর বনের ফাঁকে ফাঁকে তার হাতছানি।

গ্রাম্য উৎসব

পাথর আর কাঁকরে ভরা এই বিস্তৃত অঞ্চল। মাঝে মাঝে পলাশ আর শাল মহুয়ার বন। ছোট ছোট গ্রামগুলিতে বাস করে সাঁওতালরা। মিশকালো তাদের গায়ের রং। কিন্তু পলাশ আর মহুয়ার উচ্ছলতা এদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। এরা পাথর ভাঙে, মাটি কাটে, কাঠ কাটে আবার পাথুরে জমির বুকে সোনাও ফলায়। অবসর-মুহূর্তে উদ্দাম আনন্দে মেতে উঠে শিকার করে, নাচে, গায় আর আকণ্ঠ পান করে, মহুয়ার চোলাই করা মদ। এদের মেয়েরা গৃহকর্ম করে, জল বয়ে আনে দূর জলাশয় থেকে, পাতা কুড়ায় শাল বনের মাঝে। ফুল গুঁজে দেয় কালো খোঁপায়।

পশ্চিম বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে, বিহারের পার্বত্য বনভূমিতে বাস এই সাঁওতালদের। নিজ নিজ গ্রামসমাজের অধীনে সহজ সরল জীবনযাত্রা এদের। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সব রকম কর্তৃত্বের ভার গ্রামপ্রধান বা মোড়লদের উপর। অন্য সবাই তার নির্দেশ মেনে চলে। সামাজিক অনুশাসনের একটু তারতম্য ঘটলে শাসনের কঠোর হস্ত এদের একঘরে করতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করে না। পারিবারিক জীবন অনাড়ম্বর। ব্যক্তির চেয়ে সমাজ-জীবনের প্রাধান্য বেশী। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও এদের মধ্যে ভূতপ্রেত বা উপদেবতার পূজারই প্রাধান্য। বৎসরের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় উপদেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে। গ্রামের বাইরে মহুয়াবনের ছায়ায় জড়ো হয় সব মেয়ে-পুরুষ। জীববলি ও মদ উৎসর্গ করা হয়। নানারকম মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতার তুষ্টিসাধনের চেষ্টা চলে। তার পর সকলে আকণ্ঠ মদ পান করে—নৃত্যগীতে মেতে উঠে

সারা গ্রাম। 'বাদনা' বা 'সরাই' পরব এদের একটি বিশেষ পর্ব। তা ছাড়া মৃগয়া, বিবাহ, জাতকর্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আছে আরও কত উৎসব অনুষ্ঠান। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে, এমনকি সাঁওতাল পরগণার গভীর অরণ্যদেশে বাস করে যে সকল সাঁওতাল তাদের উপরেও বিজাতীয় প্রভাব পড়েছে বেশ কতকটা। ধর্মের দিক থেকে খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রভাব স্পষ্ট। হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার ফলে তাদের রীতিনীতি দ্বারাও এরা প্রভাবিত হয়েছে সামাজিক আচারে, পোশাক পরিচ্ছদে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক হিন্দু দেবদেবী ও আচার অনুষ্ঠানকে এরা নিজের মত করে গ্রহণ করেছে। তা হলেও নিজস্ব মূল সংস্কৃতির ধারাকে এরা অব্যাহত

মাদল বাজানো

রাখতে পেরেছে আজও। নৃত্যগীত, নানা শিল্পকলা, কৃষি, উৎসব অনুষ্ঠান, মৃগয়া প্রভৃতির ভিতর একটা মৌলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের অনেকেরই নিজস্ব জমি নেই, সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে 'মুনিষ' বা 'ভাগচাষী' খাটা-ই বাংলার অধিকাংশ সাঁওতালের উপজীবিকা। অবশ্য বাঁশ, বেত, লতাপাতা, কাঠ প্রভৃতি দ্বারা নানা জিনিস তৈরি করেও তারা অর্থোপার্জন করে। আজকাল অনেকেই আবার অর্থের লোভে দলে দলে শহরে বা বিদেশে চলে যায়, তখন জীবিকার প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়ায় চা বাগান, খনি বা কলকারখানায় মজুরি করা।

মহুয়াবনের ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ী। শালমহুয়ার নিবিড় জড়াজড়ি এখন। সাঁওতাল পরগণার প্রধান শহর দুমকার কাছাকাছি এসে পড়েছি। মোট ছ'টি মহকুমা নিয়ে এই জেলা। সদর, জামতাড়া, দেওঘর, পাকুড়, রাজমহল ও গোড্ডা। শহর থেকে শহরতলীর সৌন্দর্য বেশী। সেগুন আর শালবনের মাঝখানে ঘুমিয়ে আছে ছোট শহর। রেলগাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ বিদীর্ণ করতে পারে নি এর শান্ত স্তব্ধতা। সভ্য জগতের সঙ্গে এর যা কিছু যোগাযোগ মোটরবাসের মাধ্যমে। কয়েকটি সাজানো বাড়ী। 'নিরালা' নামটি পড়েই অচেনা বাঙালী মনের রসচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ফুলের কেয়ারী আর শাল মহুয়ার নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন বাড়ীটি।

ধান বোনা

শহরের মুখেই পুলিস হেড কোয়ার্টার আত্মগোপন করে আছে সেগুন বনের স্নিগ্ধ ছায়ায়। পোস্ট আপিস ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের বাড়ী দুটির আকৃতি এবং গঠনে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট।

পিচঢালা পথের ওপারে বিরাট সীমানা জুড়ে 'সারকিট হাউস', শাল আর সেগুন গাছের স্নেহচ্ছায়ায় ঘেরা। স্কুল ও কলেজ বাড়ীটি সুন্দর। ঝাউ আর সেগুন গাছগুলি মাথা তুলে আছে সজাগ প্রহরীর মত।

নৃত্যানুষ্ঠান

শহর ছাড়িয়ে খ্রীষ্টান মিশন 'মোহরা'। মিশনরীদের কর্মকুশলতা সাঁওতাল পরগণার সর্বত্র লক্ষ্য করবার মত। গীর্জা, স্কুল প্রভৃতি রয়েছে বিরাট সীমানার ভিতর। গাড়ী এসে পৌঁছল ময়ূরাক্ষীর তীরে। নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে,

নীচে উপলাহত জলস্রোতের রুদ্র আক্রোশ ; সেই জলধারা ঠিক যেন ময়ূরের চোখের উপমাই মনে পড়িয়ে দেয়।

গাড়ী দাঁড়াল স্থানীয় এক তীর্থক্ষেত্রে। বাসুকিনাথের মন্দির, অগণিত যাত্রীর ভিড় এখানে। প্রাঙ্গণের চারিপাশে অনেক মন্দির। কালী, তারা, বগলামুখী, দশমহাবিদ্যার সকল দেবীই এখানে অধিষ্ঠিতা। মন্দিরের বাইরে মেলা বসেছে ;

যুগলমন্দির, দেওঘর

দেবদেবীর পট, পূজার উপকরণ, বাঁশবেতের শিল্পদ্রব্য,সৌখিন জিনিস, শাকসব্জী এমনকি টাটকা মাছ পর্যন্ত আছে।

পলাশবনের ভিতর দিয়ে পথ এবার। ছোট, বড়, মাঝারি পলাশগাছের অগণিত বিন্যাস। বসন্তের আগুনরাঙা রক্তিমচ্ছটা নেই এখন, চৈত্রদিনের তপ্তশ্বাসের সঙ্গে পলাশের অগ্নিদাহন সেও ত শেষ বসন্তে! বৈশাখের রিক্ততাও নেই তা বলে। তার বদলে আছে বর্ষাসিক্ত পলাশবনে শ্যামস্নিগ্ধ সরসতা।

জোরমুণ্ডী, জামোয়া সব ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটেছে। দূর আকাশের গায়ে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া স্পষ্ট হ'ল এবার। মেঘ জমে আছে পাহাড়ের গায়ে, মনে হ'ল খুব কাছে, কিন্তু জানা গেল অন্ততঃ ঘণ্টাদেড়েকের পথ হবে। আশ্রম আছে একটি এই পাহাড়ে ; আর এই পাহাড়ের বেলপাতায় নাকি তুষ্ট হন বৈদ্যনাথ। তাই বেলপাতা চয়ন করতে নিত্য সমাগম হয় অগণিত ভক্তের ; তা ছাড়া দর্শনার্থীর ভিড় ত আছেই।

দেওঘরের কাছে এসে পড়েছি। মহুয়াশাখার অর্কিড-লতার দোলা মনকে চঞ্চল করে তোলে, দূরের দয়ানন্দ আশ্রমের গৈরিক আভা অকারণেই উদাস করে তোলে আবার।

গাড়ী থামল বাজারের কাছে। ত্রিকূট পাহাড়ে বেল-পাতা চয়ন করতে গিয়েছিলেন ভক্ত দু'জন, গুরু ও শিষ্য। এঁদের পাল্লায় পড়লাম। বৈদ্যনাথ-মন্দির দেখাতে নিয়ে চললেন এঁরা। মন্দির-প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক পুণ্যকামীর ভিড়।

উদ্যানবেষ্টিত যুগলমন্দিরের আর একটি দৃশ্য

মূল মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশ-পথ। সেখানে ঢুকে নিজের হাত নিজেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় শিবদর্শনই ঘটল না ভাল করে। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে উৎসর্গ করা হ'ল পুষ্পাঞ্জলি। স্পর্শ করা হ'ল কুণ্ডের পূত বারি। পূজা শেষ হবার আগেই প্রবেশ করল এক উদ্দাম জনতা, দেহাতী বিহারী সব। ভিড়ের আকস্মিক ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম একদিকে, একটি মাত্র প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হয়ে গেল জনতার চাপে। সীমাহীন অন্ধকার, কেঁপে কেঁপে নিভে গেল প্রদীপশিখা ; হঠাৎ এক অপরিসীম শঙ্কা আমাকে অভিভূত করে ফেলল। শেষে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা গেল। ভিড়ের আর একটা ধাক্কা আমাকে ঠেলে দিল সঙ্কীর্ণ দরজার বাইরে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত মন্দির-চত্বরে।

দেওঘরের দোকান-বাজার অত্যন্ত বিশ্রি আর অপরিচ্ছন্ন, রাস্তাঘাট উঁচুনীচু, দু'ধারে আগাছায় ভরা। সব বাড়ীতে লোকের বাস নেই। পৌর-প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ উভয়েরই সমান অবহেলার ভাব আছে এই শহরটির উপর।

শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত যুগল মন্দিরে গিয়ে মনে হ'ল বুঝি এ কোন সৌন্দর্যের অমরাবতীতে এসে পড়েছি। উন্মুক্ত উদার প্রাঙ্গণে রং-বেরঙের ফুলের মেলা বসেছে।

অঙ্গনতলে নরম ঘাসের গালিচা বিছানো, একপাশে একটি প্রশস্ত পুকুর। তার স্বচ্ছ মুকুরে সারাদিন ধরে মুখ দেখে তীরের সারিবাঁধা চাঁপা, বকুল আর ইউক্যালিপটাসের গাছ। মন্দিরটির গঠননৈপুণ্য চমৎকার, মনোমুগ্ধকর তার উদ্যান-রচনার কৌশল। লাল সাদা স্থলপদ্মের বর্ণবৈচিত্র্য, মরসুমী ফুলের বিপুল সমারোহ, রজনীগন্ধার সিত আভা আর গোলাপের অজস্র সম্ভার—কাকে ফেলে কাকে দেখব, দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়। পায়ের তলার তৃণদল থেকে সুউচ্চ মন্দিরের চূড়াটিতে পর্যন্ত একটি জাগ্রত সৌন্দর্য্যচেতনার সজাগ স্পর্শ রয়েছে। বেলা হয়ে যাওয়ায় এই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই দেবদর্শন ঘটল না। বিশেষ কোন তথ্যও সংগ্রহ করতে পারলাম না, অপূর্ণ বাসনা নিয়েই ফিরতে হ'ল। মন্দিরের সংলগ্ন আশ্রম আছে আর একটি।

মাদল-বাদক

মুখোমুখি দুটি মন্দির এখানেও। এ পাশের মন্দিরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে দেবীমূর্ত্তির সামনে। তার শান্ত আভায় দীপ্ত হয়েছে দেবীর ললাট। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম গায়ত্রী দেবী ইনি। আর ওপাশের মন্দিরে শান্ত সমাহিত মহেশ্বর। দুই মন্দিরের মাঝখানে যুঁই ও মাধবীলতার বিন্যাসে রচিত হয়েছে একটি প্রশস্ত মণ্ডপ। অসংখ্য দর্শনার্থীর নিঃশব্দ পদচারণা, সুবিন্যস্ত উদ্যান, প্রাঙ্গণ, গাছপালা, কর্ম্মব্যস্ত ব্রহ্মচারীদের ধীর শান্ত আনাগোনা—সর্বত্র একটা শ্রদ্ধার ভাব মাখানো। কি অপূর্ব সংহত রূপ! সেই শান্ত স্নিগ্ধ রূপ নিমেষে মনকে ভক্তিরসে সিক্ত করে তোলে। সহজ সরল জীবনযাত্রা, এখানে কর্মচাঞ্চল্য আছে, কিন্তু অকারণ ব্যস্ততা নেই; কি গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করছে চারিদিকে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শান্ত মহিমা হয়ত এমনি করেই মানুষের মনকে আকৃষ্ট করত।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে নিতে বেলা শেষ হয়ে এল। হোটেল ডোমিনিয়ন—ভুলব না ক্ষণিকের এই আশ্রয়টিকে।

"জলকে"

আবার পথচলা। বেলাশেষের রাঙা আভা অস্তদিগন্তে আর আকাশে নীড়ে ফেরা শ্রান্ত পাখীর ঝাঁক। দূর জলাশয়ে 'জলকে' চলেছে সাঁওতালী মেয়ের দল। ছন্দোময় লীলায়িত গতি তাদের।

দূর আকাশে শরতের চাঁদ হাসছে, আর হাসছে সারা পৃথিবী। শালমহুয়ার বনে আলোছায়ার লুকোচুরি, এ যেন কোন মায়াপুরী। সেই বনময় পথে স্তব্ধতার বুক চিরে ছুটেছে গাড়ী। পিছনে পড়ে রইল হাট থেকে ফেরা শ্রান্ত পথিকের দল, গরুর গাড়ীর সারি আর ছোট ছোট সাঁওতাল গ্রামগুলো।

উৎসবে সমবেত গ্রামবাসিগণ

শারদ জ্যোৎস্নার মনমাতানো রূপ আনন্দের বন্যা এনেছে পৃথিবীতে, মানুষের মনেও ছোঁয়াচ লেগেছে তার। তাই বাঁশিতে সুর জাগিয়েছে সাঁওতাল ছেলে, মাদলে তুলেছে

ঢোল, নৃত্যের দোলা লেগেছে সাঁওতাল মেয়ের দেহে, নৃত্যের তালে দুলছে যেন শাল-মহুয়ার বন—

আরা উপেল বাহা জনম্ ইনা
ও হায় সিবিজল দা তালায়ে
সিরিজল চিকাতে তিয়েগো।

অর্থাৎ, জলের মাঝে একটি লাল শালুকফুল ফুটেছে। হায়, কি করে তুলে আনব!

বিশ্বের সৌন্দর্যলীলায় মানুষের আদিম প্রকৃতিগত আকুতি। তাই লাল শালুকফুলের রূপে মুগ্ধ মানবমন সৃষ্টি করেছে ঐ সঙ্গীত। নৃত্যের মধ্যে তার অপূর্ব বিকাশ।

সেই রমণীয় সন্ধ্যায় মহুয়াবনের মনোরম পরিবেশে সাঁওতালী নৃত্যের মায়া আমার মনকে বিভ্রান্ত করে তুলল। বুঝতে পারলাম, অর্দ্ধসমাপ্ত ভ্রমণের যে ক্ষোভ আর বেদনা জমেছিল মনের অলক্ষ্য গভীরে তা কখন অজান্তে অপসারিত হয়ে গেছে।

স্মৃতির খেয়াল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বুঝিতে পারিনে, বিস্মিত হই,
স্মৃতির খেয়াল দেখে,
কত সমারোহ মুছে ঢেকে দেয়,
ছোটখাটো ছবি রেখে।
কোথা বর্ণের উজ্জ্বল ছটা?
কেন বা এমন ঘটে?
তুচ্ছ ও ক্ষীণ ক্ষণিকের ছবি
অটুট চিত্রপটে।
কারে কি যে দেয় বর
শুকায় সাগর, বড় নদ নদী
বহে যায় নির্ঝর।

২

আষাঢ় গগনে নবঘনঘটা
দেখালো যে মোরে ডাকি,
মুরতি তাহার সে শোভার সাথে
স্মৃতি যে রেখেছে আঁকি।
কতই আষাঢ় এলো গেল পুনঃ
করি নি তাহার খোঁজ,
বিচিত্র যেই চিত্রে দিয়েছে
নূতন রঙের পোঁচ।
ব্যাপার কি অদ্ভুত
দামী হ'ল মোর জীবন আষাঢ়ে
মেঘ চেয়ে মেঘদূত।

৩

মাঠের মাঝারে রেল ষ্টেশন
গাড়ীতে উঠায়ে দিতে
বন্ধু এলেন, ক্ষুদ্র ঘটনা—
অঙ্কিত আছে চিতে।
তিনি নাহি আর, নমি গাড়ী হতে,
দ্রুত চলে যায় ট্রেন,
তীর্থ হয়েছে এখন আমার
সেই যে স্টেশনে।
স্মৃতি বেছে নিল কিরে?
গোলাপগুচ্ছ, চম্পক কেলি
ছোট আকন্দটিরে?

৪

গভীর রাত্রে, চলেছে গোগাড়ী,
আউচ ফুটেছে কোথা?
এখনো আমার বক্ষে তাহার
গন্ধের মধুরতা।

ভুলেছি জলসা, বাদ্যভাণ্ড,
নৃত্যগীতের জাঁক
সুদূর 'চুনারে' মনে পড়ে শোনা
সাঁঝে শিয়ালের ডাক।
বলেছিল ওগো দেখো—
উহাদের সাড়া বিনা আমাদের
সন্ধ্যা মানায় নাকো।

৫

বাঙালী বাবুটি 'সান্তা'রা কেনে
ফেরিওয়ালাকে ডাকি',
'অম্বালার' এক ভবন-দুয়ারে
সেটা স্মরণীয় না কি ?
ক্ষণের আলাপে 'লুণ্ডি কোটালে'
হাতে দিল মোর হাসি,
দুইটি, আপেল যুবক জনেক
'খাইবার পাস' বাসী।
কোথা বড় বড় দান—
স্মৃতি করিয়াছে সব চেয়ে দেখি
তাহাই মূল্যবান।

৬

মনে পড়ে দূরে ছাদ হতে সেই
রুমাল ওড়ানো কার,
কাঁধে ছোট নাতি মেলা হ'তে ঘরে
ফেরে শিখ-সর্দার,
জালন্ধরের সরিষার ক্ষেতে
জানি নে কেন যে স্মরি ?
দাঁড়াইয়া ছিল কৃষক-বালিকা
রঙিন ঘাঘরা পরি'।

ঢেকে আছে মন গোটা—
রামধনুকের সপ্ত রঙের
এই সব ছিঁটে ফোঁটা।

৭

বাঁশী বাজাইয়া ষ্টীমার চলেছে,
শুনিলাম যেতে যেতে,
মণিপুরীদের নৃত্য হইবে,
গ্রামের মণ্ডপেতে।
হেরিনু সাজানো রঙ্গমঞ্চ,
জনগণ উৎসাহে—
আলোক লইয়া করে ছুটাছুটি,
অবিরাম পথ চাহে।
সাবাস স্মৃতির দাবি—
মণিপুরী দল এলো কি না সেথা
এখনো যে আমি ভাবি।

৮

স্মৃতির খেয়ালই রঙিন ঝুলিতে
আহরি' রেখেছে মরি,
সুদীর্ঘ মোর জীবন পথের
এই সব মাধুকরী।
কোথাও সিঁদুর আবীরের দানা
প্রসাদের রেণুকণা,
তীর্থমহিমা মাখানো মধুর
গন্ধের আনাগোনা।
উৎসব গেছে চলি'—
কানে ভেসে আসে আজও ভাঙা ভাঙা
ভজন গানের কলি।

উইলিয়ম ইয়েট্‌স

(১৭৯২-১৮৪৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভূমিকা

ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির মূলে খ্রীষ্টান মিশনরীদের কৃতিত্ব অসামান্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম কেরীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। মিশনকে কেন্দ্র করিয়া কেরীর নেতৃত্বে আরও অনেকে এই কার্য্যে ব্রতী হন। কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী এবং 'সমাচার-দর্পণ' সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সাহিত্য-সাধনার কথাও অনেকে অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। উইলিয়ম কেরীর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী অথচ এই সাহিত্যসেবীদের সমতুল আর একজন বিশিষ্ট পাদ্রী বা মিশনরী ছিলেন ড. উইলিয়ম ইয়েটস। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস তথা কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার ইয়েটস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"Mr. Yates was an eminent linguist, applied with such diligence to the cultivation of Oriental literature, under the able tuition of Dr. Carey, as to become eventually second only to his master as a translator." *

অর্থাৎ, ইয়েটস ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ, এবং প্রাচ্য ভাষাসমূহে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদক হিসাবে তদীয় শিক্ষক ড. কেরীর পরেই তাঁহার স্থান।

জন্ম : শৈশব : শিক্ষা

ইংলণ্ডের লো বরা নামক স্থানে ইয়েটস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার ঝোঁক দৃষ্ট হইত। জনৈক মহিলা বলিয়াছেন, ইয়েটস তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। ইয়েটস ইংরেজী ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনবরত কথা বলিতে ভালবাসিতেন। তিনি ভাষার বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ সম্পর্কে এমন ভাবে আলাপ জুড়িয়া দিতেন যে, শ্রোতাদের স্বতঃই মনে হইত, ইয়েটস ধরিয়া লইয়াছেন; তাঁহারা ঐ সব আলোচনায় সমান উৎসাহী!

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইয়েটস স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চ্চে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রিষ্টল ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। দীক্ষা গ্রহণান্তর ইয়েটস এখানে আসিয়া খ্রীষ্টশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে রত হইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন, বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে এখানে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। বাইশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইয়েটস ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৮১৪ সনের ৩১শে আগষ্ট। ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের তিন জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—ইয়েটসের অধ্যাপক ড. রাইল্যাণ্ড, রবার্ট হল এবং এণ্ড্রু ফুলারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইহার কিছুকাল পরেই মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ ইয়েটসকে ভারতীয় শাখার সাহায্যার্থ এদেশে পাঠাইলেন। ১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে 'ময়রা' জাহাজে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

শ্রীরামপুরে অবস্থিতি

শ্রীরামপুর তখন এ অঞ্চলে ব্যাপটিষ্ট মিশনের কেন্দ্রস্থল। ইয়েটস অবিলম্বে শ্রীরামপুরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া নিজেকে ঈপ্সিত কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কেরীর নেতৃত্বে শিক্ষানবিশী সুরু করিয়া দেন। বিদ্যাচর্চ্চা, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যায় অনুশীলন ছিল এ সময়ে তাঁহার প্রধান কার্য্য। ১৮১৬ সনের মার্চ্চ মাসে ইয়েটস স্বীয় দৈনন্দিন কার্য্য সম্বন্ধে বিলাতে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লেখেন :

"The way I spend my time is this: In morning before breakfast I study Hebrew abo an hour and a half. After worship I attend Bengali, and all the Bengali proofs with Dr. Care having before compared them with the Greek. I ha got through the Sanskrit roots once, have not y got through the grammar, but am reading the Ram yan with my Pandit. My afternoons are chief taken up with reading or hearing Latin or Gree I have read ten volumes of Greek since I le England, but not more than three of Latin. In t evening, after worship I generally read Englis or look over English proofs."*

ইয়েটস প্রাতরাশের পূর্ব্বে দেড় ঘণ্টাকাল হিব্রু পাঠ করিতেন উপাসনান্তে বাংলা শিক্ষায় নিবিষ্ট হইতেন। মূল গ্রীক্‌র সহিত মিলাইয়া বাংলা প্রুফ দেখায় কেরীকে তিনি সাহায্য করিতেন। এ সময়ে সংস্কৃত ধাতুগুলি একবার পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যাকরণ পাঠ তখনও শেষ হয় নাই। ইয়েটস পণ্ডিতের সাহায্যে ব্যাকরণ পাঠেও লিপ্ত ছিলেন। তিনি অপরাহ্নে পাঠ করিতেন গ্রীক লাটিন পুস্তক। ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর ঐ অল্পকালের মধ্যে তিনি দশ খণ্ড গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, কিন্তু লাটিন সাহি

---

* *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol. II, p. 88.

* *The Calcutta Christian Observer*, Septe ber 1845, p. 582.

পড়িতে সমর্থ হন মাত্র তিন খণ্ড। সান্ধ্য প্রার্থনার পর ইয়েটস সাধারণতঃ ইংরেজী পাঠ করিতেন এবং ইংরেজী প্রুফ দেখিতেন। উক্ত পত্রে তিনি আরও লেখেন যে, প্রাত্যহিক কার্য্য ব্যতিরেকে প্রার্থনাদি ব্যাপারও তাঁহাকে পালাক্রমে পরিচালনা করিতে হয়। সপ্তাহে একবার কি দুইবার দুই মাইল দূরে গঙ্গার ওপারে ব্যারাকপুরে তিনি উপাসনা করিতে যাইতেন। গঙ্গা দিয়া নৌকাযোগে মাসে অন্ততঃ একবার তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হয় এই উদ্দেশ্যে।

ইয়েটস কিন্তু বেশী দিন শ্রীরামপুরে রহিলেন না। শ্রীরামপুর মিশন এবং বিলাতস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির মধ্যে নানা কারণে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। এই মতানৈক্য ১৮১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। উইলিয়ম ইয়েটস প্রমুখ নব্য মিশনরীগণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া ঐ বৎসরে কলিকাতায় আসেন এবং বিলাতস্থ ব্যাপটিষ্ট সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে এখানে একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করেন। ইহার পর হইতেই কলিকাতা হইল ইয়েটসের কর্ম্মক্ষেত্র।

কলিকাতা-বাস : প্রথম যুগ

উইলিয়ম ইয়েটসের কলিকাতা-বাস আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম ভাগ—১৮১৭ হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়কার কথা প্রথমে বলা হইবে। কলিকাতায় আগমনের পর ইয়েটস শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন। কেননা ব্যাপটিষ্ট মিশন হইতে তিনি যে মাসহারা পাইতেন তাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারেরও ব্যয়সঙ্কুলান কঠিন হইত। শিক্ষকতা এবং মিশনের কার্য্য, দুইটি বিষয়েই তাঁহাকে একই সময়ে মনঃসংযোগ করিতে হইল। এসব সত্ত্বেও তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা কিন্তু অব্যাহত ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের ফলে ইয়েটস ক্রমে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী ও উর্দ্দু—এ ক'টি ভাষায়ই ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ এবং ইহার আনুকূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে তদ্রচিত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় পরে বলিব। এখানে তাঁহার সংস্কৃত-চর্চ্চা সম্বন্ধে একটু বলিতেছি।

সংস্কৃত ভাষা ইয়েটসের ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় রসদ যোগায় সবচেয়ে বেশী। ইয়েটস এই ভাষা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুশীলন করেন যে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন। সংস্কৃতে একখানি শব্দকোষ ('vocabulary') সঙ্কলন করেন এই সময়ে। হিতোপদেশ, নলোদয় প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ সংস্করণও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েটসের পাণ্ডিত্যের কথা বিদগ্ধ সমাজে শীঘ্র প্রচারিত হইল। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Asiatic Researches"-এর বিংশতিতম খণ্ডে, ১ম ও ২য় ভাগে ইয়েটস দুইটি প্রবন্ধ লেখেন—একটি সংস্কৃত অলঙ্কার বিষয়ক, অপরটি কাশ্মীরের শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধ-চরিতের আলোচনা।* শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৮৩৬ সনে সোসাইটি কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

নিজ মাতৃভাষা ইংরেজীতেও ইয়েটস পুস্তক প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্পর্কে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার এবিষয়ক রচনাগুলি "Essays in Reply to Rammohan Ray" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "Memoirs of Chamberlain" ইয়েটসের আর একখানি ইংরেজী গ্রন্থ। এ ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম্মমূলক পুস্তকাদিও তিনি লিখিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনে তিনি লোয়ার সারকুলার রোড চার্চ্চের কর্ম্মকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন। অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু ইয়েটসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি আমেরিকা হইয়া বিলাত গমন করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

কলিকাতা-বাস : দ্বিতীয় যুগ

কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইয়েটস পুনরায় বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল তাঁহার কলিকাতা-বাসের দ্বিতীয় যুগ। তিনি লোয়ার সারকুলার রোড চার্চ্চের পাদ্রীর পদ পুনরায় গ্রহণ করিলেন। এই সময় অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদে তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সমগ্র বাইবেল গ্রন্থখানি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ করিলেন আরও তিনটি ভাষায়—উর্দ্দু, হিন্দী এবং সংস্কৃতে। শেষোক্ত ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্টেরও অর্দ্ধেকটা অনূদিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বানিয়ানের "Pilgrim's Progress" (প্রথম খণ্ড) এবং দুই-একখানি অপর ধর্ম্মমূলক পুস্তকও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে ইয়েটসের জীবিতকালে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন পাদ্রী জে, ওয়েঙ্গার। ওয়েঙ্গারও প্রাচ্যবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাদ্রী ওয়েঙ্গার ইয়েটসের এবম্বিধ অনুবাদ-কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"The remarks which I have to offer on the subject of Dr. Yates's character as a Translator of the Scriptures refer exclusively to his Bengali version of the Bible. . . . .

"Often have I admired the beautiful simplicity, transparent cleanness, or the rich brevity of his renderings . . . .

"He also aimed at a style uniformly free and dignified. He allowed of no vulgar expressions, and excluded with equal firmness of determination all high-flow Sanskrit terms . . . .

"If, however, a finely balanced mind, endowed with splendid talents and enriched by

---

* প্রবন্ধ দুইটির নাম :

1. "Essay on Sanskrit Alliteration."
2. "Review of Naisadha Charita, or Adventures of Nala Rajah of Nisadha, a Sanskrit poem."

solid and extensive erudition, rooted in an ardent love of truth, and chastened by humility unfeigned; if these qualities, accompanied by untiring industry, a tender conscience, fervent prayer, constitute a liberal translator, then such a translator was William Yates."*

ইয়েটস্ কত উঁচুদরের অনুবাদক ছিলেন, ওয়েঙ্গার স্বল্প কথায় এখানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইয়েটস্ বিশুদ্ধ অথচ ভাবগম্ভীর রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সহজ সরল ভাষায় তিনি সর্ব্বদা ভাবপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, আর ইহাতে তিনি বিশেষ সাফল্যও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মূল এবং অনুবাদের ভাষা—দুইটিতেই তাঁহার প্রগাঢ় এবং ব্যাপক জ্ঞান ছিল। এই সময় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায়ও (১৮৩২, জুন হইতে প্রকাশিত) ভাষাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা-বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির পক্ষে তিনি পাঠ্য পুস্তকাদি লিখিতে যে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময়ে তিনি পাঠ্য পুস্তক বাদে বিরাট হিন্দুস্থানী-ইংরেজী ও সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান এবং পাঠ-সংগ্রহ সমেত একখানি বাংলা ব্যাকরণ সঙ্কলনে সবিশেষ তৎপর হইলেন। জীবিতকালে ইহার কোন কোনটির মুদ্রণ অনেকটা অগ্রসর হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যেই এ সমুদয়ও প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে উইলিয়ম ইয়েটসের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই সোসাইটির ইউরোপীয় সেক্রেটারী বা সম্পাদক হিসাবে অতীব কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে এখানে দু'চার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এদেশে ইংরেজদের স্বাধীন ভাবে বসবাসে যে সকল বাধানিষেধ ছিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের ফলে তাহা দূরীভূত হয়। কাজেই এই সময়ের পর হইতেই বহু ইংরেজ পাদ্রীও এদেশে আসিতে থাকেন এবং নানা স্থানে স্কুল-পাঠশালা স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এসব স্কুলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এ কার্য্য সাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়—উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দেশী-বিদেশী প্রধানেরা মিলিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপন করেন। এ সময় হইতে বহু বৎসর যাবৎ সোসাইটি ইংরেজ ও বাঙালী তথা ভারতীয় যোগ্য লেখকদের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লিখাইয়া লইয়া সে সমুদয় প্রকাশ ও প্রচার করিতে তৎপর হন। সংস্কৃত, আরবি ফারসি, বাংলা, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজী নানা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচিত হইত। পাদ্রী ইয়েটস বহুভাষাবিদ্ এবং এদেশীয়দের মধ্যে নব্যশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহান্বিত; স্বতঃই এই সোসাইটির কার্য্যে সহযোগিতা করিতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইলেন। ১৮২৪-২৫ সনে ইয়ে[টস] স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী বা সম্পাদক পদে বৃত হন।

উইলিয়ম ইয়েটস এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর বা[বৎ] ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। সোসাইটির কার্য্যে তিনি আত্মনিয়ো[গ] করেন। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও সম্পাদনে তি[নি] প্রথমাবধি অগ্রসর হন। সোসাইটির আনুকূল্যে তিনি এগু[লি] ক্রমশঃ বাহির করিতে থাকেন। মিশনরী জীবনের প্রাত্যহিক কর্ত্ত[ব্য] চার্চ্চের কার্য্য এবং সোসাইটির বিবিধ প্রয়াস—প্রভৃতির নিমি[ত্ত] তিনি এতই পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভ[ঙ্গ] হইল এবং ১৮২৬ সন নাগাদ বিলাতযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোসাইটির সপ্তম রিপোর্টে (১৮২[৬-] ১৮২৭) ইয়েটস সম্পর্কে উহার অস্থায়ী সম্পাদক এইরূপ উল্লে[খ] করেন:

"Your Committee beg to express their hig[h] sense of the varied services of their Secretary M[r.] Yates, in this department; and their reg[ret] that protracted indisposition, in consequence o[f] sedentary life, and close attention to stud[y] should have rendered his visiting Euro[pe] necessary to the recruiting of his constitutio[n]. They are happy, however, to report, that durin[g] his voyage to and from Europe, he will [be] engaged in preparing works in prosecution [of] the Society's plans; and that thus on his retur[n] which they expect will be at the end of th[e] present year, they may anticipate great adantag[e] from his labours." (p. 12).

ইয়েটসের অনুপস্থিতি কালে সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদ[ক] হইলেন কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব ইউরোপীয় সম্পাদ[ক] ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স। ইয়েটসের কৃতির কথা রিপোর্টে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তাঁহারা ইয়েটসের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার নিকট হইতে যেসব কার্য্য আশা করিয়াছিলেন তাহাও অনেকাংশে পূর্ণ হয়। ইয়েটস ১৮২৮ সনের প্রথমে, মনে হয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮২৮-২৯ সনের (অষ্টম) রিপোর্টে দেখা যায়, তিনি এদেশে আসিয়া পুনরায় সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা দুইখানি পুস্তক—'জ্যোতির্বিদ্যা' এবং 'সত্য ইতিহাস সার' সঙ্কলিত ও অনূদিত হইয়া মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হইতেছিল। সেক্রেটারী রূপে তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। এজন্য ১৮৩০-৩১ সন হইতে সোসাইটির কার্য্য পরিচালনের জন্য একাধিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতে থাকেন। এই বৎসরে তিনি ছিলেন "Recording Secretary"; ১৮৩২-৩৩ সন হইতে ১৮৪৪ সনে পদত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার পদের নাম ছিল—'Editorial and Minute Secretary'। সোসাইটির

* *The Calcutta Christian Observer*, Sept., 1845, pp. 594, 596-7.

দ্বাদশ রিপোর্টে (১৮৩৮-১৮৩৯) উল্লিখিত হয় যে, ১৮৩৭ সনেই ইয়েটস অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া উক্ত পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু সোসাইটির কর্তৃপক্ষের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, যোগ্য লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত, তিনি এই পদে কার্য্য করিতে সম্মত হন। আরও প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অবশেষে ১৮৪৪ সন নাগাদ তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সোসাইটির অধ্যক্ষ সভা তাঁহার মৃত্যুতে (৩রা জুলাই ১৮৪৫) গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা এখানেই উল্লেখ করি:

"That the Committee having received the mournful intelligence of the death of the Rev. W. Yates, D.D., for many years Editorial Secretary to the Society, desire to express their sorrow for so great a loss, and to record their sense of his eminent talents, his solid and extensive learning, his unwaried diligence, and of the important services he has rendered both to the Society and to the cause of Education, throughout India."—*The Thirteenth Report* (1840-44), p. 28.

শিক্ষা-সমাজ: পাঠ্য পুস্তক রচনা

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ এ অভাব মিটাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু নব্যশিক্ষা এবং নূতন পরিবেশে পাঠ্য পুস্তক রচনার ধরন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাংলা পাঠশালা স্থাপন করিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার আদর্শে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী-সভার অধীন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাও এই সনের মাঝামাঝি স্থাপিত হইল। উভয় প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত নূতন ধরনের পাঠ্য পুস্তক রচনার আয়োজনও হইল। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ নানা বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক রচিত হইতে লাগিল।

গবর্ণমেণ্ট তথা শিক্ষা-সমাজ ("Council of Education") দেখিলেন—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথক পৃথক পাঠ্য পুস্তক রচনায় শিক্ষার উদ্দেশ্য-সাম্য রক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ হিন্দু কলেজ বাংলা পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকেই অর্থ যোগাইতে হয়, অথচ পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁহাদের কর্তৃত্ব রক্ষিত হইতেছে না। সরকার পূর্ব্ববর্তী কয়েক বৎসর যাবৎই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনার বিষয় ভাবিতেছিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি এত দিন এ প্রয়োজন মিটাইলেও, নূতন পরিবেশে নূতন ধরনের পাঠ্যপুস্তকের অভাব তাঁহারাও অনুভব করেন। বাংলা পাঠশালার জন্য রচিত এবং হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা-সমাজ বিশেষজ্ঞ হিসাবে উইলিয়ম ইয়েটসের অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি অন্ততঃ 'শিশু সেবধি' সম্পর্কে বিরূপ মত দেন।[1] এই সব কারণে শিক্ষা-সমাজ "Section of the Council of Education for the preparation of Vernacular Books" নামে একটি সাব-কমিটি গঠন করিলেন। এই সাব-কমিটি বা 'সেকশুন'-কে পরবর্ত্তী কালের সরকারী টেক্সট-বুক কমিটির পূর্ব্বজ বলা যাইতে
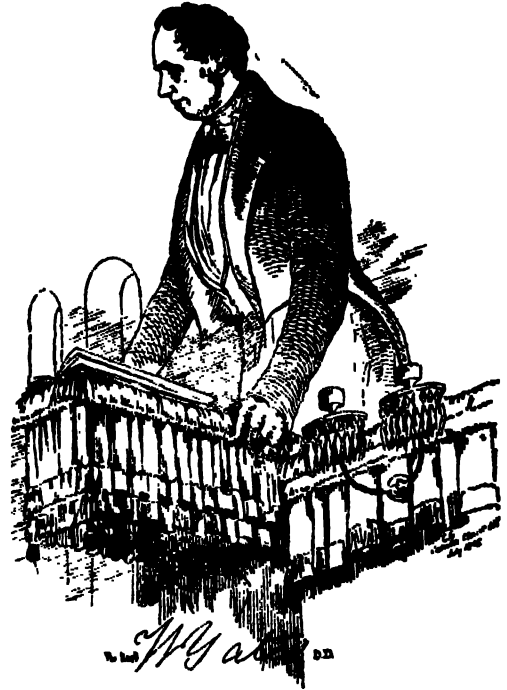
পারে। কি পদ্ধতিতে পাঠ্য পুস্তক রচনা করা যাইবে, সে উদ্দেশ্যে শিক্ষা-সমাজের পক্ষে উক্ত সেকশুন এবারেও কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে ইয়েটসের মতামত চাহিলেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৪২ তারিখে ইয়েটস এইরূপ মত দিলেন:

"I would submit that it is absolutely necessary to the object in view, that the Council of Education should first fix the series of their Class Books in English. As these are prepared they might hand them over to the Section for Vernacular Class Books to be translated into such languages as might be thought desirable, and with such alteration only as the idiom of the language and the usage of the people might require. In this case the object of the Section would be definite and tangible, and I doubt not they would make a steady progress towards its

1 *General Report of the late General Committee of Public Instruction*, for 1840-41 and 1841-42, App. No. VI, pp. xxxvi, xi.

accomplishment, but without this my opinon is, that all the consultations and efforts of the Section will be desultory and unsatisfactory; and the grand desideratum of a regular set of Class Books in the Vernacular languages will never be obtained. In preparing the Series in English the Council might avail themselves of the aid of men of the first talents in England as well as in this country—and that series being prepared, will serve for all the Presidencies ald with some trifling varieties for all the languages of India."*

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা ব্যাপারে ইয়েটস দুইটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করিলেন। প্রথমতঃ পাঠ্য পুস্তকগুলি বিলাতের এবং এখানকার সুযোগ্য গ্রন্থকারদের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী ভাষায় লিখাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই ইংরেজী পুস্তকগুলিই বাংলা এবং অন্যান্য দেশভাষায়, ভাষার স্বকীয় প্রয়োগরীতি এবং স্থানীয় আচার-আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দরকারমত কিছু কিছু বাদ-সাধ দিয়া উপযুক্ত লেখকদের দ্বারা অনুবাদ করাইতে হইবে। আর এই উপায়েই শিক্ষা-সমাজ বিভিন্ন ভাষায় ও বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। অন্য যে-কোন উপায়ই অবলম্বন করা যাউক না কেন, তাহা হইবে খাপছাড়া ও অসন্তোষজনক। শিক্ষা-সমাজ ইয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া 'সেকশুন'কে নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দিলেন :

"Ordered. That on the arrival of the expected supply of Chambers' Educational Course, Books be selected from that course for translation and adaptation, and that the Section concurring generally in Dr. Yate's opinion will bear in mind his remarks whenever favourable opportunities occur."

ইয়েটসের অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ করিয়া "সেকশুন" শিক্ষা-সমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিলাত হইতে 'চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স'-এর অন্তর্গত পুস্তকাবলী এদেশে আসিয়া পৌঁছিলে উক্তরূপ অনুবাদের ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু এই ধরনের প্রথম পুস্তকের জন্য, দেখা যাইতেছে, তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া ডাঃ গ্রাণ্টের উপর একখানি ইংরেজীতে পাঠ্য পুস্তক রচনার ভার দিলেন। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরী হইলে ইহা হইতে ইয়েটস বাংলায় অনুবাদ করিলেন; ইহার নাম দেওয়া হইল 'সার-সংগ্রহ'। এখানির পরিচয় আমরা পরে পাইব। তবে সরকার-প্রবর্ত্তিত এই পাঠ্য পুস্তক রচনা-পদ্ধতি যে তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ত্রয়োদশ রিপোর্টে (১৮৪০-১৮৪৪) সে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

Report of the General Committee of Public Instruction for 1842-43, p. 26.

সাহিত্য-সাধনা

শ্রীরামপুরে অবস্থান কালে ইয়েটসের সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি। ১৮১৫-১৮৪৫ মৃত্যুর পূর্ব্বে এদেশ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর বাং তিনি সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ের আভাসও আম আগেই পাইয়াছি। ড. কেরী ও ড. মার্শম্যানকে বাদ দিলে তিনি যে এ বিষয়ে মিশনরীদের মধ্যে অনন্যতুল্য ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাঁহার এই সাহিত্য-সাধনার ফল তিন দিকে প্রকটিত হয় : ১ বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা, অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন, এবং ৩ ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ। ই ছাড়া তাঁহার কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকও আছে। তিনি ইংরে সাময়িকপত্রে ভাষাতত্ত্বমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'এশিয় টিক রিসার্চেসে' প্রকাশিত প্রবন্ধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 'f ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায় এই দুইটি ভাষাত মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় : ১ "Theory of the Hindus thani Particle no; এবং ২ Theory of the Hebre verbs"।

সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েটস সাতিশয় ব্যুৎপন্ন হন। তৎসঙ্কলি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ডাঃ উইলসনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের উপরও ইয়েটস বহু নূতন শব্দ যোজনা করিতে সক্ষম হন। তাঁহার মৃত্যুর প ১৮৪৬ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। অভিধানখানির নাম—"A Dictionary in Sanscrit and English, designed for the use of Private Students and of Indian Colleges and Schools"। ইহা ছাড়া হিতোপদেশের বিশু সংস্করণ এবং 'নলোদয়'ও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা আগে বলা হইয়াছে। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের নামে তিনি এই বইখানি উৎসর্গ করেন। সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তকসমূহের এইরূপ উল্লেখ পাই : "A Grammer; A Vocabulary; A Reader; Elements of Natural Philosophy"।*

হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু, হিন্দী এবং আরবি ভাষায়ও তাঁহার বিস্তর পুস্তক রহিয়াছে। সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের মত হিন্দুস্থানী ইংরেজী অভিধানখানিও বেশ বড়। এখানি যে হিন্দুস্থানী ভাষায় পাণ্ডিত্যের দ্যোতক সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তদ্রচিত হিন্দুস্থানী অন্যান্য পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় : "An Introduction to the Hindusthani Language; Selections; Spelling

* The Calcutta Christian Advocate, 9th August 1845। ১৮৪৫, সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার'-এ উদ্ধৃত। পরবর্তী তালিকাও ইহা হইতে লওয়া হইয়াছে।

Book I & II; Reader I, II and III; Pleasing Tales; Students' Assistant।" তাঁহার হিন্দী বই: "Reader I, II and III; Elements of History"; আরবি বই মাত্র একখানি: "A Reader"। ইহা ব্যতীত ইয়েটস হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম ইয়েটস বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বিশেষভাবে করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে 'পাইওনিয়ার' বা অগ্রদূতের সম্মান দেওয়া চলে। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বহু পুস্তক তিনি বাংলায় অনুবাদ, সঙ্কলন ও সম্পাদন করেন। তিনি এই সকল পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও প্রকাশ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় সমসময়ে এবং পরবর্তীকালে কোন কোন রচনার কৃতিত্ব তাঁহাতেই আরোপিত হইয়াছে। এ কারণে তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহ সম্পর্কে পুরাপুরি স্থিরনিশ্চয় হওয়া সম্ভব নয়, যখন সবগুলি এখনও আমরা দেখিতে পারি নাই। তথাপি যে ক'খানি বাংলা পুস্তক দেখিয়াছি, এবং যে সকল পুস্তক সম্বন্ধে কতকটা স্থিরনিশ্চয় হওয়া গিয়াছে এখানে কিছু কিছু মন্তব্য সমেত সেগুলির উল্লেখ করা হইল:

১। পদার্থবিদ্যাসার। অর্থাৎ বালকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে কথোপকথন। ১৮২৫।

এ বইখানির ইংরেজী নাম—"Elements of Natural Philosophy and Natural History in a series of Familiar Dialogues।" কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্টে (৭ম বর্ষ ১৮২৪-২৫, পৃ. ৮) আছে: "One thousand in Bengali and five hundred in Bengali and English have just issued from the press"। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, পুস্তকখানির দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়—একটি শুধু বাংলায় এবং দ্বিতীয়টি বাংলা ও ইংরেজীতে।

২। জ্যোতির্বিদ্যা। ১৮৩০।

ইহার ১৮৩৩-এর সংস্করণ দেখিয়াছি। পুস্তকখানি জেমস কার্সন, এফ.আর.এস., রচিত এবং ডেভিড ব্রুষ্টার কর্তৃক সংশোধিত "An Easy Introduction to Astronomy" নামক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির অষ্টম রিপোর্টে (একাদশ, দ্বাদশ বর্ষ, পৃ ৬) এই মর্মে লিখিত হয় যে, ইয়েটস পুস্তকখানির অনুবাদকার্য্যে দুই জন পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং রাধাকান্ত দেব পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দেন।

৩। সত্য ইতিহাস সার। ১৮৩০।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইংরেজী "Celebrated Characters in Ancient History" পুস্তক হইতে অনূদিত। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান এডভোকেট' ৯ মে ১৮৪৫ সংখ্যায় ইয়েটসের যে গ্রন্থ-তালিকা দিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকখানির উল্লেখ আছে।

৪। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১৮৩০।

ইংরেজী নাম "An Epitome of Ancient History, containing a Concise Account of the Egyptians, Assyrians, Persians, Grecians, and Romans"। পুস্তকখানির ইংরেজী অংশ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে উইলিয়ম ইয়েটস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠা হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক অনূদিত। অবশিষ্টাংশ চুঁচুড়ার মিঃ পিয়ার্সন অনুবাদ করেন, ইহার বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং দক্ষিণ পৃষ্ঠায় বাংলা দেওয়া হইয়াছে। এখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা মোট ৬২৩।

৫। হিতোপদেশ। বিশুদ্ধ সংস্করণ। ১৮৪১।

পুস্তকখানির ইংরেজীতে এইরূপ উল্লেখ পাইয়াছি—"An Expurgated Edition of Hitopadesh"।

৬। সারসংগ্রহ:। ১৮৪৪

এখানির ইংরেজী নাম—"Vernacular Class Book Reader for the Government Colleges and Schools"। ডাঃ গ্রাণ্ট কৃত ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ।

৭। পরবর্ত্তী পুস্তক দুই খণ্ডে সমাপ্ত, এবং নাম পুরাপুরি ইংরেজীতে। ইহার আখ্যাপত্র এই—

"Introduction to the Bengali Language./ Vol. I./ By the Late W. Yates, D.D./ in two volumes./ Edited by J. Wenger./ Containing a Grammer, a Reader, and Explanatory Notes,/ with an Index and Vocabulary,/... Calcutta/ 1847./..../;—Vol. II, 1847."

এই ব্যাকরণখানি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রচিত, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইয়েটস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে, ১৮৪৫ সনের জুন মাসে ইহা তাঁহার সহকর্মী পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গারের নিকট রাখিয়া যান। প্রথম খণ্ডের ব্যাকরণ বাদে অন্য অংশ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষে ফিরিয়া ইহা সম্পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গার এই মূল্যবান পুস্তক সম্পাদনা ও প্রকাশের ভার লইলেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দুইটি ভূমিকা: "Author's Preface" এবং "Editor's Preface"। দ্বিতীয় খণ্ডে একটি "Prefatory Note" সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারও সম্পাদক জে. ওয়েঙ্গারের। পুস্তকের কতটা ইয়েটস রচনা ও সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, এবং কতটাই বা ওয়েঙ্গারের কৃত, "Editor's Preface"-এর নিম্নাংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে:

"He (the Editor) found that the Grammar, the Preface, and the table cr contents to the second volume were prepared and he also discovered some materials intended for the Reader, with a few hints respecting their arrangement. It may therefore be said that the author wrote the Grammar, and furnished the plan for the whole whilst the Editor must be responsible for nearly all the rest."

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল অংশ ইয়েটস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই অংশে শুধু দেশীয় লেখকদের রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিশিষ্ট অংশ ইয়েটস যেরূপ ঠিক করিয়াছিলেন, সম্পাদক ওয়েঙ্গার তাহা অনুরূপ করিয়াছেন। ইয়েটস বাংলা প্রবাদ ও নীতিবচন সঙ্কলন করিয়া পরিশিষ্টে দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা সঙ্কলন করিয়া যান নাই। সম্পাদক ইহার পরিবর্ত্তে দেশীয় কবিদের কবিতা এবং সাময়িক সাহিত্যের অংশবিশেষ নমুনাস্বরূপ ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন।

ধর্ম্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ : ইয়েটস সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ অনুবাদে উদ্যোগী হন। তাঁহার এই অনুবাদকার্য্যে কলিকাতার অন্যান্য ব্যাপটিষ্ট মিশনরীগণ সাহায্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কেননা ১৮৫২ সনের পরবর্ত্তী সংস্করণে "Translated by Calcutta Baptist Missionaries" এইরূপ উল্লেখ আছে। তবে ইয়েটস যে মূলতঃ ইহার অনুবাদক সে বিষয়েও সংশয় নাই। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউ টেষ্টামেণ্ট "ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ" এই নামে বাংলায় কিন্তু রোমান অক্ষরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। তৎকৃত 'ওল্ড টেষ্টামেণ্টে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এক বৎসর পরে, ১৮৪৫ সনে এই দুইখানি পুস্তক বাংলা অক্ষরে বাহির হয়। ১৮৫২ সনে প্রকাশিত সংস্করণে পুস্তকের আখ্যাপত্রে নাম দেখিতেছি—"ধর্ম্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ"।

মৃত্যু

ইয়েটস ত্রিশ বৎসর কাল (মধ্যে প্রায় দুই বৎসর বাদে) এদেশে কাটান। ধর্ম্মপ্রচার এবং জ্ঞান-অনুশীলন দুই-ই সমানে চলিয়াছিল। তিনি ১৮৪৫ সনের জুন মাসে স্বাস্থ্যলাভার্থ স্বদেশে রওনা হইলেন। কিন্তু জাহাজেই তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। এডেন বন্দর অতিক্রম করিয়া জাহাজ লোহিত সাগরে পড়িলে ১৮৪৫, ৩রা জুলাই তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতল সমুদ্রে তাঁহার শব নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে একটি কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটিল। ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য এবং ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে উইলিয়ম ইয়েটসের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।*

---

* আমি 'উইলিয়ম ইয়েটস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তাকারে প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৫-এ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধটিতে বহু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।—লেখক

শোক

শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

সারা বাড়ীটায় ছড়িয়ে রয়েছে বিষাদের ছায়া। আজ মহালয়া। আজকের এই উৎসব-দিনটি একটি বিশেষ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। গত বৎসরের বেদনাবিক্ষুব্ধ একটি স্মৃতি। এই দিনেই নন্তু মারা গিয়েছিল—এ বাড়ীর বছরছয়েকের ছেলে। সরমার আর পাঁচটি ছেলেপুলের মধ্যে নন্তু ছিল মেজ। সে মারা গিয়েছিল একেবারে হঠাৎ। কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ডিপথিরিয়া রোগে।

স্ত্রীর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখখানা সকাল থেকেই লক্ষ্য করছিল অরুণাংশু। আর দেখছিল ওর একটা এড়িয়ে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা। নিজেরও যে নন্তুকে মনে পড়ে নি তা নয়। বুকটা বার বার মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সরমাকে মনে পড়িয়ে দিতে চায় নি। তার কি আর মনে পড়ছে না যে, এই দিনটিতেই সকালে, এতক্ষণে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে এই স্বল্পপরিসর বাড়ীটা। এই একটি মাত্র শোয়ার ঘরে বন্ধুবান্ধব, পাড়া-পড়শীরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। আর নন্তুর সেই বিকট কাতরানি—তার পর ডাক্তারের ঘন ঘন আসা-যাওয়া—প্রতি বারের ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দেখে নন্তুর সেই আর্ত্ত চিৎকার। জোর করে প্রতি বার চেপে ধরে রাখতে হয়েছে নন্তুকে। সরমা কোনবারেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি সামনে। ঠিক ঐ সময়টায় টিনের শেড দেওয়া রান্নাঘরের এক কোণে কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তারপর সন্ধ্যাবেলার সেই ঘনিয়ে আসা অন্তিম সময়টা। মৃত পাণ্ডুর একটি শিশুর মুখ—সরমার বুকফাটা আর্ত্তনাদ—আর সবার শেষে শক্ত কাঠের মত মন নিয়ে সরমার বুক থেকে নন্তুকে ছিনিয়ে নিয়ে অরুণাংশুর মন্থর গতিতে বেরিয়ে যাওয়া। সবই স্পষ্ট মনে আছে, এতটুকু ম্লান হয়ে যায় নি।

সেদিন আর আজ। দুর্গতিনাশিনীর আগমন-সূচনায় সেদিনও ছিল দিগ্‌বিদিক মুখরিত এবং আজও তাই। কিন্তু এসব আনন্দের ছিটেফোঁটা এ বাড়ীকে স্পর্শ করে নি।

সকালবেলায়ই কখন উঠে গেছে সরমা। অন্য দিন অরুণাংশু ঘুমিয়েই থাকে। তবু যাবার সময় একবার সরমা ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে যায় স্বামীকে। আজ কিন্তু আর তেমনটি হয় নি। ছুটির দিন, একটু বেলা করে উঠে, মুখ হাত-পা ধুয়ে খুঁটিনাটি কাজ সারতে বেলা প্রায় আটটা। স্মৃতিটা মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল। খোঁচাটা আরও তীক্ষ্ণ হ'ল কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ যখন মনে হ'ল, সরমার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয় নি সকাল থেকে। বারকয়েক বোধ হয় কাজ নিয়ে ঘরে এসেছে গেছে, কিন্তু কোন কথা বলে নি। চা পাঠিয়ে দিয়েছে বড় ছেলের হাত দিয়ে। এড়িয়ে এড়িয়ে রয়েছে সরমা। ছেলেদের নিয়ে সেই সকালে রান্নাঘরে ঢুকে কি করছে কে জানে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল অরুণাংশু। ছেলেদের কলরবটা ও আর রান্নাঘরে নেই—পাশের বাড়ীর রোয়াকে শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরেও কোন শব্দ নেই। কোথাও গেছে নাকি সরমা! ভাঙা উঠোন পার হয়ে, কাদা প্যাচপ্যাচে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অরুণাংশু। সরমা একলা বসে কুটনো কুটছে হেঁট মুখে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হ'ল—রক্তজবার মত অশ্রু-ভারাক্রান্ত দুটি চোখ। তুলেই আবার নামিয়ে নিল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল অরুণাংশু।

এই জন্যেই সরমা এড়িয়ে এড়িয়ে রয়েছে সারা সকাল। দাওয়ার খুঁটি ধরে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল অরুণাংশু। আগের বছরের সেই বিষাদমাখা দিনটি। সেই ভিড়, সবাই ত্রস্ত, ব্যস্ত, মৃত পাণ্ডুর একটি শিশুর মুখ, আর শেষটা নন্তুকে বুকে জড়িয়ে···।

—বাজার যাবে না ?

কখন নিঃশব্দে এসে বাজারের থলিটা এগিয়ে ধরেছে সরমা। মুখ চোখ পরিষ্কার করে মোছা—আঁচলের ভিজে দাগগুলি তারই সাক্ষী। বেশ স্পষ্ট ভাবেই এবার তাকিয়েছে। মুখে একটা জোর করে ফুটিয়ে তোলা হাসি-হাসি ভাব। বললে—যাও, বাজারটা করে আন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে—তুমি আবার মন খারাপ করো না—যে গেছে সে কি আর···চোখ দুটি নত করে নিতে হ'ল, দ্রুত চলে যেতে হ'ল সামনে থেকে।

সান্ত্বনা দিতে এসেছিল স্বামীকে সরমা—শোকে সান্ত্বনা। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে বাজারে বেরিয়ে গেল অরুণাংশু।

দুপুরের দিকে বাড়ীর থমথমে আবহাওয়াটা অনেকটা সহজ হয়ে এল। গতানুগতিক কাজের মধ্যে সকালবেলাকার বেদনাক্ষুব্ধ মনটা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে

উঠল। অনেকটা ভুলে রইল সরমা। সেদিনের সেই শোকটা সহ্য হতে হতে তার তীব্রতা এমনিতেই অনেকখানি কমে এসেছে—চাপা পড়ে গেছে একটু একটু করে—ছেলেপুলে স্বামী সংসার নিয়ে অনেক কাজের মধ্যে ক্রমশঃ তলিয়ে গেছে। তবু আজকের এই বিশেষ দিনটিতে শোকটা আবার একবার নতুন করে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। হয়ত প্রতি মহালয়ার দিনটিতে এমনি হবে—নন্ত একবার নিজেকে মনে পড়িয়ে দেবে আনন্দ-কলরবের মাঝে—আবার এ বাড়ীর অনেক কাজের ভিড়ে তলিয়ে থাকবে সারা বছর।

ছেলেদের হৈ চৈ, তাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো ইত্যাদি সারতে সারতে বেলা প্রায় একটা। মেঝেয় মাদুর পেতে চারটি ছেলেকে নিয়ে গল্পে মেতে উঠল সরমা। বেশ সহজ মন নিয়ে ওদের আব্দার আবদারের কথা শুনল, জবাব দিয়ে গেল। বছরতিনেকের আর চারেকের ছেলে দুটিকে দু'পাশ থেকে আগলে রেখেছে বুকে। সাত বছরের আর পাঁচ বছরের অপর বড় দু'জন ছোট দুটির দু'পাশে আছে শুয়ে। অনর্গল সব বকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সরমা সাবধান করে দিচ্ছে—এই আস্তে, বাবা শুয়ে আছে না খাটে?

অরুণাংশু উপরে খাটে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে নেই, ঘুমোবার ভান করে পড়ে আছে। আড়াল থেকে মা আর ছেলেদের কথাবার্ত্তা উপভোগ করছে। বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে সরমার মন। নন্ত এখন আর সব ক'টি ছেলেদের মধ্যে তলিয়ে গেছে। একবার মনে হ'ল ওদের আলাপে যোগ দেবে নাকি? অমন একটা স্নেহস্নিগ্ধ পরিবেশের বাইরে সেই-বা পড়ে থাকবে কেন?

কথাবার্ত্তার মোড় ঘুরে গেল। আর ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়া গেল না। বড় ছেলেটি জিজ্ঞেস করে বসেছে—এবার আমাদের পুজোর জামাকাপড় হবে না মা?

—হবে রে, হবে। মা সান্ত্বনা দিল। আর তিনটিও দাদার অনুকরণে একেবারে উঠে বসে হৈ হৈ করে উঠল—আর কবে হবে মা?

মা বললে—দাঁড়া দাঁড়া—অত ব্যস্ত হোস কেন, তোদের বাবা বোনাসের টাকাটা আগে পাক।

সরমা একবার খাটের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। না, ঘুমোচ্ছেই। জেগে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত বোনাসের টাকাটা পেয়েছে কিনা। অন্যান্য বছর ত মহালয়ার আগেই পেয়ে যায়।

অরুণাংশু শুয়ে শুয়ে ভাবল টাকা পঞ্চাশটা কালই পাওয়া গেছে। কথাটা আর বলা হয়ে ওঠে নি সরমাকে। ভাবল এবার উঠে বসবে নাকি! বোনাস প্রাপ্তির খবরটা এখখুনি প্রকাশ করে দিয়ে এদের আরও খুশী করে তুলবে নাকি।

কিন্তু এবারেও ওঠা হ'ল না। বড়টি আবদার তুলেছে—ক্যাম্বিসের জুতো আর নেব না মা—বড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়। পাশের বাড়ীর ছেলেরা কেমন সুন্দর চামড়ার জুতো পরে। আর তিনটিও সুরে সুর মিলাল।

সরমা বিশেষ কিছু বলতে পারল না। আচ্ছা সে দেখা যাবে, বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিল। ক্যাম্বিসের জুতোগুলি সত্যিই টেঁকে না। বড়জোর ছ'মাস। তারপর ছেঁড়া জুতোয় তালিতুলি মেরে কোনগতিকে আর ছ'মাস, বাকি মাসকয়েক একরকম খালি পায়েই চালিয়ে নিতে হয়। কিন্তু ক্যাম্বিসের জুতো ছাড়া ত অন্য কিছু কিনে দেবার উপায় নেই। সরমার সব হিসেব নিজের হাতেই করা আছে। আগের দু'বছর ঐ পঞ্চাশ টাকায় পাঁচটি ছেলের কোন রকমে কুলিয়েছিল। একটা শার্ট চার টাকা, প্যাণ্ট তিন টাকা, আর ক্যাম্বিসের জুতো আড়াই-তিনের মধ্যে—এই ভাবে পাঁচ জনের গড়পড়তা দশ টাকা ধরে, পঞ্চাশ টাকায় ছেলেদের পূজার বাজার হয়েছিল। গেল দু'বছরে সরমার নিজের জন্যে কিছু হয়ে ওঠে নি। আগে যখন এরা ছোট ছিল, নিদেনপক্ষে একটা তাঁতের শাড়ি ওরই মধ্যে কুলিয়ে যেত। এখন হয় না। অরুণাংশু দু'বারই বিষণ্ণ মুখে বলেছিল—'তোমার কিছু হবে না?'—'ছেলেরা বড় হয়েছে, মায়ের আর সেজে কাজ নেই।'—এই জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়ে সরে গেছে সরমা। অর্থাৎ, যখন কিছু হবার সামর্থ্য নেই, তখন হবে না—এতে দুঃখের কি আছে।...

অরুণাংশুর ঠাকুরদার আমলের দেয়াল-ঘড়িটায় চারটা বাজল। সরমা এবার উঠে পড়ল। আঁচ দিতে হবে, চা করতে হবে—অনেক কাজ। এবার অরুণাংশুকেও উঠতে হ'ল। এদের কথায় যোগ দেব দেব করে দেওয়া হয়ে ওঠে নি। কথা শেষ হয়ে এল প্রায়—তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

—কি এত বকর বকর করছিলি রে তোরা?

চাবির থোলোশুদ্ধ আঁচলটা পিঠের উপরে ফেলে দিয়ে সরমা বললে—বোনাসের টাকাটা পেয়েছ?

—ও হ্যাঁ, কালই ত পেয়েছি।

—এদের নিয়ে আজ একটু ঘুরে এস না বাজারে!

—তা বেশ ত, যাব।

—এরা সব বলছে চামড়ার জুতো নেবে।

—দেখি, ওর মধ্যেই ত কুলোতে হবে।

—তা ছাড়া আর উপায় কি।

হাসিমুখে সরমা বেরিয়ে যেতে, ছেলেদের নিয়ে ঘিরে বসল অরুণাংশু—কি কি নিবি সব বল। মনটা বেশ প্রফুল্ল

হয়ে উঠেছে। মা ছেলেদের নিয়ে বেশ আমোদ করে গেল —এবার বাপের পালা।...

জামা প্যাণ্ট কেনা হ'ল বাজার ঘুরে। এবার জুতোর দোকান, সরমা দেখতে বলেছে চামড়ার জুতো। চারটি ছেলে সারি সারি চেয়ারে বসেছে, তাদেরও ঐ আবদার। পকেটের টাকাগুলো ঝেড়ে হিসেব করে নিল অরুণাংশু। আগের বছরের হিসেবমত—জামা চার টাকা, প্যাণ্ট তিন টাকা, চার আর তিনে সাত, চার জনের আটাশ টাকা হওয়া উচিত, খরচ হয়েছে প্রায় ত্রিশ টাকা। বাকি পঞ্চাশের মধ্যে আছে প্রায় কুড়ি টাকা। পাঁচ টাকা করে একজনের জুতো ধরলে চার জনের কুড়ি টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। বাঃ, এই ত বেশ কুলিয়ে যাচ্ছে। খুশীমনে চামড়ার জুতো দেখাবার নির্দেশ দিয়ে, আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল অরুণাংশু। আগের বারে ত কুলোয় নি, এবার কি করে কুলোল। কয়েকটা মুহূর্ত, বেশীক্ষণ লাগল না সূত্রটা ধরে ফেলতে—নন্তুর হিসেবটা মুছে গিয়ে এদের হিসেবে যুক্ত হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অরুণাংশু।...

ছেলেরা সব প্যাকেটগুলো বগলে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ী ঢুকল। রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সরমা। হাসি-হাসি মুখ। অরুণাংশু এক নিমেষ তার মুখের দিকে চেয়ে ঘরে চলে এল। কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা আড়ষ্টতা—স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না—ও ভুলে আছে, ভুলে থাক— যতক্ষণ পারে ভুলে থাক।

ছেলেদের নিয়ে ঘরে ঢুকল সরমা। দেখি, দেখি, তোদের কি সব হ'ল। মেঝেয় বসল সব ক'টিকে নিয়ে। খুব হৈ চৈ, আনন্দে মশগুল সব। অরুণাংশুর টেবিলের উপর কি একটা খোঁজার খুব দরকার পড়ে গেল।

জামাগুলো সব দেখা হ'ল। চামড়ার জুতো দেখে ছেলেদের মত মাও মহা খুশী। সরমা বললে—এই ত বেশ চামড়ার জুতো হয়েছে তোদের।

—আমাকে পরিয়ে দাও, আমায় আগে। তাড়া দিচ্ছে সবাই। এক এক করে পরিয়ে দিয়ে দেখছে সরমা। অরুণাংশুর টেবিলে এখনও খোঁজা শেষ হয় নি।

সরমা তাড়া দিল—কি গো, কি হ'ল তোমার? দেখ না কি রকম হ'ল সব!

পেছন না ফিরেই অরুণাংশু বললে—আমি ত দেখেই কিনেছি। আমি আর কি দেখব—তুমি দেখ।

—বেশ হয়েছে সব, কিন্তু ওরই মধ্যে কুলিয়ে গেল ত?

—হ্যাঁ। উত্তরটা অস্পষ্ট স্বরে দিয়েই সিঁটিয়ে রইল অরুণাংশু। প্রসঙ্গটা কোন রকমে কি এড়ানো যায় না?

—কি করে কুলোল?

আর জবাব দেওয়া গেল না। মিনিটকয়েক চুপচাপ দু'জনেই। হিসেবটা মেলাতে অরুণাংশুর যতটুকু সময় লেগেছিল, সরমারও তাই। তার পরেই একটা ছোট্ট অস্ফুট স্বর—ওঃ।

হিসেব মিলে গেছে সরমার। হেঁট হয়ে ছেলেদের জুতোর ফিতে পরাতে পরাতে চোখ দুটো জ্বালা করে জলে ভরে উঠল।

ছেলেরা তখন মাকে ধরে পড়েছে—কারটা ভাল হয়েছে মা, কারটা?

সব ক'টি ছেলেকে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে টেনে নিয়ে এল কোলের কাছে সরমা। মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে বললে সবাইকারটাই খুব সুন্দর হয়েছে। তার পর হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ দুটি ভাল করে মুছে নিল। এমন একটা সুন্দর মুহূর্তে চোখের জল ফেলতে নেই মাকে—ছেলেদের অকল্যাণ হয়। কথাটা হঠাৎই মনে পড়ে গেছে সরমার।
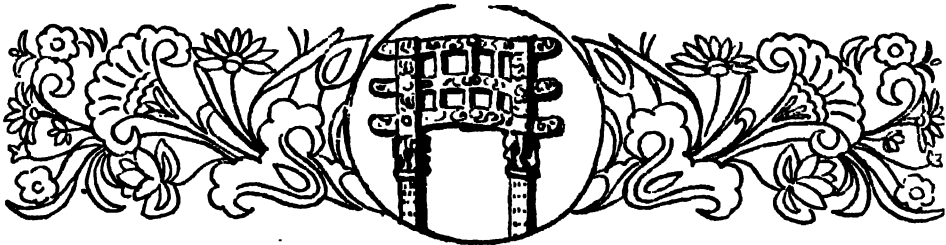
দুঃশীলের শীলগ্রহণ

মারের দীক্ষা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মথুরা নগরীর উপকণ্ঠে, এক অরণ্যে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত আশ্রয় নিয়েছেন। অপূর্বচরিত্র দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় এই মহাপুরুষকে দর্শন এবং তাঁর উপদেশ শ্রবণ করবার জন্য প্রতিদিন বহু জনসমাগম হচ্ছে।

একদিন এক বিরাট সভায় উপগুপ্ত ধর্মব্যাখ্যা করছেন। জনতা নীরবে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করছে—এমন সময় সহসা আকাশ হতে মুক্তাবর্ষণ হ'ল। জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো। একাধিকবার ঐরূপ মুক্তাবর্ষণ হওয়ায়, উপগুপ্তের ধর্মোপদেশে আর কারও চিত্তই আকৃষ্ট হ'ল না।

উপগুপ্ত বিস্মিত হলেন। হঠাৎ এরূপ মুক্তাবর্ষণ হ'ল কেন? এর কারণ কি? ধ্যানযোগে তিনি অবগত হলেন—ধর্মের বৈরী মারের এই কীর্তি।

পরদিন সভায় অধিকতর জনসমাগম হ'ল। কারণ চতুর্দিকে সংবাদ রটেছিল উপগুপ্ত যখন ধর্মপ্রচার করেন, তখন আকাশ হতে মুক্তাবর্ষণ হয়। সেদিনের সভায় উপগুপ্ত যখন বুদ্ধপ্রচারিত সত্য ব্যাখ্যা করছেন—তখন সহসা সুবর্ণ বর্ষণ শুরু হ'ল। বলা বাহুল্য, জনতা ধর্মের চেয়ে সুবর্ণের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হ'ল।

তৃতীয় দিনের সভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হ'ল। ধর্মোপদেশ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—মার অনতিদূরে নাটক আরম্ভ করেছেন। দিব্যবাদ্য সহযোগে স্বর্গীয় সঙ্গীত এবং সেই ঐক্যতানে পরমাসুন্দরী অপ্সরাগণ নৃত্য করছেন। এই দৃশ্য সমস্ত জনগণের মন হরণ করল। বীতরাগ সাধুগণের পর্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। নিজের সাফল্যে উৎসাহিত মার উপহাসপূর্বক উপগুপ্তের কণ্ঠে মাল্যদান করলেন।

উপগুপ্ত চিন্তিত হলেন। ধর্মের এই পরমশত্রু মারকে তথাগত কেন দমন করলেন না—তাঁর মনে এই প্রশ্ন উদিত হ'ল। যাই হোক, মারকে তিনিই দমন করবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করে তিনটি বিভিন্ন জাতীয় কঙ্কাল তিনি সংগ্রহ করলেন। একটি মনুষ্যের, একটি কুক্কুরের ও একটি সর্পের। ঋদ্ধিবলে এই কঙ্কাল তিনটিকে পুষ্পমাল্যে পরিণত করে তিনি মারের দিকে অগ্রসর হলেন। "উপগুপ্তও এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়েছেন।"—এই ভেবে মার অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। উপগুপ্ত সেই মাল্য, মারের শীর্ষে ও কণ্ঠে অর্পণ করলেন। মারও নত হয়ে তা গ্রহণ করলেন। এই ভাবে কি ভয়ঙ্কর বিপদ তিনি শিরোধার্য করলেন, হায়! তা যদি তাঁর বোধগম্য হ'ত। উপগুপ্ত বললেন:

"সন্ন্যাসী ভিক্ষুর মাল্যধারণ
জান তুমি বেশ, আছে শাস্ত্রে বারণ!
তথাপি পরায়ে মালা কণ্ঠে আমার
লাঞ্ছনা কর মোরে, গর্বিত মার!
রূপে তব যত প্রীতি
কংকালে তত ভীতি,
হোক তাই কণ্ঠের হার।
পরিয়া হাড়ের মালা
গর্ব তোমার,
কেমন, এবার হলো
খর্ব ত মার?"

পুষ্পমাল্যের পরিবর্তে শীর্ষে ও কণ্ঠে, সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত কঙ্কাল দর্শন করে সন্ত্রস্ত মার সেই কঙ্কালগ্রন্থি ছিন্ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি কৃতকার্য হলেন না। তখন তিনি আকাশে উত্থিত হয়ে উপগুপ্তকে বললেন:

"খুলিতে না পারি তবু
মনেতে ভেবো না কভু
খুলিবে না এ দৃঢ় বাঁধন।
দেবতা যতেক আছে
ছুটিব সবার কাছে
অসাধ্য করিবে সাধন।"

উপগুপ্ত উত্তর দিলেন:

"ছাড়ি এই তপোভূমি
যেথা খুশি যাও তুমি
যারে খুশি কর আবেদন।
ছুটে যাও অমরায়
দেবতার নম পায়
ইন্দ্রের লও গে শরণ।

কুবের বরুণ যম
হয় যদি অক্ষম
ব্রহ্মার ধর গে চরণ।"

স্বর্গে একে একে পবন, বরুণ, যম, কুবের, ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবতার নিকট মার গমন করলেন। কিন্তু কেহই তাঁর ঐ বন্ধন মোচন করতে সক্ষম হলেন না। তখন নিরুপায় মার স্বয়ং ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হলেন।

ব্রহ্মা বললেন :

"শকতি আমার যদিও অনেক তবু
সীমা আছে তার, অসীম নহে সে কভু।
অগ্নি যদিও কম নয় কিছু তেজে
সূর্যের কাছে দাঁড়াতে পারে না সে যে!"

তথাপি মার যখন তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগলেন, তখন ব্রহ্মা বললেন :

"পদ্মের নালের সূত্রে বাঁধি
হিমালয়ে উথাড়িতে চাও?
হয়ত পারিবে কেহ তাও।
বুদ্ধের সেবক-বদ্ধ কংকালের হার
খুলে দেবে, সাধ্য আছে কার?"

বিভীষিকাগ্রস্ত মার করযোড়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তবে আমি আর কার শরণ নেব?" ব্রহ্মা উত্তর দিলেন :

"আছাড় খাইয়া, মাটিতে পড়ে যে-কেহ
মাটিরেই ধরি, তুলে সে নিজের দেহ।
হাড়ের এ মালা পরালেন যিনি গলে
খুলিবেন তিনি, পড় গিয়ে পদতলে!"

ব্রহ্মার উত্তর শুনে মার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন :

বুদ্ধের সেবক এক, তাঁরও কাছে ব্রহ্মা মানে হার!
আশ্চর্য ঘটনা হেরি, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'ল মার।
"না জানি কত না শক্তি ধরিতেন বুদ্ধ তথাগত,
কত না লাঞ্ছনা হায়, তাঁরে আমি করেছি নিয়ত!
মুখের আহার তাঁর নিয়েছি কাড়িয়া—আমি মূঢ়মতি!
কন নাই কোন কটু কথা। করেননি কভু কোন ক্ষতি।
শক্তিগর্বে গর্বিত বালক! বুঝি নাই তাঁর শক্তিলেশ
অবহেলে করিলে প্রয়োগ, দেহ মোর হ'ত ভস্মশেষ!
সয়েচেন শত অত্যাচার, হোক না সে যত ক্লেশকর,
জনকের মত রক্ষা মোরে, করেছেন করুণা-সাগর!"

পূর্ব-আচরিত পাপকর্মে নিতান্ত অনুতপ্ত মার উপগুপ্তের চরণে নিপতিত হয়ে বললেন :

"ক্ষমা কর মোরে, হে বীর তুমি,
এই আমি তব চরণ চুমি।
গর্বের আজি লইনু শরণ
মুক্ত কর হে কোপ-আভরণ।"

উপগুপ্ত বললেন, "বন্ধন মোচন করছি, কিন্তু আমার একটি কাজ করতে হবে।"

মার উল্লসিত হয়ে বললেন—"প্রভু, আজ্ঞা করুন।"

উপগুপ্ত বললেন—"তথাগতের পরিনির্বাণের শতবর্ষ পরে আমার জন্ম। তাঁর সেই পরম রূপবান দেহ দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তুমি সর্বপ্রকার রূপ-ধারণে সক্ষম। তথাগতের রূপ ধারণ করে' তুমি তাঁর শূর নামক ভক্তকে মোহিত করেছিলে। আমাকে তাঁর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করাও। আমি কৃতার্থ হই।"

মার বললেন—"তার পূর্বে আপনাকে এক প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

উপগুপ্ত শুধালেন—"কি প্রতিজ্ঞা?"

মার বললেন—"তথাগতের রূপ দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে আপনি আমায় প্রণাম করবেন না :

"স্মরিয়া সুগতে নাথ
কর যদি প্রণিপাত,
ভস্ম হবে এ তনু আমার।
সাধকের শ্রদ্ধাভক্তি
সহ্য করে হেন শক্তি
ধরে নাকো ক্ষুদ্রশক্তি মার।"

উপগুপ্ত বললেন—"প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে প্রণাম করব না।"

মার তখন গহন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অতঃপর সুদক্ষ নটের ন্যায় তথাগতের রূপ পরিগ্রহণ করে, তিনি উপগুপ্তের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

সেই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করে উপগুপ্তের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন :

"দাঁড়াল সম্মুখে একি লভিয়া আকার
মম শত জনমের তপস্যার ফল!
স্নিগ্ধ শান্ত মুখখানি তনু-শোভা-সার
মানস-সরসজলে শুভ্র শতদল।
বিকচ নয়ন দুটি সমুজ্জ্বল মণি,
শোভিতেছে সুষমায় জিনি নীলোৎপল।
হেরি দুঃখ ত্রিলোকের দিবসরজনী
করুণার সুধারসে স্নিগ্ধ সমুচ্ছল!
বিন্ধ্য হিমাচল পরাজিত ধীরতায়।

তেজে তিরস্কৃত রবি, গাম্ভীর্যে সাগর।
গতিতে ধিকৃত সিংহ অরণ্যে লুকায়
তনুর চম্পকবর্ণে ম্লান চামীকর।
"চন্দ্র সূর্য হয়ে যায় ম্লান
অপূর্ব এ রূপে মূর্চ্ছি তাঁর।
কর্মবলে সৃষ্ট এই রূপ!
সৃষ্ট নহে খেয়ালী ধাতার!
"শত শত জনমের শুভকর্ম যত
প্রেম, সেবা, ক্ষমা, দয়া দানধ্যান আদি;
তারি বলে হিংসা দ্বেষ করিয়া সংযত
চিত্তের ঐশ্বর্য মাঝে লভিয়া সমাধি
সৃজিলা নিজের রূপ নিজে তথাগত!"

বুদ্ধের স্বরূপ চিন্তায় বিভোর উপগুপ্ত স্থান, কাল, পাত্র, সমস্ত বিস্মৃত হয়ে মারের পদতলে দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হলেন। ভীত, সচকিত মার কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন—"অন্যায়! অন্যায়! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অন্যায়!"

উপগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন—"কি প্রতিজ্ঞা?"

মার বল্লেন—"প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমাকে প্রণাম করবেন না। কিন্তু আপনি আমায় প্রণাম করলেন।"

উপগুপ্ত গদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন:

"আমি কি জানিনা শতাব্দী আগে তথাগত ভগবান
জলেতে আহুত অনলের মত লভেছেন নিরবাণ!
তথাপি যখন কুসুমকোমল অমলকান্তি তাঁর
হেরিনু সমুখে নমিনু চরণে, নমিনি তোমারে মার।"

মার আশ্চর্য হয়ে বল্লেন—"আমি স্বচক্ষে দেখলাম, আপনি আমায় প্রণাম করলেন। এখন বলছেন, 'তোমাকে প্রণাম করি নি'। একি কথা!"

উপগুপ্ত বল্লেন—"শোন!
মাটীর প্রতিমা গড়ি
যবে দেবতার
সমুখে নমিয়া পূজি,
পূজা করি কার?
সুগতের রূপধারী
সমুখে তোমার
প্রণমিনু যাঁরে, সে তো
তুমি নহ মার!"

অতঃপর মার উপগুপ্তকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে' প্রস্থান করলেন।

পরদিন তিনি স্বয়ং মথুরায় ঘণ্টার দ্বারা ঘোষণা করলেন:

"হীনতা দীনতা যত
অনর্থের মূল
ধ্বংস করি লভিবে না
ঐশ্বর্য অতুল?
ওঠ, জাগো! তপস্যায়
লভ ইন্দ্রপদ,
অমরায়! লভ মুক্তি
পরমাসম্পদ!
দেখ নাই তথাগতে
দুঃখ তায় কিবা?
নব বুদ্ধ অবতীর্ণ
সমুজ্জল বিভা!
অনির্বাণ দীপজ্যোতিঃ
সদা আছে জ্বলি,
নাশি ঘোর তমোরাশি
ত্রিলোক উজলি।"*

* অশ্বঘোষের "সূত্রালঙ্কার" হইতে গৃহীত

পবন-দূত

অনুবাদক শ্রীরামপ্রসাদ ঠাকুর চক্রবর্ত্তী

প্রস্তাবনা: সংস্কৃত সাহিত্যের আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্য দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, দৃশ্য এবং শ্রাব্য। তাহার মধ্যে দৃশ্য—অভিনেয় নাটকাদি এবং শ্রাব্য—কাব্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং কথাকাব্য প্রভৃতি। দূতকাব্যগুলি এই খণ্ডকাব্যেরই অন্তর্গত। সংস্কৃত সাহিত্যে যতগুলি দূতকাব্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতই প্রথম এবং প্রাচীনতম। সুতরাং এই মেঘদূতেরই অনুসরণ করিয়া বহু প্রাচীন কবি নানা ভাবে পবন-দূত হংস-দূত, উদ্ধব-দূত, পদাঙ্ক-দূত, এবং মনো-দূত প্রভৃতি দূতকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের সহিত আর কোনও দূতকাব্যেরই তুলনা হয় না। তবে অন্যান্য দূতকাব্য অপেক্ষা গুণ-গরিমায়, রচনা-ভঙ্গীতে, গাম্ভীর্য্যে এবং প্রাচীনত্বে পবন-দূত যে মেঘদূতেরই পরে স্থাপনীয় তাহাতেও কোনই সন্দেহ নাই। কারণ পবন-দূতের উপজীব্য বস্তুও অতি সরস এবং কারুণ্যের প্রতীক্।

মলয়-পর্ব্বতবাসিনী গন্ধর্ব্বকন্যা কুবলয়বতী ইহার নায়িকা এবং গৌড়াধিপতি মহারাজ চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণসেন ইহার নায়ক। দাক্ষিণাত্য বিজয়ের প্রসঙ্গে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ এবং বিরহে অবসন্না কুবলয়বতী, মলয়ানিলকে দূত নিযুক্ত করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কবি মলয়-পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমার মধ্য দিয়া দূত মলয়ানিলকে গৌড়বঙ্গে আনয়ন করিয়া, কুবলয়বতীর বিরহজনিত চরম অবস্থার কথা দূতমুখে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই ইহার মাধুর্য্য অপরিসীম এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায়, আচার্য্য হলায়ুধ, আচার্য্য পশুপতি, ভক্তচূড়ামণি জয়দেব, নীতিবিৎ পুরুষোত্তম এবং কবিরাজ-চক্রবর্ত্তী ধোয়ীক, পাণ্ডিত্যে, ব্রাহ্মণ্যে, ভক্তিমার্গে, নীতিশাস্ত্রে এবং কবিত্বে তাৎকালিক গৌড়বঙ্গ উজ্জ্বল করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন। মহাকবি ধোয়ীক তাঁহার পবন-দূতের উপসংহারে কবিপ্রশস্তির প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী" এই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন ভক্তচূড়ামণি জয়দেব গোস্বামীও তাঁহার গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে চতুর্থ শ্লোকের চতুর্থ চরণে লিখিয়াছেন—"ধোয়ী কবিঃক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।" সুতরাং নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে, কবিরাজ-চক্রবর্ত্তী ধোয়ীক পবন-দূত রচনা করিয়াই গৌড়বঙ্গে তাৎকালিক কবিগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই মহাকবি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া গৌড়ের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু তিনি কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। পবন-দূত রচনা করিয়া তিনি যে কেবল কবিরাজ-চক্রবর্ত্তী এই উপাধিটি লাভ করিয়াছিলেন তাহাই নহে; দন্তিব্যূহ, কনকহার, সুবর্ণচামর এবং স্বর্ণদণ্ড ও রাজ-পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"নিরাশ্রয়া ন শোভন্তি, কবিতা, বনিতা লতা।"

গ্রন্থারম্ভ

১

নিখিল ভুবনে সুন্দর ছিল, চন্দন নামে গিরি;
কনক-নগরী রমণীয় তায়,—দেব-গায়নের বাস।*
হেমময় লীলা-ভবন-শিখরে, অম্বর-তল ঘিরি,
সুর-নগরের শাখা-গণনায়, ধরেছিল—যে বিলাস।

২

কুবলয়বতী নামে তথা সেই, সুতা উপদেবতার;
ভুবন-বিজয়ে লক্ষ্মণসেন, নামে সে ক্ষৌণীপালে।
কুসুমের চেয়ে মৃদুজয়শীল, ধনুকাম-দেবতার,
হেরিয়া সদ্যঃ পড়িল বালিকা, মদনের শর-জালে।

৩

প্রথম বয়সে সখী-পুর-বাসে, কামেরে করিয়া হেলা;
পাণ্ডুরকায় কাতর তনুতে যাপিয়াছে নিশিদিন।
মধুমাসে হায়! দক্ষিণ বায়, বহিলে সন্ধ্যাবেলা;
গাঢ় উদ্বেগে প্রণমি তাহায়, যাতনায় থাকে লীন।

৪

তুমি হে পবন! জীবের জীবন, প্রকৃতিতে মহীয়ান্;
বেগময় তুমি মনের অভিন্ন, নিখিলের প্রাণবলে।
তাই তব পাশে প্রার্থনা আশে, আসিয়াছি কর দান;
তোমা সম জনে হয় না বিফল, কখনো ভিক্ষাকালে।

৫

বিরহ-বিধুর শ্রীরামের দশা, নিরখি সে হনুমান:
সাগরের পারে গিয়েছিল এবে, পশিতে লঙ্কাপুরে।
আমারি লাগিয়া যাবে তুমি তায়, জনকের গতিমান;
গৌড়ীয় ভূমি মলয়গিরির, পাদ হতে কিছু দূরে।

* দেব-গায়েন এবং উপদেবতা, গন্ধর্ব্বজাতীয় দেবতার নাম।

৬

নিশ্চিত তুমি মধুবাসে সেথা, হেরিবে সে নরপালে ;
গাঢ় উপবনে আবৃত গগন, জানিও গৌড়দেশ।
নৃপতির কাছে কহিও আমার, যে দশা হেরিলে ভালে ;
করুণায় তব পরের কারণ, ত্রিভুবনে বিনিবেশ।

৭

চন্দন-তরু হতে হরি লও, রমণীর পরিমল ;
দ্রুত চলে যাও ত্যজিয়া কানন, মলয়ের সানুভরা।
মৈথুন-কেলিরত মৎসর, এই যে ভুজগ-দল :
গণ্ডুষে পান না করে যাবৎ, ভোগছলে তোমা ত্বরা।

৮

মলয়-গিরির ত্যজি পরিসর, ক্রোশ দুই সবে দূর ;
ধরণীর শোভা কি যেন আর এক, যাইবে পাণ্ড্য-দেশ।
ক্রমুক-তরুর বদ্ধ যেথায়, ভজিও উরগ-পুর ;
তাম্রপর্ণী তটিনীর তীরে, প্রখ্যাত যে বিশেষ।

*　*

১০

লীলা-গিরি বলি, ভুজগ-নগরী—রমণীর মনোরম ;
শৃঙ্খলাদামে জল-বারণের, লম্বিত সেতু যেন।
জানকীর স্নেহে আশ্বাস তরে, জীবনের প্রিয়তম ;
ধরণীর বাহু মনে হয় ওই, একটি লঙ্কা যেন।

*　*

১২

লীলা-নিকেতনে অমরাবতীর, গর্ব্ব করিছে চুর :
দক্ষিণা-পথে ভূষণ যে সেই, কাঞ্চী-নগরে যেও।
নগরজনের প্রহরীর প্রায়, করিতে বিঘ্ন দূর ;
মদন যেথায় ধরি' ফুল-শর, জাগরে রাত্রি সেও।

১৩

কৌতুক-রসে, জল-কেলি-বশে, শিথিল উত্তরীয় :
রমণী-হৃদয় হেরিবে তথায়, পাংশুবর্ণে ঢাকা।
সুবলা সদ্য তালে সখীপ্রায়, বীচি-করে যেন স্বীয় ;
মনে হয় যেন, মেঘে লীলায়িত, অঞ্চলে বুক ঢাকা।

*　*

১৫

অবিনীত নারী সেবিত কুঞ্জ,—ত্যজিয়া কাঞ্চীপুরে ;
বিহগ-কুলের কলকল রবে, আকুল কাবেরী যেও।
প্রিয়তমা হতে সুখ-পরশন, চন্দ্রিকা থাকে দূরে ;
এমন স্বচ্ছ অতি লঘু জল, ভিখারীর চেয়ে সে-ও।

*　*

১৭

লীলা-নদী-সম কাবেরীর সেই, গতিবেগে কটি-নিতে ;
দক্ষিণা-পথে তরুণীরা বসি, লীলা-কেলি করে জলে।
লহরী তুলিয়া হারে তাহাদের, স্তন-পরিসরে দিতে ;
কুন্দ-ধবল বিন্দুতে তার, খুজিও মুক্তা-কলে।

১৮

অতিকায় কত পাষাণে রচিত, স্নিগ্ধ শ্যামল গিরি
বর্দ্ধিত যেন ধরা কেশ-জাল, হেরিও বাল্যবাসে।
নির্ঝর-জলে আজিও যেথায়, জর্জ্জর দেহ ধরি ;
গম্ভীর-শোকে ঘুচিছে রামের, বিগত অশ্রুবাসে।

১৯

সরল-পাদপে ঘেরা উপান্ত, রমণীর সরোবর ;
মাণ্ডকর্ণি-নির্ম্মিত সেই, ইন্দ্রের তাপহারী।
আজিও যেথায় দেব-তরুণীর, সঙ্গীত মনোহর,
উপগতরাগ মৃগ-দলে করে, উৎকণ্ঠিত ভারি।

*　*

২১

জনপদ-বধূ-স্নানে বিহ্বল, গোদাবরী নদীতীরে ;
ছাড়িয়া অন্ধ, প্রবেশিবে তুমি, কলিঙ্গের রাজপুর।
সম্ভোগ-শেষে মুকুল-নয়না, বারনারী তরে ধীরে ;
কেলি-বাতায়নে পশিও তথায় করিবারে গ্লানি দূর।

২২

বীচি-বিক্ষোভে রচিত অনেক, সোপানের শ্রেণীরেখা ;
ফল-ভারে নত পূগ-বনে ঘেরা, জলধির তীরে যাবে।
গীতিকা-মুখর সিদ্ধনারীর, মিলিবে সেখানে দেখা ;
তাল অনুকারী রচিও শব্দ, শ্রুতি-সুখে তারা গাবে।

*　*

২৪

বিন্ধ্যের সানু-প্রণয়ে অধীর, উন্নত তরু-শিরে ;
বিহগ-কাকলি-মুখরিত বন, বিচর রম্য রসে।
অভিসারে ভরা ভিল্ল-রমণী, নির্জ্জনে যথা ধীরে ;
দয়িত-কণ্ঠে করে বাহুদান, বৃংহণে ভীতিবশে।

২৫

স্বেচ্ছা-লীলায় রসিকা শবরী, কুঞ্জে করিছে স্নান ;
নবতৃণ-প্রায় শ্যাম-বেণু-বনে, যাইবে সে রেবাতটে।
লৌকিক-ভূবে প্রৌঢ়া নারীর, লীলায়িত অভিমান ;
মনে করে যুবা বুঝি এই ভান, কেলির বিঘ্ন বটে।

দিল্লীর লালকেল্লায় শ্রী আর. এন. আগরওয়ালার নিকট হইতে ইউনেস্কো কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ হাইঞ্জ ফন ট্রেশলারের মানপত্র গ্রহণ

সংবর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ

সখী-সংলাপ

[ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

"কানে কানে"

[ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

২৮

কেতকী-মাধবীর বক্তি-নীল যদি নয়নে হেরিতে চাও ;
পশিয়া হৃদয়ে যথাতিথ সেই, ব্যাকুলিত রাজধানী।
আবেশে ভরা, পুলকিত যেথা তাপ নীরবে যাও,
শিখাইছে তারা বালিকার যথা, প্রিয়-মগনখানি।

*　　　*

*　　　*

২৯

গমনে তোমার কৈলাস-পথে, হেরিবে সে হিমাচলে ;
চারু অভিরাম নগর সেথায়, মহেশের প্রিয় ধাম।
ভালে যথা কত প্রিয় নখ-লেখা, অঙ্কিত কুচ যুগলে ;
দরিদ্রের তুষা শশিকলা তুলে, যাবনারী বহে কাম।

৩০

নমিয়া চলিও ভাগীরথী-তীরে, রঘুকুল গুরুদেবে ;
রমণীর দেহে মিলিত অতুল, অর্দ্ধনারীশ্বর।
রমণের প্রেমে ক্লান্ত অভিমান, ভুলিল যাহারা সেবে,
হেরিবে তথায় ক্রীড়া-শোভন, প্রৌঢ়ের মধ্যাহ্ন।

৩১

মন্দাকিনীর অন্তর-ভরা, রম্য সে ভূমি-ধারে,
শ্রীবল্লালের কীর্ত্তি সুন্দর, দেখিবে বাঁধ সেতুর।
স্বর্গনদীর স্নানে সমাকুল, অগণিত জন-ভারে,
মনে হয় যেন অমর নগর, দুই ভাগে ভবপুর।

৩২

কেশের গুচ্ছে রচিত মকর, বীচি করে রতি শিরে ;
পরিসর-শোভা মরালের দলে, কর্ণ-ভূষণ করি।
উদ্ধত-বেশে ধরিবারে কেশ, প্রেম-লালসায় ধীরে ;
প্রিয়-জলধিতে ছুটিছে গঙ্গা, দেখিবে তাহারে বরি।

৩৩

জল-কেলি-তরে মুগ্ধ-রমণী, সঘনে পশিলে তায় ;
স্তন-মৃগ-মদ ক্ষালিত তাদের গঙ্গার বীচি ঘাতে।
জ্ঞান হারাইয়া পুনঃ ধরিয়া যমুনা, যে দেশে বহিয়া যায় ;
জগৎ-পাবন যাইবে সে দেশে, ভকাতর নতি-পাতে।

৩৪

ভ্রুকুটি-কুটিল গমনে বক্র, প্রবাহে চিত্রনীতি ;
মন্দাকিনীর অঙ্গের ভঙ্গ, নিরখি যমুনা-জল।
মুক্ত-খোলস কাল-ভুজঙ্গীর, শঙ্কায় জাগে ভীতি ;
যত কাতর করিছে সকল, কিবা তোমাজনে বল।

৮

৩৫

লীলাবতী নারী মিলিয়া তথায়, কেলি করে সদা জলে ;
লহরী তুলিয়া রচিবে তাদের, বুকের বসনে চ্যুতি।
মাঝে তাহাদের রতি-নয়নে, সদা ব্যাকুল দলে ;
লীলা-সুচিকণ হসিত আনিবে, প্রাবরণে অনুভূতি।

৩৬

বিজয়-নগর স্কন্ধাবারের, উন্নত রাজধানী ;
ভুবন-বিজয়ী সে মহারাজার, দেখিয়া চলিবে ধীরে।
তোমা সম সেই চতুর কপট, গঙ্গার বায়ু মানি ;
সম্ভোগ-শেষে পুর-রমণীর, শান্তি বিতরে তীরে।

৩৭

কেলি-কুতূহলে পক্ষসম, বল্লভ-কর-তটে,
পরশে তাহারা পুলক-মুকুলা, সুন্দর ক্রীড়াভার।
নির্জনে তার কোকলে করে, [illegible] পটে,
সৌধের চূড়া যথা লীন প্রায়, কাঠের পুতুলী সার।

৩৮

পুরনারী যত, প্রাঙ্গণে বেশে, ক্রমুক বৃক্ষকুলে,
স্নিগ্ধ [illegible] রমণ-মণিতে, বাঁধা তার আলবাল।
অযতনে সেথা উপজাত জলে, সিক্ত নিশীথে ফুলে ;
পুর রমণীর সিঞ্চন-লোভে, যাপে না তাহারা কাল।

৩৯

ভাগীরথী-বাগে প্রকৃতি বিমল, নৃপকরে প্রপালিত,
স্মরণ ধরার উপজাত ভয়ে, যেথা ভীত পুরজন ;
প্রণয়-কলহে বড় কোপে ভরা, ভ্রূকুটিতে পরিচিত ;
ভীষণবদনা ললনা হইতে, সদা তারা ভীত মন।

৪০

কাল হতে টানি নয়ন-কাজলে, আঁকিয়া মরমলেখা ;
তালীর পত্রে মৃণাল-সূত্রে, বাঁধিয়া সে লিপিখানি।
যেথা ললনার অধর-কান্তি, সিন্দূর রুচি-রেখা ;
তাপের শোষণ কাননে প্রেরণ, প্রিয়জনে প্রেম মানি।

*　　　*

৪২

কুঙ্কুম-রাগে রক্ত অধর, কুচ ভারে নত প্রায় ;
মদনের বাণে তপ্ত হৃদয়, বাসনে আন্দোলিত।
কেলি-রসিক সুন্দরী যত, নির্জন বাপিকায় ;
মালতীর দামে জ্যোৎস্না নিশীথে যুবজনে তোষে কত।

৪৩

বসন্ত তরে ভ্রমণে ব্যাকুল, নিবিড় অন্ধকারে ;
পুর-ললনার চরণ-গলিত, লাক্ষার রাগ-রেখা ।
রক্তাশোকের স্তবকে ললিত, তপনের দ্যুতি-ভারে ;
রজনী-বিগমে নাহি যায় যেথা, পুর-পথে কভু দেখা ।

৪৪

মরকত-আর মুকুতা রতন, মিলিয়া ইন্দ্রনীলে,
প্রবালে শঙ্খে রচিত বলয়, যথা যুব-ললনায় ।
কুম্ভমুনির গণ্ডূষে প্রায়, নিঃশেষ সে সলিলে ;
রমণীর রূপ করিয়াছে ম্লান, সুললিত শোভা যায় ।

৪৫

মুখরতা-হীন মরকত দলে, রচিত কণ্ঠহারে ;
মৃগ-মদে কালো পিচ্ছিল কুচে, যেখানে রমণীদল ।
মদন-অনলে দীপ্ত করিয়া, চিত্ত স্নেহের ভারে ;
ঘন তমসায় চলিছে ছুটিয়া, প্রিয়তম-গৃহতল ।

৪৬

আয়তলোচনা যতনে বহিয়া, অবিনয় লিপিখানি ;
বাহিরিল যেথা ক্ষালন করিতে, সহসা হৃদয়-ভার ।
চরণে প্রণত দয়িতে হেরিয়া, মিলনে বাসনা মানি ;
কাজলে শ্যামল অশ্রুবিন্দু, ত্যজিছে মানিনী তার ।

* *

৪৮

ত্রিদশ-যুবতী-বিজয়ে চতুর, মদনের সেনা যথা ;
আহ্লাদ-ভরে ব্যোম-কান্তারে, শিখিয়া সুপ্রয়াণ ।
মনসিজ-গুরু আগমনে তব, কত মৃগআঁখি তথা ;
উত্থান-দোলা বিলাস-চাতুরী, দেখায় মূর্তিমান ।

* *

৫০

কেলি-বিলসিত প্রাসাদ-শিখরে, নিশীথে যুবতী যত ;
প্রণয়-কলহে বহে অভিমান, বৃথা চারু প্রিয় ভাব ।
শিরের ভূষণ কুবলয়-মালা, রোষে প্রহরণে রত ;
চ্যুত মালিকায় ব্যথিত ইন্দু, করে সদা দানে লাস ।

* *

* *

৫৩

বাইরে চলিয়া তুমি তার পর, রমণীর রাজ-বাসে ;
দেখিবে সেথায় সপ্ত কক্ষে, শোভিত সে রাজপুর ।
পুঞ্জিত-ধরা-সম ভবনের, শিখরে অভ্রিলাসে ;
প্রান্ত জলদ বিতরে চপলা, পতাকায় ভরপুর ।

৫৪

দেখিবে পশিয়া স্নিগ্ধ শ্যামল, প্লাবিত ইন্দ্রনীলে ;
অবনী-নারীর রোমরাজি প্রায়, বিরচিত বাপীশোভে ।
তীরে লীলাগতি অতি যুবতীর, বিহরণে প্রীতি মিলে ;
মনে হয় যেন দীক্ষা তাদের, হংস প্রদানে লোভে ।

৫৫

মদনের প্রায় রূপের বিভায়, রাজাসনে উপনীত ;
সেবিবে সে দেবে ব্যথিত সময়, চামরের সহবাসে ।
দুর্বার গতি স্নিগ্ধ দীপ্ত, অসি যার চমকিত ;
রণে রিপু বধূ-লোচনে জনের, পরাভব আনে ত্রাসে ।

* *

৫৭

সেন-পরিবারে এই সে নৃপতি, হেন ত্রাসে কুতূহলে ;
মৃণাল-লতিকাসম ভুজে রাখি, ক্ষুণ্ণ কমলানন ।
বঙ্কিম গ্রীবা পুরনারী যত, নেত্র-কমল-দলে ;
অরি নগরীর অবরোধে যায়—দানিছে দৃষ্টি মন ।

৫৮

ক্রীড়ানিকেতনে অতি পুরাতন, দয়িতের প্রতিকৃতি ;
ধারণ করিয়া চিত্তের প্রায়, বিহগের কলনাদে ।
রুদ্ধবেদন অরাতি নগরী, অপনীত প্রায় প্রীতি ;
সৌধের গায় জাত তৃণছলে, অলক বহিয়া কাঁদে ।

৫৯

ক্রীড়া-রোষ-বশে শোভনা রমণী, হননীর প্রিয় জনে ,
ত্যজিয়া পলায় পুলকে মজিয়া, বহিয়া ব্যথিত মন ।
পাহাড়ের পথে ভ্রমিতেছ কেন ! ক্রূর কুশে ভরা বনে ;
অরি নগরীর সারিকায়া প্রায়, হেন করে বিলপন ।

৬০

হেন কালে যদি কখনো সে রাজা, বাসবের সীমামূলে ;
শক্তির চাপে অতিবাহ করে, স্মরিয়া অন্তরায় ।
প্রার্থনা মম তখনো পবন ! বলিবে না তারে ভুলে ;
কার্য্য-ব্যস্ত-হৃদয়ে বিলাস, বিরাম নাহি গো চায় ।

৬১

শুভ অবসর গনি তার পর, নির্জনে কামীনাথে ;
বিনয়ে চতুর, নম্র শোভন ! কথা তব আরম্ভিবে ।
অবকাশে চির প্রণয়ীজনের, কার্য্য অন্ত সাথে ;
সক্ষম যদি লভিতে সিদ্ধি, নাহি কথা পার্থিবে ।

৬২

চন্দন-গিরি-শিখরে যে বাস, কোন উপদেবতার ;
কুবলয়বতী নামে তথা এক, আছে নারী মনোরম ;
মলয় পবন বলিয়া আমায়, জানিও দূতটি তার ;
বিরহ-বিধুর কামী-যুগলের, মিলনে যে অনুপম ।

অতি বেগে দেব ! দক্ষিণা-পথে জিনিয়া নৃপতিকুল ;
ফিরিলে হরিয়া চিত্ত তাহার, মলয়ের সানুদেশে ।
দূরে গেলে প্রিয় বৃথা পরিবেদ, হেন ব্যথা দৃঢ়মূল :
বাষ্পীয়-পীড়া দরশন-পথ, রোধিল সহসা এসে ।

৬৪

কৌতুক-বশে আয়ত-নয়ন, উন্নত গ্রীবা তায় ;
হরষে, আশায় ভূমে নিবেশিয়া, চরণের পুরোভাগ ।
সৌধ-শিখরে বসিয়া শোভনা, কি যেন হেরিতে চায় .
সমীপে তোমার গমনে ব্যগ্র, রোধিয়া অশ্রুরাগ ।

কুবলয়বতী মৃগ-নয়নার, নয়নের পথে যবে ;
পড়ে ছিলে তুমি নয়নানন্দ ! ললনার প্রিয়তম ।
জানি আমি সেই হতে সে রমণী, সন্তাপ-পরিভবে ;
রমণীয় রূপ করে না কখনো প্রত্যয়ে মনোরম ।

মুষ্টি পরিধি করি হ'ত যিনি, পড়িয়াছে কটি তার ;
মনে হয় বালা কুসুম-আয়ুধে, কার্ম্মুক তরে গড়া ।
শোন নররাজ ! কঠিন-বিরহে, বহিয়া সে কৃশকায় ;
মৌর্ব্বীর প্রায় এখনি শোভনা, আহা ! কি কালিমা-ভরা ।

৬৭

বলহে তরলে ! হৃদয়ে তোমার, হেরিছ সতত যাঁরে ;
কেবা সে কান্ত ? যতনে সখীরা, শুধাইছে হেন যত ।
নিঃশ্বাসে ত্যজি চিত্রিত কামে, কোনরূপে হেরিবারে ;
রোধিয়া অশ্রুভিত্তি-ফলকে, দৃষ্টি হানিছে কত ।

৬৮

কর্ণে ভ্রষ্ট তালীর পত্রে হেরি প্রিয় ললনার ;
তোমাতে জড়িত প্রেমলিপি ভ্রম, ধরে সে বালিকা মূল ।
বারতা তোমার ক্রীড়াশুকগণে, জিজ্ঞাসে অনিবার ;
গাঢ় অভিভূত অর্থীর ভাব, কোথায় গনে বা কূল ।

৬৯

নয়নে হেরে না, কর্ণভূষণ, উৎপলে সদা রোষ ;
ক্লান্ত বলিয়া বাহু-লতিকায়, মালিকা নাহি সে পরে ।
তাপের দীপন বলিয়া কমলে, উদ্বেগে ভাবে দোষ ;
মীলিত নয়নে হৃদয়ে সখীর, পরশনে ত্রাস করে ।

৭০

সরস-কুসুম কল্পতরুর, প্রান্তে যামিনী যাপে ;
শুষ্ক পঙ্কে শফরী-লীলায়, করে ভয়ে বিনিগম ।
নয়ন-নলিনে নলিনীর প্রায়, বহে ধারা সদা তাপে ;
মনে হয় বালা কোন রূপে দিবা, করে পুনঃ অতিগম ।

৭১

হিমময় জলে শমনীয় নয়, অন্তরে হেন জ্বলে ;
চন্দন-রেণু-প্রবাহে সে তাপ, সাধনীয় কভু নয় ।
তোমা হতে বালা লভিয়া এ জ্বালা, নিন্দে মদনে ছলে ;
সুস্থ যদিও সমস্তা মুগ্ধ, বিরহে কে কবে সয় ।

৭২

লীলা-বনবাসে পোষে মনে দ্বেষ, চন্দনে বাধা আনে ;
সরস-নলিনী-বৃন্ত-সমীরে, করে সদা অনাদর ।
বিরহে তোমার কোন রূপে তাতে, রাখিয়াছে বালা প্রাণে
মূর্চ্ছা-বিগমে সখী অভিমত, বিধি-দশা হেন তার ।

চন্দ্রমা হেরি করে সদা দ্বেষ, কেশে নাহি ধরে করে ;
দূরে ফেলে হায়, মলয়জ-রসে, নিন্দনে পরিতোষ ।
বলিতে তোমায় দশাটি হে দেব ! কিছু বালা-প্রীতি-তরে ;
উদ্বেগ-ভরে বাসর কাটায়, স্মরিয়া কবিতা-কোষ ।

৭৪

প্রথমে তাহার রোধিয়া পক্ষ্ম, ছুটিল অশ্রুরাশি ;
নয়নের পথে উদিল ত্বরায়, চুমিতে গণ্ডদেশ ।
ওষ্ঠ অধর পানিয়া কণ্ঠে, ঝরিল সহসা আসি ;
বিরহে তোমার কুচকোলে তার ; শয়নে কি নহে শেষ ।

৭৫

বিরহে তোমার মদন-বহ্নি প্রশ্বাসে প্রদীপিত ;
করে নাই আজো মৃগ-নয়নার, ভস্ম সে দেহখানি ।
জানি আমি দেব ! শ্রোণি সম তার, নয়নে তা প্রভাবিত
অথবা সতত মনোগত তব শৈত্য-প্রভাবে মানি ।

৭৬

শান্তির কোলে যামিনী যখন, ঈষৎ মুদিয়া আঁখি ;—
গাঢ় অনুরাগে স্বপনে তোমায়, লভি বালা কোন রূপে।
স্বীয় তনুখানি করে আশ্লেষ, পরে জাগরণে থাকি ;
সখী-মুখপানে লজ্জা-চপল, মুখখানি সে আনে চুপে।

৭৭

চাঁদিয়া চক্ষে রমণীর উপবন-ভূমে, বালা যেবে ;
সখীসনে কভু করে না আলাপ, অধোমুখে সদা রয়।
মদনের বাণ বাঁধিছে জীবন, নিয়ত সে দীন বেশে ;
হৃদয়ে ধরিছে চিত্র-ফলক, তব প্রতি শোভাময়।

৭৮

দুর্দিনে ভরা চাঁদিমার মত, নয়নে অশ্রু বহে :
প্রশ্বাসে করে বকুলগন্ধ-আঘ্রাণে, কত আশ।
অলি-গুঞ্জনে শ্রবণে লোলুপ মূর্চ্ছা ও বাধা সহে ;
করুণা-কাতর কেন হে তাহার, নিরখি সে দশা-বাস।

৭৯

চিত্তের ভাব করুণার ভরা, বিরহে সদা বিরাগ ;
কুসুম-বিশিখে রোষপরবশ, নিয়ত সে নিজ দুঃখ।
এইরূপে স্বীয় বশে রতি যেন, আশ্রয়ে ধরি রাগ ;
তোমাতে নিভৃত স্থির নিবেশিতভাবে আনে, দীনা দুখে।

৮০

সখী-জনে ছিল প্রেম-রমণীয়, পুরাতন কথা যত ;
অতি দয়াহীন তোমা সনে দেব! মিলনের আশা নাই।
চিন্তা তাহার বিরহ-জনিত, ভুলাইয়া অবিরত ;
মূর্চ্ছা কেবল জীবনের তরে, সতত হেরিতে পাই।

• •

৮২

ক্লেশবশে হেন চলে যায় ত্বরা, তিমঋতু তব দূরে ;
সমাগত তার মলয়-লহরী, করে না সে উপভোগ।
কোকিলের কেলি-কল-চঞ্চল, মধু-ঋতু ফেরি পুরে ;
বলহে শোভন! কি আছে তাহার, জীবনে রক্ষাযোগ।

৮৩

তবু বারে বার প্রবেশিছে মন, নিদারুণ কামানলে ;
অশরীরী ঐ বিরহ-জ্বালায়, জ্বলিছে হৃদয় তার।
কমলের প্রায় নয়ন-যুগল, ভাসিছে অশ্রু-জলে ;
পাণ্ডুর-কায় কৃপণ কপোল, বহিছে ভস্ম-ভার।

৮৪

বরা বলয়ের বনিতার লোভী, শোন শোন নররাজ ;
তোমা হতে হোক্ চারুনয়নার, আশা-জাল প্রেম-জাল।
কষ্টের চেয়ে কষ্ট তার এই, নয়নে লাগিয়া লাজ ;
সঙ্কেতে বহি স্বপনের দূত, নিদ্রা যাপে না কাল।

• •

৮৬

সম্বরিয়া তোমার বদন-কমল, কাতরে ভাসিয়া বসে ;
জোছনা-পরশে চাঁদিমায় করে, ভর্ৎসনা অনিবার।
বিবুধ-বৈদ্যের করে কত দ্বেষ, সুন্দর! রূপবশে ;
হেন প্রায় হয় মনীষা কাতর, মরণ নিকটে তার।

৮৭

বিরাগিণী বশে অসিতনয়না, হেমতালী-দলে ত্যজি ;
স্বভাবে সুরূপ রমণীর সেই, কর্ণের ভূষা পরে।
শরীরে তাহার কি জানি সহসা, ভুজগ হবে যদি ;
কার্মুকে গুণ মদনের প্রায়, ভয়ে ভূষা পরিহরে।

• •

৮৯

যতনে অশ্রু করি প্রতিরোধ, হেরে লীলা উপবন ;
চন্দনে কায় করিয়া শীতল, জোছনা মাখিতে ধায়।
সমীরে সেবিতে ক্রীড়াবাপিকায়, ব্যাকুলিত সদা মন,
দয়িত-বিরহে সাহসে রমণী, কিনা আচরিতে চায়।

• •

৯১

ক্ষীণ তাপে প্রায় শরীর শীতল, নয়নে অশ্রু নাই ;
স্তিমিত তাহার অঙ্গের রাগ ক্রমে তার কৃশতায়।
বিরহজনিত রোগরাশি যত, শান্ত এখন তাই ;
বর্দ্ধিত শ্বাস মৃগনয়নার, সুখের অন্তরায়।

৯২

লীলা-নিকেতনে কোকিল-কাকলি, পঞ্চমে তারে পীড়ে ;
কেলি-বাতায়নে মলয়-পবনে, সহে দেহে কত ক্লেশ।
মিলিত চরণে কাতর-নয়না, চলিতে পারে না ধীরে,
পীড়িতের প্রীতি-তরে ত্রিভুবনে, নাহি যে সত্যলেশ!

• •

৯৪

মদন-অনলে দগ্ধ দেহের, স্তন-পরিসরে তার ;
সদ্য-লিপ্ত চন্দন-রস, দীপ্ত দহনে শোষে।
বচনে কি কাজ? দুর্লভ জনে, অনুগত চিত যার ;
কুবলয় প্রায় নয়নার সেই, জীবন তোমারে তোষে।

৯৫

হেন রূপে কথা, সমাপিলে প্রায়-সময় বসুধায় ;
গাঢ় আশ্লেষে প্রণয়ে তোমায়, জানাইবে আবাহন।
স্নিগ্ধ করুণ বচনে যখন, পাষাণো গলিয়া যায় ;
প্রকৃতি-সরস চিত্ত যাঁহার, বাচ্য নহে সে জন।

৯৬

বিনয়ে পবন ! অঞ্জলি কিছু, মস্তকে ধরি তবে ;
নির্জ্জনে তুমি বচনে আমার, বলিবে সে নংবরে।
তোমা হতে সেই অবহিত মনে, শুনিবে তা প্রিয় সবে।
দয়িতার প্রিয় বচনে দয়িতে, সুধার লহরী বহে।

৯৭

পার্শ্বে অগ্রে পিছনেও দেব ! দেখাইয়া রূপ যীয় ;
তুলনীয় তুমি নারায়ণ সনে, জগতের কৃতিমান্।
ভকতি পূরিত চিত্ত আমার, নাহি কেন দয়া প্রিয় !
নারায়ণ ছাড়া কে পারে রচিতে শরীরী মূর্তিমান।

• •

৯৯

গিরিজনয়ার পরিণয়কালে, ত্রিপুর-বিজয়ী যবে ;
নব কামরূপে সৃজিয়াছে তোমা, রমণীর মনোরম।
দূর হতে হোক্ প্রণয়ে মুখর প্রেমের গ্রন্থ তবে ;
কি যেন পুণ্য পরশে তোমায় সেবায় হে প্রিয়তম ?

১০০

হৃদয়ে রেখেছে চিরজীবী কোন, বার্ত্তাটি তেন সম ;
তে যাহতে রচিত মঙ্গ-লালসে, পুনঃ কিবা প্রয়োজন।
পরহিতে সদা প্রসন্ন-চিত্ত, মহাজন তোমা সম,
পারে না সহিতে অশ্রুপূর্ণ, কাতরের নিবেদন।

১০১

স্বর্ণ-দণ্ড হেমময়-চার, চামর দণ্ডী-দলে ;
ভারতীর মহামন্ত্র কাব্য রচিয়া যে প্রমোচন্।
গৌড়ের পতি করে লভিয়াছে, শ্রীধোয়ীক জ্ঞানবলে ;
মহা-কবিরাজ চক্রবর্ত্তী, বরণীয় মহাজন।

১০২

গঙ্গার শুচিতট-পরিসরে, স্বজনে মিলিত বাস ;
কুলীন-রীতি কবিগণ-মুখে, 'স্বচ্ছ ভোগ্য-ভূতি।
সজ্জনে স্নেহ, রাজ-সভায় কবিতার প্রবিকাশ ;
লভিয়া বিষ্ণুপদে হোক মন, পরকালে অনুভূতি।

১০৩

যে অবধি শিব বহিবেন দেহে, অর্দ্ধনারীশ্বর ;
যে অবধি কাম ধরিবেন করে, কুসুমের ধনু।
কদমের তরু যে অবধি, রাধা-রমণের কেলিধর ;
ততকাল কবি রাজেন্দ্রকাব্য, বিলাসে বহিবে তনু।

১০৪

লভিয়াছি তাই পরম কীর্ত্তি, কোবিদের পরিষদে,
নৃপতি-প্রিয় অমৃত-বর্ষী, রচিয়া বাক্যজাল।
মন্দাকিনীর তীরে কোথা কোন, শৈলের উপপদে,
ব্রহ্ম-সাধনে সমাধি রচিয়া, যাপিতে চাহি একাল।

সুভাষিত সাহিত্যে সূক্তিমুক্তাবলী

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

সূক্তি, সদুক্তি আর সুভাষিত তিনটিই সমার্থক শব্দ। এর অর্থ উৎকৃষ্ট বচন। জল্‌হণের 'সূক্তিমুক্তাবলী' সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট বচনের সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থের আরম্ভেই আছে—

"যদি কেউ অনায়াসে সাহিত্যবিদ্যার সার আস্বাদন করতে চাও, তবে জল্‌হণ-কৃত সূক্তিমুক্তাবলীর অনুশীলন কর। অঙ্গুরীয়ক, কেয়ুর, কণ্ঠহার বা কঙ্কণ—কোন অলঙ্কারই বিদ্বান্ ব্যক্তির তেমন শোভা বাড়াতে পারে না, যেমন পারে কণ্ঠগতা সূক্তিমুক্তাবলী।

> সাহিত্যবিদ্যাহৃদয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছসি চেৎ সুখম্।
> তৎ পশ্য জল্‌হণকৃতাং সূক্তিমুক্তাবলীমিমাম্॥
> নাঙ্গুলীয়ৈর্ন কেয়ূরৈর্ন গ্রৈবেয়ৈর্ন কঙ্কণৈঃ।
> তথা ভাতি যথা বিদ্বান্ কণ্ঠসঙ্গতয়ানয়া॥

সত্যই 'সূক্তিমুক্তাবলী' সুভাষিত কবিতার উপাদেয় সঙ্কলন।

দীর্ঘ রত্নহারের সর্বাঙ্গে ইতস্তত বিন্যস্ত হীরকখণ্ডের মত বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা গ্রন্থে শত শত সুভাষিত ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া, বিচ্ছিন্ন অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ সুভাষিতের সংখ্যা সংস্কৃত ভাষায় অগণ্য। অনেক শক্তিমান কবি কোন সুসংবদ্ধ গ্রন্থ রচনা না করেও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বনে নানা রসের, নানা ভাবের মনোহর শ্লোক লিখে গেছেন। এগুলি যুগ যুগ ধরে উপদেশপরম্পরায় কাব্যামোদী সহৃদয়গণের মুখে মুখে রক্ষিত হয়ে আসছিল।

সূক্তি-সৌন্দর্যমুগ্ধ কোন্ সাহিত্যরসিক মনীষী সর্বপ্রথম সুভাষিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হলেন, তা আজ আর জানবার উপায় নেই। যে কখানি সুভাষিত গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তার কোনখানিই খুব পুরাতন যুগের নয়। এর মধ্যে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' প্রাচীনতম সঙ্কলন বলে গণ্য হয়, কারণ খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পরে রচিত কোন কবিতা এতে সংগৃহীত হয় নি। এর পর কাশ্মীর দেশে বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী' রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু কালে কালে এ গ্রন্থে পরবর্তী কবিদের রচনাও সংযোজিত হয়েছে। একাদশ শতকের প্রথম দিকে লক্ষ্মণসেনের সময়ে বাঙালী শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে আর একখানি সুভাষিত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। জল্‌হণের 'সূক্তিমুক্তাবলী' আরও পরে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত হয়।

এ সকল গ্রন্থে আছে বড় বড় কবির রচিত কাব্যের ভাল ভাল শ্লোক, আর আছে অখ্যাত অজ্ঞাত কবিদের স্নিগ্ধমধুর সরস বচন। এ প্রকৃতির সুভাষিতের একনাম উদ্ভট কবিতা। উদ্ধৃত শব্দের রূপান্তর উদ্ভট, অর্থ উদ্ধৃত। বিশ্বপ্রকৃতির সমৃদ্ধি বর্ণনে মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য চিত্রণে জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ উপস্থাপনে এ সব কবিতায় হৃদয়গ্রাহিতা অতুলনীয়। কোন কোন কবিতা বক্রোক্তির চাতুর্যে আর ব্যঞ্জনার মাধুর্যে বিদ্বৎসমাজে এতই খ্যাতিলাভ করেছিল যে, সৎকাব্যের উদাহরণ-স্বরূপ একাধিক আলঙ্কারিক আপন আপন গ্রন্থে একই কবিতা সমান আদরে উদ্ধৃত করেছেন।

দূরদর্শী সঙ্কলয়িতারা এসব দুর্লভ কবিতা কালের কবল থেকে রক্ষা করে সংস্কৃত কাব্যের নিভৃত ভাণ্ডারের এক অসামান্য প্রাচুর্যের সন্ধান দিয়েছেন, আর সংস্কৃত সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের ক্রোড়বিলীন নানা তথ্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রাচীন কবিদের রচিত সমস্ত সুভাষিতই যে এঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, এমন সম্ভব নয়। হয়ত কত সুমধুর উদ্ভট কবিতা সঙ্কলন থেকে বাদ পড়েছে। যা সঙ্কলিত হয়েছে, তাতেও অনেক ক্ষেত্রে কবির নাম পাওয়া যায় নি, কোন ক্ষেত্রে বা একের স্থলে অপরের নাম আরোপিত হয়েছে। একই কবিতার রচয়িতা বিভিন্ন সঙ্কলন গ্রন্থে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সূক্তিমুক্তাবলীকার জল্‌হণও কোন কোন স্থলে দিগ্‌ভ্রান্তির হাত এড়াতে পারেন নি।

জল্‌হণের সম্পূর্ণ নাম ভগদত্ত জল্‌হণ। কাশ্মীরী কবি কল্‌হণ, বিল্‌হণ, শিল্‌হণের সঙ্গে খানিকটা নামসাম্য থাকলেও জল্‌হণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী, মহারাষ্ট্র প্রদেশের দেবগিরি রাজ্যে যাদববংশীয় রাজা কৃষ্ণদেবের পদস্থ কর্মচারী। জল্‌হণের পিতৃপিতামহ বংশপরম্পরায় রাজ্যের হস্তিবাহিনীপতির পদ অধিকার করে এসেছেন। পিতা লক্ষ্মদেব মন্ত্রণায় আর নীতিকৌশলে বৃহস্পতির তুল্য ছিলেন। জল্‌হণের উপরও হস্তিবাহিনীর ভার অর্পিত ছিল। তাঁর কর্মকালে রাজা কৃষ্ণদেব আর রাজভ্রাতা মহাদেবের আশ্রয়ে যাদবরাজসভা একটা মহনীয় সংস্কৃতির পরিবেশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত নিবন্ধকার হেমাদ্রি, মহাপণ্ডিত

বোপদেব প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের সমাবেশে দেবগিরি তখন পরম সমৃদ্ধ।

জলহণ যে সূক্তিমুক্তাবলীর গ্রন্থকার সে কথা গ্রন্থের আরম্ভে আর অবসানে স্পষ্ট ভাষায়ই ঘোষিত আছে। তিনি একশত তেত্রিশটি প্রকরণে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন—

হরীশয়োস্ত্রয়াস্ত্রিংশৎপদ্ধতীনামিদং শতম্।
সূক্তিমুক্তাবলী সেয়ং জল্‌হণেন ব্যরচ্যত॥

কিন্তু পদ্যসঙ্কলনের কাজে ভানু নামে একজন কাব্য-নিপুণ বৈদ্য জল্‌হণের সাহচর্য করেছিলেন বলে মনে হয়। সূক্তিমুক্তাবলীতে ভানুকবির প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর রচিত অনেক কবিতা এ গ্রন্থে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এমনকি, গ্রন্থের মধ্যেই এমন কথাও স্থান পেয়েছে যে, কৃষ্ণরাজের শাসনকালে ১১৭৯ শকাব্দের চৈত্র মাসে বৈদ্যজীবী ভানুকবিই জল্‌হণের জন্য সূক্তিমুক্তাবলী সঙ্কলন সম্পূর্ণ করেন।

শাকেঽঙ্কাদ্রীশ্বরপরিমিতে বৎসরে পিঙ্গলাখ্যে
চৈত্রে মাসে প্রতিপদি তিথৌ বাসরে সপ্তসপ্তেঃ।
পৃথ্বীং শাসত্যতুলমহসা যাদবে কৃষ্ণরাজে
জল্‌হস্যার্থে ব্যরচি ভিষজা ভানুনা সেয়মিষ্টা॥

খুব সম্ভব, কর্মান্তরতৎপর জল্‌হণ শ্রমসাধ্য শ্লোকসংগ্রহের কাজে বৈদ্য ভানুর উপরই বেশির ভাগ নির্ভর করেছিলেন। সূক্তিমুক্তাবলীর প্রকৃত গ্রন্থকার যিনিই হন, গ্রন্থখানি জলহণের নামেই পরিচিত।

সূক্তিমুক্তাবলীর সূক্তিগুলি স্তুতি-আশীর্বাদ, সুকবি-কুকবি, সুজন-দুর্জন, কাক-কোকিল, হস্তী-অশ্ব, বৃক্ষ-পর্বত, মরু-সমুদ্র, গ্রীষ্ম-শিশির, সন্ধ্যা-প্রভাত, কুলটা-কুলস্ত্রী, প্রণয়-বিরহ, ঋদ্ধি-দারিদ্র্য, ভোগ-বৈরাগ্য, দৈব-পুরুষকার—এ ধরনের একশ' তেত্রিশটি বিষয় অবলম্বনে এক এক পদ্ধতি বা বিভাগে বিভক্ত। জল্‌হণ প্রত্যেক বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ভিন্ন ভিন্ন রচনা বেছে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্কলনে নানা কবির গ্রন্থ থেকে, নানা জনের কণ্ঠ থেকে দু'হাজার সাতশ' নব্বইটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। কবিতার সঙ্গে প্রায় তিন শত কবির নাম উল্লিখিত আছে। তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, ভারবি-ভর্তৃহরি দণ্ডী-সুবন্ধু, মাঘ-মুরারিও আছেন, আবার একান্ত অপ্রসিদ্ধ বাকুট-বিশল্য, শ্রীধর-শ্রীপাল, নাচিরাজ-কৃষ্ণাগিল্লও আছেন। এ ছাড়া সূক্তিমুক্তাবলীতে রচয়িতার নামহীন রচনা আছে প্রচুর।

কোন কোন সুভাষিত গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা আরও বেশী দেখা যায়। কিন্তু সূক্তিমুক্তাবলীর সূক্তির মধ্যে যে সকল বিস্মৃতপ্রায় কবি আর কাব্যের পরিচয় রয়েছে, তাতে এ গ্রন্থের মূল্য অধিক। জল্‌হণই সর্বপ্রথম এসব সাহিত্যিক বিবরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এজন্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর দান অসাধারণ।

সূক্তিমুক্তাবলীর একটি প্রকরণের নাম কবিকাব্য-প্রশংসা-পদ্ধতি। এই প্রকরণে সঙ্কলিত শতাধিক পদ্যে বিশেষ বিশেষ কবির নাম উল্লেখের সঙ্গে অল্পবিস্তর বৃত্তান্ত আর তাঁদের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এসব বর্ণনা স্বল্প হলেও স্পষ্ট।

ভাস যে অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন, আর তার মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্ত' নামে একখানি নাটক আপন উৎকর্ষে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, এই বিস্মৃত সাহিত্যিক সংবাদ সূক্তিমুক্তাবলীতে সঙ্কলিত রাজশেখরের একটি পদ্য থেকে প্রথম উদ্ধার করা হয়।

ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥

এই একটি পদ্যই আজ পণ্ডিতসমাজে ভাসনাটক সৌধের মূল ভিত্তি বলে গণ্য হয়।

এককালে এদেশের বিদুষী মহিলারা সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন একথা অজ্ঞাত নয়। জল্‌হণ তাঁর গ্রন্থে কয়েক জন মহিলা-কবির কবিতা সংগ্রহ করেছেন। তা ছাড়া বিজ্জাকা, বিজয়াঙ্কা, সুভদ্রা, শীলা ভট্টারিকা, প্রভুদেবী, বিকটনিতম্বা সম্পর্কে রাজশেখরের রচনা থেকে তিনি বহুমূল্য বিবরণ তুলে দিয়েছেন।—

(১) শীলা ভট্টারিকা বাণভট্টের মত শব্দ আর অর্থের উপর সমান দৃষ্টি রেখে কাব্যরচনায় পাঞ্চালী রীতির অনুসরণ করতেন।

(২) বিজয়াঙ্কা ছিলেন কালিদাসের মতই বৈদর্ভী রীতির আবাসস্থল।

(৩) বিকটনিতম্বার বচন ছিল 'মৌগ্ধ্যমধুর'।

(৪) এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন কর্ণাটী কেউ-বা লাটী।

(৫) বিজ্জাকা নাকি দেখতে কালো ছিলেন। মহাকবি দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বিদ্যাদেবতা সরস্বতীকে সর্বশুক্লা বলে বর্ণনা করেছেন। সূক্তিমুক্তাবলীর কবি এই উক্তির উপর কটাক্ষ করে বলেছেন—মূর্ত সরস্বতী বিজ্জাকার কথা জানতেন না বলেই দণ্ডী তাঁর বর্ণনায় ভুল করেছেন। বিদুষী বিজ্জাকা ছিলেন নীলোৎপলদলের মত শ্যামা।

নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জাকাং তামজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্লা সরস্বতী॥

সূক্তিমুক্তাবলীর আরও অনেক কবিতায় নানারূপ

সাহিত্যিক ও সামাজিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে। দুটি পদ্যের অর্থ এই—

বিদ্যার পবিত্রস্পর্শে যাঁরা ধন্য হয়েছেন, তাঁদের জাতিকুল বিচার্য হয় না। কুম্ভকারজাতীয় দ্রোণ কবি কবিত্বগরিমায় ব্যাসদেবের সমান মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। চণ্ডাল দিবাকর বিদ্যাপ্রভাবে শ্রীহর্ষের রাজসভায় বাণ আর ময়ূর কবির সমান পদ লাভ করেছিলেন।

সরস্বতীপবিত্রাণাং জাতিস্তত্র ন দেহিনাম্।
ব্যাসস্পর্ধী কুলালোঽভূদ্ যদ্ দ্রোণো ভারতে কবিঃ॥
অহো প্রভাবো বাগ্‌দেব্যা যচ্চাণ্ডালো দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরয়োঃ॥

সূক্তিমুক্তাবলীর বহু সুভাষিতই পূর্বগামী সংগ্রহকারদের সঙ্কলনেও পাওয়া যায়। বিদ্বদ্বিলাসেও 'সুভাষিতাবলী'র সঙ্গে সূক্তিমুক্তাবলীর বেশ মিল আছে। তবুও মুক্তাবলীর স্বাতন্ত্র্য অল্প নয়। অন্যত্রদুর্লভ কবিতার সংখ্যা এতে প্রচুর। এসব কবিতা তথ্যবাহুল্যেও যেমন অসামান্য, রচনাকৌশলেও তেমন অপূর্ব।

মুক্তাবলীর এক অজ্ঞাতনামা কবি একজন দীনদরিদ্রের মুখে তাঁর দৈন্যের বর্ণনা দিয়েছেন। দরিদ্রব্যক্তি আক্ষেপ করে বলছে—আমি সব রকমেই রামের দশা লাভ করেছি, কেবল কুশলব-সুতাকে পাই নি, কুশলব-সুতার এক অর্থ কুশ ও লব যাঁর সুত সেই জানকী, আর এক অর্থ প্রচুর সম্পত্তি। কুশল অর্থ প্রচুর, বসু অর্থ ধন। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্রু প্রলপিতম্।
কৃতালঙ্কাভর্তুর্বদনপরিপাটীষু রচনা
ময়াপ্তং রামত্বং কুশলবসুতা ন ত্বধিগতা॥

রাম কনকমৃগের লোভে অন্ধবুদ্ধিতে জনস্থান অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, আর দরিদ্র ব্যক্তি কনকরূপ মরীচিকার আশায় ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। রাম প্রতিপদে বৈদেহি বৈদেহি বলে উদশ্রু হয়ে বিলাপ করেছিলেন, আর দরিদ্র প্রত্যেকের পায়ে লুণ্ঠিত হয়ে দেহি দেহি স্বরে সজলনয়নে কাতরতা জানায়। রাম লঙ্কাধিপের বদন-পঙ্‌ক্তিতে বাণসন্ধান করেছিলেন, আর দরিদ্র দুষ্ট প্রভুর আনন পারিপাট্য সম্পর্কে প্রশস্তি রচনা করে থাকে। কাজেই দরিদ্র সব রকমেই রামের মত। কেবল কুশলব-সুতাই তার নেই।

এরূপ দ্ব্যর্থক সুভাষিতের মাধুর্য অনুভবগ্রাহ্য। সুধীজন একমাত্র স্বানুভবেই এ মধু আস্বাদ করতে পারেন।

সূক্তিমুক্তাবলীর এক কবি যথার্থই বলেছেন—কবিতার আসল সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না, কেবল অন্তরেই তা পরিস্ফুট হয়।

যদেতদ্ বাগর্থব্যতিকরময়ং কিঞ্চিদমৃতং
প্রমোদপ্রস্তৌঘঃ সহৃদয়মনাংসি স্নপয়তি।
ইদং কাব্যং শ্রাব্যং স্ফুরতি চ যদত্রাণু পরমং
তদন্তর্বৈদ্যানাং স্ফুটমথ চ বাচামবিষয়ঃ॥

বাক্যার্থের মিশ্রণের ফলে যে অমৃত রসায়নের উৎপত্তি হয়, তার আনন্দধারা ভাবুকহৃদয় প্লাবিত করে। এই ত কবিতার ধর্ম। আমাদের কানে আসে তার একটা স্থূল রূপ। অতি-গহন নিগূঢ় ভাবটি অন্তর্দৃষ্টির কাছেই ধরা দেয়, বাক্য সেখানে পৌঁছতে পারে না।

সত্যই উৎকৃষ্ট সুভাষিতের মাধুর্য শ্রুতির গ্রাহ্য নয়, হৃদয়ের সংবেদ্য।

আজও সুভাষিত কবিতাবলীর উপযুক্ত বিশ্লেষণ হয় নি। অথচ এরই মধ্য দিয়ে শত শত কবি সেকালের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি রূপায়িত করে রেখেছেন। কোন একখানি বিখ্যাত কাব্যের মধ্যে থাকে একজন খ্যাতিমান কবির মনের কথা, আর সুভাষিত-সঙ্কলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নানা কবির মন। সুভাষিতের সমধিক অনুশীলন বাঞ্ছনীয়।*

---

* আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

দক্ষিণ দেশে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

(২)

কাঞ্চীপুরম্ থেকে পূর্ব্বমুখে চললাম পক্ষীতীর্থের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের দিকে। পথের বৃক্ষ-বৈচিত্র্যে মন কিন্তু মুগ্ধ হ'ল না, কেবল বোধ হতে লাগল আমাদের উত্তরের বৃক্ষ এরকমটি নয়। বেলা তখন দশটার বেশী। বাসগুলি দ্রুত ছুটছে। শোনা ছিল, প্রত্যহ বেলা এগারোটার পরে একই সময়ে দুটি পাখী একটি পাহাড়ের চূড়ায় এসে বসে। মাদ্রাজের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যে বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি চালকগণকে দ্রুত গাড়ি হাঁকাতে নির্দ্দেশ দিলেন, যাতে আমরা যথাসময়ে তীর্থে পৌঁছতে পারি। বললেন, "দেরি হলে পাখী উড়ে চলে যাবে। কথাগুলি তিনি বললেন অবিশ্যি ইংরেজীতেই। পাখী দুটিকে কেন্দ্র করে বহুকাল থেকে কয়েকটি কিম্বদন্তী গড়ে উঠেছে যা বহু লোকেই জানেন। তাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ বা কৌতূহলবশে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে সারা বৎসরই যাত্রী যাতায়াত করে থাকেন। যাতায়াতে তাঁদের কিছু কষ্ট ভোগ করতে হয়। কারণ, কাছে রেলপথ নেই, আছে যানবাহনের মধ্যে আমাদের সনাতন গোযান বা আধুনিক মোটর-বাস। মনে পড়ছে যেন খান দুই গোযান আর, ঘোড়ার গাড়িও দেখেছিলাম।

অনেক পাহাড় ও পথ ঘুরে, অনেক ধুলো উড়িয়ে আমাদের বাসকয়খানি একটি পাহাড়ের তলায় এক গ্রামে এসে থামল। আমাদের মধ্যে ভাগ্যবানেরা কয়েকখানি অমাগুলিক মোটরে আমাদের আগেই পৌঁছেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের বাসের দরজায় এসে বললেন, "যান, যান, দেখে আসুন। পাখী দুটি যুগ যুগ ধরে আসা-যাওয়া করছেন।"

একজন জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, আপনি যাবেন না?"

"আমি? আমি ওঁদের দেখেছি। যান যান"—বলতে বলতে তিনি তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন।

আমরাও সকলে বাস থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। প্রায় সকলেই লম্ফে লম্ফে উঠে চললেন এবং মিনিটকয়েকের মধ্যেই আমাকে ছাড়িয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখলাম, আমরা তিনটি মাত্র মানুষ মর্ত্ত থেকে ঊর্দ্ধলোকে উঠবার ব্যর্থ প্রয়াস করছি। আর, কয়েকটি স্থানীয় লোক খানদুই দোলা বা ডোলা নিয়ে আমাদের তাতে উঠবার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তারা এক একজনকে নিয়ে উঠবে-নামবে। সেজন্যে যৎসামান্য পারিশ্রমিক নেবে—মাত্র সাতটি করে টাকা! শেঠের কাছে মাগুলটি নিতান্ত অল্প হলেও বললাম, "দু'জনকে যদি নিয়ে যাও তো রাজী।" দর-কষাকষি করতে করতে পর্ব্বতারোহীর দল ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। পর্ব্বতটির সানু থেকে শিখর অবধি কয়েক শ' সিঁড়ি। অর্দ্ধপথে উঠেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সহযাত্রী বললেন, "আর ওঠার দরকার নেই মশাই। এখানেই দাঁড়ানো যাক্। জীবনে অনেক বড় বড় পাহাড়ে উঠেছি। শেষে এটাতে উঠতে গিয়ে কি মরব? আর ওখানে দেখবারই বা কি আছে?"

বললাম, "যুগচারী দুটি পক্ষী-বাবা।"

"বিশ্বাস করেন যে যুগ যুগ ধরে দুটো পাখী আসা-যাওয়া করছে?"

"যুক্তি দিয়ে বিচার না করলেই বিশ্বাস করা যায়। রক্তমাংসের দেহ কতদিনই বা পৃথিবীতে টিকতে পারে? যা হোক, একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে না? তাই তো।"

দু'জনে রেলিঙের ধারে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির দুপাশেই লোহার রেলিঙ, উপরে স্বল্প বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতশীর্ষ. পাশে ঘনবনময় পর্ব্বতগাত্র, সানুদেশও বনাচ্ছাদিত। বামে পথের ওপারে এক প্রাচীন পাষাণ-মন্দির। সু-উন্নত তার গোপুরম। আমরা তারও অনেক ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে। তারও ওধারে কয়েকটি পাহাড়। আমাদের আশে-পাশে কয়েকটি স্থানীয় লোক ও ভিখারী। হঠাৎ দেখলাম, নিচে বনের একাংশ থেকে চিলের আকার, বিচিত্র বর্ণের দুটি পাখী শ্বেত-পাখা মেলে চক্রাকারে পর্ব্বতশীর্ষের দিকে উঠতে লাগল। কোন্ একখানি গ্রন্থে ছবি দেখেছিলাম, এই ধরনেরই দুটি পাখী এই পাহাড়টিরই চূড়ায় পুরোহিতের সম্মুখে বসে আছে। সন্দেহ জাগল, সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, "এরা দুটিই কি সেই যুগচারী?"

তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে বটে। হাঁ—হাঁ—ঐ তো চূড়ার দিকে উড়ে গেল।"

অতঃপর তাঁদের দুটিকে আর দেখা গেল না। শুনেছিলাম, পাখী দুটি প্রত্যহ সুদূর বারাণসী বা লঙ্কাদ্বীপের কোন এক অংশ থেকে এখানে ভোগ খেতে উড়ে আসেন। আহারান্তে আবার পূর্ব্ব স্থানে ফিরে যান। আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম, সঙ্গীরা কখন নেমে আসবেন এবং পাখী দুটি সম্বন্ধে কত কি আলোচনা করবেন। আমরা অবাক্-বিস্ময়ে নির্ব্বোধের মত তাকিয়ে শুনব আর মনে মনে নিজেদের ধিক্কার দেব। কিন্তু পাখীর আহার সামান্যই। অল্পক্ষণ পরেই আবার সেই ধরনের দুটি পাখীকে পর্ব্বতশিখরের দিক থেকে তেমনি চক্রাকারে উড়তে উড়তে ঘুরে একটি বিশাল জলাশয়ের দিকে যেতে দেখলাম। সম্ভবতঃ তাঁরা বারাণসী বা লঙ্কাদ্বীপের পথ ধরে থাকবেন।

তার অল্পকাল পরেই সহযাত্রীর দল স্রোতের মত নেমে আসতে লাগলেন। নিকটবর্তী হতেই দলে মিশে গেলাম। তাঁদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, পাখী দুটি এবং যাঁরা অসুস্থ শরীরেও উপরে উঠেই শিলালুণ্ঠিত বা অচৈতন্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে। দলে আমার কয়েকজন বন্ধু বা সুহৃদের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা পাখীর কথা বাদ দিয়ে রোগীদের কথাই আলোচনা করছিলেন। আমিও উপরে উঠেছিলাম কিনা সেকথা জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। কিন্তু একজন তরুণ প্রতিনিধি পাশে এসে বললেন, "দাদা, উপরে ওঠেন নি? আপনাকে তো দেখতে পেলাম না।"

সলজ্জ কণ্ঠে বললাম, "অসুস্থ শরীরে উঠতে সাহস হ'ল না, ভাই! প্রাণপাখী মাত্র একটি! উড়ে গেলে খাঁচাটিতে দ্বিতীয় বলতে আর কেউ থাকবে না।"

সে সহাস্যে বললে, "না গিয়ে ভালই করেছেন। দেখবার কিছুই নেই। মন্দিরটাও বিশেষ কিছু নয়। স্রেফ ভাওতা।"

তারই মত কয়েকজনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠল, "আরে, ঐ ধরনেরই কয়েকটা পাখী মন্দিরের কোকরে ছিল দেখলে না? পুরোহিত ওদিকে যেতে দিচ্ছিল না। সব বুজরুকি!"

যে ধিকার মনে ঠেলে উঠছিল অতঃপর তা বুদ্বুদের মত লীন হয়ে গেল। সকলে বাসে উঠবার আগে শৈলমূলের জনপদটি যতটুকু পারলাম দেখে নিলাম। এই তীর্থের কারণেই এখানে ছোট জনপদ গড়ে উঠেছে, কিন্তু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমন কিছু হয় না। দোকানপাট এক রকম নেই-ই। বহুকাল থেকে এখানে যাত্রীর আনাগোনা। কিন্তু একটা বড় রেলষ্টেশনের মুসাফিরখানার মতই জায়গাটি শুধু ক্ষণে পূর্ণ, ক্ষণে শূন্য।

অঞ্চলটি শৈলময়। তবে শৈলগুলি সর্বত্র পরস্পর সংলগ্ন নয়। মধ্যে মধ্যে সুবিশাল হ্রদসদৃশ জলাশয়। তার তট থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত। জলাশয়কূলে জলচর পাখী।

বাস আবার আমাদের নিয়ে ছুটল সমুদ্রতটে মহাবলীপুরমের দিকে। মধ্যে আহারাদির জন্যে কিছুক্ষণ থামবে রেলষ্টেশন চিংলিপাটে এমনি ব্যবস্থা। বাসের জানলা দিয়ে তাকিয়ে বসে আছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি জলাশয়ের কূলে তীর্থে দেখা দুটি পাখীর মত একজোড়া পাখ।। কিন্তু সেদিকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের সাহস হ'ল না। কারণ তখন সকলেই প্রায় ধ্যানমগ্ন। পরে দূর দক্ষিণে ভারতমহাসাগর-তীরে ধনুষ্কোটির সুদীর্ঘ নির্জন বেলায় ও প্রখর-স্রোতা কাবেরী নদীর চরে দেখেছি ঐ ধরনের পাখী। সেদিকে আমার সঙ্গীদের দৃষ্টিও আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ থাকায় চেষ্টা বিফল হয়।

যা হোক, প্রায় বেলা একটায় পৌঁছলাম চিংলিপাট ষ্টেশনে। বড় জংশন। ষ্টেশনের রেস্তোরায় আমাদের আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল। পুরোদস্তুর নিরামিষ মাদ্রাজী খাদ্য—রসম, সাদম, সম্বরম, কাউম আরও 'কিম' মনে পড়ছে না। সেই সঙ্গে পাত্র-কোণে কিঞ্চিৎ উপপু, গেলাসে তাম্নি; পাত্র, কদলীপত্র। ক্ষুধা থাকলে নুন দিয়েও যে খাওয়া যায় তা বোঝা গেল সকলেরই আহারে। আহারান্তে বিটিল অর্থাৎ পান অনেকেই কিনলেন। কিন্তু পানে চুণ-খয়ের ব্যবহারের রেওয়াজ আছে বলে তো মনে হ'ল না। সেলোফেনের ছোট্ট মোড়কে কয়েক কুচি কুচো কাগজের মত সুপুরি ও কয়েক বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ এবং কয়েকটি পাকা পান—এই হ'ল বিটিল। যাঁরা পানাসক্ত ছিলেন তাঁরা তাতেই খুশী হয়ে চর্বণপর্ব শেষ করতে লাগলেন। আমার তখন মনে হতে লাগল, ষ্টেশনের বাইরে পথের ধারে বিশাল বৃক্ষগুলির ছায়ায় ঘাসের উপর খানিকটা গড়াতে পারলে হ'ত। কিন্তু ভাগ্যে সে সুখশয্যা আর লাভ হ'ল না, আবার বাসবন্দী হয়ে যাত্রা করতে হ'ল মহাবলীপুরমের দিকে।

চিংলিপাট থেকে কতক্ষণে মহাবলীপুরমে পৌঁছলাম মনে পড়ে না। তবে পথের দূরত্ব খুব বেশী নয়। আমাদের আগেই অনেক তীর্থযাত্রী নিয়ে কয়েকখানি সরকারী বাস সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

বাস থেকে নেমে সকলে উৎসাহে, উল্লাসে উন্নত শিলাভূমিতে উঠতে লাগলাম। ক্রমোন্নত পথটির ধারে একখানি বৃহদাকার শিলা এমন ভাবে ভূমিসংলগ্ন হয়ে আছে যে, তার পাশ দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হতে লাগল, সামান্য ধাক্কায় বা কোন কারণে তৎক্ষণাৎ গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে আসবে। সেটি ছাড়িয়েই দু'পাশে কঠিন শিলা ও গুহাগাত্রে অনুপম শিল্পকলা অক্ষয় সৌন্দর্যে সুদূর অতীত থেকে ছড়িয়ে রয়েছে। তার কোথাও শিল্পীর সামান্য পরিচয়ও নেই। আর তার বিশেষ প্রয়োজনই বা কি? শিল্পীর আসল পরিচয় তো তাঁর রচিত শিল্পে। তা দেখে যখন মুগ্ধ হই, তার রস উপলব্ধি করি তখনই তো তাঁর অজস্র প্রশংসা না করে, তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকা যায় না। এখানে যাঁরা শিল্প-সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন প্রায় তেরশ' বৎসর আগে। কিন্তু শিল্পগুলি একজনের রচনা নয়, কয়েকজনের। এক জায়গায় কবি ভারবির অমর কাব্য "কিরাতার্জ্জুনীয়ে"র শ্লোকের পর শ্লোক শিল্পীর হাতে অক্ষয় রূপে ফুটে উঠেছে। সেখানে সুকঠোর তপস্যানিরত অর্জ্জুন ও অপরাপর মূর্ত্তিগুলি মৌনতায় যেন মুখর। মহাবলীপুরম পল্লবরাজগণের সমসময় (৬০০ খ্রীঃ অঃ—৮৫০ খ্রীঃ অঃ) কীর্ত্তি। পল্লবরাজগণ ছিলেন শিবের ভক্ত। তাই এখানে শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি কিছু বেশী।

পথের শেষ দিকে ছিল মহিষমর্দ্দিনী গুহা। শিল্পী এই গুহা-গাত্রে অনবদ্য সুষমায় ফুটিয়ে তুলেছেন সিংহবাহিনী দুর্গার মহিষাসুর বধের কাহিনী। কিন্তু এই স্থানটির অন্যান্য অংশে আরও যে সকল কাহিনী রূপায়িত হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়ার মত স্থান আমাদের নেই। স্বল্প সময়ে গভীর আকুলতায় যতটুকু দেখা সম্ভব সেখানে দেখলাম মাত্র ততটুকু। দেখলাম, আদি বরাহ মন্দির। এটিও গুহাগাত্র খোদাই করে রচিত। তবে ঐ গুহাটির মত বিখ্যাত নয়। সঙ্গে স্থানীয় এক পাণ্ডা জুটে গেল। সে হিন্দী ও ইংরেজী

মিশিরে উত্তরের দক্ষিণী উচ্চারণে এক নূতন ভাষাজাল রচনা করে আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটির পিছনেই দ্রৌপদীর স্নানঘর। ছাদহীন ঘরটির অবস্থা, আকার ও সজ্জা দেখে ধারণা হ'ল, স্নানঘর না হোক সেখানে এক সময়ে যেন জলের বন্দোবস্ত ছিল। তবে দ্রৌপদী ছিলেন, ভারতের মহাকাব্যের যুগে—পল্লবরাজগণের বহু পূর্ব্বে। এই মহাবলীপুরমেই আছে পাঁচটি শিলাখণ্ড কেটে তৈরী পাঁচখানি রথ যেগুলিকে বলা হয়, পঞ্চ পাণ্ডবের রথ। রথগুলি আছে গ্রামের মধ্যে। স্নানঘরের বাইরে জনকয়েক প্রতিনিধিকে দাঁড় করিয়ে তাদের ও পিছনের শিলাশিল্পের একখানি ছবি তুলে নিলাম। সেখানে দাঁড়ালে নিবিড় নারিকেলকুঞ্জপারে সমুদ্র চোখে পড়ে—নীল উদ্বেল, শুভ্র ফেনময়। সেখান থেকে কিছুদূরে নবনির্ম্মিত উন্নত বাতিঘর। সমুদ্রপথে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে সেগুলি যাতে মহাবলীপুরমের শৈলসঙ্কুল তীরে রাত্রিকালে আহত না হয় সেজন্য সেখান থেকে আলো দেখান হয়ে থাকে। অনেকে গিয়ে উঠলেন তার উপর।

মহিষমর্দ্দিনী

মহাবলীপুরমের এই অঞ্চলটিকে ১৮ শতকে আবিষ্কার করেছিলেন মান্নুচি নামে জনৈক ইটালীয় পর্য্যটক। ইউরোপীয়গণ গ্রামখানিকে বলতেন, সপ্ত প্যাগোডা। কেন তাঁরা এই নাম দিয়েছিলেন তা অনুমানসাপেক্ষ। সমুদ্রবেলায় তিনটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সেগুলির দুটি ভগ্নপ্রায়। এখনও যেটি সমুদ্রের বালুকা-ভরা লোনা হাওয়ার এবং জলকণার অবিরাম আঘাত সহ্য করে টিকে আছে সেটিও বালুতলে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে বহু পরিশ্রমে বালুকবল মুক্ত করে একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাষাণ-বেষ্টনী দিয়ে রক্ষা করছেন। দশ বৎসর আগেও সমুদ্রতরঙ্গ এসে মন্দিরগাত্রে আঘাত করত। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, সমুদ্রতীরে আরও ছয়টি মন্দির ছিল। কিন্তু সমুদ্র সেগুলিকে গ্রাস করে সপ্ত মন্দিরটিকেও গ্রাসে উদ্যত। তবে এ কথার কোন তাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। অবিচ্ছিন্ন কূল থেকে সমুদ্রমধ্যে কিছুদূরে একটি জায়গায় অবিশ্রান্ত বিক্ষোভ দেখা যেতে লাগল। মনে হ'ল, সেখানে জলতলে কিছু আছে। স্থানটি এত মনোরম যে বসলে আর উঠে আসতে ইচ্ছা হয় না। এই মন্দির কয়টিই দক্ষিণে দ্রাবিড় স্থাপত্যের আদি।

গ্রামের প্রধান পথটির ধারেই গুহাগাত্রে অর্জ্জুনের তপস্যা-কাহিনীটি খোদিত। এটি এখানকার শিল্প-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন। এটিতে শিল্পীর ধ্যান-ধারণা ও নিপুণতা অনবদ্য মহিমায় ফুটে উঠে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের অন্তর স্পর্শ করছে। তখন গুহাটি দিনান্তের ঘনায়মান ছায়ায় ভরে উঠেছিল। তাই চেষ্টা করেও ক্যামেরায় ছবিখানি তুলে আনতে পারলাম না। এত কাছে পেয়েও ধরা গেল না! এখানকার শিল্পগুলির প্রত্যেকটি মাত্র একটি করে শিলাখণ্ডে রচিত।

পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্ম্মণ (খ্রীঃ অঃ ৬৩০-৬৩৮) ছিলেন অসাধারণ সাহসী ও বীর—তাঁকে লোকে তাই বলত, মহামল্ল বা মামল্ল। তাই থেকে এই ছোট গ্রামখানির নাম হয়, মামল্লপুরম। তা আবার কালে কালে হয়ে দাঁড়ায়, মহাবলীপুরম। কিন্তু কেই বা সেই নরসিংহ বর্ম্মণ আর কারাই বা পল্লবরাজ সাধারণ লোকের কে সে সবের খোঁজ রাখে? তাঁদের বদলে লোকে পুরাণোক্ত বলী রাজা ও বিষ্ণুর সেই কাহিনীটি দিব্যি চালিয়ে দিয়েছে। সাধারণের মধ্যে তাই-ই বেশ চলে যাচ্ছে।

মহাবলীপুরম দেখলাম বটে কিন্তু অন্তরে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরতে হ'ল। মাদ্রাজের সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মুখুজ্যেমশাই প্রতিনিধিগণের তৃষ্ণানিবারণোদ্দেশ্যে দশটি-বিশটি নয়, ছয় শ' ডাবের ব্যবস্থা করেছিলেন। যিনি যতটা পারলেন জল পান করতে লাগলেন। এদিকে নারিকেলবনপারে দূরদিগন্তে শৈলশিরে সূর্য্য পাটে বসল। স্বেচ্ছাসেবক সর্দ্দার বার বার বাঁশী বাজাতে লাগলেন, উষ্মাও প্রকাশ করলেন, কিন্তু প্রতিনিধিগণ তখন শিল্পরসে এমন জীর্ণপ্রায় যে আর যেন দানা বাঁধতে পারছেন না। অবশেষে দুজন-চারজন করে এসে বাসে উঠতে লাগলেন। বাসগুলি ভর্ত্তি হ'ল এবং মাদ্রাজ শহরের পথ ধরল। ভাগ্যবানেরা কোন্ পথে কোন্ বাঁকে যে অদৃশ্য হলেন বুঝতে পারলাম না।

তার পর সূর্যের উদয়াস্ত যে বৈচিত্র্যভরা চিত্রস্রোত চোখের সম্মুখ দিয়ে বয়ে গেল সেগুলি মানসপটে আবার দেখতে দেখতে সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে ফিরলাম আস্তানায়। সেদিনই আমাদের সেই রজনকে "শেষ রজনী"। পর দিনই বেলা দশটার পর সকলকে অন্যত্র নিজ নিজ আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, এমনই নির্দেশ পাওয়া গেল। কেউ কেউ সেই রাত্রেই দূর দক্ষিণে যাত্রা করলেন।

আমরাও সেজন্যে প্রস্তুত ছিলাম। তাই ভোর হতেই গাঁট-গাঁটরি বাঁধা-ছাঁদা করে, স্নানাদি সেরে ছয় জনে বেলা আটটায় দু'খানি ট্যাক্সিতে রওনা হলাম এগমোর মাদ্রাজ ষ্টেশনের দিকে ধনুষ্কোটির উদ্দেশে। বলা বাহুল্য, ষ্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল, দু'-খানি ট্যাক্সির মিটারে একই দূরত্বের দু'রকমের ভাড়া উঠেছে। আমাদের ভাগ্য মন্দ—তাই বেশীই দিতে হ'ল। সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন, শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী। বামুনে বরাত মন্দ—এমনি একটা কথা শোনা যায়, কিন্তু শিল্পী বন্ধুটির ভাগ্যে বরাবর বিপরীতটাই ঘটতে দেখছি—এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। নিজ ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিতে দিতে বেশ শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমরা তো আরও অনেকটা ঘুরে এলাম। তোমাদের এত বেশী উঠল কেন ?

বললাম, "বোধ হয় খুব জোরে এসেছে বলে।"

এগমোর থেকে প্রায় সারা দক্ষিণ ভারতের রেলপথ, মিটার গেজ। গাড়ির কামরাগুলি সকল বিষয়ে সঙ্কীর্ণ হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—যাত্রিগণেরও দৃষ্টি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবার দিকে।

স্থানীয় জনৈক বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলাম, ধনুষ্কোটি প্যাসেঞ্জারে বেশ ভিড় হয়, বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীতে—কিন্তু কি কারণে জানি না, আমরা এক রকম খালি কামরা পেয়ে গেলাম—বলতে গেলে, প্রায় গোটা কামরাটা আমরাই দখল করে বসলাম। যে দু'একজন স্থানীয় লোক আগেই উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে এক-জন আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। বললেন, "আমরা বেলা চারটের কাছাকাছি ভিল্লুপুরমে নেমে যাব। সেখান দিয়ে পুঁদিচেরী যেতে হয়।" তখন বেলা প্রায় দশটা। তাঁর পুরো নাম তিনি কিছুতেই বললেন না, কেবল বললেন, তাঁর উপাধি রেড্ডি। পরে সেখানে ও চলার পথে অন্যান্য ষ্টেশনে যাঁরা উঠলেন, তাঁরাও আমাদের জায়গা ছেড়ে দেবার জন্যে কোন অনুরোধ বা কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তাঁদের মধ্যে দু-একটি মহিলাও ছিলেন। আমরা বসতে অনুরোধ করলে যত জনের স্থান সঙ্কুলান হ'ল তত জনও বসলেন না। না বসতে দিলেও যে আমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ ছিল এমন বোঝা গেল না। আমরা বিদেশী,তার উপর বাঙালী, চলেছি দূর দক্ষিণে তাঁদের দেশ দেখতে। সেজন্যে যেন তাঁরা কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। অথচ দক্ষিণের রেলপথে রাত্রিগামী গাড়িতে মধ্যে মধ্যে ডাকাতি হয়। তাই রাত্রিগামী গাড়িতে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন থাকে। আমাদেরও ধনুষ্কোটি পৌঁছতে পরদিন সকাল বেলা সাতটার কাছাকাছি হবে। পাশের কামরাটিতে উঠেছিলেন আরও চারজন সম্মেলন-প্রতিনিধি—তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। তাঁদেরও গন্তব্য স্থল রামেশ্বরম ও ধনুষ্কোটি। কাজেই বেশ নির্ভয়ে, আনন্দে যাত্রা সুরু হ'ল, তবে পৈটিক ব্যাপারটিতে কিছু ঘাটতি রয়ে গেল। কিন্তু রসনাপরিতৃপ্তি ও ঘাটতি পূরণের আশা গৃহে ফিরে যাওয়া অবধি মুলতুবি রেখে গাঢ় নিদ্রাকেও দিলাম বিদায়।

আসন্ন ইলেকট্রিক ট্রেনের খবরে আজকাল পশ্চিমবঙ্গ মুখরিত ও উত্তেজিত। কিন্তু মাদ্রাজে ও গাড়ী পুরনো। প্রায় প্রতি দশ মিনিট অন্তর আমাদের পাশ দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন হুড় হুড় করে ছুটে যেতে লাগল। কিন্তু দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমাদের কেউ হারাতে পারলে না। ত্রিচিনপল্লীতে আবার দেখেছিলাম, রেলপথ দিয়ে যাত্রীবাহী মোটর বাসও ছুটছে।

মিঃ রেড্ডি আমাদের শিক্ষক হয়ে বসলেন : বললেন, "আপনারা চায়ের বদলে খাবেন কফি। সব ষ্টেশনেই ভাল কফি পাওয়া যায়।" এবং আমাদের অন্ন, জল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের তামিল নাম শিখিয়ে দিতে লাগলেন। সঙ্গে এক ছাত্র-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনিও অপর একজন সঙ্গী নামগুলি ডাইরিতে লিখে নিয়ে মুখস্থ করতে লাগলেন। মুখস্থ করলেও আমার কিছুই মনে থাকে না। তাই ও ঝঞ্ঝাটে গেলাম না। কেবল শুনে রাখলাম।

জানলার বাইরে ধরিত্রীর বুকে দক্ষিণের প্রখর রৌদ্রঢালা ক্ষেত প্রান্তর অরণ্য জলা শুষ্ক নদীপথ ছায়াচিত্রের মত চোখের সম্মুখ দিয়ে অবিরাম ছুটে চলেছে। মধ্যে মধ্যে সে স্রোত শহরে শৈলে ছিন্ন হয়। চলার পথে কত গ্রাম দেখি, কত ছোট বড় মন্দিরের গোপুরম চোখে পড়েই দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। দক্ষিণে তামিল দেশের প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেই সাধারণতঃ দুটি করে মন্দির। একটি শিবের, অপরটি বিষ্ণুর। তাই একটি তামিল প্রবাদ আছে, "যে গ্রামে মন্দির নেই সে গ্রামে বাস করা উচিত নয়।" আবার আরও দক্ষিণে দেখেছি, বহু বড় বড় গ্রামে গির্জ্জার ক্রুশাগ্র শান্ত আকাশের দিকে যেন অঙ্গুলি তুলে রয়েছে। উত্তরের মত দক্ষিণে মসজিদ ইদগা দরগা চলার পথে বিশেষ চোখে পড়ে নি। তার কারণ, সকলেরই জানা আছে।

আমাদের কামরায় নানা রকমের যাত্রী—ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, নিরক্ষর। চেহারায় তাঁদের অন্ততঃ আমার চোখে, আমাদের থেকে তেমন পৃথক মনে হ'ল না। শিল্পী বন্ধু দুজন খাতা-পেনসিল বার করে তাঁদের কয়েকজনের প্রতিকৃতি আঁকতে লাগলেন। তাই দেখে কামরাসুদ্ধ সকলে চমৎকৃত।

মিঃ রেড্ডি শিক্ষক থেকে হয়ে দাঁড়ালেন—আমাদের কামরা-স্বামী। শিল্পী চক্রবর্তী পথে চলবার কালে পৈটিক বিষয়ে অতি সাবধানী। তাই গাড়িতে উঠবার আগে আমাদের খুব সাবধান করে দিয়েছিলেন, "পথে কিছু কিনে খেও না। আমি তো গাড়িতে যতক্ষণ থাকি দাঁতে কিছুই কাটি না।" এবং তার প্রমাণ দিতে

লাগলেন বড় বড় ষ্টেশনে। পাতায় মোড়া সাড়ে বত্রিশ ভাজা বড়া, ইডলি, দোসে উপমায় তা সরবে ঘোষিত হতে লাগল। মিঃ রেড্ডিও ফেরিওয়ালাদের আমাদের কামরার জানালার ধারে ডেকে নিয়ে আসেন এবং আমাদের আহারে যেন তৃপ্ত হন।

শিল্পীবন্ধু এক সময়ে বললেন, "দেখছ এদের খাবারে তুলসীপাতা দেওয়া।" এবং তার পরই তাঁর খাদ্যভক্তি যেন আরও গভীর হয়ে উঠল।

তাঁর কথায় ধারণা হ'ল, মাদ্রাজীরা ভারি কৌশলী। এরা তুলসীপাতা খাইয়ে লোককে বশ করে। ধর্মভীরুদের এ এক অভিনব পন্থা বটে। তবু কয়েকটি পাতা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখলাম, সেগুলি তুলসীও নয় বাবুইও নয়, তেজপাতার মত মসৃণ এক রকমের সুগন্ধি পাতা যার গাছের চাষ কেবল দক্ষিণেই নানা জায়গায় করা হয়। এদিকে সর্বত্র খাদ্যে—বিশেষ করে ডালের সঙ্গে এই পাতার ব্যবহার আছে।

একটি বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই দেখা গেল, বিপরীত দিকে কয়েকখানি মালগাড়িতে আখ বোঝাই করা হচ্ছে। মিঃ রেড্ডি অমনি নেমে গিয়ে বেশ বড় দেখে একখানি আখ সংগ্রহ করে এনে আমাদের দিলেন। তিনি তো দিলেন কিন্তু ইক্ষুরস কি সহজে পাওয়া যায়? আমাদের পাশে বসেছিলেন এক কৃষাণী। তিনি আমাদের অধিকাংশের অবস্থা দেখে দয়াপরবশে একজনের হাত থেকে একটি খণ্ড টেনে নিয়ে তার একটি প্রান্ত বেঞ্চিতে কয়েকবার ঠুকতেই খোলা আলগা হয়ে গেল। সেটি তখন তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে খেতে ইঙ্গিত করলেন।

বন্ধুটি এই স্নেহস্পর্শে বিগলিত অন্তরে বললেন, "আমার মাতৃস্নেহের কথা মনে পড়ছে। এঁর আচরণ মায়ের মত।"

মিঃ রেড্ডিকে বললাম, "মিঃ রেড্ডি। আমার বন্ধুটি বলছেন, এই মহিলাটির আচরণ মাতৃবৎ। ওঁকে একথা বুঝিয়ে বলুন।"

মিঃ রেড্ডি আমার কথা কানেই তুললেন না। আমি আবার কথাগুলি বলতে তিনি কিছুটা বিরক্তিভরে বললেন, "ও অজ্ঞ মূর্খ স্ত্রীলোক। এ কথার কি বুঝবে?"

একই মানুষ, একই পরিবেশ, কিন্তু ব্যবহারে কি তারতম্য! নিজ দেশেও একশ্রেণী, আর একশ্রেণীর কাছে মর্য্যাদা পায় না। মিঃ রেড্ডির মন্তব্যে ব্যথিত হলাম। মনের সুর কেটে গেল। তবুও মিঃ রেড্ডির অতিথিবৎসলতা প্রবাস-পথে একটি সুখস্মৃতির মত অন্তরে জেগে আছে। তিনি বিল্লুপুরমে বেলা চারটের নেমে গেলেন এবং যাবার সময়ে আমাদের একছড়া কলা উপহার দিয়ে বললেন, "আমার ভালবাসার দান।" কৃষাণী মাতা তাঁর আগেই একটি ষ্টেশনে নেমে গিয়েছিলেন। দুটি কামরায় রইলাম কেবল আমরা দুটি দল।

কলকাতার জনৈক শিল্পী বন্ধু শ্রীরঙ্গম দেখবার অনুরোধ করেছিলেন। সন্ধ্যার কিছু আগে দেখলামও তার চারটি উচ্চ গোপুরম, তবে রেলগাড়ির কামরা থেকে। মন্দিরটির স্থাপত্য ও শিল্পকাজ দেখবার যোগ্য বলেই ধারণা হ'ল। কিন্তু আমরা তখন ক্লান্ত হয়েও সেদিক পানে বৃদ্ধের মতই অচল। তার পর প্রথম রাত্রে
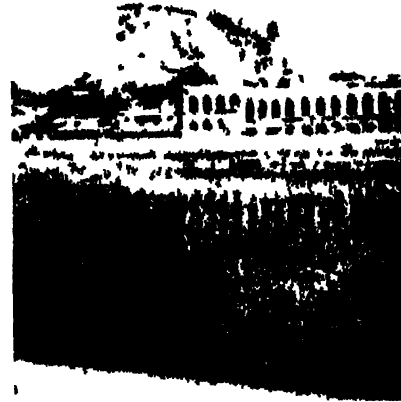
শৈলমন্দির—ত্রিচি

কাবেরীর সেতু পার হতে হতে চোখে পড়ল ত্রিচিনপল্লীর শৈল-মন্দিরের বিজলী আলোকে উজ্জ্বল স্বর্ণময় চূড়া আকাশের নক্ষত্রতলে স্থির হয়ে আছে। প্রথমে অবিশ্যি কেউই সেটিকে ত্রিচির মন্দির বলে বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি এসে বিশাল ত্রিচিনপল্লী ষ্টেশনে থামল। ষ্টেশনটি খুব বড় জংশন। এখানে নেমে অনেকেই কাবেরীপারে শ্রীরঙ্গমেও যান যদিও 'শ্রীরঙ্গম' নামে একটি পৃথক ষ্টেশন আছে। সকলেরই জঠর তখন ক্ষুধানলে জ্বলছে অথচ যোগ্য খাদ্য নেই। প্লাটফরমে নেমে যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এমন সময়ে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায়, রক্তচক্ষু পশ্চিমা পোশাক-পরা মাথায় চাদর চাপানো একটি স্থানীয় লোক। তার সঙ্গীও কিছু খর্ব্বকায়। সে এসেই আমায় ভাঙা হিন্দীতে রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবে?"

বললাম, "তোমার সে কথায় কি দরকার?"

সে বললে, "জিজ্ঞেস করায় কি দোষ?"

বললাম, "আমি তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি না কিছু।"

তার চোখ দুটি আরও আরক্ত হয়ে উঠল। বললে, "জিজ্ঞেস করেছি তো হয়েছে কি?"

বললাম, "আমি পছন্দ করি না।"

আমাদের মাস কয়েক আগে আমার অগ্রজা এদিকে তীর্থ-দর্শনে এসে শ্রীরঙ্গমে ডাকাতের হাতে পড়েন এবং ডাকাতদলের

মধ্যে যে নারীটি ছিল সে তাঁদের রক্ষা করে। এও ঐ শ্রীরঙ্গমের এ-পারের ষ্টেশন। তার উপর লোকটির চেহারা ও কথাবার্ত্তা ঈষৎ শিষ্টও নয়। সে তবুও উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, "জিজ্ঞেস করেছি তো কি হয়েছে?"

আমার সঙ্গীরা ব্যাপারটি দেখলেও তখন খাদ্য নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন, তাই কেউই প্লাটফর্মে নেমে এলেন না। আমি লোকটার কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে নিজ মনে আহারকার্য্য শেষ করতে লাগলাম। সেও সমানে চীৎকার করতে লাগল। ঠিক ছিল, ফিরবার পথে ত্রিচির ও শ্রীরঙ্গমের মন্দির মূর্ত্তি দেখব। তাই সেখানে না নেমে সোজা চললাম, ধনুষ্কোটির উদ্দেশে।

একটি ছোট দ্বীপের দক্ষিণে ধনুষ্কোটি, উত্তরে রামেশ্বরম এ কথা সেখানে যাবার আগে জানতাম না। ভারতভূমি ও দ্বীপটির মধ্যে পশ্চিমে প্রকাণ্ড সমুদ্রখাড়ি। প্রশস্ত খাড়িটির উপর সেতু। সেতুপথে রেলগাড়ি চলাচল করে। অঞ্চলটির নৈসর্গিক দৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অবিস্মরণীয়।

উচিপ্পুলি ষ্টেশন থেকে রাত্রির যবনিকাখানি ধীরে উঠে যেতে লাগল আর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে চোখের সম্মুখে প্রকাশিত হতে লাগল সম্পূর্ণ নূতন এক দেশ। নিবিড় সন্নিবিষ্ট নারিকেল ও বেণুবনের মধ্য দিয়ে গাড়ি কিছু মন্থর গতিতে চলতে লাগল। কারণ বালির উপর রেলপাতা। মাঝে মাঝে পরিচিত বাদাম, ঝাউ, বাবলা ও অপরিচিত কত রকমের গাছ। তার ফাঁকে ফাঁকে কাঁচা ও দু'চারখানি একতলা পাকা বাড়ী। মানুষজন বড় একটা দেখা যায় না। আকাশে উড়ছে সামুদ্রকূলচর পাখী। মানডাপাম ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামল। তখন বেশ আলো ফুটেছে। ষ্টেশনটি সমুদ্রের ধারেই। ঘাটে দুখানি জাহাজ—অনেক যাত্রী এখানে নামলেন।

সম্ভবতঃ তাঁরা সিংহলযাত্রী। এখানে সিংহলযাত্রীদের যাত্রার আগে সরকারী আপিসে কিছু কর্ত্তব্য পালন করতে হয় বলে শুনেছিলাম। সিংহলগামী জাহাজের ঘাট হচ্ছে ধনুষ্কোটি পায়ার ও তালাইমানার পায়ার।

গাড়ী আবার চলতে লাগল। পথের দৃশ্য সেই একই কিন্তু হঠাৎ দেখি, দু'পাশে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে বৃহদাকার প্রজাপতির ঝাঁক। প্রজাপতিগুলির ডানার রঙ কালো, ডানায় গায়ে কয়েকটি শাদা চক্র। তারা কোথা থেকে আসছে কোথায় চলেছে কে জানে। কিন্তু সামনে পিছনে কোথাও তাদের শেষ নেই! যেন পতঙ্গজীবনের একটি অন্তহীন ধারা সমুদ্রের দিকে অবিরাম বয়ে চলেছে। তাদের মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে গাড়ি গিয়ে উঠল সমুদ্র-খাড়ির সেতুতে। তারাও পাশে পাশে চলল, গাড়িও ঝমঝম শব্দে সেতুপথে এগোতে লাগল। আমাদের নিচে শিলাসঙ্কুল চঞ্চল সমুদ্র, বামে বঙ্গোপসাগরের নীলাভ কালো সংক্ষুব্ধ জলরাশি, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পাংশু, শান্তপ্রায়। দু'পাশেই সাদা পাল উড়িয়ে ধীবরদের নৌকা চলেছে; আর দক্ষিণে দূরে, বহুদূরে দিকচক্র-রেখায় আকাশপটে আঁকা চিত্রের মত একখানি দেশীয় পাল-তোলা জাহাজ স্থির হয়ে আছে। সেতুপারে পৌঁছে গাড়ি দু'পাশে নিবিড় কেয়াবনের মাঝ দিয়ে ছুটতে লাগল। সমুদ্রের ভিজে বাতাসে কেয়াফুলের মৃদু গন্ধ। দু'পাশে বালুময় ভূমি, সুবিশাল জলা। জলায় হাজার হাজার বড় বড় সামুদ্রিক পাখীর মেলা। দূর থেকে মনে হতে লাগল জনসভা বসেছে। জলাশেষে লতা-ছাওয়া ছোট-বড় বালিয়াড়ি, যেন সমুদ্রতীরে অসংখ্য কুটীর। লতাগুলি বেগুনি রঙের বড় বড় ফুলে ফুলময়। সেগুলির উপর দিয়ে সেই প্রজাপতির বিরামহীন স্রোত শত তরঙ্গ তুলে উড়ে চলেছে।

অবশেষে তখনকার মত আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল—ধনুষ্কোটিতে পৌঁছলাম। কিন্তু প্রজাপতিগুলি উড়ে যেতে লাগল আরও দূরে সমুদ্র-মধ্যে যে দ্বীপরেখা দেখা যাচ্ছিল তার উদ্দেশে। এদিককার রেল-পথেরও এখানেই শেষ। ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে সমুদ্র। এখানে স্থায়ী অধিবাসী বিশেষ নেই। রেলের ও সরকারের প্রয়োজনে কতকগুলি গৃহ তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় লোকের কয়েকটি অপরিচ্ছন্ন মক্ষিকা-অধ্যুষিত হোটেল আছে বটে। সেখানে পুরোদস্তুর মাদ্রাজী খানা ও তার উপর অসংখ্য মাছি পাওয়া যায়। উত্তরদেশবাসীরা প্রাণরক্ষার্থে সেই খাদ্যই গলাধঃকরণ করেন। আমরাও তা বাদ দিই নি। ষ্টেশনে মালপত্র জমা দিয়ে রৌদ্রতপ্ত বালুপ্রান্তর ভেঙে চললাম সমুদ্রস্নানে। প্রান্তরশেষে সমুদ্রকূলে কয়েকখানি চালা। কিছু দূরে একখানি ঘরে এক বাঙালী সাধু একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপন করে সেখানেই বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। সন্ধ্যার পর নির্জ্জন সমুদ্রতীরে, বালুপ্রান্তরে তিনি ছাড়া আর কোন মানুষ থাকে না। যা হোক, সমুদ্রকূলে আমাদের মত আরও অনেক যাত্রীর সমাগম হয়েছিল। ক্লান্ত দেহে, গ্রীষ্মতাপে দু'প্রহরের সেই ছায়াটুকুতে বসে সমুদ্রের শীতল হাওয়ার স্পর্শে মনে হতে লাগল, পৃথিবীতে জুড়াবার ঠাঁই বোধ হয় একমাত্র এইখানেই। দূরে সমুদ্রগর্ভে নারিকেলবনরাজিনীল কয়েকটি দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। সিংহল থেকে যাত্রী নিয়ে শুভ্র রাজহংসের মত নীল জলে ভেসে এল একখানি জাহাজ। সেদিকে তাকিয়ে ছায়াময় বালুশয্যা ছেড়ে উঠতে মন চাইছিল না।

এখানে সমুদ্রের একটি জায়গাকে মনে করা হয়, দুই সমুদ্রের মিলনস্থান। সেই সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যকামীরা তর্পণ করেন। সঙ্গীদের মধ্যে চার জনে স্নান সেরে পারলৌকিক ক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর 'ইডলি' কিনে বালক ও নারী ভিখারীদের মধ্যে বিতরণ করে শিল্পীদ্বয় গেলেন সেই কালীবাড়ীর ছেঁচতলার ছায়ায় বসে রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে। আর দু'জন গেলেন ঝাপড়সারির একেবারে শেষে। আর আমি স্নান সেরে সেই ছায়াতেই এসে বসলাম। কিন্তু ভিখারী ও সাধু নেই কোন্ তীর্থে? তারা এসে আমায় ঘিরে ধরল। তাদের সকলকে এড়াতে পারলাম, পারলাম না কেবল একজন তিলকধারী সাধুবেশীকে। সে ভাঙা-হিন্দীতে বললে, "শেঠ,

এত পয়সা খরচ করে, এত দূর থেকে এসেছ, সাধু খিলাবে না? খিলাও।"

বললাম, "বাবা, বেশ কিছু খরচ করে, অনেক ধকল সয়ে, অনেক দূর থেকে এখানে এসেছি। তুমি আমায় কিছু খিলাও।"

সে বললে, "দেখছি, তুমি যোগী সাধু পুণ্যাত্মা। আমায় খিলিয়ে আরও পুণ্য কর।"

বললাম, "বাবাজী, আমাতে এতই যখন দেখলে, তখন খিলানোটা আর বাকি রাখছ কেন?"

সে বললে, "এ হে হে। তুমি করছ কি, শেঠ?"

বললাম, "এ হে হে। তুমিই বা কি করছ, বাবাজী?"

যে সঙ্গীটি এতক্ষণ আমার পাশে বসে সব শুনছিলেন ও দেখছিলেন, তিনি আমার প্রতি নিদারুণ বিরক্তিতে উঠে গেলেন। একটু আগে তাঁরা এবং আরও কয়েকজন একে খিলিয়েছিলেন। পরিশেষে তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে একাকী চললাম সেই বালুপ্রান্তর ভেঙে ষ্টেশনের দিকে। শিল্পীদ্বয় তখনও রবিকরোজ্জ্বল, উচ্ছল নীলসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাগজে রঙ চড়াচ্ছেন। আর অন্যেরা তাঁদের পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে অন্তরের ভাবসমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছেন।

অতঃপর একসময়ে সকলে জমায়েৎ হয়ে রেলে উঠতে যাব এমন সময়ে দেখা গেল আমাদের ছাত্র-সঙ্গীটি নেই। সে যে কোথায় কেউ জানে না। ছেলেটি ভাবুক ও সাহিত্যিক। বুঝলাম, সর্ব্বনাশ হয়েছে। কোথায় তার ছোট্ট ডাইরিখানি খুলে মনের কথাগুলি টুকে রাখতে বসেছে কে বলবে? এদিকে গাড়ি যে ছাড়ে! এ যে প্রাণহীন নিষ্পন্দ যন্ত্র যান। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক— এসব কিছুই বোঝে না, কোন কালে বুঝবেও না। এদিক ওদিক সম্ভব অসম্ভব জায়গায় খোঁজা হ'ল—সে নেই। কুলি বেচারীও আমাদের সেই অবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একবার বললে, "পাম্বান! পাম্বান!" এবং ইঙ্গিতে বোঝালে সেদিকেও যেতে পারে। কারণ সিংহলগামী জাহাজখানি তখনও পাম্বানেই বাঁধা ছিল। পাম্বান ধনুষ্কোটি ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে।

সঙ্গীদের বললাম, "তোমরা যাও। আমি থাকি। ওকে নিয়ে পরের গাড়িতে যাব।" কিন্তু তাঁরা কেউই আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না অথচ কিসে যে মুশকিলের আসান হবে তাও কেউই বুঝতে পারলাম না। তার পরের গাড়িখানিতে গেলে রামেশ্বরমে পৌঁছতে সন্ধ্যা। ততক্ষণ সেই বালুবাজো ষ্টেশনের লোহা-লক্কড়ের মধ্যে উৎকট গন্ধ শুকতে শুকতে বৃথা বসে থাকাও যায় না। অগত্যা তার মাল পত্র তুলতেই গাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলল "পাম্বানে"। সকলে রেলপথের দু'পাশে নজর রাখতে রাখতে চললাম। কিন্তু সেই তপ্ত বালুবাজো, নীলসমুদ্রকূলে কাউকেই চোখে পড়ল না। তখন সকলেরই অন্তর অশুভ আশঙ্কায় ভরে উঠল। "পাম্বানে" পৌঁছেও তাকে দেখতে পেলাম না। যে মানুষটি কিছুক্ষণ আগেও ছিল, সে এমন রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাম্বানে কত যাত্রী উঠল। কিন্তু তাদের মধ্যেও সে নেই! হায়, মানুষের কৌতূহল ও ভাবুকতা। "পাম্বান" থেকে আমার আর অগ্রসর হতে ইচ্ছা হ'ল না। সেখানে নেমে তাকে চারধারে খুঁজবার সংকল্প করলাম। এমন সময়ে গাড়ি ছাড়বার সিটি দিল আর সঙ্গীদের মধ্যে একজন জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে আকুলভাবে বলে উঠলেন, "ঐ যে দীপেন! ঐ—ঐ—।" ছেলেটির নাম দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে ফুটবোর্ডে বেরিয়ে দেখি ছোট্ট মানুষটি বালুর উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। সকলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম, এবং সে এসে গাড়িতে উঠেই বেঞ্চিতে একেবারে এলিয়ে পড়ল। তার অবস্থা তখন বেশ উদ্বেগজনক। সে অবস্থায় তার দরকার হাওয়া বাতাস ও জল। কিন্তু বাতাস তখন মন্দীভূত আর জল—তাও দূরে। একজন গাড়িতে ডাব বিক্রি করছিল। ডাব কিনে তার জলে তাকে পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাতেও জল ছিল সামান্যই। এদিকে গাড়ি চলতে সুরু করল। কিছু পরে সে কিঞ্চিৎ সুস্থ হলে তার অন্তর্দ্ধানের কাহিনীটি ব্যক্ত করল। বললে, গাড়ি ছাড়বার দেরি দেখে এসেছিল পাম্বানে। পাম্বান থেকে ধনুষ্কোটি ষ্টেশনে ফিরে গিয়ে কুলিটির মুখে আমাদের বার্ত্তা শুনেই গাড়ী ধরবার জন্যে প্রায় দু' মাইল আবার গাড়ির পিছন পিছন ছুটে এসেছে। তরুণের প্রতি বয়স্কগণ চিরদিনই উপদেশ বর্ষণ করে থাকেন। আমরাও পাঁচ জনে সে সুযোগ ছাড়লাম না, যদিও সে উপদেশের কণিকামাত্র অমৃত প্রয়োজন ছিল। কারণ গাড়ি ছাড়বার অনির্দিষ্ট সময়-সংবাদ আমিই তাকে দিয়েছিলাম।

মনে পড়ল প্রৌঢ় কুলিটির কথা। সে শত শত বিদেশীকে দেখছে। তাদের চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারই সাহায্যে বলেছিল—'পাম্বান। পাম্বান।' সে জানতই না যে ছেলেটি এদিকে এসেছে।

ধনুষ্কোটি থেকে রামেশ্বরমের দূরত্ব খুব বেশী না হলেও পাম্বানে গাড়ি বদল করতে হয়। সঙ্গে বেশী মালপত্র থাকলে কিছুটা অসুবিধার। কিন্তু দক্ষিণ দেশের যাত্রীর শয্যা ও পোশাকের বোঝা সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজনই বা কি? যেটুকু আবশ্যক তা নিজেই বাঁধে বা হাতে ঝুলিয়ে বওয়া চলে। একথা বলছি, আমাদেরই মত সামান্য লোকদের সম্বন্ধে।

যখন রামেশ্বরমে পৌঁছলাম তখন নিবিড় তাল-নারিকেল বন-শিরে সূর্য্য নেমেছে। ষ্টেশনের কাছেই একটি ধর্ম্মশালার সিঁড়ি-পথে উঠতে উঠতে উঠোনের ধার থেকে কানে এল কয়েকটি বাংলা শব্দ। তাতে মন দুলে উঠল। দু'টি বাঙালী সন্তান এক সঙ্গে পথ চলছি, বাংলা বলছি। তবুও বাংলার জন্যে অন্তরে ব্যাকুলতা! দ্বিতলের একখানি ঘরে আশ্রয় নিতে নিতে খবর পেলাম, নিচে এক ঘরে আছেন কয়েকজন বাঙালী। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে দেখি তাঁরা আমাদের সেই চারজন সহযাত্রী। তাঁরা ধনুষ্কোটিতে না গিয়ে প্রথমে সেখানেই এসেছেন এবং সেখান থেকেই কলকাতায়

ফিরবেন। কারণ, তাঁদের মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের জনৈক পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। আপিস তাঁকে টানছে, তিনি আর থাকতে পারেন না। সঙ্গের মহিলাটি তাঁরই পত্নী। আসবার পথে মহিলাটিকে আমরা বলতে শুনেছিলাম, "সামনের বার আর কাজের লোকের সঙ্গে আসব না, একজন বেকারের সঙ্গে আসব।" শেষে দুর্দ্ধর্ষ কলকাতা কর্পোরেশনের আপিসেরই জয় হ'ল।

রামেশ্বরম্—গোপুরম্

কিছুক্ষণ পরেই চললাম, মন্দিরে। খানিকটা গিয়ে রাজপথ ছেড়ে চললাম এক বিচিত্র পথ ধরে। সামনে শৈল বা সু-উচ্চ দুর্গপ্রাকারের মত রক্তাভ বালিয়াড়ি—তার পিছনে কোমল নীল আকাশ সমুদ্র বাতাসে সতত সঞ্চরণশীল সিকতায় ঈষৎ রক্তিম। রামেশ্বরমের প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই বালিয়াড়িগুলি ও তাদের সান্নুদেশে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার তালতরুশ্রেণী এমন একখানি চিত্রসৃষ্টি করে রেখেছে যা এক অনাস্বাদিত ভাব ও আনন্দ মনে আনে। পথটি বালুময়—একধারে নিবিড় তালীবন যেন একখানি জমাট কালো মেঘ মাটিতে নেমেছে। অপর ধারে ছায়াঘন সুবিস্তৃত নারিকেল ও বেণুবন। তার ছায়ায় পল্লীকুটীরগুলি। রামেশ্বরম একখানি অৰ্দ্ধসুপ্ত পণ্ডগ্রাম। তবে পথে, মন্দিরে, অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে, দোকানে বিজলী আলো জ্বলে। পল্লীকুটীরে জ্বলে না। অধিবাসী এদেরই সংখ্যা ভারতে বিপুল। শোনা ছিল, রামেশ্বরম ও কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতট থেকে সমুদ্রে সূর্য্যের উদয় এবং সূর্য্যের অস্ত দেখা যায় যা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে। আমরা সূর্য্যাস্ত দেখবার আশায় তাড়াতাড়ি একটি বালিয়াড়ির উপর উঠতে লাগলাম। সূর্য্যাস্ত দেখতে পেলাম না সত্য কিন্তু বালিয়াড়ি শীর্ষে বাতাস ও বালুতে যে মায়া রচনা করেছে তা দেখে মুগ্ধ হলাম। হাওয়ায় বালিয়াড়ি-শীর্ষের বালুকণারাশি শীর্ষ থেকে মাত্র আধহাত-মত উপরে উড়ছে। তাতে মনে হতে লাগল, সূক্ষ্ম লূতাতন্তুজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। এই দৃশ্য আবার সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। পরদিন সঙ্গীদের মধ্যে

রামেশ্বরম্—গোপুরমের আর একটি দৃশ্য

তিন জন রামেশ্বরম গ্রাম থেকে মাইল দুই তফাতে জলবেষ্টিত একটি মন্দির থেকে সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত দেখেন—সেখান থেকে উদয়ও দেখা যায়।

বালিয়াড়ি থেকে নেমে গ্রামের পাশ দিয়ে সমুদ্রকূলের দিকে যেতে যেতে দেখলাম, বালিতে খুব বড় কয়েকটি গর্ত্ত—দুটি গর্ত্তের কিনারে দুটি স্ত্রীলোক বসে অতি দীর্ঘ দুটি হাতায় গর্ত্তের তলা থেকে জল তুলে বিশাল ও বিচিত্রাকার দুটি পিতলের ঘড়ায় ভরছে। বৃষ্টির যে জল বালুরাশি শোষণ করে এ সেই জল এবং পানযোগ্য। এখানে কলের জলও সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীই বাড়ীতে তা পায় না।

অৰ্দ্ধচন্দ্রাকার উপকূল ঘিরে ধীবর ও অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসীদের ঘর-বাড়ী। সেখান থেকে রামেশ্বরম মন্দিরের গোপুরম দেখা যায়—তাল-নারিকেলের মাথা ছাড়িয়ে আকাশপানে উঠেছে। এখান থেকে অনেক যাত্রী সমুদ্রপথে নৌকায় ধনুষ্কোটি গিয়ে থাকেন। তবে আমাদের মধ্যে কারও কারও হাতে সমুদ্রযাত্রার রেখা রয়েছে। তাই কয়েক মাইল সমুদ্র অতিক্রমণে তা মুছে যাবার ভয়ে আমরা ও পথ ধরি নি।

মন্দিরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা শেষ হয়েছে। রামেশ্বরের মন্দিরের সুদীর্ঘ অলিন্দ ভারতের স্থাপত্যশিল্পের এক পরম বিস্ময়। গোটা মন্দিরের নির্মাণকৌশল স্থপতিগণের, প্রস্তরস্তম্ভে মূর্তি ও শিল্পকাজ শিল্পীদের গভীর আলোচনার বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকের অন্তর অলিন্দপথে চলতে চলতে এমন এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে যা আর কিছুতেই টলাতে পারে না। আমারও হ'ল সেই অবস্থা। মণিকোঠাস্থিত শিববিগ্রহের সম্মুখে মর্ম্মরের বিশাল বৃষমূর্তি, পার্ব্বতীর মহাসমারোহপূর্ণ আরতি, তাঁর স্বর্ণশিবিকা ও বিবিধ মণি-রত্নালঙ্কার, অলিন্দকোণে নটরাজের অনুপম মূর্তি সে গাম্ভীর্য্যে কোথায় নিমগ্ন হয়ে গেল।

সঙ্গীরা যিনি যে মানস ও মানত নিয়ে এসেছিলেন মূল্য দিয়ে তা সম্পন্ন করতে বসলেন। আমি তো অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে সারা। ছাত্রটিও অস্থির হয়ে আনমনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটু রাত্রে একটি হোটেলে খাদ্যের আশায় যেতেই তামিল হোটেলওয়ালা বললে, "আসুন! বসুন। কি চাই?" মাদ্রাজে সম্মেলনের শেষ দিনে বক্তৃতায় শ্রীরাজগোপালাচারী বলেছিলেন, "বেঙ্গল নোজ নো বাউণ্ডারি!" হোটেলওয়ালার কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, "বেঙ্গলি নোজ নো বাউণ্ডারি।"

পরদিন সকালে চললাম, আবার মন্দিরের দিকে। শিল্পী দুজন গেলেন সেই বালিয়াড়ির ধারে ছবি আঁকতে। মন্দিরের পথে দেখলাম, দুটি কিশোরী তাদের বাড়ীর সম্মুখে পথের খানিকটা ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করে ও জল ছিটিয়ে সেখানে শুকনো চালের গুড়ো দিয়ে বড় ও বিচিত্র আলপনা দিচ্ছে। দেখলাম, প্রায় সব বাড়ীর সম্মুখেই পথে আলপনা। কিন্তু সে চিত্রগুলি আমাদের বাংলার আলপনার মত স্নিগ্ধ নয় এবং তার সঙ্গে মিলও নেই। কাঞ্চীপুরমের মতই দেখলাম, কোন কোন বাড়ীর সামনে আলপনার উপর চারটি গোময়ের গুলীতে চারটি কুমড়ার ফুল। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ, এর মানে কি?"

তিনি আমাদের পরিচয় নিয়ে বললেন, "এ হ'ল মাঙ্গলিক। দক্ষিণে মাদ্রাজে হিন্দুদের বাড়ীর সামনে পৌষ ভোরই আলপনা দেওয়া ও বাড়ী ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়ে থাকে।" তখন পৌষ মাস।

পথেই দেখা হ'ল সাহিত্য সম্মেলনের চার জন লক্ষ্ণৌয়ের প্রতিনিধির সঙ্গে। তাঁরা লক্ষ্ণৌয়ে তাঁদের বাড়ীর পথ ধরেছিলেন। জানি না কাজের তাড়নায় কিনা। তাঁদেরও সঙ্গে একটি মহিলা ছিলেন। তাঁরা উঠেছিলেন মন্দিরের ধারে রেষ্ট হাউসে।

দুটি কিশোরী তাদের বাড়ীর সামনে রাস্তায় আলপনা দিচ্ছে।
রামেশ্বরম্—প্রভাতকাল

রামেশ্বরমের খ্যাতি যেমন সুদূরবিস্তৃত তার তুলনায় যাত্রিসমাগম সামান্যই। কাফিখানা বা রেস্তোরা ও হোটেল আছে অনেকগুলি। একটি দোকানে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি। দক্ষিণে বাঙালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র। এদেশে বাঙালী যে মর্য্যাদা পায় তা মুখ্যতঃ এঁদেরই জন্যে। তবে আরও দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার নয় মাইল উত্তরে মোটরবাসে এক মারাঠী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সময় কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, "বাংলা ভারতের সব চেয়ে অগ্রসর প্রদেশ।" হয় তো তাই-ই।

যা হোক, সেই দিনই গভীর রাত্রে রামেশ্বরম ছেড়ে সকলে রওনা হলাম মাদুরাইয়ে—তবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নয়।

"ঘুম ভেঙে শুনতে পেলাম—"

শ্রীকুমাররলাল দাশগুপ্ত

ঘুম ভেঙে শুন্‌তে পেলাম বিষ্টি নেমেছে—রাত দুপুর।
তাড়াতাড়ি উঠে আসি,
জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাই,
অন্ধকারে দেখতে পাইনে কিছু ;
হাত বাড়িয়ে দি বাইরে
বড় বড় জলের ফোঁটা এসে পড়ে হাতে।
আনন্দে শিউরে ওঠে দেহ, এ যে অমৃতের স্পর্শ।
শুক্‌নো প্রাণের আর শুক্‌নো মাটির চাওয়া
বিষ্টি এল এত দিনে।
হাত পেতে দি' ভিক্ষুকের মত, ধীরে ধীরে ভরে ওঠে অঞ্জলি
আকাশের দানে।

পাহাড়ের ঢালু গায়ে,
সাঁওতাল পল্লীর একধারে আমার ছোট মাটির ঘর।
পেছনে গভীর শালবন ধীরে ধীরে উঠে গেছে
পাহাড়ের মাথায়,
সামনে পাথর ছড়ান ঢালু পথ নেমে গেছে নদীতে।
রোজ রাতে শালবনের পথে যাদের পায়ের আওয়াজ
শুন্‌তে পাই,
নদীর ধারে শুন্‌তে পাই গলার আওয়াজ—
রাশভারী বাঘ আর রসিক ভালুক,
চঞ্চল হরিণ আর কদাকার হায়না,
মেঘের ডাক শুনে ফিরে গেছে তারা যে যার আস্তানায়
ভিজে মাটির গন্ধে আমার মত আকুল হয়ে উঠেছে
তাদেরও মন।

হু হু করে হাওয়া আসে
জানালা দিয়ে জলের ঝাপটা ঘরে ঢোকে।
বন্ধও করিনে জানালা, সরেও বসিনে একপাশে,
অন্ধকারে মুখ রাখি জানালার উপর।
চোখে-মুখে স্পর্শ লাগে জলধারার
গুটিকয়েক চেনা আঙুলের স্পর্শের মত।

রাত হয়ে আসে শেষ
আবছায়া অন্ধকারে দেখি দুলছে শাল আর পিয়াশের দল।
দুলছে যেন ভিজে আঁচল।
পাহাড়ের মাথা থেকে ভেসে আসে বনমোরগ আর
ময়ূরের ডাক।
সে ডাক আজ লাগে বড় মধুর।

মেঘের আড়ালে উঠেছে সূর্য,
আলো হারিয়ে গেছে শ্যামল অন্ধকারে।
ঘুম ভেঙেও যেন ঘুমিয়ে আছে পৃথিবী,
সিক্তশীতল আলিঙ্গন অনুভব করবে চোখ বুঁজে।
অরণ্যের অন্তর হতে ভিজে বাতাসে ভেসে আসছে একটা
মিঠে খোশবায়,
বনকরমচার সঙ্গে মেশান চেলিফুলের গন্ধ।
মেঘ ডাকছে গুড় গুড়, বিষ্টি পড়ছে অবিরাম।
চাকর আসে নি এখনো—চাইবার আগেই ছুটি দিয়েছি তার
চা তৈরি হয় নি—নাইবা হ'ল, দরকার দেখিনে,
ছোটখাটো সাধারণ জিনিষের কথা মনেই পড়ছে না আজ।
আমার মধ্যে নেই যেন আমার মন,
সে মন আকাশে মেঘের বুকে ঘনিয়ে আছে,
বিষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ছে, অরণ্যের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছে।

হঠাৎ আসে বিষ্টি,
এ যেন মুহূর্তের বিশ্রাম।
গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা,
পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নেমে চলেছে অসংখ্য জলধারা
পাহাড়তলীর ছোট নদীটির দিকে।
কূল ছাপিয়ে, পাথর ডিঙ্গিয়ে ছুটে চলেছে স্রোত
কল কল ছল ছল আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি সকাল থেকে
মহুয়া গাছের আগডালে ঝটপটিয়ে ডানা ঝাড়ে
একজোড়া চিল,
মাঠের উপর নেমে পড়েছে একঝাঁক শালিক।
সাঁওতাল-পল্লীতে উঠেছে সোরগোল,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি, হাসি আর গান।

।থায় মাটির কলসী নিয়ে নদীর পথে যায়
গুটিকয় সাঁওতালী মেয়ে।
।টো আঁচল বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে মাজায় আঁট করে বাঁধা,
।লায় লাল পুঁতির মালা, হাতে কাঁচের সবুজ চুড়ি,
পায়ে তাদের পিতলের বাঁকা মল।
।লার ছন্দটা প্রায় নাচের মতই,
কথার ফাঁকে ফাঁকে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

ছোকরা চাকরটা দরজায় এসে দাঁড়ায়
তরুণ সাঁওতাল, একমাথা ভিজে চুল নেড়ে হাসে।
খুশির নেশায় যেন টলমল করে দেহমন।
এটা ওটা কাজ করে, আর গুনগুন করে গান গায়;
ভাষাটা সাঁওতালী কিন্তু ভাবটা বিশ্বের—
।স গায় "শালবনের সরু পথে ফুটলো কাঁটা কোমল পায়
হায় রে, হায় হায়,
সে কাঁটা ফুটলো আমার কলিজায়
হায় রে, হায় হায়।"

ঘড়িতে দেখি বেজেছে ন'টা
টুপ্‌টাপ করে আবার নামে বিষ্টি,
হরেক রকম আওয়াজ, যেন বাজছে অনেক যন্ত্র।
।লাশগাছের বড় বড় পাতায় আওয়াজ হচ্ছে তবলার,
।ঠের ঘাসের উপর আওয়াজ হচ্ছে
পায়ে চলার আওয়াজের মত চাপা,
।থের কাঁকরের উপর আওয়াজ হচ্ছে
অসংখ্য হাইহিলের খুট্ খুট্ খুট্ খুট্।
।কাথায় যেন পড়ে আছে একটা ভাঙা টিন,
তার উপর বাজছে জলতরঙ্গ।

হঠাৎ ঝম্‌ঝম্ করে চেপে আসে বিষ্টি,
মুহূর্তে মিলিয়ে যায় টুংটাং যত স্বতন্ত্র আওয়াজ,
বেজে উঠে একটা বিরাট গম্ভীর অরকেস্ট্রা।
মহুয়াতলায় ছুটে এসে দাঁড়ায় দুটি মেয়ে,
আমি জানি ওদের নাম—সোনিয়া আর সুদন।
পাতার ফাঁকে ফাঁকে ওদের মুখে মাথায় এসে পড়ে জল।
গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে গলাগলি ধরে
ওরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা কয়,
থেকে থেকে খিলখিল করে হেসে ওঠে।
গুড় গুড় করে ডেকে ওঠে মেঘ, হাওয়ায় দোলে মহুয়ার ডাল
হঠাৎ দেখি সোনিয়া আর সুদন ধরেছে নাচ,
হাতে হাত ধরে দুলে দুলে এগিয়ে আসে দুজনে,
তালে তালে পা ফেলে পিছিয়ে যায় আবার।
বাতাসে দোল খায় মহুয়ার ডাল,
দোল খায় শাল শিসমের ডাল,
অরণ্যের এই দোলা দেখলুম সাঁওতালী মেয়ের দেহে।

দুপুর পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ,
আকাশভরা কালো মেঘ, ফাঁক নাই কোথাও,
কালো চোখ মেলে চেয়ে আছে ধরণীর দিকে।
সেই নিবিড় দৃষ্টির মায়ায় মোহিত হয়েছে অরণ্যানী।
শাল আর শিসমের মত আমিও অরণ্যের অংশ,
আমিও হয়েছি মোহিত।

হরিজন সেবায় অর্থসাহায্য

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

: প্রতিষ্ঠানকে সমাজসেবার কার্য্য গ্রহণ করিতে হয় তাহাদের জকাল কঠিন সমস্যা, অর্থ আসিবে কোথা হইতে। আজ-ন, বরাবরই এ সমস্যা আছে এবং থাকাও উচিত, কারণ সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের যোগ আছে, ইহা দেখিবার অন্যতম ইল, জনসাধারণ অর্থ দিয়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে কিনা। স্তা পরীক্ষা, জনসংযোগ কি গণসংযোগ কতখানি হইয়াছে পরীক্ষা। এই যোগ না থাকিলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব-কানও রূপ থাকে না। যদি যথা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা ওয়া যাইত, যদি সে টাকা কি ভাবে ব্যয় হইবে তাহার করিবার উপায় বা ক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের না থাকিত, তাহা একদিকে অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা বাড়িত, অন্যদিকে সেবা-নের ভিত্তি সেবাভাবেরও লাঘব হইত। কথাটা ঠেকিয়া শিখিতে হইতেছে। আজকালকার দিনে সেবাপ্রতিষ্ঠানের চাহিতে গেলে শোনা যায়—কেন, আমাদের দেশ স্বাধীন , welfare state, কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র—রাষ্ট্র টাকা দিবে, : কাছে চাওয়া কেন? কিন্তু সরকারের টাকাটা ঠিক আসিয়া পৌছায় না, পাওয়ার নানাবিধ ধাপ বা গণ্ডীও সে টাকা পাইলে প্রয়োজনের দাবি হয় তো মিটিতেও কিন্তু সাধারণের দান না থাকিলে প্রতিষ্ঠান যে জন-ই সেবক বা প্রতিনিধি, সেরূপ দাবি করিবারও পথ । সুতরাং জনসাধারণের কাজে আর্থিক সাহায্যের জন্য ণের নিকটেই প্রত্যাশা করিতে হয়। সেবামূলক র দায়িত্বও যে সাধারণের আছে! সরকারী দানের একটা : এই যে, সরকারী দান পাইতে হইলে সরকারের অধিকার আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিবার। সেবাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে , তাহার আয়-ব্যয় পরীক্ষার ভার রহিয়াছে সর্ব্বসাধারণের তবে দেখিতে হইবে, তাহাতে প্রতিষ্ঠানের দৈনিক কার্য্যের া ঘটে।

াহা হউক, কোথা হইতে টাকা আসিবে, কর্ম্মীর এ চিন্তা আছে। সেইখানেই কর্ম্মীর পরীক্ষা, সে হয় ত এমন র্থের গুরুত্ব সাধারণকে বুঝাইতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত-িতে পারি, আমি কয়েক বৎসর হইল হরিজন সেবক-ীয় শাখার কর্ম্মব্যবস্থার জড়িত আছি। দেখা হইলে বলি, হিন্দুর জন্ম, অন্নারম্ভ, বিবাহাদি সংস্কারে বর্ণহিন্দুকে দুর কথা মনে রাখুন, অবর্ণ বা হরিজনদের জন্য হরিজন-ণ্ডর ভাণ্ডারেও কিছু দিন। দশসংস্কারে ব্যয় তো কিছু করিতেই হয়, হরিজনদের জন্যও সামান্য কিছু খরচ করুন না। এ কথায় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেহ কিছু করেন, কেহ বা করেন না। কিন্তু চেষ্টা করি আমাদের কথা সকলকে বলিবার ও বুঝাইবার।

কয়েক বৎসর আগে বন্ধু জীবনময় রায় মহাশয় আসিয়া তিন হাজার টাকা আমার হাতে দিলেন, নিরঞ্জন বৈরাগীর স্মৃতিরক্ষায় জন্য লোকের হিতার্থে যেন ব্যয় হয়। প্রথমে তাঁহার ইচ্ছা ছিল, টাকাটা যেন কোথাও লাগাইয়া তাহার সুদ হইতে ব্যয় করা হয়। আমি অবশ্য পরামর্শ দিলাম, সুদের উপর নির্ভর না করিয়া আসলও ব্যয় করিতে। আমাদের প্রয়োজন এখনই; বন্যা, অনশন, অর্দ্ধাশন, পড়ার খরচ—অর্থের আশু প্রয়োজন এখনই, সাধ্যমত সে প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা না করিয়া, যথাসাধ্য এখনই ব্যয় না করিয়া যদি সুদেরই উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে কতটুকু ব্যয় করিতে পারিব? আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি আমাকে আমার ইচ্ছামত সেবার কর্ম্মে উক্ত টাকা ব্যয় করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। স্থির করিলাম, যেসব কাজের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট তহবিল নাই, অথবা তহবিল হইতে অর্থ আনা সময়সাপেক্ষ, সেই সব কাজেই টাকাটা খরচ করিতে চেষ্টা করিব। হরিজনদের বই, ফি, বা অন্য সাধারণ খরচ ইহা হইতে করিব না, কারণ এজন্য তাহাদের তো স্বতন্ত্র তহবিল আছে। প্রাপ্ত অর্থ কি ভাবে খরচ করি তাহার নমুনা দিতেছি:

এই ভাণ্ডার হইতে আমি ১৯৫১ সালে সরোজনলিনী মেমো-রিয়াল এসোসিয়েশনের দুইটি ছাত্রীর জন্য ১০০৲ একশত টাকা, দুঃস্থ ছাত্রদের বইয়ের জন্য ১৭।০, একটি অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ছাত্রের ঔষধ ও পথ্যের জন্য ২১৵০, একটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর ফি দিবার সময় কম পড়িয়াছিল ৪৲ —মোট ১৪২।৵০ খরচ করি।

ঐরূপ ১৯৫২ সালে ২৩১।০ খরচ করি। পূর্ববৎসরের মত সরোজনলিনী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের দুইটি ছাত্রীর জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ১০০৲ একশত টাকা, বেথুন কলেজে নিরঞ্জন বৈরাগীর নামে এক বৃত্তি দিই ৬০৲, দশম শ্রেণীর ছাত্রের স্কুল-বেতন ৫০৲, একটি মেয়ের ভর্ত্তি হওয়ার সময় স্কুল-বেতন ৮।০ এবং বইয়ের জন্য ১৩৲—মোট ২৩১।০।

১৯৫৩ সনে বেথুন কলেজে প্রদত্ত নিরঞ্জন বৈরাগী বৃত্তি বাবদ ৩০০৲, একটি যক্ষ্মারোগীর ঔষধ ও চিকিৎসা বাবদ ১১৫।০, স্কুলের বেতন বাবদ ৫০৲, ছাত্রদের বই কেনা বাবদ ১৯৸০, জনৈক দুঃস্থ ছাত্রকে এককালীন সাহায্য ২৫৲, একটি দরিদ্র ছাত্রকে সামান্য কিছু

হারে জলখাবার বাবদ ১৬৲, একটি ছাত্রকে এককালীন সাহায্য বাবদ ৪৲ এবং বিবিধ এককালীন সাহায্য ২০৲—মোট ৫৫০৵০।

বর্তমান বৎসরে এ পর্যন্ত খরচ করিয়াছি রোগীর পথ্য ও ঔষধ বাবদ ৯৩৮৵০, ছাত্রটির জলখাবার বাবদ ১০৲, বই বাবদ ১২৮৫, পরীক্ষার ফি বাবদ ৪৫৲, এককালীন দান ইত্যাদি বাবদ ৪০।০, বেথুন কলেজে নিরঞ্জন বৈরাগী বৃত্তি বাবদ ৬০৲—মোট২৬২০/৫।

১৯৫৫ সনে পান্তিপুকুর যামিনীভূষণ আয়ুর্বেদ যক্ষ্মা হাসপাতালে নিরঞ্জন বৈরাগীর স্মৃতিরক্ষার্থ ১৫০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ টাকায় উক্ত হাসপাতালের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

জীবনে দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোকের যন্ত্রণা নিরঞ্জন বৈরাগীকে বিচলিত করিত। রোগগ্রস্ত অবহেলিত অল্পসংখ্যক জনের কাজে সর্বদা লাগিলেই তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডারের মর্যাদা রক্ষিত হইবে। এই সঙ্গে যে টাকার হিসাব দিলাম, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, এই সব টাকা আমরা কি ভাবে ব্যয় করি তাহা জানিতে পারিলে অর্থসাহায্য করিতে সর্বসাধারণের আগ্রহ জন্মিবে এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, দরিদ্রজন-সেবায় কত অজস্র কাজ অর্থাভাবে অ-কৃত রহিয়াছে।

হরিজন সেবায় যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

পোর্ট সৈয়দ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

জাহাজ দাঁড়ালো ভোর সাতটায়
ঝলমল করে রূপালি রোদ,
সামনে আমার পোর্ট সৈয়দ!
ছুটে ছুটে আসে মোটর-লঞ্চ—
আসে পুলিস,
ইজিপ্‌সিয়ান পতাকা উড়ছে
মাস্তুল থেকে অহর্নিশ!
অনেক দোকান—অনেক বেসাতি—
কি গোলমাল;
লঞ্চগুলি জলে টাল-মাটাল!
চামড়ার ব্যাগ, আইভরি পট, কার্পেট আনে ফেরিওলা—
প্লাটিনাম চুড়ি, মুক্তারও আসে কত মালা—
সে সবে বিছানো স্বপ্নজাল!
স্বপ্নের মতো বাড়ীগুলি যেন
ছোঁয়া দিয়ে যায় মনে মনে,
প্রতিটি জনের মনে-মনে।
গৃহগত প্রাণ—গৃহগত দুটি বিরহী আঁখির—
কোণে-কোণে!

"উলওয়ার্থ"
বাড়ায় হাত।

ঝিপ ঝিপ করে পড়িছে তাল।
নৌকা সাগরে টাল-মাটাল!

শক্ত বয়ায় বাঁধা পড়ে আছে বহু জাহাজ।—
ইংলণ্ড আর আমেরিকার।

নানান দেশের পতাকা সেখানে বাতাসে তুলেছে
কুচকাওয়াজ!

পতাকা তো বড় আমেরিকার
ডলারের হার কণ্ঠে তার!

ফ্রেঞ্চ নাচঘরে এখন সুপ্ত
রাতের কাকলি, সব আওয়াজ!

কায়রো-সুয়েজ-মিশরপ্রান্তে পোর্ট সৈয়দ
আজব নগর পোর্ট সৈয়দ
তারই পরে দেখি সকাল বেলায় নির্বিরোধ
ঝিলমিল করে রূপালি রোদ!

ভারতীয় সাহিত্য প্রদর্শনী

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান কথাটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিধানে নূতন আমদানী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ-ব্যবস্থা আরও অর্বাচীন। কিন্তু যাঁরা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করেছেন, তাঁরা জানেন একথাটির মর্ম এদেশে মোটেই নূতন নয়। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিভাগ ও পতন-অভ্যুদয়কে উপেক্ষা করে বহুতাধিক ভাষা ও সংস্কৃতি পাশাপাশি নির্বিবাদে সহ-অবস্থান করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। এতগুলি ভাষার একত্রে অবস্থান ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতগুলি ভাষার মধ্যে চতুর্দ্দশটি ভাষা রাষ্ট্র-স্বীকৃতি পেয়েছে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে—অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়া, মলায়-য়ালাম, কাশ্মীরী, মরাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু এই বারটি আঞ্চলিক ভাষা এবং দুইটি সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃত ও উর্দ্দু। সিন্ধি এর মধ্যে স্থান পায় নি, বোধ হয় ভাষাভাষীর সংখ্যা যথেষ্ট নয় বলে। সিন্ধি সহ এই পনরটি ভাষা নিয়েই ভারতীয় সাহিত্য এবং এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজী তো আছেই।

ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের সহ-অবস্থানের প্রকৃত রূপটি সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে আরও স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা, সাহিত্য আকাদেমি। উপলক্ষ, ইউনেস্কোর নবম সাধারণ অধিবেশন। স্থান—ইণ্ডাস্ট্রিজ ফেয়ারের পরিত্যক্ত ময়দান, দিল্লী। লক্ষ্য: "Indian literature is one though written in many languages"—"ভারতীয় সাহিত্য এক, যদিও বহু ভাষায় লিখিত"—এই উদ্ধৃত বাণীটির সার্থকতা প্রতিপন্ন করা এবং সেই অবসরে ভারতীয় সাহিত্য বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতদূর সমৃদ্ধ তার এক সুস্পষ্ট ছবি জনসমক্ষে তুলে ধরা। নিছক গ্রন্থপ্রদর্শনী নয়, সাহিত্যপ্রদর্শনী বলাই শোভন ও সঙ্গত। কেননা গ্রন্থবিশেষের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নি, বিভিন্ন সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয়টি স্পষ্ট করে প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই কোন্ বিশেষ গ্রন্থ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে কি পায় নি, সেটা দ্রষ্টব্য নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলির প্রতিনিধি-মূলক সঙ্কলন ছিল কিনা সেটাই বিবেচ্য। এ বিবেচনায় প্রদর্শনীটি ভাল ভাবেই উৎরেছে—তার প্রমাণ পাওয়া গেছে দর্শকের মন্তব্যের পাতায় পাতায় অজস্র প্রশংসাবাদে। অনেকে বিস্মিত হয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যের বহুমুখিনতায়, অনেকে খুশী হয়েছেন কোন কোন ভাষার বিষয়বিশেষে পূর্ণাঙ্গ কাজ দেখে। যেমন, প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরু সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাংলা বিভাগের অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের অভিধান ও এনসাইক্লোপিডিয়ার কাজ দেখে, মরাঠীর বিভিন্ন কোষগ্রন্থ ও তামিলের লোকগাথার সঙ্কলনে।

প্রদর্শনীতে সিন্ধি, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও ইংরেজী সহ ষোলটি ভাষা-কোটর ছিল। ('কোটর' শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত হ'ল)। এ ছাড়া ছিল তিনটি বিশেষ বিভাগ। ইউনিটি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, রবীন্দ্রনাথ ও শিশু বিভাগ। ইউনিটি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার বিভাগের পরিকল্পনাটি অভিনব। রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাস ভারতীয় সাহিত্যে শাশ্বত এবং সর্ব্বগ্রাহী। কেবল ভারতীয় সাহিত্য নয়, বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সংস্কৃতি বহুধা প্রকাশিত, কিন্তু এই নানা বর্ণের ফুলগুলি একটি বিনিসুতোর মালায় গাঁথা—সেই অলক্ষ্য সুতোটি হ'ল রামায়ণ-মহাভারত ও কালিদাস। এদের প্রভাবই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরটিকে জাগিয়ে রেখেছে। প্রত্যেকটি ভাষায় এদের অনুবাদ, সারানুবাদ, ছায়ানুবাদ ও প্রভাবিত গ্রন্থ পাঠকের কাছে ঐক্যের সুরটি পৌঁছে দিয়েছে। আমরা ভারতের প্রতি প্রান্তের মানুষ নিজের নিজের সাহিত্য নিয়ে কেউ মরাঠী, কেউ গুজরাটী, কেউ বাঙালী—কিন্তু রামায়ণ মহাভারত হাতে নিয়ে আমরা সবাই ভারতীয়—তার ভাষা বাংলাই হোক আর উর্দ্দুই হোক। ইউনিটি অব ইণ্ডিয়ান লিটারেচার বিভাগে বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ-মহাভারত ও কালিদাসের অনুবাদ সাজিয়ে রেখে উপরোক্ত তত্ত্বটির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-বিভাগে ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহ—তাঁর বাংলা বইয়ের দু'ধারে সাজানো ছিল ভারতীয় এবং বিদেশীয় অনুবাদ। ভারতীয় অনুবাদে একমাত্র কাশ্মীরী ভিন্ন ভারতের সকল মুখ্য ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিদেশীয় অনুবাদের মধ্যেও ছিল অন্ততঃপক্ষে বারোটি ভাষায় অনুবাদ। এ ভিন্ন বহু অনুবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বিদেশীয় অনুবাদের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে stray birds-এর সুদৃশ্য ক্ষুদ্র জার্মান সংস্করণ, স্প্যানিশ ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য সঙ্কলনের রাজসংস্করণ ও সাম্প্রতিক কয়েকটি রাশিয়ান অনুবাদ। ভারতীয় অনুবাদের প্রচ্ছদপট ও প্রকাশ-নৈপুণ্য হতাশ করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র-বিভাগে কয়েকটি প্রথম যুগের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি উল্লেখ-যোগ্য। এই বিভাগে জাতীয় গ্রন্থশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত রবীন্দ্র-নাথের 'নাইট' পদত্যাগের মূল পত্রটির বৃহদাকার আলোকচিত্র এবং কবির স্বহস্তলিখিত 'where the mind is without fear' কবিতাটির সুবৃহৎ প্রতিলিপি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—বিশেষ ভাবে নাইট পদত্যাগপত্রের প্রতিলিপি। সজ্জা ও শোভনতায় দিক দিয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল শিশুবিভাগ। এ বিভাগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শিশু-সাহিত্য একত্রিত করা হয়েছে সুদৃশ্য আসবাবে। শেলফগুলি নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ারের

আকৃতিতে করা হয়েছিল—কোথাও পাখীর ডানায়, খরগোশের কানে, কোথাও হাতীর পিঠে, উটের পেটে বই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এই বিভাগের দেওয়ালের গায়ে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথের তোতা কাহিনী চিত্রে বর্ণিত ছিল।

বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থনির্বাচনের মানদণ্ডের থেকে ইংরেজী বিভাগের নির্বাচন-আদর্শ স্বভাবতঃই ভিন্ন ছিল। এখানে দেশী ও বিদেশী লোকের লেখা ভারতবিষয়ক বই স্থান পেয়েছে।

প্রত্যেক ভাষা-বিভাগে প্রদর্শিত পুস্তকের নির্বাচনের আদর্শ এক ধরনের ছিল, যার ফলে সকল ভাষার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের একটা তুলনামূলক ছবিও ধরা পড়েছিল। বিশুদ্ধ সাহিত্য অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ছাড়া বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থও ছিল। প্রতি ভাষা-কোটরে প্রায় ১ হাজার করে বই ছিল—অর্থাৎ একটি ৬৪ ফুট × ৫১ ফুট কক্ষে প্রায় বিশ হাজার বই প্রদর্শিত হয়েছিল! যার ফলে নিদারুণ স্থানাভাব এবং উপযুক্ত প্রদর্শনের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে দর্শককে বইয়ের নামগোত্রহীন 'পুট'টুকু দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আর একটি বিশেষ ত্রুটি ছিল গাইডবুকের অবিদ্যমানতা। গ্রন্থপ্রদর্শনীতে গাইডবুকের অভাব অমার্জনীয় ত্রুটি। এর ফলে প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রতি ভাষা-কোটরে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, সেই সাহিত্যের কৃতী সন্তানদের প্রতিকৃতি ও কোন একটি বিশেষ উক্তি। বাংলা বিভাগে ছয়টি প্রতিকৃতি ছিল—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের। উক্তি ছিল চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। প্রতি ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি ও একটি করে বিখ্যাত উক্তি প্রদর্শনীর পরিবেশটিকে সাহিত্য-তীর্থের মর্যাদা দিয়েছিল। ইংরেজী বিভাগে ভারত-বিদূদের ছবির মধ্যে সরোজিনী নাইডুর ছবি কেন স্থান পেয়েছে, এবং উইলিয়াম জোন্সের ছবি কেন বাদ পড়ল বোঝা গেল না।

পুস্তক ছাড়া উদ্যোক্তারা বিস্তর পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ও ব্যক্তি বিশেষের সংগ্রহ থেকে, তালপত্রের উপর কয়েকটি উড়িয়া সচিত্র পুথি, তেলুগু ভাষায় ভাগবতের পুথি, সারদা বর্ণমালায় ভূর্জপত্রে লেখা পুথি এবং বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি ও পত্রের একস্থানে এমন সমাবেশস তাই দুর্লভ।

রাজধানীতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে—৬ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই একমাস কাল দিল্লী শহর ইউনেস্কো ও বৌদ্ধ কনফারেন্সের কল্যাণে দেশের ও বিদেশের পণ্ডিতজনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সেই কারণে প্রদর্শনীর গুরুত্ব ছিল অসামান্য। ভারতীয় সাহিত্যের এমন বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা অভিনব। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষাগুলির ভিতরে সংযোগস্থাপন ও পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়। এদিক দিয়ে এ প্রদর্শনী সার্থক হয়েছে। এমন আসরে বাংলা-সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বিভিন্ন প্রকাশকের সহযোগিতায় সাহিত্য পরিষদ এই দায়িত্ব বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে পালন করে বাঙালী-সমাজের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্য নিয়ে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিতে গিয়েছিলাম সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে; প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। গিয়েছিলাম অন্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবার আছে কিনা জানতে। সেই প্রসঙ্গেই আজ কয়েকটি কথা নিবেদন করব।

বাংলা বিভাগের গৌরবের কথা বাহুল্যবোধে উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু দর্শকসমাজের কাছে যে সব প্রশ্ন পেয়েছি, গত এক মাসে নিজের মনেও যে সব প্রশ্ন জেগেছে আজ তারই উল্লেখ করব। যে সব গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একান্ত গৌরবের তার অনেকগুলিরই প্রকাশকাল আজ থেকে বিশ বছরেরও পূর্ব্বে। তার ফলে প্রায় সবই অপ্রাপ্য অথবা অসংস্কৃত। অবাঙালীর বাংলা শিক্ষার ভাল বই কোথায়—সুনীতিবাবুর মার্লবারো সিরিজের বই ভিন্ন? সে বইও তো নিঃশেষিতপ্রায়। বেণী-মাধব গাঙ্গুলীর দুষ্প্রাপ্য বাংলা-ইংরেজী অভিধান ভিন্ন এ ধরনের প্রামাণিক অভিধান কোথায়? অবাঙালী ছাত্রের হাতে আজ কোন্ অভিধান তুলে দেব। বাংলা-হিন্দী, বাংলা-উর্দু, বাংলা-ফরাসী, বাংলা-রুশ—এসব অভিধান কি আছে? প্রামাণিক বাংলা অভিধানই বা কোথায় বাজারে? হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দুর্লভ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান নিঃশেষিত-প্রায়। আর আছে রাজশেখর বাবুর চলন্তিকা। এর মধ্যে অক্সফোর্ডের তুল্য অভিধান কোনটি? বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণের কথা তুলি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ব্যাকরণ পাওয়া যাবে না, সুনীতিবাবুর ভাষাপ্রকাশ ব্যাকরণটিও অপ্রাপ্য। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর জন্য তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণটিই কি প্রামাণ্য বাংলা ব্যাকরণ, না সুনীতিবাবুর 'Origin and Development of Bengali Language' বা এণ্ডারসনের "গ্রামার"? কিন্তু দুটিই তো ইংরেজীতে ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস কোনটি? ক্লাসিক সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদ কোথায়? বেদব্যাসের অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত এখন আর পাওয়া যায় না। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদের খোঁজ ক'জন রাখেন? বেদ, উপনিষদ, গীতা—এদের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ খুব কমই চোখে পড়ে। তন্ত্রের দেশ বাংলা, কিন্তু তন্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ কোথায়?

এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে—কিন্তু এটা তার উপযুক্ত স্থান নয়। শুধু লক্ষ্য করা কর্তব্য যে, অনেক কাজ আজও বাংলায় হয় নি এবং অনেক গ্রন্থ ঘটনাচক্রে আজ অপ্রাপ্য। তাই

আধুনিক পাঠক বড় অসহায়—তার হাতে তুলে দেবার মত অনেককিছুই নেই বাংলার গ্রন্থ-ভাণ্ডারে—এই সত্যটাই বার বার অনুভব করেছি। তাই প্রশ্নাকারে সেই সব আবেদন রেখে গেলাম বাংলার পণ্ডিতসমাজের কাছে।

ভারতীয় সাহিত্য-প্রদর্শনী নানা দিক দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন দিগ্‌দর্শন—বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে উদ্যোক্তা সাহিত্য আকাদেমি নানা দিক দিয়ে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। তবে তাঁদের কর্ত্তব্য এই সুরু, আরও অনেকদূর এগোতে হবে—সবে গ্রন্থিবন্ধন হয়েছে, এবার সহ-অবস্থান শুধু নয় সক্রিয় সহযোগিতা চাই, আর তার পৌরোহিত্য করতে হবে সাহিত্য আকাদেমিকে, তবেই সার্থক হবে সাহিত্য-প্রদর্শনী।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

শ্রীকালিদাস রায়

নগরে আমার কর্ণ পায় না বিশ্রাম
পথে ছুটে কত যান—ফায়ার ব্রিগেড, ট্রাক, ট্রাম।
শিঙা বাজাইয়া ধায় লরি, বাস, হাজার মোটর।
কোমলতা কোথা? লোহা ইট কাঠে, সকলি কঠোর।
সর্ব্ব বর্ণ দেখি এক শ্যামলতা ছাড়া।
ছুটে লক্ষ লক্ষ লোক পেয়ে যেন রাক্ষসের তাড়া।
চিম্নিতে উঠিছে ধূম, পণ্যভরা দোকান হাজার
সমগ্র শহরে যেন বানায়েছে একটি বাজার।
রণক্ষেত্র বলি হয় ভ্রম,
হেথা মানুষের দেখি দুর্গতি চরম।
কি লিখিব এই সব নিয়ে?
মোর কবিচিত্ত হেথা জাগে না উঠে না সাড়া দিয়ে।

এই পরিমণ্ডলের গণ্ডীপারে সেবি' মুক্ত বায়ু
শান্ত হয় উত্তেজিত স্নায়ু।
দেখি সেথা চাষী চষে, জেলে ফেলে জাল
তাঁতী তার তাঁত বোনে, মাঝি ধরে হাল।
হাতে তারা কাজ করে সাথে তার মুখে গান গায়;
মাতে তারা পর্ব্বদিনে, রাতে তারা বাতি না জ্বালায়।
মাঠে গোঠে গোরু চরে, ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল,
মার কোলে শিশুসম শাখা হ'তে দুলে পাকা ফল।
কলসী খেজুরগাছে, তালগাছে বাবুয়ের বাসা;
শুনি সেথা মক্ষীদের পক্ষীদের কল কণ্ঠে ভাষা।
চাল ফুঁড়ে উঠে ধূম, কাল কারো নয় ঘড়িধরা;
নাই পথে হট্টগোল, নাই কোন ত্বরা।

শ্রমিকের মত যেন কারখানা হতে মুক্তি পেয়ে
এখানে আমার চিত্ত উঠে গান গেয়ে।
মনে হয় গদ্য থেকে যেন সে ফিরিল কবিতায়
পঙ্ক থেকে কুঞ্জে যেন, খাঁচা থেকে যেন নীলিমায়।
যেন সে বিদেশ থেকে ফিরিল ভারতে
কারাগার থেকে যেন মুক্ত হয়ে আসিল সে পথে।
ঝি'র কোল থেকে যেন মার কোলে বাড়াল সে হাত
এইত স্বদেশ মোর, নগর-ত নকল বিলাত।
এরি পাঠশালে মোর বিদ্যা হ'ল সুরু
এরই গান গাহিবার দীক্ষা মোরে দিল কবিগুরু।
তাই আমি গেয়ে যাব, ঘুচিবে না আমার স্বভাব,
বিজাতির বৈতালিক চারণের হবে না অভাব।
সারা জগতের কবি তারা হ'তে চায়
বাঙলারই কবি হয়ে তাই রয়ে লইব বিদায়।
যে ভাষায় তারা গাবে সে ভাষা এ ভাষা কভু নয়
আমার ভাষার সাথে তাদের রবে না পরিচয়
হয়ত আমার ভাষা গণ্য হবে পালিভাষা সম
বিলুপ্ত ভাষার অন্যতম।
এ ভাষাই শিখালেন পিতা-পিতামহ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে জানি ভয়াবহ।

শেষ পাণ্ডুলিপি

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সকালের টিউশনি ও দশটা হইতে বেলা চারটা পর্য্যন্ত আপিসে কলম পিষিয়া আসিয়া আমি আর বড় একটা কোথাও বাহির হই না। প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া ছাদে খোলা বাতাসে শুইয়া পড়ি। দীনবন্ধু লেনের ভিতর এমন সুন্দর ছাদওয়ালা বাসা যে পাইব তাহা আমার কল্পনাতীত। দোতলায় দুখানি ঘর, একটি রান্নাঘর, আর তাহারই সম্মুখে ছোট্ট ছাদখানি আমার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। গৃহিণী সেই ছাদে গুটিকয়েক ফুলের টব বসাইয়াছেন। একটি টবে তুলসী গাছ আর কয়েকটি টবে ফুলগাছ। গৃহিণী নিজেই গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেন—গাছে জল দেন। গাছে ফুল ফুটিলে সহর্ষে আমায় দেখাইয়া বলেন, ওগো দেখছ, কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। ওমা—একটা কি সুন্দর প্রজাপতি আবার এসে জুটেছে যে!—সত্যিই একটা সুন্দর প্রজাপতি তাহার নরম পাতলা অপরূপ দু'খানি ডানা মেলিয়া সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটির উপর আসিয়া বসিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই ইট কাঠ লোহা পাথর ঘেরা কলিকাতার এক নিভৃত ছাদে কি করিয়া রূপপিপাসু প্রজাপতি সন্ধান পাইল যে, এখানে ফুল ফুটিয়াছে। সিগারেটে মৃদু টান দিয়া বলিলাম—কাউকে সন্ধান দিতে হয় নি গো। রূপের আকর্ষণে ওরা ছুটে আসে। এটা ওদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলতে পার। নতুবা দীনবন্ধু লেনের অখ্যাত দোতলা বাড়ীর ছাদে একটা টবে ফুল ফুটেছে এর সন্ধান ওকে কে দিয়েছিল। ফুলের সুগন্ধ কি লুকোনো থাকে? হোক না এ কলকাতা—ইট-পাথর আর লোহার তৈরী। তবুও দেখ, কোত্থেকে এসে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক জায়গাটির সন্ধান পেয়েছে। যেমন আমি তোমাকে পেয়েছিলাম—

আমার গৃহিণী চারটি সন্তানের জননী, বয়স প্রায় ত্রিশ। কিন্তু আমার কথায় তিনি যেন হঠাৎ নববধূর মত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন।

বলিলাম—কেন? বর্দ্ধমানের অখ্যাত বন-জঙ্গলঘেরা চাপাডাঙ্গা গ্রাম কে জানত বল? কে জানত সেখানকার বন-জঙ্গল আলো করে তুমি রয়েছ। ঠিক এই প্রজাপতির মতই আমি ত ঠিক সন্ধান করে তোমায় নিয়ে এলাম। গৃহিণীর ত্রিশ বৎসরের দেহে খুশির তরঙ্গ বহিয়া গেল। একটু চাপা গলায় বলিলেন—যাও। থাক্—কি হয়েছে তোমার। ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে খেয়াল নেই বুঝি।—আমি পুত্রদের দিকে চাহিয়া, ভালমানুষের মত সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

সেদিন শনিবার। তাহার পূর্ব্বদিনে মাহিনা পাইয়াছি। তাই সকালবেলায় বাজার হইতে সেরখানেক মাংস আনিয়াছি। রাত্রে—আরাম করিয়া মাংস ভাত খাইয়া ছাদে শুইয়া সিগারেট টানিতেছি। আকাশে সুন্দর জ্যোৎস্না—চারিদিক ঠিক দিনের মত ধপ ধপ করিতেছে। টবের রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়াছে—ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছে। আমার দুই চোখ পরম আরামে প্রায় মুদিয়া আসিতেছিল। ছেলেরা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শুধু গৃহিণী তখনও রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজকর্ম্ম করিতেছিলেন। হঠাৎ ঘুমের আমেজ ছুটিয়া গেল। কে যেন সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—সুরেশদা, ও সুরেশদা—

গৃহিণী বলিলেন, ওগো শুনতে পাচ্ছ। তোমায় কে যেন ডাকছে—কড়া নাড়ছে। লুঙ্গিটা কোনমতে কোমরে জড়াইয়া বলিলাম—রাত দশটার সময় আবার কার কি দরকার পড়ল? ভাল আপদ—চটিজুতাটি পায়ে গলাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দরজা খুলিয়া বলিলাম, কে? কাকে চান?

লোকটি বলিল, কে সুরেশদা নাকি? আমি নীলকণ্ঠ—

নীলকণ্ঠ? নীলু তুমি এত রাত্রে কোত্থেকে এলে হে? নীলু তখন তাহার ছোট বিছানার বাণ্ডিল ও বোঁচকাটি লইয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সদর দরজা বন্ধ করিয়া, নীলকণ্ঠকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ছাদে আসিয়া বলিলাম, বস হে নীলু। তার পর এত রাত্রে কি ব্যাপার। দেশ থেকে এলে নাকি হে?

নীলকণ্ঠ আমাদের গ্রামের সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মশায়ের ছেলে। এতদিন গ্রামেই ছিল জানিতাম। গাঁয়ে ষষ্ঠীপুজো, অন্নপ্রাশন, বিয়ের পৌরোহিত্য করিত—আর দিনের বাকি সময়, যদু সাহার দোকানে বিড়ি বাঁধিত। জিজ্ঞাসা করিলাম—দেশ থেকেই আসছ ত—

নীলু বলিল, হাঁ। ট্রেনটা অনেক লেট ছিল—তাই হাওড়া পৌছতে দেরি হয়ে গেল। বাবা আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন—

বলিলাম, সে কাল দেখব। এখন হাতমুখ ধোও। দেখি

কিছু খাবার-দাবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। দোকানের খাবার খাইয়া নীলু বলিল, বাবা পাঠালেন। দেশে আর সুবিধে হচ্ছিল না। পুজোআর্চ্চা কে করাবে বলুন। গাঁয়ে লোক কৈ, যাদের ক্ষমতা আছে তারা শহরে চলে গিয়েছে। তাই বাবা পাঠালেন যদি কিছু কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দেন এই আশায়।—আমার বেশ ঘুম আসিতেছিল। নীলকণ্ঠকে বলিলাম, আচ্ছা, কাল সব কথাবার্ত্তা হবে। রাত হয়েছে এখন ঘুমিয়ে পড়—

সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মশায় আমাদের কুলপুরোহিত। তিনি ভাবিয়াছেন, আমি যখন কলিকাতায় সরকারী আপিসে চাকরি করি, তবে নিশ্চয়ই আমি একটা কেউকেটা ব্যক্তি। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মশায় জানেন না, আমার শক্তি কি সামান্য ও সীমাবদ্ধ। আমি সরকারের একজন নগণ্য চাকরে। আমি আমার দুই-একজন বন্ধুকে নীলুর সম্বন্ধে বলিলাম, কিন্তু কেহই নিশ্চয় করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিল না। নীলকণ্ঠ গ্রামের স্কুলে পড়িয়াছে এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে। সে ম্যাট্রিক পাস নহে বা ইংরেজী কিছু জানে না। তাহা নীলকণ্ঠের মুখেই জানিলাম।...

নীলকণ্ঠ আমার বাসাতেই আছে। দুই বেলা বাজার করে, দোকান হইতে এটা-ওটা কিনিয়া আনে। ইহারই মধ্যে সে গৃহিণীকে বেশ আপন করিয়া লইয়াছে; ছেলেমেয়েরা তাহার কাছে পড়াশুনা করে। নীলকণ্ঠ দেখি গৃহিণীকে একবেলা ছুটি দিয়া নিজেই হাতাবেড়ী লইয়া রান্না করিতে লাগিয়াছে।

বলিলাম—কি নীলু রান্না বিদ্যেটাও জানা আছে নাকি?

হাসিয়া নীলকণ্ঠ বলিল,সুরেশদা সবই কিছু কিছু জানি। ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিলেন তা জানেন ত। তার পর থেকে দুই বেলাতেই রান্নাবান্না, ঘরসংসারের কাজ সবই করতাম। ইচ্ছে ছিল ম্যাট্রিকটা পাস দেব কিন্তু তা হয়ে উঠল না। এখন আপনি একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে যে কোন একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে দিন দাদা। আমাদের অবস্থা জানেন ত সব—

আমি বলিলাম—তা ত জানি। তুমি ত বিয়েও করেছ। ছেলেপুলে ক'টি—

—একটি মাত্র ছেলে। গাঁয়ের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। বাবা বুড়োমানুষ আর পেরে ওঠেন না। গাঁয়ে ঘরে বারব্রত পুজোআর্চ্চ সব কমে গেল। দু' দু'বার অজন্মা হ'ল। বিঘেকয় যা জমি আছে তাতে হ'ল না কিছুই। দোকানে বিড়ি বাঁধতাম, কিন্তু তাতে কি সংসার চলে! তাই মনে করলাম, বাইরে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করে যাক। তাই চলে এলাম আপনার কাছে। এখন আপনি ভরসা।—আমি নীলকণ্ঠকে বিশেষ ভরসা দিতে পারিলাম না। যে রকম দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে কাহারও চাকরি জোটানো সহজ কথা নয়। তবুও নীলকণ্ঠকে কিছু আশা দিলাম; কিন্তু আজ কাল করিয়া আরও এক মাস চলিয়া গেল। দেশ হইতে নীলকণ্ঠের নামে পত্র আসিয়াছে, একখানি পোস্টকার্ড—তাহাতে তাহার স্ত্রী লিখিয়াছে—"তুমি কোন কাজকর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিলে কি? এখানে সংসার অচল। বাবা আর পারিয়া উঠিতেছেন না। শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাও।" সেই পোস্টকার্ডের অপর দিকে তাহার পুত্র আঁকাবাঁকা অক্ষরে বাবাকে লিখিয়াছে—"বাবা, তুমি কবে আসবে। আমার খুব মন কেমন করছে। কলকাতা থেকে আমার জন্যে একটা বল এনো।" আমি নীলকণ্ঠের পত্রখানি পড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, নীলু আজ তোমার বাবার নামে পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দাও। আমি মনি অর্ডারের ফরম লিখে দিচ্ছি; এই টাকা নাও। নীলু নিঃশব্দে টাকা লইয়া শূন্যপানে চাহিয়া রহিল।

দুপুরে নীলকণ্ঠ ঘরে থাকে না। উপরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়ায়। দেখে কলিকাতাকে—দেখে কলিকাতার ব্যস্ততা, কলিকাতার সমস্ত আবহাওয়ায় জীবন-সংগ্রামের তীব্র প্রতিযোগিতা। নীলু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে, খালি গায়ে মাথায় গামছা জড়াইয়া হিন্দুস্থানী রিক্সাওয়ালা সোয়ারী লইয়া ছুটিতেছে, মাথায় বিরাট মোট লইয়া মুটেরা হাঁটিতেছে। বড় বড় লরীতে স্তূপাকার মাল বোঝাই দিয়া, শিখ ড্রাইভার লরী চালাইতেছে। সমস্ত কলকাতা কর্ম্মকোলাহলময়। পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকানির্ব্বাহের প্রবল প্রতিযোগিতা। কয়লা ডেকে কাজ দিবে বলিয়া মজুর সর্দ্দার আজ নাকি তাহাকে দেখা করিতে বলিয়াছে। দেখিলাম, নীলকণ্ঠ এক পা এক পা করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কলিকাতার কোলাহলময় ভিড়ে মিশিয়া গেল।

সমস্ত দিন বাহিরে থাকিবার পর রাত্র প্রায় দশটার সময় নীলু বাসায় ফিরিতেই ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, আরে সমস্ত দিন কোথায় ছিলে বল ত? আমরা ত ভেবে মরি। শেষে গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়লে নাকি—

নীলু হাসিয়া বলিল, না দাদা। চাপা পড়লে ত সবই শেষ। তবে আর দুঃখকষ্ট কে ভোগ করবে বলুন? তা নয়—একটা চাকরি যোগাড় করে এলাম—

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলাম, বল কি? চাকরি যোগাড় করলে কোথায় হে?

নীলু বলিল, সে চাকরির কথা শুনলে হাসবেন। কয়লা

ডকে চাকরি নিলাম। দু'টাকা চার আনা রোজ। ওখানে দিন পনের ধরে ঘুরছি। আজ পাকা হয়ে গেল।

বলিলাম, কয়লা ডকে? সে যে ভীষণ পরিশ্রমের কাজ! সে কি পারবে?

নীলু বলিল, কি আর করি দাদা বলুন। যখন পাস-টাস করি নি, পিছনে কোন সুপারিশ নেই, তখন আপিসের চাকরি আমায় কে দিচ্ছে বলুন। কয়লা ডকের সর্দার বলেছিল বটে, এ সব পারবে না। এসব হিন্দুস্থানীর কাম—বিমারে পড়ে যাবে। কিন্তু দাদা, নাই বা পারব কেন? সুস্থ শরীর নিয়ে তো চুপ করে বসে থাকতে পারি নে। ছেলে, বউ, বাবা না খেয়ে মরবে আর আমি ঠুনকো বংশমর্যাদা আর পরিশ্রমের ভয়ে চুপ করে বসে থাকব, তা হয় না। বাবাকে একখানা চিঠি দিয়ে দেবেন—লিখবেন নীলু কাজ করছে, শীগগিরই টাকা পাঠাবে।

পর দিন নীলকণ্ঠ আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। তবে তাহার খবর মাঝে মাঝে পাই বটে।

সন্ধ্যার সময় নীলকণ্ঠ যখন সমস্ত দিনের কাজ সারিয়া তাহার ভুকৈলাস রোডের বস্তিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহাকে নাকি আর চেনা যায় না। কালো হাফ প্যান্ট আর ছেঁড়া কালিঝুলি মাখা গেঞ্জি সারা দেহে কয়লা মাখা। শুধু দেখা যায়, সাদা সাদা দাঁত, আর সাদা চোখ।

ডকের সর্দারেরা নাকি নীলকণ্ঠকে অনেক উপদেশ দেয় বলে, আপিসকা কাম দেখো ভাইয়া। এসব কাম বাঙালী পারে নাকি? তুমি ত বাবুমানুষ—তা এসব কেন? কিন্তু এই সব উপদেশ নীলু গ্রাহ্য করে না। সে আয়েসী নয়, শক্ত হাতে কোদাল ধরিতে পারে, হাল ধরিতে পারে আর এই কয়লা টানিতে পারিবে না? নিজের শরীর আর দশটা শক্ত হাড়ের উপর বিশ্বাস রাখে সে।

ভুকৈলাস রোড হইতে মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসে নীলু।

আমাকে সে কত কথা বলে। আর কিছুদিন পরেই নাকি দেশ হইতে বাবা, বউ, ছেলেকে লইয়া আসিবে। বস্তীর ভিতর দুখানি ঘর লইয়া সে বাসা বাঁধিবে, খোকাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবে। শোভা আসিবে—শক্তসমর্থ গোলগাল চেহারাতে লালপাড় সাড়ী মানাইবে ভাল। কপালে থাকিবে সিঁদুরের টিপ, সেবাপরায়ণ হাতে দুই দিনেই বস্তির দুইখানি ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে লক্ষ্মীশ্রী। ফালি উঠানের এক পাশে থাকিবে তুলসীমঞ্চ। সন্ধ্যাবেলায় শোভা শাঁখ বাজাইবে, তুলসীমঞ্চে মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিবে, স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনা করিবে। সমস্ত দিনের পরিশ্রম শোভার হাসিতে সার্থক হইয়া উঠিবে, আর তাহার পাঁচ বছরের ছেলে বাবলু—সে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে কলিকাতা দেখিবে। এমনি কত স্বপ্ন সে দেখে।

মাঝে মাঝে ছেলেদের জন্য প্লাষ্টিকের খেলনা, এই সব উপহার আনে। আমি অনুযোগ করি, এমনি করে পয়সা নষ্ট করো না নীলু।

নীলু বলে, নষ্ট নয় দাদা। ওরা আনন্দ পাচ্ছে এ কি কম কথা!—নীলু গল্প করে, চা খায়, তাহার কাজের কথা বলে। নীলু বলে, শুনেছেন দাদা, আমাদের ডক ইয়ার্ড ইউনিয়ন নাকি সেক্রেটারী বাবুকে ধরেছি। শিশিরবাবু বলেছেন, শীগগির একটা ভাল কাজ জুটিয়ে দেবেন। আমার হাতের লেখা দেখে, বাংলা-সংস্কৃত জানি শুনে খুব খুশী হয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের ইউনিয়ন থেকে একটা কাগজ বের হয়, তাতে আমার লেখা গল্প পড়ে আরও খুশী হয়েছেন।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, তুমি গল্প-টল্প লেখ নাকি হে?

নীলু সলজ্জে বলিল, হাঁ দাদা, লিখি। গাঁয়ে থাকতে অনেক গল্প কবিতা লিখেছি। সমস্ত একটা বাঁধানো খাতায় লেখা আছে।

বলিলাম, সমস্ত দিন এ হাড়ভাঙা খাটুনির পর আবার গল্পটল্প লেখ কখন?

—কেন রাত্রে। অনেক রাত ধরে লিখি, যখন সমস্ত শহর নিস্তব্ধ নিঃশব্দ, যখন সবাই ঘুমে অচেতন, তখন লিখি। আর সেই ত সময়—

বলিলাম, তোমার লেখা গল্পটা আমায় পড়িও নীলু। বাঃ তোমার যে এ দিকে আছে তা ত জানি নে!

মৃদু হাসিয়া নীলু বলিল, দাদা, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। এখন আমি ত পড়ে থাকি সেই ডকে। আমার বহুকালের ইচ্ছে একখানা বই ছাপিয়ে বের করি। আপনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

বলিলাম ঠিক না। আমি দশটা পাঁচটা কলম পিষি। ওসব সাহিত্যের খবর আর রাখবার সময় হয় না। কালে-ভদ্রে দু'একটা বই-টই পড়ি ঐ পর্যন্ত, তবে চেষ্টা করব। আজকালকার মস্ত লিখিয়ে বৃন্দাবন বাঁড়ুজ্যের নাম শুনেছ ত। যার বই সিনেমায় হচ্ছে, কত নাটক, কত উপন্যাস লিখেছেন। সেই বৃন্দাবনবাবু আমাদের আপিসেই কাজ করেন, তাঁকে না হয় বলে দেখব'খন।

নীলু অত্যন্ত আগ্রহভরে বলিল, দোহাই দাদা—মনে করে বলবেন। আমি না হয় আমার লেখা খাতাগুলো আপনাকে দিয়ে যাব। তিনি যদি সময় করে পড়ে দেখেন।

বলিলাম, আচ্ছা, আগে তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

নীলু উৎসাহভরে বলিল, বই আমি ছাপাবোই সুরেশদা। কেউ যদি না ছাপে তবে নিজের টাকায়ই ছাপাব।

—নিজের টাকায়? বল কি নীলু, বই ছাপাতে যে অনেক টাকা লাগে। এত টাকা কোথায় পাবে?

নীলু বলিল, এখন থেকে কিছু কিছু জমাচ্ছি যে—

—জমাচ্ছ? বল কি তুমি? সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, রাত জেগে লিখে তার পর ঐ গতর-জল-করা রোজগার থেকে টাকা জমানোর অর্থ কি বোঝ? এ যে আত্মহত্যার সামিল। আমি বলি, যদি বাঁচতে চাও তবে ঐ কাজ ছেড়ে অন্য চেষ্টা কর। ঐ সামান্য পয়সা থেকে বই ছাপবার জন্যে আর জমিয়ো না। শেষে মারা পড়বে যে।

ইহার পর প্রায় দুই মাস আর নীলু আমার বাসায় আসে নাই—আমার সহিত তাহার দেখাও হয় নাই। সে যে কোথায়, কি তার ঠিকানা, বা এখন কি কাজ করিতেছে, তাহাও জানি না। একদিন দেশ হইতে সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—আমি নীলুর খবর আজ এক মাসের উপর পাই নাই। তাহাকে দুই-তিনখানি চিঠি দিয়াছিলাম, কিন্তু একখানারও উত্তর আসে নাই। বৌমা কাঁদিয়া কাটিয়া পাগলের মত হইয়াছে, ছেলেটি বাবার জন্য খুব অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ ডাকঘরে গিয়া খোঁজ লয় যে, তাহার বাবার কোন পত্র আসিয়াছে কিনা। কিন্তু কোন খবর নাই। তাহার জন্য আমরা বড়ই উৎকণ্ঠিত। ইহা ছাড়া এখানে হঠাৎ বন্যায় সমস্ত ধান ফসল ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা নিদারুণ কষ্টে আছি।

চিঠিখানি পড়িয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।

সেইদিনই আপিস হইতে নীলুর পূর্ব্ব ঠিকানা সেই ভূকৈলাস রোডে খোঁজ লইতে চলিলাম। বৈকাল হইয়া গিয়াছে—ট্রাম, বাস সমস্ত ভর্ত্তি। রাস্তায়ও অসম্ভব ভিড়। রাস্তার দুই পাশে, অসংখ্য পানের দোকান, আর সস্তা হোটেল। চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ সমস্তই বেজায় নোংরা। সমস্ত রাস্তা প্যাচপেচে, কাদা জল আর পানের পিকে যেন নরক হইয়া উঠিয়াছে। বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, ছেঁড়া কাগজে চতুর্দ্দিক আরও নোংরা হইয়াছে। কলিকাতা শহরের এই আর এক রূপ দেখিয়া, চমকাইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, ইহার চেয়ে যে কোন এঁদো গ্রামও ভাল। সেখানে বাতাস আছে, আলো আছে। কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশা পরিবেশ—এ যেন কেহ গলায় দুই হাত দিয়া টিপিয়া, দম বন্ধ করিয়া দিতেছে। আমি পকেট হইতে, নীলুর ঠিকানাটা বাহির করিয়া চোখ বুলাইয়া লইলাম। এ গলি—সে গলি করিয়া, অবশেষে বস্তির ভিতর একখানি খোলার ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলাম—নীলকণ্ঠ—ও নীলু ঘরে আছ নাকি হে?

—কে? ভেতরে আসুন। আমি কোনমতে মাথা হেঁট করিয়া, সেই জীর্ণ খোলার ঘরে ঢুকিয়া, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

—কে সুরেশদা!—অস্পষ্ট আলোয় তাকাইয়া এইবার দেখিলাম, একটা ভাঙ্গা খাটিয়ার উপর নীলু শুইয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা হয় নাই তবুও ঘর অন্ধকার। বাতাস আসিবার পথ নাই। একটা স্বল্প-পরিসর ক্ষুদ্র জানালা মাত্র। নীলু একটা মোমবাতি জ্বালাইল। মোমবাতির মৃদু আলোয়, নীলুর চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। এ কি চেহারা হইয়াছে নীলুর। মাথায় বড় বড় চুল—সমস্ত মুখ খোঁচা খোঁচা গোঁপদাড়িতে আচ্ছন্ন। লোহার মত সেই শক্ত শরীর আর নাই, কে যেন ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিয়াছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম, এ কি চেহারা হয়েছে হে! কি অসুখ?

নীলু হাসিয়া বলিল, হঠাৎ একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে জ্বর। আমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, শুষ্ক মুখ শীর্ণ নীরক্ত বর্ণহীন। দুই চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, মাথায় রুক্ষ লম্বা লম্বা চুল।

বলিলাম, ভট্টাচার্য্য মশায় চিঠি দিয়েছেন তোমার খোঁজ করতে।

—জানি। বাবার দু'খানা চিঠিই পেয়েছি। কিন্তু কি উত্তর দেব। সুরেশদা আমি হেরে গেলাম। সত্যই হিম্মতে কুলোল না, পারলাম না ঢুকি, কঠিন মাটিতে টিকে থাকতে?

—তখনই ত বলেছিলাম নীলু। ওসব কাজ তোমার-আমার ধাতে সয় না। কিন্তু না নীলু তুমি দেশে ফিরে যাও। তোমার যা শরীরের অবস্থা, তাতে এই আলো-বাতাসহীন নরককুণ্ডে থাকলে বাঁচবে না। সেখানে একবেলা খেয়েও, সেখানকার আলো-বাতাসে তবু বাঁচবে কিন্তু এখানে আর না। দেশে ফিরে যাও নীলু, সেখানে তোমার বুড়ো বাবা বউ ছেলে পথ চেয়ে রয়েছে।

নীলু আস্তে আস্তে বিছানায় বসিয়া বলিল, আমার ছেলে আমার বাবলু, সে চিঠি দিয়েছে এই দেখুন তার হাতের চিঠি। আমি তার জন্যে খেলনা কিনেছি, একটা বল কিনেছি। আমি ফিরেই যাব, ফিরেই যাব।

বলিলাম, শুনেছ বোধ হয় দেশে এবার হঠাৎ বান হয়ে সব ভেসে গেছে।

—হাঁ, তাও শুনেছি। শুধু হাতে কি করে সেখানে দাঁড়াব, সুরেশদা। তাই দুদিন দেরি করছি। তিরিশটে

টাকা জমিয়েছি, একজনের কাছে জমা আছে। সে আজকালের মধ্যেই দেবে, ঐ টাকা পেলেই চলে যাব। হাঁ দাদা সেটার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন? সেই বই ছাপানোর ব্যাপারটা।—আমায় মিথ্যা কথা বলিতে হইল। একজনকে বলেছি তিনি খুব আশা দিয়েছেন। নীলু উৎসাহিত হইয়া বলিল, দাদা, আমি আমার প্রথম বইটার স্বপ্ন দেখছি। বাইরে আজও তার কোন আকার নেই, কিন্তু আমি দেখছি তার অবয়ব কি সুশ্রী, অক্ষরগুলি কি সুন্দর, ছাপা কি ঝকঝকে, আর পাতগুলো কি মসৃণ। সেই বইয়ে আমার জীবনের এই ত্রিশ বৎসরের প্রতি মুহূর্তের জ্বালা, যন্ত্রণা, অভাব, অনটন সবকিছু ফুটে উঠেছে। আমার নিজের দুঃখ আর অভিজ্ঞতা দিয়ে পৃথিবীর অগণিত দুঃখী মানুষের কথা তাতে ফুটিয়েছি। আমার ঐ বই দুঃখী বঞ্চিত মানুষের বেদনার ইতিহাস, তাদের লোনা চোখের জলের ইতিহাস। আমার প্রথম বই বাবলুকে উৎসর্গ করব।—সেই মৃদু আলোয় তাকাইয়া দেখিলাম, নীলুর মুখ উদ্দীপ্ত, ললাট প্রসারিত আর তার দুর্বল আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ। রাত হইতেছিল তাই সেদিনের মত চলিয়া আসিলাম।

ইহার পর কয় দিন নানান কাজে আর নীলুর খবর পাই নাই এবং সেও আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহার দেশে যাইবার কথা অথচ আজকাল করিয়া এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, নীলুর কোন সন্ধান পাইলাম না। তাই সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার ভুকৈলাস রোডে গিয়া তাহার বস্তির ভিতর ঢুকিলাম। আজ আর খোঁজ করিবার প্রয়োজন হইল না, গতবার আসিয়া তাহার ঘর চিনিয়া গিয়াছি। নীলুর ঘরের দরজা খোলা আর ভিতরটা অন্ধকার। ডাকিলাম, নীলু ও নীলকণ্ঠ। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নাই। কাহার নিকট খোঁজ লইব, তাহাই ভাবিতেছি। হঠাৎ অন্য ঘরের একজন বাসিন্দা তাহার দরজা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল কে—কাকে চান?

বলিলাম, নীলকণ্ঠ, যে এই ঘরে থাকত, তাকেই চাই।

লোকটি আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিল, ও নীলকণ্ঠ। তা আপনি কি কিছু জানেন না? তিনি ত নেই, মারা গিয়েছেন যে।

প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম, মারা গিয়েছে? নীলু মারা গিয়েছে—কবে?

—এই দিন-দুই হ'ল মশায়। মশাই, সে কি রক্ত! বিছানা বালিশ সব রক্তে একাকার। রাজব্যাধি হয়েছিল মশাই, যাকে বলে কালব্যাধি। ও মরা কি মশাই, কেউ ছুঁতে চায়। শেষে আমরাই না ক'জন মিলে—

বলিলাম, তার জিনিষপত্র ছিল যে, সে সমস্ত কোথায়?

লোকটি অত্যন্ত অশ্রদ্ধায়, মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিল, আঃ, জিনিষ তো ভারি, ফুটো বাটি একটা, টিনের মগ আর এনামেলের থালা। কাগজে জড়ানো ত্রিশটে টাকা ছিল তাই রক্ষে। সে সমস্ত খরচ হয়ে গিয়েছে মশাই। লোকজনকে দিতে হয়েছে, দু-এক বোতলের দামও দিতে হয়েছে নইলে ও মড়া কে ছোঁবে মশাই। আপনি কে হন তার?

একটা আর্ত্ত চীৎকার গলা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। ভিতরের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনকে কোনমতে চাপিয়া বলিলাম, আচ্ছা কতকগুলো লেখা খাতা ছিল সে সব কৈ? সেই সব খাতাগুলো?

লোকটি বলিল, হাঁ, হাঁ, কতকগুলো খাতা ছিল। দোয়াত-কলম লেখা খাতাপত্তর সব তার সঙ্গে চিতেয় দিয়েছি। কি হবে ওসব বাজে কাগজ কতকগুলো রেখে বলুন। আর ওতে যে মশাই রাজব্যাধির বীজ, তাই যার জিনিস তার সঙ্গেই দিয়ে দিলাম।

রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিলাম, বেশ করেছ, খুব করেছ

লোকটি হঠাৎ আমার রাগের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া গেল। আমি আর তাহার দিকে না চাহিয়া রাস্তায় হাঁটিতে লাগিলাম। গলির মুখে দেখিলাম, এই বস্তিরই একটি ছেলের হাতে একটা প্লাষ্টিকের বাঁশী আর একটি রবারের বল। মনে হইল, এই দুটি খেলনা, বোধ হয় নীলু তাহার ছেলে বাবলুর জন্যই কিনিয়াছিল।

বাংলা 'রম্যরচনা'

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন হতে পারে সাম্প্রতিক কালে বহু-আলোচিত রম্যরচনার স্বরূপ কি? এর রূপ একটি, না বহু? রম্যরচনার গঠনভঙ্গী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর গঠনের মধ্যে রয়েছে অলস ও এলোমেলো ভঙ্গিমা ও স্বচ্ছন্দভাব, বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণশীলতা। সাহিত্যিক পত্র রচনাও এই রম্যরচনার অন্তর্গত একই ধরনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য। গঠনভঙ্গীর মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট কল্পনা বা পদ্ধতি মেনে না চলার প্রয়াসের জন্য এই সাহিত্যকর্ম একরূপী না হয়ে, হয়ে উঠেছে বহুরূপী। পত্ররচনার প্রাক্কালে মানুষ যেমন নিজেকে বিস্তারিত করে তোলে, করে তোলে সংযমের রূপরেখাগুলির প্রতি উদাসীন—নিজেকে প্রকাশ করে উজাড় করে আত্মগতির প্রেরণায়, রম্যরচনাতেও শিল্পী-মানস তেমনি সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গদ্যরচনার অন্যান্য ক্ষেত্রে পালিত ও পালনীয় নিয়মকানুনগুলিকে অস্বীকার করে। শিল্পীর রচনাশৈলী স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এই সংযমের বাঁধ না মানার জন্য। নাটক ও ছোটগল্পে শিল্পী থাকেন পর্দার অন্তরালে; চরিত্রগুলিকে ও ঘটনাভাগকে পরিচালনা করেন নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে। উপন্যাসে, কখনও কখনও শিল্পী হঠাৎ যবনিকার অন্তরাল বা রঙ্গমঞ্চের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে সরে যান রসপিপাসু মনের কৌতূহল জাগিয়ে। কিন্তু রম্যরচনার ক্ষেত্রে লেখক নিজেই পাত্র বা পাত্রী হয়ে পাঠকের সামনে হাজির হন। শিল্পী ও শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে যায় এক আত্মিক একযোগে যুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন রম্যরচয়িতার প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন হলেও তাদের নিজেদের প্রকাশ করার প্রবৃত্তির মধ্যে দেখা যায় একটি ঐক্য। কোন রচয়িতা চিঠির আকারে, কেউ বা জনান্তিকের মাধ্যমে, কেউ সাংবাদিকতার প্রচ্ছদপটে, কেউ বা নিছক রসচিত্রের মধ্য দিয়ে, কেউ বা খোলাখুলি মনের এক একটি বিশেষ ভাবকে রসাত্মক গদ্যের আকারে রম্যরচনায় পরিবেশিত করে তোলেন। রম্যরচনায় বিষয়বস্তু নিতান্তই গৌণ, রচনাশৈলীই মুখ্য। পৃথিবীর যে-কোন বিষয়বস্তু নিয়ে রম্যরচনা করা চলে, যদি থাকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের আত্মিক যোগ যা দেয় শিল্পীর শিল্পে বিশেষ এক শৈলী ও ভঙ্গিমা। এই শৈলী বা ভঙ্গিমা হ'ল রম্যরচনার প্রাণবস্তু। এই প্রাণবস্তু যে লেখকের রচনায় যত বেশি প্রদীপ্ত সেই লেখক হয়ে উঠেন তত বেশী বরণীয়।

অনেকের মতে রম্যরচনা ফরাসী বাক্যাংশ Belles letters-এর দিশী প্রতিচ্ছবি। Belles letters-এর উপযুক্ত ইংরেজী প্রতিশব্দ আছে বলে মনে হয় না, এর থেকে ধরে নেওয়া যায় ইউরোপে, ফরাসীদেশে Belles letters রচনার একটা রীতিমত প্রসার ছিল, যেমন ছিল সনেট রচনার বিশেষ আদর ইটালীতে। এক এক দেশে এক এক প্রকার রচনার প্রচলন ও আদর থাকে। এর প্রভাব পড়ে অন্যান্য দেশের উপর এবং এই প্রভাব তীব্র হয়ে দেখা দেয় যুগের আবহাওয়া ও পাঠকসমাজের তাগিদের ফলে।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গি। সভ্যতার অগ্রগতি, সমাজের চাহিদা ও সাহিত্য এবং শিল্পের কল্প ও টেকনিক পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। সভ্যতার এই অগ্রগতির ধারার সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে সাহিত্যেরও 'কল্প' বদলেছে। প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে আজ উপন্যাস—গদ্যরচনার এক বিশেষ কল্প, কিন্তু আজকের দ্রুতগতি দুনিয়া সাহিত্যকল্পে আরও এগিয়ে যেতে চায়, তাই চলে নব নব এষণা—কখনও সম্পূর্ণ নূতনকে সৃষ্টি করে, কখনও বা পুরাতনকে নূতনের সাজে সাজিয়ে। আধুনিকতম রম্যরচনা কিছু পুরানো এমনি এক সাহিত্যকল্পের নবরূপায়ণ। ইহা গতিবাদী পাঠকসমাজের শিল্পক্ষুধা কতখানি মেটাবে তা পূর্ণভাবে বিচার করার দিন এখনও আসে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গুরুগম্ভীর সাহিত্য পাঠের একটা তাগিদ দেখা দিয়েছিল পাঠকসমাজে। পৃথিবীব্যাপী আদর্শের সংঘাতজাত যুদ্ধ মানুষের মনে এনেছিল জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করার, বিশ্লেষণ করার তাগিদ আর এই তাগিদ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ঐজাতীয় সাহিত্যের চাহিদা। কিন্তু যুদ্ধশান্তির সঙ্গে এই চাহিদা ধীরে ধীরে হ্রাস পেল। পাঠকসমাজে এল একটি চাপল্য—অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে। গভীর সাহিত্য পাঠের ইচ্ছা—তা প্রবন্ধ মারফতই হোক বা উপন্যাসের মধ্য দিয়েই হোক, স্তিমিত হয়ে এল। অথচ পাঠক, বিশেষতঃ শিক্ষিতসমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে সাংবাদিক মানসিকতা, ফলে, নতুন ধরনের সাহিত্যকল্পের চাহিদা অনুভব করল পাঠকসমাজ। নিছক গুরুগম্ভীর রচনা পাঠে মন নেই, অথচ নিতান্ত হালকা গল্প ও উপন্যাস পাঠে সংবাদ মানসিকতার ক্ষুধা মেটাতে পারে না। পাঠকসমাজের এই মানসিক ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় হিসাবেই যুদ্ধোত্তর কালে পুনরায় শুরু হ'ল রম্যরচনার রেওয়াজ। রসপিপাসু মন ও সাংবাদিক মানসিকতার মিলনের ফলে চালু হ'ল রম্যরচনার যুগ। গভীরতার স্থলে এল চোখঝলসানো চটকদারী সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি রম্যরচনার প্রাণবস্তু হ'ল তার রচনাশৈলী ও ভঙ্গী। ভাব এবং বিষয়বস্তু এখানে গৌণ। তাই আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র বাদ দিলে এমন রম্যরচনা কমই দেখা যায়, যার বিষয় বা ভাববস্তু চিরন্তন কোন সুর সৃষ্টি করে পাঠক-মনকে নাড়া দিতে পেরেছে। যদি কোন রম্যরচনার মধ্যে এই চিরন্তন সুর বা শাশ্বত কোন বাণী তুলে ধরা সম্ভব হয়, তবেই

রম্যরচনার দ্বারা সাহিত্য-জগতে স্থায়ী কোন সৃষ্টি সম্ভব হবে, যেমন সম্ভব হয়েছিল মহাকাব্যের পক্ষে। সাধারণতঃ রম্যরচনায় এই শাশ্বত সুর সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না—হয় অতি আত্মকেন্দ্রিকতা, আর না হয় সংবাদ-মানসিকতার জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই আলগা একটা রসের আমেজ পাঠক-মনে সৃষ্টি করে স্রষ্টার কাজ শেষ হয়। গভীর ভাব ও বিষয় পরিবেশনে প্রয়োজন হয় গভীর ও স্থির অন্তর্দৃষ্টির আর না হয় দূর-প্রসারী মননশীলতার। কিন্তু রম্যরচয়িতার মন রম্যরচনা সৃষ্টিকালে থাকে লঘু ও এলমেলো—যা গভীর ভাবগ্রাহিতা ও দূর-প্রসারী মননশীলতার পরিপন্থী; ফলে চোখঝলসানো ও ক্ষণদীপ্ত রচনাশৈলীজাত রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। এর বেশী আশা করলে রম্যরচনা রচয়িতার মানসিক ভঙ্গীকে ভিন্ন রূপ নিতে হবে—তখন রম্যরচনা আর রম্যরচনা না থেকে হয়ে উঠবে অন্য কোন সাহিত্যকর্ম।

কবিতার মত রম্যরচনাকেও ব্যক্তিক (Subjective) এবং নৈর্ব্যক্তিক (Objective) রচনাতে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিক রম্যরচনা অনেকটা গীতিকবিতার মত—এখানে লেখকের আত্মরতি বা আত্মবিকলন মুখ্য হয়ে ওঠে। লেখক হয়ে ওঠেন সম্পূর্ণ ভাবে আত্মকেন্দ্রিক। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে বুদ্ধদেব বসুর "হঠাৎ আলোর ঝলকানি"তে। অতি সাধারণ দৃশ্য বা বস্তু কিংবা ঘটনা কিভাবে লেখকের মনে ভাবপ্লাবন ঘটায়, কিভাবে লেখক আবেগ-প্রবণ হয়ে ওঠেন তার পরিচিতি মেলে উল্লিখিত রচনাসঙ্কলনে। কেমন করে "হ্যারিসন স্ট্রীটে এক ফালি চাঁদ" লেখকের মনে ভাবঘূর্ণি সৃষ্টি করে তারই সন্ধান পাওয়া যায় এই গীতিকবিতাধর্মী গদ্যে। লেখকের উক্ত সঙ্কলনের অনেক রচনারই এমনি গাঁথুনি বা বিন্যাস, এমনি ভাবধর্ম যে, পংক্তিগুলি যদি স্তরে স্তরে সুসম্বদ্ধ ও কিছু অদল-বদল করে সাজানো যায় তা হলে ঐগুলি হয়ে উঠবে এক একটি গদ্য কবিতা। এই ধরনের রচনার এমনি প্রকৃতি যে, তা ছন্দে রূপ নিলে হয় গীতিকাব্য আর গদ্যে রূপ নিলে হয় রম্যরচনা—কেবল মাত্র কাঠামোর পার্থক্য। কবিতায় মিল ও ছন্দের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আকুলতা যেমন জন্ম দিয়েছে গদ্যকবিতার তেমনি গদ্যের ক্ষেত্রে কাঠামোর নিগড় থেকে লেখকের নিজেকে মুক্ত রাখার আকূতি সৃষ্টি করেছে রম্যরচনা। এইখানে দুই প্রকারের সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একটা ভাবগত বা সৃষ্টিগত মূল ঐক্য। কাঠামোর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার প্রয়াস থেকে এই উভয় প্রকৃতির রচনার জন্ম। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, উভয় প্রকৃতির রচনাই কাঠামোর কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। গদ্যকবিতায় যেমন আছে সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন ছন্দ তেমনি রম্যরচনায় আছে নিজস্ব দু-একটি ধর্ম। যেখানে স্বাধীনতা বেশী সেখানে প্রয়োজন হয় স্বাধীনতাকে সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা। গদ্যকবিতায় বাহ্যিক ছন্দের ঝলমলানি অল্প বলে প্রয়োজন হয় পাকা কাব্যশিল্পীর দক্ষ হাতের কারুকাজের। রম্যরচনাতেও স্বাধীনতা অপরিসীম থাকায় রম্যরচনাকে সার্থক করে তোলার জন্য দরকার হয় আত্মশিল্পীর—যিনি আবেগ ও ভাবোন্মত্ততার রাশ টেনে ধরতে পারেন ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে। শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্তর্নিহিত একটি প্রধান গুণ হবে সংযম, তাই রম্যরচনার ক্ষেত্রে আতিশয্য দেখাবার অবকাশ থাকলেও সংযমের স্বীকৃতি রম্যরচনাকে করে তোলে অধিকতর সার্থক। প্রসঙ্গতঃ যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র সঙ্গে রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'র তুলনা করা যেতে পারে। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র মধ্যে আছে বুদ্ধির দীপ্তি ও চমকের সঙ্গে সঙ্গে পরিমিতি বোধের পরিচয়। কিন্তু 'শীতে উপেক্ষিতা'র মধ্যে রচনাশক্তির সম্প্রসারণশীলতা পরিমিতির কোঠা ছাড়িয়ে গেছে অনেক স্থানেই। তা ছাড়া নিজেকে বিশেষ একটি চঙের সঙ্গে জাহির করার প্রয়াস মাঝে মাঝে অতিপ্রকট হয়ে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায় রচয়িতার নিজেকে অতি প্রকাশচেষ্টা রসসৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকারক। উল্লিখিত উভয় রচনাই নৈর্ব্যক্তিক।

প্রসঙ্গক্রমে যখন আমরা নৈর্ব্যক্তিক রচনার কথায় পৌঁছলাম তখন সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ব্যক্তিক রম্যরচনায় যেমন ব্যক্তি হয়ে ওঠে প্রধান, নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায় তেমনি সংবাদিক মানসিকতার পরিবেশন হয়ে ওঠে মুখ্য। কিন্তু রচয়িতা মানুষ হিসাবে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর চোখের মধ্য দিয়ে পাঠককে রচনার বিষয়বস্তুর রস আহরণ করতে হয়। লেখক নিজস্ব মনের মাধুরী মিশিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেন। তার মনের প্রতিক্রিয়ার রঙ দেখা যায় বিষয়-বস্তুর উপর অন্যথা রচনাগুলি হয়ে উঠত নিছক সংবাদ বা তথ্য—যেগুলিকে খবরের কাগজের রিপোর্টের মূল্য দেওয়া ছাড়া অন্য কোন মূল্য দেওয়া যাবে না। নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনাগুলির চরিত্র অনেকটা হয়ে উঠে বর্ণনাধর্মী উপন্যাসের মত। এই প্রকৃতির উপন্যাসে লেখক উত্তম পুরুষ হয়ে বর্ণনা করে যান উপন্যাসের আখ্যান, গতি ও ধারা।

ব্যক্তিক রম্যরচনাকে যদি তুলনা করা যায় গীতিকবিতার সঙ্গে তো নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনাকে তুলনা করা যাবে চিত্রধর্মী গল্প বা উপন্যাসের সঙ্গে। চিত্রধর্মী কথাসাহিত্যে যেমন চরিত্রাবশ্লেষণ এবং আখ্যানপরিবেশন অপেক্ষা বিভিন্ন বস্তুর চিত্রাঙ্কন করাই প্রধান হয়ে উঠে তেমনি ঐ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায় বাহ্য-জগতের বাস্তব রূপ খণ্ড খণ্ড ছবির মারফতে পরিবেশিত হয়। এই ধরনের বস্তুগত ঐক্য বা বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে কোন ঐক্যের সন্ধান-প্রয়াস সব সময়ে করা হয় না। একমাত্র ঐক্য হ'ল লেখকের নিজস্ব মনের প্রতিক্রিয়া ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী কখনও পরিচ্ছন্ন, কখনও বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশমান হয় পাঠকের রস-সন্ধানী মনে।

নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দু'টি মূল উপাদান—সাংবাদিক মানসিকতা বা রসাপ্লুত মনের প্রতিক্রিয়া ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই কয়েকটি উপাদানের জন্যই আজকের দিনের চঞ্চল, গতিবাদী ও বাস্তবপন্থী অথচ চিরন্তন রসপিপাসু মন খুঁজে পায় একই সঙ্গে রসপিপাসা ও তথ্য-বুভুক্ষা মেটাবার খোরাক। কিন্তু রম্যরচনার বিকীর্ণদীপ্ত জিজ্ঞাসু মনে ক্ষণস্থায়ী

ছটার সৃষ্টি করে চকিতে মিলিয়ে যায় চলন্ত বাষ্পযানের যাত্রীর চোখে পরি-দৃশ্যমান বাইরের অপস্রিয়মাণ বস্তুপুঞ্জের মত। এর মূল কারণ হ'ল রম্যরচনায় সাধারণ তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্যের উপরে গুরুত্ব দেওয়া—গভীরতা অপেক্ষা ব্রিলিয়ান্স বা ক্ষণস্থায়ী দীপ্তির উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করা। নতুন কর্ম্ম সৃষ্টির মোহ সৃজনশীল শিল্পীর মনে যে প্রেরণা যোগায় তার থেকে জন্ম নেয় নব নব রূপ। তাই আজকের অনেক জীবনীধর্ম্মী বা আত্মজীবনীধর্ম্মী রচনাও রম্যরচনায় কোঠায় এসে পৌঁছেছে।

কালানুক্রমিকভাবে বাংলা রম্যরচনার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে আমাদের যেতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর যুগে। তবে বঙ্কিমের উক্ত রচনার কিছু পূর্ব্বে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রম্যরচনাধর্ম্মী ভ্রমণকাহিনী 'পালামৌ' তৎকালীন পাঠক-সমাজের মনোরঞ্জন করেছিল—একথা স্বীকার করতে হবে! বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর এক সময়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কমলাকান্ত নামক এক কল্পিত অহিফেনসেবী ব্রাহ্মণের কল্পনাজালে ধরা দিয়েছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ত্রুটি ও গলদের এমন এক রূপ যা বঙ্কিমের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দূরদর্শিতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির অকাট্য প্রমাণ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গলদগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিম ছিলেন বিশেষ সজাগ এবং তাঁর শিল্পীসুলভ মানবতাবোধ চেয়েছিল এই ত্রুটিগুলির অবসান। এই মনোভাব থেকে সৃষ্টি হয় কমলাকান্তের 'ছোট চোর' এবং 'বড় চোরে'র উপর অতি কঠিন ও সত্য মন্তব্য। কমলাকান্তের দপ্তর রম্যরচনার কোঠাভুক্ত হলেও এর মধ্যে আছে এমন কতকগুলি সাহিত্যগুণ ও তত্ত্ব যা স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে আসন পাওয়ার দাবি রাখে। এ রচনাটির বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, ভঙ্গী ও শৈলীর দিক থেকে এ রম্যরচনাজাতীয় হলেও বিষয়বস্তু এবং ভাবসম্পদের দিক থেকে এ গুরুগম্ভীর সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। এখানে রয়েছে এই রচনাটির স্থায়িত্ব দাবি করার কারণ। এ ধরনের সাহিত্যকর্ম্মের নজির অল্পই মেলে। অনেকেই এখানির সঙ্গে ইংরেজ লেখক ডি কুইন্সির "Confessions of an Opium-Eater"-এর তুলনা করেন। রচনায় বর্ণনাকারী পাত্রের মনে মায়া (Delusion) বা দিবাস্বপ্নের মধ্যে যে সমস্ত সত্য বা তত্ত্ব দেখা দেয় তা এক বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরিবেশন করা হ'ল এই ধরনের রচনার বৈশিষ্ট্য। এই রচনাগুলির প্রকৃতিই হ'ল এই যে, এগুলির সাহায্যে লেখক নিজস্ব মতামত বা উপলব্ধিগত সত্য, অন্য ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা শ্রেণীকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত না করে পাঠকসমাজের নিকট তুলে ধরতে পারেন। এই ধরনের রচনা আজকের দিনের অনেক সংবাদ বা সাময়িকপত্রে অনুসৃত হয়। তা ছাড়া অধুনা-প্রচলিত হাস্যরসাত্মক অনেক ছোট গল্প ও নাটিকায় এই কর্ম্ম ব্যবহার করার রেওয়াজ চলেছে। অনেক স্থলে ছোটগল্প বলে এই রচনাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া হলেও প্রকৃতির দিক থেকে এগুলি নিছক রম্যরচনা ছাড়া আর কিছু নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর আমরা আসি রবীন্দ্রনাথের যুগে। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' যে রম্যরচনার পর্য্যায়ে পড়ে একথা আগেই বলেছি। ছিন্নপত্রের রম্যতার সঙ্গে গভীরতার এমনি সংমিশ্রণ ঘটেছে যে, এ রচনা স্থায়ী সাহিত্যের পর্য্যায়ে এসে পড়ে। বর্ত্তমান যুগে—ছিন্নপত্র রম্য-রচনার অপূর্ব্ব ব্যতিক্রম। এর প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথের মানসিক ভঙ্গী ছিল গভীরতাপ্রবণ, তত্ত্বের দিকে ছিল সহজাত আগ্রহ এবং এই সহজাত আগ্রহই তাঁর রচনাগুলিকে নিছক ব্রিলিয়ান্ট বা ক্ষণদীপ্ত রচনায় পর্য্যবসিত না করে পাঠক-মনকে টেনে নিয়ে গেছে জীবনের গভীরতার দিকে, তাই 'রাশিয়ার চিঠি' নিছক ভ্রমণ-কাহিনী না হয়ে হয়ে উঠেছে জীবন-কাহিনী।

ট্রানজিশন পিরিয়ড বা যুগসন্ধিক্ষণে মানসিক প্রশান্তি কাম্য হলেও আশা করা যায় না সব সময়ে। তাই ঐ সময়ের সৃষ্টিতে ধরা পড়ে প্রশান্তির বদলে চাপল্য, অস্থিরতা; প্রজ্ঞার বদলে ক্ষণদীপ্তি, বাকসংযমের পরিবর্ত্তে অতিবাগ্মিতা বা বাচালতা। আজকের সজ্বর্ষময় দুনিয়ার স্থির প্রজ্ঞার প্রয়োজন থাকলেও, তার পরিস্ফুরণের অবকাশ কোথায়? তাই জীবনের রম্যতার দিক নিয়েই আমরা তৃপ্ত, গভীরতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও পরিবেশ যে নিছক রম্যতারই অনুকূল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত রম্যরচনার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এর কারণ পূর্ব্বেই বিশ্লেষণ করেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য রম্যরচনার বই অন্নদাশঙ্কর রায়ের "পথে প্রবাসে" যেমন দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্বে তেমনি রচনাশৈলীর স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনা বাংলা সাহিত্যে অল্প নয়। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী সত্যিকারের সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে এমন রচনার সংখ্যা নগণ্য। "পথে প্রবাসে" ঐ সাহিত্য-গুণসম্পন্ন অল্প কয়েকটি এই জাতীয় রচনার অন্তর্গত। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্তাকে, তার বৈশিষ্ট্যকে অপূর্ব্ব নিপুণতার সঙ্গে এই বইয়ে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে রচনাটিতে। এ ছাড়া বুদ্ধি ও হৃদয়ের যে সামঞ্জস্য দেখা যায় তাও অল্প লক্ষণীয় নয়। লেখক ইউরোপীয় সভ্যতাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছেন, কিন্তু সে বিচার ছিল হৃদয়ের অনুভূতির জারকরসে জারিত। বিচারের সঙ্গে যদি সমন্বয় ঘটে অনুভূতির তা হলে সে বিচার হয় সত্যিকারের মানবিক, অন্যথা হয়ে ওঠে প্রাণহীন বিশ্লেষণমাত্র—উল্লিখিত গুণাবলীর জন্য পথে প্রবাসে বইখানিকে আধুনিকতম রম্যরচনার জাতে ফেলা যায় না।

আধুনিকতম রম্যরচনার সূত্রপাত দেখি যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র আবির্ভাবের সময় থেকে (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। সত্যই এ আবির্ভাব। রূপে, রসে, বর্ণবাহুল্যে মনোহারিণী এ রচনা। ক্ষণদীপ্তির বিদ্যুৎ-ঝলক এর সর্ব্বাঙ্গে। যুদ্ধক্লান্ত, গুরুগভীর বিষয়ে বিমুখ সাহিত্যরস-পিপাসু মানুষ এমনই এক চটকদার বহুবর্ণা বিলাসিনী মূর্তির আবাহনে আকুল হয়ে উঠেছিল। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' নৈর্ব্যক্তিক

রম্যরচনার অতি সুন্দর উদাহরণ। লেখক সাংবাদিকের ঢঙে সুরু করেছিলেন লেখনী-চালনা—কিন্তু শেষ হ'ল চটকদার এক সাহিত্য-কর্মে। দিল্লীর কোন সমাজ, কোন শ্রেণী তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। একের পর এক দিল্লীর মানুষ, দিল্লীর সমাজ, পথঘাট ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে লেখকের নিপুণ লেখনীর মুখে। তাই পাঠক স্বাদ নেয় ঐ রচনায় অন্তর্নিহিত সাহিত্যরসের, বাহবা দেয় দিল্লীর উন্নাসিক সমাজের উপরে লেখকের নিছক ব্যঙ্গাত্মক কশাঘাতের। কিন্তু লেখক কেবল সাংবাদিক ঢঙ দেখিয়েও ক্ষান্ত হলেন না—নিয়ে এলেন, প্রক্ষেপ করলেন রোমাণ্টিক এক এপিসোড বা আখ্যানভাগ—আধারকারের প্রেমজীবনের ট্র্যাজেডির কথা—রচনার সাংবাদিকতা ছিন্ন হ'ল এপিসোডের আঘাতে, ছোটগল্প চাপা দিল রম্যরচনাকে। আখ্যানটিতে গল্পত্ব যতটা না থাক, সাংবাদিকতাকে চাপা দিয়ে রোমাণ্টিক ভাব পরিবেশন করার প্রয়াস আছে প্রচুর। সাধারণ পাঠক মুগ্ধ হবে নিশ্চয়ই, জনপ্রিয়তার কারণ হয় ত এখানেই। কিন্তু আখ্যানভাগের এই প্রক্ষেপ নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনার প্রকৃতিকে দিয়েছে বিশেষ এক আঘাত।

দৃষ্টিপাত প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের রম্যরচনা পাঠকচিত্ত প্লাবিত করে চলল। দৃষ্টিপাত বইখানি প্রকাশের কিছু পরেই বার হয় রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'। পাঠক-সমাজ আগ্রহ নিয়ে এই রম্যরচনার আস্বাদগ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ঐ রচনায় 'দৃষ্টিপাতে'র ঢঙের অনুসরণ দেখা গেলেও শেষ পর্য্যন্ত এটি হয়ে ওঠে নি সার্থক শিল্পকর্ম। নৈর্ব্যক্তিক রচনা হিসাবে সংবাদ মানসিকতা পরিবেশনের ঢঙ নিয়ে সুরু হলেও লেখকের ব্যক্তিমানস হয়ে উঠেছে অধিকতর প্রবল। তার পর ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন আখ্যানভাগের সংযোজনা করে এটিকে পর্য্য-বসিত করা হয়েছে উপন্যাসধর্ম্মী রচনায় : ফলে এটি না হয়েছে খাঁটি রম্যরচনা, না হয়েছে কল্পনামূলক সার্থক রসরচনা।

এই দু'খানি আধুনিকতম রম্যরচনার কথা বলতে গিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনাধর্ম্মী ভ্রমণকাহিনী "দেশেবিদেশে" এবং "পঞ্চতন্ত্র", "ময়ূরকণ্ঠী" প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। দেশেবিদেশে ভ্রমণ-কাহিনীর পর্য্যায়ভুক্ত হলেও এখানি নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনারই জাত। বিশেষ একটি দেশের কথা বলতে গিয়েও লেখক এমন এক বিরাট মানসিক দিকচক্রবাল সৃষ্টি করেছেন যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে লেখকের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসশিল্পীর সূক্ষ্মানুভূতি, রম্য পরি-হাসের সঙ্গে আছে জীবনদর্শনের পরম গাম্ভীর্য্য। রম্যরচনা হিসাবে এখানিও একটি সুসমঞ্জস সৃষ্টি। আঙ্গিকগত কোন কনভেনশন বা প্রথাকে স্বীকার না করে, শব্দচয়নের সম্পূর্ণ মুক্ত মন নিয়ে রস ও তথ্য পরিবেশন করেছেন একই সঙ্গে লেখক। হয়ত অনেক স্থানে অনাবশ্যকভাবে উর্দ্দু, ফার্সী ও ইংরেজী শব্দ লেখক ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার সামগ্রিক প্রভাবের সার্থক দিক বিচার করলে শব্দ-চয়নের এই অতি স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ক্ষমার্হ বলে বিবেচিত হবে। লেখকের রম্যরচনাগুলির বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক। একটি নৈষ্ঠিক জাতীয়তাবাদী মন নিয়ে লেখক দুনিয়ার মানুষকে দেখেছেন বা দেখতে চেয়েছেন—বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু কোন স্থানে মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদের মাপকাঠিতে বিচার করতে বসেন নি। তাঁর বিচারবোধ মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই তাঁর রচনা চপল ও চটকদার হালকা ভঙ্গী নিয়েও মানুষের মনের গভীরে স্পর্শ করে। মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ রচনায় এই স্পর্শকাতরতার কারণ।

রম্যরচনার মধ্যে যেমন আছে আঙ্গিকগত শ্লথ বিন্যাস, সম্প্র-সারণশীলতা, ও শিথিল গাঁথুনি, তেমনি এতে ধরা পড়ে অনেক আধুনিক রচয়িতার অতীতমুখীনতা বা তার নিজস্ব ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ও স্থির জীবনদর্শনের অভাব। অবচেতন মনে চলতি জীবনের প্রতি বিক্ষোভ অর্থাৎ অগ্রগতির অনুপন্থী জীবনবেদকে মেনে না নেওয়ায় রচয়িতার দৃষ্টি পড়েছে অনেক স্থানেই অতীতের প্রতি। ফলে কেউ করেন আধ্যাত্মিক ভারতের সন্ধান, কেউ দেখেন জীবনের কল-কোলাহল থেকে পলায়নের স্বপ্ন, অন্ততঃ স্বল্পক্ষণের জন্যেও। রাণী চন্দের রম্যরচনাধর্ম্মী "পূর্ণকুম্ভে"র মধ্যেও ধরা পড়ে এমনই এক পলায়নী মন যা আধুনিক বুদ্ধিসঞ্জাত আবরণ ভেদ করে স্বকীয় রূপ প্রকাশ করে। তাই বিশেষ কোন ধর্ম্মমতকে লেখিকা প্রশ্রয় না দিলেও ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্য থেকে মানসিক ক্ষুধা মেটাবার খোরাক ও মানসিক ভারসাম্য আনবার উপায় তিনি খুঁজে বেড়ান। তাঁর লেখায় অধ্যাত্ম-ভারতের ছবি আমরা দেখি—যে ছবি দীপ্ত হয়ে উঠেছে, সাবলীল বর্ণনা ও শৈলীর গুণে।

এই রচনাটি সম্বন্ধে আলোচনাকালে কালকূটের "অমৃতকুম্ভের সন্ধানে"র কথাও এসে পড়ে। প্রায় একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে দু'জনের কাহিনী এগিয়েছে। কিন্তু লেখিকার লেখনী যেখানে মাঝে মাঝে ভাবপ্রবণতার ঘূর্ণি সৃষ্টি করে নিজেকে ও পাঠকসমাজকে ভাসি-য়াছে, লেখক সেখানে বিশ্লেষণের রাশ টেনে রচনায় অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবণতার গতিনিয়ন্ত্রণ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তাই লেখকের রচনা নৈর্ব্যক্তিক রচনা হিসাবে সার্থকতর। নৈর্ব্যক্তিক রচনায় লেখকের নিজস্ব মনের রঙের আধিপত্য সার্থক শিল্পকর্মের পরিপন্থী। কালকূটের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীও পলায়নী নয়। ভিড়ের মেলায় কুম্ভের আড়ম্বর ও আতিশয্যের মাঝে তিনি মানুষকে খোঁজার প্রয়াস করেছেন—মানব-বৈচিত্র্যকে আস্বাদ করার জন্য মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আকুল হয়ে ঘুরেছেন। কিন্তু তিনিও রচনাকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে সস্তা করতালি পাওয়ার মোহ ভুলতে পারেন নি। কোন পশ্চিমদেশীয়া তরুণীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে লেখক যে প্রেমোপাখ্যান রচনা করেছেন, তা কি সত্যিকারের নৈর্ব্যক্তিক রচনার ক্ষেত্রে পরিহার্য্য নয়?

রম্যরচনায় রসাত্মক চিত্ররচনাই প্রধান। যেখানে এই রসচিত্র উজ্জ্বল, লেখকের রম্যরচনা সেখানে সার্থক। একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীগত ঐক্যই রম্যরচনার অপরিহার্য্য উপাদান। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "দুয়ার থেকে অদূরে" সার্থকতর

সৃষ্টি—জীবনের কলকোলাহল থেকে লেখকের ক্ষণিক পলায়নের আকুতির প্রয়াস সত্বেও। এ রচনাটির মিষ্টতা ও সংবেদনশীলতা সত্যই অনুপম। রচনাশৈলীর মধ্যে সর্ব্বত্র সাবলীলতার পরিচয় না থাকলেও, লেখকের আন্তরিকতা, প্রতিটি ক্ষুদ্র বস্তুকে সর্ব্ব অন্তর দিয়ে স্পর্শ করার ইচ্ছা—তার অন্তর্নিহিত রূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস সত্যই অপরূপ। লেখক কলকাতার আশে-পাশে নিভৃত পল্লীলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যের সন্ধান করেছেন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু, অখ্যাত মানুষের পরিচয় লাভ করে অন্তের মধ্যে অনন্তের মহিমা উপলব্ধি করার ব্রতী হয়েছেন।

রম্যরচনার অনেক ক্ষেত্রেই থাকে রচয়িতার ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে দর্শনের প্রয়াস। ছোট ছোট বস্তুর পরিচয় কেমন করে লেখকমনে নানা রঙের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কেমন করে মানসিক দিকচক্রবাল বিস্তৃত হয়, কেমন করে লেখকের স্বকীয় রূপ প্রকাশ করতে প্রেরণা দেয় তার সন্ধান পাওয়া যায় ব্যক্তিক রম্যরচনাগুলিতে আর ইঙ্গিত মেলে নৈর্ব্যক্তিক রম্যরচনায়। কিন্তু রম্যরচনায় এই 'দর্শন' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষণিক আনন্দোপলব্ধির সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়। তবু এর সার্থকতা আছে—যেমন থাকে ধানের শীষের ওপর শিশির-বিন্দুর অস্তিত্বের সার্থকতা। সামান্য আঘাতে শিশির ঝরে যাবে ঠিকই, বেলা গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পায়িত হবে বিন্দুগুলি সূর্য্যের উত্তাপে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও যে সৌন্দর্য্য সেগুলি বিতরণ করে যাবে মাটির বুকে, পথিকমনে এনে দেবে যে স্নিগ্ধতার আমেজ ও স্পর্শ তার কি কোন মূল্যই নেই?

বাউল গান—২

শ্রীকামিনীকুমার রায়

১

গুরু তোরে কি ধন দিল চিন্‌লে না মনা,
তোরে রাং দিল না সোনা দিল পরখ করে দেখলে না।
গুরুর বাক্য অক্ষয় করে নেও তারে যতন করে,
করে নিশানা,
তোরে রাং দিল না সোনা দিল পরখ করে দেখলে না।
গুরু দিল কাঁচা সোনা রাং বলে তুই জ্ঞান করলে না
(ওরে দিনকানা) তোর সাধনের ধন পরশমণি
অসাবধানে পাবি না।
চণ্ডীদাস রজকিনী তারা হ'ল পরশমণি
রাং বানায় সোনা
তারা এক মরলে দু'জন মরে এমন হয় কয় জনা?

২

গুরু না ভজিয়া সংসারে কি লাভ বাঁচিয়া।
নিত্যি নিত্যি মরণ জীয়ন ঘুমেতে পড়িয়া,
এহি মত যাইবা তুমি ভাইবন্ধু ছাড়িয়া,
সংসারে কি লাভ বাঁচিয়া গুরু না ভজিয়া।
হিংসা নিন্দা কৈতব ছাড়, ছাড় ভবের মায়া,
চান্* বদনে হরি বল দুই বাহু তুলিয়া,
কি লাভ বাঁচিয়া?
ভেবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
গনা দিন ফুরাইয়া গেল কারবাঁ† রইলা চাইয়া
গুরু না ভজিয়া কি লাভ বাঁচিয়া।

৩

লইলে নায়ে দেহের খবর
দিন গেল বিফলে;
তোর গুরুর হাতের ছাপা জিনিষ
পরের হাতে সঁপিয়া দিলে।
দেহের আঠার কোঠা
কোঠায় কোঠায় ধন
হীরামণ মাণিক্য সোনা
আছে অগণন।

* চাঁদ
† কাহার দিকে

দেহে জ্বলছে বাতি দিবানিশি
সলতা ছাড়া বিনা তৈলে ;
শ্রীনাথ কান্দে মনের দুঃখে বাহেতে বসিয়া
তোর ঘরের জিনিষ ঘরে থইয়া,
ভূতের বেগার খেটে মলে।

৪

তিন বেড়ের এক বাগান আছে,
সেইখানে এক আজব আছে,
চন্দ্র সূর্য্য ফুল ফুইটাছে,
বোঁটা ছাড়া ফুল ঝুলছে গাছে।
বোঁটার মধ্যে আছে কাঁটা,
পাহারা দেয় ঐ ছয় বেটা,
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রে আঁটা,
গুরুর রূপে ঝলক দিছে।
গুরু ব্রহ্মরূপে গিল্টি করা,
প্রেমরসে আছে ভরা,
মরা মানুষ গাছে ঝুলে
রাধাকৃষ্ণ বলতে আছে।

৫

হল করা বিলাতি তাস খেলাও না মন,
দেশে আদর কম।
স্বদেশী গৌর আফিসে রাধাকৃষ্ণ ছাপা আছে,
খেল তাস মনের উল্লাসে ধর গুরুর শ্রীচরণ।
পঞ্চতত্ত্ব পাঞ্জা মেরে, পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে,
দীক্ষার গুণ কি শিক্ষার ধরে নয়নে হবে মিলন।
ছকাতে ছয় গোসাই হবে, সাতাতে রঙ্গ উঠাবে,
আটাতে মাল বন্ধ রবে, নলাতে দরজা বন্ধ,
দশেতে দশ দেবতা আছে, চিন্তা না তোর গুরুর কাছে,
মন টাকায় যা করাইতেছে, তাই করতেছে সর্ব্বক্ষণ।
নিত্যানন্দ সাহেব কয়, যেন হবে গদাধর,
তিরিতে ত্রিগুণ ধরে, ছকাতে বেদবিধি ছাড়।
সাধন কর ইস্তকবিন্তি, একশ' হাজার ছয়শ' গন্তি।
গণতিতে যার কমতি হবে সে পাবে মানুষ রতন।

৬

হৃদয় পিঞ্জরায় বসে, রাধাকৃষ্ণ বল না।
সে নাম তুমি বল আমি শুনি,
আমি বলি কেহ শুনে না।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে,
আটাশ অক্ষর যাও না ছেড়ে,
চার অক্ষরে রাধাকৃষ্ণ নাম,
সাধু জপে নাম জীবে জানে না।
হরির নাম বলতে বলতে,
আনন্দ বাড়িবে চিত্তে,
কৈতবজ্বালা যাবে দূরে,
নিরানন্দ গন্ধ দেহে রবে না।
ভেবে নিধিরাম বলে,
কেবা বলে, কেবা শুনে,
মনের দুঃখ রইল মনে,
মন মিলে, মনের মানুষ মিলে না।
সে নাম বলরে মন নিষ্কপটে,
পশু আত্মা যাবে কেটে,
মানুষ আত্মা বসবে ঘটে,
স্বভাব যাবে তোর অভাব রবে না।

৭

কি আশায় বসে রইলে মন,
গেল দিন অকারণ
ভজ শ্রীগুরুর চরণ।
তোর গনায় দিন হইল আহেরি
বেজে উঠল কালের ঘড়ি
আর দেরি করবে না শমন।
তোমার মুণ্ড দিয়ে দণ্ডের বাড়ি,
করবে রে বন্ধন।
যত মন করছ দর্প সকলি হইবে খর্ব,
কালসর্পে করতেছে গর্জন।
কোন্‌দিন জানি কালভুজঙ্গে অঙ্গে
করবে রে দংশন।
মন রে কারে বল আমার আমার,
মন তুমি কার কেবা গো তোমার,
অন্ধকার মুদিলে নয়ন।
জেনে শুনে মায়াফাঁসি
গলে লইলে কি কারণ ?

৮

মন লওগা গুরুর উপদেশ, জানতে পার সহজে।
তোমার হৃদয় মাঝে আছে মানুষ, বইসা বিরাজ করে

পাঁচ মহল্লার যোগ করে লাগাইল এক আইটা প্যাঁচ,*
ঘরের মারুল জোড়াতাড়া চামড়া ছানি† কাগজের
জানতে পার সহজে।
চন্দ্রসূর্য্য আদি অন্ত সকলি তাহার কাছে,
যমুনার জল কইয়ে উত্তল পদ্মপত্রে বইসাছে।
কাঙ্গাল দীনে বলে, মজেতে মন ডুইলে রইলে,
তোর মায়ার বন্ধন ছুইটে যাবে গুরুর চরণ পরশে,
জানতে পার সহজে।

৯

তোমার সব ভেল্কিবাজি
বুঝে উঠা ভার।
(তুমি) কখন মার কখন বাঁচাও,
কাঠের পুতলা কলে নাচাও,
কখন মার কখন বাঁচাও,
আজগুপি তাজ্জব ব্যাপার।
ভোজবাজি আর ভারমতি,
তারা ভেল্কি খেলায় দিবানিশি,
মনমোহন কয় পরিপাটি
ধান্ধাবাজি এ সংসার।
ভেল্কি ভাঙা মন্ত্র আছে,
আমি শিখলাম যাইয়া ওঝার কাছে,
সব দেখেছি মিছামিছে,
পাছে না আছে খেলোয়াড়।
খেমটা গাওয়া আরধা চৌতাল,
ঠেস কাওয়ালী ডুমরী দামাল,
তাল বাজাইয়া সামাল সামাল
বাজাবাজে কেও চীৎকার।
তুমি কখন যোগী, কখন ওঝা,
কখন বাঁকা কখন সোজা,
যায় না তোমার স্বভাব বোঝা
আম্বারাম সরকার।

১০

গুরু কল্পতরু জড়িয়ে ধর, কইগো আমার ভক্তিলতা?
সাধুর সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে প্রেমতীর্থে মুড়াইয়া মাথা।
চৌদিকেতে সত্যের বেড়া, ঘুরে কত ছাগল ভেড়া
জল ঢাল তার গোড়ায় গোড়ায়,
ফুটবে কলি মেলবে পাতা।
বিশ্বাসেরি খাঁকড়া দিয়ে, ধর তারে পাকড়িয়ে
ফুবাতাসের ঝাপটা লেগে ভাঙবে যে তার লতাপাতা।
রাধাপদ্ম ফুটলে পরে গুন গুন স্বরে শব্দ করে,
কালো ভ্রমর আসবে উড়ে কালো নয় সে উজ্জ্বল সাদা।
মনমোহন কয়, নিজের মাটি হইল নায়ে পরিপাটি
মিছামিছি কান্দাকাটি শুক্‌না মাটি হয় না কাদা।

১১

আজব কল তৈয়ারি করেছে রাইকিশোরী,
চাক চুমাচুম কলের মত,
ঘুরছেরে কল মনের মত,
শিইখাছে কল যার আছে মন শিকারী!
চৌদ্দ পোয়া দেহের মাঝে কতই কল,
আসা কল, যাওয়া কল,
চাক চুমাচুম্ দিচুম কল,
উজানি ভাইটানি আছে দুইখানা কল।
আরো দুই কল আছে
খোলা শুনতে লাগে কর্ণ তালা
সেই কলেতে মানুষ ধরা কোঠরী।
কি কল কইরাছে রাইকিশোরী
তোরা শিখলে না কেউ আশমানি কল,
কলে উঠা আশমানি জল,
রসিক যে জন দিচ্ছে কলের প্রহরী।

১২

আজ আমার সাধের তরী
আচম্বিতে পইড়ে গেল ঘোর তুফানে
বাণিজ্যের বস্তু নিয়ে দিলাম পাড়ি
ব্যাপার করব আশা মনে।
থাক আমার ব্যাপার করা
মূলে হারা কীর্তিনাশার মধ্যখানে
সে তরীর ন' দরজা আছে সোজা
এক দরজা আটকা কেনে?
সেখানে বস্তু আছে কেউ না জানে
জানে না এর মহাজনে
ফিকির চান ফকির বলে, রূপচানরে,
তুই বসে বসে ভাবছিস কেনে?
এ তুফান হবে ক্ষান্ত হও না শান্ত
হরি বল চান বদনে।

* যে প্যাঁচ সহজে খোলা যায় না।
† ছাউনি, আচ্ছাদন।

রবীন্দ্র-সকাশে

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আমি বাল্যকালেই আসি। তাঁহার সান্নিধ্যে আসার পূর্বে আমি কি সূত্রে কলিকাতায় গিয়াছিলাম এবং কি ভাবে তাঁহার সান্নিধ্য-লাভ করিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস সংক্ষেপে দিতে হয়। আমি পিতৃদেব সংগীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করি। আমার যখন দশ বৎসর বয়স তখন প্রথম কলিকাতায় যাই।

তৎকালে বিষ্ণুপুরে রেলষ্টেশন ছিল না। বিষ্ণুপুর হইতে পনর ক্রোশ দূরে অবস্থিত পানাগড়ে গিয়া ট্রেনে করিয়া হাওড়া যাইতে হইত। ঐ পনর ক্রোশ গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইতে হইত। তখন বিষ্ণুপুরনিবাসী ধ্রুপদী কেশবলাল চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় থাকিতেন। কলিকাতায় দানবীর তারকনাথ প্রামাণিকের বাড়ীতে কেশবলাল অবস্থান করিতেন। তাঁর মধ্যম পুত্র রামসুন্দর কলিকাতায় বর্মার এক সাহেবের বাড়ীতে জহুরীর কাজ করিতেন। বর্মার সাহেব মিনার্ভাতে বাড়ী ভাড়া লইয়া, হিন্দুস্থানী ও বর্মার গায়ক এবং বাঈজী আনাইয়া একটি চ্যারিটি শো করিবার জন্য রামসুন্দর বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দিন ধার্য করেন। এই 'চ্যারিটি শো'তে আমাকে গান গাওয়াইবার প্রস্তাব রামসুন্দরবাবু বর্মার সাহেবের নিকট উত্থাপন করেন। সাহেব আগ্রহান্বিত হইয়া ইহাতে অনুমতি দিলেন। ঐ চ্যারিটি শোতে আমি গান করি। আমার গান শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রাজা দুর্গাচরণ লাহা ছিলেন। তিনি গান শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার বাড়ীতে গিয়া গান শুনাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া গান শুনাই। তিনি আমাকে স্বর্ণপদক দেন; ইহাই আমার প্রথম পদকপ্রাপ্তি। তার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গান শিখিয়াছ?" আমি তখন আমার পিতৃদেবের নাম করিলাম। এত অল্প বয়সে আমার ঐরূপ সঙ্গীতনৈপুণ্যে শিক্ষাগুরু পিতার তিনি খুব প্রশংসা করিলেন। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন। মিনার্ভাতে তিনি তখন অধ্যক্ষ ছিলেন। মিনার্ভাতে যেদিন গান হয় সেদিন তিনি আমাকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে ডাকিয়া পাঠান। তিনিও আমাকে আমার শিক্ষাগুরুর নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি পিতার নাম করিলাম। তিনি আমার সুরালো কণ্ঠের এবং পিতার শিক্ষাদান প্রণালীরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মচারী মতিলাল বাবু আমাকে মহর্ষির নিকট লইয়া যাইতে রামসুন্দর চক্রবর্তীকে বলিলেন। রামসুন্দর বাবু আমাকে লইয়া মহর্ষির নিকট যান। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গান আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ গায়ক শ্যামসুন্দর মিত্র মহাশয় আমার সহিত পাখোয়াজ সঙ্গত করেন। প্রথম, আমি তানসেনের একটি গান গাহিয়াছিলাম। তার পর সদারঙ্গকৃত একটি খেয়াল গাই।

তার পর মহর্ষি আমাকে শোরীর টপ্পা গাহিতে আদেশ করায় আমি তাহা গান করি। শুনিয়া তিনি খুবই মুগ্ধ হন অতঃপর বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও বর্দ্ধমানের রঘুনাথ দেওয়ান এবং পিতার রচিত গান গাহিতে আদেশ করায় আমি তাহাও গাই। আমার সমস্ত গান শুনিয়া মহর্ষি পরম প্রীতিলাভ করেন এবং আমাকে একটি স্বর্ণপদক দেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই সময়ে আমার গান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহারাজের প্রাসাদে আমার গান হয়। তাঁহার দরবারে তের জন বাঁধা ওস্তাদ ছিলেন। সেখানে আমি ইমনের খেয়াল গান করি। মহারাজের তবলাবাদক ষষ্ঠীবাবু তবলা সঙ্গত করেন। তার পর আরও কয়েকটি খেয়াল ও টপ্পা গাহিয়াছিলাম। মহারাজ আমার গান শুনিয়া প্রীত হন এবং বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।

আমি কলিকাতায় গিয়া একমাস কাল থাকি এবং বিভিন্ন স্থলে আমার গান হয় ও উপযুক্ত পুরস্কার পাই। সেখানে প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী সত্য গুপ্ত, গোপাল মল্লিক ও তৎপুত্র বিপিন মল্লিক আমার গানে বিভিন্ন মজলিসে সঙ্গত করিতেন।

ঐ এক মাস কলিকাতায় থাকাকালীন আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিবার আমার একটি উদ্দেশ্য ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাধ্যাপক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখাৎ শুনিয়া নবাবিষ্কৃত গ্রামোফোন রেকর্ড দেখিবার

কৌতূহল আমার জন্মিয়াছিল। ঐ রেকর্ড ও গ্রামোফোন প্রথম ঠাকুরবাড়ীতে আসে। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাইয়া রেকর্ডে রাধিকা গোস্বামীর গান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কীর্ত্তিচাঁদ গোস্বামীর পাখোয়াজ-সঙ্গত শুনিয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। রেকর্ড মোমের তৈরি ছিল। কর্ণে অনেকগুলি নল লইয়া প্রায় সাত-আট জন একসঙ্গে গান শুনিতে পাইত। একটি লম্বা গোলাকার পদার্থ রেকর্ডের সহিত সংযুক্ত ছিল ; তাহা ঘুরাইলেই গান শুনিতে পাওয়া যাইত। তখন রবিবাবুর আদেশক্রমে আমি রেকর্ডে দুইখানি গান দিলাম। একটি শোরীকৃত টপ্পা ও অন্যটি বাংলা গান ; তখন তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই গান রেকর্ডে শুনাইলেন। ইহাই কবির সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত।

কলিকাতায় একমাস থাকার পর পুনরায় বিষ্ণুপুরে আসিলাম। পিতৃদেবের নিকট আরও পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে সঙ্গীতশিক্ষা করিলাম। আমার যখন পনর বৎসর বয়স তখন পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। ষোল বৎসর বয়সে আমি কলিকাতায় গিয়া চন্দননগরনিবাসী বিখ্যাত জমিদার হরিপদ মিশ্রের আশ্রয়ে থাকি। তিনি আমার অগ্রজ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

সেখানে থাকাকালীন আমি প্রসিদ্ধ খেয়ালী গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট কতকগুলি খেয়াল শিক্ষা করিয়াছিলাম। বিখ্যাত ধ্রুপদী খেয়াল ও টপ্পাগায়ক নুলোগোপালের নিকট কিছু শিক্ষা করি। সতর বৎসর বয়সে আমি বিষ্ণুপুরে আসিয়া বিবাহ করি। তার পর এক বৎসর ধরিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি। বর্দ্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের সভায় গায়কপদে নিযুক্ত হই। কলিকাতায় 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' নামক সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হই ১৯১৮ সনে। তথায় সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সঙ্গীতশিক্ষা দিতে হইত। তখন মধ্যে মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যাইতাম ও রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইত। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গানও শুনাইতাম। তিনি আমার হিন্দী গান শুনিয়া সেই গানগুলির অনুকরণে বহু বাংলা গান রচনা করেন। সঙ্গীতসঙ্ঘে পাঁচ-ছয় বৎসর সঙ্গীতশিক্ষাদানের পর আমার ছাত্রছাত্রীদের গান শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ আমার শিক্ষাদানপ্রণালীর খুবই প্রশংসা করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, বাল্যাবস্থা হইতে সঙ্গীতশিক্ষা না করিলে গলা বেশ খোলে না। আমি উত্তরে বলিলাম যে, কণ্ঠস্বরও মিষ্ট হওয়া দরকার। তিনি বলিলেন, সুশিক্ষা দানও সঙ্গীতশিক্ষার অনুকূল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিস্তর বাংলা গান বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর হিন্দী গানের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন ; তবে স্বরচিত কতকগুলি গানে স্বীয় ইচ্ছানুসারে সুর দান করেন।

এ সময়ে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক সভায় আমার গান হয়। তাহাতে বহুলোকের সমাগম হয়। তথায় আমার গানের পর রবীন্দ্রনাথকে কিছু বক্তৃতা দিবার জন্য সকলে অনুরোধ করেন। তখন তিনি রসিকতার সঙ্গে বলিলেন, "গোঁফেশ্বরের হ'ল, এবার দাড়ীশ্বরের হচ্ছে।" সভায় হাসির রোল পড়িয়া গেল।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ যখন ফিরিয়া আসেন, তখন কলিকাতার এলবার্ট হলে তাঁহার এক সংবর্দ্ধনা-সভা হয়। এই সভায় জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমাগম হয়। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যখন হিন্দী গানের ভাঙ্গা বাংলা গান প্রথম করেন, তখন হিতবাদী পত্রিকায় (সাপ্তাহিক) তাঁহার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা বাহির হয়। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার প্রথম সমালোচনা করেন। দেখাদেখি অন্যান্য অনেক পত্রিকা তাঁহার গানের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আরও বলেন যে, পশ্চিম হইতে প্রচুর সম্মানলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসায় "আমার গানের আদর বাড়ে"। তাঁহার বক্তৃতার পর সকলের অনুরোধে আমি খেয়াল ও শোরীয় টপ্পা গান করি।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আর একবার সঙ্গীতসঙ্ঘের এক উৎসবে রবিবাবু যোগদান করেন। তথায় সরলা দেবী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন। বহু রাজা জমিদারও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথায় সঙ্গীতসঙ্ঘের ছাত্রীদের অনেকের খেয়াল, ঠুমরী ইত্যাদি গান হয়। তার পর আমার ধ্রুপদ, খেয়াল হয়। আমার সহিত প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয় সঙ্গত করেন। সেই সভায় হিন্দী গান সমাপ্ত করিয়া আমি বাহার রাগের হিন্দী গানের ভাঙ্গা রবিবাবুর একটি বাংলা গান গাই 'আজি মম মন'। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গানটি শুনিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন।

আর একবার কলিকাতার আলিপুর বিজয়-মঞ্জিলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা-সভায় আমার গান হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহতাব তথায় এই সভা আহ্বান করেন। কবি আমাকে সাহানা রাগের একটি গান গাহিতে বলায় আমি উক্ত রাগের একটি গান করি। আমার গানের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্গত করেন। গান শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ খুবই সন্তুষ্ট হন।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ একবার রবিবাবুকে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেন। সেই দিনে আমার গান হয় এবং

দুর্গতচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয় পাখোয়াজ সঙ্গত করেন। আমি রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'শ্রী' রাগের একটি গান প্রথম করি। সেই বাংলা গানটি সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'কণ্ঠ-কৌমুদী' পুস্তকে প্রকাশিত হিন্দী গানের ভাঙা। মূল গানটি 'তন মিলন দে পরবার।' কবি 'কার মিলন চাও বিরহী' এই বাংলা গান উহার অনুকরণে রচনা করেন। বহুদিন পূর্ব্বে রচিত এই গানটির কথা তাঁহার স্মরণে ছিল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁচি হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার সঙ্গীত সঙ্ঘে কিরূপ শিক্ষাদান হইতেছে ইহা প্রতিভা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ছাত্রীদের গান শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে সঙ্গীতের এক আসর হয়। তাহাতে ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে মালতী বসু, মেধা ঠাকুর ও অমিয়া রায় গান করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া খুবই সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হন।

তার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিভা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বর্ত্তমান সঙ্গীতসঙ্ঘে কে সঙ্গীত শিক্ষাদান করিতেছেন। প্রতিভা দেবী তদুত্তরে বলেন, বিশ্বনাথজী সঙ্গীতসঙ্ঘ হইতে অবসরগ্রহণ করায় বর্দ্ধমান মহারাজের সভাগায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সঙ্গীতসঙ্ঘে শিক্ষাদান করিতেছেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, গোপেশ্বর বাবুর সঙ্গীতে খুবই অনুরাগ।

রবীন্দ্রনাথের যখন দশ বৎসর বয়স তখন যদুভট্ট মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আলয়ে ছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট গান শিক্ষা করেন। রবিবাবু শ্যামসুন্দর মিশ্রের নিকটও কিছু গান সংগ্রহ করেন। একদিন ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়া তাঁহার গান শুনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি নায়কী কানাড়ার "বলমা রে চুনরিয়া' এই খেয়ালটি আমাকে শোনান। গান গাওয়ার পর তিনি নিজেই বলিলেন, "সাধনার অভাবে আমার আজকাল গান গাওয়া বেশ সুবিধা হয় না।" তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ ও ভাব আমার খুবই ভাল লাগিল। হিন্দী গানগুলির বাংলা রূপান্তরসাধন নিঃসন্দেহে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দীনুবাবু প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। একদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে আমি কবির সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। সেই সময় দীনুবাবু তথায় আসিলেন এবং তাঁহার সহিত জঙ্গাবাদ-নিবাসী শশীভূষণ হালদার নামক এক ব্যক্তি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দীনুবাবু রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "শশীবাবু বিদ্যানুরাগী ও সঙ্গীতানুরাগী ; ইঁহার কিছু কবিত্বশক্তিও আছে ; আপনার কবিতাপাঠে ইনি মুগ্ধ।" শশীবাবু বলিলেন, "পুত্রের সঙ্গীতে খুবই আস্থা আছে। সেই জন্য কলিকাতার বিশ্বনাথ ধমারীর নিকট সে কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করে। বিশ্বনাথজীর মৃত্যুর পর সে বর্দ্ধমান মহারাজের সভাগায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটও গান শিক্ষা করে।" তখন দীনুবাবু আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই সেই গোপেশ্বর বাবু।" শশিভূষণবাবু তদুত্তরে বলিলেন, "আজ আমার দিনটি খুবই শুভ, কারণ কবিশ্রেষ্ঠ ও গায়কশ্রেষ্ঠ উভয়ের সহিত একই ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইল।" শশীবাবুর প্রশংসা-প্রসঙ্গে দীনুবাবু বলিলেন যে, শশিবাবু বিবাহের পণদানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে অর্থসাহায্য করিয়া রক্ষা করেন। ইহা শুনিয়া কবি শশীবাবুর খুবই প্রশংসা করিলেন এবং বিবাহে পণগ্রহণের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে আমি কলিকাতায় ঠাকুরবাড়ীতে আর একবার তাঁহারসহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তখন তিনি আমাকে "খট্"রাগের একটি গান শুনাইতে বলেন। প্রথম আমি উক্ত রাগের একটি ধ্রুপদ "ক্যায়সে যমুনা তট মেঁ জল ভরণ জাঁউ ম্যায়" গানটি গাহিয়াছিলাম। তখন কবি বলিলেন, "গানটি কাহার রচিত"? আমি বলিলাম, গানটি মদীয় পিতৃদেবের রচিত। তিনি গানটি লিখিয়া লইলেন।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ও দানের কথা বলিয়া বা লিখিয়া বুঝানো যায় না। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে আমি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতাধ্যাপক হইয়া গিয়াছিলাম। তথায় রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তিসমূহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গান রচনা করি।

গানটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সিন্ধু—ঝাঁপতাল

ধন্য বিশ্বকবি তুমি, হে রবীন্দ্র গুণাধার।
তোমার অপূর্ব কীর্তি তুলনা নাহিক তার।
শান্তিনিকেতন দেশে রচিলে জনকাদেশে।
সেথা কত শত লোকে শান্তি পায় অনিবার।
তুমি মহাজ্ঞানী-গুণী বুঝিয়াছে সর্বজন।
বহু ভাষাবিদ্‌গণে সুখে শান্তিনিকেতনে,
জীবন কাটান তাঁরা, কোন দুঃখ নাহি আর।
তুমি নবরূপী দেব, অমর হইয়া আছ।
মার্গসঙ্গীত ভাঙ্গি কত গীত রচিয়াছ।
গোপেশ্বর ও পীঠস্থানে সুখে আছে তৃপ্ত প্রাণে,
তব কীর্তি হেরি আজি হর্ষে ভাসে হিয়া তার॥

পুষ্পপরী

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুষ্পপরী ! পুষ্পপরী ! স্বপ্নভরে উচ্ছসি'
ললিতা-লতা ছন্দোলীনা সুন্দরী !
ফুলবনেতে ফুলসনেতে কোন ক্ষণেতে উল্লসি'
মাখিলে তুমি গন্ধ ওই কুন্দ'রি ?

কুঞ্জোপরি ছন্দ ভরি' নৃত্য করি' তরঙ্গি'
হাসিলে তুমি লাস্যময়ী সুন্দরী !
চিত্ত হরি' হাস্যময়ী ছুটিলে তুমি কুরঙ্গী,
গুঞ্জরিয়া উঠিলে তুমি সুর ধরি !

লহর-দোলে লীলার ছলে ভাসিলে তুমি হিল্লোলি',
কানন শুধু উঠিল দুলে সুন্দরী !
দোদুল-দোলে ফুল-দোলেতে দুলিলে তুমি হিন্দোলি',
লাগিল দোলা কুঞ্জবনে গুঞ্জরি' !

সাগর-নীল নিচোল তব স্বপন-রাগে মূর্চ্ছিত,
নীলা-আঁখিতে চাও চকিতে সুন্দরী !
কপোল তব সুরভি-ভরা চন্দনেতে চর্চিত,
যাপিলে তুমি লীলাতে মধু-শর্বরী !

পুষ্পপরী, পুষ্পভরা বসন্তেতে উচ্ছলি'
পুলক-ভরে উঠিলে ভরি' সুন্দরী !
মদির-হাসি-মাখা-অধর উঠিল তবে উজ্জ্বলি',
কুহক জাল সরিয়া গেল সঞ্চরি !

যৌবনেতে প্রথম লীলা ধরিল রূপ ছন্দিয়া,
মধুর হাসি ফুটল তব সুন্দরী !
কুসুমরাশি লুটায়ে পড়ে আজিকে তোমা' বন্দিয়া,
হিল্লোলিল নবীন-ফুলমঞ্জরী !

কল্লোলিল সাগর-ঢেউ, হিন্দোলিল ফুলদোলা,
জানায়ে দিল যৌবনেরে সুন্দরী !
প্রথম-ফোটা ফুলের মত সুবাস বহে দিক্‌ভোলা :
গন্ধ তার ছড়ায় বুক কুঞ্জ'রি ।

ঝর্ণাসম উচ্ছলিত স্রোতের ধারা সুবাকা,
চপলা তুমি বিজলী সম সুন্দরী !
গরবিণী গো ! চটুল আঁখি, বিলোল তব কটাক্ষ,
সুঠাম তব যুগল বাহুবল্লরী !

পুষ্পসম বক্ষ তব উঠিছে শুধু স্পন্দিয়া :
যৌবনেরি লাগিছে আভা, সুন্দরী !
নিশাস মাঝে পুলক-ভরে উঠিছে তাহা ছন্দিয়া,
তুলনা দেয় গোলাপ-ফুলপুঞ্জ'রি !

মঞ্জিরাতে চরণ তব নাচিছে যেন সঙ্গীতে,
ফুল ফোটালে চরণ-ঘায়ে সুন্দরী !
মুক্তাহারে কণ্ঠ দোলে নূতন-মধু-ভঙ্গিতে,
কুসুম-শাখা লজ্জালতা মুঞ্জরি' !

শিহরি' উঠে কানন আজি গহন তব নিঃশ্বাসে,
হাওয়ার ভরে নাচিলে তুমি সুন্দরী !
রোমাঞ্চিল বক্ষ তব উতল কোন্ উচ্ছ্বাসে,
গভীর বুকে শুভ্র তব উত্তরী !

হাসিছ তুমি মদিরা-ভরে কাজল-চোখে আনন্দে,
পুষ্পপরী ! তুমি গো সখী, সুন্দরী !
পুষ্পপরী ! পুষ্পপরী ! স্বপ্ন আনো কি ছন্দে ?
কাব্যমাঝে ছলনাময়ী অপ্সরী !
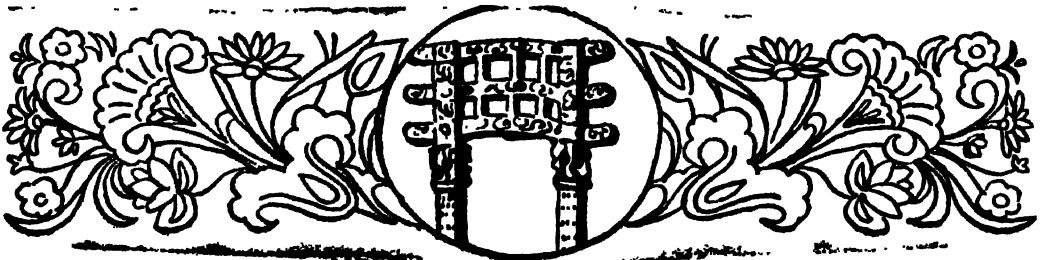
ছোট্ট বীণার কাহিনী

ডাঃ শ্রীডি. আনন্দ

"বীণা"—বাবা তার ছোট্ট মেয়েকে ডাকছেন শুধু এই বিষয়ে নিশ্চিত হবার নিমিত্ত যে, স্কুলে যাবার জন্তে সে তৈরী হয়েছে কিনা? বীণার তরফ থেকে কিন্তু কোন জবাব এল না। তিনি উঠে দেখেন, তার তখন কাঁদকাঁদ অবস্থা।

"কি হয়েছে তোমার? তুমি কি স্কুলে যেতে চাও না?"

"হাঁ, বাবা আমি চাই, কিন্তু আমার ভাই বলছে আজ স্কুলে যেতে পারবে না তুমি।"

যখন তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল যে সে স্কুলে যাবে তখন বেশ খুশী হয়ে উঠল বীণা।

"বিদ্যালয়ে মেয়েটি কত দিন ধরে যাচ্ছে যে জায়গাটার উপর তার মনে এরূপ অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে?"—বাড়ীতে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জানতে চাইলেন।

"ওঃ, মাত্র এক মাস"—জবাব দিলেন বীণার বাবা।

দশ বছর আগে বিদ্যালয়ের প্রতি তিন বছর বয়সের একটি মেয়ের এরূপ অনুরাগের কথা কি কেউ ভাবতেও পারত!

গত দশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির যে সকল পরিবর্তন শিশু, গৃহ এবং বিদ্যালয়কে প্রভাবিত করেছে তা পরিস্ফুট হয় শিশুমনের উপর এই প্রতিক্রিয়া থেকে। বীণা ভালবাসে তার বিদ্যালয়কে এবং বন্ধুবান্ধবদের। স্কুলে যে-সকল খেলাধুলো করবার সুযোগ-সুবিধা সে পায় সে-গুলোর প্রতিও আছে তার অনুরাগ। তার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত রাখবার জন্তে সেখানে আছে, গড়ানে বোর্ড এবং সিমেণ্ট-লেপা বৃক্ষ। গাছের গোড়ায় জল দিতে তার ভাল লাগে। যখন ঘরের ভেতর বসে খাবার ঘণ্টা বাজে তখন অন্ত শিশুদের সঙ্গে মিলে সে কমলালেবু খায়। কমলালেবু খাওয়া শেষ হলে পর শিশুরা তাদের পাত্রগুলো টেবিলের উপর ফেলে রাখে না। সকল শিশুই নিজ নিজ পাত্র তুলে নেয়, খাবারের উদ্বৃত্তটুকু একটা বাটিতে জমা করে, তার পর সেগুলোকে যথাস্থানে রেখে দেয়। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে এরা বেশ মজা পায় এবং বীণা অন্যান্যদের সঙ্গে মেঝের উপর শুয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

বিদ্যালয়ের প্রতি বীণার যে অনুরাগ তার পিতামাতারাও তার অংশভাগী। তাঁরা উভয়েই নিযুক্ত আছেন সরকারী চাকরিতে এবং এটা তাঁরা অনুভব করেন যে, বিদ্যালয়ে বীণার সময়টা ভালই কাটে। এটা মনে করা কিন্তু ভুল হবে যে, যে-সকল পরিবারে পিতামাতা উভয়েই উপার্জনশীল, নার্শারি বিদ্যালয়সমূহ কেবলমাত্র সেই সকল পরিবারের পক্ষেই অপরিহার্য্য। যে-কোন প্রগতিশীল সমাজ—যা তার শিশুদের বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা করতে চায়, তার পক্ষেই এ ধরনের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। এটা লক্ষ্য করতে দীর্ঘ সময় লাগে না যে, নার্শারি স্কুলে শিশুরা শিক্ষা করে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী—গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের পক্ষে যা অপরিহার্য্য।

শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যা, অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে নিজেকে বিকশিত করা, শিশুরা ব্যক্তিগত ভাবে সেই বিষয়ে নার্শারি স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করে। এবং এসমস্তই করা হয় বই, স্লেট, অথবা পেন্সিলের ব্যবহার ছাড়া।

শিশুদের পকেট-খরচার দরকার আছে কি?

শ্রীশীলা রাম

পিতামাতার সংখ্যা যত শিশুদের পকেট-খরচা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা ও আচরণের পরিমাণও প্রায় তারই অনুরূপ। কেহ কেহ শিশুদিগকে তাহাদের নিজ নিজ ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্ত কখনও আদৌ টাকা-পয়সা দেন না।

ইহা শিশুর (এখানে শিশু বলিতে বালক বালিকা উভয়কেই বুঝাইবে) অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের এবং বদান্যতা প্রকাশের সুযোগ-সুবিধাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। এই ধরনের কোন শিশু যদি এমন কিছু করিবার নিমিত্ত প্রণোদিত হয়, যাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন তাহা হইলে সে তাহা উপার্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর হইলে চমৎকার সুফলপ্রদ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ সে ঘরের এখানে-সেখানে যা কিছু পয়সাকড়ি পড়িয়া থাকে, চুরি করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করে।

অপর শ্রেণীর পিতামাতা আকস্মিক উচ্ছ্বাসবশে শিশুদের কিছু অর্থ দিয়া থাকেন। এই সকলের উপলক্ষ হইতেছে—কোন কোন সময় দেওয়ালী অথবা জন্মদিন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিসমূহ। কিন্তু প্রায়শঃই শিশুরা এগুলি আদায় করে অন্য উপায়ে। কখনও হয় ত শিশু পিতামাতার মধ্যে একজনের চতুষ্পার্শ্বে হট্টগোল জুড়িয়া দেয় অথবা ঐ রকম কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া তাহারা কোন রকমের হস্তক্ষেপ করে। শান্তির জন্য পিতামাতা তাদের কোন পুরস্কার বা ঘুষ দিয়ে থাকেন। অতএব প্রায়ই যে শিশুর দাবি বেশী এবং যদিও সে অধিকতর সৎ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তথাপি তাহার পকেট থাকে খালি, আর যে শিশু দোষী তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে কোন কোন পিতা আবার সপ্তাহ অথবা মাসের কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে নিয়মিত ভাবে পকেট-খরচা দিয়া থাকেন। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা এবং শিশুর বয়ঃক্রম অনুসারে ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ভারতের অধিকাংশ পিতামাতারই—যাঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই এই প্রবন্ধ পড়িতে সমর্থ হইবে না—প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রতি মাসে সামান্য চারি আনা দিবারও সামর্থ্য নাই। কিন্তু যাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িবেন তাঁহারা হয় ত ইহার বেশীও দিতে পারেন। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইতেছে—সময়-মত বেতনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অভাব। যাঁহাদের মনে এবিষয়ে সংশয় আছে তাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত যাদের সকল স্তরের শিক্ষকদের কথা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প কয়েক জনই প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেতন পাইয়া থাকেন, ইহার ফল দাঁড়ায় পুষ্টিসম্পর্কিত ত্রুটি অথবা সঞ্চয়ের অভাব। কিন্তু হায়, সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ এই বিলম্বিত বেতন প্রদানের জন্য এমন কোন লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্টের ব্যবস্থা করেন না যা শিক্ষককে দিতে হয় 'বানিয়া'কে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য।

অনেকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "কিসের জন্য শিশুর টাকাপয়সার দরকার হয়, তাহাকে পকেট-খরচা দিবার সার্থকতা কি ?" বর্ত্তমান লেখিকা সামগ্রিক ভাবে এই সকল প্রশ্নের জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছেন না, কেননা পাঠক নিশ্চয়ই অন্যান্য বহু সুযুক্তির কথা চিন্তা করিবেন যাহা এখানে উল্লিখিত হয় নাই। এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে উক্ত বিষয়ের প্রতি পিতামাতার মনোযোগ আকৃষ্ট করা যেন তাঁরা এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করেন এবং তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাও মনে মনে আলোচনা করেন।

বহু দেশের শিশুদিগকে এবং নিজের দেশের বহু পরিবারের শিশুদের লক্ষ্য করুন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাই তাহাদের হাতে পড়ুক না কেন মিষ্টি খাইয়া খরচ করিয়া ফেলে। একটা সাধারণ নিয়ম হিসাবে ইহা দেখা যাইবে যে, এই সকল শিশু যদিও যথেষ্ট পরিমাণে খাবার খাইয়া থাকে তথাপি তাহাদের বৃদ্ধি এবং শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় যথোচিত পরিমাণে উৎকৃষ্ট প্রোটিন তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। এই সকল শিশুকে মটর অথবা গোল আলুর সঙ্গে সিদ্ধ করা কিছু পনীর দিবার চেষ্টা করুন। তাহাদের মধ্যে যদি এই বস্তু প্রচুর পরিমাণে খাইবার ক্ষমতা এবং আভ্যন্তরীণ তাগিদ দেখা যায় তাহা হইলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাইতে পারে যে, তাহারা এ জাতীয় খাদ্যবস্তুর অভাবে ভুগিতেছে। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছু টাটকা ফল খাওয়াইয়া দেখুন। এমন হইতে পারে যে, ভাইটামিন গ-এর স্বল্পতাই ছিল এই তাগিদের কারণ—ভক্ষ্য মিষ্ট ফলের সহিত রহিয়াছে এই ভাইটামিনের সম্পর্ক। তাদের প্রয়োজন ছিল অধিকতর পুষ্টির, অধিকতর শক্তিসঞ্চারক খাদ্যের, কিন্তু তাদের পকেট-খরচা দ্বারা হইতে পারে শুধু মিষ্টির ব্যবস্থা।

কতকগুলি শিশু আবার তাহাদের পয়সা খরচ করে চুলের ফিতা, গলাবন্ধ, কেশতৈল ইত্যাদি ব্যক্তিগত অঙ্গসজ্জা এবং প্রসাধনের জন্য। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাদের নির্ব্বাচন আর যাই হোক, সৌন্দর্য্যবোধের পরিচায়ক যে নয়, একথা সত্য। কিন্তু প্রায়ই কদাজ্ঞান অথবা সৌন্দর্য্যবোধের অচরিতার্থতা হইতেই এই তাগিদ উদ্ভূত হইয়া থাকে। যাহারা অত্যধিক তীব্র গন্ধযুক্ত কেশতৈল পছন্দ করে—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়কার এই ধরনের ঘটনার কথা লেখিকার মনে পড়ে, তারা প্রায়শঃই সেই সকল চূড়ান্ত রকমের নোংরা পরিবারের ছেলেমেয়ে যেগুলিতে ফুলের গন্ধ এবং ঝোপঝাড়ের অভাব। কেহ কেহ ঐ সকল দ্রব্য আহরণ করে আত্মপ্রীতিবশতঃ তাহাদের নিজেদের প্রতিই

মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এর মূলে রহিয়াছে—নিছক বৃথা আত্মাভিমান, কিন্তু প্রায়শঃই এই আভ্যন্তরীণ তাগিদের ভিত্তি হইতেছে পরিবারে শিশুর অধিকতর অকৃত্রিম স্নেহের প্রয়োজনীয়তা। তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধ উৎকৃষ্টতর রূপে চরিতার্থ হইত যদি পিতামাতা গৃহের দ্রব্যাদি এবং কাপড়চোপড় পছন্দ করায় শিশুকেও তাহার নিজের মত প্রকাশ করিতে দিতেন। শিশুকে নিজের রুচিমাফিক ঐ সকল জিনিষ তৈরি করার শিক্ষাও দিতে হইবে। কাঁচা মালের দাম তৈরী জিনিষের মূল্যের অর্দ্ধেক মাত্র, কাজেই একই পরিমাণ টাকায় উৎকৃষ্টতর জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে যদি তাহা ব্যবহারকারী অথবা পরিধানকারী দ্বারা প্রস্তুত হয়।

আত্মাভিমানী শিশু বিশেষভাবে পিতামাতার দৃষ্টান্ত হইতে ইহা শিখিতে পারে যে, মহার্ঘ্য, জমকালো এবং যেগুলিকে ধোয়া এবং সারানো যায় না সে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কাপড়-চোপড় অপেক্ষা, সুসমঞ্জস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সংস্কার-সাধ্য পোশাক লোকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্টতর বিকল্প বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পোশাক-পরিচ্ছদ প্রথমতঃ হইবে পরিধানকারীর রুচির উপযোগী এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা হইবে ফ্যাশানের অনুযায়ী। কতকগুলি শিশু স্নেহ হইতে বঞ্চিত ইহা সত্য, কিন্তু ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান নয়—হয়ত অন্যান্য অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়সমূহের নীচে ইহা চাপা পড়িয়া থাকে। অনেক শিশু খাওয়া-দাওয়া অথবা উত্তম বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি আহরণের জন্য ভিতরে ভিতরে যে তাগিদ অনুভব করে, তাহার দরুনই তাহারা তাহাদের সমস্ত টাকা-পয়সা নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতঃপর তাহারা পিতামাতাকে বিশেষ সাবান, ষ্টেশনারি জিনিষ এবং ষ্ট্যাম্প অথবা খেয়াল-খুশির দ্রব্যাদি অধিকতর পরিমাণে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকে।

এমন শিশুও আছে যাহারা তাহাদের পকেট-খরচার টাকাপয়সা উপরোক্ত খেয়ালখুশির কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা কিন্তু বই, উপহারদ্রব্য এবং দাতব্য জিনিষ প্রভৃতি কিনিবার খরচও ইহা হইতেই কুলাইয়া লয়। এই সকল শিশুর পকেট-খরচা দ্বারাই সকলের চেয়ে সেরা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। প্রত্যেক শিশুকে যদি প্রথম পকেট-খরচা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট হিসাববহি এবং পেন্সিল দেওয়া যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা টাকার কি পরিমাণ অংশ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যের জন্য ব্যয়িত হয়, দ্রব্যাদির মূল্য কত, এবং কিভাবে বাজেট, আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দ্ধারণ ইত্যাদি করিতে হয় এ সকল বিষয় বুঝিবার পক্ষে তাহার সাহায্য হইতে পারে। পিতামাতার কিন্তু এই বইয়ের গোপনতার উপর অনধিকারপ্রবেশ করা সমীচীন নয়। অবশ্য শিশু যদি পিতামাতাকে হিসাব-পরীক্ষা, মিতব্যয়িতার পন্থানির্দ্দেশ অথবা উৎকর্ষসাধনের কথা বলে তো সে অন্য বিষয়।

যে শিশু তাহার পকেট-খরচার টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করে, সে বিচক্ষণতার সহিত সওদা করিবার, যাহা ক্রয় করিবে বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিল তাহা কিনিবার এবং দ্রব্যাদির প্রকৃত গুণাগুণ, নমুনা এবং মূল্য নিরূপণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। উপরন্তু চকচকে অনাবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য পয়সা খরচ করিবার আগ্রহ দমন করিবার ক্ষমতাও তাহার অর্জ্জিত হয়। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ কিনিতে গিয়া, শৈশবে ওরূপ অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ ভিতরে ভিতরে একটি পকেট-বুক কিনিবার আগ্রহ অনুভব করেন—ওদিকে হয় ত তাঁহার ড্রয়ারের মধ্যে ইতিমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে ছয়-ছয়খানা নোট-বুক।

পকেট-খরচা ব্যবহারকারী শিশুর কিন্তু যথার্থ বদান্যতা প্রকাশের উপায়ও আছে—অর্জ্জিবার দিনে ইহা একটি দুর্লভ গুণ বলিয়া গণ্য হইবে, তা ছাড়া কতকগুলি গঠন-মূলক খেয়ালের সৃষ্টিও তাহার মধ্যে হইতে পারে। বর্ত্তমান লেখিকা এমন একটি ছেলেকে জানিতেন, দৃশ্য-চিত্র অঙ্কনের জন্য যে ভিতরে ভিতরে একটা প্রেরণা অনুভব করিত। অবশ্য এই বিষয়ে সে কখনো চেষ্টা করে নাই। পাছে তাহার প্রথম প্রয়াস তাহাকে হাসির পাত্র করিয়া তুলে এই জন্য অঙ্কনের সাজসরঞ্জামের কথা সে তাহার পিতামাতাকে বলিতে চাহে নাই। নির্দ্দিষ্ট পকেট-খরচা পাইবার সৌভাগ্য যদি তাহার হইত তাহা হইলে অঙ্কনের সাজ-সরঞ্জাম কিনিবার পয়সা সে সঞ্চয় করিত, গোপনে চিত্র-বিদ্যার চর্চ্চা করিত এবং মৌলিক চিত্রকর্ম্ম দ্বারা একদিন সে যে শৈশবেই তাহার হর্ষোৎফুল্ল আত্মীয়স্বজনের তাক লাগাইয়া দিতে পারিত তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল উত্তর-জীবনে তাহার প্রয়াসের দ্বারাই—যখন অধিকতর লাভজনক বৃত্তি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সে চিত্র-বিদ্যার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিল। অধিকতর সৌভাগ্যবতী একটি বালিকার কথা জানি, সাত বছর বয়সে দুই টাকা সম্বল করিয়া যাহার পকেট-খরচার সূচনা হয় এবং ষোল বৎসর বয়সে তাহা বাড়িয়া দাঁড়ায় দশ টাকায়— বালিকাটির বয়স যখন বার বৎসর তখন ঐ পকেট-খরচা হইতে জমানো টাকা দিয়া সে তাহার সেলাইয়ের কাজ এবং প্রসাধনের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ছাড়া "এনসাইক্লোপীডিয়া", "ক্লাসিকস" প্রভৃতি কয়েক খণ্ড উৎকৃষ্ট

গ্রন্থ কিনিতে সমর্থ হইয়াছিল- মধ্যবয়সেও ঐ সকল বই ছিল তাঁহার নিকট বিশেষভাবে উপযোগী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সে তাহার হাতের তৈরী অনেক জিনিষ দান করিয়াছে, হিসাব এবং বাজেট প্রভৃতিতেও সে কতকটা পটুতা অর্জন করিয়াছে।

সুতরাং শিশুদিগকে পকেট-খরচা দেওয়া তাহার দেহ-মন ও আত্মার বিকাশসাধনে সহায়তা করার অন্যতম উপায়। বাস্তবিকই ইহা শিক্ষাসহায়ক। প্রায়শঃই ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, গঠনের শিক্ষা (Instruction) বিকাশ-সাধনের শিক্ষার (Education) ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পুষ্প যেমন করিয়া বিকশিত হইয়া উঠে তেমনি ভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনও প্রকৃত শিক্ষার (Education) অঙ্গীভূত। একটি উপায় হইতেছে উপদেশাত্মক শিক্ষাদান, সুচিন্তিত পাঠাভ্যাস। খাদ্য যারা যেমন দেহের পুষ্টি হয়, ইহাও তেমনি মনের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। আর একটি উপায় শিশুকে অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া। পকেট-খরচায় অর্থ ব্যয় করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তাহা এক রকমের অভিজ্ঞতা। আমাদিগকে এই পার্থক্যের কথা ক্রমাগত আরও বেশী করিয়া মনে রাখিতে হইবে এই জন্য যে, আমাদের অনেক বক্তা নির্বিচারে "শিক্ষা" কথাটা ব্যবহার করেন, এবং অনেক সাকু লারেও অনুরূপ ভাবে কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সকলের মনে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং বস্তুতঃ কখনো কখনো মনে হয় যেন কোনো মন্ত্রীর বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহার সেক্রেটারী। ইহা হিতকর হইলেও কদাচিৎ উপভোগ্য হইয়া যাক।

মুখ্যতঃ, উপরোক্ত এই সকল কারণেই লেখিকা মনে করেন যে, যেমন প্রত্যেক শিশুর জন্য পিতামাতাকে যথোচিত পুষ্টিকর খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হয় তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে যতটা সম্ভব প্রতিটি শিশুকে সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত পরিমাণে পকেট খরচা দেওয়াও তাঁহাদের একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

শিশুদের প্রতি পিতামাতার যত্ন

মিথান জে. লাম

শিশু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, ইহার জীবনে পিতামাতা এবং পরিবার এই দুইটিরই গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, সুস্থ এবং সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবনযাপনের সহায়তাকল্পে আমরা যাহাই করি না কেন তাহা কেবল পরিবারের এবং ইহার শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুখের উপরেই নয়, পরিণামে জাতির উপরেও প্রতি-ফলিত হয়।

পারিবারিক বন্ধন আজও পর্য্যন্ত ভারতে খুব দৃঢ় এবং পরিবারকে একটি জোরালো এককরূপে সংরক্ষণ ও বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যদিও আমাদের বর্ত্তমান ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় স্বতঃই সকল সময়ে আমাদের পরিবারগুলি সেই পুরানো একান্নবর্ত্তী পরিবার হইতে পারে না যাহা অতীতে ইহার যাবতীয় ত্রুটি-সত্ত্বেও পরিবারস্থ সকলকে সামাজিক অসুবিধা এবং সমস্যা-সমূহ উত্তীর্ণ হইতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিত। এমন-কি পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাহাদের সামাজিক নিরাপত্তার পরি-কল্পনাসমূহ এবং সামাজিকীকৃত সংস্থাসমূহের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, সাফল্যের সঙ্গে সমস্যা-সমূহের—বিশেষ ভাবে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাসমূহের, সমাধান করিতে হইলে পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ়তর করিতে হইবে। শিশুদের প্রতি পিতামাতার ভালবাসা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া শিশুদের যত্ন-আত্তি করার জন্য তাঁহাদের যে উদ্বেগ এতদুভয়কেই যথোচিত মর্য্যাদা দান করিয়াও সুনিপুণ শিশু-পরিচর্য্যার ব্যাপারে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব সম্পর্কে অনেক কথা বলিবার থাকে। শিশুর মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, তার ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ, অভ্যাসগঠন, দলের মধ্যে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে চূড়ান্ত মাত্রায় সুযোগ গ্রহণ করিতে তাঁহারা অপারগ হন। কি স্কুলের পাঠ্যতালিকায়, কি কলেজের অধ্যেতব্য বিষয়ে কোথাও পিতৃমাতৃকৃত্যের প্রভৃতি-বিষয়ক জ্ঞান স্থানলাভ করিতে পারে নাই। কাজেই শিক্ষিত পিতামাতাও শিশু-পরিচর্য্যা সংক্রান্ত এই জটিলতম এবং দুরূহ কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় কোন-না-কোন প্রকারের শিক্ষণের আবশ্যকতা গুরুতর রূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই অবস্থাই শিশুদের প্রতি অজ্ঞাতে আচরিত অবহেলা-সঞ্জাত বহু ঘটনার জন্য দায়ী যাহা পরিণামে শিশুদিগকে করিয়া তুলে বেমানান, অপরাধপ্রবণ এবং অসুস্থ অথবা ত্রুটি-যুক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। পিতামাতারা যাহাতে উৎকৃষ্টতর রূপে

শিশুদের যত্ন লইতে পারেন এবং আরও পরিপূর্ণ ভাবে তাহাদের বুঝিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করে কোন প্রকারের পন্থার উদ্ভাবন একান্ত অপরিহার্য্য।

যে জিনিষটার উপর আমি জোর দিতে চাই তাহা হইতেছে এই যে, শিশুর সঙ্গে এমন আচরণ করা সমীচীন নয়, যেন সে মহাশূন্যের অধিবাসী নিরালম্ব ব্যষ্টিমাত্র, তাহাকে মনে করিতে হইবে পরিবারের এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যাহার রীতিনীতি, অভ্যাস এবং আচরণের গুরুতর প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে পরিবারের চেতনার উপর। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে পারিবারিক চর্য্যার জন্য যতদূর সম্ভব সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের সংহতিসাধন এবং অখণ্ডতাবিধান করিতে হইবে।

আমি যতদূর জানি, ভারতে কমবয়সীদের জন্য খুব স্বল্পপরিমাণ যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কতকগুলি মামুলি "ইহা করিও, ইহা করিও না"—যাহা অধিকাংশ মাতা তাঁহাদের কন্যাদের বলিয়া থাকেন—ছাড়া কোন বালিকা ভবিষ্যৎ জীবনে যে সকল বিষয় তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক তৎসম্বন্ধে খুব স্বল্পপরিমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই লাভ করিয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লোকে জীবনের অন্য প্রায় সকল স্তরেই শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু বালিকার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে শিক্ষাদান করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করে না।

অতীতে স্বামীর পরিবারে বাস করিবার নিমিত্ত মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহার মূলে নিহিত ছিল এক ধরনের দার্শনিকতা। সেখানে সে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিত তাহার স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের নিকট। এখন আমরা ছেলেদের ন্যায় তরুণবয়স্কা মেয়েদেরও অল্পবিস্তর একই ধরনের শিক্ষাদানে আস্থাবান এই জন্য যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমরা এমন কোন দার্শনিকতার সৃষ্টি করিতে পারি নাই যাহাতে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাসমূহ ধর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হয়।

শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হইলে—যাহা নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিস—পরবর্ত্তীকালে বিবাহিত জীবনে প্রায়শঃই কোন-না-কোন রকম সংঘর্ষের সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং বিবাহের পথনির্দ্দেশক কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই নির্দ্দেশের প্রয়োজন হইতে পারে বিয়ের আগে কিংবা পরে, কিন্তু ইহাকে আমাদের অবস্থা, পটভূমিকা এবং রীতিনীতিসমূহের উপযোগী হইতেই হইবে। বিবাহের পথনির্দ্দেশ অথবা পরামর্শদানের উদ্দেশ্য হইবে—যে দুইটি পৃথক ব্যষ্টি একত্রে একটি জীবনের পরিকল্পনা করিতেছে সেই তরুণ দম্পতি কিভাবে বিবাহিত জীবনে পরস্পরের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করা, তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন, যে সকল মন-কষাকষি সাধারণতঃ দেখা দেয় সেগুলি পোষাইয়া লওয়া, যে সকল সম্ভাব্য অথবা বাস্তব সমস্যা বিবাহের ভিত্তিমূলে নাড়া দেয় সেগুলিকে স্বীকার করা এবং ভাবী সমস্যানিচয়কে উদ্ভূত এবং দৃঢ়মূল হইতে না দেওয়া।

কেহ কেহ পরিবার-পরিকল্পনা-কর্ম্মকে এমন কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে নারাজ যাহা পিতৃমাতৃকৃত্যের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর্ম্মসমূহের অন্যতম। পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক পিতামাতা—শিশুর আগমন-প্রতীক্ষায় যাঁহারা তাহাদের আশাপথ চাহিয়া থাকেন—শিশুকে স্বাগত করিবেন আগ্রহভরে—পিতামাতার নিকট হইতে কেবল স্নেহপ্রীতি পাইলেই ত শিশুর চলিবে না, বাপমাকে তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুরা আসিবে আকস্মিক ভাবে নয়, কিন্তু এমন সময়ে যখন পিতামাতা সুষ্ঠুভাবে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিবেন।

যে সকল মায়ের দল যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারিণী নহে তাহাদের মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের উন্নয়নকল্পে "মায়েদের সঙ্ঘ"র ধরনের সংস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। সকল শহরে এবং বড় গ্রামগুলিতে মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কতকগুলি পরিকল্পনা আছে, এবং শিশুকল্যাণের ভারতীয় পরিষদ ইহার রাজ্যপরিষদসমূহের মাধ্যমে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় শিশুদের ক্রীড়াকেন্দ্র এবং শিশুবাগ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিতেছে। এই একই গৃহ এবং স্থানসমূহ মায়েদের সঙ্ঘের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারিত—সেখানে মাসে একবার কিংবা দুইবার অথবা পুনঃপুনঃ তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন, চলচ্চিত্র দেখিতে কিংবা তাঁহাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে পারেন।

পিতামাতার মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ প্রতিষেধই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। শিশুদের, এমনকি সবে হাঁটিতে শিখিয়াছে এমন বাচ্চাদিগকে পর্য্যন্ত শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে লইয়া আসিবার জন্য মায়েদের প্রণোদিত করিতে হইবে। ছোটখাটো অসুখ এবং ত্রুটি-

সমূহ এই ভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে এবং সময়ে সারানোও যাইতে পারে। যে সকল মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক এই সকল মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ-কেন্দ্র পরিচালিত হয় তাহারা মায়েদের সঙ্ঘ এবং শিশু-ক্লিনিক পরিচালনায় স্বচ্ছন্দে এই সকল স্বেচ্ছামূলক সংস্থার সাহায্য লইতে পারে।

পিতামাতা এবং শিক্ষকদের সমিতি

ইহা একটি স্বীকৃত তথ্য যে, শিশুদিগকে এবং তাহাদের ধরন-ধারন পরিপূর্ণ ভাবে বুঝিতে পারিলে পারিবারিক জীবন উৎকৃষ্টতর এবং সমৃদ্ধতর হয়। শিশু এবং পিতার উত্তম সম্পর্ক কেবল যে ব্যক্তিগত সুখ এবং গৃহে সৌমনস্যেরই বিধান করিয়া থাকে তাহা নহে, এগুলিকে সৎ নাগরিকত্বের সোপানস্বরূপও বলা যাইতে পারে। আমরা সকলেই জানি যে, শিশুর সর্ব্বতোমুখী বিকাশের উপর বিদ্যালয়ের প্রভাবই গভীরতম। বর্ত্তমানে, বৃহৎ শহরে এবং বড় বড় নগরীসমূহে—যেখানকার বড় বড় বিদ্যালয়গুলিতে অতি ক্লান্ত এবং স্বল্প বেতনভোগী শিক্ষকদিগকে বিস্তর শিশু লইয়া কাজ চালাইতে হয়—শিশুর জীবন বস্তুতঃ দুইটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—গৃহ এবং বিদ্যালয়। শিশুর অন্য কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কি ধরনের কাজ চলিতেছে তাহা পিতা কিংবা শিক্ষক কেহই জানেন না অথবা তাহা লইয়া মাথা ঘামান না। "পি. পি. টি. এ." (The Parent Teachers Association) শিশুর এই দুইটি প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রের সংহতিবিধানের প্রয়াস পায়। "পি.টি.এ"-র মুখ্য উদ্দেশ্য পিতামাতার মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপ্ত করা, পিতামাতা এবং শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়ার ভাব সৃষ্টি করা। তা ছাড়া শিশুদের ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহের—যাহার সম্মুখীন হইতে হয় প্রত্যেক পিতামাতা এবং শিক্ষককে—আলোচনার মাধ্যমে শিশুশিক্ষার প্রবণতাসমূহ এবং মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন।

যখন কোনো শিশু অসদাচরণ করে তখন পিতামাতার মনে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাহা হইতেছে তাহাকে তিরস্কার করা, এবং যদি এই অসদাচরণ চলিতেই থাকে তাহা হইলে তাহাকে আচ্ছা করিয়া চড় কষাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। শিশুদের সাময়িক অসদাচরণ প্রত্যেক বয়সেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জিনিস এবং ইহা প্রত্যাশাও করা হয়, কেননা উত্তেজনার চাপে অথবা কোন অসাধারণ পরিস্থিতিতে শিশুদের মধ্যে নিয়ম ভুলিয়া যাইবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কোন স্বাভাবিক শিশু যখন পৌনঃ-পুনিকভাবে অসদাচরণ করিতে সুরু করে, বিবেচক পিতা-মাতার তখন উচিত, ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে—কেন সে এরূপ করিতেছে তাহার হেতু বাহির করিবার চেষ্টা করা। কেননা এইরূপ অসদাচরণ অথবা অন্যায় কিংবা অপ্রীতিকর অভ্যাসের সৃষ্টি ইহাই সূচিত করে যে, শিশু তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছে না—শাস্তি দ্বারা ইহাকে কেবলমাত্র দাবাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে ইহা বিভিন্ন আকারের স্নায়ুরোগ রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। "দি চাইল্ড গাইডেন্স" নামক সংস্থা শিশু-কল্যাণের ক্ষেত্রে সামান্য কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—পিতামাতার শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া, শিশুদের অসদাচরণ নিবারণ এবং ব্যক্তিত্বের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের ব্যাপারে অন্যান্য সংস্থাসমূহের আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়া এবং অন্যবিধ কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া।

বহু জনাকীর্ণ নগরী এবং শহরগুলিতে—যেখানে বস্তি পরিবেশের প্রাবল্য—চূড়ান্ত রকমের সদিচ্ছাসত্ত্বেও পিতা-মাতা ঠিকমত শিশুদের দেখাশুনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, বাসস্থানের অবস্থা ভয়াবহ, তাহাদের শিশুদের জন্য সেখানে আমোদ-প্রমোদের কোন সুযোগ-সুবিধা নাই, ফলে রাস্তায় শিশুরা খেলা করিয়া বেড়ায় উদ্দেশ্যহীনভাবে অথবা দল বাঁধে অপকর্ম্মের জন্য এবং দুর্গতির মধ্যে গিয়া পড়ে। এমনিতর অবস্থায় তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করা, যেখানে আগে ও-ধরনের কিছু ছিল না সেখানে ছেলে-বুড়ো সকলের জন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা এইগুলি হইতেছে শিশুকে অপরাধপ্রবণতার পিচ্ছিল পথে গা ভাসাইয়া দেওয়ার হাত হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করার চমৎকার পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কয়েকটি। পরবর্ত্তীকালে যখন তাহারা প্রতিষ্ঠানে আসে তখন শোধরাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা গোড়ার দিকেই ঐ ধরনের কাজ করা বহুল পরিমাণে শ্রেয়ঃ। কেননা, শৈশবে দুর্ব্যবহারের ফলে মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাহা সারাজীবন থাকিয়া যায়, ওদিকে আবার অপরাধপ্রবণদের প্রতিষ্ঠানে থাকার অপবাদের দরুন পরবর্ত্তীকালে তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম-প্রাপ্তি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। "জুভেনাইল সার্ভিস ব্যুরোর" মত অধিকতরসংখ্যক সেবা-সংস্থানসমূহ একান্ত প্রয়োজনীয়, কেননা ভারতে অল্পবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা ক্রমশঃ বাড়তির পথে। যে সকল বড় প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক শিশুকে স্থান দেওয়া হয় সেগুলিতে টাকা খরচ না করিয়া, শিশুকে তাহার নিজ গৃহ এবং পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে শোধরাইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

যেখানেই সম্ভব সেখানেই পরিবার-কল্যাণ সংস্থাসমূহ (Family welfare Agencies) প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন—

এগুলি যাবতীয় কাজের ভার গ্রহণ করিবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন কল্যাণ সংস্থাসমূহের কর্মপ্রচেষ্টার সংহতিবিধান করিবে।

যে সমস্ত অঞ্চল যথোচিত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী নয় সেগুলিতে যদি "প্রতিবেশ সদন" (neighbourhood house) প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে ইহা সকল রকমের সামাজিক এবং কল্যাণকর্ম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়ক হইবে। এই ধরনের প্রতিবেশ সদনের হিতকর প্রভাব অচিরেই সমগ্র অঞ্চলে অনুভূত হইতে সুরু হইবে।

জামিয়া মিলিয়ায় তরুণদের গ্রামীণ শিক্ষা

গ্রামাঞ্চলের তরুণদের শক্তির ক্রমিক অপচয়ের দরুন যে দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতে উচ্চ শিক্ষার দশটি গ্রামীণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাহা ভগ্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই সকল সংস্থার মধ্যে একটি—দিল্লীতে প্রথম যেটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—উদ্বোধন হয় দিল্লীতে আগষ্ট মাসে এবং ৫৫ জন ছাত্রের প্রথম দলটি—পঞ্জাব, পেপসু, হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লীর ছেলে ও মেয়েরা তাহার অন্তর্ভুক্ত—কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

উচ্চ শিক্ষার চালু অধিকাংশ সংস্থাই নগরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। গ্রামাঞ্চলে সুযোগ-সুবিধাসমূহ সীমাবদ্ধ বলিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে যোগ্যতর লোকেরা শহরমুখী হইয়া সেখানে সরিয়া গেল। নেতৃস্থানীয় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা গ্রাম হইতে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামগুলির অবস্থার আরও অবনতি হইল এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাদি হইয়া পড়িল অধিকতর দুরূহ।

কিন্তু ভারতের বিপুল জনসমষ্টি ৫৫০,০০০টিরও অধিক গ্রামে বাস করে বলিয়া আমাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও শিক্ষাবিষয়ক প্রচেষ্টা গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অতি সাম্প্রতিক কালে কিন্তু এই সমস্যা কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের (University Education Commission) অনুমোদনসমূহের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদালিয়ার কমিশন অনুরূপ অনুমোদনসমূহ উপস্থাপিত করেন।

এই অনুমোদনসমূহের সঙ্গে গ্রামীণ শিক্ষা উন্নয়নে বিপুলসংখ্যক সমাজকর্মী এবং গ্রামকল্যাণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদর্শিত ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ সংযুক্ত হওয়াতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কমিটি চালু প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান ও মূল্য নিরূপণ এবং গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হন। উক্ত কমিটির মুখ্য অনুমোদন ছিল—দেশের বিভিন্ন অংশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য গ্রামীণ সংস্থা (Rural Institutes) প্রতিষ্ঠা—কাজের সূচনা হইবে এই ধরনের দশটি সংস্থা স্থাপনের দ্বারা।

এই সকল অনুমোদন অনুসারে কাজ আরম্ভ হইল এবং বর্তমান বৎসরে গ্রামাঞ্চলসমূহে একটি উচ্চ শিক্ষার জাতীয় পরিষদের (National Council for Higher Education) উদ্ভব হইল। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা উপমন্ত্রী হইলেন ইহার চেয়ারম্যান। ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ দশটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনিকেতন, উদয়পুর, মাদুরাই, মুজাফ্ফরপুর, সানোসার, (সৌরাষ্ট্র), কইম্বাটুর, অমরাবতী, কোল্হাপুর এবং জামিয়া মিলিয়া (দিল্লী) প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের একটি অতি বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া আছে।

পাঠক্রম

তিন বৎসরের পাঠক্রম হইতেছে এই :—

(১) গ্রামীণ কল্যাণকর্মে তিন বৎসরের ডিপ্লোমা,

(২) কৃষি-ইঞ্জিনীয়ারীং বিজ্ঞানসমূহে দ্বিবার্ষিক সার্টিফিকেট;

(৩) সিভিল ও রুর‍্যাল ইঞ্জিনীয়ারিঙে ত্রৈবার্ষিক সার্টিফিকেট প্রস্তুত এবং অনুমোদিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত গরীব ছাত্রদের জন্য একটি বৃত্তির পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বিবেচনাধীন রহিয়াছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই একটি পাঠক্রম লইয়া—কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি কোর্সসহ—কাজের সূচনা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়: জামিয়া মিলিয়ার গ্রামীণ কল্যাণ-কর্ম্মের তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্সের সেসন সুরু হয় গত মাসে। উচ্চ শিক্ষার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ শিক্ষণীয় পাঠ্যতালিকা ছাড়া যে সকল বিষয় ইহার পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত তাহা হইতেছে: (১) সভ্যতার কাহিনী, (২) গ্রামীণ অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, কৃষি-বিষয়ক, ইঞ্জিনিয়ারীং এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপক্রমণিকা। সমবায়, সমাজকর্ম্ম, সাধারণ প্রশাসন (Public administration), সামাজিক শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, গ্রামীণ শিল্প, সুকুমার-কলা। অধিকাংশ কোর্সের মধ্যে মুখ্যত: জোর দেওয়া হয় ক্ষেত্রকর্ম্মের (Field work) উপর। এই সকল প্রতিষ্ঠানে কৃষি-বিজ্ঞানবিষয়ে যে দ্বি-বার্ষিক সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত:—

(১) গ্রামীণ শিল্প; (২) উদ্যান-রচনাবিদ্যা; (৩) পশুপালন কৃষিকর্ম্ম, গোমহিষাদি রক্ষণ ইত্যাদি। আর একটি কোর্সের—সিভিল এবং রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিঙের ত্রৈবার্ষিক সার্টিফিকেট কোর্সের—অঙ্গীভূত হইতেছে নিম্নলিখিত অধ্যেতব্য বিষয়সমূহ:—

(১) ফলিত যন্ত্রবিদ্যা (Applied Mechanics); (২) ওয়ার্কশপ বা কারখানা (সূত্রধরের কাজ, কামারশালা ফিটিং) এবং রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদির মত গ্রাম সম্প্রসারণ কর্ম্ম (Village Extension)।

ক্ষেত্রকর্ম্মের উপর গুরুত্ব আরোপ

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে সংস্কৃতি ও কর্ম্ম, মানবতা ও যান্ত্রিকতা এবং বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান তাহা ঘুচাইবার জন্যও এই সকল প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রামীণ জীবনের প্রকৃত সমস্যাসমূহের কি ভাবে সমাধান করিতে হয়, ছাত্রদিগকে তাহাও শিখিতে হয়।

ইহা কিন্তু কোন দিক দিয়াই সেই "মানস-জীবনের" মূল্যকে ক্ষুণ্ণ করে না—যাহা উচ্চ শিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে বিদ্যমান থাকা উচিত। কিন্তু ইহা দ্বারা এ-কথাও বুঝায় যে, মন তাহার সুস্থ বিকাশের জন্য পুষ্টিকর উপাদান গ্রহণ করিবে বহু বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে—উৎপাদন-শীল কর্ম্ম এবং উপলব্ধীকৃত সামাজিক অভিজ্ঞতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

গ্রামীণ সংস্থা দ্বারা অন্যান্য বহুবিধ কৃত্যও সম্পন্ন হয়। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা এবং পরীক্ষণের কাজেও প্রবৃত্ত হইবে এবং "পাইলট প্রোজেক্ট"গুলিকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিবে। লক্ষ্য হইতেছে—গ্রামীণ সংস্থাগুলিকে সমগ্র জনসমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে পরিণত করা। এগুলি যে কেবল গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়রূপে কাজ করিবে তেমন নয়, সামগ্রিক ভাবে জনসমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে চেতনাসঞ্চার করিবার জন্যও কাজ চালাইয়া যাইবে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম্য জনসমষ্টির জীবনের বোঝা হাল্কা করিবার কাজে সহায়করূপে গণ্য হইবে।

এগুলি সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া কাজ করে যেগুলি এখন সংগঠিত এবং বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে—উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কর্ম্মের (National Extension Services) কর্ম্মীদের শিক্ষণের জন্য। বস্তুতঃ, এই সকল প্রতিষ্ঠানের হওয়া উচিত—বিভিন্ন স্তরে ঐরূপ শিক্ষণের উপযুক্ত স্থান। এগুলিতে শিক্ষালাভ করিবে গ্রামীণ কর্ম্মিগণ। যুব-নেতৃবৃন্দ, সমাজের নেতৃবর্গ, সোশ্যাল এডুকেশন অফিসার এবং কম্যুনিটি প্রোজেক্ট অফিসারগণ। ব্লক ডেভেলপমেণ্ট এবং কম্যুনিটি প্রোজেক্টের কর্ম্মীবৃন্দ অবশ্যই ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে যখনই তাঁহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে তখন তাহার সমাধানের জন্য আছে ঐ প্রতিষ্ঠান—এবং উহা এমন একটি স্বাভাবিক কেন্দ্র যেখানে তাঁহারা নিজেরা যাইতে পারেন অথবা গ্রামবাসীরা যাহাতে নিজেরাই সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার করিতে এবং শিখিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকেও পাঠাইতে পারেন।

দ্বন্দ্ব

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

কাচের মত স্বচ্ছ সবুজ শাড়ির ভেতর দিয়ে জাফ্রান রঙের ব্লাউজ স্পষ্ট দেখা যায়। লাল রঙের বাটার চটিজোড়া পড়ে আছে এক পাশে, আর সাদা মসৃণ পা দুটো লেকের জল ছুঁই ছুঁই করছে। নরম সবুজ ঘাসের গদীতে বসে আছে ওরা দু'জন—পাশাপাশি, একটু-বা ঘেঁষাঘেঁষি।

একটা ঘাসের শীষ ছিঁড়ে তাই দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে কমল বলল, "কেন রাজী হচ্ছ না তুমি মলিনা, কিসের বাধা তোমার ?"

সাদা আদ্দির পাঞ্জাবীর একটা কোণ ফুরফুর করে উড়ছে অল্প হাওয়ায়। উড়ছে ওর প্রশস্ত ললাটের ওপর খসে-পড়া দু'তিন-গাছি চুল।

বিদায়-চুম্বনে আবির-রাঙা পশ্চিম আকাশের মায়া কাটিয়ে অস্ত দিগন্তের সন্ধানে ডুব দিয়েছেন সূর্য্যদেব। বিচ্ছেদের করুণ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চার পাশে।

কালো হয়ে আসা লেকের জলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপ করে বসে আছে মলিনা দোদুল্যমান চিত্তে। কমলের আবেগতপ্ত কণ্ঠস্বরে যেন যাদু আছে—ভুলিয়ে দেয় সমাজ-সংসার, বিশ্বভুবন। অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুৎ-বিদারণরেখার মতই আবার ওর সাবধানী মন হাতছানি দেয়। সবকিছু ভুলতে গিয়েও ভোলে না মলিনা। উষ্ণ কম্পিত নিঃশ্বাস পড়ে একটা।

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে কমল। মলিনার আনত মুখের দিকে তাকায় একবার। বুঝি বা অনুভব করে ওর চিত্তের গভীর আলোড়ন। আস্তে আস্তে মলিনার বাঁ হাতখানা তুলে নেয় নিজের ডান হাতের মুঠোয়। বলে, "দূর কর তোমার এই দ্বিধা মলিনা। চল আমরা ভেসে পড়ি নামহীন ঠিকানায়, অজানার উদ্দেশে।"

কমলের হাতে-ধরা মলিনার বাঁ হাতখানা থর থর করে কেঁপে ওঠে। চাপা, কাঁপা গলায় বলে, "আমাকে আর একটু সময় দাও কমল, ভাবতে দাও আমাকে আরও একটু..."

ওর গলার স্বর যেন নদী-জলে পড়া সূর্য্যের পলাতক আলো। ঝিরঝির করে ঝরে-পড়া এক পসলা বৃষ্টির মত ভিজিয়ে দিল কমলের মন, তবু নিজকে সংযত করে কমল বলল, "ভাবতে গেলে ভাবনার শেষ খুঁজে পাবে না মলিনা। ভাবনা হ'ল একটা অতলস্পর্শী খাদ। যতই নাম তল খুঁজে পাবে না তার। শুধু তাই নয়, ভাবনাই মনকে করে তোলে দুর্ব্বল। ভেবে ভেবে কেউ কোন দিন মনস্থির করতে পারে নি। ভাবনা-চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে ভেসে পড় জীবন-স্রোতে। দেখবে, ঠকবে না তাতে তুমি।"

আবার দুলে ওঠে মলিনার মন। আবেগের বিপুল বন্যায় ভেসে যাবে বুঝি সে। তবু আবার অনিশ্চয় অনুভূতির স্তরে আটকে যায় তার মন।

ওর মনের অর্দ্ধেকটা প্রথম প্রণয়ের আরক্ত আবেশে বিহ্বল, কিন্তু বাকি অর্দ্ধেক জুড়ে রয়েছে দ্বিধা আর সাবধানতা। বাস্তব-বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোয় উজ্জ্বল সেদিক।

তাই চট করে সায় দিতে পারে না কমলের প্রস্তাবে।

সদ্য ডোবা সূর্য্যের কথা ভাবে সে।

তারই মত যদি ডুব দেয় কমল তার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকার করে ?

তরল অন্ধকারে হেসে ওঠে কমল। ঝকঝকে দাঁতের স্পষ্ট ঝিলিক যেন দেখা দেয়। বুঝি ও পড়ে ফেলেছে মলিনার চিন্তার লিপি। বলে, "চেয়ে দেখ ঐ রাস্তার দিকে, এমনি অজস্র আলোর শতনরী হার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে কলকাতা শহর ভুলেছে তার দিবসের সঙ্গীর বিচ্ছেদব্যথা। চেয়ে দেখ, উচ্ছল যৌবনে ঝলমল করছে মহানগরী। কিসের এত ভয় তোমার ? কেন একটা প্রদীপশিখার মত জ্বলে ওঠ না তুমি! নিঃশেষে পুড়েও যদি যাও, তোমার ক্ষণিক অনিন্দ্যদীপ্তি তো পাবে শাশ্বত সৌন্দর্য্যের অধিকার।"

ওর নরম উষ্ণ ঘামে ভেজা হাতে মৃদু চাপ দেয় কমল। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায় মলিনার সমস্ত শরীরে। বাঁধ-ভাঙা বন্যার বেগে ভেসে যেতে চায় সমস্ত প্রতিরোধ।

চট করে উঠে দাঁড়ায় সে। ছুরির ফলার মত ইস্পাতি দ্যুতি-ভরা চোখ ফিরিয়ে নেয় কমলের কেমন হয়ে যাওয়া মুখের উপর থেকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি মুহূর্ত। তার পর ধীর পদে এগিয়ে যায় রাস্তার দিকে।

কমল আসে পিছু পিছু। উৎসাহহীন অবসাদে ভরে ওঠে ওর মন।

বাসে উঠতে উঠতে কমলের মুখের দিকে একবার তাকায় মলিনা। ব্যথায় সকরুণ তার চোখের চাওয়া। মৃদু কণ্ঠে বলে, "আগামী শনিবার..."

ব্যাকুল আগ্রহে কমল কিছু বলবার আগেই ছেড়ে দেয় বাস।

হতাশ মনে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যায় কমল। দুঃসহ জ্বালায় পুড়তে থাকে তার বুকের ভেতরটা।

কালীঘাটের কাছাকাছি একটা সরু অন্ধকার গলিতে ঢোকে মলিনা। অল্প এগিয়ে ডানহাতী একটা বাড়ীতে ঢুকল সে। স্যাঁতসেঁতে উঠানটুকু পেরিয়ে যে ঘরে ঢুকল, সে ঘরের বায়ুস্তরে

এখনো আটকে আছে চার ভাড়াটের বিকেলবেলার উনুন ধরাবার কয়লার ধোঁয়া।

লণ্ঠনের আলোয় চাল বাছছিলেন মলিনার মা। মলিনাকে দেখেই খনখনে গলায় বলে উঠলেন, "দিন দিন তোর হচ্ছে কি বলত মলু, রাত আটটায় বাড়ী ফেরা—"

"একটা কেস ছিল মা,—" শান্ত স্বরে কথা কয়টি বলে দড়ির আলনা থেকে আটপৌরে শাড়ি সেমিজ নিয়ে পাশের ছোট কুঠিরটায় ঢুকল মলিনা।

কেসের নামে চুপ করে গেলেন মলিনার মা। লোকান্তরিত স্বামীর কথা মনে পড়ল তাঁর। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে কুলোয় রাখা বাছা-অবাছা চালের দিকে আনমনে চেয়ে রইলেন তিনি। চশমার কাচ দুটি বাষ্পের আস্তরণ মেখে অস্বচ্ছ হয়ে গেল।

মা আর মেয়ের সংসার। তবু খরচ বড় কম নয়। বছর-দেড়েক আগে বাবা মারা যাওয়ার সময়ে আই-এ পড়ছিল মলিনা আশুতোষ কলেজে। অনেক স্বপ্নের অঞ্জন লেপেছিল তার চোখে—প্রথম যৌবনের আশা আর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাস্তব তার প্রথম আঘাতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল সবকিছু। ওর বাবা ছিলেন কোন এক সওদাগরী অফিসের কেরানী। অবসর সময়ে ইনস্যুরেন্সের একেন্টগিরি করতেন। শেষের দিকে এইটাই তাঁর মুখ্য উপার্জন হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর যখন তিনি মারা গেলেন তখন অর্থের অনটন দেখা দিয়েছে সংসারে। পড়া ছাড়তে হ'ল মলিনাকে। ধরাধরি করে সেই কোম্পানীরই এজেন্সি নিল সে। ক'টাকাই বা সে কমিশন পায়, তাই দিয়ে কোনমতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে সংসারের চাকা।

মোটা মিলের শাড়ি আর মার্কিনের সেমিজ-পরা মলিনাকে মলিনই দেখাচ্ছে এখন। বারান্দায় গিয়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মুছে ফেলেছে স্বল্প প্রসাধন। সারা দিনের শ্রান্তি হরণ করেছে তার চোখের দীপ্তি।

সুজনী-বিছানো তক্তপোশের এক প্রান্তে বসল সে পা ঝুলিয়ে।

"বিজনবাবু এসেছিল আজ, অনেকক্ষণ বসে ছিল তোর অপেক্ষায়—" মলিনার মুখের দিকে চশমা-পরা চোখ দুটি একবার তুলে তেমনি মাথা নীচু করে চাল বাছতে বাছতে বললেন, মলিনার মা,—"হাঁ বা না পষ্টাপষ্টি জানতে চায় সে।"

চুপ করেই রইল মলিনা। তার মনের সাবধানী অংশ হঠাৎ যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

বিড় বিড় করে বলতে থাকেন মলিনার মা,—"সত্যিই তো। দেরি করা তো আর চলেও না তার, ছেলেমেয়ে ক'টির দিকে আর তাকানো যায় না। অযত্নে অবহেলায় এমনি হয়েছে তারা।"

মলিনার প্রণয়ের আগুনে রাঙা মনের অর্দ্ধাংশের উপরে তার সাবধানী মনের অর্দ্ধেক যেন একটা কালো ছায়া বিস্তার করে চলেছে। তারুণ্যদীপ্ত কমলের মুখখানা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে প্রৌঢ় বিজনের বহু অভিজ্ঞতার চিহ্নভরা মুখ।

নিকটেই দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি থাকে বিজন বোস। বড় ব্যাঙ্কে ভাল মাইনেতে কাজ করে। পঁয়তাল্লিশ ছুঁয়ে ফেলবে সে অনতিবিলম্বে। সম্প্রতি বিপত্নীক হয়ে তিনটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে ভদ্রলোক। মলিনার বাবার পুরনো মক্কেল সে। সেই সুবাদে জানাশোনা ছিল মলিনাদের সঙ্গে। যাকে এত দিন বাৎসল্য-রসাপ্লুত চক্ষে দেখে এসেছে, তাকেই আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছে প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে। পরিণয় পর্য্যন্ত এগিয়ে যাবার ইচ্ছায় ঘোরাঘুরি করছে মলিনার মায়ের কাছে। মায়েরও অমত নেই। নির্ঝঞ্ঝাটে গলা থেকে মেয়েটার নেমে যাবার সম্ভাবনায় বেশ একটু খুশীই তিনি।

এখন মলিনা রাজী হলেই—শেষ কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধাটি অপসারিত হয়।

"তা হলে কি বলিস?" আবার প্রশ্ন করেন মলিনার মা,—"কি বলব তাকে?"

চিন্তায় তলিয়ে থাকা মনটা চমকে ওঠে। অসহায় ভাবে চার-দিকের হলদে দাগ-ধরা দেয়ালের দিকে তাকায় মলিনা। দেয়াল-গুলি যেন ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে তার দিকে একেবারে পিষে ফেলবার জন্য।

চকিতে আবার ভেসে ওঠে কমলের শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। ওর মুখে যেন আছে এই শ্বাসরোধকারী চার দেয়ালের দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তির আশ্বাস—বাইরের অফুরন্ত আলো আর সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসের সম্ভাবনা।

এম-এ ক্লাসের ছাত্র কমল ব্যানার্জ্জী। ধনী পিতার সন্তান। একটা পলিসির জীর দিয়ে তাকে গাঁথতে গিয়ে কি ভাবে যেন নিজেই গেঁথে গেল মলিনা। গভীরতর হ'ল ওদের পরিচয়। মনের একটা অদ্ভুত অস্থিরতা, আবেগ-কম্পিত শরীরের অসহ পুলকানু-ভূতি একেবারেই নতুন মলিনার কাছে। লক্ষ্যহারা ভাবের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল ওরা দু'জনে। হঠাৎ কঠিন তীরভূমি থেকে বিজনের গদ্যময় প্রস্তাবটা এসে মারাত্মক আঘাত হানল ওদের দু'জনার সম্পর্কের উপর।

কমলের সঙ্গে মিলনে রয়েছে দুরতিক্রম বাধা। মলিনা কায়স্থ আর কমল ব্রাহ্মণ। বর্ণের এই বাধার চেয়েও যেন বড় হয়ে দেখা দিল আর একটা কি বাধা—কিছুতেই যাকে অতিক্রম করা যায় না।

কঠিন বাস্তবের এই প্রচণ্ড ধাক্কাতেই মলিনার মনে চিড় দেখা দিল। তার পর কি করে যেন অলক্ষিত ভাবে দু' ভাগ হয়ে গেল ওর মন। এক অংশে সাবধানতার উদ্যত তর্জ্জনী আর অন্য অংশে ভাব-রোমান্সের অন্তহীন কল্পনা। এই দুই মনের অনুক্ষণ সংঘাত-সংঘর্ষে হাঁপিয়ে ওঠে মলিনা।

"চল আমরা পালিয়ে যাই এ কলকাতা ছেড়ে"—আবেগ কম্পিত স্বরে বলে কমল। মলিনার হাতখানা শক্ত ভাবে ধরে। "চলে যাব বহু দূরে, অজানা এক জনপদে। সেখানে আমরা বাঁধব বাসা। দিনের উপার্জ্জন নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরব ঘরে—সেখানে

দুই চোখের শান্ত প্রদীপ জেলে বসে থাকবে তুমি আমার প্রতীক্ষায়। তোমার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চোখের স্নিগ্ধ চাওয়ায় আমার শ্রান্তি যাবে মুছে। নাই-বা পেলাম সমাজের আশ্রয়। তোমার আমার সঙ্গ-সুখের আনন্দে ডুব হয়ে যাবে অন্য সব অভাববোধ।"

সর্বনাশা এ প্রস্তাবে বুক কাঁপে মলিনার। বিদ্যুৎবহ্নির মত দীপ্ত আবেগে কেঁপে ওঠে ওর সমস্ত শরীর। দুলে ওঠে ওর সাবধানী মনের অন্তঃস্থল। সত্যি অসম্ভবের সীমারেখা যায় মুছে। উদ্দাম নক্ষত্রবেগে স্পষ্ট হয়ে ভাসে কমলের কোমল মুখখানা।

তবু মত দিতে গিয়েও দিতে পারে না মলিনা। প্রতিক্রিয়ার শেষ সীমায় এসে মন তার ছুটতে থাকে বিপরীত দিকে। আকর্ষণের পরেই আসে বিকর্ষণের পালা।

বিজন বোসের প্রস্তাবে আকর্ষণ যেন ভুলিবার। সেখানে আছে নিশ্চয়তার দৃঢ় ভিত্তি। কঠিন তার স্পর্শ। সামাজিক স্বীকৃতি যেন সে প্রস্তাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

কমলের প্রস্তাব যেন একটা মধুর স্বপ্ন। তাতে আছে অসহ সুখের জ্বালা। হালকা মেঘের ভেলায় চেপে পরিণামহীন ঠিকানায় ভেসে যাবার আনন্দ। তবু একটা বৃহৎ সংশয় যেন মুখব্যাদান করে আছে। সে সংশয় অনিশ্চয়তার।

এই দ্বিমুখী টানে দোদুল্যমান মলিনা আজ এক মাস সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে প্রেমাস্পদের সঙ্গে নিরুদ্দেশযাত্রার রোমাঞ্চকর ভাবনায় মাঝে মাঝে ভেসে যায় সে। আবার অলক্ষিতে কোন মুহূর্তে পা ঠেকে যায় বিজনের প্রস্তাবের শক্ত মাটিতে। তখন আকাশচারী কল্পনাকে মনে হয় নিতান্তই অবাস্তব।

আজ এসেছে সব সংশয় ছিন্ন করবার দিন। কণ্ঠস্বর চমকে কালো মায়ের মুখে চোখে পড়েছে। শান্ত সংযত তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে একটা নিবিড় তৃপ্তি।

মুখের বিবর্ণ দেয়ালে বাবার ছোট্ট বাঁধানো ছবিটির দিকে চোখ গেল মলিনার। গাঁদাফুলের শুকনো মালাটি এ কোণ থেকে আছে ঝুলে সব পাশে।

একদিকে সমাজ-অনুশাসিত শান্ত নীরব গৃহকোণ। মনের তৃপ্তি না থাক সংযম শুচিতায় ঘেরা। অন্যদিকে সমাজদ্রোহের দীপ্ত শিখায় অসহ্য সুখের জ্বালায় পুড়ে মরা।

কোনটি? কোনটিকে বরণ করবে আজ মলিনা!...

প্রায় অস্পষ্ট, ফিস ফিস স্বরে মায়ের কানে কানে মলিনা বলল, "এমত নেই। বলে দিও বিজন বাবুকে।"

অনেক, অনেক দিন পরে স্বপ্নহীন নিবিড় অতল ঘুমের মাঝে তলিয়ে গেল মলিনা।

সময় নেই

শ্রীবাসন্তী সেনগুপ্তা

সময় নেই, নেই সময় নেই,
পথিকের একা একা
হয় না পথ দেখা,
দু'কথা বলি, তার সময় নেই—
সময় নেই।

হাওয়ায় হা হা শ্বাসে জীবন বয়ে যায়,
গ্রীষ্ম-উত্তাপ তৃষ্ণা রেখে যায়,
শ্রাবণ বারি কোথা শান্ত জীবনের—
মনের শ্রী কই, তৃপ্তি হৃদয়ের,
কেবল ছুটে চলা, কেবল বয়ে যাওয়া,
শুধুই পথচলা, দূরের পথ চাওয়া,
পথিক জীবনের
পরশ হৃদয়ের
যদি-বা লাগে মনে, সময় নেই।

জন্ম এই হেথা মৃত্যু ঐ কাছে
সেতুর দু'প্রান্তই রয়েছে কাছে কাছে
উদয় হতে চলা অস্ত গোধূলিতে
প্রাণের ক্ষয় হ'ল এটুকু যেতে যেতে,
জীবন এত ছোট, কাটা বা গোনা দিন
স্মৃতিতে ভরে রাখি, হৃদয় তাও ক্ষীণ,
কেবল সারাবেলা
সময় নিয়ে খেলা,
সময় এত কই, সময় নেই,
কেবল বসে থাকি, অনেক কথা কই,
সময় এত কই—
সময় নেই।

Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL
এখন
রেক্সোনা
আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগন্ধী!
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরী লিমিটেড এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত
RP. 144-X52 BG

কিরণাবলী

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ন্যায়ের অন্যতম আকরগ্রন্থ, উদয়নাচার্য্য রচিত "কিরণাবলী" বঙ্গাক্ষরে অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবৃতি সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।* মনোহর মলাটপত্র দেখিয়া সপ্তমবর্ষীয়া দৌহিত্রী প্রশ্ন করিল, "কোন্ সিনেমার বই? ছবি কৈ?" একজন প্রবীণ লেখক নব্যন্যায় সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, ইহার "প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কোন উপকারই হয় নাই।...উহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্টসাধনই হইয়াছে"! (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ ১৮৩) সাহিত্যপ্রিয় সমাজের শিশু যে প্রশ্ন করিল তাহার সহিত প্রবীণ লেখকের অনালোচিত মন্তব্যের বিশেষ পার্থক্য নাই—উভয়ই উচ্চাঙ্গ অনর্থকারী জাতির অগ্রদূত। এই তথাকথিত ক্রমোন্নতিবাদীর স্বর্ণযুগেও একাদশ শতাব্দীতে রচিত অত্যন্ত দুরূহ একটি সংস্কৃত গ্রন্থ আমরা যে কেবল বাঙ্গালী পাঠকের জন্যই সম্পাদিত হইল ইহার তাৎপর্য্য ও সম্ভাবনা সম্যক্ উপলব্ধি করা আবশ্যক।

মননশক্তির তারতম্য হইতেই মনুষ্যজাতির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হইতেই মননশাস্ত্রের চর্চ্চা অব্যাহত রহিয়াছে। তন্মধ্যে আন্বীক্ষিকী সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়া গঙ্গা-যমুনার ন্যায় যুগলধারায় প্রবাহিত হয়—ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন। মধ্যযুগে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া গৌড়-মিথিলাকে প্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করিয়াছিল। মননশাস্ত্রের এই অনন্যসাধারণ উচ্ছ্বাসের নাম নব্যন্যায়—উহা নবদ্বীপ-মিথিলা-বারাণসীর উপাদেয় স্বর্ণময় শস্যভূমি এবং জাতীয় বুদ্ধির সম্পদ। পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে উহার তুলনা নাই। এই মহামহীরুহের মূল বৈদিক ন্যায়াচার্য্য উদয়নের গ্রন্থমালা। মধ্যযুগে গঙ্গেশের মণিগ্রন্থ ও তদুপরি রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতি অবলম্বন করিয়া নব্যন্যায়ের যে চরম পরিণতি "অনুমান" শাখাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহাতে উৎকালে একমাত্র কুসুমাঞ্জলি ব্যতীত উদয়নের সমস্ত গ্রন্থ বঙ্গদেশ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে উলাপাড়ার জগৎকৃষ্ণ বাবুর জীবদ্দশায় হইঙ্গলন সাহেব (?) বেদান্ত-রচিত "মোক্ষাধিকার" গ্রন্থের আলোচনার জন্য উপস্থিত হন—তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক কোন্নগরের নীলকণ্ঠ ন্যায়রত্ন তাহার সহায়ক হইয়া উলাপাড়ার জগন্নাথ তর্কালঙ্কারের এক মাত্র টীকা তাঁহার নিকট সাহেবদ্বয়কে পড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং সেখানে সুকঠিন দুরূহ টীকা তাঁহারা অন্যত্র পাঠাইয়াছিলেন। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণ তখন গাদাধরী সাম্রাজ্যভুক্তির "চৌকাঠ"র মধ্যে মধুলুব্ধ মধুকরের ন্যায় ঘুরিয়া থাকিতেন। নবদ্বীপগৌরব গদাধর ভট্টাচার্য্যের অভ্যুদয়ের দুই শত বৎসর মধ্যে ক্রমশঃ প্রাচীন গ্রন্থের পঠন-পাঠন গৌড়মিথিলায় এই ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়—লুপ্ত হইল—প্রশস্তপাদকৃত বৈশেষিকভাষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকা উদয়নাচার্য্যের অশেষ অসমাপ্ত রচনা আলোচ্য কিরণাবলী গ্রন্থ।

১. প্রাতঃস্মরণীয় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ গদাধরের ২০০ বৎসর পরে, "বাৎস্যায়নভাষ্য" প্রথম মুদ্রিত করেন। বাঙ্গালীর মনীষা নব্যন্যায়ের চরম পরিণতি হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া নূতন ভাবে প্রাচীন গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইল—ইহা তাহারই সূত্রপাত। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বার বৎসরে বৃহৎ পাঁচ খণ্ডে ঐ গ্রন্থের সমুচিত ব্যাখ্যা বাঙ্গলা ভাষায় সমাপ্ত করিলে বঙ্গভাষার "এক অপূর্ব্ব দান" বলিয়া তাহা অভিনন্দিত হইয়াছিল (প্রবাসী, ফাল্গুন, ৩৩০, পৃ. ৭২৬)।

উক্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রশস্তপাদভাষ্যের সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প পরেই স্বর্গত হন। পরে কাশীর বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ পণ্ডিত মহাশয় (১৮৮৪-১৮৯৭ খ্রীঃ) কোন প্রকারে কিরণাবলী-সহ ঐ ভাষ্যগ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোসাইটী হইতে মুদ্র্যমাণ কিরণাবলী ৪৫ বৎসরেও সম্পূর্ণ হইল না—তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের প্রকাশ, তদুপরি রুচিদত্তের বিবৃতি ও বাদীন্দ্রের দ্রব্যটীকা মুদ্রিত হইতেছে। কাশীতে রঘুনাথ, গুণপ্রকাশ, ভগদীশের ও পদ্মনাভকৃত কিরণাবলীভাস্কর মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু কিরণাবলীর উপর যে বিরাট সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বহুলাংশ অদ্যাপি অপ্রকাশিত ও অনধীত রহিয়াছে এবং দ্রব্যদীধিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে সুযোগ্য গ্রন্থকার অপ্রকাশিত দ্রব্যকিরণাবলীমাথুরীর ব্যাখ্যাবচন বহু স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রথম খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের দশমাংশও প্রকাশিত হয় নাই—গ্রন্থটি এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি সহ সম্পূর্ণ করিতে পারিলে অধ্যাপক ডক্টর শাস্ত্রীর কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজের আধুনিক রুচি-গতি অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় একটি সরল ভ্রমরচনা দ্বারা কর্ণদর্পণের সেবা করিতে অগ্রসর হন নাই। তিনি উদয়নাচার্য্যের গম্ভীর রচনার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, প্রাচীন পদ্ধতিতে পদে ও বাক্যের ও সন্দর্ভের সমগ্র অর্থ গ্রহণ ও নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধরণ করিয়া সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হইলেও মননশীল প্রকৃত জিজ্ঞাসুর প্রভূত উপকার না হইয়া পারে না।

এইরূপ বিস্তৃত বিবৃতি পাঠ করিয়াও স্থানে স্থানে আমাদের মনে হইয়াছে, আলোচনার কোন কোন অংশ পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আরও জিজ্ঞাসা থাকিয়া যাইতেছে। একটি উদাহরণ দিতেছি। কিরণাবলী গ্রন্থের সন্দর্ভ অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক-পরম্পরায় শত শত "ফক্কিকা" উদ্ভূত ও আলোচিত হইত। আরম্ভে মঙ্গলশ্লোকের একটি ফক্কিকা ছিল "ব্যাপ্তি-লক্ষণ"—তদুপরি প্রগল্ভাচার্য্যাদি বহুতর মহানৈয়ায়িক রচিত নানা সন্দর্ভ পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, পরবর্ত্তী খণ্ডে শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাপ্তিলক্ষণের বিশদ আলোচনা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, মঙ্গলশ্লোকের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে—যাহা বর্দ্ধমানের টীকায় উদ্ধৃত হয় নাই। বর্দ্ধমানের পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহার অন্যতম উপজীব্য দিবাকরোপাধ্যায় "বিশ্বাসকোবিদোদ্বেগাৎ" পদের বিকল্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অথবা বিশ্বা আত্মান শ্রবণমনন-ধ্যান-রূপাঃ প্রতিপত্তয়স্তা এব বিদঃ সন্ত্যঃ" ইত্যাদি। তত্র ন্যায়বাচস্পতির ব্যাখ্যানুসারে "উদ্বেকাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী, রজনীক্ষয়ে ইতি নিমিত্ত-সপ্তমী।" তবে ইহাও বক্তব্য—এই সকল ব্যাখ্যা প্রায়ই মুদ্রিত হয় নাই এবং পুথি খুঁজিয়া বাহির করাও প্রায় অসাধ্য।

২৩ পৃষ্ঠায় উদয়নাচার্য্যের "প্রমাদ" প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইল—ভাট্টমতের বহুতর গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই, যথা—স্বয়ং কুমারিলের "বৃহট্টীকা" এবং সুচরিত মিশ্রের কাশিকা (সামান্য অংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে)। সুতরাং যুক্তিতে সিদ্ধান্তস্থাপিত কিন্তু কোন ভাট্ট সম্প্রদায়ই স্বীকার করিতেন না, অদ্যাপি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করা চলে না। আর উদয়নাচার্য্য বাৎস্যায়নভাষ্য ভাল করিয়া দেখেন নাই এইরূপ কল্পনা করার হেতু নাই।

---

* কিরণাবলী: প্রথম খণ্ড—শ্রীগৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী-রচিত। পৃ ২০+২৭০। মূল্য দশ টাকা। প্রকাশক—অধ্যাপক শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১০ রঘুনাথ চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।
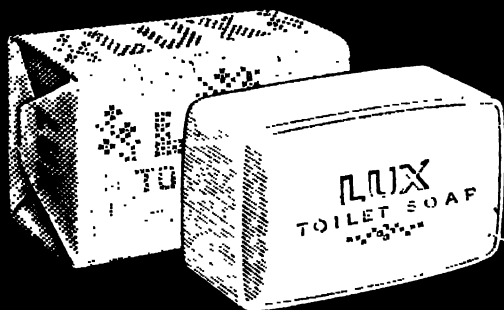
"এর শুভ্রতাই
এর বিশুদ্ধতার
পরিচায়ক"
বলেন অনুভা গুপ্ত
"সেইজন্যেই
আমি সর্ব্বদা
লাক্স টয়লেট
সাবান
ব্যবহার করে
থাকি"
ভারতে প্রস্তুত
LUX
TOILET SOAP
অনুভা গুপ্ত বলেন:
"আপনার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখতে হলে ভালভাবে মেখে নিন..."
"লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত ফেনা—কি সৌরভময়"।
"তারপর ধুয়ে মুছে ফেলুন—আপনি এত তাজা অনুভব করবেন।"
"সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে বড় সাইজ ব্যবহার করুন—যা আমি করি।"
চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 479-X52 BG

রাতের আকাশের রূপবৈচিত্র্য

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে আকাশের কালো মখমলী পটভূমিকায় গ্রহ, তারা, নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক যে রূপবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে তা আমাদের দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ এবং হৃদয়কে বিস্ময়ে অভিভূত করে। কিন্তু নক্ষত্রসমূহের অবস্থানের মধ্যে যে নিয়মশৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা বিদ্যমান তা ধরা পড়ে আকাশ-পর্যবেক্ষকের সন্ধানী দৃষ্টিতে।

পেগাসাসে অগ্নুজ্জল নীহারিকা

অনেকেরই ধারণা যে, সবগুলি তারাই আকাশের গায়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যাঁর নক্ষত্র-পরিচয় কিছুমাত্র হয় নি তিনিও যদি দু' এক রাত ভালো করে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন তা হলে দেখবেন যে, স্থানে স্থানে কতকগুলি তারা মিলে এক একটি বিশিষ্ট আকৃতির সৃষ্টি করেছে। জ্যোতিষীরা এগুলোর নাম দিয়েছেন নক্ষত্র বা তারামণ্ডল (constellation)। এই সকল মণ্ডলের মধ্যে কোনটি মনুষ্যাকৃতি, কোনটি ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মত, কোনটি মালার মত, কোনটি ক্রুশ চিহ্নের মত, কোনটি বা মন্দিরের মত আকৃতিবিশিষ্ট। আমরা চন্দ্র-সূর্য্যেরই শুধু উদয় অস্ত দেখতে পাই। কিন্তু নক্ষত্রমণ্ডলসমূহের সঙ্গে পরিচিত হলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যেও অনেকগুলি যথানিয়মে পূর্ব্বদিগন্তে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। সন্ধ্যার সময় যাকে দেখা গেল পূর্ব্বদিগন্তে, মধ্যরাত্রে তাকে দেখা যাবে মাঝ আকাশে আর শেষ রাত্রে সেটি হবে পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত।

আকাশ-পর্য্যবেক্ষণের প্রকৃষ্ট সময় শীতকাল—বিশেষতঃ মাঘ মাস। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসও নক্ষত্র চেনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। অগ্রহায়ণ মাসে আকাশ থাকে নির্মেঘ, উজ্জ্বলতম তারাগুলি আর বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ এই সময় দেখা দেয় আকাশের পটে। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত ছায়াপথ। এই মাসে রাত নয়টা সাড়ে নয়টার সময় মাথার উপরকার আকাশের কাছাকাছি এমন কয়টি বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় যাদের চিনে নেওয়া খুব সহজ। কাজেই নক্ষত্রপরিচয় লাভ করতে হলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অগ্রহায়ণ মাস থেকে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ সুরু করা মন্দ নয়। এই মাসের রাতের আকাশে যে সকল নক্ষত্রমণ্ডল এবং বিশিষ্ট তারা দৃষ্টিগোচর হয় তাদের অনেকগুলিই স্পষ্টতর এবং উজ্জ্বলতররূপে দেখা যায় পৌষ-মাঘ মাসে—তবে তাদের উদয়-অস্তের সময়ের আর অবস্থানের পরিবর্ত্তন হয় বটে। তবে একবার কোনো একটি নক্ষত্রমণ্ডল এবং তারকা চিনে রাখলে আর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। রাত্রে যে সময়ে যে দিকেই থাকুক না কেন তাকে খুঁজে বের করা কঠিন হয় না।

আধুনিক কালে জ্যোতিষীরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করেন। সুদূর অতীত কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিন্তু খালি চোখেই তারা দেখতেন। কতকগুলি তারা মিলিয়ে তাঁরা এক একটা নক্ষত্রমণ্ডলের রূপকল্পনা করেছিলেন। যেমন ধরা যাক কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলের কথা—এর নাম অনেকেরই জানা আছে। ঋগ্‌বেদে এই কালপুরুষ নক্ষত্রের কথা আছে। এই কালপুরুষ হচ্ছেন রুদ্রের প্রতীক—এঁর পৌরাণিক যুগের নাম মৃগনক্ষত্র। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখ মনীষীরা ঋগ্‌বেদ রচনার কালনির্ণয় করেছেন ছয় হাজার থেকে আট হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। এর থেকে বুঝতে পারা যায়—আমাদের দেশে নক্ষত্র চেনবার চেষ্টা কত আগে আরম্ভ হয়েছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরীয়, চীনা এবং ক্যাল-ডিয়ানরাও যখন নক্ষত্রমণ্ডল-শোভিত আকাশের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করে তখন নক্ষত্রমণ্ডলগুলির যে-রকম অবস্থান ছিল আজও প্রায় তেমনি আছে এবং আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর

পরেও এর বড় একটা অদল-বদল হবে না একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

নক্ষত্র চেনার পালা প্রথম কোথায় সুরু হয়েছিল—ভারতবর্ষে, না মিশর প্রভৃতি দেশে সে তর্কের মধ্যে না গিয়ে একথা নিঃসন্দিগ্ধ-রূপেই বলা চলে যে, সুদূর অতীতে খালি চোখে রাতের আকাশ চেনার চেষ্টা সুরু হয়েছিল সেই সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বৎসরের অধিকাংশ সময় যেখানকার আকাশ থাকে নির্মেঘ—উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

এণ্ড্রোমিডা এম-৩১ মহা-নীহারিকা
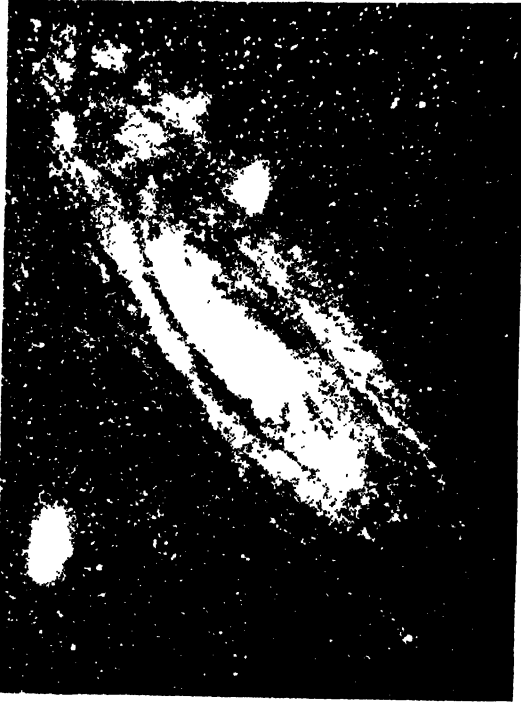
আগেকার দিনে যেমন মানুষের ধারণা ছিল যে, সূর্য্য চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিক ঘুরে আসে, তেমনি নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষকেরাও ভুল করে মনে করতেন যে, নক্ষত্রমণ্ডলগুলিও আকাশপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এ ধারণা ভ্রান্ত। আসলে সূর্য্য, তারা এবং নক্ষত্র-মণ্ডলসমূহ স্থির। পৃথিবীই নিজের অক্ষদণ্ডের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরে আসছে। আমরা কিন্তু দেখছি সূর্য্য এবং নক্ষত্রসমূহ পূব থেকে পশ্চিমে গতিশীল। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে নক্ষত্রগুলি বৃত্ত ঘুরে আসে। কিন্তু এ হচ্ছে মায়া, চোখের ভুল দেখা—সূর্য্য এবং নক্ষত্রদের এ গতি হচ্ছে আপাত (apparent) গতি। যেমন চলন্ত ট্রেনে বসে জানালার বাইরে তাকালে পরে মনে হয় যে, ট্রেনটা নিশ্চল আর ঘরবাড়ী গাছপালা সব ছুটে চলেছে উল্টোদিকে।*

কিন্তু রাতের আকাশে যে অসংখ্য আলোকবিন্দু আমরা দেখতে পাই তার সবগুলিই কি গতিহীন? মোটেই নয়। তারাগুলি দপ দপ মিট মিট করে জ্বলে, কিন্তু আকাশের গায়ে এমন কতক-গুলি আলোকবিন্দু দেখতে পাওয়া যায় যারা স্থির নিশ্চল। এগুলি হচ্ছে গ্রহ। গ্রহ নয়টি: বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস (প্রজাপতি), নেপচুন (বরুণ) আর প্লুটো (রুদ্র)। আমাদের পৃথিবীও একটি গ্রহ। কোনো কোনো গ্রহের তাপ থাকতে পারে, কিন্তু এদের নিজস্ব আলো নেই। এরা সূর্য্যের আলোয় আলোকিত হয়। সূর্য্য যে পথে পৃথিবী পরিক্রমা করে বলে মনে হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ। এই ক্রান্তিবৃত্তকে বারো ভাগে ভাগ করে নামকরণ করা হয়েছে রাশিচক্র। এই রাশিচক্রে আছে—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই বারোটি রাশি—সোয়া দুইটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত এক একটি রাশি। গ্রহগুলি এই রাশিচক্রের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে আর ক্রমাগত ঠিকানা বদলায়। মূল গ্রীক নাম থেকে ইংরেজীতে এদের বলা হয় Planet, যার মানে পর্য্যটক। জেমস জীনস বলেছেন, এরা হচ্ছে আকাশের বেদে।

আকাশে তারকা অগণিত। কিন্তু সারা বৎসরে সমগ্র পৃথিবী থেকে খালি চোখে প্রায় ছয় হাজার মাত্র তারা দেখা যায়। তবে এক সময়ে আমরা আকাশের আধখানা মাত্র দেখতে পাই বলে এক সময়ে এক স্থান থেকে খালি চোখে আড়াই থেকে

* অনেকের ধারণা যে, পৃথিবীর গতিশীলতা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায়। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৩০০ বৎসর পূর্বে গ্যালিলিওর আবিষ্কারসমূহের সমকাল থেকে। এর বহু আগে যে ভারতীয়গণ জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক এবং ভৌগোলিক নানা তথ্য পরিজ্ঞাত ছিলেন তার প্রমাণ আর্য্যভট্টের আর্য্যসিদ্ধান্ত; (পঞ্চম শতাব্দী) ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গোলাধ্যায়; সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থ। শেষোক্ত পুস্তক দু'খানিতে প্রসঙ্গক্রমে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ, ভূপঞ্জরের স্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত ভূবিদ্যাবিষয়ক নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। পৃথিবী যে গতিশীল এবং নক্ষত্রসমূহ স্থির তা লিপিবদ্ধ আছে আর্য্যভট্টের আর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকে:

"অনুলোম গতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥"

অর্থাৎ, যেমন গতিশীল নৌকার আরোহী তীরবর্তী অচল গাছ-পালাকে উল্টাদিকে যেতে দেখে, তেমনি (পৃথিবীর গতির জন্যে) স্থির নক্ষত্রদিগকে সমবেগে যেতে দেখা যায় পশ্চিম দিকে।

তিন হাজারের বেশী তারা দেখা যায় না। জ্যোতিষীরা গোটা আকাশটিকে কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর তারা নিয়ে গঠিত মোটামুটি উননব্বইটি মণ্ডলে বিভক্ত করেছেন। বসন্ত-গ্রীষ্ম শরৎ-শীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মণ্ডল আকাশে দেখা দেয়। উননব্বইটি বা ততোধিক মণ্ডলে যে অসংখ্য তারা দৃষ্টিগোচর হয় তার মধ্যে বড় কুকুর (Canis Majoris) মণ্ডলের লুব্ধক Sirius), বীণা মণ্ডলের অভিজিৎ (Vega) প্রভৃতি ২০টি তারার উজ্জ্বলতা সব চেয়ে বেশী। এগুলিকে বলা হয় প্রথম-প্রভা (First-magnitude) তারা। উজ্জ্বলতার ক্রম অনুসারে তারাগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জ্যোতিষীরা (১) আলফা, (২) বিটা, (৩) গামা, (৪) ডেলটা,

ওরায়েন বা কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে 'অশ্ব-শির' (Horse's Head) নীহারিকা

(৫) এপিলসন ইত্যাদি গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করে থাকেন। কাজেই কোন নক্ষত্রমণ্ডলের প্রধান তারাকে—সাধারণতঃ যেটি উজ্জ্বলতমও বটে—উক্ত মণ্ডলের আলফা বলে বর্ণনা করা হয়, এমনি ভাবে দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারাটিকে বিটা, তৃতীয়টিকে গামা বলে নির্দেশ করা হয়। আমরা খালি চোখে যে ক্ষীণতম ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট তারাটি দেখতে পাই তার তুলনায় প্রথম-প্রভা তারকাগুলির উজ্জ্বলতা অন্ততঃ ১০০ গুণ বেশী।

দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশে দেখা যায় কোটি কোটি তারা। জেমস জীন্‌স হিসাব করে বলেছেন যে, যদিও তারাদের সংখ্যা নির্ভুল ভাবে বলা যায় না তথাপি তা যে দশ হাজার কোটির বেশী হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল। সূর্য্যের আয়তন এত বিশাল যে, তার মধ্যে তের লক্ষ পৃথিবীর জায়গা হতে পারে। সূর্য্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার মাইল। "১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে সূর্য্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারে।" এমন সব মহাকায় নক্ষত্রও আছে যারা সূর্য্যের চেয়ে হাজার গুণ, লক্ষ গুণ বা কোটি—গুণ এমনকি দশ কোটি গুণ বড়। সূর্য্যের দূরত্ব পৃথিবী থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের কিছু কম। আর নক্ষত্রের দূরত্ব—সে ত ভাবাই যায় না। উত্তর গোলার্দ্ধে যে তারাটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে এবং উজ্জ্বলতম দেখায় সেটি হ'ল লুব্ধক বা সিরিয়াস। লুব্ধক পৃথিবী থেকে ৫১ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। এই নিকটতম তারাটির দূরত্ব থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, মাইল-ক্রোশে তারাদের দূরত্বের হিসাব করা যায় না, তাদের দূরত্বের পরিমাপ করতে হয় আলোর গতি দিয়ে। আলো ছুটে চলে সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে। সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে প্রায় আট মিনিট। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী যে নক্ষত্রটি কথা এই মাত্র বলা হ'ল তার থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে চার বছরচার মাস। এক বছরে আলো যতটা পথ—প্রায় পাঁচ লক্ষ অষ্টাশী হাজার কোটি মাইল—অতিক্রম করে আসে তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন এক আলোক-বর্ষ বা 'লাইট-ইয়ার'। এই আলোকবর্ষ ধরেই নক্ষত্রগুলির দূরত্ব মাপা হয়।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশের এক শোভা নক্ষত্রমণ্ডল আর এক শোভা আকাশে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত আলোক-বলয়ের মত দৃশ্যমান ছায়াপথ বা Milky way.—স্মরণাতীত কাল থেকে এই ছায়াপথ উদ্বুদ্ধ করেছে মানুষের কল্পনাকে। প্রাচীন মেক্সিকোর অধিবাসীরা একে বলত সাতরঙা রামধনুর ছোট বোন। হিন্দুদের বিষ্ণুপুরাণে এই ছায়াপথকে বলা হয়েছে সরিৎগঙ্গা। বায়ুপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে ছায়াপথের উল্লেখ আছে:—

দিবি ছায়াপথো যস্তু অনুনক্ষত্রমণ্ডলম্।
দৃশ্যতে ভাস্বরো রাত্রৌ দেবী ত্রিপথগা তু সা।

অর্থাৎ, "রাত্রে নক্ষত্রমণ্ডলের কাছে স্বর্গে যে ছায়াপথ ভাস্বররূপে দৃশ্যমান হয়, তিনিই ত্রিপথগামিনী দেবী—অর্থাৎ আকাশ-গঙ্গা।" ছায়াপথ দক্ষিণাকাশ থেকে আরম্ভ করে উত্তরাকাশ পথে ধ্রুবতারার প্রায় ২৫°-২৬° ডিগ্রী দূর দিয়ে ঘুরে পুনরায় চলে গেছে দক্ষিণাভিমুখে। অনেক অনেক দূরে ঐ ছায়াপথে অসংখ্য ছোট ছোট তারা খুব কাছাকাছি জটলা করে আছে। তারাগুলি এত দূরে আছে যে, তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সমষ্টিগত ভাবে তারা যে আলোক বিকিরণ করছে, তাই প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের চোখে। ঐ ছায়া-

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
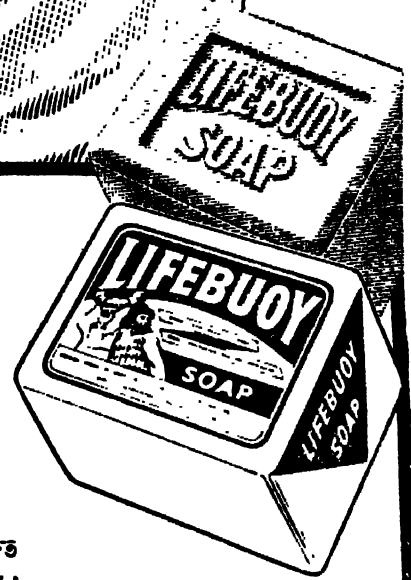
পথের দু'পাশেই তারাদের ভিড়, ছায়াপথ থেকে যতদূরে যাওয়া যায়, তারার সংখ্যা ততই কমে আসে।

রাতের আকাশে যে তিনটি নক্ষত্রমণ্ডল আকাশ-পর্যবেক্ষকদের নিকট সুপরিচিত রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে আর যাদের খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয় না তারা হ'ল সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ আর পেগাসাস সপ্তর্ষিমণ্ডল সাতটি তারা নিয়ে গঠিত, উত্তর আকাশের একটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডল। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষির নামে নামকরণ করা হয়েছে এই মণ্ডলের। বশিষ্ঠের কাছে আছে খুব ছোট একটি তারা—বশিষ্ঠের সাধ্বী স্ত্রী অরুন্ধতী। এই মণ্ডলটিকে চিনে রাখা খুবই দরকার। কেননা এর সাহায্যে অনায়াসে ধ্রুবতারাকে বের করা যায়। ধ্রুবতারার একদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর উল্টাদিকে ক্যাসিওপিয়া—(আমাদের জ্যোতিষে যাকে শতভিষগ বা শতভিষা এবং কাশ্যপী নক্ষত্রও বলা হয়)। এই দুটি মণ্ডলকে একসঙ্গে আকাশে অবস্থান করতে দেখা যায় না। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ এই কয় মাস সন্ধ্যার সময় সপ্তর্ষিমণ্ডল থাকে অদৃশ্য। পৌষের শেষে সন্ধ্যায় একে দেখতে পাওয়া যায় আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে।

সিগনাস বা হংসপুচ্ছ মণ্ডলের নীহারিকা

অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পরে উত্তর আকাশের দিকে তাকালে ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে পাওয়া যায়, আর একে চিনে নেওয়াও কঠিন নয়—এর চেহারাটা হচ্ছে ইংরেজী ডব্লু অক্ষরের মত, আর উল্টা দিক থেকে দেখলে 'এম্'-এর মত। উত্তর দিকের শীর্ষবিন্দুর তারাটি থেকে এই মণ্ডলটিকে দেখায় একটা চেয়ারের মত। কল্পনা করা হয় যেন রাণী ক্যাসিওপিয়া বসে আছেন চেয়ারের উপরে। ক্যাসিওপিয়া সিফিউস, এনড্রোমিডা, পার্সিউস, পেগাসাস পরস্পরের কাছাকাছি দৃশ্যমান এই কয়টি মণ্ডল আর দূরে পেগাসাসের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিককার সিটাস নামক একটি মণ্ডলকে গ্রীক পুরাণের একটি কাহিনীর বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কাহিনীটি পরে বলব, আপাততঃ এই মণ্ডলগুলির পরিচয় দিই।

পেগাসাস মণ্ডল অগ্রহায়ণের আকাশকে দেয় একটা বিশিষ্ট রূপ। সন্ধ্যার সময় এই মণ্ডল থাকে ঠিক মাথার উপর, নয়টা সাড়ে নয়টা নাগাদ সরে আসে একটু পশ্চিম দিকে। ঐ সময় মাথার উপরকার মাঝ আকাশের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিকে একটু পশ্চিম দিকে প্রসারিত করলে দেখা যায়—চার কোণায় চারটি তারা একটা প্রকাণ্ড বর্গক্ষেত্রের মত রচনা করেছে। অবশ্য তারাগুলিকে মনে মনে একটা কল্পিত রেখার দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিতে হবে। এই বর্গক্ষেত্রটিই হচ্ছে পেগাসাস বা বীর পার্সিউসের সাদা ডানাওয়ালা পক্ষিরাজ ঘোড়া। যে সকল স্থানের আকাশ পরিষ্কার সেগুলিতে এই বর্গক্ষেত্রের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় ১০২টি তারা গুনতে পারা গেছে।

পেগাসাসের উত্তর-পূর্ব্ব দিকের মাঝারি রকমের উজ্জ্বল তারাটির নাম উত্তর ভাদ্রপদ আর এর কোণাকোণি উল্টাদিকে যে তারাটি দেখতে পাওয়া যায় তার নাম পূর্ব্ব ভাদ্রপদ। উত্তর ভাদ্রপদ হচ্ছে এনড্রোমিডা নামক আর একটি মণ্ডলের তারা। এখন পেগাসাসকে মনে মনে কল্পনা করা যাক একটি ঘুড়িরূপে। উত্তর-ভাদ্রপদ থেকে সুরু হয়েছে এই ঘুড়ির লেজ। এই লেজটি একটু বাঁকা ভাবে চলে গেছে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। ঘুড়ির লেজের দিকের তারাটি আর দুটি তারা—একই বক্র রেখায় অবস্থিত এই তিনটি তারা নিয়ে এনড্রোমিডা মণ্ডল।

এনড্রোমিডা মণ্ডলের দ্বিতীয় তারাটির উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি অনুজ্জ্বল তারা দেখা যায়। এই তারাটি থেকে পশ্চিম দিকে তাকালে খানিকটা জায়গায় 'লেপে দেওয়া আলো'র মত চোখে পড়ে —এটি হচ্ছে এনড্রোমিডা এম-৩১ নেবুলা (M 31 in Andromeda) বা মহা নীহারিকা। সংস্কৃতে নীহারিকাকে নভস্তুপ বলা হয়। 'একস্ট্রা-গ্যালাকটিক নেবুলে' নামে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নীহারিকাদের একটা সুনির্দিষ্ট আকার আছে এটি তাদের অন্যতম। এই দৃশ্যমান নীহারিকা থেকে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তার প্রকৃতি অনুসারে একে বলা হয় শ্বেত নীহারিকা (White Nebula)। আমাদের নক্ষত্র-জগতের মত এই এনড্রোমিডা নীহারিকা বহু কোটি

তারকাসমন্বিত আলাদা একটি নক্ষত্র-জগৎ। খালি চোখে এই নীহারিকাটিকে ঝাপসা আলোর মত দেখতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদ মারিয়াস ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে বর্ণনা করেছিলেন এটিকে দেখায় "শিং-এর ভেতর দিয়ে দৃশ্যমান মোমবাতির আলোর মত"। এই নীহারিকা থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ৮ লক্ষ বছর আর এটি এত বিরাটায়তন যে, এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আলো পৌঁছতে লাগে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, পেগাসাসকে যদি ঘুড়ি কল্পনা করা হয় তা হলে এন্‌ড্রোমিডা হ'ল ঐ ঘুড়ির লেজ। ঘুড়ির লেজটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে যে উজ্জ্বল তারাটি দেখতে পাওয়া যায় সেটি হ'ল পার্সিউস মণ্ডলের তারা। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানে তিনটি তারা আড়াআড়ি ভাবে যেন এন্‌ড্রোমিডার সীমা নির্দ্দেশ করে অবস্থিত। এই পার্সিউস মণ্ডল—চেহারা অনেকটা ধনুকের তীরের মত—লক্ষ্য ক্যাসিওপিয়ার দিকে। এই হ'ল ক্যাসিওপিয়ার জামাতা দৈত্যহন্তা বীর পার্সিউস। হাতে তার মেডুসার কাটা মুণ্ড। পার্সিউস মণ্ডলের আলগল বা দৈত্যতারা খুব উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র, কিন্তু দু'দিন একুশ ঘণ্টা অন্তর এর উজ্জ্বলতা অনেকটা কমে আসে। আমাদের জ্যোতিষে এই তারাটির নাম মায়াবতী।

গর্ব্বিতা রাণী ক্যাসিওপিয়ার স্বামী সিফিউসকে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁরই খুব কাছাকাছি উত্তর-পশ্চিম দিকে। পাঁচটি তারা মিলে মন্দির বা গীর্জ্জার মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে—এটিই সিফিউস মণ্ডল—এর সব কয়টি তারাই ক্ষীণপ্রভ। পেগাসাস মণ্ডলের পূব দিকের বাহুটিকে দক্ষিণ দিকে বাড়িয়ে দিলে সেটি ইংরেজী V অক্ষরের মত মীন রাশির একটি বাহুকে অতিক্রম করে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল তারার কাছ দিয়ে যাবে—এটি হ'ল সিটাস মণ্ডলের তারা। এই সিটাস মণ্ডল বৃহত্তম নক্ষত্রমণ্ডলসমূহের মধ্যে একটি। মাইরা সেটি নামক আশ্চর্য্য তারাটি এই মণ্ডলেই অবস্থিত। ক্রমাগত এর আলোর পরিবর্ত্তন হয় আর এগার মাস পরে এটি অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

সিফিউস, ক্যাসিওপিয়া, এন্‌ড্রোমিডা, পার্সিউস, পেগাসাস পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত এই কয়টি আর সিটাস এই সাতটি নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে গ্রীক পুরাণের যে কাহিনীটি রচিত হয়েছে, আরাটাস অব সলি নামক খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের জনৈক গ্রীক কবির বর্ণনা অনুযায়ী সেটি বলছি।

রাণী ক্যাসিওপিয়া ছিলেন অত্যন্ত গর্ব্বিতা, মেয়ে এন্‌ড্রোমিডার রূপের জন্য তাঁর দেমাকের আর অন্ত ছিল না। এতে অপ্সরাদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হ'ল। বরুণদেবতার নিকট গিয়ে তারা তাঁর শাস্তির দাবি করলে। বরুণের আদেশে সিফিউস স্বয়ং এন্‌ড্রোমিডাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলেন এক পাহাড়ের গায়ে। দূর থেকে ক্যাসিওপিয়া আর সিফিউস দেখছেন—সিটাস নামক সাগর-দৈত্য এগিয়ে আসছে এন্‌ড্রোমিডার দিকে তাকে গিলে খাবার জন্যে। কিন্তু তাঁরা নিরুপায়—কোন প্রতিকার করবার ক্ষমতা নেই তাঁদের। হঠাৎ শোনা যায়, আকাশপথে সাদা ডানাওয়ালা পক্ষিরাজ পেগাসাসের পক্ষ-বিধূনন শব্দ। তাতে সওয়ার হয়ে এসেছেন বীর পার্সিউস—এন্‌ড্রোমিডার ত্রাণকর্ত্তা। তড়িৎ-গতিতে পেগাসাস থেকে অবতরণ করে তিনি তাঁর করধৃত মেডুসার কাটা মুণ্ডটি দিলেন দৈত্য সিটাসকে। সঙ্গে সঙ্গেই সে রূপান্তরিত হয়ে গেল পাথরে, তা'র পর বন্ধন মোচন করে এন্‌ড্রোমিডাকে উদ্ধার করলেন বীর পার্সিউস।
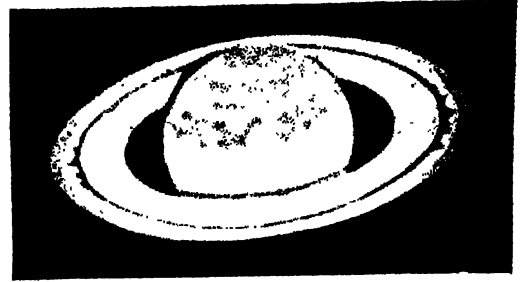
বলয়সমন্বিত শনিগ্রহ
(ইটালীয়ান চিত্রকর মেস্তোর ম্যাজিনি কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি)

অগ্রহায়ণ মাসে আর যে দুটি নক্ষত্রমণ্ডল বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা হ'ল প্রজাপতি বা অরিগা (Aurigae) আর কালপুরুষ বা ওরায়েন (Orion)। অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে রাত নয়টা সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রজাপতি উঠে আসে পূর্ব্ব দিগন্তের বহু উর্দ্ধে পার্সিউসের কাছাকাছি একটু পূব দিকে তাকালেই প্রজাপতিমণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যাবে। ঠিক যেন একটি মহাকায় প্রজাপতি আলোর পাখা মেলে উড়ে চলেছে পূব থেকে পশ্চিম আকাশের পানে—যে কয়টি তারা মিলে অরিগাকে এই সুনির্দ্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছে তাদের মধ্যে ছয়টিকে খালি চোখে অনায়াসে দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুবতারা থেকে একটি রেখা কল্পনা করলে এটি চলে যাবে সরাসরি প্রজাপতিমণ্ডলের উপর দিয়ে। এই মণ্ডলের উত্তরদিকে জলদে রঙের ব্রহ্মহৃদয় (Capella) বা (Alpha Aurigae)। তারাটি এরূপ স্বয়ংপ্রকাশ যে, এটিকে আর চিনিয়ে দিতে হয় না, শীতকালের রাতের আকাশকে এই তারাটি দেয় একটা বিশিষ্ট রূপ। আপন প্রভায়ই এটি নক্ষত্র-পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ করে। ক্যাপেলার নিকটে যে তিনটি উজ্জ্বল তারা ছোট অক্ষরের মত আকৃতির সৃষ্টি করে অবস্থান করছে তা দেখেও এই তারাটিকে চেনা যায়। ঐ নক্ষত্রত্রয়কে বলে Haedi, মানে ছাগলছানা, আর 'ক্যাপেলা' হচ্ছে অজা। আকাশের উত্তর গোলার্দ্ধে ব্রহ্মহৃদয় আর বীণামণ্ডলের অভিজিৎ বা 'ভেগা' এ দুটিই হচ্ছে আর সকল তারার চেয়ে উজ্জ্বল—আর গোটা আকাশে ব্রহ্মহৃদয় হচ্ছে পঞ্চম উজ্জ্বলতম তারা—এর দূরত্ব ৫২ আলোকবর্ষ।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের আকাশের আর এক শোভা কৃত্তিকাপুঞ্জ

বা সাতভাই। অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ার দিকে রাত ন'টা সাড়ে ন'টার সময় কৃত্তিকা আকাশের অনেকখানি উপরে উঠে আসে। ঐ সময় খমধ্য বা সুবিন্দুর (Zenith) দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিকে সরাসরি একটু পূব দিকে প্রসারিত করলে যে ছোট একটি আলোর মৌচাকের মত দেখতে পাওয়া যায় ঐ হ'ল কৃত্তিকা। গোটা আকাশে এত ছোট আলোর ফুলকি দিয়ে তৈরী নক্ষত্রপুঞ্জ বা তারাগুচ্ছ আর নেই, কৃত্তিকাকে দেখলেই চেনা যায়। কৃত্তিকা নক্ষত্রে খুব কাছাকাছি ছয়টি তারা গুনতে পারা যায়—যাঁদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর তাঁরা সাতটিও দেখতে পান। 'কৃত্তিকা' শব্দের অর্থ কর্তন করবার অস্ত্র, অর্থাৎ কাটারি। তারাগুলিকে কল্পিত রেখা দ্বারা যোগ করলে একটা ছেদনাস্ত্রের আকৃতি পাওয়া যেতে পারে। কৃত্তিকার গ্রীক নাম—প্লাইয়াডস (Pleiades)। Pleiones—বহু থেকে উৎপন্ন বলে

লাইরা বা বীণামণ্ডলের এম-৫৭ ধূম্রবলয় (Smoke-Ring) নীহারিকা

এই নাম। গ্রীক পুরাণে প্লাইয়াডস বা কৃত্তিকাগণ হায়েডস (Hyades) বা রোহিণীর ভগ্নী। এরা সাত জন হলেও—ছয় জন দৃষ্টিগোচর হতেন এবং এক জন থাকতেন অদৃশ্য। এরা সকলেই কুমারী।

কৃত্তিকার ছয়টি তারা সহজেই দেখা যায় বলে হিন্দুগণ একে বলেন ষষ্ঠীমাতা। কৃত্তিকাকে নিয়ে হিন্দুপুরাণেও একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী যে তাঁর নিকটে অবস্থান করছেন সেকথা আগে বলেছি। ঐ মণ্ডলের অপর ছয় জন ঋষির পত্নীরা কিন্তু অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতা ছিলেন না। অগ্নিদেব এই সাত জন ঋষিপত্নীকে দেখে তাঁদের রূপে মুগ্ধ হলেন। দক্ষকন্যা স্বাহা জানতে পারলেন অগ্নির মনোভাব। তিনি সতী অরুন্ধতী ছাড়া ক্রমে ক্রমে আর ছয় ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবকে ভজনা করেছিলেন। এতে প্রমাণ হ'ল যে, ঐ ছয় জন ঋষিপত্নী স্বামীদের প্রতি নিষ্ঠাবতী নন। এই অপরাধে তাঁরা নিজ নিজ স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র অবস্থান করছেন ছয় জন কৃত্তিকারূপে। এরাই হলেন স্কন্দ বা কার্ত্তিকের মাতা এবং ষষ্ঠীদেবীরূপে হিন্দুরা এদেরই পূজা করে থাকেন।

কৃত্তিকার পূব দিকে রোহিণী। এতে পাঁচটি তারা ত্রিকোণ শকটাকারে সজ্জিত। রুহ ধাতু অর্থাৎ আরোহণ করা থেকে রোহিণী শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে—রোহিণী মানে যাতে আরোহণ করতে পারা যায়। একে প্রাচীনকালে রোহিণী শকট অথবা সংক্ষেপে শকটও বলা হ'ত। রোহিণী অত্যুজ্জ্বল লাল রঙের তারা - এই হ'ল বৃষরাশি।

রোহিণীর পূব দিকে মৃগশিরা—ছোট ছোট তিনটি তারা নিয়ে গঠিত মৃগশিরাকে কল্পনা করা হয় কালপুরুষের মস্তকরূপে। কালপুরুষ শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোর চারটায়, আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি বারোটায় এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি আটটায় পূর্বদিকে উদিত হয়—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত নয়টা সাড়ে নয়টার সময় কালপুরুষ পূর্ব দিগন্তের ৪৫° ডিগ্রীরও উপরে উঠে আসে। এই কালপুরুষ বা ওরায়ন (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলই তারাভরা আকাশের শ্রেষ্ঠ শোভা—গোটা আকাশে এই নক্ষত্রমণ্ডলের তুলনা মেলে না। মনে মনে কল্পিত রেখা দ্বারা এর ১৩টি তারা যোগ করলে একটি মনুষ্যমূর্তি পাওয়া যায়। এই কালপুরুষকে না চিনতে পারলে নক্ষত্রখচিত আকাশের শ্রেষ্ঠ রূপ দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। কালপুরুষকে চিনে নেওয়ার একটি সহজ উপায় আছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত আটটার পরে পূব আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় পরস্পরের খুব কাছাকাছি তিনটি তারা কেচো ভাবে আকাশের গায়ে শোভা পাচ্ছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে একেই বলা হয় ওরায়ন অর্থাৎ শিকারীর কোমরবন্ধ। সমস্ত আকাশে একমাত্র একুইলা মণ্ডলের একই রেখায় অবস্থিত তিনটি তারা ছাড়া কাছাকাছি এই ধরনের অবস্থানে নক্ষত্রত্রয় আর দেখা যায় না। মাঝখানের তারাটি থেকে দুদিকের দুটি তারার দূরত্ব প্রায় সমান। কোমরবন্ধটিকে চিনতে পারলে কালপুরুষের হাত পা ইত্যাদি বের করাও কঠিন হবে না। কোমরবন্ধ থেকে নীচের দিকে ঝোলানো তিনটি তারা ওরায়নের তলোয়ার। কোমরবন্ধের মাঝের তারাটির সরাসরি নীচেকার তলোয়ারের হাতলে আছে ওরায়নের মহা নীহারিকা—দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাকাশে যে সকল সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক জিনিষ দেখতে পাওয়া যায় এটি তাদের অন্যতম। নীহারিকাকে দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একশ্রেণীর নীহারিকার নির্দিষ্ট আকার আছে—এই শ্রেণীর অন্তর্গত মহা নীহারিকা এম—৩১ এণ্ড্রোমিডার কথা পূর্বে বলেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকার কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। কোনো ঘরে আগুন লাগলে পরে ধোঁয়া যেমন করে শূন্যে ভেসে বেড়ায়, শেষোক্ত শ্রেণীর নীহারিকাকেও মহাকাশে তেমনি সঞ্চরমাণ সাদাকালো ধূম্রপুঞ্জের মত দেখায়। এগুলি হচ্ছে ছায়াপথের সীমানার মধ্যে এক তারা

থেকে অত তারায় প্রসারিত জড়কণা বা ধুলোর মেঘ এবং জলন্ত বাষ্পরাশি। সাধারণ অগ্নিকাণ্ডে ধূম এবং অগ্নিশিখার দরুন যেমন আকাশের গায়ে লেপে দেওয়া অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টি হয়, তেমনি নীহারিকার এই সকল জলন্ত বাষ্পাদিও আকাশের বুকে আলো-আঁধারির বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করে। ওরায়েনের নীহারিকা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকার সগোত্র। দূরবীক্ষণের সাহায্যে এর অন্ধকার অংশে একটি ছায়ামূর্ত্তির মত দৃশ্যমান হয়—সেটি ঠিক যেন একটি অশ্বশিরের মত। এই নীহারিকাকে অশ্ব-শির (Horse-head) নীহারিকা বা কৃষ্ণোপসাগর (Dark Bay) নীহারিকাও বলা হয়। এতে যে Silhouette বা সাদার উপর কালো রঙের চিত্রের আদরা দেখা যায় তার কারণ এই যে, মহাজাগতিক ধূলিকণার (Cosmic Dust) মেঘপুঞ্জ পটভূমিকায় তারাসমূহের আলো-কে ঢেকে রাখে।

ত্রিকোণাকারে অবস্থিত ছোট ছোট তিনটি তারা নিয়ে গঠিত মৃগশিরা বা কালপুরুষের মস্তকের কথা আগেই বলা হয়েছে। কালপুরুষের ডান দিকের বাহুর উপরকার যে লাল তারাটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার নাম আর্দ্রা বা বেটেলজিয়ুস (Betel-geuse)। এর ব্যাস ২০ কোটি মাইল, এর মধ্যে বহু কোটি সূর্য্যের স্থান হতে পারে। আর্দ্রা কথাটার মানে সিক্ত। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্বর্গের নদী ছায়াপথ, কাজেই এ সিক্ত। কাল-পুরুষের বাম বাহুর উপরের তারাটির নাম কার্ত্তিকেয় (Bella-trix)। বাঁ পায়ের উপর যে নীলাভ সাদা তারাটি দেখতে পাওয়া যায়—যাকে একটি এড়ো রেখা দ্বারা আর্দ্রার সঙ্গে যুক্ত করা চলে—ঐ হ'ল বাণরাজা বা রিগেল (Rigel)—ঔজ্জ্বল্যের ক্রম-অনু-সারে একে বলা হয় 'বিটা ওরায়েনিস' (Beta Orionis)—অর্থাৎ কালপুরুষ মণ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা। এই বাণরাজা একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারা। এর ক্যাণ্ডেল পাওয়ার সূর্য্যের চেয়ে পনের হাজার গুণ বেশী।

কালপুরুষের ডান পায়ের তারাটির দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে, শ্বক বা বড় কুকুর মণ্ডলের লুব্ধককে—যার গ্রীক নাম আলফা ক্যানিস ম্যাজোরিস। সমগ্র আকাশে এই লুব্ধকই হচ্ছে উজ্জ্বলতম তারা। এর থেকে যে হরেক রঙের আলোক বিকীর্ণ হয় তা এই নক্ষত্রটিকে দিয়েছে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। আসলে এটি একটি সাদা তারা, কিন্তু আকাশের গায়ে এটি এরূপ ভাবে ঝিকমিক করে যে, মনে হয় এটি যেন অতি দ্রুত পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন রঙের আলো বিকিরণ করছে। লুব্ধক বা সিরিয়াসকে বলা হয় Monarch of the Skies অর্থাৎ আকাশ-সম্রাট। কয়েকটি অনুজ্জ্বল তারা নিয়ে গঠিত বড় কুকুর মণ্ডলের চারপাশে অনেকখানি

তারকাহীন ফাঁকা জায়গা। এই পরিবেশে স্বকীয় প্রদীপ্ত মহিমায় বিরাজিত এই আকাশ-সম্রাট স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন :—

"I am the monarch of all I survey
My right there is none to dispute."

লুব্ধকের বহু নিচে দেখা যায়, Argo Navis নামক বিরাট মণ্ডলকে। এই মণ্ডলটা আকারে এত বৃহৎ যে, এটিকে সাধারণতঃ কেরিণা, Puppis এবং vela এই তিনটী ক্ষুদ্রতর মণ্ডলে বিভক্ত করাই সুবিধাজনক বলে জ্যোতিষীরা মনে করেন। স্নিগ্ধ প্রভা-বিশিষ্ট অগস্ত্য বা canopus কেরিনা মণ্ডলের তারা। ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে লুব্ধকের পরেই এর স্থান। এর দূরত্ব কল্পনাতীত বলেই এটিকে লুব্ধক থেকে ঈষৎ অল্প দ্যুতিমান দেখায়। অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা আছেন স্বামীর নিকট থেকে একটু দূরে ছোট একটি তারার আকারে।

কালপুরুষের পায়ের দিকে বাণরাজা থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি তারা আঁকা-বাঁকা পথে পশ্চিম দিকে এগিয়ে শেষে মোড় ঘুরে বরাবর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। এই মণ্ডল আকাশের একটা বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে—এ হ'ল এরিডানাস বা স্বর্গনদী—দেখতে ঠিক সর্পিল-গতি নদীর মত—এরিডানাসও আকাশের বৃহত্তম মণ্ডলগুলির অন্যতম। খালি চোখে এই মণ্ডলে দেখতে পাওয়া যায় প্রায় তিনশ'টি তারা—তন্মধ্যে কেবলমাত্র শেষেরটি ছাড়া কোনটিই তৃতীয় শ্রেণীর উজ্জ্বল তারার চেয়ে উজ্জ্বলতর নয়। ঐ তারানদীর শেষ-প্রান্তস্থিত এই নীল রঙের প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল তারাটির নাম আখার্নার (Achernar)।

লাইরা বা বীণামণ্ডল এবং একুইলা ঈগল) এই সময়ে পশ্চিম আকাশে দৃশ্যমান। বীণা মণ্ডলের পূর্বদিকে আর একটু ভূরে দেখা যায় সিগনাস (Cygnus) বা হংসপুচ্ছকে। এটিকে উত্তর ক্রুশও বলে, আমাদের জ্যোতিষে এর নাম হংসপুচ্ছ। বিরাট ক্রুশচিহ্নের আকারের এই মণ্ডলটিকে চেনা সহজ। ক্রুশের উত্তর প্রান্তের প্রথম-প্রভা নীল রঙের তারাটির নাম দেনেব (Alpha cygni)। হংসের পুচ্ছের উপর এটি শোভা পাচ্ছে। হংসের দীর্ঘ-প্রসারিত গ্রীবার অগ্র-ভাগে, চঞ্চুর উপর আছে একটি পরম রমণীয় দ্বিতীয়-প্রভা যুগল তারা—Albireo অথবা বিটা সিগনি। হংস এখন উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গায় সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলেছে অস্তাচলের পথে। শেলি চিনতেন এই নক্ষত্র-মণ্ডলকে—এর গতিপথের কথাও জানা ছিল তাঁর—একে উড়ন্তশীল মরালরূপে কল্পনা করে তিনি বলেছেন—

"Yonder goes the cygnus-swan
flying s uthwards."

দেনেবের পশ্চিম দিকে এর একই রেখায় জ্বলছে একটি প্রথম শ্রেণীর উজ্জ্বল নীল রঙের তারা—এটির নাম অভিজিৎ বা ভেগা (Vega)। লাইরা (Lyra) বা বীণামণ্ডলের তারা এটি—আকাশের উত্তর গোলার্ধে এটি হ'ল উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ব্রহ্মহৃদয় অপেক্ষা এর উজ্জ্বলতা বেশী। সূর্য্যের চেয়ে এটি পঞ্চাশ গুণ বেশী উজ্জ্বল—এর দূরত্ব ২৬ আলোকবর্ষ। অভিজিৎ নক্ষত্র-শোভিত বীণামণ্ডলের দিব্য সঙ্গীত শ্রবণ করে Lowell বলেছেন :—

"The Lyra whose strings give music
Audible to holy ears."

বীণামণ্ডলের অভিজিৎ এবং একুইলা বা ঈগলের প্রথম শ্রেণীর নীল রঙের তারা শ্রবণাকে (Altair) নবেম্বর মাসে রাত সাড়ে নয়টার সময় দেখা যায় পশ্চিম দিগন্তের কাছে। শ্রবণা, অভিজিৎ এবং দেনেব এই তিনটি তারা মিলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে সেটি বিশেষ ভাবে দর্শনীয়। একুইলা মণ্ডলে একই রেখায় অবস্থিত যে তিনটি তারা দেখতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে মাঝখানের প্রথম-প্রভা তারা শ্রবণাই সর্বাপেক্ষা দ্যুতিমান। একুইলার এই লক্ষণীয় নক্ষত্র-রেখাকে অনেকে সময় সময় ভুলক্রমে কালপুরুষের কটিবন্ধ বলে মনে করেন।

ছায়াপথ চলে গেছে একুইলা মণ্ডলের ভিতর দিয়ে। গ্রীক পুরাণের উপাখ্যানে আছে যে, দিব্য ঈগল উড়ে চলেছে Milky-way বা ছায়াপথ নামক সুরনদীর উপর দিয়ে।

পাশ্চাত্ত্য মতে যে মণ্ডলের নাম একুইলা হিন্দু পুরাণমতে সেটি হ'ল বিষ্ণুর বাহন গরুড় পক্ষী। এই বাহনে সমাসীন শ্রবণা (Altair) তারার উভয় দিকে উর্দ্ধে ও নিম্নে তৃতীয়-প্রভা পাশ্চাত্ত্য Tarzed (আমাদের লক্ষ্মীতারা রূপে) ও চতুর্থ-প্রভা Alshain (আমাদের সরস্বতীতারা রূপে) বিরাজিত। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী ও মাকরী সপ্তমীতে উপেন্দ্র (Altair) আদিত্যের অর্চনা হয়। এই সময় এই তারা উত্তর-পূর্বাকাশে ভোর চারটার সময় প্রথম উদিত হয়। আশ্বিন পূর্ণিমায় এই তারার উদয় হয় সান্ধ্য আকাশে—তখন হিন্দুরা লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান করে থাকেন।

উত্তর ক্রুশ আর একুইলার মাঝখানে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় ডেলফিনাসকে—মণ্ডলটি ছোট কিন্তু দর্শনীয়। ডেলফিনাসের পূর্বদিকে খেঁকশিয়াল (Vulpecula) মণ্ডল। শ্রবণা নক্ষত্রের প্রায় সমাসরি উত্তর দিকে আছে চারিটি অনুজ্জ্বল তারা নিয়ে গঠিত তীরের মত আকৃতিবিশিষ্ট সেজিটা নামক ছোট একটি মণ্ডল।

এবার ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ (ecliptic) ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক পশ্চিম থেকে পূব দিকে। সিগনাসের দক্ষিণে—অনেক দূরে একুইলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আকাশের গায়ে ঝুলানো যেন একখানি ছাগের মাথা। দেখলে মনে হয় চোখ দুটি বাস্তবিকই সার্থক হ'ল—ঐ হ'ল মকররাশি। মকর এখন এগিয়ে আসছে পশ্চিম দিগন্তের পানে।

মকরের পূব দিকে কুম্ভরাশি—দেখতে একটি কলসীর মত—আকাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এই কুম্ভরাশি। শত-ভিষা মণ্ডল হচ্ছে এই রাশির প্রসিদ্ধ তারামণ্ডল। কুম্ভের ঠিক দক্ষিণ দিকে ক্রান্তিবৃত্তের অনেক নীচে দক্ষিণ মীন (Piscis Australis)। দক্ষিণ মীন কতকগুলি তারা নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র মণ্ডল। এই মণ্ডলে একটি মাত্র তারা দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। সেটি

হ'ল একটা নীল রঙের প্রথম-প্রভা উজ্জ্বল তারা—নাম ফোমালো (Fomalbaut)। ফোমালো থেকে এরিডানাস মণ্ডলের আখার্ণার পর্যন্ত একটি রেখা কল্পনা করে সেটিকে যদি একই দিকে সমান দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত করা যায় তা হলে গিয়ে পৌঁছানো যায় দ্যুতিমান তারকা অগস্ত্যে—লুব্ধকের পরে সমগ্র আকাশে এটিই যে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র সেকথা আগে বলা হয়েছে।

রবিমার্গ ছেড়ে অনেক দক্ষিণে নেমে আসা গেছে। আবার উত্তরমুখী হয়ে কুম্ভে ফিরে গিয়ে পূব দিকে অগ্রসর হলে পৌঁছানো যাবে ইংরেজী V অক্ষরের মত আকৃতিবিশিষ্ট মীনরাশিতে। এর আকৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের কতকটা সাদৃশ্য আছে। মীনের পূব দিকে মেষ রাশি—ক্রান্তিবৃত্তের প্রথম রাশি—বৈশাখ মাসে সূর্য্য এই রাশিতেই গতিশীল বলে প্রতীয়মান হয়। মেষের পূর্ব্ব দিকে বৃষ। বৃষের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে মিথুনরাশি। মিথুনের শিরোভূষণরূপে জ্বল জ্বল করে কমলা রঙের উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় ক্যাষ্টর (Castor) ও পোলাক্স (Pollux)। আমরা এদের বলি, পুনর্ব্বসু। পুরাণকারেরা এ দুটিকে যম-যমী দুই ভ্রাতা-ভগ্নী বলেছেন, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উৎসব এই দুটি তারকাকে উপলক্ষ করে কল্পিত হয়েছে। উত্তর আকাশে ক্যাষ্টরই সম্ভবতঃ সবচেয়ে সুন্দর যুগ্মতারা (binary star)। ছোট দূরবীক্ষণেও এটিকে পরম রমণীয় দেখায়। এই যুগ্মতারার দূরত্ব প্রায় ৪৩ আলোকবর্ষ। প্রত্যেক ৩০৬ বৎসরে এই যুগ্মতারার মধ্যে একটি অপরটির চতুষ্পার্শ্ব ঘুরে আসে।

আমাদের ক্রান্তিবৃত্ত পরিক্রমা শেষ হ'ল। নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ কিন্তু সারা রাত ধরে আকাশ প্রদক্ষিণ করে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ রাত্রে উঠে যদি আকাশের পানে তাকানো যায় তা হলে দেখা যাবে আকাশের রূপ বদলে গেছে। নক্ষত্রমণ্ডলগুলির মধ্যে কোন কোনটি অস্তমিত—অনেকেই স্থান পরিবর্ত্তন করেছে—কালপুরুষ চলে এসেছে পূর্ব্বাকাশ থেকে সরাসরি পশ্চিম আকাশে। ক্যাসিওপিয়া অদৃশ্য আর উত্তর-পূর্ব্বাকাশে ফুটে উঠেছে বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্নের মত আকৃতিবিশিষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডল—প্রশান্ত মৌন মহাকাশের বুকে অগ্নি অক্ষরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে যেন সেই চিরন্তন প্রশ্ন—ততঃ কিম্ ?*

*এই প্রবন্ধরচনায় নিম্নলিখিত পুস্তক এবং পত্রিকা থেকে অল্পবিস্তর সাহায্য পেয়েছি :

(১) The Universo Around us—by Sir James Jeans, (২) The Stars in their Courses—by Sir James Jeans (৩) New Handbook of the Heavens—by H. J. Bernhard, D. A. Bennett, H. S. Rice. (৪) আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, (৫) পৌরাণিক উপাখ্যান—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, (৬) বিশ্বপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (৭) সহজ নক্ষত্র চেনা—শ্রীকামিনীকুমার দে, (৮) ভারতে জ্যোতিষচর্চা ও কোষ্ঠী-বিচারের সূত্রাবলী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল জ্যোতিঃশাস্ত্রী, (৯) আকাশকাহিনী—শ্রীকৃষ্ণলাল সাধু এবং (১০) The Astrological Magazine.

দেশ-বিদেশের কথা

নিবেদিতা বক্তৃতা

১৯৫২ সনে অনুষ্ঠিত নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগী দেশবাসীর নিকট হইতে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, "নিবেদিতা সুবর্ণ জয়ন্তী পরিষদ" কর্তৃক তাহা হইতে ৫০০০৲ টাকার জি পি. নোটস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "নিবেদিতা বক্তৃতা"র ব্যবস্থার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট জমা করা হয়। বক্তৃতার বিষয় এবং বক্তা নির্ব্বাচনের দায়িত্ব সিণ্ডিকেটের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৬ সনে প্রথম বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতেছে। আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০শে নভেম্বর "দ্বারভাঙ্গা হলে" অপরাহ্ন ৩ টার সময় বক্তৃতা হইবে। বক্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যামন্দিরের (বেলুড়) অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ। বক্তৃতার বিষয়—ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও কীর্ত্তি।

দেখুন!
অর্দ্ধেকটী
সান্‌লাইট্‌
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে !
সান্‌লাইটের ফেণার আধিক্যই এর কারন!
সান্‌লাইট্‌
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
S. 248-X52 BG

কল্পতরু-শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত মহেশ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ সিকা।

হিন্দুর জীবনে গীতার প্রভাব অসামান্য। নানা ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে গীতা শুধু 'সূত্রে মণিগণা ইব' নহে, সাহিত্যেও ইহা প্রেরণা দেয়, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সমাদৃত। সাম্প্রতিককালে বহু মনীষী গীতাকে সর্ব্বমানবের জীবন-বেদ বলিয়াছেন। এহেন অমূল্য গ্রন্থের বহুবিধ সংস্করণ আছে। অন্বয়, ভাষ্য, ব্যাখ্যা সমন্বিত সুবৃহৎ সংস্করণ হইতে শুধু মূল শ্লোক নিবদ্ধ ক্ষুদ্রকায় সংস্করণ পণ্ডিত কিংবা সাধারণ মানুষ উভয়ের উপযোগী গীতাই চোখে পড়ে। বাংলা পদ্যছন্দে গীতাও আছে—কিন্তু মূল সংস্কৃত শ্লোক তাহাতে নাই, পক্ষান্তরে শুধু সংস্কৃত শ্লোক আছে—বাংলা ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু পাশাপাশি সংস্কৃত ও বাংলা পদ্যানুবাদ আলোচ্য কল্পতরু গীতাতেই দেখা গেল। শ্লোকগুলি মূলানুযায়ী—ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল, কবিতাগুলিও ভাবমাধুর্য্যভরা। সুলভ মূল্যের এমন একখানি সুন্দর গীতা অবশ্যই সমাদর লাভ করিবে।

মামার দেশ—(একাঙ্ক কৌতুক নাটিকা)। শ্রীঅমরকুমার দত্ত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য বার আনা।

'প্রিন্টার্স ডেভিল' কথাটির সঙ্গে অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে, কিন্তু তাহারই মাধ্যমে ছাপাখানায় প্রতিদিন যে কৌতুকরসের সৃষ্টি হয়—তাহার আস্বাদ পাঠকমহল কদাচিৎ পাইয়া থাকেন। সেই জাতীয় একটি ভুলকে কেন্দ্র করিয়া আলোচ্য নাটকখানিতে চমৎকার হাসির ভোজ্যপরিবেশন করিয়াছেন লেখক। ঝুনো ব্যবসায়ী এক প্রেস ম্যানেজার, অল্প বেতনের কর্ম্মচারী লইয়া তাঁহার কারবার। সেখানে তোৎলা হেড কম্পোজিটার, তার দু'জন সহকর্ম্মীর মধ্যে প্রথমটি ট্যারা ও ছিটগ্রস্ত, দ্বিতীয় জন নেশাখোর, একচক্ষু প্রুফরীডার, উগ্র মেজাজের মেশিনম্যান—প্রভৃতির যোগাযোগে কৌতুক-নাটিকাটি জমিয়াছে চমৎকার। এই ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয়ের একটা সুবিধাও আছে—সজ্জাবাহুল্য বা অর্থব্যয়ের কোন প্রশ্নই আসে না। ছোট বা বড় সমস্ত সম্মেলন মঞ্চের সাহায্য না লইয়াও অনায়াসে এটি অভিনয় করিতে পারেন। সম্প্রতি ইণ্টার-কলেজ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় সেণ্টপলস্‌ কলেজের ছাত্র-সংসদ অভিনীত এই নাটিকাটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। নাটিকাটির গ্রন্থন যেমন সুন্দর—কৌতুকরসের ধারাটিও তেমনি স্বচ্ছ এবং সাবলীল, কোথাও কষ্টকল্পনার লেশমাত্র নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাজা গণেশের আমল—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। শৈলশ্রী, ১।১।১-এ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই নাতিক্ষুদ্র (পৃ. ১৪২+I৵০) পুস্তক আমরা বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিরোধী কল্পনাবিলাস যে ভাবে খরতর গতিতে বাংলা সাহিত্যকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে তাহাতে বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা বাংলাদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। উদীয়মান গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় এই গবেষণাগ্রন্থ লিখিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন যাহারা "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস" জাতীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রাজা গণেশকে রূপকথার নায়ক সাজাইয়া তৃপ্তিবোধ করেন—বহু শিক্ষিত বাঙালী অদ্যাপি করিতেছেন—তাঁহারা আলোচ্য গ্রন্থটি একবার পড়িয়া দেখুন। বর্ত্তমানে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে রাজা গণেশের রাজত্বের উপর প্রচুর আলোকপাত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার যাবতীয় উপকরণ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন-মণ্ডন করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কোন কোন ঘটনার বৈচিত্র্য এতই চিত্তাকর্ষক যে, রূপকথাকেও পরাস্ত করিতে পারে। মিথিলার রাজা শিবসিংহের সহিত রাজা গণেশের প্রামাণিক সংযোগ-বৃত্তান্ত (পৃ. ২০), কৃত্তিবাস ও চৈনিক প্রত্যক্ষদর্শী কর্ত্তৃক তাঁহার "নয় মহল" প্রাসাদবর্ণনা (পৃ. ১২৯-৩০), রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের অভ্যুদয় (পৃ. ৭২-৮৭) প্রভৃতি চিত্র প্রত্যেক বাঙালীর দর্শনীয়। গ্রন্থকার প্রামাণিক কুলপঞ্জীর বৃত্তান্ত সাদরে বিশ্লেষণ করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা অন্যত্র অপ্রাপ্য। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চক্রবাক—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। প্রফুল্ল-কুমুদ লাইব্রেরী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৪৲।

'শতাব্দী' 'কুরপালা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া শ্রীরমেশচন্দ্র সেন খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। চক্রবাক এই খ্যাতিমান লেখকেরই রচিত আর একখানি রমণীয় উপন্যাস। ইহার নায়ক সুশান্ত, বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী এক সুশ্রী যুবক। সে একাধারে কবি এবং গায়ক—অভিনয়কলায়ও তার নৈপুণ্য কম নয়। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঙালী-সমাজে সে ব্যতিক্রম। কাহিনীর প্রারম্ভে তাহাকে আমরা দেখিতে পাই খয়রাতে গহনাবিক্রেতারূপে। সেখানে সে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিল বন্ধু সন্তোষের গৃহে। বন্ধুপত্নী মন্দারের অনুপম যৌবনশ্রী এবং অক্লান্ত সেবা তাহাকে মুগ্ধ করিল। খয়রা হইতে সে গেল চন্দ্রিকায়। এই পাহাড়িয়া দেশে দীর্ঘকাল পরে তাহার দেখা হইল বালবিধবা সরযূর সঙ্গে। জীবনে প্রথম সে ভালবাসিয়াছিল এই সরযূকেই, তাহার কবি-মন এই প্রথম প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই রচনা করিয়াছিল এক নিরুপম স্বপ্নলোক—কিন্তু চন্দ্রিকায় আসিয়া বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সে দেখিল, ব্যাধির আক্রমণে সরযূ হইয়াছে শ্রীহীনা—অকাল বার্দ্ধক্যে নিঃশেষিতপ্রায় তাহার যৌবন-লাবণ্য,—কেশে তাহার পাক ধরিয়াছে। সরযূর পরম বেদনার স্থানটিতে সুশান্ত ঘা দিল নির্মম ভাবে। কিন্তু চন্দ্রিকা হইতে ফিরিবার পরেই সুশান্তর জীবনে দেখা দিল নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়। অবশ্য ইহার জন্য দায়ী যে সরযূর অবিমৃষ্যকারিতা তাহা সুশান্ত তখন জানিতেও পারিল না। শেষ পর্যন্ত গহনাবিক্রয়ের কাজটি গেল—মেস ছাড়িয়া তাহাকে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইল হাওড়ায় এক বস্তিতে নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে। জীবিকার জন্য তাহাকে ফিরিওয়ালার ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইল।

ইহার পর সুশান্তের জীবনের স্রোত আবর্তিত হইয়া চলিল উদ্দাম গতিতে। ছককাটা বাঁধাধরা জীবন তাহার নয়—সেখানে আছে রোমান্স, আছে অভাবিতের লীলা, পদে পদে নব নব বিস্ময়—অজানাকে আবিষ্কার করিবার বিপুল আনন্দ। মিনতির সঙ্গে তাহার বিবাহও এমনি এক অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক রোমান্স—কিন্তু তাহার পরিণতি হইল শোচনীয় ট্রাজেডিতে। সুশান্ত দৈন্যদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিল বটে, কিন্তু মন্দার সরযূ আর মিনতি এই ত্রয়ীর প্রতি প্রেম তাহার জীবনে এমন ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিল যে, পরিপূর্ণ প্রাচুর্যের মধ্যেও সে ভাসিয়া চলিল স্রোতোমুখে তৃণের মত। মিনতির অকালমৃত্যু তাহার হৃদয়কে বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—তার সেই বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ে তীব্র আঘাত হানিল সরযূ। শেষ পর্যন্ত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল সুশান্ত।

সুশান্ত চরিত্রটি লেখকের সার্থক সৃষ্টি। তাহাকে তিনি হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন। সে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক হইলেও এবং সামাজিক অনুশাসন না মানিয়া চলিলেও তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা স্বকীয়তা এবং জীবনের প্রতি এমনি একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আছে যে, তাহার প্রতিভা ও প্রাণশক্তির অপচয় পাঠকের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। সরযূ এবং মন্দারের প্রতি সুশান্তর যে প্রেম তাহা অবৈধ এবং সমাজবিগর্হিত, কিন্তু তাহা ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া—বিশেষতঃ সুশান্তর প্রতি মন্দারের অনভিব্যক্ত অনুরাগের বর্ণনায় লেখক যে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। চির অভিশপ্তা সরযূর জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনে এবং তাহার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেও লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাই। ব্রীড়াবনতা অশ্রুমুখী মিনতি অনেকটা আড়ালে থাকিলেও, অকালে পরিসমাপ্ত তাহার ব্যর্থ জীবনের সুগভীর বেদনা কাহিনীর শেষাংশটিকে স্নিগ্ধ কারুণ্যে আর্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে সুশান্তর বন্ধু কাফ্রী যুবক 'জনের'—যে সার্কাসে 'God's wonderful Creation' আজানুলম্বিত দাড়িওয়ালা ছাগলটিকে দেখাইত—আচরণ এবং উক্তি মনে বেশ একটা কৌতুকমিশ্র বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

চরিত্রসৃষ্টি ছাড়া লেখক আর একটি বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—সে প্রকৃতি বর্ণনা। অল্প কথায় পল্লীপ্রকৃতির নিখুঁত এবং নিরুপম ছবি তাঁহার নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—মাঝে মাঝে সুষ্ঠু উপমাপ্রয়োগে সেই ছবি একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন—"পথের দুই ধারে আকাশচুম্বী মাঠ, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু'একটি গাছ। ঘাসগুলি বর্ষার নূতন জল

পাইয়া তাজা ও সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ঘাসের সাদা ফুলগুলি প্রকৃতির বুকে যেন চন্দনের এক একটি ফোঁটা।"

মোট কথা, চরিত্রসৃষ্টিতে, প্রকৃতিবর্ণনায়, নিরলঙ্কৃত ভাষার অনায়াস মাধুর্যে "চক্রবাক" যে পাঠককে মুগ্ধ করিবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। বি বুক এক্সচেঞ্জ, ২১৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২৲, পৃষ্ঠা ১১৩।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে মোট ব্যয় হইয়াছে প্রায় ২'৫৬ কোটি টাকা—প্রায় বলা হইল এজন্য যে, ইহার পূর্ণ হিসাব এখনও বাহির হয় নাই। এই সময়ে ভারতের জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে। তুলা, প্রধান প্রধান তৈলবীজ উৎপাদন, জলসেচের ব্যবস্থা, শিল্পোৎপাদন, সিমেন্ট উৎপাদন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মসংস্থানের দিক হইতে ইহা সাফল্যলাভ করে নাই বলিলেই চলে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪,৮০০ কোটি টাকা—তন্মধ্যে ২,৫৫৯ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বাকী ২২৪১ কোটি টাকা রাজ্যসরকারসমূহের ব্যয়। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি, শিল্প ও খনি, পরিবহন ও যোগাযোগ, সমাজসেবা ও বিবিধ খাতে যথাক্রমে ৬৫, ১০৫, ৭৪৭, ১২০৩, ৩৯৬ এবং ৪৩ কোটি টাকা খরচ করিবেন এবং রাজ্যসরকারসমূহ ঐ সকল খাতে যথাক্রমে ৫০২, ৮০৮, ১৪৩, ১৮২, ৫৪৯ এবং ৫৬ কোটি টাকা খরচ করিবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হইতেছে—জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার জন্য জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, মৌলিক ও ভারী শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়ন, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি এবং আয়ের ও ধনসম্পদের অসমতা হ্রাস ও যতদূর সম্ভব আর্থিক সংস্থানের সমবণ্টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৌলিক শিল্পের উপর জোর দিলেও ভারতের আর্থিক জীবন গ্রাম ও কৃষিকেন্দ্রিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে মোট ১৫৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সরকারী মোট ৪৮০০ কোটি বরাদ্দের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় এবং ৪০০ কোটি টাকা কোন সূত্রে পাওয়া যাইবে তাহা স্থির হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। আগামী পাঁচ বৎসরে বেকারসমস্যা আরও বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যে বিঘ্ন হইবে সন্দেহ নাই। সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য ইতিমধ্যেই ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ককে ষ্টেট ব্যাঙ্কে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ হইয়াছে। অবশ্য তৎসত্ত্বেও প্ল্যানিং কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক নানা মত উদ্ধৃত করিয়া পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছেন এবং নিজেও আলোচনা-প্রসঙ্গে বিষয়টি অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এইরূপ সুলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

চার্বাকের উক্তি—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪০-সি, চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা-২০। মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার বহুদিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি একরূপ নীরব ছিলেন। তাঁর পরিণত জীবনের কাব্যসাধনার এই ফল রসলিপ্সার সাধ মেটাবে। কতকগুলি কবিতার ভাবে ও ভাষায় আধুনিকতার স্পর্শ আছে; বোঝা যায়—কবি বয়সে প্রবীণ হলেও তাঁর মন এখনও সক্রিয়, গতিশীল। "যারা দিনের পর দিন খাটে, তারা বাঁধে, ইঁটের উপর ইঁট গাঁথে"—তাদের মর্য্যাদা "প্রথগতি মেদবহুল নরনারী"র চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশী। কৃত্রিম সভ্যতার কারাগার থেকে মাঝে মাঝে মন উড়ে যেতে চায় আদিম যুগে:

"হে মহানগরী!
আজও গভীর রাত্রে
পাহাড়ের পাগলা হাওয়ায়
আমরা শুনতে পাই
অতীত অরণ্যের সেই অস্থির ক্রন্দন;
আর বেড়েই চলে তোমার ইতিহাস
পাতার পর পাতা জুড়ে।"

শেষ কবিতা 'চার্বাকের উক্তি'—ঐ নামেই বইয়ের নাম। কবির মতে "চার্বাক ছিলেন বহুজন হিতবাদী" এবং সেই জন্যই তিনি তাঁর প্রিয়। বৈরাগ্যবাদ বা পলায়নপর মনোভাবের প্রতি কবি প্রসন্ন নন। 'কয়েকটি চীনা কবিতার ভাবানুবাদ'—সরস ও সাবলীল।

আনন্দ-প্রতিষ্ঠা—শ্রীচিত্তরঞ্জন। দেব এজেন্সি, ২০ আমীর আলি এভেনিউ, কলিকাতা-১৭। মূল্য আট আনা।

অধ্যাত্ম আনন্দলাভের পথনির্দেশ। বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের শিক্ষা থেকে লেখক প্রেরণা পেয়েছেন। "বিদ্যা-অবিদ্যা, সম্ভূতি-বিনাশ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ—এই দ্বন্দ্বমূর্ত্তিগুলি যে কেবল একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিকাশ, এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বাধা চিরতরে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে।" রচনার ভাষা শান্ত গভীর অনুভূতিপূর্ণ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০৷২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বীণাপাণি
শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

'মেঘের ভেলা''

[ফোটো : শ্রীকনক দত্ত

জলপথে

ফোটো : শ্রীঅজিতকুমার শ্রীমানী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ
২য় খণ্ড
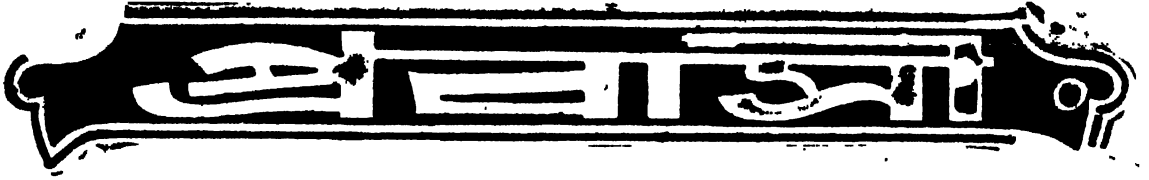
মাঘ, ১৩৬৩ } ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আসন্ন নির্ব্বাচন

সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রে আচার্য্য কৃপালনীর এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি ও শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণ কংগ্রেস দলে যোগদান করিবেন না, কারণ তিনি মনে করেন, গণতন্ত্রবাদের পরিচালনায় বিরোধীপক্ষের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

ইহা ধ্রুব সত্য। সবল ও যুক্তি-বিচারযুক্ত বিরোধীপক্ষ সর্ব্বদাই শাসনতন্ত্রের অধিকারীদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ থাকে ও সেরূপ কিছু ঘটিলে যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, যাহার ফলে দেশের লোক বুঝিতে পারে শাসন-তন্ত্র কি ভাবে চলিতেছে ও তাহার গতি কোন্ দিকে। কিন্তু বিরোধীপক্ষের যুক্তিতর্কের মাত্রা থাকা উচিত এবং সকল ক্ষেত্রেই ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীত হওয়া দরকার যে, বিপক্ষদল দলীয় স্বার্থের জন্য দেশের ও দশের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করিতে চেষ্টিত নহেন। তিলকে তাল করিয়া দেখাইয়া বা বিদেশ হইতে আমদানী মাৎস্যন্যায়ের চালনায় দেশের কাজ-কারবার ও শান্তি-নিরাপত্তা নষ্ট করিয়া, শাসন-তন্ত্রের অধিকার লাভের চেষ্টা যে বিপক্ষদল সময়ে অসময়ে, ক্রমাগত করিয়া চলে তাহার মূল্য গণতন্ত্রে কিছুমাত্র নাই বরঞ্চ সেরূপ বিপক্ষদল দেশের বিপদের হেতু। কারণ তাহাদের কার্য্যক্রম ধ্বংসাত্মক।

বাংলা দেশ হইতে কাজ-কারবার চলিয়া যাইতেছে, নূতন ত কিছুই হইতেছেই না—সরকারী উদ্যোগ ছাড়া—যেগুলি আছে সে সবও ক্রমেই অবনতির পথে চলিতেছে, ইহার কারণ কি তাহা সকলেই জানে এবং কাহাদের প্ররোচনায় উহা ঘটিতেছে তাহাও সকলেই জানে। যে দল বা যে দলগোষ্ঠী ঐরূপ কার্য্যক্রম চালাইতেছে তাহারা যে কোনও দিন দেশের শ্রী ফিরাইতে পারিবে একথা বিশ্বাস করাও বাতুলতা। পূর্ব্ব-ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, যাহারা ঐভাবে শাসনতন্ত্র অচল করিয়া পরে অধিকার করিল, উচ্চতম শক্তির কর্ত্তৃপক্ষ প্রায়ই তাহাদের "ক্রীতভূত" করিয়াছেন বা চিরদিনের মত অকেজো ক্লীব করিয়া রাখিয়াছেন, কেননা ঐরূপ দল ধ্বংসের কাজে প্রবল সহায়তা করিতে পারে কিন্তু রক্ষার ব্যাপারে বা গঠনের ব্যাপারে তাহাদের কোনও মূল্য নাই।

বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসে ও কংগ্রেস-চালিত সকল শাসনতন্ত্রে যে দুর্নীতি ও কলুষের বন্যা বহিতেছে তাহার একটি কারণ উপযুক্ত বিরোধীপক্ষের অভাব। যাহারা কথায় কথায় বলে, "নেহরুকে ফাঁসী দাও" "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" ইত্যাদি, যাহাদের কাজে বা কথায় মাত্রাজ্ঞানের কোনও চিহ্ন নাই, তাহাদের বিরোধিতার ওজন ক্রমেই কমিয়া আসে। বিশেষে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলগত স্বার্থ ভিন্ন যাহাদের অন্য কোনও নীতির বালাই নাই তাহারা কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করার পথ দেখাইবে কিরূপে? সর্ষিবার ভূতাবেশ হইলে ওঝা কি করিতে পারে। সেকথা আমরা আচার্য্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণকে নিবেদন করি। ইহারা দুই জনেই নিষ্কাম ও দেশসেবায় আত্মনিয়োজিত বলিয়া খ্যাতিমান। কিন্তু যে সকল দলগোষ্ঠী এখন নির্ব্বাচনী যুদ্ধে নামিয়াছে তাহাদের সাধারণ প্রার্থী ও কংগ্রেস প্রার্থীর মধ্যে মানুষ হিসাবে যেটুকু প্রভেদ আছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বামপন্থীদিগের অনুকূল নহে। অন্ততঃপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে।

নির্ব্বাচনী ইস্তাহার সকলেই দিয়াছেন বা দিবেন। বলা বাহুল্য, উহার মূল্য কাণাকড়িও নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাতে প্রভাবিত না হইয়া প্রত্যেকটি প্রার্থীকে যাচাই করিয়া লইবেন। শ্লোগান বা আপ্তবাক্যের ছলনায় ঠকিলে পাঁচ বৎসরের মত নিরুপায় এ কথা যেন সকলের মনে থাকে। যদি প্রার্থী মনোমত না হয় তবে সময় থাকিতে উপযুক্ত প্রার্থীর ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের অভাগা দেশে অবশ্য সেটা বোধ হয় সম্ভব হইবে না। এখানে আমরা ভাবের উচ্ছ্বাসে কাজ করিয়া বসি এক মুহূর্ত্তে ও পরে কপাল চাপ-ড়াইয়া কাটাই বৎসরের পর বৎসর।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, "দেশের লোক যেমন, সেই মতই শাসন-তন্ত্র হয়।" বিগত পাঁচ বৎসরে সেই প্রবাদের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

আসামে কংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়ন

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে আসামের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আসামে কংগ্রেস যে সকল প্রার্থীদিগকে মনোনয়ন করিয়াছে, তাহাতে চতুর্দ্দিকে বিশেষ সমালোচনা উঠিয়াছে।

আসামে কংগ্রেসকর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" পত্রিকার ৬ই পৌষ ও ১৩ই পৌষ সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে মনোনয়ন ব্যাপারে কংগ্রেসী নীতির প্রশংসা করা যায় না।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, যে, সাধারণভাবে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, প্রার্থী মনোনয়নকালে কংগ্রেসপ্রার্থীর অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ ও শিক্ষাদীক্ষা এবং অন্যান্য যোগ্যতা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করিয়া দেখিবেন, "কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে তাহার বিন্দুমাত্র পরিচয়ও যেন পাওয়া যাইতেছে না।"

করিমগঞ্জ মহকুমার রাতাবাড়ী পাথরকান্দি সংরক্ষিত আসন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ সাধারণ আসন এবং বদরপুর আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন যথাক্রমে শ্রীহরমোহন রায়, আবদুল হামিদ চৌধুরী এবং মৌলানা আবদুল জলিল।

যুগশক্তি উপরোক্ত প্রার্থীদের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া লিখিতেছেন যে, শ্রীরায়কে কখনও কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হিসাবে দেখা যায় নাই, "বরং কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রীগোপেশ নমঃশূদ্রের সমর্থক হিসাবেই অনেকে তাঁহাকে জানেন। যতদূর মনে পড়ে অল্পদিন পূর্ব্বে ভলু-কালীনগর গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সভাপতি নির্ব্বাচনে তিনি কম্যুনিষ্ট সহায়তায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর কাছে ১৯-৩ ভোটে পরাজয় বরণ করেন।...আরও জানা গিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে ভেজাল দুধ ও ঘি সংক্রান্ত অভিযোগে তিনটি ফৌজদারী মামলা ঝুলিতেছে।"

আবদুল হামিদ চৌধুরী সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "কুখ্যাত রাইস সিণ্ডিকেটের মামলার সঙ্গে তাঁহার পরিবারের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল—রেফারেণ্ডাম-বাগে কমিশনের সময় ইঁহারা করিমগঞ্জকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থদান ও অন্যান্য উপায়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া পাকিস্থান প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াও অভিযোগ রহিয়াছে।" উপরন্তু মৌলনা আবদুল মুনিম এবং খান বাহাদুর মহম্মদ আলী প্রমুখ আজীবন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ উপেক্ষিত হওয়ায় কংগ্রেসসেবী মুসলমানগণও স্বভাবতঃই হতাশ হইবেন।

আবদুল জলিল বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে পাকিস্থান হইতে আগত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারূপে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু নির্ব্বাচনপর্ব্ব শেষ হওয়ার পর তাহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি দুর্গাপূজার শোভাযাত্রায় বাধাদান এবং অন্যান্য প্রকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির প্রয়াস পান। "এহেন দাম্ভিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনুপাতিক সদস্যহার রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই মনোনয়ন দ্বারা কংগ্রেস বিঘোষিত আদর্শের সম্পূর্ণ অমর্য্যাদা করা হইয়াছে বলিয়াই সর্ব্বসাধারণের ধারণা।"

"আসামে কংগ্রেস নমিনেশন" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক 'যুগবাণী' ২১শে পৌষ লিখিতেছেন যে, আসামে নমিনেশন দান ব্যাপারে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাকেই নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে যদিও কংগ্রেসী দলের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার সাধু ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে।

আসামে সেন্সাস গ্রহণের সময় বাঙালীদের সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার জন্য নানা প্রকার জালজুয়াচুরির সাহায্য লওয়া হয়। আসাম ভ্যালীর ছয়টি জেলা (কামরূপ, দরং, নওগাঁ, লখীমপুর, শিবসাগর ও গোয়ালপাড়া)—১৯৩১ সনের সেন্সাসে বাঙালীর সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার, আর অসমীয়াদের ১৯ লক্ষ ৭৩ হাজার। ১৯৩১-১৯৫১ এই কুড়ি বৎসরে আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ২২ হারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উক্ত হারে ১৯৫১ সনের সেন্সাসে বাঙালীর সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল মোটামুটি ষোল লক্ষ এবং অসমীয়ার ২৯ লক্ষ। উপরন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বহু বাঙালী গিয়া আসামে আশ্রয় লওয়ায় বাঙালীর সংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ বেশী হওয়া উচিত ছিল। তৎসত্ত্বেও দেখা গেল যে, ১৯৫১ সনের সেন্সাসে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ত দূরের কথা, কমিয়া আট লক্ষ চৌদ্দ হাজারে নামিয়াছে এবং অসমীয়ার সংখ্যা বেলুনের মত ফুলিয়া ৪৯ লক্ষ ১৩ হাজারে উঠিয়াছে। অনুরূপ ভাবে কাছাড় জেলায়ও বাঙালীদের সংখ্যা ১৯৫১ সনের সেন্সাসে কম করিয়া দেখান হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা সেরূপ ফলবতী হইতে পারে নাই। "যুগবাণী" লিখিতেছেন যে, ১৯৫১ সনের সেন্সাস যথাযথরূপে গৃহীত হইলে আসামে বাঙালীর সংখ্যা হইত ৩২ লক্ষ (আসাম ভ্যালীর ছয়টি জেলায় ষোল লক্ষ + কাছাড়ে এগার লক্ষ + উদ্বাস্তু পাঁচ লক্ষ) —"অর্থাৎ, আসামের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী। এই হিসাবে আসামের বিধানসভায় অন্ততঃ ৩৬টি এবং লোকসভায় পাঁচটি ও রাজ্যসভায় দুইটি আসন বাঙালীদের ন্যায্য প্রাপ্য হয়। কিন্তু কংগ্রেস নমিনেশনে বিধানসভায় বাঙালী পাইয়াছে ১১টি এবং লোকসভায় মাত্র ১টি, তাহাও সিডিউল সীট—যা না দিয়া উপায় নাই।"

'যুগবাণী' আরও দেখাইয়াছেন, এমনকি ১৯৫১ সনের সেন্সাসের 'জলজ্যান্ত মিথ্যা হিসাব'কেও যদি মানিয়া লই তবে বাঙালীদের সংখ্যানুপাতে যে কয়টি আসন পাওয়া উচিত ছিল তাহাদিগকে তাহাও দেওয়া হয় নাই ; ১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুযায়ী আসামে বাঙালীর সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ ২৯ হাজার। এই হিসাবে বাঙালীকে

বিধান সভায় ২৩টি এবং লোকসভায় ৩টি আসন দেওয়া উচিত ছিল। "বাঙালীর এই ন্যূনতম দাবি স্বীকার করাও কংগ্রেস কর্ত্তব্য মনে করে নাই। রাজ্যসভার কথা না তোলাই ভাল, গত ৫ বৎসরের মধ্যে কোন বাঙালীকে কংগ্রেস সেখানে পাঠায় নাই।"

যদিও ভাষা-সংখ্যালঘু বাঙালীদের ক্ষেত্রে কংগ্রেস এরূপ অসম আচরণ করিয়াছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে জনসংখ্যার অনুপাতে ১৭টি আসন দিতে কংগ্রেসের বাঁধে নাই। বাঙালীদের বেলা আটকাইয়াছে, কারণ সেখানে অস্তিত্বের প্রশ্ন, সুতরাং কংগ্রেসী কর্তাদের মতে লিঙ্গুইজম (Linguism)।

"যুগবাণী" লিখিতেছেন—

"সীমা কমিশনের রিপোর্ট এবং রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস করার সময় কংগ্রেসী কর্তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীকে নিরাপত্তার যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা কি ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে এই হিসাব হইতে বুঝা যাইবে—

বাঙালীকে কংগ্রেস নমিনেশন দেওয়া হইয়াছে :—

জেলা	বাঙালীর সংখ্যা (১৯৫১ সেন্সাসে)	লোকসভায়	বিধানসভায়
কাছাড়	৮,৬০,৭৭২	১ জন সিডিউল্	১০ জন
গোয়ালপাড়া	১,৯৩,৩৬৬	একজনও না	একজনও না
কামরূপ	২,২৫,২০৯	,,	,,
দরং	৬৩,৯৮৯	,,	১ জন
নওগাঁ	২,০৭,২৫৪	,,	একজনও না
লখীমপুর	৮৩,৫৮৫	,,	,,
শিবসাগর	৪১,৫৮১	,,	,,
		১ জন সিডিউল্	১১ জন

"বিধান সভায় এই ১১ জনের মধ্যে ১০ জনই কাছাড়ের। আসাম ভ্যালীর ১৬ লক্ষ বাঙালীর মধ্যে একজন মাত্র কংগ্রেস নমিনেশন পাইয়াছেন। ধুবড়ীতেও কোন বাঙালী নমিনেশন পান নাই, পাইয়াছেন—কংগ্রেসের জেনারেল-সেক্রেটারী মাধবন নায়ার যাহাকে গোয়ালপাড়ার দাঙ্গাবাজির প্রধান নায়ক বলিয়াছিলেন সেই শরৎ সিংহ ও তাহার মুসলমান সাগরেদটি। ইহাকে প্রাদেশিকতার পুরস্কার ছাড়া আর কি বলা যায়? কাছাড়ের ১৩টি আসনেও অ-বাঙালী এবং পাকিস্থানী আন্দোলনের পাণ্ডাদের আনিয়া ঢুকান হইয়াছে। কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতি যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সমস্ত জীবন পালন করিয়াছেন তাঁহারা নমিনেশন পান নাই, পূর্ব্বাচল আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই অতি সতর্কতার সহিত বাদ দেওয়া হইয়াছে, শুধু যাহারা আসাম কংগ্রেসের হুঁকাবরদার রূপে তাঁবেদারী করিতে পারিবে সেই সব সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানীদের ভাগ্যেই কংগ্রেস নমিনেশন জুটিয়াছে।"

কাছাড় লোকসভার জন্য নমিনেশন দান ব্যাপারে কংগ্রেস বাঙালীদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "যুগবাণী" লিখিতেছেন, "সাত লক্ষ বাঙালী ভোটারের মধ্যে কংগ্রেস একজন যোগ্য লোক পায় নাই, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে মজুর-সর্দ্দার অখ্যাতনামা এক তেওয়ারীকে। ইহা দুরভিসন্ধিমূলক বলিলে কম বলা হয়, ইহার পশ্চাতে প্রাদেশিকতাদুষ্ট আসাম কংগ্রেসের অতি-গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত রহিয়াছে। শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানে-ঐতিহ্যে এবং রাজনৈতিক চেতনায় আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেলার পক্ষে ইহার মত অবমাননাকর আর কিছু হইতে পারে না। কাছাড়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানকার কংগ্রেসীরাও ইহা মানিয়া নিতে পারিতেছেন না। কাছাড়ের বাঙালীরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে, এই অপমানের সমুচিত উত্তর দিতে পারেন তবেই দিল্লীর হাইকম্যাণ্ডের চৈতন্যোদয় হইবে।"

ডাকবিভাগের অবহেলা

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকার ৫ই পৌষ সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—টেলিগ্রাম প্রেরণে, ভিপি, রেজেষ্ট্রী, মনিঅর্ডার প্রভৃতি প্রেরণে সহরবাসীদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। "বহুকাল হইতেই শহরবাসী এই অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে কয়েক বার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই।"

ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া "ভারতী" একটি কোমল স্থানে আঘাত করিয়াছেন। ডাকবিভাগের খেয়ালীপনার 'বলি' হিসাবে আমাদিগকেও বহু সময় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। ডাকবিভাগের যে সুনাম ছিল এখন তাহা প্রায় আর কিছুই নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ প্রত্যহ প্রকাশিত হয় তাহাই ইহার প্রমাণ।

অনেক ক্ষেত্রেই যে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়াও ফল হয় না—একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। জনৈক বন্ধু চিঠিবিলি সংক্রান্ত গোলমাল সম্পর্কে তাঁহার আঞ্চলিক পোষ্ট মাষ্টারকে জানাইলে, গতানুগতিক অনুসন্ধানের পর পোষ্ট আপিস হইতে তাঁহাকে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অনুরূপ অভিযোগের কারণ আর থাকিবে না। ইহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পত্রটিতে কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় কাহারও কোন স্বাক্ষর নাই এবং পত্রের উপরে লিখিত ঠিকানাটিও যথাযথ নহে। ইহাতেই ডাকবিভাগের কর্ম্মপদ্ধতির একটি নমুনা পাওয়া যায়। এইরূপ চিঠির পর কেহই আশা করিতে পারেন না যে, অভিযোগের প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা হইতে পারে—কারণ যেখানে বাহিরের লোকের নিকট পত্রে সহি ভুল হইয়া গেলেও কাহারও নজরে পড়ে না সেখানে আভ্যন্তরীণ কর্ম্মে

শৃঙ্খলা আনয়ন কতদূর সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। বসুটির অভিযোগের কারণ পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। তিনি পুনরায় পোষ্টমাষ্টারের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন —কিন্তু কোন উত্তর পান নাই। তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এবার পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের নিকট লিখিবেন।

ডাকবিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতির নানা কারণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কর্ম্মীর অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিভাগ সম্পর্কে সে-কথা খাটে না। কোন সরকারী বিভাগই কর্ম্মীর অভাবের জন্য যথাযথ কাজ করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া আমরা জানি না। সরকারী আপিসে কর্ম্ম সম্পাদনে ত্রুটিবিচ্যুতির প্রধান কারণ কর্ম্মীদের মধ্যে কর্ম্মবণ্টন ব্যাপারে অসঙ্গতি। যথাযোগ্যভাবে কর্ম্মবণ্টন করা হইলে সরকারী আপিসের কর্ম্মদক্ষতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু আপিসেই অফিসারগণ কার্য্যতঃ দৈনিক দুই-একটি সহি ছাড়া আর কোন কাজই করেন না। তাঁহারা বিভিন্ন বিদেশী এবং দেশী চলচ্চিত্র পত্রিকা পড়িয়াই দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন হইল বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা নিজেরা ত কোন কাজই করেন না, উপরন্তু নিম্নতন কর্ম্মীদের সহিত বিশেষ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় ইঁহাদের নির্দ্দেশগুলিও সহজে প্রতিপালিত হইতে চায় না। নিম্নতন কর্ম্মীদের মধ্যেও অনেকে উপরওয়ালাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন।

কর্ম্মবণ্টনে অসঙ্গতি ব্যতীত সরকারী বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার আর একটি প্রধান কারণ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কল্পনাশক্তির অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, কোন্ সময়ে কোন্ বিশেষ বিভাগে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাইবে। সেই হিসাবে বিভাগান্তর হইতে কর্ম্মীদিগকে সাময়িক ভাবে কর্ম্মব্যস্ত বিভাগে নিযুক্ত করিলে সহজেই কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা করা হয় না। রেডিও লাইসেন্স বণ্টন, রেলের মাসিক টিকিট বিক্রয় ব্যাপারে এইরূপ কল্পনাশক্তির অভাবের জন্য জনসাধারণকে সততই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

মুষ্টিমেয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অফিসার এবং প্রধানতঃ নিম্নতন কর্ম্মীদের সততা এবং পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করিয়াই সরকারী বিভাগগুলি বাঁচিয়া রহিয়াছে। কিন্তু উপরতলার গাফিলতি এখন নীচের তলায়ও আসিয়া পড়িয়াছে—তাই আজ সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা।

পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রভাবে অন্যান্য সকল শিল্প যখন বিস্তার লাভ করিতেছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই অবস্থায় ভারতীয় পাটশিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে; ১৯৫৬ সনে পাট-শিল্পের পক্ষে দুর্দ্দিন গিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্যে পাটজাত দ্রব্য প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সনে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পাটশিল্পের প্রধান সমস্যা হইতেছে—প্রতিযোগিতা ও মূল্যবৃদ্ধি। ১৯৫৫ সনে পাটশিল্পে উন্নতি হয়, ঐ বৎসর প্রায় ১০·৩৩ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় হয় এবং ১৯৫৪ সনে হয় ৯·৫৬ লক্ষ টন। ১৯৫৫ সনে উন্নতির ফলে ১৯৫৬ সনে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া কাজ সুরু করা হয়, পূর্ব্বে হইত সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা। ১৯৫৫ সন পর্য্যন্ত কাঁচা পাটের অভাবে প্রত্যেক কারখানায় ১২৷ শতাংশ তাঁত বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৫৫ সনে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী অধিক হওয়ায় ভারতীয় পাটকল সমিতি ১৯৫৬ সনে ৯ই জানুয়ারী হইতে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ তাঁতের ২৷ শতাংশকে পুনরায় কার্য্যকরী করার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার ফলে মাসে ২,৫০০ হাজার টন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কোরিয়া যুদ্ধের পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত পাটদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায় এবং গত বৎসর সোভিয়েট রাশিয়া ভারতীয় পাটদ্রব্য ক্রয় করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার ক্রয় আশানুরূপ হয় নাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদাও হ্রাস পায়। অধিকন্তু পাকিস্থানী প্রতিযোগিতা রপ্তানী-বাজারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

ভারতের পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার মানসে ১৯৫৫ সনের আগষ্ট মাসে পাটের থান ও থলির উপর হইতে রপ্তানী কর তুলিয়া লওয়া হয়; কারণ পাকিস্থানী মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে পাকিস্থানী পাটের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। ইহার উপর পাকিস্থানী পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্থান অধিক পরিমাণে রপ্তানী করিতে সমর্থ হয়। পাকিস্থানে বর্ত্তমানে প্রায় ৭,০০০ হাজার তাঁত চালু আছে, কিন্তু এই তাঁতগুলিতে তিন দফায় কাজ করা হয় এবং ইহার ফলে পাকিস্থান প্রায় ২১,০০০ হাজার তাঁতের সুবিধা পাইতেছে। ১৯৫৫ সনে পাকিস্থান ৮০,০০০ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে; কিন্তু ১৯৫৬ সনে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ২·৫০ লক্ষ টনে দাঁড়ায় এবং ইহার মধ্যে সে রপ্তানী করে ২ লক্ষ টন; ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের সরবরাহ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় কারখানায় অতিরিক্ত তাঁত চালু করার ফলেও সরবরাহ কতকাংশে বৃদ্ধি পায়।

সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়াতে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। পাকিস্থান হইতে কাঁচা পাটের আমদানী অল্প হওয়াতে ভারতে কাঁচা পাটের অভাব হয় এবং এই কারণে ১৯৫৬ সনের ১৬ই জুলাই ভারতীয় কারখানাগুলির ২৷ শতাংশ তাঁত আবার বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইহাতেও কাঁচা পাটের অভাব দূরীভূত হয় না এবং সেই কারণে ১৯৫৬ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর আরও ৫ শতাংশ তাঁতকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। পাকিস্থানে ক্রমবর্দ্ধমান পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ভারতের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ১৯৬০ সনে পাকিস্থানী পাটশিল্পে তাঁতের সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৩,৫০০। বর্ত্তমানে ভারতীয় তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজার, তবে ইহার অধিকাংশই পুরানো ধরনের। ভারতে ২১টি পাটকলকে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে তাহাদের

হয়। ১৯২০ সনে উক্ত আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মীর পদোন্নতি ঘটে এবং তাঁহাকে ডেপুটি ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ পদ দেওয়া হয়। সম্প্রতি উক্ত আপিসটি বহরমপুর হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া "মুর্শিদাবাদ সমাচার" ২৮শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আটচল্লিশ বৎসর পরে বহরমপুর হইতে কীটপোষের ডেপুটি ডিরেক্টরের আপিস কলিকাতায় সরাইবার কি কারণ ঘটিল, তাহা আমরা বলিতে পারিব না।"

কেন্দ্রীয় সরকার বহরমপুরে একটি রেশম শিল্প গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অথচ রাজ্য সরকার তাহাদের আপিসটি কলিকাতায় সরাইয়া আনিতেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করিয়া "মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন, "রেশম শিল্পের উন্নয়ন সরকারের কাম্য এবং তাহার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করিতেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার সহিত রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার সহযোগিতা এক শত মাইলের ব্যবধানে কি ভাবে চলিবে, তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। বিগত আটচল্লিশ বৎসর বহরমপুরে ডেপুটি ডিরেক্টর আপিস থাকায় রেশম শিল্পের উন্নতি যখন ব্যাহত হয় নাই, তখন উক্ত আপিস এখানে (বহরমপুরে) থাকিলে উন্নয়ন ব্যাহত হইত না বলিয়াই আমাদের ধারণা।"

সাম্প্রতিক বন্যা ও চাষের জমি

গত শরৎকালে বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় যে ব্যাপক বন্যা হয় তাহাতে প্রায় বিশ লক্ষ লোক নানা-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কাহারও বাড়ী গিয়াছে; কাহারও শস্ত গিয়াছে, কাহারও বা সর্বস্বই গিয়াছে। বন্যায় চাষীদের আরও একটি ক্ষতি হইয়াছে—বর্দ্ধমানের অজয় নদের তীরে বহু জমি বালি-চাপা পড়িয়াছে। জমিগুলি বালিচাপা পড়িবার ফলে বর্তমান বৎসরের শস্ত ত নষ্ট হইয়াছেই, বালি অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত ঐ জমিগুলিতে ভবিষ্যতেও কোন শস্তোৎপাদন করা সম্ভব হইবে না।

বর্দ্ধমান জেলার তেদিয়া, নূতনহাটা, পালিটা, নারেঙ্গী অঞ্চলে যে সকল জমি অনুরূপ ভাবে বালিচাপা পড়িবার ফলে যে পরি-স্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমান বাণী" ২৮শে অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন:

"সরকার হইতে বন্যার্তগণের সাহায্য করা হইতেছে, তাহা-দিগের পুনর্বাসনের চেষ্টা হইতেছে। বন্যাপীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্ত এই বালি চাপা জমিগুলির পুনরুদ্ধার আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে যে সব স্থানে অজয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে সেইগুলিরও সংস্কার প্রয়োজন, নতুবা ভবিষ্যতে এই সব অঞ্চলে পুনরায় বন্যা হইবার আশঙ্কা থাকিবে। আমরা এই দুইটি অর্থাৎ বালি-চাপা জমি উদ্ধার ও ভাঙ্গা বাঁধগুলির সংস্কারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

মফস্বলে মোটর দুর্ঘটনা

২৫শে পৌষ সংখ্যা সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, আসানসোলের বেগুনিয়া-বরাকর চৌরাস্তার মোড়ে প্রায়ই মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি একাধিকবার আকৃষ্ট করা হইলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই, "কেননা এখনও আমরা ঐ স্থান হইতে যথারীতি মোটর দুর্ঘটনায় লোকের প্রাণহানির সংবাদ পাইতেছি এবং ঐ স্থানের পাহারারত মোতায়েন পুলিশ যথারীতি পানবিড়ি খাইয়া তাহার কর্তব্য পালন করিতেছে বলিয়া মনে হয়।"

অপর একটি স্থানেও এক সপ্তাহের মধ্যে মোটর দুর্ঘটনায় একজন মহিলা ও একটি দশ বৎসরবয়স্ক বালকের জীবনহানি ঘটে।

এইরূপ পৌনঃপুনিক মোটর দুর্ঘটনার প্রতি স্থানীয় পুলিশ কর্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "একই স্থানে যখন বারবার মোটর দুর্ঘটনা ঘটিতেছে তখন নিশ্চয়ই সেই জায়গার অবস্থা, পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিকতার সহিত তাহার কোন যোগাযোগ আছে। একটু চেষ্টা করিলে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃ-পক্ষ নিশ্চয়ই ইহার প্রতিকার করিতে পারেন। তবে স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের জীবনের কোন মূল্য যদি না থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। যদি বর্তমান ব্যবস্থার সামান্ত কিছু অদলবদল করিলে সেখানে বহু লোকের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে না তাহা হইলে সেটুকু করারও কার্পণ্য কেন?"

বহরমপুরে কয়লাসঙ্কট

বহরমপুর শহরে এক অভূতপূর্ব কয়লাসঙ্কট দেখা দিয়াছে। কয়লার অভাবে শহরবাসীর চরম দুর্গতি হইয়াছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন সুরাহাই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বক্তব্য হইল—কয়লা নাই অতএব কয়লা সরবরাহ করা সম্ভব হইবে কিরূপে?

বহরমপুর কয়লাসঙ্কট সম্পর্কে ২৩শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হয় অথচ রাজ্যের অন্যতম জেলা মুর্শিদাবাদের লোকেরা কয়লার অভাবে দুর্দশা ভোগ করিতেছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় কয়লা সরবরাহ সম্ভব হইলে মুর্শিদাবাদেই বা কেন কয়লা সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না—সেই সম্পর্কে পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন, "কয়লা না পাইলে জন-সাধারণকে কাঠ ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু কাঠের মূল্যাধিক্যহেতু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কাঠ ব্যবহার বিশেষ সহজসাধ্য নহে। উপরন্ত শহরের বাহির হইতে যে পরিমাণ কাঠ বহরমপুরে চালান হইতেছে তাহা শহরের জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল। এতদ্ব্যতীত কাঠ বিক্রয় করিবার লোকে

পল্লী-অঞ্চলের অনেকেই নির্ব্বিচারে বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলিতেছে। ভবিষ্যতে ইহার বিশেষ কুফল দেখা দিতে পারে।

আসানসোল পৌরসভায় দুর্নীতি

বার্ণপুর হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "জি. টি. রোড" পত্রিকা ১১ই পৌষ এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসানসোল পৌরসভার দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন, "পৌরসভার কর্ম্মচারীরা এখন পৌরসভার সেবক অপেক্ষা দুর্নীতি চালাইবার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।"

"জি. টি. রোড" লিখিতেছেন, "এই সকল কর্ম্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরিয়া এইরূপ করিয়া আসিতেছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের বোর্ড এই দুর্নীতির অবসানের কোন চেষ্টা ত করেনই নাই বরং তাঁহারা সযত্নে এই দুর্নীতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—Death certificate এবং Birth certificate-এর টাকা লওয়া হয় কিন্তু জমা হয় না। একজন সামান্য কেরাণী, পৌরপতির সমর্থন না থাকিলে দীর্ঘদিন এই ধরনের দুর্নীতি চালাইতে পারে না। তেমনি জলকলের জন্য জমা দেওয়ার টাকার হিসাব দেখিলে দেখা যাইবে—যত ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা [জমা] লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে জলকল দেওয়া হইয়াছে—এই অধিকসংখ্যক লোকের জলকলের টাকা কোথায় গেল?...রিক্সা ও অন্যান্য যানের Licence-এর টাকা আদায় হয় কিন্তু পৌরসভার জমা হয় না। মুন্সীবাজারের বাহিরে যে সকল স্থানে হেটোরা বাস করে তাহার কর আদায় হয় কিন্তু পৌরসভার তহবিলে জমা হয় না। অথচ এই সব হেটোরা পৌরসভার এলাকায় বসিয়াই জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে।" পৌরসভা-সংক্রান্ত এইরূপ আরও নানাবিধ দুর্নীতির দৃষ্টান্ত "জি. টি. রোড" দিয়াছেন।

"জি. টি. রোড" লিখিতেছেন, "এই পৌরসভার অচলায়তন দুর্নীতি সম্বন্ধে স্থানীয় মহকুমা-শাসক, জেলা-শাসক, বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার সকলেই অবহিত আছেন এবং তাঁহারা যাহাতে এই পৌরসভা সরকারের অধীনে আসে সেই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু তাঁহারা সরকারের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে সক্ষম হন নাই। অবশ্য সরকার যদি সত্যই নিদ্রা যাইতেন তবে হয়ত সরকারের ঘুম ভাঙিত কিন্তু তাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছেন—কারণ একবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই পৌরসভাকে বাতিল করিয়া সরকার যাহাতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু জনাব সাত্তার হইতে শ্রীযোগেন রায় পর্য্যন্ত প্রাণপণে এই ব্যবস্থাকে বাধা দিয়া আসিতেছেন। ডাঃ রায়কে বোঝান হইয়াছে—এই পৌরসভা যদি সরকার গ্রহণ করেন তবে আসানসোলের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান রসাতলে যাইবে ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য।"

কালনা বাজার

কালনা মহকুমার স্থানীয় সাপ্তাহিক 'ভাগীরথী' পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কালনার বাজার সম্পর্কিত অব্যবস্থার আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বৎসরে বাজারটির ডাক হইত এবং যিনি সর্ব্বোচ্চ দর দিতেন এক বৎসরের জন্য তিনিই বাজারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ডাক তুলিয়া দিয়া বাজারটি নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। ইহার ফলে জনসাধারণকে নানাদিক হইতে অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

"ভাগীরথী" লিখিতেছেন, পূর্ব্বে, যখন বাজার সর্ব্বোচ্চ দরে ডাকিয়া লইবার প্রথা ছিল তখন একটি নিয়ম ছিল এই যে, যাহারা জিনিষপত্র কিনিয়া বিক্রয় করে তাহারা বেলা ৯টার পূর্ব্বে কোন জিনিষ কিনিতে পারিবে না। ৯টার পূর্ব্বে এই সকল ফেরিওয়ালা জিনিষ কিনিলে তাহাদের শাস্তি হইত। ফলে সাধারণ ক্রেতা যুক্তিসঙ্গত মূল্যে তাঁহার দৈনিক বাজার করিতে পারিতেন, কিন্তু "বর্ত্তমানে স্থানীয় বাজার মহারাজার পরিচালনাধীনে আসায় পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিলেই ফড়িয়াদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতাসাধারণ চাষীর নিকট হইতে কোন জিনিষ ক্রয় করিবার কালেই তাহা ফড়িয়ার হস্তগত হয়—মূল্যও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ শাসনকালে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম (অর্থাৎ নয়টার পূর্ব্বে ফড়িয়ারা কোন জিনিষ কিনিতে পারিবে না) ভঙ্গ করিবার কোন উপায় ছিল না, কারণ তাহা হইলে বিশেষ শাস্তি হইত।

যাহাতে পুনরায় উক্ত নিয়ম চালু হয় এবং বেলা ৯টার পূর্ব্বে বাজার হইতে বা পথ হইতে ফড়িয়ারা যাহাতে কোন দ্রব্য না কিনিতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য "ভাগীরথী" স্থানীয় মহকুমা-শাসক ও বর্দ্ধমানের মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

"ভাগীরথী"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে কয়টি তথ্য উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা সত্য হইলে অবিলম্বেই মহকুমা-শাসকের এ বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরাও মনে করি।

নাগা পরিস্থিতি ও সরকারী প্রচার

নাগা পাহাড় অঞ্চলে প্রায় তিন বৎসর যাবৎ সংঘর্ষ চলিতেছে। বিদ্রোহী নাগারা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে গরিলা-সংগ্রাম চালাইতেছে। নাগা পাহাড় অঞ্চলের প্রকৃত পরিস্থিতি কি তাহা বলা বিশেষ কঠিন। তবে বিদ্রোহী নাগাদের দমন সম্পর্কে সরকারী প্রচারপত্রে যে সকল বিবরণ দেওয়া হয় তাহা যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবসম্পর্কশূন্য তাহা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

নাগা পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী প্রচারের এই বিশেষ

দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" ২৮শে অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, নাগা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বর্ষার পরবর্তী অভিযানের সম্পূর্ণ সাফল্য ঘোষণা করিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর-জেনারেল কোচারের বিবৃতির অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে নাগা বিদ্রোহীদের নূতনতর প্রচেষ্টার সংবাদ আসিতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে নাগারা নূতন উদ্যমে আক্রমণ চালাইতে থাকে। "ইহাতে কি প্রতীয়মান হয়?"—"যুগশক্তি" প্রশ্ন করিয়াছেন।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন :—

"শিলঙের অন্য এক সংবাদে বলা হয় যে, নাগা গ্রামবাসীরা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং যাহাতে কোন অন্যায় কার্য্য সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতেছে। কিন্তু এই ধরনের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য আছে কি? ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, নাগা পাহাড়ের পরিস্থিতি আয়ত্তে আসিয়াছে, নাগারা শান্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বক্তৃতাদানের কিছুদিন মধ্যেই আবার বিদ্রোহীরা নানা স্থানে সহিংস আক্রমণ চালাইয়া উপরি-উক্ত ঘোষণা যে অবাস্তব তাহা প্রতিপন্ন করে। ইহাতে জনসাধারণের মনে নাগা পাহাড়ের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নহে।

"আমাদের মনে হয় নাগা পরিস্থিতি সম্পর্কে এই ভাবে বিবৃতি না দিয়া প্রকৃত অবস্থাই জনসাধারণকে জানাইবার এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করাই সমীচীন।"

ডাকমাশুল ও নয়া পয়সা

নয়া পয়সা প্রচলিত হইলে দ্রব্যমূল্যমান যে বৃদ্ধি পাইবে "ডাকমাশুল ও নয়া পয়সা" শীর্ষক পাক্ষিক "হিন্দুবাণী"র ১১ই পৌষ তারিখের মন্তব্য পাঠে তাহা সবিশেষ অনুধাবন করা যায়।

"হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন :

"নয়া পয়সার মাধ্যমে খাম, পোষ্টকার্ড প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লোকসভা ভারতীয় পোষ্ট আপিস (সংশোধন) আইন, ১৯৫৬, নামে একটি আইন পাস করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছামত দিনে উহা প্রযুক্ত হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। উক্ত সংশোধনে খামের মূল্য ১৩ নয়া পয়সা ও পোষ্টকার্ডের মূল্য ৫ নয়া পয়সা ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ১ টাকায় ৮ খানির বদলে ৭ খানি খাম বা ২১ খানির বদলে ২০টি পোষ্টকার্ড পাওয়া যাইবে। ফলে জনসাধারণের ডাকব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারী হিসাবে ৵০ আনার স্থলে ১২ নয়া পয়সা ধরা হইলেও খামের মূল্যের ক্ষেত্রে উহা ১ নয়া পয়সা বেশী ধরা হইয়াছে।"

ডাকমাশুলসংক্রান্ত এই নূতন আইনটি চালু হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সংবাদপত্রসমূহ। বিশেষ ভাবে সাময়িক পত্রিকাগুলির ডাকব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে রেজিষ্টার্ড পত্রিকাগুলি ১০ তোলা পর্য্যন্ত এক পয়সায় পাঠাইতে পারে—অর্থাৎ এক টাকায় ৬৪খানি পত্রিকা পাঠানো চলে। সে স্থলে নয়া পয়সা চালু হইলে পাঠানো যাইবে মাত্র পঞ্চাশটি।

উপসংহারে "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন, "ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি না করিয়া কেবল নয়া পয়সার নামে সরকার মাশুল বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করিতেছেন সে সম্বন্ধে জনসাধারণ ও পত্রিকাসমূহের সচেতন হওয়া আবশ্যক। নচেৎ উহা চালু করিবার সময় গোলমাল করিয়া লাভ হইবে না।"

পাকিস্থানী জবরদখল

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত দুইটি চর পাকিস্থানীরা বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভারত-সরকার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ঐ অঞ্চলে কিছু সৈন্যও মোতায়েন করা হইয়াছে।

সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলগুলি এইরূপ জবরদখল করা পাকিস্থানী রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এইরূপ জবরদখলের ফলে দখলীকৃত অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় নাগরিকদিগের স্বার্থ বিশেষরূপে ব্যাহত হয়। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার রোয়েদাদ প্রকাশিত হয় এবং তদনুযায়ী সার্ভের কাজও সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সীমারেখা চিহ্নিত করিবার কাজ এখনও পর্য্যন্ত সম্পন্ন না হইবার ফলেই এই সকল সীমান্ত বিরোধের সৃষ্টি হইতেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারও যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাহা মনে হয় না।

ভারতীয় অঞ্চলে পাকিস্থানীদের এইরূপ বলপূর্ব্বক অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ৫ই পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "ভারতী" পত্রিকা লিখিয়াছেন :

"কিছুদিন হইতে রাজসাহী-মুর্শিদাবাদের সীমান্তে পদ্মায় চর লইয়া পাকিস্থানীরা এই একই খেলা খেলিতেছে। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মহকুমার দয়ারামপুর ইউনিয়নের হরিশ্চন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, শিবপুর, বাজিতপুর, পিরোজপুর প্রভৃতি মৌজাগুলির হাজার হাজার বিঘা জমি এই কৌশলেই পাকিস্থানীরা দখল করিয়া লইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার যে বিষয়টির উপর কার্য্যতঃ কোন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কারণ এতদঞ্চলের ভুস্বামিগণ পুনঃ পুনঃ পাকিস্থানীদের এই অন্যায় আচরণের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন এবং উভয় সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত এই চরগুলি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। অপর পক্ষে এই চরগুলি পাকিস্থানী এলাকা বলিয়া ঘোষিত না হইয়াও পাকিস্থানীরা বেশ নির্ব্বিবাদে ইহার উৎপন্ন ফসলাদি বৎসরের পর বৎসর আত্মসাৎ করিয়া চলিয়াছে। ভারত সরকারের

এই নির্ব্বিকল্প ভূমিকায় উৎসাহিত হইয়া তাহারা হয়ত এ বৎসর আরও দুইটি চর দখল করিয়া লইল এবং ভবিষ্যতে যদি এইভাবে অগ্রসর হইয়া আরও কিছু কিছু ভূখণ্ড দখল করিয়া লয় তাহা হইলেও হয়ত বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না।"

পূর্ব্ব পাকিস্থানে শিক্ষা কমিশন

পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান কমিশনের চেয়ারম্যান। কমিশনের অন্যান্য সদস্য হইতেছেন ড. মহম্মদ কুদরত-এ-খুদা, কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান, মৌলবীবাজার কলেজের অধ্যক্ষ আবু লাইস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যেই কমিশন সরকারের নিকট তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ রহিয়াছে, কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য প্রশ্নপত্র রচনা, প্রেরণ এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া সেই সম্পর্কে কমিশনের মতামত দান এত অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়া উঠা বিশেষ সহজসাধ্য নহে।

শিক্ষা কমিশন নিয়োগ উপলক্ষে ২৫শে পৌষ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষা পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্ত্তী যুগে "পূর্ব্ব পাকিস্থানের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়া পড়িয়াছে।" প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে বলিয়া ১৯৫১ সনে একটি আইন পাস হয়। তাহার বলে প্রদেশের ৩৯৮টি থানার প্রতি থানায় দুইটি ইউনিয়নকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র প্রদেশে বিস্তারের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

যে কয়টি স্কুল রহিয়াছে তাহাদেরও ঘরগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্কুলঘরের অভাবে দুই বেলা করিয়া স্কুল বসিতেছে। প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে কর্ম্মরত ৭২ হাজার শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার ম্যাট্রিক পাস ও ট্রেণিংপ্রাপ্ত, ত্রিশ হাজার নন্‌ ম্যাট্রিক ট্রেণিংপ্রাপ্ত, বাকী সাতাশ হাজার শিক্ষাদান কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

"গড়পড়তা প্রতি স্কুলে এক জন ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকও নাই। ফলে শিক্ষার নামে অশিক্ষাই চলিয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া একশটি ছেলের মধ্যে ৪০ জনই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই পাঠ শেষ করে।"—"জনশক্তি" লিখিতেছেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিও সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত। স্কুলগুলি সরকার হইতে যে সাহায্য পায় তাহা নামমাত্র। ফলে অর্থাভাবে উপযুক্ত বেতন দিতে সক্ষম না হওয়ায় অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিকেই অনুপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা কার্য্য চালাইতে হইতেছে। পত্রিকাটির ভাষায় "যাঁহারা অন্য কোন দিকে কোন সুবিধা করিতে পারেন না অধিকাংশ স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই সেই শ্রেণী হইতেই গৃহীত হইতেছেন। ফলে, শিক্ষার মান সর্ব্বনিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে।"

শিক্ষকদের দুর্গতি লইয়া কোন জাতির পক্ষেই উন্নতি করা সম্ভব নহে। শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকার গুরুত্ব এবং শিক্ষা-উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির ভূমিকার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি নবগঠিত শিক্ষা কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া "জনশক্তি" লিখিতেছেন, "দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করিবার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশে পর্য্যাপ্তসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করিতে হইবে। শিক্ষাদান কার্য্যকে যাঁহারা একটি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা সমাজ তথা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শিক্ষা কমিশন সর্ব্বাগ্রে এই শিক্ষক তৈরি সম্পর্কেই চিন্তা করিয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন ইহাই আমরা আশা করি। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা এই কয় বৎসরে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার মূলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই বড় কারণ—এই কথাটা আজও বুঝা দরকার।"

ইডেনের বিদায়গ্রহণ

স্যর এণ্টনী ইডেন প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়াছেন। ৯ই জানুয়ারী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সহিত বাকিংহাম প্রাসাদে দেখা করিয়া তিনি তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহা গৃহীত হয়। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার জন্যই স্যর এণ্টনী পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

রাণী এলিজাবেথ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ্‌দিগের সহিত পরামর্শ করিবার পর মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলানকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৪ই জানুয়ারী মিঃ ম্যাকমিলান তাঁহার মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। নূতন মন্ত্রীসভার প্রধান সদস্যদের নাম যথাক্রমে: প্রধানমন্ত্রী—মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, অর্থ-মন্ত্রী—মিঃ পিটার থর্ণিক্রফ্‌ট; পররাষ্ট্রমন্ত্রী—মিঃ সেলুইন লয়েড, কমনওয়েল্‌থ সচিব—আর্ল অব হোম; ঔপনিবেশিক সচিব—মিঃ লেনক্স বয়েড; প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—মিঃ ডানকান স্যাণ্ডিস (চার্চ্চিলের জামাতা); স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও লর্ড প্রীভি সীল—মিঃ রিচার্ড বাটলার; প্রেসিডেণ্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেড—মিঃ ডেভিড একক্‌লেস; লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি প্রীভি কাউন্সিল—মার্কুয়েস অব স্যালিসবারী। লর্ড চ্যান্সেলর (প্রধান বিচারপতি)—ভাইকাউণ্ট কিলমুইর।

মিঃ ম্যাকমিলানের মন্ত্রীসভায় মোট আঠার জন সদস্য আছেন—স্যর এণ্টনী ইডেনের সময় অপেক্ষা একজন সদস্য কম। স্যর এণ্টনী ইডেনের মন্ত্রীসভার সদস্যদের গড়পড়তা বয়স ছিল ৫৫ বৎসর; বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার ৫৩ বৎসর।

পুরাতন মন্ত্রীসভার যে কয়েকজন সদস্যকে নূতন মন্ত্রীসভা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেন—

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী হেড (সুয়েজ সমস্যার সামরিক দিক সম্পর্কে যাঁহার কার্য্যাবলীতে ব্রিটেনের সংবাদপত্র এবং রক্ষণশীল দলের একাংশের মধ্য হইতে বিশেষ সমালোচনা উঠিয়াছিল); স্যর ওয়াল্টার মন্‌কটন (যিনি সুয়েজ খাল লইয়া মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের বিরোধী ছিলেন); প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুইলিম লয়েড জর্জ্জ এবং প্রাক্তন পূর্ত্তমন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক বুকান-হেপবার্ণ।

স্যর ওয়াল্টার মন্‌কটনকে রাণী ভাইকাউণ্ট উপাধি দিয়াছেন: স্যর এণ্টনী ইডেনকেও আর্ল উপাধি দেওয়া হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

স্যর এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগ কোন দিক হইতেই অপ্রত্যাশিত নহে। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে যখন ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মিশর আক্রমণ করে তখনই ইডেন সরকারের জঙ্গীবাদী নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই বিক্ষোভ কেবলমাত্র বিরোধী শ্রমিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; রক্ষণশীল দলের একাংশের মধ্যেও ইডেন সরকারের নীতির বিশেষ সমালোচনা হইতে থাকে। সুয়েজ খাল লইয়া মিশর আক্রমণের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ দু'একজন মন্ত্রী পদত্যাগও করেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্যর এণ্টনী ইডেন স্বাস্থ্যের অবনতির অজুহাতে জামাইকা চলিয়া যান এবং মিঃ রিচার্ড বাটলার তাঁহার স্থলে কার্য্য চালাইতে থাকেন। সেই সময়ই অনেকে জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকেন যে, স্যর এণ্টনী হয়ত আর মন্ত্রীসভায় যোগদান করিবেন না। কার্য্যতঃ অবশ্য স্যর এণ্টনী ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় যে আসন্ন সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ থাকে না।

স্যর এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগে কেহ বিস্মিত না হইলেও নূতন প্রধানমন্ত্রীর নাম দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। ওয়াকিবহাল মহল সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, স্যর এণ্টনীর পদত্যাগের পর মিঃ বাটলারই প্রধানমন্ত্রী হইবেন। কিন্তু বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রী হইলেন মিঃ হারল্ড ম্যাকমিলান—যিনি ম্যাকমিলান পুস্তক কোম্পানীর কর্ণধার এবং ইডেন মন্ত্রীসভার প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে অর্থমন্ত্রীরূপে কার্য্য করেন। স্যর উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং প্রধানতঃ মার্কুয়েস অব স্যালসবারীর পরামর্শ অনুসারেই রাণী এলিজাবেথ মিঃ ম্যাকমিলানকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করেন।

নূতন প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন সম্পর্কে ব্রিটেনে এক রাজনৈতিক বিতর্ক চলিয়াছে। শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে অভিযোগ করিয়া বলা হইয়াছে যে, রক্ষণশীল দলকর্ত্তৃক কোন নেতা নির্ব্বাচিত হওয়ার পূর্ব্বেই রাণী প্রধানমন্ত্রীরূপে মিঃ ম্যাকমিলানকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দলীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অভিমতে রাণী মিঃ ম্যাকমিলানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার ফলে রক্ষণশীল দলের পক্ষে মিঃ ম্যাকমিলানকে নেতা নির্ব্বাচিত করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না, কারণ যদি ম্যাকমিলানকে নেতা না করা হয় তাহা হইলে রাণীকে অমান্য করা হইবে। এইরূপ ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া রাণীর পক্ষে ঠিক হয় নাই বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন।

ইডেনের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক দল দেশে একটি সাধারণ নির্ব্বাচনের দাবি জানান। নূতন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান বলিয়াছেন যে, এখন সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে না।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক মহলে স্যর এণ্টনী ইডেনের পদত্যাগ এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। স্যর এণ্টনীর পদত্যাগে ব্রিটেনে পররাষ্ট্রনীতির কি পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার জন্য সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, স্যর এণ্টনীর পদত্যাগে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রধানমন্ত্রী পদে মিঃ ম্যাকমিলানের নিয়োগে এবং পরে পররাষ্ট্রসচিব পদে মিঃ লয়েডের পুনর্নিয়োগে তাঁহাদের সেই আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রমণ্ডলী, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বুলি প্রায়ই আওড়াইয়া থাকে। হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার আক্রমণে ইহারা যে পরিমাণ চোখের জল ফেলিয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না যে ইহারা নিজেরা কোন নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের মতই ইহারাও অপরাপর রাষ্ট্রের আচরণকে যে মানদণ্ড দিয়া বিচার করে, নিজেদের আচরণের বিচারের সময় তাহারা সেই মানদণ্ড ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট আক্রমণ ও বর্ব্বরতা যে কঠোরভাবে নিন্দনীয় তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা বিনা দ্বিধায় তাহার নিন্দা করিয়াছি। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গও সোভিয়েট আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছে—তদপেক্ষা বেশী কিছুও করিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই শক্তিবর্গ নিজেরা কি আচরণ করিতেছে? ব্রিটেন ইয়েমেন আক্রমণ করিয়াছে; ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে বর্ব্বরোচিত উপায়ে দমন করিতেছে, পর্তুগীজ আফ্রিকায় ও ভারতের গোয়াতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ নির্লজ্জ অত্যাচার ও শোষণ চালাইতেছে। হাঙ্গেরীতে যে অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে, এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। তদুপরি মধ্যপ্রাচ্যে আইসেনহাওয়ার নীতির ফলে নূতন করিয়া সংঘর্ষের বিপদ দেখা দিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য—বিশেষতঃ মার্কিনী গণতন্ত্রের সর্ব্বশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ওকিনাওয়াতে। ওকিনাওয়া জাপানের অন্তর্গত রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ। ১৯৫১ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তদনুযায়ী রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের কর্ত্তৃত্ব "অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে

জাপান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের আট লক্ষ অধিবাসী সকলেই জাপানী-শিক্ষা-দীক্ষায় প্রভাবিত এবং তাহারা সকলেই জাপানের সহিত পুনর্মিলনের জন্য উন্মুখ। কিন্তু মার্কিন সামরিক অধিকারের জন্য রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের স্বাধীনতা লাভের ও স্বজাতির সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

সম্প্রতি ওকিনাওয়া দ্বীপের রাজধানী নাহা শহরের মেয়র নির্বাচনে মার্কিন-বিরোধী কমিউনিস্ট সেনাগা বিপুল ভোটাধিক্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। মার্কিন সামরিকমহল প্রকাশ্য ভাবেই সেনাগার নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু এইরূপ সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও সেনাগা ১৭০০০ ভোট পান। সেনাগা এক জন প্রাক্তন সাংবাদিক। ১৯৫৪ সনে কমিউনিস্টকে আশ্রয়দানের অভিযোগে তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। গত এপ্রিল মাসে দেড় বৎসর কারাভোগের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার বয়স বর্তমানে ৪৯ বৎসর।

যদিও ওকিনাওয়া নিবাসী নাহার মেয়র মিঃ কামেজিরো সেনাগা বিপুল ভোটাধিক্যে জনপ্রিয় মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন তথাপি মার্কিনী গণতন্ত্রের এমনই অপার মহিমা যে, তাঁহাকে নাগরিক কাজের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কোন অর্থই ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে না।

আইসেনহাওয়ার-নীতি

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভুত্বই সার্বভৌম ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্রিটেন পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া পড়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্রিটেনকে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। ব্রিটেনের ক্ষমতা হ্রাসের সূচক হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভুত্বেও ফাটল দেখা দেয় এবং সেই অঞ্চলে মার্কিন অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এমনকি তাহার অব্যবহিত পরেও মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনেরই প্রভুত্ব সমধিক ছিল। আইসেনহাওয়ার-নীতি ঘোষণার পর এখন আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না বলা চলে।

মধ্যপ্রাচ্যে শূন্যস্থান পূর্ণকরণের আইসেনহাওয়ার-নীতি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তারেরই নীতি। যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টই বলিয়াছে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সহিত মিলিয়া মধ্যপ্রাচ্যে কোন নীতি কার্যকরী করিতে মার্কিন সরকার বিশেষ আগ্রহান্বিত নহেন।

ইউরোপে মার্কিন প্রভুত্ব স্থাপনের নীতি ছিল ট্রুম্যান-নীতি। ট্রুম্যান-নীতির উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজম প্রতিহত করা। আইসেনহাওয়ার-নীতিরও একটি লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজম প্রতিরোধ করা। ইউরোপে কমিউনিজম কতদূর প্রতিহত হইয়াছে তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই তবে ইউরোপের রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উপর মার্কিন প্রভাব যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তারে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিদ্‌দিগের একাংশের উদ্বেগের প্রতিধ্বনি করিয়া লণ্ডনের "টাইম্‌স" পত্রিকা সেইজন্যই ১৯৫১ সনে লিখিয়াছিলেন, পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের বেশী অঞ্চলে মার্কিন সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন রাষ্ট্রেরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক কাজ করিবার ক্ষমতা নাই।

ট্রুম্যান নীতি ঘোষণার পর ইউরোপে 'ঠাণ্ডা লড়াই' দেখা দেয়। আইসেনহাওয়ার-নীতি ঘোষণার পর মধ্যপ্রাচ্যেও অনুরূপ ঠাণ্ডা লড়াই সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছে। সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করিয়াছেন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সৈন্য পাঠান হইলে তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। শূন্যস্থান পূরণের নব মার্কিন নীতিতে মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। সিরিয়া সরকার প্রকাশ্যেই তাঁহাদের উদ্বেগ ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাভাবিক-ভাবে ভারতীয় রাজনৈতিকমহলও এই নূতন নীতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না।

নির্বাচনী-যুদ্ধ

নির্বাচনের মুখে প্রতিটি দল ও উপদল বিপক্ষের 'গুণকীর্তনে' পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। নিজের গুণাদি সাফাই গাওয়া ও অন্যের দোষ লইয়া পাঁচালী গাওয়া ইহাই পার্টি সিস্টেমের অবদান। নীচে কিছু নমুনা দেওয়া গেল। বিচক্ষণ পাঠক ক্ষীর ও নীর সম্পর্কে সজাগ থাকুন:

"লক্ষ্মীবাঈনগর, ৫ই জানুয়ারী—আজ কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন যে, ভারতকে তাহার নিজস্ব সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে; সে-পথ শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ। ভারত যদি শান্তি ও গণতন্ত্রের পথ পরিহার করে, তবে ভারতভূমি বিরোধ-বিসংবাদের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শক্তিপ্রয়োগের সাহায্যে জোরজবর-দস্তিতে যাহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে তাহারা ভুলিয়া যায় যে, ভারতে ৩৭ কোটি লোককে সমাজতন্ত্রের পথে লইয়া যাইতে হইবে। এই বিরাট জনসমষ্টির উপর জোর করিয়া সমাজতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার পরিণাম যে ব্যর্থ হইবেই—তাহা দিনের আলোর মত স্পষ্ট।

ভারতীয় কম্যুনিস্টদের সরাসরি আক্রমণ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, পৃথিবীতে দ্রুতবেগে নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে—কিন্তু ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী আজও অনড়-অটল। সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গীকে এখনও ইঁহারা আঁকড়াইয়া আছেন। হয়ত নূতন যুগের আলোয় আসিয়া দাঁড়াইতে ইঁহাদের আরও এক শত বৎসর লাগিয়া যাইবে।

পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করেন যে, ভারতে শ্রেণী-বিরোধ আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার তাগিদও বিদ্যমান। ইউরোপের কম্যুনিস্টরা শ্রেণী বিরোধের অবসানকল্পে উহাকে

উস্কাইয়া দিয়া তীব্রতর করিয়া তুলিতে চাহে। শ্রেণী-বিরোধকে তীব্রতর করিয়া শোষক শ্রেণীর পতন ঘটানো ও সর্ব্বহারার এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠাই তাহাদের কাম্য। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই পথ অনুসরণের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এখানকার পরিস্থিতির মধ্যে গুরুতর রকমের নানা জটিলতা আছে এবং ভারতের গত চল্লিশ বৎসরের বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্যও ইহার পরিপন্থী।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ সমালোচনা করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারীরা মনে করেন যে, সমাজতন্ত্রের মত আদর্শবাদ জোরজবরদস্তিতে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেওয়াই উচিত। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন রাজনৈতিক দলকে স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিজেদের সকলশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে মারাত্মক একটি বিপদ রহিয়াছে। জনসাধারণের বৃহৎ অংশ যদি ইহাতে সাড়া না দেয়—তবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলেরও অন্তিম ঘনাইয়া আসিবে।

"এই সকল সঙ্গত কারণেই কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই এই পথ গ্রহণ করিতে পারে না।"

গত শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা ময়দানে সম্মিলিত পঞ্চ বামপন্থী দলের কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী প্রচার সভার উদ্বোধনে সংশ্লিষ্ট প্রধান বামপন্থী দলগুলির সর্ব্বভারতীয় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আগামী নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমান সরকারের পরিবর্ত্তে বিকল্প সরকার গঠনের ধ্বনি তোলেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টি, প্রজা-সোস্যালিষ্ট, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল এবং মার্কসিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক এই পাঁচটি দল লইয়া গঠিত সম্মিলিত বামপন্থী নির্ব্বাচনী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উক্ত জনসভায় প্রজা-সোস্যালিষ্ট নেতা ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। বিভিন্ন দলের পতাকা ও ফেষ্টুন লইয়া অনেকগুলি শোভাযাত্রা সভায় আসিয়া মিলিত হয়।

এই সভায় উল্লিখিত বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে, সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ আয়ের ব্যবধান হ্রাস এবং উভয়ের সীমা নির্দ্ধারণ, নির্ব্বাচনের পাঁচ বৎসরের মধ্যে বেকার ভাতা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল বালকবালিকার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান এবং চিকিৎসা ও অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁহাদের পাঁচটি দলের মধ্যে একটি ন্যূনতম কর্ম্মসূচী প্রণয়নে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ড. ঘোষ পরে সাংবাদিকদিগকে জানান যে, উক্ত ন্যূনতম কর্ম্মসূচীতে আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করিবার জন্য আলোচনা চলিতেছে। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে এই সম্পর্কে ঘোষণার সম্ভাবনা আছে।

ড. ঘোষ ঘোষণা করেন যে, পাঁচটি বামপন্থী দল আলোচনাকালে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতরূপ ন্যূনতম কর্ম্মসূচী সম্পর্কে একমত হইতে পারিয়াছেন :

(১) বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (২) নিম্নতম আয় এবং উচ্চতম আয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, (৩) মুষ্টিমেয় লোকের হাতে টাকা কেন্দ্রীভূত হইতে দেওয়া হইবে না, (৪) ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৫) পাঁচ বৎসরের মধ্যে বেকার-ভাতা, উচু-নীচু আয়ের ভেদ না থাকা, শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা প্রভৃতির সমাধান করিতে হইবে। তাঁহার মতে যে কোন গবর্ণমেণ্টই আসুক না কেন, উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন না করিতে পারিলে সে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোন দাবি থাকিতে পারে না। ড. ঘোষ বামপন্থী দলের নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করিতে আহ্বান জানান।

শ্রীজ্যোতি বসু এম-এল-এ বলেন, বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যই বেশী, অনৈক্য কম। আজ পাঁচটি বামপন্থী দল ন্যূনতম কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই ঐক্য সুবিধাবাদী ঐক্য নয় অথবা শুধু আসন ভাগাভাগির জন্য এই ঐক্য নয়। ইহা সাধারণ মানুষের ঐক্য। সাধারণ মানুষ কুশাসন ও দুর্নীতির অবসান চায়। তাহারা দুর্গতির অবসান চায়।

শ্রীবসু অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সরকার "গণতন্ত্রবিরোধী" নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। জনসাধারণের আন্দোলন দমনের জন্য বেপরোয়া পুলিশী জুলুম চালান হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুলিসের গুলি চালনায় ৫০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা নিশ্চয়ই ভারতের গর্ব্বের বস্তু। কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল করিতে যে ২২ হাজার কর্ম্মচারী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ ছাঁটাইয়ের খড়্গ তাঁহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের শেষে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল—এই দুইটি রাজ্যে সম্মিলিত বামপন্থী শক্তিদের এক বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। অন্যান্য রাজ্যেও বামপন্থী দলগুলি এই নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে বলিয়াও তিনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। নির্ব্বাচনে ইঁহারা কংগ্রেসের সহিত যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেছেন তাহার উদ্দেশ্য শ্রীঘোষ বলেন যে, যেখানেই সম্ভব সেখানেই বিকল্প সরকার গঠন এবং পার্লামেণ্টে ও প্রত্যেক রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে গণতান্ত্রিক বিরোধিতার শক্তি বৃদ্ধি করাই এই সংগ্রামের লক্ষ্য। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান বামপন্থী দলগুলির মধ্যে একটা মতৈক্য সাধিত হইয়াছে, ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনে পরাজিত করিয়া একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট

জনসাধারণের প্রয়োজন ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে এবং উহার ফলে সমগ্র দেশের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব হইবে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইবার মধ্য দিয়া যে নেতৃত্ব দিয়াছে তাহা সমস্ত রাজ্যের জনগণেরই অভিনন্দন লাভ করিবে।

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন

কল্যাণীবাঈনগরের অধিবেশনে সভাপতি ঢেবর যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার সারাংশ নীচে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করা হইল। উহাতে নূতন তথ্য কিছুই ছিল না :

"ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬২তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ এন ঢেবর সমবেত কংগ্রেসকর্মীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মানবেতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আজ আমরা এক সঙ্কটপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন—বর্তমান বিশ্বের ভবিষ্যৎ কি? এই প্রশ্নই আজ আমাদের সকলকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে

কংগ্রেস সভাপতি বলেন মানবেতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে শান্তি ও শুভেচ্ছা লইয়া অগ্রসর হইলে একদিকে যেমন সর্বাত্মক প্রগতি ও অতুল বৈভব সুনিশ্চিত, তেমনি অন্যদিকে সংগ্রামের পথে মানবজাতির বহু-আয়াসলব্ধ এই সভ্যতার পরিপূর্ণ ধ্বংস অবধারিত। মানবজাতির সম্মুখে আর কখনও এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই। তার একদিকে সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য এবং অন্যদিকে সর্বনাশ ও ধ্বংস। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দেশে বিশ্বনেতৃত্বের এক পরীক্ষা চলিতেছে।

শ্রীঢেবর বলেন, বিশ্বের সর্বত্র আজ জাগিয়াছে এক অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের অকুণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি জগতে প্রবেশের এক দুর্দ্দমনীয় আবেগ। বৃহত্তম শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র আজ ইহা প্রতিরোধে অক্ষম।

আমরা দেখিয়াছি, ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েলের অস্ত্রাগারের সম্মিলিত অস্ত্র মিশরবাসীকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই এবং সোভিয়েটের নির্মম পেষণ অবাধ্য হাঙ্গেরীকে কম্যুনিজমের বন্ধন গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে নাই।

কংগ্রেস সভাপতি বলেন, যে নীতিতে সমগ্র বিশ্ব চলিতেছে, ভারতও সেই নিয়মেই চলিতেছে। প্রকৃতির লীলা সর্বত্র সমান। গণতন্ত্রের অবিসংবাদিত সত্য আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। সামাজিক অসাম্য, অবিচার, রাজনৈতিক দাসত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতাহীনতা যে ধ্বংসের পথ, ইহা আমাদের অস্বীকার করিলে চলিবে না।"

সামরিক চুক্তি ও বিশ্বযুদ্ধ

বিগত কংগ্রেস অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু সামরিক চুক্তি ও পাকিস্থান সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমরা জানিতে চাহি যে, ভারত সরকার পাকিস্থানের মতিগতি সম্পর্কে কতটা সজাগ ও ওয়াকিবহাল। মার্কিন সরকারের আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে আশা করি এই সোজা কথা আমাদের কর্তৃপক্ষের মাথায় জাগিয়াছে :

"কল্যাণীবাঈ নগর, ৬ই জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু অদ্য কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সামরিক চুক্তির নিন্দা করেন এবং বলেন, উহার ফলে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার পর শ্রীনেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ অভিমত ব্যক্ত করেন।

শ্রীনেহরু বলেন, 'মিশর ও হাঙ্গেরীর ঘটনাবলীর দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র দেশের বিরুদ্ধেও ঔপনিবেশিক অথবা কমুনিষ্ট শক্তির আক্রমণ আরম্ভ করা দুরূহ ব্যাপার। এই ধরনের কাজ এখন অত্যন্ত কঠিন। তবে উহা যে অসম্ভব একথা আমি বলিতে পারি না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার মতে এই সকল ঘটনায় কতকগুলি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়াছে এবং জগতেরও কিছু মঙ্গল হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় ইহার ফলে লোকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্বসমস্যা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইবে এবং নূতন উপায়ে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইবে। তবে দুঃখের সহিত আমি বলিতেছি যে, কোন কোন দেশের কয়েক জন সম্মানিত ব্যক্তি এই সকল ঘটনা ঘটার পরও উহা হইতে বাঞ্ছিত শিক্ষালাভ করেন নাই অথবা করিতে চাহেন নাই। এ সকল ব্যক্তি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, পুরাতন পথে তাঁহারা লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবেন না।'

পণ্ডিত নেহরু বলেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এখনও কেহ কেহ নূতন পথ অনুসরণ না করিয়া তরবারি আস্ফালন করিতেছে। তবে একথাও সত্য যে, তরবারিকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই একথা বলিবে না যে, তরবারি ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তবে সকল সময় তরবারি আস্ফালন না করিয়া উহা কোষবদ্ধ করিয়া রাখাই উচিত।

পাকিস্থানকে যে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আশ্বাস দিয়াছে যে, এই সকল অস্ত্র আক্রমণাত্মক কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে না, কিন্তু একথা সত্য যে, অতি-আধুনিক ধরনের অস্ত্রাদি পাকিস্থানে মজুত করা হইতেছে। ভারত এই প্রকার সামরিক সাহায্যদান ব্যাপারে নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে না।

এই সকল অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের নীতি সমর্থনের জন্য পাকিস্থান দুই প্রকার কথা বলিতেছে। একদিকে পাকিস্থান বলিতেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিতেছে—আবার অপর দিকে সে সোভিয়েট ইউনিয়নকে বলিতেছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তাহার এই সকল অস্ত্র প্রয়োজন।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যখন অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হইতেছে তখন আমরা কিভাবে চোখ বুঁজিয়া থাকিতে পারি? এই সকল অস্ত্র আধুনিক অস্ত্র। পাকিস্থানে কোন কোন লোক প্রকাশ্যেই বলিতেছে যে, এই সকল অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে।'

পণ্ডিত নেহরু বলেন, এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের অপপ্রয়োগ হইবে না বলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যে আশ্বাস দিয়াছে, তাহা যে সত্য এই বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের সীমান্তে অত্যন্ত মূল্যবান নূতন ধরনের অস্ত্রাদির সমাবেশ করা হইতেছে। অস্ত্র মজুত করার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ভারতের ইচ্ছা নাই। ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকল অর্থ ব্যয় করিতে চাহে। কোন দেশ হইতে বিনামূল্যে অস্ত্র লইতেও আমরা অস্বীকার করিয়াছি। দান হিসাবে আমরা কোন অস্ত্র লইব না। আমরা হয়ত নিজে অস্ত্র তৈয়ার করিব অথবা অন্য দেশ হইতে তাহা ক্রয় করিব। প্রকৃত কথা হইতেছে, আমরা অস্ত্রক্রয়ের জন্য অল্প অর্থ ব্যয় করি এবং অন্য কাজে বেশী অর্থ ব্যয় করি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাকিস্থানে প্রচুর পরিমাণে যে অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া আমরা পারি না। এই অবস্থায় অবিচলিত থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে এবং কি ঘটিতে পারে তাহা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, বুদ্ধিমান লোক লইয়া গঠিত পাকিস্থানের কোন মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। কিন্তু কি ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে নাই। সেইজন্য ভারতকেও বাধ্য হইয়া অস্ত্র রাখিতে হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সকল কারণেই ভারত দৃঢ়ভাবে বাগদাদ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থার বিরোধিতা করিয়াছে। এই সকল সামরিক চুক্তি শান্তির পথে এবং যে সকল দেশ শান্তির পথ অনুসরণ করিতেছে তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

প্রসঙ্গক্রমে পণ্ডিত নেহরু বলেন, 'পাকিস্থানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের অন্যতম শত্রু হইল ভারত। পাকিস্থানের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা যদি এইরূপ উক্তি করিয়া পরিস্থিতি বিষময় করিয়া তোলেন, তবে আমরা কি করিতে পারি। তবে অবস্থা অধিকতর খারাপ হইবার মত কোন কাজ আমরা করিব না, কারণ আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ করিলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে সমস্যা আছে তাহার সমাধান হইবে না।' "

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

পৌষ সংক্রান্তির দিনে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। নীচে পণ্ডিত নেহরু ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণের সারাংশ দেওয়া হইল। উহা আনন্দবাজার হইতে গৃহীত:

"সোমবার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু গভীর ভাবসমৃদ্ধ এক ভাষণে পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বের পটভূমিকায় বিজ্ঞানের অপ্রতিহত সাধনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণের কর্ত্তব্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি এই বলিয়া এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বিজ্ঞান যদি ঘৃণা ও হিংসার ভাবধারার সহিত জড়াইয়া পড়ে তবে নিঃসন্দেহে উহা ভ্রান্ত পথে পদক্ষেপের দ্বারা বিশ্বের সমূহ বিপদ ডাকিয়া আনিবে। পণ্ডিত নেহরু তাই বৈজ্ঞানিকগণকে সঙ্কীর্ণতা ও পরমত অসহিষ্ণুতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় ব্রতী হইবার জন্য আহ্বান জানান। কারণ, তিনি বলেন, বর্ত্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নূতন অস্ত্রের হুমকি বড় কথা নহে, বড় কথা হইতেছে 'মানুষের ভাবধারা আজ কোন্ পথে চলিয়াছে, মানুষ কি চিন্তা করিতেছে।'

শান্তিময় বিশ্ব গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ভারত এক্ষণে স্বীয় ভবিষ্যৎ রচনায় ব্যাপৃত আছে। শুধু এই দেশেরই ভবিষ্যৎ গঠন নহে, শান্তি, সহিষ্ণুতা ও করুণার বিশ্ব গড়িয়া তুলিতেও বিজ্ঞানীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রয়োজন:

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে নিয়োগ ও বিজ্ঞানের উন্নয়নকল্পে উপযুক্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

'মানুষের জীবনে এমন অনেক কিছু দেখা যায় যাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য। নানা জটিলতার বৃদ্ধি মানুষের জীবনে। মানুষ যতই অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে, ততই নূতন নূতন সমস্যা দেখা দেয়। কাল যত অগ্রসর হইতে থাকে, জীবন-প্রণালী নূতন নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে।

জীবনের অভিযান চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে। আজ যাহা আমাদের আদর্শ, তাহার সাফল্য হয়ত আজ হইতে আরও এক শত বৎসর দূরে। তখন কার যাহা আদর্শ হইবে, তাহাও আবার শত বৎসর দূরে রহিয়াছে।

আমরা যতই অগ্রসর হই নির্দ্ধারিত লক্ষ্য দূরে সরিয়া গিয়া বৃহত্তর ও উন্নততর লক্ষ্য রূপ পরিগ্রহ করে। সময়ের মেঘজাল হয়ত অসংখ্য সমস্যা, পরীক্ষা ও বিপদকে আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে; আবার সময়েই হয়ত বহু অজ্ঞাত সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে, অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিবে। এই সব সমাধান ও নবলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের হিতার্থে কাজে লাগাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।'

সোমবার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার বহু তথ্যসম্বলিত ও সারগর্ভ অভিভাষণে এই উক্তি করেন।

ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে বলেন, এদেশে আমরা গত প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা করিতেছি, কিন্তু নক্সা, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনা, নির্ম্মাণ, সংস্থাপন, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি

ইঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রবিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। ভারতের মত অনুন্নত দেশে আমাদের নিজেদেরই যে যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা নির্মাণ করিতে পারা একান্ত উচিত তাহা নহে, আমাদের হাতে যে সরঞ্জাম ও উপকরণ আছে, তাহার সাহায্যেই কি ভাবে ঐ সব কাজ করা যাইতে পারে তাহাও জানা উচিত। ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা বলিতে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার সমাধানে পদার্থবিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগই যেন না বুঝায়। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছে, সাধারণ মানুষের সমস্যার সহিত জড়িত বলিয়া সেগুলির বিশেষ সামাজিক মূল্য আছে, যেমন জীবতাত্ত্বিক, রাসায়নিক এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইঞ্জিনিয়ারিং। এই সকল নূতন বিষয়েও আমাদিগকে গবেষণা করিতে হইবে। অন্যান্য দেশে এ সকল বিষয়ে গবেষণা করিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও আমাদের যেটুকু সম্বল আছে, তাহা লইয়াই ইঞ্জিনিয়ারিঙের এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রগতির জন্য অনতিবিলম্বে আমাদিগকে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদিগকে কিছু আর্থিক ঝুঁকি লইতে হইলেও তাহা লওয়া উচিত। মানুষের মন সাধারণতঃ অভ্যস্ত পথেই চলিতে চাহে, নূতন কোন কিছু সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা যদি নূতন নূতন গবেষণালব্ধ ফলের সহিত দ্রুত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার ও ঐগুলির সুযোগ গ্রহণের মূল্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহারা সমাজের একটি মহৎ উপকার করিবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বহুসংখ্যক উন্নয়ন কার্য্য ও বিরাট ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রবিদ্‌গণ যদি অল্প ব্যয়ে অথচ নিখুঁতভাবে উন্নয়ন কার্য্যগুলি সমাধা করিবার কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন না করিতে পারেন, তবে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে আমাদিগকে বেগ পাইতে হইতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সস্তায় ও প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং সস্তায় কাঁচা মাল পাইবার জন্য আমাদিগকে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য লইতে হইবে। এদেশে লোকবল অপর্য্যাপ্ত এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া সামগ্রিক ব্যয় যথেষ্ট লাঘব করা যাইতে পারে। কিন্তু এই লোকবল ব্যবহার করিতে হইলে নিম্ন পর্য্যায়ের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে বিশেষ দক্ষতাহীন সাধারণ লোকেরাও তাহা বুঝিতে পারিয়া নির্মাণকার্য্যে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।"

কলিকাতায় শান্তি ও নিরাপত্তা

কলিকাতার পথে ঘাটে যে লোক ও যানবাহন চলাচল দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে পুলিস কিছু নজর দিয়াছে, তবে নজর দেওয়ার ফল কি দাঁড়ায় সেটা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

অন্যদিকে চুরি, রাহাজানি সমানেই চলিতেছে। চুরি হইলে খবর দিয়া পুলিস তদন্ত করান দুরূহ ব্যাপার। তদন্ত হইলেও কিনারা হয় অতি কম।

সম্প্রতি খুনখারাবি ও লুণ্ঠন বাড়িয়াই চলিতেছে। নীচে দুইটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

"কলিকাতায় গত রবিবার রাত্রে উল্টাডাঙ্গা রোডে ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলসের অভ্যন্তরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। কে বা কাহারা ঐ মিলের হেড জমাদার এবং অপর একজন প্রহরারত দারোয়ানকে খুন করিয়া চম্পট দেয়। সোমবার ভোরে এই জোড়া খুনের ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর ঐ অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রবিবার যথারীতি ঐ ময়দা কলটি বন্ধ ছিল। সোমবার ভোরে উহা খুলিবার প্রাক্কালে মিলের লোকজন আসিয়া হেড জমাদার ও দারোয়ানকে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে। হেড জমাদারের ঘরের সিন্দুকটি খোলা অবস্থায় ছিল। কিন্তু উহাতে খুব বেশী অর্থ ছিল বলিয়া মনে করা হইতেছে না। তাই এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত অভিসন্ধি সম্বন্ধে মিল-কর্তৃপক্ষ অথবা পুলিস কোন পক্ষই এখনও সঠিক কিছু আঁচ করিতে পারিতেছেন না।

নিহত উভয়েই উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। হেড জমাদারের নাম হরপ্রসাদ শুকুল (৪৫)। তাহার বাড়ী প্রতাপগড় জেলায়। সে বিবাহিত। প্রকাশ, তাহার কোন সন্তানসন্ততি নাই। আর নিহত দারোয়ানের নাম শিউনারায়ণ তেওয়ারী (২৮)। তাহার বাড়ী সুলতানপুর জেলার পুরাভিখপাত্তে গ্রামে। প্রকাশ, সে মাত্র সাত-আট মাস পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিল। তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এক কন্যা আছে। বিবাহের পর নবপত্নীকে গৃহে রাখিয়া গত শ্রাবণ মাসে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল চাকুরী করিতে। আশা ছিল, আর কয়েক মাসের মধ্যেই আবার সে গৃহে যাইবে। কিন্তু 'একেবারেই চলিয়া গেল', গভীর খেদে বলিল মিলের একজন দারোয়ান। শুকুল ও তেওয়ারী মামা ভাগ্নে সম্পর্কের।"

"সোমবার সন্ধ্যায় মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ছোরা দেখাইয়া জনৈক দারোয়ানের নিকট হইতে নগদ প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা ছিনাইয়া লয়। একটি থলির মধ্যে ঐ টাকা ছিল বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী কামতাপ্রসাদ নামে উক্ত দারোয়ান ঐ দিনের আদায় সংগ্রহ করিয়া চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে অবস্থিত অফিসে ফিরিতেছিল। মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট এবং সাহা লেনের মোড়ে সহসা পিছন হইতে একজন থলিটি ধরিয়া টানে। দারোয়ান ফিরিয়া চাহিলে তাহার চারিপাশে ৩।৪ জনকে দেখিতে পায়, তবু বুঝিবার চেষ্টা করে কিন্তু দুর্বৃত্তরা দারোয়ানের থলি ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করে। অবশেষে তাহারা কয়েকটি পটকা ফাটাইয়া চম্পট দেয়। আহত অবস্থায় কামতাপ্রসাদকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।"

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য কত দিনের ?

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ভাষার জন্ম জীবের জন্মের ন্যায় নয়। অমুক সন তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। ভাষা নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম। যখন একটি ভাষাপ্রবাহের মধ্যে কোনও সময়ের ভাষা তাহার পরবর্ত্তী সময়ের ভাষাভাষীদিগের নিকট নূতন ভাষা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহার নূতন নামকরণ হইয়া থাকে। বাংলা ভাষার পূর্ব্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রংশ বলিতে পারি। প্রাকৃত বৈয়াকরণ মার্কণ্ডেয় সাতাশটি অপভ্রংশের মধ্যে গৌড় অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। কাহ্নের ও সরহের দোহাকোষে এবং প্রাকৃত পিঙ্গলে গৌড় অপভ্রংশের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। গৌড় অপভ্রংশের পূর্ব্বে ছিল গৌড়ী প্রাকৃত। দণ্ডী (আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়ী প্রাকৃতের (কাব্যাদর্শ ১।৩৫) নামোল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ অপভ্রংশ যুগের আরম্ভ ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ মনে করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার আরম্ভ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে। দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে (১।৩২) এবং ভামহ (৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে (১।১৬) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশকে সাহিত্যিক ভাষারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে অপভ্রংশে রচিত কতকগুলি শ্লোক দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ এই যে, বলভীর রাজা গুহসেন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে (৫৫৯-৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) এক অনুশাসনে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে গৌড় অপভ্রংশ হইতে সর্ব্বপ্রথম বিহারী উৎপন্ন হইয়া পৃথক হইয়া যায়, তৎপরে উড়িয়া, তৎপরে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা। এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও অসমীয়াতে পরিণত হইয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে গৌড় অপভ্রংশের কাল্পনিক রূপ নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। যথা: অম্হেহি রোট্টিআ খাই অব্বী (আমি রুটি খাইব); রাহিআ, কহিঁ গইল্লী (রাই কোথায় গেল), গচ্ছকের ফল গচ্ছহু তলে পড়ই (গাছের ফল গাছ হইতে তলায় পড়ে)।

কখন গৌড় অপভ্রংশ হইতে গৌড়ীয় বা বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইল তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। কারণ, একটি ভাষা জন্মিয়াই সাহিত্যে স্থান পায় না। এমনকি সাহিত্যে স্থান পাইলেও তাহার পূর্ব্বস্তরের ভাষা, যাহা পূর্ব্বেই সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল, সাহিত্যে প্রচলিত থাকে। অপভ্রংশ হইতে তাহার পরবর্ত্তী স্তরের অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার ধ্বনি ও ব্যাকরণগত পার্থক্য আছে। ধ্বনিতত্ত্বে যেখানে অপভ্রংশ স্তরের পদমধ্যে যুগ্ম ব্যঞ্জন, নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় সেখানে ব্যঞ্জনের একীকরণ ও পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা দেখি, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় সত্য, হস্ত, পক্ষী—মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় অর্থাৎ পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে সচ্চ, হত্থ, পক্‌খী আর নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় সাচ, হাথ, পাখী। ব্যাকরণে প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য এই যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে কারক বিভক্তি থাকে, মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় ক্রমশঃ ইহার বিশ্লেষণমূলক (Analytical) বিভক্তি রূপ দেখা যায়। নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষায় এই বিশ্লেষণ এত দূর অগ্রসর হয় যে, বিভক্তি চিহ্ন অতি অল্পই রক্ষিত থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার 'বুদ্ধস্য' কথ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় 'বুদ্ধ কার্য্য', প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'বুদ্ধকের', বাঙ্গালায় 'বুদ্ধের'।

এই সমস্ত লক্ষণদ্বারা আমরা মীননাথের একটি কবিতাকে—যাহা আশ্চর্য্য চর্য্যাচয়ের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা বলিতে পারি। কবিতাটি এই,

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট॥
কমল বিকসিল কহিহন জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকই (ধোকে) ন ভমরা॥

ইহার অনুবাদ:

কহেন গুরু পরমার্থের বাট,
কর্ম্মের রঙ্গ, সমাধির পাট।
কমল বিকসিল কহিও না জোংড়াকে
(শামুককে)।
কমল মধু পান করিতে ক্লান্ত হয় না
(অথবা ভুল করে না) ভমরা॥

এই পদে 'বাট' এবং 'পাট' শব্দ দুইটিতে মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের 'বট্ট', 'পট্ট' স্থানে যুগ্ম ব্যঞ্জনের একীকরণ ও পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘত্ব আমরা দেখিতেছি। 'পরমার্থের' এই পদে ষষ্ঠীর 'এর' বিভক্তি দেখা যাইতেছে। 'কর্ম্মকু' ও 'সমধিক' এই দুই পদের 'কু' এবং 'ক' প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ষষ্ঠী বিভক্তি। 'কমল বিকসিল' এখানে কর্ত্তায় বিভক্তি লোপ এবং অতীতকালে 'ইল', ইহাও বাংলা ভাষার লক্ষণ। 'কহিহন', 'ধোকইন

এই দুই স্থলে ক্রিয়ার পরে নিষেধার্থক 'ন' বাঙ্গালার একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য 'পিবিবি' এই পদে পূর্ব্বস্তর অপভ্রংশের অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি 'ইবি' রক্ষিত হইয়াছে।

কেহ যদি এই পদকে প্রাচীন কামরূপী বলেন তাহা অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ এই সময় বঙ্গ ও কামরূপী ভাষার মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু আমরা জানি মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ দক্ষিণ বঙ্গের চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। এইজন্য আমরা এই পদটিকে প্রাচীন বাংলা বলিয়াই গ্রহণ করিব।

সিলভাঁ লেভীর মতে (দ্রষ্টব্য "Le Nepol," vol I, p. 347) মৎস্যেন্দ্রনাথ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে গমন করেন। ইহা হইতে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সাক্ষ্যপ্রমাণে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দকে বাংলা সাহিত্যের আরম্ভকাল বলিয়া ধরিতে পারি। সপ্তম শতকে যে বাংলা ভাষা ছিল তাহার একটি সুন্দর প্রমাণ আছে। এই সময় রচিত একখানি সংস্কৃত চৈনিক অভিধানে "আর্য্য" এর প্রতিশব্দ "আহরা" [illegible] "আহরা" শব্দ বাংলা। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বাংলা শব্দ আছে, যথা লই (লই), [illegible] পহান (পহ), বৈস (বস), [illegible] শতকের একখানি সংস্কৃত চৈনিক অভিধানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যায় : আট (আট), চাল (চাউল), [illegible], পট (পাট), [illegible], হট (হাট), এ (এই), বইশ (বইস, উপবেশন কর) ভতার (ভাতার), মোটা (মোটা)। এই দুইখানি অভিধান ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদনা করেন।

মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ যে নাথপন্থার আদিগুরু বা প্রবর্ত্তক এবং বাংলার প্রাচীনতম লেখক, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সময় সম্বন্ধে ভিন্ন মত আছে। মীননাথের [illegible] যে মৎস্যেন্দ্রনাথ তাহা বাঙ্গালা নাথসাহিত্যে পাওয়া যায়। তন্ত্রশ্লোকের টীকাতেও এইরূপ আছে :

ভৈরব্যা ভৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপ্য ততঃ প্রিয়ে।
তৎসকাশাৎ তু সিদ্ধেন মীনাখ্যেন বরাননে
কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছন্দেন মহাত্মনা (১২৪)।

ড. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথের সময় খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের শেষে ("The origin and development of the Bengali Language", vol 1, p. 122)। সুতরাং মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ দ্বাদশ শতকের লোক। সুনীতিবাবু এই সিদ্ধান্ত পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীকণ্ঠপদ বিরচিত কায়স্থ গয়াকর কর্তৃক গোবিন্দপালদেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে (=১১৯৯ খ্রীঃ অঃ) লিখিত ছিন্ন পঞ্জিকা যোগ রত্নমালার লিপিকাল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, এই পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকার কাহ্নুপাদের সমসাময়িক হইতে পারে (ঐ পৃ. ১২০), কিন্তু এরূপ মনে করার কোনও হেতু নাই। অধিকন্তু কাহ্নুপাদ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য জালন্ধরী পাদের শিষ্য। সুতরাং মৎস্যেন্দ্রনাথ কাহ্নুপাদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি মরাঠী পুস্তক জ্ঞানেশ্বরীর (১২৯০ খ্রীঃ অঃ) জ্ঞানদেবের গুরুপরম্পরা অবলম্বনে মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ তথা কাহ্নুর সময় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, জ্ঞানেশ্বরীর প্রণালী ত্রুটিপূর্ণ (ঐ, পৃঃ ১২২)।

সুনীতিবাবু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে একটি চর্য্যাগীতির লেখক লুইপাদকে [illegible] শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে চর্য্যাপদের প্রাচীনতম লেখক অনুমান করিয়াছেন (ঐ পৃ. ১২০)। এই মত তিনি প্রাচীনতম বাংলা রচনার কাল ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ঐ পৃ. ১২৩)।

অধ্যাপক [illegible] মৎস্যেন্দ্রনাথ দশম শতকের শেষে বিদ্যমান ছিলেন (বাংলার লোকধর্ম্ম, পৃ. ১০৮, ১০৯)। তাঁহার যুক্তি এই যে, "মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঙ্গদেশের রাজা গোপীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।" (ঐ পৃ. ১০৮)।

ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লুইপা ও মৎস্যেন্দ্রনাথকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই ব্যক্তি অভিন্ন নহে। Cordier তাঁহার পুস্তক-তালিকায় তিব্বতী ইতিহাস অনুযায়ী লিখিয়া গিয়াছেন (Catalogue du fonds Tibetain de la Bibliotheque National" Vol II, p. 33).

এখানে আমি নবগীতিকার গোপীচাঁদ এবং চর্য্যাপদের লুইপার সময় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, মৎস্যেন্দ্রনাথের সময় ৭ম শতকের পরে হইতে পারে না। গোপীচাঁদকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে (১০২৩ খ্রীঃ) উল্লিখিত বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াই গোলযোগে সকলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তারনাথের মতে বঙ্গ, কামরূপ ও ভাঁভুক্তির রাজা বিমলচন্দ্র রাজা ভর্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদের পুত্র ("Schiefner, Geschiechte des Buddhismas in Indien" page 195 ff.)। হিন্দী কবিতায় আছে যে, গোপীচাঁদ রাজা ভরথরীর (ভর্তৃহরি) ভাগিনেয় ছিলেন (লক্ষ্মণ দাশ, গোপীচান্দ ভরথরী)। তারনাথের মতে সিদ্ধ জালন্ধরী ভর্তৃহরি ও গোবিন্দচন্দ্রকে দীক্ষা দান করেন।

বিয়োগান্ত

শ্রীসুবোধ বসু

নিতান্ত উৎসাহ সহকারেই প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় আধুনিক নাটকের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বিখ্যাত নাট্যকারের পক্ষেও সব সময় এ রকম সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হয় না। শহর ও শহরতলীর বহু সভায় তাঁর নিমন্ত্রণ হয় সভা অলঙ্করণের জন্য। সবগুলি যাইবার মত জায়গাও নয়, কিন্তু আপন প্রসিদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে হয়, প্রধান অতিথি সাজিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সভায় একক বক্তা হিসাবে যোগদান করিতে পারিয়া প্রশান্ত নিজেও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে।

রডন স্ট্রীটের এই বাড়ী বর্ম্মার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সুবিনয় চৌধুরীর। চৌধুরী রেঙ্গুনে প্র্যাকটিস করেন, আর তাঁর স্ত্রী থাকেন কলিকাতায় মেয়ে লতিকাকে লইয়া। লতিকা এ বছর ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি এ পাস করিয়াছে এবং বর্তমানে কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়িতেছে।

আজিকার সাহিত্য-সভা তার উদ্যোগেই ডাকা। অভিজাত-সমাজে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি কতটা, বর্তমান অধিবেশনটিই তার যথেষ্ট পরিচয়। বিখ্যাত পণ্ডিত হইতে সুরু করিয়া শহরের শ্রেষ্ঠ ধনী উপস্থিত হইয়াছেন তার আমন্ত্রণে। এতগুলি খ্যাতিমান লোককে একই সময় এক জায়গায় জড়ো করিতে পারা কম ক্ষমতার কথা নয়। লতিকার প্রতি ইঁহাদের একান্ত স্নেহ না থাকিলে ইহা কদাচ সম্ভব হইত না।

এতগুলি বিশেষ লোকের উপস্থিতিতে একমাত্র বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করিতে পারিয়া প্রশান্ত আত্মতৃপ্তি বোধ করিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই পরিতৃপ্তিতে বাধা পড়িল সভার শেষে যখন অধিকাংশ গণ্যমান্য অতিথিই বিদায় লইলেন। লতিকার ছেলে এবং মেয়েবন্ধুরা প্রশান্তকে ঘিরিয়া দেশ-বিখ্যাত নাট্যকারের নিকট-সাহচর্য্য ভোগ করিতেছিল। ইতিমধ্যে প্রশান্ত গোটা পঞ্চাশেক অটো-গ্রাফ-খাতা সহি করিয়াছেন এবং নিজের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবন সম্বন্ধে প্রায় শ'খানেক প্রশ্নের জবাব দিয়া তরুণ ভক্তদের কৌতূহল মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমন সময় হোমরা-চোমরা অতিথিদের বিদায় দিয়া লতিকা নিজেও সেখানে হাজির হইল।

'এবার আমি উঠতে পারি কি?' লতিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত কহিলেন।

'গাড়ি হরিয়াবাদের বৌরাণীকে পৌঁছে দিতে গেছে। এলেই আপনাকে দিয়ে আসবে।'

'ইতিমধ্যে' লতিকার বন্ধু সুনন্দা কহিল, 'আমরা এঁর নূতন নাটকটা সম্বন্ধে আরও ভেতরের কথা জেনে নিই। "কান্না" দেখেছিস? নাচঘরে চলছে।'

'ওঁর নাটক আমি দেখি না।' লতিকা সংক্ষেপে কহিল।

এবার প্রশান্ত নিজেও একবার আড়চোখে তার দিকে তাকাইলেন।

'কেন?' সবিস্ময়ে সুনন্দা কহিল।

'ওঁর নাটক আমার ভাল লাগে না।'

এক মুহূর্ত একটা সম্পূর্ণ নীরবতা। উপস্থিত সকলেই যেন অপ্রস্তুত বোধ করিতেছে। এই নীরবতা ভাঙিলেন প্রশান্ত নিজে। প্রশ্নের কণ্ঠে কহিলেন, 'এর কারণ'?

'কান্না।' লতিকা নিজের আঙুলের দিকে চাহিয়া কহিল।

'বইটা একেবারে বাজে হয়েছে!' একটি [illegible] প্রশান্তের [illegible] ভঙ্গিতে।

'কান্না নামে বইটা নয়। সাধারণ ভাবে আপনার নাটকগুলির মূল পরিণতির কথাই বলছি। সব বিয়োগান্ত, সব কান্না, সব ব্যর্থতা! কি নিষ্ঠুর! আপনি যেন [illegible] চোখে জগৎ এবং জীবনকে দেখেন!'

সুবিখ্যাত নাট্যকার প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের লেখার প্রতি এমন প্রত্যক্ষ আক্রমণ পেশাদার সমালোচকেরাও করিতে সাহস পায় না। লতিকার বন্ধুরা লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল। নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া মানী লোককে এ যেন ইচ্ছা করিয়া অপমান!

'জীবনটা যদি মিলনের আনন্দে ভরি থাকত, রোগ শোক-দারিদ্র্য না থাকত, হাসিখুশীয় মদের ফেনার মত পূর্ণ থাকত জীবনের পেয়ালা, তবে মন্দ হ'ত না।' প্রশান্ত উদাস-গম্ভীর ভাবে অন্যমনস্কের মত কহিলেন, 'কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, এটাই ত দুঃখ! গ্রীক নাটকে দেখা যেত, পরিণামে পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয়। এটা খুবই ন্যায্য পরিণতি। কিন্তু অনুশোচনার কথা এই যে, জীবনের

পর পর এমনি কতকগুলি লাঞ্চ এবং টি হইয়া গেল। একটা অবিশ্বাস্য মোহে পাইয়া বসিয়াছে প্রশান্তকে। নিজে তিনি বহু রোমান্সের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজে কখনও রোমান্স করেন নাই। সহসা অভিজাতঘরের এই মেয়েটি নিজে হইতে আসিয়া অন্তরঙ্গতা সুরু করিল। বয়সের তফাৎটা তার কাছে কোনও প্রশ্নই নয়।

প্রশান্ত বইয়ে পড়িয়াছেন, ভালোবাসা নাকি অন্ধ। লতিকার এই ভালোলাগাটা সেই অন্ধ ভালোবাসা অথবা প্রশান্তের খ্যাতির প্রতি সম্মানপ্রসূত, তাহা প্রশান্ত স্থির করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ভালোবাসার উত্তাপ তিনি সহজেই উপলব্ধি করিয়াছেন। রোমান্সের মাদকতায় জীবন পূর্ণ হইয়াছে।

ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া প্রশান্ত ও লতিকা হাঁটিয়া চলিলেন। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে পড়িয়া, বাঁ দিকে মোড় লইয়া গঙ্গার বিপরীত ধার ধরিয়া হাঁটিতে লাগিলেন দু'জনে। সন্ধ্যা পার হইয়াছে। ষ্টীমারের পোর্ট হোল হইতে আলোর শিখাগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ও-দিকে কেল্লার ওয়ারলেসের পোস্টগুলি আকাশের দিকে আঙুল তুলিয়া নিঃশব্দ ভাষায় আদানপ্রদান করিতেছে। রাস্তা জনবিরল; চলন্ত মোটর গাড়িগুলি তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

'লতা।'

'কি?'

'জীবনে এত আনন্দ এখনও বাকি আছে, আগে তা কল্পনাও করতে পারি নি। অথচ জন্মজন্মান্তরের যোগাযোগ না থাকলে তোমার সঙ্গে আমার এই অপূর্ব্ব মিলন কি সম্ভব হ'ত?'

'কিন্তু মিলন কি করে হবে বলুন? আপনার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে...'

'তোমার চেয়ে তারা কেউ বড় নয়। তাদের সকলের ওপরে তোমার স্থান।'

'কিন্তু সমাজ কি তা স্বীকার করবে? আগে হিন্দুদের সুবিধে ছিল; দশটা স্ত্রী থাকলেও কিছু দোষের হ'ত না। আইন ত আজকাল সে পথও বন্ধ করে দিয়েছে।' লতিকা হালকা এবং ঈষৎ গম্ভীর ভাবে কহিল।

'তুমি আমার সখী, আমার প্রিয়া, আমার মানসী।' প্রশান্ত কহিলেন। 'তোমার সঙ্গে আমার এই সম্পর্কে ক্লেদ নেই, মালিন্য নেই। যদি তোমার পাশে হেঁটে, তোমার হাত দুটো নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে স্বর্গ-সুখ পাই, তবে কার কি ক্ষতি?'

'আপনি কবিমানুষ', লতিকা সহাস্যে কহিল, 'এতে আপনার পেট ভরতে পারে কিন্তু আমি যে পুরোপুরি গদ্য। এতে তো আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনে...'

'তুমি কি চাও?'

'যাকে ভালোবাসি, তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করতে চাই। আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র ছাড়তে পারবেন? যদি পারেন বলুন। লোকনিন্দার বাইরে—বহু দূরের জায়গায় চলে যাব দু'জনে। কোনও নির্জ্জন পাহাড়ে ছোট করে একটা ঘর বাঁধব, সমাজের কোন শাসনেরই তোয়াক্কা রাখব না...'

'তুমি একবার আদেশ কর।' বলিয়া প্রশান্ত আবেগ-ভরে লতিকার হাত চাপিয়া ধরিলেন।

আরও এক সপ্তাহ পরে। হাওড়া ষ্টেশনের শেডের তলায় দেরাদুন এক্সপ্রেস যাত্রা করিবার জন্য ছটফট্ করিতেছে। গাড়ি ছাড়িতে মিনিটদশেক বাকি। প্ল্যাটফর্ম্ম জনাকীর্ণ।

প্রশান্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে লোকের ভিড় ঠেলিয়া নিজের রিজার্ভড্ 'কুপে'টার কাছে ছুটিয়া আসিলেন। উহাতে আর কোনও যাত্রী নাই তাহা বুঝিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবার কথা নয়, তবু জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া তিনি ভিতরটা ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। তাঁর মুখে উদ্বেগ, বিস্ময় এবং আশঙ্কা ফুটিয়া উঠিল। পাগলের মত আবার তিনি ছুটিলেন প্ল্যাটফর্ম্মের প্রবেশদ্বারের দিকে।

কয়েক জন হিন্দুস্থানী কুলি প্রশান্তের আচরণ পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়াছে। তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল: 'বাবুজীকা ক্যা হুয়া?' কেহ যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে বারদুয়েক ঠিক একই রকম ভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে, তবে বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশান্ত যখন বাহিরের দিক হইতে আবার নিজের কামরার কাছে ছুটিয়া আসিলেন, তখন তাঁর চোখে মুখে একটা বিপন্নভাব যেন প্রায় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

'বাবুজী!'

প্রশান্ত চমকাইয়া পিছনে তাকাইলেন।

'আপ্‌কে লিয়ে ইয়ে খত্।'

'আমার! কে পাঠিয়েছে?'

'মিসিবাবা।'

ব্যগ্র আঙুলে প্রশান্ত খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ক্ষণকাল চোখে অন্ধকার দেখিলেন, তার পর পড়িলেন: 'ক্ষমা করবেন আপনাকে একলাই মুসৌরী যেতে হবে। একদিন আপনার সঙ্গে তর্ক করেছিলাম, বলেছিলাম আপনার নাটকে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ বড় মর্ম্মান্তিক। আপনিও তর্ক করে বলেছিলেন যে, বিচ্ছেদই বাস্তব, ট্র্যাজেডিই জীবন।

এর মর্মান্তিক বেদনার দিকটা আপনার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে নাই। আশা করি, বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে এবারও আপনার কষ্ট হবে না। আর যদি সত্যই ব্যথা পান, তবে ভবিষ্যতে হতভাগ্য নায়ক-নায়িকাদের এবং সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের এ রকমের আঘাত করা থেকে বিরত থাকবেন। নমস্কারান্তে—প্রতিকা।'

ইহার পর কয়েক বছর প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের কোনও নূতন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। যখন নূতন নাটক সত্যই বাহির হইল তখন দেখা গেল, নাট্যকার তাঁর চিরাচরিত রীতি ত্যাগ করিয়া বিয়োগান্তের বদলে মিলনান্ত নাটক লিখিয়াছেন।

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নীড়ভ্রষ্ট, নীড়-আশ্রয়, নিরাশ্রয় আজ আমি,
গৃহে ত এমন অনুভূতি নিয়ে কখনো ডাকি নি স্বামী।
অন্তবিহীন নীলাকাশে নাই একটুও আশ্রয়,
তবুও চকোর যাঁর উদ্দেশে উড়িয়া তৃপ্ত হয়,
আশ্রয়হীন গ্রহ তারা লভি যাঁহার আকর্ষণ
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে ঘুরিছে অনুক্ষণ,
তাঁহারি যে টান তাঁহারি পরশ পেতেছি বুকের মাঝ,
দীনবন্ধুকে ডাকার লভেছি যোগ্যতা যেন আজ।

২

প্রতিমার মত গলে গেল আহা সজ্জিত গৃহসারি,
চারিদিকে জল তাতেই মিশিল ক' ফোঁটা নয়নবারি।
নূতন দীক্ষা দিল মোরে আজ ভুবন মজ্জমান,
জীবন প্লাবন আমাকে নূতন জীবন করিল দান।
আবার দেখিনু আদিম প্রাতের প্রথম সূর্যোদয়
মূর্তিমতী সে গায়ত্রী সনে আজ হ'ল পরিচয়।
বাজিতেছে শুধু জল কলরব গভীর অহর্নিশ
অভিভূত হয়ে কাতরে তোমারে ডাকিলাম জগদীশ।

৩

সব আশ্রয় ধুয়ে মুছে গেল—তুমি পরমাশ্রয়
দৃশ্যপটের পরিবর্তনে রহিলাম নির্ভয়।
ব্যাকুল হইয়া খুঁজিনু কোথায় কমলে কামিনী মা,
বটপত্রেতে ভাসেন কি হরি? দেখিবার বাসনা।
পাঠ করিলাম প্রলয়পুঁথির ক্ষুদ্র সংস্করণ
জলময়ী এক নূতন পৃথ্বী করিলাম দর্শন।
সহিলাম বহু বিড়ম্বনা ও সহিলাম বহু দুখ,
কখনো পাই নি কিন্তু এমন তোমারে ডাকার সুখ।

৪

নিরাশ্রয় যে হওয়াতেও আছে পরমানন্দ এত,
ভাবিতে পারি নি—নিবেদনে হয় গরল অমৃতমত।
করে নীড়হারা বিহগ যেমন প্রতি তরুতেই বাস,
আমিও যেখানে থাকি—ভাবি গৃহ ফেলি দীর্ঘশ্বাস।
পর্ণ-আবাসও পরম কাম্য তুমি যদি কাছে থাকো,
মাটিকে কেবল উর্দ্ধে তুলিতে আর ভাল লাগে নাকো।
বন্যায় ভিজে গাছগুলি দেখি সতেজ হয়েছে ভাবি,
তাদেরি মতন আমিও পেয়েছি তোমার করুণাবারি।

৫

আমার চেয়েও নিরাশ্রয়েরা আমারে ঘিরিয়া আছে
তোমার কাহিনী উল্লাসে আমি কহি তাহাদের কাছে।
সুরভী মায়ের স্তন্যে আমার বক্ষ রয়েছে তাজা,
কিছু নাই মোর, তবু যেন আমি কাঠুরিয়াদের রাজা।
তুমি কত বড় তাদিকে জানাই শুনাই কৃপার কথা,
যা লয়েছ তার দশ গুণ দিতে নাহি তব কৃপণতা।
তাহাদেরি সাথে ব্যাকুল কণ্ঠে পরমানন্দে ডাকি,
চারিদিকে জল তাহারি সঙ্গে জলে ভরে উঠে আঁখি।

৬

সব ভেসে গেছে, ভেঙে চুরে গেছে অন্তর তবু প্রীত
এতদিন পরে প্রাণভরে পান করিনু নামামৃত।
মাটি গলে গিয়া, বাহির করিয়া দিল সে পরশমণি,
সব নিয়ে গেল তবু করে গেল অমূল্য ধনে ধনী।
চারিদিকে করে জল থই থই—অস্থির দেহমন
হঠাৎ তাহাতে জাগিয়া উঠিল হরির পদ্মাসন।
ভয়ের মাঝারে কখনো হই নি এতখানি নির্ভয়,
কোথা জগদীশ রক্ষ আমারে—আমি যে নিরাশ্রয়।

জন ম্যাক

(১৭৯৭-১৮৪৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উইলিয়ম ইয়েট্‌সের মত জন ম্যাকও শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্ম্মীরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ম্যাক কখনও এই মিশন হইতে আলাদা হইয়া যান নাই, আমৃত্যু শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নানা ভাবে মানব-সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান-শিক্ষাদানে এবং বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান-পুস্তক রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা কখনও ভুলিবার নয়।

জন ম্যাক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন সেখানকার একজন সলিসিটর। ম্যাক শৈশবেই প্রতিভার পরিচয় দেন। স্কুল ও কলেজে বিদ্যাবত্তায় সতীর্থদের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। প্রথমে হাই স্কুলে এবং পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তৎকালীন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। প্রতিটি স্থলেই তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। গ্রীক, লাটিন ক্লাসিক সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপন্ন হন। আবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন—অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রে, তাঁহার বিশেষ দখল জন্মিল। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার ছিল সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ। এই বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতাদি শুনিতেন। শল্যবিদ্যা (Surgery) বিষয়েও তিনি কতকগুলি বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। ম্যাকের কৌতুহল এবং জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া শল্যবিদ্যার অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হন।

পাদ্রীরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে জন ম্যাক মনস্থ করিলেন। স্থির হয় যে, তিনি চার্চ্চ অফ স্কটলণ্ডের পাদ্রী হইবেন। কিন্তু এই চার্চ্চের কতকগুলি বিধিব্যবস্থা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দিকে যৌবনেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি মিশনের মূল কেন্দ্র ব্রিষ্টলে গমন করিলেন—ব্যাপটিষ্ট মিশন-প্রদত্ত বিশিষ্ট শিক্ষা-লাভ ও ধর্ম্মচর্য্যার নিমিত্ত। ম্যাক ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, এখানে আসিয়া খ্রীষ্টশাস্ত্র অনুশীলনান্তর তাহাতেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেন। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ড বিলাতে গিয়া ম্যাকের বিষয় অবগত হন। শ্রীরামপুর কলেজের জন্ম একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল। তিনি জন ম্যাককে এই পদ গ্রহণে সম্মত করাইলেন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-নিয়োগের কথা জানিয়া স্কটলণ্ডনিবাসী জেমস ডগলাস কলেজের বিজ্ঞান গবেষণাগার বা লেবরেটরী গঠনের জন্ম পাঁচ শত পাউণ্ড দান করিলেন; ইহা দ্বারা বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুবিধা হইল।

ওয়ার্ড ম্যাককে লইয়া ১৮২১ সনের মে মাসে ভারতবর্ষে রওনা হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিস কুকও আসিলেন, ইনি বিবাহের পরে মিসেস উইলসন নামে অধিকতর পরিচিত হন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব অপরিসীম। এই বৎসর নবেম্বর মাসে ওয়ার্ড ও ম্যাক শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজ পরিচালনায় ড. জসুয়া মার্শম্যান বিশেষ ভাবে লিপ্ত ছিলেন। জন ম্যাক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কলেজে বিজ্ঞান অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। ওয়ার্ড ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার লন। ম্যাক বাংলা ভাষা শিক্ষায়ও অবহিত হইলেন। বিভিন্ন বিষয় অধ্যাপনাকালে মানচিত্রের অভাব বড়ই অনুভূত হইত। ম্যাকের নেতৃত্বে মিশনরীগণ ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র বাংলায় সংকলনে মন দেন। ভারতবর্ষের প্রায় এক হাজার শহর ও নদনদীর ইংরেজী ও বাংলা নামসম্বলিত ভারতবর্ষের মানচিত্রের একটি খসড়া তৈরি করিবার পর লণ্ডনে শিল্পী ওয়াকারের নিকট তাহা প্রেরিত হয়। খসড়ার ভিত্তিতে মানচিত্রটি অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইল। এখানি বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গ করা হয়। ভারতীয় ভাষায় মানচিত্র রচনা এইভাবেই শুরু হয়।

শ্রীরামপুর কলেজে লেবরেটরী বা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। ম্যাক এখানে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। রসায়নবিদ্‌রূপে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতায় তখন যে স্বল্পসংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারাও ম্যাককে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির শেষ সভায়, তাঁহারই প্রস্তাবে সোসাইটি-ভবনে ম্যাকের দ্বারা রসায়নশাস্ত্রের উপরে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ম্যাক সোসাইটির হল-ঘরে রসায়ন সম্বন্ধে এক প্রস্থ বক্তৃতা দিলেন।

জন ক্লাক মার্শম্যান বলেন, বক্তৃতার দিনগুলিতে আশী হইতে একশত জন পর্য্যন্ত সমঝদার শ্রোতা হাজির থাকিতেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনদশেক ছিলেন ভারতীয়। বক্তৃতার দক্ষিণাস্বরূপ ম্যাক সর্ব্বসাকুল্যে এক শত পাঁচ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি সবটাই মিশন-ভাণ্ডারে দান করেন।*

ম্যাক শ্রীরামপুর মিশনে যোগদানের অল্পকাল পরে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড মারা গেলেন। মিশনের অন্য প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয় উইলিয়াম কেরী ও জশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে তিনি সর্ব্ববিষয়ে একযোগে কার্য্য করিতে লাগিলেন। মিশনের যাবতীয় বিপদ আপদে, সুখে-সম্পদে তিনি তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। ম্যাক তাঁহাদের উভয়েরই বয়ঃকনিষ্ঠ; এ কারণেও তিনি তাঁহাদের স্নেহপ্রীতি প্রাপ্ত হন। উপরন্তু ম্যাকের বিদ্যাবত্তা এবং কর্ম্মতৎপরতা তাঁহাদিগকে কম মুগ্ধ করে নাই। কেরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চায় প্রথম হইতেই অবহিত হইলেন। কলেজে তিনি ক্রমে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায়ই ছাত্রদের রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। ড. জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সঙ্গে একযোগে একটি বাংলা গ্রন্থমালা প্রকাশে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন। মার্শম্যান লইয়াছিলেন ইতিহাসমূলক পুস্তকাদির ভার, ম্যাক বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিতে অগ্রসর হন। কলেজ এবং মিশনের কার্য্যে ক্রমে অধিকতর ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় তিনি একখানির বেশী বই লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই একখানি বই লিখিয়াই ম্যাক পাইওনিয়ার বা অগ্রদূতের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম—"কিমিয়া বিদ্যার সার", অর্থাৎ রসায়নবিদ্যার মূল কথা। ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক এবং পত্রিকাদি কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, তবে রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে এখানিই প্রথম। পুস্তকখানি সম্বন্ধে পরে বলিব।

ম্যাক আর একটি বিষয়েও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বিশেষ সহায় হন। মার্শম্যান লিখিয়াছেন, তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথম বাহির করেন, সেই সময় এবং তাহার পরেও ম্যাক সম্পাদকীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া বহু রচনা দ্বারা উক্ত পত্রিকাখানির গুরুত্ব ও সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন। তাঁহার রচনা ছিল একদিকে যেমন সহজ, স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর, অন্যদিকে তেমনি নির্দ্দোষ, তেজঃপূর্ণ ও ঝাঁঝালো; সংবাদপত্রের লেখা যেমন হওয়া উচিত ইহা ছিল ঠিক তেমনই। তাঁহার সংবাদপত্রের রচনাদি সম্বন্ধে সম্পাদক মার্শম্যান লিখিয়াছেন:

জন ম্যাক

"As a public writer, he had few equals among us. His compositions bore the exact impress of his mind, and were remarkable for their purity, clearness and vigour. He cultivated his style with no little assiduity, and was remarkably happy in clothing his thoughts in the strongest and most appropriate expressions. In all he wrote, however, his great object was to discover and exhibit the truth without any undue partiality, either for his own preconceived notions or for the authority of others. He wrote with much deliberation and seldom modified the structure of a sentence, or even change a word. Some of his ablest papers were sent to press without the alteration of more than a phrase or two. That correctness and elegance of diction

*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, etc. Vol. II. Pp. 260-61.

ম্যাকের জীবনকথা সংকলনে এই পুস্তকখানি এবং ১৮৪৫ সনের 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' ও 'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

which some men attain only by the most painful and elaborate emendations, was exhibited in the first draft of his compositions."

শ্রীরামপুর ছিল ম্যাকের কর্ম্মস্থল। কেরীর মৃত্যু (১৮৩৪) এবং জশুয়া মার্শম্যানের ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু ম্যাককে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হইত যথেষ্ট। ইহার উপর তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পূর্ব্বাঞ্চল—খাসিয়া পাহাড়, আসাম প্রভৃতি ভ্রমণে গমন করেন। তাঁহার ভ্রমণের কথা শুনিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ ঐসব অঞ্চলের যথাযথ অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃতিদানের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ জানান। কারণ, ঐ সময়ের মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চল ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাক-প্রদত্ত বিবরণ সরকারের দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ হইয়াছিল। আসাম পর্য্যটনকালে ম্যাক কঠিন জররোগে আক্রান্ত হন। শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি এই ব্যাধিমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভার্থ অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিলেন। স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। এবারে তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। জশুয়া মার্শম্যানের অসুস্থতা, এবং অল্পকালের মধ্যে মৃত্যুতে (১৮৩৭) তাঁহাকে বিলাতের ব্যাপটিষ্ট মিশনের সঙ্গে এক নূতন বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইল। ম্যাক শ্রীরামপুর ব্যতীত, অন্যান্য অঞ্চলের মিশন-পরিচালিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উহার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জন ম্যাক ১৮৩৯ সনের প্রারম্ভে এদেশে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ, মিশনচার্চ, এবং মিশনের অন্যান্য কার্য্যসমূদয়ের পরিচালনাভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে শ্রীরামপুর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তনে পরিণত হইল। উৎকর্ষের দিক হইতে বেসরকারী কলেজসমূহের মধ্যে ইহা ছিল অদ্বিতীয়। চার্চে বাংলা ভাষায় তাঁহার প্রার্থনা ও উপদেশাবলী শ্রোতাদের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত। ম্যাক তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কর্ম্মশক্তি সকলই মিশনের উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত নিঃসন্দেহ, কিন্তু তিনি কখনও ভ্রূক্ষেপমাত্রও করিতেন না। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে এইরূপ কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৪৫, ৩০শে এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাত্রী ও খ্রীষ্টান-সাধারণ তো বটেই, এমনকি এদেশীয়েরাও বিশেষ দুঃখিত হন। 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অব্‌জার্ভার' (মে ১৮৪৫)-এর শোকসূচক উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করি:

"We have only time in our present issue to announce the death of one of our oldest and most valued missionary friends and fellow-labourers, the Revd. J. Mack, of Serampore. He was removed by the fatal scourge the Cholera, on Wednesday evening, the 30th April. . . .

"Mr. Mack had been a resident in India upwards of twenty-three years. His age was 48. He was a man of great natural and acquired habits. He was an original and deep thinker, a devoted labourer in the cause of truth, and one whose place will not be readily supplied. As a man of talent, a minister, a leader of youth, and adviser and friend, few equalled our good, honest, cheerful and devoted friend, John Mack of Serampore. He rests from his labours. The Lord enable us to meet him in the skies. . . .

"He possessed extensive natural abilities. He was conspicuous as a student and shone in the midst of such men as Carey, Marshman, Ward, Yeates and Pearce, which is not small praise. To have laboured with such men was an honour. To be in point of talent ranked with such men was to earn a worthy fame, as to be with them now is the most complete felicity."

এখন, জন ম্যাকের "কিমিয়া বিদ্যার সার" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। গ্রন্থের আখ্যাপত্র এই: PRINCIPLES OF CHEMISTRY./By/JOHN MACK, of Serampore College/Vol. I/কিমিয়া বিদ্যার সার।/শ্রীযুত জন মাক সাহেব কর্ত্তৃক/রচিত হইয়া/গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।/প্রথম খণ্ড/From the Serampore Press./1834.

পুস্তকখানির ইংরেজী ভূমিকায় ড. কেরীর সহায়তার কথা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। রসায়নের পরিভাষা সম্বন্ধে এই ভূমিকায় তিনি অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা তথা দেশভাষার মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার আয়োজন আজ হউক কাল হউক হইবেই।

এসময়ে এতৎসম্পর্কে জন ম্যাকের সুচিন্তিত অভিমত সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। উচ্চতর বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকাদি রচনায় এই অভিমত আমাদের কাজে লাগিবে নিশ্চয়। ভূমিকা হইতে অতি প্রয়োজনীয় অংশটি এখানে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, 'কিমিয়া বিদ্যার সার' রচনায়ও ম্যাক স্ব-প্রস্তাবিত নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন :

"First, that our European terms have been taken from our ancient languages for the very purpose of preventing the confusion which must arise from as many different names being applied to the same thing as there are languages, in which it is spoken of;—and secondly, that, it is a mistake to suppose, that any good will be done by accurate translations of scientific names, since as many of them, as far as their derivative import is concerned, are totally misapplied, and the translation of them therefore would only be giving currency to error. Thus the word oxygen might have been very neatly rendered অম্লজান (*umlujan*, the producer of acidity); but the result would have been, that the exploded idea of oxygen being necessary to the production of acidity, would have been embodied in the new word."

গ্রন্থখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহাতে ইংরেজী-বাংলা দুইটি পাঠই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে ইংরেজী এবং দক্ষিণ দিকে বাংলা। পুস্তকের বিষয়ব্যঞ্জক অংশটি—যাহাকে আমরা সচরাচর 'প্রস্তাবনা' বা 'ভূমিকা' বলি—ম্যাক "পরিভাষা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পরিভাষাটি এখানে উদ্ধৃত হইল :

॥১॥ কিমিয়া বিদ্যাদ্বারা এই২ শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু যেং ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা।

॥২॥ অদ্য পর্য্যন্ত যত বস্তুর তত্ত্ব জানা গিয়াছে সে অল্প অর্থাৎ ৫১ একপঞ্চাশতের অধিক নহে। সে সকলের নাম মূলবস্তু যেহেতুক বোধ হয় যে ঐ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেবল এক পদার্থ আছে।

॥৩॥ অন্যান্য বস্তুর নাম সঙ্কর বস্তু যেহেতুক সে সকলের মধ্যে দুই কিংবা অধিক পদার্থ আছে। তাহার সংখ্যার প্রায় সীমা নাই।

॥৪॥ যখন মূলবস্তুর পরস্পর লয়েতে সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্কর বস্তুদ্বয়াদির পরস্পর লয়েতে অধিক সঙ্কর বস্তু উৎপন্ন হয় তখন সে কার্য্য নিশ্চিত ব্যবস্থানুসারেই হয়।

॥৫॥ ইহাতে বোধ হয় যে এ বিদ্যা দুই প্রকার অর্থাৎ বস্তু ও তাহার স্বাভাবিক গুণবিষয়ক এবং সেই২ বস্তুর পরস্পর লয়বিষয়ক।

॥৬॥ কিন্তু এই বিদ্যাজ্ঞানার্থ দ্বিতীয় প্রকরণ প্রথম শিক্ষা করিতে হইবেক যেহেতুক বস্তুসকল যেং ব্যবস্থানুসারে ও যেং মতানুসারে সংলীন হয় তাহা না জানিলে মূলবস্তু কিম্বা সঙ্কর বস্তুর গুণ জানা অসাধ্য অতএব সেই ব্যবস্থা প্রথম কথয়িতব্য। কএক নিশ্চিত প্রভাবদ্বারা বস্তুসকল লীন হয় সে প্রভাব নানা প্রকার অতএব এই পুস্তকের দুই ভাগ হইবে। প্রথমতঃ কিমিয়া প্রভাব দ্বিতীয়তঃ বস্তুবিষয়ক।"

পুস্তকখানির ভাষার প্রাঞ্জলতা এই উদ্ধৃতি হইতে লক্ষ্য করা যায়।
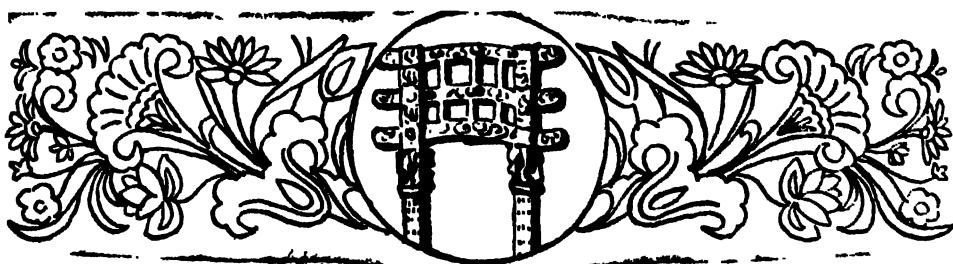
বালুরঘাট

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার বালুরঘাটে যাই। হিলি-বালুরঘাট রোডের যে শোভা দেখিয়াছি এখনও তাহা আমার চিত্তে জাগরূক রহিয়াছে। দুই দিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে জনবহুল গ্রাম; দীর্ঘ পথে আম, তাল

বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের একাংশ

ও কাঁঠালের ছায়াঘন বীথি; মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বে বিরাট জলাশয়ে লাল পদ্মের বন।

শহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নাতিক্ষুদ্র বাজার, আরও অগ্রসর হইলে দক্ষিণ পশ্চিমে সাহেব-সুবার বাড়ী। উত্তর-

বালুরঘাট ভবন: জেলা কংগ্রেস আপিস

পশ্চিমে খালের পুল অতিক্রম করিলেই বালুরঘাটের অপরার্দ্ধ আত্রেয়ী নদীর তীর ঘেঁষিয়া ইহা অবস্থিত। সেখানে এই মহকুমা-শহরের আদালত ও ফৌজদারী কাছারি, ডাকঘর, ইংরেজী বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী, থিয়েটার হল, কালীবাড়ী, থানা ও স্যানিটারী বোর্ড।

শহরের নেতৃস্থানীয়েরা তখন শহরটিকে অতি দ্রুত গড়িয়া তুলিতেছেন। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক আন্দোলনে বালুরঘাট তখন সমগ্র বঙ্গদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ছাত্রজীবনের সঙ্গীরা কেহ কেহ উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছেন। অভিভাবকেরা ছাত্রদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বালুরঘাটের গ্রন্থাগারটি ক্ষুদ্র হইলেও দেশ-

জেলা জজ আদালতে জনসাধারণের বিশ্রামগৃহ

বিদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল। আমরা এই সব পড়িয়া লাভবান হই। গ্রন্থাগার-কর্ত্তৃপক্ষ এগুলি সংগ্রহ করিয়া জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে যৌথ কর্ম্মে, সমাজ-সেবায় বালুরঘাট-বাসীদের তৎপরতা দেখিয়া কর্ম্মীদের প্রতি আমাদের চিত্ত যে শ্রদ্ধায় ভরপুর হইয়াছিল আজিও তাহা অক্ষুন্ন রহিয়াছে। অবসর পাইলেই বালুরঘাটে যাইতাম, একটা উন্মুক্ত, বলিষ্ঠ, উদার জীবনধারার আস্বাদ পাইয়া নিজেকে উজ্জীবিত করিয়া লইবার জন্য। রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ

ললিতমোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

বালুরঘাট : প্রাচ্যভারতী ভবন

একটি মসজিদ

জেলা জজকোর্টের একাংশ

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসগৃহ

বালুরঘাট—নবনির্মিত শহরে পুলিশ সাহেবের বাংলো

প্রচেষ্টায় বালুরঘাট বাংলা তথা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ওদিকের বারদৌলী, এদিকের বালুরঘাট।

সরকারী পরিকল্পনায় নবনির্ম্মিত স্কুলগৃহের একাংশ

১৯৪২-এর আন্দোলনের শেষে বালুরঘাটের বার-চৌদ্দ জন রাজনৈতিক কর্ম্মীকে নিরুদ্দেশযাত্রা করিতে হয়। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পরে; তখন ভারত স্বাধীন হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন তাঁহাদের বালুরঘাট খণ্ডিত দিনাজপুর জেলার পশ্চিমে অবস্থিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা-শহর রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তখনকার দিনের থানা রাইগঞ্জ অন্যতম মহকুমা-শহরে পরিণত।

নবনির্ম্মিত জেলা লাইব্রেরী

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমগ্র প্রদেশে বিস্তর রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তন্মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুরের এই রাস্তাগুলি দৈর্ঘ্যে, গঠননৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে বুঝিবা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সব রাস্তায় দ্রুতগামী শত শত বাস যাত্রী ও পণ্য লইয়া জেলা এবং জেলার বাহিরেও যাতায়াত করিয়া সমগ্র প্রদেশের সঙ্গে যোগ রাখিয়া
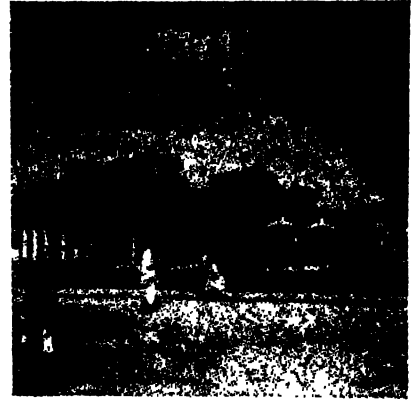
নবনির্ম্মিত জেলা জজ আদালত

চলিয়াছে। বস্তুতঃ তিন-চার বৎসর আগে যখন মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্নাভাব দেখা দিয়াছিল তখন এই সব রাস্তা দিয়াই বালুরঘাট অঞ্চল হইতে বিপুল পরিমাণ ধান ও চাউল প্রেরিত হইয়া ঐ অঞ্চলবাসীর খাদ্যাভাব দূর করিয়াছিল।

কেবল রাস্তা নির্ম্মাণ নহে; বালুরঘাট যে জেলা-শহর হইয়াছে, ইহা ঘোষণা করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার গঠনে গত দশ বৎসর ধরিয়া এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহার ফলে আমার সেই চৌত্রিশ বৎসর

নবনির্ম্মিত শহরে জেলার সদর হাসপাতাল
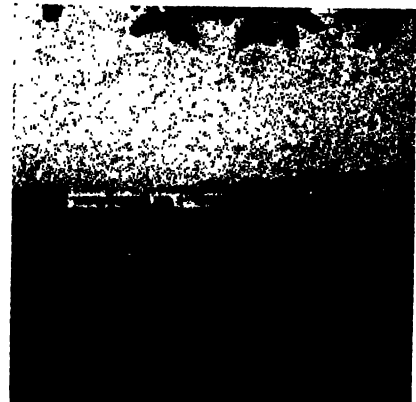
আগেকার দেখা বালুরঘাট শহরের সঙ্গে বর্ত্তমান বালুরঘাটের অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে।

বিখ্যাত আত্রেয়ী নদীর তীরে তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে

প্রায় ছয় বর্গমাইলব্যাপী এক বিস্তীর্ণ শহর। এই বৃহত্তর শহরে জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। একটি সুন্দর সড়ক শহরের দুই প্রান্তকে যুক্ত করিয়াছে। তাহারই উত্তর-পূর্ব্ব দিকের পুরাতন শহর ও বিমানঘাটির মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ নূতন শহর অবস্থিত। এই অংশের সমৃদ্ধি অতি সহজেই চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় চারি শত বিঘা জমির উপর বিরাট জেলা হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্সদের বিরামগৃহ, জেলা জরিপ আপিস, জেলা পুলিস-সুপার ও ইঞ্জিনীয়ারদের কোয়ার্টার এবং জেলা জজের কোয়ার্টার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আর ভারত গবর্নমেণ্টের পঁচিশ লক্ষ টাকায় বিমানঘাটি উন্নততর করা হইয়াছে, মাত্র কুড়ি টাকায় কলিকাতা-বালুরঘাটে যাত্রী যায়।

ওদিকে পুরাতন শহরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে ও স্থানীয় লোকেদের অর্থসাহায্যে এবং চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, সাতটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বিস্তীর্ণ বাজার, জেলা গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি।

নবনির্ম্মিত প্রথম শ্রেণীর কলেজ

বালুরঘাটের নেতাদের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্রুত সংগঠন-শক্তি দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়।

এইভাবে জেলা-শহর গড়িয়া উঠায় বালুরঘাটে জনবসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানা কারণে এখানে জীবিকা অর্জ্জনের বিভিন্ন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহারই দরুন বালুরঘাট শহরের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন করিয়া পুনরায় জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হইতেছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পনরটি জেলা। ইহার মধ্যে এক বালুরঘাট মহকুমাই এই জনসমষ্টির প্রায় দশ লক্ষের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বালুরঘাটের কৃতিসমূহের মধ্যে ইহাও একটি বিশেষ আনন্দদায়ক ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বালুরঘাট শহরতলীতে ছয়টি চাউলের কল বসিয়াছে, হিলিতে চৌদ্দটি রহিয়াছে; বাঁধানো পথ ও আত্রেয়ী নদী-

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্ম্মিত বাড়ীর একাংশ

যোগে এই পণ্য ও পাট, সরিষা প্রভৃতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আত্রেয়ী হইতে পুনর্ভবা, তাহা হইতে মহানন্দা এবং তাহা হইতে মালদহের দক্ষিণে গঙ্গায় পড়িয়া নৌকাবাহিত পণ্য সর্ব্বত্র নীত হইতেছে। এবার কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনকালে ভারত সরকারের পক্ষে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বালুরঘাট ও হিলিকে যুক্ত করিয়া একটি রেল লাইনের আয়োজন বর্ত্তমান পাঁচসালা উন্নয়নের মধ্যেই করা হইবে। চক্ষের উপর বালুরঘাটের এতাদৃশ ক্রমোন্নয়ন আমাদের চিত্তে এই আশার উদ্রেক করি-

উদ্বাস্তু-পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়

য়াছে যে, বালুরঘাট একদিন অপ্রত্যাশিত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিবে স্থানীয় লোকেদের চেষ্টায় ও সরকারের আনুকূল্যে।

সম্প্রতি কিষেণগঞ্জের কিয়দংশ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আয়তন আরও বর্দ্ধিত হইল। ঐ অঞ্চলে চা উৎপন্ন হয় এবং অনেক অকর্ষিত ভূমিও আছে। সুতরাং এই জেলার সমৃদ্ধিতে ইহা সহায়ক হইবে নিঃসন্দেহ। কাজেই এই সীমান্ত জেলা-শহর প্রতিষ্ঠায় ভারত সরকার অবশ্যই অবহিত থাকিবেন, যেমন তাঁহারা অবহিত রহিয়াছেন পূর্ব্ব পঞ্জাবের রাজধানী, সীমান্তবর্ত্তী চণ্ডীগড় প্রতিরক্ষায়। এ কারণেও বালুরঘাটের গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। মোট কথা, বালুরঘাটের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া অন্তরে যে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হয় সেকথা বলাই বাহুল্য।

ফোটোগুলি শ্রীরাধামোহন মোহান্ত কর্ত্তৃক গৃহীত

অব্যক্ত

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

কবিতায় মিল নাই
পাদুকায় হিল নাই
এই সব আজকাল চলছে।
রাঙা খাম চিঠি নাই
টানা আঁখি দিঠি নাই
এলোমেলো কত কি যে বলছে!
যে হিয়াতে আশ নাই
আকাশে বাতাস নাই
বনফুলে কত রঙ ফলছে
নয়া ছুরি ধার নাই
ঢালা শাড়ী পাড় নাই
বিধি যেন মেকি হয়ে ছলছে।
কত সাধ সাধ্য নাই
নভে চাঁদ রাতি নাই
ক্ষ্যাপা কোন্ ফুলমালা দলছে,
কাঁটা আছে ফুল নাই
দুঃখস্রোতে কূল নাই
ব্যথা-ধূপ তিলে তিলে গলছে।
চোখে যার দেখা নাই
প্রাণে তার রোশনাই
নিশিদিন ধিকি ধিকি জ্বলছে
জ্বালা আছে ভাষ নাই
ব্যথার প্রকাশ নাই
চোখে জল টল টল টলছে।

চেয়ে থাকি

শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায়

জীবনের পূর্ণ পাত্রে সঞ্চয় করিয়া শুধু জ্বালা
ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর কণ্টকিত পথে যারা চলে,
নিত্য যারা করে পান ফেনায়িত বিষের পেয়ালা
ভগ্ন মেরু কান্তিহীন আমি যে গো তাহাদেরই দলে।

হৃদয়-শ্মশানে মোর ছড়ানো যে আশার কঙ্কাল
কামনার শূন্য কুম্ভ ইতস্ততঃ যায় গড়াগড়ি
অনির্বাণ দাহে চিত্ত অনুক্ষণ হয়ে থাকে লাল
বেদনার সিংহদ্বারে আমি রহি বিনিদ্র প্রহরী।

গান মোর কণ্ঠে আসি ক্রন্দনের তোলে রোল শুধু
বঞ্চনার খরতাপে সবুজের স্বপ্ন যায় টুটে
শূন্য শুষ্ক রিক্ত প্রাণ বর্ণহীন নিঃশেষিত মধু
ললাটের লোল চর্ম্মে রেখাঙ্কিত মৃত্যু ফুটে ওঠে।

শতাব্দীর অশ্রুজলে সঞ্জীবিত গাণ্ডীব-টঙ্কার
অধীর আগ্রহ লয়ে শব্দ তার কান পেতে শুনি
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা লাগি অবিচারে করিতে সংহার
ধরণীর মর্ম্মতলে গর্জ্জায়িত রথচক্রধ্বনি!

কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়ে দৃপ্ততেজে পার্থ আসে নাকি?
জ্বলন্ত প্রতীক্ষা লয়ে পথ পানে তাই চেয়ে থাকি।

দুই রাত

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

কানাডিয়ান ইঞ্জিন বারতিনেক অদ্ভুত কর্কশ শব্দে শিস্ দিল। ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় কয়লার গুড়োর ভিড়। প্ল্যাটফর্মের এতক্ষণের স্তব্ধতায় যাত্রী আর অযাত্রীদের দুর্বার কলরোল। এদিকের টানা টানা সারি সারি লাইনে ছেঁড়া ছেঁড়া মালগাড়ীর বগী।

যাত্রী-অযাত্রীদের দুরন্ত কলরব শুধু সারাটা প্ল্যাটফর্মেই নয়, এই কামরার দুটো দরজার মুখেও। সেখানে কলরবই শুধু নয়, সেই সঙ্গে বচসা আর পরিণামে ঠেলাঠেলিরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দরজার কাছে এগিয়ে এসে সেখানকার অশোভন বংকারে নিজের উপস্থিতির সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করল না সুপবিত্র। আধখোলা হোলড অলের ওপর আধ-শোয়া শরীরটাকে আরও গুটিয়ে রহস্য পত্রিকার পাতা মুড়ে রাখা পাতাটায় মন দিল আবার।

শেষ কামরার গার্ডের সবুজ আলো চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু গার্ডের সিটি দেবার শব্দ অন্ততঃ কানে আসা উচিত ছিল। কানে না এলেও নিশ্চল গাড়ীর গতিবেগ নিঃসন্দেহে জানিয়ে দিল, এসব আনুষঙ্গিকগুলো আগেই হয়ে গেছে।

কিন্তু গাড়ী ষ্টেশনের পাথরের প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে আর ওঠানামায় ব্যস্ত যাত্রীদের কোলাহল হারিয়ে দু'পাশের অন্ধকার ফাঁকা মাঠে ঝিরঝিরে হাওয়ায় কিছুটা নামতেই কানে এল—কানাডিয়ান ইঞ্জিনের কর্কশ হুইসিল নয়, পাশ কাটিয়ে হঠাৎ দুরন্ত গতিবেগে বেরিয়ে যাওয়া কোন ডাক-গাড়ীর আচমকা গর্জন নয়, কানে এল মিঠে গলায় ছোট্ট একটু মিষ্টি ডাক।

চিনতে পারছেন ?

রেল গাড়ীর নানা জাতের অচেনা যাত্রীদের ভিড়ে চেনা কেউ নেই। চেনা কেউ এতক্ষণ ছিলও না। কেউ কাছে এসে চিনিয়ে না দিলে, চেনা মুখ আর চেনা গলার স্মরণ-চিহ্ন নিয়ে কাছে এসে না দাঁড়ালে এই দুস্তর অচেনার ভিড়ে চেনা কাউকে খুঁজে বার করা কঠিনই কাজ। তবু রহস্য-পত্রিকার পাতায় রহস্যের উত্তেজনায় তন্ময় মন হঠাৎ ভছনছ হয়ে গেল পরিচিত গলার মিষ্টি ডাকে।

কি, চিনতে পারছেন না ?

ঠিক সামনের বেঞ্চেই মুখোমুখি। খানিকটা জায়গা ওখানে খালি ছিল। ওই একটুখানিতেই জায়গা জুড়ে বসেছে অনেক-খুশির একজন। তাকাল সুপবিত্র—তাল করেই যেন। রহস্য-পত্রিকার রহস্যের আকাশ থেকে মাটির পৃথিবীতে আরও রহস্যময় অবতরণ।

চিনতে পারল সুপবিত্র। চেনা নয়, এ যেন আবিষ্কার। একটুখানি অনেক-কাছে পাওয়া একটি রাতের হারিয়ে-যাওয়া চাঁদ। তারপর অনেক রাতের অন্তহীন অন্ধকারের পর হঠাৎ এই আবিষ্কার। চিনতে পারল বৈকি সুপবিত্র। খুশি আর বিস্ময়ে আটকে রইল অনেকক্ষণ। তাই ত বোবা হয়ে গেল। তাই দেরি হ'ল সাড়া দিতে, একটু বেশীই।

হ্যাঁ। বইটা পাশে নামিয়ে রাখল সুপবিত্র।

মনে ত হচ্ছে না।

মনে না হওয়াটা স্বাভাবিকই। তবে বিশ্বাস করুন চিনতে ঠিকই পেরেছি। তবে সেটা জানাতে দেরি হ'ল একটু, এই যা। সুপবিত্র সহজ থেকে সহজতর হ'ল।—এই যা দোষ।

দোষ আপনার অনেক। হাসি ঠোঁট চিরল চিত্রলেখার।

অনেক ? কি কি শুনি ?

নাই-বা শুনলেন। মেয়েদের মত অত কৌতূহলী হওয়া ছেলেদের ভালো দেখায় না। আর দোষগুণ নিয়েই তো মানুষ। খালি গুণগুলো নিয়ে ভালো ছেলে হওয়ার চেয়ে একটু দোষ নিয়ে দুষ্টু ছেলে হওয়া ঢের ভালো—তা জানেন ?

কি জানি।

তা কেন জানবেন। শুধু ভালো কথা বলে মেয়েদের লোভ দেখাতেই জানেন আপনারা।

বাঃ রে, কাকে আবার কখন লোভ দেখালাম ? অবাকই হ'ল সুপবিত্র।

যাক্ গে, ও সব ভাববেন না কিছু, দোহাই। হাসি আরো একটু চিরে দিল নরম গোলাপী ঠোঁট দুটো। মেয়েরা ত আজেবাজে কত কিই বলে। ও সব শুনতে নেই।

বেশ। হাসি ছড়াল সুপবিত্রও।

এই ত কেমন লক্ষ্মী ছেলে। কত সহজেই মেনে নিলেন। অন্য কেউ হলে এক গাদা তর্ক করত।

শুনেছি ত যে তর্ক করতে মেয়েরাই ওস্তাদ।

মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কথাই হয় ত শুনেছেন, আবার অনেক কথাই হয় ত শোনেনও নি। সব ছেলে মেয়েদের সব কথাই কি শুনতে পারে? পারে না। কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য, আবার ট্রেণে আমাদের এমনি করেই দেখা হওয়া।

এমনিই হয়।

হয় না, হাতি। বড় ত বিজ্ঞের মত মন্তব্য করে দিলেন। আপনি অবাক হন নি?

হয়েছি বৈকি। হয় ত আপনার চেয়েও বেশী। তবে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ছেলেদের অনেক কম।

সবই কম ছেলেদের। তবে বেশীটা কি?

যদি বলি দুষ্টুমি।

থাক, তাও জানা আছে। হাওয়ায় উড়ে-আসা চুল-গুলোকে মুখের উপর থেকে সরায় চিত্রলেখা।

কি করে জানলেন? এর আগে অনেক আগের একটা ট্রেণের রাতের ত মাত্র আলাপ।

ছেলেদের জানতে মেয়েদের একটা রাতই যথেষ্ট। একটা রাতও অনেক। এক ঘণ্টাই ঠিক।

তবে ত কিছুই জানেন না।

বেশী জেনে দরকার নেই আমার।—শাড়ীটাকে বুকের উপর ঘুরিয়ে নিল চিত্রলেখা।—আমার শুধু আশ্চর্য্য লাগছে, আজকের এই আবার দেখাটাই তখন থেকে। আশ্চর্য্য শুধু দেখাটাই নয়, আবার রেলগাড়ীতেই আর রাত্তিরেই।

আশ্চর্য্য ত নিশ্চয়ই। হয় ত দুর্ঘটনাই।

যে-কোন ঘটনাকেই ত দুর্ঘটনায় নামানো যায়। হাসল চিত্রলেখা।

এর থেকে প্রমাণ হ'ল যে পৃথিবী গোলাকার। হাসল সুপবিত্রও।

প্রমাণ ত অনেককিছুই হয়। গোলাপী ঠোঁটের হাসি লুকোল না। আচ্ছা বলুন ত, কত দিন বাদে আবার এই দেখা?

কি জানি?

হিসেব করে রাখেন নি?

না ত?

বিশ্বাস হয় না।

হয় না কেন? ওর কালো চোখের অস্থির তারা দুটোর দিকে ইচ্ছে করেই তাকিয়ে থাকে সুপবিত্র।

কারণ ট্রেণের সেই রাত, হঠাৎ পাওয়া একটাই রাত। সে রাতকে ভোলা যে বড়ই শক্ত।

ভোলাই ত ভাল।

ভাল ত পৃথিবীতে অনেককিছুই।—কালো দুটো অস্থির চোখের তারায় হঠাৎ যেন পড়ল মেঘের ছায়া।

ভোলা সত্যিই যায় না। হঠাৎ-পাওয়া একটা রাত। অগোচর অসতর্কে ঝিরঝিরে ভিজে হাওয়ায় রাতের ট্রেণের মিষ্টি সময় অনেকখানি। হয় ত জানত না কেউ। হয় ত চায়নিও দুজনের কেউ। কিন্তু পাবার পর বলতে কেউ পারে নি, বলতে কেউ চায় নি, চাই না।

সে রাতেও এমনই মুখোমুখি চিত্রলেখা, এমনই মুখোমুখি সুপবিত্রও। আজকের মত ডাকবার সাহস ওর হয় নি। সাহস সুপবিত্রেরও হয় নি। দুজনে তাকিয়েছিল শুধু অনেকটা রাস্তা। বোবা বালির বাঁধ স্নিগ্ধ নীল জলের ঝরণায় মুখর হতে একটু সময় ত লাগবে।

অবশ্য তার আগে চিত্রলেখার সঙ্গীদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে সুপবিত্রর। ওর বড় মামা কল্যাণবাবু, মা আর ছোট বোন মিনু। ভিড় ঠেলে ওদের জায়গা করে দিতে সাহায্য করেছে সুপবিত্র। আশ্চর্য্য, ভাব ওদের সঙ্গে শুধু তাড়াতাড়িই নয়, সহজেও হয়।

কল্যাণবাবু বললেন, খাবার বার কর যে চিত্রা, বেশ ক্ষিধেটা পাকিয়ে এসেছে।

চিত্রলেখা হাসল, তোমার বড়মামা খালি খাই খাই।

খাই খাই মানে? সকলেরই ক্ষিধে পেয়েছে। আস্ক মিনু, কি রে পায় নি?

খুব বড়মামা। মিনু ঘাড় নাড়ল।

ওই শোন। এর পর আর দেরি নয়। তার পর কল্যাণবাবু তাকালেন সুপবিত্রর দিকে।—আপনার কি মশাই? হোয়াট এবাউট ইউ? সঙ্গে ত খাবার কিছুই দেখছি না।

আমি পরের স্টেশনে রেষ্টুরেন্ট কারে ঢুকে পড়ব।

সেখানে কি পাবেন ছাইপাশ মশাই।

আর আমাদের কাছে খাবার থাকতে ওখানে যাবেনই বা কেন? আরও আপত্তি ভেসে এল।

রাইট। মাথা দোলালেন কল্যাণবাবু।

ইতিমধ্যে কাঁচের প্লেটে খাবার সাজিয়ে ফেলছে চিত্র-লেখা।. প্লেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন।

আপনাদের খাবারে ভাগ বসানো ভাল হ'ল না কিন্তু।

নাই-বা হ'ল। মৃদু হাসল চিত্রলেখা। ভাগ বসাতে ভাল লাগছে না বুঝি আপনার?

তা নয়। তবে কি মনে করবেন আপনারা।

কি আবার?

ভাববেন, কি হ্যাংলা ছেলে রে বাবা!

ভাবব কেন, ছেলেরা তা নয় বুঝি? মিষ্টি গলাটাকে

আরও যেন নরম করল চিত্রলেখা। নিন, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলুন ত।

কিন্তু এ যে অনেক দিয়েছেন।

অনেক আবার কোথায়? ভারি ত খাবার?

কম পড়বে না আপনাদের?

পড়ুক। না হয় সবাই কম করেই খাব। না হয় আমার ভাগ খাবই না। একটুও ক্ষিধে নেই আমার।

বাঃ রে, তা কি হয় নাকি?

খুব হয়। তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলুন দিকি। আপনার সঙ্গে আর বকতে পারি না। ছেলেদের যে এত সাধতে হয়, আগে জানতাম না।

আগে কি জানতেন?

জবাব শোনা গেল না চিত্রলেখার। হয় ত শুনতে পায় নি, বা জবাব দিতে চায় নি। ট্রেণ তখন মস্ত একটা নদী পার হচ্ছে।

ঠিক আজকের দিনই আমারও যাবার দিন পড়ল, আর বেছে বেছে ঠিক আপনার কামরাতেই উঠলাম—আশ্চর্য্য যোগাযোগ না?

আশ্চর্য্যই।

শুধু তাই নয়, আপনাকে খুঁজে বার করার ক্রেডিটও আমার।

এক শ'বার। তবে এ ক্রেডিট আমি নিতে পারলে আরও খুশী হতাম।

পারবেন কি করে? যে রকম বই পড়ায় মেতেছিলেন। কি বই অত সব? নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ?

হু। ঘাড় নাড়ল সুপবিত্র।

ঠিক ধরেছি। সে রাতেও সঙ্গে দেখেছিলাম এক গাদা ডিটেকটিভ বই। আচ্ছা, কি আছে এতে?

কি নেই বলুন। প্রেম থেকে খুন সব।

ভাল লাগে আপনার?

খুব। ভারি ইনটারেষ্টিং। আপনি পড়েন না?

বই পড়তে আমার একটুও ভাল লাগে না।

তবে কি ভাল লাগে? রাতদিন শুধু বকবক করতে কি?

তাই। হাসল চিত্রলেখা। আচ্ছা ডিটেকটিভ বইয়ের হিরোরা কি করে? হিরোইনকে গুণ্ডা-খুনেদের হাত থেকে উদ্ধার করে কি?

তাই ত করে।

আর সত্যিকারের হিরোরাও কি তাই করে?

তারাও।

কি জানি। আবার হাসল চিত্রলেখা। কেমন যেন বিবর্ণ মনে হ'ল এবারের হাসি।

খাবার দিতে গিয়ে ছুটো কথা। ছুটো কথাতেই দুষ্টু মেয়ে চূড়ান্ত দুষ্টুমি দেখাল। রাতের রেলগাড়ীতে মুখোমুখি চঞ্চল তারার স্নিগ্ধ আলোয় শান্ত নয়, প্রাণবন্ত এক দুরন্ত মেয়ে।

রেলের খোলা জানলায় প্রাণবন্ত মেয়ের প্রাণবন্তা উজ্জ্বল কৌতূহলে বারবার উছলে পড়ছিল।

শুনুন, জানলা দিয়ে অত ঝুঁকবেন না।

কেন, কি হবে ঝুঁকলে?

কি হবে জানি না। তবে একটা কিছু হবে।

কি একসিডেন্ট?

তাই।

তবে ত ভালই হবে।

ভাল ঘোড়ার ডিম। হাত-পা ভেঙে পড়ে থাকবেন। বিয়ে হবে না।

পৃথিবীতে এত কিছু জিনিস থাকতে হঠাৎ বিয়ের কথাটাই কেন আপনার মনে পড়ল শুনি?

কি জানি। হাসল সুপবিত্র। বেশী মুখ বাড়াবেন না। কয়লার গুঁড়ো পড়বে চোখে।

তখন কথা শুনল না। একটু পরেই মুখ ফেরালো চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

কি হ'ল, কয়লা পড়েছে ত চোখে?

হুঁ। শাড়ীর আঁচলে চোখ ঘষতে ঘষতে মাথা নাড়ল চিত্রলেখা।

কলেজে পড়া মেয়েরা ভারি অবাধ্য হয়।

ক'টা মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে শুনি মশাই। রগড়ানো লাল চোখ তুলে তাকাল চিত্রলেখা।

অনেক দিনের পরে দেখা। এবার খবর শোনান আপনার। সুপবিত্র হেসে শুধাল।

ভালই।

ছোট্ট ঐটুকু জবাবে সব কথা শেষ করে দিলেন। ভারি চালাক ত।

জানি ভাল নেই বললে এখুনি একগাদা প্রশ্ন করবেন।

জানেন ত অনেককিছুই। কিন্তু এটা কি জানেন যারা অনেককিছুই জানে আসলে তারা কিছুই জানে না।

হবে হয় ত। কি জানি।

সঙ্গে কাউকে দেখছি না ত। একা এসেছেন নাকি?

একা আসতে ভয় আমার একটুও নেই। কিন্তু যারা পাঠাবে, ভয় একগাদা তাদেরই।

ভয়টা স্বাভাবিক।

তাই সঙ্গে রয়েছে মন্টু। আমার ছোট ভাই। এখানে জায়গা হ'ল না তাই পেছনের বেঞ্চে বসেছে।

ট্রেণ থেমে গেল। কোন স্টেশন নয়, এক ঝাঁক কালো অন্ধকারের মধ্যে নিরালা মাঠ। বারছয়েক সিটি দিয়ে বিরাট ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনটা ধুঁকতে লাগল। সিগন্যালের সবুজ আলো জ্বলে নি বোধ হয়।

সেই রাতের ট্রেণের আপনি আর আজকের রাতের ট্রেণের আপনি খুব বেশী বদলান নি। শুধু—

শুধু কি? মুখটা কাছে আনল চিত্রলেখা।

চুলের মধ্যে ওই লাল দাগটুকু।

কত ছোট করে টেনেছি। তাও আপনার চোখ এড়াল না।

তাই ত দেখছি। কিন্তু অত সরু করে এঁকেছেন কেন। দেখাই ত যায় না।

দেখাতেই হবে নাকি? ফিরে হাসল চিত্রলেখা।

হবে না?

কি জানি?

নতুন জীবনের লাল নিশানাটুকুতে অত কৃপণতা কেন, তা ত বললেন না?

এমনিই।

লাল দাগ টানতে ভাল লাগে না, না?

জানালার বাইরে কালো অন্ধকার। সেদিকেই চেয়ে রইল চিত্রলেখা।

কি, জবাব দিলেন না যে?

বাইরের অন্ধকার থেকে চোখ ফেরাল না চিত্রলেখা। শুধু বলল, সব প্রশ্নেরই কি জবাব থাকে।

গাড়ী থামল। মাঝ রাতের নির্জ্জন রিক্ত স্টেশন। কে জানে, কি নাম। কেউ জানবার চেষ্টাও করল না। গাড়ী আবার এগোল।

সত্যি তা হলে বিয়ে করলেন।

করি নি, হয়ে গেল।

ওই একই।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল চিত্রলেখা। সত্যিই এক কি? প্রশ্ন করল, কিন্তু জবাব চাইল না।

আবার বলল সুপবিত্র, বেশ ফাঁকি দিলেন আমায়। দিব্যি লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করে নিলেন।

তাই। ট্রেণে ত কত বার কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। সবাইকেই মনে রাখতে হবে নাকি।

তবু আমার বেলায় অন্ততঃ তাই আশা করেছিলাম।

অমন আশা করা দুরাশা। একটা ডিটেকটিভ বই টেনে পাতা ওলটাতে থাকে চিত্রলেখা। তবু—

তবু কি?

তবু মনে ত রেখেছিলাম।

প্রমাণ পেলাম না।

প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু ঠিকানা জানা সত্ত্বেও আপনিই বা ক'বার এসেছিলেন বা খোঁজখবর করেছিলেন শুনি?

সত্যিই সময় পাই নি।

অথচ বেশ লোক আপনি, দোষ দিচ্ছেন আমাকেই। মেয়েদের পায়ে পায়ে বাধানিষেধের কত শেকল, জানেনই ত।

বিশ্বাস করুন, এ আমার অবহেলা নয়, অক্ষমতা।

বিশ্বাস না করলেও ক্ষতি হবে না আপনার। ট্রেণের শুধু একটা রাতের চেনা, ওর কিই-বা দাম, কিই-বা দাবি।

আগুন লেগেছে লাইনের পাশে বনের মধ্যে।

কেমন হয়েছে বিয়েটা?

ভালই।

মনের মিল হয়েছে ত ভদ্রলোকের সঙ্গে?

একটা রাতেই যদি আপনার সঙ্গে অত মিল হতে পারে —আর ওঁর সঙ্গে ত কতগুলো রাত কাটালাম।

তার পর হঠাৎ বোবা দুজনেই। জানালায় শুধু এলোমেলো হাওয়া চিত্রলেখার শাড়ীকে টানাটানি করছে। রুক্ষ চুলের গোছাকে বারবার মুখের ওপর আছাড় দিচ্ছে। রেলের লাইনে লাইনে ইস্পাতের বেদনায় কর্কশ কান্নার শুধু একটানা সুর।

কল্যাণবাবুর নাক ডাকছে। মাও শুয়ে পড়েছেন। মিন্নুকে নিজের জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়েছে সুপবিত্র।

আপনার কি হবে? চিত্রলেখা শুধাল।

হয়ে যাবে একটা কিছু।

ঘুমোবেন না?

আপাততঃ নয়। পরে দেখা যাবে।

পরে আর কি দেখবেন? নিজের শোবার জায়গাটুকু ত মিন্নুকে দিয়ে দিলেন।

হাসল সুপবিত্র। দিয়ে দিই নি, নিয়ে নিল। দুটোর তফাৎ অনেক। কিন্তু আপনি কি করবেন?

ট্রেণে আমার ঘুমই আসে না।

সারারাত জেগে থাকবেন?

তাই থাকব। বেশ লাগে সারাটা রাত ট্রেণে জেগে থাকতে—জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে

তাকিয়ে থাকতে। কোথাও গণ্ডগোল নেই। শুধু বোবা আমি আর বোবা রাত। আপনার ভাল লাগে না?

কি জানি।

কিচ্ছুই জানেন না। খালি গুচ্ছের ডিটেকটিভ বই পড়তে শিখেছেন ট্রেণে বসে। কত কি হচ্ছে, বাইরে কত কি চলে যাচ্ছে কিছুই কি দেখতে ইচ্ছে করে না। কিছুই কি ভাল লাগে না?

না। কিন্তু ট্রেণ জার্নিতে এই প্রথম বই এত কম পড়লাম।

হঠাৎ?

কারণ তোমায় দেখলাম। এর আগে ট্রেণে এমন আর কাউকে দেখি নি। তোমাকে ভাল লাগল। এর আগে এত ভাল ট্রেণে আর কাউকে লাগে নি।

সুরু হয়েছে।

কিসের সুরু?

ছেলেদের দুষ্টুমির।

ঐ যা, তুমি বলে ফেললাম।

থাক, আর শুধরে দরকার নেই। জানালার দিকে মুখ ফেরাল চিত্রলেখা। ঝুঁকে পড়ল চাঁদ উঠেছে কিনা দেখতে।

অত মুখ বাড়িও না, আবার কয়লা পড়বে চোখে।

পড়ুক গে।

এই শোন, কাল ভোরেই কি তোমরা নেমে যাবে?

হুঁ।

তার পর?

তার পর আর কি, হোম সুইট হোম।

আমাকে মনে রাখবে না?

মনে? ফিরে তাকাল চিত্রলেখা। চঞ্চল দুটো কালো তারার খুশির বুদ্‌বুদ ফোটাল একটু। 'প্রভাতে কে আর মনে রাখে বল রজনী শেষের চাঁদে'। আচ্ছা মনে কর, ভোর আর যদি নাই হয়। বলে উঠল সুপবিত্র।

তার মানে?

মনে কর যদি রাতের আর শেষ না হয়। অনন্ত কাল ধরে রাতের এই রেল যদি চলতেই থাকে।

হাসল চিত্রলেখা। পাগল, তাই কি হয়।

হয় না, না?

উঁহু।

আচ্ছা মনে কর, হঠাৎ এখুনি একসিডেন্ট হয়ে গেল এই গাড়ীর। সবাই প্রাণ হারাল, শুধু আমরা দুজন একসঙ্গে অনেক দূর ছিটকে পড়ে বেঁচে রইলাম।

কি সব আবোলতাবোল বকছ তখন থেকে। মিষ্টি মেয়ের নরম গোলাপী ঠোঁট পাপড়ির মত ফুলে ফুলে কেঁপে উঠল হাসিতে।

তবু বোবা হাওয়ার কান্নার ভিড় ওই মেয়েই ভাঙল কথাতে আবার।

যাই হোক, আজ হঠাৎ আবার এভাবে ট্রেণে আমার আপনার দেখা হয়ে গেল, ভালই হ'ল।

কি জানি।

সত্যিই। আমি বলছি। কারুর মন্দ করার সাধ্য আপনার নেই।

ধন্যবাদ।

দোহাই, ওটা নাই-বা দিলেন। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আজ শ্বশুরবাড়ী ফেরার পথে বার বার এই কথাই মনে হচ্ছিল, আবার যদি হঠাৎ ট্রেণে দেখা হয়ে যায় আপনার সঙ্গে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। আপনি ভাগ্যবতী।

কি জানি।

ভোর হতেই নেমে যাবেন? শুধাল সুপবিত্র।

হুঁ।

তার পর?

তার পর আর কি, সোজা বাড়ী।

হোম সুইট হোম ত?

ফিক করে হেসে ফেলল চিত্রলেখা। সেদিনের জবাব মনে আছে দেখছি।

ভোলা কি যায়। হেসে ফেলল সুপবিত্রও।

আচ্ছা এ কথা কি মনে আছে যে, আপনি বলেছিলেন, ভোর যদি আর কোন দিন না হয়, এ রাতের যদি শেষ না হয়, রাতের এ রেল যদি অনন্ত কাল চলতে থাকে!

নিশ্চয় মনে আছে। আরও বলেছিলাম, হঠাৎ যদি একসিডেণ্টে রেলগাড়ী ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, সবাই মরে যায়, বেঁচে থাকি শুধু আমরা দু'জন।

হাঁ, তাও বলেছিলেন।

আর পাগলামি বলে আপনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হাঁ।

ঠিকই করেছিলেন।

কি জানি। জানালার বাইরে অন্ধকারে তাকাল চিত্রলেখা। তার পর মুখ ফেরাল আবার। আচ্ছা, আপনার সে রাতের সেই প্রশ্নগুলো আজকের রাতে যদি আমি আপনাকে করি, আপনি কি খুবই অবাক হবেন? সেই রাতে আমার মতই আপনি কি আজ পাগলামি বলেই হেসে উড়িয়ে দেবেন সেগুলোকে?

অবাক বিস্ময়ে ফিরে তাকাল সুপবিত্র। জবাব

তখনিই দিতে পারল না। সে রাতে পাগলামিই করেছিল। তবু আজকের চিত্রলেখার মুখে সে রাতের ওর মুখের আজগুবি কথাগুলো—তারা কি পাগলামি নয়? জানালার দিকে মুখ ফিরিয়েছে চিত্রলেখা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চোখের জল লুকোবার জন্তেই অন্ধকারে মুখ ঢাকল কি?

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবে সুপবিত্র, হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে বিরাট একস্‌প্রেস ট্রেণ থমকে থেমে গেল। স্টেশন নয়, কে একজন মেয়ে লাইনে কাটা পড়েছে। কে জানে কে, তবু কেন কে জানে মনে হ'ল সুপবিত্রর, আর কেউ নয়—ট্রেণে কাটা পড়েছে চিত্রলেখাই যেন।

দেহাতী গানের দেশে

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

সারেঙ্গী বেজে চলল বিষাদের সুর তুলে। বনস্পতি শাখা আন্দোলিত করে সুর মেলাল সেই সুরে। উদাসী গায়ক তখনও একমনে রচনা করে চলে বিচ্ছেদের আলপনা। এইবার মুখ খোলে। অস্তগামী সূর্যোর দিকে চেয়ে চেয়ে মনে পড়ে কত না মধুমাখা দিনের কথা। সবই ত তার ছিল। কিন্তু আজ সে ভিখারী। কিন্তু কেন?

এই কেনর উত্তর কে দেবে? অলক্ষ্যে যদি কোন দেবতা থেকেই থাক তা হলে বল দেব, আমার এই হৃদয়-মন্দির লুঠ করে তোমার কি লাভ হ'ল? আমার এই হৃদয়-কমলকে হরণ করে নিয়েও কি তোমার এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না? এমন যে সম্রাট সাজাহান-পত্নী মমতাজ তিনিও ত আজ মাত্র স্মৃতির গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মুখ ত গেছে আজ হারিয়ে। আজ আর আমার সংসার বলেই বা কি আছে? কার সঙ্গেই বা হাসি-খেলায় দিন কাটাব বল। তোমাকে শোনাবার জন্ত লক্ষ লক্ষ কথা আজ আমার বুকের মাঝে জড়ো হয়ে রয়েছে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কার কাছেই বা আর সে সব কথা বলব বল?—

"মালিক তুঝে ক্যা মিলা
মেরি দুনিয়াকো লুট কর
ক্যা তুঝে কুছ ভি নেহি আতা হায় লাজ
মেরি খুশীকো ছিন কর
ভগবান নে দিল হায়
মেরা দিলকা তমন্না।
× × ×
এ ক্যায় কর দিয়া তুনে আরে
সংসারকে সিরতাজ
লাখে মুশীবাতে হায়
মেরে জানপর
আব ক্যায়সা বাতা হাম জিয়ে
বিন আপনে সংসার,
ভগবান মেরে দিল হায়
মেরা দিলকা তমন্না।"

পূর্ব্ববঙ্গের উদাসী সম্প্রদায় কিংবা উত্তরবঙ্গের বাউদিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারেন বিহারের এই দরবেশ শ্রেণীর লোকদের এই ভাবসম্পদের কথা। দরবেশরা জাতিতে মুসলমান বটে, কিন্তু এদের ধর্ম্মে কোন গোঁড়ামি নেই। বাঙলার বাউলের মতই তাদের সাধনার ক্ষেত্রও ব্যাপক। বাউলের ভাব-সাধনার সঙ্গে এদের গীতের তুলনা হয় না একথা ঠিক। কিন্তু বিহারের এই দরবেশ, সুফী কি সুরদাসদের গান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।

সুরদাসেরা জাতিতে অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু এদের গানেও সেই উদার ভাবই লক্ষ্য করা যাবে। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করাই হ'ল এ সম্প্রদায়ের শেষ কথা। কিন্তু সেই ভগবান কোন মূর্ত্তির ভিতর আবদ্ধ নন। তিনি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাই ত সুরদাসকে গাইতে শোনা যায়, এই আলো বাতাস, এই সূর্য্য, চন্দ্র, এই যে নীল আকাশ, সবই ত আছে, কিন্তু আমার হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, তাঁর ঘরই বা কোথায়, দেশই বা কোথায়? ধরার বুকে এত সুখশান্তি বিরাজ করছে, কিন্তু আমার মনের শান্তি কোথায়? নববসন্তে পৃথিবী হাসছে নতুন দিনের সাড়া পেয়ে।

কিন্তু আমার হৃদয় কি শুধু শূন্যই থাকবে? সে কি শুধু ব্যথার মালাই গেঁথে যাবে?—

"জমি ভি ওহি হ্যায়, আশমান ভি ওহি হ্যায়
মগর আব উ দিলকি দুনিয়া কাঁহা হ্যায়।
দরখ্‌তি ওহি হ্যায়, দরখ্‌তি ওহি হ্যায়
মগর ও দিলকি খুশীয়া কাঁহা হ্যায়।
সুরজভি ওহি হ্যায়, চাঁদ ভি ওহি হ্যায়
মগর মেরি দিলকি আর সব কাঁহা হ্যায়
× × ×
খুশী আ গেই মেরি সারি দুনিয়া
রহে কি একেলা হাম ছুড়ে এ সারি দুনিয়া।"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে। উদাসী তার সারেঙ্গী থামিয়ে গাছতলায় বসে বিশ্রাম করে। দেশ থেকে দেশান্তরে খুঁজে বেড়ায় তার জীবনধনকে। কিন্তু খুঁজে কি সত্যিই পায় না তার প্রাণের প্রভুকে।

রাতের আঁধার গাঢ় হয়। সীমাহীন অাঁধারের মাঝে তারায় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে বিরহিণীর মনোমন্দিরে ফুটে ওঠে এক-খানা অতি পরিচিত মুখের ছবি। ছবিখানা ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে সমস্ত আকাশ, জগৎসংসার জুড়ে। সে যেন আর ধরতে পারে না তাঁকে তার সীমার মধ্যে। থেকে থেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে মুনিয়া, অঝোর ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করে; তাঁর প্রিয়তমের উদ্দেশে—অতি সন্তর্পণে। যেন কেউ টের না পায়, যেন কারও ঘুম না ভেঙ্গে যায়—দেবতার উদ্দেশে আত্মনিবেদন করবার এই ত উপযুক্ত সময়। এই সময় ছাড়া আর কখন বলা সম্ভব, তুমি ত চলে গেছ বন্ধু, কিন্তু আমার শরীর যে বিকল হয়ে যাচ্ছে তোমার তরে, সে কি শুধু এই যাতনা সহ্য করবার জন্যই? আমি তোমার সন্ধানে কত জায়গায়ই ত ঘুরলাম। ঘুরে দেখলাম পাহাড়-পর্ব্বত, দেখলাম জগৎ-সংসার। কিন্তু তোমায় ত কোথাও পেলাম না। দু'দিনের জন্য আমার জীবনে কেনই বা আবির্ভূত হলে, আর কেনই বা এত কথা বলে গেলে? আমার এই ব্যথার মালিকা কার গলায়ই বা পরিয়ে দেব? কার কাছেই বা প্রকাশ করব আমার মনের গোপন কথা? বল বন্ধু, বল, আমার কি শুধু কান্নাই সম্বল হ'ল?—

"তু গেই মেরা দিল জালা
জল গিয়া শরীরা
ম্যায় দুনিয়া মে রহা গিয়া তেরা লাল।
ও জানে আলে তু গেই কাঁহা
তেরি মুনিয়া রোএ রো রো নীর বহাবে
ও জানে আলে তু গেই কাঁহা।
ম্যায় ত ঢু ড়হ পর্ব্বত নালে
ঢু ড়হ জগ সনসার,
ধরাত ঢুড়হ দর দর ঢুড়হ
কাঁহি ন পায় তেরি বিকাল
ও জানে আলে তু গেই কাঁহা।"

তাই ত বলি ওগো আমার প্রাণবঁধু, তুমি আমার জীবন-তরণীকে ডুবিয়ে দিয়ে কি ফল পেলে বল। কত নির্য্যাতনই ত সহ্য করলাম তোমার জন্যে; হয় ত এই কষ্ট, এই দুঃখ পাওয়াটাই ছিল আমার কপালের লিখন। তুমি আমার আনন্দকে হরণ করেছ, সংসারের সকল সুখ কেড়ে নিয়েছ, আমার বলতে যা কিছু ছিল সবই ত গেছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে। তবে কেন এখনও এত যন্ত্রণা দাও:—

"মেরি নৈয়াকো ডুবানে আলে
মেরি নৈয়া ডুবাকে তুকেকো ক্যা মিলা?
লখি উলফাতে হাঁয় মেরি নৈয়াকো ডুবনে সে
জিন্দগী ভি বরবাদ হ্যায়, ম্যায় ভি বরবাদ হু
মেরি কিসমৎ ভি বরবাদ হ্যায়
মেরি নৈয়াকো ডুবানেয়ালে।"

তামসী রজনীর শেষ হয়। ধীরে ধীরে জগৎসংসারের বুক থেকে মুছে যায় সেই একখানা অতি মধুর ছবি। সূর্য্যকরস্পর্শে মুদিত কমলিনীর মত বুজে আসে তার অাঁখি-পাতা। জেগে ওঠে বিশ্বচরাচর। বিরহিণীর কথা চাপা পড়ে যায় সেখানে। জগৎ-সংসার চলে একই ভাবে, কোথাও এতটুকু ছেদ নেই, নেই তার কোন ব্যতিক্রম। দেশের পর দেশ, যোজনের পর যোজন পার হয়ে যায় উদাসী। সারেঙ্গীর সুরে সুর মিলিয়ে, নিজের মনের সবটুকু কথাকে উজাড় করে দিয়ে উদাসী গেয়ে চলে, তার চলার পথে নজরে পড়ে সংসারের কত না বিচিত্র ঘটনা।

সর্ব্বত্রই ত সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গয়া জেলার এক অতি নগণ্য পল্লীর ভিতরও দেখা যায়—ছোট্ট বৌটি স্বামীর ঘর করতে এসেছে। পতি তার বিদেশে। পতির চিন্তায় হয় ত বা বাহ্যজ্ঞানশূন্যই হয়ে যায় বেচারী। তন্ময় হয়ে দূর পথের উপর চলমান গাড়ীর দিকে চেয়ে ভাবে, হয় ত ঐ রাঙা মাটির পথ ধরেই এগিয়ে আসবে তার 'প্রাণবঁধু'। কিন্তু তার এ স্বপ্নসৌধও ধূলিসাৎ হয়ে যায় যখনই শোনে শ্বশুরশাশুড়ীর গঞ্জনা, সহ্য করতে হয় তাকে দেওর-ননদের অত্যাচার। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেও দূর-প্রবাসী স্বামীকে মনে মনে সম্বোধন করে বৌটি বলছে, হে আমার প্রাণবল্লভ, তুমি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। কি যাতনায় যে ভুগছি আমি, তা ত তুমি জান না। যখন পাকা ইঁদারার কাছে জল আনতে যাই, তখন ননদী রাগের মাথায় আমার কলসী ত ফেলে দেয়ই, উপরন্তু ঠোক্‌নাও মারে। দেবরও বড় কম যায় না, বারান্দায় যদি বা কখনও একটু গেছি অমনি সে আমায় বকাবকি সুরু করে। সুতরাং তুমিই বল, এখন আমার উপায় কি?—

"রাজাজী মেরি সেইয়াকো কয় কেয় বানা।২
বব সে আঙনামে বাঁউ

দেওয়া যোরে করে বাকাবোরি
মনদ মোহে মারে তাজা
মাজাজী বেরি গৈঁয়াকো কয় কের মানা।
পানীয়া ভরণে যাউ পাকাওয়া ইনারাওয়া পর
তাহি সময় কেরিলে গাগরিয়া
ও রাজাজী বেরে সে ইয়াকো কয় কেম মানা।"

হায় অভাগিনী। সে ত জানে না, সে যখন তার পতিদেবতার উদ্দেশে এই ভাবে আকুতি জানাচ্ছে, পতি তখন অনেক দূরে। তার কি আর মনে আছে ঘরের এই বালিকা বধূর কথা। সে হয়ত তখন অন্য কারও সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত।

প্রাণবঁধুর উদ্দেশে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে বিরাগী, তার বেশ বাস হয়েছে অপূর্ব্ব। মাথায় রেখেছে দীর্ঘ জটা, গায়ে নেই বাড়তি পোশাক কিছু, সে এসে বসেছে এক গাছতলায় —দেখে মনে হয় মস্ত এক সন্ন্যাসী। লোক-কবি এবার একটু রসিকতা না করে পারলেন না। বললেন, কি বন্ধু, কার ভয়ে তুমি জটা রাখতে গেছ? কি কারণেই বা অনাবশ্যক ভাবে মুটিয়ে চলেছ, বিরাগী হয়ে ঘরসংসার ত্যাগ করে কাশীবাসীই বা হতে গেলে কেন? তুমি ত জান, দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র কি বলেছেন—'এ দুনিয়ায় কেউ বেকার থাকবে না। সুতরাং বন্ধু হে, পার্থিব সুখে ভুলে না থেকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা কর, তা হলেই ত মনে শান্তি পাবে:

"ক্যা ভয় তোর জট মাথারে
ক্যা ভয় তোর মোটেসে।
ক্যা ভয়ে কাশীকে বসবে
ক্যা বেণী সে লোটে সে।
ইস জগপর আয়কে পাকিন মা রাইনে
দশরথওয়ালে ঢোক্তে সে।
মানত মুরুখ তোলে খাত
পাই মত রামকে লোটে সে।"

উদাসী মুখে কিছু বলে না, ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্মিত হাস্যে বলে, সবই ত উপরওয়ালার মর্জ্জি। তিনিই ত সবার মালিক। এ সংসারে যদি আমার বিনাশ ঘটাই তাঁর ইচ্ছা হয়ে থাকে ত তাই হোক্, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। একদিন জীবনে যিনি সুখ দিয়েছেন, শান্তি দিয়েছেন, বেদনাও তিনিই দিয়েছেন। হাসি, খুশি, সুখ, দুঃখ এ সব ত তাঁরই দান। সুতরাং এ সবই যেন সমান ভাবেই গ্রহণ করতে পারি।

"ও মালিক তেরে সন্সার মে
বরবাদ হু বরবাদ রহেনে দে।
× × ×
একদিন দিয়া খুশী
একদিন দিয়া হাসি
একদিন রোনা হায় মেরি কিসমত মে
রোনে দে।
× × ×
হাসিখুশী, সুখী, দুঃখী
হাসনা রোনা, তুহু বানায়া
তুহি বানায়া এ সন্সার
ও মালিক তেরি সন্সার মে
বরবাদ হু, বরবাদ রহেনে দে··

আশ্বাস

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ঘুমায়ে পড়েছে ধরা। আমি একা জাগি'
লিখি আর লিখি শুধু,—কেন? কার লাগি'?
কাঁচমূল্যে চায় যারা কিনিতে কাঞ্চন
ফাঁকি দিয়া,—ওরে মূঢ় কবি অভাজন,—
লিখিস্ তাদেরি তরে! হায়রে কপাল!—
কে দিল আশ্বাস, "আছে নিরবধি কাল।"
দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি নয়,—প্রাণের এ কথা
অতি সত্য, অতি সোজা—সূর্য্যালোক যথা
সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল! শুধু বাতুল-প্রলাপ
নহে এ তো,—মর্ম্মসাথে মর্ম্মের আলাপ
লাগিবে কি ভালো কারো? বিশ্বে কদাচন
মিলিবে কি সমধর্ম্মা অন্ততঃ দু'জন?
এ মধুর মাধারাতি,—তবু আমি জাগি'
কথার মালিকা গাঁথি,—কেন? কার লাগি'?
অন্নহীন দুঃস্থ দেশ,—কবিতা কূজন—
এ যেন উন্মাদসম অরণ্যে রোদন!
তবু ভাবি—কবিশিল্পী যত সে পাগল
আছে বলি' মরু নহে আজো ধরাতল!

বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মহাকবির স্বরূপ ও দান

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কবি শব্দের বাচ্য শুধু কাব্য-রচয়িতা হিসাবে নন, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী দরদী মানুষ, ঋষি চেতনায় উদ্ভাসিতদৃষ্টি কবি, ভারতীয় মালঞ্চের মালাকর, মানসমুকুল ফুটিয়ে তোলার বাউল, ভাগবত ভাবের বৈষ্ণব, প্রেমপন্থী মরমিয়া সাধক এবং তত্ত্বদর্শী আচার্য্য।

তিনি যুগন্ধর পুরুষ—জনগণমনের পথপ্রদর্শক নেতা, নিয়ন্তা এবং নায়ক।

গতানুগতিক বৈষ্ণবতাকে তার অচলায়তন প্রকোষ্ঠ-পরায়ণতা থেকে মুক্ত করে তিনি বিশ্ব-বৈষ্ণবতার উদার দৃষ্টি দান করে মানবতার মহাজাতির আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন।

ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে অরূপে এবং অরূপ থেকে অপরূপের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনের বিচিত্র বিস্ময়কর উপলব্ধি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে অনুভব করে সম্রাটের মত এই নিত্যকার দুঃখ-দৈন্য-হিংসা-দ্বেষ-পীড়িত বিশ্বের নরনারীকে দান করে গেছেন মুক্তি, শান্তি এবং প্রেম ও এই দানই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁর বৈষ্ণব ভাবধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে চেষ্টা করব।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব

'বিষ্ণু' শব্দ বৈদিক যুগ হতেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে বিষ্ণু আরাধনার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যথা "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্" ইত্যাদি বিভিন্ন সূক্তে এবং ঋকে।

'বৈষ্ণব' শব্দের বাচ্যার্থ তিনি, যাঁর উপাস্য দেবতা হলেন 'বিষ্ণু'।

'বিষ্ণু' শব্দের ব্যুৎপত্তি নানাবিধ। "বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ"—অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী হয়ে যিনি আছেন। যাঁকে শ্রুতি বলেছেন "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজঃ বিশ্বপাদাক্ষি নাসিকঃ"। অপর অর্থে "বেষতি (বিষ সেচনে—to sprinkle) সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বম্" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে নিজের রসে রসায়িত আপ্যায়িত করেন। আর এক অর্থ "বিষ্ণাতি ('বিষ' বিপ্রয়োগে বিযুক্ত বা পৃথক্‌করণে) বিষণক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাদিতি বা" অর্থাৎ মায়া অপসারণ করে সংসার থেকে ভক্তকে যিনি সরিয়ে নেন।

সুতরাং মৌলিক অর্থ ধরলে 'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্ম' সেই এক এবং অদ্বয় তত্ত্বকেই বুঝায়, শ্রীভাগবত যাঁকে উদ্দেশ করে বলেছেন :

> "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

দর্শনে ও সাহিত্যে 'রস'

প্রশ্ন উঠবে এর সঙ্গে সাহিত্যের তথা কাব্যের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক সনাতন এবং শাশ্বতিক।

কাব্যের কষ্টিপাথর হ'ল 'রস', কারণ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। এই 'রস' অনির্ব্বচনীয়। কটু তিক্ত অম্ল মধুরাদি যেমন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, মনবুদ্ধির প্রতীতির বিষয়, কাব্যরস ততোধিক সূক্ষ্ম এবং অনির্ব্বচনীয়।

দেবর্ষি নারদ বলেছেন—"মূকাস্বাদনবৎ"। এই সাহিত্য-কাব্য এবং সঙ্গীতের রস "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ"—শ্রুতি বলেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"—"মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম" ইত্যাদি। মহাকবি বলেছেন—"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে"—কারণ এই গানের সুর, প্রাণের প্রেম এবং কাব্যের রস এই সকলেরই মূল উৎস সেই 'রস'স্বরূপ।

শ্রুতি বলেছেন—'রসো বৈ সঃ' যে রস লাভ করলে "রসং হেবায়ং লব্ধ্বা নন্দীভবতি স্তব্ধীভবত্যমৃতী ভবতি"—জীব আনন্দিত হয় স্তব্ধ বা অভিভূত হয়, অমৃতত্ব লাভ করে। তিনিই মধুব্রহ্ম অমৃতব্রহ্ম আনন্দব্রহ্ম, তিনিই ভূমানন্দ বা অতিশয়ানন্দস্য (acme of joy), তিনি 'রসানাং রসতমঃ' (বৃহদারণ্যক) রসঘন আনন্দঘন। বৈষ্ণবের অভিধায় তিনি 'হরি'-'কৃষ্ণ'-'রাম'। 'হরি' অর্থাৎ, সকল মলিনতা হরণ করেন। 'কৃষ্ণ' কারণ তিনি সকল চিত্তাকর্ষক—'হরে সবার মন'। 'রাম' যেহেতু তাঁকে—মনোভিরামং বচোভিরামং···সদাভিরামং সততাভিরামম্' বলা হয়। তিনি আত্মারাম।

প্রেমে 'তুমি' ও 'আমি'

ক্রীশ্চান মিষ্টিকদের ভাষায় তিনি Dulce Amore বা Sweet Love—মুসলমান সুফীদের ভাষায় তিনি 'মুক' বা প্রেমাস্পদ, ভক্তকবি 'আসিক' বা প্রেমিক। তাঁর বাঁশী শুনে ব্রজগোপী বলেন—"শ্রীগোপেন্দ্র-সুতঃ স কর্ষতি বলাৎপঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে"। তাঁর আহ্বান শুনে ভক্তকবি বলেন—'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'? বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী বলেন—'বাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।' মহাকবিও সেই বাঁশী শুনেই বলেন—'সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে না মনমাঝে।" তিনি 'সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারী লীলা-কল্লোলবারিধিঃ'।

এই প্রেমের পরিণতি কোথায়? Browning বলেন, "All love assimilates the soul to what it loves."

ক্রীশ্চান মিষ্টিক যা বলেন Apotheosis বা Deification বা attainment of Divine Similitude বা Divine assimilation—গীতার 'মম সাধর্ম্ম্য' আগতি বা প্রাপ্তি।

এই প্রাপ্তির ফলেই মহাকবি ঋষিপদবাচ্য হয়েছেন। তাঁর মধ্যে এবং কবির মধ্যে যেটুকু ব্যবধান সেটুকুর কথা কবির ভাষায় "আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা।" যখন সে ব্যবধানটুকুও থাকে না তখন—

"তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে"

এই 'তুমি', এই মহান্ 'তুমি', এই মহতো মহীয়ান 'তুমি', ইনি কবির 'আমি'কে চান কেন? কবিই তার উত্তর দিয়েছেন:

"আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে,
……তুমি তাই এসেছ নীচে।"

অবতরণ ও লীলা

এই 'নীচে'-আসাই অবতরণ এবং অবতারবাদের মূল সূত্র। এই প্রেম শুধু দয়া নয়, বরং বলব দয়াই নয়, কারণ দয়ার ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম এক নয়, এই প্রেমই তাঁর লীলা—তাই বেদান্তসূত্রে পাই "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্" (২.১.৩৩) দয়ার ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যপ্রধান, প্রেমের ধর্ম্ম মাধুর্য্যময়। কবি তাই বলেছেন:

"তাই তো প্রভু হেথায় এলে নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

চরিতামৃত বলেন:

'ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান,
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান।'
এবং 'বৃহৎ বস্তু ব্রহ্ম কহি, শ্রীভগবান
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলছেন:

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।

এই প্রেমে আগম আছে নিগম নাই। জীব আত্মনিবেদন করেও তবু লজ্জিত ভীত হয়ে পিছিয়ে আসে—"The self resists the pull……flees from the touch of Eternity and the Eternal seeks it, tracks it ruthlessly down" (—Underhill).

তাই দেখি "অকূল থইইতে চকল কান
যাই কমল পদ আধ পয়ান।"

'দেবতাকে প্রিয় করা' এবং 'প্রিয়কে দেবতা করা'র কাজে—রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব কবি, বাংলার বাউল কবি, ক্রীশ্চান মিষ্টিক বা মরমিয়া কবি এবং মুসলমান সুফী সাধকেরা সকলেই সগোত্র। 'এক' এবং 'অদ্বৈত' তিনি—"ওয়াহিদাহু লা শরিক্"—বলেন মুসলমান।

শ্রীভগবান উত্তম পুরুষ বা গীতায় বর্ণিত 'পুরুষোত্তম'। কবি তাঁর প্রতীক্ষায়, পথিকবধূর মত, 'ব্রজসুন্দরগন্ত সখি! নূপুরধ্বনিং—নিশময্য সংভৃত-গভীর-সম্ভ্রমা,—ঈক্ষণোত্তরলা' হয়ে চেয়ে আছেন,

'আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম!
চাই যে বারে বার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।"

কখনও প্রগাঢ় প্রত্যয় বক্ষে আঁকড়ে বসে আছেন, দেখতে না পেলেও—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।"

'মিষ্টিক' রবীন্দ্রনাথ

তাই যখন এই প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়কে তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকায় বলতে শুনি—"মিষ্টিকের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা এ দুয়ের কোথাও মিল নাই"(!) তখন মনে না করে পারি না যে, তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের 'ভূমিকা' থেকে ভূমিই সরে যাচ্ছে যেন! চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকারা তার বিচার করবেন, কারণ আমরা কবিগুরুর অন্তরলোকের এই অপরূপ দিকটাই দেখবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করেছি।

কোন আধুনিক সমালোচক গান্ধীজীর জীবন থেকে তাঁর আস্তিক্য বা ঈশ্বর সম্পর্ক বাদ দিয়ে যেমন গান্ধীজীর জীবন-বেদ দর্শন করতে চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে তাঁর মিষ্টিক দৃষ্টি, মরমিয়া সাধনা বা বৈষ্ণব ভাবধারা বাদ দিতে গেলেও ঠিক তেমনি হয়—'বিচেষ্টিতং ভেকভুক চেষ্টিতং যথা'।

কবির পত্র ও জীবনী

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি তাঁর অনুরাগ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং একখানি পত্রে লিখেছেন, "আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলাম।" (রবীন্দ্র-জীবনী প্রভাত মুখো:, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১) "আগাগোড়া গীত-গোবিন্দখানি তিনি নকল করিয়া লইয়াছিলেন"…"সংস্কৃতের শব্দলালিত্য রূপকল্পনা ছন্দ-মাধুর্য্য বাল্যবয়স হইতেই তাঁহাকে এই সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে।" (ঐ, পৃঃ ৭০)

তাঁর উড়িষ্যা ভ্রমণের প্রসঙ্গে পাই—"অন্যবার বরাবর আমার সঙ্গে বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনিনি সে জন্য ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশী অনুভব হচ্ছে।" (ঐ, পৃঃ ২১৮)

"রবীন্দ্রনাথের মতে যেখানে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিত ভাবে কাজ করে বা এক কথায় যেখানে আস্ত মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে, সেখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। পর্য্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে আর সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" (ঐ পৃঃ ২১২)

'সাধনা' পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়তত্ত্বের' প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি-তর্ক বলিষ্ঠভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহকারে বৈষ্ণব-দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করে। তিনি বলেন, "চন্দ্রনাথবাবু সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ী পাকাইয়া তুলিয়াছেন যাহা অভূতপূর্ব্ব। প্রথম কথা, ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।' দ্বিতীয় কথা, 'সৃষ্টি-কৌশলে'র মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণত্ব প্রকাশ করে? লীলা কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র প্রকাশ নহে? 'সৃষ্টি-কৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনও যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে? সৌন্দর্য্যের একমাত্র কার্য্য—হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেম-স্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; সৃষ্টির সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভাল-বাসেন এই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অনেক নিয়মপাশে বাঁধিয়া, আমাদিগকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে চাহেন তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশেষ সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদিগকে বংশীস্বরে আহ্বান করিতেছেন, তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান।

বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য্যে এই প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্য বিরাট লয়প্রার্থীকে যে কি করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"…

"চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ শিক্ষিত সাহিত্যিকগণ ও 'বঙ্গবাসী'র লেখক-গণ বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া তাহার বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন…দেশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথবাবু উপলক্ষ্য মাত্র।" তিনি (রবীন্দ্রনাথ) একটি প্রবন্ধে বলিলেন, "যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল পাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলি অমূলক বিশ্বাস কিম্বা গোঁড়ামির কথা বলি না, কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি।"…সেই জন্য তিনি যুক্তির উপর জোর দিয়াছেন গুরুবাদের উপর নহে।

'আদিম সম্বল' প্রবন্ধটিতে তিনি বলিলেন যে, মানুষের যুক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া, তাহাকে কলের মত চালাইয়া নির্বিরোধে কাজ আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের চরম সম্পদ মনুষ্যত্ব সেখানে লুপ্ত হইয়াছে। 'সেখানে চিন্তা, যুক্তি, আত্ম-কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম্ম কাজ করা তাহাই চলিতে থাকিবে।' (সাধনা ১২৯১, আষাঢ় পৃঃ ১৮০) "কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়; কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।" (রবীন্দ্র-জীবনী, পৃঃ ২৫৪-৫)

প্রেম ও প্রেমিক

দার্শনিক প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের চোখে বৈষ্ণব কবিদের ভগবৎ প্রেম ক্রীশ্চান মিষ্টিকদের মরমিয়া প্রেম—মুসলমান সুফী প্রেমিকের প্রেম এবং মহাকবির 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যের এবং গীতি কবিতার অঞ্জলিতে গীতিভরা প্রেমের মধ্যে 'অমিল' অল্পই, মিল-ই বেশী। কারণ—

"শশীকো কুমুদন বহুৎ হ্যায়" কিন্তু "কুমুদনকো শশী এক"।

এই শশীকে বৈষ্ণব কবি বলেছেন মহাপ্রভুর মুখে—

"ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর"। (চরিতামৃত)

এই 'কৃষ্ণ' কে 'ব্রহ্ম'ই বলুন 'খৃষ্ট'ই বলুন আর বৈজ্ঞানিকের ভাষায় 'X'-ই বলুন তাতে কিছুই আসে যায় না।

দেবর্ষি তাঁর ভক্তিসূত্রে এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন:

"নাস্তি তেষু জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদি ভেদঃ"।

প্রেমভক্তিই বৈষ্ণব কবির পাথেয় এবং পথ, উপায় এবং উপেয় সাধনা এবং সিদ্ধির ফল। প্রেম স্বয়ংই ফলরূপ—

"স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ" (নারদ ভক্তিসূত্র)।

এই প্রেমই তাঁদের মোক্ষের পরেও পঞ্চম পুরুষার্থ।

"পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম আনন্দের সিন্ধু,—মোক্ষাদির আনন্দ তার নহে এক বিন্দু"। তাই ভাগবতকার 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' বা সকল প্রকার কৈতব (কপটতা) বর্জ্জিত এই প্রেমধর্ম্মের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'প্রোজ্ঝিত কৈতব' শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেছেন, "প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ,—'প্র'-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ, কেবলমীশ্বরারাধনালক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যত ইতি"।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রেমে 'কেন' 'কি হবে' এ সব প্রশ্ন থাকতেই পারে না, প্রেম আপনাতেই আপনি জবাবদিহি, প্রেম আপনি আপনার লক্ষ্য"। অশ্বিনীকুমার দত্ত ভক্তিযোগে উদ্ধৃত করেছেন সুপরিচিত গানের একটি কলি—"ভালবাসিবে বলে ভাল-বাসি নে…আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে"।

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন, "আনন্দচ্ছন্দধৃত জীবনে

বন্ধন কোথায় যে মুক্তির জন্য হবে তার আস্পৃহা ? প্রেম আনন্দ-স্বরূপ···বুদ্ধির সীমাকে অতিক্রম করে প্রেমের গতি। এই প্রেমের গতিতে দ্বৈত রূপান্তরিত হয় অদ্বৈতে, অদ্বৈত রূপান্তরিত হয় দ্বৈতে"। ('রবীন্দ্র স্মৃতি' 'পূর্ব্বাশা'-পত্রিকা পৃঃ ২৫)

এই প্রেমকে পাবার জন্য কোনও রহস্যাত্মক নিগ্রহপূর্ণ নৈষ্ঠিক বিধি-বিধানপূর্ণ তপস্যার প্রয়োজন হয় না, ধ্যান ইহার সহজাত তপস্যা। ইহার মূল্য সহজ এবং সুলভ হয়েও দুর্লভ। তাই আচার্য্যেরা বলেন,

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং কল্পকোটিসুকৃতৈ র্ন লভ্যতে।"

অর্থাৎ পাবার লালসা এবং চাইবার ঐকান্তিকতাই এর মূল্য। এই প্রেম ব্যতীত জীবনের একান্ত ব্যর্থতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তাই অনুযোগ করেছেন—

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে—
তবে কেন ভোরের হাওয়া ভরে দিলে গানে।"

আবার প্রাণে যখন প্রেমের স্পর্শ লাভ করলেন, তখন তিনি প্রেমিকার মত অনুযোগ করেছেন—

তবে, পরাণে ভালবাসা কেন বা দিলে রূপ না দিলে যদি বিধি হে
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে ?
* * যত গোপনে ভালবাসি পরাণভরি, পরাণভরি উঠে শোভাতে
যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।
* * তাই আঁখিতে প্রকাশিত চাহিনে তারে নীরবে থাকে তাই রসনা
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত গোপনে মরে কত বাসনা।

'গুপ্তপ্রেম'।

প্রেমাস্পদ

ভক্তিসূত্রে নারদ বলেছেন "সা কস্মৈচিং পরম-প্রেমরূপা" অর্থাৎ নর বা নরোত্তম নির্ব্বিশেষে কাহারও প্রতি পরম প্রেমভাব। শাণ্ডিল্য বলেছেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অর্থাৎ, "অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা" (পঞ্চরাত্র)

রবীন্দ্রনাথ যেন নারদের সূত্রকে এনে শাণ্ডিল্যসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন; 'প্রেয়'কে এনে 'শ্রেয়'কে সমর্পণ করেছেন যাতে "তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্ব প্রেমতৃষা"। 'কিম' শব্দের এই অনির্দ্দেশ্য উদ্দেশ রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করেছেন—বলেছেন :

"কে সে ? জানি না কে, চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি তাঁরি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছেন 'অপরূপ' এবং সারাজীবন এই 'অপরূপকে দেখে' গেছেন 'দুটি নয়ন ভরে'। এই অপরূপকে কেউ বলেছেন 'শ্যাম' কেউ বা 'শ্যামা', এই সব ভিন্ন ভিন্ন অভিধা। সকল ভাষা মিলে গিয়েছে সেই এক সমুদ্রে—"সর্ব্বে বেদাযং পদমামনন্তি"—(শ্রুতি) কারণ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিং সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" (শ্রুতি)

যদিও তিনি অনির্ব্বচনীয়—'ইদম্'-'এতদ্'-'এতাবং'-পদের অবিষয়, তথাপি যিনি কবি তিনি তাঁকে উপলব্ধি করে থাকেন—"তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম।" কৌতূহলী লোকের প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন :

কতো জনে এসে মোরে ডেকে কয়
'কে গো সে'—শুধায় তব পরিচয়
'কে গো সে' ?
তখন কী কই নাহি আসে বাণী
আমি শুধু বলি 'কী জানি কী জানি'—
তুমি শুনে হাসো তারা দুষে মোরে
কী দোষে।"

তবু 'জানি না' বললেও সত্য বলা হয় না—তাই আবার বলেন :

তাই—"তোমায় 'জানি না চিনি না' একথা বলতো কেমনে বলি
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও খনে খনে যাও ছলি।
কখনো—'আপির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে'
কখনো—'বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছো চরণ চকিতে'

তাই হাল ছেড়ে দিয়ে কবি বললেন,

কাজ নাই তুমি যা খুসি তা করো
ধরা নাই দাও মোর মন হরো
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন পুলকি।"

কাম ও প্রেম

কাম ভোগাত্মক, প্রেম ত্যাগাত্মক। ভোগাত্মক কামকে যে চিন্তামণির প্রভায় এবং প্রভাবে ত্যাগাত্মক বিষ্ণুপদী-প্রবাহে পরিণত করে তাকে "নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" (মহিম্ন স্তোত্র) অথবা "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে)" (মুণ্ডক) মিলিয়ে দেওয়া যায়—সেই চিন্তামণিই প্রেম।

নরনারীর অন্তর্দ্দাহকারী ভোগতৃষ্ণা বা 'তৃষ্ণা'কে "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেমে" পরিণত করা এই প্রেমের মহিমময়ী শক্তি।

নারদ বলেছেন, "তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্", রবীন্দ্রনাথ এই প্রেম-সূত্রকে নূতন ভাষ্যে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর অপরূপ "বৈষ্ণব কবিতায়" :

"দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

এই প্রেমের সুধাধারায় নরনারী অমৃতত্ব লাভ করে।

এই প্রেম যুগপৎ রসায়নের উর্দ্ধপাতন (sublimation) এবং প্রাণিতত্ত্বের metamorphosis বা রূপপরিবর্তন। annihilation বা উচ্ছেদ নয়, transformation বা রূপান্তর —যেমন গুটিপোকা শূকদেহ থেকে প্রজাপতিদেহ লাভ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে—এই দেহমন ভূমানন্দময় হবে,—বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।"—'লয়' হওয়ার অর্থ ছড়িয়ে গিয়ে বিশ্বে এবং বিশ্বাত্মায় লীন হওয়া। অন্তর তখন অন্তরের সুখ-দুঃখে অভিভূত না হয়ে বিশ্বের সুখ-দুঃখ অন্তরে অনুভব করে। নিপীড়িত মানবের বেদনায় তখন কবির অন্তরের সহস্র নাড়ী পাক দিয়ে ওঠে। এই অনুভূতিই আইনষ্টাইনের 'Cosmic religious consciousness'।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

মহাকবির 'দুই পাখী' যেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "দ্বাসুপর্ণা"। সেখানে দেখি একটি পাখী স্বাদু পিপ্পল ফলটি বা বাইবেলের নিষিদ্ধ ফল (forbidden fruit)-টি ভোজন করে আর অপরটি 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি' না খেয়ে শুধু দেখেন সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চেতা এবং সাক্ষীরূপে।

এখানে দেখি মুক্তাত্মা বনের পাখী ডাকছে দেহের সোনার খাঁচাটিতে আবদ্ধ জীবাত্মাকে। 'দোঁহার ভাষা দুই মত'—খাঁচার পাখী বনের গান জানে না, তাই খাঁচার পাখী বলে "খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারিধার," বনের পাখী বলে "আকাশ ঘন-নীল কোথাও বাধা নাহি তার"।

"এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে তবুও কাছে নাহি পায়
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায়।"

মহাকবি একাধারে ঋষি এবং কবি, যেমন মহাত্মা গান্ধী একাধারে ঋষি এবং যোদ্ধা। উভয়েই কাব্যে এবং যুদ্ধে স্বাধীনতার নব জাগৃতির যুগশঙ্খ ধ্বনিত করেও, মানব অভীপ্সার শাশ্বত লক্ষ্য সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের অনুসরণ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। উভয়েরই 'জীবন' এবং 'বাণী'—'লাইফ' এবং 'ম্যাসেজ' কবিতার মতই মিত্রাক্ষর। 'যা বলি তাই কর—যা করি তা করো না'—এ কথা বলবার অবকাশ নেই উভয়েরই জীবনে।

কবি তাঁর আত্ম-পরিচয়ে বলেছেন—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনও ধর্মতত্ত্ব থাকে ত সে হচ্ছে এই যে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই সেই ধর্ম্মবোধ। যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত। একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন। একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে। যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে। যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে মানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।"

কবির উদ্ধৃত বাক্যে ভগবৎ প্রেমের এই যে যুগপৎ দ্বৈতাদ্বৈত উপলব্ধি এ যেন ভগবান শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের আক্ষরিক অনুবাদ—"ভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ অভেদঃ—অভেদং চিন্তয়িতুমশক্যত্বাৎ ভেদঃ"। এই তত্ত্ব অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়। আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করেছেন শ্রুতির উভয়মুখিতা, স্বীকার করেছেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"—তবু তাঁর কল্পনার ঘুড়ি এক কানাচে ঝোঁক থাকার জন্য একদিকেই চলে পড়েছে। কিন্তু সে কথা এখানে বলবার স্থান নয়।

মহাপ্রভুর মুখে একদিকে পাই "কৃষ্ণ যদি কৃপা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান।" আর অন্যদিকে শ্রীরামানন্দের গানের সমর্থনে পাই—"না সো রমণ না হাম রমণী, দুহু মন মনোভব পেষল জানি।"

রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরাণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখে :

"মমার্দ্ধাংশ স্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী" (ব্রহ্মবৈ)

অথবা "আত্মাতু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ"

শ্রুতি বলেন—

"স...একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ, সোঽকাময়ত
জায়া মে স্যাৎ" অতঃপর "স হ এতাবান্ আস যথা
স্ত্রী পুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ, স ইমম্ এব আত্মানং দ্বেধা
অপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ অভবতাম।" (বৃহ ১।৪।৩)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্বটি কবি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন (১৩০২ অগ্রহায়ণ—'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৪৯ দ্রষ্টব্য), এই পত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতকে বৈষ্ণব ধর্ম্মমত বলিয়া প্রকাশ করেন। (রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৮)

২

রবীন্দ্রকাব্যে 'তত্ত্ব' ও 'রস'

রবীন্দ্র-রচনা একদিকে যেমন অন্তর্গূঢ় ভাবগম্ভীর অন্যদিকে তেমনি বাক্যের এবং অর্থের সামঞ্জস্য সাধনে প্রতিভান্বিত প্রকাশ-মুখর—বিশ্বতোমুখী।

'হৃদয় যমুনা'য় কবি আহ্বান জানিয়েছেন—"নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ, ঢেকে দিব সব লাজ সুনীল জলে" —কিন্তু জীবনের আশা রেখে এস না—"যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে...স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর, নাহি তল নাহি তীর, মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে", "যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে, ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে"—কারণ এখানে কাজ নেই, লাজ নেই, ফিরে পাবার কিছু নাই।

এখানে 'look before you leap' নেই—you leap

and be lost for ever, এক মরণে মরে চিরদিনের মত অমর হওয়ার বাণী।

'ব্যর্থ যৌবন' কবিতাটিতে বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে আসার ব্যর্থতার নিঃশ্বাস সুস্পষ্ট।

'রবীন্দ্রজীবনী'কার বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের বহু চিত্র ও পদাবলীর বহু শব্দ প্রায়শই দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বহুদিনকার। কিন্তু এ আকর্ষণ তত্ত্বমূলক না রসমূলক, তাহার সুবিচার হওয়া প্রয়োজন।"

আমাদের বক্তব্য এই যে, যে রাজ্যে গিয়ে এই তত্ত্বের কথা এবং 'রসের' কথা উঠেছে সেখানে তত্ত্বই রস এবং রসই তত্ত্ব। সেখানে ভাবের ঘরে সদর মফস্বল নেই, bed-room drawing-room-এর প্রকোষ্ঠ ভাগ নেই; একটি কক্ষ, যবনিকার বালাই নেই, ধর্মের চিহ্নে বা রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়তা হয় না, শুধু এক সম্পর্ক "যে জনা গোবিন্দ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।" এ ভজনা রসের ভজনা, মরমিয়া ভজনা, ঋজুতা বা আর্জবম্ এর প্রাণ, কিন্তু বাঁকা পথেই এর গতি, তাই রসিক বলেন, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।"

ভালবাসিবে বলে' ভালবাসি নে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানি নে।

স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রেম।

মহাকবির ভাষায় শুনুন—

আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া আর এ জীবনে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু নাহি চাই গো।

এ যেন মহাপ্রভুর উক্তির বঙ্গানুবাদ—

"পাদরতাং পিনষ্টু মাং" "মর্মহতাং করোতু বা"
"যথা তথা বা বিদধাতু"—কিন্তু আমার 'তুমি ছাড়া আর কেহ নাই—কিছু নাই—"স এব নাপরঃ"।

গীতায় আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্তের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলছেন—

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী"—অর্থাৎ এই পরা ভক্তিই জ্ঞানের লক্ষণ বা পরিচয়।

প্রেমবিহঙ্গের দুটি ডানা, একটি জ্ঞান অপরটি ভক্তি;

বায়রণ বলেছেন—

"To 'know' her is to 'love' her
And love but her for ever
For Nature made her what she is
And never made another."

রক্ত-মাংসের পুত্তলিকার প্রতি এই আকর্ষণ, চিন্তামণির পায়ে বিল্বমঙ্গলের এই আত্মসমর্পণ, ইহাই পরিণত হয় তাঁর কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম পংক্তিতে—

"চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরি গুরু র্মে।"

চিন্তামণির লৌকিক প্রেম, চিন্তামণির একটি রশ্মি পেয়ে, চিন্তামণির অলৌকিক প্রেমে পরিণত হয়,—তখন সে "নিকষিত হেম—কাম-গন্ধ নাহি তায়।" তখন অন্তরাত্মা আকুল হয়ে বলে—"বাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।"

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'—কিন্তু ঐ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি ঐরূপ বাঁশীর ডাক শুনেই পরমাত্মা বা অন্তরাত্মার দিকে দৃক্‌পাত করে—বাঁশী শুনে—বাঁকা চোখে চায়—

"শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল।"

রবীন্দ্র-রচনাতেও ঠিক তাই—

"সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বনমাঝে কি মনমাঝে।"

তাঁর বিরহিণী অন্তরাত্মা আক্ষেপ করে বলে—

"সখি—এত ভালবাসা প্রাণের পিয়াসা কেমনে আছে সে পাসরি
সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী সেথা কি বাজে না বাঁশরী?
হেথা সমীরণে লুটে ফুলবন সেথা কি পবন বহে না—
সে যে তার কথা মোরে, কহে অনুখন,
মোর কথা তারে কহে না।
আমারে যদি সে ভুলিবে সজনি! আমারে ভুলালে কেন সে?
সারাটি জীবন করিব রোদন এই ছিল তার মানসে?"

দেবতা ও মানুষ

বৈষ্ণব-কবিতায় দেবতা ও মানুষ একান্ত সহজভাবে স্থানবিনিময় করেছে। যশোদা তাঁকে বেঁধেছেন,—রাখালরা—"কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপনা সেবন।" শ্রুতি বলেছেন, প্রিয় বলেই আত্মাকে উপাসনা করবে, কারণ তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ"। গীতায় তাঁকে পতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, শরণ, সুহৃৎ প্রভৃতি সকল সম্পর্কে সম্পর্কিত করা হয়েছে। সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করে একমাত্র তাঁর শরণ নিতে বলা হয়েছে—ভক্ত নিত্যকার স্মরণে নিত্যই তাঁকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে থাকেন—"মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়ামি স্বাহা।" তাঁর সাধনার প্রথম কথা তৃণের চেয়ে সুনীচ এবং তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হওয়া। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় কবির আত্ম-নিবেদন—

তোমার আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব
সবার শেষে বাকী যা রয় তাহাই লব।

এই 'বাকী' গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের প্রসাদ পাওয়া—ঈশোপনিষদের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।

গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাতেও পাই এই বৈষ্ণব ভাব, কিন্তু ভাষায় এবং প্রকাশভঙ্গীতে, প্রাক্তন বাংলা ও সংস্কৃত উভয়

পদাবলীকেই তা অতিক্রম করেছে। আমার মাথা তোমার চরণ-ধুলার তলে নত কর; সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডোবাও—নিজেকে মান দিতে গিয়ে আমি নিজেকে কেবলই অপমান করছি, এবং নিজেকে কেন্দ্র করে নিজের চারিদিকেই ঘুরে মরছি। কথা কয়টি সহজ এবং সরল, কিন্তু "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" এই সহজ কথা কয়টি এমন ভাবে বোধ হয় একমাত্র মহাকবিই প্রকাশ করতে পেরেছেন। তিনি ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা করেছেন, অব্যক্ত হতে ব্যক্তের পথে, তিনি অবলীলাক্রমে নিসর্গের গুপ্ত কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন, তিনি রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন আহরণ করে তাঁর দয়িতের গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আগমনীর জয়ধ্বনি করেছেন—

"ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়—
তিমির-বিদার-উদার অভ্যুদয় তোমারি হউক জয়।"

তাঁর পায়ের ধ্বনি অবিশ্বাসী অন্যমনস্ক আমরা শুনি নি বলে অনুযোগ করেছেন—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে আসে আসে
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে যে আসে আসে আসে
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী।

ক্রীশ্চান মিষ্টিক বলেন,

"Our Lord says to every living soul, I become man for you. If you do not become God for me, you do me wrong."

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, চোখের চোখ।

Closer is He than breathing, nearer than our hands and feet.

বৈষ্ণব কবির—"হাতকি দরপণ, মাথকি ফুল আঁখ কি অঞ্জন মুখকি তাম্বুল। শীতের ওড়নি পিয়া, গিরিষির বা বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।"

ভক্ত তাঁর 'আমি'র—শেষ লেশটুকু রাখতে চান তাঁর প্রেম আস্বাদনের জন্ত। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি'। রামকৃষ্ণ একে বলেছেন 'দাস' আমি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তোমার আমার প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাক বাকী।"

কবি কৃতার্থ হয়েছেন যখন ত্রিভুবনেশ্বর তাঁরই প্রেমের ভিক্ষায় হাত পেতেছেন।

"তাই ত তুমি রাজার রাজা হয়ে, তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছ জাগি
তাই ত প্রভু হেথায় এলে নেমে, তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

দৈন্যে তিনি দীনের হতেও দীন হয়েছেন, তিনি জেনেছেন যে, তাঁর ঠাকুর কাঙ্গালের ঠাকুর তাঁর পূজার পীঠস্থান সবহারাদের মাঝে—
"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন, সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে, সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে—
সঙ্গী হয়ে আছ সেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে—
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

কবি কামনা করেছেন 'মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে'—তিনি বিশ্বাস করেছেন 'মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।

তিনি এসেছেন, "ধরণীর মহাতীর্থে এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা।"

চণ্ডিদাসের উপলব্ধিও অনুরূপ—'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

তাই প্রত্যেক পুরাণে এবং মহাভারতে নারায়ণের বন্দনা নর এবং নরোত্তমের বন্দনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ—

'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'।

নর এবং নরোত্তম বলিতে বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্যে সাধারণ মানুষ এবং পুরুষোত্তম বা 'Best Man'কেই বোঝায়, এই উভয় সীমায় সীমিত মানুষের নারায়ণ। এই সীমা অতিক্রম করেও তিনি আছেন—শ্রুতি যেন মানুষের ধীশক্তিকে পরিহাসের ছলেই বলেছেন,

"যো লোকান্ সকলান্ ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্"

সকল লোক সকল সীমা—দেশকাল অতিক্রম করে তিনি দশ আঙুল বেড়ে আছেন! এ যেন "বুঝ জন যে জান সন্ধানে"র হেঁয়ালি! 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ'—তাদের চিন্তার বিষয়ীভূত করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা।

কবির পরিচয়

কবি শুধু মানুষের কবি নন—সকলের কাছেই তাঁর এক পরিচয়
"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরি লোক—
আর কিছু নয়—এই হোক শেষ পরিচয়।"

কিন্তু কবির পরিচয়ের 'শেষ' পাবার উপায় নেই—সুরু হয় নব নব পরিচয়—

"যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে?
* * কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।"

তাঁর ভাষাতেই বলি 'তিনি জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে আপনাকে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ' করছেন। সে বর্ষণে অভিভূত হয়ে আমরা বলি—

"হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা?

ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা।"
বৈষ্ণবের মতই তিনি হরিনাম গান করেছেন—এবং করিয়েছেন—
'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি বল ভাই ধন্য হরি।'
আপনাকে কবি যন্ত্রমাত্র মনে করে সেই যন্ত্রীর হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন—'আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে—।'
বলেছেন—'সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো—
এতদিন যে গেয়েছো গান, আজকে তারি হোক অবসান
এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র সেই কথাটাই ভোলো—
একটি একটি কোরে তোমার পুরাণ তার খোলো।'
এই নূতন তারে নূতন সুর বেঁধে তোলাই তাঁর রূপান্তর গ্রহণ—মার্কণ্ডেয়র নব জন্মলাভ—transformation, transmutation বা metamorphosis—আধ্যাত্মিক খোলস ছাড়া বা spiritual ecdysis.

নূতন বাঁধা সেতারে কবি গাইলেন শুধু 'তুমি' আর 'তুমি'—কবীরের ভাষায়—'তু-তু করতে তু ভয়া তুঝমে রহা সমায়—'
গীতায় উক্তি 'ততো মাং, তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।'
কবি গাইলেন—'তুমি আমার আপন তুমি আছ আমার কাছে
আমার এই কথাটি বলতে দাওহে বলতে দাও—
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে—* *
* * আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।'
হে প্রকাশ স্বরূপ! তুমি নিজের প্রেমে নিজের দাক্ষিণ্যে আপনাকে প্রকাশিত কর—আবির্ভূত হও—'আবিরাবির্ম এধি।'
কবির প্রার্থনাও তাই 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।'
সেই দৃষ্টি যখন চোখে লাগল তখন পরিপূর্ণ আনন্দে কবি গেয়ে উঠলেন, 'আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো—'
তখন সকল আঁধার মিলাল, আনন্দে হাসিতে ভরা জগতের—
'যে দিক পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো।'
অমৃতের পুত্র হয়ে লাভ করলেন মধুব্রহ্মের মধু।

প্লেটোর 'Beauty only and alone and separate and eternal' এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'Hedonism' বা সুখাভিলাষ-বাদ মিলে যায় 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর অনুধ্যানে।

বৈষ্ণবের দৈন্য, বিনয়, আকুতি, অনন্যমনতা-রূপ প্রেম,—হরিনামের জয়ধ্বনি সবই মহাকবির কবিতায় নূতন ভাবে এবং নূতন ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সে ভাষার তিনিই স্রষ্টা, প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক। সাহিত্যের নব যুগের নব জাতকের ভাষা। তাই বলা চলে যে, তিনি যেন পুকুর কেটে তার পরে তাতে স্নান করেছেন। এই ভাষা তিনি দান করেছেন আমাদের, এই ভাষাই—রেনেসাঁসের ভাষা। এই ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করল কবির কবিতায়—বৈষ্ণবের দিব্য প্রেম। 'যার এক বিন্দু জগৎ ডুবায়'—যার এক বিন্দু ভাবাস্তরিত হয়ে পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীকে মুগ্ধ করল—কবি লাভ করলেন—

'শুভ্র কেশে বরমাল্য রম্যা অয়োরাঙ্ক'—অর্জন করলেন নোবেল পুরস্কার, স্থাপন করলেন বঙ্গভারতীর সিংহাসন—বিশ্বভারতীর উচ্চতর মঞ্চে।

বিশ্ব-বৈষ্ণবতা

তিনি প্রচার করলেন উদার এবং ব্যাপকভাবে বৈষ্ণবতা। সব ঠাঁই তাঁর ঘর আছে এবং ঘরে ঘরে তাঁর পরমাত্মীয় আছে। 'ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি 'পরে—জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।' উদার সার্ব্বভৌম প্রীতি এবং জগৎপিতা মহেশ্বরের প্রতীতি—যার ফলে অনুভূত হ'ল—'ভ্রাতরো মানবাঃ সর্ব্বে—স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।' গীতায় 'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।' 'ধূলায় আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে—' সেই আলোকেই দেখেছেন—'One world spiritually aware and psychologically integrated.' শ্রীভাগবতও ঠিক এই কথাই বলেছেন—উত্তম ভক্তের লক্ষণে—
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

'আগুনের পরশমণি'

কাব্যে মিলনের চিত্র অপেক্ষা বিরহের চিত্র অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী। বিরহ ধ্যানগম্ভীর এবং বেদনার অগ্নিসংস্কারে পবিত্র এবং উজ্জ্বল। এই আশাবদ্ধ সমুৎকণ্ঠার ছবি বৈষ্ণবকবি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এই অবস্থাকে "উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণঃ।" বিরহিণীর এই অবস্থায় "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যং মন্যে জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" কালিদাসের যক্ষবধূর "আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং" প্রাণটিকে কোনও রূপে দেহে সংলগ্ন করে রেখেছে। জয়দেবের বর্ণনায়—"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে ...পশ্যতি তব পন্থানম্।"

রবীন্দ্রনাথের ছবি জয়দেবের অনুরূপ হলেও অপরূপ :—
"দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি
তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, আশা হয় মনে যদি দেখা পাই
কে আসিছে বলে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখী।"
কবি 'বৈরাগ্যসাধনের মুক্তি' বর্জ্জন করে অনুরাগকেই বরণ করে নিয়েছেন—
"মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া"
কিন্তু এই অনুরাগই বিরহে পরম বৈরাগ্যের রূপ ধারণ করে, তখন, "যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে" সব নিমেষে অন্তর্হিত হয়। তখন "অদর্শনে তব মনাক কা ধেনবঃ কে বয়ম্
কিং গোষ্ঠং কি মতীষ্টমিত্যাচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি।"

ওয়াশিংটনের ব্লেয়ার হাউসে পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার

ভারতে ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রদূত উ থান আউং কর্তৃক রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধির উপর পুষ্পমাল্য প্রদান

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীপদ্মজা নাইডুর সহিত চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হো-লুঙ্

পুণা, ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে দলই লামা

ভানুসিংহের পদাবলীতে 'মরণ' কবিতায় বিরহিণী রাধা মৃত্যুকে যখন 'শ্যাম সমান' বলে বিরহিণীকে মৃত্যুরূপ অমৃত দান না করার জন্য তাকেও শ্যামের মত প্রিয় এবং শ্যামের মতই নিষ্ঠুর বলছেন :— তখন কবি তাঁকে বুঝিয়ে বলেছেন—

ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি
মাধব পহু মম পিয় সো মরণ সে
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

কবীর প্রেমের রাজ্যে বিরহকেই সুলতান বা সম্রাট বলেছেন।

বিরহ বিনা তন শূন্য হ্যায় বিরহ হ্যায় সুলতান
যো ঘট বিরহ ন সঞ্চারে সো ঘট জন্ম মশান।

মহাকবি এই পরম বিরহে প্রশস্তিপাঠ করেছেন অননুকরণীয় ভাষায়—

এই করেছো ভালো নিঠুর এই করেছো ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে
বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো।

আগুনে দগ্ধ হলে যেমন অগ্নিতাপেই কিছু উপশম মেলে—তেমনি আবার কবি তাঁকেই প্রার্থনা করেছেন—

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ—
এবার তুমি ফিরো না হে হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।

কত কলুষ কত ফাঁকি, এখনো যে আছে বাকী, মনের গোপনে আমায়—তার লাগি আর ফিরায়ো না, তারে আগুন দিয়ে দহ।— বারংবার দগ্ধ হয়েও কবি এই আগুনকেই আবার বরণ করেছেন— বলেছেন—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন ধন্য কর এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে—
আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর
নিশিদিন দহনশিখা জ্বলুক প্রাণে।"

এই অগ্নিসংস্কারই প্রেমের Baptism of Fire.

চরিতামৃতে পাই—

"বাহ্যে বিষজ্বালা হয় অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত লক্ষণ"
"এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।"
"বিষামৃতে একত্র মিলন।" ইত্যাদি।

মীরা বলেন—

উপল বরখি তরজত গরজি ডারত কুলিশ কঠোর
চিত্তক চাতক জলদক তেজয়ি মাগত আনকি ওর?

মেঘ কুলিশ-কয়কা বর্ষণ করে, তাকে আহত কি নিহত করলেও চিত্তচাতক সেই মেঘ ছাড়া কি আর কাউকে চায়?

'পুরুষোত্তম' ও 'পুরুষ'

ভানুসিংহের পদাবলী মহাকবির বৈষ্ণব-কবিতায় প্রথম হাতে-খড়ি। তখনি তাঁর (গীতার) পুরুষোত্তমের প্রতি বৈষ্ণব ভাবানুরাগের প্রথম সঞ্চার হয়। মনে মনে প্রশ্ন ওঠে—হে অপরিকল্পিতপূর্ব্ব চিত্তচমৎকারকারী মূর্তিমন্ত মাধুর্য্যস্বরূপ তুমি কে? কবির মুখেই শুনুন—

কো তুঁহু বোলবি মোয়?

হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখন আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম নিমিখ না অন্তর হোয়।
হৃদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছল ছল
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢল ঢল চাহে মিলাইতে তোয়।
বাঁশরী ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে, হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে উতল প্রাণ উতরোয়।
গোপবধূ জন বিকশিত যৌবন, পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ পুলকে প্রাণ মন খোয়—
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

ইনি যেই হোন, যুগে যুগে পারঙ্গম ঋষিরা বলে গেছেন—'ইত্থম্ভূত' —রূপগুণবিশিষ্ট পুরুষ একবার অন্তরে প্রবেশ করলে আর অব্যাহতি নাই তার, আর মুক্তি (?) নাই তার সেই দস্যুর কবল থেকে।

মহাপ্রভু বলেছেন—

"কৃষ্ণের সে ডাকাতিয়া বক্ষ
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষ
হরিদাসী করিবারে দক্ষ।"

অথবা—

"কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঁঠা
নারীর মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সিয়াকুলের কাঁটা।"

কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে "কো তুঁহু", প্রশ্ন করার পরে এই পুরুষকেই তিনি পরিপূর্ণ যৌবনে 'জীবন দেবতা' রূপে দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করেন। তখন তাঁর সহজাত পৌরুষ ঐ পুরুষের সংস্পর্শে এসে আপন সত্তার পরিবর্তন করছে, তাঁর sex sense ক্রমশঃ mystical sense-এ পরিণত হতে চলেছে। F. W. Newman বলেছেন—

"If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness, it must become woman,—yes however manly you may be among men."

এজন্যই নরোত্তমের প্রার্থনা 'ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব'। এই কথাই মীরা বলে পাঠিয়েছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামীকে যখন তিনি রমণী বলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। মীরা বলেন,

"বৃন্দাবনে তো এক জনই পুরুষ আছে জানতাম—শ্রীরূপ কি আরও এক জন ?" সেই এক পুরুষই পুরুষোত্তম। শ্রুতি তাঁকে বলেছেন, "ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" "দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ'—তাঁকে ঘিরে তাঁর রাসমণ্ডল ঘিরে—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।' ইনি দশরথতনয় রাম বা বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ কিনা এ প্রশ্ন, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে অনর্থক। এঁদের জন্ম-কর্ম দিব্য হলেও এরা মাটির দেহ প্রত্যেকেই মাটিতেই রেখে গেছেন। সার্থক কথা এই এবং দিব্য তত্ত্ব এই যে, রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-চৈতন্য না হলে এই পুরুষোত্তমের কোনও রূপ রস তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হ'ত না। তাই এরাই আমাদের yard-stick বা unit ধ্যান-ধারণার জন্য—সেই অসীম অনন্ত অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের। সকল রূপই তাঁর রূপ, সব কথাই তাঁর স্তোত্র, কারণ 'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।'

মুসলমান সুফী সাধকের দৃষ্টিতেও দেখি ভগবান 'মাসুক' বা beloved—ভক্ত 'আসিক' বা lover, এই মধুর রসই শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস। তাই 'শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।' পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।' ক্রীশ্চান মিষ্টিক এই সম্পর্কে বলেছেন—

এই প্রেমের আদান-প্রদান between Finite and the Infinite—সসীমের সঙ্গে অসীমের, একেই তাঁরা বলেছেন Divine Osmosis.

বৈষ্ণব কবি বলেছেন—'যদি হয় তার যোগ, না হয় কৈছে বিয়োগ'—নারদ বলেছেন, 'প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানম্' 'অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্'।

'জীবনদেবতা'য় দেখি কবি পূর্ব্বরাগ থেকে প্রিয়সঙ্গ লাভ করে অনুরাগের স্তরে উন্নীত হয়েছেন, সর্ব্বস্ব সমর্পণের পর দয়িতকে প্রশ্ন করছেন,

ওহে অন্তরতম

মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায় পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।*
* কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে রাখিয়া নয়ন দুটি
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন পতন ত্রুটি ?

তার পরে আবার নূতন করে আত্মনিবেদন করছেন,

'নূতন করিয়া লহ আর বার চির পুরাতন মোরে
নূতন বিবাহে বাঁধিয়া আমায় নবীন জীবন ডোরে।'

ক্রীশ্চান মিষ্টিকগণ একেই বলেছেন, Betrothal,—এই বিবাহে আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নেই, সাময়িক বিরহ আছে। তাই ভক্ত বলেন,

'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।'

শ্রীভাগবত বলেন,

'যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া।'

অর্থাৎ, দেহের দূরত্ব বাড়লে মনের দূরত্ব কমবে, ধ্যান বাড়লে ভাব গাঢ় হবে বলে।

সুন্দরের সঙ্গ

বিরহের বেদনার পর প্রিয়সঙ্গ লাভ করে উৎফুল্ল হয়ে কবি বলেছেন,

'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
ধন্য হ'ল অঙ্গ মম পূর্ণ হ'ল অন্তর।'

কবি অভিনন্দিত করেছেন তাঁকে,

'আমার নয়ন ভুলানো এলে,
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।'
'শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে,—

তিনি তাঁর অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে এসেছেন। আলোছায়ার সুষমায় সৌন্দর্য্যে তাঁর আবির্ভাব, বনদেবীর শঙ্খধ্বনিতে আকাশবীণার তারে বাজে তাঁর আগমনী। তাঁর সোনার নূপুর বেজেছে, তবু কবির সন্দেহ সে বাজনা বুঝি wishful thinking—'বুঝি আমার হিয়ার মাঝে' কিন্তু যখন সন্দেহ দূর হয়েছে, প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে তখন বলেছেন, সাহস করে

'তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ দুহাত দিয়ে ফেল ঠেলে।

এই মিলন, এই সুন্দরের সঙ্গলাভ

'মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে অতি সুমধুর'
'মধুরং মধুরং মধুরং' 'মধুরং বা আনন্দং নন্দনাতীতম্।'

শ্রুতি বলেন,

'তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্
এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন
বেদ নান্তরম্।। (বৃহঃ ৪।৩।২০-২১)

বিরহে কবি আবেদন জানিয়েছেন, 'বঁধু হে ফিরে এসো, আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিতে, হে নাথ ফিরে এসো, হে আমার নিতি-সুখ আমার চিরদুখ, হে আমার সব সুখ মন্থন ধন, আমার অন্তরে ফিরেএসো' বলে। তাঁর 'সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে' দিয়ে তাঁর ব্যথার পূজায় বারংবার অর্ঘ্যদান করেছেন।

বর্ষণমুখর শ্রাবণে তাঁর 'ক্ষণিকের অতিথি'র ক্ষণিক আবির্ভাবের পর গাইলেন,

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে, গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।'

স্বপনের মত তাঁর আগমন, যেমন মিলিয়ে যাবার শঙ্কা জাগল, অমনি

'হে একা সখা হে প্রিয়তম রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেও না মোরে হেলায় ঠেলে।'

বলে মিনতি জানালেন। আশার চেয়ে আশঙ্কাই ত বেশী, কারণ তিনি স্বৈরচারী বহুবল্লভ। 'একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু 'স্বৈরচারী' যথা সুখম্'। সময় অসময়ের হিসাব নাই, তাই শুনি

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।

যখন সেই স্বৈরচারী বন্ধু আড়াল দিয়ে চলে যান, বৈষ্ণব কবির ভাষায়

'আমারি বঁধুয়া, আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া'

তখন মিনতি করেন কবি,

'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না,
তুমি হৃদয়মাঝে লুকিয়ে বোসো কেউ জানবে না,
কেউ বলবে না।

তবুও যখন তিনি চলে যান, তখন তাঁরই দুঃখে গভীর বেদনায় কবি প্রশ্ন করেন,

'তুমি কাহার সন্ধানে,
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল করে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাসো?'

গিরীশচন্দ্রের গান মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে,

'কে বলে হরি রাজা, হরি প্রেমের ভিখারী
প্রেমের ভিক্ষা পায় না বলে চক্ষে বহে প্রেমের বারি।
ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে কাঁধে, দাঁড়িয়ে দ্বারে হরি কাঁদে
হাসিমাখা বদনচাঁদে বিষাদরেখা সারি সারি।
প্রেম না পেলেও কাঁদে পেলেও কাঁদে
প্রেমেই পাগল প্রেমের হরি।'

মহাকবি প্রেমের অগ্নিদাহে গলিত কাঞ্চনের মত পবিত্র এবং উজ্জ্বল হয়েছেন, প্রেমের অমৃত পান করে অমর হয়েছেন, আমাদের যাত্রাপথে বিশ্বাসের পাথেয় দান করে গেছেন। বৈষ্ণব ভাবধারাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নূতন রূপদান করে, তাতে নূতন রসসঞ্চার করে তার শুষ্কপ্রায় শীর্ণ কায়ায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তিনি ধন্য হয়ে আমাদেরও ধন্য করে গেছেন:

'এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে
পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

ব্রহ্মজ্ঞান

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত সেন

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্। সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"

"ব্রহ্মবিৎ পরাৎপরকে লাভ করেন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। যিনি হৃদয়গুহাতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, জীবের অন্তরে শ্রেষ্ঠ আকাশে তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু উপভোগ করেন, সর্বজ্ঞানের আধার ব্রহ্মের সাহচর্যে।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রহ্মবল্লীর এই হ'ল প্রথম বাণী, পরম সত্যের বিশদ বর্ণনার আরম্ভ।

কিন্তু ব্রহ্ম কি?

অস্তিত্বের মধ্যে সত্য যা আছে, যাকে অবলম্বন করে আর সব বর্তমান থাকতে পারে—সেই ব্রহ্ম। সব অনিত্যের পশ্চাতে যা নিত্য, বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও সর্বত্র সূচিত হয় যে স্থির সত্য, সব বিকারের আশ্রয় যে অব্যয়ের কোন হ্রাসবৃদ্ধি বিলোপ হয় না, আছে এমন এক অজ্ঞাত বস্তু। আর সেই জন্যই অস্তিত্ব হয় একটা সমস্যা, আমাদের আত্মা হয় রহস্যাবৃত, বিশ্ব হয় একটা হেঁয়ালি। আমাদের স্বভাবী-আত্মজ্ঞানে মনে হয় আমরা যা, আমরা যদি শুদ্ধমাত্র তাই হতাম তা হলে কোন রহস্য থাকত না; ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা এবং তার উপর নির্ভর করে বিচারবুদ্ধির কঠোর বিশ্লেষণের ফলে যা জানা যায় বিশ্ব যদি শুধু তাই হ'ত, তা হলে কোন হেঁয়ালি থাকত না; এখনকার মত জীবনযাপন করা এবং আমাদের অভিজ্ঞতার কাছে যতটা প্রকাশিত হয়েছে তাকেই বিশ্বের স্বরূপ বলে গ্রহণ করাই যদি হ'ত আমাদের জ্ঞান ও কর্মের বিকাশের চরম সীমা, তা হলে কোন সমস্যা থাকত না। আর থাকলেও, সে রহস্য গভীর হ'ত না, সে হেঁয়ালির সমাধান সহজ হ'ত, সে সমস্যা হ'ত বালোচিত। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু আছে আর সেই হ'ল অনন্তের প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা, শাশ্বতের গোপন হৃদয়। সে-ই পরাৎপর এবং সেই পরাৎপরই

সর্বময়, তাঁর উপরেও কেহ নাই, তা থেকে বিবিক্তও কিছু নাই। তাঁকে জানাই হ'ল পরাৎপরকে জানা এবং সেই পরাৎপরের জ্ঞানে বিশ্বকে জানা। কারণ, সবের আদি ও উদ্ভব সেই, আর সবই তার পরিণাম; সবের আধার ও উপাদান সেই, সুতরাং তার রহস্যের জ্ঞানে অপর সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়; সবের অন্ত ও সমষ্টি সেই, অতএব তাতেই এবং তার মধ্যে নিজেকে আহুতি দিয়েই প্রত্যেক অস্তিত্ব নিজের সার্থকতা লাভ করে।

এই হ'ল ব্রহ্ম।

এই অজ্ঞাত যদি শুধু নির্বিশেষ অনির্বচনীয়ই হতেন, তাকে যদি কখনই জানা না যেত, পর্দার বাইরে যদি তিনি কখনই পা না দিতেন, সে গোপন তত্ত্ব কখনই যদি আমাদের কাছে প্রকাশিত না হ'ত, তা হলে আমাদের রহস্য চিরকাল রহস্যই থাকত, আমাদের হেঁয়ালির উত্তর কখনই মিলত না, আমাদের সমস্যা গণনার মধ্যে আসত না। আমরা যা হই যা জানি ও যা করি সে সবই তাঁর দ্বারাই নির্ধারিত হয়, সত্য, তথাপি তাঁর অস্তিত্বে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিছু এসে যেত না। কারণ, তা হলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হ'ত— অন্ধ অসহায় ভাবে তাঁর শাসন মেনে নেওয়া, আর সেই সম্বন্ধই অজ্ঞানের গভীর মধ্যে আমাদের আবদ্ধ করে রাখত এবং সেই অজ্ঞানের জন্যই সে সম্বন্ধ স্থায়ী হতে পারত। অপর পক্ষে আবার, কোন উপায়ে তাঁকে জানা গেলেও সে জ্ঞানের একমাত্র ফল যদি হ'ত আমাদের সত্তার অবসান বা বিলয় তা হলে আমাদের সত্তায় তার কোন ক্রিয়া হতে পারত না; সে-জানার ব্যাপারে ও পরিণতিতেই সাধিত হ'ত এখন আমরা যা তার বিলয় বা অবসান, পূর্ণতা বা সার্থকতা নয়। আমাদের রহস্য, হেঁয়ালি বা সমস্যার সমাধান করা হ'ত না, রহিত করা হ'ত; কারণ তার কোন উপাত্ত (data) থাকত না, বিচারের পূর্বপক্ষের লোপ হ'ত। ফলতঃ মানতে হ'ত যে, আমরা এখন যা তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিরোধ মীমাংসা করা অসম্ভব—অর্থাৎ, পরম কারণ ও তার কার্য্যের মধ্যে, আদিমূল ও তা থেকে জাত সব পদার্থের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। আর মনে করতে হ'ত যে, ব্রহ্ম যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যাদের আশ্রয় দিচ্ছেন এবং নিজের মধ্যে ফিরিয়ে নিচ্ছেন সে সবই তাঁর সত্তার একান্ত বিরোধী ও বিপরীত, এবং একমাত্র যাঁর অস্তিত্ব আছে স্বরূপে তাঁর সম্পূর্ণ ব্যতিরেকী হয়েও, কোন-না-কোন রকমে সে সবের একটা ভাবাত্মক অস্তিত্ব এসেছে। তা হলে চেতনাতে এ দুইয়ের একত্র অবস্থান সম্ভবপর হ'ত না, তিনি যদি তাঁকে জগৎকে জানতে দিতেন তা হলে জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত।

কিন্তু ব্রহ্মকে জানা যায়। সীমার দ্বারা তিনি নিজেকে নিরূপিত করেন যাতে আমরা তাঁকে ধারণায় গ্রহণ করতে পারি, যাতে মানুষ মানুষ থেকেই এই বিশ্বে এবং এই দেহেই ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞান ক্রিয়াহীন আলোকমাত্র নয় যে শুধু বুদ্ধির কাছেই তার সংবাদ আসবে, কিন্তু ব্যষ্টির আত্মা বা জীবন তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সে জ্ঞানের স্বরূপ হ'ল শক্তি, ভগবানের একটা নির্বন্ধ, পরিবর্তিত হতে বাধ্য করা। তা থেকে মানবজীবনে এমন একটা কিছু লাভ হয় যা চেতনায় আগে ছিল না। কি সে লাভ ? মানুষ এখন জানে কেবল-মাত্র তার সত্তার নিম্নতর স্তর, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সে পায় তার উচ্চতম সত্তাকে।

আর আমাদের সত্তার ঊর্দ্ধতম রূপ আমরা এখন যা তার ব্যতিরেক, বৈপরীত্য বা বিলোপ নয়। সে হ'ল আমাদের বর্তমান জীবনের যা তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সে সকলের চরম সার্থকতা—তবে সে সবের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় অনুসারে এবং চিরন্তন শ্রেয়ের মানদণ্ডে।

আত্মসংবিতের বর্তমান অবস্থাতে আমরা অজ্ঞানের মধ্যে বাস করি, অজ্ঞানে কাজ করি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে, অজ্ঞান, কারণ এখন অবধি আমরা জানি শুধু আমাদের মধ্যে যা পরিবর্তনশীল, অবিরাম—ক্ষণে ক্ষণে, প্রহরে প্রহরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, জন্মজন্মান্তরে যার বদল হচ্ছে; আমাদের মধ্যে যা নিত্য তাকে আমরা জানি না। বিশ্ব সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞান, কারণ ঈশ্বরকে আমরা জানি না, সন্ধান রাখি বাহ্য প্রপঞ্চের সব নিয়মের, প্রকৃত অস্তিত্বের ধর্ম বা সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ বিবেচনায়, সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী ও নির্ভুল বিজ্ঞানে, বিদ্যার সবচেয়ে বেশী সমর্থ প্রয়োগে অজ্ঞানের আবরণ বড়জোর একটু পাতলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করা যাবে না—যতদিন আমরা মূল-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ না করব এবং সে জ্ঞান যে-চেতনার প্রকৃতি-গত তাতে উপনীত হতে না পারব। বাকী যা তার উপযোগিতা আছে শুধু সাময়িক প্রয়োজনে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবই নিষ্ফল, কারণ সে সমুদয়ের দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করা যায় না বা অস্তিত্বের সমস্যার কোন স্থায়ী সামধান হয় না।

যে অজ্ঞানের মধ্যে আমরা বাস করি তা একেবারেই ভিত্তিহীন বা সর্বাঙ্গীণ মিথ্যা নয়। নিম্নতম অবস্থায় সে হ'ল কোন না কোন সত্যের বিকৃতি আর ঊর্দ্ধতম অবস্থায় হ'ল ক্ষুদ্রতর—এবং সেই পরিমাণে ভ্রান্তিজনক—পুরুষার্থের প্রয়োজনে বৃহত্তর সত্যকে খণ্ডিতরূপে প্রতিবিম্বিত করা বা

পরিবর্তিত করা। এই জ্ঞান শুধু বাহ্যস্তরেই সীমাবদ্ধ, অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্বের সন্ধান সে দেয় না, অথচ বাহ্যস্তরের সব প্রয়াসের উৎস হ'ল অন্তরে। সে জ্ঞান শুধু সসীম আপাত-দৃশ্যই জানে, কিন্তু সসীম যাঁর প্রতীক, আপাত যাঁর আভাস তাঁর সংবাদ আনে না। সে শুধু অস্তিত্বের নিম্নতর আকারের জ্ঞান, কিন্তু এই নিম্নতর সত্তা ও জীবনের উপরে যিনি আছেন এবং নিজের মহত্তম সম্ভাবনা বাস্তবে সাধন করতে যাঁর অভীপ্সা অন্তরে জাগিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে তা পায় না। পরাৎপরের জ্ঞান অন্তরতমের জ্ঞান, অনন্তের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞ নিম্নতর বিশ্বকে দেখেন সেই পরাৎপরের আলোকে, বাহ্য উপরিচর পদার্থকে দেখেন আন্তর স্বরূপ-সত্যের রূপায়ণ বলে, সসীমকে দেখেন অসীমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। অস্তিত্বকে তিনি দেখতে ও জানতে শেখেন—যেভাবে মননক্ষম প্রাণী দেখে ও জানে সে ভাব ছেড়ে, যেভাবে নিত্য-ব্রহ্ম দেখেন ও জানেন সেই ভাবে। সুতরাং তাঁর সত্তা হয় প্রফুল্ল, সমৃদ্ধ ও সুখোজ্জ্বল, জীবনে তিনি হন আপ্তকাম।

জ্ঞানেই জ্ঞানের শেষ নয়, শুধু জানবার উদ্দেশ্যেই জ্ঞান অনুসন্ধান ও অর্জ্জন করা হয় না। জ্ঞানের উপযোগিতা পূর্ণ হয় যখন সে শুধু জানার চেয়ে বেশী কোন লাভের দিশা দিতে পারে, সত্তার কোন সম্পদ অর্জনের প্রেরণা জাগায়। ব্রহ্মকে জেনেও যদি বর্তমান জীবনধারার স্বভাবগত দুঃখ-বিরোধ-ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বাস করতে হয় তা হলে সে পঙ্গু নিঃস্ব জ্ঞানে লাভ কি ?

বৃহত্তর জ্ঞানে সত্তার বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় আর সে জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অধিগত হলে, সে সব সম্ভাবনা বাস্তবে সিদ্ধ হয়। প্রথম ক্রিয়া হ'ল 'হওয়া', প্রথম ধাতু 'ভূ'; তার মধ্যেই আর সব ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত—জ্ঞান-কর্ম-সৃষ্টি-উপভোগ সবই হওয়ার পরিপূর্ণতা বৈ নয়। আমাদের হওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, তাই পুষ্টি আমরা চাই। সব জ্ঞান-কর্ম-সৃষ্টি-উপভোগের মধ্যে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হ'ল—যা আমাদের সত্তার প্রসার ও পুষ্টিবৃদ্ধি করতে এবং আমাদের সত্তাকে অনুভব করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে।

শুধু থাকাই সত্তার সবটা নয়। সত্তা নিজেকে জানে শক্তি-চেতনা-আনন্দরূপে। মহত্তর সত্তা অর্থে মহত্তর শক্তি-চেতনা-আনন্দ।

মহত্তর সত্তার ফলে যদি আমরা শুধু আরও বেশী দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতাম তা হলে সে লাভ নেবার মত হ'ত না। নেবার যোগ্য বললে তার অর্থ হয় যে, সত্তার প্রসার ফলে আত্মসার্থকতার বোধ বৃদ্ধি পায় আর তা থেকেই স্বতঃই অস্তিত্বের শক্তির বেশী তৃপ্তি আসে বলে এই প্রসার-উচ্চতা-শক্তির উপচয়বোধের মূল্য হিসাবে কিছু দুঃখের বৃদ্ধি বা সুখের হানি অনুচিত মনে হয় না। তবে সত্তার পরিপূর্ণতার বা আত্মসার্থকতার পরাকাষ্ঠা এ হতেই পারে না, কারণ দুঃখই হ'ল নিম্নতর সংস্থিতির অব্যভিচারী লক্ষণ। অস্তিত্বে প্রসার ও শক্তিতে সমগ্র সংসিদ্ধি লাভ হলে ঊর্দ্ধতম চেতনার সার্থকতা আসে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণতার জন্য আনন্দের সমগ্র সংসিদ্ধি চাই।

ব্রহ্মজ্ঞ শুধু যে আলোর আনন্দেই তুষ্ট থাকেন তা নয়, সে জ্ঞানের ফলে তাঁর আর একটা বিরাট লাভ হয়। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি'।

তিনি যা পান সে হ'ল সবের উপরে, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ—তিনি লাভ করেন ঊর্দ্ধতম সত্তা ও চেতনা, সত্তার প্রসারের ও শক্তির পরাকাষ্ঠা, চরম আনন্দ। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং।'

পরম সকল সম্বন্ধের অতীত নন বা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। তিনি শুদ্ধ অনির্বচনীয় নন বা নিজের নির্বিশেষ-কৈবল্যের দ্বারা এমন একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধ নন যে, বিচিত্র-রূপে নিজেকে সংজ্ঞা দিতে, সৃষ্টি করতে বা জানতে অপারগ হবেন। আত্মলীন সুষুপ্তি বা সমাধিতেও তিনি চিরকাল নিমগ্ন থাকেন না। পরাৎপরই অনন্তপুরুষ, সর্বময় বিরাট সে আনন্ত্যের অন্তর্ভুক্ত। পরাচেতনাতে যিনি উপনীত হন, তিনি সত্তাতে অনন্ত হন এবং নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন।

একথা পরিষ্কার বোঝাবার জন্য—উপনিষদে ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সত্য-জ্ঞান-অনন্ত এবং তাঁকে জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে অন্তরের গোপনকক্ষে, হৃদয়গুহাতে, আর সেই পরম ব্যোমে ব্রহ্মকে জানবার ফল বলা হয়েছে—ব্যষ্টি জীবের ঊর্দ্ধতম সত্তার উপলব্ধির দ্বারা সকল কামনার পরিতৃপ্তি।

নিত্যতাতে ও আনন্ত্যে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা আমাদের সত্তার ঊর্দ্ধতম অবস্থা ত বটেই, কিন্তু তা ছাড়াও আছে আত্মসংসিদ্ধির আনন্দে ব্রহ্মের সাহচর্য বা সাযুজ্য। 'অশ্নুতে সহ ব্রহ্মণা'—এবং ব্রহ্মের যে তত্ত্ব অবলম্বন করে এ সাযুজ্য সম্ভবপর হয় তা হ'ল তাঁর জ্ঞানের তত্ত্ব—যে প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি সর্বলোকের সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে সম্যক্‌রূপে জানেন। 'ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা'।

বহুবিধ কামনার আকারে জীবনে আমরা যা এখন অনুসন্ধান করি সেই সকল অল্পতর পুরুষার্থের পূর্ণসংসিদ্ধির আধার হ'ল সত্তার আনন্দ। সে আনন্দের জন্য কি প্রয়োজন তা জানবার এবং বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণরূপে সে আনন্দ নেবার অনন্ত সামর্থ্য একমাত্র শাশ্বত পরম প্রজ্ঞারই আছে।*

* তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা।

পল্লীগীতিতে নারীর ব্যথা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পল্লীগীতি প্রচলিত আছে। এসব পল্লীগীতি নানা বিষয় নিয়ে রচিত, তবে অধিকাংশ পল্লীগীতিতেই গ্রামের বধূদের দুঃখ ও মর্ম্মবেদনার কাহিনী পাওয়া যায়। পূজাপার্ব্বণ, বিয়ে বা উৎসবে গ্রাম্য নারীরা নিজেদের রচিত এ সকল গীত গেয়ে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এই সব পল্লীগীতি থেকে আমরা নানা দেশীয় সমাজচিত্র ও নারীদের প্রাণের নিবিড়তম অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হই। অধিকাংশ পল্লীগীতিতে বধূদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখভরা কোমল হৃদয়ের চিত্র ফুটে উঠে, গীতিগুলির ব্যথা-বেদনাপূর্ণ সরল বাক্যগুলি কোন কোন স্থলে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হয়।

শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই বধূরা চিরকাল ধরে গঞ্জনা পেয়ে আসছে শাশুড়ী-ননদের কাছ থেকে। পুরাকালে পিতামাতারা অষ্টম বর্ষে কন্যাকে গৌরীদান করতে পারলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করত। যে যার যথাসাধ্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা কন্যাকে পাত্রস্থ করে বিদায় দিত, শ্বশুরবাড়ীতে—শাশুড়ী, ননদ, পাঁচ কুটুম বাড়ভাণ্ডের ভিতর দিয়ে সমাদরে বধূবরণ করে নিত নিজগৃহে।

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা গুজরাট ইত্যাদি দেশের প্রথানুযায়ী সেই বালিকা বধূরা পনের ষোল বছরে পদার্পণ না করা পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে আনন্দে দিন কাটাত। "গৌনা" উৎসবের পর বধূরা তাদের শ্বশুরগৃহে সংসার করতে আসত নব উৎসাহে, পেছনে ফেলে আসত তাদের চিন্তাভাবনাহীন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের দিন। পিতামাতা ভাইবোনের বুকভরা ভালবাসায় সুরু হ'ত তাদের কর্ত্তব্যকঠিন দুঃখের জীবন। অবগুণ্ঠনের আড়ালে কঠোর তাড়নায় গঞ্জনায় অর্দ্ধবিকশিত হৃদয়-কমল শুকিয়ে যেত, অভাগিনীদের সুখ দুঃখ মান-অভিমানের দিকে কেউ দৃকপাতও করত না। স্বামীর প্রেমে ব্যথাকাতর হৃদয় সঞ্জীবিত করে তুলতে চাইত, তাও সহ্য হ'ত না, ননদিনীর ঈর্ষাজর্জ্জরিত হৃদয় সেখানে সৃষ্টি করত অনর্থ।

এ সব পল্লীগীতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু সুরের মাধুর্য্যেই সরল পংক্তিগুলোতে মন দ্রব হয়ে উঠে না, শাশুড়ী-ননদের হস্তে লাঞ্ছিতা বধূরাও যেন সজীব হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। গীত শুনতে শুনতে দেখতে পাই—একটা কাক উড়ে এসে বধূর খাবারের থালা থেকে এক টুকরা মোটা বাজরার রুটি নিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে, তার পেছনে ছুটেছে রঙীন ঘাঘরা দুলিয়ে ফুলতোলা ওড়নার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কিশোরী রাজপুত-বধূ, তার কোমল মুখ শুকিয়ে উঠেছে ক্ষুধাতৃষ্ণায়।

আবার দেখি উত্তরদেশীয় বধূ চলেছে গাগরি নিয়ে নদী থেকে জল আনতে, পায়ের নূপুর বাজছে রিণিঝিনি। গয়না-ভরা কচি হাত দিয়ে ঘড়া জলে ডুবিয়ে জল ভরতে গিয়ে সাপ দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছে, অবগুণ্ঠনের আড়ালে কিশোরী বধূর নয়নদুটি ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠেছে, তবু তাকে জল নিতেই হবে নইলে শাশুড়ী-ননদিনীর অত্যাচারের সীমা থাকবে না।

মধ্যপ্রদেশের বধূ ঘাঘরা-ওড়নায় সুসজ্জিতা হয়ে, অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে শাশুড়ীকে বিনয়নম্র বচনে করুণ ভাবে মিনতি করছে, শাশুড়ী যেন আজ্ঞা দেন বধূ দোলনায় দুলবে, কাজরী গাইবে, কিন্তু নির্ম্মম শাশুড়ীর গম্ভীর "না" শব্দটিতে বধূ স্তব্ধ হয়ে রইল, পায়ের পায়েলের রুণুঝুনু থেমে গেল, কাজলটানা আঁখি জলে ভরে উঠল।

অলক্তকরঞ্জিত পায়ে, শাড়ীর লাল পাড়ে কোমল মুখখানা ঢেকে, কিশোরী বাঙালী বধূ চলেছে নদীতে জল আনতে, শাঁখাপরা কোমল হাত দু'খানি কাঁখের কলসীটিকে বেষ্টন করে ধরেছে। ধানের ক্ষেতের গা ঘেঁষে নদী ছুটে চলেছে এঁকে বেঁকে দূরে দূরে যেখানে বধূর বাপের গাঁ। পালতোলা নৌকা ছুটে চলেছে, বধূ অবগুণ্ঠন ঈষৎ তুলে চেয়ে দেখছে। কালো আঁখি দুটি সজল হয়ে উঠছে, ধীরে ধীরে অশ্রু ঝরে পড়ছে, কত দিন বধূ তাঁর বাপমাকে দেখতে পায় নি, শাশুড়ী-ননদের অত্যাচারে জর্জ্জরিতা বধূ নির্জ্জনে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নদীতীরে।

"ও কুটালির বৈরণ, ভাটি গাঙ্গে যাওরে বইঠ্যা বাইয়া,
বড় ভাইরে কইও আমায় নাইহর নিতে আইয়া।"

নিরক্ষর গ্রাম্য কবিরা কি নিপুণ ভাবে নিতান্ত ঘরোয়া কথায় ফুটিয়ে তুলেছে নারীদের এই মর্ম্মবেদনা যার তুলনা নেই। এসব পল্লীগীতি উপেক্ষার বস্তু নয়। রাজস্থানের একটি পল্লীগীতির কাহিনী এই :

বধূকে শাশুড়ী একমন গম এনে দিয়েছে পিষতে, বধূ ত্যক্ত হয়ে সেই গমের থলেটা টেনে এনে জাঁতার উপর ফেলে দেয় যেন পিষবার কাঠটা ভেঙে যায়, তা দেখে

গোয়ালা হাসতে থাকে। বধূর সখীরা সব খেলা করতে চলে যায় বধূরও মন চলে সখীদের সঙ্গে, কিন্তু শাশুড়ী বধূকে রুটি বানাবার জন্ত হুকুম দিয়েছে, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেবর সবার জন্ত হবে আটার রুটি আর বধূর জন্ত বাজরার রুটি। সব পরিজনদের জন্ত বরাদ্দ চার খানা করে আটার রুটি, আর বধূর জন্ত বাজরার একটা মোটা রুটি। সবার থালায় পরিবেশন করা হ'ল চিনি, বধূর থালায় নুন। ঘিয়ে চুবিয়ে রুটি পড়ল, সবার থালায় ঘিয়ের বাটি দেওয়া হ'ল; বধূর থালায় দেওয়া হ'ল তেল। কিন্তু বধূর এমনই দুরদৃষ্ট এতখানি পরিশ্রমের পর যাও বা জুটল একখানা বাজরার রুটি, তাও একটা কাক উড়ে এসে নিয়ে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর কিশোরী বধূ ঐ রুটির টুকরার জন্ত কাকের পেছনে ছুটতে লাগল, বধূর পায়ে ফুটল কেরলের কাঁটা, তখন ক্ষুধায় ও দুঃখে জর্জ্জরিতা বধূ নিরাশ হয়ে কাককে বললে :

"আয়ো আয়ো, মা পীবরিয়ো, রো, এ কাগ,
লেজ্জ্যা লেজ্জ্যা মহারে পীবরিয়ে রারে কাগ
জায় দিখায় মহারি নে জো।"

"ওরে কাক, আয় আয়, তুই এসে আমার মুখের ঐ রুটির টুকরাটা নিয়ে আমার মাকে দেখা আমি কি দশায় আছি।"

এই সরল গাথাটি কত মর্ম্মস্পর্শী, অসহায়া বধূর তীব্র মর্ম্মবেদনা ফুটিয়ে তুলেছে সুন্দর ভাবে, শ্রোতার হৃদয় লাঞ্ছিতা বধূর জন্ত সমবেদনায় ভরে উঠে।

আর একটি পঞ্জাবী লোকগীতিতে আছে- বধূ লুচি ভাজবে, লুচিতে ময়ান দেবার জন্ত শাশুড়ী ঘি দিয়েছে সামান্ত একটু। ঘি কম হয়েছে এই কথা বলাতে শাশুড়ী বধূকে তীব্রভাবে গালি দিতে লাগল—তখন নিরুপায় হয়ে বধূ বলে, ওগো শাশুড়ী ঠাকরুণ আমাকে গালি দিও না, তোমার মহলের পাশে আমার মা দাঁড়িয়ে আছে, তোমার গালি শুনলে আমার মার চোখের জলে বুক ভিজে যাবে। মর্ম্মপীড়িতা বধূ তার মাকে বললে, "মাগো, তুই কাঁদিস নে, বধূজীবন যে বড় দুঃখের।"

"সস জো মৈন্থু অখিয়াঁ ঘিয়ো বিচ মৈদা গো
ঘিয়ো বিচ মৈদা থোড়া পেয়া
সস মৈন্থু পালিয়াঁ দে।
ন দে সস গালিয়াঁ, এথে মেরা কৌন সুনে
মহলাঁ হেঠ মেরী মাঁ খড়ী।
সুন সুন নয়না ভরে
নয়ো অম্মড়ী মেরএং ধীয়াঁ দে দুঃখ বুরে।"

বধূ-জীবন বড় দুঃখের, এ কথাটি ছাড়া মাকে সান্ত্বনা দিবার আর কি আছে অসহায় বধূর ?

পিতৃগৃহ হতে বহুদূরে শ্বশুরবাড়ীতে অভাগিনী মাতৃহীনা কন্তা, দুঃখে কষ্টে তার দিন কাটে। তার মনের ব্যথা বুঝবার কেউ নাই, মনের দুঃখকষ্ট কার নিকট ব্যক্ত করবে, তাই সে আকুল হয়ে কাককে ডাকছে, কারণ কাক দেশ-দেশান্তরে উড়ে বেড়ায়। আশা হ'ল, হয়ত কাক তার মনের ব্যথা সুদূরে পিতৃগৃহে উড়ে গিয়ে বলবে :

"উড় উড় কাঁওয়াঁ উয়ে তেরিয়াঁ ছাঁওয়াঁ
মরজ্ঞান মতইয়াঁ, উয়ে জুগ জীবন মাঁওয়া
মেরে বাবুল দিতিয়ো দূরে—
দূরে দূরে উয়ে সুন ধর্মীঁ মীরা পরদেসিন বেঠী ঝুরে।'

কাক উড়ে যা, উড়ে যা—কন্তাদের মা যেন বহুদিন বেঁচে থাকে। আজ আমার মা নেই, আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছে দূরে দূরে—বহুদূরে শ্বশুরগৃহে। আমি পরদেশী হয়ে গেছি। ওরে কাক আয় তুই আয়, তুই উড়ে যা যেখানে আমার ভাই আছে। গাছের ডালে বসে আমার স্নেহের ভাইকে বল—তোমার বোন সুদূরে বসে তোমার জন্তে চোখের জল ফেলছে।

এটি একটি সাধারণ পল্লীগীতি—কত করুণ নিষ্ঠুর সত্য লুকিয়ে আছে এর মাঝে।

নারীর জীবন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের। অধিকাংশ নারীর জীবন কাটে দুঃখ যাতনা অবহেলার ভিতর দিয়ে। পুত্রের জন্মে পরিজন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে, পুত্রের মাতার ভাগ্যে আদরযত্ন জোটে, আর কন্তার জন্ম দিয়ে মাতা আরো নির্য্যাতিতা হয় শাশুড়ী-ননদ, এমনকি পতির তীব্র বাক্যবাণে।

সেকেলে সমাজে বন্ধ্যা নারী ও বিধবা নারীদের মর্য্যাদা সধবা ও পুত্রবতী নারীদের চেয়ে বহু নিম্নে ছিল। সন্তান-হীনা নারীদের এমনিতেই সন্তানের অভাবে মনে দুঃখের অন্ত থাকত না, তার উপর শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা, স্বামীর অবহেলা অভাগিনীদের জীবন বিষময় করে তুলত। শাশুড়ী-ননদ পরিজনদের নিকট সমবেদনার বদলে তারা ব্যঙ্গোক্তি শুনত।

সাসু মোরী কইহৈ বাঁঝিনিয়াঁ ননদ
ব্রজবাসিনী হো।
রামা জেকরি মায়বারী বিয়াহী
ও ঘরসে তে নিকারই হো।

—"শাশুড়ী আমাকে বাঁঝা বলে, ননদ বলে ব্রজবাসিনী, যে আমাকে বিয়ে করে এনেছে সেও আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।"

বধূর দুঃখকষ্টের কাহিনীমূলক পল্লীগীতিতে শাশুড়ী-ননদের বধূনির্য্যাতনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখতে পাই।

আগয়ে কী গৈল মেঁ দোরাজা ভৈয়া জাস্তে,
ঠাঢ়ে রহিয়ো রাজা ভৈয়া এক সন্দেশো দেস্তে,
সাস ননদ মোয় বড়ো দুঃখ দেস্তী,
সাঁপিন কী কুড়রিন মোপে পনিয়া ভরাউস্তী,
কা করেঁ মোরে রাজা ভৈয়া চাঁদকো লেঁ খাস্তে।

অসহায় বালিকা-বধূ শাশুড়ী-ননদের নির্যাতন আর সহ্য করতে পারে না, কি করে মায়ের কাছে, ভাইয়ের কাছে খবর পাঠাবে বুঝতে পারে না, অবশেষে হতাশ হয়ে রাস্তা দিয়ে চলমান এক পথিককে দেখে ডেকে বলছে, "ও আমার রাজা ভাই, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, তুমি আমার হয়ে আমার ভাইয়ের কাছে মায়ের কাছে এক খবর দাও, আমার শাশুড়ী-ননদ আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে। যেখানে সাপের গর্ত্ত আছে সেখান থেকে আমাকে জল আনতে পাঠায়।"

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে উত্তরপ্রদেশের কাজরী গানের একটি বড় করুণ কাহিনী আছে—

শিবু কোই চাকরী কো জাতু হৈ
মেরী মায় তুম কহো হম দূর জায়।

শিবু চাকরি করতে পরদেশে যাবে, মাকে বলছে—মা তুমি আজ্ঞা দাও আমি দূরদেশে যাই।

মা বলে, "বাবা তুমি যদি চাকরি করতে বিদেশে চলে যাও তবে নিজের স্ত্রীকে কি বুদ্ধি দিয়ে যাবে ?

স্ত্রী সামনে এসে বলে "প্রিয়তম, তুমি চাকরি করতে বিদেশে গেলে আমি কি করে থাকব ?"

উচে সে করিয়ো বৈঠকা মেরী ধনা
মেরী ধনা নীচে নয়ন করি লেউ
পোনী তো করিয়ো সহেলরী
মেরী ধনা চরখা মীত করি লেউ।

স্বামী উত্তর দিচ্ছে "প্রিয়ে ভাল ভাবে চলো, ভাল কাজ করো; নীচে দৃষ্টি রেখো, তুলো আনিয়ে সুতো কেটো—চরকাকে বন্ধু বানিয়ে নিয়ো।"

তখন স্ত্রী বললে, "প্রিয় তুমি চলে গেলে আমি কার সঙ্গে হাসব, কার সঙ্গে কথা বলব ?

"দেয়ালের সঙ্গে কথা বলো, রাস্তা তোমার উত্তর দেবে।"

"তুমি চাকরি করতে বিদেশে গেলে আমি কোথায় যাব ?"

"আমি পরদেশে গেলে ধনি, তুমি বাপের বাড়ী যেও।"

একথায় স্ত্রীর দু'চোখ জলে ভরে উঠল, করুণ স্বরে বলল, "প্রিয়তম আমার মা নেই, বাপ নেই, তুমি চলে গেলে আমি কোথায় যাব ?"

তখন স্বামী সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"প্রিয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের বাপ মা মনে করে নিও, দেওর জাকে নিজের ভাই বোনের মত দেখো।"

উল্টী তো গঙ্গা ন বহে
রাজা পিয়া উল্টে চলন ন হোঁ।

—শাশুড়ী-ননদ কষ্ট দেয়, তাই স্বামীর এ প্রবোধবাক্যে মাতৃপিতৃহীনা বধূর মন ভরে উঠল না, বললে, "প্রিয়, গঙ্গা ত উল্টো বয়ে চলে না, সংসারে এই উল্টো রীতি কি করে হবে ?"

এর পর স্ত্রীকে অনেক প্রবোধ দিয়ে স্বামী বিদেশে যাত্রা করল, কিন্তু যাত্রার সময় নানাবিধ বাধাবিঘ্ন পড়তে লাগল, হাঁচি দিল, সাপ রাস্তা কেটে চলে গেল, কাক ডেকে উঠল—স্বামীর মন একটা অমঙ্গল-আশঙ্কায় কেঁপে উঠল, কিন্তু স্ত্রী ভয় পাবে তাই মুখে কিছু প্রকাশ না করে স্বামী চলে গেল বিদেশে।

দিন কেটে যাচ্ছে, ঝুলনপূর্ণিমা এসেছে, সব সখীরা দোলনায় দুলছে, বধূরও ইচ্ছে হ'ল দোলনায় দুলবে। বধূ শাশুড়ীকে এসে বললে :

ছোটো মো দেবরা লাড়িলো
মেরী সাসু বানে ডরাই পছডোর।

—ওগো শাশুড়ী ঠাকরুণ, আমার ছোট দেওর কোথায় আছে তাকে খুঁজে আনি।

তখন বধূর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে শাশুড়ী বলল :

জো তুম মেরী বহু ঝুলন জাতি হো
মেরী বহু পীসনা পিসে ধরি জাউ
মেরী বহু রসোঈ তপে ধরি জাউ।

"ওগো বধূ, তুমি যদি ঝুলায় ঝুলতে চাও, তবে আটা পিষে রাখ, রান্না তৈরি করে রাখ, তবে দোলনায় দুলতে যেয়ো।"

বধূ উত্তর করলে :

পিসনা পীস চক্কী ধরা
রসোঈ বনাঈ চৌকা ধরী
নীর ভরি ঘিনৌচী ধরি দীনা
মেরী সাসু তুম কহো অবউঁর জায়েঁ।

"জাঁতায় আটা পিষে রেখেছি, রান্নাঘরে রান্না তৈরি করে রেখেছি, মটকা ভরে জল রেখেছি—ও আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ, এবার তুমি আজ্ঞা কর আমি ঝুলায় ঝুলতে যাই।"

বধূর কথায় শাশুড়ী চিন্তা করতে লাগল এখন কি করা যায়, বধূ ত সব গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে রেখেছে, তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বললে, "যেতে হয় যাও, তবে ছোট ননদকে সঙ্গে নিয়ে যাও আর তোমার ছোট দেবর যদি জানতে

পারে যে, তুমি দোলনায় দুলতে গিয়েছ তবে তোমাকে মেরে ফেলবে।"

বধূকে তখন আর কে পায়, কিশোরী বধূ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ঝুলায় দোলবার জন্ত ননদকে নিয়ে চলে গেল।

তার পর অসহায় বধূর কি শোচনীয় পরিণাম! বধূ আর ঘরে ফিরে এল না। শাশুড়ীর কাছে মৃত বধূর আত্মা এসে দেখা দিয়ে বললে:

এক পোখী ঝুলী, দূজী পোখী ঝুলী
মেরী সাস্থ তীজী কো ডারী হমমারি
খোদি বরিয় তন গাড়িয়ো মেরী সাস্থ
মেরী সাস্থ উপর জমি গঙ্গ দুব।

"এক বার দোলায় দুলেছি, দু'বার দুলেছি, তিন বার দোলবার সময়ও ওগো শাশুড়ী, দেবর এসে আমাকে মেরে ফেলেছে, বড় গাছের নীচে মাটি খুঁড়ে আমাকে পুতে ফেলেছে, সেই মাটির উপর এখন দুর্ব্বাঘাস গজিয়েছে।"

বধূর আত্মা শাশুড়ীকে দেখা দিয়েই সন্তুষ্ট হ'ল না, তার প্রবাসী স্বামীকে মধ্যরাত্রে স্বপ্নে বললে, "ওগো, প্রিয় তুমি শহরের চাকরি ছেড়ে দাও, তোমার ঘরদুয়ার দেখ, তোমার এক টাকার জন্য লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

স্বপ্ন দেখে স্বামী সচকিত হয়ে জেগে উঠল, এক অমঙ্গল-আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠল। ভোরের কিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, স্বামী মনস্থির করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজ দেশে ফিরে চলল। বাড়ী পৌছে মা ভাই বোন সবাইকে দেখতে পেল, দেখতে পেল না শুধু তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে। বললে, "মা সবাইকে ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার স্ত্রীকে কেন দেখা যাচ্ছে না?"

মা মুখ ফিরিয়ে বললে, "তোর বৌ ঝুলায় দুলতে গেছে এখনও ফিরে আসে নি।"

ছেলে বললে, "আমি গাছে ঝুলায়ও দেখে এসেছি, কৈ সে ত নেই মা সেখানে।"

তখন মা আর কি করে, বাধ্য হয়ে সত্য কথা বললে, "তোর বউ দোলনায় দুলতে গিয়েছিল, তোর ছোট ভাই তাকে মেরে গাছের নীচে পুঁতে ফেলেছে, সেখানে এখন দুর্ব্বা গজিয়েছে।"

দুঃখে ক্ষোভে অনুতাপে ছেলের মন ভরে উঠল, মাকে বলল, "মা তুমি কেন আমাকে ছলনা করলে, প্রথমেই কেন একথা বললে না? আমার কাপড় এনে দাও, লোটা কম্বল এনে দাও, আমি যোগী হয়ে চলে যাব, আমার দুঃখিনী রাণী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে. আমি আর কি নিয়ে সংসারে থাকব, আমার রঙ্গমহলের চাকরি এখানেই শেষ, আমি আর সংসারে থাকব না।"

ইতনে তো ছলবল তুম করে
মেরী মাঙ্গ তব তৈঁ দেতী বতায়।
ল্যাও হমারে কাপড়ে ভৈয়া
ল্যাও পাঁচো হথিয়ার
মেরী মৈয়া জোগী হৈ বনি জাঁয়
বনিয়া দুখিয়া চল বসী
মৈয়া ছোড় হমারী সঙ্গ
হমউঁর ছোড়ি চলে ঘর বার
ধুর্ত্তনী হো লেহহুঁ রমায়
রঙ্গমহল কী চাকরী।

এসব কাজরী গীত বহুপূর্ব্ব রচিত, কিন্তু সেগুলি এখনও বছরের পর বছর নারীদের মুখে মুখে গীত হয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। যুগ উল্টে গেছে, সমাজের হাওয়া বদলেছে। আজকাল একান্নবর্ত্তী পরিবার বড় একটা দেখা যায় না, একেবারে বালিকা-বয়সে কন্যাদের বিয়ে কম হয়, সেজন্য বহু সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ত্তমান সমাজেও অনেক অন্যায় অত্যাচার আছে, কিন্তু আজকাল কন্যার জন্মে গৃহে বিষাদের ছায়া নামে না, কন্যার জন্ম দিয়ে মাতা লাঞ্ছিতা হয় না, বন্ধ্যা নারী স্বামীপরিত্যক্তা হয় না।

শহরের, এমনকি গ্রামের জীবনধারাও বদলে গেছে। কিন্তু এসব পল্লীগীতি পুরনো হয় নি। এখনও বছরের পর বছর রাজপুতানা, গুজরাট উত্তর হিন্দুস্থান ও মধ্য-প্রদেশের নারীরা এসব করুণ পল্লীগীতি গেয়ে শ্রোতার হৃদয় ব্যথায় ভরে তোলে।

দক্ষিণ দেশে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

(৩)

রাত্রি শেষ হয়ে বেলা যত বাড়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভিড়ও বাড়ে তত, কিন্তু ঠেলাঠেলি বা হট্টগোল নেই। আমরা কেউ কারও ভাষা বুঝি না, কিন্তু উভয় পক্ষেই পরস্পরকে জানবার কৌতূহল। মনে হতে লাগল একটা সার্ব্বজনীন ভাষা যদি থাকত! অনুমানে বুঝতে পারছি, তাদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক, চলেছে শিল্পপ্রধান শহর—মাদুরাইয়ে। মাদুরাই মাদ্রাজ-রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। তারাও বুঝছে, আমরা বিদেশী, কিন্তু কোন্ দেশবাসী আন্দাজ করতে পারছে না। পরিশেষে একজন, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। ইংরেজ আমাদের দেশ ত্যাগ করেছে, কিন্তু মনের অধিকার এখনও ছাড়ে নি, আমরাও তা হতে দিচ্ছি না! মাদ্রাজ থেকে আসবার পথে অনেক ষ্টেশনের নাম-ফলকে হিন্দী নামের উপর হিন্দী-বিরোধী অভিযানের কলঙ্কচিহ্ন দেখেছিলাম। এ অঞ্চলে নগরে, বিশেষতঃ গ্রামে বহু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বাস। তার উপর এ হ'ল দাক্ষিণাত্য—যার সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের অপ্রীতি অতি প্রাচীন, কাজেই উত্তরের একটি ভাষার পক্ষে এখানে সার্ব্বজনীন আসন লাভ সহজ নয়। অতঃপর ইংরেজের ভাষার মাধ্যমেই আমাদের মাঝে মাঝে আলাপ চলতে লাগল। মানুষগুলিকে লাগলও বেশ। যেমন সাধারণ তাদের পোশাক, তেমনি সাদাসিধে তাদের আচরণ। অধিকাংশেরই পা খালি এবং শরীর বেশ মজবুত।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। দূরে ছোট ছোট পাহাড় ও তার দু'একটির উপর সাদা রঙের বাড়ি-ঘর রৌদ্রে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। যাত্রীদের একজন বললে, "ঐ পাহাড়ের ওধারে মাদুরাই শহর।"

মাসখানেক আগে দক্ষিণের এই সকল অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে যায়। রেলপথের দু'পাশের দৃশ্য তাই করুণ। শস্যক্ষেত, কলাবাগান, তরুশ্রেণী রিক্ত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন। জায়গায় জায়গায় অহেতুক জলাশয়। তবে শীতকালে করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা রৌদ্রে-গ্রীষ্মে ক্লিষ্ট হলেও সে অবধি কোথাও বর্ষণে বিব্রত হই নি।

অবশেষে আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মাদুরাইয়ে গাড়ি পৌঁছাল—অনেক বড় ষ্টেশন, অনেকগুলি প্ল্যাটফরম, গাড়িরও অবিরাম যাতায়াত। কোথায় আশ্রয় নেব কিছুই ঠিক ছিল না। কুলিই বললে, "কাছেই মারোয়াড়ী ধর্ম্মশালা।" সঙ্কল্প করেছিলাম, নিজের মোট নিজেই বইব। কারণ, শরীর ও কাজে তেমন পটু না হলেও অর্থ-সামর্থ্যে ছিলাম আরও দুর্ব্বল। তার উপর, রেল ষ্টেশনের কুলি সর্ব্বত্রই সমান। তাদের কবলে যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে সতর্কতা অবলম্বন দরকার। কিন্তু ষ্টেশনের বাইরে এসে সম্মুখীন হলাম একদল কিশোর ও প্রৌঢ়ের। তারা কুলিও নয়, ভিখারীও নয়। আমার মোট দুটোর দিকে হাত বাড়িয়ে হিন্দী, ইংরেজী ও তামিলে যা বলতে লাগল তার মোদ্দা কথাটি এই বুঝলাম, "বোঝা আমায় দাও। আর দিও 'টু অ্যানা।'" 'টু অ্যানা' স্বচ্ছন্দে ব্যয়ের ক্ষমতা আমার মত 'শেঠে'রও আছে এবং চলেছিলামও আর এক শেঠের লক্ষ টাকায় গড়া কুঠিতে। তাই বোঝা দুটি এক জনকে দিয়ে হাল্কা হয়ে চললাম। মনে পড়ল, রামেশ্বরমের ষ্টেশনের বাইরেও একজন চেয়েছিল 'টু অ্যানা'। সেদিন রাত্রেও একজন ভারবহনের পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রার্থনা করে 'টু অ্যানা'। অতঃপর আরও দক্ষিণে টিনেভেলি ষ্টেশনের বাইরেও শুনি ঐ পরিমাণ মুদ্রার আবেদন। জানি না, ঐটেই এদিকে ন্যূনতম পারিশ্রমিক অথবা একখানি ইডলি বা ধোসার ও সেই সঙ্গে একটু কলাইয়ের দাল কিংবা রসমের মূল্য বলে তারা ঐরূপ প্রার্থনা করেছিল কিনা।

পরিচ্ছন্ন রাজপথের ধারে পরিচ্ছন্ন ধর্ম্মশালাটি। তার একটি লম্বা নামও আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকে তা ভুলে গিয়ে কেবল বলে, 'মারোয়াড়ী ধর্ম্মশালা'। আমিও নামটি ভুলে গেছি। সেখানে আমরা ছ'জন মানুষের জন্যে মাত্র দু'জন থাকবার মত একখানি কুঠরি পাওয়া গেল। অপ্রসন্ন মনে ক্লান্ত দেহে সকলে উঠে বারান্দা দিয়ে সেদিকে যেতে যেতে দেখি, কলকাতার এক কলেজের অধ্যাপক—সপরিবারে একখানি বেশ বড় ঘর জুড়ে আছেন তারা। আর, তাঁর পাশের ঘরেই রয়েছেন লক্ষ্ণৌ বিখ্যাত কলেজের বিখ্যাত মহাশয়। তিনিও ছিলেন সপরিবারে। তাঁরাও মাদ্রাজের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রতিনিধি। তবে কলকাতার অধ্যাপক মহাশয় ফিরছিলেন উত্তরে, আর তিনি যাচ্ছিলেন দক্ষিণে। আসা-যাওয়ার পথে ঐখানে তাঁদের দেখা। আবার, আমরাও গিয়ে জুটলাম। তবে গুলজারের আর অবসর হ'ল না। স্নান সেরেই চললাম মন্দিরের দিকে। সঙ্গে গাইড জুটল। লোকটি নির্ভয়ে ইংরেজী বলে। হিন্দীও বেশ শিখেছে। আর তামিল ত তার মাতৃভাষা। বললে, 'মিঃ, খাবারের ভাবনা কি? পথের ধারে অনেক কফিখানা আর হোটেল পাবে।" খাবারের ভাবনা আমাদের কোথাও ছিল না। এ বিষয়ে আমরা হয়ে গিয়েছিলাম, তামিলদেশীয়। জানতাম, যতক্ষণ ট্যাকে আছেন চিন্তামণি ততক্ষণ চিনি না হলেও গুড়ের যোগান পাওয়া যাবেই।

মিনিট আট-দশ হাঁটবার পর মীনাক্ষীর সুবিশাল মন্দিরের পশ্চিম গোপুরমে পৌঁছলাম। মন্দিরটির চারদিকে চারটি গোপুরম আকাশের দিকে উঠে গেছে। সেগুলির গায়ে নানা রকমের মূর্ত্তি।

মন্দিরটি ঘিরে পর পর দুটি সু-উচ্চ প্রাচীর। বাইরের ও ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে সুপ্রশস্ত চাতাল। সবই পাথরের। প্রাচীরের শীতল ছায়ায় শুয়ে বা বসে ক্লান্তি দূর করছে যাত্রী ও ভিখারীর দল। শোনা ছিল, উত্তর গোপুরমের গায়ে দুটি পাথরের স্তম্ভে আঘাত করলে

মাদুরাই—মীনাক্ষী মন্দিরের পশ্চিম গোপুরম

মধুর ধ্বনি ওঠে। স্তম্ভ দুটি দেখিয়ে গাইড একখানি ছোট পাথর দিয়ে স্তম্ভদুটির গায়ে যে নলাকার, মসৃণ, লোহিতাভ শিলাগুলি ছিল সেগুলিতে একে একে আঘাত করতে লাগল। আর এক একটি থেকে এক এক রকমের শ্রুতি-মধুর ধ্বনি উঠতে লাগল। শুনতে শুনতে মনে হ'ল স্তম্ভ দুটির ধারে দু'জনে দাঁড়িয়ে যদি ঘন ঘন আঘাত করা যায় তা হলে বোধ হয়, কোন সঙ্গীতের সুর ওঠা সম্ভব।

ভিতর প্রাচীরের মধ্যে রয়েছে শিল্পীর স্বপ্নলোক। স্থপতি ও ভাস্করগণ তাঁদের সারা মনের মাধুরী পাথরের গায়ে অনবদ্য রচনায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। প্রতি পদে মুগ্ধ বিস্ময়। এক জায়গায় শিব-পার্ব্বতীর পাষাণমূর্ত্তি, নৃত্যভঙ্গিমায় স্থির হয়ে আছে। মীনাক্ষী, পার্ব্বতীর মুখে যে নারীসুলভ সলজ্জ ভাব শিল্পী প্রস্ফুটিত করেছেন তা অবর্ণনীয়। তার পর মন্দিরের সরোবরে স্বর্ণকমল, মূল মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া ও আরও কত শিল্পকাজ দেখে দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু মীনাক্ষীর ঐ অনির্ব্বচনীয় মুখচ্ছবি শিল্পদলের মাঝে একটি পূর্ণ কমলের মত আমার মনে রইল ফুটে।

মাদুরাইয়ের তাঁতশিল্পের বড় খ্যাতি। তারই মোহে অনেকে বস্ত্রালয়ে যান সস্তায় সওদা করতে। দোকানীও বিদেশী খরিদ-দারের সামনে দোকান উজাড় করে নানা রকমের বস্ত্রের স্তূপ সাজায়, দামও সস্তা বোধ হয়। কিন্তু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যা লেখা থাকে তার সঙ্গে আসলের আর মিল খায় না। তবুও লোকে কেনে আর ওরাও বেচে এবং কারবারও চলে জোর।

দুপুরের দিকে আমার সঙ্গী শিল্পী দু'জন মন্দিরে গেলেন ছবি আঁকতে। আঙিনায় একটি জায়গা বেছে নিয়ে দু'জনে রঙ-তুলি-কাগজ সাজিয়ে বসলেন। আর এঁদের দু'জনকে তিন দিক থেকে ঘিরে ধরল কৌতূহলী জনতা। তাদের বেশভূষা মলিন। তারা যাত্রী নয়, পাণ্ডা নয়, ব্যবসায়ীও নয়। অঢেল তাদের অবসর। যখন বেলা-শেষের ছায়া নামল মন্দিরের আঙিনায় তখনও তারা গেল না। কিসে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে, কোথায় রাত্রিযাপন করে তারাই জানে।

সন্ধ্যায় মন্দিরের ধারে ছিট-কাপড়ের একটি ছোট দোকানে সওদা করবার কালে স্থানীয় একটি কলেজের ছাত্রের সঙ্গে আমার সওদার সামগ্রীটি সম্বন্ধে তারই কৌতুককর একটি বক্তব্যে আলাপের সুযোগ হ'ল। সে বললে, 'আপনি যদি ঐ রঙের জোব্বা (পাঞ্জাবী) পরেন তা হলে লোকে বলবে, আপনি কংগ্রেসী। ওরা ঐ রঙেরই জোব্বা পরে।'

বললাম, 'কিসের জোব্বা পরলে লোকে বলবে কম্যুনিষ্ট?'

সে সহাস্যে বললে, 'ওরা সব রঙেরই জামা পরে।'

'আর হিন্দুমহাসভার লোকেরা?'

সে এবার হাসিতে ফেটে পড়ল বললে, 'তাদেরও কিছু ঠিক নেই।'

'আমি যখন ঐ তিনটির একটিও নই তখন যে রঙের কাপড় কিনছি তার জোব্বা পরতে ক্ষতি কি? কি বল?'

সে প্রচুর হাসতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি?'

'আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সদস্য। আপনি এর নাম শুনেছেন?'

'হাঁ।'

'এখানে হিন্দু মহাসভা সম্মেলন হচ্ছে, আপনি যাবেন? আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি সেখানে। আমি তার একজন কর্ম্মী।'

'তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। পারলে এই শহরটা ঘুরে দেখতাম। কিন্তু পথশ্রমে বড় ক্লান্ত। এসেছিলাম মাদ্রাজে বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে—'

'হাঁ—হাঁ—খবরের কাগজে সে খবর পড়েছি। কিন্তু আপনা-দেরই এক বাঙালী সম্মেলনে আজ বক্তৃতা দেবেন।'

'যত খুশি দিন।'

সে নিজ পরিচয় দিল, জাতিতে সৌরাষ্ট্রীয় (গুজরাটী) ব্রাহ্মণ বলে। সেই শহরে শৈশব থেকে আছে, দেশে কখনও যায় নি। এখন তার দেশ মাদুরাই। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম শহরে মিল আছে পাঁচটি, লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ হাজার, খ্রীষ্টানের সংখ্যাও তাই। গ্রামাঞ্চলেই খ্রীষ্টানেরা অধিক সংখ্যায় বাস করে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রতিপত্তি বেশী? কংগ্রেসী না কম্যুনিষ্ট?'

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'ওরা কি করবে?' অর্থাৎ প্রাধান্য তাদেরই। কিন্তু আসল ঘটনা অন্যরূপ।

মীনাক্ষী মন্দিরের অভ্যন্তরে—দ্বিতীয় প্রাচীর

বললাম, 'তোমরা কংগ্রেসে মিশে যাও না কেন?'

বললে, 'আমরা ত চাই। ওরা যে নেয় না।'

অতঃপর আলাপের আর অবসর হ'ল না। কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পথ-ক্লান্তিতে বড় পীড়া বোধ করলাম। আসবার সময় বললাম, 'যদি কালও থাকি সন্ধ্যায় এখানেই দেখা হবে। বিদায়।'

সে সহাস্যে বিদায় দিয়ে বললে, 'আচ্ছা।'

পরদিন আর থাকা হ'ল না, একটু বেলায় রওনা হলাম, কন্যাকুমারিকার পথে, টিনেভেলির উদ্দেশ্যে। আসবার সময়ে প্রিয়দর্শন, হাসিখুশিভরা ছাত্রটির কথা মনে হতে লাগল। হয়ত সে আজ আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। দোকানটি তারই বন্ধুর। কিন্তু অবিরাম চলার পথে দীর্ঘ আলাপের সুযোগও মেলে না যে!

আরও দক্ষিণে অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে রবিকর প্রখরতর হতে লাগল, বাইরের দৃশ্যও হয়ে উঠতে লাগল উজ্জ্বলতর। রেলপথের সমান্তরালে সুদূর মাদ্রাজ থেকে একটি সুন্দর রাজপথ চলে গেছে টিনেভেলি—তার পর কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত। পথে মাঝে মাঝে যাত্রীবোঝাই বাস ও নানা আকারের ঘরোয়া মোটর ছুটে চলেছে। পথের দুটি পাশে শস্যক্ষেত, কলার বাগান, তাল-নারিকেলের বন, পশ্চিমে দূরদিগন্তে অস্পষ্ট শৈলমালা, ছোট-বড় ষ্টেশনের ধারে ছোট-বড় গ্রাম। কোথাও নদী নেই, সুবিশাল জলাশয়ও চোখে পড়ে না। কিন্তু বড় বড় ইঁদারা এবং তা থেকে জল তোলবার অভিনব যন্ত্র দেখা যেতে লাগল।

যে শৈলমালা প্রথম দিকে ছিল অস্পষ্ট ও মেঘবিলীনপ্রায়, আমাদের চলার পথে তা ক্রমে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে উঠে পশ্চিম দিগন্ত বিচিত্রাকার ধূমল প্রাচীরে আড়াল করে রাখল। এ হ'ল দক্ষিণের সুবিদিত কারডামাম্ শৈলমালা—ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে ভারত মহাসাগরে নিমগ্ন।

এ অঞ্চলের প্রধান ফল চীনাবাদাম, নারিকেল ও কলা। অবশ্য প্রত্যেক ষ্টেশনে এগুলি সহজলভ্য বলে আমার ধারণা হ'ল সেই রকমই। আমাদের কামরায় কয়েকটি ছাত্র উঠেছিলেন। ফেরিওয়ালারা ষ্টেশনে সবুজ-রঙের কলা বিক্রয় করছিল। স্থানীয় কয়েকজন ছাত্র-যাত্রী আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আলাপ করতে করতে বললেন, "আপনারা সবুজ-রঙের কলা কিনবেন না, হলদে রঙের কিনবেন। সবুজ-রঙের কলাতে পোকা থাকে, খেয়ে লোকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওগুলো পাহাড়ে জন্মে।"

শুনেছি, ঘন ঘন ক্ষুধা পাওয়া রোগের লক্ষণ। আমরা সকলেই তার পর থেকে এই সাংঘাতিক ভারতীয় সাধারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বুঝলাম, সবুজ কলা খাওয়ার ফল ফলতে শুরু করেছে এবং রোগটির কিছুতেই উপশম ঘটাতে পারা গেল না। অবশেষে বেলা বারোটার কাছাকাছি পৌঁছলাম টিনেভেলি দক্ষিণ রেলপথের অন্যতম প্রান্ত। এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ সর্পিল মোটর-পথ চলে গেছে তিন-সমুদ্রের মিলন-তট—কন্যাকুমারিকায়।

ভরা পৌষ, কিন্তু মাথার উপর মধ্যদিনের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড। রৌদ্রে সব যেন তৃষিত। আমাদেরও জঠরে নিদারুণ হুতাশন-জ্বালা, কণ্ঠে তৃষ্ণা। পথভরা ধুলো। চারদিকে শুষ্কতা, রুক্ষতা। টিনেভেলিকে মনে হতে লাগল ট্রেনে ফেলি। তখন একটু শীতল জল, একটু শীতল ছায়া, দূরদক্ষিণ বাতাসের একটু স্পর্শ আমাদের সকলেরই কাম্য হয়ে উঠল। অথচ স্থানীয় অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দে, সহাস্যে চলাফেরা করছে!

ষ্টেশন থেকে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দূরত্ব সামান্য নয়। তবুও নিজের বোঝা নিজেই কাঁধে-পিঠে তুলে এগিয়ে চললাম সেদিকে এবং খানিকটা এগোতেই পিছন থেকে "টু আনায়" কাতর আহ্বান কানে এল। ফিরে দেখি কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধ-নগ্ন এক কিশোর। সে ভাঙা হিন্দীতে বললে, "শেঠ, বাস-ষ্ট্যাণ্ড দূর আছে। আমায় বোঝা দাও।"

শেঠজী যে পয়সা বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই সেই রৌদ্রজ্বালা সত্ত্বেও বোঝা কাঁধে স্বাবলম্বী সেজেছে তা যদি সে জানত! কিন্তু বাঁচাতে চাইলেও পয়সা বাঁচে না, বাঁচতে পারে না, বাঁচানো যায় না। তার কাঁধে বোঝা চাপিয়ে হাল্কা হয়ে চলতে লাগলাম এবং কয়েক পা যেতে যেতেই দেখি, আমার দুজন সঙ্গী একখানি মোটরে আমার বিপরীত দিক থেকে আসছেন, এবং মোটরখানি ঘরোয়া।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কাটতেই তাঁরা সারা পথ ধুলোয় অন্ধকার করে ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে। বোধ হয় কোন তামিল ভদ্রলোক সাহিত্যিক ও শিল্পীদের গুণের পরিচয় পেয়ে মোটর চড়িয়ে ওঁদের সমাদর করছেন। এখন ওঁদের সঙ্গে থাকলে সঙ্গী বলে আমিও কি আর মোটর চড়তে পেতাম না? কিন্তু ভাগ্যে আছে ধুলো ভাঙা, পায়ে হাঁটা। যা হোক ষ্ট্যাণ্ডে এসে বাসে উঠে মনোমত আসন বেছে নিয়ে বসলাম। কিশোরটিকে 'দু আনা' দিতে যেতেই সে বললে, 'চার আনা।' কারণ পথ অনেকটা, রোদও খুব। অবশেষে তারই দাবি মানতে হ'ল। আলাপ জুড়ে দিলাম তার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, সে সেই শহরেরই অধিবাসী কিনা।

বললে, 'তারা গ্রামের লোক গ্রামখানি শহর থেকে আট মাইল তফাতে। তার বাবা নেই, দুটি ছোট ভাই আর মা আছে। মা লোকের বাড়ী দাসীর কাজ করে আর সে মোট বয়। এই আয়ে তাদের জীবন চলে। সে লেখাপড়া জানে না এবং ভাইয়েরাও স্কুলে যায় না। তাদেরও যা হোক একটা কাজে লাগাতে হবে।' এ কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? একে অস্বীকার করাও ত পুরাতন ঘটনা। তবুও তার মিষ্ট মুখখানিতে শেষের কথাগুলির সঙ্গে যে বিজ্ঞজনোচিত ভাব ফুটে উঠল তা মর্ম্মস্পর্শী। আসমুদ্র-হিমাচল সাধারণ মানুষের চিন্তা ও বেদনা এই।

এমন সময়ে সেই মোটরেও হয়ে এলেন আমার সঙ্গীরা। তাঁদের মোট-ঘাট বাসে উঠানো হতে লাগল। তাঁদের সঙ্গে মোটর-স্বামী জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। তিনি আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, 'আপনারা একবার আমার বাড়ী যাবেন না? আমার স্ত্রী আপনাদের আহারের আয়োজন করেছেন। আমরা আশা করে আছি আপনারা আমাদের দেশের লোক, অন্ততঃ একটা দিন আমার বাড়ীতে থাকবেন!'

তা হলে তিনি মাদ্রাজী নন, বাঙালী? যতক্ষণ বাংলা না বলছেন ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারবে না যে, তিনি বাঙালী! ভদ্রলোক সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলার বাইরে কর্ম্মসূত্রে আছেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। হিন্দী, ওড়িয়া, গুরুমুখী, তামিল ভাষা তিনি লিখতে, পড়তে, বলতে পারেন। আর বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ত আয়ত্তে এনেছেনই। জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল বিদেশে, তবুও ভুলতে পারেন না সেই 'দুই বিঘা জমি'। তাঁর পত্নীও ঐ ভাষাগুলি জানেন, কিন্তু বাংলা হয়ে আছে তাঁদের মর্ম্মের ভাষা। তবে তাঁদের ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষায় অজ্ঞ!

বললাম, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে এই দূরদেশে পেয়ে এমন আনন্দ বোধ করছি যে কথায় বলতে পারব না।'

তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনারা ত আমার বাড়ী গেলেন না। আমরা অনেক আশা করেছিলাম। আপনাদের থাকবার কিছু কষ্ট হ'ত না। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে সম্প্রতি যে আবিষ্কারগুলি করেছেন তা আপনাদের মত লোকের দেখা দরকার। দক্ষিণে ভারতের ইতিহাসের নূতন কথা তা থেকে জানা গেছে।'

বললাম, 'আমরা যে আসব তা কি করে জানলেন?'

'কেন, কলকাতার চিঠি পেয়েছি।'
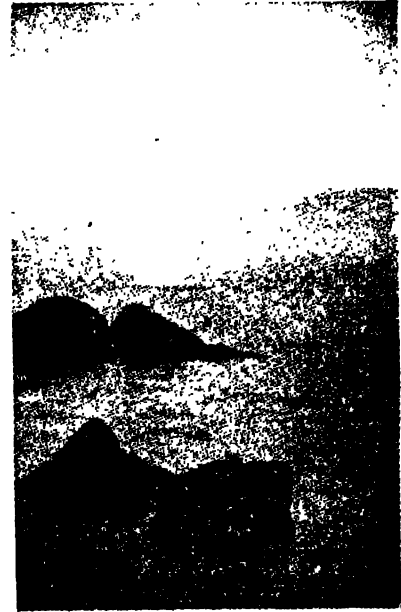
কন্যাকুমারী—আরব সাগরে সূর্য্যাস্ত

যিনি চিঠি লিখেছিলেন তিনি কলকাতায় আমাদের প্রতিবেশী, ওঁর নিকট-আত্মীয়।

বললাম, 'শুনেছিলাম। আপনি তুতিকোরিনে থাকেন।'

তিনি হাসলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, এ শহরে আর বাঙালী আছেন?'

'এ শহরে আমি ছাড়া আর কোন বাঙালী নেই। তবে আমার দু'জন বাঙালী প্রতিবেশী আছেন। সব চেয়ে কাছের যিনি তিনি থাকেন বাইশ মাইল তফাতে, আর, দূরের যিনি তিনি থাকেন বিয়াল্লিশ মাইল দূরে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন এখানে কোন্ ঋতু?'

'শীতকাল।'

'গ্রীষ্মকালে কেমন অবস্থা হয়?'

'এখন দিনের সর্ব্বোচ্চ তাপ ১০৮ ডিগ্রী হয়। গ্রীষ্মকালে কত হতে পারে আন্দাজ করুন।'

বললাম, 'সুখের কথা যে শীত থাকতে থাকতেই দেশে ফিরে যাব, গ্রীষ্মকালে থাকব না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, একটু জলের ব্যবস্থা করতে পারেন? শীতেই তৃষ্ণায় গলা কাঠ।'

তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন জলের ব্যবস্থা করতে। এমন সময় রব উঠল বিদ্যাভূ মহাশয়ের পরিচারিকাটিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাকে পথের ধারে গাছতলায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে সে নেই।

সকলেই উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজব? আমাদের মধ্যে একজন বললেন, 'সে হারাতে পারে না। কারণ, কথা বললেই লোকে বুঝবে, সে বাঙালী।'

কন্যাকুমারীকা—ভারত মহাসাগর—বিবেকানন্দ শৈল

'যদি একটিও কথা না বলে চুপচাপ পথে পথে ঘুরে বেড়ায়? আর কথা বললেও সে যে বাঙালী তা এরা কি করে বুঝবে? চেহারায় ত এদের সঙ্গে দিব্যি মিল? তবে কাপড় পরার ধরনটা—'

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক কাঁদি ডাব নিয়ে এলেন এবং দুঃসংবাদটি শুনেই তিনি বিভ্রান্ত মহাশয়কে গাড়িতে তুলে পরিচারিকাটিকে খুঁজতে বেরুলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে পাওয়া গেল।

তার পর বাস যখন ছাড়ে ছাড়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন আবার বললেন, 'আপনারা অভুক্ত অবস্থায় চললেন। কথা দিয়ে যান ফিরবার পথে আমার বাড়িতে আসবেন?'

বললাম, 'ইচ্ছা রইল। আর খাবার কথা যা বলছেন, কিছু খাবার না হয় আমাদের সঙ্গে দিন।'

অতিথিবৎসল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎক্ষণাৎ ছুটলেন মাদ্রাজী হালুইকারের দোকানে এবং মিনিটকয়েকের মধ্যেই আনলেন, দিস্তে-কতক পুরী ও আলু-পিয়াজের নিরামিষ তরকারী! বোধ হয় হালুইকার আমাদেরই জন্ত তৈরি করছিল। নইলে দুটোই গরম থাকে কি করে?

টিনেভেলি শহরের দক্ষিণ সীমায় তাম্রবর্ণী নদী। তার দুটি তীর ও বক্ষের বালুকার রঙ তামাটে। তার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে শীর্ণকায়া নীলাভ জলধারা। নদীপারে পালা-মকোটা শহর—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় সব বাড়ির রঙ সাদা। রৌদ্রে শহরটিকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এই শহরেরই পূর্ব্বাংশে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুন্দর বাড়িখানি, ফিরবার পথে দেখেছিলাম।

শহরটি ছাড়িয়েই উন্মুক্ত প্রান্তর। বামে পূর্ব্বদিকে দিগন্তে প্রসারিত হরিৎবর্ণ ধানক্ষেত—দক্ষিণে পশ্চিমদিকে আলোছায়ায় বিচিত্র মেঘমৌলী কার্ডামাম শৈলমালা। তার সানুদেশ অভ্রভেদী তালীবন-সমাচ্ছন্ন। আকাশে স্তূপাকার মেঘ। দূরে কোথায় যেন বৃষ্টি হয়ে গেল। ঠাণ্ডা বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শে বড় আরাম বোধ হতে লাগল। পথ জন ও যান বিরল। কোথাও কৃষকের কুটির দেখি না, চোখে পড়ে কেবল তাদের অক্লান্ত শ্রমের বিজয়কেতন প্রান্তরে ও বাগানে দক্ষিণ-বাতাসে লীলায়িত। পথের ধারে দু'একখানি ছায়াহীন ছোট গ্রাম। ঘরগুলির দেয়াল মাটির, চালে খড়, তাল-পাতা বা খোলার ছাউনি। আবহাওয়া রুক্ষ। তাই অধিবাসীদের পোশাকের বেশী প্রয়োজন নেই। রুক্ষ বিহার প্রদেশের গ্রামগুলির সঙ্গে এখানকার গ্রামগুলির কিছু সাদৃশ্য আছে। এক এক সময়ে মনে হতে লাগল আমরা বিহার প্রদেশের মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে গীর্জ্জা, কোন খ্রীষ্টান সাধু বা সন্ন্যাসিনীর নামে উৎসর্গীকৃত। অবশেষে একখানি গণ্ডগ্রামে বাস পৌঁছল। পথের দুধারে কলা, ডাব, চীনাবাদাম, ছোলা-মটর ও অন্যান্য খাদ্যের দোকান-সারি। সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে মনে হতে লাগল—দোকানে সাজানো বাদাম ও ছোলা-মটর আপনিই ভাজা হয়ে গেছে। দশ-বারটি বালক ও কিশোর বাসে উঠে পড়ল। তাদের হাতে ছোট ছোট থালায় তেল-কাগজে মোড়া দেশী বিস্কুট। উত্তর ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিমের উদ্বাস্তগণ দক্ষিণে তত দূরে পৌঁছন নি যে বলব, সামাজিক ও আর্থিক বিপর্য্যয়ের ফলে তারা লেখাপড়া না শিখে ফেরিওয়ালাগিরি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই দুটি-চারটি ইংরেজী শব্দ শিখেছে পৈটিক কারণে।

তাদের এক জনকে বললাম, 'ডাব আনতে পার?'

সে থালার বিস্কুট দেখিয়ে বললে, 'কোকোনাট। ওয়ান অ্যানা টু।'

বললাম, 'কোকোনাট ওয়াটার।'

সে আবার বিস্কুটগুলি দেখিয়ে বললে, 'গুড কোকোনাট। ওয়ান অ্যানা টু।' বলেই হাসতে লাগল। আমাদের গাড়িতে কাউকেই তার 'গুড কোকোনাট' কিনতে দেখলাম না। সকলেরই তখন বিস্কুটে রূপান্তরিত 'কোকোনাট ওয়াটারের' বদলে তরল 'ওয়াটারে'র প্রয়োজন। তারা চলে গেল বিপরীতগামী বাসের দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার আমাদের বাস চলতে লাগল। প্রখর রৌদ্রতাপে যাত্রিরা ক্লিষ্ট। বাতাসে আরাম পাওয়া যায় না।

পশ্চিমের পাহাড়গুলি দূরে সরে গেছে, দু'পাশে সমতল ক্ষেত। হঠাৎ অশ্বত্থবীথিকার শীতল ছায়ায় গাড়ি পৌঁছল। দেখি, পথের দু'পাশে অশ্বত্থের সারি, শাখায় শাখায় খিলান রচনা করে ছায়াজালে পথ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনে পড়ল, সারনাথের পথের ধারের আম্র-বীথি। কিন্তু এটি তার চেয়ে দীর্ঘতর, প্রায় ক্রোশব্যাপী। তার পর থেকে পথ দু'পাশের ধানক্ষেত, বেণুবন, নারিকেল ও তালীকুঞ্জে এমন সংকীর্ণ হয়ে গেল যে, দুখানি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না, গাছগুলিও গাড়ি থেকেই যেন হাতে স্পর্শ করা যায়। পথের রঙ লাল। মাঝে মাঝে দু'চারখানি কাঁচা বাড়ি চোখে পড়ে। এ-দিকে সূর্যও পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। হঠাৎ আমাদের সঙ্গী-দের মধ্যে একজন বলে উঠলেন—'ঐ—ঐ—'

সামনে তাকিয়ে দেখি তরঙ্গময় সীমাহীন নীল পাথার—তার কূলে আমাদের যাত্রা সেদিনের মত শেষ হ'ল।

ধর্মশালায় একটা ঘরে জিনিষপত্রগুলি বন্দী করে রেখে সকলে ছুটলাম আরব সাগরে সূর্যাস্ত দেখতে। আমাদের আগে আরও জন-কতক বাঙালী ও আর্য্যাবর্তবাসী এসেছিলেন। তাঁরাও যাচ্ছিলেন।

এখানে স্থলভাগ ক্রমে সংকীর্ণ ঢালু হয়ে সমুদ্রে নেমে গেছে। কূলে ও কূল থেকে তফাতে জলমধ্যে বৃহদাকার শিলাখণ্ড এবং অর্দ্ধমগ্ন শৈল। সেগুলির গায়ে অবিরাম প্রচণ্ড বেগে ঘোর রবে তরঙ্গাঘাত হচ্ছে। জলের রঙে ও অস্থিরতায় বৈচিত্র্য স্পষ্ট। বঙ্গোপসাগরের জল নীলাভকৃষ্ণ ও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ, ভারত মহাসাগরের জল পাংশু ও কিছুটা শান্ত, আর আরব মহাসাগরের জল রক্তাভ ও ক্ষুদ্র তরঙ্গময়। বালুকার রঙও তিন সাগরকূলে তিন রকমের—নীলাভ-কৃষ্ণ, পাংশু ও রক্তাভ। কন্যাকুমারীর মন্দির এই তিনটি সমুদ্রের মিলনতটে। তার ফটকের এক পাশে একটি লোক অতিকায় শঙ্খ, ঝিনুক ও ঐ তিন রঙের বালু ইত্যাদির বেসাতি সাজিয়ে বসে আছে। পরে তার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হ'ল।

আরব সাগর-জলে একটি শিলাখণ্ডে বসে সূর্যাস্তের ছবি তুলে নিলাম। পূর্ণিমায় বঙ্গোপসাগরের নীলাভ-কৃষ্ণ জল থেকে চন্দ্রোদয় ও আরব সাগরের রক্তাভ বক্ষে সূর্যাস্ত একই সময়ে ঘটে। কিন্তু তখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। এই বিরল দৃশ্য দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটল না বটে, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণ আকাশে দেখলাম 'সাদারন ক্রশ' নামে নক্ষত্রপুঞ্জ যা দর্শন আমাদের উত্তরাঞ্চলবাসীদের কপালে ঘটে না। সূর্যাস্তের পরে সমুদ্রস্নানে সারাদিনের ক্লান্তি ও ক্লেদ দূর করে চললাম কন্যাকুমারীর বিগ্রহ দেখতে।

দেখলাম কন্যার মন্দিরটি বিশালও নয়, শিল্পে স্থাপত্যে অপরূপও নয়। কিন্তু ভিতরে পাষাণ-মণিকোঠায় রক্তগোলাপ ও শ্বেতচন্দনে সজ্জিত মর্মরমূর্তিটি শিল্পীর অতুলনীয় সৃষ্টি। অবর্ণনীয় তার করুণা, হাসি ও জিজ্ঞাসাভরা চোখ দুটির চাহনি। ঘৃতপ্রদীপের স্তিমিত আলোকে তার কপালের হীরকখণ্ডটি সন্ধ্যাতারার মত জ্বলছে। এই হীরকখণ্ডটির একটি ইতিহাস আছে। সেটি এবং কন্যাকুমারী সম্বন্ধে যে লৌকিক ও অলৌকিক দুটি কাহিনী আছে আপাততঃ তা এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। তবে লৌকিক কাহিনীটি বড় মর্মস্পর্শী এইটুকু মাত্র বলতে পারি।
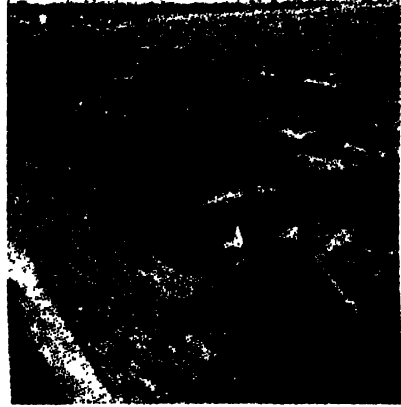
কন্যাকুমারীকার সাগরতটের একাংশ—বঙ্গোপসাগর

বিগ্রহদর্শনের একটি নিয়ম আছে। দর্শনার্থীকে যেতে হয় স্নানান্তে, গায়ে চাদর বা কাপড় জড়িয়ে বিগ্রহের সম্মুখে। অবশ্য আমাদের পুরুষদের তাই-ই করতে হয়েছিল। সেখান থেকে ছয় মাইল উত্তরে সুচিন্দ্রামের শিববিগ্রহ দর্শনের বেলায়ও এই নিয়ম, তবে স্নান করতে হয় না।

অনুপম শিল্পদর্শনে মনে যে ভাবোদয় হয়, তারই গভীর আনন্দভরা অন্তরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে হতে লাগল, ভারতের এই দক্ষিণতম প্রান্তে এসে আজকের সন্ধ্যাটি সুন্দর ও সার্থক হ'ল। একটি পরম মুহূর্ত জীবনে এসে দেখা দিয়ে গেল।

ফটকের ধারে যে শঙ্খাদির ব্যবসায়ীটি বসেছিল সে তার বেসাতির প্রতি হিন্দীতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা উভয় পক্ষই হিন্দী ভাষায় সমপারদর্শী। কাজেই নির্ভয়ে আলাপ করতে লাগলাম এবং পরস্পরের কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হ'ল না।

অতিকায় এবং বিচিত্রাকার শঙ্খ ও ঝিনুকগুলি দেখিয়ে লোকটি বললে, "এগুলো ভারত মহাসাগরের। এই কালো বালি বঙ্গোপ-সাগরের, সাদা বালি ভারত মহাসাগরের আর এই লাল বালি হিন্দু মহাসাগরের।"

জগতে সবই বদলাচ্ছে। তাই "আরব সাগর" "হিন্দু-মহাসাগরে" নামান্তরিত হয়েছে, কিন্তু আগের মতই তার আর্তরোল উঠছে।

সে জিজ্ঞেস করলে, "আপনারা কোন্ দেশী"?

বললাম "বাঙালী"।

সে বললে, "বঙ্গসাগরের জল বড় জোরে ঘা দেয়, ভারত-মহাসাগর তার চেয়ে কম জোরে দেয়, হিন্দুমহাসাগর তার চেয়ে কম জোরে।"
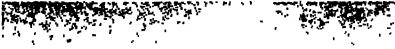
ত্রিচয় পাহাড়দুর্গে বা শৈলমন্দির-শীর্ষ থেকে শহরের একাংশ ও কাবেরী নদী

মনে হ'ল যেন বাংলাদেশটা সম্বন্ধে তার ধারণা কিছু উঁচু। সেটা যাতে থাকে সেজন্যে দেশের কথা আর বললাম না যে, বাংলার মাটির মত সাগরের জলও দু' ভাগ হয়ে গেছে, হয় নি কেবল ভাষা। ভাষাও নাকি জাতীয় জীবনে তেমন গুরুতর কিছু নয় এমনি একটা সংশিক্ষা দেবারও চেষ্টা কিছুদিন আগে হয়েছিল।

রাত্রে একটি হোটেলে আহারের সময়ে হোটেলওয়ালা বললে, "বাঙালী ভার্সিও খাত্তা নেই।" সম্ভবতঃ লোকটি তেমন বাঙালীর পাল্লায় পড়ে নি, অথবা তার নারকেল তেল ও মশলাবিহীন নিরামিষ ব্যঞ্জনই তাকে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে রক্ষা করে আসছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোন্ দেশের লোক?"

"আমার বাড়ি মাদুরাই। আমি ত্রিশ বছর এই হোটেল চালাচ্ছি। এখানে বাঙালীই বেশী আসে।" সম্ভবতঃ আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীদের মধ্যে বাঙালী যাত্রীর সংখ্যাই বেশী বলে সে ঐ কথা বলে থাকবে।

কূল থেকে কিছু তফাতে সমুদ্রমধ্যে যে শৈলগুলি সিন্ধুর বিরাম-হীন আঘাত সয়ে ভূভাগকে রক্ষা করছে সেগুলির মধ্যে বৃহদাকারটির নাম, "বিবেকানন্দ শৈল।" স্বামীজী নাকি সেটির শীর্ষে বসে ভারতের কল্যাণ-চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছতে গেলে কিছুটা জল ভাঙতে হয়। শৈলটিতে যাবার কালে স্বামীজী অক্টোপাসের আক্রমণে বিপদগ্রস্তও হন। গ্রামখানির রাজপথের ধারে স্বামীজীর নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বাঙালী যাত্রীরা প্রত্যেকেই তাতে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করে যান।

ফিরবার পথে সকালে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের ধারে বসে থাকতে থাকতে দেখি একদল বালক-বালিকা বই-খাতা-শ্লেট হাতে স্কুলে চলেছে। আমাদের দেশেও যেমন সেখানেও তেমনি তাদের খালি পা, গায়ে আধময়লা জামা ও প্যাণ্ট—শরীর অপুষ্ট। তবুও আনন্দে উল্লাসে কলরব করতে করতে চলেছে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ!

কুমারীকার ছ'মাইল উত্তরে সুচিন্দ্রাম গ্রাম। তার মন্দিরের অঙ্গনের একধারে ছিল প্রকাণ্ড রথ, কারুকার্য্যে সুন্দর। মন্দিরের মধ্যে এক জায়গায় রয়েছে কষ্টিপাথরের বিশাল হনুমানমূর্ত্তি। সালঙ্কার মূর্ত্তির মাত্র মুখখানি ও লেজটি তার জাতির পরিচায়ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানবীয়। শিল্পী তাকে ভক্তি ও অমিত শক্তির প্রতীকরূপে গঠন করেছেন। তার একখানি ছবি নিতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু স্থানীয় একজন বললেন, "ওর ছবি তুলতে পারবেন না। কেউ এ পর্যন্ত পারেন নি। এমনকি"—বলে এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর নামোল্লেখ করলেন—"তিনিও বারো বার চেষ্টা করেও পারেন নি।"

কর্ম্মচারীটির ভারতজোড়া নাম। তাঁর ক্যামেরাও নিশ্চয়ই বহুমূল্য। তিনি যখন বারো বারের চেষ্টায় বারো দশায় পড়েছিলেন তখন একবারের চেষ্টায় আমি সফল হব কি করে? তবে ফটো-গ্রাফার তফাতে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা পেলে এই হনুমানটি যুক্ত কর করে এলবাম ও পত্রিকার পাতা আলো করে দাঁড়াতেন!

ফিরতি-পথে নগরকোয়েলে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়ে গেল। আমার সঙ্গীরা তখন আহারে গেছেন, আর আমি মালপত্র আগলাচ্ছি। ভদ্রলোকটি বললেন, "মিঃ, আপনি বাঙালী?"

"হাঁ।"

"আমি তিন বছর কলকাতায় ছিলাম।"

"বটে!"

"আমাদের রান্না আপনার কেমন লাগছে? খেতে কষ্ট হচ্ছে?"

"না। চালাচ্ছি এক রকম।"

তিনি কথাটি শুনে বড় খুশী হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে বললেন, "কিন্তু আপনাদের রান্না আমি অতি কষ্টে খেতাম। তিন বছর খাওয়ার বড় কষ্ট ছিল। তখন থেকে আমার অসুখ হয়েছে।"

শুনে বড় কষ্ট হ'ল। তিনি আবার বললেন, "দেখুন, আমাদের রান্না আপনারা খেতে পারেন, কিন্তু আপনাদের রান্না—!"

ইচ্ছে হ'ল বলি, সবই তেলের গুণে। কিন্তু সঙ্গীরা তখনই

ফিরে এলেন এবং আমাকেও যেন টেনে খাদ্যের সন্ধানে যেতে হ'ল। কাজেই কথা আর বাড়ল না। তবে ক্ষুধা বাড়ল। কারণ, আমার পছন্দমত খাদ্য কোথাও পেলাম না। ফিরে এসে মনে করলাম বলি, "মিঃ, তুমি ত তবু আমার দেশে খেয়েছিলে। আর আমি যে না খেয়েই তোমার দেশ থেকে চললাম। তবে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। পথের দুঃখ পথেই রেখে গেলাম।"

এখান থেকে বাসে ত্রিবেন্দ্রাম যাওয়া যায়। ইচ্ছাসত্ত্বেও আর্থিক কারণে সে পথ ছেড়ে পূর্বপথেই আমরা ফিরে চললাম এবং টিনেভেলিতে পালামকোটায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুন্দর বাসভবনে মিনিট পনেরোর জন্যে আতিথ্যগ্রহণ করে আকাঙ্খায় নিয়ে দেশের পথ ধরলাম।

ভাবতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে ত্রিচিনপল্লী ও শ্রীরঙ্গমের বেদনাময় কাহিনীটি ভারতবাসীর বিশেষ করে দক্ষিণ দেশবাসীদের, জানা আছে। সেই ত্রিচিনপল্লীতে পৌঁছুলাম সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে এবং আশ্রয় নিলাম সিন্ধীদের ধর্ম্মশালায়। পশ্চিম পাকিস্থান থেকে যেসব সিন্ধী ভারতে চলে এসেছেন, তাঁদের এক অংশ আশ্রয় নিয়েছেন এই শহরে। তাঁদেরই একটি বিদ্যালয় এই বাড়িতে স্থাপিত হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ত এখানে লেখাপড়া শেখেই, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, বিশেষ করে মহিলারাও, শেখেন সেলাইয়ের কাজ। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ মহাশয় কেবল ধর্ম্মশালাটির তদারক করেন না, উঁচু ও সাজানো বেদীতে বসে ধর্ম্মশাস্ত্রও পাঠ করেন এবং ধর্ম্মোপদেশও দিয়ে থাকেন। সেটা দেখলাম পরে, কিন্তু তার আগে তাঁর সুমধুর মেজাজের পরিচয় লাভ করে ক্লান্ত ক্লিষ্ট পথিক আমরা পরম পুলকিত ও স্নিগ্ধ হলাম। সৌভাগ্য যে, যে হাত চার-পাঁচ জায়গায় আমরা ছ'টি দীর্ঘাকার মনুষ্য বিছানা-পত্র নিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলাম, সেখানে ছিলাম অল্পক্ষণই। বেশীর ভাগ সময়ই কেটেছিল পথে, মন্দিরে ও কাবেরী নদীর তীরে।

ত্রিচিনপল্লীর শৈলমন্দিরে উঠতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয় অনেকগুলি। মন্দিরটি দুর্গবিশেষ, উত্তর দিকে পরস্রোতা কাবেরী, ওপারে শ্রীরঙ্গম, মধ্যে ইংরেজের গড়া সেতু। সেতুপথে যানবাহন ও জনস্রোত চলেছে। এই শৈলদুর্গে ছিল টিপুর বারুদাগার এবং গায়ে এখনও যুদ্ধের চিহ্ন আছে। সঙ্গীরা দেখতে দেখতে উপরে উঠে স্বর্গলোকে অদৃশ্য হলেন। আমি অত তাড়াতাড়ি উঠতে পারলাম না, ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করতে করতে পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে দেখি এক সাধু তাড়াতাড়ি উঠে আসছে। তার বগলে বাঘ-ছাল, শীর্ণ শ্মশ্রু দেহে ভস্ম, পরণে কৌপীন, মাথায় দীর্ঘ পিঙ্গল কেশ। লোকটি কোন্‌ দেশীয় বুঝতে পারলাম না। সে উঠছে ঘুরে ঘুরে। আমার পাশ দিয়ে কয়েকটি সিঁড়ি উপরে উঠেই সে বার দুই পিছন ফিরে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যে, মনে হ'ল আমাকেও যেন তারই মত করে উপরে উঠতে ইঙ্গিত করছে। অগত্যা মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অতি আয়াসে একেবারে মন্দিরশীর্ষে উঠে গেলাম। শীর্ষদেশের খানিক নীচে একখানি সুবিশাল কক্ষে আছে কষ্টিপাথরের অনেকগুলি মূর্ত্তি এবং প্রত্যেকখানিকেই কাপড় পরিয়ে রাখা হয়েছে। শীর্ষে যে মন্দিরটি আছে তার মধ্যে কে বন্দী বা বন্দিনী হয়ে আছেন জানতে পারি নি। সেখান থেকে ত্রিচিনপল্লী নগর, কাবেরী নদী ও ওপারে নারিকেল-অরণ্যমাঝে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরের সু-উন্নত গোপুরম অতি মনোরম দেখায়। দৃশ্যের একখানি ছবিও নিলাম।

অতঃপর নেমে এসে সকলে বাসে চড়ে চললাম শ্রীরঙ্গম। অপরাপর তীর্থস্থানের মতই এখানেও মন্দির ও বিগ্রহ মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কাল্পনিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে—রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে যাবার পথে এখানে 'হল্ট' করেছিলেন। যাই হোক, শ্রীরঙ্গমের যে শিল্পীর অনুপম সৃষ্টি এতে আর সন্দেহ নেই। শিল্পীর সুগভীর ধ্যানেই তাঁর মানসলোকে এই অমিয়মাখা মুখখানি প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কে জানে এই মুখখানি রচনা করেও তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন কিনা। হয় ত তাঁর অন্তরে বেদনা ছিল যে, যা রচনা করলেন তার অন্তরলোকের সত্তাকে তা ঈষৎ স্পর্শও করতে পারল না!

মন্দির দর্শনার্থীরা সকলেই কাবেরীতে স্নান করেন। কলকাতার কলের জলের স্রোতই কলকাতাবাসীদের অধিকাংশেরই কাছে গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরীর স্রোতোধারা। এই ধারা নিয়ে এক বাড়ির বহু ভাড়াটে ও বস্তিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে এবং জীবনকে দুর্বিষহ তিক্ত করে তোলে। কর্পোরেশন আবার ধারাটিতে মাঝে মাঝে উচ্চ চাপ, নিম্ন চাপ ও বন্ধ এই তিন রকমের খেলা দেখান। সেই কলকাতার লোক আমরা ইতিহাস-খ্যাত ও কাব্য-কাহিনীতে কথিত কাবেরীর জলে স্নানের লোভ সামলাতে পারলাম না একালের বাংলার এক বিশিষ্ট কবির একখানি গানের দু'একটি কলিও মনে ছিল। কিন্তু গিয়ে দেখি, জলের স্রোত অতি প্রখর এবং নেমে দেখলাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দায়। প্রবল স্রোতে পায়ের তলা থেকে বালুরাশি সরে যাচ্ছে। এর কূলে বসে কোন বালিকা 'আনমনে চম্পা-শেফালিকা' ভাসাতে ভাসাতে জলে স্খলিত হয়ে ভেসে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। তখন তার পিতৃ-পিতামহেরও সাধ্য নেই যে তাকে উদ্ধার করে। তার উপর নদীটিতে কুমীরও আছে। কূলে বসে থাকলে কুমীরাক্রান্ত হবারও বিপদ যথেষ্ট। তবে কবির কল্পলোকে সবই সম্ভব। তীরে অনেক বড় বড় অচেনা গাছ দেখলাম, কিন্তু "চম্পা-শেফালিকা"র দেখা পেলাম না। অবশ্য দক্ষিণের কোথাও তাদের দেখা পাই নি। হয় ত নদীটির উজানে বা ভাটিতে কোথাও ফুটে বা ফোটবার অবস্থায় থাকবে।

এপারের ঘাট থেকে ওপারের ত্রিচির শৈলমন্দিরটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সানুদেশে ঈষৎ লোহিত কাবেরী স্রোত, শীর্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চরণশীল মেঘ, পিছনে নীল আকাশপট, রবিকরে উজ্জ্বল স্বর্ণচূড়া।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমার চার জন সঙ্গী চলে গেলেন তাঞ্জোর। ছাত্র-সঙ্গীটির সঙ্গে আমি প্ল্যাটফরমে বসে রইলাম। রেলগাড়ি তাঁদের নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আমরা দু'জনও তার

ঘণ্টা কয়েক পরে মাদ্রাজের পথ ধরলাম। তাঁদের আগেই আমাদের মাদ্রাজে পৌঁছবার কথা হলেও তাঁরাই পৌঁছে গিয়েছিলেন আমাদের আগে। রেলগাড়ির, বিশেষ করে জনতার কামরা আগে দখল করার সুবিধা কি তা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীমাত্রেই অবগত এবং বিলম্বে পৌঁছনোর দুর্ভোগের কথাও বোধ করি কারও অবিদিত নয়। সে কথা আর এখানে নাই বললাম।

বেজওয়াডায় পৌঁছে হাত-পা ছড়াবার বেশ জায়গা পাওয়া গেল আর পাওয়া গেল ত্রিবেন্দ্রামের এক ক্যানভাসারকে। লোকটি বাঙ্কে বিছানা পেতে তার পথের সঙ্গীটিকে বালিশের তলায় গুঁজে রাখল এবং ঘুমোবার আগে পর্য্যন্ত সেটিকে মাঝে মাঝে বার করে তার মধুপান করতে লাগল, কিন্তু মাতাল হ'ল না। সে ত্রিবেন্দ্রাম থেকে আরম্ভ করে দাক্ষিণাত্যের কথা পরম দাক্ষিণ্যে বলে গেল।

পরদিন দুপুরের দিকে দেখলাম অদেখা চিল্কাকে—সৌন্দর্য্যে ঝলমল করছে। তার নীল জল, বক্ষের বনাচ্ছন্ন বিচ্ছিন্ন শৈলগুলি, ধীবরদের পালতোলা নৌকা, দিগন্তবিলীন একটি অংশ, সব মিলিয়ে যেন ধরণীর বুকে আঁকা একখানি নৈসর্গিক ছবি। এ ছবিতে রঙ লাগানো আজও শেষ হয় নি। কিন্তু আমার কাহিনীটির এখানেই শেষ হ'ল, এবং শেষ কথাটি এই যে, মনোরম দক্ষিণের দেখলাম সামান্যই, তার অধিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের অভাবে দেশটিকে জানলামও অল্পই।*

* ছবিগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত।

ওগো মোর ভীরু প্রিয়

শ্রীবীথিকা দেবী

ওগো মোর ভীরু প্রিয়—
সুগোপনতার আড়ালে আমারে ফেলে
চলে যেয়ো নাক' বিস্মৃত অতলতায়
শুধু চুপি চুপি কাছে এসে হেসে খেলে
চলে যেয়ো ফের পাখীর মতন বিহ্বল বনলতায়।

কথা যদি নাই বল—
চোখে চোখে রেখে শুধু বসে থেকো আমার বনানীতলে,
ঝিল্লির ডাক থামবে যখন নির্জন বন হতে
নীল আকাশের গলে পড়া নীল আমাদের পদতলে
নীল নদ হয়ে বয়ে যাবে ও যে অন্ধকারের স্রোতে।

সেদিন আমার জেনো—
ফোটা ফুল হবে যত ছিল মোর আধফোটা কুঁড়িগুলি
দিনের আলোর বিদায় বেলায়, সাঁঝের অন্ধকারে।
ক্ষতি নেই কিছু যদি তুমি নাও সব ফোটা ফুল তুলি
রিক্ত শাখাই ফোটাবে কুসুম আর বার অভিসারে।

মূক হয়ে যদি থাকো—
কোন ক্ষতি নেই স্রোতে দু'জনেই ভেসে যাবো কোন দিকে,
মালতী বনের ফুলের কাঁপনে দখিনের সমীরণে
ওড়কলমীর ধাপে ঠেকে হবে আকাশের রঙ ফিকে;
ক্ষতি নেই কোন, শুধু তুমি আমি, এই কথা রবে মনে।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেয়ো মন—
নভ যদি হয় বিরহবিধুর সবুজ বনের পাতা
ফির ফির করে মৃদু মৃদু কাঁপে ধীরে;
হাতে হাত রেখো, নয়নে নয়ন, তরুতলে রেখো মাথা,
প্রেমগান যত গেয়ে যেয়ো ফিরে ফিরে।

অসম্ভব

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

এ কি রকম হ'ল! মরতে হয় তুই মর, না ওই কচি ছেলেটাকে নিয়ে টানাটানি কেন? আর তাও যদি করলি তবে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলে নিজে আবার ফিরে এলি কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে? মরণ, মরণ, অমন মুখে আগুন!

সমস্ত গ্রামটারই এই মত, বিশেষ করে মেয়েদের এবং তার মধ্যেও আবার মায়েদের। ব্যাপারটা হ'ল, মুখুজ্যেদের ছোট বৌটিকে কাল শেষ রাত্রির দিকে পাশের পুকুরে এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ধরেছিল গাঁয়ের চৌকিদার। কোলে তার মরা শিশু একটি, সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। চৌকিদার ভেবেছিল বৌটি মরা ছেলের শোকে পুকুরে আত্মহত্যা করতে এসেছিল, সে তাকে অনেক বুঝিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ব্যাপারটা এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক এবং হলেই ভাল ছিল কিন্তু শাশুড়ী তরঙ্গিনী গণ্ডগোল বাধালেন।

সকাল ভাল করে না হতেই পিল্ পিল্ করে মুখুজ্যে-বাড়ী লোকসমাগম হতে থাকে, গ্রামের বৈচিত্র্যহীন জীবনে এত বড় একটা সংবাদের লোভ সম্বরণ করা কঠিন। সান্ত্বনা—সেই বৌটির নাম—ভিজে কাপড়ে উঠানের এক কোণে লুটিয়ে পড়ে আছে, ছেলেটি নেই, বোধ হয় একটু আগেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তরঙ্গিনী বারান্দার উপরে একটা এলোমেলো ছেঁড়া মাদুরে বসে আছেন, চোখে-মুখে তাঁর নিদ্রার বিঘ্নজনিত বিরক্তির ছাপ পরিস্ফুট। মাঝে মাঝে আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইছেন, হয়ত কাল সন্ধ্যেবেলার ঝগড়ার কথাও চিন্তা করছেন।

কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা প্রবেশ করেই সোজা তরঙ্গিনীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন—বলি ব্যাপারখানা কি মঙ্গলের মা?

তরঙ্গিনী ক্ষিপ্রহস্তে ছেঁড়া মাদুরখানা যতদূর সম্ভব বিছিয়ে দিয়ে বললেন—এস, বস সব। আর বলো না, ব্যাপারটা কি আমিই ছাই বুঝছি না হাজারবার জিজ্ঞেস করলেও ও হতভাগী বলবে!

বর্ষীয়সীরা বিশ্বাস করলেন, তাকিয়েই রইলেন। তাঁরা বনে-জঙ্গলে বাস করেন না, তাঁদেরও ঘর-সংসার আছে। শাশুড়ী হয়ে বৌয়ের খবর রাখে না, অন্ততঃ এমন একটি ব্যাপারে এ অসম্ভব।

অবশ্য তরঙ্গিনীর এটা শুধু জমি প্রস্তুত করে নেওয়া, তার পরই বীজ ফেলতে থাকেন।

—পাগল পাগল বুঝলে দিদি, একেবারে বদ্ধ পাগল, নইলে এ কাজ ভালমানুষ করতে পারে। ভয় হয় ও কবে আমারই গলাটা টিপে দেবে।

বিচিত্র নয়। ছেলেকে যে নিজের হাতে মেরে ফেলতে পারে, সে পারে না সংসারে এমন কাজ নেই। এটা অন্ততঃ কাউকে বোঝাতে হয় না।

একজন প্রাচীনা একটু তফাতে সিঁড়ির উপরে বসে পড়েছিলেন। তাঁর কানে তরঙ্গিনীর কথাগুলো যাচ্ছিল বটে, কিন্তু চোখদুটো ছিল সান্ত্বনার দিকে। অবশ্য দেখা যাচ্ছে কেবল ভিজে কাপড়খানা, কিন্তু তার নীচে আছে দেহ এবং তারও নীচে আছে মন, যেখান থেকে শোকের তরঙ্গ উঠে একেবারে শেষ সীমানায় এসে কাপড়ের তটে এলো-মেলো ভাবে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ছে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে সেই দিকে চেয়ে নিজের মনে একরকম যেন শুনতে শুনতেই বললেন—না, বৌ, ঠিক পাগলামি ত মনে হচ্ছে না।

তরঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে কথাটা লুফে নিয়েই নিজের কপালে করাঘাত করে বললেন—তা হলে ত বাঁচতাম দিদি। কখন যে মাথাটা গোলমাল হয় কেউ বলতে পারে না, তা না হলে এমনিই। বলি, ও বৌ, কাপড়টা ছেড়ে এস যাও নইলে ভুগতে ত হবে শেষকালে এই আমাকেই। আমার যত হয়েছে ভুতের বোঝা আর কি!

সান্ত্বনা তেমনিই পড়ে রইল। কাপড় এমনিতেই শুকিয়ে উঠতে থাকে।

মঙ্গলময় শহরের এক ছোট মণিহারী দোকানের অল্প মাইনের একজন বিক্রেতা। মুখুজ্যেরা আগে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার ছিল, পরে নানাবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান এই পতনদশায় এসে দাঁড়িয়েছে। সংসারটাও আগে ভরাট অবস্থায় ছিল, বাপ কাকা জ্যেঠা নাতি-নাতনী সব নিয়ে সে এক জমজমাট ব্যাপার। কিন্তু সে ছিল জমি-জায়গার কল্যাণে। মাটির সে স্নেহশক্তি আর নেই, সব বিক্রি হয়ে গেছে, তাই এখন জীবিকার খোঁজে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে খোঁজ রাখাই দায়। কেবল মঙ্গলময় এখনও গ্রামে

টিকে আছে, হয়ত ছিটেফোঁটা জমি এখনও আছে কিংবা বাইরে যাওয়ার সুযোগের অভাব, কিংবা হয়ত তরঙ্গিণীর ভিটেমাটির আকর্ষণ এবং সেই সঙ্গে মঙ্গলের মায়ের প্রতি আকর্ষণ। অর্থাৎ এ এমন এলোমেলো ব্যাপার যে সবই হতে পারে, আবার সঠিক কেউই বলতে পারে না।

সম্প্রতি মঙ্গলময় একটু মুশ্‌কিলে পড়েছে। কাল সে জেলার সদরে গিয়েছিল কতকগুলি মাল কিনতে। কলকাতায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে কিছু সুবিধা পাওয়াতে এই ব্যবস্থা। যাই হোক, আজ সকালে ফিরে এসে মালিকের কাছে মাল ও টাকার হিসাব মিলিয়ে দিতে গিয়ে কি রকম হঠাৎ গোলমাল বেধে গেল, দু'টাকা বারো আনার হিসাব কিছুতেই মিলল না।

মঙ্গলময় ভদ্রবংশের ছেলে, বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। মালিক সহসা কিছুই বললেন না বরং এমন ভাব দেখালেন যে, হারিয়েও ত যেতে পারে। কিন্তু মঙ্গলকে অত্যন্ত বিব্রত মনে হ'ল, কারণ তার যা অভাবের সংসার তাতে হারিয়ে যাওয়াটাই যে কি রকম দেখায়!

এই ভাবে ইন্টেপাল্টে নানা ভাবে মিলিয়ে দেখিয়ে পরিশ্রান্ত হৃদয়ে মঙ্গল বাড়ী ফিরছিল। চোখে মুখে তার যন্ত্রচালিতের মত নির্বিকার চাহনি, কিন্তু তবু যেন মনে হয় কি একটা হিসাব সে তখনও করেই চলেছে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ তার মুখের ভাবটা বদলে গেল, সে একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ময়লা ছেঁড়া কোটটার পকেটে হাত ভরে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে একটা বড় কৌটামত জিনিস বার করে ফেলল! ভাল বিলিতী দুধগুঁড়োর কৌটো। মঙ্গল অত্যন্ত আদরে সুদৃশ্য কৌটোটির গায়ে হাত বুলোয় আর হাঁটে। চারিদিক নিঃশব্দ, শুধু তার শতছিন্ন চটিটা যেন একরকম অদ্ভুত প্রতিবাদ করতে করতে ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে চায়।

তার পরের দৃশ্য। মঙ্গল মায়ের অদূরে বারান্দায় বসেছে, সান্ত্বনা তেমনিই পড়ে আছে। সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই হয় নি। তরঙ্গিণী বোধ হয় থামে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। মঙ্গলের পদশব্দে সচকিত হয়ে উঠে বসে যা বলার সমস্ত শেষ করে সম্প্রতি আবার হেলান দিয়ে বসেছেন। মঙ্গল উনা কিছুই বলে নি, কারণ এসব বিষয়ে বলারই বা কি আছে!

অনেকক্ষণ পরে কিছু বলতেই হবে এমনিভাবে সে আস্তে আস্তে বলে—কাল রাগারাগি হয়েছিল বুঝি?

এবারে তরঙ্গিণী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, কোলাহল করে বলে উঠেন—হ্যাঁ, আমি ত সংসারে সবাইকে মারধোর করবার জন্যই জন্মেছি। বলি, যাদের ভাত জোটে না তাদের আবার দুধের সখ কিসের? ভাত খেয়ে কি বাঁচত না? অত বড় ছেলেটা দিদি ত শেষকালে জল খাইয়ে মেরে—বলতে বলতে এবার তিনি সত্যিই কেঁদে ফেলে চোখে আঁচল চাপেন।

মঙ্গল হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ল। কোন কিছু না পেয়ে মিছিমিছি হাত দু'খানা কোটের দুই পকেটে চালান করে দিয়ে ঘাড় সোজা করে উঁচু হয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে ঠেকল তার দুধের কৌটোটি আর মনে পড়ল তরঙ্গিণীর শেষ কথাটি। যোগাযোগ বটে! তাই ত, ভাত যে খেতে পারে না এবং দুধ যে পায় না, তার জল ছাড়া উপায় কি! সে হঠাৎ কি ভেবে চোখ তুলে তাকাল সান্ত্বনার দিকে, ভাবল, কিন্তু ও ফিরে এল কেন? প্রাণের মায়ায়? হঠাৎ এই খুনী বৌটির জন্য মঙ্গলের কি রকম যেন মমতা হয়, আর হাতটা কেবলই কৌটোর ওপরে ঘামতে থাকে। কলঙ্কের কথা বৈকি! কিন্তু খোকা তাকে অন্ততঃ একটি লজ্জার হাত হতে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। কালই সে দুধের কৌটোর হিসেব মিলিয়ে দিয়ে আসবে।

তরঙ্গিণী কিছুটা সামলে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বাছা আমার কিছুতেই মরত না, সে তোমরা যাই বল আর যাই বল।

এ কথায় মঙ্গলের কেমন গোলমাল বেধে যায়। সে অল্প-স্বল্প মাথা নাড়ে, কিন্তু কথা দুটো কিছুতেই মেলাতে পারে না—যদি নাই মরবে তবে মরল কেমন করে?

মঙ্গলদা! ও মঙ্গলদা! বাড়ী ফিরেছ নাকি? বাইরে কার ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

মঙ্গল চোর-ধরা-পড়ার মত হাতদুটো পকেট হতে বাইরে এনে একটু সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বলে—কে, ও?

কণ্ঠস্বর ততক্ষণে একেবারে দোরগোড়ায়, বলে—আমি তিনু, একটু পুকুরের দিকে গেছলাম। প্রসন্নকাকা তোমায় পাঠিয়ে দিতে বললেন, ওখানে পুলিস এসেছে নাকি। তুমি এগোও, আমি এই মাছ দুটো রেখে কাপড়টা বদলে এখুনি আসছি। যাও দেরি করো না—বলতে বলতে সে চলে গেল।

পুলিস! তরঙ্গিণী, মঙ্গল ও সান্ত্বনা একই সঙ্গে চমকে উঠে বসে পরস্পরের পানে চাইল। এবার আর দুধের গুঁড়ো আর চোখের জল নয়, সাক্ষাৎ পুলিস!

সান্ত্বনার চোখদুটো কি লাল, মুখখানা কি বিকৃত এবং এই নতুন বিপদের সম্ভাবনায় তাকে কি পরিমাণ কাতর দেখাচ্ছে। মঙ্গল তাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়েই উঠে পড়ে। চটিটা আলগা হয়ে পড়েছিল, সে দুটোকে পায়ে

ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সমস্ত শরীরটাকে নাড়া দিয়ে যতটুকু পারে ধুলো ঝেড়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধা সঙ্কোচও।

তরঙ্গিনী তার ভাবটা বুঝে চকিতে দাওয়া ছেড়ে প্রায় একলাফে তার সামনে এসে ব্যাকুল ভাবে বলে—তুই যাস নে মঙ্গল, তুই যাস নে। ওখানে গেলে ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে যাবে। বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর গলার জোর বেড়ে যায়, প্রায় শাসনের ভঙ্গিতে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে—আর কি এমন হয়েছে, এখানে আসুক না একবার, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওঃ ভাত-কাপড়ের ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই! ভারি বাহাদুর!

মঙ্গল একটু ম্লান হেসে বলে—কিন্তু এখানে ত আসবে না মা। বলে সে দরজার দিকে আরও দু'পা এগোয়। কিন্তু মুশকিল হ'ল তার দুধের কৌটোটি নিয়ে। না পারে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে, কারণ কোথায় যেন বাধ-বাধ ঠেকে, আর না পারে মা-বৌয়ের সামনে বার করে রাখতে। সে কেবলি পকেটে হাত ভরতে থাকে আর এদিক ওদিক তাকায়।

সান্ত্বনা কি বুঝল সেই জানে, কিন্তু সে আর থাকতে পারে না, একদৌড়ে এসে স্বামীর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ফেলে বলে—ওগো আমায় সঙ্গে নিয়ে চল, আমি যাব।

মঙ্গল তার মনের ভাব বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বেদনায় দু'হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনাকে উঠিয়ে আস্তে আস্তে বলে—পাগল! কোন ভয় নেই তোমার, আমি সব জানি। মা তুমি একে একটু ধর ত—বলতে বলতে সে ধুলো-কাদামাখা বিভ্রান্ত পত্নীকে মায়ের দিকে একটু এগিয়ে দেয় এবং এবারে সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে দুধের কৌটোটা বার করে তরঙ্গিনীর হাতে দিয়ে বলে—আর এটাও একটু ধর।

কৌটোটা দেখেই শাশুড়ী ও বৌ দু'জনেই চমকে উঠল, কারণ এর চেহারা অতি পরিচিত। মঙ্গল সেটা বুঝেও সহজ ভাবেই বলল—ওটা সাবধানে রেখো, কাল দোকানে নিয়ে যেতে হবে।

প্রকাণ্ড বাড়ী। জমিদার প্রসন্ন গাঙ্গুলী কাছারিবাড়ীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন, আশেপাশে কয়েক জন লোক বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল। মঙ্গল পুলিসের দিকে নজর রাখতে রাখতে একেবারে তাঁর সামনে এসে পড়ল। প্রসন্নবাবু ওকে দেখে সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং ভারিক্কী সুরে বললেন—হ্যাঁ বল্‌ ত মঙ্গল, ব্যাপারখানা কি। যা শুনছি তা ত ভাল মনে হচ্ছে না।

মঙ্গল ভাবছিল পুলিসের কথা, চুপি চুপি বলল—বলছি কাকা, কিন্তু পুলিসের লোক কোন দিকটায়?

পুলিস? পুলিস আবার কোথায়। ও হো বুঝেছি। তা বাপু যা ব্যাপার তাতে পুলিস আসতেই বা কতক্ষণ? নে, বল দেখি খুলে এবার। বলে প্রসন্নবাবু আবার আরাম করে চেয়ারে গা ছড়িয়ে দিলেন।

মঙ্গল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। একটু দম নিয়ে এবার সে সম্পূর্ণ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে—ও কিছু নয় কাকা, ছেলেটা পরশু বিকেল হতেই কেমন করছিল। ও যে হবে সে একরকম জানাই ছিল।

তবে যে শুনছি অন্য রকম—বলে প্রসন্নবাবু একটু যেন সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকান। আশপাশের লোকেরাও পরস্পর একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করে।

কিন্তু মঙ্গলের দৃষ্টি একটুও কাঁপে না, সে একরকম নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গেই জবাব দেয়—ওর আর রকম কি আছে কাকা, ওইটুকু ত জান।

তাই ত। প্রসন্নবাবু সহসা আর কিছু বলার খুঁজে পান না। একটু পরে বলেন—যাক না হলেই ভাল। আরে, আমি তখনই বলেছিলাম, এ হতেই পারে না। একি একটা কথা হ'ল, না মানুষে ঐ রকম কখনো করে—বলে তিনি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে থাকেন।

পৃথিবী প্রসঙ্গ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

আমাদের পৃথিবী সৌরপরিবার-ভুক্ত নবগ্রহের মধ্যে গণনীয়। এই মেদিনী মহাশূন্যে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তিই পৃথিবীকে দীর্ঘবৃত্তাকার কক্ষপথে চলিতে বাধ্য করিয়াছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী গড়ে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে পৌঁছিতে আট মিনিট সময় লাগে। সূর্য্যই মধ্যস্থলে স্থির রহিয়াছে আর পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ উহার চারিদিকে বিচরণ করিতেছে—এই সত্য পাশ্চাত্ত্যে সর্ব্বপ্রথম পোলাণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেন।

এই পৃথিবী যে বিরাট বলের মত গোল তাহা প্রাচীন কালেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন, সূর্য্য ও চন্দ্রের আকৃতি গোল এবং গ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয় তাহাও বৃত্তাকার—সুতরাং একান্ত স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবী গোলাকার। ভারতবর্ষেও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট, ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যান যে, ভূমণ্ডলের গঠন গোলকাকার। ইহা ছাড়া, পৃথিবীর আকার সম্পর্কে অন্যান্য অনেক আধুনিক প্রমাণ আছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ইজিপ্টে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বিখ্যাত ভৌগোলিক ও গ্রন্থাগারিক ইরাটস্থিনিস (খ্রীঃ পূঃ ২৭৫-১৯৪) মাপিয়া দেখেন—পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫,০০০ মাইল। ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঈষৎ চাপা ও মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ স্ফীত। প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ নাবিক ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান (১৪৭০-১৫২১) ১৫১৯ সনে প্রথম জাহাজে করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

বৈজ্ঞানিকদের হিসাবে বসুন্ধরার ওজন ছেষট্টির পরে কুড়িটি শূন্য বসাইলে যত বড় সংখ্যা হয়, তত টন—এক টন ২৭ মণের সমান। এই ধরণী সর্ব্বদা সমস্ত বস্তু নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহাকেই মাধ্যাকর্ষণ বলে। স্যর আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করেন।

পৃথিবীর গতি প্রধানতঃ দুই প্রকার—দৈনিক ও বাৎসরিক। ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে বা এক দিনে পৃথিবী নিজের চারিদিকে একবার আবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে অবনীর অর্দ্ধেক ভাগ একবার করিয়া সূর্য্যের আলো পায় এবং অপর অর্দ্ধেক ভাগ অন্ধকারে পড়িয়া যায়। যে অংশ যখন সূর্য্যের আলো পায় সে সময় সেখানে দিন এবং অন্য অংশ অন্ধকারে থাকার জন্য সেখানে তখন রাত্রি। দৈনিক গতি ছাড়া পৃথিবীর বাৎসরিক বেগও রহিয়াছে। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এই পরিভ্রমণকাল আমাদের এক বৎসর। এই সময় পৃথিবীর গতিবেগ সেকেণ্ডে সাড়ে আঠার মাইল। সাধারণতঃ ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ধরা হয়। চার বৎসর অন্তর অতিরিক্ত পৌনে ছয় ঘণ্টা যখন জড়ো হইয়া এক দিনে পরিণত হয়, তখন উহা ২৮ দিনের ফেব্রুয়ারী মাসে যোগ দিয়া ২৯ দিন করা হয়। এই সব বৎসরকে 'লীপ ইয়ার' বলে।

পৃথিবী সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হয়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-প্রদেশে সূর্য্যকিরণ তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হয়। সেজন্য ধরিত্রীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত হিমশীতল ও চিরতুষারের রাজ্য। তথাপি অনেক বাধাবিপত্তি ও তীব্র শীত উপেক্ষা করিয়াও ১৯০৯ সনে কমাণ্ডার পিয়ারী উত্তর মেরুতে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন আর ১৯১১ সনে এমাণ্ডসেন দক্ষিণ মেরু অভিযান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা বিষুবমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি অধিকাংশ সময় সোজাভাবে পড়ে, এজন্য এই প্রদেশ সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। হিমমণ্ডল ও তাপমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী স্থানকে সমমণ্ডল বলা হয়।

পৃথিবীর অক্ষ সোজা না থাকিয়া সাড়ে তেইশ ডিগ্রী হেলিয়া আছে, ইহার জন্য সূর্য্য-পরিক্রমণকালে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়। বৎসরের যে সময় উত্তর গোলার্দ্ধ সূর্য্যের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া গিয়া অতিরিক্ত আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করে তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সেই সময় শীতকাল। আবার অন্য সময় পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ সূর্য্যের দিকে বেশী হেলিয়া গেলে সেই অঞ্চলে গ্রীষ্মঋতু হয়, আর উত্তর অংশে সেই সময়ে খুব অল্প সৌরতাপালোক পড়ার জন্য শীতঋতু থাকে। আমাদের দেশে এই দুই ব্যাপারকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলা হয়। শীতকালে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হয় আর গরমকালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। শরৎ ও বসন্তকালে পৃথিবীর অবস্থান এ রকম থাকে যে, তখন উভয় গোলার্দ্ধে প্রায় সমভাবে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়। এই সময় দিনরাত্রি অনেকটা সমান থাকে এবং আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হয়।

পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, ইহার নাম চন্দ্র। চন্দ্র সাড়ে সাতাশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে এক বার ঘুরিয়া আসে। গগন-পর্য্যটনকালে কখনও কখনও চন্দ্র, পৃথিবী এবং সূর্য্য এক পংক্তিতে আসিয়া যায়, ইহার ফলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর গিয়া পড়ে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। আবার চন্দ্র চলিতে চলিতে কোন সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যে আসিয়া পড়ে, চন্দ্র যখন এইরূপে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তখন আমরা সূর্য্যগ্রহণ দেখি।

পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাড়ে পাঁচ অর্থাৎ সম-আয়তন একটি জলের গোলক অপেক্ষা পৃথিবী সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী। অথচ পৃথিবীর উপরিভাগে যে সমস্ত শিলারাশি পাওয়া যায় তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব গড়ে মাত্র ২·৭। সেজন্ত অনেক বিজ্ঞানীর মত পৃথিবীর অভ্যন্তরে লৌহের মত কোন গুরুভার পদার্থ সঞ্চিত আছে, কারণ লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭·৫। পৃথিবীর ব্যবহার বিরাট চুম্বকের মত, সেজন্ত চৌম্বক-শলাকা বা কম্পাস-কাঁটা সদাই উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে।

পৃথিবীর উপরে উচ্চ পর্বত ও সমতল ভূমি রহিয়াছে আর নিম্নভাগে জল জমিয়া বিশাল সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীই বায়ুমণ্ডল দিয়া ঘেরা। পৃথিবীর উপরটা তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। স্থলের পরিমাণ ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গমাইল আর জলের ব্যাপ্তি ১৩,৯৪,৪০,০০০ বর্গমাইল। সাগর-জল হইতে স্থলভাগের উচ্চতা সাধারণতঃ তিন হাজার ফুট। সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বতচূড়া মাউণ্ট এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। প্রশান্ত মহাসাগরে এক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ৩৫,৪০০ ফুট নির্ণীত হইয়াছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্থানের ব্যবধান ১২ মাইল।

এখন পাতালের বিষয় আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে উপরিভাগ ৪,০০০ মাইল হইবে। উপরকার ভূপৃষ্ঠ মাত্র ৪০ মাইল পুরু, এই স্তরে আবহাওয়া আক্রান্ত আগ্নেয় প্রস্তর বাসাল্ট ও গ্রানাইট আছে। ধরাপৃষ্ঠের শিলাসমূহ বিশ্লেষণ করিলে সাধারণতঃ এই সকল মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়—অক্সিজেন শতকরা ৪৭ ভাগ, সিলিকন শতকরা ২৮ ভাগ, এলুমিনিয়াম শতকরা ৮ ভাগ, লৌহ শতকরা ৫ ভাগ, ক্যালসিয়াম শতকরা ৩·৫ ভাগ, ম্যাগ্নেসিয়াম শতকরা ২ ভাগ, সোডিয়াম শতকরা ২·৫ ভাগ, পোটাসিয়াম শতকরা ২·৫ ভাগ, অঙ্গার, ক্লোরিণ ইত্যাদি শতকরা ১·৫ ভাগ। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল খুব সম্ভব লৌহ ও নিকেলে গঠিত তরল এক গোলক, উহার উপর লৌহ ও শিলাসংযুক্ত নমনীয় ও নিরেট এক আবরণ, তাহার উপর কঠিন প্রস্তরের খোলা। মানুষ এ পর্যন্ত মাত্র পৌনে দুই মাইল গভীর খনি খুঁড়িতে সক্ষম হইয়াছে।

পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হইলেও ভিতরটা এখনও খুব গরম। আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত উত্তপ্ত ও গলিত শিলাস্রোত এবং ভূগর্ভনির্গত উষ্ণ প্রস্রবণ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের পরিচয় দেয়। বীরভূম ও রাজগীর অঞ্চলে গরম জলের ঝরণা অনেকেই দেখিয়াছেন। আসলে এই সব জায়গায়—উপরকার জল এক দিক দিয়া মাটির খুব নীচে প্রবেশ করে আর সেখান হইতে গরম হইয়া অন্য পথ দিয়া আবার উপরে উঠিয়া আসে। মাটি খুড়িয়া নীচে নামিলে কিছুদূর পর্যন্ত প্রতি ৬০ ফুট অন্তর এক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা বাড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সূর্যের একাংশ কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী এক জলন্ত গ্যাসের ঘূর্ণমান পিণ্ড ছিল, ইহা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল পরে কঠিন অবস্থা লাভ করিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবী ঘিরিয়া বায়ুর যে আবরণ রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে এই সব গ্যাসের অস্তিত্ব জানা যায়—অক্সিজেন শতকরা ২১ ভাগ, নাইট্রোজেন শতকরা ৭৮ ভাগ, আরগন,কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলবাষ্প প্রভৃতি শতকরা ১ ভাগ। এই বায়ুরাশি সম্ভবতঃ ধরাপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদধিক দুই শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। তাহার পর মহাশূন্য। দক্ষিণ আমেরিকার কণ্ডর নামক শকুনপক্ষী আকাশে চার মাইল উচ্চে উড়িতে পারে, আর কোন জীবই এত উর্দ্ধে যাইতে পারে না। এরোপ্লেনে করিয়া আকাশে উঠিলে কিংবা কোন পর্বতচূড়ায় আরোহণ করিলে বেশ শীত বোধ হয়। প্রতি হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিলে তিন ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা কমিয়া যায়। এই নিয়ম কিন্তু দশ মাইল অবধি খাটে, তাহার পর কিছু দূর পর্যন্ত তাপমান স্থির থাকিয়া আবার কোন অজ্ঞাত কারণে বাড়িতে আরম্ভ করে।

সূর্যতাপে ভূমিসংলগ্ন বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে আর অন্য স্থান হইতে শীতল বাতাস আসিয়া শূন্য স্থান পূরণ করে, এইরূপে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। সাধারণ অবস্থায় বাতাসের গতি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল, ঝড়ের সময় বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল পর্যন্ত হইতে পারে। দুই শত মাইল উচ্চ বায়ুর স্তূপ সমতল স্থানের প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের ওজনের চাপ দিতেছে। ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর চাপ মাপা যায়। সাগরতলে ব্যারোমিটারে পারদের দৈর্ঘ্য ত্রিশ ইঞ্চি থাকে। যত উপরে উঠা যায়, বায়ুর চাপ তত কমিয়া যায়। উর্দ্ধে প্রতি হাজার ফুট অন্তর ব্যারোমিটারের পারা এক ইঞ্চি করিয়া নামিয়া আসে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুস্রোত সর্বদা উচ্চচাপ হইতে নিম্নচাপের দিকে ধাবিত হয়, এজন্য প্রবল ঝড়ের আগে বাতাসের চাপ হঠাৎ কমিয়া যায়।

মেঘ-বৃষ্টির কারণও সূর্যের উত্তাপ। প্রখর সূর্যতাপে সমুদ্রের জলরাশি বাষ্প হইয়া আকাশে গিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং তাহাই আবার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িয়া নদ-নদী দিয়া পুনরায় সাগরে প্রত্যাবর্তন করে। বৃষ্টিজলের কিয়দংশ ছিদ্রময় মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও নীচেকার নিশ্ছিদ্র শিলাশ্রেণীর উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকে, সেজন্য মাটি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। আকাশে যে স্তর-মেঘ দেখা যায় তাহার উচ্চতা আধ মাইল কিন্তু স্তূপ-মেঘ এক মাইল উপরে অবস্থান করে, আর অলক-মেঘের অবস্থিতি প্রায় সাত মাইল উর্দ্ধে। ইহার উপরে যে বায়ুস্তর আছে তাহা ঝড়বৃষ্টিশূন্য ও প্রশান্ত।

প্রায় কুড়ি মাইল উচ্চে উষ্ণ ওজন (Ozone) গ্যাসের যে স্তর আছে, তাহা শব্দতরঙ্গ প্রতিহত করে। আবার ৬০ মাইল উচ্চে হেভি-সাইড-কেনেলী স্তর নামক এক বিদ্যুৎকণাপূর্ণ স্থান আছে, উহার পরে ১৭০ মাইল উর্দ্ধে দ্বিতীয় আর এক বৈদ্যুতিক

স্তর রহিয়াছে, ইহাকে এপল্টন স্তর বলা হয়। উভয় বৈদ্যুতিক স্তরই অত্যধিক রেডিওতরঙ্গ প্রতিহত করে। খুব উচ্চ পর্বত-চূড়ায় আরোহণ করিলে কিংবা উর্দ্ধাকাশে উঠিলে প্রথমে তীব্র শীত-বোধ হয় আর বাতাসের চাপ হ্রাস হওয়ায় ও অক্সিজেনের অংশ কমিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাসের বড় কষ্ট হইতে থাকে। তথাপি ১৯৩৫ সনে ক্যাপ্টেন ষ্টিভেন্স ও এণ্ডার্সন নামক দুই জন অসমসাহসী আমেরিকান বৈমানিক বেলুনে করিয়া প্রায় চৌদ্দ মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন।

সমুদ্রে যে বিশাল জলভাণ্ডার আছে তাহার মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। সাগরজলে শতকরা প্রায় সাড়ে তিন ভাগ বিভিন্ন লবণজাতীয় পদার্থ দ্রব অবস্থায় আছে। বায়ুর সহিত সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রের জলে অনবরত ঢেউ হয়। প্রচণ্ড ঝটিকার সময় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উচ্চ এবং প্রায় পাঁচ শত ফুট দীর্ঘ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাগর-তরঙ্গ বেলাভূমির উপর আছড়াইয়া পড়ে আর শিথিল শিলাসমূহ অপসারিত করে। সমুদ্রের গভীরতা গড়ে বার হাজার ফুট। ১৯৫৪ সনে দুই জন ফরাসী নৌ-বিভাগীয় অফিসার—জর্জ্জ ও পিয়ারী উইলিয়াম, ইস্পাত-নির্ম্মিত গোলকে বসিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে আড়াই মাইল নীচে নামিয়াছিলেন। সমুদ্রের যত নীচে নামা যায়, জলের চাপ তত বাড়িতে থাকে। দড়ি, কাঠ কিংবা কর্ক গভীর সাগরে নিমজ্জিত করিলে প্রবল চাপের ফলে পিষ্ট ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ উপর হইতে নীচে দশ গজ অন্তর জলের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের করিয়া বাড়িতে থাকে। এক মাইল নিম্নে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে সাতাশ মণ ওজনের জলের চাপ পড়ে। জলমধ্যস্থ মৎস্যাদি প্রাণী এই বিপুল চাপ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না, কারণ ইহাদের শরীরের ভিতরকার চাপ বাহিরের জলচাপকে সমানভাবে প্রতিরোধ করে। সমুদ্রের তলায়ও বহুরকম জীব বাস করে।

ঠাণ্ডা জল ঘন হইয়া নীচে নামিয়া যায় আর গরম জল স্ফীত হইয়া উপরে উঠিয়া আসে, তাপের তারতম্যের জন্যই সাগর-স্রোতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের তলার জল প্রায় তুষার-শীতল, উপরকার জলের তাপমাত্রা ৪০°—৮০° ফারেনহাইট থাকে। সূর্য্যের আলোক সাগরের নীচে বেশী দূর যাইতে পারে না। জলের ভিতর সাদা আলোকের গতি সচরাচর এক শত গজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহার পর অত্যন্ত অন্ধকার আরম্ভ হয়। এই জন্য অনেক সামুদ্রিক জীবের শরীরে জোনাকির মত স্বাভাবিক আলো জ্বলিবার ব্যবস্থা আছে।

চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য সাগরজল দিনে দুই বার স্ফীত হইয়া উঠে, ইহাকেই জোয়ার আসা বলে। এক জায়গায় যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তখন অন্য স্থানের জল কমিয়া ভাটার সৃষ্টি হয়। এইরূপে জোয়ার ও ভাটা প্রায় ছয় ঘণ্টা অন্তর হইতে থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় চন্দ্র-সূর্য্য ও পৃথিবী অনেকটা এক পংক্তিতে থাকে সেই জন্য তখন উভয়ের সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে জোয়ারের জোর বেশী হয়। অপর সময় সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমকোণে থাকিয়া পৃথিবীর জলরাশিকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকর্ষণ করে, সেজন্য সে সময় জলস্ফীতি কম হয়।

পৃথিবীর উপরকার আদিম আগ্নেয় শিলা ঝড়-বৃষ্টি এবং শীত ও সূর্য্যতাপের প্রভাবে ক্রমশঃ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া শেষে মাটিতে পরিণত হয়। মাটির প্রধান উপাদান জলযুক্ত এলুমিনিয়াম সিলিকেট। জল, বায়ু ও শীতোত্তাপের প্রভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং চূর্ণীকৃত শিলারাশি হয় সেখানেই থাকিয়া যায়, নয় ত জলস্রোতের সহিত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। ইহা ছাড়া ধূলি ও বালুকণা বায়ু-বাহিত হইয়া স্থানান্তরে গমন করে। এক জায়গায় ক্ষয়িত শিলা—জল বা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া অন্যস্থানে অনবরত সঞ্চিত হইতেছে। পর্ব্বতাগত নদীর জল ঢালু জায়গা দিয়া গড়াইয়া গিয়া সাগর-সমীপবর্ত্তী মোহনায় অবিরাম প্রস্তরচূর্ণ ও মৃত্তিকাকণা নিক্ষেপ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস ও গঠনের কার্য্য যুগপৎ চলিতেছে। হিমালয়ের শিলা ক্ষয় হইয়া গাঙ্গেয় সমভূমি ও বঙ্গদেশ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই সব স্তরে স্তরে সঞ্চিত শিলাচূর্ণকে পাললিক প্রস্তর বলে। আর উত্তপ্ত গলিত অবস্থা হইতে যে শিলা ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়াছে তাহার নাম আগ্নেয় অশ্ম। চাপ ও তাপের প্রভাবে পাললিক শিলা কখনও কখনও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন উহাকে রূপান্তরিত শিলা বলা হয়। যেমন শেল নামক কাদা পাথর পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্লেট পরিণত হয়। মর্ম্মর-প্রস্তর রূপান্তরিত চূণাপাথর ছাড়া আর কিছু ই নয়।

প্রায় দেড় হাজার বৎসরে পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ এক ফুট আন্দাজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন সমগ্র ভূমিভাগ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, তেমনই সমুদ্রের উপকূলে উহার অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া নদ-নদী হইতে অনবরত পলি পড়িয়া সাড়ে সাত শত বৎসর অন্তর এক ফুট করিয়া নূতন ভূভাগ গঠিত হইতেছে। জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, শীত, সূর্য্যতাপ, ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিসঙ্কোচের ফলে সারা পৃথিবীময় বিরাট পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কখন কখন কোথাও কোন ভূভাগ পার্শ্বচাপের ফলে উপরে উঠিয়া যায়, যেমন হিমালয় পর্ব্বত পাঁচ কোটি বৎসর পূর্ব্বে টেথিস নামক সাগরতল হইতে উত্থিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ হিমালয়-শীর্ষে অনেক-রকম সামুদ্রিক জীবের ছাপ, কঙ্কাল ও প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন সময় হয়ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ বেশ খানিকটা নীচে বসিয়া গেল। সুইডেনের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী সাগরজলে প্রাচীন যুগের ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট নিমজ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। ১৮১৯ সনে ভূমিকম্পের পর কচ্ছ উপসাগরের বেলাভূমি সমুদ্রজলে অনেকখানি নামিয়া যায়।

ভূকম্পন বিভিন্ন কারণে সঙ্ঘটিত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর তাপ

বিকিরণের ফলে শীতল ও সঙ্কুচিত হইলে সেই সঙ্গে উপরকার শিলা-স্তরও বাঁকিয়া দুমড়াইয়া যায়, ইহার জন্য ভূতল কম্পিত হইতে থাকে। আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইবার সময় আভ্যন্তরিক উষ্ণ বাষ্প-চাপের জন্য বসুন্ধরার উপরিভাগ কাঁপিয়া উঠে। ইহা ছাড়া ভূমিপাত ও স্তরচ্যুতির জন্যও ভূমি আন্দোলিত হইতে পারে। ভূকম্পনের সময় মাটি ফাটিয়া গরম জল বাহির হয় এবং জলপূর্ণ কূপ অকস্মাৎ শুষ্ক ও বালুকাপূর্ণ হইয়া যায়। রাস্তা ও নদীর গতি বাঁকিয়া যায়। কোন স্থান উত্তোলিত ও অন্য স্থান অবনমিত হয়। এক কথায় ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে।

বসুমতীর বয়স আনুমানিক দুই শত কোটি বৎসর হইবে। প্রায় এক শত কোটি বৎসর আগে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, সর্ব্ব-প্রথম সাগরজলে বীজাণু, এক-কোষ প্রাণী ও শৈবালের উৎপত্তি হয়। ইহার পঞ্চাশ কোটি বৎসর পরে বিবিধ খোলসধারী জীব, চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, শামুক এবং জলজ কীট ও উদ্ভিদের জন্ম হয়। প্রায় চল্লিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে মেরুদণ্ডযুক্ত জলচর মৎস্য ও স্থলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। ত্রিশ কোটি বৎসর আগে কীটপতঙ্গ ও উভচর ভেক আবির্ভূত হয়, এবং ফার্ন শৈবাল প্রভৃতি সমস্ত অপুষ্পক গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, ঘটনাক্রমে মাটির নীচে চাপা পড়িয়া তাপের প্রভাবে এখনকার কয়লায় পরিণত হয়। পনর কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীময় এক শ' ফুট দীর্ঘ টিকটিকি গিরগিটিজাতীয় বিরাটকায় সব সরীসৃপ বিচরণ করিত। মাত্র দশ কোটি বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তু ও বিবিধ প্রকার বায়ু-বিহারী পক্ষী এবং সপুষ্পক বৃক্ষসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে। গত দশ লক্ষ বৎসরের মধ্যে ধরাধামে মানুষ আসিয়াছে এবং মাত্র দশ হাজার বৎসরের ভিতর আশ্চর্য্যরকম সভ্যতার বিকাশ এবং শেষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই আদিম জলচর এককোষ জীবের ক্রম-বিকাশের ফলেই শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। প্রাথমিক হইতে আধুনিক, সকলপ্রকার জীবের স্বাভাবিক বা শিলীভূত দেহা-বশেষ ভূপৃষ্ঠে স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। এই স্তর-বিন্যাসের বিষয় উইলিয়াম স্মিথ (১৭৬৯-১৮৩৯) আবিষ্কার করেন আর প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশের কথা ১৮৫৯ সনে ডারুইন (১৮০৯-১৮৮২) প্রকাশ করেন।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত প্রায় সাত লক্ষ প্রকার প্রাণী এবং তিন লক্ষ রকম গাছপালার বিষয় ভালভাবে জানা গিয়াছে। জগতে পাঁচ লক্ষ প্রকার পতঙ্গ, কুড়ি হাজার রকম মাছ, তিন হাজার ভেকজাতীয় উভচর, পাঁচ হাজার সরীসৃপ, তের হাজার চতুষ্পদ জন্তু এবং আটাশ হাজার রকম পাখী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সংখ্যাও অগণিত। মানুষের সংখ্যা প্রায় দুই শত পঞ্চাশ কোটি হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বেকার হিসাবমতে প্রতি মিনিটে এক শ' কুড়ি জন লোক জন্মগ্রহণ করে আর এক শ' জন ইহলোক ত্যাগ করিয়া যায়। সুতরাং মিনিটে কুড়ি জন করিয়া লোক বাড়ে। সাধারণতঃ জন-সংখ্যা প্রতি বৎসর শতকরা এক ভাগ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় স্থির ছিল এবং জন্ম-মৃত্যুর হার প্রায় সমান ছিল। আর জীবজগতেও শত্রু এবং সংক্রামক ব্যাধি ও খাদ্যের সীমা সর্ব্বদা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। সেই জন্য ইতরপ্রাণীর কখনও অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না, জন্ম ও মৃত্যু সাধারণতঃ সাম্যা-বস্থায় থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে ক্ষুদ্র প্রাণী সংখ্যায় বেশী থাকে আর বৃহৎ জীব সংখ্যায় কম।

সাধারণ সবরকম গাছ মাটি, জল ও বাতাস হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া দেহ গঠন করে। গাছের সবুজ পাতা দিনের বেলায় সূর্য্যা-লোকের সাহায্যে বায়ুমধ্যস্থ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গারটুকু আত্মসাৎ করিয়া বাকি অক্সিজেন পরিত্যাগ করে এবং মাটি হইতে শিকড়ের দ্বারা শোষিত জল ও খনিজ লবণ সহযোগে শরীর গঠন করে। নিরামিষাশী জীবজন্তু উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে আর আমিষভোজী প্রাণী তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করে। মানুষ ও আর সব জীবজন্তু নিশ্বাসের সহিত অক্সিজেন, লইয়া উহার সাহায্যে দেহমধ্যস্থ খাদ্যবস্তু দগ্ধ করিয়া জীবনীশক্তি লাভ করে, আর প্রশ্বাসের সহিত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলবাষ্প বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে কার্ব্বন বা অঙ্গার অণু উদ্ভিদ হইতে প্রাণীদেহে এবং প্রাণী হইতে উদ্ভিদ-শরীরে পুনঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে থাকে। জীবিত জীবজন্তুর নাইট্রোজেনবহুল মূত্র ও পুরীষ মাটিতে পড়িলে সার হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে আর কোন জীব মরিয়া গেলে তাহার শরীর বিকৃত ও বিগলিত হইয়া পুনর্ব্বার বায়ু এবং মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়। সুতরাং উদ্ভিদজাতি পুনরায় শরীরগঠনের সকল উপাদান মাটি ও বাতাস হইতে সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে কোন বস্তু কণামাত্র বিনষ্ট হয় না, রাসায়নিক চক্র অবিরাম আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

সবশেষে ভৌগোলিক তথ্যের সমাবেশ করা যাইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,০০০ মাইল। বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান সাগরের বিস্তার ১,৬৫,৫২০ বর্গমাইল। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ড ৮,৪৬,১৭০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা ৩৫,০০,০০০ বর্গমাইল। এখানে বৎসরে দশ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টি-পাত হয়। সাহারার উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত লিবিয়াতে আজিজিয়া বলিয়া এক জায়গায় এত গরম যে, সেখানে তাপমাত্রা ১৩৬° ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আবার অন্য দিকে ভার-কোয়ান্স্ক নামক সাইবিরিয়ার এক গ্রামে শীতকালে এত দারুণ ঠাণ্ডা হয় যে, তাপমাত্রা শূন্য হইতে আরও ৯০° ফারেনহাইট নীচে নামিয়া যায়। আসামের চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে প্রায় পাঁচ শত ইঞ্চি বারিপাত হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি মৌনালোয়া হাউই দ্বীপে অবস্থিত, ইহার উচ্চতা ১৩,৬৮০ ফুট, গহ্বরের ব্যাস ১২,৪০০ ফুট। তিব্বতের অন্তর্গত ফারি শহর ১৪,৩০০ ফুট উচ্চে

অবস্থিত। ভেনিজুয়েলার অন্তর্বর্তী এঞ্জেল জলপ্রপাত ৩,২১২ ফুট উচ্চ। পৃথিবীর বৃহত্তম জীব আমেরিকার সিকুইয়া গাছ ৩০০ ফুট উচ্চ, ৩০ ফুট প্রস্থ, ২,০০০ টন ভারী। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দৃশ্যমান আণুবীক্ষণিক জীবাণুর বিস্তার এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ আর ওজন এক গ্রেণের সাত লক্ষ কোটি ভাগ মাত্র।*

---

* এই প্রবন্ধরচনায় শ্রীকণিকা দাস ও শ্রীদীপালি দাস আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ব্যবধান

শ্রীকলিদাস রায়

রামধন তাঁতী গামছা বুনিয়া ফেরি করে দ্বার দ্বার
গামছার আছে আকছার দরকার।
হরিধন ভড় বোনে মিহি শাড়ী দেয় তায় জরিপাড়
শহরের সাথে চলে তার কারবার।
হরি ভড় যত বড় কারিগর হোক
পাড়ার লোকের নয় আপনার লোক।
মদন কুমোর হাঁড় সরা গড়ে হাটে করে বিক্রয়
জন্মে তাহার সঙ্গে সবার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।
নরহরি পাল দেবীর প্রতিমা গড়ে,
তারে দরকার দু-চার জনার ঘরে।
প্রতিমা দেখিতে সারা গ্রামখানি জোটে
কে গড়িল তার খোঁজও লায়নাক' মোটে।

কেনারাম মুচি বাজায় ঢোলক ঢাক,
প্রতি পার্বণ পরবেই পড়ে ডাক।
বাবুরাম দাস গড়েছে একটা রসানচৌকি দল
অধিগত তার সানাইবাঁশীতে সব সুরকৌশল।
সভ্য সমাজে তার সমাদর হয়
গাঁয়ের লোকের কাছে বাবুরাম মুচি ছাড়া কিছু নয়।

ক'রে থাকে বেচু লাউ ঝিঙে কচু আলু বেগুনের চাষ
গাঁয়ের লোকের সব তরকারী দরকারী বারোমাস।
মধু মোড়লের বাগানে জন্মে আনারস তরমুজ
দাড়িম খরবুজ।
গাঁয়ের হাটে ত বিকায় না তার মাল,
গঞ্জেরই সাথে চলে তার কারবার।
গাঁয়ে তার বাড়ীঘর
গাঁয়ের কাছে সে তবু চিরদিন পর।

জাতীয় জীবনে সর্বত্রই এই ধারাটিই চলে
এ ভেদবুদ্ধি রুদ্ধ হবে না কভু আইনের বলে।
চটে কার্পেটে, বিড়ি সিগারেটে, কাস্তে ও তরোয়ালে,
মোড়ায় সোফায়, ডুলি চৌদলে, কাঁথা কাশ্মীরী শালে।
রঙ ও রসানে, পানি ও পানায় তফাৎ রয়েছে ভারি,
ইংরাজী ভাষা ভাগ করে খাসা 'নেসেসারি লাক্সারি।'
চারুশিল্পীর, কারুশিল্পীর মত নয় নাম যশ
একের আদর করিবে হাজার অজ্ঞের জনদশ।
সুধী জ্ঞানী গুণী শিল্পী করে না ক্ষোভ
বস্তাপচা সে সস্তা লাভের প্রতি নাই তার লোভ।
বীণা ছেড়ে গুণী বাজাবে না ঢাক ঢোল
ধ্রুপদ খেয়াল ছেড়ে সে দেবে না কভু গোলে হরিবোল।

সেই নিশীথে

শ্রীঅরবিন্দ পালিত

পাত্রপাত্রী

শশাঙ্ক মিত্র—অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী
প্রমীলা দেবী—ঐ স্ত্রী
বিশ্বজিৎ মিত্র—ঐ পুত্র, তরুণ যুবক, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার
ক্যাপ্টেন মুখার্জি—শশাঙ্কর বন্ধু, যুদ্ধ-ফেরত ক্যাপ্টেন।
শনি চৌধুরী—বিশ্বজিতের সহকর্মী

[মঞ্চদৃশ্য—মহানগরীর উপকণ্ঠস্থিত একখানি ছোট বাড়ীর একটি ঘর। মঞ্চ কোণাকুনি ভাবে সাজানো। বাঁ দিকে বাড়ীর ভিতরে যাবার দরজা। তার পাশেই একটা র‍্যাক। তার উপরটা টেবিলের মত ব্যবহৃত হয়। উপরে রয়েছে একটা ফুলদানি, তাতে কিছু রজনীগন্ধার ঝাড়; একটা টাইমপীস; আরও কয়েকটি টুকি-টাকি জিনিসপত্র। ডান দিকে একটি আধুনিক ধরনের জানালা। তাতে গরাদ নেই, পরদা লাগানো। তার পাশেই বাইরে যাবার দরজা। ঘরের মাঝখানে বড় টেবিল। তার তিন দিকে তিন খানি চেয়ার, একটি টুল। দেয়ালে একটি এসরাজ টাঙানো।]

প্রথম দৃশ্য

[যবনিকা উঠলে দেখা গেল—প্রমীলা দেবী ডান দিকের টুলে বসে কি একটা বুনছেন। পশমের গোলাটা টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে। টেবিলের উল্টোদিকে বিশ্বজিৎ আর শশাঙ্কবাবু গভীর মনোনিবেশ সহকারে দাবা খেলছেন। প্রমীলা দেবী মাঝে মাঝে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাচ্ছেন। টেবিলের উপর একটা ঘেরাটোপ দেওয়া আলো। দেখেই বোঝা যায় শশাঙ্কবাবু হারছেন; বাঁ হাতটা অনবরত মাথায় চালিয়ে চালিয়ে চুলগুলো বিপর্যস্ত, এলোমেলো; চোখমুখ কুঁচকে রয়েছে; চশমাটা কপালের উপর তোলা। বিশ্বজিৎ খুব তৃপ্তির দৃষ্টিতে তার সদ্য-দেওয়া চালটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মাথাটা মৃদু মৃদু দুলছে। শশাঙ্কবাবু একবার বড়েটা টিপছেন, কখনও বা গজটা নিয়ে নাড়ছেন। কিন্তু ভাল চাল একটাও দিয়ে উঠতে পারছেন না। বাইরে যাবার দরজাটা ভাল ভাবে বন্ধ করা। বাইরে ঝড়বৃষ্টির গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; জানালার পরদাটা দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।]

প্রমীলা। [হাতের উল-কাঁটা টেবিলের উপর রেখে] উঃ! কি দুর্য্যোগের রাত। [উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে] রাস্তায় জল যা জমেছে, তাতে এবার নৌকো চালাতে হবে। [জানালা বন্ধ করে দিলেন।]

শশাঙ্ক। [বোর্ডের দিকে তাকিয়ে] নৌকো তলিয়ে গেছে গিন্নী। এবার গজ ছাড়া আর উপায় নেই।

প্রমীলা। [ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতে বসতে] হুঁ! তুমি আবার খেলবে বিশুর সঙ্গে। তা হলেই হয়েছে।

শশাঙ্ক। [অবশেষে একটা চাল দিয়ে বিজয়ীর মত মুখভঙ্গী করে] এই! এইবার তোমাকে পেয়েছি! দাও ত বিশু, এবার একটা চাল। দেখি তোমার দাবা এবার বাঁচে কি করে।

বিশ্বজিৎ। [কৌতুক করে] ওহো! সত্যি বাবা, আপনি কি অদ্ভুত খেলেন! তাই নয় মা?

প্রমীলা। সে কিরে? শেষকালে তুই হেরে গেলি ওনার কাছে।

বিশ্বজিৎ। হায় ভগবান! বাবা এত বড় বড় চালের কথা ভাবছেন যে, এই ছোট্ট ভুলটা ওঁর নজরে পড়ে নি। [বিশ্বজিৎ একটা চাল দিল।]

শশাঙ্ক। [উত্তেজিত হয়ে] না, না, আমি ওটা দেখেছি। ওকি, ওকি! ও চালটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

বিশ্বজিৎ। বা রে! তা কি করে হয়? খেলার নিয়ম যে তা নয়!

শশাঙ্ক। [বিরক্ত হয়ে] আরে দূর ছাই! রেখে দাও তোমার ঐ সব নিখুঁত নিয়ম-কানুন। আর তুমি যে রকম হালকা ভাবে খেলছ, তাতে কি আর ভেবে চিন্তে কোন চাল দেওয়া যায়। যত সব—

প্রমীলা। বটেই ত! এখন তুমি হারছ কিনা, তাই দোষটা হ'ল ওর। বক বক করাটা থামিয়ে চাল দাও। দেখি, ওকে কি রকম আটকাতে পার।

বিশ্বজিৎ। [হেসে উঠে] বাবা আমাকে আটকাবেন? তা হলেই হয়েছে। কৈ, কি চাল দিলেন?

শশাঙ্ক। [বিশ্বজিৎকে একটু অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে] ওঃ! বাইরে কি ঝড়ের আওয়াজ!

[এই সময় আবার ঝড়ের গর্জ্জন শোনা গেল; স্কাইলাইট দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকানির আলো এসে পড়ল।]

বিশ্বজিৎ। [গভীর মনোযোগে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে।] এ্যা! হ্যাঁ! যা বলেছেন। সত্যিই তো—এই নিন্—কিস্তি—

শশাঙ্ক। [তখনও অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে] আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন মুখার্জী আজ রাতে আর আসতে পারবেন না। কি বিশু, তুমি কি বল?

[শশাঙ্ক একটা চাল দিলেন ।]

বিশ্বজিৎ । আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি যা বলি তা হ'ল এই—এই—এই মাৎ—

[উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন ।]

শশাঙ্ক । [বিরক্তিতে ফেটে পড়ে ঘুঁটিগুলি সব এলোমেলো করে দিয়ে] শহরের বাইরে থাকার এই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ ফল। এত দূরে কোন বন্ধু-বান্ধব আসতে পারে না। আর তোমার মত ইয়ং ম্যান শুধু বাড়ীতে বসে বসে, এই সমস্ত অলস খেলা নিয়ে মেতে থাকবে ।

বিশ্বজিৎ । [শশাঙ্ককে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে] কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বাবা, ক্যাপ্টেন মুখার্জী আজ নিশ্চয় আসবেন । কথা যখন দিয়েছেন—

শশাঙ্ক । [বাধা দিয়ে] আরে রেখে দাও তোমার কথা । এই নোংরা রাস্তা, পথে ঘাটে কাদা, একটু বৃষ্টি পড়লেই একহাঁটু জল, পাণ্ডববর্জ্জিত জায়গা ; এখানে কোন ভদ্রলোক আসতে পারে ! নাম আবার মনোমোহন এভিনিউ । (হঠাৎ স্ত্রীর দিকে ফিরে রাগত স্বরে) বলতে পার, এখানকার কাউন্সিলাররা ভেবেছে কি ? জায়গাটার বাসিন্দা অল্প দু'চার জন লোক বলে কি তারা এ দিকে একবার ফিরেও তাকাবেন না ? আমি এক বার জানতে চাই তাদের ব্যাপারখানা ।

প্রমীলা । [একটু হেসে] তুমি অত চটে উঠছ কেন ? আজ হেরে গেছ বলে কি কালও হারবে ? কাল ত জিততেও পার । তবে—

শশাঙ্ক । কি বললে ! কাল জিততে পারি ! কাল ! তার মানে তুমি কি বলতে চাও । ওঃ হো (উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন) ঠিক ! তুমি ঠিক ধরেছ গিন্নী, তুমি ঠিক ধরেছ। মনের ভেতরে কি হচ্ছে, তুমি ঠিক ধরেছ দেখছি ।

প্রমীলা । তুমি বল কি গো । আজ তিরিশ বছর ধরে তোমার সঙ্গে ঘর-সংসার করলাম, আর তোমার মনের কথা বুঝতে পারব না । এই যে আজকের ঠাণ্ডা রাতটায় তোমার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে, একি তুমি বলতে তবে বুঝব । [বলতে বলতে তিনি উঠে র‍্যাকের কাছে গেলেন এবং ট্রের ওপর চায়ের সরঞ্জাম গোছাতে লাগলেন ।]

বিশ্বজিৎ । [জানলার ধার থেকে সরে এসে] যাই বলুন বাবা । জায়গাটা খুব খারাপ নয় । আর বাড়ীটাও পাওয়া গেছে বেশ ছোট্ট, সাজানো । আপনার ঐ শহরের মাঝখানে, চারিদিক চাপা, আলো-হাওয়া বন্ধ বাড়ীর চেয়ে আমার তো এ-বাড়ীটা খুব ভাল লাগে । কি বল মা । আর আপনার নিশ্চয় ভাল লাগে বাবা ; তা না হলে আর পয়সা খরচ করে এ বাড়ী কিনেছিলেন ।

শশাঙ্ক । [গজরাতে গজরাতে] হ্যাঁ, তবে আর কি ! খুব ভাল কাজ করেছি । এই জঘন্য জায়গায় বাড়ী কিনতে পাঁচ হাজার টাকা ধার করেছি । নিজের গালে নিজেরই চড় মারতে ইচ্ছে করছে ।

বিশ্বজিৎ । [চেয়ারের পেছনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে] টাকাটার জন্য আপনি একটুও ভাববেন না বাবা । যে প্রমোশনটা কোম্পানী আমাকে দেবে বলেছে, সেটা যদি পেয়ে যাই তা হলে বছর-তিনেকের মধ্যে সব দেনা আমি শুধে দেব ।

শশাঙ্ক । তোমাকে আর দেনা শোধ করতে হবে না । তোমার মা যেরকম তোমার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে তোমাকে বিয়ে করিয়ে ঘর সংসার গুছিয়ে দিতে পারলে হয় ।

বিশ্বজিৎ । আপনারা সেই আশাতেই থাকুন, আমায় সেরকম ছেলে পেয়েছেন কিনা ?

প্রমীলা । তার মানে ! তুই বিয়ে করবি না নাকি ? বড় হয়েছিস, ভাল চাকরি করছিস, এখন যদি তোকে বিয়ে না করাই, লোকে বলবে কি ? (বলতে বলতে ট্রে হাতে নিয়ে টেবিলে এসে রাখলেন ।)

বিশ্বজিৎ । তুমি কিচ্ছু ভেব না মা । বিয়ের জন্য সারা জীবনটাই তো পড়ে রইল । এখন আমার বিয়ে করবার সময় কোথায় ? পাওয়ার হাউসের ডায়নামোগুলো যা ভিংসুটে মা, ওরা আমাকে এক মিনিটের জন্য ছেড়ে দিতে চায় না ।

শশাঙ্ক । [অল্প একটু হেসে] সত্যি । মাঝে মাঝে যখন রাতে ঘুম আসে না, তখন শুয়ে শুয়ে ভাবি—বিশু যদি এখন একটু ঘুমিয়ে পড়ে আর তোমাদের—ঐ কি বলে যে—ঐ ডায়নামোগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তো ব্যস—সারা কলোনীটা একেবারে অন্ধকার । বেশ মজা না ! [বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন ।]

বিশ্বজিৎ । মজা ! আপনি বলছেন কি বাবা । আমি ঘুমিয়ে পড়ব ! গোটা কলোনীটার আলো যে আমার হাতে ।

[বাইরে দরজায় করাঘাত]

প্রমীলা । ওগো শুনছ, কে যেন কড়া নাড়ছে ।

[আরও জোরে করাঘাত]

শশাঙ্ক । [দরজার দিকে তাকিয়ে] মুখুজ্জেই এল বোধ হয় । মিলিটারীর লোক, কথা যখন দিয়েছে—দেখত বিশু [বলতে বলতে দাবা ঘুঁটি ইত্যাদি গোছাতে লাগলেন ।]

বিশ্বজিৎ । [দরজা খুলতে খুলতে] দেখ, আজ আবার উনি ওঁর গল্পের ঝুলি ভরে আমাদের জন্য কি এনেছেন ।

[শশাঙ্ক দাবার বাক্স র‍্যাকের ওপর রাখল]

প্রমীলা । [ব্যস্ত হয়ে কাপ-ডিশগুলো গোছাতে লাগলেন ।] দেখিস, দরজা সবটা খুলিস না ; বৃষ্টির ঝাপটায় সব ভিজে যাবে ।

[বিশু একটা পাল্লা চেপে ধরে দরজাটা একটু খুলল ; হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল তার গায়ে । ক্যাপ্টেন মুখার্জী প্রবেশ করলেন—পরনে সামরিক পোশাক । তার উপর রেন-কোট, টুপি, তা থেকে জল ঝরছে । বাঁ হাতটা নেই ।]

বিশ্বজিৎ । আসুন, আসুন ক্যাপ্টেন মুখার্জী ।

শশাঙ্ক। এস, এস, চট করে ঢুকে পড়। বা জলের ঝাপটা—

মুখার্জী। কি দুর্যোগ! কি দুর্যোগ! (বলতে বলতে বিশুর সাহায্যে কোট টুপি ইত্যাদি খুলে দরজার পাশে হ্যাট র‍্যাকে ঝুলিয়ে দিলেন।) কোথায় তোমাদের বাড়ী, বাবাঃ! শ্মশানের ধার থেকে প্রায় মাইলখানেক। আর কি রাস্তা! একহাঁটু জল-কাদা—তার ওপর ঝড়-বৃষ্টি। মনে হচ্ছিল চুলগুলো পটাপট ছিঁড়ে যাবে।

বিশ্বজিৎ। [চেয়ারটা মুখার্জীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে] এই যে! নিয়েই তো গেছে দেখছি। (বলে তাঁর চকচকে টাকের দিকে তাকাল।)

মুখার্জী। [কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে] বটে! আমার সঙ্গে ঠাট্টা! জানিস তোর বাপের চেয়ে আমি ছ'মাসের বড়।

প্রমীলা। আঃ বিশু, কি হচ্ছে। মিঃ মুখার্জী, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। এই দুর্যোগে যে আপনি আসবেন তা ভাবি নি।

[মিঃ মুখার্জী চেয়ারে বসলেন। প্রমীলা ভেতরে গেলেন।]

শশাঙ্ক। তোমার ছড়িটা এবার হাতছাড়া কর দেখি। (ছড়িটা নিয়ে 'হ্যাট ব্যাকে'র পাশে রেখে দিলেন। প্রমীলা ভেতর থেকে গরম জলের কেটলী আনলেন।)

প্রমীলা। নিশ্চয়, এখন এক কাপ গরম গরম চায়ে আপত্তি হবে না।

মুখার্জী। এমন দুর্যোগের মাঝেও আপনি আতিথ্য ভোলেন নি দেখছি। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ লোভেই তো এলাম এত ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে।

প্রমীলা। [চা তৈরি করতে করতে] সত্যি, এই ঝড়-বৃষ্টিতে এলেন কি করে?

[চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলেন]

মুখার্জী। [চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে] আঃ! এ আর কি? কোহিমার জঙ্গলে কোমর পর্যন্ত কাদা-ভরতি ট্রেঞ্চ, মশা, মাছি, পোকা-মাকড়, ঝড়-বৃষ্টি, তার ওপর আছে শত্রুপক্ষের বুলেট। তার তুলনায়—হু—

[পেয়ালায় চুমুক দিলেন]

প্রমীলা। [শশাঙ্ককে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে] কেন? আপনাদের সঙ্গে ছাতা ছিল না?

মুখার্জী। ছাতা (উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন) বা বলেছেন! শশাঙ্ক, শুনছ, ছাতা; রেনকোট, গলোশ, হট-ওয়াটার বটল্—এ্যা বলেছেন বটে। ভাগ্যিস আপনি সৈন্য-জীবনের একটুও আঁচ পান নি।

বিশ্বজিৎ। [একটু আহত হয়ে] মা অবশ্য সে হিসেবে বলেন নি। আপনাদের কষ্টের কথা শুনে—

মুখার্জী। হ্যাঁ রে বাপু হ্যাঁ, তা জানি। বুঝলেন মিসেস মিত্র, কঠোরতা—একমাত্র কঠোরতাই সৈনিক জীবনের সঙ্গে জড়ানো। অনাহার, অর্দ্ধাহার, অসুখ-বিসুখ, বিনা চিকিৎসা, তার পর একদিন গুলি খেয়ে টপ করে মারা যাওয়া। এই হ'ল আমাদের ভাগ্য। আর আমার নিজের বরাতেও অনেকটা সেই রকম হয়েছিল।

প্রমীলা। অবশ্য আপনাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না যে আপনি খুব কষ্ট সহ্য করেছেন। শুধু এই হাতটাই যা—

[কাটা হাতটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন]

মুখার্জী। [কোটের বাঁ দিকটা খুলে একটা পদক দেখিয়ে] ঐ জন্যই তো এটা পেলাম। [বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে—(সে চা খাচ্ছিল না)] কি হে, তুমি চা খাচ্ছ না যে। তুমি কি চা ছাড়লে, না সামাজিকতা ছাড়লে।

বিশ্বজিৎ। [মৃদু হেসে, চেয়ারে বসে] কোনটাই না। তবে এখন চা খেলে রাতে আর ভাল ঘুম হয় না। সারারাত কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। আর কাজ করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হলেই ব্যস—একেবারে ডায়নামোর ভেতর।

প্রমীলা। [উদ্বিগ্ন ভাবে] না, না বিশু, তোকে এখন আর চা খেতে হবে না।

বিশ্বজিৎ। [একটু হেসে] না, মা, না। তোমাকে অত ভয় পেতে হবে না।

মুখার্জী। সত্যি! তোমরা—ইলেকট্রিসিয়ানরা—আশ্চর্য্য। যাদুকরের মত তোমাদের ক্ষমতা। তোমরা বললে, আলো—অমনি চারিদিক আলোয় ভরে গেল। তোমরা বললে, শক্তি—অমনি ঘরঘর করে ট্রাম, বাস, ট্রেণ চলতে সুরু করল। তোমরা বললে, জ্ঞান—অমনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমি স্বীকার করি, হিমালয় আর আসামের জঙ্গলে সাধুসন্ন্যাসীদের যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আমি দেখেছি, তার তুলনায় তোমাদের এই সব ম্যাজিক খুব কম-দরের নয়।

বিশ্বজিৎ। বলেন কি! সেই সব ভণ্ড সাধুসন্ন্যাসীদের চালাকির সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের তুলনা করছেন।

মুখার্জী। [উত্তেজিত ভাবে] ভণ্ড সন্ন্যাসীদের চালাকি! বটে! আমি নিজের চোখে দেখেছি, তা জান হে ছোকরা!

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে] বেশ বলুন ত, কি আপনি দেখেছেন।

মুখার্জী। [সমান উত্তেজিত ভাবে] মণিপুরে একটা ছোট পাহাড়ের তলায় আমি একবার একজন লোককে দেখেছিলাম—লোকটা প্রায় উলঙ্গ—তার হাতে একটা খালি ঝুড়ি ছিল—(প্রমীলার দিকে ফিরে) কি রকম খালি বুঝেছেন—এই—এই যে চায়ের কাপটা দেখছেন ঠিক এই রকম খালি—(চায়ের পেয়ালাটা তুলে দেখালেন)

শশাঙ্ক। ওগো, কাপটা ভরে দাও।

প্রমীলা। [একটু হেসে] কৈ দিন। (কাপটা নিয়ে ভরে দিলেন)।

মুখাৰ্জ্জী। আরে না, না, আমি ভয় দিতে বলি নি। মানে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম—মানে—

বিশ্বজিৎ। হ্যাঁ মানে আপনার সেই সাধুর ঝুড়িও এমনি ভাবে নানারকম জিনিষ দিয়ে ভরে যেত—এই ত! ও ম্যাজিক কি করে দেখাতে হয় তা আমি পড়েছি। শুধু একটু প্র্যাক্‌টিস দরকার—আর ভাল হাত-সাফাই, তা হলে আমিও করতে পারি। এর চেয়েও বেশ একটা কড়া ধরনের ছাড়ুন দেখি।

মুখাৰ্জ্জী। আরও কড়া! বটে! টিম্বিড়ম থেকে প্যালেল যাবার পথে একবার এক ফকিরকে দেখেছিলাম। সে একটা দড়ি নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিত। বুঝলে শূন্যে ছুঁড়ে দিত—আর দড়িটা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকত। যেন হুক দিয়ে উপরে বাঁধা—আর তার পর সেই দড়ি ধরে ফকির উপরে উঠত, (হাত নেড়ে নেড়ে দেখাতে লাগলেন) উপরে উঠতে উঠতে সে কোথায় মিলিয়ে যেত; আর তাকে দেখা যেত না।

[সবাই অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন মুখাৰ্জ্জীর দিকে তাকিয়ে রইল; বিশ্বজিৎও। একটু পরে বিশ্বজিৎ টেবিলের দিকে ফিরে এক টুকরো কেক্ প্লেটে নিয়ে মুখাৰ্জ্জীর দিকে এগিয়ে দিল, অত্যন্ত বিনীত ভাবে।]

মুখাৰ্জ্জী। [ডিশটার দিকে তাকিয়ে] এটা কি হবে?

বিশ্বজিৎ। [বিনীত ভাবে] আপনি যে অপূর্ব্ব গল্পটা ছাড়লেন, তার জন্য কিঞ্চিৎ—

[শশাঙ্ক ও প্রমীলা হাসতে লাগল]

মুখাৰ্জ্জী। তার মানে তুমি বলতে চাও আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না।

প্রমীলা। না, না, তা নয়। বিশু আপনাকে একটু রাগাতে চাইছে। বিশু কি হচ্ছে তোমার!

শশাঙ্ক। আরে তুমি চটছ কেন? আজকালকার ছেলে-ছোকরা, ওরা জানেই বা কি আর দেখেছেই বা কতটুকু। ওদের কথাবার্ত্তাই ঐ রকম।

[বিশ্বজিৎ কেকের প্লেটটা নামিয়ে রাখল; তার পর চেয়ারটা সরিয়ে প্রমীলার কাছে আনল।]

মুখাৰ্জ্জী। ঘটনাটা পুরোপুরিই সত্যি। এ ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আমি আরও দেখেছি—কিন্তু না, তোমাদের আর সে সমস্ত শোনাব না।

শশাঙ্ক। মাথা খারাপ, মুখাৰ্জ্জী। তোমার মাথা খারাপ! (চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে) ছেলেমানুষদের কথায় কান দিতে আছে। [চেয়ারটা মুখাৰ্জ্জীর কাছে সরিয়ে এনে] আচ্ছা, সেই যে একদিন বলেছিলে, কি এক আশ্চর্য্য বাঁদরের থাবা—না কিসের গল্প—সেই যে (বিশ্বজিৎকে ইসারা করল)।

বিশ্বজিৎ। প্লীজ ক্যাপ্টেন মুখাৰ্জ্জী—গল্পটা বলুন। সত্যি বলছি—আর যাই হোক আপনার গল্পগুলো খুব ইণ্টারেষ্টিং।

মুখাৰ্জ্জী। [গম্ভীর ভাবে] না, না, সে কিছু না। সে বাজে গল্প, শোনবার মত নয়।

প্রমীলা। [আশ্চর্য্য হয়ে] বাঁদরের থাবা সে আবার কি—নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ক্যাপ্টেন মুখাৰ্জ্জী।

শশাঙ্ক। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে সেদিন, হরিচরণের বাড়ীতে তুমি বলেছিলে—

মুখাৰ্জ্জী। [একটু বিরক্ত হয়ে] না, না, ও গল্পটা থাক। (তাড়াতাড়ি চায়ের কাপটা মুখের কাছে তুলে ধরলেন। তারপর কাপটা দেখলেন।) আরে! খালি হয়ে গেছে! যখনই আমার ঐ থাবাটার কথা মনে পড়ে যায়, তখনই আমার সবকিছু কেমন যেন ভুল হয়ে যায়।

শশাঙ্ক। [মুখাৰ্জ্জীর কাপটা টেনে নিয়ে চা ভরতি করতে করতে] তুমি যে বল, সেটা তুমি সব সময়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়াও।

মুখাৰ্জ্জী। তা করি বটে, পাছে একটা অঘটন ঘটে যায়। (কি যেন ভাবতে লাগলেন) পাছে—পাছে—

শশাঙ্ক। [চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে] এই নাও।

প্রমীলা। কিন্তু, বাঁদরের থাবা নিয়ে কি হয়?

মুখাৰ্জ্জী। ব্যাপারটা যদি আপনাদের কাছে বলি তবে আপনারা নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারবেন না।

বিশ্বজিৎ। না, না, আমি প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করব। সত্যি বলছি।

মুখাৰ্জ্জী। কিন্তু এ প্রায় ম্যাজিকের মতই আশ্চর্য্য, হেসে উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার নয়।

বিশ্বজিৎ। না, না, হাসব না। সত্যি সত্যিই আপনার কাছে আছে নাকি বাঁদরের থাবাটা—

মুখাৰ্জ্জী। [গম্ভীর ভাবে] আছে বৈ কি।

বিশ্বজিৎ। [ব্যগ্র ভাবে] কৈ কোথায় আছে? দেখান না জিনিষটা। (মুখাৰ্জ্জী এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে পকেটের দিকে তাকাতে লাগলেন। প্রমীলা এগিয়ে এসে ওঁর হাত থেকে কাপটা নিয়ে ট্রের ওপর গুছিয়ে রাখলেন। তিন জনেই উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে মুখাৰ্জ্জীর দিকে তাকিয়ে রইলেন; প্রমীলা দাঁড়িয়ে।)

মুখাৰ্জ্জী। অবশ্য এটার মধ্যে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। (পকেট হাতড়াতে লাগলেন) এমনি একটা সাধারণ বাঁদরের থাবা—ছোট্ট—চামড়াটা শুকিয়ে চিমড়ে পাকানো হয়ে গেছে—

[পকেট থেকে বার করে প্রমীলার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন]—এই যে।

প্রমীলা। [দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন। মৃদু আর্ত্তনাদ করে পিছিয়ে গেলেন] ইস-স, কি বিশ্রী!

বিশ্বজিৎ। কৈ দেখি, দেখি। (মুখাৰ্জ্জী শশাঙ্ককে দিলেন। শশাঙ্ক দেখে বিশ্বজিৎকে দিলেন) আরে! এ যে সত্যিই সব শুকিয়ে গেছে।

মুখার্জী। আমি ত তাই বলছিলাম। (বাইরে প্রচণ্ড হাওয়ার গর্জন।)

প্রমীলা। [কেমন যেন শিউরে উঠে] শুনছ, বাইরে কি ঝড়।

[আস্তে আস্তে টুলের ওপরে বসে পড়লেন]

শশাঙ্ক। [বিশ্বজিতের কাছ থেকে থাবাটা নিয়ে] কিন্তু এর মধ্যে আশ্চর্য্যের কি আছে?

মুখার্জী। [দৃঢ় ভাবে] আছে। এই থাবাটার একটা অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি আছে।

শশাঙ্ক। [চমকে উঠে] এ্যা! কি বললে! [চমকে থাবাটা তাড়াতাড়ি মুখার্জীর হাতে দিয়ে দিলেন।]

মুখার্জী। [গম্ভীর ভাবে, থেমে থেমে] হ্যাঁ। এক বুড়ো ফকির এই থাবাটায় সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দিয়েছেন। শুনেছি, খুব পুণ্যাত্মা তিনি। একই জায়গায় বসে বসে তিনি পনর বছর সাধনা করেছেন। কত যে তাঁর বয়স কেউ জানত না। বয়সের ভারে বেঁকে দুমড়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন—মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন, ভাগ্যই মানুষকে পরিচালিত করে। জন্ম থেকেই মানুষের ভাগ্য ঠিক হয়ে থাকে; কেউ তার বাইরে যেতে পারে না। আর কেউ যদি যাবার চেষ্টা করে তাকে তিক্ত অভিজ্ঞতাই লাভ করতে হবে। [থেমে, একটু ভেবে] তাই তিনি এই জিনিষটার ওপর একটি ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্পণ করেন। অবশ্য তার জন্ম এই বাঁদরের থাবাটারই যে দরকার ছিল তা নয়; তবে হাতের কাছে যা পেলেন, সেইটাই নিলেন। হ্যাঁ—যা বলছিলাম—এই থাবাটার এমনই গুণ যে তিন জন লোক (তিন জনের দিকে এক বার তাকালেন)

মুখার্জী। প্রত্যেকে এর কাছ থেকে তিনটি মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে। (শশাঙ্ক, বিশ্বজিৎ হো হো করে হেসে উঠল, প্রমীলা ভীত ভাবে একটু হাসলেন)

প্রমীলা। এই! এই! চুপ—আঃ, আস্তে!

মুখার্জী। (আরও গম্ভীর ভাবে) কিন্তু—(শশাঙ্ক, বিশ্বজিৎ তাকাল) কিন্তু, মনে রেখ যদিও তাদের তিনটে ইচ্ছে পূরণ হবে, তবুও পরে তাদের এই ভেবে অনুতাপ করতে হবে যে, ইচ্ছাগুলো পূর্ণ না হলেই ভাল হ'ত।

শশাঙ্ক। কিন্তু ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হবে কি ভাবে?

মুখার্জী। তা অবশ্য ফকির বলেন নি। তবে সেগুলো খুবই স্বাভাবিক উপায়ে হবে। মনে কর, আজ তুমি একখানা বাড়ী চাইলে। কাল তুমি খবর পেলে যে, তোমার কোন এক আত্মীয় মারা যাবার সময়ে তোমাকে একখানা বাড়ী দিয়ে গেছে। এমন-কি এও মনে হতে পারে যে, এর সঙ্গে থাবাটার কোন যোগ নেই।

বিশ্বজিৎ। তা ক্যাপ্টেন মুখার্জী, আপনি নিজে এক বার চেষ্টা করে দেখেন নি কেন?

মুখার্জী। [গম্ভীর ভাবে, একটু থেমে] আমি দেখেছি।

বিশ্বজিৎ। [আগ্রহান্বিত হয়ে] আপনি তিনটে প্রার্থনাই জানিয়েছিলেন।

মুখার্জী। [একই রকম গম্ভীর ভাবে] হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম।

প্রমীলা। আপনার ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়েছিল?

মুখার্জী। [কিছুক্ষণ ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে রইলেন] তাও হয়েছিল। (চুপ করে ঐ দিকে তাকিয়ে রইলেন)

শশাঙ্ক। [উদ্বিগ্ন ভাবে] আর কেউ ইচ্ছে করেছিল?

মুখার্জী। হ্যাঁ, করেছিল। প্রথম যার কাছে এটা ছিল, সেও তিনবারই ইচ্ছে করেছিল। (একটু ভেবে) আর তার তিনটা ইচ্ছেই পূর্ণ হয়েছিল। তার প্রথম দুটো ইচ্ছের কথা আমার জানা নেই। কিন্তু (একটু দৃঢ় ভাবে) তার শেষ প্রার্থনা ছিল, মৃত্যু—[সবাই চমকে উঠল] হ্যাঁ, মৃত্যু। এর পর থাবাটা আমার হাতে আসে। [আবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন]

শশাঙ্ক। [জিজ্ঞাসু ভাবে] আচ্ছা মুখুজ্জে তোমার যদি তিনটে ইচ্ছে পূর্ণই হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে এটাতে ত তোমার আর প্রয়োজন নেই। তবে তুমি এটাকে আর রেখে দিয়েছ কেন?

মুখার্জী। [হাতে-ধরা থাবাটার দিকে তাকিয়ে] এটা আমার একটা খেয়াল। মাঝে মাঝে ভাবি যে, এটা বেচে দেব, তারপর ভাবি সেটা কি ঠিক হবে? হাজার হোক, জিনিষটা অভিশপ্ত ত। তা ছাড়া আমার মনে হয় কেউ ওটা কিনবে না। কারণ, কেউ ভাববে এ একটা গাঁজাখুরি গল্প। আর কেউ কেউ ভাববে, আগে পরখ করেই দেখা যাক না, তারপর না হয় দাম দেওয়া যাবে।

প্রমীলা। [একটু ভীত ভাবে হেসে উঠলেন] আচ্ছা, আপনার যদি আরও তিনটে ইচ্ছে থাকত, আপনি চাইতেন?

মুখার্জী। [আস্তে আস্তে হাতের তেলোয় ওপর বাঁদরের থাবাটার ওজন বুঝতে বুঝতে, ওটার দিকে তাকিয়ে] এ্যা—আমি—আমি না—বোধ হয়—বোধ হয়—কি জানি, ঠিক বলতে পারি না। (হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) ছি, ছি, আমার মত লোভীর মৃত্যুই ভাল। [দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল।]

শশাঙ্ক। [ব্যস্ত ভাবে] আরে আরে তুমি করছ কি?

মুখার্জী। [উত্তেজিত ভাবে] না, না, মানুষের সমাজে এই অভিশপ্ত জিনিষটার কোন প্রয়োজন নেই। একে আমি এখুনি ফেলে দেব। [জানালা খুলতে চেষ্টা করলেন]

শশাঙ্ক। [দৌড়ে এসে ওর হাত ধরে] না, না, তুমি এটা ফেলে দেবে কেন?

প্রমীলা। [শশাঙ্কর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে] আহা! উনি যখন ফেলেই দিচ্ছেন, দিন না। শুনছ, ওটা ফেলেই দাও।

শশাঙ্ক। [মুখার্জীর হাত থেকে থাবাটা কেড়ে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে] না। তোমার যদি দরকার না থাকে, বেশ ত আমাকে দিয়ে দাও। (চেয়ারে এসে বসলেন)

মুখার্জ্জী। [উত্তেজিত ভাবে] না, না, তুমি ওটা নিয়ে কি করবে। ফিরিয়ে দাও আমাকে। [বলতে বলতে হাতটা এগিয়ে দিলেন]

প্রমীলা। [কাতর ভাবে] আঃ! কি করছ! ফিরিয়ে দাও না ওটা।

শশাঙ্ক। [শান্ত ভাবে] তোমার যখন দরকারই নেই এটা, আর বিক্রীও যখন করবে না, তখন আমার কাছে রাখতে দোষ কি?

মুখার্জ্জী। [নিজের চেয়ারের কাছে ফিরে, বসতে বসতে] বেশ! আমার কিন্তু আর দায়িত্ব রইল না। ভবিষ্যতে যদি কিছু অঘটন ঘটে, আমাকে দোষী করো না।

[হঠাৎ কাতর ভাবে] শশাঙ্ক ভাই, কেন এ নিয়ে জেদাজেদি করছ। ফেলেই দাও না। ওটা কি হবে তোমার?

শশাঙ্ক। [দৃঢ় ভাবে] না, এটা আমি রাখব। তুই কি বলিস বিশু?

বিশ্বজিৎ। [তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে] রেখে দিন, আপনার যদি ইচ্ছে হয়—যত সব বাজে ব্যাপার। আপনিও যেমন—

শশাঙ্ক। [থাবাটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত ভাবে] বাজে ব্যাপার। হুঁ! আশ্চর্য্য—(হাল্কা ভাবে) আচ্ছা, আমি ইচ্ছে কমি (ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, কি ইচ্ছে করা যায়]

মুখার্জ্জী। [ব্যস্ত হয়ে] আরে, আরে, থাম। মনে রেখ, তুমি কি করতে যাচ্ছ।—কিন্তু—হাঁা—ওরকম ভাবে চাইলে হবে না।

শশাঙ্ক। তা হলে কি রকম ভাবে চাইতে হবে?

প্রমীলা। [একটা গামলার মধ্যে জল ছিল, সেই জলে কাপ-গুলি ধুতে ধুতে] আচ্ছা, তোমার ঐ নোংরা জিনিষটা নিয়ে ঐসব করবার কি দরকার বল ত?

মুখার্জ্জী। দেখুন, দেখুন, মিসেস মিত্তির! আমি বার বার সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, শশাঙ্ক—ঐ অভিশপ্ত জিনিষটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা আর আগুন নিয়ে খেলা করার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।

শশাঙ্ক। তা হোক, তুমি বল।

মুখার্জ্জী। বেশ। নিয়ম হচ্ছে, ডান হাতে ওটা ধরতে হবে, তার পর জোরে জোরে তোমার ইচ্ছেটা বলতে হবে। কিন্তু সাবধান, সাবধান শশাঙ্ক!

প্রমীলা। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত। আচ্ছা, আমার আর একজোড়া হাত করে দিন না। দুটো হাতে ত এত কাজ আর পেরে উঠি না।

শশাঙ্ক। [হেসে উঠে] ঠিক বলেছ গিন্নী, ঠিক বলেছ। আচ্ছা—আমি ইচ্ছে করি—

মুখার্জ্জী। [ব্যস্ত ভাবে তার হাতটা ধরে থামিয়ে দিয়ে] আঃ! থাম! চাইতেই যদি হয়, তবে বাস্তব কিছু চাও। আজে বাজে জিনিষ কিছু চেয়ো না। যাক—আমি ভাই আর এখানে থাকতে পারছি না। আমার বড্ড বিশ্রী লাগছে। আমি চললাম। আমার কোটটা কোথায় রাখলে? [বলতে বলতে বাইরে যাবার দরজার পাশে 'হ্যাট র‍্যাকে'র কাছে এসে দাঁড়ালেন।]

বিশ্বজিৎ। [কোটটা ক্যাপ্টেনকে দিয়ে] চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। এক মিনিট অপেক্ষা করবেন? আমি ওপর থেকে দৌড়ে রেনকোটটা নিয়ে আসি। (বলতে বলতে ভেতরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।]

ক্যাপ্টেন। [কোটটা পরবার চেষ্টা করতে করতে] না, না, আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারছি না। বাইরে বেরুতে পারলে বাঁচি। তার পর তোমরা যত খুশি বরপ্রার্থনা কর। দোহাই তোমাদের—আমাকে চলে যেতে দাও। কিন্তু মনে রেখ, আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম।

শশাঙ্ক। [তাড়াতাড়ি উঠে র‍্যাকের ওপর থাবাটা রেখে ক্যাপ্টেনকে কোট পরতে সাহায্য করতে লাগলেন] ঠিক আছে। ঠিক আছে মুখুজ্জে। আমাদের জন্য একটুও ঘাবড়িও না। (পকেট থেকে একটা নোট বার করে) এটা রাখ।

ক্যাপ্টেন। [প্রত্যাখ্যান করে] না, না, ও আমি নিতে পারব না।

শশাঙ্ক। [জোর করে পকেটে গুজে দিয়ে] হাঁা, হাঁা নিতে হবে। [দরজাটা খুলে ধরলেন]

ক্যাপ্টেন। [বাইরের দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা চলি (শশাঙ্ককে) ওটা উনুনে ফেলে দাও গিয়ে।

সকলে। আচ্ছা, আবার আসবেন।

[ক্যাপ্টেন চলে গেলেন। শশাঙ্ক দরজা বন্ধ করলেন। ভেতরে এসে র‍্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে থাবাটা দেখতে লাগলেন। বিশু চট করে ভেতরে গিয়ে রেনকোট নিয়ে এল। প্রমীলা বাসনপত্র ট্রের উপরে গুছিয়ে রাখলেন।]

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্কর পাশে দাঁড়িয়ে থাবাটা দেখতে দেখতে] ক্যাপ্টেন মুখার্জ্জী আজ একটা কড়া ধরনের ছেড়ে গেছেন। আগের গল্পগুলির চেয়ে এটা বেশ কড়া। আমার মনে হয় জিনিষটা একদম বাজে।

প্রমীলা। [বাসনসুদ্ধ 'ট্রে'টা র‍্যাকের ওপর রাখতে রাখতে] হাঁা গো, তুমি কিছু দিলে নাকি ওঁকে।

শশাঙ্ক। সামান্য কিছু। ও নিচ্ছিল না। আমিই জোর করে দিলাম।

প্রমীলা। বাজে বাজে জিনিষের ওপর তুমি বড্ড টাকা খরচ কর।

শশাঙ্ক। [থাবাটা হাতে করে নিয়ে] সত্যি—আশ্চর্য্য।

বিশ্বজিৎ। কেন? আশ্চর্য্য আবার কি?

শশাঙ্ক। কি আবার থাকতে পারে এটার মধ্যে! দূর, এটা আগুনে ফেলে দিলেই হয়।

বিশ্বজিৎ। [জোরে হেসে উঠে] যা বলেছেন। তা এক কাজ করুন না কেন বাবা—আমরা রাতারাতি যাতে বিরাট একটা বড়লোক কিংবা বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারি—এমন কিছু চেয়ে নিন না।

প্রমীলা। [শশাঙ্কর দিকে চেয়ে] আগুনে ফেলে দেবে? তাই যদি দেবে ত পয়সা নষ্ট করলে কেন? তখনই বারণ করেছিলাম, নিও না। তুমি চিরটাকাল এ রকম বাজে খরচ করে এলে। আর আমি সব দিক সামলে কি করে চালাই তা আমিই জানি—

বিশ্বজিৎ। বাবা, আপনি এক কাজ করুন। সম্রাট হবার বর প্রার্থনা করুন। তা হলে মা আর আপনার ওপর হুকুম চালাতেও পারবে না আর ছুটো-চারটে টাকা খরচ করলে মায়ের ধমকও খেতে হবে না।

প্রমীলা। তবে রে মুখপোড়া! [হাতের ঝাড়ন নিয়ে বিশ্বজিৎকে তাড়া করলেন] তোর বড্ড কথা হয়েছে না! [ঝাড়ন দিয়েই মারতে লাগলেন। বিশু হাসতে হাসতে হাত দিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল।]

শশাঙ্ক। [টেবিলের ধারে এগিয়ে এসে, ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে] সত্যি—কি যে চাই—কিছুই ত ভেবে পাচ্ছি না—মনে হচ্ছে যেন—সবই ত আছে, কি আর চাইব।

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্কর সামনে এসে] আরে! একটা জিনিষ ত রয়েছে। আপনি পাঁচ হাজার টাকা চান না! তা হলেই ত আপনার দেনাটা শোধ হয়ে যায়। বাস, তখন আর আমাদের পায় কে।

শশাঙ্ক। হাঁা, হাঁা, এ কথাটা ত মন্দ নয়। কি বল, গিন্নী, তাই না হয় চাওয়া যাক।

প্রমীলা। না, না, দরকার নেই। ওটাকে নিয়ে কিছু করতে হবে না।

বিশ্বজিৎ। হাঁা, তুমি থাম ত মা। নিন—বাবা—আপনি বর প্রার্থনা করুন।

শশাঙ্ক। [একটু লজ্জিত ভাবে, মঞ্চের মধ্যস্থলে এসে, ডান হাতটা বাড়িয়ে] আমি ইচ্ছে করি—আমি যেন পাঁচ হাজার টাকা পাই।

ঝনঝন্ করে একটা আওয়াজ উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই শশাঙ্ক চীৎকার করে উঠলেন। থাবাটা হাত থেকে পড়ে গেল।]

প্রমীলা ও বিশু। কি হ'ল?

শশাঙ্ক। [অত্যন্ত ভীত ভাবে থাবাটার দিকে তাকিয়ে] ওটা নড়ে উঠল! যেই আমি বলেছি, অমনি আমার হাতের মধ্যে ও। ঠিক সাপের মত কিলবিল করে নড়ে উঠল।

বিশ্বজিৎ। [এগিয়ে এসে থাবাটা কুড়িয়ে নিয়ে। কি যে বলেন! কৈ একেবারে হাড়ের মত শক্ত। [র‍্যাকের উপর রেখে দিল]

প্রমীলা। ও তোমার মনের ভুল নিশ্চয়।

বিশ্বজিৎ। [হাসতে হাসতে] কৈ [ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে] কোথায় টাকা। হুঁঃ! এ টাকা আপনি পেয়েছেন।

শশাঙ্ক। [একটু নিশ্চিন্ত ভাবে] যাক! ভগবানকে ধন্যবাদ খারাপ কিছু ঘটে নি। আমি কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

বিশ্বজিৎ। [ঘড়ির দিকে তাকিয়ে] ওঃ! অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার আমি বেরিয়ে পড়ি।

[রেনকোটটা পরতে লাগল]

প্রমীলা। সকালে ফিরতে দেরি করিস না।

বিশ্বজিৎ। যেমন ফিরি, তেমনিই ফিরব। এই ন'টা নাগাদ। তবে আমার জন্য অপেক্ষা করো না।

প্রমীলা। তোর বাবা সকালে উঠে চা না খেয়ে অপেক্ষা করবে! তুইও যেমন [শশাঙ্ককে] ওগো এসো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

[ট্রেটা নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন

বিশ্বজিৎ। [শশাঙ্ককে চিন্তিত দেখে] কি বাবা, আপনি এখনও ভাবছেন। ভাববেন না।

শশাঙ্ক। [বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে] সত্যি বিশু, ওটা নড়ে উঠেছিল।

বিশ্বজিৎ। [দরজার দিকে যেতে যেতে] হাঁা। আর একটা বাঁদর ল্যাজে ভর দিয়ে খাটের উপর ঝুলছিল, আর দেখছিল, আপনি টাকা গুনছেন।

[শশাঙ্ক ম্লান হেসে বিশুর পেছনে চললেন]

বিশ্বজিৎ। [দরজা খুলে] উঃ কি ঝড়রে বাবা! দরজাটা ভাল ভাবে বন্ধ করে দিন (বেরিয়ে গেল)

[শশাঙ্ক মাথা নাড়তে নাড়তে দরজা বন্ধ করলেন। দরজার কড়ায় তালা লাগালেন। তলায় ছিটকিনি আটকালেন। তার পর উপরের ছিটকিনিটা লাগাতে গিয়ে একটু ধস্তাধস্তি করতে হ'ল, তার পর লাগালেন।

শশাঙ্ক। ছিটকিনিটা বড্ড শক্ত হয়ে গেছে। কাল সকালে বিশুকে বলতে হবে।

[ভিতরে এসে চেয়ারে বসলেন। ল্যাম্পটা কমাতে গিয়ে আলোর শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখের ভাব ক্রমশঃ বদলাতে লাগল; কি একটা দেখতে দেখতে যেন তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন।]

শশাঙ্ক। [ভীতকণ্ঠে) প্রমীলা! প্রমীলা!

প্রমীলা। (হাতা হাতে নিয়ে দৌড়ে এসে) কি হয়েছে?

শশাঙ্ক। (নিজেকে সংযত করে) এঁ্যা! ওঃ! না—কিছু না। আমি যেন এই শিখাটার মধ্যে বাঁদরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম, জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

প্রমীলা। (হাতটা ধরে) চল, চল খাবে চল। (হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেলেন। শশাঙ্ক এক বার পেছন ফিরে ভীত ভাবে আলোটার দিকে তাকালেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঞ্চদৃশ্য—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। উজ্জ্বল সূর্যালোক এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। টেবিলের উপর কাপ, ডিশ, কেটলি প্রভৃতি সাজানো রয়েছে। শশাঙ্কবাবু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রমীলা দেবী একটি পাত্র নিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকলেন।]

শশাঙ্ক। আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে।

প্রমীলা। উঃ! কাল যা ঝড়টাই গেল। সকালেই যে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যাবে একদম ভাবি নি। বাজ পড়ার আওয়াজে আমার ত সারারাত ঘুমই হয় নি।

শশাঙ্ক। যা বলেছ। (একটু থেমে) নদীর ধারে শ্মশানের পাশের রাস্তাটা যা খারাপ। কালকের ঝড়জলে যদি রাস্তায় জল দাঁড়ায় তবে বিশুর ফিরতে দেরি হবে।

প্রমীলা। (টেবিলের ওপর পাত্রটা নামিয়ে) তা'ও ত বটে। বাজল ক'টা? ওর কি ফেরবার সময় হয় নি? (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) পৌনে আটটা। ওর ছুটি হয়েছে ত সকাল সাড়ে সাতটায়। (চেয়ারগুলো টেনে বার করতে লাগলেন।)

শশাঙ্ক। ওখানে যারা জামাকাপড় ছাড়তে, হাতমুখ ধুতে আধ ঘণ্টা। তা হলে এতক্ষণে ও শ্মশানের ধারে পৌঁছে গেছে।

প্রমীলা। তা হলে ত মিনিটদশেকের মধ্যে এসে পড়বে।

শশাঙ্ক। হাঁ, হাঁ, এখনই এসে পড়বে। (টেবিলের ধারে এগিয়ে এসে) আজ কি তৈরি করলে?

প্রমীলা। (বাক্সের উপরটা পরিষ্কার করতে করতে) মোহন-ভোগ। বিশু ক'দিন ধরে বলছিল। (বাঁদরের থাবাটা দেখে) আঃ! এই নোংরা জিনিষটা আবার এর ওপর।

(হাতে নিয়ে একবার দেখে আবার নাকমুখ কুঁচকে রেখে দিল।) বাজে জিনিস! এই নিয়ে কাল রাতে আমরা এত হৈচৈ করেছি যে ভাবলে হাসি পায়।

শশাঙ্ক। (জানালার ধারে থেকে যেতে) হ্যাঁ! যেমন ক্যাপ্টেন আর তেমনি তার গল্প—স্রেফ গাঁজা। আমার মনে হয় যুদ্ধফেরত লোকগুলোই ও রকম।

প্রমীলা। (টেবিলের ধারে এসে) এস। চা হয়ে গেছে। বিশুর জন্ম অপেক্ষা করে থাকলে ও আবার রাগ করে। (দু'জনে খেতে আরম্ভ করল)

প্রমীলা। (খেতে খেতে) আচ্ছা, আজকালকার দিনে কখনও এ রকম ভাবে ইচ্ছে পূর্ণ হয়?

শশাঙ্ক। তুমি বোধ হয় সারারাত ধরে এই সব ভেবেছ?

প্রমীলা। আহা, নিজে যেন কত ভাবেন নি। সারারাত শুধু এপাশ-ওপাশ করেছ।

শশাঙ্ক। (একটু হেসে) তা যা বলেছ। সত্যিই কাল ভাল ঘুম হয় নি। হয়ত ঝড়ের জন্যই—

প্রমীলা। (ঝঙ্কার দিয়ে) হ্যাঁ, ঝড়ের জন্য না ছাই!

শশাঙ্ক। কি জানি! সারারাত শুধু আধো-ঘুমে, আধো-তন্দ্রায় অস্বস্তিতে কাটিয়েছি।

প্রমীলা। আর সারারাত ধরে বোধ হয় ভেবেছ যে, যদি প্রার্থনা পূর্ণই হয়, তা হলে অমঙ্গলটাই বা হয় কি করে! আচ্ছা, সত্যিই যদি পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যেত, তা হলে তার খারাপ ফলটা কিই-বা হ'ত?

শশাঙ্ক। (একটু উদাসীন ভাবে) কে জানে। বোধ হয় টাকার থলিটা ঝপ করে মাথায় পড়ে, মাথাটা ফাটিয়ে দিত। আর ত কিছু মাথায় আসছে না— (প্রমীলা হাসলেন) তবে হ্যাঁ— বুদুক্কে বলে গেছে কিন্তু—টাকাটা এমন স্বাভাবিক ভাবে পাব যেন মনে হতে পারে, এর সঙ্গে থাবাটার কোন যোগ নেই।

প্রমীলা। যাকগে। টাকা ত পাওয়া যায় নি। আর আমার বিশ্বাস, যাবেও না। মিছিমিছি এসব বাজে ভাবনা।

(বাইরের দরজটা একটু খুলে, 'চিঠি' বলে ডাক দিয়ে পিয়ন ঘরের মেঝেয় একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে গেল।)

প্রমীলা। (চমকে উঠে) কে এল?

শশাঙ্ক। ডাকপিয়ন। একটা চিঠি দিয়ে গেল দেখছি।

প্রমীলা। (একটু উত্তেজিত ভাবে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, তাই ত চিঠিই ত দিয়ে গেল।

শশাঙ্ক। (হালকা সুরে) কি বিপদ! ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে যাবে না ত কি কয়লা দিয়ে যাবে, না, দুধ দিয়ে যাবে?

প্রমীলা। (অসহিষ্ণু ভাবে) না, না, তা বলছি না। আমি বলছিলাম কি, মনে কর—(ইতস্ততঃ করতে লাগলেন)

শশাঙ্ক। (বিস্মিত হয়ে) কি? কি মনে করব?

প্রমীলা। ধর, একটা পাঁচ হাজার টাকার চেক—কিংবা ঐ রকম কিছু—

শশাঙ্ক। (উত্তেজনা দমন করে) হ্যাঁ তোমার যত সব—দেখি আন না চিঠিটা।

প্রমীলা। (চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে) বেশ মোটা ত। (হাত দিয়ে অনুভব করে) শক্ত মতন কি যেন রয়েছে (শশাঙ্ককে দিলেন)

শশাঙ্ক। (চোখমুখ কুঁচকে পড়বার চেষ্টা করে) কার নামে চিঠিটা?

প্রমীলা। তোমার নামে।

শশাঙ্ক। (চিঠিটা উলটে পালটে দেখতে লাগলেন; উত্তেজনা গোপন করবার চেষ্টা করেও পারছেন না) যত সব আজগুবি ধারণা, কোথাও কিছু নেই পাঁচ হাজার টাকা—ইয়ে, আমার চশমাটা কোথায় গেল?

প্রমীলা। (দ্রুত কণ্ঠে) আমাকে দাও না। আমিই খুলছি।

শশাঙ্ক। (ব্যস্ত হয়ে) না, না হাত দিও না। কি মুশকিল আমার চশমাটা কোথায় ? (এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন)

প্রমীলা। কেন আমি খুললে—

শশাঙ্ক। (অধীর ভাবে) আঃ! আমার চশমাটা দেবে ?

প্রমীলা। (র‍্যাক থেকে চশমাটা নিয়ে দিল) এই ত চশমা। (শশাঙ্ক চশমা পরে চিঠিটা ছিঁড়তে লাগলেন) দেখ, সাবধান, যেন ছিঁড়ে না যায়।

শশাঙ্ক। ছিঁড়বে ?

প্রমীলা। (একটু অপ্রতিভ হয়ে) না যদি ব্যাঙ্কনোট কিংবা চেকটা।

শশাঙ্ক। (খামটা ছিঁড়ে একটা অফিসিয়াল ডকুমেন্ট বার করলেন, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট স্লিপ।) তোমার ভীমরতি ধরেছে মানুষকে এমন নার্ভাস করে দাও। (চিঠিটা পড়লেন) 'মহাশয় বাড়ী বন্ধকী খাতে পাঁচ হাজার টাকা হাওলাত বাবদে আপনার প্রদত্ত সুদ পাইয়াছি। ইতি—"দূর"—।

(দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকালেন। শশাঙ্ক বসে পড়ে তাহার শেষ করতে লাগলেন। প্রমীলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন)

প্রমীলা। (উষ্মাভরে) এ তোমার ঐ গাঁজাখোর বন্ধুর কথা শোনার ফল।

শশাঙ্ক। (নিরুৎসুক ভাবে) কেন ? কি হয়েছে ?

প্রমীলা। এই যে তুমি ভেবেছিলে, এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার ড্রাফট আছে।

শশাঙ্ক। (রাগান্বিত ভাবে) আমি বলেছিলাম। আমি বরাবর বলে আসছি—

প্রমীলা। বলে আসছ বৈ কি! দাঁড়াও না বিশু শুনলে যা করবে!

শশাঙ্ক। (একটু রুক্ষভাবে) আচ্ছা থাক। এসব কথা আর বিশুর কানে তুলতে হবে না।

প্রমীলা। না, বলবে না। আমি নিশ্চয় বলব! তার পর সে যা খুশী করবে তোমাকে নিয়ে। (জানালা দিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে বাইরে কি যেন দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে) কাল রাত্রে তুমি যখন বলছিলে থাবাটা নড়ছে, তখন তোমায় যা ঠাট্টা করেছিল।

শশাঙ্ক। ঠাট্টা করলেই হ'ল। নড়েছিলই ত সেটা। আমি শপথ করে বলতে পারি।

প্রমীলা। (বাইরে কিছু একটা দেখতে দেখতে) ও তোমার মনের ভুল।

শশাঙ্ক। আমি বলছি, নড়েছিল। মনের ভুল হতেই পারে না। আমি কি রকম চমকে উঠেছিলাম, দেখেছিলে ? (প্রমীলা উত্তর দিলেন না।) কি দেখ নি ? কি হ'ল, ওখানে কি এত দেখছ ?

প্রমীলা। (ঘরের দিকে ফিরে) না, কিছু না। ও একটা লোক, আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে।

শশাঙ্ক। বিশুকে খুঁজছে না ত ? ওর ত আসবার সময় হয়ে গেছে।

প্রমীলা। (জানালা দিয়ে দেখে) না, লোকটা চলে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক। যাক। হ্যাঁ যা বলছিলাম।

প্রমীলা। না গো! লোকটা ফিরে আমাদের বাড়ীর দিকেই তাকাচ্ছে।

শশাঙ্ক। তা হলে বোধ হয় নম্বর খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রমীলা। (অল্প উত্তেজিত ভাবে) হ্যাঁ—তা লোকটা ফুল-প্যান্ট পরে আছে আর কালো কোট—আমাদের গেটের ছিটকিনিটা খুলছে।

শশাঙ্ক। এই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অমন চেঁচিও না, লোকটা তা হ'লে আমাদের বাড়ীতেই আসছে ?

প্রমীলা। না বোধ হয়, দরজাটা ভেজিয়ে চলে যাচ্ছে। (হঠাৎ দ্রুত কণ্ঠে) না, না, লোকটা সোজা বাড়ীর ভেতরে আসছে। (টেবিলের কাছে ছুটে এসে) দেখ, লোকটাকে ঠিক উকিলের মত দেখতে।

শশাঙ্ক। তাতে কি হয়েছে ?

প্রমীলা। মানে—বলছিই ত তুমি হাতের—মানে মনে কর সেই পাঁচ হাজার টাকার ব্যাপারে লোকটা হয় ত আসছে।

শশাঙ্ক। আচ্ছা, থামো দেখি, তুমি একটি আস্ত নির্বোধ। দেখি আবার কে এল।

(বাইরের দরজায় ধাক্কা)

(শশাঙ্ক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রমীলা ইতিমধ্যে টেবিলটা অল্প একটু গোছাবার চেষ্টা করলেন। শাড়ীটা একটু ঠিক করে নিলেন। শশাঙ্ক দরজা খুললেন। ট্রাউজার আর কালো কোট-পরা একটা লোককে দরজায় দেখা গেল।)

আগন্তুক। (বাইরে থেকে) এটাই বোধ হয় শশাঙ্কবাবুর বাড়ী ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ। আপনি ভিতরে আসুন।

(লোকটি ভিতরে এলেন)

আগন্তুক। নমস্কার। আপনিই বোধ হয় শশাঙ্কবাবু ?

শশাঙ্ক। হ্যাঁ। আপনি বসুন। (একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন)

আগন্তুক। (হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে) না, না, ঠিক আছে—ঠিক ধন্যবাদ—আমি মানে—আমি আসছি—(থেমে পড়ল)

শশাঙ্ক। আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারলাম না।

আগন্তুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমার নাম শনি চৌধুরী, আমি আসছি—

(এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে লাগল)

শশাঙ্ক। আপনি বোধ হয় বিশ্বজিৎকে খুঁজছেন ?

প্রমীলা। বিশু এখনই এসে পড়বে। ওর আসবার সময় হয়ে গেছে।

শনি। (প্রমীলাকে বাধা দিয়ে) না, না, (একটু থেমে) আমি পাওয়ার-হাউস থেকে আসছি। (শশাঙ্ককে গম্ভীর ভাবে) আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

প্রমীলা। (উদ্বিগ্ন ভাবে) সে কি। তা হলে তো আপনার বিশুর সঙ্গেই আসা উচিত ছিল।

শশাঙ্ক। (একটু অবাক হয়ে) পাওয়ার-হাউস থেকে আসছেন। কি দরকার, বলুন।

শনি। (প্রমীলাকে দেখিয়ে) ওকে একটু ভেতরে যেতে বলুন। (শশাঙ্ক বিস্মিত দৃষ্টিতে শনির দিকে তাকালেন। তার পর ফিরে প্রমীলার দিকে তাকালেন। প্রমীলা ওঁর মুখের দিকে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভেতরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।)

শশাঙ্ক। (উত্তেজনা দমন করে) কি ব্যাপার বলুন ত?

শনি। পাওয়ার-হাউসের কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাকেই—

শশাঙ্ক। (বাধা দিয়ে অধীর ভাবে) কি হয়েছে বলুন না। আশা করি, আপনি কোন খারাপ খবর আনেন নি?

শনি। আমাকে এই খবরটা দিতে পাঠানো হয়েছে যে।—

শশাঙ্ক। (উত্তেজিত ভাবে) কি খবর? বিশুর খবর? তার কি কিছু হয়েছে? কোন কিছু আঘাত— (থেমে পড়লেন)

(শনি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল)

শশাঙ্ক। বলুন, বলুন।

শনি। হঠাৎ এবং দুর্ঘটনায় বিশ্বজিৎবাবু— (থেমে গেলেন)

শশাঙ্ক। (চীৎকার করে) বিশু, আহত হয়েছে?

(শনি চুপ করে রইল। ভিতরে আর্ত কণ্ঠে চাপা চীৎকার।)

শনি। সাংঘাতিক আহত।

শশাঙ্ক। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ওর কি জ্ঞান আছে? খুব কি কষ্ট পাচ্ছে?

শনি। (মুখ তুলে, ধীরে ধীরে) না, আর তার কোন কষ্টই নেই।

শশাঙ্ক। (বুঝতে না পেরে, দ্রুত কণ্ঠে) কোন কষ্টই নেই। (বুঝতে পেরে, স্খলিত কণ্ঠে) এ্যা, তার মানে! সে কি আর— সে কি আর—(ভেতর থেকে আলুথালু বেশে প্রমীলা বেরিয়ে এলেন।)

প্রমীলা। (আর্তস্বরে) বিশু—বিশু—বিশুরে—(শশাঙ্ক প্রমীলাকে এক হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। আর এক হাতে শনির হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে জড়িত স্বরে বললেন)

শশাঙ্ক। বলুন, বলুন। দোহাই আপনার, চুপ করে থাকবেন না।

শনি। বিশ্বজিৎ কাল রাত্রে আমাদের একটা গল্প বলছিল; কি একটা বাঁদরের থাবা নিয়ে। বোধ হয় কাল রাত্রে গল্পটা এখানে শুনেছিল। খুব হাসতে হাসতে গল্পটা বলছিল। ফলে একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। এমন সময় (একটু থেমে) হঠাৎ একটা মেশিনের মধ্যে হাতটা কিরকম করে যেন—মানে তার পর—(প্রমীলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। তার পর কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর মুখে যুগপৎ আতঙ্ক ও শোকের চিহ্ন।)

শশাঙ্ক। (শূন্য দৃষ্টিতে, প্রমীলার কাঁধে হাত রেখে) মেশিনের মধ্যে পড়ে গেল—এ্যা, আমাদের একমাত্র সন্তান বিশু, তাকে নিয়ে গেল—এ্যা! ওঃ!

শনি। (বিনীত ভাবে) কোম্পানী আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছে, আপনাদের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে—।

শশাঙ্ক। (শূন্য দৃষ্টিতে, থেমে থেমে) আপনাদের অপূরণীয় ক্ষতি—

শনি। আমাকে আরও বলতে বলা হয়েছে যে—মাপ করবেন—আমি কোম্পানীর ভৃত্য মাত্র—

শশাঙ্ক। (ফিস্‌ফিস করে) আমাদের—আমাদের—অপূরণীয় ক্ষতি—

শনি। (টেবিলের ওপর একটা খাম রেখে, এবং দরজার দিকে একটু পিছিয়ে গিয়ে) আমাকে বলতে বলা হয়েছে—কোম্পানী এই দুর্ঘটনার সব দায়িত্ব অস্বীকার করেছে—তবে আপনার ছেলের কর্মকুশলতার কথা স্মরণ করে তারা সামান্য কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দিয়েছেন। (দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।)

শশাঙ্ক। (জড়ানো সুরে) দায়িত্ব!—ক্ষতি!—ক্ষতিপূরণ!—(সহসা আতঙ্কিত ভাবে) কত?—কত টাকা?

শনি। (দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) পাঁচ হাজার টাকা। (বেরিয়ে গেল।) (প্রমীলা আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে টেবিলের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল। শশাঙ্ক তাঁর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণভাবে একটু হাসলেন; অন্ধের মত হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন। তার পর সেই অবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

মঞ্চদৃশ্য—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ।

[রাত্রি। টেবিলের ওপর একটা অর্দ্ধদগ্ধ মোমবাতি। ঘরের জিনিষপত্র অগোছালো। শশাঙ্ক টেবিলে মাথা দিয়ে বসে আছেন। প্রমীলা জানালার পরদাটা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে আছেন। শশাঙ্ক হঠাৎ মাথা তুললেন। চারিদিকে তাকালেন।]

শশাঙ্ক। (ভগ্ন স্বরে) ওগো কোথায় গেলে!

প্রমীলা। (জানালা থেকে) এই যে। জানলায়।

শশাঙ্ক। (স্বাভাবিক স্বরে) ওখানে কি করছ?

প্রমীলা। (উদাসীন ভাবে) দেখছি রাস্তটা।

শশাঙ্ক। (পেছনে হেলে পড়ে) কি লাভ প্রমীলা! কি লাভ ওতে!

প্রমীলা। (একই ভাবে) আচ্ছা, ঐ ধারটায় শ্মশান, না!

শশাঙ্ক। হ্যাঁ! হ্যাঁ! এক হপ্তা হয়ে গেল। মাত্র এক সপ্তাহ আগেও—এখন ক'টা বেজেছে?

প্রমীলা। (বিক্ষুব্ধ স্বরে) জানি না।

শশাঙ্ক। (ম্লান হেসে) জান না? কেন, সময়ের হিসেব কি ক'রে রাখবে না?

প্রমীলা। সময়ের হিসেব! কি হবে গো তা রেখে! সে কি বাড়ী আসবে? কোন দিন—কোন দিনই ত সে আর বাড়ী আসবে না।

শশাঙ্ক। অত উতলা হয়ো না প্রমীলা। (একটু থেমে) জানলা থেকে সরে এস, ঠাণ্ডা লাগবে।

প্রমীলা। ঠাণ্ডা লাগবে! আমার! সে যে চিরকালের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

শশাঙ্ক। হ্যাঁ, প্রমীলা। চিরকালের মতই চলে গেল।

প্রমীলা। আর আমাদের সব আশাও চলে গেল।

শশাঙ্ক। আর আমাদের সব আকাঙ্ক্ষাও—

প্রমীলা। আর আমাদের—এ্যা—আকাঙ্ক্ষা—

(হঠাৎ চীৎকার করে দৌড়ে এলেন। শশাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন)

শশাঙ্ক। প্রমীলা! প্রমীলা! দোহাই তোমার! বল কি হয়েছে?

প্রমীলা। (মুখ চোখে ভয়ানক উদ্বেগ ফুটিয়ে) হ্যাঁ! হ্যাঁ! আকাঙ্ক্ষা! থাবা! সেই বাঁদরের থাবা?

শশাঙ্ক। (বিহ্বল ভাবে) কেন? কেন? কি হবে সেটায়?

প্রমীলা। (তীব্র স্বরে) চাই! চাই! আমার চাই ওটা! কোথায় রেখেছ সেটাকে?

শশাঙ্ক। কি জানি। আমি ত আর দেখি নি সেটাকে। কিন্তু কেন?

প্রমীলা। আমার চাই। বার কর। খুঁজে বার কর সেটাকে।

শশাঙ্ক। (র‍্যাকের ওপর হাতড়াতে হাতড়াতে) এই যে। এখানে। কি করবে এটা নিয়ে। (র‍্যাকের ওপর রেখে দিলেন)

প্রমীলা। এতক্ষণ আমার মনে পড়ে নি! আশ্চর্য! তোমারও কি মনে পড়ে নি।

শশাঙ্ক। কি মনে পড়বে?

প্রমীলা। আরও দুটো ইচ্ছে!

শশাঙ্ক। (আতঙ্কিত ভাবে) কি?

প্রমীলা। হ্যাঁ। আমরা ত একটা মাত্র চেয়েছি। আরও দুটো আছে—আরও দুটো আছে!

শশাঙ্ক। (ক্লিষ্ট ভাবে) না, না, ও আর নয়। একটাই কি যথেষ্ট হয় নি?

প্রমীলা। না গো না। আমরা আরও একটা চাইব। (শশাঙ্ক মধ্যস্থলে এগিয়ে এলেন। প্রমীলা থাবাটা নিয়ে পিছু পিছু এলেন) নাও। নাও এটা। আর চাও—

শশাঙ্ক। (থাবা'টা না নিয়ে) চাইব কি?

প্রমীলা। ওগো, বিশু বিশু। তুমি চাও আমাদের বিশু আবার ফিরে আসুক!

শশাঙ্ক। (আঁৎকে উঠে) আঃ! তুমি কি পাগল হলে!

প্রমীলা। না, না—নাও বলছি। নাও (প্রচণ্ড শোকার্ত্ত হয়ে) ওরে বিশু, বিশুরে—

শশাঙ্ক। চল, শোবে চল। তোমার মাথার ঠিক নেই—কি বলছ বুঝতে পারছ না।

প্রমীলা। (অবুঝ ভাবে) আমাদের প্রথম ইচ্ছে যখন পূর্ণ হয়েছে, কেন—কেন—আমাদের দ্বিতীয় ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

শশাঙ্ক। ওগো, তুমি বুঝছ না। সাত দিন আগে সে মারা গেছে। আর—আর তুমি ভেবে দেখ—আমি তাকে তার কাপড়-চোপড় দেখে চিনতে পেরেছিলাম—তোমাকে তখন দেখতেই দেওয়া হয় নি—এখন তুমি তাকে দেখে সহ্য করবে কি করে।

প্রমীলা। (আকুল স্বরে) না, না, না। আমি পারব। তাকে ফিরিয়ে আন।

শশাঙ্ক। (থাবাটা নিতে গিয়ে, হাতটা সরিয়ে নিয়ে) না, ওটা ছুঁতে আমার সাহস হয় না।

প্রমীলা। (জোর করে শশাঙ্কর হাতে গুঁজে দিয়ে) নিশ্চয় পারবে। নাও, এবার চাও—যেমন ভাবে আমার ছেলেকে চিতায় শুইয়ে দিয়ে এসেছ, ঠিক তেমনি ভাবে যেন সে ফিরে আসে।

শশাঙ্ক। (কম্পিত কণ্ঠে) প্রমীলা!

প্রমীলা। (ভীষণ ভাবে) চাও, চাও বলছি—

(হিংস্রভাবে ক্রমাগত বলতে লাগল—চাও, চাও!)

শশাঙ্ক। (হাত এবং কণ্ঠস্বর কম্পিত) আমি—আমি—ইচ্ছে করি—আমার ছেলে—আমার ছেলে ফিরে আসুক।

(আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে টলে চেয়ারে বসে পড়লেন। থাবাটা মেঝের পড়ে গেল। হাত লেগে বাতিটা উল্টে গিয়ে নিভে গেল। প্রমীলা দৌড়ে জানালার ধারে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। চাঁদের আলো এসে পড়ল তাঁর গায়ে। কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত)

প্রমীলা। (হতাশ ভাবে) কিচ্ছু নেই।

শশাঙ্ক। আঃ! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

প্রমীলা। কেউ নেই। এত বড় রাস্তাটায় একজনও জীবিত

প্রাণী নেই। (পরদাটা বন্ধ করে দিয়ে) নেই, নেই, ওগো কেউ নেই; আমাদের জীবনে একটু আলো দিতে একজনও রইল না।

শশাঙ্ক। শুধু, আমরা দু'জনে আর বিশুর স্মৃতি।

প্রমীলা। (জানালার কাছ থেকে সরে এসে শশাঙ্কর কাছে দাঁড়ালেন) এই বুড়ো বয়সে যে নতুন করে আর কিছুই করা যায় না; আমরা যে তার মধ্যেই বেঁচেছিলাম। তাকে ঘিরেই আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার চোখেই আমাদের সব স্বপ্ন--বাতি নিভে গেছে—চারিদিক শূন্য—এই ভয়াবহ শূন্যতা আর অন্ধকারের মাঝেই আমাদের বাকি দিনক'টা কাটাতে হবে। (চেয়ারে বসে পড়লেন।)

শশাঙ্ক। খুব বেশী দিন নয় প্রমীলা। আর এই বাকি দিন ক'টা—

প্রমীলা। প্রতিটি মুহূর্তই যে অনন্ত বলে মনে হচ্ছে!

শশাঙ্ক। (সোজা হয়ে বসে) নাঃ। এ অন্ধকারটা সহ্য হচ্ছে না;

প্রমীলা। উপায় নেই—উপায় নেই--চারিদিক অন্ধকার—

শশাঙ্ক। বাতিটা কোথায়? (টেবিল হাতড়ে হাতড়ে বাতিটা পেলেন) দেশলাইটা? দেশলাইটা কোথায়? (তাক থেকে খুঁজে দেশলাইটা আনলেন; দেশলাই দিয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে টেবিলে বসালেন। জ্বলন্ত কাঠিটা ফেলতে গিয়ে প্রমীলার সামনে ধরলেন; দেখলেন প্রমীলা চেয়ারের পিঠে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে) ছিঃ। প্রমীলা! এ কি হচ্ছে। চল শোবে চল।

প্রমীলা। (ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে) ওগো, ঘুমিয়ে পড়লেও কি ভুলতে পারব। ভুলতে কি পারব--আমায় আর মা বলে কেউ ডাকবে না। আমি— (দরজায় মৃদু করাঘাত।)

প্রমীলা। (চমকে উঠে) ও কি!

শশাঙ্ক। (উত্তেজনা দমন করে) না, কিছু নয়; বোধ হয় ইঁদুর-টিঁদুর হবে। বাড়ীতে যা ইঁদুর।

(আবার জোরে করাঘাত। প্রমীলা তড়াক্‌ করে উঠে পড়ল। শশাঙ্ক তার হাতটা ধরে ফেলল।)

শশাঙ্ক। থাম! কোথায় যাচ্ছ তুমি!

প্রমীলা। (প্রচণ্ড আবেগে) ওগো! এসেছে! এসেছে! আমার মনে ছিল না—শ্মশান যে এখান থেকে অনেকটা পথ—ছাড় আমাকে—দরজাটা খুলে দিতে হবে—বিশু, দাঁড়া—

(দরজায় মাঝে মাঝে ধাক্কা)

শশাঙ্ক: (দৃঢ় ভাবে প্রমীলাকে ধরে) প্রমীলা, প্রমীলা—

প্রমীলা। (ধস্তাধ্বস্তি করতে করতে) আমাকে যেতে দাও।

শশাঙ্ক। দোহাই তোমার, দরজা খুলো না। (হাত ধরে ভেতরের দরজার দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।)

প্রমীলা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে যেতে দাও।

শশাঙ্ক! ভাবতে পার, তুমি কি দেখবে!

প্রমীলা। (হিংস্রভাবে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে) তুমি কি ভাব আমার পেটের ছেলেকে আমি ভয় করব। যেতে দাও।

(সহসা হাত ছাড়িয়ে নিল এবং দ্রুত দরজার দিকে যেতে যেতে) বিশু; বিশু! আমি আসছি, দাঁড়া।

শশাঙ্ক। (ভয় পেয়ে ভেতরের দরজার দিকে সরে এসে) ওগো, খুলো না! খুলো না!

(প্রমীলা দরজা খুলতে লাগলেন; দরজায় ধাক্কা চলছে; তলার ছিটকিনিটা খুলে ফেললেন। চাবি লাগিয়ে তালা খুলতে লাগলেন।)

শশাঙ্ক। (হঠাৎ) থাবা! কোথায় সেটা। কোথায় সেই বাঁদরের থাবা?

(হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন।)

প্রমীলা। (তালা খুলে ফেলে, ওপরের ছিটকিনিটা খুলবার চেষ্টা করে) ওগো, ওপরের ছিটকিনিটা বড্ড এঁটে গেছে। আমি পারছি না। এসো না, খুলে দিয়ে যাও না।

শশাঙ্ক। (উত্তেজিত ভাবে) কোথায়? কোথায় সেটা? এখনও একটা ইচ্ছে বাকি আছে। (দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত)

প্রমীলা। শুনতে পাচ্ছ না তুমি? তোমার ছেলে যে দরজা খুলতে বলছে!

শশাঙ্ক। (আতঙ্কিত ভাবে) কোথায়? কোথায় পড়ল সেটা?

প্রমীলা। (প্রাণপণে ছিটকিনিটা ধরে টানতে টানতে) ওগো, খুলে দাও, তোমার ছেলেকে কি বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না?

শশাঙ্ক। পাচ্ছি না। আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কে নিল—কে নিল---

(দরজায় ধাক্কা এমন হ'ল যে, মনে হ'ল ছিটকিনি খুলে যাবে)

প্রমীলা। বিশু! বিশু! দাঁড়া, তোর মা দরজা খুলে দিচ্ছে। আঃ, ছিটকিনিটা ভেঙে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক: ভগবান! (থাবাটা পেয়ে) এই তো—পেয়েছি—পেয়েছি—

প্রমীলা। (ছিটকিনি টানাটানি করতে করতে) এই তো খুলে গেছে—বিশু—

শশাঙ্ক। (প্রায় সেই মুহূর্তেই টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠে থাবাটা হাতে নিয়ে) সে মরে থাক। (সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ থামল) সে শান্তিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে থাক।

প্রমীলা। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল) বিশু—

(চাঁদের আলো ঘরের ভিতর এসে পড়ল। সব নিস্তব্ধ। শশাঙ্ক চেয়ারের পিঠটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার কপাটে ভর দিয়ে প্রমীলা বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।)*

যবনিকা

---

* W. W. Jacobs-এর The Monkey's Pow অবলম্বনে।

আর এক দিকের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্প্রতি গ্রামে (আটপুর, জাঙ্গীপাড়া থানা, জেলা হুগলী) গিয়াছিলাম। দেশের অবস্থার কথা, উন্নয়নের কথা, বহুমুখী উন্নতিমূলক প্রচেষ্টার কথা সংবাদপত্রে পড়িয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে শুনিয়া মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়; ২।১ দিন পূর্ব্বেও বিলাত হইতে এক বন্ধু লিখিয়াছেন :

"I hope that you won't lose hope and faith in India. It seems to me to be the country with the greatest possibilities in the Far East", অর্থাৎ 'আমি আশা করি তুমি ভারতের উপর আশা ও বিশ্বাস হারাইবে না, আমার মনে হয় দূর প্রাচ্যে ভারতের বিরাট সম্ভাবনা আছে।' বন্ধুটি পূর্ব্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে এক জন নামজাদা কর্ম্মচারী ছিলেন।

কিন্তু গ্রামে যাইয়া যাহা দেখি, এবারেও যাহা দেখিলাম তাহাতে মন হতাশায় পূর্ণ হইয়া যায়। কোন দিকেই উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং পূর্ব্বের তুলনায় অবনতিই দেখিতে পাই। একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি না। ২।১টি উদাহরণ দিলে আমার মনোভাব স্পষ্ট হইতে পারে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) আটপুরে ঘোষ-বাটীতে স্বামী প্রেমানন্দের (তখন বাবুরাম ঘোষের) গৃহের প্রাঙ্গণে আট জন সঙ্গীসহ সন্ধ্যার সময় ধুনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। রোমা রোঁলা প্রণীত "The Life of Ramkrishna" পুস্তকের ১১৪শ পৃষ্ঠায় Epilogue শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পুণ্য দিনটি স্মরণে রাখিবার জন্য গত ছয় বৎসর হইতে প্রত্যেক বৎসর ২৪শে ডিসেম্বর আটপুরে স্বামী প্রেমানন্দের গৃহের প্রাঙ্গণে জনসাধারণের চেষ্টায় একটি পবিত্র ও পুণ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরাম ঘোষ এখনও জীবিত আছেন, বয়স ৯২, বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত—শয্যাশায়ী; তিনি বাগবাজারে "বলরাম মন্দিরে" অবস্থান করেন। গ্রামের প্রতি, পৈতৃক বাটীর প্রতি, পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ, পূজা-অর্চ্চনা, বিশেষতঃ এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এখনও অটুট আছে। এই বৎসরেও ২৪শে ডিসেম্বর উক্ত পবিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল; দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী চিৎস্বরানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য জনসাধারণকে সাদর আহ্বান জানান। কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য উক্ত দিবসে আটপুর গমন করিয়াছিলেন, হুগলী জেলাবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীকানাইলাল দে, হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দের দুই জন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরেরাম ঘোষ ও শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ অতিথিগণের প্রতি অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। পরদিন আটপুর বাজারে প্রধানতঃ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও যুবক সম্প্রদায়ের আগ্রহে ও উৎসাহে ভিক্ষালব্ধ চাউলের দ্বারা এবং আর্থিক সাহায্যে প্রায় দুই হাজার নরনারায়ণের সেবা করা হয়।

স্বামী চিৎস্বরানন্দের ভাষণ খুবই ভাবগম্ভীর, শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রধানতঃ যাঁহাদের চরিত্র ও আদর্শ গঠনের জন্য এই অনুষ্ঠানের মূল্য অতি অধিক তাঁহারা—অর্থাৎ ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায় অনেকে এই অনুষ্ঠান হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। অথচ এই অনুষ্ঠানে সমবেত ভাবে যোগদানের জন্য এবং এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আটপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। অনুষ্ঠানে ছাত্রগণের উপস্থিতি ছিল না বলিলেই হয়, শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। ইহার মধ্যে কোন প্রকারের রাজনীতি ছিল কিনা জানি না। কিন্তু রাজনীতিসত্ত্বেও সার্ব্বজনীন পূজায় এবং এইরূপ কোন অনুষ্ঠানে যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের উপস্থিতি, উদ্যম-উৎসাহ, কঠিন পরিশ্রম প্রচুর ভাবেই দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানে দেখা গেল না কেন? কোন কোন বন্ধু বলিলেন এই অনুষ্ঠানে "লাউড স্পীকারের" সাহায্যে নানা রকম সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল না, অন্য কোন হালকা আমোদ-প্রমোদের আয়োজন ছিল না—ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের কোন কর্তৃত্ব ছিল না ইত্যাদি কারণ এবং আরও ২।১টি কারণবশতঃ যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করা সম্ভব হয় নাই। মোট কথা, সকলের অভিমত বিশ্লেষণ করিলে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে যে, এই অনুষ্ঠানে বাহ্যিক কোন আড়ম্বর ছিল না, ইহার মধ্যে কোন প্রকার "হৈ হুল্লোড়" করিবার সুযোগ ছিল না বলিয়াই ইহা যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য একজন মন্ত্রী বা এইরূপ হোমরাচোমরা কোন ব্যক্তি যদি আসিতেন তাহা হইলে সভা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। এইরূপ বিশ্লেষণ যদি ঠিক হয় তাহা হইলে দেশের অবস্থা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা বুঝিতে কঠিন হইবে না। অথচ যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ই ভবিষ্যতের নেতা।

ক্ষুদ্র গ্রামে দলাদলি, রেষারেষি ক্রমশঃই বাড়িতেছে. দেশ যে স্বাধীন হইয়াছে, স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের যে দেশের প্রতি একটা মহান কর্ত্তব্য আছে এবং সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে দলাদলি, রেষারেষি ভুলিতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ একটু-আধটু ত্যাগ করিতে হইবে—এ মনোভাব প্রায় কাহারও নাই ! বহু দিনের পরিশ্রমে, বহু জনের স্বার্থত্যাগে গ্রামের যে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকেও ভাঙিতে হইবে—এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মনোভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। স্বীকার করি, সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক রকমের ত্রুটি দেখা গিয়াছে ; কিন্তু সেই সকল ত্রুটি দূর করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া অধিকতর উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা ভাল, না ব্যক্তিগত কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ভাল ? ইহার মূলে ব্যক্তিগত দলাদলি, স্বার্থ, রেষারেষি যথেষ্ট রহিয়াছে এবং সকলেই নেতার আসনে বসিতে চান—যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া সকলেই কাজ হাসিল করিতে চান। এইরূপ মনোভাব দূর করিতে না পারিলে গ্রামাঞ্চলের উন্নতি সুদূরপরাহত।

গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়—বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ব্যবসা, বাণিজ্যের অবস্থা খুবই মন্দা ; ভদ্রশ্রেণীর কয়েকজন যুবক সামান্য মূলধন লইয়া সামান্য ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল, তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িতেছে।

বর্ত্তমানে ধান-কাটা চলিতেছে—শ্রমিকের পারিশ্রমিক জল-খাবার সমেত দৈনিক ১।০ আনা। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের মূল্য এইরূপ :

১। চাল (নূতন) এক মণ—১৭।৯—২০৲
২। মুগুর ডাল /১ ।৵০
৩। মুগ ডাল /১ ।৵০
৪। অড়হর ডাল /১ ।০
৫। ছোলার ডাল /১ ।০
৬। সরিষার তৈল /১ ২।৴
৭। হলুদ /১ ।৵০-৷৵০
৮। সরিষা /১ ৷০
৯। ধনে /১ ৷০
১০। লঙ্কা /১ ৩৲
কাচা লঙ্কা /১ ১৲
১১। আটা /১ ।০
১২। ময়দা /১ ।৵০
১৩। চিনি /১ ৸৵০-৸৵০
১৪। গুড় /১ ।৶১০
ঐ আকের /১ ।০
ঐ খেজুরে /১ ৷০
১৫। মাছ /১ ২৲-২।০
চনো /১ ৷০-১।০
১৬। হাঁসের ডিম /১৫
মুরগীর ডিম /৫
১৭। দুধ /১ ।০
১৮। আলু /১ ৷৵০
১৯। বেগুন /১ ।/০
২০। পেঁয়াজ /১ ।৵০
২১। শাক /১ ৵০
২২। মূলা /১ ৵০
২৩। রাঙালু /১ ৶০

উপরোক্ত হিসাব হইতে অনায়াসেই বুঝা যাইবে—একজন শ্রমিক দৈনিক ১।০ উপার্জ্জন করিয়া পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা কি করিয়া করিতে পারে ? কয়েক জনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহা এতই মর্ম্মন্তুদ যে, লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে না। একজন শ্রমিক বলিল—ভাত ও কাঁকড়া (পুকুরের ছোট ছোট) পোড়া খাইয়াছি ; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—একটু তেল ও লঙ্কা দিয়া কাঁকড়া রান্না করিলে না কেন ? সে উত্তর দিল, 'তেলের পয়সা কোথা হইতে আসিবে ?' আর একজন বলিল, 'ভাত ও লাউশাক সিদ্ধ খাইয়াছি।' এই ধরনের উত্তরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাইয়াছি।

গ্রামে সবদিকেই অভাব। একজন ব্রাহ্মণ বিধবা বলিলেন, 'দেশ হইতে বাঁশ উধাও হইয়া যাইতেছে—মরিলে পোড়াইবার মত বাঁশও পাওয়া যাইবে না। কথাটা খুবই সত্য ; মৃতদেহ পোড়াইবার জন্য কাঠের অভাব খুবই দেখা দিয়াছে। মোট কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকবর্গের প্রতি অসন্তোষ ও বিদ্বেষ। 'ইলেকশন' আসন্ন, দলীয় বিদ্বেষ, নিন্দা-কুৎসা প্রভৃতি রাস্তা-ঘাটে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কোন দলেরই কোন গঠনমূলক কাজের আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

গ্রামের রাস্তাঘাট-পুকুরের কোন সংস্কার নাই, পানীয়জলের অভাব যথেষ্ট আছে, 'টিউব-ওয়েল' অচল হইলে মিস্ত্রীর অভাবে উহা মেরামত হয় না। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতির হ্রাস হয় নাই ! ছাড়া-গরু, ছাগলের অত্যাচারে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেই উহা কলহে পরিণত হয়। গ্রামে থাকিতে হইলে এইরূপ অনেক প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে নেতার বিশেষ অভাব।

রাবণ ও মন্দোদরী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। চন্দ্র অস্তমিতপ্রায়। পূর্ব্ব গগনে শুকতারা উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে। লঙ্কার রাজপ্রাসাদের একপ্রান্তে রাবণ চিন্তিত মনে একাকী বসিয়া আছেন। দূরে রাম-নির্ম্মিত পাষাণ-সেতু রেখার মত অস্পষ্ট বাতাসের হু হু শব্দ ও সমুদ্রের গর্জ্জন আর্ত্তনাদের মত শোনা যাইতেছে। মন্দোদরী একাকিনী রাবণ-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মন্দোদরী

মহারাজ!

রাবণ

মহারাণি, এলে হেথা কি সংবাদ দিতে?
একান্তে বসিয়া আছি এ অলিন্দে চিন্তাকুল চিতে,
বিনিদ্র নয়নে জাগি'। জানি, তুমি হয়েছ আকুল
অতীত শোকের ভারে। জানি, যত করিয়াছি ভুল,—
তুমি মোর রাজেন্দ্রাণী, ক্ষমিয়াছ সে-সব আমার।
চিরদিন মোর পার্শ্বে রহি', সহি' তীব্র হাহাকার
বিক্ষত মাতৃত্বমাঝে, দিয়াছ উৎসাহ অনুক্ষণ।
আজি যবে চাহি আমি রামসনে সর্ব্বশেষ রণ
আসন্ন প্রত্যুষে, তুমি নিদ্রাহীনা অশ্রুভরা-চোখে
কি সান্ত্বনা মোর পাশে পারে বলো অনন্ত এ শোকে?

মন্দোদরী

মহারাজ, কোথা পাব সান্ত্বনা আমার? তুষানলে
নিত্য দহিতেছে চিত্ত। তাই তাই তপ্ত অশ্রুজলে
তোমারে মিনতি করি, ক্ষান্ত হও এ কালসমরে

রাবণ

রাত্রিশেষে হবে আজি এ রণের শেষ চিরতরে।
রাবণ অথবা রাম হবে জয়ী। বৃথা তুমি সহ মনস্তাপ,
স্বর্গজয়ী রাবণের জান তুমি দুর্বার প্রতাপ।
সাগরবলয়া লঙ্কা কোনদিন অগৌরব মাঝে
বরিবে না পরাজয়। কোনদিন নতশিরে লাজে
রহিবে না রক্ষকুল। রাবণের বিশ্বজয়ী নাম
অশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গে মহাসিন্ধু গাবে অবিরাম।
যাও রাণি শয্যাগৃহে, কেটে যায় তৃতীয় প্রহর,
দূর কর চিন্তাজাল, জয়লাভ করিব সত্বর।

মন্দোদরী

জানি স্বর্গজয়ী তুমি, তবু মনে হয় বারবার
তুচ্ছ এক নারী লাগি' কেন এনে দিলে হাহাকার
এ শান্ত লঙ্কার বুকে? কেন তুমি মজি' অগৌরবে
আপন আত্মজগণে দিলে বলি নির্ম্মম আহবে?
এ প্রলয়-স্রষ্টা তুমি।

রাবণ

মহারাণি, সে ত আমি নহি।

মন্দোদরী

তুমি নহ, মহারাজ? তব নিন্দাস্রোত বুকে বহি'
গর্জ্জে শৃঙ্খলিত সিন্ধু। এ দুর্ভাগা তোমারি সৃজন।
ক্ষম মোরে লঙ্কেশ্বর, তুমি লঙ্কা-ধ্বংসের কারণ।

রাবণ

বৃথা দাও অপযশ। এ যাতনা বুঝাব কাহারে!
সত্য কহি মন্দোদরি দাঁড়াইয়া আজি মৃত্যুদ্বারে,
—নহি আমি স্রষ্টা এর। জানে শুধু আমার অন্তর
সেই সুগোপন কথা। যাও রাণি, নিশান্ত প্রহর
দেখা দেয় পূর্ব্বাচলে শুকতারা-ম্লানরশ্মিপথে,
এখনি সাজিতে হবে রণবেশে মোর স্বর্ণরথে।

মন্দোদরী

সংশয় জাগাও কেন? ভ্রান্ত কর প্রলাপবচনে?
পরনারী হরি' তুমি, রাখ নি কি অশোককাননে
বন্দিনী করিয়া তারে? এ যে কত বড় ব্যথা মোর
কেমনে বোঝাব আমি। পতিপ্রেমে হইয়া বিভোর
তুলেছিনু স্বর্গ গড়ি'। তুমি তুচ্ছ ক্ষণিকের ভুলে
ভাঙিলে সে-স্বর্গ মোর। জীবনের শান্ত নদীকূলে
আনিলে প্রলয়-ঝঞ্ঝা। বহি' বুকে নির্ব্বাক সে-জ্বালা
তোমারি চরণপ্রান্তে সাজায়েছি প্রেম-অর্ঘ্য ডালা।
এই অকল্যাণ নাথ, জানি সৃষ্টি তব।

রাবণ

মহারাণি,
আমি নহি অপরাধী।

মন্দোদরী

কেন কহ সান্ত্বনার বাণী।

রাবণ

সান্ত্বনার বাণী নহে, আজি আমি আসি' মৃত্যুদ্বারে
জীবনের শেষ রণে, সত্যবাণী কহি যে তোমারে।

মন্দোদরী

তোমারে বলেছি কত রূঢ় কথা, ক্ষমিও আমায়।
জীবনের শত সাধ একে একে ভেঙ্গে গেছে হায়,
অভিশপ্ত এ সমরে। পুত্রহারা পুত্রবধূহারা,
আত্মীয়স্বজনহারা,—রুধি' তবু তপ্ত অশ্রুধারা
তোমারে করেছি দোষী। জানি আমি এ ধ্বংসের মূলে
শুধু জাগে দম্ভ তব কলঙ্কের মসীধ্বজা তুলে'।

রাবণ

সত্য কহি দোষী নহি আমি প্রিয়ে। আজি ত্রিভুবন
ধিকার দিতেছে মোরে,—আমি লঙ্কাধ্বংসের কারণ।
কেহ বুঝিল না আজো কোন্ বহ্নি বুকে বহি' হায়,
জ্বালিলাম চিতানল, আনিলাম প্রলয় লঙ্কায়।
ফিরে যাও মহারাণি, কিবা হবে শুনি' সেই কথা,
রাত্রি হয়ে এল শেষ, স্তব্ধ হোক গোপন-বারতা।

মন্দোদরী

তুমি লঙ্ক-রাজেশ্বর, তবু মোরে বল একবার,
ধ্বংসের এ আর্ত্তনাদ লঙ্কাবুকে সৃজন কাহার?
কে হয়েছে অপরাধী? কা'রে দোষী কর তুমি নাথ,
কে দিয়াছে তব প্রাণে অকরুণ নির্ম্মম আঘাত?

রাবণ

ক্ষান্ত হও প্রশ্নে তব। শয্যাগৃহে যাও তুমি ফিরে।
আমার এ প্রগল্‌ভতা যাও ভুলি'। শেষ রাত্রিটিরে
দাও ভালবাসিবারে। রজনীর অন্ধকারে থাকি'
অতীত স্মৃতির পথে দাও মোরে ফিরিতে একাকী।

মন্দোদরী

সংশয় রেখো না আর। সত্য বল, এ মহা আহবে
কেবা দোষী? কা'র নাম জেগে রবে চির অগৌরবে?

রাবণ

নিতান্ত শুনিতে চাও? শোন তবে বলি চুপে চুপে
—তুমিই নিমিত্ত এর।

মন্দোদরী

আমি? কেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে
দগ্ধ কর এ দাসীরে? কেন মোরে কর প্রবঞ্চনা
দুঃসহ প্রলাপবাক্যে? সত্য বল এ মহা যাতনা
কেন দাও বক্ষে মোর? এ দুর্নাম কেন মোর ভালে
আঁকিলে নির্ম্মম করে? কোন্ রাজনীতি-তর্কজালে
আমারে করিলে দোষী? অন্তঃপুরে আছি চিরদিন,
কেন মোর ভাগ্যাকাশ করে' দিলে কলঙ্কমলিন?

রাবণ

রাজনীতি নহে রাজ্ঞি, প্রাণনীতি বঞ্চিত স্বামীর।
সে কথা এখন থাক্। দেখ চেয়ে দূরে উষসীর
রক্তাক্ত অধরে ফোটে ধীরে ধীরে ক্রূর হাস্যরেখা,
আমারি জীবনগ্রন্থে সমাপ্তির রূঢ় চিহ্নলেখা।
এ সময়ে কিবা হবে পূর্ব্বকথা করায়ে স্মরণ?
অমৃতসাগরে কেন পেতে চাও গরল-প্লাবন
শেষ বিদায়ের ক্ষণে? তুমি রও চিরমহীয়সী
ভূলোক-বরেণ্যা ধন্যা বীরমাতা রাবণ-প্রেয়সী।

মন্দোদরী

তবু শুনিতে চাই কেন দোষী করিয়াছ মোরে
লঙ্কার বিনাশ তরে? কেন বাঁধি' কলঙ্কের ডোরে
রেখে দিলে চিরদিন? বল, আজি কোন্ ভ্রান্তিবশে
ভাঙ্গিলে প্রেমের স্বপ্ন দুর্বাক্যের নির্ম্মম পরশে?

রাবণ

মনে পড়ে বিভীষণে?

মন্দোদরী

সেই মহাপাতকীর কথা
আর শুনায়ো না কানে। স্বর্ণলঙ্কার স্বাধীনতা
দিতে চায় বৈরীকরে কুলপাংশু বিশ্বাসঘাতক,
তার নাম উচ্চারিয়া বাড়ায়ো না আর এ পাতক।

রাবণ

মনে পড়ে তার প্রতি রাজ্ঞি, তব প্রণয় আভাস?
কত সু-গোপন কথা, কত মধু হাস্য-পরিহাস
প্রেম-অনুরাগভরে? নিরালায় কাটাতে প্রহর
নির্জ্জন উদ্যান মাঝে সাথে তার রহি' নিরন্তর
স্নেহ-অভিনয়চ্ছলে। আমি বসি' রাজসভা মাঝে
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক লয়ে রহিতাম লিপ্ত শত কাজে।

যত প্রেম অনুরাগ ডালি দিতে বিভীষণ-করে ;
শুধু সম্রাজ্ঞীর বেশে দেখা দিতে নিশীথ প্রহরে
নিদ্রালু নয়নে প্রিয়ে। মৃদুহাস্যে ভক্তিনত শিরে
আমারে করিতে পূজা। রূপোজ্জ্বল যে যৌবন ঘিরে
জ্বলিত আরতিদীপ, সেথা আমি নিমেষের ভুলে
প্রেমের দেবতা হয়ে' রহি নাই প্রাণ-বেদীমূলে।
যে আবেগ উচ্ছলতা, যে যৌবন-মাধুরী-প্লাবন
ছিল বিভীষণ তরে, তুমি তারে রাখিয়া গোপন
শুষ্ক প্রেম জানাতে আমায়। শুধু দেহ-উপচারে
সাজাতে কর্ত্তব্য-ডালি। কিন্তু কভু স্নিগ্ধ প্রেমধারে
সিক্ত কর নাই চিত্ত। নিদ্রাভঙ্গে কত অর্দ্ধরাতে
দেখিতাম তুমি বাতায়নে, চাহি' প্রেম-দৃষ্টিপাতে
বিভীষণ-কক্ষপানে। মোর ভ্রাতৃবধূ সরমারে
"অতি বড় ভাগ্যবতী" বলি প্রশংসিতে বারে বারে।
কিন্তু তুমি লঙ্কেশ্বরী, অসামান্যা, ক্ষণিকের তরে
বলি নাই কোন কথা। শুধু রহি' বিষাক্ত অন্তরে
লয়েছি তোমার শ্রদ্ধা প্রেমহীন, আকুলতাহীন
পেয়েছি যৌবনস্পর্শ। অভিশপ্ত চিত্তে প্রতিদিন
সহেছি সে তুষানল। বসন ভূষণ অলঙ্কারে
করিয়াছি রাজেন্দ্রাণী। জীবনের গরল পাথারে
ফুটায়েছি রাজ-পদ্ম সহস্র জনের দৃষ্টিপথে,
দাম্পত্যের প্রেমবন্যা আনিয়াছি নিষ্প্রাণ সৈকতে।

মন্দোদরী

এত বড় অপবাদ কেন বল দিলে মোরে আজ,
কলঙ্কের ডালি দিতে হ'লে তুমি এতই নিলাজ ?

রাবণ

জানি বিভীষণ ভ্রাতা। একই রক্ত দেহে বহে তার।
ঘরের কলঙ্ক লয়ে প্রকাশ্যে কি করিব বিচার ?
বন্দী করি' তারে যদি রাখি আমি দূরে কারাগারে,
কি বুঝাব প্রজাগণে ? কি বলিব বধূ সরমারে ?
ভ্রাতৃবধ ? ভ্রাতা শুধু একা অপরাধী মোর কাছে ?
ইন্ধন ব্যতীত কভু অনলের অস্তিত্ব কি আছে ?
একদিন সভাতলে রামস্তুতি শুনি' মুখে তার,
ভাবিলাম সে সুযোগে তারে আমি করি বহিষ্কার
মোর রাজ্যসীমা হ'তে। সঙ্গে দিয়া বধূ সরমারে
লঙ্কা হ'তে নির্বাসনে পাঠালাম দূরে সিন্ধুপারে।
হায়, কেহ জানিল না, কোন্ ব্যথা বহি' মোর বুকে
দিনু ভ্রাতৃ-নির্বাসন। দেখিলাম সে কী ম্লান মুখে
নিঃশব্দে রহিলে তুমি। রাজ্য জুড়ি' রণ-কোলাহলে
ঈর্ষার সে তীব্র জ্বালা ডুবে গেল কোন্-সে অতলে।

মন্দোদরী

আমারে করেছ দোষী, এ কলঙ্ক মুছিব কেমনে,
তবু কেন হরেছিলে জানকীরে পঞ্চবটী বনে ?

রাবণ

হায় রাজ্ঞি, সীতা তরে কোনদিন ছিল না কামনা,
চিরপুণ্যবতী সীতা, নিশিদিন চেয়েছি মার্জ্জনা
আমার অন্তরতলে। রাখি' তা'রে অশোককাননে
বন্দিনী করেছি শুধু, দেবীজ্ঞানে পূজেছি গোপনে।
তবু দেখেছিনু চোখে পঞ্চবটী বনে একদিন
সাধ্বীর সে আকুলতা, অশ্রুজলে নয়ন মলিন
দুরান্ত স্বামীর লাগি'। সেই বনপথে চেয়ে থাকা,
অনাহার-ক্লিষ্ট মুখে সেই বেদনার ছবি আঁকা,
আজো ভুলি নাই আমি। সেই ক্ষুদ্র রক্তিম অধরে
বেদনার কি কম্পন, কি স্পন্দন নিশ্বাসের ভরে
বিচ্ছেদকাতর বুকে! উদ্বেলব্যাকুল কণ্ঠে তা'র—
"লও ভিক্ষা যোগীবর"—শুনি মোর চিত্ত বার বার
সতীপদে জানাল প্রণতি। যদি তুমি মন্দোদরী
মোর তরে কোনদিন রহিতে এমনি রূপ ধরি
হো'ত না এ মহারণ। অভিশপ্ত আমার জীবনে
যে চিত্র দেখি নি কভু, দেখিলাম পঞ্চবটী বনে।
তারপর সাধ হ'ল নিত্য হেরি সতীরূপখানি
বঞ্চিত জীবনে মোর। রাখিলাম তারে হেথা আনি
অশোক-কাননতলে। রাজদম্ভ জাগিল অন্তরে,
এ ঐশ্বর্য্য এ জগতে রাখিব না আর কারো তরে।
আমার আদেশে যবে চেড়ীদল ঘিরিয়া সীতারে
করিত তাড়না, আমি অন্তরালে রহি' একধারে
শ্রদ্ধানত চিত্তে শুধু হেরিতাম সতীর আনন
স্বামীর চিন্তায় মগ্ন। মনে হ'ত যদি মন্দোদরী
মোর লাগি কোনদিন একবিন্দু অশ্রু যেত ঝরি'
তোমার আয়ত চোখ, তৃপ্ত হ'ত দাবদগ্ধ প্রাণ,
ধন্য হ'ত সিংহাসন। অন্তরের ক্ষুব্ধ অভিমান
যাতনার পক্ষ মেলি' উড়ে চলে বিহঙ্গের মত
দূর হতে দূরান্তরে। শুধু রয় নিশ্চল জাগ্রত
একটি ব্যাকুল তৃষ্ণা নিশিদিন মনের দুয়ারে।
আসন্ন প্রত্যূষে হবে শেষ রণ, তবু বারে বারে
তব পাশে ক্ষমা চাই, রূঢ় বাণী শুনালাম কত।
এ নির্জ্জনে কেহ নাই, সবে আছে দূরে নিদ্রাগত

এ স্বর্ণপ্রাসাদ মাঝে। শুকতারা ডুবে যায় ধীরে,
আমার জীবনাকাশে আর কভু আসিবে না ফিরে

মন্দোদরী

কেন হও হতাশ্বাস ? কেন আন অমঙ্গলে ডাকি' ?
অমিতবিক্রম তুমি, রণজয় করিবে একাকী।
সুবর্ণলঙ্কার মান তুমি ছাড়া কে রাখিবে আর ?
অচিরে আসিবে ফিরে পরি' গলে মহিমার হার
বিজয়তোরণে তব। শুধু মোরে আর কোন দিন
দেখিতে পাবে না তুমি। বিদায়ের পথে ছায়াহীন
নীরবে যাইব চলি। ফিরে এস তুমি মহারাজ
হয়ে রণজয়ী, তব শৌর্য্য হেরি শত্রু পাক লাজ।

রাবণ

কিবা হবে ফিরে আর ? জীবনের দাবদগ্ধ পথে
নবসূর্য্য হেরিব না আর কভু উদয়পর্ব্বতে।
তবু করি আশীর্ব্বাদ, অদৃষ্টের রূঢ় অভিশাপ
মুছে যাক ভালে তব, মোর তরে কোরো না বিলাপ।
জীবনের শত ভ্রান্তি লুপ্ত হোক, শুধু অনির্ব্বাণ
তোমার গৌরবশিখা যুগে যুগে রহুক অম্লান।

মন্দোদরী

এ ত নহে আশীর্ব্বাদ। চিরদিন ঘৃণার এ ডালা
কেমনে বহিব আমি ? কণ্ঠে পরি' কলঙ্কের মালা
কেমনে লুকায়ে রব ? দিবানিশি অন্তরের তলে
সকল কামনা মোর দগ্ধ হবে স্মৃতির অনলে।

রাবণ

সব মিথ্যা প্রিয়তমে। রহস্য করেছি শুধু আমি,
মিথ্যারে করেছি বড়, মন মোর জানে অন্তর্যামী।
নিশিদিন "যুদ্ধ, যুদ্ধ" দুঃসহ এ সমর বারতা
সহিতে না পারি কানে, তাই ছুটো রহস্যের কথা
তোমারে বলেছি আজ। ক্ষমা কর মোরে মন্দোদরী।

ওই দেখ নভপ্রান্তে শেষ হয়ে আসিছে শর্ব্বরী।
নীলাভ আঁধারে শুধু জেগে আছে ম্লান শুকতারা
আমার বিদায়পথে। জীবনের সুখস্বপ্নহারা
আজি দাঁড়ায়েছি আমি বজ্রাহত বনস্পতিসম
দাবদগ্ধ বনমাঝে। সাগরকুন্তলা লঙ্কা মম
সমাচ্ছন্ন চিতাধূমে। দীর্ঘশ্বাসে দুরন্ত ঝঞ্ঝায়
ফেরে তার অভিশাপ। রুদ্ধগতি তীব্র যাতনায়
শৃঙ্খলিত উর্ম্মিদল দিবানিশি উন্মাদ কল্লোলে
ভাঙিবারে চায় সেতু। মুহুর্মুহু অশ্রান্ত হিন্দোলে
কেঁপে ওঠে বসুন্ধরা। পিতৃগণ রহি শূন্যপথে
ধিক্কার দিতেছে মোরে। প্রতিদিন সপ্তাশ্বের রথে
ব্যঙ্গ-হাসি হাসিছে অরুণ। অভিশপ্ত কোথা পাবে ত্রাণ,
আপনার বধ্যভূমে শুনি কানে মরণ-বিষাণ।

মন্দোদরী

বিদায় দেবে না মোরে ?

রাবণ

বিদায়ের কোথা প্রয়োজন ?
তুমি মোর রাজেন্দ্রাণী, কত মোর আকাঙ্ক্ষার ধন।
তব দেহ, তব মন, তব স্বপ্ন আজো আছে ভরি'
আমার জীবনসত্তা। প্রতিদিন কি সাধনা করি'
তোমারে দিয়েছি অর্ঘ্য কামনার স্বর্ণ-শতদলে।
তব সঙ্গ জীবনের মোহময় প্রতি পলে পলে
আমারে রেখেছে স্বর্গে। সুখে দুঃখে রহি একসাথে
কাটায়েছি দীর্ঘকাল। আজি শুধু নির্ম্মম আঘাতে
ভাঙিব প্রেমের চূড়া ? জীবনের শেষলগ্নে আজি
তোমারে বিদায় দিব ? যে মালায় গাঁথি পুষ্পরাজি
প্রতি মুহূর্ত্তের স্বপ্নে, সে মালা কি আজি ছিন্ন করি'
হেলায় ছড়াব ফুল ছায়াহীন তপ্ত মরু ভরি' ?
জাগে অনুতাপ মোর ব্যথাতুর হেরি তব মুখ,
আমারে করিও ক্ষমা, কৌতুক যে শুধুই কৌতুক।
তবু এ কৌতুক প্রিয়ে, জানিবে না কেহ কোন দিন,
ধরণীর ধূলিতলে সব স্মৃতি হইবে বিলীন।

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে?

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

"নীলদর্পণে"র ইংরেজী অনুবাদক কে?—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আজিকালি অনেকেই বলিবেন—"কেন?—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।" কারণ, প্রমাণ না থাকিলেও অনেক সময়ে কিংবদন্তী বা অমূলক কাহিনী বহু বার শ্রুত হইলে উহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়

নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদে অনুবাদকের নাম ছিল না, কেবল লিখিত ছিল "By a Native". রেভারেণ্ড লং উহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন "Both the original and translation are *bona fide* Native productions" অর্থাৎ মূল এবং অনুবাদ উভয়ই খাঁটি এতদ্দেশবাসীর প্রণীত। রেভারেণ্ড লঙের বিরুদ্ধে যখন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সুপ্রীম কোর্টে মানহানির মোকদ্দমা আনীত হয়, তখন লঙ সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন এবং অনুবাদকের নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হন। মোকদ্দমার সময় লেখক ও অনুবাদকের নাম অজ্ঞাত ছিল।

মধুসূদনের জীবিতকালে কেহই তাঁহাকে নীলদর্পণের অনুবাদক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর সংবাদপত্রাদিতে তাঁহার মৃত্যু বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও ঐরূপ উল্লেখ নাই।

মাইকেল মধুসূদনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিতে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের এই সাহিত্য-কীর্ত্তি সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার জীবনচরিতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ—গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি।

দেখা যায়, মধুসূদন যাহা কিছু করিয়াছেন, তাঁহার সামান্যতম সাহিত্য-কীর্ত্তিও বন্ধুগণকে জানাইয়াছেন। কিন্তু কোন পত্রে 'নীলদর্পণ' অনুবাদের উল্লেখ নাই। বন্ধুগণের যে বিস্তৃত স্মৃতিকথার উপর যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রামাণিক গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপিত সেই স্মৃতিকথাসমূহে কোথাও মধুসূদনের এই সাহিত্য-কীর্ত্তির উল্লেখ নাই।

মধুসূদনের পরম অনুরক্ত ভক্ত, বর্ত্তমান লেখকের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় যখন 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে 'মধুস্মৃতি' প্রকাশিত করেন, তখন তিনি প্রায়ই তাঁহার নিকটে যাইতেন, মধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, 'মধুস্মৃতি'র ভূমিকায় বন্ধুবর এই সাহায্য স্বীকার করিয়াছেন।

একদিন তিনি বলেন যে, তারকনাথ ঘোষের বাড়ী হইতে তিনি শুনিয়াছেন যে, একদা উক্ত বাড়ীতে বসিয়া মধুসূদন এক রাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে (১৩২৭ ও ১৩৬১) পরে এ বিষয়টি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

মধুসূদন যে নীলদর্পণ অনুবাদ করেন তাহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ আমরা দেখি তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর সহিত সংযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত দীনবন্ধু জীবনীতে। উহার একস্থানে আছে:

'এই গ্রন্থ (নীলদর্পণ) রচনা করিতে করিতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন—লঙ সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। উহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।'

যে মধুসূদনের নাম নীলদর্পণ মোকদ্দমার সময় ঘুণাক্ষরেও উঠে নাই, তাঁহাকে গোপনে তিরস্কৃত করিলেন কে? বঙ্কিমের অনুজ পূর্ণচন্দ্র স্পষ্টতর ভাবে লিখিয়াছেন, 'অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রীম কোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন।'

মোকদ্দমার সময় যাঁহার নাম প্রকাশ পাইল না, সুপ্রীম কোর্ট কি গোয়েন্দা লাগাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং বাহির করিয়া প্রকাশ্যে নহে, গোপনে, তিরস্কার করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে এরূপ লেখা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় নিম্নরেখ অংশটি ছিল না, পরে কোন অজ্ঞাত হস্তে উহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নিকট পাণ্ডুলিপি ছিল; কিন্তু পরে সন্ধান করিলে বর্ত্তমান লেখক উহা দেখিতে পান নাই। তাঁহার অনুমান উহা বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের দ্বারা সন্নিবেশিত। নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় লিখিয়াছেন:

'সঞ্জীবচন্দ্র স্বহস্তে মধুসূদনের কথা উক্ত গ্রন্থে (দীনবন্ধু-জীবনীতে) লিখিয়া দিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের পর অনেকে মাইকেলকে নীলদর্পণের অনুবাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু উক্ত সন্নিবেশিত অংশটি একান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের বহু বৎসর পরে যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দ্বারা মধুসূদনের প্রামাণিক জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। ১৩০০ বঙ্গাব্দে উহার প্রথম সংস্করণ, ১৩০১ সনে দ্বিতীয়, ১৩১২ সনে তৃতীয় ও ১৩১৪ সনে চতুর্থ সংস্করণ এবং স্কুলপাঠ্য সংস্করণাদিও প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের নীলদর্পণ অনুবাদের বৃত্তান্ত প্রমাণসহ নহে বলিয়াই হয়ত যোগীন্দ্রনাথ কুত্রাপি উহা উল্লেখ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক প্রভৃতির নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্মৃতিকথায় মধুসূদনের এত বড়

সাহিত্য-কীর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ এই কারণেই। পূর্ব্বে বিস্মৃত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু জীবনী পাঠের পর নিশ্চয়ই এই ঘটনার কথা তাঁহাদের মনে পড়িত। মধুসূদনের জীবিতকালে যদি প্রকাশ পাইত যে, তিনি নীলদর্পণের অনুবাদকর্ত্তা তাহা হইলে যদি-বা তাঁহার কোন ক্ষতি হইত, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে প্রকাশিত জীবনচরিতে উহা প্রকাশ করিতে কোন বাধা ছিল না। কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না থাকাতেই যোগীন্দ্রনাথ এবং মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করি।

নগেন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার 'মধুস্মৃতি' প্রকাশের (ভারতবর্ষ ১৩২১ ২৪, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৭) পূর্ব্বে মধুসূদনের কোন জীবনচরিতে লিখিত হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। উহা hypothesis মাত্র, উহাকে এখন পর্য্যন্ত সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।

মধুসূদন সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা, আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

মহিলা সংবাদ

দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপ্রভাতচন্দ্র নিয়োগীর কন্যা শ্রীমতী স্মিতা নিয়োগী এই বৎসর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রে এম্-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং এম্-এ, এম্-এস্‌সি, এম্-কম্ প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি বি-এস্‌সি অনার্স পরীক্ষাতেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের ছাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশ ইণ্টার বোর্ডে ও আই-এ, আই-এস্‌সি পরীক্ষার ছাত্রীদের মধ্যেও তিনি প্রথম হন।

"মধুসূদন গুপ্ত"

(সংযোজন)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মধুসূদন গুপ্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটীর অধিবাসী। পিতার নাম বলরাম গুপ্ত। মধুসূদনের আর এক ভ্রাতা ছিলেন কাশীনাথ গুপ্ত। মধুসূদন ১৮০০ সনের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পাঠে মনোযোগ তাঁহার একেবারেই ছিল না। এজন্য একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। তাহাতে তিনি মনের দুঃখে বাড়ী হইতে চলিয়া যান এবং কলিকাতা আসিয়া গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। বাটী হইতে চলিয়া আসিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষ না হইয়া পুনরায় বাড়ীতে ফিরিবেন না। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হইলে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এই বিদ্যায় তাঁহার কৃতিত্বের কথা মূল প্রবন্ধে (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) বিশদভাবে বলিয়াছি। মধুসূদন বৰ্দ্ধমান জেলায় হারোয়া গ্রাম-নিবাসী জমিদার-কন্যা পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—গোপালচন্দ্র গুপ্ত, জয়গোপাল গুপ্ত ও দ্বারকানাথ গুপ্ত।

*

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় (১৮৪০) উত্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য ছাত্রদের মত মধুসূদনও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। সার্টিফিকেটখানি ইংরেজী, আরবি এবং বাংলা এই তিনটি ভাষায় পাশাপাশি লেখা। এসেসর, পরীক্ষক এবং কলেজের অধ্যাপক মোট সাতাশ জনের স্বাক্ষর রহিয়াছে এই সার্টিফিকেটখানিতে। বাংলা অংশ এখানে দিলাম:

"আমরা মনোযোগ পূৰ্ব্বক সম্যক প্রকারে ইং ১৮৪০ নবেম্বর মাসের ২৬ দিনে বৈদ্যবাটী নিবাসী মধুসূদন গুপ্তের পরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপত্র দিতেছি। ইনি শরীরবিদ্যা, দ্রব্যতত্ত্বজ্ঞান, দ্রব্যগুণ ও কিমিয়া বিদ্যা এই সকল বিষয়েতে বিশেষ নিপুণ এবং ঔষধ প্রস্তুত করণে ও তদ্ব্যবহারে আর অস্ত্রবিদ্যা ও তাচ্চিকিৎসাকৰ্ম্মে প্রকৃত উপযুক্ত হইয়াছেন ইহাতে ইনি রাজকীয় চিকিৎসক সাধারণের পদপ্রাপ্ত হইতে পারেন এবং সহকার ব্যতিরেকে স্বয়ং তৎকৰ্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

উক্ত ব্যক্তির বাঙ্গলাদেশীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নারম্ভাবধি এ কাল পর্য্যন্ত সুশীলতায় ও পরিশ্রমেতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

*

মধুসূদনের দ্বিতীয় পুস্তকখানি সম্প্রতি পাইয়াছি। ইহার দুইটি আখ্যাপত্র—ইংরেজী ও বাংলায়। বাংলা আখ্যাপত্রটি এই:

"এনাটোমী।/অর্থাৎ/শারীরবিদ্যা।/তৎ প্রথম ভাগ/মেডিকেল কালেজের হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালি ছাত্রদিগের/শারীরবিদ্যার উপদেশক/ শ্রীমধুসূদন গুপ্ত প্রণীত। /কলিকাতা/ ১২৫৯ শাল ইং মার্চ্চ ১৮৫৩।" পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্দ্দেশক পূর্ব্বাভাষ অংশটি এখানে দেওয়া হইল। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশ তখনই কতটা সম্ভব হইয়াছিল; এই অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

"এনাটোমীর প্রকৃত অর্থ ছেদবিদ্যা। বস্তুতঃ চিকিৎসার্থক শারীরবিদ্যা। "শারীরজ্ঞেরা মানব শারীরবিদ্যাকে শাখাদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম জেনরেল এনাটোমী অর্থাৎ সামান্য শারীরবিদ্যা এবং দ্বিতীয় ডিস্ক্রিপটিব এনাটোমী অর্থাৎ নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যা।

শরীরের নির্ম্মাপক সমবায়ি দ্রব্য সকলের স্বভাব ও সামান্য গুণ সমূহের বিবরণের নাম সামান্য শারীরবিদ্যা।

দেহের নানা ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং প্রদেশ সকল এবং পৃথক পৃথক অংশের বাহ্য আকৃতি ও আভ্যন্তর নির্ম্মিতি এবং তাহাদিগের যথারূপ পরস্পর অবস্থিতি এবং যোগ এবং ঐ সমস্ত অংশের উৎপত্তির পর যে রূপ উত্তরোত্তরাবস্থা ইত্যাদির বিবরণের নাম নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যা।

এই গ্রন্থে কেবল নির্দ্দেশক শারীরবিদ্যার বিষয় লিখিত হইবেক যাহা সাধারণ চিকিৎসকগণের পাঠ্য।

শারীরবিদ্যার অঙ্গ যাহাকে ফিজিয়লজী অর্থাৎ প্রকৃতিবিদ্যা কহে তাহার দ্বারা সুস্থ শরীরের যে যে অবস্থা ও কর্ম্মসকল এবং জীবনের ক্রিয়াবিধি সমুদয়ের জ্ঞান হয়।

শরীর ঘন এবং দ্রববস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। শারীরজ্ঞেরা কেবল ঘন অংশ সকলকেই শরীরের সমবায়ি করিয়া গণ্য করিয়াছেন। রক্ত রস এবং লসীকা এই তিন দ্রবেতে কার্পসল বা ঘনকণা সকল মিলিত থাকাতে উক্ত তিন দ্রব ধাতুকেও ঘন বস্তুর সহিত নিরূপণ করিয়াছেন। শরীরের ঘন বস্তু লিখিত সকলের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।...অস্থি সকল শরীরের প্রধান আধারস্থান এই হেতুক অস্থির বিবরণ প্রথমতঃ কর্ত্তব্য।"*

---

* মধুসূদন গুপ্ত বিষয়ক তথ্যাদি এবং 'এনাটোমী' পুস্তকখানি মধুসূদনের বংশধর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ গুপ্তের সৌজন্যে পাইয়াছি। লেখক।

নিরালা প্রহর

শ্রীউমা দেবী

মনের অতলতলে মাঝে মাঝে ডুবে যাই
মাঝে মাঝে অতলে ঘুমাই !
একান্ত আমারি জন্যে
সুপ্তির গহনারণ্যে রাত্রি সহচর
একাকী অপেক্ষা করে নিটোল নিবিড় এক নিরালা প্রহর।
সেখানে জলের তলে
মুক্তা ও প্রবাল দলে—বিশীর্ণ করুণ
বাসনা মুহূর্তে হয় সহাস অরুণ
—নিরালা প্রহর এক নিরালা প্রহর,
আমি খুঁজি সেই অবসর।

হিম জলতলে ডুবে ধুয়ে যায়—ধুয়ে যায় সব পরিতাপ,
সহসা পৃথিবী লাগে নির্মল নিষ্পাপ।
সব প্রেম শুচি হয়—গ্লানিমুক্ত সমস্ত কামনা,
প্রীত নরনারী চিত্ত, পুণ্য হয় সর্ব আরাধনা
—নিরালা প্রহর এক নিরালা প্রহর
মাঝে মাঝে খুঁজে পাই সেই অবসর।

এখন এসো না প্রেম ! অশ্রুর কলঙ্ক বয়ে নিয়ে
এখন এসো না স্মৃতি বিষাক্ত চেতনা ঢেলে দিয়ে
ফুটে ফুটে ঝরে যাও—সন্ধ্যামালতীর ফুল রঙীন তৃষায়—
নিভে যাও সব তারা মোহাবেশ-শিথিল নিশায়।
এখন গহন এই অতলের নিরালা প্রহরে
আপন আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি ক্ষণ অবসরে।

সেখানে অনেক কথা অশ্রুর সমুদ্র বয়ে এসে
গান হয়ে যায় অবশেষে !
অনেক স্মৃতির চিহ্ন মুছে গিয়ে নীলাকাশপটে
জ্যোৎস্নার শরীর নিয়ে ভেসে ওঠে প্রাণের নিকটে !
আর—প্রেম দুঃখধারাহত নিরন্তর
ভরন্ত বীথির মত কাঁপে থরথর !
সেখানে আমারি জন্যে
অপার গহনারণ্যে—রাত্রি সহচর
একান্তে অপেক্ষা করে নিটোল নিবিড় এক নিরালা প্রহর
- তুলনাবিহীন অবসর !

সে অতলে ডুবে যাই—
মাঝে মাঝে অতলে ঘুমাই,
অতনু স্বপ্নকে ফের তনুর বাঁধনে ফিরে পাই !
আমাকে ডেকো না কেউ—আমাকে ঘুমাতে শুধু দাও
সেই নীল অতলের সোনালি আবেশ ঢালা সবুজে উধাও !
সেখানে অনেক গান অনেক রঙীন আলো !
অনেক—অনেক রঙে আশা।
অনেক অচেনা সুখ—চেনা মুখ—অনেক গভীর ভালবাসা
আপন আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি সেখানে আলাপ
সেখানে পৌঁছলে পর প্রেম হয়ে শান্ত হয় সব দুঃখতাপ !
—নিরালা প্রহর এক নিরালা প্রহর,
খুঁজে ফিরি সেই অবসর !

পুষ্পাবেন এবং চারি ধর্ম্মযাত্রা

ফ্রেডা বেদী

সংসারে দুই শ্রেণীর লোক আছে—এক শ্রেণীর লোক বেঁচে থাকে আর এক শ্রেণীর লোক বেঁচে থাকার পথ দেখায়। পুষ্পাবেন মেহ্‌তা হচ্ছেন শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিছুকাল আগেও যিনি সৌরাষ্ট্রের রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন সেই পুষ্পাবেনকে—সমগ্র গুজরাটীভাষী অঞ্চলে সকলে আদরের সঙ্গে তাঁকে এই নামেই ডাকে—সত্যই কেবল জনৈক শ্রেষ্ঠ সমাজকর্ম্মীই নন, একজন মহীয়সী মহিলাও তাঁকে বলা যেতে পারে।

গত বৎসর দিল্লী পরিদর্শন করতে যাবার পথে রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা ভেঙে যায় এবং এর দরুন ব্যাহত হয় তাঁর চারপাশে ছুটাছুটি করবার অসীম ক্ষমতা। সাময়িক ক্রাচ বা বগলে লাগিয়ে চলবার লাঠি কিন্তু স্তিমিত করতে পারেনি তাঁর আত্মার উজ্জ্বল দীপ্তিকে—যদিও নিজের কোন কোন কাজ তাঁকে হস্তান্তরিত করতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, গিরনারের জঙ্গলে তিনি আর তেমন অনায়াসে ছুটে গিয়ে দেখতে পাবেন না তাঁর আরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীদের এবং সেই সকল গোরক্ষক এবং তাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তানের যাদের গৃহে এবং গোলাবাড়ীতে স্থিতু করবার জন্তে তিনি প্রয়াস পাচ্ছেন। অবশ্য আগেকারই মত কিন্তু তিনি নারী এবং শিশুদের জন্ত তাঁর মুখ্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

গৃহের পরিবেশে

সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছ পরিভ্রমণকালে যখন তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করি তখন তিনি আমার জন্ত প্রতীক্ষা করছিলেন জুনাগড় শহরে "শিশুমঙ্গলে"র সহিত সংশ্লিষ্ট জীর্ণদশাপ্রাপ্ত বাসগৃহ বনামআপিসে। এই "শিশুমঙ্গল" হচ্ছে যাকে বলা যেতে পারে একটি 'আদর্শ পুষ্পাবেন প্রতিষ্ঠান'—সকল শ্রেণীর নিঃস্ব এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত অসুখী এবং স্বজনপরিত্যক্ত নারী এবং শিশুদের আস্তানা ও আশ্রয়স্থল এটি। এদের মধ্যে আছে সেই সকল কুমারী মায়েদের শিশু যারা এই প্রতিষ্ঠানে আসে আশ্রয়লাভের নিমিত্ত এবং শেষ পর্য্যন্ত সেখানে রেখে যায় তাদের শিশুদের।

পুষ্পাবেন বসেছিলেন তাঁর দিওয়ানের উপর, পরনে ছিল তার সাদাসিধে কালো খদ্দরের শাড়ী এবং একটি সাদা ব্লাউজ। এই মাঝবয়সী মহিলাটি সুন্দরী এবং গ্রামাঞ্চলের গুজরাটী মেয়েদের মত লম্বা এবং বলিষ্ঠ তাঁর দেহের গড়ন। তাঁর কক্ষের ভিতরে এবং বাইরে ছুটাছুটি করছিল কয়েকটি শিশু, বাগান থেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা তাদের ক্ষুদ্র সম্পত্তি—হয়তো একটি খেলনা; তাঁর কানে কানে বলছিল তারা কোন গোপন কথা অথবা সমস্যার কথা। তাদের মধ্যে ছিল ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই—তিন বছর বয়সের হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলতে-শেখা ছোট বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বয়স্থা বালিকা এবং তরুণী বধূরা পর্য্যন্ত। সেখানে ছিল পুরোপুরি ঘরোয়া পরিবেশ। শিশুরা এখানে অনুভব করে স্ব গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য এবং তারা যে নিজেদের বাড়ীতেই আছে এটা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল।

বর্ত্তমান মান অনুযায়ী আমি অবশ্য শিশুমঙ্গলকে একটি তৎপর প্রতিষ্ঠান বলব না। এখানকার কর্ম্মী-সংসদের শিক্ষা-লাভ হয়েছিল গৃহে, কয়েকজন হচ্ছেন পুরানো "আবাসিক" কর্ম্মী—প্রতিষ্ঠান স্বয়ং তাদের শিক্ষাদান করে। সাধারণতঃ মৌলিক সাজসরঞ্জামের জন্য—বিশেষতঃ নার্সারি বা শিশুদের খেলাঘর বিভাগের জন্ত যথেষ্ট অর্থ ছিল না—যদিও সৌরাষ্ট্রেই এত সস্তায় এবং সুষ্ঠুভাবে যে চমৎকার মন্তেসরি সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস ভালভাবেই খোলা

হয়। উপযুক্ত মানের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত একপ্রস্ত চিত্রিত কাঠের ব্লক এবং "শিক্ষামূলক" খেলনার মূল্য প্রায় ষাট টাকা। কিন্তু দিনকতক ঐ গৃহে অবস্থান করে আমি দেখতে পেলাম, জীবনের স্রোতে সে সকল অনাথ নিরাশ্রয় বালকবালিকা ভেসে এসেছে তাঁর আরামপ্রদ আবদ্ধ জলে তাদের জন্যে কি-এক বিস্ময়কর কাজ করছেন পুষ্পাবেন। প্রত্যেক শিশুই তাঁর নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কতকগুলি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানেই প্রতিপালিত সাধারণ স্বাভাবিক শিশু। অন্যেরা যারা এসেছিল পিতৃমাতৃবিয়োগ, অথবা কোন অসুখের দরুন প্রায় অনশন অথবা পিতামাতার বেকার অবস্থা ইত্যাদির ন্যায় প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার পরে তাদের বিষয় ছিল নিশ্চিতভাবেই মনস্তাত্ত্বিক। তাদের অনেকেই ছিল বিপদ্‌গ্রস্ত এবং তাদের অধিকাংশের সঙ্গেই মানিয়ে চলা ছিল কঠিন।

পুষ্পাবেনের পরিবার

তারা সকলেই ছিল তাঁর পরিবার—গর্ভদেবের প্রজনন-কার্য্য সম্পন্ন করানো যাদের বৃত্তি তাদের পরিবার থেকে যে সকল বালিকা এসেছিল তাদের থেকে আরম্ভ করে আকস্মিক পিতৃমাতৃবিয়োগের পর ভিক্ষা করে কাটিয়েছিল যারা কয়েকটি ভয়াবহ সপ্তাহ—তাদের সকলেরই ছিল একই অবস্থা। মৃদু হেসে পুষ্পাবেন বললেন, "এদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনিতে লাগে প্রায় দুই থেকে তিন বৎসর এবং পরবর্ত্তী কালে তাদের চরিত্রের বিকাশ হয় সুষ্ঠুভাবে। ঐ অবস্থায় পৌঁছুলে পর তাদের বিকাশ-গৃহগুলির মধ্যে একটি অথবা অপরটিতে পাঠানো হয়—সেগুলিও তাঁরই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও কথা আমরা পরে বলব। শিশুদের সম্বন্ধে তাঁর যে কর্ম্মনীতি তা হচ্ছে যথার্থ নীতি। তিনি বললেন, তিনি এটা অধিকতর শ্রেয়ঃ মনে করেন যে, শিশুদের এই অবস্থায় পরাতে হবে সাধারণ গ্রাম্য পোশাক। বড় ছেলেদের জন্য একটি সার্ট এবং একটি কাছি আর বয়স্থা মেয়েদের জন্য হয় ঘাঘরা এবং চোলী অথবা সাদাসিধে শাড়ী। তিনি এটা চান না যে, তারা জীবনযাপনের সেই সকল মানে অভ্যস্ত হয় যা পরবর্ত্তী জীবনে উপার্জ্জনক্ষম অথবা বিবাহিত হলে পর তারা বজায় রাখতে সমর্থ হবে না। ঐ কারণেও তিনি, শিশুরা বেড়ে উঠার দরুন তাদের গায়ে লাগে না বলে স্ত্রীলোকেরা যে সকল পুরনো পোশাক পরিচ্ছদ দিতে চায় সেগুলো অথবা নূতন কাপড়-চোপড়—মাত্র কয়েকটি প্রদত্ত হলেও, গ্রহণ করেন না। যদি কোন শিশু বিশেষভাবে চালাক-চতুর এবং চটপটে বলে প্রতিপন্ন হয় তা হলে যথোচিত শিক্ষালাভের জন্য তিনি তাকে প্রেরণ করেন ওয়াধাওয়ানের বিকাশ-বিদ্যালয়ে অথবা রাজকোটস্থিত কান্তশ্রী বিকাশ-ঘরে।

চারি ধর্ম্মযাত্রা

তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, যে-কয়টি কক্ষ বারান্দা এবং বাগান নিয়ে এর প্রাকৃতিক সীমা নির্দ্ধারিত তার চেয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি কত ব্যাপকতর। হাসতে হাসতে তিনি আমাকে বললেন তাঁর "চারি ধর্ম্মযাত্রা"র কথা:—"আমাদের একটি নয়, কিন্তু চারটি প্রতিষ্ঠান। নারী এবং শিশুদের উদ্ধারের জন্য ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমেদাবাদে প্রতিষ্ঠিত জ্যোতি সঙ্ঘে ছিল আমাদের কাজের মূল। এটি একটি উৎকৃষ্ট সংস্থা এবং এখনো এটি উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। মৃদুলা সারাভাই—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ছিন্নমূল এবং দলিতা নারীদের মধ্যে বিস্ময়কর কল্যাণকর্ম্মের জন্য যিনি সুপরিচিতা ছিলেন—তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্ম্মিণী। এই অসমসাহসিকতাপূর্ণ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল কেবল নিষ্ঠার নয়, উপরন্তু শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সাহসের। তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন সেই সকল কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিদের কঠোর সমালোচনা—এমনকি অত্যাচারের পাত্রী, অনাশ্রিত অবস্থায় পথে ফেলে দেওয়া স্ত্রীলোকদের পাশে এসে দাঁড়াত যারা লাভের আশায়। বাজারে গুণ্ডাদের সম্মুখীন হওয়া এবং নৈতিক দিক দিয়ে বিপন্ন অল্পবয়স্কা মেয়েদের উদ্ধার করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না—অন্যান্যদের নিয়মিতভাবে বিক্রি করা হ'ত পতিতালয়ে এবং অল্পবয়স্ক শিশুদের রেখে দেওয়া হ'ত পতিতালয়ের দুর্দশাপূর্ণ জীবনের অবসানকল্পে [illegible]।

গুজরাটে আত্মহত্যার হিড়িক

এর উপর আর একটি সমস্যাও ছিল। বর্ত্তমানে যে অঞ্চলটি সৌরাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যদিও তা বহু দিক দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল এবং ওখানেই জাত গান্ধীজীর দীর্ঘকালীন সংস্পর্শ এবং জাতীয় আন্দোলন দ্বারা পবিত্রীকৃত, তথাপি সমগ্র ভারতে এখানেই নারীদের আত্মহত্যার হার শোচনীয়রূপে সর্ব্বাধিক বলে এখানকার অবাঞ্ছনীয় খ্যাতি(?) আছে। সম্প্রতি হিসেব করে দেখা গেছে যে, এই হার হচ্ছে প্রতিদিন একটি করে (বৎসরে ৩৬৫)। এই শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্যে সরকার স্বয়ং সম্প্রতি একটি উচ্চস্তরের কমিটি নিয়োগ করেন এবং যদিও চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি, তথাপি এটা প্রতীয়মান হয় যে, এর মূলগত কারণ হচ্ছে খাঁটি সামাজিক, অর্থনৈতিক নয়।

এক্ষেত্রেও এসে মাথা গলালেন পুষ্পবেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আহমেদাবাদের বিখ্যাত বিকাশগৃহ—যাবতীয় দুর্গত নারীদের আশ্রয় দেবার জন্যে। মমতাশূন্য গার্হস্থ্য পরিবেশ এবং স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচারের হাত থেকে যাঁদের উদ্ধার করা হয় অথবা স্বজনপরিত্যক্তা হওয়ার দরুন যে সকল নারীকে সকল প্রকার প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয় তাদেরও এই প্রতিষ্ঠানে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। একটি 'হোম' বা সদন কিন্তু যথেষ্ট বলে মনে হ'ল না। ১৯৪৫ সালে অপর দুটি প্রতিষ্ঠার উপযোগী অর্থ পাওয়া গেল—ওয়াধাওয়ান নগরীর বিকাশ-বিদ্যালয় এবং জালাওয়ার জেলার হালওয়াড়ের 'প্রাগিতি গৃহ'। সর্ব্বশেষে খোলা হ'ল রাজকোটের শ্রীকাণ্ড বিকাশ-গৃহ—এটি হ'ল চতুর্থ 'সদন'। সবগুলো 'হোম'ই ছিল প্রকাণ্ড কক্ষসমন্বিত, পাকাবাড়ী—অনাড়ম্বরভাবে এগুলির কার্য্য পরিচালিত হয়, কিন্তু এগুলির পরিচালনার মধ্যে আছে পরিচ্ছন্নতা এবং মাধুর্য্য। ভারতের ঐ অঞ্চলের নারী এবং শিশুদের কল্যাণকল্পে অনুষ্ঠিত কাজের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট হয়েছি। সবগুলিতে ছিল সেই একই ছাপ—ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ছাপ। পুষ্পবেনের স্ব-নির্ব্বাচিতা নারী সমাজকর্ম্মীরা সেই প্রতিষ্ঠানেই অবস্থান ও কাজ করছেন আর প্রতিষ্ঠানকেই করে নিয়েছেন তাঁদের গৃহ। এই জন্যেই রাজকোটে হীরাবেন, হালওয়াড়ে মায়াবেন, ওয়াধাওয়ানে পুষ্পবেনের তরুণী ভাইঝি অরুণাবেনের মত আশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্না, শান্ত এবং সমঝদার কর্ম্মীদের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে—তাঁরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন আজও তা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম অরুণাবেনের—একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান গঠনের কৃতিত্বের অধিকারিণী যিনি—বয়স এখনো ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয় নি। এই বয়সেই তিনি কর্ম্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এগারো বৎসর এমন ভাবে কাজ করেছেন, যা সম্পন্ন করতে একজন বয়স্কা নারীকে অনন্ত ধৈর্য্য এবং কূটনীতির চরম পরীক্ষা দিতে হ'ত। পুষ্পবেনের একমাত্র কন্যা উষাবেন—এখন যিনি মাতৃনীতিকার্য্যে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না, পরিপূর্ণরূপে শিক্ষিতা একজন চিকিৎসক—আমেদাবাদের বিকাশ-গৃহের মূল কর্ম্মীদের একজন—এই গৃহের কাজকর্ম্মে সরলাদেবী সারাভাইয়েরও সক্রিয় অনুরাগ আছে।

কারাপ্রাচীর নয়

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান—আশ্রয়স্থল নামটিই আমার অধিকতর পছন্দসই—নূতন নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের একান্তভাবে খাপ খাওয়াইয়া একটি ইউনিটের মত কাজ করে। "অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হয়" পুষ্পবেন বললেন, "যখন কোন-একটি হোমে উত্তমরূপে যে প্রতিপালিত হচ্ছে এমন কোন বালিকা চায় পরিবর্ত্তন। সে মানুষ তো। কখনো কখনো সে চায় ছুটি। আমি তাকে পাঠিয়ে দিই হীরাবেনের কাছে অথবা অন্যান্যদের মধ্যে কোন একজনের নিকটে। তার পর সে ফিরে আসে চাঙ্গা হয়ে। কোন কোন সময় কোন মেয়ে অসদাচরণ করে এবং খারাপ মেজাজ দেখায়, এবং তার সেখানকার বান্ধবীদের চোখে বোকা বলে প্রতীয়মান হয়। আমি তাকে একটু ঠাণ্ডা করবার প্রয়াস পাই, তার পর পাঠিয়ে দিই তাকে একটি নূতন হোমে—যাতে করে নূতন ভাবে সুরু হয় আবার তার এগিয়ে চলা এবং অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে সে পায় সম্মান।

ওয়াধাওয়ানের বিকাশ বিদ্যালয়—এটিও একটি চমৎকার স্কুল, শান্তিনিকেতনের এক তরুণ শিল্পীর আঁকা ছবি দ্বারা এর প্রাচীরগুলি সুসজ্জিত (হায়, এখন সে লোকান্তরিত)—আমি শুনতে পাই সেই একই কাহিনী। এর পরিবেশ ছিল ভারতে যাকে বলা হয় "একটি উত্তম কনভেণ্ট স্কুল" তার অনুরূপ, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, ধরনধারন এবং রীতি-পদ্ধতিতে এটি ছিল অধিকতর ভারতীয়। সেই একই তৎপরতা, একই যোগ্যতা, সকল শ্রেণীর ছোট শিশু থেকে সুরু করে প্রায় কলেজে অধ্যয়নের বয়সী মেয়েদের সেই একই ধরনের সুখী মুখগুলি। বহু ক্ষেত্রে শহুরে পরিবার থেকে আগত মেয়েদের এবং অনাথ বালিকাদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না, প্রায়শঃই এটা দেখে আমি বিস্মিত হ'তাম যে, অনেক ক্ষেত্রে "হোমের বালিকাদিগকে" তাদের কোন কোন শহুরে সহপাঠিনীগণ অপেক্ষা—কড়াকড়ির বাঁধন যেখানে শিথিল এবং যা প্রীতিকর এমন পরিবারের কন্যা বলে অধিকতররূপে প্রতীয়মান হ'ত। অরুণাবেন সেই কাহিনীই পুনরাবৃত্তি করলেন, "যখন ছুটির দিন আসে তখন এই সকল বালিকারাও যদি অন্যান্য মেয়েদের মত আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যেতে অথবা নূতন স্থান পরিদর্শন করতে না পারে তা হলে মনে দুঃখ অনুভব করে। কাজেই অল্পকালের জন্যে আমি তাদের পাঠিয়ে দিই পুষ্পবেন অথবা হীরাবেনের নিকটে। তারা ফিরে আসে সজীব হয়ে। মোটের উপর ছুটি উপভোগ করা খুবই মজার, কিন্তু ঘরে ফিরে আসা যে আরও মজার।

আবার গৃহে

এই বুঝাপড়ার দরুন বালিকারা যে কি অপরিমেয় ভাবে

উপকৃত হয় তা আমি উপলব্ধি করতে পারলাম। তাদের আছে একটি প্রকৃত গৃহ—যেটি হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যাতে তারা প্রথম ভর্ত্তি হয়। সেখানে আছেন তাদের "মাতা"। তার পর তাদের আছে খুড়ী জেঠী—অন্য চারটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে তারা দেখা করতে পারে। কখনও কখনও তাঁদের নিকট বিরক্তি সহকারে বকবক করেও তারা বেশ মজা পায়। সকলেই এটাকে বেশ প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করেন। কখনও কখনও অপর কারুর নিকট 'এটা অথবা ওটা পাই নি' এই বলে, অথবা কোন বাস্তব কিংবা কল্পিত কষ্টের জন্য অনুযোগের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন। সুতরাং এসব শোনা হয় ধৈর্য্য সহকারে; প্রতিকার করা হয়, আবার ভুলেও যাওয়া হয়। এর দ্বারা চরিতার্থ হয় আত্মপ্রকাশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন।

এই চারিটি তীর্থধামেরও প্রত্যেকটির আবার বিশেষ পরিবেশ আছে। একটির বিশেষজ্ঞতা আছে খুব কঠিন 'কেস'সমূহে, একটির কলেজের কাজ এবং ট্রেনিং ক্লাসসমূহের শিক্ষাদান ব্যাপারে; একটির বৈশিষ্ট্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানে, আর একটির বয়স্কা নারী এবং তাদের পরিবারসমূহের তত্ত্বাবধানে। হালওয়াডস্থিত সকলের শেষেরটি হচ্ছে মূলতঃ চলচ্চিত্র জগতের প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ডালসুখ পাঞ্চুলী কর্ত্তৃক তাঁর নেতৃস্থানীয় ভ্রাতার স্মৃতিরক্ষার্থে দান। এখানে রাখা হয়েছে দশ অথবা বারোটি পরিবারকে এবং সেখানকার "মাতা"কে দেওয়া হয়েছে তাঁর নিজস্ব রান্নাঘর ও শিশুদের পুরোপুরি তত্ত্বাবধানের ভার। শিক্ষালাভের জন্য রাজকোট-স্থিত "স্কুল" প্রতিষ্ঠানে যাবার মত বয়স যে পর্য্যন্ত না তাদের হয় সে পর্য্যন্ত তাঁকেই তাদের দেখাশুনা করতে হয়। চিকিৎসার দিক দিয়ে দেখলে আমেদাবাদ হোমটিকেই বলতে হয় সকলের সেরা। এই হোম হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পাঠানো হয় মেয়েদের যখন একটি উত্তম গৃহ দিতে সমর্থ এবং শীলতাসম্পন্ন তরুণের সঙ্গে তাদের বিয়ের সময় সমাগত হয়। এটি হচ্ছে পুষ্পবেনের পুনর্ব্বাসনকার্য্যের আর একটি দিক এবং এ বিষয় বিশদভাবে বলবার জন্তে প্রয়োজন আর একটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের। পুষ্পবেন অথবা তাঁহার সহকর্ম্মিগণ অপেক্ষা অধিকতর প্রযত্নের সঙ্গে চিরা-চরিত ভারতীয় প্রথায় কোন জননীই তাঁর কন্যার জন্ম বর-নির্ব্বাচন করতে পারতেন না।

বিয়ের পরও মেয়েরা যে-কোন স্বাভাবিক ভারতীয় মেয়ের মত 'হোমে' বা ঘরে ফিরে আসে। তার শিশুদের নিয়ে সে আসতে পারে এক মাস অথবা এক বছরের জন্যে। অথবা সে আসতে পারে তার সন্তানজন্মের সময়। এটা তাকে কখনও বুঝতে দেওয়া হয় না যে, সে যখন তার নিজের সংসার পাতবার জন্যে এই গৃহ ছেড়ে চলে যায় তখন এটি আর তার গৃহ থাকে না। "বিয়ের মধ্যে কতগুলি সফল ও সার্থক হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "প্রায় শত-করা একশ'টি"—এই উৎসাহপ্রদ জবাব শোনা গেল। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আরোগ্যোত্তর কর্ম্মই, বালিকা যে নিরাপত্তা বোধ করে তার অপর একটি কারণ।

বর্ত্তমান যুগে যখন প্রায়শঃই সমাজকর্ম্মকে প্রচারের প্রবল ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়, তখন হীরাবেনের আত্মবিলোপ এবং রাজ্যের বাইরে এই কৃত্যকে পরিজ্ঞাত করবার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা থেকে অনেককিছু শিখিবার আছে। এই পঞ্চ কর্ম্মীগোষ্ঠী এবং তাঁদের চেয়ে যিনি কম যান না সেই বিক্রমভাই—ইনিই হচ্ছেন একমাত্র আঙ্কল বা খুড়ো এবং মহান্ ক্রিয়াশীল ইউনিটের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এতেই সন্তুষ্ট আছেন যে তাঁদের কর্ম্মধারা প্রবাহিত হচ্ছে আপন গতিপথে এবং ছড়িয়ে দিচ্ছে এর স্বকীয় শান্ত আশিস্। কিন্তু সম্পাদক এবং কর্ম্মী উভয়রূপেই কর্ত্তব্য হতে আমি বিচ্যুত হব যদি আমার ভারত ভ্রমণকালে যে উৎকৃষ্টতম সংহত সমাজকর্ম্মের রূপ দেখেছি তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানে আমি বিরত হই।

"এহ বাহ্য"

কিন্তু "এহ বাহ্য"—এ পর্য্যন্ত যা বলা হ'ল তা-ই পুষ্পবেনের সমুদয় কাহিনী নয়। কিংবা সৌরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত উৎকৃষ্ট সমাজ-কর্ম্মের সমগ্র কাহিনী এর মধ্যেই পর্য্যবসিত নয়—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে আরও বিশদভাবে। কৃষ্ণ-বসনাচ্ছাদিতা এই মূর্ত্তিটির পিছনে আছে স্বাধীনতার দীর্ঘ পথে বাপুজীর পাশাপাশি জনসেবার এক সমৃদ্ধ পটভূমিকা। ওয়াধাওয়ানে মহাত্মাজীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা পত্রখানি কি এটাই প্রমাণ করে না যে, পুষ্প-বেন এবং মৃদুলাবেন তাঁদের প্রাথমিক সংগ্রামকালে লাভ করেছিলেন তাঁর নৈতিক সমর্থন। মনে পড়ে ১৯৪৭-এর সেই দিনগুলোর কথা যখন জুনাগড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরজি হুকুমত এবং তিনি হয়েছিলেন সাময়িক প্রশাসক পরিষদের (Administrative Council) স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং শরণার্থী মন্ত্রী। সৌরাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হওয়ার পর উক্ত অঞ্চলের আড়াই লক্ষ সিন্ধী শরণার্থীর সমস্যা সম্পর্কে তিনি প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁরই চেষ্টায় ৪০৭০ জন মাল-দারী রাখালকে ওখানকার জমিতে স্থিতু করা হচ্ছে—অবশ্য

একাজে তিনি তুলনারহিত বিক্রমভাইয়ের সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শিখবার অনেককিছু

উপসংহারে এই কথাটিই বলতে চাই যে, আমাদের অনেকেরই অনেককিছু শিখবার আছে এই অঞ্চলটি থেকে—সংক্ষেপে যাকে বলা হয়েছে "ভারতের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে"র একটি। এই সমস্ত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এরূপ একটি অঞ্চলের শ্রেণীনির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন এবং এবিষয়েও সন্দেহ নেই যে, মহিলামণ্ডলসমূহের এবং সৌরাষ্ট্রের সাধারণ নারীদের ও শিশুদের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীও আদর্শস্বরূপ বলে গণ্য হতে পারে। এ হচ্ছে এমন কৃত্য যা এক বিশেষ ধরনের সম্পূর্ণতা এবং পরিচ্ছন্নতা দ্বারা চিহ্নিত এবং প্রীতিকর পরিবেশটি পুরোপুরি এর নিজস্ব।

আমাদের অন্ধ কবি সুরদাস

সুরদাস ছিলেন অন্ধ—তাঁকে বলা যেতে পারে ভারতের মিল্টন। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যে ব্রজভাষার ভক্তিযুগের শীর্ষস্থানীয় কবি।

তিনি কেমন করে অন্ধ হন সে সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। একটি প্রচলিত ধারণা এই যে, চিন্তামণির সঙ্গে ভোগলালসাপূর্ণ জীবনযাপনের পালা সাঙ্গ করে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। একদা ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে তিনি এক বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, যে স্ত্রীলোকটি তাঁকে ভিক্ষা দিতে এসেছেন তিনি পরমাসুন্দরী। তিনি রিপুর তাড়না অনুভব করলেন। কোমল এবং শান্ত ভাবে তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে দুটো টেকো নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর হাত থেকে টেকো দুটো নিলেন এবং এই কথা বলে চোখ দুটো টেনে তুলে ফেললেন—"যে চক্ষুদ্বয় এমন পাপাসক্ত যা আমাকে প্রলুব্ধ করে পার্থিব বিষয়ের প্রতি এবং আমাকে করে তোলে ইন্দ্রিয়ের দাস তাদের আমি আর রাখব না।" এমনি ভাবে অধ্যাত্ম চেতনায় আলোকিত হয়ে, কবি-প্রতিভার চক্ষুতে অপরকে একটা নূতন আলোকরশ্মি দান করবার জন্তে তিনি নিজের দৃষ্টিশক্তিকে বিসর্জ্জন দিলেন। বিখ্যাত গায়ক তানসেন একবার সুরদাস সম্বন্ধে বলেছিলেন—পাপ, প্রলোভন ও আসক্তির যে মেঘজাল এই সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করে রেখেছে তা অপসারিত হয়েছিল সুরদাসের দ্বারা—যিনি ভগবানের প্রশস্তিমূলক সুললিত সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন। তাঁর নিকট থেকে নিঃসৃত হয়েছিল ভগবদ্ভক্তির অমৃতবাণী।

যে চোখ তিনি দেখতে পেতেন না তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও সুকুমার সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন তিনি। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত এক গোপিনী তার সখীকে বিশ্রম্ভালাপচ্ছলে বলছে—

প্রভুর খঞ্জন পাখীর মত চোখ দুটির সৌন্দর্য্য এবং
মাধুর্য্য দ্বারা বিমুগ্ধ হয়েছে আমার এ দু'চোখ—
সুখে পরিপূর্ণ, সুন্দর এবং স্বচ্ছ এই নৃত্যপর চক্ষু দুটি
মনে হয় যেন খাঁচায় থাকতে নারাজ
তারা বলে
'এখানে কেন আমরা ?
ওগো সখি, সেই প্রিয়তমের কাছে যাব আমরা
যিনি আমাদের জীবনের জীবন।'

অন্য দিকে নিজের অন্ধত্বের কথাও তার মনে থাকত। পরম দেবতার মহিমা এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি গেয়েছেন—

তোমার চরণ দুটি আমার চরম আশ্রয়
তাদের উপর আছে আমার গভীর আস্থা—
লক্ষ্মীপতি বল্লভস্বামীর নখচন্দ্রের কিরণ বিনা
সারা জগৎ যে অন্ধকার আমার কাছে।
এই কলিযুগে, এই অন্ধকারের যুগে
এমন আর কোন পথ নেই যা বাঁচাতে
পারে এই গায়ককে।
কি আর বলতে পারে সুরদাস,
সে যে উভয় দিকেই অন্ধ
আমি যে তার বিনা মাহিনার চাকর।

দ্বিতীয় ওয়েলফেয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরি : হায়দরাবাদ পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত নাগরিক কল্যাণ পরিকল্পনা (Urban Family Welfare Scheme) অনুসারে ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে হায়দরাবাদের নিকটবর্তী আশিফ নগরে একটি দেশলাইয়ের কারখানার প্রতিষ্ঠাকে এই পরিকল্পনার প্রগতির পথে দ্বিতীয় মাইলনির্দ্দেশক স্তম্ভ বলা যাইতে পারে। নয়া দিল্লীর নাজফগড়ে প্রতিষ্ঠিত দেশলাইয়ের কারখানাটি হইতেছে উক্ত পরিকল্পনার প্রথম রূপায়ণ। তার পর হইতে অন্য দুইটি দেশলাই কারখানা প্রোজেক্টের উদ্বোধন হইয়াছে—একটি অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়ায় এবং অপরটি বোম্বাই রাজ্যের 'পুণা' শহরে।

সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সব প্রোজেক্ট। শিল্পান্বিত নাগরিক অঞ্চলে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নয়নকল্পে প্রবর্তিত এই সকল পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ।

বেকার অবস্থা অথবা এমন কর্ম্মে নিয়োগ যা জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং জীবনযাপনের ব্যয়ের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক এই শ্রেণীর লোকেদের ঘায়েল করিয়াছে শোচনীয়ভাবে। যেগুলি বিশেষ ভাবে ঘায়েল হইয়াছে সেগুলি হইতেছে সেই সকল পরিবার যাহাদের মাসিক আয় পঞ্চাশ টাকা হইতে দেড়শ' টাকার মধ্যে। ঐ ধরনের পরিবারের নারীদিগকে লাভজনক কর্ম্মে নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার বিষয় কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক বিবেচিত হয়। নারী-কল্যাণ প্রচেষ্টার উন্নয়ন এবং শিল্পবিষয়ক সমবায়মূলক পরিকল্পনাসমূহের প্রোগ্রামের একটি অত্যাবশ্যক দিক লইয়া কাজ আরম্ভ হয়। এতদনুসারে এই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত স্ত্রীলোকদের উপযুক্ত শিল্পে কর্ম্মলাভের সুযোগ দেওয়া হয়, এমনিভাবে তাহাদের দ্বারা পারিবারিক আয়ের পরিপূরণ হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত সুবিধা এই যে, নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী তাহারা কারখানায় অথবা স্ব স্ব গৃহে কাজ চালাইয়া যাইতে পারে।

তিনটি একক (unit)

আশিফ নগরের দেশলাইয়ের কারখানা এরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিসমন্বিত যে, তাহা পাঁচ শত স্ত্রীলোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারে, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের কাজের ব্যবস্থা হইতে পারে কারখানায় এবং বাকী অর্দ্ধেকের তাহাদের গৃহে। এই ব্যবস্থার দরুন মূল কারখানায় কাজে লাগানো হইয়াছে প্রায় ৩০০ জন স্ত্রীলোককে, তন্মধ্যে প্রায় ১৮০ জন কাজ করে ফ্যাক্টরিতে। আশিফ নগরস্থ মূল ফ্যাক্টরি ছাড়া শিল্প সমবায় সমিতির (Industrial Co-operative Society) দুইটি শাখা একক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে চঞ্চলগুড়া এবং গোলকুণ্ডায়—প্রথমোক্তটি ১৯৫৬ সনের মে মাসে এবং শেষোক্তটি ঐ বৎসরেরই জুলাই মাসে। ইহা আশা করা যায় যে, তিনটি ইউনিট একত্রে ১৫০০ স্ত্রীলোকের নিয়মিত কর্ম্মনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে এবং দৈনিক ১৫০০ গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্স তৈরী হইবে।

১৯৫৫ সনের আগষ্ট মাসে রেজিষ্ট্রিকৃত আশিফ নগরস্থিত "ম্যাচ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটির উদ্বোধন হয় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক। এই পরিকল্পনাধীনে আসিতে প্রস্তুত পরিবারসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান এবং অন্যান্য তদন্তকার্য্য পরিচালিত হয়, হায়দরাবাদ রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি 'এড্ হক' কমিটির দ্বারা। যে চারি শত পঞ্চাশ জন স্ত্রীলোক সমিতির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে প্রাক্তন সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভরপরায়ণা নারী, যাহাদের মনসবদারী লোপ পাইয়া গিয়াছে সেই সকল মনসবদারদের পরিবারের স্ত্রীলোক এবং কেরাণী, শিক্ষক ও অনুরূপ অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়াদের মত নিম্নতর আয়কারী কর্ম্মচারীগোষ্ঠীসমূহের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রীলোকগণ। দেশলাই নির্ম্মাণের বিভিন্ন প্রণালী সম্পর্কে প্রায় তিনমাস কাল প্রাথমিক শিক্ষাদানের পর স্ত্রীলোকদের লাগাইয়া দেওয়া হয় দেশলাই উৎপাদন-কার্য্যে।

উৎপাদন বাড়তির পথে

মূল ফ্যাক্টরি দেশলাইয়ের বাক্সের বাণিজ্যিক উৎপাদন সুরু করে ১৯৫৫ সনের ১৮ই ডিসেম্বর। সেই সময় হইতেই উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান উৎপাদনের হার হইতেছে—দৈনিক প্রায় দুই শত গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্স। দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে একটি প্রভাবশালী সেলিং এজেন্ট বা বিক্রয়কারী সংস্থার উপর এবং বিক্রয় ক্রমশঃ বাড়তির পথে। যে দিবস হইতে ফ্যাক্টরি

উৎপাদন-কার্য্যে ব্রতী হয় সেই দিন হইতে ১৯৫৬ সনের মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত মজুরি রূপে কর্ম্মীদিগকে ৮,৮৬২৲ টাকা এবং শিক্ষার্থীদিগকে বৃত্তি হিসাবে ১৪,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। দেশলাই প্রভৃতির বিভিন্ন প্রণালীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মজুরির হার নির্দিষ্ট আছে। এক গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্সের লেবেল লাগানোর জন্য কর্ম্মীরা দৈনিক তিন পয়সা করিয়া পায়—অন্যবিধ কর্ম্মের জন্য প্রত্যহ দেড় টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের নাগরিক কল্যাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত চারিটি দেশলাইয়ের কারখানা—সেই সকল অনুরূপ প্রোজেক্টসমূহের অগ্রণী, পর্ষদের প্রতিভূস্বে যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে অন্যান্য রাজ্যে। এগুলি শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পসংক্রান্ত সমবায় প্রতিষ্ঠান। ইহার অধীনে হয় দেশলাই নতুবা মন্ত্রণালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত একটি তালিকা হইতে নির্ব্বাচিত অন্যান্য কোন কোন দ্রব্য উৎপাদক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সকল প্রোজেক্টের প্রস্তাব বিভিন্ন রাজ্য সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

ভারতে নারীজীবনের নূতন গুরুত্ব

শ্রীদুর্গাবাঈ দেশমুখ

ঘরের জন্য প্রবাসীর মনে যে ধরনের অনুভূতি জাগে, শৈশবের কথা স্মরণ করিলে হয়ত সর্ব্বদাই সে ধরনের অনুভূতিই জাগ্রত হয়। এ এমন একটি অনুভূতি যাহা আমাদেরই একটা কিছু অথচ যেন আমাদের নয়। একটা পৃথক ধরনের সত্তা অথচ যে অনিবার্য্যভাবে ইহার অনুসরণ করিয়াছে তাহার সহিত বিজড়িত। কিন্তু আমার কাছে এবং আমার সমসাময়িক কালে বর্ত্তমান শতকের প্রথম দশকে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যে শৈশবকে আমরা জানিতাম তাহা যেন এই জীবিতকালের নহে, অন্য কোন জীবনের এবং এই স্বল্পপরিমিত কালের মধ্যে আমরা একটি নয়, কিন্তু অনেকগুলি জীবন যাপন করিয়াছি।

ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের এই বিকাশের কালে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ছিল এমন একটি নিরাপদ ক্ষুদ্র সংসারে জন্মানো যেখানে নারীর স্থান ছিল চিরাচরিত প্রথা দ্বারা নির্দিষ্ট এবং ধর্ম্মীয় সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত। যে শিশু মেয়ে হইয়া জন্মাইত, বর্ত্তমান জীবনধারার গুরু চাপ কদাচিৎ তাহাকে স্পর্শ করিত; কাজেই, কপাল ভাল হইলে তাহাকে লেখাপড়া শিখানো হইত। এতদ্ব্যতীত তাহাকে পরিবারস্থ পুরুষদের—পিতা এবং ভ্রাতাদের পরিচর্য্যা করিতে হইত, সহায়তা করিতে হইত ঘর-গৃহস্থালির কাজে এবং সেই অতি দ্রুত আগমনশীল দিনটির জন্য নিজেকে তৈরি করিতে হইত যখন পিতামাতার স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইত দীর্ঘ ব্যবধানে অবস্থিত পতিগৃহে। ঐরূপ সমাজে অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং আধুনিক ভাবাপন্ন পরিবারে জাত মেয়েই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের আশা করিতে পারিত—এ ধরনের মেয়ে ছিল আরও বিরল যারা নিজ নিজ পছন্দসই কোন বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জনের অনুমতিলাভের প্রত্যাশা করিতে পারিত। কোন অনূঢ়া কন্যার উপার্জ্জিত অর্থ লওয়া পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত; কোন তরুণী পত্নী উপার্জ্জন করিতেছে এই ধারণা স্বামীর উপার্জ্জন-ক্ষমতার অথবা তাহারা উভয়েই যে যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাহার আর্থিক সচ্ছলতার উপর কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত।

ইহা হইতেছে অবশ্য একটি সাধারণ চিত্র। উনবিংশ শতাব্দীতেই পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের মত অগ্রণী সমাজকর্ম্মী, তরু দত্তের মত শ্রেষ্ঠ সৃজন-শিল্পী (creative artist) এবং পরবর্ত্তীকালে আমাদের অবিস্মরণীয়া সরোজিনী নাইডুর মত মহীয়সী মহিলারা আবির্ভূত হইলেন—বহিরাবরণের ঠিক নিম্নভাগেই যে শক্তি নিহিত ছিল তা প্রদর্শন করিবার জন্য। কিন্তু যে সাধারণ পরিবারে আমার এবং আমার মত অগণিত মেয়ের জন্ম হইয়াছিল সেগুলিতে এই সকল ছিল সুদুর্লভ ও সুদূরের জিনিষ।

কিন্তু যেমন যেমন বৎসর গড়াইয়া চলিল এবং বালিকারা পরিণত হইল তরুণী বধূতে তেমনি নূতন ভাবাদর্শের

সংঘাতে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল আমাদের মাতৃভূমির সনাতন ভিত্তিভূমি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম—ছেলে এবং মেয়ে যাহারাই ইহার কথা শুনিল তাহাদের সকলকেই করিয়া তুলিল অনুপ্রাণিত। নারী এবং মেয়েদের মধ্যে আসিয়া পড়িল মহাত্মা গান্ধীর আলোক-বিকিরণকারী প্রভাব। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে যাহারা বাপুর অথবা 'পিতা'র—তাঁহাকে যাহা বলিয় আমরা ডাকিতাম—কথা শুনে নাই—অথবা ভারতের সঙ্গে জড়িত করে না তাঁহার নামকে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, কিংবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর উক্তিসমূহের নির্গলিতার্থ কি কয় জন তাহা জানেন, কয় জন একথা অবগত আছেন যে, তাঁহার কৃত ন্যূনতম কাজ এবং সামান্যতম উক্তিও প্রতিধ্বনিত হইত ভারতের চতুষ্পার্শ্বে এবং তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। ভারতের নারীত্বের প্রতি ছিল তাঁহার মহতী ও অবিনাশী শ্রদ্ধা এবং আমাদের যাবতীয় সমস্যা উপলব্ধি করিতেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের জন্ম সমান অধিকার ছিল তাঁহার কাম্য—ইহার চেয়ে ন্যূনতর কিছু তিনি চান নাই। তাঁহার নিকট যাহারা আসিত তাহাদের সকলেরই সহিত তাঁহার স্নেহপূর্ণ অকপট আচরণে যে সরলতা প্রদর্শিত হইত তাহাতে অবিচার অথবা ছলচাতুরীর স্থান ছিল না। সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন সত্যের সেবক। তাঁর সর্ব্বাধিক পরিচিত পুস্তকের নাম—'My Experiments with Truth" বা সত্যের সহিত আমার পরীক্ষা। তাঁহার কত উক্তি এবং বাক্যাংশ আমার মনে উদিত হয়—"এমন ভারতের জন্য আমি কাজ করিতেছি যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও অনুভব করিবে যে, ইহা তাহাদেরই দেশ, যাহার গঠনে তাহাদের কথাও হইবে কার্য্যকরী...নারীরা যেখানে ভোগ করিবে পুরুষদেরই মত সমান অধিকার—ইহাই আমার স্বপ্নের ভারত।"

ভারতের নারীজাতির উপর -কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় যে কয় জন নারী সেই সময়ের মধ্যে শিক্ষিকা অথবা চিকিৎসক হইয়াছিলেন তাঁহাদের উপর নয়, কিন্তু গ্রাম্য নারীদের এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে ও গৃহিণীদের উপর গান্ধীজীর এই আস্থা ছিল বলিয়া নারীসমাজ রক্ষণশীল পরিবারের সঙ্কীর্ণ মানসিক গণ্ডী ছাড়িয়া বাহিরের প্রশস্ততর জগতে পৌঁছিতে উৎসাহিত হইয়াছিল। এই সুযোগ আসিয়াছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় যখন নারীদিগকে সভা এবং সম্মেলনের ব্যবস্থা করিতে হইত, পরিবারের উপার্জ্জনশীল লোক জেলে গেলে পর প্রায়শঃই যখন তাহাদিগকে পারিবারিক কাজকর্ম্ম চালাইয়া যাইতে হইত এবং নিজেদের ভবিষ্যতের প্রতি অনপনেয় আস্থাসঞ্জাত সাহসবশতঃ মাঝে মাঝে যখন তাহাদিগকে কারাগারে পর্য্যন্ত পুরুষজাতির অনুগামিনী হইতে হইত।

যদিও কিছুসংখ্যক এমন স্ত্রীলোকও ছিল—আমার মত সৌভাগ্যের অধিকারিণী যাহাদের বলা চলে না, রক্ষণশীল সামাজিক অনুশাসনে তাহাদের বাহিরে আসা ছিল বারণ, এমনকি তাহাদের রাখা হইত পর্দ্দার আড়ালে। তৎসত্ত্বেও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যে বাহিরে আসার একটি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল এই বিষয়টি তাহাদের মনোবলের উপর বৈদ্যুতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের অবস্থা

আমরা কিন্তু যখন আজকের দিনে দেশে নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে কি বিপুল দীর্ঘ পদক্ষেপে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে নারীদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক শ'র বেশী নয়, এখন হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃকই কুড়ি হাজারের অধিক স্ত্রীলোক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। ১৯৫১ সনের গত আদমশুমারি হইতে প্রকটিত হইয়াছে যে, ভারতের পঞ্চাশ লক্ষ স্ত্রীলোক স্বাবলম্বিনী, তন্মধ্যে উৎপাদন-শিল্পে নিযুক্ত আছে আট লক্ষ এবং বাণিজ্য বিভাগে পাঁচ লক্ষ।

সরকারী কর্ম্মে নিয়োগের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ে কর্ম্মে নিযুক্ত আছে ৮,৮০০ স্ত্রীলোক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অধিকার করিয়াছে দ্বিতীয় স্থান—ইহাতে নারীকর্ম্মীর সংখ্যা ৩০০০, উৎপাদন মন্ত্রণালয় তৃতীয় স্থানের অধিকারী—ইহাতে নারীকর্ম্মীর সংখ্যা ১০৭২। বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয় (The External Affairs Ministry) স্থান দিয়াছে ৭০১ জন স্ত্রীলোককে। প্রায় ত্রিশ জন স্ত্রীলোক সেক্রেটারিয়েটে উচ্চতম বেতনের পদে বহাল আছেন—প্ল্যানিং কমিশনে গবেষক কর্ম্মীরূপে এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো সার্ভিসে ও ভারতীয় প্রশাসক সার্ভিসেও (Indian Administrative Service) নারীরা কাজ করিতেছেন।

এই পটভূমিকায়ই আমাদিগকে ভারতীয় শিল্পসঞ্জাত এবং সকল শ্রেণীর নারীদের জীবনচর্য্যায় ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)
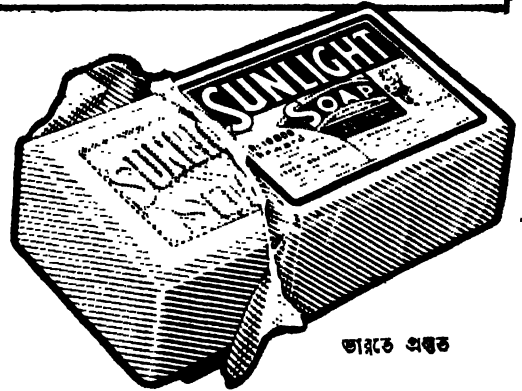
শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

সম্প্রতি প্রবাসীতে (ভাদ্র, ১৩৬৩) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি পাঠান্তর আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থের, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থের, পাঠান্তর আছে এবং মূল গ্রন্থের সহিত সংযোজনও আছে। থাকিবারই কথা। যে-কালে গ্রন্থ মুখে মুখে চলিত, সে কালে পরিবর্ত্তন ও সংযোজন বেশী হইত। ক্রমে লিপি আসিল। রচনা লিপিবদ্ধ হইলেও পরিবর্ত্তন চলিতে থাকিল। একখানি হাতে-লেখা পুথি হইতে আর একখানি পুথি লিখিয়া লইবার সময় কিছু অজ্ঞাতসারে, কিছু লেখকের ইচ্ছায় পরিবর্ত্তন ঘটে। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আরও মনে রাখিতে হইবে, এই ভাষার কোন নিজস্ব লিপি নাই। বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, মরাঠী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থ উহাদের নিজ নিজ লিপিতে লিখিত হইত, এখনও হয়। সংস্কৃতের বেলায় উহা বাংলা দেশে বাংলা অক্ষরে, উড়িষ্যায় উড়িয়া অক্ষরে, গুজরাটে গুজরাটী অক্ষরে লিখিত হইত। এ কারণ এক লিপির পুথি হইতে আর এক লিপির পুথি প্রণয়ন-কালে মূল গ্রন্থের কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইত। এখনও দেখা যায়, প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধার-কালে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও স্থানে স্থানে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কারণ —একই ভাষার লিপির পূর্ব্বে যে রূপ ছিল এখন তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায়শঃ সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা হয়—উহা অত্যন্ত আধুনিক রীতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন লিপিতে লিখিত গীতার প্রাচীন পুথি মিলাইয়া দেখিতে পারিলে হয় ত আলোচ্য শ্লোকের আদি শব্দটির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিত। গীতার যে সকল ভাষ্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম। ইহাতে 'তদাত্মানং' পাঠই গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করের পূর্ব্বেও গীতার উপর ভাষ্য রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ ভাষ্য আর এখন পাওয়া যায় না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অংশাবতার অথবা পূর্ণ অবতার ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা কোনও শ্লোকের একটি শব্দের পাঠান্তর হইতে নির্ণয় করা যায় না। সমগ্র গীতার আলোচনা করিয়াই তবে উহা বলা যাইতে পারে। তাহাও সমস্যাসঙ্কুল। কেননা পরবর্ত্তী কালে হয় ত ঐ ধারা রক্ষা করিবার জন্য আরও শ্লোক উহাতে যুক্ত হইয়াছে।

গীতার আধুনিক কলেবর আর কিছু না হইলেও পাণিনীর পূর্ব্বের। কেননা ইহাতে অপাণিনীয় (আর্ষ) শব্দের প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। পাণিনীর সময় খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী ধরা হয়। এত প্রাচীন গ্রন্থের মূল রূপ কি ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া জানা সম্ভব নহে। ইহা অতি সাধারণ যুক্তির কথা। একমাত্র ঋগ্বেদ এই যুক্তির ব্যতিক্রম—যাহার মূল রূপের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

শাস্ত্রমতে গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। মহাভারতে পাইতেছি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ৬২০টি শ্লোক বলিয়াছেন, অর্জ্জুন বলিয়াছেন ৫৭টি, সঞ্জয় ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্র ১। মোট—৭৪৫।

ষটশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মানমুচ্যতে। (ভীষ্মপর্ব্ব)

প্রচলিত গীতায় শ্লোকসংখ্যা ৭০০। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ৫৭৫, অর্জ্জুনের ৮৪, সঞ্জয়ের ৪০ এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১। শঙ্করাচার্য্য হইতে সকল ভাষ্যকার, টীকাকার, ব্যাখ্যাকারগণ ৭০০ শ্লোকের উপরেই তাঁহাদের ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন।

এককালে গীতার শ্লোকসংখ্যা যে সাত শতের অধিক ছিল তাহার ঐতিহাসিক সমর্থনও পাইতেছি। আলবেরুনি নিজে সংস্কৃতবিদ ছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন, গীতার শ্লোক-সংখ্যা সাত শতের অধিক। যে সকল শ্লোক তিনি তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা প্রচলিত গীতায় নাই। আবুল ফজল ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজী-কৃত গীতার দুইটি ফার্সী অনুবাদ আছে। এই দুই গীতার একটিতে আছে—"সম্রাটের আদেশে গীতার ৭৪০ শ্লোকের ফার্সী অনুবাদ সমাপ্ত হইল।"

অভিনবগুপ্তের টীকা-সম্বলিত গীতা, গীতার কাশ্মীরী সংস্করণ। উহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫। ৭৪৫ শ্লোকের গীতা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত। দক্ষিণ ভারতে ঐ গীতার প্রচলন নাই।

গীতা যে মহাভারতের অন্তর্গত, সেই মহাভারতই অনেক পরিবর্তিত হইয়া আমাদিগের নিকট পৌঁছিয়াছে। ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া পুত্র শুকদেবকে উহা অধ্যয়ন করান। পরে উহা তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহার বহুদিন পরে মহারাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন উহা কীর্ত্তন করেন —লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন তাহা আবার বহুদিন পরে শৌনক ঋষির দ্বাদশ বার্ষিকী যজ্ঞে, যজ্ঞকর্ম্মের বিরামকালে উপস্থিত ঋষিমণ্ডলীকে শুনাইতেন। এই সময় হইতে লোকসাধারণের মধ্যে মহাভারত প্রচারিত হইল।

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হইয়াও বহুদিন হইতে ইহা স্বতন্ত্র

গ্রন্থরূপে চলিতেছে। ইহা ব্যাসের রচনা, অথবা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বক্ষণে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাই যথাযথ গ্রথিত হইয়াছে? প্রাচীন উক্তি আছে—

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।

অর্থাৎ, গীতা স্বয়ং ভগবান নারায়ণের দ্বারা (অর্জ্জুনকে) উপদিষ্ট ও প্রাচীন মুনি ব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারত মধ্যে গ্রথিত (বা রচিত)।

রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলেন ব্যাস, তাঁহার দিব্যদৃষ্টি (ও দিব্যশ্রুতি)-বলে, আর শুনিয়াছিলেন সঞ্জয় ব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া। সঞ্জয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। জনসাধারণ পাইতেছে উগ্রশ্রবাঃর মুখ হইতে মহাভারত কীর্ত্তনকালে।

গীতার, তথা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অংশ-ভগবান অথবা একজন মহামানব? দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা অর্জ্জুনও বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেন না। বিশ্বরূপ দর্শনের পরে জানিতে পারিয়া বলিলেন:

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।
যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্। ১১।৪১-৪২

সখা ভাবিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ অবিনয়ে কখনও কৃষ্ণ, কখনও যাদব, কখনও সখা বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি তাহা তোমার মহিমা জানিতাম না বলিয়াই।

হে অচ্যুত, একসঙ্গে ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি কালে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমার যে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি তাহার জন্য হে অপ্রমেয়, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

মানুষ মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়াই ক্ষমা চাহিতেছেন। নচেৎ স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিতে পারিলে তাঁহার সহিত অর্জ্জুন ঐরূপ ব্যবহার করিতেন না।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্যরূপেই দেখিতেন। তথাপি পাইতেছি, তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন, ভয়ও পাইয়াছেন (১১।৪৫)। বলিতেছেন, "তদেব মে দর্শয় দেবরূপম্"—আমাকে সেই পূর্ব্বরূপ দেখাও। সেই পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টু মহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে। ১১।৪৬

তোমার সেই কিরীটী—গদা ও চক্রধারী রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে, তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

পরবর্ত্তী ৫১ শ্লোকেও অর্জ্জুন বলিতেছেন—

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্ত সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।

হে জনার্দ্দন, তোমার সেই সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখিয়া এক্ষণে আমি চেতনা ফিরিয়া পাইলাম ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

মনুষ্যরূপ অথচ কিরীট-গদা-চক্রধারী চতুর্ভুজ ইহার অর্থসঙ্গতি হয় না। শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী বলেন, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা চতুর্ভুজরূপে দেখিতেন। মনুষ্যরূপে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ—চতুর্ভুজ কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তিনি পূর্ণাবতারও নহেন, অংশাবতারও নহেন—স্বয়ং ভগবান (নরদেহে অবতীর্ণ)। শাস্ত্রোক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম অষ্টম অবতার—শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থানার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, যুগে যুগে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য যাহারা দুষ্কৃতকারী তাহাদিগকে বধ করেন—যাহাতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে ঐ অর্থ নিতান্তই আক্ষরিক অর্থ হইবে। সমাজে রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে যুগে যুগে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং যুগপ্রবর্ত্তকেরা তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন—ইহা ত ঐতিহাসিক সত্য। এই সকল যুগপ্রবর্ত্তকদিগকে ঐশ্বরিক সত্তা স্বীকার করিতে আপত্তি কি? গীতায়ও আছে—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্।১০।৪১

যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীমান্, প্রভাবান্ বলবান্, তাহা আমারই তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।

তত্ত্বের দিক দিয়া 'আত্মাংশং' ও 'আত্মানং'-এর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই—

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" (বৃহদারণ্যক)

পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে—ভগবানের অংশও ভগবান। গীতার উপসংহারে সঞ্জয়ের উক্তি পাইতেছি—

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানেতদ্
গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ
সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।

ব্যাসের প্রসাদে (দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া) এই পরম গুহ্য যোগ যোগেশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণের মুখ হইতে প্রত্যক্ষভাবে শুনিলাম।

পরবর্ত্তী শ্লোকেও আছে "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ..." যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ রহিয়াছেন এবং ধনুর্ধর পার্থ রহিয়াছেন সেই পক্ষেরই শ্রী, বিজয় হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথন শুনিয়া এবং কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও সঞ্জয় তাঁহাকে ঈশ্বর না বলিয়া যোগেশ্বর বলিতেছেন। এই 'যোগ' কি ? গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ই 'যোগ' নামে অভিহিত। বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি। এবং 'যোগ' কথাটি গীতায় বহু স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে—কোথাও মুখ্য অর্থে, কোথাও গৌণ অর্থে। 'যোগেশ্বর' অর্থ পরম যোগী বা যোগসমূহের প্রভু ধরিলে মনে হয় অর্জ্জুনের ন্যায় সঞ্জয়ও কৃষ্ণকে মানুষ মনে করিতেন।

ভারত-দর্শন-সার গীতা এমনই একখানি গ্রন্থ যে, উহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার, অংশাবতার অথবা মহামানব হউন তাহাতে গীতার তত্ত্বগত মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তবে কেহ হয়ত বলিতে পারেন ইহা যদি ভগবানের নিজের মুখের কথাই না হইল তবে সে গীতার মূল্য কি ? ইহা ভক্তের কথা হইতে পারে, যুক্তির কথা নহে।

গীতার ভক্তি-ধর্ম্ম অতীব উদার।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে যে-ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে অনুগৃহীত করি। "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (৯।২৩)—যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ও ভক্তিভাবে অন্য দেবতার পূজা করেন তাঁহারাও আমাকেই পূজা করেন।

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বলিতে কি বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মপরিচয়ে অর্জ্জুনের নিকট তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্বে ও আত্মার সহিত ভগবানের একত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের নিকট তিনি আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব মতে।

গীতায় ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের রহস্য সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। ইহা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে—একাধারে সকল সম্প্রদায়ের এমনকি সকল চিন্তাধর্ম্মী মানুষের পার্থিব ও পারমার্থিক মঙ্গলের পথনির্দ্দেশক। লৌকিক ও অলৌকিক উভয় উপদেশই অত্যন্ত যুক্তি সহকারে কথিত হইয়াছে এবং এই উভয়ের সমন্বয় করা হইয়াছে—ইহার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের কথা না হয় নাই ধরিলাম। কেননা মূল সংস্কৃতে না পড়িলে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না। এ কারণ সম্প্রদায়বিশেষের পুস্তক মনে করিয়া পাঠ করিলে গীতার এক অংশই বোঝা যাইবে। এ পর্য্যন্ত গীতার কোন লৌকিক ব্যাখ্যা স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত হয় নাই। ইহাতে লৌকিক যুক্তি দিয়া দিয়া লৌকিক বিষয়েরও যথেষ্ট উপদেশ করা হইয়াছে। হিন্দুরা পার্থিবকে অবহেলা করিয়া পরমার্থেরই সন্ধান করিয়াছেন এরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"—কর্ম্ম করিতে করিতেই ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। কর্ম্ম না করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", ত্যাগ-বুদ্ধিদ্বারা ভোগ করিবে। কর্ম্মযোগের প্রসঙ্গে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ আছে তাহা যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেবল 'ইহা করিবে' এবং 'উহা করিবে না' বলিয়া আদেশ প্রদত্ত হয় নাই।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপী পরম ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অবিনাশী আত্মার অস্তিত্বে সন্দিগ্ধ লোক চিরকালই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তাঁহাদিগকেও নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম-দর্শনের কথা তাঁহাদিগকে গীতায় কর্ম্মযোগের উপদেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে।

যুক্তি-বিচারের দিক দিয়া গীতার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা চলে যে, বহুকাল হইতে বেদের উক্তি, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব, সাংখ্য-পাতঞ্জল বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষিগণের মধ্যে যে চিন্তাধারা চলিতেছিল, ব্যাস তাহারই সমন্বয় করিয়া মহাভারত-মধ্যে গীতা আকারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকে পটভূমি করিয়া। ইহা সম্পূর্ণ ব্যাসের রচনা অথবা বহু-প্রচলিত প্রাচীন উক্তির অংশতঃ সঙ্কলন, অংশতঃ সংযোজন, তাহা পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়—সাধারণের পক্ষে গীতা বুঝিবার সহায়ক বা প্রতিবন্ধক নহে।

মহাভারতের সহিত গীতার ভাষা ও রচনাপদ্ধতির সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন উহা ব্যাসের রচনা। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সঞ্জয় প্রভৃতির বাক্য ব্যাস স্বকর্ণে যেমন শুনিয়াছেন ঠিক তেমনই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা বুঝা যায় না।

উপনিষদের সময়ে তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই প্রধান ছিল। এই জ্ঞান-ধর্ম্মের পরে পুরাণের সময় ভক্তি-ধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা দিল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপাস্যকে উপলক্ষ করিয়া। কালে ভক্তি-ধর্ম্মের বাহিরের রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলেও অন্তরের সত্তা ক্ষীণ হইতে থাকে। গীতার ভক্তিবাদেরও এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। হিন্দুসাধারণের এক অংশ গীতাকে ফুল-চন্দন-মন্ত্র সহযোগে পূজা করেন, গীতা নামক গ্রন্থখানিকে ইষ্টদেবতা বা বিগ্রহ মনে করেন। গীতার উপদেশকে ধর্ম্মজীবনে সাধনার বিষয় মনে করেন না। গীতায় একদিকে যেমন আছে :

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥

অথবা

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

অন্য দিকে ভক্তের সংজ্ঞা ভক্তিযোগ (১২শ) অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে :

"কাহারও প্রতি যাঁহার বিদ্বেষ নাই, যিনি সকল প্রাণীতে মৈত্রীভাবাপন্ন, করুণাপরায়ণ, মমত্ববুদ্ধিহীন, নিরহঙ্কার, সুখে-দুঃখে যাঁহার সমভাব, যিনি ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত।"

কাজেই প্রকৃত ভক্ত হওয়া দুষ্কর সাধনসাপেক্ষ। মাত্র করজোড়ে প্রণাম করিয়া অথবা গীতা নামক পুস্তকখানির উপর পুষ্প-চন্দন প্রদান করিয়া ভক্তিধন লাভ করা যায় না। জ্ঞানের ধর্ম্মই হউক আর ভক্তির ধর্ম্মই হউক সাধনা না থাকিলে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না ইহা সহজ কথা।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীতা মুখ্যতঃ হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ নামেই পরিচিত। তাহার কারণ ইহাতে অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদের কথা আছে, যাহা মাত্র হিন্দুধর্ম্মেরই বিশেষত্ব। ঐটুকু বাদ দিলেই ইহা সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির, এক কথায় সকল চিন্তাধর্ম্মী মানুষেরই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-দর্শনের গ্রন্থ এবং সাহিত্যের দিক দিয়া সুললিত কাব্য। প্রাচীনেরা সত্যই বলিয়াছেন, "গীতা" সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ" গীতা ভাল করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য, বিস্তর শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কি?

দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বহু শিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকেন এখনকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর বলিয়া কিছু আছেন কি না, মরিবার পর আত্মা বলিয়া কিছু থাকে কি না তাহাই ত সন্দেহের বিষয়। কিন্তু মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কাজ করিতে হইবে :

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মনঃ" (৩.৮)

(হে অর্জ্জুন) কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।৩।৫

কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। প্রকৃতি-জাত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার) গুণের প্রয়োজন চালিত হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। আর এই কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্ম করিবার কৌশল এবং রহস্যও জানিতে হইবে। এই কর্ম্মদর্শন একমাত্র গীতাতেই সুসংবদ্ধ যুক্তি-সহকারে কথিত হইয়াছে।

গীতা কেবলমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের অধ্যয়নের জন্য রচিত হয় নাই। মহাভারত যেমন সর্ব্বসাধারণের গ্রন্থ, মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও তেমনি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান এবং কর্ম্মকে পরম মঙ্গলের পথে চালিত করিবার সুললিত বংশীধ্বনি।

শুধু ভারতবর্ষের নহে, পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান ভাষায়ই গীতার অনুবাদ হইয়াছে। ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য সকলেরই এই মাত্র সাত-শত শ্লোকের গীতাখানি কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়াও পড়িয়া দেখার প্রয়োজন আছে। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অধ্যয়ন করিতে পারিলে ত ভালই হয়—"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে (৪।৩৮)—জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র এই পৃথিবীতে আর কিছু নাই।

হিন্দুধর্ম্মে কয়েকটি 'বাদ' আছে যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে বাদানুবাদের বিষয়।

প্রথম—ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার। সকল ধর্ম্মমতেই ঈশ্বর আছেন। তবুও অনেকে আছেন যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না। ঋগ্বেদে বহু দেবতার উল্লেখ থাকিলেও ঋষিরা বহুর মধ্যে একের কথাও বলিয়াছেন। উপনিষদ্ এবং গীতায় এই এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—আত্মার অস্তিত্ব ও তাহার অবিনশ্বরত্ব। মৃত্যুর পর মানুষের দেহাতিরিক্ত কিছু থাকে কিনা এ সন্দেহ চিরকালই আছে। গীতায় ও উপনিষদে এই আত্মার সহিত ভগবানের একত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। উপনিষদের 'তত্ত্বমসি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বীজ. গীতায় জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির ভূমি গ্রহণ করিয়া পত্র-পুষ্প-ফলসমন্বিত বেদান্তদর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহা ভারতীয় তত্ত্বচিন্তার চরম পরিণতি।

তৃতীয়—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে সেই আত্মার অবস্থা মরণান্তর কি হয়? ঋগ্বেদে আছে পুণ্যকর্ম্মাগণের আত্মা অগ্নির প্রসাদে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া পিতৃলোকে গমন করেন। তাঁহারা তখন দেবতাই হইয়া যান। যাঁহারা দুষ্কৃতকারী তাঁহাদের আত্মা কোন গতিপ্রাপ্ত হন তাহার কোন উল্লেখ নাই। কাজেই জন্মান্তরবাদ বেদের কালে স্পষ্ট হয় নাই। উপনিষদে দেখা যায়—মৃত্যুর পর মানবাত্মার গমনমার্গ তিন প্রকার। কৃত কর্ম্মের ভাল-মন্দ অনুসারে আত্মা উন্নত অথবা নিকৃষ্ট জীবের শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। অপর কেহ স্বর্গে গিয়া, নানাবিধ স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে নির্দিষ্ট কালান্তে, পৃথিবীতে কোনও সৎ বংশে জন্মগ্রহণ করেন—ইহাই পিতৃযান-মার্গ। আর যাঁহারা ইহলোকে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আত্মার অন্বেষণ করেন, তাঁহারা অমৃত, অভয় ও পরমপদ লাভ করেন। তাঁহারা আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন না—ইহা দেবযান-মার্গ। উপনিষদে পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে যতটুকু আছে, গীতায় তাহা অপেক্ষা আরও বিস্তৃত ভাবে আছে।

চতুর্থ—ঈশ্বরের মনুষ্যাদিরূপে অবতার গ্রহণ। বেদে বা উপনিষদে অবতারের কথা নাই। গীতাকে সকল উপনিষদের সার-সংগ্রহ ও 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' বলা হয়। কাজেই গীতার অবতার-বাদ বেদ ও উপনিষদাতিরিক্ত। অবতারবাদ পুরাণের কথা। পুরাণ-সমূহের রচনা মহাভারত রচনার পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে ধরিলে, স্বীকার করিতে হয় যে, মহাভারতের অন্তর্গত মূল গীতায় সহিত অবতারের কথা উহাতে পরবর্ত্তীকালে ক্রমে ক্রমে সংযোজিত হইয়া

ইহার অঙ্গীভূত হইয়াছে, এবং এই কারণেই গীতার মধ্যে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি পাওয়া যায়।

আদি রামায়ণ, আদি মহাভারত, আদি গীতা পাইবার কোনও উপায় নাই। পাইলেও তাহা গবেষকের উপজীব্য, আমাদের নিকট উপভোগ্য হইবে কিনা সন্দেহ।

ভগবান, আত্মা, জন্মান্তর ও অবতারে বিশ্বাসী হউন আর নাই হউন—রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা এই তিনখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ যিনি পাঠ না করিবেন তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এবং ভারতবাসী হইয়াও তিনি ভারতের প্রাণস্পন্দনের সহিত অপরিচিত রহিবেন। মূল সংস্কৃতে না পড়িতে পারিলে অনুবাদ পড়িবার বাধা নাই। অবতারবাদ ও ভক্তিধর্ম্মের উদ্ভবে বহুকাল হইতে রামায়ণ ও মহাভারত ধর্ম্মগ্রন্থে পরিণত হইয়াছে—যদিও মুখ্যতঃ এই দুখানি সংস্কৃত-সাহিত্যের দুই অভ্রভেদী মহাকাব্য যাহা পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় সাহিত্যরথীদিগকে কাব্য ও নাট্য-রচনার প্রেরণা দিয়াছে ও উপকরণ যোগাইয়াছে।

আগ্রায় সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা বাজছে। আগ্রার মাথায় অমারাত্রির ঘনান্ধকার। ট্রেনের উপর উৎকণ্ঠ জনতা নিশ্চুপ বসে ভীরু চোখে চেয়ে আছে যমুনার ওপারে তাজমহলের দৃশ্যটি বুকে চেপে। ইতিহাস বুঝি আবার আসছে তার নতুন ভাষ্য নিয়ে।

৩১ অক্টোবর। রজনীর শেষযামে পার হয়ে গেল যমুনা-ব্রীজ। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা এগিয়ে চলেছেন ফোর্ট ষ্টেশনের দিকে। নূতন আলোর ইঙ্গিত ভোরের আকাশে। মানুষ তার ধ্রুবলক্ষ্যে আজও অটল। আজও তাই ইউনেস্কোর অধিবেশন বসছে ভারতে। বঙ্গ-ভারতীর সুর গিয়ে পৌঁছেছে বিশ্ব-ভারতীর মর্ম্মবীণায়। বহু-বিশ্রুত আগ্রা নগরীতে এবার নিখিল-ভারত-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাত্রিংশৎ অধিবেশন বসছে নভেম্বরের প্রথম তিন দিনে।

সবাই যে নিছক সাহিত্যিক অভিযানেই চলেছেন এমন মনে করবার হেতু নেই। অনেকের ঘর-সংসার চলেছে সঙ্গে। আগ্রা দেখার সুযোগ অনেকেরই মেলে না সহজে। আর তা ছাড়া, অনেক দেশেই এমন সাহিত্য-মেলার রেওয়াজ আছে। দূরের মানুষ কাছে আসবে, এক প্রান্ত গিয়ে দাঁড়াবে অন্ত প্রান্তের গৃহপ্রাঙ্গণে —এমনি করেই জীবন তার মূল বিস্তার করে—একাত্মতার ক্রমে পৃথিবী সার্ব্বভৌম মানবিকতার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

দিনের আলো ফুটতে তখনও কিছু বাকি। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে সামান্ত কাঁপন লাগছে। ট্রেন থামতে দেখা গেল, কয়েক-জন স্বেচ্ছাসেবক আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন সেখানে। গাড়ী তৈরী—ভাড়া ঠিক করা আছে, গিয়ে বসলেই হ'ল। প্রায় মাইল-দেড়েক দূরে হাণ্টলি হোষ্টেলে প্রতিনিধি-শিবির। উঁচু পাদভূমে দাঁড়িয়ে আছে হোষ্টেলবাড়ী—বিস্তৃত প্রাঙ্গণের আশেপাশে বেশ কিছু তাঁবু খাটানো। গাড়ী এসে দাঁড়াল গেট পার হয়ে। দক্ষিণে ভারত-স্বেচ্ছাসেবকদলের শিবির। মাথার ওপর নিশান উড়ছে। সুচারু ব্যবস্থা। এত তাঁবু, এত চেয়ার-টেবিল-খাটের আয়োজন কি করে করলেন অভ্যর্থনা-সমিতির অধিকারীবর্গ, বিস্ময়ের ব্যাপার। অনেক নূতন মুখ দেখা গেল—অনেক পরিচিত মুখ চোখে পড়ল না। আগের আগের বছরের বহু সঙ্গী আবার মিলিত হ'ল বৎসরান্তে।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সময় ছিল অপরাহ্ণে। সেই সুযোগে প্রাতরাশ সমাপ্ত করেই অনেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন। কেউ কেল্লার দিকে, কেউ বা তাজ কিংবা ইৎমদদৌল্লার পথ লক্ষ্য করে।

টাঙ্গায় বসে বেশ অনুভূত হ'ল এখানকার প্রাণকেন্দ্রে সাড়া জেগেছে। অনেক আপিসের বাবু গাড়ী থামিয়ে চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে। এতগুলি বাঙালী নরনারীর একত্র সমাবেশ বোধ হয় আর কখনও হয় নি। কিন্তু তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছে এখানকার গাড়ীওয়ালার দল। ভাড়া ইতিমধ্যে দ্বিগুণে পৌঁছেছে। তখনও সমানে সুসমাচার পাচার হচ্ছে রাস্তার এক মোড় থেকে অন্ত মোড়ে।

আবার একবার এলাম মমতাজমহল তাজসৌধে। তাজমহল অনেকে অনেক চোখে দেখে গেছেন, অনেক ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমার দৃষ্টিভঙ্গীও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমি সচরাচর শেষ রাত্রের ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় তাজ দেখতে অভ্যস্ত। আমার মনে হয়েছে সেই সময়েই যেন মহৎ প্রেমের আত্মা মূর্ত্তি গ্রহণ করে। আবার শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারার ভিতর দিয়ে যে ছায়ামূর্ত্তি অনেকে দেখেছেন, তাঁদেরও বিশিষ্ট দৃষ্টিকে আমি ভালবাসি। কিন্তু এবারে সে রকম কোন সুযোগই পাই নি। দু'একটি ছবি নেওয়া হ'ল বটে—তবে গতানুগতিক।

অনেকটা ছুটাছুটি করে ইৎমদদৌল্লার সমাধিপ্রান্তে এসে একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। ভিড়ও অপেক্ষাকৃত কম। যমুনায় তখনও তেমন জলের অভাব ঘটে নি। কিন্তু যমুনা দেখলেই কেমন যেন বৈষ্ণব ভাবটি প্রবল হয়ে ওঠে। সময় বুঝে সঙ্গের বন্ধুটি কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের একছত্র শুনিয়ে দিলেন, 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও—'

কিন্তু না, সৌধটির ভিতরে-বাহিরে মোজেক এবং মর্ম্মরের কারু-কার্য্য দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে চেয়ে থাকতেই হ'ল। তবু এই সঙ্গে প্রাকার-প্রাচীরের ছায়ায় লালিত দু'একটি ফুলগাছের প্রচুর সৌন্দর্য্যের উল্লেখ না করে পারছি না। সহসা দেখলাম মাধবী-লতার আকারে একটি ছোট গুল্ম, ঘনসবুজ তীক্ষ্ণপ্রান্ত পাতার ঊর্দ্ধে ছোট ছোট অতসীবর্ণের ফুল। প্রতিটি পুষ্পস্তবকের নীচে উজ্জ্বল বাদামীরঙের গোলপাতার একটি করে রেকাবি সমস্ত দৃষ্টিকে অভি-ভূত করে দেয়। বর্ণাঢ্যতার সমস্ত অহঙ্কার যেন কেবল ঐ একটি মাত্র গোলপাতার রেখায় কেন্দ্রীভূত!

তার পাশের ফুলগুলি দেখলেই, নব-বধূর চন্দনলিপ্ত চারু ললাট-খানি মনে পড়বে। হাস্নাহানার চেয়েও ছোট ফুলের সুসম্বদ্ধ সাদা স্তবক, প্রতি ফুলে চারটি করে সূক্ষ্ম ত্রিকোণ পাপড়ি। চন্দনে ডুবিয়ে ললাটে এঁকে দিলেই হ'ল। বালিকা-বধূর মতই যেন পাতার আঁচলে লুকিয়ে আছে ভীরু কুসুমগুলি।

তৃতীয় গুল্মের জবারঙের পুষ্পগুচ্ছগুলি রুক্ষ রোদের আভায়

ধীরে ধীরে কেমন করে গৈরিক বর্ণ ধারণ করছে, দেখলাম চোখের উপর। এ কোন্ বিরহ-সাধনা ভেবে পেলাম না।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দিয়ে সুরু হ'ল প্রথম দিনের সাহিত্য অধিবেশন। স্থান—আগ্রা কলেজের ৺গঙ্গানাথ শাস্ত্রী হল, কাল—অপরাহ্ণ আড়াইটা। মঞ্চের উপর দেখতে পাচ্ছি বসে আছেন সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ, মাঝে মূল সভাপতি শ্রীহুমায়ুন কবীর। ওপাশে আছেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ড. শ্রীহরপ্রসাদ বাগচী, সম্পাদক ড. শ্রীতারিণীচরণ বসু চৌধুরী প্রভৃতি। মঞ্চপৃষ্ঠ নানা বর্ণের জ্যামিতিক কারুচিত্রে সুসজ্জিত। প্রেক্ষাগৃহে আসীন ন্যূনাধিক তিন শত নর-নারী।

ড. বাগচী তাঁর সরল, প্রাণস্পর্শী ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে উঠেই প্রথমে সম্মেলনের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে সাদর স্বাগত জানালেন। অতঃপর অগ্রবনের স্থানীয় ইতিহাস, কবি-সমৃদ্ধি এবং হিন্দী-সাহিত্যের উল্লেখ করে বলেন, "ভারতবর্ষ যে সত্যই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মাদ্রাজ-গুজরাট-মারাঠা প্রভৃতির মিলন-ক্ষেত্র এবং হিন্দীকে জাতীয় ভাষায় পরিণত করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে যে অন্য প্রাদেশিক ভাষাকে বিপর্যস্ত করিবার কোন দুরভি-সন্ধি নাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল, এখানকার নব-প্রতিষ্ঠিত 'অখিল-ভারতীয় মহাবিদ্যালয়। বর্তমানে এখানে প্রায় ৬০ জন ছাত্র আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা, কেরল, তামিলনাদ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে।'

এই তালিকায় বাংলার নাম না থাকায় বাগচী মহাশয় ক্ষুণ্ণ কিনা জানি না। তবে প্রবাসী বাঙালী হিসাবে তিনি অন্ততঃ জানেন হিন্দীপ্রচারে বাঙালীর কোন নীতিগত বিরোধ নেই। বাঙালীর আশঙ্কা তারা হয়ত প্রবাসে আর নিজেদের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

ভাষণের একাংশে বাগচী মহাশয় আর একটি সমস্যামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি যদিও মোটামুটি ভাবে আশ্বস্ত যে, 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্য একেবারে অন্ধকারে গিয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহা সৌভাগ্যক্রমে অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।'···তবে, 'অনেক ভাল ভাল মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া যে বহু বাজে বই ছাপা হইতেছে না তাহা নহে।···কিন্তু আজিকার কর্মব্যস্ত জীবনে ভাল বই বাছিয়া বাহির করিবার অবসর কই?'

সুতরাং বক্তা 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট'-এর আদর্শে এক-খানি নিরপেক্ষ সমালোচনাপত্রের জন্য আবেদন জানান। জিজ্ঞাস্য ঐ পত্রিকাখানি কি একান্তই নিরপেক্ষ, না অনুরূপ, একটি পত্রিকা হলেই পাঠকের সকল সমস্যার সমাধান হবে? সাহিত্যের মূল্যায়ন—তাও শেষ পর্যন্ত পাঠকের নিজস্ব বিচারবোধ, পাঠরুচি এবং আগ্রহের উপরই নির্ভরশীল থাকবে। ভাল এবং মন্দ গ্রন্থের বাজার পাঠকই চিরদিন নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন—আসল কথা হ'ল, পড়বার অবসর করে নেওয়া। কিন্তু বক্তা যদি এই বলে আক্ষেপ করেন, "আমরা প্রবাসী বাঙালীরা বাংলা বুঝিও না (সাংঘাতিক কথা!) বাংলা ভাষার জ্ঞানও আমাদের সামান্য"—তা হলে যে সমস্ত আয়োজনই বৃথা! তাঁর কাছে অন্ততঃ এটুকু সংবাদ আশা করতে পারি যে, সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবাসী বাঙালীর দান কম নয়। অতুল-প্রসাদ, গোবিন্দচন্দ্র, কেদারনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনুরূপা দেবী, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি বহু সার্থকনামা কথাসাহিত্যিক আজীবন প্রায় প্রবাসে বসেই সাহিত্য-সাধনা করেছেন এবং আজও যাঁরা করছেন, তাঁদের সংখ্যাও অকিঞ্চিৎকর নয়। প্রবাসী তরুণ সমাজ শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আজও যেভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বঙ্গভারতীর সেবা করে যাচ্ছেন, সেইটাই সবার বড় বিস্ময়, সবচেয়ে আশার কথা।

এ অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অভিভাষণ হ'ল শ্রীহুমায়ুন কবীরের। তিনি এক দিকে যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ একক সাধনার প্রয়োজনের কথা বলেছেন, আবার অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সংযোগরক্ষার উপকারিতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, "নব নব শক্তি ও ভাবধারার অভিঘাত সহ্য করে সাহিত্য ও জীবন গড়ে তুলতে পারলে মানুষের জীবনে ও সাহিত্যে যে সার্থকতা লাভ করা যায়, প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদার হৃদয় নিয়ে ও চিন্তাশীলতার সঙ্গে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তার ভিতর দিয়েই বাংলা সাহিত্যের নব যুগের সূচনা হবে এবং তার উন্নতি ঘটবে।"

সত্য কথা। গত কয়েক বৎসর থেকেই লক্ষ্য করছি সম্মেলন ক্রমেই যেন শিবহীন যজ্ঞের মত হয়ে পড়ছে। বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ যোগ দিচ্ছেন না। যে দু'একজন আসেন তাঁরাও যেন 'নিজ অন্ন পরে, কর পণে দিলে, পরিবর্তে ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে' মনোভাব নিয়ে প্রাণ খুলে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করতে পারছেন না। এর কারণ, সাহিত্যিকগণের ব্যক্তিগত অভিমান ছাড়াও সম্মেলনে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। সমস্ত আয়োজনের পিছনে কোথায় যেন পরামুগ্রহলাভের একটি প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তি কাজ করছে বলে সন্দেহ জাগে।

অতঃপর উপরাষ্ট্রপতি ড. শ্রীরাধাকৃষ্ণন ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিক-দের কাছ থেকে পাওয়া শুভেচ্ছা-বাণীর কিয়দংশ ড. বসু চৌধুরী পাঠ করে শোনাবার পরে সম্মেলনের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলেন, সাধারণ সম্পাদক শ্রীযতীকুমার মুখোপাধ্যায়।

এলাহাবাদের অধ্যাপক শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ বাংলা প্রবেশিকা পরীক্ষা বোর্ডের সম্পাদকরূপে এ বৎসরের উত্তীর্ণ ১৯ জনের মধ্যে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাদের সনদ উপহার দেন অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবীর। এ বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এলাহাবাদের কুমারী স্বর্ণা চট্টোপাধ্যায়। এঁর কনিষ্ঠা

অপর্ণাও উত্তীর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় বিভাগে। কিরণবাবুর ব্যক্তিগত উৎসাহে প্রবাসী ছাত্রছাত্রীকে মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট করবার এ মহৎ প্রয়াসের সকলেই প্রশংসা করবে।

বেলা চারটে নাগাদ 'জনগনমন' জাতীয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে প্রথম অধিবেশন শেষ হ'ল। সম্মেলনের দিক থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন অভ্যর্থনা-সমিতির উপ-সভাপতি ড. শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘটক।

সম্মেলন উপলক্ষে হিন্দী ও বাংলা গ্রন্থাবলী এবং উত্তর প্রদেশ ও বাংলার কুটীর-শিল্পেরও একটি করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীকে. পি ভাটনগর। দুর্ভাগ্যবশতঃ সিগনেট প্রেস, শান্তি লাইব্রেরী এবং বিশ্বভারতীর কিছুসংখ্যক গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনার অনুপস্থিতি চোখে ঠেকল। অথচ হিন্দী শাখায় যে পরিমাণ গ্রন্থ ও আয়োজন ছিল তা শ্লাঘনীয়।

এক ফাঁকে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের সঙ্গে দুটো কথা হ'ল। শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্যকে দেখবার সুযোগ হ'ল এখানেই। চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়ে দিলেন এক সতীর্থ। আর এক বন্ধু ভিড়ের মধ্যে সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পরে যদিও খবর পেলাম তিনি এসেছেন, কিন্তু আমি আর মীরাটের বন্ধুটিকে আবিষ্কার করতে পারি নি। আমার আশা আগামী অধিবেশনে বাংলার তরুণ সাহিত্যিক-গোষ্ঠী দলে দলে যোগ দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ দেবেন প্রতিনিধিদের। এতে করে তাঁদেরও দৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রসারলাভ করবে।

ঘুরতে ঘুরতে সহসা এবার লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীদ্বিজেন সান্যালের সামনে এসে পড়লাম। সেই কৌতুকোচ্ছল হাসি, বর্তুল শ্যাম আননের মধ্যভাগে একজোড়া গুম্ফ। রসশিল্পী হাস্যরসিক দ্বিজুবাবুর সাহচর্য্য যে না পেল, মেলার আনন্দে তার অনেকখানি ফাঁক পড়বে। কিছু অভিমান ছিল তাঁর উপর। কেননা তিনি তাঁর নিজের ঘর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে অতুলপ্রসাদের গানে বঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু লোভ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন জয়পুরে। কিন্তু এবার তাঁকে দেখে বুঝলাম তাঁর দোষ নেই। জরা ছায়া ফেলেছে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার উৎসমুখে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীত শাখায় আবার তাঁর কণ্ঠে শুনলাম 'ভারতভানু কোথা লুকাল'। নানাভাবে হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টাও করলেন, কিন্তু আনন্দের আর সে স্বতঃস্ফূর্তি নেই, রাত্রে 'পার্থ-সারথি' মঞ্চাভিনয়ে মনে হয়েছিল 'সব্যসাচী' সত্যিই এবার বৃদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু ঐ দিনই বৈকালিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যকালে তাঁর একটি মন্তব্য বড় মনের মত লাগল। সেদিন শিল্পী শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অভিভাষণ পাঠ করে শোনানো হ'ল। আলোচনা করতে উঠেই দ্বিজুবাবু বললেন, 'এ রকম সুযোগ ত বড় একটা হয় না। দাদা আসেন নি তাই না বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল! তা লাগছে কিন্তু বেশ,— উপর থেকে দাঁড়িয়ে আপনাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিচের দিকে।" এই সূক্ষ্ম শ্লেষের মধ্যে অনেকখানি সত্য কখন লুকিয়ে ছিল (অবশ্য ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে)।

সে যাই হোক, প্রথম দিনের শেষ অধিবেশন বসল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, হিন্দী সাহিত্য ও কবি-সম্মেলন দিয়ে। কবি বালকৃষ্ণ শর্ম্মা, 'নবীন' মহাশয়ের সভাপতিত্ব করবার কথা। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পারায়, তাঁর আসন গ্রহণ করলেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীগুলাব রায়। দু'জনের অভিভাষণই শুনলাম। দু'জনেই বাংলার সম্পর্ক ও ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্গ-ভাষার অবদানের কথা শ্রদ্ধায় সঙ্গে স্বীকার করেছেন। কিন্তু 'নবীনে'র মত অত স্বচ্ছ চিত্তে পারেন নি শ্রীগুলাব রায়। বরং তাঁর একটি দুটি ইঙ্গিত এখনও কানে বেসুরো লাগছে।—"হিন্দী-ভাষী ক্ষেত্র বঙ্গালকা ঋণী হায়। ঋণ হম্ কৃতজ্ঞতা সে স্বীকার করতে হায়, কিন্তু হম্ ক্ষমা গর্বকে সাথ কহ সকতে হায় কি হম্ উন্ কুশল ব্যাপারীয়োঁ মে সে হায় জিন্‌হোঁনে ঋণ লেকর ধন কো বরবাদ (অপচয়) নহি কিয়া, বরন্ মূল কো কঈ গুণা বঢ়ায়া হৈ।"

এই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করেছিলেন কবীর সাহেব তাঁর মন্তব্যের সময়। তিনি বলেন, "ভাববিনিময় ব্যতিরেকে কোন সাহিত্যই বাঁচে না, সেইটাই জীবনের লক্ষণ। পৃথিবীর অনুবাদ-সাহিত্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমনকি এত যে প্রাণবন্ত ইংরেজী ভাষা তাঁরও শ্রেষ্ঠ অভিধান 'অক্সফোর্ড ডিক্সনারী'তে প্রতি বছর অন্ততঃ পাঁচশ' নতুন শব্দ সংযোজনের তালিকা প্রকাশ হয়।"

অনুবাদের মাধ্যমে প্রেরণার সুযোগ না থাকলে, রামায়ণ মহাভারতেরও এত প্রচার হ'ত না, এ মূল সত্যটুকু আশা করি বক্তা অস্বীকার করবেন না। বেদ পুরাণ-জাতক প্রভৃতির প্রথম বাংলা অনুবাদ না হলে, অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যকে আরও কতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হ'ত সেটিও ভাববার বিষয়। শেষের দিকে এক বক্তা বললেন যে, হিন্দী ভাষার প্রথম অভিধান রচয়িতা বাঙালী নগেন্দ্রনাথ বসু এবং আজও এর সমকক্ষ হিন্দী অভিধান রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং, বঙ্গ-সাহিত্য ঋণদ্বারা নিজেকে অপচিত করে নি, অন্যকেও সমৃদ্ধ করেছে।

রাষ্ট্রভাষার সপক্ষে ইংরেজী ভাষা বিতাড়নের যুক্তিটি আরও দুর্ব্বল। 'হিন্দী কোনও প্রান্তীয় ভাষাকে তার স্নেহ ও আদরের উচ্চ আসন থেকে স্থানচ্যুত করতে চায় না।...যদি কাউকে পদচ্যুত করতে চায় ত সে ইংরেজী—যে ভাষা দেশের জনগণের কাছে নিতান্ত বিদেশী, দুরূহ আর প্রাক্তন দাসত্বের চিহ্নস্বরূপ।' এমন মন্তব্য অসাহিত্যিক বলেই আমি মনে করি।

কিন্তু 'নবীনে'র বঙ্গপ্রীতির ভিতর ছলনা নেই। শুধু এটুকু উদ্ধৃত করে দিলেই যথেষ্ট হবে: 'বঙ্গদেশে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহাতে স্নান করিয়া সমগ্র ভারত সুন্দরতর হইয়াছে। আমার ইহাই বিশ্বাস যে, বঙ্গ-সাহিত্যের

প্রভাব সমস্ত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের নাম প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারেই অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রতীক হইয়াছে।'

অতঃপর হিন্দী ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'আমরা হিন্দী-ভাষীরা ত গুরুদেবের ভাষায় 'নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে', আমরা হিন্দী ভাষাকে বঙ্গভাষা এবং অন্য ভাষার নূপুরধ্বনি মনে করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছি। তবে সময়ে সময়ে আপনাদের ভাষার নূপুরধ্বনিতে দু'একটি সুর সংযোজনার স্বাধীনতা প্রার্থনা করি। ইহার অতিরিক্ত অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।'

শেষের দিকে দেবনাগরী লিপিকে সর্বভারতীয় লিপিরূপে গ্রহণ করার বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা চলে। কবি বালকৃষ্ণ শর্মার অভিভাষণে ভারতীয় সর্ব-ভাষার সংহতির অনুকূলে এরূপ একটি আবেদন ছিল। অনেকের মতে বিশুদ্ধ উত্তর-ভারতীয় ভাষা-সমূহ দেবনাগরীতে লিপিবদ্ধ হলে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের কোন বাধা থাকবে না। বিরুদ্ধপক্ষ জোর দেন লিপির ক্রমবিবর্তন এবং ধ্বনির মৌলিক প্রয়োজনের উপর। প্রকৃতপক্ষে, 'মেঘনাদবধ' কিংবা রবীন্দ্রনাথের '[illegible]' লিপিপরিবর্তনের ফলে যদি হিন্দী-অনুবাদের রূপ (দুটি নমুনা শোনানো হয়েছিল) পরিগ্রহ করে, তাতে ওরে 'কাব্য' ও 'কথা'র দৈন্যই প্রকাশ পাবে।

প্রথম দিনের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল রাতে, আয়োজিত কবি-সম্মেলনের ভিতর দিয়ে। কয়েকজন স্থানীয় তরুণ হিন্দী কবি আগ্রা ও বহিরাগত বাঙালী কবিরা নিজেদের নিজেদের রচনা পাঠ করে আনন্দ দান করলেন। কিন্তু হিন্দী কবিরা কেন যে স্বাভাবিক কণ্ঠে আবৃত্তি করতে চান না ভেবে পাই নে।

এ বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল দ্বিতীয় দিনে—সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং কলা ও সঙ্গীত অধিবেশন। সভার উদ্বোধন করার কথা ছিল কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও অনুপস্থিত থাকায় প্রাতঃকালীন কর্মসূচী আরম্ভ হ'ল শাখা-সভাপতি শ্রীপ্রবোধ-কুমার সান্যালের অভিভাষণ পাঠ দিয়ে। কেউ কেউ বলেন, এমন সারগর্ভ ভাষণ কোন অধিবেশনের পর আর শোনা যায় নি। কি বিষয়-গাম্ভীর্যে, কি ভাব-সম্পদে—তাঁর এ অভিভাষণের সারমর্ম বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে সাহিত্যকর্মী মাত্রেরই প্রণিধান-যোগ্য।

তাঁর প্রথম কথাগুলি এরূপ: "প্রায় চৌত্রিশ বছর আগে বিশ্বশ্রুত নগরী বারাণসীধামে প্রথম প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের সর্বপ্রধান ভাবনায়ক মহাকবি রবীন্দ্র-নাথ।...সেদিন এই সম্মেলন সৃষ্টির দ্বারা যাঁরা বাংলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বৃহত্তর ভারতের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ জীবিত নেই—অনেকেই অনুপস্থিত—তাঁদের সকলের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

সম্মেলনের শুভকামনা করে তিনি বলেন: "আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তঃপুরিকা এবার বৃহত্তর ভারতের প্রসারিত ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে পদচারণা করুক। সেটি তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতারই পরিচায়ক হবে। ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে এবার বাংলা সাহিত্যের সুনিবিড় সংযোগ ঘটুক।"

সমস্যা-কণ্টকিত আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের রূপরেখা বিচার নিয়ে তর্কের শেষ নেই। এ বিষয়েও শ্রীসান্যাল তাঁর বলিষ্ঠ জীবনবাদ এবং দার্শনিক তত্ত্বচিন্তাপ্রসূত আশ্বাস দিয়ে বলেন: "১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের কালে বাংলায় বসে মনে হয়েছিল এই অন্ধকার মৃত্যুপুরীর বাইরে আলোক বায়ুময় বিশ্বপৃথিবীর অস্তিত্বও বোধ হয় নেই—আশা, আনন্দ ভবিষ্যৎ সবই লোপ পেয়েছে। কিন্তু সেটি সত্যদর্শন নয়—প্রভাতের প্রথম আলোকের আবির্ভাবের পূর্বে সেটি ছিল সুদীর্ঘ রজনীশেষের গাঢ়তম অন্ধকার। ঐ অন্ধকার ইতিহাসের ভিতর থেকেই আবার উঠে এসেছে নবীন জীবন—যে-জীবন পদে পদে আনে বৈচিত্র্য, কথায় কথায় বাধায় বিপ্লব, নিমেষে নিমেষে করে যায় নতুন সৃষ্টি ও সংগঠন।...বাংলা-সাহিত্যে আজ আবার নতুন জোয়ার এসেছে। লেখক-সমাজের মনের উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রেখে গেছে অনেক কলঙ্কের দাগ। অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা—এই ইতিহাস রয়েছে তাদের মনে। এদেরই ভাণ্ডার নিশ্বাস নিয়ে তারা কলম ধরেছে। জীবনের সর্বব্যাপী অপচয়ের কাছ থেকে তারা পেয়েছে নতুন একটি চেতনা। তার ফলে আজ নব্য-কণ্ঠের কাকলী শুনছি। শুনছি একদল শক্তিমান লেখকের পদধ্বনি। তারা আসছে যুগসন্ধিক্ষণে।... তারা অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে যাত্রা করেছে।...

কিন্তু কোন উপাদানে নব্য-সাহিত্যের উদ্বোধন ঘটবে, এটি বলা কঠিন। তবে দারিদ্র্য, নৈরাশ্যবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা, এরা বোধ হয় বেশী দিন আর কাঁদবার জায়গা সাহিত্যে পাবে না।"

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে শ্রীসান্যালের অভিমত: "চৌদ্দটি ভাষার মধ্যে ঐক্য সংহতি স্থাপন করাই হ'ল আজ ভারতের রাষ্ট্রসাধনা। রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দীর ভিতর দিয়ে আমরা ভারতকে আয়ত্ত করতে চেয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কম-বেশী পনর কোটি লোক হিন্দী বলতে প্রস্তুত হতে পারছে না।...দেড়শ' বছর ধরে ইংরেজীতে ভারত-শাসন চলে এসেছে। কিন্তু আজ মনপ্রাণ বিনিময়ের জন্য যদি তাদেরকে রাতারাতি হিন্দীভাষাভাষী করে তুলতে চাই, তবে তারা কেবলমাত্র আন্তরিক ভালবাসার দায়ে এই আবেদন জানাতে পারে: 'কম-সে-কম বছর পঞ্চাশেক সময় অন্ততঃ দাও, না হলে দেড়শ' বছরের অভ্যাস দেড় দশকে কেমন করে বদলাই? চলুক না ইংরেজী ততদিন'?"

পরিশেষে এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন: "প্রতিভার

মৌলিকতা প্রতি যুগেই একটি আশ্চর্য্য অভিনবত্ব লাভ করে নিজেই সে প্রকাশ করতে থাকে নিজের অনন্ততা, নিজের সুদীর্ঘ পরমায়ু নিজের ভিতর থেকেই সে খুঁজে পায়। ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারাবাহিকতা, সে আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে কল্পে ও কল্পান্তে।...প্রকাশভঙ্গী এবং আঙ্গিকের পরীক্ষা বাংলা-সাহিত্যে নিরন্তর চললেও সাহিত্য কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও বাকচাতুর্য্যের খেলা নয়, হৃদয় ও প্রাণের লীলাই হ'ল সাহিত্যের অন্তঃসার।... একালের কবি ও সাহিত্যসেবীর বিদগ্ধ মনের মৃত্তিকায় যদি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরথিগণের উড়ো চিন্তার বীজ এসে পড়ে, তার থেকে সুমধুর কাব্য ও কাহিনী অঙ্কুরিত হতে পারে স্বীকার করি। কিন্তু সেই সকল রচনার যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের ভারতীয় মনের ছাঁচটি যদি সেই রচনা থেকে হারায়, তবে তাঁদের এদেশে-ওদেশে কোথাও ঠাঁই হবে না।...বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠাসন এ জন্য নয় যে, তিনি বার্নার্ড শ' অথবা ওয়েলস প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁকে ঘিরে ভারতীয় ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সভ্যতার ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ শতাব্দী গৌরব লাভ করেছে।"

এর পরে আর কোন আলোচনা সম্ভব ছিল না বলেই সকলে অনুভব করেছিলেন, এমন সময় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্য-প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। শ্রীকুমারবাবু প্রবীণ শিক্ষাব্রতী—বঙ্গ-সাহিত্যের শিক্ষক এবং আলোচক হিসেবে তাঁর মতামত উপেক্ষার নয়। তবু মনে হ'ল, প্রবীণ-মনের সংস্কার তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা রক্ষা করতে পারে নি। আদর্শের একটি অলৌকিক ধারণা সর্ব্বদাই এদের ভাবিয়ে রাখে নবসাহিত্যের পরিণাম নিয়ে। এ আশঙ্কা বক্তার মনেও ছায়া ফেলেছে, বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। তা ছাড়া, স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করার পথে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, আধুনিক সাহিত্যকে তাঁর সস্নেহ স্বাগত জানিয়ে।

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি ভবিষ্যদ্বাণী নতুন করে মনে জাগে। প্রায় ৪০ বছর আগে 'সবুজপত্রে' তিনি লিখেছিলেন, 'বঙ্গ-সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে।...প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নব্য-সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন করেছে। বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্প-শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে।' এই বোধ হয় বর্ত্তমান শতাব্দীর কথা, বিশ্ব-সাহিত্যের পরিচয়। সুতরাং ব্যাপকতায় সাহিত্য তার সু-উচ্চ ব্যক্তিত্ব হারিয়েছে এমন কথা জোর করে কে বলবে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী না গেলে?

শ্রীকুমারবাবুর আলোচনার পরেই প্রাতঃকালীন সাহিত্য-শাখার অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল।

'সমাজ ও সংস্কৃতি' শাখার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল বেলা দুটোয়। এ শাখার সভাপতি ছিলেন ড. শ্রীকালিদাস নাগ। তিনিও উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অভিভাষণটি পাঠ করলেন অন্য এক জন প্রতিনিধি। ড. নাগ বহু গবেষণামূলক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে তাঁর অভিভাষণে বাংলার সমন্বয়ী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বলেন: 'কেবল ভারতবর্ষে নয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গেও বাংলার তথা বৃহত্তর বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংযোগ ছিল। মধ্যযুগের বাংলা তাই সুদূর প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যোগ রেখে এসেছে।...বাঙালী দ্রাবিড় সভ্যতায়ও অনুপ্রবেশ করেছিল। আমি স্বকর্ণে শুনে এসেছি সেন রাজাদের সভাকবি জয়দেব গোস্বামীর 'গীত-গোবিন্দ' দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরে গীত হয়েছে এবং মলয়ালী ভাষায় তার অনুবাদ কেরল প্রদেশে আদৃত। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের পূর্ব্ব-পুরুষ কার্ণাটবংশীয় হয়েও কেমন করে বাঙালী হয়েছিলেন?

অভিভাষণ পাঠ চলছিল এমন সময় শ্রীজগনপ্রসাদ রাওয়াত (উত্তরপ্রদেশের উপমন্ত্রী) এলেন। তাঁরই এ শাখা উদ্বোধনের কথা। ঠিক একই সময়ে কিন্তু ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলি দিল্লী থেকে 'তাজ' পরিদর্শনে এসে পড়ায় তাঁকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল সেখানে। তিনি বিলম্বে আসার দরুন মার্জ্জনা চেয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে সম্মেলন ও প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বঙ্গভাষার স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভাষার সপক্ষেও কিছু বলেন। অতঃপর এই অনুষ্ঠানের জন্য চিহ্নিত তিনটি প্রবন্ধ, 'ভক্তকবি সুরদাস' 'প্রবাসে বাঙালীর সমস্যা' এবং 'বৈদিক যুগে নারীর স্থান (?)' পাঠ করে শোনালেন যথাক্রমে এক জন লেখক ও দুই জন লেখিকা। বাচনভঙ্গীর দোষে প্রথমটি তেমন বোঝা গেল না। তবে দ্বিতীয়টি খুবই সময়োপযোগী এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। লেখিকা স্বয়ং প্রবাসী মনে হয়। সুতরাং তিনি যা অনুভব করেছিলেন, প্রত্যেক পরিণামদর্শী বাঙালীই তা সমর্থন করবেন। প্রবাসে আজ কোথাও বাঙালীর সন্তান মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। তারা কি শেষ পর্য্যন্ত বড় হয়ে কেবল একটি বাংলা ভাষার ডিপ্লোমা নিয়েই খুশী থাকবে? দুঃখের বিষয় বিচারপতি শ্রী পি. কে. সরকার শষকালে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করতে উঠে যদিও অনেক বিষয়ে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাতৃভাষায় মৌলিক অধিকারের প্রশ্নটি তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় 'কলা ও সঙ্গীত' শাখার সভাপতি শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর উপস্থিত হতে পারেন নি আগেই বলেছি। সুতরাং বিকল্পে শ্রীদ্বিজেন সান্যাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি একাই দু'টি বিভিন্ন কলার রস-সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আর কোন কলাবিদ উপস্থিত না থাকায় তিনি নিজেও বুঝি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন।

শ্রীখাস্তগীরের ভাষণের মর্ম্ম ছিল এরূপ—বাংলা দেশের বাইরে প্রায় সমস্ত শিল্পকলা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বাংলা দেশ থেকে আগত শিল্পী। এর কারণ নির্দ্ধারণ করা শক্ত নয়। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাংলা দেশেই ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থান আরম্ভ

হয়েছিল।…স্বর্গত আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও হ্যাভেল সাহেবের সাহায্যে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরভ্যুদয় ঘটাতেও সমর্থ হন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যর্থ অনুকরণে দুঃখপ্রকাশ করে শ্রীসান্যাল বলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় তাঁর কাছে বসে গান শুনবার ও শিখবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, সেই জন্যই ভাবহীন প্রাণহীন ঢিমে তালে যখন তাঁর গান আধুনিক গায়কদের মুখে শুনি, তখন অত্যন্ত বেদনা বোধ করি।'

এ দিনের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল রাত্রে দ্বিজুবাবুর দল কর্তৃক 'পার্থসারথি' নাট্যাভিনয়ের দ্বারা।

তৃতীয় ও শেষ দিনের প্রাতঃকালীন আন্তঃরাজ্য সাহিত্য-শাখার অধিবেশনে দৈবযোগে বাদ পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু অপরাহ্নে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে পাশাপাশি বসতে দেখে সত্য সত্যই গৌরব ও রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন সবাই। এমন অভিজ্ঞতা এ দেশে এই প্রথম। সেজন্যে শ্রীদেবেশ দাশ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই ধন্যবাদার্হ। তাঁদেরই চেষ্টায় রাষ্ট্র-সঙ্ঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্থার প্রতিনিধিগণকে বিশেষ বিমানযোগে দিল্লী থেকে সম্মেলনে আহ্বান করা সম্ভব হয়েছিল। উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সুইডেনের মহিলা রাষ্ট্রদূত আলভা মারডাল নিজের ভাষণে ইউরোপীয় সাহিত্যে আদর্শের যে উত্থান-পতন চলেছে তারই রূপরেখা দান করে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, সাহিত্য আবার যেন সর্বব্যাপী কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছে—বহু অভিজ্ঞতার শেষে আবার তাই ঝুঁকেছে শাশ্বত আদর্শের দিকে।

এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইরাণ, মিশর, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও রুশিয়ার প্রতিনিধিগণ সকলেই ভারতীয় আদর্শ ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমোন্নতির শুভ-কামনা করলেন। শুনে আনন্দ হ'ল যে, প্রতিনিধিদের সকলেই রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে পরিচিত। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সের প্রতিনিধি বৈজ্ঞানিক মিঃ লেগুই নিজের মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিয়ে জানান যে, কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, কবির নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর তাঁর ফ্রান্সে আগমন থেকে। তিনি সেইদিন থেকে আজীবন রবীন্দ্রভক্ত। ইরাণী প্রতিনিধিও ইরাণী ভাষায় অভিভাষণ আরম্ভ করে ইংরেজীতে উপসংহার করেন। কিন্তু সকলের বড় বিস্ময় ছিল রুশিয়ার দুই জন প্রতিনিধির মুখে হিন্দী ও বাংলা অভিভাষণ, রুশিয়ার প্রাচ্যবিদ্যা একাডেমির ডিরেক্টর মিঃ শিলিকভ হিন্দীতে এবং মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক মিঃ ভাশুক গ্যাসিলচাক্ বাঙালীর বাচনভঙ্গীতে পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় অভিভাষণ দিলেন। হিন্দী উচ্চারণে বরং অস্পষ্টতা ছিল, কিন্তু বাংলা শব্দ-প্রয়োগে ধরার উপায় ছিল না—কোন বিদেশাগতের মুখে লিখিত ভাষণ শুনছি। ইনি মস্কোর রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচার কমিটির একজন প্রখ্যাত সদস্য এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি উপন্যাস মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন। এর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গীতাঞ্জলির প্রথম যে রুশ-সংস্করণ তাঁরা ছাপছেন, ইতিমধ্যে তার লক্ষাধিক কপির অগ্রিম আবেদন তাঁরা পেয়েছেন। এদের পরবর্তী কাজ হ'ল রবীন্দ্ররচনাবলী দশ খণ্ডে মুদ্রণ করা; তবে প্রথম চার খণ্ডে যে-যে রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তারও একটি তালিকা পড়ে শুনালেন। এ ছাড়াও, হিন্দী ও বাংলার আধুনিক সাহিত্যিকগণের রচনাও অনুবাদ করতে তাঁরা মনস্থ করেছেন বলে জানালেন।

এই অধিবেশনের জন্য বিশেষ ভাবে রচিত একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ ইংরেজী নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক পরিচয় দান করেন অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণে বলেন যে, 'রাজনীতির খেলায় বাংলা দেশের সীমা অনেকবার বদলে গেছে। কিন্তু বর্তমানের মত এত সঙ্কুচিত বোধ হয় কখনও হয় নি। আমাদের নদীতে ভরা দেশে নদী যখন দুই কূলই ভেঙে দিয়ে যায়, তখন বন্যার বুকেই আমরা বাসা বাঁধি। এই হচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দীর জীবনমন্থন করা বিষে নীলকণ্ঠ বাঙালীর অমৃতসাধনা।'

জাতীয় সঙ্গীতের শেষে তিনদিনব্যাপী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কার্যসূচী শেষ হ'ল। বাকি ছিল দুটি কাজ। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সম্মানার্থে আয়োজিত প্রতিনিধি-শিবিরে একটি প্রীতি-সম্মেলন ও রাত্রে কলকাতার সাংস্কৃতিকী কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য—চিত্রাঙ্গদা। গীতাংশ চমৎকার, কিন্তু নৃত্যছন্দ মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল।

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা কয়েকটি দৃশ্যমাত্র দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন, কেননা তাঁদের আর অপেক্ষা করার অবসর ছিল না—তখনই দিল্লীতে ফিরতে হবে।

এর মাঝেই ধন্যবাদ দিতে উঠে শ্রীদেবেশ দাশ জানালেন, আগামী অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে সুদূর আমেদাবাদ থেকে।

করভারের পরিবর্ত্তন ও অর্থ কমিশনের এক্তিয়ার

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শগুলিকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তা হলে সরকারী খরচ বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাষ্ট্রের প্রয়োজন দিনের পর দিন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন অনুযায়ী জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় না করলে সরকারের পক্ষে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। অবশ্য কর বৃদ্ধিকে মানুষ সাধারণতঃ প্রীতির চক্ষে দেখে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অন্যান্য উন্নত দেশের জনসাধারণ যে ভাবে করভার বহন করছেন সে ভাবে করভার বহন করার জন্য ভারতের জনসাধারণ যাতে ক্রমশঃ প্রস্তুত হতে পারেন তার পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে খুব উচ্চ হারে কর আদায় করা হয়ে থাকে। তবে এর পিছনে সমর্থনযোগ্য কারণ বিদ্যমান রয়েছে। জানা গিয়েছে, উন্নত দেশগুলিতে যারা পঙ্গু হয়ে পড়েছেন কিংবা যাদের কর্ম্ম-সংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয় নি কিংবা যাঁরা বার্দ্ধক্যের জন্য কাজ করতে অক্ষম তাঁদের জন্য সরকার নিজের খরচে সাপ্তাহিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। তা ছাড়া কোন কোন দেশে সরকার কর্ত্তৃক এমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে যার ফলে চিকিৎসার জন্য জনসাধারণকে পয়সা খরচ করতে হয় না। এমনকি বালক-বালিকাদের বিনা ব্যয়ে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়বার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সমস্ত জনহিতকর কাজের ব্যয়ভার সরকারই বহন করে থাকেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য দেশের সরকার যে টাকা খরচ করেন সে টাকার একটা অংশ সরকার দেশবাসীর কাছ থেকে করের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। প্রশ্ন হতে পারে, জনসাধারণের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানান হয় না কেন। জনসাধারণ বুঝতে পারেন, যে সব ব্যবস্থার জন্য সরকার ব্যয়ভার বহন করেন সে সব ব্যবস্থা একদিকে যেরকম জনহিতকর সেরকম অন্যদিকে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই প্রতিবাদের প্রশ্ন উঠে না।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আমরা আগেই বলেছি, সে সব দেশের সরকার কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুসারে জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করেন। তবে জনসাধারণের মধ্যে যেরকম শ্রেণী এবং পর্য্যায়ের পার্থক্য রয়েছে—সে রকম অর্থসামর্থ্যের তারতম্যও বিদ্যমান। ফলে সরকার যে কর আদায় করেন সে করের পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ভারতের অবস্থা কিন্তু অন্য ধরনের। এখানে ব্যক্তিগত আয়ের উপর ক্রমশঃ উচ্চতর হারে কর আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত কারবারের উপর ব্যক্তিগত খরচের একটি বিরাট অংশ চাপিয়ে দেবার সুযোগ আছে—সে হেতু যাদের কাছ থেকে আয়কর আদায় করা হয় তাঁদের অনেকেই অনায়াসে ব্যক্তিগত আয়ের একটি অংশ থেকে রেহাই পেয়ে সাশ্রয় করতে সমর্থ হন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত করপ্রথা সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা হয়ত একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছেন। সেখানে আলাদা ভাবে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না। যে সব জিনিষ আমদানী করা হয় সে সব জিনিষের উপরও সরকার আলাদা ভাবে শুল্ক আদায় করেন না। অথচ দেশের ভিতরে এবং বাইরে যে সকল পণ্য বিক্রী করা হয় সে সব পণ্যের উপর সোভিয়েট সরকারকে খুব উচ্চহারে কর ধার্য্য করতে দেখা যায়। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সরকার এই ভাবে প্রচুর টাকা আদায় করেন। অবশ্য এই ধরনের করপ্রথার ফলে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বিলাসদ্রব্যের কথা বলা যেতে পারে। রাশিয়ায় বিলাসদ্রব্যের দাম খুব চড়া। এর চেয়ে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে বিলাসদ্রব্যের দাম অনেক কম। তবে এই সব দেশেও বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করে সরকার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে থাকেন। আমাদের দেশেও দেখেছি, কতকগুলি বিলাসদ্রব্যের উপর খুব উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে আমদানী শুল্কজনিত বোঝা তেমন দুর্ব্বহ হয় নি।

কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থকমিশনের সভাপতি এবং সভ্যবৃন্দ কলকাতায় এসেছিলেন। চারদিন ধরে এদের বৈঠক চলছিল। শ্রী কে. শান্তনম্ হলেন অর্থকমিশনের সভাপতি। কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে করভার আরও বর্দ্ধিত করা ছাড়া উপায় নেই। কেন করবৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়ে পড়বে বলে তিনি মনে করছেন, সে সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ করেছেন। এসকল কারণের মধ্যে বৈষয়িক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে, করবৃদ্ধির আগে লোভী ব্যবসায়ীরা যে অতি-মুনাফার জন্য সচেষ্ট হন সে মুনাফার বোঝা যাতে জনসাধারণকে বহন করতে না হয় তার জন্য সরকারের পক্ষে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। সরকারী ব্যবস্থা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তা হলে জনসাধারণের অর্থের সাশ্রয় হবে এবং সরকারও এর কিছু অংশ রাজকোষে আদায় করতে পারবেন। যতদিন পর্য্যন্ত সরকার অতি-মুনাফার বোঝা থেকে জনসাধারণকে

নিষ্কৃতি দিতে পারবেন না ততদিন পর্যন্ত সরকারের করভার বৃদ্ধি করবার কোন নৈতিক অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি না।

কি নীতি অনুযায়ী এবং কতটা পরিমাণ রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য আইনসঙ্গত ভাবে বণ্টন করা দরকার এবং বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করাই হ'ল অর্থকমিশনের একমাত্র কর্তব্য। অবশ্য এই রাজস্ব কোন একটা বিশেষ দফার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন দফার রাজস্ব বণ্টনের ব্যাপারে অর্থকমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে বর্তমানে প্রচলিত করপ্রথার পরিবর্তন সম্বন্ধীয় কোন সুপারিশ করার আইনসঙ্গত অধিকার কমিশনের নেই। এমনকি, নূতন কর ধার্য করা সম্বন্ধেও কমিশন আইনসঙ্গতভাবে কোন সুপারিশ করতে পারেন না। মোট কথা হ'ল এই যে, করপ্রথা সম্বন্ধীয় গোটা ব্যাপারটি অর্থকমিশনের এক্তিয়ারের বহির্ভূত।

ভবিষ্যতে অনিবার্যভাবে করভার বেড়ে যাবে বলে শ্রী কে. শান্তনম্ যে মন্তব্য করেছেন সে মন্তব্যটিকে অর্থকমিশনের হাতে ন্যস্ত দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে যদিও অপ্রাসঙ্গিক বলে প্রতিভাত হবে তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর মন্তব্যটি খুব সময়োপযোগী হয়েছে। যাঁরা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা ভবিষ্যৎ করবৃদ্ধির সম্ভাবনায় চিন্তিত না হয়ে পারবেন না। অবশ্য কোন দেশের জনসাধারণের কাছে করবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হবে না। তবে সময় থাকতে যদি এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয় তা হলে জনসাধারণ হয়ত বর্ধিত করভার বহন করার জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হয়, ভবিষ্যৎ করবৃদ্ধি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে শ্রী কে. শান্তনম্ মনে হয় অন্যায় কিছুই করেন নি, যদিও অর্থকমিশনের সভাপতি হিসাবে প্রচলিত করভারের পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন সুপারিশ করার আইনসঙ্গত অধিকার তাঁর নেই।

ভ্রম-সংশোধন

গত পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে "রাতের আকাশের রূপবৈচিত্র্য" নামক প্রবন্ধে কিছু ভুল হইয়াছে। ৩৭৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে "...ঋক্ষ বা বড় কুকুর মণ্ডলের লুব্ধককে"। কিন্তু ঋক্ষ বলিতে বড় কুকুর মণ্ডল বুঝায় না। ঋক্ষ শব্দের মানে ভল্লুক ও নক্ষত্র। ঋক্ষ শব্দ হইতে গ্রীক Arktos ও পরে লাটিন Ursa হইয়াছে। আমাদের সপ্তর্ষি মণ্ডলকে পাশ্চাত্য জ্যোতিষে Ursa Major বা Great Bear বলা হয়। 'বৈদিক ঋষিরা ঋক্ষগণ বলিতে হয়ত সপ্তর্ষিকে বুঝিতেন'। সুতরাং ঋক্ষমণ্ডল কথাটি সপ্তর্ষিমণ্ডলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে, 'বড় কুকুর মণ্ডল' বা Canis Majoris-এরবদলে নয়।
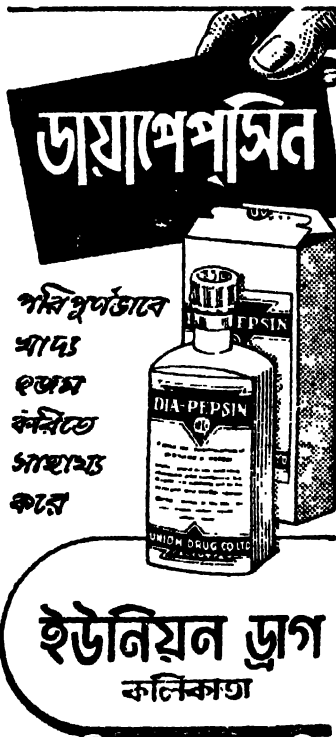
৩৭০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—"এই কালপুরুষ হচ্ছেন রুদ্রের প্রতীক—এঁর পৌরাণিক যুগের নাম মৃগ নক্ষত্র।" বেদ এবং পুরাণের রচনাকালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। কিন্তু বেদের অব্যবহিত পরবর্তী ব্রাহ্মণের যুগেও যে কালপুরুষের নাম ছিল মৃগ বা মৃগব্যাধ, ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যান হইতে তাহা জানা যায়। কৃত্তিকা সম্বন্ধে (পৃ. ৩৭৬) বলা হইয়াছে—"ইহার গ্রীক নাম Pleiades। Pleiones—বক থেকে উৎপন্ন বলে এই নাম।" এই উক্তিতেও কিছু ভুল আছে। প্লাইয়্যাড্‌স কৃত্তিকার গ্রীক নাম নয়—"ইংরেজীতে কৃত্তিকার চলিত নাম প্লাইয়্যাড্‌স। গ্রীক Pleiones=বহুলা হইতে উৎপন্ন।" আমাদের জ্যোতিষেও "কৃত্তিকার একটি প্রাচীন নাম বহুলা।" (যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ", পৃ. ৪২৮)

ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রকে (পৃ. ৩৭৪) আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে শতভিষগ বা শতবৈদ্য বলা হয় না; কুম্ভরাশিতে দৃষ্ট অনেকগুলি তারাকে মণ্ডলাকারে কল্পনা করিয়া আমাদের জ্যোতিষীরা শতভিষক শতভিষা বা শততারকা নামকরণ করিয়াছিলেন। "শতভিষার অর্থ যাহাতে শতভিষক বা বৈদ্য আছে বা আবশ্যক হয়। শতভিষা নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিবার সময় রোগ হইলে নাকি শত বৈদ্যেও তাহার উপশম করিতে পারে না। শত অর্থে বহুসংখ্যক। এই নক্ষত্রে বহুসংখ্যক তারকা আছে বলিয়া নাম শততারকা হইয়াছে।" (ঐ)

হিন্দু জ্যোতিষে ক্যাসিওপিয়ার নাম শুধু কাশ্যপী-ই, আর পার্সিউস হইয়েছে 'পুরুষ'। পার্সিউস মণ্ডলের আলগল বা দৈত্যতারা আমাদের পুরাণের শঙ্করূপা বলিয়া আচার্য যোগেশচন্দ্র অনুমান করেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য জ্যোতিষে যে মণ্ডলের নাম একুইলা বা ঈগল পক্ষী, তাকে বিষ্ণুর বাহন গরুড়পক্ষী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ন. ভ.

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

গত ২৩শে ডিসেম্বর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাধারণ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী যে বার্ষিক কার্য্যবিবরণী আলোচনা করেন, তাহা হইতে জানা যায়, আলোচ্যবর্ষে সাতটি প্রচারক-বাহিনী পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, অন্ধ্র, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে, পরিভ্রমণপূর্ব্বক, জাতিগঠন-মূলক প্রচারকার্য্য করেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্রস্থিত সঙ্ঘের তীর্থসংস্কার কেন্দ্রগুলিতে ৫৪,৭৯৭ জন তীর্থযাত্রীকে নিরাপদে আশ্রয় ও আহার্য্য দান করা হইয়াছে।

ঐ বৎসর উত্তরবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের প্রবল বন্যায় দুর্গত নরনারীদের ভিতর ব্যাপক সেবাকার্য্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত গয়ায় পিতৃপক্ষ মেলা, কাশীতে অন্নকুট মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, প্রয়াগে মাঘ মেলা, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ মেলায়ও সেবাকার্য্য পরিচালিত হয়।

আলোচ্যবর্ষে সঙ্ঘের শিক্ষা-প্রসার কার্য্যও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১২টি আবাসিক ছাত্রাবাসে দুই শত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক জীবন গঠনের শিক্ষাদান করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়েনায় এক শত ছাত্রের বাসোপযোগী একটি ত্রিতল ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হয়। ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাই স্কুল, আটটি নৈশ বিদ্যালয় সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সঙ্ঘকর্ত্তৃক গঠিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পরীক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী গীতা, রামায়ণ, মহাভারত অধ্যয়ন করে এবং তিনটি পরীক্ষা-কেন্দ্র হইতে পরীক্ষাদান করে।

সঙ্ঘের তিনটি শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র হইতে বেকার গ্রামবাসিগণের কর্ম্মসংস্থানের জন্য বেত, বাঁশ, তাঁত ও পাপোশ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

সঙ্ঘের সমাজ-সংস্কার এবং অনুন্নত ও আদিবাসী উন্নয়ন প্রচেষ্টাও এবার বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিন শত হিন্দুমিলন-মন্দির (গ্রাম সংগঠন-কেন্দ্র) হইতে গ্রামবাসিগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-কল্যাণকর বিবিধ গঠনমূলক কার্য্যাদি পরিচালিত হয়।

১২টি কেন্দ্র হইতে আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের জন্য বিবিধ গঠনমূলক কার্য্য করা হয়। তাহাদের মধ্যে নৈশ বিদ্যালয়, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার স্থাপন, এবং বিবিধ ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন করা হয়। সঙ্ঘ-পরিচালিত ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের অন্যতম সদস্য স্বামী পূর্ণানন্দজীর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গায়েনা ও ত্রিনিদাদে বাইশটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম্মের মহান্ আদর্শ প্রচার করা হয়। এই স্থানে মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ২০ একর জমি এবং ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী সংক্রান্ত আলোচনার পর সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী ১৩৬১ সালে সঙ্ঘের আয়ব্যয়ের যে পরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপিত করেন তাহা এই—আয় সাধারণ খাতে ৩,৩৯,৯৭৭।/১৫, ব্যয় ২,৪৮,৭৮০৫ এবং সাহায্য খাতে আয়—৯৩,৭৭৪।/০, ব্যয় ৪৫,১৯৯৲ টাকা।

হাওড়া জেলা পাঠাগার-সঙ্ঘ

গত ৩০শে ডিসেম্বর, মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাঙ্গণে হাওড়া জেলা পাঠাগার-সঙ্ঘের উদ্যোগে হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রায় দুই শত কর্ম্মী এবং বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজসেবী ও গ্রন্থাগার-প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ড. শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীনন্দীধন সরকার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মাজু গ্রামের দানের কথা উল্লেখ করেন। সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্ঘের ১৯৫৫-৫৬ সনের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি ড. রায় দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দেন। সভায় সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণীভূষণ রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন।

—

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ. পি-এচ-ডি। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি খ্যাতনামা প্রবীণ অধ্যাপকের গভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। গ্রন্থখানিতে বারোটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় দর্শনের দুরূহতম সমস্যার কত অনায়াস স্বচ্ছন্দ আলোচনা হইতে পারে তাহার নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মিলিবে। গ্রন্থকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন মনীষীর মতবাদের তুলনমূলক আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে। 'দর্শনের স্বরূপ' প্রবন্ধে জড়বাদ ও দৃষ্টবাদকে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় দর্শন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন মনীষীর মতবাদের উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়া যে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া দিই: "দর্শন ন্যায়সঙ্গত যুক্তির দ্বারা সমর্থিত জ্ঞান বটে, কিন্তু যে কোন যুক্তিযুক্ত জ্ঞানকে দর্শন বলা যায় না। যুক্তি দ্বারা সমর্থিত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত দর্শন।" আমরা দর্শনের এই সংজ্ঞা গ্রহণ না করিলেও গ্রন্থকারের যুক্তির বলিষ্ঠতা ও মতের স্বচ্ছতা স্বীকার করিতেছি। 'শ্রীঅরবিন্দ ও মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক ও সুলিখিত। ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে এ যুগে আগ্রহের অভাব নাই। গ্রন্থকার শ্রীঅরবিন্দের মূল দার্শনিক মতবাদ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে চৈতন্য ও জড়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাঁহার দিব্যজীবনের ধারণা, বিশ্বচেতনার কথা, বন্ধ ও মুক্তির ধারণা, এই সকল দুরূহ তত্ত্ব আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে। "মানুষের জীবনে যে একটি চিরন্তন সমস্যা দেখা যায় তাহার সমাধানে শ্রীঅরবিন্দ কি আলোকপাত করিয়াছেন" ড. চট্টোপাধ্যায় তাহার পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক আলোচনা করিয়াছেন উল্লিখিত প্রবন্ধে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম ও দর্শন, দার্শনিক প্রমাণ পদ্ধতি, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে মুক্তির স্বরূপ ও উপায়, হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে দর্শনের স্থান শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে গ্রন্থকারের সুগভীর মননশীলতার নিদর্শন রহিয়াছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' শীর্ষক প্রবন্ধটিও সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। ঠাকুর ছিলেন দেব-মানব ও অবতার। তাঁহার আবির্ভাবের তাৎপর্য্য, তাঁহার মূল শিক্ষার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গলাভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটি হইল 'আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ'। এই প্রবন্ধটি গ্রন্থখানির মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র এ যুগে আবির্ভূত হইলেও তিনি প্রাচীন মনস্বী চিন্তানায়কদের সমগোত্রীয়। তাঁহার জীবনবাদ এ যুগের মনীষীদের জীবনবেদ। আপন নিভৃত নিলয়ে একাগ্র চিত্তে জ্ঞান-তপস্যায় নিরত এই মনীষীর জীবন-কথা ও দার্শনিক মতবাদের ব্যাপক আলোচনার সময় আসিয়াছে। আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র বিংশ শতকের দার্শনিকদের মধ্যে বিস্ময়কর চিন্তার অগ্রনায়ক। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রত্যেক দর্শন-অনুরাগীর প্রণিধানের বস্তু। "তাঁহার দার্শনিক চিন্তার গভীরতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধি এবং দার্শনিক সমস্যা সমাধানের নূতন ও মৌলিক পদ্ধতি দৃষ্টে মনে হয় যে তাঁহার সমতুল্য দার্শনিক এদেশে বা বিদেশে বিরল।" এই জ্ঞানতপস্বীর দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া ড. চট্টোপাধ্যায় আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রানুরাগী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ সকলের এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

কুমারীকন্যা—শ্রীদীপক চৌধুরী। এম, সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য পাঁচ টাকা।

দীপক চৌধুরীর উপন্যাসে ও গল্পে, নানাদিকেই নূতনত্ব থাকে। সাধারণতঃ এই জাতীয় কথাসাহিত্যে যে একটা গতানুগতিক ধারা থাকে, দীপক চৌধুরীর লেখায় ঠিক সেরকম পাওয়া যায় না। লেখার ভাষায় ও বর্ণনায় একটা তীক্ষ্ণ অম্লমধুর রসান দেওয়াই ইহার ধরন, যাহাতে পাঠকের মন কিছুতেই অনুভূতি হারাইয়া ফেলে না। উপন্যাসের আখ্যান-বস্তুর অর্থাৎ প্লটের সজ্জায় ও গতিতে ক্রমাগত রকমফের করে, দৃশ্যপটে আলোছায়ার খেলা দেখানোর মত, আখ্যান-চালনাও ইহার লেখায় পাওয়া যায়। উপরন্তু আছে প্লটে কল্পনা-বৈচিত্র্য।

কুমারীকন্যায় ঐ সবই আছে। ইহার মূল ব্যাপার মনস্তত্ত্বঘটিত। জৈব প্রেমের মধ্যে মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সন্দেহ ও বিশ্বাস কি ভাবে চলিতে থাকে এবং সেইসঙ্গে চেতন ও অবচেতনের প্রেরণায় বাস্তব ও অবাস্তব কি ভাবে দাবার চালের মত হারজিতের খেলা খেলে, তাহাই লেখক উজ্জ্বলভাবে দেখাইয়াছেন তাঁহার নায়িকা ও নায়কদের ভিতর দিয়া। উপন্যাসের অভিনবত্ব আরও জাগিয়াছে এক প্রধান নায়ক-সনৎ ও অন্ততমা নায়িকা মধুমায়া, যেন ছায়ারূপেই চলিয়া গেছে কাহিনীর ভিতর, তাহাদের বাস্তবরূপ প্রত্যক্ষভাবে কোথায়ও যেন পাওয়া গেল না। এবং সেই কারণেই আখ্যানের পরিণতিও আশ্চর্য্যজনক ভাবে অপ্রত্যাশিত। লেখার ধরন চিত্তাকর্ষক ও বলিষ্ঠ।

ক. চ.

আকাশ থেকে মহাকাশে—শ্রীঅরুণ রায় ও শ্রীকালিপদ দাস। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম দেড় টাকা।

গ্রন্থখানি সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের জন্য লিখিত এবং জ্যোতিষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। মহাকাশের দিকে তাকিয়ে, পৃথিবীতে দিন-রাত্রির উদয়াস্তে, হিম ও উষ্ণতার স্পর্শে শৈশবে মনে যে সকল প্রশ্নের স্বতঃই উদয় হয়, এই গ্রন্থে সেই প্রশ্নগুলির অতি সুন্দর ভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলি যত সোজা তাদের উত্তর তত সোজা নয়। কারণ, বিষয়গুলি জটিল। কিন্তু গ্রন্থকারদ্বয় প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে রচনাটিকে সকল করেছেন। ভাষা এমন সরল ও সুমিষ্ট যে, অপরিণতমন বালক-বালিকারা সানন্দে গ্রন্থখানি পাঠ করবে এবং অধীত বিষয় আপনা হতেই স্মরণে রাখবে। আমাদের জাতীয় জীবনে বর্ত্তমানে নব জাগরণ দেখা দিয়েছে। জাতীয় উন্নতির অন্যতম প্রধান অবলম্বন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উনবিংশ শতাব্দীতেই আমাদের পূর্ব্বসূরিগণ এ সত্য উপলব্ধি করে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের বিজ্ঞান শিক্ষাদানে সচেষ্ট হন। পৃথিবীর অপরাপর উন্নতিশীল দেশেও বর্ত্তমান কালে আমরা তাই দেখছি। আমাদের দেশেও এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থকারদ্বয় সেই প্রচেষ্টায় যোগ দিয়ে দেশের কল্যাণকর্ম্মের অংশভাগী হলেন। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। আলোচ্য গ্রন্থখানি স্বল্পশিক্ষিত বয়স্কগণও পাঠ করলে লাভবান হবেন। এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শিশুরোগের গৃহ-চিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়। ১১৪।২-বি. ও সি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী। "যে পদ্ধতিতে প্রকৃতি দেহের এই বিষ দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেহকে রোগমুক্ত রাখে, প্রকৃতির ঠিক সেই পদ্ধতিতে দেহকে দোষমুক্ত করিয়া রোগ-আরোগ্যের যে ব্যবস্থা তাহাকে প্রাকৃতিক চিকিৎসা বলা হয়।" একালের বহু চিকিৎসক কড়া ঔষধ দিয়ে রোগ চাপা দেবার পক্ষপাতী নন; তাঁরা বলেন, এর প্রতিক্রিয়া অনেক সময় আরও ক্ষতিকর। মহাত্মা গান্ধীও প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। এ বইয়ে বিভিন্ন শিশু-রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসার উপায় সযত্নে প্রদর্শিত হয়েছে। আশা করি, অনেকে এই সকল উপায় পরীক্ষা করে দেখবেন। ঘরে ঘরে শিশুদের অসুখ-বিসুখ নিয়ে গৃহী ও গৃহিণীদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। ঘন ঘন ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে যদি তারা তাদের এই পদ্ধতিতে সুস্থ করে তুলতে পারেন তবে টাকা বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় চেষ্টার সাফল্যে তাঁরা নিশ্চয় আনন্দ লাভ করবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একলব্য—শ্রীমতিলাল দাশ। প্রকাশিকা : শ্রীপ্রীতিরাণী দাশ। ব্লক কে, প্লট ৪৩৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। মূল্য এক টাকা।

ছোটদের একাঙ্ক নাটক। ইহাতে মহাভারতের একলব্য চরিত্রটি নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়া সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। পুস্তকখানি ছেলেদের শুধু যে আনন্দবিধান করিবে তাহা নয়, তাহাদের চরিত্র-গঠনেরও সহায়ক হইবে ।

রাজ্যবর্দ্ধন—শ্রীমতিলাল দাশ। শিব সাহিত্য কুটীর। ব্লক কে, প্লট ৪৩৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। মূল্য দুই টাকা।

পঞ্চাঙ্ক নাটক। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রাজ্যবর্দ্ধনের অভিযান, দেশকে শত্রুর কবলমুক্ত করিতে প্রাণপণ সংগ্রাম, শত্রুকে আপন চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ করিয়া ভ্রাতৃত্বে বরণ, তাঁর পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি নাটকখানির সংলাপ এবং ঘটনার মাধ্যমে সুষ্ঠু ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজপুরোহিত, সেনাপতি এবং তাঁর কন্যার চরিত্রও সুন্দর এবং স্বাভাবিক রূপেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। নাটক হিসাবে রাজ্যবর্দ্ধন লেখকের সার্থক সৃষ্টি।

স্মৃতির রেখা—মহাদেবী বর্ম্মা। অনুবাদ : শ্রীমলিনা রায়। প্রদীপিকা। কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

গল্পসঙ্কলন। পুস্তকখানিতে সাতটি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে ; সাধারণ এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ গল্পের পাত্রপাত্রী। মহাদেবী বর্ম্মা হিন্দী সাহিত্যে সুপরিচিতা। যাদের তিনি দেখিয়াছেন তাদেরই হুবহু আঁকিয়াছেন। ভক্তিন, চিনা ফিরিওয়ালা, দুটি পাহাড়ী ছেলে, মন্নুর মা, বিবিয়া, ঠাকুরী বাবা ও গুদিয়া এই সাতটি গল্পের ভিতর দিয়া তিনি যে মানুষগুলিকে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাদের চরিত্র-মাধুর্য্য মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বিক্রমোর্ব্বশী—শ্রী"কুড়রাম" ভট্টাচার্য্য। ৬।১, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির সহৃদয় হৃদয়বেদ্য রস পরিবেশন করিয়া যাঁহারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, কবি শ্রী"কুড়রাম" ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত শকুন্তলার কাব্যানুবাদ শুধু যে পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নয়, তাঁহার কবিখ্যাতিকেও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নানা বিচিত্র ছন্দে রূপায়িত বিক্রমোর্ব্বশীর এই কাব্যানুবাদ তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠাকে সমধিক বর্দ্ধিত করিবে।

বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসমূহের অন্যতম। স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী এবং রাজর্ষি পুরূরবার পূর্ব্বরাগ, মিলন-বিরহ মান-অভিমান ইহার উপজীব্য। কুবেরের আলয়ে নৃত্যগীতান্তে নন্দনকাননে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেববৈরী কেশীর কবল হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিলেন রাজা পুরূরবা—তার পর ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইল। কিন্তু এই নবানুরাগের মুহূর্ত্তে দেবরথ আসিয়া উর্ব্বশীকে লইয়া গেল স্বর্গলোকে। কিন্তু রাজার প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আত্মগোপন করিয়া স্বর্গ হইতে উর্ব্বশী আবার নামিয়া আসিলেন মর্ত্ত্যলোকে, ভূর্জ্জপত্রে লেখা লিপিতে অভিব্যক্ত হইল রাজার প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেম। দৈবক্রমে সে পত্র রাজমহিষী ঔশীনরীর হস্তগত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ ও নিদারুণ বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। শেষ পর্য্যন্ত কাশীরাজ-কন্যা ঔশী-নরী স্থির করিলেন, রাজার মনস্কামনা যাহাতে পূর্ণ হয় সেজন্য তিনি নিজের সকল কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিবেন, উর্ব্বশীকে তিনি সমাদরে গ্রহণ করিবেন সপত্নীরূপে। ওদিকে শাপভ্রষ্টা হইয়া উর্ব্বশীকে আবার আসিতে হইল মর্ত্ত্যভূমিতে। উর্ব্বশী ও পুরূরবার পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখানে অকস্মাৎ রচিত হইল বিরহের দুস্তর ব্যবধান—অভিমানিনী উর্ব্বশী মায়াকাননে লতায় পরিণত হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত গৌরীচরণরাগসম্ভূত 'সঙ্গম'মণি-স্পর্শে আবার নিজের অনুপম রূপলাবণ্যময় দেহ ফিরিয়া পাইলেন উর্ব্বশী। স্বর্গের অপ্সরা আর রাজার মিলনের ফলে জাত শিশু 'আয়ু' পুরূরবার অজান্তে প্রতিপালিত হইল ঋষির আশ্রমে। রাজা যেদিন প্রথম পুত্রমুখ দর্শন করিলেন সেই পরম আনন্দের দিনেই তাঁহাকে অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাসের সম্মুখীন হইতে হইল, উর্ব্বশী স্মরণ করাইয়া দিল যে, দেবরাজের আদেশ—পিতাপুত্রের মিলনের পর তাহাকে চিরতরে চলিয়া যাইতে হইবে স্বর্গলোকে। এই বেদনাময় মুহূর্ত্তে আশাতীত আনন্দের বার্ত্তা লইয়া আসিলেন দেবর্ষি নারদ—দেবরাজ তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। উর্ব্বশীকে আর স্বর্গে যাইতে হইবে

না—তখন প্রণয়ীযুগল বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইয়াছে, ভাগ্যাকাশ হইয়া উঠিয়াছে সুপ্রসন্ন।

এই রোমান্টিক কাহিনীকে কালিদাস যে অনুপম রসশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন, জগতের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। বাংলা কাব্যে ইহাকে রূপায়িত করিতে গিয়া গ্রন্থকার যে ছন্দোনৈপুণ্য, ভাষার প্রসাদগুণ এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। কাব্যগ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইহাই মনে হয় যে, তিনি কালিদাসের রসসৃষ্টির একেবারে মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাণসত্তার সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং সেজন্যই তাঁহার নিপুণ তুলিকায় বিক্রমোর্ব্বশীর রোমান্টিক কাহিনীটি এমন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। উর্ব্বশী মায়ালতায় রূপান্তরিত হইবার পর পুরুরবা যখন তাহার সন্ধানে বনে প্রবেশ করিলেন তখনকার বর্ণনাটি ধ্বনি-মাধুর্য্যে এবং ভাষার উদাত্ত গাম্ভীর্য্যে মনকে বিচিত্রভাবে আন্দোলিত করে :

উদিল সজল নবমেঘদল
গগনকোণে
খর বারিধারে হানি' শরজাল
বেদনাবিধুর বিরহিমনে।
বিজলী জলদে গরজে মাদল
নৃপতি হৃদয়ে জ্বলে রোষানল,
বিরহোন্মাদ যেন কবিরাজ
বন প্রদেশে—
বীর পুরুরবা পশিলা কাননে
লতাকিশলয়জড়িত বেশে।"

সার্থক রসানুভূতি সৃষ্টির অনুকূল ভাষার এই উদাত্ত গম্ভীর সুরটি বই-খানির আগাগোড়া অনুস্যূত। মাঝে মাঝে চটুল ছন্দে শোনা যায় যেন নৃত্যপরা উর্ব্বশীর চরণের মঞ্জীরশিঞ্জন। ভূমিকায় কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় সত্যই বলিয়াছেন, "প্রসাদগুণই তাঁহার রচনার সমাদর লাভের অন্যতম কারণ।

এই কাব্যগ্রন্থখানির প্রচ্ছদপট এবং রূপসজ্জাও অনিন্দ্য। বস্তুতঃ ভাব-সম্পদে ও ভাষার প্রসাধনে যেমন বিক্রমোর্ব্বশী পাঠক চিত্তকে নন্দিত করিবে তেমনি ইহার অঙ্গসৌষ্ঠবও তাঁহার নয়নের পরিতৃপ্তিসাধন করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পাথরের ফুল—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। সাহিত্যায়ন, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা চার আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ গ্রন্থকার কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি যে তাঁহার খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে—শুধু তাহাই নয়, ইহা কিশোর-সাহিত্যে একটি অভিনব দান বলিয়া তাঁহার খ্যাতি অনেকটা বাড়াইয়া দিয়াছে। একটি নিছক গল্পের মাধ্যমে শিল্পী-জীবনের দুঃখ-বিপদ, ব্যথা-বেদনা, নিষ্ঠা-ত্যাগ অনবদ্য ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। জনৈক ধনী-গৃহিণীর খেয়ালে নিরন্ন শিল্পী অনবরত খাটিয়া যাইতেছেন একটি সুন্দর দ্রব্য তৈয়ার নিমিত্ত। শিল্পী তাঁহার পুত্রকেও এই কার্য্যে লাগাইয়াছেন। একটি নারী আসিয়া পুত্রের জীবনকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে—কর্ম্মনিষ্ঠ নায়ক শিল্পীর ত্যাগস্বীকারকেও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। কাহিনীটির বিষয়বস্তু এরূপ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে যে, উচ্চস্তম সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
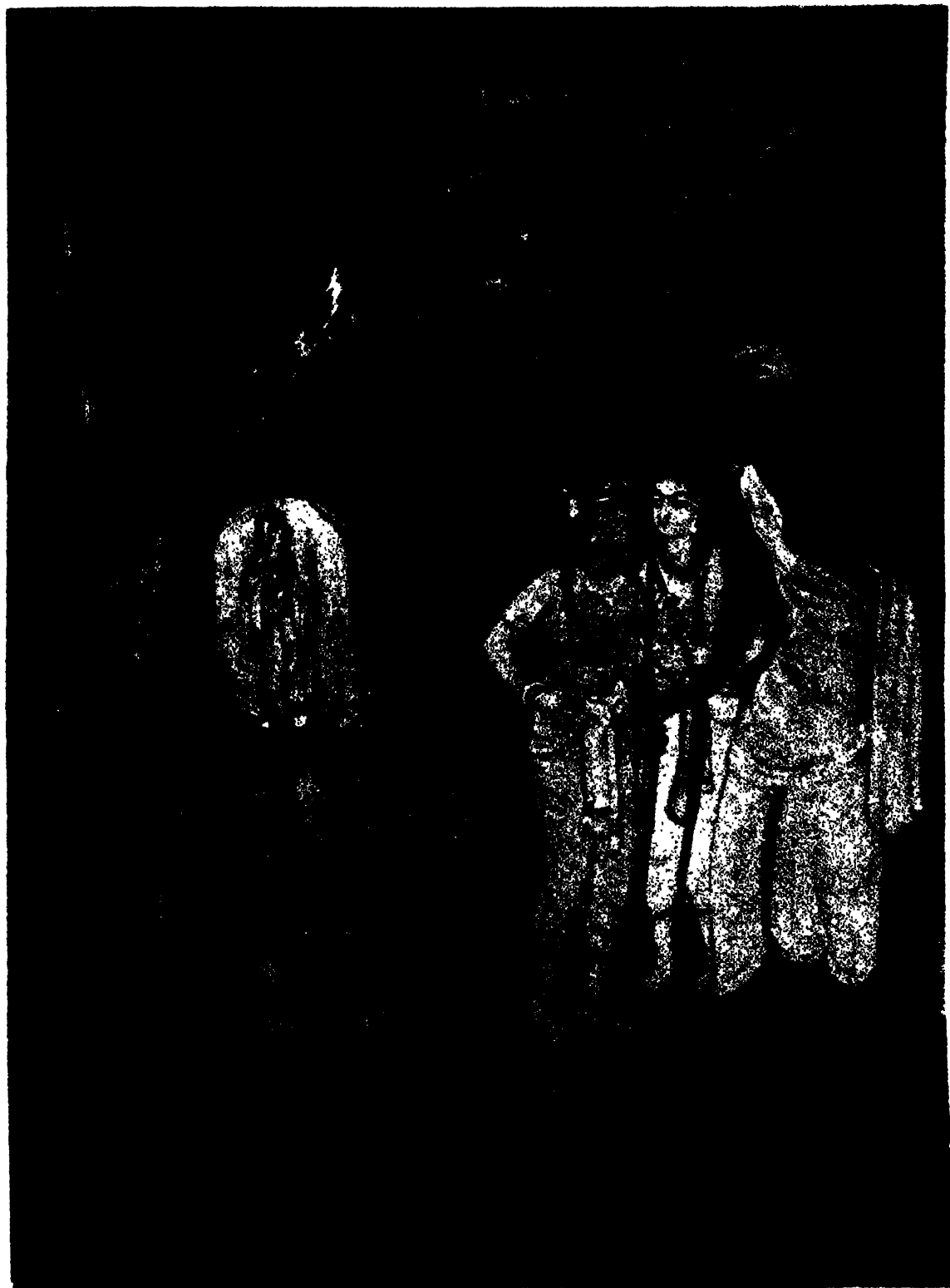
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ধৃতরাষ্ট্রের অরণ্যযাত্রা
শ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
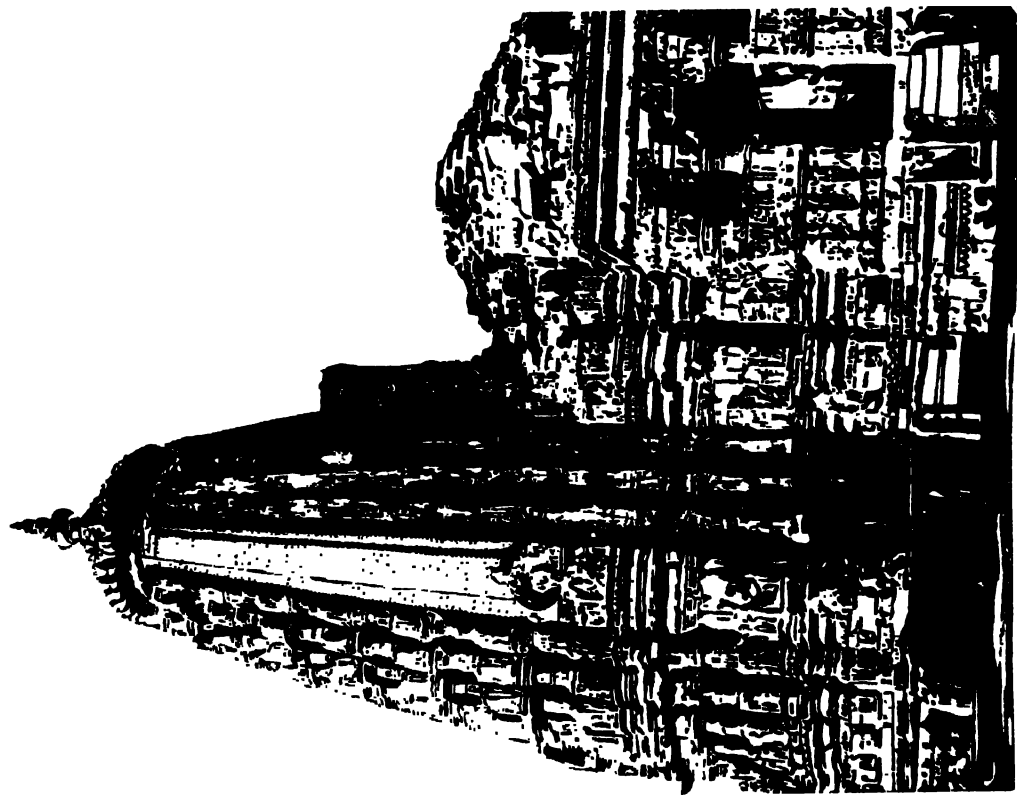
জেলেনী

ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

মন্দির

[শিল্পী : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস বাগচী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫০শ ভাগ ২য় খণ্ড } ফাল্গুন, ১৩৫৭ ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আগামী নির্ব্বাচন

বিগত ২০শে জানুয়ারী পণ্ডিত নেহরু বোম্বাইয়ে নির্ব্বাচনী-বক্তৃতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "কম্যুনিষ্টদের মেহনতি জনগণের একাধিপত্যের কথা অর্থহীন ও বাগাড়ম্বর মাত্র।"

ইহা খুবই সত্য। সম্প্রতি দেশে কর্ম্মী ও শ্রমিক যাঁহারা তাঁহারা একদল অতি অপকৃষ্ট ও নিষ্কর্ম্মা শ্রমিক নেতার উস্কানিতে ভুলিতে বসিয়াছেন যে, তাঁহারাও এদেশের জনসাধারণের অংশ। এদেশের জনসাধারণ বলিতে তাঁহাদিগেরই মা, বোন, বাপ-খুড়া, ভাইদেরই বুঝায়। তাঁহারা ক্রমেই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন হইয়া পড়িতেছেন, যাহার ফলে দেশের চতুর্দ্দিকের কাজ-কারবারের মধ্যে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে এবং কার্য্যতঃ দেশের মূল্যমান ও দ্রব্য উৎপাদন দুইয়েই অবনতি দেখা দিতেছে। দেশের কল-কারখানায় ও কুটীরজাত দ্রব্যাদির দাম চড়িতেছে এবং তাহা ক্রমেই নীরস ও বাজে হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাংলা দেশে ত ইহা চরমে গিয়াছে, যাহার ফলে এখানকার কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধোগতি হইতেছে এবং নূতন উদ্যোগ যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা পশ্চিম বাংলাকে প্লেগ-আক্রান্ত অঞ্চলের ন্যায় দূরে রাখিয়া চলিতেছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বেকার-সমস্যা ও দারিদ্র্য, যাহার ফল সকলকেই ভুগিতে হইবে—কি শ্রমিক, কি নিরীহ জনসাধারণ। এই ধ্বংসকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তাঁহাদের হাতে-ধরা ছোট বড় ইউনিয়নগুলি এবং সেই সঙ্গে দেখাইয়াছেন ঐ জাতীয় উৎসাহ আরও কয়েকটি টুকরা দল। ইহারা গঠনমূলক কার্য্য করিতে জানেন না, ও চাহেন না, চাহেন শুধু ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থসিদ্ধি। জানেন শুধু বাধিগতের শেখানো বুলি ও জানেন কংগ্রেসের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইতে। সেই কারণে নির্ব্বাচনে ইঁহাদের জয়লাভ খুব ভরসার বা আশার কথা বলা যায় না।

কিন্তু অন্য দিকেও কথা আছে। কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমেই কলুষ বাড়িতেছে। এবং সেই কারণে সমস্ত শাসনতন্ত্র দুর্নীতি ও অনাচারপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য এখনও কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে রাহুগ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু যে ভাবে তাহার উচ্চতম অধিকারীবর্গ, চাটুকার ও স্বার্থান্বেষী অনুচরগণের প্ররোচনায়, যথেচ্ছাচারী ও সমালোচনাবিমুখ হইয়া উঠিতেছেন তাহাতে ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপূর্ণ নহে। আমলাতন্ত্র ত এখনই "হাতে মাথা কাটা" চালাইতেছেন, তাহাদের অত্যাচার বাড়িয়াই চলিতেছে, জনসাধারণের প্রতিকারের উপায় প্রায় কিছুই নাই। কেননা যদি কোনও লোক অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চ-অধিকারীর কাছে অভিযোগ জানায়, ত হয় তিনি কর্ণপাত করিবেন না কিংবা হয়ত উল্টা তাহাকেই বিপদে ফেলিবেন। আদালতে যাইলে সরকারের সমস্ত শক্তি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। অবশ্য হয়ত হাইকোর্টে বা সুপ্রীমকোর্টে প্রতিকার হইবে, কিন্তু ততদিনে অভিযোগকারী ধনে প্রাণে শেষ হইবে। এইরূপ অত্যাচার চতুর্দ্দিকে যেরূপ চলিতেছে, তাহার পুরা ফিরিস্তি একটি পূর্ণ সংখ্যায় দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ক্ষমতার অপব্যবহার এখন আমলাতন্ত্রের বিশেষত্বে দাঁড়াইয়াছে।

কংগ্রেস বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে যাঁহাদের ছাড়পত্র দিয়াছেন তাঁহাদের সকলের গুণাবলীর সহিত আমরা পরিচিত নহি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাহা দেখি তাহাতে মনে হয়—নিকৃষ্ট অপাংক্তেয় ভাগ্যান্বেষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, সাধারণ চাটুকার অনুচরবর্গ ত ছাইয়াই আছে। বলা যায় যে, এবারকার দল পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টই, উন্নতির কোনও চিহ্ন ত দেখা যায় না।

তবে দেশের আশা-ভরসা কি? আগে ছিলেন গান্ধীজী। বর্ত্তমানে গান্ধীবাদী "নৈকষ্যকুলীন" যাঁহারা, তাঁহারাও ত প্রায় শতকরা ৯৫ জন অর্থলোলুপ বা ক্ষমতালোলুপ হইয়া নীতিবাদ ও আদর্শবাদকে জলাঞ্জলি দিতেছেন।

একমাত্র উপায় ছিল এই নির্ব্বাচনে সবল ও সক্রিয় বিরোধীপক্ষ গঠিত হইলে। কিন্তু দলগত স্বার্থের খেলায় তাহা সুদূরপরাহত। দেশের সংবাদপত্রও ত প্রায় ক্লীবত্বপ্রাপ্ত বা বিবেচনাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভোটারগণ সজাগ না হইলে দেশের উদ্ধার নাই।

কাশ্মীর

সম্প্রতি পাকিস্থান কাশ্মীর ব্যাপার লইয়া যে রকম তোড়জোড় করিতেছে তাহার কারণ প্রধানতঃ পাকিস্থানের আভ্যন্তরিক গোল-যোগের সমাধান করা। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাকিস্থানের রাজনৈতিক গগন হইতে মুসলিম লীগ অস্তগমনোন্মুখ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অন্য কোন রাজনৈতিক দল পাকিস্থানে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যে আওয়ামী দলের সহযোগিতায় সুরাবর্দী সাহেব গদীতে আসীন হইলেন এবং তিনি এক চালেই পাকিস্থানের দ্বিধাবিভক্ত শাসকশ্রেণী তথা জন-সাধারণকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কাশ্মীর ব্যাপারে আজ সমগ্র পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ সনের কলিকাতার হাঙ্গামার অভিজ্ঞতা সুরাবর্দী সাহেবের আছে এবং তিনি জানেন কেমন করিয়া বিরুদ্ধবাদী জনমতকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে হয়।

আর ভারতবর্ষ? কাশ্মীর ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতবর্ষের পরাজয় সূচিত হয়; এই পরাজয় ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিরও পরাজয় সূচনা করে। ভারতবর্ষের দিকে আইন আছে অবশ্য এবং সেই আশাতেই ১৯৪৮ সনে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কাশ্মীরে ডাকিয়া আনিয়া বসানো হইয়াছে, যাহাকে বলে খাল কাটিয়া কুমীর আনা। সেই প্রাথমিক ভুলের জেরের নিষ্পত্তি আজও হয় নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও স্বস্তিপরিষদে কাশ্মীর বিষয় পরিচালনা ব্যাপারে ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই সুদৃঢ় পন্থা অনুসরণ করে নাই। স্যর গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এবং স্যর বি. এন. রাও উভয়েই এ বিষয়ে সঠিক ও পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। দুইটি জিনিষ পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত—প্রথমতঃ, ভারতের সহিত কাশ্মীরের সংযুক্তি আইনসঙ্গত এবং দ্বিতীয়তঃ, কাশ্মীরের উপর পাকিস্থানের আইনসঙ্গত কোন দাবি নাই, সে কাশ্মীর আক্রমণকারী মাত্র এবং জোর করিয়া ভারতের অংশকে দখল করিয়া রাখিয়াছে।

কাশ্মীর কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, পাকিস্থান অন্যায় করিয়া বলপূর্ব্বক ভারতীয় দেশ দখল করিয়াছে। সুতরাং এই কথা যদি নিরাপত্তা পরিষদ স্বীকার না করে তাহা হইলে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর ব্যাপারে ভারতবর্ষ কোন অংশ গ্রহণ করিবে না, কিন্তু সে কথা সেদিন স্পষ্ট করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিরা দাবি করেন নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ডাকা হইয়াছিল, পাকিস্থানী আক্রমণ প্রতি-রোধ করিবার জন্য, এবং তাহাকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য। কিন্তু এই ব্যাপারের কোন সমাধান না করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ পাকিস্থানের পক্ষসমর্থন করিল এবং কাশ্মীরে গণভোটের দাবি করিয়া বসিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবর্ষ এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিল এবং গণভোটের জন্য এডমিরাল নিমিৎসকে নিয়োগের কথাও স্বীকার করিয়াছিল। এত বড় বেচাল ভারতীয় প্রতিনিধিরা কেমন করিয়া করিলেন তাহা ভাবিবার বিষয়। অবশ্য পণ্ডিত নেহরু তখনও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, এবং কাশ্মীর চাল-বেচালের জন্য তাঁহার দায়িত্বও কম ছিল না। তবে কাশ্মীর ব্যাপারে ভাবিবার তখন তাঁহার সময় ছিল না, কারণ তাঁহার চিন্তার সবটুকু ত চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি দখল করিয়া বসিয়াছে, কাশ্মীর-সমস্যা কিংবা দেশের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে ভাবিবার তাঁহার সময় ছিল কোথায়? তাই সেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভুলেই তিনি সায় দিয়াছিলেন।

ইহার পর দেখা যায় যে, গ্রেহাম মিশন ও ডিক্সন কমিশনের নিকট অবান্তর ব্যাপার লইয়া ভারতবর্ষ মাথা ঘামাইয়াছে। গ্রেহাম দাবি করিয়াছিলেন যে, কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তি হইবে সালিশী দ্বারা, তখন কিন্তু ভারতবর্ষ সালিশীর প্রস্তাবকে এড়াইয়া গেল—প্রস্তাবিত গণভোটের পুনরায় সমর্থন দ্বারা। ভারতবর্ষের তখন বলা উচিত ছিল যে, আক্রমণকারীর সহিত কোন সালিশী হইতে পারে না। পাকিস্থানের সহিত ভারতবর্ষের কাশ্মীর ব্যাপারে কোন প্রকার আলোচনা করাই উচিত হয় নাই, কিন্তু সেই সময় ডাঃ গ্রেহামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ পাকিস্থানের সহিত কাশ্মীর বিষয় লইয়া বার বার আলোচনা করিয়াছে। ইহার দ্বারা বিশ্বদরবারে প্রতীয়মান হয় যে, কাশ্মীর ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয়েই সমমর্য্যাদা-ভুক্ত, অন্যায়পূর্ব্বক আক্রমণকারীকে যেন জাতে তোলা হইল। ডিক্সন কমিশনের নিকট ভারতবর্ষ তাহার ভুলের পুনরাবৃত্তি করিল। ডিক্সন কমিশনের নিকট ভারতবর্ষ প্রকারান্তরে গণভোটের কথা স্বীকার করিয়াছিল, এবং আপত্তি উঠিল কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্থানের কি পরিমাণ সৈন্য থাকিবে। ভারতবর্ষ দাবি করিয়াছিল যে, পাকিস্থানের সৈন্যসংখ্যা কম থাকিবে, কিন্তু পাকিস্থান জিদ ধরিয়া বসিল, তাহার সৈন্যসংখ্যা আজাদ-কাশ্মীর এলাকায় অন্ততঃ পনর হাজার থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেহেতু পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণকারী, সেই হেতু একটি সৈন্য রাখার অধিকারও পাকিস্থানের নাই, সেই কথা ভারতবর্ষ একবারও দাবি করে নাই। তাই দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সন হইতে ১৯৫৪ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কাশ্মীর-নীতি বলিষ্ঠ ও সুচিন্তিত ছিল না।

ভারতবর্ষ তাহার কাশ্মীর-নীতি বর্ত্তমানে সংশোধন করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহা অতীব বিলম্বে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ দুইটি জিনিষ দাবি করিতেছে—প্রথমতঃ, ১৯৪৭ সনে ভারতের সহিত কাশ্মীরের সংযুক্তি আইনসঙ্গত ভাবে স্বীকৃত ঘটনা; এবং দ্বিতীয়তঃ, গণভোটের ব্যবস্থার পূর্ব্বে আজাদ-কাশ্মীর হইতে সমস্ত পাকিস্থানী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে। এই দুইটি কথা যদি সর্ব্বপ্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সর্ত্ত হিসাবে ১৯৪৮ সনে বলা হইত তাহা হইলে কাশ্মীর পরিস্থিতি অন্য রূপ পরিগ্রহ করিত। স্বস্তি-পরিষদে কাশ্মীর ব্যাপারে ভারতের পরাজয় শুধু ভারতের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা সূচিত করে না, ইহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ব্যর্থতা (কিংবা অযোগ্যতা) সূচিত হয়।

শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের কার্য্যপন্থা বিগত কয়েক বৎসরে

ভারতের মিত্রের চেয়ে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতের পঞ্চশীল ও নিরপেক্ষতা ভারতবর্ষকে যেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একঘরে করিয়া দিয়াছে। দেশের ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া পরের ব্যাপারে অতিরিক্ত মাথা ঘামানোর ফল এই। স্বস্তি-পরিষদে ভারতের কাশ্মীর-নীতির পরাজয়ের প্রধান কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধতা। ইহা যেন সুয়েজ খাল ঘটনার প্রতিশোধ। পৃথিবীর বহু দেশই মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণের বিরোধিতা করিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়া বিরোধিতা করিয়াছে, তবে মাত্রা রাখিয়া। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর গলাবাজি ও শ্রীকৃষ্ণ মেননের উক্তি দুই-ই যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে মিশরের লাভ হইলেও ভারতের লাভ কিছু হয় নাই। ভারতীয় বৈদেশিক নীতির আর একটি প্রধান দোষ এই যে, অনর্থক সে অন্য দেশের ব্যাপারে নিজের মাথা গলায়, সে কোরিয়া হউক বা টিউনিসিয়া হউক কিংবা ভিয়েৎনাম হউক। পররাষ্ট্র ব্যাপারে ভারতবর্ষ অনর্থক অত্যধিক মাথা গলায়।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর ব্যাপারে ব্রিটেন ফ্রান্সের সহযোগিতায় যে রকম নির্লজ্জ ভাবে ভারতের বিরোধিতা করিয়াছে, তাহার পর ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথে থাকার লাভ আছে মনে হয় না। পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ উভয়েই কমনওয়েলথের সভ্য-রাষ্ট্র, সে অবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে পাকিস্থানপক্ষ সমর্থন করিয়া ভারতের বিরোধিতা করা অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য্য হইয়াছে, বিশেষতঃ আইন যখন ভারতবর্ষের দিকে। কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতীয় লোকসভায় পণ্ডিত নেহরু কমনওয়েলথের জয়গান গাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ সকল দেশের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিতে চায়, সেই কারণে সে কমনওয়েলথে আছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কমনওয়েলথের সভ্য না হইলে কি ঐ দেশগুলির সহিত মিত্রতা বজায় থাকে না? কমনওয়েলথের সকল দেশগুলির সহিত কি ভারতের সদ্ভাব আছে? দক্ষিণ-আফ্রিকা ও পাকিস্থানের (যাহারা কমনওয়েলথের সভ্য) সহিত ভারতের যে মিত্রতা নাই তাহা সর্ব্বদেশবিদিত। কমনওয়েলথের বাহিরে পৃথিবীর অগণিত দেশ, তাহাদের সহিত কি ভারতের মিত্রতা বজায় নাই? কমনওয়েলথ একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ইঙ্গ-মার্কিন দলের সমর্থক। এহেন অবস্থায় ভারতবর্ষ তাহার নিরপেক্ষতা নীতির সহিত কমনওয়েলথের সভ্যপদের কি করিয়া সমন্বয় ও সমর্থন করে। সুতরাং কমনওয়েলথে অবস্থান করিবার জন্য যে যুক্তি পণ্ডিত নেহরু দেখাইয়াছেন তাহার সবটাই গোঁজামিলে ভরা। নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকা দুরূহ।

পরিকল্পনার পরিস্থিতি

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যেন মনে হয় সহজ উত্তর, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সময় ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়াপত্তন সুষ্ঠু ভাবে হয় নাই। সুরু হইতেই দেখা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যমান বৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি, বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পিত অর্থের পরিমাণ যোগাড় করা আরও একটি প্রধান সমস্যা। অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে যতই আশ্বাস দেন না কেন, বহির্বাণিজ্যে যে পরিমাণ ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে যন্ত্রপাতি আমদানী ব্যাহত হইতে বাধ্য। আভ্যন্তরিক অর্থসংগ্রহও সহজসাধ্য হইবে না, অন্ততঃ দিল্লীর সরকারী মহলে এই ধারণা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পর হইতে প্রায় ১২৬ কোটি টাকার মত ঘাটতি খরচ হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের দাদনমুদ্রার পরিমাণও প্রায় ২০০ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমবেত মুদ্রাস্ফীতির ফলে এবং খাদ্যদ্রব্য ঘাটতির ফলে মূল্যমান ক্রমবর্দ্ধমান। অর্থনৈতিক সমস্যা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম প্রধান সমস্যা শিক্ষিত কারিগরের অভাব। প্রয়োজনীয় কারিগরী-বিদ্যার অভাবে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না। বর্দ্ধিত চাহিদার তুলনায় শিক্ষিত কারিগর পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদন-ম্যানেজার, কারিগর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি চাহিয়া দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আশানুরূপ প্রার্থী পাওয়া যায় নাই। উত্তর-ভারতে একটি কাগজের কলের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কয়েক মাস ধরিয়া কোনও উপযুক্ত উৎপাদন-ম্যানেজার পাওয়া যায় নাই। শুধু নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিই যে এই অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা নহে, বর্ত্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান যথা: শর্করাশিল্প ও বস্ত্রশিল্পগুলিও শিক্ষিত কারিগরের অভাব বোধ করিতেছে। এই শিল্পগুলির বিস্তৃতি উপযুক্ত কারিগরের অভাবে ব্যাহত হইতেছে। এমনকি উপযুক্ত একাউণ্টেণ্ট, কর্ম্মসচিব, ষ্টেনোগ্রাফার প্রভৃতিরও অভাব হইতেছে। এই সকল অসুবিধার প্রধান কারণ স্বাধীন ভারতে ইংরেজী শিক্ষার অবহেলা। শিক্ষাব্যবস্থায় যে সকল রাজনৈতিক খেলা চলিতেছে তাহার ফলে এক দিকে যেমন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবে শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি যুবজনের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পন্ন হইতে পাঁচ বৎসরের অধিক সময় লাগিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

চাউল উৎপাদন ও দ্রব্য মূল্যমান

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত কমনওয়েলথ ইকনমিক কমিটির "রাইস বুলেটিন" পত্রে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬–৫৭ সনে বিশ্বে চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ অধিকাংশ দেশেই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ধান চাষ করা হইয়াছে এবং আবহাওয়াও মোটামুটি উন্নততর ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ভারতে চাউল

বলিত অবস্থা কবিসুলভ আন্তর্জাতিক ভাবে কম্যুনিষ্টদের বিশ্ব- চীন, ইন্দোচীন, ইটালী এবং ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট
ছিল না তথাপি ইহাকে সকল দেশের কম্যুনিষ্টগণই কম্যুনিষ্ট নূতন সংঘের নেতৃত্বের অধীনে থাকে হবে তাহার স্বস্তি

যাছে।

ব্রহ্মদেশে প্রায় এক কোটি একর ক্ষেত্রে ধান চাষ করা হইয়াছে। যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালে আর কোনও সময় এরূপ বিস্তৃতক্ষেত্রে ব্রহ্মদেশে ধানের চাষ হয় নাই। চীন, ফিলিপাইন, কম্বোজা, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাণ ইরাক প্রভৃতি সকল দেশেই চাউল উৎপাদন ভাল হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

চাউল উৎপাদনের কথা আলোচনায় স্বভাবতঃই কলিকাতার চাউলের বাজারের কথা স্মরণে আসে। বৎসরখানেক পূর্ব্বেও কলিকাতার বাজারে ১৮ ১৯ টাকা মণে ভাল চাউল কিনিতে পারা যাইত। কিন্তু যদিও এখন শস্য উঠিবার পর চাউলের দর বিশেষ সস্তা হইবার কথা তথাপি কলিকাতায় মণপ্রতি ২৪ ২৫ টাকার কমে চাউল পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। মধ্যে চাউলের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন সরকার যে কয়টি "ন্যায্য মূল্য" দোকান খোলেন তাহার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য এবং সরবরাহের চাউলও অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কলিকাতার বাজারে চাউলের দুর্ম্মূল্যতা—সঙ্গে সঙ্গে আটাও দুর্লভ। অনুরূপ ভাবে সরিষার তৈল প্রভৃতি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকার মূল্যমান বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া রাজ্যের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মাসিক দুই টাকা মাগগি ভাতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—হইবার কথাও নহে। যেখানে দ্রব্য-মূল্যমান সততই বৃদ্ধি পাইতেছে তথায় মাগগি ভাতা এক টাকা দুই টাকা বৃদ্ধি করিয়া সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। উপরন্তু, সরকার কেবলমাত্র সরকারী কর্ম্মচারীদেরই ভাতা বৃদ্ধি করিতেছেন। সরকারী কর্ম্মচারীরা জনসাধারণের ক্ষুদ্র অংশ। (কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভাতা বৃদ্ধি করেন নাই।) সুতরাং ভাতা বৃদ্ধিতে সরকারী কর্ম্মচারীদের কিছু সুবিধা হইলেও দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের দুর্দ্দশার তাহাতে কোনই লাঘব হইবে না।

সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় এইভাবে দেশের জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন দায়িত্বশীল প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন আয়ের ব্যবধান কমানো। কিন্তু আজ সকলেই জানেন যে, উহার বিপরীতই ঘটিতেছে। চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ চাউলের মূল্য কমিতেছে না—জীবন-যাত্রার মূল্যমান ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা কি মুদ্রাস্ফীতিরই লক্ষণ নহে? ঘাটতি বাজেট-নীতি অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল মুদ্রাস্ফীতি—উহার বিপদ সম্পর্কে সরকার অনেক সাবধানবাণী পাইয়াছেন, কিন্তু উহার কুফল প্রতিরোধ সম্পর্কে তাঁহারা বিশেষ কোন চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

অন্যান্য দেশে পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা এবং ভারতেও প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সরকার যদি এই বিষয়ে চিন্তা না করেন তবে বিপদ যখন রূপে ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিবে তখন আর কোন থাকিবে না।

চিনি রপ্তানী

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের আভ্যন্তরিক চিনির উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইতেছিল এবং ইহার ফলে ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতের চিনির উৎপাদন ১২ হইতে ১৪ লক্ষ টন হইতেছিল তখন আভ্যন্তরিক চাহিদার তুলনায় ইহার ঘাটতি হইতেছিল। কারণ সরকারী হিসাবমতে দেশের চিনির চাহিদা ১৮ হইতে ২০ লক্ষ টনে নির্দ্ধারিত। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৬ সনে ভারতবর্ষে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮'৫৯ লক্ষ টনে অর্থাৎ এই উৎপাদনের পরিমাণ দেশের প্রয়োজন কোনও রকমে মিটাইতে পারে এবং বিদেশ হইতে আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝা ভার। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই চিনি রপ্তানির জন্য অনুমতি দিয়াছেন এবং ১০,০০০ মেট্রিক টন চিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই আরও চিনি রপ্তানি করা হইবে। পাকিস্থান, ব্রহ্ম, সিংহল এবং আফ্রিকান দেশসমূহ ভারতীয় চিনি সরবরাহের জন্য আদেশ দিতেছে। পাকিস্থানে বর্ত্তমানে চিনির মূল্য প্রতি সের ১৷০ হইতে ১৷৶০ আনা। এত উচ্চ মূল্যের প্রধান কারণ পাকিস্থানের আমদানী-কর। ভারতীয় চিনির মূল্য কিউবা ও জাভার চিনির মূল্য হইতে অধিক, তাহা না হইলে ভারতীয় চিনির চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইত। সুয়েজ খাল বন্ধ থাকার জন্য মধ্য-প্রাচ্যে ও পাকিস্থানে ভারতীয় চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, সুয়েজ খাল খোলা হইলে ভারতীয় চিনি রপ্তানি এই সকল দেশগুলিতে হ্রাস পাইবে। গত বৎসরের উৎপাদন হইতে ৫০,০০০ টন চিনি রপ্তানি করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই পরিমাণ চিনি রপ্তানির পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা করা উচিত যে, ইহাতে ভারতের আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের পক্ষে ঘাটতি পড়িবে কিনা। গত বৎসর ৮০,০০০ টন চাউল রপ্তানি করিয়া ভারতে চাউলের অভাব হইয়াছিল। চিনির বেলায় যেন সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার পুনরাবৃত্তি না হয়।

তৈলসঙ্কট দেখা দিয়াছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধ (অর্থাৎ আমেরিকা) হইতে তৈল আমদানী করিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। যদি পশ্চিম গোলার্দ্ধ হইতে যথেষ্ট তৈল আমদানী করা সম্ভব হয় তাহাতেও প্রয়োজনের শতকরা ৬০/৭০ ভাগের বেশী তৈল পাওয়া যাইবে না।

বা মালয়কে স্বাধীনতা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্রিটেনের নাই, মালয়ে কোন দায়িত্বশীল সরকার গঠনেরও কোন পরিকল্পনা তাহাদের নাই। সাত বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মালয় পরিত্যাগ করিতে হইতেছে—অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! ১৯৪৮ সনে মালয়কে স্বায়ত্ত-শাসন দিলে ব্রিটেনের প্রতি মালয়বাসীদের যে সম্প্রীতি থাকিত এখন ব্রিটেন তাহা আশা করিতে পারে কি?

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া পাক্ষিক "হিন্দুবাণী" লিখিয়াছেন, "বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বা অর্থ স্বাধীনতার পর ফেরত দেওয়া হইয়াছে। বীর সাভারকরের সম্পত্তিও অনুরূপ ভাবে ফেরত দেওয়া হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার যে দলের হাতে, তাঁহাদের দলীয় মনোবৃত্তি এত প্রবল যে সঙ্কীর্ণ দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিয়া সাভারকরের ন্যায় একজন দেশপ্রেমিকের কথা বিবেচনা করিতে পারেন নাই।" "হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন যে, বীর সাভারকর কংগ্রেসী না হইয়া হিন্দু মহাসভার নেতা বলিয়াই "তাঁহার উপর কংগ্রেস সরকারের এই হীন আচরণ।"

ভারত সরকার কি কারণে সাভারকরের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, প্রকাশিত সংবাদ হইতে তাহা সঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়াই যদি একমাত্র বাধা হইয়া থাকে তবে সরকারের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মোটেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। সরকার সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দিতে পারিতেন। এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট সরকারী নীতিগ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হইবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা হইবে না—যদি ইহাই সরকারী নীতি হয় তবে তাহাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের নজীর অন্যান্য দেশেও রহিয়াছে। আমাদের দেশে সেই নীতি কেন কার্য্যকরী করা যায় না, স্বভাবতঃই জনসাধারণ তাহা জানিতে চাহিবেন।

কম্যুনিষ্টদের নূতন বিশ্বসংস্থা

গত বৎসরের এপ্রিল মাসে কমিনফর্ম ভাঙিয়া দেওয়া হয়। কমিনফর্ম কম্যুনিষ্টদের বিশ্বসংস্থা ছিল না। প্রতিষ্ঠাকালে উহার সদস্য ছিল নয়টি কম্যুনিষ্ট পার্টি—সোভিয়েট, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, ইটালী এবং ফ্রান্সের পার্টিগুলি। ১৯৪৮ সনে যুগোস্লাভ পার্টির বহিষ্কারের পর সদস্য-সংখ্যা দাঁড়ায় আট; তাহা আর বৃদ্ধি পায় নাই।

আলোচনা করিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় প্রথমে ছিল যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে, পরে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্টে স্থানান্তরিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবে বেলগ্রেডে অবস্থিত বিভিন্ন পার্টির সদস্য-সম্বলিত সম্পাদকমণ্ডলীরই পত্রিকা পরিচালনা করার কথা। কিন্তু সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং বিশেষভাবে ষ্ট্যালিন নিজেদের প্রভুত্ব হ্রাস সম্পর্কে এরূপ শঙ্কিত ছিলেন যে, তাহারা সে ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না। সোভিয়েট পার্টির চাপে অন্যান্য পার্টিকে মানিয়া লইতে হইল যে, সকল প্রবন্ধ প্রভৃতির প্রুফ উঠাইয়া মস্কো পাঠান হইবে সোভিয়েট পার্টির অনুমোদনের জন্য, সেই অনুমোদনলাভ হইলে পরই কেবলমাত্র প্রবন্ধগুলি ছাপা হইবে। বলা বাহুল্য, এই ক্ষমতার সুযোগ লইয়া সোভিয়েট পার্টির কর্ণধারবৃন্দ এবং বিশেষভাবে ষ্ট্যালিন নিজের খেয়ালখুশিমত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধগুলির যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন পরিবর্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের নির্ব্বাক থাকা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। কমিনফর্ম যত দিন মুদ্রিত হইয়াছে, এই ভাবেই হইয়াছে। একবার ষ্ট্যালিন প্রবন্ধগুলি অনুমোদন করিয়া পাঠানোর পর যখন প্রায় ছয়টি ভাষার পত্রিকাটির মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তখন সহসা তিনি পুনরায় গেলিগুলি চাহিয়া পাঠাইলেন। পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া সেগুলি পুনরায় ষ্ট্যালিনের নিকট বিমানযোগে প্রেরিত হইল। ষ্ট্যালিন সেগুলি পুনরায় এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিলেন যে, মুদ্রিত সকল সংখ্যা পোড়াইয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আবার পত্রিকাটি মুদ্রণ করিতে হইল।

এই ভাবে রুশ প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টাতেও কোন কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ করে নাই—আদর্শগত দিকে তাহারা এতই মোহগ্রস্ত ছিল। তবে স্বাধীনচেতা যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দের নিকট এই সোভিয়েট নীতি প্রথম হইতেই বিরোধিতা পাইতে থাকে। কোন রূপ বিরোধিতাই কম্যুনিষ্টদের অসহ্য; সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী দালাল বলিয়া যুগোস্লাভ পার্টি ও নেতৃবৃন্দকে কমিনফর্ম হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

যদিও অবশ্য কমিনফর্ম আনুষ্ঠানিক ভাবে কমুনিষ্টদের বিশ্ব-সংস্থা ছিল না তথাপি উহাকে সকল দেশের কমুনিষ্টগণই কমুনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় সংস্থারূপে দেখিত এবং উহার নির্দ্দেশাবলী মানিয়া চলিত। কমিনফর্মের সাপ্তাহিক মুখপত্রে লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির নীতি পরিবর্তন ঘোষিত হয়। অনুরূপভাবে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠির ভিত্তিতে জাপানী কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ও নীতি পরিবর্ত্তিত হয়।

কমিনফর্মের ইতিহাস রুশ কমুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব-বিস্তারের ইতিহাস। অনুরূপ ভাবে কমিনফর্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কমুনিষ্ট বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান "কমিনটার্ণও (Communist International) ষ্ট্যালিনী স্বেচ্ছাচারের একটি যন্ত্র ছিল। ষ্ট্যালিনের নির্দ্দেশে এবং কমিনটার্ণের সমর্থনে ১৯৩৮ সনে পোল্যাণ্ডের কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে মস্কোতে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। বলা হইয়াছিল তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদের চর হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। আঠার বৎসর পর সোভিয়েট কমুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে প্রমাণ হয় যে, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশের কত কমুনিষ্টকে যে কমুনিজমের বলি হইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সম্প্রতি একটি বিশ্ব কমুনিষ্ট সংস্থা প্রতিষ্ঠার আলোচনা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। কমিনফর্ম ভাঙিয়া দিবার সময়ও ইঙ্গিত করা হয় যে, কমুনিষ্টদের অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হইতে পারে। ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইটালীয় কমুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে বক্তৃতাপ্রদান-কালে পামিরো তোগলিয়াত্তিও অনুরূপ ইঙ্গিত করেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ শ্রমিকদলের বামপন্থী সদস্য কনিজিলিয়াকাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্রুশ্চভ নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন শীঘ্রই একটি আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট সংস্থা স্থাপিত হইবে।

সাধারণ ভাবে কমুনিষ্টদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপকারিতাও থাকিতে পারে। কমুনিষ্ট দেশগুলি হইতে সংবাদ সংগ্রহ নিতান্তই কষ্টসাধ্য। একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্রে যদি কমুনিষ্ট দুনিয়া সংক্রান্ত সরকারী তথ্যাবলীও প্রকাশিত হয় তাহাতেও উপকার হইতে পারে। কিন্তু অতীতে আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ ভাবে একটি বিশেষ রাষ্ট্রের জাতীয় প্রভুত্বসম্প্রসারণের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তদপেক্ষা আরও গুরুতর ব্যাপার—অন্যান্য দেশের খ্যাতিসম্পন্ন কমুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ সজ্ঞানে তাহাতে যেরূপ নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন তাহার কথা স্মরণ করিলে এই নূতন প্রস্তাবে আশঙ্কার কারণ থাকে বৈকি। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, কমুনিষ্ট দুনিয়াতেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদি পোল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া, চীন, ইন্দোচীন, ইটালী এবং ইন্দোনেশিয়ার কমুনিষ্ট পার্টিগুলি নূতন সংস্থার নেতৃত্বের অংশীদার থাকে তবে তাহার ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই লোপ পাইবে। অন্যথায় নূতন বিশ্ব-সংস্থাটি সোভিয়েট ইউনিয়নের আদর্শগত এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব-বিস্তারের আর একটি নূতন অস্ত্র হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা ও ব্রিটেনের অর্থনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা ব্রিটেনের অর্থনীতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র এখনও পাওয়া যায় নাই। নিম্নোক্ত বিবরণী হইতে তাহার আংশিক রূপ উদ্‌ঘাটিত হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যে গোলমালের ফলে এবং সুয়েজ খাল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্য হইতে তৈল সরবরাহ পাইতেছে না—ইহাতে বিশেষ অর্থনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। তবে সরকারী ভাবে বলা হইয়াছে যে, এই সঙ্কট সাময়িক এবং শীঘ্রই তাহা কাটিয়া যাইবে। এই বিশ্বাসের মূলে দুইটি কারণ রহিয়াছে বলা হইয়াছে: প্রথমতঃ সুয়েজ খাল এবং তৈলবাহী পাইপ লাইনগুলি শীঘ্রই পুনরায় কার্য্যকরী হইবার আশা রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে অসুবিধা হইবে তাহা কাটাইয়া উঠিতে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক শক্তি অনেকাংশে সাহায্য করিবে। তবে চলতি ঘাটতি মিটাইবার জন্য ব্রিটেনকে সঞ্চিত ডলার ও স্বর্ণ ব্যয় করিতে হইতেছে।

ব্রিটেনের উৎপাদন মোটামুটি ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের স্তরেই রহিয়াছে, তবে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন অপেক্ষা উৎপাদনদ্রব্য উৎপাদনের অধিকতর ঝোঁক দেখা গিয়াছে। প্রকাশ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণও ১৯৫৫ সন হইতে অপেক্ষাকৃত কম।

ষ্টার্লিঙের উপর বিশেষ চাপ পড়িয়াছে। সরকারী ভাবে উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্যিক ঘাটতির জন্য এই চাপ পড়ে নাই—উহার মূলে মানসিক কারণ বিদ্যমান। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি মনে করিতেছে যে, শীঘ্রই পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের মূল্যমান হ্রাস করা হইবে, সেজন্য সকলেই ষ্টার্লিঙের প্রাপ্য মিটাইতে বিলম্ব করিতেছে এবং ষ্টার্লিং দ্বারা তাহারা অপরাপর মুদ্রা ক্রয় করিতেছে। ইহাতে স্বভাবতঃই ষ্টার্লিঙের হারের অবনতি ঘটিয়াছে এবং এইভাবে ষ্টার্লিং খরচ করিয়া ফেলায় কয়েকটি রাষ্ট্রের সঞ্চিত ষ্টার্লিং ভাণ্ডারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ঐ সকল দেশকে শীঘ্রই পুনরায় ষ্টার্লিং কিনিতে হইবে এবং ষ্টার্লিঙের বর্ত্তমান অবনতি আর থাকিবে না। ব্রিটিশ সরকার সর্ব্বপ্রকার উপায়ে পাউণ্ডের বর্ত্তমান হার বজায় রাখিতে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

তৈল-সঙ্কট কেবল ব্রিটেনকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নহে, সমগ্র ইউরোপই এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। সুয়েজ-যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপের প্রয়োজনীয় তৈলের প্রায় শতকরা আশী ভাগই আসিত সুয়েজ খাল এবং পাইপ লাইনগুলির মধ্য দিয়া। সুয়েজ খাল ও পাইপ লাইনগুলি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র

তৈলসঙ্কট দেখা দিয়াছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধ (অর্থাৎ আমেরিকা) হইতে তৈল আমদানী করিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। যদি পশ্চিম গোলার্দ্ধ হইতে যথেষ্ট তৈল আমদানী করা সম্ভব হয় তাহাতেও ইউরোপের প্রয়োজনের শতকরা ৬০।৭০ ভাগের বেশী তৈল পাওয়া যাইবে না। পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল দেশই সেজন্য তাহাদের তৈল ব্যবহার শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ হ্রাস করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে ব্যবহার আরও শতকরা পাঁচ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই যদি আমেরিকা হইতে তৈল সরবরাহ না করা যায় তবে ইউরোপের দেশগুলিতে তৈল-সরবরাহ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন শিল্পে তৈল সরবরাহ কমাইয়া দিবার ফলে উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে।

মালয়ের স্বাধীনতা

গত বৎসর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ১৯৫৭ সনের আগষ্ট মাসে মালয়কে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। আসন্ন ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত খুঁটিনাটি আলোচনার জন্য জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুল রহমান এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে এক আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, স্বাধীনতালাভের পরও মালয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকিবে। অপর পক্ষে ব্রিটিশ সরকার মালয়ী সেনাবাহিনীকে গড়িয়া তুলিতে ও ট্রেনিং দিতে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

মালয়ের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনাকালে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে গভীর মতানৈক্য দেখা দেয়। প্রতিরক্ষা খাতে প্রভূত ব্যয় মিটাইবার জন্য মালয়ের প্রতিনিধিগণ ব্রিটেনের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে স্থির হইয়াছে যে, ঋণ এবং দান সাহায্য বাবদ ব্রিটেন মালয় সরকারকে মোট ৪ কোটি পাউণ্ডের মত দিবে। ইহার কিয়দংশ সুদহীন বা অল্প সুদে ঋণ বাবদ দেওয়া হইবে—অধিকাংশই দেওয়া হইবে সাহায্য হিসাবে।

মালয় স্বাধীনতালাভ করিতেছে তাহা সকল দিক হইতেই সুখবর। আশা করা যায়, স্বাধীনতালাভের পর মালয়ের গৃহযুদ্ধের অবসান হইবে। এই গৃহযুদ্ধে ১৯৪৮ সন হইতে প্রতি বৎসর ১৩ কোটি মালয়ী ডলার ব্যয়িত হইয়াছে। এই ব্যয়ের ভারে মালয়ের অর্থনীতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—ইহারই আংশিক পূরণ হিসাবে মালয় ব্রিটেনের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল।

১৯৪৮ সন এবং ১৯৫৭ সনের মধ্যে কতই না প্রভেদ, ১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বক্তৃতাদানকালে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এটলী বলিয়াছিলেন যে, মালয় ত্যাগ করা বা মালয়কে স্বাধীনতা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্রিটেনের নাই, মালয়ে কোন দায়িত্বশীল সরকার গঠনেরও কোন পরিকল্পনা তাহাদের নাই। সাত বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মালয় পরিত্যাগ করিতে হইতেছে—অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! ১৯৪৮ সনে মালয়কে স্বায়ত্ত-শাসন দিলে ব্রিটেনের প্রতি মালয়বাসীদের যে সম্প্রীতি থাকিত এখন ব্রিটেন তাহা আশা করিতে পারে কি?

স্বাধীনতার পরও সামরিক ঘাঁটি রাখিতে মালয়কে বাধ্য করিয়া ব্রিটেন কতদূর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছে, ভবিষ্যৎই তাহা প্রমাণ করিবে। উপনিবেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে সর্ব্বত্রই তাহাদের এইরূপ অনিচ্ছা—কিন্তু পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার এইরূপ আংশিক স্বীকৃতি দ্বারা ব্রিটেন বিশেষ লাভবান হইতেছে না। সামরিক বলে পৃথিবীশাসনের যুগ চলিয়া গিয়াছে—সুয়েজ যুদ্ধে যদি ব্রিটেন সে কথা বুঝিয়া না থাকে তবে সেই ভুলের জন্য ব্রিটেনকে আরও বহুগুণ বেশী মূল্য দিতে হইবে।

তবে ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তি অপেক্ষা অধীন দেশগুলি সম্পর্কে ব্রিটেন যে অধিকতর দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করিয়াছে সে সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ নাই (অবশ্য কেনিয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের এই দূরদর্শিতার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই)। এই মার্চ্চ মাসেই গোল্ড কোষ্ট "ঘনা" নূতন নামে নূতন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের আর একটি রাজ্য নাইজিরিয়াও শীঘ্রই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

যুগোশ্লাভিয়ায় কৃষকদের স্বাস্থ্যবীমা

যুগোশ্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সেই সম্পর্কে আমাদের দেশে বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নাই। সমাজতন্ত্রের তথাকথিত সমর্থক কমুনিষ্টরা যুগোশ্লাভিয়ার অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অল্পকালের জন্য ভারতীয় কমুনিষ্টগণ যুগোশ্লাভিয়া লইয়া খুবই হৈ চৈ করে, কিন্তু যখনই যুগোশ্লাভ নেতৃত্ব ষ্টালিনবাদী রুশ স্বৈরাচারের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে তখন হইতেই ভারতীয় কমুনিষ্টদের দৃষ্টিতে যুগোশ্লাভ কমুনিষ্টরা 'পতিত' হইয়া রহিয়াছে। ১৯৫৫ সনে ক্রুশ্চেভ যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি পূর্ব্বকৃত অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার পর হইতে অবশ্য কমুনিষ্টরা প্রকাশ্যভাবে যুগোশ্লাভিয়ার নিন্দা করে না, তথাপি যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, অথচ যুদ্ধোত্তর যুগে পূর্ব্ব-ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে কেবলমাত্র যুগোশ্লাভিয়াতেই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে ঘটিতে পারিয়াছে। কমুনিষ্ট এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরোধিতাসত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়া অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুগোস্লাভিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, মোট জনসংখ্যা ১৬,৯২৭,০০০-এর মধ্যে ১১,৩৩৪,০০০ জনই কৃষিজীবী। সুতরাং যুগোস্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করা কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আশা করা যায়—আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদগণ যুগোস্লাভ অভিজ্ঞতার সমস্যা ও সাফল্য সম্পর্কে অধিকতর আলোচনা করিবেন।

যুগোস্লাভিয়ায় কৃষকদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থার প্রচলন করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সনের শেষ দিক পর্য্যন্ত প্রায় ১৫,৮১,৭৬৫ জন এই স্বাস্থ্যবীমা করিয়াছেন। কৃষকদের মোট সংখ্যার তুলনায় এই জনসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য—কেবলমাত্র কৃষকগণের কর্ম্মসমবায় এবং রাষ্ট্রীয় কৃষিভূমির শ্রমিক ও কর্মচারিগণই শুধু স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনার আওতায় পড়িয়াছেন। তবে কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনাকে ব্যাপকতর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রত্যেক কৃষককে এই পরিকল্পনার আওতায় আনিতে এখনও অনেক দিন লাগিবে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সমস্ত কৃষি-উৎপাদক এবং গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন কর্ম্মরত ব্যক্তিগণের জন্য সাধারণ ও বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্তন করা হইবে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ হইবে। স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রথম প্রয়োজন উপযুক্তসংখ্যক চিকিৎসক। স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বেসরকারী চিকিৎসকগণ প্রতি বৎসর গড়ে ৪ কোটি রোগী পরীক্ষা করেন। স্বাস্থ্যবীমা প্রসারিত হইলে ইহাদের উপর চাপ আরও বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

যুগোস্লাভ স্বাস্থ্যবীমা আইন অনুযায়ী কৃষি-উৎপাদকগণের স্বাস্থ্যবীমার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করেন সামাজিক বীমা-সংস্থা এবং বাকী অর্দ্ধেক বহন করেন বীমাকারী নিজে।

"যুগোস্লাভ সংবাদ" লিখিতেছেন :

"বীমার ব্যয়সহ, কৃষকগণ ১৯৫৩ সনে চিকিৎসার জন্য ৭৫,৪২,৪৭০ দিনার ব্যয় করেন। এই ব্যয়ের পরিমাণ ২,৪৭২ মিলিয়ন দিনার বেড়ে যাবে। কাজের সময় দুর্ঘটনা, শিশুজন্ম, সংক্রামক রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবীমাই যদিও চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় বহন করবেন তবুও প্রস্তাব করা হয়েছে, বীমাকারীরও কিছু ব্যয় বহন করা উচিত। স্বাস্থ্যবীমা প্রবর্ত্তনের ফলে, সামাজিক বীমা-সংস্থার ব্যয় ৬,২৮৩ মিলিয়ন দিনার ও কৃষকগণের ব্যয় ৩,৭৩১ মিলিয়ন দিনারে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

"কৃষিজীবিগণের মোট আয় ধরা হয়েছে প্রায় ২০০ বিলিয়ন দিনার আর ১৯৫৪ সনে আয়করের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৩২ বিলিয়ন। কাজেই কৃষকগণকে মোট ৪২,০১৪ মিলিয়ন দিনার অর্থাৎ তাঁদের মোট আয়ের শতকরা ২১ ভাগ দিতে হবে। তবে এখন কৃষকগণকে যে কর দিতে হয় তা যদি ২,৫৯২ মিলিয়ন দিনার কমিয়ে দেওয়া হয় তা হলে তাঁদের দেয় অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯,৪২২ মিলিয়ন দিনার, অর্থাৎ তাঁদের মোট আয়ের শতকরা ১৯·৭৯ ভাগ। আয়কর বাবদ অর্থ আদায় করে তা থেকেই স্বাস্থ্যরক্ষার কর্ম্মসূচীগুলি চালু রাখা হয়।"

পাকিস্থানের রাজনীতি

পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থান উভয় অংশই জড়াইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থানে রিপাবলিকান দলে ভাঙন দেখা দিয়াছে এবং ডাঃ খান সাহেবকে অপসারণের চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানের গণতান্ত্রিক দাবিকে প্রতিহত করিয়া পাকিস্থানের পার্লামেন্টে উভয় অংশের সমান প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে সম্মিলিত করিয়া একটি ইউনিটে পরিণত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্থানের একটি প্রভাবশালী অংশ সকল সময়েই এই এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। এবং সকলেই ইহা জানেন যে, নানারূপ কূটকৌশল বিস্তার করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের লীগ নেতৃবৃন্দ সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সকল ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করিয়াই এক ইউনিট পরিকল্পনা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। এই কার্য্যে তাঁহারা ডাঃ খান সাহেবের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে "এক ইউনিট" নেতৃবৃন্দ পুনরায় চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রদেশগুলির বিলুপ্তিসাধনে 'ক্ষমতার আসন-সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় স্বার্থসন্ধানী রাজনীতিবিদদের অসন্তোষে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ এক ইউনিট গঠনের পিছনেও একচ্ছত্র ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যই প্রবল ছিল।

সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রথম হইতেই এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। সিন্ধুর জি. এম. সৈয়দ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফফর খান এই বিরোধীদলের নেতা ছিলেন। তদুপরি পশ্চিম পাকিস্থান আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পঞ্জাবেরও স্বল্পসংখ্যক নেতা এক ইউনিট পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। সম্প্রতি রিপাবলিকান দলের কয়েকজন নেতা মিঃ সৈয়দ ও খান আবদুল গফফর খানের সহিত আলোচনার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

এদিকে পূর্ব্ব পাকিস্থানে কাগমারীতে আওয়ামী লীগ সম্মেলন লইয়া এক উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী এবং আওয়ামী লীগের নেতা মৌলানা ভাসানীর মধ্যে যে বিরোধিতা এত দিন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল কাগমারী সম্মেলনের পর সেই বিরোধিতা বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। সকল প্রকার সামরিক চুক্তি বর্জ্জনের নীতি সমর্থন করিয়া আওয়ামী লীগ যে পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেন, মিঃ সুরাবর্দ্দীর পররাষ্ট্রনীতি কার্য্যতঃ তাহার বিরুদ্ধাচরণই করিয়াছে। কৌশলে মৌলানা ভাসানীকে দিয়া তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদ-

কমাইয়া লইবার যে চেষ্টা মিঃ সুরাবর্দী করেন, স্পষ্টতঃই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। দলের নিকট এরূপভাবে পরাজিত হইলে অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষমতা-লাভই যাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য সেই সুরাবর্দী সাহেবের নিকট সেরূপ সৌজন্য আশা করা বৃথা।

কাগমারী সম্মেলনে মূলতঃ মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্ব ও নীতির প্রতি দলের পুনরায় আনুগত্য জানানো হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বনসংক্রান্ত দলের নীতি-ভঙ্গকারী যে-কোন সদস্যকে দল হইতে বহিষ্কারের চরম ক্ষমতা মৌলানা ভাসানীর হাতে দেওয়া হয়। সম্মেলনে পূর্ব্ব পাকিস্থানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কাগমারী সম্মেলন সুরাবর্দী-ভাসানী বিরোধিতা উপলক্ষে একশ্রেণীর পাকিস্থানী রাজনৈতিক নেতা এবং সংবাদপত্র পুনরায় ভারতবিরোধী প্রচারে নামিয়াছে। পাকিস্থানের শাসকশ্রেণী পাকিস্থানের জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তাহারা ক্রমশঃই জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইতেছেন। পাকিস্থানের প্রকৃত স্বার্থের পরিপন্থী আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি গৃহীত হওয়ায় পাকিস্থান বহু দিক হইতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সকল শিল্প ও উচ্চতর সরকারী পদগুলি পশ্চিম পাকিস্থানবাসীদের হাতে থাকায় পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনগণের উপর শোষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় জনসাধারণের দাবিকে সমর্থন করিয়া মৌলানা ভাসানী যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, সহজেই পাকিস্থানের জনসাধারণের মনে তাহাতে সাড়া জাগিয়াছে। ঠিক সেই কারণেই মৌলানা ভাসানীর উপর প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্থানী রাজনীতির বিশেষতঃ, পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনীতিবিদদের বিশেষ উষ্মা জাগিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক এবং পাকিস্থানের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ভারত-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব এবং বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণের জন্য মৌলানা ভাসানী প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভারতের চর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "ডন" পত্রিকা তাঁহাকে "লালমোল্লা" আখ্যা দিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থানের পত্রিকাগুলিতে বলা হইয়াছে যে, হয় মৌলানা ভাসানীকে পরিত্যাগ করা হউক, না হয় তাঁহাকে "খতম" করা হউক।

পাক পার্লামেন্টের রিপাবলিকান সদস্য খান আলাউদ্দীন খান বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট (ইস্কান্দার মির্জ্জা) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ভাসানীকে পাকিস্থানের পয়লা নম্বর শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন; সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন সত্যে পরিণত হইয়াছে। কারণ তাহা না হইলে ভাসানী কি আর কাগমারী সম্মেলনে গান্ধী আর সুভাষ বসুর নামে তোরণ নির্ম্মাণ করিতে সাহস করিতেন।

এদিকে আওয়ামী লীগেরও এক অংশ মৌলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে লাগিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খাঁ এবং দলের সম্পাদক মুজিবর রহমান খাঁ (ইনি পাকিস্থানের বাণিজ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্যন্ত ভাসানী-অন্ত প্রাণ ছিলেন) বলেন যে, কাগমারী সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্রনীতির কোনরূপ বিরোধিতাই করা হয় নাই—এ সকল ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কারসাজি ও মিথ্যা প্রচারকার্য্য। কিন্তু "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার ঢাকাস্থিত সংবাদদাতা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সাংবাদিকদিগকে প্রদত্ত মৌলানা ভাসানীর স্বহস্ত-লিখিত বিবৃতি অনুযায়ীই তাঁহারা সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক কাগজেও ভাসানীর বিবৃতি অনুরূপ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে—অর্থাৎ স্পষ্টতঃই ভারত-বিরোধী কুৎসারটনা দ্বারা পাকিস্থানী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ নিজেদের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে পাকিস্থানের জনসাধারণের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন।

দৃঢ়চেতা, নির্ভীক এবং নীতিবাদী ভাসানী অবশ্য এ সকল কুৎসার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদানকালে মৌলানা ভাসানী বলেন যে, পাকিস্থানের লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্গতিমোচনের কল্পনাকে বাস্তবরূপ দানের জন্য তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইবেন।

মৌলানা ভাসানী বলেন, "দুর্গত জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামকে যদি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়—তাহা হইলে আমি এরূপ ষড়যন্ত্রের জন্য যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হইতে রাজী আছি।"

তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া মৌলানা ভাসানী বলেন, "জনগণের দাবি সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরাকেই কি ষড়যন্ত্র বলা হয়? গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এবং অন্যান্য রাজনীতিকবৃন্দের উপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। গবর্ণমেণ্ট কিংবা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে বলিয়া কি তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? জনগণ সম্মিলিত ভাবে তাঁহাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবি তুলিয়া ধরাতেই প্রতিক্রিয়াশীল দল শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দাবি আদায়ের জন্য আমরা শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইব এবং এজন্য আমি মৃত্যুবরণ করিতেও প্রস্তুত আছি।"

পাকিস্থানে অধ্যক্ষের অপকীর্ত্তি

বরিশাল হইতে প্রকাশিত "বরিশাল হিতৈষী" পত্রিকার ১১ই পৌষ সংখ্যায় একটি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে :

"বরিশাল জেলায় চাখার গ্রামে আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যপাল মোঃ ফজলুল হক সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চাখার কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এ. এইচ. এম. মহীউদ্দীন এম-এ (আল আজাহার), এম-লিট

(কায়রো), এম. ইড. লেকচারার কায়রো ইউনিভারসিটি, ঢাকা ইউনিভারসিটি, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, প্রফেসার প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, এক্স-প্রফেসার রকফেলার ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক ষ্টাডিজ, অফিসিয়েটিং প্রফেসার, ইডেন কলেজ, ঢাকা, এম. সি. গিল ইউনিভারসিটি প্রভৃতি আরও বহু অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে সুদূর নোয়াখালি জেলা হইতে বরিশালের চাখার গ্রামে যেদিন আসিলেন সেদিন চাখার তথা বরিশালবাসী তাহাকে এক অভূতপূর্ব্ব অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল। তার পর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার ভিতর তাঁহার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ আমাদের নিকট আসিয়াছে কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করিয়া আমরা সে সব অভিযোগ উপেক্ষা করিয়াছি।"

সম্প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক অনুসন্ধানের পর প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ "অধ্যক্ষের" নাকি ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটও নাই।

চন্দ্রলোকে ভ্রমণ

পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোকে গমন করা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশেই জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নেও চন্দ্রে গমনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলিতেছে। মহাশূন্যে ভ্রমণের উপযোগী বিমানের বা রকেটের জ্বালানি সমস্যাই বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা চন্দ্রলোকে একটি বাহকহীন রকেট পাঠাইতেও শত শত টন জ্বালানি লাগিবে। সোভিয়েট অধ্যাপক জেড. চেবোতারিয়েফ অবশ্য হিসাব করিয়াছেন যে, মাত্র ষোল টন জ্বালানি লাগিবে। চেবোতারিয়েফের হিসাব অনুযায়ী কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠ হইতে রকেটটিকে শূন্যে ছাড়িবার প্রাথমিক অবস্থাতেই মাত্র জ্বালানি লাগিবে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবার পর রকেটটি পৃথিবীর ও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উড়িয়া চলিবে।

ডক্টর চেবোতারিয়েফ বলিতেছেন, "রকেটটি এমন একটি কক্ষপথ ধরিয়া চলিবে যাহার দুই প্রান্ত একই বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে—কক্ষপথটি দেখিতে হইবে অনেকটা একটি চ্যাপটা উপবৃত্তের ন্যায়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রে যাত্রা ও প্রত্যাবর্ত্তনের দূরত্বটি ২৩৬ ঘণ্টায়, অথবা প্রায় দশ দিনে, অতিক্রান্ত করা হইবে, এই সময়ের মধ্যে রকেটটি প্রায় দশ লক্ষ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার=⅝ মাইল) পথ অতিক্রম করিবে। ইহার চেয়ে কম গতিবেগে চলিলে রকেটটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। চাঁদের কাছাকাছি আসিতে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে এই গতিবেগ শূন্যে দাঁড়াইবে।"

রকেটটিকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হইলে উহা চন্দ্রের নিকট হইতে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ভূপৃষ্ঠে অবতরণের কালে যাহাতে রকেটটির কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য উহার সহিত একটি বিশেষ ধরনের প্যারাস্যুট ব্যবস্থা থাকিবে। রকেটটির ওজন হইবে ৫০ হইতে ১০০ কিলোগ্রাম।

উক্ত সোভিয়েট বিজ্ঞানীর অভিমতে, "এই রকেটের অভিযানের দ্বারা আমরা মহাশূন্যের প্রকৃতি ও বিশেষত্বগুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যাদি লাভ করিতে পারিব, উল্কাগুলির গতিপ্রকৃতি ও মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের লব্ধ তথ্যাদির যাথার্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার এক নূতন সুযোগ পাইব, আবহ তথ্যাদি সম্পর্কে আরও জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইব।"

রকেটটি চন্দ্র হইতে ৩০ হাজার কিলোমিটার দূরে থাকিয়া চন্দ্রের চারিদিকে উড়িবে। ফলে রকেটে রক্ষিত সিনেমা ও ফোটো-ক্যামেরার তোলা বহুসংখ্যক ছবির সাহায্যে এই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবী-বাসী চন্দ্রের অপরাপর দিক সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে—(কারণ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের মাত্র একটি দিকই দৃশ্যমান হয়)। চন্দ্রের চারিদিকে আবহমণ্ডল নাই বলিয়া পৃথিবীর আবহাওয়ার বিশেষত্বের দরুন আলোকচিত্র গ্রহণে যে সকল বাধা অসুবিধা থাকে, সেখানে সেইরূপ ব্যাঘাতসৃষ্টির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। উপরন্তু অপরিসীম দূরত্ব হইতে গৃহীত পৃথিবীর আলোকচিত্রগুলি হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবী সম্পর্কেও জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

এখনও পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের জল্পনাকল্পনা চন্দ্রলোক সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, কারণ মঙ্গলগ্রহে পৌঁছিবার অভিযানে সূর্য্যের প্রভাব, এবং খুব সম্ভব শুক্র ও বুধ গ্রহেরও প্রভাবের প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়াইবে।

চন্দ্রলোকে রকেট প্রেরণ করিতে আর কতকাল লাগিবে সেই সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক চেবোতারিয়েফ বলেন যে, রকেট প্রস্তুত হইলেই উহা সম্ভব হইবে, তবে রকেট প্রস্তুত করিতে কতদিন লাগিবে তাহা কেবলমাত্র ইঞ্জিনীয়ারগণই বলিতে পারেন। তবে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির কথা স্মরণ রাখিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে ঐরূপ রকেট নির্ম্মাণ সম্ভব হইবে সে সম্পর্কে প্রায় নিশ্চয়রূপেই বলা যাইতে পারে।

আসানসোলে নেতাজী শোভাযাত্রার উপর হামলা

১৬ই মাঘ সংখ্যা সাপ্তাহিক "জি. টি. রোড" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"গত ২৩শে জানুয়ারী সেন-র‍্যালে ফ্যাক্টরীর কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নের শ্রমিকরা, কন্যাপুরে শান্তি কমিটি যখন নেতাজীর ছবি লইয়া শোভাযাত্রা করিতেছিলেন, তখন সহসা লাঠি-সোঁটা লইয়া শোভাযাত্রার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। শ্রীশশাঙ্ক তেওয়ারী এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅরবিন্দ তেওয়ারী যথাক্রমে পতাকা এবং নেতাজীর ছবি বহন করিতেছিলেন। ইউনিয়ন কর্ম্মীদের যত কিছু রাগ তাঁহাদের উপর এবং পতাকা ও নেতাজীর ছবির উপর পড়ে। তাহারা উভয় ব্যক্তিকেই আঘাত করে, পতাকা ও নেতাজীর ছবি ছিন্নভিন্ন করিয়া পদদলিত করে এবং শ্রীসুধীর মিশ্র প্রভৃতি কয়েক জনকে আঘাত করিয়া আহত করে।..."

পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, পূর্ব্বপরিকল্পিত পদ্ধতিতেই সেন-র‍্যালের কম্যুনিষ্ট ইউনিয়ন নেতাজী শোভাযাত্রার উপর হামলা চালায় এবং পরে ঐ অপকর্ম্মের জন্ত অন্তান্তদের প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকে।

উক্ত একই তারিখের "বঙ্গবাণী" পত্রিকার সম্পাদকীয় আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, কল্যাপুরের উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নড়িগা, কল্যাপুর ও গাঁড়ই পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বলিয়া কথিত একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রচারিত সংগুবিলে কংগ্রেসকে এই দুর্ঘটনার জন্ত দায়ী করা হইয়াছে। অপরপক্ষে কল্যাপুর অঞ্চলের শান্তি কমিটির বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, লালঝাণ্ডা হাতে লইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া এই মারপিট করিয়াছে। এই সম্পর্কে দুইটি মামলাও নাকি রুজু হইয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষে মন্তব্য প্রসঙ্গে "বঙ্গবাণী" লিখিয়াছেন :

"হামলা কে করিয়াছে তাহা না জানিলেও একটা ঘটনা যে হইয়াছে এ কথা সত্য এবং তাহাতে কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে এ কথাও সত্য। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, নেতাজী জন্মদিবসে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। যাহাদের উপর যাহাদেরই রাগ থাকুক না কেন, নেতাজী জন্মদিবস ছাড়াও অন্ত দিনে সে বা তাহারা ত এই রাগ মিটাইতে পারিত।"

ঘটনাটি সম্পর্কে দায়িত্ব কাহার তাহা আদালত ঠিক করিবেন। সুতরাং সে বিষয়ে আমরাও কোন মন্তব্য হইতে বিরত থাকিলাম। তবে সভা শোভাযাত্রার উপর এই ধরনের হামলা আমাদের দেশে বিরল নহে। ইহাও সত্য যে, এই ধরনের হামলা দলমত-নির্ব্বিশেষে সুযোগ পাইলে সকলেই করিয়া থাকে। গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পরমতসহিষ্ণুতা যে অপরিহার্য্য, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। সেজন্তই আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, বিরোধী-পক্ষের বক্তব্যকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইষ্টকবর্ষণেই কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। ইহাতে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দই অন্তায় হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল দলেই সুস্থ মনোভাবসম্পন্ন সদস্ত রহিয়াছেন যাঁহারা এই ধরনের গুণ্ডামি সমর্থন করেন না; কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা সংখ্যালঘু। দলের নেতৃত্ব যাঁহাদের উপর থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলগত স্বার্থসাধনের জন্ত তাঁহারা কোন কাজকেই গর্হিত বলিয়া মনে করেন না। কম্যুনিষ্টরা প্রকাশ্তভাবে এই সুবিধাবাদী নীতিকে একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে খাড়া করিয়াছে—আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় কোন ঘটনা বিচারেই তাহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। তাহাদের মতের সহিত অমিল হইলে যে-কোন লোককেই "দালাল", "চর" প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করিতে তাহাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। একইভাবে সরকারী দলেও সকলপ্রকার বিরোধিতাকেই "বিভেদকারী", "নাশকতামূলক" প্রভৃতি অপবাদ প্রায়ই দেওয়া হয়। এইরূপ ডিক্টেটরী মনোভাব লইয়া চলিলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হইবে। জনসাধারণকে সেজন্ত এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

রঘুনাথগঞ্জে বিদ্যুৎ-সরবরাহ

'ভারতী' ৩রা মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

"রঘুনাথগঞ্জ শহরে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যাপারটা ক্রমেই বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। বৎসরখানেক পূর্ব্বে শহরে যখন তার খাটানো সুরু হয় তখন লোকে মনে করিয়াছিল—দুই-তিন মাসের মধ্যেই শহর আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। খুব দেরি হইলেও অন্ততঃ শারদীয়া উৎসব বিজলীবাতির সাহায্যে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় মিউনিসিপ্যাল এলাকার এক অংশ জঙ্গীপুরের পারে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করা সম্ভব হইলেও মিউনিসিপ্যালিটির অপর অংশ রঘুনাথগঞ্জে তাহা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই, যদিও শহরে তার খাটানোর কাজ বহুপূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে।"

আশু বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রাপ্তির আশায় জনসাধারণ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান তার প্রভৃতি খাটাইতে অনেক টাকা লগ্নী করিয়াছে। কিন্তু সরবরাহে বিলম্বের জন্ত তাহাদের লগ্নীকৃত অর্থ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। এ ব্যাপারে সরকারের কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব না থাকিলেও জনসাধারণের অসুবিধা ও ক্ষতির পরোক্ষ দায়িত্ব যে তাহাদেরই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন গুজব রটিল 'কেব্‌ল'টি ছোট হইয়াছে ও ইহাকে পরিবর্ত্তন না করিলে আর উপায় নাই তখন মানুষ অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরে সরকারী ঘোষণার ফলে যখন জানা গেল যে, এ গুজব ভিত্তিহীন এবং ১লা নবেম্বর এখানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করার কর্ম্মসূচী থাকিলেও নৈসর্গিক কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই তখন শহরের মানুষ ভাবিল খুব দেরি হইলেও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাদের আশা পূর্ণ হইবে। এই সময় আরও কিছু লোক তাঁহাদের বাড়ীতে তার খাটানোর কাজ শেষ করিলেন। অবশেষে ডিসেম্বরের শেষে বহু-প্রত্যাশিত কেব্‌লটি নদীগর্ভে ফেলা হইল ও বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেল যে, জানুয়ারী মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে নিশ্চয়ই আলো জ্বালা হইবে। স্থানীয় মানুষ আর একবার নূতনভাবে আশান্বিত হইয়া উঠিল ও কর্ম্মচাঞ্চল্য সুরু হইল। কিন্তু কয়েক-দিন কাজকর্ম্ম চলার পর পুনরায় সরকারী কার্য্যকলাপ স্তিমিত হইয়া আসিল ও পুনরায় একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইল। এখন আবার গুজবের রাজত্ব সুরু হইয়াছে।"

শহরের একাংশে বিদ্যুৎ-সরবরাহ সম্ভব হইয়াছে অথচ সকল আয়োজন সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মিউনিসিপ্যালিটির অপর অংশে এক বৎসর পরেও বিদ্যুৎ-সরবরাহ করা কেন সম্ভব হইতেছে না সে সম্পর্কে একটি সরকারী বিবৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া

"ভারতী" যে মন্তব্য করিয়াছেন আমরাও তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

বিশ্বশিল্প প্রদর্শনী

মানুষের শ্রম এবং শ্রমসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের নিকট কিরূপভাবে প্রতিভাত হইয়াছে বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসে জেনেভা নগরীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে তাহা পরিস্ফুট হইবে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার প্রথম ডিরেক্টর আলবার্ট টমাসের মৃত্যুর পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিকী উপলক্ষে "শিল্প ও শ্রম" সম্পর্কীয় এই পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা হইলেন আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা। ভারতসহ ৭৭টি দেশকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্ত আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রদর্শনীর পাঁচটি বিভাগ থাকিবে। বিভাগগুলিতে যে যে বিষয়ের উপর শিল্পকার্য্য প্রদর্শিত হইবে সেগুলি হইল: (১) কৃষি; (২) অগ্নিসংশ্লিষ্ট শিল্প অর্থাৎ ধাতুশিল্প, কাচশিল্প ইত্যাদি; (৩) মানসিক শ্রম; (৪) নির্ম্মাণশিল্প (Building) এবং (৫) শ্রমিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা।

প্রদর্শনীতে মোট পাঁচ শত হইতে ছয় শতখানি শিল্পকার্য্য দেখান হইবে।

আসামে ডাক বিভাগে ধর্ম্মঘট

১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে আসামের ডাক বিভাগীয় কর্ম্মিগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং নেফা (NEFA) অঞ্চলের প্রায় ছয় হাজার কর্ম্মী এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন। "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার শিলংস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, কার্য্যতঃ কয়েকজন নূতন কর্ম্মী ব্যতিরেকে সকল কর্ম্মীই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছেন এবং ধর্ম্মঘটের ব্যাপকতার ফলে আসামের ডাক বিভাগের কাজ সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে উত্তর-পূর্ব্ব রেলওয়ের কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট করিবার কথা ছিল কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘ প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট পিছাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন।

ডাকবিভাগীয় কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮ই মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিয়াছিলেন:

"ডাক ও তার এবং রেল ধর্ম্মঘট প্রায় এক সঙ্গে সত্যই যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় অসুবিধা এবং ব্যবসায়াদির বিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে তাহা ভাবিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু নিম্নবেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারীদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগাদির যথাবিহিত প্রতিকার করিতে কেন পশ্চাৎপদ হইতেছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বহুবিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনই যদি বাস্তবিক কংগ্রেস-নেতাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের পারিশ্রমিকের আকাশপাতাল বৈষম্য সর্ব্বাগ্রে দূরীভূত করাই সঙ্গত নহে কি?"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশমুখ

গত মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে শ্রীদেশমুখ যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা সুচিন্তিত ও প্রণিধানযোগ্য। আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের সভাপতি সি ডি. দেশমুখ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকত্বের জন্ত প্রস্তুতি মাত্র, এই নাগরিকত্ব সারাজীবনের ব্যাপার।

তিনি আরও বলেন যে, নূতন গ্রাজুয়েটগণ এক গতিশীল সমাজে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন। এই সমাজের উপযুক্ত বিজ্ঞানী, টেকনোলজিষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির লোক আবশ্যক, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এতদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন এরূপ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, অকপট, সাধু ও পরিশ্রমী লোকের যাহারা আধুনিক গণতন্ত্রে তাঁহাদের কাজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন।

শ্রীদেশমুখ তাঁহার বক্তৃতায় প্রথমে শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত মালবীয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার আবদুর রহিম, ড. রাসবিহারী ঘোষ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ড. মেঘনাদ সাহা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ড. এস. রাধাকৃষ্ণণ, ড. যদুনাথ সরকার, ড. সি. ভি. রামন ও ড. এস. এন. বসুর নাম উল্লেখ করেন।

শ্রীদেশমুখ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করিবার পর বলেন যে, ছাত্র-সংখ্যার প্রভূত চাপে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষকদের যোগ্যতা ও সংখ্যা, স্থান সঙ্কুলান, বিশেষতঃ পরীক্ষাগারে স্থান, সাজসজ্জা, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের পিছনে পড়িতেছে। এক সময়ে ভারতের পুরাতন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি উহাদের দায়িত্বের সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমান উচ্চ মানবিশিষ্ট ছাত্র সৃষ্টি করিত। সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা সম্ভবতঃ পৃথিবীর সমৃদ্ধতর দেশ-গুলিতেও মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ব্রিটেনের 'ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারলি' নামক ত্রৈমাসিক পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে: "বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকিলেও তাঁহাদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ পূর্ব্বে যেরূপ ভাল ছিল সেইরূপ ভাল আছে, সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ ছাত্রগণ পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ নহে; কিন্তু নিম্নতর স্তরে সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্ত গড়পড়তা গুণ হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মান সম্বন্ধে এইরূপ এবং সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা কঠোরতর মন্তব্য প্রযোজ্য। অনুসন্ধান করিলে ইহার তিনটি প্রধান কারণ পাওয়া যাইবে, যথা—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাখাতে অপর্য্যাপ্ত ব্যয়, শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে গোলযোগ এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ প্রথার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ।

দেশমুখ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধে বলেন, "বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে হয়, এই সংখ্যা ব্রিটেনের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাও অধিক। এক সিটি কলেজেই ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৩ হাজারের উপর, অপর পাঁচটি কলেজের প্রত্যেকটিতে গড়ে ৬ হাজার ছাত্র আছে। হুগলী নদীর অপর পারে হাওড়ার কলেজ কয়টিতে ১৮ হাজার ছাত্র আছে, সুতরাং বাংলার মেট্রোপলিটান এলাকায় মোট প্রায় ৬০ হাজার ছাত্র আছে।

আজ যাঁহারা ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পাইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৮৮২২। তাঁহাদের অধিকাংশই নাগরিক জীবন ও উহার সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিবেন। যাহারা আরও অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক। আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি। আমি তাঁহাদিগকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালের সাহায্য কমিশনের হস্তে যে অর্থ রহিয়াছে তাহা হইতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক-কিছু করা হইতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের মনোনীত কোর্স শেষ করিলে কর্ম্মের কিংবা উপযুক্ত বৃত্তির অভাব তাঁহাদের পক্ষে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ দেখিবেন যে, তাঁহাদের উপার্জ্জন অন্ততঃ দীর্ঘকাল নৈরাশ্যজনক ভাবে অল্প থাকিবে; কিন্তু ঐ অবস্থা এখনও দেশের অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর অবস্থার পরিচায়ক।

যাঁহারা বৃত্তি বিষয়ক কিংবা পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পাইতেছেন, আমি আশা করি তাঁহাদের অবস্থা কতকটা ভাল হইবে। কিন্তু গ্রাজুয়েটদের অধিকাংশের পক্ষে, বিশেষ করিয়া দেশের এই অংশে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ আশানুরূপ হইবে না।

অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের অধিকতর প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ শিল্প ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত কর্ম্মমুখর হইলেও পল্লী অঞ্চলে আধুনিক অর্থে কোন বড় শহর নাই। ইহার ফলে যুবকগণ কর্ম্মসংস্থানের ও উচ্চ শিক্ষা-লাভের আশায় কলিকাতায় আকৃষ্ট হয়। কলিকাতায় বৃহৎ শিল্প এবং ব্যবসায়ের ভিড়ে ক্ষুদ্র শিল্পেও আত্মনিয়োগ অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহার ফলে উচ্চ শিক্ষা লাভরত ব্যক্তিগণকে পেশামূলক কাজ, কেরানীর কাজ কিংবা শাসনসংক্রান্ত চাকুরির উপর অত্যধিক নির্ভর করিতে হয়। মধ্য শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে মধ্য শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে উহাতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকদের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলেজে ভর্ত্তি হওয়া ব্যতীত অপর কোন পথ নাই; কারণ অনেক প্রকার কাজের জন্য শিক্ষাগত ন্যূনতম যোগ্যতা নির্দ্ধারিত রহিয়াছে—ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া কিংবা ডিগ্রী থাকা। মফস্বলের বহু কলেজে অনার্স কিংবা বিজ্ঞান পড়ার পুরাপুরি সুব্যবস্থা নাই বলিয়া যুবকগণ কলিকাতায় চলিয়া আসে। বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে অবিরাম উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে কলিকাতা ও হাওড়ায় কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা এইরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং কলেজ পরিচালক সমিতিসমূহ এই সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ও বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের উপদেশ এবং সহায়তায় কলিকাতার কলেজগুলিতে ছাত্রদের ভিড় ক্রমশঃ হ্রাস করিবার জন্য কিছু করা সম্ভবপর হইবে।

আমার মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন কর্ত্তৃক তাঁহাদের রিপোর্টে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা বিষয়ে নির্দ্দেশিত পন্থায় যুবকদিগকে পথ প্রদর্শন ও সাহায্য করিতে হইবে। কমিশন পরীক্ষামূলক ভাবে যে সমস্ত অগ্রবর্ত্তী পরিকল্পনা সুপারিশ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অনেকগুলি বাঙলায় প্রবর্ত্তিত হইবে। উপযুক্ত সাড়া পাওয়া গেলে তাঁহারা ঐ সমুদয়ের জন্য অধিকতর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিবেন।

কর্ম্মসংস্থানের আর একটি দিক কর্ম্মপ্রার্থীদের পক্ষে কিছু সান্ত্বনার বিষয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দেশে উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের দারুণ অভাব রহিয়াছে। দেশে কাজের অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে। সুতরাং সহরের শিক্ষিত যুবকদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমি বর্ত্তমান ভারতের যুবকদিগকে শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক মনে করি। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকত্বের জন্য প্রস্তুতি মাত্র; এইরূপ নাগরিকত্ব একটা সারা জীবনের ব্যাপার ও চ্যালেঞ্জ।"

পণ্ডিত নেহরু ও কাশ্মীরপ্রসঙ্গ

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্থানের অভি-যোগ ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পণ্ডিতজীর অভিমত নীচের সংবাদে পাওয়া যায়:

"এলাহাবাদ, ৬ই ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অদ্য পুনর্ব্বার এই কথা বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষ কোন আন্তর্জ্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালনে পশ্চাদপদ হয় নাই, কিংবা ঐরূপ কোন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে নাই।

অদ্য অপরাহ্নে এই স্থানে এক বিরাট নির্ব্বাচনী সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন, কোন কোন মহলে আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আমরা কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রতিশ্রুতি পালনে অসম্মত হইয়াছিলাম। গণভোট গ্রহণের

পূর্ব্বে যে সর্ত্ত পূরণ করা একান্ত আবশ্যক, আমাদের বিরুদ্ধে যাঁহারা এই অভিযোগ করেন আমি সেই সর্ত্তের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সেই সর্ত্তটি হইল এই যে, পাকিস্থান কাশ্মীরের যে অংশ দখল করিয়া আছে, গণভোট গ্রহণের পূর্ব্বে পাকিস্থানকে সেই অংশ হইতে সরিয়া যাইতে হইবে। পাকিস্থান কি এই সর্ত্ত পালন করিয়াছে?

অতঃপর পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইয়াছে। পাকিস্থান যে কাশ্মীরে আক্রমণ চালাইয়াছিল—এই মূল সত্যটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে।

কতকগুলি নির্দিষ্ট সর্ত্তে এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ গণভোট গ্রহণে সম্মত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সর্ত্ত এই ছিল যে, পাকিস্থানী সৈন্যগণকে কাশ্মীর হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে হইবে। নয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্থান এই সমস্ত সর্ত্তের একটিও পালন করে নাই। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে এবং এই প্রশ্নটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকিতে পারে না। গত চারি বৎসর ধরিয়া কাশ্মীরের সংবিধান প্রণয়ন করা হইতেছিল এবং শেষ পর্যন্ত গণপরিষদে এই সংবিধান গৃহীত হইয়াছে। কেহই গণপরিষদকে এই সংবিধান গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পারে নাই।

অতঃপর পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, গত নয় বৎসরে কাশ্মীরের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে এবং এখন এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে যাহাতে ঐ রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে।"

পাক্-অধিকৃত কাশ্মীর

সম্প্রতি নিম্নে প্রদত্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"জম্মু, ১১ই ফেব্রুয়ারী—কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন, ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতির পর প্রায় চারি লক্ষ কাশ্মীরী মুসলমান পাক-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর এলাকা হইতে পলায়ন করিয়া যুদ্ধবিরতি সীমারেখার এই দিকে চলিয়া আসে। সেই সকল মুসলমানের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে আগত মুসলমানদের নিকট হইতেই জানা যায় যে, পাক-অধিকৃত এলাকায় রাজনীতিক কারণে উৎপীড়ন, অত্যাচার, অরাজকতা এবং শোচনীয় অর্থনীতিক দুরবস্থার জন্যই তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে।

বক্সী গোলাম মহম্মদ বলেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি তথাকথিত "আজাদ কাশ্মীর" এলাকার লোকদের নিকট হইতে অনেকগুলি পত্র পাইয়াছেন। সেই সকল পত্রে পাক-অধিকৃত এলাকার লোকদের যুদ্ধবিরতি সীমারেখার এই দিকে আশ্রয়গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। পাছে তাহাদের উপর উৎপীড়ন হয়, এই কারণে তিনি তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে চাহেন না।

এক প্রশ্নের উত্তরে বক্সী গোলাম মহম্মদ বলেন, কোন কোন লোক ঐ সময় পাক-অধিকৃত এলাকায় চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভ্রান্তি দূর হওয়ার পর তাহাদের অনেকেই এদিকে ফিরিয়া আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে যাহারা সরকারী চাকুরিতে ছিল, এখানে ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদের পুনরায় কর্ম্মে নিয়োগ করা হইয়াছে।"

পাকিস্থানের সামরিক খাতে ব্যয়

পাকিস্থান শুধু যে মার্কিন দেশ হইতে বিরাট যুদ্ধ-সম্ভার লইতেছে তাহা নয়, অন্যদিকেও তাহার প্রস্তুতি চলিতেছে। উদ্দেশ্য কি তাহা বলা বাহুল্য। নিম্নে প্রদত্ত সংবাদে তাহা বুঝা যাইবে।

"করাচী, ৯ই ফেব্রুয়ারী—পাকিস্থান আগামী বৎসর দেশরক্ষা খাতে ১,১১,৬০ ০০,০০০্ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। অদ্য অপরাহ্নে পাকিস্থানের অর্থমন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলী জাতীয় পরিষদে ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেট পেশ করেন।

সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ অনুসারে বর্ত্তমান বৎসরে দেশরক্ষা খাতে ৯৪,৬০,০০,০০০্ ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেটে ৭,৮০,০০,০০০্ টাকা ঘাটতি হইবে। নানারূপ নূতন কর ধার্য্য করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন কর ধার্য্য করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার ফলে ৩০,০০,০০০্ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

পূর্ব্ব পাকিস্থানে হিন্দু

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত বিবৃতি বিগত ৮ই মাঘ দিয়াছিলেন। আমরা বলি "ফলেন পরিচীয়তে।"

"পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান সোমবার কলিকাতায় বলেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। এই দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের সহিত ৪০ মিনিটকাল আলোচনার পর সাংবাদিকদের নিকট তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা সরকারী নির্দ্দেশে তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করিতে পারিবে না বলিয়া সম্প্রতি যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

জনাব আতাউর রহমান খান সাংবাদিকদের জানান যে, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে তাঁহার সরকার সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন এবং হিন্দুদের অভাব-অভিযোগের সম্বন্ধে তৎপর হওয়ার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের কড়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, যেহেতু সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকারদানকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই হেতু সরকারকে ইহা সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার প্রতি হিন্দুদের যে আস্থা আছে তাহার সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি হিন্দুরা হাজারে হাজারে আওয়ামী লীগে যোগদান করিতেছে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ সম্প্রতি অনেক কমিয়াছে। অবশ্য তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতিও ইহার জন্ম কতকটা দায়ী এবং বাস্তুত্যাগ কমিলেও পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকারের নিকট বাস্তুত্যাগের আবেদনের সংখ্যা তেমন কমে নাই।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, চার মাস পূর্ব্বে যখন তাঁহারা শাসনভার গ্রহণ করেন তখন দেশে খাদ্যসমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করে এবং এই খাদ্যাভাবের জন্মই বাস্তুত্যাগীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভারতের পথে পা বাড়ায়। জনাব মুজিবর রহমান এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিসভার কার্য্যকলাপের জন্ম আমাদের দায়ী করা চলে না।'

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বর্ত্তমানে উহা সম্পূর্ণ দূর না হইলেও এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে।

স্বাগতম্

আনন্দবাজার পত্রিকা নীচের বিবৃতি দিয়াছেন :

"পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত দশ বৎসর ধরিয়া বিহার বিধানসভার সদস্য থাকাকালে বিহারের বাংলা ভাষাভাষী এলাকাগুলি পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্ম এবং বিহারে বাঙালীদের জন্ম বাংলা ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা করার নিমিত্ত ক্রমাগত দাবি জানাইয়া আসিয়াছেন। এই দাবি উত্থাপন এবং এতৎসম্পর্কে আন্দোলন করার জন্ম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যাচার ও দুঃখবরণ করিয়াছেন।

পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ায় পুরুলিয়ার অংশ হইতে নির্ব্বাচিত বিহার বিধানসভার সদস্যগণ এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। পুরুলিয়ার মোট আট জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য বলিয়া গণ্য হন এবং সোমবার তাঁহাদের মধ্যে সাত জন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া পূর্ণিয়ার কিষেণগঞ্জের দুই জন সদস্য ঐদিন বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিবার পর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি বিধানসভার লোকসেবক সঙ্ঘের দলনেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার মনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "৪৪ বৎসর পর মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমি হয়েছি, মায়ের একজন অধম সন্তানরূপে তা রক্ষার জন্ম আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।"

নেতাজীর নামে শিশুমেধ যজ্ঞ

নেতাজীর নামে যাঁহারা নির্ব্বাচন বারিধি উত্তীর্ণ হইতে চাহেন তাঁহাদের কার্য্যক্রম কিরূপ তাহার পরিচয় নীচের সংবাদে পাওয়া যাইবে। উহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত :

"বুধবার রাত্রে নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে মশাল-শোভাযাত্রা পরিচালনাকালে মহাজাতি সদনের সম্মুখে শোচনীয় দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে একটি বালক বৃহস্পতিবার সকালে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে। তাহার নাম শঙ্কর কুণ্ডু, বয়স আট বৎসর, নিবাস ১৪৫, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। প্রকাশ, শঙ্কর ঐ দুর্ঘটনায় পদতলে পিষ্ট হইয়া আহত হয়। আহতদের মধ্যে আরও ৫।৬ জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলিয়া প্রকাশ। উহাদের মধ্যে কয়েকজন দগ্ধ হইয়া আহত হয়।

ইতিমধ্যে জানা গিয়াছে যে, বালক-বালিকাদের লইয়া ঐ মশাল-শোভাযাত্রা বাহির করিতে যাহারা প্রকৃত দায়ী এবং ঐ দুর্ঘটনাকালে যাহারা ধাক্কাধাক্কি সুরু করিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়, পুলিস তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছে। পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, বিনা অনুমতিতে এরূপ মশাল-শোভাযাত্রা বাহির করা, বিশেষতঃ বালক-বালিকাদের লইয়া—শোচনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, এবার নেতাজী জন্মোৎসব সম্পর্কে পুলিস কোন মশাল-শোভাযাত্রা বাহির করার অনুমতি দেয় নাই।

বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদপত্রে ঐ মর্ম্মান্তিক ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করিয়া জোড়াসাঁকো থানার সন্নিকটে এই ধরনের শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটায় রাইটার্স বিল্ডিংস ও লালবাজারের কর্ত্তৃপক্ষমহলে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকন্তু বৃহস্পতিবার আহতদের মধ্যে একটি বালকের মৃত্যু হওয়ায় ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষমহল ঐ দুর্ঘটনার আশু সম্বন্ধে জোর তদন্ত করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে অনুরূপ ঘটনা আর না হয় তজ্জন্ম কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন।"

নেহরু ও কম্যুনিষ্ট পার্টি

"বোম্বাই, ২০শে জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য চৌপট্টিতে এক জনসভায় বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যের উদ্বোধন করিয়া ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আক্রমণ করিয়া বলেন, বর্ত্তমানে উক্ত দল 'চিন্তার ক্ষেত্রে দেউলিয়া' হইয়া গিয়াছে এবং 'দেশে ঘৃণা, অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টিই উহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের মেহনতী জনগণের একাধিপত্যের কথা অর্থহীন ও বাগাড়ম্বর মাত্র।

তিনি বলেন, আমি কম্যুনিষ্টদের চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, তাহারা মেহনতী জনতার উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় কোথাও তাহা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, ভারতে কম্যুনিষ্টদের অনুগামী খুবই কম এবং তাহারা যদি ক্ষমতা পায় তবে গৃহযুদ্ধ ও জনগণের মধ্যে বিভেদ দেখা দিবে এবং তাহার ফলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পাঁচ লক্ষাধিক লোকের সভায় একশত দশ মিনিট বক্তৃতায়

শ্রীনেহরু বলেন, এই দেশে কম্যুনিষ্টরা গোলযোগ ও বিভেদই চায়। যে-কোন উপায়ে তাহারা ক্ষমতা হস্তগত করিতে চায়।

নয়া পয়সা

নিম্নে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি সকলেরই জানা প্রয়োজন।

"নয়াদিল্লী, ৯ই ফেব্রুয়ারী—আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৫৭) ভারতের সকল ট্রেজারি, সাব-ট্রেজারি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল আপিস ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সকল শাখা, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ ও ব্যাঙ্ক অব মহীশূরে প্রচলিত পয়সার পরিবর্ত্তে দশমিক মুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

বর্ত্তমানে এক পয়সা, দুই পয়সা, এক আনা ও দুই আনার যে মুদ্রাগুলি বাজারে চালু আছে সেইগুলি আগামী তিন বৎসর পর্যন্ত চালু থাকিবে। প্রচলিত মুদ্রাগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার জন্য ট্রেজারিতে বেশী ভিড় করিবার প্রয়োজন কিংবা কোনও ট্রেজারিতে বা ব্যাঙ্কে দশমিক মুদ্রার অভাব দেখিলে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই।

টাকার মূল্য বর্ত্তমানের অনুরূপ থাকিবে, কিন্তু এক টাকায় ৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই না হইয়া ১০০ নয়া পয়সা হইবে। আধুলি ও সিকি অর্দ্ধ টাকা ও সিকি বলিয়া চলিতে থাকিবে এবং সেইগুলির পরিবর্ত্তে যথাক্রমে ৫০ ও ২৫টি নয়া পয়সা পাওয়া যাইবে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জয়ন্তী

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম জানেন না, বাংলা দেশে এরূপ লোক বিরল। গত শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি আবির্ভূত হন। বাংলা সাহিত্যের চর্চা তখন সবেমাত্র নূতন ভাবে সুরু হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র ইহার সেবায় সেই যুগেই আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের সাহিত্য-সাধনায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার গুরুস্থানীয় ছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-চর্চায় ঈশ্বর গুপ্ত দ্বারা যে কতখানি অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জীবনী ও কবিত্ব' প্রবন্ধে এই ধরনের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র সুবিখ্যাত কুমারহট্টের (বর্ত্তমান হালিশহর) উত্তরবংশে কাঞ্চনপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী শিক্ষালাভার্থে তিনি কলিকাতায় আসেন, কিন্তু এ শিক্ষা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি আজীবন বাংলানবিস ছিলেন, এবং বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াই জীবনপাত করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকরে'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। এই সংবাদপত্রখানির মাধ্যমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু ব্যতীত আরও বহু নব্য-শিক্ষিতকেও সাহিত্যসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা দেশের শেষ খাঁটি বাঙালী কবি—বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার উপরি-উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা এবং বাঙালীর যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহা গদ্য-পদ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধে তাঁহার রচনা ভরপুর ছিল। তিনি আজীবন সংবাদপত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সংবাদ প্রভাকর বাদে আরও কয়েকখানি লঘু-ছন্দের পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। 'হিত প্রভাকর', 'প্রবোধ প্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যে গবেষণার সূত্রও তিনি প্রথম দর্শান। তিনি রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত, রাম বসু, হরু ঠাকুর ও অন্যান্য কবি এবং কবিওয়ালা সম্পর্কে বহু অনুসন্ধান করিয়া বিস্তর তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। নিজ 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থলে গমন করিয়া তিনি তথাকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। এসমুদয়ও ক্রমে প্রভাকরে বাহির হয়। সংবাদপত্রের সেবা মারফত তিনি উচ্চ সাংবাদিক আদর্শও স্থাপন করিয়া যান। জন্মভূমি কাঞ্চনপল্লীতে কবিবরের জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হইতেছে। এই আয়োজন সর্ব্বপ্রকারে সমীচীন। আমরা এই উৎসবের সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে রাজমোহন সেন

গণিতশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত মনীষী রাজমোহন সেন ৯৮ বৎসর বয়সে গড়িয়াহাট রোডে অবস্থিত নিজ বাসভবনে সম্প্রতি পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি ৮৮ বৎসরবয়স্কা পত্নী শ্রীযুক্তা নিশিতারা দেবী, পুত্র অধ্যক্ষ শ্রী বি. এম সেন আই-ই-এস (অবসরপ্রাপ্ত) পৌত্র শ্রী এম. এম. সেন আই. সি. এস. ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। এইদিন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

রাজমোহন সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৯ সনে জুন মাসে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের আমোদিয়া গ্রামে। সেই গ্রামেই তাঁহার বাল্যশিক্ষার সূচনা হয়। তিনি ১৮৭৮ সনে ১৫ টাকা বৃত্তি পাইয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রাজমোহন ১৮৭৯ সনে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ এবং ১৮৮১ সনে ঐ কলেজ হইতেই ৪০ টাকা বৃত্তিসহ বি-এ পাস করেন। ১৮৮২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঐ বৎসর একই পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে কে. পি. বসু ও যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এ দুই জনও বিখ্যাত গণিতজ্ঞ।

এম-এ পরীক্ষার ঐ বৎসরেই রাজমোহন ঢাকা কলেজে গণিতে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বদলী হন। ঐ বৎসরেই তিনি রাজসাহী কলেজে গণিতের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। একাদিক্রমে দীর্ঘ ৩৬ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯১৯ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাজমোহন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারের ওস্তাদ মীর্জ্জার নিকট হইতে তিনি নিয়মিত সেতার বাদন শিক্ষালাভ করেন।

কালিদাস সাহিত্যে 'লতা'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যনাটকগুলির স্থানে স্থানে 'লতা'কে উপমান করিয়া রূপসী নারীদের বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেখানো গেল।

'কুমারসম্ভবে'র একটি বর্ণনা—গৌরী আসিয়াছেন শিব-পূজা করিতে, শিবের তপোবন সহসা সেদিন পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া তাঁহার সখীরা তাঁহাকে নানারকম পুষ্পের আভরণে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। নানা বর্ণের পুষ্পে রঞ্জিতা হইয়া ও নবোদিত রবির বর্ণের মত লাল রঙের বস্ত্র পরিয়া গৌরী যখন বক্ষের ভারে কিঞ্চিৎ আনতা হইয়া চলিতেছিলেন, তখন মহাকবি তাঁহার রূপের বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন :

> 'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
>
> সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥' (কু-৩ ৫৭)

যেন পুষ্পে পুষ্পে ভরা লালরঙের পল্লবশোভিতা, পুষ্প-স্তবকের ভারে কিঞ্চিৎ আনতা একটি লতা চলিয়া বেড়াই-তেছে।

লতার সহিত রূপসী নারীদের উপমা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'ও পাওয়া যায়। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে বল্কলপরিহিতা শকুন্তলা ও তাঁহার দুই সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রাজা দুষ্মন্ত মনে মনে বলিতেছেন, "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ" (শকু-১ম অঙ্ক), এহেন রূপ যাহা রাজাদের অন্তঃপুরেও দুর্লভ, তাহা যদি আশ্রমবাসীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বলিতেই হইবে যে, বনের লতাদের গুণের কাছে উদ্যানলতারাও পরাজিত হইল।

বনের লতাদের যেমন কেহ যত্ন করিতে যায় না, তেমনি শকুন্তলা ও তাঁহার সখীরা মুনির আশ্রমে লালিতাপালিতা হইয়াছিলেন বলিয়া আদর যত্ন পাওয়া তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, কৃত্রিম সাজসজ্জা কি বস্তু তাহাও তাঁহারা জানি-তেন না, তবু তাঁহাদের সে স্বাভাবিক রূপলাবণ্যের যেন তুলনা ছিল না। দুষ্মন্তের মত রাজাকেও স্বীকার করিতে হইল যে, রাজান্তঃপুরেও এ অপরূপ রূপ নয়নগোচর হয় না, রাজান্তঃপুরের নারীরা—যাঁহারা সৌখীন পুরুষের সখের বাগা-নের সযত্নে পালিতা লতাদের মত অতি সমাদরে জীবনযাপন করেন, নানা রকমের বিলাসের ও প্রসাধনের সামগ্রী ব্যবহার করিতে পান, তাঁহাদের রূপও এ স্বাভাবিক রূপের কাছে কিছুই নয় বলিয়া মনে হয়।

মহাকবি কেবল বনলতার সহিত শকুন্তলার দেহসৌন্দর্যের উপমা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পুষ্পিতা লতার সহিত তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও তুলনা অতি সুন্দর ভাবে দিয়াছেন। নিম্ন-লিখিত শ্লোকে তিনি বলিতেছেন :

> অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
>
> কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥ (শকু-১ম অ)

অধরটিতে নবপল্লবের অরুণিমা, বাহু দুইটি কোমল-শাখার অনুসরণ করিয়া রহিয়াছে। আর সারা অঙ্গে যেন পুষ্পের মত লোভনীয় যৌবন লেপিয়া গিয়াছে।

শকুন্তলার অধরোষ্ঠ ছিল নবপল্লবের মত লাল, বাহু দুইটি লতার কোমল শাখার মত কোমল ও সুন্দর, আর পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া আসিলে লতাকে যেমন অতি মনোহর দেখায়, সারা অঙ্গ নবযৌবনের সুষমায় মণ্ডিত হওয়ায় তাঁহাকেও সেইরূপ মনোহারিণী দেখাইতেছিল।

মহাকবি যেমন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র সহিত গৌরীর ও 'বনলতা'র সহিত শকুন্তলার উপমা দিয়াছেন, তেমনি 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' নাটকে উৎকণ্ঠিত-হৃদয়া ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণা নায়িকা মালবিকার উপমা দিয়াছেন 'কুন্দলতা'র সহিত। কুন্দলতার যেটুকু বিবরণ দিয়াছেন মহাকবি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কুন্দলতার পুষ্প পাণ্ডুবর্ণের ও তাহাতে পুষ্প ফোটে বসন্তের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে, বসন্তের উন্মেষের পর কুন্দলতার পত্রগুলি পরিণতপত্র হইয়া যায় এবং পুষ্পও মাত্র কয়েকটিতে পর্যবসিত হয়।

মালবিকা যাঁহাকে মনে মনে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহার সহিত মিলনের আশা অতি ক্ষীণ বুঝিতে পারিয়া দুর্ভাবনায় পাণ্ডুবর্ণা হইয়া যাইতেছিলেন, বেশভূষার পারিপাট্য বা অলঙ্কারধারণের সাধ তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়, এ অবস্থায় মহাকবি বলিতেছেন—"কপোলদেশ পাণ্ডু-বর্ণ, দেহে আভরণ ধারণ করিয়া আছেন অতি সামান্যই, দেখিলে মনে হয় যেন, বসন্তকালের পরিণতপত্রবিশিষ্টা, মাত্র কয়েকটি পুষ্পাবশিষ্টা কুন্দলতা।"

নববসন্তের আগমনেও কুন্দলতা পাণ্ডুবর্ণা, পুষ্পশোভাও অতি ক্ষীণ, সুতরাং নবযৌবনেই পাণ্ডুবর্ণা ও অতি সামান্য

অলঙ্কারধারিণী মালবিকার উপমা কুন্দলতার সহিত দেওয়া অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছে বলিতেই হইবে।

কুন্দলতা ছাড়া আরও একটি লতা 'অতিমুক্তা লতা'র সহিত মালবিকার উপমা পাওয়া যায়। মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথ অতিমুক্তা লতাকে বলিয়াছেন 'মাধবীলতা'। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অগ্নিমিত্র তাঁহার আকাঙ্ক্ষিতা ও প্রেয়সী মালবিকাকে তাঁহাদের 'সমুদ্রগৃহে'র একটি নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমি আম্রবৃক্ষের মত হইয়াছি, তুমি এবার মাধবীলতার মত আচরণ করিতে থাক।"

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, মালবিকা যখন দুর্ভাবনায় পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গিয়াছিলেন, কালিদাস তাঁহার সে সময়কার রূপবর্ণনায় কুন্দলতার সহিত উপমা দিয়াছিলেন, তারপর যখন তিনি বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়ের ভালবাসা লাভ করিবার সুযোগ পাইলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বর্ণ আর পাণ্ডুর ছিল না, সৌভাগ্যের পুলকে তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাই মহাকবি এবার কুন্দলতার সহিত তাঁহার উপমা দিলেন না, দিলেন মাধবীলতার সহিত।

'রঘুবংশে' কালিদাস 'অশোকলতা'র সহিত রাজভগিনী ইন্দুমতীর উপমা দিয়াছেন। অশোকলতার পুষ্পগুলি রক্তাভ আর ইন্দুমতীর ছিল দুধ-আলতায় গোলা রং, সুতরাং উভয়ের সাদৃশ্য দেখানো যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই। মহাকবি বলিতেছেন—

> 'হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধ্বাঃ
> স রাজসূনুঃ সুতরাং চকাশে।
> অনন্তরাশোকলতা প্রবালং
> প্রাপ্যেব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥' (রঘু-৭,২.)

রাজকুমার (অজ) যখন বধূর হাতখানি নিজের হাত দিয়া ধরিয়া রহিলেন, আমগাছ তাহার পল্লবদ্বারা নিকটস্থ অশোকলতার পল্লব গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহাদের যেরূপ শোভা হয়, তাঁহাকেও সেইরূপ রমণীয় দেখাইতে লাগিল।

মহাকবি যেমন পাণ্ডুবর্ণা তরুণীর কুন্দলতার সহিত, মনোমুগ্ধকর রূপসীর মাধবীলতার সহিত, রক্তাভবর্ণা যুবতীর অশোকলতার সহিত উপমা দিয়াছেন, তেমনি যে নারী শ্যামাঙ্গিনী—গৌরবর্ণা বা গোলাপী আভাযুক্তা নহেন, তাঁহার উপমা দিয়াছেন 'শ্যামা' বা 'প্রিয়ঙ্গুলতা'র সহিত। 'মেঘদূতে'র বিরহী যক্ষের প্রিয়া যে শ্যামাঙ্গিনী ছিলেন, তাহা তাঁহার স্বামী নিজের মুখে বলিয়াছেন, 'তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা' ইত্যাদি বাক্যে। সুতরাং 'উত্তরমেঘে'র ৪৩শ শ্লোকে তিনি যখন বলিলেন, 'শ্যামাস্বঙ্গং' অর্থাৎ 'শ্যামা' লতায় তোমার অঙ্গের সাদৃশ্য দেখিয়া থাকি, তখন বুঝিতে হইবে 'শ্যামা' বা 'প্রিয়ঙ্গুলতা'র বর্ণ কালো বলিয়া যক্ষপত্নীর দেহটি শ্যামবর্ণা ও লতার মতই সুকোমল ছিল। প্রিয়ঙ্গুলতা যে শ্যামবর্ণা তাহা জানিতে পারা যায় 'নবগ্রহের স্তোত্র হইতেও, বুধগ্রহের বর্ণনা দেওয়া আছে 'প্রিয়ঙ্গুকলিকা শ্যামং'—প্রিয়ঙ্গুলতার মত ময়লা রংবিশিষ্ট।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকেও মহাকবি লতার সহিত রূপসী নারীদের উপমা দিয়াছেন, দৈত্যদের হাত হইতে অপ্সরা উর্বশীকে উদ্ধার করিয়া পুরূরবা যখন তাঁহাকে নিজের রথে বসাইয়া তাঁহাকে তাঁহার সখীদের নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়ার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তখন সারথিকে বলিতেছেন 'সখীভিরাতি সম্পর্কং লতাভিঃশ্রীরিবার্তবী' (বিক্রম-১ম অঙ্ক), অর্থাৎ 'বসন্তলক্ষ্মী যেভাবে লতাদের সহিত মিলিতা হন, ইনিও তেমনি সখীদের সহিত মিলিতা হইবেন'। এখানে বসন্তলক্ষ্মীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে উর্বশীর আর বসন্তকালের পুষ্পিতা লতাদের সহিত উর্বশীর বান্ধবীদের। তাঁহারাও যে সকলে পুষ্পিতালতার মত কমনীয়া ও সৌন্দর্যশালিনী ছিলেন ইহাই মহাকবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। উর্বশীর তুলনা স্বয়ং বসন্তলক্ষ্মীর সহিত দেওয়াতে তিনি যে তাঁহার সখীদের অপেক্ষা অতুলনীয় রূপে রূপসী ছিলেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে।

উমার বিবাহের দিন, যখন তাঁহাকে কনে সাজানো হইল, উমার সে অনুপম বধূবেশের বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি পুষ্পিতা লতার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, উমাকে তখন কিরূপ দেখাইতেছিল? মহাকবি বলিতেছেন, যেমন দেখায় লতাকে যখন সে পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া থাকে ('সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব'), তারপর আবার বলিতেছেন, যেমন দেখায় উজ্জ্বল নক্ষত্রে ভূষিতা রাত্রিকে (জ্যোতির্ভিরুদ্ভিরিব ত্রিযামা), কিন্তু ইহা বলিয়াও যেন তিনি তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাই আবার বলিলেন, যেমনটি দেখায় নদীকে, যখন তাহার বক্ষে পাখীরা ভাসিয়া থাকে ('সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈঃ')।

মহাকবি বধূবেশিনী উমার রূপ তিনটি উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মল্লিনাথের ব্যাখ্যা পড়িলে মনে হয়, তাঁহার মতে পুষ্পিতা লতার উপমা মুখ্য উপমা, অপর দুইটি তাহারই পরিপূরক। 'উজ্জ্বলনক্ষত্রভূষিতা রাত্রি' বলাতে বুঝিতে হইবে অলঙ্কারের মধ্যে নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল মুক্তাবলী, আর পক্ষিযুক্ত স্রোতস্বিনীর পক্ষী অর্থে সোনালী রংবিশিষ্ট চক্রবাক পাখী, সুতরাং তাঁহার মতে এখানে পক্ষিযুক্ত স্রোতস্বিনীর অর্থ বুঝিতে হইবে উমার দেহের স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারগুলি।

পুষ্পিতা লতার শোভার সহিত মহাকবি যেমন রূপসী নারীদের উপমা দিয়াছেন, তেমনি আবার ঝড়ে উৎপাটিতা

শ্রীহীন লতাকে উপমান করিয়া দুর্দশাগ্রস্তা নারীদেরও বর্ণনা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ যখন রামের আদেশে সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমের সন্নিকটে লইয়া গিয়া রাম যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এই কথাগুলি কোনও গতিকে শুনাইয়া দিলেন, তখন রামের সে মর্মঘাতী আদেশ শুনিয়া সীতার কি অবস্থা হইল জানাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন :

'স্বমূর্তিলাভ প্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম॥' (রঘু-১৪।৫৪)

এই অপমানরূপ ঝটিকায় অভিহতা হইয়া সীতা সহসা (ঝড়ে উৎপাটিত) লতার মত তাঁহার জননী বসুন্ধরার বক্ষে লুটাইয়া পড়িলেন, তাঁহার দেহের অলঙ্কারগুলি পুষ্পের মত ছড়াইয়া পড়িল।

এখানে মহাকবি কেবল যে ঝড়ে উৎপাটিতা লতার সহিত অপমানের নিদারুণ বেদনায় মর্মাহতা সীতার ভূমির উপর সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়া যাওয়ার উপমা দিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার দেহ হইতে ভ্রষ্ট অলঙ্কারগুলিকেও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া পুষ্পের সহিত উপমা দিয়া 'উপমা কালিদাসস্য' বাক্যটির সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন।

অনেকটা এই ধরনের একটি উপমা 'রঘুবংশে'র চতুর্দশ সর্গেই পাওয়া যায়। চতুর্দশ বৎসর পরে রাম ও লক্ষ্মণ যখন বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের জননী কৌশল্যা এবং সুমিত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তখন জননীদের যে শোচনীয় অবস্থা তাঁহারা দেখিলেন, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন, 'ছেদাদিবোপঘ্ন তরো ব্রততৌ' (রঘু-১৪।১), বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিয়া দিলে তাহার আশ্রিতা লতার যে দশা হয়, স্বামী দশরথের শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহাদেরও সেরূপ দশা হইয়াছিল।

দশা তাঁহাদের কিরূপ হইয়াছিল, মহাকবি তাহা স্পষ্ট ভাবে কিছুই বলিলেন না, কিন্তু যে উপমাটি এখানে ব্যবহার করিলেন তাহা দ্বারা জননীদের অবস্থার সবকিছুই বলা হইয়া গেল।

'বিক্রমোর্বশী' নাটকে লতায় রূপান্তরিতা উর্বশীর একটি অতি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায়। তখন বর্ষাকাল উর্বশীর প্রিয়তম পুরূরবা লতার নিকটে গিয়া ভূমির উপর বসিয়া লতাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিতেছেন :

মেঘের জল পড়ায় শীর্ণা লতাটির পল্লব ভিজিয়া গিয়াছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন লতারূপী প্রিয়ার অধর অভিমানের অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে; পুষ্প উদ্গমের কাল আর নাই, লতা তাই পুষ্পহীনা, দেখাইতেছে যেন প্রিয়া তাঁহার দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে; পুষ্প নাই, সুতরাং মধুকরও নাই, তাহাদের গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় না, মনে হয় প্রিয়া বুঝি চিন্তায় মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, কথা কহিতেছে না; 'চরণতলে আমি যে পড়িয়া রহিয়াছি রোষভরে প্রিয়া যেন দেখিয়াও দেখিতেছে না।'

(বিক্রম—৪র্থ অঙ্ক)

পুরূরবার মানসচক্ষে উর্বশীর অভিমানিনী রূপটি ভাসিয়া উঠিতেছিল বলিয়া, যে লতায় তিনি পরিণতা হইয়া গিয়াছিলেন তাহার দিকে চাহিয়া সেই ভাবটি তিনি ব্যক্ত করিতেছেন।

মহাকবি লতাকে যে সকল স্থানে উপমান করিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে উপমেয়ও করিয়াছেন। 'রঘুবংশে'র নবম সর্গে নর্তকীদের হাত নাড়িয়া নৃত্যকে উপমান করিয়া তিনি লতাদের বায়ুভরে কিশলয়কম্পনের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন, বসন্ত বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন :

'উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ
কিশলয়ৈঃ সদৃশৈরিব পাণিভিঃ॥' (রঘু-৯।৩৫)

উপবনের সীমানায় লতাগুলির কিশলয় বায়ুর প্রভাবে নড়িতেছে, দেখাইতেছে যেন নর্তকীরা বুঝি লয়ের ছন্দে হাত দোলাইয়া নৃত্য করিতেছে।

আর একটি বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন :

'অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রসূনৈ
রাচার লাজৈরিব পৌরকন্যাঃ॥' রঘু-২।১০

বাতাস লাগিয়া ছোট ছোট লতাগুলির পুষ্প উড়িয়া গিয়া দিলীপ রাজার দেহের উপর পড়িতেছিল, দেখাইতেছিল যেন শহরের মেয়েরা রাজাকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার উপর খই নিক্ষেপ করিয়া দেশাচার পালন করিতেছে।

'রঘুবংশে'র ষষ্ঠ সর্গে মহাকবি মলয় পর্বতের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 'পাণলতা' ও 'এলাচলতা'র উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন :

'তাম্বুলবল্লীপরিণদ্ধপুগা
স্বেলালতালিঙ্গিত চন্দনাসু।' (রঘু-৬ ৬৪)

সেখানে পাণলতারা সুপারি বৃক্ষগুলিকে জড়াইয়া থাকে, আর এলাচলতারাও চন্দনতরুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে।

শিশুশিক্ষার নব রূপায়ণ

শ্রীচারুশীলা বোলার

শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার কারবার চাকরি ব্যপদেশে। কি শিশু-শিক্ষণের ক্ষেত্রে, কি শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক সময় এমন অনেক সমস্যার কথা ভাবতে হয়েছে যার সমাধান শুধু বই পড়ে করা যায় না। যাঁদের কাছে থেকে আমরা আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করেছি তাঁরা বাস্তবিক কেমন করে সেই সব সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের দেশের সমস্যার সঙ্গে আমাদের এই নূতন স্বাধীনতা-পাওয়া দেশের সন্তানদের সমস্যার তফাৎ কোথায় সেই সব নিজের চোখে দেখে আসবার ইচ্ছা বহু-কাল মনে ছিল। তাই গিয়েছিলাম গ্রেট ব্রিটেনের শিশু-প্রতিষ্ঠানগুলি দেখতে। তবু লণ্ডন ইউনিভারসিটির ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনে ভর্তি হয়েছিলাম তাঁদের সাহায্যে আমার উদ্দেশ্য সফল করা সহজ হবে এই মনে করে। সে সাহায্য তাঁদের কাছ থেকে আমি বহুল পরিমাণেই পেয়েছি এবং তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। তাই আজ আমাদের দেশের সন্তানদের পিতামাতার কাছে ঐ দেশের শিশুদের লালন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ মানুষকে গড়ে তোলার আন্তরিক চেষ্টার একটা নক্সা দেবার চেষ্টা করব।

গ্রেট ব্রিটেনে প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন; আর আমেরিকায় প্রথম নার্সারী স্কুল স্থাপিত হয় মনস্তত্ত্ব গবেষণার পরিকল্পনায়। আমেরিকায় মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদের ওপর দিয়ে এই কাজের সুরু হয়। বর্তমানে আমেরিকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্যেও নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আবার এদিকে ইংলণ্ডে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদেরও নার্সারী স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়।

গত কুড়ি বৎসর যাবৎ সমস্ত পৃথিবীতে শিশুশিক্ষা-রূপায়ণের একটা বিরাট আন্দোলন চলছে—বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে। দেশের নারীরা যখন কলকারখানার কাজে ভর্তি হ'ল তখন তাদের শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজন-বোধে বহু 'ক্রেশ', নার্সারী স্কুল এবং শিশুবিদ্যালয় ইত্যাদি খোলা হয়। এই সব বিদ্যালয়ে একটি সুস্থতর পরিবেশে শিশুদের কেবল শিক্ষা নয়—দেহমনের স্বাস্থ্যের জন্যও যত্ন নেওয়া হয়। তা না হলে মজুর পিতামাতার অনুপস্থিতিতে শিশুগুলিকে—অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সব দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হ'ত।

১৯১৮ সনের 'ফিশার বিল'-এ ২—৫ বৎসরের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত সুপারিশপত্র পেশ করা হয়। পরামর্শ সমিতি সেগুলির মীমাংসা এই ভাবে করেন: "পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের দায়িত্ব সরকারের নিজে গ্রহণ করা উচিত এবং যথোচিত ব্যবস্থা যথাশীঘ্র করা প্রয়োজন। এর জন্য নার্সারী স্কুল স্থাপন বিশেষ আবশ্যক এবং পরিচালনার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার প্রয়োজন। কেবল শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি নয়—কিন্তু মানসিক ও অনুভূতিঘটিত বিকাশের জন্যেও বিশেষ যত্নের দরকার। সুতরাং নার্সারী স্কুলের উপযুক্ত বাড়ী, বাগান, সরঞ্জাম, উপকরণ ও স্বাস্থ্যগঠনের উপযুক্ত নীতির আবশ্যক। আরও চাই শিশুর গৃহের সঙ্গে স্কুলের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। কিন্তু এই বয়সের শিশুদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা ঠিক হবে

এই গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশপত্র ইংলণ্ডের 'জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি'র অত্যাবশ্যক ভিত্তিস্থাপনের পথ নির্দেশ করে এবং জাতীয় জীবনের একতাকে দৃঢ় করে। নানা কারণে সুপারিশপত্রটি দশ বৎসরেও সম্পূর্ণ কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু চিকিৎসকের পরীক্ষায় দেখা গেল—বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় এক-তৃতীয়াংশ শিশু কমবেশী অসুস্থ, যেটা প্রতিরোধ করা সম্ভবপর। আরও দেখা গেল যে, জন-সাধারণের অর্থভাণ্ডার (Public Fund) থেকে কিছু টাকা দিবা-মাতৃকাপীঠের (Day Nursery) এবং অন্যান্য শিশুদের (যাদের মায়েরা সারাদিন বাইরে কাজে থাকে) জন্যে পৃথক্ রাখা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্য ভর্তি করার সময় পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, শৈশব অবস্থায় যথোচিত লালন-পালনের অভাবে তারা উপযুক্ত রকমে কষ্টসহিষ্ণু, দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। এ ছাড়া বহু শিক্ষাবিদ ও মনোবিদের গবেষণার ফলে এই বয়সের শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তাবোধ অনেকের মনে জাগে। এ বিষয়ে রেচেল ও মার্গারেট ম্যাকমিলানের দান শিশু-শিক্ষা-ক্ষেত্রে অতুলনীয়। এই দুই বোনের অক্লান্ত পরিশ্রমের

সফলতা আজ শিক্ষাক্ষেত্রে রূপ গ্রহণ করেছে। প্রথম মুক্তবায়ু মাতৃকাপীঠ (Open-air Nursery School) এঁরা স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টাও স্মরণীয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে নার্সারী স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সর্বসাধারণের মনে সাড়া দেয়। ১৯২৯ সনে কিছু উৎসাহও পাওয়া যায়। ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে এই বয়সের শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা। অবশেষে ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনের একটি দফায় স্থানীয় অভিভাবকদের উপর নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সনে যে সব নার্সারী স্কুল খোলা হয়, ১৯৩৯ সনে যুদ্ধ স্নরু হওয়াতে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলিও কার্যকরী হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। যুদ্ধান্তে শিশুদের ভিতর নানারকম সমস্যা দেখা যায়, যার ফলে কেবল সাধারণ নার্সারী স্কুল নয়, কিন্তু শিশুদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের নার্সারী স্কুল খোলা হয় এবং শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে কেবল শিক্ষিকার ব্যবস্থা নয়, ডাক্তার, মনোবিদ্ প্রভৃতির উপরেও গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

ইংলণ্ডে ২—৫ বৎসরের শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা মনে হয় বহু দেশ অপেক্ষা অগ্রসর। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে সরকারী অবৈতনিক মাতৃকাপীঠের সংখ্যা ৪৮৪, যেখানে ২৩,৪৬৯ শিশুর শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। আরও ২০টি স্কুল সরকার থেকে সরাসরি অর্থসাহায্য পায়, যেখানে ৮১৮টি শিশুর জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে আটটি স্কুলকে দক্ষ (efficient) এবং স্বাধীন (independent) বলে স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে ২৬৭টি শিশুর ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও ১,৯৬৫টি নার্সারী শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে যেখানে ৫৫,৬২৭ জন শিশুকে স্থান দেওয়া ও তত্ত্বাবধান করা হয়। এই সংখ্যা পরিবর্তনশীল।

শিশুকে যদি জাতীয় সম্পদ রূপে গণ্য করা হয় তবে জাতিগঠনের প্রয়োজনেই শিশুকে শক্তিশালী বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক করে তোলা দরকার। এ সত্য প্রমাণ করেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ইংলণ্ডে ২—৫ বৎসরের শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের মাতৃকাপীঠের ব্যবস্থা আছে। রাজ্যসরকার-পরিচালিত স্কুলগুলি খুব উন্নততর। বেসরকারী মাত্র কয়েকটি স্কুল আছে যেখানে বেশী হারে বেতন নেওয়া হয়। কেবল অবস্থাপন্ন পিতামাতার পক্ষেই এই ধরনের স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের পাঠানো সম্ভব।

সরকারী স্কুলগুলির বেশীর ভাগই শহরতলীতে অবস্থিত। বাড়ীগুলি উপযুক্ত প্ল্যানে তৈরী। শিশুসংখ্যা অনুযায়ী ঘরের ব্যবস্থা এবং খেলাধুলার জন্যে প্রশস্ত স্থান আছে। এই স্কুলগুলিতে শিশুসংখ্যা ১৬৫টির বেশী নয়, এবং ৪০টির কম নয়। ১৬৫, ৯০ ও ৬০ সংখ্যার স্কুলকে 'ডাবল ইউনিট স্কুল' এবং ৪০টি শিশুর উপযুক্ত স্কুলকে 'সিঙ্গল ইউনিট স্কুল' বলা হয়। প্রত্যেক স্কুলে শিশুদের জন্যে খেলার ঘর, স্নানের ঘর, কাপড় ছাড়ার ঘর এবং কর্মচারীদের জন্যে প্রয়োজনীয় ঘরের ব্যবস্থা আছে। উপযুক্ত আসবাবপত্র, উপকরণ ও খেলাধুলার সরঞ্জাম দ্বারা ঘরগুলি সুসজ্জিত।

শিশুদের জন্যে খাদ্য ও বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। সরকারের পরিচালিত রান্নাঘর এবং সেখানে সরকার নিযুক্ত পথ্যবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত রান্নার লোকের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক শিশু দুই-তৃতীয়াংশ পাইণ্ট দুধ, বোতলে কমলালেবুর রস এবং কড্‌লিভার অয়েল বিনামূল্যে সরকার থেকে পেয়ে থাকে। কেবল মধ্যাহ্নভোজন বাবদ প্রত্যেক শিশুকে দৈনিক ছয় পেনি করে দিতে হয়। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পাস করা পথ্যবিশারদ রাঁধুনী আছেন তিনিই সাপ্তাহিক খাদ্য-তালিকা রচনা করেন।

শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ভর্তির সময়ে শিশুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়াও বছরে তিনবার প্রয়োজনমত শিশুকে পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে একদিন করে একজন নার্স আসেন এবং প্রয়োজন হলে যে-কোনও দিন তাঁকে আসতে হয়। সামান্য অসুস্থতার ভার তাঁর উপর।

ধনী-দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের শিশুর জন্যে শিক্ষাব্যবস্থা একই। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের উপর এই বয়সের শিশুদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। প্রতি ১২টি শিশুর জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রী। প্রতি দিনের কাজের একটি পরিকল্পনা মোটামুটি এঁরা তৈরী করে রাখেন, এবং যতদূর সম্ভব সেই ভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে তা পরিচালনা করেন।

আগেই বলা হয়েছে, সরকারী অবৈতনিক স্কুলগুলির প্রকারভেদ আছে। ফুল টাইম নার্সারী, যেখানে শিশুদের ছয়-সাত ঘণ্টা রাখা হয়, সাধারণতঃ সকাল ন'টা থেকে বিকাল সাড়ে তিনটা-চারটা পর্যন্ত। ২—৫ বৎসরের শিশুরা এখানে আসে। সব এলাকাতেই সরকার স্কুলের উপযুক্ত প্ল্যানে বাড়ী তৈরি করতে পারেন নি। তবুও যতদূর সম্ভব শিক্ষার বাধা সৃষ্টি যাতে না হয় সেই ভাবে বাড়ীগুলিকে স্কুলের উপযোগী করা হয়েছে। বস্তিপাড়ায় (Slum Area) স্থানাভাব, সুতরাং স্বল্পপরিসর জায়গায় সিঙ্গল ইউনিট স্কুল স্থাপন করা হয়েছে এবং সম্ভবমত সব রকমের ব্যবস্থা আছে।

সব এলাকায় মধ্যবিত্ত লোকেরা ফ্ল্যাটে বাস করে,স্কুলবাড়ী তৈরি করবার স্থান নেই সেখানে নীচের তলার কয়েকটি ফ্ল্যাট এক সঙ্গে করে স্কুলের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। আবার এমন পাড়াও আছে যেখানে অবস্থাপন্ন পরিবারের বাসের জন্তে এক-একটি বাড়ী তৈরি করা হয়েছে, স্কুলবাড়ী তৈরি করবার আর স্থান নেই, সেখানে হয় ত ঐ রকম একটি বসতবাটীকেই স্কুলের প্রয়োজনে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেগুলিকে লাভ নার্সারী স্কুল বলা হয় সেগুলি অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঠিক নার্সারী স্কুলের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি।

ইংলণ্ডে শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামে নার্সারী স্কুলের ব্যবস্থা নেই, কারণ সেখানে বেশীর ভাগ মায়েরাই বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীগুলি দূরে দূরে অবস্থিত, সুতরাং নার্সারী স্কুল খোলার সার্থকতা সেখানে নেই। ইনফ্যান্ট স্কুলেই নার্সারী ক্লাসে চার বৎসরের শিশুদের ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সরকার গ্রামীণ পরিবেশে আদর্শ নার্সারী স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য—সহজ উপায়ে, কম খরচে অথচ শিশুর প্রয়োজনীয় সবকিছু বজায় রেখে বাড়ীটি তৈরি হবে। বার্কশায়ারে কুকৃহাম গ্রাম এই আদর্শে নার্সারী স্কুল স্থাপনে সাফল্য লাভ করেছে বলে মনে হ'ল।

পার্ট টাইম নার্সারী: ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এখন অনেক উন্নত। খাওয়া-পরার চিন্তা পূর্বের মত তার প্রবল নয়। বেকার-সমস্যাও সামান্য। নারীর চাকরি করার প্রয়োজন তেমন ব্যাপক নয়। সুতরাং বর্তমানে ডাক্তারেরা মনে করেন ২—৫ বৎসরের শিশুর যতটা বেশী সম্ভব মায়ের কাছেই থাকা বাঞ্ছনীয়। মাতৃকাপীঠে এত দীর্ঘ সময় কাটালে শিশুকে বহু দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত বিশ্রাম, প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং উপযুক্ত খেলনা যদি পিতামাতা দিতে পারেন, তবে শুধু বাকী থাকে সমবয়সী খেলার সঙ্গীর—যা শিশুর জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন। শেষোক্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্তে আজ তিন বৎসর সরকার লণ্ডনে তিনটি এবং ব্রিস্টলে দুইটি পার্ট টাইম নার্সারী স্কুল স্থাপন করেছেন পরীক্ষামূলক ভাবে। সেখানে দুই 'শিফট্' কাজ চালানো হয়। সকালে ন'টায় এক দল ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে এবং বারোটায় চলে যায়। দুধ এবং কমলালেবুর রস বিনামূল্যে সরকার থেকেই দেওয়া হয়। বাড়ী গিয়ে তাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন ও বিশ্রাম হয়। বেলা দেড়টায় অন্য দল আসে—খাওয়া এবং বিশ্রামের পর। দুধ ও কমলালেবুর রস স্কুলেই খায়। সাড়ে চারটায় বাড়ী ফিরে যায়। এই তিন ঘণ্টা সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে তাদের খেলার সুযোগ দেওয়া হয়।

ডে নার্সারী: যুদ্ধের সময়ের 'এমারজেন্সি ডে নার্সারী'-গুলি যুদ্ধান্তে ক্রমে ক্রমে 'ফুল টাইম নার্সারী'তে পরিণত করা হয়। তবুও বেশ কিছুসংখ্যক ডে নার্সারী এখনও আছে। এখানে মাত্র কয়েক মাস বয়স থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের রাখা হয়। এই স্কুলগুলি স্বাস্থ্যবিভাগ (Ministry of Health) দ্বারা পরিচালিত। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে মেট্রন বলা হয় এবং সহকারী শিক্ষয়িত্রীকে সিস্টার বলা হয়। হাসপাতাল ও শিক্ষা-বিভাগের বিশেষ ট্রেনিং এঁদের নিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও সকলে শিক্ষাবিভাগে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা। সাধারণতঃ ডে নার্সারীগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেই বেশী নজর দেওয়া হয়—শিশুর খেলা-ধূলার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় না। এই স্কুলগুলিতে অভিভাবকের আয় অনুযায়ী শিশুদের বেতনের ব্যবস্থা আছে। কতকগুলি বিনা ব্যয়ের স্থানও আছে। যে সব মায়েরা দীর্ঘ সময়ের জন্য বাইরে কাজ করে তাদেরই ছেলে-মেয়েরা এখানে ভর্তি হয়। সুতরাং প্রায় আট-নয় ঘণ্টা শিশুদের স্কুলে রাখতে হয়। জারজ সন্তান, বিধবার সন্তান, বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে এমন পিতামাতার সন্তান, অথবা যে সব শিশু অল্পপরিসর স্থানে বা অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করে এই রকম সব শিশুদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ভর্তির জন্য।

আবাসিক মাতৃকাপীঠ (Residential Nursery)—বহু ছেলেমেয়ে আছে যাদের লালনপালন করার কেউ নেই। এদের জন্যেই এই আবাসিক মাতৃকাপীঠ। এই স্কুলগুলিও স্বাস্থ্যবিভাগের দ্বারা পরিচালিত। এখানেও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে মেট্রন এবং সহকারী শিক্ষয়িত্রীকে সিস্টার বলা হয়। কারণ হাসপাতালের শিক্ষাও এঁদের গ্রহণ করতে হয়। এ ছাড়াও শিক্ষাবিভাগে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীও আছেন। কয়েক মাস বয়স থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এখানে রাখা হয়। এদের এক তৃতীয়াংশ শিশু অস্থায়ী ও দুই-তৃতীয়াংশ স্থায়ী। হয়ত মা অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে; অথবা ছেলেমেয়েকে বাপের কাছে দিয়ে কোন মা চিরদিনের জন্যে চলে গিয়েছে; কিংবা শিশুর শৈশব অবস্থাতেই মায়ের মৃত্যু ঘটেছে; অথবা হয় ত বাপ পঙ্গু—মাকে সারাদিন চাকরি করতে হয়; কিংবা মা বিধবা আয় কম—প্রতিপালন করার ক্ষমতা নেই;—এই সব পর্যায়ের শিশুদের সাময়িক ভাবে লওয়া হয় অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই যে-কোনও সময় অভিভাবক ইচ্ছা করলেই তাদের এসে নিয়ে যেতে পারেন। জারজ ও পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের স্থায়ী আবাসিক করে রাখা হয় এবং এই স্কুলের মেয়াদ শেষ হলে এবং শিশুর পাঁচ বৎসর পূর্ণ হলে স্কুল-

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হ'ল তাদের অন্য আবাসিক শিশু বিদ্যা-পীঠে পাঠানো।

শিশুদের সর্বপ্রযত্নে রক্ষা ও পালন করা হয়—সেখানে কোন ত্রুটি যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই স্কুলগুলি কখনও বন্ধ হয় না। সমস্ত কর্মচারীকে বোর্ডিংএই থাকতে হয়। অন্যান্য নার্সারী স্কুলের মত এখানেও শিশুদের সবরকম খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে এবং যতদূর সম্ভব একটি আপন গৃহের আবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। স্থায়ী আবাসিক শিশুরা পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত—এই জন্য 'uncle' ও 'aunt'-এর ব্যবস্থার একটা রেওয়াজ আছে। উদারচেতা, স্নেহপ্রবণ দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বহু লোক আছেন যাঁরা এক-একটি শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন,—নিজেদের বাড়ী নিয়ে যান, কখনও বা বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান, এবং প্রয়োজনমত জিনিসপত্রও দিয়ে থাকেন। নিঃসন্তান পিতামাতাও কখনও কখনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পছন্দমত কোনও শিশুকে লেখাপড়া করে নিয়ে নেন এবং আপন সন্তানের মত প্রতি-পালন করেন। কর্তৃপক্ষ এখানেও নিশ্চিন্ত থাকেন না। সরকারের শিশুরক্ষা বিভাগ থেকে কল্যাণকর্মীদের এই সব গৃহে মাঝে মাঝে পাঠানো হয় এটা পরিদর্শনের জন্যে যে, শিশুদের ওপর পালক-পিতামাতারা কোনও রকম অত্যাচার করেন কিনা।

কেবল সুস্থ সবল শিশুদের জন্যে ব্যবস্থা নয়, যে সব শিশুরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত হাসপাতালে থাকে তাদের শিক্ষার জন্যেও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। যে সকল শিশুর হৃদযন্ত্র খারাপ অথবা যাদের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, অথবা দুর্ঘটনায় যারা জখম হয়েছে; ডাক্তারের চিকিৎসার পর যখন তাদের উঠে বসে কিছু করার ক্ষমতা হয় তখন বয়সোপযোগী তাদের শিক্ষা সুরু হয়। ২—৫ বৎসরের শিশুদের জন্যে উপযুক্ত সব রকম খেলনার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাবিভাগের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীও নিয়োজিত আছেন, তাঁরাই এ কাজ পরিচালনা করেন। নিয়মমত খাওয়া, বিশ্রাম, চিকিৎসা এ সবের নির্ধারিত সময় ছাড়া বাকী সময়টা শিশুরা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। স্কুল থেকে অনুপস্থিতির কারণে যে দীর্ঘ সময়টা শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা এই ভাবে পূরণ করে দেওয়া হয়।

যে সব শিশুর শারীরিক বিকলতা আছে—যেমন মূক, বধির ও অন্ধ, তাদেরও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সাধারণ নার্সারী স্কুলের অনুরূপই সে সব ব্যবস্থা বিদ্যমান। তা ছাড়া বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে।

নানা স্কুলের শিশুদের কর্মসূচী বিবৃত করে তাদের প্রতি-দিনের কর্মের ছবিটা দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া আর যে সকল বিষয় বিশেষভাবে এর মধ্যে লক্ষ্য করবার রয়েছে সেইগুলি এখানে উল্লেখ করলাম:

১। প্রত্যেক শিশুর পিতামাতার সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে। (ক) পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুরা স্কুলে আসে, বেশীর ভাগ আসে মায়েদের সঙ্গে। (খ) মায়েরা প্রতিদিন স্কুলের কাজ দেখার সুযোগ পান এবং (গ) শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। (ঘ) প্রয়োজনমত প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শিশুর সম্বন্ধে পিতামাতার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পরামর্শও দিয়ে থাকেন। (ঙ) ডাক্তারের পরীক্ষার ফলাফল তাদের জানানো হয়। (চ) প্রতিদিনের খাদ্য-তালিকা নোটিশ-বোর্ডে দেওয়া থাকে মায়েদের জানানোর জন্যে। (ছ) স্কুলের প্রত্যেকটি উৎসবে পিতামাতার সাহায্য থাকে।

২। অনেক সময়ে ভাঙা খেলনা সারানো অথবা খেলার ঘর তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব কোনও কোনও পিতা নিয়ে থাকেন।

৩। কখনও কখনও বাপ-মাদের নিয়ে শিশুদের সারা দিনের জন্য বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী করে থাকেন।

৪। চলচ্চিত্র, বক্তৃতা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা—এগুলির ভিতর দিয়েও পিতামাতার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫। নার্স প্রয়োজনমত শিশুদের গৃহ পরিদর্শনও করে থাকেন। এই ভাবে স্কুলের এবং শিশুগৃহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।

ইংলণ্ডের শিশুশিক্ষার এই সুনিপুণ ব্যবস্থা দেখে মনে হয় সত্যিই শিশুকে এঁরা "জাতির সম্পদ" ভাবেন। পাঁচ বৎসর বয়সে স্কুলের শিক্ষারম্ভের পূর্বে শিশুর যে কতখানি প্রস্তুতির দরকার তা এঁরা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা চলছে।

আমাদের দেশের পিতামাতারা এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ পরস্পরের সঙ্গে একযোগে শিশুর শিক্ষা তথা ভবিষ্যৎ ভারত সংগঠনে ঐকান্তিকতা নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে আসুন।

হাঁসুলি

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

ঘরে পড়ে থেকে রূপোর চকচকে হাঁসুলিটা কালচে হয়ে গিয়েছিল হরিমতীর। তাই ওটাকে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করে দিতে দিনু কর্মকারকে দিয়েছিল হরিমতী। কিন্তু ফেরত আনতে গিয়ে দিনুর কথা শুনে হরিমতী যেন আকাশ থেকে পড়ল, নিয়ে গেল? বলি নিয়ে গেল কি রকম শুনি?

দিনু মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, মাধব জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কি করি বলুন!

জোর করে হাঁসুলি নিয়ে গেল? মাধবের শরীরে এতই তেল! হরিমতীর চোখ জ্বলতে লাগল, চোয়াল দৃঢ় হ'ল—রাগে যেন জ্ঞান হারিয়ে কাঁপতে লাগল হরিমতী।

বৃদ্ধ বয়সের ঝিমিয়ে-পড়া রক্তও যেন আজ আগুন হয়ে উঠেছে হরিমতীর। তার গোলগাল ভারী চেহারায় খুদে খুদে একজোড়া চোখ—সে চোখ যেন রক্ত হয়ে উঠল এখন—আর চ্যাপটা নাকটা ফুলতে থাকল উত্তেজনায়। মাথার ঘোমটা যে খসে পড়ল সে-দিকে আর খেয়াল রইল না হরিমতীর। ঘোমটার আড়ালে চির-কালের পর্দানশীন গ্রামের বিধবা—আজ যেন দিশেহারা হয়ে উঠেছে কি এক প্রচণ্ড ক্রোধে, নিদারুণ এক আক্রোশে।

দিনু কর্মকারের দোকান থেকে নেমে আসবার পথে মাত্র একটি কথাই বললে হরিমতী, ঐ বদমায়েস ছুঁচোটাকে তুমি ছেড়ে দিলে দিনু? জান, তুমি জান ও কি? নিজের বউকে ধরে মারে, মদ খায়, বেলেল্লাপনা করে—পরের ঘরে বউ-ঝি নিয়ে। আর আমার গাইগরুগুলো নিয়েছে, এবার হাঁসুলি নিলে। এবার কর্মকারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল হরিমতী। বললে, আমি জানি না কর্মকার—যেখান থেকে পার হাঁসুলি এনে আমাকে দাও।

জোর করেই ছিনিয়ে নিল, তা আমি কি করি বলুন। দিনু কর্মকার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত জবাব দিলে। একটু শয়তানী ভঙ্গী ওর হাসিতে ছিল, কিন্তু উত্তেজিত হরিমতী তা টের পেলে না। দোকান থেকে নেমে আসবার পথে হরিমতী চলতে চলতে বললে, হাঁসুলি আমি ফেরত চাই—হ্যাঁ। যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক, ও-জিনিস আমি চাই।

বালুরঘাট শহরের উত্তর-পশ্চিমে ফুলবাড়ী গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে মজে-আসা পুকুর, একধারে তাল-খেজুরের দীর্ঘ ঋজু-রেখার উদ্ধত ভঙ্গিমা—আর তারই ছাওয়ায় মাধব বর্ম্মার দোচালা খড়ের ঘর। তারই পাশে কত কালের এই মজে-যাওয়া পুকুর কে জানে। লাল মাটির এই পুকুরে এখন স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জলের ঢেউ জাগে না, শুধু পান-মরিচ আর বনকলমীর বুনোলতাপাতার জঙ্গলে ফড়িঙের পাখা কাঁপে, প্রজাপতি ওড়ে।

আজও তাই উড়ছিল। চারিদিকে পড়ন্ত বিকালের স্বল্পায়ু রোদের আক্ষেপ যেন কি এক বিষন্নতায় ভরিয়ে দিয়েছিল সারা গ্রাম, সারা মাঠ আর দিগন্ত। আর পুকুর পাড়ে ঢালু জমিতে শেষ রোদ সারা শরীরে মেখে খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছিল দুটি ছাই-রঙা গরু আর সাদা সাদা চঞ্চল দুটি বাছুর।

হরিমতী এসে দুটো গরুকেই চিনতে পারল। এ তারই গরু। বয়স হয়েছে বলে গরু দুটোকে আধি দিয়েছিল এক সাঁওতালকে। হরিমতী আর নিজে ওদের পালতে পারে নি। আর মাধব সেই গরু দুটিকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে দিনসাতেক হ'ল। হরি-মতী থমকে দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগল।

উঠানে বসে কুড়ালের হাতে লাগাচ্ছিল মাধব বর্ম্মা। হরিমতীকে হঠাৎ এই সময়ে দেখে কাজ বন্ধ করে ওর দিকে তাকাল। দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই হরিমতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল ক্রোধে, বললে, হাঁসুলি ফেরত দাও—শয়তান, ছুঁচো!

মুখ সামাল করে কথা বল, হাঁ—মাধবের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল যেন।

হরিমতী কিন্তু নিজেকে আর সামলাতে পারল না, চীৎকার করে উঠল, বদমাস, বউকে মারে, গরু চুরি করে, হাঁসুলি চুরি করে—পুকুরপাড়ের একতাল কাদা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে মাধবকে।

চোখের পলকে বসে পড়ল মাধব, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে কুড়ালটা বাগিয়ে ধরল। ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসতে হরিমতীরও সময় লাগল না এক মুহূর্ত। সবে এসেই ভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, ওরে কে কোথায় আছিস রে, আমাকে মেরে ফেলল—আমাকে মাধব কুড়াল দিয়ে মেরে ফেলল।

গ্রামের লোক ছুটে এসে দু'জনকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল—হরিমতীর মেয়ের জামাই মাধব। আর সেই হরিমতীর মাথার ওপর মাধবের উদ্যত কুড়াল। গ্রামের লোক মারামারি থামাল। হরিমতী চুপ করে গেল বটে, কিন্তু এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়াল। আর মাধব দুরন্ত আক্রোশে সবাইকে সরিয়ে আস্ফালন করে চলল, শালার বুড়ীকে আজ শেষ করব।

ক্রোধে, অপমানে, দুঃখে হরিমতীর চোখে জল এল। এ কান্না থামবার নয় হরিমতীর। সারা জীবনের দুঃখের কান্না—অপমানিত প্রাণের কান্না, দুঃখী জীবনের কান্না। সব কান্নাধারাই আজ যেন এই মুহূর্ত্তে মুক্ত হয়ে গিয়েছে।

গ্রামের মাতব্বর জিতেন দাস। হরিমতীর দূরসম্পর্কের কাকা—

বললে, কাঁদছ কেন হরি ভাজি—এখানে বস, ঠাণ্ডা হও, ব্যবস্থা একটা করে দেবই।—জিতেন দাস সব ঘটনা জানে। জানে যে, মাধব তার স্ত্রী সুধনীর ওপর অত্যাচার করত। হরিমতীর মেয়ে সুধনী—মাধবের স্ত্রী। বিধবা হরিমতীর তাই দুঃখের শেষ নাই। সুধনী তখন অন্তঃসত্বা। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে মাধব একদিন নিষ্ঠুরভাবে মেরেছিল। আর সেই রাত্রেই দাঁত দিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে সুধনী পালিয়ে এসেছিল মায়ের কাছে। আর ফেরে নি। এখানেই পরের দিন দারুণ জ্বর এসেছিল—সেই জ্বরেই চিরকালের মত চোখ বুজল সুধনী। মৃত্যুর আগে স্বামীকে একবার দেখতে চেয়েছিল সুধনী, কিন্তু মাধব আসে নি। জিতেন দাস নিজে গিয়ে মাধবকে আসতে বলেছিল। কিন্তু মাতব্বরকে আশ্বাস দিয়ে মাধব চলে গিয়েছিল শহরে—বালুরঘাটে। মদ খেয়ে বে-পাড়ায় পড়েছিল কোন মটর ড্রাইভারের সঙ্গে। মাধব নিজেও মটর ড্রাইভারি করত। গ্রামের ঘর-গৃহস্থালি, জমি-জমা, হাল-গরু কোন কালে ভাল লাগত না মাধবের। চিরকাল সে শহর ভালবাসত—আর ভালবাসত শহর-জীবনের ঐসব কলঙ্কিত রূপোপজীবিনীদের খোপগুলি। সেদিনও মাধবকে ফিরিয়ে এনেছিল জিতেন দাস। এই মাধবের চরিত্র! সে যে হরিমতীকে আঘাত হানতে কুড়ুল তুলবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি—অন্ততঃ জিতেন দাস আশ্চর্য্য হয় নি।

হরিমতীকে অনেক সান্ত্বনা দিলে জিতেন দাস। কিন্তু হরিমতির কান্নার শেষ নেই। নিষ্ঠুরতম আঘাতের পর এ সান্ত্বনা যেন আজ তার সমস্ত কান্নাধারাকে আরও জোরে বইয়ে নিয়ে এল। কেঁদে কেঁদেই হরিমতী বললে, আমার মেয়ের জীবনটাকে নষ্ট করেছে ঐ শয়তান, এবার আমার ওপরও ওর হামলা।—হরিমতীর কান্না থামল না।

জিতেন দাস আবার বললে, কথা দিচ্ছি এর একটা বিহিত আমি করব—যেমন করে হোক করব।

হরিমতী চোখ মুছে বললে, আর কবে করবে গো জিতেন কাকা, কবে করবে? সুধনী মরেছে ওর হাতে, আমিও মরব—তার পর তোমরা বিচার করো, পঞ্চায়েৎ ডেকো, বিধি-ব্যবস্থা করো। দেখির যে কোন মানে নেই জিতেন কাকা!

পরদিন গ্রামের পঞ্চায়েৎ-সভায় হরিমতী সব কথা বললে। শেষে বললে, জোর-জবরদস্তি করে গরু বাছুর নেওয়ার কথা, হাঁসুলি নেওয়ার কথা, আর সুধনীর ওপর অজস্র অত্যাচারের কাহিনী। শেষে আঁচলে চোখ মুছল হরিমতী, তার পর কাঁদল। পঞ্চায়েতের পাশে বসে কাঁদল।

শুধু পঞ্চায়েতের পাশেই নয়, শহরে উকিল বাবুর বাসাতেও হরিমতীর চোখের জল পড়ল। হরিমতীকে মামলার পরামর্শ দিয়েছে গ্রামের মাতব্বর জিতেন দাস, বলেছে, ও ডাকাতকে এক 'গরমেণ্ট' পারে শায়েস্তা করতে—আমরা কি করব?

আসল কথা হরিমতী জানে না। জিতেনের সঙ্গে মাধবের বন্ধুত্ব। মাধব শহরের উকিল-ডাক্তার-মোক্তার-অফিসারদের সঙ্গে জীতেনের খাতির করিয়ে দিয়েছে। এতে জীতেন এটা-ওটার লাইসেন্স, রেশনের দোকান, কিংবা ডি-পি এজেন্সির-দালালী, আর ব্লিলিফ আপিসের তদ্বিরকারক হয়ে ওঠে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারছে। এ মন্দ রোজগার নয়। এই স্বার্থ—এই স্বার্থেই জিতেন দাস মাধবের কোন শাস্তির ব্যবস্থা পঞ্চায়েৎ মারফত করলে না, নিজের হাতে। হরিমতীকে মামলার পরামর্শ দিলে। আত্মীয়তার চেয়ে, মাতব্বরের কর্ত্তব্যের চেয়ে, স্বার্থ বেশী মনে হ'ল জিতেনের।

পঞ্চাশ বছরের হরিমতী এ যুগের স্বার্থের বেড়াজালের জটিলতা বুঝলে না, বুঝতে পারলে না। মামলা করতেই রাজী হ'ল সে। ঘটি-বাটি বন্ধক রেখেও মামলা করবে হরিমতী। সংসারের সততায় যা পারলে না হরিমতী, আইনের ঘোর-প্যাঁচ চক্রে তারই পরীক্ষা করবে সে। মাধবকে দেখে নেবে। আর ঐ হাঁসুলি আর গরু বাছুরগুলি তার চাই-ই। উকিলবাবুর হাতে ধরেছে হরিমতী, যা চান সব দেব বাবু, কিন্তু মামলায় আমাকে জিতিয়ে দেন। আঁচল থেকে পুরানো নেতিয়ে-পড়া নোংরা পাঁচ টাকার এক একখানা নোট উকিলবাবুর হাতে গুঁজে দিয়েছে হরিমতী। প্রবীণ উকিলবাবু মাথা দুলিয়ে বলেছেন, ব্যস্ত হয়ো না, দেখি কি করতে পারি। আর মনে মনে দীর্ঘ-মেয়াদী মামলা দাঁড় করিয়ে বেশী পয়সার স্বপ্ন দেখেছেন উকিলবাবু।

এমনি করেই মামলা চলেছে। শুনানি চলেছে—জেরা উল্টো জেরা হয়েছে। মামলায় জানা গেল অন্য কথা। এ কথা হরিমতী কখনও কল্পনা করে নি। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে, আর উকিল বাবুর মুখ থেকে যা শুনতে পেয়েছে, তা অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখলে না হরিমতী। হরিমতী শুনেছে, কর্ম্মকার একশত টাকা নিয়ে মাধবকে হাঁসুলি দিয়েছে, মারধোর বা জোর-জবরদস্তি করে হাঁসুলি নেয় নি মাধব। সে যাই হোক, হাঁসুলি এখন মাধবের দখলে, ফিকির-ফন্দি করেই হোক আর ঘুষ-ঘাষ দিয়েই হোক—হাঁসুলি এখন মাধবের হাতে। এ হাঁসুলি হাতছাড়া করতে পারবে না হরিমতী, কখনও কোন কালে।

হাঁসুলি তার চাই-ই। আর চাই মাধবের শাস্তি—কঠিন শাস্তি। তা হলে খুশী হবে হরিমতী। অমন শয়তান মাধব! তাকে শাস্তি না দিলেই নয়। উকিলবাবুর সেরেস্তায় বসে ক্রোধে আর আক্রোশে অস্থির হয়ে ওঠে হরিমতী।

শেষ পর্য্যন্ত মামলার রায় বের হ'ল। হরিমতী মামলায় জিতেছে। ডিক্রী হয়েছে মামলায়। মাধব সব ফেরত দেবে। গরু-বাছুর, আর হাঁসুলিও।

গরু-বাছুর আর হাঁসুলি ফেরত পেল হরিমতী সাত দিন পরে। গরু-বাছুরগুলি অনেক দিন পর তার বাড়ীতে ফিরে এসেছে। কোথায় যে ওদের রাখবে তাই ঠিক করতে পারছিল না হরিমতী। গোয়ালের ঘরটা ভেঙে গিয়েছে, ওখানে রাখা চলবে না। রান্নাঘরের বারান্দায় রাখা চলবে না—বারান্দার 'চাল' জীর্ণ হয়ে গিয়েছে—বৃষ্টি পড়ে। গাছতলাতেও না। শেষ পর্য্যন্ত শোবার ঘরের বারান্দায় ওদের এনে তুলল হরিমতী।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। হরিমতী ওদের প্রদীপ দেখাল, ধুপ

ধুছুচি মুথাল—গা-মাথা-গলা আর সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে পরম যত্নে—মায়ের মত। হাড়গোড়-পাঁজরাগুলি কেমন ঠেলে এসেছে প্রকট হয়ে। আহা-হা! হরিমতী ওদের আদর করলে। তার পর কানা গরুটার কাছে গিয়ে কাঁদল। এই গরুটা ছিল সুধনীর। বাছুর হওয়ার কালে সুধনী ঢেলা মেরেছিল চোখে—সেই থেকে ডান চোখটা কানা হয়ে গিয়েছে। তখন থেকে গরুটাকে সবাই ডাকে 'কানীগাই।' ওদের জন্ম নতুন ভাত বসাল হরিমতী। জল-ভাত-ফ্যান দিলে গামলায় ঢেলে। খাইয়ে দিয়ে পিঠের ওপর চট জড়িয়ে দিলে। এখন বর্ষাকাল! চারিদিকে মশার উৎপাত। এতদিন পর গরুগুলি ঘরে এসেছে। ওদের যত্ন না নিয়ে হরিমতী যেন খুশী হতে পারছিল না।

এইবার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল হরিমতী। প্রদীপের অস্বচ্ছ আলোয় রহস্যমাখা ঘর। বাইরে রাত্রির প্রথম প্রহর—প্রায় গড়িয়ে গেল। বিছানায় বসে বালিশের নীচে রাখা পুঁটলিটা টেনে নিলে হরিমতী। খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। চুপচাপ বোবা গাছগুলির মাথায় জলে-ভরা কালো কালো মেঘ—বর্ষণব্যাকুল, অস্থির। হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুতের ঝলকানি। আলোময় ঘর। আর তখনই হাঁসুলির গায়ে লেখা কতগুলি বড় হরফ ওর চোখে পড়ল। চকচকে হাঁসুলিতে স্বামীর নাম লেখা একদিকে, অপরদিকে হরিমতীর। হরিমতী হরফগুলির ওপর হাত বুলায়; এ হাঁসুলি তার স্বামীই তাকে গড়িয়ে দিয়েছিল। সেই একবার—তাদের যৌবনকালে বিয়েপত্তি হিন বড় বেশী ফসল হয়েছিল। সেইবার—সেইবারই এ হাঁসুলি গড়িয়ে দিয়েছিল স্বামী। সুধনী তখন পেটে বোধ হয়। হ্যাঁ—তাই। হরিমতীর চোখজোড়া ভিজে উঠল।

সেই বছরটা এমনি করেই ঘুরে গেল। এমনি করেই হাসি-কান্নায় অতীত স্মৃতিকে বুকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিলে হরিমতী। তারপর বর্ষা গেল। শরৎ এল—আকাশে সাদা সাদা আত্ম-ভোলা নিরুদ্দেশ মেঘের দল নিয়ে। হরিমতীর বয়স আরও বাড়ল। হাঁপানি আরও বৃদ্ধি পেল। ঘড় ঘড় কাশি, হাঁপানির টান। সে যে কি কষ্ট! হরিমতী কেমন করে তা বোঝাবে।

গ্রামের মেয়েরা শরৎকালে পূজার সময় গ্রামে এল—শ্বশুরঘর করে। চারিদিকে ঢাকের বাজনা। মা আসছেন। নতুন কাপড়ের গন্ধ—নতুন সুগন্ধি তেলের গন্ধ। মেয়েদের কপালে ডগডগে লাল সিন্দুর। এই এক একটা জীবনে কি সুখী সবাই—কি আনন্দ মুখরিত। মানুষ চিরকাল তাই চায়—সুখ শান্তি আর দিকে দিকে জীবনের সমৃদ্ধি। ঝগড়াবিবাদ চায় না মানুষ—কোন দিন, কোন কালে; ঘরে শুয়ে জানালায় তাকিয়ে কথাটা বার বার ভাবল হরিমতী। চোখ জোড়া ছল ছল করে উঠল। সুধনীর কপালে এ সুখ হয় নি। স্বামীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পেয়েছে সুধনী—ভালবাসা পায় নি।

হরিমতীর চোখে তাই জলের শেষ নেই। সম্পূর্ণ শরৎকালটাই সে অমন করে কেঁদে কাটাল—পাড়ার অন্য বাড়ীর মেয়ে বউদের দেখে আর মাধবকে অভিসম্পাত করলে। শুধু অভিসম্পাত করেই নিবৃত্ত হ'ল না হরিমতী, মাতব্বরকে ডেকে বললে, জিতেন কাকা, মাধবকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দাও—

তার পর একটু থেমে বললে, আমার বয়স হয়েছে, গতর গেছে, না ত ওকে আমি কোঁচ দিয়ে মারতাম—মনে নেই তোমার—সেই যে একবার ডাকাত মেরেছিলাম খোঁচ বিঁধিয়ে।

হ্যাঁ—খুব মনে আছে। জিতেন দাস হরিমতীর পাশে বসে মাথা নাড়ে।

আরও দিন কেটে গেল, কিন্তু হাঁপানির টান কমল না, বরং আরও বাড়ল। শীতকালের প্রায় মাঝামাঝি আর একটা নতুন ব্যাধি এসে জুটল সেই সঙ্গে—চোখে কম দেখা। হরিমতীর দুই চোখেই ছানি পড়েছে। চোখে ঝাপসা দেখে।

আজকাল আর সেই পুরানো বিবাদের ইতিবৃত্তটা খুব বেশী মনে পড়ে না হরিমতীর। মনে পড়ে না তা নয়, তবে আজকাল নিজের কথাই বেশী ভাবে হরিমতী—নিজের সুখ-দুঃখ। তার নিজের হাঁপানির টান—চোখে না দেখার কষ্ট। এই দুই-ই ওকে বেশী করে ভাবিয়ে তুলেছে যেন।

আবারও বর্ষাকাল এল। আকাশে আকাশে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ আর ঝর ঝর আকুল বৃষ্টি। আষাঢ়ের শেষ দিকে হরিমতীর জ্বর এল। ঘোর জ্বর আর ভুল বকা। সেই জ্বরেই হরিমতী শয্যা নিলে। পূর্ণ এক মাসেও সে জ্বর ভাল হ'ল না হরিমতীর। মাতব্বর জিতেন দাস রোজই আসে এখন, একবার করে দেখে যায় হরিমতীকে।

এমনি এক জল-ঝড়-দুর্যোগের সন্ধ্যায় জিতেন দাস এল হরিমতীকে দেখতে। হরিমতী বললে, বস জিতেন কাকা—

একটা ছোট জলচৌকীতে বসল জিতেন দাস।

হরিমতী বললে, একটু জল খাব জিতেন কাকা—ঐ মাটির কলসীতে জল আছে। একটু দাও—বুকটা শুকিয়ে আছে।

ঘরের এক কোণায় মাটির কলসীতে জল ঢাকা। জিতেন বললে, গ্লাস কোথায় হরি ভাজি?

গ্লাস নেই জিতেন কাকা—একটাও নাই। সব গেছে—কর্মকারের দোকানে বন্ধক রাখা আছে। টাকা—টাকা—জিতেন কাকা! মামলার খরচ যোগালাম ঐ টাকায়।

জিতেন দাসের বুকটা কেমন নরম হয়ে উঠল, বললে, মাধবের কোন খবর রাখ?

কি খবর?

ও ত আবার বিয়ে করেছে। শুনি এই স্ত্রীকে নাকি মার-ধোর করে না—ভালবাসে।

জানি জিতেন কাকা—সব জানি। মাধব আমাকে যেতে বলেছিল। আমি যাই নি ঐ শয়তানের ঘরে। হরিমতীর চোখের দৃষ্টিতে আবার ঘৃণা ছড়াল।

মানুষ চিরকাল শয়তান থাকে না হরিভাবিত ! সে ভাল হয়, সুন্দরও হয় একদিন। জিতেন দাস দেয়ালের দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বললে—

ভাল হয় ? সুন্দরও হয় ? হরিমতীর বুকের ভেতর কি এক বোবা ব্যথা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। আহা-হা ! সুধনীর কপালে তা জুটল না কোন দিন, কোন কালে। হরিমতীর চোখে আবার জল গড়াল।

বাইরে সারা রাত আষাঢ়ের অবিশ্রাম বর্ষণ। জিতেন দাস ফিরে যেতে পারলে না সে রাত্রে—বসে রইল সারা রাত হরিমতীর পাশে। শুধু সেই দিনই নয়, তারপর আরও অনেক দিন, অনেক রাত্রি। এমনি করেই বর্ষণ-ব্যাকুল আষাঢ়-শ্রাবণ, শুভ্র-মেঘ-বিহারী উচ্ছলতায় রঙীন ভাদ্র-আশ্বিন, সব দূরে চলে গেল পৃথিবীর ঋতু-পরিক্রমায়।

এখন কার্তিক মাস। শিশির-ভেজা সকালের সিরসিরে হাওয়ায় আসন্ন শীতের কানাকানি। হরিমতীর শেষ অবস্থা। আর একটা রাত্রি কি তারও কম। জিতেন দাস এসেছে হরিমতীকে দেখতে গত চার মাস প্রায় রোজই একবার এসেছে।

হরিমতী কাঁদল জিতেন দাসকে দেখে, আমি আর বাঁচব না জিতেন কাকা

জিতেন দাস কোন জবাব দিলে না। তার চোখজোড়াও ছল ছল করে উঠল। হরিমতীর কাছে আরও সরে বসে বললে, জোত-জমি আর গাই-গরুগুলির একটা ব্যবস্থা করে দাও।

হরিমতী কোন জবাব দিলে না, কাঁদল আবার, বললে, আমার মুখে আগুন দেওয়ার কেউ রইল না জিতেন কাকা—বংশে বাতি দেবারও কেউ রইল না

কেন মাধব ত রইল ওকেই সব কিছু লিখে পড়ে দাও। এখন শেষকালে আর ঝগড়া-বিবাদ করে কি লাভ।

লাভ-ক্ষতি জানি না জিতেন কাকা—আমার ভিটের ঘুঘু চরবে, গাই-গরুগুলি মরে পড়ে থাকবে, তবুও মাধবকে দেব না কিছু। হরিমতীর দুর্বল কণ্ঠও যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল আবার

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠল জিতেন দাস—হরিমতীও তারপর জিতেন দাস যেন মনে মনে বললে, মাধব।

মাধব ? চোখ কুঁচকোলো হরিমতী। জীতেন দাস জানত, মাধব আসবে। সেই-ই মাধবকে সস্ত্রীক উপস্থিত হতে বলেছিল। জমি-জমা গরু-বাছুরগুলিরও লোভ দেখিয়ে মাধবকে বলেছিল, সময়মত উপস্থিত থাকিস, কপালে মিলে যেতে পারে কিছু।

মাধব কোন কথা বললে না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা ! কে যেন ডাকলে।

হরিমতী চমকে উঠল, মা ! মা কে ডাকে জিতেন কাকা !

দেখতে এলাম মা—আপনার অসুখের খবরে—

আবারও মা ! এ যেন সুধনীর কথা, তার কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ-ভঙ্গী—হরিমতীর বুকটা তোলপাড় করে উঠল। উত্তেজনায় উঠে বসল হরিমতী। চোখ দুটো মিট মিট করে উঠল। কিছু দেখতে পায় না চোখে, দৃষ্টিতে সব ঝাপসা, সব অন্ধকার। হরিমতী কাঁদলে, সুধনীরে—ওরে—মা আমার—

আমি ত আপনার মেয়ের মতই মা। মাধবের স্ত্রী এইবার হরিমতীর পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে। হরিমতীও হাত বুলাল মাধবের স্ত্রীর মাথায়। ঘন কালো এক রাশ চুলে হাত বুলাল। মুখখানা অনুভব করলে হাতড়ে হাতড়ে। কিছু দেখলে না হরিমতী, দেখতে পারলে না। তবুও অন্তর আলোময়, আনন্দে দিশাহারা। যেন সুধনী এসে তার পাশে বসেছে কতকাল পরে। মা বলে ডেকে বুক জুড়িয়েছে।

সুধনী—সুধনীরে—হরিমতী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল

এইবার হরিমতী বালিশের নীচেটা হাতড়ে বের করলে—সেই হাঁসুলিটা। রূপোর চকচকে হাঁসুলিটা। হাতড়ে ওর গলায় পরিয়ে দিলে, আর কাঁদল। তারপর ডাকল, জিতেন কাকা !

বল। জিতেন দাস নড়ে বসল।

আমার সুধনী আমাকে দেখতে এসেছে। আমি দেখতে পাই না, তুমি দেখ। তুমি দেখে সুখী হও জিতেন কাকা জোত-জমি গরু-বাছুর সব ওকে দিলাম

জিতেন দাস কোন জবাব দিলে না হরিমতী বললে, একটা গীতা এনে আমার মাথায় রাখ জিতেন কাকা—আর একটা তুলসীর চারা

জিতেন দাস তাই করলে। এমন সজ্ঞান মৃত্যু আর কখনও দেখে নি সে। তারপর জীতেন দাস বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখলে মাধব দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে যেন কি ভাবছে গভীর ভাবে। ফোঁস দুটো গিয়েছে বাইরে কুয়োয়— একঘটি জল আনতে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে জিতেন দাস বললে, কি মাধব, আসতে বল্দ ভাল করি নি ? জোত-জমিগুলি লাভ হ'ল ত ?

হরিমতীর রোগশয্যায় সস্ত্রীক উপস্থিত থাকবার পরামর্শ মাধবকে জিতেন দাসই দিয়েছিল—তা সত্ত্বেও খুশী হতে পারছিল না মাধব। বুকের ভেতর একটা কথাই কেবল ঘুরে ঘুরে বাজছিল তার। একটা হাঁসুলি কিম্বা একশো গরু-বাছুরের স্বার্থের বাইরেও মানুষের জীবন আছে। আর সে স্বার্থ ত্যাগ করেও চিরকাল সুখী হতে পারে মানুষ—চিরকাল সুখী হয়েছে। অথচ এ-কথা আর কখনও ভাবে নি মাধব। ছি—ছি—ছি ! নিজের একটা জীবনে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কি করল সে ? চল্লিশ বছরের দীর্ঘ জীবনে মদ, ব্যভিচার, আর বীভৎস পাপের পঙ্ককুণ্ডে ডুবে থাকা ছাড়া আর কি করল সে ?

চারিদিকে অন্ধকার বোবা রাত। সম্মুখে কুয়াশার লম্বা মাঠ। তারপর শতবর্ষের পুরানো বট গাছের নীচে বুড়ি-ডিহির খালের জল—তার পাশে শ্মশান। ঐখানেই সুধনীর চিতা সাজানো হয়েছিল।

সেই সুখদী—অনাস্বাদিত জীবনের বহু নীরব কামনায় পাণ্ডুর মুখশ্রী—মাধব যেন সকরুণ ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল—বারান্দায়। তারপর কি মনে পড়ল মাধবের। প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকে হরিমতীর জট-ধরা রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলে পরম যত্নে নিবিড় করে।

জিতেন দাস ব্যস্ত হয়ে উঠল, আরে কি কর? কি করছ? জিতেন দাসকে কি বলবে মাধব? কি বুঝবে সে? এ যুগের গ্রামের মাতব্বর জিতেন দাস। অনুভূতিশূন্য, হৃদয়হীন—কতটুকু বুঝবে? তাকে কি বলবে মাধব? সে এসেছিল, হরিমতীর কানে কানে বলতে চেয়েছিল, ক্ষমা কর, সব ভুলে যেয়ো।

হরিমতী শুনল না মাধবের কোন কথা। অনেক আগেই সকলের অগোচরে মুক্ত হয়ে গিয়েছে সে।

স্মৃতির মিছিল

শ্রীকালিদাস রায়

মিছিল বাঁধিয়া চলিয়াছে স্মৃতিগুলি
তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে শুধু, বড়গুলি যাই ভুলি।
বড়গুলি যেন দাদা মহাশয়, হারায় মেলার ভিড়ে,
ছোটগুলি নাতি ঘাড়ে তাহাদের বাঁশী বাজাইয়া ফিরে।
মনে পড়ে মোর ভাইদ্বিতীয়ায় দি-এর হাতের ফোঁটা,
কুলীর কন্যা কাঁদে কুয়াপাড়ে কুয়ায় হারায়ে লোটা।

আজি মোর পড়ে মনে
ছুঁড়িয়া দিলাম দুইটি পয়সা কাটোয়া ইষ্টেশনে
ভিখারী বালকে। ট্রেন ছেড়ে দিল প'ড়ল চাকার নীচে,
ট্রেন চলে গেল, সে কি খুঁজে পেল? সে দান হ'ল
কি মিছে?
একটি বালিকা বলেছিল, 'বাবু পেয়েছে বড়ই খিদে।'
খেয়াপারঘাটে, কাঁটা হয়ে মোরে বিঁধে—
টাকা সিকি ছিল দুয়ানিও ছিল, আনিও ছিল না বলে
ভিক্ষা দিই নি, ম্লানমুখে আহা কেঁদে গিয়েছিল চলে।

মাঠ পার হয়ে বৃদ্ধ খঞ্জ ভারী বোঝা নিয়ে ঘাড়ে
থেমে থেমে থেমে চলেছিল হাটে, মনে পড়ে আজ তারে।
বহুদিন পরে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে কাছারি-বারেন্দায়,
প্রণাম করিনু শূদ্রজাতির গুরুমশায়ের পায়।

অবাক হইয়া লোকে,
বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন তিনি অশ্রুতে ভরা চোখে।
বালক তখন, তুলে দিয়ে কাকা আমারে ইষ্টিমারে,
কাঁদিতেছিলেন দাঁড়ায়ে নদীর ধারে,
বহুদূর হতে ঝাপসাই দেখা যায়,

পড়া হয় নাই, বেত্রহস্তে ছাত্রে করিনু তাড়া
ছাত্র বলিল, পরশু রাত্রে ছোট ভাই গেছে মারা।
ছল ছল চোখ ম্লান মুখখানি তার
দিল মোরে ধিক্কার
একটি ছেলের ছিল বড় মনে সাধ
জন্মতিথিতে লিখে দিই তারে পদ্যে আশীর্ব্বাদ,
বিদায় করিনু বিরক্ত হয়ে একটা লাইন লিখে
বিদায় নিল সে ছল ছল চোখে চাহিয়া আমার দিকে।
একমাস পরে শুনিনু সে নেই আর
সেই কথা আজ মনে পড়ে বার বার।

পাঁচ বছরের ছোট ছেলে মোর কঠিন দারুণ রোগে
একদা যখন চল্লিশ দিন ভোগে,
'ভাত খাব' বলে কেঁদেছিল কোলে মা'র,
মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছিনু তারে—ভাত চড়ে গেছে বলে
দশ দিন পরে সেই ভাত হ'ল রাঁধা,
কানে বাজে মোর আজ তার সেই কাতর কণ্ঠে কাঁদা।
এমনি কতই ছোট ছোট স্মৃতিগুলি
রক্তনিশান তুলি',
মিছিল বাঁধিয়া আসে মোর মনে আজ,
কেহ দেয় ব্যথা, কেহ দেয় মোরে লাজ।
সুপ্ত হইয়া ছিল এরা মোর মনে
কোথায় কুহর-রন্ধ্রকোটর কোণে
দল বেঁধে আজ করে তারা অভিযান
চূর্ণ করিতে আমার রূঢ়তা রুদ্রতার অভিমান।

ফয়জল সেতু

ইরাকে

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

হারুণ অল-রসিদের রোমাঞ্চ ও কল্পনার নগর বাগদাদ—শেষ রাত্রির তিমির ছায়ায় সুপ্ত—তবে বিমান পোতাশ্রয় আলোকিত, আমাদের বিমান এসে নামল। আধ ঘুম, আধ তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলাম। নূতন স্থান—নূতন পরিবেশ—অজানা নগরে কোথায় উঠব—তারই ভাবনা মনকে ব্যাকুল করে তুলল।

১৯৫৫ সনের ১৫ই জানুয়ারী ৪-৫০ মিনিট। এখানে পাস-পোর্ট ও শুল্ক-পরীক্ষকেরা খুবই ভদ্র ব্যবহার করল। আরব জাতির আতিথেয়তার ঐতিহ্য স্মরণে জাগে। এসেছিলাম কে. এল. এম কোম্পানীর বিমানে—ওদের বাস নিয়ে চলল ঘুমন্ত শহরের মাঝে।

এখানে ওয়াই-এম-সি-এ'র হোটেলে উঠবার ব্যবস্থা ছিল—তাদের লৌহ-কবাট রুদ্ধ—বাসের লোকেদের ডাকে দারোয়ান দরজা খুলল, কিন্তু আমার বসবার বা থাকবার কোনই ব্যবস্থা করল না—আমি ওদের বড় বারান্দায় একটা বড় বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম। আড়াই ঘণ্টা এই ভাবে কাটল।

এরা সবাই ভোরের দিকেই উঠে—তাদের চলাফেরা সুরু হ'ল—কিন্তু কেউ আমায় বিরক্ত করল না—সাতটায় এলেন এখানকার কর্মী শ্রীশান্তিরাম শর্মা। বেশ ভদ্র—আলাপও সৌজন্যপূর্ণ। আমাকে ৪১ নম্বর ঘর দিলেন—ঘরটি এক কোণে। প্রাতরাশ শেষ করে টাইগ্রিস নদীর তীরভূমি দিয়ে চললাম কে. এল. এমের এজেন্ট ইরাক টুরস আপিসে। বাড়ীর চিঠিপত্র বহুদিন পাই নি—তাই অপরিসীম ব্যাকুলতায় চিঠির সন্ধান করলাম।

না, বাড়ীর চিঠি আসে নি—অন্য চিঠি একখানি মাত্র পেলাম। কারও কোনও সাড়া নেই কেন বুঝি না—যাযাবর পথিকের চলার সঙ্গে তাল রেখে চিঠি হয়ত চলতে পারে নি—কিন্তু তাতে দুশ্চিন্তার শেষ হয় না। তার পর গেলাম ভারতীয় দূতাবাসে।

প্রেস অফিসার হরকত আহম্মদ বাগদাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার পর দূত খুব সিংহ

বর্তমান রাজা দ্বিতীয় ফয়জল

ফলভারাবনত খর্জুর-বৃক্ষ

মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি আই-সি-এস ছিলেন—নিজ দক্ষতায় দু'তর পদ পেয়েছেন।

আমায় তিনি বললেন, "ভারতবর্ষের গৌরব অপরিমেয়, তাই জগৎ বিস্ময়ে ভারতের দিকে চেয়ে আছে।"

তিনি বলেই চললেন—৫০৬টি দেশীয় রাজ্যকে ভারতবর্ষ এক করে ফেলেছে—কৃষি ও শিল্পে খুবই উন্নতি করেছে। ভারতবর্ষ কারও মুখাপেক্ষী নয়—ধীরে ধীরে সে নিজ শক্তিতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভল্যুশন করুক, তা হলেই সে বড় হবে।"

আমি বললাম, "কিন্তু এই অভ্যুদয়ের কাহিনী যে পুরোপুরি সত্য নয়—"

ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হলেন। আমি যখন বললাম, ভারতবর্ষ বাইরের সহায়তায় আরও তাড়াতাড়ি আরও ভাল ভাবে অগ্রসর হতে পারে।

তিনি বললেন, "না, সবাই ভারতবর্ষকে দ্বেষ করছে—ভারতকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে।"

কথাগুলি ভাববার মত—শ্রীযুক্ত সিংহ চমৎকার দরদ দিয়ে কথা বলেন। তার পর এদের এটর্নি-জেনারেলের ওখানে গেলাম। ভদ্রলোক কফি খাওয়ালেন—ভারতীয় আইন সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হ'ল। বাসায় ফিরে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষে ঘরে বসে খানিক পড়াশোনা করলাম।

এখানে একটি হিন্দুসভা আছে—আর্য্যসমাজের পণ্ডিত শর্ম্মা তার পরিচালক। তাঁর সন্ধানে চললাম। একটি ভারতীয় দোকানে গিয়ে তাঁর সন্ধান নিলাম, অপরিচিতকে শুধু ঠিকানাই বলেছিলেন। তাদের নির্দ্দেশমত অনেক কষ্টে খুঁজে বার করলাম।

পণ্ডিতজী খাঁটি মানুষ—নিরহংকার অথচ কাজের লোক। আমাকে অনেক স্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। আমার বক্তৃতার আয়োজন করলেন। সান্ধ্যভোজন শেষে ওয়াই-এম-সি-এ'র পর্য্যবেক্ষকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ভারতে ছিলেন—বললেন তিনি ভারতের বিশেষ বন্ধু। ভারতীয় নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হ'ল।

১৪ই জানুয়ারী, শুক্রবার। সকালে আনি দিল বিছানায় চা এবং সামান্য খাবার, এসে তার আগেই উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিয়েছিলাম—কাজেই খেলাম, কিন্তু একেবারে অখাদ্য। বেড়াতে বার হলাম—গাজি স্ট্রীট ধরে গেলাম আবদুল কাদির আল গৈলানি মসজিদে— সেখান থেকে বাসে করে পৌঁছি নর্থ গেটে তার পর চিঠির সন্ধান করে গেলাম দুটি যাদুঘরে 'আরব এণ্টিকুইটিজ' এবং 'ইরাক মিউজিয়ম' এদের নাম। শেষেরটি চমৎকার।

ইরাক নূতন রাজ্য—১৯২১ সনে মাত্র এর জন্ম। খলিফা-বংশজাত ফয়জল এর প্রথম রাজা। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে অতীতের অনেক ইতিহাস। জগতের সংস্কৃতির ইতিহাসে ইরাকের দান অসামান্য। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কূলে কূলে অনেক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উত্থান ও পতন হয়েছে। অসুর সভ্যতা, বাবিলনের কৃষ্টি, পার্থিয়ান, সাসানিয়ান প্রভৃতি কত জাতি কত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এখানে লীলাখেলা করেছে।

যাদুঘরে সেই সব অতীতের খণ্ডিত অবশেষ দেখতে দেখতে ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার কথা মনে জাগল। এখানে যেসব জিনিষ চোখে বিশেষ আকর্ষণযোগ্য ছিল তাদের মধ্যে এক নম্বর ঘরে সিংহশিকারের ছবি—কালো 'ব্যাসাল্ট' পাথরের উপরে আঁকা—এটা লেখা আছে ছ' হাজার বৎসরের পুরানো। ২নং ঘরে—প্রাচীনতম আইনের একটি সংগ্রহ—হামুরাবিরও দু'শ বৎসর আগে বিলানামা নামে রাজা এশুনুন্নার দ্বারা এই আইন প্রচলিত করান। ৩নং ঘরে ওদেশের বিখ্যাত রাজা কেসকালামদুগ্গার আংটি রয়েছে। তা ছাড়া রাণী সুবাদের অলঙ্কাররাজি থরে থরে সাজানো আছে। ৪নং ঘরে প্রাচীন ইরাকীয় ব্যবহারবিদ গুডিয়ার আবক্ষ মস্তকাবরণ দেখতে চমৎকার। ৬নং ঘরে রাজার চাষ অশ-

উর সমাধিতে প্রাপ্ত স্বর্ণাভরণ

[খ]চিত রথের ছবিটি খুবই সুন্দর। এ ছাড়া [রা]জার বংশীয়দের যেসব স্বর্ণালঙ্কার উর নগরীর [ধ্ব]ংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলিও [ম]নে বিশেষ ছাপ রাখে। একটি সোনার [বী]ণা আছে—সেটাও অতীতের শিল্পসমৃদ্ধির [প]রিচায়ক। তার পর কায়দর মসজিদ দেখে [হো]টেলে ফিরলাম।

খেয়ে-দেয়ে সিনেমায় যাব বলে রওনা [হ]লাম, কিন্তু বেলা সাড়ে চারটায় আরম্ভ [হ]বে জেনে পণ্ডিতজীর ওখানে যাওয়া গেল। [সে]খানে "Independence and After" বইখানি পড়লাম—খুব ভাল লাগল। স্বাধীনতা পেলেও আমাদের জাতীয় জীবন আশানুরূপ চরিত্রবলদীপ্ত ও কর্মতৎপর হয়ে উঠছে না, এটা খুবই দুঃখের।

ওখান থেকে চিঠির সন্ধান করে বাসায় ফিরলাম। সন্ধ্যা ছ'টায় ভোজনপর্ব শেষ করে পণ্ডিতজীর সঙ্গে বাহাইদের ওখানে গেলাম। বাহাইরা তাঁদের কিছু কিছু বই দিলেন। আমার বক্তৃতায় তারা খুব খুশী দেখলাম—পণ্ডিতজীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধুর জন্য তাঁর লজ্জা পেতে হ'ল না বরং সকলের সাধুবাদ পেলেন।

বাহাইদের ধর্মমতের উদারতা তাঁদের স্বাধীন করে তোলে। তাই এই অস্বাভিক বন্ধুদের সঙ্গে সময়টা বেশ কাটল। রাত দশটায় বাসায় ফিরলাম।

শনিবার বেলা নয়টা পর্যন্ত হোটেলেই থাকি। তার পর আমি কলেজে গেলাম। একটি আরব তরুণীপথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। মেয়েটি কৃষ্ণা কিন্তু সুশ্রী। এদের 'ডীন' এবং সহকারী ডীনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা বললেন—ওখানে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের বড়ই অভাব—ভারতবর্ষ থেকে লোক নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পান নি। রবিবার চারটায় এদের 'ইংলিশ সোসাইটি' নামক সভায় বক্তৃতা দেব স্থির হ'ল।

ওখান থেকে ডক্টর মহম্মদ ইয়াসিনের সঙ্গে দেখা করলাম। ভাল লোক, আলাপ-কুশল। তিনি ওখানকার প্রচার-অধিকর্তার ("Director of Propaganda") সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি ব্যস্ত থাকায় তাঁর সহকারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি রেডিও প্রোগ্রামের তদারক করেন। তার কাছে "India and the World" নামে আমার একটি রচনা রেখে এলাম।

এখান থেকে মেয়েদের কলেজে গেলাম। রাণী আলিয়ার নামে কলেজটি সুপরিচালিত—এখানে একটি পার্শী মহিলা অধ্যাপিকা আছেন, তার নাম মিস কামা। ওখান থেকে ফিরলে পণ্ডিতজী এলেন।

এখানে আর্যসমাজের গৃহরচনার জন্য একখণ্ড ভূমি কিনেছিলেন—তার উপর সমাজগৃহ করবেন এই তাঁর বাসনা। এই জন্য তিনি আর্যসমাজের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দরবার করতে বললেন। তাঁর সেই অনুরোধ দিল্লীতে আর্যসমাজের দু'চার জনকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। ঐ দিনে "The Flame of Calcutta" নামে একটা ছায়াচিত্র দেখলাম। এটি একেবারে বাজে—যারা ছবি তুলেছে তাদের কলিকাতা সম্বন্ধে আদৌ জ্ঞান নেই। ভারতীয় পরিবেশ আদৌ সৃষ্টি হয় নি—একটা জগাখিচুড়ি করে রেখেছে। এই ধরনের ছবি ভারতবর্ষের বিকৃত পরিচয় দিয়ে বিস্তর ক্ষতি করে। ফিরে Lampard-এর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তার কথাবার্তা গোঁড়ামিতে ভরা। এযুগেও তাঁর ধারণা—পৃথিবীর একমাত্র সেরা বই—'বাইবেল'। মানুষের যতকিছু সমস্যা, যতকিছু ভাবনা—তার সমাধান রয়েছে বাইবেলের ভিতর।

রবিবার—পাকিস্থান Chancery-তে গেলাম করাচীর একখানা মানচিত্রের জন্ত—অনেক খোঁজাখুঁজির পর আপিসে পৌঁছলাম, কিন্তু পেলাম না মানচিত্র। চৌধুরী বলে একজন বাঙালী আছেন এদের আপিসে। সেখান থেকে এদের Charge-de-affairs' নাজির হোসেনের বাসায় গেলাম। ভদ্রলোক বেশ আলাপী।

পাকিস্থানের আপিসে একটা চমৎকার বই পড়লাম—ভাল কাজের জন্ত চাঁদা সংগ্রহের কৌশল। বইখানি চমৎকার ভাষায় অর্থসংগ্রহের পন্থা নির্দ্দেশ করেছে।

চারটার সময় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে যাওয়ার জন্ত বার হলাম। এটি নদীর অপর পারে। টাইগ্রিস নদীর উপর কয়েকটি সুন্দর সুন্দর সেতু আছে, তাদের একটি দিয়ে ওপারে গেলাম।

স্বর্ণ-বীণা
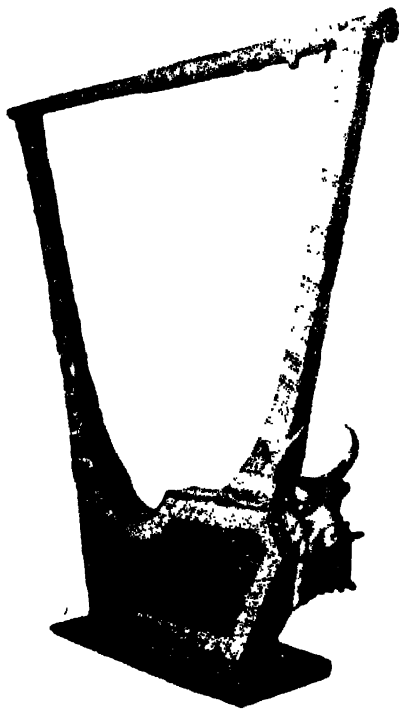
সন্ধ্যা সাতটায় বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল। বাগদাদ-প্রবাসী ভারতীয়দের অনেকেই এসেছিলেন। আমি ঘণ্টাদেড়েক বললাম—ওরা খুব খুশী হলেন। বাগদাদে এলাম, কিন্তু খেজুর খাওয়া হ'ল না। এটা সত্যই বড় একটা ভুল হয়ে গেল। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ খেজুরই ইরাক থেকে রপ্তানি হয়। আর এই খেজুরের চাষ ইরাকের প্রাচীনতম শিল্প। এখান থেকে বর্ত্তমানে নূতন পদ্ধতিতে খেজুরকে পরিষ্কৃত করে বিদেশে পাঠানো হয়।

রাত্রে আহার করে জিনিষপত্র অনেকটা গুছিয়ে নিলাম—আগামীকাল রওনা হতে হবে। সোমবার সকালেই মনের সাধে স্নান করে নিলাম সকলের আগে—একটু একটু শীত করছিল, কিন্তু তাকে আমলই দিলাম না। প্রাতরাশ সেরে শর্ম্মাজীর কাছে গেলাম দক্ষিণা দিতে।

শর্ম্মাজী বললেন—পণ্ডিতজ ফোন করেছেন, কে. এল. এমের বাসের জন্ত অপেক্ষা না করে আমি যেন ট্যাক্সি করে বিমান-পোতাশ্রয়ে চলে যাই, পণ্ডিতজী আর হংসরাজ সেখানে গেছেন। যথারীতি বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ট্যাক্সিতেই গেলাম—পাঁচ শিলিং খরচ হ'ল—পণ্ডিতজী সেটা দিয়ে দিলেন। প্লেন ছাড়বার দেরি ছিল। পণ্ডিতজী, হংসরাজ, গিল ও আমি তৃণাচ্ছাদিত মাঠে চেয়ার পেতে গল্প জুড়লাম।

বাগদাদ বিমান-পোতাশ্রয়

'ইরাণ টাইম্‌স' পত্রিকায় আমার বিষয় কিছু বার হয়েছিল—সম্পাদকের সহিত আমরা আলাপে আমি বলেছিলাম—আজ পৃথিবীতে ঐক্যের দিন এসেছে—এই ঐক্যের পথ মানুষে মানুষে, দেশজাতিনির্ব্বিশেষে একটি আন্তর্জ্জাতিক ভাষার অনুশীলনে সম্ভব। প্রত্যেক জাতি যদি নিজ নিজ মাতৃভাষার সঙ্গে একটি আন্তর্জ্জাতিক ভাষা শেখে—তা হলে খুব ভাল হয়। সম্পাদক মহাশয়কে বলেছিলাম—ইংরেজীর এই আন্তর্জ্জাতিক ভাষা হওয়ার শক্তি আছে।

বিমান ছাড়ল—পণ্ডিতজী আকুল নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কবে, ইংরেজ আমলে এসেছিলেন ভারত ছেড়ে, সেই থেকে রয়ে গেছেন আজও। বিমান থেকে বাগদাদ শহর চোখে পড়ল।

টাইগ্রিস নদীর দুই কূলে নূতনের জয়ধ্বনি বাজছে। ইরাকীরা নব নব পরিকল্পনায় ব্যাপৃত—নূতন আশায় এরা মেতেছে।

দাগ

শ্রীদীপক চৌধুরী

—'And their blood is the seed of the
future harvests.'

মহীতোষের বিবৃতি

আজ শুধু সুতপা রায়ের কথাই মনে পড়ছে। বার বার করে মনে পড়ছে। কলকাতার এই বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে সুতপা রায়ের অস্তিত্বটা বিন্দুর চেয়ে বড় ছিল না বটে, কিন্তু তবু তাকে ভোলা গেল না—দৃষ্টির বাইরে তাকে সরিয়ে দেওয়াও গেল না।

ভুলে যাওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। মানুষের স্মৃতি-শক্তির ওপর এত বেশী অত্যাচার এ যুগের মত অন্য কোন যুগেই আর হয় নি। অসংখ্য নামের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ঘটনাও মনে করে রাখতে হচ্ছে। একালের মত এত বেশী প্রাতঃ-স্মরণীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সংখ্যা অন্য কোন কালেই ছিল না। খবরের কাগজগুলির বুকে যুগপুরুষদের কি বিরাট মিছিল চলেছে দিনরাত! সুতপা রায়ের মত সাধারণ একটি মেয়ের বুকের ওপর দিয়ে মিছিলটা পার হয়ে গেল, থেৎলে গেল সুতপার গোটা অস্তিত্বটা। অথচ কাগজের গায়ে এক ইঞ্চিও দাগ লাগল না। এক ইঞ্চি কাগজের দাম না কি ষোল টাকারও বেশী।

হয়ত ষোল টাকার চেয়ে অনেক বেশীই হবে। তাই আজকের কাগজে সুতপার কোন খবর বেরোয় নি। এস-প্লানেডে ঘুরে ঘুরে সবগুলি দৈনিক আমি কিনে ফেললাম। আপিসে বসে পড়েও ফেললাম সব। কোথাও সুতপার নামটা আমি খুঁজে পেলাম না।

গতকল্যের ঘটনাটা কি দেশের লোকের জানা উচিত ছিল না? আপিসে বসে ঘটনাটা লিখলাম আমি। সবসুদ্ধ আট লাইন হ'ল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখুন ত, এই আট লাইনের খবরটা ছাপাতে কত টাকা লাগবে?"

টেবিলের ওপর উবু হয়ে বসে যুবকটি বিজ্ঞাপন পড়-ছিলেন। একটু বাদে যুবকটি হাসতে লাগলেন। হাসির ভঙ্গিতে তাঁর রহস্যের ঢেউ।

জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসছেন কেন?"

"না—এমনিই। সুতপা রায় আপনার কে হন?"

বললাম, "আমার কেউ নয়। এক আপিসে কাজ করি।"

"কোন্ আপিসে?" পুনরায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

বললাম, "বণিক আপিসে। উনি হচ্ছেন গিয়ে লাহিড়ী সাহেবের ষ্টেনো।"

"ওঃ—" যুবকটি লাইন গুনতে গুনতে জিজ্ঞাসা কর-করলেন, "মিস রায় বুঝি কাল ময়দানে গিয়েছিলেন বক্তৃতা শুনতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস সুতপা রায়।"

"তবে আপনি পয়সা খরচ করে খবরটা ছাপাচ্ছেন কেন?" যুবকের সুরে ভেসে উঠল হতাশা ও অভদ্রতার ধ্বনি।

পুনরায় সবিনয়ে বললাম, "দেখুন ত, আট লাইনের খবরটা ছাপাতে কত টাকা লাগবে।"

হিসেব করে এবার তিনি বললেন, "ষোল টাকা।"

মাসের প্রথম সপ্তাহ, তাই ষোল টাকা দিতে পারলাম আমি।

আমাদের আপিসে কাজ করে সুতপা রায়। মুখ চেনা ছিল। হয় ত দু'চার দিন দু'একটা কথাও হয়ে থাকবে। কি কথা হয়েছে প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব না। দরকারী কথা কিছু নয়। লিফ্‌টে করে চার তলায় ওঠবার সময় হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যেত। জড়সড় ভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত লিফ্‌টের কোণায়। বাঁচিয়ে রাখবার মত শরীরের সম্পদ তেমন তার কিছু নেই। তবুও সে সতর্ক থাকত। পাশের জায়গাটা দখল করতে গেলে অন্য পাশে সরে দাঁড়াত সুতপা। 'কেমন আছেন', জিজ্ঞাসা করলে, জবাব দিত চার তলায় উঠে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সুতপা খরচ করতে চায় না। এমন কি দুটোর বেশী তিনটে কথা পর্যন্ত না। আমি ভাবতাম, আর ঠিকই ভাবতাম যে, সঞ্চয় ওর কিছু নেই বলেই খরচের প্রতি ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে পথ চলবার সময় হঠাৎ কোন কোন দিন আমার চোখে পড়েছে ওর দ্বিতীয় অস্তিত্ব। একটা অশরীরী ছায়া সুতপার দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে চলতে থাকে ওরই পিছু পিছু। দ্বিতীয়

সুতপা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা যে নকল তা অবশ্য আমি বুঝতে পারি নি। বুঝবার জন্যে চেষ্টাও করি নি। গতকল্যের ঘটনাটা আমার চোখে না পড়লে ওর সঙ্গে আমার সত্যিকারের পরিচয় হ'ত না। হলেও ওর গায়ে আমি হাত দিতে পারতাম না। কাল আমি সুতপার গায়ে হাত দিয়েছি।

দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ওর নাকের তলায় আমি হাত রেখেছিলাম প্রথম। তার পর আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ওর চেপে ধরেছিলাম।

মনে আছে আঙুলগুলি আমার কাঁপছিল। পরে বুঝেছিলাম, শুধু আঙুল নয়, সমস্ত শরীরটাই আমার কাঁপছিল। দু'তিন বার চেষ্টা করেও ওকে কোলে তুলতে পারি নি। যখন পারলাম, তখন আমার হাসি পেল। বোধ হয় পঁচিশ কি ত্রিশ সের ওজন হবে। সুতপার ওজন যে এত কম বাইরে থেকে দেখে আমি বুঝতে পারি নি। আমি কেন, আপিসের কেউ কি বুঝতে পেরেছিল? কাল আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, সুতপা রায় দু'জন। একজন লাহিড়ী সাহেবের ষ্টেনো, অন্য জন কাল আমার কোলে চেপে ময়দানটা পার হয়েছে বিনা প্রতিবাদে। একজনকে চোখে দেখলে চেনা যায়, অন্য জনকে বুকের ওপর চেপে অনুভব করতে হয়।

খবরের কাগজের আপিস থেকে বেরিয়ে এসেছি প্রায় আধ ঘণ্টা আগে, বেলা এগারোটায়। লাহিড়ীসাহেব কেন, আপিসের সবাই এতক্ষণ বুঝতে পেরেছেন, সুতপা রায় আজ কাজে আসবে না। সুতপা ছাড়া আরও একজন ষ্টেনো আছে। মাদ্রাজী। তাকে দিয়ে লাহিড়ীসাহেব তাঁর কাজ চালিয়ে নেবেন। সুতপার অনুপস্থিতি কারও চোখেও পড়বে না। চোখে পড়বার মত সুন্দরী সুতপা নয়।

লিফটে চেপে চারতলায় উঠে এলাম। বণিক আপিসের মস্তবড় হল-ঘরটায় বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা নেই। মেশিনের নিয়মানুবর্ত্তিতা পাখার হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরটার চতুর্দ্দিকে। ইশারা করে বড়বাবু ডাকলেন আমায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "বাইরে এতক্ষণ কি করছিলেন?" বড়বাবু জানতেন সত্য কথা আমি বলব না। কোন্ মানুষটা সত্য কথা বলে? বড়বাবু পৃথিবীটা দেখছেন অর্দ্ধ শতাব্দীর ওপর। তিনি কি জানেন না যে, স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে এখানে কেউ সত্য কথা বলতে চায় না?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "লাহিড়ীসাহেব আমায় ডাকছিলেন নাকি?"

"না। তিনি এখনও আপিসে আসেন নি।"

বড়বাবুর কথা শুনে খুবই আশ্চর্য বোধ করলাম। কোনদিনই ত তাঁকে লেট হতে দেখি নি। সকাল সাড়ে ন'টায় তিনি আসেন। দশটা পর্যন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর হেণ্ডারসন সাহেবের কামরায় মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি। দশটার একটু পরে ডেকে পাঠান মিসেস সুতপা রায়কে। আজ দেখলাম, নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

বড়বাবু বললেন, "বিলেত থেকে আজ আমাদের একজন নতুন সাহেব আসছেন, মিষ্টার হেওয়ার্ড।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। হেণ্ডারসন সাহেব দেশে চললেন। বোধ হয় আর ফিরবেন না।" একটু থেমে বড়বাবুই আবার বললেন, "শুনলাম, ছোকরা সাহেব। বড়কর্ত্তাদের আত্মীয়...জানেন, মিসেস্ রায় অসুস্থ?"

"অসুস্থ নয়, আহত। আপনি খবর পেলেন কি করে? খবরের কাগজে নিউজ বেরিয়েছে নাকি?"

"কি যে বলেন! একটু আগে একটা চিঠি পেলাম। গড়িয়া থেকে কে একজন এসে দারোয়ানের হাতে চিঠিখানা দিয়ে গেছে।...কিন্তু লাহিড়ী সাহেবের আবার কি হ'ল?"

"আর যাই হোক, তিনি নিশ্চয়ই আহত হন নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যাঁরা দু' হাজার টাকা মাইনে পান... আচ্ছা, আমি এবার চলি বড়বাবু। হাতের কাজ সব শেষ করে দিচ্ছি। এক ঘণ্টা আগে আজ ছুটি চাই।"

"কেন?"

"গড়িয়া যাব।"

হাতের কাজ শেষ করতে পারি নি। কিন্তু আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম চারটের আগেই। সুতপা কাল আমায় অনুরোধ করেছিল, যদি সময় পাই তা হলে ওকে যেন একবার দেখে আসি। পাঁচ বছর একই আপিসে একসঙ্গে কাজ করছি। রবিবার এবং ছুটির দিনগুলি বাদ দিলে ওকে ত প্রত্যেক দিনই দেখেছি। দেখেছি এবং ভুলেও গেছি তখন লাহিড়ীর ষ্টেনো সুতপা রায়কে। আজ যাকে দেখতে যাচ্ছি তার পরিচয় নতুন—হয় ত সারা জীবনেও তাকে ভোলা যাবে না। দ্বিতীয় সুতপার নিঃশ্বাস আমার গায়ে লেগেছে।

ময়দানের জনসভায় কাল আমিও গিয়েছিলাম বক্তৃতা শুনতে। বিরাট জনসভা। আইনের চাবুক মেরে সমাজ-দেহের গলিত মাংস সব ফেলে দিচ্ছিলেন ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হবে। সামাজিক বিপ্লবের জয়পতাকা আমিও দেখতে চেয়েছিলাম। ময়দানের সভায় কাল আমিও তাই উপস্থিত ছিলাম।

সভাশেষে উত্তেজিত জনতা স্রোতের জলের মত ছুটে

চলেছে ময়দানের চতুর্দ্দিকে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক পাশে। পেছন থেকে গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু দূরেই দেখলাম সুতপা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ময়দানের বুকের ওপর। ওর কাছে গিয়ে পৌঁছতে সময় লাগল আমার। উন্মত্ত জনতা তখন বক্তৃতামঞ্চের দিকে ছুটছে। এরা কেউ বক্তৃতা শুনতে আসে নি। ভারতবর্ষের যাঁরা নেতা তাঁদের মুখ দেখবার জন্যেই এখানে আজ এত ভিড়।

সুতপার কাছে গিয়ে পৌঁছতে বোধ হয় মিনিটপাচেক লেগেছিল। কেউ সেখানে আর তখন ছিল না। বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে গঙ্গার পশ্চিম পারে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঈষৎ পূর্বের উত্তাপ সব এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে —ময়দানের বুকে নরম অনুভূতি। কচি কচি সবুজ ঘাসের মাথাগুলি জনতার পায়ের চাপে নুয়ে পড়েছে। তারই ওপর ভেঙে পড়েছে আমাদের আপিসের সুতপা রায়।

নাকের তলায় হাত রাখলাম। নিঃশ্বাসের তাও দেখলাম এখনও নিঃশেষ হয় নি। কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তের রং লাল নয়। তামাটে রঙের বিন্দু দেখলাম ওর ভাঙা চোয়ালের মধ্যে এসে আটকে রয়েছে। সুতপার নষ্ট স্বাস্থ্যের পাঁক আমার হাতে ঠেকল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে গিয়ে অনুভব করলাম রক্তের ফোঁটাগুলি ঠাণ্ডা। —বুঝলাম উষ্ণতার পুঁজি ওর কত কম!

দু'একজন সংবাদদাতা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটু বাদেই কাছে এগিয়ে এলেন তাঁরা। সুতপার নাম এবং পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, আগামী কল্যের সংবাদ পত্রে যেন ঘটনাটার উল্লেখ থাকে।

মুহূর্ত পূর্বেও ভাবতে পারি নি যে, সুতপা রায়ের গোটা অস্তিত্বটা বহন করবার শক্তি রাখি আমি। নিজের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না। কিন্তু আলগা করে ওকে যখন আমি তুলে ফেললাম, তখন আমার হাসি পেল। আধ মাইল লম্বা ময়দানটা পার হয়ে গেলাম হাসতে হাসতে।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় এসে ট্যাক্সি নিলাম। হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যই আমার ছিল। হঠাৎ দেখি সুতপা সোজা হয়ে উঠে বসেছে। উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীর আঁচল দিয়ে দেহটাকে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করছে। দেহ? বোধ হয় অন্য কিছু হবে। ঢাকবার মত দেহের আকৃতিতে ওর আদিম ঐশ্বর্য নেই। থাকলে, বণিক আপিসের তপন লাহিড়ীকেও আজ আমি এখানে দেখতে পেতাম।

তবুও দেহটাকে ভাল করে ঢাকবার জন্যে সুতপার সে কি চেষ্টা। ট্যাক্সির কোণার দিকে সরে বসলাম আমি। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "আমি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম, না?"

"বোধ হয় মাটিতে পড়ে যাবার পর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এখন কেমন আছেন আপনি?"

"অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।"

"তা হলে কি হাসপাতালে যাবেন না?"

"হাসপাতাল?" চৌরঙ্গীর দিকে চেয়ে সুতপা রায় বলল, "না, কিছু দরকার নেই। মাসীমার ওখানেই যাব। গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে বলুন।"

মেট্রো সিনেমার কাছ থেকে গাড়ীটা ঘুরল। ঘুরল উল্টো দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যেতে হবে?"

"গড়িয়া।"

সামনের দিকে মুখ করে ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, "করপোরেশন এলাকার বাইরে যেতে পারব না।"

সুতপা রায় সঙ্কুচিত ভাবে বলল, "গড়িয়াহাটের মোড়ে গিয়ে আমরা বাস ধরব। আপনি যখন সঙ্গে আছেন, তখন আর ওকে গড়িয়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই।"

বললাম, "আপনি ভাববেন না। বাড়তি পয়সা পেলে ট্যাক্সিওয়ালা ভূ-প্রদক্ষিণ করতেও রাজী হবে।...আপনার কি খুব লেগেছে?"

চুপ করে রইল সুতপা রায়। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলাম আমি। এবার সে ধীরে ধীরে বলল, "না তেমন কিছু নয়। শরীরটা ভাল ছিল না। হঠাৎ কেমন দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। কখন যে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম মনে নেই। পড়ে যাওয়ার পরে মনে আছে ওরা সব আমার গায়ের উপর পা ফেলে এদিক-ওদিকে ছুটতে লাগল।"

"ওরা? ওরা কারা মিসেস রায়?"

"পুরুষমানুষেরা।"

শেষের কথাটা সুতপার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত ধীরে ধীরে। মনে হ'ল বিদ্বেষের কাদায় প্রতিটি অক্ষর ভারী হয়ে উঠেছে। অক্ষরগুলো আজই হঠাৎ কর্দমাক্ত হয়ে উঠে নি। ওর মনের উপর পায়ের দাগ পড়েছে অনেক দিন আগে।

আমি বললাম, "আপনার নাক এবং মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল।" মুহূর্তের জন্যেও অবাক হ'ল না সুতপা রায়। কোন কিছু জানতেও চাইল না সে। অতএব আমাকেই আবার বলতে হ'ল, "একবার ভাল করে দেখুন ত বুকে পিঠে কোথাও আঘাত লেগেছে কি না।"

এবার সে ওপাশ থেকে মুখটা তার ঘুরিয়ে নিয়ে এল। চোখদুটো তুলে ধরল আমার দিকে। চোখের ভঙ্গিতে ওর আঘাতের গভীরতা দেখতে পেলাম আমি। দু'দশ জন

পুরুষমানুষের পায়ের চাপে এত বেশী আঘাত কেউ পায় না। আমি তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "খুব বেশী লেগেছে, না ?"

তপন লাহিড়ীর ষ্টেনো সুতপা রায় আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। মুখ নীচু করে চোখের জল ফেলতে লাগল সে।

লোয়ার সারকুলার রোড পার হয়ে এলাম। গুরুসদয় দত্ত রোড পর্যন্ত কোন কথা হ'ল না। এরই মধ্যে বার-কয়েক আমি এসপ্লানেডের আপিসটা ঘুরে এসেছি। পাঁচ বছর আগে যেদিন সুতপা প্রথম এসে আমাদের আপিসে কাজে যোগ দিল সেদিনটাও চোখের উপর ভেসে উঠল আমার। আমরা সবাই সেদিন ভাল জামাকাপড় পরে এসেছিলাম। আমাদের আপিসে মেমসাহেবের সংখ্যা বড় কম নয়। কিন্তু বাঙালী মেয়ে কেউ ছিল না। সুতপা এল প্রথম। এতদিন যেন আমরা ইংরেজ বণিক আপিসে ডাঙার মাছের মত নিশ্বাসও নিতে পারছিলাম না। স্বাধীন ভারতবর্ষেও গোলামির মানসিকতা থেকে মুক্তি পাই নি আমরা। সুতপা যেন আমাদের জন্য প্রথম এই মুক্তির জল নিয়ে এল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য বড়বাবুও সেদিন গলা-বন্ধ কোটের ইস্ত্রি বাঁচিয়ে আপিসে এসেছিলেন। বাগবাজার থেকে ট্যাক্সি ধরেছিলেন তিনি।

তার পর সুতপা যখন লিফটে করে চারতলায় উঠে এল তখন দেখলাম বড়বাবুই প্রথম তাঁর গলাবন্ধ কোটের ইস্ত্রির ভাঁজ সব নষ্ট করে ফেললেন। গা থেকে কোটটা খুলে রেখে দিলেন চেয়ারের হাতলের উপর। সুতপার ভাঙা চোয়ালের রুগ্নতা বণিক আপিসের ধুলোর সঙ্গে মিশে রইল। কেউ আর ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে চোখও তুলল না। আমিই কেবল সুতপা রায়ের দ্বিতীয় অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলাম। ধুলো থেকে তুলে আনবার লোভ আমি তাই কোনদিনই গোপন করতে পারি নি। এখন ত আমি ওর পাশেই বসে আছি। গুরুসদয় দত্ত রোড পার হয়েও এলাম।

গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে বললাম, "একজন ডাক্তার আমার চেনা আছে। তিনি এই অঞ্চলেই থাকেন, চলুন না, একবার তাঁকে দেখিয়ে আসবেন ?"

"কি দেখাব ?"

"ব্যথা—মানে যে জায়গাটায় আঘাত লেগেছে।"

"মাসীমার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ব্যথা বেদনা আর কিছু থাকবে না।"

যোধপুর ক্লাব ডানদিকে রেখে ট্যাক্সিটা যাদবপুরের রাস্তা ধরেছে। কয়েক বছর আগে এদিকটায় একবার এসেছিলাম। আজ আমার চোখে গোটা এলাকাটা নতুন নতুন ঠেকতে লাগল। দু'দিকের ফাঁকা মাঠে বড় বড় বাড়ী উঠেছে। ডোবাগুলোও দেখলাম নেই। মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপরও বাড়ী তোলা হয়েছে। এ অঞ্চলের নির্জনতা লুপ্ত। ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত টিন এবং টালির ঘরগুলো দেখে মনে হ'ল, রিফিউজীদের কলোনী তৈরি হয়েছে রাস্তার দু'ধারে। ডানদিকের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল আমার—বাঘা যতীন কলোনী। যাদবপুরের পুরনো মাটিতে নতুন ঘাসের সমারোহ !

ট্যাক্সির মিটারের দিকে চেয়ে বললাম, "দূর ত কম নয়। প্রত্যেক দিন সময়মত আপিসে পৌঁছোন কি করে ?"

"একটু আগে বেরুতে হয়। গড়িয়ার মোড় থেকে পাঁচ নম্বর ধরি। ফেরবার মুখেও আবার সেই পাঁচ নম্বরই ধরতে হয়।" এই বলে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে সুতপা রায়ই আবার বলল "প্রায় বারো মাইল যেতে, বারো মাইল আসতে।"

"আপিসের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রত্যেকদিন চব্বিশ মাইলের চাবুক পড়ছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বেন।"

"মাসীমাকে ছেড়ে আসবার ক্ষমতা আমার নেই। তা ছাড়া মেসোমশাইও সেখানে আছেন। তাঁরা আমার আত্মীয় নন। সেই জন্যেই ছাড়তে পারি না।"

জ্ঞান বাড়ছে আমার। বণিক আপিসের সর্বগ্রাসী আধিপত্যের দূষিত আবহাওয়া থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পাচ্ছি আমি। সুতপা রায়কে তপন লাহিড়ীর ষ্টেনো বলে মনে হচ্ছে না আর। ওর ভাঙা চোয়ালে মাংস গজাচ্ছে। শহর কলকাতার বর্বরতা বাঘা যতীন কলোনীর সীমানা পার হতে পারে নি। প্রাক্‌সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোয় দেখলাম বৈষ্ণবঘাটার মাঠে সবুজের ঢেউ উঠেছে। কচি কচি ধান গাছের শীর্ষদেশে সভ্যতার বিজ্ঞাপন। লোভের কাস্তে খেয়ে এরা এখনও ক্ষতবিক্ষত হয় নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, "মেসোমশাই কি করেন ?"

"কি একটা কাজ করতেন। এখন তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। শুনেছি এক সময়ে তাঁর প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ছিল। এখন আর কিছু নেই। সরকার-কুঠি নামে পৈতৃক বাড়ীটা শুধু আছে। সরকার কুঠি পাকা বাড়ী। মাসীমা পেইং-গেষ্ট রাখেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "পাড়াগাঁয়ের মধ্যে তিনি হোটেল খুলেছেন বুঝি ?"

"না। হোটেল কিংবা মেসবাড়ী এটা নয়। অবশ্যই থাকা এবং খাওয়ার জন্যে পয়সা দিতে হয়। বাইরে থেকে সরকার-কুঠির বৈশিষ্ট্য কেউ বুঝতে পারে না। এখানে প্রথমে থাকতেই আসে। তার পর সবাই এখানে আশ্রয়

পায়। সরকার-কুঠি হোটেল নয়, এটা হচ্ছে মাদ্রাজীর পরিবার, সংসারও বলতে পারেন।" এই বলে সুতপা বাইরের দিকে আঙুল তুলে পুনরায় বলতে লাগল, "ওইটা হচ্ছে গড়িয়ার খাল। আমরা এবার বাঁদিকে ঘুরব। ডানদিকের রাস্তাটাকে রক্ষিতের মোড় বলে। একটু এগিয়ে গেলেই পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির দেখতে পাবেন। আমার আজ সেখানে পূজো দেবার তারিখ ছিল।"

"আপনি পূজো দেন বুঝি ?" বিস্মিত হলাম আমি।

"হাঁ। আজ দিতে পারি নি। বোধ হয় সেই জন্যেই শাস্তি পেলাম। পঞ্চানন ঠাকুরের ছটা পা-কে উপেক্ষা করতে গিয়ে, আপনি নিজেই ত দেখলেন, হাজার লোকের পায়ের দাগ নিয়ে আজ আমি বাড়ী ফিরছি।" সুতপা চোখ বুজল। ভাল করে হেলান দিয়ে বসল ট্যাক্সির পেছনে। আমি ওর দিকে চেয়েছিলাম হাজার মানুষের পায়ের দাগ দেখবার জন্যে মন আমার একবারও উদগ্রীব হয় নি। আমি দেখবার চেষ্টা করছিলাম শুধু একটা দাগ, যে দাগ কেবল একটা মানুষের পা থেকে উৎপাদিত হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, শুধু সেই দাগটিই ওর মনের আকাশটাকে কালো করে রেখেছে। হাজার মানুষের নিষ্ঠুরতা হয় ত বা সে এরই মধ্যে দেহ থেকে মুছে ফেলেছে। ডাক্তারের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ হয় ওর সত্যিই নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ময়দানে গিয়েছিলেন কেন ? পঞ্চানন ঠাকুর আপনাকে যা দিতে পারেন, দুনিয়ার অগণিত নেতার ত তা দেবার সাধ্য নেই।"

"মানুষের ত ভুল হবেই মহীতোষবাবু। পঞ্চানন ঠাকুর বক্তৃতা দিতে পারেন না বলেই সম্ভবত আমি বক্তৃতা শুনতে ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসবার পরে প্রথমেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন ?"

"আপনি বলুন, আমি শুনি।"

সুতপা বলতে লাগল, "ভাগ্যিস্ মন্দিরের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে একটি দেবতাও বক্তৃতা দেবার ভাষা পান নি !"

আমার সন্দেহ হ'ল, মহিলাটি আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতে রাজী নয়। ময়দানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা সে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চাইছে না।

ট্যাক্সি থেকে নামতে হ'ল। সরকার-কুঠি পর্যন্ত গাড়ী যায় না। তা ছাড়া খানিকটা নীচে নামতে হবে, গড়িয়ার খাল পর্যন্ত। দু'পা হাঁটবার পরে সুতপা বলল, "কষ্ট হচ্ছে।"

"কোথায় ?" আমার প্রশ্নের প্রত্যক্ষতায় সুতপা একটু বিচলিত বোধ করল। জবাব দিতে দেরি করতে লাগল সে। আঁচলটা আলগা না করে সে আরও বেশী সতর্কভাবে আঁচলটাকে গুছোতে লাগল। গুছোতে গুছোতে সে বলল, "ডান পায়ের হাঁটুটা বোধ হয় জখম হয়েছে। হাঁটতে কষ্টই হচ্ছে খুব।"

"হাঁটবার কি দরকার ? ময়দান থেকে চৌরঙ্গীর রাস্তা পর্যন্ত ত হেঁটে আসেন নি।"

"এতটা কাছে কি করে যে এসে গেলেন তাই ভাবছি। আমি যে তপন লাহিড়ীর চেনা তা বোধ হয় আপনি জানেন মহীতোষবাবু ?"

"জীবনের ময়দানটা এত বড় যে, তপন লাহিড়ী তাঁর দৃষ্টি দিয়ে সবটা দেখতে পাচ্ছেন না। মানুষের দৃষ্টি যে সীমাবদ্ধ তা বোধ হয় আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন।"

"জানি। আর এও জানি যে, পঞ্চানন ঠাকুর মানুষকে এই জায়গায় পরাস্ত করেছেন। তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন না বটে, দেখতে পান সবই।"

"তা হলে বিপদ সব কাটল। এবার আসুন, আমার হাতের উপর ভর দিয়ে পথটুকু পার হবেন।"

সুতপা রায় পথ চলতে লাগল আমাকে অবলম্বন করে। ঢালু রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলাম আমরা। গড়িয়ার খালটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মরা খাল। জল যতটা আছে তার চেয়ে কাদার পরিমাণ বেশী। গড়িয়ার এটা ব্যাকওয়াটার। সুতপার জীবনটাও যেন ঠিক এরই মত বলে মনে হ'ল আমার।

সমতল রাস্তায় নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিষ্টার রায়, মানে আপনার স্বামীও কি এখানে থাকেন ?"

"না।"

"আমারও ঠিক এই রকমই ধারণা হয়েছিল।"

"একথা কেন বলছেন ?"

"বলছি আপনি ময়দানে গিয়েছিলেন বলে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন সম্বন্ধে আপনার এত আগ্রহ কেন ?"

"কিন্তু আমি ত বিচ্ছেদ চাই না। তবুও ময়দানে আমি গিয়েছিলাম। মহীতোষবাবু, আমি ভেবেছিলাম, দিল্লীর বড় নেতা আজ ময়দানে বিপ্লবের আগুন জ্বালাবেন। আগুনের তাপ লাগাতে গিয়েছিলাম। নইলে—নইলে আমি যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি !"

পাঁচ বছর ধরে যাকে দেখছি তার পক্ষে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাকে দেখি নি তার উত্তাপ আমি অনুভব করছি। হাতের আস্তিন আমার গুটানো ছিল। সুতপা আমার ডান হাতের উপর ভর দিয়ে পথ চলছে। ওর দ্বিতীয় অস্তিত্বটা আমার উপর অবলম্বনশীল

ময়। পঞ্চানন ঠাকুরকে যে মেয়েটি পূজো দিতে যায়, সে আজ ময়দানের সভায় বিপ্লবের আগুন গায়ে লাগাতে যায় নি। সুতপাকে বুঝতে সময় লাগবে। আমি জানি, বিপ্লবের নতুন বিগ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

সরকার-কুঠিতে প্রবেশ করবার রাস্তাটা খুব সরু। পল্লীগ্রামের পরিবেশ এখান থেকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মোটর, বাস কিংবা লরী চলার আওয়াজ উঁচু রাস্তাটা থেকেও শুনতে পেয়েছি। এখানে শুধু নির্জনতার স্থায়ী আয়োজন। রাস্তার দু'ধারে নারকেল আর সুপারী গাছের সারি। ঝিরঝির হাওয়ায় উঁচু মাথাগুলো নড়ছে বটে, কিন্তু নীচের নির্জনতাকে আঘাত করতে পারছে না। গড়িয়ার খালটা বাঁ দিক থেকে বাঁক নিয়েছে। আমরা ডান দিকের ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

মাসীমাকে দেখলাম। মেসোমশাই ত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একতলার বড় ঘরটাতে ভিড় জমেছে। এটাই বোধ হয় সরকার-কুঠির বসবার ঘর। প্রথম দৃষ্টিতে মাসীমার সংসারের আর্থিক দৈন্য আমার চোখে পড়ল। ক'খানা ভাঙা চেয়ার আর বেঞ্চি পাতা রয়েছে। সবগুলো চেয়ারের হাতল ভাঙা। ঘরের এক কোণায় একটা চৌকি ছিল দেখলাম। সুতপাকে ধরে মাসীমা এই চৌকির উপর শুইয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'ষষ্ঠী, যাও তো বাবা একটা বালিশ নিয়ে এস।"

ষষ্ঠী বালিশ আনতে গেল। লোকটি একটু মোটা ধরণের মানুষ। বয়স মনে হ'ল চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। দিন বারো দাড়ি কামায় নি। কাঁচা-পাকা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মত ছুঁচলো হয়ে উঠেছে।

আমার দিকে চেয়ে মাসীমা বললেন, "বোস বাবা বোস। বলরাম গেল কোথায়? একটা চেয়ার এগিয়ে দে ত বাবা।"

তের-চোদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলে হাতল-ভাঙা চেয়ারটা আমার কাছে এনে বলল, "আপনি বসুন, আমি ধরে থাকছি।" মাটিতে বসে বলরাম চেয়ারের তলায় নিজের ঘাড় ঠেকিয়ে রাখল। চেয়ারের একটা পা নেই।

বলরামের ঘাড় চেপে বসবার মত দেহের ওজন আমার হাল' ছিল না। ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম, "মেঝে থেকে উঠে এস ভাই।"

বালিশ নিয়ে ষষ্ঠীবাবু ফিরে এসেছে। সে বলল, 'আপনি ভয় পাবেন না, বসুন। বলরামের ঘাড়েগর্দানে অনেক তাকত।"

মাসীমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ওরে, ঐ বেঞ্চিটা একটু এগিয়ে নিয়ে আয় ত। চেয়ারগুলি বাবা অনেক দিন থেকে ভেঙে পড়ে আছে। এবার সব মেরামত করাতে হবে।"

বুঝলাম, আমার জামাকাপড়ের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে এঁরা সবাই বিব্রত বোধ করছেন। মেসোমশাই ইত্যবসরে একটা বেঞ্চি ঠেলতে ঠেলতে আমার সামনে নিয়ে এসেছেন। ত্রিশ নম্বর হেসিয়ানের মত মোটা সুতোর বোনা কাপড়ের প্যান্ট পরেছেন তিনি। প্রথম তাঁর দিকে চেয়ে সত্যিই আমার মনে হয়েছিল যে, প্যান্টের কাপড়টা সাহেব কোম্পানীর চটকলে তৈরী। তাও নতুন নয়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বস্তার ফাঁকে ফাঁকে যেন গড়িয়া খালের কাদা জমেছে। মেসোমশাই পকেট থেকে রুমাল বার করে বেঞ্চিটা মুছতে মুছতে বললেন, "কাল বোধ হয় বলরাম বেঞ্চির ওপর শুয়ে রাত কাটিয়েছে। ও ত ঠিক আইনমত পেইং গেষ্ট নয়। ফিল্ম কোম্পানীর ষ্টুডিওর সামনে থেকে ষষ্ঠী ওকে তুলে নিয়ে এসেছে।"

প্রতিবাদ করল ষষ্ঠীবাবু, "সামনে থেকে নয়। চায়ের দোকান থেকে। ষ্টুডিওর পশ্চিম দিকটাতে একটা চায়ের দোকান আছে। সেখানে সব ফিল্মের 'এক্সট্রা' পাওয়া যায়। তাগড়া তাগড়া ছেলেগুলো মশাই দিনরাত ধুঁকছে। মরা সৈনিকের পার্ট ত সব সময়ে জোটে না। মাসীমা, তোমার ত ভুতোর কথা মনে আছে? ছোঁড়াটা পাঁচ বছর আগে যখন এসেছিল তখন ওর বয়স ছিল পনর। এখন দেখলে মনে হবে, একশ' পনর।"

"তা বাবা, তোমার কথা ত মিথ্যে হতে পারে না। তুমি হচ্ছ গিয়ে ও লাইনের পুরনো লোক।" মন্তব্য করলেন মাসীমা মেসোমশাই বাকী পরিচয়টুকু শেষ করলেন, "ষষ্ঠী হচ্ছে গিয়ে ফিল্ম কোম্পানীর মেক্-আপ ম্যান। কিন্তু ষষ্ঠীর মুখে আজ এত কথা ফুটছে কি করে? গত দশ বছরের মধ্যে ষষ্ঠী বোধ হয় দশটার বেশী কথা বলে নি।"

"বলরামই বোধ হয় ওকে বকাচ্ছে। হ্যাঁ বাবা, তুমি কি বসবে না?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

মেসোমশাই সহসা রুমাল দিয়ে পুনরায় বেঞ্চিটা মুছতে লাগলেন। বেঞ্চিটা তাতে আরও বেশী ময়লা হ'ল। নোংরা জমে জমে রুমালটা খাকী রঙের মত তামাটে হয়ে উঠেছে। মেসোমশাই আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন। বললেন তিনি, "একটু নস্যি নেওয়ার অভ্যাস আছে মশাই।"

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটু হাসতে বাধ্য হলাম।

বলরাম মেঝে থেকে উঠে পড়েছে। চেয়ারটা দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে সে এসে সামনে দাঁড়াল। মাসীমা ওর দিকে চেয়ে বললেন, "যা ত বাবা গরম জলের ব্যাগটা নিয়ে

আয়। উনোনে জলের কেটলী চাপানোই আছে। সেটাও নিয়ে আসিস।"

বলরাম চলেই যাচ্ছিল, এমন সময় মাসীমা বললেন, "না বাপু, থাক। তুই পারবি নে। হাত-পা পুড়িয়ে ফেলবি। আমি নিজেই যাচ্ছি।" মাসীমা উঠলেন। বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

অনেকক্ষণ থেকে আমি বলরামকে দেখছিলাম। গায়ে ছটো শার্ট পরেছে। পরনেও দেখলাম দু'খানা ধুতি। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ষষ্ঠীবাবুই আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, "বলরাম হচ্ছে গয়ে রিফিউজীর বাচ্চা। মা বাপ কেউ নেই। গত দশ বছর থেকে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাক্স পেটরা নেই, অথচ একটা শার্ট আর একটা ধুতি ওর বেশী আছে। কোথায় রাখবে ও ছটো? গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চায়ের দোকান থেকে সেদিন তুলে নিয়ে এলাম।"

ষষ্ঠীবাবু বিদায় নিল। পেছন দিকে চেয়ে দেখি, মেসো-মশাইও সেখানে নেই।

সুতপাকে বললাম, "এবার তা হলে আমি যাই। মাসী-মার সংসারটা দেখে গেলাম।"

"কিছুই দেখেন নি। সবটা দেখতে সময় লাগবে। কাল একবার আসবেন।"

"আসব। মিষ্টার লাহিড়ীকে কিছু বলতে হবে কি?"

"না।"

এই সময়ে মাসীমা গরম জলের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সুতপাকে বললেন তিনি, "চল্, তোর ঘরে গিয়ে শুবি। মাঠে-ময়দানে যাওয়ার কি দরকার ছিল তোর? থাক, থাক, আমাকে আর বিপ্লবের গল্প শোনাস নে। ফাঁকা মাঠে যারা চেঁচায় তাদের মুরোদ আমি জানি। বিপ্লব আনবেন পঞ্চানন ঠাকুর, বিপ্লব আসবে মনে। আর কোনদিন ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে ময়দানে যাস নি তপা। হ্যাঁরে, এই বাবুটিকে চা খেতে বললি নে?"

"না, না—এমন অসময়ে আমি আর চা খাব না মাসীমা।"

মুখ তুলে আমার দিকে চাইতে গিয়ে সহসা তিনি তাঁর মুখটা নীচু করে ফেললেন। ধীরে ধীরে বললেন তিনি, "লালু বেঁচে থাকলে আজ তার তোমার মতই বয়স হ'ত। তোমার মত জোয়ান ছিল সে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় এক দিন ভোররাত্রে এক হাজার পুলিশ এই বাড়ীটাকে ঘেরাও করে। কি করে যেন ওরা সন্ধান পেয়েছিল, লালু সেই রাত্রে বাড়ী ফিরবে। লালুকে ওরা অনেক দিন থেকে খুঁজছিল। দুমদাম করে সরকার-কুঠির দরজাগুলি ওরা ভেঙে ফেলল। পুলিশসাহেব বিপিন চাটুজ্জের নাম শুনেছ ত? কোন কিছুই বুঝতে না পেরে আমি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম। ওমা, সামনে দেখি পিস্তল হাতে নিয়ে বিপিন দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে এক পাশে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল দোতলার ছাদে। একটু বাদেই শুনি, গুলির আওয়াজ হচ্ছে। চারদিক থেকে আওয়াজ আসছে। দোতলার ছাদ থেকে লালু লাফিয়ে পড়ে-ছিল। বোধ হয় ভেবেছিল পেছন দিকের খালটা সহজেই পার হয়ে যেতে পারবে। মরা খাল। বিপিনের গুলি খেয়ে সে গড়িয়ে গড়িয়ে খালের কিনারা পর্যন্ত গিয়েছিল বটে, কিন্তু পার হতে সে পারে নি। লালু শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোর হ'ল। গুলির আওয়াজ শুনে চড়ুই পাখীগুলি সেদিন কি ভীষণ ভাবে কিচির মিচির করছিল। বিপিনের মত পুলিশ সাহেবকে ওরাও বোধ হয় চিনতে পেরেছিল। পেছন দিকে আমিও ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে বিপিন সেখানে পৌঁছে গেল। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নীচে নামছিল। এই ঘরটার দেওয়ালের পলস্তারা খসে পড়ল দু'চার জায়গায়। সেই থেকে উনি আর ঘর মেরামত করান না। আজ দেখছ, গোটা বাড়ীটার পলস্তারাই খসে পড়েছে। কিন্তু বিপিন কি কাণ্ড করল জান? ক্ষতবিক্ষত লালু বোধ হয় শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগের মুহূর্তে একটু জল খেতে চেয়েছিল। গড়াতে গড়াতে খালের কিনারায় গিয়ে মুখ নীচু করে যেমন জল খেতে যাবে, বিপিন এসে অমনি আবার ওর ঘাড়ের উপর গুলি ছুঁড়ল। 'মাগো' বলে লালু টুপ করে গড়িয়ে পড়ল জলে। গড়িয়ার খালে স্রোত নেই। বিদ্রোহী লালু সরকারের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এখনও বোধ হয় ঠাণ্ডা হয় নি।... হ্যাঁরে তপা, শুনলাম স্বাধীন ভারতবর্ষে বিপিন চাটুজ্জে নাকি আরও বড় চাকরি পেয়েছে?"

গরম জলের ব্যাগটা দু'হাতে চেপে ধরে মাসীমা চেয়ে রইলেন পূবদিকের দেয়ালে।

পলস্তারা নেই, ছটো বড় বড় গর্ত চোখে পড়ল আমার। মাসীমার বুকের সঙ্গে দেয়ালটার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে!

ক্রমশঃ

দরদী কথাশিল্পী

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মহান্ কথাশিল্পী বলে নয়,
গভীর তার প্রাণের পরিচয়।
নিবিড়তম প্রিয়ের মত যারে
পেয়েছিলাম আত্মসহচর,
বাসর-শেষে যায় সে চলে ঘর ;
দেশের মাটি ডাক দিয়েছে তারে।
গাঁয়ের ডাক, মায়ের ডাক বলেই মনে হয় ;
নেই যে তার প্রয়োজনের সময় অসময়।
শিল্পীমন যদিও গান
গেয়েছে, তারই করেছে ধ্যান,
দূরের থেকে দিয়েছে মান,
চেয়েছে তারই হাতের বরাভয়।
নিবিড় করে পেয়েছি তার প্রাণের পরিচয়।

বড় বলেই দূরেই সে তো নয় ;
গাঢ় আকাশ দূরেই মনে হয়।
মনের নীড়ে আছে যে তার বিপুল পরিসর ;
প্রাণের রসে সজীব ব্যবহারে
টানে সে মন, সকলে ছেড়ে সে যায় চলে ঘর,
দেশের মাটি ডাক দিয়েছে তারে।
গাঁয়ের ডাক, মায়ের ডাক সমান মনে হয় ;
সেখানে তার গূঢ় গভীর প্রাণের পরিচয়।
জীবন ঘিরে দুঃখের বান
ডেকেছে, তবু গেয়েছে গান
শিল্পীমন, পেতেছে কান
সেখানে তার রয়েছে শেষ জয়।
বড় বলেই গাঢ় আকাশ, দূরেই সে তো নয়।

আমরা যারা তাকে আপন ভাবি,
শূন্য মনে ভাবছি তার অভাবই—
সহজ মেলামেশার ফলে কত
এসেছি কাছে, তবু সে যেন নদী
পাই নি যার উৎস খুঁজে, তবু সে নিরবধি
মেটালো স্নানপানের সুখ যত ;
দিনে দিনেই বেড়েছে তবু অবুঝ শত দাবি ;
হয়তো তার অনর্গল মনের মায়াচাবি
পেয়েছি, আর মূঢ় খেলায়
কাটিয়ে দিন অবহেলায়
পড়েছে মনে শেষ বেলায়
হারাই তার বাক্য মধুস্রাবী,
আমরা যারা নিবিড় করে তাকে আপন ভাবি।

বিচ্ছেদের করুণ মেঘস্তর
আড়াল যাকে করলো অতঃপর,
আলো যে তার রইলো কাছে কাছে,
বুকে নিবিড় উষ্ণতার মাপে,
হৃদয় রেখে দূরের সংলাপে ;
পাহাড়-পারে উৎস যেন আছে।
এখনো মনে ফেলবে শ্বাস অনেক ক্ষ্যাপা ঝড়,
অকূল জলে দুলবে ডিঙি, খুঁজবে বাতিঘর ;
দুর্যোগের হবেই শেষ,
থাকবে মনে অনির্দেশ
স্মৃতির ইতিবৃত্ত-স্বর—
শহর-জোড়া প্রহর-গোণা-লেশ—
আড়াল করে বিচ্ছেদের করুণ মেঘস্তর।
অঢেল মাঠ, বাবলা-বাঁশবন
কাজলদীঘি করে আমন্ত্রণ।
খেতের রবিশস্য ধান যব,
স্বর্ণশোভ হেমন্তের কাল,
গাছের জাম খেজুর আম কাঁঠাল,
কতই পাখী-শিশুর কলরব
বৃদ্ধ যুবা গ্রামীণ জন আনে নিমন্ত্রণ ;
মায়ের মত গাঁয়ের ডাক উতল করে মন
ফেরাবো তাকে, সাহস নাই,
ছাড়তে গিয়ে বেদনা পাই,
দেশের ডাকে বাজে সানাই,
সেবায় হবে সবই সমর্পণ ;
অঢেল মাঠ, কাজল দীঘি করে আমন্ত্রণ।
তোমাকে সখা, বিদায় দেব নাকো,
জাগবে মনে যতই দূরে থাকো।
তুমিও ভুলে থাকবে না, তা জানি,
আঁকবে ছবি 'আল্পনার রঙ'
উঠানে রোদ, লতার কম্পন,
গাছে পাতায় হাওয়ায় সিরসিরানি।
সারা জীবন স্বর্ণকণা কুড়িয়ে জমা রাখো,
তা দিয়ে বসে গড়বে ঘরে ভাবী কালের সাঁকো।
রাঙা বিকেল হলেই—সারা
আকাশ ভরে উঠলে তারা,
পড়বে মনে তোমার যারা
মনের সাথী, যাদের ভুলে থাকো।
দিলেম প্রিয়, প্রণাম, প্রেম, বিদায় চেয়ো নাকো।*

---

* কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে।

কাদের স্থান কোথায় ? ওদের দিয়ে সমাজ মানুষ তৈরীর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কি পেল এই সব মেয়েরা—যারা প্রাণের দায়ে শিক্ষকতাকেই বৃত্তি বলে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে ? ওদের স্বপ্ন আর কল্পনার দিকে কেউ কখনও তাকিয়েছে সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে ? কি পাওয়া উচিত ওদের, কতখানি পেলে তার কিছু অন্ততঃ দান করতে পারে, তা কি ভেবেছে কেউ কখনও ?

ক্লান্ত মস্তিষ্কটা ঝিম্ ঝিম্ করে। নতুন পরিবেশটা খাপ খাইয়ে নিতে হবে জীবনের সঙ্গে। পেছুটান নেই কোন, সামনেও নেই কোন আলোর নির্দেশ। একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা যেন চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বেলা মল্লিককে। শুধু বাইরেই নয়, মনের মধ্যেও। সেখানে নেই কোন সান্ত্বনা, নেই কোন আশ্রয়। একটা অতৃপ্তি শুধু খচ খচ করছে নিরন্তর। একটা অবোধ্য জ্বালা। সে অতৃপ্তি আর জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে সারা পারিপার্শ্বিকে। মনটা উঠছে বিমুখ হয়ে। বাইরে থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছে কিন্তু শান্তি নেই অন্তরেও। শুধু শূন্যতা, শুধু রিক্ততা।

অতন্দ্র চোখ দুটো বার বার মুছে নিল বেলা মল্লিক। এপাশ ওপাশ করল বার বার। ঘুম আসছে না। টেবিলের উপর ছোট টাইমপিসটা টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে অবিরাম। সারা হোস্টেল নিস্তব্ধ।

এমনি কত রাত কেটেছে। এমনি করে মনের মাঝে তিক্ত বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে কত বিনিদ্র রাত্রিতে। বঞ্চিত হৃদয়টা গুমরে মরেছে নিরন্তর। শুধু ছটফট করে মরেছে বিক্ষুব্ধ অন্তরে।

কত ছিন্ন স্মৃতি মনে পড়ে যায় এমনি নিঝুম রাত্রির অন্ধকারে। ঘুম নামে না চোখে। জ্বালাময় চোখের সামনে দিয়ে অতীত ভেসে চলে তার সব রিক্ততা আর শূন্যতা নিয়ে। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস শুধু হাহাকার করে ফেরে নিঃসঙ্গ ঘরের কোণে।

এমনি নিদ্রাহীন রাত্রে, থমথমে প্রকৃতির আশ্চর্য নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতুল লাহিড়ীকে মনে পড়ে বেলা মল্লিকের। ওর মনটা দুলতে থাকে এক অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে তীব্র বেদনাবোধের মাঝে।

সেই প্রতুল লাহিড়ী! বিছানা ছেড়ে উঠে আসে বেলা মল্লিক। গগ্‌লসটা আবার তুলে নেয় চোখে। হারিকেনের শিখা উজ্জ্বল তর করে দিয়ে এসে দাঁড়ায় দেয়াল-আয়নাটার সামনে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয়, রূপ যৌবন কিছুই তো ক্ষুণ্ণ হয় নি তার। দেহলাবণ্যের বাহ্যিক ঘাটতি তো নেই আজও। শুধু…

মনটা টন্ টন্ করে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। একটি মাত্র অভাব ওর জীবনটাকে শূন্য করে দিল চিরদিনের জন্য। এ অভাব কি মেনে নিতে পারত প্রতুল লাহিড়ী? দেহ-মনের ঐটুকু খুঁতকে অগ্রাহ্য করে বেলা মল্লিককে টেনে নিতে পারত নিজের জীবনে? কে জানে! সে পরীক্ষা দেবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি বেলা মল্লিক। যদি প্রত্যাখ্যান করে প্রতুল? যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ঘৃণায়? তখন কি নিয়ে বাঁচবে বেলা মল্লিক, কি আশায় মন বাঁধবে? কোন সান্ত্বনা দেবে নিজের মনকে? তার চেয়ে এই ভাল। শুধু স্মৃতিটুকু নিয়ে বেঁচে থাকা। কি পেল না, তার হিসাব নয়; কি পেতে পারত, তার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা।

তবু মনে হয়, মানুষের মন কি এতই ভঙ্গুর? প্রেম কি এতই স্বার্থপর—ক্ষমাহীন, সহানুভূতিহীন। বেলা মল্লিক ভাবে, সে তো বিচ্যুত হয় নি তার একনিষ্ঠতা থেকে। তবু শুধু ভয় আর দ্বিধায় তাকে সরে আসতে হয়েছে প্রতুল লাহিড়ীর জীবন থেকে। দেশে যখন ফিরত প্রতুল, কেমন করে গ্রহণ করত তাকে? দেহ-মন সিরু সির্ করে। আঘাতটা ওর মনে কেমন করে বাজত, কে বলবে? কে বলবে—ওর চোখে সহানুভূতির দৃষ্টি উঠত সজল হয়ে, না ঘৃণাই উপচে পড়ত শুধু? কে জানে! সেকথা জেনে নেবার মত মনের জোর হারিয়েছে বেলা মল্লিক।

আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল একাগ্র দৃষ্টিতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছড়ে পড়তে লাগল সর্বাঙ্গে। হারিকেনের আলো মাংকারী-গগলসের উপর প্রতিফলিত হতে থাকল ঝিক্‌মিক্ করে …

প্রতুল বলত—"তুমি যতক্ষণ দূরে থাক, মনটা শুধু আকুলি-বিকুলি করে মরে। মনে হয় ছুটে চলে আসি তোমার কাছে। অথচ কাছে এলেই সব শান্ত। মনের মধ্যেকার অন্ধ ছটফটানিটা যে কোথায় লুকোয়, খুঁজেই পাই না। তুমি কি যাদু জান বেলা?"

শুনে হাসত বেলা মল্লিক। কুন্দশুভ্র দাতে নীচের ঠোঁটটি আলতো করে কামড়ে ধরত হাসতে হাসতেই। বলত—"দূরে থাকলে আঁকুপাঁকু, আর কাছে এলেই পালাই পালাই? তার মানেটা কি, কল্পনা করতে পার প্রতুল? ভবিষ্যৎটা যে অন্ধকার মনে হচ্ছে—"

—"আমার না তোমার?" প্রতুলও হাসত, "আমার ভবিষ্যৎ মানে ত তুমি। শুধুই আলো। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ যদি আমি হই, তবে সেটা যে অন্ধকার, সন্দেহ নেই—"

গম্ভীর হয়ে যেত বেলা। একাগ্র দৃষ্টিবিনিময় হ'ত দু'জনের, বেলা বলত—"আমাদের ভবিষ্যৎ ত দু'রকমের নয় প্রতুল! হতে পারে না যে! হয় দুটোই আলো, না হয় দুটোই অন্ধকার। পথ যে একই—"

একই ছিল হয় ত। থেকেও যেতে পারত একই রকম। বেলা মল্লিক ভাবল, কাকাবাবুকে শেষ পর্যন্ত হয় ত আঘাত দিতে হ'তই। আপোষ করতে হ'ত মানসিক। উপায় ছিল না কোন। প্রতুলকে পাবার জন্যে যে-কোন ক্ষতি স্বীকার করতেই ত প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু…কিন্তু…কিছুই করতে হ'ল না ওকে। স্ফুটনোন্মুখ জীবনটা নিঃশেষে শুকিয়ে গেল, ঝরে গেল পথের ধুলোয়।

জীবনে কিছুই ত পায় নি বেলা মল্লিক। আশৈশব বঞ্চিত জীবনে হাহাকার সঞ্চয় করে করে বড় হয়ে উঠেছে। আপন বলতে ত ছিল না কেউ। আবছা শুধু মনে পড়ে বাবাকে।

টুকরো টুকরো ছিন্ন স্মৃতির মাঝে গাঁথা এক বিশাল পুরুষ। তার পর শুধু চিনেছে কাকাবাবুকে। বাবার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওঁরই কাছে মানুষ। ওঁরই পরিবারের আত্মীয়তায় আর ঐকান্তিকতার শিকড় ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেলা মল্লিকের জীবনটা লতায়িত হয়ে উঠেছে যৌবনের পত্র-মাধুর্যে। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা ...সব পেয়েছে। সব অভাববোধ মেটাবার চেষ্টা করেছেন অধরবাবু। কিন্তু ও পারে নি তেমন করে মিশে যেতে, তেমন করে গ্রহণ করতে।

মেয়ে ছিল না অধরবাবুর। বন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর মেয়েকেই কোলে তুলে নিয়েছিলেন অপত্যস্নেহে। মনের নিভৃতে হয়ত সঞ্চারিত হয়েছিল একটি গোপন বাসনা—লালিত হয়েছিল দিনের পর দিন। এ মেয়েকে আর পরের হাতে তুলে দেবেন না অধরবাবু। ছেলে মানস। মেয়ের মতই বেলা। একসঙ্গে মানুষ হয়েছে সেই জীবনধারার স্বাদ পেয়ে পেয়ে। ওদের দু'জনকে এক জীবনে বেঁধে দিয়ে যাবেন

সব মনে পড়ছে আজ ... মান রাত্রির একক মুহূর্তে সব মনে পড়ে বেলা মল্লিকের। মনে পড়ে কাকাবাবুকে। মানসকেও মনে পড়ে। বেচারা! স্বাভাবিক নিয়মেই ওকে ভালবেসেছিল মানস। মানসের জীবনের মাঝে কখন যে সংগোপনে প্রেম উঁকি দিয়েছিল, বলতে পারবে না বেলা। যখন জানল, তখন বেদনায় মনটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে বারংবার। প্রাণভরেই হয়ত বেলাকে চেয়েছিল মানস, কিন্তু বেলা পারে নি সে ভালবাসা গ্রহণ করতে।

অধরবাবুর সঙ্কল্প অজানা ছিল না কারো। বেলারও নয়, মানসেরও নয়। মনে মনে অবিচ্ছিন্ন স্বপ্ন-জাল বুনেছে মানস, আর অবোধ্য ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় ছটফট করেছে বেলা। ওর জীবনে তখন মানস নয়, উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে প্রতুল লাহিড়ী।

মানসের এম-এ পরীক্ষার ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটা তোলেন অধরবাবু। সরাসরি বেলা মল্লিকের কাছেই।

দারুণ আতঙ্কে সেদিন ভাষা খুঁজে পায় নি বেলা। কোনক্রমে বলতে পেরেছে, "আর দু'টো বছর অন্ততঃ যেতে দিন কাকাবাবু, বি-এটা পাস করে নিই—"

মুখের উপর অস্বীকার করবার মত মনের জোর পায় নি। পারে নি সর্বশক্তি সঞ্চয় করেও পিতাপুত্রকে এতখানি আঘাত হানতে। শুধু সময় চেয়ে নিয়েছে। চাপা দেবার চেষ্টা করেছে প্রস্তাবটাকে।

শুনে প্রতুল বলেছিল, "দু' বছরই যথেষ্ট। বিলেতের ডিগ্রীটা জুটিয়ে নিতে পারব ততদিনে। বাবা যখন আমাকে ব্যারিষ্টার না করে ছাড়বেন না—"

উৎকণ্ঠিত চিত্তে বেলা বলেছিল, "অপেক্ষা আমি করব প্রতুল। দিন গুনব তোমার আশায়। কিন্তু দু'টো বছর যে অনেকখানি সময়। সে সময় পার হয়ে এসে আমাকে মনে থাকবে ত তোমার? আমার স্বপ্ন সফল হবে ত?"

উত্তরে হো হো করে হেসে উঠছিল প্রতুল। বেলা মল্লিকের দ্বিধা আর উৎকণ্ঠা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল সে হাসিতে।

চোখে চোখে তাকিয়ে প্রতুল বলেছিল, "প্রতুল লাহিড়ী কখনো কথার খেলাপ করে নি বেলা, তুমি বিশ্বাস রাখতে পার—"

বিশ্বাসে ত ফাটল ধরে নি বেলা মল্লিকের। সে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ আছে আজও। কিন্তু উপায় নেই কোন। প্রতুল হয় ত ফিরে এসেছে ব্যারিষ্টার হয়ে। হয় ত সন্ধানও করেছে ওর। কে জানে। তবু প্রতুল লাহিড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে ওর।

এম-এতে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেল মানস। তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশনে এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টারের চাকরিও পেয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বেলা প্রস্তুত হতে লাগল বি-এ পরীক্ষার জন্যে।

দিন গুনতে লাগল মানস। ওর চোখের সামনে রঙীন স্বপ্ন। দু'বছর পরে বেলাকে পাবে সে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বেলাকে সাহায্য করতে করতে ওর চোখে ঝিকমিক করত আনন্দোচ্ছলতা। আর বেলার মনটা সারাক্ষণ শুধু মৌন হয়ে থাকত অপরাধীর মত।

ধীরে ধীরে দিন গেল এগিয়ে। মানসের প্রেম উন্মুখ হয়ে উঠল। কাকাবাবুর সঙ্কল্প হ'ল দৃঢ়তর; একমাত্র ছেলে ওঁর, তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যাবেন সংসারে। সুখী, সচ্ছল পরিবারটিতে কল্যাণস্পর্শ লাগবে আবার। বন্ধুর মেয়ে হয়ে আশ্রিতা থাকবে না বেলা, পুত্রবধূর দাবি নিয়ে নিজের আসন স্থায়ী করে নেবে।

বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেল। এল তার চেয়েও বড় পরীক্ষা বেলার জীবনে। এতদিনের সেই স্নেহ-মমতা-ভালবাসার দাবিকে অস্বীকার করার প্রশ্ন। জীবনে স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন।

মাঝে মাঝে চিঠি লিখত প্রতুল ... উত্তর যেত। ওদিক থেকে আশাপথ চেয়ে দিন গুনত প্রতুল ... তার মনের আনন্দের ছোঁয়া এসে লাগত এপারে। আর এদিকের আবেগ আর উচ্ছ্বাসের ঢেউ এয়ার মেলের চিঠি হয়ে গিয়ে পৌঁছত সাত সাগরের পারে।

কিন্তু সকলের উর্দ্ধে, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, বড় সমস্যা, প্রচণ্ডতর আঘাত অপেক্ষা করেছিল বেলা মল্লিকের জীবনে—যা তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিল চিরদিনের জন্যে।

কলকাতায় তখন বসন্তের প্রকোপ চলছে। একদিন সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর এল বেলা মল্লিকের। ডাক্তার এল, নার্স এল। অভাব ছিল না অধরবাবুর সংসারে। যতখানি করা সম্ভব ছিল, তিনি তা করলেন। যমে-মানুষে টানাটানি চলল কয়েকটা দিন।

কারও নিষেধ শোনে নি মানস। দিন-রাত্রি বসে থেকেছে মাথার কাছে। ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রয়েছে প্রলাপরত বেলা মল্লিকের রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে। সাহায্য করেছে নার্সকে সেবায়, শুশ্রূষায়—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—অবিশ্রান্ত।

শেষ পর্যন্ত সেরে উঠল বেলা মল্লিক। না উঠলেই হয় ত

ভাল ছিল। যা হারাল সারা জীবনের বিনিময়েও সে জিনিষকে ফিরে পাওয়া যাবে না। একটি চোখের দৃষ্টি হারাল বেলা। শুধু দৃষ্টি নয়, বীভৎসভাবে ঠেলে বেরিয়ে এল চোখের মণিটা। একটা মাংসপিণ্ডের মাঝে ঘোলাটে চোখের তারাটা উৎকটভাবে জেগে উঠল।

আয়নায় সেদিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল বেলা মল্লিক। বালিশে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়েছিল কান্নায়।

চোখের জল ধরে রাখতে পারেন নি অধরবাবু। তাঁর সব স্বপ্ন, সব সঙ্কল্প লুটিয়ে পড়েছিল ধুলোয়। বেলার সারা মুখখানা জোড়া সেই বীভৎসদর্শন মাংসপিণ্ডটার দিকে তাকাতে পারতেন না অধরবাবু—মানসও নয়। শুধু বেলাই দৃষ্টি হারায় নি, মানসের সব কল্পনাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে যেন এ দুর্ঘটনা। বেলাকে এড়িয়ে চলত মানস, মুখোমুখি পড়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিত। তাকাতে পারত না এ বিকৃত মুখের দিকে। ও মুখ যে দিনের পর দিন গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেছে মনের গভীরে। নিশ্চিত আশায় স্থায়ী আসন পেতে রেখেছে অন্তরের অন্তস্থলে। এমন বিকৃতি কেমন করে সইবে মানস? বেলার সেই টানা টানা দুটি সজল চোখের কথা ত ভুলবার নয়? ওর সারা হৃদয়টা যেন চৌচির হয়ে যেতে লাগল অসহ্য যন্ত্রণায়।

আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল বেলার। ধীরে ধীরে ও বুঝতে পারল, যে আশায় দিন গুনছিল পিতা-পুত্র, তা আর সফল হবার নয়। দুঃখের মধ্যেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বেলা মল্লিক। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠল প্রতুলের কথাটা মনে করে। যে দৈহিক ক্ষতি আশৈশব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল, এতদিনের তিলে তিলে গড়ে ওঠা স্নেহ, মমতা, প্রেমকে টুকরো টুকরো করে ফেলল ভেঙে, এতদিনের স্নেহপ্রীতিকে টেনে আনল অস্বীকারের অসার্থকতায়, সে ক্ষতি কি সহ্য করতে পারবে প্রতুল লাহিড়ী? ওর প্রেম কি দেহের এ অপূরণীয় ক্ষতিকে অস্বীকার করে গ্রহণ করতে পারবে হৃদয়ভরা প্রেমকে?

রেজাল্ট বেরুল বি-এ পরীক্ষার। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস। আর কয়েক দিনের মধ্যেই চিঠি এল প্রতুলের কাছ থেকে, অবিলম্বেই দেশে ফিরছে ও।

অদ্ভুত এক উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল বেলা মল্লিকের। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল মনটা। আশা-নিরাশার সংঘাতে তিক্ত হতে তিক্ততর হতে লাগল ক্রমশঃ। যদি প্রত্যাখ্যান করে প্রতুল? যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ঘৃণায়? সে আঘাত সহ্য করতে পারবে না বেলা মল্লিক। ভগবানের দেওয়া আঘাত সারা জীবন ধরে ও সহ্য করে যাবে, কিন্তু মানুষের আঘাত সইবার ক্ষমতা নেই আর। মানুষের স্নেহ-মমতা প্রেম ভালবাসাকে চিনতে পারছে বেলা। স্বার্থপর মানুষের চাহিদাকে চিনতে পারছে। মানুষের কাছে আর কিছু পাবার নেই—কিছুই নয়।

চোখটাকে লোকচক্ষুর আড়াল করবার জন্যে একটি মাকারী গগ্‌লস কিনল বেলা। সাইড-শেড-ফ্রেমে ঢাকল তার জীবনের চরম ক্ষতি ও কলঙ্ককে। এতদিনে আবার আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সবই আছে। সারা শরীরে টলমল যৌবন, গগলস-ঢাকা মুখে পেলব সৌন্দর্য্য। আড়ালেই থাক বীভৎস মাংসপিণ্ডটা। মানুষের চোখকে সে আর আহত করতে চায় না। কিন্তু···কিন্তু প্রতুল? মনকে বাঁধল বেলা মল্লিক। না, প্রতুল ফিরবার আগেই তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে—অজানার মাঝে। নিজেকে নির্বাসন দিতে হবে পরিচিত পৃথিবী থেকে। সুখী হোক প্রতুল। তার জীবনে অভিশাপ হয়ে বাঁচতে চায় না বেলা। যা পেয়েছে, সেটুকু নিয়েই জীবন চলে যাবে। ঐ স্মৃতির সম্বলটুকু হারাতে রাজী নয় বেলা মল্লিক।

মেদিনীপুরের এক স্কুলে চাকরি পেয়ে গেল একটা। তার পর থেকেই আছে রঞ্জাবাসে। বি. টি. পাস করেছে চাকরি করতে করতেই। কোন মতে দিন যাচ্ছে কোন দিক দিয়ে। বুঝেছে, যেখানে যত দুর্নীতি, সেখানে তত বড় আঘাত। ভুলেও চোখ থেকে খোলে নি গগল্‌স, একক জীবনের দুঃস্বপ্ন নিয়ে শেষ পর্যন্ত নতুন চাকরিতে এসেছে মধুপুর। আরও চার বছর পার করে। কুড়ি বছরের স্বপ্ন আজ পঁচিশে এসেও ধিকি ধিকি জ্বলছে মনে মনে। সে দাহ অস্থির করে তোলে বেলা মল্লিককে। এমনি অতন্দ্র রাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশে অতীত এসে অবিশ্রান্ত আঘাত হানে হৃদয়ের বন্ধ কপাটে। ভোলা যায় না, ভুলতে পারে না বেলা মল্লিক।

জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকেছে। অবিশ্রান্ত পায়চারি করতে করতে কেটে গেল রাতটা। এমনি কেটেছে কত রাত। আবার এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে চু দিয়ে আঁচড়ে সমান করে নিল বাত্রিজাগরণের ছাপটা মুছে নিল নিঃশেষে। এখনও উঠে নি কেউ, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেলা মল্লিক। মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। অতীতকে ভুলবার সাধনা ওর, নতুন জীবনে ডুবে থাকবার প্রাণপণ প্রয়াস। অন্তঃপুরের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিতে হবে যেমন করে হোক। বাকী জীবনটা কাটাবে এইখানেই।

কাটতে লাগল দিন।

হোষ্টেলের মেয়েরা কেউ কেউ আসত মাঝে মাঝে, লতিকা সেন নতুন এসেছে। চপল মেয়ে, বছর কুড়ি বয়স হবে। ছুটো-ছুটি করে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায় এঘর ওঘর। সবাইকে এড়িয়ে থাকতে পারে বেলা মল্লিক কিন্তু লতিকার কাছে ওর সব গাম্ভীর্য্য খান খান হয়ে যায়।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে একেবারে শুয়ে পড়ে বিছানায়। বলে "আচ্ছা বেলাদি, রাতদিন আপনি এমন গম্ভীর হয়ে থাকেন কেন বলুন ত? কারও সঙ্গে মেশেন না, যান না কারও ঘরে। ভাল লাগে এমন নিরিবিলি থাকতে?"

ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ হাসি খেলে যায় বেলার। মসৃণ গালে ছুটোয় টোল পড়ে। বলে, "কোথায় আর যাব, বল? ঘরে বসেই পড়াশুনো করি একটু—"

"রাত্রেও গগলস চোখে রাখেন?" অবাক হয় লতিকা—"আলো লাগে বুঝি চোখে?"

হাসিটি মুছে যায় চোখ থেকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেলা মল্লিক, লতিকা জানে না, ওই গগলসের তলায় কি বীভৎস দৃশ্য লুকানো আছে। বাধ্য হয়েই মিথ্যে করে বলতে হয়—"আলো সহ্য হয় না আমার। দিনে-রাতে সব সময় তাই চোখে রাখতে হয় এটা। ডাক্তারের নির্দেশ।"

চুপ করে থাকতে পারে না লতিকা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে। বলে, "আচ্ছা বেলাদি, ছুটিতে ত কোথাও যান না আপনি! বাড়ী বুঝি অনেক দূর?"

দুর্বলতা আড়াল করে বলে বেলা, "হ্যাঁ লতিকা।"

স্কুল আর হোস্টেল। হোস্টেল আর স্কুল। একঘেয়ে জীবন। বেলা ভেবেছে, এবারে এম-এ পরীক্ষাটাও দিয়ে দেবে। পড়াশুনোয় তবু ভুলে থাকা যায় বৈচিত্র্যহীন জীবনের অবসাদকে। মাইনের যে অংশটা থাকে খরচ-খরচা বাঁচিয়ে, তাই দিয়ে কিনে রাখে, আর কিছুতে কেনে নানা রকম বই। সারাদিন ডুবে থাকে তাতে।

যখন পড়তেও ভাল লাগে না, তখন হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বেলা মল্লিক। মাঠের আলপথে পথে, অঞ্জন বিলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায় একাই। লোকজন বড় একটা আসে না এদিকটায়। বিলের জলে অজস্র পদ্ম ফুটেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বেলেহাঁস নামে বিলের জলে। সাদা বক উড়ে চলে সার বেঁধে। দূরের মেঠো পথে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফেরে রাখালছেলে। আর ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে, পায়ে চলা সরু পথে ঘরে ফেরে বেলা মল্লিক।

মাঝে মাঝে লতিকা সঙ্গ নেয়। কলকাতায় কাটিয়েছে আজন্ম, পাড়াগাঁ দেখে নি এর আগে। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, "আপনি বুঝি এদিকে প্রায়ই আসেন বেলাদি? ডাকেন না কেন আমাকে? কি সুন্দর জায়গা।"

কি হবে ডেকে—বেলা ভাবে, ও যে মানুষের সংসর্গ এড়াতেই চায় শুধু। মনটা যখন হাঁপিয়ে উঠে ঘরের কোণে, তখন শান্তি খুঁজে ফেরে অঞ্জনপুরের পথেপ্রান্তরে।

তবু বলে, "তুমি ত থাক না সব সময়, একাই আসি তাই। তা ইচ্ছে হলে এস না আমার সঙ্গে।"

লতিকা জিজ্ঞাসা করে, "জানেন বেলাদি, মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগে এখানে পড়ে থাকতে। মনে হয় পালাই এ ছাই চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে। সারাজীবন শুধু মাষ্টারণী হয়েই কাটাব নাকি?"

সারাজীবন? বেলা ভাবে, এই ত সবে জীবনের সুরু ওর। মনে এখনও কত স্বপ্ন কত সাধ, আশা আর আকাঙ্ক্ষা। হয়ত একটি সুখী আর শান্ত গৃহকোণের স্বপ্ন দেখে ও। কল্যাণী গৃহিণী হবার ভরসা রাখে মনে মনে। কিন্তু বেলা মল্লিকের সারা জীবনটাই যে উষর-সফলতার সম্ভাবনাহীন। এমনি করে তাকে কাটিয়ে দিতে হবে জীবনের বাকী দিনগুলি। মনকে বেঁধে রাখতে হবে কঠিন হাতে।

বলে, "তোমার আর কে আছেন লতিকা?"

উৎসাহ পেয়ে মুখর হয়ে উঠে লতিকা, বলে, "বাবা মারা গেছেন বছরখানেক আগে, বড় ভাই নেই কেউ। বাধ্য হয়েই চাকরি নিতে হয়েছে আমাকে। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে অনেকদিন আগে থেকে। কিন্তু বিয়ে হয়ে আমি চলে গেলে মা আর ভাই বোন দুটো অথৈ জলে পড়বে, তাই জয়ন্ত রাজী হয়েছে অপেক্ষা করতে। প্রায়ই কলকাতায় যাই, দেখা করি জয়ন্তের সঙ্গে। উৎসাহ দেয় জয়ন্ত। বলে, 'বিয়ে ত আমাদের হয়েই গেছে, কথা ত তা নয় লতু; স্বামীর ঘরের চেয়েও বড় কর্তব্য তোমার সামনে। ওদের পথ তৈরি করে দাও, আমি অপেক্ষা করব তত দিন।'"

লতিকার চোখ দুটো জল জল করে ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনায়। ভাই এ-ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে এবার। আর দুটি মাত্র বছর। অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট হউক ও। তার পর পারবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তখন ছুটি লতিকার। ঘর বাঁধবার কথা তখন। এ দুটো বছর অন্ততঃ চাকরিটা বজায় রাখতেই হবে।

আর বেলা মল্লিকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরনো দিনগুলি। এমনি করে প্রতীক্ষা ত সেও করেছে। কিন্তু সে প্রতীক্ষা কি দিয়েছে তাকে। তার স্বপ্ন ফলপ্রসূ হ'ল না এ জীবনে। সুখী হোক লতিকা, জীবনের এ কঠোর পরীক্ষা পার হয়ে ও সার্থক হয়ে উঠুক।

প্রশ্ন করে, "জয়ন্ত কি করে লতিকা?"

—"কেন, চাকরি?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় লতিকা, "অবস্থা ত ওদেরও ভাল নয় তেমন। এম-এ পাস করতে পারে নি টাকার অভাবে, চাকরিতে ঢুকেছে—ওর বাবার আপিসে। এক সওদাগরী আপিসের বড়বাবু ছিলেন ওর বাবা, রিটায়ার করেছেন কয়েক বছর হ'ল। ছোট তিনটে বোন, দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে, একটি পড়ছে ফার্ষ্ট ক্লাসে। মোটামুটি চলে যায় দিন—"

টাকার সমস্যা ছিল না বেলার জীবনে। অভাব সে বোধ করে নি কোন দিন। বিখ্যাত আইনজীবীর মেয়ে প্রফুল্ল, সেখানেও কোন হেতু ছিল না অর্থচিন্তার। যে সমস্যা ওর জীবনে প্রধান হয়ে উঠেছিল, তাকে আয়ত্তে আনা যেতই। কিন্তু বিধাতাই যে বাদ সাধলেন অবশেষে।

পড়ন্ত সূর্যের আলো ঝিকমিক্ করে বেলা মল্লিকের মাকারী গগলসে। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য আর অপরূপ দেহলাবণ্যে অপূর্ব দেখায় ওকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে লতিকা।

বলে, "আচ্ছা বেলাদি, আপনার ত তেমন কোন অভাব নেই

বলেই মনে হয়। তবে কেন চাকরি করছেন মিছিমিছি? আমার মতন অবস্থা কি আপনারও···"

—"না না," এবারে হাসতে হয় বেলাকে—"সে সব কিছু নয়। ওকথা ভাবি নি এখনও। কারও জন্যে প্রতীক্ষাও নেই। এমনি করেই, স্বাধীনভাবে জীবনটাকে যদি কাটিয়ে দেওয়া যায়, তবে সাধ করে কে আর নিজেকে জড়াতে চায় বল "

"একে আপনি স্বাধীনতা বলেন?" রীতিমত রেগে যায় লতিকা, "এমনি করে হোষ্টেলের ঠাকুরের রান্না গিলে স্কুলের মেয়ে ঠেঙিয়ে, নীরস, একঘেয়ে জীবন কাটানোকে আপনি শান্তির বলে মনে করেন? আপনার বিচারবোধকে কিন্তু প্রশংসা করতে পারলাম না বেলাদি।"

উদগত দীর্ঘশ্বাস চেপে বেলা বলে, 'আদর্শও ত থাকে মানুষের! এতগুলি মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে আমাদের হাতে দিয়ে—তারা মানুষ হয়ে উঠবে—'

"মানুষ নয় বেলাদি"—লতিকা বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে, 'শিক্ষয়িত্রী হবে। কিসের আদর্শ বেলাদি—কিসের আশা যে আপনাকে এমন করে চিন্তা করতে শিখিয়েছে জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, শুধু আমি নই, আমার মত আরও যারা আছে এখানে, এ ধরণের জীবনযাপনে সবাই অতিষ্ঠ। কোনক্রমে দিনগত পাপক্ষয় করছে সবাই—'

সেই কি করছে না? বেলা মল্লিক ভাবে, এই জীবন কি সাধ করে বরণ করে নিয়েছে সে? কিন্তু উপায় কি? নিজের দৈন্য জানিয়ে কি লাভ? ওর সামনে ধু ধু মরুভূমি, নিরানন্দ জীবন। মনকে চোখঠারা ছাড়া গতি নেই। আদর্শ বলে মেনে নিলে তবু যদি একঘেয়েমিটা কমে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। ঘুরে এল বছরের পর বছর।

এম-এ. পরীক্ষার জন্যে এক মাসের ছুটি নিল বেলা মল্লিক। উঠল এসে কলকাতার এক পরিচ্ছন্ন হোটেলে—একটি ঘর নিয়ে।

পরীক্ষার শেষ দিনে ঘটল ঘটনাটা। ইউনিভার্সিটি থেকে সবে বেরিয়েছে। ইচ্ছা—ক্লান্ত শরীর আর মনটাকে চাঙ্গা করে নেবে কলেজ স্কোয়ারের উন্মুক্ত হাওয়ায়। পথটা পার হচ্ছে এমন সময়—

কর্কশ একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল 'ক্রাইসলার' গাড়ীখানা ঠিক ওর পাশেই। একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর বাজল এসে কানে—'বে-লা'—

বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরে দাঁড়াল বেলা মল্লিক। মার্কারী-গগল্‌সে ঠিকরে পড়তে থাকল দীপ্ত সূর্যের আলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—'প্র-ফু-ল!'

কয়েকটি মুহূর্ত। অবাক বিস্ময়ে আর প্রচণ্ড পুলকে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল বেলা মল্লিক। আর ষ্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল প্রফুল লাহিড়ী। কয়েকটি অসহ্য মুহূর্ত। তার পর উদ্বেল আনন্দে একটানে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল প্রফুল। পাশে এসে দাঁড়াল। সারা জগৎ তখন মুছে গেছে চোখের সামনে থেকে—প্রখর সূর্যের আলো, লোকজন, যানবাহন, সবকিছু। ওরা পরস্পর চেয়ে রইল চোখে চোখে—জীবনের চরম পরীক্ষার শেষে, ব্যাকুল প্রতীক্ষার অবসানে:

কাটল কিছুক্ষণ।

এক সময় প্রফুল বলল, 'এখানে নয় আর। উঠে এস বেলা, চল—'

মন্ত্রমুগ্ধের মত গাড়ীতে এসে উঠল বেলা মল্লিক। বসল প্রফুলের পাশে। কত দিন পর ওরা আবার কাছাকাছি এল। হৃৎপিণ্ডটা যেন যুগপৎ আনন্দে আর বেদনায় দাপাদাপি সুরু করে দিয়েছে বেলার। ভাগ্য আজ ওকে চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর শেষে হয় পরম আনন্দ, না হয় দুঃসহ বেদনা। হয় আলোকোজ্জ্বল জীবন, না হয় চির অন্ধকারাবৃত মৃত্যু। পথ নেই আর।

গাড়ী ছুটছে, তীব্র বেগে। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট আর ধর্মতলা হয়ে চৌরঙ্গী। গড়ের মাঠ পার হয়ে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। সামনে বিস্তৃত-বক্ষ গঙ্গা। ওরা থামল।

প্রফুল তাকাল চোখে চোখে, এতক্ষণে। আবেগ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'জীবনে আবার দেখা পাব তোমার একথা ভাবি নি বেলা। এমনি করে, এতদিন পরে ভগবানের কৃপাতেই এ সম্ভব হ'ল। কিন্তু কেন তুমি এমন করলে বেলা—'

রক্তে রক্তে তাণ্ডব চলছে। শিরা-উপশিরা বেয়ে কি একটা তীব্র জ্বালা উঠছে মাথার দিকে। হাতটা আপনা থেকে গিয়ে ঠেকল চোখের উপর মার্কারী গগল্‌সটায়।

বেলার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিল প্রফুল লাহিড়ী। বলল, 'দেশে ফিরে প্রথমেই গিয়েছিলাম তোমার কাছে। অভিনন্দন কুড়োতে। কিন্তু কি যে আঘাত পেলাম! তোমার কাকাবাবু শুধু জানালেন, তুমি ছেড়ে চলে গেছ তাদের। কি কারণে, বললেন না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শুধু খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে। সে কি অসহ্য জ্বালা, তুমি কি বোঝ নি বেলা? কিন্তু পেলাম না তোমাকে। জীবনের উপরেই যেন বিতৃষ্ণা এসে গেল আমার। অথচ কি আশ্চর্য, চেষ্টা না করেও প্র্যাকটিস ঠিকই জমে গেল। শত কাজের মধ্যেও তোমাকে ত ভুলতে পারি নি বেলা। আর ভুলতে পারি নি আমার প্রতিশ্রুতিকে।'

মার্কারী গগল্‌সের তলায় চোখ দুটো আসছে ঝাপসা হয়ে। প্রফুল লাহিড়ীর হাতের মুঠোয় সাতাশ বছরের ভর-যৌবন থর থর কাঁপছে। তীব্র কান্নার বেগ কণ্ঠ বেয়ে উঠছে প্রবল গতিতে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল বেলা মল্লিক।

বলল রুদ্ধ কণ্ঠে, 'আমি জানতাম প্রফুল, আমি জানতাম। সবই জানতাম আমি। কিন্তু তবু আমাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে—বাধ্য হয়ে। কেন, সে প্রশ্ন আজ বোধ হয় অবান্তর। কোন

লাভ নেই সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে। তুমি শুধু জেনে যাও, সেদিন যা সম্ভব ছিল, আজ আর তা হবার নয়। কোন ভাবেই নয়—'

পরম বিস্ময়ে প্রতুল স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভাষা যোগাল না কণ্ঠে। তার পর শক্তি সঞ্চয় করে বলল, 'কেন হবার নয় বেলা? কেন তুমি ভেঙে দিতে চাও আমার এত দিনের স্বপ্নকে? কেন আমার প্রেমকে অস্বীকার করতে চাও তুমি?'

আর নয়, আর নয়। আর পারবে না বেলা মল্লিক। এমন করে দুঃসহ দাহনে দগ্ধ হতে পারবে না আর। তার চেয়ে সেই ভাল। জেনে নিক প্রতুল, দেখে নিক। উন্মোচিত হয়ে যাক ওর জীবনের সর্ব্বনাশা আঘাত। সব সংশয় চুকে যাক আজ।

একটি মুহূর্ত্ত ওর হাতখানা গিয়ে স্থির হয়ে রইল যাকারী গগল্‌সের সাইড-শেড-ফ্রেমে। একটা প্রাণ-সংশয় দ্বিধা, কিন্তু ঐ মুহূর্ত্তকালই। একটানে চোখ থেকে তুলে নিল যাকারী গগল্‌সটা। মণিটা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে গেল প্রতুল লাহিড়ীর চোখে চোখে।

আর একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করে পিছিয়ে গেল প্রতুল লাহিড়ী আতঙ্কে আর হতাশায় ওর দুটো হাতে চেপে ধরল নিজের দুটো চোখ, ভয়কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, 'এ—কি?'

ঐ একটি মুহূর্ত্তই। যাকারী গগল্‌সটা নাকের উপর বসিয়ে হ্যাঁচকা টানে গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেলল বেলা মল্লিক। অশ্রুর বন্যা নেমেছে দু'চোখের কোলে। পরাজিত জীবনটা যেন হাহাকার করে উঠল ওর অশ্রু-ভেজা কণ্ঠে—'এই জন্যেই চাই প্রতুল, এই জন্যে সরে যেতে চাই তোমার জীবন থেকে। দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে প্রেম, সে ত সইতে পারবে না তার ঈপ্সিত দেহের এই প্রচণ্ড ক্ষতি। তার বিকৃতিতে মন শিউরে উঠবে আতঙ্কে আর ঘৃণায়। তুমি মহৎ, হয় ত সমবেদনা দেখাতে পার তুমি, অনুকম্পায় ভিজে উঠতে পারে তোমার মন। কিন্তু কৃপা নিয়ে কি প্রেম বাঁচে প্রতুল? আমি সে জীবন সহ্য করতে পারতাম না প্রতুল, আজও পারব না। তার চেয়ে···তার চেয়ে এই ভাল। এই-ই ভাল। পথ নেই, পথ নেই—'

পথ ছেড়ে দ্রুত পায়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল বেলা মল্লিক। পা দুটো ভেঙে পড়ছে, তবু থামলে চলবে না। থামা যায় না—

আর গাড়ীর মাঝে দু'হাতে মুখ ঢেকে বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে স্তব্ধ হয়ে রইল প্রতুল লাহিড়ী—তীব্র অবসাদ বুকে নিয়ে।

সাঁঝ আকাশে আবীর ছড়িয়ে তখন গঙ্গার অপর পারে অস্ত যাচ্ছেন সূর্য্যদেব। দিনান্ত হ'ল।

জীবনের দাম

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

জীবনের কতটুকু দাম!
ডাকে-আসা ছাপমারা
মুখছেঁড়া খাম—
কতটুকু কাজে লাগে?
বড়জোর রাত্তিরে—
ঘুমোবার আগে—
পিদ্দিমে জেলে নিয়ে
করা চলে শেষ ধূমপান।
অথবা—
অফিসে যেতে
গোটাকতো পান—
মুড়ে নিয়ে যাওয়া চলে;
তারপর—
মুখ ধুয়ে রাস্তার কলে
ফেলে দাও পথের ওপরে,
কুচি কুচি ক'রে।
অথবা—
উল্টে নিয়ে—
শাদা পিঠে তার—
লেখা চলে মুদীর ভাউচার।
অথবা—
টুক্‌রো ক'রে বইয়ের পাতায়-
বুক্‌মার্ক ক'রে রাখা যায়।
প্রয়োজন শেষ হ'লে—
সকলেরই এই পরিণাম।
জীবনের কতটুকু দাম?

পল্লীর দেবদেবী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলা দেশের সভ্যতা গ্রামীণ সভ্যতা। বহু বৎসর, বহু যুগ ধরিয়া ইহা চলিয়া আসিতেছে। ইহার সৃষ্টি, পুষ্টি ও উন্নতির যুগ শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এক্ষণে ইহার ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষয় ভাল কি মন্দ তাহা আমরা জানি না। আমাদের মনে হয় এই সভ্যতা যুগে যুগে কিরূপ ছিল ও কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সে বিষয়ে আলোচনার সময় আসিয়াছে।

গ্রামীণ সভ্যতার একটি অঙ্গ হইতেছে গ্রামবাসীদের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম-চর্চ্চার সুযোগ-সুবিধা। পূর্ব্বে নূতন গ্রাম পত্তন হইলে বা গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়িলে গ্রামের জমিদার কিংবা বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিরা মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি করিতেন। এ বিষয়ে হিন্দুরা মন্দির ও মসজিদে প্রভেদ করিতেন না। লেখকের পূর্ব্বপুরুষেরা কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা হইলেও, বাখরগঞ্জ জেলায় (অধুনা খুলনা জেলায়) বলেশ্বর নদের তীরে তাঁহাদের জমিদারীতে একটি নূতন গ্রামের পত্তন করিলে বহু মুসলমান প্রজা চাষবাস করিতে আসে। এই সব প্রজার সুবিধার জন্য ইংরেজী ১৮২০-২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা গ্রামে একটি মসজিদ করিয়া দেন ও মসজিদের জন্য ৩০ বিঘা জমি দেন। ইহা বাংলার রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্রে উল্লিখিত আছে। মুসলমান জমিদারেরা তাঁহাদের ধর্ম্মে বাধে বলিয়া হিন্দু প্রজাকে মন্দির করিয়া দিতেন না বটে, তবে দেবস্থান প্রভৃতির খাজনা লইতেন না। মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ী হইতে এখনও মুর্শিদাবাদ জেলার বাহড়ান্ধার দেবালয়ে নিত্য সিধা আসে।

এইরূপ বহু মন্দির, দেবস্থান বা মসজিদ বাংলার বিভিন্ন গ্রামে আছে যাহাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অনেক মন্দির বা দেবস্থান অথবা দেবদেবী অনাদিকাল হইতে আছে বলিয়া লোকের দৃঢ়বিশ্বাস; কিরূপে ইহা পরিবর্ত্তিত হয় তাহার একটি উদাহরণ দিব। চব্বিশ পরগণার থানা বরাহনগরের অন্তর্গত এঁড়েদহ গ্রাম। শ্মশানঘাটের নিকট ভাগীরথীতীরে পাকা পোস্তার উপর একটি মন্দিরে 'বুড়োশিব' আছেন। কেহ কেহ বলেন ইহার নাম দক্ষিণেশ্বর —লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে নাকি ইহার উল্লেখ আছে; এবং ইহারই নাম অনুসারে এককালে ইহার দেবোত্তরভুক্ত দক্ষিণেশ্বর গ্রামের উৎপত্তি। এঁড়েদহ গ্রামের উল্লেখ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম করিয়াছেন—কিন্তু মৌজা হিসাবে এঁড়েদহ এখন কামারহাটির সহিত মিলিত এবং দক্ষিণেশ্বর ছিল একটি আলাহিদা মৌজা। 'বাণ'রাজা "বুড়োশিবের" পোস্তা বাঁধাইয়া দেন। এই বাণরাজার বাড়ীও লোকে দেখিয়া থাকে। বাণরাজার বাড়ীর ভিতরে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ পাকা ইঁদারা আছে। ইঁদারার ইট ছোট ছোট এবং তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরিমাণ এইরূপ যে বাবুরাম মিস্ত্রি বলে—এই রকম ইট নবাবী আমলের আগেকার ইট।

বুড়োশিব নামই সমধিক প্রচলিত। ইনি এবং ইহার নিকট-বর্ত্তী মুক্তকেশী কালীই গ্রাম-দেবতা বলিয়া বহুলোকে জানে। মুক্তকেশী কালী কিন্তু বেশীদিনের নহে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লু. সি. বনার্জ্জীর পিতামহ এক মোকদ্দমা জিতিয়া এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সোয়া শত বৎসরের কথা। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই 'বুড়োশিব' আছেন।

বাংলার বহু গ্রামে গ্রাম-দেবতা বা গ্রাম্য-দেবী আছেন। কোন কোন গ্রামে গ্রাম্য দেবদেবী ছাড়া ষষ্ঠীতলা, পঞ্চাননতলা প্রভৃতি ও "বাবা ঠাকুরের" স্থান দেখা যায়। বেলঘরিয়া গ্রামে (এঁড়েদহ হইতে ২ মাইল পূর্ব্বে) "বাবা ঠাকুরের" স্থান আছে। শিশুর মাথায় যখন প্রথম ক্ষুর দেওয়া হয় তখন বাবা ঠাকুরের তলায় পূজা দিয়া চুল দিতে হয়। থানা খড়দহের অন্তর্গত সুখচর গ্রামে "সাফফকির" তলা আছে—"সাফ-ফকির" তলায় বাতাসা মানত করিয়া ইহার মাটি খাইলে বন্ধ্যা-নারীর ছেলে হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। নিকটবর্ত্তী পানিহাটি গ্রামে এইরূপ একটি "মনসাতলা" ছিল। মনসাগাছে ফালি দিয়া ঢিল বাঁধিয়া দিলে প্রথম সন্তানবতী সহজেই সন্তান-প্রসব করিতে পারিবে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ঝড়ে মনসাগাছ পড়িয়া গেলে, নূতন মনসাগাছের কোন মাহাত্ম্য নাই বলিয়া এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

এই সকল গ্রাম্য-দেবদেবী ও ষষ্ঠীতলা, পঞ্চাননতলা প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান, উহাদের ইতিহাস, সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে। তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে গ্রামীণ সভ্যতার কিছু স্বরূপ বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে বিশেষ কোন অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া লেখকের জানা নাই।

গ্রাম্য-দেবদেবীর সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে গ্রাম কাহাকে বলে তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা উচিত। আমরা "ভদ্রলোক" বলিলে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারি যে, ভদ্রলোকের এই এই গুণ আছে বা ইনি এই এই কাজ করিবেন না, কিন্তু "ভদ্রলোকে"র সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নহে। সংজ্ঞা দিবার একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভদ্রলোকের সংজ্ঞা কিরূপ দুরূহ। এইরূপ "মধ্যবিত্ত" বলিলে আমরা একটা ধারণা

পালাম বিমানঘাঁটিতে ব্রহ্মের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ নু, শ্রীজবাহরলাল নেহরু, ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণন দলাই লামা এবং শ্রীআপ্পা পন্থ
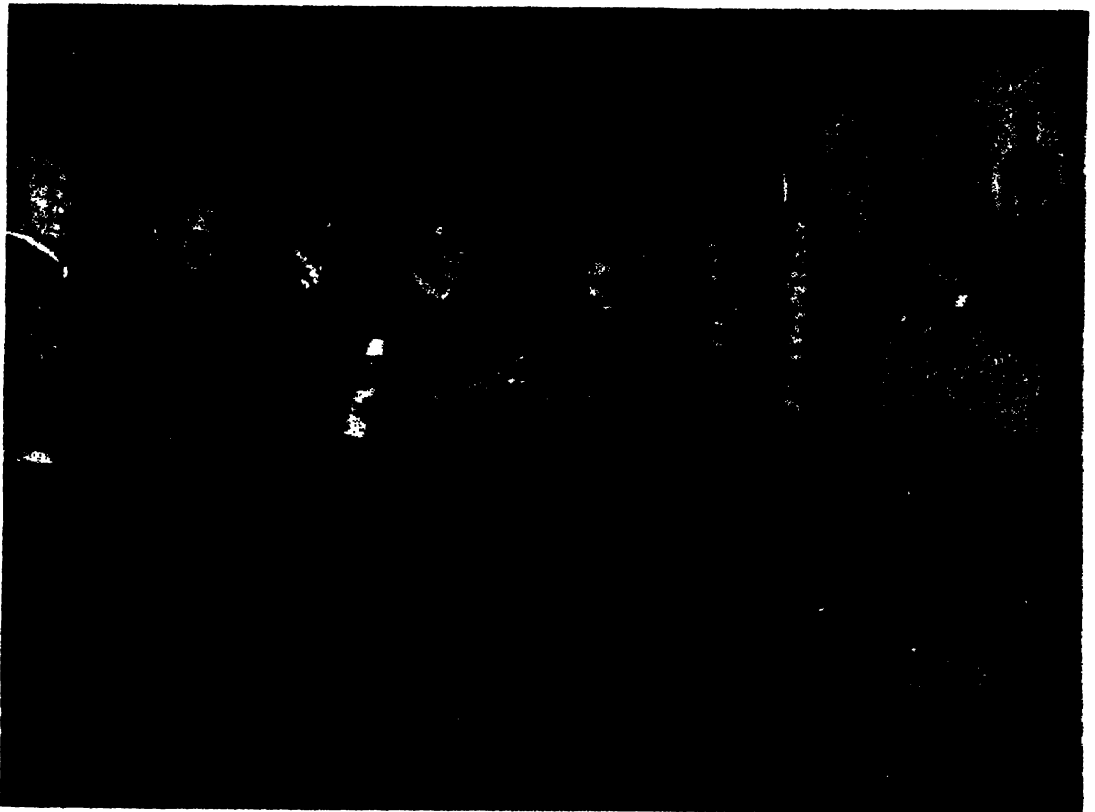
নয়া দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস এণ্ড ক্রাফটস সোসাইটির চিত্রপ্রদর্শনীতে দলাই লামা ও পঞ্চেন লামা।

ইলোরার কৈলাস মন্দিরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য।
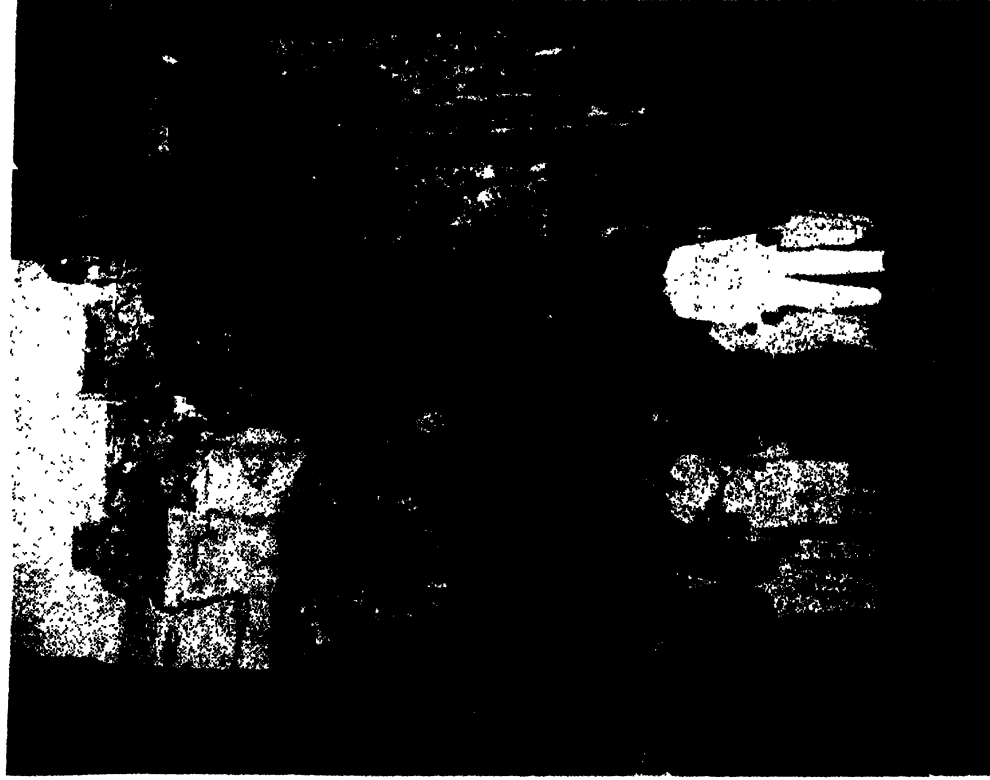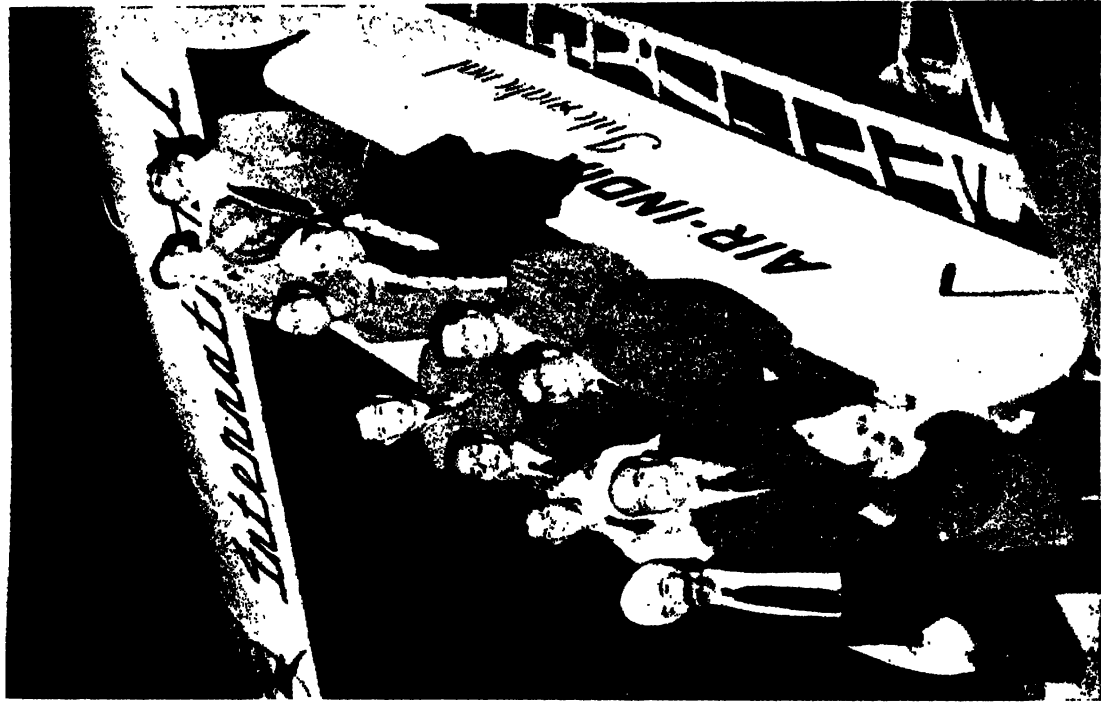
এগারজন ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের এক ডেলিগেশনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা।

করিতে পারি ; কিন্তু কত টাকা আয় হইলে আমরা ব্যক্তিবিশেষকে মধ্যবিত্ত বলিয়া ধরিব বা কত টাকা আয় বেশী হইলে আমরা তাঁহাকে ধনী-শ্রেণীভুক্ত করিব বলা আদৌ সহজ নহে।

"গ্রাম" বলিলে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারি, গ্রামের মধ্যে 'ঘোষ-পাড়া', 'দাস-পাড়া,' 'বাগ্দী-পাড়া' 'মুসলমান-পাড়াও বুঝিতে পারি, কিন্তু গ্রামের সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ।

সময়ে সময়ে গ্রামের সীমানা নির্দেশ বা গ্রাম কতদূর বিস্তৃত বলা সুকঠিন। সুখচর ও খড়দহের মধ্যে "কুলীনপাড়া।" মৌজা হিসাবে কুলীনপাড়া সুখচরের অন্তর্গত, মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে খড়দহের অন্তর্গত। কুলীনপাড়ার ব্রাহ্মণগণের সামাজিক সম্বন্ধ খড়দহের সহিত ; নবগ্রাম প্রভৃতির সম্বন্ধ সুখচরের সহিত।

বাংলার সরকারী কাগজপত্রে যে village বা গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রাজস্ব বিভাগীয় মৌজা। মৌজা হয়ত এককালে 'সামাজিক' গ্রাম ছিল—কিন্তু এখন জরিপ জমাবন্দীর কাগজে এক চৌহদ্দিভুক্ত স্থানের নাম মৌজা। কোন কোন স্থানে মৌজা গ্রামের equivalent বা সমপর্য্যায়বাচক হইলেও বহু স্থানে নহে। আবার আমাদের "শহর" মহকুমার সদর হইলেই শহর, মিউনিসিপ্যালিটি হইলেই শহর অনেক ক্ষেত্রে কতকগুলি গ্রামের বা মৌজার সমষ্টি মাত্র। সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসিলে বাংলা সরকার তাঁহাদের সম্মুখে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে বলেন যে, বাংলার শহর বেশীর ভাগই হইতেছে "overgrown villages"।—বাংলা সরকার অবশ্য village কথাটি social villages বা সামাজিক গ্রাম এই হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, মৌজার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন নাই। আবার ভাগীরথীর উভয়তীরস্থ গ্রামসমূহে এত ঘন বসতি, এত শিক্ষিত-সজ্জনের বাস, এত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র যে, তাহাদিগকে শহর বলিয়া ভ্রম হয় এবং তাহাদিগকে শহর বলিয়া ধরিলে খুব অন্যায় হয় না। কলিকাতা তিনখানি গ্রামের সমষ্টি।

পশ্চিম বাংলায় ৩৯,১৫১টি মৌজা বা গ্রাম আছে, ইহার মধ্যে ৩,৫৬৯টি মৌজায় কোন লোকবসতি নাই। দেখা যায় সংখ্যা হিসাবে শতকরা ৯টি মৌজায় লোকবসতি নাই। আর বসতিপূর্ণ মৌজার সংখ্যা প্রতি দশকেই কিছু না কিছু কমিতেছে. ইহার বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ থাকিলেও একটি বিশেষ কারণ হইতেছে—লোকের গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে, পাড়া ছাড়িয়া গণ্ডগ্রামে আসিবার ঝোঁক বা আগ্রহ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রায় ৪০ বৎসর আগে "গ্রামে ফিরিয়া যাও" ধ্বনি তুলিয়াছিলেন ও বহু যুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু জনগণের গ্রামে যাইবার মতি হয় নাই। একটু লেখাপড়া শিখিলেই কর্ম্মের সন্ধানে জনগণ শহরমুখো হয়। জমিদারী প্রথা লোপ পাইবার ফলে এই শহরমুখো ভাব বিশেষ প্রবল হইয়াছে। জমীদার, তালুকদার শ্রেণীর গ্রামে থাকিবার যে অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রয়োজন ছিল, তাহা এক্ষণে নাই। একজ তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া টাকার যোগাড়ের জন্য শহরে আসিতেছেন। গ্রামের পূজাপার্ব্বণাদিতে ভাঁটা পড়িয়াছে ; অনেকে পৈতৃক পূজা-অর্চনা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। সন ১৩৬১ সালে যেখানে ১০০ দুর্গাপূজা হইত ; ১৩৬২ সালে তাহার ১৮টি উঠিয়া গিয়াছে বা বন্ধ হইয়াছে ; ১৩৬৩ সালে ২০.২২টি বন্ধ হইয়াছে। পরেও আরও হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

ইহার একটি ফল হইতেছে—প্রাচীন সভ্যতার বা কৃষ্টির অবহানি বা স্থানবিশেষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। যদি কোন গ্রামের—মৌজার নহে, সমস্ত লোক সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দূরে অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই গ্রামের গ্রাম্য-দেবদেবীর নিত্য পূজা ত বন্ধ হইবেই, কালক্রমে সেই সব দেবদেবীর মন্দিরাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে ও "আস্তান" অবধি লুপ্ত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্যান্য স্থানে চলিয়া আসার ফলে বহু গ্রাম্য-দেবদেবীর নিত্যপূজা ত বন্ধ হইয়াছেই, পাল-পার্ব্বণে যে পূজা হইত, ধুমধাম হইত, মেলা বসিত তাহাও বন্ধ হইয়াছে। বহু স্থানে মুসলমানেরা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ও "আস্তান" অপবিত্র করিয়াছে। নবাবী আমলেও এইরূপ বহু অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার ফলে বহু গ্রাম্য-দেবদেবীর ও "আস্তানে"র বিলুপ্তি হইয়াছে। মন্দিরের ইট লইয়া মসজিদ তৈয়ারি করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

সামাজিক গ্রামের (Social villages) সহিত বর্ত্তমানের মৌজার পার্থক্য কিরূপ তাহা ১৯১১ সনের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আদায়-ওয়াশিল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়্যালী সাহেব এইরূপ-ভাবে তথ্য দিয়া দেখাইয়াছেন :—

বসতিপূর্ণ—

বিভাগ	মৌজা	গ্রাম
বর্দ্ধমান	২৪,১৩২	২৯,৪৫১
প্রেসিডেন্সী	১৩,৫৮৯	২১,২৩৩
পাটনা	১৩,২৩১	২৩,৫৬৬
ত্রিহুত	১৪,৩৫২	২৯,৬৫৬
ভাগলপুর	১৯,৭১৪	৩২,৩০১
উড়িষ্যা	১৫,৬৭৫	২৩,৩৯১

দেখা যায় সর্ব্বত্রই মৌজা অপেক্ষা সামাজিক গ্রামের সংখ্যাই বেশী। পশ্চিম বাংলায় প্রথমোক্ত দুই বিভাগের কালি দিয়া হিসাব করিলে বসতিপূর্ণ গ্রামের গড় কালি এইরূপ দাঁড়ায় :—

বর্দ্ধমান বিভাগ—০'৪৭ বর্গমাইল

প্রেসিডেন্সী ,, —০'৮০ ,, ,,

আমরা যদি সুন্দরবন এলাকার কালি বাদ দিয়া হিসাব করি তাহা হইলে প্রেসিডেন্সী বিভাগের গ্রামের ক্ষেত্রফল বর্দ্ধমান বিভাগের গ্রামের ক্ষেত্রফলের কাছাকাছি যাইবে। গড়ে সাধারণ গ্রামের ক্ষেত্রফল ০'৫ বর্গমাইল ধরিলে গ্রামগুলি যে ছোট ছোট তাহা বুঝা যায়। কোনও গ্রামই গড়ে দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে ০'৭ মাইলের বেশী নহে। গ্রামের মধ্যস্থল হইতে গ্রামের প্রান্ত ০'৪ মাইলের

বেশী নহে। বড় গ্রাম যে নাই তাহা নহে, গড়ে গ্রামগুলি ছোট ছোট।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় অনেক গ্রামে দেখা যায় যে, গ্রাম-দেবতা শক্তিমূর্ত্তি। যেখানে কালীমূর্ত্তি নাই সেখানে অন্য কোন শক্তিমূর্ত্তি, তৎপরেই শিবলিঙ্গের প্রাচুর্য্য। অনেক গ্রামে আবার শক্তিমূর্ত্তি ও শিব দুই-ই আছেন। "উনপঞ্চাশীর" ৺উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন যে, বিখ্যাত বিখ্যাত শিবলিঙ্গের অবস্থান একদিনের হাঁটা-পথের ব্যবধানে। যেমন কালিঘাটে নকুলেশ্বর, বালীতে কল্যাণেশ্বর, চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বর, তারকেশ্বরে তারকেশ্বর ইত্যাদি। পূর্ব্বে হয়ত এই সব স্থানে শৈব মঠ ছিল ; শৈব সন্ন্যাসী একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া অপর স্থানে আশ্রয় পাইত। কথাটি সমগ্র বাংলার পক্ষে কতদূর সত্য তাহা জানি না, তবে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

গ্রাম-দেবতা হিসাবে কালিমূর্ত্তির ন্যায় বিষ্ণুমূর্ত্তির তাদৃশ সংখ্যাধিক্য দেখা যায় না। বর্ত্তমানে যেখানে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি প্রায় গাঁয়ের ঠাকুরের পর্য্যায়ে উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তাহার অধিকাংশ স্থলে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ইঁহারা গ্রাম-দেবতা নহেন। কোনও ব্যক্তিবিশেষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরে সর্ব্বসাধারণের দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন-তলা বা ষষ্ঠীতলাকে গ্রাম্য-দেবতার পদবীতে উন্নীত করা যায় না—এক এক গ্রামে দুই বা ততোধিক পঞ্চানন্দ বা মা ষষ্ঠী আছেন। বহু জায়গায় শীতলামন্দির আছে।

দুই এক স্থানে "জয়াসুর" ও "বনদেবতা" দেখিয়াছি। বনদেবতা দেখিতে কন্ধকাটা মানুষের ন্যায়—প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল পেটের উপর—রং আকাশনীল। শীতকালে ধানকাটার সময় পূজা হয়—অন্য সময়ে হয় না। অনেক গ্রামে আবার নিতাই-গৌরের মূর্ত্তি আছে ও নিত্য পূজা হয়। শুধু যে বৈষ্ণবের "আখড়ায়" হয় তাহা নহে, রীতিমত মন্দিরে পূজা হয়। কোন কোন স্থানে কেবল 'মহাপ্রভু'র (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) পূজা হয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ আছে।

এককালে সারা বাংলায় বিশেষ করিয়া রাঢ় অঞ্চলে তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল এবং এখনও বহু স্থানে আছে। এজন্য শক্তিমূর্ত্তি গ্রাম্য-দেবী হিসাবে পূজিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শিব-শক্তির ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে প্রায় ২০টি বাংলার নানা স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন তন্ত্র-শাস্ত্রের উৎপত্তি বাংলায় হইয়াছিল। এ বিষয়ে একটি প্রাচীন বচনও শুনা যায় যে :

> 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
> কচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা।'

ভারতে তিনটি তান্ত্রিক সম্প্রদায় আছে। যথা :

> 'সম্প্রদায় নাম বহ্নি গৌড় কাশ্মীর কেরলায়।'

ইহা হইতে বাংলায় তন্ত্র-প্রাধান্য ও তাহার প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

আচার্য্য শঙ্কর তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শ্রীবিদ্যার (ত্রিপুরাসুন্দরীর) উপাসনা করিতেন। সকল শঙ্কর মঠে শ্রীযন্ত্র স্থাপিত আছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ঈশ্বরপুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিও তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত। অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য-পরিকর আচার্য্যগণ তান্ত্রিক উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দিরে শ্রীবিদ্যার যন্ত্র আছেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ তন্ত্র-মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৩১ সনের আদমশুমারির সময় বাংলার হিন্দুদের মধ্যে কতজন শাক্ত, কতজন বৈষ্ণব, কতজন শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত তাহার সম্বন্ধে একটি তদন্ত হয়। তদন্তের ফলাফল আদমশুমারির রিপোর্টে আছে। আমরা তাহা হইতে পাঠকগণের সুবিধার জন্য তথ্যগুলিকে শতকরা হিসাবে রূপান্তরিত করিয়া নিম্নে দিলাম। যথা :

বাংলার হিন্দুদের মধ্যে শতকরা—

স্থান	শৈব	শাক্ত	বৈষ্ণব	যাঁহারা কোন সম্প্রদায় ভুক্ত বলেন নাই
সমগ্র বাংলা	০'১৩	১৪'৮	১৬'০	৬৯'০
বর্দ্ধমান বিভাগ	*	৯'২	৭'১	৮৩'০
প্রেসিডেন্সী ,,	*	৫'৩	৬'৪	৮৬'০
রাজসাহী ,,	*	১২'৪	২০'৬	৬৭'৪
ঢাকা ,,	*	১৭'৫	৩২'৩	৪৮ ৮
চট্টগ্রাম ,,	*	৬০'০	৩৯ ৯	০'০
(কলিকাতা	*	০'৭৫	০৪'৮	৯৭'৭)

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, বর্ত্তমানের ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক হিন্দুর ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়াছে। এজন্য নিজেকে শাক্ত বা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বা অপারগ। যাঁহারা কিঞ্চিৎ গোঁড়া, কেবল তাঁহারাই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা শহরের তথ্যগুলি বিচার করিলে এই যুক্তির সহায়ক…। কিন্তু "গোঁড়ামি" সম্বন্ধে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে প্রভেদ আছে। কোনও বৈষ্ণবের নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত বাধা কিংবা নিষেধ নাই ; অনেকেই নিজেকে দীনহীন বৈষ্ণব দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শাক্তদের নিজ সম্প্রদায় বলিতে নিষেধ আছে। শাক্তদের সম্বন্ধে এই বিষয়ে একটি উপদেশ বা নিষেধ আছে। যথা :

> অন্তঃ কৌলো বহিঃ শৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ।
> কৌলো সুগোপয়েদ্দেবি নারিকেল ফলাম্বুবৎ।

(কুলার্ণব তন্ত্র)

---

* অর্থাৎ অতি নগণ্য। কলিকাতার অঙ্ক প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

গোঁড়া শাক্তরা নিজের সম্প্রদায় ত বলেনই না, বরং নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার উপদেশ আছে। এমতে যাঁহাদের পরিচয় বৈষ্ণব বলিয়া আদমশুমারির তথ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক শাক্ত আছেন এবং যাঁহারা নিজেদের কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত বলেন নাই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাক্ত।

যাঁহারা নিজেদের কোনও সম্প্রদায় বলেন নাই, এইরূপ লোকের মধ্যে আমরা যদি অর্দ্ধেক শাক্ত ধরিয়া লই ত খুব অসঙ্গত হইবে না। বাকী অর্দ্ধেক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে সম্প্রদায় বলেন নাই—ইহাদের মধ্যে কিছু শাক্ত, কিছু বৈষ্ণব আছেন।

এমতে সমগ্র বাংলায় শতকরা ৫০ জন শাক্ত ও ১৬ জন বৈষ্ণব। বাকী ৩৪ জনের মধ্যে যদি শাক্ত ও বৈষ্ণবের অনুরূপ ধরি তাহা হইলে শাক্ত ও বৈষ্ণবের অনুপাত এইরূপ দাঁড়াইবে :

শাক্ত : বৈষ্ণব=৬৭ : ৩৩ বা মোটামুটি ২ : ১।

আমাদের উপরোক্ত হিসাবে যতই ভুল থাকুক না কেন শাক্তরা যে বৈষ্ণবদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শাক্তরা বৈষ্ণবদের অপেক্ষা ২ গুণ বেশী না ধরিয়া যদি আমরা তাঁহাদের ১॥ গুণ বেশী ধরি তাহা হইলে তাঁহাদের অনুপাত এইরূপ দাঁড়ায় :

শাক্ত : বৈষ্ণব=৩ : ২

শাক্তের উপাস্য হইতেছেন শক্তি। শক্তির সাধারণরূপ দশ-মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত তন্ত্র-কৌমুদীর পুথিতে ২৭টি মহাবিদ্যার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। হরিদ্বার-কনখলের অভিমন্যুগোত্রীয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ গৌতম ঋষির সহিত লেখকের এই বিষয়ে কিছু আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, কোন কোন তন্ত্রমতে ত্রয়োদশ মহাবিদ্যা; আবার অপরাপর কোন কোন তন্ত্রমতে ষোড়শ মহাবিদ্যা। এই সব মহাবিদ্যার নামও তিনি করিয়াছিলেন। যথা :

(১) উপরোক্ত দশমহাবিদ্যা+চণ্ডেশ্বরী, লঘুশ্যামা ও ত্রিপুটা;

(২) ঐ দশমহাবিদ্যা+বনদুর্গা, শূলীনী, অশ্বারূঢ়া, ত্রৈলোক্য-বিজয়া, বারাহী ও অন্নপূর্ণা।

এইরূপে আমরা ১৯টি বিভিন্ন মহাবিদ্যার নাম পাইতেছি। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত পুথি হইতে আরও কয়েকটি মহা-বিদ্যার নাম করিয়াছেন। যথা : দুর্গা, মহিষমর্দ্দিনী, গৌরী, প্রত্যঙ্গিরা, চামুণ্ডা ও কাত্যায়নী। নিরুত্তর তন্ত্রে শ্রীকুল ও কালী-কুলের কয়েকটি মহাবিদ্যার নাম উল্লিখিত আছে। যথা :

কালীতারা ছিন্নমস্তা, ভুবনা মহিষমর্দ্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা।
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরম্।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে।
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতম্।

দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া মহাবিদ্যা ষোড়শীর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা : ত্রিপুরাসুন্দরী, ত্রিপুরেশ্বরী, শ্রীবিদ্যা, রাজরাজেশ্বরী ইত্যাদি। তারার তিনটি নাম পাওয়া যায়—উগ্রতারা, আর্য্যা তারা ও মহানীল সরস্বতী বা একজটা। সকল মহাবিদ্যার সকল নাম আমাদের জানা নাই।

পূর্ব্বোক্ত গৌতম ঋষির পিতা বজ্রপুরুষানন্দ (যাঁহার কাছে শুর জন উড্রফ তন্ত্র-অভ্যাস করিয়াছিলেন) একবার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, কালীর ৮১টি রূপ বা নাম আছে।

চণ্ডীর দেবী-কবচে আমরা নিম্নলিখিত নবদুর্গার নাম পাই।

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

শুধু নাম হইলেই হইবে না ধ্যানও জানা চাই। ধ্যানের সঙ্গে মিলাইলে তবে মূর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। ডানকুনি রেল ষ্টেশনের নিকটে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত চামুণ্ডামূর্ত্তি দেখি। দেবীর নাম জিজ্ঞাসা করায় স্থানীয় অনেকে বলিল ইহা চণ্ডীর মূর্ত্তি, পরে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, ইহা চামুণ্ডামূর্ত্তি।

ধূমাবতী বিধবা, ইনি ভৈরবকে (শিবকে) খাইয়া ফেলেন। এজন্য গৃহী কামাখ্যাভিলাষ লোকে ইহার পূজা করেন না। লেখক ১৯৩৯ সনে কামাখ্যা পাহাড়ে গিয়াছিলেন—ঐ পাহাড়ে তারাপীঠ ব্যতীত নয়টি মহাবিদ্যার পীঠ আছে। তিনি যখন ধূমাবতীর পীঠ স্পর্শ করিতে উদ্যত তখন স্থানীয় লোকেরা বারণ করেন, বলেন যে, গৃহী লোককে ধূমাবতীর পীঠ স্পর্শ করিতে নাই। এইরূপ ছিন্নমস্তার পূজাও নাকি গৃহীলোককে করিতে নাই। একমাত্র হাজারিবাগ জেলার রাজরোপ্পা'য় ছিন্নমস্তার মন্দির আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ছিন্নমস্তার মন্দির আছে বলিয়া লেখক অবগত নহেন।

দশমহাবিদ্যার একত্রে পূজা অন্ততঃপক্ষে দুইটি স্থানে হয়। ইহাদেরও সেই সঙ্গে নিত্যপূজা হয়। এই দুইটি স্থান হইতেছে যশোহরে চাঁচড়ার রাজবাটী ও বরাহনগরে কাশীপুর রতনবাবুর শ্মশানঘাটের নিকট। অন্য কোথায়ও হয় কিনা জানা নাই।

ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা রাজনারায়ণ বসুর জন্মস্থান জেলা চব্বিশ পরগণার বোড়াল গ্রামে ও ছত্রভোগে হয়। অন্যত্র হয় বলিয়া শুনি নাই। খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে ইহার যে যন্ত্র আছে তাহাতেও নিত্যপূজা হয়।

ভুবনেশ্বরীর পূজা চারটি জায়গায় হয় বলিয়া জানা আছে। যশোহরের সেখহাটি গ্রামে প্রস্তরময়ী ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তি দেশবিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিত্য ষোড়শোপচারে পূজিত হইত। এখন কি হয় জানা নাই। থানা খড়দহের অন্তর্গত রহড়া গ্রামে, বর্দ্ধমান জেলার মিঠাপুর গ্রামে ও ঐ জেলায় কুলীনগ্রামে ভুবনেশ্বরীর পূজা

হয়। ভুবনেশ্বরীর মূর্তির অভাবের একটি কারণ এইরূপ। কোনও সাধক একাদিক্রমে ৩২ বৎসর ধরিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ না করিলে তাঁহার ভুবনেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার অধিকার জন্মায় না। এইরূপ সাধকের সংখ্যা খুবই অল্প, সাধক হইলেও সঙ্গতি না থাকায় অভ মূর্তি বা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় না। এজন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের সংখ্যা খুব কম। সজলপুরের সজলেশ্বরী হইতেছেন ভুবনেশ্বরী। ক্ষত্রিয় পূজারী পূজা করেন। দেবী পূর্বাস্যা। সজলপুরে দুর্গাপূজার তিন দিন ভুবনেশ্বরীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া স্থানে স্থানে পূজা হয়। দক্ষিণ ভারতে হাম্পির নিকটে ভুবনেশ্বরীর আর একটি মন্দির আছে। গোওালে আর একটি ভুবনেশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান।

বিশালাক্ষী দেবী শক্তিমূর্তি। এককালে বাংলা দেশে বিশালাক্ষীর পূজা বর্তমান সময় অপেক্ষা যে বেশী ছিল তাহা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে পূজাপদ্ধতি দেওয়াতেই বুঝা যায়। বিশালাক্ষীর ধ্যান হইতেছে :

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদ প্রভাম্
দ্বাদশলক্ষণ ভুজগাং রক্তাম্বরধরাং, শুভাম্
মুণ্ডমালা বলীরম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্
খড়্গকপালকরাং দেবীং সাধকাভীষ্ট দায়িকাম্
সর্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পদং প্রদং স্মরেৎ।

সাধারণতঃ ইনি দ্বিভুজা; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইনি চতুর্ভুজা। বহুগ্রামে ইহার মূর্তি বা "আস্থান" আছে ও নিত্যপূজা হয়। যে যে গ্রামে বিশালাক্ষীর পূজা হয়, আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে দিলাম :

জেলা ২৪ পরগণা

১। থানা বরাহনগরের অন্তর্গত কামারহাটিতে — প্রস্তরখণ্ড
২। থানা টিটাগড়ের অন্তর্গত টিটাগড়ে — মূর্তি

জেলা হুগলী

৩। আরামবাগের বিক্রমপুর গ্রামে — প্রস্তরখণ্ড
৪। কামারপুকুর (আনুড়) — "আস্থান"
৫। শিয়াখালা — মূর্তি (উত্তরবাহিনী)
৬। কলাছড়া — মূর্তি
৭। হরিপাল থানায় ইলাহিপুরে — মূর্তি
৮। জাঙ্গীপাড়া থানায় মথুরাবাটিতে — মূর্তি

জেলা বর্দ্ধমান

৯। বেতু গ্রামে — মূর্তি (বেহুলা)

জেলা বাঁকুড়া

১০। নান্নুর গ্রামে — মূর্তি (বাশুলী)

জেলা মেদিনীপুর

১১। ঘাঁটাল—চন্দ্রকোণার নিকট বল্লা গ্রামে — মূর্তি

জেলা বীরভূম

১২। নান্নুর—মূর্তি

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় সরস্বতী নদীর উভয়-তীরে ও তাহার সন্নিকটে বিশালাক্ষীর বহু মূর্তি বা 'আস্থান' আছে। ইহা হইতে মনে হয় এই অঞ্চলে এককালে বিশালাক্ষী বহুজনপূজিতা দেবী ছিলেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্যত্র স্থানে ইহার পূজা প্রচলিত ছিল না। কোনও মূর্তি ৬০০ শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। শিয়াখালার উত্তরবাহিনী দেবী হুসেন শাহের আমল হইতে পূজিত। ইহার মূর্তি পূর্বে মাটির ছিল—সেজন্য মধ্যে মধ্যে নূতন মূর্তি করিতে হইত। গ্রামবাসীরা ১৩৪০ সালে প্রস্তরময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। তৎপূর্বে ১২৪৮, ১২৮৬ ও ১৩০৪ সালে মাটির মূর্তি তৈয়ার হইয়াছিল। এই তথ্য হইতে কত বৎসর অন্তর মাটির মূর্তি পাল্টাইতে হয় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। গড়ে ৩০.৩১ বৎসর অন্তর মূর্তি পাল্টাইতে হইয়াছে। সুখচর গ্রামের ৺জীবনাথ গাঙ্গুলী বলিতেন যে, তিন যুগ (অর্থাৎ ৩৬ বৎসর) অন্তর মূর্তি পাল্টানো উচিত—নচেৎ পূজা ভাল হয় না।

মথুরা বাটীতে—হোসেন শাহার সমসাময়িক পুরন্দর বংশধরতম তৃতীয় পুরুষ শিয়াখালা গ্রাম হইতে এই গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন এবং উত্তরবাহিনী দেবীর অনুরূপ অষ্ট ধাতুর একটি বিশালাক্ষী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কামারহাটিতে দেবীর যে 'আস্থান' আছে তাহার উল্লেখ ১১৯৯ সনের জমিদারী চিঠাতে পাওয়া যায় : নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন (১৭৫৬ খ্রীঃ অঃ) তখন তাঁহার সৈন্য-বাহিনী পুরাতন বাদশাহী সড়ক (অধুনা নীলগঞ্জ রোড) দিয়া আসিতে আসিতে বিশালাক্ষীর মূর্তি এবং মন্দির অপবিত্র করে ও ভাঙিয়া ফেলে। সেই অবধি কয়েকখণ্ড প্রস্তর ভিন্ন এই 'আস্থানে' আর কিছুই নাই—নিত্যপূজা হয়।

কলাছড়ার বিশালাক্ষী—বর্তমান সেবাইতগণের মাতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এ মতে ২০০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহেন।

যক্ষিণী দেবী এইরূপ একটি শক্তিমূর্তি। কেহ কেহ বলেন, ইনি আসলে অনার্য্য দেবী ছিলেন, কালক্রমে হিন্দু দেবী হইয়াছেন, ইহার নাম পুরাণাদিতে নাই। সে যাহা হউক, বহু কাল হইতে ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্তৃক শক্তির অন্যতম মূর্তি বা বিকাশরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আমরা যে কয়টি যক্ষিণী মূর্তির বিষয় জানিতে পারিয়াছি তাঁহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নিম্নে দিলাম। যথা :—

মেদিনীপুর জেলা

১। ব্রজলাল চক্-মাল আউড়ি গ্রামে – দেবীর পীঠস্থান

বর্দ্ধমান জেলা

২। চক্দিঘী—যক্ষিণী মাহুলা গ্রামে— মূর্তি
৩। বরাকর গ্রামের নিকট নদীতীরে— ঐ

এই মূর্তি কল্যাণেশ্বরী বলিয়া পরিচিত।

ময়নাপুর শিবমন্দিরের অন্তর্গত। এই মূর্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে—

"বনেতে বঙ্কিনী তুমি শিবরে কল্যাণী"

সিংভূম জেলা

৪। ধলভূম— মূর্তি

অন্যান্য স্থানে বঙ্কিনী দেবীর মূর্তি বা 'অবস্থান' সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞান নাই। যতদূর জানা যায় তাহাতে বলা চলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের কাছাকাছি স্থানেই এই দেবীর আবির্ভাব।

বাংলার গ্রামে মহাবিদ্যার প্রকারভেদে দেবীমূর্তি বা দেবীর ঘট বা 'আস্থান' ছাড়া, অন্যান্য বহু প্রকারের শক্তিমূর্তি আছে। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি পৌরাণিক, আবার কতকগুলি লৌকিক। লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে কতকগুলি বহুস্থানে বিস্তৃত; কতকগুলি একটি বা দুইটি গ্রামে সীমাবদ্ধ। আবার ইঁহাদের স্থানীয় নাম এরূপ যে, প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা লৌকিক দেবী বা পৌরাণিক দেবী সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। উদাহরণ স্বরূপ মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার অন্তর্গত পানিয়া গ্রামের পানেশ্বরী দেবীর কথা বলা যাইতে পারে। পৌষসংক্রান্তিতে তথায় একটি বড় মেলা বসে। পানেশ্বরী দেবীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত।—

'পানিয়া গ্রামেতে বন্দ মাতা পানেশ্বরী
যাঁর পেট চিরি নাগা মানিক কৈল চুরি।"

এই পানেশ্বরী লৌকিক কি পৌরাণিক দেবী তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সভ্যতার স্বরূপ জানিবার জন্য আমাদের দরকার তথ্য সংগ্রহ করা। এই তথ্য যত বিস্তৃত হয় ততই সমাজতাত্ত্বিকগণের কাজে আসিবে এবং তাঁহারা কি কি বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিবেন। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বশাখা অগ্রণী হইলে ভাল হয়। আমি একটি গ্রামের কয়েকটি শিবমন্দির, কয়েকটি পঞ্চাননতলা, শীতলামন্দির, কালিমন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিলাম। মন্দির কবে [illegible] বাহির করিলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, পূর্বে [illegible] গ্রামে ১২টি দুর্গাপূজা, ৫টি কালীপূজা ও ৭টি জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। পরে ক্রমে ক্রমে কমিয়া গিয়াছে; সার্বজনীন পূজা ও সরস্বতীপূজা আরম্ভ হইয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে কাহাকে জানাইব। শুধু আমার সংগৃহীত তথ্য হইতে গ্রামীণ সভ্যতার স্বরূপ বুঝা যাইবে না, বহু তথ্য হইতে একটা ধসড়ার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। নির্মল বাবুকে দেখাইলাম, তিনি বলিলেন যে, পূজার তথ্যগুলি যদি পারেন ত সময় হিসাবে সাজাইয়া দিন। আরও চেষ্টা করিয়া এইরূপ দাঁড়াইল:—

পারিবারিক—

বৎসর	দুর্গা পূজা	কালী পূজা	জগদ্ধাত্রী পূজা	কার্তিক পূজা	সরস্বতী পূজা	সর্বজনীন পূজা
১৩১০	১২	৫	৭	—	—	—
১৩২০	১০	৮	৩	১	—	—
১৩৩০	৮	৭	৩	—	১	—
১৩৪০	৫	৫	১	—	২	১
১৩৫০	২	২	—	—	৫	২
১৩৬০	১	১	—	—	১০	৫
১৩৬৩	—	১	—	—	১১	৩

তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে যদি বিশ্ববিদ্যালয় বা সাহিত্য-পরিষদ নির্দেশ দেন—কি কি তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, কি ভাবে করিতে হইবে এবং সংগৃহীত হইলে কাহাকে পাঠাইতে হইবে তাহা হইলে বড় ভাল হয়। পরে তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে সচিত্র প্রশ্নাবলী তৈয়ারি করিয়া আরও সবিশেষ detailed তথ্যসংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—এইরূপ মন্দিরকে দো-চালা মন্দির বলে; এইরূপ পাদপীঠকে সর্বতোভদ্র পাদপীঠ বলে ইত্যাদি; শিবলিঙ্গের তিন-ভাগ: রুদ্রভাগ, বিষ্ণুভাগ ও ব্রহ্মভাগ। এইসব ভাগের অনুপাত ২ : ৩ : ৪ বা ৩ : ৪ : ৫ বা ৪ : ৫ : ৬ আছে। যে শিবের সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইতেছে তাঁহার রুদ্রভাগ প্রভৃতির অনুপাত কিরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি।
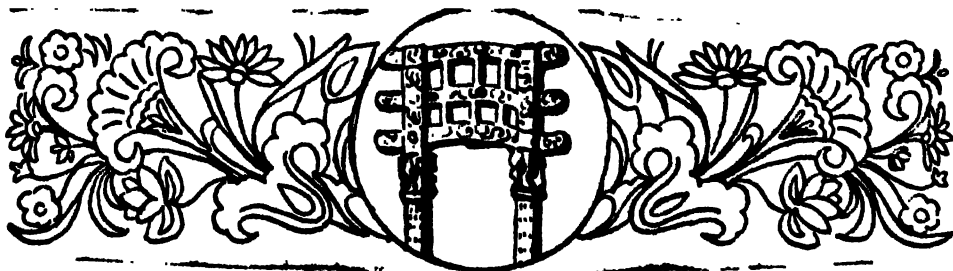
তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

ভারত ও তিব্বত পরস্পর আত্মিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকার সম্বন্ধেই আবদ্ধ। ভারতীয় হিন্দুর কৈলাস, মানসসরোবর ইত্যাদি তিব্বতে। ভারতের শিবশক্তি-সাধনা মূর্ত রহিয়াছে তিব্বতেই। সমগ্র তিব্বত আত্মিক বিশাল ভারত। তেমনই ভারতকে না হইলেও তিব্বতের চলে না। বুদ্ধদেবের জন্ম-মৃত্যু-সাধনস্থান এই ভারত, পদ্মসম্ভবের আদিস্থান এই ভারত—যে ভারতের ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে তিব্বত একসময়ে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল আজও তিব্বতের নিকট সেই ভারতের প্রয়োজন রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পূর্বেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত তিব্বতের এই সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। ভারতে যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছিল তখন কুরুপক্ষীয় এক রাজা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া সামরিক সহচরসহ তিব্বতে যাইয়া বাস করেন। তাঁহার নাম ছিল রুপতি। দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়া তিনি তিব্বতের একাংশের রাজা হন। তখন তিব্বত ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত রাজ্য।

আচার্য প্রজ্ঞাবর্মণ (সেস্-রব্-গো-ছ) বলেন, রুপতির বংশধরগণ বহু বৎসর তিব্বতে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এখন কিছুই জানিবার উপায় নাই।

ইহার পর তিব্বতের ইতিহাসে যে নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার নাম ছিল নহ-খি-ৎসন-পো। তিনি নাকি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের পঞ্চম পুত্র। তাঁহার বংশধরগণও প্রায় আট দশ পুরুষ তিব্বতে রাজত্ব করেন। তখন তিব্বতে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহাকে বলিত পোন্ ধর্ম। এই সময়ে ভারতে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রচলন হইয়াছিল। উপরোক্ত বংশের এক রাজার নাম ছিল হ্ল-থো-থোরিনন-সন। তিনি ৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধগ্রন্থ 'সূত্রাভিপিটক' পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ কি উপায়ে তিব্বতে প্রবেশ করিল সে খবর এখন আর জানিবার উপায় নাই। কিন্তু উহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কাটিয়া গেল প্রায় তিন চার পুরুষ। ইহাই ছিল তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বীজ। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল রাজা স্রোং-ৎসন-গ্যাম্পোর আমলে। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া দেশবাসীর নিকট ঐ ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সময়েই তিব্বতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। দেশবাসী লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করে। সেই সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তিব্বতের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ভারতের প্রভাব প্রথম হইতেই লক্ষ্য করা যায়। চীন এবং নেপালের প্রভাবও ছিল।

রাজা খি-স্রোন-দে-ৎসন-এর (৭৩০-৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে ভারত হইতে বহু পণ্ডিত ও সাধক তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং বৌদ্ধগ্রন্থাদি তিব্বতী ভাষায় রচনা করেন। এই সকল সাধকদিগের মধ্যে পদ্মসম্ভবই ছিলেন সর্বপ্রধান। তাঁহার চেষ্টায় তিব্বতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তী রাজগণও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে দেশময় বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের তখন জয়জয়কার।

এদিকে বৌদ্ধবিরোধী দল সংখ্যায় লঘু হইলেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহারা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সিংহাসন হইতে বঞ্চিত রাজভ্রাতা ল্যানদর্ম ছিলেন এই দলের পশ্চাতে। তিনি বৌদ্ধবিরোধীদিগের এই মনোভাব নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাইলেন। ৯০৮-৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও একসময়ে বৌদ্ধবিরোধী দলের সাহায্য লইয়া রাজাকে হত্যা করাইয়া ল্যানদর্ম নিজে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়াই বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন এবং বহু বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধ গ্রন্থ ধ্বংস করিলেন। তিব্বত হইতে বৌদ্ধধর্ম সমূলে বিনাশ করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অত্যাচার চরমে উঠিল। বৌদ্ধ-সাধক ও পণ্ডিতগণ যে যেখানে পারিলেন, দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল তখন একজন ছদ্মবেশে আসিয়া রাজা ল্যানদর্মকে হত্যা করিল।

ল্যানদর্মের মৃত্যুর পর যে সকল মন্ত্রী রাজ্যশাসনের কাজ চালাইতে লাগিলেন তাঁহারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু ল্যানদর্মের মৃত্যুর প্রায় সত্তর বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পূর্বাবস্থা আর ফিরিয়া আসিল না।

ল্যানদর্মের রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসের পর বহু বৎসর ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যান নাই। অত্যাচারের ফলে যে সকল বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক পলায়ন করিয়া পূর্ব তিব্বতে আমৃচোতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহারাই পুনরায় তিব্বতে ফিরিয়া আসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় মগধ হইতে তিব্বতে আসিয়াছিলেন পণ্ডিত ধর্মপাল এবং তাঁহার তিন জন শিষ্য, সিদ্ধপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল। তিব্বতের তদানীন্তন রাজা তাঁহাদের সাহায্যে তিব্বতে ধর্ম, কলা ও বিনয়শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইহার পর লৃহদে নামক একজন রাজা ভারত হইতে পণ্ডিত সুভূতি শ্রীশান্তিকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত সমগ্র সের্‌চিন্ (প্রজ্ঞাপারমিতা) গ্রন্থখানি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয় হয় ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দে। একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তিব্বতী সম্রাট চ্যঙ্-ছব্ ওদ ছিলেন বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আর্যাবর্তের বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য অতীশকে তিব্বতে লইয়া আসিবার জন্য তিব্বতের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেবা করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার মত ধর্মগুরু ও পণ্ডিত তিব্বতে না গেলে তথায় বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার আশা নাই। আচার্যের পক্ষে বিহার ছাড়িয়া যাইবার অনেক বাধা ছিল। কিন্তু সকল বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি তিব্বত যাত্রা করিলেন। কেহ কেহ বলেন ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৭ বৎসর বয়সে প্রভীশ তিব্বতযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর তিব্বতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া সেখানে বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়া-চতুর্থী তিথিতে য়ে-থঙ্ বিহারের তারামন্দিরে ৭৩ বৎসর বয়সে আতীশ দেহরক্ষা করেন। অতীশের ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলু, খয়ের কাথোজ যষ্টি, ঐ মন্দিরে সুরক্ষিত আছে। তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থ পঞ্চত্রিশ খানি, এবং তন্ত্রের বই সত্তরখানিরও অধিক। এই সব মূল গ্রন্থের অভাব হইলেও উহাদের অনুবাদ ও সারমর্ম তিব্বতী ভাষায় এখনও পাওয়া যায়।

১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে শন্‌কর্ লোছভ্, রিভ্ লোছভ্, নন্ লোছভ্, লোদন্ সেরব্ প্রভৃতির মত বিদ্বান্ তিব্বতী অনুবাদকগণ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই সময়েই সাধু মরম, মিল গোন্ম প্রভৃতি বহু পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বিক্রমশীলা বিহার ধ্বংসের পর তদানীন্তন ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিত শাক্যশ্রীও তিব্বতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে বিক্রমশীলার অনেক ভিক্ষুও তিব্বতে যাইয়া বাস করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এমনকি তিব্বতীয় লামাগণের সাহায্যেই সুদূর মোঙ্গোলিয়ায়ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

আন্নামালাই অধিবেশন

সুদূর চিদাম্বরম্। এবার দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল ওখানে। প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শধন্য চিদাম্বরম্ জনপদ। এখানকার নটরাজের সুপ্রাচীন মন্দিরে প্রতি বৎসরই অগণিত ভক্তের সমাগম হয়। দক্ষিণের মাদুরা ও শ্রীরঙ্গমের দেবালয়ের পরেই চিদাম্বরমের এই নটরাজ-দেউল। সু-উচ্চ গম্বুজ, সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, মন্দিরগাত্রে অজস্র চিত্তাকর্ষক কারুকার্য্য এবং খোদিত ভাস্কর্য্য ভক্ত ও কলারসিকের চিত্তে যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মন্দিরাভ্যন্তরে নটরাজের মূর্ত্তি। সেদিন প্রত্যুষের সন্তর্পণ-পাদ-বিলাসী আলোর কার্পণ্যে আলোছায়া মায়া বিস্তার করেছিল মন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে। সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেখেছিলাম নটরাজের ভুবন-ভোলানো রূপ। স্মরণের কষ্টিপাথরে সোনার লিখনে সে ছবি আঁকা রইল। যুগে যুগে অগণিত নরনারী মুক্তিকামনায় এই নটরাজের মহাতীর্থের ধূলিরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে সর্ব্বত্যাগী হয়েছে। আমরা এলাম সেই মহাতীর্থে।

মাদ্রাজের ১৫১ মাইল দক্ষিণে চিদাম্বরম্—দক্ষিণ-রেলপথের অন্যতম ষ্টেশন। চিদাম্বরমের উত্তরে ভেলোর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের বিক্ষুব্ধ বীচিমালা, দক্ষিণে কোলেরুন এবং পশ্চিমে বীরণম্ হ্রদের প্রশান্ত জলোচ্ছ্বাস। এই চিদাম্বরম্ শহরেই আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা একটি উপনগরী। পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি, বাগান, পার্ক ও খেলাধুলার জন্য খোলা-মাঠ সবই আছে উপনগরীর নির্মুক্ত অবকাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশ জ্ঞানসাধনার অনুকূল। শিল্পকলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার চর্চ্চার জন্য খ্যাত এই শিক্ষাকেন্দ্রটি আজ দেশের জ্ঞানী-গুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যুগিয়েছিল চেট্টিনাদের রাজা স্যার আন্নামালাই চেটিয়ারের রাজসুলভ বদান্যতা। লাখো লাখো টাকা দিয়ে তিনি এই বিদ্যায়তনের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে দিয়ে গেছেন। তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এ দেশের আপামর জনসাধারণ।

গত বছরের ১৯শে ডিসেম্বর এখানে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। বিভিন্ন দেশের দর্শনানুরাগীরা এসেছেন দলে দলে। নানান্ রকম ভাষা, ভূষা ও কৃষ্টির প্রতিনিধি এই সব মানুষ এসেছিলেন দর্শন-চিন্তার আদান-প্রদানের জন্য। পাকিস্থান, সিংহল তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। সুদূর আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মানী, ইতালী থেকে খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা যোগ দিয়েছিলেন আন্নামালাই অধিবেশনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে নিখুঁত আয়োজন করেছিলেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এই মনোজ্ঞ, সহজ স্বচ্ছন্দ পরিবেশে চার দিন ধরে পণ্ডিতজনেরা নানান্ প্রসঙ্গের আলাপ করলেন। সে সব আলাপ যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি চিত্তাকর্ষক। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানালেন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য লেঃ কর্ণেল টি. এন্. নারায়ণস্বামী। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহীশূরের অধ্যাপক নিকম্ পড়ে শোনালেন দূরস্থিত দার্শনিক, অধ্যাপক ও রাষ্ট্রশাসকদের শুভেচ্ছাবাণী। তার পর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর তাঁর উদ্বোধনী-অভিভাষণ পাঠ করলেন। অনুপম তাঁর বলবার ভঙ্গী। দর্শনশাস্ত্র পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তিনি তার বিশ্লেষণ করলেন। কিছুদিন আগেও দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় দেশের সেরা ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসতেন। আজ তার ব্যতিক্রম কেন হ'ল? এই সমস্যা আজ দেশের শিক্ষাবিদ্ তথা সাধারণ মানুষের চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক কবীর তাঁর ভাষণে বললেন: "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দর্শন-শাস্ত্র-পঠন বিমুখতা কেন ঘটল সেকথা ভাববার সময় এসেছে। আমাদের মতে সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্বিবহ অর্থ নৈতিক চাপ এসে পড়েছে, মূলতঃ তার ফলেই এই অঘটন ঘটেছে। মানুষ বাঁচবার তাগিদে, জীবনধারণের প্রয়োজনে তার সবটুকু শক্তি ও সময় নিয়োগ করে ফেলছে। তাই দর্শন-চিন্তা বা তত্ত্ব-বিজ্ঞানের পুঁথিগত সূক্ষ্ম আলোচনায় কালাতিপাত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আজকের দিনে বেঁচে থাকবার প্রয়াসটা এমন সর্ব্বগ্রাসী হয়ে পড়েছে যে, ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে উচ্চ চিন্তার আর কোন অবকাশ নেই। এরিষ্টটলের কথায় বলা যায় যে, এ যুগের মানুষ শুধু জীবনধারণের উপায়ানুসন্ধানের জন্য এমনই ব্যাকুল যে, সে উপায়ের উৎকর্ষসাধন চিন্তায় তাদের কালক্ষেপ করার সময় নেই।" সঙ্কটের কথা তিনি বললেন, তার কারণ বিশ্লেষণ করলেনও নিপুণভাবে। এই সঙ্কটমোচনের পথনির্দ্দেশও তিনি করেছিলেন। অধ্যাপক কবীরের ভাষা দার্শনিক জনোচিত। বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গীতে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণের উপসংহারে বললেন: "মানুষের জ্ঞানের অভাবিত বিস্তার এ যুগের অধ্যাত্ম সঙ্কটকে দূরীভূত করতে পারে নি। পরমমূল্যের প্রতি আগ্রহের অভাব এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করছে তাকে আমরা আমাদের মননে ও কর্ম্মে অস্বীকার করেছি। বাঁচবার তাগিদকে আমরা এত বড় করে দেখেছি যে, আমাদের মূল্যবোধ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে। অথচ মানুষের এই মূল্যবোধই তার সর্ব্বকর্ম্ম প্রেরণার উৎস। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে ভারত

বর্ষের ও তার বাইরের দর্শনশাস্ত্রীদের সত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণের এবং তার মূল্যবিচারের মহান্ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সত্যকে বিচার করতে হবে তার সমগ্রতায়। খণ্ড সত্যের বিচারে অস্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ণ হয় না। মূল্যের রহস্যলোকের দ্বারোদ্‌ঘাটন ঘটবে যদি আমরা সত্যের সমগ্র রূপটুকুর যথাযথ বিচার করি।"

অধ্যাপক কবীরের ভাষণের পরে সম্মেলনের মূল সভাপতি ডক্টর রাসবিহারী দাস তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। গভীর মননিষ্ঠা, সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে প্রমূর্ত্ত হয়ে উঠল। তিনি দর্শনের ব্যাখ্যা করলেন ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ ভাষণে। ডক্টর দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী অধ্যাপক। অমলনীরের গবেষণা-কেন্দ্রে বহুদিন তিনি কাটিয়েছেন দর্শনের উচ্চতম গবেষণায়। তাঁর ভাষণে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছিল এ কথা অসংশয়ে বলা যায়। তার পরে বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে বিভাগীয় সভাপতিরা তাঁদের অভিভাষণ প্রদান করলেন। নীতি-দর্শন ও সমাজদর্শন বিভাগের নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক এস. জি. হুদ্যালকার পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি তাঁর 'নীতিদর্শন ও বিজ্ঞান' শীর্ষক ভাষণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তার সংহারশক্তি, মানুষের নীতিশক্তির ক্রিয়াশীলতা এবং এই উভয় শক্তির তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করেন। দর্শনেতিহাস বিভাগের সভাপতি ডক্টর এ. কে. সরকার এসেছিলেন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে তিনি বস্তুবাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাবাহিক আলোচনা করেন। মনো-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডক্টর বি. কুপ্‌পুস্বামী মহীশূর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি তাঁর 'ব্যক্তিত্ব ও সমাজ' শীর্ষক ভাষণে ব্যক্তিত্বের গঠন ও ক্রমবর্দ্ধমানতার কথা আলোচনা করেন। সামাজিক শক্তির প্রভাব কেমন করে ব্যক্তিত্বের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোন্ পথে সমাজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ-প্রচেষ্টাকে গতি দেয়, সে গূঢ় তত্ত্বের অবতারণা করেন অধ্যাপক কুপপু স্বামী। তর্কশাস্ত্র ও পরাবিদ্যা বিভাগের সভা-পতি অধ্যাপক সি. টি. কে. চারী মাদ্রাজ ক্রিশ্চান মহাবিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি দর্শনের গঠন সম্বন্ধীয় কতিপয় পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত ও অতীন্দ্রিয় দর্শনের উপর বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক চারীর বক্তৃতা বিশেষজ্ঞের গভীর সমীক্ষার দ্বারা চিহ্নিত। তিনি সুধীজনের প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন।

পূর্ব্ব দেশের আচার্য্য শঙ্কর থেকে পশ্চিম দেশের দার্শনিক মুর পর্য্যন্ত শতাধিক দার্শনিক এবং তাঁদের দর্শন মতবাদের উপর দর্শন কংগ্রেসে যে সব মূল্যবান প্রবন্ধ পঠিত হ'ল তা চিন্তার মৌলিকতায় ও বিশ্লেষণের স্বচ্ছতায় সমাগত সুধীজনের আনন্দ বর্দ্ধন করেছে। এবারকার কংগ্রেসে বাঙালী প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য ছিল, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, ডক্টর প্রাণজীবন চৌধুরী, ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যাপক অমিয় মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা অধ্যাপকেরা বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিশ্বভারতী থেকে ডক্টর সন্তোষ সেনগুপ্ত, দিল্লী থেকে অধ্যাপক ডক্টর রায়, ডক্টর এ. সি. সেন প্রমুখ পণ্ডিতেরা এসে-ছিলেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক শ্যামা-কুমার চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। তাঁর এবং তাঁর সহকর্মী ডক্টর মিশ্রের প্রবন্ধ গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দক্ষিণ দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মহাদেবন্, অধ্যাপক জ্যাকসে ও অধ্যাপক সি. টি. শ্রীনিবাস মূর্ত্তি তাঁদের মৌলিক চিন্তার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। এবারকার কংগ্রেসে দুটি আলোচনা সভার বন্দোবস্ত হয়েছিল; তাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু যে যুগোপযোগী এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রথম আলোচনা হ'ল: ভারতীয় দর্শনের পুনর্গঠনের কোন প্রয়োজন আছে কি না? অমলনীরের অধ্যাপক মালকানি, বোম্বাইয়ের অধ্যাপক চার, তিরুপতির অধ্যাপক কে. সি. বরদাচারী ও বাঙলা দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত ডক্টর গৌরী-নাথ শাস্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ ভাষণের কথা শ্রোতাদের বহুদিন স্মরণে থাকবে। সভাপতি ডক্টর দাসের কালোচিত নির্দ্দেশনা উপভোগ্য হয়েছিল। যখন আলোচনা জমে উঠেছে, উভয়পক্ষই আপন আপন যুক্তিজাল বিস্তার করে চলেছেন ভারতীয় দর্শনের পুনর্গঠনের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে, তর্ক-বিতর্কের সেই তুমুল কোলাহলে সভা-পতি ডক্টর দাস উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন যে, ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র মায়াবাদী শঙ্করের দর্শন নয়, অথবা জড়বাদী চার্ব্বাক পন্থীদের দর্শনও নয়। কাজে কাজেই ভারতীয় দর্শনকে কোন একটি প্রান্তিক দার্শনিক মতবাদের সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করে তার পুন-র্গঠন দাবী করা যুক্তিযুক্ত নয়। উপরন্তু 'পুনর্গঠন' কথাটিও অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। তার সুসংহত অর্থ নেই। কাজে কাজেই পুনর্গঠনের ধরণধারণটাও সুপরিস্ফুট হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় আলোচনা সভাটিতে সভাপতিত্ব করলেন অধ্যাপক কবীর। আলোচ্য বিষয় ছিল: 'সামাজিক বিপ্লবের দর্শন-পটভূমি।' মূল আলোচক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মনীষী ডক্টর ডি. এম. দত্ত তাঁর আলোচনায় যে পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় দিলেন তা এযুগে বড় একটা চোখে পড়ে না। তাঁর আলোচনার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তাঁর বাচনভঙ্গীও তেমনি শান্ত ও নিরাসক্ত। অধ্যাপক কৃপালনী ছিলেন এই সভায় অন্যতম বক্তা। তাঁর লিখিত ভাষণ ও বক্তৃতায় প্রসাদগুণে সমুজ্জ্বল। বৃহস্পতিবার, ২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৬-৩০ মিনিটে ইটালীর প্রখ্যাত অধ্যাপক ফ্রাঙ্কো লম্বার্ডি বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল: 'হেগেলোত্তর সমাজদর্শন ও দর্শন-চিন্তা।' যে প্রত্যাশা নিয়ে অধ্যাপকপ্রবরের বক্তৃতা শোনার জন্য গিয়েছিলাম, তা পূর্ণ হ'ল না। জনৈক বঙ্গদেশীয় প্রতিনিধি অধ্যাপক লম্বার্ডিকে মার্ক্সীয় জড়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রে হেগেলীয় আপেক্ষিক তত্ত্ববাদের অবতারণার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন লম্বার্ডি এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলেন তা একান্তই নিষ্প্রাণ নীরস

কথা। বিশেষজ্ঞের মননশীলতার উৎকর্ষের স্বাক্ষর সেখানে ছিল না। তবে এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তাঁর ইংরাজী ভাষায় অধিকার প্রশংসার যোগ্য। এই আলোচনার সূত্রে আলাপ হ'ল নয়াদিল্লীস্থিত জার্মান দূতাবাসের কৃষ্টি বিভাগীয় প্রধান সচিব ডক্টর কাউটারের সঙ্গে। তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। আলোচনা সভার বাইরে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসে এই বিদেশীটির মুখ থেকে যে সুনিপুণ সূক্ষ্ম আলোচনা শুনেছিলাম হেগেলীয় মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদের ওপর তা সহজে ভোলবার নয়। ডাঃ কাউটার ছাড়াও বাণিরাগত পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমেরিকান প্রতিনিধিটিও আমাদের আকৃষ্ট করেছিলেন। এঁরা সব এসেছিলেন দেশ-বিদেশ থেকে ভারতীয় দর্শন চিন্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করার জন্য। ভারতীয় দার্শনিকেরা কি বলেন, তাঁদের চিন্তাধারা কোন্ পথে বর্তমান, এ তত্ত্ব জানবার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আজ যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, এটা খুবই আশার কথা। আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই জাতির প্রাণশক্তির পরীক্ষা হয়। ভারতের চিন্তানায়কদের আজ দেবার সময় এসেছে। গত দু'শত বছর ধরে আমরা কেবল 'আদান' কথাটি সুষ্ঠুরূপে প্রমাণ করেছি। আজ 'প্রদানের' সময় এসেছে। মনে রাখতে হবে বাঙালী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সেই ভবিষ্যৎবাণী: এখনও আমাদের কিছু দেবার আছে। সে দেওয়া চিন্তার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধনার ক্ষেত্রে সত্য হোক। নতুন ভারতবর্ষের সেই সাধনা, সেই প্রচেষ্টার প্রস্তুতি বুঝি দেখে এলাম সাগরোর্মিবিধৌত নারিকেল কুঞ্জ বেষ্টিত দক্ষিণ দেশের এক নিভৃত উপনগরীতে।

অধিবেশনের শেষ দিন, ২২শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের জন্য প্রমোদভ্রমণের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এ তো প্রমোদভ্রমণ হ'ল না, এ হ'ল তীর্থযাত্রা। এ যুগের মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দের পুণ্য সাধনক্ষেত্র পণ্ডিচেরী আশ্রমে তীর্থযাত্রা। আশ্রমের ডক্টর ইন্দ্র সেন কংগ্রেসের অন্যতম অধিনেতা। তিনি হলেন আমাদের যাত্রাপথের কাণ্ডারী। বেলা একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে যাত্রা করার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশিত সুদৃশ্য মোটর বাস এসে দাঁড়াল রাণী অছিদেবী ছাত্রাবাসের সামনে। দেশী বিদেশী প্রতিনিধিরা একে একে উঠে বসলেন। যাত্রা শুরু হ'ল। আসা-যাওয়ার পথের ধারে দু'চোখ ভরে দেখে নিলাম দক্ষিণ দেশের গ্রামীণ সৌন্দর্য। দূরে দূরে বহু দূরে বালুময় মাটির আস্তরণকে ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি কাজু বাদামের গাছ; চিকন পাতা তার মেলে দিয়েছে তপ্ত মধ্যাহ্নের আকাশে। বায়ুহিল্লোলে উপচে পড়া খুশির আমেজ। দূরে কাছে কোথাও বা সবুজ ধানের বাহার। চাষী কোথাও তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে তার ভবিষ্যৎ দিনের স্বর্ণসম্ভারের দিকে। কোথাও বা দেখলাম 'কলসী মাথায় ধরা' গ্রামের মেয়েকে। নিকষকৃষ্ণ কালো চোখে জিজ্ঞাসার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল সে অবাক বিস্ময়ে। গাড়ীর ভিতরে গানে, গল্পে, হাস্যপরিহাসে মনোরম পরিবেশ রচিত হয়েছিল। তরুণ দার্শনিক ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরী সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে সকলের প্রশংসা পেলেন। সিংহলের ড. সরকারের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরকার ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রায়ের কন্যা কুমারী রায়ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। তাঁদের কাছেও আমরা সকলে ঋণী। অধ্যাপক লম্বার্দির গাওয়া ইটালীয়ান সঙ্গীত খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এমনি করে আমরা এসে পৌঁছলাম প্রধান আশ্রমে, যেখানে মহাপুরুষ অরবিন্দ মহানিদ্রায় শায়িত। আশ্রমের শ্রীচারুপদ ভট্টাচার্য একান্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগ দেখালেন—ড. ইন্দ্র সেনের সৌজন্য ও চারুবাবুর সুজনতা ভোলবার নয়। তাঁদের আনুকূল্যে যে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ড. ইন্দ্র সেন আমাদের নিয়ে গেলেন শ্রীঅরবিন্দের নশ্বর দেহের সমাধি বেদীমূলে। আমরা সকলে নতমস্তকে এই মহামানবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। মন অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। একটি নমস্কারে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উজাড় করে দিয়ে মনে মনে বলেছিলাম সেদিন:

'হে মহাজীবন, হে মহামরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ।'

শরণার্থী এ যুগের মানুষ যুগাচার্যকে এই প্রার্থনা বার বার জানিয়েছে। সে প্রার্থনা সেদিন আর একবার উচ্চারিত হ'ল পূর্ব দেশের আর একটি মানুষের মর্মচেতনায়।

হৃদযন্ত্রের সূচীক্রিয়া

আর্নস্ট ওয়েস

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

[Pocket Book of German Stories and Tales, Pocket Book Inc, N. Y. হইতে সংগৃহীত।

লেখকের জন্ম ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, মোরাভিয়ায়। তিনি চিকিৎসক হিসাবে প্রথমে বের্ন-বিভাগে, পরে বার্লিন এবং ১৯৩৩-এর পর প্রাগে গিয়া ব্যবসা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে প্যারিসে পলাইতে হয়। তিনি ইহুদী। ১৯৪০-এর মে মাসে যেদিন জার্মান সৈন্য প্যারিসে প্রবেশ করে, উনি নিজের স্নান-টবে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন।]

ফ্রেডেরিক ফন দি—ডাক্তারি পড়ছে। মাথায় বাদামী চুল, গড়নটি ছিপছিপে। উঁচুদরের সার্জারির দিকেই ঝোঁক বেশী তাই বলে আর কোন দিকে অনুরাগ থাকবে না এমন কথা নেই। হিল্ডেগার্ডের এক তরুণী বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছিল এতদিন, যদিও সম্পর্কটা আপাততঃ ঠিক আগের মত নেই।

ডিসেম্বরের গোড়ায় ফ্রায়েডরিক লেহাইবাট ও-র সার্জিক্যাল বিভাগে অবৈতনিক সহকারীর কাজ পেল। সার্জনটির ভারিক্কি চেহারা আর মিলিটারী চালচলন দেখে ছাত্রেরা তাঁর নাম দিয়েছিল জেনারেল, ফ্রায়েডরিকের বাপ আর এই অধ্যাপকটি একই ধর্মসম্প্রদায়ের বলেই বোধ হয় তার পক্ষে এই পদ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরে গোড়ার দিকে পিতৃবন্ধু তার দিকে তেমন নজর দিতেন না। তবু সামান্য হলেও সে অনেক অপরিহার্য্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিয়েছে। যেমন সংজ্ঞাহীন করা, ঘা ধোয়া, কিংবা ছোটখাটো অস্ত্রোপচার। কাজ না থাকলেও সে দাঁড়িয়ে থেকেছে আদেশের অপেক্ষায়। আবার লেকচারের সময়—সোয়া ন'টা থেকে এগারোটার মধ্যে বিষয় অনুসারে 'কেস' এনে হাজির করেছে সামনে।

এমনি একদিন,- সেদিন ১৭ই জানুয়ারী—অধ্যাপক দুষ্ট অর্বুদ সম্বন্ধে ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিন বা পাঁচ বছর আগে যেগুলির ওপর অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং আজও যেগুলি তাঁর কৃতিত্বের স্থায়ী পরিচয় বহন করছে, সেগুলোর সগর্বে উল্লেখ করলেন। এমনকি অন্যূন সাড়ে সাত বছর আগে—অর্থাৎ কলেজের শিক্ষকতা গ্রহণ এবং শহরে সার্জেন হিসাবে ব্যবসা আরম্ভ করার আগে—যে রোগীকে তিনি নিরাময় করেছিলেন তার কথাও উত্থাপন করে তিনি বললেন, সে আজও অন্যান্যদের মত সুস্থ এবং এ পর্যান্ত আর কোন নতুন উপসর্গও দেখা যায় নি। সব ক'টি অস্ত্রোপচারই গুরুতর রকমের ছিল। তবে তাঁর মতে স্থায়ী উপকার সম্ভব হয়েছে শল্যচিকিৎসার নিপুণতায় আর রোগ নির্মূলীকরণের জন্য ব্যবস্থায়।

পূর্বে রোগীদের চিঠি লিখে ক্লিনিকে ডাকা হয়েছিল। দূরস্থদের রাহাখরচও পাঠানো হয়েছে। তারা এখন ওদিকের ওয়ার্ড আর এপাশের লেকচার-রুমের মাঝের অলিপথে একটি বেঞ্চির ওপর বসে। পাঁচ জন পুরুষ, তিন জন নারী। চার জন এই শহরের লোক, বাদবাকি এসেছে বাইরে থেকে। প্রধান সহকারী সাবধান করে দিয়েছিলেন, তারা যেন পরস্পরের মধ্যে রোগের আলোচনা না করে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক থেকে তারা এ ছাড়া আর কোন আলাপের বিষয় খুঁজে পায় নি। কয়েকজন ইতিমধ্যে জামা তুলে নিজের নিজের অস্ত্রচিহ্ন দেখিয়েছে, অন্যেরা জামার ওপর থেকেই ইঙ্গিতে সামান্য অতিরঞ্জন করে ক্ষতচিহ্নের দৈর্ঘ্য দেখিয়ে দিল। অতঃপর তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদ সম্বৃত করে এবার তারা লেকচারের ছাত্রটির সঙ্গে এসে দাঁড়াল অডিটোরিয়ামে। একটি মহিলা তাড়াতাড়িতে দস্তানার ভিতর হাত ঢুকাতে পারেন নি বলে ঘেমে উঠলেন।

জেনারেল শল্যচিকিৎসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তিনি এই রোগীদের সঙ্গে তাদের তুলনা করলেন যারা এই রোগে বহুদিন আগে শীতল মৃত্তিকায় আশ্রয় নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক ভগ্নদেহ প্রৌঢ়ার দুই কাঁধে নিজের বিশাল দুটি হাত রেখে পুতুলের মত তাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগলেন। সহসা তাকে ছেড়ে দিয়ে জেনারেল এবার ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর অস্ত্রোপচারের ছবি এঁকে দেখালেন ছাত্রদের। ডান হাতে খড়িমাটির ডেলা, বাঁ হাতে সহকারীর দেওয়া প্রয়োজনীয় তথ্যের বিবরণী। অতঃপর নিখুঁত ভাষায় অস্ত্রোপচার রীতির উন্নততর বিভিন্ন কলাকৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে সমালোচনা করে প্রত্যেকটি রীতির গুণাগুণ এবং নির্ভুল পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ রীতির আরোগ্য-ক্ষমতারও একটা হিসাব দিলেন। কিন্তু যে আট জনকে নিয়ে আলোচনার

সূত্রপাত তারা যে তখনও অডিটোরিয়ামে—প্রয়োজনবোধে অপারেটিং-রুম হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এটি—দাঁড়িয়ে, তাদের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন অধ্যাপক। তিনি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে শল্য-চিকিৎসার আলোচনা করে যাচ্ছেন এমন সময়ে এক সহকারী অধ্যাপকই ভিতরে ছুটে এসে তাঁর কানে কানে কিছু বলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সার্জেনের মুখ উত্তেজনায় সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল। কৈশোরের কতকগুলো ক্ষতচিহ্ন ছিল মুখে, সেগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে 'চেরি'র মত লাল হয়ে উঠেছে। গভীর উদ্বেগে ললাট কুঞ্চিত। এক অবসরে সহকারী আট জন রোগীকেই মুরগী-তাড়ানোর মত করে হলের বাইরে খেদিয়ে নিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক প্রায় সেই মুহূর্তে নিজের ব্যবহার্য জলাধারের দিকে এগিয়ে, সেল্ফের ওপরকার সময়-নির্দেশক আওয়ার-গ্লাসটিকে উল্টে দিলেন। দশ মিনিট পরে বাদামী বালুকণা ঝরবে। সেই সময়টুকুই তাঁর হাত ধোয়া এবং নিজের নির্বীজীকরণের জন্যে নির্দিষ্ট। ছাত্রটি এসে জেনারেলকে অস্ত্রোপচারের পোশাক পরিয়ে দিতে লাগল। জেনারেল পর্যায়ক্রমে হাত ধুচ্ছেন আর কথা বলে যাচ্ছেন। সেই ফাঁকে প্রকাণ্ড একটি বাদামী-রঙের জলনিরোধক এপ্রন পিতলের শিকল দিয়ে তাঁর চওড়া ঘাড়ের ওপর বেঁধে দেওয়া হ'ল। ঘাড়ের রংও লাল। মুখ না তুলেই তিনি কালো রবারের গাম-বুটের ভিতর পা ঠেলে দিলেন মুহূর্তের ব্যবধানে কলেজের অধ্যাপক যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ভাবভঙ্গী, এমনকি তাঁর দৃষ্টি পর্য্যন্ত বদলে গেছে। কড়া বুরুশ দিয়ে নখ, হাতের দু'পিঠ আর কনুই পর্য্যন্ত দুই বাহু রগড়ে ধুচ্ছেন। সক্রিয় সাবান-আধারে পায়ের চাপ দিতেই দুই বাহু তরল সাবানের ফেনায় ভরে উঠল। ফেনা ধুয়ে ফেলতে একবার করে হাতের চামড়ার লাল রং ফুটে বেরুচ্ছে। আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা ফেনার ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দেখাদেখি সহকারীও তাই করতে লাগল।

জেনারেল এবার মুখ ঘুরিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, "ভালই হ'ল। খুব সুখের না হলেও এ এক অভূতপূর্ব যোগাযোগ। হাসপাতালের কাছেই আত্মহত্যার চেষ্টা। এক কুমারী যুবতী, হার্টের ভেতর কলমের নিব বসিয়ে দিয়েছে। হার্ট সেলাই করতে হবে বলেই অনুমান করছি। অস্ত্রোপচারের কৌশলটি আধুনিক, কিন্তু আঘাতের অস্ত্রটি একেবারে সেকেলে—একটি পুরনো-চালের কলমে সাধারণ একটি লোহার নিব। আপিসে কাজ করে মেয়েটি। একটু আশার কথা, নিবটা নাকি এখনও আটকে আছে, তাই আর রক্তপাতে মারা যায় নি। কিন্তু এমন একটি আদিম-কালের যন্ত্র দিয়ে হার্ট ফোঁড়ায় বাহাদুরি আছে বটে। তবে যে কৌশলটি এখন আপনাদের—ওপরের সারিতে যাঁরা আছেন তাঁরাও শুনুন, আপনাদের প্রত্যেককেই স্থির হয়ে বসতে অনুরোধ করছি, এ সব ক্ষেত্রে ধুলো বড় সাংঘাতিক, অযথা বিপদ ডেকে আনে। হাঁ, যা বলছিলাম, যে রীতিটা আপনাদের দেখাতে চাই সেটি একেবারে নতুন এবং ফ্রাঙ্ক-ফার্টের স্বর্গত অধ্যাপক 'রেণ'-এর বহু অসমসাহসিক কীর্তির একটি।"

"ডাঃ ই—, আপনিই যথারীতি প্রথম সহকারী হবেন, ডাঃ স্নাইকার দ্বিতীয়, আর তৃতীয় পদ নেবেন ডাঃ শিলার-লিং। এনিসথেসিয়া দেবেন এই যুবকটি—আপনাদেরই সহকর্মী—ভালই দিতে দেখেছি এঁকে। এসব ক্ষেত্রে 'অবেদন' পদার্থটিও ভাল হওয়া চাই। মনে রাখবেন, 'হাইপার-প্রেসার এনিসথেসিয়া', কেননা ব্যাপারটা ঘটেছে বুকের ভেতর।"

"আগেই বলেছি আজ ক'বছর থেকে হার্টের এ ধরনের আঘাতে আমরা আর অসহায় বলে মনে করি না। রেণ-পদ্ধতিতে এখন ফোঁড়-খাওয়া হার্ট, উপায় থাকলে এমনকি গুলি বেঁধা হার্টও আক্রমণ করতে সক্ষম আমরা। সত্যি বলতে কি, জীবিত অবস্থায় আমাদের টেবিলের ওপর এলে ও ধরনের যে-কোন জখমই সামলাতে পারি। সময়ে অস্ত্রোপচার করতে পারলে পাঁচ জনের ভেতর তিন জনই বেঁচে যাবে। ভাবছি, আজ যদি অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ সারাজেভোয় হার্টে জখম পেয়ে—যাক গে, সে করুণ ইতিহাস না তুললেই ভাল।...হেড নার্স, সোডিয়াম ক্লোরাইড সলুশন গরম করে নাও, এড্রেনালিন তৈরি রাখ, ১ঃ১০০০ ভাগ, হ্যাঁ। আমি বলতে চাইছিলাম সব রকমের আঘাতেরই প্রতিকার আছে আমাদের হাতে, কেবল ঘাতকের বিরুদ্ধেই কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। আমরা জখম জুড়ে দিই, কিন্তু মর্ম্মাঘাতটুকু মুছতে পারি কি? এনিস্থেসিস্ট নাড়ী দেখবেন। দিব—ডায়ালেটার আনতে ভুলবেন না—প্রকৃতপক্ষে হাড়ের সব অস্ত্রগুলোই চাই।"

"এসব ক্ষেত্রে নিদান নিয়ে হাঙ্গামা নেই। রোগী পাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচার করতে হবে। সবকিছুই নির্ভর করে ক্ষিপ্রতার ওপর। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা নয়—কৈ, আমাদের রোগীটি কোথায়? সোজা ভেতরে নিয়ে আসুন, আদব-কায়দা কিংবা 'সাফ-কিছে'র হাঙ্গামা নিষ্প্রয়োজন রোগীর মত না নিয়েও অপারেশন করি আমি, রোগীর জ্ঞান থাকে নাকি এ অবস্থায়? আর তার আত্মীয়স্বজন—তারাই বা কতটুকু বোঝে ভাল-মন্দের? ও সব প্রশ্নই ওঠে না এ

ক্ষেত্রে। হাতে পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তাই বলে নির্বীজীকরণের কোন গাফিলতি চলবে না, কাউকে জিজ্ঞেস করবার নেই, এর যা বাঁধা নিয়ম, তা অবশ্যই পালন করা চাই। স্মরণ রাখতে হবে আমরা দেহের কোমলতম অংশে অস্ত্রোপচার করছি। বক্ষগহ্বর আর হৃদাবরক ঝিল্লি, এতে সহজেই পুঁজ এসে যায়।—এই যে, মেয়েটি এসে গেছে। চলে এস, সাবধানে—আস্তে।"

সেই ঢ্যাঙা ছাত্রটি, মাথায় বাদামী চুল, কিছুটা কবি-স্বভাব—ফ্রায়েডরিক ফন বি—আবার সেই হিন্ডেগাড়ির তরুণীটকে দেখলে। একদিন যে তার হৃদয়ের এতখানি অধিকার করেছিল, সেই আজ আত্মঘাতিনী হয়েছে।

কয়েকটি বিজলি-চুল্লীতে যন্ত্রপাতি শোধন চলছে। কতকগুলি ছোট কেৎলি থেকে ঘন বাষ্পের মেঘ অপারেশন থিয়েটারে ভেসে বেড়াচ্ছে। দুপুরবেলাতেও যেখানি আঁধার বলে মনে হচ্ছে।

জেনারেল হাঁক দিলেন—আলো।

অমনি ছাদের নীচে সারিবদ্ধ বাতিগুলো ফস্‌ফস্ করে জ্বলে উঠল। ছায়াশূন্য স্বচ্ছ শ্বেত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অপারেশন টেবিল, অধ্যাপক আর তার সহকারিগণ। অডিটোরিয়ামের শেষ সারি পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে। দেয়াল-ঘড়ির অস্পষ্ট কাচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল এগারোটা বেজে মাত্র দু' মিনিট। জেনারেল নির্বাক। কোথাও কোন শব্দ নেই। কেবল ফুটন্ত জলের সোঁ সোঁ, গরম জলের ভিতর ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির ধাতব টুং-টাং আর উপস্থিত ছাত্রবৃন্দের শ্বাসপ্রশ্বাসের চাপা শব্দ কানে আসছে।

মেয়েটি চাপা গলায় কাৎরে উঠল একবার, কিন্তু চেঁচালে না। মনে হয় বুকের সামান্যতম আন্দোলনেও আঘাত পাচ্ছে সে, তাই শ্বাস চেপে রাখবার চেষ্টা করছে। তাদের সামনে নীচের দিকে ছাত্রেরা ছাদের আলোয় উদ্ভাসিত মেয়েটির মুখ দেখতে পেল। মাথার গাঢ় বাদামী চুলগুলি ভিজে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সিক্ত অধরের অনেকখানি ওষ্ঠে ঢাকা; চোখের পাণ্ডুর পল্লব দুটি চেপে বন্ধ করে রেখেছে। অনেক কষ্টে একবার চোখ তুলবার চেষ্টা করতে পাতা দুটি কেঁপে উঠল, মণি দুটো অস্থির ভাবে নড়ে উঠল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। দেহের ঊর্ধ্বাংশের পরিচ্ছদ আগেই কেটে ফেলে সুতির পাতলা জালের পর্দায় ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পর্দার একাংশ একটি তীক্ষ্ণ বিন্দুর ওপর উঁচু হয়ে আছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দুটিও ওঠানামা করছে।

চারিদিক থমথম করছে। জেনারেল আর তার সহকারীরা ব্রাশ দিয়ে হাত ধুয়ে নীরবে মেয়েটির দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নীরবতা। ফুটন্ত জলের শব্দ, শোধক-পাত্রের বগবগানি, বাতিগুলোর একটানা কান্না আর প্রতি শ্বাস চলাচলে তরুণীর চাপা গোঙানি, এ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না।

জেনারেল হেড নার্সকে সঙ্কেত করলেন। মহিলা অতি সন্তর্পণে—যাতে মেয়েটির সামান্যতম আঘাত না লাগে এমন ভাবে, শোধিত ফরসেপস দিয়ে জালের পর্দাটি সরিয়ে দিলেন। তরুণীর বাম বক্ষের নীচে সেই কলমটি দেখা গেল। প্রতি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে সেটি। আপনিই একবার করে দেবে যাচ্ছে ভিতরে; আবার বেরিয়ে আসছে ওপরে, এত সূক্ষ্ম তার কম্পন, বুঝি সামান্য একটু চুলের আঘাতও মাপা যায় তার ডগায়।

"সবচেয়ে বড় কথা"—জেনারেল ভাজা চিংড়ির মত লাল বাহু দুটো আর একবার আরও জোরে ব্রাশ দিয়ে রগড়ে বললেন, "সবচেয়ে আশার কথা মেয়েটি এখনও জ্ঞান হারায় নি। কেবল 'শক' ছাড়া, খুবই স্বাভাবিক এক্ষেত্রে। আর, —না রক্তক্ষরণও নেই, বাইরের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। ...সামান্য থাকাই সম্ভব।"

জেনারেল তাঁর পেশীবহুল পালিশ-লোহার মত চকচকে হাত তুলে ফ্রায়েডরিক ফন বিকে রোগিণীর কাছে আসতে ইশারা করলেন।

'ঠিক আছে। এনিসথেসিয়া চালিয়ে যাও।"

ছাত্রটি ইতস্ততঃ করতে লাগল। আতঙ্কে তার সারা দেহ কাঁপছে। প্রতিটি স্নায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে কোনমতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। হাইপার-প্রেসার এনিসথেসিয়ার জন্যে বিশেষ একটি যন্ত্রের প্রয়োজন, সেটি আগেই সেখানে উপস্থিত রাখা উচিত ছিল। সামান্য মেরামতের জন্যে সেটিকে আর এক ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সবাই যখন মুহূর্ত গুনছে ঠিক সেই সময়েই যন্ত্রটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কারু সাহস হচ্ছে না জেনারেলকে জানায় সে কথা।

নার্সেরা তাড়াতাড়ি নিকেল-প্লেটকরা বড় বড় ড্রামের ভিতর থেকে কোট, টুপী, তোয়ালে, রবারের দস্তানা আর ড্রেসিং টেনে বার করল। দু'জনে ধরে সাদা চৌকোণ এক খণ্ড চাদর বিছিয়ে দিলে তরুণীর পিঠের তলায়। হেড নার্স অতি সন্তর্পণে মেয়েটিকে তুলে ধরলে। কোমরের নীচের অংশে আর একখানি চাদর ঢেকে দেওয়া হ'ল, কেবল দেহের উত্তমাংশ খোলা থাকবে। রোগিণীর মুখ প্রতি মুহূর্তে ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। হাত দুটি নীচের দিকে বাঁধা, জানুর ওপর দিয়ে চওড়া ফিতে টানা।

আওয়ার-গ্লাসে ন' মিনিট শেষ হয়ে গেছে। ফুটন্ত জল

থেকে যন্ত্রগুলো নামিয়ে আনা হ'ল। মেঘপ্রমাণ বাষ্প উঠছে। হেড নার্স চাকাওয়ালা ছোট টেবিলের ওপর নিপুণ হাতে হিসেবমত যন্ত্রপাতি সাজিয়ে দিলে। একই প্রকারের যন্ত্র কাছাকাছি রইল। বড়গুলো ডাইনে, ছোটগুলো বাঁয়ে। কাঁচি, সোজা-বাঁকা চার আংটার হুক,বোন করসেপস, ক্ল্যাম্প ছোট চিমটে, সূচাধার, সোজা বা কাস্তের আকারের সূচের কৌটা, নানা প্রকারের লাটিমে জড়ানো রেশম বা ক্যাটগাটের তন্তু। ওপরের গ্লাস থেকে সব বালি ঝরে গেল। ফ্রায়েডরিক অসহায় ভাবে ঘরের চারিদিকে চাইল, এনিসথেসিয়া যন্ত্রটি তখনও এসে পৌঁছয় নি। সহসা জলের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

"আইয়োডিন"—সার্জ্জেন আবার হাঁকলেন।

প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে যন্ত্রটি গড়িয়ে এল ভিতরে। জটিল যন্ত্র একটি। লাল নল-লাগানো আধারে অক্সিজেন—নীল নলওয়ালা আধারে আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। অবেদক-গ্যাসটি এসে মিশছে সবুজ নলে। শ্বাসক্রিয়া নিরোধের জন্য আছে চকচকে একটি প্রেশার গেজ আর তরল পদার্থে ভরা স্বচ্ছ কাচের সিলিণ্ডার।

সার্জ্জেনকে যখন তাঁর সাদা কোট, টুপি এবং মুখোশ পরান হচ্ছিল, ছাত্রটি তখন লালচে রবারের মুখোশটি অল্পে অল্পে মেয়েটির মুখের ওপর চেপে ধরেছে। বাতাসে মিশে অচেতনকারী দ্রবের মুক্তার মত বড় বড় বুদ্বুদ স্বচ্ছ একটি কাচের নলের ভিতর দিয়ে নেমে যেতে লাগল। ছাত্রটি প্রায় শব্দহীন কণ্ঠে বললে, "জোরে দম নাও, জোরে"

মেয়েটি নীরবে মাথা নাড়ালে, কিন্তু দৃঢ় ভাবে। ক্ষীণ চেষ্টায় যতটা পারলে মুখের কাছ থেকে মাস্কটিকে ঠেলে দিলে। মাস্কটি তাও মুখের সঙ্গেই লেগে রইল। মেয়েটির পাংশুটে মুখ এবার যেন বিকৃত হয়ে উঠল। সে মুখ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে। মুখও খুলেছিল, বোধ হয় চেঁচাত, কিংবা গালমন্দ করত। কিন্তু তবু রক্তহীন সেই ফ্যাকাশে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আর কোন শব্দ বার হ'ল না।

রবারের দস্তানা পরতে পরতে জেনারেল পুনরায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আইয়োডিন!"

পুরু চওড়া একখণ্ড গজের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের সমস্ত জায়গায়, দুই স্তনে গলা পর্য্যন্ত ওপরে, আর নাভি পর্য্যন্ত নীচে, তামাটে রঙের ছোপ পড়ল। ছোপ দেওয়া চামড়ার ঠিক মাঝখানে তখনও সেই কলমট ঝেঁকে ঝেঁকে উঠছে। তবে এখন অনেক ক্লান্ত, দ্রুত নিস্তেজ। হৃদযন্ত্রটি অসহায় ভাবে কাঁপছে থর থর করে, শক্তি নিঃশেষিতপ্রায়। শ্বাস-প্রশ্বাস এতক্ষণ স্পষ্ট ছিল, কিন্তু এবার যেন গভীর হয়ে আসছে। বিস্ফারিত দুই চোখ স্পষ্ট অথচ নিরাশ দৃষ্টি নিয়ে শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জেনারেলের মুখে অদ্ভুত এক নিরুদ্বেগ চিত্ততুষ্টির ভাব। মনে হয় ইতিমধ্যে তিনি অস্ত্রোপচারের শেষ খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত, এমনকি সম্ভাব্য জটিলতার প্রশ্নগুলোও বিচার করে ফেলেছেন, বাকি শুধু আরম্ভ করা। কিন্তু মেয়েটি জেগে কেন এখনও? দেখা যাচ্ছে মেয়েটির মুখ যেন আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ থেকেই কি খুঁজছিল সে, এবার বুঝি সে তার পূর্ব-দয়িতের চোখ দুটি খুঁজে পেয়েছে।

ছাত্রটি ভাবলে আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করলে চলবে না। অচেতন তাকে হতেই হবে, এখনই। কিন্তু কি বলবে, কেমন করে বোঝাবে, কি দিয়ে তার সদ্বুদ্ধি আসবে? এমন কি আছে যা তাকে স্মরণ করাতে পারে?

কার দোষ—মৃত্যুর দু'মিনিট আগে কে করবে তার প্রায়শ্চিত্ত? এগারোটা বেজে বারো মিনিট।

জেনারেল নাড়ীর অবস্থা জানতে চাইলেন। ফ্রায়েডরিক তরুণীর সুন্দর কোমল কণ্ঠে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগল। কণ্ঠের প্রতিটি রেখা তার অনেক দিনের পরিচিত। অতি সন্তর্পণে, তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে সে তার সিক্ত-উষ্ণ গাত্রত্বক স্পর্শ করলে।

—"ক্যারোটিডে কোন স্পন্দন নেই, কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না"

মেয়েটি তার হাতের স্পর্শ অনুভব করেছে। সে কি আজও ভালবাসে তাকে? আবার কি বাঁচতে চায় সে? অনুশোচনা জেগেছে? সে কি এখনও মাত্র ক'মিনিট আগের সেই মানুষ আছে? সহসা তার চোখের পল্লব বন্ধ হ'ল, পল্লবের দীর্ঘ রোমগুলির পরস্পরসম্মিলিত গাঢ় বাদামী রেখাটি উজ্জ্বল দীপালোকে পীতবর্ণ বলে ভ্রম হয়। অধরোষ্ঠ উন্মুক্ত হয়ে গেল আস্তে আস্তে। ছাত্রটি এক নিমেষের জন্য মাস্ক তুলে দেখলে হালকা প্রবাল রঙের মাড়ির ওপর জেগে আছে দুগ্ধশুভ্র দাঁতের পাটি।

দ্রুত গভীর টানে ইথারের বায়ু আকর্ষণ করে মেয়েটি তার দিকেই শ্বাস ছাড়ছে। এগারোটা বেজে তেরো মিনিট।

"ঠিক আছে?..এখুনি আরম্ভ করতে হবে আমাদের। ঘুমিয়েছে? এখনও না? তা হোক। জীবন আগে, এনিসথেসিয়া পরে। যুদ্ধ! যুদ্ধ! চালাও হাতিয়ার!... মাথা নীচু, মস্তিষ্কের রক্তশূন্যতা না আসে। বিশেষ করে শ্বাসকেন্দ্র, মেডুলা ওবলংগেটায় রক্ত থাকা চাই। জখম থেকে রক্ত ঝরে জমে এসে পেরিকার্ডিয়ামে। হৃৎপিণ্ডের

ওপর চাপ পড়ে বাইরে থেকে। আমাদের প্রতিভাবান আর্নস্ট বার্গম্যান একেই বলেছেন, 'হার্ট ট্যাম্পনেড', অর্থাৎ শ্রবণ-রোধক গুঁজি। আর একটু নীচে,···আরও, ঠিক হয়েছে। সক্রিয় বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নিঃশব্দে টেবিল নীচু করে দেওয়া হ'ল। ছাত্রটি অনুভব করলে মেয়েটির কোমল ভিজে চুলসুদ্ধ মাথাটি তার হাঁটুর ওপর এসে পড়েছে। এখনও বেঁচে আছে কি? জাগ্রত, না মৃত?

"রেডি!"

প্রথম সহকারী টলটলে এলকোহলে ভরা একটি কাচের পাত্র থেকে মাছের ডানার আকারে নিকেলের একটি বাঁকা স্ক্যালপেল ছুরি তুললে, ওপর দিকে চকচকে নীল ইস্পাতের ফলা।

চিত্রকর যেভাবে তুলি ধরে জেনারেলও তেমনি করে ছুরির আগাটা চেপে ধরলেন। তার পর ডিজাইন আঁকার ভঙ্গীতে একটি বাঁকা চির দিয়ে দুই স্তনের মাঝ দিয়ে বাম স্তনের নীচের দিক ঘুরিয়ে টেনে আনলেন ছুরি। একটি হাল্কা রেখা পড়ল মাত্র, যেন কেউ বাতাস দিয়ে ত্বকের ওপর রেখাটি টেনে দিয়ে গেল। এক ফোঁটাও রক্ত নেই। সহকারীরা ত্বকের দু'প্রান্ত চিমটের সাহায্যে ওপর-নীচ দু' ধার থেকে অনেক দূর পর্যন্ত খুলে ধরলে। মেয়েটি একবার মাত্র কাৎরে উঠে নীরব হয়ে গেল। ছাত্রটি আবার ইথার প্রয়োগ করছে। ইতিমধ্যে সার্জেনের হাত থেকে ছুরিখানি কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ লক্ষ্য করে নি। এখন তাঁর ডান হাতে পর্যায়ক্রমে বড়-ছোট, তীক্ষ্ণ-স্থূল, কাটবার, সমান করবার কিংবা ছাঁটবার নানা যন্ত্র নৃত্য করছে। সার্জেন ও তাঁর সহকারীদের হাতে অতি সূক্ষ্ম দস্তানা, নখের প্রান্তগুলিও দেখা যায় তার ভিতর থেকে। অস্ত্রোপচারের জায়গায় কেবল জেনারেলের লম্বা আঙুলসমেত বিশাল একখানি হাত ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাতের নড়ন-চড়নে মনে হবে বুঝি ঢিলে, ভাসা-ভাসা কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিসাবে তাঁর এতটুকু ভুল হচ্ছে না। অন্য হাতগুলি দিয়ে কেউ-বা ত্বকের প্রান্ত ধরে আছে, কেউ-বা প্রয়োজনমত স্পঞ্জ অথবা যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিচ্ছে। অন্যান্য কাজে জেনারেলকে সাহায্যও করছে কেউ কেউ। জেনারেল বেশীর ভাগ কেবল চোখের ইশারা দিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কথা বলছেন না। যেটুকু বলছেন, তাও কেবল ছাত্রদের প্রণালীটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

"আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করছেন তেমন রক্তক্ষরণ নেই। ভাল লক্ষণ নয়। রক্তের চাপ অতি সামান্য। এনিসথেসিয়া সাবধান, গোড়াতে দাও, জেগে না পড়ে তার জন্যে যতটুকু দরকার, তার বেশী নয়। 'শক' এখনও কাজ করছে, সুতরাং ব্যথা পাবে না।"

"চামড়ার নীচে সামান্য বজবজে শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছিন্ন অংশ দিয়ে বাতাস বেরুচ্ছে। ঠিক এখান থেকে আমাদের একটু একটু করে হাড় বার করতে হবে, এখানে এসে পাঁজরাগুলো দুমড়ে দিতে হবে, অর্থাৎ হার্টে পৌঁছনোর একটা রাস্তা চাই। তার মানে দরকারমত দুই, তিন কিংবা চারখানি হাড় সরাতে হবে। তবে অস্থি-আবরক ঝিল্লীর কোন ক্ষতি না হয়, কেননা পরে তাদের আবার এক সঙ্গে জুড়ে যাওয়া চাই। জুড়তে দেরি লাগে না। হাত টানুন, কোন জীবাণু ভেতরে না যায়। এনিসথেসিয়া জোর করুন, নামমাত্র ইথার, প্রচুর অক্সিজেন। এইবার হবে শত্রুর সঙ্গে আমাদের শক্তি পরীক্ষা। বাইরে থেকে ফরসেপ দিয়ে চেপে রাখুন কলমটাকে, হ্যাঁ, অমনি করে। দেখুন, পিছু নিচ্ছি এবার, এই পথেই গিয়েছিল নিবটা। কালির দাগ দেখতে পাচ্ছেন? এবার ঘোরাতে হবে,—একটু বাইরের দিকে দুমড়ে দিন—ঠিক। টানুন···এবার, হাল্কা—জোরে, আরও জোরে,—হয়েছে! বেরিয়ে এসেছে! যান, ওটাকে এবার সংগ্রহালয়ে রেখে আসুন। হয় ত ভাবছেন বেকুবি!—মানুষ মরিয়া হলে হাতের কাছে যা পায় তাই ব্যবহার করে। এবার পাঁজরার ব্যবস্থা। চেয়ে দেখুন। পাঁজরার কাঁচি, হাঁ, রাখুন ওখানে—সাবধানে। প্রথমে নীচে একটি আঙুল দিন, আমি চাপ দিচ্ছি। পরেরটায় এবার। আঙুল নীচে, হাড়সুদ্ধ চামড়ার পর্দাটা সবসুদ্ধ তুলে ধরুন। খুব আস্তে, একেবারে চাপ না লাগে। এক, দুই—আর একটি। এক, দুই, ভাঁজ করে যান, চালান, চালান—সাবধান, পিছলে না যায়। পর্দাটা স্থির করে ধরুন, না হচ্ছে না। আস্তে, আরও আ—স্—তে,—বেশ!"

ছাত্র কন বি. মেয়েটির মুখের ওপর হাত রাখলে, শ্বাস পড়ছে কিনা বুঝতে পারা গেল না।

"মাস্ক উঠিও না। হাইপার প্রেসার ঠিক রাখা চাই। ঠিক শ্বাস নিচ্ছে, চিন্তার কারণ নেই। আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, ফুসফুস বাতাস টানছে। এনিসথেসিয়া বন্ধ কর এবার, দরকার হলে দেখা যাবে। এবার ভাল করে দেখুন। এইটে হ'ল হৃদাবরক ঝিল্লী,-পেরিকার্ডিয়াম। ···ঠিক···সামনে। ধারালো ক্ল্যাম্প! ক্ল্যাম্প! বড় একটা, ছোটও। মাঝারি নাও তুমি, হুঁশিয়ার হয়ে বাইরের দিকে ঘোরাও একটু। আর একটা—আরও একটা, চালিয়ে যাও কথা না বলে। পেরিকার্ডিয়ামের ওপর জখমটা এই যে—ধারগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া, করাতের দাঁতের মত আঁকাবাঁকা। অমনি করেই কাটতে কাটতে গেছে ভেতরে। দাগ সোজা

র কি করে? প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে পেরিকার্ডিয়াম ঢুকে সরে যাচ্ছে, চোট খাবার সময়েও তাই হয়েছিল। শিকাটা প্রোব দাও একটা, ভেতরে যাবে, বেশ খানিকটা চে চালাতে হবে।"

নিকেল করা ষ্টীলের আঙুলের মত একটি যন্ত্র, প্রোব। গুলি লম্বা, বসাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানের রক্তাক্ত গভীর হ্বরে পিছলে ঢুকে গেল।

"ঠিক আছে। প্রোবটিকে এবার সাবধানে চেপে রাখুন। টির মাথার ওপর কাঁচি ধরুন, সোজা কাঁচিই সবচেয়ে ভাল। , কিন্তু নীচের দিকে ঠেকিয়ে,—প্রোবটি যেন ঠিক কাঁচির নীচে থাকে। একটি জায়গায় কাটুন—ঠিক হয়েছে। ভাল করে একবার দেখে নেওয়া যাক। রক্তের ডেলায় ভরে আছে। ওগুলো সরাতে হবে। মুছে ফেলুন, আস্তে—পেরিকার্ডিয়ামে ঘষা না লাগে, ক্ষতি হতে পারে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবার, কিন্তু থাকছে না বেশীক্ষণ। তাড়াতাড়ি জখমটার ব্যবস্থা করতে হবে। রক্ত আসছে কোত্থেকে? টকটকে লাল যে ওখানে?—স্পঞ্জ করে নিন, মাথা তুলে, শুধু আমায় দেখতে দিন, জায়গা ছাড়ুন। স্পঞ্জ করুন—হাত দিয়ে নয়, ফরসেপ দিয়ে স্পঞ্জ করুন। হাল্‌কা হাতে, চট্‌পট্‌—হালকা করে বললুম যে! আলতো হাতে তাড়াতাড়ি সারতে হয়, রগড়ানো চলবে না। এবার দেখে যান শুধু, চালান। শীঘ্র অন্ধকার কেটে দিনের আলো দেখা যাবে। নাড়ী কেমন? মণিবন্ধে আছে কিছু? নেই? সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন দিন। যতটা যায়। রক্ত পেলেই ভাল হ'ত, ব্লাড ট্রানসফ্যুশন! কিন্তু বড় সময় নেবে। প্রথমেই ব্লাড-গ্রুপ বাছতে হবে, বড্ড সময় লাগে! তার চেয়ে কনুইয়ের কাছে ক্যুবিটাল শিরায় ফিজিওলজিক্যাল সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন দিন। যতটা নিতে পারে। রক্তের বিকল্প ব্যবস্থা। ল্যাবরেটরিতে এখানে এক ভদ্রলোক ব্লড-গ্রুপ ঠিক করে দেন। রক্ত দেবার আছে কেউ? ডাঃ বি, আপনি একবার রক্ত দিয়েছিলেন আমাদের, আপনার ব্লাড-গ্রুপ কি? দেখতে থাকুন। ঠিক এক'শ' সেকেণ্ড! আস্তে!—হার্ট সামনের দিকে টেনে ধরুন। অমন করে কাঁপাতে থাকলে কিছুই সম্ভব হবে না। স্থির রাখতেই হবে ওটাকে, কোটরের বাইরে আনতে হবে। বাইরে বলছি, ভীতু কোথাকার! সেলাই করতে হাত পৌঁছনো চাই ত? স্থির করে ধরে রাখতেও হবে। এবার, বাঁধবার আগে ঘায়ের ধারগুলো টেনে তুলতে হবে। হ্যাঁ, ঐ সুতোতেই হবে, মিহি রেশম বাঁকা স্থচ,—এই সাইজের। আমায় দিন। হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন সবাই? সুতো খুব ছোট না হয়। স্থচ ধরবারটা আমায় দিন। তুমি পেরিকার্ডিয়া তুলে ধর, আপনি সুতোর গোড়াটা, ঝুলে না থাকে। দেখে যান, আমি পেরি—আর এপিকার্ডিয়ামের ঝিল্লী ফুঁড়ছি—বাঁয়ের ভেনট্রিকল, এপেক্‌স ভেতরে গেল। বাইরে আনছি এবার। একটা ফাঁস দিলুম—আপনি ধরুন ত এটা। আর একটা এমনি করে: দেখছেন? স্থচ দিয়ে এবার হার্টের পেশী ধরেছি, এবার ফোঁড়,—ভেতরে—বাইরে। স্থচ সরিয়ে দিন, সুতোর প্রান্ত ছুটো এক করুন, ব্যস হয়ে গেছে। সুতো কুড়িয়ে নিন। হার্টটাকে টেনে বার করুন,—সাবধানে—কোটরের বাইরে। রক্ত ঝরছে, ঝরুক, ঝরেই থাকে। তুলে ধর, তাড়াতাড়ি—আরও ওপরে, আস্তে! আর একটু হলে বোধ হয় ভাল হ'ত! ভয় পেও না! পাশের দিকে—এমনি করে। হার্টের এ পাশটায় কিছু নেই। এদিকেও না। বেশ, এবার উলটো দিকটা। ডান দিকে একটু তুলে ধরুন ত। ধরুন—স্পঞ্জ করে ফেলুন, চাপ না লাগে। থামুন—থামুন।"

"এই যে, পাওয়া গেছে জখমটা। আঙুল দিন—আপনাকে বলছি—আঙুল দিন। ক্ষতের প্রান্ত ছুটো এক করুন—খুব সন্তর্পণে। হার্টের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে ঢিল দেবেন একটু। এমনি করে—ঠিক হয়েছে। দেখতেও দিন আমাদের, বেশী চেপে নয়। হয়েছে, আচ্ছা—আচ্ছা, হয়েছে এবার। এবার হার্টের সেলাই! আগের সুতো। প্রথম ফোঁড় আড়াআড়ি, বাঁ প্রান্ত, ডান প্রান্ত—এবার ভেতর দিয়ে টেনে গাঁট দিতে হবে সুতোয়। তার পর ক্লাম্প চেপে সুতোটা দূরে ঠেলে দিন। সাজিয়ে রাখুন—এমনি করে। ওপরের পর্দা ধরেছি। ডাক্তার, সুতোটা ধরে হার্টটা আমার দিকে টেনে ধরো ত! হ'ল না—একটু ডাইনে। আর হার্টের স্পন্দনের সঙ্গে হার্টে ঢিল দিতে ভুলো না।—বেশ। আর একটা ফোঁড় দিতে হবে। আর একটু ভিতর দিয়ে। সাবধানের মার নেই। ভেতরে—বাইরে, গাঁট দিয়ে আস্তে টান দাও। ছু'দিক থেকে সমান টান দেবে, তার পর ঝুলিয়ে দাও সুতোর প্রান্ত ছুটো। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। নাড়ী পাচ্ছেন হাতে, এখনও না?

"শ্বাস কেমন—খারাপ? চিন্তা নেই। হাত সরিয়ে নিন আপনার। এবার তৃতীয় সেলাই। হ'ল? রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে. হার্টের ক্ষত জুড়ে গেছে।

কাঁচি, তিনটে সেলাইয়ের সুতোগুলিই কেটে দিন। খুব ছোট হবে না, আবার লেজ বেরিয়েও না থাকে দেখবেন। হয় নি—বেশ।"

"আর একটা সেলাই? না ওতেই হবে। ছেড়ে দিন সবার। সেলাই খুব মজবুত হয়েছে। ব্লাড-প্রেশার

কিংবা রক্তনালী স্বাভাবিক ভাবে ভরে উঠলেও ছেঁড়ার আশঙ্কা নেই। নাড়ী ?—আসে নি ?—আসবে, এখনই পাবেন। হার্ট বেঁচেছে যখন, মানুষও বাঁচবে। দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যেই হার্টের পেশীগুলো কেমন জোর নিয়েছে ? স্পন্দন ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। বিস্তার আর আকুঞ্চন, দুই-ই স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আগের সে কাঁপুনি কিংবা ধড়ফড়ানি আর নেই। বলতেও পারেন, চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। সে যাক, সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে যান হাতের উপশিরায়। কিন্তু দয়া করে ঐ নোংরা জিনিসটা আর আমাদের কাছে আনবেন না। হার্টের সুতোগুলি ঢিল দিন এবার। সুতোগুলি বাইরের দিকে সাজিয়ে দিন সমান করে। দেখুন, দেখুন! তিন জোড়া বলগায় নতুন ঘোড়ার মত কেমন হেঁচকা টান দিচ্ছে, দেখছেন! কেমন জোর বাঁধছে চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছেন! চমৎকার! নাড়ীর খবর কি ? তেমন বোঝা যাচ্ছে না ? সেও ঠিক সামলে নেব। এবার এডরেন্যালিন এগিয়ে দিন ত—একেবারে হার্টের মধ্যে ফুঁড়ে দেবে ইনজেকশ্যান।—চমৎকার! দিয়েছেন ?—এবার ? নাড়ী এসেছে মনে হচ্ছে ? আমারও তাই মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ?''

ছাত্রটি দেখতে পেল এনিসথেসিয়া যন্ত্রের একটি কাঁচের নলের ভিতর দিয়ে শ্বাসবায়ুর চকচকে রূপালি ধারা দ্রুততর বেগে ফুলে উঠছে।

"ঠিক চলেছে।"—ছাত্রটি বললে।

"এবার পেরিকার্ডিয়াম বন্ধ করতে হবে। তার জন্তে ক্যাটগাট চাই। হার্টে দিতে সাহস পাই নি। তার জন্তে রেশম বেশী নিরাপদ। তা ছাড়া হৃদাবরকের ওপর ত তেমন চাপও পড়ে না। এতেই বেশ হবে। এবার আমরা পাঁজরার হাড়গুলি বসিয়ে দেব আবার, ওপরের ঝিল্লী দু' চারটে ফোঁড় দিলেই বসে যাবে। চামড়ার নীচে কাঁচের নল দাও—এখানে, একেবারে নীচে। পেশী,—যায়ের ওপর ঝিল্লীর পর্দা দিয়ে বোজানো', যাকে বলে—'স্কিন সুচার'। মিহি রেশমের সুতো দিয়ে একটি ছুটি ফোঁড়, ব্যস। এনিসথেসিয়ার কি করছেন ?"

"কিছুক্ষণ থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে।"

"বেশ করেছেন। এবার শুধু অক্সিজেন। ক্রমে ক্রমে সাড়ে তিন বা চার লিটার। আর সতর্কতার জন্তে কর্পূর। মাথা নীচু রাখবেন। ওয়ার্ডেও ঐ অবস্থায় থাকবে। দরকার বুঝলে ব্লাড ট্রানসফ্যুশন তখন দিলেই চলবে। 'না'র চেয়ে 'হঁ্যা' বললেই ভাল।... ব্লাড গ্রুপ কি—'এ' ? আর মিঃ ফন. বি, তোমার ?"

"আমিও 'এ' স্যর।"

"চমৎকার! দু'জনেই মেয়েটির কাছে থাকুন। আমরা কখন আরম্ভ করেছিলাম যেন ?"

"এগারোটা বেজে বারোয়—।"

"তা হলে অপারেশনের সময় লাগল সাড়ে সাত মিনিট। একশ' বছর আগে নেপোলিয়নের নিজের সার্জেন একটি পা কাটতে ঐ সময় নিতেন, ব্লাড ষ্টিলিং প্রভৃতি সবসমেত। তবে তাঁরা ছিলেন আর এক ধরনের গুণী। সে যাক পেসেন্টকে সাবধানে উঠিয়ে বিছানায় শোয়ান এবার, না হয়, আমি শুইয়ে দিই ? হঁ্যা, অমনি করে।

গরম জলের বোতল তৈরি ? ঢেকে দিন এবার,... ঢাকুন। সব ঠিক ? বাকিটুকু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিন, আচ্ছা, এবার চললুম আমি। গুডমর্নিং জেন্টলমেন, গুড মর্নিং—।

রাজবল্লভী দেবীর মন্দির-সংলগ্ন তিনটি শিব মন্দির

রাজবলহাট

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

রাজবলহাট হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। হাওড়া ময়দান হইতে মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের আঁটপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে এই প্রাচীন স্থানটি অবস্থিত। রাজবলহাটের দূরত্ব কলিকাতা হইতে ছাব্বিশ মাইল।

রাজবলহাটের নামকরণ এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীরাজবল্লভীর নামানুসারে হইয়াছে। এই দেবী স্বপ্রভা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি। দেশদেশান্তর হইতে পুণ্যার্থী নরনারী তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার নবমীর দিন দেবীর নিকট পূজা দিবার জন্য এই স্থানে সমবেত হন।

রাজবলহাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম; ইহার একদিকে দামোদর নদ ও অন্যদিকে রণ নদ গ্রামটিকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাচীনকালে এই স্থান ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্যতম নগরী ছিল। এ অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য তৎকালে নদীপথে সুসম্পন্ন হইত। ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'বহু বণিকের বসতি'; ভূরি অর্থাৎ বহু, শ্রেষ্ঠী মানে বণিক (ভূরি+শ্রেষ্ঠী), অর্থাৎ যে স্থানে বহু বণিক বসবাস করেন। মুসলমান রাজত্বকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট একটি প্রখ্যাত পরগণা ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অধিপতি সদানন্দ রায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দামোদর ও রণ নদের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কার করাইয়া একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় একটি বৃহৎ হাট বসান। রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নগর বলিয়া এই স্থান 'রাজপুর' বলিয়া প্রখ্যাত হয়। প্রাচীনকালে হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়িয়া এই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ও পরগণা অবস্থিত ছিল। 'আইন-ই-আকবরী' হইতে জানা যায় যে, সরকার সোলেমানাবাদের অন্তর্গত একত্রিশটি মহালের মধ্যে এক বসন্ধরী পরগণা ব্যতীত, ভুরশুট পরগণার রাজস্ব ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—প্রায় বিশ লক্ষ 'দাম'।

ভুরশুট রাজবংশের বসন্তপুর শাখার সম্পত্তির বিবরণে দেখা যায় যে, রাজবলহাটে সাত বিঘা ভূমির উপর রাজার গড়বাটি ছিল এবং দেবী রাজবল্লভী ঠাকুরাণীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পাঁচ শত বিঘা। দেবীর প্রভূত ভূসম্পত্তি অধিকাংশই প্রায় বেদখল হইয়া ছিল। অন্যায়ভাবে যাঁহারা দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছিলেন, তাহা উদ্ধার করিবার জন্য ২৬শে বৈশাখ ১৩৪৪ সালে রাজবল্লভী ষ্টেটের জিম্মাদার তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সভাপতিত্বে মাতার সেবক ও ভক্তগণের সহযোগে 'রাজবল্লভী সেবা সমিতি' গঠিত হয়। বিশ বৎসরের চেষ্টায় সেবা সমিতি দেবোত্তর ষ্টেটের ও সেবা পূজার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কেবল বেদখল সম্পত্তি

উদ্ধার নয়, ধ্বংসোন্মুখ জঙ্গলাবৃত মন্দিরগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া সেবা সমিতি সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

রাজবল্লভী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচলিত কিম্বদন্তী যাহা আছে তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি দেবী রাজবল্লভী ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে কোন পরিবারে পরিচারিকার কার্য্য করিতেন। সেই সময় নদীপথে বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত। একদিন এই রূপবতী ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া এক বণিক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নিজ বজরায় লইয়া আসার সঙ্কল্প করেন। সেই বণিক সপ্তডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করিয়া যখন তাঁহাকে একটির পর একটি ডিঙ্গা অতিক্রম করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার পদস্পর্শে এক একটি করিয়া ছয়খানি বজরা নদীগর্ভে ডুবিয়া যায়।

যখন সপ্তম ডিঙ্গার, অর্থাৎ বণিকের নিজস্ব ডিঙ্গায় ব্রাহ্মণকন্যাকে তোলা হইবে, সেই সময় এক দৈববাণী শুনিয়া বণিক তাঁহাকে দেবী বলিয়া জানিতে পারেন এবং তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিমজ্জিত তরীগুলি উঠাইয়া দেন এবং সেই স্থানে রাজবল্লভী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ দেন।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে, ভূরশুটের রাজা "কমলদীঘি" নামক এক পুষ্করিণী খনন করান; তাহার তীরে অবস্থিত ফুলবাগানে মালিনী রাণীর আরাধ্যা গৌরী দেবীর জন্য প্রত্যহ ফুল তুলিত। একদিন ফুল তুলিবার সময় এক ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া তাহার নিকট হইতে ফুল চায়। কিন্তু মালিনী গৌরী দেবীর পূজার ফুল দিলে রাণী অসন্তুষ্ট হইবেন বলায়, ব্রাহ্মণ কন্যা বলিলেন যে, তিনি গৌরীর বড় দিদি রাজবল্লভী, তাঁহাকে ফুল দিলে যদি রাণী রাগ করেন তাহা হইলে গৌরীকে সরাইয়া তিনি তাহার স্থানে অধিষ্ঠান করিবেন।

বালিকার কথা শুনিয়া মালিনী ভীত হইয়া চক্ষু বুজিলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখেন যে, রাজবল্লভী দেবী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। দেবীর বর্ণ শরৎকালীন জ্যোৎস্নার ন্যায়, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একখানি ছুরিকা, এবং বামহস্তে রুধির পাত্র।

এদিকে রাজাও সেই দিন রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে, দেবী রাজবল্লভী তাহাকে বলিতেছেন—তিনি রাজপুরে যাইতেছেন; সেখানে যেন তাঁহাকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নগরের নাম রাজবল্লভীহাট রাখা হয়।

"নিশি পোহাইলে নাম রাখ নগরীর
দেবী রাজবল্লভী আর মর্ত্ত্য হাট
এই যুগ্মনাম রাখ রাজবল্লভী হাট।"

শ্রীশ্রী৺রাজবল্লভী মাতা

রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় পরবর্ত্তী কালে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজবল্লভীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় দেবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ বৃহৎ মূর্ত্তি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। বিগ্রহের উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট; দেবীর বাম হস্তে রুধির পাত্র ও দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা। তাঁহার দক্ষিণ পদ মহাকাল ভৈরবের বক্ষে এবং বাম পদ বিরূপাক্ষ মহাদেবের মস্তকে রক্ষিত আছে। এইরূপ মূর্ত্তি বঙ্গদেশে আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

এক বার দেবীর মূর্ত্তি পুনর্গঠন করিতে হইয়াছিল, তখন কালী-ঘাট হইতে আদিগঙ্গার মাটি, গঙ্গাজল এবং কুশ, কাপড় ও তার দিয়া উহা তৈয়ারী করা হইয়াছিল। মন্দিরের মধ্যে একখানি প্রস্তরে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

"শ্রীশ্রী৺রাজবল্লভী মাতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা*
সন ১৩৪০, ১৬ আষাঢ়
স্বর্গীয় গৌরমোহন দত্তের পুত্র
শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত, সাং রাজবলহাট
(জেলা হুগলী)"

রাজবল্লভীর মন্দির

মন্দির-গাত্রে আর একখানি প্রস্তর ফলকে দেবীর বেদী শ্বেত-প্রস্তর দ্বারা "শ্রীবজ্রেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়—গোপিনাথপুর নিবাসী, ১২৭৫ সালে বাঁধাইয়া দিয়াছেন" বলিয়া লেখা আছে। এই কার্য্যের "উদ্যোগী সাহায্যকারক ছিলেন শ্রীরাম-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়"।

১৩৪০ সালের ১১ই আষাঢ় শ্রীকালীচরণচন্দ্র, মন্মথনাথ ও জহরলাল ভড় মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে বহু অর্থ ব্যয়ে উহার আমূল সংস্কার করিয়া দেন। ১৩৪৬ সালে তাঁহারা পুনরায় মন্দিরের সম্মুখের বিরাট নাটমন্দিরটি নির্ম্মাণ এবং নহবতখানা, গড়, মায়ের পুকুরের ঘাট, মন্দির-সংলগ্ন চারিটি শিবমন্দির ও রন্ধনশালা সংস্কার করিয়া দেন। নাটমন্দির ১৬ই আষাঢ় ১৩৪৭ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন।

দেবী রাজবল্লভী চণ্ডীরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থে রাজবলহাটকে শাক্তপীঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'চণ্ডী' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চণ্ডী প্রাচীনকালে অনার্য্য দেবী ছিলেন ; পরে আর্য্য ও অনার্য্যের দীর্ঘ সংঘাতের ফলে তিনি লোকসমাজে পূজ্য হইয়াছেন।

মন্দিরের মধ্যে একটি বাসুদেব নারায়ণের প্রস্তরের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে ; ইহার পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী। সম্ভবতঃ অন্য কোন স্থান হইতে এই মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর অষ্টমী পূজার পূর্ব্বে সাতটি ছোট ছোট ডিঙ্গা তৈয়ার করিয়া মায়ের দীঘিতে ছয়টি ডুবাইয়া দেওয়া হয়, পরে পূজা আরম্ভ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীটি অদ্যাপি পূজার অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহানবমীর দিন মহিষ বলিদান হয় এবং দেবীর বামদিকের দীপশিখা সেই দিন পূজার পর সোজা হইয়া যায়।

'রাজবল্লভী মাহাত্ম্য' নামক পুস্তকে দেবীর যে বর্ণনা আছে তাহা এইরূপ :

"মন্দিরে শোভিছে মাতা শ্রীরাজবল্লভী
শরৎ জ্যোৎস্না প্রভা বিশালা ভৈরবী।
বিম্বমাল্য গলে, ছুরি ধৃত ডান হাতে
প্রসারিত বাম হস্ত পাত্র শোভে তাতে।
রণরঙ্গিণীর মূর্ত্তি—ভীমা সুনয়না
বরাভয় প্রদায়িনী, প্রসন্ন আননা।
উজ্জ্বল মুকুট শিরে ত্রিলোকরঞ্জনী।
শিববক্ষে শব শিরে চরণ ধারিণী।"

রাজবলহাট পূর্ব্বে যে বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল আজও ইহার কর্ম্মমুখরতা দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হুগলী জেলার সহস্রাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ কর্ম্মমুখর গ্রাম দুইটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতে তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে "Hand book of Hoogly District" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে :

"Rajbalhat—A considerable village famous for handloom cloth on the left bank of the Damoder in thana Jangipara of the Serampur subdivision."

রাজবলহাটের মধ্যে এমন কোন গ্রাম্য পথ নাই, যেখানে তাঁত বুনিবার শব্দ শোনা যায় না। এখনও আদমসুমারির ১৯৫১

* শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত ১৩৪০ সালে "রাজবল্লভী মাতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা" বলিয়া যাহা প্রস্তরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। বিগ্রহ যথাস্থানে আছে ; সুতরাং "পুনঃপ্রতিষ্ঠা" বলিতে কি বুঝায় তাহা জানিতে পারা যায় না।—লেখক

সনের তালিকা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৫২২৫ জনের মধ্যে প্রায় বার শত তাঁতে চার হাজার লোক তাঁতের কাপড় বুনিয়া কালাতিপাত করে। এক কথায় রাজবলহাটকে কুটীর-শিল্পের কেন্দ্রস্থান বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে 'দ্বিতীয় ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানের তাঁতীসম্প্রদায়ই যে কেবল তাঁত বুনিবার কার্য্য করে তাহা নয়, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও এই স্থানে তাঁতের কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁতবোনা শিক্ষয়িত্রী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজবল্লভীর নিকট তাঁতবোনা শিক্ষার জন্য কাপড় মানত করে; তাই দেবী কাপড় উপহার পান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

সায়েরের দীঘি

নহবৎখানা ও গড়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে যখন বাংলা দেশে ব্যবসা করিতে শুরু করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কাজের সুবিধার জন্য একজন করিয়া বড় দালাল রাখিতেন; তাহার তলায় আবার অনেকগুলি ছোট ছোট দালাল থাকিত। এই দালালটি ইংরেজের হইয়া এ-দেশে বিলাতী মাল কাটাইত এবং এই দেশ হইতে স্থানীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিদেশে পাঠাইবার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিত। প্রাচীন কাল হইতে অসংখ্য তাঁতী রাজবলহাটে বাস করিত। তাহাদের প্রস্তুত সুন্দর সুন্দর কাপড় বুধবার ও রবিবারের হাটে কেনাবেচা হইত, অনেক কাপড় দেশান্তরে গমনাগমন করিত।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দালালদের অত্যাচারের জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দালালের সহায়তা না লইয়া তাহার স্থলে নিজেদের বেতনভোগী গোমস্তা রাখেন। এই সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ইংরেজদের নায়েব দেওয়ান হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গেল। কুশাসনের ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক ইহধাম পরিত্যাগ করিল। কোম্পানী রেজা খাঁকে তখন বরখাস্ত করিয়া হেষ্টিংসকে বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠান।

হেষ্টিংস আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি কোম্পানীর ব্যবসা চালু রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে 'কমার্সিয়াল রেসিডেন্সী' খুলিয়া দিলেন। সেই রেসিডেন্সীতে প্রধান হইয়া বসিতেন একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজবলহাটে একটি কমার্সিয়াল রেসিডেন্সী খোলা হয়। এখানে কাঁচামাল সংগ্রহান্তর নিজেদের কারখানায় চালানী বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া কলিকাতায় পাঠানো হইত। এই স্থানে বহু তাঁতী ছিল বলিয়া ইংরেজ কোম্পানীর রাজবলহাটে আড়ং বা ফ্যাক্টরী ছিল। পূর্ব্বে নীলের চাষের জন্যও এই স্থানটি বিশেষ

খ্যাতিলাভ করে। অদ্যাপি রাজবল্লভীর মন্দিরের নিকট নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রেসিডেন্সী খুলিবার পর হইতে ইংরেজ রেসিডেন্টই রাজবলহাটের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন; তিনি এই স্থান হইতে কর্ম্মী ও কারিগর সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় গ্রামবাসীরা কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তজ্জন্য রাজবলহাট হইতে রেসিডেন্সী হরিপালে উঠিয়া যায়—

শ্রীধর দামোদরের মন্দির—রাজবলহাট
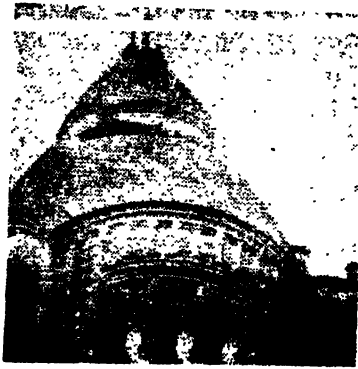
"In the early British period it was a place of importance, being selected in 1786 for the seat of a Commercial Residency. The Residency was transferred to Haripal about 1790. Rajbaulhat appears in Rennell's Atlas as a police station and the Junction of several roads." (District Handbook, Hooghly—by A. Mitra, I. C. S. p—34.

রাজবলহাটের সুবিন্যস্ত পথ ঘাট, সুরম্য ভবন, সুন্দর পুষ্করিণী ও অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রাম সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে:

"চা'র চক্, চৌদ্দ পাড়া, তিন ঘাট,
এই নিয়ে হয় রাজবলহাট।"

চার চক্ হইতেছে—দক্ষিণ চক্, সুন্দর চক্, বৃন্দাবন চক্ আর বড়র চক্; চৌদ্দ পাড়া—লক্ষ্মী পাড়া, দে পাড়া, মনসাতলা, শীলবাটী, ভট্টপাড়া, উত্তর পাড়া, দীঘির ঘাট, কুমোর পাড়া, বাড়ুয্যে পাড়া, দাস পাড়া, কুঁড় পাড়া, চণ্ডীতলা, সানা পাড়া ও পান্ পাড়া; তিন ঘাট: দীঘির ঘাট, রায়ের ঘাট ও বাবুর ঘাট।

রাজবলহাটের মধ্যে শীল পাড়ায় শীলেদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর দামোদর মন্দির ও রাধাকান্তজীউর মন্দির ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ইটের পোড়ামাটির কারুকার্য্যখচিত অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র মন্দিরগাত্রে শোভা পাইতেছে। "শ্রীধর দামোদর মন্দির ১৬৪৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত" বলিয়া একটি ফলকে উৎকীর্ণ আছে। এই মন্দির দামোদর শীল প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীধর দামোদর মন্দিরের মধ্যে শ্রীধর ও দামোদরের শালগ্রাম শিলা আছে। এইগুলি সুন্দর একটি সিংহাসনের মধ্যে রক্ষিত। সিংহাসনের তলায় লিখিত আছে:

"৺গোবিন্দ শীল ঐ কন্যা
ক্ষিরোদমোহিনী দাসী"

রাধাকান্তজীউর মন্দির ১৬৬৬ শকাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া একটি প্রস্তরে লিখিত আছে। ইটের পোড়া মাটির কারুকলা মন্দিরগাত্রে সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। বাংলাদেশে দেবালয় স্থাপত্যের এই সকল চিত্রকলা এক অপূর্ব্ব শিল্প-নিদর্শন। সম্প্রতি এই মন্দিরটিও ফকিরচন্দ্র ভড় ও জহরলাল ভড় কর্ত্তৃক সংস্কার করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় স্থানে স্থানে চূণকাম করিবার সময় অনেক কারুকার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মন্দিরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। রাধাকান্তজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও অনেকগুলি দেবদেউল ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। রাধাকান্তদেবের রথ এই অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। মাহেশ, গুপ্তিপাড়ার পরেই এই রথের স্থান। পূর্ব্বে কাঠের রথ ছিল, বর্ত্তমানে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে একটি সুন্দর লোহার রথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাজবলহাটে দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস আছে। দাতব্য চিকিৎসালয় ভবন গোষ্ঠবিহারী দাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে থানা ছিল বলিয়া রেনেলের মানচিত্রে উল্লেখ আছে। এই গ্রামে দৈনিক বাজার বসে এবং তাহাতে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়; এইরূপ বৃহৎ বাজার এতদঞ্চলে খুব অল্প দেখা যায়।

রাজবলহাট কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি। তাঁহার জন্মস্থানে স্মৃতিরক্ষার্থে "হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার" ১৩৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজবলহাটের সংলগ্ন গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি ৬ই বৈশাখ ১২৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহের নাম রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রামচন্দ্রের একমাত্র কন্যা আনন্দময়ীর সহিত উত্তরপাড়ার কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। রামচন্দ্রের অবস্থা ভাল ছিল, সুতরাং তিনি জামাতা কৈলাসচন্দ্রকে স্বগৃহে রাখিয়া পুত্রের আদরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

কৈলাসচন্দ্রের চারি পুত্র, হেমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এবং দুই কন্যা বসন্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। হেমচন্দ্রের শৈশব রাজবলহাটে অতিবাহিত হইয়াছিল; এই স্থানে পাঠশালায় নয় বৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি দাদামহাশয়ের খিদিরপুরের বাড়ীতে চলিয়া আসেন এবং সেখানে শিক্ষালাভ করেন। কর্ম্মজীবনে তিনি মুন্সেফী ও হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। হেমচন্দ্র বহু কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে

চিন্তাতরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্য, ছায়াময়ী, আশাকানন, দশমহাবিদ্যা, চিত্তবিকাশ, বৃত্রসংহার, কবিতাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা তিনি বিস্তর রচনা করেন। হেমচন্দ্র ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ সালে দেহরক্ষা করেন।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ১৫ই মার্চ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চিত্তমুকুর, বাসন্তী, যোগেশ কাব্য ও চিন্তা নামক কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। ঈশানচন্দ্র প্রথমে হুগলী কালেক্টরীতে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার উদ্যোগে ও উৎসাহে বাঁশবেড়িয়া হইতে ১৩০০ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'পূর্ণিমা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। রাজবলহাটের এই কৃতী সন্তানের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইলে তাহা খুব আনন্দের বিষয় হইবে।

রাজবলহাটের 'অমূল্য গ্রন্থশালা' ১৩৪৮ সালে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থশালা দক্ষিণ

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও অমূল্য গ্রন্থশালা ভবন—রাজবলহাট
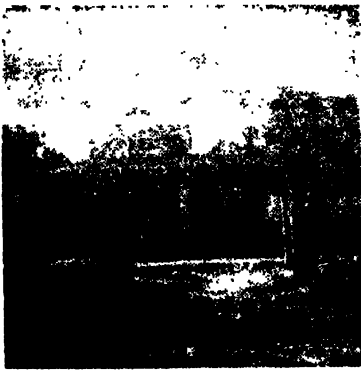
রাঢ়ের ঐতিহাসিক প্রাচীন দ্রব্যাদি সংরক্ষণের একটি অমূল্য প্রতিষ্ঠান। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই গ্রন্থশালার সম্পাদক। ১৩৫৩ সালে শ্রীফকিরচন্দ্র ভড় ও শ্রীজহরলাল ভড় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নিজস্ব ভবনে অমূল্য গ্রন্থশালা স্থানান্তরিত হয়। বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই ভবনে হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

শিবমন্দির ও নাটমন্দির

"হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার
ও
অমূল্য গ্রন্থশালার জন্য
স্বর্গীয় ভুবনচন্দ্র ভড়
ও তদীয় পত্নী মাতঙ্গিনী দাসীর
স্মৃতিকল্পে তদীয় পুত্রগণ
শ্রীফকিরচন্দ্র ভড়
শ্রীজহরলাল ভড়
কর্ত্তৃক এই ভবন নির্ম্মিত হইল
২১শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাজবলহাটের সন্তান না হইলেও এই স্থানে হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি যে সহযোগিতা করেন তাহা স্মরণ করিয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাজবলহাটে সর্ব্বত্র দিবারাত্রি তাঁতবোনার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন এক বিরাট কাপড়ের কলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এখানকার তাঁতশিল্পই তাহাদের সকলের সচ্ছল অবস্থা আনিয়া দিয়াছে। প্রতি মাসে গড়ে চার লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় এই ছোট গ্রামখানি হইতে কলিকাতা ও হাওড়ায় রপ্তানি হয়।

রাজবলহাটের প্রাণ হইতেছেন শ্রীজহরলাল ভড়; যেমন সিঙ্গুরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা করিয়া যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তেমনই গ্রামের কল্যাণের জন্য তাঁহার সদাসর্ব্বদা চিন্তা; পথ-ঘাট নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, পুরাতন মন্দির সংস্কার, বিদ্যালয়, পোষ্ট-আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার, গ্রন্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় লক্ষাধিক টাকার উপর তিনি ব্যয় করিয়াছেন। জহরলাল কলকাতায় বহু সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কেন দেশে থাকেন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি কেবল একটি উত্তর দেন, "রাজবল্লভীর মায়ায় কলিকাতায় থাকিতে পারি না।" শিক্ষিত বাঙালী গ্রামকে এইরূপ দরদ দিয়া কবে ভালবাসিতে শিখিবেন?

২৬শে জানুয়ারী

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

২৬শে জানুয়ারী। বিশাল ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর আজ বড় শুভ দিন। ভারত জুড়ে মহোৎসবের দিন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি :

"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয় গাথা—

জনগণমন-অধিনায়ক, ভারতভাগ্য-বিধাতা, তোমার জয় হোক্—তোমার জয়েই ভারতবর্ষের জয়। আজ বিধাতার আশীর্বাদ শ্রাবণের ধারার মত ভারতের জনগণের শিরে বর্ষিত হোক্। স্বাধীন ভারত আজ সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করছে। হে জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জনগণ-ঐক্যবিধায়ক, জনগণ-পথপরিচায়ক-দুঃখত্রাতা, তোমার জয় হোক—আজ আসমুদ্র হিমাচলে তোমার জয় বিঘোষিত হোক্—তোমার করুণারুণরাগরঞ্জিত হয়ে ভারত আজ জাগ্রত—শুভ ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের জয়যাত্রা সূচিত করছে। জয়যাত্রা ঐক্যের পথে, কর্ম্মের পথে, বিশ্বমানবের সমাজে শান্তির নীড় রচনার পথে। জাগ্রত ভগবান্—আজ আমাদের কোটি মৌন-কণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান—ভারতবর্ষের বাণী আজ যেন সত্যের পথে সার্থক হবার শক্তি পায়। হে সঙ্কটদুঃখত্রাতা, আজ ভারতবর্ষের সকল সঙ্কট দূর করে তার পথযাত্রা সার্থক কর।

২৬শে জানুয়ারী বহু বৎসর ধরে কংগ্রেসের নির্দেশে স্বাধীনতা-দিবস বলে পালিত হয়েছে। স্বাধীনতা তখন অর্জ্জিত হয় নি। মহাত্মা গান্ধীর সার্থক নেতৃত্বে তখন ভারত জুড়ে স্বাধীনতা-অর্জ্জনের বিপুল প্রয়াস জেগে উঠেছে। সেই প্রয়াসকে সংযত ও সংহত করবার জন্যে, এক লক্ষ্যাভিমুখী করে জাতির দেহে নিয়ত বলসঞ্চার করবার জন্যে, জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদবিভেদ ঘুচিয়ে, শহর ও গ্রামের বিপুল ব্যবধান ভেঙে দিয়ে, অস্পৃশ্যতা দূর করে, সাম্প্রদায়িক কলহের নিরসন করে, পল্লীশিল্পের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা সাত লক্ষ পল্লীর দারিদ্র্য মোচন করে, যারা উপেক্ষিত, অনুন্নত ও অত্যাচারিত তাদের কোলে টেনে নিয়ে গ্লানি মোচন করে, সত্য ও অহিংসার নূতন পথে স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার জন্যে এই ২৬শে জানুয়ারীর শুভ দিনে ভারতের গ্রামে নগরে লক্ষ লক্ষ কেন্দ্রে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য পঠিত ও স্বীকৃত হ'ত। আজ স্বাধীনতা অর্জ্জিত হবার পর আট বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা-দিবস, আজ প্রজাতন্ত্র দিবসের অপূর্ব্ব নবরূপ পেয়ে সার্থক হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ নবীন হবার তপস্যা গ্রহণ করেছে। পরাধীনতার জীর্ণ জরা আজ সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মত বিলীন হয়ে গেছে। আজও আবার নূতন করে সঙ্কল্প গ্রহণের দিন। কিসের সঙ্কল্প? সেই নবীন হবার সঙ্কল্প। এত দিন সঙ্কল্প ছিল স্বাধীনতা অর্জ্জনের—আজ স্বাধীন ভারতে সেই সঙ্কল্প হবে স্বরাজ গঠনের। প্রজাতন্ত্র দিবসে আজ শ্রদ্ধানত হৃদয়ে স্মরণ করি সেই সব স্বাদেশিকদের যাঁরা স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আপন তনুমনধন, সকল শক্তি নিয়োগ করে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। আজ স্মরণ করি ঋষি বঙ্কিমকে যিনি দেশমাতৃকার পূজার মন্ত্র দিয়েছেন—বন্দে মাতরম্। আসমুদ্র হিমাচল এই মন্ত্র গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। আজ স্মরণ করি বীর সন্ন্যাসী বিপ্লবী বিবেকানন্দকে। আজ স্মরণ করি অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথকে—স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তাঁরা—সনাতন ভারতবর্ষ তাঁদের ধ্যানে ও তাঁদের কণ্ঠে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। আজ স্মরণ করি ক্ষুদিরাম-কানাইলালকে যাঁরা বাঙালীর বলিদানের পালা সুরু করে ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনার পথ খুলে গেছেন—

"হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে শেষ পূজা পূজিয়াছ তাঁরে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ!"

আজ স্মরণ করি সেই অগ্নিযুগের বীরগোষ্ঠীকে যাঁরা জীবন দিয়ে দেশকে জাগিয়ে গেছেন। আজ স্মরণ করি দাদাভাই নৌরজী ও গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে, বজ্রকণ্ঠ সুরেন্দ্রনাথকে, লোকমান্য তিলককে, লালা লাজপৎ রায় ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে যাঁদের নেতৃত্বে নিষ্ফল নির্বীর্য্য বহুধা বিভক্ত এই দেশ শক্তি ও ঐক্যের পথ খুঁজে পেয়েছে। আজ স্মরণ করি আমাদের বাংলার চির আদরের নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। সর্ব্বোপরি স্মরণ করি জাতির জনক-মহামানব মহাত্মা গান্ধীকে, আর স্মরণ করি সেই সব শত শত সহস্র সহস্র দেশকর্ম্মীদের যাঁরা নীরবে আপন কর্ম্ম সমাপন করে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। ২৬শে জানুয়ারী জাতির

অভ্যুদয়ের দিন। এই দিনে সব বর্গভদের স্মরণ করাই হ'ল নব যুগের নব আভ্যুদয়িক।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট। তাই নব্যভারতে স্বাধীনতা দিবস আজ ১৫ই আগষ্ট। তার পর ১৯৫০ সনে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হ'ল। তাই আগেকার স্বাধীনতা-দিবস ২৬শে জানুয়ারী আজ সাধারণতন্ত্র দিবসের নবগৌরবে মণ্ডিত। স্বাধীনতালাভের পর নবরাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনার পালা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি ৩২ মাস অর্থাৎ আড়াই বৎসরের অধিককাল ধরে, বৈঠকে দিনের পর দিন সম্যক্ আলোচনা করে, এই সংবিধান বা গঠনতন্ত্র রচনা করেন। এঁদের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, বহু ত্যাগী দেশসেবক ও দেশনায়ক ছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান সম্বন্ধে খুব ভাল করে জেনে বুঝে, তার যে সকল ভাল ভাল সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের পক্ষে ভাল করে খাটে, সেই সকল গ্রহণ করে তাদের একত্র গ্রথিত করে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হ'ল। সংবিধানে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ও অধিকার কি তা অতি সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। ভারত সরকারের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা কি, বিভিন্ন প্রদেশ সরকারের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা কি, ভারত সরকারের সহিত ও পরস্পরের সহিত তাদের সম্পর্ক কি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অপর প্রধানদের কর্ত্তব্য কি — এই সকল ব্যাপার সংবিধানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্থির করা হয়। ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারের কয়েকটা কথা আজিকার শুভ দিনে স্মরণ করা ভাল। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র নিম্ন লিখিত মত কার্য্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ—

"ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ন্যায়ানুগত ব্যবহার পায়, চিন্তা, কথা, বিশ্বাস, ধর্ম্মমত ও উপাসনার ব্যাপারে প্রত্যেকের যাতে স্বাধীনতা থাকে, প্রত্যেকে যাতে তুল্য সামাজিক মর্য্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা।"

"ব্যক্তির মানমর্য্যাদা ও জাতির ঐক্য সম্বন্ধ সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে অধিবাসিগণের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিকাশে সহায় হওয়া।"

ভারতবর্ষে ছয় কোটি লোক সমাজে অস্পৃশ্য পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। সংবিধানে অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে যারা সমাজে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত ছিল, তারা আজ সংবিধান অনুযায়ী উচ্চবর্ণের যে-কোন নরনারীর সমান মর্য্যাদা লাভ করেছে। এই সকল অধিকার হতে হরিজনদের কেহ বঞ্চিত করলে আজ আইন অনুযায়ী তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। আজ আইনের চোখে স্বাধীন ভারতে সকলেই সমান। হরিজন, আদিবাসী বলে কেহ ব্রাহ্মণ বা উচ্চশিক্ষিতের অপেক্ষা নীচে নয়। আজ বর্ণ, ধর্ম্ম, জাতি, নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী সকলেই সংবিধান অনুযায়ী সম অধিকারসম্পন্ন। কথা বলবার, আলোচনা করবার, লিখে মত প্রকাশ করবার, দেশে বিভিন্ন স্থানে ইচ্ছামত বাস করবার ব্যবসাবাণিজ্য করবার অধিকার সকলের সমান — কেবল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য এই অধিকার আইন অনুযায়ী কখনও কিছু খর্ব্ব করা যেতে পারে। দেশের সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সংবিধান অনুযায়ী তার আপন ধর্ম্ম পালন, ভাষা ও কৃষ্টি রক্ষা করবার পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। এখন এই সকল অধিকার অনুযায়ী মানুষ যদি আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করে চলে, তবেই রাষ্ট্রের বিকাশ ক্রমেই বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আজ সংবিধান অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। যে লোক ভাল এবং যোগ্য, যে লোক জনগণের প্রকৃত হিতসাধন করতে পারবে, তাকে নির্ব্বাচন করার হাত এখন সম্পূর্ণ জনগণের। তাই জনগণকে আজ বুঝতে হবে তাদের প্রকৃত হিত কি? তা হলে তাদের কেহ বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

স্বাধীনতালাভ করে স্বরাজ গঠনের পথ এইরূপ দেশে খুলে গেছে। স্বরাজ গঠন তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন দেশের প্রত্যেক লোকের খেয়ে-পরে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকবার, লেখাপড়া শেখবার, রোগে চিকিৎসা ও আর্থিক সচ্ছলতার সুব্যবস্থা হবে। দেশে তাই একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর আর একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, নদীনালা উদ্ধার, সেচের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি, প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা, হাসপাতাল নির্ম্মাণ, সর্ব্বত্র এই সব কাজের সাড়া পড়ে গেছে এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। ভূমিসংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। সাধু বিনোবাজী আজ ভূদান ও সর্ব্বোদয়ের বাণী নিয়ে ভারত পরিক্রমা করছেন। সকলের অভ্যুদয়ই আজ আমাদের মূলমন্ত্র।

আজ ২৬শে জানুয়ারীর শুভ দিনে এই সকল কথা স্মরণ করে আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের দেশ ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করি *

---

* ২৬-১-৫৬ তারিখে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত এবং রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

মেয়েরা কাঠের ব্লকের সাহায্যে কাপড়ে ছাপার কাজ করিতেছেন

বিহারীলাল কলেজ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

এক এক করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র-গুলি আসিতে লাগিল। কোনটি লাল, কোনটি কালো আবার কোনটি বা সবুজ কালিতে ছাপা, ছোট বড় নানা আকারের কার্ডের উপরে হরেক রকমের ছাপার অক্ষরগুলি যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-তিনটি উৎসবের দুই-তিনখানি কার্ড আসিয়া হাজির হইতেছে, কখনও বা সেই হুজুকে একই উৎসবের যে দুই-তিনখানি করিয়া কার্ড না আসিতেছে এমন নহে। সকলের শেষে আসিল বিহারীলাল কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবের কার্ড-খানি। স্থির করিয়া ফেলিলাম, ২২শে তারিখের এই উৎসবটিতেই আমি যোগদান করিব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আলিপুর অঞ্চলে গিয়া হাজির হইলাম। তখনও হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। প্রবেশপথে উপনীত হইতে প্রথমেই চোখে পড়িল মিস্ত্রিদের সিঁড়ি লাগাইয়া তখনও কলেজের ছাত্রীরা প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে প্রবেশপথের তোরণটিকে মণ্ডিত করিতেছেন। লাল কাগজের উপর আলপনা অঙ্কিত করিয়া উহা দ্বারাই তাঁহারা প্রবেশপথটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিলেন। যথাযথ ভাবে যোগদান না করিলেও শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য মণ্ডপ ও প্রবেশপথগুলির সজ্জা যে চোখে পড়ে নাই তাহা নহে। কিন্তু কোনখানেই কোনও রকম বৈচিত্র্য বা রুচির বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই বরঞ্চ সজ্জার গতানুগতিকতায় ও পেশাদারী ছাপে মন বার বার ব্যথিত হইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। কলেজের কাজে, কলেজের গৃহসজ্জায় মেয়েদের এতখানি তন্ময়তা ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

উঁহাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া আমি এক পাশ দিয়াই আগাইয়া চলিলাম। লাল সুরকী ঢালা প্রায় ৯০০ শত ফুট দীর্ঘ একটি পথ। সেই পথের দু'ধারে প্রায় কলেজের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত সার করিয়া মেয়েরা হলুদ রঙের নিশানা উড়াইয়া দিয়াছেন। উহারই মধ্য দিয়া আমি মণ্ডপের দিকে চলিলাম। সেখানেও দেখিলাম বেদীর উপরে প্রায় আঠার ফুট উঁচুতে চারি শত বর্গফুটের চাঁদোয়াখানিও মেয়েদের কল্যাণহস্তের স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাত্র তাহাই নহে, উভয় পার্শ্বের কুড়ি ফুট দীর্ঘ দেওয়াল দুইখানিও আলিম্পন সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। ভাবিতে লাগিলাম যে সকল মেয়ে এতখানি পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে পারে তাহাদের পক্ষে হয়ত পুরা একটি মণ্ডপ তৈয়ারী করিয়া ফেলাও তেমন কিছু অসম্ভব নয়। নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাগুলি বদলাইতে লাগিল। আমি ও আমার একটি বাল্যবন্ধু মণ্ডপের দক্ষিণ পার্শ্বের দুইখানি আসন দখল করিয়া বসিলাম। অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না—হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে একটি শ্লেষোক্তি

বিহারীলাল কলেজের নবনির্ম্মিত ভবনের দ্বারপ্রান্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত সহ প্রাক্তন উপাচার্য্য ড. শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

মেয়েদের এই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই আজ পর্যন্ত প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ এই বিভাগটি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও শিক্ষক-শিক্ষণের কাজে নীরবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই বিভাগেই শিক্ষাপ্রাপ্তা প্রায় ৩০০ শতেরও অধিক শিক্ষিকা আজ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। এই বিভাগে শিশুর মনস্তত্ত্ব, স্কুল গঠন ও পরিচালন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিশুর পুষ্টি ও খাদ্যতত্ত্ব, বিভিন্ন গৃহ-শিল্প ও সজ্জা, গৃহ-শুশ্রূষা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বিষয়বস্তুগুলিই পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত।

নূতন স্থাপিত বিহারীলাল কলেজটিকে এই বিভাগেরই সম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষা এতদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বা কলেজে গৃহ-বিজ্ঞান বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলির কোনও স্থান ছিল না। অথচ দেখা যায়, শতকরা প্রায় ৯৮ জন ছেলেমেয়েরাই উহাদের নিজস্ব গৃহ বা সংসার রচনা করিয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুটি বিপরীত প্রকৃতির মানুষের একত্র হইয়া নীড় রচনা করা ও সেই নীড়ে ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী করিয়া ভবিষ্যৎ মানুষ গড়িয়া তোলা—জীবনের এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যও এইদিক হইতে কিছুমাত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা আমাদের দেশে কদাচিৎ অনুভূত হয় মাত্র। যে দেশে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অজ্ঞতা অশিক্ষা ও কুসংস্কারে যে দেশ অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, যে দেশের মানুষ পুষ্টির অপর্য্যাপ্ততায় বা খাদ্যের অভাবে ক্রমেই ম্লান নিষ্প্রভ ও মৃতের সামিল হইয়া উঠিতেছে—সে দেশের মানুষেরাই খাদ্যতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কিংবা সুষ্ঠু গৃহ-রচনার শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্দিহান। তাঁহাদের নিকট গৃহ-বিজ্ঞানের জ্ঞান 'কলাই ডালের বড়ি তৈয়ারি করা কিংবা মাছের শুক্তানি রন্ধন করার' তথা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গৃহ-বিজ্ঞান শিশুর শিক্ষা ও পালন, মাতৃত্বের জ্ঞান, খাদ্যতত্ত্ব ও পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া আজ গবেষণার অন্ত নাই। যাহাতে জাতি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও গৃহ-সম্পদে আরও সুন্দর ও উন্নততর হইয়া উঠিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছেলেমেয়ে উভয়েই এই বিষয়গুলি লইয়া গভীর চর্চা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে আজও লোকে প্রশ্ন করে এই বিষয়গুলির আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা!

বিগত কয়েক বৎসরের প্রচেষ্টার পর, ১৯৫৪ সনে গৃহ-বিজ্ঞান ও গৃহ-শিল্প, সমাজ-বিজ্ঞান, শিশুর শিক্ষা ও পালন প্রভৃতি বিষয়গুলি মেয়েদের জন্য কলেজের পাঠ্য-তালিকায় সন্নিবেশিত হইল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই প্রবেশিকা পরীক্ষায় গৃহ-বিজ্ঞানের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। গৃহ-বিজ্ঞানে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগটি তাঁহারই আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সনে ড. জে. সি. ঘোষ গৃহ-বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কলেজের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিলেন ও ও উহার চর্চ্চার জন্য বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করিলেন। ১৯৫৫ সনের ১লা আগষ্ট শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন—সেই দিনই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিহারীলাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিলেন। শ্রীযুত সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ বিহারীলাল কলেজকে পূর্ণতর রূপদানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন।

ইহাই হইল বিহারীলাল কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বসিয়া বসিয়া উহাই চিন্তা করিতেছিলাম—কলেজ ভবনটির নির্ম্মাণকার্য্য হয়ত সমাপ্ত হইল, কিন্তু কলেজ গঠনের কাজ আরম্ভ হইল মাত্র, চূণ সুরকি ঢালিয়া ইটের উপরে ইট সাজাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়ত সহজ, কিন্তু যথাযথ মাল-মশলা যোগাইয়া নূতন সমাজের উপযোগী মন ও মানুষ তৈরী করা একান্ত কঠিন।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বিহারীলাল কলেজের প্রথম উদ্দেশ্য, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষিকা তৈয়ারী করা। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি উপযুক্ত হন তাহা হইলে শিক্ষার মান আপনা হইতেই উন্নততর ও প্রশস্ততর হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে প্রতিনিয়তই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। বিহারীলাল কলেজের উদ্দেশ্য, মেয়েদের জন্য সেইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা যাহাতে মেয়েরা এই সামাজিক বিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, প্রতিনিয়তই উহার নূতন নূতন চাহিদা মিটাইয়া চলিতে পারেন। ছোট ছোট ঘর

লইয়াই সমাজ, এই ঘরগুলিকে গড়িয়া তুলিবার, এবং জাতির সম্পদ, আমাদের শিশুদের ভবিষ্যতের মানুষ করিয়া তৈয়ারী করার গুরুদায়িত্ব আমাদের মেয়েদের উপরেই ন্যস্ত। সুতরাং নূতন পৃথিবীর নূতন চাহিদার উপযোগী করিয়া আমাদের মেয়েদের তৈয়ারী করিতে হইলে উহাদের মানসিক ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্যের প্রতি উহাদের সুপ্ত অনুভূতি এবং এই দুইটি গুরুদায়িত্বের বিষয় সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হয়।

কলেজের দ্বারোদঘাটন উৎসবে মেয়েদের দ্বারা সুসজ্জিত প্রবেশ-পথ

বস্তুতঃ এই দিক হইতে চিন্তা করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ আজ সমস্ত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ব্যাপকভাবে গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যথাই উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবও একান্ত ভাবে অনুভূত হইতেছে। ১৯৫৩ সনের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলিয়াছেন, "পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত শিক্ষার যদি আরও গভীরতর যোগ সাধন করিতে চাও, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে আজ যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে উহা যদি দূর করিতে চাও, মেয়েদের দিয়া যদি উহাদের পারিবারিক ও সমাজ-জীবনের গুরুদায়িত্বগুলি সুষ্ঠু ভাবে পালন করাইতে চাও—তাহা হইলে আরও ব্যাপক ও উন্নততর উপায়ে গৃহ-বিজ্ঞানে শিক্ষার ব্যবস্থা কর।" কলেজী শিক্ষার গৃহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের নূতন সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুগুলি ও সেই সঙ্গে বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনাটি দেখিয়া মনে হয়, শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার যে যে ত্রুটিগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথ যথ ভাবে চালু হইলে এই কলেজ সেই ত্রুটিগুলি দূর করিবার কাজে অনেকখানি সহায়তা করিবে।
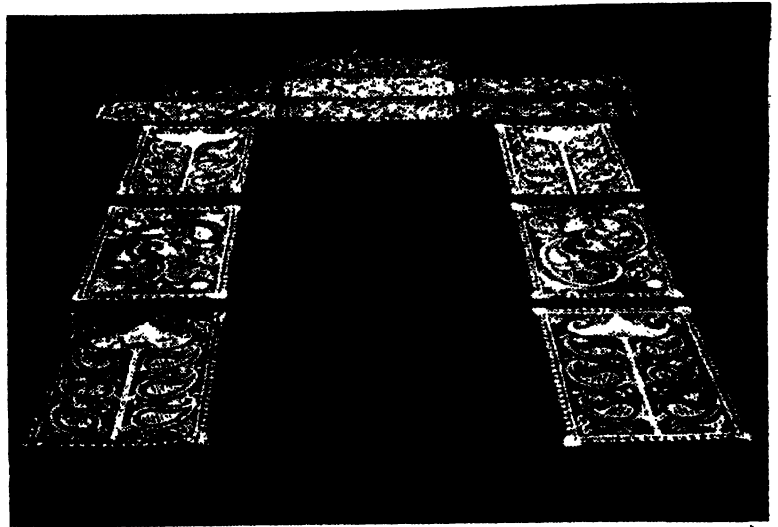
মঞ্চের পিছন দিককার দেয়ালের নক্সাটি মেয়েরা যথাযথভাবে রঙ করিয়া ফুটাইয়া দিতেছেন

বিহারীলাল কলেজের পাঠ্যকাল আপাততঃ সর্ব্বসমেত পাঁচ বৎসর। প্রথম চার বৎসর মেয়েরা যথারীতি ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। কেবলমাত্র তফাৎ এই, এই কলেজে পড়িতে হইলে ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত আবশ্যিক বিষয়গুলি ঠিক রাখিয়া উহাদের পাঠের অন্যান্য বিশেষ বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন প্রবর্ত্তিত গৃহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়বস্তু হইতে নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। ডিগ্রী কোর্স সমাপ্ত করিবার পর যাঁহারা গৃহ-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন পঞ্চম বা শেষের বৎসরটি তাঁহারা বিহারীলাল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগে অতিবাহিত করিবেন। বিহারীলাল কলেজের এই বিভাগটিতে স্নাতকোত্তর টিচার্স ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বহু আলোচিত তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হয় তাহা হইলে বিহারীলাল কলেজের চার বৎসরের ডিগ্রী কোর্সও যথাক্রমে তিন বৎসরে রূপান্তরিত হইবে।

গৃহ, গৃহ-কর্ম্ম, গৃহের অধিবাসীদিগের প্রতি পারস্পরিক সম্বন্ধ, পরিবারের প্রতিদিনের জীবন ও জীবনধারায় যাহাতে সুরুচি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি পরিস্ফুট হইয়া উঠে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিহারীলাল কলেজে গৃহকলা বা শিল্পশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও পরিচালনার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিবার উদ্দেশ্যেই শিশুর শিক্ষা বিষয়টি পাঠ্যতালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। ব্যক্তিগত ও পারি

রচিত নক্সাটি মঞ্চের চাঁদোয়ার কাপড়ের সহিত মেয়েরা সেলাই করিয়া দিতেছেন

বস্তুতঃ নূতন গৃহ-রচনার মাধ্যমে নূতন মন ও মানুষ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই আজ বিহারীলাল কলেজ স্থাপিত হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় দেখিলাম, বিহারীলাল কলেজের আর্থিক প্রয়োজনের দিকটাও ছাত্রীরা চার্টের মাধ্যমেই জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কলেজটি যে ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে, উহাতে রূপ দিতে হইলে জমির দাম ব্যতীত এককালীন ৮,৫২,০০০ টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে বাড়ী তৈয়ারী বাবদে ভারত সরকার ৩,৮৮,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কাজেই আরও ৪,৬৪,০০০ টাকার মত ঘাটতি থাকে। জমির দাম বাবদে তিন লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহারীলালের দানের তহবিল হইতে দিয়াছেন। গৃহ ও সমাজ-বিজ্ঞানে এই ধরনের কলেজ কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলায়ই যে এই প্রথম তাহা নহে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম অঞ্চলেও এই ধরনের কলেজ এখনও স্থাপিত হয় নাই।

বারিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা এবং জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই খাদ্যপ্রস্তুতি ও পুষ্টি প্রভৃতি গৃহ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি পাঠ্য-সূচীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দেশ ও জাতিকে গড়িবার উদ্দেশ্যেই সেই একই দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ-বিজ্ঞানেও, সমাজ সেবা, সমাজের সুস্থতা ও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়গুলি ডিগ্রী কোর্সে নূতন প্রবর্তিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠিত বিহারীলাল কলেজ যে, কেবলমাত্র গৃহ-বিজ্ঞানে অধিক সংখ্যক ও উপযুক্ত শিক্ষিকা তৈয়ারী করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির চাহিদা মিটাইবে তাহা নহে। বরং যাঁহারা শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিবেন না তাঁহারাও চার বৎসর ধরিয়া উপরের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের গুরু দায়িত্বগুলি অধিকতর দক্ষতার সহিত পালন করিতে সমর্থ হইবেন। পশ্চিম-বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেই দিন বলিয়াছেন, "আমাদের দেশে কি সামাজিক, কি কৃষ্টিগত, কি অর্থনৈতিক জীবনে আমাদের অগ্রসর হইবার পথে প্রধান অন্তরায় হইতেছে, আমাদের ঘরগুলি আজ সত্যিকারের শিশু-শিক্ষার কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। গৃহ-বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পিতামাতা উভয়েরই সুন্দর, সুস্থ, গৃহ-জীবন রচনায় একান্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। সুপরিচালিত সুস্থ গৃহ ব্যবস্থায় মানুষ নিজকে উপলব্ধি করে, উহাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ভবিষ্যতের বাংলার জন্য আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান আত্মশক্তিতে দৃঢ় এইরূপ মন ও মানুষেরই একান্ত প্রয়োজন।"

সুতরাং আশা করা যাইতেছে, মেয়েদের এই একান্ত প্রয়োজনীয়, এই অঞ্চলে এই এই ধরনের প্রথম কলেজটির প্রতি বাংলা সরকার বিশেষ ভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন।

এই কলেজ পরিকল্পনার বিষয় অনুধাবন করিতে গিয়া আরও একটি বিষয় আমার বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যাঁহারা এই কলেজের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাঁহারা যে কেবল শহরের মুষ্টিমেয় মেয়েদের জন্যই আই-এ, বি-এ, ডিগ্রীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা নহে। আমাদের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক গ্রামাঞ্চলবাসী তাহাদের কথাও ইঁহারা বিস্মৃত হন নাই। বস্তুতঃ গৃহ-বিজ্ঞানে জ্ঞানের প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক বেশী অনুভূত হয়। গৃহ-বিজ্ঞানের জ্ঞান যাহাতে শহরের স্বল্প লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িতে পারে বিহারীলাল কলেজ পরিকল্পনায় উহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল মেয়েরা ঘটনাচক্রে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বা কলেজী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, অথচ যাহারা গ্রামাঞ্চলে গিয়া গ্রামোন্নয়ন বা সমাজ-সেবা প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কোনও রকমে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে তাহাদের জন্য 'পল্লী-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা', 'পল্লী-গৃহ সংস্কার ও উন্নয়ন', 'শিক্ষা ও কুটীর-শিল্প' প্রভৃতি বিষয়গুলিতে স্বল্প-মেয়াদী ছোটখাট কার্য্যকরী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন সেবা বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং সেই সকল কেন্দ্রের শিক্ষাধারা আঞ্চলিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত হইবে। যাঁহারা গ্রামোন্নয়ন বা পল্লীসংস্কার প্রভৃতি কাজগুলিতে আত্মনিয়োগ করিবেন না তাঁহারাও যাহাতে বিভিন্ন

ধরনের কুটীর-শিল্পগুলিতে তিন-চার মাসের স্বল্পমেয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সংসারের আর্থিক স্বাচ্ছল্য কিছু পরিমাণে বাড়াইতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। মোটের উপর বিহারীলাল কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই বিহারীলাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ হিসাবেই বাংলা দেশের মেয়েদের জন্য বিভিন্ন দিকে এই সকল ছোটখাট বিভিন্ন শিক্ষাধারাগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে। এই সকল শিক্ষা ব্যবস্থাগুলিতে রূপ দিবার উদ্দেশ্যেই, দেখিলাম, বিহারীলাল কলেজের পূর্বদিকের জমিটুকুতে কলেজ কর্তৃপক্ষের একটি উৎপাদন-কেন্দ্র (production cantre) স্থাপন করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান গৃহ-বিজ্ঞান বিভাগে বিজ্ঞান ক্লাসের একটি অংশ

কিন্তু যে-কোনও রকম পরিকল্পনাই হউক না কেন, উহাকে কাজে রূপায়িত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং গ্রামোন্নয়ন ও সমাজসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগগুলি খুলিতে হইলে বিহারীলাল কলেজের আরও অর্থের প্রয়োজন হইবে, নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই অর্থ আসিবে কোথা হইতে? ভাবিতে হইল না—সামনের দেয়ালে চোখ পড়িতেই সুচারু নক্সার মধ্যে লিখিত পশ্চিম-বাংলার প্রধানমন্ত্রীর উক্তিটিই আবার চোখে পড়িল—'দেশ ও সমাজের পক্ষে যে কাজ একান্ত কল্যাণকর, কর্মীরাও যেখানে সকল বিষয়েই একান্ত আন্তরিক—সে কাজ কখনও অর্থের অভাবে বন্ধ থাকিতে পারে না।'

দেশ গঠনের পথে নূতন স্থাপিত বিহারীলাল কলেজ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, গ্রামোন্নয়ন ও সমাজসেবার প্রতি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বিহারীলাল কলেজের মেয়েরা, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি কার্যগুলি গ্রহণ করিয়া, উহাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতখানি সম্ভব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সহায়তা করিবে। গ্রামোন্নয়নের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের প্রতিদিনকার জীবন ও জীবনধারায় পরিবর্তন লইয়া আসা, বৈচিত্র্যহীন নিষ্প্রভ প্রাণে জীবনের আনন্দ ফুটাইয়া তোলা। জীবনের মান ও জীবনের কাজ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আসাই গ্রামোন্নয়নের মূল কথা। যথাযথ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিহারীলাল কলেজের মেয়েরা এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। গ্রামাঞ্চলের উন্নতিবিধান করা আমরা এত দিন পর্যন্ত ছেলেদের কাজ বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছি, কারণ গ্রামোন্নয়ন বলিতে আমরা এতদিন পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী ও কূপ খনন করা প্রভৃতি কাজগুলিকেই বুঝাইয়াছি। বস্তুতঃ, গ্রামোন্নয়নের একমাত্র উপায় ও পথ গ্রামের গৃহ-জীবনগুলিকে সুস্থ ও সুন্দর করিয়া রচনা করা, এ দায়িত্ব প্রধানতঃ মেয়েদের এবং ইহা ধনী ও নির্ধন উভয়েরই আওতার মধ্যে। ইহার জন্য কেবলমাত্র নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। বিহারীলাল কলেজ গ্রামের জীবন ও জীবনধারার সহিত মেয়েদের পরিচিতি ঘটাইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় দীর্ঘ দিনের অনুভূত অভাব অনেকাংশে পরিপূরণ করিবে নিঃসন্দেহ। শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে কোনও গঠনমূলক পরিকল্পনাই রচিত হউক না কেন, উহা যদি গ্রামের জীবন ও জীবনধারাকে উন্নত করিবার প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত না হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য।

বহুদিন ধরিয়া বাংলার গৃহ ও গৃহ-জীবনের উপর দিয়া বিপর্যয় সুরু হইয়াছে, মানুষের জীবন হইতে শ্রী ও সৌন্দর্য লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইল, এই কলেজের মেয়েরাই হয়ত এক দিন সেই লুপ্ত শ্রী ও সৌন্দর্যকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। নূতন শিক্ষাধারায় দীক্ষিত হইয়া ইহারাই হয়ত একদিন মানুষের জীবনে নূতন ভাবে বাঁচিবার ও ঘর বাঁধিবার ইসারা আনিয়া দিবেন।

ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহোদয় তাঁহার ভাষণের মধ্যে একটি অতি

প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই কলেজ পরিচালনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিণ্ডিকেট, ফ্যাকাল্টি, একাডেমিক কাউন্সিলের প্রভৃতির কর্তৃত্ব এবং হস্তক্ষেপ যত কম থাকে ততই ভাল। তিনি মনে করেন যে, এই কলেজ পরিচালনার জন্য একটি স্বাতন্ত্র্য-প্রাপ্ত পরিষদ থাকাই বাঞ্ছনীয়, এবং এই পরিষদে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ নারীর সংখ্যাই অধিক থাকা উচিত। আশা করি প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ ঘোষের এই উক্তিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাল্কা ভাবে গ্রহণ করিবেন না।

গৃহ-বিজ্ঞান বিভাগের রান্নার ক্লাসের একটি অংশ

বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও যাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে আজ এই বিহারীলাল কলেজটি গড়িয়া উঠিল তাঁহার সম্বন্ধেও এই প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯৪৪ সনে সেনেটের সদস্যা শ্রীমতী জ্যোতিঃপ্রভা দাশগুপ্তার বিরাট পরিকল্পনার ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহাকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব শ্রীমতী দাশগুপ্তার উপরেই ন্যস্ত হয়। তখন হইতেই তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষারূপে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ে উক্ত বিভাগের সম্প্রসারণ পরিকল্পনাটি আজ বিহারীলাল কলেজে রূপ পাইল। শ্রীমতী দাশগুপ্তা এক দিকে যেমন অবিভক্ত ভারতে প্রতি প্রদেশে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আবার ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধেও যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। আমেরিকায় থাকাকালীন সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া হইতে তিনি ফাই বিটা ফেলোশিপ প্রাপ্ত হন, এবং উহারই সাহায্যে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিহারীলাল কলেজের পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁহার চিন্তাশীল অভিজ্ঞ মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশের যাহা কিছু ভাল উহারই সমাবেশে যেন তিনি বিহারীলাল কলেজটিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং সমাপ্তি ভাষণে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারীলাল কলেজ গঠনের কাজে শ্রীমতী দাশগুপ্তা ও তাঁহার সহকর্মীদের পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করিয়া মেয়েদের শিক্ষাকে পূর্ণতর রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; তাঁহারই রোপিত বীজ আজ বৃক্ষে পরিণত হইতে চলিয়াছে; কিন্তু গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি মৃত্যুর অমোঘ বিধানে সেই মানুষটিই আজ স্বীয় প্রচেষ্টার বাস্তব-রূপ দেখিতে পাইলেন না। স্বর্গীয় বিহারীলাল মিত্রের দান এবং বদান্যতা সার্থক হউক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্তৃপক্ষগণের উদ্দেশ্য ও অভীপ্সা সাফল্য অর্জন করুক ইহাই প্রার্থনা করি। শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তার সাধনা ও পরিশ্রম সার্থকতামণ্ডিত হইয়া ঘরে ঘরে বাংলার মেয়েদের নূতন করিয়া সৃজন করুক ও নূতন কর্মধারায় উহারা দীক্ষিত হইয়া উঠুক—ইহাই একান্ত কামনা করি।

পর্ব্বত ও শিলা

শ্রীরেণুকা দেবী
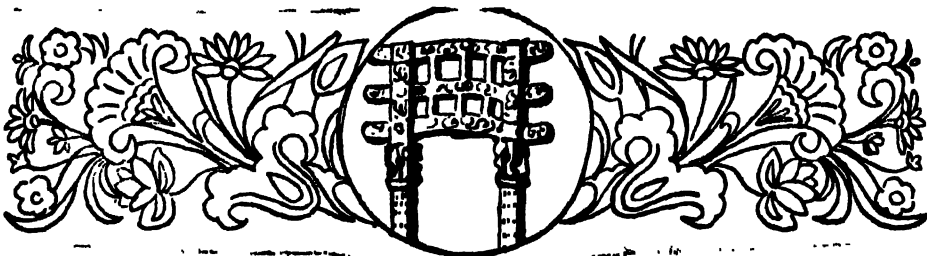
সুপ্রভা দেহ রাখলেন। সন্ধ্যা সাতটা বেজে ন' মিনিটের সময়। সুপ্রভা কলিকাতার প্রাচীন ধনী মিত্র-পরিবারের বধূ। ব্যারিষ্টার স্বর্গত নবেন্দু মিত্রের স্ত্রী। সেইদিনই সকালে, নিত্যকার অভ্যাসমত উষঃস্নান সেরে, প্রণাম জানিয়েছেন প্রভাতের দেবতাকে। তার পর নিজের ঘরে এসে মাথা লুটিয়ে দিয়েছেন জলচৌকির উপর সাজিয়ে-রাখা "নবেন্দু মিত্রের" প্রকাণ্ড ছবিটার সামনে। পূজার ঘরে এসেও প্রতিদিনের মত ঘুরে ঘুরে জোড় করে মাথা নত করেছেন, চারিদিকে টাঙ্গানো দেবদেবীর নানা চিত্রপটের দিকে। দিনের আলোয় ঘর ভরে না যাওয়া পর্যন্ত গুরুমন্ত্র জপ করেছেন আসনে বসে। এসব কাজ তাঁর সারা হয়ে যায় বাড়ীর প্রত্যেকটি লোক উঠবার আগে। তার পর গীতাপাঠ, পুরাণপাঠ, ভাগবতপাঠ আছে নিয়মিত কয়েক ছত্র করে। শেষে আছে শ্যামসুন্দরের পূজা। দাসী বকুল এসে সাজ, নৈবেদ্য করে দেয় তখন। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দন আছেন, সে পূজা হয় পালামতে। শ্যামসুন্দর তাঁর নিজস্ব। শান্তি পাওয়ার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাই শান্ত দেহমন প্রথমেই লুটিয়ে পড়েছিল শ্যামসুন্দরের পায়ের তলে।

কুড়ি বছরের ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার আগে তেরো বছরের সুপ্রভাকে ঘরে এনেছিলেন, হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল রামজীবন মিত্র মহাশয়। নবেন্দু যখন ফিরে এলেন, সুপ্রভা তখন পূর্ণ-বিকশিত। এক বছরের মধ্যেই নিজে পিতা হলেন, কিন্তু নিজের পিতাকে হারালেন। তার জন্য দুঃখ নেই, অধিক বয়সের সন্তান, মাতৃহীন পুত্রের জন্যই যেন অপেক্ষা করেছিলেন। পাঁচ ছেলের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে, পুত্রহীনা বিধবা কন্যা মহামায়ার হাতে ছোট ছেলের সাংসারিক ভার দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করেই তিনি গিয়েছেন।

নূতন সংসার, সুন্দরী স্ত্রী, প্রথম পুত্র, প্রাণে আনন্দের বন্যা বইছে নবেন্দুর। অর্থাভাব নেই, তবু অর্থ পাচ্ছেন। পুরানো "অষ্টিন" বদলে "ভক্সল" কিনলেন নতুন। ছুটি পেলেই ছোটার নেশায় পেয়ে বসল তাঁকে। এই নেশাই হ'ল কাল। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোটর দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারালেন, শিশু শুভেন্দুর তখনও তিন বছরও পূর্ণ হয় নি। আকস্মিক এই আঘাতে বিমূঢ় হয়ে গেলেন সুপ্রভা। সমস্ত অশুভের মূল ভাবলেন শুভেন্দুকে। একান্ত ভাবে আঁকড়ে ধরলেন নির্জ্জন নিঃসঙ্গ জীবনকে। নানা দেবদেবীর মূক মূর্ত্তিচিত্রই হ'ল তার একমাত্র সঙ্গী। সমস্ত আপন-জনকে সরিয়ে দিলেন, এমনকি শিশু শুভেন্দুকেও। দাসী নন্দর মা, আর মহামায়া এরাই বড় করে তুললেন তিন বছরের অবোধ শিশুকে।

বালক শুভেন্দুর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল, তিনতলার ঘ পূজা-আর্চ্চায় দিনযাপন করা মহিলাটির প্রতি। জানে তিনি মা। বিস্ময় আর আগ্রহ নিয়ে বারে বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মার ঘ দরজায়, অতি পরের মত প্রশ্ন শুনেছে—'খাওয়া হয়েছে? প শোনা করছ?' কখনও বা নীরবে ইঙ্গিত করেছেন চলে যাও জন্য। ক্ষুব্ধ অভিমান গুমরে উঠেছে বালক-মনে। কখনও অ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তবু, কখনও দ্রুত নেমে এসেছে। যা না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে মনে মনে। জগতের সবচেয়ে আ জনকে মনে করেছে সব চাইতে পর। পনেরো-ষোল বছর বয় কালে, এর রূপ হ'ল অন্য। মায়ের নিষ্ঠুরতার প্রতি তার বিপ নিষ্ঠুরতা। মা, কিসের মা উনি? মায়ের জন্য কোন আগ্রহ, ে কৌতূহল নেই তার। নিজের খুশীর বেগে চলা, সমস্ত কিছু নি মতে করা, মহামায়ার অবাধ্য হওয়া, সবই যেন মাকে কষ্ট দেও এক সান্ত্বনায় পূর্ণ। দোতলার শুভেন্দু, আর মায়ের তেতলায় নি। মহামায়ার আদরের শুভেন্দুর মধ্যে তাই গোপনে ছিল, ম স্নেহ-বঞ্চিত এক কঠিন শুভেন্দু।

যখন বি-এ পড়তে গেল শুভেন্দু, তখন আর এক রূপ প্রব পেল তার মধ্যে। তখন অষ্টাদশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তখ মেয়েদের সম্বন্ধে তার কৌতূহল হ'ল অত্যধিক। মেয়েদের স মেশবার আগ্রহ তার অতি প্রবল। কলকাতার আদি কায়স্থ তা সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে কত আত্মীয়স্বজন। আর শুভে মত ছেলে—তাই মেশবার সুযোগও হয়েছিল খুব। অর্থের খ্যা ছাড়া চেহারাটাও কম আকর্ষণযোগ্য ছিল না। আঠারো ব বয়সেই দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুদর্শন চেহারার শুভেন্দু, বহু মেয়ের মনে ভবিষ্যতের কল্পনার সৃষ্টি করাত। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে ে কোন মেয়েকেই তার ভাল লাগত না। আবার এই ভাল লাগাটাই তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত মেয়েদের কা কাছে।

বি-এ পড়ার সময়েই আলাপ হয় পরাগের সঙ্গে। বর্দ্ধমা কলেজ থেকে এসেছে ছেলেটি। দেখেই ভাল লাগে শুভেন্দুর কি বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের একহারা চেহারা। বি বোঝা যায় যে, ধারালো আর কঠিন স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু সে দেখেই না, সবকিছু জেনেও নেয়। অল্প কথা বলে, কিন্তু লা নয়। বহু ছেলের মধ্যে থেকেও ওর পৃথক পরিচয়, আলাদা ক বলে দিতে হয় না যেন। শুভেন্দুর পরিহাসসূচক কথা বলার ভ পরিষ্কার মতামত পরাগকেও মুগ্ধ করে। আলাপ আরও ঘনিষ্ঠ হ এম-এ পড়তে এসে। এখানেও বিষয় দু'জনের আলাদা, তবে

পড়ে ফিলোসফি, পরাগ পড়ে ইকনমিক্স। তাতে বন্ধুত্ব বা আড্ডা দেওয়ার কোন বাধা হয় নি।

কলেজেও মেয়েদের সঙ্গে শুভেন্দুর এই ব্যবহার লক্ষ্য করেছে পরাগ। কি চমৎকার ভাবে আলাপ জমায় শুভেন্দু, কথার পিঠে কথা বলার কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা। প্রায় প্রত্যেক মেয়েকেই মনে করাতে পারে যে, শুভেন্দু তার প্রতিই আকৃষ্ট বেশী। কলেজের বাইরে ও পরিচিত মহলের মধ্যে এই বিষয়ে কিছু কিছু শুনেছে। অবস্থাপন্ন ঘরের একমাত্র ছেলে, ওদের সমাজে হয়ত এসব চল, ত.ই এই নিয়ে প্রথমে কিছু বলে নি পরাগ। কিন্তু শুভেন্দুকে ভাল করে চেনবার পর তার মনে হয়েছে, আসল মানুষটির সঙ্গে চপলচিত্ত মানুষটির কোথায় যেন যোগসূত্র ছিন্ন আছে। দুটিই যেন পৃথক সত্তা। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এইটুকুই শুধু ধরা পড়েছে, বোধগম্য হয় নি সবটা।

পরাগকে একজন প্রোফেসার কিছু বই দেবেন বলেছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরাগকে সকলেই উৎসাহ দেন। পরাগ থাকে বউবাজারে, প্রোফেসারের বাড়ী টালীগঞ্জের চারু এভিনিউতে। কথা ছিল শুভেন্দু গাড়ীতে পরাগকে সেখানে নিয়ে যাবে।

—আসছিস তো দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে ?

—ব্যানার্জ্জির বাড়ী যেতে, না ভাই আজ হবে না, কাল আসব। উনি তো যে-কোন দিন বলেছেন, আজ বিশেষ জরুরি কাজ আছে।

—এক দিনে আমার অবশ্য কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু কি তোর জরুরি কাজ শুনি ?

শুভেন্দু বুঝতে পারে, পরাগ কিছু অনুমান করেই বলেছে, তাই তার সহজ পরিহাসের ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে বলে—আজ্ঞে, আপনার অনুমান ঠিক। সেজ জ্যেঠামার ভগ্নী-কন্যা শ্রীমতী শোভা, তিনি কলকাতা দর্শন শেষ করে কালই পিতৃগৃহে চলে যাচ্ছেন। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। মেয়েটি ভাল, আর তিনি যে এত শীঘ্র চলে যাচ্ছেন সেটা আরও ভাল।

—শুভেন্দু—

—পুরো নাম আর উচ্চারণের স্বর শুনে অবাক হয়ে যায় শুভেন্দু, বলে—

—বল।

—মেয়েদের প্রতি তোমার এরকম অশ্রদ্ধা কেন ? অনেক মেয়ের সঙ্গেই তুমি এমন অভিনয় কর।

—অভিনয়, মোটেই না, আমার ভাল লাগে।

—না, ভাল লাগলে এমন অভিনয় করতে পারতে না। তুমি একই সঙ্গে যেমন মমলা মৈত্রকে খুশির সঙ্গে, গাড়ীতে ডেকে তুলে বাড়ী পৌঁছে দাও, শীলা সরকারকে ফ্রেন্ডবুক যোগাড় করে দিয়ে কৃতার্থ হও, তেমনি মিনতি হালদারকে নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে এখানে-সেখানে বেড়াও খুশিতে গদগদ হয়ে।...

—আর বাইরে তো শোভা, স্বপ্না, লতিকার দল আছেই এটাও বল।

—'কিন্তু এ কি ভাল, এই ভাবে মেয়েদের অপমান করা হয়।' পরাগের বক্তৃতা চলে। 'স্ত্রীজাতি কত শ্রদ্ধার পাত্রী। আমাদের শাস্ত্রে কত উচ্চে আসন দেওয়া হয়েছে মেয়েদের। ইহং গেহে লক্ষ্মী তারা ইত্যাদি—

জোরে হেসে শুভেন্দু বলে—থামুন, আচার্য্য মশায়, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করা যাবে।

—না—তুই আমার কথাটা ঠিক বুঝলি না, মেশাটা অন্যায়, সেকথা আমি বলি নি, মেশা বা, ভাল লাগা···কিন্তু তোর ভাবটা···

—দেখ পরাগ, তোদের মত ওই মেপে মেপে মেশা, ভাব, আমার ধাতে সইবে না। এর সঙ্গে সাধারণ, ওর সঙ্গে অসাধারণ, ভাব আমার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, যদি বল কোন রোমান্স, বা তাদের ভাল লাগা, তা বাপু আমি কিছুই পাই নে, কিংবা বুঝি নে, তাই তোর ভাষায় অভিনয়, হাঁ। অভিনয়ই করে যাই, ওদের হৃদয় মন জানতে আমার শুধু কৌতূহল হয়, নিছক কৌতূহল।

—তোর এই নিছক কৌতূহলের জন্য কত মেয়ে, আহত হয়, দুঃখ পায় হয় ত তার খবর রাখিস ?—এই ত, তুই ক'দিন যাস নি, শীলা সরকার আমাকে বলছিল···

—বলছিল—আমার অদর্শনে সে কত দুঃখিত। দুঃখিত—মেয়েরা আবার দুঃখিত হয় কারো জন্যে ? উচ্চ হাস্যে ভেঙে পড়ে শুভেন্দু।

—এম-এ দিয়ে শুভেন্দু বিলেত যাওয়া স্থির করল। ওদের পরিবারে এখন প্রায় সকলেই বিলাতফেরত। 'ল লাইনে' যাবার কোন বাসনা নেই, শুভেন্দুর মাষ্টারি লাইনেই ঝোঁক বেশী, বাইরের পড়াশোনায় আগ্রহ তার ছোটবেলা থেকে। যাবার আগেও সেই পরিহাস—বিলেত গিয়ে বাঁচব, তুই ত সঙ্গে যাচ্ছিস না, বিদেশিনী-দের সঙ্গে অভিনয়টা কেমন জমাতে পারি, দেখি গে চেষ্টা করে।

—তোকে একটা কথা দিতে হবে কিন্তু।

—বলতে পারিস, সম্ভব হলে রাখা যাবে।

—কোন বিদেশিনীকে বিয়ে করবি নে।

—অপরাধ ?

—অপরাধ নয়, অন্যায়। আমার মনে হয় বিবাহ যদি কর, তবে একজন বাঙালী মহিলাকে করবে, অন্ততঃ একজন ভারতীয়কে, দেশে মেয়ের অভাব নেই।

—যাক গে—একটা কাগজ দে।'

—কাগজ ?

—হাঁ। যদিও তোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, তবু বিবাহের বাসনাই যখন নেই তখন তিন বার লিখে, নামটা সই করে দিই।

শুভেন্দু চলে যাওয়ার পর, ছোটবেলার ছবি আঁকার অভ্যাসটা পরাগকে পেয়ে বসল। একটা স্কুলমাষ্টারি যোগাড় করে, সে শিল্প-সাধনায় মন দিল। ছুটির সময়ে দেখে বেড়াতে লাগল, ভারতীয় নানা চিত্রকলার পাদপীঠ। বন্ধনহীন একা মানুষ, অল্প কিছুকালের একাগ্র সাধনায়, নামও হ'ল সামান্য। এক প্রদর্শনীতে অতি প্রশংসা লাভ করল, "বরদান" নামে একটি ছবি। বাল্মীকিকে বর দিচ্ছেন "দেবী ভারতী"। সামান্য সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে ঋণ করে, শিল্পপিপাসু পরাগ ছুটে গেল গ্রীস, রোম, প্যারিসে।

—ইতিমধ্যে তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে, শুভেন্দু যখন ফিরে এল, পরাগ তখন বাইরে। দেশে ফিরে এসেছে, সেই একই পরিহাসপ্রিয় শুভেন্দু, কিন্তু অন্য দিকটা একেবারে উদাসীন ও নিস্পৃহ। তার পক্ষে এটা বিশেষ পরিবর্ত্তন। দেশে আসার পর আরও বদলে গেল সে। যেদিন দেশ ছেড়ে দূর বিদেশে যাত্রা করে, সেদিনও স্থিরভাবে ছেলেকে বিদায় দিয়েছিলেন সুপ্রভা, দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতে করতে ফোটা ফোটা চোখের জল ফেলেছেন, আর মুছেছেন মহামায়া। শুভেন্দুর চিঠি এলে প্রতি ছত্র, দু'বার করে পড়েছেন মহামায়া, ছেলের কুশলটুকু ছাড়া আর কিছুই শুনতে চান নি সুপ্রভা। কিন্তু প্রবাস থেকে ফিরে যেদিন কাছে এল, প্রণাম করে মাথা তুলবার আগেই ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন সুপ্রভা, মাথাটা গভীর ভাবে চেপে, পিঠের উপর হাত রাখলেন। এই প্রথম, শুভেন্দুর সজ্ঞানে মায়ের বুকে মাথা রাখা, মায়ের আদর পাওয়া। এক মনোবিকারের ফলে, শিশুকালে যাকে দূরে রেখেছিলেন, নিজের যৌবনকালে, জপতপের কঠোরতায় যাকে কাছে টেনে নেন নি, বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই ছেলে যখন চোখের সামনে থেকে চলে গেল, তখন সুপ্রভার সমস্ত মাতৃহৃদয় কি বেদনায় হাহাকার করত? মনে পড়ত বারে বারে কাছে আসা সেই বালক-পুত্রকে, নইলে এত সহজে এত দিন পরে কেমন করে কাছে টেনে নিতে পারলেন। মায়ের জীবনধারার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা না গেলেও ছেলের মধ্যেকার পরিবর্তন সহজেই ধরা গেল।

এসেই একটা প্রোফেসারি পেয়েছে শুভেন্দু। লাইব্রেরী সাজিয়ে নিয়ে পড়াশোনায় ব্যাপৃত রইল সে। মহামায়া ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বিয়ে দেবার জন্য। তাঁর বয়স হয়েছে। মায়ের যা মতিগতি, তাতে তিনি যদি একে সংসারী না করে যান ত এ সংসার ভেসে যাবে। কত সম্বন্ধ এল, ফটো এল, শুভেন্দু নির্ব্বিকার। মহামায়া বকে যান শুভেন্দু বই নাড়ে, পড়ে আর হাসে। কেমন শান্ত আর উদাস। সে দুরন্ত, আবেগপ্রবণ শুভেন্দুকে আর খুঁজে পান না মহামায়া। বরং তাকে, সকালে বিকালে, সময় পেলেই দেখা যায় দুষ্ট ছেলের মত উঁকি দিচ্ছে মায়ের ঘরে, ওর দিকে চেয়ে একটু হাসবেন, কিংবা কাছে এগিয়ে বলবেন, কি রে কলেজ যাবি না, খুশী হয়ে চলে আসবে ছোট্ট ছেলের মত। মহামায়া কিন্তু স্পষ্ট কথা শুনতে চান।

—তুই বিয়ে করবি কি না বল?

—যাকে যেয়ে পছন্দ না হলে কি করব।

—দত্তবাড়ীর মেয়ের ফটোটা দেখেছিস, তোর ছোট পিসীর ভাসুরঝি অনুভা ত খাসা দেখতে।

—ওই আহ্লাদী পুতুল, ওকে ত শো-কেসে রাখাই ভাল।

মা ত আগেই সন্ন্যাসিনী হয়েছেন, তুমিও সন্ন্যাসী হও, আমার ভায়ের বংশটা লোপ পাক, এত বড় বাড়ীঘর, যাও আর চারটি চেলাচামুণ্ডা যোগাড় করে থাক তোমরা। আমি কিন্তু এবার তোর মেজ জ্যেঠার কাছে এলাহাবাদ চলে যাব, বলে রাখছি খোকা।

মহামায়াকে তুষ্ট করতে, ওদের বাড়ীর রীতি অনুযায়ী, নিজেই দু'একটি মেয়েও দেখল, কিন্তু কোন মেয়েকেই পছন্দ হ'ল না তার, সেটা মেয়েদের রূপ গুণ ইত্যাদির জন্য নয়, ভালই লাগল না তার। মনে হচ্ছিল, পরাগ থাকলে এই সময়ে উপকার হ'ত। যে শুভেন্দু একদা মেয়েদের একটু সঙ্গলাভের জন্য নানা কাণ্ড করে বেড়িয়েছে, আজ যৌবনকালে নিস্পৃহ হয়ে গেছে সে। বালক-বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার কালে মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রাথমিক চঞ্চলতা—সেটা তার বঞ্চিত বালকচিত্তের অন্য প্রকাশ মাত্র। অপরিসীম পিপাসা নিয়ে ছুটে গিয়ে কেবলি অতৃপ্ত হয়ে ফিরেছে, অথচ সে মনের খবর ছিল তার নিজের অজ্ঞাত। মায়ের স্নেহের এতটুকু স্পর্শেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে সেই মন। শিশুর মতই হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে ফিরে আসছে মায়ের কাছে, তাই যৌবন যেন ঘুমিয়ে গেছে তার।

আজকাল তেতলার সুপ্রভা নেমে আসেন প্রায়ই দোতলায় শুভেন্দুর কাছে। এখানেও চারিদিকে বই মাসিক পত্র ইত্যাদি, তার মধ্যে শুভেন্দুকে দেখে বিস্মিত হন। এত সব বই পড়ে নাকি সে, নিজের ঘরে বন্দী থেকে বাইরের অনেককিছুই অজানা তাঁর কাছে। ছোট মেয়ের মত তাই প্রশ্ন করেন—এই বইটা তোর পড়া। ওটা কি বিষয় নিয়ে লেখা। বিষয়ের নাম শুনে অবাক বনে যান। কোনদিন ছেলে বলে—

—একটা কবিতা পড়ব, শুনবে মা।

—ইংরিজী?

—তা হোক, শোন, পরে তোমায় বুঝিয়ে দেব।

শুভেন্দু পড়ে যায় খানিকটা, তার পরে মার মুখের দিকে চেয়ে হেসে পড়া বন্ধ করে, অবাক বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠেছে মায়ের চোখ, এমনি জলের মত ইংরিজী পড়তে পারে খোকা।

—ভাল লাগছে?

ছেলেমানুষের মত মাথা হেলিয়ে 'হুঁ' বললেন সুপ্রভা।

এদিকে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের যাতায়াত সুরু হয়েছে বাড়ীতে। অস্থির হয়ে উঠেছেন মহামায়া। এই নিয়ে কথা হয় সুপ্রভার সঙ্গে—তোর ছেলেকে বিয়ে করতে বল ছোটবৌ।

—আমি? আপনার কথাই রাখছে না সে।

বিরক্ত হয়ে উঠেন মহামায়া—রাখছে মা সে, বলেই খালাস। ভগবান তোকে মা করেছিলেন কেন? ও না বলেছে তবে আর কি—বলি সবাই মিলে বললে তবে ত ওর মনটা ভিজবে। সুর নরম করে বলেন, যতই হোক তুই মা, তোর কথা কি ফেলতে পারবে, আমার কথা না হয় হেসে উড়িয়ে দেয়, তোর কি মায়া হয় না ছেলের জন্যে, শুধুই স্বামীর জন্যে শোক, পুত্তুর কি কেউ নয়।

এত কথার মধ্যে, একটি কথাই সুপ্রভার মনে দাগ কেটেছিল, 'যতই হোক তুই মা'। কলেজ থেকে ফিরে ইজি চেয়ারে বসে বই দেখছিল, সুপ্রভা এসে দাঁড়ালেন ছেলের কাছে। বইটা রেখে, গা এলিয়ে দিল শুভেন্দু। ছাব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবন পুত্রের দিকে অবাক হয়ে দেখলেন সুপ্রভা। কৈ এমন করে ত কোন দিন দেখেন নি তিনি। কাছে এগিয়ে এসে তার ঘন চুলে ভরা মাথায় হাত রাখলেন। বড় হয়ে গেছে ছেলে তাঁর, এই আনন্দের মধ্যেও একটা দুঃখের অনুভূতি হচ্ছিল তাঁর মনে। ছেলের কাছ থেকে সরে গিয়ে, ঘরটার মধ্যে এলোমেলো একটু ঘুরে, আবার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'বস না মা', পাশের চেয়ারটা হাত বাড়িয়ে টেনে দেয় ছেলে।

না বসে, আবার ছেলের মাথার কাছে আসেন, এবার ঘন চুলের মধ্যে আঙুল নেড়ে নেড়ে আদর করার ছলে আস্তে আস্তে বলেন, "তোকে আর একা মানায় না খোকা।"

'খোকা'—একটি ডাক, শিউরে ওঠে শুভেন্দু, হাত বাড়িয়ে নিজের মাথার উপর মায়ের হাতটি চেপে ধরে। একটু থেমে বলে, 'আচ্ছা মা, তোমার কথা রাখব।'

চলে আসছিলেন সুপ্রভা, ছাব্বিশ বছরের ছেলে, ছ'বছরের মত আবদার ধরে—একটু বস না মা। সামনে-বসা মায়ের দিকে তাকিয়ে মাকে ছেলের নতুন মনে হয়। নিরাভরণা শুভ্রবেশা—অকাল বৈধব্যের আড়ালে এক চিরবিষাদের প্রতিমূর্ত্তি। মা যেন একটি ছোট বালিকা, শুভেন্দুর চেয়ে অনেক ছোট। বড় মায়া হয়, সেই বালিকাটির জন্য, মার জন্য। মা চলে যাওয়ার পরও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মার কথা। অপূর্ব্ব মমতা বোধ হচ্ছিল মার জন্য, কি করলে আনন্দ দেওয়া যায় তাঁকে, এই ভেবে মনে মনে অস্থিরতা বোধ করছিল সে।

এই ঘটনার পর দুটি দিন মাত্র পার হয়েছে। একদিন শুভেন্দু জোর করে মাকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। আর এক দিন সুপ্রভা অনেক গল্প করেছেন ছেলের সঙ্গে। ননদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। মাকে গল্প করতে দেখাও আশ্চর্য্য, পিসীমার প্রশংসা করা ত ততোধিক, কারণ পিসীমা ত, মাকে গালাগালি না দিয়ে জলগ্রহণ করেন না প্রায়। এই দুটি দিন কেমন কেটে ছিল সুপ্রভার? ছেলের মুখের দিকে ভালভাবে তাকাতে পারেন নি। নিজের নিষ্ঠুরতার কথা যত মনে হয়েছে ততই এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ হয়েছে, বারে বারেই তাঁর আশেপাশে এসে দেখা দিয়েছে বালক শুভেন্দুর মুখ। স্পষ্ট ধারণা হয় না, তবু যেন বোঝা যায়। যুবক ছেলের মুখ দেখে মনে হয়েছে, শুভেন্দু নয় ও যেন নবেন্দু, আবার নবেন্দুর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে করতে দেখেন, শুভেন্দুর ছায়া ছবির সারা মুখে।

তিন দিনের দিন, সকাল সাড়ে আটটা ন'টা হবে, শুভেন্দু দ্বিতীয় বারের চা খেয়ে কাগজ দেখছে, মায়ের দাসী বকুল হাঁপাতে হাঁপাতে আসে—শীগগির আসুন দাদাবাবু, মা যেন কেমন করছেন আসন ছেড়ে উঠতে যাচ্ছেন, পারছেন না, চোখ দেখে ভয় লাগছে—আপনি যান, আমি পিসীমাকে নীচ থেকে ডাকি।

শুভেন্দু ছুটে উপরে যায়—শ্যামসুন্দরের সামনে আসনে বসে, ফুল সাজাতে সাজাতে মাথা টলে ওঠে, একটু বেঁকে সামনে গেলেও, সেই অবস্থা থেকে উঠতে পারছেন না, চোখ দুটো কপালে ওঠা নামা করছে, অতি গৌর বর্ণ নীলাভ হয়ে এসেছে, শুভেন্দু যেতে যেতেই আরও বেঁকে পড়েছেন, মুখ দিয়ে অল্প অল্প ফেনা বার হচ্ছে। দুহাত দিয়ে মাকে তুলে ধরে কোলে করে পাশেই শোয়ার ঘরে পালঙ্কে শুইয়ে দিল। মহামায়া এসেছেন, তেত্রিশ বছরের পুরনো চাকর গিরিধারী ডাক্তার আনতে চলে গেল। শুভেন্দু ভেবেছিল, বোধ হয় ফিট হয়েছে, কিন্তু মহামায়া বুঝেছিলেন, তাঁর ডাক এসেছে, আরও ঘন্টাদশেক বেঁচে ছিলেন, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারেন নি সুপ্রভা, বড় বড় হয়ে ওঠা অস্থির চোখকে দু'একবার স্থির করতে চেষ্টা করেছেন শুভেন্দুর দিকে। ওইটুকু আদেশ বা অনুরোধ, পিসীমার কথা রেখ। মায়ের মৃতদেহের উপর থেকে অস্থির শুভেন্দুকে জোর করে তুলে নিতে হয়েছিল। মহামায়া ভাবছিলেন মাকে এত ভালো ও কবে থেকে বাসল যে আজ তিনিও শান্ত করতে পারছেন না।

মায়ের শেষ কাজ সারা হ'ল, শুভেন্দুর জীবনেও নূতন অধ্যায় সুরু হ'ল। সমস্ত বাড়ীটা খাঁ খাঁ করে। তেতলার একটি ঘরে থেকে কি করে সারা বাড়ীটাকে ভরে রেখেছিলেন সুপ্রভা। অসহ্য হয়ে উঠল মহামায়ার—যে সুপ্রভার সৃষ্টিছাড়া শোকের জন্যে, জপ-তপের ঠেলায় 'ভগবান নামলেন বলে' ইত্যাদি কটু মন্তব্য করা তাঁর নিত্যকার কাজ ছিল, সেই সুপ্রভাকে কি তিনি এত ভালবাসতেন! এই বাড়ী, এই সংসার যা তাঁর বুকের রক্তের চেয়েও প্রিয়, সে সংসারে অনাসক্তি এসে গেল সুপ্রভার অবর্ত্তমানে। তবে সুপ্রভার জন্যে দুটি কাজ তিনি করেছিলেন, বার-ব্রত, গীতা-ভাগবত পাঠে বাধা দেন নি কখনও, আর পূজা-আর্চ্চায় যতই বেলা হোক তাঁকে সঙ্গে না নিয়ে নিজে খান নি। সুপ্রভার উপর রাগ করে তাঁর পূজার ঘর মাড়াতেন না প্রায়, আজ তার ফেলে-যাওয়া ঠাকুর-দেবতার পূজার ব্যবস্থা করাতে করাতে কেবলই আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন।

'আমি আর টিকতে পারছি না খোকা, এই কালাশৌচ গেলেই, তুই বিয়ে কর'। টিকতে পারছে না যেন কেউ। যাদের সঙ্গে

সুপ্রভার কোন যোগ ছিল না, তারাও ; চাকর গিরিধারী দারোয়ান ভূপালী, ঠাকুর ভৈরব, সরকার মজুমদার মশায়, ড্রাইভার দুর্গাবাবু, দাসী নন্দর মা, বকুল সকলেই যেন এক নীরব শূন্যতা বোধ করে। শুভেন্দু অনেক সময় মায়ের খালি ঘরে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বাবার ছবিটার দিকে। বুকের মধ্যে টন্‌টন করে ওঠে, মার জীবিতকালেও বুঝি এমন করে ভালোবাসতে পারে নি তাঁকে, এর মধ্যে কেবল মনে হয়েছে পরাগ থাকলে ভালো হ'ত। অন্তরে একাকিত্ববোধ তাকে চঞ্চল করে তুলত, মাঝে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হ'ত কোথাও চলে যায়, কিন্তু মহামায়া ত আছেন। এমন সময়ে এল পরাগ। পরাগের মনে এখন শিল্পসাধনার পিপাসা—তিন-চার মাসের মধ্যেই একটি স্কলারশিপ যোগাড় করে আমেরিকা পাড়ি দিল। যাওয়ার আগে শুভেন্দুকে বিবাহ করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে গেল। তার অল্প কয়েকদিনের সঙ্গ শুভেন্দুকে অনেকটা শান্ত করেছিল।

সপিণ্ডীকরণ সারা হ'ল। মহামায়া আর দেরি করলেন না, শুভেন্দুর বড় মামা একটি সম্বন্ধ পাঠিয়েছেন, মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত জমিদারঘরের মেয়ে, মেয়েটি রূপে গুণে লক্ষ্মী। উনি ওখানে ডেপুটি থাকা কালে অনেকবার গেছেন তাদের বাড়ী, কুটুম্ব ভালই হবে মহামায়ার। বন্ধু বিমানকে সঙ্গে করে মেয়ে দেখতে গেল শুভেন্দু। রূপার ট্রেতে হাতে করে আসা মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বিমান। অল্প গৌর আর স্বল্প শ্যামলতায় মেশানো রং, কিন্তু এমন দেহ-সৌষ্ঠবের কাছে রঙের প্রয়োজন হয় না। নিখুঁত ভাবে গড়ে তোলা স্মিত মুখশ্রী। সেই মুহূর্তেই বিমানের মনে হ'ল, এ মেয়েকে যেন শুভেন্দুর পাশেই মানায় কেবল। শুভেন্দু কিছুই দেখেনি, না রং না গঠন। সবটা মিলিয়ে সে দেখেছিল, নম্রতার ছবি একটি। ফেরার পথে চুপ করে শুনেছে, বিমানের মুখের বিশেষণ যোগ-করা প্রশংসাগুলি, হেসেছে মাত্র। বাড়ী আসতেই অসংখ্য প্রশ্ন করেন মহামায়া—কেমন রং, তোর মার মত হবে?

উত্তর দেয় না শুভেন্দু। বিমান বলে ওঠে, না—না—রং শুভোর চেয়েও চাপা তবে কালো নয়, একেবারে অজন্তার ছবি পিসীমা। ও আপনি মত পাঠিয়ে দিন, শুভোর খুব পছন্দ হয়েছে—নিজের সাফ মত প্রকাশ করে বিমান। সব কথাগুলি নিয়ে এলোমেলো চিন্তা করে শুভেন্দু। না রং সে রকম নয়, তবু যেন ভাবের সমতা আছে তেমনিধারা, হাঁ বেশ প্রশান্তি আছে, সব চেয়ে ভাল, সাদাসিধে ভাব। অন্য কোথাও নয়, ঐ মেয়েটিকেই বিয়ে করবে সে। মত পাঠাবার পর থেকেই যতই মনে পড়েছে, শান্ত ছবিটিকে, ততই ভালো লেগেছে মনে মনে।

আবার ভরে উঠেছে বাড়ীটা, একটি মানুষের আগমনে, লোয়ার সার্কুলার রোডের এত বড় বাড়ীটার প্রতিটি কোণে আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে। বৌয়ের নাম 'অশ্রুহাসি' সংক্ষেপে হাসি। পরিহাস-প্রিয় শুভেন্দু তাকে বলে, হাসিকান্না, আবার মাঝে মাঝে, একটু আদরে নিয়ে বলে—'হীরে-পান্না'। তবে সেটা তার বিশেষ আদরের ডাক। একটি মানুষ হাসিখুশিতে সবাইকে ভরে দিয়েছে। বকুলই হাসির কাজ করে, হাসির ঠাসা চুলের গোছা ধরে যখন বিনুনি করে দেয় বকুল পাশে বসে, ঢেউতোলা চুলে-ঘেরা মুখখানিকে দেখেন মহামায়া। তাঁর সযত্নে মাখানো কাঁচা হলুদ, বাদামবাটা, সর ময়দা দিয়ে মাজা রং দিনে দিনে ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। সমস্ত একাকিত্ব ঘুচে গেছে শুভেন্দুর। ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেছেন সুপ্রভা। মিলিয়ে গেছেন হাসির মধ্যে, যাওয়ার আগে উদাসীনকে ভালবাসতে, দুরন্তকে শান্ত হতে শিখিয়ে গেছেন সুপ্রভা। তাই শুভেন্দুর ভালবাসা, ধীর গম্ভীর।

আবার দু'বছর পার হয়ে গেল, এর মধ্যে মহামায়ার সঙ্গে এবাড়ী ওবাড়ী বেড়াতে গিয়ে হাসি শুনেছে শুভেন্দুর বিষয়ে অনেক কথা। কোন লিলির জন্যে সে পাগল হয়েছিল, কোন শোভার সঙ্গে রোজ দেখা করত। কোন কোন হিতৈষিণী হাসিকে সাবধান হওয়ার উপদেশও দিয়েছেন। হাসি চুপচাপ, একটি কথাও বলে নি শুভেন্দুকে। হাসি সেই জাতের মেয়ে, যারা নিজেরাই ভালবেসে জয় করে নেয় সব।

সেদিন শুভেন্দু খুব খুশী—পরাগ আসছে, হাসি।

হাসির হাসি পেয়ে গেল—আচ্ছা নাম বাপু তোমার বন্ধুর, আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, ফুলের মধ্যে থাকে পরাগকেশর।

—ঠিক বলেছ···কেশর নয়—কুমারী, আমার প্রিয় বন্ধু পরাগ কুমারী তিনি। দু'এক দিনের মধ্যেই আসছেন।

পরাগের বাড়ীর কাছেই বিমানের বাড়ী তাই তার সঙ্গে আগে দেখা হয়—'জানিস শুভো একেবারে বদলে গেছে। আর ওর বউ—চমৎকার চেহারা, ঠিক যেন অজন্তার ছবি, মানুষটা আরও ভাল।' খুব খুশী হয় পরাগ। বিকেলে দুজনেই আসে শুভেন্দুর বাড়ী। হৈ হৈ করে উঠল শুভেন্দু, সকলকে টেনে নিয়ে এল দোতলায়। হাসিকে দেখে অবাক বিমুগ্ধ হয়ে গেল পরাগ, শুভেন্দুকে আবার একনজর দেখে নিয়ে বলল, সত্যি বিমানের উপমা মিথ্যে নয়, শুভোর পাশে আপনাকে অজন্তার ছবিই বলা যায়। শিল্পীর সপ্রশংস দৃষ্টি থেকে লজ্জিত হয়ে সরে যায় হাসি।

শুভেন্দুর বাড়ী বিমান আর পরাগের অবারিত দ্বার, বিমান উকিল মানুষ, দুটি ছেলের বাবা, ঘোর সংসারী প্রয়োজন ভিন্ন আসে না। পরাগ এখন বেকার, কি যে করবে তাই ঠিক করে নি এখনও। ছাত্রজীবনেরই মত সকাল বিকাল শুভোর কাছে আসা তার নিয়মিত কাজ হ'ল। এবারকার আকর্ষণ কিন্তু শুভেন্দু ছাড়াও আর একজন। পরাগের প্রশস্তি-উজ্জ্বল চোখের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝলকে উঠে, অন্য আর একটা দৃষ্টি। হাসির ভাল লাগে না। ওদের গল্পকথার আসরে অনেক পরে উপস্থিত হয়ে বোধ করেছে এক জনের মন তার উপস্থিতির আশায় উদগ্রীব হয়ে ছিল। ভারি বিশ্রী লাগে হাসির। মাঝে মাঝে নিজে না গিয়ে চাকর দিয়ে চা জলখাবার দেওয়াতে লাগল। কিন্তু প্রতিদিনই পরাগ যাওয়ার

আগে শুভেন্দু ডেকে পাঠাবে। এমনি কয়েক দিন কাটার পর, পরাগ চলে যেতেই, শুভেন্দু বলে উঠে—বেচারী পরাগ, তোমাকে দেখে মোহিত হয়ে গেছে, আর শুধু রূপে নয়, গুণেও। রাগ কর কেন ভারি প্রশংসা করে তোমার ; আমার মত মানুষকে শান্ত করে ফেলেছ এইটাই ওকে বেশী স্পর্শ করেছে। অকরুণ হয়ো না দেবী, শিল্পীমানুষ দেখলই বা অজন্তার ছবি।

হাসি অবাক হয়ে যায়, তাহলে শুভেন্দুও বুঝেছে, আরও রেগে উঠে সে। 'ওঃ! আমি একটা দেখবার জিনিস হলাম। কাল থেকে আমি কিন্তু তার সামনে যাব না—বলে দিলাম।'

কে শোনে—শুভেন্দু ঠিক ডেকে পাঠায়, আবার পরাগের সামনেই বলে, 'বুঝলি পরাগ "হীরেপান্না" তোর ছবির বেজায় ভক্ত, আমার ভয় হচ্ছে যে, কবে তোর ভক্ত হয়ে পড়বে'। এমন মানুষকে নিয়ে কি করবে হাসি। তার চেয়ে চা জলখাবার দিয়ে দুটো কথা বলে আসা অনেক ভাল।

গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্ত আবার ঘুরে গেল। পরাগ কোন কাজই যোগাড় করে নি, ছবি আঁকে, কিছু বাজে কাজ, ডিজাইন নক্সা ইত্যাদি করেই চালাচ্ছে চলছে তার নিত্য যাওয়া, আসা। এই নিয়ে আজকাল হাসি শুভেন্দু দু'জনের মধ্যে কৌতুকও চলে, সহজ হয়ে গেছে হাসির মন। 'আচ্ছা তোমার বন্ধুর জন্যে একটি রাঙা টুকটুকে বৌ যোগাড় করে দাও না, কেমন বন্ধু তুমি।

—সখি, কথাটা কি মনের থেকে বলা হচ্ছে ?

—মানে ?

—মানে স্ত্রীলোক হয়ে এ রকম ভক্ত হারানো।

—কাল কিন্তু আমি ওঁকে মুখের উপর বলে দেব।

—আহা রাগ কর কেন, ওই না হয় তোমার ভক্ত হয়েছে, তুমি ত আর এ অধমকে ত্যাগ কর নি।

—তোমার রাগ হয় না।

—একটুও না। বরং ভাল লাগে, আমার মত ভাল যদি বাসতে, তা হলে বুঝতে ভালবাসার লোককে যে ভালবাসে, তাকেও কত আপন মনে হয়।

—বৈষ্ণবের অবতার তুমি। ঝাঁঝিয়ে উঠে হাসি।

—তোমার কি করুণাও হয় না।

—না—না—না।

মুখে না বললেও করুণা কথাটাই ভাবে হাসি। আজকাল তাই অনেক সময় শুভেন্দুর অনুপস্থিতিতে যদি এসে পড়ে, গিয়ে দুটো-একটা বলে হাসি। তার ছবির প্রশংসা করে। ধন্য হয়ে যায় পরাগ, পরাগের গভীর দৃষ্টির সামনে থেকে শান্ত ভাবে সরে যায় হাসি। দিনের পর দিনের নীরব নিবেদন, এত দিনে একটু করুণা আকর্ষণ করে। শুভেন্দুর সঙ্গে এই নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে, এত দিনে খচখচ করে যেন একটু বাজে হাসির। আজ চার-পাঁচ দিন পরাগ আসে নি—হাসিই বলল, হ'ল কি ভদ্রলোকের ?

—মন কেমন করছে নাকি।

—করছেই তো, সন্ধান কর ভক্তপ্রবরের।

—বেশ অত্যই যাইবে দাস।

হাসি না বললেও শুভেন্দু আজ যেত। জেনে এল বিশেষ কাজে হঠাৎ বোম্বাই গেছে পরাগ, কয়েক দিন পরে কলেজ থেকে ফিরে দেখে, নীচেকার ঘরের টেবিলের পরাগের চিঠি। "ভেবেছিলাম, অপেক্ষা করব, পারলাম না। বেশ জ্বর বোধ করছি, দেখা করিস।"

উপরে এসে জিজ্ঞাসা করল—পরাগ কখন এসেছিল ?

—ওমা জানি না ত, এসেছিলেন বুঝি, খবর দেন নি তো। চিঠিটা দেখাল শুভেন্দু। তাই বোধ হয় দাঁড়ায় নি, লিখে রেখে চলে গেছে।

শুভেন্দু দেখে এল পরাগকে। বেশ জ্বর, ক'দিনের যাতায়াতে অসুস্থ হয়েছে বেশী, পেটে একটা ব্যথা। দু'দিন দেখে এসে বলল, অসুখটা ভোগাবে পরাগকে। তুমি ওর খবরের জন্য ব্যস্ত থাক বলায় খুব খুশী। অসুখটা সত্যিই জটিল। জ্বরও ছাড়ছে না, ব্যথাও কমছে না। সেদিন শুভেন্দু বলল, পরাগকে দেখতে যাবে। চল না, ভারি খুশী হবে তুমি গেলে।

—আমি ?

—দোষ কি, আজই বিকেলে, কেমন।

হাসিকে দেখে, অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পরাগ। দিদির বাড়ীতে থাকে সে। দিদিকে ডেকে চা খাবার দিতে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। শুভেন্দু মাঝে মাঝে বিমানকে ডেকে আনে, মানে গাড়ী নিয়ে গিয়ে ধরে আনে। সেদিনও হাসিকে রেখে বিমানকে নিয়ে এল। কয়েক ঘণ্টা বেশ কাটল গল্প করে। হাসি দেখল, বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে পরাগ, কিন্তু তার উজ্জ্বল বড় বড় চোখ যেন দপদপ করছে তবু। এর পর, পর পর দু'দিন গিয়েছে হাসি। তিন দিনের দিন, মহামায়ার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে অজুহাতে গেল না আর।

কেমন যেন লাগে তার। পরাগ তাকে কিছু বলে না, তবু লাল হয়ে যায় তার মুখ। হাসির দিকে চাইতে যাওয়া চোখ, জোর করে ফেরায় শুভেন্দুর দিকে। শুভেন্দু সব বোঝে, তবু—হাসির সব রাগ গিয়ে পড়ে তার উপর। ওর জন্যেই তো সাহস পায় পরাগ, "অসভ্য"—ভাবতে গিয়েই নিজের অন্যায় বুঝতে পারে। ছিঃ ছিঃ এ কি ভাবছে সে ! কি ভদ্র, কি সংযত, তাও তো হাসির অজানা নয় ! হাসি ঠিক করল, আর যাবে না সে, দূরে থাকাই ভাল। ভুল ভেঙে যাবে ভদ্রলোকের। ছেলের কথা, নানা ছুতো করেই হাসি গেল না আর। একটু ভাল আছে পরাগ। প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে, হাসি এল না কেন। ছেলের কথা ছুতো, মহামায়াই আছেন—মাণিক, সোনা, কনক, কনকেন্দুকে নিয়ে। সেদিন জোর করেই হাসিকে নিয়ে গেল শুভেন্দু। তার পর ওকে রেখে গেল বিমানকে আনতে। হাসি ভেতরে যাচ্ছিল, পরাগ

বলল, আপনি এখানেই বসুন, আমি দিদিকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আজকাল পরাগ ভাল আছে একটু। দিদি তখন পরাগের জন্য পথ্য তৈরি করছিলেন। আসতে একটু দেরি হবে, বলে পাঠালেন।

হাসিই কথা তোলে—আপনি এখন বেশ ভাল আছেন?

—হাঁ, ব্যথাটা প্রায় নেই, তবে শেষ রাতে জ্বরটা আসে।

—জ্বর এখন আছে নাকি?

—না এখন নেই।

—আপনি বেশ রোগা হয়ে গেছেন।

—তা হোক, তবু এ রোগের আমার প্রয়োজন ছিল।

হাসি ভেতরে যাওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে ওঠে।

—একটু বসুন।

—অদ্ভুত মিনতি-জড়ানো চোখ, হাসিকে বসতেই হ'ল।

প্রয়োজন ছিল বলেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমার দিক থেকে এইটুকুই রইল যে, "আপনি এসেছিলেন আমায় দেখতে" আর কিছুই বলার নেই। আপনি এসেছিলেন, এই যথেষ্ট।

—পরাগবাবু, আপনি অসুস্থ।

—সেটা দেহে, মনে সম্পূর্ণ সুস্থ। এইবার সেরে উঠেই আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কেন? প্রশ্ন করে হাসি।

—তা আমি বলতে পারব না।

—আপনি না বললেও আমি জানি। বেশ উদ্ধতভাবে বলে, আরও কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়—এ রকম কণ্ঠস্বর, হাসি জীবনে শোনে নি, মুখ বন্ধ হয়ে যায় তার আপনা থেকে।

—আপনি শুভেন্দুর স্ত্রী, প্রত্যেক দিন নিজের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার যে গ্লানি তার জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। তবু আজ মনে হচ্ছে, আপনি যদি একটু এগিয়ে এসে কান পেতে শুনতেন ত অনুভব করতে পারতেন—কার নাম, ওঠা-নামা করছে—রক্তের সঙ্গে বুকের মধ্যে। আমি শুভেন্দুর মত সবল নই। আমি জানি, কত দুর্বল আমি। এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাব আমি। বোম্বাইয়ে একটা চাকরি পেয়েছি।

মুখের সমস্ত কঠোর কথাগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। হাসিও কি দুর্বল হয়ে গেল? উদ্ধত চোখ নামিয়ে আনল, পরাগের শান্ত চোখের উপর আরও শান্তভাবে। হাসির আলগা ভাবে ঝোলানো হাত দুটির দিকে একবার হাত বাড়াল পরাগ, একটি বারের জন্য নিজের হাতে নিতে। পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করে ফিরিয়ে নিল নিজের হাতকেই। হাসি সামনের জানালার দিকে সরে গেল।

হাসি আর কিছু:তেই যায় নি। পরাগের খবরও জিজ্ঞাসা করে নি। শুভেন্দু বুঝতে পেরেছে, খবর ও জানতে চায়। কিন্তু কেন এই সঙ্কোচ, হাসিকে না জিজ্ঞাসা করে মনে মনে প্রশ্ন করেছে নিজেকে।

হাসি কি নিজেকে জানে না, হাসি কি শুভেন্দুকে বোঝে না। না জানুক সে, নিজেকে জানে শুভেন্দু, হাসিকে বোঝে। এর মধ্যে তিন দিন পার হয়ে গেল।

রাত্রিতে কথা হচ্ছে শুয়ে শুয়ে—পরাগ পরশু চলে যাচ্ছে।

—তাই বুঝি। আস্তে বলে হাসি।

—কেন, ও তোমায় বলে নি।

ঢোক গিলে, কোনরকমে বলে হাসি—না—না তো, বলেন নি তো।

একটু চুপ দু'জনেই।

—ও তোমায় ভালবাসে, এটা সত্যি।

হাসি চুপ, স্থির। না রাগ না কৌতুক।

একটু মৌন হয়ে যায় শুভেন্দুও—"হীরেপান্না"।

শুভেন্দুর এ ডাকেও নির্বাক হাসি।

—কি ভাবছ।

—কিছু না। কোনমতে বলে হাসি।

—যাই ভাব, আমি জানি, এখন যদি কান পেতে শুনি তা হলে উপরকার ঢেউয়ে যে শব্দই বাজুক না কেন, বুকের অতলে শুনতে পাব আমারই শুভ-ইন্দু নাম।

রোমাঞ্চিত হ'ল হাসি। সজোরে আঁকড়ে ধরল শুভেন্দুর বলিষ্ঠ বাহু, কিন্তু তাকে টেনে আনতে পারল না নায় শোনাবার জন্যে।

শুভেন্দুই টেনে নিল হাসিকে—চল হাসি, বেচারি পরশু চলে যাবে, কাল দেখা করে আসি।

—না।

—দোষ কি হাসি।

—দোষ নয়, আমি যাব না।

—না, তা নয়, ভাবছ যেতে পারবে না। আরও কাছে টেনে নিয়ে বলে, তোমায় সবাই বলে অজন্তার ছবি। সে ছবি আছে পাহাড়ের বুকের মধ্যে। তাকে দেখে লোকে মুগ্ধ হবে এ ত পাহাড়ের আনন্দ। একটা সত্যের জন্যে যদি তোমার মনে বেদনা জেগে থাকে, সে তো তোমার মহত্ব। যা তোমার মনে এসেছে, তা ক্ষণিকের আলোড়ন মাত্র। মিথ্যার সন্দেহ। আমি পাশে থাকতে ভয় কি হাসি।

আবার কি হ'ল হাসির? কিসের সঙ্কোচ, কিসের দ্বিধা. শুভেন্দু থাকতে। অজন্তার ছবি লুটিয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে। নিজের লজ্জায় মুখ লুকাল পরমাত্মীয়ের বুকে।

সহজ, মুক্ত হাসি দেখতে গেল পরাগকে।

—সত্যি চলে যাচ্ছেন আপনি? থাকুন না এখানে।

—তা হয় না।

—কেন হয় না, আমাদের মত বন্ধু ফেলে যাবেন আপনি।

পরাগের মনে হচ্ছিল—ঠিক শুভেন্দুর মত করে কথা কি ভাবে বলছে হাসি।

—ও চাকরি ছেড়ে দে, কোথায় যাবি, ছবি আঁক এখানে বসে।

আবার নিজের পরিহাসসূচক ভঙ্গিমায় শুভেন্দু বলে ওঠে—পরাগ, শিল্পীমনের আবেগ অজস্রায় ছবিকে ক্ষয় করে না, অক্ষয়তাই দান করে।

নিমেষে যেন পরাগের সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল। পরিহাসের আড়ালে কঠিন শুভেন্দুকে সে চেনে, কিন্তু তার এরূপ আলোর মত উদার, এ শুভেন্দু···

—শুভেন্দুর উচ্চ হাসির মধ্যে মিলিয়ে গেল পরাগের নির্মল হাসি। হাসি এসে দাঁড়াল শুভেন্দুর পাশ ঘেঁষে।

সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ

শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা হইতে মাত্র ছাব্বিশ মাইল দূরে ভাগীরথী তীরে হালিশহর নামক অতি প্রাচীন গ্রামটি অবস্থিত। হাবেলীশহর (যাহা হইতে হালিশহর নামের উৎপত্তি) একটি পরগণার নাম। পূর্ব্বে ইহা নদীয়ার রাজবংশের অন্তর্গত ছিল। এই পরগণার কেন্দ্রস্থল ছিল কুমারহট্ট। কুমারহট্ট কালক্রমে পরগণার নামে হালিশহর বলিয়া পরিচিত হয়। এই গ্রামের শিবের গলি নামক পল্লীতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। তাঁহার দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমার গর্ভে নিধিরাম নামে এক পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর গর্ভে প্রসাদের সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী অম্বিকা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভবানী দেবীর জন্ম হয়। তৎপর রামপ্রসাদ এবং তদনুজ বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের আদিপুরুষ রাজা শ্রীহর্ষ সেন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তদানীন্তন নবাব ফকিরুদ্দিন শাহের বেগমের দুরারোগ্য মৃতবৎসা রোগ নিরাময় করিয়া তিনি সেনভূম প্রদেশের জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ধন্বন্তরী গোত্রের কুলীন বৈদ্য ছিলেন। রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশাবলী এইরূপ—শ্রীহর্ষ সেন—বিমল—বিনায়ক—রোষ—নারায়ণ—সাও—সরণি—কৃত্তিবাস—রত্নাকর—নিত্যানন্দ—জগন্নাথ—যদুনন্দন—রঞ্জন—রাজীবলোচন—জয়কৃষ্ণ—রামেশ্বর—রামরাম—রামপ্রসাদ।

রাজা শ্রীহর্ষ সেন হইতে রামপ্রসাদের প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ তিন শতাধিক বৎসরের মধ্যে এই বংশ ক্রমশঃ বেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জয়কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হালিশহরের জগদীশ দাসের সহিত বিবাহ দেন। সম্ভবতঃ জগদীশ পরলোকগত হওয়ার পর শ্যালক রামেশ্বরের অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য তিনি তাঁহাকে হালিশহরে আনাইয়া বসবাস করান। তিনি এখানে আসার পর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রামপ্রসাদের পিতা 'মহাকবি গুণধাম' রামরাম বিষয়কর্ম্ম কিছু করিতেন না। পণ্ডিত-অধ্যুষিত গ্রাম হালিশহরে বহু টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল যেখানে সংস্কৃত ভাষার রীতিমত চর্চ্চা হইত।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে রামপ্রসাদ স্থানীয় এক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুত্রের জাতীয় ব্যবসায় কবিরাজী করিবার ইচ্ছা নাই জানিতে পারিয়া তৎকালীন অর্থকরী বিদ্যা পারস্য ভাষা শিখিবার জন্য এক মৌলবীর নিকট পাঠান। অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তি থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ফার্সী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদকে চাকুরির চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতে হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এক জমিদারের অধীনে একটি মুহুরীর পদ লাভ করেন। এই জমিদারটি কে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে, কেহ বা বলেন গরাণহাটার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে, আবার কেহ-বা বলেন বাগবাজারে দেওয়ান গোকুল মিত্রের নিকট রামপ্রসাদ কাজ করিতেন।

মুহুরীর জমাখরচের হিসাব রাখা কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না। প্রতিদিন কার্য্যশেষে খাতার খালি স্থানগুলিতে দেবতাদের নাম ও স্বরচিত সঙ্গীত লিখিয়া রাখিতেন। মনিবের কার্য্যাধ্যক্ষ এই সব দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কর্ত্তার নিকট গিয়া তাঁহাকে কার্য্যচ্যুত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ধর্ম্মপ্রবণ ভাবুক গৃহস্বামী—

আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নেমকহারাম নই মা শঙ্করী

এই গানটি খাতায় লিখিত দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং রামপ্রসাদ যে সামান্য ব্যক্তি নহেন এবং তুচ্ছ মুহুরীগিরি যে তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য নহে তাহা বুঝিলেন। প্রসাদকে ডাকাইয়া এই মুহুরীগিরি কাজে জীবন নষ্ট না করিয়া ব্রহ্মময়ীর চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে বলিলেন এবং আজীবন মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু পোষ্যবর্গ অধিক হওয়ায় ঐ স্বল্প বৃত্তির দ্বারা কোন রকমেই স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। সেজন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত তাগিদ দিত, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, শুদ্ধ শক্তিভক্তি সার করিয়া ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতের দ্বারা মাকে স্মরণ করিয়া বলিতেন—

যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জন নাই, আমায় দেখে সবাই রোষে।

সেকালের সামাজিক রীতি অনুসারে অতি অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ১৭ ১৮ বৎসর বয়সের সময় ভাজনঘাট-বাসী লোকনাথ দাশগুপ্তের কন্যা যশোদা (মতান্তরে সর্ব্বাণী) দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মা জগদম্বা একদিন পুণ্যবতী সতীসাধ্বীকে স্বপ্ন বলিলেন—'তোমার স্বামীকে রামকৃষ্ণ মণ্ডপের সিদ্ধপীঠে সাধন করিতে বল, তাহা হইলে আমি দেখা দিব।' পত্নীর প্রতি মায়ের এই প্রত্যাদেশে প্রসাদের যেমন আনন্দ হইয়াছিল তেমনি আবার অভিমানও হইয়াছিল। তাহার পরিচয় আমরা এই গানটিতে পাই—

বল দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে। ইত্যাদি

হালিশহরের সাবর্ণ চৌধুরীদের রামকৃষ্ণ রায় সন্ন্যাসীভাবাপন্ন কঠোর তন্ত্রসাধক ছিলেন এবং তিনিই এই সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা অতি গুরুতর কর্ম্ম। পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়া সেই স্থানে লক্ষ বলি, কোটিবার হোম ও কোটিবার মহাবিদ্যার নাম জপ হইলে সেই স্থান সিদ্ধপীঠে পরিণত হয়। রামকৃষ্ণ রায় উপরোক্তরূপে সিদ্ধপীঠ স্থাপন করিয়া ঐ স্থানে সাধন করিতেন। পরে রামকৃষ্ণ রায়ের কোন উত্তরাধিকারী রামপ্রসাদকে উক্ত সাধনপীঠ সহিত ৮/০ বিঘা জমিও দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ, এই সিদ্ধপীঠেই সাধন করিয়া রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

যাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র। রামপ্রসাদের তাহাই ছিল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ গৃহীর জীবনযাপন করিয়াও কিরূপ নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করা উচিত তাহা প্রসাদ দেখাইয়া গিয়াছেন। পোষ্যদের প্রতিপালন-জন্য তাঁহাকে বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কখনও ব্রহ্মময়ীকে ভোলেন নাই। মনিবের খাতায় টাকা জমার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মধনসঞ্চয়ের কথাও তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। আমরা যখন বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি তখন কেবল পার্থিব প্রভুর মনস্তুষ্টির দিকেই লক্ষ্য রাখি, ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করি না। এখানেই আমাদের হীনতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়।

রামপ্রসাদের গানের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, লোকের মুখে মুখে বঙ্গের প্রায় পল্লী, নগরে, সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট এবং আসাম অঞ্চলেও তাহা প্রচারিত হইয়াছিল। এইভাবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও লোকমুখে তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হালিশহরে জমিদারী কার্য্যাদির তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহার একটি কাছারিবাড়ী ছিল, আর ছিল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর কারুকার্য্যখচিত দেবালয় এবং সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ। তিনি সময় সময় রামপ্রসাদকে আনাইয়া তাঁহার নিজমুখের সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

রামপ্রসাদ অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। কোন দিন কোন অতিথি তাঁহার গৃহ হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। নিজের আত্মা-স্ত্রী-পুত্রের আহার হোক বা না হোক সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, যে ভাবে হোক অতিথিসেবা করা গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিয়া তিনি তাহাদের সাধ্যমত সৎকার করিতেন। এজন্য তিনি জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেন—

গৃহধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম যদি দু'জন অতিথি আসে,
দু'জনের উপর তিন জন এলে হয় না যেন মুখ লুকাইতে।

রামপ্রসাদ কোন কোন গানে নিজকে "দ্বিজ প্রসাদ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উপবীতধারী বলিয়া এই পরিচয় তিনি দিতেই পারেন, কিন্তু রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী নামে আরও দুই জন ছিলেন যাঁহারা কবিরঞ্জনের অনুকরণে গান রচনা করিতেন এবং দ্বিজ রামপ্রসাদ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হালিশহরের সাধক-কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল। তাঁহার রামমোহন নামেও একটি পুত্র হইয়াছিল। এই রামমোহনের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া রামপ্রসাদের বংশের নাম রক্ষা করিতেছেন। রামপ্রসাদ তাঁহার লেখার মধ্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ বোধ হয় "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" রচিত হওয়ার পরে রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে কবিরঞ্জন-জায়া অন্তঃসত্ত্বা হইলে পল্লী-কবি আজু গোসাই বলিয়াছিলেন—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুটি।"

কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পর রামপ্রসাদের—"এ সংসার ধোঁকার টাটি" এই সঙ্গীতটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রামপ্রসাদের সাধনা ছিল ভক্তিমূলক। তাঁহার মন্ত্র ছিল গান। তাই তিনি গাহিতেন—"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।" সংসারচিন্তা আবার যখন তাঁহাকে আস্থর করিয়া তুলিত, ইষ্টচিন্তা ভুলাইয়া দিত তিনি মনকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন—

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।

অল্পবয়সে রামপ্রসাদ কুলগুরু মাধবাচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা ছিলেন তখনকার বিখ্যাত প্রগাঢ় পণ্ডিত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

রামপ্রসাদ ছিলেন মায়ের ছেলের দুলাল। সেজন্য মায়ের উপর তাঁহার যত জোর ছিল এত জোর আর কাহারও উপর ছিল না।

মাকে কখন আদর, কখনও আবদার, কখনও বা অভিমান. কখনও আবার তীব্র শ্লেষ করিয়া বলিতেন—

মা হওয়া কি মুখের কথা
এখন ক্ষুধার বেলা শুধালে না—
এল পুত্র গেল কোথা।

অভিমানে বলিতেন—

মা মা বলে আর ডাকব না
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা ধর এলোকেশী,
(না হয়) ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাবো,
মা বলে আর কোলে যাব না।

আবার কখন তীব্র ভাষায় গালি দিয়া গাহিতেন—

বড়াই করো কিসে মাগো।
জানি তোমার আদিমূল বড়াই করো কিসে।
*   *   *
মাগী মিন্সে ঝগড়া করে রইতে নারে বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে ফিরে দেশে দেশে।

তেমনি আবার মার উপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরিচয়ও পাই এই গানে :

তিলেক দাঁড়া ওরে, শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি,
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, আসেন কিনা আসেন দেখি।

রামপ্রসাদ জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বলিতেন—"কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কোথা পাবে তার বাড়া"—কিন্তু তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে 'কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনও ত'—অতএব মা দয়া করিবেনই এবং কর্ম্মবন্ধনও কাটিবেন। তিনি অন্তরে, বাহিরে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুতে পরমাণুতে পর্যন্ত মাকে দেখিতেন এবং সেজন্য গাহিয়াছিলেন :

মন তোমার কি ভ্রম গেল না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তা জান না।

রামপ্রসাদ তাঁহার নিজের গানের মধ্যে অমর হইয়া থাকিলেও তাঁহার স্বগ্রামবাসীরা পর্য্যন্ত বহুদিন যাবৎ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় রামপ্রসাদের বংশধরেরাও যে তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বা এখনও করেন তা মনে হয় না। রামপ্রসাদ ধনবান ছিলেন না, তাঁহার পুত্রদ্বয় রামদুলাল ও রামমোহনের আর্থিক অবস্থা হয় ত ভাল ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরেরা পরে অর্থবান হইয়াছিলেন। প্রথম পুত্র রামদুলাল তিনপুরুষ পরে বংশহীন হন। কনিষ্ঠ রামমোহনের দুই বিবাহ। উভয় স্ত্রী-জাত বংশধরেরাই বিত্তমান ও বিত্তবান। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পৌত্র গোপালকৃষ্ণ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকুরি পান এবং হালিশহর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে বাস করিতে থাকেন। ১৮৯৫ সনের ২০শে এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র কালীপদ সেন ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। ১৯১৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। কালীপদ সেনের প্রথম পুত্র চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় ওকালতী করিতেন। দ্বিতীয় পুত্র মানসরঞ্জন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং অবসরগ্রহণের পর কলিকাতায় সত্যেন দত্ত রোডে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ১৯৫২ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। কালীপদবাবুর তৃতীয় পুত্র হৃদয়রঞ্জন বরিশালে বি-আই-এস-এন কোম্পানীর ডাক্তার ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র আশারঞ্জন সরকারী আপিসে ষ্টেনোগ্রাফারের কার্য্য করিতেন। এখন অবসরগ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন। মানসরঞ্জনের পুত্রেরাও সকলেই অবস্থাপন্ন ও কলিকাতাবাসী। অপর পক্ষে রামমোহনের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান দুর্গাদাস সেনের বংশধরেরাও কলিকাতার অধিবাসী। যে কারণে মানব-শিশু পিতামাতাকে নিতান্ত আপন বলিয়া ভাবে সেই কারণেই মানুষ জন্মস্থান ও বাস্তুভিটাকে পরমবাঞ্ছি বলিয়া মনে করে এবং তেল, নুন ও লকড়ির হিসাবে লোকসান সহ্য করিয়াও পিতামাতা ও জন্মভূমি তথা বাস্তুভিটার বন্ধন রক্ষা করিতে চায়। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশ যাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে কেহ রামপ্রসাদের বংশধর বলিয়া গৌরব অনুভব করেন এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। গোপালকৃষ্ণ সেনের জীবদ্দশার মধ্যে ১৮৮৫ সন হইতে রামপ্রসাদের স্মৃতিতে তাঁহার ভিটায় প্রতি বৎসর সাধারণের চেষ্টায় যে কালীপূজা হয় তাহাতে এক আশারঞ্জন ভিন্ন স্মরণকালের মধ্যে আর কাহাকেও যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে গোপালকৃষ্ণ হালিশহর ত্যাগের পর প্রসাদের ভদ্রাসন ও পঞ্চমুণ্ডী আসনসংলগ্ন সমগ্র ভূভাগ তাঁহার তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ ও শৃগাল-সর্পের আবাসভূমিতে পরিণত হয়, প্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত কেবল গান ও কিংবদন্তীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। পরে সেই ভদ্রাসন হালিশহরের "হিতৈষিণী সভা" উদ্ধার করিয়া রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করেন। গোপালকৃষ্ণ তাঁহার এই বাস্তুভিটা এই "হিতৈষিণী সভা"কে দান করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায় যেমন, গাব গাছে পদ্মফুল ফোটা, কন্যারূপে ব্রহ্মময়ীর রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা, রামপ্রসাদের বাড়ীতে কাশীর অন্নপূর্ণার আগমন ও তাঁহার দেয়ালে নাম লিখন, হালিশহর হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় আসার সময় চিৎপুরের চিত্তেশ্বরীর মূর্ত্তির তাঁহার গান শুনিয়া মন্দির-সহিত দক্ষিণ মুখ হইতে পশ্চিম মুখে ঘুরিয়া যাওয়া অনেকেই জানেন—বাহুল্য ভয়ে সেগুলি আর বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিলাম না।

ষাট বৎসর বয়সের কিছু পরেই (কোন পৌত্রের মতে শতাধিক

বর্ষ) প্রসাদ ইহধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। তিনি শ্যামাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় আত্মীয়স্বজন ও পল্লীবাসীদের বলেন, "আজই মায়ের বিসর্জ্জনের সহিত আমার বিসর্জ্জন হইবে, সুতরাং তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে এস। আমি পদব্রজে চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি গান করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে আসেন এবং গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান হইয়া গান করিবার সময় তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যায়। যে কয়টি গান তিনি গাহিয়াছিলেন তাহার শেষ গানটির শেষ লাইন—"মা গো ও মা, আমার দফা, হ'ল রফা, দক্ষিণা হয়েছে।" "দক্ষিণা হয়েছে" এই বাক্য উচ্চারণমাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল এবং তিনি মহামায়ের ক্রোড়ে চির-আশ্রয় লইলেন। প্রসাদের মৃত্যুসংবাদে হালিশহরের ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। তাঁহার তিরোধানে মর্ত্ত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন অপসারিত হইল।

তাঁহার সাধ্বী পত্নী রামপ্রসাদের বৃদ্ধ বয়সে অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও মতদ্বৈধ আছে।

প্রাণের উন্মেষ

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ বিশ্বের অন্যতম প্রহেলিকা। প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। লুই পাস্তুর শূন্য বোতল জলপূর্ণ করে তার মুখ এঁটে দিয়ে দেখালেন যে, প্রাণ ব্যতীত প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব। তা হলে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হ'ল কি করে ?

কেউ কেউ বলেন, অপ্রাণ থেকে প্রাণের বিকাশ হয় নি, অজৈব রাজ্য অপরিবর্ত্তনশীল ; জীবজগতে বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সম্ভাবনাময়। প্রাণের মূল নিদান অন্যত্র। ধরণীতে প্রাণকোষ এসেছে সুদূর তারকা বা গ্রহ থেকে কিংবা বিশ্বজগতের অপর কোন স্থান থেকে। ধারণা করা মুশকিল, প্রাণ-কণিকা পৃথিবীর বাহির হতে এসে পৌঁছল কোন পথে ; নিকটতম তারার দূরত্বও যে ৪·৩ আলোকবর্ষ। আলোকের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল, এক বর্ষে এই সংখ্যার আকার বিপুল। আরিনস, লর্ড কেলভিন, হেলমহোলজ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মত এই যে, প্রাণকোষ উল্কাপিণ্ড বাহনে আরোহণ করে উপস্থিত হয়েছিল আদিম পৃথিবীতে। কিন্তু এ অসম্ভব, উল্কাপৃষ্ঠের প্রচণ্ড উত্তাপ, গতিপথের নিরাবরণ শূন্যতা এসব প্রাণ-দৌত্যের সহায়ক নয় বিন্দুমাত্র। তা ছাড়া প্রাণ বাইরের আমদানী বললেই সমস্যার সমাধান হয় না—সেখানে প্রাণ এল কোথা থেকে ? কেউ কেউ বলেন যে, জীবজড়ের সমকালীন অর্থাৎ পৃথিবীর উপরটা যখন জলন্ত অগ্নিকুণ্ড ছিল, প্রাণের অস্তিত্ব তখন থেকেই। এর সপক্ষে প্রমাণের একান্ত অভাব। পণ্ডিতমহলে এ বিষয় নিয়ে মতান্তর রয়েছে বিস্তর, কোন মীমাংসা হয় নি। উইলসন প্রখ্যাত কোষতত্ত্ববিদ্। সারাজীবন কোষ সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি জীব ও জড় রাজ্যের ভিতর কোন সেতুর সন্ধান পান নি। তবে এ জগতেই যে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে তা মেনে নেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। জীব ও জড়জগতে ব্যবধান অধিক বটে, কিন্তু প্রাণ বাইরের আমদানী একথা বলা হয়ত অযৌক্তিক। প্রাণের উন্মেষ এক দিনে হয় নি, লক্ষ কোটি বৎসর ধরে তার জন্য প্রয়াস চলে। শেষে এক শুভ মুহূর্ত্তে এই প্রয়াস সফল হয়েছে।

চাঁদকে আপন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বসুন্ধরা স্থির শীতল জমাট হয়ে আসতে লাগল। হাল্কা বস্তুগুলি সব পড়ে ওপরেই থেকে গেল, অন্তস্থলে চলে গেল ভারী ভারী খনিজগুলি। আর্দ্র ও উষ্ণ বাষ্পভাগ তখন আদিম পৃথিবীর নভোমণ্ডল ঘিরে, সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘসমুদ্রকে ভেদ করে সূর্য্যরশ্মি এখানে এসে পৌঁছত কিনা সন্দেহ। বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল অবিরলধারায়। আজকের সাগর মহাসাগর সেই আদিম বৃষ্টির জলরাশি।

স্থলভাগ তখনও দেখা দেয় নি, সূর্য্যের অতি-বেগুনী রশ্মিজাল দিনের পর দিন অকৃপণভাবে জড় পরমাণুর ওপর আপন আলো ঢেলে দিয়ে প্রাণ-সঞ্চারের প্রয়াস করছিল, এই ভাবে প্রাণের অভ্যুদয় হ'ল। জীব জড়েরই শিশু—তার থেকে জাত। জড় তার সমস্ত সত্তার নির্য্যাস দিয়ে পরমাণুকে প্রাণময় কোষে পরিণত করেছিল। কিন্তু সে মাহেন্দ্রক্ষণ আর ফিরল না। সূর্য্যের কিরণ আজও পড়ে উষ্ণমণ্ডলের কাদামাটি ঘোলাজলে, প্রাণের উন্মেষ হয় না।

আদি প্রাণ

আদি প্রাণের সাক্ষাৎ বংশধর আজও বেঁচে আছে—ভাইরাস। ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে ক্ষুদ্র এই প্রাণীর অস্তিত্ব সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে ধরা পড়ে না, ব্যাকটিরিয়ার ন্যায় খাদ্যদ্রব্যের চারিদিকে এসে জমাও হয় না। গবেষণাগারে এদের উৎপাদন বা বৃদ্ধি করতে পারা যায় নি। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক অণুবীক্ষণযন্ত্রে গৃহীত ছবিতে জানা যায় এদের অস্তিত্ব, শুধু রোগ-লক্ষণ মিলিয়ে স্বরূপ উপলব্ধি হয় ; হাম-বসন্ত, সর্দ্দি-কাশি, হাঁপি, মহামারী, ইনফ্লুয়েঞ্জা, রিকেট

ইত্যাদির মূল অদৃশ্য ভাইরাসের কর্মচাঞ্চল্য। আদিম প্রাণ-কণা যে এইরূপ সূক্ষ্ম দেহধারী জীব তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত তারা আধুনিক ব্যাকটিরিয়ার মত সবুজহীন ছিল (অর্থাৎ ক্লোরফিলশূন্য)। বাতাস ও লবণাক্ত জলে প্রাণধারণ করত কিংবা প্রথম থেকেই জীবিতাংশ প্রোটোপ্লাজমযুক্ত দেহ অথবা প্রোটোপ্লাজমকণিকার জীব কিছু বাঁচত, কিছু মরে আহারের সংস্থান করে দিত জীবিতদের।

আদি প্রাণ দেহপুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন ও কার্বন গ্রহণ করতে লাগল আর ফিরিয়ে দিতে লাগল অক্সিজেন, গতিশীল জীবনের পাথেয়। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল, বাতাস নির্মল অক্সিজেনে ভরে উঠল, খুলে গেল অগ্রগতির রুদ্ধদ্বার—জীবজীবনের উপযুক্ত আহার পেয়ে প্রবাহিত হ'ল সাবলীল প্রাণধারা—হয়ত ভাইরাস অপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবকোষে—যার কোন চিহ্নই আজ পাওয়া সম্ভব নয়। (ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া এদের পরিণত অবস্থা—সে যুগের প্রাণ-লীলার পরিচয় বহন করে এনেছে। অনুমিত হয় যে, প্রথম প্রাণী-দেহে নিউক্লিয়াস আর কোষের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না, আলোক-তরঙ্গকণিকার চেয়ে ছোট এই প্রাণ পৃথিবীর আদি প্রাণের প্রকাশ। একাধিক কোষের সমন্বয় জীবের উন্নতির পরিচায়ক। তার পর এল সংঘবদ্ধতা। শ্রম বিভাগ করে দিয়ে সুবিধা হয়েছিল নিশ্চয়ই, নচেৎ জীবজীবন দ্রুতগতিতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হ'ত না। এককোষ-প্রাণী এবং এই সকল জীবের মধ্যবর্তী স্তরের বংশধরেরা আজও বিদ্যমান। এদের নাম ভলভক্স, ক্লথেমনিয়াম, মেরিস্মোডিয়াম।

দ্বিধাবিভক্তি

প্রাণবিকাশের ঊষাকালে জীব ও উদ্ভিদে কোন পার্থক্য ছিল না। কোন্ স্মরণাতীত যুগে প্রাণীজগৎ উদ্ভিদ-জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন পথে যাত্রা করেছিল জানি না, তবে তাতে উভয় পক্ষেরই উন্নতির সোপান প্রশস্ত হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে পৃথিবীর রূপ সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে। এ সম্বন্ধ উত্তরোত্তর একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কি কি গুণ গাছপালার আছে অথচ প্রাণীদের নেই অথবা গাছপালায় এমন কোন বিষয়ের অভাব যা জীবজগতে কোন-না-কোন রূপে বর্ত্তমান, তার হদিস মেলা ভার। গতিশীলতা জীবজগতের যেটেই একচেটে গুণ নয়। উদ্ভিদজগতের সামুদ্রিক এনিমন দুই-এক ইঞ্চি করে আস্তে আস্তে বেশ চলতে পারে, পাহাড়-পর্ব্বতের গায় আটকে না যাওয়া অবধি বিশ্রাম নেয় না। তার পর আমির ভোজন। কীটভুক লতারা নির্ব্বিচারে কীটপতঙ্গ শিকার করে—ভেনাস-ফ্লাই-ট্রাপ, সানডিউ ইত্যাদিকে মাংসাশী বলা চলে। পিচুঁকিলা, ডায়োনা, ড্রস এরান-বদনে পাতা-কেশড়া দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ চেপে ধরে তাদের নাইট্রোজেন নির্য্যাস নিঃশেষে গ্রাস করে নেয়। অপরপক্ষে চলৎশক্তি-হীন প্রাণী আছে অনেক; গভীর সমুদ্রের নিভৃত তলদেশের প্রাণীরা প্রায় নিথর নিষ্পন্দ।

জীববিদ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পৃথক সংজ্ঞানির্দ্দেশে অসুবিধা হলেও নিশ্চিত প্রভেদ অনেক, আদি প্রাণ হতে ক্রমশঃ দূরাপসরণশীল এরা। প্রসারণ-প্রবণতা প্রাণধর্ম্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে প্রভাবে জীবজগৎ দুই স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত হয়েছে। পথের পার্থক্য দেহের সম্বন্ধকে সহজে বিসর্জ্জন দিতে পারে নি, তাই ঘনিষ্ঠতা এদের আজও অটুট; উদ্ভিদ বাতাস হতে আহরণ করে কার্ব্বন ও অক্সিজেন, মৃত্তিকা যোগায় জীবনধারণোপযোগী খনিজ, উদ্ভিদ-মূল তরলীকৃত খনিজ ধীরে ধীরে দেহসংলগ্ন করে। সবুজ পাতার নীচে সূর্য্যালোকে চলতে থাকে অজৈব-জৈব রূপান্তর, ক্লোরোফিল। এই আলোকসংশ্লেষণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চর্ব্বি ও শর্করার ন্যায় অপরিহার্য্য জৈববস্তুর উদ্ভব হয়। প্রাণীরা ক্লোরোফিল-বিরহিত, অজৈব খনিজ হতে দেহধারণোপযোগী জৈবদ্রব্য প্রস্তুত করবার ক্ষমতা তাদের নেই, যেমন নেই উদ্ভিদজাতীয় ব্যাকটিরিয়া ও ছত্রাক দেহে।

সরাসরি প্রকৃতি থেকে আহার্য্য আহরণ করতে না-পারার অক্ষমতা প্রাণীকুলকে পথচারী করেছে, খাদ্যের সন্ধানে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয় অহরহ, নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা চলে না। ভূমি-তলে বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন যথেষ্ট, বৃক্ষলতার ছুটাছুটির প্রয়োজন নেই, নিষ্ক্রিয় স্থির হয়ে বসে থাকলেও নির্ভাবনায় ভরণ-পোষণ চলে। ওদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক-কোষের এমিবাটিও তার শুঁড় বিস্তার করে সদাই জৈবসামগ্রীর সন্ধানে তৎপর, উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত যদি কিছু পাওয়া যায়। প্রথম যুগ থেকেই এর সূত্রপাত। প্রাণী-বীজের চারিপাশ ঢাকা অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দিয়ে, কিন্তু উদ্ভিদবীজের অঙ্গে কঠিন আবরণ, ক্ষুদ্র প্রাণী-প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করে পাতলা ত্বক অথচ উদ্ভিদ-প্রোটোপ্লাজমের চতুর্দ্দিকে কৌশিক ঝিল্লি। মনে হয় খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গীণ নিশ্চেষ্টতার দুরতিক্রম্য পরিবেশ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, ফলে সমস্ত উদ্ভিদজগৎ নিশ্চেষ্টতায় সমাচ্ছন্ন। শ্রমবিমুখ জড়ত্ব আচ্ছন্ন করে রেখেছে এদের স্মরণাতীত কাল থেকে, তাই জৈব অভিব্যক্তি-ধারা বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি, প্রাণীজগতের তুলনায় এরা অনগ্রসর, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি-সঞ্জাত নব নব রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে নি উদ্ভিদ-জগতে। উদ্যোগ ও সক্রিয়তার সঙ্গে সংবিতের (চৈতন্য) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, একটির অভাব ঘটলে অপরটি অধিকক্ষণ বর্ত্তমান থাকতে পারে না। উদ্ভিদ-জগতে তাই ঘটেছে লক্ষ লক্ষ শতাব্দীব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিস্পৃহতায় সমস্ত উদ্বেগ। পরগাছা পরজীবীদের নাড়ীতন্ত্র কয়েক কল্প (বংশ) পরে অদৃশ্য হয়। প্রশ্ন উঠবে যে প্রথম অবস্থাতেই উদ্ভিদ-জগৎ ও প্রাণীজগৎ পৃথক পৃথক আবির্ভূত হয়েছিল কিনা। এরা জন্মকালে অর্থাৎ জীবজীবনের আদিযুগে যে মূলতঃ এক ও অভিন্ন ছিল তার সপক্ষে প্রমাণ যথেষ্ট। প্রথমেই বলা হয়েছে, এদের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে বাহ্যোলক্ষির দিক থেকে পৃথক করা বেশ আয়াসসাধ্য। অনেক ছোট ছোট জীবের ত শ্রেণী বিভাগ করাই কঠিন। প্রাণীদের অনেক বৃত্তি উদ্ভিদের মত, আবার উদ্ভিদেরও প্রাণবৃত্তির প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। যেমন জননবৃত্তি; বৃক্ষদের দেহে উভয় লিঙ্গ

বর্তমান, এদের যৌনমিলন নিষ্প্রয়োজনের বিলাস, যৌন ও অযৌন উভয় প্রণালীতে জন্ম দিতে পারে এরা। নীচের স্তরের প্রাণীরা জন্ম নেয় অযৌন উপায়ে, ঝিনুক এবং আরও অনেকে উভয়লিঙ্গ, যৌন ও অযৌন দুই প্রণালীই ব্যবহৃত হয়। অনেক প্রাণী সারা শীত ঘুমিয়ে নিস্পন্দভাবে কাটায়। মনে হয় এও উদ্ভিদবৃত্তি। সাধারণতঃ উদ্ভিদ-জগতের স্থাবিত্ব অনপনেয়ণীয় হলেও ধ্রুব সত্য নয়। জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারের পর উদ্ভিদকে বোধশক্তিহীন বলা চলবে না।

সৌরতেজ প্রভাবিত আদি জীব যখন ধরাতলে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, সৌরশক্তি তখন তার অন্তরে লুকানো। খাদ্য গ্রহণ উপলক্ষে তথা অন্যবিধ কারণে নড়াচড়া করতে হবে, তাতে ব্যয় হয়ে গেল সমস্ত সঞ্চিত তেজ। সূর্যাশক্তিশূন্য ভাণ্ডার চলে কত দিন? সে কারণে আদি তেজ সৌরশক্তি সঞ্চিত রাখবার জন্য উদ্ভিদ-জগতের অভ্যুদয়। কাছের জলমাটি, আকাশবাতাস দিবা-লোক থেকে সুলভে সংগৃহীত খাদ্য, কার্যকরী শক্তি সম্বর্ধিত করে রাখতে এরা বেশ পটু, ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সৌরতেজ সংরক্ষণের আধার হয়ে উঠল এরা, উন্নততর জীবজীবনের শরীররক্ষার্থ প্রয়োজনানুরূপ শক্তির সরবরাহ এখান থেকে। এ শ্রমবিভাগ—বৃক্ষ-লতার অণু-পরমাণুর জীবজগতের ব্যবহারার্থে সর্বদা প্রস্তুত রাসা-য়নিক শক্তি ইতস্ততঃ সঞ্চরণ বন্ধ হওয়ায় এ শক্তি সম্পূর্ণ দেহজাত হয়ে বন্দী এবং বিবর্তন সীমাবদ্ধ। প্রথমাবধি উদ্ভিদ ও প্রাণী একে অপরের পরিপূরক, উদ্ভিদ অক্সিজেন যোগায় এবং প্রাণী যোগায় প্রশ্বাসজাত কার্বন ও দেহের নাইট্রোজেন; প্রাণীর একান্ত অপরিহার্য সৌরতেজ পুঞ্জীকৃত উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরসঞ্চিত ক্লোরো-ফিল লতা পল্লবতৃণভোজীরা প্রত্যক্ষভাবেই আহরণ করে, সৌরতেজ মানুষ ও মাংসাশী পশু সংগ্রহ করে ছাগ, মেষ, গাভী, উট, বলদ ইত্যাদির মাংস হতে। প্রাণীর বিষ্ঠা ও দেহাবশেষ নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ, উদ্ভিদজীবন অপর্যাপ্তরূপে তা সংগ্রহ করে মৃত্তিকা হতে। প্রাণের এই দুই অংশ নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ, যেখানে উদ্ভিদ-জীবন বর্ধিষ্ণু সেখানে উদ্ভিদভোজীও প্রচুর আবার মাংসাশীদের আস্তানাও এইখানে—তবে সংখ্যায় কমে আসে এরা ক্রমশঃ, অল্পসংখ্যক প্রাণীর উদরপূর্তির জন্য অধিক গাছপালা দরকার। মাংসাশীরা আরও কম—যে-কোনও স্থানে শশক, কাঠবিড়াল, মূষিক, হংস-কুক্কুটের চেয়ে পেচক, চিল, শৃগাল, নকুল নিশ্চয়ই অল্প। তৃণ ও উদ্ভিদ সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য। পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাণী ঘাস, পাতা শস্যবীজ খেয়ে জীবনধারণ করে, এক মরুতপ্ত উষর মরুভূম ও হিম-শীতল মেরু ছাড়া সর্বত্র এই নিয়ম। পায়রা, বুলবুল, হাঁস, টিয়া থেকে আরম্ভ করে গৃহপালিত পশু ছুঁচো, বেজী, বীবর, হরিণ, কৃষ্ণসার, হস্তী, উষ্ট্র, বানর প্রত্যেকে ফলমূল শাখাপ্রশাখাভোজী। এদিকে কেঁচো, কেন্নো, শুঁয়াপোকা, ফড়িং, ভ্রমর, পিঁপড়ে উদ্ভিদ-রাজ্যের উপর নির্ভরশীল। জলের উদ্ভিদ স্থল অপেক্ষা কম, এখানকার অধিবাসীবৃন্দের অনেকের শৈবাল ইত্যাদি খেতে আপত্তি নেই। সমুদ্রজলে ও নদীতে জলজ গুল্ম ও উদ্ভিদ বর্ধিত বলে এরা আমাদের খাদ্যের ফলপ্রদ উৎস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান গুল্মলতা না থাকলে সম্ভবতঃ বিশাল পারাবার বিরাট মরুতে পরিণত হ'ত। যে-সব মৎস্য আমাদের প্রধান খাদ্য তারা জীবনধারণ করে ছোট ছোট পোকা ও কুচোমাছ খেয়ে—যারা শুধু আণুবীক্ষণিক জলজ-পত্রপুষ্পের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদজীবনের সঙ্গে জীবজীবনের যোগ কেবল খাদ্যের ভিতর দিয়ে নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্য সুষ্ঠু জীবনযাত্রার একান্ত অপরিহার্য। গাছপালা সব সময় বাষ্পরূপে জল নিঃসৃত করছে, বৃক্ষসমন্বিত এক একর বনভূমি প্রত্যহ যোল সহস্র গ্যালন জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে। বনভূমির অব্যবহিত উপরের বায়ুস্তর কিরূপ আর্দ্রশীতল তা সহজেই অনুমেয়, মেঘ উপর দিয়ে যাবার কালে বারিধারা বর্ষণ না করে পারে না। সেজন্য বনভূমি এলোমেলো ভাবে ধ্বংস করে ফেললে মরুময় উষর ভূমির প্রসারের সম্ভাবনা থাকে, আঁধি (ধূলিঝড়) প্রতিরোধ অসম্ভাব্য হয়ে ওঠে এবং জমিক্ষয় নিবারণ করা যায় না, যার অবশ্যম্ভাবী ফল বন্যা। উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গ ভূভাগ ক্ষয় করিতে বিশেষ সফলকাম হয় না, তার কারণ মারাম্ ঘাস উপ-কূলবর্তী বালুকাস্তূপকে বেঁধে রাখে কঠিন বন্ধনে। অনেক উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হতে নাইট্রোজেন তৈরি করে মৃত্তিকা উর্বর করে, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি নাইট্রোজেনের দান। উদ্ভিদ আর একটি প্রধান কাজ করে, তা হচ্ছে উত্তাপ সরবরাহ করা; কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে তাকে ভাঙবার সময় যে দহন-ক্রিয়া চলে, এ উত্তাপ তার। সেজন্য বনভূমিসমন্বিত দেশে শীত প্রবেশ করে সবার শেষে।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ আমেরিকায় অজটেক্ সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল অথচ স্থায়ী হয় নি। পশুপালনের অজ্ঞতা এর অন্যতম কারণ বলা হয়। পশু-বিষ্ঠার নাইট্রোজেন-ক্রিয়া ভূমিকে উর্বর করে তোলে, তার অভাবে ফসল জন্মাবে কেমন করে?

গতি ও স্থিতি

প্রাণ গতিপ্রবণ, তার ধর্ম অনুসারে সে সৃষ্টির পর সৃষ্টি করে চলে, জীবজগতের উন্মাদনা তার বিভিন্নমুখী ধারায়। গতিধর্মের যে প্রচণ্ডতা অন্তরে নিয়ে প্রাণকণিকা বিকাশলাভ করেছিল তার অফুরন্ত উদ্যম দুস্তর পথে জীবজগৎকে এগিয়ে নিয়ে চলবার প্রয়াস করেছে নিরন্তর—মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম দেয় নি জীবন-প্রবাহ স্তব্ধ থাকে নি এতটুকু, ব্যক্তি-জীবনের মত পলে পলে তিলে তিলে সার্বজনীন প্রাণধারার অনবদ্য রূপ পত্রপুষ্পে সুষমিত হয়ে সৌন্দর্যে সুষমায় ভরে উঠেছে। স্থির নিস্পন্দ থাকবার প্রলোভন এসেছে বার বার—প্রত্নভূস্তর নিদর্শনে তার সাক্ষ্য, এক জাতের কৃমি-কীটের কোন পরিবর্তন হয় নি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে, ছত্রাক বহু সহস্র বৎসর ধরে প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করছে, এদের বিবর্তন হয় নি কিছুই। বলা হয় যে, এরা নিকট প্রতিবেশে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে সুচারুরূপে, তা হলেও জীবনধারার অপর্যাপ্ত উচ্ছ্বাসে অবিচলিত থাকা কৃতিত্বের নয়, হীনতার কথা; মাঝে মাঝে প্রতিবেশের সমস্তটাই বদল হয়ে আমূল পরিবর্তন সাধিত

হয়েছে—জলবায়ুতে গাছপালার আহার্য্য দ্রব্যে। ভূমিকম্প জলোচ্ছাস বজ্রপাত ইত্যাদি প্রায়ই হ'ত সে সময়। নিত্য নূতন উদ্ভাবন-ক্ষমতার অধিকারী না হলে কোন কালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত আদিম-যুগের প্রাণ-কণিকা। কত দিকে কত রূপে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে প্রাণ, বিশালতায় ব্যাপকতায় গভীরতায় তার তুলনা নেই। কবে কোন সুদূর অতীতে পরম গতিশীল প্রাণের বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, আদিম গতিরূপের সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রাণধারা আজও প্রবহমাণ, উচ্ছলবেগে তরঙ্গাবর্ত্ত সৃষ্টি করে সে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে।

সূর্য্যরশ্মিজাল কোন এক সুদূর অজ্ঞাত যুগের প্রথম দিকে সোনারকাঠি ছুইয়ে ঘুমন্ত পুরীতে সাড়া পেয়েছিল, সেই আদিম প্রাণ কি করে দেহধারণ করল, কেমন করে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ কীট ও অন্ধমহীলতার মত প্রাণী কয়েক লক্ষ বৎসরে বড় বড় সামুদ্রিক কর্কট ও ৮.৯ ফুট লম্বা মৎস্যাকৃতি প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল আজ তা কল্পনা করা কঠিন। অবশ্য অগভীর ও জোয়ারের জলে ভেসে-আসা প্রাণীরা মৎস্য-বংশের কেউ নয়, মেরুদণ্ডীর আবির্ভাব এর বহু পরে। জেলির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ-কণিকা আকার পরিবর্ত্তন করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল নিজস্ব দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে। এই দৈহিক প্রয়োজন কি? তার রূপ কিরূপ?

এখানে প্রাণতত্ত্বকে অতিক্রম করে আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে মন ও প্রাণ এই দুই শক্তি মিলে-মিশে একাকার, স্বতন্ত্র সত্তা কিছু নেই, সেখানে সৃষ্টির সেই প্রান্তদেশে আমরা দেখতে পাই জীবের আদিম প্রবৃত্তি দুটি, আত্মরক্ষা ও বংশ-রক্ষা। জীব জন্মালেই বেঁচে থাকবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে এবং পরিণত অবস্থায় সে বংশরক্ষার উপায় খুঁজবে। জৈবিক প্রবৃত্তি বলা যেতে পারে এদের—জন্ম হতে মজ্জায় মজ্জায় মৌরসী-পাট্টা গেড়ে দখল করে থাকে জীবকে। সেজন্য মনোবিদ্‌রা বলেন যে, বংশকামনাবৃত্তি (অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি) জীবের শরীর-মন সম্পূর্ণ অধিকার করে থাকে; এখন এ তত্ত্বটি স্বীকার করে নিলে আমাদের বক্তব্য আরও সরল হয়ে যায়। জীব জন্মালে আহার চাই। তখনকার পৃথিবীতে আহার্য্য এত সহজপ্রাপ্য ছিল না। প্রথম দুই-এক দল যারা ধরণীতে চেতনার সংবাদ বহন করে এনেছিল তাদের মধ্যে উদ্ভিদের ভাগই অধিক—কারণ মৃত্তিকার অস্তিত্ব না থাকায় খাদ্যের উপকরণ আহরণ করতে হ'ত সূর্য্যালোক হতে। এ কাজে উদ্ভিদের অধিকার একচেটে। এই প্রকার একটা গোলমেলে অবস্থার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল প্রথম জীবদল। হয়ত তারা আদি বাসস্থান অগভীর বালিগোলা জলে ভেসে ভেসে বেড়াত—ঝড়ঝঞ্ঝা-সাইক্লোন-তুফান প্রবল জলস্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে; আত্মরক্ষার জন্যে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরতে শেখাই তাদের প্রথম পাঠ। পরে খাদ্যসংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ হ'ল সেই থেকে দেহাকৃতি গঠনের সূত্রপাত। খাদ্যোপকরণ সন্ধানার্থে চলাফেরা অতি প্রয়োজনীয়, প্রাণকোষ সচল অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল কেবল এই কারণে। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে পরি-চিত হয়ে উঠতে বিশেষ বিলম্ব হয় না, ধীরে ধীরে নানারূপ অবস্থায় যোগসূত্র স্থাপন এবং সেই সঙ্গে সাড়া দেবার শক্তির উন্মেষ হতে থাকে।

অনুভূতিপ্রবণতা

আধুনিক পৃথিবীতে এমিবা (এক-কোষ জীব) স্বয়ংসম্পূর্ণ আণুবীক্ষণিক প্রাণী, এর অনুভূতি, খাদ্যগ্রহণ-ক্ষমতা, চলৎশক্তি, পরি-পাক ও নিঃসরণশক্তি জৈবত্ব দান করেছে একে। এর আভ্যন্তরীণ গঠনে জটিলত্ব যথেষ্ট। কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন এরা, মৃত্যুহীন দেহ জৈব অমরত্ব দিয়েছে, তবু পৃথিবীর প্রথম প্রাণী এদের বলা অনুচিত, এর বিবর্ত্তনের ইতিহাস দীর্ঘ। জীব ও উদ্ভিদজীবনের সন্ধিস্থলে অবস্থিত হাইড্রা, উদ্ভিদজাতীয় আলজের কিয়ৎপরিমাণ অংশ আছে এর দেহে, বেশ কয়েকটি অংশে বিভক্ত করলে প্রতি অংশ পরিণত হয় এক একটি স্বতন্ত্র জীবে। সারাজীবন প্রায় স্থাণুর মত যারা কাটিয়ে দেয় সেই নিশ্চল-ভক্ষকদের দলভুক্ত এরা। নিশ্চল জলাশয়ের মধ্যে থেকে শিকার ধরবার সময় শরীরকে পূর্ণ-বিস্তারিত করে রাখে, শুঁড়গুলির আকার বহু গুণ বেড়ে যায় দেহ থেকে, তার পর দংশনের জন্য প্রস্তুত। অচঞ্চল স্বভাবের প্রাণী কোরাল এবং সামুদ্রিক এনিমনও। খাদ্যসংগ্রহের জন্য চলাফেরা করবে না কিছুতে, নিকটে যা এসে পড়বে শুঁড় বাড়িয়ে করবে গলাধঃকরণ, তবে প্রবাল শৈশবাবস্থায় কিছুদিন চঞ্চল, চলাফেরা করে—পরে সমাধিস্থ; এক শ্রেণীর প্রবাল কলোনি তৈরি করে, বুড়োরা এক স্থানে গিয়ে ভিড় করে, নবাগতেরা তাদের স্কন্ধে আরোহণ করে শ্বাসরোধ করে মারে—প্রবাল কলোনিতে জনতার ভিড় অত্যধিক। সামুদ্রিক এনিমনের মুখ আছে শুধু—বুক, পিঠ, মাথা, দক্ষিণ, বাম, উপর, নীচ আর কিছু না থাকলেও শিকারে পরাঙ্মুখ নয়—ক্ষীণ, অতি সামান্য স্মরণশক্তির অধিকারী—ইট, কাঠ, কাগজ খাইয়ে কিছুক্ষণ ধাপ্পা দেওয়া চলে, পরে যা-তা জিনিষ গ্রহণ করতে চায় না। সন্তরণরত জেলী-মাছ দেখতে চমৎকার, ইন্দ্রিয়স্থানের প্রথম উদ্ভব হয়েছে এদেরই দেহে, কারণ এরা অন্ধকার ও আলো চেনবার এবং রাসায়নিক দ্রব্য নিরূপণ ক্ষমতার অধিকারী। স্পর্শের প্রভাব এদের দেহে যথেষ্ট, একটু ছুলেই লম্বা লম্বা সূতার মত শুঁড়গুলি থেকে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাক্ত হুল বিদীর্ণ হয়ে বাহির হয়ে আসবে একযোগে, শত্রু দুর্ব্বল হলে তৎক্ষণাৎ দফা নিকেশ। স্পঞ্জ জল-তলের অধিবাসী একথা সকলেই জানেন। অথচ এই স্পঞ্জই জৈব বিবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান সাক্ষী। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে একে উদ্ভিদদলে ফেলা যায়, না, প্রাণীদের দলে টেনে নেওয়া যায় তা নিয়ে সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল। এর অচঞ্চল স্বভাব গাছপালা-গোত্রের, তবে শৈশবে ভ্রমণ করে খানিকটা—দেহ উদ্ভিদকোষের নয় প্রাণীকোষের, আর খায় কঠিন জিনিষ। দেহভাগ ঝাঁঝরা, ক্রমাগত জল গিলছে উগরাচ্ছে, জলস্থিত আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে। এদের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, নার্ভ নেই, টিসু অর্থাৎ মাংসতন্তুর আরম্ভ এইখান থেকে; অন্যান্য নিম্নস্তরের

প্রাণীর মত প্রায় প্রতি ছিন্ন অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাণী হবার ক্ষমতা রাখে।

অনেক দিন থেকে জীবনের পরিস্ফুরণ নূতনরূপে অভিব্যক্ত হবার চেষ্টা করছিল, আদিম অবয়ব (এমিবা—প্রোটোজোয়া স্তর) পরিত্যাগ করে আসতে সক্ষম হয়েছিল শুধু মেটোজোয়া—স্পঞ্জ; পরবর্তীকালে উন্নতি হয়েছে কেবল পলিপ-এর দিক থেকে, স্পঞ্জ প্রকৃতির একটি অন্ধ গলি থেকে গেছে। মুখমণ্ডলবিহীন—সর্বদেহ দিয়ে আহার্য শোষণ করে খায় যারা তাদের অঙ্গসঞ্চালনের প্রয়োজন কম। তাই সমুদ্রের নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে উঠলেও সামান্য নার্ভ-গ্রন্থিও নেই এদের দেহে। অপর দিকে বদনসমন্বিত প্রাণীদের খাবার খুঁজবার জন্য নড়াচড়া করতে হয় অনেক—টিসু ও নার্ভ ধীরে ধীরে দেখা দেয়। জীবনের ইতিবৃত্তে নার্ভের অভ্যুত্থান অতি-প্রয়োজনীয় ঘটনা, বহিঃপ্রতিবেশের সঙ্গে আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হয়, বারংবার ঘাত-প্রতিঘাতে জন্ম হয় অনুভূতি-কেন্দ্রগুলির; স্থাবরত্ব কেড়ে ফেলে প্রাণী-জীবন হয়ে ওঠে গতিশীল। অঙ্গসংস্থানের ক্ষেত্রে অনুভূতির বিকাশ অপূর্ব ঘটনা, এই সময় হতেই মস্তিষ্কের সূচনা। এই দলে তারামাছ, সামুদ্রিক শজারু, সামুদ্রিক-শসাদের রাখা হয়, ত্বক দেখা দিয়েছে এদের দেহে, সেজন্য পূর্বোল্লিখিত প্রাণীদের অপেক্ষা এরা উন্নত। পাড়া শৈল ও অনুরূপ বাধা অনায়াসে পার হয়ে যায়, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরদাঁড়া, সাঁড়াশী, উত্তোলনযন্ত্র এদের পঞ্চভুজাকৃতি দেহকে অনুক্ষণ পরিষ্কার রাখতে ও খাওয়াতে ব্যস্ত।

ইতস্ততঃ যাতায়াত প্রাণী-বিবর্তনের প্রবর্তন করে। সঞ্চরণ প্রথম আরম্ভ হয় খাদ্য অন্বেষণে, ভ্রমণের পাল্লা বিক্ষিপ্ত ও প্রসারিত হতে লাগল যত, স্নায়ুতন্ত্র তত সুসংগঠিত হয়ে উঠল এবং দেহে তার সংস্থান প্রতিষ্ঠিত হ'ল দৃঢ়রূপে। প্রোটোপ্লাজমের যুগ থেকে স্পঞ্জ-হাইড্রাযুগ অবধি আলাদা কোন নার্ভ দেখা দেয় নি, বিবর্তন হয়েছে ক্রমশঃ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে। গমনাগমনের যথাযথ উপযোগিতা ঠিক করা ও পথনির্বাচন এই দুইয়ের আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে দেহের অন্তঃস্থিত স্নায়ুতন্ত্র ও অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ধরণীপৃষ্ঠে নব নব জীব-জীবনের অভ্যুদয়।

প্রাণরূপের সার্বজনীন পরিবার থেকে সর্বপ্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে গাছপালা ও জীবজন্তু। অতিমাত্রায় কোমল ও নমনীয় সে যুগের প্রাণীদের কয়েকটি ধারা আজও অব্যাহত, তারা কণ্টকচর্মী শামুক, কীট ও মেরুদণ্ডী। এককোষ প্রোটোজোয়া থেকে এনিমনের অভ্যুদয় অল্পসময়ের ভিতর হয়নি, কয়েক লক্ষ বৎসর পার হয়ে গিয়ে ছিল। এমিবা-প্রোটোজোয়ারা আজও আছে; জলা-পুষ্করিণী, খাল, বিলে আকৃতিবিহীন উদরসর্বস্ব এরা ঘুরে বেড়ায়, মাপে ১/১০০"। স্পঞ্জ ও হাইড্রা, এনিমন, সামুদ্রিক কার কোরাল জেলিমাছ প্রভৃতির দুটি দল ধরণীপৃষ্ঠে আবির্ভূত হ'ল বটে, কিন্তু বিশেষ কেউ উন্নতি করতে পারল না, স্পঞ্জ ত স্থাবরত্ব গ্রহণ করে বেঁচে রইল, অন্যান্যেরাও কেউ হ'ল অচল, আবার কেউ দেহে চুণ-অঙ্গারের আবরণ তৈরি করে সমুদ্রস্থ শৈলশ্রেণী নির্মাণের কাজে লেগে গেল। ১০।৮০ কোটি বর্ষ পূর্বের জেলিমাছের শিলীভূত বিচরণ-চিহ্ন-নিদর্শন পাওয়া গেছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে সমুদ্রতল জনাকীর্ণ ছিল, নানা আকারের তারামাছ জেলিমাছ লিলি ছুইট এনিমন গোষ্ঠীর প্রাণীরা যথেচ্ছ বিচরণ করত, কেউ কেউ আবার আকৃতিতে ১৫ ফুট দীর্ঘ। জীববিবর্তন যদি উত্তোরত্তর উন্নতির পথে আর না অগ্রসর হ'ত তা হলে দুনিয়ায় একাধিপত্য হ'ত এদেরই। কিন্তু এদের পাশাপাশি আরও দুটি দল ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, এক দলের স্পষ্ট দুই পাশ ছিল, অপর দলের ছিল বিভিন্ন দেহাংশ। এক দল দেখা দিল শামুকরূপে, অপর দল অধুনালুপ্ত ত্রিবলী।

ত্রিবলী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্রাণী, এক সময় জলতল ছেয়ে গিয়েছিল এদের অবাধ ভ্রমণে—আজ আর একটিও নেই, শুধু শিলীভূত দেহাবশেষ একসঙ্গে পাওয়া যায় অনেক, পরস্পর পরস্পরের দেহের কোমল অংশগুলি ঢেকে তালগোল পাকিয়ে থাকত শত্রুর কবল হতে রক্ষালাভার্থে, শেষে আত্মরক্ষার্থ দেহে কাঁটার উদ্ভব হয়। এদেরই গোত্র হতে উদ্ভূত সামুদ্রিক বৃশ্চিক, রাজা কর্কট ও ঝিনুকের গোষ্ঠী শক্ত হয়ে দাঁড়াল এবং নির্বংশ হয়ে গেল ত্রিবলী। নির্বংশ অনেকেই হয়েছে, কণ্টকচর্মীরা প্রাচীন কালে শত শত জাতের ছিল, এখন মাত্র ১০-১১-এর অধিক দেখা যায় না, আদিম অমেরুদণ্ডীরা সহস্র সহস্র মাইল ব্যেপে সমুদ্রতলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এক সময়ে ইংলণ্ডের নিকটস্থ উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিকের তলে যে তরল কর্দম তা ওদের জীবাশ্ম।

সেকালের সমুদ্র যে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ও সর্বদা অশান্ত থাকত তা বোধ করি না বললেও চলে। আর একটি ভয় উপস্থিত হয়েছিল, গমনাগমনের ক্ষমতা আয়ত্তে আসায় একে অন্যকে সব সময়েই আক্রমণ করে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করত। গতি যতই অবাধ হতে লাগল ততই পেটুক আর রাক্ষস হয়ে উঠল; বিশেষতঃ একটু কর্মঠ শক্তিশালীরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল-শান্তদের দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় খুঁজত। সেজন্য একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল—নরম দেহের চারিদিক কঠিন বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলল এরা, চারিদিকের সমুদ্রজল থেকে খনিজ আহরণে উপাদান সংগৃহীত হ'ল কঠিন নির্মোকের—আত্মরক্ষা তথা অন্যত্র সংঘর্ষে কাবু না হয়ে পড়বার প্রকৃষ্ট পন্থা। কণ্টকচর্মীর কঠিন ত্বক, শামুক-ঝিনুকের খোলস, আদিম মৎস্যের বুকপ্লেট, কাঁকড়া-চিংড়ির চর্ম নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে উদ্ভূত। আত্মরক্ষা হ'ল বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত হয় নি। উত্তম-অধম এ কথাগুলি আপেক্ষিক, আজ যারা শ্রেষ্ঠ কাল তারা নিকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে, কালের গতিতে ভাল জিনিষে ঘুণ ধরা সম্ভব। সুকঠিন বর্মের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণই এক সময় গতিরোধ করে দাঁড়াল সমস্ত সম্ভাব্য উন্নতির উপায়ের—ডাইনসুরদের আমলে এ ব্যাপারের পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক, কড়ি, গুগলি, কর্কট, চিংড়ি প্রায় সুদৃঢ় দুর্গে বাস

করে কোন উন্নতি করতে পারে নি লক্ষ লক্ষ বৎসরে। আত্মরক্ষার উপায় ঠিক হয়ে গেলে ঝুঁকি নিতে মন সরে না, দুঃসাহসিক কার্য্য ভীতিপূর্ণ হয়ে উঠে। পৃথিবীতে "শামুক যুগও" একবার এসেছিল, কড়ি, গেঁড়ি, গুগলি থেকে আরম্ভ করে শঙ্খ, ঝিনুক, শুক্তি, বিরাট বিশাল অষ্টপদ অক্টোপাস দশপদী স্কুইড নটিলস ছাড়া প্রাচীন মহা-সাগরগর্ভে অন্য কিছু দেখা দুষ্কর ছিল। অমেরুদণ্ডীবর্গে অক্টোপাস ক্যাটল মাছ যথেষ্ট উন্নত দেহযন্ত্রসমন্বিত। অক্টোপাসের নিবাস সমুদ্র-গর্ভস্থ গুহা অথবা জলশৈলের নির্জ্জন ফাটলে, প্রস্তর ইত্যাদি যোগাড় করে বাসাবাড়ী তৈরি করে আর অতর্কিতে লম্বা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ফেলে অন্যমনা পথচারীকে। এদের (এমোনাইট, অক্টোপাস স্কুইড ক্যাটল মাছ) ভ্রমণও উন্নত ধরনের। নিশ্বাস গ্রহণকালে সাইফন পাম্পের ন্যায় জল টেনে নেয়, জল ছাড়বার বেগ ঠেলে দেয় উল্টো দিকে। অক্টোপাসের এরূপ গতি ঘণ্টায় ৪ মাইল।

ক্যাটল মাছ চক্ষে ধুঁল নিক্ষেপ করে পলায়নে ওস্তাদ, বহুরূপীর চেয়ে অধিক বর্ণপরিবর্ত্তন করতে পারে, তাতে ফল না হলে উল্টো দিকে কৃষ্ণ রঙের সিপিয়া নিক্ষেপ করে—যাতে পশ্চাদ্ধাবনকারী ঐ সিপিয়াকেই অনুসরণ করে চলে, যখন শত্রু নিজের ভ্রম বুঝতে পারে ক্যাটল মাছ ততক্ষণে উধাও। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এদের অনুভূতি বহু প্রকার ও তীব্র। অক্টোপাস-মাতার মনে মাতৃস্নেহের ক্ষীণ অরুণোদয়, ডিমগুলি জড়িয়ে রাখে বাচ্চা বার না হওয়া পর্য্যন্ত। পলপি গোত্রের প্রাণিকুল এদের অব্যবহিত পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে যে অনেক পশ্চাৎপদ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান। এরাও বেশী দিন প্রভুত্ব করতে সক্ষম হয় নি, কারণ সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এদের আশানুরূপ উন্নতিসাধন হয় নি। বিবর্ত্তনধারায় যে দল এদের কিছু পরে আবির্ভূত হয়েছিল তারা, কর্কট কিছু কীট-পতঙ্গ—শেষে মৎস্যকুল। মেরুদণ্ডীর মধ্যে মাছ ও অমেরুদণ্ডী কীট ব্যতীত অপর সকলে যা ছিল তাই রয়ে গেছে, অনেকে একেবারে বিলুপ্ত। কীটের অভিব্যক্তি ও মাছের উদ্ভূত জীবন-ইতিবৃত্তে প্রায় অনন্য অধ্যায়, আমাদের নিজেদের পুরনো ইতিহাস লুকানো এর ভিতর, আমরা মাছেদের অধস্তন বংশধর।

মেরুদণ্ডী-বিবর্ত্তনের প্রথম অধ্যায়ে মাছেদের আগমন, সে বিবর্ত্তন আজও চলেছে অব্যাহত ভাবে, মানুষ তার আধুনিক বংশধর। অভিব্যক্তির যে ধারা জন্ম দিয়েছিল কীটেদের তার চরম প্রকাশ-মৌমাছি, উইপোকা, পিঁপড়ে। দার্শনিকপ্রবর আঁরি বার্গস বলেছেন যে, মানুষকে যদি ধরাপৃষ্ঠের অধিপতি বলে মেনে নেওয়া যায়, পিপীলিকা তা হলে অন্তর্ভূমির একচ্ছত্র সম্রাট। বাস্তবিক, এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অনুধাবন করলে বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষের চেয়ে এরা হীন বলে বোধ হয় না। এদের সামাজিক সংগঠন, রীতিনীতি, পরিশ্রমলব্ধ সুউন্নত বসতি, রাস্তাঘাট, দাসদাসী, এমন-কি পশুপালন মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। মানসিক বিবর্ত্তনের অন্যতম প্রধান শাখায় উদ্ভূত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের সংহতি শৃঙ্খলার অপূর্ব্ব পরিচয়।

বিশাল মহীরুহ যেমন ছোট বড় অগণিত শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে প্রবহমাণ প্রাণসত্তাকে প্রকাশ করে, অনাদিকাল হতে অভি-ব্যক্তির অসংখ্য ধারা ঠিক সেই মত ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রকাশিত। তবে সাফল্যলাভ করেছে শুধু (১) সন্ধিপদ গোষ্ঠী: কাঁকড়া, চিংড়ি, বিছে, মাকড়সা, মধুপ পিপীলিকা, উই; (২) শামুকগোষ্ঠী এবং (৩) মেরুদণ্ডী। যারা সাবশেষ কৃতকার্য্য হয় নি অথচ একেবারে বিলুপ্ত হয়েও যায় নি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। কৃমি এক প্রধান সম্প্রদায়। কেঁচো কেন্নো জোঁক ও নানাবিধ পরজীবী-রূপে এদের অধিষ্ঠান। পৃথিবীর শৈশবকাল হতে কেঁচো কেন্নো ভূমির উর্ব্বরতাবৃদ্ধির জন্য যা করেছে তার তুলনা নেই। এদের বাস অন্তর্ভূমিতে। সুড়ঙ্গ তৈরীর সময় মৃত্তিকা গিলে ফেলে লেজের শেষের দিক দিয়ে নিঃসৃত করে দেয়, কেবল মৃত্তিকামধ্যস্থ খাদ্যভাগ (যেমন পদার্থ) গ্রহণ করে। পরিপাকযন্ত্রে পেষণে এবং পরিপাকরসের মিশ্রণে চূর্ণ বিচূর্ণ আর্দ্র মৃত্তিকা ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে চলেছে বহুকাল যাবৎ। ডারউইনের হিসাবমত দেখা গেছে যে, তিন ইঞ্চি পুরু মাটি বদলে দিতে এদের প্রায় ১৫ বৎসর সময় লাগে। নিজেদের উন্নতি হোক বা না হোক পৃথিবীর রূপ-পরিবর্ত্তনে এদের দান স্মরণীয়।

ভারতে নারীজীবনের নূতন গুরুত্ব

শ্রীদুর্গাবাই দেশমুখ

শিল্পবিপ্লব এবং ভারতবর্ষ

পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতেও শিল্পের বিকাশ মানেই কুটীর-শিল্পের ধ্বংস। ভারতে দেশী হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের ধ্বংসের সূচনা হয় গত শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি হইতে। ১৮৫৫ সনে ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল পাটকল। প্রায় এই সময়েই প্রতিষ্ঠা হইল প্রথম কটন মিল বা কাপড়ের কলের। এই সকল প্রাথমিক সূচনা হইতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছি তাহা হইতেছে এই যে, এখন আমাদের পাটকল আছে ১১২টি—তন্মধ্যে দশটি ছাড়া আর সবগুলিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, আর আছে প্রধানতঃ মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ এবং বোম্বাইয়ের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত ৩৫০টি বড় কাপড়ের কল।

ক্রমে ক্রমে গ্রামের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জগতে আসিয়া পৌঁছিল শহরের কাহিনী এবং কর্মীদিগকে ওখানে যে মজুরি দেওয়া হয় তাহার কথা। ফলে অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া গেল—প্রথম দিকে অনেকেই স্ত্রীপুত্রকে গ্রামে রাখিয়া গিয়াছিল—তাহারা বসবাস করিবার জন্য শহরেই রহিয়া গেল। ইহার দরুন যেমন একদিকে গ্রামীণ জীবনের যৌথ পরিবারের উপর কুফল দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনই শহরের নামগোত্রবিহীনতার মধ্যে নোংরা ও জনাকীর্ণ বস্তিগুলিতে সামাজিক সংরক্ষণ-নিরপেক্ষ এক নূতন একাত্মক যৌথ পরিবার গড়িয়া উঠিল—স্ত্রীলোকের শিথিল নাগরিক জীবনের দ্রুততর চলমান গতির সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে এবং কেবলমাত্র তাহাদের শিশুদের প্রতিপালন করিতে।

অনিবার্যরূপেই যেমন নাগরিক পারিপার্শ্বিকে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া উঠিল, তেমনি নারীরাও খাটিয়া খাইবার কথা বিবেচনা করিতে লাগিল এবং অচিরেই নারী-শ্রমিকদিগকে কলকারখানার কর্মে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

শিল্পে স্ত্রীলোকদের নিয়োগের প্রগতির ব্যাপারে কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। আপনাদের মনে এই পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে আমি দুইটি বৃহৎ শিল্প হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—ইহাদের প্রবণতা প্রদর্শনের নিমিত্ত—

(ক) পাট—ভারতের সমগ্র নারী-শ্রমিক-সমাজের শতকরা ৫৩ ভাগ কাজ করে পাটকলে। ২,৬০,০০০ হাজার কর্মীর মধ্যে (১৯৫৫ সনের সংখ্যা) প্রায় ২৫,০০০ হইতেছে স্ত্রীলোক। ইহার মানে সাকুল্য শ্রমশক্তির মোটামুটি শতকরা ৯.৭ ভাগ। কয়েক বৎসর আগে নারী-শ্রমিকদের শতকরা হার ছিল ১৪ জন।

(খ) বস্ত্র—১৯৫০ সনে বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের সংখ্যা ছিল ৬২২,৫৩৯, জন তন্মধ্যে ৫২,৬২৮ জন ছিল স্ত্রীলোক—সমগ্র শ্রমশক্তির শতকরা ৮.৫ ভাগ। ১৯২৭ সনে শ্রমশিল্পে নারীদের শতকরা হার ছিল ১৯.৪ এবং কর্মে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা ছিল ৬৬,৫৬২ জন—যদিও সমগ্র শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৪২,৯৪১। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্মে নিযুক্ত পুরুষদের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং নারীদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে প্রভূত পরিমাণে। নারী-কর্মীদের সংখ্যার এই ন্যূনতা সব রাজ্যেই ঘটিয়াছে। বোম্বাই রাজ্যে ১৯২৯ সনে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ১৩.৭ আর ১৯৫০ সালে তাহা হ্রাস পাইয়া হইয়াছে শতকরা ৭.৭।

(Social welfare, vol 1, No 4, পদ্মিনী সেনগুপ্তা)

এই সকল সংখ্যা হইতে, অন্যান্য দেশগুলির প্রবণতার নিরিখে বিচার করিলে হয়ত আমাদের দেশে এই দুইটি

শিল্পেই কর্মরত নারীদের সংখ্যা যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে সেই তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়।

শ্রম-শিল্পে কর্ম্মে নিয়োগের সংখ্যাহ্রাসের কারণাবলী

যে দুইটি শিল্পে নারীদের সংখ্যাহ্রাসের বিষয় উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মূলগত উৎস হয়ত নিহিত রহিয়াছে হিতকর শ্রম আইনের সাময়িক কার্য্যকারিতার মধ্যে। স্ত্রীলোকদিগকে এখন আর 'সস্তা শ্রমিক' হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে অতীতের ব্যাপার। ১৯৪৮ সনের ফ্যাক্টরিজ এক্ট অনুসারে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার পর স্ত্রীলোকদিগকে কাজে লাগানো যাইতে পারে না এবং রাত্রির 'শিফ্‌টে' পুরুষ শ্রমিকদিগকে সেই সকল কাজের ভার পর্য্যন্ত লইতে হয়, যাহা নারীদের ঠিকা কাজ (Women's Jobs) বলিয়া পরিচিত। উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্ম কাজ চলিতেছে বহুসংখ্যক 'শিফটে'।

মজুরির সমানীকরণ, ন্যূনতম মজুরি এবং স্ত্রীলোকেরা যে মাগগি ভাতা পাইয়া থাকে এ সকলেরই তাৎপর্য্য এই যে নারীদের শ্রমের সঙ্গে পুরুষদের শ্রমের তৌল করিতে হইবে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে। নারী-শ্রমিকদিগকে যে এখন 'মেটার্নিটি বেনিফিট' দিতে হয় এবং তাহাদের জন্ম যে শিশু-রক্ষণাগারের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহার দরুন কারখানার ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য একটি তথ্য যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্ম্মরত স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রী এবং বিধবা যাহাদের—পুরুষদের অপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্ততঃ তাহারা যা রোজগার করে সেই পরিমাণ রোজগারের প্রয়োজন—এবং প্রায়শঃই তাহারা নিজেদের উপার্জ্জন দ্বারা বৃদ্ধিশীল পরিবারসমূহ প্রতিপালন করিতেছে।

শিল্প-ক্ষেত্রে কর্ম্মনিয়োগ

শিল্পে নারীদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখাইবার উপযোগী সংখ্যাসমূহ একত্রিত করা দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার সংখ্যা প্রভূতপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সংখ্যা হইতে কিন্তু দেখা যায় যে, কর্ম্মে নিয়োগের দাবি প্রাপ্তব্য অবস্থাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। যখন আমরা এ বিষয়টা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি যে, ১৯৫৩ সনে সারা ভারতে ৫৫,০০০-এরও অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক প্রবেশিকোত্তর (Post Matriculation) অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন ইহা আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, আগামী বৎসরগুলিতে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্র এমন এক বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ শ্রমশক্তির প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে যাহাকে তাহার শিক্ষাগত পটভূমিকার দরুন চিকিৎসাবিষয়ক বর্গের (Medical categories) (নার্স, ধাত্রী হেলথ ভিজিটার প্রভৃতি) অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যাইবে না—যদিও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছনোর জন্ম ইহাদের প্রয়োজন হইবে বিপুল সংখ্যায়।

স্ত্রীলোকদের শিল্পবিষয়ক নূতন সুযোগ-সুবিধা

আমরা যে সকল বৃহৎ শিল্পের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেগুলিতে নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের সাময়িক বিপর্য্যয় সত্ত্বেও দেশে নূতন নূতন শিল্পে নারীদের শ্রমশক্তি বিনিয়োগের দাবি ক্রমবর্দ্ধমান। খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে কর্ম্মরত কতকগুলি ফার্ম্ম এবং রেডিয়ো যন্ত্র প্রস্তুতি লইয়া যাহারা কাজকারবার করে এমন কয়েকটি ফার্ম্মের কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিতেছেন যে, যে বিশেষ ধরনের কাজ তাঁহারা দিয়া থাকেন তাহার পক্ষে নারীদের শ্রম অত্যুৎকৃষ্ট এবং তদপেক্ষাও অধিকতররূপে ইহা তাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল মেয়ে আগে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে আসিত না, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর যে মজুরি দেওয়া হয় তাহা বিবেচনা করিয়া তাহারা উক্ত ক্ষেত্রে কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার জন্ম ক্রমবর্দ্ধমানরূপে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। দক্ষিণের টেলিফোন ফ্যাক্টরিসমূহ এবং উত্তরের উদ্বাস্তু বেতার কারখানাসমূহ—(Refugee radio factories) নারীরা অভিনব দক্ষতা অর্জ্জনে যে সন্তোষজনক কর্ম্মকৌশল প্রয়োগ করিতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ সহকারে নারীদের কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছে। আইনের অধীনে প্রদত্ত কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা—যেমন মেটার্নিটি বেনিফিট, 'ক্রেশে' (creches) প্রভৃতি নারীদের কর্ম্মে নিয়োগের পরিমাণকে (volume) যে প্রভাবিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মে নিয়োগে হ্রাস কিন্তু হইয়াছে সামগ্রিকতার চেয়ে বরং আপেক্ষিক এবং নারী কর্ম্মীদের ব্যাপক আকারের ছাঁটাইয়ের কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নাই। কারখানাসমূহে কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা এবং সামগ্রিক কর্ম্মনিয়োগের শতকরা হার এই সম্পর্কে কৌতূহলের উদ্রেক করিবে।

বৎসর	কারখানাসমূহে কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা	সামগ্রিক কর্ম্মনিয়োগের শতকরা হার
১৯২৭	২,৪২,৬১৬	১৬.৯৫
১৯৩২	২,১৫,৩৮১	১৬.২০
১৯৩৭	২,৩৭,৯৩৩	১৪.২০
১৯৪২	২,৬৫,০০৯	১১.৬২

১৯৪৭	২,৬৩,৯২৩	১১·৬০
১৯৫২	২,৭৩,৮১৪	১১·২০
১৯৫৪	২,৮০,০৬৯	১১·৩৬

ইহা দেখা যাইবে যে, সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে কারখানায় কর্মে নিযুক্ত নারীদের সামগ্রিক সংখ্যায় কোনও হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে নাই। পক্ষান্তরে তাহা ঈষৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সামগ্রিক চিত্রটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তুঙ্গভদ্রা বাঁধে ১২,০০০ এর উপর স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছে প্রত্যক্ষ এবং চুক্তিবদ্ধ (Direct and contract) শ্রমিকরূপে, হীরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনায় ৫,০০০এর উপর এবং অন্যান্য জলসেচ পরিকল্পনাসমূহে ১০,০০০এর উপর স্ত্রীলোককে কাজে লাগানো হইয়াছে।

নারীদের উপর শিল্পায়নের সংঘাত

শিল্পময় ভারত তাহার শ্রমশক্তির সরবরাহ আহরণ করে গ্রামসমূহ হইতে এবং এই সম্পর্কে লুইসা হাওয়ার্ড তাহার 'লেবার ইন এগ্রিকালচার এণ্ড ইণ্টারনেশন্যাল ষ্টাডি' নামক পুস্তকে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণীয়।

শহর এবং শিল্পের চৌম্বক আকর্ষণ কেন গ্রামাঞ্চলসমূহ হইতে পুরুষ এবং নারীদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ডাঃ বি· রামমূর্তি কৃত Agricultral labour—how they work and live—কৃষি-শ্রমিক—তাহারা কিভাবে কাজ করে এবং থাকে—এতৎসম্পর্কিত সাম্প্রতিক রিপোর্টে। কৃষি-শ্রমিক এবং শিল্প-শ্রমিকের জীবনধারার মধ্যে যে বৈষম্য বিদ্যমান এই রিপোর্ট হইতে তাহা উদ্ঘাটিত হয়। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৯৫০-৫১ সনে একটি কৃষি-শ্রমিক পরিবারের মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ের সঙ্গে শ্রমশিল্পে নিয়োজিত পরিবারের (.৯২০) আয়ের তুলনা করা হইয়াছে। দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে: ইহা দেখা গিয়াছে যে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ পরিবার মাথাপিছু ১৬০৲ টাকা উপার্জন করিয়াছে সেখানে শহরের পরিবারগুলির আয় হইয়াছে ২৬৮৲ টাকা। অনুরূপ ভাবে উড়িষ্যায়—যাহা একটি অত্যন্ত দরিদ্র এবং অনগ্রসর রাজ্য, তুলনীয় সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ৭৯ এবং ১৯৫।

নারীদের উপর এবং পরিবারের উপর সংঘাতকে মোটামুটি দুইটি মুখ্য পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর গৃহিণীরা শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধ পুরুষ ও বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকগণসহ বাড়ীতে থাকিয়া যায় এবং উপার্জনশীল ব্যক্তির নিকট হইতে মাসিক ভাতা পাইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা চলিয়া আসে শহরের ভাড়াটে বাড়ী বা বস্তিতে বাস করিবার জন্য, অথবা ইহাদের মধ্যে যাহারা অধিকতর ভাগ্যবান তাহাদেরই শুধু আশ্রয় জুটিয়া থাকে কারখানার মালিক কর্তৃক ব্যবস্থিত বাসগৃহে। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্তদের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক শিল্পমূলক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতের বিভিন্ন শিল্পে নারী-শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।

এই সকল নারী-শ্রমিকদের অবস্থার মধ্যে তারতম্য আছে, কিন্তু রাজ্য এখন অত্যন্ত প্রযত্নের সহিত তাহাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছে। 'এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনসুয়ারেন্স এক্টে'র অথবা 'দি মেটার্নিটি বেনিফিট এক্টে'র রক্ষণাধীনে সন্তানসম্ভাবিতা নারী-শ্রমিক অর্ধ বেতনে বার সপ্তাহের ছুটি পাইবার এবং কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের পর বৃহত্তর কারখানাগুলিতে (যাহাতে পঞ্চাশ জনের অধিক স্ত্রীলোক কর্মে নিযুক্ত আছে) ক্রেশে বা শিশুর জন্য শিশুরক্ষণাগারের সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা করিতে পারে। সকাল ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা এই সময়টুকু ছাড়া তাহাকে কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। ভারী জিনিষ তোলা তাহার পক্ষে বারণ এবং তাহার পৃথক প্রসাধন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। এখন একজন (নারী) পাট-শ্রমিকের মোট ন্যূনতম আয় হইতেছে ৬৩৷৹ আনা—যুদ্ধকালীন মাসিক ২০৲ টাকার স্তর এবং ১৯৩৮ এর মাসিক ১৩৲ টাকার স্তরের তুলনায় ইহাকে যথেষ্ট উন্নত স্তরেরই বলিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের সদস্যা পদ্মিনী সেনগুপ্তার কথায়—"আজিকার দিনের বেতনের হার, কাজেই নারী-শ্রমিকদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ আত্মসম্মানবোধ আনিয়া দিয়াছে। কারণ যদিও জীবিকানির্বাহের ব্যয় অত্যধিক, তথাপি সে যে বেতন পায় তাহা একজন সম্মানিতা স্ত্রীলোকের বেতন এবং তাহার প্রেষ্টিজ, কাজেই, স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যদিও স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই নিরক্ষর—[কারখানা-মালিক সমিতির (Millowners' Association) মতে ১৯৫১ সালে বোম্বাইয়ে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ২·৭৫ এবং এই একই বৎসরে মাদ্রাজে এই হার ছিল ঈষৎ উচ্চতর], তৎসত্ত্বেও তাহারা তাহাদের শ্রেণীর অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় সুখী, প্রফুল্ল এবং সময় সময় তাহাদের জন্য উত্তম বাসগৃহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকেও ক্রমবর্ধমানরূপে যত্ন লওয়া হইতেছে এবং অনেকগুলি কারখানায় বিশেষতঃ বোম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতে সমাজ শিক্ষা ক্লাসসমূহও (Social Education classes) খোলা হইতেছে। স্ত্রীলোকদের এখন আলাদা বিশ্রামকক্ষ আছে, সময় সময় তাহারা চলচ্চিত্র দেখিয়া থাকে, বেতার শোনে, বুনিতে এবং উত্তমরূপে শিশুদের দেখাশুনা করিতে

শেখে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, কল্যাণব্রতী নাগরিক হওয়ার মানে কি স্ত্রীলোকেরা তাহা উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছে।

পরিবারের উপর সংঘাত

ভারতে কারখানাসমূহে স্ত্রীলোকদের নিয়োগসম্পর্কিত গোড়াকার দিকের যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, কাজের সময় শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য অনেকে আফিং ব্যবহার করিত এবং তাহাদের সংখ্যাও কম ছিল না যাহারা কারখানার দীর্ঘসময়ব্যাপী দৈনন্দিন কার্য্যকালে চাঙ্গা থাকিবার জন্য টোটকা ঔষধ সেবন করিত। সৌভাগ্যক্রমে আজিকার দিনে এই সকল কাহিনী অতীতের কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে—যদিও একথা সত্য যে, স্ত্রীলোকেরা যে সকল 'লাইনে' বাস করে এবং যে সকল কারখানায় তাহারা কাজ করে এতদুভয় স্থানেরই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি প্রায়শঃই তাহাদের স্বাস্থ্যের উপর ক্রিয়া করে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, স্বাধীন ভারতকে উত্তম মাতৃ-নীতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাকল্পে এখনও বিস্তর জমি তৈরি করিতে হইবে। একদিকে অনেকগুলি পাটকল এবং কাপড়ের কল অধুনা এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে নিরক্ষরতার জন্য এবং প্রায়শঃই প্রাপ্তব্য সুযোগ সুবিধাসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকার দরুন অন্যান্যদের আজও পর্য্যন্ত নির্ভর করিতে হয় স্থানীয় দাইদের উপর, ইহার ফল দাঁড়ায় শিশু এবং মাতৃমৃত্যুর উচ্চ হার। এখন সব-কিছুই নির্ভর করিতেছে নারী-শ্রমিকদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান প্রসারের এবং সেই সকল নারীকল্যাণকর্মীদের ঠিকমত কাজে লাগানোর উপর যাহারা ফ্রি হাসপাতাল এবং যে সকল স্বেচ্ছামূলক সমাজ-কল্যাণ সংস্থার সাহায্যপ্রাপ্তি দ্রুত সহজলভ্য হইয়া উঠিতেছে তৎসমুদয়ের সহিত নারী শ্রমিক-দের যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি লক্ষ্যবস্তু হইবে—বাসগৃহের বিশেষতঃ বস্তি অঞ্চলের উন্নতিবিধান। একথা বিশ্বাস করিবার কিছু কারণ রহিয়াছে যে, শহর অঞ্চলে তরুণদের অপরাধপ্রবণতার একটা মোটা অংশের উদ্ভব হয় বস্তি এলাকায়—বিশেষতঃ মাকে যেখানে অন্যত্র কাজ করিতে হয়। এমনকি সুরুচিসম্পন্না শ্রমোপজীবিনী মায়েরাও, তরুণ বালকেরা শহরের রাস্তা হইতে যে সকল অবাঞ্ছিত সঙ্গী যোগাড় করিয়া লয় তাহাদের হাত হইতে নিজেদের শিশুদের রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু যথোচিত পরিকল্পনায় নির্ম্মিত, কম্যুনিটি কেন্দ্র এবং অবসরবিনোদনের সুযোগ-সুবিধাসমন্বিত বাসগৃহ 'এষ্টেটে'র দ্বারা এই অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারিত। পরিচ্ছন্ন এবং যথোপ-যুক্ত থাকিবার আস্তানাকে বলা যাইতে পারে প্রত্যেক গৃহিণীর জন্মগত অধিকার। এই অধিকার সেই স্ত্রীলোকের আরও কত বেশী যে তাহার স্বামীর মৃত্যু, অসুস্থতা, অথবা কর্ম্মে নিয়োগের অসম্ভাব্যতার মত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিবশতঃ তার শিশুদের জন্য রোজগার করিতে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে বাধ্য হয়।

যুগসন্ধিক্ষণে নারীমন

স্বাধীনতার পর হইতে ভারতের শিক্ষিতা নারীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সকল স্তরের ভারতীয় নারীদের মনের উপরেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সুফল সর্ব্বাধিক লক্ষণীয় হইয়াছে শাক্ষর নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে। পর পর পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম শক্তির রাষ্ট্রদূতরূপে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে গান্ধীজীর সহকর্ম্মিণী রাজকুমারী অমৃত কাউরের নিয়োগ, আর কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে উপমন্ত্রী এবং সেক্রেটারীরূপে ক্রম-বর্দ্ধমান সহযোগ—তাহাদের নিকট গর্ব্ব এবং প্রেরণার উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র নয়া দিল্লীতেই আছেন চল্লিশ জন নারী এম-পি। ১৯৩০ সন হইতে চল্লিশ এবং ১৯৪০ সন হইতে ১৯৫০ সনে যেখানে নারীদের মধ্যে ছিলেন শুধু শিক্ষিকা, নার্স এবং 'লেডি' ডাক্তার আজ সেখানে তাঁহাদের দলপুষ্টি করিয়াছেন, রেডিও অফিসিয়াল, সমাজ-শিক্ষাকর্মী, (Social Education workers) আইনজীবী, ম্যাজিষ্ট্রেট, পেশাদার সমাজ-কল্যাণকর্ম্মী (Professional Social Welfare Workers) টেলিফোন অপারেটার, সাংবাদিক প্রভৃতি। একজন নারী বৈমানিক লাভ করিয়াছেন আন্তর্জ্জাতিক পুরস্কার।

স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সাফল্যের সহিত নিখিল ভারত হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, নিখিল ভারত হ্যাণ্ড ক্র্যাফটস বোর্ড এবং নিখিল ভারত কুটীরশিল্প এম্পোরিয়ামগুলির জন্য কাজ করি-য়াছে তাহাও লক্ষ্য করিলে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। কুলগত এবং ব্যবসাগত উভয় দিক দিয়াই স্ত্রীলোকেরা প্রমাণ করি-য়াছে যে, নারীরা পুরুষদের কাজের উৎকর্ষসাধন যদি নাও করিতে পারে, তবে অন্ততঃ তাহাদের সমকক্ষতা করিতে তাহারা অপারগ নহে।

দুইটি বিশেষ পরীক্ষণ

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সমাজকর্মীরূপে এবং সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সেক্রেটারীরূপে আমি দুইটি বিশিষ্ট ধরণের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। বহু বৎসর পূর্ব্বে

অন্ধ্রের এক দল সমাজকর্মী-গোষ্ঠী অন্ধ্র মহিলা সভা গঠন করেন। ইহা এখন একটি বড় স্বেচ্ছামূলক নারী কল্যাণ এককে (Voluntary women's welfare unit) পরিণত হইয়াছে—একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল বা কারিগরি বিদ্যালয়, মাতৃনীতি হাসপাতাল, গ্রন্থাগার এবং মুদ্রাযন্ত্র ইহার অন্তর্ভূত। বহু বালিকা এবং স্ত্রীলোক যাহাতে সমাজের উপার্জনশীল ব্যক্তি হইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পাঠ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইয়াছে এবং এমন ভাবে তৈয়ারি করিয়া এরূপ বহু বালিকাকে আমরা বাহিরে পাঠাইয়াছি যাহারা নিজেদের অন্নসংস্থান এবং তাহাদের পরিবারকে সাহায্য করিবার মত যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতে পারে। এই কর্ম এখন সরকার কর্তৃক সাহায্যীকৃত হইতেছে এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের অর্থসাহায্যও লাভ করিতেছে—এই প্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত শিক্ষালাভাবিনী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালিকাদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। শিল্পায়নের দিক হইতে হয়ত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে—নাগরিক পরিবারসমূহের কল্যাণকল্পে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত "দি পাইলট সোশিও ইকোনমিক প্রোজেক্ট" নামক সামাজিক অর্থনীতিমূলক পরিকল্পনা। নয়াদিল্লীর নিকটবর্তী নাজফগড়ে প্রতিষ্ঠিত দেশলাই কারখানার লক্ষ্য হইতেছে—স্ত্রীলোকেরা যাহাতে নিজেদের বাড়ীতে ও কারখানায় উভয়ত্রই দেশলাই প্রস্তুতি এবং বাক্সবন্দী করার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। "দি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডে"র কার্যনির্বাহক সমিতিতে বসেন কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ-পর্ষদ, শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং নয়াদিল্লী সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্টার। কারিগরি শিক্ষণ এবং অর্থের ব্যবস্থা করেন শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রণালয়। উক্ত অঞ্চলের ১,৩০০ পরিবারের মধ্যে তথ্যানুসন্ধান কার্য করেন সেই সকল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মী যাঁহারা নারী সংগঠনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য সেবামূলক কল্যাণ-কর্মের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ ৫০০ গ্রোস দেশলাইয়ের বাক্স উৎপাদিত হইতেছে এবং প্রথম বৎসরে কমে নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা ৫০০ শত। যে উদ্বাস্তু অঞ্চলে ইহা অবস্থিত তাহার পক্ষে ইহাকে বিরাট সাহায্য বলা যাইতে পারে। কর্মীর কুশলতা অনুযায়ী উপার্জনের তারতম্য হয় এবং তাহা দৈনিক এক টাকা হইতে দুই টাকা পর্যন্ত যাহা কিছু হইতে পারে। আমরা আশা করি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মীদের তথ্যানুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্যীকৃত এবং নারী সমবায় সমিতিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত এই ধরনের শিল্পসমূহ চালু হইবে। তিনটি সমান্তরাল প্রোজেক্টের কাজ যথারীতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

উপসংহার

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, আজ যখন শিল্পে নারীদের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী ভিত্তিতে স্বীকৃতিলাভ করিবার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন ভারতে এই ক্ষেত্রে নারীদের কর্ম সম্পর্কে আমার মতবাদ উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি এবং আমার এই আস্থা প্রকাশ করিতেছি যে, ভারতীয় নারীদের প্রগতি, অনেকগুলি প্রতিবেশী দেশে এবং সাধারণ ভাবে এশীয় অঞ্চলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পন্থার উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিবে।

শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের জন্য হোস্টেল

ডি. পি. সি

রোগবিস্তারের প্রতিরোধ না করিয়া কেবলমাত্র হাসপাতালসমূহ খুলিলেই কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

• • •

"যে সকল হেতু সামাজিক কলুষের উদ্ভবের মূলে সেগুলি দূর করিতে হইবে। আমি একথা স্বীকার করি যে, সকল হেতুই এখনই দূরীভূত করা যাইতে পারে না। এই সকল নির্মূল করিতে সময় লাগিবে।"

১৯৫৫ সনের নবেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চেয়ারম্যানদের দ্বিতীয় কনফারেন্সে, তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত ভাষণে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু। নিম্নতর আয়কারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের হোস্টেলসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইতেছে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ব্যাখ্যাত এই দার্শনিক উপপত্তি। পর্ষদ

কর্তৃক নিযুক্ত সামাজিক এবং নৈতিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কমিটির অনুসন্ধানের ফলে তরুণী স্ত্রীলোকদের শোষিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টিও যে আংশিক ভাবে দায়ী সেই তথ্য উদ্ঘাটিত হইল। সেই বিষয়টি হইতেছে—নিজেদের শহর ব্যতীত অন্যত্র যাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই সকল শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের বাসোপযোগী স্থানের অবিদ্যমানতা। পতিতা স্ত্রীলোকদের সমস্যার সমাধান করা ছাড়াও আমাদিগকে সেই সকল কারণও বিদূরিত করিতে হইবে যাহা এই অধঃপতনের পথে তাহাদিগকে লইয়া যায়। এই ধরনের উপযোগী হোষ্টেলের অনস্তিত্ব, শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদিগকে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে কাজ লইতে উৎসাহিত করিবার ব্যাপারেও একটি প্রবল প্রতিবন্ধ। ঐ দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের সমস্যার সমাধানকল্পে এবং শ্রমিক-বালিকাদের উপর যে-কোনপ্রকার শোষণ নিবারণার্থে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কেন্দ্রীয় পর্ষদের বেসরকারী সদস্যগণ লইয়া একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেন। এই সকল সদস্য দেশের শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের হোষ্টেলসমূহ পরিদর্শনান্তে পর্ষদের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেন, কমিটি সেই ভিত্তির অনুমোদন করেন যাহাতে—হয় চালু হোষ্টেলগুলিকে অর্থসাহায্য দেওয়া যাইতে পারে অধিকতরসংখ্যক শ্রমোপজীবিনী নারীদের প্রতি সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণার্থে, অথবা নূতন হোষ্টেল খুলিবার জন্য। সাব-কমিটি বুঝিতে পারিলেন যে, যেহেতু নিম্নতর আয়কারী গোষ্ঠীর শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের এই সকল হোষ্টেল স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে না, সেইজন্য প্রাথমিক সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যয়ের জন্য তাহাদের অর্থসাহায্যের প্রয়োজন।

অর্থসাহায্যের সর্ত্তাবলী

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ, কাজেই, ১৯৫৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায়, ৫০—২০০ টাকা পর্য্যন্ত যাহাদের আয় সেই সকল শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের হোষ্টেলে অর্থসাহায্যের আবেদনপত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন—সর্ত রহিল এই দানের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হইবে ১৫,০০০ টাকা। যাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে শিক্ষিকা, কেরাণী, নার্স, ধাত্রী, টেলিফোন অপারেটার প্রভৃতি রূপে কর্ম্মে নিযুক্ত স্ত্রীলোক। ছাত্রীদের হোষ্টেলে অথবা যে সকল হোষ্টেলে আবাসিকদের বিনা খরচায় অবস্থানের ব্যবস্থা আছে সেগুলিতে অর্থসাহায্য দেওয়া হয় না। সাহায্যপ্রাপ্ত হোষ্টেলের আবাসিকদের সংখ্যা তারতম্য অনুসারে হইবে ১৫ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত। নূতন গৃহ নির্ম্মাণ, মেরামতি, চালু গৃহসমূহের সংযোজন এবং পরিবর্ত্তন, ভাড়া, সাজসরঞ্জাম এবং আবাসিকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতির জন্য অর্থসাহায্য প্রাপ্তব্য।

• কোন হোষ্টেলের আবাসিকদের খাদ্যবস্তু সংস্থানের জন্য কোন প্রকার অর্থসাহায্য প্রদত্ত হয় না।

এই সকল সাহায্য কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তাধীন, যথা: কোন অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে আবাসিকদের জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবাসিকদিগের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় করা হয় তাহা কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক বিশেষ ভাবে নির্দ্ধারিত একটি অঙ্ককে ছাড়াইয়া যাইবে না এবং নিম্নতম আয়কারী গোষ্ঠী যাহাতে এই সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে।

কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ যদি দেখেন যে, আবাসিকদের দেয় যে ভাড়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা হয় খুব বেশী অথবা খুব কম, তাহা হইলে পর্ষদ ভাড়ার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন।

যদি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমোপজীবিনী স্ত্রীলোকদের জন্য একটি হোষ্টেল পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান স্তরে চালু রাখিতে এবং যোগ্যতার স্বাভাবিক মানও বজায় রাখিতে হইবে। আর যদি হোষ্টেলটি কেবলমাত্র এখনই খুলিতে হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানকে যাবতীয় অবশিষ্ট ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করিতে হইবে।

শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের হোষ্টেলের জন্য সাহায্যপ্রার্থী প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দ্দিষ্ট ফরমে চালু হোষ্টেল এবং (অথবা) যে সকল হোষ্টেল খোলা হইবে সেগুলি সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং অনুলিপিসহ উক্ত ফরম রাজ্যের সমাজ-কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের নিকট দাখিল করিতে হইবে। রাজ্য পর্ষদসমূহ একটি বিশেষ আবেদনপত্র অনুমোদনকালে কোনও নির্দ্দিষ্ট এলাকায় একটি হোষ্টেল খুলিবার প্রয়োজনীয়তা সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণ করিবেন এবং সাহায্যের জন্য আবেদনকারী সংস্থার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র প্রদান করিবেন।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের গত সভায় অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের ১১টি হোষ্টেলকে যে অর্থসাহায্য অনুমোদন করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১,০৪,০০০ টাকা পর্য্যন্ত। দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে আরও প্রায় ২০টি দরখাস্ত পাওয়া

গিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের পরবর্তী সভায় এগুলি সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইবে।

কাজেই ইহা আশা করা যায় যে, এই সকল অর্থসাহায্য কেবল যে শ্রমোপজীবিনী মেয়েদের নিজেদের শহর হইতে অন্যত্র কর্মের সন্ধানে উৎসাহলাভের সহায়ক হইবে তাহা নহে, ইহা তাহাদিগকে নৈতিক বিপদের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া ন্যূনতম ভাড়ায় থাকিবার আরামপ্রদ স্থানপ্রাপ্তি বিষয়েও সহায়তা করিবে।

সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা

ডা. ডি. এম. বাসা

এদেশে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমাজগঠনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে সম্প্রতি প্রভূত আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহা দেখাইয়া দেওয়া সমীচীন যে, যে-কোনও রাজনৈতিক আবহাওয়াতেই সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতিবিধান হইতে পারে, যদিও ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে।

কেননা সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা হইতেছে মূলতঃ কোনও একটি সংস্থার অবস্থা হইতে অধিকতর রূপে মনের অবস্থা। জনগণের তরফ হইতে এবং অধিকতররূপে চিকিৎসাবৃত্তির তরফ হইতে ইহা একটি নির্দিষ্ট মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আগেই স্বীকার করিয়া লয়। ইহা এই বিষয়টির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারে যে, চিকিৎসাবৃত্তির প্রাথমিক লক্ষ্য হইতেছে স্বাস্থ্য—সমাজের সামগ্রিক স্বাস্থ্য—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, অথবা সামাজিক স্তরে ব্যাধিও নয়। অন্য কথায় সুস্থ সমাজ—রুগ্ন সমাজ অথবা ব্যষ্টি অপেক্ষা অধিকতর না হইলেও অন্ততঃ সমান গুরুত্বপূর্ণ ত বটেই। স্বাস্থ্যসংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ যতটা ব্যক্তিগত স্তরে ততটা সামাজিক স্তরেও অবশ্যপ্রযোজ্য হইবে।

সাধারণতঃ আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ কর্তৃক ডি. ডি. টি তরলবিন্দু নিক্ষেপ (spraying) প্রভৃতি যে সকল রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় সেগুলির সহিত আমরা সকলেই পরিচিত আছি। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার আর একটি অধিকতর নিশ্চয়াত্মক (positive) দিক আছে। বারংবার উপদেশদানের ফলে মনে উৎকৃষ্ট জীবনচর্যার বদ্ধমূল সংস্কার জন্মানো ইত্যাদি উপায় অবলম্বনপূর্বক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ইহার অঙ্গীভূত। ইহার লক্ষ্য হইতেছে, ব্যষ্টির মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল করিয়া দেওয়া যে, সে নিজে তাহার প্রতিবেশীদের সহিত একত্রে তাহার নিজের এবং তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দায়ী। "স্বাস্থ্য, কাজেই একটি ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্য এবং ইহার মূল্য হইতেছে—যেমন ব্যষ্টির তেমনি সমষ্টির পক্ষেও উৎকৃষ্ট জীবনচর্যার অভ্যাস বজায় রাখা। স্বাস্থ্য এমন কিছু নয় যাহা চিকিৎসাবৃত্তি আমাদিগকে দান করিতে পারে; বটিকা, ইঞ্জেকশন অথবা টোট্‌কা ঔষধ ইত্যাদি দ্বারা নিশ্চিতই ইহা লাভ করা যাইতে পারে না।

ইহা একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের বিষয় যে, যে সকল রোগী প্রাইভেট ডাক্তারদের নিকট আসে তাহাদের অন্ততঃ অনেক সেই সকল রোগে ভোগে যাহা সৃষ্টির মুখ্য কারণ হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক অসামঞ্জস্য। সাধারণ হাসপাতালসমূহের সংখ্যা হইতেছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ইহার মানে কি? ইহার মানে এই যে, এই সকল রোগী সেই সব রোগে ভুগিতেছে যাহার মূল কারণ—অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে তাহাদের ত্রুটিপূর্ণ অথবা অসন্তোষজনক সম্পর্ক। ইহা দ্বারা বুঝায় সেই সকল পিতামাতা, শিশু, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য লোক যাহাদের সহিত তাহারা বাস করে অথবা যাহাদের সংস্পর্শে তাহারা আসে।

ইহা সত্য যে, আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের অধিকাংশ অসুখই শারীরিক—যদিও তাহাদের কারণসমূহ নিহিত রহিয়াছে মনোজগতের গহন গভীরে। তাই বলিয়া কিন্তু একথা আমরা বলিতেছি না যে, তাহাদের অসুখগুলি কাল্পনিক—বস্তুতঃ তাহারা ক্যান্সার, নিমোনিয়া, করোনারী থ্রম্বসিস প্রভৃতি খাঁটি শারীরিক ব্যাধিসমূহের ন্যায়ই সমান গুরুতর, যন্ত্রণাদায়ক এবং রোগীকে অশক্ত করিয়া ফেলিতে পারে। যে ছোট শিশুর উদরাময় অথবা বমির অসুখ আছে সে মায়ের নিকট তাহার বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে। আর একটু বেশী ভালোবাসা, আর একটু বেশী তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা—এইটুকু মাত্র প্রয়োজন—তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে, শিশুটি আবার সুস্থ হইয়াছে। যে পরিমাণ সালফা ড্রাগ অথবা ইঞ্জেকশনই দেওয়া যাক না কেন তাহাতে কিছু ফায়দা হইবে না। কাজেই রোগের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরক্ষার গোড়াপত্তন করিতে হইবে শৈশবে। আমি এখন শৈশবকালে উপদেশপ্রদান দ্বারা সদভ্যাস এবং নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে

শিশুদের মনে বহুমূল্য সংস্কার জন্মাইয়া দিবার কথা ভাবিতেছি না। যদিও এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ—অধিকাংশ রোগ বিশেষতঃ পরবর্তী জীবনের পুরাতন ব্যাধিসমূহ হইতেছে মুখ্যতঃ পিতা-মাতা এবং শিশুর ত্রুটিযুক্ত সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত মনস্তাত্ত্বিক অসামঞ্জস্যের ফল। কাজেই সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যার একটি প্রধান স্তম্ভ হইবে, ভালবাসা ও স্বাধীনতায় পূর্ণ এবং সুস্থ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শৈশব। মানসিক স্বাস্থ্যের মোটামুটি মূলনীতিসমূহ এবং তৎসহ শিশুপালন সম্পর্কে পিতামাতার এবং ভাবী পিতামাতাদের প্রতি পথনির্দ্দেশ ঐ ধরনের সুখী শৈশবের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করার পক্ষে বহুল পরিমাণে সহায়ক হইবে।

অপর একটি স্তম্ভ হইতেছে, স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থা-সমূহ—যেমন বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত অবসর সময়ের যথোচিত ব্যবহার, পরিবারের লোকেদের এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সন্তোষজনক এবং সন্তোষ-উৎপাদক আচরণ, স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য, উত্তম হাওয়া এবং বাসগৃহ। সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যার একটি প্রোগ্রাম অনুসারে ইনডোর এবং আউটডোর উভয়বিধ গ্রুপ গেম বা ক্রীড়া-কৌতুক সংগঠন এবং তৎসহ ক্লিনিক ও হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থার গুরুত্বও সমানই হইত।

স্বাস্থ্যোন্নয়নের আর একটি দিক হইতেছে নিয়মিত ভাবে সুস্থ ব্যক্তিদের বার্ষিক পরীক্ষার দ্বারা জনসাধারণের শিক্ষা। এই উপায়ে প্রয়োজন হইলে জীবনধারণের এবং চিন্তার ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাসসমূহই যে কেবল শুধরাইতে পারে তাহা নহে, উপরন্তু চিকিৎসক অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরিতে পারিয়া এমন সব অবস্থার আঁচ করিতে পারেন, পরবর্ত্তীকালে যাহার অনিবার্য্য পরিণাম হইতে পারে—ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই প্রভূত যন্ত্রণা এবং অর্থব্যয়। কর্ম্ম হইতে ক্রমাগত এবং দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং তৎসহ তাহার আনু-ষঙ্গিক অর্থনৈতিক অপচয় ও সামাজিক অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে নিশ্চিত ব্যবস্থা করা ছাড়াও, হাসপাতালের উপরকার বোঝা প্রভূতপরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা এবং উন্নয়নের ব্যাপারে মূল ব্যক্তি হইতেছেন সমাজ-কর্মী অথবা স্বাস্থ্যশিক্ষক (Health Educator)। নিয়মিত ভাবে তিনি রোগী ও স্বাস্থ্যবানদের পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা ও যুক্তিতর্ক আর উপদেশাদির মাধ্যমে পরিবারগুলিকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন, ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যনীতিকে তিনি করিয়া তোলেন এক জীবন্ত বাস্তবতা—তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ। স্বাস্থ্যের যে-কোন সামান্য বিচ্যুতি সম্পর্কেও চিকিৎসকের নিকট রিপোর্ট করা হয়। ফলে, ব্যাধিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থাসমূহই যে শুধু অবলম্বিত হইতে পারে তাহা নহে, এই পটভূমিকায় জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া চিকিৎসক তাঁহার রোগীদিগকে দ্রুত তাহাদের পূর্ব্ব স্বাস্থ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উৎকৃষ্টতর রূপে সমর্থ হইতে পারেন।

সামাজিক এবং জীববিদ্যাবিষয়ক বিজ্ঞানসমূহের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, চিকিৎসাবিদ্যায়ও যে তাহার প্রতিক্রিয়া হয় নাই তেমন নহে, যদিও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা তার অসংখ্য কারণ এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণাবশে, কেবলমাত্র একটি বিষয় (যেমন বীজাণু অথবা খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানের অভাবের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়) রোগের জন্য দায়ী—এই যে আধুনিক কালের অনমনীয় ধারণা তাহা নির্মূল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখানো যায় যে, এক কক্ষওয়ালা যে সকল ফ্ল্যাট অথবা ভাড়াবাড়ীতে শিশুরা পিতামাতার সঙ্গে শোয় সেগুলি উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। বস্তুতঃ এগুলিতে বাস করার দরুন পিতামাতার সঙ্গে শিশুদের অবনিবনাও হয় এবং পরবর্ত্তী জীবনে তাহাদের বহুবিধ স্নায়ুরোগ ও অসুস্থতার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চিকিৎসাবিদ্যাকে তাহার গজদন্তপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া যদি জীবনের মূল ধারার সহিত মিশিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে চিকিৎসকদিগকে গোষ্ঠীগত ভাবে এই সকল তথ্য এমন কার্য্যকরী ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে স্থপতি এবং প্রশাসকগণ একথা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, বাসগৃহের বেলায়, অর্থনীতি, সৌন্দর্য্যবোধ এবং আরামই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নহে।

সংক্ষেপে, সামাজিক চিকিৎসাবিদ্যা মানুষের সহিত কারবার করে একটি সত্তা রূপে। সমগ্র ব্যষ্টিকে ইহা সামগ্রিক পটভূমিকায় দেখে এবং বিচার করে। ইহা তাহার শারীরিক ব্যথা এবং যন্ত্রণার সহিত যতটা—মানসিক দুঃখ ও হতাশার সহিত ততটাই সংশ্লিষ্ট। ইহার কর্ম্মনীতির মূল-গত ভিত্তি হইতেছে এই জ্ঞান যে, যেমন বীজাণু, দূষিত জল এবং খারাপ স্বাস্থ্যবিধির দরুন তীব্র ব্যাধির সৃষ্টি হয় তেমনি অসুখী এবং অসন্তোষজনক ব্যক্তিগত সম্পর্কসমূহ মানুষের মনের উপর তাহাদের সঙ্ঘাতের দ্বারা স্থায়ী এবং পুরাতন (chronic) রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যে সকল বীজাণু মানুষের ভালোবাসারও বুঝাপড়ার উৎসকে বিষাক্ত করে সে-গুলি, যে সকল জীবাণু আমাদের দেহতন্ত্রকে (system) বিষাক্ত করিয়া থাকে তৎসমুদয়েরই মত ভয়াবহ।

বিজ্ঞান-ভবন নয়া দিল্লী
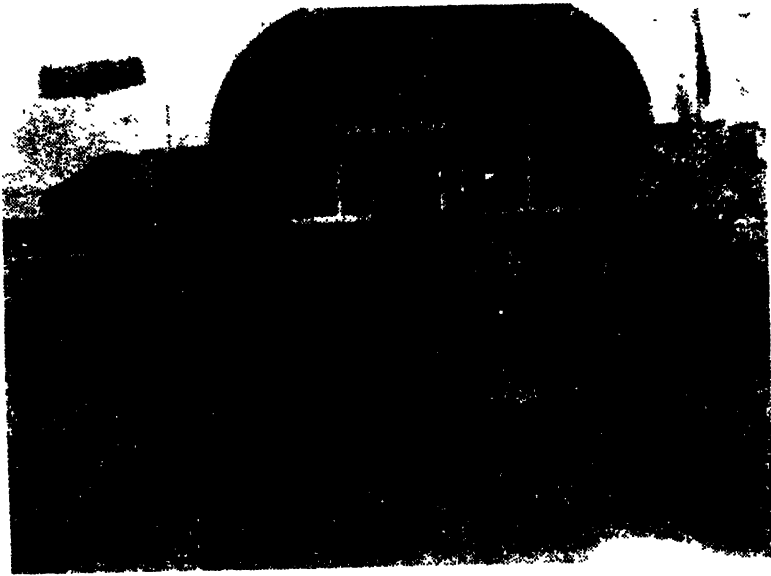
এশীয় লেখক সম্মেলন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

"পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা—"

কবির এই আশ্বাসবাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল ১৯৫৬ সনের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীর আশ্চর্য "বিজ্ঞান-ভবনে" এশীয় লেখক সম্মেলনে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র দশটি বৎসর চলে গেছে, ভারতের মহান রবিও অস্তমিত। তবুও এই ভারতেই এত বড়, এমন সম্ভাবনাপূর্ণ, এমন অভূতপূর্ব একটি ঘটনা ঘটল, যার উদাহরণ পৃথিবীর আর কোন মহাদেশের বা উপ-মহাদেশের ইতিহাসে নেই। মানবজাতির ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ভারতেরই কতকগুলি লেখক প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে এশীয় লেখকবর্গকে একটি সম্মেলনে আহ্বানে উদ্যোগী হন। তাঁদের আশা ছিল, জাতিতে জাতিতে এই পথেও মিলন হোক, সম্প্রীতি বাড়ুক, পরস্পরকে বোঝার সুযোগ ঘটুক, সংস্কৃতির ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হোক। অন্যান্য মহাদেশের বিরোধিতার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরোধিতাই বা কি থাকতে পারে? সকল লেখকের জীবন-দর্শন এক নয়, কিন্তু কোন লেখকই সত্য ও শিবকে অস্বীকার করতে পারেন না। জাপান ছাড়া এশিয়ার সকল দেশই দীর্ঘকাল কোন-না-কোন ভাবে ইউরোপের কয়েকটি জাতির অধীন ছিল। মহাচীনের অংশবিশেষে ছিল মার্কিন-ইংরেজ-জাপানী-জার্মান প্রভুত্ব। বর্তমানে এশিয়ার প্রায় সকল দেশই এই বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন। এখনও যেটুকু বাকী আছে তারও মুক্তির ক্ষণ আসন্ন। এইরূপ সময়ে এমন সম্মেলন যেমন উপযোগী তেমনি গভীর সম্ভাবনাপূর্ণ।

চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই চোদ্দটি ভাষায় যে সাহিত্য সুদীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়ে আসছে সেগুলির প্রতিনিধিবর্গ ও লেখক-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেনই রাজস্থানী ভাষা স্বীকৃতি লাভ না করলেও এই সাহিত্যের প্রতিনিধিবর্গকেও সম্মেলনে স্বীকৃতি দান করা হয়। কারণ রাজস্থানী দু' কোটিরও বেশী ভারতীয়ের মুখের বুলি। উপরন্তু মীরাবাঈ, দাদু ও পৃথ্বীরাজের মত অমর কবিগণ এই ভাষায় সুমধুর দোঁহা রচনা করে গেছেন। সম্মেলনের প্রথম দিনে ছিল পনেরটি ভারতীয় ভাষার প্রতিনিধি-লেখকবর্গের সম্মেলন। এই দিনে সভার গোড়ার দিকে কিঞ্চিৎ অপ্রীতিকর কতকগুলি প্রশ্নের অবতারণা হয় এবং সেগুলি বাংলার লেখক প্রতিনিধিবর্গের তরফ থেকেই মূল সভা-

পতিকে করা হয়েছিল। আমাদের মতে প্রশ্নগুলি করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যা হোক, শেষ অবধি সম্মেলনে প্রধানতঃ শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে সম্পন্ন হয়। তবে কি ভারতীয়, কি অভারতীয় সকল ভাষাকে সমমর্যাদা দান করা হলেও পূর্ণ সম্মেলনে বাংলা ও হিন্দীর লেখকবর্গের তিন জন করে লেখককে তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়ায় কয়েকটি ভারতীয় ভাষার লেখক প্রতিনিধি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আপত্তি প্রকাশ করেন।

পূর্ণ অধিবেশনের সুবিশাল ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, স্নিগ্ধ বিজলী আলোকমালাশোভিত কক্ষে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য সৃষ্ট হয়।

সম্মেলনে এসেছিলেন মহাচীনের, মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলির, মঙ্গোলিয়ার, উত্তর কোরিয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ও জাপানের লেখক-প্রতিনিধি। এসেছিলেন ব্রহ্মদেশের, ইরানের, সিরিয়ার, সিংহলের, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি। আর, আমাদের ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষার লেখক প্রতিনিধিগণ তো উপস্থিত ছিলেনই। এঁরা ছাড়াও ছিলেন মিশর, আফ্রিকা, অস্ট্রিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতির একাধিক লেখক দর্শক। মূল সভাপতির সঙ্গে বিশাল মঞ্চের উপর টেবিলের ধারে বসেছিলেন প্রত্যেক ভাষার প্রতিনিধিবর্গের এক একজন মুখপাত্র। আর, প্রতিনিধিগণ বসেছিলেন নিচে থাকে থাকে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে। প্রত্যেক আসনের সামনে টেবিলে একটি করে মাইক্রোফোন, পাশে [illegible] ও নিয়ামক যন্ত্র। আসনগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে, মঞ্চ ও মঞ্চের মেঝে পুরু [illegible] সামান্যতম শব্দও উঠতে দেয় না। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের মধ্যে বসে, সকলের দিকে তাকিয়ে কবির কথাগুলি পুনঃ ফিরে মনে আসছিল, "পূর্ব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে।" নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিচ্ছদ, কিন্তু এমন বিবিধের মাঝে মহামিলন এ ভারতেই সম্ভব!

সম্মেলনে ভারতের পক্ষে মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীহুমায়ুন কবীর। কিন্তু উদ্বোধনকালে তিনি উপস্থিত না থাকায় তাঁর আসনে অস্থায়ী ভাবে মনোনীত হন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর ভাষণের পর শ্রীহুমায়ুন কবির উপস্থিত হন। তার পরেই প্রশ্নাদি আরম্ভ হয়। তবে তিনি ২২শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সব কয়টি অধিবেশনেও উপস্থিত থাকেন নি। ২৫শে থেকে পরবর্তী অধিবেশনগুলির মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা তিন জনেই বাংলার লোক। এতেই বোঝা যায় বাংলা সাহিত্য এই মহা-সম্মেলনে কতখানি মর্যাদা লাভ করে। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শ্রীমুল্‌করাজ আনন্দ। বাংলা থেকে আমরা ছিলাম আঠারো জন প্রতিনিধি। দশ টাকা চাঁদা দিলেই কারো প্রতিনিধি হতে বাধা ছিল না। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল বেসরকারি। সেজন্য অর্থকৃচ্ছ্রতার দুশ্চিন্তা ছিল কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট। এমন একটি সম্মেলনে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। বিদেশী সাহিত্যের প্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজ নিজ সরকারের অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন, সম্মেলন কর্তৃপক্ষও তাঁদের আহার-বাসস্থান ও যানবাহন খরচের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিগণ কেবল লাভ করেছিলেন এক পিঠের ভাড়ায় রেলে যাতায়াতের সুবিধাটুকু। সাধারণতঃ ভারতীয় লেখকগণ দরিদ্র। তবুও সেজন্য কেউই অনুযোগ করেন নি। সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার ঐকান্তিক কামনা ছিল সকলেরই অন্তরে। এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও তামিল ভাষার লেখকগণ তাঁদের মধ্যকার দলাদলি পরিহার করে ঐকমত্যের উদাহরণ দেখিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা ও মর্যাদা লাভ করেন। অথচ এই সম্মেলন সরকারী হলে এর কাঠামো ও মূর্তি হতো অন্যরূপ এবং তা যে সমালোচনার উর্ধ্বে হতো তাই বা বলি কি করে?

[illegible] বিশেষতঃ সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কতকগুলি বাংলা, তামিল ও হিন্দী ইত্যাদি গ্রন্থের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সোভিয়েট লেখকগণ সেগুলির এক এক খণ্ড কর্তৃপক্ষকে সম্মেলনের অধিবেশন চলাকালেই উপহার দেন। সংখ্যায় সেগুলি হবে অনেক।

সম্মেলনের কার্য-কর্ম, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাবাদি সবই হয় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল? এমন সার্বজনীন রূপ পৃথিবীর আর কোন ভাষার? তবে বিদেশী প্রতিনিধিগণ তাঁদের বক্তব্য স্ব স্ব ভাষাতেই বলেন এবং তা শ্রোতৃবর্গের সুবিধার্থে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে তর্জমা করেন দোভাষী। সম্মেলনে বিবিধ বিষয় আলোচিত ও কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বক্তাগণের বক্তৃতা থেকে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের সাহিত্যের বর্তমান গতি-প্রকৃতির একটি ধারণা শ্রোতৃবর্গের করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে লাভই হয়েছে। কিন্তু তা প্রচারের প্রয়োজন যা অন্ততঃ আমাদের বাংলাদেশে করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ সকল রিপোর্টের নকল আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করেছেন।

সম্মেলনে অতি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন শ্রীরাজাগোপাল আচারী। শ্রীরাজাগোপাল আচারী তাঁর অনুপম বক্তৃতায় প্রচুর হাস্যরস বিতরণ করেছিলেন। সাহিত্য ও রাজনীতি এই দুটিকে তিনি পৃথক রাখতে পরামর্শ দেন এবং অনুবাদের চেয়ে নিজস্ব পথে

মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতেই উৎসাহ দিয়েছিলেন যথেষ্ট। এশীয় লেখক সম্মেলনটি বিশ্ব লেখক সম্মেলন হলে তিনি আরও খুশি হতেন। শেষ দিনে লেখকবর্গের গোল টেবিল সম্মেলনে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শ্রীজবাহরলাল নেহরু। তিনি নিজে শক্তিশালী ইংরেজী লেখক। কাজেই রচনার যে গুণ প্রয়োজন লেখকবর্গকে সে সম্বন্ধে সচেতন করেন। আর, আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ত তাঁর বিশাল ও সুদৃশ্য ভবনে প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত ও সম্মানিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত সকলেই যে যথোচিত মনোযোগী ছিলেন এ কথা বলতে পারলে আনন্দিত হতাম। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান কথা বলেছিলেন, বিশেষ করে বিশ্ব-শান্তি সম্বন্ধে।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য অভ্যর্থনার মধ্যে উত্তর ভিয়েৎনামের এমব্যাসিতে ও দিল্লীর পঞ্জাবী কলাকেন্দ্রে প্রতিনিধিগণকে যে অভ্যর্থনা করা হয় সে দুটির উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। কারণ, ভিয়েৎনাম এমব্যাসি তাঁদের দেশের মুক্তি-সংগ্রামের যে ছায়াচিত্রগুলি দেখিয়েছিলেন তা ছায়াচিত্রের দিক থেকে নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর, কিন্তু সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা ও অপরাপর গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য একটি জাতি যে কি ভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সহিষ্ণু হতে পারে, প্রতিজ্ঞায় অটল ও একতাবদ্ধ থাকতে পারে সে অমর কাহিনী বিচিত্র চিত্রস্রোতে মুখর হয়ে উঠেছিল, সেই ঘটনাপ্রবাহে দেখা গিয়েছিল হো চি মিনকে। সরল, অনাড়ম্বর তাঁর জীবনযাত্রা, লোকসাধারণ থেকে নিজেকে উচ্চস্তরে রাখবার ঈষৎ প্রয়াসও তাঁর মধ্যে নেই। অতি সাধারণ পোশাকে, সামান্য একজন সঙ্গী নিয়ে শ্রদ্ধাস্পদ ও অক্লান্তকর্মী এই বৃদ্ধ গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে চলেছেন নবজীবনের আশীর্বাদ নিয়ে। আর, পঞ্জাবী কলাকেন্দ্রে দেখা গেল পঞ্জাবের লোকনৃত্য, শোনা গেল লোকসঙ্গীত। সে সঙ্গীতের ভাষা সকলের বোধগম্য না হলেও তার সুর মর্মস্পর্শ করেছিল। সকল সংস্কৃতিরই মূল লোকসাধারণের মধ্যে নিহিত।

প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন অনেক নারী ও পুরুষ-কবি। তাঁদের নিয়ে এক সন্ধ্যায় বসেছিল মুশায়েরার আসর। তাঁদের কবিতার বিবিধ ভাষা, বিবিধ ছন্দ, বিবিধ ভাব। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সেই বহু ভাষাভাষী শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই ভাষার বেষ্টনী ভেদ করে সে সকল কবিতার মর্মলোকে প্রবেশ করতে পারেন নি। তবুও তাঁরা প্রতি কবিতার শেষে যথারীতি করতালি দিয়ে সকলে কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।

এই মহাসম্মেলন কতকটা বিশেষ সামাজিক মেলামেশার রূপও ধারণ করেছিল। এই মহাসম্মেলনে বাংলার যোগ্য প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল কিনা এ প্রশ্নের আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন ও বাংলার পক্ষে কথা বলেছিলেন তাঁরা বাংলার মর্যাদা হানি করেন নি বরং বৃদ্ধিই করেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সমগ্র পৃথিবীর লেখক-সমাজ, রাজনীতিকেরাও ভারতের এই মহাসম্মেলনের দিকে তাকিয়েছিলেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে বহু বাধা ও অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। এমন একটি বেসরকারী মহাসম্মেলন ত্রুটিহীন হতে পারে না। তবুও উদ্যোক্তাগণের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এতে আর সন্দেহ নেই। এটি আমাদের ভারতেরও পরম গৌরবের বিষয়। আগামীবারে মহাচীনে বা ব্রহ্মদেশে, এশিয়ার যে কোন অংশেই আরও সুষ্ঠুভাবে লেখক সম্মেলন হোক, কিন্তু আমাদের ভারতই এই মহৎ কর্মে অগ্রপথিকের সম্মানের অধিকারী হয়ে রইল। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে, ভারতে বিশ্ব-লেখক সম্মেলনও হতে পারে। সে শুভদিন আসুক।

কৃষি ও শিল্প-কথা

শ্রীশরৎচন্দ্র সেন

ধান, গম, কড়াই, সরিষা, আলু, চিনাবাদাম, ইক্ষু, চা ও পাট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে দেশবাসী ও কর্মীরা সমৃদ্ধিলাভ করেন এবং সেবাধর্ম্ম পালন করিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন হয় জমিতে উন্নত ধরনের সার দ্বারা কৃষি-কার্য্য সম্পাদন এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিল্প উন্নয়নের জন্য বৃক্ষ-রোপণ।

কৃষি-সার

কৃষি-জমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হইলে জমিতে কয়েক প্রকার দূষিত বীজাণু ও নানারূপ আগাছা ইত্যাদি জন্মিয়া ধান্য ও অপরাপর শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে, ফলে ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। এ কারণ কৃষি-জমিতে চাষের কিছু পূর্ব্বে স্বল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে সহজলভ্য "বাবলা বৃক্ষের" কাঁচা পাকা পড়া ও শুকনা পাতা ও ফুল, প্রতি বিঘা জমিতে ন্যূনপক্ষে দশ সের ও শুকনা "গোবর গুঁড়া" দশ সের এবং "ফসফেটযুক্ত ক্যালসিয়াম সার" দশ সের (যাহা স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক প্রথায় কেবলমাত্র বাংলা দেশেই প্রস্তুত হইতেছে) একত্রে মিশাইয়া জমিতে ছড়াইয়া দিয়া জল দিয়া রাখিতে হয়। পরে যথামত চাষ করিলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অনিষ্টকারী জীবাণু ও আগাছা ইত্যাদি জন্মাইতে পারে না। ধান্য ও শস্যগাছগুলি সবল, সুস্থ ও পূর্ণ ফলন্ত হয় এবং শস্যগুলি পরিপুষ্ট হইয়া সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। অবশ্য ফলন উপযুক্ত বীজের উপর নির্ভর করে। লেখক বহু পরীক্ষার পর ধান্য ও শস্যচাষের জমিতে উক্ত সার ব্যবহার করিয়া আশাতীত সুফল লাভ করিয়াছেন।

বাবলাবৃক্ষ

কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য কৃষি-জমির সীমানার ধারে অথবা সুবিধামত স্থানে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে প্রতি বৎসরে জমির সার হিসাবে পাতা ও ফুল পাওয়া যায়, গাছের ছাল ও কাঁটা বহু কার্য্যে প্রয়োজন হয় এবং গাছের কচি পাতা দুর্ব্বল গবাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাবলাগাছের সরু ডালের দাঁতন (ব্রাশের পরিবর্ত্তে) প্রত্যহ ব্যবহার করিলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। ইহার নিয়মিত ব্যবহারে পাইওরিয়া রোগে সুফল পাওয়া যায়। বাবলাবৃক্ষের পাতা, ফুল ফল এবং ছাল একত্রে পরিমাণমত জলে নিয়মিত ভাবে সিদ্ধ করিলে একরূপ কালো 'কষ' বাহির হয়, এই কষ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ও সংমিশ্রণে উত্তম স্থায়ী লিখিবার কালি ও ফাউণ্টেন পেনের কালি প্রস্তুত হয়। এই কষ রেল লাইনের কাঠের স্লিপার ও অন্যান্য কার্য্যে, নৌকার পাল এবং দাঁড়, পালিশে, কাঁচা ইট দিতে এবং মৎস্য ধরিবার জাল, ধুনী, আটচালা, গোলা ইত্যাদিতে ব্যবহার করিলে বহুদিন স্থায়ী হয় ও জল, রৌদ্র, বৃষ্টিতে শীঘ্র পচিয়া যায় না এবং উই বা অন্য কোন পোকার দ্বারা নষ্ট হয় না। বাবলাবৃক্ষের পরিপক্ব কাষ্ঠ পরিমাণমত ভারী শক্ত, মজবুত ও মসৃণ হয় এবং ইহা উই বা অন্য কোন পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এ কারণ এই কাঠে লাঙ্গল, গাড়ীর চাকা, চরকা, তাঁত ও সরঞ্জাম, বেলন, ইত্যাদি এবং কোদাল, কুড়ুল, দা, হাতুড়ি, বাটালি, গাঁইতি ও শোভেল ইত্যাদির বাঁট বা হাতল এমন কি বন্দুকের কুঁদা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যবহার করা যায়। এই সহজপ্রাপ্য কাঠ হইতে কল কারখানা ও সামরিকের প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার হাতল বাঁট, মুগুর ইত্যাদি তৈয়ারি করিলে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থান হয়।

বাবলাবৃক্ষের প্রবল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি থাকায় প্রকৃতির নিয়মে নিকটস্থ জমিতে প্রয়োজনমত বৃষ্টিপাত হয়। এ কারণ এই বৃক্ষ ধান্য ও শস্য-চাষের জমির পক্ষে বিশেষ হিতকারী ও সুফলপ্রদ। জমির নিকটস্থ এই সব কাঁটাযুক্ত ও বীজাণুনাশক গাছের সাহায্যে ফসল নষ্টকারী পোকা, মাকড় ইত্যাদি, এমন কি পঙ্গপালের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই গাছের পাতার রসের সাহায্যে পুকুর, খানা, ডোবা ইত্যাদির বদ্ধ বীজাণুপূর্ণ দূষিত জল পরিষ্কৃত হয় এবং গাছের নীচস্থ জমির বিষাক্ত জীবাণু নষ্ট হইয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়।
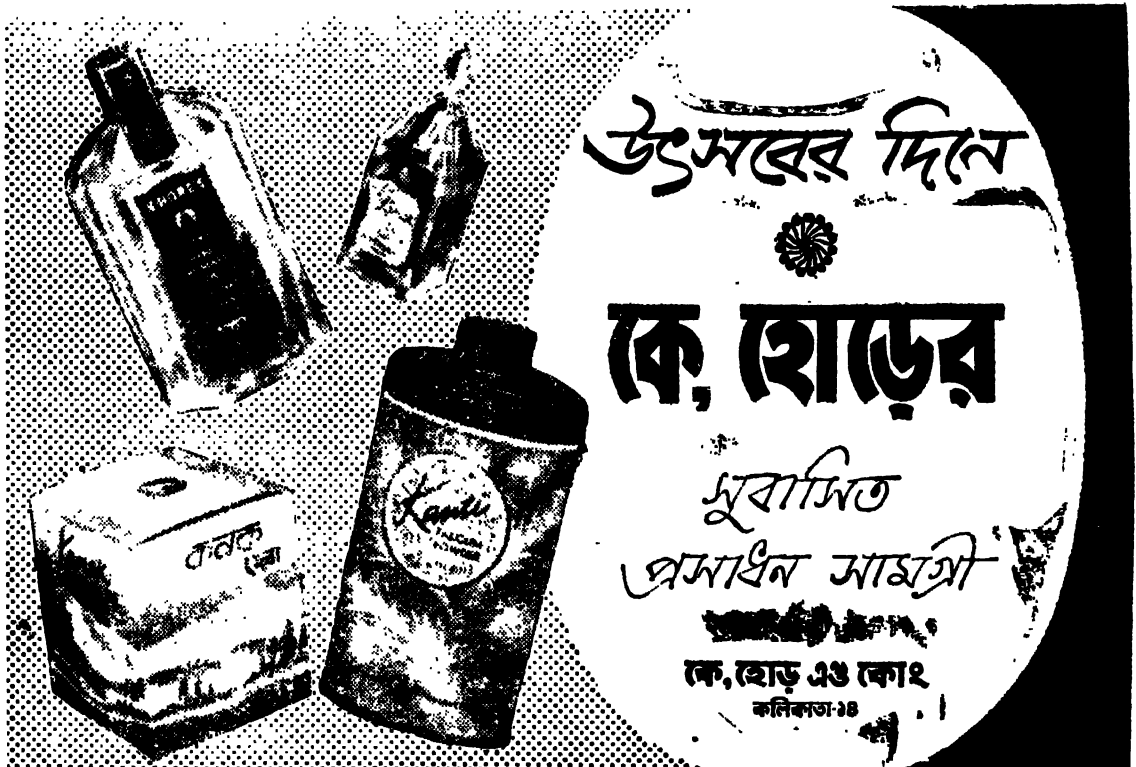
নদী, খাল, বিল, জলাশয় ও জলধারার বাঁধের ধারে ধারে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করিলে উহার পাতা ফুল ও ফল নীচে পড়িয়া পচিয়া যায়। ইহা হইতে যে রস বাহির হয় সেই রসের সাহায্যে বালি বা কাঁকর মিশ্রিত আলগা মাটির বাঁধ বা পাড় দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, বৃক্ষের শক্ত শিকড়গুলি বহুদূরপ্রসারিত হইয়া চারি ধারের মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এ কারণ প্রবল বর্ষায় বা বন্যায় বাঁধ, পাড় কিংবা গ্রাম্য সরু অথবা বড়

রাস্তা সহজে বিধ্বস্ত হয় না। বৃক্ষগুলি বেশী উচ্চ হয় না, একারণ ভীষণ ঝড়ে বা বজ্রপাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য হঠাৎ মাঠের মধ্যে প্রয়োজন হইলে পথচারী বা কর্ম্মরত সেবকবৃন্দ সাময়িক আশ্রয়-স্থল রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। এ বৎসর প্রবল বর্ষায় ও বন্যায় সুন্দরবন এলাকায় এবং অন্যান্য স্থানে মাটির বাঁধ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ঐ সকল বাঁধের দুই পার্শ্বে ঘনভাবে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য ব্যয় হয় অতি সামান্য এবং সহজে নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। ভবিষ্যতে গাছ পরিণত হইলে বহু বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভারতের যে সকল স্থান ক্রমান্বয়ে মরুভূমিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে সেই সকল স্থানে বাবলাবৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। [illegible] পাতা, ফল ও ফুলের [illegible] মরুভূমির [illegible] ক্রমান্বয়ে মিশ্রিত মাটিতে পরিণত হইয়া কৃষি-উপযোগী হয়। এরূপ বৃক্ষ ঐ সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে জন্মাইতে দেখা যায়। অদূর ভবিষ্যতে বাবলাবৃক্ষ ভারতীয় মূল্যবান বনজ সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে।

দেশবাসীর অবগতির জন্য নিবেদন এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলা দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণের যৌথ মূলধনে বাবলা ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামীয় প্রতিষ্ঠান—আধুনিক প্রথায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহৎ বৈদ্যুতিক ও বাষ্পযন্ত্র চালিত কারখানার প্রস্তুতি চলিতেছে। শীঘ্রই গণসেবার জন্য উৎপাদন ও পরিবেশন হইবে বাবলা-নির্য্যাস, বাবলা (মিশ্রিত, তরল রং ও বাবলা (মিশ্রিত) সার, ফসফরাস-যুক্ত ক্যালসিয়াম সার এবং বাবলা কাষ্ঠনির্ম্মিত লাঙ্গল, চরকা, তাঁত মাকু, বাক্স, চাকা হুইল, পুলি, মুগুর হাতল, বাঁট ইত্যাদি দ্বারা বহু লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

কেমন আছি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাটছে দারুণ শীতের রাত্তি, কষ্টে ছিটে-বেড়ার ঘরে,
'ঋষিকেশের' 'ধারি'তে সব সাধুর বসত মনে পড়ে।
সাধুর মত মন পেলে তো? এ পর্ণবাস কাম্য বড়—
মন রে আমার হিমের রাতে 'অমরনাথের' দেউল গাড়ো।
শীত তো শুধু ভোগায় নাকো, আনে কতই ত্যাগের কথা,
'সুরভি আশ্রমের' সুধা, 'দ্রোণাচার্যের' পবিত্রতা।
নিশির শেষে ধোঁয়ায় অজয়, সিঁদুর মেখে ওঠেন রবি—
আমি যে এই পল্লীবাসে, কল্পবাসের তৃপ্তি লভি।

২

শুনেছিলাম ভূমণ্ডলের স্থল বেশী নয়, তিন ভাগই জল,
দেখতে পেলাম ন ভাগ সলিল, কোন্ খানেতে দাঁড়াই
মা বল?
বন্যা নিলে অনেক কিছু-নিত আরও অধিক পেলে,
কিন্তু প্রচুর গান দিয়েছে বিহগগণের কণ্ঠে ঢেলে।
ভোর থেকে জোর জমায় আসর কাঁসর বাজায় লোচন পাটে
যোগ দিয়েছে কোকিল এবং টাকুসোনাও সে কনসার্টে।
মাধবীতে ফুলের স্তবক—অজস্রতা চক্ষে পড়ে—
এবং দরিদ্রতা যা দেখি তা নরের ঘরে।

৩

শীত পড়েছে শীত বেড়েছে, তবু দেখি সরিষে শীতে—
দিচ্ছে উঁকি শ্যামল শাখায় আমের কনক মঞ্জরীতে।
বাল্যে ডাকা সে চাঁদ সাঁঝে মোর ললাটে পরায় টিকা,
বিরাজ করেন কুটীর ঘিরে বিশাল কেদার বদরিকা।
কুবের শুধান 'রত্নরাজি এলাম দিতে নেবেন কি গো?'
আমি বলি 'যান ফিরে যান ও সব রাখার ঠাঁই নাহি কো।
পেয়েছি যা তাহাই বেশী—আমি পাবার যোগ্য যাহা,
ঘুঁয়ের বুকে ডাঁসের মধু কেমন করে ধরবে আহা।

৪

রাজপ্রাসাদে দিন কেটেছে, কেটেছে রাত তরুর তলে,
কোথায় বেশী ভাল ছিলাম? শেষেই ভাল মন যে বলে।
দেয় না ব্যথা, গ্রীষ্ম আতপ অতি দারুণ বর্ষা শীতে—
ভুলায় মোরে, ভোলে নি যে পাখীর গায়ে পালক দিতে।
দুঃখ আমায় প্রচুর দিলে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা,
শান্তি এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে সেই মহামনা।
অভাব বহু নীরব রহি—চাইতে আমার লজ্জা করে,
মহামায়ার স্তন্যধারা লেগে আছে এই অধরে।

৫

কথাতে আর গরল নাহি—কথার ভয়ে হইলে ভীত,
সকল কথাই আমার কাছে হয়েছে আজ কথামৃত।
নিন্দা যাঁরা করেন আমার—করেন না তা বন্ধু বিনে,
ধুলায় ধূসর যে জন তারে ধুলা দেওয়া স্নেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর— লই না—কারণ বিফল নেওয়া,
ন্যাংটা নাগা-সন্ন্যাসীকে পরিধানের বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখবো কোথা? ক্ষুদ্র কণায় আছি টিকে,
রে ভাই ময়ূরপুচ্ছ দিতে এসো না এ টুনটুনিকে।

৬

কাঁপে আমার পর্ণপ্রাসাদ, বৃষ্টি পড়ে, ঝড়ও বহে—
ডাকি কোথায় হে জগদীশ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে।
সে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে সন্দেহ মোর নাইক কোনো
পাই গরুড়ের পাখার হাওয়া—ঘোরে যেন সুদর্শনও।
দর্শনীয়ের দর্শনেতে আনন্দে হই আত্মহারা,
কুশল শুধান যেন এসে যুগের যুগের মহাত্মারা।
পঙ্কজের এ পঙ্কগৃহে, রাত্রে মরি দিনে বাঁচি
আমার মা আনন্দময়ী—দুখেই পরম সুখে আছি।
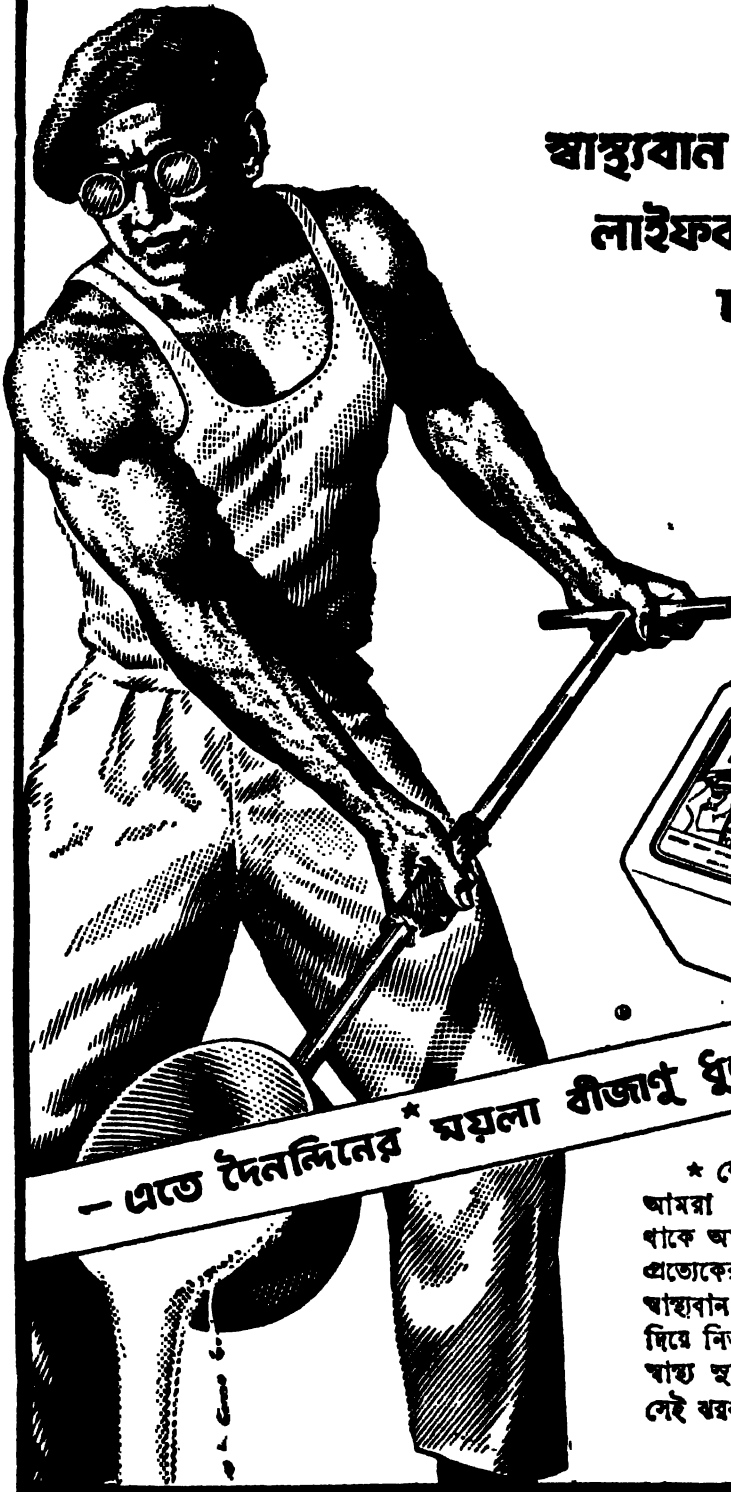
স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে –
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
– এতে দৈনন্দিনের * ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

সুভাষিতাবলী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্যের সুভাষিত গ্রন্থের আদিকাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। তবে এই শ্রেণীর এই পর্যন্ত যত গ্রন্থ পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়। এই গ্রন্থের লেখক বা সংগ্রাহকের নাম পাওয়া যায় নি। তার পর এই শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে জহ্লণের সূক্তি-মুক্তাবলী, শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, শ্রীধরদাসের সদুক্তি-কর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী গ্রন্থ অতি উপাদেয়। এ সব গ্রন্থের পরবর্তী যুগের গ্রন্থ হচ্ছে পদ্যবেণী, পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী, সূক্তি-সুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ। এ শেষোক্ত গ্রন্থগুলি মুসলমান রাজত্ব-সময়ে রচিত হয়েছে এবং এই সব গ্রন্থে মুসলমান রাজগণের বিষয়ে বিশেষ উল্লেখাদি দৃষ্ট হয়। কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ের রচনা-সময় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সুভাষিত গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে। তার পরবর্তী রচনাসমূহ বেশীর ভাগ উক্ত গ্রন্থসমূহের কবিতার চয়ন মাত্র—সংগ্রাহকদের কয়েকটি কবিতা ব্যতীত তাতে নবীনতা বিশেষ কিছুই নাই—যেমন পূর্ণচন্দ্র দের উদ্ভটসাগর। অন্য দিকে—সুভাষিত-সার-সংগ্রহ, সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার, সুভাষিত-সুধা-ভাণ্ডাগার প্রভৃতি অত্যাধুনিক গ্রন্থসমূহ একেবারে নিছক সঙ্কলন মাত্র—এতে নূতনত্ব বা সরসতা কিছুই নেই—যদিও পদ্যসংগ্রহরূপে এই সকল গ্রন্থ সুখপাঠ্য এবং বিশেষ সংরক্ষণযোগ্য।

বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী গ্রন্থ ৩৫২৭টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রারম্ভিক শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে কবি প্রথমটিতে দেবী ভবানীকে জানিয়েছেন স্তুতি—

তাং ভবানীং ভবানীত-ক্লেশনাশ-বিশারদাম্।
শারদাং শারদাম্ভোদসিতসিংহাসনাং স্তুমঃ॥

এবং দ্বিতীয়টিতে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষের জন্য তিনি আকূতি নিবেদন করেছেন—

অনপেক্ষিতগুরুবচনা সর্বান্ গ্রন্থীন্ বিভেদয়তি সম্যক্।
প্রকটয়তি পররহস্যং বিমর্শশক্তির্নিজা জয়তি॥

তার পর যথাক্রমে নমস্কার, আশীর্বচন ও বক্রোক্তি—পদ্ধতি। অতঃপর কবি-কাব্য প্রশংসা। এই পদ্ধতিতে ভট্টনারায়ণের একটি শ্লোকে খলজনের কাব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—

ক দোষোঽত্র ময়া লভ্য ইতি সংচিন্ত্য চেতসা॥
খলঃ কাব্যেষু সাধূনাং শ্রবণায় প্রবর্ততে॥৪১

শ্লেষমুখে বাক্যস্ফূর্তির সঙ্গে মনোভিরামা গৃহিণীর তুলনা করেছেন ভট্ট ত্রিবিক্রম—

প্রসন্নাঃ কান্তিহারিণ্যো নানাশ্লেষ-বিচক্ষণাঃ।
ভবন্তু কস্যচিৎ পুণ্যৈ র্মুখে বাচো গৃহে স্ত্রিয়ঃ॥

দুটি অতি মনোরম শ্লোকে কাশ্মীরক কবি বিহ্লণ কোনও রাজাকে সংবোধন করে বলছেন যে সম্মান অতি নিরহঙ্কার ভাবে জ্ঞাপন করা উচিত রাজাদের কবিগণকে—কারণ, তাঁরাই রাজাদের অমর করে রাখেন যশোগাথার মাধ্যমে—

স্বেচ্ছাভঙ্গুর-ভাগ্য-মেঘতাড়িতঃ শক্যা ন রোদ্ধুং শ্রিয়ঃ
প্রাণানাং সততঃ প্রয়াণ-পটহ-শ্রদ্ধা ন বিশ্রাম্যতি।
ত্রাণং যেঽত্র যশোময়ে বপুষি বঃ কুর্বন্তি কাব্যামৃতৈ-
স্তানারাধ্যপদে বিধত্ত সুকবীন্ নির্গর্বমুর্বীশ্বরাঃ॥১৬৬

আরও অগ্রসর হয়ে এই অমর কবি রাজাকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন—কবিরাই ত রামকে রাম সাজিয়েছেন, দশানন রাবণকে করে তুলেছেন হাস্যাস্পদ। কাজেই রাজারা কবিদের রুষ্ট করলে তাঁদের সমূহ বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী—

হে রাজানস্ত্যজত সুকবিপ্রেমবন্ধে বিরোধং
শুদ্ধা কীর্তিঃ স্ফুরতি ভবতাং নূনমেতৎপ্রসাদাৎ।
তুষ্টৈর্বদ্ধং তদলঘু রঘুস্বামিনঃ সচ্চরিত্রং
রুষ্টৈর্নীতস্ত্রিভুবনজয়ী হাস্যমার্গং দশাস্যঃ॥
এতৌ ভট্টশ্রীবিহ্লণস্য॥১৬৭

সুজন ও দুর্জন পদ্ধতিতে কবি অনেক মণিরত্ন সংগ্রথিত করেছেন। দুটি শ্লোকে দুর্জনের স্বভাব অতি সুন্দরভাবে উদ্দিষ্ট হয়েছে। একটিতে কবি বলছেন—দুর্জনের স্বভাব ও শ্লেষ্মার স্বভাব এক প্রকারের—মধুরেতে এরা কুপিত হয় এবং কটুতে এদের উপশম ঘটে—

অহো প্রকৃতিসাদৃশ্যং শ্লেষ্মণো দুর্জনস্য চ।
মধুরৈঃ কোপমায়াতি কটুকৈরুপশাম্যতি॥

অন্যটিতে কবি বলছেন—গজেন্দ্র ছায়ালাভের জন্য বৃক্ষের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিশ্রাম গ্রহণের পর গাছটিকে ভেঙে দিয়ে যায়। নীচ জনের স্বভাবই এই—

যথা গজপতিঃ শ্রান্তশ্ছায়ার্থী বৃক্ষমাশ্রিতঃ।
বিশ্রম্য তং দ্রুমং হন্তি তথা নীচঃ স্বমাশ্রয়ম্॥৩৫৪

পুনরায় তত্র পৃথ্বীধর দুটি শ্লোকে খল লোকের কি অপূর্ব চিত্রই না ফুটিয়ে তুলেছেন—

> কা খলেন সহ স্পর্ধা সজ্জনস্যাভিমানিনঃ।
> ভাষণং ভীষণং সাধুদূষণং যস্য ভূষণম্ ॥
> নির্মায় খলজিহ্বাগ্রং সর্বপ্রাণহরং নৃণাম্।
> চকার কিং বৃথা শস্ত্রবিষবহ্নীন্ প্রজাপতিঃ ॥৩৭৬

কদর্যপদ্ধতির একটি শ্লোকে কোনও কবি বলছেন—

> তে মূর্খতরা লোকে যেষাং ধনমস্তি নাস্তি চ ত্যাগঃ।
> কেবল-মর্জন-রক্ষণবিয়োগদুঃখান্যনুভবন্তি ॥৪৮৩

অর্থাৎ কৃপণেরা সত্যি কতই না দুঃখী, যারা অর্থ থাকতেও তা ব্যয় করতে জানে না—তাদের অর্জন, রক্ষণ ও ব্যয়ের কষ্টই মাত্র সম্বল।

অন্যাপদেশ-পদ্ধতিসমূহে কোনও কোনও পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে নিয়ে উপদেশবাক্য সংগ্রথিত হয়েছে। ধর্মদেব তাঁর একটি শ্লোকে পদ্মকে সংবোধন করে বলছেন—

> পদ্মাদয়ো বহুগুণা অপি যন্নিশাসু
> নাশং ন যান্তি বিরহেণ দিবাকরস্য।
> তৎপঙ্ক-সঙ্কট-জলাশয়-জন্ম জাড্য-
> জ্যায়ো বিজৃম্ভিতমিদং ত্রিজগৎপ্রতীতম্ ॥৯২৫

অর্থাৎ, ত্রিজগৎ জানে কেন বহুগুণযুক্ত হয়েও পদ্মাদি রাত্রে সূর্যের বিরহে বিনষ্ট হয় না। কবি বলছেন—এর কারণ—পদ্মাদির জন্মস্থান কর্দমপরিপূর্ণ পুকুর এবং তজ্জন্য এদের জন্ম থেকেই অনেকটা জড়তা এদের আশ্রয় করে থাকে।

শৃঙ্গার পদ্ধতিতে নারীকবি মোরিকা কোনও একটি অল্পবয়স্কা প্রিয়ার বিষয়ে প্রিয়কে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, তার প্রিয়া ত প্রিয়গৃহে আসতে না আসতেই—"প্রাপ্নোতি নিষ্ঠাং পরাম্"। মোরিকার চিত্রণে আর একজন প্রিয়কে দেখতে পাই—যিনি অত্যন্ত দুঃখ করছেন যে, অঝোর অশ্রু-বিসর্জনকারিণী প্রিয়াকে ছেড়ে অর্থ অর্জনের জন্য প্রিয়কে যেতে হয় বিদেশে—এর চেয়ে মর্মন্তুদ আর কিছুই হতে পারে না। প্রাণসমা প্রিয়ার কাছে যে কথা মুখ ফুটে বলা যায় না, সেটি কাজে করতে হয়—প্রিয়াকে ছেড়ে বিদেশে যেতেই হয়—এর চেয়ে চরমতম দুঃখ মানুষের আর কি হতে পারে?—

> যামীত্যধ্যবসায় এব হৃদয়ে বধ্নাতু নামাস্পদং
> বক্তুং প্রাণসমাসমক্ষমঘৃণেনৈষঃ কথং পার্যতে।
> উক্তং নাম তথাপি নির্ভরগলদ্বাষ্পং প্রিয়ায়া মুখং
> দৃষ্টাঽপি প্রবসন্ত্যহো ধনলবপ্রাপ্তিস্পৃহা মাদৃশাম্ ॥১০৫০

প্রিয়ার বিরহিণী অবস্থা বর্ণন করে পুনরায় মোরিকা বলছেন—

> লিখতি ন গণয়তি রেখাং নির্ঝরবাষ্পাম্বুধৌত-গণ্ডতটা।
> অবধিদিবসাবসানং মা ভূদিতি শঙ্কিতা বালা ॥১০৭২

বিরহিণী প্রিয়া ভূমিতে রেখা অঙ্কিত করে রেখেছে; কিন্তু কত দিন গেল, তা আর গুনে দেখছে না—পাছে ফিরে আসবার দিন আরও দূরে সরে যায়।

বিরহিণী প্রলাপপদ্ধতিতে একটি কবিতায় নারীকবি-কুলশিরোমণি বিজ্জা বা বিজ্জকা বা বিদ্যা বলছেন—

> গতে প্রেমাবন্ধে হৃদয়বাহুমানেঽপি গলিতে
> নিবৃত্তে সদ্ভাবে জন ইব জনে গচ্ছতি পুরঃ।
> তথা চৈবোৎপ্রেক্ষ্য প্রিয়সখি গতাংস্তাংশ্চ দিবসান্
> ন জানে কো হেতুর্দলতি শতধা যন্ন হৃদয়ম্ ॥১১৪১

প্রেমবন্ধন নষ্ট হয়ে গেল; হৃদয়ের প্রচণ্ড মান গলে ধুয়ে মুছে গেল; সদ্ভাবের হ'ল নিবৃত্তি। প্রেমাস্পদ সাধারণ লোকের মত সামনে দিয়ে যায় চলে। তথাপি—কি জানি যেন সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়; প্রিয় সখি! কত কথা যে ভাবি। না জানি কেন হৃদয় শত শত টুকরা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে যায়।

এই মহীয়সী নারী কবিই একদিন বলেছিলেন—

> নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মামজানতা।
> বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্লা সরস্বতী ॥

আমি নীলোৎপলদলের মত শ্যামবর্ণা সরস্বতী; আমাকে না জেনেই দণ্ডী কবি বৃথা বলেছেন—সরস্বতী সর্বশুক্লা।

> দূতি ত্বং তরুণী যুবা স চপলঃ শ্যামাস্তমোভির্দিশঃ
> সংদেশঃ সরহস্য এব বিপিনে সংকেতাবাসকঃ।
> ভূয়ো ভূয় ইমে বসন্ত-মরুতশ্চেতো নয়ন্ত্যন্যতো
> গচ্ছ ক্ষেমসমাগমমায় নিপুণং রক্ষন্তু তে দেবতাঃ ॥

এই কবিতাটি শীলাভট্টারিকার রচিত এবং বল্লভদেব উদ্ধৃত করেছেন দূতীপ্রেষণ অধ্যায়। এখানে নায়িকার মনের সন্দেহ—এমনকি স্বীয় দূতীর প্রতিও নারী-চিত্তের সন্দিগ্ধ আকুলতা—কবি শীলাভট্টারিকার অঙ্কনে বিশেষ করে ফুটে উঠেছে।

নারীকবি মারুলার একটি সুন্দর শ্লোকে বিরহীর চিত্র সুন্দর অঙ্কিত হয়েছে। প্রিয় প্রিয়াকে বলছেন—তুমি কৃশা হয়ে গেছ কেন? প্রিয়ার উত্তর—কৃশতা আমার শরীরের ধর্ম। তুমি মলপরিবৃতা কেন? গুরুজনের গৃহে পাচকতা করছি বলে। আমাকে কখনও মনে পড়ে কি? না, না, না—এই কথা বলতে বলতে কম্পমানা প্রিয়া আমার বক্ষে পড়ে কাঁদতে লাগল।

> "কৃশা কেনাসি ত্বং প্রকৃতিরিয়মঙ্গস্য ননু মে
> মলাধূম্রা কস্মাদ্ গুরুজনগৃহে পাচকতয়া।
> স্মরস্যস্মাৎ কচ্চিন্নহি নহি নহীত্যেবমগম-
> ৎস্মরোৎকম্পং বালা মম হৃদি নিপত্য প্ররুদিতা ॥"

সূর্যাস্ত বর্ণন করতে গিয়ে নারীকবি ইন্দুলেখা বলছেন—

একে বারিনিধৌ প্রবেশমপরে লোকান্তরালোকনং
কেচিৎ পাবকযোগিতাং নিজগদুঃ ক্ষীণেহহ্নি চণ্ডার্চিষঃ।
মিথ্যা চৈতদসাক্ষিকং প্রিয়সখি প্রত্যক্ষতীব্রাতপং
মন্যেহহং পুনরধ্বনীনরমণীচেতোহধিশেতে রবিঃ ॥১৯০২

অর্থাৎ, কেউ কেউ বলেন, সূর্য অস্ত গমনের পর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হন ; কেউ বা বলেন তিনি পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে যান ; আবার কেউ বা বলেন—সূর্যদেব দিন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যাবাতির আগুনের সঙ্গে মিশে যান। কিন্তু হে প্রিয় সখি ! এই সমস্ত কথা মিথ্যা। সত্য হচ্ছে এই—সূর্যদেব অস্তগমনের পরে যত বিরহিণীগণের উত্তপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন।

এই ভাবে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সুভাষিতাবলীতে জ্ঞানের উদ্দীপ্ত প্রকাশ, কবিত্বের অপূর্ব স্ফুরণ, ভাবের উল্লাস—অনবদ্য মাধুর্য দৃষ্ট হয়। কবি সত্যই বলেছিলেন—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ ॥

সংসার-বিষবৃক্ষের অন্যতম রসবৎফল এই যে কাব্যামৃত রসাস্বাদ, তার প্রকৃষ্ট উপকরণ যিনি আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন, সেই বল্লভদেবকে আমরা বিংশ শতাব্দীর ভক্ত-পূজারী দল কোটী কোটী প্রণতি জ্ঞাপন করি।

প্রেমের নব ধারাপাত

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

কে জানে কোন্ তমালতলে মুখর হ'ল কেকা
কোথায় রামগিরি !
এসেছে দূত শ্যামল ছায়ে, কাজল নীল লেখা
তাই ত একা ফিরি।
এইখানে এই বেঞ্চি ভিজে, কৃষ্ণচূড়ার শাখা।
বলাকা-বেলা মেলেছে, বুলু, সুরেলা স্মৃতি-পাখা।
হঠাৎ আমার মনের বনে এলো কুঁড়ির কাল
মুখর বোবা ডাল,
চমকে উঠে স্বপ্নে-দেখা সোনার হরিণপাল
গন্ধে বেসামাল।
ঘরের মানা কেই বা শোনে, রয় কে কাজের ভিড়ে !
তোমার হাতে ধরা দিতে এলেম লেকের তীরে।
আপন মনে কেয়ার কোণে মরছে ওরা বকি'
ফুরায় না সে কথা ;
দু'এক ফোঁটা ফুলকি ঝরায় চোখের চকমকি
তাই নিদারুণ ব্যথা
তারুণ্যেরে করলে না যে ঊর্ণনাভের বোনা ;
ওরা প্রেমের পাঠশালাতে করছে আনাগোনা।

কোন্ আগুনের বার্তা জানায় বিদ্যুৎ বুক চিরে
বনের মনোহর !
ঢেউয়ের পরে ঢেউ শুধালো ইতিহাসের তীরে
প্রশ্ন নিরুত্তর।
পায়ের ছায়ায় অন্ধকারে ঝিল্লী-কলরোলে
অলক্ষ্য কোন্ যক্ষবধূর বক্ষ-দুয়ার খোলে।
পরশ-পাওয়ার তরাস লাগে মোর কিশলয় আশায়
বইছে কেমন হাওয়া,
এমন সহজ ভেবেছিলেম তোমার চিঠির ভাষায়
তাই ত এ তাপ পাওয়া।
শুনি পায়ের ধ্বনি বাজে কানায় কানায় দুখে
সৌরভে ফুল উঠছে কেঁদে, বাঁধন টুটে বুকে।
এইখানে এই বেঞ্চি ভিজে, কৃষ্ণচূড়ার শাখা
করছে হাহুতাশ।
গুনগুনিয়ে গানের কলি হাতে হৃদয়-রাখা
তৃষার ব্যর্থ আশ।
অতল কালো চোখের চিঠির নীল আলোকের লেখায়
সেই অপরূপ ব্যথা, বুলু রূপকথা তার শেখায়।
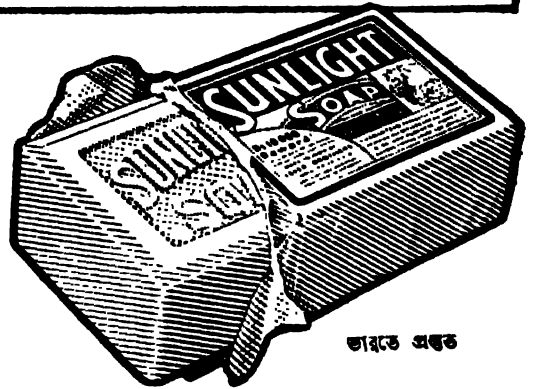
আলোচনা

"নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে?"

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ "নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক কে?" নিবন্ধে লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম তাঁর দীনবন্ধু জীবনীতে মাইকেল মধুসূদনকে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক বলেন, অথচ মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কেউই কোথাও এ-কথার উল্লেখ করেন নি। পুনশ্চ ললিতচন্দ্র মিত্র নাকি মন্মথবাবুকে বলেন, মূল পাণ্ডুলিপিতে 'মধুসূদন নীলদর্পণের অনুবাদক' একথা ছিল না। পরে খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ঐ অংশটি বসিয়ে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপিতে মধুসূদনের অনুবাদের কথা টি যে সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা, এর সমর্থনে মন্মথবাবু নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। নগেনবাবু লিখেছেন, "সঞ্জীবচন্দ্র স্বহস্তে মধুসূদনের অনুবাদের কথা উক্ত গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন।" এখন এ সম্পর্কে বক্তব্য এই—ললিতবাবু মন্মথবাবুর কাছে মুখে যাই বলুন না কেন, তিনি তাঁর "History of Indigo Disturbanees in Bengal" নামক গ্রন্থে নিজেই লিখেছেন—'The Reverend James Long took upon himself the task of having the drama translated in English, to open the eyes of the Government and the English community. The actual translation was made by the immortal poet of the 'Meghnadbadh'—Michael Madhusudan Dutt. The translation was hurried through a night.…In spite of all, the translation did not fail to prescnt a glimpse of the original to English readers.'

এখানে দেখা যাচ্ছে, মধুসূদনই যে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক একথা ললিতবাবুও স্বীকার করেছেন। আর শুধু তাই নয়, মধুসূদন কি ভাবে একরাত্রির মধ্যে অনুবাদ করেছিলেন, ললিতবাবু তারও উল্লেখ করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের রামাপুকুরস্থ বাসভবনে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন একরাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণে'র অনুবাদকার্য্য সমাধান করেন। একজন নীলদর্পণ পাঠ করিয়া যাইতেছেন, আর মধুসূদন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর অবিরত লেখনী সঞ্চালনে ইংরেজীতে উহা ভাষান্তরিত করিয়া যাইতেছেন।"

মধুসূদন যে তারকনাথ ঘোষের বাড়ীতে বসে নীলদর্পণের অনুবাদ করেছিলেন, একথা নগেনবাবু তারকনাথ ঘোষের বাড়ীতেই শুনেছিলেন। অতএব নগেনবাবুর লেখা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, মধুসূদনই নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপিতে সঞ্জীবচন্দ্রের লিখে দেওয়ার কথা। এ সম্পর্কে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার উপর সঞ্জীবচন্দ্র লিখতে যাবেনই বা কেন? দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রাণতুল্য' বন্ধু ছিলেন, মধুসূদনের সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের কারও কাছ থেকে জেনে নিজেও ত লিখতে পারেন! আর সঞ্জীবচন্দ্র যদিও বা লিখে দিয়েই থাকেন, তা হলেও কথাটা সত্য না হলে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই তা স্বীকার করে নিতেন না। দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় সতর বৎসর বেঁচেছিলেন। এর মধ্যেও যদি তিনি মাইকেলের অনুবাদের কথা সত্য নয় বলে জানতে পারতেন, তা হলে নিশ্চয়ই তা সংশোধন করে দিতেন।

মন্মথবাবু বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশিত হলে গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি নিশ্চয়ই তা পড়েছিলেন, এবং মধুসূদনের অনুবাদের কথাটা সত্য নয় বলেই, তাঁরা তাঁদের স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে—মধুসূদনের বন্ধুরা দীনবন্ধু-জীবনী পড়ে যখন দেখলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন সম্বন্ধে এত বড় একটা অসত্য কথা লিখেছেন, তখন তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে এ সম্পর্কে কিছুই বললেন না! আর এ কথাও অন্ততঃ বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি যদি বঙ্কিমচন্দ্রকে মধুসূদনের অনুবাদের কথা সত্য নয় বলে জানাতেন তা হলে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁর লেখায় ও কথার সংশোধন করে দিতেন।

দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও গৌরদাস বসাক উভয়ে একই সময়ে হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট

LUX
TOILET SOAP
LUX
LUX
TOILET SOAP
প্রণতি ঘোষ লাক্স টয়লেট
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন
"এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা
প্রমাণ করে!"
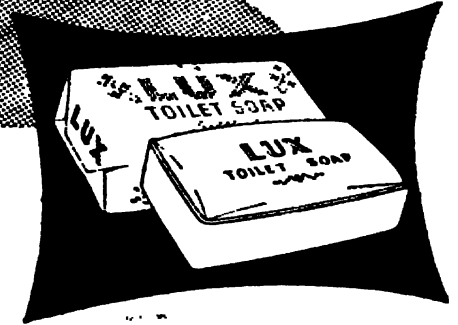
ছিলেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল এবং টিফিনের সময় কোর্টে বসে তাঁরা ইংরেজের শোষণ-ব্যবস্থা, দেশের জনসাধারণের দুরবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনাও করতেন। মধুসূদনের অন্যতম বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর "আমার দেখা লোক" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলেছেন। মুকুন্দদেব বাবুও তখন হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-জীবনী প্রকাশের পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও গৌরদাস বসাক একই সঙ্গে কাজ করছেন এবং দেশে ইংরেজের শোষণ-ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করছেন। এ অবস্থায় গৌরদাস বসাকের পক্ষে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের কথাও মনে হওয়া এবং মধুসূদন নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদক না হলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মধুসূদন সম্বন্ধে কোন ভুল কথা থাকলে, গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মধুসূদনের বন্ধুরা নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে প্রতিবাদ জানাতেন। মধুসূদন সম্বন্ধে কোন মিথ্যা প্রচার দেখে তাঁরা চুপ করে থাকতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পড়েও যখন তাঁরা বিপরীত কিছু বলেন নি, তখন একথা বলা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখেছেন।

বিশ্ব-প্রিয়া

শ্রীসুধীর গুপ্ত

মহাবিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ মাঝে
যে রূপসী আমারে ভুলালো,
শুনিলাম 'সক্রেটিস'ও তারে
প্রাণ দিয়ে বেসেছিলো ভালো।
'যাজ্ঞবল্ক্য' 'জনক'-সভায়
তারে ধরি' সর্ব্ব-সত্য সার
ব্রহ্ম-তত্ত্ব করেছিল নাকি
আজীবন ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার!
তারই লাগি, সংসার ছাড়িয়া
'তথাগত' ধরেছে কাষায়;
তারই তরে 'চৈতন্যের' প্রাণ
সিন্ধু-বুকে প্রেমেতে লুটায়।

২

সে প্রেমিকা চির-মায়াবিনী,
মুগ্ধ করে সকলেরই হিয়া;
আমি যারে প্রাণ স'পিয়াছি,
কি আশ্চর্য্য সেই বিশ্ব-প্রিয়া!
অজন্তার গুহা-চিত্র-পটে
শিল্পী তারে চেয়েছে ধরিতে;
তারই চিত্র মহাচিত্রকর
ফুটিয়াছে 'দা ভিঞ্চির'ও চিত্তে,
'দান্তে' তার সঙ্গীতে বিভোর;
'রুমী' তারে করে আরাধনা;
'গ্যেটে' তারই কবিতা রচিয়া
চাহে মাত্র প্রেম এক কণা।

৩

হে প্রেয়সী—হে শ্রেয়সী মোর—
ওগো মোর মর্ম্ম সহচরী,
তব রূপে—তব প্রেমালোকে
দাও চিত্ত উদ্ভাসিত করি।
মহাবিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ ভরি'
হে সুন্দরি, আবির্ভূত হও;
ভাগ্যহত তোমার কবিরে
একবার বক্ষে তুলে লও।
তব প্রেম-সুধা পান করি'
ধন্য হব এই নিবেদন;
ভুলি নাই ক্রুশে তব তরে
'খ্রীষ্ট' দিল নৈবেদ্য জীবন।

যাওয়া বন্ধুর বুকের "এক ঝলক তাজা টকটকে লাল রক্ত"—পাঠকের মনে একটা অনপনেয় রক্ত-লিখন আঁকি দেয়া।

খুঁটিয়া খুঁটিয়া সবগুলি গল্পের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বইয়ের প্রত্যেকটি গল্পই যে গল্পরসিকের মনোরঞ্জন করিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তদুপরি অপূর্ব্ব হইয়াছে বইয়ের প্রচ্ছদপট—ভিতরে বাহিরে সুন্দর এমন একখানি গল্পসংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিভূতিবাবু পাঠকবৃন্দকে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

টোপর—শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রভাত কলামন্দির। ২৪, করিশ চার্চ লেন। কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের কয়েকটি গল্প পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 'টোপর' তাঁহার প্রথম গল্পসংকলন-গ্রন্থ। ইহাতে টোপর, গদাধর, ঠাঁই নাই, মায়ের দয়া ও অধম প্রভৃতি সতেরোটি গল্প স্থান পাইয়াছে। সবগুলি গল্পই স্বল্পায়তন। ঠাঁই নাই, মায়ের দয়া প্রভৃতি কোন কোন গল্পে খানিকটা পাকা হাতের ছাপ পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ গল্পই ছোটও হইয়াছে এবং গল্পও হইয়াছে। লেখকের যেমন আছে নিজস্ব রচনাশৈলী তেমনি আছে তাহার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী। এই দুইটি গুণের সহিত বঞ্চিত, নিপীড়িত দুর্গত মানুষের প্রতি সুগভীর দরদ কতকগুলি গল্পকে রসসৃষ্টি হিসাবে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। ভূমিকায় প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন—"আর একটি জিনিষ চোখে পড়ল যা হরিশঙ্করের সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করে তোলে, শিল্প-চেতনার সঙ্গে ওর ব্যাপক সহানুভূতি। ওর দৃষ্টির মধ্যে কৌতূহলের সঙ্গে আছে দরদ, আছে সহানুভূতি।" এই দরদ এবং নিম্নগামী মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিও যে কত গভীর তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে 'ঠাঁই নেই' গল্পে। কারখানা ঘরে বাসা-বাঁধা চিল দম্পতির বাচ্চাটির অপমৃত্যুর বক্তব্যবর্জ্জিত বর্ণনা মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। "মানুষ এখানে বাসা পায় না, তা কাকপক্ষী"—এই কথা কয়টি যেন সকল আশ্রয়হীন মানুষ আর ইতরপ্রাণীর বেদনাকে চোখের সামনে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলে। মোট কথা, গল্পসংকলনখানি পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, নিষ্ঠার সহিত সাধনায় রত থাকিলে বর্তমান পুস্তকে যে সামান্য ছোটখাটো ত্রুটি আছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহা তিরোহিত হইবে এবং বাংলা গল্প সাহিত্যের আসরে লেখক নিজের স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি—শ্রীগুরুদাস সরকার। রত্নসাগর গ্রন্থমালা। শ্রীদেবকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে একিমিনিয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 'আর্দ্দেশীরের পিতা সাসান-পূর্ব্ব (ফরাসী ঐতিহাসিক রেণোর মতে) যুগ পর্য্যন্ত ইরাণে যে শিল্পকলা ও সংস্কৃতি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল তাহার ব্যাপক ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। পারস্যের নিজস্ব সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয় ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে। মহানুভব দ্বিতীয় কুরুষ একিমিনিয় সাম্রাজ্যের পত্তন করেন এবং এই সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে যুনানী বীরশ্রেষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের হস্তে। ইহার প্রামাণিক কাল হইল ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। একিমিনিয় সাম্রাজ্যের পতনোত্তর যুগ ইরাণের ইতিহাসে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' বলিয়া অভিহিত। এই অন্ধ-যুগের আবার অবসান ঘটে সাসানীয় যুগের অভ্যুদয়ে। দ্বিতীয় কুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সাসানপুত্র আর্দ্দেশীর পাপাকান পর্য্যন্ত ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসবিশ্রুত দ্বিতীয় কুরুষ বা সাইরাস দি গ্রেট কেমন করিয়া এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন সেকথা লেখক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে ইরাণীয় শিল্পের পরিমিতি ও বিস্তারের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই যুগের শিল্পীদের শিল্পধারণা কতদূর উন্নত ছিল তাহা আমরা পসার গড়াইয়ে সম্রাট সাইরাসের যে পক্ষবিশিষ্ট মূর্ত্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে জানিতে পারি। তাঁহার মস্তকে মিশরীয় রাজগণের ন্যায় যেহারা মুকুট আর পক্ষদ্বয় আসিরীয় প্রথামতে দেহের সহিত সম্বদ্ধ। সম্রাটের দণ্ড দেহ যেন শিল্পীর কল্পনায় এই মূর্ত্তিতে প্রাণ পাইয়াছে; ইহা প্রকাশের প্রসাদগুণে সমুজ্জ্বল। একথা স্বীকার্য্য যে, একিমিনিয় যুগের বলিষ্ঠ শিল্পে মিশরীয় ঢঙের বাঁধা ছাঁচের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ার শিল্পশৈলীও ইরাণীয় শিল্পপদ্ধতিকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। সে যুগে ইরাণীয় শিল্পীদের মধ্যে, যুনানী শিল্পের মৌলিক ধারণাগুলিও অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরবর্ত্তী কালের একিমিনিয় শিল্পে আমরা এই সব শিল্প-প্রভাবের লক্ষণ দেখিতে পাই। সম্রাট সাইরাসের পক্ষবিশিষ্ট যে মূর্ত্তির কথা আমরা বলিয়াছি তাহার সৌন্দর্য্য ও সাসানীয় যুগের প্রবর্ত্তক আর্দ্দেশীর পাপাকান ও তাহার প্রণয়িনী গুলনারের প্রথম প্রণয়-চিত্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সম্ভারে বিস্ময়ের লক্ষণীয়। এই প্রণয়-চিত্রের বর্ণ-সুষমা ও অংকরণ-রীতি পারস্যের মধ্যযুগের বর্ণসম্পাত-কৌশলের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

গ্রন্থকার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইরাণীয় শিল্পের ক্রম-উদ্বর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে এই শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন এবং ইহার প্রকৃতিবিচারের কোন প্রয়াস নাই। পুস্তকখানির এই অপূর্ণতাটুকু দূর করিলে ইহার মর্য্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইত। আজ ভারত-ইরাণ মৈত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা চলিয়াছে। নব্য পারস্যকে বুঝিতে হইলে প্রাচীন ইরাণের ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতিকে বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সরকার লিখিত কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসরের ইরাণীয় শিল্প-সংস্কৃতির ইতিকথা মধ্যযুগীয় পারস্যকে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভারত-ইরাণ মৈত্রী প্রচেষ্টার সাফল্য এই ধরনের পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিচয়—ডক্টর শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত। মডার্ণ এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রধান তথ্যগুলির সংগ্রহ ভূমিকায় লেখক বলেছেন: "রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাহিত্যিক রস ও তথ-

বিচারে কি ভাবে নূতন পথে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত, সেই সম্বন্ধে অনুশীলন ও বিশ্লেষণের কাজের দিকে এই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।" কি ভাবে তিনি 'নূতন পথে' অগ্রসর হতে চেয়েছেন জানি না, তবে অনুশীলন ও বিশ্লেষণের পথ দেখিয়েছেন বলে মনে হ'ল না: 'রস ও গুণবিচারের' চেষ্টা না করে বোধ হয় ভালই করেছেন। কবির 'যৌবনকালে'র রচনাবলীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "সাধনা' মাসিকপত্রে এই সময়ে কতকগুলি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়, যথা: 'ঘাটের কথা', 'শুভা', 'নষ্টনীড়', 'ধোপার পাট' ইত্যাদি। 'ধোপার পাট' গল্পটি সহিত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত 'মৈমনসিংহ' গীতিকার অন্তর্গত 'ধোপার পাট' গল্পের সাদৃশ্য রহিয়াছে।" (পৃ. ১২-১৩) এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন কে জানে? এ যে অভূতপূর্ব আবিষ্কার! আবার 'প্রৌঢ় কালের' রচনা-প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি: 'রক্তকরবী—বিখ্যাত একটি জার্মান উপন্যাসের ছায়া-অবলম্বনে সঙ্কেতনাট্য।" এ-ও বোধ হয় তাঁর 'নূতন পথে' চলার দৃষ্টান্ত। ভাবের সামান্য সাদৃশ্য আছে—যখনই শুনেছেন, তখনই গ্রন্থকার সে তথ্য পরিবেষণে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। 'গীতাঞ্জলি' প্রসঙ্গে গ্রীক্ কবিগণের এবং সিঙ্কারজে' ডন জুয়ানের 'স্পাই চাপ'-এর উল্লেখ তার উদাহরণ। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের মত 'বাস্তব-রস-সমৃদ্ধ' গল্প নাকি রবীন্দ্রনাথ বেশী লিখতে পারেন নি! (পৃ. ৫৭) অদ্ভুত মন্তব্য!

তথ্যসংবলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকের কাছ থেকে আমরা যথোচিত যত্ন, সতর্কতা এবং অভিনিবেশ আশা করেছিলাম

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী। বালুরঘাট, পশ্চিম-দিনাজপুর। মূল্য দেড় টাকা।

'রবীন্দ্রনাথ', 'ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ', 'মৃন্ময় পৃথিবীর কবি', 'শেষের কবিতা', 'রবীন্দ্রকাব্যের শেষযুগ' 'রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীত' এবং 'কবিপ্রণতি'—সাতটি প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিক্ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রচলিত অধিকাংশ সমালোচনাই অনুকথন মাত্র: এখানিও তাই। তবু বিষয়গুণে মনকে আকৃষ্ট করে, পুরাস্বাদিত রস নতুন করে আস্বাদন করি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দীপায়ন—শ্রীনন্দেশ্বর পাল। ১২, হলওয়েল লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

এখানি কবিতার বই। পুস্তকে পঞ্চাশটি কবিতা আছে। গ্রন্থকার বইখানিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম ভাগ—স্বদেশ, দ্বিতীয় ভাগ—অন্তর্লোক। অধিকাংশ কবিতাই 'স্বদেশে'র অন্তর্গত। 'উৎসর্গে' তিনি বলিতেছেন:

> নিজের বুকের অস্থি দিয়া জ্বালালো যারা বজ্রানল,
> কালের বুকে আঁকিল চরণরেখা;
> দীপায়নের অগ্নিশিখায়—মরণজয়ী ক্ষ্যাপার দল
> তাদের স্মৃতি রইল যে গো লেখা।

ইহাই পুস্তকের পরিচয় এবং এই সুর প্রায় সব কবিতায় বাজিয়াছে। প্রথম কবিতায় আছে:

> কোথা দধীচির বীর সন্তান প্রাণের মুক্তিবহ,
> বক্ষের তাজা রুধির অর্ঘ্য লহ।

'মহাকবি নবীনচন্দ্রে' পাই:

> ভুলি নাই পলাশীরে, ভুলি নাই তোমাকেও কবি,
> প্রতি বিন্দু রক্ত মাঝে রাখিয়াছি আঁকি তব ছবি।

'কবি সত্যেন্দ্রনাথে' পাই:

> মাতৃভাষা মঞ্জুষায় রত্ন অভিনব,
> তোমারে করেছে কবি চির মহীয়ান্।

পল্লীর ব্যথায় কবির হৃদয় কাঁদিয়াছে,

> পল্লীর ঘাটে পল্লীর মাঠে পল্লীর বুকে মানুষ নাই।

'তরুণ'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:

> ভয় ভাবনা মিছাই ওরে ভাঙ্গি বাধার নিষেধ ডোর,
> চল্ ছুটে চল্ মুক্তিপথ্যাপার দল।

একটি কবিতায় বলিতেছেন:

> আঁধারের কালো ছায়া বালুকার বুকে এল নামি,
> ওপারে বাজাও বাঁশী—এপারে যে আমি।

'খেলাঘরে' বলিতেছেন:

> আমরা শিশু ভুলের দেশে আছি সকল ভুলে
> জীবন ভরি ঝিনুক নিয়ে খেলি।

লেখক স্বদেশপ্রেমিক। তাঁহার আবেগ আছে। ছন্দের উপর আধিপত্য আছে। অনেকগুলি কবিতা মনের উপর রেখাপাত করে। "দীপায়ন" কাব্যামোদীর ভাল লাগিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। মহানাম সম্প্রদায় কর্তৃক ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১, হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০+১৯। মূল্য এক টাকা।

প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলা সম্বন্ধে ভক্তের নিবেদন। ইহা 'জীবন-চরিত' নহে। চৈতন্যদেব প্রভু জগদ্বন্ধুরূপে পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহাই ভক্তগণের বিশ্বাস।
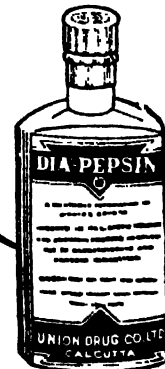
তাঁহার আবির্ভাব বৈশাখ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ এবং তিরোধান ভাদ্র ১৩২৮। সুতরাং ইহজগতে তিনি মাত্র ৫১ বৎসর ছিলেন। ভগবৎপ্রেমিক এই মহাপুরুষ ফরিদপুরের বুনো অস্পৃশ্যদের কোল দিয়াছেন এবং কলিকাতার রামবাগানের ডোমদিগের মধ্যে হরিসভা স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সদাচারে উন্নীত করিয়াছিলেন। চৈতন্যের মতই তিনি হরিনাম ও প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্তগণের মধ্যে এই পুস্তক সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শিক্ষা-বিজ্ঞান—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী, বি-এ, বি-টি। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। কলিকাতা-১২। পৃ. ২০৭। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

তরুণের শিক্ষা সকল দেশেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয় লইয়া সকল দেশেই মনীষিগণের মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা, অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলিতেছে। আমাদের দেশেও স্বাধীনতালাভের পর হইতে শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের জন্য বিরাট আয়োজন চলিতেছে। এই বিষয়ে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য পুরাতন শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক। শিক্ষা এখন আর বাহির হইতে চাপাইবার জিনিষ নহে, ভিতরের সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা। এই জন্যই শিক্ষককে মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে জানিতে হয়। দেশে শিক্ষার অভাব খুবই। কিন্তু দেশকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে যে শিক্ষণ-শিক্ষা দরকার তাহার অভাবও যথেষ্ট। শিক্ষণ-শিক্ষা বিষয়ে পাশ্চাত্যে যেরূপ আলোচনা, গবেষণা ও পুস্তক প্রণয়ন হইয়াছে তাহার তুলনায় আমাদের দেশ খুবই অনগ্রসর। মৌলিক পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য ত বটেই পাশ্চাত্যের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির অনুবাদও এখন পর্যন্ত হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থে লেখক শিক্ষণ-শিক্ষা বিষয়ে বহু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন—শিক্ষাব্রতী মাত্রেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।

আলোচ্য বিষয় পনরটি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। যথা: মনোবিজ্ঞান ও জীবজগৎ, মনের উপাদান, সংস্কার ও বুদ্ধিমত্তা, বংশবিজ্ঞান ও বিবর্তন, ব্যবহারাবৃত্তি ও ক্রীড়াগতি, মনের বিকাশ, চেতন ও অবচেতন, দেহমন, বুদ্ধির পরিমাপ, মনঃসংযোগ, স্মৃতি ও বিস্মৃতি, শিক্ষাগ্রহণ ও অবসাদ, চিন্তন ও বিচার, চরিত্রগঠন এবং মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক।

গ্রন্থকার স্থানে স্থানে পুরাতন শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করিয়া আধুনিক মতের সহিত উহার সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষক কেবল বিদ্যাবিজ্ঞানী হইলেই চলিবে না তাঁহাকে চরিত্রবান হইতে হইবে। তাঁহাকে দেখিয়া শিক্ষার্থীরা শিখিবে, কেবল তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাহাদের শিক্ষালাভ সার্থক হইবে না।

শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষাব্রতী মহলে এই সুলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঐতিহাসিক শ্যালক—শ্রীশীতাংশু মৈত্র। প্রকাশক: শ্রীপ্রতুলকুমার দত্ত, ১৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ সিকা।

স্মৃতি, দণ্ডমুণ্ড এবং ঐতিহাসিক শ্যালক এই তিনটি ব্যঙ্গ নাটিকা পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীব্র শ্লেষের মধ্য দিয়া লেখক এক শ্রেণীর "সামাজিক" জীবনের উপর যে প্রচণ্ড কশাঘাত করিয়াছেন তাহা সার্থক হইতে পারিত যদি লেখায় আর একটু সংযম প্রকাশিত হইত।

ইঙ্গিত—শ্রীশীতাংশু মৈত্র। ডি. এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য দেড় টাকা।

দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত বাঙালী সামাজিক ভাঙনের মুখে পড়িয়া কি-ভাবে তলাইয়া যাইতেছে এবং ইহাদেরই দারিদ্র্যজনিত দৈন্যতার সুযোগ লইয়া আর এক শ্রেণী কিভাবে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতেছে, কতকগুলি রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সাহায্যে লেখক তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ধনী শিবনাথ এবং তার ছেলে স্বেচ্ছাচারী লম্পট অবনী, মধ্যবিত্ত অধ্যাপক মহীতোষ ও তাঁর তরুণী সমাজসেবিকা শিক্ষিতা কন্যা রেণুর চরিত্র চমৎকারভাবে বিভিন্ন নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—বিশেষ রিয়া পরিচারিকার চরিত্রটি অপূর্ব।

মনোমুকুর—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়। শিবনাথ পাবলিশিং হাউস, ৭ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

দশটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। জীবনের অত্যন্ত সাধারণ এমন কতকগুলি ঘটনা গল্পগুলির উপজীব্য, যাহা আমাদের আশেপাশে হামেশাই ঘটিয়া থাকে। একান্ত ভাবে ঘরোয়া হইলেও এই অতি সাধারণ ঘটনাগুলিও লেখার গুণে কত স্নিগ্ধ এবং সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রমাণ জন্মদীর শোক, বনমহার ঝাপের বাড়ী যাওয়া, নিত্যকালের উপেক্ষিতা প্রভৃতি গল্পে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে এক আধটু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও চরিত্র-চিত্রণে লেখকের কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স্মরকুসুমাঞ্জলি (দ্বিতীয় পর্যায়)—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী সম্পাদিত এবং জেলা হুগলী, পোঃ গুরুপ, শ্রীরাম আশ্রম হইতে শ্রীমুরলী দে কর্তৃক প্রকাশিত। (ডিঃ ক্রাঃ ১৬ পৃঃ)। মূল্য চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ও বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সংস্কৃত গদ্য-পদ্য রচনায়, অধ্যাপক, কবি, এবং বিভিন্ন লেখক-লেখিকার নিবন্ধে ও কবিতায়, আটটি ইংরেজী প্রবন্ধ বাংলায় শ্রীমৎ সীতারাম ওঙ্কারনাথের প্রশস্তিতে, তাঁহার লিখিত পত্রাবলী-পদে, সঙ্গীত এবং বিভিন্ন সময়কার নানাবিধ বহু চিত্রে সুশোভিত। প্রধানত, ভাবের উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যপূর্ণ অলৌকিক বিভূতিরাই বর্ণনা নয়। কিন্তু ইহাতে ভাগবত সত্যের নিত্য লীলার মাধ্যমে মাতোয়ারা এই মহাপুরুষের জীবনলীলার বিভিন্ন আলেখ্য বেশ সুনিপুণ ভাবে রূপায়িত হওয়ায় এখানি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে যুগপৎ বিশেষ প্রীতিকর এবং হিতকর হইয়াছে। সম্পাদকের ভূমিকা এবং নিবন্ধাবলীর অধিকাংশই ভক্তি ও ভাবরাজ্যের দ্যোতক সম্বলিত বেশ মনোজ্ঞ রচনা। যাঁহারা এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন নাই তাঁহারাও গ্রন্থপাঠে ইঁহার ... বিভূতিপরিচয়লাভে উপকৃত হইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

নিঃসঙ্গ—শ্রীসতীশচন্দ্র দে। প্রকাশক—শ্রীসলিলকুমার দে, ২৩ডি কর্ডাইস লেন, কলিকাতা-১৪। পৃ. ২৫৪। মূল্য তিন টাকা।

গ্রন্থকারের আত্মজীবনী। তিনি ছিলেন স্কুল-কলেজে উৎকৃষ্ট ছাত্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ স্নেহপ্রাপ্ত। কৈশোরে তিনি 'বিপিনদা'র 'আত্মোন্নতি' দলে ভর্ত্তি হন। এই দলটিও বিপ্লব-কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে। লেখক তেজী, সাহসী এবং স্বাধীনচেতা; প্রেসিডেন্সী কলেজের 'ওটেন' ব্যাপারে লিপ্ত সন্দেহে তাঁহাকে 'রাসটিকেটেড' করা হয়। লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন; বিপ্লব-কর্ম্মে, টোটা প্রস্তুত বিষয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। প্রথম মহাসমরকালে তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইনে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি চট্টগ্রামে কুতুবদিয়া দ্বীপে প্রথমে অন্তরিত হন। পরে বাঁকুড়া, দার্জ্জিলিং, হাজারিবাগ, পুনরায় দার্জ্জিলিং এইরূপ বিভিন্ন স্থলে বন্দীজীবন যাপন করিয়া ১৯২০ সনে মুক্তিলাভ করেন। নিজের জীবনকথা-ব্যপদেশে অর্দ্ধশতাব্দীকালের বাঙালীর স্বাধীনতা-প্রয়াসের একটি বিশিষ্ট দিকের উপর লেখক আলোকপাত করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে কয়েকজন বাঙালী মনীষী, সাহিত্যিক ও বিপ্লবীর পুস্তক-সম্পর্কিত প্রশস্তি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা অভিনব বটে, কিন্তু পাঠকের পুস্তক সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত গঠনে ব্যাঘাত জন্মায়। এখানে এসব সন্নিবেশিত না করাই বাঞ্ছনীয়। পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধিও লক্ষিত হইল।

বাংলার ইতিহাস সাধনা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা ২১৪। মূল্য তিন টাকা।

"বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি"—এইরূপ মন্তব্য কোন কোন মনীষী করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে, বাঙালীর ইতিহাস নাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজীতে বাংলার প্রথম ইতিহাস ষ্টুয়ার্ট-কৃত "History of Bengal"। বাঙালী জাতির ইতিহাসের উপকরণ এশিয়াটিক সোসাইটির 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় উইলকিন্স কর্ত্তৃক। কোলব্রুকও কিছু কিছু প্রকাশিত করেন। বাঙালীদের মধ্যে পুরাতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করেন ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। বাঙালী জাতির ইতিহাস বাংলা ভাষায় সুষ্ঠুভাবে আলোচনা সুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গ-দর্শনে তাঁহার প্রবন্ধাবলী বাংলার ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ। রবীন্দ্র-নাথ এই ইতিহাসচর্চার আবশ্যকতা অনবদ্য ভাষায় গত শতাব্দীর শেষ দশকেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গত অর্দ্ধশতাব্দীকালের মধ্যে বাংলার ইতিহাসচর্চা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বাঙালীর ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জাতিগঠন, রাজনৈতিক উত্থানপতন প্রভৃতি বাঙালীর জাতীয় জীবনের নানা বিভাগেরই ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত, আলোচিত এবং পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত উপকরণ—মূর্ত্তি, মুদ্রা, খোদিত লিপি, সমসাময়িক মুদ্রিত-অমুদ্রিত বই-পুথি, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির ভিত্তিতে বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখনও সুধীসমাজে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বাঙালীর ইতিহাস সাধনা প্রসঙ্গে আধুনিক যুগে যে সকল ইতিহাস-পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহার এক আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিয়াছেন। 'বিবরণ দিয়াছেন' বলিলে অবশ্য সবটা বলা হয় না। তিনি প্রতিটি পুস্তক ধরিয়া তাহার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙালী জীবনের কোন্ কোন্ দিক এতদ্দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। 'ইতিহাস' বলিতে তিনি শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কথা বলেন নাই—আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস-পুস্তকাদিও আলোচনা করিয়াছেন। বাঙালীর উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, লোকশিক্ষা, সমাজ-জীবন প্রভৃতি সম্পর্কেও তথ্যনির্ভর আলোচনা করা হইয়াছে গত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন গ্রন্থে। বাঙালীর জাতীয় তথা স্বাধীনতা আন্দোলন সংকীর্ণ 'রাজনৈতিক' ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না; মানবজীবনের বাধাবন্ধহীন সামগ্রিক উন্নতির দিকে এই প্রচেষ্টা প্রধাবিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ইতিহাস-পুস্তকে এ সকল কথাও আলোচিত হইয়াছে। বাঙালী নবজাগরণ বা রেনেসাঁস এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিরই দ্যোতক। গ্রন্থকার একস্থলে বাঙালীর ইতিহাস-সাধনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দানে ইতিহাস-আলোচনার ক্ষেত্র সুগম করিয়া দিয়াছেন। বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও পুস্তকসমূহের একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদানে পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—শ্রীবিমলেন্দু কয়াল। কয়াল পুস্তক-প্রকাশক, ৯ ১এম্ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪। পৃ. ১০৪+৪০। মূল্য তিন টাকা। বহুচিত্র সম্বলিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব সবেমাত্র উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও। শুনিয়াছি বিশ্ব-বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজীতে এক নিবন্ধাকার 'মুখবান' পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় সহজ এবং সাধারণবোধ্য করিয়া লিখিত। এজন্য আমরা গ্রন্থকারকে সাধুবাদ করি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ব্যপদেশে এদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা হইতে যাবতীয় কৃতির একটি ধারাবাহিক কাহিনী পুস্তকখানিতে আছে। সাধারণ পাঠকপাঠিকা ইহা হইতে বহু অজ্ঞাত, অল্পজ্ঞাত এবং নূতন কথা জানিতে পারিবেন। পুস্তকে দুই-একটি তথ্যগত ভুল নজরে পড়িল। প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার (১৮৬৮)। 'স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' নহেন, ইনি শুধু 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়'। সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

রামপদ-সংবর্দ্ধনা

গত ২০শে জানুয়ারী হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদে উদ্যোগে প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও এই পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল এই উৎসবের পৌরোহিত্য করেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সম্পাদক ডক্টর শ্রীনিমাইসাধন বসু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরিষদ-সভাপতি শ্রীযামিনীকান্ত সোম শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার পর পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীচরণদাস ঘোষের অভিভাষণ পঠিত হয়। রামপদবাবুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কবি শ্রীসুবোধ রায় ও কবি শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামপদ সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রবাসী পত্রিকার সহঃ-সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, সহাধ্যক্ষ শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হাওড়া বার্ত্তা সম্পাদক, কুন্তি সাহিত্য আসর ও কণিকা সাহিত্য আসরের প্রতিনিধিরা শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। শ্রীস্বপ্না সেনগুপ্ত, শ্রীরেবা বসু ও শ্রীউৎপল মুখোপাধ্যায় কয়েকটি সময়োপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীপ্রফুল্ল রায় সংবর্দ্ধনা লিপি পাঠ করিবার পর তাহার অনুলিপি সভামধ্যে বিতরিত হয়। শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রতিভাষণে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং সংবর্দ্ধনার জন্য সকলকেই প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রামপদবাবুর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত করেন এবং হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য পরিষদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ প্রদান

করেন। পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সমাগত ভদ্রমহোদয়, সভাপতি ও রামপদ-বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। পরিষদের পক্ষ হইতে রামপদবাবুকে কয়েক খণ্ড 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' উপহার দেওয়া হয়। সাহিত্যিক শ্রীরমেশচন্দ্র সেন তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'পূব থেকে পশ্চিমে' বইটি রামপদবাবুকে উপহার দেন।

সেবায়তনে বার্ষিক উৎসব

গত ৯ই পৌষ ঝাড়গ্রাম সেবায়তনের ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত হইয়াছে। এই দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বৈতালিকগণের ভজনগীত হইলে আশ্রমাচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে প্রত্যূষে মঙ্গলঘট তথা আশ্রম-পতাকা স্থাপন, শাস্ত্রপাঠ ও সদালোচনাদি সহ উৎসবের উদ্বোধন হয়। অপরাহ্নে জেলা বোর্ডের প্রধান শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাহাত মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার পর অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সেবায়তন যোগমন্দির-প্রাঙ্গণে, সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশে বার্ষিক মহা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সঙ্গীতসুধাকর শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভজন ও সঙ্গীত দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। পরদিন সৎসঙ্গ-ভবনে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত তিন শতাধিক ক্রিয়াবান্ ভক্ত-সম্মেলনে যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাত্মিক ভাব ও সাধনার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা হইবার পর স্থানীয় কীর্ত্তনীয়া শ্রীঅবনীমোহন মধুর কীর্ত্তনগানে শ্রোতৃবৃন্দকে প্রায় তিন ঘণ্টা মোহিত করিয়া রাখেন। সন্ধ্যায় সেবায়তন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণের পুনর্ম্মিলন সভায় অধিবেশনের পর উৎসবানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

শ্রীনলিনী মজুমদার (মাঝখানে উপবিষ্ট) সহ ঝাড়গ্রাম সেবায়তন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বিগত ২৪শে জানুয়ারী রাত্রি দুই ঘটিকায় কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম-এ, এম-আর-এ-এস (লণ্ডন), মহাশয় ছিয়াশী বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা হাতিবাগানস্থ ভবনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার আদি নিবাস চব্বিশ পরগণাস্থ হরিনাভি গ্রাম। ইনি সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় মহেশ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ প্রভৃতি অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সরকারী কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, কটক র‍্যাভেনশ' কলেজ ও হুগলী কলেজে অধ্যাপনার পর ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসেন। এখানে সুদীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত অধ্যাপনায় রত থাকিয়া ১৯৩০ সনে অবসরগ্রহণ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ছাত্রগণের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, অগ্নিযুগের উল্লাসকর দত্ত, অধ্যক্ষ ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ অনন্ত ব্যানার্জ্জী শাস্ত্রী, ড. সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, ড. আশুতোষ শাস্ত্রী, ড. অমরেশ্বর ঠাকুর, ড. ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ড. সুকুমার সেন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সেন, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, অধ্যক্ষ ড. প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বধর্ম্মনিরত, জ্ঞানতপস্বী ও আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ছায়া, চিত্রা, পরিণাম, উপায়ন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ রচনা 'জৈন ও হিন্দু' গ্রন্থখানি বিদ্বজ্জনসমাজে বিশেষ প্রশংসা-লাভ করিয়াছে। তিনি পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী ছিলেন। সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। নিরহঙ্কার ও অকলঙ্ক চরিত্রের গুণে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আত্মপ্রচার ও আত্মশ্লাঘা তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন।

পরলোকে নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

গত ২৬শে জানুয়ারী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার ঊনষাট বৎসর বয়সে তাঁহার ৫০নং বণ্ডেল রোডস্থ ভবনে পরলোক গমন করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি মূক বধিরদিগের শিক্ষাদান ও উন্নয়নকার্য্যে একনিষ্ঠভাবে ব্রতী ছিলেন। ১৯২২ সনে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'অল বেঙ্গল এসোসিয়েশন ফর দি ওয়ার্কার্স অব দি ডেফ' নামক সংস্থার ভিত্তিতে পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় মূক-বধির শিক্ষকদের কনভেনশন সংগঠিত হয়। কলিকাতা মূক-বধির

নৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার

বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোহিনীমোহন মজুমদার ছিলেন নৃপেন্দ্রমোহনের পিতা। পিতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরিজীর শিক্ষা ও আদর্শ নৃপেন্দ্রমোহনকে জনকল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সেবা ও সামাজিক কার্য্যাবলীর জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে বণ্ডেল রোড ও ব্রড ষ্ট্রীট "রেট পেয়ার্স এসোসিয়েশন" গঠিত হয়। বালিগঞ্জ সংসদ, বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়, দুর্গাবাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট সংগঠনকারী সদস্য ও কর্ম্মী ছিলেন।

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাজপুতচিত্র

(যোধপুর পদ্ধতি)

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৬শ ভাগ ২য় খণ্ড } চৈত্র, ১৩৬৩ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অথ, নির্ব্বাচনী পর্ব্ব

এই বারের নির্ব্বাচনীতে সর্ব্বত্রই এক নূতন ধারা দেখা গিয়াছে। সেটা ভোটারের পক্ষ হইতে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বিদ্বেষকে সমষ্টিগত ভাবে পরিচালনা করিয়া দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা। কেহ-বা বলিয়াছেন, বামপথে চল, সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইবে। কেহ-বা বলিয়াছেন, পাকিস্থান জিন্দাবাদ—আমায় জয়যুক্ত কর আমি পাকিস্থান এনে দিচ্ছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলায় —বিশেষতঃ কলিকাতায়—সকল বিরোধী দলের বামপন্থী এই পাকিস্থান জিন্দাবাদে যোগ দিয়াছেন এবং ততোধিক আশ্চর্য্য এই যে উদ্বাস্তুর দলও সেই সঙ্গে ছিল। শোনা যায়, আসামে ও মাদ্রাজে এইরূপ প্রচ্ছন্ন পাকিস্থানী কংগ্রেসেরও সমর্থনলাভ করিয়াছে। অবশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে এরূপ দেশদ্রোহীতা নূতন নহে। ভারত বিভাগে তাঁহাদের কীর্ত্তি ইতিহাসে চিরদিন থাকিবে।

ভোটের পালা তো শেষ হইতে চলিল, "বিকল্প সরকার" তো বাংলায় হইল না, কেন্দ্রেও হইল না, এক হইলেও হইতে পারে সুদূর কেরলে, ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যে। কিন্তু লোকের ভাব-গতিকে মনে হয়, দেশের লোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্দের ভাল বলিয়া কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছে। যদি তাই হয় তবে এই আগামী পাঁচ বৎসরই কংগ্রেস-রাজের মেয়াদ, তাহার পর দেশে অরাজক।

বস্তুতঃ এবারের কংগ্রেসের জয় অনেক ক্ষেত্রেই বিপক্ষে অতি নিকৃষ্ট লোক দাঁড় করাইবার দরুন। কংগ্রেসের ভাল লোক পরাজিত হইয়াছেন অল্পই এবং তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি অল্প ভোটে। দুই দিকেই অতি নিকৃষ্ট স্বার্থসেবী লোকই বেশী নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সুতরাং সেদিক দিয়া বলিবার অধিক কিছু নাই। তবে এইভাবে কত দিন চলিবে?

যে দেশের শতকরা ৮৮ জন নিরক্ষর সেখানে এইরূপ নির্ব্বাচন জুয়াখেলার সামিল। তদুপরি হইয়াছে সংবাদপত্রের ক্লীবত্বপ্রাপ্তি, সুতরাং ভালমন্দ বুঝাইবেই বা কে এবং বুঝিবেই বা কে? এদেশে —বিশেষতঃ আমাদের বুদ্ধিমান বাঙালীর দেশে—[illegible] (Gresham's Law) পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে। চালে কাঁকড়, আটায় খড়িমাটি, চিনিতে কাদাজল আমরা নিতাই গিলিতেছি। কাজেই রাজনীতির কালোবাজারে মার্কামারা মেকিতে আপত্তি করার উপায় কোথায়?

দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ত গান্ধীজীর কংগ্রেসকে রসাতলে লইয়া চলিতেছে, কৈ কোথাও ত তাহার সংরক্ষণ বা সংশোধনের কথাও কেহ বলে না। শেষে কি সারা দেশ কেবল বা কলিকাতার মত কাণ্ডজ্ঞান হারাইবে?

কংগ্রেসী সরকারের শিক্ষার প্রয়োজন, একথা খাঁটি সত্য। দেশে যে দুর্নীতি দুরাচারের বন্যা চলিতেছে, তাহার দায়িত্ব তাঁহাদেরই, এবং দেশকে বুদ্ধিহীন ক্লীবত্বের পথে যদি কেহ টানিয়া লইতে পারে তবে তাহাও কংগ্রেসের অকর্ম্মণ্যতা, আত্মম্ভরিত্ব ও স্বঃগোষ্ঠী পোষণে তৎপরতার কারণে। দেশের দুর্দ্দশা বড় কথায় বা কেরো-কংক্রীটের বাঁধে যায় না। একথা আমাদের কংগ্রেসী বিদগ্ধচূড়ামণিগণ বুঝিবেন কবে?

'৫২ সনের নির্ব্বাচনে যাঁহাদের কংগ্রেসী প্রার্থীরূপে পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহাদের শতকরা ৭৫ জন ছিলেন মেকি। এবার কিছু রদবদল করিয়া শতকরা ৮৫জন মেকিকে পাঠানো হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, সাচ্চা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পার হইতে পারেন নাই। অবশ্য দু'চার জন ভাল লোকও আসিয়া পড়িয়াছেন, সেটাই আমাদের সৌভাগ্য।

পশ্চিম-বাংলায় নির্ব্বাচন এখনও শেষ হয় নাই. সুতরাং বেশী কিছু বলা যায় না। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ সুষ্ঠু হয় নাই, তাহার প্রমাণ কলিকাতায় বসিয়াই দেখা যাইতেছে। ভাগ্যবলেও গান্ধীজীর পুণ্যের জোরে মফস্বলে বামপন্থীদিগের উস্কানীতে কাজ হয় নাই, নহিলে কি হইত বলা যায় না।

এখানে কংগ্রেসী ধুরন্ধরবর্গ ইতিমধ্যেই নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেছেন। কিন্তু আসল কথার কোনও উল্লেখ নাই। মেকি দিয়া চলে কত দিন? যত দিন অন্য পক্ষে সাচ্চার অভাব সমান বা অধিক থাকে—যেমন এইবার।

ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন

স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। নির্ব্বাচনের আংশিক ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ফল প্রকাশিত হইবার এখনও বিলম্ব রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু নির্ব্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে মোটামুটি বলা চলে যে, কেন্দ্র এবং প্রায় সকল রাজ্যেই কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবে। ১২ মার্চ পর্য্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় যে, রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্ব্বাচনে কংগ্রেস অপেক্ষা বিরোধী দলগুলি ত্রিশ লক্ষাধিক ভোট বেশী পাইয়াছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির মধ্যে মিলন না থাকায় বিরোধী পক্ষের ভোটগুলি পরস্পরের মধ্যে ভাগ হইয়াছে—ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, অকংগ্রেসীগণ অপেক্ষা ত্রিশ লক্ষ ভোট কম পাইয়াও কংগ্রেস বিরোধীদলগুলির প্রায় দ্বিগুণ আসন লাভ করিয়াছে। ১২ই মার্চ পর্য্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে বিভিন্ন দলগুলির মোট ভোট ও প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা এইরূপ : কংগ্রেস—২,১১,৭০,৪৯৮ ভোট (৮৮২টি আসন); প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল—৪৪,৫৪,৫৫০ ভোট (৯২টি আসন); কম্যুনিষ্ট পার্টি—৩৪,৩৮,০৭৫ ভোট (৬২টি আসন); জনসঙ্ঘ—২১,৩১,৫০৭ ভোট (২৬টি আসন); অন্যান্য দল—২৪,০৬,৩৮০টি ভোট (৫৪টি আসন) এবং স্বতন্ত্র—১,২৫,৯৩,৭১১টি ভোট (১৮১টি আসন)।

দেশের সর্ব্বত্রই নির্ব্বাচন সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বিশেষ সুখের কথা। কিন্তু নির্ব্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিবিশেষ যে ধরনের সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাইয়াছেন তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে শঙ্কিত না হইয়া থাকায় যায় না। বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল প্রভৃতি দুই-একটি রাজ্যের কথা বাদ দিলে উত্তর এবং দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বত্রই নির্ব্বাচনের প্রধান খুঁটি ছিল ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক স্লোগান।

আসামের অন্তর্গত করিমগঞ্জ মহকুমায় নির্ব্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" ২৪শে ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, ঐ অঞ্চলে বহু স্থানে নির্ব্বাচনী প্রচারে এইবার রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতি জলাঞ্জলি দিয়া সাম্প্রদায়িক প্রচার এবং শ্রেণী-বিদ্বেষের লাগাম ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। "বিশেষভাবে দক্ষিণ ও উত্তর করিমগঞ্জ এবং বদরপুর নির্ব্বাচনচক্রে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য মুসলমান ভোটারদের মধ্যে উৎকট সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগাইয়া তোলা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের অসংখ্য 'ওয়াজ' মারফতে নির্ব্বাচনী প্রচার উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত 'ওয়াজে' শুধু মুসলমানদেরই যাইবার অধিকার ছিল। অনেক স্থানে নাকি এই সমস্ত জমায়েতে গো-কোরবানী করিয়া সিন্নীও বিতরণ করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত বক্তৃতা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, একমাত্র মুসলিম লীগের আমলের বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালীন জেহাদী জিগীরের সঙ্গেই তাহার তুলনা করা চলে। আশ্চর্য্যের বিষয় স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভোট লাভ করিবার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়াছেন।—কংগ্রেসকে ভোট না দিলে সংখ্যালঘুদের এদেশে বাস করা মুশকিল হইবে, বামপন্থীদের ভোট দিলে মুসলমানরা কবর দিতে পারিবে না—মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিতে হইবে, আরও উদ্বাস্তু আসিয়া মুসলমানদের তাড়াইয়া দিবে—এইরূপ অপপ্রচার মুসলমান গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্রমাগত ভাবে করা হইয়াছে। কংগ্রেস-মহলও ইহা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন যে তাহারা এখানে মুসলমানদের (এবং চা-বাগান এলাকার মজদুরদের) ভোটের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন।"

কংগ্রেসের তরফ হইতে এই প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রচার সত্যই বিস্ময়কর এবং অভাবনীয়! কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই সাম্প্রদায়িক প্রচারে কেবল যে ভারতীয়গণই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, বহু পাকিস্তানী নাগরিকও প্রকাশ্যভাবে নির্ব্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াইতে থাকে। এই সকল প্রচারের ফলে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দও প্রমাদ গণিতেছেন।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"স্থানীয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী মোল্লা, মৌলবী ছাড়াও বহু পাকিস্তানী ধর্মান্ধ মোল্লা এবং পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারী পর্য্যন্ত আসিয়াও বিভিন্ন "ওয়াজে" সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ নির্ব্বাচনচক্রের কংগ্রেস-প্রার্থী মৌলবী আবদুল হামিদ চৌধুরীর ভ্রাতা পাকিস্তানী নাগরিক মৌলবী আবদুল আজিজ চৌধুরী নিজে তাঁহার পাকিস্তানী গাড়ী ও সাগরেদগণ লইয়া নির্ব্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত আছেন—ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

"পাকিস্তানের সহিত ভারতের আজ যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই সব ব্যাপার অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রকৃত জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মভীরু সৎ মুসলমান ব্যক্তিরাও অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিতেছেন এবং অনেকে আসিয়া বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দের সহিত প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কি বলিতে বা করিতে চাহেন তাহা জনসাধারণ জানিতে পারে কি?"

নির্ব্বাচনে দলীয় স্বার্থসাধনে সাম্প্রদায়িক প্রচারেরও অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে বিদেশীয় নাগরিকদিগের হস্তক্ষেপ কোন দিক হইতেই সমর্থন করা যায় না। অন্যান্য রাষ্ট্রে যদি কোন বিদেশীয় নাগরিক এইরূপ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিত তবে সেই বিদেশীয়কে তৎক্ষণাৎ সেই রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা হইত। কিন্তু ভারতে আজ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাহাদের হাতে তাঁহারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছেন। রক্ষকই যখন ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায় তখনই রাষ্ট্রের চরম দুর্দিন আসিতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কংগ্রেস দলগত প্রভুত্ব রক্ষার জন্য আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিতেছে, অচিরেই ভারতকে উহার ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক

উত্থানির ফলে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিবে তাহার ফল ব্যাপকতর জনসাধারণকেও স্পর্শ করিবে, সুতরাং এখন হইতেই সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক সমস্যাগুলির ভিত্তিতে হইলেও এই রাজ্যেও নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচার স্থান-বিশেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নির্বাচন সম্পর্কে ২৭শে ফাল্গুন "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিশেষ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে :

"আমাদের মুর্শিদাবাদে ভোটের কাইট কমুন্যাল লাইনে চলেছে। বেশীর ভাগ প্রার্থী স্বতন্ত্র। দল বলতে যোলটা কংগ্রেসী, চারটে পি-এস-পি, তিনটে আর-এস-পি এবং একটা সি-পি, এক-বি আর মহাসভা। এইবার হিসাব করে দেখুন দল ক'জন, দল-ছাড়া ক'জন। সুতরাং এখানে ভোট চলছে নিজের বাতাসে যেমন চলত লীগের আমলে। তবে সুবিধা হচ্ছে মুসলিম প্রার্থী আট জন যারা কংগ্রেসের ঘোড়া বদল চালাচ্ছেন, তাঁদের দুনো জোর হয়েছে। মুসলমান হিসাবেও ভোট পাচ্ছেন, কংগ্রেসী হিসাবেও পাচ্ছেন। সুতরাং তাঁদের সিওর সাকসেস। কেবল যেখানে ভাই-ভাই-এ ভোটের লড়াই সেখানকার খবর আলাদা।"

শ্রীনেহরুর ক্ষমাপ্রার্থনা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগের মুখপত্র পাক্ষিক "এ-আই-সি-সি ইকনমিক রিভিয়ু" পত্রিকার ১লা মার্চ সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহর্ষদেব মালবীয় লিখিত একটি প্রবন্ধে ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সম্পর্কে কোন মন্তব্যে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও ব্রিটিশ সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করায় শ্রীনেহরু রাণীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন। লণ্ডনস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও রাণীর নিকট এক পত্রে ঐ প্রবন্ধের জন্ম ভারত সরকারের তরফে দুঃখ জানাইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন। ভারতস্থিত ডেপুটি ব্রিটিশ হাই-কমিশনারের নিকট এক পত্রে কংগ্রেস-সভাপতি উচ্ছঙ্গরায় নওলশঙ্কর ঢেবরও অনুরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন।

একটি সামান্ত ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এবংবিধ ব্যবহারে জনসাধারণ সত্যই বিস্মিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে "এ-আই-সি-সি ইকনমিক রিভিয়ু"র মন্তব্য তীক্ষ্ণ বিচারে আংশিকভাবে সুরুচির অনুগামী না হইলেও মোটামুটি ভাবে তাহাতে সত্য কথাই বলা হইয়াছে। গোয়াতে পর্তুগীজ অত্যাচার এবং সাইপ্রাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলার জন্ত কোন ভারতবাসীই লজ্জিত হইতে পারেন না। প্রবন্ধটিতে একটি সামান্ত ত্রুটি ছিল এই যে, পর্তুগালের প্রেসিডেণ্টের একটি বাণী ব্রিটিশ রাণীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য ভাষা সংযত ছিল না।

এই প্রবন্ধটি লইয়া ব্রিটিশ পত্রিকামহলে হৈ-চৈ পড়িয়া যায় এবং যে সকল ব্রিটিশ পত্রিকা কস্মিনকালেও রাজনীতি চর্চা করে না তাহারাও চীৎকার আরম্ভ করে যে, ব্রিটেনের মান-ইজ্জত সব গেল। পত্রিকাটি ভারত সরকারের মুখপত্র নহে এবং মন্তব্যটিও কোন সরকারী কর্মচারী করেন নাই। সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ভারত সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কোন কথাই উঠে না। কিন্তু তথাপি শ্রীনেহরু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত দুঃখপ্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ব্যাপারটির সেখানেই সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল; কিন্তু এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসী নেতৃবর্গ বিশেষ হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়াছেন। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঢেবর ক্ষমাপ্রার্থনা তো করিয়াছেনই, উপরন্তু শ্রীমালবীয়কে আনিয়া ধমকাইয়াছেন। "ইকনমিক রিভিয়ু"র প্রধান সম্পাদক প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে সকল দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া যে সাংবাদিক অসৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দিল্লীর সাংবাদিকসঙ্ঘ বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। উপরন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ পত্রিকাটির পরিচালনা ব্যাপারেও অধিকতর নিয়ন্ত্রণ চালু করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

সত্যই ইহা বিস্ময়কর! ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় ভারত এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কত কি লেখা হয়—কৈ সেই বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ তো শোনা যায় না! "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণাবিভাগও নাকি এই প্রবন্ধ প্রকাশে বিরক্ত হইয়াছেন। ভারতের অবমাননাকর প্রবন্ধ প্রকাশে ইঁহাদের বিরক্তির প্রমাণ পাইতে এখনও আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। অপরদিকে যে সকল ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা রাণীর গৌরবহানি হইতে চলিল বলিয়া চীৎকার তুলিয়াছে, মার্কিন পত্র-পত্রিকায় রাণীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশে তাহাদের কলম একটুও তুলিতে তাহারা সাহস পায় নাই।

দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইম্‌স" পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার "ইনসাফ" লিখিতেছেন, ভারতীয় নেতাদের একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, সর্বদা পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নিকট নতিস্বীকার করিয়া ভারত বিশেষ লাভবান হইতে পারিবে না। "বস্তুতঃ সকলেই একথা মনে করেন যে, ব্রিটিশ রাণীর পর্তুগাল ভ্রমণ-সম্পর্কিত প্রবন্ধের জন্ত 'এ-আই-সি-সি ইকনমিক রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদকের নিন্দা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ক্ষমাপ্রার্থনার স্রোতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সকল মন্ত্রীই বিশেষ সুখী হইয়াছেন—সেকথা বলা চলে না।" "ইনসাফ" ওয়াকিবহাল ব্যক্তি, তিনি ভারত সরকারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অনেক খবর রাখেন। সেই দিক হইতে তাঁহার এই মন্তব্যের বিশেষ মূল্য আছে।

একটি সামান্ত মন্তব্যের জন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আচরণকে

"চায়ের পেয়ালায় তুফান" আখ্যা দিয়া "যুগান্তর" পত্রিকা ২৫শে ফাল্গুন এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছেন, বিষয়টির ঔচিত্যানৌচিত্য লইয়া তাই আমরা কোন কথাই লিখি নাই। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির ...নিয়ন্ত্রণের পর স্বভাবতঃই কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠিবে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি আমরাও পড়িয়াছি—তাহাতে রাণীর ব্যক্তিগত মর্যাদার উপর সত্যই কি কোন আঘাত করা হইয়াছে? শাসনতন্ত্রের অধিনেত্রীরূপে ইংলণ্ডেশ্বরীর ব্যক্তিগত সম্ভ্রম ব্রিটিশ-জাতির কাছে যত বড়ই হউক, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রতিভূ ছাড়া অন্য কিছু নন। কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক ও ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে যদি রাণীর কথা আসিয়াই পড়ে, তাহা রাণী সম্পর্কে ব্যক্তিগত আলোচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মার্কিন ও অন্যান্য দেশের পত্রিকায় এই শ্রেণীর বা ইহার চেয়েও কঠোর আলোচনা হামেশাই হইয়া থাকে। কৈ; সে সময় ত ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি উঠে না? আসলে ব্রিটিশ রক্ষণশীল মহলে ভারতের বিরুদ্ধে একটি মনোভাব সৃষ্টির আয়োজন চলিতেছে। তাহারই লাগসই একটা ছুতা হিসাবে রাণীর প্রসঙ্গটি খুঁচাইয়া তোলা হইয়াছে। এ কথা মনে করিবার আরও একটি কারণ, পত্রিকাটি প্রকাশিত হইবার দুইদিন পূর্ব্বে মন্তব্যটি ব্রিটেনে পৌঁছিল কি করিয়া?"

"যুগান্তর" লিখিতেছেন, "ইকনমিক রিভিয়ু'র মন্তব্যে রাণীর ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কোন কথাই নাই। ব্রিটিশ ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীর অত্যাচার সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সবই সত্য। "কমনওয়েলথী সৌহার্দ্দ্যের খাতিরে এই সত্য গোপন করিতে হইলে আমাদের স্বাধীনতা কি খুব মূল্যবান্ মনে করিতে হইবে?" পত্রিকাটির মতামত নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন "যুগান্তর" সর্ব্বতোরূপে তাহার নিন্দা করিয়াছেন।

সিমেণ্টের চোরাকারবার

সিমেণ্টের বাজারে চোরাকারবার দিন দিন ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে, এবং বাংলা দেশে ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, নিয়মসঙ্গত ভাবে নিয়ন্ত্রিত সিমেণ্ট পাওয়া যায় না, চোরাবাজার হইতে অত্যধিক মূল্যে ইহা ক্রয় করিতে হয়। ভারতবর্ষে সিমেণ্টের বর্ত্তমানে এত অভাব যে, খোলাবাজারে ইহা পাওয়া যায় না, সিমেণ্ট ক্রয় করিতে হইলে সরকারী 'পারমিট' বা অনুমতির প্রয়োজন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সরকারী অনুমতি স্বাভাবিক নিয়মে পাওয়া যায় না; যাহারা লাইসেন্স প্রাপ্ত সিমেণ্টের ব্যবসাদার তাহাদের মারফতে দরখাস্ত পেশ করিতে হয়, যদিও ইহা বে-আইনী, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা আইনসঙ্গত। কারণ সরাসরি সরকারী বিভাগের নিকট দরখাস্ত করিলে সিমেণ্ট প্রাপ্তির অনুমতি পাওয়া যায় না। ব্যবসাদারদের মারফতে দরখাস্ত করিবার সময় যাহা প্রয়োজন তাহার দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণের জন্য আবেদন করিতে হয়, এই অতিরিক্ত পরিমাণ সিমেণ্ট ব্যবসাদারেরা কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রয় করে; তাহাদের বক্তব্য এই যে, সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বহুল পরিমাণে ঘুষ দিয়া পারমিট বাহির করিতে হয়, এবং সে খরচা তুলিতে হইলে কালোবাজারে চড়াদামে বিক্রয় প্রয়োজন। আর এই লেনদেনের জন্য অবশ্য কিছু পারিশ্রমিক প্রয়োজন এবং তাহার নিমিত্ত এই অতিরিক্ত পরিমাণ সিমেণ্ট কালোবাজারে বিক্রয় করিতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে দ্রব্যনিয়ন্ত্রণ প্রথাদ্বারা অহেতুক ভাবে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এই কৃত্রিম অভাবের ফলে কালোবাজারের প্রসার সম্ভবপর হয় এবং সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহাতে লাভবান হয়। সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণের প্রহসন অনতিবিলম্বে অপসারণ করা প্রয়োজন, ইহাতে যথাযথ বিতরণ সম্ভবপর না হইয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির দ্বারা কালোবাজার বজায় রাখিতে সাহায্য করা হইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ২৮টি সিমেণ্ট-কারখানা আছে, ইহাদের বাৎসরিক উৎপাদন-ক্ষমতা ৬০ লক্ষ টন। ২৮টি কারখানার মধ্যে একটির মালিক উত্তরপ্রদেশ সরকার ও অন্য একটির মালিক মহীশূর সরকার। বাকি ২৬টি কারখানার মালিকানা বেসরকারী। ইহাদের মধ্যে ৭টি আছে বিহারে, ৪টি বোম্বাইয়ে, ৩টি মাদ্রাজে, ২টি মহীশূরে, ২টি অন্ধ্রপ্রদেশে, ২টি মধ্যপ্রদেশে, ২টি রাজস্থানে, ২টি পঞ্জাবে, ১টি উড়িষ্যায় এবং ১টি কেরলে। সিমেণ্ট-শিল্পের বর্ত্তমান মূলধন ৪০ কোটি টাকা এবং ইহাতে ৩০ হাজার শ্রমিক কার্য্য করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সিমেণ্ট উৎপাদন আরও ১ কোটি টন বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সনে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টনে; আরও অতিরিক্ত ৫০ ৬০ কোটি টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া ৩১টি নূতন সিমেণ্ট-কারখানা স্থাপন করা হইবে। নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা উচিত যেন আঞ্চলিক স্থানীয়করণের সাম্য রক্ষিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, কারখানাগুলি তাহাদের উৎপাদনশক্তির সমস্তটাই যেন কার্য্যকরী করে। বর্ত্তমানে বাৎসরিক উৎপাদনশক্তির পরিমাণ যদিও বৎসরে ৬০ লক্ষ টন, তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টনের অধিক উৎপন্ন হয় না।

নূতন কারখানাগুলির মধ্যে ৭টি স্থাপিত হইবে অন্ধ্রপ্রদেশে, ৭টি, বোম্বাই প্রদেশে, ৩টি রাজস্থানে, ৩টি মধ্যপ্রদেশে, ২টি আসামে, ২টি পশ্চিমবঙ্গে, ২টি মাদ্রাজে এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পণ্ডিচেরী ও মহীশূরে ১টি করিয়া কারখানা স্থাপিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সিমেণ্টের চোরাকারবার বন্ধ করা প্রয়োজন এবং তাহার জন্য সিমেণ্টের আমদানী অবাধ করিয়া দিয়া আভ্যন্তরিক নিয়ন্ত্রণ রহিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। চিনির যখন নিয়ন্ত্রণ ছিল তখন ইহার সরবরাহে ঘাটতি হইত, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া

দেওয়ায়ও বিদেশ হইতে আমদানি শুরু করাতে চিনির আভ্যন্তরিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল এবং প্রয়োজনের তুলনায় ইহার উৎপাদন অতিরিক্ত হইতেছে। সেইরূপ, সিমেন্টের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ রহিত করিয়া দিলে ও সরকারী প্রয়োজনের জন্য সমস্ত সিমেন্ট বাহির হইতে আমদানি করিলে ইহার চোরাকারবার বন্ধ হইয়া যাইবে। চোরাবাজারের অধিকাংশ সিমেন্ট আসে সরকারী পরিকল্পনাগুলির নিকট হইতে, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে হিসাব দেখাইয়া চোরাবাজারে সরবরাহ দেওয়া হয়।

কৃষিঋণ পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, বহুপ্রকার আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও বেসরকারী কৃষিঋণ অনুকূল সর্তেও সহজলভ্য হইতেছে না। গত ১৮৭৯ সন হইতে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করিয়া আসিতেছেন যাহাতে বেসরকারী কৃষিঋণের সর্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু আইনগুলি সেরূপভাবে কার্যকরী হয় নাই। বেসরকারী কৃষিঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, বেসরকারী ঋণদাতা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ঋণদানের বন্দোবস্ত নাই, এবং তৃতীয়তঃ চাষীদের ঋণগ্রহণের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা। এই সকল কারণগুলির জন্য গ্রাম্য মহাজন তাহার পুরাতন প্রথাকেই চালু করিয়া আসিতেছে। তবে নূতন নূতন আইনের দ্বারা মহাজনের ঋণদানের ক্ষমতাকে সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে এবং উৎপাদনের প্রয়োজন ব্যতীত সাংসারিক প্রয়োজনে ঋণগ্রহণকে নিরুৎসাহ করা হয়।

সংস্থাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিস্তৃতি এবং সমবায় প্রথার উন্নতি সত্ত্বেও দেখা যায় যে, এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ কৃষিঋণ আসে গ্রাম্য মহাজনদের নিকট হইতে। ব্যবসায়ী ও কৃষিঋণের মহাজনরা যুক্তভাবে মোট প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের প্রায় ৬৯·৭ শতাংশ সরবরাহ করে। জমিদার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর দাদনের পরিমাণ ধরিলে বেসরকারী কৃষিঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট কৃষিঋণের ৭৭ শতাংশে। ভারতবর্ষে কৃষিঋণের বাৎসরিক পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা। এই প্রয়োজনীয় অর্থের কেবলমাত্র ৭·৩ শতাংশ আসে সরকারী প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। সমবায় সমিতির দাদনের পরিমাণ ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ৩ শতাংশ।

ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোতে বেসরকারী গ্রাম্য মহাজনের অস্তিত্ব যদিও অবশ্যম্ভাবী, তথাপি ইহার কুফলই অধিক হইয়াছে। সর্বভারতীয় কৃষিঋণ অনুসন্ধান সমিতি সেই কারণে সমবায় সমিতির বিস্তৃতির জন্য সুপারিশ করেন; এবং ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের কোনও কোনও ধারার পরিবর্তনসাধন করা হয়। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করিবেন; রাষ্ট্র-সহযোগিতা বর্তমান সমবায় ব্যবস্থায় নূতন নীতি; কিন্তু ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় না। ষ্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান দায়িত্ব ৪০০ নূতন শাখা খোলায়—যাহাতে কৃষিঋণের বিবর্তন সম্ভবপর হয়। কিন্তু গত তিন বৎসরে মাত্র ৬৬টি শাখা খোলা হইয়াছে। ৪০০ শাখা খোলা এখনও দশ বৎসরের ব্যাপার; এ সম্বন্ধে সরকারী গতিবিধি অত্যন্ত মন্থর।

পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় কৃষি ব্যাঙ্ক আছে ও তাহার শাখা সর্বত্রই বিস্তৃত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কংগ্রেসী সরকার এ বিষয়ে প্রথম হইতেই গোঁজামিল দিয়া আসিতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর কৃষিঋণের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু শীর্ষ ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক-প্রকার দায়িত্ব আছে যে, কৃষিঋণের ব্যবস্থা তাহাকে জোড়াতালি দিয়াই সম্পন্ন করিতে হইবে। কৃষিঋণ দুইপ্রকার—দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বন্দোবস্ত করিয়াছে; কিন্তু ইহার প্রয়োজন স্বল্পমেয়াদী ঋণের তুলনায় অত্যল্প। স্বল্প-মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন অধিক এবং ইহা গ্রাম্য মহাজনদের নিকট হইতে সহজলভ্য, যদিও এই ঋণের সর্তগুলি পীড়নদায়ক। সহজ-লভ্যতা কৃষিঋণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মহাজনদের কঠিন সর্ত সত্ত্বেও চাষীরা মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ লইতে বাধ্য হয়, কারণ ইহা সহজলভ্য। সরকার কিংবা সমবায় সমিতির নিকট হইতে ঋণ লইতে হইলে বহুপ্রকার নিয়মকানুন মানিতে হয়—যাহা নিরক্ষর চাষীর পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না।

কৃষিঋণের ব্যাপারে বাংলা একটি অনগ্রসর প্রদেশ। এই বিষয়ে মাদ্রাজ বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ ও পঞ্জাব খুব অগ্রণী। বাংলা দেশে প্রায় কুড়িটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই খুব দুরবস্থা। অন্যান্য শাখা-ব্যবসা আছে বলিয়া এই সমিতিগুলি কোনও প্রকারে টিকিয়া আছে। আর প্রাথমিক সমিতিগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়; এই সমিতিগুলির পুরাতন অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ এত অধিক যে, ইহাদের অনেকগুলি ইচ্ছাকৃত লিকুইডেশনে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। আর বাকীগুলির কাগজে-কলমে অস্তিত্ব থাকিলেও কার্যতঃ ইহারা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির সুদের হার অত্যধিক এবং এই ব্যাপারে ইহারা গ্রাম্য মহাজনের চেয়ে বেশী ভাল কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের সুদের হার বাৎসরিক শতকরা ৬ হইতে ৭ শতাংশ; এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার বাৎসরিক শতকরা সাড়ে বারো শতাংশ পর্যন্ত। অন্যান্য সমবায় সমিতির বাৎসরিক সুদের হার ১০ হইতে ১৫½ শতাংশ পর্যন্ত। ইহাতে দেখা যায় যে, সুদের ব্যাপারে সমবায় সমিতিগুলি অনেক মহাজনের চেয়ে কম যায় না। অবশ্য একথাও সত্য যে, ঋণশোধ প্রায়ই হয় না এবং সুদও সময়মত আসে না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলি আজ অর্থনৈতিক দুরবস্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা। এই জেলাগুলির অভ্যন্তর ভাগ পরিদর্শন করিলেই এই

উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। ইহাদের ঘরে ঘরে বেকার, কায়ক্লেশে ও অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যাবলী শুধু পরিকল্পনার মধ্যে রহিয়া যাইতেছে। যতদিন না কৃষককে পরিশ্রম করিয়া ফললাভ করিতে শেখানো হয় ও তাহার আয়াস-প্রয়াসের বাধা সরানো হয় ততদিন ঋণ দেওয়াও বৃথা এবং কৃষকের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টাও বৃথা।

রাণীগঞ্জের কয়লা-সম্পদ

ভারতবর্ষে অন্যান্ত কয়লাখনির মধ্যে ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লা-খনিগুলি হইতে উচ্চশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। ঝরিয়া বিহারে ও রাণীগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত; এবং ইহারাই ভারতবর্ষের অধিকাংশ কয়লা উৎপাদন করে। রাণীগঞ্জের কয়লাখনিগুলি ১৮২০ সনে খোলা হয় ও ঝরিয়া খোলা হয় ১৮৯৩ সনে। ১৯০৬ সন পর্য্যন্ত ঝরিয়ার চেয়ে রাণীগঞ্জ অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপাদন করিত। কিন্তু তাহার পর হইতে ঝরিয়ার কয়লা উৎপাদন বর্ত্তমানে রাণীগঞ্জ হইতে অধিকতর হইয়েছে। ১৯৩২ সনে ডাঃ সিরিল ফক্স সর্বভারতীয় কয়লা সম্পদের হিসাব করেন। তাঁহার হিসাবমতে ভারতের মোট কয়লা সম্পদের পরিমাণ ৬,০০০ কোটি টন। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ২,০০০ কোটি টনের উৎপাদন কার্য্যকরী ভাবে সম্ভবপর। আবার এই ২,০০০ টনের মধ্যে কেবলমাত্র ৫০০ কোটি টন উচ্চশ্রেণীর কয়লা। এই ৫০০ কোটি টনের মধ্যে রাণীগঞ্জে আছে ১৮০ কোটি টন ও ঝরিয়াতে আছে ১২৫ কোটি টন।

সম্প্রতি ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগ যে অনুসন্ধান করেন তাহাতে দেখা যায় যে, রাণীগঞ্জের কয়লাখনিগুলিতে মোট ১৩০০ কোটি টন কয়লা-সম্পদ আছে। বর্ত্তমান হারে খরচ হইলে ইহা কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে। ১৯৪৬ সনে যে হিসাব হয় তাহাতে দেখা যায় যে, উচ্চশ্রেণীর গণ্ডোয়ানা কয়লার পরিমাণ ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জে আছে ৪৫২ কোটি টন। ভারতের কয়লা-সম্পদের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা যে সীমাবদ্ধ এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার তুলনায় অল্প, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ভারতের রেল-ইঞ্জিনসমূহে উচ্চশ্রেণীর কয়লার যথেষ্ট অপচয় হইতেছে, তাহা বন্ধ করা প্রয়োজন।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অগ্রগতি

৩রা মার্চ্চ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া মাদ্রাজের ইংরেজী দৈনিক "হিন্দু" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুত কর্ত্তব্যগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা সে, বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত দিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্ববৃদ্ধির কথা চিন্তা করিয়া যাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সেই আশঙ্কা দূর হইয়াছে। জাতীয়করণের ফলে পরিচালন-ব্যবস্থার ক্ষমতা কমে নাই বা আমানতকারীর সংখ্যাও কমে নাই। জাতীয়করণের পর ডক্টর জন মাথাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম বোর্ড অব ডাইরেক্টর-দের সুযোগ্য পরিচালনায় পরিবর্ত্তনকালীন ব্যবস্থাগুলি বিশেষ সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছে।

জাতীয়করণের অব্যবহিত পরেই ব্যাঙ্কের আমানত কতকাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই হ্রাস বন্ধ হয় এবং ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গত বৎসর অন্যান্ত সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক (যাহারা উচ্চতর হারে সুদ দেয়) অপেক্ষাও দ্রুততর হারে ষ্টেট ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি পায়। দাদন সম্পর্কে ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে নাই। জাতীয়করণের পূর্ব্বাবস্থা অনুসরণ করিয়া বেসরকারী বাণিজ্যিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ব্যাঙ্ক পূর্ব্বের ন্যায়ই সাহায্য করিতে থাকে।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ঋণ বিতরণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন সম্পর্কিত ব্যাপারে ব্যাঙ্ক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারে নাই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময় বলা হইয়াছিল যে, ষ্টেট ব্যাঙ্ক কৃষিঋণের সুবিধার জন্য মফস্বল অঞ্চলে ৫০০টি শাখা স্থাপন করিবে। কিন্তু ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আঠার মাস সময়ে কার্য্যতঃ মাত্র ৬৬টি শাখা খোলা হইয়াছে। ডিরেক্টর বোর্ডের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মফস্বল অঞ্চলে শাখা স্থাপনের প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত স্থানাভাব।

"হিন্দু" লিখিতেছেন, যদি অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিক থাকে তবে স্থানাভাবের অজুহাত না দিয়া ষ্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে অস্থায়ীভাবে যে-কোন বাড়ীতেই শাখা স্থাপন করিতে পারে। পরে ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী তৈয়ার হইলে স্বচ্ছন্দে সেখানে শাখাটিকে সরাইয়া লওয়া চলিবে।

ষ্টেট ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গ স্থির করিয়াছেন যে, সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে অপেক্ষাকৃত নিম্নহারে ধার দেওয়া হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের এই সাহায্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি কতদূর পাইয়াছেন তাহা বোঝা যায় না। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ বজায় রাখিয়া গ্রামাঞ্চলে ঋণদান সংক্রান্ত কর্ম্মধারাটি কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। বোধ হয় ঋণশোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যবস্থা পরিকল্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইবে না।

যাহাই হউক, ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্ক যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অভিনন্দনযোগ্য। যদি যোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে কার্য্যক্রম চলে তবে ইহাতে সুফল হইবে। এইখানে বলা প্রয়োজন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের খদ্দর ও কুটীর-শিল্পের রীতি যদি নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে সুফলের আশা সুদূরপরাহত।

আসানসোলে অপরাধবৃদ্ধি

আসানসোল মহকুমায় অপরাধ-অনুষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বিচলিত হইয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "বাঙালী" লিখিতেছেন, "ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় মহকুমা হইতে শান্তিশৃঙ্খলা বিদায় লইয়াছে। খুন, ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি, জুয়াখেলা, বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রয়, মহিলাদের প্রতি অশোভন প্রদর্শন যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।"

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন :

"সম্প্রতি রাণীগঞ্জে সিনেমা হইতে ফিরিবার কালে দুই জন মহিলার উপর আক্রমণ—যাহার ফলে একজন মহিলা ও তাঁহার শিশুপুত্র হত ও একজন মহিলা সাংঘাতিক আহত হইয়াছেন এবং অণ্ডালে একজন সহকারী দারোগার নিখোঁজ হওয়া প্রভৃতি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সম্প্রতি আসানসোল কোর্ট এলাকার সন্নিকটে বিভিন্ন দিনে ও অবস্থায় দুইটি যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

"এই সকল ঘটনা জনসাধারণের সাধারণ নিরাপত্তার মূলে আঘাত হানিতেছে। জনসাধারণ আর নিজেদের নিরাপদ মনে করিতেছে না।"

আসানসোলে অপরাধবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন, "প্রথমতঃ অপরাধ ধরা পড়িতেছে কম, তাহার উপর নানা যোগাযোগে, আইনের ফাঁকে অপরাধীর সাজা হইতেছে আরও কম।" পুলিসের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু অপরাধের সংখ্যা কমিতেছে না। অবশ্য সকল অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য পুলিসকে দায়ী করা ঠিক হইবে না, কারণ স্থানীয় অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও এই সকল অপরাধ বৃদ্ধির হেতুরূপে কাজ করিতেছে। কিন্তু অপরাধ নিবারণে পুলিসের দায়িত্বই যে সর্ব্বাধিক তাহাও ভুলিতে পারা যায় না।

মহকুমার এই শোচনীয় পরিস্থিতির অবসানের জন্য "বঙ্গবাণী" স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তিনি যেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়া, এক গণ-প্রতিনিধি দল গঠন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট সমগ্র পরিস্থিতি বুঝাইয়া বলেন এবং এই অবস্থা অবসানের জন্য সাহায্য-প্রার্থনা করেন।

"বঙ্গবাণী"র এই প্রস্তাব বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা মনে করি।

স্বাধীন রাষ্ট্র ঘনা

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গোল্ড কোষ্ট নামক ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলটি গত ৬ই মার্চ্চ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের পর রাষ্ট্রটির নূতন নামকরণ হইয়াছে ঘনা। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর প্রায় সকল বৃহৎ রাষ্ট্রই ঘনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঘনা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তি করিয়াছে। ঘনাই কমনওয়েলথের প্রথম প্রকৃত আফ্রিকান সদস্য। দক্ষিণ আফ্রিকা যদিও পূর্ব্ব হইতেই কমনওয়েলথের সদস্য ছিল তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে আফ্রিকানদের জাতীয় সরকার বলা চলে না। নবীন ঘনা আফ্রিকায় নবজাগরণের প্রতীক। ঘনার স্বাধীনতা দিবসে এক বক্তৃতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহর-লাল নেহরু বলেন : "আফ্রিকায় অনেক 'কৃষ্ণছায়া' আছে, সুতরাং ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই আলো বিচ্ছুরণ আনন্দের কথা। আমি আশা করি এই আলো অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃতিলাভ করিবে। যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।"

ঘনার আয়তন ৯১,৮৪৩ বর্গমাইল, প্রায় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সমান। মোট ৪৬,২০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৩,০০০ জন ব্যতীত আর সকলেই আফ্রিকান। দেশটি তিনটি অংশে বিভক্ত : কলোনী, আশান্তি এবং উত্তরাঞ্চল। উহা ব্যতীত টোগোল্যাণ্ডের অংশবিশেষও নূতন রাষ্ট্রটির অংশরূপে পরিণত হইয়াছে।

ঘনা প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। রাষ্ট্রের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইল কোকো। কোকো উৎপাদনে প্রায় ১,৮৫,০০০ শ্রমিক নিযুক্ত রহিয়াছে। ঘনাই পৃথিবীর বৃহত্তম কোকো উৎপাদক। কোকো ব্যতীত নারিকেল তৈল, কফি এবং অন্যান্য শস্যাদি ঘনার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রপ্তানী-বাণিজ্যে কোকোর পরই কাষ্ঠ ও কাষ্ঠজাত দ্রব্যের স্থান।

রাষ্ট্রটি খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রধান প্রধান খনিজ-উৎপাদনের মধ্যে স্বর্ণ, হীরক, ম্যাঙ্গানিজ এবং বক্সাইট প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও ঘনা শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ পশ্চাদ্‌পদ।

আয়র্লণ্ডের নির্ব্বাচন

সম্প্রতি আয়র্লণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। নির্ব্বাচনে আয়র্লণ্ডের সর্ব্বজনমান্য নেতা ইমন ডি. ভ্যালেরারই জয় হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের ৩৮ বৎসরের স্বাধীনতার ইতিহাসে কুড়ি বৎসরই ডি. ভ্যালেরা রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে ছিলেন।

আয়র্লণ্ডের ডেল অর্থাৎ পার্লামেণ্টে মোট ১৪৭টি আসনের মধ্যে ডি. ভ্যালেরার ফিয়ানা ফেল দল ৭৮টি আসন লাভ করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এইবারকার নির্ব্বাচনেই সর্ব্বপ্রথম সিনফিন দল নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ইহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, ফিয়ানা ফেলের ভোট ভাগ হইয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ এই সকল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাকার ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন, সিনফিন উনিশটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল—পাইয়াছে মাত্র চারটি আসন, সিনফিন ঘোষণা করিয়াছে যে, যত দিন পর্য্যন্ত

পার্লামেণ্টে তাহারা সংখ্যালঘু থাকিবে তত দিন তাহারা পার্লামেণ্টারী কার্য্যকলাপে অংশগ্রহণ করিবে না। ফলে নূতন পার্লামেণ্টে ডি. ভ্যালেরার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কার্য্যতঃ আরও বৃদ্ধি পাইবে। প্রাক্‌-নির্ব্বাচন যুগের মন্ত্রীসভার অন্যতম প্রধান দল ফাইন গেল তেমন বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বলা ভাল যে, ফিয়ানা ফেল এবং ফাইন গেলের মধ্যে পূর্ব্বে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে তাহাদের রাজনৈতিক পার্থক্য নিতান্তই সামান্য।

স্বাধীনতার পর ৩৬ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও আয়ার্লণ্ড-বাসী তাহাদের দেশবিভাগকে মানিয়া লইতে পারেন নাই। দেশ-বিভাগের প্রশ্নে এখনও তাহাদের অনুভূতি বিশেষ প্রখর। কিছুদিন পূর্ব্বেও গুপ্ত "আইরিশ রিপাবলিকান বাহিনী"র সদস্যগণ গিয়া উত্তর আয়ার্লণ্ডের অঞ্চলবিশেষে হানা দেয়। যদিও সিনফিন ব্যতীত দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডের অপর সকল রাজনৈতিক দলই এই সকল সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়াছেন তথাপি একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডে এমন একজন নাগরিকও নাই যিনি এই গুপ্ত বাহিনীর আদর্শের প্রতি সহানু-ভূতিসম্পন্ন নহেন। আয়ার্লণ্ডের কোন সরকারই দেশবিভাগ-জনিত সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না—ডি. ভ্যালেরার সরকারকেও এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। কিন্তু রিপাবলিকান বাহিনীর গুপ্ত আক্রমণ দ্বারা দেশের পুনর্মিলন কতদূর সম্ভব সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব। কিন্তু ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের নিকট হইতে এ বিষয়ে কোন-রূপ সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করাও বৃথা।

সম্প্রতি কার্ডিনাল ড আলটন আয়ার্লণ্ডের সংযুক্তির এক নূতন প্রস্তাব দিয়া বলিয়াছেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডকে মিলাইয়া একটি ফেডারেশন রাষ্ট্র গঠন করিয়া আইরিশ নেতৃবর্গ যদি আয়ার্লণ্ড রাষ্ট্রকে কমনওয়েলথের সদস্য করিয়া—উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থার সাহায্যার্থ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে অনুমতি দেন তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ সহজতর হইবে এবং আয়ার্লণ্ডের দুরবস্থারও অবসান হইবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ডি. ভ্যালেরা রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

আয়ার্লণ্ডের প্রধান সমস্যা—অর্থনৈতিক-দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা। আয়ার্লণ্ডের লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও কম। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, বিগত পাঁচ বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ লোক দেশান্তরী হইয়াছে। জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ লোকই কর্ম্মহীন দিনযাপন করিতেছে এবং প্রতি সপ্তাহেই এক হাজার লোক দেশত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কৃষির অবস্থা শোচনীয়, শিল্পোন্নয়নের জন্য মূলধনের অভাব। দেশের এই অর্থ-নৈতিক দুর্গতি দূর করিতে না পারিলে আয়ার্লণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কিন্তু নির্ব্বাচনী প্রচারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন অভিনব পরি-কল্পনাই ডি. ভ্যালেরা দেন নাই।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্কট

আট কোটি লোকের দেশ ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর ষষ্ঠতম বৃহৎ রাষ্ট্র। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান ঘটিল না। বৈদেশিক উস্কানি এবং স্থানীয় বিচ্ছেদপন্থীদের কার্য্যকলাপে ইন্দোনেশিয়া আজ এক বিশেষ বিপদের মুখে পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপ।

দেশে প্রায় এক ডজন রাজনৈতিক দল পারস্পরিক কলহে রত। ইহারই অনুষঙ্গরূপে দেশে দুর্নীতি এবং বেআইনী কার্য্য-কলাপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। তদুপরি সেনাবাহিনীর একাংশের অবাধ্যতা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আজ বিশেষ বিপন্ন করিয়াছে। যদিও ইন্দোনেশিয়া একটি অবিভাজ্য রাষ্ট্র তথাপি বর্ত্তমানে যবদ্বীপ ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার আর কোন অংশের উপরই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব নাই। ইহার উপর কেন্দ্রীয় সরকারও দ্বিধাবিভক্ত। ইন্দো-নেশিয়ার দুই প্রধান নেতা ডক্টর সুকার্ণো এবং ডক্টর হাতার পার-স্পরিক মিল নাই।

ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় বিচলিত হইয়া গত বৎসর অক্টোবর মাসে ড. সুকার্ণো বলেন যে, ইন্দোনেশিয়ার উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তুলিয়া দিয়া কিছু দিন "পরিচালিত গণতন্ত্র" (Guided Democracy) ব্যবস্থা চালু করা উচিত। তিনি বলেন, চীন গণতন্ত্রে তিনি যে বিপুল জাতীয় পুনর্গঠন কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছেন ইন্দোনেশিয়াতে তাহার অনুকরণ করিতে হইলে রাজনৈতিক দলাদলি নির্ব্বাসন দিতে হইবে।

স্বভাবতঃই প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণোর এই মতবাদ অনেকেরই পছন্দ হয় নাই। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ড. মহম্মদ হাতা নীতি পার্থক্যের জন্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ করেন। তাহার পর ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী হইতে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী-গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্মিলিত মন্ত্রীসভার চারিটি দলের সদস্য মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করে। মন্ত্রীসভায় থাকে কেবল ড. সুকার্ণোর জাতীয়তাবাদীর দল।

এই রাজনৈতিক অচল অবস্থা অবসানের জন্য ড. সুকার্ণো গত ২১শে ফেব্রুয়ারী এক নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। জাতির নিকট এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণো ইন্দোনেশিয়ার ভূমিতে পশ্চিম হইতে আমদানীকৃত গণতন্ত্রের অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইন্দোনেশিয়াতে এখন একটি নূতন ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলনের সময় আসিয়াছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র পশ্চিমের দেশগুলির উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু বিগত এগার বৎসরের ইতিহাস হইতে উহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ গণ-তন্ত্র ইন্দোনেশিয়ার উপযোগী নহে। অতীতে যে সকল সরকারই

সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন প্রত্যেকক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলিকে দমাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের শক্তির একাংশ নষ্ট করিতে হইয়াছে। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিতেছেন।

ইন্দোনেশীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের সম্মিলিত প্রায় নয় শত প্রতিনিধির সমূখে তাঁহার প্রস্তাবিত পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো অবিলম্বে একটি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা এবং একটি জাতীয় পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। জাতীয় পরিষদ মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দান করিবে। এই জাতীয় পরিষদ গঠিত হইবে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, প্রোটেষ্টান্ট, ক্যাথলিক, মুসলমান, বিমান, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রতিনিধিবর্গ এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণ প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের সদস্য হইবেন। নূতন পরিকল্পনায় কমিউনিষ্টগণও মন্ত্রীসভায় যোগদানের অধিকারী হইবে। (কমিউনিষ্ট পার্টি ইন্দোনেশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম রাজনৈতিক দল—বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি বাট লক্ষাধিক ভোট পাইয়াছিল)।

প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোর প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে জাতীয়তাবাদী দল সমর্থন করিয়াছে; আর করিয়াছে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অপরাপর বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি —যথা নাদাতুল উলেমা (গোঁড়া মুসলমান) এবং মসজুমী (মুসলমান)—এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই।

প্রেসিডেন্ট সুকার্ণোর এই পরিকল্পনায় ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উপরন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ আরও ব্যাপকতর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট সুকার্ণো জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এদিকে ড. শাস্ত্রো আমিদজোজোর মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করিয়াছে।

ভারত-পোলিশ সম্পর্ক

পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ জোসেফ সাইরেনকিউইজ, শীঘ্রই ভারত পরিভ্রমণে আসিতেছেন। তিনি ভারতে দশ দিন অবস্থান করিবেন। সেই সময় ভারত-পোলিশ সম্পর্ক এবং সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক লইয়া শ্রীনেহরু ও মিঃ সাইরেনকিউইজের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিবে।

পোল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনের পর মিঃ সাইরেনকিউইজ পুনরায় পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মধ্যে কিছুদিন ব্যতীত ১৯৪৭ সন হইতে তিনি পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী রূপে কাজ করিতেছেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পোল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট মিঃ সাইরেনকিউইজের নূতন মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করেন। পার্লামেন্টের শতকরা ৫১'৭টি আসন কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিকৃত; কিন্তু মন্ত্রীসভার ৩২ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জনই কম্যুনিষ্ট। যেমন গোমুলকা (পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা), পারস্য ইয়ারসজেউইকজ এবং ষ্টেফান ইগনার (কিষাণ কৃষকদের নেতা)।

২৬শে ফেব্রুয়ারী পোল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় মিঃ সাইরেনকিউইজ বলেন, "অক্টোবরের পথ" হইতে আর অন্য পথে যাওয়া হইবে না। (এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে, গত অক্টোবর মাসে ষ্ট্যালিনপন্থীদের বিরুদ্ধে মিঃ গোমুলকার জয়লাভের ফলেই পোল্যাণ্ডে কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থায় নানাবিধ অন্যায় অবিচার দূর করিয়া নূতন ব্যবস্থা চালু হয়)। তিনি বলেন, তাঁহার সরকারের লক্ষ্য পোল্যাণ্ডে অধিকতর বাস্তব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা মারফত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে নূতন প্রচেষ্টা পোল্যাণ্ডে চলিতেছে সকল ভারতবাসীই তাহা বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত অনুধাবন করিবে। ইউরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুগোস্লাভিয়া এবং পরে পোল্যাণ্ড জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ভারত-পোল্যাণ্ড মৈত্রীবন্ধন আরও সুদৃঢ় হইবে বলিয়া আশা করিলে তাহা ভুল হইবে না।

ইতিমধ্যেই ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৬ সনের ৩রা এপ্রিল যে ভারত-পোল্যাণ্ড বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয় গত ২রা মার্চ তাহার মেয়াদ ১৯৫৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণও ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৫৬ সনের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ভারত হইতে পোল্যাণ্ডে রপ্তানীকৃত পণ্যদ্রব্যের মূল্য হইল ১৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। অপরপক্ষে ১৯৫৫–৫৬ সনে ঐরূপ রপ্তানীর মূল্য ছিল মাত্র ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। পোল্যাণ্ড হইতে ভারতে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে অগ্রগতি আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫–৫৬ সনে পোল্যাণ্ড হইতে ভারতে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য যে স্থলে ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, ১৯৫৬ সনের এপ্রিল-নবেম্বর এই আট মাসের আমদানীর মূল্যই তাঁহার প্রায় পাঁচ গুণের কাছাকাছি। ঐ আট মাসে পোল্যাণ্ড হইতে ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য ভারতে আমদানী করা হয়। ভারত হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে অভ্র, লৌহ এবং চামড়া। পোল্যাণ্ড হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে প্রধানগুলি হইতেছে বিভিন্ন ধাতু, লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য এবং কাগজ।

আমরা পোলিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

বিরুদ্ধে যাহা যুক্তিযুক্ত হইলেও হইতে পারিত, আজকার পরিস্থিতিতে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

মার্কিনী গণতন্ত্রের নমুনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই স্বাধীন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতামত পোষণ করিবার মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ এই স্বাধীন মত পোষণের অধিকার বর্ত্তমানে বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদের মতামতের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, হিটলারের জার্ম্মানী এবং ষ্ট্যালিনের রাশিয়া ব্যতীত আর কোথাও সেরূপ ঘটে নাই। বর্ত্তমানে পুলিটজার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেখকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক আর্থার মিলারের লাঞ্ছনা আরম্ভ হইয়াছে।

গত গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের অমার্কিন কার্য্য-কলাপ সংক্রান্ত কমিটি "আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট চক্রান্তের সাহায্যকল্পে পাসপোর্টের ব্যবহার" সম্পর্কে এক অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানের অন্যতম প্রধান সাক্ষী ছিলেন আর্থার মিলার। মিলার খোলাখুলিই স্বীকার করেন যে, তিনি বামপন্থীদিগের সহিত মেলামেশা করিতেন। কিন্তু ১৯৪৭ সনে কম্যুনিষ্ট সভাসমিতিতে অন্যান্য যে সকল লেখক-দিগকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন। অপর একজন সাক্ষী ছিলেন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর অটোনাথান। তিনি কখনও কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রকাশ সম্পর্কে তাঁহাকে বাধ্য করা হইলে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বহির্ভূত কার্য্য হইবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হইয়াছে। মিঃ মিলার এবং ড. নাথান দুই জনেই অবশ্য এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত সংগ্রাম চালাইতেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন চিন্তা সঙ্কোচনের আর একটি দৃষ্টান্ত মিলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনের সময়। "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, যখন কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলন চলিতে থাকে তখন সম্মেলন ভবনের প্রবেশপথে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের এক দল লোক সিনেমার ক্যামেরা লইয়া সম্মেলনে আগত সকল ব্যক্তির ছবি তুলিতে থাকে।

কম্যুনিষ্ট মতবাদ সম্পর্কে যাঁহার মনোভাব যেরূপই হউক না কেন কেবলমাত্র ঐ মতবাদ গ্রহণের জন্য এইরূপ পুলিসী নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টি নূতন যে জাতীয় নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহার পর মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে হিংসা বা ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণের অভিযোগ করা ও এইরূপ কঠোর ব্যবস্থায় দণ্ডিত করা চলিতে পারে কিনা বিচার্য্য। কেবলমাত্র বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদ পোষণের বিরুদ্ধে এই ধরনের পুলিসী ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা তর্কসাপেক্ষ। ষ্ট্যালিনের বিদেশী রাষ্ট্র ধ্বংসকারী নীতির

যুগোশ্লাভিয়া ও সোভিয়েট রাষ্ট্র

আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট মহলে পুনরায় যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধ প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ গত অক্টোবর মাসের হাঙ্গেরীর অভ্যুত্থান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হইতেই এই বিরোধের উৎপত্তি কিন্তু ইহার গভীরতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও রহিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগোশ্লাভিয়াকে পঁচিশ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অস্বীকার করিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং যুগোশ্লাভ সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক আলোচনা বিফল হইবার পর বেলগ্রেড হইতে খোলাখুলিই সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ মতবিরোধের কথা স্বীকার করা হয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী যুগোশ্লাভ পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুগোশ্লাভ পররাষ্ট্র-সচিব কোচা পোপোভিচ (Koca Popovic) অভিযোগ করেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগোশ্লাভিয়াকে কোণ-ঠাসা করিতে চাহিতেছে। মিঃ পোপোভিচ বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন মুখে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি যেরূপ বন্ধুভাব প্রদর্শন করিতেছে যদি যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিত তবে যুগোশ্লাভ সরকার সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার বিপরীত আচরণই করা হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং অপর কয়েকটি পূর্ব্ব-ইউরোপীয় রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে যাহাতে যুগোশ্লাভিয়া তাহার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে। কিন্তু সোভিয়েট-যুগোশ্লাভ আলোচনাকালীন সমস্যাগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, গত আগষ্ট মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন যটিনিশ্রোতে জলবিদ্যুৎ এবং এলুমিনিয়াম কারখানা নির্ম্মাণের জন্য ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেই প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকৃত হইয়াছে।

মস্কোর উত্তর আসিতেও বিলম্ব হয় নাই। ১১ই মার্চ্চ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "প্রাভদা" পত্রিকায় "পর্য্যবেক্ষক" (Observer) স্বাক্ষরিত এক বিশেষ প্রবন্ধে পেপোভিচের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হয়, পেপোভিচের বক্তৃতা মার্কসবাদ লেনিনবাদের পরিপন্থী। সোভিয়েট ইউনিয়নকে সকল ব্যাপারেই অভ্রান্ত বলিতে অস্বীকার করিবার জন্য যুগোশ্লাভ নেতৃবর্গকে তিরস্কার করিয়া বলা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি মনোভাবই হইল সমাজতন্ত্রের কষ্টিপাথর। সোভিয়েটকে সমালোচনা করিয়া যুগোশ্লাভিয়া সমাজতন্ত্রবিরোধী কাজ করিয়াছে। ("Attitude to the Soviet Union as the first socialist country

which has amassed the greatest wealth of experience of building socialism in the 40 years of its existence, plays an important part in the relations between socialist states. A nihilistic attitude to this experience···indicatss a definite attitude to the cause of socialism in general.")

পরিশেষে "প্রাভদা"র প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট-যুগোস্লাভ সম্পর্কের উন্নতির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যথাসাধ্য করিয়াছে—আর তাহার করিবার কিছুই নাই। এখন যাহা কিছু করণীয় তাহা যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দই করিবেন।

সোভিয়েট-যুগোস্লাভ সম্পর্কের এই নূতন পর্য্যায়ে ইহাই স্পষ্ট হইয়াছে যে, মুখে সমাজতন্ত্র ও সাম্যের বাণী ছড়াইলেও আসলে সোভিয়েট নেতৃবর্গ কোন রাষ্ট্র সমানাধিকার দাবি করিবে তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

কেনিয়া সাইপ্রাস ও এলজিরিয়ায় নির্যাতন

কেনিয়া, সাইপ্রাস ও এলজিরিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী নির্যাতন চরমে উঠিয়াছে। ১৯৫২ সনের অক্টোবর হইতে কেনিয়াতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ ১০,৫০০ আফ্রিকানকে হত্যা করিয়াছে। সরকারীভাবেই এই তথ্য স্বীকার করা হইয়াছে। আসল সংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা বলাই বাহুল্য। এলজিরিয়ায় জেলে ফরাসীদের নির্যাতন এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এলজিরিয়ার একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এলজিরিয়া বিপ্লবীদের জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির পঞ্চ সদস্যের অন্যতম বিপ্লবী নেতা বেন মাহিদি লারাব কারাগারের সেলে নিজের জামা ছিঁড়িয়া তাহা দিয়া দড়ি পাকাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ফরাসী নির্যাতন যে কি পর্য্যায়ে উঠিয়াছে একটি ঘটনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ৫ই মার্চ্চ ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে ফরাসীরা ১৩৭ জন বিপ্লবীকে হত্যা করে এবং ৯ জনকে বন্দী করে। বিপ্লবীদের দমনে ফরাসীরা প্যারাসুট সৈন্য ব্যবহার করিতেছে।

কেনিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিক নেতা দেদান কিমাথিকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাঁসি দিয়া হত্যা করিয়াছে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্রে রাজনৈতিক সংবাদ

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে কি পরিমাণ রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশিত হয়? ১৯৫৫ সনে ব্রিটিশ সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে নির্ব্বাচনী সংবাদ প্রচার সম্পর্কে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, জাতীয় নির্ব্বাচনের ন্যায় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাও ব্রিটেনের তথাকথিত জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপে পরিগণিত হয় না। জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির মধ্যে "ডেলী মিরর" ও "ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকারই প্রচার বেশী। অন্যান্য জনপ্রিয় পত্রিকার মোট যত পাঠক আছে এই দুইটি পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা তাহার প্রায় দেড় গুণ কিন্তু নির্ব্বাচনের সংবাদ এই দুইটি পত্রিকার মোট সংবাদ পরিবেশন স্থানের যথাক্রমে মাত্র শতকরা ৫'৭ ভাগ ও ৫'৪ ভাগ অধিকার করিয়াছিল। এমন কি শ্রমিকদলের মুখপত্ররূপে পরিচিত "ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকাও সংবাদ বিভাগের শতকরা ১২ ভাগের বেশী স্থান সাধারণ নির্ব্বাচনের সংবাদ প্রকাশের জন্য দেয় নাই।

এই ঘটনা হইতে হয় ত এরূপ ধারণা হইতে পারে যে, ব্রিটেনের জনসাধারণ রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ জনসাধারণের সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার উপরই ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলি এই সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু সত্য প্রচার অপেক্ষা মিথ্যা এবং অজ্ঞানতা প্রচারেই এই সকল সংবাদপত্রের উৎসাহ বেশী। কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে ভারতের নীতি সম্পর্কে ব্রিটিশ জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বামপন্থী শ্রমিক নেতা বিভানের মুখপত্র "ট্রিবিউন" লিখিয়াছেন যে, সমস্যাটি সুষ্ঠুরূপে ব্রিটিশ জনসাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরা হয় নাই। কথাটি আংশিক সত্য হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, বহুল প্রচারিত ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ ভারতের বিবৃতিগুলি প্রকাশ না করিয়া ভারতবিরোধী বক্তব্যগুলিকেই প্রাধান্য দেয়। এই অবস্থায় ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইতে পারে না। ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির এইরূপ ব্যবহারের কারণও বুঝা কঠিন নহে। ইহাদের অধিকাংশই রক্ষণশীল পুঁজিপতিদের হাতে, ইহারা কোন কালেই ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নহে। ভারতের সমৃদ্ধি এবং সম্মান এই কুটচক্রীদের চক্ষুশূল। তাই তাহারা সজ্ঞানে ভারতবিরোধী মিথ্যাপ্রচারে এত উৎসাহের সহিত লাগিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি

পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ অনিশ্চয়তার মধ্যে রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রধানতঃ তিনটি কারণ। প্রথমতঃ ঐ অঞ্চলের দেশগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে দেখিতে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অনিচ্ছা; দ্বিতীয়তঃ মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য দূর করিয়া তথায় মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা: ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধ—যাহার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিশেষ জটিলাকার ধারণ করিয়াছে; এবং তৃতীয়তঃ বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযানের অন্যতম ঘাটিরূপে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবহারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সক্রিয় বিরোধিতা—যাহার ফলে ঐ অঞ্চল বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ক্ষমতার লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হইতে

চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত ইস্রাইল রাষ্ট্রের প্রতি আরব রাষ্ট্রগুলির অন্ধ বিরোধিতাও পরিস্থিতিকে জটিলতর করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রবর্গ মধ্যপ্রাচ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ ফল সুয়েজখাল জাতীয়করণ। কিন্তু সুয়েজখাল জাতীয়করণের পর প্রায় আট মাস অতীত হওয়ার পরও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। অন্তর্বর্তীকালীন মিশর আক্রমণ এবং সাম্প্রতিক মার্কিন "শূন্যস্থান পূরণ" নীতি তাহার কারণ। তবে গত আট মাসে অবস্থার অন্যবিধ বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুয়েজ যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিটেন এবং ফরাসী সরকার মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে দ্বিতীয় স্থানে পড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব-ঘোষিত নীতিতেও তেমন বিশেষ সুবিধা হয় নাই। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে প্রধান অভিনেতা মিশরের প্রেসিডেণ্ট গামাল আবদেল নাসের।

বিগত আট মাসে নাসের প্রমাণ করিয়াছেন যে, কূটনীতিতে তিনি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌দের সমকক্ষ। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীকে তিনি একের পর এক তাঁহার প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছেন। মিশর হইতে সকল বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা হইয়াছে, গাজা হইতেও ইস্রাইলী সৈন্য সরাইয়া লইতে হইয়াছে। সুয়েজ খাল পুনরায় জাহাজ চলাচলের উপযোগী হইয়াছে, কিন্তু সেখানেও নাসের স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন যে, মিশরীয় সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষকে টাকা না দিলে কোন জাহাজকেই খাল দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীও অবশ্য নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। শেষ পর্যন্ত ইস্রাইল গাজা ও আকাবা অঞ্চল হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু ইস্রাইল সর্ত করিয়াছে যে, গাজা অঞ্চল রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর অধীনে থাকিবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ অবশ্য এই প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (প্রধানতঃ যাহার চাপে ইস্রাইল মিশরীয় ভূমি হইতে তাহার সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হইয়াছে) ইস্রাইলের এই সর্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের অভিমত হইল এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় চিরকালের জন্য না হইলেও অন্ততঃ সাময়িক ভাবে গাজা অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাহিনীর অধীনে থাকা উচিত। অনুরূপভাবে আকাবা উপসাগর এবং তিরাণ প্রণালীটিতেও মিশরের সার্বভৌমত্ব খর্ব করিবার জন্য পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রবর্গ বিশেষ প্রচেষ্টা করিতেছে। স্বভাবতঃই মিশর এইরূপে তাহার সার্বভৌমত্ব খর্ব হইতে দিতে স্বীকৃত হইতে পারে না এবং কার্যতঃ হইতেছে না। এই অঞ্চলগুলি যাহাতে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর চক্রান্তে চিরকালের মত হাতছাড়া না হয় সেজন্য মিশর কাজে কাজেই যথাশীঘ্র উক্ত অঞ্চলের কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

মিশর সুয়েজখাল দিয়া ইস্রাইলী জাহাজ চলাচল করিতে দিতে অসম্মত হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স মিশরের উপর চাপ দিতেছে যাহাতে মিশর ইস্রাইলী জাহাজকে সুয়েজ খাল দিয়া অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দেয়। মিশর ইস্রাইল সম্পর্কে এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারে কিনা অথবা আকাবা উপসাগর ও তিরাণ প্রণালী আন্তর্জাতিক জলপথ কিনা তাহা আইনের বিচার্য বিষয়। এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিবেন আন্তর্জাতিক আদালত। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠী এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত মিশরের উপর চাপাইয়া দিলে তাহা বিচারসহ অথবা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

সুয়েজ সমস্যা ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের অপর প্রধান সমস্যা আরব-ইস্রাইলী বিরোধ। ইহাতে বিদেশী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর হাত থাকিলেও প্রধানতঃ আরব রাষ্ট্রগুলির অন্ধ ইস্রাইল বিরোধিতাই এই সমস্যাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। আরব রাষ্ট্রগুলির এই কথা বুঝিবার সময় হইয়াছে যে, অন্ধভাবে ইস্রাইল বিরোধিতায় দ্বারা কোন লাভ হইবে না।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট

নিরাপত্তা পরিষদে শ্রীকৃষ্ণ মেননের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সতেজ ভাষণের ফলে বাগদাদী চুক্তিওয়ালাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর, নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন এখানে আসিয়া দুই পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। উদ্দেশ্য—যদি তাহাতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়। সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর মতামত নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :

"এর্ণাকুলম, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী নেহরু অদ্য এখানে বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট যদি ভারতে আসেন তবে আমরা তাঁহাকে সম্মানিত অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিব।

এখানে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নেহরু নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কাশ্মীর সংক্রান্ত নূতন প্রস্তাবের উল্লেখ করেন।

শ্রীমেনন যেরূপ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের পক্ষে বক্তব্য পেশ করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী তাহার প্রশংসা করেন। জনতা হর্ষধ্বনি করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেন।

সামরিক চুক্তির নিন্দা করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশ্মীর ব্যাপারে বাগদাদ চুক্তির প্রভাব পড়িয়াছে।

মিঃ জারিং-এর ভারত আগমন সম্পর্কে নেহরু বলেন, আমরা ভদ্র ব্যবহার করিব এবং তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইব। আমরা তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিব। কিন্তু আলোচনা কি ধরনের হইবে এবং আমরা কি নীতি অবলম্বন করিব তাহা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা আমার পক্ষে শক্ত। নির্বাচন শেষ হইবার পরে আমরা যতক্ষণ মিলিত হইয়া এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতে না পারিতেছি, আমাদের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেননের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ যতক্ষণ না হইতেছে, নিরাপত্তা পরিষদে কি বলা হইয়াছে যতক্ষণ না দেখিতেছি, ততক্ষণ আমরা আমাদের নীতি নির্ধারণ করিতে পারিব না।

পশ্চিম এশিয়াকে সামরিক চুক্তির আওতা হইতে বাহিরে রাখিবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছে, উহা বিবেচনা করিবার জন্য শ্রীনেহরু আইসেনহাওয়ারের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা হওয়া কর্তব্য। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণের ইচ্ছা ভারতের নাই।

নেহরু বলেন, আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাবে সামরিক ব্যবস্থার অন্তরালে অনেক কল্যাণের বিষয় আছে। কিন্তু আমার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে যে, সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা কোন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। নেহরু বলেন, আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের দুইটি মাত্র উপায় আছে—একটি যুদ্ধ এবং অন্যটি শান্তি। বিবেচনাশীল কোন ব্যক্তি প্রথমটি চাহে না। কিন্তু শান্তির পথে সমস্যা সমাধান সহজ নয় এবং ইহাতে সময়ও লাগিবে, তবুও শান্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা সমস্যা সমাধানই একমাত্র পথ।"

পাকিস্থান ও কাশ্মীর

ওদিকে নিরাপত্তা পরিষদে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্থানে গোল বাধিয়াছে। কেননা পাকিস্থানের কর্ণধারবর্গের অন্য কোনও উপায় নাই নিজেদের বাঁচাবার—এই এক ভারতবর্ষকে খণ্ড'খণ্ড করা ছাড়া। শুধু মার্কিনী খয়রাতিতে দেশ চলে কি করিয়া? সেই জন্যই নিম্নস্থ সংবাদটির গুরুত্ব আছে:

"করাচী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—পাকিস্থানের অর্থমন্ত্রী মিঃ আমজাদ আলী গতকল্য পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে বলেন যে, জারিং মিশন যদি কাশ্মীরের অসামরিকীকরণ এবং তথায় গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহা হইলে পাকিস্থান কাশ্মীর সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করিবে।

জাতীয় পরিষদে বৈদেশিক ব্যাপার আলোচনাকালে মিঃ আমজাদ আলী বলেন, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রশ্নে ভারতবর্ষ যেরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ফলে জারিং মিশন ব্যর্থ হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যদি জারিং মিশন ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পাকিস্থান কাশ্মীর সমস্যা সাধারণ পরিষদে লইয়া যাইবে।

গতকল্য জাতীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য এইরূপ দাবী করেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে ত্রিশক্তির যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পাকিস্থানের সোজাসুজি ব্যাপারটি সাধারণ পরিষদে লইয়া যাওয়া কর্তব্য।

জাতীয় পরিষদে যাঁহারা গতকল্য বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ বক্তাই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন।

বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা মিঞা মমতাজ দৌলতানা বলেন যে, পাকিস্থানের পররাষ্ট্র নীতি ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে পাকিস্থান নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরের ব্যাপারে কার্যতঃ কাহারও সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই।

বৈদেশিক ব্যাপার সংক্রান্ত বিতর্ক গতকল্যই শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু গতকল্য রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বিতর্ক চলে। যাহাতে আরও অধিক সংখ্যক সদস্য বক্তৃতা করিতে পারেন, তজ্জন্য বিতর্ক আগামীকল্য পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

গতকল্য আওয়ামী লীগের কোন সদস্য বিতর্কে যোগ দেন নাই। যে দুইটি দল কেন্দ্রে শাসনকার্য পরিচালনা করে, আওয়ামী লীগ তাহার অন্যতম। গতকল্য সরকারবিরোধী দলের সদস্যগণই বক্তৃতা করেন।

মিঃ আমজাদ আলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, সাধারণ পরিষদ যদি সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু করিতে না পারে কিংবা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব হইতে কোন ফল পাওয়া না যায়, এবং জনসাধারণ যদি ন্যায়বিচার না পায়, তাহা হইলে তাহারা শান্ত এবং সহিষ্ণু হইয়া থাকিবে না।

অতঃপর মিঃ আমজাদ আলী বলেন: আমি আশা করি যে, জগতের বিবেক উদ্বুদ্ধ হইবে। জগতের জনমত একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জকে সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, কাশ্মীরের অসামরিকীকরণ হইবে এবং তথায় গণভোট লওয়া হইবে। জনসাধারণের সহিষ্ণুতার শেষ আছে, আমি আশা করি যে, প্রতিবেশী হিসাবে ভারতবর্ষ অবহিত হইবে,...যদি ভারতবাসী অবহিত না হয় তাহা হইলে তাহারাই দোষী হইবে—আমরা নহি।"

কাশ্মীর ও বৈদেশিক চক্রান্ত

কাশ্মীর লইয়া যে চক্রান্ত পাকিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে তাহার রূপ নির্ণয় বক্সী গোলাম মহম্মদ যে ভাবে করিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নীচে দেওয়া হইল:

"কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ শুক্রবার কলিকাতার বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতাকালে ভারতের বিরুদ্ধে যে বৈদেশিক চক্রান্ত চলিতেছে তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন, সিয়াটো শক্তি জোট কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করিতে চাহেন। কারণ কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ। কাশ্মীরকে সিয়াটোর আওতায় আনিতে পারিলে যুদ্ধবাজদের চক্রান্তজাল পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে যত প্রস্তাবই গৃহীত হউক না কেন, কাশ্মীর তাহার লক্ষ্য-পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ—কাশ্মীরের জনসাধারণ একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছে। চন্দ্রসূর্য যদি পশ্চিম দিকেও উদিত হয়, তথাপি কাশ্মীরী জনসাধারণের এই রায় বহাল থাকিবে।'

নিরাপত্তা পরিষদে চতুঃশক্তির যে সংশোধনী প্রস্তাব অতি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বক্সীজী বলেন, 'নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি মিঃ জারিংকে ভারতে পাঠাইবার

প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভাল কথা, মিঃ জাকিং ভারতে আসিতে চাহেন আসুন, আমরা তাঁহাকে অবশ্যই স্বাগত করিব। কিন্তু তিনি যেন আমাদের তিনটি কথা স্মরণ রাখেন: (১) কাশ্মীর ভারতের অংশ, (২) পাকিস্থান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে এবং (৩) রাষ্ট্রপুঞ্জের ফৌজ যে কোন ভেক ধরিয়াই আসুক না কেন, আমরা প্রাণ থাকিতে তাহা বরদাস্ত করিব না।"

নাগা বিদ্রোহ

নাগা বিদ্রোহ এখনও চলিতেছে। এখন ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, পুলিশ এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। এমত অবস্থায় নীচের সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। মনে হয় শুধু সামরিক কার্যক্রমে এই জটিল ব্যাপারের সমাধান হইবে না। কেননা রোগ বহু দিনের ও চিকিৎসা বিভ্রাটও ঘটিয়াছে অনেক। দেখা যাক ফলাফল কি হয়:

"জোড়হাট (আসাম), ২০শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রে পুলিশ-মহল হইতে বলা হইয়াছে, সেনাবাহিনী আগামীকল্য হইতে নাগা-পাহাড়ের সীমান্তবর্ত্তী সমগ্র সমতল অঞ্চলে নাগা বিদ্রোহ দমনের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

উক্ত এলাকার মধ্যে শিবসাগর জেলার ১৫০ মাইল জঙ্গলাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল এবং মিকির পাহাড় জেলার অংশবিশেষ আছে।

জেনারাল থিমায়া এবং রাজ্যপাল মিঃ ফজল আলীসহ উচ্চপদস্থ অসামরিক ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের মধ্যে সাম্প্রতিক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আসাম রাইফেল-এর ইন্সপেক্টর-জেনারাল ব্রিগেডিয়ার হরভন সিংহ অভিযানের নেতৃত্ব করিবেন। নাগা পাহাড়ের জি-ও-সি মেজর-জেনারেল কোহ্লারের সর্ব্বময় কর্তৃত্বাধীনে জোড়হাটে তাঁহার সদর দপ্তর থাকিবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, সীমান্তে নাগা পাহাড় বরাবর পুলিশ ঘাটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে এবং সৈন্যপ্রেরণ করিয়া ঐগুলিকে শক্তিশালী করা হইবে। চতুর্দ্দিক হইতে সেনাদল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহীরা বিপুল সংখ্যায় শিবসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্য ও মিকির পাহাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে ও ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে তাহাদের তৎপরতা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুলিশ মহল হইতে বলা হইয়াছে, ১৬ই ফেব্রুয়ারীর পর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।"

পলতা-টালা মেন পাইপ

এই কণ্ট্রাক্ট ব্যাপার লইয়া একটা এরূপ অদ্ভুত গোলযোগ বাধিয়াছিল যে, তাহা আশ্চর্য্যজনক। এদেশে ঐ জাতীয় বৃহৎ কাজের অভিজ্ঞতা আছে মাত্র বোম্বাইয়ের একটি কোম্পানীর। তাহাদের দামদস্তুর বিষয়ে কোনও প্রশ্নই নাই অথচ কেন উহা একটি বাঙালী কোম্পানীকে দেওয়া হইবে না—যদিও তাহাদের এরূপ কাজের কোনও অভিজ্ঞতা নাই—এই লইয়া পৌরসভায় তুমুল তর্ক চলে।

কলিকাতার জল সরবরাহে এত গলদ, এত ত্রুটি রহিয়াছে যে তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন এবং এ খাতে টাকার প্রশ্নও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ভুলভ্রান্তিতে কাজে দেরীর অবসর নাই।

এ বিষয়ে ডেপুটি মেয়র যাহা বলিয়াছেন তাহা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম:

"বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলিকাতার ডেপুটি মেয়র ডাঃ অমরনাথ মুখোপাধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে দৃঢ়ভাবে এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, পৌরসভার শেষ অধিবেশনে বোম্বাইয়ের ষ্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ার্স কোম্পানীকে পলতা-টালা মেন পাইপ নির্ম্মাণ এবং স্থাপনের ভার দান সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা কলিকাতা নগরীর অধিবাসীদের স্বার্থের অনুকূল। কারণ তাঁহার ধারণা 'ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একমাত্র ঐ কোম্পানীরই উপরোক্ত কাজ করিবার অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা রহিয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, নিয়মের খুঁটিনাটি ব্যাপার এবং সামান্য আর্থিক সংখ্যা যেন শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত লইবার পরিপন্থী হইয়া না দাঁড়ায়। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে যাট ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট যে পাইপটির দ্বারা দৈনিক ৬ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ হইয়া থাকে সেটির অবস্থা খুবই খারাপ এবং উহার আশু সংস্কার প্রয়োজন। তাহা না করিলে শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা যে কোন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। শহরের পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, কলেরার বিপদ দূর করিতে হইলে এবং দ্বৈত জল সরবরাহ ব্যবস্থা (ডুয়েল ওয়াটার সাপ্লাই) তুলিয়া দিতে হইলে পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রস্তাবিত উন্নতি সাধন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ঐ ৭২ ইঞ্চি মেন পাইপ বসান হইলে বর্ত্তমান ৮ কোটি গ্যালনের স্থলে ১৫ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ সম্ভব হইবে।

বোম্বাইয়ের উক্ত কোম্পানীকে কণ্ট্রাক্ট দিবার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐ প্রতিষ্ঠান ইতঃপূর্ব্বে আরও বৃহৎ এক পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছে। অপর পক্ষে কলিকাতার মেসার্স স্যুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ঐ জাতীয় কোন অভিজ্ঞতা নাই।

স্যুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কুলিজান কর্পোরেশন কোম্পানী বোখারো এবং দুর্গাপুরে বৃহৎ পরিকল্পনার কাজ করিতেছে একথা তিনি জানেন কিনা, একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করিলে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ঐ বিষয়ে তিনি শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটি ঠিকমত জানেন না।

তিনি বলেন যে, বোম্বাইয়ের কোম্পানীকে ভার দিবার সিদ্ধান্ত সমর্থনকারীরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অভিজ্ঞতা এবং

ব্যয়ের প্রশ্ন ছাড়াও ঐ কোম্পানী 'বাহির হইতে বিশেষ কোনরূপ সাহায্য' না লইয়াও কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিবে।

একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, বোম্বাইয়ের কোম্পানী কলিকাতার জমি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দুই জন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ কলিকাতায় আনিয়াছিলেন।

ষ্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ার্স কোম্পানীর ক্যাথডিক উৎপাদনে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, 'এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না আমি জানি না।'

তিনি বলেন যে, বোম্বাইয়ের কোম্পানী ক্যাথডিক উৎপাদনের খরচা সমেত ৭২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পলতা-টালা পাইপ লাইন বসাইবার জন্য ১ কোটি ৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৫০ টাকা চাহিয়াছিল। মুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী ক্যাথডিক উৎপাদনের খরচা বাদেই পাইপ লাইন বসাইবার জন্য ১ কোটি ১২ লক্ষ ৯ হাজার ৬২৫ টাকা চাহিয়াছিল। পরে তাহারা নূতন পাইপ লাইন এবং বর্ত্তমান তিনটি পাইপ লাইনের ক্যাথডিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য আরও ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা চাহে। ইহার ফলে উক্ত কোম্পানীর খরচের হিসাব দাঁড়ায় মোট ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

ঐ কণ্ট্রাক্টে অন্যান্য খরচা বাবদ যে আরও ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে জমির জন্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা এবং তত্ত্বাবধান কাজের জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। এই প্রসঙ্গে ঐ ব্যয়বরাদ্দ যথেষ্ট কি না, এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে ডঃ মুখোপাধ্যায় জানান যে, কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মত লইয়াই ঐ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাইপ লাইন বসাইবার মূল কণ্ট্রাক্টটি ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার, সোয়া দুই কোটি টাকার নহে।

গম ও আটার কালোবাজার

কলিকাতায় কালোবাজার কি ভাবে চলিতেছে তাহার একটি নিদর্শন আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, এইরূপ কালোবাজারের মূলে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, এক বা একাধিক, বিরাজ করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। গম, চিনি, চাউল, ডাল সকল জিনিষেই দেখা গিয়াছে শুধু সরবরাহ বাড়াইলে দাম কমে না।

আসলে প্রয়োজন কঠোর দণ্ড এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন সরকারী বিভাগে তদন্ত ও কঠোর সাজার ব্যবস্থা :

"সরকার কর্তৃক গম সরবরাহের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার বাজারে আটার সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয় নাই। এক্ষণে কলিকাতায় দৈনিক প্রায় ১১০০ টন গম সরবরাহ করা হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে দৈনিক সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১০০০ টন।

"কিছুদিন পূর্ব্বে বাজারে আটার দর বাড়িলে সরকার গম সরবরাহের পরিমাণ বাড়াইয়া ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং চাকীওয়ালার দোকানগুলিতে সাড়ে ছয় আনা সের দরে আটা বিক্রয়ের নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু ঐ দরে আটা সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়। দোকানের সম্মুখে দীর্ঘ 'কিউ' পড়িয়া যায় এবং এই অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধের সময়ের 'কনট্রোল' যুগের কথা মনে পড়ে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া লোকে আটা না পাইয়া ফিরিয়া যায়।

"সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রভাবশালী একদল মনে করেন যে, কলিকাতার চাহিদা মিটাইবার ব্যাপারে ১০০০ টন গমই যথেষ্ট। সুতরাং গমের সরবরাহ ১০০ টন বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও যখন অভাব মিটিতেছে না তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উহার একটা বেশ বড় অংশ বেশী দামে চোরাবাজারে বিক্রয় হইতেছে। কিছু পরিমাণ গম চোরা পথে বাহিরে পাচার হইতেছে—এইরূপ বিশ্বাস করার মত কারণ আছে বলিয়াও ব্যবসায়ীমহল মনে করেন।

"বর্ত্তমানে ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে আটা সংগ্রহ করা কষ্টকর হইলেও বাহিরের দোকান হইতে আটা সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা নাই। ঐ সব দোকানে প্রচুর আটা মিলে। তবে উহার মূল্য সের প্রতি ৯ আনা হইতে ১০ আনা পর্যন্ত। ন্যায্য মূল্যে আটা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অনেকে ময়দা ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন। ময়দার সের ৯ আনা হইতে ১০ আনা।

"এই অবস্থার জন্যই সম্ভবতঃ রাজ্য সরকার ময়দার কলগুলিকে অধিক পরিমাণ আটা উৎপাদন করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এক্ষণে ময়দা কলগুলি সাধারণতঃ শতকরা দশ হইতে পনের ভাগ আটা উৎপাদন করে। রাজ্য সরকার উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৪০ ভাগ করার জন্য বলিয়াছেন।

"সম্প্রতি চাকীওয়ালা সমিতির পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে গম বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য অনুরোধ জানান হয়। ঐ স্মারকলিপিতে সমিতির নিকট প্রত্যহ বণ্টনের জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩০০ টন করিয়া গম দিতে বলা হয়। ইহা ছাড়া সমিতি কর্তৃক বণ্টনের উদ্দেশ্যে মাসে আরও ৫০০০ টন এতদ্দেশীয় গম সংগ্রহ করার অনুমতিও উহাতে প্রার্থনা করা হয়।

"সমিতির পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে, ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ঐগুলিতে গম সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হউক। সম্ভব হইলে ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে গম সরবরাহ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ গম চাকীওয়ালাদের দোকানে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক। কারণ, ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে যে গম সরবরাহ করা হয়, উহা সরাসরি অথবা অসঙ্গত পথে শেষ পর্য্যন্ত চাকীওয়ালাদের দোকানেই পৌঁছে।

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিলস এসোসিয়েশন এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিলস এসোসিয়েশন প্রতিনিধিবৃন্দ বাজারে অধিকতর পরিমাণে আটা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে আটার উৎপাদন বাড়াইতে সম্মত হইয়াছেন। মিলের এই আটার খুচরা দাম পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি সের ।৶৬ পাই থাকিবে।"

পুরুলিয়ায় ইউরেনিয়াম

পুরুলিয়া অঞ্চল বাংলায় ফিরিয়া আসার পর অনেকে মন্তব্য করেন যে কাঁকড় মাটি ও কাঁটাঝোপ লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট হইতে হইল। কথাটা নিতান্ত ভুল নয়, কিন্তু এখন আশা দেখা দিয়াছে যে, হয়ত সবই কাঁকড়মাটি নয়। অন্ততঃ তাহাই জানা যাইতেছে :

"পুরুলিয়ায় ইউরেনিয়াম (আণবিক চুল্লীর প্রধান জ্বালানি) পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পুরুলিয়ায় উক্ত সংবাদ পরিবেশন করেন।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, তিনি এরূপ রিপোর্ট পাইয়াছেন। এই জেলায় ইউরেনিয়ামের অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

পুরুলিয়ায় কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক নির্ব্বাচনী সভায় ডাঃ রায় ভাষণদানকালে ইউরেনিয়াম সম্পর্কে উক্ত বিবরণ দান করেন। তিনি আরও বলেন যে, পুরুলিয়া জেলা প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। ঐ সব সম্পদ ঐ জেলার উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গত ৩।৪ মাসে তিনি যে রিপোর্ট পাইয়াছেন তাহা হইতে তিনি জানিতে পারেন যে, পুরুলিয়া জেলায় কয়লা ও চুণা পাথর পাওয়া যায়।

ডাঃ রায় বলেন, আগামী কয়েক বৎসরে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে পুরুলিয়ার সকল সম্পদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নকল্পে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন লওয়া হইবে।

নভোমণ্ডল পরিক্রমা

মানুষ শুধু বায়ুমণ্ডলে ঘুরিয়া সন্তুষ্ট নয়, আরও উপরের আকাশে, হয়ত চন্দ্রলোকেও, উড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহার বাড়িয়াই চলিতেছে। নিম্নের সংবাদটি সেই সংক্রান্ত :

"মস্কো, ১৬ই ফেব্রুয়ারী—রুশ বিজ্ঞানীরা রকেট বাহিত কয়েকটি কুকুরকে ১১০ কিলোমিটার (৭০ মাইল) ঊর্দ্ধাকাশে পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন। উহারা নিরাপদে ভূতলে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। ভবিষ্যতে ব্যোম-পথে ভ্রমণের অবস্থা নির্ণয়কল্পে এই পরীক্ষাকার্য্য চালান হয়।

রুশ ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদপত্র 'ট্রুড' উপরোক্ত তথ্য প্রচার করা হইয়াছে। উহাতে বলা হয় যে, রকেটের প্রান্তভাগে যুক্ত, তাপ-নিয়ন্ত্রিত বদ্ধ করা একটি কেবিনে কুকুরগুলিকে রাখা হয়। কিন্তু ঊর্দ্ধাকাশে রকেটচ্যুত কেবিনটি প্যারাশুট সাহায্যে নীচে নামিয়া আসে। ইহাতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। ঐ সময় স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরায় কুকুরগুলির শারীরিক অবস্থার আলোক-চিত্র গৃহীত হয়। উহাতে তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়।

প্যারাশুট হইতে ঝুলানো অক্সিজেন ভর্তি বিশেষ পরিচ্ছদাবৃত কুকুরগুলিকে মাটিতে নামাইয়া দিয়াও ভিন্নভাবে পরীক্ষাকার্য্য চালান হয়।

নন্দলাল বসুকে সম্মান দান

ললিতকলার ক্ষেত্রে বাংলার নাম যাঁহারা জগৎবিখ্যাত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল বসু অন্যতম। তাঁহাকে এই সম্মান যোগ্যভাবেই দেওয়া হইয়াছে :

"বোলপুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য অপরাহ্ন চার ঘটিকায় কলা-ভবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব হয়। এই বৎসরে আচার্য্য নন্দলাল বসুকে ডি-লিট পদবী দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে যাহাতে সকল অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য বিশ্বভারতীর সকল বিভাগ ছুটি দেওয়া হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার প্রতিষ্ঠার পর এই দ্বিতীয় বার কলিকাতার বাহিরে বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব সম্পন্ন করিলেন। প্রথম বার ১৯২৮ সালে বাঁকুড়াতে হইয়াছিল এবং স্বর্গত যোগেশ-চন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। শান্তি-নিকেতনেও এই দ্বিতীয় বার বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়াছে। ১৯৪০ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি-লিট পদবী দেওয়া হইয়াছিল।

এই বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ কলাভবনে আচার্য্য নন্দলাল বসুর চিত্রসমূহের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

আচার্য্য বসু এই তৃতীয় বার ডক্টরেট পদবী লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৫০ সনে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৩ সনে বিশ্ব-ভারতী তাঁহাকে এই পদবী দিয়াছিলেন।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা সন ১৩৬৩ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন আশা করি, আগামী ১৩৬৪ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ১২ বারো টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নূতন বা পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা যেন তাঁহারা গ্রাহক নম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্যথায় পূর্ব্ব গ্রাহক নম্বরে ভি-পি যাইতে পারে; তাহা ফেরত দিবেন।

যাঁহারা আগামী ২৮শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনো কখনো বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী-সম্পাদক

ভারতীয় জড়বাদ

শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের দেশ। এখানকার লোক পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোককে এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছে। জড়বাদ ও ইহকাল-সর্বস্বতা পশ্চিমের আমদানী। এসব কথা ত হামেশাই শুনি। কিন্তু, ভারতবর্ষেও যে জড়বাদ প্রচলিত ছিল, বহু ভারতীয় যে ইহকালকেই সর্বস্ব মনে করেছেন, তার পরিচয় আমরা অনেকেই রাখি না। ভারতীয় জড়বাদ হাল আমলের কোন ব্যাপার নয়। এর মূল রয়েছে সুপ্রাচীন বেদে। একথা অবিশ্বাস্য মনে হলেও মিথ্যা নয়। এই প্রবন্ধে সুপ্রাচীন ভারতীয় জড়বাদ ও জড়বাদীদের কথাই বলব।

ভারতীয় জড়বাদের প্রচলিত নাম 'চার্বাক-দর্শন'। চার্বাক বলে কোন দার্শনিক ছিলেন কিনা, জানা নেই। চার্বাকবাদীরা বলে, জড়ই চরম সত্য ও সত্তা, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, ইহকাল ছাড়া কিছু নেই, পরকাল স্বার্থান্ধদের ভাঁওতা, ঈশ্বর পুরোহিতদের বুজরুকি, ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের একমাত্র কাম্য। তারা আরও বলে, যতকাল বাঁচব সুখে শান্তিতে বাঁচব, ঋণ করে হলেও ঘি খেতে হবে। এমন সব 'চারুবাক্' বা মিষ্টি কথা শোনায় বলেই এদের নাম চার্বাক। প্রাচীন ভারতে যারাই এমন ধারার কথা বলত তাদের সবাইকেই সাধারণভাবে বলা হ'ত চার্বাক। এখানে প্রশ্ন উঠছে—এদের খবর জানা গেল কি করে?

চার্বাক-সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ হারিয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে এদের কথা ছড়িয়ে আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকেরা চার্বাক-মত খণ্ডন করেছেন। এই সব দার্শনিক চার্বাক-মতের সত্য পরিচয় দিয়েছেন কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু এঁদের কথাই প্রামাণ্য বলে মানতে হবে।

চার্বাক-মতের ঐতিহ্য 'ঋগ্‌বেদ' থেকে সুরু হয়েছে। ঋগ্‌বেদের ঋষি বৃহস্পতি লৌক্য বা ব্রহ্মণস্পতি 'জড়'কে চরম সত্তা বলে ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতির আর এক নাম গণপতি। বৃহস্পতির শিষ্যদের বলা হ'ত বার্হস্পত্য বা লোকায়ত।

বৃহস্পতি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তা পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলেছে। রামায়ণের জাবালি মুনি জড়বাদী ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে যে সব কথা বলেছেন তা ত চার্বাকদেরই কথা। চার্বাকরা বলত, দেশের রাজার চেয়ে বড় কেউ নেই। 'হরিবংশে' রাজা বেন একথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। বেদ-বিরোধী বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিল। ব্যাসদেব তাঁকে 'অধার্মিক' বলে নিন্দা করেছেন। অজিত-কেশ-কম্বলিন বুদ্ধদেবের সমকালীন লোক। তিনি চার্বাক-মত প্রচার করেছেন। অজিত-শিষ্য পায়াসি এই মতেরই ধারক। 'মহাভাষ্য' রচয়িতা পতঞ্জলি ভাগুরিকে চার্বাক-দর্শনের মুখর সমর্থক বলে উল্লেখ করেছেন। পুরন্দর সুশিক্ষিত চার্বাক-সম্প্রদায়ের লোক। শান্তিরক্ষিত তাঁর 'তত্ত্ব-সংগ্রহ' গ্রন্থে পুরন্দরের নাম করেছেন। অবশ্য পুরন্দর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়া 'অনুমান'কেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমাণ বলে মানতে রাজী ছিলেন। আরও পরবর্তীকালে চার্বাক-চিন্তায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এতকাল চার্বাকরা ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি উপাদানকে সৃষ্টির আদিম উপাদান বলে মানত। 'ব্যোমে'র অস্তিত্ব এরা স্বীকার করে নি, কারণ, 'ব্যোমে'র কোন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় না; আর এদের কথাই ছিল—ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যা জানি না, তা মানি না। কিন্তু হরিভদ্র সূরির 'ষড়্দর্শন সমুচ্চয়' গ্রন্থের ভাষ্যকার গুণরত্ন বলেছেন—কোন কোন চার্বাক 'ব্যোম'কেও একটি উপাদান বলে স্বীকার করেছেন। 'অদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধি'তে সদানন্দ চার্বাক-মতসিদ্ধ 'আত্মা' সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করেছেন। কোন কোন মতে আত্মাকে ইন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত অভিন্ন বলা হয়েছে, কোন কোন মতে প্রাণই আত্মা, আবার কোন কোন মতে মনের সঙ্গে আত্মার অভিন্নতা স্বীকৃত হয়েছে। চার্বাকদের এই সব মতবাদ পরবর্তীকালের সংযোজনা। বুদ্ধের পরবর্তী-যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই বোধ হয় বহুকালের জীর্ণ চার্বাক-মত সংস্কার করা হয়েছিল। আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার—এই সংস্কারেরই ফল।

চার্বাক-দর্শনের ভিত্তি চার্বাক-প্রমাণবাদ। চার্বাকদের বলা হয়—'প্রত্যক্ষৈব প্রমাণবাদী'। প্রত্যক্ষকেই এরা একমাত্র প্রমাণ বলে মানে। প্রত্যক্ষ আবার যেমন তেমন হলে হবে না, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। সত্য শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষেই জানা যায়। যা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে পাই না, তা আছে, এমন কথা বলা অর্থহীন। অনুমান বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু কেন? কথাটা খুলে বলি।

ব্যাপ্তি জ্ঞান ছাড়া অনুমান হয় না। 'রাম মরণশীল'

মনে করেন যে, চৈতন্য একটি নবোস্তিন্ন গুণ। 'বস্তু'র নবোস্তিন্ন গুণ 'প্রাণ', আবার 'প্রাণ' থেকে নবোস্তিন্ন গুণ চৈতন্য। আশ্চর্য্য হতে হয় এই ভেবে যে, বহুকাল আগে ভারতীয় জড়বাদীরা এ ধরণের কথাই বলে গেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও জড় থেকে চৈতন্যের আবির্ভাবের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে দেহকেই আত্মা বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালে অবশ্য চৈতন্যের উৎপত্তি নিয়ে চার্বাকদের মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত হয়েছিল। কেউ কেউ বলত, ইন্দ্রিয় থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। কেউ আবার বলত—প্রাণই চৈতন্যের উৎস। অন্য কারও কারও মতে মনই চৈতন্যের আধার। অবশ্য এরা কেউই প্রাণ ও মনের স্ব-নির্ভর সত্তা স্বীকার করত না। এদের মতে প্রাণ ও মন দেহ থেকে ভিন্ন হয়েও দেহের উপর নির্ভরশীল।

চার্বাকদের মতে জীবদেহই জীবাত্মা। সুতরাং এদের মতে আত্মোপলব্ধি মানে দেহ-সম্ভোগ। দৈহিক বা ইন্দ্রিয়-সুখই জীবনের পরম পুরুষার্থ। চার্বাকরা [illegible] বলছে—'কাম এবৈক পুরুষার্থঃ'। [illegible] দুঃখ আছে, বিপদ, মৃত্যু, রোগ, শোক সবই আছে। [illegible] সুখ নেই, এমন কথা বলবে কে? যদি সুখ না থাকত, তবে কি মানুষ বাঁচতে চাইত, তবে [illegible] আত্মহত্যা [illegible]? যেহেতু মানুষ বাঁচতে চায়, যেহেতু মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, সুতরাং [illegible] সুখ দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী, [illegible] অনেক দীর্ঘস্থায়ী, [illegible] সুখদুঃখের [illegible] সুখভোগের [illegible], দুঃখ-[illegible] কাছে [illegible] আর সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশে আছে বলে সুখ কি ছাড়তে আছে? [illegible] আছে বলে [illegible] পরিত্যাজ্য? [illegible] কাঁটা আছে, [illegible] কি কেউ [illegible] না? [illegible] তুষ আছে বলে ধান কি কেউ ফেলে দেয়? জীবনের [illegible] সুধামৃত গ্রহণ করতে হবে। সুখই কাম্য, সুখই স্বর্গ। দুঃখই অকল্যাণ, দুঃখই নরক। সুখ-দুঃখ ছাড়া স্বর্গ-নরক বলে অন্য কিছু নেই। বেদে যে স্বর্গ ও নরকের কথা আছে, তা কি কেউ দেখেছে? যা কেউ দেখেনি তা ত কেউ জানেও না। আর যা কেউ জানে না, তা নিয়ে কথা বলাও উচিত নয়। পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করার জন্য মানুষকে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অস্বাভাবিক বস্তুর কথা শুনিয়ে এসেছে। পুরোহিতেরা স্বার্থ-কথাকেই পরার্থ-কথা বলে চালিয়ে লোকের চোখে ধুলো দিয়েছে। বুদ্ধিমানেরা এসব কথায় বিশ্বাস করবে না।

চার্বাকরা আরও বলে—অন্ধকার না থাকলে কি আলোর রূপ বোঝা যায়? কালোর পাশে থাকলেই ত আলোর ছটা খোলে। তেমনি দুঃখ আছে বলেই ত সুখের এত মাধুর্য। মানুষ অনেকক্ষণ অভুক্ত থাকলেই ত অন্নের অমৃত স্বাদ পায়। তৃষ্ণার্ত না হলে কি জলের মর্ম বোঝা যায়? বিরহের মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা। বিচ্ছেদের পরে যে মিলন, তাই সবচেয়ে মধুর। সুতরাং দুঃখের মধ্যেই সুখ সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সার্থক ও সবচেয়ে মধুর। সুতরাং দুঃখকে আমরা গ্রহণ করব। পূর্বজন্ম নেই, পরজন্ম নেই। অতীত বিগত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই অবস্থায় বর্তমান জীবনের সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য। জীবনের পরিপূর্ণ রসাস্বাদই একমাত্র পুরুষার্থ। তাই চার্বাকেরা বলে—'যতকাল বাঁচবে, সুখে বাঁচ; এই দেহ একবার ভস্ম হলে আর ত ফিরে আসবে না।'

পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত চার্বাকদের হাতে এই মত অনেকটা পরিমার্জিত হয়েছিল। তাদের কাছে কেবলমাত্র নীচ স্তরের ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের আদর্শ ছিল না। তারা চতুঃষষ্টিকলা-চর্চায় যে সুখ তাও জীবনের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

চার্বাকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। আগেই ত বলেছি, তাদের একমাত্র প্রমাণ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের কথা ত জানা যায় না। চার্বাকরা বলে—যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকতেন, তবে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় তিনি মানুষের মনে এত সন্দেহ রাখতেন না। [illegible] দুনিয়ার মালিক ঈশ্বর বলে কেউ নেই। দেশের রাজাই দেশের একমাত্র মালিক। তিনিই সামাজিক ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করেন। তাঁর আইন ও আদালতই চরম আইন ও আদালত। কিন্তু তা বলে চার্বাকেরা রাজার স্বৈরাচার সমর্থন করত না। তারা দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলেছে—'লোকসিদ্ধো ভবেৎ রাজা...'। রাজাকে প্রজারঞ্জক হতে হবে। যে রাজাকে তাঁর প্রজারা মানে না, সে রাজা রাজাই নয়।

চার্বাকরা মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদ মানত না। তারা বলত—ব্রাহ্মণ চণ্ডালে আবার প্রভেদ কি? সকল মানুষই জীবনের অমৃতের সমান অধিকারী।

চার্বাক-দর্শন ভারতবর্ষের সনাতন ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহবিশেষ। চার্বাক-দর্শনের বিদ্রোহ আসলে বৈদিক-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির বিদ্রোহ। ভারতীয় সনাতন বিশ্বাস সম্বন্ধে যুক্তিবাদী মানুষের মনে যে সমস্ত সংশয় জাগে,

চার্বাক-দর্শন তাই প্রকাশ করেছে। সাধারণ লোকের সমস্যা ও সন্দেহ চার্বাক-দর্শনের উপজীব্য বলে এর আর এক নাম 'লোকায়ত-দর্শন'। দর্শনের জগতে সমস্যা-সমাধান বড় কথা নয়, সমস্যাসৃষ্টিই বড় কথা। চার্বাকরা নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সেই জন্য পরবর্তীকালের ভারতীয় দর্শনালোচনা এদের খণ্ডন না করে অগ্রসর হতে পারে নি। এই দিক থেকে দেখলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক-দর্শন যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তা মানতেই হবে।

এই প্রবন্ধ লিখতে যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি—
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—A Short History of Indian Materialism
মাধবাচার্য্য—সর্বদর্শন সংগ্রহ
হরিভদ্র—ষড়দর্শন সমুচ্চয়
রাধাকৃষ্ণন—Indian Philosophy, Vol I,

চৈতালী ছন্দ—সাঁওতালী দেশে

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

১

বল, তবে কোথা যাব—আমলকী-পরাগ-ঝরানো,
মহুয়ার সুগন্ধে মাতাল—এই রাঙা প্রান্তরের
দেশ ছেড়ে? এই চৈত্রদিনে! ঢেউখেলা পাথরের
বাঁকে বাঁকে আলিঙ্গন বসন্তের—শিমুলে পলাশে;
রামধনু-আঁকা-পাখা প্রজাপতি; মৌমাছির গানও
আকুল করে যে মন! কি যে ব্যস্ত আয়োজন, জানো,
নীড়বাঁধা! আঁকাবাঁকা বনপথ। রাঙা দিগন্তের
গায়ে সাঁওতালী গ্রাম। অরণ্যের স্পর্শ ঘাসে ঘাসে।

চিন্তার হ্রদের ছায়া অকস্মাৎ দু'চোখ জুড়ানো
রুক্ষ প্রান্তরের বুকে: সাঁওতালী বন্য অঙ্গনারা
গান গায়। মহুয়ার তাজা মদে আবেগ-উচ্ছল—
শোণিতে আগ্নেয় ছন্দ। ঝিরিঝিরি ঝর্ণার জল
অশোকের ফুলে লাল; জলজলে ওঠে সন্ধ্যাতারা;
এ-দেশ কি ভোলা যায়! ছেড়ে যাওয়া—যৌবন ফুরানো।

২

কুঁদে তোলা কালো পাথরের কিউপিড, ভেনাসের
মূর্ত্তি ত দেখি নি; তবু, তাদের জীবন্ত রূপায়ণ
এখানের গ্রামে, বনে, উপত্যকায়। বাৎস্যায়ন
তোলা থাক; এস—দেখি, ভ্যান গগ্—গগ্যাঁর দৃষ্টিতে—
কি মিষ্টি মহুয়াফুলে উপচানো গন্ধ বাতাসের!
আহা, প্রাণ-শক্তিবেগে গৈরিক পৃথিবী, মানুষের
সবল পেশীতে বাঁধা; কি সরল সাঁওতালী মন!
জীবিকার প্রশ্ন তুচ্ছ, মাতে ওরা আনন্দ-সৃষ্টিতে।

পুরাণের প্রমীলার নারীদেশ—তবু স্বপ্ন আনে,
গ্রীসের পুরুষদেশ 'মাউণ্ট এথস্' মনে হয়—
ব্যর্থ, অন্তত আমার কাছে; জীবনের মূল্যায়ন
করে এরা আদিম হৃদয়াবেগে। অরণ্য-রমণ
চৈত্রের বাতাস কাঁপে শালে ও পলাশে; বনময়
উত্তপ্ত প্রাণের ছন্দ—সাঁওতালী নাচে প্রেমে, গানে।

৩

ডিমি ডিমি নাকাড়া মাদল বাজে গ্রামে; দূর বনে
বাঁশের বাঁশীতে উচ্ছল সুরের লাভা; হাতে-বোনা
আঁটো শাড়ী-পরা মেয়ে উদ্ধত-যৌবন—গায়ে সোনা
রোদ জলে, উৎস যেন,—গাছের ছায়ায় গান গায়,
ফুল তোলে, বাঁকানো খোঁপায় গোঁজে;—পড়ে তার মনে
সহসা নাচের কথা—দল বেঁধে উৎসব-অঙ্গনে—
মাথায় পালক গোঁজা বিচিত্র পাখীর, গান শোনা
পুরুষ বাজায় বাঁশী, শোণিতে কি ঢেউ খেলে যায়।

এখানে আরণ্য দেশে আনন্দের সহজ প্রকাশ—
মাটিতে, পাথরে, গাছে, পাখীদের কলকাকলিতে,
পশুচারণের মাঠে, শিকারের উদ্দাম লীলায়,
ঝর্ণার মঞ্জুল ছন্দে, উৎসবের চত্বরে, টিলায়।
কোথাও পাবে না তুমি শহরের অলিতে-গলিতে।
এ-আনন্দ খুঁজে, আর, জীবনের উজ্জ্বল আশ্বাস।

জীবনবীমার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—কাহার স্বার্থে ?

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

১

ভারতের সমগ্র জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে আকস্মিক সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গত বৎসর গ্রহণ করেন ও তদনুরূপ ব্যবস্থা করেন,সে বিষয়ে নানা গুরুতর প্রশ্নের জবাব সরকার-পক্ষ হইতে আজিও, প্রায় বৎসরকালের মধ্যে, পাওয়া যায় নাই। জীবনবীমা ব্যবসায়ের সঙ্গে দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের স্বার্থ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। এই কারণে যেমন একদিকে ইহার সুষ্ঠু পরিচালনায় খানিকটা সরকারী দায়িত্ব স্বভাবতঃই থাকা প্রয়োজন ও সমীচীন, তেমনি ইহার পরিচালন-ব্যবস্থায় অভাবিতপূর্ব্ব যে-কোনও সরকারী সিদ্ধান্তের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যা সাধারণ্যে পেশ করিবার দায়িত্বও সরকার-পক্ষ হইতে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করা অসমীচীন।

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা অবলম্বনের সপক্ষে সরকার বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষাকল্পে তাঁহাদের দায়িত্বের কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। এই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বীমা আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইহারই কারণে পুনর্ব্বার সেই আইন সংশোধন করিয়া ১৯৫০ সালের সংশোধিত আইন প্রবর্ত্তন করা হয়। তবে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে, এই পর পর প্রণীত আইনের দ্বারা বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হইল না, কিংবা এমন কোনও অতিরিক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া সরকারী মহলে যোগাইল না যাহার দ্বারা বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণ সম্ভব হইতে পারিত এবং যাহার ফলে একমাত্র সরাসরি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যতীত বীমাকারীর স্বার্থরক্ষা করা চলে এমন কোনও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা সরকারী মতে সম্ভব ছিল না। এ বড় অদ্ভুত সিদ্ধান্ত !

বীমাকারীর স্বার্থের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এ কথা বুঝা কঠিন হইবে না যে, তিনটি বিষয়ে বীমাব্যবসায় পরিচালন-ব্যবস্থায় তাহার স্বার্থহানি হইবার আশঙ্কা ঘটিতে পারে। এক যদি লগ্নীকৃত বীমা তহবিল সম্বন্ধে এমনকিছু করা হয় যাহার দ্বারা লগ্নীর নিরাপত্তা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ঘটে; দুই, যদি পরিচালন-ব্যয় সম্বন্ধে যথেচ্ছা অপচয় ঘটাইয়া নির্দ্ধারিত ব্যয়-সীমা অনবরত অতিক্রম করা হয় এবং তাহার ফলে বার্ষিক তহবিল বৃদ্ধি নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম গতিতে অগ্রসর হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তিন— যদি আমানতকারী বা বীমাকারীর উচিত পাওনা যথাযথ ভাবে এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ফিরিয়া পাইবার পথে কোনও বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

আরও দুই একটি বিষয়ের সঙ্গে যে বীমাকারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিতে না পারে তাহা নহে। যথা—বীমার নির্দ্ধারিত চাঁদার হার (premium rates) বীমাকারীর স্বার্থে গুরুতর আঘাত হানিতে পারে। এই দিক দিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতাই বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঢেউ যখন এদেশে আসিয়া আঘাত করিল, তাহার ফলে দেশে যে অর্থ-প্রাচুর্য্যের বন্যা সুরু হইল, সে সময়ে জীবনবীমা ব্যবসায় অভূতপূর্ব্ব প্রসারলাভ করে। বীমা কোম্পানীগুলির, বিশেষ করিয়া অগ্রণী কোম্পানীগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সাময়িক ভাবে কোনও তাগিদ রহিল না। দেশময় প্রচুর অর্থের অনুপাতে সীমাহীন নূতন বীমা-ব্যবসায়ের সুযোগ উপস্থিত হইল, কেবল দু'হাতে কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র। এই অবসরে বৃহত্তম কয়েকটি বীমা কোম্পানী কয়েক দফায় চাঁদার হার প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহা সাময়িক ভাবে মাত্র। যুদ্ধোত্তরকালে টাকার বাজারে অনিবার্য্য টান ধরিতেই যখন প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নূতন করিয়া সুরু হইল তখন ইহারাই আবার চাঁদার হার কমাইয়া লইতে বাধ্য হইল।

সে যাহা হোক, তিনটি বিষয়ের দিকে কড়া নজর রাখিতে পারিলেই বীমাকারীর মূল স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে নিরাপদ করিয়া রাখা সম্ভব তাহার উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। সমগ্র ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রাক্কালে দেশে যে বীমানিয়ন্ত্রণ আইন (ভারতীয় সংশোধিত বীমা আইন, ১৯৫০), বলবৎ ছিল তাহাতে এই তিনটি বিষয়-সংক্রান্ত আইনের কি কি নির্দ্দেশ ছিল তাহার বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, বীমাকারীর স্বার্থ কতটা সে ভাবে সংরক্ষিত করিবার আইনানুগ আয়োজন প্রচলিত ছিল।

প্রথমতঃ দেখা যাক বীমাতহবিল লগ্নীকরণ সম্বন্ধে এই আইনে কোনও নির্দ্দেশ ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহার দ্বারা লগ্নীকৃত তহবিলের নিরাপত্তা কতদূর রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ভারতীয় বীমা (সংশোধিত) আইন,

১৯৫০-এর ২৭ হইতে ৩১ সকল ধারাগুলিই জীবনবীমা তহবিলের লগ্নীকরণ-সংশ্লিষ্ট। ২৭ ধারায় জীবনবীমা তহবিলের লগ্নীর উপায় ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ২৭ক (27A) ধারায় তহবিলের কতটুকু অংশ কি কি বিশেষ লগ্নীতে খাটানো হইবে তাহার বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ধারাটির সকল নির্দ্দেশ এমন ভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বীমা কোম্পানী-বিশেষের কর্ত্তৃপক্ষের জীবনবীমা তহবিলের অর্থ লগ্নীকরণে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা বা বিচার প্রয়োগ করিবার অবকাশ সঙ্কীর্ণতম পরিধির মধ্যে সীমিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ২৯ ধারার নির্দ্দেশের দ্বারা জীবনবীমা তহবিল হইতে ব্যক্তিগত ঋণদান নিষেধ করা হইয়াছে। ৩০ ধারার দ্বারা ২৭ হইতে ২৯ ধারার নির্দ্দেশসমূহ অমান্য করিলে পরিচালক গোষ্ঠীর (Board of Directors) সভ্যগণকে সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করিবার এবং কোম্পানীর তহবিলের ক্ষতিপূরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ৩১ ধারায় কিভাবে লগ্নীকৃত তহবিল রক্ষা করিতে হইবে তাহার বিশদ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ২৮ এবং ২৮বি ধারাতে কিভাবে লগ্নীর হিসাব রাখিতে হইবে ও কোন্ কোন্ সময়ে তাহা সরকারী কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্সের নিকট দাখিল করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জীবনবীমা তহবিল লগ্নী সংক্রান্ত উপরোক্ত আইনের নির্দ্দেশসমূহ হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, জীবনবীমা-ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশে এই ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণকল্পে যে আইন বলবৎ ছিল, তাহার নির্দ্দেশ মানিলে অন্ততঃ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের দোষে আমানতী অর্থের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়া বীমাকারীর স্বার্থহানি হইবার কোনই আশঙ্কা ছিল না। ভাল হউক বা মন্দই হউক, জীবনবীমা তহবিলের লগ্নীকরণের প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব আইনের নির্দ্দিষ্ট ধারাসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার অবকাশ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই আইনের একচ্ছত্র প্রয়োগকর্ত্তা সরকারী কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্স, যদি সচেতন ভাবে ইহার নিরপেক্ষ প্রয়োগ সম্ভব করিয়া থাকেন, তবে লগ্নীকৃত তহবিল কোম্পানীসমূহের কর্ত্তৃপক্ষের অসমীচীন আচরণের কারণে নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা ঘটিবার বিন্দুমাত্র অবকাশ হইত না। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা বিল আলোচনাকালে সরকারপক্ষ হইতে পার্লামেণ্টে এরূপ অসম্ভব ঘটনারও উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এরূপ একটি কি দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে মাত্র এবং সেই অজুহাতে দেশের সকল বীমা-ব্যবসায়ীই বীমাকারীর স্বার্থ নষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি করিয়া বসিয়াছিলেন এরূপ অভিযোগ অন্যায়। কিন্তু আসল কথা তাহাও নহে। আসল কথা এইটুকু যে, সরকারী বীমা আইন প্রয়োগকর্ত্তা কিভাবে এই আইনের প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, ২৭ হইতে ৩১, ঐ আইনের লগ্নী-সম্পর্কীয় সকল ধারাগুলির নির্দ্দেশ সত্ত্বেও কোম্পানী-বিশেষের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বৎসরের পর বৎসর বীমাকারীর আমানতী লগ্নীকৃত তহবিলের বে-আইনী অপপ্রয়োগ সম্ভব হইয়াছিল? উপরোক্ত যে-কোনও ধারা অমান্য করার ফলেই ত ৩০ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা তখনই অবলম্বিত হইতে পারিত ও হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তাহা যে হয় নাই ইহার যখন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল তখনই সরকারী সিদ্ধান্ত এই হইল যে, সকল জীবনবীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষই বিশ্বাস ও দায়িত্বের অনুপযোগী এবং একমাত্র সমগ্র জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারাই বীমাকারীর উপযুক্ত স্বার্থ সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করা সম্ভব হইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বিষয়টি লইয়া পার্লামেণ্ট বিতর্কের সময় সরকার-বিরোধী দলের কেহই এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই যে, যে সকল কোম্পানীর তহবিল কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের বে-আইনী বা অসমীচীন পরিচালনার ফলে ক্ষতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ এই ছিল যে, বীমা আইনের প্রয়োগে সরকারী কন্ট্রোলার মহাশয় নিজের দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করেন নাই। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, এই বীমা আইনের নির্দ্দেশ এমন সর্ব্বতোমুখী ছিল যে তাহার যথাযথ প্রয়োগ হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলির তহবিলের নিরাপত্তা কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের দ্বারা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। তবু যে ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ ঘটিতে পারিয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ সরকারী বীমা আইন প্রয়োগকর্ত্তার দায়িত্বহীনতা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারিত না। ইহা হইতে এই একমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, যে সরকারী কন্ট্রোলারের দোষত্রুটি ঢাকিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই সমগ্র ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপরে এই আঘাত হানা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ হইতে ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইন, ১৯৫০-এর প্রয়োগে কন্ট্রোলার মহাশয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে কোনও বিভাগীয় বা অন্য কোনও প্রকার তদন্তের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করা হয় নাই। বরং নবসৃষ্ট ভারতীয় সরকারী জীবনবীমা অধিকরণে (Life Insurance Corporation of India) উক্ত কন্ট্রোলার মহাশয়কে উপরন্তু একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল করিয়া

পুরস্কৃত করা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা কঠিন হইবে না যে, অন্ততঃ লগ্নীকৃত জীবনবীমা তহবিলের নিরাপত্তার দ্বারা বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণকল্পে সরকারপক্ষ হইতে এই ব্যবসাটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় নাই—ইহা অজুহাত মাত্র। ইহাতে অন্য উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগে, যখন দৃশ্যতঃ বীমা আইনের সম্পূর্ণ প্রয়োগ হইলে কোনও জীবনবীমা কোম্পানী-বিশেষের পক্ষে কোনরূপে ইহার নিকট ন্যস্ত আমানতী জীবনবীমা তহবিল তছরূপ করার বা ইহার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কার কোনই অবকাশ আইনের কাঠামোর মধ্যে ছিল না, তখন একমাত্র এই আইনের প্রয়োগের অভাবেই, যে-কোনও ক্ষেত্রেই হউক, এমনটি ঘটিতে পারিত। যখন সরকারের নিকট প্রমাণ উপস্থিত হইল যে ক্ষেত্রবিশেষে এমনটিই ঘটিয়াছিল, তখন সরকারের করণীয় ছিল কি কারণে এমনটি ঘটা সম্ভব হইয়াছিল সে বিষয়ে তদন্ত করা এবং ইহার জন্য ব্যক্তিবিশেষের দায়িত্ব নিরূপণ করা। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া সরকারপক্ষ হইতে ক্ষেত্রবিশেষে আইনের শিথিল প্রয়োগ করার দায়িত্ব সমগ্রভাবে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপর রাষ্ট্রায়ত্ত-করণের মারফৎ চাপাইয়া দিবার এই যে চেষ্টা ইহা হইতে একমাত্র প্রমাণ হয় সরকারপক্ষ হইতে বীমা আইন প্রয়োগকর্তার দায়িত্বহীনতার প্রমাণ এই ভাবে চাপা দিবার চেষ্টাই বীমাব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা হইতে আরও প্রমাণ হয়, বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণ চেষ্টার যে অজুহাত তাহা নিতান্তই ফাঁকা। এভাবে দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টার দ্বারা এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, যখন একের দায়িত্বহীনতার দায় এভাবে চাপা দেওয়া হইল তখন নূতন সরকারী জীবনবীমা সংস্থায় অনুরূপ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দায়িত্ব-হীনতার বিরুদ্ধে বীমাকারী জনসাধারণের কোনই অভিযোগ টিকিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই!

ভারতীয় পরিচালকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে এদেশে জীবনবীমা ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন হইয়াছে আজ ৮৫ বৎসরের উপরে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নানারূপ ভুলত্রুটি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে চৌর্য্যাদি সত্ত্বেও সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় জীবনবীমা-ব্যবসায় প্রশংসনীয় প্রগতি লাভ করিয়াছে এবং মোটামুটি বীমাকারীর মূল স্বার্থ যথাযথ ভাবেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে যেটুকু ভুলত্রুটী এমনকি চুরীচামারি ঘটিয়া-গিয়াছে তাহা সমগ্রের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। কিন্তু সে সামান্যটুকুও ঘটিবার অবকাশ যাহাতে না পাওয়া যায়, সেই কারণে দেশের জনসাধারণেরই বারংবার দাবির ফলে প্রথমে ১৯১২ সনের ভারতীয় বীমা আইন প্রত্যাহার করিয়া ১৯৩৮ সালের আইন প্রবর্ত্তিত হয়। আবার তাহারই ফলে পুনর্ব্বার ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইন, ১৯৫০-এর প্রবর্ত্তন হয়। এই আইনের দ্বারা বীমাব্যবসায়ের সামগ্রিক পরিচালনার ধারা এমন নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করা হয় যে, ভুলত্রুটি বা চুরি ইত্যাদির অবকাশ যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়। প্রয়োজন হইলে এই আইনের আরও পুনর্ব্বার সংশোধন বিল পাস করাইয়া লওয়াও কিছু-মাত্র কঠিন ছিল না। অন্যান্য ব্যবসায়েও যে এমন ভুলত্রুটি, এমনকি চৌর্য্যাদিও ঘটে নাই এমন নহে। উদাহরণ-স্বরূপ ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁহারা ভালভাবেই জানেন কিভাবে বারে বারে কতবার কত ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে এবং তাহার ফলে দেশসুদ্ধ দরিদ্র এবং বিশেষ করিয়া কত মধ্যবিত্ত আমানতকারী-দের রক্ত-জলকরা অর্থ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। আজও তাহার জের কাটে নাই এবং এখনও এমন ফেল হওয়া বহু ব্যাঙ্কের সম্পত্তি হাইকোর্ট নিযুক্ত লিকুইডেটারের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। এ সকল বন্ধ করিবার জন্য অবশ্যই উত্তরোত্তর কঠিন নিয়ম-নির্দ্দেশ সম্বলিত আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের পরিচালন সুষ্ঠু ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জীবনবীমা ব্যবসায়ের উঠতি পড়তির ফলে দেশের যত না লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার অনেক অধিক হইয়াছে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উঠতি পড়তির দ্বারা। তথাপি সেই অজুহাতে সরকার পক্ষ হইতে দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা তোলা হয় নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইল ভূতপূর্ব্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটিকে অবশ্য সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারা সমগ্র ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ঘটে নাই।

কিন্তু এই প্রসঙ্গের অধিকতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেখা যাক বীমাকারীর স্বার্থ কি ভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা অধিকতর সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব। জীবনবীমা তহবিলের লগ্নী সম্পর্কীয় সবিশেষ আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছে। এবার পরিচালন ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইনের (১৯৫০) ৪০খ (Sec. 40B) ধারায় এ বিষয়ে বিশদ নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ধারার (২) উপধারায় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৫০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর হইতে ভারতবর্ষে কোন জীবনবীমা কোম্পানী প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট হারের অধিক খরচ করিতে পারিবে না। এই হার নির্দ্ধারণ করিবার সময় জীবনবীমা কোম্পানী-বিশেষের (ক) বয়স (খ) শক্তি

অথবা বিস্তৃতি এবং (গ) তাহার নির্দিষ্ট চাঁদার হারের মধ্যে রক্ষিত খরচের পরিমাণ, এ সকল বিষয় সবিশেষ বিবেচনা করা হইবে। ঐ উপধারার ব্যাখ্যায় ইহাও নির্দেশ করা হইয়াছে যে,যদি কোনও বীমা কোম্পানী উক্ত নির্দিষ্ট হারের অধিক পরিচালন-ব্যয় করিয়া ফেলেন, তবে যদি সেই অতিরিক্ত ব্যয় প্রতি বৎসর এই আইনের ৬৪চ (Sec- 64F) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশনের লাইফ ইন্স্যুরেন্স কাউন্সিলের পরামর্শমত কন্ট্রোলার যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করিয়া দিবেন তাহার বেশী না হয়, তাহা হইলে এই উপধারার নির্দেশ অমান্য করা হয় নাই ইহাই ধরিয়া লওয়া হইবে। এই আইনের নির্দেশমত যে ভারতীয় বীমা নিয়মাবলী (Indian Insurance Rules) প্রবর্তিত হয়, তাহার ১৭খ নং ধারার অনুযায়ী জীবনবীমা সম্পর্কীয় পরিচালন-ব্যয়বরাদ্দ বিভিন্ন কোম্পানীর বয়স এবং ব্যবসায়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী জীবনবীমা ব্যবসায় বিষয়ক বার্ষিক রিপোর্ট হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৫৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত ১৬৯টি জীবনবীমা কোম্পানীর মধ্যে ৭৫টি নির্দিষ্ট ব্যয়বরাদ্দের গড়পড়তা শতকরা ৫৲ টাকা কমে তাঁহাদের পরিচালন-ব্যয়ভার সঙ্কুলান করিয়া লইয়াছিলেন আর ৯৪টি কোম্পানী নির্দিষ্ট হারের উপর গড়পড়তা আরও শতকরা ৬'৮ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রিপোর্টে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত ৯৪টি কোম্পানীর মধ্যে ১০ বৎসরের অধিক বয়স ও ১০ কোটি টাকার ঊর্দ্ধাঙ্কের সমগ্র বীমার পরিমাণওয়ালা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ছয়টি এবং ২০ কোটি টাকার ঊর্দ্ধসংখ্যক বীমার পরিমাণওয়ালা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল নয়টি।

এ সকল কোম্পানীর বয়স এবং ব্যবসায়ের বিস্তৃতির পরিমাণ বিচার করিয়া ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইনের (১৯৫০) ৪০খ ধারার ২ উপধারা অনুযায়ী ভারতীয় বীমা নিয়মাবলীর ১৭খ ধারায় নির্দিষ্ট ব্যয়হারের বেশী অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করিবার সপক্ষে কোনও বিচারসহ কারণ দেখা যায় না। তথাপি তাঁহারা যে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া চলিয়াছিলেন তাহার জন্য এক সাবধানবাণী প্রচার করা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন আইনের প্রয়োগকর্তা কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্স মহাশয় প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ এই আইনের ১০২(১) ধারা মতে তিনি আইনের কোনও ধারা বা উপধারা বা ইহার বলে প্রবর্তিত কোনও নিয়মাবলী (Rules) বা আদেশনামা (Orders) অমান্য করিলে যে-কোনও কোম্পানীর বা তাহার পরিচালকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ ভারতীয় বীমা (সংশোধন) আইনের (১৯৫০) ধারাগুলি এবং তৎসম্পর্কে প্রবর্তিত নিয়মাবলী বা আদেশনামা ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখিলে ও তৎসঙ্গে ১৯৫০ সনের পরবর্তী এবং জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ-বিষয়ক সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাক্কাল পর্যন্ত কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্স প্রণীত ও প্রকাশিত ভারতে বীমাব্যবসায় সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্টের জীবনবীমা-বিষয়ক তথ্যগুলি বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রমাণ হইবে যে, প্রথম হইতেই বীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে আইনের সকল নির্দেশ মানিয়া চলে তাহার পক্ষে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা জরুরী মনে করিয়া কন্ট্রোলার মহাশয় আইনের বলে তাঁহার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। অধিকাংশ কোম্পানীই আপনা হইতে আইনের নির্দেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। যে সকল কোম্পানী তাহা ঐ সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পারিয়া উঠে নাই বা যাহারা এ বিষয়ে অবহিতই হয় নাই, তাহাদিগকে উপযুক্ত পরামর্শ বা নির্দেশ কিংবা যে সকল স্থলে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। ইহা কাহার দোষ ? জীবনবীমা ব্যবসায়ের, না ইহার সুষ্ঠু পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অপ্রতিহত ক্ষমতায় শক্তিমান কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্সের ?

এইবার বীমাকারীর প্রাপ্য অর্থের যথাযথ প্রত্যর্পণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার আলোচনা করা যাক। আলোচ্য আইনের ৪৫, ৪৬, ৪৭ এবং ৪৭ক ধারায় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ৪৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন জীবনবীমাপত্র (Policy) দুই বৎসরের অধিক চালু থাকিলে কোনও অজুহাতেই, এমনকি সেই বীমাপত্র লইবার সময় বীমাকারী মিথ্যা তথ্যাদি পেশ করিয়াছিলেন কিংবা জ্ঞাতব্য তথ্য পেশ করেন নাই, এমন কোনও অজুহাতেই সেই বীমাপত্র বাতিল হইতে পারিবে না। কেবল বীমা কোম্পানী দুই বৎসর হইয়া গেলেও বীমাকারীর বয়সের প্রমাণ দাবি করিতে পারিবেন এবং দাখিলী প্রমাণ অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে বয়সের অনুপাতে বীমার অঙ্ক কম-বেশী করিতে পারিবেন। ৪৬ ধারা অনুযায়ী যদি কোনও বীমাপত্র কোনও ভারতীয় রাজ্যের আইন অনুযায়ী কোনও বীমাকারীর পক্ষে ইস্যু করা হইয়া থাকে, তবে বীমাকারী উক্ত রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বীমার টাকা দাবি করিতে পারিবেন, বা তৎসম্পর্কে আদালতে নালিশ দায়ের করিতে পারিবেন।

আলোচ্য আইনের ৪৭ ধারা অনুযায়ী কোন বীমাপত্রের বিনিময়ে প্রদেয় অর্থের উত্তরাধিকার বিষয়ে যদি পরস্পরের প্রতিকূল একাধিক দাবি পেশ হয় কিংবা উহার উত্তরাধি

কারীর দাবি যদি সন্দেহজনক বলিয়া কোন বীমা কোম্পানীর মনে হয়, তবে প্রকৃত উত্তরাধিকার প্রমাণসহ দাবি দাখিল সাপেক্ষে, সেই বীমাপত্রানুযায়ী অর্থ প্রদেয় হইবার ছয় মাস গত হইবার পর পূর্ণ বিবরণসহ আদালতে জমা দেওয়া যাইবে। ৪৭ক ধারা অনুযায়ী ২০০০৲ টাকা বা তন্নিম্ন যে-কোনও অঙ্কের বীমার দাবির অর্থসম্বন্ধীয় বীমাকারীর উত্তরাধিকারী এবং বীমা কোম্পানীর মধ্যে কোনও মতান্তরের বিষয় কন্ট্রোলার অফ ইন্স্যুরেন্সের নিকট বিচারের জন্য পেশ করা চলিবে। বিচারে কন্ট্রোলারের সিদ্ধান্তই শেষ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ চলিবে না। উপরোক্ত ধারাগুলির নির্দেশ হইতে দেখা যায় যে, বীমার দাবির টাকা পাওয়া সম্বন্ধেও আইনের নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বীমাকারীর স্বার্থ-সংরক্ষক। কন্ট্রোলার যদি নিরপেক্ষভাবে এবং বিবেকের সহিত আইনের এই ধারাগুলির নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বীমা কোম্পানীগুলিকে মানিতে বাধ্য করিতেন তাহা হইলে বীমাকারীর দাবির টাকা কোনও ক্রমেই মারা যাইবার কোন অবকাশ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল না।

বর্তমান আলোচনায় এটুকু প্রমাণ হয় যে, বীমাকারীর স্বার্থরক্ষাকল্পে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রয়োজন হইয়াছিল, সরকার পক্ষের এই যুক্তি একেবারেই অসার ও ভিত্তিহীন। জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সঙ্গে বস্তুতঃ বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার কোনও সম্পর্ক নাই। বরং সরকারী নানা বিষয় ও নানা বিভাগের কাজকর্মের যে মান এবং ধারা আজ দেশের জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত তাহাতে এ আশঙ্কা পোষণ করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে যে, এই রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যবস্থার ফলে বীমাকারী জনসাধারণের মূল স্বার্থ নানা ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সরকারী তত্ত্বাবধানে যখন যে-কোনও ব্যবসা চালানো হইয়াছে, তাহাতেই নানাভাবে নানা দুর্নীতি আসিয়া দেশের জনসাধারণকে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এ ঘটনা দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত নানাভাবে বহুবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। জীবনবীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রকরতলগত হওয়ার ফলে ইহার বিষয়েও যে অনুরূপ অভিজ্ঞতা হইবে না, এই আশা বীমাকারী সাধারণ কোন ভরসায় পোষণ করিবে? মাত্র কয়েক মাস হইল রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যেই বীমাকারীদের পক্ষে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার সূচনা সুরু হইয়াছে। সময়মত চাঁদার টাকার রসিদ পাঠানো, চাঁদা দিবার শেষ দিনে তৎপরতার সঙ্গে সেই টাকা জমা লইয়া বীমাপত্রটিকে বাতিল (lapse) হওয়া হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করা ইত্যাদি বীমা কোম্পানীগুলির অতি সাধারণ নিয়মগুলির ইহার মধ্যেই ব্যতিক্রম হইতে সুরু করিয়াছে।

যাহা হোক, বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার অজুহাত যদি ভুয়াই হয়, তবে সরকার পক্ষ হইতে এই ব্যবসায়টিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে, এ প্রশ্নের আলোচনা এখনও করা হয় নাই। সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫৪ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০ কোটি টাকা। নিম্নোক্ত সংখ্যার, সকল খরচ-খরচা বাদ দিয়া এবং বীমাপত্রের উপরে প্রদেয় সব অর্থের হিসাব-নিকাশ করিয়া লইয়া, বার্ষিক প্রায় আরও ৩৫ কোটি টাকা লগ্নী করা হইয়া থাকে। ৪০০ কোটি টাকার পাকা সম্পত্তির ঋণমূল্য এবং বার্ষিক ৩৫ কোটি টাকার নীট লগ্নীর অতিরিক্ত ঋণমূল্য (Credit Value) কতখানি তাহা সহজেই হিসাব করা যায়। ভারত সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক প্রয়োজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিমাণ অর্থের উপরে দ্বিধাহীন অধিকারের কতটা মূল্য তাহাও সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবনবীমা ব্যবসায়টি গত ৮৫ বৎসর ধরিয়া এদেশে দ্রুত গতিতে উন্নত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এমনকি বিশ্ববাণিজ্য সঙ্কটের সময়ও অন্য সব ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও জীবনবীমা ব্যবসায় অপ্রতিহত গতিতে আগাইয়া চলিয়াছিল। এই ব্যবসায়ের অতীত প্রগতি যদি ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে যেমন ইহার সঞ্চিত মোট সম্পত্তি প্রগতির গতি অনুযায়ী স্ফীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তেমনি অন্য দিকে ইহার বার্ষিক আয় ও তদনুপাতে নীট লগ্নীর পরিমাণও বাড়িতে বাধ্য। মনে হয়, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের একটি অন্যতম সম্ভাব্য উপায় হিসাবেই জীবনবীমা ব্যবসায়কে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনের কথা কেবলমাত্র কথার কথা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে ভাবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে, তাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোনও আশা আছে কি? এ প্রশ্নের আলোচনা আগামী প্রবন্ধে করা হইবে।
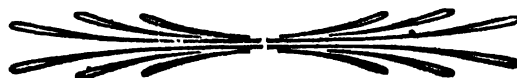
রূপকথা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

রাত তখন সাড়ে দশটার কাছাকাছি। পরেশনাথের আজ আপিস থেকে ফিরতে অনেকটা দেরি হ'ল, বাড়ীর সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। যাক তিনি এসে পড়লেন এবং যথানিয়মে হাতমুখ ধুয়ে এসে খাবারঘরে ঢুকলেন। দুর্গা খাবার প্রস্তুত করেই বসে ছিলেন, স্বামী আসনে বসতেই থালাটা এগিয়ে দিয়েই পাখাটা হাতে তুলে নিলেন। তার পর পরেশনাথ যখন দু'চার গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে একটু দম নেবার অবকাশ পেয়েছেন তখন একটু ব্যাকুল সুরেই জিজ্ঞেস করলেন—তার পর কি হ'ল? পলাশডাঙ্গা হতেই আসছ ত?

এই যে! তবে যে মা বলছিলেন এতক্ষণ কোথায় গেল, কি হ'ল ইত্যাদি—পাশের ঘরে পান সাজতে সাজতে সুলেখা ভাবে।

পরেশবাবু একটু খুশির সুরেই জবাব দেন—প্রায় ঠিকঠাক। এত শীগগির চুকে যাবে ভাবি নি। এখন আর কোন হাঙ্গামা নেই, শুধু আশীর্বাদটা হয়ে গেলেই হ'ল।

এই রে! পান সাজা সুলেখার চুলোয় গেল, মনটা তার অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ভুলেই গেল বাবার পানই সে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে সাজে। পানটাকে সে সবশুদ্ধ জড়িয়ে নিয়ে লবঙ্গটাকে তার মধ্যে কোন রকমে ঠেলে গুঁজে দিয়ে বাটার মধ্যে এক রকম ফেলেই দিল।

এর পরেও মা কৌতূহলী হয়ে আরও যেন কি কি জিজ্ঞেস করছিলেন, কিন্তু সে সবে আপাততঃ সুলেখার প্রয়োজন নেই। সে একদৌড়ে উঠোন ডিঙিয়ে ওপাশে ঠানদির ছোট ঘরটায় চলে গেল।

কৈ গো, ঠানদি কেমন আছ? শরীরটা এখন কেমন মনে হচ্ছে? বলতে বলতে সুলেখা একেবারে হুমড়ি খেয়ে তাঁর বিছানায় এসে পড়ে।

কিন্তু অত সাড়াশব্দ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। ঠানদি সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় তারই অপেক্ষায় ছিলেন। কৌতূহলে তার চোখ দুটো যে জ্বলছিল, একটু লক্ষ্য করলেই সুলেখা তা দেখতে পেত।

তিনি শারীরিক কুশলের দিক দিয়েই গেলেন না, ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কি রে লেখা, কত দূর এগোল বল দেখি?

ওমা, তা হলে ইনিও জানেন! সুলেখা এবার রাগ-প্রকাশের সুযোগ পেয়ে একেবারে দু'হাত দিয়ে তাঁর গলাটা চেপে ধরে বলল—ঠানদি পোড়ারমুখী! তুইও যদি জানতিস তবে আমাকে বলিস নি কেন?

ঠানদি সহাস্যে গলা হতে তার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললেন—ছাড়্ ছাড়্। হতচ্ছাড়ী গলা টিপে মারবি নাকি? তা হলে বল্ আশীর্বাদ পর্যন্ত ঠিকঠাক।

সুলেখা বিস্মিত হয়ে বলে—সে তুই এত দূর থেকে শুনলি কি করে?

ঠানদি হাসতে হাসতে বললেন—এই যে তুই বললি। বরাত যদি তোর না খুলত তবে কি আর এমন করে আমায় শোনাতে আসতিস, করতিস কি খারাপ সংবাদ পেয়ে ওখানেই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যেতিস—তাই ত আমার কি হ'ল গো—বলে তিনি মড়াকান্নার অনুকরণ করেন।

সুলেখা খিল খিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু সহসা থেমে গিয়ে একটু সলজ্জ কণ্ঠে বলল—তুই বিয়ে কর্ রাক্ষুসী, আমি বিয়ে করতে যাব কেন?

ঠানদি মৃদু হাস্যে সুলেখার আননে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা লক্ষ্য করছিলেন। এ কথায় হঠাৎ কি জানি কেন তাঁরও হাসি থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে লেখার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে নিজের অজ্ঞাতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চমকে উঠলেন—একি! তাড়াতাড়ি হালকা হবার প্রয়াসে একটু হেসে বললেন—সে কি আর তুই দিবি। তোর এত তপিস্যের বর।

এই বরকাড়াকাড়ির কথা এর আগেও বহু বার হয়ে গেছে, কিন্তু আজকের বাস্তবের এই পটভূমিকায় কথাটা দু'জনেরই অন্তর ঘেঁষে গেল। সুলেখা এর উত্তরে অন্যদিন কত কি বলেছে, কিন্তু আজ কিছুই খুঁজে পেল না। হঠাৎ কানপাতার ভঙ্গিতে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে বলল—ওই যা বাবার খাওয়া হয়ে গেল, মা ডাকছে আমি যাই।

সে যেমন হুমড়ি খেয়ে এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই উঠে গেল। ঠানদি টিপ্পনি কাটলেন—আমি বুঝি আর কেউ...।

সুলেখা বারান্দা পার হয়ে গিয়েছিল, এ কথায় একটু লজ্জিত ভাবে পিছন ফিরে দরজার আড়াল হতে মুখ বাড়িয়ে বলল—একটা গল্প মনে করে রাখিস, ঘুমোস না আমি আসছি।...

ঠান্‌দির জীবনটাই যেন একটা গল্পবিশেষ। এসংসারে তার রক্ত-সম্পর্কের কেউ নেই এবং বাড়ীও তাঁর এ গাঁয়ে নয়। পরেশনাথের মায়ের বাল্যসঙ্গিনী ছিলেন তিনি, বিয়ের সময় ছাড়াছাড়ি হয়ে দু'জনে দু'দিকে চলে যান। ঠান্‌দি কিন্তু অচিরেই বিধবা হয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে আসেন। সে সময় একবার পরেশনাথের মা তাঁকে নিজের কাছে ডাকেন। সেই থেকে ঠান্‌দি বরাবরই এখানে, বাপের বাড়ীর ও শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্ক তাঁর বহুদিন ধুয়ে মুছে গেছে। এখন তিনি পরেশনাথের মাসী ও সুলেখার ঠান্‌দি। তাঁর পূর্বপরিচয় বহু লোকে জানেও না।

ঠান্‌দি ভুলেই ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে সুলেখার ওই ছোট্ট কথাটি তাঁকে অনেককিছু মনে করিয়ে দিল। তুই বিয়ে কর রাক্কুসী!

সত্যিই ত, তাঁরও ত একদিন বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সইল না, সে যে রাক্কুসীর বিয়ে!

রাজপুত্র তাঁর ঘুম ভাঙাতে সত্যিই একদিন এসেছিল, তার প্রমাণ এই পোড়া কপাল, কিন্তু অন্য রকম প্রমাণও ত থাকতে পারত। থাকল না সে কার দোষে? লোকে বলে তাঁরই এবং তিনিও চিরকাল এক কথাই বলে এসেছেন—আমারই। কিন্তু মুখে যা বলা যায় তাই ত আর জীবন নয়। তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন মনেও তাই মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে—আমি ত তখন অত ছোট!

কিংবা হয়ত পূর্বজন্মের কর্মফল।

কিন্তু যে পাপের ফলে এত বড় ব্যর্থতা আসতে পারে, আজ তাঁর এতখানি বয়সেও ঠিক অত বড় পাপ সংসারে কি হতে পারে সে হদিস ঠান্‌দি পান নি।

এমনি করে এলোমেলো চিন্তার স্রোতে রাত বাড়তে থাকে। বাড়ী এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

কৈ ছুঁড়ি আসব বলেই গেল, এল না ত!—এই অস্বস্তিকর চিন্তার হাত হতে অব্যাহতি পাবার প্রয়াসে ঠান্‌দি মনে মনে বলে ওঠেন।

কিন্তু ছুঁড়ি যে ওদিকে তখন রাজকন্যে! তার রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে জয়মাল্য নিয়ে এসে পড়ল বলে, হাতে তার নতুন দিনের সোনার বাঁশী। তার এখন ভাবনা কত!

আর ঠান্‌দি ভাবেন, তিনি ত রাজকন্যে নন—রাক্কুসী! কিন্তু তাঁরও যে সবই হতে পারত! সেই সব-হতে-পারা সোনার সংসার কোথায় কত দূরে, কোন্‌ তেপান্তরের পারে? ঠান্‌দি একটা নিশ্বাস ফেলে, তাঁর শীর্ণ হাত দু'খানি—যেন এই দূরত্বের পরিমাপ করতেই মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে দেন। হাতে ঠেকে কাঁচা দেয়ালের মাটি। এই বুঝি তাঁর সব।

লেখা বলে গেছে তাঁকে একটা গল্প মনে করে রাখতে। কিন্তু সে ত জানে না মনে করাটা কঠিন নয়, বরং সেটা ভোলাই কঠিন।

তার কিছুক্ষণ পরে।

ঠান্‌দি জেগে আছ? দোরগোড়া হতে সুলেখার ফিস্‌-ফাস্‌ শব্দ ভেসে আসে।

ঠান্‌দি চকিত হয়ে ওঠেন, বলেন—আয় লেখা বোস। ঘুমোতে আর দিলি কৈ?

সুলেখা ত্বরিত পদে তাঁর পাশে এসে শুয়ে পড়ে তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলে—তা যাই, তুই ঘুমো।

ঠান্‌দি তার এই নৈকট্যজনিত একটি নূতন সম্ভাবনার স্বাদ যেন নিজের সর্বাঙ্গে গ্রহণ করতে করতে বললেন—আমি ঘুমোব আর তুই কোথায় যাবি শুনি? জেগে থাকতে ত?

সুলেখা কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলল—তুই ত সবজান্তা। আমি কি আর সাধ করে জেগে আছি? কেন তোর জ্বর, রাত্তিরে তোর যদি কিছু দরকার হয় তখন কে দেখবে শুনি?

ঠান্‌দি আস্তে আস্তে বলেন—তাই ত। আমি ভুলেই গেছলাম কার জ্বর, আমার না তোর। তুই যা, কাঁপছিস।

সুলেখা এবার সত্যিই ঠকে গেল। শীতের রাত্রি নয় যে তার উপর দোষ চাপানো যাবে। সে এবার ঠান্‌দির তপ্ত বুকে ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে মুখ লুকিয়ে বলল—যাঃ, কেবল জ্বর হলেই বুঝি কাঁপে?

ঠান্‌দি পরম স্নেহে লেখার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু কৌতুকহাস্যে বলেন—আর কি হলে কাঁপে শুনি?

সুলেখা কিছু বললে না। ঠান্‌দিও চুপ করে রইলেন।

হঠাৎ একসময় সুলেখা অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে বলল—আমার ভয় করছে ঠান্‌দি।

ভয়। কিসের?—বলতে বলতেই অত্যন্ত বিস্ময়বোধের সঙ্গে ঠান্‌দির আর এক দিকের চোখ খুলে যায়। তাই ত, কি হতে পারে, কি পেতে পারি এ নিয়ে ভয় হবার সময় ত এইটাই। তিনি ভুলেই গেছেন সুলেখা এখন আর শুধু একটি মেয়ে নয়, এবার সে নূতন মানুষ হতে চলেছে।

আর এ ভয় যে কিসের এবং কতখানি, তার সাক্ষী ত তিনি নিজেই।

এর পরে কেউ কিছু বলল না, চুপচাপ পাশাপাশি পড়ে রইল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় আর তাদের মানুষ বলে চেনা যায় না, মনে হয় যেন দুটি ছায়া। দুটিই সমান অস্পষ্ট।

একজন কি হতে পারে, আর একজন কি হতে পারত।

হঠাৎ ঠান্‌দি সুলেখাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে বলেন—আয় তোকে আজ একটা গল্প বলি শোন্‌।

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তীর চিত্রকলা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১

জগতের শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে এক-একটি বিশিষ্ট ধরনের শিল্প-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে আর কোনও এক জন শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রতিভাশালী শিল্পী-গোষ্ঠী। তাঁদের অনুগামীরা কিন্তু নির্বিচারে প্রথাগত ভাবে উক্ত ধারার অনুসরণ করে চলেন। শেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, অধিকাংশ শিল্পীর কাজের মধ্যেই ভাব-সম্পদ মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, গতানুগতিকতার পুনরাবৃত্তিই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

বিংশ শতাব্দীতে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাধনায় পুনরুজ্জীবিত হ'ল ভারতীয় চিত্রকলা। ক্রমে ক্রমে তাঁর শিল্প-সাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন নন্দলাল, সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র কর, অসিত হালদার, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পী-গোষ্ঠী। অবনীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তর-সাধক এঁরা, অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত ধারার অনুসরণকারী হলেও এঁদের প্রত্যেকেরই শিল্পকর্মে দেখা গেল অন্তরের ভাবসম্পদের রূপময় প্রকাশ, ফলে বাংলা দেশের চিত্রকলায় যে নব অভ্যুদয় হয়েছিল তার বেগবতী ধারা ক্রমে ক্রমে দুকূলপ্লাবিনী হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে পরিপ্লাবিত করল।

নগরীর আলোর আড়ালে

কালক্রমে কিন্তু পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় চিত্রকলার গতিবেগ হ'ল মন্দীভূত, নূতন যে সকল শিল্পী ঐ ধারার অনুবর্তন করে চললেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই মৌলিকত্ব বা স্বকীয় শিল্পদৃষ্টি পরিলক্ষিত হ'ল না। ভারতীয় শিল্পের নামে তাঁরা যা সৃষ্টি করতে লাগলেন তা প্রতিভাবান শিল্পীদের ব্যর্থ অনুকৃতি অথবা ভারতীয় শিল্পরীতির বিকৃতিমাত্র।

ওদিকে আর এক দল শিল্পীর মধ্যে দেখা গেল বিদেশী শিল্পরীতির প্রতি অন্ধ মোহ। ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা হলেন উন্মার্গগামী। এঁদের মধ্যে বৈদেশিক আঙ্গিকের অনুকরণে অনেকে হয়ত নৈপুণ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ নেই বলে তাঁদের আঁকা অধিকাংশ ছবিই শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি।

আজকের দিনে শিল্প-প্রদর্শনীগুলি দেখলে তাই হতাশ হতে হয়। সেগুলিতে দেখি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবির ভিড়, রঙের জলুস, বিভিন্ন আঙ্গিক অনুকরণের বিরক্তিকর একঘেয়েমি ও ব

মানুষের পশুত্ব

রেখার কেরামতি দেখানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস, কিন্তু সবই মনে হয় কেমন যেন প্রাণহীন। ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আভাস কৈ বড় একটা ত চোখে পড়ে না। এমনই শোচনীয় দুরবস্থা যখন আমাদের শিল্পকলা—বিশেষতঃ চিত্রকলার, তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে একাগ্র নিষ্ঠায় নীরবে চিত্রকলার সাধনা করে যিনি আজ কলালক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন সেই সাধক-শিল্পী গোপেশচন্দ্র চক্রবর্তীর রূপ-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ আমাদের মনকে করে তোলে আশান্বিত।

গোপেশচন্দ্র সাধক শিল্পী এবং শিল্প-সাধক দুই-ই। প্রথম যৌবনেই তিনি ধর্ম-সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম পথে পদক্ষেপ করে-ছিলেন, সম্পদে-বিপদে সুখে-দুঃখে কখনও তিনি বিচ্যুত হন নি তাঁর লক্ষ্য থেকে—ধর্মানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শিল্পকলার অক্লান্ত সাধনা, জীবনের চলার পথে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে প্রচুর, কিন্তু তা অন্তরকে তাঁর রিক্ত করতে পারে নি। যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনকে তিনি দেখেছেন তাকে কোন কোন ছবিতে রূপান্বিত করেছেন অধ্যাত্মিক অনুভূতির অনাবিল রসে অভিসিঞ্চিত করে।

দংশের কবলে

তার শিল্প-সৃষ্টির ম্বর উপকরণ ; এর সাহায্যে এই শিশুশিল্পী এক দিকে যেমন আঁকত প্রজাপতি আর পতঙ্গ, অন্য দিকে তেমনি সরীসৃপ এবং দৈত্য-দানার ছবিও ফুটে উঠত তাঁর কলমের আঁচড়ে। বালকের এই সকল ছবি মুগ্ধ করত সবাইকে। গোপেশচন্দ্রের বয়স যখন তেরো বৎসর মাত্র তখন তাঁর মাতা ইচ্ছাময়ী দেবী লোকান্তরিতা হন।

গোপেশচন্দ্র মফস্বলে থেকে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়েছিলেন বটে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। তখন তিনি পালিয়ে এলেন কলিকাতায়—উদ্দেশ্য, শিল্পকলা শিক্ষা। 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টসে' শিল্পী ভর্তি হলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হ'ল না। মাত্র এক বৎসরেরও অনধিককাল শিক্ষানবিশির পর অর্থাভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর মাত্র। সদ্য-অতিক্রান্ত-কৈশোর এই শিল্পী তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় এসে দাঁড়ালেন জনাকীর্ণ মহানগরীর রাজপথে। পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি আশ্রয়ের সন্ধানে, কিন্তু "হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া"—এই বিরাট মহানগরীতে মাথা গুঁজবার একটুখানি ঠাঁই মেলে নি সেদিন তাঁর কোথাও, সাধারণ পার্ক-গুলিতে বেঞ্চের উপর শুয়ে সারা রাত কাটাতে হয়েছে তাঁকে, সেদিন তাঁর রাতের প্রধান আশ্রয় ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার—দৈনন্দিন আহার্য্য ছিল একমুঠো ছোলা—জলসংযোগে তা গলাধঃকরণ করে তাঁকে প্রাণরক্ষা করতে হ'ত।

যে ধর্ম্মের বীজ শৈশবেই শিল্পীর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা-ই ছায়াতরুতে পরিণত হয়ে এই অভাব ও দুঃখ-দুর্গতির দাবদাহে তাঁকে আশ্রয়দান করেছিল। সেই চরম দুর্দ্দিনে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করতেন তিনি বাংলার পল্লীর নিরক্ষর সাধুসন্তদের রচিত গান গেয়ে এবং তাঁদের উক্তিসমূহ আবৃত্তি করে—পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃত' এই শিল্পীর দুঃখাভিতপ্ত অন্তরকে সান্ত্বনার প্রলেপে স্নিগ্ধ করে তুলত।

কিন্তু দুঃখের এই নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ ব্যর্থ হয় নি, শিল্পীর জীবনে। অভাবের তাড়নায় পথে এসে দাঁড়াবার পর শিল্পীর দৃষ্টির সম্মুখে নূতন

দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হ'ল, তিনি খুঁজে পেলেন নিজের পথ ; গোপেশ-চন্দ্রের গুণমুগ্ধ ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ বলেছেন, "Born artist, he soon discovered his real studio in the streets and pavements, hearths and hovels of the poor and the forgotten of society. Naturally the sombre shades dominated over the shining colours of his palette."

অর্থাৎ, জাত-শিল্পী তিনি, অচিরেই নিজের শিল্পাগার আবিষ্কার করলেন রাস্তায় এবং শান-বাধানো পথে আর সমাজের দরিদ্র ও যাদের আমরা বিস্মৃত হয়েছি তাদের গৃহকোণে। স্বভাবতঃই তাঁর রংদানির উজ্জ্বল বর্ণসমূহের উপর প্রাধান্যলাভ করল গাঢ় ছায়া।

এই ভাগ্য-বিপর্যয় কিন্তু তাঁকে সংসারের উপর বীতস্পৃহ বা জীবনের প্রতি তাঁর মনকে বিরূপ করে তোলে নি, বরং ভাগ্য-হত মানুষের জীবনের শোচনীয় অপচয়, সমাজ-সমস্যা সম্বন্ধে তাকে করেছে সচেতন। আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় এই শিল্পীর শিল্পরচনাকে এমনি একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যার তুলনা সচরাচর মেলে না। একই শিল্পীর তুলিতে "মায়া"র মত গভীর অধ্যাত্ম-ভাবদ্যোতক এবং "দুর্ভিক্ষের" মত বাস্তব অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ছবি যে এমন অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠতে পারে তা পরম বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটার সঙ্গে শিল্পীর আকৈশোর গভীর পরিচয়। নিশীথ নগরীর বিচিত্র আলোকচ্ছটা আমাদের দৃষ্টিকে করে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত, কিন্তু এই আলোর আড়ালে অন্ধকার অলিতে-গলিতে জীবনের কি ভয়াল বীভৎস বিকৃত রূপ—সেখানে কত রাহা-জানি প্রবঞ্চনা আর নরহত্যার তাণ্ডবলীলা। আলো এবং অন্ধকারের, সু এবং কু এ দুয়ের নিকট-সংস্থিতিকেই শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন তার "নগরীর আলোর আড়ালে" নামক ছবিতে।

মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্তা—দৈবী সত্তা আর পাশব সত্তা। মানুষের পশুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যখন আচ্ছন্ন করে তার দৈবী সত্তাকে তখন তার আকৃতি কি বিকট এবং বীভৎস হয় তা ফুটে উঠেছে—"মানুষের পশু-সত্তা" নামক ছবিটিতে। একটি নরাকার পশু যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর নিপুণ তুলিকায়—এই নরপশুটির মাথার দু' পাশে মোষের শিং-এর মত একজোড়া শিং, চোখে হিংস্র সতীব্র দৃষ্টি, স্ফীত নাসাগ্রে পাশব প্রবৃত্তির উৎকট অভিব্যক্তি—মুখে হাসি আছে বটে, কি এ যেন নিতান্তই দন্তবিকাশ মাত্র, এতে নেই প্রাণের স্পন্দ। কিন্তু কি অসহায়, কান্নার চেয়েও করুণ এ হাসি—মানুষের দৈবী সত্তার কাছে পাশব সত্তার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী—এ হাসি তারই দ্যোতক। পশু-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের অন্তরাত্মার অসহায়তা ফুটে উঠেছে তার নিষ্প্রাণ হাসিতে—মানুষের অন্তরসত্তার পরিচয় যে পাওয়া যায় তার হাসিতেই!

সমাজে আর এক শ্রেণীর নর-পশু আছে, ধর্ম্মের নামে যারা মানুষকে করে প্রতারিত। এই সকল ভণ্ডের মুখোশ খুলে দিয়ে-ছিলেন পরশুরাম তাঁর 'বিরিঞ্চি বাবা' নামক গল্পে। সেই গল্পেরই পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে গোপেশচন্দ্রের "কামিনী ও কাঞ্চন" নামক ছবিটিকে। সমাজে ধর্ম্মধ্বজীদের ভণ্ডামি

রূপকথার রানী

কোন্ পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, এই ছবিটি সে বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটাবার সহায়ক হবে। কণ্ঠে মালা, মুখে মৃদু হাসি, দক্ষিণ হস্ত বরাভয় মুদ্রার ভঙ্গীতে উচ্ছ্রিত—"শ্রীগুরু মহারাজজী" আসনে উপবিষ্ট। পুরুষ-ভক্তদের মাথায় রেখেছেন ডান পা, ওদিকে নারী-ভক্তেরা আঁকড়ে ধরেছেন—ভব-সমুদ্রের ভেলাস্বরূপ প্রভুর বাম পদ। প্রভু শিষ্যার মাথায় রেখেছেন বাম হস্ত, নারীভক্তেরা লাভ করেছেন তাঁর নিকট-সান্নিধ্য। তার ডান পায়ের কাছে কাঞ্চন-মুদ্রায় পরিপূর্ণ থালা—প্রভু 'কামিনী' ও 'কাঞ্চন' এ দুটিকে টেনে নিচ্ছেন নিজের কাছে—ওদিকে অন্ধ ভক্তিতে লুণ্ঠিতশির পুরুষ-

ভক্তেরা গুরু মহারাজের এই পুণ কৃত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ তাঁর চরণতলে।

আগেই বলেছি যে, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা গোপেশচন্দ্রকে করে তুলেছে সমাজ-সচেতন শিল্পী। ধর্ম্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম' তার রহস্য যে তাঁর শিল্পদৃষ্টির নিকট একেবারে অনুদ্ঘাটিত থাকে নি তা রূপায়িত হয়েছে "মায়া" নামক ছবিটিতে। তাঁর শিল্পানুভূতি এবং অধ্যাত্মসাধনা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, এই ছবি দেখে তা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর বলে মনে হয় যে, আধ্যাত্মিক এষণা গোপেশচন্দ্রকে আমাদের আজকের দিনের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ক সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে উদাসীন করে তুলতে পারে নি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে "অবাধ গতি" নামক ছবিটিতে। শিক্ষাক্ষেত্রে এখন যে অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খলতা চলছে তার কুফল আমরা সবাই টের পাচ্ছি হাতে হাতে। এর কারণ উপযুক্ত চালকের অভাব—বলগা চালকের হস্তচ্যুত হয়েছে—তার নিজেরই পতনোন্মুখ অবস্থা। কাজেই শিক্ষারূপী তুরঙ্গম অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ছুটে চলেছে অবাধ গতিতে।

"তুমি দিয়েছিলে মোরে"

আর আমাদের সংস্কৃতির অবস্থা ত ততোধিক শোচনীয়। আমাদের সংস্কৃতি বর্ত্তমানে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আশু এর প্রতিকারে অবহিত না হলে ভবিষ্যতে হয় ত সংস্কৃতি বলতে নাচ-গান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সংস্কৃতির এই শোচনীয় দুরবস্থার কারণ কি? কারণ যে, বর্ত্তমান অর্থব্যবস্থা, শিল্পী তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর 'ধ্বংসের কবলে' নামক ছবিতে। এতে আমরা দেখি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর মত বিকটাকৃতি তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাযুক্ত একটি হিংস্র প্রাণী মুখব্যাদান করে বিচিত্রাঙ্গ একটি হরিণকে গ্রাস করতে উদ্যত। বিকট আকারের এই জীবটি বর্ত্তমান অর্থব্যবস্থার আর তার কবলিত চারুদেহ হরিণটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুমুখী সংস্কৃতির প্রতীক। বর্ত্তমান অর্থব্যবস্থার দরুন সত্যই আজ আমাদের সংস্কৃত পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে—সংস্কৃতিগ্রাসী প্রাণীটির কিন্তু এতেও ক্ষুন্নিবৃত্তি হবার লক্ষণ নেই—কোন নূতন ভক্ষ্যের সন্ধানে তার থাবা দুটি সমুখের পানে প্রসারিত কে জানে?

শিল্পী বাস্তবধর্ম্মী যে সকল ছবি এঁকেছেন তন্মধ্যে কতকগুলির পরিচয় এতক্ষণ দেওয়া হ'ল—এতে তাঁর বহুমুখী শিল্পধারার একটি দিকের মাত্র পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে এই প্রতিভাবান শিল্পী কত বিচিত্র ধরনের ছবিই না এঁকেছেন। তন্মধ্যে কোনটি গীতিকাব্যধর্ম্মী, কোনটি আধ্যাত্মিক প্রতীকচিত্র, কোনটি বা অজন্তা ফ্রেস্কোর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত মনীষী এবং ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির মত কলাবিদগণ তাঁর আঁকা ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শিল্পীর কল্পনার গভীরতা এবং রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য যুগপৎ এ দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর "রূপকথার রাণী" নামক ছবিটিতে। নিভৃতি

রাতে চাঁদ-তারার দেশ থেকে মাটির পৃথিবীতে শিশুদের রহস্যলোকে নেমে আসছেন বিচিত্র মুকুটধারিণী, অনুপম রূপলাবণ্যবতী রূপকথার রাণী—সঙ্গে তাঁর সহচরী। রাণীর বাহন রূপকথার বিহঙ্গম, তার নীচের দৈত্যটির আকৃতি বিকট বটে, কিন্তু হাসিটি শিশুর মত প্রাণ-পোলা। রূপকথার দৈত্যদানা শিশুদের মনে অকারণে ভীতির উদ্রেক করে সত্য, কিন্তু শিশুদের সে ভালোবাসে—শিশুমহলে আনাগোনার দরুন প্রকৃতিটি যে তার শিশুর মতই সরল। এই ছবিটি অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল।

গোপেশচন্দ্রের জীবনে শুধু যে দুঃখ-দারিদ্র্যের তিক্ততম অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তা নয়, প্রিয়জনের মৃত্যুশোকের তীব্র আঘাতেও বারংবার বিদীর্ণ হয়েছে তাঁর হৃদয়। কিন্তু এই মৃত্যু-শোক তাঁর মর্মস্থলকে মথিত করলেও এরই প্রসাদে যে তাঁর দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেছে, এক অপূর্ব অধ্যাত্ম অনুভূতিতে যে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়েছে সে পরিচয় পাই তাঁর "তুমি নিয়েছিলে কোলে" নামক ছবিটিতে। অকালে—মাত্র এক বছর দশ মাস বয়সে কন্যা শ্যামলীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত শিল্পী এই ছবিটি আঁকার জন্যে একটি দিব্য প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। দেবতা এসে শিশুকে নিয়ে যাচ্ছেন চিরতরে। যার কাছে দেবতার দূত রূপে এসেছিল শিশুটি, বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে প্রসারিত করেও সে তাকে ধরে রাখতে পারছে না—তার এই গভীর শোকে সান্ত্বনা কোথায়? দেবতা অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখাচ্ছেন—শিশুকে নিয়ে চলেছেন তিনি মৃত্যুহীন চিরভাস্বর আলোকের রাজ্যে।

এমনি ভাবে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন ঘটনা তাঁকে এমন কতকগুলি চিত্ররচনায় অনুপ্রাণিত করেছে, কলালক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যা স্থায়ী সম্পদ বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় তাঁর "মধুর স্মৃতি" নামক ছবিটির কথা। শ্রীহট্ট জেলার সুদূর পল্লীগ্রামে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিল্পী চলেছেন ষ্টীমারে আরোহণ করে শহরের অভিমুখে। হঠাৎ ষ্টীমার থেকে তাকিয়ে দেখেন নদীতীরবর্তী তাদের গৃহ থেকে মা এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ষ্টীমারের পানে উৎকণ্ঠাব্যাকুল দৃষ্টি মেলে, মূর্তিটি অস্পষ্ট—শুধু চোখ দুটি দিয়ে বিশ্বের সকল মমতা, সকল করুণা, সকল ব্যাকুলতা যেন ঝরে পড়ছে—এল শিল্পীর জীবনে এক দিব্য প্রেরণার মুহূর্ত—প্রবাসযাত্রী সকল পুত্রের জন্য মায়েদের অনন্ত ব্যাকুলতা, করুণাঘন দৃষ্টি-মাধুর্য্য মূর্তিমন্ত হয়ে উঠল যেন অন্তরের সবটুকু ভক্তি-ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে, নিপুণ তুলিকায় আঁকা 'মধুর স্মৃতি' ছবিটিতে।

কন্যা শ্যামলীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে শিল্পী গড়ে তুললেন 'শ্যামলী' নামক সেবা-প্রতিষ্ঠান। এই সেবা-ধর্মের ভিতর দিয়ে কন্যার বিয়োগব্যথা কতকটা ভুলে ছিলেন শিল্পী, সহসা এল আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাত। ১৯৫৩ সনে দেওঘরে শিল্পীর সহধর্মিণী সরযূ দেবী লোকান্তরিতা হলেন। এমনি ভাবে একটির পর একটি করে বন্ধন ছিন্ন করে কলালক্ষ্মী তাঁকে মহত্তর জীবনব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে তৈরি করে নিলেন।

শোকজর্জরিত শিল্পীর মনে তখন জাগল শিল্পপ্রচারের প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারত-পরিক্রমার সঙ্কল্প। একদিন শুধু রেলের টিকিটের ভাড়াটা সম্বল করে সাত বছরের ছোট ছেলে কাঁচ সহ তিনি রওনা হলেন আসামের চিত্রপাড়ের অভিমুখে, সঙ্গে করে নিলেন নিজের হাতে আঁকা এক শতখানা ছবি। ১৯৫৫ সনের ১৭ই ডিসেম্বর চিত্রপাড়ে প্রথম অনুষ্ঠিত হল তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী। তার পর তিন-সুকিয়া, ডিগবয়, কোহিমা, ইম্ফল, গৌহাটি, শিলং, শিলচর প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে, সর্বশ্রেণীর দর্শক-মণ্ডলীর সুখ্যাতি অর্জনান্তে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন তিনি কলি-কাতায়। শিল্পকলার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়, বিত্তশালী ব্যক্তিদের মুখাপেক্ষী না হয়ে, একক শিল্পীর এই নিঃসঙ্গ অভিযান এক অভিনব ঘটনা—পূর্বভারতে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর দর্শকদের নিকট যে প্রচুর অভিনন্দন তিনি লাভ করেছেন, যে ভাবে সাধারণের মনে শিল্পবোধ জাগ্রত করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। অচিরেই কলিকাতায় এই অভিযাত্রী শিল্পীর একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে—তারই আয়োজন চলছে এখন পূর্ণ দমে। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের পর আবার সুরু হবে তাঁর পরিক্রমা। এবার যাত্রা করবেন তিনি দক্ষিণ-ভারতের পথে। স্বীয় শিল্পসম্ভার নিয়ে শিল্পীর সমগ্র ভারত-পরি-ক্রমার সঙ্কল্প সার্থক হোক, বাঙালী শিল্পীর প্রতিভা সমগ্র ভারতে সমাদৃত হোক, সকল স্তরের গুণীজনের স্বীকৃতিলাভ করুক—এই কামনাই আমরা করছি একান্ত মনে এবং শিল্পীকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলছি—"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"—"তোমার পথ কল্যাণময় হোক"।

ব্যাঙ্কের পাস বই

শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত
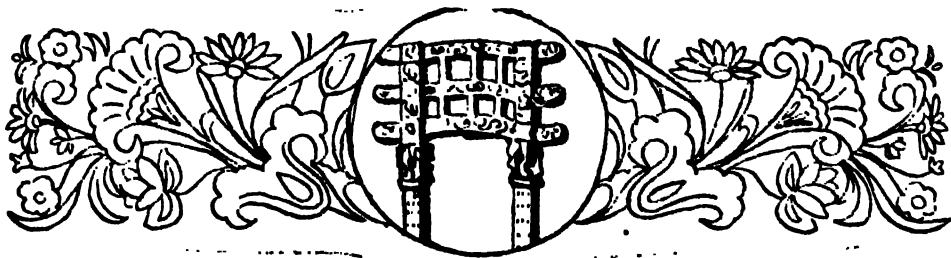
যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন তাঁহারা ব্যাঙ্কের পাস বই কি ও তাহাতে কি থাকে অল্পবিস্তর জানেন। 'পাস বই' লেখা ব্যাঙ্কের কর্ম্মসমূহের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'পাস বই' কাহাকে বলে তাহা জানা দরকার। ইংরেজী "Oxford Dictionary"তে পাস বই সম্পর্কে এই মর্ম্মে লেখা আছে :

পাস বই হইতেছে—ব্যাঙ্ক হইতে আমানতকারীর নিকট যে জমা ও খরচের (অর্থাৎ আমানতকারী সেই ব্যাঙ্কে যে যে টাকা বা চেক জমা দিয়াছেন ও যে যে টাকা উঠাইয়া লইয়াছেন মাত্র খরচ বা চেক জমা) হিসাবের নিয়মিতভাবে পাঠায় ও যাহা দেখিয়া আমানতকারী বুঝিতে পারে ব্যাঙ্কে তাহার হিসাবে কত টাকা আছে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের যে কাজ হয় তাহা বিলাতী পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের প্রথায়। সুতরাং পাস বই দেওয়া এদেশের ইংরেজী ব্যাঙ্কের অনুকরণে হইয়াছে। কবে হইতে এই পাস বই দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইল বলা কঠিন। এ বিষয়ে "Hoares Bank—a record 1673—1932" হইতে জানা যায় :

বহুকালে আগে কাঁচা কাগজে ব্যাঙ্কের হিসাব দেওয়া হইত। ১৭০২ সনে যে পাস বই দেওয়া হইত তাহাকে 'ধোপার খাতা' বলা হইত :

১৭২০ সনেও একপ্রকার হিসাব দেওয়া হইত। কিন্তু হিসাবকে 'পাস বই' বলা হইত না।

বিলাতে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক আমানতকারীকে 'পাস বই' দেওয়া হইত। কিন্তু তখন এই 'পাস বই'কে পাস বই বলা হইত না। Gilbert তাঁহার সুবিখ্যাত বইয়ে ইহাকে 'ক্যাশ-বুক' বলিয়াছেন। ১৮১৬ সনের Dwynes vs. Noble মোকদ্দমার রায়ে ইহাকে 'প্যাসেজ-বুক' বলা হইয়াছে। ১৮২৮ সনে পাস বুক কথাটির চল ব্যাপক হয় নাই। ডাঃ চোলে তাঁহার এক বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :

"ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীর নিকট নগদে বা কাগজে পাইলে তাহার হিসাব রাখেন এবং আমানতকারীকে বা তাঁহার হুকুমমত যে টাকা দেন তাহারও হিসাব রাখেন। এই হিসাব ব্যাঙ্কের লেজারে থাকে। ইহারই একটি নকল—ছোট বইয়ে তুলিয়া আমানতকারীকে 'pass' করা বা দেওয়া হইত। এই থেকে ইহাকে পাস বই বলা হয় বা 'প্যাসেজ' বইয়ে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাস বুক বলা হয় কিনা তাহা বলা কঠিন—ইহাকে যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যাসেজ-বই বলা হইত সে বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নাই।"

আমাদের দেশে টাকা লেন-দেনের বা ব্যক্তিবিশেষের কিংবা গদী বিশেষে সুদে অথবা বিনা সুদে টাকা গচ্ছিত রাখার প্রথা বহুকালের। হুণ্ডীরও প্রচলন বহুদিনের। বাংলার রাজস্ব নবাব-নাজিম জগৎশেঠের গদীতে জমা দিতেন, জগৎশেঠ হুণ্ডী কাটিয়া তাঁহাদের দিল্লীর গদীতে পাঠাইতেন। সেখানকার গদী বাদশাহকে এই টাকা দিতেন। ইহার জন্য নবাব-সরকারে ও বাদশাহী-সরকারে জগৎশেঠের মধ্যে হিসাব-নিকাশ হইত। এই হিসাব-নিকাশ অনেকটা পাস-বইয়ের অনুরূপ। আমাদের দেশের লোকেরা, মহাজনেরা বছরে দুই বার করিয়া 'দো-ফর্দ্দী' দিতেন—ইহাতে কত টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে ও কত টাকা ফেরত দেওয়া বা খরচ করা হইয়াছে তাহারও হিসাব থাকিত। 'দো-ফর্দ্দী' হাত-চিঠার অনুরূপ পাতায় দেওয়া হইত।

পূর্ব্বে ইংরেজী প্রথায় যে পাস বই দেওয়া হইত তাহাতে থাকিত ব্যাঙ্কের খতিয়ানে (লেজারে) ব্যক্তিবিশেষের যে হিসাব থাকিত তাহার অবিকল নকল। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক সেই ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার হিসাব বাবদ যে টাকা পাইত তাহা ডান দিকে জমা করিত; আর সেই ব্যক্তি যে টাকা তুলিয়া লইত বা যে টাকার চেক দিত—যাহার দরুন ব্যাঙ্কের টাকা খরচ হইত—তাহা থাকিত বাম দিকে। যেমন

K. P. Basu,
ır a/c with
Bengal Bank Ltd. Calcutta

Dr. Cr.

Date	Particulars	Rs.	As.	P.	Date	Particulars	Rs.	As.	P.
1957 Jany. 1	To Subscription of Bangiya Sahitya Parishad	12	--	-	1957 Jany. 1	By Balance b/f	12,500	12	11
2	To Asiatic Society of Bengal	36	--		" 3	By Cash	500		
" 21	To cost of 100 Shares in Sarat Textiles Ltd.	10,000			"	By Bill Collected	3,001	3	1
" 31	To B. C. Sinha cheque No. P/F 001234	2,570			" 16	By Cheques	1,000		
					" 25	By Cash	100		
					" 27	By Cheques	6,000		
	To Balance	10,484							
	Rs.	23,102	--	--		Rs.	23,102	—	—

বহুদিন হইল এই প্রথার পরিবর্তন হইয়াছে। আজকাল ব্যাঙ্কের পাস বহিতে অ্যাকাউন্টধারী নিজের খাতায় বা লেজারে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যদি আলাদা হিসাব রাখেন তবে তাহাতে যে রকম তাহার হিসাব থাকিবে সেই রকম হিসাব পাঠান হয়। আগেকার জমা-খরচ উল্টোভাবে দেখান থাকে—অর্থাৎ ব্যাঙ্কে যে টাকা বা চেক পাঠান হয় তাহা থাকে বাম দিকে, আর যে টাকা তুলিয়া লওয়া হয় বা চেক কাটা হয় তাহা থাকে ডান দিকে। যেমন :

Bengal Bank Ltd.
in a/c with
K. P. Basu

Dr. Cr.

Date	Particulars	Rs.	As.	P.	Date	Particulars	Rs.	As.	P.
1957 Jany 1	To Balance	12,500	12	11	1957 Jany. 1	By Subscription of Bangiya Sahitya Parishad	12	—	—
" 3	To Cash	500	—		" 2	By Asiatic Society of Bengal	36	—	—
" "	To Bill Collected	3,001	3	1	" 21	By Cost of 100 Shares in Sarat Textiles Ltd.	10,000	—	—
" 16	To Cheques	1,000			" 31	By B. C. Sinha cheque No. P/F 001234	2,570	--	—
" 25	To Cash	100	—	—					
" 27	To Cheques	6,000	—	—					
						By Balance	10,484	—	--
	Rs.	23,102	—	—		Rs.	23,102	—	—

'পাস বই' এই নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা একখানি বই। কিন্তু আজকাল অনেক বড় বড় ব্যাঙ্কের পাস বই আর বইয়ের আকারে নাই। উপরি-উক্ত হিসাবের মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক নকল নিয়মিতভাবে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে বা দিনে দিনে আমানতকারীর নিকট আলাদা আলাদা কাগজে পাঠান হয়। এইগুলিকে ভালভাবে গাঁথিয়া রাখিবার জন্ম ব্যাঙ্ক হইতে ভাল চামড়ার ক্লিপ দেওয়া খাতা পাঠান হয়। তাহাতে এই হিসাবগুলি পর পর সাজাইয়া রাখিলে এই সাজান হিসাবই "পাস বই" হইল। কলিকাতায় অধুনা-লুপ্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া সর্ব্বপ্রথম এইরূপ পাস বই দিবার প্রথা চালু করেন। এখন অনেক ব্যাঙ্কে এইভাবে পাস বই দেওয়া হয়।

এই প্রকার নূতন পদ্ধতিতে পাস বই চালু হইবার কারণ—অনেক বড় বড় ব্যাঙ্কে 'loose leaf ledger' রাখা হয় ও কলে হিসাব রাখা হয়। যাঁহারা এইভাবে হিসাবপত্র রাখেন তাঁহাদের পক্ষে আলগা কাগজে হিসাব পাঠানই সুবিধাজনক। আমানতকারীরও সুবিধা—ব্যাঙ্কে পাস বই পাঠাইতে হইল না, পাস বই পাঠান হইলে আমানতকারীর হাতে ব্যাঙ্কের স্বীকৃত টাকার কোন প্রকার হিসাব রহিল না; পাস বই ব্যাঙ্কে পাঠান হইলে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ পাস বই পূরণ করিতে যে কয়দিন সময় লন সেই কয়দিন আমানতকারীর নিকট কোন হিসাব থাকে না, পাস বই পাঠান বা আনাইবার ঝঞ্ঝাট ও খরচ কিছু লাগে না বা পাস বই খোয়া যাইবার কোন ঝুঁকি থাকে না।

যাঁহাদের দৈনিক অনেকগুলি চেকের লেন-দেন হয় তাঁহাদের পক্ষে এই পদ্ধতিই সুবিধাজনক। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে ব্যাঙ্ক হইতে জমা-খরচের হিসাব আসিতেছে—তাঁহার নিজের খাতার সহিত মিলাইয়া লইলেই হইল।

বাঁধানো পাস বই ও আলগা আলগা কাগজে লিখিত ও প্রেরিত হিসাব গাঁথিয়া যে পাস বই তৈয়ারি হইল ইহাদের মধ্যে কোনটি বেশী প্রামাণ্য ও আদালত-গ্রাহ্য সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কোম্পানী আইন অনুসারে Hearts of oak Assurance Co. Ltd. vs. James Flower and Sons [1936]। Chancery p, 76 দ্রষ্টব্য। ঐ মোকদ্দমায় আলগা খাতা প্রমাণ ব্যবহৃত হইবার বিরুদ্ধে জজেদের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্যাঙ্ক পাস বই দেয় কেন ?

প্রত্যেক ব্যাঙ্কই আমানতকারীকে পাস বই—তা খাতাই হউক বা আলাদা আলাদা কাগজই হউক দিয়া থাকে। কেন ব্যাঙ্ক খরচা করিয়া, দায়িত্ব লইয়া, ঝুঁকি লইয়া পাস বই দেয় ? পাস-বই দিলে যে আমানতকারীর ব্যাঙ্কের সহিত তাহার নিজের হিসাব দেখিবার সুবিধা হয় সে-কথা বলাই বাহুল্য। ব্যাঙ্ক কি খরিদ্দার বা আমানতকারী সংগ্রহ করিবার জন্ম বা ভদ্রতা করিয়া এই পাস বই দেয় ? না, আইনতঃ ব্যাঙ্ককে এই পাস বই দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা আছে ?

ব্যাঙ্কের সহিত আমানতকারীর সম্পর্ক যে প্রধানতঃ পাওনাদার ও দেনদারের সম্পর্ক—বিলাতের হাউস অব লর্ডসের Foley vs. Hill মোকদ্দমায় ১৮৪৮ সনে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে। বহুপ্রকার কাজে পাওনাদার ও দেনদারের সম্পর্ক হয়—যেমন টাকা ধার দিলে বা টাকা ধার লইলে, দোকান হইতে ধারে জিনিষপত্র খরিদ করিলে বা বেচিলে। কিন্তু ব্যাঙ্কের সহিত আমানতকারীর যে দেনদার পাওনাদার সম্পর্ক ইহা এক বিশেষ প্রকার দেনদার-পাওনাদার সম্পর্ক; এই সম্পর্কের মধ্যে মনিব-কর্ম্মচারীর বা মালিক-ম্যানেজারের 'ল অব এজেন্সী'র বহু অংশ ঢুকিয়া গিয়াছে। বিলাতের টুর্ণিয়ার বনাম নেশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের মামলায় ১৯২৪ সনে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর এজেণ্ট—এই মত প্রবল ছিল। যিনি এজেণ্ট তিনি যে টাকা এজেণ্টরূপে পাইয়াছেন বা যে টাকা এজেণ্টরূপে খরচ করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত মালিকের নিকট সন্তোষজনক ভাবে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য ও তাহার জন্ম দায়ী। সন্তোষজনভাবে কৈফিয়ত দিতে হইলে তাঁহার এজেণ্টের হিসাব রাখা দরকার। যখনই মালিক চাহিবেন তখনই এই হিসাব দেখাইতে ও দিতে তিনি বাধ্য।

ইহা হইতেই ব্যাঙ্কের পাস বই দেওয়া প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু হিসাব দেওয়া এক জিনিষ, আর হিসাব দাখিল করা আর এক জিনিষ। পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু ইহার বুনিয়াদে ব্যাঙ্কের ও আমানতকারীর পরস্পরের ব্যবহারিক, আইনগত সম্পর্ক নির্ভর করে। আজকাল পাস বই দেওয়ার প্রথা এতই চালু হইয়া গিয়াছে যে, যখনই কোন আমানতকারী কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া হিসাব খোলেন তখনই তাঁহাকে পাস বই দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক যে নূতন আমানতকারীর নিকট হইতে টাকা পাইয়াছেন এই পাস বই তাহার স্বীকৃতি। ফলে পাস বইয়ে সময় সময় ব্যাঙ্কের হিসাব উদ্ধার করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে আমানতকারীর সহিত ব্যাঙ্কের একটি অলিখিত চুক্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই চুক্তিমূলে ব্যাঙ্ক পাস বইয়ে হিসাব তুলিয়া দিতে বাধ্য।

ব্যবসায় জগতে কতকগুলি অলিখিত প্রথা আছে। আর এই প্রথা অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হয়। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বড়বাজার অঞ্চলে কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ী ঘর ভাড়া লইলে বাঙালী জমিদারকে পূজার সময় ও বর্ষশেষে ১৫ দিনের করিয়া এক মাসের ভাড়া বেশী দিতে হইত। তাহার পর মাড়োয়ারী বিত্তশালী লোকেরা বড়বাজারের অনেক বাড়ী কিনিয়া লইলেন, তখন রেওয়াজ হইল প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর ভাড়াটিয়াকে সেলামী দিতে হইবে—এই সেলামীর পরিমাণ ছয় মাস হইতে এক বৎসরের ভাড়া। তাহার পর এই অনিশ্চয়তা এড়াইবার জন্ম রীতিমত

এটর্নী বাড়ী হইতে লিজ-দলিল সম্পাদিত হইতে লাগিল। পরে ১৯২০ সনের রেণ্ট এক্ট চালু হইল। এই অলিখিত প্রথা লোপ পাইয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চুক্তিতে পরিণত হইল।

ব্যাঙ্কের পাস বই দেওয়ার প্রথা কলিকাতায় গত সত্তর-আশী বৎসর ধরিয়া এত ব্যাপক ও সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়েছে যে, এখন ইহাকে একটি অলিখিত নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। এবং আমানতকারীকে ব্যাঙ্ক পাস বই দিতে ও মধ্যে মধ্যে পাস বইয়ে হিসাব তুলিয়া দিতে বাধ্য ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ব্যাঙ্ক যে আমানতকারীর নিকট এজেণ্ট হিসাবে পাস বই সম্পর্কে দায়ী আমরা সেকথা বলিয়াছি। ইহার সহিত কিন্তু ব্যাঙ্ক যে আমানতকারীর হইয়া বহুপ্রকারের এজেন্সী সার্ভিসেস করিয়া দেয় তাহার সহিত সম্পর্ক নাই। আজকাল ব্যাঙ্ক জীবন-বীমা, অগ্নি-বীমা প্রভৃতির চাঁদা বা প্রিমিয়াম নিয়মিত ভাবে আদায় করিয়া থাকে। ইহার জন্য আলাদা লিখিত চুক্তি থাকে। ব্যাঙ্ক অনেক সময় কোম্পানীর কাগজ বা শেয়ার খরিদ বিক্রয় করিয়া দেয়, কিংবা উইলের একজিকিউটারেরূপে অথবা দলিলমূলক ট্রাষ্টিস্বরূপে কার্য্য করে। কখনও কখনও অ্যাটর্নী হইয়া কোম্পানীর ডিভিডেণ্ট প্রভৃতি আদায় করে কিংবা চিঠিপত্র উঁহার নির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। এই সব কার্য্য অনেক সময় ভদ্রতা হিসাবে বিনা পারিশ্রমিকে ব্যাঙ্ক করিয়া দেয়; আবার সময় সময় ইহার জন্য কিছু কমিশন কাটিয়া লয়। ব্যাঙ্ক যখন উইলে এক্সিকিউটারস্বরূপে কার্য্য করে তখন উহা উইলের বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে বাধ্য। এজন্য কোনও প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটিলে ব্যাঙ্ক উপযুক্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তির মত লইতে পারে বা হাই কোর্টের আদিম বিভাগে দরখাস্ত করিয়া আদালতের সে সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত তাহা জানিয়া লইতে পারে। ইহার সমস্ত খরচা মৃতের এষ্টেট হইতে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক যখন ট্রাষ্টিরূপে কার্য্য করে তখন ট্রাষ্ট দলিলের বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে বাধ্য। ব্যাঙ্ককে ট্রাষ্টিরূপে নিয়োগ করিবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিনা সম্মতিতে ব্যাঙ্ক ট্রাষ্টিরূপে কার্য্য করিতে বাধ্য নহে।

অনেক সময় মূল্যবান হীরা, জহরৎ, গহনা, দলিলাদি safe custody বা নিরাপদ ডেপোজিটের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। ইহার নিমিত্ত ব্যাঙ্ক আলাদা কমিশন লন।

পাস বইয়ের বিষয় বলিতে গেলে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে:

"The Law of banking revolves round the great principle that the relationship of banker and customer is that of debtor and creditor."

কাজেই পাস বই প্রেরণ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের দায়িত্ব নেহাত কম নয়। ব্যাঙ্ক তাহার কাষ্টমার বা আমানতকারীকে পাস বই দিয়েছে—এই পাস বইয়ে আঙ্কিক ভুল থাকিতে পারে—এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ ভুলের জন্য দায়ী কে? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, আমানতকারীর নিজের হিসাব পরীক্ষা করার কোন কর্তব্য নাই। এখন যদিও ব্যাঙ্কের দায়িত্ব অত্যধিক বলিয়া মনে হইতেছে—কিন্তু আমানতকারী তাঁহার হিসাবে কত টাকা জমা আছে তাহা না জানিয়া কাহাকেও চেক দিলে তিনি নিজে মুশকিলে পড়িতে পারেন। কাজেই আশা করা সমীচীন যে, "আমানতকারীর কর্তব্য তাহার নিজের হিসাব পরীক্ষা করা। সাধারণতঃ কাষ্টমার বা আমানতকারীরা আশা করেন:

"That the banker is under a duty to his customer in rendering his account to ensure that the items are set out accurately."

অবশ্য ভুল যে হইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তবে ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সাধারণতঃ ব্যাঙ্কার দায়ী। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য:

"That a false entry deliberately made was binding on the maker"

অনেকেই মনে করেন যে, পাস বইয়ের আঙ্কিক ভুলহেতু আমানতকারী তাহার সুযোগ লইতে পারেন। অথচ এ সম্পর্কে আইন হইয়েছে:

"Such entries [*i.e.* in the Pass book] are not conclusive. They are admissions only and as in the case of receipts for payment of money they do not debar the party sought to be bound by them from showing the real nature of the transactions which they are intended to record."

কাজেই দেখা যায় যে, পাস বইয়ে ব্যাঙ্ক ভুলবশতঃ বেশী টাকা জমা দেখাইলেও যখন ব্যাঙ্কার তাহার ভুল ধরিয়াছেন তখন:

"it will then be for the banker to prove affairmatively that the entry was wrong, and if he can do this, his action in rectifying it will be upheld.

বিলাতি আইনে "Estoppel"-এর ব্যবহার প্রায়ই হয়, অবশ্য আইনের ব্যবহার দেশগত কোন প্রভেদ রাখে না। এ ধরনের আইনের প্রয়োগ এদেশে না হইলেও হইতে পারে।

পাস বই সমস্যার সরল দিক বিচার করিলে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

পাস বইয়ের ভুল ধরা পড়িলে ব্যাঙ্কের কর্তব্য আমানতকারীকে জানানো এবং যতক্ষণ এ বিষয়ের মীমাংসা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক এই ভুলের ভিত্তিতে আমানতকারী যে চেক কাটিয়াছেন তাহার সমস্ত টাকা তাঁহাকে দিয়া দেওয়া।

ফাল্গুনের স্বপ্নছবি

শ্রীকরুণাময় বসু

চিক্কণ সবুজে মোড়া ছায়াস্নিগ্ধ ফাল্গুনের ভোরবেলা
কৃষ্ণচূড়া ঘনবনে ফিরে ফিরে আসে ; ভুলে যাওয়া কবেকার ছেলেখেলা
বকুলের কুসুম-ডালায়, সেই স্মৃতি মনে পড়ে শান্ত অবকাশে :
আশ্চর্য হারানো দিন ফুল হয়ে ফুটে ওঠে
জীবনের মধু ঘাসে ঘাসে ;
গাছে গাছে আলোছায়া রঙ,
পাতিহাঁস চোখ বুজে
কি যে খোঁজে কালো জলে শ্যাওলার নতুন সবুজে ·
বুলবুল ভুল করে খুঁজে মরে সুরের সারঙ।
মাঠে মাঠে, শালবনে রৌদ্রছায়া করে ঝিলমিল,
কাঁচপোকা উড়ে আসে, আকাশে ছবির মতো আঁকা শঙ্খচিল।
বেলা যায়, ঘুঘুডাকা ঘুমঘুম অপরাহ্ণ আসে,
সোনালি পাতায় মোড়া পদ্মকুঁড়ি-দিন
পাখী হয়ে উড়ে গেল গানের আকাশে

তার পর বেলাশেষে চাঁপাবনে ছলছল চাঁদ,
মনে হ'ল ঘুমচোখে আমার কপালে ছোঁয়
অদেখা কোমল কারো হাত ;
আঙুলে জড়ানো আছে মায়াময় মমতার স্বাদ।

কখনো বা মনে হয় জ্যোৎস্নারাতে এক ঝাঁক পরী
হাওয়ায় এসেছে উড়ে, ফেলে গেছে আনমনে ফুলের পাপড়ি
ঘন গন্ধে ঝিমঝিম পরীর নিশ্বাসে
যাদু-লাগে, চোখ বুজে আসে।
দুপুরের শুষ্ক মাঠ, বেতঝোপ, নীল পড়িবন
আশ্চর্য জ্যোৎস্নারাতে রূপ ধরে চিত্রলেখা পরীর মতন :
চিত্রিত মোমের মুখ, রাঙা ঠোঁট, এলোমেলো চুল,
কখনো কবরী বাঁধে, গুঁজে রাখে চাঁপা, বেলফুল।
অর্ধেক মানুষী রূপ, অর্ধেক নাগিনী,
মাধবী পূর্ণিমা রাতে পদ্মচোখা কালো জলে চেয়ে দেখো,
মনে হবে যেন চিনি চিনি।
মনে হবে এইখানে পাশাবতী মেয়ে কোন পেতে রাখে ফাঁদ,
রেখেছে ঝাড় ও ফেলে, জবাফুল, বনলতা, চাঁদ।
হঠাৎ এসো না কেউ একা একা আপনার ভুলে,
এ বড়ো মায়ার দেশ, মণিমালা চমকায়
পরীদের কালো এলোচুলে।
ঘুম ঘুম গন্ধমাখা ফাল্গুনের ঝিমঝিম রাত
মেলেছে রূপালি পাখা, আমার মনের সাথে
ফুল হয়, পাখী হয়, পরী হয়ে উড়ে যায় আকাশে হঠাৎ।

ভ্রম সংশোধন

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মাঘ	৪০১	১	১০	সবাহর	সরহের
	৪০১	২	৭	উষ্ম	হুম্ম
	৪০২	১	৪২	চিত্র	হেবজ্র
	৪০৫	২	৭২	বৌদ্ধগণের	বৌদ্ধগানের
	৪০৩	২	৩৪	সরহপাদ ভুসুক	সরহপাদ ও ভুসুকু

প্রবাসী ফাল্গুন সংখ্যায় রঙীন ছবির নাম ভ্রমক্রমে 'ধৃতরাষ্ট্রের অরণ্যযাত্রা'
ছাপা হইয়াছে, ইহা হইবে 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা'।

শ্রীদীপক চৌধুরী

দুই

গতকল্যের ঘটনাগুলি মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম আমি। বণিক আপিসের বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ খানিকটা দোলা লেগেছে। সুতপার অনুপস্থিতি বড়বাবুর চোখে পড়েছে।

চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। কাজ করতে পারি নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে ছিলাম। বড়বাবু আমায় ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'এক দিনের জন্যে ছুটি নেবেন নাকি?"

"না। এক ঘণ্টা আগে ছুটি পেলেই খুশী হব।"

"শরীরটা বোধ হয় আপনার ভাল নেই। আজ ত একটা ফাইলও ক্লিয়ার করতে পারলেন না। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।" এই বলে বড়বাবু তাঁর নিজের ফাইলগুলি গুছোতে লাগলেন। এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি পেলাম কিনা বুঝতে পারলাম না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হবে। প্রচুর কাজ বাড়ল আমাদের। স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।"

"আপনার কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু সুতপা রায়কে দেখতে যাওয়ার দায়িত্ব অনেক।"

"স্বাধীন ভারতবর্ষের চেয়ে সুতপা রায় কি বড় হ'ল?" প্রশ্ন করলেন বড়বাবু।

বললাম, "ঝট করে জবাব দেওয়া মুশকিল। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা কথাটা বহু বার শুনেছি। ওতে এত বেশী নেশা ছিল যে, কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করি নি। এখন নেশার মাত্রা গেছে কমে। এবার মানে বোঝবার সময় হ'ল।"

"তা হলে গড়িয়া অঞ্চলটা একবার ঘুরেই আসুন। জানাবেন, মিসেস রায় কেমন আছেন।"

"ছোট সাহেব কি তাঁর পুরনো স্টেনোর খোঁজ করেন নি?"

"মাদ্রাজী স্টেনোর কাজ তিনি পছন্দ করেন খুব। তা ছাড়া সুয়েজ খাল বন্ধ। তিনি ত মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।—যাচ্ছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"একটু দাঁড়ান।" বড়বাবু ফাইল হাতড়াতে লাগলেন। সুয়েজ খাল বন্ধ বলে দরকারী মেশিনপত্র আসতে দেরি হচ্ছে আমি জানি। হয়ত দেশের তাতে ক্ষতিও হবে। কিন্তু সুতপার ক্ষতি কি সমাজ কিংবা দেশের ক্ষতি বলে কোন দিনও গণ্য হবে না? তা যদি না হয়, তবে তেমন দেশের নাম যদি ভারতবর্ষও হয় তাতে সুতপার কি যায় আসে? যে পরিকল্পনার জন্যে বড়বাবু আমাদের অল্প মাইনেতে বেশী শ্রমদান করবার অনুরোধ জানাচ্ছেন, সুতপা তার অংশমাত্র নয়। ভারতবর্ষের কোন পরিকল্পনার মানচিত্রে গড়িয়ার খালটিকে আমি দেখতে পাই নি।

আমি চলেই আসছিলাম। বড়বাবু এবার ফাইল থেকে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলবেন?"

"মিসেস রায়কে কতদিন থেকে চেনেন?"

"কাল থেকে।"

"ও, হ্যাঁ—আপনিই ত বললেন, কাল তিনি আহত হয়েছেন।"

"আমার একটু ভুল হয়েছে বড়বাবু। তিনি বোধ হয় আহত হয়েছেন অনেক দিন আগে—"

"কত আগে?" ঝুঁকে বসলেন তিনি।

ছোট সাহেব তপন লাহিড়ীর বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াল। খবর দিল, ছোট সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বড়বাবু উঠে পড়লেন। তাঁর শেষ প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার দরকার হ'ল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আপনি তা হলে আসুন। খবর দেবেন মিসেস রায় কেমন আছেন। আর ক'দিনের ছুটির দরকার তাও জেনে নেবেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের খবরটা বোধ হয় আপনি রাখেন না মহীতোষ বাবু?"

খবরটা শোনবার জন্যে আমার আগ্রহ হ'ল। তিনি বলতে লাগলেন, "গত পাঁচ বছরের মধ্যে মিসেস রায় এক দিনের জন্যেও ছুটি নেন নি! তাঁর বরাদ্দ ছুটিও নষ্ট হয়ে গেছে। ওই অসুস্থ শরীর নিয়ে কি করে যে তিনি আপিসে আসেন ভেবে অবাক হয়ে যাই। আমি ত গোড়াতেই ঠিক করে রেখেছিলুম, এক সপ্তাহের বেশী টিকবেন না তিনি। দু'শ টাকার চাকরির জন্যে মশাই বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি আজও আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে যায়।

তা ছাড়া আমার ভাইঝিটি আবার শর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং শিখছে, এবার পরীক্ষা দেবে। কি করি বলুন ত ?"

"আপনি আর কি করবেন বড়বাবু ?"

"না, না—আমার আবার করা-করি কি ! আমি ভাবছিলুম সমাজের কথা। কি সাংঘাতিক বিপ্লব মশাই ! অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক সব বদলে যাচ্ছে। বালিগঞ্জের সেই মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না। গত রবিবারে আমায় নেমন্তন্ন করে খুব খাওয়ালে মশাই। কি একটা হোটেলে নিয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখি ছোট ছোট খুপরি, সেখানে গিয়ে বসলুম। বেয়ারা এসে পর্দা ফেলে দিলে। প্রথমেই দেখি ইয়া বড় এক কবিরাজী কাটলেট—বলি হাঁ মশাই মহীতোষবাবু, মিসেস রায়ের কি হাত-পা ভেঙেছে ?"

"না।"

"ভাগ্য ভাল। হাত-পা ভাঙলে ভদ্রমহিলার আর থাকবেই বা কি !" বড়বাবুর নিশ্বাসে সহানুভূতির উত্তাপ। আমি বুঝতে পেরেছিলাম—তাঁর কথা এখনও ফুরোয় নি। গলা-বন্ধ কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে তিনি মৃদু স্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কি কাউকে দেখলেন সেখানে ?"

"না।"

"জানতুম। আমাদের ছোটসাহেব যে মিসেস রায়ের মধ্যে কি দেখলেন বুঝতে পারি না। শুধু হাত-পা থাকলেই যে স্টেনোগ্রাফার হওয়া যায় না, তাও কি আমায় বলে দিতে হবে। এদিকের খবর তো আরও খারাপ।"

"কোন দিকের ?"

"মিসেস লাহিড়ী নাকি খুবই অসুস্থ। শুনছি দিনরাত ভুল বকেন, বোধ হয় রাঁচি পাঠাতে হবে। কি যে মুশকিলে পড়েছি আমি একমাত্র মা কালীই জানেন।"

"আপনার কি মুশকিল হ'ল ?"

"ওই যে বালিগঞ্জের মেয়েটি তাকে কথা দিয়েছি। কোন্ একটা বিস্কুট কোম্পানীতে কাজ করছে, অল্প মাইনে। দেশী কোম্পানীগুলোর কি যে হাল হয়েছে—খবর দেখেন। মিসেস রায়কে বলবেন, দু'চার মাসের ছুটি চাইলেও তিনি পাবেন, সাহেবকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারব, পারবই।" বড়বাবু আর অপেক্ষা করলেন না।

আমিও বেরিয়ে এলাম আপিস থেকে।

হ্যারিসন রোডের সাধারণ একটা হোটেলে আমি থাকি। লম্বা ধাঁচের বাড়ীটা, তারই পাঁচ তলায় আমার ঘর। এখান থেকে যে-জগৎটা আমি এযাবৎ দেখে এসেছি তার সঙ্গে গড়িয়ার নব-আবিষ্কৃত জগতের কোন সাদৃশ্য নেই। সাদৃশ্য থাকলে আজ আমি পাঁচ নম্বর বাস ধরে সুতপা রায়কে দেখতে যেতাম না।

বসবার ঘরটা দেখলাম আজ খালি, কেউ সেখানে নেই। কি করব ভাবছিলাম, চার-পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম। মনে হ'ল ঘরের দেওয়ালগুলি আমার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। বিপিন চাটুজ্জের গুলি খেয়ে এরা আর কাউকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করবার মত এদের আর স্বাস্থ্য নেই, পলস্তারা সব খসে পড়েছে। গর্ত দুটো শুধু বিদ্রোহী লালু সরকারের চোখের মত জল জল করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে লালু সরকার কি আজও পরাধীন ?

বলরাম ঘরে ঢুকল। কাল তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "মাসীমা কোথায় রে ?"

জবাব দিল না বলরাম। আমি লক্ষ্য করলাম, বলরামের মুখ শুকনো, পা দুটো কাঁপছে। শার্টটা ঘামে চুপ চুপ করছে। দু'পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে রেখেছে। ওপাশের ওই চৌকির ওপর ধপ করে বসে পড়ল বলরাম। আমি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। গড়িয়ার আকাশ থেকে সূর্য যে বিদায় নিয়েছে। বালিগঞ্জে হয়ত এখনও আলো আছে, কিন্তু সরকার-কুঠীর বসবার ঘরে সন্ধ্যা সমাগত। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে রে ? জ্বর এল নাকি ?"

জবাব দিল ষষ্ঠী দত্ত। ওর পেছনে পেছনে সেও এসে ঘরে ঢুকেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মেক-আপ ম্যান বলল, "রক্ষিতের মোড়ে ভিরমি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়েছিল বলরাম। রিফিউজীর বাচ্ছা কিনা তাই পনের টাকাকে এক গাদা টাকা মনে করে।" এই বলে ষষ্ঠী দত্ত পকেট থেকে বিড়ি বার করল। বিড়ি ধরিয়ে সে বলতে লাগল, "ছোঁড়াটা এক সঙ্গে পনর টাকা কখনও দেখে নি। একটু আগে আমার পকেট থেকে পনরটা টাকা খোয়া গেছে। বাস থেকে নেমে দেখি পকেটের তলার দিকটা নেই, সবটাই কাটা। বলরামকে এত করে বোঝালুম যে, কলকাতার শহরে মাত্র পনর টাকা খোয়া গেলে লোকে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে কিন্তু এই দেখুন ত, খবরটা শোনবার পর থেকে রিফিউজীর বাচ্ছা প্রথমে ভিরমি খেয়ে পড়ে গেল, তার পর এখন ত বসে বসে কাঁপছে। ওরে ও বলরাম—" ষষ্ঠী দত্ত চৌকির কাছে এগিয়ে এসে পুনরায় বলল, "দু'চারটে রদ্দা না খেলে তোর কাঁপুনি থামবে না দেখছি। এ হচ্ছে গিয়ে দাদা হোমিওপ্যাথি চিকিচ্ছে, বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় করা। ওঠ—ফিল্ম-

ষ্টারদের মুখে ছু'পোঁচড়া রং মাখালেই ষষ্ঠী দত্ত পনর টাকা রোজগার করতে পারে—"

"কে রে এত লম্বা চওড়া বক্তিমে দিচ্ছে? আমাদের ষষ্ঠী না? বলি হ্যাঁ রে ষষ্ঠী, গেল মাসের পুরো টাকা ত দিস নি? আমি কি তোদের ধার করে খাওয়াব নাকি? মুদির ছেলেটা তাগাদা দিচ্ছে সেই পয়লা তারিখ থেকে। তোরা সবাই যদি বাকিতে খেতে চাস তবে সংসারটা আমি চালাই কি করে? ওখানে কি বাবা?"

"কালকের বাবুটি আবার এসেছেন মাসীমা।" বলল ষষ্ঠী দত্ত।

"কালকের বাবুট? না ষষ্ঠী, ওকে বলে দাও এখানে আর জায়গা নেই। আমরা আর পেইং গেষ্ট রাখতে পারব না। মাসীমার সংসারে সবাই বিনে পয়সায় খেতে চায়। ভরে ও ষষ্ঠী, বাবুটিকে জিজ্ঞেস কর পয়লা তারিখে আগাম দিতে পারবেন কিনা। আজ সকালে ছ'জন প্রফেসর এসেছিলেন —যাদবপুরে নাকি নতুন নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে রে ষষ্ঠী?"

"হ্যাঁ।"

"সেই বাড়ীতে নাকি প্রফেসর ছ'জন চাকরি করেন। মা সরস্বতীর কপালে এত দুঃখও ছিল। তাঁরা কিন্তু বাবা আগাম দিয়েই থাকতে চান। বলি ও ষষ্ঠী, আলোটা জ্বাল না রে। বুড়ী হয়ে গেছি কিনা, চোখে ভাল দেখতে পাই না। আমাদের ষষ্ঠী হচ্ছে গিয়ে মেক-আপ ম্যান। ফিল্ম কোম্পানীর মেয়েদের মুখে রং মাখায়। হ্যাঁ রে ষষ্ঠী, আমার মুখে রং মাখিয়ে বয়স কমাতে পারিস?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাসীমাই আবার বললেন, "পারবি নে। পারলেও পঞ্চাশটা বছর লুকোই কি করে! তোর তুলির আঁচড় আমি চিনি।"

ষষ্ঠী দত্ত আলো জ্বালল। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কে? মহীতোষ? আমি ভাবলুম, আমার হোটেলে কেউ থাকতে এল বুঝি, বস।" মাসীমার গলার সুর বদলে গেল।

হেসে ফেললাম আমি। অনুরোধের সুরে বললাম, "পয়লা তারিখে সব টাকাই আমি আগাম দেব। দেবেন থাকতে?"

ইত্যবসরে মাসীমা বলরামকে দেখে নিয়েছেন। ওর মুখ দেখে তিনি নিমেষের মধ্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ষষ্ঠী দত্তর কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলেন তিনি। বলরামের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মাসীমা বললেন, "শক পেয়েছে। কেউ কেউ লাখ পনর গেলে শক পায়। সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা! ষষ্ঠী, রান্নাঘরে গরম দুধ আছে। ওকে নিয়ে যা সেখানে। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দে।"

বলরামকে নিয়ে ষষ্ঠী দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাসীমা বললেন, "বস বাবা, বস। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আঘাত যত বড়ই হোক, কেউ আর আমায় দুঃখ দিতে পারবে না। মনটাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। ছুঁতে পারলে বুঝতে, আজও সেটা পাথর হ'ল না। বাবা মহীতোষ, এ যুগের সবচেয়ে বড় উন্নতিটা যখন আমার চোখে পড়ল, তখন দৃষ্টিশক্তি আমার সবচেয়ে ক্ষীণ। এমন কি তোমাকে পর্যন্ত আমি চোখে দেখতে পাই নি।" এই বলে মাসীমা বসে পড়লেন চৌকির ওপর, আমারই ঠিক পাশে। ঈষৎ পূর্বের গ্রাম্য সুর আর তাঁর গলায় নেই। যুগের বিশ্লেষণ তাই আমার শুনতে ভালই লাগছিল। আমি জিজ্ঞাস করলাম, "সবচেয়ে বড় উন্নতিটা কি মাসীমা?"

জবাব দিতে দেরি করলেন না তিনি। বললেন, "শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিষ্ঠুরতা আজ চরমে উঠেছে। জান মহীতোষ, এদের মন থেকে ক্রমে ক্রমে দুঃখবোধ পর্যন্ত লোপ পাচ্ছে? তোমায় একটা উদাহরণ দিই শোন।" এই বলে মাসীমা বেশ জড়সড় ভাবে পা গুটিয়ে চৌকির ওপর বসলেন, চোখ বুজে অতীত উদাহরণ অন্বেষণ করতে লাগলেন তিনি। তার পর একটু বাদেই আবার বলতে লাগলেন, "প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই গ্রামে আমি বৌ হয়ে এসেছিলুম। বোধ হয় তখন আমার বয়স ছিল দশ কি বারো। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে ঘটকদের গোয়ালে আগুন লাগে। তেমন কিছু একটা সর্বনেশে ব্যাপার নয়। কিন্তু চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমার শ্বশুর ত লাফিয়ে নেমে পড়লেন উঠোনে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোমার মেসোমশাইকে ঘুম থেকে তুললেন। আমি দেখলুম, বালতি হাতে নিয়ে বাপব্যাটাতে মিলে ছুটতে লাগলেন ঘটকদের বাড়ীর দিকে। পাচ মিনিটের মধ্যে চতুর্দিকে তুমুল কাণ্ড সুরু হ'ল। শুধু বোড়াল আর বেহালাঘাটা নয়, চারদিকের গ্রাম থেকেও লোক সব ছুটে আসতে লাগল। সে সময় ত বাবা আশী নম্বর আর আটাত্তর নম্বর বাস ছিল না। পরের দিন সকালবেলা শুনলুম, সোনারপুর, গোবিন্দপুর এমনকি বারুইপুর থেকেও অনেকে এসেছিল আগুন নেভাতে। কাউকেই অবশ্যি আগুন নেভাবার জন্যে এক বালতিও জল ঢালতে হয় নি। ঘটকদের ছেলেরাই নিভিয়ে ফেলেছিল। ক্ষতি ওদের তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু ওরা যখন বালতি হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন তখন আমি দেখলুম বালতিগুলো শূন্য নয়, লাভের জলে তা একেবারে ভরপুর। ঘটকদের লোকসান হতে পারে ভেবে এতগুলো লোক যে ছুটে এল

তার মধ্যে কি সামাজিক লাভ কিছু দেখতে পাচ্ছ না মহীতোষ?"

বললাম, "পাচ্ছি।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাসীমা বললেন, "অথচ বলরামের মত একটা কচি ছেলের সর্বনাশ দেখে কৈ সারা ভারতবর্ষের কেউ ত চোখের পাতাটি পর্যন্ত নাড়ে না? থাক বাবা থাক, এ সব বড় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। ভারতবর্ষকে যাঁরা শিক্ষার আলো দিয়ে আলোকিত করবার চেষ্টা করছেন তাঁদের দৃষ্টিতে যেন অন্ধকার না থাকে। মহীতোষ, আমি বাবা বলরামকে নিয়ে বড্ড মুশকিলে পড়ে গেছি। কাজকর্ম কিছু নেই তোমাদের আপিসে—" কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

আমার নিজের কিছু বলবার মত কথা ছিল না। তা ছাড়া সরকার-কুঠীতে ঢুকেছি কথা শুনতে, বলতে নয়। কিন্তু মাসীমা দেখলাম চুপ করে বসে রইলেন। দেওয়ালের গর্ত ছুটার দিকেও তিনি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। বুঝলাম, বলরামের কাঁপুনি তাঁকে অস্থির করে তুলেছে।

আলোচনা চালু করলাম আমিই। বললাম, "আজকালকার শাসনবিধি আগেকার দিনের মত নেই। শতকরা একান্ন ভাগ লোককে ভাল করে খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে পারলে রাষ্ট্রনায়কদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না। একজন বলরামের জন্তে পৃথিবীর কোন মসনদই টলাতে পারে না মাসীমা।"

"তোমার খবর হয়ত মিথ্যে নয় বাবা। কিন্তু আমাকেও ত একটা ছোটখাটো সংসার চালাতে হয়। কৈ কাউকে ত এক বেলার জন্তেও না খাইয়ে রাখতে পারি না। শুধু একান্ন ভাগের কথা যদি ভাবতুম, তা হলে তোমার মাসীমার হোটেলে উদ্বৃত্ত দেখতে পেতে। কিন্তু এখন কি দেখছ? সরকার-কুঠীর সবগুলো দেয়াল থেকে পলস্তারা খসে পড়েছে।" এই বলে মাসীমা শুধু একটা দেওয়ালের ওপরই দৃষ্টি ফেললেন। তার পর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে পুনরায় বলতে লাগলেন, "ষষ্ঠী যেদিন বলরামকে নিয়ে এল সেদিনটা ছিল মাসের শেষ তারিখ। হিসেবের ভাত হাঁড়িতে আর একটাও ছিল না। তবুও কি বলরামকে উপোস করিয়ে রাখতে পারলুম? না বাবা, তোমাদের রাষ্ট্রনীতি যত ভালই হোক, আমাদের হোটেল-নীতিকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। এখানে শতকরা এক শ' ভাগ লোকেরই খিদে পায় এবং তাদের খাওয়াতেও হয়। আমাদের হিসেবে এক পারসেন্ট লোকও মানুষ। একান্ন আর উনপঞ্চাশ ভাগের মধ্যে এক তিলও পার্থক্য নেই। হ্যাঁ বাবা মহীতোষ, আমাদের হোটেল-নীতির মধ্যে কি অসভ্যতার গন্ধ পাচ্ছ? আমাদের জংলী ভাবছ, না? কিন্তু সোঁদরবন ত এখান থেকে অনেক দূর।"

"দূর আর কৈ? যেখান থেকে নম্বর দেওয়া বাস চালু হয়েছে তার দূরত্ব বোধ হয় আধ মাইলও নয়। আমার মনে হয়, গড়িয়ার খালটা মরা বটে, কিন্তু এটাই বোধ হয় দু' অঞ্চলের সীমানির্দেশ করছে।" এই বলে হেসে ফেললাম আমি।

মাসীমা মুখ নিচু করে বসে রইলেন। খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম সরকার-কুঠীর বাগানে অন্ধকার নেমে এসেছে। কলকাতার রাস্তায় ঠিক এমন অন্ধকার কোন দিনও চোখে পড়ে নি। ঘরে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগছে। রাত্রির রূপ এখানে স্বাভাবিক। ঘড়ি না দেখেও বলে দেওয়া যায় দিন শেষ হয়েছে। কলকাতার ব্যবস্থা আলাদা। সেখানে অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্তে রাস্তার দু'ধারে আলোর সারি।

তবুও মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে যেটুকু অন্ধকার আমার চোখে পড়েছে তার কোন রূপ নেই, দেহ নেই। কৃত্রিমতার ঔজ্জ্বল্য কলকাতার অন্ধকারকে কুৎসিত করে রেখেছে।

ঘরের নৈঃশব্দ্য ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠছিল। আমি একটু নড়ে চড়ে বসলাম। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "উঠছ নাকি?"

"না। আসল খবরই ত আমার এখনও জানা হয় নি। মিসেস রায় কেমন আছেন?"

"কাল বাবা রাত্রির দিকে জ্বর এসেছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকে সে ভালই আছে। বুকের বাঁ দিকটাতে একটু জখম হয়েছে।"

কথাটা আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হ'ল না। মাসীমা বোধ হয় সুতপার জখমটাকে ছোট করে দেখাতে চাইছেন। আমি তাই বললাম, "গতকাল তিনি যখন মাটিতে পড়ে গেলেন তখন অনেকগুলো লোকের পা-ই তাঁর গায়ের ওপর পড়েছিল।"

"হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। একটা লোকের জুতোর তলায় বোধ হয় নাল বাঁধা ছিল।"

সুতপা রায়ের জন্তে উদ্বেগ অনুভব করলাম। মাসীমা বুঝতে পারলেন তা; তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "সুতপার আসল জখমটা তুমি দেখ নি ...বলি ও মহীতোষ, তোমাদের ছোটসাহেব ত ওকে একবার দেখতে এলেন না?"

আমি একটু চমকে উঠলাম। মনের ভাব গোপন রেখেই

মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "লাহিড়ী সাহেবের আসবার কথা আছে নাকি ?"

"না কথা কিছু নেই, এলে ভাল হ'ত। তাঁর কাছেই ত মেয়েটা চাকরি করে।"

"হয়ত আসবেন। সুয়েজ খাল বন্ধ বলে তিনি আপিসের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। খবর দেওয়ার দরকার থাকলে—"

"না, না বাবা, দরকার কিছু নেই।" একটু থেমে মাসীমাই আবার বললেন, "লালু যখন মুখ থুবড়ে গড়িয়ার খালে পড়ে গেল, তখন ওর জন্তে আমি খুব গর্ববোধ করেছিলুম, লালু পেট্রিয়ট আমি তার মা। দেশের স্বাধীনতার জন্তে যে ছেলে ইংরেজের গুলি খেয়ে মরেছে তার মা হওয়ার মত সৌভাগ্য গড়িয়ার আর কোন মায়েরই হয় নি। কিন্তু—মহীতোষ, তুমি কি মাসীমার হোটেলে এক পেয়ালা চা ও খাবে না ?"

"খাব। একটু পরেই খাব। আপনার আগের কথাটা কিন্তু শেষ হয় নি।"

"কি যেন বলছিলাম ?"

"পেট্রিয়ট লালু সরকারের কথা।"

"ও হ্যাঁ। পেট্রিয়ট কথাটা শুনলে এখন হেসে হেসে মরে যেতে ইচ্ছে করে। ভগবান রক্ষে করেছেন, ও কথাটা এখন আর খুব বেশী শোনা যায় না। নইলে—মহীতোষ, সুয়েজ খালের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে ?"

"ইংরেজ আর ফরাসীরা মিলে খালটা জবরদখল করতে চেয়েছিল। ওঁরা বলছেন, ইংরেজদের সাম্রাজ্যভোগের নেশা এখনও কাটে নি।"

"ওরা কারা ?"

"ভারতবর্ষের যাঁরা মাথাওয়ালা লোক। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ। অতএব এঁরা যা বলবেন তা মেনে নিতেই হবে। হয়ত ইংরেজরা সত্যিই মানুষের সর্ব্বনাশ করতে চায়।"

"কি জানি বাবা, এঁদের কথা শুনলে আমার ত হাসি পায়। কেন পায় জান ?"

"না।"

হঠাৎ কান খাড়া করে মাসীমা পেছন দিকের জানালার পানে মুখ ঘোরালেন। কি যেন শোনবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। একটু পরে আমিও শুনতে পেলাম, কে যেন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। মাসীমা এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "না, তপা নয়। ভেবেছিলুম, মেয়েটা বুঝি নিচে নামছে। মহীতোষ, তুমি ত আমাদের হোটেলটা একদিনও ভাল করে দেখলে না। দু'দিনই সন্ধ্যেবেলায় এলে। একদিন দুপুরের দিকে এস বাবা। চার দিকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব। গড়িয়া খালটা সরকার-কুঠীর পেছন দিয়ে পুব দিকে চলে গেছে। এপারে আমরা থাকি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এপারের সব ক'টি মানুষই হতভাগ্য। ইংরেজ কিংবা ফরাসীদের সঙ্গে এদের কারো সম্পর্ক নেই। অনেকে ফরাসী কথাটা পর্যন্ত কানে শোনে নি। তবুও এদের জীবনের মাটি সর্বনাশের বারুদ লেগে লেগে নিষ্ফলা হয়ে গেল। তোমরা সুয়েজ খাল দেখেছ, গড়িয়া খাল দেখ নি। ওপারের প্রতিবেশী রাম আর শ্যামবাবু থেকে সুরু করে সবাই যেন অনবরত চেষ্টা করছে এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্তে। এদের বুকের ওপর দিয়ে প্রতিদিন যে সব পা গুলো পার হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সব স্বদেশী পা বাবা। বলরামকে দেখলে না ? সুতপার কতটুকু দেখেছ ? দেখতে হবে ষষ্ঠীকেও। চিরুণীর ভাঙা-দাঁতের মত ভাঙা-মানুষের একটা লম্বা মিছিল রোজই আমার চোখের সামনে দিয়ে গড়িয়ার খালটা পার হয়ে যাচ্ছে। আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না, তবুও আমি বুঝতে পেরেছি যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের পা গুলো কি কালো! কে রে ? বাইরে কে ? ভেতরে আয় না—ও চণ্ডী! এস, কখন এলে ? মহীতোষ, এর নাম হচ্ছে চণ্ডী ভটচাজ, বামুন। আমার বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে এরা থাকত। এখান থেকে মাইল ছয় দক্ষিণে। গোবিন্দপুরের নাম শোন নি ?"

"আজ্ঞে না।"

"সোনারপুর থেকে বেশী দূরে নয়। নেতাজী সুভাষ বোসদের আদিবাড়ী ওই অঞ্চলেই ছিল। যাক গে। চণ্ডী এখন বালিগঞ্জ অঞ্চলে জ্যোতিষী করে, থাকে আমার হোটেলে। বলি হ্যাঁ চণ্ডী, কত রোজগার করলে আজ ?"

"শনির দশা না কাটলে রোজগারের অঙ্ক আর বাড়বে না। মাসীমা আর মাত্র আঠারো মাস বাকী। তার পর—হেঃ, বৃহস্পতির খেলাটা একবার দেখে নিয়ো। তোমার বাকিবকেয়া চুকিয়ে দিতে চণ্ডী ভটচাজ এক মিনিটও দেরি করবে না।"

"আরও আঠারো মাস যদি অপেক্ষা করতে পারি, তা হলে দু'চার মিনিট দেরি হলেও অসুবিধে আমার হবে না। চণ্ডী, এবার বল্, তপার কোষ্ঠীতে কি দেখলি ? বিচার শেষ হয়েছে ত ?"

চণ্ডী ভটচাজ ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকালেন। বিচারের ফলাফল সম্ভবতঃ তিনি পকেটেই রেখেছিলেন। মনোযোগ দিয়ে লোকটিকে দেখছিলাম আমি। ফতুয়ার বাঁ দিকের

পকেটটা নেই, খুলে পড়ে গেছে। বোধ হয় অনেক দিন ধরে তিনি অনেক লোকের ভাগ্যের বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়িয়েছেন বালিগঞ্জের বড় বড় বাড়ীগুলোর সামনে দিয়ে। ভাগ্যবানদের ফলাফল বয়ে বেড়াবার মত ফতুয়ার কাপড়টা শক্ত নয়। ঘাড়ের দু'দিকে দেখলাম ডবল তালি পড়েছে। প্রথম তালিটা ফুটো হওয়ার পরে দ্বিতীয় তালি লাগাতে হয়েছে তাঁকে। মেটে রঙের ফতুয়ার ওপর লাল কাপড়ের তালি। চণ্ডী ভটচাজকে এতটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম বলেই হয়ত মাসীমা গম্ভীর সুরে বললেন, "চণ্ডীর গণনায় বেশী ভুল থাকে না। আর থাকলেই বা কি? ও ত কারো ক্ষতি করছে না! চণ্ডী তার পেট চালাবার জন্যে রোজগার করছে। দু'মুঠো ভাতের জন্যে ওকে বার ঘণ্টার চেয়েও বেশী মেহনত করতে হয়। হ্যাঁ বাবা মহীতোষ, দেশের যাঁরা নেতা তাঁরা ক'ঘণ্টা মেহনত করেন?"

"আমি, মানে—সত্যি কথা বলতে কি, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন খবরই রাখি না।"

"ভোট দাও নি?" চেঁচিয়ে উঠলেন মাসীমা।

"না। আপিস সেদিন ছুটি ছিল বলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলুম। আমাদের হোটেলের পাঁচ তলায় প্রচুর হাওয়া পাওয়া যায়।"

চণ্ডী ভটচাজ এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে আমি বোধ হয় কোথাও দেখে থাকব।"

"অসম্ভব নয়। আপিস কোয়ার্টারে দেখা হতে পারে। সেদিকে যান না?"

"দৈবে সৈবে। ওদিকটায় গেলে হয়ত উপার্জন কিছু বাড়ে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে না। নাঃ, উপোস করে থাকলেও যাব না।"

"কেন?"

জবাব দিলেন মাসীমা। তিনি বললেন, "চণ্ডী যেতে চাইলেও আমি যেতে দেব না।" মাসীমা ভাবলেন একটু। তার পর আবার তিনি বললেন, "ও অঞ্চলে বড্ড বেশী শিক্ষিত লোকের ভিড়। চণ্ডীকে সবাই ভিক্ষুক মনে করে। আমার হোটেলে যারা থাকে তারা কেউ ভিক্ষে করে না। এবার বল দিকি বাছা, তপার সময়টা কেমন? আর কতদিন ওকে ভুগতে হবে?"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করলেন চণ্ডী ভটচাজ। শেষবারের মত ভেবে তিনি ঘোষণা করলেন, "ভাল সময় আসতে বাধ্য।"

"কতদিন বাকী তাই বল্ না রে।" অনুরোধ করলেন মাসীমা।

"বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হবে না। সৌভাগ্যের শুরু তাঁর এখানে থেকেই হবে।"

"বলিস কি চণ্ডী? হিসেব কষে বললি, না অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লি?"

"হিসেব করেই বললুম। রাহুর দৃষ্টি ওর পক্ষে ক্ষতিকারক। এবার সে জায়গা বদল করছে।" এই বলে চণ্ডী ভটচাজ আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ঘোষণা করলেন, "সৌভাগ্য এমন জিনিষ মাসীমা যে, সময় এলে তার পা গজায়। নিঃশব্দে সে হেঁটে চলে আসে, এসে দাঁড়িয়ে থাকে মাথার কাছে। ডাকবারও দরকার হয় না—" দ্বিতীয় বার আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি ঘোষণা শেষ করলেন, "সৌভাগ্যকে কেউ নেমন্তন্ন করে আনতে পারে না, সে হঠাৎ আসে।"

চণ্ডী ভটচাজের গণনায় ফাঁকি আছে মনে করে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "মহীতোষের দিকে অমন করে চেয়ে কি দেখছিস চণ্ডী? তুই বোধ হয় ভেবে নিয়েছিস, মহীতোষ হচ্ছে গিয়ে তপাদের আপিসের ছোটসাহেব?"

"তা কেন ভাবতে যাব? লাহিড়ী সাহেবকে আমি চিনি না বুঝি?"

"চিনিস? তুই যে আমায় অবাক করলি চণ্ডী!"

"সেদিন তাঁর বাড়ী গিয়েছিলুম। দেওদার স্ট্রীটে সাহেবি কায়দায় দেখলুম বাড়ীঘর সাজানো। বললুম, এসব তাঁকে এক দিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। লাহিড়ী সাহেব হচ্ছেন গিয়ে আমার বড় মক্কেল। স্ত্রীর খুব অসুখ যাচ্ছে।"

"কি অসুখ?" আগ্রহের আতিশয্যে মাসীমা খাড়া হয়ে বসলেন।

"মাথার অসুখ। তাঁকে বলে এলুম, সেরে যাবে, গোমেদ পরবার জন্যে উপদেশ দিয়ে এসেছি।"

"কই তপার মুখে ত এসব কথা কিছু শুনি নি?"

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম উঠে পড়ব। হঠাৎ উঠে পড়বার কারণটা খুঁজতে গিয়ে দেখি, তপন লাহিড়ীকে আমি ঈর্ষা করছি। মনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনা দরকার। সুতপা রায়কে এখন পর্যন্ত আমি চিনি না। কিন্তু তপন লাহিড়ীই বা ওকে চেনবার সুযোগ পেলেন কি করে? ধৈর্য ধরলাম আমি।

"মাসীমা, মাসীমা কোথায়?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। মুখটা তাঁর দেখতে পেলাম না। তিনি বাইরে থেকে পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে এলেন। মাথার দিকটাতে পাঞ্জাবীটা আটকে গেছে।

মাসীমা বললেন, "বোতাম খোল নি, পাঞ্জাবীটা মাথার ওপর দিয়ে গলবে কি করে বিজয় ?"

"ওঃ, তাই ত। আগে বোতামগুলো খুলে নিচ্ছি। সুতপা কেমন আছে মাসীমা ? আমার সেই ডাক্তার বন্ধুটিকে খবর দিয়েছি। বাড়ী ফেরবার মুখে সে একবার এসে দেখে যাবে। আজ আর জর আসে নি ত ?"

"না। তোমার পকেট থেকে টাকা পড়ে গেল যে বিজয়। মহীতোষ, বিজয় হচ্ছে ইস্কুলের মাষ্টার। কাল এর সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি।"

"না।"

"ছাত্র পড়িয়ে ওর ফিরতে একটু রাত হয়। আগে এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চারটে টিউশনি করত—"

বাধা দিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট নয়, এক ঘণ্টা পনর মিনিট। মশাই, মাসীমা আমার রোজগার কমিয়ে দিলেন। এখন একটাই করি।"

"তা কি করব বাছা ? মাসীমার হোটেলে যারা থাকবে তাদের নীতি একটা মানতেই হবে। বিজয়ের কীর্তিটা তা হলে শোন।"

"আমি উঠছি মাসীমা। দুটো নতুন কোষ্ঠী তৈরির অর্ডার পেয়েছি।"

এই বলে চণ্ডী ভটচাজ উঠলেন। বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, "মাত্র দুটো ? তা হলে জ্যোতিষসম্রাট হতে আপনার কত দিন লাগবে ভটচাজ মশাই ?"

"সম্রাট হওয়ার দরকার কি ?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে মাসীমা বললেন, "সম্রাটদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডী যা রোজগার করে তার একটি পয়সাও কালো নয়। পয়সা ওরা চেনে। প্রাচীন কালে ভটচাজদের গঙ্গা দিয়ে চাঁদসদাগরের নৌকো চলত। মহীতোষ, তুমি বোধ হয় জান না যে, একসময়ে খিদিরপুর ওপাশ দিয়ে পঞ্চবটীর গা ঘেঁষে গঙ্গার ছিল গতি। শোনা যায়, চাঁদসদাগর পঞ্চবটীর কালীমন্দিরে যাওয়া-আসার সময় পূজো দিয়ে যেতেন। এখন সেই গঙ্গা বহু দূরে সরে গিয়েছে, কিন্তু নামটা রয়ে গেছে। আমার বাপের বাড়ীর সামনের পুকুরটাকে ঘোষেদের গঙ্গা বলে। চণ্ডীদেরটার নাম তো শুনলেই। যারা চাঁদসদাগরের পুণ্যি পেয়েছে তারা পয়সা চেনে। কালো পয়সাতেও ওরা হাত দেবে না। বিজয়, তোমার সেই গল্পটা বলব নাকি ?"

"ও তো শুধু আমার একলার গল্প নয়—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো বলি বিজয় বাঁড়ুয্যে হচ্ছে এ অঞ্চলের একমাত্র আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু বাবা প্রথম যখন এখানে থাকতে এলে, তখন কি ছিলে ? বুঝলে মহীতোষ, এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে বিজয় চারটে টিউশন করে বাড়ী ফিরে আসত। ইস্কুলে যা মাইনে পেত তার চেয়ে বেশী রোজগার ছিল বাইরে। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হ'ল, কচি কচি ছেলেগুলোর পরকাল নষ্ট করছে আমাদের বিজয়। বিপ্রদাসবাবু দেখি একদিন সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে উপস্থিত। উনি ওই বঙ্কিমের মোড়ে থাকেন। তাঁর ছেলেকে বিজয় প্রাইভেটে পড়াত। বিপ্রদাসবাবু বললেন যে, তাঁর মেজো ছেলে প্রথম হয়ে ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছে। পাস করার মত ছেলে সে নয় বলেই তো তিনি বাড়ীতে মাষ্টার রেখেছিলেন। সে প্রথম হ'ল কি করে ? আর তাও মাত্র ছ'মাস মাষ্টার রাখবার পরে! এমন পয়লা নম্বরের সোনারচাঁদ তো বিপ্রদাসবাবুর তিন পুরুষের মধ্যে একটিও জন্মায় নি। ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসে তিনি পরীক্ষা করতে বসলেন। তিনটি সরল অঙ্কের মধ্যে তিনটিই সে ভুল করল। এক লাইন বাংলা লেখার মধ্যে পাঁচটা বানান ভুল। তার পর ?"

মাসীমার গল্প বলার ভঙ্গি দেখে চণ্ডী ভটচাজ হাসছিলেন। বিজয়বাবু মাথা নিচু করে বসেছিলেন। আমি শুধু গল্প শুনছিলাম না, সমগ্র সরকার-কুঠীর চরিত্রটা বোঝবার চেষ্টাও করছিলাম। পলস্তারা-খসা ভাঙাচোরা বাড়ীটার মেরুদণ্ড এখনো খুবই মজবুত। বোধ হয় মাসীমা তাঁর নিজের মেরুদণ্ডের বাঁধুনি দিয়ে সরকার-কুঠীর মেরুদণ্ড খাড়া রেখেছেন। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে মাসীমার গল্প শুনতে লাগলাম।

তিনি বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "এতে লজ্জার কিছু নেই বিজয়, বরং অপরাধ স্বীকার করার মধ্যে গৌরব আছে। শুনেছি খ্রীষ্টভক্তরা পুরোহিতের কাছে গিয়ে সদাসর্বদা নিজেদের পাপের কথা কবুল করে আসে। নিয়মটা ভাল। গল্পটা এবার শোন। তার পর বিপ্রদাসবাবু বোধ হয় ছেলেটাকে মারধোর করলেন। ওমা, মার খেয়ে ছেলেটা বলে কি জানো ? বলে যে, পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ওর জানাই ছিল। জানিয়েছে বিজয়। মাষ্টারীতে ওর খুব নাম। ওর ছেলেরা সব ভাল নম্বর পেয়ে পাস করে। বিপ্রদাসবাবু যখন এলেন বিজয় তখন বাড়ী ছিল না। তাঁর কথা শুনে আমার তো মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। ওর হয়ে আমি বিপ্রদাসবাবুর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলুম। জানি, এমন অপরাধের ক্ষমা নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই তো শিশুবধকে মহাপাপ মনে করে। বিপ্রদাসবাবু যাওয়ার সময় দুঃখ করে বলে গেলেন, একা বিজয়বাবুকে দোষ দিয়েই

যা কি করব ? হয় ত আরও অনেকে এমন কাজই করে বেড়াচ্ছেন। নীতিহীন মানবসমাজের ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। কাল থেকে বিজয়বাবুর আর পড়াবার দরকার নেই। ওদের ইস্কুলেও আর ছেলেটাকে রাখা চলে না। বললুম, বিজয়কে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাল থেকে সে শুধু আপনার ছেলেকেই পড়াবে। মাইনে যা আপনি দিচ্ছেন, তাই-ই দেবেন। বিপ্রদাসবাবু তাঁর স্বীকৃতি জানিয়ে ছড়ি দোলাতে দোলাতে এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মহীতোষ, আমি যেন দেখলুম বিপ্রদাসবাবুর চতুর্দিকে শতাব্দীর অন্ধকার ক্রমশঃই ঘন হয়ে আসছে। তিনি ছড়ির আঘাতে অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু পারছেন না। ছুটে গেলাম পেছন দিকে। গড়িয়ার খালে দেখলাম মাত্র এক ফুট জল! মরতে পারলাম না। লালুও তো ঠিক এইখানেই মরেছে। তার তপ্ত নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগতে লাগল। বসে পড়লুম মাটিতে। কি যেন খুঁজছিলাম আমি। হঠাৎ মনে হ'ল পেলুম বুঝি! কিন্তু আর কি পাওয়া যায় ? লালুর ঘাড়ের রক্ত শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বিপিন চাটুজ্যের হাতে আজ নতুন অস্ত্র। হ্যাঁ রে, তোরা কি কেউ ওর হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিতে পারিস না ? সুয়েজখালের ওপারের লোকগুলোর জন্যে তোরা কেঁদে মরছিস, লালুর জন্যে একটু কাঁদ। সারা দেশ যে ওকে ভুলে গেল রে।"

আমি বললাম, "মাসীমা, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন। বিজয়বাবু কাউকে দিয়ে দু' পেয়ালা চা আনানো যায় না ?"

"ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাসীমা, এ গল্প তুমি আর কোনদিনও কাউকে বলতে পারবে না।"

"না বাবা, আর বলব না। লালু প্রতিশোধ নিয়েছে। কুশিক্ষার বিষ খেয়ে হাজার হাজার লালু আজ আত্মহত্যা করছে। তা করুক, আমি তো তা বন্ধ করতে পারব না। যাচ্ছিস বিজয় ?"

"হ্যাঁ। তোমাদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"টাকাগুলো যে মাটিতে পড়ে রইল—"

মাটি থেকে তিনখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "তোমার কাছে রেখে দাও। এ মাসের টাকা তোমার শোধ হয়ে গেল। বিপ্রদাসবাবুর কাছ থেকে আজ মাইনে পেয়েছি। মাসীমা, এই টাকাটা হ'ল আমার নতুন সুরুর প্রথম উপার্জন।"

নোট তিনখানা হাতে নিয়ে মাসীমা বললেন, "এ টাকা কালো নয়।"

চণ্ডী ভটচাজ আগেই চলে গিয়েছিলেন। বিজয়বাবুও গেলেন। মাসীমাকে একলা পেয়ে এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মিসেস রায় কেমন আছেন ?"

"না বাবা তেমন ভাল নেই সে।" মাসীমা উঠে পড়লেন।

"তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"দেখি, সে নিচে নামতে পারে কি না।" মাসীমা এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

পেছনে পেছনে আমিও গেলাম। অনুরোধ করলাম, "তাঁর কাছে আমায় একবার নিয়ে চলুন না। তিনি নিজেই আমায় আসবার জন্যে বলেছিলেন।"

"কিন্তু তা তো হয় না। তপা তো ঘরে একলা থাকে না, অন্য একজনও থাকে।"

"বেশ, বেশ"—মাসীমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম, 'আজ থাক, কাল আবার আসব। মিসেস রায়কে বলবেন—"

"তুমি চা খেয়ে যেয়ো মহীতোষ।" এই বলে একতলার অন্ধকারে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়লেন সরকার-কুঠীর মালিক শ্রীবসন্তকুমার সরকার, এখানকার মেসোমশাই। তিনি বললেন, "চলুন একসঙ্গে বসে চা খাওয়া যাক। গড়িয়ার ইতিহাস শুনতে আপনার ভালই লাগবে।" ক্রমশঃ
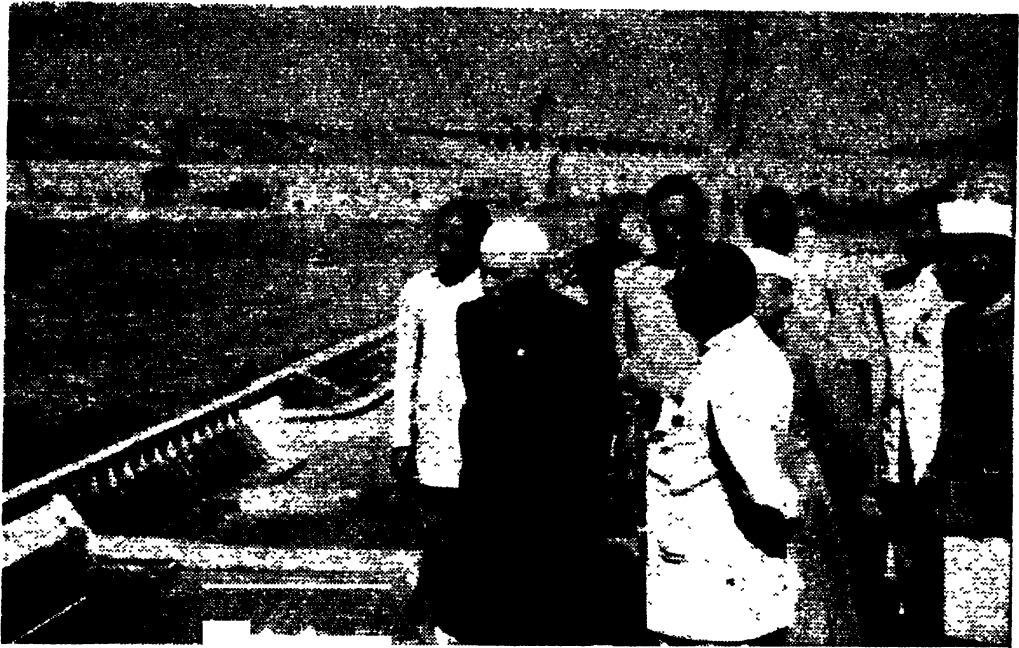
প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু কর্তৃক হীরাকুঁদ বাঁধের উদ্বোধন
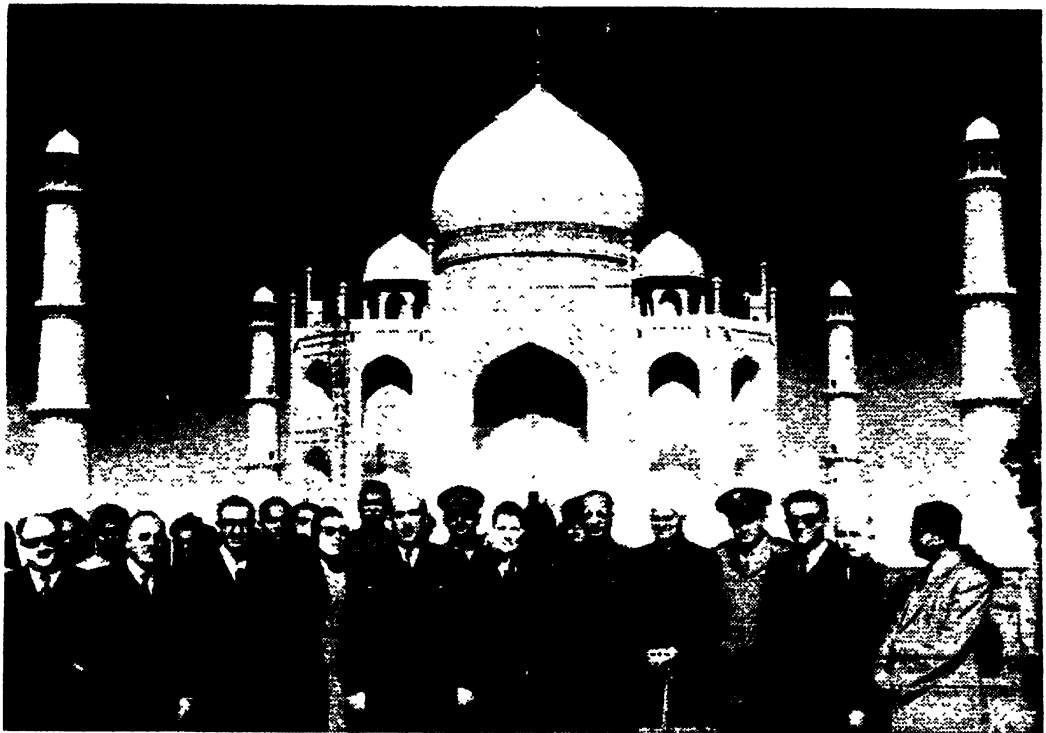
মাদাম কুওয়াটলিসহ সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট এইচ. ই. মিঃ শুকরি আল কুওয়াটলির
আগ্রায় তাজমহল পরিদর্শন

সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জি. কে. জুকভ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরুকে দুই ফুট উচ্চ একটি ব্রোঞ্জ-মূর্তি উপহার প্রদান

১৯৫৭ সনের প্রজাতন্ত্র দিবসে অংশগ্রহণকারী বোম্বাই রাজ্যের নৃত্যশিল্পীগোষ্ঠীর 'সঙ্গীত-নাটক আকাদমি শিল্ড' পুরস্কার লাভ

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বাংলাদেশে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল দিকপাল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের জীবন ও কৃতির সহিত আমরা মোটামুটি ভাবে পরিচিত আছি, কিন্তু চিকিৎসাক্ষেত্রে বর্ত্তমান শতাব্দীতে যাঁহাদের কৃতিত্ব একদা সমগ্র দেশবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কথাই আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল সমগ্র ভারতবর্ষে চিকিৎসাক্ষেত্রে যিনি ছিলেন নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত, সেই চিকিৎসকাগ্রগণ্য স্যার নীলরতন সরকারকে আমরা ভুলি নাই সত্য, কিন্তু দেশের কল্যাণকল্পে তাঁহার বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কোন খবর আমরা রাখি না। নীলরতনের আযৌবন অন্তরঙ্গ সুহৃদ, বাংলার অন্যতম মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ও মানব-কল্যাণব্রতে নিজের জীবনটিকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কাহিনীও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। নীলরতন ও প্রাণকৃষ্ণ ইঁহারা শুধু যে সমব্যবসায়ী ছিলেন তাহা নহে, ইঁহারা ছিলেন সমানধর্ম্মা এবং সারাজীবন পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। ইঁহাদের এক জনের কথা বলিতে গেলে অপরের কথা আসিয়া পড়ে অনিবার্য্য ভাবে। এই দুই জন শ্রেষ্ঠ কল্যাণকৃৎ মানুষের জীবনাদর্শ বর্ত্তমান যুগের বাঙালীকে মহত্তর জীবনগঠনে অনুপ্রাণিত করিবে।

চিকিৎসক হিসাবে প্রাণকৃষ্ণের খ্যাতি সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি চিকিৎসক হিসাবে যত বড় ছিলেন, মানুষ হিসাবে ছিলেন তাহার চেয়ে অনেক বড়। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি সততা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা মানুষের মত মানুষ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জ্ঞানী সাধুপুরুষের যেসকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি—সমস্তই তাঁহার ছিল।"

হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রে প্রাণকৃষ্ণের ছিল বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন। তাঁহার বাগ্মিতা এবং শাস্ত্র-ব্যাখ্যানকৌশলও ছিল অপূর্ব্ব।

নীলরতনের সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণের গভীর অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠে ছাত্রজীবনে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উভয়ের সেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য তিল পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দু'জনকেই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া জীবনে অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এই দুই বন্ধুর প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট। উভয়েই ছিলেন বহুমুখী কর্ম্মপ্রতিভা এবং অতুলনীয় ধীশক্তির অধিকারী, অধ্যয়নপ্রিয়, স্বাবলম্বী, দেশপ্রেমিক, পরমাত্মার প্রতি নির্ভরপরায়ণ। লোকহিতৈষণাই ছিল দু'জনের জীবনের মূলমন্ত্র—পীড়িত মানুষের সেবাকে ইঁহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন—চিকিৎসাবৃত্তি ইঁহাদের নিকট পেশামাত্র ছিল না।

২

১৮৬১ সনে, ২৫শে আগষ্ট পাবনায় এক অতি দরিদ্র পরিবারে প্রাণকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ আচার্য্য, মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী। বিন্দুবাসিনীর বয়স যখন কুড়ি বৎসর মাত্র তখন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সে বিধবা হইয়া বিন্দুবাসিনী দুইটি শিশুসন্তান সহ যেন অকূল পাথারে পড়িলেন। কখনো অর্দ্ধাশনে, কখনো বা অনশনে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা দয়াপরবশ হইয়া কিছু কিছু অর্থসাহায্য না করিলে তাঁহাদের আর বাঁচোয়া ছিল না। আট-নয় বৎসর বয়সের সময় প্রাণকৃষ্ণ প্রথমে এক বাংলা অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি চার টাকা বৃত্তি পান।

প্রাণকৃষ্ণের পক্ষে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছিল মুখ্যতঃ তাঁহার মায়ের যত্ন ও চেষ্টায়। শিশু-পুত্রদিগকে লইয়া বিধবা বিন্দুবাসিনীকে যে ভাবে প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহা উপন্যাসের কাহিনীর মতই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রাণকৃষ্ণের পিতা সম্পত্তির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন একটি ভগ্ন জীর্ণ কুঁড়েঘর—চেরা বাঁশের তৈরি তার বেড়াগুলি এরূপ নড়বড়ে ছিল যে একটু জোরে ধাক্কা লাগিলেই ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইত। কালের হস্তাবলেপে বেড়ার মধ্যে বড় বড় ফুটার সৃষ্টি হইয়াছিল। কখনও কখনও রাত্রে কুটীরের নিকট বাঘ আসিত। বিন্দুবাসিনী এই বিপদে অবিচলিত থাকিতেন এবং ইহাতে ভয় পাইবার যে কিছু নাই সেকথা বলিয়া ছোট শিশুদুটিকে আশ্বাস দিতেন।

একজন প্রতিবেশী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করায় বিন্দুবাসিনীর পক্ষে পুত্রকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানো সম্ভবপর হইল। অর্থাভাবে প্রাণকৃষ্ণের পক্ষে পুস্তক ক্রয় করা সম্ভবপর হইত না, সমপাঠীদের নিকট হইতে পুস্তক ধার করিয়া তাঁহাকে পড়া করিতে হইত। হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে গণিতশাস্ত্রে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করা সত্ত্বেও অপূর্ব্ব মেধা এবং ধীশক্তির কল্যাণে তিনি অষ্টম শ্রেণী হইতে প্রত্যেক বৎসর ডবল প্রমোশন পাইতে লাগিলেন এবং মাত্র চার বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। এণ্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি এফ-এ পড়িবার জন্ত কলিকাতায় আসেন। পাবনার ছাত্রেরা তাঁহাকে মেসের একতলায় একটি অন্ধকার ঘরে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দিলেন। দিনের বেলায়ও নাকি সেই ঘরে আলো জ্বালিয়া পড়িতে হইত।

এফ-এ পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া প্রাণকৃষ্ণ ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। থার্ড ইয়ারে পড়িবার সময় বিলাতযাত্রার সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগে এবং তিনি গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দেন। তাঁহার বিলাতযাত্রার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চরিতার্থ হয় নাই।

বি-এ পাস করিবার পর প্রাণকৃষ্ণ এম-এ পড়াই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার জীবনের স্রোত ভিন্নমুখী হইল। চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নার্থে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। মেডিক্যাল কলেজে প্রতি বৎসর প্রথম হইয়া তিনি বৃত্তি ও পদক ইত্যাদি লাভ করিতে লাগিলেন। শেষ বৎসরে গুডিভ বৃত্তি পাইয়া তিনি ইডেন হাসপাতালের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন।

নীলরতনের সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় কখন কি উপলক্ষে হয় তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ইঁহাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ জয়কালী দত্ত মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়।*

জয়কালী লিখিতেছেন—"১৮৮৩-৮৪ সন হইতে আমি কলিকাতায় ভাই নীলরতনদের (স্যার নীলরতন সরকার) সঙ্গে থেকে পড়াশুনা করিতাম। ১৮৮৭† সনে যখন আমরা সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে ২৭ নং বাড়ীতে থাকিতাম, তখন 'বক্সী' (ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য) এসে আমাদের সঙ্গে জুটিলেন। কেমন করে তিনি এসে জুটিলেন কিছু মনে নাই। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের বেশ ভাব হয়ে গেল। আমরা তিন জন "বক্সী", "নীলমণি" (নীলরতন) ও আমি প্রায় সমবয়সী। যখন আমরা মিলিত হই তখন আমাদের বয়স ২৫।২৬ বৎসর। তখনও আমাদের পরীক্ষার পালা শেষ হয় নাই।"

মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে প্রাণকৃষ্ণ প্রাণীতত্ত্ববিদ্যায় এম-এ পাস করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশ। কলেজ-জীবনে প্রাণকৃষ্ণ যে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। প্রাণকৃষ্ণ ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের কন্যা সুবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

প্রাণকৃষ্ণ, জয়কালী এবং নীলরতন এই তিন বন্ধুর মধ্যে তখন একমাত্র নীলরতনই ছিলেন উপার্জ্জনশীল। তিনি যাহা রোজগার করিতেন, প্রধানতঃ তাহার উপরেই তিন বন্ধুকে নির্ভর করিতে করিতে হইত। নীলরতনের উপার্জ্জনের পরিমাণও তখন খুব বেশী ছিল না। সেইজন্য সময় সময় সকলের উপবাস থাকিবার উপক্রম হইত। এ সম্বন্ধে প্রাণকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণীর নিকট নিম্নোক্ত কাহিনীটি শুনিয়াছি:

একদিন প্রাণকৃষ্ণ স্নানান্তে আহারের জন্য রান্নাঘরে আসিয়াছেন। রন্ধন এবং পরিবেশনাদি নীলরতনের ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী করিতেন। প্রাণকৃষ্ণ আসনগ্রহণের উপক্রম করিবামাত্র ক্ষীরোদবাসিনী হাসিতে লাগিলেন। প্রাণকৃষ্ণ ত অবাক, বলিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি। এদিকে আমার কলেজের তাড়া, কিন্তু তুমি ত দিব্যি হাত গুটিয়ে বসে রয়েছ, ভাত-টাত বেড়ে দেবার কোন লক্ষণই নেই, তার উপর আবার হাসতে সুরু করে দিয়েছ।" ক্ষীরোদবাসিনী তখন বলিলেন, "খাবেন কি, আজকে যে উনুনই জ্বলে নি। মেজদা (নীলরতন) কিছু ভিজানো ছোলা খেয়েই বেরিয়ে গেলেন।"

শুনিয়া প্রাণকৃষ্ণ তখনই টাকা ধার করিবার জন্য বাহির হইলেন এবং বহু আয়াসে চার টাকা যোগাড় করিয়া আনিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর হাতে দিলেন। তখন সেদিনকার মত উনুনে হাঁড়ি চড়াইবার ব্যবস্থা হইল।

চিকিৎসাবিদ্যার কোর্স শেষ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার কয়েক বৎসরের

---

* প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, জয়কালী দত্ত আর নীলরতন সরকার এই তিন জন ছিলেন অভিন্নাত্মা। ইঁহারা একসঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। নীলরতন যাহা রোজগার করিতেন, তাহা দ্বারা এই ত্রয়ীর যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। নিতাড়ার নিকটবর্ত্তী উক্তী জয়কালী দত্তের জন্মপল্লী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই বৎসরে তিনি গণিতশাস্ত্রে এম-এ দেন। তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়াছিল রাঁচিতে। ১৩৪৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লোকান্তরগমনের পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসী'তে লেখেন—"বিগত ১৮ই অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মী ও সেবক জয়কালী দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। কলেজে পাঠকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সমাজের সেবা করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি রাঁচির ব্রাহ্মমন্দিরের দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। রাঁচির বালিকা-বিদ্যালয়টিকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি বড় স্কুলে পরিণত করেন—বর্ত্তমানে সেটি হাই স্কুল হইয়াছে।"

† ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন এম-বি পরীক্ষা দেন। সুতরাং এই সময় তিনি ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। প্রাণকৃষ্ণ তাঁহা অপেক্ষা মাস কয়েকের বড় হইলেও তাঁহার নীচে পড়িতেন।

মধ্যে কলিকাতায় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে প্রাণকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। নিজে ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া দরিদ্র ছাত্রদের দুঃখ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক জন দরিদ্র ছাত্রকে তিনি নিজ গৃহে আশ্রয়দান করিলেন। তাহাদের ভরণপোষণ, পড়াশুনা ইত্যাদির যাবতীয় ব্যয় তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন। ব্যবসায়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আশ্রিত ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। প্রসিদ্ধ স্থাপত্যশাস্ত্রবিদ্ প্রসন্নকুমার আচার্য্য এম্‌-এ, পিএইচ. ডি, ডি-লিট তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া কিছুকাল সিটি কলেজে পড়িয়াছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ গোপনে দান করিতেন বলিয়া কয়শত ছাত্রকে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, কত ছাত্র তাঁহার সংপরামর্শে উপকৃত হইয়াছিল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কত জনকে তিনি পড়াইতেন সেকথা লোকে জানে না। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহে তাঁহাদের দানের পরিমাণ বড় কম ছিল না। একমাত্র গরীব ছাত্রদিগকেই তিনি দান করিয়াছিলেন সবসুদ্ধ এক লক্ষ টাকা।

যেমন গরীব ছাত্রদের প্রতি তেমনি দরিদ্র রোগীদের প্রতিও প্রাণকৃষ্ণের অপরিসীম দরদ ছিল। এ বিষয়ে প্রাণকৃষ্ণ এবং নীলরতন একই ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন। সংক্রামক রোগীকে নিরাময় করিতে গিয়া এই দুই বন্ধু সময় সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। নিম্নোক্ত ঘটনাটি হইতে যেমন আর্ত্তের প্রতি প্রাণকৃষ্ণের সহৃদয়তার, তেমনি নীলরতনের বন্ধু-প্রীতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার প্রাণকৃষ্ণের একটি কর্ম্মচারীর প্লেগ হয়। কর্ম্মচারীটি আশ্রিত হিসাবে প্রাণকৃষ্ণের বাড়ীতেই থাকিতেন। সকলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সেখানে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের অভাবে রোগীটি যে নিজেকে কিরূপ অসহায় মনে করিবে তাহা ভাবিয়া এই উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন না। পরিবারস্থ সকলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র পত্নীসহ কলিকাতার বাটীতে থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা এবং শুশ্রূষাদি করিতে লাগিলেন। রোগসংক্রমণের ভয়ে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার সংস্রব পরিহার করিলেন। কিন্তু এই সঙ্কট-সময়ে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার সর্ব্বোত্তম সুহৃদ নীলরতন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহার প্রাত্যহিক উপস্থিতি প্রাণকৃষ্ণের অন্তরে প্রেরণা-সঞ্চার করিত, তাঁহাকে সাহস ও বল দিত। প্লেগরোগীর সংস্পর্শে থাকা বিপজ্জনক বলিয়া সুবালা দেবীকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য নীলরতন খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীকে একলা রোগীর নিকটে রাখিয়া অন্যত্র যাইতে সুবালা দেবী রাজী হইলেন না। দিনকতক পরে সুবালা দেবী হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা প্লেগে পরিণত হইতে পারে ভাবিয়া নীলরতন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি আর কোন ওজর-আপত্তি শুনিলেন না। বন্ধুপত্নীকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিলেন। এ-দিকে নীলরতনের বাড়ীটি ছেলেপুলেতে ভরতি। এমন অবস্থায় প্লেগের সময় জ্বরাক্রান্ত বন্ধুপত্নীকে নিজ ভবনে স্থান দিতে নীলরতন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ পরস্পরের বিপদে-আপদে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া ইঁহারা যেভাবে বন্ধুকৃত্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতেন তাহার তুলনা বিরল।

আর একবার উমেশচন্দ্র দত্তের বাটীতে এক ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মারা যান। ব্যাধিসংক্রমণের ভয়ে বাটীর প্রায় সকলেই পলাইয়া গিয়াছিল। লোকাভাবে মৃতদেহ কিরূপে শ্মশানে লইয়া যাওয়া যায় তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। খবর পাইয়া প্রাণকৃষ্ণ বাড়ীতে কিছু না বলিয়া দত্ত মহাশয়ের ভবনে গিয়া হাজির হইলেন এবং স্বয়ং শবদেহ বহনে অগ্রণী হইলেন। তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও কয়েকজন আগাইয়া আসিলেন—এবং প্রাণকৃষ্ণ অন্যান্য শববাহকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়া মৃতদেহ বহন করিয়া সংকারভূমিতে লইয়া গেলেন।

এই সহজাত পরোপকারপ্রবৃত্তি সমগ্র জীবন প্রাণকৃষ্ণকে বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রণোদিত করিয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর-গমনের পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন,"দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করা জীবনের শেষ সজ্ঞান দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার একটি নিয়মিত কর্ম্ম ছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও সিটি কলেজে বোলটি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার সাহায্যের বিষয়ে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়া পুত্রদ্বয়কে তদনুযায়ী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। 'দাসাশ্রম' নামে গত উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতায় অসহায় নিরাশ্রয় আতুরদের বাস গ্রাসাচ্ছদন ও চিকিৎসাদির যে প্রতিষ্ঠান ছিল, আচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল তাহার স্বেচ্ছাবৃত চিকিৎসক ছিলেন। বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের অট্টালিকা নির্ম্মাণ প্রধানতঃ তাঁহার ব্যয়েই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।"

"যে মহৎ ও বৃহৎ কাজটিতে তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি অনেক সময় দিতেন, তাহা আসাম ও বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণী-সমূহের উন্নতি বিধায়িনী সমিতি। তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র শ্রমিক লোকদের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাদান ইহার প্রধান কাজ। ইহার তত্ত্বাবধানে নানা জেলায় প্রায় চারি শত বিদ্যালয় আছে। শ্রমিক লোকদিগকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনার্থ তিনি পদব্রজে, পা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, বহুবার বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

দুর্গত মানুষের দুঃখমোচনই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসক-জীবনে কদাপি তিনি এই ব্রত হইতে বিচ্যুত হন নাই—কলিকাতা এবং মফস্বলের বহু গরীব রোগীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন। শত কাজে তাঁহাকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যাইতে হইত, কিন্তু যে উপলক্ষে যেখানেই

যান না রোগীকে নিরাময় করা যে তাঁর বিধাতৃনির্দিষ্ট কর্তব্য তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতেন না, এবং সেই জন্যই কি শহরে, কি মফস্বলে কোথাও দরিদ্র রোগী চিকিৎসার আশায় তাঁহার নিকট আসিয়া কখনও বিমুখ হয় নাই। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি বিনা পারিশ্রমিকে সকল রোগীর চিকিৎসা করিতেন—এমনি ভাবে অর্থের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া আর্ত পীড়িতের কল্যাণব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি দেশবাসীর সমক্ষে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের মণিকোঠায় এক অমূল্য রিক্থরূপে চিরকাল সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।

প্রাণকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার সুগভীর দেশপ্রেম। বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হইবার পর, স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত যখন উদ্বেল হইয়া উঠিল, তখন তাহাতে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন ইহার অন্যতম নেতা। তাঁহার বাগ্মিতা তখন বহু লোককে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য তিনি আন্তরিক ভাবে সকলকে উৎসাহিত করিতেন।

যৌবনে প্রাণকৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির পদলাভ করিতে সমর্থ হন, শেষে আচার্য্যের পদে বৃত হইয়াছিলেন। বহু শাস্ত্রবচন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, উপাসনার সময় ভাবগম্ভীর স্বরে সেগুলি তিনি অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। তৎপ্রদত্ত বহু জ্ঞানগর্ভ সরস ভাষণ তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সেগুলি একত্রে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বাংলা মনন ও অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি করিবে।

আদর্শবাদী প্রাণকৃষ্ণ প্রখর ব্যবসাবুদ্ধিরও অধিকারী ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবিতকালের কয়েকটি বৎসর তিনি নানা কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টার্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। এতৎসংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জীবনে নানা ব্যক্তি দ্বারা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নাই, এমনকি দুই বন্ধুর দরুন যখন তাঁহার ১,১৭,০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইল, তখনও তিনি নীরবে এবং শান্ত ভাবেই তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। বারংবার নানা ভাবে প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মানুষের কল্যাণসাধনে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। এই লোক-হিতৈষণার প্রবৃত্তি আমৃত্যু সমভাবে তাঁহার মনে জাগরূক ছিল।

নিজের অন্তিম সময় যে ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা প্রাণকৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর সপ্তাহদুই পূর্ব্বে তিনি নাকি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর মাত্র চৌদ্দ-পনর দিন বাঁচিবেন।

নীলরতন এবং প্রাণকৃষ্ণ যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, প্রাণকৃষ্ণের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা ছিন্ন হয় নাই। নিজের অসুস্থ শরীর লইয়াও নীলরতন প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে তাঁহার শেষ রোগ-শয্যাপার্শ্বে গিয়া হাজির হইতেন। প্রিয়তম বন্ধুর সেই প্রীতিপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিবামাত্রই প্রাণকৃষ্ণের ব্যাধিযন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, মনে হইত যেন যাদুমন্ত্রবলে তাঁহার রোগযন্ত্রণার উপশম হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা তাঁহার ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল, রক্তের চাপ বাড়িতে বাড়িতে আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ১৩৪৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ৭৬ বৎসর বয়সে প্রাণকৃষ্ণ সন্ন্যাসরোগে পরলোকগমন করিলেন।

প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি হইতে চলিল, একই বৎসরে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের দুইটি অখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বাংলার দুই জন শ্রেষ্ঠ সন্তান—প্রাণকৃষ্ণ আর নীলরতন। তাঁহাদের আবির্ভাবে কুল পবিত্র হইয়াছিল এবং জননী কৃতার্থা হইয়াছিলেন। বিধাতা ইঁহাদের জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন—ইঁহাদের হৃদয় ছিল এক, ব্রত ছিল এক এবং আকৃতিও ছিল সমান। নীলরতনের ন্যায় প্রাণকৃষ্ণের খ্যাতি তত সুদূরপ্রসারী হয় নাই সত্য, কিন্তু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রের পবিত্রতা, অফুরন্ত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি স্বাবলম্বন এই কয়টি গুণের সমন্বয়ে মানুষ যে কি অসাধ্যসাধন করিতে পারে প্রাণকৃষ্ণের জীবন ও কৃতিসমূহ তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।
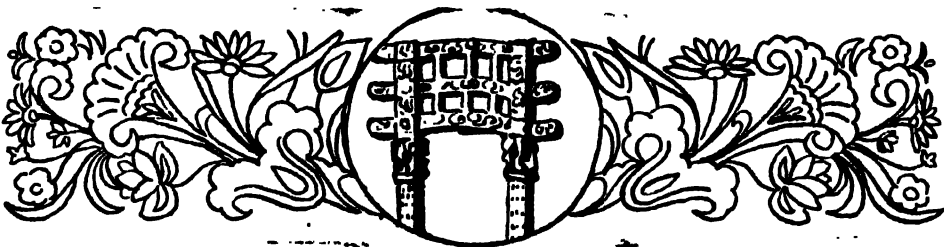
মিথিলায় তিন দিন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মিথিলা বলতে রামায়ণের কথাই মনে পড়ে। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর সাতকাণ্ড রামায়ণে এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যার তুলনা বিশ্বের কোন মহাকাব্যে নাই। যোগ এবং ভোগ একই সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করে সেই পুণ্যশ্লোক মানুষটি হয়েছেন রাজর্ষি। বিদেহরাজসভায় বিদগ্ধজনপরিবৃত হয়ে শাস্ত্রালোচনা করতে ভালবাসতেন তিনি—এবং সেই সময় থেকেই বিদগ্ধসমাজে মিথিলার খ্যাতি-প্রতিপত্তি। মহাকবি বাল্মিকী আর একটি মহৎ কর্ম করেছিলেন তাঁর মহাকাব্যে, সারা ভারতবর্ষের মেলবন্ধন। কোথায় অযোধ্যা—কোথায় মিথিলা—দণ্ডকারণ্য, দ্রাবিড়ভূমি আর সমুদ্র পারে সৌধকিরীটিণী লঙ্কা। ভিন্ন রাজ্যের অধিকারীরা সংস্কার-সংস্কৃতি, ভাষা ও চরিত্রে বহু প্রভেদ নিয়েও কাহিনীর মৈত্রীবন্ধনে সারা ভারতবর্ষে এক হয়ে গেছে। আধুনিক যুগেও এর কল্যাণ-স্পর্শ আমাদের অভিভূত করে।

যেমন ভারতবর্ষের সঙ্গে মিথিলার—তেমনি মিথিলার সঙ্গে বাংলার যোগাযোগও অটুট ছিল। জনকসভার পাণ্ডিত্যের যশো-ভাতি হাজার হাজার বৎসর পরে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে এসেও অম্লান ছিল—এই সত্য নব্যন্যায়ের উপাধি আহরণ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নব্যন্যায়ে পক্ষধর মিশ্র আর কাব্যে বিদ্যাপতি—বাংলার হৃদয় জয় করেছিলেন। তার প্রমাণ রঘুনন্দনকৃত ন্যায়বিধি—যার প্রভাব বাঙালীসমাজে আজও অনুভূত। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ত বিদ্যাপতির পদাবলী আবৃত্তি করতে করতে ভাবসমাধি লাভ করতেন। যদিও ন্যায়ের বিধি বিধান ও কাব্যের রসাস্বাদন—দুই দেশের মানুষকে অন্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে এনে ফেলেছে, তবু অনেকের কাছে দুই দেশের দূরত্বও ত কম নয়। পণ্ডিতজনেরা ও কাব্য-রসিকরা এ কথার প্রতিবাদ করবেন, মাইলের মাপেও এটি অস্বীকৃত হবে। কিন্তু মোকামা বা সেমারিয়ার গঙ্গাতীরে পৌঁছে কোন মিথিলাগামী বাঙালী অথবা বঙ্গঅভিমুখী মৈথিলী এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। তাঁদের মানতেই হবে দিল্লীর চেয়েও মিথিলার দূরত্ব অনেক—অনেক বেশী। কেমন করে? স্ব-অভিজ্ঞতার কথাই বলা যাক।

সবাই জানেন হাওড়ার ট্রেনে চেপে মোকামা ঘাট পার হয়ে মিথিলায় পৌঁছতে হয়। এই পথের দূরত্ব বড়জোর সাড়ে তিন শ মাইল। আকাশযানের যুগে এই দূরত্ব পলকপাতের ব্যাপার, বাষ্পযানেও এমন কিছু দীর্ঘ ও দুস্তর পথ অতিক্রমের ভীতি জাগায় না, কিন্তু গঙ্গা? একা নদী দু'শো ক্রোশেরও বেশী। নামেই মোকামা ঘাট—আসলে শীতকালে এ ঘাট সরে যায় হাতীদায়। হাতীদা—যেখানে গঙ্গাকে সেতুবন্ধনে সায়েস্তা করে দু'টি বিহারের যোগসূত্রকে নিবিড় ও যাত্রাপথকে সংক্ষিপ্ত ও সহনীয় করার ব্যবস্থা হচ্ছে। রেলপথে মোকামা জংশন থেকে হাতীদার দূরত্ব ছ'সাত মাইল—বাঁধা সড়ক দিয়ে ঘুরে যেতে হলে আরও দু' এক মাইল 'কাউ' নিতে হয়। এমনই সুব্যবস্থা—সারাদিন রাত্রিতে একখানি মাত্র ট্রেন ষ্টীমার ঘাটে যায়, ষ্টীমারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ষ্টীমার কিন্তু একাধিক বার গঙ্গা পারাপার করে। জাতীয় সরকারের রেল বিভাগ—নিরুপায় যাত্রীদের মোকামায় পৌঁছে দিয়ে টম টম একা সাইকেল-রিক্সাওয়ালাদের করকবলিত করে দেন। এরা যাত্রী-দোহন কার্যে কেমন পটু সে পরিচয় সেই দিন প্রত্যক্ষ করেছি।

রাত একটা। বেনারস এক্সপ্রেস থেকে উত্তর বিহারগামী বহু যাত্রীর সঙ্গে আমরা মোকামা জংশনে নামলাম। শোনা গেল—ষ্টীমার ছাড়বে দুটো কুড়ি মিনিটে। ট্রেন-যাত্রীদের ষ্টীমার ধরার কি ব্যবস্থা আছে? কিছুমাত্র নয়। সকালের যে ট্রেনখানি ঘাটে যায়—রাত্রিতে সেইখানিই ফিরে আসে—মাঝখানের ব্যবস্থা যাত্রীদেরই করে নিতে হয়। অথচ ষ্টীমার সমস্ত থ্রু টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে! এ যেন কড়ি ফেলেও তেল মাখার অধিকার না দেওয়া।

অতএব ভরসা ওই টমটম, একা, সাইকেল-রিক্সা। ওদের বেকারত্ব ঘুচাবার জন্যই এমন অপূর্ব্ব পরিকল্পনা! রাত গভীর—পথ দুস্তর—যাত্রী পীড়নে ওরাও পরাঙ্মুখ নয়। শহরের এলাকায় বিজলী আলোর ঝলমলানি, কিন্তু মাঝখানের বেশীর ভাগ পথই অন্ধকার। নিশানাস্বরূপ দূর-দূরান্তে আলো থাকলেও—একটা পোষ্ট থেকে আর একটা পোষ্টের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। মাথার উপর তারায় ঝকঝকে আকাশ যত ঐশ্বর্য বিস্তারই করুক, মনকে আশ্বস্ত করতে পারে না। তা ছাড়া শীতের রাতে খোলা টমটমে বসে উত্তরবায়ু সেবন করতে করতে যাওয়া যে কি আরামের!

টমটমচালক অবশ্য অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই বাবু—আমি বেইমান নই, ঠিক পৌঁছে দেব।

ওর অভয়বাক্যে ভয়টাই বেড়ে গেল। তা হলে বেইমানও আছে, পথ আপদশূন্য নয়! ট্রেনে একজন টিকেট চেকারও বলে দিয়েছিলেন, খবরদার, একলা যাবেন না। যদি আরও সঙ্গী পান একা টমটমে উঠবেন।

সঙ্গী ত অনেকই ছিল, ভরসাও জেগেছিল তাঁদের দেখে। কিন্তু আমাদের টমটমখানা আর সমস্ত যাত্রীকে ফেলে যখন অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ছুটতে লাগল—তখন দু'পাশের নিঝুম

প্রান্তর, উপরের তারাভরা নিঃশব্দ আকাশ, দূরে নিশাচর পাখীর কর্কশ ডাক আর গ্রামপ্রান্তে সারমেয়ের আর্তনাদ একটা অশুভ ইঙ্গিতই যেন বয়ে আনল।

মোকামা ঘাটের কাছে এসে চালক একবার তার সাধুত্বের প্রমাণ দিলে। বলল, দেখুন বাবু, বেইমান লোকদের কাণ্ড! মোকামা ঘাট পর্যন্ত এসে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে পথে। বেশী ভাড়া না দিলে ষ্টীমার ঘাট পর্যন্ত যাবে না বলে জুলুম করছে। যাত্রীরা ত জানে না আসল ঘাট দু'মাইল দূরে হাতীদায়।

দেখলাম—প্রায় দশ-বারোখানা সাইকেল-রিক্সা দাঁড়িয়ে। চালকদের সঙ্গে যাত্রীদের বচসা তুমুল হয়ে উঠেছে। গভীর রাত্রিতে ঘাট থেকে দু'মাইল দূরে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিরুপায় যাত্রীর অবস্থা কল্পনা করতে পারেন কেউ?

যাহোক, হাতীদায় পৌঁছলাম যথাসময়ে। এখানে দেখলাম অনেক মজুর দাঁড়িয়ে। এরাও মোটা রকম দাঁও মারবার প্রতীক্ষা করছে। রাত দুপুরে ন্যায্য পারিশ্রমিক নিয়ে যাত্রীকে সাহায্য করবে এমন সংবৃত্তিপরায়ণ মানুষ বিরল। মোকামা জংশনে ট্রেন বদল করে মজুরের কবলে প্রথম দফা, টমটমওয়ালার খপ্পরে দ্বিতীয় দফা এবং হাতীদার ঘাটে তৃতীয় দফা—দফায় দফায় যাত্রীদের দফা নিকাশ হওয়ার দাখিল। এর পরেও একটা দফা আছে—সেমারিয়া ঘাটে ষ্টীমার থেকে মাল নামিয়ে ট্রেনজাত করা। যাঁর মাল যত বেশী—মজুরদের কাছে তিনিই তত লোভনীয়।

ষ্টীমারে বসে দেখা গেল গঙ্গার বুকে কয়েকটি আলো-ঝলমলে স্তম্ভ। হাতীদায় সেতুবন্ধন আরম্ভ হয়েছে—তারই কয়েকটি পদক্ষেপ গঙ্গার বুকে। এগারোটি স্তম্ভ তৈরি হয়েছে—অল্প কয়েকটি বাকী। বছর তিনেকের মধ্যেই ট্রেন চালু হলে এই দুঃস্বপ্নের অবসান হবে।

সেমারিয়া ঘাটের ব্যবস্থাও চমৎকার। মাঠ ভর্তি বালি—তার মাঝে লাইন পাতা। একটুখানি আচ্ছাদন কোথাও নাই। শীত-গ্রীষ্মের প্রতাপ না হয় র‍্যাগ-আলোয়ান জড়িয়ে আতপত্র মাথায় দিয়ে কোনরকমে ঠেকান গেল—বর্ষার বিক্রম কল্পনা করা যায় না। আর কল্পনা করা যায় না চৈত্র-বৈশাখের ঝড়ের দাপট। এর উপর ট্রেনের মেজাজ! সময় নিয়ে তার মাথাব্যথা নাই, আপন খেয়াল খুসিমত সে চলে। সকালের ট্রেন সন্ধ্যায় পৌঁছলেও যাত্রীরা নিজেদের ধন্যজ্ঞান করে—তবু ত ঠিকানায় পৌঁছানো গেল।

মিথিলায় পৌঁছে কিন্তু এত সব বিপত্তির কথা মনেই থাকে না। যাঁরা দেশের মানুষ তাঁরা ত ঘরে পৌঁছেই সব রকম দুঃখ-স্মৃতি ভুলে যান, যাঁরা নবাগত তাঁরাও নূতন একটি দেশের নূতন পরিবেশে অচিরাৎ মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বারুণি জংশন পর্যন্ত বা একটু রুক্ষ ভূমি, শ্রীহীন গৃহ বা গৃহাঙ্গণ, কিন্তু মিথিলার পুরদ্বারে প্রকৃতি শ্রীময়ী। সমস্তিপুর থেকেই মাটির রূপ বদল সুরু হয়। আকাশ ঘন নীল হয়ে ওঠে—বুড়িগণ্ডকের পোল পেরিয়ে আদি-অন্তহীন শস্যশ্যামল মাঠ দৃষ্টিতে মোহ-অঞ্জন মাখিয়ে দেয়। স্বচ্ছ-সলিল খাল-বিল, শস্যভূষণা মাটি, বাঁশের ঝাড়, লতাগুল্মের ঝোপ, শিশু-শিমুল-মেহগ্নি-আম-অশ্বত্থের বনরচনা—সবুজ আর নীলের অন্তহীন সমারোহ—এ যে বাংলা নয় কেমন করে বিশ্বাস করা যায়! পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়া আর জেগে ওঠার সুযোগ না থাক (ট্রেন-কামরায়, এঞ্জিন আর বাঁশীর মিশ্র শব্দটাই অদ্বিতীয়।) পাখী যে সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে কম নয় তার প্রমাণ ট্রেনে বসেও পাওয়া যায়। মাঠে গরু চরে, রাখাল ছেলে গরু-মহিষের পিঠে চেপে নাচন-বাড়িতে তান দিয়ে গান গায়—এ দৃশ্যের অভাবও ত নাই। দ্বারভাঙ্গা বাংলা দেশেরই দ্বার এবং মিথিলার মধ্যমণি এ কথা ভোলবার জো কি!

কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে,—আমাদের দেশান্তর যাত্রাও সেই গোত্রের। বাংলা সাহিত্যের একজন দীন-সেবক বলে দ্বারভাঙ্গায় সন্ধ্যা-মজলিশের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি। এটি অবশ্য সংস্কৃতি সম্মেলন। দ্বারভাঙ্গার মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক মিলে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁরা যে শুধু দুরূহ শারীরবিদ্যার অনুশীলনে দিনযাপন করেছেন তা নয়—অবসর কালে নিষ্ঠাভরে দেবী ভারতীর আরাধনাও করে থাকেন। এরা সঙ্গীত, কলা, কাব্য ও কথাসাহিত্যের কুসুম চয়ন করে যে মালা রচনা করেন সারা বছর ধরে—তারই পরিচয় এমনই একটি মনোজ্ঞ বার্ষিক সারস্বত সভার মাধ্যমে নিবেদন করেন, অতিথিদের কাছ থেকে শোনেন সাহিত্য-সেবার ইতিহাস। শুধু বঙ্গ-ভাষাভাষী সাহিত্যানুরাগীজন নয়—বঙ্গভাষা-অনভিজ্ঞ সুধী-সজ্জনরাও উপস্থিত থেকে এই সারস্বত অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলেন।

এই মজলিশের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন—দ্বারভাঙ্গা নিবাসী বিখ্যাত কথাকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। শুধু এই মজলিশ নয়—দ্বারভাঙ্গার বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইনি প্রাণস্বরূপ। বাংলার মানুষ যেমন বিদ্যাপতিকে আপনজন মনে করে—মিথিলার মানুষও তেমনি বাংলাকে ভালবাসে। বেশবাসে, আচার-আচরণে, এমনকি কথাবার্তায় দুই প্রদেশের প্রভেদ যৎসামান্য। মিথিলায় যেমন ব্যাপকভাবে দেবী বীণাপাণির প্রতিমা পূজা হয়—তেমনটি বাংলা ছাড়া আর কোথাও ত দেখি নি। এই অর্চনা শুধুমাত্র বহিরঙ্গ উৎসব-কৌতুক নিয়ে তৃপ্ত নয়—আন্তরনিষ্ঠার প্রকাশটাই বেশী করে চোখে পড়ে। মিথিলার স্কুল-কলেজে, পাঠাগারে, সমিতিগৃহে, গৃহস্থ বাড়ীতে কোথায় না জ্ঞানদায়িনীর অর্চনা হয়? ছেলেমেয়েরা স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে, দেবীপূজার আয়োজন করে, দেবী চরণে অঞ্জলি দেয়, সাংস্কৃতিক সভা বসায়, শিক্ষাব্রতীর কাছ থেকে শোনে দেবী সাধনার কথা। বিকটধ্বনিময় মাইক বসিয়ে মণ্ডপ ও দেবীর সাজসজ্জার প্রতিযোগিতায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, হৈ-হুল্লোড় ও আমোদে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে এবং প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে অসংস্কৃত মনের পরিচয় দিয়ে মত্ততা প্রকাশ করে না। এমনি মনোজ্ঞ

একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, সে কথা পরে বলছি।

সন্ধ্যা মজলিশের বয়স বেশী নয়—১৩৫৩ সালে এর জন্ম। চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করতে যে সব ছাত্র এখানে সমবেত হন—উপাধি অর্জ্জন করে তাঁরা চলে যান দেশ-দেশান্তরে—পরবর্ত্তীদের হাতে আসে মজলিশ পরিচালনার ভার। এঁরা যে দেবীপূজার যোগ্য অধিকারী তার প্রমাণ প্রতি বৎসরের অনুষ্ঠান-লিপিতে মিলবে। এবারকার সম্পাদক ছিলেন অমৃত আচারি, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধ যাঁরা পাঠ করলেন, তাঁরাও প্রথম থেকে পঞ্চম বার্ষিকের ছাত্র-ছাত্রী। সবগুলি লেখাই সাহিত্য গুণান্বিত। পাঠের ধরণটিও ভাল। রবীন্দ্রনাথের সাজাহান কবিতাটি আবৃত্তি করলেন একটি ছাত্র। সুদীর্ঘ কবিতা—আবৃত্তির গুণে একটুও একঘেয়ে লাগল না! প্রসঙ্গত মনে পড়ল, বাংলায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে যে সমস্ত কবিতা আবৃত্তি হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—কবিতাটি ভাল করে মুখস্থ না করেই আবৃত্তিকার বইয়ের পাতা খুলে সভামঞ্চে এগিয়ে আসেন। পাঠ আরম্ভ হলে বোঝা যায় কবিতাটি হয় এই প্রথম পড়ছেন, কিংবা পড়বার আগে অবহেলাভরে দুই-একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন। এদের ভাবটাই 'ঠেক্রে মেরে দেব' গোছের। কবিতার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার ধৈর্য্য বা শক্তি এদের থাকে না বলে শ্রোতার কানে কতকগুলি অর্থহীন শব্দঝংকার একটানা আঘাত করে চলে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর গানও বহুক্ষেত্রে এই গোত্রের। প্রবন্ধপাঠ বিশেষ কিছু হয় না—যা বলেন সভাপতি ও প্রধান অতিথিরা।

যাই হোক, এখানে যাঁরা গল্প-কবিতা ইত্যাদি পড়লেন, যাঁরা আবৃত্তি করলেন এবং সুধীর আসনে বসে রসগ্রহণ করলেন, যাঁরা সকলকার মধ্যেই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা লক্ষ্য করলাম।

অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের দেশে একজন ভাল ভাগবত কথক বৃন্দাবন-লীলা পাঠ করেছিলেন এক সপ্তাহ ধরে। অপূর্ব্ব তাঁর পাঠ, ব্যাখ্যা ও গল্প বলার ধরণ। মেয়েরা বাড়ীতে এসে শতমুখে প্রশংসা করতেন। তিনি সপ্তাহকাল পাঠ শুনিয়ে চলে গেলে আর একজন কথককে ভাগবৎ-আসরে বসিয়ে বৃন্দাবন-লীলার সবটা শোনার ব্যবস্থা হয়েছিল। মেয়েরা যথারীতি শুনতে যেতেন, কিন্তু বাড়ীতে এসে প্রশংসায় আর পঞ্চমুখ হতেন না।

লোক পরম্পরায় জানা গেল—পরবর্ত্তী কথক তেমন সুকণ্ঠ নন, সবক্তাও নন। পূর্ব্বেকার কথকের সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করতাম—মেয়েরা প্রতিবাদ করে বলতেন, তা হোক, ঠাকুরদেবতার কথা সবই ভাল। যেমন করেই বলা যাক না, ভালই লাগে। অসীম শ্রদ্ধা আর প্রীতি না থাকলে এমন কথা বলা যায় না।

সন্ধ্যা মজলিশের আসরে এমনই প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশ লক্ষ্য করলাম, আশ্চর্য্য এখানকার সাহিত্য-প্রীতি। তরুণ প্রবীণ পণ্ডিত ছাত্র সাহিত্য-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষ—সকলেই স্থির চিত্তে শেষ পর্য্যন্ত বসে রইলেন। এমন জমজমাট আসর কদাচিত দেখা যায়।

পাটনা থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক যতীন হালদার, ইনি রবীন্দ্র-কাব্যে মানবিকতা নিয়ে আলোচনা করলেন, আমরাও কিছু নিবেদন করলাম। তিন ঘণ্টা ধরে চলল সারস্বত অনুষ্ঠান।

সভাক্ষেত্রের তোরণদ্বার থেকে সভামণ্ডপ পর্য্যন্ত একটি রুচি-রম্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন ছাত্রদল। চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে ললিতকলা ও রস-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কিছু মাত্র অঘটন নয়—এটি ওঁরা প্রমাণ করে ছাড়লেন। জানি না, কতজন এঁরা চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে উত্তর-জীবনে দেবী বীণাপাণির চরণ-তলে অর্ঘ্য নিবেদন করার সুযোগ পাবেন—তবে সেবার সুযোগ এঁদের বৃত্তির মধ্যেই নিহিত। সাহিত্যের অঙ্গণে এসে মানুষের মনোবেদনার রূপটি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন—কর্ম্মক্ষেত্রে তেমনি দিব্যদৃষ্টি লাভ হলে আশার কথা। সেখানেও দেহ ও মনের বেদনা তো অল্প নয়। যেমন সাহিত্যে—তেমনি জীবিকার সঙ্গে জীবনের যোগসাধন না হলে জীবনযাত্রার স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায় না।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় একটি বিদ্যালয়ে এসে জমল ছাত্রেরা। তারা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু শুনতে চায়। সকালবেলায় একজন ছাত্র প্রশ্ন করেছিল, শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ? জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ধর্ম্ম বলতে কি বোঝ তুমি? ঈশ্বর ভজনা? কতকগুলি আচার নিয়ম পালন? ধর্ম্মের অর্থ তো এত সঙ্কীর্ণ নয়। ব্যাপক অর্থে তা দেহরক্ষা ও সংসার চালনার যতকিছু নিয়মকানুন পালন, মনোবিকাশের যা-কিছু সাধনা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা, ভালবাসা, তাকে আনন্দ দেওয়া—তার সঙ্গ পেয়ে আনন্দ লাভ করা, পুত্র-পরিজন প্রতিপালন, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, দেশপ্রীতি, নীতি, নিয়ম, অনুদ্বেগকর বাক্য, সংকাজ···কোন্‌টা নয়? জানি না—ছেলেটি কি বুঝেছিল, কোন উত্তর করে নি। সন্ধ্যাবেলায় সেই কথাটিই বললাম। সাহিত্য-সৃষ্টিও ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম—নিজেকে ব্যক্ত করার আনন্দ, নিজে সৃষ্টি করে আনন্দ, অপরকে আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার আনন্দ। সৃষ্ট সাহিত্য ধর্ম্ম-বোধান্বিত হলে সমাজকে দুর্ব্বল করবে না, মানুষকে নৈরাশ্যে ডোবাবে না, হিংসা-লোভ-দ্বন্দ্ব সংঘাতে জীবন ক্ষতবিক্ষত হবে না, দেহ-বিলাসের কামনায় উত্তেজনা ও অবসাদ আসবে না—রূপলোক আর রস-লোকের প্রবাহধারাটি নিত্যকালকে আশ্রয় করে সুস্থ ভালবাসায় মহিমা প্রকাশ করবে। অসুন্দর সাহিত্য অসুস্থ মনেরই রচনা। জীবজগতে সব বস্তু যদিও সুস্থ নয়, সুন্দর নয়, উদার নয়, বৃহৎ নয়, গ্লানিমুক্ত নয়; মনের চোরাগলিতে অনেক অন্ধকার, অবরুদ্ধ বাসনার নদীতে অনেক পাঁক, কামনার অদ্ভুত শাখায় রুগ্ন ফুলও প্রচুর ফোটে—এবং এই সকলকে অস্বীকার করে সুস্থ সুন্দর রূপটিকে প্রকাশ করতে গেলে ছবিটা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তবু সৎ অসৎ

মিলিয়ে যে একটি পরম প্রকাশ—একটি পরম বার্তা আছে—যা থেকে চরিত্রের বা জীবনের সত্য পরিচয়টি পাওয়া যায়—তাকেই কি অস্বীকার করা চলে? উপনিষদের ঋষি তাই বলেন—আনন্দের প্রকাশ থেকে হ'ল সৃষ্টি—আনন্দে তার স্থিতি—আর আনন্দের মধ্যেই তার লয়। মূলে যদি আনন্দই রইল, দুঃখ জীবন-দর্শন কেন থাকবে না? কেন বা সৃষ্টি হবে তার প্রধান উদ্দেশ্য হবে না আনন্দ দান? অতএব—

অতএব উপদেশ তত্ত্বকথা থাক, জীবনের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে যাও শুধু। তোমার জীবন, আমার জীবন, নানা মানুষের নানা জীবন—স্বাদে, গন্ধে, রূপে, রসে বিচিত্র জীবন—সবের মূলেই রয়েছে একটি সুর। বীণার তার ঠিকমত বাঁধা থাকলে সঙ্গীত যেমন অবলীলায় সুর সৃষ্টি করে, তেমনি জীবনের তারেও চলছে সুরকে ধরা আর সুরকে আশ্রয় দেওয়ার লীলা। চলিত কথা আছে—সব মহৎ চিন্তা একই ধারায় বয়ে যায়। সেটা আর কিছুই নয়, সহযোগিতার আকুতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রেম-পরিচয়ের ক্ষেত্রটিতে পৌঁছলে মন যে সুরে গান গেয়ে ওঠে—সেই সুরই সমস্ত মানুষকে আপন আত্মীয় বলে কাছে টানে; একটি মহৎ কল্যাণ-চিন্তার মাধ্যমে হয় হৃদয় বিনিময়, নানা জাতের মানুষ মিলে তৈরী করে এক জগৎ, উপাসক হয় এক জগদীশ্বরের।

আদি মানবরা গুহার গায়ে অপটু হাতে জীবজন্তুর ছবি এঁকে আনন্দকে প্রকাশ করতে চেয়েছে—সেই অপূর্ণাঙ্গ চিত্রই তো চিত্রজগতের শেষ কথা নয়। উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে মিথুনাসক্ত নরনারীর ছবি থাকলেও মন্দির মধ্যে রয়েছেন নিরঞ্জনরূপী দেবতা। উদ্দেশ্যটা, মনের অনিত্য কলুষ-কালিমা একটি গোলা আরশিতে প্রতিবিম্বিত করে কলুষমুক্ত মনকে নিত্য পথে বোধস্বরূপের শ্রীপাদ-পদ্মে পৌঁছে দেওয়া। পথের দু'পাশে ঝোপঝাড়, খানাখন্দ, কণ্টক, শ্বাপদ প্রভৃতি নানা বিঘ্ন থাকলেও অভীষ্ট একটি লক্ষ্যস্থানও তো রয়েছে। সাহিত্য বা শিক্ষা এই লক্ষ্যস্থানটিকেই চিনিয়ে দেয়।

দূরত্বের মাপকাঠিতে রাজ্য ও দেশাচার মানুষকে যে ভাবেই পৃথক করে মাপুক না কেন—মনোবীণার তারে সর্বব্যাপী চেতনার সুরটি এসে লাগলে ঘর-পর ভেদ মুছে যায়, তখন ভেদাভেদজ্ঞানহীন এক পরম ভূমিতে এসে দাঁড়াতেই হয় তাকে। মিথিলার সংস্কৃত-বিদ্যাপীঠ থেকে বাণী-বন্দনা উপলক্ষে একখানি আমন্ত্রণ লিপি পেয়ে এই সত্যটি আর একবার উপলব্ধি করলাম। বাংলার মত এখানেও বাণী-অর্চনার উৎসব হয়—প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে, প্রায় প্রতিটি ঘরে। সুদীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতির যোগাযোগে স্থানটি বাংলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত—তাতে আর সন্দেহ কি। কি গভীর নিষ্ঠা এঁদের বাণী-পূজায় সে কথা ইতিপূর্বে বলেছি, একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে তা উপলব্ধি করলাম। মহারাণী লক্ষ্মীশ্বরী পাঠা-গারের অভ্যন্তরে দেবীমূর্তি পূজিতা হয়েছেন—সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বসেছে সভা। বেলা তিনটা হলেও সভাক্ষেত্র সুধীজন পরিপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানে দু'টি বিষয় নিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেদের বিতর্ক আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হ'ল বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞান মানুষকে উন্নত করছে না ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে বিতর্ক। বলা বাহুল্য, পরমাণু শক্তি আবিষ্কার ও প্রয়োগ নিয়ে বিশ্ববাসীর মনে সম্প্রতিকালে যে শঙ্কা জেগেছে—এই বিতর্ক-সভা সেই প্রতিক্রিয়ার ফল। প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন আন্তঃকলেজের ছেলেরা। তিনটি বিভিন্ন ভাষায় (হিন্দী, মৈথিলি ও সংস্কৃত) এঁরা বিতর্ক করবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পুরস্কৃত হবেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল—শিক্ষায় ধর্মের স্থান। এই বিষয়টির প্রতিযোগীরা আরও নবীন—ইস্কুলের ছেলে। এদের বক্তব্য হিন্দী ও মৈথিলী ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। সভাপতি হয়েছেন পাটনা নিবাসী প্রবীণ লেখক ও বিধান সভার সদস্য শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয়। মিথিলা ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীবৈদ্য প্রমুখ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন। এই সভা-আয়োজনের পিছনে রয়েছেন পাঠাগারের সভাপতি কুমার কল্যাণলাল। মিথিলার প্রতিটি কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের পিছনে এঁর সহযোগিতা থাকেই। এর সম্পাদকও একজন অক্লান্তকর্মী সংস্কৃতি-অনুরাগী যুবক—শ্রীশঙ্কর মিশ্র। এই সভাক্ষেত্রে উত্তর-সপ্ততিতম বর্ষের এক মৈথিলী পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—নাম শ্রীজগদীশ্বরী শর্মা। বাংলা ভাষার উপর এঁর প্রবল অনুরাগ, বাংলা বলেনও চমৎকার। এই কারণে ইনি 'বাঙালীবাবু' নামে খ্যাত।

ছেলেদের বিতর্ক ভাল লাগল। বেশ গুছিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করলে ওরা—ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত ও মৈথিলীতে ভাষণ দিলেন বিশিষ্ট কোবিদ্ জন। সভাপতি আমাদের অনুরোধ করলেন কিছু বলতে।

ইতস্তত করছিলাম—বাংলা কি এঁরা ভাল বুঝবেন?

সভাপতি অভয় দিয়ে বললেন, বাংলাতেই বলুন, আমরা সবাই বুঝতে পারব। আমি আর বিভূতিবাবু বাংলায় কিছু বললাম। বিভূতিবাবু অবশ্য প্রদেশীয় ভাষা ভালই জানেন—তবু মাতৃভাষাতেই বললেন। ওঁরা আনন্দ প্রকাশ করলেন। একটি অকপট প্রীতির আস্বাদ নিয়ে সভাক্ষেত্র থেকে ফিরলাম।

শ্রীমান শঙ্করের বাড়ীতেও বাণী অর্চনা হয়। সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন তিনি। শঙ্করের অশীতিপর পিতাকে দেখলাম পণ্ডিতজনের সঙ্গে বসে শাস্ত্রালোচনা করছেন। মিথিলার একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ইনি। আরও কয়েকটি স্থান ঘুরে মিথিলার বাণী-পূজার সার্থক রূপটি প্রত্যক্ষ করলাম।

গতকাল দুপুরে মিথিলা ইনস্টিটিউটে আরও কয়েকজন কৃতবিদ্য তরুণকে দেখেছিলাম। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং জ্ঞানভারতীর সেবায় করেছেন আত্মনিয়োগ। এদের বিনয়-নম্র ব্যবহার ও অতি সাদাসিধা বেশভূষা দেখে একটি

উপমাই বারবার মনে পড়ছে। মিথিলার বিদ্যামন্দিরে এরা ফুলের মত ফুটে আছেন বলতে পারলেই উপমার সার্থক প্রয়োগ হ'ত, কিন্তু এ দের দেখে রসভারে অবনত ফলের কথাই মনে পড়েছিল : বর্ণ-সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধে ফুল মনকে আকৃষ্ট করে—অথচ তারই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটু প্রচার অহমিকাও যেন লেগে থাকে। শাখার উপর ঈষৎ উদ্ধতভাবেই সে তার রূপসম্ভার মেলে দ্রষ্টাকে লুব্ধ করে, কিন্তু সেই ফুলই রসভূয়িষ্ঠ ফলে পরিণত হলে—অবনত হয়ে সবুজ পত্রের অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। মিথিলা ইনষ্টিটিউটে এ রাও তেমনি মিথিলার গৌরব ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন আন্তরিকভাবে। সরকারী সাহায্যপুষ্ট এই বাণী-ক্ষেত্রটিতে প্রাচীনকালের সংস্কৃতির রূপটিকে উন্মোচন করে দেখাবার চেষ্টা চলেছে কিছুদিন ধরে। কয়েকজন তরুণ গবেষক এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন—তার মধ্যে বাংলা দেশ থেকে এসেছেন শ্রীঅনন্ত-লাল ঠাকুর। বিদ্যাবিনয়ী এই তরুণদল মিথিলার প্রাচীন কীর্ত্তিকে কিভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন তা প্রাচীন পুথিপত্রের সংগ্রহ দেখলেই বেশ বোঝা যায়। কিভাবে এগুলি সংগৃহীত হয়েছে—কিভাবে বা পাঠোদ্ধার হচ্ছে এবং বিনষ্ট শ্লোক বা টীকার অংশটি আদি-অন্তের লিখনরীতি অনুযায়ী কেমন করে পূর্ণাঙ্গ করা হয়, সমস্ত তথ্যই পরিবেশন করলেন এ রা। শুনতে শুনতে কৌতূহল জাগে—বিস্ময় বাড়ে জ্ঞানসমুদ্রের অনন্ত পরিধির কথা ভেবে, চিত্ত পুলক-গৌরবে ভরে ওঠে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-সুন্দর মূর্ত্তির আভাস পেয়ে।

এই বিদ্যাকেন্দ্র থেকে যে সব প্রাচীন পুঁথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং যেগুলি প্রকাশের জন্য গবেষণা চলছে তার কয়েকটির নাম মাত্র দিলাম।

কাব্যাদর্শ—সিংহলাচার্য্য রত্নশ্রীকৃত টীকা সহ প্রকাশিত হয়েছে, মূল সামীক্ষিক সাম্প্রকাশিত হবে। প্রকাশিত হয়েছে—কবি কর্ণপুর রচিত পারিজাতহরণ। আরও প্রকাশিত হয়েছে—১। ত্রিতলাবচ্ছেদ বা বিচার (নব্যন্যায়—শশিনাথ ঝা), ২। বিমণ্ডল বক্র বিচার (জ্যোতিষ—দয়ানন্দ ঝা), ৩। লিঙ্গ বচন বিচার (ব্যাকরণ—দীনবন্ধু ঝা), ৪। History of Mithila (Dr. Upendra Nath Thakur, M.A. D Phil), ৫। বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থে (ক) রত্নকীর্ত্তি নিবন্ধ ও (খ) জ্ঞানশ্রী নিবন্ধ। শেষোক্ত বই দুখানি শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুরের সম্পাদনায় জয়সোয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশের অপেক্ষায় আছে যেগুলি তার মধ্যে ১। বিষ্ণুপুরাণের সামীক্ষিক সং, ২। তত্ত্ব চিন্তামণি বা গঙ্গেশের মূল (ক) পক্ষধরের আলোক ও (খ) মহারাজ মহেশ ঠকুরের দর্পণ।) ৩। ন্যায়সূত্র—গৌতম, ৪। ন্যায় চতুগ্রাহিকা যার মধ্যে আছে (ক) ন্যায়ভাষ্য—বাৎস্যায়ন, (খ) ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক—উদ্দ্যোতকর, (গ) ন্যায়ভাষ্য-বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা—বাচস্পতি মিশ্র ও (ঘ) ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধি—উদয়নাচার্য্য, ৫। অলঙ্কার—অভয়তিলক উপাধ্যায় (গুজরাট), ৬। মিথিলায় নব্যন্যায়চর্চ্চা—অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। লীলাবতী, ৮। বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থাবলী।

এই বিদ্যামন্দিরে অলঙ্কার, ন্যায়, পুরাণ, স্মৃতিনিবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য আটটি গবেষকের পদ আছে, এম-এ বিভাগ থেকে আচার্য্য ও গ্রাজুয়েট উপাধি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। আর সর্ব্বোপরি আছে প্রকাশন বিভাগ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কৃতবিদ্য ছেলেরা গবেষণা বা উপাধি লাভের জন্য এখানে আসেন। তাঁদের বসবাসের কোন অসুবিধা নাই, বৃত্তিলাভের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী ছেলেরা এদিকে বড় একটা আসেন না। চাকরির চেয়ে জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রটিকে তাঁরা হয় তো কাম্য মনে করেন না। অথচ জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রটি অবৈতনিক নহে, জীবনে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগও এখানে যথেষ্ট।

মিথিলা ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখেছি, সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ভাল। এই মনোরম ভবনটি সারস্বত সাধনার অনুকূল পরিবেশে স্থাপিত। প্রশস্ত প্রান্তর-বেষ্টিত তরুছায়াস্নিগ্ধ প্রাসাদ তুল্য এই ভবনটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্বারভাঙ্গার গৌরব প্রকাণ্ড একটি ভূমি, শহরের মধ্যে অথচ জনকোলাহল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এক সময়ে এটি মহারাজের ইউরোপীয়ান সেক্রেটারীর আবাসগৃহ ছিল।

প্রায় দু' ঘণ্টা কেটেছিল বিদগ্ধ সজ্জন সাহচর্য্যে। এই জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র দেখেই মনে হয়েছে—নবীন-মিথিলা প্রাচীন-মিথিলার যোগ্য উত্তর-সাধক। রাজপাট আজ অস্তমিত, ক্ষমতা-দর্প ও জেকজমক জলবুদ্বুদের মত কালের হাওয়ায় ফেটে গেছে। এই সমস্ত নিয়ে যদি প্রাচীন মিথিলার গৌরবসম্পদকে লিপিবদ্ধ করতে যেতেন কেউ—কোথায় থাকত সে মিথিলা! 'রাজা রাজ-পাট শূন্যে মিলায় ধূলায় নিশান তুলে।' প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে মিথিলার নবজাগরণের যে হৃদয়স্পন্দন অনুভব করেছি কয়েকটি মুহূর্ত্তে—তা মিথিলার চিরঞ্জীবনেরই বার্ত্তা। রামায়ণের জনক-চরিত্র যেমন, জনকরাজার মিথিলাও তেমনি কালজয়ী।

প্রভু তথাগত

শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদের সন্নিকটস্থ উদ্যান

(নেপথ্যে স্তবগান ও বাদ্যের ঐকতান চলতে থাকা-কালে যবনিকা ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। একটি মনোরম উদ্যানে স্বপ্নালোকে দেখা যাবে কুমার সিদ্ধার্থ অন্যমনস্ক উদাসীন ভাবে উপবিষ্ট। নয়নে তাঁর তাপসের অন্তর্ভেদী জ্ঞানদীপ্ত দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি যেন এক পরম রহস্যলোকে হারিয়ে গেছে। শান্ত সমাহিত মূর্তি। সহসা রক্তাপ্লুত অবস্থায় আহত একটি রাজহংস কুমার সিদ্ধার্থের ক্রোড়ে পতিত হ'ল। কুমার সচকিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন)

সিদ্ধার্থ। একি? কার এই নিষ্ঠুর আচরণ? কে এই নিরীহ রাজহংসকে এমন করে আঘাত করেছে? (কণ্ঠস্বর কান্নার আবেগে আপ্লুত হওয়ায় কুমার আর কথা বলতে পারলেন না, উদ্যানস্থিত সরোবর হতে জল নিয়ে এসে অসীম করুণায় সেই ক্ষতস্থান ধৌত করতে করতে বলতে লাগলেন)

—মানবের জিঘাংসাপ্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করবার কি কোন উপায় নাই? বিনা প্রয়োজনে প্রাণিহত্যা! এর কি কোন প্রতিকার নেই? (রাজহংসের দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে) আহা! কোন্ পাষণ্ড তোকে এমন করে শরাঘাত করেছে? তার কি প্রাণে এতটুকু মায়া নেই, দয়া নেই? (রাজহংস কুমারের শুশ্রূষায় ক্রমশঃ সুস্থ হয়।)

(বেগে দেবদত্তের প্রবেশ)

দেবদত্ত। এই যে কুমার, আমার রাজহংসকে নিয়ে তুমি খেলা করছ। এক অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ওকে আমি উড়ন্ত অবস্থায় হত্যা করেছি। দাও আমাকে আমার রাজহংস।

সিদ্ধার্থ। কে বললে এই রাজহংস তোমার?

দেবদত্ত। বা রে! রাজহংস আমার নয় ত কার? ও আমারই শরে যখন হত হয়েছে তখন ওর উপর আমার পূর্ণ অধিকার। কাল-বিলম্ব না করে আমার রাজহংস দিয়ে দাও।

সিদ্ধার্থ। রাজহংস মরে নি, আহত হয়েছে মাত্র। তুমি ওকে আঘাত করেছ, আমি শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করেছি, রাজহংসকে যে বাঁচাল তার অধিকারকে তুমি অস্বীকার করছ কোন্ যুক্তিবলে?

দেবদত্ত। বাজে কথা বলে আমায় ভোলাতে পারবে না কুমার। রাজহংস আমার চাই-ই।

সিদ্ধার্থ। বৃথা তর্ক করো না দেবদত্ত, রাজহংস আমি দেব না। আমি তাকে করুণা দিয়ে, সেবা দিয়ে সুস্থ করেছি, সেই সেবার অধিকারেই ওর ওপর আমার দাবি।

দেবদত্ত। উড়ন্ত অবস্থায় রাজহংসকে আহত করে আমি তোমাকে ওর সেবা করবার সুযোগ দিয়েছি, সুতরাং রাজহংস আমাকে দেওয়া তোমার কর্তব্য।

সিদ্ধার্থ। অদ্ভুত যুক্তি তোমার। স্পষ্ট ভাষায় আমি তোমায় বলছি এই রাজহংস তোমায় দেব না। আজ আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি—ব্যথার কি অপরিসীম দাহ, কি সুতীব্র জ্বালা। সামান্য শরের আঘাতে যন্ত্রণা যদি এতই তীব্র হয়, জানি না পিতার রাজ-অস্ত্রাগারে রক্ষিত শাণিত সমরাস্ত্রগুলির কি মারাত্মক ধ্বংসের ক্ষমতা? শুনেছি শত শত যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে ঐ সকল অস্ত্র। সহস্র সহস্র সৈনিকের রক্তস্নাত অস্ত্রগুলির রক্তাক্ত ধ্বংসলীলা আজ এই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি···এই পৃথিবীতে মানুষ মারাত্মক সমরায়োজনে ব্যস্ত, কেন এই মূঢ় মানব এ জাতীয় লোভে, আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর ধ্বংসের ইতিহাস রচনা করে চলেছে—এর পরিসমাপ্তি নেই। দেবদত্ত, কপিলাবস্তুর সিংহাসন তুমি চাও? গ্রহণ কর ভাই, এ রাজ্য আমি অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারি···শুধু যাকে স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে বাঁচিয়েছি, তাকে আমি দিতে পারব না···পারব না···

(ভাবাবেগে সিদ্ধার্থের কণ্ঠরোধ হয়ে এল। এক অপরিসীম বেদনায় যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্ত। দেবদত্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় অপলক দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে রইল।)

(যবনিকা ধীরে ধীরে নামতে থাকে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্থান কপিলাবস্তুর রাজ-অন্তঃপুর। রাজা শুদ্ধোদন ও রাজ্ঞী প্রজাবতী এক গভীর উৎকণ্ঠায় কথোপকথনে রত।)

শুদ্ধোধন। বড় দুঃসংবাদ রাণী, সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা স্থির করেছে। ওর মুখ চেয়ে মায়ার শোক আমি ভুলেছি, ওকে সমভাবে পিতার কর্তব্য ও জননীর স্নেহ দিয়ে লালন করেছি, সকল বিষয়ে এক নিদারুণ উপেক্ষা, এক গভীর ঔদাস্য ওর প্রকৃতিগত। এতদিন অপরিসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে দিনপাত করেছি, আজ সেই উৎকণ্ঠার বীজ বাস্তবে মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। এত সতর্কতা, রাজপ্রাসাদের অফুরন্ত প্রলোভন গৌতমকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ হতে

প্রতিনিবৃত্ত করতে পারল না। আমার সকল আশা, সব সুখ, আজ সমূলে উৎপাটিত হতে চলল।

প্রজাবতী। সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা নেবে? সত্য বলছেন আর্যপুত্র? তবে কি কুমারের জন্মকালে সেই ঋষিগণের ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হতে চলল! চাঁদের মত পুত্র, সোনার প্রতিমা বধূ গোপা, বিরাট শাক্যরাজ্য—রাজসিংহাসন, অনুরক্ত প্রজাকুল, স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা—সবকিছু ফেলে, উপেক্ষা করে সন্ন্যাস নেবে গৌতম? এ কি অঘটন প্রভু! মাতা, পিতা, সুন্দরী বধূ, সদ্যোজাত শিশুপুত্র ওদের উপর গৌতমের কি কোন কর্তব্য নেই?

(সহসা সিদ্ধার্থের প্রবেশ।

সিদ্ধার্থ। এক মহান্ কর্তব্যের নির্দেশে আমি প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করেছি। সেই কর্তব্য সমগ্র মানবজাতির উপর। মানবের কল্যাণকামনায় আজ আমি মহান্ ব্রত উদযাপনে প্রবৃত্ত হয়েছি। সংসারে মানবজীবনের এক শোচনীয় পরিণাম মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। জরা ব্যাধির প্রকোপে মানবকুল অহরহ পীড়িত হচ্ছে। দুঃখের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে মানবসমাজ কত অসহায় তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাই আজ আমি মানবের কল্যাণকামনায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প করেছি। আমার ব্রত যেন সফল হয়, তুমি আশীর্বাদ কর মা!

প্রজাবতী। বৎস, সন্ন্যাসের পথ বড় কঠোর, তোমার ঐ নবনীতকোমল সুকুমার দেহে সন্ন্যাসের সেই বেশ, সেই অনাহার, কৃচ্ছ্রসাধন কি সহ্য হবে পুত্র?

সিদ্ধার্থ। কঠোর ব্রত উদযাপনের জন্যই কঠোরতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় মা। কঠোরতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবার মত ধৈর্য আমি যেন লাভ করি—তুমি আশীর্বাদ কর মা! (সিদ্ধার্থ নতজানু হয়ে প্রণাম করেন।)

শুদ্ধোদন। শোন কুমার, মানবজাতির মুক্তি-অন্বেষণে তুমি কেন অহেতুক দুঃখকে বরণ করবে? তোমার কিসের অভাব? স্বর্ণপ্রতিমা বধূমাতা গোপা, নব শশধরসম পুত্র, রাজসিংহাসন সব-কিছু কেন পরিত্যাগ করবে? ধর্মাচরণ করতে তোমার যদি একান্ত অভিলাষ হয়—গৃহে বসে তুমি যজ্ঞাদির আয়োজন করতে পার। অক্ষম, অথর্ব বৃদ্ধ পিতার জীবনের স্বপ্নকে, সাধনাকে ব্যর্থ করে দিও না কুমার!

সিদ্ধার্থ। (সিদ্ধার্থের মনে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। কিছুক্ষণ অধোবদনে থেকে বললেন) একটি মাত্র সর্তে আমি সংসারে থাকতে পারি পিতা। আপনি অনুগ্রহ করে আমার চারটি বর প্রদান করুন!

শুদ্ধোদন। (উৎফুল্ল হয়ে) চাও বৎস, কি তোমার অভিলাষ?

সিদ্ধার্থ। যৌবন যেন আমার জরায় আক্রান্ত না হয়, শরীর যেন আমার ব্যাধিশূন্য হয়, আমি যেন মৃত্যুঞ্জয়ী হই পিতা।

শুদ্ধোদন। (কিছুক্ষণ মৌন থেকে) তোমার অভিলাষ পূর্ণ করা আমার সাধ্যাতীত বৎস! যোগশ্রেষ্ঠগণ সহস্র বৎসর সাধনা করে, কঠোর তপস্যায় যা লাভ করতে অক্ষম হন, সেই বর আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ তোমায় কিরূপে দিতে পারবে?

সিদ্ধার্থ। (সহসা শুদ্ধোদনের চরণে পতিত হয়ে) তবে পিতা আমায় এই বর দান করুন—আমার বিরহে আপনারা কাতর হবেন না, আমি যেন সাংসারিক ভোগসুখের সকল আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে পারি!

শুদ্ধোদন। (সিদ্ধার্থের মস্তকে হাত বুলাতে বুলাতে) কঠোর সঙ্কল্প তোমার। আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য নেই এই সঙ্কল্প হতে তোমাকে বিচ্যুত করি। মানুষের দুঃখনিবৃত্তি তোমার সঙ্কল্প। ঈশ্বর তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন! তোমার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

(শিশুকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করে গোপা। রাণী প্রজাবতী গোপার কোল থেকে শিশুকে নিজের অঙ্কে গ্রহণ করলেন। স্তব্ধ বিস্ময়ে অপলক নয়নে শিশুকে দেখতে লাগলেন সিদ্ধার্থ। তার পর শিশুকে নিজের ক্রোড়ে নিয়ে একবার তার মুখচুম্বন করে পুনরায় প্রজাবতীর ক্রোড়ে ফিরিয়ে দিলেন। এই বার ধীর পদক্ষেপে রাজপুরীর বহির্দেশে অগ্রসর হতে লাগলেন। গোপা এতক্ষণ অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে নীরবে কাঁদছিলেন। কুমারকে চলে যেতে দেখে গোপার অবগুণ্ঠন খসে পড়ল। উন্মাদিনীর মত ভূমিলুণ্ঠিতা হয়ে আছড়ে পড়লেন গোপা।)

গোপা। স্বামী, প্রভু!

(নেপথ্যে সকরুণ করুণ বাদ্যধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ক্রমে ক্রমে তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। সিদ্ধার্থ একবার পিছনে তাকিয়ে ভূলুণ্ঠিতা গোপাকে দেখলেন, পরে দ্রুত পদে বাইরের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। যবনিকা নামল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ছন্দক ও সিদ্ধার্থ

সিদ্ধার্থ। এই সেই বহ্মাতীরস্থ বেণুবন? রজনী শেষ হয়ে এল। এই স্থান হতে তোমাকে বিদায় নিতে হবে ছন্দক।

ছন্দক। প্রভু! এ দাস আপনার সঙ্গ ছাড়বে না, আমাকে আজীবন আপনার সেবা করবার অনুমতি দিন প্রভু!

সিদ্ধার্থ। যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করো না ছন্দক। আমাকে নিশ্চিন্তচিত্তে বিদায় নিতে দাও।

ছন্দক। সংসারে অনন্ত সুখের আকর পরিত্যাগ করে কিসের মোহে আপনি ছুটে চলেছেন প্রভু? স্নেহময় পিতা, অনন্ত করুণা-রূপিণী জননী, পতিব্রতা পত্নী, প্রাণপ্রতিম শিশুপুত্র—কেন আপনি ঐ সব পরিত্যাগ করবেন প্রভু? চিত্ত স্থির করুন।

সিদ্ধার্থ। স্থির চিত্তেই এই কার্যে আমি ব্রতী হয়েছি ছন্দক। ঐ দেখ ছন্দক! আজ পৃথিবী শুভ্র জ্যোৎস্নায় বিমল হাসিতে

হয়ে গেছে···কিন্তু কতটুকু তার স্থায়িত্ব? এই রজতধারা স্নাত নিশার অবসান হবে, তার পর আসবে অন্ধকার রাত্রি। সংসারে সুখের স্থায়িত্বও এইরূপ। আর তর্ক নয় ছন্দক, সময় হয়ে এসেছে। আমায় বিদায় নিতে দাও।

ছন্দক। (কাঁদতে কাঁদতে ঈষৎ অভিমানাহত হয়ে) বেশ, আপনার যা অভিরুচি করুন।

সিদ্ধার্থ। (একটু কঠোর দৃষ্টি হেনে) ছন্দক (শিরের উষ্ণীষ খুলে) এই নাও আমার শিরের আভরণ। এইবার মস্তক আমার বিনয়-নম্রতা শিখবে। এই নাও আমার অঙ্গের আভরণ, ঐ সুপ্ত ব্যাধের সঙ্গে আমি আমার পরিচ্ছদপরিবর্তন করব। আজ আমার অহঙ্কার, আভিজাত্যের, দাম্ভিকতার মুখোশ খসে পড়ুক। (নিজের তরবারির দ্বারা মস্তকের চুল কাটিতে উদ্যত হলে ছন্দক বাধা দিলেন)

ছন্দক। না না প্রভু! অত সুন্দর চিকুররাজি আপনি নষ্ট করবেন না। নিজের উপর অতটা নির্মম আপনি হবেন না।

সিদ্ধার্থ। অতটা অবুঝ হয়ো না ছন্দক, চিকুর নষ্ট করে আমি মিথ্যা শ্রীর আসক্তি হতে মুক্ত হব। (চিকুররাজি নষ্ট করে) এই নাও আমার তরবারি। ক্ষাত্রধর্ম আজ হতে পরিত্যাগ করলাম···

ছন্দক। এ কি করছেন প্রভু! (কাঁদছে ছন্দক)

সিদ্ধার্থ। শোকার্ত হয়ো না ছন্দক। রাজপ্রাসাদে ফিরে যাও তাড়াতাড়ি। পিতা-মাতা, পত্নী—সকলে গভীর শোকে মুহ্যমান। সত্বর ফিরে গিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দাও। ওঁদের ব্যথা উপশমের সহায়তা কর। বিদায় ছন্দক! বিদায় বন্ধু! বিদায়!

(ছন্দক কাঁদতে লাগল। যবনিকা নামে।)

(সহসা স্বর্ণপাত্রে পায়সান্ন সহ সুজাতার প্রবেশ)

সুজাতা। কে ওখানে? কে ঐ নয়নাভিরাম তাপস? উনিই কি তবে বনদেব? সেই স্বপ্নদৃষ্ট তেজোদৃপ্ত ভাস্বর জ্যোতির্ময় পুরুষ। দেবতা সুপ্রসন্ন নিশ্চয়ই, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। (উৎফুল্ল হয়ে সিদ্ধার্থের সন্নিকটে গিয়ে ভক্তিভরে স্বর্ণপাত্র ওঁকে উৎসর্গ করলেন।)

সুজাতা। বনদেব! দাসী আজ সামান্য পায়সান্নে অর্ঘ্য-উপচার নিবেদন করছে, দাসীর প্রতি করুণা করে এ পায়সান্ন গ্রহণ করুন দেব!

সিদ্ধার্থ। কে তুমি দেবি? তোমার পরিচয়?

সুজাতা। নান্দিকপতির তনয়া আমি, দাসীর নাম সুজাতা। পুত্রকামনায় আজকের এই অর্ঘ্যরচনায় ব্রতী আমি দেব। কৃপা করে এইবার পায়সান্ন গ্রহণ করুন।

সিদ্ধার্থ। ভদ্রে! অতি সামান্য মানব আমি। তোমার সেই পরমারাধ্য বনদেব আমি নই। এই বনেই আমি তপস্যায় নিরত রয়েছি। আজ ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে তপস্যায় ব্যর্থকাম হয়েছি। যদি দ্বিধাহীনচিত্তে সংশয়হীনা হয়ে এক সামান্য বুভুক্ষু মানবকে তোমার ঐ পায়সান্ন নিবেদন করতে অভিরুচি হয়, তবে তুমি তা করতে পার সাধ্বি!

সুজাতা। কৃপা করে দাসীর এই অন্ন গ্রহণ করুন দেব।

সিদ্ধার্থ। আজ পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে তোমার পায়সান্ন গ্রহণ করলাম দেবি! আমার দেহ সঞ্জীবিত হ'ল। আশীর্বাদ করি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক! তোমার কল্যাণ হোক!

(করজোড়ে সুজাতা বসে রইল। ওর নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। অতীব তৃপ্তিসহকারে অন্নগ্রহণ করতে লাগলেন সিদ্ধার্থ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য। স্থান গয়াধাম।

সুজাতার পায়সান্ন ও ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা সিদ্ধার্থের দেহ সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান সমাপন করে বোধিদ্রুম মহাবৃক্ষকে সাত বার প্রদক্ষিণান্তে পুনরায় যোগাসনে বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নিস্তব্ধ উরুবিল্ববন। পূর্ণিমার রজতশুভ্র কিরণধারাস্নাত পৃথিবী। জ্যোৎস্নার সেই শুভ্র আলোকে এক কঠোর সঙ্কল্প অভিব্যক্ত হ'ল সিদ্ধার্থের মুখমণ্ডলে।

সিদ্ধার্থ। এই শেষবার। প্রাণপাত করে নিজের সঙ্কল্পে সিদ্ধিলাভ করতে হবে। এক স্থির সত্যকে আজ আবিষ্কার করতে হবে। মানবের নির্বাণের পথ, মুক্তির পথ আজ আমায় অনুসন্ধান করতে হবে। সঙ্কল্পসাধনের শুভলগ্ন সমুপস্থিত। এই লগ্নকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না। হে আকাশের বিমল শুভ্র পূর্ণচন্দ্র, নিস্তব্ধ উরুবিল্ববনের মহীরুহগণ, হে শান্ত সমুন্নত প্রবীণ মহাদ্রুম, অরণ্যচারী হে শ্বাপদকুল, কীট, পতঙ্গ, বিহঙ্গ, হে মূক নীরব প্রকৃতি, আজ তোমরা সাক্ষী হও। সাধনার পথে, সিদ্ধির পথে হে আমার নীরব দর্শকগণ—তোমাদের সাক্ষী করে আজ আমি এই শুভ লগ্নে পরম মুহূর্তে দিব্য প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করছি···

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থি মাংস প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

(প্রতিজ্ঞা শুনে পৃথিবী কম্পিত হ'ল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। সিদ্ধার্থ সেই মহাবোধিদ্রুমতলে যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন। এক বিমল জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল। যবনিকা ধীরে ধীরে নামতে লাগল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। স্থান ঋষিপত্তন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সিদ্ধার্থ সম্বোধিলাভ করার পর এখন প্রভু তথাগত নামেই পরিচিত। ঋষিপত্তনের সংঘারাম

শিষ্যগণের সান্ধ্য-মাঙ্গলিক পাঠে মুখরিত। ধূপ-অগুরু-চন্দন-মিশ্রিত ধুনার সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। কাশ্যপ, আনন্দ উপালী, অনাথপিণ্ডদ প্রভৃতি শিষ্যগণ "যোগাসনে বসে করজোড়ে সান্ধ্য-মাঙ্গলিক পাঠ করছেন।"

"পঠমং বোধি পল্লঙ্কং দুতিয়ং অনিমিসম্পিচ
ততিয়ং চঙ্কমন সেট্ঠং চতুত্থং রতন ঘর'
পঞ্চমং অজপালশ্চ মুচলিন্দেন ছট্ঠমং
সত্তমং রাজায়তনং বন্দেত বোধি পাদকং !!"

(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি··· ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি···

আনন্দ। প্রভু তথাগতের অনেকদিন কোন কুশলাদি পাই নি! প্রভুর জন্য আজ সহসা চিত্ত আমার বিক্ষিপ্ত হয়েছে!

কাশ্যপ। শ্রাবস্তী, কোশল, বৈশালী, কৌশাম্বী প্রভৃতি রাজ্যগুলি পরিক্রমা সমাপন করে প্রভু ঋষিপত্তনের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন বলে সংবাদ পেয়েছি, এখন প্রভু মগধরাজ্যে অবস্থান করছেন বলে জানতে পেরেছি ···

(সহসা প্রভু তথাগতের প্রবেশ. সঙ্গে শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্লায়ন)

তথাগত। শুভমস্তু। শুভমস্তু: তোমাদের কুশল ত? সংঘারামের মঙ্গল ত? (সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে—প্রভু তথাগতকে প্রণাম করলেন।)

কাশ্যপ। প্রভুর কুশল ত?

তথাগত। তোমাদের কুশলেই আমার কুশল মগধ হতেই এখন ফিরে এলাম। বৎসগণ এবারের এই পরিক্রমায় আমি ঐ পবিত্র আধার দুটি আবিষ্কার করেছি। দুজনেই ব্রাহ্মণকুমার। দু'জনেই আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। উনি সারিপুত্ত, উনি মৌদ্গল্লায়ন। (সঙ্ঘারামের শিষ্যগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।)

তথাগত। এইবারের পরিক্রমায় আরও তিনটি হৃদয়কে বিজয় করে ফিরেছি।

অনাথপিণ্ডদ। কোন মহান্ সম্রাট কি আমাদের পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন প্রভু?

তথাগত। হ্যাঁ। মগধাধিপতি আমাদের শীলের উপর প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করেছেন। আমি সেকথা বলছি না।

উপালি। প্রভু কি অন্য কোন মহাত্মার সন্ধান পেয়েছেন?

তথাগত। শুদ্ধভক্তি আমি উপঢৌকন পেয়েছি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ঘোর আত্মকেন্দ্রিক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণকুমার ভরদ্বাজ সংস্কারমুক্ত হয়ে মানবপ্রেমী হয়েছে, সত্যাশ্রয়ী হয়েছে।

উপালি। অপর দুই জন!

তথাগত। এক দুর্দ্দান্ত দস্যু নরহত্যা, লুণ্ঠন, প্রভৃতি সমুদয় পাপাচার বিসর্জ্জন দিয়ে সাধু গৃহস্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

উপালি। শেষেরটি?

তথাগত। একজন নারী।

অনাথপিণ্ডদ। নারী?

তথাগত। হ্যাঁ, নারী। আমাদের ত্রিশরণ ও শীল গ্রহণে নারীর কোন বাধা নাই। বৎস আনন্দের পরামর্শক্রমে আমি এইবার সঙ্ঘারামে নারীদের স্থান দেওয়া স্থির করেছি।

অনাথপিণ্ডদ। নারী যে মায়াময়ী প্রভু! তাদের সাহচর্য্যে মায়াপাশে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা যে আছে প্রভু!

তথাগত। কিন্তু নারীরাও ত দুঃখভোগ করে বৎস! তারাও জরা, ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পায়। নির্ব্বাণ-লাভের তারাও উপযুক্ত আধার।

উপালী। কে সেই মহীয়সী নারী প্রভু?

তথাগত। পুত্রশোকাভিভূতা কৃষা গৌতমী। পুত্রশোকের সংস্কার হতে উনি মুক্ত হয়েছেন। সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্লায়ন ওঁরা শীল সম্পর্কে জ্ঞানলাভে উৎসুক। আমি পুনরায় শীলগুলি বলছি, বৎসগণ শীলগুলির প্রতি যত্নপরায়ণ হও। আর্য্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে শীলগুলি পালন করেন। এই শীলগুলি বিজ্ঞজনের দ্বারা অনুমোদিত।

সারিপুত্ত। নির্ব্বাণ কি?

তথাগত। নির্ব্বাণ অব্যক্ত। নির্ব্বাণ কোন বিবৃতি নয়, নির্ব্বাণ কোন সত্তা নয়—নেতি—অভাব, নির্ব্বাণ একটি নেতিবাচক অবস্থা। শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা, মুক্ত জীবনের এক পরম আস্বাদ নির্ব্বাণের অবস্থা।

মৌদ্গল্লায়ন। জগৎ কি?

তথাগত জগৎ শুধু কতগুলি ঘটনার অনন্ত প্রবাহ। জগতে শাশ্বত বলে, স্বয়ম্ভু বলে কিছু নাই: এখানে চলেছে শুধু পরিবর্তনের প্রবাহ। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র রূপান্তর নয়, বিপরীত সংঘর্ষের মধ্যে এক নূতনের পরম আবির্ভাব। সমস্তই একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার স্থান জগতে নেই।

কাশ্যপ। জ্ঞান ও সত্য কি?

তথাগত। জগৎ অসীম। সত্যও সীমিত নয়। অনন্ত সত্যের ভাণ্ডার হতে আমরা একটি সত্যকে উপলব্ধি করেছি মাত্র। জ্ঞান—ধন নয়, মান নয়, রাজ্য নয়, শক্তি নয়, কঠোর পুণ্যময় জীবনযাপনের আদর্শই জ্ঞান! জ্ঞানী যিনি তিনি সংস্কারকে জয় করেছেন, কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করেছেন। এই জ্ঞান লাভ করতে গেলে অষ্ট আর্য্য পন্থাকে প্রতিপালন করতে হয়। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবন, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক আনন্দ বা সমাধি এই অষ্ট আর্য্য পন্থা! কোন বিষয়কে দেখে নেবার নাম সংজ্ঞা, জেনে নেবার নাম বিজ্ঞান, আর সঠিকভাবে বুঝে নেবার নাম প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাও আবার করুণা ও মৈত্রী ব্যতীত সম্ভব নয়। করুণাহীন জ্ঞানের নাম বন্ধ্যা প্রজ্ঞা!···

কাশ্যপ। প্রভু ব্রাহ্মণ কে?

তথাগত। জটা গোত্র, জাতিতে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সত্যে ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তিনি ব্রাহ্মণ।

আনন্দ। সত্য কি উপলব্ধির বস্তু?

তথাগত। সেই সত্যকে নিজের প্রচেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়। তোমাকে যা সত্য বলা হবে তুমি তা সত্য বলে গ্রহণ করতে নাও পার। তুমি নিজেই নিজের প্রদীপ হও, নিজেই নিজের শরণ হও, নিজে যাকে সত্য বলে জেনেছ, বুঝেছ দেখেছ—তাই সত্য।

অনাথপিণ্ডদ। ঈশ্বর কি?

তথাগত। এই প্রশ্ন যে করে, এবং যে উত্তর দেয় উভয়েই ভ্রান্ত। থাক এ সম্বন্ধে এখন আর কিছু বলতে চাই না —কে? কে আপনি?

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রভু! আমি কপিলাবস্তু হতে আসছি। মহারাজ শুদ্ধোধন আপনাকে কপিলাবস্তু যাবার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন।

তথাগত। কপিলাবস্তু! আজ দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে কপিলাবস্তু পরিত্যাগ করেছি। প্রণাম জন্মভূমি! প্রণাম তোমায়। (দূতের দিকে ফিরে) পথশ্রমে তোমার কোন ক্লেশ হয় নি ত? রাজ্যের সবকিছু মঙ্গল ত? পিতামাতার কুশল ত?

দূত। সবই কুশল প্রভু। তবে আপনার বিরহবেদনায় সকলে ব্যথিত। শ্রাবস্তী, কোশল, মগধ, কৌশাম্বী প্রভৃতি রাজ্যগুলি আপনার পদধূলিতে কৃতার্থ হয়েছে, ধন্য হয়েছে। সকলকেই কৃপাবর্ষণ করেছেন আপনি। শুধু কপিলাবস্তু কি উপেক্ষিত থেকে যাবে? কপিলাবস্তুর উপর এতটা কার্পণ্য কেন প্রভু?

তথাগত। কপিলাবস্তুর আমন্ত্রণ আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করছি। অবিলম্বে আমরা তথায় উপস্থিত হব। শুরুপদে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বার্তা নিবেদন করো।

(যবনিকা)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[উৎসবমুখর কপিলাবস্তু। রাজকুমার নন্দের বিবাহ-উৎসব। সুসজ্জিত নগরী। দিকে দিকে নৃত্যগীত···নহবতের সুমধুর তান। পুরবাসিগণের গৃহদ্বার সিন্দুরলিপ্ত, মঙ্গলকলস ও আম্রপল্লব দ্বারা সুসজ্জিত। রাজ-অন্তঃপুর হতে মঙ্গলশঙ্খ বাজছে। পুত্রের বিবাহোৎসবে রাজা শুদ্ধোধন কিন্তু ততটা উৎফুল্ল নন। এক গভীর ঔদাস্যে পরিপূর্ণ রাজার অন্তর, মনের মধ্যে অসীম শূন্যতা।]

প্রজাবতী। প্রভু, আজকের দিনে আপনি এত বিষন্ন কেন? মঙ্গলাচার সম্পূর্ণ হয়েছে। বর-বধূকে আশীর্বাদ করবেন আসুন।

শুদ্ধোধন। তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে। সুখ, আনন্দকে আজকাল আমার বড় ভয় হয় রাণী। সুখ আনন্দ আমার জীবনে আশীর্বাদ নয়···এ নিদারুণ অভিশাপ প্রবঞ্চনা। তাই ওদের আমি পরিহার করতে চাই,···সবকিছু হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাই। আজ আমার চিত্ত বড়ই বিক্ষিপ্ত রাণী। তুমি—কে—কি সংবাদ সচিব?

(প্রধান সচিবের প্রবেশ)

প্রধান সচিব। মহারাজ, প্রভু তথাগত আজ শিষ্যগণসহ কপিলাবস্তুর উপবনে সমাগত হয়েছেন।

শুদ্ধোধন। সত্য বলছ, সচিব? সে এসেছে—এসেছে? এতদিন পরে বৃদ্ধ পিতাকে তার মনে পড়েছে! ওরে—কে কোথায় আছিস, তোরা শঙ্খধ্বনি কর, জয়ধ্বনি কর। (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) যাও—যাও সচিব তুমি অবিলম্বে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস। পরিচর্যার জন্য দাসদাসীদের পাঠাও। কনকমণ্ডিত রথ, কনক-কিরীট, রাজ-আভরণ কুরুবকের সুগন্ধি মাল্য প্রভৃতি বিবিধ উপচার নিয়ে তাকে বরণ কর। এতটুকু ত্রুটি থাকতে দিও না। যাও।

প্রধান সচিব। সমস্তই পাঠিয়েছিলাম মহারাজ। তিনি সব-কিছু বর্জন করেছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু ভিক্ষাপাত্র ও ধর্মচক্র হস্তে ধারণ করে পদব্রজে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

(প্রধান সচিবের প্রস্থান)

শুদ্ধোধন। (উৎফুল্ল হয়ে) ঐ দেখ রাণী ওরা আসছে। গবাক্ষের পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ ঐ অপূর্ব গৈরিক মেলার মিছিলকে। ঐ দেখ তোমার গৌতমের গৈরিক বাসে আবৃত দেহের হেমময় অপূর্ব আভা।

[নেপথ্যে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি···ধর্মং শরণং গচ্ছামি···সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি···ত্রিশরণ মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে।]

(তথাগতের প্রবেশ)

তথাগত। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি!

শুদ্ধোধন। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) তোমার একি বেশ পুত্র! তোমায় এ বেশে আমি দেখতে পারব না, পারব না।

তথাগত। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি। ভিক্ষুর এই ত ঐশ্বর্য পিতা। (তথাগতের মুখে প্রসন্ন হাসি)

শুদ্ধোধন। ওরে গৌতম···পুত্র! (প্রথমে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন প্রভু তথাগতকে, এক দিব্য আনন্দের আবেশে শুদ্ধোধনের ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। তিনি করজোড়ে ত্রিশরণ মন্ত্র গাইলেন। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।)

তথাগত। (প্রজাবতীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) মা—মা।

প্রজাবতী। (কম্পিত কণ্ঠে) কে—কে—তুমি পুত্র? তোমার দর্শনে এত সুখ, এত পুলকোচ্ছ্বাস! কে তুমি।

[নেপথ্যে ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল]

তথাগত। মা—মা।

[নন্দের প্রবেশ]

নন্দ। প্রভু বিবাহবাসর ত্যাগ করে তোমাকে দর্শন করতে

ছুটে এসেছি। তোমার মুখনিঃসৃত অভয়মন্ত্র আজ সকল মানুষকে সঞ্জীবিত করেছে···এই দীন দাসকেও দাও সেই অমৃতময় মোহন মন্ত্র। আমাকেও দেখাও সেই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা।

(নন্দ তথাগতকে প্রণাম করলেন) তার পর সকলে ধীর পদক্ষেপে কক্ষান্তরে চলে গেলেন।)

(নেপথ্যে: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি···ধম্মং শরণং গচ্ছামি···সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।)

[গোপার প্রবেশ]

গোপা। কৈ সেই নয়নাভিরাম তেজঃপুঞ্জকলেবর দেবতা? কৈ সেই পরমবাঞ্ছিত বল্লভ? কোথায় তিনি?
—রাজপ্রাসাদের সকলেই পেল তাঁর সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ স্পর্শ শুধু আমিই উপেক্ষিতা থেকে যাব? প্রাণের ব্যাকুলতায় ছুটে এলাম তাঁকে দর্শন করতে, কিন্তু কৈ তিনি? তবে কি প্রভু আমাকে দর্শন দেবেন না?

(নেপথ্যে 'গোপা' 'গোপা' ডাক)

—ঐ আহ্বান কার? শান্ত গম্ভীর উদাত্ত স্বরে ঐ অমৃতময় আহ্বান কার?—ঐ ঐ ত প্রভু আসছেন। (মুখে হাসি ফুটে উঠল, আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) ঐ ত সেই পরমবাঞ্ছিত বল্লভ!

(ধীর পদক্ষেপে তথাগতের প্রবেশ)

—হে পরম পুরুষ তুমি এসেছ? সার্থক হয়েছে আমার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা। আমাকে তুমি রিক্ত করে পূর্ণ করে দাও! (পবিত্র গঙ্গাবারি দ্বারা তথাগতের পদযুগল ধৌত করে নিজের অলক-গুচ্ছের দ্বারা মার্জনা করলেন সেই দেবদুর্লভ পদযুগল, নেপথ্যে বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ। তথাগত অপলক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন গোপাকে)

গোপা। রাহুল! রাহুল! (শিষ্য সারিপুত্রের সঙ্গে সপ্তম-বর্ষীয় বালক রাহুলের প্রবেশ, তথাগত দেখলেন নিজ আত্মজকে)—আজকে কে এসেছে জানিস! দেখেছিস বাবা! ঐ সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরেছিস রাহুল?

রাহুল। কে মা?

গোপা। ওরে তোর পিতা। তোর পরমগুরু। যা চাইবার আজ ওঁর কাছ হতে প্রাণ খুলে চেয়ে নে বাবা। (আনন্দের বিপুল আবেগে যেন গোপার সমস্ত শরীর কাঁপছে)

রাহুল। (বিহ্বল দৃষ্টিতে তথাগতকে দেখতে দেখতে অশ্রু প্রবাহিত করল)—বাবা—বাবা

তথাগত। বৎস!

রাহুল। বাবা!

তথাগত। সারিপুত্র, বালককে ওর পিতৃধন দাও,—ভিক্ষাপাত্র!

(সারিপুত্র বালকের হাতে ভিক্ষাপাত্র দিলেন)

গোপা। (আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে)—আজ সার্থক তুই রাহুল। এই ভিক্ষাপাত্রে কি আছে জানিস? সাত রাজার গুপ্ত ঐশ্বর্য্য ওতে গচ্ছিত আছে। (রাহুল কিছুক্ষণ ভাববিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর সারিপুত্র বালককে নিয়ে কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন)

তথাগত। গোপা! সার্থক হোক তোমার জীবন। (নেপথ্য হতে ত্রিশরণ মন্ত্রের অস্ফুট রেশ শোনা যাচ্ছে।)

গোপা। (তথাগতের পায়ে মাথা রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে) প্রভু! প্রভু তথাগত। (নেপথ্যে ত্রিশরণ মন্ত্র তীব্র হয়ে উঠল···বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল···গান শোনা যায়।)

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান—ঋষিপত্তন সঙ্ঘারাম। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রি। যোগাসনে প্রভু তথাগত উপবিষ্ট, মারের প্রবেশ।]

মার। হে তপোধন—আমার শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ কর দেব। কঠোর তপোবলে—পবিত্র জীবনের এক মহান্ আদর্শে তুমি নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছ। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করার সাধ্য আমার নেই।—হে মহান্—হে জগজ্জ্যোতি তপোবলে জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করো না। হে মহামহিম, তোমায় নমস্কার! হিংসা-জর্জ্জর, কলুষ-কালিমালিপ্ত মানুষ গভীর নৈরাশ্যের মাঝে তোমায় স্মরণ করে পাবে আনন্দ, আশা ও শান্তির অভয় মন্ত্র। দেব আমার অনুরোধ—

তথাগত। (যোগারূঢ়াবস্থায়) তোমায় চিনেছি। উপলব্ধি করতে পেরেছি তোমার অন্তরের অভিলাষ।

মার। প্রভু তথাগত!

তথাগত। তোমার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই। শঙ্কিত হয়ো না, জগতের কোন নিয়ম ও শৃঙ্খলায় আমি বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই না। আজকের এই পরম লগ্নে আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আজ হতে তিন মাস পরে এই পূর্ণিমা তিথিতেই আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করব।

(প্রতিজ্ঞা শুনে পৃথিবী কম্পিত হল)

মার। প্রভু তথাগত। (মারের অন্তর্দ্ধান) (প্রভাত হয়ে এল। পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্য উঠেছে। সঙ্ঘারামের সকল শিষ্য ত্রিশরণ গাইলেন) কাশ্যপের প্রবেশ।

তথাগত। শিষ্য কাশ্যপ। তোমরা এইবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মশরণ হও, মুক্তির জন্য আত্মনির্ভরশীল হও। এই সঙ্ঘারামের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব আজ তোমার উপর অর্পণ করছি।

কাশ্যপ। কেন প্রভু?

তথাগত। আগামী তিন মাসের মধ্যে আমাকে আমার সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। আগামী পূর্ণিমাতিথিতে আমি পরি-নির্ব্বাণ লাভ করতে চাই বৎস! এইবার আমাকে বিদায় নিতে হবে।

কাশ্যপ। না, না, প্রভু। আপনার বিরহ আমরা সহ্য করতে পারব না।

তথাগত। আমার পরিনির্ব্বাণ হলে বৃথা শোক করো না বৎস! এই বিরহ জগতের নিয়ম। শোককে সহ্য করবার জন্ত সংস্কারমুক্ত হও। অবিহিংসা-সঙ্কল্পপরায়ণ শীলবান ভিক্ষু কখনও শোক করেন না।

'অহিংসকা যে মুনয় যো নিচ্চং কায়েন সংবুতা
তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা না সচরে।'

কাশ্যপ। প্রভু, আমরা আপনার উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করেছি। কিন্তু—

মৌদগল্যায়ণ। প্রভু আপনি আমাদের প্রাণ হতেও প্রিয় তাই সহসা—

সারিপুত্র। শীলের প্রতি আমরা আস্থাবান তবুও আপনাকে হারানোর মত নির্ম্মম আঘাত আর কিছু নেই।

উপালী। আরও কিছুদিন জগতকে উপদেশ দান করুন।

তথাগত। বুঝতে পেরেছি, তোমরা শোকার্ত্ত হয়েছ। স্মৃতি, মার্গ, ধ্যান, সমাধি, সমাপত্তি প্রভৃতি সমস্ত পূত ধর্ম্মের আধার শীল। শীলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তির শোক নেই, শঙ্কা নেই, ভয় নেই, প্রয়োজন নেই। বৎসগণ, তোমরা শোককে পরিহার কর। প্রিয় হতে শোক, ভয় হতে শোক উৎপন্ন হয়। কাজেই তোমরা প্রিয়বিমুক্ত হও, শোকের সংস্কার হতে মুক্ত হও! কিসের শঙ্কা তোমাদের? কিসের ভয়? এই নাও আমার স্মৃতিবিজড়িত দেহবাস। এই দেহবাসের দায়িত্ব, সঙ্ঘারামের দায়িত্ব তোমরা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ কর। আমি আজই আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন এদের নিয়ে পরিক্রমা সুরু করব। অনেক রাজ্য আমায় পরিভ্রমণ করতে হবে···সময় ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। আজ এই সঙ্ঘারাম হতে বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আমি কি দেখতে পাচ্ছি জান?—তোমাদের এক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এক পবিত্র ভাস্বর আদর্শের দীপ্ত মহিমা। জম্বুদ্বীপের প্রতিটি দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষই শ্রদ্ধাবনত শিরে গ্রহণ করেছে এই ত্রিশরণ মন্ত্র।···আমি দেখতে পাচ্ছি ত্রিশরণ মন্ত্রের এক মহা-প্লাবন—নিখিল বিশ্ব সেই প্লাবনে পরিস্নাত হয়ে গ্রহণ করেছে তোমাদের আদর্শ। সূর্য্যরশ্মির মত অজ্ঞানের তমসাকে নাশ করে এই মন্ত্র সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, রাজা-প্রজা, দীন-দুঃখী-দরিদ্র সকলে নিঃসঙ্কোচে ত্রিশরণের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে··· জগতে তোমরা জয়ী হয়েছ।

(শিষ্য কাশ্যপকে নিজের দেহবাস দান করলেন, প্রভু তথাগত। শিষ্যগণ সকলে প্রভু তথাগতকে প্রণাম করলে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।)

সূত্রধর। (নেপথ্য হতে) ওঁদের যাত্রা হ'ল সুরু। সেই মহাপরিক্রমা। ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন প্রভু তথাগত। সঙ্গে শিষ্য আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন উপালী, যশ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ। তাঁরা ঐ পবিত্র ভাস্বর-আদর্শের দীপ্ত মহিমা প্রচার করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। আম্রপালী হতে বৈশালী, বেলুব গ্রাম ধীরে ধীরে অতিক্রম করলেন ওঁরা। শ্রাবস্তীতে এসে শিষ্য সারিপুত্রের তিরোভাব ঘটল। মৌদগল্যায়নও বিদায় গ্রহণ করলেন নির্ব্বাণ-লাভ করবার জন্ত।···এই সময় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন প্রভু তথাগত। রোগে জীর্ণ হয়ে আসছে তাঁর দেহ, তবুও ক্লান্ত পদে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেছেন ভণ্ড গ্রামের দিকে। ওঁরা ক্রমশঃ অতিক্রম করলেন হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম, চম্পানগরী ···কৌশাম্বী, কোশল প্রভৃতি। প্রভু তথাগতের পরিনির্ব্বাণের সময় সমাগত জেনে প্রভুকে শেষ দর্শন করবার মানসে দেশ-দেশান্তর হতে সমবেত হতে লাগলেন শিষ্যগণ! ভোগনগর অতিক্রম করে ওরা সমুপস্থিত হলেন আজ পাবাগ্রামে···।

[মঞ্চ আলোকিত হ'ল]

চণ্ড। আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য দেব। পিতৃপুরুষের বহু পুণ্যফলে আজ আমার গৃহ আপনার পদরেণুস্পর্শে পবিত্র হয়েছে। কিন্তু প্রভু, আমি দীন অন্ত্যজ চণ্ডালের পুত্র, অন্ত্যজ কি প্রকারে কোন্ উপচারে আপনার সেবা করবে? আমার স্পর্শ যে দূষিত প্রভু!

তথাগত। তুমি আমার বন্ধু চণ্ড। আজ তোমার সেবায় আমি পরিতৃপ্ত হতে চাই। তুমি অন্ত্যজ নও বন্ধু, তোমার হৃদয় আছে, তোমাতে আমাতে আজ কোন প্রভেদ নেই, তুমি বিনয়ী তাই তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি অতিথিপরায়ণ, তাই তুমি ব্রাহ্মণ হতেও উত্তম।

চণ্ড। প্রভু তথাগত। (চণ্ড চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে থালায় করে শূকরমদ্দব নিয়ে এল) অন্তকিছু সংগ্রহ করতে পারলাম না দেব! অধম অন্ত্যজের নিকৃষ্ট সেবায় পরিতৃপ্ত হোন প্রভু!

তথাগত। হোক এ শূকরমদ্দব। তবু আজ আমি নিঃসঙ্কোচে এই আহার গ্রহণ করছি, দাও—দাও।

(প্রভু তথাগত শূকরমদ্দব আহার করলেন। আর একবার মানবপ্রেমের বিজয়দুন্দুভি বেজে উঠল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল)

সূত্রধর। কিন্তু চণ্ডপ্রদত্ত ঐ শূকরমদ্দব গ্রহণ করে প্রভু তথাগত মারাত্মক রক্তামাশয় পীড়ায় আরও জীর্ণ হতে লাগলেন। সমস্ত শরীর তাঁর বিবাক্ত হয়ে উঠল। ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলেন প্রভু তথাগত। শরীর রোগে ও পথশ্রমে ক্লান্ত।··· আর অগ্রসর হতে পারছেন না, তবুও তিনি প্রিয় শিষ্য আনন্দের স্কন্ধে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পাবাগ্রাম হতে মাত্র বারো মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে অনেক সময় অতিবাহিত হ'ল। পথিমধ্যে বারবার তাঁকে ক্লান্তি অপনোদন করার নিমিত্ত বিশ্রাম নিতে হ'ল। অবশেষে দিবাবসানের রক্তরাগ যখন দিগন্তের অন্তরালে বিলীন হ'ল, তখন কুশীনারা গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন

প্রভু তথাগত। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন প্রভু তথাগত। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। শিষ্যগণ সান্ধ্যমাঙ্গলিক ও ত্রিশরণ গাইলেন··· বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি··· সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। পূর্ণিমার তিথি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হ'ল। রজতশুভ্র জ্যোৎস্নার প্লাবনে স্নাত হয়ে উঠল সমগ্র চরাচর।

(মঞ্চ আলোকিত হ'ল)

আনন্দ। আমাকে সবকিছু সহ্য করবার ধৈর্য্য দান করুন প্রভু! কোথায় আপনার পরিনির্ব্বাণের ব্যবস্থা করব অনুগ্রহ করে আমায় নির্দ্দেশ দিন। আপনার মনোমত কোন্ স্থানটি নির্ব্বাচন করব বলুন দেব! সেকি চম্পানগরী, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী···না বারাণসী?

তথাগত। এই সেই স্থান! কুশীনারা!

আনন্দ। কুশীনারা? (সহসা আনন্দ কেঁদে উঠল)

তথাগত। আনন্দ শোকের এই সময় নয়, সংস্কার হতে দুঃখের জন্ম, সংস্কার রূপ অজ্ঞানের অন্ধকার নাশের জন্য চাই সংস্কার-মুক্ত মন ও মানসিক দৃঢ়তা। পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণ শীলগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। আমি মহাসম্বোধিলাভের সময় সুজাতাপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেছি এবং পরিনির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে খেয়েছি চণ্ড প্রদত্ত শূকরমদ্দব। অহেতুক তোমরা চণ্ডকে দোষারোপ করো না! সে আমার হিতকামী, বন্ধু হতেও প্রিয়। তোমাদের আর কি কোন জানবার বিষয় আছে, আরও কি আছে কোন সংশয়?

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল)

সূত্রধর। শুভ্র জ্যোৎস্নাস্নাত ধরণীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রভু তথাগতের মুখনিঃসৃত শেষ উপদেশবাণী শুনল শিষ্যগণ। এই সেই আশ্বাসবাণী, উপদেশাবলী—দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ যে বাণী তিনি জগৎকে শুনিয়েছেন তারই সার মর্ম্ম ···শিষ্যগণের হৃদয় এক দুঃসহ বেদনার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। প্রভু তথাগত যোগাসনে গিয়ে বসলেন। ধরণী নিস্তব্ধ হ'ল। নিস্তব্ধ হ'ল কুশীনারা, সেই মূক শালবন, বিরাট অরণ্যানী···বিশ্বপ্রকৃতি! এল দূর হতে দিব্যসঙ্গীত ভেসে—

ফুল হতে দল ঝরে একে একে
প্রদীপের শিখা ম্লান।
অস্তাচলের তীরে যান চলে
অমিতাভ ভগবান।
সুন্দর দুটি আবৃত নয়নে
মৃত্যু কুহেলি নামিছে গোপনে।
তবুও আননে মধুর হাসিটি
রয়েছে অনির্ব্বাণ।
কুশীনগরের আকাশ বাতাস
করে শুধু হায় হায়।
মানবের চির কল্যাণকামী
যায়—চলে যায়।
অমৃতবাণী কণ্ঠে না ঝরে
মূক হয়ে হয়ে গেল চরাচরে
নিভল প্রদীপ মরণের ঝড়
হ'ল সব অবসান!
করুণাসাগর মুক্ত পুরুষ
লভেন নির্ব্বাণ!

(যবনিকা)

বসন্ত না জাগে যদি মনে

শ্রীস্নেহলতা দেবী

বসন্ত না জাগে যদি মনে,
বনেতে বসন্ত তবে, কেবল জানিতে পায়
বৃথা তার আসা অকারণে।
বৃথা তবে বিহগ কুজন, বৃথা বহে দখিনমলয়
বৃথা লোটে পুষ্পগুচ্ছ থরে থরে ওই,
ভ্রমর গুঞ্জন বৃথা বসন্ত সে কই,
বৃথা নব কচি কিশলয়।
মনের বসন্ত যদি নাহি দেয় সাড়া
বনেতে বসন্ত এলে যায় কি তা ধরা?

সে যে বড় দূরে বহু দূরে,
বৃথা তার যত আয়োজন
হৃদয় গুমরি কাঁদিয়া মরে সকরুণ সুরে।
ফুলে ফুলে ছাওয়া তরুতল,
শীতে যেন ঝরে তার জীর্ণ পত্রদল,
রিক্ত শূন্য নিঃস্ব সে বনানী।
বনের বসন্ত শুধু থাকে একা বনে,
বসন্ত না জাগে যদি মনে।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের হাসপাতাল

ড্রেস্‌ডেনে কয়েক দিন

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

সুইজারল্যাণ্ডের লুজানে যে বিশ্ব-মাতৃসম্মেলন হয়েছিল ১৯৫৫ সনে জুলাই মাসে, মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রতিনিধি হয়ে সে সম্মেলনে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সম্মেলনের শেষে প্রাগ্ হয়ে বার্লিনে গেলাম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণ পেয়ে। সেখান থেকে ১৯শে জুলাই প্রাতরাশের পর রিজার্ভ বাসে উঠে ষাট মাইল দূরে ড্রেসডেনে রওনা হলাম। আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গিনী ম্যাডাম থিয়া আর দোভাষী হান্‌সও আমাদের সঙ্গে চললেন। ষাট মাইল রাস্তা বাসে চড়ে যেতে বেশ খানিকটা কষ্ট হলেও দু'দিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল। আগেই শুনে এসেছিলাম যে, যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশী বোমা পড়েছিল এই ড্রেসডেনে। দু'দিকের ধ্বংসস্তূপ দেখে সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না। নির্বিরোধী স্বামী-স্ত্রী প্রিয় পুত্রকন্যাকে নিয়ে সজ্জিত সুন্দর বাসগৃহে যে সুন্দর সুখের স্বপ্নকল্পনা পেতে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বাস করছিলেন, অতর্কিতে একদা উচ্চাকাশ হতে নিক্ষিপ্ত মৃত্যুবাণ নেমে এসে এক নিমেষে সেই আশা-আনন্দে সমুজ্জ্বল সংসারটিকে তছনছ করে দিয়েছিল।

ড্রেসডেনে পৌঁছে ওয়াল্ড পার্ক হোটেলে উঠলাম। এই ক'দিনেই আমাদের আবুহোসেনী কায়েমী হয়ে এসেছে, তাই হোটেলটি বিশেষ পছন্দ হ'ল না। রাজধানী থেকে দূরে হলেও ড্রেসডেন ছোট শহর নয়। অবশ্য গাছপালার শ্যামলতা জায়গাটাকে পল্লী-পরিবেশসমন্বিত করে তুলেছে। তখন ভোর হতে দেরি নেই। হঠাৎ যেন সুখ-স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠলাম। এ কি শুনলাম? এ কি সত্যি না স্বপ্ন? না, স্বপ্ন নয়, সত্যি পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। আমাদের দেশের পাখীর ডাকের মতই মিষ্টি ডাক। কোন গাছের পাতার নীচে লুকিয়ে কোন্ পাখী ডাকছে। গলার সুরের মত তার দেহের সৌন্দর্য্যও আমাদের দেশের পাখীর মত কিনা কিছুই জানা গেল না; তা না-ই যাক্—তবু মিষ্টি সুরটুকু কানের মধ্যে মধুবর্ষণ করতে লাগল।

পল্লীর মাধুর্য্য থাকলেও ড্রেসডেন বেশ বড় শহর। বড় বড় দোকান-বাজার, প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে বিরাট সৌধশ্রেণী, ট্রাম-বাস কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু রাস্তায় ভিড় অল্প, তাই ট্রাম-বাসও চলে কম। এখানে গোলাপের খুব বাহার। ডালের একটি বোঁটায় একটিমাত্র গোলাপ দেখতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু এখানে আমাদের দেশের অতসী-করবীর মত, এক বোঁটায় থোকা থোকা গোলাপ। নানা বর্ণের মখমল দিয়ে যেন ফুলগুলি তৈরী হয়েছে। এমন সুন্দর ফুলে কিন্তু গন্ধ নেই।

এখানকার এলব নদীর এপার-ওপার সর্ব্বদাই লোকভরতি স্টীমার চলছে। এখানকার একটি চার্চ আর পিক্‌চার প্যালেস দেখতে গেলাম। কিন্তু পূর্ব্বের খ্যাতিকে এই ধ্বংসস্তূপ যেন এখন পরিহাস করছে। পিক্‌চার প্যালেসে শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে কি নৃশংসভাবেই না ধ্বংস করা হয়েছে। এইসব খণ্ডবিখণ্ড ভাস্কর্য্য মূর্ত্তিকে তাদের পুরাতন চিত্র দেখে আবার সংস্কার করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে অর্থ আর শিল্পী দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন খুব সাহায্য করছে। বড় বড় কৃত্রিম ঝরণাও দেখা গেল। কিন্তু এই সব

শিল্পকলা যে আমাদের দেশের চেয়ে বিশেষ উন্নততর তা মনে হয় না। রাস্তায় একখানা বড় পাথরের উপরে বড় করে 'এন' লেখা আছে, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নাকি এই পাথরের উপরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচালিত 'রেলওয়ে পাইওনীয়ার' দেখতে ও চড়তে গেলাম। দরজা-জানালা আর ছাদহীন ছোট ছোট কয়েকখানা বগী দিয়ে ছোট্ট একখানা ট্রেন। গাড়ী চালানো ছাড়া সবই ছোটরা করে। এই ট্রেন থেকে ডাক্তার দাশগুপ্তের নোটবইখানা পড়ে গেল। কত যত্ন করে এই বিদেশের তথ্য সব ঐ নোটবুকে সঞ্চয় করা হয়েছিল। ঝুক ঝুক করে ট্রেনখানা ষ্টেশনে গিয়ে থামলে আমরা টিফিন খেতে হোটেলে গেলাম। ডাক্তার হারানো নোটবুকখানা সেখানেই এসে উপস্থিত। পাইওনীয়ারের ছেলেরা সেটা পেয়ে ফেরত দিতে এসেছে। তার উপরে জার্মান ভাষায় লেখা আছে, "ড্রেসডেনের ছেলেরা তোমাকে দিল।" পাহাড়ের উপরে একটা রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হ'ল দার্জ্জিলিঙে এসেছি। নীচে বয়ে চলেছে নদী, ঢেউ তুলে ষ্টীমার চলেছে, রাস্তাঘাটে মানুষ চলেছে, সবই ছোট ছোট দেখা যায়। এখানকার ছবি আঁকা পোষ্ট কার্ড আমাদের দেওয়া হ'ল, আমরা ওখানে বসেই দেশে চিঠি লিখে পাঠালাম।

পরদিন ২১শে সকালে প্রাতরাশ সেরেই আমরা ষ্টীমারে করে নদীতে বেড়াতে গেলাম। ষ্টীমার চলার শব্দের ছন্দের তালে তালে ব্যাণ্ড বাজতে লাগল। তীরে তীরে দেখা যায় খালি-গায়ে খালি-পায়ে শুধু প্যাণ্ট পরে বড় বড় বালক ও শিশুরা ঘাসের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এটা নাকি ওঁদের গ্রীষ্মকালের রৌদ্র উপভোগের প্রণালী। আমাদের দেশে তখন বর্ষাকাল, ওখানেও মাঝে মাঝে মেঘলা হয়ে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও এই সময়টাই ওখানকার গ্রীষ্মকাল। দু'পাশেই সেই সুবিস্তৃত উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতের চূড়ায় পিঁপড়ের সারির মত অনেক মানুষ দেখা যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে ওঁরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন। দুরন্ত বরফ-পড়া শীতের দেশে এই রোদটুকু পেয়ে সকলেরই কি যে আনন্দ। যেমন করে পারছে ঋতুর এই প্রসন্নতাটুকু লুটেপুটে নিচ্ছে।

এক ষ্টেশনে নেমে একটা বড় ক্যাসেলে গেলাম। শোনা যায়, হিটলারের সময়ে এটা পাগলাগারদ ছিল, অর্থাৎ বেকার লোকদের পাগল অপবাদ দিয়ে এখানে এনে অত্যাচার করে পাগল বানিয়ে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা হ'ত, দেশে বেকার লোক নেই এই কথা প্রমাণ করবার জন্য। এখন এখানে সোভিয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারেরা থাকেন।

একটা নূতন জিনিষ দেখা হ'ল—'নাইট সেনেটরিয়াম।' শ্রমিক কৃষকেরা সারাদিন কাজ করে প্রয়োজন হলে সন্ধ্যাবেলায় এখানে চলে আসে। এখানে খাদ্য, চিকিৎসা, বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ সবরকম ব্যবস্থাই আছে। রাত্রিটুকু থেকে একটু চাঙ্গা হয়ে সকালে আবার ওরা কাজে চলে যায়। যাদের অল্পস্বল্প অসুখ, তাদেরই এখানে চিকিৎসা হয়, বেশী হলে নিশ্চয়ই তারা হাসপাতালে যায়। এদের খরচ ষ্টেট আর বড় বড় ফ্যাক্টরী থেকে দেয়।

তার পর যেখানে গেলাম, তাকে আশ্রম বলাই সঙ্গত। কোরিয়া যুদ্ধে মা-বাপকে হারিয়ে যে সব ছেলেমেয়ে অনাথ হয়েছে, তাদের অনেকে এখানে থেকে মানুষ হচ্ছে। তের-চৌদ্দ বছরের বেশী তাদের বয়স নয়, ছোটও আছে। এদের ব্যয়ভার ষ্টেটই বহন করে। তারা ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের কাছে এগিয়ে এল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আন্তরিকভাবে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। প্রত্যুত্তর দিয়ে আমরাও ওদের অনেক প্রশ্ন করলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা যেন আমাদের নিতান্ত আপন হয়ে উঠল। ওরা আর আমরা একই মহাদেশের বাসিন্দা এই কথা

ড্রেসডেন নগরীর একটি দৃশ্য

বোমা-বিধ্বস্ত ড্রেসডেনের একাংশ

ভেবেই বুঝি ওরা আমাদের আত্মীয় করে নিতে চেয়েছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে, বড়রা সিঁড়িতে ওঠা-নামায় সাহায্য করে, ফুলের তোড়া তুলে দেয় আমাদের হাতে। কয়েকটি ছেলে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শুয়েছিল, তারাও আমাদের দেখতে চাইল। আমরা গিয়ে ওদের আদর করে আমাদের ফুলের তোড়াগুলি দিয়ে দিলাম। সুস্থ ছেলেরা দল বেঁধে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত এল আমাদের বিদায় দেবার জন্য। ওদের জন্য কোন খাদ্যদ্রব্য আনি নি বলে আমাদের খুব আপসোস হ'ল। ওদের ছেড়ে আসতে অনেকেই কেঁদে ফেললেন।

'ছেলেদের হোটেল' আর একটা নূতন জিনিষ। এ হোটেলে ছোটরাই মুখ্য, গৌণ তাদের অভিভাবকেরা। অন্যান্য হোটেলে বহুসংখ্যক অভিভাবকের সঙ্গে দু'চারটি ছেলেমেয়ে থাকে, এখানে অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে দু'চারটি বয়স্ক অভিভাবক আছেন। এখানে এই রকম নানা ব্যাপারেই বোঝা যায় যে, ছোটদের জন্য ভাল ভাবে, ছোটদের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা করাই এদেশের সবচেয়ে বড় কাজ। ছোটরাই জাতির উৎস, এ কথা তারা মনে-প্রাণে স্বীকার করে! এ হোটেলে আমাদের সবংৎ খেতে দিল।

২৩শে—কয়েকটি প্রসূতিসদন দেখতে গেলাম। সন্তান-সম্ভাবিতা হওয়ার পর প্রসূতির প্রাথমিক অবস্থার জন্য যে হাসপাতাল সেখানে প্রসূতি তিন মাস পর্যন্ত থাকেন। তারপর দ্বিতীয় অবস্থায় যান অন্য একটি হাসপাতালে, সেখান থেকে যে হাসপাতালে যান, সেখানেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই, প্রয়োজন অনুসারে প্রসূতি থাকতেও পারেন, বাড়ীতে চলে যেতেও পারেন। এর খরচ ষ্টেটই বহন করে, তবে সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু এরাও দিয়ে থাকেন, তবে সে সম্বন্ধে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

হাসপাতালগুলিতে কত আলো কত বাতাস, প্রসূতিদের প্রসন্ন ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে থাকবার কত ব্যবস্থা! মনে পড়ে আমাদের দেশের দরিদ্র প্রসূতিদের কথা! কি অনাদর, কুণ্ঠা আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই না তাঁদের দিন কাটে! সন্তান ধারণের সূচনাতেই ভয় ভাবনায় তাঁরা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠেন। অনাগত সন্তানের অভিনন্দনের প্রস্তুতি করা দূরে থাক, যে বিধাতা তাকে পাঠিয়েছেন মনের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জমে ওঠে।

যে মায়েরা দিনান্তে পেট ভরে দুটি খেতে পায় না, তাদেরই পেটের শিশু দেশের মেরুদণ্ড বলে নেতারা ঘোষণা করেন, আর বছরে একবার দু'বার শিশু-উৎসবের ঢক্কানিনাদ করে তাঁদের কর্তব্য সমাপ্ত করেন! আমাদের দেশে বর্তমানে দুটি ছেড়ে চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছে শুনলেই লোকে আতঙ্কে চমকে ওঠে। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্তা মুক্তাকুমার নামে একটি মেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দশটি সন্তান শুনে ওদেশের মেয়েরা খুশীতে ডগমগ করতে লাগলেন; মুক্তাকে 'হিরোইন মাদার' খেতাব দিলেন, আর তাঁর বাচ্চা ছেলেমেয়ের জন্য অনেক খেলনা দিলেন। শিশুদের 'ক্রেশ'ও অপূর্ব সৃষ্টি। আমাদের দেশের যে সব মায়েরা বাইরে বেরিয়ে কাজকর্ম করতে বাধ্য হন, (আর আজকাল অনেকেই বাধ্য হয়েছেন) তাঁদের শিশু সন্তানদের রক্ষা করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ মায়েরাই অশিক্ষিতা ঝিয়ের কাছে সন্তানদের রেখে যান। সে ঝি শিশুর সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করে।

এখানে প্রতিটি ফ্যাক্টরীর কাছে কাছে আর শহরের নানা স্থানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এইরকম অনেকগুলি ক্রেশ আছে। সেখানে কুড়িটি শিশুর জন্য একজন করে শিক্ষিতা নার্স আছে। শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার, আমোদ-প্রমোদের প্রচুর আয়োজন আছে সেখানে। শিশুর-জীবনের অঙ্কুর যাতে কোনমতে ক্ষতিগ্রস্ত না

হয় তার সতর্ক ব্যবস্থা আছে। কোন কোন ক্রেশে মা সকালে কাজে যাবার সময় শিশুকে রেখে যান, সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে তাকে কাছে নিয়ে যান। কোন কোন ক্রেশে সোমবার সকালে কাজে যাবার সময় রেখে যান, নিয়ে যান সপ্তাহ-শেষে শনিবারে। ছ' মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের কাছেই থাকে, কারণ তখন তারা মায়ের স্তনপান করে। এখানকার খরচ প্রধানতঃ ষ্টেট দেয়, মায়েরাও যৎসামান্য দেয়। আমরা সকালে গিয়েছিলাম, দেখলাম রেলিং দেওয়া ছোট ছোট খাটে চুষি মুখে দিয়ে কেউ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, কেউ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ বালিশে মাথা রেখেই পিট পিট করে তাকাচ্ছে, এখনো ভাল করে তার ঘুম ভাঙে নি। আমাদের দেখে কেউ হাসল, কেউ কাঁদল। একটি বছরদুয়েকের ছেলে 'পটে' বসেছিল, নার্স তাকে পরিষ্কার করে ইজের পরিয়ে দিলে সে টলতে টলতে আমাদের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করতে লাগল। সেদিন শনিবারের সকাল, কয়েকজন মা বাড়ী থেকে নিয়ে আসা জামা ইজের পরিয়ে ছেলেদের নিয়ে গেলেন। নার্সের কোল থেকে মায়ের কাছে যেতে ছেলে কাঁদে। এই ক'দিনেই সে তার মাকে ভুলে গেছে।

এদের জামা ইজের সবই দেখলাম মেশিনে কাচা হচ্ছে গরম জলে। বাসন কাপড়-চোপড় সবই এখানে গরম জলে ধোয়া হয়, রোগবীজাণু ছড়াবার পথঘাট এইরূপে বন্ধ করা হয় বলেই ওখানে সংক্রামক রোগ কম হয়। একটা ঘরভর্তি ওদের খেলনা। নিজেদের ইচ্ছামত তারা খেলা করছে। ভারতবর্ষ থেকে আমরা একঝুড়ি কাঠের খেলনা নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো ওদের দেওয়া হ'ল। এখানে শিশুরা তিন বৎসর পর্যন্ত থাকে, তার পর চলে যায় কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে। ২২শে— গেলাম আমরা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল হাউসে। কাউন্সিলার আমাদের আমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। জাঁকজমকপূর্ণ কাউন্সিল হাউসে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ সম্মেলন হ'ল। বহু লোকসমাগম হয়েছিল, প্রচুর আহারেরও আয়োজন হয়েছিল। ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে পরস্পরের করমর্দন হ'ল। ওঁরা আমাদের অভিনন্দন জানালেন, প্রত্যুত্তরে আমরাও ধন্যবাদ জানালাম। খাবার-টেবিলে প্রচুর প্রশ্নোত্তর হ'ল। প্রশ্ন করে আমরা জানলাম যে, সেখানে সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রির সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। এদের সর্বনিম্ন বেতন দুই শত টাকা।

বেসরকারী শিল্পকারখানার সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ। ঐ সব ফ্যাক্টরীকে সরকার সাহায্য করেন। এই ফ্যাক্টরীতে মহিলারাও কাজ করেন। বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলিতে মহিলাকর্মীর সংখ্যাই বেশী। এই সব মেয়ে কর্মী প্রসবের পূর্বে ছয় সপ্তাহ আর প্রসবের পরে পাঁচ সপ্তাহ পূর্ণ বেতনে মেটারনিটি ছুটি পান। তা ছাড়া শিশু অথবা মা অসুস্থ হলেও তাঁদের পূর্ণ বেতনে ছুটি দেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আনুষঙ্গিক খরচপত্র ছাড়াও মায়েরা মাসে পঞ্চাশ মার্ক করে সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকেন। তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তানের জন্ত যথাক্রমে ১০০ ও ১৫০ মার্ক সাহায্য আসে সরকার থেকে।

যানবাহন বিভাগে আর ডাক্তার অথবা নার্সের কাজে মেয়েরা নাইট ডিউটি করে। কৃষি, মজুরি, চিকিৎসা, সেবা, যানবাহন পরিচালনা সবরকম কাজই মেয়েরা করেন। এখানে ব্যক্তিগত ভাবে কেউ চাষ-আবাদ করে না, সমবায় ব্যবস্থায় কাজ হয়। দুই-পঞ্চমাংশ চাষের কাজ মেয়েরাই করেন। চাষে যে শস্য হয়, তার থেকে দশ ভাগের এক ভাগ সরকারকে দিতে হয়। উৎপাদন ভাল না হলে সরকার সাহায্য করেন। চাষী আর শ্রমিককে সরকার কি কি সাহায্য করেন প্রশ্ন করাতে ওঁরা বললেন, চাষী আর শ্রমিকেরই রাজত্ব, তারাই রাজত্ব চালায়, সরকার তাদের কতটুকু সাহায্য করেন এ প্রশ্নের কোন মানে হয় না। তারা সবরকম সুবিধা আর সাহায্যই পায়। ছেলেদের শতকরা ৮০ ভাগই চাষী। চাষের জন্ত বৃহৎ যন্ত্রপাতি সব সরকার দেন, তবে ছোটখাটো মেশিন তারা নিজেরাও কেনে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, এখানে শিশুদের সাধারণ রোগ খুব কম হয়। মহামারী নেই। ড্রেসডেন শহরে কুড়ি লক্ষ লোকের বাস। শিশুদের জন্ত এখানে

গীর্জার ধ্বংসাবশেষ

অসংখ্য লোক এসেছে। আমরা প্যালাবিতে গিয়ে বসলে আমাদের হাতে হাতে আঁকা কাগজের পতাকা দেওয়া হ'ল। রুশ-নেতারা রুশ ভাষায় বক্তৃতা করলেন। বার্লিনের নেতারাও তাঁদের ভাষায় বললেন। এদের বক্তৃতা খুব সংক্ষিপ্ত, দীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতাকে এরা ক্লান্ত করে ফেলেন না। এত বড় সভা, কিন্তু শেষ হয়ে যেতে দেরি হ'ল না। বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভ দূর থেকে টুপি খুলে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানালেন। আমরাও জানালাম।

সংগ্রাম ও শান্তি

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শোষণে নিষ্পেষণে যারা চিরলুণ্ঠিত
উপেক্ষা যাহাদের সজ্জা,
অন্নবস্ত্রহারা যাহারা শান্তিহীন
বয়ে চলে স্বজাতির লজ্জা।
যাদের জীবন ঘিরে অজস্র করভারে
অসহ্য দৈন্যের হাহাকার,
দ্রব্যমূল্য চাপে নিত্য মৃত্যুমুখে
ভেসে যায় যাহাদের সংসার।
তারা যদি হেঁকে কয়—"আমরা শান্তিবাদী
আমরা চাহি না কোনো সংগ্রাম,"
তাহারা জীবন্মৃত মানসপক্ষাঘাতী
তাদের এ বাক্যের নেই দাম।
যাদের নারীরা হায় ঘরে ঘরে লাঞ্ছিতা
পতির জুতার তলে পিষ্ট,
ধনীর বিলাস ভোগ পূজার বলির লাগি'
যাহারা হয়েছে হেথা সৃষ্ট।
লক্ষ দুর্দ্দশাতে জীবনটা তচ্ নচ্
হাঁকে তবু শান্তির ভাষ্য,
স্বয়ং শান্তিদেবী তাদের বাক্য শুনি
নির্ব্বোধ ভাবি করে হাস্য।

দুর্দ্দশা থেকে যারা জাতিকে মুক্ত করি'
স্বদেশকে করিয়াছে স্বর্গ,
জন্মভূমিকে যারা সম্পদময়ী করি'
লভিয়াছে স্বজাতির বর গো;
শান্তির উৎসবে তাহাদেরি অধিকার
তাহারাই শক্তির সন্তান,
গাহিবে পৃথ্বী ঘিরে গর্ব্বে উচ্চ শিরে
তাহারাই শান্তির জয়গান।

ভেজাল খাদ্য খেয়ে দুর্নীতি বহি' তার
নির্ব্বিকারের যারা যাত্রী,
তাদের লাগিয়া নয় শান্তির দিবালোক
তাদের লাগিয়া অমারাত্রি,
অপরাধ করে যারা তাদের চেয়েও পাপী
অপরাধ সহে যারা নিত্য,
সহিয়া অত্যাচার শান্তির গান গাওয়া
জীবন্মৃতেরি তাহা নৃত্য।
আত্ম ফাঁকীর এই মেকী ভুয়া শান্তির
বন্ধ করেছে ভাই জয় গান,
ঐ দ্যাখ্ সম্মুখে আসন্ন মৃত্যুর
ধাক্কায় হবি যে রে খানখান।

দুর্নীতি নাগপাশে দারিদ্র্যে দহে যারা
আগে চাই তাহাদের যুদ্ধ,
দুঃখের মুক্তির মন্ত্রের সিদ্ধিতে
আগে ভাই হওয়া চাই শুদ্ধ
বন্দুক তোপ নয় আত্মার তেজ দিয়া
দুর্জ্জয় এই অভিযান রে,
ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে দুর্নীতি রণজয়
স্বার্থের এ যে বলিদান রে।
শান্তির কথা হেঁকে জীবন্মৃতের মত
শ্মশানে নাচার ভাই নেই দাম,
লক্ষ সর্প ফণা উদ্যত সম্মুখে
তার সাথে আগে চাই সংগ্রাম।
জাতির দুর্দ্দশাকে বহি' চলা অপরাধ,
ইহা পাপ—ইহা মহাভ্রান্তি,
আগে চাই সংগ্রাম—বাঁচিবার সংগ্রাম—
তার পর চেয়ো ভাই শান্তি।

বাংলা ভাষায় 'রাগসঙ্গীত'

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীতের 'বাণী' রচিত হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে ইতঃপূর্বে সামান্ত আলোচনা দুই-একজন সঙ্গীতজ্ঞ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সকলে মিলিয়া কোন পরিষদে এই বিষয়টি লইয়া বিশেষ আলোচনা হয় নাই। কাহারও মতে বাংলা ভাষায় রচিত গীত, মাটির ভাঁড়ের মত তাহার কাব্যসম্পদে সঙ্গীতের যাবতীয় রস শুষিয়া লয়, এজন্য সঙ্গীতের রস আশানুরূপ ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কাহারও মতে, রাগসঙ্গীতের প্রয়োজনীয় বোল আলাপ এবং বোল-তান ইত্যাদি রচনায় বাংলা ভাষা উপযুক্ত মাধ্যম হইতে পারে না। কিন্তু কেন বাংলা ভাষা রাগসঙ্গীতের উপযুক্ত মাধ্যম রূপে কৃতিত্বের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে না অথবা কোনদিনই পারিবে না, তাহা কেহ বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই।

দশম শতকের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। তৎপূর্বে প্রাকৃত, সংস্কৃত, মাগধী, সৌরসেনী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে রাগসঙ্গীত অথবা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নামে যে সঙ্গীত উত্তর-ভারতে প্রচলিত তাহা প্রাচীন সঙ্গীত নহে এবং তাহার ভাষাও বর্তমানে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা। সাধারণতঃ প্রচলিত রাগসঙ্গীতকে ক্লাসিক্যাল বলিয়া যাঁহারা আখ্যা দিয়া থাকেন —তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। অবশ্য একথাও আমরা অস্বীকার করিব না যে, পুরাতন সঙ্গীত ইহার অবয়বের ভিতরে কিছুমাত্র বর্তমান নাই। বিশেষ বিশেষ নিয়ম-সাহায্যে শব্দ বা তাদের যে রচনা প্রাচীন কালে সৃষ্টি করা হইত—এখনও প্রায় তদ্রূপই করা হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তনে ব্যক্তির পরিবর্তন হয় না সত্য, কিন্তু রূপের পরিবর্তন হয় একথা স্বীকার্য। প্রাচীন কালের রাগসঙ্গীত কবে, কেন ও কি ভাবে লুপ্ত হইয়াছিল তাহা গবেষণার বিষয়। বর্তমানে প্রচলিত রাগসঙ্গীত দেশী সঙ্গীত হইতে রাগরূপে পরিবর্তিত বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন সঙ্গীতের কিছু কিছু বাণীমাত্র এখনও পাওয়া যায়। কতকগুলি প্রাচীন সঙ্গীত শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত-রত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি নান্যদেবের 'ভরত ভাষ্য' নামক পুঁথি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। নান্য দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা; মিথিলায় আসিয়া তিনি কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তাঁহার স্বরলিপীকৃত সঙ্গীতগুলি প্রাচীন কর্ণাটক পদ্ধতির। এই গীতগুলির ভাষা সংস্কৃত। নান্যদেবের মার্গসঙ্গীতের দুই-একটি বাণী এখানে দেওয়া হইল :

> "রক্ষতু বিষমনয়ন দহন তীব্রতর তাপমনু ভবতঃ।
> কৃত মদন দেহভঙ্গং তৃতীয় নয়নোৎপলং শম্ভোঃ।
> ঝংটুং ঝংটুং
> মহাকপালধর কমল সংভব পরমার্থ বিভব
> সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম সনাতন পরম্।
> সকল সুরাসুর মুনিনায়ক কিংপুরুষবৃন্দ
> নিরতিশয় বদন সংস্তুত নিজ মহিমানম্॥"

উচ্চারণাদির নানাবিধ নিয়ম পালন করিয়া এই সকল বাণী পূর্বকালে মার্গরাগে গাওয়া হইত। এই জন্য সম্ভবতঃ স্বরগুলির ব্যবহারে অধিক বৈচিত্র্য প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ থাকিত না।

অধুনা-প্রচলিত রাগসঙ্গীতের বাণীগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহাদের অধিকাংশই হিন্দী ভাষায় রচিত। ইহা ব্যতীত উর্দ্দু, পঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষায়ও কিছু কিছু রাগসঙ্গীত রচিত হইয়াছে দেখা যায়। ইহা হইতে এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, যখন যে প্রদেশে রাগসঙ্গীতের চর্চা হইয়াছে, সেই প্রদেশের ভাষায়ও তখন দুই-চারিটি ঐরূপ সঙ্গীত সৃষ্ট হইয়াছে। লোচন পণ্ডিতের মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষাতেই মার্গরাগের অনুকরণে অসংখ্য রাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাই বর্তমানে দেশী সঙ্গীত অথবা রাগসঙ্গীত বলিয়া প্রচলিত।

"দেশ্যশ্চ তত্তদ্রাগাশ্রিতাস্তাস্তত্তদ্দেশ গীতগতয়ঃ।"

রাঃ তঃ

ইহা হইতে মনে হয় যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাতেই রাগসঙ্গীতের বাণী রচিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষাতেও যে হইয়াছিল তাহা 'চর্যাপদ'গুলির উপরে লিখিত রাগের নাম দেখিয়া বুঝা যায়। কতকগুলি টপ্পা বাংলা ভাষায় রচিত হইয়া গুণীসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম গীতরচনা করিবার সময়ে হিন্দী রাগসঙ্গীতের সুরের অনুকরণে অনেকগুলি ধ্রুবপদ, খেয়াল ইত্যাদি বাংলা ভাষায় রচনা করেন। ইহা ব্যতীত হিন্দী ভাষায় যাঁহারা সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদেরও দুই-এক জন বাংলা ভাষাতেও দুই-চারিটি রাগগীতি রচনা করিয়াছেন। আজ যে পরিমাণে রাগসঙ্গীতের

চর্চা বাংলা দেশে হইতেছে, এত অধিক আগ্রহ সহকারে আর কোন প্রদেশেই বোধ হয় রাগসঙ্গীতের চর্চা হয় না অথচ ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলা ভাষায় রাগ-সঙ্গীতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাংলা দেশের গুণীগণ কেন যে এখনও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই তাহা আশ্চর্যের কথা বটে। বোধ হয় নূতন রচনার কথা তাঁহাদের মনেই স্থান পায় না। 'রাগপ্রধান' গান নামে যে নূতন গান রাগের মধ্যে রাখিয়া সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহা উন্নত আধুনিক গান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই গানগুলি লক্ষ্য করিলেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাংলা ভাষায় রাগগীতি রচিত হইতে পারে।

হিন্দী ও বাংলা ভাষায় পার্থক্য কোথায়? হিন্দী ভাষা রাগসঙ্গীতের উপযোগী মাধ্যম কেন হইল? বাংলা ভাষার অনুপযুক্ততা কোথায়? সেই ত্রুটি দূর করা সম্ভব কিনা? একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রত্যেক সঙ্গীতেরই একটা উচ্চারণবৈশিষ্ট্য থাকে। ইহাকে সাঙ্গীতিক উচ্চারণ বলা হয়। কথ্য অথবা পুস্তকের ভাষার উচ্চারণ হইতে ইহা কিঞ্চিৎ পৃথক। রবীন্দ্র-গীতের উচ্চারণে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা বাদ দিলে অর্থাৎ অন্য রকমে উচ্চারণ করিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাধুর্য নষ্ট হয় ও সঙ্গীতের উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফল হয় না। শ্রোতার মনে যদি সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবটি দোলা দিতে না পারে তবে ত সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ মনে করা যাইতে পারে। এই জন্য একই গান কাহারও কণ্ঠে অতি মধুর এবং কাহারও কণ্ঠে গতানুগতিক বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'ও'কার 'ও'কার ও 'উ'কারের মাঝামাঝি একটি নূতন স্বরবর্ণ উচ্চারিত হয়; ঠিক তেমনি 'এ'কারের উচ্চারণে 'এ' ও 'ই'র মাঝামাঝি একটি স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ উচ্চারণে বাণী অতি শ্রুতিমধুর হয় এবং কণ্ঠস্বরেরও সাবলীল গতি বজায় থাকে। এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাধুর্য অনেকখানি কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কীর্তনগানে 'অ' ও 'আ'-কারের বাহুল্য দেখা যায়। অবশ্য অন্যান্য স্বরবর্ণগুলিও প্রয়োজনীয় রীতিতে উচ্চারিত হয়। এইরূপে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সর্বপ্রকারের সঙ্গীতেই 'বাণী'র উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তারে বিশেষ রূপে সহায়তা করে।

কেবলমাত্র রাগসঙ্গীতেই নহে, পরন্তু সর্ববিধ সঙ্গীতেই স্বরবর্ণগুলির অর্থাৎ অ, আ, ই, উ, ও ইত্যাদির উচ্চারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী হেল্মহোলজ দেখাইয়াছেন যে, সঙ্গীতে ব্যবহৃত শব্দ বা নাদগুলি কোন-না-কোন স্বরবর্ণের উচ্চারণজ্ঞাপক হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সঙ্গীতের শাব্দিক স্ফুরণের সম্বন্ধ খুবই কম। তবে রাগসঙ্গীতে স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ প্রাঞ্জল করিবার জন্য জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উচ্চারিত দন্ত্যবর্ণ ত, দ, ন এবং র প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ উহার সহিত ব্যবহার করা হয়। তাই উচ্চ-প্রতীকের আলাপে তে, নে, রে, নেতা, তোম্, নোম্, তুম্, মুম্, রিরেনা, তেনেরি, ইত্যাদি শব্দাংশ ব্যবহারে প্রচুর সুফল ফলিতে দেখা যায়। খেয়াল গানের আলাপে সাধারণতঃ 'আ'কার অথবা গানের বিশেষ বিশেষ শ্রুতিমধুর বাণীগুলিই ব্যবহার করা হয়। উপরে লিখিত বোলগুলি (তে, নে, রি, নোম্ ইত্যাদি) বাংলা ভাষাতেও আছে। কাজেই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে রাগসঙ্গীতে যে উচ্চপ্রতীকের আলাপ অর্থাৎ 'অনিবদ্ধ গান' প্রচলিত আছে তাহা বাংলা ভাষা ব্যবহারে হইতে পারে।

রাগসঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ হইতেছে 'আ' এই স্বরবর্ণটির। এই 'আ'কারটি ঠিক এরূপ ভাবে কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া উচ্চারণ করা প্রয়োজন হয় যাহাতে কণ্ঠস্বরের গতি মুহূর্তমধ্যে ইচ্ছানুরূপ উচ্চ বা নিম্ন দিকে দ্রুত চালনা করা সম্ভব হয়। হঠাৎ একটি তান অতি দ্রুত 'তার'-ষড়জ হইতে মধ্য ষড়জ পৌঁছাইয়া দিতে হইবে—এইরূপ আবশ্যক। এই 'আ'কারটি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে উচ্চারিত না হইলে তাহা সম্ভব হয় না। তখন এই 'আ'কারটির উচ্চারণ 'আয়' এইরূপ শোনায়। দ্বিতীয়তঃ এই 'আ'কার সঠিক ভাবে উচ্চারিত না হইলে গায়কের নিজের কণ্ঠস্বর নিজেরই কানে 'ঝা ঝা' করিতে থাকে, তানপুরার সুর তাঁহার পক্ষে শোনা কঠিন হইয়া পড়ে এবং প্রকাণ্ড হাঁ না করিলে গান করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এই 'আ'কারটি কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া উচ্চারণ করা সমীচীন। তাহা হইলে কণ্ঠস্বরও সর্বদা আবশ্যকমত শব্দ অথবা তান প্রকাশে সক্ষম হইবে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর রাগসঙ্গীতের এই আকারের উচ্চারণ অতি সুন্দর ও মধুর ছিল। বাংলা ভাষায় রচিত কতকগুলি খেয়াল গান তিনি রেকর্ড করিয়াও গিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রকৃত উচ্চারণ-ভঙ্গী সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এখন দেখা যাক, হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতে যে বাণীগুলি সাধারণতঃ ব্যবহার হয় তাহার উৎস কোথায় এবং সেরূপ শব্দ বাংলা ভাষায় আছে কিনা। অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রথমে সংস্কৃতে পরে প্রাদেশিক ভাষায় 'শিবের মহিমা' অবলম্বনে ধ্রুপদাদি রচিত হইত। এই শব্দগুলি বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত আছে, যেমন:

"ভস্ম অঙ্গ গৌরী সঙ্গ
জটা মে বিরাজে গঙ্গ।"
ভৈরবী—চৌতাল

"ডমরু হরকর বাজে বাজে
ত্রিশূল ধর অঙ্গ ভস্মভূষণ।"
গুণকেলী—তীব্রা

"ভব রুদ্র উগ্র সর্ব পশুপতি সমসমান
ঈশান ভীম সকল তেরোহী অষ্ট নাম।"
ভূপালী—চৌতাল

ইহার প্রত্যেকটি শব্দই ত বাংলা ভাষাতে আছে। সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, 'কৃষ্ণ কান্হাইয়া'কে লইয়া অধিকাংশ বাণীই রচিত। রামচন্দ্রের গুণ অবলম্বনেও দুই-চারিটি গান দেখিতে পাওয়া যায়। রামলীলা প্রসঙ্গে প্রচুর ভজনগান প্রচলিত আছে। 'নাদব্রহ্ম' লইয়াও কয়েকটি ধ্রুবপদ রচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রিয়তমের বিরহ-মিলন ইত্যাদি লইয়াও প্রচুর বাণী রচিত হইয়াছে। যেমন—

"পিয়া পরদেশ"
"পিয়া মিলন কি বারি"
"এরি আলি পিয়া বিন"
"পিয়রবা তেহারি"। ইত্যাদি

এই সকল শব্দ বাংলা ভাষায় নাই এরূপ নহে, অথচ বাংলা ভাষাতে রাগসঙ্গীত রচিত হইতেছে না কেন? যে শব্দগুলি হিন্দী ভাষা হইতে লইয়া রাগগীতি রচিত হইয়াছে, সেই শব্দগুলি যদি বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা ভাষাতেও রাগগীতি রচিত হইতে পারে। অবশ্য বাঙালী সঙ্গীতগুণী-দের কাব্যপ্রতিভাও ইহার মূলে থাকা আবশ্যক এবং নূতন বাণীরচনার প্রেরণাও থাকা প্রয়োজন।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মাত্র কয়েক শব্দই সঙ্গীতে ব্যবহারের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া কয়েক শতাব্দী হইতে এগুলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'সন্ধ্যা' হ'ল কাব্যসঙ্গীতের উপযুক্ত ভাষা, কিন্তু রাগসঙ্গীতে বিশেষতঃ খেয়ালে 'সাঁজ ভই' শব্দের প্রয়োজন। তাহার কারণ ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃত কণ্ঠস্বর প্রকাশের পরিপন্থী। ধ্রুবপদাদিতে অর্থাৎ গম্ভীর চালের গানে 'সন্ধ্যা হ'ল' প্রভৃতি এই সকল শব্দ অত্যন্ত সুললিত হয়, কিন্তু খেয়ালের বাণী যতদূর সম্ভব সহজ সরল উচ্চারণবিশিষ্ট হইবে, ততই রাগবিস্তারের পক্ষে সহজ ও উপযোগী হইবে। গানের বাণী লইয়া রাগবিস্তার করিতে স্বরবর্ণগুলির সাহায্যের জন্য উপযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োজন হয়। সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিই সঙ্গীতে ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। অবশ্য সাঙ্গীতিক উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলে প্রায় প্রত্যেক শব্দই সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

রাগসঙ্গীতে ('আ', 'এ', 'ই', 'ও', 'উ') প্রত্যেকটি স্বরবর্ণেরই স্পষ্ট ব্যবহার হয়; কিন্তু কেবলমাত্র 'অ'কার উচ্চারণ রাগ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া মনে হয়। হিন্দী ভাষায় 'অ'-এর উচ্চারণ কতকটা 'আ'কারের মতই শোনায়। যে স্থানে নিতান্তই 'অ' প্রয়োজন সে স্থানে 'হসন্ত' ব্যবহারে এই 'অ'কারকে এড়াইয়া যাওয়া ঐ ভাষার নিজস্ব স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন: তন্, মন্, ধন্, কৌন্, মীত্, মন্দর্ ইত্যাদি। এই 'অ'কারের স্পষ্ট উচ্চারণ হেতুই কিন্তু বাংলা এবং উড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা রাগসঙ্গীতের বাণীরচনার উপযুক্ততা অর্জন করিতে পারে নাই। হিন্দী ভাষাতেও যেস্থানে 'অ'কার উচ্চারণ প্রয়োজন হয় তাহা কিঞ্চিৎ বক্র করিয়াই উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় রাগ-সঙ্গীতের বাণী রচনা করিতে হইলে রচয়িতার কর্তব্য হইবে সহজ সরল স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ। সুরশিল্পীর কর্তব্য হইবে শব্দগুলি ঈষৎ বক্র করিয়া হিন্দী ভাষার মতই উচ্চারণ করা।

প্রত্যেক সঙ্গীতেই বাণীগুলির উচ্চারণে একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। ইহাকে সাঙ্গীতিক উচ্চারণ বলা হয়। এই উচ্চারণ কথ্য ভাষার উচ্চারণ হইতেও পৃথক। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, রাগ, কীর্তন প্রভৃতি সঙ্গীতের শাব্দিক উচ্চারণের একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী আছে। কণ্ঠস্বরের সাহায্যে শব্দের বা নাদের প্রকাশ-দ্বারা যে ভাবের অনুভূতি শ্রোতৃমনে জাগাইয়া তুলিতে শিল্পী ইচ্ছা করেন, ভাষা যেন তাহার সাহায্যই করে। বাংলা ভাষায় রাগগীতি রচনা ও সুরসংযোজনা করিতে হইলে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ চয়ন করিতে হইবে, যাহাতে শিল্পীর সেই শব্দগুলি বক্রভাবে উচ্চারণ করিতে অসুবিধা না হয় এবং শ্রোতারও কানে বিসদৃশ না লাগে। কেবলমাত্র একটু বক্র ভাবে বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেই অথবা করিলেই বাংলা ভাষায় এই রাগগীতি সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এই উচ্চারণকে যদি কেহ উপহাস করিয়া হিন্দী ভাষার অনুকরণ বলেন, আমরা তাহা স্বীকার করিব না। আমরা বলিব এই বিশেষ উচ্চারণটি বাংলা ভাষায় রচিত বাণীর সাঙ্গীতিক উচ্চারণ। ভাষার উচ্চারণ এইরূপ একটু বিকৃত করিতে না দিলে বাংলা ভাষা রাগসঙ্গীতের মত এত বড় একটি সম্পদ হইতে চিরকাল বঞ্চিত থাকিবে।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি—তিনি সোমেশ্বরের 'মানসোল্লাস' হইতে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

কাব্যসঙ্গীতে যেরূপ কথ্য ভাষার ব্যবহার শোভন হয়, রাগসঙ্গীতে তাহা নহে। রাগে সাধু ভাষাই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা না হইলে যেন একটু 'হাল্‌কা' প্রকৃতির শব্দরচনা হয়। যেমন পেয়ে, দিয়ে, চলে, এসে ইত্যাদি শব্দের বদলে পাইয়া, দিয়া, চলিয়া, আসিয়া ইত্যাদি সুসঙ্গত হয়। আরও একটি অনুযোগ শোনা যায় যে, 'বাংলা গানগুলি শব্দবহুল', এই কথাটি ভিত্তিহীন। কারণ কবির উপরেই নির্ভর করে—কোন গান শব্দবহুল অথবা অল্প শব্দ বিশিষ্ট হইবে। দুই বা তিন অক্ষরে রচিত প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় আছে, সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সাধারণতঃ মুষ্টিমেয় কয়েকটি শব্দ সাহায্যেই গীত রচিত হইয়া থাকে। বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীত রচিত হইলে এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত যদি গুণিগণ তাহা ব্যবহার করিয়া দেখাইতে পারেন তাহা হইলে হয় ত এমন দিন আসিবে যখন ভারতের সকল স্থানেই বাংলা ভাষার রাগসঙ্গীত শোনা যাইবে। আমি নিজে কয়েক জন হিন্দুস্থানী গায়ক-বন্ধুকে বাংলা খেয়াল শিখাইয়াছি। অবশ্য এইগুলি তাঁহারা বাঙালীসমাজ ব্যতীত প্রায়ই গান করেন না। সুললিত শব্দসম্ভার যে ভাষায় বর্ত্তমান সে ভাষায় রাগসঙ্গীত রচিত হইতে পারে না অথবা বড় একটা হয় নাই ইহা ভাবিতেও দুঃখ হয়। যাঁহারা বাংলা ভাষার বাংলা উচ্চারণের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকেও আমরা এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিব।

জনগণের একাংশ

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষকে বাস্তবিকই বলা চলে উপমহাদেশ। এই উপমহাদেশের প্রথম শহর আর সমগ্র এশিয়াখণ্ডের মিলন-কেন্দ্র এই কলিকাতা শহরের জন-বৈচিত্র্য অপূর্ব্ব। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির লোক ত এখানে আছেই তা ছাড়া পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বহু জনের অবিরাম কর্ম্মব্যস্ততা, আনাগোনা এবং পদচারণা চলছে বিরাট এই শহরের বুকে। এখানে দীর্ঘকায়, প্রাণচঞ্চল আমেরিকানের পাশে দেখতে পাই মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির পরুষ-প্রকৃতির মানুষকে আর তা'রই কাছাকাছি দেখা মেলে সুদূর প্রাচ্যের স্বল্পভাষী লোকেদের। এর উপর আছে আবার পশ্চিমবঙ্গের বাইরেকার সব রাজ্যের লোক। তারা এসেছে বিহার থেকে, মাদ্রাজ থেকে, মধ্যপ্রদেশ আর উড়িষ্যা থেকে। এসেছে ওরা কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্ব্বার আকর্ষণে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে, পেছনে রেখে এসেছে নিজের গ্রাম আর জমি-জেরাত। পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য প্রদেশ থেকে যত লোক এসেছে তার মধ্যে নিকট-প্রতিবেশী বিহার থেকে আগত লোকের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে পর পর দুই-তিন বৎসর অজন্মা হলেই ওরা চিন্তা করতে সুরু করে বিকল্প জীবিকার কথা। দৈহিক শক্তিই যাদের একমাত্র মূলধন, কায়িক পরিশ্রমসাপেক্ষ জীবিকাই তাদের অবলম্বন। আর তখনই ওদের চিন্তাকে অধিকার করে 'কলকাত্তা মুলুকে'র নানা সুযোগ-সুবিধা। কলিকাতার ব্যবসায়গত ঐতিহ্য তাদের মনে এমনভাবে রেখাপাত করেছে যে, তাদের ধারণা কলিকাতায় জীবিকা-সমস্যার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহজ। ওখানে গেলে মাঠে বীজ বুনে নির্মেঘ আকাশের দিকে জলের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকতে হবে না এই আশায় তারা কলকাতার দিকে পাড়ি জমায়।

কলকাতায় এরা কদাচিৎ একলা আসে, অধিকাংশই যাত্রা সুরু করে দল বেঁধে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা অনিশ্চিতের উপর ভরসা করেই যাত্রা করে, সঙ্গে নিয়ে আসে জমি-বাঁধা-দেওয়া কয়টি টাকা। শহরে এসে ওরা থাকে স্বজাতের বা স্বগ্রামের লোকের বাসায়।

মোট ব'য়ে বা রিক্সা চালিয়ে কলকাতায় প্রথম তাদের জীবিকা-

নির্ব্বাহের পালা সুরু হয়। কলিকাতার পীচ-ঢালা মসৃণ পথে জড় এবং জীবন্ত উভয় প্রকার বোঝা বয়ে যে কাঁচা টাকার আস্বাদ পায় তাতে এদের শ্রম-জনিত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এদের মধ্যে কেউ পানের দোকান চালায়, কেউ বা মাথায় তুলে নেয় ভাজা চীনে-বাদামের ঝুড়ি। এরা ক্রমশঃ জীবিকা-অর্জ্জনের ক্ষেত্রে উঁচু ধাপে উঠতে থাকে। যারা মোট বয় বা রিক্সা চালায় তারা বেশীদিন এই কাজে লিপ্ত থাকতে চায় না। কিছু টাকা জমিয়ে তারা ছোটখাটো ব্যবসায় সুরু করতে চেষ্টা করে। করপোরেশন ইলেকট্রিক কোম্পানী বা ট্রাম কোম্পানীতে চাকরির প্রতি এদের প্রবল মোহ লক্ষণীয়। এদের যে আত্মমর্য্যাদা বোধ খানিকটা বাড়ছে তা বুঝা যায়—কোন কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজের প্রতি প্রবল অনিচ্ছা দেখে। এদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত তারা দারোয়ানের কাজ পছন্দ করে থাকে।

এদের বাসস্থানের সঙ্কীর্ণতা আর আবেষ্টনের অপরিচ্ছন্নতা না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। যে ঘরে কোনক্রমে দু'জনে থাকা যায় সেখানে ওরা নির্ব্বিকারচিত্তে বাস করে চার-পাঁচ জন। সে ঘরে প্রবেশ করলে পৃথিবীতে যে আলো-হাওয়া আছে তা ভুলে যেতে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই অপরিসর (খুপরি) ঘরেই উনুন জেলে তারা রান্নাবান্না ইত্যাদি করে থাকে। বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে দেখেছিলাম টিনে-ছাওয়া একটা কোটরে—যেখানে ঢুকতে গেলে মাথা নীচু করতে হয় আর তলে পা গুটিয়ে নিতে হয়—উনুন জেলে পরমানন্দে রান্না করেছে এক ছাপরাবাসী মুটে। সুবিধা থাকাসত্ত্বেও তারা পয়সা বাঁচাবার জন্যে পাশের ঘরে বিজলী আলো থাকলেও নিজেদের ঘরে তার ব্যবস্থা করবে না। তবে তারা সারাদিন কাজকর্ম্মে বাইরেই থাকে, এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনমানে তাদের বেশীক্ষণ থাকতে হয় না। আর গ্রীষ্ম-কালে রাতটা খাটিয়া পেতে বা গামছা বিছিয়ে ফুটপাথেই কাটিয়ে দেয়। তবে শীত আর বর্ষায় ওরা গাদাগাদি করে ঐ অন্ধকূপেই রাত কাবার করে।

সাধারণতঃ ভাত আর ডাল কলকাতায় তাদের প্রধান খাদ্য। তবে সময় সময় ভাতের পাশে খানিকটা শাক-চচ্চড়ি উঁকি মারতে দেখেছি। বর্ষায় ইলিশ মাছ তাদের আহারের রুচিকে পরিতৃপ্ত করে। তবে যারা সবে এসেছে গ্রাম থেকে আর কাজকর্ম্মও জোটে নি তেমনকিছু তারা শুধু ছোলার ছাতু জল দিয়ে মেখে তেঁতুলের আচারসংযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

কলকাতায় এসেছে এরা টাকা রোজগার করতে, তাই প্রতিটি ফুটো পয়সার ওপরও এদের গভীর মায়া। অশনে-বসনে বিলাসিতা ত দূরের কথা সাধারণ মানও বজায় রাখে না। টাকা তারা জমায় কোন ব্যাঙ্কে নয়, কারুর কাছেও নয়, প্রত্যেকেরই একটা করে টিনের বাক্স আছে তাতে ভরতি করে রাখে। কিংবা মাঝে মাঝে 'মণিঅর্ডার' করে দেয়, আবার বিশ্বাসী কোন 'দেশওয়ালী' দেশে গেলে তার মারফতেও পাঠিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে তারা দেশে গিয়ে জমির ব্যবস্থা করে আসে। ফলে কলিকাতায় খেটে যেমন কাঁচা টাকা রোজগার করে তেমনি নিজের জমি থেকে খোরাকিটার ব্যবস্থা হয়। অবস্থা তাদের ফিরে যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ভাগ্যটাকে আর পুরোপুরি জমির হাতে ছেড়ে দেয় না, ফলে কলকাতায় বেড়ে যায় বিহারীদের সংখ্যা।

দেশে তারা যায় বৎসরে অন্ততঃ একবার। অবশ্য দুই-তিন বৎসর পর পরও অনেকে গিয়ে থাকে। একশ্রেণীর লোক আছে এদের মধ্যে যারা ধান কাটা আর ধান রোয়ার সময় দেশে যায়। যেদিন যে বাসা থেকে কেউ দেশে যাবে সেদিন সে বাসার সকলের মধ্যেই যেন সাড়া পড়ে যায়। এদের পারস্পরিক সম্প্রীতি অনুকরণীয়। একসঙ্গে সবাই থাকে 'মেস' প্রথায়, কিন্তু খাতা-পত্রে কোন হিসেব নেই, সব মুখে মুখে—কেবল বাসিন্দাদের নাম-লেখা একটা খাতা আছে।

কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও তারা আনন্দের ব্যবস্থা করে থাকে। কোন দূর গ্রামের প্রান্তে রেখে এসেছে প্রিয় পরিজনদের, তাদের বিচ্ছেদ জনিত বেদনায় ওদেরও মন ভারী হয়ে থাকে। প্রিয়বিচ্ছেদ-কাতর মনকে হাল্কা করবার জন্যে এরা আয়োজন করে নানা অনুষ্ঠানের। "রামলীলা" ওদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। তা ছাড়া সমবেত সঙ্গীত আর হা-ডু-ডু খেলার মধ্যে ওরা প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকে। শহরতলীতে বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা লোকনৃত্যের আয়োজন করে থাকে, সেটা কাজরী নামে অভিহিত।

এই তাদের প্রবাস-জীবনের মোটামুটি চিত্র। এখানে বলা হয়েছে কেবল চাষী মুটে-মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষদের কথা। সমাজের উঁচুতলায় যাঁরা আছেন, আর্থিক কৌলিন্যের দৌলতে তাঁদের জীবনের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।
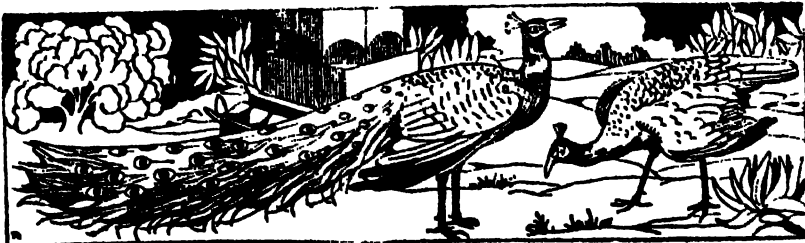
কালিদাস সাহিত্যের কয়েকটি উপমা

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যের যেমন সীমা নাই, তাঁহার রচিত উপমাগুলিরও তেমনি সংখ্যা করা যায় না। এই প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্যসমুদ্র হইতে কয়েকটি উপমা-রত্ন আহরণ করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

মানুষ যখন তন্ময় হইয়া কোনও কিছুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, তখন তাহার সে দৃষ্টিভঙ্গীটি বর্ণনা করার জন্য মহাকবি রকমারি উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এখানে দেখানো যাইতেছে।

বিদর্ভ নগরের 'স্বয়ংবর' সভায় যখন রাজভগিনী অপূর্ব রূপসী ইন্দুমতী বরণমালাটি হাতে লইয়া মনের মত পতি নির্বাচন করার জন্য প্রবেশ করিলেন, যে সব রাজারা ও রাজপুত্রেরা নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবার আশায় সভায় আসিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজকুমারীর অসামান্য রূপের দিকে কি ভাবে তাকাইয়া রহিলেন, মহাকবি তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন—

'তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ
কন্যাময়ে নেত্রশতৈক-লক্ষ্যে।
নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রাঃ
দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু।' (রঘু ৬।১১)

শত শত নয়নের একমাত্র লক্ষ্য, বিধাতার সেই অপূর্ব সৃষ্টি তরুণীর কাছে রাজন্যগণ তাঁহাদের অন্তঃকরণের মাধ্যমে চলিয়া গেলেন, দেহগুলি কেবল সিংহাসনের উপর পড়িয়া রহিল।

মহাকবি এখানে বলিতে চাহিতেছেন যে, নৃপতিরা ইন্দুমতীর মনোমুগ্ধকর রূপের দিকে এমন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন যে, সে সময় তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হইত যে, তাঁহাদের অন্তঃকরণগুলি—রাজাদের যাহা প্রকৃত সত্তা—তাঁহাদের চক্ষুর ভিতর দিয়া রাজকুমারীর কাছে চলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহাদের স্পন্দহীন সারশূন্য দেহগুলি সিংহাসনের উপর নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেহের যা সারবস্তু মন, অন্তঃকরণ ইত্যাদি সেগুলি ত চক্ষুর ভিতর দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া রাজকুমারীর কাছে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং দেহগুলিতে আর আছে কি?

প্রায় এই ধরনের একটি উপমা 'কুমার-সম্ভবে' পাওয়া যায়। বর যাইতেছেন বধূর বাড়ী বিবাহ করিতে, সঙ্গে বরযাত্রী। 'বর আসিতেছে' শুনিয়া পথের দুই পার্শ্বের বাড়ীগুলির কৌতূহলী নারীরা বর দেখিবার জন্য জানালায়, এবং সোনালী 'চিক'-ফেলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া বর দেখিতেছেন, মহাকবি তাঁহাদের সে বর দেখার ভঙ্গীটিকে উপমা দিয়া বর্ণনা করিতেছেন:

'তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো
নার্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথা হি শেষেন্দ্রিয়-বৃত্তিরাসাং
সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা।' কু-৭।৬৪

একমাত্র লক্ষণীয় সেই বরকে নারীরা যেন নয়নের দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, অপর আর কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মন রহিল না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি বুঝি সর্বতোভাবে চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে।

এখানে মহাকবি বলিতেছেন যে, নারীরা এমন তন্ময় হইয়া অপলকনেত্রে বর দেখিতেছিলেন যে, বর ছাড়া অন্য কোনও কিছুর দিকে তাঁহাদের নজর ছিল না, অন্য কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মন যাইতেছিল না। তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোকের মনে হইতেছিল, যেন তাঁহাদের শ্রবণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি আপন আপন কর্তব্য ভুলিয়া, যে যাহার কাজকর্ম ছাড়িয়া একমাত্র চক্ষুর মধ্যে সকলে মিলিয়া আসিয়া জড়ো হইয়া রহিয়াছে, আর সেই কারণে নারীদের চক্ষু ছাড়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। 'রঘুবংশের' ৭ম সর্গেও এই উপমাটি পাওয়া যায়।

নিবিষ্ট মনে কোনও কিছু দেখাকে মহাকবি অপর কয়েকটি স্থানেও চক্ষু দ্বারা পান করার আখ্যা দিয়াছেন।

'পুষ্পক' বিমানে বসিয়া রামসীতা যখন লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসিতেছিলেন, তখন নীচে পম্পা সরোবর দেখিতে পাইয়া রাম এমন নিবিষ্ট মনে সরোবরের শোভা দেখিতে লাগিলেন যে, মহাকবি তাঁহার সে সময়কার দৃষ্টিভঙ্গীকে চক্ষুদ্বারা পান করিতেছিলেন, বলিয়াছেন:

'দূরাদবতীর্ণা পিবতীব খেদাৎ
অমূনি পম্পা-সলিলানি দৃষ্টিঃ।' রঘু-১৩.৩০

দৃষ্টিকে অত ঊর্দ্ধ হইতে এত নীচে নামিতে হইল বলিয়া সে যেন পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পম্পা সরোবরের জল পান করিয়া লইতেছে।

মানুষ যখন বহু পথ হাঁটার ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়ে, তখন কোনও জলাশয় দেখিতে পাইলে সে যে ভাবে তাহার জল পান করিতে থাকে, রামের দৃষ্টিকে আকাশ হইতে নীচে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হইল বলিয়া মহাকবি বলিতেছেন, সে যেন অত বেশী পথ চলার পরিশ্রমে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পম্পা সরোবরের জল সেইরূপ নিবিষ্ট মনে পান করিয়া লইতেছে।

'রঘুবংশের' দ্বিতীয় সর্গে মহাকবি বলিতেছেন, রাজা দিলীপ

যখন সারাদিন ধরিয়া মাঠে মাঠে গুরুদেবের গরু চরাইয়া দিনের শেষে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহার পত্নী সুদক্ষিণা সে সময় আশ্রমের সীমানার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন, রাজাকে আসিতে দেখিতে পাইলে, তাঁহার দিকে এমন আবেগপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া থাকিতেন যে, মহাকবি বলেন :

'পপৌ নিমেষালস পক্ষ্মপঙ্ক্তি
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্।' রঘু-২৩

তিনি যেন তাঁহার উপবাসী নিমেষহীন নয়ন দুইটি দ্বারা তাঁহাকে পান করিয়া লইতেন।

সারাদিন রাজাকে দেখিতে-না পাইয়া সুদক্ষিণার নয়ন দুইটি যেন থাকিত উপবাসী, তার পর সন্ধ্যার সময় রাজার দেখা পাইলে সুদক্ষিণা তাঁহার দিকে যেরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন, তাহা দেখিয়া লোকের মনে হইত সারাদিন উপবাসে কাটাইয়া তৃষ্ণার্ত মানুষ সন্ধ্যার সময় পিপাসার জল পাইলে, সে জল সে যে আগ্রহভরে পান করিতে থাকে, সুদক্ষিণারও তেমনি উপবাসী নয়ন দুইটিও দিলীপ রাজার রূপসুধা বুঝি সেইভাবে পান করিয়া লইতেছে।

বিশ্বামিত্র মুনি যখন রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলার রাজার জনকের যজ্ঞ দেখিতে গেলেন, রামলক্ষ্মণের অনুপম রূপ মিথিলাবাসীরা কি ভাবে দেখিতেছেন, মহাকবি তাহা এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

'তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানারেভুষোঃ সদ্মনি মৈথিলস্য'
'মত্তস্তৈ পিবতাং বিলোচনৈঃ
পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ। রঘু-১১।৩৬

বিদেহ নগরের অধিবাসীরা যেন চক্ষুদ্বারা তাঁহাদিগকে পান করিতে লাগিলেন, এমনকি চোখের পাতার নিমেষপাতও তখন তাঁহাদের দৃষ্টি-প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শীতল ও সুস্বাদু জল পাইলে মানুষ যে তৃপ্তির সহিত তাহা পান করিতে থাকে, এবং পান করার সময় যেমন কোন প্রতিবন্ধকতা সে সহ্য করিতে পারে না, বিদেহ নগরের অধিবাসীরাও তেমনি রাম ও লক্ষ্মণের রূপমাধুরী এমন পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছিলেন যে চোখের পাতা ফেলার সময়ের দৃষ্টির মুহূর্তের প্রতিবন্ধকতাও তাঁহাদের নিকট অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছিল।

প্রেমাতুর নায়কের সম্মুখ হইতে তাঁহার প্রণয়িনী যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার মনে যে ব্যথার সঞ্চার হয়, মনোবেদনার সে ভাবটি বুঝাইবার জন্য মহাকবি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' ও 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে তিনটি উপমা রচনা করিয়াছেন, এখানে সে তিনটি উপমা দেখানো হইতেছে।

অপ্সরা উর্বশী যখন রাজা পুরূরবার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার সখীদের সঙ্গে আকাশপথে উড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রেমপ্রার্থী পুরূরবা হতাশ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিতেছেন :

'এষা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ
পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তী।
সুরাঙ্গনা কর্ষতি খণ্ডিতাগ্রাৎ
সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী।' বিক্রম-১ম অঙ্ক

রাজহংসী যে ভাবে পদ্মের মৃণাল খণ্ডিত করিয়া তাহার ভিতর হইতে সূত্র বাহির করিয়া লইয়া যায়, এই অপ্সরাও সেইরূপ আমার শরীর হইতে মনটিকে জোর করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া আকাশপথে চলিয়া যাইতেছে।

পুরূরবার মনে হইতেছে যে, অপ্সরা তাঁহার মনটি তাঁহার দেহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই, কোনও কাজে আর তিনি মন দিতে পারিবেন না, যতক্ষণ না অপ্সরা আবার তাঁহার কাছে তাঁহার মনটিকে লইয়া ফিরিয়া আসেন।

কতকটা এই ধরনের একটি উপমা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' পাওয়া যায়। রাজা দুষ্মন্তের সম্মুখ হইতে শকুন্তলা ও তাঁহার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা আশ্রমের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন, দুষ্মন্তও নিজের শিবিরে ফিরিয়া যাইবার জন্য তপোবন হইতে বাহির হইলেন, বাহির হইলেন বটে, তবে তাঁহার মন পড়িয়া রহিল শকুন্তলার কাছে—মনের এই ভাবটি জানাইবার জন্য তিনি আপন মনে বলিতেছেন :

'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।' শকু-১ম অঙ্ক

শরীর আমার সম্মুখে চলিয়াছে বটে, কিন্তু চঞ্চল মন ধাওয়া করিতেছে পিছন দিকে, যেমন পতাকার ধ্বজা সম্মুখ দিকে লইয়া চলিলেও প্রতিকূল বায়ুর প্রভাবে তাহার উপরিস্থিত চীনদেশীয় রেশম-বস্ত্র পশ্চাদ্দিকে উড়িতে থাকে।

পতাকার দণ্ড যেমন সম্মুখ দিকে লইয়া চলিলেও বাতাস যদি বিপরীত দিকে বহিতে থাকে, তাহার উপরকার বস্ত্র পিছন দিকেই ধাবিত হয়, সম্মুখে আসিতে চাহে না, তেমনি দেহ যদিও শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, মনটি পড়িয়া রহিল পিছন দিকে, কণ্বমুনির আশ্রমের সেই কুটীরটির কাছে শকুন্তলা যেখানে বাস করার জন্য চলিয়া গেলেন। রাজার দেহ যাইতেছে সম্মুখে আর মন চলিতেছে পিছনে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের' তৃতীয় অঙ্কেও এই ভাবের উপমা পাওয়া যায়। লতাপকুঞ্জের মধ্যে দুষ্মন্ত গোপনে আসিয়া শকুন্তলাকে প্রেম নিবেদন করিতেছেন, শকুন্তলার কিন্তু কেবলই ভয় হইতেছে; তিনি একাকী থাকিতে পারিতেছেন না রাজার কাছে, তাই যখন তিনি লতাপকুঞ্জ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, আশাহত প্রণয়ী তখন তাঁহাকে শুনাইয়া বলিতেছেন :

'ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিনাবসানে ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতেঃ।' শকু-৩য় অঙ্ক।

দূরে তুমি চলিয়া যাইতেছ বটে, আমার হৃদয়কে কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, দিনের শেষে বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও তাহাকে পরিত্যাগ সে করিতে পারে না।

সূর্য্যাস্তের পর বৃক্ষের ছায়া যেমন বৃক্ষের নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া গেলেও বৃক্ষের মূলে তাহার একটা দিক লাগিয়া থাকে, বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে সে ছাড়িতে পারে না শকুন্তলাও তেমনি দুষ্যন্তের সম্মুখ হইতে যত দূরে চলিয়া যান না কেন, তাঁহার মন তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, রাজার মনের মধ্যে তাঁহার চিন্তা থাকিয়াই যাইবে।

সমুদ্রের জল যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তাহার উদ্বেলিত জলরাশি যে সমস্ত নদী সমুদ্রের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তটভূমি অতিক্রম করিয়া সাগরের জল কখনও জনপদ প্লাবিত করিয়াছে—এ ব্যাপার কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই। সমুদ্রের এই মহত্ব উপমা করিয়া মহাকবি বলিতেছেন :

'অপথেন প্রববৃতে ন জাতূপচিতোঽপি সঃ।
বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ।' রঘু-১৭।৫৪

তাঁহার (রাজা অতিথির) সমৃদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি কখনও বিপথগামী হয়েন নাই, লবণসাগরের জল উদ্বেলিত হইলে একমাত্র নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়।

সাগরের জল যেমন ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া সারা দেশ ভাসাইয়া দিতে পারে, কিন্তু এ অনাচার সমুদ্র যেমন কখনও করে না, রাজা অতিথিরও তেমনি ধনসম্পদ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও বিপথগামী হইয়া সে ধন অসৎ কর্মে নিয়োজিত করেন নাই। সৎপথে থাকিয়া সৎকার্যে তিনি অর্থ ব্যয় করিতেন।

'রঘুবংশের' আর একটি শ্লোকে মহাকবি বলেন, রামচন্দ্রের দুই পুত্র কুশ ও লব, এবং ভরতের ও লক্ষ্মণের পুত্রেরা রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পূর্বে পৈতৃক রাজত্বের কিছু কিছু অংশ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্যের রাজা হইলেও নিজ নিজ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া কখনও অপরের রাজ্যে প্রবেশের বা অনিষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদের এই মহত্বকে সমুদ্রের সহিত উপমা দিয়া কালিদাস বলিতেছেন :

'অন্যোন্যদেশ প্রবিভাগ সীমাং
বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ।' রঘু-১৬।২

বিপুল সম্পদ লাভ করিলেও, সমুদ্রেরা যেমন বেলা অতিক্রম করিয়া যায় না, তাঁহারাও তেমনি নিজ নিজ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিতেন না (পররাজ্যে প্রবেশ করিতেন না)।

এখানেও মহাকবি সমুদ্রের মহত্ব লইয়া উপমা রচনা করিয়াছেন। সমুদ্র যেমন পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজের বেলাভূমির সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তাল তরঙ্গ লইয়া অপরের ভূমিতে কখনও অবৈধ প্রবেশ করে না, কুশ লব প্রভৃতি রঘুবংশীয় রাজারাও বিপুল সমৃদ্ধির অধিকারী হইলেও নিজেদের রাজ্য ছাড়িয়া পরের রাজ্যে অনধিকারপ্রবেশ করিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতেন না।

পলাতক

শ্রীসুনীল বসু

ফিরিয়া পাব কি আর সেই তারাময় রাত
ডালিম সূর্যের রশ্মি। কোনো রূপালি প্রভাত?
বটের বৃক্ষের তলে তৃণের কবোষে শুয়ে,
গোধূলি বিকেলে কভু ছায়ার অঞ্চল ছুঁয়ে—
হবে কি কখনো আর লক্ষ স্বপ্নজাল বোনা?
হৃদয়ের রিক্ত তটে ফুরালো সমস্ত সোনা!

আশ্চর্য বিস্ময়ে কোনো মাছরাঙা চেয়ে দেখা,
অস্পষ্ট আঁধারে জ্বলা জোনাকির জ্যোতির্লেখা,
শীতের আখের ক্ষেতে খুশিচক্ষু ঝলমল
হবে কি পিপাসা পূর্ণ মিঠারসে কণ্ঠতল?

হাটে চলা মেঠো পথে কোনো গরুর গাড়ির
পাশে আঁকা একখানি শান্ত গৃহস্থবাড়ীর
সেই নম্র পল্লীচিত্র কোথা আর পাব খুঁজে?
এখানে প্রকৃতি রুদ্ধ লক্ষ প্রাসাদে বুরুজে।

এখানে ব্যাংডাযোড়া ব্যর্থ স্থূল কৃত্রিমতা
মুখোশে আবদ্ধ মুখ। শ্বাসরুদ্ধ আকুলতা।
নিত্য তাই পাখী-মন স্বপ্নে.—গ্রামে যায় উড়ে,
সেখানে আকাশে সন্ধ্যা আনে কেয়ারী বাহুড়ে।

চোরা-কাঁটা

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

কয়েক দিন আগে আঙুলে কাঁটা বিঁধেছিল একটা। বার করবার সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে সেটি আঙুলাগ্রয়ী হয়ে আছে আজও। বাড়ীর সামনেই বাবার আপন হাতে গড়া মালঞ্চ। যত্নের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে এখন অনেকটা। তারই এক কোণে আগাছাদের ভিড়ের মধ্যে গোলাপগাছ আছে একটি। তার বিষণ্ণ-ম্লান অস্তিত্ব নজরে পড়ত না বড় একটা। হঠাৎ সেদিন চমকে উঠেছিলাম। কাঁটায়-ভরা অতি নগণ্য একটি প্রশাখা তার ঊর্দ্ধ আকাশের আশীর্ব্বাদের লোভে মাথা উঁচিয়েছিল কবে। তারই শীর্ষদেশে একটিমাত্র ফুল তার প্রাণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিছিয়ে উচ্ছলিত আবেগে হাসছিল যেন। লাবণ্যদীপ্ত অপরূপ সে হাসি। দেখতে দেখতে অভিভূত হয়েছিলাম যেন। ফুলটিকে চয়ন করবার লোভ সামলাতে পারি নি সেদিন। বৃন্তলগ্ন কাঁটা একটি আঙুলে বিঁধে গিয়েই এ অঘটন ঘটেছিল। বার করতে পারি নি সেটিকে কিছুতেই। মাঝে মাঝে খচ্‌খচ্‌ করে এখনও।

আজও খচ করে উঠল আবার কাঁটার ব্যথা। টেবিলের উপর ছাই পড়ে গিয়েছিল—একটু সিগারেটের ছাই। আঙুল দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে গিয়েই অনুভব করলাম ব্যথার অস্তিত্ব। মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা বেদনাব্যঞ্জক 'উঃ' শব্দটা অপ্রত্যাশিত একটা ধ্বনি-তরঙ্গ তুলল ঘরের মধ্যে। অদূরেই বসেছিল অতসী। খোকার কাঁথায় নিবিষ্ট মনে সেলাইয়ের ফোঁড় দিচ্ছিল বেচারী। চমকে চোখ ফেরাল। স্বামীর আঙুলের কাঁটার ব্যথাটা ওরও মর্ম্মে সঞ্চারিত হ'ল যেন চকিতের মধ্যে। হঠাৎ আমার কাছে উঠে এল অতসী, অপ্রত্যাশিত তৎপরতার ভাব। অতর্কিতে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে নিবিড় অনুরাগভরে বললে—কৈ, দেখি আর একবার চেষ্টা করে—কাঁটাটা বেরোয় কিনা। খচ্‌খচ্‌ করে লাগে বল, অথচ চোখে ত কৈ দেখতে পাই না—ভাল আপদ হয়েছে।

আপদই বটে! কাঁটাটার অস্তিত্বের সন্ধান মেলে না—খচ্‌খচ্‌ করে অথচ। ছুঁচের ডগা দিয়ে তর্জ্জনীর বিশেষ একটি জায়গাকে অতি সন্তর্পণে খোঁচাতে লাগল অতসী। তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি অতসীর। অপরূপ প্রয়াস-ভঙ্গীটুকুও লক্ষ্য করবার মত। এ চেষ্টা যেন ওর ব্যর্থ হবে না কিছুতেই। তবু কৌতুকভরে বললাম—এ চোরা-কাঁটা অতসী। তোমার সাধ্য নয় খুঁজে বার কর একে। কত দিন এখনও এমনি ভাবে খচ্‌খচ করে বাজবে—কে জানে!

হাতের উত্তপ্ত স্পর্শের সঙ্গে ওর উচ্ছ্বসিত অনুরাগও সঞ্চারিত হচ্ছে আমার দেহে মনে। ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অল্প ভাবাবিষ্ট হতেই খচ্‌ করে উঠল আবার কাঁটাটা। ভাবলাম—অসম্ভব নয়। এ কাঁটার হয় ত হদিস পাবে অতসী। অস্বস্তিরও অবসান হবে হতে। কিন্তু মর্ম্মের কোণেও যে আমার এমনি কাঁটা বিঁধে আছে আর একটি। চোরা-কাঁটার মতই খচ্‌খচ্‌ করে ওঠে প্রায়ই তার ব্যথাটা। সারা জীবনেও কি তার সন্ধান পাবে অতসী?

অনন্ত আকাশের কোল থেকে বিপুল সুদূর হঠাৎ হাতছানি দিলে যেন। জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম সুদূরের পানে। চোখের সামনে থেকে কালের যবনিকা সরে গেল চকিতের মধ্যে। পনর বছর আগেকার অতীতের পটভূমি। বিয়োগান্ত একটি জীবন-নাটকের কয়েকটি দৃশ্যপট ফুটে উঠল দেখতে দেখতে।—অতসী তখনও গৃহলক্ষ্মী হয়ে আসে নি আমার সংসারে। মহাযুদ্ধ চলছে পুরাদমে, রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে; কলকাতা রীতিমত আতঙ্কবিহ্বল। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানির আপিসের চাকরি আমার। বোমার ভয়ে আপিসের কিছু অংশ সরে গেল পাটনায়। হুকুম হ'ল—আমাকেও যেতে হবে পাটনার নতুন আপিসে। গৃহ এবং পল্লীর অবিচ্ছিন্ন প্রীতি-স্নেহে আজন্ম-লালিত আমি। জীবনে এই প্রথম নীড়ভ্রষ্ট হলাম যেন। পাটনায় গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিঠাপুর অঞ্চলে বাসা মিলল একটা। নতুন করে আবার কুলায়ে আশ্রয় মিলল যেন। নীড়ে দুটি মাত্র প্রাণী, আমি আর ঘনশ্যাম; ঘনশ্যাম উড়িয়া ঠাকুর আমার, স্থানীয় এক ভদ্রলোক জুটিয়ে দিয়েছিলেন ওকে।

রবিবারের আলস্যমন্থর একটি প্রভাত। ভোরে একবার ঘুম ভাঙবার পর আবার কখন নিদ্রাঘন আবেশে কেমন আচ্ছন্ন হয়েছিল একটু। দরজায় ঘন ঘন ধাক্কার আওয়াজ হতেই তন্দ্রাবেশ কাটল হঠাৎ।—রাজুর মা এসেছে নিশ্চয়ই। খুব সকালেই ও আসে রোজ। ক'দিন আসতে পারে নি রাজুর মা। খবর নিয়েছে অবশ্য ঘনশ্যাম। সন্দি-

জ্বর নাকি হয়েছে বলছিল। অসুস্থ বলেই একটু দেরি করে এসেছে সম্ভবতঃ। রাজুর মা ঠিকে-ঝি হিসাবে কাজ করছে আমার এখানে—মাসদেড়েক হ'ল। পাটঝাঁট সারবে এখনি। বাসনপত্র ইত্যাদি মাজবে, ধোবে।

আবার ধাক্কা পড়ল দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ঘনশ্যাম—মলা', এমতি ধক্কা লাগাইছ কাঁই! বাবু গোঁসা হই ঘিব পরা ?—টিকে ক্লুব।

অপরিচিত নারীকণ্ঠ খনখন করে বেজে উঠল সমান তালে।—তুই থাম রে উড়িয়ার পো। গোঁসা হবে ত আমার কি রে মুখপোড়া ? কেনা দাসী বাঁদী নাকি যে মাথা কেটে ফেলবে! এদিককার সব ধোয়ামোছা হয়ে গেছে কখন। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তখন থেকে। দরজা খোলবার নাম নেই বাবুর, বেলা বাড়ছে এদিকে। ঘাটে পথে, চার রাজ্যে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। এমন নবাবী ঘুম দেখি নি কখনও বাপের জন্মে।

আপিসের পদস্থ কর্ম্মচারী আমি। বংশমর্য্যাদাও আমাদের গগনচুম্বী। আবাল্য ঝি-চাকরদের মুখ থেকে খোশামোদের বুলি শুনতেই কান অভ্যস্ত। 'নবাবী ঘুম'—'কেনা দাসীবাঁদী'—উদ্ধত কথাগুলোর ধাক্কা লেগে আমার আজন্ম-অর্জ্জিত মানসম্ভ্রমের ভিত কেঁপে উঠল যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে। বেশ রুষ্ট মেজাজ নিয়েই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। বাইরের নারীকণ্ঠ খাদে নেমে এল হঠাৎ। অনু-যোগের গুঞ্জন কানে এল।—ওঠবার নাম নেই, বেলা বাড়ছে এদিকে। তিন বাড়ীর কাজ বাকি এখনও আমার, সব সেরে হাসপাতালে ছুটতে হবে আবার ন'টার মধ্যেই। জ্বরে বেহুঁস হয়ে মা ধরে পড়ে রয়েছে। বুকে-পিঠে সর্দ্দি বসেছে চাপ চাপ। নিমোনিয়ার ভাব—সবাই বলছে।

মুখে চোখে বিপুল বিরক্তির ভাব নিয়ে দরজাটি খুললাম তাড়াতাড়ি। দেখলাম সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে খরভাষিণী প্রগল্‌ভা একটি মেয়ে। চৌদ্দ কি পনের বছরই বয়স হবে বোধ করি। বয়ঃসন্ধির অনুপম ছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠেছে সারা অঙ্গ ব্যেপে। ঘন ময়লা রং, মুখ চোখের শ্রী ছাঁদ নিতান্ত সাদামাটা। চাহনির ভঙ্গীটুকু কিন্তু অপরূপ। আমাকে একনজরে দেখে নিয়েই মেয়েটি হেসে ফেললে ফিক্ করে। উপরন্তু আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় মাথা দুলিয়ে বললে—আহা, সকালের কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম—রাগ হ'ল বুঝি বাবুর ?—পরক্ষণেই অতি অন্তরঙ্গের মত বলে উঠল—বলিহারি ঘুম কিন্তু বাবু তোমার! দেখ দিকি একবার ভোরের দিকে তাকিয়ে—কত বেলা হয়েছে! জোয়ান মানুষ তুমি—অত আলিস্যি ভাল নয় বাপু।

আমাকে ঐ ভাবে 'তুমি' সম্বোধন! বিশেষ করে পরিচারিকাশ্রেণীর অল্পবয়সী একটি মেয়ের মুখ থেকে। এমন সম্ভ্রমহানিকর সম্বোধন প্রবাসে এই প্রথম কানে বাজল আমার। আমার স্তম্ভিত হতবাক্ অবস্থা দেখে 'হাঁ হাঁ' করে এগিয়ে এল ঘনশ্যাম, ধমক দিলে মেয়েটাকে। আমার দিকে চেয়ে বললে—ঝিয়ের মেয়ে এটা। টিকে পাগল আছি বাবু।

চকিতের মধ্যে বাজ ফেটে পড়ল যেন কানের কাছে।—আমি পাগল হতে যাব কেন রে মুখপোড়া—পাগল তোর সাতগুষ্টি।

পরক্ষণেই হঠাৎ সজল কোমল হয়ে এল মেয়েটির কণ্ঠস্বর। অপরূপ ভঙ্গীতে আমার দিকে চোখ তুলে বললে—তুমি পেত্যয় যেও না বাবু ও মুখপোড়ার কথায়। সে বছরে সান্নিপাতিক ধরেছিল ত আমায়! সবাই জানে—সে কি জ্বর! জ্বরের ঘোরে ধনঘন মাথা চালতুম শুধু। তিন মাস ধরে একনাগাড়ে বিছানায় পড়ে। শুয়ে শুয়ে ঘাড়ে পিঠে ঘা হয়ে গেল শেষটায়, এখন-যাই, তখন-যাই অবস্থা। মা বলে—শরীলটায় হাড় ক'খানা ছাড়া ছিল না আর কিছু। মহাপ্রাণীটুকু ধুকধুক করত শুধু! বেঁচে উঠলুম। পোড়া দেহও পুরল আবার। মাথাটা কিন্তু আর সারল না বাবু! আগুন জ্বলে যেন ভেতরটায়, কাপড় রাখতে পারি নে মাথায়। কি শীত কি গ্রীষ্ম—যখন-তখন জল থাবড়ে দিই। বকা রোগও বেড়েছে, চুপ করে থাকতে পারি না একদণ্ড। মাথা বেশী তাতলে যা-নয়-তাই বলেও ফেলি যাকে তাকে। সবাই তাই বলে—রাজী পাগলী। ওরা বলবে না কেন? আমার যেন কষ্ট হয় না এতে। আচ্ছা, তুমিই বল ত বাবু সত্যি পাগল কিনা আমি ?

বাষ্পাকুল চোখদুটিতে আসন্ন বর্ষণের আভাস যেন। মাথায় রাগ চড়া চুলোয় যাক—কথা বলার বিচিত্র ধরন আর মুখ-চোখের অপরূপ ভঙ্গী—সব দেখে শুনে নরম হয়ে গেলাম মুহূর্ত্তের মধ্যে। মেয়েটির জন্যে অল্প একটু মমতা জাগল যেন মনের কোণে। মাথা নেড়ে বললাম—না, না। পাগল হতে যাবে কেন? সবাই ওকথা বলে রাগায় বোধ হয় তোমায়। যাও, কাজ সেরে নাও তাড়াতাড়ি। তোমার মায়ের অসুখ ত আবার বেড়েছে বলছ।

মুহূর্ত্তের মধ্যে খুশীর ঢেউ উঠল ওর সারা মুখের পরি-মণ্ডল ব্যেপে। ঝাঁটা হাতে নিয়ে আমার ঘরের মধ্যে অসঙ্কোচে ঢুকে পড়ল তাড়াতাড়ি। যাবার আগে আর এক বার বক্রকটাক্ষ হেনে ঘনশ্যামের মেজাজে যেন আগুন

খারয়ে দিয়ে গেল। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এই ভাবেই সুরু।

•

মায়ের বদলে পর পর আরও তিন দিন কাজ করতে এল রাঙ্গী পাগলী। অতি অশোভন কথা বলার ভঙ্গী মেয়েটার, ব্যবহারও ততোধিক বিরক্তিকর। তিন দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ঘনশ্যাম। দেখে শুনে আমার মনেও পাহাড়প্রমাণ বিরক্তি জমে উঠেছিল। ঘনশ্যামকে ডেকে বলেছিলাম, অন্য লোক একটা দেখ তুমি, ওদের জবাব দিয়ে দেব।

সপ্তাহখানেক আর পাত্তা মিলল না কারও। না রাজুর মায়ের—না তার সেই পাগলী মেয়ের। ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে এক বিহারী নোকরকে এনে হাজির করলে কোথা থেকে। জঙ্গলী ভূত একটা বললেই হয়। তা হোক। তাকে দিয়েই ধোয়া-মোছা আর মাজা-ঘষার কাজ চলছে কোন রকমে।

রবিবারের আর একটি আলস্যমন্থর প্রভাত। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি অবশ্য অনেক আগে। পূবের জানালা দিয়ে শেষ পৌষের এক-ঝলক রোদ সামনের নিম-গাছটার মাথা ছুঁয়ে এগিয়ে এসেছে আমার ঘরের মধ্যে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ-ডিশ এগিয়ে দিলাম নতুন চাকরটার হাতে। ক্ষৌরকর্ম্মের সরঞ্জাম নিয়ে বসলাম তাড়াতাড়ি। সকালেই আপিসের দু'জন ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল আমার বাসায়। গালে ক্ষুর ঠেকিয়ে টানতে সুরু করেছি সবে হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে কুয়াতলায় কাপ-ডিশ ভাঙার কর্ণভেদী শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে ঝনঝন্ করে বেজে উঠল মেয়েলি গলার আওয়াজ—আ মরণ! এ যম আবার এসে জুটল কোথা থেকে! ভাঙলি—ভাঙলি ত মুখপোড়া দামের জিনিসটা? বেরো—দূর হ' বলছি—হতভাগা।

চিনতে দেরি হ'ল না একটুও, রাঙ্গী পাগলীর গলা। কিন্তু বলিহারি ধৃষ্টতা ওর! ঝিয়ের মেয়ে বৈ ত নয়। হোক পাগলীগোছের। তা বলে—আমার বাসায় দাঁড়িয়ে আমারই চাকরকে—'বেরো, দূর হ' বলবে! এ নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা বৈ কি! ঘনশ্যাম বাইরে কোথাও গেছে সম্ভবতঃ। না হলে চড়া-পর্দ্দায় কড়া গোছের একটা জবাব হত নিশ্চয়ই। নতুন চাকরটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বোধ য়। রুষ্ট মেজাজ নিয়েই উঠে গেলাম তাড়াতাড়ি। আমাকে দেখেই আরও জ্বলে উঠল রাঙ্গী পাগলী। অগ্নুৎ-পাত সুরু হ'ল যেন। বললে—সর্ব্বস্ব ভেঙে খান্‌খান্ রছে—এখুনি বিদেয় করে দাও মুখপোড়াকে। ভূতটাকে কোন্ চুলো থেকে ধরে আনলে বল ত বাবু? এ নিশ্চয়ই সেই উড়ে বেটার কাজ। গেল কোথায় মুখপোড়া—দেখুক এসে কাজের ছিরিটা!

হোক পাগলী! অতি অশোভন এবং অভদ্র সব উক্তি আর কি বিশ্রী ভঙ্গী ওর মুখের, সত্যিই অসহ্য। রাগের চোটে হঠাৎ বজ্রকঠিন ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল আমার কণ্ঠ দিয়ে—আমি এনেছি ওকে। আমার জিনিস ভাঙে আমি বুঝব। তুমি চেঁচামেচি করছ কেন আমার বাসায় দাঁড়িয়ে?—তোমাদের আর কাজ করতে হবে না আমার এখানে। মাইনে চুকিয়ে দিচ্ছি এখুনি, নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি। চেঁচামেচি আমি আদৌ পছন্দ করি না।

মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত অবস্থা হ'ল যেন ওর। তর্জ্জন-গর্জ্জন, দৃপ্ত-উদ্ধত ভঙ্গী—সর্বকিছু মিলিয়ে গেল চকিতের মধ্যে। 'ঘনশ্যাম, ঘনশ্যাম'—বলে হাঁক পাড়লাম বার দুই, সাড়া মিলল না তার। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নতুন চাকরটা। সকালেই হাঙ্গামা—অবাঞ্ছিত উপসর্গ এসে জুটেছে। গজগজ করতে করতে ঘরে ফিরে এলাম তাড়া-তাড়ি। ওদের পাওনাগণ্ডা আগে চুকিয়ে দিয়ে তার পর অন্য কাজে বসব ঠিক করলাম। পকেটে মনিব্যাগের মধ্যে টাকা ছিল না আর একটাও। তাড়াতাড়ি স্যুটকেসের চাবিটা খুঁজতে লাগলাম। চাবির রিংটা গেল কোথায় ছাই! সপ্তাহখানেকের মধ্যে স্যুটকেসগুলো একবারও খুলেছি বলে ত কৈ মনে পড়ে না। গেল কোথায় চাবির গোছা! বালিশের তলা, দু'তিনটে জামার পকেট, তাকের উপর বইগুলোর পাশটা—চাবি থাকবার সম্ভাব্য সব জায়গা-গুলোই প্রায় দেখলাম দু'তিনবার করে। কিন্তু চাবি কোথায়! আমার পিছু পিছু রাঙ্গী পাগলী কখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্য করি নি। থমথমে আবহাওয়াকে চমকে দিয়ে অপ্রত্যাশিত অন্তরঙ্গতার সুর বেরুল তার কণ্ঠ দিয়ে। বললে—চাবি খুঁজছ বুঝি বাবু? বার করে দিচ্ছি আমি—সরো দিকি একটু। তোশকের একপ্রান্তের তলা থেকে চাবির গোছাটিকে বার করলে রাঙ্গী পাগলী। চাবি হাতে তুলে দেবার আগে অপরূপ ভঙ্গী সহকারে বললে—এমন বেতাক মানুষ দেখি নি বাপু কখনও! চাবি বুঝি বাইরে অমন করে ফেলে রাখে কেউ! ঠাকুর-চাকরদের আবার বিশ্বাস আছে নাকি! ঘরঝাঁট দিতে গিয়ে সেদিন দেখলুম মেঝের পড়ে রয়েছে। ওখানে তুলে রেখে দিয়েছিলুম তাই।

স্যুটকেসটা খুলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভিতরের সবকিছু দেখে নিলাম একবার। কাপড়-চোপড়, শ'দেড়েক টাকা,

জুনিয়ার পার্কার পেনটা—না, উধাও হয় নি কোনকিছুই। সব জিনিসই রয়েছে যথাস্থানে। বড় সুটকেসটাও খুললাম ওর সামনেই, সন্ধানীদৃষ্টি দিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখলাম সবকিছু। দামী আলোয়ান, গরমের সুট এক-প্রস্ত, হাতঘড়ির সোনার ব্যাণ্ড, সোনার বোতাম—গলার আর হাতের, দামী পাথরবসানো আংটি এক জোড়া—সবই পড়ে আছে ঠিক জায়গায়। নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়েটার আপাদমস্তকের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম একবার। পনের দিনের মাইনে হিসাবে পাঁচ টাকা পাওনা হয় ওদের, পাঁচ টাকার একখানা নোট এগিয়ে ধরলাম ওর দিকে। নির্লিপ্তভাবে হাত বাড়িয়ে নোটখানা নিলে রাজী পাগলী। আঁচলের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বললে—তুমি কেমন মনিষ্যি বাপু—একটু দয়ামায়া থাকতে নেই শরীলে! মা ভুগছিল ক'দিন ধরে, পরশু সকালে মারা গেল। আসতে পারি নি তাই ক'টা দিন। ঠিকে কাজই না হয় করতুম, তা বলে পৌষ মাসের দিনে লোকে কুকুর-বেড়ালও তাড়ায় নাকি ঘর থেকে?

এমন আর্দ্র-কোমল কণ্ঠস্বর জীবনে সেই প্রথম শুনলাম যেন। বাষ্পাকুল দুটি চোখ চকিতের জন্যে আমার দিকে একবার তুলেই চট করে আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিলে মেয়েটা। সদ্য-মাতৃহারা আধপাগলী মেয়েটার জন্যে মনের ভিতরটা কেমন করে মোচড় দিয়ে উঠল হঠাৎ। পা বাড়িয়েছিল রাজী পাগলী চলে যাবার জন্যে, নিজের অজ্ঞাতেই যেন অন্তরঙ্গতার সুর বেরুল আমার গলা দিয়ে—একটু দাঁড়াও ত রাজী। পাঁচ টাকার আর একখানা নোট এগিয়ে ধরলাম ওর হাতের কাছে, বললাম—মা মারা গেছে তোমার তা বল নি ত আগে! টাকার দরকার হবে এখন তোমার, ধরো এটা।

চকিতের মধ্যে দৃপ্ত ভঙ্গীতে যেন ফণা ধরে ফিরে দাঁড়াল রাজী পাগলী। বললে—আহা, ভিক্ষে মাঙতে এসেছি যেন ওনার কাছে! গতর খাটাই খাই—তা বলে অপচ্ছেদ্দার দান নেব কেন গা?

বিস্মিতই হলাম না শুধু, করুণাপ্রবণ মন কথার ঘা খেয়ে অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজী পাগলী। মন সঙ্কুচিত হোক—আপদ গেল ভেবে কিন্তু নিশ্চিন্ত হলাম অনেকটা। সত্যি, মুখ বেগোড়া রকম আলগা মেয়েটার, মানুষের মানমর্য্যাদা বোঝে না। ক'দিন মাত্র এসেছে, সারাক্ষণেই অস্বস্তিকর ঠেকেছে ওর উপস্থিতি। আপদ গেলই বটে! কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে মাত্র একটি দিন পরেই আবার দেখা মিলল ওর। অতি প্রত্যুষ তখন, পরিচিত কলকণ্ঠের চড়া পর্দ্দার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। কানে এল রাজী পাগলীর মুখের কথা—কথা নয় অগ্নুদগার যেন।—জবাব দিয়েছে—সে আমি বুঝব আর বাবু বুঝবে। তুই অমন করে চেঁচিয়ে মরছিস কেন রে উড়ের মড়া? পরক্ষণেই হঠাৎ উদারায় নেমে এল কণ্ঠস্বর। বললে—পোষ মাসের দিন। তাড়িয়ে দিলেই যেতে আছে নাকি! গেরস্তের ভালমন্দ ভাবতে হবে না বুঝি? রাগের মাথায় অমন অনেক কথাই বলে ফেলে মানুষে। মাইনে চুকিয়ে দিলেই জবাব দেওয়া হয়ে গেল নাকি! মানুষ একটা খাবে কি, পরবে কি, কোন্ চুলোয় দাঁড়াবে থাকবে, এসব ভাবতে হবে না যেন।

ভালো আপদ জুটেছে ত! শুধু ছিটগ্রস্তই নয়—বিচিত্র পর্য্যায়ের জীব যেন এই মেয়েটা। বয়সের তুলনায় মনটা এর অনেকখানি পরিণত-পরিপক্ব যেন, আর বাচনভঙ্গী—মাথায় আগুন ধরিয়েও দেয় আবার মর্ম্মে মোচড় দিতেও জানে। আমার আটাশ বছরের জীবনে নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, এটি কিন্তু অভূতপূর্ব্ব।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অল্পপরিসর রোয়াকটার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম, অপ্রীতিকর দৃশ্য। ঘনশ্যামের পুরোপুরি যুযুৎসু মূর্ত্তি! রাজী পাগলীর হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নেবার জন্যে সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াস তার! আমাকে দেখেই নিরস্ত হয়ে সরে এল একটু। বাড়ী ফাটিয়ে একে-বারে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠল রাজী পাগলী—আমায় এখানে কাজ করতে দেবে না হতভাগা। ঝাঁটা কেড়ে নিচ্ছে হাত থেকে। কব্জির কাছটায় কি রকম মুচড়ে দিলে মুখপোড়া, দেখো না বাবু!—বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে মেয়েটা। ছোট মেয়ের মত কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে ফোঁপাতে সুরু করলে শেষটায়। ধমক দিয়ে সরে যেতে বললাম তখনই ঘনশ্যামকে। বললাম—ছিঃ ছিঃ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে একবার তীব্র কটাক্ষ হেনে অভিমানমিশ্রিত কণ্ঠে মেয়েটি বললে—ওসব লোক-দেখানো সোহাগ বুঝি আমি। মনিবের উস্কানি না থাকলে সাধ্যি কি ও মুখপোড়া আমার গায়ে হাত দেয়।

গাম্ভীর্য্যের আবরণ খসে গেল আমার মুখের উপর থেকে। হেসে ফেললাম মেয়েটার কথা বলার বিচিত্র ধরন দেখে। সত্যিই পাগলী মেয়েটা। কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে বললাম—কাল পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বলে দিলাম ত এস না আর তুমি। আজ সকালেই আবার জালাতে এসেছ—আচ্ছা পাগল ত?

চমকে উঠল যেন রাজী পাগলী আমার কথা শুনে। বললে—তা, তুমিও পাগল বলবে বৈ কি বাবু? তোমার

আর কি দোষ বল ?—উড়ে ব্যাটাই লাগিয়ে ভাঙিয়ে এ সব বলাচ্ছে, করাচ্ছে। পাগলছন্ন হলেও বুঝি সব।

বিরক্তিভরে বললাম—বলেইছি ত কাল, আর কাজ করতে হবে না এখানে তোমায়। আমি অন্ত লোক লাগিয়েছি, দেখছ ত ?

আমার কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মেয়েটা কাজ করতে হবে না—অন্ত লোক লাগিয়িছি—তা যাব কোথায় শুনি ? দু'বাড়ীর কাজ ছুটে গেল, 'পাগল' বলে তাড়ালে। তোমারও মতলব, ঐ বলে বিদেয় করা। সাধ করে যেন বকি আর চেঁচিয়ে মরি আমি! মাথার রোগটার কথা ত কেউ ভাবে না ?—বলতে বলতে আবার অশ্রু-আর্দ্র হয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর।

সকালের ঝলমলে আলোয় পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম রাজী পাগলীর দিকে। বিপুল উৎকণ্ঠায় ভরা মুখ, চোখ দুটিতে একান্ত অসহায়ের দৃষ্টি। কৌতূহল জাগল হঠাৎ মনের কোণে। সহানুভূতির স্বরে বললাম—তোমার আপনার লোক বলতে আর কে কে আছে রাজু ?

ছলছলে চোখজোড়া তুলে তাকালে একবার আমার দিকে। অন্তরের ছোঁয়া পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল যেন একটু। বললে—যম আছে আমার। সদু পিসী আপনার কেউ নাকি! তার নিজেরই বলে দু'বেলায় জোটে না সব দিন তা আমায় খাওয়াবে কি শুনি ? কেবল বলছে—এবার সোয়ামীর ঘর করগে যা। মারুক, কাটুক মেয়েমানষের সোয়ামীর ঘরই সগ্গ।

চমকে উঠলাম। মেয়েটা বিবাহিতা তা হলে। কিন্তু সিঁথিতে ওর সিঁদুর কৈ! বিস্ময়ের ভাব কাটতেই বললাম—সেই ভাল, স্বামীর কাছেই চলে যাও তুমি রাজু—সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে।

দূর আকাশের দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে রাজী পাগলী। মনটা তার চকিতের জন্তে অতীতমুখী হ'ল যেন। পরক্ষণেই বললে—পোড়াকপাল আমার। সে আবার সোয়ামী নাকি। পাকা দেখা হ'ল না, গায়ে হলুদ হ'ল না। মেড়ো পুরুত একটা ইড়বিড় করে ছাইপাঁশ কি দু'চারটে মন্তর পড়লে—ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল অমনি। শুভদৃষ্টি না হলে বিয়ে হয় বুঝি—তুমিই বল না বাবু ? দু'কুড়ির উপর বয়েস মিনসেটার। গজদাঁতের মত তিনটে দাঁত উঁচু হয়ে আছে সামনে। ওপরকার ঠোঁট নেই বললেই হয়, গন্না-কাটার মত দেখতে। মাগো, পাগল বলে আমার পছন্দ থাকতে নেই যেন ?

কৌতূহল বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। চোখেমুখে আমার সে ভাব ফুটেছিল নিশ্চয়ই। রাজী পাগলী তা লক্ষ্য করেছিল সম্ভবতঃ। এমন ধৈর্য্যশীল শ্রোতাও বোধ হয় পায় নি ও এর আগে। চোখেমুখে অপরূপ ভাবের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে বললে—ছত্তরের মেলা দেখতে গেছলুম ত গেল বছরের আগের বছরে। মন্দিরের কাছে মুখপোড়া মিনসের সঙ্গে দেখা। কাকেও বলো না বাবু—মা বর্দ্ধমানের মেয়ে ত পালিয়ে এসেছিল এখানে। অনেক কাল পরে গাঁয়ের চেনা লোক পেয়ে মা মেলার কথা ভুলে গেল যেন। এর কথা তার কথা শোনাতে শোনাতে সেই যে আমাদের সঙ্গ নিলে মুখপোড়া—যেতে আর চায় না। আমাদের বাসায় এসে রইল বেশ দিনকতক। দেশে ঘরদোর আছে, ক্ষেত-খামার আছে, দুখ্যু শুধু ঘরে নাকি বউ নেই মুখপোড়ার—মেয়ে দিতে চায় না কেউ। ভালই করে সবাই, মাথার চুলে পাক ধরেছে, তায় ওই ত চেহারার ছিরি। ক'দিন ধরে গুজগুজ ফিসফিস করে মার মন ভেজালে মুখপোড়া। নগদ আট গণ্ডা টাকাও গুঁজে দিলে মায়ের হাতে, মা জল হয়ে গেল অমনি। পাঁচ জনকে বললে—ওই ত পাগলছন্ন মেয়ে—বর জুটবে কোথায় এর পর, খাবে পরবেই বা কি ? নিজে থেকে যখন মেয়েটার ভার নিতে চাইছে মানুষটা!—ব্যস, দিলে অমনি বলির পাঁঠার মত উচ্ছুগ্গু করে! আমার জীবনটার কি হ'ল বল ত বাবু ?

আকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে মেয়েটা আমার মুখের পানে চাইলে। কৌতূহল কমে গিয়ে বিস্ময়ের ভাব জাগল হঠাৎ আমার মনে। নেহাত পাগলী নয় মেয়েটা! তলে তলে সহজ মানুষের মত জ্ঞানবুদ্ধি রয়েছে দিব্যি। রাজী পাগলী এর পর আপনমনে গজগজ করতে লাগল। ধীরে ধীরে স্ফুটতর হয়ে উঠল আবার ওর কণ্ঠস্বর—আহা, সোয়ামীর ঘর করি নি নাকি কখনও ? দিনকতক ছিলুম ত মিনসের কাছে গিয়ে। নিত্যি রাতে মদ গিলে এসে পিটত আমায়, মুখ বুজে মুখপোড়ার সঙ্গে ঘর করতে হবে। শুধু তাই নয়—ভালবাসতে হবে আবার ওই হতচ্ছাড়াকে। মুখপোড়া কম হেনেস্তা করে নি আমায় বাবু। এই ছাখ, মেরে মেরে আষ্টেপিষ্টে কি রকম দাগ করে দিয়েছে আমার!

সত্যি তাই! মাথায়, হাতে, কপালের উপরে কাটা দাগের মতই রয়েছে বটে! পতি পরমগুরু সোহাগের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে অনেকগুলো। হঠাৎ বারুদের মত জ্বলে উঠল রাজী পাগলী। বললে—আমিও তেমনি করিছি। যথাসর্ব্বস্ব জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসিছি বাবু, ও মুখো হচ্ছি না আর এ জন্মে। ঘষে ঘষে মাথার সিঁদুরও তুলে ফেলিছি এখানে এসেই। ও বালাই আমার রেখে লাভ!

কৌতূহলভরে তবু প্রশ্ন করলাম—লোকটা থাকে কোথায় ?—তোমার শ্বশুরবাড়ী কোন্ জায়গায় রাজু ?

আবার জলে উঠল রাজী পাগলী। ঝেঁজে বললে—যমের দক্ষিণ দুয়ারে। ক্ষেত-খামার ঘরদোর না ছাই—সব বাজে কথা বাবু। কোলকাতার ওদিকে যেতে আসানসোল বলে ইষ্টিশান পড়ে ত? মুখপোড়া চা ফেরি করে শুনেছি সেই ইষ্টিশানে।

হঠাৎ কোমল পর্দায় নেমে এল রাজী পাগলীর কণ্ঠস্বর। বাষ্পাকুল দুটি অসহায় চোখ তুলে চাইলে আবার আমার মুখের পানে। বললে—পাগল বলে সবাই অগেরাহ্যি করে বাবু, দুখ্যু বুঝতে চায় না কেউ। তুমিই যা শুধু আদর করে 'রাজু' বলে ডাক এক-আধবার—কান পেতে শোন সব কথা। না হলে...বলতে বলতে অকস্মাৎ কিসের আবেগে কে জানে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ফেললে মেয়েটা।

মনের মধ্যে হঠাৎ আলোড়ন সুরু হ'ল যেন। উচিত-অনুচিতের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে দেরি হ'ল অনেকখানি। স্বাভাবিক অবস্থায় এল যখন মন, রাজী পাগলী তখন ঝাটা হাতে নিয়ে দিব্যি কাজ করতে সুরু করে দিয়েছে। 'না' বলতে পারলাম না আর তাকে। নতুন চাকরটাকেই বিদায় নিতে হ'ল সেদিন।

পুরো একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল দেখতে দেখতে। রাজী পাগলী ঘরের মানুষের মত হয়ে গেল যেন। সকালে-বিকালে আসে রোজ, বকবক করে, উদ্ধত মেজাজে চেঁচায়—ঝগড়াও বাধায় এক এক দিন। হাত কিন্তু ওর কাজ করে চলে সর্ব্বক্ষণ। কাজও ওর বড় পরিপাটি। বিরক্তির ভাব জাগে না আর বড় একটা, দৈনন্দিন অভ্যাসের কল্যাণে গা-সওয়া হয়ে এসেছে সব। আমার মত ঘনশ্যামও বুঝেছে মেয়েটা পুরোপুরি পাগলী। পাগলী মেয়েটার বিচিত্র কথাবার্ত্তা কৌতুকভরে উপভোগ করে এখন, রাগে না আর।

শীতান্তের একটি ম্লান অপরাহ্ণ। জ্বরতপ্ত দেহ নিয়ে আপিস থেকে বাসায় ফিরলাম, গায়ে হাতে বেদনা—বিছানায় শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। ঘনশ্যামকে ডেকে শরীরগতিকের কথা জানিয়েও দিলাম তখনই। রাজী পাগলী কড়ামাজা ফেলে রেখে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরি রোজ আপিস থেকে। অসময়ে আমার এমন অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিল ও, অসুখ-বিসুখ একটা কিছু অনুমানও করেছিল সম্ভবতঃ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে সব। হঠাৎ কাছে এসে আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে একবার। কাজ সেরে যাবার সময়ে শত উপদেশ দিয়ে গেল ঘনশ্যামকে। কানে এল অনেক কথা—'ঠাণ্ডা লাগে না যেন বাবুর। দুধ একটু গরম করে খাওয়াস রাতে। ছটফট করে যদি মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিস একটু। চোখমুখ থমথম করছে যেন বাবুর। চণ্ডী ডাক্তারকে একবার ডেকে এনে দেখালে হ'ত না। দিনকাল ভাল নয়, চারদিকে ঘরে ঘরে লোকের মায়ের দয়া হচ্ছে!' উৎকণ্ঠামিশ্রিত কণ্ঠস্বর।

রাজী পাগলীর অনুমান মিথ্যা নয়। পরদিন সকালে দেখলাম গায়ে মুখে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে কয়েকটা, জ্বরও বেড়েছে বেশ। প্রবাসে নিঃসঙ্গ একক জীবন। মনটা অনেকখানি দমে গেল যেন। রাজী পাগলী সামনে এসে দাঁড়াল, দারুণ উৎকণ্ঠা আর শঙ্কায় ভরা মুখ চোখ। এমনই ভীতি-বিহ্বল আরও দুটি মুখচ্ছবি স্মরণে জাগল হঠাৎ। টাইফয়েডে আমার যাই-যাই অবস্থা হয়েছিল একবার, বছর পনের হবে বয়স তখন। মা আর মেজদি এমনি মুখের ভাব নিয়েই সারাক্ষণ বসে থাকত আমার পাশটিতে। সে দুটি মুখচ্ছবির সঙ্গে এর মুখভাবের যেন মিল আছে কোথায়।

পাগলী মেয়েটা ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে একটি শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। মায়ের দয়া হয়েছে আমার উপর, ঘনশ্যামকে বার বার সাবধান করে দিলে—আঁশ কিছু ঢোকে না যেন বাড়ীর ভেতরে। আর ঘন ঘন পান চিবনো চলবে না তোমার। থাকতে না পার তিন দিন সুপুরি চিবোও শুধু। ওসব অনাচার চলবে না ক'দিন এখন। মা শেতলা ভালয় ভালয় গায়েরগুলো এখন মিলিয়ে দিলে বাঁচি!—এমনি ধরনের কত কি কথা কানে এল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এল রাজী পাগলী, ধুনো আনালে—গঙ্গাজলও আনালে কোথা থেকে। মেঝেয় জল ছিটিয়ে, ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে মন্দিরের মর্য্যাদা দিলে যেন ঘরখানাকে। মা এসেছেন যে! জ্বরের ঝোঁক বেড়েছে তখন অনেকটা। চোখ বুজে পড়ে পড়ে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে ওর গতিবিধি অনুভব করছিলাম। কপালে হঠাৎ মৃদু একটু স্পর্শ পেতেই চমকে চোখ মেললাম। কপালে কি একটা ছুঁইয়ে তুলে রাখলে যেন রাজী পাগলী কুলুঙ্গির এক পাশে—পয়সাই সম্ভবতঃ। ছোট বোন মন্টির একবার বসন্ত হয়েছিল, বেশ মনে পড়ে তিন দিন তিন রাত মায়ের সে কি আকুলতা—কি অস্থিরতা! রাজী পাগলীর ব্যাকুলতাও কতকটা যেন সেই ধরনের। অন্তর বিচলিত হয়েছিল কিনা কে জানে—জ্বরের ঘোরেই সম্ভবতঃ অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত ফস করে বলে ফেললাম—কপালটায় একবার হাত দিয়ে দেখ ত রাজু, জ্বর বোধ হয় বেড়েছে আমার!

ওর চোখমুখের ভাব দেখে বুঝলাম স্বর্গ হাতে পেল যেন হঠাৎ রাজী পাগলী। কপালে মমতাস্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ

দিয়ে বললে—মানত করিছি মায়ের কাছে, ভয় নেই, গা জুড়িয়ে দেবেন মা দু'এক দিনের মধ্যেই।

তিন দিন আর বাসা থেকে নড়ল না রাজী পাগলী। উড়িয়া বামুনটার ওপর বিশ্বাস নেই ওর, অনাচার হতে কতক্ষণ! কাছে কাছে থেকে আমার খবরদারি করলে প্রায় সর্বক্ষণ! অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম ওর মেজাজের। চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি সব বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ! ঘনশ্যামের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাও বাড়ল যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে! ভীতিবিহ্বল কণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি কানে এল এক সময়ে—শ্রোতা ঘনশ্যাম। মুগুরিগুটির মত মায়ের দয়া হয়েই নাকি ওর ভাইটা মারা গিয়েছিল। সেও নাকি ফাল্গুন মাসের এমনি দিনে হয়েছিল। অজান্তে অনাচার হয়ে গিয়েছিল একটু। মা ওর মনিববাড়ী থেকে তেল আর আঁশ ছুঁয়ে এসেছিল নাকি! ভুলে সেই কাপড়েই রোগীর ঘরের চৌকাঠ মাড়িয়েছিল কখন! সেদিনই রাতে টকটকে জবার মত লালপেড়ে শাড়ী পরে কে যেন ওর ভাইয়ের মাথার কাছে এসে বসেছিল! স্পষ্ট দেখেছিল ওর ভাই। অন্য কেউ নয়—ওই মা শেতলা। স্বপ্ন হোক, সত্যিই হয়েছিল কিন্তু তা শেষটায়। দশ দিনের দিনই নাকি ভাইটি ওর মারা যায়! এমনি কত কি সব কথা!

তিন দিন পরেই জ্বর ছাড়ল আমার। রাজী পাগলী বড় আপনজনের মত বললে—পূজো দিতে হবে আজ মায়ের। চা-টা কিছু খেয়ো না আজ বাবু। মায়ের পেসাদ একটু মুখে ঠেকাতে হয়।

শীতলার পূজো! সংস্কারমুক্ত মন আমার। যুক্তি দিয়ে যাচাই করে দেখি সবকিছুকেই। পাগলী মেয়েটাকে কিন্তু যুক্তির কথা শুনিয়ে লাভ নেই। পূজোর কথা তুলতেই হেসে শুধু উপহাস করলাম ওর প্রস্তাবকে। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখজোড়া তুলে মুহূর্তের জন্যে তাকালে একবার রাজী পাগলী, পরক্ষণেই ক্ষেপে উঠল যেন। গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাসা ছেড়ে চলেও গেল সেই মুহূর্তে।

ঘণ্টাতিনেক পরে দেখি কোথা থেকে ফুল আর প্রসাদ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে বেচারী। সে কি সাধাসাধি আমাকে! কপালে ঠেকাতে হবে ফুল, প্রসাদও মুখে দিতে হবে একটু। 'খাব না, ছোঁয়াব না'—এমন নাকি বলতে নেই! অন্তরের সে কি ব্যাকুলতা! পাছে অবজ্ঞা করে ঠাকুরদেবতার অপমান করি সে জন্যে শঙ্কাও কম নয়। যুক্তিনিষ্ঠ মনেরই হার হয়েছিল সেদিন, কেন কে জানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবাসে এই নিঃসম্পর্কীয়া মমতাময়ীর একান্ত অনুরোধ এড়াতে পারি নি সেদিন!

ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল কোথা দিয়ে। আপিসের কর্তৃপক্ষের হুকুম এল হঠাৎ আমাকে ফিরতে হবে আবার কলকাতার আপিসে। খবর শুনে ঘনশ্যাম মহা খুশী। হাওড়ার কোন্ চটকলে ওর ভাই কাজ করে, প্রায়ই চিঠি লেখে নাকি ওকে চটকলে কাজ নেবার জন্যে। আঠারো-উনিশ টাকা করে হপ্তা। ঠিক হ'ল ঘনশ্যাম আমার সঙ্গেই রওনা হবে। যাবার দিন দুপুরে বিছানাপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে বাঁধছে ঘনশ্যাম, আমি তদারক করছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পোস্টকার্ড আকারের একখানা ফটো ছিল আমার, সেটার খোঁজ করতে গিয়ে হঠাৎ তার আর পাত্তা মিলল না। বাল্যবন্ধু রঞ্জনের তোলা ফটো, আমার একান্ত প্রিয় বস্তু সেটি। কলেজ-জীবনের বিশেষ একটি স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে ফটোটির সঙ্গে। কিন্তু যাক সেকথা, ফটোখানা গেল ছাই কোথায়! চকিতের মধ্যে মনে পড়ল রাজী পাগলীর মুখখানা। বিবেক কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তিন বছর ধরে বাসার সব জিনিসপত্র নাড়ছে পোছাচ্ছে মেয়েটা, কোন দিন হারায় নি কোন কিছু। না, সন্দেহের সীমার মধ্যে টেনে আনা চলে না তাকে কোনমতেই।

বৈকালে সেদিন পরিচিত কয়েক জনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরলাম। দেখলাম রোয়াকের ধারে উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে আছে রাজী পাগলী, মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নের বিষণ্ণ-করুণ ছায়া নেমেছে ওর সারা অঙ্গে। আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই ছোট বালিকার অসঙ্কোচে ব্যগ্রভাবে বলে ফেললে ফস্ করে—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবু, আমাকে নিয়ে চল। ঘনশ্যাম যাবে আর আমি কেউ নই বুঝি?

চমকে উঠলাম। বলে কি মেয়েটা! পাগলী হোক, রূপহীনা হোক, নবযৌবনের ভারে টলমল করছে কিন্তু ওর সর্বাঙ্গ! উপরন্তু ইদানীং ওর কথাবার্তায় আর ব্যবহারে কেমন এক ধরনের অন্তরঙ্গতার ভাব ফুটে ওঠে যেন। সঙ্কুচিত হয়ে উঠি, অস্বস্তি বোধ করি পদে পদে। মেয়েটা নিতান্ত পাগলী বলেই মনকে প্রবোধ দিই, প্রশ্রয়ও দিই এ সবের।

তা বলে এ আবদারকে ত আমল দেওয়া চলে না কোন মতেই। একে পাগল তায় ওই ধরনের অসঙ্কোচ ব্যবহার ওর। কি বলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতেও কম বিপত্তি নয়। উদ্ভিন্নযৌবনা এই মেয়েটিকে দেখে মা-কাকীমা, দাদা-বৌদিদিরা সব ভাববেন কি! দুর্বার লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে মনকে অধিকার করে বসল কায়েমী ভাবে।

কঠোর ভাবে বললাম হঠাৎ—আমার সঙ্গে যাবে বলতে লজ্জা করে না তোমার? কচি খুকী নাকি তুমি? তুমি এখানে থেকে পাঁচ বাড়ীতে গতর খাটিয়ে পেট চালাতে পার ভালই—না হলে তোমার স্বামী আছে তার কাছেই চলে যেয়ো তুমি।

কথা শুনে আর আমার মুখচোখের ভাব দেখে একটুও চেঁচালে না রাঙ্গা পাগলী। মর্ম্মভেদী দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে। চাউনির ভঙ্গী দেখে মনটা আমার একটু বিচলিত হ'ল, অন্তরও বিগলিত হ'ল যেন আপনার অজ্ঞাতে। ওর পাওনা সব চুকিয়ে দিয়েছিলাম সকালে। তা হোক, বিদায়বেলায় কৃতজ্ঞতার দান হিসাবে কিছু দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি দশ টাকার তিনখানা নোট নিয়ে এসে ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম। অসঙ্কোচে নোট ক'খানা হাতে করে নিলে রাঙ্গা পাগলী। কৃতার্থ হওয়ার ভাব ফুটল যেন ওর মুখে চোখে। চলেও গেল সঙ্গে সঙ্গে, যাবার আগে অপরূপ ভঙ্গীতে আমার পানে একবার তাকিয়ে আমার অন্তরের শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে চাইল যেন। ভাবলাম—ভালই হ'ল। অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করলাম যেন।

রাত ন'টা নাগাদ ট্রেন। আকাশ মেঘমেদুর, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছিল আগে থেকেই। তা হোক, সর্ব্বতীর্থসার জন্মভূমির কোলে ফিরে চলেছি। প্রাণের আনন্দ-উদ্দীপনা বেড়েছে অনেকখানি। ষ্টেশনে এসে কিন্তু চমকে উঠলাম, আনন্দ ম্লান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাঙ্গা পাগলী আগে-ভাগে এসে দাঁড়িয়ে ছিল কখন ষ্টেশনে—একেবারে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর। রাঙা চেলী পরেছে একখানা—বিয়ের সময়েরই চেলী সম্ভবত। শুধু তাই নয়, ব্রীড়াময়ী নববধূর ধরনে মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছে দিব্যি। অভিনব ভাবভঙ্গী ওর, স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটি। দুর্ব্বার আবেগ-কম্পন জেগেছে যেন ওর সারা দেহে-মনে। হাতে রঙচটা একটা টিনের সুটকেস। আমাকে দেখতে পেয়েই উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল রাঙ্গা পাগলী। প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্ত ওর হারানিধি খুঁজে পেল যেন—মুখচোখের এমনি ভাব হ'ল চকিতের জন্যে। আমার খুব কাছটিতে এসে কোন রকম ভূমিকা না করেই অতি আপনজনের মত বললে—টিকিট কেটে সন্ধ্যে থেকে ঠায় বসে আছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবু। ঝি-চাকররা বাবুদের সঙ্গে যাবে এতে আবার লজ্জা কি! ওই বলে আমার ক'টা টাকা দিয়ে ভুলিয়ে এখানে ফেলে রেখে যাবার মতলব। পাগলচ্ছন্ন হলেও আমি বুঝি সব। পরক্ষণেই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর। বললে—পাগল বলে ফেলে রেখে যাচ্ছ এখানে সদুপিসীর কাছে। পিসী লোক ভাল নাকি! ক'দিন হ'ল কি রকম পেছনে লেগেছে আমার। কোন্ চুলো থেকে ওর এক ফিচেল ভাইপো এসে জুটেছে। কেমন করে যেন তাকায় আমার পানে মুখপোড়া যখন-তখন। পিসীর মতলব মুখপোড়ার সঙ্গে আমার ভালবাসার সম্বন্ধ পাতিয়ে দেয়। উঠতে-বসতে কানে মন্তর পড়ছে কেবল—আমার নাকি ছিল্লে হবে, গায়েও নাকি সোনাদানা উঠবে! পাগল বলে মানুষ নই যেন আমি?—বুঝি না যেন কিছু?

ছোট ঘরের কদর্য্য কাণ্ড সব। কান পেতে শোনবার মত কথা নয় এসব। আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আমার। ভাবলাম, সমাজের যে স্তরের মানুষ এরা সেখানকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাই উচিত ছিল ওর। কিন্তু উচিত-অনুচিত বিবেচনা করবার মত সময় ছিল না আর। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করতে সুরু করেছে তখন। মুখ দিয়ে আমার কোন কথা প্রকাশ পাবার আগেই ঘমশ্যামের সঙ্গে পরম উৎসাহে সামনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটায় উঠে পড়ল রাঙ্গা পাগলী। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে পাশের ইণ্টারক্লাস কামরাটায় গিয়ে উঠে পড়লাম আমি কোন রকমে। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ অস্বস্তিকর চিন্তা ভর করল সারা দেহে-মনে। চিন্তাভারে স্নায়ুগুলো বিধ্বস্ত হ'ল সারারাত ধরে। রাতের শেষ প্রহরের দিকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এসেছিল যেন। যাত্রীদের হাঁকডাক, ফেরিওয়ালাদের চীৎকার শুনে ঘুম ভাঙল হঠাৎ। ট্রেন থেমেছে বড় একটা ষ্টেশনে, তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম—আসানসোল ষ্টেশন। পাশের কামরাটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম তাড়াতাড়ি, ঘুমোয় নি তখনও রাঙ্গা পাগলী। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার কামরার দিকেই চেয়েছিল সম্ভবতঃ। চকিতে মাথায় আমার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত খেলে গেল। মনের সব দ্বিধ-দ্বন্দ্ব ঠেলে রেখে রাঙ্গা পাগলীর কা৷ টিতে এগিয়ে গেলাম। কোমল কণ্ঠে বললাম—তাড়াতাড়ি তোমার সুটকেস নিয়ে নেমে এস রাঙ্গু। ট্রেন বদলাতে হবে আমাদের এখানে।

দরজাটা খুলে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আলগোছ হয়ে বসে ছিল যেন মেয়েটা। গাড়ী থেকে নেমেই ব্যাকুল ভাবে বললে—ঠাকুর যে ঘুমুতে লাগল এখনও, ওকে তাড়াতাড়ি ডাক বাবু!

আশ্বাস দিয়ে তৎক্ষণাৎ বললাম—ভয় নেই, এ গাড়ী

ঘনশ্যামের দেশের দিকে যাবে। ও নেমে যাবে ঠিক সময়ে।

আমার পিছু পিছু হন্‌হন্ করে হেঁটে এল রাজী পাগলী। ওয়েটিং রুমের ভিতরে ওকে এনে বসালাম তাড়াতাড়ি, বললাম—আধ ঘণ্টা দেরি আছে এখনও আমাদের গাড়ী আসতে। তুমি বস এখানে চুপ করে, আমি আসছি এখনই।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রাজী পাগলীর সারা মুখখানা। পরম নির্ভরতায় ভরা দুটি চোখ আমার পানে তুলে রাজী পাগলী ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললে—তুমি তাড়াতাড়ি ঘুরে এস বাবু—আমার ভারি ভয় করছে কিন্তু।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বললাম—ভয় কি, পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব আমি। কুলি ডেকে আমার স্যুটকেস বিছানা—এসব নামাতে হবে ত গাড়ী থেকে?

তিন মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিলে ট্রেনখানা। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে আসতেই মুখ বাড়িয়ে দেখলাম একবার। দূরে—প্ল্যাটফর্মের উপরে—আলোর তলায় লাল চেলী একখানা জলজল করছে যেন। ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে নিশ্চয়ই রাজী পাগলী! মনে হ'ল গতিশীল ট্রেনের দিকে আকুল ভাবে চেয়ে আছে একজোড়া ভীত সন্ত্রস্ত চোখ। গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকুল দুটি চোখের দৃষ্টি ক্রমপ্রসারিত হয়ে এগিয়ে আসছে যেন ট্রেনের পিছু পিছু!

একটু নিশ্চিন্ত হলাম তবু। ভাবলাম, আর মাত্র ঘণ্টা-দেড়েক পরেই ত তিমিরাবরণ সরে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে, সর্ব্বপাপঘ্ন প্রভাকর দেখা দেবেন পূর্ব্বাশার প্রান্তে। ট্রেনের আলো ফুটলেই রাজী পাগলী চারদিকে খুঁজে বেড়াবে নিশ্চয়ই আমাকে। বলেছিল স্বামী ওর চা ফেরি করে—আসানসোল ষ্টেশনে। নিশ্চয়ই আবিষ্কার করবে সে তার একান্ত বাঞ্ছিতাকে। উপায়ান্তর না দেখে রাজী পাগলীও নিশ্চয়ই তার স্বামীর ঘরে আবার আশ্রয় নেবে। নিশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে সিগারেটে আগুন ধরাবার উদ্যোগ করতে লাগলাম।

মাত্র এক পক্ষ পরের ব্যাপার। অবকাশের মধুময় অপ্রহর একটি। আলোয় ঝলমল করছে যেন দিগ্‌দিগন্ত। অন্তরের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হয়েছে নির্ম্মল প্রশান্তি আর আনন্দ। আনন্দের কূলছাপা বান ডেকেছে যেন সবদিকে। পিওন চিঠি দিয়ে গেল একটা হাতে। রি-ডাইরেকটেড হয়ে আসছে খামটা পাটনা থেকে। খুলেই চমকে উঠলাম। দেখি খামের মধ্যে আমার সেই পাটনার বাসায় হারিয়ে-যাওয়া ফটোখানা রয়েছে। বিস্ময়-বিহ্বল মন নিয়ে সঙ্গের লিপিখানার উপর চোখ বুলাতে সুরু করলাম তাড়াতাড়ি। রঞ্জন লিখছে আসানসোল থেকে, অবাক হলাম একটু! রেলের কর্ম্মচারী সে—পি-ডবলিউ-আই। হালে আসানসোলে বদলি হয়েছে সম্ভবত। কিন্তু আরও পুঞ্জীভূত বিস্ময় অপেক্ষা করছিল চিঠিটার শেষ দিকে। রঞ্জন লিখেছে একটা মেয়েছেলে রেললাইনে কাটা পড়েছে এখানে, পরশু দিন ভোরে। সঙ্গে তার টিনের স্যুটকেস ছিল একটা, সেটার মুখ খুলে গিয়ে কাপড়চোপড়, আয়না চিরুণী যথাসর্ব্বস্ব দেখি ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে লাইনের ধারে। কাটা পড়টার পাশেই দেখি তোর এই ফটোখানা পড়ে রয়েছে! কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে তোলা সেই ফটোখানা না? আমি স্ন্যাপ নিয়েছিলুম মনে পড়ে? ভেবে অবাক হলাম তোর ফটো এখানে এল কি করে? ফর্সা হচ্ছে তখন সবে। ট্রলিতে চেপে ডিউটিতে বেরিয়েছি—দেখি এই কাণ্ড! ফটোখানা কুড়িয়ে নিয়ে এসে ভাল করেছি নিশ্চয়ই, কি বলিস? দেখে ছোট জাতের মেয়েছেলে বলেই মনে হ'ল। আহা বেচারী, লাল চেলী পরে একা কোথায় যাচ্ছিল কে জানে। কোন নগণ্য গৃহকোণের নববধূ হয়ত। কিন্তু যাক, ভেবে অবাক হচ্ছি শুধু তোর ফটোখানা এখানে এল কি করে? ইত্যাদি।

ফটোটার দিকে চাইলাম আর একবার। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল ভীতিবিহ্বল অতি অসহায় আর একজোড়া চোখ আর সেই সে চোখের সেই মৌন, আকুল আবেদন, "তুমি তাড়াতাড়ি ঘুরে এস বাবু—আমার ভারি ভয় করছে কিন্তু"। মনের মধ্যে আজ আবার এ কথার আলোড়ন সুরু হ'ল যেন। রক্তের দাগের মতই কি লেগে রয়েছে যেন ফটোখানার গায়ে। হাঁ, সেই রকম অস্পষ্ট একটা দাগই বটে! রাজী পাগলীর হৃদয়ের শোণিত-চিহ্ন হয়ত বা এ! আমার চৈতন্যলোকে হঠাৎ আকাশ ফাটিয়ে বজ্রপাত হ'ল যেন। সকল সত্তা চমকে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন সঙ্গে সঙ্গে। লাল-চেলীপরা বধূবেশিনী রাজী পাগলীই তা হলে কাটা পড়েছে সেদিন রেললাইনে! চিঠির তারিখটা দেখলাম চট করে, ঠিক তাই। আধপাগলী মেয়েটা তা হলে তলে তলে অন্তরের মধ্যে অনুরাগই পোষণ করে এসেছে এত দিন ধরে। দুর্লভতম একটি আকাঙ্ক্ষাকে লালন করে এসেছে মনে মনে অতি গোপনে। আমার ফটোটায় না হলে কিসের প্রয়োজন ছিল ওর? ফটোখানাকে লুকিয়ে

সরাবার লোভই বা তার মধ্যে জাগবে কেন। বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চোখের সামনে ছুটির দিনের সব আলো, সব উজ্জ্বলতা, সব আনন্দ, চিত্তের নির্মল প্রশান্তি—সবকিছুই লেপে মুছে একাকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন মুহূর্তের মধ্যে।

খচ্ করে উঠল আবার আঙুলের কাঁটাটা। অতীত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম বর্তমানের সীমানায়। অনুরাগ-ভরে অতসীর মুখের পানে তাকালাম, চোখে মুখে তার নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের উজ্জ্বল আনন্দ। দুর্নিরীক্ষ্য কাঁটাটার সূক্ষ্মতম একটি অংশকে ছুঁচের ডগায় রেখে তুলে ধরলে অতসী আমার চোখের সামনে। বার করেছে অতসী কাঁটাটিকে, সার্থক হয়েছে তার ঐকান্তিক চেষ্টা।

আঙুলের অস্বস্তির নিরসন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মর্মের কাঁটাটা কিন্তু খচ করে উঠল আবার আজ দ্বিগুণ ব্যথা জাগিয়ে। ছাঁদনাতলায়, বাসরঘরে, ফুলশয্যার রাতে অস্বস্তি-কর এই কাঁটার ব্যথা অনুভব করেছি বারে বারে। আজও, এত বছর পরে একান্ত অনুরাগের মুহূর্তে অতসী খুব কাছ ঘেঁষে এসে বসলেই ব্যথাটা খচ্ করে ওঠে।

অভিনয়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

চিরদিন ধরি, একি মরি মরি,
অপরূপ অভিনয়!
সৃষ্টির মাঝে খুঁজিছ স্রষ্টা,
আপনার পরিচয়।
একসাথে জুড়ি' হাসিকান্নায়
গাঁথিয়াছ মালা চুনিপান্নায়;
দুটি সহচর জীবন মরণ
চরণ-শরণ লয়!
প্রিয়া হয়ে থাকো বক্ষোবিলীন
বাসর শয়ন 'পর,
প্রিয়তমরূপে ভুঞ্জিছ মধু—
নিঙাড়ি' বিম্বাধর।
কত যে মুরতি ধর অহরহ,—
তুমি প্রেম আর তুমিই বিরহ;
তুমি বাঁশরিয়া, তুমি হে বাঁশরী,
বংশীর তুমি স্বর।

নিবিড় ব্যথার আগুনে দহিয়া
ঢালো করুণার ধারা,
ভালোবাসো যারে দুখ দাও তারে,
এ কি এ সৃষ্টিছাড়া!
জননী-জঠরে, শ্মশান-চিতায়
তব অভিনয়মঞ্চ কি হায়?
চাই কি মহান্, ক্ষুদ্রের মাঝে
হইতে আপনহারা?
তাইতো আমারে জ্বালায়ে পুড়ায়ে
এত তব কৌতুক,—
কবিতা উৎস করিছ বাহির —
ভাঙিয়া চুরিয়া বুক।
হানিয়া মৃত্যুজরা ব্যাধিশোক
করিতে আপন লীলাসম্ভোগ—
সৃষ্টির সেই প্রত্যূষ হতে
তাই তুমি উৎসুক।

চব্বিশ পরগনার কয়েকটি লোকসঙ্গীত

এ. কে. এম. হাসান উজ্জামান

বাংলার পল্লী-অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর বাউল মারেফতি ফকির' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইসলামের গূঢ় তত্ত্বকে 'মারেফৎ' বলে। সেই মারেফতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে চাই শরিয়ৎ অনুযায়ী কঠোর সাধনা। অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন সাহেব "হারামণি" পুস্তকে যে সম্প্রদায়কে 'বাউল' নামে অভিহিত করিয়াছেন, মনে হয়—তাহারই একটি শ্রেণী হইতেছে "মারেফতি ফকির।" ইহারা বেশরা ফকির নামে অধিকতর পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়—ইহাদের দর্শন বা ফিলজফি। ইসলামিক দর্শন লইয়া ইহারা সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করে। তাহাদের চিন্তাধারা যে উন্নত এবং শাশ্বত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বহুপূর্বে বৌদ্ধ বা হিন্দুযুগে "বাউল" সাধনা ছিল, পরে মুসলমান ধর্মাবলম্বী "বাউল" সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের সহিত তাহাদের মিলন হয়। তাই মুসলমান ফকিরদের পূর্ণ ইসলামিক ভাব নাই, বৈষ্ণব, শাক্ত বা বৌদ্ধভাব উহাতে প্রবেশ করিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি গান প্রদত্ত হইল। গানগুলি চব্বিশ পরগণা জেলার গয়াঘাট থানার নীলকুঠি অঞ্চলের কয়েক জন মারেফতি ফকির বা বাউলের নিকট হইতে সংগৃহীত।

১

মোহাম্মদ মোস্তফা নবী আরবের যে ফুল।
ঐ নাম শুনলে বলতে প্রাণ চায় মোহাম্মদ রসুল।
কি মধু সেই নামেতে, রহে না মন ঘরেতে
গওছ কুতুব দিশেহারা, হয়ে ফুলে মাতুয়ারা,
সাহা ফকির হ'ল হারা পেয়ে ফুলের মূল
আমার মোহাম্মদ মোস্তাফা নবী আরবের সে ফুল।
ফুলটি হল রাসুলাল্লাহ, বাসটি হল গণি আল্লাহ
আমরা কেবল হলুম রে ভাই উম্মতে রসুল
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নবী আরবের সে ফুল।
আমি বান্দা গোনাহ্‌গার, শোন মোনাজাত আমার ;
একটি বার দেখাও আল্লাহ সেই নূরের পুতুল
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নবী আরবের সে ফুল।

শব্দার্থ—মোস্তফা—পছন্দসই। এখানে হজরত মোহাম্মদের প্রতি সম্মানার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে।

নবী—খোদার প্রেরিত পুরুষ।

রসুল—খোদার প্রেরিত পুরুষ।

গওছ, কোতব—একার্থক শব্দ : আধ্যাত্মিক বা তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রসম্পন্ন ব্যক্তির বিশিষ্ট পদবী।

সাহা ফকির—পদকর্তা। এই সাহা ফকির কে জানা যায় না। তবে ইনি হারামণির ১৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শ্রীহট্টের ফকির শীর সাহা কি না কে জানে!

এশকেতে—প্রেমে।

রাসুলাল্লাহ—আল্লাহর রসুল।

গণি—বেনিয়াজ, পরমুখাপেক্ষী।

উম্মত—শিষ্য।

গোনাহগার—পাপী।

মোনাজাত—প্রার্থনা।

নূর—জ্যোতি।

২

আমি জেনেছি জেনেছি খোদা মহিমা তোমার
তোমার ভেল্কিবাজীর ব্যাপার
দেখে হই চমৎকার
আমি জেনেছি জেনেছি খোদা মহিমা তোমার।
বানিয়ে খাকের আদমের বেহেস্তে দিলেন আশ্রয়
কি কারণে খেতে গন্দম নিষেধ কর বারে বার
কি কারণে পুনরায় আদম কাছে গন্দম যায়,
তোর বাহানায় খেলে গন্দম আদম গুনাহগার
আমি জেনেছি জেনেছি খোদা মহিমা তোমার।

শব্দার্থ—ভেল্কিবাজীর—এখানে খোদার কুদরত বা সৃষ্টিকৌশলের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা অর্থে নিরক্ষর বাউলগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে।

খাকের—খাক ফারসী শব্দ, অর্থ মাটি। তাহা হইতে বাংলায় খাকের হইয়াছে।

আদম—সৃষ্টির প্রথম মানুষ। তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

গন্দম—ফারসী শব্দ, অর্থ গম। আদম ও তদীয় পত্নী হাওয়াকে জান্নাতে স্থাপন করিয়া খোদা বলিয়াছিলেন, "অলা তাক্‌রাবা হাজিহিশ শাজারাতা ফাতাকুনা মিনায যা লিমীন।"

অর্থ—"তোমরা এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, (যদি যাও) তাহা হইলে তোমরা হইয়া যাইবে অত্যাচারীদের মধ্যে।" কোরআন ১ম পারা সুরা বাকারাহ ৩৫ আয়েত ৪র্থ রুকু। কিন্তু ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষ সম্বন্ধে মতভেদ আছে : এবনে আব্বাসের মতে উহা আঙ্গুর অথবা গমের গাছ বা গন্দম গাছ। কিন্তু এখন গন্দমই নিষিদ্ধ বৃক্ষ হিসাবে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

আদম কাছে গন্দম যায়—'গন্দম কাছে আদম যায়' হওয়া উচিত ছিল।

৩

হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়
ওরে ক্ষেপা মন আমার,
নবীজীর কলেমা পড়ে
দোজখ হতে পাও নিস্তার।
আওল কলেমা শরিয়তে
ইমান খাঁটি রাখ তাতে
মোহাম্মদ মস্তকা বিছে
জ্বলছে বাতি দীপ্তাকার।
হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমা পড়
ওরে ক্ষেপা মন আমার।

শব্দার্থ—হক—সত্য।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই। ইহা ইসলামের মূলমন্ত্র।

নবীজীর কলেমা—অনেকের ধারণা, কেবল মোহাম্মদ এই মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তাঁহাকে লইয়া মোট এক লাখ অথবা দুই লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর ইহা প্রচার করিয়াছেন।

আওল—আউয়াল, প্রথম। উক্ত মন্ত্র ইসলামের প্রথম সূত্র।

কলেমা—আরবী শব্দ, অর্থ—শব্দ। এখানে ইসলামের মূলমন্ত্র।

শরিয়ত—ইসলামী বিধানশাস্ত্র। বিছে—উর্দ্দু শব্দ বীচে, অর্থ—মধ্যে।

৪

মন তুমি কোথায় ছিলে, কোথায় এলে,
আর ভি কোথায় যেতে হবে, দেখ না ভেবে;
অখণ্ড গোলক ছেড়ে, লাভ নিতে এসেছ ভবে,
রতি মা'বা কম্‌লে পরে, আবার ফিরে আসতে হবে।
আত্তা বোহু কাত্তা রুহু, খাঁই বলেছে
দেখে বোঝ হামারু।
এখানে না দেখতে পেলে, সেখানে যে দেখতে পাবে।

শব্দার্থ—মন তুমি···না ভেবে—"ইন্নালিল্লাহে অ ইন্না এলায়হে রা জেউন।" অর্থাৎ 'verily we are from God and to God we shall return.'—কোরআন, ২য়, পারা সুরা বাকারাহ ১৫৫ আয়েত ১৯শ রুকু।

ভি—উর্দ্দু শব্দ, 'ও' অর্থে।

আত্তা বোহু কাত্তা রুহু—কোরআন শরীফের এক বাক্যাংশের অপভ্রংশ। আসল, "আনতায়বুদাল্লাহাকা আন্নাকা তারাহু"—অর্থাৎ, এমন ভাবে তাঁহার এবাদৎ (উপাসনা) কর, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ। হামারু—উর্দু শব্দ, হামারা—আমাদিগের।

৫

আহম্মদ মিমের পরদা উঠিয়ে উঠিয়ে দেখরে মন
আহাদ সেথায় বিরাজ করে খোদার নূরিতন।
খাদকে যদি চিনতে পারিস চিনবি খোদাকে
চোখ চেয়ে দেখ তোরই চোখে সেই নূরের রৌশন।
যে চিনতে পারে ঘর না ঘরে হয় সে উদাসী
আপন মনে ভজেন সদা নবীজীর চরণ।
ঐ রব শুনিয়া হ'ল পাগল মনসুর হাল্লাজ
আয়নাল হক, আয়নাল হক বলে ত্যজিল জীবন।

শব্দার্থ—আহম্মদ—চরম প্রশংসিত। হজরত মোহাম্মদকে বুঝাইতেছে। মিম—আরবী শব্দ।

আহাদ—এক। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। নূরিতন—নূর।

আহম্মদ মিমের······খোদার নূরিতন। আলিফ, হে, মিম, দাল এই চারটি আরবী অক্ষর লইয়া আহম্মদ শব্দ গঠিত। ইহা হইতে মিম শব্দ সরাইয়া লইলে আহাদ অর্থাৎ খোদার এক নাম অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ, খোদার যে বিশেষ সৃষ্টি আহম্মদ অর্থাৎ মোহাম্মদ তাহাই বুঝানো হইতেছে।

তুলনীয়—

আহম্মদ নামেতে দেখি
মিম হরফ লেখেন নাব,
মিম গেলে আহাদ বাকী
আহম্মদ নাম থাকে না।
হারামণি, মনসুর উদ্দিন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮।

শব্দার্থ—খাদকে—অন্য একটি ফকিরের বর্ণনায় খোদকে অর্থাৎ নিজেকে আছে। খোদ হওয়া সম্ভব।

কেননা হাদিস শরীফে আছে—'He who knoweth himself, knoweth God'. [Vide "Sayings of Mohammad", by Sir A. Suhrawardy, p. 53,

ঐ রব শুনিয়া হ'ল পাগল—অন্য একটি বর্ণনায় "ঐরূপ দেখিয়ে পাগল হ'ল।" আছে। তুলনীয়—

ঐরূপ দেখল মনসুর হাল্লাজ, আহেরাতে হয়েছে ভুল!—হারামণি মনসুর উদ্দিন, পৃ ৫০। মনসুর হাল্লাজ—ইহার প্রকৃত নাম হুসায়েন বিন মনসুর, পৈতৃক ব্যবসায় অনুযায়ী হাল্লাজ উপাধি।

আয়নাল হক—প্রকৃত উচ্চারণ আনাল হক্—অর্থ, অহং ব্রহ্ম, অর্থাৎ, আমিই খোদা।

৬

মোহাম্মদ নামে একটি ফুলে পাঁচটি রং ধরেছে।
সৌরভে গৌরবে তারই দুনিয়াদার সব মেতেছে।
সেই ফুলের সার সুবাস যিনি, হজরত আলি গুণমণি
ফুলের পাতায় মা জননী ফতেমা নাম তার রয়েছে।
সেই ফুলের আতর যে জন, হাসান-হোসেন দুটি রতন
পাঁচ ফুলের পাক পাঞ্জাতন এক রং-এ সব মিশেছে।
সেই ফুলের এক বিন্দু, পণ্ডহল আজম দীনবন্ধু
পূর্ণ করে সকল সিন্ধু যে তাঁর প্রেমে মজেছে।

শব্দার্থ—পাঁচটি রং—এখানে পাক পাঞ্জাতনকে বুঝাইতেছে। পাক—পবিত্র।

পাঞ্জাতন—হজরত মোহাম্মদ, তাঁহার জামাতা, হজরত আলী, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা হজরত ফাতেমা, তাঁহার দৌহিত্র এবং ফাতেমার পুত্রদ্বয় হজরত হাসান এবং হজরত হোসেন ইহাদিগকে পাঞ্জাতন বলা হয়। পাঞ্জাতন আরবী শব্দ, অর্থ পঞ্চশক্তি।

গওছুল আজম—শ্রেষ্ঠ গওছ। এখানে হজরত আব্দুল কাদের জিলানীকে বুঝাইতেছে।

৭

খালেক নে কেয়া বানায়ী
নুরে নজর নামাজ,
মাহবুবে কিবরীয়া হো
হোসেন নজর নামাজ
নামাজ আলি, কুল মোতাওয়াল্লী
নামাজ খাতুন জেন্নাত আলী
সাহাদৎ কলেমা উত্তারি
খালেকুল নামাজ।

শব্দার্থ—খালেক—সৃষ্টিকর্তা। নে কেয়া বানায়ী—উর্দু শব্দ। কি সৃষ্টি করিয়াছেন।

নুরে নজর—চোখের মণি, নয়নপুত্তলি, এখানে জ্যোতির্ময়।

নামাজ—ইসলাম ধর্ম্মের উপাসনা। মাহবুব—প্রিয়। কিবরীয়া—মহান। হো—হয়। হোসেন নজর—সুন্দর সৃষ্টি; এখানে জ্যোতির্ময়।

নামাজ আলি—নামাজকে নবীর সহিত তুলনা দেওয়া ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী নীতিবিরুদ্ধ। আর উপমা দুইটিও অদ্ভুত; এরূপ উপমা বড় একটা পাওয়া যায় না। মোতাওয়াল্লী—ট্রাষ্টী। জেন্নাত—বেহেশত। বেহেশতকেও পুরুষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

সাহাদৎ কলেমা—ইসলামের দ্বিতীয় মূলমন্ত্র।

উত্তারি—নামাইয়া, এখানে পরে হইবে বোধ হয়।

খালেকুল—সৃষ্টিকর্তা।

সাহাদৎ কলেমা......নামাজ—প্রথমে সাহাদৎ কলেমা দ্বারা বিশ্বাস ঠিক করিয়া পরে নামাজ পড়িতে হইবে এইরূপ ভাব বুঝাইতেছে। কেননা, ইসলামের পঞ্চভিত্তির প্রথম হইতেছে ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস। দ্বিতীয় হইতেছে নামাজ।

৮

ও আমার আপন খবর আপনারি হয় না
আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
ও সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখ না।
লালন মোল মনের ঘোরে
হয়ে চোখ থাকতে কর না।

উপরের গানটি বিখ্যাত সাধক-কবি লালন ফকিরের রচিত। তিনি নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার বহু গান সংগৃহীত হইয়াছে।

৯

মন তুমি ত কাজ বোঝ না
অভয় অক্ষয় বস্তু ধরে
তারি সঙ্গে প্রেম কর না।
অভয় পদে দিয়ে মতি
শেখরে মন অটল ভক্তি
রবকে করে সঙ্গের সাথী
অমূল্য ধন কুড়িয়ে নে না।
পথে পথে দেখাশুনা
পথের নাহি শেষ গণনা
হাকের হাকিম সেই রব্বানা
পলে পলে হয় রচনা
একা সেই ময়ূরায়
সব্বদেহে কেমনে রয়
প্রাণপাখী তোর নাইক রে ক্ষয়
অমৃত ফল ফলিয়ে নে না।

হকের হাকিম—ন্যায় বিচারক। রব্বানা—প্রভু।

ময়ূরায়—দ্রষ্টব্য—'ময়ূরা উড়িয়া গেল পড়ি রৈল কায়া'। 'পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা'। কিন্তু আসলে বোধ হয় মনওয়ারা হইবে। মনওয়ারা—সমুজ্জ্বল, এখানে আত্মাকে বুঝাইতেছে।

১০

হুজুর দেলে পড় নামাজ, শরিয়তের কাজ,
ও আমার মন হও নামাজি,
সে নামাজ হলে কাজা, পাবি সাজা,
বলে গেছেন নুর নবীজী।
সে নামাজ দমে বেদম, পড় হরদম,
যে জন হও সে কাজের কাজী।
এক নামাজ বন্ধ করে, চার অক্ষরে
পড়ে গেল আজগর সাজি।
নামাজের রং চিনিলে, যাবে খুলে,
ছিন কাটিলে হবে আলি।

শব্দার্থ—হুজুর দেলে পড় নামাজ—কায়মনে নামাজ পড়া।

কাজা—সময়মত যাহা আদায় করা হয় নাই। দমে বেদম—সর্ব্বক্ষণ।

চার অক্ষরে—নামাজের আরবী শব্দ সলাত। সোয়াদ, লাম, ওয়াও, তে এই চারটি অক্ষর লইয়া সলাত গঠিত। নামাজ উর্দু

শব্দ। ইহাও হু, মিম, আলিফ, জে, এই চারটি অক্ষর লইয়া গঠিত।

আজগর সাজি—বোধ হয় পদকর্তা। ছিন কাটিলে—বক্ষ বিদারিত হইলে।

আলি—বন্ধু।

১১

হক কুল হক বলে গেছে
আমার হজরত নবী পাঞ্জাতন
হকের হাকিম আল্লাহ
একিন হ'ল নারে মন।
আলাছত বু কয়লেন সাঁইজি তিনি
কালু বালা কয় বরকত জননী।

শব্দার্থ—হক কুল হক—ধ্রুব সত্য।

আলাছত বু—আরবী শব্দের অপভ্রংশ—আলাছতু বিরব্বিকুম। ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী আল্লাহ সমস্ত আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, "আলাছতু বিরব্বিকুম" অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? কালু বালা অর্থাৎ তাহারা (আত্মা) বলিল, হাঁ। কোরআন শরীফ।

কয়লেন—কহিলেন হইবে।

বরকত জননী—বেশরা ফকিরগণ হজরত ফাতেমাকে বরকত জননী বলে। ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী ইহা ভ্রান্ত; তদুপরি এখানে বরকত জননীর প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। কারণ, শুধু হজরত ফাতেমা উত্তর দেন নাই, সমস্ত মানুষের আত্মা উত্তর দিয়াছিল।

১২

ও আমার মন কাবা শরীফের নিয়েত করো
রসুলের তন মদিনা, মন মক্কা তাও চেন না
করিয়ে অজুদ ফানা রসুলের দিদার করো।
সে কাবা খলিলের নয়, ও কাবা পরেতে হয়
এখন আদম কাবায় সেজদা রয় বলিল রবানা
আদম চিনে সেজদা করো সকল জনম তারো
মক্কা মদিনার ঘরে সেজদা করো তরো।

শব্দার্থ—কাবা শরীফ—হজরত ইব্রাহিম নির্ম্মিত মক্কার পবিত্র গৃহ। এই গৃহকে কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবীর মুসলমান নামাজ পড়ে এবং এখানে তীর্থে আসে। কারণ, "ফা অল্লে অজহাকা শাত্‌রাল মাসজেদিল হারাম—অ হায়সো মা কুনতুম ফা অল্লু অজুহাকুম" অর্থাৎ "আপনি (মোহাম্মদ) আপনার মুখমণ্ডলকে মসজিদে হারাম (সম্মানযুক্ত মসজিদ) শরীফের দিকে করুন এবং তোমরা সকলে (উম্মতে মোহাম্মদী) যেখানেই থাক না কেন, নিজেদের মুখমণ্ডলগুলিকে সেই মসজিদে হারাম শরীফের দিকে কর।" কোরআন শরীফ ২য় পারা সুরা বাকারাহ ১৪৪ আয়েত। ১৭শ রুকু।

শব্দার্থ—নিয়েত করা—মনস্থ করা। তন—দেহ; এখানে স্থান।

অজুদ—অস্তিত্ব; ফানা—বিলয়।

অজুদ ফানা—এখানে বোধ হয় আত্মাকে লীন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

খলিল—বন্ধু। এখানে হজরত ইব্রাহিমকে বুঝাইতেছে। হজরত ইব্রাহিমকে খলিলুল্লাহ বা আল্লার বন্ধু বলা হইত। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ।" অর্থাৎ, "আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং ইব্রাহিম আল্লার বন্ধু।"

সেজদা—খোদার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রণতি; এই প্রণতি খোদা ছাড়া আর কাহাকেও করা যায় না। বেশরা ফকিরদের ধর্ম্মচ্যুত হওয়ার ইহা একটি লক্ষণ।

আদম চিনে সেজদা করো—ইহা ইসলামে নাই। ইসলামে খোদা ছাড়া কাহাকেও সেজদা করা হারাম বা কোরআনে নিষিদ্ধ। খোদার হুকুমে ফেরেস্তারা প্রথম মানব হজরত আদমকে সেজদা করেন। "ইজকুলনা লিল মালাই কা তিন জুদু লি আদামা ফাছাজাদু ইল্লা ইবলিস।"—"যখন আমি বলিলাম ফেরেস্তাদিগকে সেজদা কর আদমকে, ইবলিস (শয়তান) ব্যতীত সকলেই সেজদা করিল।" (কোরআন শরীফ ১ম পারা সুরা বাকারাহ ৩৪ আয়েত।)

সরস্বতী পূজা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সরস্বতী পূজার সংখ্যা, আড়ম্বর, জাঁকজমক, দেবীর নূতন নূতন ধরণের মূর্ত্তি প্রভৃতি যদি শিক্ষা বিস্তারের ও উৎকর্ষের অন্যতম মাপ-কাঠি হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, শিক্ষার প্রভূত বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটিতেছে।

শহরে যে প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের বালকবালিকা-গণ সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিল তাহা নহে, প্রায় সকল স্কুল, কলেজ, হোষ্টেল এবং সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতিতেও পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে শহরের প্রায় সকল মহল্লাতেই অধিকতর আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের সহিত সার্ব্বজনীন পূজার আয়োজন করা হইয়াছিল।

ইহাও শুনিয়াছি যে, একই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একই অট্টালিকার অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক বিভাগের (বালিকা বিভাগ, বালক বিভাগ, কলেজ বিভাগ প্রভৃতি) পৃথক পৃথক পূজা হইয়াছিল। স্বচক্ষে এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দেখিয়াছি—বালকদিগের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে একতলায়, এবং বালিকাদিগের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে দ্বিতলের এক ঘরে। এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এমনও ঘটনা ঘটিয়াছে যে, কলেজ বিভাগের ছাত্রগণ কলেজের সন্নিকটে এক প্রাঙ্গণে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পৃথকভাবে পূজার আয়োজন করিয়াছেন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এইরূপ পৃথক পৃথক পূজার মধ্যে কত পরিমাণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল জানি না; তবে পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল—এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবল ও সুস্থ মনের পরিচয় দেয় কিনা তাহাও জানি না, তবে ইহাতে প্রমাণ হয় যে, "মিলে মিশে কোন কাজ করিবার" আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ এখন পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জন্মায় নাই। ইহাও শুনিয়াছি—কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার ঘটনা লইয়া আইন-আদালতও নাকি করিতে হইয়াছে, এবং রেষারেষির ফলে প্রতিমার পর বোমাও বর্ষিত হইয়াছে।

সংবাদপত্র হইতে অবগত হইয়াছি যে, নির্ব্বাচনই (ইলেকসান) এ বৎসরকার সরস্বতী পূজার সংখ্যা-বৃদ্ধি, আড়ম্বর, আলোকসজ্জা প্রভৃতির অন্যতম প্রধান কারণ। নির্ব্বাচনে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ কেন্দ্রে পূজার ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহশীল হন, এবং মুক্ত হস্তে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনীতি কিছু বুঝি না, নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাও নাই, সুতরাং এরূপ পূজার মাধ্যমে নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের নির্ব্বাচনে সফল হইবার কি পরিমাণ সহায়তা করে তাহাও বলিতে পারি না।

কিন্তু আমাদের মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পূজার ভিড়িকে "প্রাণান্ত-কর পরিচ্ছেদ" হইয়াছে। আমি কলিকাতার যে অঞ্চলে বাস করি—সেই অঞ্চলের ছোট এলাকার মধ্যে পূজার সংখ্যা সঠিকভাবে বলিতে পারিব না, তবে আমাকে ঊনত্রিশটি পূজার চাঁদা দিতে হইয়াছে, সবগুলি রসিদ এখনও আমার কাছে আছে। একই লেনে বা রাস্তায় ১৫।২০ হাত অন্তর ৫।৬টি পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাধারণতঃ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রগণ চাঁদার জন্য আসিয়াছিল। প্রত্যেক দলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাদের বিদ্যালয়ে পূজা হইতেছে কি না—উত্তরে শুনিয়াছি বিদ্যালয়ে পূজা হইতেছে। প্রশ্ন করিয়াছি বিদ্যালয়ে যখন পূজা হইতেছে পাড়ায় এইরূপ পৃথক পূজার আয়োজন করিবার কারণ কি? কাহারও নিকট হইতে কোন সদুত্তর পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাও প্রশ্ন করিয়াছি—একই লেনে বা রাস্তায় ৩।৪।৫।৬টি পূজা করিবার আবশ্যকতা কি? ইহারও কোন সদুত্তর পাই নাই—তবে সাধারণতঃ অল্প-বয়স্ক বালকগণ বলিয়াছে—বড়রা আমাদের লইয়া পূজা করিতে চাহেন না, যদি বা করিতে চাহেন তবে তাঁহারাই 'মাতব্বরি' করেন, আমাদের কিছু করিতে দেন না। ছোটদের কথা বলিতেছি না, বড়দের কথাই অতি দুঃখ ও বেদনার সহিত বলিতেছি—তাঁহারা যে ভাবে চাঁদা চাহিতে আসেন তাহা মোটেই প্রীতিকর নহে, তাঁহারা এমনভাবে চাঁদা চাহেন যাহাতে মনে হয় গৃহস্থ যেন তাঁহাদের কাছে ঋণী, তাঁহারা পাওনাদার, সাধারণতঃ তাঁহারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলেন "চাঁদাটা দিন", যেন চাঁদাটা দিতে গৃহস্থ বাধ্য, ঘরের মধ্যে গৃহস্থ যদি বাহিরের লোকজনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তায় বা আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, সেদিকেও 'চাঁদা-আদায়কারি-গণের' ভ্রূক্ষেপ থাকে না। একটি প্রবীণ বন্ধুর জামাতার চায়ের দোকান আছে, জামাতা তখন দোকানে ছিলেন না, শ্বশুর সেই (প্রবীণ বন্ধুটি) দোকানে ছিলেন, কর্ম্মচারিগণ চা বিক্রয় করিতেছিল—এই সময় একদল যুবক চাঁদা চাহিতে আসেন বন্ধুটি তাঁহাদের বলিয়াছিলেন—জামাতা এখন উপস্থিত নাই, পরে চাঁদার জন্য আসিবেন। এই কথায় যুবকগণ উত্তর করিয়াছিলেন—চাঁদা এখনই যদি না দেন, চা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিব। আমাকে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় নাই বটে, তবে আমি যখন বলিয়াছি চাঁদা এখন দিতে পারিব না, পরে দিব, উত্তরে শুনিয়াছি "Thank you when shall we come again? জানি না এই সব ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় কতটা উৎকর্ষ অর্জ্জন করিয়াছেন।

অনেক সময় কি ছোট, কি বড় ছাত্রগণকে বলিয়াছি—এইরূপ

ভাবে বাড়ী বাড়ী চাঁদার জন্ত যাওয়া কি সম্মানজনক? অনেকে হয় ত রূঢ় কথা বলেন—ইহাতে কি তোমাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না? উত্তরে শুনিয়াছি, "দেশের কাজে মান অপমান কিছুই নাই।" খুবই ভাল কথা! কিন্তু এইরূপ ভাবে সরস্বতী পূজার মধ্য দিয়া দেশের কাজ কতটা অগ্রসর হয় বুঝিতে পারি নাই। অনেক সময়ে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রশ্নও করিয়াছি—চাঁদা-আদায়কারীদের মধ্যে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কতজন পুরস্কার অর্জন করিয়াছে। কিন্তু উত্তর শুনিয়া নিরাশ হইয়াছি—কোন কোন ক্ষেত্রে অপমানিতও হইয়াছি—শুনিয়াছি "ও সব কথা রাখুন, চাঁদাটা দেবেন কিনা বলুন।" ভয়ে ভয়ে চাঁদা দিয়াছি। এই প্রসঙ্গে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ লিখিতেছি। একজন সংবাদ-সরবরাহকারী একটি নয় বৎসর বয়স্ক বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দেবীর নিকট সে কি প্রার্থনা করিয়াছে—বালকটি এই প্রশ্নে প্রথমতঃ একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, পরে স্পষ্ট-ভাবেই উত্তর দিয়াছিল সে দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছিল যে, লেখাপড়ায় সময় খেলাধুলা করিয়াও সে যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। সংবাদ-সরবরাহকারী বলিতেছেন, বালকটির এই স্পষ্ট উত্তর সাধারণতঃ অনেক বয়স্ক ছাত্রদের উক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলিতেছেন—ইহা হইতে বুঝা যায় সরস্বতী দেবীর প্রতি ছাত্র সম্প্রদায় কি মনোভাব পোষণ করেন। এক বন্ধু বলিতেছিলেন, আজকাল পরিসংখ্যানের যুগ, পরিসংখ্যানের সাহায্যে নির্ণয় করা যাইতে পারে, যে সকল ছাত্র প্রত্যক্ষভাবে দেবীর পূজার প্রতি এত বেশী আগ্রহশীল এবং এত বেশী পরিশ্রম করেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা কতজন শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং যাঁহারা পূজায় এত বেশী মাতামাতি করেন না, তাঁহাদের মধ্যেই বা কতজন শিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। ছাত্রছাত্রিবৃন্দ কেবল যে তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদান করেন এবং অঞ্জলি দেন তাহা নহে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বা ক্লাবের পূজাতেও অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যত বেশী বার অঞ্জলি দেওয়া যাইবে পড়া-শোনার ঘাটতি তদ্দারা পূরণ হইয়া যাইবে। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে বলিলেন—পূজার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রিগণ যে পরিমাণ উৎসাহ, উদ্দীপনা, মনোযোগ প্রদর্শন করেন লেখাপড়ায় যদি তাহার একশত ভাগের এক ভাগও করিতেন তবে পরীক্ষায় তাঁহারা আশ্চর্যজনক ফল দেখাইতে পারিতেন।

প্রতিমার মূর্তি সম্বন্ধেও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি যে, বর্তমান বৎসরের পূজার এক বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রতিমার বিভিন্ন মূর্তি, আকার ইত্যাদি। এই আলোচনাকালে একজন প্রবীণ বন্ধু বলেন, আমাদের কালে দেবীর মাতৃমূর্তি দেখিয়াছি এবং সেই ধারণাতেই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছি কিন্তু বর্তমানের মূর্তি ভিন্ন, ইহার মধ্যে মাতৃমূর্তি দেখিতে পাই না—অন্ত মূর্তি প্রকট হইয়া উঠে।

এই প্রবন্ধ-লেখা যখন শেষ করিতে যাইব, তখন এক সংবাদ-পত্রে দেখিলাম—কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিদ্যালয়ের পূজায় চাঁদা দেয় নাই বলিয়া একজন ছাত্রকে এমন প্রহার করিয়াছেন যাহার ফলে তাহার গলার হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে—হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অনাবশ্যক, শুধু বলিতে চাই—কোথায় গিয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি!

যতই লিখি না কেন পূজার হিড়িক বাড়িবে, কমিবে না—কিন্তু কি উপায়ে এই ক্রমবর্দ্ধমান পূজার অনুষ্ঠানের জন্ত আমরা চাঁদা দিব? না দিলে অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবে। আর একটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি—প্রত্যেক দলই চাঁদা প্রাপ্তির একখানি রসিদ দিয়া থাকেন—এমন দেখিয়াছি একই দল দুই-তিন বার চাঁদা লইয়া গিয়াছেন।

আর কিছুই ভাবিতেছি না, কেবল ভাবিতেছি—মা সরস্বতীকে কোথায় নামান হইয়াছে! বাল্যকালে আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দেবীর আরাধনা করিতাম না—পুস্তক পূজা করিয়া দেবীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিতাম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার "হৈ-হুল্লোড়" ছিল না। এখন দেখিতেছি পূজা হৈ-হুল্লোড়েই পরিণত হইয়াছে। আমরা সকলেই তাহাতে যোগ দিয়াছি। কে প্রতিরোধ করিবে?
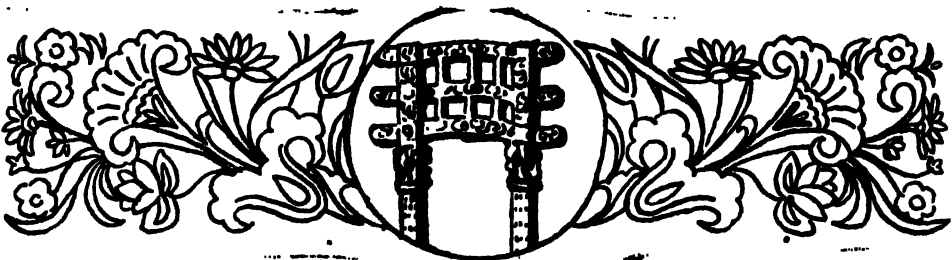
উপজাতীয় লোকেদের কতকগুলি সমস্যা

কাকাসাহেব কালেলকার

ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ হয় যে, সামগ্রিকভাবে দেশের জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের আমাদের ভ্রাতৃগণও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা সত্য যে, উপজাতীয়দের মধ্যে যে জাগরণ হইয়াছে তাহা হরিজনদের তুলনায় অনেক ন্যূন পরিমাণের, কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে উপজাতীয় সমাজে যথেষ্টসংখ্যক এমন লোকেদের আমরা পাইয়াছি যাহারা নিজেদের সমাজের উন্নয়নকল্পে সংগ্রাম করিতেছে। ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয় যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঠক্কর বাপা যে কাজের সূচনা করেন, দেশের সকল অংশে তাহা উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

আসাম হইতে রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশ হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হরিজন এবং ভূমিজনদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, পাঠকদের সমক্ষে তাহা উপস্থাপিত করা সমীচীন বলিয়া আমি মনে করিতেছি।

উপজাতি অধ্যুষিত এবং পাহাড়িয়া অঞ্চলকে প্রকৃতি গরিমায় এবং সৌন্দর্যে বিভূষিত করিয়াছেন তাহার সহিত উপজাতীয় লোকেদের প্রকৃত অবস্থার দারুণ বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং প্রকৃতির দ্বারা ও প্রাক্তন সরকারের দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথকীকৃত এবং উপেক্ষিত হইয়া থাকাই এই সকল লোকের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী।

আদিম সারল্য

কেহ কেহ লক্ষ লক্ষ উপজাতীয় লোকেদের রাখিতে চান তাহাদের আদিম সারল্যপূর্ণ জীবনচর্য্যার গণ্ডীর মধ্যে। তাঁহাদের নিকট উপজাতীয়দের জীবন এরূপ কবিত্বপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রতিভাত হয় যে, তাঁহারা তাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখিতে চাহেন না। এই সকল কবিত্বভাবাপন্ন লোক আজিকার দিনের উপজাতীয় লোকেদের জীবনের কঠোরতার কথা স্বল্পই অবগত আছেন। ইহা হয়ত সেই সকল নৃতত্ত্ববিদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারে, যাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, উপজাতীয় লোকেরা থাকুক যাদুঘরে প্রদর্শনযোগ্য মূল্যবান নিদর্শনরূপে। যে সকল নৃতত্ত্ববিদের কৌতূহল মানবিক অপেক্ষা সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ অর্থে অধিকতর বৈজ্ঞানিক —তাঁহাদের নিকট হয়ত মানবজাতির এই সকল 'নমুনা' আলোচনা ও গবেষণার মূল্যবান আধার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আমরা যাহারা উপজাতীয়দের ভালবাসি এবং আত্মীয়-কুটুম্ব হিসাবে দেখি তাহাদের কাম্য এই যে, জ্ঞানের সকল বিভাগে এবং জীবনচর্য্যার কলাকৌশলে ইহাদের উৎকর্ষ সাধিত হউক। মানবীয় বুদ্ধিকৌশলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের যে-কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাই এই সকল লোকেদের পক্ষে যাহাতে প্রাপ্তব্য হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অপর লোকেদের ন্যায় আত্মোন্নয়নের এবং অবসরবিনোদনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তাহাদিগকে দিতে হইবে এবং জনসমষ্টির অগ্রণী অংশের লোকেরা আজ যে সম্মান উপভোগ করিতেছে, উপজাতীয় লোকেরাও যাহাতে সেই একই গৌরবজনক স্থান লাভ করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। উপজাতীয়দের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন যে সকল যুবক আছে তাহারা অবশ্যই অন্য যে-কোন ব্যক্তির সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার উচ্চাশা পোষণ করিতে পারিবে।

ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, উপজাতীয়দের সমাজের কতিপয় তরুণ-তরুণী কিছুটা শিক্ষালাভের অব্যবহিত পরে

তাহাদের স্ব-সমাজের লোকেদের উন্নয়নের বিষয় চিন্তা করিবে, কিন্তু একথা আমাদিগকে অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন জাতি এবং কোন জনসমাজই উন্নতির শীর্ষতম স্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না যদি তাহারা তাহাদের মনোযোগ এবং উচ্চাভিলাষকে সীমাবদ্ধ রাখে কেবল আত্মীয় স্বজনের উন্নয়নের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। পূর্ণতম বিকাশ কেবল তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর যাহারা সকলের উন্নতির কথা অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করে। উপজাতীয় সমাজের আমাদের ভ্রাতাভগিনীদের উচ্চাভিলাষের পথে কোন সীমারেখা টানিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না।

এই সম্পর্কে আরও একটি বিবেচ্য বিষয় আছে যাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। যখনই আমরা হরিজন অথবা ভূমিহীনদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করি তখনই আমাদের নিজেদের গড়া কোন আদর্শ তাহাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। আমাদের নিজেদের পছন্দ এবং ধারণার ছাঁচে তাহাদিগকে গড়িবার চেষ্টা হইবে অসমীচীন। উপজাতীয় লোকেরা হইতেছে ভগবানের শিল্পসৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন। তাহাদের সমক্ষে আমরা বর্তমান মানুষের উদ্ভাবিত যাবতীয় ভাব আদর্শ এবং সুযোগ সুবিধা উপস্থাপিত করিব এবং বাছিয়া লইবার ভার তাহাদের উপরেই ছাড়িয়া দিব। যাহাই মনে সাড়া জাগাইবে তাহাই তাহারা আত্মসাৎ করিবে, যাহা তাহাদের পছন্দসই নয় তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে।

সমগ্র জগৎ আজ দ্রুত প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে। সামগ্রিকভাবে উপজাতীয় লোকেদের বর্তমান অবস্থাসমূহ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা নাই। অদূরদর্শী স্বার্থপর লোকেরা এই সকল লোকের সরলতা এবং নিরীহতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে শোষণ করে। এই ধরনের শোষণের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। উপজাতীয়েরা যাহাতে তাহাদের চারিপাশের দুনিয়া দেখিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। উপজাতীয়দের সমাজের যুবকযুবতীদের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভ্রমণ-বৃত্তির (Travelling scholarship) ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা কি ভাবে বাস করে, কথাবার্তা বলে এবং জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সংগ্রাম করে—তাহা প্রত্যক্ষ করিতে অবশ্যই তাহারা সমর্থ হইবে।

শ্রেষ্ঠ পন্থা

এই সকল লোকেদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ এবং প্রগতির নিরাপত্তাবিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা হইয়াছে—প্রকৃত শিক্ষা। যে প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের প্রকৃত প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, জোর করিয়া তাহা যেন আমরা তাহাদের উপর চাপাইয়া না দিই। ইহাই কি যথেষ্ট নয় যে, যে সনাতনী ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি বেকার সমস্যা এবং নিরুপায় অবস্থার সৃষ্টি করে তদ্দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের শিশুদের নষ্ট করিয়াছি। আমাদের অতীতের ভুলভ্রান্তিসমূহ দ্বারা আমাদিগকে লাভবান হইতেই হইবে এবং এই সকল লোকের জন্য এমন শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা সমীচীন যাহা জীবনচর্য্যায় তাহাদের নিকট সহায়ক হইতে পারে। এবং আমার মতে তাহাই হইতেছে ঐ ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি—মহাত্মা গান্ধী যাহা দেশের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন প্রায় তাঁহার জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া। এই 'নই তালিম' বা নূতন শিক্ষাকে তিনি জাতির নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই বুনিয়াদী শিক্ষা যেন অন্ধগলি বলিয়া প্রমাণিত না হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা উপজাতীয়দের জন্য অবশ্যই উচ্চতর শিক্ষার এবং উচ্চতম কর্মে নিয়োগের যাবতীয় পথ উন্মুক্ত করিবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক জাতির নিকট অনুমোদিত বুনিয়াদী শিক্ষা উপজাতীয় লোকদের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে সর্ব্বাধিক উপযোগী, কিন্তু এই বুনিয়াদী শিক্ষাকে তাঁহারা সেই পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না যে পর্য্যন্ত না সরকার তাহাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, যখন সরকারী চাকরির জন্য লোক নেওয়া হয় তখন যাহারা বুনিয়াদী শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদিগকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে।

এমন আর একটি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে সরকারসমূহ এবং বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থকদিগকে গভীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। এখন পর্য্যন্ত আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য শিক্ষক সংগ্রহ করিয়াছি নাগরিক অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে। এই সকল লোক সাধারণতঃ তাঁহাদের হাতের সাহায্যে কাজ করিতে পরাঙ্মুখ। অধিকন্তু তাঁহারা মনে করেন যে, হাতের কাজ তাঁহাদের সামাজিক মর্য্যাদা এবং শিক্ষার পক্ষে হীনতাজনক। নিজেরা কাজ করা অপেক্ষা তাঁহারা অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়াতেই বিশ্বাস করেন। এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন তাহারা অপর লোকেদের শোষণ করিয়া কেবলমাত্র নিজেরা লাভবান হইবার কথাই ভাবিতে

পারেন। এই ধরনের লোকেদের হাতে মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি নিরাপদ হইতে পারে না। এখন আমাদিগকে আমাদের নীতির পরিবর্তন করিতে হইবে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষক নির্বাচন করিতে হইবে গ্রামের কারিগর এবং বৃত্তিজীবী (occupational) সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে।

কি ভাবে কাজের সূচনা করিতে হইবে

জাতীয় দিক দিয়া প্রয়োজনীয় হাতের কাজে সকল লোকের পরীক্ষা দ্বারা আমাদিগকে কাজের সূচনা করিতে হইবে। এইরূপে গার্হস্থ্য হাতের কাজে যাহারা নিজেদের পটুতা প্রমাণ করিতে পারিবে তাহাদের জন্ত সাধারণ শিক্ষার এক বর্দ্ধনশীল পাঠক্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অবশেষে বুনিয়াদী পদ্ধতিতে বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে একটি কোর্স শিক্ষাদান করিতে হইবে। সকল শ্রেণীর লোকের জন্ত আমরা যে-সকল বিদ্যালয় খুলিব, তাহাদের আমরা সেগুলির শিক্ষকরূপে কাজে লাগাইব। এই একটি পন্থাবলম্বন দ্বারা আমরা বাঞ্ছিত ধরনের বুনিয়াদী শিক্ষক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব, এবং গ্রামীণ লোকেরা শহরের লোকেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে বাধ্য হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃতিগত হীনতাভাবের (Inferiority complex) সৃষ্টি হয় অচিরে তাহার অবসান হইবে। এই সকল নূতন বুনিয়াদী শিক্ষক শীঘ্রই দেখিবেন যে, তাঁহারা সেই সকল কাজ করিতে সমর্থ যাহা আয়ত্ত করা তাহাদের 'সাদা কলারওয়ালা' সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

গ্রামাঞ্চলে মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্প্রসারিত হইলে এক নব জীবনের ও এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইবে এবং আপনারা অচিরেই দেশে এক নূতন ধরনের নেতৃত্বলাভ করিবেন। শিক্ষকদের তখন চাকরি-ভিক্ষার্থী হইয়া সরকারের নিকট যাইতে হইবে না। তখন আসিবে সরকারের তাঁহাদের নিকট গিয়া সেবামূলক কর্ম্ম চাওয়ার জন্ত তাহাদিগকে অনুরোধ করিবার পালা। সরকার অচিরেই আবিষ্কার করিবেন যে, প্রশাসন পরিচালিত হইবে অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত যদি তাহা এই সকল লোকের—যাহাদিগকে বলা যাইতে পারে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত ফল—নিকট হস্তান্তরিত করা যায়।

জীবনে সাফল্যলাভের জন্ত যে সকল প্রবণতা অত্যাবশ্যক, শিক্ষাদ্বারা অবশ্যই সেগুলি বিকাশপ্রাপ্ত হইবে। দেখিবার জন্ত চোখের দৃষ্টিশক্তি হইবে তীক্ষ, শুনিবার জন্ত কর্ণদ্বয়কে শিক্ষাদান করিতে হইবে, মস্তিষ্কের বিকাশসাধন করিতে হইবে ইহার ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চস্তরে এবং আঙুলগুলি অনুশীলনের দ্বারা চরমতম নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে—ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগের দাবি।

কুসংস্কারের কবলে নিপতিত যারা

শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সম্পন্ন করিতে হইবে—আর একটি কৃত্য। সাধারণ ভাবে গ্রামীণ লোকেরা এবং বিশেষ ভাবে উপজাতীয় লোকেরা কুসংস্কারের কবলে নিপতিত তাহারা যাদুবিদ্যা এবং ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে আস্থাবান।

তাহাদের এলাকায় যদি কোন সংক্রামক ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দেয় তাহা হইলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তাহারা সাহায্যের জন্ত ছুটিয়া যায় যাদুকর এবং ঐন্দ্রজালিকের নিকট। তাহাদের গরু-মহিষের পালে যদি মড়ক লাগে তাহা হইলে তাহারা হরিজনদিগকে বেদম মারপিট সুরু করিয়া দেয়, কেননা তাহারা বিশ্বাস করে যে, হরিজনরা তাহাদের যাদুবিদ্যার বলে গরু-মহিষের মধ্যে মড়কের সৃষ্টি করে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইতেছে—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারসমূহ লোপ পাইয়া যাইবে এবং তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল প্রকারের প্রয়োজনীয় এবং সুকুমার কলাসমূহের বিকাশসাধন হইবে। নই তালিম অথবা বুনিয়াদী শিক্ষা সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবে—বিজ্ঞান এবং কলাকে।

উপজাতীয়দের—গিরিজন এবং ভূমিজনদের স্বাস্থ্য হওয়া উচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরনের, কেননা মুক্ত বাতাস এবং কঠোর পরিশ্রমের জীবন তাহাদের। চামড়ার ভিতর দিয়া তাহাদের দেহে প্রচুর সূর্য্যালোক প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং বহু রোগের হাত হইতে তাহাদের মুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নানা ব্যাধির কবলে তাহাদিগকে নিপতিত হইতে হয়, মুখ্যতঃ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা এবং যে নিকৃষ্ট খাদ্য তাহারা পায় তাহার দরুন। তাহাদের জীবন সম্বন্ধে আমি যাহা পড়িয়াছি তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধেও তাহাদের যথার্থ ধারণার প্রয়োজন।

কেনাবেচা, সঞ্চয়ের গুরুত্ব এবং মূলধনের ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানদানের ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে। আইন এবং আইন-আদালত, ভোট এবং ভোটদান, পার্লামেণ্ট বা লোকসভার কাজকর্ম, ন্যায়বিচারলাভের পদ্ধতি এবং নূতন ধরনের পঞ্চায়েতসমূহের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও অল্পস্বল্প তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অনুবর্তী হইবে প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান—যে ধর্মশিক্ষা আজ তাহারা পাইতেছে তাহা নহে—কিন্তু সকল ধর্মের সার যাহা তাহাই তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি এবং উন্নয়নের জন্য নাচ গান নাট্যাভিনয় প্রভৃতিরও সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আদিবাসীদের নৃত্যগীতকে উৎসাহিত অথবা এগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করাই যথেষ্ট নহে। তাহাদের নাচ-গানে ভাল এবং চিত্তাকর্ষক যাহা-কিছু আছে তৎসমুদয়কে আমাদের নিজেদের জীবনের অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। যখন তাহারা ইহা দেখিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের এমন কিছু আছে যাহাকে আমরা মূল্য দিই, তখন তাহাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িবে এবং আমাদের সহিত মেশা তাহাদের পক্ষে অধিকতর সহজ হইবে।

প্রকৃত সংস্কৃতি

আদিম জাতীয় লোকেরা অরণ্যবাসী হইলেও কোন দিক দিয়াই তাহাদিগকে সংস্কৃতিহীন বলা চলে না। তাহাদের সামাজিক সংগঠন, তাহাদের অকপটতা এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ, এবং যাহারা বিশ্বাস উৎপাদনকারী তাহাদের প্রতি অনড় আনুগত্য এই সকলই হইল তাহাদের প্রকৃত আনুগত্যের নিদর্শন। জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধানে তাহাদের যে পন্থা তাহাতেও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কুটীরশিল্পসমূহে তাহাদের নৈপুণ্য, তাহাদের বাদ্যযন্ত্রসমূহ ও কারুকর্ম্মের যন্ত্রপাতি এবং শিকারের হাতিয়ারসমূহেও তাহাদের সংস্কৃতির প্রাণশক্তি পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের নির্ম্মিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যমণ্ডিত দ্রব্যাদি আমরা শুধু আমাদের যাদুঘরসমূহেই প্রদর্শন করিব না, আমাদের গৃহে অধিক হইতে অধিকতররূপে গর্ব্বের সঙ্গে সেগুলি ব্যবহার করাই সমীচীন হইবে।

আদিবাসীদের ধর্ম্মীয় ভাবাদর্শসমূহ সম্পর্কে গভীর এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা অত্যাবশ্যক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদিগকে সকল ধর্ম্মের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

ধর্ম্মীয় কলহের স্থান দখল করিয়াছে এখন রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ। একে অপরের সঙ্গে সংগ্রামে রত আজ বিভিন্ন 'ইজম্' এবং মতবাদ। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, কম্যুনিজম ইত্যাদির পারস্পরিক বিতর্ক আজ বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যেকার বাগবিতণ্ডার মতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সহাবস্থান আমাদিগকে দেখাইয়াছে এই বিতর্কের বাগুরাজাল হইতে বাহির হইবার একটি পথ। তিক্ত কলহসমূহ যখন কাহাকেও সাহায্য করে না তখন কেন আমরা তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাইব না এবং যেমন নিজেদের জন্য দাবি করি তেমনি প্রত্যেককে কেন অবস্থান করিবার অধিকার দিব না। ভগবান যখন প্রত্যেককে সহ্য করেন তখন আমরা কেন অন্যান্যদের শান্তিতে বাস করিতে দিব না এবং নিজেরা শান্তিতে থাকিব না।

অসহিষ্ণুতা পরিহার করিয়া কেহ যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করে, তাহা হইলে সহাবস্থান অচিরেই পরিণত হইবে সহযোগিতায় এবং সহযোগিতা আমাদিগকে লইয়া যাইবে সংশ্লেষ ও সমন্বয়ের সামঞ্জস্যে।

আসল প্রয়োজন হইতেছে প্রেম, সেবা, সৌভ্রাত্র এবং সহযোগিতার। যদি আমরা প্রেম এবং শ্রদ্ধা সহকারে আমাদের ভ্রাতৃগণের সেবা করি এবং তাহাদের প্রগতিতে সুখী হই তাহা হইলে সকল ঝগড়া-বিবাদ অপসারিত হইয়া যাইবে।

ভাষাগত সমস্যাসমূহ

আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক উপজাতি ইহার নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। কেবল যে সমাজসেবকগণ কর্ত্তৃকই এই সকল বিভিন্ন ভাষা অধীত এবং আলোচিত হইবে তাহা নহে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও এগুলি সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিবেন। পুণা, ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ড. কাত্রে এই দিক দিয়া বাস্তবিকই একটি প্রশংসনীয় কাজের সূচনা করিয়াছেন। আদিবাসীদের মধ্যে কর্ম্মরত আমাদের সমাজ-সেবকদের উচিত তাঁহার সংস্পর্শে আসা এবং তাঁহার সহিত সহযোগিতা করা।

আদিবাসীদের ভাষার জন্য ব্যবহৃত হইবে হয় আঞ্চলিক লিপি অথবা নাগরী লিপি। তাহাদের অভিধান, ব্যাকরণ এবং গান মুদ্রিত হওয়া উচিত নাগরী অক্ষরে। ইহা উপজাতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়ন ও আলোচনাকে সহজসাধ্য করিয়া তুলিবে, আদিবাসী যুবকদিগকে অধিকতর সহজ ভাবে হিন্দী এবং সংস্কৃত শিখিতেও ইহা সাহায্য করিবে।

স্বরাজের ভিত্তিকে যাঁহারা দৃঢ়তর করিতে চান এবং জাতীয় সংহতির গুরুত্ব যাঁহারা উপলব্ধি করেন, আদিবাসীদের জীবন এবং ভাষা সম্বন্ধে— মন গভীর ভাবে তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইবে যেন আদিবাসী ভাষাসমূহে তাঁহার নূতন এবং যথোপযুক্ত শব্দাবলী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইতে পারেন, এবং আমরা নিজেরাও কেনই বা তাহাদের কতকগুলি অত্যন্ত শুদ্ধ শব্দকে আমাদের

প্রান্তিক ভাষাসমূহের এবং হিন্দীর অঙ্গীভূত করিয়া লইব না? আমাদের উচিত তাহাদের নৃত্য গীতও শিক্ষা করা। তাহাদের সহিত আহার করিতে এবং খেলাধুলা করিতে আমরা সমর্থ হইব। দিল্লীতে আমাদের জাতীয় উৎসবে যোগদান করিতে যেমন আমরা তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করি তেমনি আমাদের আঞ্চলিক উৎসবসমূহে অংশ গ্রহণ করিবার জন্যও তাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিব এবং আমাদের আনন্দোপভোগে ও অবসরবিনোদনেও আমরা তাঁহাদের সহিত একাত্ম হইয়া যাইব।

প্রকৃতির সন্তান

যেমন আমরা তাহাদের সেবা করি তেমনি তাহাদের সেবাও সানন্দে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হইবে। আদিবাসীরা প্রকৃতির সন্তান; বিভিন্ন প্রকারের ওষধি এবং গাছ গাছড়া গুণাগুণ তাহারা অনেকেই জানে। আমাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক এবং রাসায়নিকগণ তাহাদের নিকট হইতে অনেককিছু শিখিতে পারেন।

উপজাতীয়দিগকে শিক্ষাদানকালে এই বিষয়টিও বিবেচনা করা সমীচীন হইবে যে, অরণ্যচারী প্রাণীকুল, পশুপক্ষী এবং বনের উদ্ভিদ্‌জীবনের সঙ্গে তাহাদের জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিক উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং খনিজবিদ্যা শিক্ষা করা তাহাদের নিকট সহজতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই সকল উপজাতীয় লোকেদের প্রায়শঃই লৌহ এবং কয়লার খনিগুলিতে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। উপজাতীয়দের ভিতর হইতে বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত যুবকদিগকে যদি বন-সংরক্ষণবিদ্যা (Forestry) অথবা খনিজবিদ্যা এবং ধাতুবিদ্যায় (Metallurgy বিশেষজ্ঞ হইবার সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের প্রতি ঠিক ন্যায় বিচারই করা হইবে এবং ইহা তাহাদিগকে জাতির সেবা করিবার সুযোগও প্রদান করিবে। কতিপয় যোগ্য তরুণকে জার্মানী, রাশিয়া এবং আমেরিকায় পাঠানো খুবই সঙ্গত হইবে ইহার দরুন তাহারা আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার (Technology) জ্ঞান আহরণ করিয়া আমাদের দেশে লইয়া আসিতে সমর্থ হইবে।

সমবায় এবং উপজাতিসমূহ

সমবায় সমিতিসমূহ লইয়া এখানে আমি বেশী আলোচনা করিব না। বিশেষজ্ঞগণই এই বিষয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ করুন। এই পর্যন্ত আমি জানি যে, 'আদিবাসীদের আরণ্য সমিতি সমূহ' (Forest Co-operative Societies for Adivasis) বোম্বাই রাজ্যে খুব কার্য্যকররূপে এবং সাফল্যের সহিত কাজ করিতেছে। ইহাও আমি জানি যে, উপজাতীয়দের স্বভাবতঃই এই ধরনের সমবায়মূলক কর্মপ্রচেষ্টার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং উপদেশ দিলে তাহারা নিজেরা নিশ্চিতই কৃতিত্বের সহিত সমবায় সমিতি চালাইতে পারে। ইহ মনে রাখা ভালো যে, বর্ত্তমান নববিধানে সকলের শেষে যাহার স্থান সে হইতে পারে প্রথম।

প্রত্যেক সভ্য সরকারকে যথোচিত মনোযোগ দিতে হয় ইহার বন-সংরক্ষণের ব্যাপারে। সরকারকে এই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, প্রতি বৎসর যে পরিমাণ গাছ কাটা হয় রোপণ করিতে হইবে অন্ততঃ তাহার দশ গুণ অধিক। অরণ্যসমূহ আমাদের মূল্যবান সম্পত্তি এবং সেগুলিকে বিধ্বস্ত হইতে দেওয়া সমীচীন নহে।

কিন্তু ইহাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, অরণ্যবাসী উপজাতীয় লোকেরা যেন উপদ্রুত এবং দুর্গত না হয়। আদিবাসীদের সংখ্যা এবং শক্তিও আমাদের দেশের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ।

বন-সংরক্ষণবিদ্যায় আদিবাসীদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূলসূত্র শিক্ষা দেওয়ার পর তাহাদিগকে ফরেষ্ট গার্ড এবং ফরেষ্ট অফিসাররূপে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। তখন বাহির হইতে লোক আমদানী করা হইয়া দাঁড়াইবে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

শিক্ষিত আদিবাসী যুবকদের নিকট আমি কেবলমাত্র এই কথাই বলিব—"সর্ব্বতোভাবে তোমাদের জনগণের, তোমাদের সম্প্রদায়ের সেবা কর। কিন্তু কেবলমাত্র ইহা দ্বারাই তোমরা কখনও তোমাদের লোকেদের উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইবে না। সামগ্রিক ভাবে জাতির পরিপূর্ণ বিকাশের কার্য্যে তোমাদিগকে সহযোগিতা করিতে হইবে অন্যান্য মহান্ নেতাদের সহিত। তোমাদের পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব্বতোমুখী প্রগতির ইহাই একমাত্র পন্থা।"

পুণ্যকৃত্যের অধিকারা তারাই

দেশে এমন অনেক কর্ম্মী আছেন, আদিবাসীদের সেবাকে ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যাহারা তদুদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজ একটি পুণ্যকৃত্য। যাহাদের আমরা সেবা করি তাহাদের মধ্যে ভগবানকে দেখা আমাদের আদর্শ। ভগবান যখন এই সকল সাদাসিধা আদিবাসীর রূপে আমাদের সেবা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আসুন, যতখানি আমাদের সাধ্য ততখানি নিষ্ঠা এবং আনুগত্য দ্বারা আমরা ইহাদের সেবা করি—আসুন, তাহাদের আস্থাভাজন হইবার জন্য আমরা চেষ্টিত হই। তাহাদের পক্ষে আমাদের নিকট তাহাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ ভাবে

উৎপাটিত করিয়া দেওয়া অসম্ভব যদি না তাহাদের ভাষা শিক্ষা করি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। আমরা যেমন তাহাদের সেবা করি তেমনি যদি তাহাদের ভাষারও সেবা করিতে সমর্থ হই তবে তাহা হইবে নূতন সাহিত্যের মাধ্যমে।

জাতিসংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ আমাদিগকে পানভোজন সম্পর্কিত অনেক 'ট্যাবু' বা ধর্মীয় নিষেধের কবলিত করিয়া ফেলে। সৌভ্রাত্রের অনুশীলন কেবল তখনই আমরা করিতে পারি যখন আমরা এই সকল 'ট্যাবু' পরিহার করিতে সমর্থ হই। একথা বলা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয় যে, নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ আমরা পান অথবা আহার করিব। কিন্তু কিছুই যেন আমাদিগকে যে-কোনও লোকের সহিত বসিয়া আহার করিতে অথবা যে-কোনও লোকের দ্বারা রন্ধিত খাদ্য ভোজনে প্রতিনিবৃত্ত না করিতে পারে।

আদিবাসীদিগকে আমরা যত বেশী একাউণ্টেন্সী বা হিসাবপত্র সংরক্ষণবিদ্যা শিখাইব, তাহাদের প্রগতি হইবে ততই বলবত্তর এবং দ্রুততর। সাফল্যের সহিত তাহাদের সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতিসমূহের (Multipurpose Co-operative Societies) কার্য্যপরিচালনার জন্ত বুক কিপিং বা হিসাব-কিতাবের কাজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত জ্ঞানদানেও সমর্থ হওয়া আমাদের উচিত।

প্রকৃত প্রয়োজন হইতেছে—তাহাদের মধ্যে আশ্রম-সমূহ প্রতিষ্ঠা যেখানে আদিবাসী এবং অপর সম্প্রদায়ের কতিপয় পরিবার একত্রে অবস্থান করিতে পারে এবং যেখানে বিকশিত হইতে পারে সকল ধর্মের জন্ত শ্রদ্ধা। আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত পবিত্রতা এবং জীবনের শুদ্ধি।

আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের জীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত হওয়ার জন্ত লব্ধ হইবে যে অনাবিল আনন্দ—তাহাই আমাদের সত্যিকারের পুরস্কার।

আদিবাসীদের লোকসঙ্গীত

শ্রীপ্রভাকর মাচওয়ে

সরল গ্রামবাসীদের অথবা সমতলে কিংবা শহরের নিকটে যে সকল লোক বাস করে, আদিবাসীদের লোক-সঙ্গীতসমূহ তাদের লোক-সঙ্গীত থেকে ভিন্ন ধরনের· তাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতত্ত্ববিদের, সাহিত্য-বিষয়ক গবেষক-কর্মী এবং ভাষাতত্ত্বিদের, আদিম সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক রীতি পদ্ধতিসমূহের পারস্পরিক বিপ্রকর্ষণের অনুশীলকের গবেষণার উপকরণ ভাণ্ডার। এই সকল লোকগীতির অধিকাংশই অলিখিত এবং কাজেই তাদের লিপিবদ্ধ রূপের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। মূল ভাষান্তরের প্রামাণ্যতা বজায় রাখবার দিকেও আমাদের দেশে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। মূলের আর্জ্জব বা সরলতা (Naivete) প্রায়শঃই ব্যাহত হয় অজ্ঞাতসারে মুখে মুখে রচিত কবিতার চরণসমূহ দ্বারা। কখনও কখনও স্বরাঘাতের (accent) একটি পরিবর্তনে অর্থের অদল-বদল হয়। এবং যেহেতু আদিবাসীদের শব্দ-ভাণ্ডার এত সীমিত সেইজন্ত এগুলি মূলরূপকে অবিকৃত রাখবার জন্তে প্রয়োজন চূড়ান্ত প্রযত্নের। এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের লোক-সঙ্গীতের রচনাংশসমূহ যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে:

শবর উপজাতীয়দের ওড়িয়া লোক-সঙ্গীত

উড়িষ্যা যেমন ভাস্কর্য্যের এবং বিভিন্ন রঙের আদ্যক্ষরে অলঙ্কৃত (illuminated) হাতে লেখা পুথির, তেমনি লোক-সঙ্গীতেরও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এখানে শবর উপজাতির একটি লোক-সঙ্গীতের নিদর্শন দেওয়া যাচ্ছে:

মাদল বাজায় ক্ষেত-ইঁদুরে
নকুল হল বাদ্যকর।
কাঠবিড়ালী মদ বিলায়
ভেরী বাজায় শশকবর।
ময়ূর রাখে মৃদঙ্গ যে
দীর্ঘ তাহার গ্রীবার 'পর।
লম্ব গ্রীবা তাই ত তার—
ক্ষেত-ইঁদুরের পিঠটা দেখি,
মস্ত বড় তার প্রসার।
লাফিয়ে যখন পড়ল সবাই
ময়ূর-গ্রীবার মৃদঙ্গে
'ডিনজুব' 'ডিনজুব' গান ধরিয়া
ময়ূর মাতে কি রঙ্গে!
"বুম্বসার" "বুম্বসার"
নকুলভায়া গান ধরে,
কাঠবিড়ালী বলছে ডেকে
মদের গ্লাসটা দাও ভরে।
'টিউডোই' 'টিউডোই'
শশক বুঝি গান করে।

মাদল বাজায় ক্ষেত-ইঁদুরে
নকুল হ'ল বাদুকর
কাঠবিড়ালী মদ বিলায়
ভেরী বাজায় শশকবর।

কন্ধ, পরজা এবং অন্যান্য যে সকল উপজাতীয় লোক ময়ূরভঞ্জের অভ্যন্তর প্রদেশে ও মহানদীর তীরে এবং চিল্কা হ্রদের তীরে বাস করে তাদের মধ্যেও এই ধরনের সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই সকল অঞ্চলের অনেকগুলিতে এখনও যা দিয়ে লোক-সঙ্গীতের রস-সম্পদ আহরণের চেষ্টা হয় নি। শান্তিনিকেতনে ডক্টর কুঞ্জবিহারী তাঁর অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত সম্বন্ধে সুষ্ঠু ভাবেই আলোচনা করেছেন।

রাজস্থানী লোক-সঙ্গীত

রাজস্থানী হচ্ছে বিভিন্ন উপভাষার—'ভিলি'ও তার অন্তর্ভুক্ত—সাধারণ নাম। রাজস্থানের লোকসঙ্গীতসমূহ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। ওখানে যে সকল জাতির বাস তারা হচ্ছে তীরন্দাজ ভীল, অপরাধপ্রবণ কাঞ্জার, এবং "দেবী"-উপাসক 'গবিরা লোহার'—শেষোক্তরা হচ্ছে এক শ্রেণীর বেদে উপজাতির লোক। একটি বিখ্যাত রাজস্থানী (মাড়োয়ারী) বিবাহ-সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাচ্ছে:

সাদা কি, ওগো সাদা কি,
জঙ্গলের তুলো সাদা
সাদা প্রভু সূর্য্যদেবের ঘোড়া,
সাদা তাঁর পত্নী রাইনাদের দাঁতগুলো
উদীয়মান সূর্য্য সাদা
ডুবে-যাওয়া রবি কিন্তু সিঁদুররাঙা
গোরুগুলো গিয়েছিল চরতে
পাখীরা চলে গেল সুদূরে
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যত সব
হ'ল প্রতিপালিত সুচারুরূপে।
ওগো প্রিয় বন্ধু, আমার বাপের বাড়ীতে
বাজে মাদল।

লাল কি, ওগো লাল কি
চুড়িগুলির লাক্ষা লাল,
লাল প্রভু সূর্য্যদেবের অশ্ব
লাল তাঁর পত্নী 'বহু রাইনাকের চক্ষু দুটি'
উদীয়মান সূর্য্য সাদা
ডুবে যাওয়া সূর্য্য সিঁদুররাঙা
রক্তরাঙা মুদে আসা নলিনী।
গোরুগুলি গিয়েছিল চরতে
পাখীরা উড়ে চলে তাদের পথে
আচার অনুষ্ঠান যত হ'ল প্রতিপালিত
ওগো বন্ধুরা, আমার বাপের বাড়ীতে
বাজে মাদল।

উদয়পুরের হিন্দী বিদ্যাপীঠ মোতীলাল মেনারিয়ার উপযুক্ত পরিচালনাধীনে ফুলাজী মীনা কর্ত্তৃক রেকর্ড-করা শত শত ভীল গীত আমি পড়েছি এবং শুনেছি। একটি ভীল লোকসঙ্গীতে পাই তেজা ভীলের কাহিনী—খুব ভোরবেলা সে রওনা হ'ল বাড়ী থেকে—সঙ্গে তার তরুণী বধূ। গাঁয়ের সকল লোকে তাকে যেতে বারণ করল—কেননা সোমা নদীতে সেদিন বান ডেকেছে, কিন্তু কারুর মানা শুনল না সে—ফল হ'ল কি? নদী গ্রাস করে ফেলল তেজা আর তার স্ত্রী দু'জনেই। কবিতাটি ছোট, কিন্তু বড়ই মর্ম্মস্পর্শী এবং শোকাবহ।

ছত্রিশগড়ের গোন্দ-সঙ্গীত

গোন্দ এলাকায় আমি ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছি এবং রাতভোর গান করতে শুনেছি মারিয়া বিয়ের দলকে। শুনেছি রাজগোন্দ সম্প্রদায়ের এক অন্ধ চারণকে এমন সব লোকসঙ্গীত গাইতে—যাতে প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহের রূপ—যেমন রিক্রুটিং অফিসার কর্ত্তৃক শ্রমিকদের চা বাগানে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিশোরদের "ঘটুল" সঙ্গীত এবং 'দাদারিয়াজ' ও ভজুলি সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। ড. ভেরিয়ার এলউইন এই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর বই-গুলিতে।

গোন্দরা বাস করে শহরের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং দুইটি যুদ্ধের অন্তর্ব্বর্তীকালে তারা হয়েছিল বিপর্য্যস্ত। অনেক মোচড় খেতে হয়েছে তাদের চিন্তাভাবনাহীন সরল জীবনকে। মারিয়া লোকগীতিসমূহে দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্য-পীড়িত লোকেদের উল্লেখ আছে প্রচুর। বিভিন্ন ফসলকাটার উৎসব এবং মহুয়া-সঞ্চয়ন, ব্যাধি নিরাময় করা এবং অতি-প্রাকৃত শক্তিনিচয়ের তোষণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, এমনকি কামনাতুর প্রণয়ের খোলাখুলি প্রকাশ সম্বন্ধে পর্য্যন্ত বহু সঙ্গীত প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে।

আসাম উপজাতীয় লোকে পূর্ণ—যেমন নাগা, আঙ্গামী নাগা, কাছারী, গারো খাসিয়া ইত্যাদি। "তারা তাদের তাঁতে কবিতা বোনে"—গান্ধীজী তাদের সম্বন্ধে বলতেন এই কথাগুলি। তারাও নাচে গায় এবং বিভিন্ন ঋতু-উৎসবে এবং আধা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে স্ফূর্তি আমোদ করে। প্রাচীন

কামরূপের পেছনের সমাজতাত্ত্বিক বিন্যাসের প্রশংসনীয় আলোচনা পাওয়া যাবে পরলোকগত ড. বাণীকান্ত কাকতির "দি মাদার গডেস অব কামাখ্যা" নামক পুস্তকে। উপ-জাতীয়দের লোকসঙ্গীত লিপিবদ্ধ করার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই অঞ্চলের অধিকাংশই এখনও রয়ে গেছে অনবেক্ষিত। ভারতীয় বিদ্বানগণ এখনও পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ ভাবে এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করেন নি।

এই প্রবন্ধ অন্ততঃ কয়েকজনকে এ বিষয়টি শুধু সখ হিসাবে (যেমন আমার আছে) জীবনের প্রিয়বস্তু রূপে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করুক। এবং মহারাষ্ট্রের ডোজ, গুজরাটের ভীল, দক্ষিণের টোডা, বিহারের সাঁওতাল এবং হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতির লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে অধ্যয়ন এবং আলোচনায় তাঁরা প্রবৃত্ত হোন্।

টোডা প্রণয়-সঙ্গীত

টোডারা নীলগিরির একটি আদিম জাতি। এখানে তাদের একটি লোকসঙ্গীতের নমুনা দেওয়া হ'ল:—

যদি তুমি আমায় বিয়ে করো—
তবে, একই আকারের এবং রঙের যুগল পত্রের মতো
এক হয়ে যাবো আমরা। তাই এসো।
একই গাছের শাখা থেকে যেমন করে তৈরি
হয় দুটি মোষের মূর্ত্তি
তেমনি করে মিলব আমরা। তাই এসো।
চল আমরা যাই ওখানে ওই পিপার মত
গৃহে। এসো।
এক কুঁড়েঘর ভরতি ছেলেপুলের জন্ম দেবো আমরা
এসো।
খোঁয়াড় ভরা মোষ পালব আমরা। এসো।
বাক্স ভরতি টাকা হবে আমাদের। এসো।
যেভাবে থাকব আমরা সেভাবে বাস করে নি
কখনো কেউ। এসো।
আমাদের বাপঠাকুরদার মত থাকব আমরা। এসো।
পুরনো কালের মত থাকবে আমাদের
মোষের পাল। এসো।
বুভুক্ষু মানুষকে দেবো আমরা খাদ্য এবং
প্রীতি। এসো।
তৃষ্ণার্ত্তকে দেবো আমার দুধ আর ভিক্ষা। এসো।
সবাইকে অনুরোধ করব আমরা মিলিত হতে
আমাদের মন্দিরের কাছে। এসো।
ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরব আমরা। এসো।
নক্সা-তোলা কাপড় পরব আমরা। এসো।
একত্রে, আলাদা ভাবে নয়, আমাদের দিন গুনব আমরা।
এসো।

ছত্রিশগড়ের, মারিয়া উপজাতিদের লোকসঙ্গীত

মহাজনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত আদিবাসীদের গভীর বেদনা ব্যক্ত হয়েছে এই লোকসঙ্গীতে:—

আমাদের গাঁয়ের মহাজন, সেই মহাজন
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে!
অন্তরে তার অবহেলা, রসনায় তার প্রতারণা
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে!
তার নিক্তিতে ফাঁকি, ওজনেও তার ফাঁকি
ওগো মেয়ে ওগো মেয়ে
দিন রাত সে সব আমাদের নিচ্ছে লুটে,
লুঠ করছে সব—
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে—
ঋণ আমাদের জড়িয়ে ফেলেছে,
ঋণ আমাদের করেছে অভিভূত
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে
বলদগুলো নিয়ে গেছে সেই মহাজন
ওগো মেয়ে ওগো মেয়ে
শূন্য লাঙলগুলো করবে কি,
করবে কি শূন্য লাঙল
ওগো মেয়ে ওগো মেয়ে
এর চেয়ে মৃত্যুই যে ছিল ভালো,
কিই বা হ'ত যদি
মরে যেতাম আমরা
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে।
আমাদের গাঁয়ের সেই মহাজন,
সেই মহাজন
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে।
অন্তরে তার অবহেলা
রসনায় তার প্রতারণা
ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মৃত্যু-রহস্য

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেহত্যাগ করেন ৩১শে আষাঢ় শক ১৪৫৫, ইং ৯ই জুলাই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র; কিন্তু আজও জনমনে এই প্রশ্ন জাগে যে, তাঁহার দেহাবসান প্রকৃতপক্ষে কিভাবে ঘটিয়াছিল। এই জড়-জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু যে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহসহ শ্রীজগন্নাথের অথ শ্রীগোপীনাথের বিগ্রহের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য ঘটনা কিনা, এ প্রশ্ন আজও সাধারণ ভক্তগণের বিশেষতঃ ঐতিহাসিকগণের মনে উঁকি মারে। অন্ধ বিশ্বাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া, মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের ঘটনাটির সহিত বাস্তব ও সত্যের কি সমন্বয় থাকিতে পারে তাহা উদ্ঘাটিত হওয়া কর্তব্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও দৈহিক মৃত্যু হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, যদুবংশ ধ্বংস হইবার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে আসিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন। মতান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ শায়িত ছিলেন এবং তদবস্থায় এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। এই উভয় প্রকার মৃত্যুই নরদেহধারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর দ্বারকাতেই তাঁহার শেষকৃত্যাদি নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর দেহ অকস্মাৎ বিগ্রহমধ্যে অদৃশ্য হওয়া কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা?

প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন, "মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলা দুঃখময়পূর্ণ হইলেও এক্ষণে শিক্ষিতসমাজের তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে প্রবল বাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বয়ং ভগবান। তাঁহার লীলা-কথার যতই আলোচনা হইবে, যতই বিচার বিশ্লেষণ হইবে, ততই জীবের পরম মঙ্গল হইবে ···মহাপ্রভুর সঙ্গোপন-লীলারও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেই বা ক্ষতি কি?"

প্রধানতঃ ঠাকুর লোচন দাস ও জয়ানন্দ তাঁহাদের চৈতন্য-মঙ্গলে, নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এবং মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার অমিয়-নিমাই চরিতে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-গ্রন্থে যথা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অথবা বৃন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে কোনকিছুরই উল্লেখ নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহাদের ন্যায় একনিষ্ঠ গৌরাঙ্গ-সাধক মহাপ্রভুর একান্ত হৃদয়বিদারক মৃত্যু-কথা লিপিবদ্ধ করিতেও দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। সেই কারণেই দেখা যায় যে, মহাপ্রভুর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ারও অন্তর্ধান বৃত্তান্ত অনুরূপ অস্পষ্ট ভাবেই বৈষ্ণব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, এক দিন তিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয় সহচরী কাঞ্চনমালার সহিত নবদ্বীপে স্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি দর্শন করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইল, গৌরাঙ্গমূর্তি সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া সেই অতি শুভ মুহূর্তে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তিতে লীন হইলেন।

এখানেও বিষ্ণুপ্রিয়ার নশ্বর দেহের পরিণতি অথবা তাঁহার দেহের শেষকৃত্যাদি সম্বন্ধেও কোন গ্রন্থে কোনরূপ উল্লেখ নাই। অতএব দেখা যায় যে, কোন কোন বৈষ্ণব-কবি শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ও দেবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই মহাপ্রভু ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নশ্বর দেহ দুইটির শেষ পরিণতি সম্বন্ধে কোনরূপ তথ্যাদির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই তথ্য গোপন না রাখিলে বা উল্লেখ করিলে যে তাঁহার অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে এমন নহে। যে সমস্ত বৈষ্ণব-সাধক এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোকপাত করিয়াছেন, তাঁহারাও একনিষ্ঠ গৌরভক্ত। এখন, যে সমস্ত বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদের সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন (খ্রীঃ ১৪৮৬-১৫৩৩)। তন্মধ্যে চব্বিশ বৎসর তিনি নবদ্বীপে ছিলেন। তৎপরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছয় বৎসর দক্ষিণ-ভারত, দ্বারকা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থে পদব্রজে ভ্রমণ করেন ও অবশিষ্ট ১৮ বৎসর নীলাচলে বাস করেন।

> 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
> অষ্ট-চল্লিশ বৎসর প্রকট-বিহরি।
> চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহ-বাস।
> নিরন্তর কৈলা কৃষ্ণ-কীর্তন প্রকাশ।
> চব্বিশ বৎসর শেষে করিলা সন্ন্যাস।
> চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস।
> তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
> কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন।
> অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
> কৃষ্ণ-প্রেম নামামৃতে ভাসাল সকলে।'
>
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মহাপ্রভুর শেষ কয়েক বৎসর অহরহ প্রেমোন্মাদ অবস্থায়

কাটিয়াছিল। মূর্চ্ছা, উদ্দণ্ড-নৃত্য, আবেশ ও উন্মাদনা এই অবস্থাগুলি তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এই সময়ে তিনি কখনও বা গম্ভীরার দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণচরণভ্রমে নিজ মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিয়া রক্তাক্তকলেবর হইতেন, কখনও বা চটক পর্ব্বত দর্শনে গিরি-গোবর্দ্ধন ভ্রমে আনন্দ-নৃত্য করিতেন, কখনও বা যমুনাভ্রমে সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হইতেন, কখনও বা জগন্নাথ-মন্দিরের তিলঙ্গা গাভীগণের সহিত রাখালভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন, আবার কখনও বা শ্রীরাধাভাবে বিভোর হইয়া প্রেম-লীলা কীর্ত্তন করিতেন। তৎকালে তাঁহার দেহবোধ একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল বলিলেই হয়। এই সময়ে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও গোবিন্দ দিবারাত্র তাঁহার দেহরক্ষীর কার্য্য করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকৃত প্রেম-গীতিকাব্য শুনাইলে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইতেন এবং তাঁহাকে সুস্থ রাখিবার জন্য স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ সর্ব্বদাই উক্ত বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদাবলী শুনাইতেন।

এই সময়ে এক দিন, সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ দিন, (৩১শে আষাঢ় ১৪৫৫ শক, ইং ৯ই জুলাই ১৫৩৩) তিনি কাশী মিশ্রের গৃহে আকুল আবেগে কৃষ্ণ-বিরহ কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ নীরব হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে বিষাদ-কালিমা, বেগে নয়নাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া উন্মাদের ন্যায় জগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন।

"হেনকালে মহাপ্রভু কাশী মিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবনকথা কহে বাঞ্ছিত অন্তরে॥
সত্বরে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে গিয়া উত্তরিল সিংহদ্বারে॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥"

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ঠাকুর শ্রীলোচন দাসের মতে মহাপ্রভু সেদিন উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া জগন্নাথের মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি যেন সেদিন মন্দিরস্থ জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। এ কারণ টলিতে টলিতে তিনি গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দৈবক্রমে তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দ্বার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। তখন মন্দিরাভ্যন্তরে মহাপ্রভু মাত্র একা। তিনি দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হে পতিতপাবন, এই কলিহত জীবকে তোমার মধ্যে আশ্রয় দাও।" এই আকুতি ও আত্মনিবেদনের "পর মুহূর্ত্তেই তিনি দারুব্রহ্ম জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হইলেন।"

"এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হৃদয়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল আপনে॥" —শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ঠাকুর লোচন দাস আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু যখন জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে করিতে জগন্নাথের মধ্যে লীন হইলেন তখন "গুঞ্জাবাড়ী" হইতে এক পাণ্ডাঠাকুর উহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। ইহা কোন ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া পাণ্ডাঠাকুর ভিতর হইতে সত্রাসে চীৎকার করিতে থাকেন। তাঁহার চীৎকারে বাহিরে অপেক্ষমান ভক্তবৃন্দ দ্বার ঠেলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিলেন। সকলেই দেখিলেন মহাপ্রভু আর নাই। তিনি জনমের মত এই মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন এমনকি তাঁহার নশ্বর দেহটি পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়াছে। পাণ্ডাঠাকুর তখন সাশ্রুনয়নে বলিলেন—

"ভক্ত ইচ্ছা দেখি কাছে পড়িছা তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভু হৈলা অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥"

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

আবার নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে অনুরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহাপ্রভু বেলা দ্বিপ্রহরে স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করেন। কিন্তু তিনি সমুদ্রজলে না নামিয়া সোজা টোটা গোপীনাথের মন্দিরের দিকে চলিয়া যান এবং মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন। গদাধর পণ্ডিত তখন গোপীনাথের পূজারত ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার কানে কানে কি কথা বলিলেন ও তৎপরে অকস্মাৎ গোপীনাথ-বিগ্রহের সহিত লীন হইলেন। এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া গদাধর পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে গোপীনাথ আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণিত আছে:

"ওহে নরোত্তম এইখানে গৌর হরি।
কি জানি কি গদাধরে কহিল ধীরি ধীরি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥
কাশী চূড়ামণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
প্রবেশিয়া এই গোপীনাথ মন্দিরে।
হ'ল অদর্শন পুনঃ না আইল বাহিরে॥
প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হ'ল যাহা।
লক্ষ মুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা॥
এইখানে গদাধর হৈল অচেতন।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন॥" —ভক্তিরত্নাকর

চৈতন্যমঙ্গলেও এই উক্তির সমর্থন আছে, যথা:

"কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথ ঘরে॥"

মহাপ্রভুর জগন্নাথ অথবা গোপীনাথের বিগ্রহের সহিত লীন হওয়ার উক্ত দুই প্রকার মতবাদ ব্যতীত ইহাও জনশ্রুতি আছে যে,

তিনি সমুদ্রগর্ভে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। কেননা তিনি বহু বার যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রজলে ঝম্প-প্রদান করিয়াছিলেন এবং একবার সারারাত্রি যোগ-মূর্চ্ছায় সমুদ্রজলে ডুবিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে জেলের জালের সহিত তাঁহার দেহ সমুদ্রগর্ভ হইতে তীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :

> "শরজ্জ্যোৎস্না সিন্ধোরব কলনয়া জাত যমুনা—
> ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
> নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
> প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচী সূনুরিহ নঃ।"

অর্থাৎ, যিনি শরৎকালীন জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সমুদ্র-দর্শনে যমুনাভ্রমে আকুল আবেগে ধাবিত হইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-তাপ রূপ সমুদ্র-মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া তজ্জলে সারারাত্রি বাস করিয়াছিলেন এবং পরদিন প্রভাতে ভক্তগণ কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সেই শচীনন্দন আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মহাপ্রভুর এইরূপে বারংবার সমুদ্রে ঝম্প-প্রদানের দৃষ্টান্ত হইতে অনেকের এই ধারণা পোষণ করাও অসঙ্গত নহে যে, তিনি হয়ত সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হইয়াছেন।

কিন্তু জয়ানন্দ নিজ চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর মৃত্যু সম্বন্ধে একটি নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের রথের পুরোভাগে মহাপ্রভু উদ্দাম নৃত্য করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পদতলে পথের পাথুরে খোয়া বিদ্ধ হইয়া একটি গভীর ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত হইতে অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণ হইতে থাকে। কিন্তু মহাপ্রভুর তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। কেননা ঐ সময়ে প্রতি বৎসর নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইতে প্রায় তিন শতাধিক ভক্ত আসিতেন। সেই সমস্ত স্বজন ও অন্তরঙ্গগণ-সহ তিনি আত্মহারা হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। তদুপলক্ষে তিনি প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এক কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা বাহির করিতেন। ঐ দল সাতটি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটির পুরোভাগে অদ্বৈত-প্রভু, নিত্যানন্দ-প্রভু, ঠাকুর হরিদাস, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত ও গদাধর পণ্ডিতকে রাখিতেন। এই সাতজন বৈষ্ণব-চূড়ামণির নেতৃত্বাধীনে সাত সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব প্রেম-কীর্ত্তন সারা নীলাচল প্রকম্পিত করিয়া তুলিত। এই কীর্ত্তনকালে মহাপ্রভুর পদের ক্ষতের কি হইল না হইল তাহা তাঁহার নিজের অথবা অপর কাহারও লক্ষ্য হয় নাই।

রথযাত্রার উৎসব সমাপ্তির পর ভক্তবৃন্দ তাঁহার পদের ঐ ক্ষত লক্ষ্য করেন। ঐ ক্ষত বিষাক্ত হইয়া যায় ও তাঁহার জ্বর হইতে থাকে। ঐ ক্ষত-জ্বর হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহা অতি সাধারণ এবং নরদেহধারী অবতারেরও লৌকিক মৃত্যুর নির্ভর-যোগ্য ঘটনা।

চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল ১৬শ শতকের সপ্তম দশক। জয়ানন্দ মহাপ্রভুর নীলাচল বাসকালে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু-কালেও যে নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একারণ জয়ানন্দের উক্তি নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরা যায়।

মহাপ্রভুর এই ক্ষত-জ্বরে মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে ড. শ্রীসুশীলকুমার দে জয়ানন্দের উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া এবং মহাপ্রভুর শেষ জীবনের করুণ কাহিনীর কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"Sree Chaitanya's emotions grew in intensity and became characterised by excess of stupor, trances and frenzied energy, verging upon hysteria and dementia. To the faithful the last twelve years of his life consist of an orgy of devotional passion of an exclusive madness of Divine love (Premonmada). Day by day he became incapable of taking care of himself, but he was watched and tended with loving solicitude by Svarupa Damodara and other intimate disciples. His prolonged emotional experiences of religious rapture must have made extraodinary demands on his highly wrought nervous system, and brought on exhaustion and constant fits of seizure. Under the increasing strain of an impossible emotionalism his physical frame broke down and he passed away in Asadha Saka 1455, June-July 1533 A.D. The piety of his followers has drawn a veil of mystery over the manner of his end ; but various legends exist of his disappearance in the temple and in the image of Jagannatha, as well as of his accidental drowning in the sea during one of the frequent fits of ecstasy and even of assassination in the Gundica Temple. One of the less authoritative biographies records perhaps the actual fact of a less sensational but rather common human death by attributing the end to a wound in the left foot, which he received from a stone during one of his usual outbursts of frenzied dancing and

which brought on septic fever resulting in an untimely death."*

ড. দীনেশচন্দ্র সেনও এই কথা সমর্থন করিয়া "শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার যুগ" (পৃ. ২৫৯, পাদটীকা) নামক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

এখন দেখা যায় যে, ক্ষত-জ্বর হইতেই যে মহাপ্রভুর মৃত্যু হইয়াছিল এ বিষয়ে অনেকেই একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জয়ানন্দ এই সাধারণ মৃত্যুর কথা তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে লিপিবদ্ধ করায় বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার পুস্তকখানি সমাদৃত হয় নাই। এমনকি তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল পাঠ করাও নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার মতবাদ পাইয়া থাকি।

১। জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্যকালে তাঁহার পদে যে ক্ষত হয় সেই ক্ষত হইতে তাঁহার ক্ষত-জ্বর হয়। এই ক্ষত-জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

২। জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহের মধ্যে তিনি লীন হন।

৩। টোটা গোপীনাথের বিগ্রহমধ্যে তিনি অদৃশ্য হন।

৪। তিনি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হন।

৫। গুণ্ডিচামন্দিরের নিকট তিনি নিহত হন।

আবার এই পাঁচটি মতবাদের মাঝামাঝি আর একটি মতবাদ আছে যাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মতবাদটি এই : নীলাচলে মহাপ্রভুর মৃত্যু হইলে (জয়ানন্দের মতানুসারে) সম্ভবতঃ তাঁহার নশ্বরদেহ গুণ্ডিচামন্দির অথবা টোটা গোপীনাথের মন্দির-সংলগ্ন কোন স্থানে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল—অর্থাৎ, যেভাবে মহাপ্রভু স্বহস্তে বড় হরিদাসের সমাধি সমুদ্রতীরে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই সমাধির কথা বৈষ্ণব-কবিগণ সরাসরি প্রচার অথবা স্বীকার না করিয়া জগন্নাথ অথবা মতান্তরে গোপীনাথের সহিত তাঁহার লীন হওয়ার ইঙ্গিত মাত্র করিয়া হয়ত বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদের এক সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিকগণ শেষোক্ত মতবাদের মধ্যেও কিছু সত্যের সন্ধান পাইবেন আশা করি।

* Vaisnava Faith and Movement, pp. 76-7.

তারার জগৎ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

অনেক তারার হদিস মিলেছে, এখনো অনেক—অনেক বাকী ;—
তারায় তারায় ফিরিছে নয়ন,—তারায় তারায় ভরিছে আঁখি।
ও-ই যে অথই নিথর ইথরে প্রবাহ তুলিয়া আসিছে দ্যুতি,
এ মনের চোখে অচেনা লোকের ঘনায়ে তুলিছে কি অনুভূতি!
প্রকাশ-প্রয়াস—বিফল কেবল, কথার কথাও পড়ে না ধরা ;—
মনেরে ভুলায়—ভুলায় শুধুই জ্যোতির সাগর তারায় ভরা।
বসুন্ধরার বুকে সে ছোঁয়ায় জ্যোতিষ্কমের প্রীতির শিখা ;
আমার প্রাণের পরতে পরতে লিখিছে প্রেমের অনাদি লিখা।
নিবিড় গভীর গোপন আঁধারে দীপালি জ্বালায়ে ধেয়ায় কারে?
কোন্ সে প্রিয়ের লীলায় হাসিটি ফোটে শত কোটি তারার ঠারে!

মাটির মানুষ আকাশ-পারের ইশারা পেতেই ভোলে সে মাটি ;—
মাটির বাটির মধু পান করে, আকাশে তবুও কি হাঁটাহাঁটি?
জীবনের পরে কাটিছে জীবন, তবুও কিছুতে নেশা কি কাটে! –
তারার জগৎ ছাড়ায়ে সে হয় উধাও অজানা আকাশ-বাটে।
তারার আলোর আকুল ইশারা করিল তারে যে পাগল-পারা,
সৃষ্টি-ফাঁদের বাঁধন কাটিয়া হয় সে শুধুই সৃষ্টি-ছাড়া।
কাহার মায়ায় মুগ্ধ এ মন মাটিতে যতই লুটায়ে পড়ে,
লক্ষ তারার আলো বার বার কার উৎসব-মশাল ধরে।
এ মহাজড়ের পাহারা এড়ায়ে জ্যোতিষ্কমের বাসরে ফিরে
আঁখি-তারা তার তারায় তারায় তাই কি হারায় তিমির-তীরে!

চন্দননগরের পুরনো কথা

শ্রীহরিহর শেঠ

সিপাহী-বিদ্রোহের ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যে ব্রিটিশ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল সেকথা এই ১৯৫৭ সনে অনেকেরই মনে না আসিয়া পারে না। চন্দননগরে বসিয়া ১৭৫৭ সনের ২৩শে মার্চের কথা আজ স্মরণ হইতেছে।

সেকালে নিভৃত সুপ্ত পল্লী চন্দননগরের জাগরণের পর যখন ইহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত তখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ভারতের অদ্বিতীয় নগরী কলিকাতা একটি সামান্য পল্লীমাত্র ছিল। তখন এই চন্দননগর এ প্রদেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে একটি কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। দুই সহস্রাধিক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাসগৃহ-সম্বলিত, এক লক্ষ তিন সহস্র লোকের বসতিপূর্ণ গঙ্গাতীরস্থ এই স্থানটি একটি শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হইয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল।

ব্রিটিশ জাতির প্রধান প্রতিনিধিরূপে এখানে তখন লর্ড ক্লাইভ অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতীয় সেন্যের দ্বারা ভারত বিজয়—তদানীন্তন চন্দননগরের সেনকর্ত্তা ডুপ্লের পরিকল্পিত এই রাজনীতি তিনি গ্রহণ করেন। তখনই চন্দননগরের উপর প্রথম তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয় এবং আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে থাকেন। এ কথাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, চন্দননগরেই তাঁহাদের ভাগ্যপরীক্ষা হইবে। অভিযানে বাহির হইবার প্রাক্কালে স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াই পাদক্ষেপ করেন যে, হয় চন্দননগরেই তাঁহাদের শেষ, আর যদি শেষ না হয় তাহা হইলে সেইখানেই নিরস্ত হওয়া চলিবে না, তথা হইতে পুনরায় আরম্ভ হইবে তাঁহাদের অগ্রগতি।

যথাসময়ে জলপথে ভাগীরথীর উপর দিয়া টাইগার কেন্ট স্যালিসবারি প্রভৃতি রণতরী লইয়া কর্নেল ওয়াটসন এবং স্থলপথে ক্লাইভ স্বয়ং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছেন। সুপ্রসিদ্ধ অর্লেয়াঁ দুর্গের পাদমূলে ১৭৫৭ সনের ২৩শে মার্চ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাস-পাঠকদিগের নিকট অবিদিত নাই। বিশ্বাসঘাতক টেরেনুর সহিত ষড়যন্ত্রের ফলে একপ্রকার বিনাযুদ্ধেই আর্লিয়াঁ দুর্গ অধিকার তথা চন্দননগর-বিজয় ঘটে; আর

"অর্লেয়াঁ দুর্গসমীপে টাইগার, কেন্ট ও স্যালিসবারি রণতরী"

গৌরহাটীস্থ ডুপ্লের পল্লীভবনের নিকট স্যার আয়ার কুটের অধিনায়কত্বে সৈনিকবাহিনীর কিছুদিন অবস্থিতির পর তথা হইতেই পলাশীযাত্রা সুরু হয়।

পলাশীর প্রাঙ্গণেই ইংরেজের ভারত-বিজয়ের প্রথম ও প্রধান সোপান নির্ম্মিত হয়। আর ভারত-বিজয়ের ফলেই জগতে ব্রিটিশ জাতি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের পরাজয়ের পর প্যারিসের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ১৭৬৩ সনে চন্দননগর ইংরেজ কর্ত্তৃক ফরাসীদের নিকট প্রত্যর্পিত হইল বটে, কিন্তু সেই দিন হইতেই ভারতে ফরাসীদের অভ্যুত্থানের পথ অবরুদ্ধ হয়। আরও তিন বার অবশ্য ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক বারই চন্দননগর ইংরেজ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। শেষবার

"ওয়াটসনের এক দিকে শৃঙ্খলিত চন্দননগর এবং অন্য দিকে মুক্ত কলিকাতা"

(ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবেতে রক্ষিত প্রস্তরমূর্ত্তি)

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ফরাসীদের নিকট পুনরায় প্রত্যর্পিত হয়।

ক্লাইভ একদিন সদম্ভে বলিয়াছিলেন—তাঁহারা বাহুবলে ভারত জয় করিয়াছেন, বাহুবলেই তাহা রক্ষা করিবেন। তাহার পর দেড় শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে; আজ ভারতে ইংরেজ কোথায়, ফরাসী কোথায়? কীর্ত্তি এবং অপকীর্ত্তি উভয়ই রাখিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। আজিও ইংরেজের চন্দননগর বিজয়-স্মৃতি আর্লেয়াঁ দুর্গসমীপে টাইগার, কেণ্ট ও স্যালিসবারি রণতরীত্রয়ের আলেখ্য গ্রীণউইচের যাদুঘরের কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত রহিয়াছে, আর পাষাণ-রচিত,—কর্ণেল ওয়াটসন এবং শৃঙ্খলিত চন্দননগর আজও বিলাতের ওয়েষ্টমিনস্টার এবিতে বিরাজিত আছে।

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্ত বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্‌ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান— কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

২। কিভাবে প্রকাশিত হয়— প্রতি মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
জাতি ভারতীয়
ঠিকানা ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম ঐ
জাতি ঐ
ঠিকানা ঐ

৫। সম্পাদকের নাম শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
জাতি ভারতীয়
ঠিকানা ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
এবং
(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—

১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
২। মিসেস্ অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
৩। মিস্ রমা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
৪। মিস্ সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
৫। মিসেস্ ঈষিতা দত্ত
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
৬। মিসেস্ নন্দিতা সেন
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
৮। মিসেস্ কমলা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
৯। মিস্ বন্যা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
১০। মিস্ অলোকানন্দা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
১১। মিসেস্ লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—২৫।২।১৯৫৭ ইং প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—কলিকাতা অধিবেশন

ডক্টর শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

এবারে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন বসেছিল কলিকাতায় বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু। তিনি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সমবেত বৈজ্ঞানিকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। যে ধরনের গবেষণায় হিংসাত্মক কার্য্যের ইন্ধন যোগায়, বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদিগকে তিনি তার প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেন এবং মানব-সভ্যতার উৎকর্ষসাধন করবার জন্যই যে বিজ্ঞান-সাধনার প্রয়োজন—এই সত্য প্রচার করতে উপদেশ দেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানকে কোনক্রমেই ঘৃণা ও হিংসার ভাবধারার সহিত বিজড়িত রাখা সমীচীন নয়। বিজ্ঞানীদের পক্ষে কেবল সত্য আবিষ্কার করে শক্তির সন্ধান দেওয়াই কর্ত্তব্য এটা ঠিক নয়। এই শক্তিতে ধ্বংস আসবে কি মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হবে তাও বৈজ্ঞানিকদের অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাজ্যপাল শ্রীপদ্মজা নাইডু উপস্থিত দেশীয় এবং বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে এক প্রারম্ভিক ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, আজ বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের সমবেতভাবে এই প্রতিজ্ঞাই করা উচিত যে, বৈজ্ঞানিক সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা মানব-কল্যাণই যেন সাধিত হয় এবং মারণাস্ত্র প্রস্তুতে উহা ব্যবহৃত না হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত বলেন, মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আবশ্যক। বিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কার দিয়ে মানবজাতির ঐশ্বর্য্য এবং সুখ বৃদ্ধি করবেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত শক্তি শান্তির পথে যাতে চালিত হয় তার জন্য এবং যুদ্ধ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি বন্ধ করতে রাজনীতিবিদ্‌গণের সাহায্য চাই।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় একটি সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। ডাঃ রায় তাঁর ভাষণে বলেন, দেশ আজ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করেছে। এই নূতন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে হলে বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগরের প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক উপদেষ্টাদের কাছ থেকে সাহায্য পেলেও দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণকে সবকিছু আয়ত্ত করে নিতে হবে। দেশীয় কাঁচামাল প্রভৃতি ব্যবহার করে পরিকল্পনাটি যাতে দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় সে বিষয়ে সকলকে অবহিত হতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিগত চল্লিশ বৎসর ধরে এদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা চলছে, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রবিজ্ঞান—বিশেষ করে নক্সা তৈরি, যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, নির্ম্মাণ ও সংস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। ভারতবর্ষের মত দেশে কেবল যন্ত্রপাতি তৈরি করলেই চলবে না—আমাদের দেশীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ প্রভৃতির সাহায্যেই যাতে যতদূর সম্ভব যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা নির্ম্মিত হয় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। ডাঃ রায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রবিদ্‌গণকে অল্প ব্যয়ে কার্য্যগুলি সম্পন্ন করবার উপায়সমূহ নির্দ্ধারণ করবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। বৈজ্ঞানিক পন্থায় সস্তায় কাঁচামালসমূহ উৎপাদন করতে পারলে সামগ্রিক ব্যয় যথেষ্ট লাঘব করা যেতে পারবে।

অবশেষে ডাঃ রায় বলেন, আমরা এখন এক নূতন যুগে বাস করছি, তাকে আণবিক যুগ বলে। বিজ্ঞান আজ আণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে এক অফুরন্ত শক্তির সন্ধান পেয়েছে যার ফল ভাল ও মন্দ উভয়ই হতে পারে। হাইড্রোজেন বোমা মানবজাতির ধ্বংসের কারণ হবে অথবা স্থায়ী শান্তির উপকরণ হবে সে সম্বন্ধে এখনও কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। আণবিক চুল্লি থেকে বহু উপাদান পাওয়া যায় যা গবেষণা, চিকিৎসা, কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অদূর ভবিষ্যতে আণবিক চুল্লি প্রতিষ্ঠা করে আণবিক শক্তির কারখানাসমূহ গঠিত হবে এবং সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে নূতন শক্তি উৎপন্ন হয়ে মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করবে। যেসব দেশে তেল এবং কয়লা সম্পদের ঘাটতি দেখা যাবে সেগুলিতে আণবিক চুল্লির উপযোগী মালমশলা নিয়ে গিয়ে আণবিক শক্তির কারখানা তৈরি করলে বিশেষ সুবিধা হবে।

ডাঃ রায় রাসায়নিক সংশ্লেষণের সাহায্যে যে সমস্ত ঔষধ তৈরী হয়েছে সেগুলির বিষয় উল্লেখ করেন। বীজাণুসমূহের উপর রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য হয়েছে। রাসায়নিক গবেষণার ফলে সিফিলিস, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের ঔষধ এবং বহুসংখ্যক হরমোন, ভিটামিন প্রভৃতি ঔষধও আবিষ্কৃত হয়েছে। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করে চিকিৎসা-জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন।

ডাঃ রায়ের মতে কৃষিকর্ম্মীদের অধিকতর ফসল ফলানোর জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতির সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। জল সরবরাহ, বীজসংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার এবং কতকগুলি পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে নূতন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার জন্য কৃষিকর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দেওয়া আবশ্যক।

রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন বোম্বাই ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যাপক এস. এম. মেটা। অধ্যাপক মেটা তাঁর ভাষণে বলেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে অজৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি দেখা যায় বাংলা দেশেই। এখানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তাঁর সহকর্ম্মিগণ বিভিন্ন ধাতুসমূহের নাইট্রাইটস সম্বন্ধে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন। এর পরে আরও কুড়ি বৎসর বাংলার বাইরে অজৈব রসায়নের প্রসার দেখা যায়। তিনি বলেন,. ভারতবর্ষে অজৈব রাসায়নিকগণের সংখ্যা

অত্যন্ত কম। ১৯৪৫ সনের আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিত গবেষণার সঙ্গে অজৈব রসায়নে যুগান্তর আসে। আণবিক গবেষণার ফলে রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের নূতন পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অজৈব পদার্থসমূহ অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রস্তুত হয়েছে। পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং ঐ সমস্ত সূক্ষ্মকণার সাহায্যে নূতন পরমাণু সংশ্লেষণেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে—এটাই ছিল একদিন এলকেমিষ্টগণের স্বপ্ন। অধ্যাপক মেটা আরও বলেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে। এখন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের নিকট অনেক সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। অনেকগুলি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। কেবল গবেষণাগার স্থাপিত হলেই চলবে না—যাতে পর্য্যাপ্ত কাজ হয় সেজন্য সরকারকে কয়েক জন সুযোগ্য রাসায়নিকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে নিযুক্ত করতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সর্ আশুতোষের নিকট আমরা ঋণী এবং সর্ জে. সি. ঘোষের নিকটও অনুরূপ সাহায্য আশা করা যায়। উপসংহারে তিনি বলেন, পণ্ডিত জবাহরলালের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতির কল্যাণে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সাফল্যলাভ করুক এটাই কাম্য।

পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ কে. আর. দীক্ষিত। তিনি কিউপ্রাস-অক্সাইড রেক্টিফায়ারের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি মৌলিক গবেষণামূলক বক্তৃতা দেন।

কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর ই. এস. নারায়ণন্। তিনি কীটপতঙ্গকুলের পরজীবী অর শ্রেণীর কীট-পতঙ্গের বিষয় আলোচনা করেন এবং কৃষি-বিজ্ঞানে এদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় সমালোচনা করেন।

মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক এস. এম. মহসীন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষের কর্মক্ষমতা নির্দ্ধারণ করবার যে ব্যবস্থা আছে তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ সি. আর. দাশগুপ্ত। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক এবং তাঁদের উপযুক্ত কর্ম্ম-সংস্থান দরকার। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ গবেষণা-কর্মীদের জন্য অনেকগুলি সুবিধার সৃষ্টি করেছে। তিনি গবেষণা-কারীদের জন্য উৎকৃষ্টতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সেই সময়ের মধ্যেই আবার শিক্ষণের ব্যবস্থা করারও যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ভারতবর্ষের মধ্যে হিম্যাটোলজি সম্বন্ধে প্রথম কর্মীদের অন্যতম এবং এই বিষয়ে মৌলিক গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছেন।

শারীর-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সিং। তিনি পেশী সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে তার বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, শরীরের বাইরে পেশী সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, এতে জড় ও জীবনের পার্থক্য ক্রমেই কমে আসবে এবং এই ভাবে এগিয়ে গেলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারবে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভের উপায় সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দেন। তিনি বলেন, আধুনিক সভ্যতার চাপে মানব-দেহ অতিরিক্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয় এবং তার ফলে রক্তের আধারসমূহ সঙ্কুচিত হয়ে রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে। পথ্যাদি নির্ব্বাচনের উপরও রক্তাধারসমূহ সক্ষম রাখা বহুলাংশে নির্ভর করে। আধুনিক খাদ্যতালিকার মধ্যে অত্যধিক লবণ এবং কোলেষ্টেরল ঐ সব রক্তাধার সঙ্কুচিত করে। এই রক্তাধারসমূহ সবল ও সক্ষম রাখতে পারলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ভাত খাওয়া ভাল, কারণ এতে লবণ কম আছে। ডাক্তার, উকীল প্রভৃতির পক্ষে ছুটি উপভোগ করা খুব ভাল, কারণ তাঁদের অত্যন্ত বেশী মানসিক পরিশ্রম করতে হয়।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর এস. এন. দাশগুপ্ত। শিল্পপ্রসারের জন্য বায়ু দূষিত হওয়ায় প্রাণী এবং উদ্ভিদ-জীবনের উপর এর যে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান ভাষণ দেন।

ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতু-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর জি পি. চ্যাটার্জি। তিনি ধাতু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু মৌলিক তথ্যসম্বলিত একটি ভাষণ দেন।

প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর এম. এন. শ্রীনিবাস। তিনি ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার স্বরূপ বর্ণনা করে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

ভূ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর বি. সি. রায়। শিল্পোন্নয়নকল্পে ভারতের খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সুব্যবস্থা যাতে হয় সেজন্য খনিজ বিভাগের নিমিত্ত একটি পৃথক মন্ত্রীদপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান। এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের সভায় বহু মৌলিক-গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি পঠিত ও সমালোচিত হয় এবং দেশীয় ও বৈদেশিকগণ উক্ত আলোচনায় যোগদান করে সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে বহু বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক যোগদান করে অধিবেশনকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরেই বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজের একই প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হয়। এজন্য বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমারোহ এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রতীয়মান হয়।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৫)—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তনে সংস্কৃত পণ্ডিতদের দান অপরিসীম। স্বতন্ত্রভাবে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত বিভিন্ন পণ্ডিত নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়াছিল—বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য বাংলায় বিবৃত হইয়াছিল। তৎকালীন বাঙালী জনসাধারণ এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রচুর উপকার ও আনন্দলাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থের মূল্য এবং প্রয়োজন এখনও অস্বীকার করা চলে না। তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে আমরা এই সমস্ত পণ্ডিত ও ইঁহাদের রচিত গ্রন্থের কথা ভুলিয়া যাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' প্রকাশ করিয়া ইঁহাদের বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—ইহা খুবই আনন্দের কথা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের কথা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েক জন পণ্ডিতের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থ ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা অবলম্বনে এই কাহিনী রচিত হইয়াছে। ইঁহাদের কর্ম্মময় জীবনের বিস্তৃত পরিচয় সঙ্কলন করা যথোচিত উপকরণের অভাবে সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। বাগল মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। তথাপি যেটুকু বিবরণ তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া সে যুগের সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি সুন্দর চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। আমরা দেখিতে পাই—একাধিক মনীষী ও প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত বিবিধ রত্ন সাধারণের মধ্যে প্রচারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'বেদের অনেক প্রধান অংশ অনুবাদ করিয়া আমাদের বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন'—'পঞ্চদশী বেদান্তসার, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।' আজ হইতে এক শত বৎসর পূর্ব্বে বেদান্তবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বৃহৎকথা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে প্রসিদ্ধ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় রঘুবংশ ও কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থেরও সটীক সানুবাদ সংস্করণ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, তিনি আজ হইতে ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও সোমদেবের 'রাগবিবোধ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং রামায়ণের এক সংক্ষিপ্ত কাহিনী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

এই সমস্ত সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি আজ আর তেমন পরিচিত বা সুলভ নয়। বাগল মহাশয় ইঁহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শিক্ষিত বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তবে এই সব মনীষীর কথা কেবল স্মরণ করিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইবে না—ইঁহাদের রচিত কোন কোন গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা ছাড়া, মনে রাখিতে হইবে—ইঁহারা যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—এখনও অনেক করণীয় অবশিষ্ট আছে। সেই কর্তব্যসম্পাদনের প্রথম সোপান প্রাচীন মনীষীদের কৃত কার্য্যের পরিচয় লাভ করা। বাগল মহাশয় সেই সোপান-রচনার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই কাজে তাঁহার সাফল্য কামনা করি এবং তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি কালীবর বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এই জাতীয় অপরাপর পণ্ডিতদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যের পথ প্রশস্ত করুন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। রূপসংঘের গ্রন্থমালা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আধুনিক য়ুরোপের চিত্রসাধনার রূপটি গ্রন্থকার নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যে প্রকাশ-স্পৃহা মানুষের আজন্ম সহচর তাহা কেমন করিয়া কোন্ পথে নব্য য়ুরোপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহার সঠিক ধারাবিবরণী গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে বৈদগ্ধপূর্ণ ভঙ্গীতে পরিবেশন করিয়াছেন। শিল্পী প্রকাশ-সাধনায় তন্ময়, তাঁহার প্রকাশের প্রয়াসটুকু Lespugue-এর ভেনাসমূর্তির মধ্যে যেমন সুপ্রকট তেমনই আবার তাহা জিয়াকোমো বাল্লার 'দ্রুতগামী কুকুরে'র চিত্রটির মধ্যেও সমান ভাবে স্বপ্রকাশ। ফরাসী দেশের এক অখ্যাত পল্লীতে প্রাপ্ত এই ভেনাসমূর্তিটির নির্ম্মাণকাল খ্রীষ্টের জন্মের পঁচিশ হাজার বছর পূর্ব্বেকার ঘটনা বলিয়া পুরাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। সম্ভবতঃ সেই অস্ফুট প্রত্যূষে মানুষ প্রকাশের যে দুর্নিবার বাসনায় ভেনাসমূর্তি সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার নানান্ ভঙ্গী আশ্রয় করিয়া 'চতুষ্কোণবাদ' 'আকৃতিবাদ', 'নব্যতান্ত্রিকবাদ', 'নৈরূপ্যবাদ', 'প্রতিচ্ছায়াবাদ' প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির জন্মদান করিল। মানুষের কল্পনা শিল্পসৃজনে বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া এক পরাবৃত্তের রহস্যলোকের দ্বারোদ্ঘাটন করিল। কেমন করিয়া সেই রহস্যলোকের সবটুকু রং, সবটুকু রস, সেই অনির্ব্বচনীয় সুন্দরের সবটুকু সৌন্দর্য্য শিল্পে ধরিয়া দেওয়া যায় তাহাই হইল সর্ব্বযুগের শিল্পীর সাধনার বস্তু। এ যুগের য়ুরোপীয় শিল্পীরা বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া সাদৃশ্য-বিবেককে তাঁহাদের সুগমগ্ন করিলেও চয়নবাদীদের শিল্পবাদে বাস্তবকে পুরাপুরি অস্বীকার করা হয় নাই। প্রাচীন শিল্পবাদ মূলতঃ বস্তুপন্থী। আধুনিক চয়নবাদীরা সেই প্রাচীন মতবাদের আংশিক সমর্থন করিয়াছেন। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে চয়নবাদীদের সমন্বয়াত্মক শিল্পদর্শনের কথা বলিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের দৃষ্টিকোণ যথার্থ শিল্পসমালোচকের। বহুবিস্তৃত শিল্প-অভিজ্ঞতার আলোক-স্বচ্ছ চতুষ্কোণবাদের সার্থক আলোচনা গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কেমন করিয়া চতুষ্কোণবাদের পরিণতি ঘটিল নৈরূপ্যবাদে, আমরা তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিয়াছি। প্লেটো কথিত শিল্পের বিরুদ্ধ বাদের আর কোন সার্থকতা রহিল না—আধুনিক ইউরোপে নৈরূপ্যবাদের অকুণ্ঠ গ্রহণে ও সমর্থনে। শিল্পীমনের বস্তুবিমুখ চিত্রকল্পনা আধুনিককালে নব্যবাদে আত্মপ্রকাশ করিল। মাতীস এই নব্যবাদের অগ্রনায়ক। মাতীসের দৃশ্যবাদ প্রতিবাদ হইতে স্বতন্ত্র। এত দিন য়ুরোপের চিত্রশিল্পীরা স্থাবর জীবনের প্রকাশ-সাধনা করিলেন। জঙ্গম জীবনের চলমানতা প্রথম মূর্ত হইল 'ভবিষ্য'বাদীদের হস্তে। তাঁহারা গতিকে প্রমূর্ত করিলেন আপনাদের শিল্পকর্ম্মে। শিল্পের প্রাচীন পীঠস্থান ইটালীতে 'ভবিষ্যবাদ' জন্ম নিল আপন আন্তর শক্তির প্রসাদগুণে। গ্রন্থকার ভবিষ্যবাদীদের যুগপুরোধা বল্লীর বিশদ আলোচনা গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বস্তুর মধ্যে যে গতিচ্ছন্দ মূর্ত তাহার প্রকাশ-সাধনা আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় স্তবকের শেষাংশে গ্রন্থকার বর্ব্বরবাদীদের (Fauvist) শিল্প-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পে বর্ব্বরবাদের ঐতিহাসিক মূল্য

আছে কেবল অত্যাধুনিক এই শিল্পবাদের পটভূমিকায়—ভারতবর্ষের লোক-শিল্প ওসিয়ানিয়ার বর্বরজাতির শিল্পপ্রকর্ষ ও অন্যান্য দেশের লোকশিল্প নূতন অর্থে, নূতন ব্যঞ্জনায় শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে। এই ভাবে বারবার শিল্পজগতে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষণের ফলে কখনও বা উগ্র অত্যাধুনিক শিল্পবাদ অতীতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছে, আবার কখনওবা তাহার বিরোধী মতবাদ অতীতকে সবিনয়ে স্বীকার করিয়া তাহার সহিত আপোষ করিয়াছে। প্রাচীনকালে ধর্ম ও শিল্প হাতধরাধরি করিয়া চলিয়াছিল। এ যুগের 'Post-impressionist'দের দল ধর্মের পথ পরিহার করিয়া বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিলাম নৈরূপ্যবাদের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা বাসিলি কান্দিন্স্কী বৈজ্ঞানিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিকতার পথেই আপন শিল্প-রথকে চালিত করিলেন। কান্দিন্স্কীর নৈরূপ্যবাদের বিরোধী মতবাদরূপে আবির্ভূত হইল উণ্ডহাম লিউইসের 'আবর্তবাদ'। এডওয়ার্ড ওয়াডওয়ার্থ ও নেভিনসন্ এই পথের পথিক। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নৈরূপ্যবাদের চরম পরিণতি 'স্বেচ্ছাচারবাদ' বা দাদাইজম্ জন্ম নিল। এতদিনকার কল্পিত শিল্প-নির্দেশনার দাসত্ব একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল সর্বগ্রাসী স্বেচ্ছাচারবাদে। অনেকে একে 'শিশুবাদ' আখ্যাও দিয়াছেন। এই দায়িত্বহীন শিশুবাদের স্বেচ্ছাচার হইতে পাবকশুদ্ধ হইয়া জন্ম নিল 'শুদ্ধিবাদ' বা Purism। 'শুদ্ধিবাদ' 'নিয়ন্ত্রিত নিয়মরহিতা' তত্ত্বের উদ্বর্তন করিল আর এক নূতন পটভূমিকায়: সংযমের পথে, নিয়মের পথে আধুনিক শিল্পধারার প্রবর্তন ঘটল শুদ্ধিবাদী অজেন ফাণ্ট, জেনেরেৎ এবং লীজারের হাতে। এমনি করিয়াই আধুনিক ইয়োরোপের সৃষ্টিপ্রয়াস রূপ হইতে রূপান্তরে, এক রীতি হইতে অন্য রীতিতে যাওয়া-আসা করিতেছে। প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইয়োরোপে এই নব্য শিল্পরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষণের কাহিনীটুকু সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পুস্তকখানি শিক্ষিত-সমাজের শিল্পদৃষ্টি উন্মেষের সহায়তা করিবে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রাশি-বিজ্ঞানের কথা—শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের ১২১নং পুস্তক। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ।৹ আনা।

লেখক একজন রাশি-বিজ্ঞানবিদ্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশি-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ। রাশি-বিজ্ঞান যে কেবল কতকগুলি রাশি-তথ্যের সমষ্টি নয় বা কতকগুলি সূত্রের সমন্বয় নয়, এইটি যে বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যেটি সম্ভাবনার (probability) মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার সাহায্যে সামান্য নমুনা হইতে পরিপূর্ণের অনুমান করা সম্ভব, নমুনা হইতে পূর্ণকে, সমগ্রকে জানা সম্ভব, লেখক তাহা অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও মধ্যে রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান ত অল্পই, বরং ভ্রমাত্মক ধারণা আছে। লেখক এই ভ্রম দূর করিবার সাহায্য করিয়া দেশের ও সমাজের উপকার করিয়াছেন। পরিশিষ্টে কলিকাতা রাশি-বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক সঙ্কলিত ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রাশি-বিজ্ঞান সারস্বত সঙ্ঘ কর্তৃক অনুমোদিত রাশি-বিজ্ঞানের পরিভাষা দিয়া, যাঁহারা বাংলায় রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহাদের উপকার করিয়াছেন।

আমরা আশা করি লেখক রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলায় একখানি বড় পুস্তক লিখিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ভগবান তথাগত—শ্রীইন্দিরা দেবী। অরুণালোক প্রকাশনী। সচিত্র। মূল্য দুই টাকা।

বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত এই বইটি খুবই সুখপাঠ্য হয়েছে। ইন্দিরা দেবীর লেখা পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। আলোচ্য বইটিতে তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ধর্মসংক্রান্ত বিষয় এত সরল ও সরস ভাবে লেখা সাধারণতঃ খুব কমই দেখা যায়। ছবিও সুন্দর হয়েছে।

বুদ্ধচরিতের পুণ্যকাহিনী বাংলার ঘরে ঘরে জানা প্রয়োজন। জগতে ভারতের সংস্কৃতি-প্রচারের মূল এর মধ্যে নিহিত। সেই জন্য ইন্দিরা দেবীর এই বইখানি সব দিকেই উপযোগী হয়েছে।

প্রেমের গল্প—শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। রীডার্স কর্ণার। সচিত্র। মূল্য সাত টাকা আট আনা।

সমকালীন তেইশ জন খ্যাতনামা লেখকের তেইশটি গল্পের সংগ্রহ। গল্পগুলি লেখকদিগের স্ব-নির্ব্বাচিত।

কবিতা ও গল্পের—বিশেষে প্রেমঘটিত ছোটগল্পের সমালোচনা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কেননা শুধু যে মাপকাঠির বদল যুগে যুগে হচ্ছে তাই নয়, উপরন্তু রসাস্বাদী যারা তাঁদেরও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসে রুচি-অরুচি আসে। আবার সবশেষে আসে অভিনবত্ব, আধুনিকত্বের উৎকট প্রয়াস ও বিরাট সন্ধান।

বিষ্ণুবাবুর সংগ্রহে সব রকমই আছে, অম্লমধুর, তিক্তকষায়, সকল রসেরই পরিবেশন করা হয়েছে। সুতরাং রসিকজন এই প্রেমের বেসাতিতে ইচ্ছামত রসের আস্বাদন পাবেনই। এটা বড় সহজ কথা নয়।

বিখ্যাত লেখকদের বাছাই করা গল্প, সুতরাং পৃথক ভাবে আলোচনা বৃথা। শুধুমাত্র বলা যায় যে, প্রেম কত বিচিত্ররূপে দেখা দিতে পারে তার তেইশটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিচয় এই সংগ্রহে আছে, তাতেই সংগ্রহটি সমষ্টিগত ভাবে সার্থক হয়েছে।

"প্রেমের গল্প" আলোচনা করতে গেলেই প্রথম কথা ওঠে—"প্রেম কি?" ভূমিকায় সম্পাদক আরম্ভেই বলেছেন, "হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম বৃত্তি প্রেম"। একথা অস্বীকার করার দুঃসাহস সমালোচকের নাই। নাই এই কারণে যে, "তার পরই প্রশ্ন আসতে পারে "প্রেমের তুমি কিই-বা জান?" তবে নির্ভয়ে না হোক ভয়ে ভয়েই বলি, সে ত সেই প্রেম যাতে "নাহি কাম গন্ধ লেশ"—যথা:

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম

বড়ু চণ্ডীদাস গাএ।

সম্পাদক মহাশয়ও বোধ হয় সেই কথাই পরে বলেছেন, "কামনা বাসনাকে পরিশুদ্ধ করার কথা বলার পরও আমি বলব, সেকথা প্রারম্ভেই বলেছি, প্রেম দেহকে অস্বীকার করে নয় (না?), অতিক্রম করে। প্রেম কাম নয় কামভিত্তিক। কাম যদি হয় কুসুম, প্রেম তার সৌরভ। 'দেহসম্ভোগ বাসনার উদ্দামতায় যা রিপু, দেহাতীত অথচ সূক্ষ্ম সুন্দর ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ সুকুমার রূপে তাই মানবীয় প্রেম এবং দেহাতিক্রান্ত দিব্য প্রীতিতে তাই-ই ভগবৎ প্রেম।"

অবশ্য ফ্রয়ডীয় 'লিজারেৎ' মহাশয়েরা অন্য কথা বলেন, তবে তাঁদের কথা ও মাথা দুয়েরই উল্টো সোজা বোঝা ভার।

যা হোক পাঠক যেন ভেবে বসবেন না, যে এই গল্পসংগ্রহ বুঝি আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক দর্শনের উদাহরণসমুচ্চয়। কেননা যদি কোনও দার্শনিক মতবাদের ছায়া এই আলোচ্য গল্পগুলির অধিকাংশে পড়ে থাকে তবে সে চার্ব্বাক-দর্শনের। সম্পাদক বলেছেন:

"এই সঙ্কলনগ্রন্থে সমকালীন খ্যাতনামা গল্পকারদের প্রেম, প্রণয়, অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি সম্পর্কে গল্পের একটি নিদর্শন দেবার চেষ্টা করেছি।"

এখানেই বলি চেষ্টা সফল হয়েছে।

ক. চ.

শরৎ-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)—শ্রীকালিদাস রায়। ১০ চারুচন্দ্র এভিনিউ, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ছন্দে লিখিত। কিন্তু গদ্য রচনায় তাঁহার নিপুণতা কতটা এই পুস্তকই তাহার প্রমাণ। গ্রন্থখানি শরৎ-সাহিত্য-পরিচিতি। এই খণ্ডে তিনি শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পণ্ডিত মশাই, নববিধান, অরক্ষণীয়া, চন্দ্রনাথ, বামুনের মেয়ে, বৈকুণ্ঠের উইল, দত্তা, পথনির্দ্দেশ, পরিণীতা, দেবদাস, দেনাপাওনা, চরিত্রহীন, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম, মেজদিদি প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সে বিচারে কৃতিত্ব আছে। কিন্তু প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদে এবং অষ্টম পরিচ্ছেদেও গ্রন্থকার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমনি শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের উপর নানা দিক দিয়া আলোকপাত করে, তেমনিই গ্রন্থকারের মননশীলতা, পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টিরও পরিচয় দেয়। লেখকের মতে শরৎচন্দ্র কোথাও গতানুগতিক নহেন, তিনি ক্রান্তদর্শী, রসশিল্পী, সত্যের আবিষ্কারক। কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র সত্যকে সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নারীজাতির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাকে অসাধ্য-সাধনই বলিতে হয়। সংস্কারকে চূর্ণ করিয়া মানবজীবনকেই তিনি অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সাধনাবলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা, পদ্ধতি ও গঠনভঙ্গী প্রবর্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের অনেক কথাসাহিত্যিকের দীক্ষা শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠে। তিনি আবাল্য যে-সকল নরনারীকে তাঁহার চারিপাশে দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাদেরই জীবনযাত্রা হইয়াছে তাঁহার সাহিত্যের উপজীব্য। জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও জীবনদর্শনের অতি প্রখর গোচর-শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে অফুরন্ত অপরিমেয় সহানুভূতি। সৌভাগ্যক্রমে শরৎচন্দ্র কেবল সত্যদ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি অসামান্য রসস্রষ্টাও ছিলেন। তাঁহার রচনার একটি প্রধান টেক্‌নিক হইল অরঞ্জিত বাস্তব চিত্র দিয়া আরম্ভ করিয়া তারপর তিনি ধীরে ধীরে রঙ চড়াইতেন। শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তক। ঘটনার বিবৃতি বা প্লটের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য নাই, তিনি অতি সূক্ষ্ম নিপুণতার সহিত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিশ্লেষণ অধিকাংশ স্থলে অন্তরের গভীর সহানুভূতির দ্বারা রঞ্জিত। যেখানে আমরা মনুষ্যত্বের বা মহত্ত্বের কোন প্রত্যাশা করি না, সেখানে তিনি মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আকস্মিক আবির্ভাব দেখাইয়া আমাদের চিত্তে একটা বিস্ময়ানন্দের সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্র নূতন যুগের উপায় নূতন ভাষায় নূতন আশা দিয়াছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থকারের দুটি বক্তৃতার অনুলিপি। এ দুটি পরিশিষ্টে দিলে বোধ হয় ভাল হইত। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির সমালোচনা। গ্রন্থকারের কাব্যের মত তাঁহার গদ্যও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। রচনা পরিচ্ছন্ন, সরল, স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল। "শরৎ-সাহিত্য" পাঠ করিয়া বাঙালী পাঠক জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই লাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

জলপ্লাবনের ভূগোল, ইতিহাস ও ভূবিদ্যা—শ্রীআদিনাথ সেন। ৩২, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬০, মূল্যের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দুরূহ বিষয় সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জলপ্লাবনের স্থায়ী প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মতামত ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পনেরটি অধ্যায়ে বাঁধ, জলপ্রবাহ, নদীনিয়ন্ত্রণ, জলাশয়, কৃত্রিম হ্রদ, বহুমুখী পরিকল্পনা, বরফগলা জলে প্লাবন, বৃষ্টিপাতে জলপ্লাবন, সাময়িক প্লাবন, বন্যায় জলপ্লাবন প্রভৃতির কথা আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ও প্রাচীন কালের নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য করা হইয়াছে। প্রথম অংশ পাঠ করিলে সাধারণ পাঠকের মনে জলপ্লাবনের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

দ্বিতীয় অংশে ষোলটি অধ্যায়ে, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবী, মহাকাশ, সৃষ্টি, পৃথিবীর আবরণ, প্রস্তরস্তর, আলোড়ন, গণ্ডোয়ানা, থেটিস সাগর, প্রাচীন ভূগোল ও ইতিহাস, হিমালয় অঞ্চলে আবহাওয়া ও আয়রণের নমনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতামত সঙ্কলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে পৃথিবীর বহু কোটি বৎসর লাগিয়াছে। যেখানে আজ হিমালয় পর্ব্বত এককালে সেখানে মহাসমুদ্র ছিল। পর্ব্বত, নদনদী, জলস্থলের অবিরাম পরিবর্ত্তন চলিয়াছে। জড়জগতের এই সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের বর্ণনা ও তথ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণা গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থকার স্বল্পপরিসরের মধ্যে এই জটিল বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র ও বিশ্বরাজনীতি—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ॥০। পৃষ্ঠা ৩৪।

সমবায় ও সমাজতন্ত্র এই দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ সর্ব্বত্রই করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রকডেলের শ্রমিকগণ যে সমবায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল সেই সম্পর্কে কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ কথাটি ব্যবহৃত হয়। লেখক উহার অনুবাদ 'সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র' করিয়াছেন। জগতের আর্থিক প্রগতি কোন পথে হইয়াছে তাহা লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে। ধনতন্ত্রের পথে এই উন্নতি বহু অবাঞ্ছিত অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার একটি হইতেছে শ্রেণীসংগ্রাম এবং অপরটি দুর্ব্বলের শোষণ। সমবায়-ব্যবস্থা সংগ্রাম ও শোষণ এড়াইয়া আর্থিক উন্নতি কায়েম করিতে চায়। সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন দেশের পরিবেশে ইহার সফলতা দেখা গিয়াছে, সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ও সফলতা এখন পর্যন্ত গবেষণার বিষয়। লেখক বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, জগৎ বিশ্ব-সমবায়ের পথ নিয়াছে। এই সম্পর্কে ভারতের প্রচেষ্টার উদাহরণগুলি লেখক বিশেষ ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমবায়ের পথ শান্তির পথ। রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারত সকলেই শান্তি তথা বিশ্বশান্তি চায়। কিন্তু শান্তি কথাটি সকলে উচ্চারণ করিলেও ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সকলে একমত নহে—বর্ত্তমান বিশ্বরাজনীতি আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। "কার্ল মার্কস ও গান্ধী একজন আর একজনের পরিপূরক" লেখকের এই অভিমত গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্র লোপ পাওয়া' (withering away of the State) সম্পর্কে উভয়ের মত যে একেবারে অভিন্ন এ-কথা বলা সমীচীন নহে। "রামরাজ্য" এবং "রাষ্ট্রহীন সমাজ" উভয়ই একটি আদর্শের বোধক—লেখক ইহা বলিতে চান। অথচ মার্কসের ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থা-ধ্বংসের উপায় ও গান্ধীর উপায় পরস্পরবিরোধী। এ ব্যবধান আস্তিক ও নাস্তিকের, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর ব্যবধান। যাহা হউক আর্থিকবা

পরমার্থিক কিংবা নৈতিক কারণে পৃথিবীর দেশগুলি আজ মহা মিলনের পথে যাত্রা করিয়াছে এ কথার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। লেখকের চিন্তাধারার সকলেই তারিফ করিবেন। সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমবায়তন্ত্র সকল তন্ত্রই ক্রমবিকাশের পথে প্রতিদিন পরিবর্তিত হইয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়েছে। লেখকের আলোচনা-পদ্ধতি সুন্দর। তাঁহার ডায়ালেকটিক যুক্তির দ্বারা আদর্শের অনুসরণ স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। এই সুলিখিত গ্রন্থ পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ঠাকুরাণীর বাঘ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য দুই টাকা।

শিকারের সন্ধানে উড়িষ্যার বনে-পাহাড়ে দীর্ঘ আঠারো বৎসর ঘোরাঘুরি করিয়া লেখক যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে পরিবেশিত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলি যখন 'যুগান্তর সাময়িকী'তে প্রকাশিত হয় তখনই পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ আগ্রহ এবং কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার কারণ—প্রচলিত শিকারকাহিনীসমূহ হইতে এগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। পুস্তকটির প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—শিকার সম্বন্ধে লেখকের অকপট স্বীকারোক্তি। সাধারণের ধারণা শিকারীমাত্রেই অসমসাহসী, তাঁহার প্রাণের ভয় লেশমাত্র নাই। যাঁহারা একাকী শিকারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইয়া শিকার করেন, লেখক তাঁহাদের বাহাদুরি অস্বীকার করেন না। কিন্তু দলবলসহ শিকারে গিয়া গুলি করিয়া হিংস্র জন্তু বধ করার কৃতিত্ব যে শুধু শিকারীর নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ভাগ্যের খেলা' এবং 'নিহত জন্তুটির কৃতিত্ব' একথা বহু স্থানেই তিনি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাওয়া যায় ভদ্রক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রথম বাঘ শিকারের ঘটনাটিতেই, অথচ গুলিবিদ্ধ বাঘটিকে মোটরে তুলিয়া আনিবার সাহস যে তাঁহার হয় নাই সেকথা তিনি অকপটে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

লেখক এমন অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে ও আন্তরিকতার সহিত তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, সুরু হইতেই পাঠকের মনে তাঁহার কাহিনীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে গভীর আস্থার সৃষ্টি হয়। কোথাও কল্পনার রং চড়াইয়া চমক লাগাইবার প্রয়াস নাই, অথচ বর্ণনা এমনি জীবন্ত যে পাঠককে পদে পদে চমকিত হইতে হয়। আমরা যেন মনশ্চক্ষে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই—খাণ্ডি গ্রামের পাঁচ মাইল দূরবর্তী জঙ্গলে বিরাটকায় ভল্লুকটি থাবা মেলিয়া শিকারীদ্বয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত। সহসা মাত্র হাতদশেক দূরের ভালুকের খোলা বুকে যুগপৎ বিদ্ধ হইল চারিটি গুলি—সঙ্গে সঙ্গেই তার মরণাহত কঠোর বিকট চীৎকারে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল নিস্তব্ধ বনভূমি। খুরদায় পথে বিক্রান্তমূর্তি ব্যাঘ্রের কবলে নিহত হতভাগ্য গাড়োয়ান বাইধরের অন্তিম দৃশ্যটি কি বীভৎস-করুণ! "সেই ছোট ফাঁকা জমিটায় বাইধর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—তার বুকের উপর একটি থাবা রেখে বাইধরের ওষ্ঠাধরের দিকে চেয়ে বাঘটি বসে আছে। কি যেন দেখছে সে মাঝে মাঝে, সোজা হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে কোন আততায়ী আসছে কিনা! বাইধরের ওষ্ঠাধর তখনও কাঁপছে। সর্বাঙ্গে ক্ষত, প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। বাঁ পাশের চোয়ালের মাংস ঝুলে পড়েছে। কি মর্মান্তিক দৃশ্য!"..."পাহাড়ের অধিত্যকায় বাঘের বিশ্ববিজয়ী মূর্তি আর তার পদতলে পড়ে আছে হতভাগ্য বাইধর।" এই দৃশ্য লেখকের শিকার-সঙ্গী দীনেশবাবু যেমন বহুদিন ভুলিতে পারেন নাই, তেমনি পাঠকের মনেও ইহা ছাপ রাখিয়া যাইবে। আর ভুলিতে পারা যাইবে না—নয়াগড় রাজ্যের জঙ্গলে বুনো ঘাসের ঝোপের ধারে ডোরাকাটা ব্যাঘ্রদম্পতির সমরেখায় অবস্থিত দু'জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে। সেই ত্রাস জাগানো মূর্তি শুধু লেখকের নয়, পাঠকদেরও 'ধ্যানের বস্তু' হইয়া থাকিবে।

কিন্তু পাঠকচিত্তকে অপরিসীম বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিবে চাঁদকার জঙ্গলের সিন্দুরলিপ্ত শিলাখণ্ডাধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ঠাকুরাণী'র মন্দিরের পাশে অবস্থানকারী শান্ত সমাহিতমূর্তি বিশালকায় চিতাবাঘের কাহিনী। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে জীবহিংসার প্রেরণাশূন্য ঠাকুরাণীর বাঘের স্বচ্ছন্দ বিচরণের কথা পড়িয়া মন শান্ত রসের প্রলেপে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অরণ্যচারী এই পশুটির অহিংস আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজিতে গিয়া বুদ্ধি হার মানে, অলৌকিক ব্যাপারের অন্তর্নিহিত রহস্য অনুদ্ঘাটিতই থাকিয়া যায়। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্রার্থনা করি—শান্ত, ভয়লেশহীন পদক্ষেপে অরণ্যে বিচরণশীল এই বাঘ যেন দীর্ঘজীবী হয়।

লেখকের বর্ণনার মুন্সীয়ানার কল্যাণে "ঠাকুরাণীর বাঘ" পুস্তকখানি শিকার-কাহিনী হইলেও সাহিত্যগুণান্বিত হইয়াছে। আর একটি জিনিষ ইহাকে সমধিক উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে—তাহা ইহার মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত স্নিগ্ধ অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরস। এই হিউমার অরণ্যের ভয়াবহ পরিবেশকেও বহুস্থানে হালকা হাসির হাওয়ায় প্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে। অপরিসীম কৌতূহলোদ্দীপক এবং কৌতুকরসসিক্ত এই শিকারকাহিনীটি বাংলা শিকার-সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। পৃ ৩০৭। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

প্রকাশকের 'নিবেদন' হইতে জানা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা, পত্র, কথোপকথন, বক্তৃতাবলী ইত্যাদিতে যে সব মানবকল্যাণকর উক্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, আলোচ্য পুস্তকখানিতে তৎসমুদয় বিষয়ানুযায়ী এক স্থলে সংগৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর সুচিন্তিত অভিমত জানিবার সুযোগ করিয়া দিয়া প্রকাশক আধুনিক পাঠকসমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিরাট। ইহা হইতে সুষ্ঠু সঙ্কলন খুবই শ্রমসাধ্য এবং বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান-সাপেক্ষ। 'বেদ, উপনিষদ্ বা বেদান্ত গ্রন্থ, উপনিষদ্-তত্ত্ব, আত্মা, ঈশ্বর, গুরু, ধর্ম, পাপ, বিশ্বাস

ও শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধর্ম্ম, ত্যাগ ও বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য, সেবা ও পরোপকার, চরিত্র, হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম, মূর্ত্তিপূজা, সমাজ, জাতি-বিভাগ, বিবাহ, শিক্ষা, নেতা, ভারত —(ক) ভারতের বৈশিষ্ট্য, (খ) ভারতের অবনতির কারণ ও (গ) ভারতের পুনরুত্থানের উপায়, বিবিধ প্রসঙ্গ—এই অধ্যায়গুলিতে স্বামীজীর উক্তিগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ সমুদয় যেমন সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ তেমনি সাবলীল ও সুখপাঠ্য। স্বামীজীর মতামতগুলি এখনও, অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে যুক্তিসহ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। নিষ্ঠাবান্ সমাজসেবী এবং শিক্ষা-নেতাদের এই নিবন্ধগুলি দিগ্‌দর্শন স্বরূপ হইবে। এখানে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। স্বামীজীর কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে মূলে বা অনুবাদে এই নিবন্ধসমূহ সঙ্কলিত তাহার কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। এরূপ নির্দ্দেশ থাকা বিবেকানন্দ-সাহিত্যরসিক এবং গবেষকের পক্ষে ইহা খুবই প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ ত্রুটির সংশোধন হওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইবে নিশ্চয়।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। পৃ. ৫+১১৯। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

গ্রন্থকার ১৯৫৬ সনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'নিবেদিতা-লেকচারার' রূপে ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এই বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন যে, নিবেদিতা-জীবনের মূল ঘটনাবলী পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে "বিভিন্ন ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ভারতীয় শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, জাতীয়তা ও জাতির মুক্তি-সংগ্রামে তাঁহার কি অমূল্য অবদান তাহার সম্যক পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।" পুস্তকখানি পাঠে লেখকের শেষোক্ত উক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'সিষ্টার নিবেদিতা' (ভগিনী নিবেদিতা) গুরু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত নাম। তাঁহার পূর্ব্ব-নাম 'মিস মার্গারেট নোব্‌ল'। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বপর্যন্ত মিস নোব্‌ল নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় সবিশেষ সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী রূপেও তাঁহার অভিজ্ঞতা কম হয় নাই। তিনি সুশিক্ষিতা, যুক্তিপন্থী, আত্মপ্রত্যয়শীল আইরিস জাতিসুলভ বিদ্রোহী। মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-স্নেহ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই তাঁহাতে পরিস্ফুট হইয়াছিল। এহেন পরিণতবুদ্ধি, মানবসেবাপরায়ণা মিস মার্গারেট নোবল স্বামীজীর বক্তৃতা, উপদেশ ও শিক্ষায় তদীয় মানস-কন্যা সিষ্টার নিবেদিতায় পরিণত হইলেন। ভগিনী নিবেদিতার জীবনকথার আলোচনায় এ কথাটি যেন আমরা না ভুলি। নিবেদিতা ভারত-মাতার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাই তিনি সত্য সত্যই 'নিবেদিতা'। সে যুগের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ্, ধর্ম্ম-নেতা—সমুদয়েরই শ্রদ্ধা-প্রীতি তিনি নিজগুণে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'লোকমাতা'। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের 'বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে'র প্রেরণাদাত্রী তিনি। তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। তাঁহার জীবনকথা আজকাল যে আলোচিত হইতেছে, জাতির পক্ষে ইহা বড়ই শুভ লক্ষণ। আমরা গ্রন্থকারকে অভিনন্দন জানাই। এই সুলিখিত তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানি প্রত্যেক বাঙালীর হস্তে বিরাজ করুক ইহাই কামনা।

কর্ম্মবীর রাসবিহারী—শ্রীবিজনবিহারী বসু। প্রকাশক—শ্রীমতী ইলা বসু, গোমো, মানভূম। পৃ ৪+৩৪৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনকথা প্রত্যেক বাঙালীরই অনুধাবনযোগ্য। আমরা কৈশোরে 'প্রবর্ত্তক' মাসিকে তাঁহার বিপ্লবকার্য্যের বিবরণ সম্বলিত লেখাগুলি যখন পাঠ করিতাম তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইতাম। তাঁহার রচনাশৈলীর উৎকর্ষ হয়ত তেমন বুঝিতাম না, কিন্তু বিভিন্ন লোমহর্ষক ঘটনাপুঞ্জের মাদকতা আমাদের যেন পাইয়া বসিত। রাসবিহারী আইনতঃ জাপানের বাসিন্দা হইলেন, সেখান হইতে ভারতের সপক্ষে রাষ্ট্র-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এ সকল কথাবার্ত্তা আমরা শুনিতে পাইতাম। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথমার্দ্ধে তাঁহার কার্য্যকলাপ পুনরায় আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে নেতৃত্বভার অর্পণ করিয়া রাসবিহারী অবসরগ্রহণ করেন ১৯৪৫ সনের ২১শে জানুয়ারী তিনি মারা যান।

রাসবিহারী-জীবনের এই কয়েকটি স্থূল কথা মাত্র এ যাবৎ আমাদের বিশেষ জানা ছিল। আমরা এত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাব বোধ করিয়াছি। রাসবিহারীর অনুজ অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী বসু বর্ত্তমান জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া এই অভাব অনেকাংশে নিরাকৃত করিয়াছেন। রাসবিহারীর মত ভারতমাতার একনিষ্ঠ স্বাধীনতাকামীর জীবনকাহিনী ও কার্য্যকলাপ আমাদের এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জানা একান্ত আবশ্যক। অথচ তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই জানি। এই পুস্তকখানি পাঠে আমাদের সে ক্ষুধা অনেকটা চরিতার্থ হইবে, আমরা যথেষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিব। স্বাধীনতার নূতন পরিবেশে জাতির কর্ম্মপ্রচেষ্টা নূতন পথে পরিচালিত হইতে বাধ্য, হইবেও তাহাই। কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে ভারত সন্তানদের। সর্ব্বাত্মকনিষ্ঠা, ত্যাগ ও ধৈর্য্যশীল সেবাপরায়ণতা। রাসবিহারীর মধ্যে এই সমুদয় গুণই অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হইত। রাসবিহারীর জীবন হইতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সেবার ভাব আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। পুস্তকখানির লিখনভঙ্গী, ঘটনা-সমাবেশ প্রভৃতিতে ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু গ্রন্থকার যে একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর মাল-মশলা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন সেজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL

দেশ-বিদেশের কথা

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মহর্ষি চরক জয়ন্তী ও রজত জয়ন্তী

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ও পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কবিরাজ শ্রীগঙ্গাকুমার মজুমদারের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে তিন দিন ব্যাপী (৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৬, ও ১লা জানুয়ারী '৫৭) মহর্ষি চরক জয়ন্তী ও পরিষদের রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৩০শে ডিসেম্বর, মহর্ষি চরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। সমবেত সুধীবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি এবং অধ্যাপক, শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ড. শ্রীকালিদাস নাগ, ড. শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি চরক-সংহিতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনতীর্থ এই আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন। ৩১শে ডিসেম্বর রজত জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত. সভাপতির আসনে বৃত হন কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন; রাজস্থানের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীপ্রেমশঙ্কর শর্ম্মা বিশিষ্ট অতিথি রূপে হিসাবে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন, কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশ শর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীমুরারি ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। ১লা জানুয়ারী, আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ডাঃ শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী, সভাপতিত্ব করেন কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এই উপলক্ষ্যে মিউনিসিপাল-মিউজিয়ামে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

সন্ধ্যা মজলিসের বার্ষিক অধিবেশন

গত ২০শে মাঘ দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা সাহিত্য-সংস্থা "সন্ধ্যা মজলিসে"র বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে সাহিত্যিক শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রনাথ হালদার। সংস্থার স্থায়ী সভাপতি সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ অতিথিদের পরিচয় দেওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অতঃপর ছাত্র-সম্পাদক অমৃত আচার্য্য কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পাঠ করেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন; রবীন্দ্র-সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। রচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারীদের গভীর নিষ্ঠার পরিচয় থাকাতে অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়। ছোট গল্প যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন অঞ্জলি চন্দ ও গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধে প্রথম হন কল্পসি পাল। প্রধান অতিথি মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ দেন, বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক হালদার 'রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতা' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন এবং সভাপতি মহাশয় দ্বারভাঙ্গার বঙ্গ-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন।

প্রবাসী ও স্থানীয় ছাত্র এবং অধ্যাপকবৃন্দের মিলিত উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই মজলিস মাত্র ১৩৫৩ সালে জন্মলাভ করেছে। বাঙালী সাহিত্যানুরাগী ছাড়াও বহু বিশিষ্ট মিথিলাবাসী ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। প্রাচীনকাল হইতে দুই প্রদেশের সাংস্কৃত ভূমিতে যে আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ় রহিয়াছে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোষ্ঠবিহারী দে

গত ৫ই জানুয়ারী অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রায়-

গোষ্ঠবিহারী দে
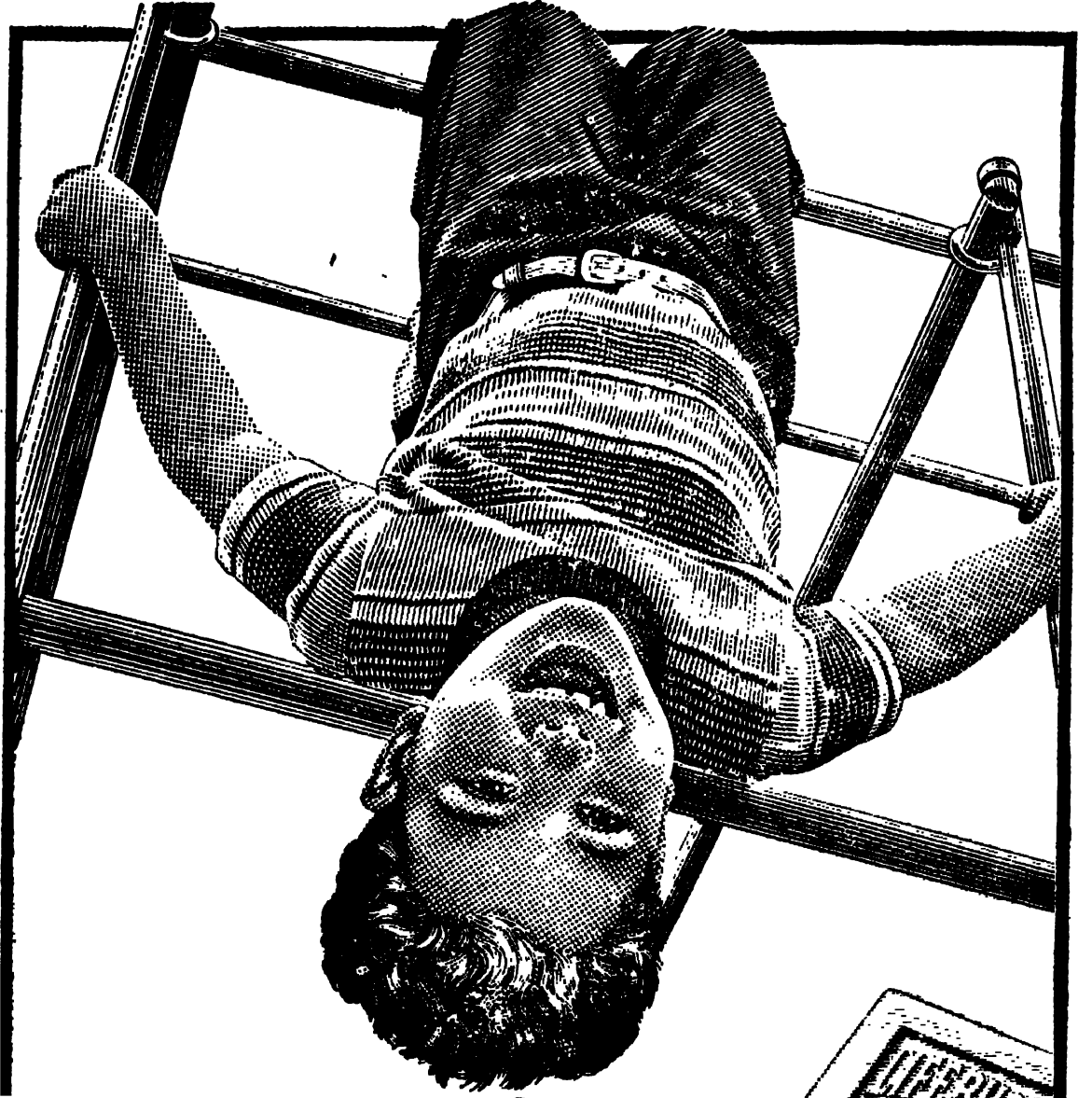
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্তে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
L. 247-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

বাহাদুর গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের-ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার নাগপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮১ সালে বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জাড়গ্রাম নামক পল্লীতে গোষ্ঠবিহারীর জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে প্রবাসে থাকিতে হয়। পাটনা কলেজ হইতে বি-এ এবং নাগপুর মরিস কলেজ হইতে বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলা আদালতে আইনব্যবসা আরম্ভ করেন। অবশেষে ১৯০৫ সনে মধ্যপ্রদেশে বিচার বিভাগে মুন্সেফ নিযুক্ত হন। ১৯২৮ সনে তিনি যখন মধ্যপ্রদেশে অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ ছিলেন তখন সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়া ভারত সরকারের আইন বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ সনে নাগপুর হাই-কোর্টের রেজিষ্ট্রার পদ লাভ করেন। ১৯৩৫ সনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কোর্ট ফি বিল প্রণয়ন করিবার কার্য্যে মধ্যপ্রদেশের আইন-সভায় সরকারী প্রতিনিধি মনোনীত হন। ১৯৩১ সন হইতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত জেলা ও দায়রা জজের কার্য্য করেন। এই কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর ১৯৩৭ সনে ধার ষ্টেটের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সনে ঐ পদে ইস্তফা দেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই ভারত সরকার তাঁহাকে এক্টি-কয়াপশন ট্রাইবুনাল—সাদার্ণ কমাণ্ডের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করেন। এই ট্রাইবুনালের কার্য্য সমাপ্ত করিবার পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এস কে. ঘোষ, আই-সি-এস প্রভৃতির বিরুদ্ধে আনীত প্রসিদ্ধ মামলায় বিচার-ট্রাইবুনালের সভ্য নিযুক্ত হন।

গোষ্ঠবিহারী বাবু প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আজীবন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ১৩৪৮ সালের কলিকাতা অধিবেশনে বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার লিখিত—C. P. Land alievatton Act-এর টীকা আইন-ব্যবসায়ী ও বিচারক-গণের নিকট বিশেষরূপে আদৃত হয়। তিনি গীতার একটি বঙ্গানুবাদ টীকা (ভাষ্য) প্রণয়ন করেন কিন্তু তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি তাঁহার জন্মস্থান জাড়গ্রামের "মাখনলাল পাঠাগার" নামক প্রতিষ্ঠানের গৃহনির্ম্মাণার্থ তিন হাজার টাকা, উক্ত গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের জলকষ্ট নিবারণকল্পে একটি ইঁদারা খননের জন্য এক হাজার টাকা এবং তাঁহার মাতুলালয় পাঁচড়াগ্রামের বুড়া শিব-মন্দিরের সংস্কারের নিমিত্ত দুই হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং বহু দুঃস্থ ও দরিদ্র ছাত্রকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন।

দে মহাশয়ের সাহিত্যানুরাগ প্রবল ছিল। পল্লীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় তিনি বিচলিত হইতেন এবং সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। প্রবাসে থাকিলেও তিনি জন্মভূমিকে কখনও ভুলেন নাই।

নর্ম্মদা নদীতে শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ২৬শে জানুয়ারী জব্বলপুর হইতে তের মাইল দূরে নর্ম্মদা নদীর ভেড়াঘাটে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসুর তিন পুত্র—ভাস্কর, অমের ও অংশুমান—নদীতে মজ্জমানা ভাস্করের নব-বিবাহিতা পত্নী সুস্মিতা (ইভা)-কে বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বধূটিও জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন।

অংশুমান বসু

ভাস্কর (বয়স ৩০) ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্ম্মানীতে শিক্ষালাভ করিয়া বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীতে অফিসারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

জয়ের (বয়স ২০) এবার সাগর ইউনিভারসিটির বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। অংশুমান (বয়স ১৬) স্থানীয় স্কুলে প্রী-ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেন।

ভাস্কর বসু

ইন্দিরা (ইভা) বসু

ইভা (বয়স ২০) বিহারের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅমিয়কান্ত দত্তের প্রথমা কন্যা। তিনি মহিলা কলেজে বি-এ পড়িতেন, গত ২০শে জানুয়ারী ভাস্করের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবার পর তাঁহারা উভয়ে ভাস্করের পিতামাতার কাছে আসিয়াছিলেন।

ভাস্করের জননী শ্রীঅমিতাকুমারী বসু 'প্রবাসী'র একজন লেখিকা। বহুকাল যাবৎ 'প্রবাসী'তে তাঁহার প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বসু-দম্পতি এই গভীর শোকে সান্ত্বনা লাভ করুন, ভগবানের নিকট আমরা ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

সুনির্মল বসু

বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক সুনির্মল বসু গত ৫ই ফাল্গুন, টালিগঞ্জ সেকেন্দ্রপুর রোডস্থ তাঁহার নিজ বাসভবনে করোনারী-থ্রম্বসিস রোগে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সুনির্মল বাবুর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মালখানগরে। তাঁহার পিতা পশুপতি বসু একজন বিখ্যাত অভ্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। গিরিডির বস্কঙ্ক পাহাড়ের কোলেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তিনি বিখ্যাত 'বিপ্লবী' ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার দৌহিত্র।

সুনির্মল বসু

গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ সুনির্মল বাবু অক্লান্ত ভাবে গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা বাংলা শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ছোটদের গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি সকল শ্রেণীর রচনায় তিনি সমান দক্ষতা দেখান, তবে ছোটদের কবিতা ও ছড়ায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক। তন্মধ্যে ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈ-চৈ, হুলস্থুল, কথা শেখা, পাততাড়ি,

ছবির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার ডান দিকে (তৃতীয়) শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

মরণের ডাক, ছন্দের টুংটাং প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। তিনি 'ছোটদের চয়নিকা' এবং 'ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন' নামক সঙ্কলন গ্রন্থ দুইখানিও সম্পাদনা করেন। এই কৃতী সাহিত্যিকের লোকান্তরগমনে বাংলা শিশু-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

সারস্বত সম্মেলন

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২৪৯নং আপার চিৎপুর রোডে বাণী-মন্দির, সাহিত্য-সভা, সঙ্গীত সমাজ ও তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে, বাণী-অর্চনা উপলক্ষে প্রবাসী সম্পাদক শ্রীকেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সাহিত্যা লোচনা ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল; সভাপতি মহাশয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি মনোরম ভাষণ দেন। ধ্রুপদ গানে গীতা ও অমিতা সান্যাল এবং চাপা চাকলাদার অংশ গ্রহণ করেন। অরুণা ঘোষ দুইখানি ভজন গান করেন, খেয়ালে চাপা চাকলাদার ও রেণা বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ধ্রুপদ ও ধামারে অংশ গ্রহণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

ভগবান বুদ্ধদেবের ২৫০০তম জয়ন্তী
উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত
বহু চিত্রপরিশোভিত, সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে
সজ্জিত অনুপম বুদ্ধচরিত
॥ বুদ্ধ-জয়ন্তী অর্ঘ্য ॥
মণি বাগচির
গৌতমবুদ্ধ
দাম—চার টাকা
OUR
BUDDHA
Price Rs. 3/- only
কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের
অমিতাভ
দাম আড়াই টাকা
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী কলি